

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

১। কথাযুত	(গদ্য)		১
২। ভারতের সম্রাট ও তাহার সমাধান	(প্রবন্ধ)	ডাঃ নরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত	২
৩। বিরকোড়ালনে বঙ্গ মহিলা	(প্রবন্ধ)	ঐনির্ভালচন্দ্র চৌধুরী	৭
৪। বন কেটে বসন্ত	(উপন্যাস)	মনোজ বসু	১২
৫। ছবি	(প্রবন্ধ)	ঐবদ্যনাচরণ ভট্টাচার্য	১৭
৬। শিশির-সান্ত্বিত্তে	(কবিতা)	যদি মিত্র ও বেবকুমার বসু	১৮
৭। পত্রিকা			২২
৮। অশ্ব ও অশ্বের ঐশ্বর্য	(কবিতা)	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২৪
৯। আলোকচিত্র			২৪(ক)
১০। চার জন	(ব্যঙ্গাত্মক গল্প)		২৬
১১। জীবন-গীতা	(প্রবন্ধ)	ঐশ্বর্য সেন	৩০

ছোটদের জন্যে কৃত-প্রকাশিত সুপার্য রচনাবলী

লীলা মজুমদারের লেখা

বাঘের চোখ

সজ্জা নতুন কাহিনী। ছোট বড় সকলকার পক্ষেই চিত্তগ্রাহী। ২'৫০

প্রমোদে মিত্র রচিত

ড্যাগনের নিঃশ্বাস

পরিবর্তিত সংস্করণ। "ড্যাগনের নিঃশ্বাস" ও "পিশুড়ে পুরান"—একত্রে। ২'৫০

জনজয় বৈরাগীর

মধুরাই

নতুন আকারে নতুন প্রচ্ছদে পোস্তন সংস্করণ। উপহারে অনবদ্য। ২'৫০

কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে

এম্. সি. সি. ক্যাডেট বিষয়ের বিবাসের স্বেচ্ছা হিমালয়-অভিযান-শিক্ষার্থীর দিনজিপি। নতুন ধরণের বই। প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পে ঐক্যগুরুত্বপূর্ণ। সুন্দর সচিত্র বই। ছোট বড় সকলকার পক্ষেই। ২'০০

.....প্রকাশিত গ্রন্থাবলী.....

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থিত গল্প। প্রতিভা বসুর প্রেমের গল্প। বুদ্ধদেব বসুর সাড়া। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নতুন তারা।

৪৭ সংস্করণেও যে উপন্যাসের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে

জনজয় বৈরাগীর সবুজখর্ষী বাতবাবাী রচনা

এ ক মু ঠা আ কা জ

কল্যাণবাদের পর আর-এক নতুন ধ্রুপদ যোষণা। ৫'০০

পরিবর্তিত সংস্করণ। ৩'০০

ফণ্ডেটে বসি ক্রম

সংলা গায়িতার জন্যে রচনা

সংস্করণে নবী রচিত

বিক্রয় প্রাপ্য। ৩'০০

মুদ্রিত

পরিবর্তিত সংস্করণে নবী রচিত

সংলা গায়িতার জন্যে রচনা

অজ্ঞাত উল্লেখযোগ্য বই : বিহারক ভট্টাচার্যের অজ্ঞানতার চিঠি ৩'০০ ॥ পরিবর্তিত সংস্করণে নবী রচিত ২'০০ ॥ মোক্তার বোনের ভক্তব্রতের সংস্করণ ৩'০০ ॥ ঐশ্বর্যর জীবন-গীতা ৩'০০ ॥ শতাব্দীর রাজচৌধুরীর ডাক চিত্রিতের সংস্করণ ৩'০০ ॥ হরন রত্নের আকাশ প্রকাশ ৩'৫০ ॥ বিজুতি ওড়ার বাঁধ ৩'০০ ॥ প্রমোদে মিত্রের লাইনে চড়াই ১'৫০ ॥ বিহারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাইনে চড়াই ১'৫০ ॥

একমাত্র পণ্ডিত : পত্রিকা সিণ্ডিকেট। ১২১১, ক্রিস্টেন স্ট্রিট, কলি : ১৬।
নিউ কলি : কোল কলেক্ট, নিউ কলি-১ ॥

সূচীপত্র

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
১৫। এই স্মৃতি হানি।	(কবিতা)	৩৭
১৬। ভেড়া-কিপ-নার	(বিপ্লব কাহিনী)	৩৮
১৮। অজিতের দিনে	(কবিতা)	৪২
১৫। বিদেশিনী	(উপভাস)	৪৩
১৬। শেব কথা	(কবিতা)	৪৭
১৭। অজ্ঞানী হৃদয়	(উপভাস)	৪৮
১৮। বাতিঘর	(উপভাস)	৫৪
১৯। বিসর্গ	(কবিতা)	৫৮
২০। জাবি এক, হয় আর	(উপভাস)	৬০
২১। বিজ্ঞান	(কবিতা)	৬৪
২২। অনিন্দ-বুলায়ন	(সংস্কৃতকাব্য)	৬৬
২৩। চম্পা তার নাম	(উপভাস)	৬৯
২৪। বিপ্লবের সন্ধান	(বিপ্লব কাহিনী)	৭৭
২৫। বোতলের সাহা-প্রতিলিপি	(কবিতা)	৮৫



দে এণ্ড দত্ত
জার্নালিস্ট এণ্ড লিটারেরি ম্যানেজার
১৯৭ বঙ্গবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা-৩২

বিশ্বস্ততা
আধুনিকত্ব
ও
মনোরমশিল্প-
নিপুণতায়।

হাতই আপনার ভাগ্য

জানতে চান?

আমুন অথবা দুই হাতের ছাপা পাঠান।

পারিভ্রমিক ৫/- হইতে ২০/- টাকা।

মাষ্টার পাস্টি

ভূপেন চ্যাটার্জি বি. এ.

মিউ ট্যালিগ্রাফ (মিউন বাস) ভাঙ্গা কলিকাতা-৩৩

(৬ নং বাসে মেস্তাজী নগরে নেমে পথের ওপারে অথবা

৪ নং বাস ঠিক থেকে আসিতে হয়)

আর একখানি উপহার গ্রন্থ ছত্রপতি শিবাজী

৬ সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত

যে বীরের কৃপার উক্ত পোষিত প্রাণ। করিয়া জননী অমৃতমি পু
করিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণসংগে, অনুদিন স্বরাজ্য ছত্রপতি মহার
শিবাজীর উপাসনায় ভক্তিমিত্তক ও ভাবভর্য বীর চরিত্র পা
অমৃতক মনোহাতিতে প্রকাশিত হইবার সঙ্কল্প কর্তব্য করেন।
শিবাজী পূর্বে কিয়দ বিস্তারিত। ভক্তিমিত্তক ১৬ পৃষ্ঠা ৩৫/-
বুৎ প্র. কার্যেই বিবাহ। মূল্য দুই টাকা।

বঙ্গবাজার সাহিত্য দপ্তর : কলিকাতা - ৩২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
২৬। কাল ভূমি আদ্যের	(উপভাস) আভ্যন্তরীণ মুখোপাধ্যায়	১৬
২৭। শ'	(জীবনী) ভবানী মুখোপাধ্যায়	১৮
২৮। বিদেশে	(গল্প) শ্রীজ্যোতিরীন্দ্র বোহা (ভাস্কর)	১০২
২৯। মজলিস	(গল্প) শ্রীগণেশচন্দ্র দাস	১১২
৩০। অকাজের কাণ্ড	(গল্প) সুরেশ্বর বার	১১৭
৩১। কারার কাণ্ড	(গল্প) ফুলটন আওরাসলার—অনুবাদ : অমির ভট্টাচার্য	১২০
৩২। গুণাভিলি	(জীবনী) সি. এক, অ্যান্ড—অনুবাদ : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	১২১
৩৩। বিবাদ	(কবিতা) ডি. এইচ. লয়েল—অনুবাদ : অমির ভট্টাচার্য	১২৮
৩৪। ভূবর্গ পরিক্রমা	(জয়গ-কাহিনী) শ্রীনিবাসদাস নাগ	১২৯
৩৫। অজস্র ও প্রোজা—		
(ক) পূর্বা-সত্ত্বা	(গল্প) পূর্ণী চন্দ্রসর্বা	১৩৬
(খ) গজাব ধার	(গল্প) কল্যাণী বসু	১৪০
৩৬। ছোটদের বই—		
(ক) দিন আগত ঐ	(উপভাস) বনজর বৈরাগী	১৪২

— ছোটদের পড়বার কয়েকটি বই —

মিকোলাই মোলভের

ভিটিয়ার কাণ্ড

সোভিয়েতের নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে স্থল পালানো দুই ছেলে কেমন করে সেরা হাতে পরিণত হইল তার কৌতুহলজনক অথচ শিক্ষণীয় কাহিনী।

দাম : ২'৫০

বোরিস পোলেভের

একটি সাচ্চা মানুষের গল্প

এক বৈমানিকের অসামান্য আত্মপ্রত্যয়ের কাহিনী। বাংলার কিশোরদের মত করে দেখা।

দাম : ১'৭৫

এস. কসমোভেভিয়ানস্কার

জন্ম শুরুর কথা

গত মহাবুদ্ধে মাতৃভূমিকে জাধীন করল হস্ত করতে গিয়ে দুটি কিশোর-কিশোরীর আত্মদানের কাহিনী লিখেছেন তাদের মা।

দাম : ৩'৫০

ইলির ও মোলভের

মানুষ কি করে বড় হয়

লক্ষ বছরের বিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষের 'বড়' হওয়ার কাহিনী।

দাম : ৩'৫০

রুশ বিজ্ঞান কাহিনীকারদের দেখা

চাঁদে অভিযান ৩'০৫

ডি. আই গ্রন্থের

অতীতের পৃথিবী

কোটি কোটি বছর আগে জেলির মত এক কোথী অলঙ্কার প্রাপ্তি থেকে মানব জাতির ক্রমবিকাশের মনোজ্ঞ বর্ণনা।

দাম : ১'৬২

এক, আই, চেন্ডমভের

আয়নোশ্ফিয়ারের কথা ১'৫০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বক্স চার্টার্ড স্ট্রিট, কলিকাতা—১২ । ১৭২ ধর্মভাড়া স্ট্রিট, কলিকাতা—১৩

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
(খ) কেন চাক পড়ে	(প্রবন্ধ) শ্রীমান জগদীশ	১৪৫
(গ) অভিশপ্ত মাঝি	(প্রবন্ধ) দেবজিত ঘোষ	১৪৬
৩৭। লেখা ও লেখক	(সংগ্রহ) শ্রীমান চন্দ্রশঙ্কর	১৪৮
৩৮। আলোকচিত্র		১৪৮(ক)
৩৯। কেনা-কাটা	(কাব্য-বাণিজ্য)	১৪৯
৪০। বিজ্ঞান-সার্ভা		১৫২
৪১। নাচ-গান-বাজনা—		
(ক) উত্তরবঙ্গের মহাশয়তীর পান	(প্রবন্ধ) বঙ্গীয় সুখোপাধ্যায়	১৫৪
(খ) দেবর্ষ পরিচয়		১৫৫
(গ) আমায় কথা	(আত্মপরিচিতি) শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য	১৫৬
৪২। গ্রন্থের গতি	(কবিতা) শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৭
৪৩। পাগলা হত্যার মায়ালা	(রহস্যোপভাস) ড. পঞ্চানন ঘোষাল	১৫৮
৪৪। পূর্ণ বসি, শূন্য হবো	(কবিতা) পবন মণ্ডল	১৬৪
৪৫। সাহিত্য-পরিচয়		১৬৬

বস্ত্রশিল্পে মোহিনী মিলের

অবদান অতুলনীয় !

মূল্যে, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন

১ নং মিল—

২ নং মিল—

কুটীয়া, বদৌয়া : বেলবরিয়া, ২৪ পরগণা

ম্যানেজিং এজেন্টস্—

চক্রবর্তী, সন্ন এণ্ড কোং

রেজি: অফিস—

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।



শ্রীরামপুরের
এন্ড চক্রবর্তীর

স্টেম্পাল
XX
মার্ক

লক্ষ্মী এডেন্সী

৪৩/৩, ফ্র্যাঙ্ক রোড • কলিকাতা-৭

আমেরিকার বিস্তৃত হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ

প্রতি জুলাই ২২ অং পঃ ও ২৫ অং পঃ, পাইকারগণকে উক্ত কমিশন দেওয়া হয়। আমাদের নিকট চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তকাদি ও ব্যবহার্য সরঞ্জাম দ্রুত মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। ব্যবহার্য পীড়া, স্নায়বিক সোপান, অকুশ, অনিদ্রা, অর, অসীর্ণ প্রভৃতি ব্যবহার্য জটিল রোগের চিকিৎসা বিচক্ষণতার সহিত করা হয়। অক্ষঃক্ষয় রোগীদিগকে ডাকঘোরে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক ও পরিচালক—ডাঃ কে, সি, কে এল-এম-এক, এইচ-এম-বি (সোসে মেডিসিট), ডুতগুর্সে হাঁডস, কিনিদিসন, ক্রোয়েল হাসপাতাল ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল ইন্সটিটিউট এন্ড হাসপাতালের চিকিৎসক।

কম্প্রাইস করিয়া অর্ডারের সহিত কিছু অগ্রিম পাঠাইবেন।

হোমিওপ্যাথ হোমিও হেল্পিং, নিউকাম্পন রোড, কলিকাতা-৩৫

সূচীপত্র

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
৪৬। খেলাধুলা		১৬১
৪৭। রক্তপট—		
(ক) শক্তির টুকরো	অপরিচিতি	১৭১
(খ) হাতের অঙ্ককায়ে	সাধনা বসু : অজুবাণ—কল্যাণিক বন্দোপাধ্যায়	১৭২
(গ) তত্ত্ববিবাহ		১৭৩
(ঘ) রক্তপট প্রসঙ্গে		ঐ
৪৮। প্রচ্ছদ-পরিচয়		ঐ
৪৯। দেশে-বিসেলে	ঘটনা-পত্রী)	১৭৪
৫০। অবন্তন পৃথিবী	হস্তোপভাস)	১৭৬
৫১। সাময়িক প্রসঙ্গ—	ড. পঞ্চানন বোষাল	
(ক) দেশের শিল্প		১৮১
(খ) কঠোর দৃষ্টি চাই		ঐ
(গ) স্বাভাবিক সালসে		ঐ
(ঘ) আজন্তবী খবর		১৮২
(ঙ) বর্তমান বিশ্ববিজ্ঞানের		ঐ
(চ) দর্শন		ঐ
(ছ) শোক-সংবাদ		ঐ

সমগ্র প্রকাশিত

শঙ্করনাথ রায়ের

ভারতের সাক্ষী (৫ম খণ্ড) মূল্য ৬.৫০

- যোগী, তাত্ত্বিক, বৈদান্তিক ও মনো সাধকদের প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। নিগূঢ় তথ্য ও তত্ত্বের ভরপুর। প্রত্যেকটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ।
- বিশিষ্ট পত্র পত্রিকা ও বিদগ্ধ সমালোচক অভিনন্দনযুক্ত এই মহান গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।
- পাঠাগার, ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার দেবার পক্ষে অপরিহার্য।

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজের

সান্দ্রদর্শন সংপ্রসঙ্গ (১ম খণ্ড)

মূল্য—৫.০০

ভারতবিশ্বস্ত মহাপণ্ডিত ও কের দৃষ্টিতে সারাজীবন ধরে ধরা পড়েছে যে সব আলৌকিক জীবন ও ভক্ত, এই তা বর্ণিত হয়েছে সহজ সাবলীল ভাষায় ও ভঙ্গীতে।

বংশধর মনুসংস্করণের

পাণ্ডুলিপি মূল্য ৪.৫০

প্রতিভাধর লম্বাক-সচেতন লেখক এ উপজাতি বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সংযোজন।

শ্রমিকদের চিঠি : ...ভাষার, বর্ণনাকৌশল ও ঘটনা বিভাগে লেখক শিল্পী মনের পরিচয় দিচ্ছেন। ...উপজাতির গল্প ডিটেইল্ড, উপজাতির মত চমকপ্রদ হইরাও মানবজীবনের ও মনো আদর্শকেই জরবৃদ্ধ করিচ্ছে। স্বল্প অক্ষুণ্ণ ও মননশীলতার ইহা নিছক রোমাঞ্চ কাহিনী হয় নাই। শিরশ্চিহ্ন : ...

প্রাচী পাবলিকেশন : ২/২ সেবকবৈষ্ণব স্ট্রীট, কলিকাতা—২৯

ফোন : ৪৬-২৯৬৫

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

প্রকাশিত হল
শেখালি নন্দীর

গীতিমুখর ভিয়েনা ২.০০

ভিয়েনার সবচেঁহ ইতিহাস ও ব্যাতির কাহিনী পড়ের হলে দেখা,
বাংলা ভাষায় এখন বই।

ত্রিপুরাশতক সেরে

উনিশ শতকের বাংলা-সাহিত্য ৫.০০

(সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য নিয়ে সমগ্র ও সামগ্রিক
আলোচনা);

নারায়ণ চৌধুরীর

সাহিত্যের সমস্যা ৩.০০

(অধ্যাত সবলোচ্চ বাংলা-সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন)

যোগেশ বাগলের

ভারতের মুক্তি সঙ্কামী ৫.০০

(রামমোহন বোম, আদমবোম, অবিদ্যুৎ, ভগিনী বিবেকিত
একটি ভারতীয় মুক্তি সঙ্কামীর কল্পনাবন ও সাক্ষার কথা দেখা হয়েছে।
ভূমিকা লিখেছেন বহুনাথ সরকার।)

উৎপল দত্তের

হান্সান্ট (নাটক) ২.৫০

ডাঃ অধিনাশ ভট্টাচার্যের

ইন্টারোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা ৪.০০

(ভাবাতী কৃষ্ণা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বীর সাতারকার,
মহানন্দা ফিড়া প্রভৃতি বিপ্লবীদের কার্যকলাপের ইতিহাস।)

এই থেকে গ্রহে ১.৫০

(দিল জ্যোতির্বিজ্ঞানী: জ্যাকবিনের বইএর বাংলাবাদ। জয়
বিজয়ের পর গ্রহ থেকে গ্রহে সৌর্যের বাতাস কি করে সত্ত্ব হবে
তাই আলোচনা করা হয়েছে এ বইয়ে।

দক্ষিণাচরণ বসুর

হেড়ে আসা গ্রাম (২য় খণ্ড) ৩.৫০

ঈশ্বর, জিহ্বা, শ্রীহট, রাজসাহী প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন গ্রামের
বেদনায়র দৃষ্টি ও ইতিহাস।

সোফিস্ট—স্মৃতিচিত্র ৪.০০

(ভালভ, তেজ প্রভৃতি সত্যজন রূপ প্রকৃতির, দৃষ্টিজ্ঞা)

শেখালি নন্দীর

সঙ্কামীর চোখে পশ্চিম ২.৭৫

(পাশ্চাত্য জনগণের কাহিনী)

প প লার লাইব্রেরী—১১৫১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৩

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রমত্তা বন্দী

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরদের
বিশ্ব-প্রসিদ্ধ রচনার সমাবেশ

টলষ্টয়ের—কুৎসার সোনাটা

এ-যুগের অভিধাপ

গোকর্ন—মাধার

ম্মা

রেনে মারর—বাতোয়াল

ভেরকরসের—কথা কও

চক্র ও চক্রান্ত

রুশ ক্লাশেভিক বিপ্লব ও সোভিয়েট পন্থনের
মাবামান্তি কর বৎসরের রোমহর্ষক কাহিনী।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

বঙ্গুমতী সাহিত্য মন্দির : ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা - ১২

সেই বিখ্যাত ও বহু প্রভোজনীয় মহাগ্রন্থ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

বা

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

বাক্যক-মহর্ষি প্রণীতম্

ভারতীয় অধ্যাপনাশ্রমের চির উজ্জল মুহূর্তমণি; সর্বজনের অনারাগলতা
জ্ঞানশাস্ত্র; সর্ব-সাহিত্যের সার; প্রকৃতি নামে অভিহিত এই
মহাব্যামায়ণ গ্রন্থে মানবজাতির মোক্ষলাভ অবজ্ঞাবাব। সর্বাপেক্ষা
সহায়ক ও চিন্তাকর্ষক এই মহাগ্রন্থের উপাধ্যায়সমূহ। কথোপকথনের
রূপে নানা আখ্যায়িকার মাধ্যমে সৌন্দর্যের স্বরূপ, মোক্ষলাভের উপায়
বিষয়গুলি সুবিচারে বিবৃত ও বর্ণিত হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানের দীর্ঘসত্যের
অভাবই যোগবাশিষ্ঠের চমৎকারিষ। মাহুয়ের কাব্য ও প্রাধান্য—
চতুর্বিগলিত। মোক্ষ-তত্ত্বযোগে শ্রেষ্ঠতম। মোক্ষের বৃক্ষ বিশেষণ এই
মহারামায়ণের প্রতিপাত বিষয়। মূল সংস্কৃতের সঙ্গে

সতত গভ্র অনুবাদ।

প্রথম খণ্ড : বৈরাগ্য ও যুক্তি প্রকরণ

মূল্য সাড়ে সাত টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড : স্থিতি প্রকরণ

মূল্য সাত টাকা

উপভাস

॥ প্রতাপভক্ত ভক্ত ॥

শৃঙ্খলিতা

নবজন্ম শৃঙ্খলিতা স্বভাবগত থেকে পোষিত হইতে পারে কি
অসহনিক অত্যাচার, অবিচার ও উৎপন্ন কলমে সঞ্চিত হবে
আজকে এই উপভাসখানি তারই প্রমাণ চিত্র। দায় ৩'২০

॥ রূপান্তরিত ভক্ত ॥

রোশনচৌকি

কতকাল হুগল হাটকারপ্রভৃতি ভাবনধারায়, সোপানচৌকি দত্ত
বোম্বাটিক উপভাস কতের উপর প্রকাশের কাজ করে। দায় ২'১৫

॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

পরানধীন প্রেম

এক অনভিজ্ঞান প্রেমের অপকল্প হইবার উপভাসখানি
সম্মত। দায় ৩'০০

বিশুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

চক্রবৎ

ভক্তের পত্নীভাব ও কাহিনীর বিচিত্রতার চক্র একখানি হইবার
উপভাস। দায় ৪'০০

॥ প্রেমের মিত্র ॥

পাঁক

প্রভাত লেখকের প্রথম উপভাস, কিন্তু রসের অভাবে পাঁক
বাঙ্গা সাহিত্যে চিরনূতন। এ হুগল প্রথম উপভাস। দায় ২'৫০

॥ রমেশচন্দ্র ভক্ত ॥

বঙ্গবিজেতা

ঐতিহাসিক পটভূমিকার বাঙালী জীবনের পূর্ব ও প্রেমের
অবিচ্ছেদ্য কাহিনী। দায় ২'৫০

॥ বীরেন্দ্র কান ॥

সন্ধান

আজকালী শিকড়ের জীবনের সমাজিক কাহিনী ॥ দায় ২'০০

॥ সুমাত্রের বোম্ব ॥

ভাঙ্গাগড়া

ভুক্তক হুগল হাটের জীবনের সমাজিক উপভাস। দায় ২'৫০

স্বীকৃতি কল্যাণ

এ পত্রের প্রকাশক : কলিকাতা ৩

অন্য অসাধারণ এবং দর্শনসমৃদ্ধ মহৎ উপন্যাস

বীরেন্দ্র বহুর

চা মাটি মানুষ

...চা বাগানের নরনারী, তাদের জীবনের হাসি-কান্না,
হৃৎ স্পন্দ, আনন্দ-বেদনার এক সুন্দরী বাস্তব চিত্র লেখক
এখানে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। এর-
নারী জীবনের প্রতি পদে পদে তিক্ত অভিজ্ঞতা লক্ষ্য
করল, আঘাত পেল ভালবাসার ক্ষেত্রে, বারংবার পেল
লাহলো ভাব ভালবাসার বেশা তার মন থেকে গেল না। এই
দুঃসম্পন্নী চরিত্রটির মাধ্যমেই জীবনের এক সত্য দিনের
আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চা, মাটি আর মানুষের বে-
নিমিত্ত সংযোগ, তাঁর স্ব স্ব অর্থবশে লেখক চিত্রিত তৎপর।
উপভাসটি বেশিষ্টের দাবী করতে পারে। কাহিনী দুঃসম-
্পন্নী। লেখকের আন্তরিকতা ও প্রশংসনীয়।

—মাসিক বঙ্গবন্ধু

...সম্ভবত বীরেন্দ্র বহুর প্রথম বাঙালী উপভাসিক,
যিনি বাংলা দেশের চা বাগান নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং
মৌলিক উপভাস লেখার প্রয়াস করেছেন। ...আমি যুগ থেকে
প্রথম পর্বের সময়কাল পর্যন্ত চা বাগানের ইতিহাস সম্পর্কে
লেখকের ধারণা যে স্বচ্ছ, এ-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ
নেই। কতৃপক্ষের আড়কাঠি কৃষিনির্ভর গ্রাম-মাছুষকে
উন্নততর জীবনের মরীচিকায় ভুলিয়ে বাগানের কঠিন
শোষণ-যন্ত্রের আওতায় আনছে। তারপর তাদের দুঃস্থ
ও আশ্রয় জীবন—এই উপভাসের কাহিনী। ...অমিত্র
জীবনের পালাপার্বন ও সামাজিক রীতিনীতির ডিটেল
অংশগুলি বনোহর। অল্প পরিচিত ভূখণ্ড ও মানবগোষ্ঠীর
পরিচয় এখানে অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে বর্ণিত। প্রত্যেক
অভিজ্ঞতার আওতায় লেখক বারবারই স্বকল হলেছেন।
চরিত্র যিরেবণের দিক দিয়ে পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক
বিচ্ছিন্নতা বা কতৃপক্ষের শাসনের ভয়ে যেখানে সত্য ও
ভয়ের পথ ছেঁড়ে ভাবনাথকে অসত্য বা ভ্রান্ততার সঙ্গে
আপোষ করতে হচ্ছে, সেই সমস্ত অংশে চরিত্রের অর্থবৎ
বাস্তব... —পরিচয়

কথামালা প্রকাশনী

১৮-এ কলকাতা স্ট্রীট, মার্কেট
কলকাতা ২২

করেকটি সঙ্কলন-গ্রন্থ

এক যে ছিল রাজা

সবান্নাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণায়ন থেকে
উক করে বিখ্যাত লেখকদের একটা করে
রপকথার গল্প। ৩.৫০

হালুকা হাসির গল্প ৩.৫০
(হাসির গল্পের সঙ্কলন)

খেয়াল-খুশি-অসম্ভব ৩.০০
(আজগুণি গল্পের সঙ্কলন)

বিদেশী গল্পগুচ্ছ ৩.৫০
(অনুবাদ গল্পের সঙ্কলন)

গ্রীক পুরাণের গল্প ৪.০০
(পৌরাণিক গল্পের সঙ্কলন)

ভার্জিলের অমর মহাকাব্য

ঈনিড ১.৭৫

সংক্ষিপ্ত গভাভাবাদ—মণীন্দ্র দত্ত

হোবারের

ইলিয়াড ১.০০ অডিসি ১.২৫

সহস্র

বান্দ-সাপ-ভূত ১.৫০

অপমবুড়োর রকমারি গল্প ১.২৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

খুশির হাওয়া ২.০০

চারমুঠি ২.৫০

রং বেরং ৩.৫০

অবনীন্দ্রনাথের সর্বাধুনিক গল্পগ্রন্থ

সুস্মার দে সরকারের

বাঘমামার ভাল্লুকদাদার
গল্প ১.২৫ গল্প ১.২৫

বনের গল্প ১.৫০ ময়ূরকণ্ঠ বন ২.০০
মাতুরাজ্য ১.৮০

শিবরায় চক্রবর্তীর

বাড়ি থেকে পালিয়ে ২.০০

স্বীহমিকা-বর্জিত মাটক

পরিণতন ১.২৫

মনোয়জন বোব ও বীক চট্টো

চারমুঠি ১.২৫

নারায়ণ গঙ্গো ও বীক চট্টো

কিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের

বারোষিখির রায়বাড়ি

অনুবৃত্ত ঐতিহাসিক উপভাস। ২.৫০

বেলুন রাজার দেশে

শৈল চক্রবর্তীর লেখার ও বেখার অনূর্ব
কল্পকাহিনী ১.০০

মুসান মুসিজের

কেটির কাণ্ড ২.০০

এইচ. জি ওয়েলসের

পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৩.০০

আইল্যাণ্ড অব ডক্টর মোরো ২.৫০

ফুড অব দি গডস ২.০০

কার্ট মেন ইন দি মুন ২.০০

ওয়ার অব দি ওয়াল্ডেন ২.০০

ফুল ভান-এর

জানি টু দি সেন্টার

অব দি আর্থ ২.০০

এরাউণ্ড দি ওয়াল্ড ইন

এইটি ডেজ ২.০০

কম দি আর্থ ই দি মুন ২.০০

কনুটুন্নর

অ্যাডভেঞ্চার ১.৭৫

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সম্পূর্ণ নৃতন ধরনের শিশু-উপভাস।

বিত্তীন্দ্রনাথের।

রূপকথা

আজব দেশে অমলা ১.৫০

লুই ক্যারল অবলম্বনে হেমেন্দ্রকুমার রায়

অর্থই জলের রূপকথা ২.০০

কিসলি

বুনো হাঁসের দল ১.০০

হানস অ্যাণ্ডারসেন

সোনালি নদীর রাজা ১.০০

রাফিন

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

হেমেন্দ্র, মানিক, জরাসন্ধ, প্রেমেন্দ্র,
শরদিন্দু, শৈলভানন্দ, অচিন্ত্য, রবীন্দ্রলাল
রায়, কাশ্যাপীপ্রসাদ, মণিলাল গঙ্গো,
মোহনলাল গঙ্গো, তারানন্দ, শিবরায়,
বুদ্ধদেব, আশাপূর্ণা, নারায়ণ গঙ্গো, লীলা
মজুমদার, সুস্মার দে সরকার, সৌরীন্দ্র,
বিক্রান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি ২.০০

• মাটকোঠা •

প্রশান্ত ভৌমুরী

বস্ত্রবাসীদের কথক্বে নিয়ে লেখা রসোত্তীর্ণ অসামান্য উপভাস। ৩.০০

• শালপিয়ালের বন •

শক্তিপাথ রাজকুমার

আদিবাসীদের জীবন অবলম্বনে রচিত সার্থক উপভাস। ৩.০০

• কণিকা •

কাঠিক মজুমদার

শক্তিপাথালী নবীন শৈবকেশর নৃতন ধরনের প্রেমের উপভাস। ২.০০

বড়দের বই

• এডগার অ্যালান পো-র গল্প •

সম্পাদক নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিখ্যাত করেকটি গল্পের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। ২.৭৫

নেড়

সিদ্ধ টালকর

ফ্যামিলি ফ্যান্টাসি এবং

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ২.০০

কালিদাস কাব্যগ্রন্থ

মেঘদূত, কুমারলতায়,

রিক্তমোহন,

আজবীকান্তিবিহা

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির—৬, বস্ত্রম চাইল্ডেন স্ট্রীট, কলকাতা—১২



(কমল,)

বাণিক বহুমতী
॥ কালিক, ১৩৩৩ ॥

কালিকা
— কালিকা বা কালিক

স্বরণীয় ৭ই • অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি
প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের মৃতন বই প্রকাশিত হয়

৭ই কাণ্ডিকের বই

বিভূতিভূষণ যুগোপাধ্যায়ের নিকশান গান (উপজাস) ৫
শ্রীধেলোয়ারের ক্রিকেটের রাজকুমার ২৫০



৭ই অগ্রহায়ণের বই

দীপক চৌধুরীর নূতন উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস
নীলে সোনার বসতি ৩৫০ মাঝির ছেলে ২৫০
বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ৫৫০

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত দু'খানি ছোটদের বই

১৯৫৯ সালে ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত (৭—১৪ বৎসর বয়স্কদের)

১। লীলা মজুমদারের হলদে পাখীর পালক দুই টাকা

১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত (৭—১৪ বৎসর বয়স্কদের)

২। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘ না দা র গ ল তিন টাকা

উপজাস ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের মোহনমী ৩ ॥ লীলা মজুমদারের কাঁপতাল ২৫০ ॥ বনফুল-এর জলতরঙ্গ ৪৯ ॥
পঙ্কজকুমার মিত্রের কলকাতার কাছেই ৫০ ॥ প্রশান্ত চৌধুরীর অগতোক্তি (নবোপজাস) ৩০ ॥
প্রবোধকুমার সাক্ষাৎ অগ্রগামী ৪ ॥ বিমল মিত্রের স্বপ্নোরাণী ৪৯ ॥ অরুণা দেবীর উত্তরায়ণ ৫০ ॥
নিরুপমা দেবীর অল্পপূর্ণার মন্দির ৩০ ॥ সত্য ভট্টাচার্যের সৃষ্টি ৫০ ॥ অজিতকুমার বসুর প্রজ্ঞাপারমিতা ৩ ॥
জ্যোতির্ষক নন্দীর বার ঘর এক উঠোন ৭০ ॥ দেবেশ দাশের রক্তরাগ ৪৯ ॥ দিলীপকুমার রায়ের অঘটন
আজো ঘটে ৫ ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকন্তা ৪০ ॥ মতি নন্দীর নক্ষত্রের রাত ৩০ ॥
'বিক্রমাদিত্য'-এর অনোখীলাল পঞ্চোড়িয়া ২০ ॥ বিমল করের ত্রিপদী ২৯ ॥ তুবানী মৃণালধর্মের
কাল্মাহাসির দোলা ৩৫ ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিষেক (উপজাস) ৫৫ ॥ অঙ্গদীপক জগদ্রথের অনির্বাচিত
গল্প ৫ ॥ জ্যোতির্ষক বোষ (ভাস্কর)-এর কাংশল (সরস গল্পগ্রন্থ) ৩ ॥ কণাদ জগদ্রথের পূর্ব-মীমাংসা ২০ ॥
কবিতা, গ্রন্থ ॥ চিত্তমঙ্গল দাশের কবি-চিত্ত ৫ ॥ মোহিতলাল মজুমদারের অনির্বাচিত কবিতা ৪০ ॥
প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাগর থেকে ফেরা ৩ ॥ নরেন্দ্র ইসলামের শেষ সপ্তগাত ৪ ॥ সত্য ভট্টাচার্যের
অনির্বাচিত কবিতা ৫ ॥ অজিতকুমার সেনজগদ্রথের নীল আকাশ ২ ॥ বনফুলের নূতন বঁকে ২০ ॥

নৌহাররঞ্জন গুপ্তের দুরহং উপন্যাস হা স পা তা ল (৩য় সং) ৬ ॥

[এই উপজাসখানি চলচ্চিত্রে নরেশকুমার ও হুচিরা সেন সমন্বয়ে রূপায়িত হইবে]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম : কালিচর

৩৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৬৪১



ঐন-এ-শুখ

যা যা চাওয়া যায়
তা যা পাওয়া যায়না

কিন্তু

আপনি ইচ্ছামত একটি সর্বজন সম্পন্ন কেশভৈল
অন্যভাবে পাইতে পারেন। আয়ুর্বেদচাৰ্য্যকণ
কর্তৃক উক্ত প্রস্তুত 'হিমকল্যাণ'ই আপনায়
কেশভৈল নির্বাচন-সমস্ত সমাধানে সক্ষম।

ইহা কল্যাণ পরশে বাবতীর কেশরোগ
নিরাময় ও মজিক দীভল হয়। দীর্ঘদিন
নিরামিত ব্যবহারেই আশাহত
কল পাওয়া যায়।

ভৈল বিশারদ মণ্ডল দাব পাটী

হিমকল্যাণ

আয়ুর্বেদীয় হিমমিত সুরভিত কেশভৈল।

অন্যান্য প্রসারনী

● পামিকোকো
সুরভিত নারিকেল ভৈল

● হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টের অয়েল
সুরভিত কেশভৈল

● ভূসামলা ক্ষেপকারী কেশভৈল

● যোজনগম্ভা সুরভি নিধান



হিমকল্যাণ ওয়ার্কন, লিঃ

কলিকতা

পতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



সামিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—কার্তিক, ১৩৫৬]

। স্থাপিত ১৩২৯ ।



—কথামৃত—

কাহাকে গুরু করিব ?

‘প্রোহির’—মিনি বেদের রহস্যকি, ‘অবু জিন’—নিষাপা, ‘অকামহত’—মিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া অর্থসংগ্রহের বাসনা করেন না, তিনিই শান্ত, তিনিই সাধু। বসন্তকাল আগমন করিলে যেমন বৃক্ষে পত্রপুল্লসোবন হয়, অথচ উহা যেমন বৃক্ষের নিকট ঐ উপকারের পরিবর্তে কোন প্রকারপ্রত্যাশার চাহে না, কারণ উহার প্রকৃতিই অপরের হিতসাধন। পরের হিত করিব, কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ কিছু চাহিব না। প্রকৃত গুরু এইরূপ।

‘তীর্থাঃ স্বয়ং ভীষ্মভার্গবঃ জনাঃ।

অহেতুনাস্তানপি তারয়ন্তঃ।’

—‘তাহারা স্বয়ং ভীষণ জীবনসমুদ্র পার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজের কোন লাভের আশা না রাখিয়া অপরকেও তারণ করেন।’ এইরূপ ব্যক্তিই গুরু, আর ইহাও বুদ্ধিও যে, আর কেহই গুরু হইতে পারে না। কারণ—

‘অবিভার্যমহরে বর্তমানাঃ কথং ধীমঃ পণ্ডিত্যভ্যাসনঃ।

কথম্যদ্যনাঃ পুণিষ্যন্তি যুগ্মঃ অকলৈব নীরয়ানা কথংভ্যঃ ব’

—‘নিজেরা অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, কিন্তু অহংকারবশতঃ মনে করিতেছে তাহারা সব জানে; শুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, তাহারা আবার অপরকে সাহায্য করিতে যায়। তাহারা নানা কুটিল পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপ অন্ধের দ্বারা নীরয়ান অন্ধের ভায় তাহারা উভয়েই খানার পড়িয়া যায়।’ তোমাদের বেশ এই কথা বলেন।

তোমার ভাব অপরকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। প্রথমে দিবার মত কিছু সঞ্চয় কর। তিনিই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, ধাঁহা কিছু দিবার আছে; কারণ শিক্ষাপ্রদান বলিতে কেবল বচন বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝান নহে; শিক্ষাপ্রদান অর্থে বুঝায় ভাবসঞ্চার। যেমন আমি তোমাকে একটা ফুল দিতে পারি, তদনুসারে অবিকৃতর প্রত্যক্ষভাবে ধর্মও দেওয়া বাইতে পারে। ইহা কবিরের ভাবার বলিতেছি না, অন্ধরে অন্ধরে সভা।

—বানী বিবেকানন্দের বাণী।

ভারতের সমস্যা ও তাহার সমাধান

ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

ভারতের সমস্যা বহু এবং চিরন্তন। এই প্রকার সমস্যা অল্পবিস্তর প্রায় সকল দেশেই বিদ্যমান। এই সব বাধ দিয়াও কতকগুলি নতুন সমস্যা দেখা দিয়াছে ভারতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে এই সকল সমস্যার মূল ভারতের স্বাধীনতা বলিলেও ভুল হইবে না। অল্পগ্রহণ এই স্বাধীনতা যেন সমগ্রাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাদের সম্ভাবনা ভারতীয় নেতাদের চিন্তার অতীত থাকিলেও, বহুদূরী বিচক্ষণ কূটনীতিসম্পন্ন ইংরেজের অজ্ঞাত ছিল মনে করিলে ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ত্যাগ অনিবার্য অনিবার্যই কতকগুলি দুরূহ দুরভিক্ষ্য সমস্যার বীজ বপন করিয়াই ইংরেজ বলাভক্তার ভাগ করিয়া ভারতভূমি ত্যাগ করিল। স্বাধীনতার অবৈধ সম্ভাবনা পাকিস্তানই এখন ভারতের প্রধান সমস্যা।

কিন্তু ইংরেজের এই জঘন্য ব্যবহারের কারণ কি ?

বর্তমান পৃথিবীতে কোন জাতিই নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে না। কিছু অভিলক্ষি থাকেই। পূর্বাভূও দর কবাকবি করিয়া রাজ্যবাসি বিবাসী হইবার এমন কি কারণ উপস্থিত হইল, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল ভারতীয় নেতাদের। উল্লাসের আতিশয্যে মহা সমারোহে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বিদায় অভিনন্দন জানাইবার কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরেজের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে এমন একটা অবস্থার ভিতর ফেলিয়া এদেশ ত্যাগ করা, বাহাতে যে কোন কালেই সমস্যার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া, নিশ্চিন্ত মনে সুগঠনের সাহায্য আপনাকে সমুদ্রশালী করিতে না পারে। অসমিত লোকবল, অপরিসর খনিজ সম্পদ, স্বনিযুক্ত বনভূমি অসংখ্য শ্রোতবৃত্তা, বহু সহস্র বৎসরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সমৃদ্ধ এই মহান দেশ যে উপযুক্ত পরিবেশে আপনাতঃ পৃথিবীর স্বর্গস্থানে স্থাপন করিতে পারে, তাহাতে সমগ্রদেশের অবকাশ কোথায় ? প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছে। এ দেশের নগনীর পাহাড় পর্বত, বন উপত্যকা, কিছুটা তাহার অবিদিত নাই। ভূগর্ভস্থ বহু সম্পদের সন্ধানও সে পাইয়াছে। কিছু কিছু আহরণ করিয়া তাহার নিজ স্বার্থে ব্যবহারও করিয়াছে। স্তব্ধতার ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সন্দেহ কোন সন্দেহই তাহার থাকিবার কারণ নাই।

একদা যে ইংরেজের রাজ্যে দুর্বল অস্ত্র বাহিত না, একদিন যে সমাগরা পৃথিবীর অধিতায় শক্তি ও সমুদ্রশালী রাজ্য ছিল বলিয়া পরিগণিত হইত, শুধু এই ভারতবর্ষের মৌলভে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটশিখি বলিয়া খ্যাত ছিল যে দেশ, সে দেশ তাহার হস্তচ্যুত হওয়া যে ইংরেজের কত বড় হুভাগ্য তাহা করুনা করাও কঠিন। তাহার উপর সেই ভারত যদি শক্তি-সমৃদ্ধিতে বৃটেনকে ছাড়িয়াই যায়, তবে তাহা সহ্য করিবে কেমন করিয়া ইংরেজ ?

ইহাই পাকিস্তান সৃষ্টির একমাত্র কারণ। নতুবা মুসলমান ইংরেজের এক অন্তরঙ্গ নহে যে তাহার জন্ত বিনা স্বার্থে জিন কোটি হিন্দুর চিরন্তন কবিবার খুঁকি সে লইবে। বর্তমান ভারতবাসী কুল করিলেও অল্প ভবিষ্যতে বৃটেন সন্দেহ তাহার বাগদান নিশ্চয়ই মন্যহইবে।

কিন্তু সহস্র বৎসরের জৌগোলিক ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করিয়াই

ইংরেজ কাজ হয় নাই। সে এবং তাহার বংশোদ্ভূত শক্তির বৃত্তবাহী পাকিস্তানের সঙ্গে অসাধু মিত্রতার আবদ্ধ হইয়া, রাষ্ট্রসংঘে নিলজ্জ ভাবে ভারতের বিরুদ্ধে তাহাকে সমর্থন করিয়া, অল্পশক্তি দিয়া তাহাকে শক্তিশালী করিয়া ভারতের ভীতি উৎপাদন করিয়া, যে ভাবে উভয় রাষ্ট্রের ক্ষতি করিতেছে, তাহাতেই উহাদের বরুণ প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষমতার উগ্র নেশার অন্ধ হইয়া ভারতের শাসকবৃন্দ ইহা লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। প্রতিরক্ষা ব্যয় শুধু এই কারণেই িপুল ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহারই জন্ত অত্যাধিকারী বহু কার্য অব্যাহতি হইতেছে।

লঙ্ঘনাতীত দুর্ব্যবহার এবং অপরিমিত ক্ষতি করিয়া শক্তি-সামর্থ্যে বহু ক্ষণে শ্রেষ্ঠ ভারতকে বিশ্বাস কল্প পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। ভারতের দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা তাহার মনে সর্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় নিজের সাময়িক শক্তি বৃদ্ধি এবং ইন্ড আমেরিকা জোটের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাহার আবশ্যকীয় শর্তে একান্ত আবশ্যক মনে করিতেছে। এই ভাবে একটা দৃষ্ট চক্রের সৃষ্টি হইয়াছে, বাহাতে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব স্থাপন করা সম্ভব হইতেছে না। প্রতিরক্ষা ব্যয় বাহ্যিকের জন্য উভয় রাষ্ট্রই ধন-জালে জড়িত হইতেছে। উন্নতি দূরে থাক, ক্রমশঃ তাহাদের শক্তি, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতি বাবতীর সমস্যাই বৃদ্ধি পাইতেছে। অকূল পাথারে তাহার হাবুডুপু খাইতেছে।

পাকিস্তান সমস্যা মিটাইতে পারিলে বহু সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে অনায়াসে।

দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে ভারতের দৃষ্টভঙ্গী। দ্রুত শিল্পায়ন করিয়া পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র সমূহের অন্তত সমকক্ষ হইব জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিয়া তাহাদের সমপাথে উঠিব, বিশ্ববাসীর চারিত্রিক উন্নতি করিয়া পৃথিবী হইতে বৃত্ত-বিগ্রহ চিরকালের জন্য বিদূষিত করিয়া বিশ্বব্যাপী চিরশান্তি প্রতিষ্ঠা করিব, বিশ্বব্যাপী ভাঙতক নোতা বলিয়া গণ্য করিবে, ইহাই যে ভারতের কর্তব্যের মনোবাঞ্ছা তাহা বৃদ্ধিতে অন্তর্বিধা হয় না।

হাজার বৎসরের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মাত্র সেদিন মুক্ত হইয়া— বাহার সমুদয় কৃতিত্ব তাহার নিজস্ব নহে, আজই ভারত বিশ্বনেতৃত্ব আধাৰিত হইবে, মুহূর্ত শীতকর্ষণের কে ইহা সহ্য করিবে ? এই মেকুৰ লইয়া কলহ বিবাদের যে অন্ত নাই ; একটা বিশ্বাণপর্বও অসম্ভব নহে।

এই দুরাশা, ইহার জন্ত অপোতন আগ্রহ, বিশ্ববাসীর বাগদান, অবিজ্ঞাত ছুটাইটি শুধু অধীন নহে, ভারতের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকরও বটে। বুদ্ধদেব, বীতশুণ্ডের পক্ষে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা বাহা সম্ভব হয় নাই, তাহা সম্ভব হইবে অতি সাধারণ নেতার দ্বারা ? এই দুরাকাঙ্ক্ষা বাতুলতা ব্যতীত আর কি ?

ভারতের সমস্যা সমাধান করিতে হইলে এই দুই মূল সমস্যার সঙ্গে মুঠাধাৰিত করিতে হইবে। নতুন অস্ত্র কোন সমস্যাই সমাধান হইয়া সম্ভব নহে, বৃথাও অর্থব্যয়, বুখাই হইয়াগি।

জ্ঞাত করিবার আকাঙ্ক্ষা, কল হইবার বলনা দ্বন্দ্ব বহির্ভূত

আছে এক সেই মনে সম্বন্ধিত ভাবে জড়িতও আছে। উহা ব্যাভাবিক। কিন্তু এই উন্নতির সজা সজ্জিত ও সজাতা অস্বাভাবিক পৃথক হইয়া থাকে। জীবনব্যতীর মান সম্বন্ধে এই ব্যাথাই প্রসঙ্গ। প্রাচ্য সভ্যতার মানুষের উন্নতি বলিতে বাহা বুঝায়, পাশ্চাত্য সভ্যতার সেকণ বুঝায় না। ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তি কত উন্নতি করিয়াছে বলিতে তাহার পোষাক পরিচ্ছদ কিংবা ব্যক্তি কালসাল বুঝায় না। আট হাত পরিমের লইয়া মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে 'মহাত্মা' কীলাতে 'হাক' নৈকেড করিব।

এই কুষ্টি ও বৈশিষ্ট্য লইয়া ভারতবর্ষ বহু সহস্র বৎসর যাবৎ বীড়িয়াই নাই। পরাধীন অবস্থায়ও বিবেক দরবারে বিশেষ আসন পাইয়া আসিয়াছে। বিধ সভ্যতার তাহার অবলম্বনও কিছু কম নহে। ভারতবর্ষের সুখী ঈতিহাসে সে কখনও হিংস্রবেশ কিংবা পশুপাশহরণের শিকা দেয় নাই। তাহার শিক্ষা ভায় ও শ্রীতির, ত্যাগ ও প্রেমের; শাসন কিংবা শোষণের নহে।

পাশ্চাত্যের উন্নতির মানদণ্ড ব্যক্তি ব্যালাল, আহাৰ বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ, বিলাস লালসায়। ভারতের মাগকাটি জ্ঞান ও প্রেম। ভারতের কুষ্টি তাহার পূর্ণকৃষ্টি, তাহার শতক্ষেত্রে; ইউরোপ আমেরিকার সভ্যতা তাহাদের চকু বলসান নগরী ও অতিকার শিল্পশালায়। তাই ভারতের অবলম্বন উপনিষদ ও গীতাঙ্গলি, ইউরোপ আমেরিকার আধুনিক বোমা ও মহাশূভ্রভেলী রকেট। বিশ্বরূপ নর্শন করিতে ভারতের মনোবীকে রখে চড়িয়া চন্দ্রমণ্ডলে হানা দিতে হয় না, বিশ্বরূপ লইয়া স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তাহার অন্তরে আবিস্কৃত হইয়া থাকেন।

সুতরাং পাশ্চাত্যের অস্বকরণে ভারতবাসীর জীবনব্যতীর মান স্থির করিবার কোন যুক্তি নাই। ভারতের প্রাচীন কুষ্টি ও সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, শরীর সুস্থ রাখিতে বাহা আবশ্যক শুধু তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া মনের উন্নতি সাধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইবে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা।

ভবিষ্যতে বিশ্বের দরবারে ভারতের যদি শ্রেষ্ঠ আসন পাইতে হয় তবে ইহাই হইবে প্রকৃত পন্থা। নচেৎ সমগ্র অনিবার্য, বিনাশ অবতটাবী।

বিজ্ঞানের পথে ভারতকে বহু শতাব্দীতে ফেলিয়া বাহায়া অগ্রসর হইয়াছে, বহায়েদের অর্ধের পরিমাণ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, ক্ষমতাভিতে বাহায়া অত্যন্ত সযত্ন, তাহাদের সঙ্গে পাঠা দিতে কোন ভয়সার কোন ধাবি? ছই শতাব্দীর 'ব্যবধান পূরণ করিবার আয়োজন করিতে করিতে উহায়া আবার আয়াদিপিকে এক শতাব্দী শতাব্দীতে ফেলিয়া অগ্রসর হইবে।

পরিহাসিত বখন এইরূপ, তখন পরিকল্পনা চালিয়া গাফিতে হইবে।

বর্তমান পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা একবার হিসাব করিয়া দেখিবার সময় নিশ্চয়ই আসিয়াছে। স্বাধীনতা অর্জন করিবার সময় ভারতের ঈর্ষা ব্যালাল অর্থাৎ ইংলণ্ডে ভারতের আহানত, দ্বিলা সন্তোষ' কোটি টাকা। উহাতেই আমরা নিজেদের অস্বস্তি ধনী মনে করিবার। কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনা অস্বাভাবিক কাজ করিতে এই মূল্যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হইয়াছে, অধিকন্তু উহার বহুলাংশ

করিতে হইয়াছে বিশেষ হইতে। পরিকল্পনার মূল পাইতে এখনও বহু বিলম্ব অথচ বিশুল করতাবে মানুষের প্রাশাদ। এক শ্রেণীর অধিবাসী অসন্তব ধনী হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কত? ইহাদের লইয়া গড় হিসাব করিয়াই জাতির মাথা-প্রতি আয়বুদ্ধির ধারাবাহী চলিতেছে। শতকরা অশী জনই অধীভাবে জীবন ধারণের একাঙ্ক আবশ্যকীয় শ্রব্য ক্রম করিতে অসমর্থ। পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলে ইহাদের জীবনব্যতীর মান নাকি উন্নত হইবে; কিন্তু সে পথত ইহারা বাঁচিবে কি?

সুতরাং এইরূপ পরিকল্পনার পশ্চাতে আরও অর্থ ব্যয় করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। বাহাকে ইংরেজিত মনে 'খোই' শুভ মানি আকটার ব্যাড' ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া আরও শত শত কোটি টাকা উহার পশ্চাতে চালিয়া অন্তল তলে ডুবিয়া কি লাভ হইবে?

কোন দেশের উন্নতি করিতে হইলে আগে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাই বলিষ্ট ঐক্যবদ্ধ জাতি। দুর্বল কলহপ্রিয় জাতি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য বহুবার দিয়াছে। সুতরাং প্রাধান্য আবশ্যক অধিবাসীর স্বাধা এবং একতা রক্ষা করা।

ভারত বখন স্বাধীনতা অর্জন করিল তখন তাহার চল্লিশ কোটি অধিবাসীর অন্তত ত্রিশ কোটি একমত হইয়া কংগ্রেসকে সমর্থন করিত। মশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বেই ইহার অর্ধেকেরও বেশী কংগ্রেসের বিরোধী হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও বিবাদের অন্ত নাই। ঈর্ষা বেগও কম নাই। ভাষা, সীমানা, শিল্প-বাণিজ্য, চাকরী প্রভৃতি বহুবিধ প্রের লইয়া বিবাদ লাসিয়াই আছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দুর্নীতি ব্যভিচার, অনাচার অ'ব্যচার ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাধিতে সমগ্র জাতি জর্জরিত; ভাঙ্গিয়া পড়িতে বিলম্ব নাই। বিশেষ তৎপরতার সহিত প্রতিকার করিতে না পারিলে অরাজকতা ও রাষ্ট্রবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী বলিচাই মনে হয়। শুধু বক্তৃতা এবং প্রচাদের দ্বারা একতা রক্ষা করা সম্ভব নহে। শূন্য পরিকল্পনার দ্বারা সমাজের নৈতিক এবং আর্থিক ভিত্তি শূন্য করা ই একমাত্র প্রতিকার।

কি উপায়ে ইহা সম্ভব?

পূর্বেই বলা হইয়াছে উন্নতির মূল হইল স্বাধীনতা, এবং উহা রক্ষা করিতে হইলে চাই সুস্থ সবল দেশ। সুতরাং এই প্রেরই অগ্রাধিকার পাইবার অধিকারী।

খাতিশ্রুত অথবা প্রোটিন কি শ্রেষ্ঠজাতীর অভাবকরী খাতের অভাব যদি দেশে থাকে তবে উপযুক্ত পরিমাণে উহা বিশেষ হইতে আমদানী করিতে হইবে। উহার জন্য আবশ্যকীয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। বিলাসিতার মাথ্রী, নৌখিন বস্ত্রাদি, মোটর গাড়ী ইত্যাদির আমদানী নিষিদ্ধ করিতে হইবে। অসম্পূর্ণ বৃত্ত শিল্পের জন্য সর্বপ্রকার রূপান্তর আমদানী বন্ধ করিতে হইবে, ঐ সকল কাজ বন্ধ করিত হইলেও। বিশেষে ভারতীয় শিল্পের ব্যয় কঠিন হতে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এক প্রকারাধিত বিভিন্ন দ্রব্যাবাস সংরক্ষণ করিয়া ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে শিল্পের জায় স্থানীয় শোকেয় উপর ভস্ত করিয়া, আর্থিক দিক হইতে অস্বস্তিক নিবন বন্ধ করিয়া, ব্যয় সাধার সম্ভব হইবে, বিশেষ

মুজিব আনুগত্য কখন বাইবে। অঙ্গুলি কবিতা দেখিলে
অজ্ঞাত বহু দিক দিয়াও বিশেষ মুজিব ব্যয় সঞ্চার করা সম্ভব হইবে।

পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ করিলে বিশেষে বাণিজ্য মিশন পাঠাইবার
আবশ্যকতা হ্রাস পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বিশেষী মুজিব বাঁচিয়া
বাইবে। তথাকথিত কালচারাল মিশন নিষিদ্ধ করিয়া ব্যয়
কমাইতে হইবে। অত্যাধিকারী শিক্ষা ব্যতিরেকে বিশেষে ছাত্র
ক্লেম শঙ্কু করিয়া দিতে হইবে। বিলাতী ডিগ্রীর মোহ ত্যাগ
করিতে হইবে। মন্ত্রীদের ভ্রমণ বিদেশে অথবা ঘরে—কঠিন
হুজু নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

আইনসভা হইবে কুঁচি কুঁচি আইন পাশ করিলেই দেশের
উন্নতি হয় না। স্বাধীনতা পাইবার পর ভারতের আইনসভাগুলি
হইতে যে পরিমাণ আইন প্রস্তত করা হইয়াছে তাহার ওজন বোধ
হয় এক টন হইবে। কিন্তু উহাতে দেশের জনসাধারণের কি
উপকার হইয়াছে? আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক অঞ্চল শিক্ষার
দিক দিয়া কোন উন্নতিই লক্ষ্য করা যায় না। যখন পুণ্ডিত পরাধীন
অবস্থারও ইহার সব দিক দিয়া জনসাধারণ বোঁ দীর্ঘ উন্নত ছিল।

অঙ্গুলি বিজ্ঞা কিংবা শিক্ষার পরিচায়ক নহে। তবু
উহার বিজ্ঞানে কৃত্রিমের কিছু নাই। বিজ্ঞা অর্জন সময়-সাপেক্ষ
নয়; কিন্তু সাংসারিক, সামাজিক অথবা নৈতিক জ্ঞানের জন্য
বিজ্ঞা একান্ত আবশ্যক নহে। ভারতের জনসাধারণের শতকরা নব্বই
জন নিরক্ষর মানুষের এই সকল জ্ঞান খুব কম ছিল না। বাঁহারা
তাহাদের সঙ্গে বন্দিভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে
শিক্ষা দিবেন। সুতরাং উহা লইয়া ঢাক পোটানোর কোন অর্থ নাই।

সুতরাং এই প্রকার আইনসভা পোষণ করিয়া জনকতক
ভাগ্যবান ব্যক্তির গলাবাঁধি ও অর্থ উপার্জনের সুবিধা করিয়া দেওয়া
তবু নিরর্থক নহে, অত্যন্ত কৃত্রিমও বটে। ইহা দরিদ্র জনসাধারণকে
শোষণ (এক্সপ্লয়েট) ব্যতীত আর কিছুই নহে। আইনের সংখ্যা
অথবা পরিমাণ উহার মূল্যের পরিচায়ক নহে, যেমন নহে অর্থ ব্যয়
কার্যকলের পরিচায়ক। উহার দ্বারা জাতি তথা দেশের কি উপকার
হইল, তাহাই প্রকৃত মূল্য। আইনসভা বদ করিয়া স্বল্পব্যয়সাধ্য
বিষয় ব্যবস্থা বর্তমান হয় করিতে হইবে।

লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তশরনম আয়ার্যার তাঁহার স্মরণীয়
অভিজ্ঞতা হইতে সম্প্রতি গণতন্ত্র সন্থকে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন,
তাঁহাতে মনে হয়, ভারতের শাসন প্রণালী সন্থকে তাঁহার মনে
গভীর সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। শ্রীআয়ার্যার বলিয়াছেন, 'গণতন্ত্র
ব্যর্থ হইলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আকারে সরকার প্রবর্তন
সর্বোত্তম হইবে' (যুগান্তর, ১১ই অক্টোবর, ১৯৬১)। যুক্তরাষ্ট্রের
প্রেসিডেন্ট যে ভাবে শাসন পরিচালনা করেন তাহাতে সিনেটের
আবশ্যকতা সন্থকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করা বাইতে পারে। প্রচুর
সম্পদশালী আমেরিকার পক্ষে অনাবশ্যক এই ব্যয় নগণ্য হইতে
পারে; কিন্তু দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রকার বিলাসিতার
অর্থ করভারে নিশ্চিষ্ট হওয়া। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অল্পকরণে
জনসাধারণের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার
জন্ম করেকজন সং বিশেষজ্ঞ লইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা বাইতে
পারে। ইহাও গণতন্ত্রের আখ্যা পাইবার অধিকারী, কারণ ইহা
সাধারণ নির্বাচনমূলক। ইহা নিশ্চয়ই ডিক্টেটরী শাসন নহে।

ইহার দ্বারা শাসন পরিচালনার ব্যয় প্রচুর পরিমাণে লাঘব
করা সম্ভব হইবে। দরিদ্র দেশবাসীকে বিপুল করভার হইতে
কিঞ্চিৎ অব্যাহতি দেওয়া বাইবে।

ভারতেও বৃটেনের মত পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে
বলিয়া গর্ব কিংবা উল্লাস করিয়া কি লাভ? উহার দ্বারা শাসন-
ব্যয়ের উপর জনসাধারণের কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে
তাহাই হইল মূল কথা। এদেশে বর্তমানে ইহার কতটুকু আছে?

আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিলে রানবাচনের আবশ্যকতা
কমিয়া গাইবে। উহার কোন সমস্ত থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।
বিশেষ হইতে ইঞ্জিন, মোটর গাড়ী প্রভৃতির আমদানী প্রচুর
পরিমাণে হ্রাস পাইবে। ইহা ব্যতীত ব্যবসায়ের জন্য মাল্‌টের
হুটটুকু কমিবে। ট্রেনের তীক্ষ্ণের সমস্তাও সম্ভবত সমাধান করা
বাইবে। করচাক্ষা জাতীয় উন্নতির একমাত্র পরিচায়ক
নহে। চকলতা কমিলেই যে জাতি অর্থপাতে বাইতেছে তাহাও
সত্য নহে। সুতরাং হুটটুকু কমিলে যে দেশের ক্ষতি হইবে এমন
আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।

সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন জনসাধারণকে এক্সপ্লয়েট করিবার
অতিশয় শক্তিশালী যন্ত্র। উহার দ্বারা লোকশিক্ষা সামান্যই হয়,
পরন্তু মানুষের মন বিপথে আকর্ষণ করিয়া চিত্তশক্তি ধ্বংস করে।
চারিত্রিক অবনতি যে হয় তাহা অনস্বীকার্য। সুতরাং এই সকল যন্ত্র
কঠিন হস্তে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। ইহাতে জাতির নৈতিক
উন্নতির সাহায্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে খরচও কমিবে।

সম্প্রতি এদেশে টেলিভিশন যন্ত্রের ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে
মিল্লাতে উহার প্রাথমিক ব্যবস্থা হইয়াছে। এই যন্ত্রের কোন অংশই
ভারতে প্রস্তুত হয় না; উহা অভ্যন্তরীণ ব্যয়সাধ্য। উহার জন্য প্রচুর
বিশেষী মুজিব আবশ্যক। সুতরাং দেশের আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট
না হওয়া পর্যন্ত এই যন্ত্রের আমদানী নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

খাদ্যশস্যের মূল্য কমাইবার জন্য উহার উপাদান বৃদ্ধি করিতে
হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে টেনিসি জ্যালির অল্পকরণে এদেশে নদী
পরিকল্পনা রচনা করিয়া কাজ করা হইতেছে। অণু কবিতা ঐ সকল
পরিকল্পনা রচনা করিয়া কাজ করা হইতেছে। অণু কবিতা ঐ সকল
পরিকল্পনা রচনা করিয়া কাজ করিতে বর্তমানে করভার অত্যন্ত বৃদ্ধি
পাইয়াছে। অণু পরিশোধ করিবার পরও এই করভার যে লাঘব
করা সম্ভব হইবে তাহাও মনে হয় না। এই সকল পরিকল্পনা
সন্থকে অধুনা বহু প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং অল্পপ্রকারে
সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইন্দোরা ও নলকুপের সাহায্যে উহা
হইতে পারে।

বস্তার জন্য প্রায় প্রতি বৎসরই প্রচুর শ্রম নষ্ট হইয়া থাকে।
এ বৎসর বাহা হইয়াছে তাহার তুলনা মেলা দুর্ভর। উহার
জন্ম নদী পরিকল্পনাও দায়ী করা হইতেছে। নদীর
গভীরতা বৃদ্ধি করিয়া এই সমস্ত সমাধান করা সম্ভব বলিয়া
মনে হয়। উহা বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বস্তা
শ্রম ব্যতীত অজ্ঞাত দিক দিয়া যে ক্ষতি করে তাহার পরিমাণও
কিছু কম আছে। সুতরাং বস্তা ব্যয়সাধ্য হইক এই ব্যবস্থা
করিতে হইবে, এবং উহাকে অপ্রাধিকারও দিতে হইবে।

অমি এবং খাতের অভাবে কৃষক জাল কারখানার যন্ত্র
হইয়াছে। প্রকারও ইহার জন্য কতকটা দায়ী। হাতের কাজ

দলিয়া সোভার্ব প্রভাব করিয়া থাকেন। হুগু নরনারী কৃষিকর হইতে বহুবৈধ কাহ্নে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেতব কাহ্ন কি চাতের কাহ্ন নহে? না জল-কাহ্না জাল আসন্নামেব? কৃষিকাজ কি সম্মানের কাহ্ন নহে? আশনার ভরিতে কদম উৎপাদন করি। মানুষ যদি খোজাঙ্গন নীল আকাশের নীচে বিভক্ত বায়ু সেবন করিয়া সপরিবারে শান্তিকর বাস করিয়া, দিনান্তে একবার স্মৃতিকর্তাকে জগৎ করিতে পারে, তবে তাতা অপেক্ষা লাভিময় জীবন আর কি হইতে পারে? অগণের গোলামী করিয়া অতিকার্য বায়াকে অথবা অজ্ঞতার বন্ধিতে বিভক্ত বায়ুবদ্ধিত পাণ্ডুরক্তের খোপে বাস করা কি অপেক্ষাকৃত বৈধ সম্মানের? প্রোভাট ট্রাটিক লক আউটের সন্মুখীন হইয়া কাজ করি কি সৌক্য ন্যায়? এই প্রোভাট বাম্বাবাজী ব্যতীত আর কি? গ্রামীন বিভক্ত সমাজত ধ্বংস করিয়া কারখানার ট্রিভিটান সমাজতার পত্তন করা পমিতাপের বিষয় মিশ্রচর।

বৈদেশিক অর্থ অর্জনকারী পাট এবং অজ্ঞাত কসলের উৎপাদন হ্রাস করিয়া, উহার পরিবর্তে প্রাকৃতিকের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। বর্তমান গভর্নমেন্ট বিশেষী মুদ্রার জন্ম যেন উদ্ভাবন হইয়া যে কোন প্রকারে উহা সংগ্রহ করিতে বহুপরিবর্তন হইয়াছে। উজ্জ্বল জাতি নিবৃত্ত হইয়া ধ্বংস হইউক, অথবা বিব্রত হইয়া লজ্জার বালাই পরিভাগ্যগতি করুক। পাটের ফসল কম হইলে বিশেষী মুদ্রার অর্জন কমিয়া বাইবে সত্য, কিন্তু প্রাকৃতিক বৃদ্ধি পাটলে উহার আমদানী কমাইয়া বিশেষী মুদ্রার প্রয়োজন কমানও সম্ভব হইবে।

মানুষ বখন তাহার আদিম বস্ত্রজীবন পরিভাগ্য করিয়া কৃষ্টির নির্মাণ করিল, তদবধি শত সহস্র বৎসর ধরিয়া কখনও তাহার বাসগৃহের সমস্ত দেখা দেয় নাই। গ্রাম পত্তন করিয়া, কৃষি করণ করিয়া, জী-পুত্রসহ সে গৃহেই বাস করিত। কিন্তু যখন সে বাস্তবিক জীবনে পদার্পণ করিল, সহর পত্তন করিতে বাধ্য হইল, তখন দেখা দিল তাহার বাসগৃহের সমস্ত। আজ তাহার সেই বৈশিষ্ট্য ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে, হাহার জন্ত সমুদ্রের জীব হইতে সে স্বতন্ত্র ও উন্নত, হাহার জন্ত সে সামাজিক জন্ত—সোশাল আনিম্যাল আখ্যা পাইয়াছে। আজ বাসগৃহের অভাবে রাজ্যত, গাছতলার পরিবার লইয়া মানুষ বাস করিতে বাধ্য হইতেছে, যেখানে বিচরণ করে সারমের তাহার কণিকের সঙ্গিনী লইয়া, শূণ্যল ভাহার রক্তের সহচরী লইয়া। ইহাই কি উন্নতির নিদর্শন, সভ্যতার পরিণাম?

ক্রমবর্ধমান এই সমস্তা সমাধান করা এখন মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্তা দরিদ্র ভারতেও দেখা দিয়াছে, অজ্ঞাত দেশের অল্পকয়েক শিল্পায়ন করিতে আশঙ্ক করিয়া। পর্বত পরিমাণ ইম্পাত সিমেন্ট ব্যবহার করিয়াও গৃহ সমস্তার শেষ দেখা যাইতেছে না; ইহার জন্ত কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, পল্লীজীবন বর্জন করিয়া মানুষ নাগরিক জীবন হাসন করিতে বাধ্য হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ জীবনের অনিবার্য মানসিক ও শারীরিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে।

বৃহৎ শিল্পের প্রসার সীমাবদ্ধ করিয়া মানুষকে গ্রন্থার পল্লীজীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই এই সমস্তার একমাত্র সমাধান বলিয়া মনে হয়। বৃহৎ শিল্প বিবেচনায় করিয়া লাহের আবহকতা কমান সম্ভব। ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটিরশিল্পের প্রসার করিয়া শিল্পজীবন হ্রাসের প্রয়োজন

নেটান সম্ভব। উচ্চায় দ্বারা বেকার এবং পুত্রসমস্তা হুট-ই সমাধান করা বাটবে। গ্রাম বর্জন করিয়া সম্ভবশীল হওয়াই পুত্রসমস্তার একমাত্র কারণ। গ্রামে কখনও পুত্র সমস্তার প্রসার দেখা দেয় নাই।

উল্লিখিত কর্মকাণ্ড লইয়া কাজ করিলে ভারতের আভ্যন্তরীণ অশান্তি দূর করা সম্ভব হইবে। উজ্জ্বল দেশের ঐক্যের সত্যতা হইবে। চুবি, ডাক্তি, লাক্সাসায়া প্রভুর পরিমাণে হ্রাস পাইবে। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ব্যয় কমিয়া যাইবে। সেই অল্পপাণ্ডে কর্তব্য লাঘব করা সম্ভব হইবে।

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সমস্তা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে। উহা জবিলখে সমাধান করিতে হইবে। ঐ সমস্তার লক্ষণ প্রচুর অর্থব্যয় হইতেছে। ক্রম সমাধান করিতে পারিলে ঐ অর্থ বাটিল যাইবে। পুলিশ এবং মিলিটারী চিহ্নিতা যার্ব হইয়াছে। উহা বর্জন করিতে হইবে। নতুন হুটভুক্ত লইয়া উপায় স্থির করিতে হইবে। নাগাভাতি ভৌগোলিক হিসাবে, বংশে, ভাষায়, সভ্যতার অথবা অজ্ঞ কোন দিক দিয়াই ভাবতীয় বলা যায় না। ভ্রাতৃত্ববর্ধের অজ্ঞাত আদিবাসীদের সঙ্গে উভাদের তুলনা চর না, কারণ তাহারা ভৌগোলিক দিক দিয়া নিঃসন্দেহে ভারতের অন্তর্ভুক্ত। নাগারা সব দিক দিয়াই পৃথক জাতি। প্রত্যেক জাতিই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। এই সত্য ভারত মানিয়া লইয়াছে। সুতরাং এই অধিকার নাগাদের দিতে হইবে। অজ্ঞাত সীমান্ত রাজ্য ঐ দাবী করিতে পারে, অথবা ভারতের সহিত বিদ্রোহ হইবে বলিয়া বল প্রয়োগের চেষ্টা শুধু ব্যর্থ হইবে না, উহাতে বিপরীত ফল ফলিবে। নাগাদের দাবী মানিয়া লইয়া ঐ রাজ্যের উন্নতির জন্ত উপযুক্ত অর্থ ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা সাহায্য করিলে মিত্রতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। ভবিষ্যতে নাগাভাতি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইবে। যে অর্থ এবং উত্তম কর্মমানে নাগাদের মনন করিবাব জন্ত ব্যয় করা হইতেছে উহার দ্বারা উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে; অধিকন্তু শত্রুতার স্থলে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

চীন-ভারত সমস্তা—ভারত যখন প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তখন তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য স্বীকার করা ভারতের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। এখন উহা লইয়াই পূণ্ডন বন্ধ চীনের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়াছে। চীন কোন যুগে তিব্বতের উপর আধিপত্য করিয়াছে বলিয়া বর্তমানেও তিব্বত চীনের অধীনে থাকিবে, ইহা কোন যুক্তি নহে। এই সমস্তা সমাধানের এখন একমাত্র উপায় দালাই লামা এবং তাহার অনুচরবর্গকে ভারতের বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া, অথবা ভারতের আশ্রয়ের বাধিতা তাঁহাদের রাজনীতি নিঃস্বপন করা। তিব্বতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারত হইতে চালান যাইবে না। তিব্বতে বসিয়াই করিতে হইবে। স্বাধীনতার উপযুক্ত মূল্য তিব্বতবাসীকে অবশ্যই দিতে হইবে।

চীন-ভারত সীমান্ত সমস্তা সাম্প্রতিক হইলেও অতি ক্রম জটিলতা অর্জন করিতেছে। ঐ বিবাদ সম্ভব সীমান্তা না হইলে চীন কিংবা ভারত কাহ্নাও মঙ্গল হইবে না। এই বিবাদ লইয়াই হয়তো শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিবে। কারণ ঐ সীমান্তের ওরফে এতো অধিক যে বৃহৎ কোন শক্তিই নিম্প-ই রক্ষকত্ব ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না। সীমান্তা করিতে হইলে উভয় পক্ষেই ভিন্ন পরিভাগ্য করিয়া আলোচনার প্রস্তুত হইতে হইবে। কুশোল এবং ভায়র ভিত্তিতে

চীন-ভারত সীমানা নির্দিষ্ট করিতে হইবে, সে সীমানা ম্যাকমোহন লাইনেই হউক, অথবা উহার চূড়ান্ত এখার ওপরই হউক। ম্যাকমোহন লাইনের দ্বারা চীন-ভারত সীমান্ত সমস্ত সমাধান করা সম্ভব নহে। একলা অপেক্ষাকৃত দুর্বল চীনের অল্পপাতিতে ইংরেজ ম্যাকমোহন লাইনে সীমানা স্থির করিয়াছিল বলিয়া ভারতও ঐ দাবী করিবে, ইহা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মতে, কিংবা বৃটিশের উত্তরাধিকারীও নহে যে বৃটিশের স্বাধীনতা পথের দাবী সে জাতি করিবে।

ভারতের পক্ষে ওকালতি এক ম্যাকমোহন লাইনের দাবীর জন্য ভারত আজ চীনের আঁহা হারাইয়াছে। ইংরেজ আমেরিকার সহিত ভারতের বহুদলীয় সম্মেলন চীনকে তৎপর করিয়াছে হিমালয়ের অংশ শুধু দাবী করিতে নহে, অধিকারও করিতে। চীনের পক্ষে বিবাদী করা সম্ভব নহে যে অল্প ভবিষ্যতে হিমালয় যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বাঁটি হইয়া চীনকে বিপর্যয় করিবে না। যে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ বাঁটি লইয়া তাহার নিশ্চয় এলাকা দশ বৎসর বাহ্য পক্ষরাষ্ট্রের কবলিত রাখিয়া শুধু কথার ভুড়ি কুটাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, বিশেষী কুচক্রী অল্পপ্রবেশ বন্ধ করিয়া আপন সীমান্ত-রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, তাহার সীমান্তের অল্প কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে শক্তিশালী কোন রাষ্ট্রের সামরিক বাঁটি হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়?

চীনের কার্যকলাপ শঠতা এবং চরিত্রগণা নিঃসন্দেহ; কিন্তু ইহাই রাজনীতি। ভারতের কর্তব্যের ইচ্ছা যোজন কি না সন্দেহ। তাহার বিশ্বশক্তির দেশা তাহাকে কুটনীতি বুদ্ধি বিবজিত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

ভারতকে যেমন ম্যাকমোহন লাইনের পৃথক ভূমিতে হইবে, চীনকেও তদ্রূপ তাহার পুরাতন সীমান্তে, অর্থাৎ ম্যাকমোহন লাইনের অপর পার্শ্বে করিয়া বাইতে হইবে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণে ইহাই নান্দম প্রয়োজন।

ইহাতে যদি চীন সৈন্ত অপসারণ করিয়া আপোষ নিষ্পত্তি করিতে রাজি না হয়, তাহা হইলে তাহার আচরণের পক্ষে কোন যুক্তিই থাকিবে না। চীনকে তখন পরিহার্য ভাবে বুঝিয়া দিতে হইবে যে ভারতের আত্মরক্ষার যুদ্ধ তাহাকে নিঃসঙ্গ হইয়া করিতে হইবে না। ঐ যুদ্ধ অবিলম্বে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবে। ঐ যুদ্ধ লইয়া চীন যদি ভারতের অংশ দখল করিয়া বলিয়া থাকে, তবে নতুন বিশ্বযুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব চীনের। যুদ্ধ দেখি বলিয়া মাথা গরম করা কাহারও পক্ষে শুভ নহে।

পাকিস্তান সমস্যা—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শক্তিশালী প্রতিবেশী ভারতকে পাকিস্তান বিশ্বাস করিতে পারে না, বিশেষ করিয়া পূর্বাফগানিস্থ বখশ চতুর্দিকে ভারত কড়ক পরিবেষ্টিত।

ভারত কাহাকেও আক্রমণ করিবে না, ইহা ভারতের মূল নীতি। কোন দেশ হইতে ভারতের আক্রমণ হইবার সম্ভাবনাও নাই। অল্পপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং দুর্বল। সে তাহার আপন সমস্ত

লইয়া বিরত। ভারতের পক্ষে ভারতের আক্রমণ প্রতিবেশী। চীন, রাশিয়া কিংবা আমেরিকা ভারতকে আক্রমণ করিলে অবিলম্বে বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া পড়িবে। ভারতের ভার বিশ্বযুদ্ধ এবং সমৃদ্ধি-সম্ভাবনাপূর্ণ দেশ অপর রাষ্ট্রের করতলগত হইয়া তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি করিবে, ইহা কেহই সন্দেহ করিবে না। স্বতরাং ভারতের পক্ষে বিশুদ্ধ সৈন্ত বাহিনীর কোন প্রয়োজন নাই। স্বতরাং সমরসজ্জার, বাহ্য প্রতিরক্ষা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ভারতের পক্ষে কমান তথু সম্ভব নহে, কর্তব্যও বটে। ঐ ভাবে সে পাকিস্তানের আত্মরক্ষা হইবে। পাকিস্তানও তাহার সামরিক বাহ্য হ্রাস করিয়া দেশের উন্নতির দিকে মন দিতে পারিবে, দেশের কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে। পাকিস্তানের হুমকি আক্রমণের পূর্বসূচী নহে, উহা যাত্র ভারতকে বিরত করা। অল্পপ্রবেশ সম্বন্ধিত হইয়া উত্তরের ভিতর অসামর্য চুক্তির কোন মূল্য নাই। উত্তরে আঁহা আসে না। অত্যাচারেই বন্ধু প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ঐ ভাবেই পাক-ভারত সমস্যা সমাধান হইবে। ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের ভার পাকিস্তান এবং ভারত নির্বিবাদে খনিজ প্রতিবেশী হিসাবে বাস করিতে পারিবে। নতুবা প্রাপ্য অর্থ অথবা খালের জল লইয়া আলোচনা চালানিলে খালের কোলা জল কোন কালেও বন্ধ হইবে না।

উল্লিখিত কর্মসূচি হইবে নব ভারতের নতুন পরিকল্পনা। অর্থহীন, উল্লসপ্রায়, অকালে অসামর্য দেশবাসীর উন্নতির ইহাই একমাত্র এবং প্রকৃত পন্থা।

অনেকে অবশ্য মনে করেন, বিপ্লব ব্যতীত জাতির স্বাধীনতা উন্নতি সাধন সম্ভব নহে। বৃষ্টান্তস্বরূপ ফরাসী, চীন এবং রুশ বিপ্লবের ইতিহাস তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। বর্তমান রাশিয়া ও চীন সম্বন্ধে স্বাধীন রাষ্ট্রের মতলব হইতে পশ্চিমবঙ্গের দাবী তথ্যস্বরূপিত যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা বাহ্য মিলেও ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, ঐ দুই দেশের ভাগ্য এখনও কালের কলিপাথরে বিচার হয় নাই। ১৯১১ বৃষ্টিকে চীন তাহার পুরাতন শাসকের নিষেধণ হইতে মুক্তির সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৩১তেও তাহা শেষ হইবে কি না সন্দেহ। এখনও তাহার গৃহবিবাদে অবসান হয় নাই। ইতোমধ্যে চীনের হুং-কিং-বিরোধী মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছে অঙ্গুর বস্ত্র, মস্তপ্রান্তর রঞ্জিত হইয়াছে তত্ত্ব শোণিত। সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষমতার দৃষ্টও কি শেষ হইয়াছে?

অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্বোত্তর ফরাসী জাতি তাহার রাজত্বশক্তি নির্বাক করিয়া নিজের উন্নতি-প্রয়াসী হইরাছিল। সাম্য বৈদ্য দ্বায়িত্বের জন্য যে মূল্য দিয়াছে ঐ জাতি, তাহার কতটুকু প্রতিদান তাহার পাইয়াছে? দুই শতাব্দী অল্পে আজ তাহার ঐ দেশে জনী একনায়ক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতোমধ্যে বিশেষী শক্ত আক্রমণে বহু বার সে নিশ্চিত হইয়াছে।

স্বতরাং বক্তব্য বিপ্লব পন্থা নহে। ব্যালট বাক্সের দ্বায়িত্বই জাতির স্বাধীনতা মঙ্গল সম্ভব। উহার ভিতর দিয়াই জাতিতে হইবে অহিংস বিপ্লব। শুধু আবর্তক বলিৎ সং নিঃস্বার্থ নৈক্য।

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বন্ধুত্বের উল্লেখ করবেন]

বিশ্বকীর্তীকর্মে বঙ্গ মহিলা

ত্রিনিদাদ জাতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপার্শ্ব ও বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। ইহা সাহিত্যে ও শিল্পে পৌরষাবিত; কাব্য, নাটক ও সঙ্গীতে সুখরিত। এ যুগে বাঙ্গালীর মনে প্রাণে এক নতুন উদ্যমান জাগরণ হইয়া তাহাকে সমুদ্র ভাঙতে প্রেরণ করিয়াছিল। নবযুগের নতুন প্রবাহে যশোপময়ে বাঙ্গালী জাতি সমুদ্র ভাঙতের মন মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ১১০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রেরিত রাজসভার স্বর্ণগত পৌরষে মহোদয় বাঙ্গালীর অত্যাচার দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—বহু বিবরে বাঙ্গালী জাতি ভারতে গণনীয়। ভারতবাসীর সমুখে বতগুলি কর্মপথ মুক্ত হইয়াছে তাহার সকল পথেই বাঙ্গালী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্তমান যুগে যে কয়েকজন সমাজ সংস্কারক ও ধর্মবেত্তা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালী। বক্তা, সবাদপত্র পারচালক ও রাজনীতিকাদিগের মধ্যেও কয়েকজন বাঙ্গালী উজ্জ্বল রত্নরশ্মি। শারীরিক বল ও সাহসের অভাব বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের একটি প্রধান কলঙ্ক বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ইহার সংস্কার আরম্ভ করিয়াছে। কয়েকখানি এংলো ইতিহাস পড়িলে প্রকাশিত বিবরণগুলি সত্য হইলে বলিতে হয় যে, এই কলঙ্কের দুঃখ বলীর যুবকদিগের হৃদয়ে একগুটি আঘাত করিয়াছে যে, শারীরিক বল ও সাহস একান্তে পরাধীন হওয়া যুগে থাকুক, তাহারা এখন উহা লাভ কারবার জন্য সচেতন হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার যুবকসমূহের মত বাঙ্গালার রমণী-সমাজও নতুন যুগের নবীনমুখে জাগরণের লাড়া উঠিয়াছিল। জানে ধর্ম, শিল্পে সাহস, সমাজসেবা ও রাজনীতিতে তাহারা যেমন সমুদ্র ভাঙতে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তেমন আকাশে, সমুদ্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শিকারে এবং ক্রীড়াকোশেও অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গরমণীগণ সমগ্র ভারতে আশ্চর্য্যভরা কার্য্যেছেন।

বাঙ্গালার রেশাক্ষবোধের জাগরণের প্রথম পর্ব্বারে “হিন্দুমেলার” অবদান অপরিণাম। সে মেলার কাহিনী এখন বিবৃত ও বিলুপ্তপ্রায়। বিবর্তন রচনা নাহি তাহার “জীবনমুখতি”তে এই মেলার বিষয়ে লিখিয়াছেন—আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষকে যশো বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধি করি সেই প্রথম হয়। মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত ‘মিলে সব ভারত সন্তান’ রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলার মেলের ভবগান সীত, শোভারঙ্গের কবিতা পঠিত, সঙ্গী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও সঙ্গী ওদী সৌক পুষ্কৃত হইত। হিন্দুমেলার অন্ততম প্রবর্তক নবগোপাল বিদ্যার প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলার শুভাবদানে একটি ব্যায়াম বিভাগের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একজন ইংরেজশিক্ষক এই বিভাগের নিয়ন্ত্রণ দিখাইছেন। কৃতী ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যায়ামশিক্ষকরূপে দক্ষতা লাভের চাকুরী পাইলেন। শুধু তাহাই নয়, বঙ্গবাসীরা স্বাধীনতার স্বপ্নপতি করেন। প্রেরিত রাজসভার

তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—বতগুলি মড়াপেতে। খোড়া লইয়া নবগোপাল বাবুই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী সার্কাসের পূর্ণপাতি করেন। তাহারই অনুপ্রেরণায় ব্যায়াম কোশে প্রথম প্রেরণা বঙ্গের প্রেরকের বোসের প্রেরিত সার্কাস গড়িয়া গঠে। এই সার্কাসে বোগদান করিয়া কয়েকজন বঙ্গরমণী বিশ্বজনপক্ষে বিমোহিত করিয়া কৃতৃত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যে সময়ের কথা হইতেছে, সে যুগে কোন বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে প্রেরিত সার্কাসে কিংবা অবতীর্ণ হইয়া খেলা দেখান নিত্যই অপ্রত্যাশিত ছিল। বাঙ্গালার বীর রমণীগণ সে অভাব ঘূর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর ভক্ততার কলঙ্ক ঘূর্ণ করিয়াছিলেন। সার্কাস-জনপক্ষে প্রথম বাঙ্গালী মহিলা খেলায় প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে অপর কোন বাঙ্গালী মেয়ে সার্কাস খেলার বোগদান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। শুধু বোগদান নহে, স্থলীলাসুন্দরী কৃতৃত্ব—তাহার কৃতৃত্ব শারীরিক শক্তিকোশে প্রদর্শনের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কেহ কেহ বলেন, স্থলীলাসুন্দরী সমগ্র ভারতের মধ্যে হিন্দু ব্যাঙ্গের খেলা দেখাইতে প্রথম মহিলা খেলায় প্রেরিত। স্থলীলাসুন্দরী ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় রমণী বঙ্গ ব্যাঙ্গের লইয়া প্রেরিত সার্কাসে খেলা দেখাইয়া বঙ্গাবধী হইতে পারেন নাই। স্থলীলা নির্ভরে অঙ্গ না লইয়া, আত্মরক্ষার জন্য একপাশে হাড়ি পড়ান না লইয়া ব্যাঙ্গপঙ্করে প্রবেশপূর্ব্বক যে আশ্চর্য্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বাঁহারা না দেখিয়াছেন তাহাদের দুকান অসাধ্য। ইংলিশম্যান পত্রের ইংরেজ সম্পাদক তাহার বিষয়ে লিখিয়াছেন হিন্দুরমণীগণ অকলা বলিয়াই কাণ্ড। কিন্তু স্থলীলাসুন্দরী একান্ত নির্ভরে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়াই হুটী বঙ্গ ব্যাঙ্গের কক্ষ প্রবেশ করিয়া একান্ত নির্ভরে এক আবাচলতভাবে তাহার কোশল প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার সন্ধে প্রেরকের বোস লিখিয়াছেন—যিক্ত হস্তে, সামান্য বস্ত্রে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া অত্যাচার উপর বাহে-মাহুবে প্রেরিত মনুষ্য এবং ব্যাঙ্গগুলিকে ভাঙা উত্তোষিত করিয়া পঙ্করের প্রটিকের উপর একেবারে লম্বমান হইয়া শরন ও লক্ষ্য ত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাঙ্গ কর্তৃক প্রাণবিশেষ ঘন ঘন নশন করান ও পরস্পর ঘন ঘন চুষন ও আলসন প্রদর্শন করিয়া লোমহর্ষণ প্রদর্শিত শোক ব্যাপার আর কেহ কোথাও দেখাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। ব্যাঙ্গের খেলা ব্যতীত স্থলীলাসুন্দরী ট্রাণ্ডিং ও লেডার প্রভৃতিতেও ব্যায়াম কোশল দেখাইতে পারিতেন এবং সেই সকল খেলায় তিনি অঙ্গ সাহস, কোশল ও শক্তিমত্তার পরিচয় দেন নাই।

সার্কাস ক্রীড়ায় স্থলীলাসুন্দরীর পরে বৃহদীর নাম কথিত হয়। ইনি হাড়পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া সমুদ্রবনের ব্যাঙ্গের সহিত খেলা দেখাইয়া অত্যাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্থলীলাসুন্দরী হাড়পৃষ্ঠে আশ্রয় করিয়া হাড়পৃষ্ঠে উপবিষ্ট বঙ্গ ব্যাঙ্গের সহিত তিনি

দেব্র শাস্ত্রী কৌশল ও বীরেশ্বর সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন, তাহা স্বপ্নে দেখিলেও লোকে আতঙ্কিত হইয়া উঠে। ইহারই কথা উল্লেখ করিয়া সেকালে কবি গাহিয়াছিলেন,—

কীদারে বল্লনা

গর্জ বাঘাননা

বলবীরাঙ্গনা

বরে মরণে।

শুশীলাশঙ্করীর ভগিনী কুমুদিনীও 'লেডার' ও অস্ত্রাস্ত্র খেলা ব্যতীত অঙ্গপুষ্টে আরোহণ করিয়া নানাবিধ নয়নরঞ্জন খেলা দেখাইতেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে বাঙ্গালী অবলাজাতির একজনের দ্বারা অস্বাভাবিক ও অঙ্গপুষ্টে নানারূপ অঙ্গচালনা দর্শককে কিরূপ বিমুগ্ধ করিত তাহা অল্পমান করা যায়। প্রেটবেল সার্কাসের সহিত এই বীররমণীর ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে বাইরা বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তথা হইতে পিনা ও পরে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিজয়গর্বে শেলা দেখাইয়া অর্ধ ও মন্থানে ভূষিতা হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে বাঙালীমেয়ে প্রেমীলাশঙ্করী এ্যাক্রোব্যাটস্ সার্কাসে খেলা দেখাইয়া লোকের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন। বেণী বাবুর এ্যাক্রোব্যাটস সার্কাসে ইনি খেলা দেখাইতেন। লোকবোঝাই পাকীগাড়ি বর্ণা দিয়ারা গিয়া দিতেন, ত্রিশ মণ ওজনের পাখর বুক ভাসিতেন, তিন মণ ওজনের গোলা লইয়া খেলা করিতেন। তিনি বোসে সার্কাসেও খেলা দেখাইয়াছেন। গায়ত্রী দেবী নামী একজন বাঙ্গালী মহিলা ঘোড়দোড়ে জিকি হইয়া প্রতিযোগিতায় অঙ্গচালনা করিয়াছিলেন। ইদানীংকালে 'জেমিনী সার্কাসে' কুমারী রেবা রক্ষিত নামী এক বলবীরাঙ্গনা নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া রমণী-বীরেশ্বর পরাক্রান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থবছরী শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী রক্ষিত বন্ধুর উপর ভারী 'রোলার' উত্তোলন, কঠোর বর্ণা-কলকের মুখে লৌহপুং বাকান, পৃষ্ঠদেশে ধারালো তরবারি রাখিয়া শেটের উপর প্রস্তুত ভর করা এবং বন্ধকের লক্ষ্যভেদে কৃতিত্বের জন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল স্বর্ণীয় হস্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ১১৫০ খুঁটা 'দেবী চৌধুরাণী' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর সার্কাসে বোগদান করিয়া বৃকের উপর হস্তী উত্তোলন করিয়া এবং ২৫ পাউণ্ড স্প্রিং (বিস্ফোরক) টানার খেলা দেখাইয়া প্রভূত বশ ও গৌরব অর্জন করিয়াছেন।

এ দেশে লজ্জ-চর্চার একটি প্রাচীন পদ্ধতি ছিল মল্লযুদ্ধ। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে এবং পুরাণাদিতে ইহার পরিচয় আছে। মল্লযুদ্ধকালেই যমু ও কৈটভ নামক অন্তরঙ্গ বিষ্ণু বর্জ্বক নিহত হইয়াছিল। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে এবং পাড়াপুুর, ময়নামতী ও বিষ্ণুপুরের পাড়ামাটির ফলকে আজিও সেকালের মল্লযুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠান ও মোগল শাসনকালেও এ দেশে মল্লক্রীড়ার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু দেশের দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গে মল্লক্রীড়া বা কুস্তি বাঙ্গালার জনসমাজে অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। কিন্তু ১২৩০ সালেও বে এদেশের বালিকাগণ শরীরচর্চা করিতেন তাহা বলিলে এখন হয়ত কেহই বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। সমসাময়িক কলকাতায় হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে

১২৩০ সালে কলিকাতার পাখুরিয়াখাটার দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটতে প্রত্যহ বৈকালে বালিকাগণ মল্লযুদ্ধ করিত। চৈত্রমাসে গাজনের মেলায় চড়কে আরোহণ করিতে যে সাহস ও বীরেশ্বর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও সেকালে বঙ্গ রমণীগণ পশ্চাৎপদ ছিলেন না। স্বদেশীয়গণ বাঙ্গালার মহিমময়ী বীরমাতা সরলা দেবী 'বীরঠাকুরী' সমিতির' মাধ্যমে পুরুষগণের সহিত বাঙ্গালার নারী সমাজেও শরীরচর্চার জ্ঞান নতুন প্রেরণা আনয়ন করিয়াছিলেন। তার পর হইতে কলিকাতায় এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন সহর ও পল্লীতে বিভিন্ন আখড়া বা ক্লাবের সহযোগিতায় বাঙ্গালার নারীসমাজ আপনার শারীর সামর্থ্যভাবের জ্ঞান একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। লাঠি ও ছোরাখেলা এবং যুগ্ম প্রভৃতির চর্চা আজ বঙ্গকুমারীর শিক্ষালভের অপরিহার্য অংশ।

কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতার 'রামমোহন বীর শতাবধিকী প্রদর্শনী' ক্ষেত্রে কুমারী অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায় বেগবান মোটরগাড়ি বোম্ব করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র পনের বৎসর। বরিশালের রাজেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরতাল বাঙ্গালার অন্ততম ব্যায়ামাচার্য্য বলিয়া পরিচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠকন্যা উষারানী বয়স ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর কলিকাতার দক্ষিণে পার্কে স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনীতে একখানা চলন্ত মোটরগাড়ি থামাইয়া তাঁহার পিতার বাণী 'বাংলাদেশ থেকে জামি অন্ততঃ একশ রামমুগ্ধি গড়ে' দিয়ে' যাব' কথাটার সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছেন। কলিকাতা বাগবাজারের সার্কসজনি দুর্গোৎসবের সময় বঙ্গ বালিকাগণ লাঠি ও ছোরাখেলায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন 'করিয়াছিলেন। 'স্কুলঅফ ফিজিক্যাল কালচাভের' উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে বহু ব্যায়াম সমিতি যোগদান করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বরোদার আর্থকন্যা বিজালয়ের ছাত্রীগণের নিয়মানুবর্তিতা বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালার বালিকাগণ ব্যায়ামের বৈচিত্র্যে অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে মহিলাদের দৌড় প্রতিযোগিতায় বঙ্গকুমারী নীলিমা লাল ও মেরী ডি স্ত্রায়া স্বাধিক্রমে ১৩'৬ এবং ১৩'১ সেকেন্ডে ১০০ মিটার পথ অতিক্রম করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ভারতের জাতীয় স্কুল গেমসে ৮০ মিটার হার্ডল রেসের বিজয়িনী (১৫'৩ সেকেন্ড) নাম কুমারী নিমিতা বোম্ব। রাইফেল চালনার সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ বঙ্গ রমণীর কৃতিত্বেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। বোনলেন খেলায় এবং তারের উপর ব্যালানের খেলায় বাজু শিবপুর স্ক্রুপল ক্লাবের সভ্যা কুমারী জ্যোত্স্না দে ও কুমারী নির্মলা মদ্যকের কৃতিত্ব রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি অর্জন করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে জানিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ কুমারীগণ লাঠি, তরবার ও ছোরার খেলায় এবং ভারোত্তোলনে এমন কৌশল আদৃত করিয়াছেন যে, তাহাদের খেলা দেখিয়া দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়া যায়। অল্পসন্ধান করিলে একশ দৃষ্টান্ত যে আরও সংগৃহীত হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

বিমান চালনা কার্যে ইউরোপ ও আমেরিকার মহিলাগণ কৃতিত্ব দেখাইয়া আশ্চর্য্যতেন। বঙ্গ রমণীগণও কিন্তু এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ রহেন নাই। কুমারী সুরমা স্বাধিক্রমে নামে একটি মেয়ে রমণ

উড্ডাহাজ বীজিত্তে এরোপ্লেন চালনা শিক্ষা করিতেছেন। তিনি শ্রীষ্ট প্রথম শ্রেণীর লাইসেন্স পাইবার জন্ত পরীক্ষা দিবে। বাঙ্গালী মহিলাগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম এরোপ্লেন চালনা শিক্ষা করিতেছেন 'দাদাবার বৃত্তি তহবিল' হইতে মহিলা শিক্ষার্থীদের বিমান চালনা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম বৎসরেই কুড়ি জন বাঙ্গালী ছন্দ ও একজন মুসলমান রমণী বিমান চালনা শিক্ষা করিতে আগ্রহের হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে তিনজনকে মনোনীত করা হয়।

(১) কলিকাতা বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রী কুমারী অঞ্জলি দাস।

(২) লাহোর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিক।

(৩) শ্রীহট্টের রমা গুপ্তা।

পরে স্থির হয় একঘণ্টা কাল বিমান বিহারের কল পরীক্ষা করিয়া তিনজনের মধ্যে প্রথম স্থানীয়রাই এক হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় স্থানীয়রাই পাঁচ শত টাকা বৃত্তি দিয়া দমদম বিমান দ্রাঘে তাঁহাদিগকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। সম্প্রতি তহবিলের সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে ষটশচার্চ কলেজের কুমারী অশোকা রায়কন্ত বি. এ., বিমান চালনার জন্ত বৃত্তি পাইবেন স্থির হইয়াছে। ইহার শিক্ষাদান কল দেখিয়া দ্বিতীয় বৃত্তিপ্রদান করা হইবে এবং সেই সময়ে কুমারী সুশালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৃত্তিদানের বিষয় বিবেচনা করা হইবে। এয়ারহট্টেল পদেও কয়েকজন বঙ্গকুমারী কৃতিত্বের সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, শ্রীমতী হুর্না বানাজি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি বৈমানিকের চাকুরী লাভ করিতে পারিতেছেন। ইহা বঙ্গকুমারীর পক্ষে কম সৌরবের বিষয় নহে।

সংবাদপত্রের বিবরণে প্রকাশ, লাইট লেকটোরাণ্ট কুমারী গীতা চন্দ্র পর পর সাত বার বিমান হইতে প্যারাসুটযোগে লক্ষ্যপ্রদান করিয়া প্রথম ভারতীয় মহিলা প্যারাসুটপার হিসাবে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন শ্রীমতী চন্দ্র বিমান বাহিনীর একজন ডাক্তার এবং ছাত্রীসেনা হিসাবে শিক্ষালাভের ব্যাপারে তিনিই বিমান বাহিনীর প্রথম মহিলা। বর্তমানে তিনি বিমান বাহিনীর কলাইকুলা কেন্দ্রে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত আছেন। ভারতের প্রথম মহিলা প্যারাসুটপার শ্রীমতী গীতা চন্দ্রের কৃতিত্বে বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।

মহীমাতৃক বঙ্গদেশের অধিবাসী বাঙ্গালীজাতির সম্ভরণপটুতা চিত্র-প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার রমণীগণও সম্ভরণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 'চর্যাপীতিকার' জানা যায়, বেয়া পারাপারের কাজও এসময়ে বাঙ্গালার রমণীগণই করিতেন। পত্নী অঙ্কলে এতনও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানকালে বঙ্গশালিকাগণকে সম্ভরণ শিক্ষা দিবার জন্ত অনেক দ্রাব বা সহিত পণ্ডিত হইয়াছে এবং বঙ্গকুমারীগণের সম্ভরণ পটুত্বের কাহিনী সংবাদপত্রে বিবোদিত হইতেছে। কিন্তু জলক্রীড়া বা সম্ভরণ যে অতি প্রাচীন কালেও বঙ্গবধীর অন্তরম প্রধান দারীর ক্রিয়া তাহার পরিচয় সেন রাজবে লিখিত পবনভূত মামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ১২৩৬ সালেও অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যাবধী কৌড়াকলে কুৎসলে সম্ভরণব্যায়াম অকীলক্রমে গলা পায় হইতেন—তাহার বিবরণ লক্ষ্যমাসিক সূর্যাসপত্রে লিখিত আছে।

১৩৪২ সালে নিখিল ভারতীয় মহিলাদিগের সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় যে ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকাটি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কুমারী বাণী ঘোষ। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই ছোরা ও লাঠি খেলা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথম সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পর বৎসর হইতে তিনি মহিলাদের সকল সম্ভরণ প্রতিযোগিতাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেছেন এবং ইংরাজ ও এঙ্গেল ইণ্ডিয়ান মহিলা সম্ভরণকারীদিগকে অনায়াসে পরাজিত করিতেছেন। পূর্ব সম্ভরণকারীদিগের সহিতও তিনি বহু সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় ১৭ জন বয়োক্রোড় পুরুষকে তিনি পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়া প্রথম হইয়াছিলেন। আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের অষ্টম বার্ষিক সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় অষ্টমবর্ষীয়া কুমারী তারকবালা, সপ্তমবর্ষীয়া চামেলী ও ষষ্ঠবর্ষীয়া মনোরমা নাস্তী বালিকা সম্ভরণকারিগণ সাত মাইল সম্ভরণে সমস্ত পঞ্চ অতিক্রম করিয়াছেন, আমাদের দেশে কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সীতারূপণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইংহাই এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ সীতারূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের জাতীয় সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় মেয়েদের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালার স্থান সবার উপরে। বাঙ্গালী ৪৫ বোম্বাই ১১ ও দিল্লী ৩ পয়েন্ট পেয়ে বাক্যক্রমে লাভ করেছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান। এবার প্রথম দিন বাঙ্গালার দীর্ঘদেহী মহিলা সীতারূপ কল্যাণী বসু নিকট ২০০ মিটার ফ্রিষ্টাইলে বোম্বাই-এর ডলি নাজিরের পরাজয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাঙ্গালার মেয়েরা বিশেষ করে সন্ধ্যা চন্দ্র ও কল্যাণী বসু যে ভাবে অজ্ঞাত প্রদেশের মেয়েদের পরাজিত করে বিজয়ীর স্থান অর্জন করেছেন তা যথেষ্ট প্রশংসা দাবী রাখে। ১০০ মিটার ব্যাকট্রাকে সন্ধ্যা চন্দ্র ডলি নাজিরের ভারতীয় রেকর্ড হান করে দিয়েছেন। আর কল্যাণী বসু ২০০ মিটার ফ্রিষ্টাইলে দেখিয়েছেন অসূর্য কৃতিত্ব। মেয়েদের ৪×১০০ মিটার রিলে মেয়ে নুতন রেকর্ড করেছেন বাঙ্গালার রিলে টামের চার জন সীতারূপ সন্ধ্যা চন্দ্র, গীতা দে, কল্যাণী বসু ও অনুরাণা গুহ।

১৩৬৫ সালে কলিকাতার আভাশহিন্দ বাগে হুইট সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালার সীতারূপের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার সম্ভরণ পটয়নী মেয়েদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর আর এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছে। হুইট বিবয়ের ভারতীয় রেকর্ড হান করা ছাড়াও একাধিক বিবয়ে হান করিয়াছেন মেয়েদের রাজ্য রেকর্ড। ভারতীয় রেকর্ড হান করিবার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন সেন্ট্রাল ভাইসি ক্লাবের সভা কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র আর ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং শোসাইটির সভা কুমারী অম্বাধা গুহঠাকুরতা। ১০০ মিটার সীতারে কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্রের উত্তরোত্তর উন্নতির কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। গত আশ্বীনের মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় সন্ধ্যা চন্দ্র ১ মিনিট ২৯'৫ সেকেন্ডে ১০০ মিটার ব্যাকট্রাক বা শির্ট সীতারে নুতন করিয়া ভারতীয় রেকর্ড করেন। আভাশ হিন্দ বাগে বাঙ্গালার রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপের সময় তিনি সেই রেকর্ডকে আরও উন্নত করে ১ মিনিট ২৮'৪ সেকেন্ড করেন। এক সপ্তাহ পরে আশাশুভ হুইসি এসোসিয়েশনের সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র আরও খামিকটা উন্নতি করে ১ মিনিট ২৮'২ সেকেন্ডে ১০০

মিটার (পিঠ সীতার) অতিক্রম করেছেন। জাতীয় সন্তরণে বাঙ্গলা মহিলাদের অধিনায়িকা কুমারী অম্বরধা গুহাচাঁকুরতায় সীতারেও দিনে দিনে উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। দিল্লীতে অম্বরধা কোন রেকর্ড না করলেও আজাদ হিন্দ বাগে রাষ্ট্র চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার বুক সীতারের-দূরত্ব ১ মিনিট ৩৭' ৮ সেকেন্ডে অতিক্রম করেন। ১৯৫৫ সালে ডলি নাক্সির কৃত রেকর্ড (১ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে) রান করে দেন। পরে ক্রীড়াশ্রম স্ত্রীমণি এসোসিয়েশনের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় তিনি এই সময়কে আরও উন্নত করে ১ মিনিট ২৬' ৩ সেকেন্ড করেছেন ১৩৬৬ সালেও সন্ধ্যা চন্দ্র সন্তরণে পূর্ব রেকর্ড অতিক্রম করেন।

এ প্রসঙ্গে সন্তরণ পটীয়সী বঙ্গকুমারী আরতি সাহার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আরতি ইতিপূর্বে বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে সন্তরণে রেকর্ড করিয়াছিলেন এবং ১৯৫২ সালে হেলসিংকি অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু বর্তমান ১৯৫১ সালের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম তাঁহার জীবনের শিখের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ২৭শে আগষ্ট ফ্রান্সের উপকূলে কেপগ্রিনজেনে হইতে ইংলণ্ডের ডোভার পর্যন্ত বাতায় শিক্কু উদ্যম তরঙ্গসহুল ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিবার জন্য বিলি ব্যাটলন আয়োজিত আন্তর্জাতিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় আরতি যোগদান করেন। প্রারম্ভে নৌকা বিভাগে হওয়ার তাঁহার ব্যাড়া স্তব্ধ করিতে চলিল মিনিট দেরী হয়। তথাপি তিনি সন্তরণের মধ্য পথে আমেরিকার গ্রেট এস্টারসনকে ধরিয়া ফেলেন; কিন্তু পথ প্রদর্শক পাইলটের তুলসে জন্ত ১৪ ঘট্টা ১০ মিনিট কাল সন্তরণ করিয়াও এক ইংলণ্ডের উপকূলের মাত্র তিন মাইলের মধ্যে আসিয়াও দুর্ভাগ্যপূর্ণ আবহাওয়ায় জন্ত নৌকার উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হন। ইংলিশ চ্যানেল কখনই সন্তরণকারীদের নিরাপদে সফল হইতে দেয় নাই এবং এবারে চ্যানেলের জলঝাঁপে, দুর্ভাগ্যপূর্ণ আবহাওয়া এবং হিমশীতল উত্তাল জল আরও প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা সফল না হইলেও মহিলা প্রতিযোগীদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিবার জন্য আরতি পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেন এবং অসাধারণ মনোবল ও সহিষ্ণুতার জন্য আরও পঁচিশ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেন। ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার নারীদের মধ্যে শ্রীমতী সাহা এই প্রথম অভিবানে অগ্রণী হইয়াও ১৪ ঘট্টা ১০ মিনিট কাল দুর্জয় তরঙ্গের মধ্যে যুধিবার ক্রমতা এবং দুর্ধর্ষ সাহস দেখাইয়া সকলের অভিনন্দন লাভ করেন।

কিন্তু প্রথম অসাফল্য শ্রীমতী আরতিকে নিরন্তর করিতে পারে নাই। এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় চেষ্টায় ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে ফ্রান্সের কেপ গ্রিনজেন হইতে সন্তরণ আরম্ভ করিয়া ১৬ ঘট্টা ২ মিনিট সন্ধ্যাবেগে দ্বারা চ্যানেল অতিক্রম পূর্বক ইংলণ্ডের কোকটোনে পৌঁছিয়া ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিবার তুলভ গৌরব লাভ করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে প্রথম অঙ্গন মহিলা সীতার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। তাৎপর্য বিগত ৩২ বৎসর মাত্র সাতটি দেশ হইতে ১০ জন মাত্র মহিলা এই দুর্ভিক্রম্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনও এশিয় মহিলা স্থান লাভ করেন নাই। এই গৌরব সেমিক দিয়া নিশ্চয়ই অসামান্য। দ্বিতীয়বার চ্যানেলে অবতরণ করিয়া সন্তরণ আরম্ভ করিবার পর কিছুকাল তিনি অসুস্থ, আত্মাণ্ডা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভারত

প্রবল ঝড়, হিমশীতল জলপ্রোভ, এবং উত্তম তরঙ্গরাশি অনুান দ্বয় ঘটাকাল তাঁহাকে প্রতি নিয়ত বাধা দিয়াছে—এমনও সময় পিয়াছে যখন মনে হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে চ্যানেল অতিক্রম করা বোধ হয় আর সম্ভব হইল না। পথপ্রদর্শক ক্যাপ্টেন বলিয়ার্ডেন—প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শ্রীমতী সাহা যে ভাবে সন্তরণ করিয়াছেন, ইতিপূর্বে আমি কখনও সেরূপ দেখি নাই। কাজেই সংকল্পের দৃঢ়তা, সাহস ও সন্তরণ কৌশল সর্বাঙ্গিক দৃষ্টি এই গৌরবের পূর্ণমর্যাদা তিনি লাভ করিয়াছেন। সাগর বিভাগিনী মহিলাদের মাধ্য এশিয়ার তিনিই প্রথম এবং সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলাদেশে তাঁহার অজিত এই তুলভ গৌরবের অংশীদার হইয়াছে। কুমারী সাহার বীরত্ব বঙ্গজননীর মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গবঙ্গীর নানা তীর্থ ভ্রমণের কাহিনী জানিতে পারা যায়। পদ্মজ্ঞে ও নৌকার সেকালে তাঁহার পুরী, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ গমনাগমন করিতেন। তুবারমৌলি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত হরিদ্বারেও তাঁহার গমন করিয়াছেন। কান্দীরে ভূতপূর্ব বাঙ্গালী মেঘরান সাহেবের স্ত্রী একবার অমরনাথ হাট্টা ছিলেন। তিনি নিজের খরচে হাট্টারের জন্য হাসপাতাল ও ভাণ্ডার সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রতিবৎসরই কষ্টকর গিরিপথে বঙ্গনারী অনাদ্যাসে শ্রীধাম (কেন্দার-বমরী) গমন করিয়া দেবদর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। তাঁহাদের ভ্রমণ কাহিনী নানা পুস্তকে ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অতিশয় দুর্গম মানস-কৈলাস তীর্থ বঙ্গমহিলার গমন একটী পরম বিস্ময়কর ব্যাপার। পাণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ভোড়া বড়া হেমকতা সরকার এই দুর্গম পথে হিমালয় বিজয় করিয়াছিলেন। সেই দুর্গম পথে আসুকোট হইতে ৫০ মাইল উত্তরে ভীষণ নির্পান পাড়া। উহা দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ মাইল। পথে এক বিলুপ্ত বার নাই। এমন খাড়া পথ যে, মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কাটা আছে। সেই সকল সোপান বহিয়া প্রতি পদক্ষেপে উর্দ্ধে উঠিতে হয়। উঠিতে উঠিতে খাসকই দেখা দেয়, হাতীর মাথা ঘুরিয়া যায়—পর্যন্ত-পীড়া আরম্ভ হয়। তাহার পর সেই ভীষণ লিঙ্গুকে গিরিবন্ধ। কুয়াশায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন—তাহার উপর বরফের উপর দিয়া পথ। সে পথের রেখা পর্যাপ্ত নাই। ভাববাগী ছাগল ভেড়ার দল বহির্জ্যেয় দ্রব্য সজ্জার লইয়া বরফের উপর দিয়া যে স্থান দিয়া গিয়াছে, সেই রেখাতেই মাহুৎ চলাচলের পথ পাড়িয়াছে। রেখা ছাড়া অপর দিকে যাইলে বিশেষ সম্ভাবনা। বরফে চলিবার আগে মাল বোঝাই ষোড়াতালিক আগাইয়া দিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘোড়ার পা বরফে ঢুবিয়া যাইতে লাগিল,—আমাদেরও পা বরফে ঢুবিয়া যাইতে লাগিল। বহুকণ চেষ্টার পরে আমরা শক্ত বরফে আসিয়া পৌঁছিলাম। ক্রমে অন্ত্যস্ত ঠাণ্ডার ও সূর্য্যে এবং বরফ আমাদের সর্বাস অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল। বেলা প্রায় ১২টার সময় লিঙ্গুপাশের উচ্চ দিগে উঠিলাম।

লিঙ্গুলেকপাস সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৬০০০ ফিট উচ্চ। এতকণ কেবল বরফের চড়াই উঠিতেছিলাম। এইবারে আমাদের উৎসাহ করিতে হইবে, নীমিবার সময় পড়িয়া বাইবার সম্ভাবনা। আমরা নটন: নটন: বরফ হইতে নামিতে লাগিলাম। অন্ত্যস্ত ঠাণ্ডার দাসদোষ হইয়া আসিতে লাগিল। অসুস্থ বাইতে

না বাইতেই ধাঁপাইতে হইল। বঙ্গবীর্য এই হিমালয় বিজয় কাহিনী পৃথিবীর যে কোন দেশের ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য।

কৃপ্ত হইতে হিমালয়ের চো ওয় শৃঙ্গ ২৬,৮৬৭ ফুট উচ্চ। আজ-পর্যন্ত বাঁহারা পদক্ষেপে ওই শৃঙ্গ আরোহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দুইজন সফল হইয়াছেন। বলা বাহুল্য সেই দুইটি অভিযাত্রীগলে কোন রমণী ছিলেন না। কিন্তু বিধে রমণী সমাজ বৈদিনি এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ রহিলেন না, বিভিন্ন দেশের নারীদের লইয়া গঠিত আন্তর্জাতিক অভিযাত্রীগণ গত আগষ্ট মাসে (১৯৫১) চো ওয় পর্বত শৃঙ্গ জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। চো ওয় পৃথিবীর বর্ষ উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ। ইহার পথ যেমন দুর্গম, তেমন ইহার আবহাওয়াও ভূবায়ান্তর্য ও ঝড়, বিস্কৃৎ, পর্বত, নদী, গিরিশৃঙ্গ, জলপ্রপাত সবই তুবারে আচ্ছন্ন থাকিয়া সব সময়ই বলতগিরি সন্নিক্ত বোধ হইয়া থাকে। কোথাও পথের রেখামাত্র নাই। এই চির তুবারের দেশে আন্তর্জাতিক অভিযাত্রী নারীগণের নেত্রী শ্রীমতী রুডকোপান তাঁহার এগারজন সহযাত্রী লইয়া নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে গত ২১শে আগষ্ট (১৯৫১) যাত্রা করেন। শ্রীমতী কোপান নিজে জাতিতে ফরাসী—তাঁহার সঙ্গিনীগণের মধ্যে ছিলেন আরও দুইজন ফরাসী, তিন জন ইংরাজ, একজন সুইস, একজন বেলজিয়ান, একজন অস্ট্রেলিয়ান এবং তিনজন ভারতীয় মহিলা। আনন্দ ও গৌরবের কথা এই যে, এই তিনজন ভারতীয় মহিলাই বাঙ্গালী, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং সহরের অধিবাসিনী। ইহাদের মধ্যে দুইজন হইতেছেন এভাবেই বিজয়ী তেনজিং নোরকের কন্যা শ্রীমতী পেমপেম ও শ্রীমতী নীমা এবং অল্পজন তেনজিং-এর ভাগিনেরী শ্রীমতী লোমা। আন্তর্জাতিক মহিলা পর্বত অভিযাত্রীগণ লে ইহাদের যোগনানে বঙ্গরমণীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এই মহিলা পর্বত অভিযাত্রীগণ ২১শে আগষ্ট (১৯৫১) কাঠমান্ডু হইতে যাত্রা করিয়া মোটরযোগে বানেপা গিরিবন্ধ পর্বত গমন করেন এবং তথা হইতে পর্বতআরোহণ শুরু করেন। সেন্টেবরের শাখামাঝি অভিযাত্রীগণ উনিশ হাজার ফুট উচ্চ পৌছিয়া তথায় তাঁহাদের কেন্দ্রীয় শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর শিখর অভিমুখে তাঁহাদের যাত্রা আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্বত ২৬,০০০ ফুট উচ্চ তাঁহারা তাঁহাদের চতুর্থ শিবির সংস্থাপন করেন। এই সময় হইতে

প্রতিপদক্ষেপে তাঁহাদের যাত্রা ব্যাহত হইতে থাকে। কারণ সেন্টেবরের শেখরকে আকোওয়া খাংপা হইতে থাকে এবং বহন তখন দুঃসহ তুবার ঝটিকা ও তুবারপাত হইতে থাকে। তেপুসা নামে একজন মালবাহী শেরপা এই সময় বরফের ধসে চাপা পড়িয়া নিহত হয় এবং দুইজন অভিযাত্রী পর্বতগীড়া ও প্রায়বিক ক্লান্তিতে আক্রান্ত হওয়ার নিম্নতম আশ্রয় শিবিরে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। মূল বাহিনী কিন্তু অগ্রসর হইতেই থাকে এবং অক্টোবরের ১লা হইতে সত্তরই তারিখের মধ্যে কোন সময়ে একই দিনে অথবা বিভিন্ন দিনে দলের নেত্রী শ্রীমতী রুড কোপান, তাঁহার সহকারিণী বেলজিয়াম কুমারী ক্লডিন এবং শেরপা আনন্দবর মুখ্য হয়। সুবাদে প্রকাশ এই সময় চো ওয় প্রাকৃতিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্যোগ্যপূর্ণ ছিল এবং ঝটায় একশত মাইল বেগে তুবার ঝটিকা বহিতেছিল এবং এই তুবার ঝটিকা এক সপ্তাহেরও অধিককাল স্থায়ী ছিল। ঠিক কবে এই তুবারঝড়াজনিত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই এবং নিচত অভিযাত্রীদের মুহুদেহও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। বলাবাহুল্য, অভিযানটি এখানেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মাত্র কয়েকজন শেরপা সহকারী লইয়া সম্পূর্ণরূপে মহিলাদের দ্বারা গঠিত আন্তর্জাতিক অভিযাত্রী বাহিনী হিমালয়ের একটি প্রধান গিরিশৃঙ্গ জয় করিতে এই সর্বপ্রথম অগ্রসর হইয়াছিল এবং প্রায় সাকল্যের অতি নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বঙ্গকুমারী পেমপেম, নীমা ও লোমার যোগে গণনা ঘটনা হিসাবে যেমন আনন্দপ্রসূক, তেমন অপরিণাম গৌরবান্বিতও। প্রকৃতি বিরূপ না হইলে নারী অভিযাত্রী বাহিনী যে চো ওয় বিজয় করিতেন এই বিশ্বাস অবশ্যই করা যায়। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় ইহাদের অমর্য সাহস ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু নিফলতা ও মৃত্যুর দ্বারা চিহ্নিত হইলেও এই রমণী বীরত্ব চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে এবং ইহা হইতে ভবিষ্যতের রমণী সমাজ প্রেরণা লাভ করিবেন। দুঃখের পরীকার এবং দুঃসাহসের তপস্তার বাঙ্গালার নারী সমাজের এই গৌরবে এই দুর্দিনেও বাঙ্গালীজাতির বক্ষ দ্রুত হইয়া উঠিবে। বঙ্গরমণী, তথা বাঙ্গালীজাতির এই নবীন অত্যাশ্রয় সফল হউক ;—

অসমারম্ভ: শুভার ভবতু।

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অধিমূল্যের দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধ-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা বক্ষা করা বেন এক দ্বিবিহ বোবা বহনের সাদিল হয়ে থাকিবে। অথচ মাসিকের সঙ্গে মাসিকের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, মেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারণ উপনয়নে, কিংবা অন্নদানে, কারণে শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ বাহিকিতে, নহতো কারণে কোন কৃতকার্যতার আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তাঁর ব্যক্তি যখন কর্তব্যে পারে একবার

'মাসিক বসুমতী' এই উপহারের জন্ত ব্রহ্মা ব্যবসার ব্যক্তি আছে। আপনি শুধু নাম টিকানা টাকা পাঠিয়েই পালাস। প্রথম টিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা কেনে বন্ধী হবেন, সন্তানি বেশ করে পড় এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যে-কোন জাতবোধের জন্ত লিখুন—প্রচার বিভাগ মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বনু

তেইশ

কুমিরমারির হাট সেদিন। মেছোভিড়ি ঘাটে বেঁধে বোটে রেখে জগা নেমে পড়ল। বলাই ভয়ে ভয়ে একবার বলেছিল, পাঁচও ভাই একটু। মাছগুলো উঠে থাক।

আমার কি দার পড়েছে ?

ক্রমশ না করে ভিড়ের মধ্যে চক্ষুর পলকে সে অদৃশ। জগন্নাথ নিতান্ত পর-অপর এখন। গগনের ষাতিরে ডিঙিটা বেয়ে এনে দিল, ডিঙি পৌছে গেছে—বাস, ছুটি। হু-জন ব্যাপারি এসেছে ঐ ডিঙিতে—তাদের সঙ্গে ধরাধরি করে বলাই মাছের ঝোড়াগুলো খাতায় তুলে ডাক ধরিয়ে দিল। সমস্ত বলাইর ব্যবস্থা। কাজকর্ম সম্পূর্ণ শিখে গেছে।

বিকালবেলা হাট পাড়সা হয়ে গেছে। নানা অঙ্কলের নৌকো এসে জমেছিল, বেচাকেনা সেরে একে ঘুরে সব কাছি খুলে দেয়। ঘাটের জল দেখবার জো ছিল না, আস্তে আস্তে আবার কীকা হয়ে আসে। জগা সেই যে ভুব দিয়েছে—বাবার সময় হয়ে এসে, এখনো তার দেখা নেই। খুঁজে খুঁজে বলাই হররান। কোথায় গিরে পড়ে আছে—হোটেলের ভাত না-ই হোক, চিঁড়ে-মুড়কি জলবোগ করতও তো একটাবার দেখা দেবে মাইবট।

জগা তখন ছই-দেওয়া বড় এক হাটুরে নৌকোর ভিতরে। নৌকো ছাড়া-ছাড়া। যারা গাঙে-বালো ঘোরে, জগাকে চেনে তারা মোটামুটি সবাই। মাঝি বলে, এ নৌকোর উঠলে কেন তুমি ? আমার মোটে একটুখানি পথ বাব—বরারখোলার।

জগা বলে, এই বাঃ। বরারখোলার নৌকোর উঠে বসেছি ?

তুমি কি ভাবলে বল দিকি ?

জগা পাঁচ বের করে হাসে : বাব তো সাঁইতলা। চৌধুরিগঞ্জ বরাপোতা—ঐদিককার কোন একখানা হলে চলে।

মাঝি বলে, জলের পোকা হলে তুমি। তোমার এমনিধারা কুল হয়ে গেল ?

হল তো দেখছি। তামাক খাওয়াও দিকি ও বোঠেওয়ালা ভাই—

মাঝি বলে, তামাক খাবে কী এখন। গোন বয়ে যাচ্ছে, নৌকো ছাড়া হবে। নেমে বাও তুমি তাড়াভাড়ি।

জগন্নাথ বলে, বা কাঁদা ! উঠে বখন পড়েছি, নেমে কাদার পড়তে ইচ্ছে থাকে না। একেবারে বরারখোলা গিরেই নামা বাবে।

মাঝি বুঝে ফেলে এইবারে হেসে উঠল : বুঝলাম, বরারখোলাতেই বাবে তুমি। মতলব করে উঠেছ। মন্তরা না করে গোড়ার সেইটে বললে হত। নাও, বোটে ধরে বোসোপে। শিশুবর, জগার হাতে বোটে দিয়ে জুত করে তুমি কলকে ধরাও।

হাটুরে নৌকোর নিয়ম হল, উটকো বাতী টাকাপয়সার ভাড়া দেবে না, গতরে খেটে দেবে। জগন্নাথ হেন পাকা লোক নৌকোর, তাকে না খাটিয়ে ছেড়ে দেবে কেন ?

জগন্নাথ বোটে বেরে চলেছে। আর বলাই ওদিকে সমস্ত হাট পাতিপাতি করে খুঁজছে তাকে। হাকে পায় জিজ্ঞাসা করে, জগা গেল কোন দিকে, জগাকে দেখেছ ? ক'টা দিন জগা নৌকোর আসে নি, শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে। নতুন ছাঁটের গল্পর মতো জোরাল আর কাঁধে রাখতে চায় না। বিবম ব্যস্ত হচ্ছে বলাই—আর দেরি করলে সাঁইতলা রাতের ভিতরেই পৌছন বাবে কিনা সন্দেহ। ডিঙি নিয়ে আসতে হবে তো আবার সকালবেলা।

বরারখোলার নেমে জগন্নাথ সোজা চলল পাঠশালা-ঘরের দিকে, গগন দাস একদা যেখানে গুরু হয়ে বসেছিল। গাঁয়ের মধ্যে ঐ একটা বাড়ি শুধু চেনা, এখানে এসে আড্ডা জমাত সে গগনের সঙ্গে। চেনা আছে আরও একজন বাহুব—ঠৈলক।

কী কাণ্ড ! আশ'পাশে চলার উপায় নেই। হস্তদুবরণ ধানগাছ ফসলের ভায়ে ঘুরে পড়েছে দু-পাশ থেকে। পায়ের পায়ের ধান ঝরে পড়ে। ধানের ঘবার পায়ের পোছার উপর খড়ির মতন ছাপ এঁকে যায়। অম্মাণ শেষ হয়ে যায়, কেটে তোলে নি একদো কেতের ধান ?

কত আর তুলতে পারে বল। খাটেছে ভো সকাল থেকে রাত দেড় পহর দু-পহর অবধি। দিনরাত ধান কেটে এনে ফেলে খোলাটের উপর, রাতে মলন মলে। লক্ষ্যটাকরন এত দিয়েছেন যে ধান তোলায় খোলাটাই পায় না খুঁজে। কেখানে যেইকু উঁচু চৌরস জারগা, লেপে-পুছে সেখানে খোলাটি বানিয়ে নিয়েছে। পাঠশালা-ঘরের উঠানও দেখে পালার পালার ভরাটি।

গাছের ডাঁড়ি-কোলা ভোবার হাটে পা খবে খবে বুয়ে হাতের চট-
জোড়া পায়ে পরে জগা এবার ভল হল। তাইতে আরও পোলমাল।
কিন্তু হয়ে এক ছোঁড়া চেঁচিয়ে উঠল, বড্ড রে জুতোর বেমাক।
মা-লক্ষ্মীর ধান মাড়িয়ে চলেছ—খোল জুতো বলছি।

দাঁওয়ার উপরে তৈলক। সেখান থেকে জিজ্ঞাসা করে, কাকে
বলিস রে খুন?

চিনি নে। ম্যাচ-ম্যাচ করে আসছে দেখে ধানের উপর দিয়ে।

তৈলক বলে, কে হে তুমি? জুতো পরে ধানের উপর দিয়ে
আসতে নেই। ঠাকুরনের গোসা হয়।

চটি খুলে জগা আবার হাতে নিল। এখান থেকে চেঁচায় :
আমায় চিনতে পারলে না তৈলক মোড়ল? সেই কত আসতাম।
গগন গুলকে আমিই তো জুটির দিয়েছিলাম।

তৈলক তড়াক করে উঠে পৈঠা অবধি নেমে এসে খাতির করে :
এসো এসো জগাধা। এদ্বিনে সপ্ন হল? বলি, পাকাপাকি এসে
তো? না, এসেই অমনি পালাই-পালাই করবে?

পাকা ছড়াদায়ের মতো কথা বলে জগা : বাজার দলও কি
পাকাপাকি তোমাদের? যতক্ষণ সিনমান, ততক্ষণ কমল দল
মেলে আছে। বাস্তব হলে আর নেই। তোমাদের বাজাও গোলা
ভরতি ধান আছে বন্ধিন। ধান কুরোবে, দল বাবে। পাঠশালায়
নিয়েও যে ব্যাপার হত। সমস্ত ছেড়েছুড়ে হাত-পা বুয়ে উঠে
আসব তোমাদের এখানে, দল গেলে আমার তখন কি
গতি বল?

চিনতে পেয়ে তৈলকের বড় ছেলে খুনও উঠে এসেছে দাঁওয়ার।
কলকের তামাক সেজে গেরো কাঠের কল্যা ধরাচ্ছে টেমির উপর ধরে।
বলে, খাটিতে পারলে কখনো ভাতের অভাব। গুল মশায়ের কাছে
বখন আসতে, ধানের ভরা নিয়ে হাটে হাটে খোয়া কাজ ছিল
তোমার। দল উঠে থাক কি হাচ্ছেতাই হোক গে, গাঙ-খাল তো
জুকিয়ে বাবে না। নতুন রাস্তাপথে আবার গুলরপাড়ির চল
হয়েছে। তোমার মতন লোকের কি ভাবনা?

তামাক টানতে টানতে তৈলককে জগা বলে, কেতখামার
দেখতে দেখতে এলাম। চোখ জুড়িয়ে বার। কিন্তু পাঠশালা
বাতিল করলে কেন বল তো মোড়ল? বেশ নামডাক হয়েছিল
বয়্যারখোলায় পাঠশালায়। বাজি থাক তো বল—সেই গগন
গুলকে খবর দিয়ে দিই। এখন সে খেরিয়ার—টাকাপয়সা
করেছে। কিন্তু মুখ নেই। খবর দিলে পালিয়ে এসে পড়বে
ফটক-পালানো আসামির মতো।

তৈলক বলে, গোড়ায় পাঠশালায় কথাই হয়েছিল। দু-এক হাট
খোরাবুগিও করেছিলাম গুলর চোঁচায়। তারপরে মাতব্বরদের মন বুয়ে
গেল : খরচপত্তার দু-শরসার আরগায় চার পরস্যা হলেও এবারে
অমুখি হবে না—বাজার দল হোক এবারটা।

জগা বলে, বাজা আর পাঠশালা দু-রকমই তো হতে পারে।

তৈলক বাড় নেড়ে বলে, ওইটি বোলো না। বাজার
দলেও ছেলেগুলোর অনেক কাজ। জুড়িয়, দল—বুখোড়ে
আটটা করে ধরলে চার সারিতে আট গত্তা। তার উপরে
রাজকতা সখী কেউ-বাখা গোপিনী—সবই তো ছেলেগুলোর ব্যাপার।
তুমি পাঠশালায় বসে সকাল-বিকাল ক-ক-ক করতে লাগল তো

পেরাজ সামলার কে? লেখাপড়া আর পালাপান উট্টো রকম
কাজকর্ম—দুটো এক সঙ্গে হয় না।

আবার নিজেই বলছে, পুরোপুরি উট্টো—তাই বা বলি কেমন
করে? পাঠ পড়তেও পড়াগুনো লাগে। মোশান-মাকার কাঁহাতক
পড়িয়ে পড়িয়ে দেবে, শুধু একজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে তো দল
চলে না। তা এবারটা বাজা হল। দেখা থাক, কি বকম পাড়ার।
আমেরা সনে আবার না হয় একটু পাঠশালা করে নেওয়া বাবে।

জগাকে বলে, দরাজ গলাখানা তোমার। এক একটা পালে
আসার ফেটে চোঁচির হবে। বিবেক নিয়ে ভাবনা ছিল, মা বীশাশাপি
শুবুদ্বি দিয়ে তোমায় হাজির করে দিলেন।

শ্রেশাসার কথায় জগা চূপ করে আছে।

তৈলক বলে, কি ভাবছে? ভাবনার কিছু নেই। জবর মাকার
এনেছি। সবাই তো নতুন। সকলের সঙ্গে তুমিও শিখে পড়ে
নেবে। ঠিক হয়ে বাবে।

জগার অভিমানে আঘাত লাগে : আমার কাঁচা লোক ঠাওয়ালে
নাকি তৈলক মোড়ল? বাজার নামে ঘর ছেড়ে বেরই—কতটুকু
বয়স আর তখন! বিবেকই তো কতবার করেছে! মেডেল আছে,
আটঘরার রসিক রায় দিয়েছিল। বিষম খুঁতখুঁতে মামুষ—তার
হাত থেকে মেডেল জিনে নিয়েছি আমি। চাঁটখানি কথা নয়।

পরনে গেকুরা রঙের আলখাল্লা, কপালে সিঁদুর আর চন্দন,
গলায় এক বোকা কড় কল্লাক আর কাঠের মালা—এই হল বিবেকের
সজ্জা। একটা নয়, কথাবার্তা একটিন্ত বোলে না, গান শুধুমাত্র।
খাপরসঙ্গুল মহাবাণ্য থেকে সজ্ঞাতের শুদ্ধাঙ্গ-পুষ্ক-বিবেকের গতি
সর্বত্র। চকের পলকে কোন কৌশলে পৌছে থাকে, তার কোন ব্যাখ্যা
নেই। মামুষজন বাজা গুনতে আসরে বসে এই সব আবেশবাজে
বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাইরের বেশদেশান্তর শুধু
নয়, মনের অঙ্গিসন্ধিতেও বিবেকের অবাধ যোগাচর। কোন
লোক মনে মনে কি ভাবছে, সে তা সঠিক জানতে পারে।
অত্যাচারীকে সাবধান-বাণী শোনায়, বেদনার ইচ্ছমান বিরহীকে
প্রিয়-মিলনের ভরসা দেয়, দুঃখে ভেঙে-পড়া মামুষকে আশার বাণী
বলে। বাজার দলে তারি খাতির বিবেকের। আসর মুকিয়ে
থাকে—বখন বড্ড সঙ্গিন অবস্থা, বৃষ্টিতে পারে এইবারে এসে পড়বে
বিবেক। দুঃখ-বেদনার মামুষ আর নিখাস নিতে পারছে না—
ঠিক সেই চরমক্ষেণে দেখা গেল, আখ-বাওয়া বিড়িটা ছুঁড়ে কেলে দিয়ে
ছুটেছে বিবেক আসর পানে। আখ-পুইই গান ধরেছে—

তিষ্ঠ তিষ্ঠ ওরে হুট, (ও তোর) ইতো নষ্ট ততো ভ্রষ্ট,

খটিবে অনিষ্ট ঘোর, বৃকিবি কি মহাকষ্ট—

আসর জুড়ে বাহবা-বাহবা রব। উল্লাসে শ্রোতার ফেটে পড়ছে।
রকে পেয়ে গেল একতরুণে। পাশের ক্ষয়, গুণের জয়—আর কোন
সংশয় নেই বিবেকের এই গানের কথার পরে। পূণ্যবান নামকের
হুণ্ড হুইখণ্ড হয়ে গেলেও শেষ অবধি নির্ধাৎ সে বেঁচে উঠবে।
ঝোঁকের মাথার মেডেলই বা ঠেক বসল মুকুন্দবিরের কেউ।

এ হেন বিবেকের পাঠ আবার এসে থাকে। মাহিক হাতের
বুটোর পেয়ে ছাড়ে কেউ কখনো? চুলোয় থাকগে সীঁহিঙলা আর
পগল। দাঁকের খেঁকি। লেখ করে বালানো আদ্য পরমালা করে গিল

হানিহেলা থেকে ছিটকে-পড়া ওরা ঐ ভিনটি প্রাণী। বিশেষ করে হাতকর ঠাকরনটি—ঐ চাকর। জগা নিরুদ্দেশ কুমিরমারির হাট থেকে। জীবনে এমন কতবার ঘটল। সাইতলার উপর ভিত্তি বিরক্ত, ব্যারখোলায় দলের মধ্যে সে ছুটে গেল।

চক্রবর্ত্ত

ভাল ব্যক্তির দলে বারমাসে কাজকর্ম। বৃত্তিবাদলার সময় ভিনটে কি চারটে মাস ঘরে বসে কাজ। পালা ঠিক করে কেসে পাঠ লেখাও, পেরাজ দাও, সাজপোশাক বানাও, বাজপেটা গোছাও। বাইরে বৃত্তি বরছে, দেখা ডাকছে, ঘরের মধ্যে বৃষ্টিবৃষ্টি কুমুম্বু সখাদের পারের বৃষ্টি, রাজকন্তা ছোঁড়াটার নাকিস্বরের একটো। সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি একনাগাড়ি চলছে। তার পরে বৃত্তিবাদলা বিদায় হল তো মজা এইবারে। দেশ-দেশান্তর চরে কিয়ে গাওনা করে বেড়াও। নতুন নতুন জায়গা, নতুন নতুন মানুষ। আজকে এই গাঁয়ে পাত পেড়ে থাকছি, কালকের অন্ন কোথায় মাগা আছে সে জানেন দেবী অন্নপূর্ণা আর দলের ম্যানেজার।

এসব পেশাদারি পাকা দলের রীতি। বাসা অঙ্গলের শখের দলের পরমাণু অংশ নয় অমনথার। এ বছর রমায়ম চলছে, কিন্তু ও-বছর চলবে কিনা, সেটা নির্ভর করে কেত কি পরিমাণ কসল দেবে তার উপরে। খামার ভরা তো মনও ভরা। খামার খালি তো ভিন বেলার ভিন পাতড়া ভাত কোন কোশলে জুটবে, মানুষ তখন তাই ভাববে—আমোদকুতি উঠে বাবে মাথায়। ভিন্ন বছরের কথাই বা কেন, সাহনের বোশেখ-সজ্জিতেই দেখা বাবে ধান বত গোলা-আউড়ির তলার এসে ঠেকছে, দলের মানুষ ছলভ হচ্ছে ভতই। আয়ান বোব আসেনি আজকের আসরে, যে লোকটা মৃত-সৈনিক করে তাকেই শিখিয়ে পড়িয়ে আয়ানের কথাগুলো তার মুখে জুড়ে দেওয়া হল। কিন্তু পনের দিন খোদ রাখিকাই গর-হাজির হয়তো। শখের দল, শখ হল তো আসবে। মাইনে খায় না যে কান ধরে বেত মারতে মারতে এনে ঝাঁড় করিয়ে দেবে। তেমনি গুসিকে পালাগান দেওয়ার মানুষও ক্রমশ অমিল হয়ে আসছে। নিয়ম ছিল, বায়না পনের তত্ত্বা নগদ এবং খাওয়া। পনের কমিরে দল, তারপরে পাঁচ, ক্রমশ বোলখানাই মকুব হয়ে গেল, শুধুমাত্র এক বেলা পেটে খাওয়া দলের লোক ক'টির। এত সুবিধা দিয়েও কাউকে রাজি করা যায় না। এখন খোরাকির দাবিও তুলে নেওয়া হয়েছে। সামিয়ানা খাটেরে অথবা কোন রকম একটা আচ্ছাদন দিয়ে দাঁড় উঠানে। পান-ভামাক এবং লঠনের প্রয়োজনীয় কেরোসিনটুকু দাঁড়—ঘরে খেয়ে তোমার বাড়ি গেয়ে আসব। তবু কালেজেরে কদাচিৎ গাওনার ডাক পড়ে।

তবে জগা কবিত্বকর্মী লোক—দল একবারে উঠে গেলেও সে বসে থাকবে না। বিবেক সাজা ছাড়াও কাজ জুটতে নিয়মে, পরমা রোজগারের নতুন কিকির। কুমিরমারি থেকে রাস্তা বেরিয়ে ব্যারখোলা ছুঁড়ে সোজাশুজি চলে গেছে চৌধুরীগঞ্জের দিকে। দু-ভিন বছর মাটি কেলার পরে রাস্তা মোটাহুটি চালু এখন। বাবার মানুষ দিনকে দিন ভরা হয়ে উঠে ডাক্তার পথে চলাচল শুরু করেছে। জলচররা হুলচর হচ্ছে ক্রমশ। আরও দেখবে দু-চার বছর বাসে খোয়া কেসে পাকা করে নেবে বখন এই রাস্তা—পথর জায়গায় নতুন মোটাহু-

বাস দুটাহুটি করবে বাবার পাকা-রাস্তা দিয়ে। এখন কিছু গরুর গাড়ি চলে মাটির রাস্তায়। খামারের ধান গাড়িতে চাপান দিয়ে খোলাটে তোলে, মানুষ নৌকোর কাজামা নিতে যায় না। তবে ভগবতীর স্বপ্নে চোপে বাওয়া বলে মানুষ সোয়ারি কিছু খিচা করে গরুর গাড়ি চাপতে। মেয়েলোক হলে তো কিছুতে নয়। কিন্তু কতদিন! উত্তরে দক্ষিণে চান পথ চলে গেছে, জোয়ার-ভাটার ভোতাঙ্গা নেই। অতএব জরুরি কাজকর্ম থাকলে এবং গাড়ে বেগোন হলে নিতেই হবে গরুর গাড়ি।

তৈলক মোড়ল একখানা গরুর গাড়ি করেছে। নুদন চালার। কাজকর্ম না থাকলে জগাও এক একদিন গাড়োয়ান হয়ে গাড়ির মাথায় চোপে বসে। ডা-ডা-ডা-ডা—বাসা লাগে গরুর লেজ মলে এমনি ধরনের মোলাকাত করতে। নৌকোর কাজে জগার জুড়ি নেই, গাড়ির কাজেও ক'টা দিনের মধ্যে দেখতে দেখতে সে ওস্তাদ হয়ে উঠল। আবার মোটরবাস চালু হয়ে গেলে জগা যদি ড্রাইভার হয়, তার সঙ্গে তখনও দেখা কেউ গাড়ি দাবড়ে পারবে না।

চৈত্রের গোড়া অবধি ধান বওয়ারবিড়ি চলল, গাড়ির তিলেক কুমুম্বু নেই। মাঠের কাজ কর্ম শেষ হয়ে গেলে নুদন তখন গাড়ি নিয়ে কুমিরমারি চলে যায়। হয় কিছু কিছু রোজগার। বিশেষ করে হাটবারগুলো কীক পড়ে না, ব্যাপারীদের মাল পৌছে দেবার ভাড়া পাওয়া যায়। অল্প ভাড়াও ভোটে অববে সবরে।

একদিন এক কাণ্ড হল। মানুষ সোয়ারি দু-জন। কুমিরমারিতে তারা মোটরলকে করে এসেছে। বাবে চৌধুরীগঞ্জ। এসেছে বেড়ে প্রহর বেলায়। গাড়ের পোনও ভাল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ছেড়ে সন্টার আগে করালীর মোহানায় নামিয়ে দিত। তবু কিন্তু নৌকায় গেল না, অত সকাল সকাল পৌছতে চায় না তারা। গদাঘর ভট্টাচারের হোটলে ডরপেট খেয়ে মানুষ পেতে শুয়ে পড়ল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বখন উঠল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। হাটেরও শেষ হয়ে এসেছে। ভরা জোয়ার, নাবালে কোন নৌকো বাবে না। দেখ, কোথায় গরুর গাড়ি পাওয়া যায়।

নুদনকে গিয়ে ধরল। চরের উপর গরু ছেড়ে দিয়ে হাটখোলায় প্রান্তে গাছের হায়ার গাড়ির চালার উপর সে শুয়ে আছে। মাথা ছিঁকে পড়ছে, অর হয়েছে। ব্যাপারীর ধানের বস্তা বোঝাই দিয়ে গাড়ি দাবড়ে আসছিল ঠিক দুপুরবেলা, পথের মধ্যে অব এসে গেল। বস্তাগুলো কোন গতিতে ঘাটে নামিয়ে সেই থেকে শুয়ে পড়ে আছে। হাটেরে অনেকেই তো ব্যারখোলায় কিংবে, তাদের একজন কেউ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে বাবে, নুদন শুয়ে পরে থাকবে অমনি—এই মতলব মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। এমনি সময় গদাঘর মধ্যবর্তী হয়ে এসে ধরল : নৌকো নেই, অল্প গাড়িও পাওয়া যাচ্ছে না, এই দুটো মানুষকে চৌধুরীগঞ্জে নিয়ে যেতে হবে। জরুরি কাজ ওদের, পৌছতেই হবে। জায়া ভাড়া পাবে, না হয় কিছু বেশি ধরে নেবে। নিতেই হবে মোটর উপর। দর কষাকষি করে শেষ পৰন্ত বে অক্লান্ত বকা হল, তার পরেও আর শুয়ে থাকা চলে না। উঠে বসল নুদন ভড়াক করে।

গাড়ির ছই রিক্ত মন্ডার। সেটা অবধান করল।

জুড়িওরাল মোটাসোটা - ইয়া এক লাল—প্রমথ হালদার, চৌধুরী-এটেরে ম্যানেজার। প্রমথ বললেন, সে তো দেখাশুই পাছি বাণু। শেষ আদায়ের কাশা নয়। পানের বস্তা বোঝাই

দিস, বেশ তো ভয়বানো? জ্ঞা হয়ে বাব। হেলব না, জুলব না, নড়া চড়া করব না—তবে আর কি! মুখ কবন্তে কে চাচ্ছে, গিয়ে পৌঁছলেই হল।

কত কষ্টে যে স্মৃন বয়ঃখালা অবধি গাড়ি চালিয়ে এলো সে জানেন মাথার উপরে যিনি আছেন। বাপের পুণ্যের জোর, তাই মুখ খুঁড়ে পড়ে নি। আর পায়ে না। বড় রাস্তা ছেড়ে বেশ খানিকটা আলপথ ভেঙে হৈলুক মোড়লের বাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে পড়ে গল্পব কাঁধের জোয়াল নামিয়ে স্মৃন বলে, আর হবে না, নেমে পড়ুন এবারে—

বেগা লিকলিকে ভক্ত মামুঘটা—আদালতের শেরাদা, নাম নিবারণ। সে খিঁচিয়ে ওঠে : তেপান্তরের মধ্যে এসে বলে নেমে পড়ুন। ইরাকি? আমাদের হা-তা! মামুঘ ভাবিল নে। উনি হলেন ফুলতলা এন্টের ম্যানেজার। রশখানা লাটের মালিক, প্রত্যাপে বাপ আর গল্প ৩৩ ঘাটে জল খায়।

প্রথমও তেমনি মেজাজে নিবারণের পরিচয় দেন : আর এই যে একে দেখছ, সরকারি লোক ইনি; চাপডাশখানা দেখাও না হে নিবারণ। সরকার তো নিজে আসেন না, এই সব মামুঘ দিয়ে কাজস্বর্য করেন। এর পায়ে একখানা যদি কাঁটা ফোটে, সেটা সরকারের পায়ে ফোটার সামিল। জানিস?

বালা রাজ্যের বোকাসোকা মামুঘ স্মৃন, খুব বেশি বিচলিত হল মনে হ'ল। বলে, চন্দ্র-স্বথি যা-ই কোন ভজুর মশায়রা, মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি। : তখন ছাঁটের গল্প আপনাদের শ্রদ্ধ কোন খানাখন্ডে নিয়ে ফেরে, ঠেকাতে পারব না। সেটাই কি ভাল হবে মশায়?

প্রথমথর মেজাজ খান্দে নেমে এলো : তাহলে কি করব বাবা, উপায় একটা কর। চৌধুরিগঞ্জে বেতেই হবে, বড্ড জরুরি কাজ। অত ভাড়া কবুল করলাম তো সেইজন্মে।

স্মৃন একটু ভেবে বলে, আছে একজন আমাদের বাড়ি। জগন্নাথ তার নাম। মেজাজ-মরজি ভাল থাকলে সে গিয়ে আসতে পারে। ধী করে পৌঁছে দেবে, তার মতন গাড়িওয়াল এ পাইতজ্ঞে নেই। এইখানে থাক একটু তোমরা, বাড়ি গিয়ে তাকে বলে করে দেখি। গল্প চুটো রইল, ভয় কি তোমাদের?

বাক্সার বায়না বিহম হন্দা এখন। শেরাজের ঘরে জগা বিনা কাজে একলা বসে ছিল। অত দরের মামুঘ ছ'টি বিপাকে পড়েছে—শুনতে গেলে বিস্ময় ন'করে সে রাস্তায় ছুটল। গল্পব কাঁধে জোয়াল তুলে দিল : ডা-ডা ডা-ডা—গল্প তুই ভেবেছিস কোনটা? হজুরদের জরুরি কাজ। চান উঠবার আগে সাঁইতলার খাল পার করে দিবি। নয়তো ছাড়ান নেই।

গাড়ি চলছে, চলছে। হাঠ ছেড়ে তরলে এলো। খানিকটা জায়গা হাসিল হয়নি এইখানে। না হলেই বা কি—কাঠকুটো বেতেও পরস। বালাবনের এই বড় মজা। যেমন-কে-তেমন বন বেথে লাগে, পরস গণে দিয়ে কাঠ কেটে নিয়ে বাবে। হাসিল করে নোনা জলে বুড়িয়ে রাখ, গাভ-খালের চায় মাছ এসে আপনি জমাবে। কঠিন বাঁধের খেয়ে নোনা জল, ঠিকিয়ে বেথে লাগল নামাও, ৩৩ ঠাকুর সোনার বাঁশ উপড় করে দেখবর ধার চালবেন, ভাড়া অকলে তার সিঁথি সিঁথি কলম নেই।

হু-পাশে জঙ্গল, গল্পব গাড়ি চলছে নতুন মাটির রাস্তার উপর দিয়ে। ডালপালা ছাতের মতন মাথার উপরে। আকাশে চান নেই, ঘুংঘুটি অন্ধকার।

রাস্তাও তেমন এই দিকটায়। উঠছে, উঁচুখো উঠে চলেছে—স্বর্গধামে নিয়ে তোলবার গতিক। হুড়হুড় করে ওজুণ আবার পাভালের তলে পতন। ভেঙে চুরে গাড়ি উলটে পড়ে না, লোহা দিয়ে বুঝে বানানো নাকি?

নিবারণ স্মৃমিষ্ট স্বরে বলেন, পথ ভুল করে পথতে ওঠানি তো বাবা? দেখ দিক ঠাইর করে।

আর প্রথম হালদার গর্জন করে উঠলেন, কোথায় আনিলি? হাড়-পাঁজরার জোড় খুলে মাথার নাকি রে হারামজাদা?

গালিগালাজে জগার স্মৃতি আরও বেড়ে যায়। কানের কাছে মধুকণ্ঠে যেন তার তারিণি হচ্ছে। তি-তি করে তেমে বলে, গল্পব খাবার খড় রয়েছে পিছন দিকে। জাঁটিগুলো টেনে গদি করে নিয়ে গল্পব এলিয়ে গিল। কাঁকুনি লাগবে না, আয়েসে ঘুম ভেঙে বাবে।

সামনে খুঁকে পড়ে প্রথম নিনিরীক অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। শক্তিত কণ্ঠে বলেন, রাত দুপুরে কোন জঙ্গল জঙ্গলের মধ্যে এনে ফেলি, পথ বলে তো মালুম হয় না। সে বেটা গাড়িতে তুলে মাথপথে চম্পট দিল। ভাড়ার লোভে ভাঙতা দিস নে—সত্যি কথা বল, পথঘাট চিনিস তো সত্যি সত্যি?

জগন্নাথ বলে, বাবা রাজি হজুর ফুলতলার মতন বাঁশ শড়ক কোথা এখানে? এ-ও তো ছিল না এদিন। সাপ-সুরোরের চলাচলে পথ পড়ত, তাই ঘরে আমরা যেতাম?

প্রথমথর সবদেহ শিরশির করে ওঠে : বলিস কি, সাপ-সুরোর খুব বেরোর বুঝি?

জগা বলে, ওরা তো সামান্য। বড়বাও আছেন। রাতের বেলা নাম করব না হজুর।

জঙ্গল আরও এঁটে আসে। রাত্রির পাখির ডাক। গাছগুলো জোনাকির মালা পরছে। পাতার ডালে হাওয়া ঢুকে অনেক মামুঘের কিসকিসানির মতো শোনা যায় চতুর্দিকে।

সজোর গল্পব লেজ হলে জগা টেঁচিয়ে ওঠে : ডা-ডা-ডা—নড়িস নে যে মোটে? বেতো কগি হলি নাকি ম্যানেজার?

প্রথম হালদার নিজের চিন্তায় ছিলেন। চমকে উঠে বলেন, ম্যানেজার কাকে বলছিস যে হতভাগা?

জগা ভালমাস্তবের ভাবে বলে, গল্পব নাম হজুর। মামুঘজন কেউ নয়। এই ডাইনের ইনি। খেয়ে খেয়ে গল্পবখানা বাগিয়েছে দেখুন। তিন ঘণের রাস্তা। তোয়াজের গল্পব পারতপক্ষে নড়াতে চান না। শুয়ে শুয়ে খালি জাবর কাটবেন আর লেজে-মাছি ভাড়াবেন। পিটুনি দিই হজুর, আবার ম্যানেজার বলে তোয়াজও করি। বাঁতে বধন কাজ হয়।

নিবারণ শুনে কিংকি করে হাসে। বসটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। বলে বড্ড কাজিল তুই তো হেঁড়া। ম্যানেজার হলেই বুঝি পাড়ে-পড়বে হতে হবে? ক'টা ম্যানেজার দেখেছিস তুই ভনি?

জগা কলম সলম বলে, দেখব কোথায় হজুর? সে সব তারি তারি

মাছুষ বালাবনে কি ভক্ত মরতে আসবেন ? ম্যানেজার দৃষ্টান্ত।
চাপড়াশই বা ক'টা দেশেছি ? এদিন বাধে মাছুষের গতিগম্য হুঙহার
এখনই বা একটি হুটি আসতে লাগেছেন। বাঁয়ের এই এনারে
সেখেছেন, রোগা পাঁচকাটি পাঁজরার ভাড় গাশে নেওয়া বাবে—কিন্তু
ছোট্ট একেবারে তেজের ইঞ্জিনের মতন। চুঃ-চুঃ। চাপরাশি ভাই,
অন্ত ছুটলে ম্যানেজার পেরে উঠবে কেন ? মুখ ধ বেড়ে পাড়ে বাবে।

অর্থাৎ ভাইনের গরু ম্যানেজার, বাঁয়ের গরু চাপরাশি।
কাউকে বাধ দেয়নি। নিবারণও অন্তএব চূপ। অঙ্ককারে পা
টেপাটেপি করছেন হুঁজনে। গাড়োয়ান টের পেয়ে গেছে, একজন
হলেন চৌধুরি এষ্টেটের ম্যানেজার অপরে আদালতের চাপরাশি।
সেই আগের ছোঁড়াই নিশ্চর বলে দিয়েছে। মেজাজ হারিয়ে আত্ম-
পরিত্র দিয়ে ফেলা উচিত হয়নি তখন। পাকা লোক হয়ে এই
বিষয় কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন, তার ভক্ত মনে মনে পস্তাচ্ছেন
এখন। গাড়োয়ান কৌতুক করে গরু হুটো এঁদের দুই নামে
ডাকছে। তা সে বাই-করুক, কানে তুলে আর মুখে ছিপি
আটলেন আপাতত। ভালর ভালর চৌধুরি-আলার পৌছানো বাক,
তার পরে শোধ নেওয়া বাবে। পথের মাঝখানে এখন কিছু নয়।
চলেছে, গাড়ি চলেছে। এক সময় প্রথম বললেন, হু-দুটার
পৌছে হবে বলেছিলে কিন্তু বাবা—

বাড় নেড়ে জগা সম্ভাবে সমর্থন করে, দেবোই তো—

ম্যানেজার দেশলাই জ্বলে বিড়ি ধরালেন। অমনি ট্যাঁক থেকে
খড়িটা বের করে দেখে নিলেন : এগারোটা বেজে গেছে—

জগা বলে, কলং বাড়ি বদি লাকিয়ে লাকিয়ে ছোটো। গরু তার
সঙ্গে পেরে উঠবে কেন হুজুর ?

কথার তুরাড়ি, জবাব দিতে দেরি হয় না। নিবারণের বৈধ থাকে
না। খিচরে উঠল : একের নম্বর শরতান হলি তুই।

পশম আপায়িত হয়েছে, এমনি ভাবে নম্র মেলে জগা বলে,
আজ্ঞে হ্যাঁ, সবাই বলে থাকে এটা। আপনারাও বলছেন।

নিবারণের গা টিপে প্রথম হালদার থামিয়ে দিলেন। বলেন,
ভালই তো। দেরি তাতে ক' হয়েছে। দিবা ডাঙর ডাঙর যাচ্ছি
—জলে পড়ি নি তো। থাসা আয়ুমে লোক তুমি বাবা, হাসিয়ে
রসিয়ে কেমন বেশ নিয়ে যাচ্ছ। চৌধুরি-আলার একটা লোক কিন্তু
বলে এসেছিল, কুমিলমারির নতুন রাস্তার ডাঙাপথে হু-দুটা হুদ
আড়াই বন্টার বেশি লাগে না।

কে লোক—অনিরুদ্ধ ?

তাকেও চেনে তুমি ? বাঃ বাঃ, সবই দেখছি চেনাজানা তোমার।
কিন্তু হু-দুটার জায়গার চার বন্টা হতে চলল, পথ ঠিক মতো চেনা
আছে তো ? মানে বড় জাঁধার কিনা, আর চলছে জঙ্গল-জাঙ্গল
ভেত্রে—

জগা নিশ্চিন্ত বসে বলে, আমি তুল করলেও গরু কখনো তুল
করবে না হুজুর। কত ধান বওয়াবরি করেছে। ছেড়ে দিলে চমকে
চরান্ত কত বঁদ অবধি চলে যায়, পথঘাট গরুর সব নখদর্পণে থাকে।

সন্দেহ নিবারণ বলে ওঠে, কী সর্বনাশ ! সে ছোঁড়া তো জয়ের
নাম করে বাড়ি গিয়ে উঠল। তুই তবে কি পক্ষর ভরসার এই
রাস্তা আমাদের বাবার পথে ঘোরালি ?

লাজ হুজুর, ভয় করবেন না। মাছুষের চেয়ে পক্ষর মুক্তি

বেশি। চাপরাশি হটকে মতন আছে, তার কথা বাদ দিলাম। কিন্তু
এই ম্যানেজারটি হলেন ভারি সেহান—সেখেতনে হিসেব করে চরণ
ফেলে। পিটিয়ে খুন করে ফেলেন, কিছুতে বেপথে বাবে না। এক
কাজ করেন আপনারা—এক এক আঁটি খড় মাথার নিচে বালিশ
করে নিয়ে ঘুম দেন। উতলা করেন না, ভাবনা করবেন না।
আলার উঠানে হাজির হয়ে আপনাদের ডেকে তুলে দেব। বলে
মনের সুস্থিতে জগা গান ধরে দে—

ও নন্দী পোড়াকপালি,

মিথ্যে বলে মার খাওয়াশি ?

আমুক তো শবুয়ের বেটা,

বলে দিব তারে—

ভাত-কাপড় না দিবার পারে,

বিয়া কেন করে ?

প্রথম ডাকছেন, শোন বাগধন—

কলি কয়েকটা সমাধা করে খেমে গিয়ে জগা বলে, কি ?

বলছি কি, চূপচাপ চলে। গান-টান আলায় গিয়ে হবে।

জগা বলে, ভাল লাগছে না হুজুর ? আমার গানের সবাই তো
সুখ্যাতি করে।

খুব ভাল লাগছে। ভারি মিঠে গলা তোমার। তবে ঐ যে
বললে, এ পথে আরও অনেকের চলাচল। রাস্তা নাম করতে নেই,
তীরাও সব খোরাকেরা করেন। দরকার কি, গান শুনেতে তীরা
বাদ গাড়ির কাছ বেঁসে আসেন।

এবারে জগা, রীতিমতো ধমকে উঠল : বালাবনে আসতে গেলেন
কেন হুজুর ? পাকা ঘরের ঘরের মধ্যে মেরেমানবের মতো ঠাণ্ডা
ঘুমে বসে থাকুন সেই তো বেশ ভাল। ভরষাক মশায় কিন্তু এমিক
দিয়ে ভাল। বনবাদাড় গ্রাছ করে না, একলা চরে বেড়াতে ভয়
পায় না রাত্রির বেলা।

প্রথমও চটেছিলেন কি—একটা জবাব দিতে গিয়ে সামলে
নিলেন। ভাঁি বেন রসিকতার বখা—হেসে উঠলেন তেমনি ভাবে।
বললেন, ভরষাককেও জান তুমি ? থাসা লোক তুমি হে—দুনিয়ার
সঙ্গে ভাবসাব, সব কিছু জানাশোনা !

চাকের আঁগরাজ আসছে। আঁগরাজ হুহু—অনেকটা হুহু
বলেই। জগা বলে, শুনেতে পাচ্ছেন ? কালীতলায় পুজো দিচ্ছে
কাসা।

প্রথম বলেন, আরগাটা কোথায় ?

একেবারে করালী গাঙের উপর। আসল সাঁইতলা—সাঁইয়ের
বেথানটা আসন ছিল। আপনাদের চৌধুরি-আলা ওর ভাগেই
পেয়ে বাব। গরু তবে তুল পথে আমেনি, বৃকতে পারছেন ?

প্রবল উৎসাহে গরু হুটোর পিঠে পাঁচনির খোঁচ দিয়ে জগা
জিতে টঙ্কর দেয় : টক-টক। চল সোনামানিক ভাইরা আমায়,
টেনে চল দিকি পথটুকু—

হড়হড় করে, পড়িবি জো পড়, গরুর গাড়ি একেবারে জলের
মধ্যে। ছিটকে উঠল জল—হুখে-চোখে কাপড়ে-আমায় জল এরে
পড়ল। প্রথম শুনে পড়েছিলেন একসময় গাধার পুঁটুলি মাথায়
নিজ গুঁজে দিয়ে। বড়বড়িয়ে উঠে বললেন।

কোথায় এসে ফেলিবি যে ?

পাথে জল জমেছে সজ্ঞ করি।

ব্যাকুল কণ্ঠে প্রেমধ্বনিত, দুঃখাশ্রিত ভিতর আকাশে এক কুচি মেঘ দেখলাম না, জল জমেবে কেমন করে? কি পেরো, কোমল অমল সমুদ্রের মধ্যে এনে ফেলেছিল—এখন উপায় কি বল?

অপরাধ ইতিমধ্যে লাক্ষির পড়েছে। জল সামান্য, কিন্তু হাঁটু অবধি কাদায় ডুবে গেল। নোনা কালী—সমস্ত বাড়ি এবং এক পুকুর জল লাগে পাবের এই কাহা ছাড়াতে। এদিক-ওদিক ঠাঁহর করে দেখে সে হেসে উঠল: সমুদ্র নয় আজ্ঞে, খাল। এর পাবে আরও একটা খাল—সাঁইতলায় খাল বার্ক বলে। প্রায় তো বাড়ি এনে ফেলেছে।

আবার কৈফিয়তের জাবে বলে, নতুন রাষ্ট্রা তেলিপাঁতি হয়ে গেছে। অনেকখানি ঘূর্ণ-পথ। খালের উপর পুল বানাজে,

এখনো হয়ে যায় নি। ম্যানেজার ভাই বোধ হয় ভাল, খাল জমতে হবে তো একবারে সোজা হয়ে গিয়ে উঠি। বড় কষ্ট বন্ধন ভাইনে নেমে পড়েছে, গানের মধ্যে অন্ত শত ঠাঁহর করতে পারিনি।

নিবারণ পীত বিঁচিয়ে ওঠে: বেশ করেছে। রাত দুপুরে গায়েছা পরে খাল সাঁতরাতে হবে কিনা, সেইটে বিজ্ঞাসা কর এবার তোর ম্যানেজারকে।

জগন্নাথ অন্তর দেয়: নির্ভাবনার বসে থাক চাপরাশি ভাই। ম্যানেজার মশায় নড়াচড়া কোরো না—ওজনে তারিফি কি না, নড়াচড়ার চাকা বসে বাবে। গরু হানকেন মজন বেয়াকিসে নয়। এনে ফেলেছে বখন, ঠিক ওপায়ে নিয়ে তুলে দেবে।

[কম্পন:]

ছবি

শ্রীবরদাচরণ ভট্টাচার্য্য

আমরা ঘরে ঘরে বড়লোকদের ছবি বুলানো দেখিতে পাই।

এখানে প্রশ্ন এই যে, আমরা এ সকল লোকের ছবি বুলাইয়া রাখি কেন? তাহার এত মাত্র উত্তর এই যে, আমরা এ সকল লোককে তাঁহাদের জীবনদশার শ্রদ্ধা করিতাম। ছবি তাঁহাদের প্রতীক, স্মরণ্য তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত আমরা তাঁহাদের ছবি আমাদের ঘরে বুলাইয়া রাখি। মহাপুরুষদের জীবন আমাদের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে, সেই জন্যই আমরা তাঁহাদের ছবি ঘরে টাঙাইয়া রাখি।

আমরা শুধু মহাপুরুষদের ছবিই বুলাইয়া রাখি না। আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর, স্থলর সৃষ্টিদায় ও সৃষ্টিধর্মের ছবিও বুলাইয়া রাখি। কোন জলপ্রপাতের, পর্বতের বা সমুদ্রের ছবিও বুলাইয়া রাখি। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বা মহত্ব উপলব্ধির জন্ম আমরা এ সকল ছবি বুলাইয়া রাখি।

কখনও আমরা সিংহ, ব্যাঘ্র, ভেড়া, গণ্ডার ও ভীষণ সর্প প্রভৃতির ছবি বুলাইয়া রাখি। কখনও বা প্রাকৃতিক পশুর বা গোলাপের ছবি বুলাইয়া রাখি, তাহাও আমাদের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত।

ছবিমাত্রই বাস্তবের প্রতীক। এখানে প্রশ্ন উঠে এই যে, ছবিতে আমরা বাস্তবের কতটা ভাঙান বা বোধ পাই? বাস্তব আর প্রতীক কি একই? কালীর ছবি, আর কালী দেবী কি একই? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি কি একই? সেইরূপ মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু, আর তাঁহাদের ছবি কি একই? এক যে নয়, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, কারণ বাস্তব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র বসু আর ইহুজপতে নাই। যদিও কেহ কেহ বলেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন, তথাপি জলদ্বানী অধিকাংশের মতান্তরগত তাহাকে মৃত বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

কেনেকি ঘরে শিতামাতার ছবি বুলাইয়া রাখেন, শুধু বুলাইয়াই রাখেন না, অনেকের পূজাচন্দনাদি দ্বারা তাঁহাদের ছবির পূজাও করেন। কেহ বা গুরু ছবি বা শাহুকা পূজা করেন। ছবি বুলানো কঠোর পণ্ডিতের হস্তেই হইবে, আর কঠোর পণ্ডিত বলাই হইবে, ছবি বুলানো কঠোর পণ্ডিতের হস্তেই হইবে।

আকৃতি প্রতিফলিত হয়, মস্তিষ্কে ততপরি অবয়ব সন্ধানও প্রদর্শিত হয়। মুক্তি ছবির চেয়ে বেশী বাস্তব বা জীবন্ত হয়, কারণ বাস্তবের সঙ্গে মস্তিষ্কের ছবির চেয়ে বেশী সাদৃশ্য থাকে।

যে মানব মরিয়া যায়, তাঁহার আত্মা কি তাঁহার মূর্তি বা ছবিকে সঞ্জীবিত করে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ছবি আছে বা মহাত্মা গান্ধীর মত ছবি আছে, প্রত্যেকটিই তাঁহাদের শারক। সুতরাং ঐগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বা মহাত্মা গান্ধীর আত্মাচার্য্য সঞ্জীবিত বলা যাউতে পারে। কিন্তু বখন কোন চিত্রকর নিজ করুনা বলে ভীষণ সিংহ বা ব্যাঘ্রের ছবি অঙ্কিত করেন, কিংবা ঐ চিত্রকরই বখন করুনা বলে সত্যাবরে প্রকৃতি পশুর সন্নিহানে কোন রাজহংসের চিত্র অঙ্কিত করেন, তখন ঐ চিত্র কতটা বাস্তব হইতে পারে, তাহা বলা কঠিন ব্যাপার। কারণ চিত্রিত পশু বাস্তব পশুর পেলবতা ও শ্রীতশ্পর্শ নষ্ট। তথাপি চিত্রিত পশু বাস্তব পশুরই প্রতীক, এতদ্ব্যতীত উহা বাস্তব চিত্রকর কর্তৃকই চিত্রিত হইয়াছে। উটক উহা চিত্রিত বা কল্পিত, তথাপি উহা বাস্তবেরই প্রতীক। চিত্রিত রাজহংস বা পশু রাজহংস বা পশুরই ভৌতিক বা সূচক, উহা অল্প কোন বস্তুকে বুঝায় না। সেইরূপ রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী বা সুভাষচন্দ্রের ছবি ঐ ঐ ব্যক্তিকেই বুঝাইবে, অপর কাহাকেও বুঝাইবে না। এইরূপে দেবদেবীর মূর্তি বা ছবি ঐ ঐ দেব দেবীকেই বুঝাইবে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বা কোন পশুর মূর্তি বা ছবি সম্পর্কেও সেই কথা প্রযোজ্য। ভৌতিক দৃশ্যকে বুঝায়—প্রতীক বাস্তবকে বুঝায়, সুতরাং ভৌতিক বা প্রতীকের মধ্যে একটা প্রাণবন্তি আছে, নতুবা উহা দৃশ্য বা বাস্তবকে বুঝাইবে কেন? অন্তঃস্থ ছবি বা ছবিমাত্রই প্রাণবন্ত। সেইজন্যই আমরা দেবদেবীর মূর্তি বা ছবিতে কিংবা মহাপুরুষদের মূর্তির বা ছবির পূজা করি। তাঁহাদের পূজা করিয়া আমরা প্রাণে বল পাই। সেই সকল মূর্তি বা ছবি প্রাণবন্ত ও বলবন্ত বলিয়াই তাঁহাদের পূজা করিয়া আমরা প্রাণবন্ত ও বলবন্ত হইয়া উঠি। সুতরাং কেহ কখনও মূর্তি বা ছবির পূজার মনে করিবেন না।

শি শি র=সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

তখনকার দিনে থিয়েটার কেমন হবে জানতে চেয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথের কাছে, তিনি এড়িয়ে গেলেন, থিয়েটারের অবস্থা জানতে এসেছিলেন উনি, কিন্তু স্পর্শকাতরতায় ভুলে কিছু করতে পারলেন না। অবশ্য তখন থিয়েটারের অবস্থা ছিল খুবই উন্নত। মাতালকে ঠর ঘুগা ছিল না, ঠর বাড়িতেই শুকত মাতাল ছিল, তাছাড়া লোকের পালিত ছিলেন ঠর বন্ধু, কিন্তু Vulgarities জন্মেই পারলেন না।

আরে আমার কথাই ধরুন বন্ধন প্রথম চাকরী নিলুম, ম্যানেজার বলে আমার নাম জানান হল, আমার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা, বেশ সাহস নিয়ে গেলুম প্রথম রিহার্সাল দিতে। গিয়ে দেখি কতকগুলো মোটা মোটা কাপো কাপো কি তাদের মধ্যে হুঁচরজন যে ভাল দেখতে ছিল না এমন নয়। তবে তাদের সবাইকে দেখলেই মনে হত খুব মুখ আলগা খোলাসার ঘরে যারা থাকে তারাই উঠে এসেছে বুদ্ধি। নতুন ম্যানেজারকে দেখতে মুখ ভর্তি পান আর গা ভর্তি গরুন। পরে এসে একদিকে বসে আছে : পুরুষেরা অঙ্কদিকে। দেখেই ত আমার বুক বিশ হাত নেবে গেল, হঠাৎ নৃপেনবাবু বাঁচিয়ে কিলেন, মাইরি হুঁ একটা পান দে ত' বলে বেই চুকেছেন আমিও তেড়ে উঠেছি, তুমি কে বট হে? চাকরী রাখতে চাও না চাওনা, চাও ত সরে পড়। বাস, ঐ ঘটনার পরই আমার দায় বেড়ে গেল।

বিজ্ঞবাবুর সঙ্গে মজের কারোই গভীর বোগ ছিল না; কাউকে শোখাননি, শুধু দানীবাবুকে সাক্ষাৎ আর চম্ভেপ্তে কিছুটা নড়াচড়া করতে শোখালেন।

বোধহয় ডাঃ অধিকারী বললেন, দানীবাবু বলেছিলেন বাণী তাঁকে শিখিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—দানীবাবু, যদি বলে থাকেন বাণী শিখিয়েছেন তাহলে তুলে বলেছেন, বাপের কাছে কখনো শেখেননি। তবে ঝপকে খুব ভক্তি করতেন।

দানী বাবুর একটা মস্ত গুণ ছিল, শিক্ত লোক দেখলে মুখ বড় করতেন, কিছুতেই আর খুশতেন না। ঠর গীতা খাওয়া অভ্যাস ছিল। (উনি তখন আমার কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে) বিতকে চুপি চুপি ডেকে বলেছেন, ভায়া আমি ওই কোণে (কোনের Marinal-এর পাশে) বাবো আর ওই ফেলোটা গরিয়ে দেবে এখন।

—বিশু শুনে বললে, বেশ ত আপনি খান ত, তবেই ব্যবস্থা করে দেব এখন।

তাড়াহাড়ি তখন বলতেন, না ভায়া, ওখানে কত শিক্ত লোক আছে কে অধিকার কি ভাববে, উনি বড় একটা খিঁচি করতেন রাষ্ট্রকেন্দ্র সাহায্য হুঁ একটা কথার মাত্রা ব্যবহার করতেন। ঠর নামে বন্দনাঃ রে রটিয়েছিল তাকে আমি চিনি। ওই যে মস্ত বড়—
—রাষ্ট্রা, রাষ্ট্রা-মহন পড়ছে নাকি খেতে পাচ্ছি না বলে আমার কাছে এসে কাজ দিয়েছিল।

Open Air Theatre আমাদের দেশে করা সম্ভব কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন—আমাদের দেশে Open Air Theatre হ'তে পারে না, আর ওটাত আসলে বাংলা Theatre-এ শুধু দর্শকদের অংশ খোলা। তা তাতে আলোকের বন্ধন বা খরচ হবে তাতে ভিনটে থিয়েটার হতে পারে।

—আবি থিয়েটার কোনদিন স্কুল না হবে বাইনি। ভায়া ভাল বলতে হবে। তাছাড়া, ওদেশের বড়লোকেরা ছিলেন শু, কাজেই দাঁড়িয়ে গেল।

—Experimentation করাও দরকার, তবে সেটা বাস্তব Form নিয়ে হলেই ভাল হয়।

থিয়েটার জঙ্গলা বলার উনি বললেন—ভাল থিয়েটার করলে চলবে না। ভাল দৃষ্টপট দিয়ে ভাল অভিনয় করলে লোকে নিশ্চয়ই নেবে, তার পর কৃতি বলতে হবে।

সংস্কৃত নাটক পড়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন—সংস্কৃত নাটক পড়াও দরকার। নইলে নিজেরের ঐতিহ্য জানব কেমন করে? ভাসের নাটকও বেশ ভাল ভিনিব, আমাদের অবস্থা ত ওই জন্মেই ধারাপ। আমরা নিজেরের অতীতের কথা কিছুই জানি না। Wilson সাহেব মুচ্ছকটিকের প্রশংসা করে আমাদের সভ্য করে দিলেন। অথচ ওটা অনেক পরে লেখা মনে হয়, দশম শতাব্দীর হবে হয়ত। তার আগে 'বেবুস্তের' বিয়ে বোধ হয় চলত না।

—পশ্চিম দেশে Sex-এর ওপর বৌকটা বেশি। আমাদের দেশে সমাজের ভয় ছিল। হুঁ চার জন করেনি এমন নয়, কিন্তু ওদের মত অন্ত preoccupied হলে আমাদের tradition এতদিন চলতে পারত না। যুনি ঋষিদের অপরা সংযোগ allegory বলেই মনে হয়, সেগুলোর মূল কথা হ'ল বস্তই আত্মনিগ্রহ কর না কেন কামকে জয় করা মোটেই সহজ নয়।

২১শে আগস্ট এসে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের শেষ অংশটা পড়লেন। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের শেষের দিকে যে ব্রাহ্মণকে আনা হয়েছে সে সম্বন্ধে বললেন—ওকে আনা হয়েছে একটি যুগের শেষ বোঝাতে।

কুক ধর্মবাক্য স্থাপনের জন্মে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূত্রপাত করলেন কিন্তু (যুদ্ধ শেষে) যুদ্ধবিরকে সিংহাসনে বসিয়ে ধর্মবাক্য স্থাপন করতে পারলেন না। কিরে গিয়ে দেখলেন বত পাশ সব এসে বহুদশে জড়ো হয়েছে। সেই পাশ দূর করতে গিয়ে তিনি প্রাণ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অজুনেরও ক্রমতা গেল। তাঁর চোখের সামনে বহুদশীরে কেড়ে নিয়ে গেল।

যুদ্ধবির খবর পেয়ে বললেন, ভায়া, আমাদের সময় আর সেই, এবার অভিনয়্যার হেসেই সিংহাসনে বসিয়ে সরে পড়ি। তাই গেলেন তাঁরা।

শিখিবাবুনা চরিত্রের সমগ্রতার বাসনা করে অভিনয় করতেন

বটে, কিন্তু সমগ্রতার ধারণা তাঁরা রাখতেন না, দৃষ্ট থেকে দৃষ্টেই অভিনয় করতেন। Production এর সমগ্রতার ধারণা নিয়ে প্রথম নাটক আঁরাই করি—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। তখন অপেরেশনবুর আর্ট থিয়েটার বাট টাকার ভাড়া নিতে হয়েছিল, আমি তখন মদনের চাকরী নিয়েছি, বিহাত্রাল দেখে ভাল মনে হল না তাঁদের, দিলেন গোলমাল বাধিয়ে।

আগেকার দিনে গিরিশবাবু অর্ধেকশ্রাব্য আর অসুস্থ বোস ছাড়া বাকী সবাই চরিত্র সঞ্চকে কিছু না ভেবেই হাততালি পাবার জন্যে অভিনয় করতেন, একবারকার benefit এর মত বোগেশ করতেন। আমি আর বতে বার অনেক কষ্টে দু'টাকার টিকিট কিনে একটাকার সিটে বসেছি, অমর মত এক জারগার সলাপ বলছেন, ডাবনা আমায়—বাবব, বাবব বলতে গিয়ে হঠাৎ গলা চড়ালেন। বতেটা ছিল cantankerous সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, মাধব, তারপর লোকেরা এই মারে ত এই মারে, তাকে বার করে এনে সব ঠাণ্ডা করি।

হাততালি দিলে মটরা হাত তুলে নমস্কার করতেন, তবে ওই আগের তিনজন ছাড়া। নৃপেনবাবুর ওই মোহটা বড় বেশি ছিল। অমরবাবুর মত দানীবাবুও অভিনয় ভাল করতেন না, তবে কণ্ঠস্বর ছিল অপরূপ। গিরিশবাবুর পরেই তাঁর গলা, অমত মিত্র মশায়ের গলাও ভাল ছিল, তবে নকাচড়া করতেন না দানীবাবু অবশ্য শরীরটা একটু ঝিকাতেন, তবে সব চরিত্রে একই রকম করতেন বলে মোটেই হানাত না, তাছাড়া পোষাক পরা সব চরিত্রে—সিরাজ, মীরকাশিম, হুতপতি—এক ধরনের অভিনয় করতেন, চরিত্রগুলোর পোষাকও তত এক রকমের। এক শব্দরচাণের বেলায় কিছুটা আলাদা, গিরিশবাবু ওই ডুমিকাকা করার আগে ছেলেকে কান্না নিয়ে গিয়েছিলেন।

গর আছে, গিরিশবাবু একবার ছেলেকে বলেছিলেন—কাল কি বই করছিলি যে—এ (একটি সামাজিক বইয়ের একটি চরিত্রের নাম করে) না সিরাজ?

দানীবাবু উত্তর দিলেন, সবাই কী সব পারে?

তবে অশিক্ষিত লোকদের জমিয়ে দেবার কাহন্য গিরিশবাবু খুব ভাল জানতেন, দানীবাবুও কিছুটা পারতেন, অশিক্ষিত পট্টা কিছুটা ছিল তাঁর। আর কি রম, একটানা বাইশ ডেইশ লাইন বলতে পারতেন।

দানীবাবু অভিনয় করতে শেখেন বিজুবাবুর কাছে, ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে প্রথম, অবশ্য তাঁর (বিজুবাবুর) চরিত্রের conception আর আমার conception-এ অনেক গুফা ছিল, চাপকা করায় প্রথম দিন সকালে দু'বটা কাটলে এসেছিলুম, তবে তর্কাতর্কিই হ'ল।

উনি বললেন, কাতায়ন একটি fool (হয়ত নাটকের দিক থেকে প্রয়োজন নেই বলে বলেছিলেন)।

তা' আমি বললুম, কি করে হবে। চাপকাই ত বরং সঙ্গায় ত্যাগী সমালী ধরনের পারে কুশ ফুটেছিল বলে একটি বিতর্কিত্বী কাণ্ড করলে, তাকে সভার নিয়ে এসে অপমান করিয়ে অভিজিৎসের কথা বুঝিয়ে তুললে কে? বুঝকে চমকজন্মের সাহসে অপমান করলে কে? সেলুকানকে আললে কে?

তবে কাতায়ন চরিত্রের চরলতা হ'ল, কোন একটি জিনিস শেষ পর্যন্ত ধরে রাখবার ক্ষমতা ছিল না তার, সে ক্ষমতা ছিল চাপকায়। আর চাপকাতা মিথো কথা বলত না, মেরেকে পেয়ে বললে, আমি চলে বাব, কিন্তু তুমি তোমার সুযোগ্য মন্ত্রীর সাহায্যে সূত্রে রাজ্য শাসন কর, ভয় নেই। কাতায়ন fool হ'লে কি বলতে পারত?

বিজু বাবু শুনে বললেন, খুব ভেবে পড় ত! ওর শেখান খুব একটা ভাল কিছু ছিল না মনে একটা ধারণা ছিল, আমার লেখা কেউ বুঝবে না, কাজেই যাতে ভয়ে বার তাই করাই ভাল।

আমি এখন প্রথম চাকরীতে ছুঁকি, তখন কোনোরকম থেকে সাহায্য পাইনি, দলের লোকেরা তাড়াতে বন্ধপরিবর, কিন্তু ভাণ্ডা ভাল ছিল, প্রথম ব্রাহ্মিতেই জমে গেল।

কাগজওয়ালারা প্রথম দু'তিন বছর আমাকে কোন আয়দই দেয়নি বরং উটে পালাগান দিয়েছে। অল্প থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ আমাকে ভাগাতেই চাইত, তাছাড়া মদন কোম্পানী আবার বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দিত না।

'হু'—একদিন নেশার ঘোরে একটি ভাল কথা বলেছিল। (ওই যে ডু'ডিওয়াল জমিদার, কি নাম বেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, গোপিকারমণ, আমার বলতুম গোপিকারমণ, তার ওখানে)। ওর তখন বেশ নেশা, বললে—শিশির ভাড়ুড়ি, তাকে আমায়ই তুলেছি, আবার আমায়ই নাংবাং। কথাটাতে exaggeration থাকলেও কিছুটা সত্যি বটে।

আমায় প্রথম প্রশংসা করে 'নাচ ঘরে' হরিদাস। আর লিখে না হলেও, প্রকাশ সভার বলেছিলেন নীলেন সেন। অবশ্য কল তাতে ভাল না হয়ে ধারাপট হয়েছিল।

শিবপুরে একটি মিটিং (হরিগোপালের ক্লাব গোবর্দ্ধন নাট্য সমাজে) প্রথম অভিনয় সঞ্চকে সুখ্যাতি করেছিলেন। প্রথমে আমাকে আবৃত্তি করতে বললেন, আমি তখনও আবৃত্তি করা ছাড়িনি, কাজেই একটা (বোধহয় পঞ্চদশের তাঁরে) আবৃত্তি করলুম। তারপরই উনি বক্তৃতা করতে উঠে রামের উজ্জ্বলিত প্রশংসা শুরু করলেন। এক জারগায়—গান্ধী যেমন বংসকে লেহন করে তেমনি রাম চোখ দিয়ে লবকে লেহন করেছেন—বলার খুব হাসির হোল পড়ে গেল। উপমাটা অবশ্য খুব ভুল সেননি।

ওর একটি নাটক (নাম দ্বিবক্টর—ত্রিবাঙ্কুরের এক শিব-রক্ষির নিয়ে লেখা, বেশ ভালই হয়েছিল। তা' আমি বললুম, বললে দিন। উনি বললেন, তুমিই নাওনা লিখে, তাতে আমি বললুম, সে আমি পারব না।) হারিয়ে গেল। উনি কিন্তু শুনে কালেন, ও কিছু নয়, অমন আমার কত পেছে।

নীলেনবাবুর ছেলে অক্ষণ একটা উপভ্রাস লিখেছিল, পড়ে বেশ ভাল লেগেছিল, বললে, ছাপলে পরশা হবে? বললুম, হবে। তা' আমাকে দেয়নি।

অক্ষণ বোকার মত রিটারার করলে। রটিশচার্ট কলোজের সাহায্যে বারন করেছিল, বলেছিল, ও কাজ করে না, তা তুলে না। ওর ছেলে সময় তখনলুম নতুন আছে, এই নতুন সঙ্গে লোড়টা ভাঙা হয়কার।

লোকের বলে, বহীষ্ণাব নাকি নতুন জন্মে দুজনকে কি করতে রেখেছিলেন আমায়ই বিইনি, কথাটা সত্যি নয়।

রবি বাবু খুব একজন ভাল অভিনেতা ছিলেন না, ওর চেয়ে একজন বাবু অনেক ভাল অভিনয় করতেন, রবি বাবু যে ভূমিকাতেই দায়িত্ব না কেন, সব সময়েই মনে হ'ত রবি বাবুকে দেখছি।

একজন বললে—কেন, বিনম্রনে বয়পাতি? হাসলেন—ভূমিকার কথা আর বল না ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। বয়পতির পাঞ্জামা আর পাঞ্জাবী পরা চোরা।

ডাকঘরের কথা উঠল, বললেন—ডাকঘরের প্রথম অভিনয় দেখেছিলুম, বিচিত্রা ভবনের মেঝেয় বসে। অবন বাবুর ঘরোয়া বইটিতে আছে, অবন বাবু নন্দলালকে ঘরের চালে লাউ খুলিয়ে দিতে বলেছিলেন এই বইটিতেই। মোড়লের ভূমিকায় অবন বাবু সত্যি ভাল অভিনয় করেছিলেন, আর রবি বাবু এলেন, কারো বুঝতে ভুল হ'ল না—রবি বাবু এলেন।

সামান্য ভাবে থিয়েটারের কথায় বললেন—থিয়েটারকে ভাল বাসতে পারা চাই ত? সে ভালবাসা ছিল গিরিশ বাবুর। অন্য দলকে সোমবারের মধ্যে আড়াই হাজার টাকা জমা দিতে হবে, দলত ক্লাসিক থিয়েটার থেকে উৎখাত করবে। শনিবার পর্যন্ত নানা জারগার ঘুরে ঘুরে টাকা আর বোগাড় হ'ল না। খবর পেয়ে গিরিশ বাবু ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এত জারগার ঘুরেছ আর আমার কাছে আসতে পারনি? এই নাও টাকা যখন পারো শোধ দিয়ো, না পারো দিয়ো না; কিন্তু সোমবার সকাল দশটার সময়েই বেন টাকাটা জমা পড়ে। থিয়েটারকে আগে বাঁচাও, হীরেন দত্তর ছেলে নাকি কথাটা লিখেছে, কিন্তু লোকের কী নজরে পড়েছে?

গিরিশ বাবু সব্বদে এত কথা জানি যে 'হ'শ' পাতার একখানা বই হ'তে পারে। কিন্তু লিখবো কখন? বই বা দরকার নেবে কে? আর যে ক'মাস লিখবো, সে ক'মাসের খরচ চলাবে কি করে আমার?

গিরিশ বাবুকে মাতাল চরিত্রহীন বলে, কিন্তু তাতে কী তাঁর বৈশিষ্ট্য আর? হীরালাল বাবুর মুখে গল্প শোনা, একদিন একজন মাতাল থিয়েটারে খুব হজা করছে। শুনে গিরিশ বাবু বললেন, ডেকে আন ত খানকীর ছেসেসের (খুব বড় ধারণা ছিল তাঁর: প্রায় কথাতেই একটা মাত্রা ছুড়ে দিতেন) তারা এসে পরে বললেন, আমি মদ খেলে মাতাল, না খেলে গিরিশ ঘোষ। মদ না খেলে তো বেটোরা (একটা মাত্রা ছুড়ে) কে?

ছবি এবার সর্ব্বদা পেলো, তা ভালই হয়েছে। অভিনয় ও ভালই করে। ছবি রাষ্ট্রীয় করার কথা বলেছে বুঝি। ভাবছে খুব বড় কথা বললুম, কিন্তু রাষ্ট্রীয় করলে কোনও জিনিষ কি ভাল হয়? রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় করে ভাল সাহিত্যই মরে গেল, এ সব্বদে আমার একটা প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে, কিন্তু ছাপবে কে?

এই সমান আমাকেই প্রথমে দিলে, আমি গোড়ার রাজি হইনি। শেষ পর্যন্ত সতীশের (অধ্যাপক সতীশজি ঘোষ) কথার দ্বারা হলুম, তাহাড়া একটা লোভও হয়েছিল; আর লোভে পাশ, পাশে বৃত্ত। মানে তিন চার লাখ টাকা দেবে বলেছিল, সব্বই প্রায় ঠিক, 'জিরদর' নাম মেনে নিল, agreement ready হ'ল। একটি কাকড়া উঠে সব বাচাচাল হয়ে গেল।

বাবার সময় শেষ কথা বললেন—আমার একটি বাড়ি লাও আর কিছু উৎসাহী ছেলেরা, বসে বসে আর ভাল লাগছে না।

বালা নাটকের ঠিক বিবর্তন অনুসরণ করে নাটক উনি পড়তে শুরু করেননি, গিরিশজির প্রাতি প্রগাঢ় স্বার্থে নির্মলন ছিলোবেই প্রথম তাঁর হুটি বই পড়লেন। এবার অন্য কারো বই পড়া দরকার, নিজেই বললেন একথা, কিন্তু কার বই?

নানারকম প্রস্তাব হল, শেষ পর্যন্ত ছির হল যে, রবীন্দ্রনাথের "মালিনী" পড়বেন। কথাটা কি করে বাইরে রটে গিয়েছিল, কাজেই আটাশ তারিখে যখন এসেন ঘরে তখন প্রচণ্ড ভীড়, একা বসার পর, নন্দলালের কথা উঠল, বললেন—কাজীর "বিদ্রোহী" নায়া কোলকাতার পড়ে বেড়িয়েছি। লেখাটা প্রথম বোধ হয় বেরিয়েছিল মোসলেম ভাষাতে নয় একটা সাপ্তাহিক, কি বেন নাম—খ্যা, মনে পড়েছে—বিজলীতে।

তার প্রতিভা ছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যাছে তাঁর পতীর বাইরে অমন করে কেউ পাঁড়াতে পারেনি, তবে তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হল কই?

সব কিছুই একটু করে করলে অথচ কোনটাই ভাল করে করলে না, বেশ ছিল আবার কাছে, বপাক করে গিয়ে চুকল প্রবোধের ওখানে, অবশ্য ওর কি অসুবিধে হচ্ছিল তা আমি জানি।

দিল্লীতে আজিমুল হক নিয়ে গিয়ে কোনরকম সাহায্য করলেন না, আমিও চোঁটা কতখিনলুম, কিন্তু কিছুই হল না, উত্তরবঙ্গের জমিদার দুডাই কি নাম বেন? (বুড়ো বয়েসের সঙ্গে এই হয়েছে দোষ নাম ভুলে বাই।)

ওদের মধ্যে বেঁটে কে? দুজনেই অবশ্য লম্বা, তারই মধ্যে বেঁটে যে তাকে সাহায্য করতে বলাতে, বললে, কেন করব? (এক জিহ্বা প্রতিষ্ঠানের নাম করে) ওরা টাকা দিচ্ছে, ওদের হয়ে করছি।

অল্প করলুম, টাকা নাও তোমরা?

বললে, সবাই যখন নেয়, আমিই বা নোবান কেন?

দিল্লীর মরজার মরজার ঘুরে এই জ্ঞান হয়েছে কিছু জানেনা ওরা, ওদের না সরালে মজল নেই, 'তবে 'ক'দের দিয়েও কিছু হবে না।

দেবুলার দেশ মেদিনীপুর আর মেদিনীপুরে ওর মামার বাড়ি, কিছুদিন আগে দেবুল মেদিনীপুর থেকে ঘুরে এসেছেন। সেখানকার কে ওর সব্বদে কি বলেছে বলার, উনি বললেন—একটানা মেদিনীপুরে কখনো থাকিনি, গরমের ছুটিতে আর পূজোর ছুটিতে দাদামশায়ের কাছে বেড়াতে যেতুম, বাখা মারা বাবার পর মা অবশ্য ছোটদের নিয়ে ওখানে ছিলেন লেখাপড়া লেখানোর ক্ষেত্রে, তা কারো লেখাপড়াই হল না। তাহাড়া মামার পোষ্টাংগিসে চুক পড়ল। আমি কোলকাতাতেই থাকতুম। আর বিত্তও আমার কাছেই ছিল। পনেরো থেকে সত্তেরো সালের ভেতর একটা ওলট পালাত হ'ল।

মেদিনীপুরে থাকার সময়েই বোগজীবনের সঙ্গে খুব ভাব হয়। কুন্দিরাম, বোগজীবন, বিনয়ের দাদারা সব অনেক কিছু করেছিল; পর পর তিন চারজন ব্যক্তিষ্টকে মারল, সবাই কাঁদে গেল।

বিনয়কে সেদিন দেখলুম, ভেগুটা সেক্রেটারী হয়েছে। তাকে বললুম, তোমরা সব ছোলো হয়ে গেছ। মেদিনীপুরের ছেলেরা আগে কিছু পদার্থ ছিল এখন আর কিছু নেই। আমার শব্দ 'ক' হয়েছে।

হেলেনসময়ের তুল্য থেকেই নিজের সভ্যত গড়তে দেখা
উচিত। আর তার জন্যে প্রচুর বই পড়তে দেখা দরকার।

পড়ানোর মাত্রার আপনাই পাওয়া যাবে। আমাদের
হেলেনসেলার একটা cultural atmosphere ছিল। ছোট থেকে
কত বই যে পড়েছি। আমরাই শেখা হল না, কিন্তু ভায়েরা সবাই
গান শিখেছিল। কিন্তু ত ভালই গাইত, পুতুও ভাল গাইতে পারত,
কিন্তু বাইরের লোকের সামনে গাইত না, বাড়ির লোকের কাছেই
গাইত।

উনিশ থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত খুব পড়েছি। তখন সব রকম পত্রিকা
নিতুম আর বইও কিনতুম। Times literary supplement
থেকে ভাল বইয়ের খোঁজ পেতুম। তারপর থেকে কিছু বিশেষ
পড়া হয়নি। অবশ্য ওদেশেও ভাল বই বেরোনো বহুকাল বন্ধ
হয়েছে।

এবার এলেন 'মালিনী' প্রসঙ্গে, বলেন—মালিনী রবীন্দ্রনাথের
শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যেতে পারে, ওর আর একখানি ভালো নাটক
'তপস্বী'। বাকি সব কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রচলিত
নাট্যধারার ছাপ ত আছেই। বিসর্জন দেখ, রাজাসঙ্গী দেখ।

উনি খুব থিয়েটার দেখতেন, তবু লোকেরা বলবে, উনি
কালেজের থিয়েটার দেখেছেন। শিশির ভাটড়ির থিয়েটারে
হুঁচকায় গেছেন। অথচ তার উলটো প্রমাণ ইউরোপ প্রবাসীর
পক্ষে রয়েছে।

বোঙ্গের চতুর্থ পত্রেই আছে পার্লামেন্ট দেখার কথা। সেখানে
উনি বলছেন, আমাদের গ্রেট ব্রিটেন থিয়েটারের ট্রেনের হুঁপালের
দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে পোষাক পরা চ'টারজন লোক বেরোত,
ভাদের ভাব দেখে মনে হ'ত বেন বলছে, কি হবে তা' আমরা
জানি। পার্লামেন্টের নকরা অনেকটা ওই রকম ভাব নিয়ে
ধোঁাকেরা করছে।

তখন মাত্র ওর আঠার বছর বয়স, কাজেই থিয়েটার দেখতে
উনি তখন থেকেই পোচ্ছ ছিলেন বোকা যায়। (আবার আমি
বলছি বলে কথাগুলো হয়ত পনের সত্তরশে তুলেই দেবে।)

মালিনী বোকা শু খুব কঠিন নয়, ওই যে 'পরমরূপ' বলছে
প্রথমেই, কমা করে ক্ষেমকবে—এখানটাই সেই পরমরূপ এলো আর
তার প্রেমধর্ম জরী হ'ল। মালিনীর মন্ত্রিস্রর ওপর একটু ভৌক
পড়েছে। ভালবাসা এই কথাটা জোর করে বলতে পারব না, বরঞ্চ
মনে একটা ছায়া পড়েছিল এইটুকুই বলা যায়, সেটারও একটা

innuendo আছে বাকি। তবে যদি বলো মালিনী ক্ষেমকবে
দেখে ভালবেসে কেলেছিল, তবে সেটা ভীষণ তুল করা হবে।

মালিনী অবশ্য সাধারণবোধ নয়, ওর যেটুকু popularity
তাও কিন্তু আমার ভক্ত। যে এটিমচার দল বইয়ের কথা জানতে
এসেছে, তাকেই বলেছি দুটো নারী চরিত্র আছে, তোমরা মালিনী
করো বেশ ভালো বই। উনিশশো আটত্রিশ সালেই বংমান রাজ
কলেজের মেয়েদের দিগ্রে করালাম। উত্তরপাড়া কলেজের ছেলের
দিগ্রেও করিয়েছি, তবে public board এ হয়নি। বক্ত ছোট, সেক
খটায় বই। সবাই বললে আবার একটা শব্দধ্বনি হবে। শব্দধ্বনি
বই ভাল হলে কি হবে পর্যা দেখনি যে, তাছাড়া মালিনীর সিনটিনে
হাজার চারেক টাকা লাগবে, তাই সবাই পেছিয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের অন্ত কোন বই পড়া যায়, এ সব্বলে বললেন—
রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী পড়া যেতে পারে, রক্তকরবী একসঙ্গে সবটা না
পড়লে অনুবিধে হয়, ওই বইটার মধ্যে একগালা idea আছে,
বলতে চেয়েছিলেন মাঠে চাব করে কসল ফলানো, পাঁচাল তুলে মাটি
খুঁড়ে ভাল ভাল সোনা তোলার চেয়ে অনেক ভাল, বইয়ের শেষ
কথা হল, পৌষ ভোদের ডাক দিয়েছে। কিন্তু লিখতে গিয়ে
ব্রোকেসির ওপর ওঁর যে সব কোভ ছিল তা শিল্পিল করে চুক
পড়ল। মালিনী কিন্তু খুব ভাল নাটক হয়, কটি ভাল ছেসেমেয়ে দাঁও,
রিহার্স'য়াল দিতে দিতে তোমাদের বার বা প্রশ্ন আছে তার উত্তর
পাইয়ে দেব। বাংলা নাটক অভ্যন্ত: পঞ্চাশখানা পড়া যায়, সিরিশ
বাবুরই চরিত্রখানা আছে পড়ার মত বই। কীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণ
খুব ভাল বই। যিছু বায়ের ভীষ মোটেই ভাল বই নয়। কীরোদবাবুর
ভীষ অনেক ভাল, ওঁরটি মোটেই যিছুবাবুর দেখে লেখা নয়।
যিছুবাবুর 'ত' অনেক পরে লেখা। একজন প্রস্তাব করলেন—
ইংরেজী বই, বিশেষ করে সেক্সপীয়রের বই পড়ুন না।

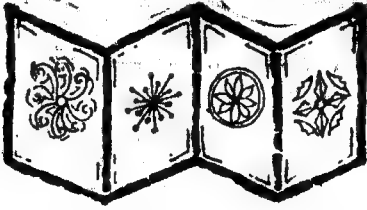
উত্তরে বললেন—ইংরেজি বই পড়তে পারানা, প্রথমত: পাঁচটা
খুলে যায়; তাছাড়া অনেককাল পড়া অভ্যাস নেই, দম পাও না।

রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী প্রসঙ্গে বললেন—চন্দ্রাবলী আমার মোটেই
পছন্দ হয় না, ওটা চার ভট্টাচারের করা।

মালিনীর পর রবীন্দ্রনাথের আর কোন বই পড়া হলনা,
বলেছিলেন পরে এক সময় রক্তকরবী পড়ে শোনাকেন, কিন্তু
আমাদের দুর্ভাগ্যবশত: তার মধ্যে রক্তকরবী পড়া ও তার বিশেষণ
শোনা হল না।

[কথা:।





পত্র

বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পত্রাবলী

[ষষ্ঠি রাজনারায়ণ বসুর মধ্যম জ্যোতিষ ছিলেন ওজরচরণ বসু। মেদিনীপুর সহরে ইচ্ছাসের নিবাস ছিল। ওজরচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা বসু। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার মধ্যম পুত্র। বীর ক্ষুরিয়ারের ইনি বিপ্লব-গুরু। সরকারের হইয়া বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী সেওয়ার অপরাধে নবেন গোসাঁইকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। সেই অপরাধে চন্দ্রনগরের সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এবং মোহনপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কীসী হয়। কীসির মাত্র তিন দিন পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ পত্র দুইটি লিখিয়াছিলেন। পত্র দুইটি হইতে সিঙ্গুরী ভগবান্দাস, মাতৃভক্তি এবং অবিশ্লিষ্ট চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মেদিনীপুর রাজনারায়ণ শ্রুতি পাঠাগারের ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসুর সৌজতে।]

দাদা সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে

১৭। ১১। ০৭, মঙ্গলবার

বেলা ৪টার পর

পুজারী—

দাদা বাবু

পত্র শনিবার আপনি আসিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু আসিলেন না কেন? সেদিন হইতে আপনার জন্ত আশা করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি আজ পর্যন্ত আসিলেন না। বাই হউন—আজ এখনি দুশারিটেগেণ্ট সহযেব বলিলেন যে, আপনি আগ্রাহ হইয়াছে এক ২১ তারিখ, শনিবার সকালে তিন দ্বি হইয়াছে। অতএব মধ্যে আর মাত্র তিন দিন সময়। পত্র পঠ আপনি একবার শেষ দেখা করিয়া বাইবেন। যেদিন আসিবেন সেদিনই দেখা হইবে। জন্ত কেহ যদি দেখা করিতে চান সঙ্গে লইয়া আসিবেন। মি: বারকে দেখিতে ইচ্ছা করে। যদি তিনি আসেন তবে সুখী হইব। ভংগরে দাদা! আপনার নিকট একটি অল্পরোধ আছে—আনিবেল আপনার নিকট এটি আহার এই প্রথম ও শেষ অল্পরোধ সেটি এই যে আপনি বেরকমই ভাবুন আমার অল্পরোধ তাহিয়া দেখিবেন যে সে শেষ জীবনে এই বৃদ্ধ বয়সে মা কোন বিশেষ কষ্ট না পান। আর আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শনিবার সকালে আসিয়া কেহ লইয়া বাইবেন।

ন' দিদি প্রভৃতি আসে তা ভালই। প্রার্থনা করিয়া যেন সংকার করা হয়। আশা করি পত্রপাঠ একবার দেখা করিয়া বাইবেন।

ইতি—

আপনার মেহের ভাই সত্যেন্দ্র

দিদি সুরবালাকে

১৭। ১১। ০৭, মঙ্গলবার,

বেলা ৪টা

শ্রীচরণ—

ন' দিদি, এখনি সাহেব বলিলেন যে, শনিবার, ২১শে তারিখ বিন দ্বি হইয়াছে। মধ্যে মাত্র আর তিন দিন সময়। শনিবার সকালে যেন দেখে লইয়া যাওয়া হয় ও বিশেষ প্রার্থনা করিয়া যেন সংকার করা যায়। বিশেষ আমার বলিবার কিছু নাই কেবল তুমি, সেজ দিদি প্রভৃতির নিকট এই অল্পরোধ যে সকলে মিলিয়া থাকে দেখিও—মা যেন শেষ জীবনে কোনরূপ বিশেষ কষ্ট না পান। সেজদিকে আমার বড়ীতে ও মাকে লইয়া সব সময় প্রার্থনা করিতে বলিও। দিদিমাকে ও মামাবাবুকে আমার শেষ প্রণাম দিও। তুমি আমার ভালবাসা জানিও। আর কি লিখিব, যদি কেহ দেখা করিতে চান ভক্তবাদের মধ্যে আসিলে দেখা হইবে। আজ শুধে শেষ বিদায়।

ইতি—

তোমাদের

মেহের ভাই সত্যেন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের পত্র

১

কল্যাণীয়াবু

পাণ্ডিত্যিকজন

তোমার জন্মদিনের জন্তে তিনটে বাঁধা দেয় পাঠিয়েছি। কিন্তু তুমি নিজেই এমন একটি বাঁধা তৈরি করেছ যে, আমি তার কিনারা করতে পারছি নে। তোমার চিঠি বখশ করা তখন তোমার জন্মদিন শোভিত পড়েছে—তোমার সেই বেশ-কল্যাণীয়া আবার বাঁধা শৌখিনে কি করে? তা হাতা আর-একটা সুকল আছে—আমি

অনেক রকম লেখা লিখেছি, কিন্তু জেনে শুনে উদ্ধে ক'রে বাঁধা লিখিনি। আমার অনেক লেখা অনেক লোকে বাঁধা ব'লে মনে করে, কিন্তু সেরকম বাঁধা ত কাগজে ভালো লাগে না। কিন্তু বোসো—যদি পড়তে অনেক দিন আগে যখন তুমি জন্মদিন, হয়ত তোমার মাও তখননি, তখন তোমাদের জন্তে কখনো কখনো খোলাই তৈরি করেছি। তাহি থেকে তিনটে তোমাকে পাঠাই—আজি বছরের জন্মদিনের আগে হয়ত তুমি পাবে।

(১) তিন অক্ষরের কথা। প্রথম ও শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে কান থাকে না। শেষ দুটো অক্ষর ছেড়ে দিলে মাস থাকে না। সমস্তটা ছেড়ে দিলে প্রাণ থাকে না।

(২) চার অক্ষরের কথা। প্রথম দুটো অক্ষর একটি প্রাণী, শেষ দুটো অক্ষর তার বন্ধন। সমস্ত কথাটার মানে হচ্ছে বাঁধা পড়লে সেই প্রাণীর অবস্থা।

(৩) তিন অক্ষরের কথা। তার প্রথম অংশটাকে ইংরেজি শব্দ ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তারো বা মানে বাকি অংশটারও সেই মানে, সমস্ত কথাটাই সেই একই মানে। ইতি ১২ বৈশাখ ১৩৩২

ততাকালী

"বহি-বাবু"

২

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীবাবু

তুমি আর ফুলদিগি দুই বোনে আমার দুই বাঁধার উত্তর ঠিক বের করে দিয়েছ। কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার বাবা বাঁধার উত্তর বের করবার বয়স পেরিয়ে গেছেন। আমার তৃতীয় বাঁধার উত্তর হচ্ছে সংগীত। Song গীত। প্রথম অংশটাকে ইংরেজি শব্দ ব'লে ধরে নিলে তারও বা মানে, তার পরের অংশেরও সেই মানে, সমস্ত কথাটারও সেই মানে।

আমি কেমন আছি জানতে চেরেছ। খুব ভালো আছি। ছেলেবেলার অন্তর্য করলে খুসি হকুম, ইতুনে বাওয়া বড় হ'ত। কিন্তু তখন শরীর এত সুস্থ ছিল যে, শরীরের উপর ভারী রূপ হ'ত। এখন শরীরটাকে অত্যন্ত সতর্ক ব'লে কেউ কোঁচ দিতে পারবে না—বেশ অনেক দিন ধরে অন্তর্য করে আছে। দুটি পেতেছি। প্রায় সমস্ত তিন, রাত্রি দুপুর পর্যন্ত ঘাট্টে ব'লে থাকতে পাই—কেউ বন্ধুতা করতে ডাকে না, তুমি ছাড়া কেউ ধাঁধা চেয়ে পাঠায় না, চিঠি লেখলেও জবাব দিইনে। ছেলেবেলার ছুটির দিনে খেলা ছিল মাটির উপর খেলা নিয়ে, আজ ৬৫ বছর বয়সে আমার খেলা নীল আকাশের উপর ভাবনা নিয়ে। কিসের ভাবনা? সেই বয়সে মন কিরে গেছে ব'লেই তোমার বয়সের মেরে চিঠির জবাব দিতে ডাক্তারের নিষেধ মানিনে। আমার একটি সঙ্গিনী আছে, তার বয়স তিন—ডাকে দিনের মধ্যে পাঁচ ছ বার বাফের গল্প বলতে হয়। আমার অভ সব কাজ দিয়ে এই একটাতে এসে ঠেকেছে। আমার মনিবটি বড় শক্ত, কিছুতে ছুটি দেয় না।

আমার জন্মদিনের জন্যে যে খাটাটি পাঠিয়েছ ঠিক দিনে সেটি পূর্ব। আমাদের বেশে বোকাবান্দাররা কংসরের প্রথম দিনে নতুন খাটা খেলে। আমিও আমার ৬৫ বছর বয়সের দিনে তোমার হাতের দেওয়া নতুন বাঁধা পূর্ব। কিন্তু আঙুলাল খাটা ভাঙি করবার বড় মূল্য নেই। ইতি ১১ বৈশাখ ১৩৩২

ততাকালী

শ্রীকীর্ত্তননাথ ঠাকুর

কল্যাণীবাবু

ডাক্তারের কথা। হকুমে চিঠিপত্র লেখা কমিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু তুমি লিখেছিলে এক বছরের মধ্যে তুমি ভালো মেরে হ'বে উঠবে তাই শুনে তোমাকে আমার এই শেষ আশীর্বাদ পাঠাচ্ছি। তুমি শক্তী মেরে হ'বে উঠলে সবাই আমার চিঠির জবাবাখ্যা করবে এ সোভ সাম্রাজ্যে পারলুম না।

আ ছাড়া তুমি আমাকে আরো একটা মন্ত সোভ দেখিয়েছ। আমাকে বলেছ, আমি "খুব ভালো লোক।" তোমাকে আমি চিঠি লিখেছি এই হচ্ছে তার একটিমাত্র প্রমাণ। এত সহজে এত বড় খ্যাতি আমার শরীরে আর কখনো পাইনি। এ জগতে দুঃসাহ্য ভালো কাজ করেও "ভালো" উপাধি সব সময় মেলে না। তাই তোমার কাছ থেকে আমার "ভালো" উপাধি আরো পাকা করে নেবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখলুম। অতি অল্প দিনের মধ্যেই জাহাজে চড়ে সরুয়ে পাড়ি দেব। অন্তঃপ্রাণ এ চিঠির উত্তরে তোমার কাছ থেকে বিতীর্ণ প্রশংসাপত্র পাবার আশা নেই। কির এনে যদি কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হয় তাহলে দেখতে পাবে "বহি-বাবু" তোমাদেরই বড় ছোট ছেলে-মেয়েদের বন্ধু। ইশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। ইতি ৭ আগষ্ট ১৯২৫

শ্রীকীর্ত্তননাথ ঠাকুর

৪

লিখতে বন্ধন বসে আমার
তোমার খাটার প্রথম পাতে
তখন জানি, কাঁচা কলম
নাচবে আজও আমার হাতে।
সেই কলমে আছে মিশে
ডাক্তারদের কাশের হাসি,
সেই কলমে স্নানের মেঘ
লুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশি।
সেই কলমে শিত মোড়েল
শিশু দিয়ে তার বেড়ার উড়ি।
পাল্ল দিগির বাসার ঘোল
কনক চাঁপার কচি কুড়ি।
বেলার পুতুল আজো আছে
সেই কলমের খেলা-ঘরে;
সেই কলমে পথ কেটে দেয়
পথহারানো ভোপান্তরে।
নতুন চিকন জলধ-পাতা
সেই কলমে আশু নি নাচে।
সেই কলমে মোর বয়সে
তোমার বয়স বাঁধা আছে।

শ্রীকীর্ত্তননাথ ঠাকুর

১৫ বৈশাখ ১৩৩৬



যেহেতু যেহেতু
এইজন্য
অসুখের জন্যে যেহেতু

১৬

জীবনের সুখবাসনা আগন্তুকী নয়, স্বাভাবিকী। কিন্তু তার সুখ কিসে? একমাত্র রসরূপকে পেয়ে। রস জেবায় লঙ্কানন্দী ভবতি। জীব আনন্দী শুধু রসবস্তুর পেয়ে। আর সেই আনন্দকে একবার জানলে, আর ভয় নেই। ন বিবেচি কুতশ্চন।

সেই আনন্দকে জানি কী করে? পাঠ কী করে? অনুভবে। আনন্দদনে। আনন্দদনের উপায় কী? সারিধ্য। আর সারিধ্যের তত্ত্বতা ও পাটতা সেবায়। আর, প্রেম ভক্তি ছাড়া কি সেবা সম্ভব? সুতরাং প্রেম-ভক্তিই সাধ্যবস্ত।

ছাপরে কৃষ্ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ। ব্রজেন্দ্রনন্দন আর শচীনন্দন। উভয় লীলার সেবাতেই আনন্দদনের পূর্ণতা। 'এথা গৌরচন্দ্র পাষ সেধা রাধাকৃষ্ণ।'

কৃষ্ণসেবার চার ভাব। দাস্ত সখ্য বাৎসল্য আর মধুর। মধুরই সব ভাবের শ্রেষ্ঠ, মধুরই সাধ্য-শিরোমণি। মধুরই আরেক নাম কান্তা প্রেম। 'পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।' আরেক নাম শৃঙ্গার। 'সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মধুরী।' কিন্তু সঙ্গম-সুখ থেকেও সেবা-সুখ বেশি মধুর। 'কাম্বুসেবা সুখপূর, সঙ্গম হইতে সুমধুর, তাতে সাধী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী।'

অঙ্কট সাধনের মূল। অঙ্কা কাকে বলে? শাস্ত্র-বাচ্যে বিশ্বাসট অঙ্কা। কৃষ্ণভক্তি করলেই সমস্ত কর্ম করা হল, আলাদা করে আর কিছু করতে হবে না—এই শাস্ত্রকথার নির্বিলম্ব বিশ্বাসের নামই অঙ্কা। 'অঙ্কা-শব্দে বিশ্বাস কহে হুতু নিচয়। কৃষ্ণভক্তি কৈলো সর্ব কর্ম

কৃত হয়।' আর এই অঙ্কার মূল সাধুসঙ্গে। 'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।' আর কৃষ্ণরতিই সর্বসিদ্ধি। 'কোন ভাগ্যে কারো সংসার কয়োগুণ হয়। সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণ রতি উপজয়।' আর কৃষ্ণরতি কৃষ্ণভক্তিই সাধন। আর সেই সাধনের উপচার হরিনাম। নামকীর্তন।

এ কে এল নবদ্বীপে?

একে চেন না? বিছায় বাকি দেশ জয় করে এসেছে। নবদ্বীপ জয় করতে পারলেই অধিতীয় হতে পারবে। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা গেল কোথায়? ঘরের কোণে মুখ লুকোল নাকি?

বিস্তর হাত-ঘোড়া-দোলা লোকজন নিয়ে এসেছে। চালচলন দেখে মনে হয় যেন অটল পয়সা। বিস্তার ঔজ্জল্য নিয়ে এসেছে কিন্তু বিনয় নেই এককিন্দু। আটোপটকারে কথা কইছে। কে আহ নবদ্বীপে, যদি সাহস না থাকে, আমাকে লিখে দাও জয়পত্র।

কে এ পণ্ডিত?, এর নাম কী?

কেশব পণ্ডিত।

দেশ কোথায়?

কাম্মীর।

কী এর বৈশিষ্ট্য?

ইনি সরস্বতীমন্ডের উপাসক। সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁর নথ্যাগ্রে সর্বশাস্ত্রের অধিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, তার জিহ্বায় স্বয়ং সরস্বতী প্রবক্তা। সরস্বতীর বরে দিখিজয়ী।

নবদ্বীপের পণ্ডিতের দল ডুকুকে গেল। স্বয়ং সরস্বতীর সঙ্গে কে বিচার করবে?



[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম থাম ও
ছবির বিষয়বস্তু যেন লিখতে ভুলবেন না।]

মৃৎশিল্পী মৃতি
—কুমারকুমার বাগচী



একাত্তর

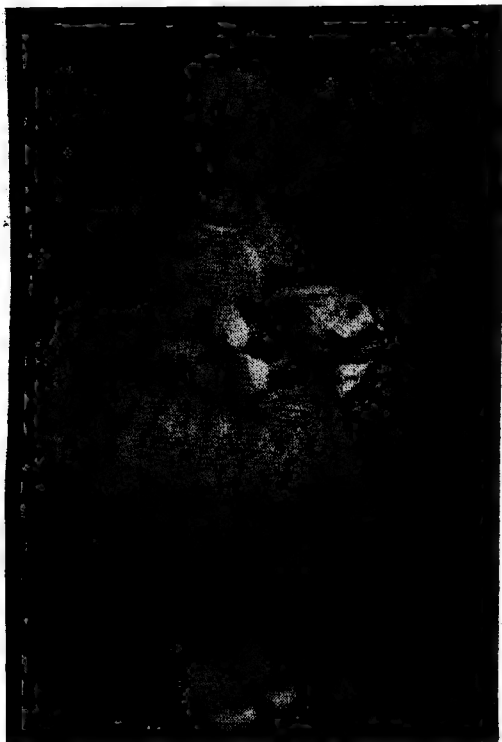
—চিত্তব্রজ মল্লী



হস্তভাষা

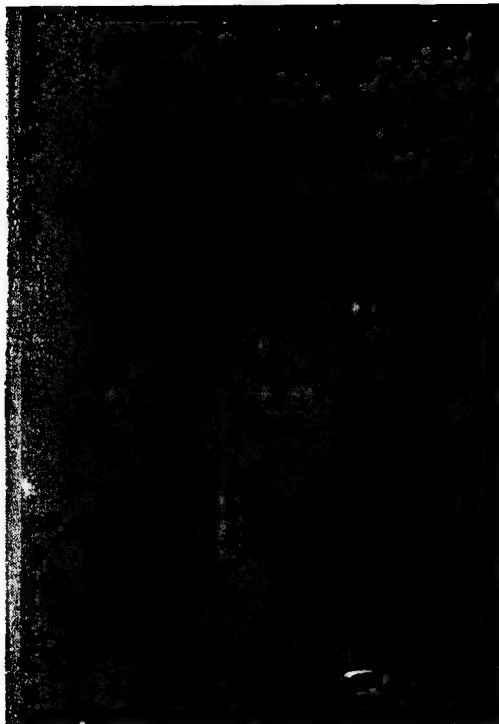
—স্বদেশ মণ্ডল





পুতুল পুতুল
শিকার

—চিত্ত বন্দী

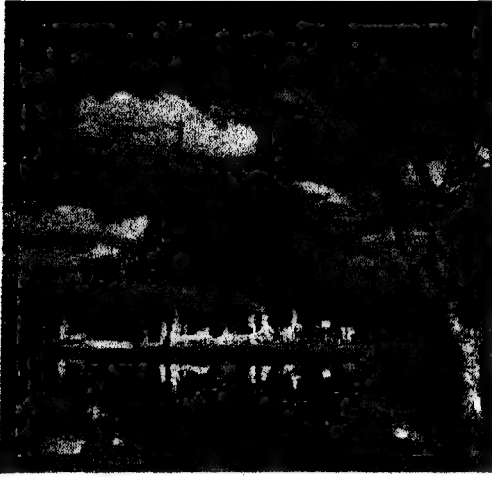


একা

—সুকুমার মণ্ডল

—কুমার বসু





প্যাপোডা

—বীরেন্দ্র পাতুলী



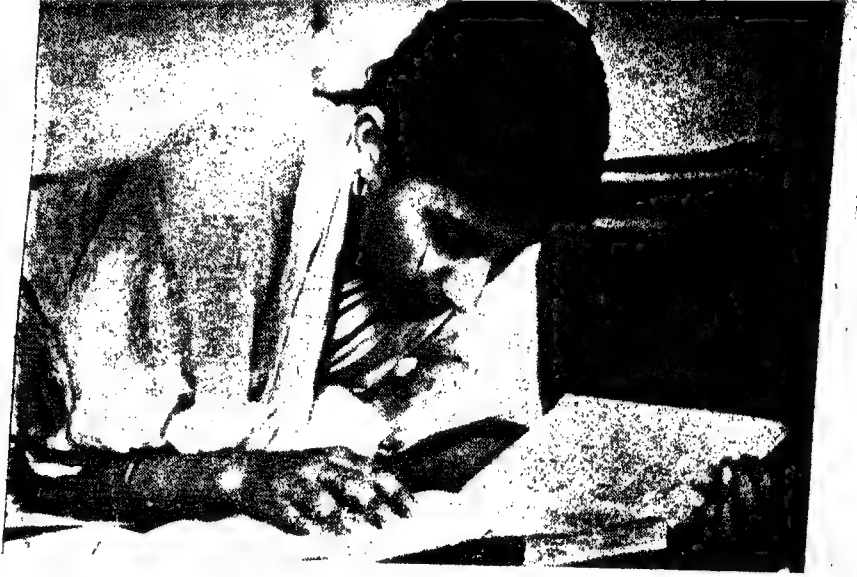
তাজ

—ভূপ্তি দাস

অমুশীলন

—সন্তোষকুমার মজুমদার





পরীক্ষা আগত ঐ

—দীপক ঘোষ

জানায়েযক

—বিখাজিং সেন



ভাঙলে ধূলিমাং হল নবদীপের মান। সকলে দস্তখৎ করে জয়পত্র তবে লিখে দাও কেশবকে।

জ্যাংত্রাভরা সন্ধ্যা। গজার ঘাটে পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আছে নিমাই। পুরানো পড়া আলোচনা করছে। বেড়াতে বেড়াতে সেখানে হাজির হল কেশব।

যোগপট্ট ছন্দে বপু বাঁধা, বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ রেখে শাস্ত্রব্যাখ্যা করছে, কে এই পণ্ডিত—থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দ্বিধিজয়ী।

সংসার লোক বললে, 'ইনিই নিমাই পণ্ডিত।'

'কী পড়ায়?'

'ব্যাকরণ। আর ব্যাকরণের মধ্যে সবচেয়ে যা সোজা সেই কলাপ।'

অবজ্ঞার হাসি হাসি হাসল কেশব। যে সর্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তাকেই লোকে পণ্ডিত বলে। যার শুধু ব্যাকরণে জ্ঞান সে পণ্ডিত হয় কী করে? তাকাল আরেকবার নিমাইয়ের দিকে। কী অপূর্ণ সুন্দর দেখতে। সিংহদ্রীষ, গজস্কন্ধ, সুবলিত মস্তকে চাঁচর কেশ, প্রদীপ্ত চোখ, সমস্ত মাঠঘাট আলো করে বসেছে। কিন্তু সামান্য বৈয়াকরণিককে আমার ভয় কী। দ্বিধিজয়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয় এমন কী আছে তার প্রতিষ্ঠা! যাই একবার, দেখি বাঞ্জিরে।

গজার বন্দনা করে নিয়ে দ্বিধিজয়ী এগুলো নিমাইয়ের দিকে।

তার সঙ্গে লোক পরিচয় করিয়ে দিল।

শিষ্য উঠে দাঁড়াল নিমাই। সাদরে অভ্যর্থনা করল। বললে, 'বসুন'।

'তুমিই বুঝি নিমাই পণ্ডিত? দেখতে তো প্রায় বালকের মত। কী পড়াও? ব্যাকরণ?' কেশবের প্রশ্নে প্রচল্লর অবজ্ঞা: 'বালাশাস্ত্র? আর তাও নাকি চুনতে পাই, কলাপ? যা সবচেয়ে সরল, শিশুবোধ্য।'

'তাও পড়াতে পারি এমন অভিমান করতে পারিনা।' নিমাই বললে সবিনয়ে, 'আমি নিজেকে কিছু বুঝিনা, শিষ্যদেরও পারিনা কিছু বোঝাতে।'

'পারেনা? কলাপ তো জলের মত তরল।'

'কোথায় আপনি সর্বশাস্ত্রে সর্বকবিষে প্রবীণ, আর কোথায় আমি নবীন বিদ্যার্থী! আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা!' নিমাই তৃপ্তের মত হয়ে বললেন। 'আপনার কবিষ চুনতে বড় ইচ্ছা হয়। কৃপা করে গজার মহিমা কিছু কর্তা করুন। কাব্য জাযাদ করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছবিও পাশপাশে।'

সগর্বে দ্বিধিজয়ী মনে মনে শ্লোক রচনা করে মুখে আঙড়ে যেতে লাগল অনর্গল। একাদিক্রমে একশো শ্লোক। আর আনন্দিত করে যাচ্ছে উদাম ঝড়ের মত, চিন্তা করবার ভাঙেও কোনো ছত্তে বিন্দুমাত্র ছেদ টানছে না। সন্দেহ কি, জিহবাগ্রে স্বয়ং সরস্বতী বসেছে, নইলে এই শক্তি মানুষে সম্ভব হয়? জ্যোতারী সবাই উল্লাসে হরি-হরি করে উঠল। যত শব্দ ছন্দ অলঙ্কার সব যেন হাত ধরাধরি করে মেতেছে আনন্দে নৃত্যে। এ অদ্ভুতশক্তি লোকের সঙ্গে নিমাই আঁটিষে কি করে? নিমাইয়ের জন্তে সকলের কষ্ট হতে লাগল।

কিন্তু নিমাই নিঃসঙ্কোচ। নিরুদ্ধেপে 'বললে, সত্যি আপনার মতন কবি নেই আর পৃথিবীতে। কার সাধ্য প্রাকৃতাবনা না করে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন কবিত্বময় শ্লোক রচনা করতে পারে। কার বা সাধ্য আত্মোপাস্ত অর্থ বোঝে। আসল বোঝা আপনি আর আপনার বরদাত্রী সরস্বতী। ইচ্ছে করে এই শ্লোকগুলির মধ্য থেকে যে কোনো একটা বেছে নিয়ে তার ব্যাখ্যা করেন নিজমুখে!'

'বেশ তো বলো কোন শ্লোকটার ব্যাখ্যা চাও।' গর্বভরে তাকাল কেশব।

'আমি বলব? আপনার রচনা, আমার কি মনে আছে?'

'তা তো ঠিকই। তবু আভাস দাও, ভাবার্থ দিয়ে বোঝাও কোনটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।'

'আচ্ছা বলি।' বলে গোটা একটা শ্লোকই আবৃত্তি করল নিমাই। উচ্চধোষে বললে,

'মহৎ গজায়া: সত্যমিদমাভাতি নিভরাং

যদেখা ত্রিবিংশচরণকমলোৎপত্তি স্তম্ভগা।

দ্বিতীয়স্ত্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈর্যচরণা

ভবানীভূতুর্ধা শিরসি বিভবভ্যাহুতস্তম্ভগা।'

কেশবের চকুছির। বললে, 'সে কি কথা? স্বজ্ঞাবাদের মত একশোটা শ্লোক ছুঁছুঁ করে বলে গেলাম, তার মধ্যে থেকে এটাকে বেছে নিয়ে কঠিন করলে কী করে? তুমি কি ঋতিধর?'

নিমাই নয়মুখে বললে, 'সরস্বতীর বরে তুমি যেমন কবি হয়েছ, তেমনি কেউ ঋতিধরও তো হতে পারে।'

সবিনয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল কেশব। এমন অসম্ভব ঋতিধর কে কোথায় দেখেছে!

'শ্লোকটার ব্যাখ্যা করুন।'

'কিন্তু তো সোজা।' উপহিত সকলকে উদ্দেশ্য

করে বলতে লাগল কেশব : 'যে ঐক্যবিরূপ চরণকমল থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে সৌভাগ্যবতী, সুরনরগণ যার চরণ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর চরণের মত পূজা করে, যে ভবানীভক্তার মাথায় বিরাজিত বলে অদ্বুতগুণাধিতা, সেই গঙ্গার এ মহিমা নিশ্চিতরূপে নিরন্তর দীপ্তি পাচ্ছে।'

নিমাই বললে, 'ভালো কথা, এবার তবে গ্লোকে দোষ-গুণ বিচার করুন।'

কেশব ত্রুদ্ধ হল। বললে, 'এ গ্লোকে দোষের লেশস্পর্শ নেই। সমস্তই এর গুণ। ছোটো অলঙ্কার দেখতে পাচ্ছ না? একটা উপমা, আরেকটা অনুপ্রাস—'কিন্তু দোষ?'

'দোষ?' ক্রোধের মাত্রা আরও বেড়ে গেল কেশবের। 'তুমি তো বৈয়াকরণ, শিশুপাঠ্য কলাপের শিক্ষক, তুমি অলঙ্কার কী বুঝবে? তুমি তো আর অলঙ্কার পড়নি। আমার গ্লোকে কবিত্বের যে সার নিহিত আছে তা বোঝ তোমার বিজ্ঞা কই?'

'অলঙ্কার পড়িনি বটে,' নিমাই বললে শান্তস্বরে, 'কিন্তু লোকমুখে শুনেছি কিছু কিছু। যা শুনেছি তার থেকে বলতে পারি, আপনি রুষ্ট হবেন না, আপনার এই গ্লোকে পাঁচটি দোষ আছে—'

'মধ্যে কথা।' হস্তার ছাড়ল দ্বিধিজয়ী।

'বস্তু হবেন না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।' নিতাই বলতে লাগল : 'যে বস্তু অজ্ঞাত তাকে বলে বিধেয়, আর যে বস্তু জ্ঞাত তাকে বলে অনুবাদ। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম কি? তার নিয়ম আগে অনুবাদ কসবে, পরে বিধেয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলে অবিস্মৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হয়। এখন দেখুন, আপনার গ্লোকের প্রথম ছত্রের এই কথারা : মহৎ গঙ্গায়াঃ ইদং। এখানে, গঙ্গার কী মহৎ, প্রারম্ভেই জানা যায় না। সুতরাং মহৎ কথারা বিধেয়। আর ইদং—জ্ঞাতবস্তুকে জানাবার শব্দ, সুতরাং এটা অনুবাদ। মহৎ গঙ্গায়াঃ ইদং না বলে বলা উচিত ছিল ইদং গঙ্গায়াঃ মহৎ। সুতরাং বাক্যের বিজ্ঞাসে পরিপূর্ণ অবিস্মৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ঘটেছে।'

বিমূর্ষের মত তাকিয়ে রইল কেশব।

'ও রকম দোষ আরো একটা ঘটেছে। ধরুন দ্বিতীয়-ঐলক্ষ্মীর কথারা। এখানে লক্ষ্মী জ্ঞাত, তাই সে অনুবাদ। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্মী বলতে কী কোথার কাকে বোঝার, তা অজ্ঞাত। সুতরাং দ্বিতীয়

শব্দ বিধেয়, লক্ষ্মী শব্দ অনুবাদ। দ্বিতীয় ঐলক্ষ্মীর কথারা, অনুবাদ আগে না বলে আগে বিধেয় বলাতে, এখানেও অবিস্মৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ হয়েছে। অন্য দোষও দেখাচ্ছি।'

বলে কী বালক! হতচেতনের মত তাকিয়ে রইল দ্বিধিজয়ী।

'হ্যাঁ, বিরুদ্ধমতিকূল দোষ।'

'সে আবার কোথায়?'

'ধরুন ভবানীভক্ত কথারা। কথার মানে কী? মানে হচ্ছে, ভবানীর স্বামী। ভব বা মহাদেবের যে পত্নী অর্থাৎ দুর্গা—সেই ভবানী। এখন ভবানীর স্বামী বললে মহাদেবকেও বোঝানো যায়, আবার মহাদেব ছাড়া ভবানীর অন্য স্বামী আছে—এ ভাবনাও অসম্ভব হয় না। প্রকৃত অর্থের প্রতিবুল ইঙ্গিত যদি এসে পড়ে তাকেই বিরুদ্ধমতিকূল দোষ বলে। যদি ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্তা বলা হয়, তা হলে সেটা খোদ ব্রাহ্মণও হতে পারে, আবার ব্রাহ্মণপত্নীর দ্বিতীয় স্বামীও বাতিল হয়ে যায় না।'

'আর নেই?' দ্বিধিজয়ী বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল।

'আরো ছোটো আছে। একটা পুনরাবৃত্তি, আরেকটা ভগ্নক্রম।' নিমাই বলল স্বচ্ছন্দে।

'আমাদের সবাইকে বলুন বুঝিয়ে।' শ্রোতার দল চঞ্চল হয়ে উঠল।

'ক্রিয়াপদের ব্যবহারের পরেই বাক্যের সমাপ্তি ঘটা সমীচীন। বিভবতি—এই ক্রিয়াপদেরই বাক্যের শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, না, ক্রিয়াপদের পরে 'অদ্বুতগুণা' এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই এখানে ঘটেছে পুনরাবৃত্তি।'

'কিন্তু ভগ্নক্রম!' শ্রোতাদের মধ্য থেকে কে বলে উঠল।

'বলছি। এই গ্লোকে চারটি চরণ বা ছত্র আছে। প্রথম চরণে 'ত'—এর অনুপ্রাস, তৃতীয় চরণে 'র'—এর অনুপ্রাস, চতুর্থ চরণে 'ভ'—এর অনুপ্রাস, কিন্তু দ্বিতীয় চরণে দেখছ কোনোই অনুপ্রাস নেই। আত্মোপাস্ত একই নীতি মানা হলনা বলে ভগ্নক্রম দোষ হয়েছে। যদি দ্বিতীয় চরণে অনুপ্রাস থাকত, কিংবা প্রত্যেক চরণই অনুপ্রাসযুক্ত থাকত, তা হলে ঘটত না ভগ্নক্রম।'

'কিন্তু কণ?'

‘বলেছি তো পাঁচটা গুণও আছে, কিন্তু বা দেখালাম, ঐ পাঁচ দোষেই সমস্ত গুণ ছারখার হয়ে গেছে। সুন্দর শরীরে যদি একটিও ধবল কুষ্ঠের দাগ থাকে, যত ভূষণেই তাকে সাজাও না, সেই এক দাগের দোষে সমস্ত অলঙ্কার মূল্যহীন।’ নিমাই তাকাল দিগ্বিজয়ীর দিকে। বললে, ‘দেবতার প্রসাদে আপনি লোকোত্তর প্রতিভা পেয়েছেন, যার বলে নিবিচারে কবিতা তৈরি করলেন অনর্গল, কিন্তু রচনার বিচার না থাকলে দোষ এসে পড়ে অলঙ্কার্য।’ ‘বিচারি কবি হ’লে হয় সুনির্মল। সালঙ্কার হৈলে অর্ধ করে বলমল।’

নিমাইয়ের কথা শুনে, কাণে দেখে, দিগ্বিজয়ী স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরাভবের লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না, কথা আসছে না কণ্ঠে। প্রতিবাদ তো দূরস্থান। শেষকালে একটা ‘পড়ুয়া বালকের’ কাছে অপমানিত হতে হল। কিন্তু যে ব্যাখ্যা করল সে তো সাধারণের সাধ্য নয়। তার জিহবার সরস্বতী কি স্থান বদলে বসল গিয়ে নিমাইয়ের রসনায়? কে এই বালক?

‘তোমার ব্যাখ্যা শুনে আশ্চর্য লাগছে। অলঙ্কার পড়নি, কোনো শাস্ত্রাভ্যাস নেই। অথচ এ সব অর্ধ প্রকাশ করলে কী করে?’

‘আমি কী জানি। সরস্বতী যা বলতে বলল তাই বললাম।’

‘আর আমি সরস্বতীর বরপুত্র, আমাকে তিনি নির্জিত করলেন ‘শিশুদ্বারে।’ কোন্‌তে-লজ্জায় পুড়ে যেতে লাগল কেশব : ‘আমার বিচার বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রেখে আমাকে দিয়ে অশুদ্ধ শ্লোক রচনা করালেন। একটা সিদ্ধান্ত দুরগুণও হল না আমার। কেন? কেন?’

নিমাইয়ের শিষ্য ছাত্রেরা এতদূর চূপ করে ছিল, এখন দিগ্বিজয়ীর এই নিশ্চিত পরাজয়ে তারা উল্লাস করে উঠল। কী অজলিহ অহঙ্কার! নিমাইকে কত উৎসাহ, কত অবজ্ঞা। শুধু বালাশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়াও, তাও আবার সরলতম কলাপ। তুমি কাব্য বিচারের কী বুঝে। যে অলঙ্কারশাস্ত্র পড়েনি তার আবার কাব্য জিজ্ঞাসা কিসের। কত আফেট, কত বাগাড়ম্বর। কিন্তু আমাদের নিমাইকে দেখতো। কী অগাধ বিজ্ঞা অথচ কী সুন্দর বিনয়। যেমন নির্ভর তেমন নিরতিমান। দিগ্বিজয়ীর এমন হেরে যাওয়া নয়,

বাকে হেরে জ্ঞান করেছে তার কাছে হেরে যাওয়া। তাই নিমাইয়ের দলের ছেলেরা দিগ্বিজয়ীকে পরিহাস করে উঠবে তা আর বিচিত্র কি।

কিন্তু নিমাই শাসন করল। নিবৃত্ত করল শিষ্যদের।

বরং প্রশংসা করল দিগ্বিজয়ীর। বললে, ‘কাব্যের দোষগুণের বিচার সামান্য ব্যাপার। আসল বিষয় কবিত্বশক্তি, কবিতা রচনার ক্ষমতা। আপনি সে শক্তিতে অভুলন। সুস্থ চোখে দেখতে গেলে কবিত্ব দোষ কার বা নেই বলুন, কালিদাস ভবভূততেও আছে। আপনার কবিতা গঙ্গাজলধারার মত পবিত্র আর অচ্ছিন্ন স্রোত। যার মুখ দিয়ে অমন কাব্যবাক্য বেরয় সে মহাকবি-শিরোমণি।’ বিনয়ে আরও স্নিক হল নিমাই : ‘আমার শৈশবচাপল্য মাফনা করবেন। আপনার কবিত্বের সত্যিকার দোষগুণ বিচার কার, আমার এমন যোগ্যতা নেই। আপনি শ্রান্ত হ’য়েছেন, রাতও অনেক হল, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন। কাল আবার না হয় বিচার করা যাবে।’

‘এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।

যাহারে জিনেন সেহো দুঃখ নাহি পায়।’

শিষ্যেরা ঘিরে ধরল নিমাইকে : কেন, কেন, দিগ্বিজয়ীর পতন হল?

‘আর কেন! শুধু অহঙ্কার। এই বিত্বের অহঙ্কার হয়েছিল—জগৎসংসারে তার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যেই আসবে সেই পরাস্ত হবে।’ হাসল নিমাই—‘সরস্বতী তা সহিবে কেন?’

শুন ভাই সব! এই কহি সত্য কথা।

অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা।

যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।

অবশ্ত ঈশ্বর তাহা করেন সংহার।

ফলবস্ত বৃক্ষ আর গুলবস্ত জন।

নয়তা সে তাহার স্বভাব অমুকুণ।

‘দিগ্বিজয়ীকে সভামধ্যে জয় করলে আরো ভালো হত।’ বললে শিষ্যদের কেউ-কেউ। ‘তা হলেই ওর শিক্ষা হত সমুচিত।’

‘না, সেটা উচিত হত না। সে অপমান ওর দৃষ্টান্ত হত। ওর সর্বশ লুট করে নিত সকলে। বিরলে ভয় করলাম ওকে, যাতে ওর গর্ব ক্ষয় হয় অথচ কোনও দুঃখ না পায়।’

দিগ্বিজয়ী ব্যক্তি কেবল কটকট কিন্তু দুর্বলও গেল না।

সন্ধ্যারাত সন্ধ্যার আরাধনা করল। কী দোষ করেছি যাতে আমার প্রতিভার স্কেচ ঘটল। লোপ পেল বিচারবুদ্ধি।

সন্ধ্যা দেখা দিলেন। বললেন, 'যার কাছে তোমার পরাজয় হয়েছে, তিনিই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। আর জেনো আমিই তাঁর পাদপদ্মের দাসী।'

'তুমি তাঁর দাসী?' দিগ্বিজয়ী নিষ্পন্দ-আড়ষ্ট।

'হ্যাঁ, তিনি আমার কান্ত, আমার প্রভু। তাঁর কাছে আমার ক্ষুতি নেই, বরং অপাধ লজ্জা। তুমি যাও, ওঁর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করো, চরম কবিত্ব লাভ করবে।'

প্রভাত হতেই দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। ডাক শুনে নিমাই বাইরে আসতেই দিগ্বিজয়ী তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

নিমাই ব্যগ্র হাতে তুলল তাকে মাটি থেকে। বললে, 'সে কী! তুমি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আর আমি এক অপোগণ্ড বালক। তোমার এ কী দৈশ্য।'

দিগ্বিজয়ী কাতর কণ্ঠে বললে, 'আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি সন্ধ্যাভীপতি নারায়ণ, তুমিই সমস্ত বিস্তার রাজ্যধিরাজ। কী শুভকণ্ঠে এলাম আমি নবদ্বীপ। প্রভু, আমার সমস্ত অবিজ্ঞা বাসনার বন্ধন দূর করে দাও। কী করে যাবে দুর্বাসনা। দাও তার উপদেশ।' কঁাদতে বসল দিগ্বিজয়ী।

নিমাই বললে, 'কী আর উপদেশ দেব। সমস্ত জঞ্জাল ছেড়ে, আর সব চেয়ে বড় জঞ্জাল অহঙ্কার, কৃষ্ণ-চরণ ভজনা করো। এই অনন্ত সংসারে যদি কিছু সত্য বস্তু থেকে থাকে তা কৃষ্ণ ভক্তি। তাই সর্বভূতে দয়া করে কৃষ্ণভক্তি করো।'

দিগ্বিজয় করিব বিস্তার কার্য্য নহে।

ঈশ্বরে ভজিলে, সে বিস্তার সম্ভবে কহে।

সেই সে বিস্তার ফল জানিহ নিশ্চয়।

কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়।

কেশবকে আলিঙ্গন করল নিমাই। দেখতে-দেখতে কেশবের দেহে ভক্তি, বিরক্তি আর

বিজ্ঞান দেখা দিল। তৃণের চেয়ে অধিক এল কোমল নরতা, দন্তের বাষ্পমাত্র রইল না। বাড়ি কিংগে গিয়ে হাতি ঘোড়া দোলা—যা কিছু স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি ছিল—সব জনে জনে বিলিয়ে দিল। কোপীন পরল, দণ্ডকমণ্ডলু হাতে নিল। সংসার ছেড়ে চলে গেল অসল হয়ে।

কং বা দয়ালু শরণ ব্রহ্মেণ? কৃষ্ণ ছাড়া এমন দয়ালু কে আছে যে তার ভজনা করব? স্তনলিপ্ত কালকূট পান করিয়ে বালকৃষ্ণের প্রাণনাশ করতে চেয়েছিল পুতনা, তবু বদাশ্রু কৃষ্ণ সেই পুতনাকে ধাত্রীপতি দিলেন, মৃত্যুর পরে সিদ্ধদেহে দিলেন তাকে কৃষ্ণলবঙ্গের অধিকার। এত মহৎ করুণা আছে কোথায়? কিন্তু কেন এই করুণা? কাপট্যের অভিনয় হলেও ক্ষণকাল পুতনার মধ্যে ভক্তির আভাস জেগেছিল, জেগেছিল বাৎস্যল্যের আভাস, যখন সে কৃষ্ণকে কোলে টেনে নিয়েছিল, স্তন্যদানে দেখিয়েছিল উন্মুখতা। যদিও তার অন্তরে জিঘাংসা, যদিও আসলে সে পাপীয়সী, তবু কৃষ্ণের জন্তে ঐটুকু সে করেছিল বলে, কোলে টেনে নিয়েছিল বলে, স্তন্যপান করাতে চেয়েছিল বলে, কৃতজ্ঞ কৃষ্ণ তার দেহান্তরে দিলেন তাকে প্রেমসেবার অধিকার। পুতনা যদি করুণা পায়, আমিও পাব। আমি যে ধরেছি কৃষ্ণভক্তি। জানি আমার গাঢ়তা নেই, একান্ত চিত্ততা নেই, জানি আমি কাপট্যলেশশূন্য নই, জানি বিষয়েবিলাসে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত—তবু যেহেতু কৃষ্ণকে একটু ভালোবাসার ভাব করেছি, ডেকেছি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, তাতেই তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন। তিনি কৃপণ নন, অকৃতজ্ঞ নন, ক্ষুদ্রাত্মা নন। তিনি দাতার রাজ্যরাজেশ্বর।

এই যে নরদেহ পেয়েছি, এই তো তাঁর অনন্ত কৃপা। 'নরতনু ভজনের মূল।' দেবতার দেহে জ্ঞান-ভক্তির সাধন নেই, সে সাধনের সুযোগ শুধু নরদেহে। তাই স্বর্গবাসীরাও এই মতদেহের অভিলাষী। কিছু করতে হবেনা, শুধু গুরুকে কর্ণধার করে দেহতরীকে ভবসাগরে ভাসিয়ে দাও। কৃপার বাতাস বইছে, অশ্রুকূল তরঙ্গে নিয়ে যাবে গম্ভব্যে, মনোহরের কন্দরে।

শুধু চলো, চলো আর চলো।

অর্থাশ্রমে ব্রজ, ব্রজ, ব্রজ।

সৈয়দ নওশের আলি

[জনপ্রিয় দেশকর্মী ও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান এম. এল. নি]

খাঁটি জাতীয়তাবাদী ও সংগ্রামী পুরুষ বলতে বা বুঝায়, ইনি হচ্ছেন ভাই। একটি বৈশিষ্ট্যময় আদর্শ জীবন এর, বে-জীবনের মূল দাবীই হচ্ছে—মামুষে মামুষে ভেদ করলে চলবে না, নিচে যে রয়েছে, টেনে তুলতে হবে তাকে ওপরে। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদই সৈয়দ নওশের আলির জনপ্রিয়তার জন্ম প্রদানত: দায়ী, এ নিশ্চয়।

বশোহর জেলার (বর্তমানে পাকিস্তানভুক্ত) একটি নগরী গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে এই কর্মী-মামুষের জন্ম হয় ১৮৯১ সালের আগস্ট মাসে। কিন্তু দরিদ্র হলেও এই সৈয়দ পরিবারটির খ্যাতি ছিল সেই সমাজে বহুকাল আগে থেকেই। নওশের আলির পিতা সৈয়দ ওয়েদ আলি ছিলেন বিশেষ শিক্ষানুরাগী। কর্মজীবনে কৌশলবাহী আদালতে তিনি সামাজ্য কাল করতেন বটে কিন্তু সেকালের এম-ডি পাশ করা ও ইংরেজী পাশ লোক বলতে তিনিই ছিলেন গ্রামের প্রথম। অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও ছেলে সেখাপড়া করে মামুষ হয়ে উঠুক, এ ছিল তাঁর মুখা দাবী ও প্রত্যাশা।

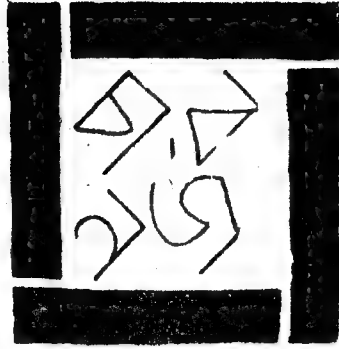
পিতৃ-আজীবন মাথায় নিয়ে বালক নওশের আলির পড়াশুনো শুরু হয় এবং সে প্রথম নিজ গ্রামের এম, ই হুগেই। তাঁর মা (নসিম-নেছা) ছিলেন অশেষ বুদ্ধিমতী—ছেলেবেলায় মায়ের সম্বন্ধে প্রভাবে তিনি আপনি প্রভাবিত হয়েছিলেন অনেকটা। কাজেই সহসা পা পিছলে পড়ার কিংবা লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা তাঁর ছিল না, স্পষ্টত: বলা চলে।

সৈয়দ নওশেরের অগ্রগতির পাথে দু'টি বড় বাধা ছিল পাশাপাশি—এক আর্থিক দৈন্যবস্থা, দ্বিতীয় নিজেয় ভয়বাহ্য। সারাটা ছাত্র-জীবন সংগ্রাম দিয়ে বেতে হয় তাকে এ দু'টির সাথে চূড়ান্তভাবে। অটুট মনোবলের অধিকারী ছিলেন বলে তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে এক একটি ধাপ তিনি অতিক্রম করে চলেন।

গ্রামের স্কুল থেকে এম. ই পরীক্ষা দিয়ে নওশের আলি বৃত্তি পান এবং সেইটি সম্বল করে ভর্তি হন পরে খুলনার দৌলতপুর হাইস্কুলে। ১৯০৯ সালে এন্ট্রান্স (সর্বশেষ এন্ট্রান্স পরীক্ষা) পাশ করেন তিনি সেই স্কুল থেকেই আর সে-ও বৃত্তিসহ। চললো পড়াশুনো দৌলতপুর কলেজে আর্টস নিয়ে—বৃত্তি পেলেন তিনি বখারীতি আই-এ পরীক্ষাতেও। তার পরই চলে আসেন তিনি কলকাতায় এবং সিটি কলেজ থেকে ১৯১৩ সালে নর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ থেকে তিনি একে একে আইনের সব কয়টি পরীক্ষায় পরম সাক্ষ্য অর্জন করেন।

বাস্তব কর্ম-জীবনে যে লোককে প্রতিষ্ঠা পেতে হবে, ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর ভেতর বেশ কতকগুলো বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। নির্ভাবিত পুঁথি-পুস্তক তিনি বড় একটা কিনতে পারেন নি:স্বার্থেও ছিল বরাবর প্রতিজ্ঞা। কিন্তু বে-টুকু পড়তেন বা শুনতেন, মনোযোগ দিতেন তাতে অসম্ভাব্য—সেখানে কিছুমাত্র কঁকি ছিল না। কি স্কুল কি কলেজ—সর্বত্র শিক্ষক-সমাজ তাঁর অগুণ সাধারণ জ্ঞান ও মননশক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন।

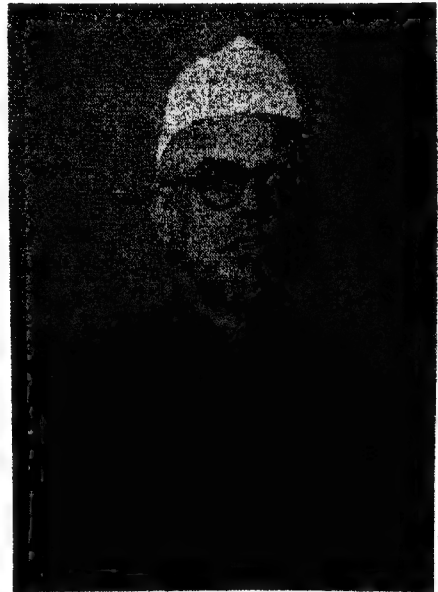
সৈয়দ নওশের বাস্তবস্থা থেকেই নিত্যক নিত্যক ও স্পষ্টবাহী ছিলেন। তিনি বাহ্য কুল ও খেঁচক মনে করতেন, পাঁড়িয়ে বলতে



কখনও এতটুকু স্থিধা করতেন না। প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নির্ভীকতার পরিচয় তিনি রেখে এসেছেন। কলেজ-জীবনে পরলোকগত রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী (পশ্চিমবঙ্গ) ছিলেন তাঁর একজন শ্রদ্ধাপ্পন অধ্যাপক। এত আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদও তিনি আপন গুণে আদায় করে নেন তখনই।

সৈয়দ নওশেরের বৈচিত্র্যময় কর্ম-জীবনের সূত্রপাত ১৯২২ সালে—যে সময় তিনি কলকাতা হাইকোর্টে এডভোকেটরূপে ব্যবসা শুরু করেন। পসার জমাবার মতো কোন সন্ধানই সে সময় ছিল না তাঁর। কিন্তু তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাকে কয়েক বছর ভেতরেই প্রথম শ্রেণীর আইনজীবীর মর্যাদা এনে দেয়।

ইত্যবসরে জমজন্মির সেবার জরুরী আহ্বান আসে সৈয়দ নওশেরের নিকট। তাঁর জেলাবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনে তিনি নির্বাচিত হলেন বশোহর জেলা বোর্ডের সদস্য। ১৯২৮ সালে তিনি এ



সৈয়দ নওশের আলি

বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ অলঙ্কৃত করেন। জেলা বোর্ডটি বাঙালি জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে, তৎক্ষণাত্ তাঁর প্রয়াসের অমূল্য ছিল না। বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে এই সময়। কিন্তু তার জন্ত কর্তব্য অনুষ্ঠানে শিষ্ট-পা হয়ে আসেন নি তিনি।

সমাজে ও দেশে নগণ্যের আলির সুনাম ও জনপ্রিয়তা বেড়ে চলে ক্রমেই। ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কঙ্গলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী নেতা। ১৯৩৫ সালে নতুন শাসন পদ্ধতি অনুসারে বাংলার যে কৃষক-প্রজা মসলম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তিনি তাকেও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সবল হাতে ছিল সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও চিকিৎসা-দপ্তর। নীতিগত কারণে কঙ্গলুল হকের সঙ্গে বিরোধিতা হওয়ার ১৯৩৮ সালের জুন মাসে তিনি সাগ্রহে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেন। ১৯৪৩ সালে তিনি নির্বাচিত হন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্পীকার। কি জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে, কি প্রাদেশিক মন্ত্রা হিসাবে, কি আইন সভার স্পীকার হিসাবে ব্যক্তিত্বে ও স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি সর্বত্র।

কৃষক-প্রজা পার্টি ছেড়ে দিয়ে সংগ্রামী সৈয়দ নগশের বোগদান করেন কংগ্রেসে। সে সময় দেশসৌরব সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। স্বভাবচন্দ্রের সাথে তখন থেকেই নগশের বিশেষ মিত্রতা ও ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানো ব্যাপারে তাঁদের ভেতর বহু নিবিড় আলোচনা হয়েছে সেদিনে।

দেশ-বিভাগের প্রস্নে নগশের আলির জাতীয়তাবাদী মন প্রচণ্ড রকম দৃঢ় ও আলোড়িত হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রকাশ্য বৈঠকে এই আত্মঘাতী বিভাজন প্রস্তাবের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর অকাটা যুক্তি ও সাহসিকতাপূর্ণ স্পষ্টোক্তিতে কংগ্রেস হাইকমান্ড পর্যন্ত অস্থবিধা বোধ করতে থাকেন অন্ততঃ তখনকার মতো।

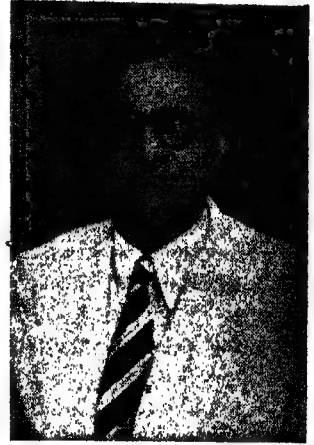
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি অন্তর্বর্তী পার্লামেন্টের (১৯৫০) সদস্য নির্বাচিত হন এবং সে কংগ্রেস-কক্ষরূপেই। ১৯৫২ সালে কংগ্রেসের মনোনয়নেই তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে সৈয়দ নগশের পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য। কয়দিনের সম্মেলন বিভিন্ন বামপন্থী দলের সমর্থনে তিনি এই আসন অধিকার করেন। শারীরিক দিক থেকে তিনি এখনও খুব সুস্থ নছেন। কিন্তু তাঁর সংসাহস ও মনোবল অটুট রয়েছে; একটু আলাপেই তা বুঝা যায়। কথা প্রসঙ্গে তিনি এই বোঝা করতে বিধা করেন নি কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে, এ না করলে দেশ ও পার্টির মঙ্গলের সম্ভাবনা নেই। এইখানেই সংগ্রামী সৈয়দ নগশেরকে বুঝি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেলো।

মেজর খগেন্দ্রকৃষ্ণ বোষ

[সুখাত সাঙ্ঘেদন]

কথা শোনার কণ—কথা বলার কণ—আর নিখোঁস প্রবাসের
জন্ত বাসিকা—জীবনধারণে অপরিহার্য। এগুলি যোগাযোগ হলে
বিশবন্ধের পরামর্শ প্রয়োজন। বিশিষ্ট জাঃ খগেন্দ্রকৃষ্ণ

বোষ (মেজর কে. কে. বোষ) শরীরের এই তিনটি অঙ্গের ব্যাধি নিরাময়ের অস্ত্রতম বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভারতবর্ষে সুপরিচিত। বীর, স্থির, শান্ত ও প্রচুর-বিমুখ এই ব্যক্তিকে দেখে মনে শ্রদ্ধা জেগেছিল। পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান খগেন্দ্রকৃষ্ণ ২৬শে মার্চ ১৯০০ সালে ব্রহ্মা জকপুরে (মেদিনীপুর) জন্মগ্রহণ করেন। তিন মাস বয়সে তিনি বাবা গোপাল চন্দ্র বোষকে হারান তখন মা মহামায় দেবী ছয় সন্তানকে মানুষ



মেজর খগেন্দ্রকৃষ্ণ বোষ

করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বড় ভাই ঐমণীশ্রকৃষ্ণ মেদিনীপুর ও কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট, মেজরাই ঐশেন্দ্রকৃষ্ণ মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক ও অস্থায়ী অধ্যক্ষ, বড় ভগিনীপতি ৩৪১ বাতাহুর মদ্রখনাথ বসু ও মেজ ভগিনীপতি ছিলেন বঙ্গলাচরণ বসু। মাতুলালয় খানাকুল নবাসন গ্রাম। প্রথমে জকপুর পাঠশালা, পরে শিঙ্গা ও কাঁধি বিদ্যালয়ে পড়িয়া তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েটে স্থল হইতে ১৯১৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। উক্ত বৎসর প্রাপ্ত তিনবার পরীক্ষার পূর্বেই প্রকাশিত হইয়া যায়। খগেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯১৯ সালে মেদিনীপুর কলেজ হইতে আই, এস, সি পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৬ সালে এম. বি ডিগ্রী লইয়া তথায় ক্লিনিক্যাল সাঙ্ঘারীর হাউস সাঙ্ঘেদন নিযুক্ত হন। ১৯২৭-৩২ সাল পর্যন্ত তিনি ডাঃ এন. জে জুডার অধীনে E. N. T.র বিভিন্ন বিভাগে অবৈতনিক ক্লিনিক্যাল সহকারী ও হাউস সাঙ্ঘেদন হিসাবে কাজ করেন। এখানে স্ট্রিন, উইলসন, বারনাডো ও লেটার প্রভৃতি অধ্যাপকদের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। উচ্চশিক্ষার্থে ডাঃ বোষ ১৯৩২ সালের মে মাসে এডিনবরা রয়্যাল ইনফারমারিতে বোগদান করেন এবং আটমাসের মধ্যে F. R. C. S. ডিগ্রী লাভ করেন। ইহার পর তিনি সেন্টাল লণ্ডন E. N. T. হাসপাতালে যুক্ত হন এবং তথা হইতে ১৯৩৩ সালের জুন মাসে তাঁহাকে Diploma in Laryngology & Otology (D. L. O.)

ভারতে কিরিয় ডাঃ বোষ মেডিক্যাল কলেজে ডাঃ জুডার অধীনে ১৯৩৩এর সেপ্টেম্বর মাসে অবৈতনিক ক্লিনিক্যাল টিউটর পদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫-৪৮ সাল পর্যন্ত তথায় অবৈতনিক জুনিয়র ভিজিটিং সাঙ্ঘেদন হিসাবে থাকেন। পরবৎসর প্রখ্যাত চিচ্চৎসক ক্লিনিক্যাল বাস হায় অবসর গ্রহণ করিলে তিনি অবৈতনিক সিনিয়র সাঙ্ঘেদন নিযুক্ত হন। ১৯৫২ হইতে অগাধ ৫৭ পর্যন্ত তিনি উক্ত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকপদে বৃত্ত ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি মেডিক্যাল কলেজ

জীবনিক অধ্যাপক হিসাবে রহিয়াছেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ডাঃ আর. এন. চৌধুরী, ডাঃ বোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কনিষ্ঠবর্ষ সূর, বিপ্রেতিয়ার এ. এন. চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯২২ সালে ডাঃ বোব ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোরের সদস্য হিসাবে লেগদান করেন এবং ১৯২৬ সালে কমিশনড অফিসার পদ প্রাপ্ত হইয়া মেজর পদে উন্নীত হন।

নিজ পেশা ছাড়া মেজর বোব বহু প্রতিষ্ঠানে বণ্ড Doctors' Amusement Club এর সভাপতি, ভারতীয় মেডিক্যাল এসোসি়েট (কলিকাতা শাখা) সভাপতি ও 'লাইফ সদস্য, উহার বকীর শাখার সহঃ সভাপতি, কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবের কার্যকরী সমিতির সদস্য, নিখিল ভারত Antolaryngologist এসোসি়েট এর ভূতপূর্ব সভাপতি, উহার বকীর শাখার বর্তমান সভাপতি, এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স সোসাইটির আজীবন সদস্য হইয়াছেন।

সৌখীন নাট্যাভিনয়ে ডাঃ বোবের অংশ গ্রহণ উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। ছাত্রজীবনে তিনি হকি খেলায় সুনাম অর্জন করেন এবং বর্তমানে তিনি একজন বিশিষ্ট ক্রীড়াঙ্গরঙ্গী হিসাবে মোহনবাগান ক্লাবের সহিত জড়িত আছেন। এছাড়া তিনি বাধারমণ কীর্তন সমাজের সহিত বনিষ্ঠভাবে সন্ধি ও সুগায়করূপে পরিচিত। বহুদিন হইতে তিনি প্রসন্ন বান্দ্য নৃত্যশুভায়ে আয়ত্ত করিয়াছেন। বেলেড় বামকৃষ্ণ মিশনের (বামা বিরজানন্দর আশ্রিত) সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত আছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়েছি ডাঃ বোবের স্বস্ত্র পশমের বুননের কাজ দেখে।

হুগলী জেলার হুগলী গ্রামের উপরেশনাথ সিংহের কন্যা শ্রীমতী সুধা দেবীকে মেজর বোব বিবাহ করিয়াছেন।

কথায় কথায় তিনি আমায় বলেন, মা একাধারে বাবার ও মায়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন—তাঁহারই আশীর্বাদে আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়েছি—সেই স্নেহময়ী জননীকে আমরা হারালুম ১৯৩০ সালে। আমাদের জন্ম মায়ের কষ্টভোগ জীবনে ভুলতে পারব না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন

[বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও সমাজসেবী]

চৌধুরী-বংশ প্রতিভার সীমিত ও সারল্যের চাপ রয়েছে এই মাহুঘটির। আপন গুণবস্তার ইনি নিত্য অপরিচিত জনকেও যুহুর্ন্তে আকৃষ্ট করতে পারেন। কালিয়ার (বশোহর) বিখ্যাত সেন-পরিবার এর নামে বিশেষ গবিত। বাইরের সমাজেও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেনের সত্যি প্রচার খ্যাতি।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় কালিয়া গ্রামে ১৮৮৫ সালের নভেম্বর মাসে। তৎকালীন বিশিষ্ট সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রেসিকিউটর (খুলনা) রায় মহেন্দ্রচন্দ্র সেন বাহাদুরের ইনি জ্যেষ্ঠপুত্র। পরিবারের প্রোঞ্চল ধারা অনুসরণ করে এই নবজাতকও জীবন-পথে সোজা এগিয়ে যাবেন, এ বেন ছিল নিশ্চিত।

কাঁধে করে হুলাও কিন্তু তাই। বাপ-মায়ের স্মৃতিপ্রাপ্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র কোথাও আটকে থাকেন না। প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর সাক্ষ্য প্রমাণিত হতে দেখা গেলে। গ্রামের হাইস্কুলেই তিনি পড়াশুনা শুরু করেন এবং ছাত্র হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ

পায় গোড়া থেকেই। আর অশ্রুভাবে জীবন গঠন করবেন বলে তিনি চলে আসেন কলকাতার হিন্দু স্কুলে। এই বিদ্যায়তন থেকেই তিনি ১৯০৭ সালে এন্ট্রাল পাশ করেন। প্রধান শিক্ষক রায় রসময় মিত্র বাহাদুর তাঁকে খুবই ভালবাসতেন এবং তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন বরাবর, শ্রীসেনের মনে এ গর্ব আজও রয়েছে। ১৯০৬ সালে তদানীন্তন ভারতীয় শিক্ষা পরিষদের এন্ট্রাল পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এন্ট্রাল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভর্তি হন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে, (বর্তমান বিভাগের কলেজ) সেখান থেকে আই-এ পাশ করে তিনি চলে যান প্রেসিডেন্সী কলেজে। এইখানেও স্বনামধন্য অধ্যাপক ডব্লিউ সি ওয়ার্ড ওরানের তিনি ছিলেন একান্ত প্রিয় ছাত্র। গ্র্যাডুয়েট হওয়ার পর আইনশাস্ত্র পড়বার দিকে তাঁর ঝোক যায়। এই যুহুর্ন্তে তৎকালীন বঙ্গলা সরকার তাঁকে ডেপুটি পুশিশ সুপারের পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। পাঁচ লক্ষভ্রষ্ট হয়ে পড়েন, তাই যুবক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেই লোভনীয় পদও গ্রহণ করলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজে স্থায়ীভি চললো তাঁর আইন পড়া।

বি, এল, ডিগ্রী নিয়েই শ্রীসেন আইন ব্যবসারে আত্মনিয়োগ করার জন্য উত্তীর্ণ হন। আপন যুগ্মভাত হাইকোর্টের সে সময়কার নামকরা এডভোকেট রায় মহেন্দ্রচন্দ্র সেন বাহাদুরের কাছে ইনি শিক্ষানবীশ হিসাবে কাটান ছ' বছর। তার পরই ১৯১৯ সালে তিনি খুলনা বারে যোগদান করেন। দেখতে না দেখতে তাঁর নাম ও খ্যাতি দ্রুতকালে পর্যাপ্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর প্রতি সরকারের দৃষ্টি পড়ে। সে দিনের (১৯২৩) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: ডি গ্র্যাভি আই-সি-এস তাঁকে সহকারী পাবলিক প্রেসিকিউটরের পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি নতুন মর্ধ্যাঙ্গর আধিকারী হন—বশোহরের সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রেসিকিউটরের পদ লাভ করেন তিনি সে সময়ে। এই দায়িত্বসূর্ণ পদে থাকাকালীন তিনি পরম দক্ষতা সহকারে বহু চাকল্যকর দায়িত্ব মামলা পরিচালনা করেন।

দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তান সরকার আইনবিদ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে অবসর নিয়ে থাকতে মিলেন না। ১৯৫২ সালে তিনি আবার পাবলিক প্রেসিকিউটর নিযুক্ত হলেন। সেদিন কয়েকটি Gang case পরিচালনায় যে দক্ষতার পরিচর মেন, তাতে তাঁর খ্যাতি বেড়ে যায় বহু ভাবে। Mongla port police Firing Enquiryতে সরকার পক্ষের হয়ে যেভাবে তিনি কার্য পরিচালনা করেন, তাও বিশেষ মতাবে



শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন

উল্লেখযোগ্য। বশোহর খুলনার কোর্সমারি উকিল হিসাবে তিনি ছিলেন সে সময়ে সমধিক জনপ্রিয় ও খ্যাতিসম্পন্ন।

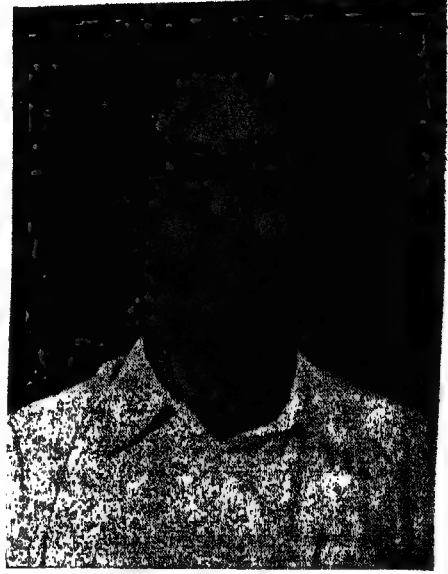
১৯৫৮ সালে জীসেন পাকিস্তান ছেড়ে এসে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এখানেও তাঁর বৈয়াক্যতার স্বীকৃতি পেলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে—তাঁকে নিয়োগ করা হলো চুঁচুড়ায় (ভগলী) সরকারী panel pleader পদে। এই পদেই তিনি আজও অবধি অধিষ্ঠিত রয়েছেন—অজিত সন্নাম এখানেও ঠিক অক্ষুণ্ণ আছে।

সমাজসেবী ও শিক্ষামুগ্ধগী হিসাবেও জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র কম নয়। খুলনার গাজিরহাটে তিনি জনসেবার তাগিদে প্রচুর অর্থ ও একটি বিস্তীর্ণ ভূমি দান করেছেন—যা ভিত্তি করে সেখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে উঠেছে। নিজের স্বনামধন্য পিতামহ গিরিধর সেনের নামে এই চিকিৎসালয়টি উৎসর্গীকৃত। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র যেমন জ্ঞানপিপাসু তেমনি বিজ্ঞোৎসাহী। কালিয়া হাইস্কুলের পরিচালনা কমিটির দীর্ঘ ২০ বছরেরও বেশী সময় পর্যন্ত তিনি সদস্যপদে (Founder's representative) অধিষ্ঠিত আছেন। কালিয়ার বিরাট বৌদ্ধ সেন-পরিবারটি জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে ঘিরে যেন একটি মধুর রচনা করেছে। পরিবারের কারও ভেতর এতটুকু অহংকারের ছাপ নেই, সকলেই বিনয় ও শিকাতারে নত—এটি আপনি চোখে পড়ে যায়। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের অল্পজ বিশিষ্ট এডভোকেট হাইকোর্ট বারের বর্তমান সভাপতি জীহেন্দ্রচন্দ্র সেন, অপর কনিষ্ঠ জ্ঞাতা চন্দনগরের মহকুমা হাকিম সোমেন্দ্রচন্দ্র সেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র জীলোকেন্দ্রচন্দ্র সেন (মেদিনীপুরের সাব-জজ), কনিষ্ঠ পুত্র জীপূর্ণেন্দ্রচন্দ্র সেন (বীরভূমস্থ দুবরাজপুরের মুন্সিফ)—এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আজ প্রভূত জনপ্রিয়তার অধিকারী। ৭৫ বছর বয়সে পদাৰ্পণ করেও জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র হনের দিক থেকে এখনও সবল। তাঁর অসাধারণ বিচারবুদ্ধি ও ব্যক্তিগত তাঁকে আরও শ্রদ্ধা এনে দেবে, এ একত্বপ নিশ্চয় করে বলা চলে।

শ্রীসরোজকুমার দত্ত

[ভেবেজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানের কর্ণধার]

বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যে ক'জন বাঙালী স্বীয় দক্ষতার কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বেঙ্গল ইমিউনিটি নামক নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীসরোজকুমার দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ যুগের স্ফূর্ত ২৮ কৃতী বাঙালীর মত তিনিও জীবন শুরু করেছিলেন বাস্তবনৈতিক আন্দোলনকারী হিসাবে কিন্তু ভাবনাবাদী সোভা বাঁকা পথ আজ তাঁকে শিল্পপতিদের দলে টেনে নিয়ে গেছে। অবিরত বাঙালী জননায়ক এবং পাকিস্তানের ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বর্গীয় গামিনি কুমার দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীসরোজকুমারের জন্ম ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে নোয়াখালীতে। কুমিল্লা থেকে ব্যাটিক পাল করে ১৯১৯ সালে তিনি কলকাতায় এসে বঙ্গবাসী কলেজে এম্টি-এস-সিতে ভর্তি হন। কিছুকাল বাল্যে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে বোর্ড সেন অসচল্যোগ আন্দোলনে। পরে National Council of Education (বর্তমানে হানসবুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রেক্ষিতিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা নিয়ে ১৯২৪ সালে কর্ণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পর পাব পাঁচ বছর আসাম এবং ব্রিটেনের বিভিন্ন চা বাগানের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করার পর স্বাধীন ভাবে ঠিকাদারী ব্যবসা করেন বলে চলে আসেন



শ্রীসরোজকুমার দত্ত

কলকাতায়। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সেই কাজেই লিপ্ত ছিলেন। ঠিক ঐ সময় স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন দত্তের নায়কত্বে বেঙ্গল ইমিউনিটি বিরাট জয়যাত্রার পথে এসে ঠাঁড়িয়েছে। নিত্য নতুন তার সংযোজনা আর সমৃদ্ধি। প্রতিষ্ঠানের জয়যাত্রার কাজ তৃপ্তভাবে পরিচালনার জন্য ক্যাপ্টেন দত্ত একজন তরুণ সহকর্মী খুঁজছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সরোজের মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর পেয়ে তাকেই তিনি গ্রহণ করলেন কোম্পানীর সেক্রেটারী হিসাবে। শিক্ষা স্তর হল প্যাকারের কাজ থেকে। কারখানা, গবেষণাগার এবং অফিসের সমস্ত কাজ না দেখা পর্যন্ত তিনি সেক্রেটারীর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। ক্যাপ্টেন দত্তের মৃত্যুর পর ১৯৪১ সালে শেয়ার হোল্ডাররা শ্রীদত্তকেই কোম্পানীর নতুন কর্ণধার নির্বাচিত করেন। জৈব ভেজ উৎপাদন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে বেঙ্গল ইমিউনিটি যে ভারতীয় কোম্পানীগুলির পূর্বাভাসে এসে ঠাঁড়িয়েছে, তার অনেকখানি কৃতিত্বই শ্রীদত্তের।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীদত্তই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম গভীর সমুদ্রে মাছধরার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মাছধরা আহাজখান সরকার জবর দখল করায় তাঁদের সে পরিকল্পনা বাধ্ হই।

সুপুত্র সদাশাসী শ্রীদত্ত অতি উঁচুয়ের কথক। আগ্রহ-উদ্দীপক আলোচনা শুরু করে তিনি যে কোন লোককে মটর পর ঘটা আটকে রাখতে পারেন। বিশ্বভারতীয় আজীবন সনাত শ্রী দত্তের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র দত্ত দায়কনিধি ভাণ্ডার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অশ্রুতি জনকতাপদলক কাজে ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ টাকা দান করেছেন। তিন পুত্র তিন কন্যা জনক শ্রী দত্তের পত্নী শ্রীমতী কল্যাণী মধুরস্বভাবা বিহুবা, কণ্ঠ এবং কল্যাণীতে তিনি বিশেষ পায়দারি।

ধী, মনেও চলেছে তাই কি। মনও চায় তাসিক হতে, রাজসিক সাধিক হতে। অজু'ন বললেন, তবে এ বাধা দূর করে কে ?

বাধা অক্ষু'তি কাজ করে বাধাকেই দূর করতে। তখন প্রকাশ বা আনন্দের দিকে তার লক্ষ্য থাকে না, বাধাকে দূর করার কাছেই সে মত্ত। প্রকাশ-আনন্দ আপনিই এসে পড়ে। জীব যে পরিমাণে এই প্রকাশ ও আনন্দের বাধাকে দূর করতে পারে, সেই পরিমাণে সে প্রকাশ ও আনন্দের অধিকারী হয়। সকলেই এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। ইতর জীব ক্রমশ এই বাধা অতিক্রম করে উত্তরগতিতে সহৃদয়ের দিকে এগিয়ে বাচ্ছে। যে সাধিক প্রকাশ ও আনন্দ জড়ভাষ্যে বীজভাবে অন্তর্নিহিত ছিলো, পড়হাজ্যে অংশট আনন্দ ছিলো, প্রকৃতির ভাটনার তাই একমিনি আপন চোঁর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মাহু'বের অন্তর্ভগতে ও বহির্ভগতেও সেই একই সংগ্রাম—প্রকাশ ও আনন্দের বাধা অতিক্রম করার সংগ্রাম। মাহু'ব চলেছে নিরন্তর এই সংগ্রাম করতে করতে—অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে, প্রেম দ্বারা বেধকে জয় করে সে চলেছে তার সত্ত্বগুণের অধিকার স্থল করতে—সে চলেছে এগিয়ে অবাধ আনন্দের দিকে, প্রকাশের দিকে। এই ক্রম, ধাপে ধাপে ওপরে ওঠার ক্রম—যার ফলে জীব শিবে পবিত্র হচ্ছে।

অজু'ন বিষয়ে অতিক্রম হয়ে পড়েছেন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, এই জীব-জগৎ, জড়-জগৎ বা কিছু সব প্রকৃতি দ্বারা চালিত হচ্ছে। আজ রহস্য আর রহস্য নয়। চিররহস্যের লৌহ-কপাট আজ অজু'নের সম্মুখে খুলে গিয়েছে। কত তুচ্ছ মাহু'বের শক্তি—কতটুকুই বা তার ক্ষমতা।

একটি মাত্র শক্তি—যার নাম আত্মশক্তি, তিনিই প্রকৃতি। তাঁকে জানাই জ্ঞান। ভগবান বললেন, এই জ্ঞান অর্জন করো। জানই সব।

জ্ঞানে করে তবে প্রভেদ কোথায় ?

ভগবান বললেন, জ্ঞান ছাড়া কর্ম নেই। অজু'ন জানতে চাইলেন, এই জ্ঞানকে জানবো কি করে ?

জানী যে, সে কাজ অনিশ্চয় করে না—বালকের মতো তার স্বভাব। বালক খেলাঘর বনায়, আবার নিজেই ভাঙে। অতুল ঐশ্বর্য, সব ফলে ঐ বালকই চলে বেতে পারে। জ্ঞান আশুন। ঐ আশুন সবকে পোড়াতে হবে—কাম ক্রোধ লোভ মোহ সবকে। অজু'ন বললেন, জ্ঞান হলে কর্ম থাকে কি, ক'রে ?

কর্ম ছাড়া জ্ঞান নেই, কর্মও জ্ঞান ছাড়া নয়। ভগবান বললেন, এই জ্ঞানই জীবন।

তাহলে আমাকে জীবহত্যার কাজে উত্তেজিত করছো কেন ? যা হয় বসো, জ্ঞান, না কর্ম ? কুক হাসলেন। বললেন, জ্ঞানও চাই, কর্মও চাই। কাজ না ক'রে কি শুধু জ্ঞান নিয়ে থাকা যায় ? সেটা তখন হয় বোকা।

কর্ম ছেড়ে চকু খুঁজে

জ্ঞানের দ্বারে ত্রুটি খুঁজে

মনে মনেও ভাবতে হবে

ঐ পেক্টাই কথা।

তাইতো বলছিলেন, কর্ম জির উপায় নেই। নিকাম কর্ম যে করে, তার জ্ঞানে কর্ম প্রবেশ থাকে না। অজু'ন বললেন, জ্ঞান

কায় ? দেখে কে ? আছাই কি দেখে ? ভগবান উত্তর দিলেন, সকল প্রকৃতিই আছার জন্মে, আছা প্রকৃতির জন্মে নয়। প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রয়োজন সেই আছার নিকার জন্মে—এই শিক্ষা, এই জ্ঞানের দ্বারাই সে আশ্রয়কে বুদ্ধ করতে পারে। এই কথাটা মনে রাখলেই প্রকৃতিতে আর আসক্তি আসে না। প্রকৃতি হলো পাঠ্যপুস্তক, পড়া হয়ে গেলেই ফেলো ছাও।

কাজ করো, প্রভুর মতো কাজ করো—কৌতলাসের মতো নয়, দ্বারীনভাবে কাজ করো, প্রেমের সঙ্গে কাজ করো। কৌতলাসের কাছে প্রেম নেই—শেকলে বাঁধা জীব, যেমন ভরাও তেমনি করে। চাই প্রেম। প্রকৃত সত্য প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত প্রেম অনন্তকালের জন্মে পরম্পর পরম্পরে আবদ্ধ। একটি বেধানে, অপরভঙ্গোও সেধানে। ওরা একে তিন—সেই অধিতীর সচ্চিদানন্দেই ত্রিবিধ রূপ। ভগবান বললেন, আমি কর্ম করি কেন ? ভগবৎকে ভালবাসি বলে। ঈশ্বর ভালবাসেন বলেই অনাসক্ত। তাই বলছিলেন, প্রকৃত ভালবাসা না থাকলে অনাসক্ত হওয়া যায় না। আসক্তি তো আকর্ষণ—পারিত্রিক আকর্ষণ, ভৌতিক আকর্ষণ। যে-আকর্ষণে দুটি বস্তু নিরন্তর কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করছে, না যেতে পারলেই যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা থেকে মাহু'বকে মুক্ত হতে হবে। আর এ-রুজি আছে একমাত্র অনাসক্তিতে। অভ্যাসের দ্বারা মাহু'ব সবকিছুকেই আয়ত্তে আনতে পারে। প্রকৃতিও পোষ মানেন, কিন্তু তাকে বশে রাখতে হলে নিরন্তর সজাগ থাকা চাই। প্রকৃতির প্রতিশোধ সে বড় জীবন অবস্থা।

লক্ষ্য কাজই ফিরে আসে কলরূপে

অজু'ন বললেন, কাজ আমাকে দেবে কি ?

দেবে ফল। ভগবান বললেন, সকল কাজই কলরূপে আবার ফিরে আসে। একের কাজ অপরকে প্রভাবিত করে। কর্মেরও শক্তি বাড়ে—কাজ করলেই, আবার করতে ইচ্ছে হয়। কেউ কসং কি একদিনে হয় ? একদিনের অসং কাজ তাকে ঐনিকই প্ররোচিত করে। এমনি করেই মাহু'ব ধাপে ধাপে নীচে নামে। এটা প্রভাব—কর্মের প্রভাব। মনেরও আছে প্রভাব।

অজু'ন বিস্মিত হয়ে মনের প্রভাব কি, জানতে চাইলেন।

এক মন আর এক মনের ওপর কাজ করতে পারে। কাজ তো ক্রিয়া, তারও আছে কম্পন। এই কম্পনই কাজ করে। এক মূর্খে বাঁধা নানা বাস্তবতা একটি ভাবের কংকারে সব বস্তুগুলোই বেজে ওঠে। মনও তেমনি যদি এক মূর্খে বাঁধা থাকে, তবে একের চিন্তা অপর মনেও কাজ করে। সং-চিন্তাও করে, অসং-চিন্তাও করে।

অজু'ন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন, বললেন, কম্পন তো ভয়ঙ্কর। ভগবন্তের কোনো ভয়ই তো মরে না ? ভগবান উত্তর দিলেন : না, মরে না। লক্ষ লক্ষ আলোক-ভয়ঙ্কর যেমন শূন্যে ঘুরছে—তেমনি ঘুরছে মাহু'বের চিন্তাভরজ। প্রত্যেকটি বক্তির প্রত্যেকটি চিন্তা এই শূন্য আকাশে ডাসছে। তারা আধার খুঁজছে—সেই আধার, যে আধারে তার মূর বাঁধা। মাহু'বও চেষ্টা করছে সেই আকাশে ভাসা চিন্তাভরজকে ধরবার জন্মে। সে তরঙ্গ ধরতে ফলে, মনকেও সেই ভাবে তৈরি করতে হবে। মাহু'ব এমনি করেই এগিয়ে চলেছে তার চিন্তার ক্রম-পরিবর্তির দিকে।

এই 'তবে'র উত্তর দিলেন ভগবান : হৃৎ যেমন দূর করাও যায় না, তাকে বোধ করুও যার না। যেখানে মঙ্গল, সেখানেই অমঙ্গল। আবার যেখানেই অমঙ্গল, সেখানেই মঙ্গল। জীবন যেখানে, মৃত্যুও সেখানে ছাঁয়ার মতো তাকে অনুসরণ করছে। যে হাশ্বে সেই কাঁদবে। আবার যে কাঁদছে, সেও একদিন হাসবে। এই হয়। হাসবার শক্তি যেখানেই আছে, কাঁদবার শক্তিও সেখানে প্রবাহিত রয়েছে।

জানবে। জগতের ব্যক্তি সকলই সর্বদাই সমান। একে বাতানোও যায় না, ভরানোও যায় না। সেই একই মুখ-চুপে নিয়ে মানুষ কেউ দলী, কেউ দরিদ্র, কেউ সুখ, কেউ অসুখ,—এ চিরকাল ধরে চলে আসছে। মানুষ চেষ্টা করছে—অবিচার চেষ্টা করছে—তাকে সমান অবস্থায় আনবার। কিন্তু সে চেষ্টা তাকে অপর দিকে ঠেলে দেওয়া পর্যন্তই।

অর্জুন ভিজ্ঞান করলেন, এ বৈষম্য তবে ঘটিছে কেন? পৃথিবীর ধন-সম্পদে আমারও যেমন অধিকার, অপরকেও তো তেমন অধিকার?

ভগবান বললেন, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা। তট-নামাই ওর বড়ায়। হৃদয়গুহে জীবন যদি বসতে পারো, তবেই উদ্যানকে পতন

থেকে পৃথক করতে পারো। জীবন যেনেই তো নিরন্তর দৃঢ়। আলোর পোড়ানিই ওর জীবন। ভগতে সাম্যভাব কখনো হয়নি, হতে পারে না। জগতের উৎপত্তি ও দ্বিতির কারণই হলো ঐক্যভাব। বিরোধ, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই শক্তির উদ্ভব। সম্পূর্ণ সাম্যভাব—বার হারানো হলো, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকুলের সম্পূর্ণ সামরাজ্য, ভগতে কখনোই তা হতে পারে না। তাহলে ভগৎ থেকে যেতো, সৃষ্টি থেকে যেতো। ভগবান বললেন, সেই কর, যা নিরন্তর অভ্যাস করলে এ বহুস্ত জানা যায়। অভ্যাসেরও ক্রম আছে। প্রথমে শ্রবণ, তারপর মনন, সকলের শেষে অভ্যাস। প্রত্যেক বোগ সবচেয়ে এই এই কথা। [শেষ।]

এই মিনতি রাণি।

সমীরণ গুহ

সখি, অনেক আগের কিশোরবেলায় কথা মনে কি পড়ে?

তোমার আমায় বক্তৃতা পুঙ্খলখলায় বেলাঘরে,
জ্বলন্ত গোধ পুঙ্খলখলা হৃ-ভাত দিয়ে ভড়িয়ে গলা,
বসতে পাশে কাঁচিট বঁধে চোপটি তুলে বলতে তেলে, গল্প বলো।
আমায় কথার বেরন-গান সুখ ধরত তোমার প্রাণে,
কষ্ট তোমার আসত বুঁকে, বেদনার চোখ ছলোছলো।

হেঁচে তোমার বান ডাকল, ফুটল যে কত চোখ-মুখে।
দেখে দেখে ভীষণ মাতন লাগল যে গো আমার বুকে।
তোমায় ডেকে কইলুম আমি, 'ভালোবাসি তোমায় রাণি।'
লাগল কাঁপন তোমার দেহে হাসলে তুমি সলাজ হাসি।
যেই শুধামু নয়ন তুমি, 'ভালোবাসি আমার তুমি?'
কি জানি কোন লজ্জাক্রমে, ঢাকলে নয়ন আঁচল বাসে,
উঠতে ছুটে কইলে তুমি, সরম-রাগ, 'ভালোবাসি।'
আমি যবে আঁখির দাঁত ডাকলুম তোমায় বানকথারায়,
তুমি তখন আসলে কাছে সরম বয়ে নয়নভারায়।
ভড়িয়ে বখন কইলুম আমি, 'ছাড়ো না আজ তোমায় রাণি।'
বুকের ভেতর সরমে বেগু হৃ-ভাতে মুখ ঢাকলে।
কপোল চুম্বি কইলুম আমি, 'তোমার রাণি সব নিয়েছি।'
ধরধারের মুহূর্তে কইলে তুমি, 'সব নিয়েছি।'
সুখ ধরল তোমার কাঁকন, পাগল হ'ল মনের মাতন,
বাঁধলধারার তালে সে বাঁত বুকের ভেতর কাঁপলে।

তোমার পাশে আবার বখন আসলুম আমি সন্ধ্যাবেলা
তখন তোমায় কোমল হাতে ছিল যে গো ফুলের ফেলা।
'কাহার ভয়ে ও ফুল নিয়ে?' বখলুম কইলুম তিরে।
প্রাণের ভাবে চাইল যে গো কামল কামলে তোমার আঁখি।
তোমায় গাঁথা ফুলহারের প্রেমে তুমি বাঁধলে মোরে,
কইলে তুমি হাতে বেঁধে, 'এই আমারে মিলনরাণী।'

হৃ-ভাত দিবে ধরতে তোমায়, সরলে তুমি বিদম্বা
মাথায় 'পরে আঁচল টেনে নিলে যে মোর চরমখুঁচি।
চিনতে মোর সকল মাতন এলো তখন আগল খুঁচি।
নিদাক-বেলায় বিদম্বা থেকে আসলুম বখন তোমায় ঘায়ে,
আঁচল দিবে মুছলে সে ঘাম, কষ্ট বেড়ি বতন ভয়ে।
তোমায় হাতে মধু বীজন জুড়াল মোর এ প্রাণ-মন,
বসতে দিবে আসন বসন দিবি নিলে মাথার কিরে।
বখন আমি ডাকলুম 'রাণি' ফোলে চোখ তিলিক তানি,
অবধ-কোণে ফুটল তানি ফুটল যে লাজ তোমায় দিবে।
কোলের 'পরে বেঁধে মাথা কইলে তুমি কতো কথা,
হৃদয় আমার ভরিয়ে দিলে তোমায় গানর মৃদুনার।
আমায় প্রাণে কাঁপল যে সুখ তিন-তিনি মনোবীণায়।
বখন আমি তুলসীতে এলুম পাশে ভবের কোবে,
বাকুল মুখে আসলুম ছুটে হৃ-ভাত দিবে ধরলে মোবে।
মাথায় 'পরে কোমল করে, নিলে সে মোর বিকার হয়ে,
বুকলুম আমি আঁখির পাঁতা কোমল তোমায় লক্ষ্যপাতে।
নিদ্রাহারা তোমার আঁখি করল সেলা সরাশাখি,
গুহ তোমার আননখানি দেখলুম উঠে রাশপ্রভাতে।
শুধায় হবে, 'এ কি ক্রিসে?' কষ্ট বেড়ি হৃ-ভাত দিবে
উজল মুখে হবর ভবে, কইলে তুমি, 'নয় কথা নয়।'
তোমায় বুক লুকিয়ে আনন দেখলুম শুধা পৃথিমর।
মনে নাই সখি, মনে কি নাই, সে সব চিনের সে সব কথা?
আমায় পায়ে কুটিলে কাঁটা বাক্ত তোমায় বুক ব্যথা।
আজকে তুমি হৃ-বিকায়ে রইছ পক্ষে লক্ষ্যপরে,
আমায় লাগি ভাবনা ভেব করছে চোপে লখায় ধরা।
তোমায় সেবা করলে আমি, কই তলে, ভাঙত তুমি,
(হুই) করছে নিবেদন পায়ে বারে করল তোমার নয়নভাগ।
চিনতি মোর শোন গো সখি। তোমায় কাছে এ ভিষ মাগি,
পরশ স্পর্শ করব সেবা ভাণন তুলে আমি
কুপা করে এইটুকু দাত, এই মিনতি রাণি।

ভেরা ফিগনার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অমল সেন

আঁখি ২৮শে ফেব্রুয়ারী। কাল পরলা মাচা—জারের আসার দিন, তার যুদ্ধের তারিখ।

কীদ পাভা হবে তিনটে। এক মাইন। তার পর, বোমা।

দ্বিতীয়ত, ছোরা। প্রথমে মাইন কাটানো হবে।

তাতে কল না হ'লে বোমা—মল্ল-লগোভর রাস্তার হু'পাশে হু'হু করে চার জন বোমা হাতে ক'রে পাড়িয়ে থাকবে। সিগনাল পেলেই বোমা ছাড়বে।

তাতেও যদি কিছু না হয়, তো ছোরা। একজন ছোরা নিয়ে লাকিরে পড়বে জারের উপর এবং চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কাজ শেষ করবে। বন্দোবস্ত এই—

কিন্তু একী! মাইন্ যে পাভা হয়নি আজও, বোমাও মোটে একটা তৈরি হ'য়েছে, আরো তিনটে চাই। মাঝে রাত্রিটা মাত্র সময়।

বিকেল পাঁচটার কর্মীরা এসে সমবেত হ'ল—সুখানভ, কিবাললিল, প্রাশেভস্কি, ভেরা ফিগনার, শোফিয়া প্রভৃতি।

সবাই বোমা প্রস্তুতে লেগে গেল। সে কী উত্তেজনা! সে কী উৎসাহ! বটায় বটায় শহরের খবর নেওয়া হচ্ছে,—পুলিশ টের পেলেই সব মাটি।

শোফিয়ার উপর বোমা-নিক্ষেপকারীদের সিগনাল দেওয়ার ভার। অথচ সে কিছুতেই কাজ করা ছাড়বে না।

ভেরা তাকে জোর করে শুইয়ে দিল—বিশ্রাম না ক'রলে কালকের কর্তব্য করার মতো জোর পাবে কোথা থেকে?

শোফিয়া অনিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লো। সমস্ত রাত জেপে কাজ ক'রলো ভেরা এবং আরো জনতিনেক। ঢা ঢা ঢা—ঘড়িতে আটটা বেজা গেল। বোমা চারটাও তৈরি শেষ—১৫ বটায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর। মাইন্ পাভাও সারা। সব ঠিক।

শোফিয়া বোমা ছোঁড়ার পর নিক্ষেপকারী চার জন কোথায় বাবে, কেমন ক'রে বাবে, তাই বুঝিয়ে দিতে লাগলো।

ভেরা নিজের বাড়ীতে গেল—মাইন্ কাটার কিছু আসে কবোজেন্ড—বাসকা তার ওখানে গিয়েই উঠবে। মাইন কাটাবে ফ্রোলোকো,—মাইন কাটার পর যদি বাঁচে নিরীহ একজন খদ্দেরের মতো পালিয়ে বাবে।

কিন্তু বাটার সন্ধানটা কয়—সন্ধান সন্ধানই পদে পদে জানা।

বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু তার জন্ত ফ্রোলোকোর কোন হুশিয়ারি নেই।

ভেরা ঘরে ব'সে আছে,—উত্তেজনার অস্থির। ফ্রোলোকো তার ঘরে গেলো—বগলে এক বোতল মদ,—আর কিছু খাবার। বিবিয় আরামে সে খেতে লাগলো।

ভেরা তো অবাক। এমন সময়ে কি খাওয়া আসে? বিশেষতঃ এই লোকটার, অল্প কিছুক্ষণ পরে বাকি নিশ্চিত যুদ্ধের মুখে কাঁপিয়ে পড়তে হবে।

ভেরা জিজ্ঞেস ক'রলো—আপনি এমন নিশ্চিত আছেন কেমন ক'রে বলুন তো? একটা উত্তেজনা বোধ ক'রছেন না?

ফ্রোলোকো হেসে ব'ললো,—না, মোটেই না।

কেন বলুন তো?

তা'হ'লে খাওয়াটা ঘাটি হবে। দেখছেন মদ কেমন টকটকে লাল, জারের রক্তও বোধ করি এতো লাল নয়।

ভেরা ব'ললে, আশ্চর্য! স্থির যুদ্ধাযুধে বাবার পূর্বক্ষেণে এতো আনন্দের সংগে খেতে কাউকে দেখিনি।

ফ্রোলোকো হেসে ব'ললে, বাঃ রে, আপনার তো বেশ বিবেচনা! এই হয় তো জীবনের শেষ খাওয়া, এটাও ভালো ক'রে খাবো না?

ভেরা মনে মনে ফ্রোলোকোকো তার অপূর্ণ সাহসের জন্ত নতি জানালো। ফ্রোলোকো খেয়ে-দেয়ে চ'লে গেলো।

তার পর বধ্যাসময়ে মারশাল্লসহ তিন জন হত্যাকারীই প্রস্তুত। জার দোকানের পাশের রাস্তা দিয়ে বাবেন না, বাবেন খালিঘরের একটা রাস্তা দিয়ে।

এমনটা যে হবে কেউ আশা করেনি—হার হার। তিন-তিনটে কীদ।

ভেজখিনি নারী শোফিয়া—বার উপর বোমা-নিক্ষেপকারীদের সিগনাল দেওয়ার ভার—সে এক যুদ্ধ কী কেন ভাবলো। তার পর ছকুম দিল, চলো খালের পাশের রাস্তায়।

বোমা নিয়ে মলতক্ত সেই রাস্তায় গিয়ে ও'ং পেতে রইলো। জারের গাড়ী বধ্যাসময়ে এলো, আর বোমাও পড়লো।

পর্ষিত জারের জীবলীল এতখিনি পরে শেষ হ'ল

বোমা-নিক্ষেপকারীদের মধ্যে প্রিন্সেভস্কি হত হ'ল। শোফিয়া

পালিয়ে গেলে। হাইদরকন্ড পালানো—কিন্তু পুলিশের চক্ষের দৃষ্টি পড়লে ভয় উপর।

কলে অনেক বিপ্লবীর ঘর পড়বার পথ প্রদত্ত হ'ল।

কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন। আজ বিপ্লবীদের মহা আনন্দের দিন—হু' বছর বার বার চোঁচের পর জার নিহত।

সুত সন্ধ্যার পূর্বে তৃতীয় আলোকক্ষেত্রের এখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী—রাজ্যভার গ্রহণ করেছে, কিন্তু অভিষেক বা অস্ত্র কোন উৎসব হয়নি এখন পর্যন্ত—বোধ হয় বিপ্লবীদের ভয়ে।

কার্যনির্বাহক সমিতি স্থির করলো, তৃতীয় আলোকক্ষেত্রকে একঘানা চিঠি পাঠাবে, তাতে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য কি, কী তাদের দাবী, কতটুকু কি পেলে বিপ্লবাব্দোদন ছেড়ে দিতে পারে তারা, তাই লেখা থাকবে।

চিঠি লেখা হল।

মাজবরেহু,—

শিতলোকে আপনি কাতর, এ ভেদেও আপনাকে করেকটা কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা বহু বড়ই হোক না কেন, তার চেয়েও একটা বড় ভিন্নিষ আছে দুনিয়ায়;—তা হচ্ছে, স্বদেশের প্রতি কর্তব্য। এর কাছে প্রত্যেক নরনারকে বলি দিতে হবে তার সমস্ত ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত। দেশের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে অস্ত্রের মনে যদি আঘাত দিতে হয় তো তাও দিতে বাধ্য আমরা। এই কর্তব্যবোধে আপনার কাছে চিঠি দিচ্ছি; এক্ষুনি, কেন না বিপ্লবের কথা কে বলতে পারে ঠিক করে?—অর্থ ভবিষ্যতে হয়তো যুক্তগলা হয়ে বাবে দেশের বুকর ওপর দিয়ে, আরও হবে অনেক অনাচার।

আপনার শিতাকে হত্যা করে আজ যে রক্ত-হোলি শুরু হল দেশে, মনেও করবেন না এ আকস্মিক। দেশবাসী কেউ এতে অবাক হয়নি। গত দশ বছর ধরে জাতি যে উৎপীড়ন অভ্যাসে সজ্জ করে এসেছে, তার পরে এ হতেই হবে। এ হত্যার অর্থ—এই সজ্জিত অভ্যাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। ভালো করে বুঝতে হবে। জাতির জীবনের স্পন্দনের সঙ্গে পরিচিত নেই যাদের তারা বলবে একে একমল দুই লোকের যড়যন্ত্র, তারা বলবে একে ডাকাতি। আপনিও কি তাই বলবেন?

এ বিপ্লবীদের পিছে মারবার জন্ত আপনার শিতা কি না করেছেন? পৈশাচিক অভ্যাস; জাতির শিকারীকা, ব্যবসা-বাণিজ্য, মান-সম্মান সমস্ত অবহেল্য করে শুধু নির্ধাতনের আরোজন। তবু ধামেনি এ বিপ্লব। জাতির খাটি লোক যারা, সবচেয়ে নিঃস্বার্থ এক প্রমত্তল যারা, তারাই মলে মলে এতে যোগদান করেছে। এসে নিজেই গভ ভিন বছর ধরে লড়াই চলেছে সরকারের সঙ্গে। আপনি জানেন, আপনার শিতাও অলস হয়ে বসে ছিলেন না এতদিন। অপরাধী নিরপরাধী থাকেই পেয়েছেন, তাকেই কীসেতে লটকিয়েছেন। জেল ভাঙে—সাইবেরিয়াও আর শৃঙ্খলান ছিল না, এতো লোক সেখানে নির্ধাসিত হয়েছিল। বিপ্লবী নারিকদের মলে মলে প্রেস্তার করে মলকে দুঃস্থতা করেছেন কত বার। তবু ধামেনি আন্দোলন। বহু দিন দিন একলভর হয়ে উঠেছে। দশ-বিশজনকে হত্যা করে কী হবে? এ বিপ্লব তো আর ব্যক্তি বা

সংস্কারপন্থের উপর নির্ভর করছে না। একটা সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রাধা আত্মপ্রকাশ করেছে এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সমগ্র জাতিকে কে কীসির বন্ধ দেখিয়ে তার দেখাবে? ও করে এ বিপ্লব খামানো অসম্ভব।

তা যদি হত, তা হলে ইহুদীরাও পারতো বীজকে ক্রুশবিদ্ধ করে জাতির আকাঙ্ক্ষিত বুধেরের-লোপ করতে।

সরকার বহু লোককে ঘরে কীসি দিতে পারেন, হু'-চারটা বিপ্লবীদেরকে হয়তো নষ্ট করতে পারেন। এমন কি, বর্তমানের সবচেয়ে বড়ো বিপ্লবীমল, তারও তিনি বিনাশ করতে পারেন,— তাহেই কি বিপ্লব ধামবে?

বিপ্লবের বীজ কোথায়?—জাতির মনে। সর্বব্যাপী অসন্তোষ, নবীন আদর্শের প্রতি প্রবল একটা আকাঙ্ক্ষা—তাই-ই বিপ্লবের মূলীকিত করে লোককে। সরকার সমগ্র জাতিটাকেই তো ঘেরে ফেলতে পারেন না—নির্ধাতন শুধু বিপ্লবের অগ্নিকুণ্ডেই ইচ্ছন ভোগায়। সরকার দশজনকে ঘরে কীসি দেয়, একশ' জন আরও বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে এগিয়ে আসে সে ছান পূর্ণ করতে। বিপ্লবের আন্তন সরকারী নির্ধাতনের হাওয়ায় উত্তরাত্তর প্রবল হয়ে ওঠে।

এই কি আমরা দেখে আসিনি গত দশ বছর ধরে?

আজ দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা জাতির ভবিষ্যৎ কি। সরকার যদি নির্ধাতনের দণ্ড সহ্য না করেন তবে এ বিপ্লব আরো প্রবল, আরো ভীষণ হবে। এক মল নষ্ট হলে শক্তিশালী নবনদের প্রতিষ্ঠা হবে। জাতির মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে, সরকারের প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকবে না। তার পর একদিন এ বেছাচার জারতন্ত্র যন্ত্র-বিপ্লবের প্রেলর সীলার তাসের ঘরের মতো ভূস্থিতি হবে।

কী ভীষণ ভবিষ্যৎ! আমরা বিপ্লবী, আমরা আরো ভালো করে বুঝি—এই বিপ্লব জাতির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কতো বড়ো একটা ক্ষতিও বহন করে আনবে। কত বিদ্যা, কত শিল্পকলা, কত সম্পদ নষ্ট হবে। এই ক্ষয়ের দাক্তি যদি স্বতন্ত্রের দিকে দিতে পারতুম আমরা, তবে জাতি কত উন্নত হ'ত।

কিন্তু দিতে পারি না কেন আমরা? কেন আমরা এ বিপ্লবের বন্ধ হাতে মাখতে বাধ্য হই? কেন এ বেগনামের কর্তব্য?

তার কারণ, এ বেছাচারতন্ত্র রূপ সরকার, এ রাষ্ট্রই নয়। খাটি রাষ্ট্র হ'ল তাই যার মধ্য দিয়ে প্রজামণ্ডলীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, তাদের ইচ্ছা ফুটে ওঠে। কিন্তু কপিয়ায় কি?—একমল পরখাপহারী গুণ্ডার রাজত্ব। কথাটা রুট হ'লেও কমা ক'রবেন—এ সত্য, জীবন সত্য।

সন্ধ্যার কী ইচ্ছা জানি না, তার সরকার দেখছি বরাবরই জাতির সুখ-দুঃখ নিয়ে ছিমিছিম খেলছে। জনসাধারণ প্রকৃত প্রস্তাবে আজ দাস—প্রকৃত তাদের অভিজাতবর্গ, সরকারই তাদের ছেড়ে দিয়েছে অভিজাতবর্গের হস্তায় হুখে। সরকার স্ভাষামূলক নিয়ম করেন মাঝে মাঝে। তাতে লাভবান হয় অভিজাতবর্গ, তাদের শক্তি বাড়ে, কিন্তু জনসাধারণের দাসত্বের নিগড় আরো শক্ত হয়, হুখ আরো বাড়ে। তারা আজ ভিক্স, নিজে নিজেই পৰ্ব্বভূটিয়ে শাঙিতে য'রবে, তারও ঘো নেই। আইন তাদের দক্ষা করার জন্ত দৃষ্ট হয়নি।

বিলাসী, অপরাধী, অভ্যাসচারী অভিজাতবর্গ, তাদের দক্ষা করার

জাইন, তাদের জড়ই সরকার। তারা অতি হীন পৈশাচিক
অত্যাচার করলেও তাদের শাস্তি নেই।

অথচ, কেউ যদি জাতির মঙ্গলের জন্ত আত্মত্যাগ করে তবে সে
সরকার, তার আইন, তার মারপাশ—একসঙ্গে করে ফেলে ওঠে।

এই কি রাষ্ট্র? না। এ একদল খেচ্ছাচারী, স্বার্থপর
শিশুরের তাত্ত্বিক। তাই তো রূপ সরকারের আজ কোন
নৈতিক প্রভাব নেই জাতির উপর, কেউ তাদের সমর্থন করে
না। তাই এই বিপ্লব। রাজবাতক তাই আজ জাতির দ্বারা
এতো অভিনবিত। ভগ্ন যাদুকরের মুখে অস্ত্র কথা শুনে
পাবেন আপনি, কিন্তু যদি মুষ্টি থাকে তা দেখুন—ক্লান্ত আজ
রাজহত্যা কত জনপ্রিয়। এখন উপায় কি? উপায় দুটো। এক,
আপনারা যদি জাতির ইচ্ছাধারা রাষ্ট্রকে গঠন করেন। নতুবা,
আমরা যে পথ ধরেছি—বিপ্লব।

আপা কর, জাতির মঙ্গলমঙ্গলের দিকে চেয়ে, তাকে বিপ্লবের
হস্তসংগে আঁঠু নিম্ন হওয়ার বেদনাময় কর্তব্য থেকে রক্ষা করতে
আপনি প্রথম পথটাই বেছে নেন।

১০ই মার্চ, ১৮৮১

কার্খনিরীক্ষক সমিতি
“প্রজার দাবী”

এই চিঠির এক কপি নতুন জারের কাছে পাঠানো হ’ল।

পুলিশও অলস হয়ে বসে ছিল না। বিপ্লবীদের পুলিশের চর
ছিল, তারই সাহায্যে বিপ্লবী-নাহকদের একে একে ধরতে লাগলো।
খানাতল্লাসে খানাতল্লাসে শহরে আতঙ্ক লেগে গেলো।

ভোরের জীবনে সে এক শরীর দিন—শুধু ভোরের নয়, অনেক
বিপ্লবীর জীবনেও তাই। কত চোঁটা ব্যর্থ হয়েছে, কত জীবন বलि
হয়েছে, ...সব আজ সার্থক হ’ল, সব প্রোতাপ্ত। তৃপ্ত হ’ল আজ জারের
হস্তে। সমগ্র রূপজাতির প্রাণে একটা চাপা আনন্দের প্রোত
বয়ে গেলো।

৩রা মার্চ।

ভক্তনোব-ব্রজ এর কাছে একটা বাড়ীতে ভেড়া আছে। হঠাৎ
কোন ধবধাবের না দিয়ে কিবালিশ এসে চুকলো।

ব্যাপার কি?

সেবলিন আতঙ্কিত হয়ে।

সে কি? কল?

পুলিশ ঘেঁষাও করেছিল বাড়ী। জেলায় ধরা পড়েছে। কিন্তু
তার চাইতেও একটা বড়ো বিপদ সামনে।

কি?

লোকসভা যেমন কে যেমন পড়ে আছে। পুলিশের খানাতল্লাস
করার খুবই সম্ভাবনা। শুভা তুলে দেওয়া সরকার।

ভেড়া বললে, কার্খনিরীক্ষক সমিতির বৈঠক ডেকে তা ঠিক করা
যাক।

সমিতির বৈঠকে ভেড়া প্রস্তাব করলো, যত জারের জন্ত যে মাইন
পাড়া হয়েছিল নতুন জারকে তাই দিয়ে অভিনবিত করা হোক।
নতুন জার এই মধ্যে এশব দিয়ে গেছেন, কাজেই এটা নিঃসন্দেহ—
পুলিশ লোকদের সহজ এখনও ভয় করতে পারেনি।

কিন্তু বেশীর ভাগ সভা মত দিল না এতে। পুলিশের দৃষ্টি
সম্মতি এতো প্রথম যে তা করা দলের পক্ষে বিপদজনক হবে।

ভেড়া উচ্চ হয়ে বললে, কিন্তু এতে কত বড় একটা আবহাওয়া
সৃষ্টি হবে দেশে, তা কি আপনারা বুঝতে পারছেন না? আপনারা
এটুকু সাহস থাকা উচিত।

বুধা এ গরম বক্তৃতা।

প্রস্তাব না-মঞ্জুর হল।

ভেড়া, শোফিয়া—হ’তনকেই ধ’জে বেড়াচ্ছে পুলিশ, কিন্তু পাচ্ছ
না। অথচ দুজনেই রাজধানীতেই আছে—অবশ্য বিভিন্ন স্থানে।

শোফিয়া রাজধানী ছেড়ে যাবনি, কারণ তার মতলব নতুন
জারকেও শেষ করে যাবে।

এই মতলব নিয়ে সে কাজ আরম্ভ করে দিল। হস্তক্ষেপে রাজ-
প্রাসাদের চাতিপাশে ঘুর বেড়ায়। রাজবাড়ীতে যাত্রা কাজ করে
তারের সঙ্গে ভাব করে সম্রাটের গতিবিধি সব্বক্ষে খবর নেয়। আর
মতলব আঁটে।

পুলিশও কেবল তার খোঁজে। শোফিয়া এক স্থানে হ’রাত থাকে
না। আজ এখানে, কাল কোথায় থাকবে তা কেউ বলতে পারে
না। বন্ধুর বাড়ী সে যেতো না, কারণ তাহলে বন্ধু হয়তো
তারই জন্ত বিপদ হবে। একদিন বোধ হয় অস্ত্র কোথাও স্থান না
পেয়ে ভোরের কাছ হ্রস্ব বললো, তোমার এখনে থাকতে পারি এ
রাতটা? ভেড়া অবাক হয়ে ভা’সনার শব্দে বললো, শোফি, তুমি
আমাকে এতো পর মনে করো জানচুম না।

শোফিয়া বললে, পর মনে করবো কেন?

নইলে, যোনের ঘরে থাকতে আবার অসুখটি চাওয়ার সরকার হয়
নাকি?

শোফিয়া বললে, ব্যথা পেয়েছিল ভেড়া। আমি ও ভেবে
বলিনি। জানিস তো দিদি, আমার সঙ্গে থাকেই দেখবে পুলিশ
তাকেই কীসি দেখে।

ভেড়া জবাবে বিজ্ঞানীর দিগে একটা রিতলবার দেখিয়ে দিয়ে
বললে, ঐ দেখেছিল, আমার এখানে যে মহাপ্রভুর আসবেন—তারের
অভ্যর্থনার জন্ত।

সে হাত নিরাপদে কেটে গেল।

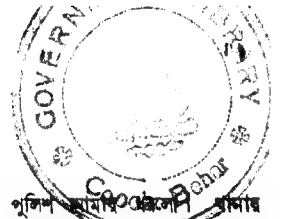
শোফিয়ার মত নারী হুলুভ! ভেড়া শোফিয়া দুজনেই বিপ্লবমুখে
লীকিত হয়ে পুলিশি হিসাবের বাঁধা-পাখের বাইরে চলতে বাধ্য হয়ে।
নইলে তাদের নৈতিক চরিত্র ছিল অনিশ্চয়।

একদিন শোফিয়া ভেড়ার কাছে এলো। ভাই, গোটা পনেরো
টাকা ধার দিতে পারিস? আমার হাতে যা ছিল শুধু-পনের ধরত
হয়ে গেছে। একটা সিন্ডের পোষাক বিক্রা করতে দিয়েছি, তার
টাকা পেলেই ধার শোধ দিয়ে যাবো।

ভেড়া তাকে টাকা এনে দিল। অথচ এই শোফিয়ার
হেঁজাজে প্রচুর টাকা। কিন্তু সে সব সমিতির। না খেয়ে-
মরলেও সে টাকার হাত দেবে না শোফিয়া। কত বড় চরিত্রের
জোর থাকলে এ লব?

শোফিয়া সেদিনও ঘিরেয়েছে তার মতলব নিয়ে। এক
বিধাযাতক তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল।

পুলিশ তাকে এমন করে বাঁধলো যে, তার মনে হ’ল শরীরের



শিরাঙলি বেন কে কেটে দিচ্ছে। বললো, একটু আলসা করো বাঁশ, ভারি লাগছে আমার।

পুলিশের কর্তা পৈশাচিক হাসি হেসে বললো, এখনই কি হয়েছে লক্ষী! আরো কত লাগবে!

শোকিয়াকে উঠো খোঁড়ার চাপিরে, তার বুকে “রাজহত্যা” লেবেল এঁটে শহরের মধ্য গিয়ে নিয়ে যাওয়া হ’ল।

ভারপরে বিচার।

সরকারী উকিল তাকে অভিযুক্ত করলো রাজহত্যার অপরাধে। শুধু তাতেই উকিলের তৃপ্তি হ’ল না।

আমি এ নারীকে জানি। এ যে শুধু রক্তসোলুপ তাই নয়, এ দুশ্চরিত্রা।

শোকিয়া বুধ তুলে চেয়ে দেখলো, কে এ উকিল! চিনতে পারলো। তারই বালাবন্ধু, বাড়ীর পাশে বাড়ী, কিন্তু একটা কথাও বললো না শোকিয়া।

বিচারে তার চরম মশ হ’ল।

এই প্রথম ক্রমনারী, বিনি বিপ্লবী বলে কানিকার্ঠে আত্মবলি দেবার মহৎ সম্মান প্রথম লাভ করেন।

ভোর উপরেও পুলিশের উপদ্রব শুরু হ’ল।

ভোরা পালিয়ে ওড়েন্দায় এলো। এসে দেখে, কার্ণিবারীক সমিতির ২৮ জন সভ্যের মধ্যে ২০ জন ধরা পড়েছে। অধৃত অবস্থার আছে তিনজন মহিলা, পাঁচজন পুরুষ।

বিপ্লববাহীরা আশা ক’রেছিল, রাজহত্যার সঙ্গে সংগেই দেশময় একটা বিদ্রোহ আগবে। তা কিছু না হওয়ায় এইবার তারা ভয়ানক হয়ে পেলো। পুলিশের হাত কেউ যে এড়াতে পারবে না, এ তারা বেশ জানতো। কারণ, দলের ভিতর এমন একজন গুপ্তচর ক’রেছে পুলিশের—যে এ দিকের সব খবর জানে এক ভরিকৈ সব খবরগুলি সে বোলাসুয় ঢালায় করে। কে এ? ধরা শক্ত।

বিপ্লবীবল ঢালাতে পারে, এমন একজন লোক বলে আছে শুধু এখন। সে ভোরা কিং নার। সমস্ত তার স্বভাবতই তার উপর এসে পড়লো।

করকক্ষে নেমে ভোরা দেখলো, আগের মতো কর্মী নেই এখন। নতুন বারা চুকছে তাদের গড়ে তুলতে পারলেই তবে বল জেনে উঠবে আবার।

ভোরা গড়নের দিকে মন দিল। শের্ভোগ্রাণ থেকে কেন্দ্র মতোতে স্থানান্তরিত করা হ’ল। দলের যুগপত বের করা হ’ল। প্রচারকার্য চলতে লাগলো খুব জোর।

তার পর হু’ বহর কেটে গেছে—খুরানো কার্ণিবারীক সমিতির সবাই ধরা পড়েছে। হুজু শুধু ভোরা কিং নার। শত ত্রোতেও পুলিশ তার নাগাল পায়নি।

ভোরার একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী—ডিগারেড। ওড়েন্দায় দলের একটা প্রেস আছে—তার তার নিয়ে ডিগারেড সস্তীক দেখানো থাকে।

একদিন খবর এলো, ক্রম সরকারী প্রেস ব্যবহৃত কয়েক—ডিগারেড পুলিশের হাতে বন্দী।

সিনকরেক পরে ডিগারেড হাফির। ভোরা তো অবাক! আরও হ’ল।

তুমি না ধরা পড়েছিলে? হী।

কি করে পালিয়ে এসে?

ওঃ, সে অনেক কাশলে। পুলিশ আমাকে ধরলো আমার নিয়ে গিয়ে ভোরা, তোমার বাড়ী কোথায়? আমি কলুম্ব কিভে। সেখানে গিয়ে আমার যা কিছু বর্ণনা দেওয়ার আছে, বেব।

পুলিশরা রাজী হ’ল।

না, কিছুতেই কিভে নিয়ে যেতে চায় না, তার পর শেষটায় কি নি কি ভেবে রাজি হ’ল। এক অন্ধকার রাত্রে দুটো পুলিশের পাহারায় আমার নিয়ে চললো গাড়ীতে ক’রে ট্রেনের দিকে। খোলা একটা মাঠের মধ্য দিয়ে পথ। মাঠের মাঝামাঝি বখন এলো, আমি পকেট থেকে এক মুঠো তামাকচূর্ণ বের করে পুলিশ দুটোর চোখে মারলুম ছুঁড়ে। বেচারাদের দুর্দশা তখন বুঝতেই পারিলাম। আমিও গাড়ী থেকে মেয়ে অন্ধকারে তলিয়ে গেলুম।

তারপর কোথায় গেলে?

ওড়েন্দায়, আমাদের হলভুক্ত সৈন্যসম্প্রদায়ের আড্ডায়। তারপর পুলিশের কড়া দৃষ্টি একটু নরম হ’তে পতকলা এখানে এলুম।

হু’চার জন অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ছাড়া ভোরার আসল বাসস্থানের কথা কেউ জানতো না। কাজেই ভোরা লিভ্রেস করলো, তুমি আমার ঠিকানা কি ক’রে পেলো?

ডিগারেড বলল, এখানে এসে জেনেছি। বার ‘কোরারে’ আপনাকে চিঠি লিখলুম, তিনি অনেক পীড়াপীড়ির পর বললেন।

কাল এসেছ, সমস্ত রাত কোথায় ছিলে? পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছ নাকি?

না, তবে যেখানে ছিলুম সেখানটারও খুব স্মরণ নেই।

আচ্ছা, তুমি তো জানি তামাক খাও না। তারাকের ভাঁড়ো কী ক’রে পেলো?

পথেই কিনে নিয়েছিলুম, পালাবার প্ল্যান আগে থাকতেই ট্রিক ছিল কি না।

ভোরা আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। তার দরল হ’ল ডিগারেডের ক্ষমতা। হায় বেচারী! হুজু হ’য়েও হুজির আনন্দ উপভোগ করার যো নেই। বউকে যে পুলিশের কবলে ফেলে আসতে হয়েছে।

এরই কিছুদিন পরে কর্মীর পর কর্মী ধরা পড়তে লাগলো। এ যে দলের সেই একই বিশ্বাসঘাতকের কাজ, তা বুঝতে ভোরার বাকী রইলো না।

ডিগারেড বলল, ওড়েন্দায় বাবের ধ’রেছে, তাদেরই কেউ হয়তো সব কথা বলে দিচ্ছে।

ভোরা বলল, কিন্তু কে সে?

পুলিশের চর কেউ হবে।

কিন্তু পুলিশের চর এলো কোথেকে? ওড়েন্দায় তো ছিলে তুমি আর তোমার স্ত্রী, আরও একজন। এরা তো আর চর নয়?

ডিগারেড মাথা হুলকাতে হুলকাতে বলল, আমার তো মনে হয়, আমাদের দলের কোনো পুলিশের চরের এক কাজ।

ভোরা একটু ভিত্ত হ’ল।

কাজ যে এখনো অনেক বাকী। বিপ্লবীলকে সুরক্ষিত করা

যাওয়া চাই ধরা পড়ার আগে, কারণ সে ধরা পড়লে বর্তমান বিপ্লবীমলকে কশ্মিরার বুক থেকে মুছে ফেলা পুলিশের পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না। পুলিশও ভাই বায়ে বায়ে জাল ফেলেছে—ভেরা যদি ধরা পড়ে। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত পুলিশের খবর নজর, বিজ্ঞাপন, প্রাকার্ড, পুরস্কার বোষণা, কিছুই বাকী নেই।

—অথচ ভেরাকে চোখে কেউ দেখে না!

এ যেন আফ্রিকার নদীতে নেমে কুমীরের সংগে লড়াই করা।

একদিন ডিগারেভ চিন্তিত মুখে এসে ব'ললে, এখানে কি আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করেন?

নিশ্চয়।

কেউ চেনে না বুঝি এখানে আপনাকে?

হী, অনেকটা তাই। ভেরা কিং নারের নাম অনেক শুনেছে কিন্তু দু-চারজন খুব বিপুল বন্ধু ছাড়া ভেরা কিংনার ব'লে চেনে না কেউই।

কিন্তু, সে দু-চারজন বন্ধুর মধ্যে একজনও কি পুলিশের চর নেই? আছে—মাকুলভ। সে দেখতে গেলেই বিপদ।

ডিগারেভ তখন অজ্ঞা কথা পাড়লো। আচ্ছা, আপনি বেব হন কখন?

সাধারণত আটটার।

আটটার কেন?

একটা ডাক্তারি দুল বসে তখন। তাদেরই কায়র ছাড়পত্র নিয়ে বেই কি না আমি।

আর একদিন ডিগারেভ একথা সেকথার পর ব'ললে, আপনি যোজাই দেখি এই দোর দিয়ে বেরোন। একটা দোরই বুঝি এ বাড়ীতে?

ভেরা ব'ললে, তা কেন? বাড়ীওয়ালার ঘরের দিক দিয়ে আর একটা দোর আছে। তবে আমি কখনো ও দোর দিয়ে যাই না।

অজ্ঞা কেউ এ সব প্রশ্ন করলে ভেরা নিশ্চয়ই সন্দেহ

ক'রতো,—ব'লতো না কিছু। কিন্তু ডিগারেভ—বিপুল বন্ধু। তার কথা স্বতন্ত্র।

১-ই ফেব্রুয়ারী।

ভেরা ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে, ঠিক আটটা বেজেছে। বাড়ী থেকে বের হ'ল। দশ-পাণ্ড বোধ হয় এগোরনি। ও কে? মাকুলভ না? হী—তাই তো। ও কি ক'রে এলো? নিশ্চয়ই পুলিশের চরটি খবর দিয়ে আনিয়েছে। নির্ধাৎ—এইবার ভেরা ধরা পড়লো বুঝি!

মাকুলভ ভেরার শিছু নিয়েছে, কিন্তু ধ'রছে না। ভেরা খুব জোরে জোরে পা চালিয়েছে, মাকুলভও তাই। ভেরা পথ চলছে, আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করছে চারিদিকে—পালাবার কোন অলিগলি নাই—লুকোবার কোন ঠাই নেই। সত্যিই কি ধরা পড়তে হবে? আচ্ছা, পকেটে কি আছে?

ভেরা হাত দিয়ে দেখলো, একখানা নোটবুক আর মনিঅর্ডারের বসিদ একখানা। নোটবুকে কয়েকটা নাম আছে, তারা এ দলের নয়—অথচ তাদের জীবন নিয়েও টানটানি হবে। না, যে ক'রেই হোক এ নষ্ট ক'রে বাঁচাতে হবে তাদের।

ভেরা তখনও চলছে সমাসভাবে। অস্তুরালে যে পুলিশের বাহ চারিদিকে, তা যেন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছিল।

ডোট কেয়ার! বা হবার হবে।

ক্রান্ততর পদচালনা।

সামনেই একটা অর্ধগোলাকৃতি বাগান—তারপরেই একটা বহু-পুরানো বাড়ী।

এখানে বন্ধু ইভাসেভ থাকে, না? হী, ঐ তো তার দোকান।

ভেরা সেই দিকে কিরবে—

কিন্তু কেহা আর হ'ল না। কোথা থেকে যে দলে দলে পুলিশ এসে তাকে ঘিরে ফেললো, তা সে বুঝতেই পারলো না!

কশ-পুলিশের বহুবর্ষব্যাপী অমুগ্ধান সার্থক হ'ল—

ভেরা কিংনার আজ বন্দিনী।

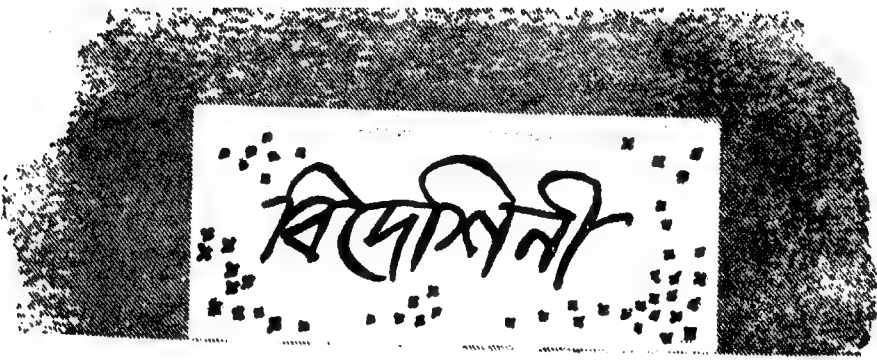
[ক্রমশঃ]

অবিচ্ছেদ্য মানে

পয়েন্ট মণ্ডল

ত্রিশকুয় মতো হবে উদাসীন মন
চিরদিন। পথ ধোঁকা শেষ হবে নাক'
যদি কেউ ধরে বসে একাবিক। বন
বড় জঙ্গল। ওই হিসেবেরা থাক্।

উর্বর মাঠে বসে। বতো জঙ্গল
সহগামী আয়ার। জঙ্গলের টানে
কোবাবে কথের লুখ? ভূমি বাজচাল
দূতী! আমি পাখো ঠিক অবিচ্ছেদ্য মানে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

পূর্বের দিন বখাসময়ে ব্রেকফাস্ট খেতে খাবার-ঘরে গিয়ে দেখি—
সেই কালকের লোকটি তার টেবিলে বসে আছে। তার
ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গেছে, টেবিলে বসে বসেই খবরের কাগজ
পড়ছে। টেবিলে যেতে তার টেবিলের কাছাকাছি দিখেই যেতে হয়।
যখন যাচ্ছি—লোকটি উঠে পাড়িয়ে হেসে আমাদের স্তম্ভভাত জানাল।
আমরা দু'জনেই স্তম্ভভাতের স্তম্ভভাত জানিয়ে নিজেদের টেবিলে
গিয়ে বসলাম এবং লক্ষ্য করলাম, মালিন নিজের চেয়ারটি একটু টেনে
একেবারে লোকটির দিকে পিছন ফিরে বসল। একটু চাপা গলায়
হেসে মালিনকে বললাম—তুমি দেখছি লোকটির প্রতি বিশেষ
বিরূপ।

মালিন শুধাল, কেন ?

বললাম, লোকটি আলাপ করার জন্য স্তম্ভভাত জানাল—এক
মিনিট পাড়িয়ে কথা বললেই হত।

বলল, তোমার অন্ত ইচ্ছে হয়েছিল—তুমি বললেই পারতে।

বললাম, তুমি যে রকম গভীর ভাবে চলে এসে—আমি আর
পাড়িয়ে কথা বলি কেন ডবসায়।

একটু চুপ করে থেকে মালিন বলল, ভালই করেছে—লোকটা
ভাল নয়।

হেসে শুধালাম, তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে বলে ?

বলল, শুধু তাই নয়, লোকটির ভিতরে একটা অবজ্ঞা আছে।

শুধালাম, অবজ্ঞা—কায় প্রতি ?

বলল, তোমার প্রতি।

শুধালাম, কি রকম ?

বলল, ইংরেজরা ত সাধারণতঃ যে কোনও বিদেশীদের নিজেদের
চেয়ে ছোট মনে করে—কেউ কেউ আশার কালোদের মাছুষ বলেই
মনে করে না। তারা অতি ইতর—ও সেই দলের।

অবাক হয়ে শুধালাম তুমি কি করে এত বুঝলে ?

বলল, কালকে ওর তাকাবার ধরনেই বুঝেছি।

বলা। বহুদিন আগেকার মালিনের একটা কথা মনে পড়ে
গেল—আমি বিশেষ করে কোনও জাতেরই নই, আমি জগতের
যে। মনে আছে ত—আমার হাজীরাবনের কাহিনীতে তোমাকে
লিখেছিলাম—একদিন লন্ডনে মালিনদের বাড়ীতে 'চা' খেতে খেতে

মহুটনের কথায় ইংরেজ জাতের অভিজাত্যের গর্বের ইঙ্গিতে মালিন
কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ? মনে আছে ত মহুটনকে
বলেছিল—এই অভিজাত্যের গর্কেই তোমরা সকলের চেয়ে ছোট।
এবং সেইদিনই প্রথম টের পেয়েছিলাম—মালিন আসলে ইংরেজ নয়,
শেনদেশীয়, মালিনের পিতামহ শেনন ছেড়ে এদেশে এসে বসবাস
শুরু করেছিলেন, যদিও মালিনের মা ইংরেজ। মনে আছে ত ?
তাই মালিনের চুল কালো, চোখ কালো, গায়ে রং এদেশী মেয়েদের
মতন উৎকট লাল নয়—উজ্জল গোলাপী। সবই ত জান।

শুধু তাই নয়, সেইদিনের পর থেকে এটুকুও আমার লক্ষ্য
এড়ায়নি—বাঁটা ইংরেজদের উপর মালিনের মন খুব সদয়
নয়। মনের গভীরে কোথায় যেন একটা বিরাগ ছিল লুকিয়ে,
কিচ্ছি কখনও তার আভাষ পাওয়া যেত কথার-বার্তার। কিন্তু
এর পিছনে যে একটা কারণ ছিল সেটা টের পেয়েছিলাম
আরও অনেক পরে।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেবাকোষ গেলাম। এফ্টন কাজ নিয়ে সদয়
দরজায় কড়া নাড়তেই, সেই বৃষ্টি দরজা খুলে দিয়ে স্তম্ভভাত
জানিয়ে চেসে আমাদের ভিতরে যাওয়ার আয়তন জানালেন।
ভিতরে গিয়ে লাউঞ্জে বসবার ভল্লকণ পড়েই গ্রেসও ভিতর থেকে
এল দেখানে। চেসে স্তম্ভভাত জানিয়ে শুধাল, বাইরে বাগানে
বসবেন ? আজকের দিনটা বড় সুন্দর !

সত্যি দিনটা বড় সুন্দর হয়েছিল। গত ক'দিনের মেঘলা
মেঘলা ভাবটি কেটে গিয়ে পরিহার্য সূর্য দেখা দিয়েছিল আকাশে।
চারদিকে ঘন সবুজ সোনালী সূর্যের আলোর যেন গাঝাড়া দিয়ে
ঝলমলিয়ে উঠেছিল। এরকম দিন ইংল্যান্ডে খুব কমই পাওয়া যায়।

বললাম স্তম্ভভাতটি বড় সুন্দর হয়েছে। তবে, বাইরে বাগানে
বসলে আপনার ঠাণ্ডা লাগবে না ?

বলল না, না। ঝাঁকায় বসলে আমি ভালই বোধ করি।

বাগানে গেলাম। ছোট বাগান—তারই একপাশে তিন
চারখানা ছোট বেতের চেয়ার পাড়া রয়েছে দেখলাম। গ্রেস
সেইখানে নিয়ে গেল। আমাদের জন্য আগে থেকেই গ্রেস এ
বলোবস্ত করিয়েছিল কিনা জানি না। সেইখানেই বসা হল।

গ্রেস বলল, আপনারা দয়া করে আজও আমার খবর নিতে এসেছেন—সেজন্য আমি সত্যই বড় কৃতজ্ঞ।

হেসে মার্লিন বলল, বা রে, আসবার ত কথাই ছিল।

গ্রেস বলল ডাঃ চৌধুরীও এসেছেন।

মার্লিন বলল, ডাঃ চৌধুরীটি যে আমার বাহন—নইলে আসব কি করে।

আমি বললাম, যদি কিছু মনে না করেন—আপনারা কথাবার্তা বলুন, আমি সমুদ্রের ধারটা ভাল করে বেড়িয়ে দেখে আসি।

গ্রেস শুধাল, আপনার এখানে বসতে কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে ? বললাম, না না, তা নয়। তবে—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মার্লিন হেসে বলল, যে রকম ছটকটে লোক, একটু ঘুমেই আশ্রয় না—উনি থাকলে আমাদের নিরিবিলা গল্প হয়ত সেদিক জমবে না।

একটু চুপ করে থেকে গ্রেস মার্লিনকে বলল, যদি আমাকে নিয়ে কথা বলতে চাও, তবে ডাঃ চৌধুরী থাকতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

মার্লিন তৎক্ষণাৎ বলল, বেশ! (আমার দিকে চেয়ে) তুমি বস তাহলে। কিন্তু গ্রেস! তোমার বিয়ে যদি কথা বলি, তোমার কোনও আপত্তি নেই ত ভাই? কিছু মনে করো না—সত্য কথা বলতে গেলে, তোমাকে যে অবস্থায় দেখছি, তোমার একটা ভাল ব্যবস্থা না হলে আমি স্তব্ধ হয়ে এখান থেকে যেতে পারব না।

গ্রেস একটু চুপ করে থেকে মার্লিনকে শুধাল, কি তোমার প্রশ্ন?

মার্লিন বলল, আমার কোনও প্রশ্ন মাই—আমি শুনতে চাই।

একটু হেসে শুধাল, কেন আমার এ দুর্বুদ্ধি হল—এই ত?

মার্লিন বলল, যদি বল।

গ্রেস বলল, আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলাম—মুখ পুড়ে গেল।

মার্লিন বলল, তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে আগুন নিয়ে খেলা করবে—এ ত আমি কোনও দিনই ধারণা করিনি।

একটু চুপ করে থেকে গ্রেস বলল, শুনবে? আগুনের তাপের আকর্ষণে নয়—রেগে। রেগে ভেবেছিলাম—দেখি না আগুনে আমার মুখ পুড়ে যাচ্ছে দেখে যদি তার মনে কোনও সাড়া জাগে। কিন্তু কিছুই হল না—সেই উদাসীন ভাব, আমি থাকলেই বা কি, সেলেই বা কি! তাই বোধ হয় রেগে শেষ পর্যন্ত দিক-বিদিক জ্ঞান হারালাম। আমি ত লুকিয়ে কিছু করিনি—সবই ত জান।

একটু চুপ করে মার্লিন বলল—গ্রেস! তুমি লালকাকাকে একবারেই চিনতে পারিনি—আগাপোড়া ভুল বুঝেছি।

গ্রেস চোখ তুলে মার্লিনের দিকে চাইল। প্রশ্ন করল, কি রকম?

মার্লিন বলল, লালকাকা তোমাকে কি রকম ভালবাসেন, তুমি কোনও দিনই ধারণা করতে পারনি। উদাসীন ত ননই। তিনি আজও তোমার সমস্ত খবর রাখেন। তোমার দুঃখের কথা তাঁর একটুও অজানা মাই—তাই তিনি অভ্যস্ত ব্যাকুল হয়েছেন। শুনে অবাক হবে—তিনি তোমার জন্য আমাদের হাতে হুশ পাউণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি গ্রহণ করলে তিনি কৃতার্থ হবেন।

কথাগুলি বলে মার্লিন একদৃষ্টে গ্রেসের মুখের দিকে চেয়ে বইল।

গ্রেস একবার চোখ তুলে মার্লিনের দিকে চেয়ে চোখ নাড়িয়ে নিল।

মার্লিন আবার বলল, আমি বতদূর মিঃ লালকাকাকে চিনেছি—তিনি বোকা নন। তোমার মনোভাব তাঁর বুঝতে দেয়ী হয়নি। তোমার লীলায় তাঁর বুক ভেঙ্গে গেছে কিন্তু মুখে তিনি কিছু বলেননি। হয়ত ভেবেছিলেন তুমি নিজেই একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে। তোমার কোনও স্বাধীনতায় কোনও দিনই ত তিনি কোনও হস্তক্ষেপ করেননি। সেই ত তাঁর স্বভাব। তনসে বিবর্তিত হবে গ্রেস—তোমার বর্তমান অবস্থার জন্য তিনি নিজেকেই দোষী করেন, তোমাকে নয়। আমাদের বলেছেন সে কথা। কি মনে হবে!

গ্রেস কোনও উত্তর দিল না। মাথা নীচু করে চুপ করেই বসে রইল। খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। হঠাৎ গ্রেস চোখে স্ক্রাম দিয়ে ফাঁদতে লাগলো। মার্লিন নিজের চেয়ারখানি গ্রেসের চেয়ারের কাছে টেনে নিয়ে গ্রেসকে একহাতে জড়িয়ে ধরে সাধনার সুরে বলল, গ্রেস! প্রিয়তম গ্রেস! শান্ত হও। অবশ্য উত্তেজিত হয়ে নিজের ক্লান্তি বাড়িও না।

একটু পরে জলভরা চোখ তুলে মার্লিনের দিকে চেয়ে গ্রেস বলল, তবে কেন? কেন তিনি আমাকে অত অবহেলা করেছেন? জাদ মার্লিন—দিনের পর দিন চলে গেছে আমাকে একটি চুমো পর্যন্ত খাননি।

মার্লিন বলল, গ্রেস! এখানেই ত তোমার ভুল। তুমিও ভারতবাসী নিয়ে ঘর করছ, আমিও করছি। এটুকু লক্ষ্য করনি যে এদের মন সাধারণত অন্তর্ভুক্ত—ইন্দ্রিয়ের লোকের মত বহির্ভুক্ত নয়। এদের অহুত্ব ভয়খানি, মুখে প্রকাশ তার চাইতে অনেক কম—বিশেষতঃ আমি-তুমি সম্পর্কে। এদেশে ঠিক উল্টো। ভারতবাসীর মনের অহুত্বের গভীরতা খিচায় করতে হয় বাইরের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে নয়, অন্তরের পরশ দিয়ে।

হঠাৎ গ্রেস আবার চোখ তুলে চাইল। শুধল, তাই বলে তুমি অস্ত্র লোকের সঙ্গে প্রেম করছে—তুমি প্রতি ভালবাসা থাকলে—সেটা কি ওরা নিষিদ্ধ করে, বলতে চাও?

মার্লিন বলল, হ্যাঁ, এক জাতের লোক আছে—সব নিষিদ্ধ করে। বিরাটটা তারা নিজদের অন্তরের মধ্যেই বতদূর সম্ভব হজম করার চেষ্টা করে—বাইরে বিরোধের সৃষ্টি সহজে হতে দেয় না। আমি বতদূর বুঝেছি ভাই—বাইরের বিরোধটাকে তারা কুৎসিত বলে মনে করে, তাই চেষ্টা করে সেটাকে এড়িয়ে চলতে। ভারতবাসীরা বেশী ভাগই বোধ হয় এ দলের। মিঃ লালকাকা ত নিশ্চয়ই। তাদের মানসিক সহনশক্তি যে সাধারণ ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী। সাধারণ ইংরেজ ভালবাসা থাকুক বা না থাকুক—ও অবস্থায় একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুঁদাখনি করে বসে।

খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। একটু পরে গ্রেস শুধাল, তা তুমিই বা এত জানলে কি করে?

মুহূর্ত্তে হেসে মার্লিন বলল, আমিও ত প্রায় বারো বছর ভারতবাসী নিয়ে ঘর করছি। তার উপর মিঃ লালকাকাকে দেখেছি। তাঁকে বুঝলে এসব কথা অতি সহজ হয়ে যায়।

মার্লিনের কথাগুলি শুনেও তনসে অবাক হয়ে হুত্বভিত্তিক মার্লিনের মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম—আজও মনে আছে।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট খেয়ে আবার পেলামি বেবাকোঁবে।
মালিনকে এঁটলজের কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে আমি পেলামি সমুদ্রের
ধারে—একটা রেস্তোরাঁয় মালিনের জন্য অপেক্ষা করব, এইরকম ঠিক
হয়েছিল মালিনের সঙ্গে। ঠিক হয়েছিল—মালিন একলাই আজ
গ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সমুদ্রের ধারে এসে আমার সঙ্গে দেখা
করবে রেস্তোরাঁয়। মালিনকে নামিয়ে দেবার সময় বলেছিলাম,
লীনা! আজই কিন্তু টাকাকড়ি দিয়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়ে
এস। টর্কিতে আর ভাল লাগছে না।

মালিন বলেছিল, আমি খুব চোঁটা করব।

যাঁটা দেড়েকেরও উপর একটা রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করলাম
মালিনের জন্য—মালিন ফিরে এল। শুধু শুধু বসে থাকে চলে না,
তাই ইতিমধ্যে চায়ের সঙ্গে কিছু জলযোগও করে নিতে হল।
মালিনের হুঁশ দেখেই বুঝলাম—মালিনের মনটা খুশিতে ভরা।

মালিনকে বললাম, তোমার হুঁশ দেখে মনে হচ্ছে—তোমার কাজ
সকল হয়েছে।

হেসে মালিন বলল, বোল আনা।

গুথলাম, কি হল বল?

বলল, কি আর হবে। শেষ পর্যন্ত সবই রাজী হয়েছে।
টাকাকড়িও নিয়েছে এবং লালকাকা যদি ওকে এসে নিয়ে যায়—
ফিরেও যাবে।

বললাম, বাঃ—আন্তরিক অভিনন্দন। তুমি সত্যি অঘটন
ঘটাতে পার।

মালিন হেসে বলল, এ আর এমন কঠিন কাজ কি? এ আমি
আগেই জানতাম।

গুথলাম, কি করে?

বলল, গ্রেসকে ত কিছু কিছু চিনতাম।

গুথলাম, আচ্ছা, গুর প্রেমিকটির কি খবর? সে ওকে ছেড়ে
গেল কেন?

মালিন বলল, প্রেমিক না ছাই। কোঁকের মাথায় তার সঙ্গে
চলে এসেছিল, শেষ পর্যন্ত বা বাতাবিক, সে গুর কাছে অসহ্য হল।
তাই তাকে ভাড়িয়ে দিয়েছে।

বললাম, বাই হোক—গ্রেস একটা লীলা দেখালে বাটে।

বলল, ইয়েজ মেয়েদের মনের উত্তাপ যে এত বেশী হতে পারে
—এটা এর আগে আমার ঠিক জানা ছিল না।

গুথলাম, কি রকম?

বলল, ইয়েজ মেয়েরা যে বড় ড় হাঁসিরা। মনের উত্তাপে
বেঁস তারা সহ্য হয় না।

বুলা! আগেই তোমাকে বলেছি—এ ধরনের কথা ইয়েজদের
বিষয় যাবে যাবে মালিনের কাছে গুনডাম এবং এ-ও বলেছি
যে এর পিছনে একটি কারণ ছিল, সেখান থেকে পেরেছিলাম
অনেক পরে।

বললাম, সব রকমই সব মেয়ের মধ্যে আছে।

সেখান থেকেও উত্তর না দিয়ে বলল, শোন। আজই তোমাকে
একটি কাজ করতে হবে। লালকাকাকে একখানা চিঠি লেখ—তিনি
বেন পরশাট এসে গ্রেসকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। গ্রেস যেতে রাজী।
টাকাটাও নিয়েছে—সেখানও গিখে দিও। বিশেষ করে গ্রেসের

শরীরের কথা লিখ—সেরী করলে গ্রেস বাঁচবে না। অবশ্য গ্রেসও
আমাকে কথা দিয়েছে—সে টাকাটা জন্ত লালকাকাকে বহুবাদ জানিয়ে
একটা চিঠি লিখবে।

সেই দিনই বিকেলে বাইরে খাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে আমি
আমাদের শোবার ঘরে লালকাকাকে চিঠি লিখতে বসেছি—চিঠিখানা
শেষ করে, চা খেয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাব।

মালিন বলল, আমি ততক্ষণ লাউজে গিয়ে ‘চা’এর হুকুম দি,
তুমি চিঠিখানা শেষ করে লাউজে এস।

বললাম, বেশ। আমি মিনিট কুড়ির মধ্যেই আসছি।

লাউজ, অর্থাৎ সাধারণ বসবার ঘর, আমাদের শোবার ঘর থেকে
বেশী দূরে নয়—এক জলারই। ঘরটি বড় সুন্দর—দামী দামী
আসবাবে সাজান এবং পিছনের একটা বড় জানালা দিয়ে দূরে সমুদ্র
পরিদ্রার দেখা যায়। ঠাঁক পেলেই লাউজে বসতে আমাদের খুব
ভাল লাগে। এবং বিকেলের চাঁটা সাধারণত আমরা লাউজেই
আনিয়ে নিতাম। বেশী নয়, দু-একজন হোটেলবাসী মাঝে মাঝে
লাউজে থাকত—হয় কিছু পড়াশুনা করছে কিংবা এককোণে একটি
টেবিলে দাবাখেলায় ব্যবস্থা ছিল—তাই খেলায়। কিন্তু দেখা হলে
‘স্বপ্নভাঙ’ বা ‘তবসখ্যা’ জানান ছাড়া কেউ কারও সঙ্গে গায়ে পড়ে
আলাপ ক্রমাবার চোঁটা করত না।

আমার চিঠিখানা শেষ করতে প্রায় আর ঘণ্টার উপর
লাগল—ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে লিখতে হবে ত! চিঠিখানা
শেষ করে, শোবার ঘর থেকে লাউজের কাছাকাছি আসতেই
দেখতে পেলামি—মালিন ক্রতপক্ষে লাউজের ভিতর থেকে বেরিয়ে
এল—উত্তেজিত মুখে রক্তমাভা। আমি মালিনের কাছে
বাগটার সঙ্গে সঙ্গেই একটি পরিচারিকা খাবার ঘর থেকে
এগিয়ে এল মালিনের কাছে। মালিন তার দিকে চেয়ে বলল,
আমাদের ‘চা’ লাউজ থেকে শোবার ঘরে নিয়ে চল—
সেইখানেই চা খাব।

বেশ, বলে পরিচারিকাটি লাউজের ভিতর গেল চুকে। আমি
লাউজের দিকে চেয়ে দেখি—সেই লোকটা ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময়
যাকে তুমিন দেখেছি লাউজে পাড়িয়ে আছে—মুখে একটা বিকৃত
মুগার হাসি।

একখানি হাত দিয়ে মালিনের একটি বাহ জড়িয়ে নিয়ে গুথলাম
কি হল লীনা?

চলতে আরম্ভ করল। বলল, চল শোবার ঘরে—বলছি।

শোবার ঘরে গিয়ে চা খেতে খেতে খানককণ গজীরভাবে বইল
বলে। চা খাওয়া শেষ হলে আমায় গুথলাম, হল কি লীনা?

বলল, ঐ লোকটা—ইতর, আগেই বুঝেছিলাম, কিন্তু এত ইতর
তা জানতাম না।

গুথলাম, কেন?

একটু চুপ করে থেকে বলে যেতে লাগলো, বড়দুর্ন মনে
আছে বলি—আমি লাউজে গিয়ে দেখি—ঐ লোকটা একলা লাউজে
বসে চা খাচ্ছে, আর কেউ নেই। আমি ঢোকায়া হেসে আমার
কাছে এগিয়ে এসে আলাপ শুরু করল এবং আমি বসার পর
নিজেই চা নিয়ে এসে বলল আমার কাছে।

শুধালায়, তারপর ?

বলল, প্রথমটা ভুলভাবেই কথা বলছিল এবং আমিও ভুলতা বজায় রেখে বহুটুকু দরকার সেই ভাবেই ওর কথার জবাব দিচ্ছিলাম—এই যেমন চাকি কি রকম লাগছে, ইত্যাদি। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল—এ কাল লোকটি কি আপনার স্বামী? একটু রাগ হল। বাই হোক, গভীর ভাবে জবাব দিলাম—হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থেকে মার্গিন আমার বলল, ও লোকটি ভারতবর্ষীয় আমি জানি। বলল ও নিজেও নাকি ভারতবর্ষে গভর্ণমেন্টে কি বড় কাজ করে, ছুটি নিয়ে দেশে এসেছে। আমি আর কি বলব—চুপ করেই ছিলাম। হঠাৎ প্রশ্ন করল—আপনি কখনও ভারতবর্ষে গেছেন? সংক্ষেপে উত্তর দিলাম—না। আমার প্রশ্ন করল, কতদিন বিবাহ হয়েছে? ক্রমেই আমার রাগ বাড়ছিল। একটু রেগেই বোধ হয় বললাম, তা আপনার আমার বিষয় এত জানবার প্রয়োজন কি? বলে কি জান?

শুধালায়, কি?

মার্গিন বলল, বলে রাগ করবেন না। আপনি ভারতীয়দের চেনেন না—আমি চিনি। আপনি ত আমারই দেশের মেয়ে, তাই আপনার অবস্থার আপনার জন্ত আমার বড় দুঃখ হয়েছে। তাই এত খবর নিচ্ছি। এই বলে একটি হাত আমার হাতের উপর রাখল। সরিয়ে নিলাম।

বললাম, লোকটি ত ভীষণ ধারণা ?

মার্গিন বলল, তার পর শোন, নিজের মনেই যেন বলল—হার রে। আপনার মতন এমন একটি মেয়ে শেষে কিনা একটা অসভ্য ভারতীয়ের হাতে পড়ল—অসহ্য হল। উঠে কাঁদালাম। কড়া একটা কিছু বলেছিলাম—কি বলেছিলাম মনে নাই। ঘণ্টা বাজিয়ে পরিচারিকাকে ডেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম—এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা।

কথাগুলি শুনে আমি চুপ করেই বসেছিলাম। একটু পরে মার্গিন আমার হাত ধরে মুখ হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, ছুটি মন ধারণা কর না। ওটা কি একটা মাছুর! ওর কথায় কি এসে যায়।

* * * *

ব্যাপারটা কিছু সেইখানেই শেষ হল না। সন্ধ্যাবেলা ডিনারের পর লাউঞ্জে গেলাম—যেমন রোজই বাই। ডিনারের পর লাউঞ্জে গিয়ে বসে ককি খেতাম—পরিচারিকা সাজিয়ে ককি দিয়ে বেত—শুধু আমাদেরই নয়, হোটেলবাসীদের মধ্যে আরও অনেককে। এই সময়টা লাউঞ্জে একটু গুলফার হাট এবং হোটেলবাসীদের মধ্যে আলাপেরও সুযোগ ঘটত। এইভাবে প্রথম দিন সন্ধ্যার পরে একটি নম্পতিব সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল—মিঃ মিসেস গ্রীকিং। এরা দু'ক দু'জন, দু'জনেই মধ্যবয়সী। মিঃ গ্রীকিং বোধ হয়, মধ্যবয়সের সীম্যাটও গেছেন ছাড়িয়ে। এই নম্পতিটির জয়তা ও সৌন্দর্য আমার মুগ্ধ হয়েছিল।

আজ লাউঞ্জে বাওয়ার আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না—কি জানি সেই লোকটার সঙ্গে যদি আমার দেখা হয় সত্যকথা বলতে গেলে—ওর মুখ দেখার আর আমার ইচ্ছা ছিল না।

মার্গিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আজ বাবে লাউঞ্জে ?

প্রশ্ন করেছিল, কেন বাবে না ?

কি বলব—ইতস্তত করছি।

মার্গিন বলল, সেই লোকটার ভয় ? তাকে অবজ্ঞা করার শক্তি আমার আছে।

লাউঞ্জে গেলাম—গ্রীকিং-নম্পতিও ছিলেন। এক কোণে ককি নিয়ে বসে আমরা চারজন গল্প শুরু করলাম। আশে পাশে আরও দু-চারজন বসে ককি খেতে খেতে নিজেরদের মধ্যে গল্প করছে কিংবা খবরের কাগজ পড়ছে। সে লোকটা লাউঞ্জে নেই দেখে খুসী হয়েছিল।

আমাদের মধ্যে কথায় কথায় ভারতবর্ষের কথা উঠল। মিসেস গ্রীকিং আমার দিকে চেয়ে বললেন—আমার একবার ভারতে যেতে বড় ইচ্ছে করে। শুনেছি বড় সুন্দর আপনারদের দেশ—বকরকে স্থায়ী আশ্রয় চিরবসন্ত।

হেসে বললাম, সুন্দর নিশ্চয়ই তবে চিরবসন্ত নয়। গরমের সময় প্রখর তাপ অনেক সময় অসহ্য হয়ে ওঠে।

মিসেস গ্রীকিং বললেন, তাও শুনেছি বটে, তবে সেটা ত বছরের মাত্র কয়েকটা দিন।

বললাম, ভারতবর্ষের মজা কি জানেন? সেখানে সবরকম আবহাওয়া পাওয়া যায়। প্রখর গরমের সময় কোনও পাহাড় কিংবা সমুদ্রের ধারে গেলেই শরীর ঠাণ্ডা হয়।

মিসেস গ্রীকিং শুধালেন, গরমের সময়টা পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রের ধারে থুং ভিড় হয় বুঝি ?

বললাম, পাহাড় বা সমুদ্রের ধার ত একটা নয় অনেকগুলি আছে। এবং আমাদের দেশের সাধারণ লোক ত থুংই গরীব—সকলেই পাহাড়ে যেতে পারে না।

সেই লোকটি ইতিমধ্যে যে কখন ঘরে ঢুকে একটু দূরে পাড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল, টের পাইনি। হঠাৎ নেশায় অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল—শুধু গরীব নয়, অসভ্য জীবনে সভ্যতার আলো এখনও পেল না।

চেয়ে দেখি লোকটি একটি মদের গ্লাস হাতে পাড়িয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

এ কথা ত চুপ করে সহ্য করা চলে না। লোকটির দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম, আপনি আমার চাইতে ভারতের বিষয় বেশি জানেন দেখছি।

লোকটি হেসে উঠল। বলল, আমি দশ বছর ভারতে ইন্সপেক্টর পুলিশ সার্ভিসে আছি। আমি জানি না—কি রকম উল্লম্ব অবস্থায় আপনার দেশের লোকেরা বাস্তায় শুয়ে থাকে।

গ্রীকিং-নম্পতি বোধ হয় বিশেষ আগ্রহও বোধ করছিলেন। লোকটির কথা ধামিয়ে দিয়ে মিঃ গ্রীকিং বললেন—তা আপনি দ্বন্দ্ব করে চুপ করুন। আপনাকে ত কেউ আমাদের কথার মধ্যে কথা বলতে আমন্ত্রণ করেনি ?

লোকটি বলল, কিন্তু (আমাকে দেখিয়ে) এই লোকটি আপনারদের সুব ভারতের বিষয় যা-তা বুঝিয়ে দেবে আমি ভাতে বাঁধী দই। জানেন—আমাদের দেশের জন্ত কিনা করেছি, ওদের স্বাধীন করে তোলার জন্ত সভা করে তোলার জন্ত। অথচ ওরা এখন আমাদের শ্রম করছে—আমাদেরই ভাড়াতে চার। এত বড় অকৃতজ্ঞ ওয়।

মার্সিন বলল, ওরা যে আপনাদের তাড়াতে চাইছে— আপনাকে দেখে সেটা ত কিছু অজ্ঞার বলে মনে হয় না। খুবই স্বাভাবিক।

লোকটি বোধ হয় একটু যেনে পেল। মার্সিনকে বলল, তা আপনি ওদের বিষয় কি-ই বা জানেন। আমাদের সভ্যতার মুখোপরা একটিমাত্র লোক ত দেখেছেন জীবনে।

মার্সিন বলল, তা একটি মাত্র লোক দেখেই এটুকু বুঝতে পেরেছি—মাহুব হিসাবে আপনার মতন* লোকের চাইতে ওরা অনেক বড়।

লোকটি এবার সত্যিই যেনে গেল। বলল, আপনি চুপ করুন। আপনার সঙ্গে আমার কোনও কথা নাই। আপনার মতন মেয়েদের আমি ইংলণ্ডের কলঙ্ক বলে মনে করি।

সকলেই শব্দ হয়ে গেল। মার্সিনের দিকে চেয়ে দেখলাম— মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। আমারও রাগ হল। কি করি? একটা কিছু এখন আমার করা দরকার। উঠে গিয়ে লোকটার বুকের কোটটা ধরে বলা উচিত তোমার কথা এই মুহূর্তে প্রত্যাখ্যার কর—নইলে—। কড়া ভাবে কি একটা বলতে বাচ্ছি, এমন সময়

হঠাৎ মার্সিন উঠে পাঁড়াল। ভীষণতঃ বলল, এ ঘরে কি এমন একটি ইংরেজ নেই, যে মাহুব, যে এই ইস্তর লোকটার বর্বরতা সংহত করতে পারে? যদি না থাকে ত বুঝব ইংল্যান্ড মাহুব হারিয়েছে।

একটু দূরে একটি ইংরেজ যুবক একলা বসে কফি খেতে খেতে খবরের কাগজ দেখছিল। হঠাৎ সে উঠে দ্রুত এগিয়ে এল সেই লোকটার কাছে। পঙ্কীয়ভাবে বলল, আপনি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

মিঃ গ্রীকিথ ও আমি নিজদের আসন ছেড়ে উঠে পাঁড়লাম— এগিয়ে গেলাম লোকটির দিকে।

লোকটি মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, কেন? কড়াভাবে সেই যুবকটি বলল, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান— নইলে—

লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। তারপর কি ভাবল জানি না—টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। বাওয়ার সময় জড়িতকণ্ঠে বলে গেল—

তাই হোক। মিষ্টিমুখেরই জয় হোক।

[কম্পন:]

শেষ কথা

[Let us contend no more, love

Strive nor weep :

All before love,

—Only sleep. —R. Browning]

কথার পরে কথার মালা, কেঁদে কেঁদে চোখ,
অনেক খোঁজা অনেক খুঁজি, ভালবাসার তেঁতী
মিটলো না ত' মিটুক হাত যেমন ছিল থাক :
ঘুমের 'পরে ঘুম দিয়ে তাই সময় কেটে যাক।

অনেক কথা কইলে তুমি কথার চোঁচামেচি
আমার কথা, তোমার কথা, পাখীর কিতমিচি ;
কথার ছুরি শানাও পরে চোখের পানি চাও,
গাছের ডালে বাজর চোখে শিকার দেখে যাও।

সবাই ভাখ জমার ঘরে দুহায়ে দেয় খিল,
জামরা শুধু কথার পরে খুঁজি কথার মিল ;
বন্ধ কর বর্ণমালা কথার গালাগাল,
টোটির 'পরে টোটি রাখা আর গালের 'পরে গাল।

সত্যি বাহা তার চেয়ে কি মিথ্য—গাছে কিছু
মিথ্যা আছে তোমার কাছে, মিথ্যা শিছু শিছু।
গাছের ডালে সাপের বাসা, সাপের পাতে ধার,
কাজ কি গিয়ে গাছের ডালে নাই বা পেলো আর ?

গাছের ডালে কল পেকেছে টুকটকে রঙ তার,
চোখ দিও না, হাত দিও না, লোভ দিও না আর,
নইলে তুমি নইলে আমি স্বর্গে বাবার পথে
হারিয়ে যাবে হারিয়ে যাব পুঙ্খ প্রকৃতিতে।

সেবতা হ'রে মগ্ন গিরে মুগ্ধ কর মন,
মাহুব হয়ে জড়িয়ে লাও মধুর আলিঙ্গন।

কেবল প্রের ভালবাসা শুধু প্রেমের কথা
শিখিয়ে লাও শিখিয়ে লাও প্রেমের মধুরতা,
গাইবো আমি গাইবো তোমার প্রেম-রামায়ণ,
তাবো শুধু তুমি আমার প্রেমের নারায়ণ।

বা চাও তুমি তাই নিয়ে যাও আমার দেহ-মন,
সার্থক হোক তোমার পায়ে আত্মসমর্পণ।

ঘটবে হা হা ঘটুক তা কাল আজকে রাতে নয়,
হৃৎ ব্যথার বিদায় দিয়ে আজকে পরিণয়।

একটু কীদি কীদব আমি আমার বোকাবোত,
ঘুমাও শ্রিয়, হারিয়ে যাও, তোমার প্রণয়ীতে ॥

অনুবাদক—পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়



[Osamu Dasai's 'THE SETTING SUN'-এর জুহাব]

সপ্তম অধ্যায়

নাগড়ির জরানি

কাঁছকা

কোন লাভ নেই, আমি চললাম। কি উদ্দেশ্যেই বা বাঁচা—এ কথাই কোন হৃদয়সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না। শুধু বাঁচতে চাই, তাই থাক না বেঁচে। মাছের বেচে থাকার যেমন অধিকার আছে, হুতায়ও তেমনি অধিকার আছে।

আমার কথার মধ্যে নতুন নয়, চিরন্তন সত্য বাস্তব বললে ভুল হবে না। এ বায়বীয় যুগোন্মুখি পাঁচাতে মাছের ভয় হয়।

বাঁচা বাঁচতে চাই, শত বাধা সত্ত্বেও তাই যেমন করেই হোক বেঁচেই থাকে। এ তাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসনীয়, এবং হামব-জন্মের গৌরব বলতে একেই বোঝায়। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, দুত্যা পাণ নয়। আমাব মত কিশলয়ের পক্ষে এ ধর্মীয় আলো খাতাসে প্রাণ বাঁচানো অসম্ভব। আমার ভক্ত কিসের যেন অত্যাচার আছে। আচ্ছ অবশিষ্ট যে বেঁচে আছি এই আমার কৃত্তিম।

হাই ইমুলে ডুতি হয়ে প্রথম যখন আমাব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের সুস্থ সবল বহু-বাক্যের পাঁচায় পড়লাম, তখন তাল্লব কর্তৃকমতা দেখে আশ্চর্য্যের প্রচেষ্টায় আমাব নেশা ধরতে হল। সাতোশে দেশায় যোরে আমি তাদের আক্রমণ বোধ করলাম। পরে

সেনাবিভাগে ডুতি হয়ে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন স্বপ্নে আঁকি ধরি। কি তখন প্রবাহ, সে তুমি করনাও করতে পার না—নয় কি?

কক, শতি মান, না নৃশংস হতে সাধ গেল। ভাবলাম, এই একটি মাত্র রাস্তায় আমি নিজে আঁচকনের বহু দাবী করতে পারি। মদে ঠিক প্রবিবে হল না। সারাক্ষণ মাথা ঘুরত। সেইজন্ত নিরুপায় হয়ে নেশা ধরলাম। আমার পরিবার তুলতে হল। পিতৃরক্ত অধিকার করতে হোল। মায়ের শালীনতা প্রত্যাখ্যান করতে হল। ভগ্নী প্রতি দুর্ব্বলতা জয় করতে হল। ভাবলাম এ ছাড়া সবার মাঝে টাই মিলবে না।

আমি বস্ত্র হয়ে উঠলাম। অভব্য ভাষা ব্যবহার করতে শিখলাম। কিন্তু এর অর্ধেকটা, না—শতকরা বাট ভাগই দুর্ব্বল অভিনয়। হীন প্রবঞ্চনা মাত্র। সাধারণ লোকের সঙ্গে আমি এত উদ্ধত ব্যবহার করতাম যে, আমাবের উল্লাসিক ব্যবহারে সবাই কেঁপে যেতো। আমার তারা কোনদিনও ভাণ চোখে দেখেনি। অন্তরিকে আবার যে সব শিল্পী সাহিত্যিক বহুদের আমি একদিন বেছায় বর্জন করেছি, তাদের কাছে ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। আমার মধ্যে আরাসলজ এই দৃষ্টিভঙ্গি শতকরা বাটভাগ হলও, বাকী চল্লিশভাগের মধ্যে কোন ভেদালা নেই। উচ্চশ্রেণীর চূড়ান্ত ভাবতা আমার আর এক মিনিউও বরলাভ হয় না। সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমাজের শীর্ষস্থানীয় বাবা, তারা আমার নিম্ননীর ব্যবহার ক্ষমা করবেন না, এবং শীঘ্রই তাদের 'মহল থেকে আমার বিতাড়িত হতে হবে। যে ছলনি আমি বেছায় জ্ঞাপ করে এসেছি, সেখানে আবার ফিরে যাওয়া চলে না। অথচ নীচের মহলের এরা আমার (বদ্ব করে বিনয় দেখিয়ে) দর্শকের আসনে ঠেলে রেখেছে।

যে কোন সমাজে আমার মত এমন জীকীর্ণাভিহীন জাতি বহুল চরিত্র দেখা যায়; কিন্তু যতামত, অথবা অন্ত কোন কারণে এরা মরে না, নিজেবাই এরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। ঘটনা পরিবেশের প্রোণাত্তকর পরিচ্ছেদই আমার জীবন ধারনের পক্ষে প্রধান অন্তরায়।

সব মাছইই সমান।

চরিত্র দর্শন একেই বলে। না জানি কোন দার্শনিক অথবা দিল্লী এই অতুলনীর অভিব্যক্তি করেছিলেন। বলবার আগেই বোধ হয় এই কীট কোন মাতালের আত্মজাখানা থেকে বেরিয়ে সমস্ত তত্ত্বনু করে এ পৃথিবীর মাধুরী পোষণ করে নেয়।

এই অদ্বুত দর্শনের সঙ্গে গণতন্ত্র অথবা রাজ্যবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। অকারণে মনের ঠোঁকে কু-লোকের দৃষ্টির প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি করে। কেবল বিবিজি হরত হিংসাই এর কারণ কোন আদর্শের প্রতি এর আশ্রয় লক্ষ্য ছিল না।

কিন্তু সাধারণ এক ভাতি থানার তিলোর জালায় যে ক্ষতবোয় দূর-পাত, জনসাধারণের ভেতর সর্গোবরে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে শাস্ত্রের রূপ নিল। গণতন্ত্র অথবা রাজ্যবাদের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক ছিল না। দেখতে দেখতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দূর জলির সঙ্গে বোলাবোলা স্থাপন করে সে এক অবিদ্যাত রকম বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করল।

আমাব মনে হয় এই অসম্ভব উত্তির এ মনে বিরাট ভগ্নাভবে 'সেকিউ' স্বয়ং বিচলিত হ'তেন।

সব মাছইই সমান।

কত হীন এই মন্তব্য। এ উক্তির নিষ্পত্তি গ্রামির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মনুষ্য জাতির অধঃপতন। সকল গর্বের অবসান। সকল উত্তমের উচ্ছেদ।

মাত্র বাদ শ্রমিকদের প্রাণান্ত ঘোষণা করে কিন্তু এ কথা বলে না যে, সব মানুষই সমান। গণতন্ত্র ব্যক্তিগত মর্যাদা স্বীকার করে কিন্তু একথা বলে না যে, সব মানুষই সমান। অপনর্ভ শুধু একথা প্রচার করে যে, যত উঁচু দরের মানুষই হোক না কেন, সে মানুষই।

আর সকলের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই।

কেন বলবে 'সমান'? 'উন্নততর' বলতে পারে না? এই হ'ল দাসমনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়া।

অত্যন্ত অসত্য ও ঘৃণ্য এই উক্তি। আমার ধারণা—‘এ যুগের বাস্তব উদ্বেগ’—পরশুরের প্রতি আতঙ্ক, নৈতিক অবনতি, উৎসাহিত উত্তম, প্রবলিত স্বথ, সৌন্দর্যের অন্তর্ভিকরণ, সম্মানের অধঃপতন—এ সকলের সূত্রপাত এই অবিদ্যাত অভিযান্ত্রিক থেকে।

এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই উক্তির কদর্যতাকে আমি ভয় পেয়েছিলাম। মর্যাহত, বিব্রত হয়ে আমি সারাক্ষণ উদ্বেগে কাটাতেম এবং আমার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হ'ত। মদ এবং বিবাক্ত মাদক দ্রব্যের গুণে যে ক্ষণিকের বিশ্রাম আমি পেতাম, তা অপরিহার্য হয়ে উঠল। নেশা কেটে গেলেই সব গোলমাল ঠেকত। আমি দুর্বল একথা সত্যি। কোথার একটা মন্তব্য বড় কঁক রয়ে গেছে। আমি যেন চুনতে পাই যে এক জলী বুড়ো ঘোরাই টোট বৈকিয়ে আমার বিবর বসছে—এতো মাথা বামাবার কি আছে? সবাই জানে ছেলোবোলা খেঁকেই ও একটা কুঁড়ে, কামুক, বার্থপর, নষ্ট ছেলে। এখন পর্যন্ত লোকমুখে এ মন্তব্য শুনে অপ্রসন্ন হয়ে মাথা হেঁট করেছি, কিন্তু আজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বাব।

কাজুকো। আমার বিশ্বাস করে। আমোদ আচ্ছাদে কখনও তৃপ্তি পাইনি। সম্ভবতঃ এ থেকে ভোগবিলাসের অসারতাই প্রমাণিত হয়। আমি বনেনী ঘরের ছেলে; এই 'আমি'র মত থেকে পালিয়ে বেড়াবার আশায় দুর্বল উদ্ধতলভার মধ্যে ডুবে থাকতাম।

জানি না এর জন্য আমাদের বাস্তবিকই দায়ী করা যায় কিনা? যে পরিবারে জন্মেছি, তার জন্য কি আমরা দায়ী? কেবলমাত্র পারিবারিক অবস্থার জন্যই কি ইহুদিদের মত সারা জীবন আমাদের মাথা নীচু করে সদ্যোকে অপমানের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে?

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। কিন্তু সবের উপরে একটা জিনিষ ছিল—মা'র ভালবাসা। সে কথা মনে করে আমার এতকাল মরা হয়নি। একথা ঠিক যে, স্বাধুবেষ যেমন করে স্বাধীনভাবে বাচার অধিকার আছে, তেমনি ইচ্ছা মত মরতেও বাধ্য নেই; তবু মা বতর্নির জীবিত ছিলেন ততদিন বেচ্ছায়ত্বকে জোর করে ছুঁয়ে ঠেলে রেখেছিলেন, কারণ জানতাম আমার ইচ্ছা পূর্ণ করা মানে মায়ের হৃদয় ডেকে আনা।

আমি জানি আমার মৃত্যুতে কারুর শারিরিক ক্ষতি হবে না। না কাজুকো, তোমার কত কষ্ট হবে আমি তা জানি। আমি জানি তোমার মত ভাবপ্রবণ স্বভাব আমার মৃত্যুসংবাদ কি দারুণ আঘাত দেবে। কিন্তু লক্ষী বোন আমার, ভেবে জাখো ঘৃণ্য জীবনের অঙ্গ বক্ষা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যে আনন্দ তাকেই আমি বেচ্ছায় বরণ করছি। একথা ভেবে তুমি শান্তনা পাবে।

যে ব্যক্তি অল্পকল্পা ভরে আমার আত্মহত্যার প্রতি কটাক্ষ করে (সাহায্যের জন্য হাত না বাড়িয়েই) বলবেন যে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আমার বেঁচে থাকাই উচিত ছিল, তিনি অতিমানব; যখন সন্ধ্যাকণ্ড ফলের দোকান দেবার পরামর্শ দিতে তাঁর গলা কাঁপবে না।

কাজুকো, আমি মরে যাঁচব। বেঁচে থাকার শক্তি আমার নেই। টাকা নিয়ে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করার ক্ষমতাও নেই। লোকের কাছে হাত পাতা আমার দ্বারা হবে না। এমন কি মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে বখানই মদ খেতে গিয়েছি, আমার ভাগের দাম আমিই দিয়েছি। আমার এই ব্যবহারের তিনি অত্যন্ত নিন্দা করতেন। বলতেন—এ আমার সম্মান বনেনী চাল ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ঠিক অহঙ্কারের বেশ আমি এ কাজ করতাম না। তাঁর উপার্জিত অর্থে মদ খেতে বা মেয়েমানুষ নিয়ে ফুটি করতে আমার ভয় হত। মিষ্টার উয়েহারার লেখার প্রতি সম্মান দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। বাইরে আমি এমনি ভাব দেখাতাম, কিন্তু সেকথা মিথ্যা। কেন যে করতাম নিজেই জানি না, শুধু বুঝতাম অপর কেউ আমার হ'য়ে দাম দিয়ে দিলে অবশিষ্ট লাগে। বিশেষতঃ আর কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থে আমোদ-আচ্ছাদ করতে রীতিমত ঘৃণা বোধ হ'ত।

আমার নিজের ঘর থেকে টাকা নিয়ে মাকে ও তোমাকে কই দিয়ে ক্ষুধিত করেও স্বথ পাইনি এক তিল। আমার এই অর্থাত্মিক অবস্থা গোপন করার ইচ্ছায় 'প্রকাশনা' কারবারের চিন্তা করি, নতুবা মন থেকে আমার আদৌ এ ধরনের কোন ইচ্ছা ছিল না। শত নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে এটুকু বুঝতাম যে, যে ব্যক্তি এক গেলান মদ পর্যন্ত পরের অর্থে খেতে নারাজ, তার দ্বারা আর বাই হোক ব্যবসা করা চলেবে না। স্মরণ্য সে চেষ্টা বুঝ।

কাজুকো, আমরা গরীব হয়ে গেছি। আমাদের বখান অবস্থা ভাল ছিল, তখন মর্দঙ্গা অপরের জন্য খরচ করতে চাইতাম; কিন্তু এখন আমাদের খরচ অন্তরের চালাতে হবে।

কাজুকো, এর পর বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। বুঝ। আমি মরছি। আমার কাছে একটা বিব আছে, বা খেলে মৃত্যুকালে কোন বাতনা হয় না। সৈন্ত বিভাগে চাকরি করার সময়ে আমি এই বিব সংগ্রহ করে রেখেছি।

কাজুকো, তুমি সুন্দরী। (বরাবর আমার সুন্দরী মা, বোনের জন্য মনে মনে গর্ব ছিল) তুমি বুদ্ধিমতী। তোমার বিষয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। দুশ্চিন্তা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। যে দল্ল্য তার শিকারের শোকে অপ্রসন্ন হয়, তার মত শুধু আমি লক্ষিত হতে পারি মাত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি বিয়ে করে সুখী হবে, তোমাদের সম্ভানাদি হবে এবং তোমার স্বামীর ভেতর দিয়ে তুমি নতুন করে যাঁচবে।

কাজুকো, আমার একটি গোপন কথা আছে। বহুকাল আমি একে গোপন করে রেখেছি। এমন কি যুদ্ধে গিয়েও আমি সে কথা ভুলতে পারিনি। আমি সেখানেও তার স্বপ্ন দেখতাম। কতবার বে রেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। ঘুম ভেঙ্গে গেলে টের শোতাম যে, ঘুমের মধ্যে আমি কেঁদেছি।

কারণ কাছে আমি তার নাম বলতে পারি নি। কিন্তু এখন

বুড়ুর সামনে ঝাঁড়িয়ে তোমাকে, আমার প্রাণসমা ভগিনীকে একথা জ্ঞানিনো প্রয়োজন বোধ করছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আলও তার নাম করতে ভয় পাই। তবু মনে হয় যদি আমার মনের কথা বাইরের লগ্নতের কাছ থেকে গোপনে বুকে চেপে মরি, তবে কবরের নীচে আমার পাঁজরের ভেতরটা আঁধা বলসানো, স্যাঁৎস্যাঁতে রয়ে যাবে। একথা ভেবে এত অশান্তি পাই যে তোমাকে, শুধু তোমাকেই একথা বলে বাব, এমন খাপছাড়া ভাবে বলব যেন আর কারও বিবরে গল্প করতে বসেছি। আর আমি একে তৈরী গল্প বললেও তুমি নিশ্চয়—তখনই বুঝবে কার বিবরে কথা হচ্ছে। ঠিক গল্প না বলে একে ছদ্মনামের স্বপ্ন আবরণও বলা চলে।

হঠাৎ মনে হল—তুমি কি আগে থেকে সব জান? হতে পারে তুমি তাকে কখনও চোখে দেখনি, তবু সে তোমার অতি পরিচিত। তোমার চেয়ে সামান্যই বড় হবে সে। তার চোখ ছুটি বাদামের আকারের, পুরোপুরি আমাদের জাপানী বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরী। তার সুরীষ চুলের তার (কখনও বা' কেশকুকন বস্ত্রের সম্পর্কে আসে নি) সেকলে জাপানী কারদার শক্ত করে মাথার পেছনে টেনে বাঁধা। পোষাক অভ্যস্ত খেলো, কিন্তু ধবধবে পরিষ্কার এবং অতি পরিপাটি করে পরা। মুক্তোভর কোন এক নতুন আঙ্গিকে পর পর অনেকগুলি ছবি একে নাম করেছিলেন—মহিলা তাঁরই স্ত্রী। চিত্রকর অতি লম্পট, বর্বর স্বভাবের মানুষ, কিন্তু স্ত্রীর স্বভাব অতি শান্ত, মধুর, হৃদয়ঙ্গমিক দেখে মনে হয়, স্বামীর দুর্ভাবতার তাকে স্পর্শও করতে পারে না।

সেদিন আমি উঠে ঝাঁড়িয়ে যেই বলেছি—এবার তবে আসি।—দেখি সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে ঝাঁড়িয়ে আমার পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করল। অসত্যাতে মুখের পানে চেয়ে প্রেম করল,—কেন যাবে? তার কঠোর অবিকলিত শাস্ত। মাথাটি একপাশে ঝুঁকিয়ে অকৃত্রিম সন্দেহভরে সোজা চোখের দিকে চেয়ে প্রেম করল। তার চোখে না ছিল বিদ্বেষ, না ছিল আত্মগোপনের প্রয়াস। সাধারণতঃ তার চোখে চোখ পড়লে আমি সন্দেহেতে দৃষ্টি সরিয়ে নিই, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল। প্রায় বাট সেকেন্ড বা তার চেয়েও বেশী সময়, তার মুখের মাত্র একফুট দূর থেকে সেই অপরূপ ছুটি চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে কোন এক অসীম সুখসাগরে ডুবে গেলাম। শেষ পর্যন্ত হেসে ফেললাম—কিন্তু—

তার মুখের ওপর গাভীঘোর ছায়া নেমে এল—ওঁর আসার সময় হল।

হঠাৎ মনে হল সেই মুখে একটি মাত্র শব্দ জাঁক আছে,—সোটি হল—তচ্চি। জানিনি। শবটের স্বার্থ সজ্ঞা পৃথিবীজমাধা কঠিন কর্তার, অথবা এই অপরূপ স্থাভিব্যক্তির মত পরম মধুর।

আমি আবার আসব।

এল।

আগাগোড়া আমাদের কথাবার্তা একবারেই অব্যবহা ছিল। প্রায়ের এক সন্ধ্যায় আমি চিত্রকরের বাড়ী গিয়ে দেখি তিনি নেই, যে কোন মিনিটে এসে পড়ার কথা। তাঁর স্ত্রী আমার অপেক্ষা করতে বসলেন এবং আমি আঁধাট্টা বসে বসে পত্রিকার পাতা

উচোলায়। এর পরেও যখন দেখলাম ওঁর ফেরার কোন লক্ষণ নেই, তখন আমি উঠে পড়লাম। বিলায় নেবার অবকাশমাত্র, বাস তার বেশী কিছু নয়, কিন্তু এতই মধ্যে সেদিন তাঁর চোখের দিকে চেয়ে আমার মরণ হল।

সে চোখের ভাবার এমন কিছু ছিল, যা দেখে তাকে মহীয়সী বললেও ভুল হবে না। আমি শুধু জোর গলায় বলতে পারি যে, একমাত্র আমাদের মা জননীকে বাদ দিয়ে, বাকী উচ্চকুলোদ্ভব বাসের মধ্যে আমার তোমার বাস, তাদের একজনের পক্ষেও এ হেন 'সত্যতা'র অসতর্ক অভিব্যক্তি সম্ভব নয়।

এর পর এক সীতের সন্ধ্যায় তার পাশ ফেরানো মুখের সৌন্দর্য আমার ভাবাবেগে আগ্রস্ত করে।

সেদিন সকাল থেকে শিরীর ঘরে বসে আমরা মদ খেয়ে তথাকথিত জাপানী সংস্কৃতির ধ্বংসাত্মক সমাজকে গালাগাল দিয়ে হৈ হৈ হাসি ঠাট্টায় ভুবেছিলাম। একটু পরে শিরী ঘুমিয়ে নাক ডাকাতে লাগলেন। আমারও তন্দ্রা আসছিল, এমন সময়ে কে যেন আমার গায়ের ওপর একখানা কবল ছুঁড়ে দিল। আমি আঁধাখানা চোখ খুলে দেখি, মেয়ে কোলে জানালার ধারে বসে তদার হ'য়ে টোঁকিওর আকাশে সীতের নীল রং ধরা দেখছে। দূর নীলিমায় পটভূমিতে তার পরিচ্ছন্ন নিধুঁত মুখের ছায়া বেনেসা। যুগের ছবির মত অপূর্ণ উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। আমার গায়ে কবলটি ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে কামগন্ধ বিবজিত মমতার স্পর্শ পেলাম। সেই ভুলভ্রম ভ্রমটিতে 'মানবতা' শব্দটি ব্যবহার করলে ভুল হ'ত না। কি সে করছে, সে সবকিছু নিজেই সচেতন ছিল না, শুধু একটি মানুষের প্রতি মরদের প্রকাশ মাত্র, তার পর বাইরের শাস্ত আকাশের দিকে চেয়ে ছবির মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

আমি চোখ বুজে পড়ে রইলাম। আমার দেহের ভেতর দিয়ে প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার তীব্র প্রবাহ বয়ে গেল। চোখের পাতা ভেদ করে কান্না বয়ে পড়ল, আমি কবল টেনে মাথা চাপা দিলাম।

কাঁজকো, প্রথম প্রথম আমি যখন শিরীর বাড়ী যেতাম তাঁর কাজের নিজস্ব আঙ্গিক এবং দুরন্ত আবেগ আমার সম্মোহিত করেছিল, কিন্তু ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হবার পর, তাঁর শিকার অভাব, দায়িত্বহীনতা, তাঁর অপরিচ্ছন্নতা আমার মোহ ভেঙ্গে দিল। তাঁর স্ত্রীর অপূর্ণ মধুর স্বভাব আমার দুর্বার বেসে অপর দিক থেকে টানতে লাগল। না, এক অকৃত্রিম মমতাস্বাদ আমায় পাগল করে তুলল। শুধু একবার চোখের দেখা দেখব—এই আশায় আমি শিরীর বাড়ী যেতাম।

আমার দুট বিবাস যে, এই চিত্রকরের ছবির মধ্যে যেটুকু মানুষের স্পর্শ পাওয়া যায়, সে শুধু স্ত্রীর সুকুমার চরিত্রের দ্বারা মাত্র।

এবার আমি আমার মনের বীণাটি কথা খুলে কলব এই হাতাল, লম্পট চিত্রকর অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবাসী। যখন তাঁর টাকার প্রয়োজন হয়, তখন চলতি ঢা-এ ছবি একে, নিজেকে মস্ত শিরী বলে লোকের মনে ধাঁধা লাগিয়ে, প্রচণ্ড দামে হাটোকে এক আঁধাখানা ছবি বাজারে চালিয়ে দেন।

বিদেশী বা জাপানী চিত্রকরের অকন পদ্ধতি সবকিছু ভুললোকে হরত কোন ধারশাই নেই এবং নিজে কি জাঁকেন, তাও হরত ট্রি

বোধেন না। যেট কখা, টাকার টান পড়লে ভদ্রলোক পাগলের মত কানুজাসে হু বোলান।

আত্মচর্যের বিষয় এই যে, নিজের অল্প ছবিগুলো সবচেয়ে ভদ্রলোকের মনে আসে। কোন দুশ্চিন্তা, লজ্জা, ভয় কোনটাই নেই। উন্টে তা নিয়ে মনে মনে অহঙ্কারই আছে। যে নিজের কাজই বোঝে না, সে অপরেট। কি বুঝে? বোঝা বুঝে থাক, ভদ্রলোক খালি অন্তের কাজের খুঁৎ ধরে বেড়ান এবং গালমন্দ করেন।

যেট কখা, অযোগ্যতা জীবনের মল ভুগতে হচ্ছে বলে পাড়া ফাটিয়ে আক্ষেপ করে। বেড়ানো ভদ্রলোকের স্বভাব, কিন্তু বাস্তবিকই তিনি গেরো তুত ছাড়া আর কিছুই নন নেহাৎ বড় সহরে এসে আশাভীত সাক্ষ্যে জীবন যন্ত্র হয়ে গেছে। তাঁর অহমিকা এমন চরমে উঠেছে যে, একটি একটি করে সংসারের সব রকম রস চেষ্টে বেড়াচ্ছেন।

একবার আমি তাঁকে বলেছিলাম, যখন আমার আর সব বন্ধুবান্ধব ক্ষুণ্ণি মেরে বেড়াচ্ছে। তখন একা বলে পড়া শোনা করতে এত ভয় করে যে, কিছুই এগায় না। সেই জন্ত ইচ্ছে না থাকলেও অনেক সময়ে ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে যেতে হয়।

শ্রোত ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—কি? বুঝছি, যত সব বড়মুখেরা চাপ স্তনলে গা জলে যায়। কয়েক জন লোক মিলে হুলা করে ছেলে আমায় তো আক্ষেপের অন্ত না, না জানি কত কি মজা লুটে নিচ্ছে, আমি বুঝি মাঝে থেকে কাঁকে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাদের মধ্যে বাঁপিয়ে পড়ি!

জবাব শুনে বিতৃষ্ণার মন ভরে গেল। তাহলে নিজের এই ব্যতিক্রান্তিতার পেছনে এতটুকু অশুশোচনা যাত্র নেই।

উন্টে তিনি বুদ্ধির সংস্পর্শে বিবর্তিত এই আনন্দের বড়াই করেন। একেই বলে সুবিধাবাদী গদর্ভ।

এই শিল্পীর নামের পেছনে আরও অনেক নিষ্ঠুর বিশ্লেষণ বোগ দেওয়া যায়, কিন্তু কি হবে আর? তাঁর সঙ্গে তোমার কি বোগ তাছাড়া যুতার মুখে ঝাড়িয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতার কথা মনে পড়ছে এবং তাঁর জন্ত হঠাৎ বুকের ভেতরটা এমন মোচড় দিয়ে উঠেছে যে, এখনি ছুটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আর একবার মল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভদ্রলোকের অনেক ভাল গুণও আছে। থাক তাঁর কথা, আর নয়।

শুধু তোমার জানিয়ে বাব দিনের পর দিন তাঁর গ্রীষ্ম জন্ত নিফল আকাঙ্ক্ষায় কেমন জলে-পুড়ে মরেছি। ব্যস্ এতটুকু।

কিন্তু একটা কথা, এর পর ভূমি যেন তোমার ভাই-এর 'মনকাম পূর্ণ' করার আশায়, জীবিতকালীন এই ব্যর্থপ্রেম যরণের পর কাঁদর ঘরে পৌঁছে দিয়ে দিয়ে এস না। ভূমি তো জানলে, জেনে মনে বললে—ওঃ তাই বুঝি? এই ব্যাপার? সেই যথেষ্ট। তাছাড়া এই লজ্জাকর অপরাধের গ্রানি অন্তত তোমার কাছে স্বীকার করলে, ভূমি বুঝলে আমার জন্তর দহন ছালা—এই আমার একমাত্র সাধনা।

একবার বন্ধ দেখলাম আমি তাঁর গ্রীষ্ম হাত ধরে আছি, তখনই বুঝলাম, অনেক দিন আগেই আমি তার হৃদয়ে স্থান পেয়েছি। যুগভঙ্গার পর কিছুক্ষণ অবধি তার কনস্পিগের উদ্ভূত আমার হাতে জড়িয়েছিল।

মনে মনে বললাম—এইটুকুই আমার পাওনা, এর বেশি কিছু নয়। এ বিষয়ে নৈতিক তীতি আমার ছিল না, কিন্তু

এ অর্জুন্য, এই বিকারপ্রসূ শিল্পকে মনে ভয় শেতায়। তাকে তুলতে চেয়েছিলাম। হৃদয়ের ছালা পাত্রাভূত করার আশায় আমি—হৃদয়ের কাছে যা পাওয়া যায়, তেমনি মেয়েমানুষ নিয়ে হারান্নক রকম লাম্পট্যে যেতে হইলাম। এমন বাড়াবাড়ি শুরু করলাম যে একবারে স্বয়ং শিল্পী পর্যন্ত আমার প্রতি বিরক্ত হইলেন। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। আমার মত মানুষ হ'বার প্রেমে পড়ে না। হলক করে বলতে পারি যে, আমার পরিচিত কোন মেয়ে তার মত এত সুন্দরী, এমন প্রেমময়ী ছিল না।

কাজুকো, যুতার আগে একবার তার নাম লিখে বাব।

সুগা। এই তার নাম।

গতকাল আমি এক নর্ভকীকে (আকাটী মুখ) এখানে এনেছি, যার প্রতি কথাবার্তা হুর্সলতা আমার নেই। ঈগগিরই মরতে হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম, কিন্তু আজ সকালেই চলে যাব—এমন কথা ভাবিনি। মেয়েটিকে আজ তোরে এখানে আমার কারণ, যে সে পাড়ী করে বেড়াতে চেয়েছিল, আমিও টোকেও সহরের অন্যতরে লাল হয়ে দিন দুইয়ের জন্য বোকা মেয়েটির সঙ্গে এখানে জড়িয়ে যেতে চাইলাম। জানতাম তোমার খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু তবু হ'জনে শেব পর্যন্ত চলেই এলাম। ভূমি হেই টোকেও চলে গেলে, অমনি মনে হ'ল এই তো সুযোগ। আগে মনে করতাম আমাদের নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই নিজের ঘরে শেব নিঃশাসটুকু কেলে বাব। পাচজনের আড্ডাখানার যুতা হ'লে তার পর বেশে এসে আমার সহ স্পর্শ করবে—একথা ভাবতেও মন বিবিরে উঠত। কিন্তু আমাদের নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ী বৈহাত হ'য়ে গেছে, এখন এখানেই ছা বরণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

তা সত্ত্বেও যখনই মনে হ'ত আমার মুতমেহ তোমারই হাতে পড়বে এবং ভূমি কতদূর বিচলিত হবে, তখনই যুতা সন্ধ্যা হিব এসেছে এবং হরত শেব পর্যন্ত মরা আমার হ'ত না।

কিন্তু আজ পেয়েছি অপূর্ণ সুযোগ। ভূমি এখানে নেই। আজ একটা নিরেট বোকা নাচওয়ালা—আমার আত্মহত্যার একমাত্র সাক্ষী। গত রাতে একদে খাওয়া দাওয়া সেরে তাকে ঘোড়ার ঘরে ভাইয়ে দিহর এলাম। আমি নীচে এসে মা যে ঘরে মারা গিয়েছিলেন, সেখানে আমার বিছানা পেতে নিলাম। তার পর এই ইতিবৃত্ত লিখতে বসছি।

কাজুকো।

আর কোন আশা নেই। বিদায়।

শেব বিশ্রবণে এই ষ্ট্রীটার যে, আমার যুতা বাস্তবিক। শুধুমাত্র আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা অসম্ভব। একটা অমরোহ করতে ভারী সম্ভেচ হচ্ছে। মনে আছে, মায়ের একখানা তসরের কিমদো, আসছে গ্রীষ্মে আমার কাজে লাগবে ভেবে ঠিক করে রেখেছিলে? সেখানা আমার কবিনে দিয়ে দিও। সেখানা আমার গারে দেবার সাধ ছিল। রাত শেব হয়ে এল। তোমার অনেকক্ষণ ভোগলাম। বিদায়।

আমার গতরাতে মনের নেশা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। শেব সময়ে আমি শান্তভাবেই মরব।

বিদায়, আবার বিদায়।

কাজুকো!

শেব পর্যন্ত আমি আমার বড় ঘরের রক্তের মর্দাখা গিরে গেলাম।

অষ্টম অধ্যায়

তমসা

একে একে সবাই আমায় ছেড়ে গেল।

নাওজির সুফার পর এক মাস আমি দেশের বাড়ীতে থেকে সমস্ত দেখাশোনা করলাম। তার পর হতাশায় বুক ভরে মিষ্টি উয়েহারাকে জিটি লিখলাম।

মনে হচ্ছে আপনিও আমার ত্যাগ করলেন। না, বোধ হয় ক্রমশঃ আমার ভুলতে বসেছেন। কিন্তু আমার আর কোন দুঃখ নেই। এতদিনে আমার সাধ মিটেছে, আমি সন্তানের মা হতে চলেছি। আজ সব হাসানোর দিনে, সব পাওয়ার আনন্দ বয়ে এসেছে আমার ভেতরের ক্ষুদ্র প্রাণটুকু।

একে আমি 'চরম ভাষ্টি' বা এ জাতীয় কিছু বলে বীকার করব না। আজ আমার কাছে দুনিয়ার বা কিছু ব্যাপার যুদ্ধ, শান্তি, লস, বাণিজ্য, রাজনীতি ইত্যাদির রহস্য ঘুচে গেছে। সম্ভবতঃ আপনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি আপনাকে এ সবের কারণ বলছি শুধু—যুগে যুগে নারী সবল শিশু জন্ম দেবে বলে।

প্রথম থেকেই আপনার চরিত্র ও দায়িত্বজ্ঞানের উপর আমার বিশেষ আস্থা ছিল না। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আমার এই একাগ্র প্রেমের অভিযানে জয়লাভ করা। এখন, যখন বাসনা চরিতার্থ হয়েছে, গভীর অরণ্যে শুক জলাভূমির মত আমার হৃদয়ও শান্তিতে ডুবে উঠেছে। আমি জানি, আমারই জয়। কেবলমাত্র মাতৃহৃদয়ের গর্বে মেরী ও তাঁর সন্তান দেবরাতা ও দেবশিশুর আসনে অধিষ্ঠিত।

আশা করি, আমাদের শেষ দেখা হবার পর আপনি পূর্ববৎ নর-নারী পরিবেষ্টিত হয়ে গিলোটিন, গিলোটিন স্তর সহযোগে স্তরার বস্তার ভেতর দিয়ে অধঃপতনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন।

এ নারকীয় জীবনধারা পরিবর্তিত করুন, একথা আমি বলব না। সম্ভবতঃ আপনার শেষ সংগ্রাম এই পথেই চলবে।

মদ খাওয়া ছেড়ে দিন, নিজের স্বাস্থ্যের নিকে তাকান, দীর্ঘায়ু হোন। আপনার অপূর্ণ শিল্পসমৃদ্ধ জীবনের দায়িত্ব পূর্ণ করুন। বা এই জাতীয় কোন ভণ্ড অমুজ্ঞা করার আমার একেবারেই ইচ্ছা নেই।

বস্তুতঃ জানি আপনার অপূর্ণ সমুদ্র জীবন এর নয়, আংগামী দিনের মানুষ আপনার নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের জন্তই আপনাকে মনে রাখবে বেশী।

বলিদান। এরা সব কালের বিবর্তমান নীতিবোধের যুগকাঠে বলিদান মাত্র।

জগতের কোথাও একটা বিপ্লব অবশ্যই ঘটে চলেছে, কিন্তু চিরন্তন নীতিজ্ঞান আজও অব্যাহত অবস্থায় আমাদের চতুর্দিকে বিরাজ করছে এবং আমাদের অগ্রগতির পথ আগলে বসে আছে।

সমুদ্রের উপরিতলে উত্তাল জলতরঙ্গের খাত প্রতিধাত হয়ে চলেছে, কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে এর আঘাত পৌঁছয় না। সেখানে বুকের তান করে জলধি নিশপকে কালের পদধ্বনি গুনছে।

কিন্তু বোধ হয় আমার এই বোগাযোগের পূত্রপাত দ্বারা আমি প্রাচীন বিধিনিষেধ বংশীয়মাত্র উল্লঙ্ঘন করতে পেরেছি এবং আমার ভাবী সন্তানের হাত ধরে দ্বিতীয়, তৃতীয়তম যুদ্ধে অগ্রসর হব।

আমার প্রেমামাদের সন্তান গর্ভে ধারণ করে থাকে মানুষ করে তোলাই হবে তথাকথিত নীতিবোধের বিরুদ্ধে অভিযান।

আপনি আমার ভুলতে পারেন, মনের পক্ষ ডুবে আপনার হৃদয় হতে পারে, কিন্তু এ দুঃখ অভিযানের সার্বকতার আমার দেহ মন পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

অল্প কিছুকাল আগে আমি একজনের কাছে আপনার চারিত্রিক অপদার্থতা সবক্ষেত্রে অবহিত হয়েছি। বাই হোক আপনি আমার শক্তি দিয়েছেন, আপনি আমার অন্তরে বিদ্রোহের হামধ্বু এঁকে দিয়েছেন। আপনি আমায় বৈদে থাকার উপাদান জুগিয়েছেন। আপনার সবক্ষে আমার মনে যে গর্ভ আছে, তার বীজ আমি সন্তানের মধ্যেও বপন করে দেব।

জারজ সন্তান ও তার মা ! *

সুখের মত প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। আপনি আপনার সংগ্রাম চালিয়ে যান।

এ বিপ্লবের শেষ নেই; বহু, বহুতর অমূল্য প্রাণ এর পায়ে বলিদান করতে হবে।

বর্তমান যুগে সৌন্দর্যের প্রতীক যদি কিছু থাকে, তা এ'র অসংখ্য নরবাল।

আরও একজন এই যুগকাঠে আবদ্ধ আছেন—তাঁর নাম মিষ্টার উয়েহার।

আর আপনার সমুদ্রে আমার কোন কোঁতুল নেই। কিন্তু ক্ষুদ্র এই উৎসর্গীকৃত প্রাণটির হয়ে আপনার কাছে একটি বর ভিক্ষা চাই। আমি আমার সন্তানের অন্ততঃ একবার আপনার স্ত্রীর কোলে দিয়ে বলতে চাই—একটি মেয়ের সঙ্গে নাওজির পোশন মিলনের ফল।

কেন এমন করব? তার কারণ আমি কাউকে বলতে পারি না।

কেন তা আমি নিজেরও ঠিক জানি না। কিন্তু এটুকু সাহায্য আপনি আমায় করবেন। দয়া করে হতভাগ্য নাওজির কথা ভেবে আপনি এতে আপত্তি করবেন না।

বিরজ হলেন বোধ হয়। তা হোন—এ আমার সইতেই হবে। নিঃসঙ্গ এক রমণীর কথা শীগিরিই আপনার মন থেকে মুছে যাবে জানি। ধরে নিই এটুকুই তার অপরাধ।

আমার মাথা থান—কথা রাখুন।

অনুবাদ—কল্পনা রায়।

সমাপ্ত

Commonsense is instinct, enough of it is genius.

—Shaw



ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ

ତୈଳ



ଏମ୍. ଏଲ. ବସୁ ଯାଞ୍ଚ କୋ: ପ୍ରାୟେଟେ ଲି:
ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ ହାଉସ, କଲିକାତା-୧

বাতিঘর

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

—কাকীরা! ও কাকীমা!

কার মিষ্টিগলার ডাক শুনে চমকে উঠলেন যমুনা দেবী। ভোরবেলার স্নান শেষে গরদের খানখানি পরে সবে মাত্র ঠাকুরঘরে ধারাবর জন্ত পা বাড়িয়েছেন তিনি। ছোট বাগানটি থেকে তুলে এনেছেন সাজিভর্তি ফুল, পুজার জন্ত। ওঁকে বীভূতম অবাক করে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে ওপরে উঠে এলা সুমিতা।

—আমি এসেছি কাকীমা! দেখুন কাকে নিয়ে এসেছি। হাসিমুখে বললো সে।

—ও মা! আমার মিতুরাণী যে! আর আর। তা এত ভোরে ঠাকুরঘণা আসতে গিলে যে? কোলে ভোর ও কে রে? দেখি দেখি, কবে হলো? একটা খবরও তো পাই নি। সাজিটা নামিয়ে রেখে ওর কোল থেকে বাচ্ছটাকে নিজের কোলে নিলেন যমুনা দেবী।

—কি ভাবছেন আপনি? বিল-খিলের হেসে উঠে বললো সুমিতা। আসবার সময় এক গালা জঙ্গলের মধ্যে থেকে এই হানিকটাকে কুড়িয়ে পেলার কাকীরা! দেখুন, দেখুন কি সুন্দর!

—ওমা তাই বুঝি? তা বেশ করেছি। তা মানুষ করতে পারবি তো? এ যে সন্ত জন্মেছে বলে মনে হচ্ছে রে। একে বাঁচিয়ে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। আহা, এমন ফুলটাকে কোন পাখাণী কেলে দিয়েছে গো?

—তবে কি হবে কাকীমা? বাখা-ছলো-ছলো চোখ দুটি মেলে কল্পনায় বসলো সুমিতা। আমি তো কিছু জানিনা। ও তাহলে আপনার কাছে থাক। একটু বড় করে আমার দেখেন।

ও মা! পাপলী মেয়ে এ আবার কি বলে গো? আবার এই বয়েসে মাহাবন্ধনে জড়াবি আমার? আচ্ছা, সে পরের কথা। আগে ওকে চান করিয়ে একটু মিছুরির জল খাইয়ে দি। তুই বোস বাছা!

বাচ্ছাকে নিয়ে যমুনা দেবী নিচে নেমে গেলেন।

চকল পায়ে সুমিতা এমিক ওমিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ওর শুকিয়ে মজা বাওয়া মনের নবীতাতে বেন হঠাৎ পুলকবজার ঢল নেমেছে। সে অধীর আবেগে হুতুল ভাসিয়ে মন্ত উল্লাসে কেটে চলেছে। কোনো বাধাই মানবে না সে আর। মহাসাগরের ডাকে টুটে গেছে তার কারাবন্ধন। মহামুক্তির আনন্দ-কঙ্গরালে, হারিয়ে গেছে স্নেহ ভর, ভাবনা, সংসারের কুটোঙালো।

সুখামের ঘরের দরজায় পা দিয়ে থমকে পঁড়ালো সুমিতা। তখনও খাটে শুয়ে ঘুচ্ছে সুখাম। আচ্ছা কি চমৎকার ঐ পবিত্র মুখখানা! চিলে শায়খামা আর জালি পেজি পরা। চিং হয়ে শুয়ে আছে সুখাম। একটি হাত বুকের ওপর; আরেকটি হাত উটে মাথার তলার রাখা, বাঁশিটি পাশে সরানো রয়েছে। খোলা

জানলা দিয়ে হ হ করে হাঁওয়া এসে এসোমেসো কৌকড়া ফুলগুলোকে কাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

কয়েক মিনিট নিখর হয়ে পড়িয়ে রইলো সুমিতা। অবাধ্য চোখ দুটো যে কিবতে চায় না। কত কত দিন, কত মাস, বছর বার ব্যাঙ্কল অবশেষে কেটেছে তার, এইতো, হুহাত বুকে রয়েছে সেই মনোহারী ছবিখানি। কিন্তু হুহাত বুঝতো নয়। মাঝে যে এক অন্তর্লজ্জিত খাদ। কি করে বাবে ওর কাছে?

একটা রক্ত বেদনার ছুঁপ বেন ওর কণ্ঠনালির বাস রক্ত করে দিতে চাইলো। হু হাতে বুকা চেপে ধরে, আঙে আঙে বাগানের দিকে বারান্দার এসে পঁড়ালো সুমিতা।

পরিস্ফুট ছোট বাগানটি দেখে বেন চোখ জড়িয়ে গেলো ওর। কায় দরদী মনের অল্পহাঙ্গ ছড়ানো বেন প্রত্যেকটি গাছের শাখার, পাতার, ফুলে। তাই ওরা অত পরিস্ফুট, স্নানর প্রশ্রয়।

একধারে তারের জালের ওপর ঘন বেগুনি রংএর বাগনভালিয়া, তার পাশেই লতানো সুই-এর বাদ, দুজনে হাত বাড়িয়ে বেন পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে চাইছে। বেল, সুইও ফুটেছে অজস্র। তার মাঝে মাঝে লাল, আর হলধে রংএর গোলাপ ফুট, ঘুর থেকে একখানি কান্দীরা শাড়ির কান্ডকার্যকর পাড়ের মত লাগছে দেখতে। ও পাশে ল্যাজগুণার চাপার কয়েকটি গাছ। ওতে ফুল ফোটেনি এখনও। তারই পাশে আলো করে ফুটে আছে ক্রিসানথিমাম। মাঝামাঝি চারটি থাকে ফুটেছে লাইলক ভায়োলেট, সুইটলি, ডেলি। ভোরের দমকা বাতাস লেগে খর-খর করে কাঁপছে ওরা।

কি স্নানর! কি স্নানর! আপন মনে বললো সুমিতা।

ওদের লালকুটির অত বড় বাগানটা যত্নের অভাবে দিনে দিনে কি হতশ্রী হয়ে যাচ্ছে। তখননা বড় বড় হয়ে গেছে আর পায়ে না খাটতে, আর কে-ই বা মজর দিচ্ছে বাগানের দিকে—

—মিতা! কার ভাবি কণ্ঠসরে চমকে উঠে মুখ কেরালো সুমিতা।

সুখাম এসে পড়িয়েছে ওর পাশে।

চোখ দুটো ঝক ফুলো ফুলো, তখনও বেন ঘুম জড়িয়ে আছে চোখে মুখে—কখন এসেছে! মিতা? ডাকোনি কেন আমার? বললো সুখাম।

—এসেছি কতক্ষণ? তা, পনরো কুড়ি মিনিট হ'ল। তারি অবাক হয়ে গেছে না? রাত না পোরাতেই কেন এলাম? কোন উপায়ে তাই তো? কিন্তু এর চেয়েও অবাক হয়ে বাবে আরেকটি জিনিষ দেখলে দামোদা! খুসি, আর কৌতুকভরা হাসি চিক্‌চিকিয়ে উঠলো ওর হুটি চোখে, আর টোন্টের কঁাকে।

—তাই নাকি? প্রেসর হাসির সঙ্গে জবাব দিলো সুখাম—অবাক হবার জন্তে সর্বস্বদাই প্রস্তুত আমি মিছু!

—ঠেক রে, মিছু, একে এবার একটু ঘর ঠিকিনি বাছা! চাই কোরে পুজোটা সেবে নিই! বলতে বলতে যমুনা দেবী, একটি ছোট গরম শালে বাচ্ছটিকে জড়িয়ে এনে সুমিতার কোলে নিলেন।

—এ কি? কবে হলো ও? কিছু জানি না তো। কিয়তকরে বললো সুখাম।

—বাচ্ছটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিল বিল করে হেসে উঠলো সুমিতা।

—ঐ পাগলীর কাণ্ড! হাসতে হাসতে জবাব দিলেন বহুনা দেবী—এখানে আসবার পথে কুড়িয়ে পেয়েছে। মাছের করবার ইচ্ছে আছে তবে ভয় পাচ্ছে, এ সব ব্যাপার কিছু জানা নেই তো? কাজে কাজেই আমাদেরই একটু শক্ত সামোশ করে গিতে হবে আর কি। নাও দাবী একটু ত্যাগতাড়ি চা খেয়ে, বাগানের কাজ আজ থাক—দোকান থেকে চট করে বাজারটার জন্তে জামা, বিছানা, কিড়ি বোতল, কাউগেট মিছ এই সব একুণি যা লাগবে, আমি একটা কর্দ করে দিচ্ছি, কিনে আনো। ওর সঙ্গে তুইও যা না মিছ, পছন্দ করে সব নিয়ে আর! দামীর ছোটবেলার দোলনা খাট আছে, সেটা আম কেড়ে-বুড়ে, টুক করে নেব। চলে গেলেন বহুনা দেবী ব্যস্ত ভাবে।

—সত্যিই তুমি অবাক করতে জানো মিতা। দেখি, দেখি—হুঁহাত বাড়িয়ে বাজারটাকে নিজের কোলে নিয়ে বললো সুদাম বাঃ! একেবারে গোলাপ ফুলের মত ছেলেটি তোমার দেখছি। একটা সুন্দর ফুলের নাম মিও এর, ধুব মানাবে।

—ফুলের নাম? না দামীসা! বেদনা-ছলো-ছলো কণ্ঠে বললো সুমিতা—আমার জীবন ভরা অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভেতর আলো হয়ে বলবে আমার এই মণিকটা, তাই ওর নাম রাখলাম—আলোক।

—তাই হোক মিতা! কয়লার খনির নিকব-কালো অন্ধকারের ভেতরই আলোর উজ্জ্বল হয়ে। মহামণি কোহিনূর। তোমার আলোক নাম সার্থক হোক ওর জীবনে।

নাও তোমার আলোককে এবার, তৈরী হয়ে নিই। এখনি যা এসে তাপাল লাগাবেন। সুমিতার হাতে আলোককে দিয়ে বাঁধকমে চলে গেলো সুদাম।

সুদামের ঘরে এসে ওকে নিয়ে খাটে বসলো সুমিতা। আলোককে বুকে জড়িয়ে ধরে, দুলে দুলে, গুন গুন করে গান গেয়ে ওকে ঘুম পাড়াতে লাগলো।

—ঘটাধানেক পরে এলেন বহুনা দেবী, একখানি একশো টাকার নোট সুমিতার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—দে ওকে তুইয়ে দিই! আমি পুজো দেবে তোদের চারের জল চড়িয়ে দিয়ে এগছি, মজলকে বলেছি তোদের চা, আর পাউরুটি টোট করে দিয়ে বাবে, মালপো তৈরী করেছিলাম, আছে দু-চারখানা, আর কি খাবি বল? আহা বাছা রে, কত দিন দেখিনি তোকে—কি বেগা হয়ে গেছিল ক' বছরে। নে ওঠ বাছা, সে-সব কথা এখন থাক, এখন শোকনমির জিনিষগুলো আগে নিয়ে আর, চা খেয়ে।

—খোকন নয় কাকীয়া! ওর নাম দিয়েছি আলোককুমার। বহুনা দেবীর কোলে আলোককে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে বললো সুমিতা—দামীসা'র হয়েছে তো? আমি বাই, চা নিয়ে আসি গে।

—ও মা, সে কি কথা! তুই এসেছিস এই আমার কত ভাণি রে, আবার হুঁ দণ্ডের জন্তে এসে খাটতে বাঁধি কেন? বোসু আমার কাছে, বললই চা আনবে।

—না, না, একটু হাত-পাগুলো নাড়াচাড়া করতে বিন কাকীয়া, সব বে জড় হয়ে গেলে, বিন-হাত গুঁহে-বসে থেকে। ঢকল পায়ে বর থেকে বেরিয়ে গেলো সুমিতা।

ওর গল্পনপথের দিকে ক্রমে একটা নিখোঁস কেলো বৃহকর্ভ

আকোশ করলেন বহুনা দেবী—মরে যাই বাছা রে, আলোককে নিয়ে তিনি চলে গেলেন নিজের ঘরে।

সুদামের ঘরেই চা'রে বসলো ওরা। কাপে চা ঢেলে সুদামের হাতে তুলে দিলো সুমিতা, নিজেরটিও পূর্ণ করে, কাপের চিনি গুলিয়ে নিচ্ছিলো চামচ নেড়ে। মুখে ওর ফুটেছে একটা সলজ্জভাব।

কত দিন পরে একসাথে বসেছে ওরা হুঁজন। হার! মাঝের পাঁচটা বছর বহি হুছে দিতে পারতো জীবন থেকে! অবসর দুটিতে ভাবে সুমিতা।

—বাঃ! চা বে জল হয়ে গেলো, খাও? পাখরকুচি ভো আর চারে লাগনি, দিচ্ছে মাঝ হুঁচামচ চিনি, আর সে গলে গিয়েও ডাকছে চামচের পিছুনি এখনও খামে না কেন?

—চামচে রেখে, কাপটি হাতে তুলে নিয়ে চোখ তুলে চাইলো সুমিতা।

সুমধুর লজ্জা কাঁপছে ওর নীল চোখের পাখার! গালে কিকে গোলাপী ফোপ, টোটে চাপা নিভে হাসির ফিস্কে।

পাশেই খোলা জানলা দিয়ে বাসন্তী বঃ এক বলক হাছা বোদ এসে ওদের ছুঁই-ছুঁই করছে। জানলার ওপাশে এপ্রিল ফুলের গাছে ফুটেছে খোকা-খোকা রক্তরঙা ফুল; আর তারই ওপর উড়ে এসে বসেছে একজোড়া দুগুণা শান্তির বৃত্ত। ওরা বেন রক্তবরী মহাযুদ্ধের শেষে, রক্তাক্ত সমরাক্ষরের বুকে গুঁজ শান্তির পতাকা।

জ্বরবুদ্ধ বধন কামার কানার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন বুধি এমন করেই সে স্তব্ধ হয়ে যায়। ধনি হয়ে যায় মুক, আর ভাব-বুধর হয়ে ওঠে। কত কথাই বলার ছিলো ওদের দুজন্য, কিন্তু এই বুদ্ধিতে সে সব কথাগুলো বেন গেছে হারিয়ে; তাই নিশাশ্বে দুজনে চা খেতে লগলো আনমনা হয়ে।

—আরে! একি! একি? এই সন্ধ্যাবেলার তোমার ভবনে ইছামতীর দর্শন পাবো, এমন ঘটনা তো চোখে দেখেও; বিশ্বাস করতে পারছি না হে!

চমকে উঠে ওরা দুজনে মুখ কেরালো,—একটু দূরে হুঁ কোমরে হাত দিয়ে ঝাড়িয়ে হাসছে অনিরুদ্ধ।

—এসো, এসো, ঝাড়িয়ে কেন? কতকণ এসেছে! অপ্রভতের হাসির সঙ্গে বললো সুদাম।

—এসেছি কতকণ? তা মিনিট কুড়ি হবে। দামীসার সঙ্গে দেখা করে, মিতার খোকাকে দেখে এবারে এলাম ইছামতীকে দর্শন করতে।

—জাঃ! কি বাজে বোকছো দাদা? চাপাঘরে বললো সুমিতা।

—আপনার কথাই হেঁদালী আমার মস্তকেও হুকছে না যে, একটু শাধা-মাটা করে বলুন, তবেই তো বুঝবে ঠিক। ক্রমালে মুখ হুহুতে হুহুতে বললো সুদাম।

—বীরে বহু বীরে। বলছি সব বলছি। পাশের চেয়ারটিতে বসে একটি সিগারেট ধরালো অনিরুদ্ধ। চোখ বুজে আদেস করে বোঁদা ওড়ালো। তারপর বললো—ব্যাপারটা খুবই সাধারণ, মানে আমি আরো শাট করেই বলছি, তোমার অভি প্রিয় কাব্যগ্রন্থ

বাগুচরের লেখিকা ইছামতী সশরীরে তোমার সামনে বিরাজ করছেন, এই আর কি !

—চট করে উঠে দাঁড়িয়ে পালাতে গেলো সুমিতা। টপ করে গর হাতখানি ধরে গুকে চেয়ারে বসিয়ে দিলো অনিরুদ্ধ।

—আমার অনেক দিনের আশা সত্যিই তুমি সার্থক করেছো মিতা ! উঃ ! আজ একরকম পর একটু করে আশ্চর্য ঘটনা এমন ভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে যে, মঙ্গলগ্রহ থেকে যদি কোনো আশ্চর্য প্রাণীর আবির্ভাব হয় এখানে, তাহলে আর বেশী কিছু আশ্চর্য হবারা না নিশ্চরই। এমন অপূর্ণ ভাব আর ভাষা কোথায় পেলো মিতা ? তাহলে তুমিই আমার পাঠিয়েছিলে বইখানা ? গভীর আনন্দ-হলো-হলো কণ্ঠে শুধালো সন্দাম।

মুখ নিচু করে বসেছিলো সুমিতা। দারুণ লজ্জার গর কণ্ঠধোষ হয়ে গেছে। তাই জবাব দিতে পারলো না কিছু। শুধু মুখ তুলে একবার চাইলো সন্দামের দিকে।

ওর নিম্নবন্ধ সমুদ্রের গভীর নীলের মত তুটী চোখে সকল প্রেমের জবাব খুঁজে গেলো সন্দাম।

—আমি জানতাম মিতা, তুমি একদিন সার্থক কবিতা রচনা করবে—যুদ্ধকণ্ঠে বললো সন্দাম। মনে পড়ে—বখন আমার লেখা কবিতা শুনতে তুমি, তখন মাঝে মাঝে ব্যাকুলভাবে বলতে আমার জানো দামীদা'। কত কথা আমার মনেও ভিত্তি জন্মায়,—কিন্তু আমি পারি না তাদের মুখে ভাষা দিতে—তাই মাঝে মাঝে বড় ব্যথা পাই মনে। তখনই 'জেনেছিলাম এ তোমার জুল ফোটানোর বেদনা !

এ সব শিক্ষা তো আমার তোমার কাছেই দামীদা' ! শান্ত কোমলকণ্ঠে বললো সুমিতা—সুখিবীর অসীম সৌন্দর্যকে দেখবার জন্য নতুন দৃষ্টি তুমিই আমায় দিয়েছিলে ! তার গন্ধ আর রসকে গ্রহণ করবার মত মনোবল আমি তোমার কাছেই পেয়েছিলাম—আই যেদিন দাদা আমার বই ছাপিয়ে এনে দিলেন আমার হাতে সেদিন সবার আগে তোমাকে সে বই দেবার জন্যে মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো। তারপর দাদার সাহায্যেই পাঠিয়েছিলাম তোমায় বাগুচর এক কপি !

—ও ! তাই বুঝি ? আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই ! এতদিন ধরে গৌলকর্ষাধার ঘুরিয়েছেন আমার। হাসতে হাসতে বললো সন্দাম।

—বাঃ, চমৎকার ! বার জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর। এই হচ্ছে কলির মাছাঙ্ক্য ;—বুঝলে মিতা ! কপট গান্ধীর্ষের সুধোণ পরে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

হো-হো করে হেসে উঠলো সন্দাম আর সুমিতা।

ওদের হাসির শব্দ শুনে ঘরে এসে দাঁড়িয়ে বললেন বহুনা দেবী—ওমা ! এখনও গল্প করবি তোরা ? খোকনের জিনিষ-পত্রের কখন আসবে ?

—আসবে মাসীমা ! সব আসবে। খোকন এখন এসেছে, তার মাল পত্রোও আসবে। এখন মিতাকে একটু প্রাণ খুলে হাসতে বিন মাসীমা ! বেচারি এই পাঁচ বছর হাসির ভাঁজের একেবারে ভালগাচি দিয়ে রেখেছিলো !

—আহা, মরে বাই ! মিতার দিকে চেয়ে নেত্রহারা হয়ে বললেন

ভিনি—খোকনকে তবে একটু দেখিস মিতা ! বেলা হলো, রান্নার জোগাড় করিগে।

—তা হবে না কাকীমা ! আঁকার ঘরলো মিতা, আজ আমি রান্না করবো। আমার রান্না করে সকলকে খাওয়াতে কত ইচ্ছে করে কাকীমা, কিন্তু একটা দিনও সে সাথ আমার মিলেগো না ! আজ আপনি আমার দেখিও দেবেন আমি রাঁধবো, লজ্জীট কাকীমা ! বলতে বলতে সুমিতা উঠে এসে দু' হাতে গর গলাটা জড়িয়ে ধরলো।

—আজ্ঞা, আজ্ঞা, তাই হবে যে পাগলী ! ওর পিঠে ছোট ছোট চাপড় দিয়ে বললেন বহুনা দেবী—কি রাঁধবি বল ? আমাদের তো নিরাশ্রম ব্যাপার, শুধু তোর জন্তেই মাছ হবে। আর অনিরুদ্ধ, তুমি বাবা আজ এখানেই থাকে।

—একে আপনার হুকুম, তার ওপর মিতার হাতের রান্না, একে অমায়িক করবার ছেলে আপনার অনিরুদ্ধ নয় মাসীমা ! তবে একবার বাড়ী থেকে ঘুরে মাকে বলে আসি।

—ঠিক আছে। দামীদা' আর তুমি দুজনে গিয়ে খোকনের জিনিষগুলো কিনে তার পর বাড়ী যেও দাদা ! আমি আর বাবো না, ততক্ষণ কাকীমার সঙ্গে রান্না করিগে। কি রান্না করবো বলো তোমরা দুজনে। আর মাছ আমিও খাই না কাকীমা, অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি, শুধু দাদার জন্তে মাছ হবে।

—লাফিয়ে উঠলো অনিরুদ্ধ। সবাই মিলে আমাকে একঘরে করবার মতলব, কেন বলো তো ? ভালো ভালো নিরাশ্রম রান্নাগুলো নিজেরা খাবে আর দাদার জন্তে কতকগুলো মড়া ? কক্খোনো না ! আজ একেবারে বাছাই বাছাই জিনিষ খাওয়াতে পারো তো খাবো।

—কি খাবে বলছি কেমনা না—হাসিমুখে শুধালো সুমিতা।

—কি খাবো ? ঝাঁড়াও ভাবি। মাথা চুলকে বললো অনিরুদ্ধ

—নাঃ, রান্নাগুলোর নাম যে খুঁজে পাছি না, হ্যাঁ মাসীমা, আপনার ওপরই ভাব দিচ্ছি—নামগুলো সব আপনি ঠিক করে দেবেন। নাও এবারে রাঁধো মিতা, আমিও এখন ঘুরে আসছি, সত্যিই তুমি হাতা খুঁজি ধরছো,—না মাসীমা সব রেখে তোমার নামে চালালেন, এ আমায় দেখতেই হবে।

—বেশতো, পাহারা দেবে চলো রান্নাঘরে। এবারে বলুন কাকীমা, কি রান্না হবে ?

—রান্না ? তা মাছ তো কেউ ছোঁবে না—তবে নিরামিষই সব হোক। ফুলকপি কড়াইগুট দিয়ে জাক রাগী খি-ভাত কর। আর তার সঙ্গে ছানার কালিয়া—বেগুনের বাল, এঁচোড়ের দই,—আর আলু-পটলের দমপোক্তা কর। শেষে আমাদের চাটনি আর কয়লা লেবুর পায়ের। আর কি খাবে বলো তোমরা—বাবা !

ওরে বাবা ! এর ওপরে আরো ? চোখ বড় করে বলল অনিরুদ্ধ। মিতা তাহলে কাল সকালে রান্নাঘর থেকে বেঁকেবে মাসীমা, আজ শুধু হরিমটর চিবুতে হবে দেখছি।

—ইস তাই বৈ কি ! তোমরা কিবে এসে দেখবে সব বেড়ি ! বাজি রাখো,—কে হারে আর কে জেতে।

—আলবৎ বাজি ফেলবো'। টেবিল চাপড়ে বললো অনিরুদ্ধ। আমি হারি যদি তবে মিতার খোকনকে একটা পেরাফুটোর দেব।

—আর আমি যদি হারি, তবে তোমাকে একটা খুব সুন্দর

টুকটুক বউ এনে দেব। বলতে বলতে বিলাপিল করে হেসে ছুটে পালালো সুমিতা।

স্বপ্ননা দেবীও ওর পেছন পেছন বেতে বেতে বললেন—পাগলীটা চিদকালই একতাবেই রইলো।

সুদাম টেবিলের ওপর হাত দুটি রেখে এতক্ষণ উপভোগ করছিলো ওদের হাত-পরিহাসগুলো, এবারে চোখ তুলে চাইলো অনিরুদ্ধর দিকে। আশ্চর্য! অনিরুদ্ধর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

পকেট থেকে ক্রমালটা বার করে চোখ মুছতে মুছতে বললো অনিরুদ্ধ। —জানি মিতাকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানো সুদাম! ভীষণ ভাবে কলসে ওকিয়ে বাঙরা একটা লতা পাচ্ছ—আবার বেনে নকুন করে প্রাণসংকার হচ্ছে। ও বাঁচবে! আবার সবুজ পাতার ফুলে ও হাসবে।

মুহু গলার বললো সুদাম—এঃ ভালো মেয়ের সঙ্গে চূর্ণাবতার করা কেমন করে সম্ভব হোল এ তো আমি কিছুতেই ভেবে পাই না অনিরা! আমার ধারণা ছিলো, মিতা সুখী হয়েছে,—কিন্তু এখন যা দেখছি বা শুনি—

—তবু তো তুমি কিছুই দেখেনি সুদাম! দেখেছি কিছু কিছু আমি। মিতাকে বিয়ে করেছিলো ও শ্রেয় টাকার লোভে। সেই টাকাগুলো যখন হাতছাড়া হয়ে গেলো, তখনই ওর স্বরূপ প্রকাশ পেল। মিতাকে বললো অসীম,—তোমার বাবার নামে নালিশ করো, শৈতক বিষয় যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার নেই ওর! মমন্ত বিষয় নামলা করলে তোমার হাতে ফিরে আসবে। মিতা রাজী হয়নি। তখন থেকে আরম্ভ হলো ওর অত্যাচার। অকথ্য ভাষার গালাগাল দিয়েছে মিতাকে আর ওর বাবাকে।

আমাকে ও বললো একদিন,—তুমি একটু চেষ্টা করো না মিতাকে রাজী করাবার। এর জন্যে পারিশ্রমিক অবিলম্বে দেব।

আমি একটু ভেবে রাজি হয়ে গেলাম—তখন মিতা একেবারে একলা থাকতো। অল্প কালকর বাড়ীতে আসা বারণ ছিলো অসীমের। মিতাও কোথাও বেড়তো না।

আমি ভাবলাম—মিতার সঙ্গে দেখাশোনা করবার এই হচ্ছে মন্ত সুযোগ।

সে সুযোগের সদ্ব্যবহারও করলাম। আমার অবাধ বাঙরা-আগার অসীমের আর আপত্তি রইলো না, মিতাও একটু খুশি গেলো আমাকে পেয়ে।

চায়ে কাপ হাতে মিতাকে আসতে দেখে কথা খামালো অনিরুদ্ধ।

—বট! চূপ করলে কেন? বেশতো গল্প করছিলে। চায়ের কাপটি টেবিলে রাখতে রাখতে বললো সুমিতা—বুঝি, আমার নিশ্চয় করা হচ্ছিলো।

—কাপটি হাতে তুলে নিয়ে চুষক দিতে দিতে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ। একশো বার নিশ্চয় করবো—একটা মোটা রকমের গাঁও কবে গেলো জেয়ার জন্তে।

জলীরের কথাটা যদি তুমি শুনে—ভালো ব্যারিটারের কি ফলাফল হুগুগু? হ্যাঁ-হ্যাঁ, শব্দে হেসে উঠলো অনিরুদ্ধ।

—এ আশায় থাকো তুমি, আমি চললাম রান্না করতে—তোমাকে আজ বাজি হারিয়ে পেরাবুলেটার কিনিয়ে তবে ছাড়বো।

কোমরে কাপড় ঝাড়রে হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেলো সুমিতা।

চা শেষ করে, সিগারেট ধরালো অনিরুদ্ধ। অসীমের দিকে এগিয়ে দিলো সিগারেট-কেসটা।

—ও রসে বকিত আমি দাদা! বোড় হাতে সিগারেট প্রত্যাখ্যান করলো সুদাম।

—ও! তাই নাকি! ভালো করেছে। হ্যাঁ, তারপর—বাঙরা-আসা করি আমি, বোকাই অসীমকে সময় লাগবে। আরেকটি বায়না ধরলো সে—লালকুটিটা বিক্রি করলে আসবাব সমেত বেশ মোটা টাকা হাতে আসবে।

মিতা এক এক সময় বলতো,—আর সইতে পারছি না দাদা, লালকুটি ওর নামে লিখে দিই—ওর যা প্রাণ চায় কলক। কিন্তু আমি তা হতে দিইনি। কারণ মিতার এক লক্ষ টাকা ও আগেই কেড়ে নিয়েছিলো, এবারে সম্বল ছিলো তার—এ বাড়ী এবং মূল্যবান ফানিচার আর অন্ত্যস্ত জিনিষগুলো বিক্রি করে ও শুকতারাকে নিয়ে বিলেতে পালাবে। সেখানে ব্যবসা বাড়িগড়া যা হোক করবে। আমাকে মদের খোঁকে সব কথা বলে ফেলতো কি না—আর আমি বলতাম—ব্যস্ত হয়ে না, ধৈর্য ধরো, সময় লাগবে।

এর পরেই এলো পুলিশ হাঙ্গামা। অলকাপুত্রী হাঙ্গামা, ধানিকটা ওর বাড়িও এসেছিলো কি-না! অনেক টাকার খেসারত দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে হোল। ঠিক তারপর থেকেই ওর স্বভাব আরো জঘন্ত, আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। তখন ওর একমাত্র কাম্য বস্তু হচ্ছে প্রচুর টাকা; আর তার জন্যে ও যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত আছে। তা—সে কাজ বস্তু জঘন্ত বা ভয়াবহ হোক না কেন। আমাকেও মনে হয় ও এখন আর বিশ্বাস করে না, কিন্তু কিছু বলতেও সাহস পায় না। কারণ ওর ভেতরের কথা সব আমার জানা কি না।

নিজের হাতঘড়িতে নজর বুদিয়ে চমকে উঠলো অনিরুদ্ধ—এই যে, নটা বাজলো যে, দোকান বন্ধার কখন হবে? তারপর কোর্টে যাবার তাড়া রয়েছে, সে সব কথা তো ভুলেই গেছি—নাঃ মিতাই জিতবে বাস্তবতে, বেলো একটার আগে আসা আমার হবে উঠবে না।

—একটা কথা। ওর টেবিলে রাখা হাতটির ওপর হাত রাখলো সুদাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা সে হাত।

—বলো। কি জানতে চাও? বিষয়-কোর্ডফল ফুটেই অনিরুদ্ধর চোখের দৃষ্টিতে।

—বালুচর বইখানি মিতার কত দিন আগে লেখা?

—ও, সে কথা বলতে তোমাকে ভুলেই গেছি। বছর তিনেক আগেকার কথা বলছি। যখন আমি মিতার কাছে বাঙরা-আসা শুরু করেছি, সেই সময়ে একদিন মার্কেট থেকে কিছু ভালো কেক প্যানটি ফুল, আর একখানি শাড়ী নিয়ে ভোরবেলার মিতার ঘরে গেলাম, ওকে চমকে দেব বলে। কারণ সে মিনটা ছিলো ওর জন্মদিন। ঘিরে পর থেকে ওর জন্মদিনে আর ও কারকে ডাকতো না কিন্তু লম্বাঘর হয়েছিলো সে তারিখটির কথা।

গিয়ে দেখলাম, ও ঘুম থেকে উঠে সবে বাথরুম পেছে, বিছানার পাশে পড়ে আছে একখানি কালো চামড়াবঁধানো খাতা।

নিষ্কিচাৎ সেখানি তুলে নিয়ে দেখতে লাগলাম পাতার পর পাতা উল্টে। চমৎকার এক একটি সনেট! যেমন ভাব তেমনি ভাষা। ওর কাব্যগর্ভে যখন একেবারে ডুব দিয়েছি, ঠিক তখনই নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলো সুমিতা।

—এ কি দাদা, এত সকালে যে? হিজিবিজি লেখাগুলো দেখলে কেন বলোতো? ছি, ছি, ভারি লজ্জা কবছে আমার বিজ্ঞ।

—খাতাটি হাতে চেপে রেখে চাইলাম ওর দিকে। লজ্জায় সত্যিই গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে ওর। বললাম—তোমার কল্পনামনের শুভ ইচ্ছা আর আশীর্বাদ জানাতে এসেছি মিতা! আর অভিমোগও জানাচ্ছি তার সঙ্গে, তুমি যে আমাকে এত পর ভাবো, তা এই মাত্র জানলাম।

—কেন? কি করেছি আমি দাদা? মিতার ছ'-চোখে ভর্যর্জিত দৃষ্টি।

—এমন অপূর্ণ কবিতা লিখে লুকিয়ে রেখেছো এত দিন? আমাকে বঞ্চিত করেছো তোমার এমন সুন্দর কাব্যরস থেকে?

—তোমার ভালো লেগেছে দাদা? ব্যাকুলভাবে বললো মিতা—আমার মনে হয়েছিলো কি জানো? সময় কাটে না, তাই বা মনে

আসে হিজিবিজি লিখি, নোহাংই কাঁচা হাতের লেখা, দারীদা' থাকলে তাঁকে দেখাতাম, কিন্তু তোমাকে দেখাতে সত্যিই বড় লজ্জা করছিলো তাই। বা হোক, ওরকম আরো অনেক লেখা আছে। সব দেখাবো। এবারে হলো তো? কুল আর শাড়ী হাতে তুলে নিয়ে খুব খুসি হয়ে বললো—আমার জন্মদিন তুমি মনে রেখেছো দাদা! কিন্তু আমি তুলে গেছি—

সেমিনের পর থেকে পড়তে লাগলাম ওর রাশি রাশি কবিতা! বললাম—আমি এগুলো থেকে বেছে বেছে কবিতা নিয়ে বই বার করতে চাই মিতা! এমন অপূর্ণ জিনিষ অবহেলা করে অপচ্যুত করবার নয়—এ যে সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ!

—তা কি করে হবে দাদা? ওমিক আঙন তো বলছেই,—ওতে যে বৃত্তান্তটি দেওয়া হবে! ভয়ে ভয়ে বললো সুমিতা।

—তোমার কিছু ভাবতে হবে না মিতা, বললাম আমি—ছন্দনামে বার করবো বইখানা। লেখিকার নাম হবে 'ইছামতী'।

চমৎকার নাম দিয়েছো দাদা! তবে তোমার ইছামতীর পাক, পাকে যে শুধুই বালি আর বালি। তার ছ'-কুলে নেই সবুজ সমারোহ, নেই জীবনের কলতান,—শুধু বৃ! বৃ! বালুই তার জীবনের সাথী। তাই ইছামতী বই-এর নাম দিও দাদা, 'বালুচর'।

[ক্রমশঃ।]

রিসাচ

সাধনা সরকার

টেবিলের অন্ধকারে পৃথিবীর শব,
অজস্র বইয়ের ভূপে তাত্ত্বিক উপাসনা চলে,
ছন্দে কলুপ এঁটে কৃষ্ণ হাত টেনে নিয়ে
ক্রকটিল চোখে দার্শনিক সমীক্ষা সুরু।

এসিকে বুখচারী করেকটি তারা
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নীচে শব্দহীন শরীরী সংকেতে
মারামিনী, বেলোয়ারি জ্যোৎস্নার দিন
বামে ঘূমে শান্ত হওয়া উগ্রুক পদাবলী রাত।
দেওবলের স্লেমচকু টিকটিকি ভাবে—
এই সব পাণ্ডুলিপি, ভাষা, টীকা, ভণিতার
অস্থি-মেঘ-মন্ডা-শিরা আর উপশিরা ধুঁটে
দর্শনিকের অশ্লগন্ধ আত্মবস্তির
এ কোন প্রত্যয়লব্ধ জীবন-জিজ্ঞাসা?
চেতনার শুদ্ধ বাহুবলে অভিভূত হয়ে
অভীতের মনোবীর ফসিল
যতীহীন আবিস্কৃতিবির জীব প্রকৃ-জিজ্ঞাসার সাক্ষাতিক উপাধান হয়ে

ব্রেইল অক্ষরে মোড়া জীবনের
প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞান
আদিব কনকুশিরমের মতো স্তব্ধ সমাহিত
হৃদীর মুহূর্তগুলি হাসে
শব্দর আর ভৈমিনির হাসি
'মাহুবে'র জন্ম মৃত্যু, সুখ-দুঃখ আর
অস্তিত্বের সত্যাসত্য বোধ
ঐহিক ও পারত্রিক সমতার জটিল গ্রন্থি খুলে ফেলা
পৃথগের অপ্রাকৃত সত্তা নিয়ে
মস্তিষ্কের উপলব্ধি কোষে প্রজ্ঞার সন্ধান খুঁজে ফেলা
এ সবই মাহুবে'র বাগীশ্বরী চেতনার
পারমাণবিক প্রকৃতিভাস।

যেন বিন্দু থেকে বৃত্তে ছুটে গিয়ে
বৃত্ত থেকে বিন্দুতে চক্রাকার পরিভ্রমণ
বিনিময় সময়ের কীকে
সময় ফুয়ার
অবলুপ্ত পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতা
টেবিলে ঘুরায়।

মাসিক বরদী—বার্ষিক

চিএতারকাদের মত

নিখুঁত লাভন্য

আপনারও হতে পারে



সাঁঝেরী চাটাইর মত লাভন্যময়ী চিত্রভাষক
জানেন যে হারীর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে নিখুঁত ত্বকের ওপর।
সাঁঝেরী চাটাইরী বলেন—“লাক্স টয়লেট সাবানের স্নেহ
মত কেনা আর বিক্রয় ২৭৫ আমি পছন্দ করি। আমার
ত্বকে এটি মেলিয়ে আর মনন রাখে।” আপনার
লাভনের জন্যেও হৃদয় লাভ ব্যবহার করুন না কেন?
মনে রাখবেন, স্নানের সময় লাক্স সত্যিই আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুদ্ধ

লাক্স

টয়লেট সাবান

চিত্রভাষকদের সৌন্দর্য্য সাবান



বিশুদ্ধ মিলার বিক্রিতে এর তৈরী

LT8/P3-X52 BQ

ভাবি এক, হয় আর

ঐলিলীপকুমার রায়
আঠারো।

যে ঘরে যুদ্ধ থাকত সেই ঘরেই পল্লব রাতে শুল। সে ঘাতে
কী বৃষ্টি! সঙ্গে সঙ্গে সারা আকাশে বিদ্যুৎ ছুঁশি লাগায়।
থেকে থেকে ঝড় ঝড় ঝড় ঝড়। কাঁপা বাপের বুকে এত আশ্রয়
লুকিয়ে থাকে।

খানিক বায়েই কোথায় বা মেঘ, কোথায় বা বড়! আকাশে
কেন চাঁদ ওঠে হেসে।

পল্লবের মনের মধ্যে আবার শান্তি ফিরে আসে। এলিওনোরার
গুপ্ত আশ্বাসেই নয়, বেদনারও ও বেন বল পায়। একলা হয়েও
পায়ল কোত জর করতে—আর পল্লব পায়বে না বন্ধু-বাঁধব থাকা
সঙ্গেও?

জানলা খুলে দিয়ে বাইরের ব্যালকনিতে একটি আরামকোয়ারা
টেনে নিয়ে ও চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

জীবন বিচিরি বৈ কি। বহুদুঃখীও বটে—ঠিক ঐ আকাশের
মতন। খানিক আগে যেখানে বেথেছিল মেঘের কুরুক্ষেত্র, খানিক
পরেই সেখানে শান্ত তারার সভা বসেছে কান্ড চাঁদের আলোয়।
সায়নের গাছে ক্ষেপে ক্ষেপে মরবার প্রতীক্ষণি জেগে ওঠে হাওয়ার
সভায়। ওমিকে পাশের নিচে ব্রুদের বুক সোনার গুস্ত রিকমিক
রিকমিক করছে। অশান্তি কোত হুংস আছে সত্যি, কিন্তু
উন্টো পিঠেই কি নেই শান্তির এলোপ, আশার বাগী?

ও সব চেয়ে গভীর শান্তি পায় আজ এই চিন্তার বে, এই হুংস
পাওয়া ওর দরকার ছিল বিশ্বাসীর নিয়তির সয়িক হবার জন্তে।
যদি এক কথার আইরিনকে শেত তবে বিশ্বের স্বপ্নে বেদনার বাগী
তখনতে শেত কি এভাবে? এলিওনোরার কথার ব্যাধী হতে
পারত কি?

তুখু ভাই নয়—অনুভব করে ও গভীর ভাবে—একজনের ব্যাধীও
আর একজনকে যে শক্তি দিতে পারে, একথা মর্মে মর্মে ও উপলব্ধি
করতে পারত কি যদি না নিজে ব্যাধীর আগুনে পুড়ে শুকলিলাত
করত? চলার পথে একমাত্র হুস্তর বাধা—কোভ। ও স্থির করল,
এ কোভকে জয় করতেই হবে আইরিনের কাছে কোনো কিছু না
চেয়ে। এলিওনোরার একটা কথা আজ ওর স্বয়ত্ত্বাধীনে কেবলই
বেজে বেজে ওঠে—আহা, ওকে একটু সময় দাও।

উনিশ

পরদিন পল্লব লুনা হোটেলে ফিরল বিকেলবেলা। হঠাৎ কেন
বৃষ্টি। ওর মন কেমন করে উঠল। সব কোত ভুলে আইরিনকে
লিখল কোনো মানা না মেনে।

তোমার চিঠি না পেয়ে মনে অভিমান জমেছিল। তখনায়,
তোমার শবীর ভালো নেই। এ জন্তে উদ্বিগ্ন আছি, কিন্তু অভিমানকে
বোধ হয় জয় করেছে। ঠিক করছি আর দশ পনের দিনের মধ্যেই
দেখে ফিরব। কুছুম ডাকছে। সে জেলে গেছে। তাই মোহনলালকেও
দেখের কাজের কিছু ভার নিতে হয়েছে—যে কাজ আগে কুছুম করত।
আমি আর দেরি করতে চাই না। সালভিনি ফিরলে তাঁর সঙ্গে দেখা

করেই দেখে ফিরব। তিনি দু-চার দিনের মধ্যেই রোমে ফিরবেন
তদ্বি।

তুমি চিঠি লেখা বন্ধ করছে কেন ঠিক জানি না। তবে যেখানে
ভিতরের ব্যাপার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সেখানে জল্পনা কল্পনা করে মনকে
অকারণ উত্তেজিত করে কল কী? মনে আশা আছে তুমি তোমার
ধবর মেঘে সময় হ'লেই। তোমার মনের ভাব এখন কী জানি না।
তবে এলিওনোরার কাল বলছিল, তোমাকে সময় দিতে বলছিল, যে সব
হুর্ভাবনা তোমাকে বিচুড় করে তুলেছে তাদের বিতরণে বেতে না
দিলে চলবে কেন? কথটা আমার মনে লেগেছে। আমি অপেক্ষা
করব শান্ত মনেই, ভেবো না। কিন্তু এর পরে আর চিঠি লিখব না,
তোমার মনে হুর্ভাবনার কেনা সব বিতরণে গেলে হয়ত তুমি লিখবে।
তখন—কী হবে তখন, কে জানে?

লিখে মনে হল বড় শুক চিঠি। একবার ভালো ছিঁড়ে ফেল।
কিন্তু সে ইচ্ছা জোর করে শাপিরে রেখেই চিঠিটা ডাকে দিয়ে শব্দা
সাতটার রোজকার মতন আহারের টেবিলে এসে বসল।

কিন্তু কোথায় শাপিরো? ওর মন আজ উৎসুক হয়ে উঠেছে
ওর জন্তে—আরো কাল দেখা হয়নি বলে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ
মনে হয়—এ বন্ধুটির কিছুই না জেনেও কেন ডাকে এমন ভালোবেসে
ফেলল। কেন মনে হয় ওকে বহুদিনের চেনা? কেন ওর সঙ্গে এত
ভুক্তি বহন করে আনে ও মনের কথা কিছু না বলা সঙ্গেও? সব
চেয়ে আশ্চর্য—ওর সঙ্গে বন্ধু হবার পর থেকেই কেমন করে এমন
বদল হল নিজের মনের? মাথানেক আগে কী হুংসই পেয়েছে ও
আইরিনের কথা ভাবতে। কিন্তু আজ সে হুংসের তলেও এ কী অচকল
সমাহিতি! জীবন বিচিরি বৈ কি। নৈলে কি—মনে পড়ে বার
কবিতার ছটি চরণ:

বার লাগি চকু বুজে বহিরে মিলাম অজ্ঞসাগর,

তাহারে বাদ দিয়েও দেখি—বিশ্বভূবন মন্ত ডাগর।

এমনি সরসে শাপিরোর আবির্ভাব।

পল্লব উঠে ঠাড়িয়ে বলে: এসো এসো। আজ এত দেরি।—
আমি ঠায় আধ বটা বসে।

শাপিরো কোমল কণ্ঠ বলে: je vous demande pardon
monami! * আজ একটু বিশেষ কাজ ছিল। কিন্তু তুমি কেন
মধ্যে আমার জন্তে অপেক্ষা করতে গেলো ভাই?

পল্লব হেসে বলে: বাঁ, বাসা বন্ধু! একলা একলা বৃষ্টি খেতে
ভালো লাগে?

খেতে খেতে ওদের গল্পালাপ শুরু হয়।

শাপিরো এখমেই বলল: তোমার ভিন্নতার ভাই, মাথা পেতে
নিছি। কারণ, এলিওনোরাকে ভালো করে না জেনে ওকে
'বিলাসিনী' বলা আমার খুব অজ্ঞার হয়েছে—আরো এই জন্তে যে সে
তোমার বাড়ী।

পল্লব বলল: আশ্চর্য, কাল ও-ও বলছিল এই কথা—যে
বাইরে থেকে ওকে দেখে সেরকম বিলাসিনীই ভাবে। আমি বললাম
—তুমি বিলাসিনী নও উচ্চাশিনী। ব'লেই যেম: কিন্তু সত্যি
ও ভালো মেয়ে। ব'লেই বলল ওকে এলিওনোরার অন্তর্ভবের কথা।

শাপিরো মুহু মুহু বলে: আহা, যেচারি। বলে একটু খেমে—

* তোমার কাছে কমা চাইছি, বন্ধু।

তবে সিভারার একথা আমি মনে নিতে পারছি না যে আত্মদান বোঝেনই ধর্ম। এ-ধর্ম অতি অল্প লোকেরই। আর তাঁদেরই নাম মহৎ।

পল্লব একটু পরে বলল : শাপিরো, তোমাকে একটা কথা যদি খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করি—উত্তর দেবে ?

কী ?

পল্লব একটু চুপ করে থেকে বলল : দুহক কী লিখেছে এলিভেনোরা সব বলল না। তবে ভাবে মনে হ'ল—ব'লে থেকে একটু ইতস্তত করে। মনে হ'ল—হয়ত আইরিন অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে পড়েছে—ইতিমধ্যে কোনো ক্রম বুঝকে ভালো বেসে ফেলেছে ব'লে।

শাপিরো একটু চুপ করে থেকে বলল : এরকমটা হওয়া অসম্ভব আমি বলি না, কিন্তু—একদমে তা হয় নি ব'লেই আমার মনে হয়। কেন—বলবে ?

পল্লব উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে। শাপিরো বৃহৎ হেসে বলে : ভাই, যে-যে-একবার তোমাকে ভালবেসেছে সে—মানে আর বাই পাচ্চ না কেন, তোমার আশা নিমূল না হ'লে আর কারুর দিকে ব'কেতে পারবে বলেও আমার মনে হয় না—ভালোবাসা তো দুবের কথা।

পল্লব বিবর্ণ কাঁধে বলে : ভাই, এ তোমার মনভোলানো কথা। আমার বরাবরই অবাক লেগেছে ভাবতে যে আইরিনের মতন মেয়ে কেমন করে আমার মতন অজ্ঞাত-কুললীলকে ভালোবাসল ! ওর সঙ্গে আমি বতই মিশেছি ততই মনে হয়েছে আমি ওর অযোগ্য। তাই তো আমার মন আজ বলে যে ও শেষে ঠিক পেরেছে যে আমাকে বিবাহ করে ও সুখী হতেই পারে না। নৈলে কেন আমাকে দূরে ঠেলেবে বলো ?

শাপিরো হাসে : ভাই, তোমার কথা শুনে সময়ে সময়ে কী যে ভালো লাগে কেমন করে বোঝাবে ?

পল্লব আশ্চর্য হ'য়ে বলে : মানে ?

মানে তোমার এই আশ্চর্য আত্মবিলোপের কমতা। তাই তুমি মনে করতে পারলে যে, আইরিনের মতন মেয়ের তুমি যোগ্য পাত্র নও। আইরিনকে আমি জানি না। তোমার কাছে বা শুনেছি তাতে আমার শুধু এইটুকু মনে হয়েছে যে ও সুন্দরী ও প্রাণোচ্ছল। আমাদের দেশে এরকম মেয়ে খুব বিরল নয়। কিন্তু তুমি ভাই, নিজেকে জানো না আজো। আর জানো না ব'লেই এমন কথা বলতে পারো যে তুমি আইরিনের মতন মেয়ের ভালোবাসার যোগ্য নও। আর একথা তোমার দুহকের কথা নয়—অন্তরের কথা ব'লেই তুমি এত বেশি ভালোবাসা পাও।

পল্লব অবাক হয়ে বলে : কী বলছ তুমি শাপিরো ?

বলছি শুধু এই কথা ভাই, যে, বাবা মনে করে তুমি ভালোবাসার যোগ্য, তারাই সবচেয়ে কম পার সত্যিকার ভালোবাসা—কী পুরুষের কী মেয়ের।

পল্লবের মন বৃহৎ উৎকল হ'য়ে ওঠে, ওর হাতের প'রে সস্ত্রহ চাপ দিয়ে বলে হাসলো সুরে : mille mercis, mon ami ! কেবল একটু টুকর : তুমি কি জন্মে ভালোবাসা কা'কে বলে ? তোমাকে দেখে আমার কেবলই মনে পড়ে আমার সেই বিদ্রবী বন্ধুর কথা—যে ঠিক তোমারই মতন জীবনকে সঁপে দিয়েছে একটা মাজ

লোকের পারে। তার লক্ষ্য—দেশসেবা, তোমার লক্ষ্য কাজ আর কাজ, আর কাজ—বন্দিও—ব'লে একটু খেমে—কী যে সে কাজ জানি না আজো, তুমি তো বলবে না, জানব কেমন করেই বা ?

শাপিরো ওর দুহকের দিকে ঋণিকদৃষ্টি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, পরে বলে : শুনেবে তবে ? বলবে ?

পল্লব খুশিভরা সুরে বলে : বলবে ? সত্যি ?

শাপিরো নরম সুরে বলে : বলব ভাবছিলাম কিছুদিন থেকেই। তবে তোমার মতন স্বভাব-সরল তো নই ভাই, তাই সাধ জাগলেও সাধ্য হয় না মনের দুয়ার খুলতে—সাত পাঁচ ভাবনা আসে। কিন্তু এখানে নয়, চলো আমার ঘরে। কেবল একটি কথা দিতে হবে—আজ আমি বা বলব তা এদেশের কাউকে বলতে পারবে না।

তাই হবে।

ওরা দুজনে উঠল তিনতলায়। শাপিরো গুকে বসতে ব'লেই ঘোর বন্ধ করে ঢাবি দিলো।

কুড়ি

পল্লব একটু আশ্চর্য হ'য়ে ঘণ্টার এদিক ওদিক চেয়ে দেখে। দেখাবার প্রায় কিছুই নেই বলতেই হয় : ছোট ঘর—ছোটলে সবচেয়ে সম্ভাব্য—বাকি বলে "প্যারেট"। একটি ছোট খাট, একটি টেবিল, একটি লোহার তোরঙ্গ, দুটি চেয়ার, একটি বইয়ের শেলফ আর কোণে একটি তেপায়া টেবিলে একটি জল চালবার গামলা ও বড়—বাসু। ওর মনে পড়ে যায় বিখ্যাত বিশ্বপ্রেমিক ধোতার ঘরের বর্ণনা। পল্লব আজ পর্যন্ত কোনো ছোটলে এমন রিক্ত ঘর দেখেনি। একটি আলনা পর্যন্ত নেই—আলমারি তো দুবের কথা।

শাপিরো হেসে বলল : আমার পরিব ঘরে তোমাকে আনলাম—কারণ এটি হ'ল তিনতলার কোণে একটি মাত্র ঘর—এখানে কথাবার্তা কইলে কেউ শুনেতে পারে না। বসেই থেকে : আশ্চর্য হচ্ছে হয়ত—কিন্তু কেন এভাবে আজি শুনে—বুঝতে বেশ পেতে হবে না।

একটি সিগার ধরিয়ে শাপিরো বলল : তোমাকে আজ বা বলতে বাচ্ছি শুধু যে কখনো কাউকে বলিনি ভাই নয়, ভাবিওনি যে কাউকে কোনো দিন খোলাখুলি বলবাম এমন প্রবল ইচ্ছা হতে পারে আমার। বলে একমুখ ঘোঁরা ছেড়ে দ্বিভ কঠে : তবে এ অবচন ঘটল কেন—আমি জানি : তোমার সরলতার হোঁচক। অর্থাৎ মনের কথা যে অব্যবহে বলতে পারে সেই পারে অপারের মনের কথা টেনে বার করতে।

পল্লবের মন আনন্দে উজ্জ্বল ওঠে। শাপিরো বলে চলে : আমি প্রথম থেকেই এমন চাপা প্রকৃতির ছিলাম না। এক সময়ে হাসতাম তোমার মতনই খোলা হাসি, মনের কথা বলতাম তোমারি মতন—অনর্গল। বহুখ পাভাতেও আমার জুড়ি ছিল না। কিন্তু—একটা বিবম যা থেকে আমার স্বভাব বদলে গেছে—বন্দিও প্রারই খোনা বার মাল্লের স্বভাব কখনো বদলায় না। বাক, এসব অবান্তর কথা। আজ সংক্ষেপে তোমাকে বলব আমার কথা—আর কোনো কারণে নয়, শুধু এইজন্তে যে তুমি সত্যিই শুনেতে চাও আর তোমাকে আমি চিনেছি বন্ধু বলে। বলে পল্লবের দিকে ছাট লাঠই বাড়িয়ে

মিল। পল্লব সানন্দে ওর হাত হুটি নিজের হু হাতের মধ্যে ধানিক ধরে রেখে ছেড়ে দিল।

শাপিরো সিগারেট টান দিয়ে শুরু করে : শোনে। আমার এই ছাব্বিশ বৎসরের জীবনের উপর দিয়ে কত জলখড়ু যে বয়ে গেছে তোমাকে একটু আভাস দিতে চেষ্টা করব, যদিও পারব কি না জানি না।

কেন শাপিরো ?

ভাই, মানুষ দিনে দিনে পলে পলে বড় কিছু ঠেকে শিখেছে তার কতটুকুই বা দু-চার কথায় বলে প্রকাশ করতে পারে ? যা হোক শোনে। সব কথা বলতে গেলে রাত কাবার হ'য়ে যাবে। তাই বলব যা সংক্ষেপে বলেও বোঝানো যায়। শোনে।

নিবন্ধ সিগারেট শেষ ধরিয়ে শাপিরো বলে চলে :

তোমাকে বলেছি আমার বাবা থেকেও নেই। আমাকে তিনি তাজা পুত্র করেছেন।

তাজা পুত্র ?

হ্যাঁ, শোনে। বলি। একটানাই বলে বাব এবার। বলে কেন যেম : আমার বাবা ছিলেন মস্তায় মস্ত নামকরা সার্জন। ১৯১৪-র বিশ্বযুদ্ধের আগে তিনি প্রচুর টাকা করেন। যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হ'তেই টুকটুকসের ব্যাঙ্ক তাঁর প্রায় সব টাকা পাঠিয়ে দেন ও তারপরেই পাছে তাঁকে যুদ্ধে যেতে হয় এই ভয়ে ছদ্মবেশে পালিয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেন। ঠিক করেছিলেন, আমাদের পরে নিয়ে আসবেন, কিন্তু যুদ্ধের ডঙ্কা এত আচম্বিত্তে বেজে উঠল যে, আমার মার সঙ্গে আমি মস্তোতে আটক পড়ি—আরো এই জন্তে যে আমার বাবা পলাতক।

যুদ্ধের কয় বৎসর আমরা দারুণ অর্থকষ্টে পড়ি। আমার মা ছিলেন যেমন ধমিকা তেমনি স্বাবলম্বিনী। যুদ্ধের সময় এক কুনিশন ক্যান্টিনিতে কাজ নিয়ে আমাকে অতি কষ্টে মানুষ করেন। তাঁকে হাড়ভাঙা ষাটুনি খাটতে হ'ত। কলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, কন্নারোগে তিনি মারা যান। তখন আমার বয়স পনের বৎসর।

মার মৃত্যুর পরে আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। বাপ থেকেও নেই, ব্রহ্মময়ী মাও আমার জন্তেই খেটে খেটে অকাল মৃত্যু বরণ করলেন। মন আমার বিকল মতন হ'য়ে যায়। এক কাকা লম্বা ক'রে আমাকে পোষাপুত্র নেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা ভালো ছিল না। কাজেই আমি অভাব অনটনের মধ্যেই মানুষ হই।

আরো বৎসর বয়সে আমাকে সৈন্সকলে ভোগ দিতে হয়। যুদ্ধে গিয়ে আমি প্রথম দেখতে পাই আমাদের সভ্যতার নিজস্ব মূর্তি। মার প্রভাবে আমি ক্যাথলিক ধর্মের আবহাওয়ার মানুষ হয়েছিলাম, রোজ ভগবানকে ডাকতাম। কিন্তু আমার অমন যা বন্ধন দারুণ রোগে অসহ্য যন্ত্রণার তিল তিল ক'রে মারা পেলেন তখন আমি বিশ্বাস হারালাম। এই সময়ে এক বিখ্যাত বিপ্লবীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এই নাস্তিক মহাবীরই আমার দীক্ষাগুরু।

তিনি কাল' মাস্তের বাগী আমাকে বুকিয়ে দিলেন সরল ভাষায়। বললেন : মানুষ যা কিছু পেয়েছে লড়াই ক'রেই পেয়েছে—ভগবানকে ডেকে পায়নি। তিনি আমার তরুণ মনে বুনে দিলেন বিদ্রোহের বীজ। আমি রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর ক'রে ভর্তি হলো তাঁদের দলে। তিনি বললেন : ভগবান নেই বটে, কিন্তু মানুষের মধ্যে আছে

উচ্চাশা, প্রেম ও গঠনমূল্য, মানুষের মুক্তি মিলতে পারে শুধু এই তিনটির বিকাশে। কিন্তু এদের মধ্যে প্রেমই সব চেয়ে বড় হ'লেও তাকে মৃত্যির তুলতে হ'লে প্রথমে চাই অত্যন্তক অভাব বলে চেনা ও তার বিরুদ্ধে প্রাণপাত ক'রে যুদ্ধ করা। তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন কয়েক জন বৃদ্ধমান ও নান্দুর মানুষ এ জগতের নায়ক। তারাই দরিদ্রের রক্ত শোষণ করছে। সব আগে চাই তাদের হাত থেকে রাজস্ব ছিনিয়ে নেওয়া। এ-জগতের সভ্যতা বলা, কালচার বলা, আর্ট বলা, সমাজ বলা—সবেরই খোঁজক জোগাচ্ছে কেটি কেটি দরিদ্র কুখান আর শ্রমিক। এরা দুর্বল, যে কেউ বিজিত। এদের শিখিয়ে পড়িয়ে গ'ড়ে তুলতে হবে—দীক্ষিত করতে হবে সৌজাত্যে। সে সৌজাত্যের প্রতিষ্ঠা শুধু কল দেশে করলে চলবে না, চাই সব দেশের শ্রমিকদের ডাক দেওয়া : তোমরা ভাই ভাই, কাছে এসো পরস্পরের, দু'করো অত্যাচারীকে। করানী বিপ্লবের তিনটি নীতি—স্বাধীনতা, সৌজাত্য ও সাম্য—liberte, fratermite, egalite—বিশ্বব্যাপী হ'লে তবেই মানুষের মুক্তি। যে সর্বশক্তমান সর্বব্যাপী ও সর্বজ ভগবানকে মানুষ নিছক ভয়ের ভাগিদে গ'ড়ে তুলেছে—তাঁর কল্পিত কল্পনার কাছে হাত পাতে তারাই বারা অজ্ঞান—বারা ভানো না যে আমাদের নিয়তি গড়বার ভার আমাদেরই—কোনো বহুশ্রম্য আকাশ-পারের বেজ্ঞাচারী বিশ্বাস নয়। তিনি নাড়ি। অস্তি কী ? না, মানুষের নিজের বৃত্তি, বিবেক ও গঠন প্রতিভা—সবার উপর—মানব-প্রেম। এ সবই তো তুমি জানো। তাই এ কথা বাক।

আমি দীক্ষিত হলো এই নিরাশর বিপ্লববাদের মস্ত্রে। পূর্ণ নিলাম—শ্রমিকদের জন্তেই জীবন দেব, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের গতি কাটিয়ে সমষ্টির মধ্যেই খুঁজব আত্মবিসর্জনের পরমানন্দ। আনন্দ বলছি লক্ষ্যকে নিশানা করে—কারণ এ-আনন্দে পৌঁছানোর পথে দুঃখ-কষ্টের অবধি নেই, কারণ অত্যাচারীরা স্বঘব্বৎ এবং তাঁদের হাতেই শক্তির পেশবস্ত্র। আমরা—জগতের উৎপীড়িত ও নিরস্ত্রের দল—les insultes et les miserables du monde—এই যুদ্ধের কয়েক লক্ষ ধনিক ও মধ্যবিত্তের বিলাসের খোরাক জোগাতেই এ বাবৎ উদ্যোগ খেটে প্রাণপাত করে এসেছি। এখন থেকে খাটব—শুধু কোটি কোটি উৎপীড়িতের জন্তে, নিরস্ত্রের জন্তে, সর্বহারাদের জন্তে। এই মহাবীর ডাকে আমার বৃকের রক্তে ডমক বেজে উঠল : এই-ই তো জীবন—মানুষই সভ্য—ভগবানের কাছে দরবার ক'রে মানুষ কবে বড় হয়েছে ? খুঁটও দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন না, তাই বললেন : সীজারকে লাও তার প্রাণ্য। কিন্তু সীজারকে কর দেব কেন—বখন তার প্রাণ্য কানাকড়িও নয় ? কেন রাজারা, অত্যাচারীরা নিরস্ত্রের অধিক ধনবান্ন কেড়ে নিয়ে বিলাসে ডুবে থাকবে—নিরস্ত্রদেরকেই জোর ক'রে সেপাই ক'রে তাদের দিয়েই কাবিরে রাখবে বাকি নিরস্ত্রদেরকে ? এরই নাম তো দানবিকতা। বাইবেলের একটি কথা কেবল সত্য : ভগবান নেই বটে, কিন্তু পরতান আছে। এ পরতান হ'ল ধনিকদের সং। তাই সব আগে এদের করতে হবে নিরস্ত্র, পরাকৃত, পুণ্ডিত।

তারপর সে ফী কাও। মার মার হবে সর্বত্র বিদ্রোহের ডাঙর-লীলা জেগে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একদল গৃহশত্রু বিদ্রোহের নাম ক'রে ক্রিরে আনতে চাইল অত্যাচারীর প্রতিষ্ঠা। এরা হ'ল আরো বড় লক্ষ—anti-revolutionary : কলে আমাদের দেশে বিপ্লব

গেল ছেয়ে। ঠিক এই সময়ে আমি পড়লাম একটি ধনী গৃহশত্রুর সোনিয়া ব'লে একটি মেয়ের প্রেমে। মন আমার ধোঁটানায় পড়ে উঠল টলমল করে: মোহ আর আশা, মূলভ সুখ আর দুঃখের ডাক, সহজ পথের লোভ আর দুর্গম পথের বিভীষিকা। দুর্ভাবনার, অশান্তিতে, অশ্রুধ্বংসে আমি অস্থির হ'য়ে উঠলাম।

ঠিক এই সময়ে সোনিয়ার বাপ শুনী চালালের একদল নিরস্ত্র বিদ্রোহীর জনতার উপরে। ছ'হাজার লোক মারা গেল। তাদের অপরাধ—তারা খেতে না পেয়ে চেয়েছিল অন্ন। এই অপরাধে তাদের দেওয়া হ'ল মৃত্যুদণ্ড। দেশের হাাহাকার জেগে উঠল। চারদিকে বিশৃঙ্খলা—কোথায় নেতা? কোঁকে বিশ্বাস করবো?

শাপিরোর কঠোর গাঢ় হ'য়ে এল: ঠিক এই স্ফটিকেরে নিরাশার কুরাশা কেটে যেতে না যেতে দেখা গেল একটি অদ্রোভী মাথা—মাত্র একটি, দুটি নয়! যে এল সুইজারল্যান্ড থেকে বেখানে বহু বংশের বাপন করেছিল নির্দাসিতের বিপন্ন জীবন। সে হঠাৎ এসে তার আশ্রয় প্রতিভাবে স্বেচ্ছা করল একদল নিপুণ বিদ্রোহীকে। সৈন্তদের নেতৃত্ব এরা রাতারাতি অধিকার করল দুর্বার তেজে, যে তেজ তারা পেয়েছিল ঐ অস্থিতার মাহুঘটির অগ্নিগন্তার কাছ থেকে। এরা একতানে বলল—জগতের বস্তুরূপকে উপেক্ষা করে—যে দরিদ্রতম মাহুঘ বতদিন না মাহুঘের মতন বাঁচবার অধিকার পাবে ততদিন আমরা যুদ্ধ করব—সুখ, মান, সর্ব্ব, প্রাণ—সব যায় যাক তবু জয় পেছুব না।

বলেতে বলেতে শাপিরোর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বলল: প্রাণম বুটকে নয়, যিনি ছিলেন নাস্তির ধামাধার, প্রাণম সেই মহামানবকে যিনি সর্ব্বহারাধের মুক্তিলাভ, পরমবন্ধু।

পল্লব চমকে ওঠে: কে তিনি? লে—

শাপিরো গাঢ়স্বরে বলে: ঈ। পল, সে অমর প্রাণ—সেনিন। একা গাঁড়ালেন তিনি শুধু স্বদেশের রাজতন্ত্রের বিপক্ষে নয়, সারা জগতের স্বেচ্ছা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দোষণা করলেন যেমন্তব্যরে: বতদিন না প্রতিমাহুঘের, দীনতম মাহুঘের অন্নসন্ধান হয় ততদিন বিলাসীরা পাবে না পরমার। জগত বিশ্বরে তাকিয়ে দেখল। দানবিক শক্তির অনীকিনী কলচাক, ব্যাঙ্গেল, হুভেনিচ প্রমুখ দুর্ভদের নেতৃত্বে ডেউয়ের পর ডেউ তুলে এল এ-বল্লকটিন বোঝা তথা কুসুমকামল বিশ্বপ্রেমিককে ভূবিষে দিতে, কিন্তু একের পর এক তারা তাঁর প্রতিঘাতে পড়ল বার্ষ ডেউয়ের মতনই ভেঙে—হাহাকার করে। অত্যাচারের গর্জমান ডেউ জরী হল না, জরী হ'ল মহত্ত্বের অটল নীরব পর্ব্বতশিখর—একা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অকৃতোভব! বলে পল, এ-সহিময়র ভূত কি মাহুঘ মিশরের কারাগারের যুগ থেকে আজ পর্ব্বত কখনো দেখেছে? আমার জীবন সার্থক যে তাঁকে আমি চর্চকে দেখেছি: ঈশ্বরের সন্ধান নয়—মাহুঘের বন্ধু, অত্যাচারীর পৃষ্ঠপোষক নয়—সবিত্তের সহায়, দুর্গতের ভিক্ষার্থী নয়—নিরস্ত্রের সহযাত্রী, সারথি, পরম সন্তান।

পল্লব সবিস্ময়ে বলল: তুমি কি ভবে—

শাপিরো সর্গর্বে বলল: ঈ। পল, আমি বলশৈতিক, সেনিনের পটিলম্বক। এখানকার একটি ক্রম প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। ইতালির শ্রমিকদের আশ্রয়দানই আমার ক্রম। কিন্তু পোপনে।

বাইরে আমি এখানকার একটি কেরানী মাত্র। বলে একটু খেয়ে: ঈ। বলতে ভুলেছি—সেনিন সোনিয়ার পিতা দরিদ্রদের উপর ভুলী চালালের সেনিন আমি তাকে গিয়ে বললাম আমার সঙ্গে আসতে—আমার পাশে গাঁড়তে। সে ভয় পেয়ে আমার আঁটি ফিরিয়ে দিল। বেদনার আমি রাতের পর রাত ঘুমতে পারিনি। এরই নাম ভদ্রনারীর বুর্জোয়া প্রেম! না পল, ব্যক্তিগত হস্তপ্রেম আমার জন্মে নয়। বলেতে বলেতে বেদনার গুর স্বর গাঢ় হ'য়ে এল: সেনিন আমি মনের দুঃখে কোঁড়ে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি যদি কখনো বিবাহ করি—প্রেমের জন্মে করব না। যদি পাই কখনো এমন কোনো মেয়ে যে নিরস্ত্রের দুখে অন্ন জোপাতে চেয়ে দুঃখ বরণ করতে রাজি, যে সবার জন্মে ব্যক্তিগত সুখ সুখি ছাড়তে উদ্বুদ্ধ—এক কথায়, যে মাহুঘের মুক্তির জন্মে নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত—তবে তাকেই দেব মালা। বকিত, ধূলিমান ও বৃত্তুহু মাহুঘই আমার কাছে ভগবান, সমাজ, রাষ্ট্র—আর কোনো ভগবান, সমাজ, রাষ্ট্র আমি মানি না।

পল্লব তার নিজের স্থাপ্পন্ন শব্দ শুনেতে পায়।

একুশ

এর পরে ওরা পরস্পরের আরো কাছে এসে পড়ল। বোঝাই সন্ধ্যাবেলা বেরুত বেড়াতে। ওদের গল্প আর যেন শেষ হ'তে চায় না। পল্লব ওর জীবনের একটা কথা বলে তো শাপিরো বলে তিনটে। পল্লব একদিন হেসে বলল: শাপিরো, যদি বৃত্তুহু আজ তোমাকে দেখত তো বলত: এ তো সে শাপিরো নয়, তার সুখোশ প'রে আর একটা মাহুঘ।

শাপিরো হেসে বলল: বললে তুল বলবে ভাই! কারণ একই মাহুঘের মধ্যে অনেকগুলো মাহুঘ জড়াজড়ি করে গারে গারে বাস করে—যে খেলি কখনো এটা উপরে আঁস কখনো বা ওটা। এই-ই মনস্তাত্ত্বিক সত্য।—আর সেই জন্মেই না মাহুঘ চেনা এত শক্ত। বাকি দশ বছর থ'রে দেখছি ক, তাকে হৃদয় তারপরে পাঁচ বছর দেখব থ, তার পরের তিন বছর প এই ভাবে। কিবা উপমা দেওয়া যেতে পারে—পাঁপড়ি মেলা। একটা পাঁপড়ি মেলালে ফুলের এক চেহারা, দুটো মেলালে আর এক রকম, তিনটে মেলালে আবার আর এক রকম। কিন্তু এ সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় একদিনে নয়, বহুদিন লাগে ঠেকে শিখতে। আর তাই তো বিজ্ঞ বিচক্ষণ বলি শুধু তাকেই যে বহুশর্মা—অভ্যভার, যে অনেক পোড় খেয়ে পোক্ত হয়ে উঠেছে। বলে কেব একটা সিগার ধরিয়ে: আমার নিজের জীবনেরই একটা দৃষ্টান্ত একবার ভাব্য হিসেবে পেশ করি পোনে।

বলে সিগারে টান দিয়ে শুরু করল: আমি তখন সেনিনের সৈন্তদলে। হঠাৎ আবার একটি যুদ্ধে আমি কলচাকের হাতে বন্দী হই। সেনিন রাতে আমার ও আমার প্রায় দশ বার জন সহচরের একটা অন্ধকার কাবাগারে কটিল। পরদিন সকালবেলা শুনলাম যে আমাদের সকলকেই বধ করা হবে—কেন না, কলচাক ইহাঞ্জুর হাতে বন্দীদের খেতে দেবার মতন বখেট রসদ নেই।

সেনিনকার সন্ধ্যাবেলা বেশ হয় আমার জীবনের ইতিহাসের পাতার বরাবর রক্ত-অক্ষরে লেখা থাকবে। একে একে আমার ডিন

তিনটি বন্ধুকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল। বধ্যভূমিটি আমাদের হাজত থেকে এক শত হাতও হবে না। বন্ধুকের আওরাজ ও তাদের অস্ত্রসম আর্দ্রনাদ পর পর কানে আসতে লাগল। আমারও ডাক এল বলে। নিশ্চিন্ত নির্ভর অপেক্ষা করছিলাম কখন এ পৃথিবীকে শেষ বিদায়বাণী শোনাবার লগ্ন আসে।

পল্লব শিউরে ওঠে। শাপিরা ব'লে চলে : ডাক এল বধ্যাসময়ে, যেমন চিরকাল আসে। আমার পায়ের বেড়ি খুলে নিয়ে দুধারে হুজুম শাস্ত্রী আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চলল।

হঠাৎ আমার মনে বিষম ভয় কেঁপে উঠল—যে, এখনই মরতে হবে! জীবনে কখনও আমি মরবার ভয়ে এ বকম ভীত হয়েছি বলে মনে পড়ে না। প্রাণে আবার কখনও কেউ মরতা দেখেনি। বাবা-মা ছেলেবেলা থেকে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতেন পাছে আমি পাহাড় পর্বত জাহাজ স্ত্রীর থেকে লাক মারি, কি বনে জঙ্গলে বাই হারিয়ে। পাড়া পড়শিরা আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করত : একটা! অশান্ত ভূত চুকেছে মাহুকের খোলে। এ-হেন আমি বেশ মনে পড়ে—সম্মিলিত সৈনিকদের বন্ধুকে টোটা পুরতে দেখতে না দেখতে ভয়ে চোখে অন্ধকার দেখলাম। প্রাণ আকুলি বিকুলি ক'রে উঠল।

তারপর ?

হঠাৎ না ভবে চিস্তা বিলম্ব ছুট। আমার হুপাশে হুজুম শাস্ত্রী গাছের গুড়িতে বন্ধুকে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল। আমাকে ছুটেতে দেখে তারা বেন চোখকে বিধাঙ্গ করতে পারল না। কাজেই আমি একটু ঠাঁট পেয়ে গেলাম। তার পরই সোরগোল : ধর, ধর ধর। কিন্তু ততক্ষণে আমি তিনশো হাত দূরে!

ভাগ্য বলে যদি কিছু থাকে তবে বোধ হয় এই সন্কটলগ্নে তিনি আমার সব চেয়ে কাছে এসেছিলেন। হ'ল কি, স্বাতন্ত্র্য সৈনিকদের বন্ধুকে উঁচু করে ধরে থাকাই সার হ'ল—ছুড়িতে পারল না। কারণ তাদের সামনে গাওয়া করেছে পাঁচ-সাত জন শাস্ত্রী আমাকে ধরতে। ছুঁলে তাদের গায়ে লাগার সম্ভাবনাই বেশি তো। কাজেই এই দুর্দিনে শত্রুই হয়ে ঝাঁড়াল আমার পরম মিত্র—বর্ষ যাকে বলে। তবু হুজুম ঐ কীকে গুলী ছুঁড়েছিল। শুধু একটা গুলী আমার পকেট কেটে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

তারপর ?

তার পর আমার আর কিছুই মনে নেই, আমি পাপালের মতন ছুটেতে লাগলাম সব ভুলে। হ্যাঁ, কেবল একটা কথা মনে আছে, ফুল-কলজে দোঁড়োদোর আমি বরাবর প্রথম হতাম। আমার হঠাৎ মনে হ'ল বেন আমি সেই প্রতিযোগিতার নেমেছি।

তারপর ?

বললাম না—ভাগ্যদেবতা জীবনে সেই একটিবাইই আমার সবচেয়ে কাছে এসেছিলেন? নৈলে কি আমি না জেনে কলশেভিক সৈন্যদলের দিকেই মুখ ক'রে ছুটি? বটামানেক ছুটেই তাদের লাইনে পৌঁছে গেলাম।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : আচ্ছা তোমার বাবা তোমাকে আর ডাকেন নি ?

শাপিরোর মুখ রান হ'য়ে আসে হঠাৎ : ডেকেছিলেন ভাই ! আর শুধু ঐ ব্যাটাটাই আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি আজো। কারণ—এ আমার এক বিচিত্র গতি আমাদের স্তব্ধের—আমি সোনিয়াকে ভুলতে পারলাম এক বৎসরের মধ্যে—যাকে এক সময়ে হুজুম না দেখলে চোখে অন্ধকার দেখতাম—কিন্তু আমার বাবাকে ভুলতে পারি নি আজো—তিনি আমার সবচেয়ে বড় শত্রু হওয়া সম্ভব।

পল্লব চমকে ওঠে : শত্রু ?

নয় ? যে বলে লেনিন মহাদানব, বলশেভিকরা নরকের সামন্ত, কম্যুনিসম মানি শয়তানের রাজ্য? বাবা আজ ষ্ট্রকহল্‌সে শলাতক হোরাইট রাশিয়ানদের নায়ক, বাস করেন মন্ত বাগানওয়াল প্রাঙ্গণে। কিন্তু তাঁরও ঐ এক দুর্বলতা : তিনি বন্ধুবান্ধব স্ত্রী সব ছেড়ে বিদেশে থাকতে পারলেন, কেবল তাঁর বিরোধী উম্মাদ দিগ্‌ভ্রান্ত ফুলতিলককে আজো ভুলতে পারেন নি। তিনি কাপুরুষ ও বিলাসী, কিন্তু আমাকে তিনি আজো ভালোবাসেন—কিবে চান তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকাররূপে। অথচ তাঁর কিসের অভাব বলা? কেন চান আমাকে—যাকে তিনি মনে করেন বিধর্মী উম্মারগামী, দানববাহিনীর পদাতিক? আমরা পরস্পরকে অভিলাষ দিই হয়ত প্রতিদিন সাঁক-সকালে। কিন্তু তবু তিনি আমাকে ডাকেন কিবে কিবে আর আমি যেতে চাই—কিন্তু বাব কোন মুখে বলা—যে বাণ—ব'লে শাপিরা দুহাত মুখ ঢাকে। [ক্রমশ :]

বিশ্রাম

(Mathew Arnold রচিত Requiescat হইতে)

গোলাপ শুধু গোলাপ দিয়ে শয্যা সাজাও তার
শোকের চিহ্ন নাই বা দিলে তার,
কি শান্তিতে ঘুমার দেখো, জাগবে না সে আর,
আমি যদি অমন হতেম হার !

সবার দাবী মিটাতে তো হাসুলো জীবনভোর
হরবধারার করিয়ে গেল স্নান,
এত দিনে এ সংসারে মিললো ছুটি গর,
ল্লাভ বড় ল্লাভ এখন প্রাণ !

তপ্ত উত্তর, শব্দবুধর, পুষের কীকর'পরে,
ঘুরে ঘুরে গেছে জীবনচাকা,
স্বপ্ন তবু আকুল ছিল, শান্ত ঘুমের তরে,
সে শান্তি আশ নীরবে দিক দেখা।

সেহের খাঁচার বন্দী পরাণ নিখোঁসে প্রাঙ্গণে,
বাগটে পাখা ছিল পাগলপারা,
আজ সে পাবী মুক্তি পেল, মরণ-মহাকাশে,
কোন অসীমে কোথায় হল হারা।

অনুবাদিকা :—সবিতা রায়চৌধুরী

সেকেন্দ্রে

ধারনা নিয়ে

ভালভাবে জীবনযাপনের সুযোগ

নষ্ট করবেন না ?



সেকেন্দ্রে ধারণা ও অন্তঃসত্তার বাস্তবের পক্ষে ভালভাবে জীবন উপভোগ করার এবং আধুনিক জগতের সুযোগ সুবিধে সম্ভাব্যতার পথে সঠিক বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো কোনো লোককে বলতে শুনা যায়, "আমি কখনো বনস্পতি ব্যবহার করি না। শুনেছি, বাস্তবের পক্ষে জিনিসটা ভাল নয়।" এ হল একেবারেই সেকেন্দ্রে সংস্কার ... কারণ রেহপদার পদার্থ যে বাস্তবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। উপরন্তু, বনস্পতি যে সবচেয়ে পুষ্টিকর ও উপকারী রেহপদার্থের মধ্যে অন্যতম বিজ্ঞান তাও প্রমাণ করেছে।

অত্যাবশ্যক ভিটামিনে সমৃদ্ধ

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে বাস্তু ও শক্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ পক্ষে দু' আউন্স করে রেহপদার্থ খাওয়া দরকার। রেহপদার্থ আমাদের অল্প খাদ্য হজম করতে ও তার উপকারিতা পেতে সাহায্য করে। তাছাড়া, রোগ ও অবসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং আমাদের স্বাস্থ্য ও সবল থাকতেও সাহায্য করে।

বনস্পতি বিশুদ্ধ উদ্ভিদ রেহ—চিনাবাদামের ও তিলের তেল পরিশোধন করে বিশেষ প্রণালীতে তৈরী। এর ভেতরে রেহপদার্থের সব গুণ ঘনীভূত হয়ে আছে বলে বনস্পতি শুধু যে দামে হলভ ও আরুতেই অনেক কাজ দেয় তা নয় ... আরো স্বাস্থ্যপ্রদ করার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত আবশ্যকীয় ভিটামিনও এতে যেমনো হয়। বনস্পতির প্রতিটি আউন্স এ-ভিটামিনের ১০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ—যা চোখের ও ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষায়, শরীরের ক্ষয়পূরণে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে অত্যাবশ্যক।

ভাল স্বাস্থ্য আপনাকে ভাল স্বাস্থ্য উপভোগ করতে ও ভালভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করে ... এবং বিশুদ্ধ, পুষ্টিকর ও দামের দিক থেকে হলভ বনস্পতির কল্যাণে ভাল খাদ্য খাওয়া সহজ হয়েছে। আপনার কি বনস্পতি ব্যবহার করতে শুরু করা উচিত নয় ?

বনস্পতি

— বাড়ীর গিরীর বসু

কবি কণপূর-বিরচিত আনন্দ-রত্নাবলি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—ঐ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৪৭। মহাসর্পের তখন মহা-ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মন।
বোধ করি ভগবৎ-প্রবেশের অপেক্ষায়, বোধ করি বা নিজের ক্ষয়ের
অনিবার্যতায় তিনি সবুত করলেন না নিজের বদন।

৪৮। ঐতগবান বধন তাঁর মুখবিবরে প্রবেশ করেছেন তখন
নিজেকে বিশেষ কৃতার্থ বলে মনে করলেন মহাপূর্ণ। গর্বে উদ্ভত
হয়ে উঠল তাঁর কণ ও প্রজ্ঞা। শরীরস্থরের মায়ারিতা তিনি জানেন।
তাই অধীর হয়ে, সঙ্কটিত করতে গেলেন বদন। কিছু পারলেন না,
এতটুকুও না।

৪৯। ঐতগবানের যে ভাবটাই প্রয়োজন করা হোক না কেন,
সে ভাব কখনও উপযোগী হয় না অভাবের। তাই যে মুখখানিকে
একবার বাধান করে মহাপূর্ণ গ্রহণ করেছিলেন কুরুকে, সেই মুখের
হীন্ট তিনি আর বন্ধ করতে পারলেন না।

৫০। গলায় মধ্যে কীলকের মত কাঁড়িয়ে গেলেন ঐক্লম।
অগ্নিলাঙ্গার মত তাঁর তেজ, দহন করতে লাগল অখাসুরকে। তার
পরে বাতে অন্তরের স্মৃতিশিত মুহূর্ত ঘটে সেই প্রক্রিয়ায় নিজেকে
কীত ও বর্ধিত করতে লাগলেন ঐক্লম।

লীলাকিশোর ঐতগবান নিখিল কলাবিদ্যার বিনি সৌভাগ্যবান,
যক্তিরে ছন্দয়ে প্রবেশ করতেও বিনি ঘণা বোধ করেন তিনি
তখন তাঁর করুণাক্ষ অঙ্গের তবঙ্গ-যুক্ত অমৃতধারায একদিকে
বেমন সজীবিত করলেন তাঁর সহচরদের, অজ্ঞানকে ভেমনি-বিপুল হয়ে
উঠলেন অখাসুরের অভ্যন্তরে। মহামতিময় অখাসুর বিদীর্ণ হয়ে
গেলেন; পাঁচা কাঁড়ের মত।

৫১। দেবশঙ্কর সেই বিদীর্ণ হতেই ব্রহ্মা শিব ও শতরুহ
সত্ত্বধর হয়ে উঠলেন বনমালীর জগৎ-পাবন স্ততিগানে। কারণ,
অখাসুরের তেজ: তখন ঐক্লমে প্রবেশ করতে উদ্ভত হয়েছে। স্বর্ষ
বা চন্দ্রের মতই মহোজ্জ্বল সে তেজ:। হঠাৎ দেখা গেল সেই তেজ:
গগন-সরোবর পঙ্খ হতে হতে নিরালম্বের মত ভাসছে।

৫২। আর এদিকে মহাসর্পের বিরাট জ্বার সে কী মুচ্যাক্ষয়।
লুটিয়ে পড়তেই ফণা-গম্বীর থেকে বেরিয়ে এলেন বনমালী।
উদয়গিরির গম্বীর ছেড়ে এ যেন গভস্তিমালীর নিরুদ্ভব। এক আশ্চর্য,
ইত্যবসরে কখন যেন ব্রহ্মবালকরাও প্রাণ ফিরে পেয়েছেন, এবং
তাঁদের জীবিতের পূর্বটি বেরিয়ে এসেছেন ফণা-গম্বীর থেকে।

৫৩। ভূতশাপি-বন্দিত-চরণ বনমালী বধন বহিরাগত হলেন,
তখন অখাসুরের সেই তেজ: অখাসুরদের বিষমবিষুত করে দিয়ে,
তাঁদের নয়ন সমুখের লয় হয়ে গেল, নবময়বহুর ঐক্লমে। যে
অধুর প্রথমে নিজের অভ্যন্তরে নিয়ে এসেছিলেন ভগবানকে, তিনিই
শেষে নিজে নিষিদ্ধ হয়ে গেলেন সেই ভগবানেই; অখাসুরের এই
কীড়িরসের মহান অমৃতভাব-তথ্য সত্যই বর্ণনাতীত।

আর সেই লয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাকালে বোধে উঠল ভেদী,

পটহে পটহে বেজে উঠল ঘোর ঘনাবাজের তুমুল ধ্বনি; উকণ্ড বেজে
উঠল ভিত্তিমের ভিম্ ভিম্। মহাধূমে বাজতে লাগল তুমুলি।

গান গেয়ে উঠলেন গচ্ছ-বিভাধর ও অমৃৎ-প্রেরণী; তৌ।
পাঠ করতে লাগলেন মুনিজনেরা; শব্দের ওষধিতার কণকালোর
জন্ত যেন বধির হয়ে গেলেন স্বর্গের অমরেরা।

উর্ধ্বশী ইত্যাদি স্বর্গের অপ্সরাগণ নেচে উঠলেন। মূল্যে
বোল তুললেন সিদ্ধবধ্য। স্বপ্নের ভ্রুক বাকিরে মধুরে গেয়ে উঠলেন
কিররজিয়ারা। দেবালনারা দুহাতে বরাতে লাগলেন দেবক্রমের
কুমার। সে এক বিপুল আনন্দে মাতাল হয়ে উঠল যেন অমর-
নগরী।

বেদী কী, চন্দ্রশেখরেরও চাঁদ থেকে স্বরে পড়ল অমৃত। অমৃতের
রসে আগ্নত হয়ে শরীর হল মুগমলা। তখন কী তাদের নৃত্য।
কী তাদের নটন-পটুতা। নৃত্যের ঘূর্ণীর মধ্যে ভিমিভিমি বেজে উঠল
ডমক, অট-অট রোল উঠল অটহাসির। শব্দের সঙ্কার-সারে যেন
ব্রহ্মজ্ঞতাও বিদীর্ণ করে পরমানন্দে তাণ্ডবে মেতে উঠলেন চণ্ডিকেশ।

৫৪। মুহূর্ত্থ থেকে ফিরে এসেছেন এই রকমের একটি
অমৃতভূতি নিয়ে ব্রহ্মবালকরা তারপর দেখতে পেলেন তাঁদের
নীতিনলিন্ত-ভূবন সুকুমার ব্রহ্মবালকুমারকে; কী সুন্দর তাঁর নয়ন,
যেন পদ্মের পাণ্ডি খুলছে শিত-রোম্ভর। সুখে বিবশ হয়ে গেলেন
তাঁরা। একে একে তগবানকে আলিঙ্গন করে বললেন—

সখা, খেলতে খেলতে বিবমুগ্ধবিরের ভীষণ হৃৎকায় আমরা তো
লেহ হয়ে গিয়েছিলাম। তা আপনি কেনম করে আমাদের
বাঁচালেন?

ঐক্লম তাঁদের চমৎকৃত করে দিয়ে বললেন—আনি যে' বিবের
ওষধ জানি। এই ওষুধ টুকরো টুকরো হয়ে বায় সাপ, আবার
এই ওষুধের এতটুকুও গন্ধ পেলো প্রাণহারা প্রাণ পায়, অমৃতের করে
মধুপানোন্মতের মতোলাস।

৫৫। কুরুক মুখের আনন্দিত ভাষা উৎকর্ণ হয়ে সকলে শুনলেন
পরম সৌহার্দ্য, আনন্দ হয়ে গেল হিরা। এ ঠেকে, উনি তাঁকে বুকে
জড়িয়ে কোলাকুলি করতে করতে বললেন—

ভাই সব, আমরাও দৈবজ্ঞ, তখনি তো বলেছিলাম, বখাসুরের মত
এ বেটাকেও বধ করবেন আমাদের সখা।

সৌভাগ্যশালী ব্রহ্মবালকের মন। এবার তাঁরা সৌকান্তবচরিত
ভগবানের আদেশে যুবক বললেন বাচুরদের। স্বমর হরিণদের মত
এতক্ষণ সেগুলি এদিকে গুদিকে নাচা-কৌশ করে ঘুর বেড়াচ্ছিল।
তারপরেই ব্রহ্মবালকের নিকর-পড়ল তাঁদের বাকগুলির প্রতি। জোখ
কপালে তুলে দেখলেন ব্রহ্মবালকবিদ্যন্ত ভোজ্যাদিতে পরিপূর্ণ সেই
বাকগুলিকে বন্ধা করছেন পক্ষিত্তীরা সকলে। হাসতে হাসতে
বাকগুলিকে খুলে নিয়ে তাঁরা অমৃতস্রব করলেন ভগবানের।

৫৬। অনন্ত রহস্য করুণাসুন্দর কনকাক্ষর নন্দকিশোর তখন
বাচুর ও বাখালদের নিয়ে, বরজদের সঙ্গে খেলতে খেলতে খুঁজে
বেড়াতে লাগলেন নির্জন বনভোজনের একটি উপযুক্ত স্থান। কিছু
দূরেই চোখে পড়ল—সরোবর, এবং তার সরস পুদিন পবিসর।

৫৭। দেখেই বলে উঠলেন—

আ হা হা, কী সুন্দর স্থান, একটি পাখীও এখানে চরে না—চোখ
তুলিয়ে দিয়েছে। আরের কোলের মত আনন্দ দিচ্ছে এই পুদিন-
পবরী। ভাই সব, কবির কিছুই তো দেখেছিল এখানে। পায়েরা

পূর্ব বিরল। এইখানেই আমাদের ভোজনের আয়োজন করা থাক। কাছাকাছি বাছুরেরা চরুক আর আমরাও বনভোজন করি।

৫৮। হাসতে হাসতে একসঙ্গে সকলে সায় দিলেন—হ্যাঁ, তাই হোক। আর আমাদেরও তর সইতে না দেখা, বেজায় ক্ষিপে।

শ্রীকৃষ্ণও তখন তাঁর অপার মহিমার আদেশ দিলেন—এইখানেই তবে ভোজনস্থল রচনা করা হউক।

গাছের ঘন ছায়ায় কপূর-খুলিখল দীর্ঘ পলিনখানি হেসে রয়েছে লেশমাত্র প্রয়োজন নেই লেপনের। বাতাসে উড়ে আসছে পদ্মসরোবরের মাননীয়া জলকণা, ভেসে আসছে কহলারের কমনীর গন্ধ। পলিনের মাঝখানটিতে শ্রীকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতেই ব্রজবালকেরাও তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। মন তাঁদের আর এখন চকল নয়।

৫৯। পদ্মের সহস্র পাণ্ডুর মত একটি সুপরিচ্ছন্ন মণ্ডল রচনা করে তাঁরা দাঁড়ালেন। ক্রমে জল দিয়ে কে বেন ধুয়ে দিয়ে গেছে পলিনের জ্বরদেশ। আর সেই মণ্ডলের মধ্যস্থলে কিঞ্চিদূরত বীজকোষের মত বিরাজ করতে লাগলেন কনককটি রুচিরায় শ্রীভগবান।

৬০। এই সম্ভারের সন্নিবেশ পদ্মের পাণ্ডুগুলিতে ঘেন-হুটি হয়ে গেল বলয়াকৃতি তিন-চারটি রঙের কয়েকটি সারি। সারিগুলির মধ্যে ব্যবধান থাকলেও প্রাণের অভিব্যেগে সেগুলি বেন অবহিত। শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল প্রত্যেকের অভিযুগ্মন; তাই শ্রীকৃষ্ণই বেন প্রত্যেকের মধ্যেই অভিমানে এনে দিলেন—“মমৈবাত্মভিঃস্বখঃ” (গীঃ। ১৩।১৩)। এক নিম্বেও তখন “সর্বভোহিন্দ্রিয়রোমুখ্য”— ইতি প্রাচীন বাক্যায়ের অভিনয় করতে করতে সহর্ষে বলে উঠলেন—

সোনার চাকতির মত আপনাবা তো সকলেই চমকাচ্ছেন, এবার তাহলে ভাল ভাল খাবারগুলিকে দখা করে বের করে ফেলুন।

বাকগুলি থেকে খাতভার নামিয়ে নিয়ে কেউ তখন সেগুলিকে সাজিয়ে রাখলেন পরিচ্ছন্ন চালরের উপর, কেউ রাখলেন ফুলের পাণ্ডুতে, কেউ চকচকে দড়ির গোছার উপর, কেউ তোড়ার বিনোটে, কেউ তক্তক্ত পাথরে, কেউ লতার নিম্নলতায়। স্তব্ধ বোধকৃত হাতের পাতা, উত্তরীরের আঁচলা, উরুদেশের উপর পিঠ, সব কিছুই বেন তাঁদের খাবার রাখার থালা হয়ে দাঁড়াল। তারপরে নিজের নিজের খাবার থেকে সেরা খাবারটি বেছে নিয়ে পাতায় চৌগাং সাজিয়ে তাঁরা নিবেদন করে দিলেন প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের প্রাথম্যে।

৬১। তেঁজ-বাসের শ্রীকৃষ্ণের সে কী হাসি, আর হাসানোর ঢঙ। শাঁসালো কত সব মিষ্টি মিষ্টি বুলি। সুধার সু-রাগের বেন দূরে বেতে লাগল তাঁর দশন ও বসন। তার পরে পরমকৌতুকী নিজের ছোট্ট পেটটির উপর কবির নিকটে বুঝলিটি তাঁর রাখলেন। স্থলকণ বগলটিতে বিস্তৃত করলেন বেত্র ও বিধাণ, কঁরে, পরমস্বন্দর বায় করতলে গ্রহণ করলেন—এক গ্রাস নই-ভাতের যশু। করেই, তিনি এমন একটি বিশেষ স্বন্দর ঢঙে সেই বাঁ হাতেরই আঙুলগুলিকে নীচের দিকে ঝুকিয়ে তুলে নিলেন স্রমচার আচার, বেশমর্গে বসেও হেসে ফেললেন জ্ঞান, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণ, এমন কি অমরনগরের নাগবীর্যও।

খেতে খেতে ব্রজবালকদের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল বাজি ধরা।

কোন খাবার বেটী ভাল। শেষে দেখা গেল, যে যার নিজের নিজের খাবারটিরই মাধুর্য-বর্ণনায় সহস্রমুখ হয়ে উঠেছেন, আর হোঃ হোঃ করে হাসছেন। সবল প্রাণের সরল হাসি হাসাল ভগবানকেও। একমুখ মিষ্টি হাসি হেসে তিনিও ডান হাত চালিয়ে দিলেন। খেতে খেতে কথার পিঠে কথা কইতে কইতে বধন অতি মর্মপ্রিয় হয়ে উঠেছেন সকলের, তখন—

৬২। ঠিক সেই সময়ে, অদ্বৈতের বধের বৈভব দেখে এবং কল্যাণ ও দাক্ষিণ্যগুণে গুণাবিত হওয়া সন্দেহ, বিমিত্র ভ্রমার দ্বন্দ্বের জাগল মগাভিমান। সহস্র সহস্র পরমেশ্বরেরও যিনি পরমেশ্বর, তাঁরই ঐশ্বর্য পরীক্ষার জন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন তিনি।

৬৩। সমুদ্রের জল কত, খবরটি জানতে হলে সমুদ্রের সীমানার দাঁড়িয়ে কেউ কি কখনও একগাছি সাত বিঘা লাঠি ব্যবহার করে? আকাশের পরিমাণ কত মাথাত হলে কেউ কি কখনও ওলন-পড়ি ব্যবহার করে? না। যার এমন মোহ ঘটে থাকে হস্তাশ্পদ হতে হয়। ভ্রমারও হল তাই।

৬৪। তিনি মায়াবলে ভগবানের বাছুরগুলিকে অপহরণ করলেন।

জলাধার বটে দুটিই, কিন্তু কুয়ো আর সাগর কি একই বস্তু? না। জ্যোতির্গুণ বটে দুটিই, কিন্তু জোনাকী ও সূর্য কি একই পদার্থ? না। জাঁধার ঘটায় দুটিই, তাই বলে রাত্রি ও রাহ কি এক? না। তাই মনোমস্তের মত শিতামত ব্রহ্মও ব্যতীত পারলেন না নিজের ও শ্রীভগবানের মায়াবিধের সামান্য বিশেষ ভাব।

৬৫। ব্রহ্মা বধন বাছুরদের অপহরণ করলেন রাখালেরা তখন ভগবানের সঙ্গে একত্রে বসে আচার করছিলেন সানন্দে। উজ্জল হাসির মাধ্যমে যেখানে চতুর্দিকে উঠছে এত কথার এত মিষ্টি কথার এত উপকথার কণকথার ফোয়ারা, সেখানে কি কারো মনে থাকে বাছুরদের কথা? তুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তুলেও গিয়েছিলেন রাখালেরা। কিন্তু হঠাৎ তাঁদের মস্তিষ্কে জেগে উঠল বনসুভূতি। তাঁরা তাকালেন হাঠের দিকে—যেখানে চরছিল বাছুরের দল। একটিও নেই।

৬৬। কৃষ্ণের নিকে তাকিয়ে তাঁরা বলে উঠলেন—কৃষ্ণ, সখা! মহাবিপদ হল, একটিও বাছুর দেখা বাচ্ছে না! নতুন ঘাসের লোভে লাফাতে লাফাতে দূরে কোথাও চলে গেল না তো? খুঁজে ফিরিয়ে আনতে এখন আমাদের পৌঁড়তে হয়।

কথা নয়ত, বেন নাগিল। মুচকি মুচকি হেসে চন্দ্রবদনে তৃপ্তির গ্রাস তুলতে তুলতে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

৬৭। শুনন শুনন, আপনাবা এইখানেই থাকুন। আমাই বাচ্ছি খুঁজতে। বসেই আর এক খামচা খাবার না হাতে তুলে নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়লেন অতিবলী। বগলদাবায় বেত্র-বিধাণ নিয়ে কোমরের কাপড়ের কীসে বেটিকে দৌঁদিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাছুরদের সন্ধানে।

৬৮। দেশোচিত বেশে শ্রীকৃষ্ণ চাষ ফেললেন বনপ্রদেশ। শ্রীজ্ঞের পরমালোকে আলোকিত হয়ে উঠল বনভূমি কিন্তু কোথাও তাঁর চোখে পড়লো না খরখর বুকের এতটুকুও একটি চিহ্ন। তাঁর বললে তিনি দেখলেন—অধর্জাত ভৃগুস্থলে ভ্রামল হয়ে রয়েছে বনতল চতুর্দিকে। না, এ পথে বাছুরেরা তাহলে চলেনি—স্থির করে নিয়ে

সেখান থেকে কৃষ্ণ ফিরলেন। অপরিসর্যে ধীর বীণাঙ্গি তিনিও তাহলে অধীর হন।

কিঞ্চিৎ বিম্বিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে কি অনন্ত-রমণীয়া মায়ার আত্মকুল্যে,—বাছুরচুরি রাখালচুরি দুইই হল? ভেবেই চোখ ফিরিয়ে দেখলেন,—তীর সহচররাও নেই! অথচ তিনি নিজে অহুভব করলেন অক্ষত স্বরূপে তাঁর আত্মবল। শান্ত হল তাঁর সম্মুখ। অনিশ্চিত হলেন, পরমেষ্ট্রই এই কাজ।

এক তৎক্ষণাৎ সত্ত্ব সত্ত্ব, তিনিই হয়ে গেলেন, বাছুরের পাল, রাখালবালকের দল, সুবলী বীক বিবাণ, মালা, ডুবা, পাঁচবাড়ী সমস্ত বীর যেমনটি গুণ বর্ণ রূপ বয়স, যেমনটি স্বর প্রজ্ঞাতাব নাম কীতি সমস্তই। তিনিই হলেন সব।

৬৯। আনন্দাত্মক ও চিন্মাত্মক করে এই সমস্তেরই সম্প্রাচনা করেছিলেন তিনিই স্বয়ং। শুদ্ধ হলও অখিলকার্যজাত, কারণ থেকে কখনও ভিন্ন হয় না। তবুও এক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ ভাবের অভ্যাস হওয়াতেই তাদের লীলোপাধি ভিন্ন হয়ে গেল। অতএব এই নিসর্গোত্তম বিরাট সৃষ্টিটি অনির্বচনীয় ভাবে অদ্ভুত হয়েছে দীর্ঘাল।

শ্রীভগবানের আত্মবাহুল্য যখন ধারণ করল তত্ত্ব ভাবাপন্ন গোপকুমারদের এবং বাছুরদের আকৃতি, তখন তিনি সেই গোপকুমারদের দিয়েই একত্রিত করলেন সেই বাছুরদের, এবং দিব্যবাসনে বনের আশ্রয় ত্যাগ করে বাছুরদের গোহালে নিয়ে যেতে হবে এই অছিল্য নিজে অবিবৃক্ত আত্মার প্রবোজনায় বাহুবায় বাজিয়ে দিলেন তাঁর বেণু।

৭০। মনোমধুর বেণুধনি! শুনতে পেয়েই শ্রীভগবানের আত্মভূত সমস্ত সহচর সারা পৃথিবী মাং করে বাজিয়ে দিলেন তাঁদের পাতার ডেপু বেণু বিবাণ শৃঙ্গ। মনের উল্লাসে চতুর্দিক থেকে একত্রিত করলেন আত্মভূত সমস্ত বাছুর। তারপরে অন্তর্দ্বারের মতই প্রবেশ করলেন জঙ্গে।

৭১। তাঁদের ঘরে নিতে এসেছিলেন মায়েরা। নিজের ছেলে ফেলে, পূর্বেও তাঁরা দেখতে ভালবাসতেন শ্রীকৃষ্ণকেই, আজ কিন্তু তাঁরা নিজের ছেলের মাধ্যমেই লাভ করে বসলেন কৃষ্ণ-সাধারণ প্রেম। প্রতিচমৎকারিতার আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁদের মন। মন ভরে নামল নিবৃত্তি।

৭২। এবং স্ববল্যাদির মত অজ্ঞাত বালকেরাও দেখতে দেখতে পূর্বপূর্ববৎ, মায়েরদের দিয়েই স্নান ইত্যাদির কাজগুলি সারিয়ে নিয়ে গ্রীত করে ফেললেন তাঁদের মন। এখানে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, যেহেতু কৃষ্ণাত্মক এরা সকলেই অনন্ত উপশ্রুতি শান্তিকারী সেই হেতু এঁরা কেউই রটিয়ে দিলেন না পাগলারী ভগবানেক্সসম্মিলনের সেই কীতি।

৭৩। অন্তর্দ্বারের মতই কৃষ্ণাত্মক বাছুরেরাও ফিরে গেল তাদের মায়েরদের কাছে। বাছুরজননীদেবও স্নান অর্পণ সম্বোধে গলে গেল। বাছুরদের অভিব্যক্ত করে, অসীম করুণায় তাঁরা চাটতে লাগলেন তাদের পা। অপরিসর্যে আনন্দে হৃৎ খেল বাছুরেরা। তারপর কণ্ঠে একটি ঘর ঘর ঘর ঘর তৃপ্তির স্বর তুলে মায়েরদের কোলের মধ্যে শুয়ে বুদিয়ে পড়ল সুখে।

৭৪। শ্রীকৃষ্ণও নিজের ঘরে ফিরলেন। বাল্যখেলার বিবরণ

দিতে, গোকুলেশ্বরের কাছে যখন গেলেন তখন পিতৃদেব দু'হাত দিয়ে সোজা বৃকের উপর উঠিয়ে নিলেন ছেলেকে। বৃকে বীধলেন মেহের অতি নিবাড় বীধনে। পাল্লের মত কী নরম নরম ছেলের মুখ! পাছে লাড়ি লেগে ছড়ে যায়, তাই অতি সাবধানে গালের উপরে রাখলেন ছেলের গাল। তারপর কৃষ্ণের মাথা থেকে উকীয়াট নামিয়ে নিয়ে আত্মাণ করলেন তাঁর শির। জলে ভাসতে লাগল দু'নয়ন। তবুও তৃপ্তি নেই। তারপরে যেন মহিষার তৃপ্তির অস্ত্রই তাঁকে যুক্তি দিতে হল তাঁর ছেলেকে।

৭৫। আর কৃষ্ণের জননী অতুল বাৎসল্যরসেব বিনি অধিতীরা পতাকাধরপিনী তিনি কেবল পাড়িয়ে বাগীহীন আনন্দে দেখলেন সেই যুগ্ম। তারপরে মা যশোদা কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে ঝেড়ে তুলে ফেললেন গোখুর ধূলি। ততঃপরে যখন তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে চন্দন মাখালেন, তখন এত নির্মল, এত যত্নকে হয়ে উঠল শ্রীকৃষ্ণের লাবণি যে তিনিই যেন একখানি বিগ্রহ হয়ে পাঁড়ালেন জননীর বাৎসল্য-সাবরে।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ আহার করলেন, পা খুলেন, বৃকে হার দোলালেন, কিছুকণ এদিক-ওদিক খেলায় কাটালেন, সর্বশেষে শুয়ে পড়লেন পরাধর্ম্যের পালঙ্কের শুভ্রতায়। ভোর করে দিলেন রাত।

৭৬। পরদিন সূর্য্যও উঠল তে। শ্রীকৃষ্ণও উঠলেন। বনমালা গলার ছুরিয়ে বনগমনের উদ্ভোগ করছেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর আত্মভূত সহচররাও হুগুগু করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত। জননীরা তাঁদের খাটো-পারয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের আভিয়ার।

৭৭। বাপ-মাকে রাজি না করিয়ে কৃষ্ণ কোথাও যেতেন না। তাই, তাঁদের আশ্রয় কাড়িয়ে এং অগম্যনে বাধা দিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আত্মরূপী সহচর ও আত্মরূপী প্রাণতপালদের আত্মপ্রতিপালক হয়ে পূর্ব পূর্ব দিনের মতই বনের পথে চলে গেলেন।

৭৮। এর পর কয়েক মাস কেটে গেল এই ভাবে। তারপর অকস্মাৎ একদিন—

সেদিন শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন জনাভিরাম দাদা শ্রীবলরামের সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে লাগিত্য ছড়িয়ে চলেছেন আত্মভূত রাখাল ও সহচরের দল, গিরি গোবর্ধনের নিকটে এসে আত্মভূত বাছুরদের তাঁরা চরাতে যাবেন, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটতে গেল।

গিরি গোবর্ধনে যে সব জিন্ন গোহালের খেঁহু চরছিল, তারা হঠাৎ তাদের নিজদের দুধের বাছুরের ছেড়ে দিয়ে—কোনোটি সত্ত্বভূত, কোনোটি বা এক বছরের হবে, কোনোটি বা দু' বছরের, এত ঘোরে দৌড়িয়ে আসতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের আত্মভূত বাছুরগুলির দিকে, যে অবাক হয়ে তাদের আভ্যেহরা, লাঠি হাঁকিয়েও তাদের রূপভে পারলেন না। কা আশ্চর্য, দেখার দল কি আকাশ বেরে উড়ে যাচ্ছে নাকি?

আত্মভূত বাছুরগুলির কাছে থেমে গেল। মন্থন-আপা একটি বাৎসল্যরস তাদের যেন পেয়ে বসেছে। অবসর হলও তারা হাঙ্গা-ধনি তুলল। উগ্র মেহের উৎকর্ষার ভরা হাঙ্গা। তারপরে বাছুরদের আত্মাণ করতে লাগল খসখসাতে। লেহন করতে লাগল। সেখান থেকে মড়বার নামটিও করল না, চরভেঙে গেল মা, বাসল।
[ক্রমশঃ]

চন্দ্রা তার নাম

৷ বার্ষিক উপন্যাস ৷

মহাশেতা ভট্টাচার্য

১১

কানপুর থেকে যখন বেরিয়েছিলেন ভবানী, মনটা ছিল বিকৃত। এলাহাবাদ থেকে নৌকার কাশীর পথ ধরলেন তাঁরা। গঙ্গার দুই কুলের প্রকৃতির শোভা যেন ধীরে ধীরে তাঁকে প্রাণান্তির প্রলোপে শান্ত করলো। নদী ও গ্রাম-প্রকৃতিতে এমন কোন চিরন্তন উদ্ভাস ও শান্তি আছে, যা স্পর্শকাতর মনকে স্পর্শ না করে পারে না। চলতে চলতে ভবানীর মনে হলো, মাতৃসমা এই নদীর মতো! এমন সম্পদ যেন আর কিছু নেই। যৌবনে সমকালীন ছাত্রদের ইংরাজী সাহিত্যপ্রীতির মধ্যে পড়ে প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখেছিলেন ভবানী। স্বদেশ থেকে এই সুস্বরে এসে উত্তর-ভারতের ভূ-প্রকৃতি দেখে দেখে বাংলার জামল সৌন্দর্যকে আরো অপরূপ মনে হতো। মল্লিকার্দ্বা হচ্ছে বহমান এই নৌকাযাত্রার সময় প্রকৃতির এই অজস্র অব্যবহিত সৌন্দর্য তাঁর চোখে নতুন করে ভাল লাগলো। মাঝিসের নৌকা টানা পাঁড়ের কাঁ কাঁ তীব্র রূপ শব্দ, এর মধ্যে যেন তাঁর নিজের মানসের কোন মিল আছে। সহসা জীবনটা যেন বড় বেগী গতিপূর্ণ হয়ে উঠছিলো। টেলিগ্রাফে খবর বাচ্ছে, রেলপথ তৈরী হচ্ছে ভাবতেও যেন কেমন হিত্রত লাগে ভবানীর। এত গতি দিয়ে কি হবে? প্যাভেড, কুচ, ভবিকাজনা, ক্যান্টনমেন্টের দ্রুত ছন্দ জীবন এখান যেন সে সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমা মাঝিরা চৌকা ধরিয়ে অড়ের ডাল ও ভাত রাগা করে থাকে। খেতে খেতে দুটো একটা কথা বা বলে, শুনে অবাক হয়ে থাকেন ভবানী। ছেদীরামের চাটী এতদিনে মারা গেল। ছবিলাদের বাবা নিজে প্রার্থণ আর গরাজীতে তীর্থ ধরম করতে বাচ্ছে। বাবার সময়ে তার দুইলা গাই বাছুর, আফশোষ—দুই টাকার বেচে দিয়ে গেল। মাছট্যা অনেক পয়সা করেছে। কেন না নিজের গায়ে ইটের বাড়ী বানিয়েছে। কোন না তিনশো টাকা খরচ হলো তাতে? বড় ভারী মাছুর।

এই সব ছোট ছোট কথা। পরিকার বোকা বায় তাদের জীবনের পরিধি এর চেয়ে বিস্তৃত নয় আশঙ্ক। তার বাইরে কি হলো না হলো। তার মাথা ঘামায় না। ভবানী ভাবেন, এই সব মাছুরকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এই যে আর একটা জীবন গড়ে উঠছে, তাতে এদের লাভ কি? সর্বশা পোনা বায় এতে ইতিহাস ভাল হবে। সে কোন ইতিহাস? নদীবন্ধর দুই পায়ে চলমান জীবন। প্রত্যাহ অপরূপ বর্ণগন্ধা নামে। নদীর 'পরে' আকাশ অনেকক্ষণ অবধি স্থনীল থাকে। দুই

পাশে সোকালায় থেকে শিবমন্দিরের আরতির ঘণ্টা বাজে। কোথাও দেখা যায় আশানের আলো। ধিক্ধিকি চিতা জ্বলছে।

চন্দ্রনের সঙ্গে ভবানীর অনেক কথা হয়। অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলেন অনেক কথা। বলেন—চন্দ্রন, তোমাদের গ্রামে সতী দেখেছ? চন্দ্রন বলে—জানি একবারই হয়েছিলো। আমাদের জন্মের আগে। তবে কোম্পানী কাছনের পরে।

ভবানী আজ তাকে এমন কথা বলেন, যা তাঁর মনেই ছিলো, অথবা যা কোনদিনও বলবেন বলে ভাবেননি। বলেন—আমি যখন খুব ছোট, তখন ছয় বছর বয়সে আমাদের গ্রামে একজন সতী হয়েছিলেন। সে কথাটা আমি কোনদিনও ভুলিনি। তার ক'দিন বাদেই কোম্পানী কাছন চালু হলো। তাই আমাদের গ্রাম আর ঐ অঞ্চলে সেই শেষ ঘটনা। মনে ছবির মতো আঁকা রয়েছে। আজকে সন্ধ্যায় ঐ যে ঢাক বাজছিলো? ঢাকের শব্দ শুনে মনে হলো, সেদিনও এমনই সন্ধ্যা ছিলো, এমনই বাজনের শেষ, যতদূর মনে পড়ে।

চন্দ্রন মনের কাষবারী নয়। সেই কথা মনে পড়বার এখন কি হলো সে কার্যকারণ বুঝতে পারে না। যে কথা ভবানী বলতে পারেন না, সে হলো এক জলধাত্রীর। সে চার বছর হলো, ত্রাইটের কোন এক সফরে একসঙ্গে গাভিপুত্র অবধি গিয়েছিলেন তিনি। অজ্ঞ বজরা, অজ্ঞ সহচর। ত্রিজহলারীকে তখনো তিনি তেমন জানেন না। এক পুনঃস্মিতা রমণীর স্বর্ণভূষার কথা শুনেছিলেন। শুনেছিলেন দেশীয় সিপাহীদের কাছে। শুনেছিলেন, যে অজ্ঞ কোন সাহেব হলে কথা ছিল না, ঐ ঘৃণিত মাছুরটার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে তাদেরই স্বদেশ স্বজাতির মধ্যে, তাতেই তারা অপমানিত হয়েছে। তাঁর কাছ করতেন যে ব্রাহ্মণ-সিপাহী সে বলতো—আশ্চর্য গরনার লোভ ঐ মেয়েটার। ওর অজ্ঞ সোনা কিনতে কিনতে ঐ সাহেব ফতুর হলো।

ভবানী তখন জনশ্রুতি শুনে শুনে বিরূপ ধারণাই পোষণ করতেন। বজরা তাঁর লাগিয়ে একই জায়গায় পৃথক পৃথক ঠাইয়ে রাগার ব্যবস্থা হতো। রাজপুত্র হাবিলদার ও সিপাহীদের অহুরোধে ভবানী অনেক সময় স্ববরে স্তোত্রসঙ্গীত শুনিতেছেন। তরুণ কণ্ঠের সে শুক মন্ত্রোচ্চারণ গঙ্গার প্রশান্ত উর্মিমালার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়তো। তখন হুটি ভক্তিনন্দ্র চোখের নীরব প্রণাম তাঁর পায়ে কণ্ডবারই হুটিয়ে পড়তো, কোনদিনও চেয়ে দেখেননি ভবানী। পরে জেনেছিলেন। আবাক গঙ্গার জলে পাঁড়ের সুবের দিকে মুখ তুলে সেই মেয়েটি কি আবুল ভক্তিতে চোখ বুঁজে প্রণাম করতো

করজোড়ে তাঁও যে দেখেননি তাঁ নয়। তখন ভাষতেন সে শুধু পুণ্যার্জনের স্পৃহা। সেবশসিবে সোপান বাধিয়ে দেয় পুণ্যের আশার—সে তো ঐ কলুবিভা মেয়েগাই। পুণ্যের প্রয়োজন ভায়ই, যে পাশে ছুবে আছে।

আজ তাঁর পুনরীক সে কথা মনে হয়। মনে হয় চিন্তাধারায় তিনি ব্রিজহুলায়কে অবমাননা করেছিলেন একদিন। তাই আজ বেন দুঃখ হয়। কেন দুঃখ হয়? সে কোথায়, আর তিনি কোথায়। সংস্কার ও বহু বাধা মনে থেকে কাটিয়ে একদিন ত' জিন সহজ মানবধর্মে তাকে ভালবেসেছেন। একদিন? কেমন, আজ ভালবাসেন না? তবে সেই স্থলর মুখ, সেই বিষন্ন হস্তাশা, তাঁকে আজ ব্যাখ্যাত করলো কেন? মেয়েদের সম্পর্কে অবিচার আর অত্যাচার—মেয়েদা যে কত অসহায় সে কথা, এই মেয়েটিকে না জানলে কি তান বুঝতেন? এই একটি মেয়েকে অসহায় ভাবে নিগোড়িত হতে দেখে তবে না মনস্তাত্ত্বিক আঘাত পেয়ে তিনি শিবলেন? তাঁর স্বদেশেই কি মেয়েরা কম অত্যাচারিত?

আজ ব্রিজহুলায়র কথা মনে হতে সেই বিগত শৈশবযুগটি মনে পড়ে। ভাবনা ধীরে ধীরে বলেন। ঈষৎ অন্তরমনে ভাবে, ভুল কুঁচকে বিবৃত টুকরোটাকরা মনে করে করে। চক্ষুনের সঙ্গে অলিখিত একটা সন্ধি হয়েছে যেন। আর প্রোভা এখানে অবাস্তব। ভাবনা অন্তরমানে ঈষৎ বিষন্ন হেসে বলেন—কি জানো, সে বেন একটা কাহিনী। কেউ বেন আমাকে বলেছিল। কিন্তু কাহিনী ত নয়। আমায় জীবনেই দেখা। বৃহৎ পরিবার আমাদের। আমার একজন পিসীমা ছিলেন। কলকাতার কাছে গ্রাম। যে কোন সময়ে আইন চালু হয়ে থাকে বলে শোনা থাকে। এমনি সময় পিসেমশায় মারা গেলেন। আমাদের গ্রামে নয়। দূরে। খবর এলো। আমাদের বাড়ীর যিনি কড়া ছিলেন, তাঁকে গ্রামের দশজনকে বুদ্ধি দিলো। তিনি ঠিক করলেন যে পিসীমাকে সত্যি করতে হবে। আর এমন ধুমধাম হবে, যে সকলে মনে রাখবে।

সেই জ্যাঠামশায়কেও মনে পড়ে ভবানীর। পিসীমা তাঁর চেয়ে বছর বারো বড় ছিলেন। কুলীন ঘরের মেয়ে। কুলীনের স্ত্রী। উনিশ সতীনের একজন। স্বামীর সঙ্গে জীবনেও যোগ ছিল না তাঁর। হেমশশীর বিয়ে তাঁদের বাড়ীতে একটা উপহাসের কথা ছিলো। বৃহৎ একাদিকালী পরিবারটিতে মহিলাদের মধ্যে, ধারা স্বামিপ্রভে সোহাগিনী, অথবা সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিতা তাঁরা নির্মম ও নিষ্ঠুর কোঁড়হলে সে প্রসঙ্গ বার বার তুলতেন—হেমশশীর বিয়ের কথা। কুলে মেল নৈকিয়া কুলীন মুখোটি মহাশয় একজন ভৃত্য ও একটি বিষম নাপিত সঙ্গে নিয়ে বিয়ে করে বেড়াচ্ছিলেন। নাপিত এসে একদিনের পথ এগিয়ে থাকতো এবং ধোঁজধবর করে ঠিক করতো। মুখোটি মহাশয় নতুন হাড়িতে মুণের ডাল-চালে স্নেহ খেয়ে এঁটো কলাপাত জলে কেসে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে উঠতেন ভাবী স্বপ্নরগৃহে। হেমশশীকে তিন শত এক সিদ্ধা টাকা পণ ও চার জোড়া ধুতি-চাদরের বিনিময়ে তিনি উদ্ধার করে বান। এক দণ্ডের নোটিশে বিয়ে। নতুন একখানা সৌও জোটে। ভবানীর জননীর একখানা সৌও জোটে। ভবানীর জননীর একখানা বেগুনফুলী নতুন শাড়ী ছিল, তাই পরে বিয়ে হয়েছিল। রাত না পোহাতে মুখোটি, হেমশশীর কানের মাকড়ী ও গলায় মুক্তকীমালা চেয়ে

নিরে প্রস্থান করেন। আর কখনো তাঁকে দেখেননি হেমশশী। বাড়ীর মেয়েরা হাসতে হাসতে বলতেন—ঠাকুরকত্তার মতো স্বামি-ভক্তি ভাই দেখিনি। ঠাকুরজামাই কসী না কালো, তাই চেয়ে দেখতেও সময় দিলেন না, অথচ তাঁরই এক কথাতে ঠাকুরকত্তা গহমা খুলে দিলে?

হেমশশীর বিবাহ হয়েছিল মাত্র। সেহে মনে তিনি কুমারীই ছিলেন। আর সেই এক ধরনের সরল গুচিভা তাঁকে ঘিরেছিলো। পূর্বের অবস্থার সঙ্গে তফাৎ এই, যে বিয়ের ডালার 'শ্রী' গড়তে, ইউ পূজার ঘট তুলতে, জরমজলবারের ব্রত করতে তাঁর অধিকার হয়েছিল। ভবানীর মনে আছে বাগান থেকে নারকেল আসতো। পিসীমা সন্তানানের ভিত্তে চুল মেলিয়ে সেই নারকেল কুবে বড় বড় কাঁসার খালায় চুষড়া করে রাখতেন। পরে মায়ের সঙ্গে বসে সন্দেশ তৈরী করতেন ছাঁচে বসিয়ে। ব্রতপূজার দিনে পাখরের খালার শসা, বাতাবিলেবু ও কলা কেটে কেটে রাখবার দায়িত্ব ছিলো তাঁর। বাড়ীতে বহুজনের একজন। হেম রয়েছে, শাকগুলি বেছে রাখুক, হেমকে ডাক, দাসী চাকরদের জল খেতে দিক—হেম বেন ছোট ছোট মেয়েদেরই একজন। ভবানীর মা ছিলেন কোমল প্রাণের কণিকার মানুষটি। হেমশশীর সঙ্গে তাঁর একটা সখ্যতা ছিল। দুইজনে একসঙ্গে নাইতে গেলে পুকুরপাড় বসে জলে পা ডুবিয়ে কথা তাঁদের ফুরাত না। ভবানীর মা নীচু গলায় তাঁর বাপের বাড়ীর গল্প করতেন। তিন ফোশ দূরেই পিতামহ, তবু আর কোনদিনও বেতে পারবেন না—কুলীনের মেয়ের চিরদিনের দুঃখের কথা।

সহসা হেমশশীর বেন সে সামান্ত পদমর্যাদা থেকে কোথায় উঠে এলেন। জ্যাঠামশাই-এর উম্মাতে হৈ চৈ পড়ে গেল। গানের দলটি মানুষ এল। ঢাক বাজল। ঢুলিরা ঢাক বাজিয়ে বাড়ীর সামনে লোক জড়ো করে ফেললো। এক নিমিষে বোধ হলো কি না কি হতে চলেছে। ভবানীর মনে আছে একটা নিরবধর উম্মত্ততা অথবা কোঁক বা নেশা বেন সংক্রামিত হয়ে পড়লো বাড়ীতে। প্রবীণারা তাল তাল হলুদ বাটলেন। ভেল হলুদ বাটি ভরে ভরে রাখা হলো। আশপাশের বাড়ী থেকে মেয়ে বোঁরা ছেলে কোলে তাড়াতাড়ি এলেন। উজ্জ্বলী জ্যাঠামশায় ভবানীকে কোলের কাছে বসিয়ে কদ' লিখছেন, পুরুতঠাকুর হাঁকছেন, ভবানীর আঙুল মনে পড়ছে—ঘুত ৩—গুড়ন পাড়ন বস্ত্র—১—সতীবস্ত্র একজোড়া ২।—কাঠা—৩—পুরোহিত ৩—দান ১—চাল ১—সুপারি ১—কুল ১—কপূর ১—মিঠার ১—হরিদ্রা ১—চন্দন-বুণ-নারিকেল ১—হোহারা ১—চুলি ১—নাপিত ১—তবলদার ১—

জ্যাঠামশাই বলছেন—হ্যাঁ পুরুতমশাই, এতদে হলো পানরো টাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা, এঁয়া? পুরুতঠাকুর বললেন—হ্যাঁ। এ হলো কম করে—এ আপনি বত বাড়িতে চান!

তারপরে ঢোল ঢাক কীসি ঝাঁঝের বটা বেজে উঠলো। ভবানী বেন আজও দেখছেন, পিসীমার পরনে নতুন জেলি, সর্দায়ে জেল হলুদ, মাথায় সিঁদুর, পায়ে আলতা—কিন্তু পিসীমা বেন কুন্তেধরা মানুষ হয়েছেন। * অপ্রকৃতিস্থ চোখে ঘরের জনসমূহের দিকে চাইছেন, আর একরকম আর্দ্রান করে উঠে পালাতে চাইছেন। দশজনে ভেল সিঁদুর ও হলুদ দিতে দিতে আবার বসিয়ে দিচ্ছে। সেই সিঁদু কুঁড়ির ঘর খুঁচোর গন্ধে অন্ধকার! কোনো অজানিত জয়ে ভবানীর

বুক তুলিয়ে বাচ্ছে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে মা-কে পাচ্ছেন না। মা বুঝি ঐ তৌড়ে আছেন?

তারপর আর কিছু মনে পড়ে না। শেষে অবশ্য জেনেছিলেন তিনি, যে জ্যাঠামশায়ের ওপর তর্ক করে গিয়েছিলেন ইয়েজ দাবোগা। তবে বাঙালী থানা-কর্তাবাট পিছু ধিরে এসে পুণ্যবান জ্যাঠামশায়ের পদধূলি নিয়ে গিয়েছিলেন।

বোনকে সামান্য দেবার ছলে জ্যাঠামশায় বলেছিলেন—মঠ দেব আমি তোরা নামে। মঠ দেব।

নদীর ভাঙনে সে মঠ টেনে নিয়েছে বুকো। কিন্তু হেমশায় মরুভূমি সে মুহুরাঙ্গা। একটুই কয়েছে কি? তবানী জানেন, যে না, কয়ে নি।

এ মরুভূমি কাহিনী শেষ করে তবানী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন—আমাদের দেশের মেয়েরা, বুথলে চন্দন, বড় অভাগী। তাদের ছুপ তাদের বাণ-ভাইরাও বোঝে না। একটুই নয়।

তবানীর কথা শেষ হয়। ঠাণ্ডা বাতাসে ঝড়িয়ে দিচ্ছে চোখ মুখ। জলে তারার ছায়া বিকমিক করছে। মুহূ-মুহূ বাতাসে পাল তুলে চলেছে নৌকো। চন্দন চুপ করে থাকে। তারপর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে—ডাক্তারগতের, এবার কেন যেন বসন্তকালটা বড় সুন্দর হয়েছে! তাই না? আছে বত বোল

এসেছে, কসলও চমৎকার হলো—সুন্দর লাগছে যেন সেনগুলো যৌগও যেন মিঠা।

সত্যিই সুন্দর হয়েছে দিন। এই প্রাকৃতিক-সুন্দরার অতীত কোন সৌন্দর্য যেন ব্যাপ্ত হয়েছে বিশ্বচরাচরে। কেন যেন যেহিনী মাদ্রাজাল বিস্তার করেছে বসন্তের দিনগুলি। কোন্ উৎসব আসন্ন?

বারাণসীর অর্ধচন্দ্রাকৃতি মহানদীর ললাটিকা-চূড়িত কঙ্করীয় অপরূপ চিরায়ত সৌন্দর্য দেখে কুপ্ত হলো নহন। অন্তর থেকে ধল বোঝ হলো নিজেকে তবানীর। বারাণসীর নামে এমন কোন বাত্ম আছে, প্রণাম করতে সাধ যায়। এক অল্পলি জল তুলে মাথায় দিলেন তবানী। নৌকা করে বাড়ীতের নিয়ে দেখাতে বেরিয়েছে মাদ্রিয়া। তাদের গাভিয়ার মুউচ্চকণ্ঠে বলে চলেছে—হরিশচাট দর্শন করুন, ঐ দেখুন কোয়ারবাট—জাহা—কালুতোষ রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্মরণ নিয়ে কি ধনী হলো, ঐ যে তার কুটি! আর ঐ চৌবটিবাট, পেপোয়া প্রাসাদ দেখুন!

বড় বড় ছাতার নিচে যেন মেলা বসেছে দশাধমেঘ বাটে। স্ববক্তার নামগানের ধনি উঠছে প্রভাতী আকাশের দিকে। বাটের নিচের দিকে দুই পাশে যে সকল গুপ্ত শিবমন্দির আছে, গজাব জল কয়ে বাওয়াতে তারা প্রকাশ হয়েছে। জাহ্নবী এতদিন ধরে গুজাহলে মহানদীরকৈ গৈরিক মাটিতে বিজ্জ্বলত করেছেন। ডিখারী

ও-আর-সি-এল এর



কুমারেশ

নিজের ও দোস্তের স্বাস্থ্য

২৫

দি ওরিয়েন্টাল বিদ্যাচ ১০৮ কোমিকাল হাট বারোটা লিঃ

সেবতা—নাম সার্থক করে মহাদেব ধূলি-ধূসর হয়েই বিবাহ করছেন। মন্দিরের আধাখানি এখনো জলে ডোবা। ছলাং ছলাং করছে জল। ঘটি-পুজারী নৌকা নিয়ে শিবের কূল ও বেলপাতা নিয়ে যাচ্ছে। তিনি যে নিরন্তর গঙ্গার পবিত্র উদ্ভিতের খোঁজ, সে কথা মনে না রেখে সে তরুণ পুজারী কখনো থেকে শিবদীর্ঘে জল ঢেলেও দিচ্ছে। অধিকন্তু ন সোযার—এমনি একটা তৃপ্তির ভাব সে মহাদেবের মুখে চোখে। বাঙালী ভাবের বেশ তৃপ্ত আলাভোলা ভাবটি এনেছেন মহাদেবের মুখে। মনে হচ্ছে নিহক জগদারা না হয়ে তৃপ্ত-মধু বা ঘি হলেও জোছনপ্রিয় সোতা সেবতটি অদৃষ্ট হজেন না।

ঘাটে ছাতার তলে তেল ও দ্রাব্যের আয়োজন নিয়ে বসে আছেন পুজারীরা। একটু টেবুয়া পয়সা, দুটি কড়ি, বা একটি আধলা পয়সার বিনিময়ে তেল মেখে দ্রাব্য করে নিপুণ দ্রাব্যার্থী। অর্ধ নিয়ে জলে গাঁড়িয়ে ক্রত মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। সকলে ওপরে সকালের আলো এসে ঝলমল করছে।

পুষ্টিয়ার ঘাটে নৌকা ঠেকিয়ে উঠে আসতে আসতে সহসা মনে হয় সকল মানুষ বেন গঙ্গার দিকে তাকাচ্ছেন গাঁড়িয়ে উঠে। নৌকাগুলি বেন হর-হর বলতে বলতে ক্রত পাড়ের দিকে আসছে।

—চন্দন দেখ! আজ খড় হল।

সমবেত সকলে হাত জোড় করে রয়েছে। চন্দনও হাত জোড় করে। গঙ্গার বুক দিয়ে তাঁর শ্রোতের বিপরীতে ভেসে চলেছেন লম্বান ভকীতে চিত্তসাঁতারে এক বিরাটকার পুরুষ। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বেহ, চোখ মুদ্রিত—বিশাল দেহটি নিগম্বর। জনতার জয় জয় ধ্বনির মধ্যে দৃকপাত নেই। বেন মহাদেবের এক মর প্রতীক ঐ আত্মভোলা সন্ন্যাসী।

ত্রৈলোক্যাম্বিকী কী জয়! এই শুনে এক অক্ষ বৃদ্ধাও প্রশংসা করেন লম্ব্যন্তে। বারানসীর মানুষ এই মহাপুরুষকে স্বয়ং মহাদেবের আশোভূত বলেই জানে।

চন্দন বলে—তিনি কি দুইশো বছর সত্যিই বেঁচে আছেন?

ভাবানী বলেন—সে শোনা কথা। তবে আত্মভোলা এক শিশুর মতোই পুরুষ তিনি। সকলে বড় শ্রদ্ধা করে।

দশাখমের ঘাটের সন্ন্যাসানে ভবানীর জ্ঞাতিদাদার বাড়ী। ভবানীদেবের অঙ্গ তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। ভবানীকে দেখে সকলেই আনন্দিত হলেন। দার্শনিক বাবে আত্মীয়বন্ধন সাংঘর্ষনে ভবানীরও আনন্দ বোধ হলো। ক্রাচ-মেজাজ ও শিক্ষাদার্য্য তিনি এঁদের থেকে অনেক স্বতন্ত্র। তবুও গৃহ এবং পরিবারের পরিবেশ তাঁর কাছে খুব ভাল লাগলো। ভবানীর দাদা হরিশঙ্কর আরগাঠী বিভাগের কেরাণী। তামাক ব্যবসায়ীদের কল্যাণে তাঁর উপার্জন ভালই। মাদুঘাটি ব্রেহ্মীল হাসিখুশী। সাংসারিক সকল কর্তব্যই বেশ হাসিমুখে করতে পারেন। আগ্রয় কর্তব্যগুলিও হাসি ও মিষ্টি কথার প্রলেপে এমন ভাবে নিকর বধেন, যে কোন পক্ষই ব্যথা পায় না। ভবানী উপবীত রেখেছেন মাত্র। অস্ত্রধার আচার ব্যবহারে অধার্মিক। তাঁর পরিবারের মধ্যে থাকবার পক্ষে তো বক্টেই। এই নিয়ে কোন গোলমাল হতে পারে জানে—তিনি পূর্বাভূই ব্যবস্থা করেছেন।

কলসেন—ভাই, তোমার চিঠি পেয়েই আমার বন্ধু (বনসীকীকে) বললাম। পোরখনাখ পণ্ডিতের নাতদার, বড় ভাল লোক।

আমার বাড়ীর লাগাও হাবেলীটি খরদ করেছেন। বললাম যে বনসীকী, আমার ভাই সোজা মানুষ নন। সাহেব বড় খাতির করেন তাঁকে। তাঁর চালচলনও সাহেবী কারদার। তা তাঁর থাকবার কি বন্দোবস্ত করি?

—বাড়ীতেই তো হতে পারতো—বিস্তৃত হয় পড়েন ভবানী। হরিশঙ্কর বলেন,—তাঁর বাড়ীতেই দুইখানা কামরা—দ্বিখা আলাবাতাস—চৌকি, টেবিল, কুর্সী, সেজবাতি সব আছে, কোন মুশ্বিল হবে না। চল দেখিয়ে দিই।

হরিশঙ্করের স্ত্রী ভেতরে গাঁড়িয়ে শুনছিলেন। শাস্তিক এই সেবটিকে নিয়ে যদি কোন গোলমাল হয়, সে আশঙ্কা ছিল। এমন স্ব-সমাধান হলো দেখে বেন আশ্বস্ত হলেন। চুড়ি বাজিয়ে লম্ব করলেন। হরিশঙ্কর বললেন—বাও হে অন্দরে। তোমাকে কতদিন দেখে নি। সবাই অর্ধেই হয়ে উঠেছে।

ভবানী হেসে জুতো খুলে ভেতরে গেলেন। হরিশঙ্কর চন্দনকে নিয়ে পড়লেন। বললেন—হাবিলদারজী, তোমার চেহারা দেখেই আমি বুকে নিয়েছি তুমি একজন কৃতী মানুষ।

চন্দন হেসে বললো—আমি হাবিলদার নই।

হরিশঙ্কর তাড়াহাড়ি বললেন—আহা, না হলেও অচিরে হবে। আমি যে দেখতে পাচ্ছি।

চন্দনকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে বললেন—পছন্দ হয়? আচ্ছা—তোমার বেশ কোথায়?

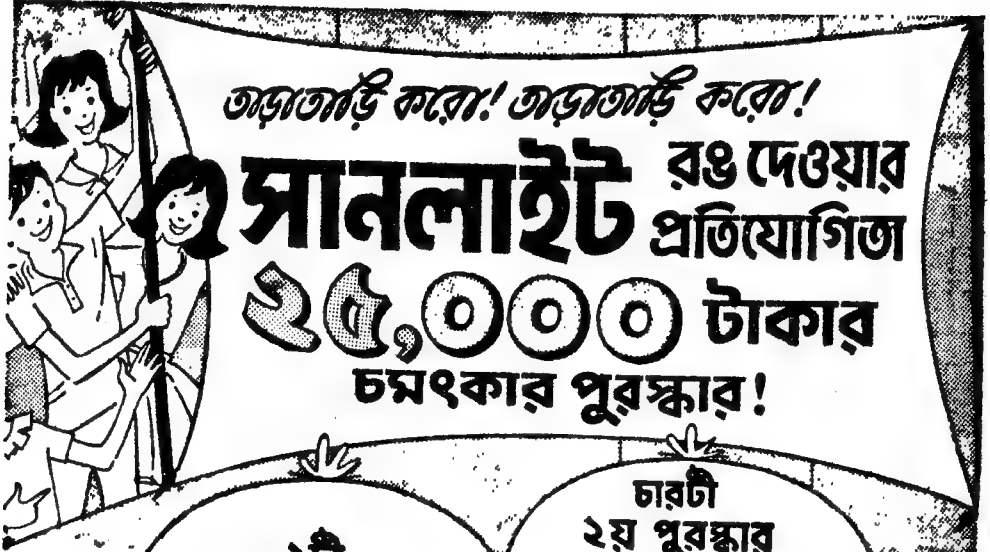
—ডেবাপুখ-বিহুঁর।

—তাই বলি। ডেবাপুর বড় ভারী জায়গা। সেখানকার মানুষ ভারী-নামী হয়।

ডেবাপুরে তিনি কোনদিনও যাননি। তবু অভিযিকে খুসী করবার জন্য স্বদয়গর্বে বলে চসলেন—কি সে জায়গা? কেমন সেখানকার বৈশিষ্ট্য। চন্দন বোধ হয় মাদুঘটাকে আবছা বুঝলো। তাই সে প্রতিবাদ করে ভুল ভেঙে দিল না। বরঞ্চ গভীরমুখে সাংঘর্ষিত লাগলো। চাকর প্রচুব মিষ্টার খালার সাজিয়ে নিয়ে এলো। হরিশঙ্কর বললেন—এই—সামান্য আয়োজন।

চন্দন প্রতিবাদ করতে না করতে তিনি খাত্তল্যের কথাই চলে গেলেন। বললেন—আর কি, অবস্থা বা ভালো মাদুঘটকে পরসা চিসিয়ে খেয়ে বাঁচতে হবে। কোনো কারণ নেই, হঠাৎ বাড়িতে পুষ্ক করেছে দাম। জোনপূরী গমের ভাল আটা, টাকার তিরিশ সের ছিলো আটশ সের হয়েছে, আর বাসি চালের মশ দেখে টাকা থেকে উঠলো দুই টাকার—দুধের দাম টাকার তিরিশ সের—বল ভাই! কি ধারে আর কি ধাওয়াবে। আটা না কি টাকার পঁচিশ সের হলো বলে। কাশী ছেড়ে যেতে হবে আর কি। তিরিশ বছরের বাস। মামাদের দিক থেকে দেখতে গেলে তিন পুরুষ বলা চলে। সোজা কথা ত' নয়, চৈঃসিংহের আমলে দাণ্ডামশায়ের বাবা পাখরের বাসনের ব্যবসা করেন এসে। ঐ বাড়ীর সামনে তাঁরও বাড়ী ছিল! কিন্তু কি জানি, মাদুঘ এখন ভুলে যায়, যে আজ হুজীকীর হাবেলী বললে দেখিয়ে দিতে কেউ নেই।

চন্দন বোঝে যে এই গল্পশ্রোতে বাধা না পড়লে মুশ্বিল হবে। সে বলে—আমি একটু গঙ্গাজীতে নান করে ছুঁতে আসি।



তড়াতাড়ি করো! তড়াতাড়ি করো!

সানলাইট রঙ দেওয়ার
প্রতিযোগিতা
২৫,০০০ টাকার
চমৎকার পুরস্কার!

২টি

প্রথম পুরস্কার

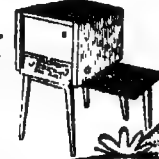
৪,০০০ টাকার
ভেতর সারা ভারত
এমন বা নগদ
৪,০০০ টাকা



চারটি

২য় পুরস্কার

এইচ.এম. ডি.
রেডিওগ্রাম



৬টি

৩য় পুরস্কার

মাস্কি অল
ভয়েজ ডিউটি
এবং একটি
করে ফিল প্রাইসসক
সাইকেল



২,০০০

৪তম পুরস্কার ছবি আঁকার



রঙের বাস
না
তল প্রদান



অভিভাবকরা: আপনাদের ছেলোমেয়েরা এখনও
যোগদান করেছে কি? মনে রাখবেন সান-
লাইটের প্রতিটি বোতল পাঠিয়ে তারা সান-
লাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতার যোগ দিতে
পারবে।

এই প্রতিযোগিতা দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে
(১) ১০ বছর বয়সের কম (২) ১০ থেকে ১৫
বছর পর্যন্ত। এই দুটি বিভাগের ছবিগুলি
আপনারা ভাবে বিচার করা হবে এবং প্রত্যেক
বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় ও ৪তম পুরস্কার দ্বারা
পাবে তাদের একই রকম পুরস্কার দেওয়া হবে।

তড়াতাড়ি করো

শেষ তারিখ: ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।

লিখুন আপনার সানলাইট বিজ্ঞপ্তির
কাজ থেকে প্রবেশের নিয়ম আনুন।
প্রতিটি সানলাইট একটা রঙের ছবি পাঠিয়ে
জন্মে আপনার সানলাইটের ২৫ লক্ষের
হবে। যে রঙের ছবি জন্মে উত্তম দ্বারা
করতে পারবে।



অন্য একটু সানলাইটই অনেক কাপড় কাচা যায়।

হরিশঙ্কর তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে বান। বলেন—তুপুয়ে খাওয়া লাগার পরে কের গল্প হবে।

ভবানীশঙ্করকে খরে বসিয়ে জলবাগের খালা সাচ্চিয়ে দিয়ে বোঁঠান বলেন। একটা বাড়ীর বধু ছিলেন, সেওরদের সঙ্গে বাক্যলাপ বা গল্প-গুছবে বাধা ছিল অনেক। এখানে বিশেষে তিনিই সঙ্গের গৃহিণী। অতিথিকে আদর বড়, সেও নিজেরই করতে হবে। দেশাচারে বাধে। কিন্তু কি আর করা যায়! আর এমন সুপুঙ্খ লম্বা-চওড়া বিদ্যান সেবের সম্পর্কে তাঁর গর্বও কম নেই। আজ সামনে বসে তিনি কুলবর্তার পর বলেন—কতদিন আর এমন থাকবেন? সঙ্গার করবেন না?

—আর বোঁঠান, বয়স হয়ে গেল!

—কি বয়স? পুরুষমানুষের চৌত্রিশ বছর একটা বয়স না কি? আর এমন ঘর, এমন বংশ। কুলীনের ঘরে এমন কত হয়।

ভবানী ঈর্ষ্য হেসে সে প্রশ্ন এড়িয়ে বলেন—বাড়ীতে কোন কাজ আছে কি? কেমন ঘেন ঘেন হচ্ছে?

বোঁঠান বলেন—সে কথা বলেননি দাদা আপনাকে? এ বছর থেকে বাসন্তী কালীপূজা নিলাম যে? আর দশ দিন বাদে পূজা। মিত্রপুত্রের কাকার পরিবার এসেছেন, ও জোনপুর থেকে আমার বোন ভগিনীপতি আসতে পারেন। বোঁঠানকে বেশ ভাবিত দেখা যায়। বলেন এত বড় কাকটা নিলাম, ভালভাবে হলে বাঁচা যায়।

কোনও উৎসবেরই প্রস্তুতি বটে। অনেক দিন পরে দেখছেন হলে ভবানীর বড় মধুর লাগে এই পরিবেশ। এবাড়ী ওবাড়ী থেকে হকিয়ার আসছেন। তাঁদের পান-মুপারি দিয়ে অভ্যর্থনা করছেন বোঁঠান। কেউ বা ভাল ভাজতে বসেছেন কাঠের উনান বেলে। হু তিন জন হাতে ধরাধরি করে হামালদিতের হলুর ছুটছেন। বুদ্ধানীরায়ী মুপারি ছুটোছেন আলতাখরা পা হুড়িয়ে বসে। বিখ্যাত মিত্র বাড়ী থেকে মিত্রগৃহিণীকে আনা হয়েছে। সম্মানিত ভিঙ্গি, বরোবুঝা। তিনি ঢকতে পিড়িতে বসে আছেন। তাঁর দাসী পাশে ঝাঁড়িয়ে আছে পানের কোঁটা হাতে। তিনি যেমন তেমন লোক নন। সারদা মিত্রের মা। তাঁর ছেলেরের কথার অনেক কিছু হতে পারে। এই সেদিনই সরকারী রাস্তা মেয়ামতের খাতিরে নিজেরের জমি দিয়েছেন কতখানি। ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর খাতির করে চলেন তাঁদের। তাঁদের মাধ্যমে বড় বলসন্তান এসে সম্বন্ধই কলিয়ারিয়েটে তর্কিত হয়েছেন। কোম্পানীর চাকরী তাঁরা হলোই হয়ে যায়। মিত্রগৃহিণী মাঝবটী সামান্য দান্তিক। তবে পরোপকারী। তাঁর বাড়ীতে নিত্য ক্রিয়া পাখণ, সে হেতু এই মহাপুজার কি করণ বিধি ও আয়োজন প্রয়োজন তা তাঁর মতো কেউ জানেন না। কাকীতে হাতলী সমালে তাঁর ডাক পাড় বয়ে বয়ে। তিনি কোথাও আর গ্রহণ করেন না। বিনেব উপায়েই মিটার ও তালু নিয়ে সৌজন্য করেন। বর্তমানে তিনি হরিশঙ্করের ব্রাহ্মণীকে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। কাকীতে বসেও তাঁর পরনে ঢাকা ও কদমাতাড়ার জামের কাপড় ও বিষ্ণুপুত্রের গরম ডিল আর কিছু দেখা যায় না। পুরুষের চারটি দাসীর হাতে। উৎকৃষ্ট তিন পেড়ে শাড়ীর টুকটুকে প্রোথাক্স পা দুটি ঈর্ষ্য উন্মুক্ত। পায়ের আলতা ও আঙুলে রূপোর চুড়ী। হাতে সোণবী ছড়ির আগের বাড়ীট। গলায় মুড়কি মালা

ও কানে চারটি করে আটটি মাঝকি। নাকের হীয়ার কুলের সঙ্গে টানা বেওয়া। মিত্রগৃহিণী বৃত্তি হতে বলে বান।

—সর্বোপরি বড় ধূপ বোড়শাল ধূপ গুগল, সরল কাঠ, দেবদারু তেজপাতা, বালা, বেতচলন, অগুরু, কুড়, গুড়, ঘূনা, বুখা হরীতকী, লাফা, জটামাংসী, শৈলের ও নখী—বোড়শাল ধূপ সকল দেবকাজে লাগে। আর পুষ্প নির্বাচনে বস্তপদ্ম, বস্তজবা, বৃকশপরাঞ্জিতা, বস্তকরবী ও ব্রোণপুষ্প—নিজে বলে দিবে। তোমরা যে পুরোহিতকে দিয়ে কাজ করাবে তিনি অনভিজ্ঞ, একটুকু জ্ঞাতে দোষ অজ্ঞাবে।

সমবেত মহিলারা শোনে ও বলেন—দাদি, আপনার তুল্য জ্ঞান কি সকলের আছে?

তিনি তুষ্ট হয়ে পান খেয়ে রূপার শিকদানীতে শিচ ফেলেন ও বলেন—জামাইয়ের কালেক্টরীর নাজির হওনে সারদা ও কুলদা দৈবী কালীপূজা করেছিলেন। তারাপীঠ থেকে মা পুরোহিতকে সপরিবারে নৌকাযোগে আনেন। মূর্খিদাম্বার খাগড়া থেকে কীসার বান এসেছিল, বোলটি বলি পড়েছিল—পঞ্চদশ নবরত্ন প্রকৃত আনা হয়—কাকীর মাঘুর আঁধ ও বলবে। আমাদের রামকৃষ্ণপুরের ভোঁসান থেকে পুজার ফদ আনা হয়। এখন কি সেই মন কাক হয়, না সেই নিষ্ঠা আছে?

তা হো নিষ্ঠহ—এমন ঘর না হলে এমন লক্ষী কেন, ধন যেখানে লক্ষী সেখানে—এই রকম কথা বলেন সকলে। মিত্রগৃহিণী তুষ্ট হয়ে উঠে ঝাঁড়ান। তাঁর পাঠী এসেছে। বলেন—দেখ বউ, আমি কিন্তু পূজাদর্শন করে চলে বাব। আমার ভাগা-বউ, তার মেয়ে—তারা খেয়ে বাবে। যন্ত্র নিয়ে থেকে বাইরে ত জাহাজের উপায় নাই আর কর্তাকে ও ছেলেরের জ্ঞান না, বউরা এসেছেন—কাজের লোক হয়েছে, তবু প্রত্যাহ আমার হাতের ছুটি-একটি তরকারী চাই—নচং, কুলদা সারদা আহ্বার করেন না। এমন কি বলে থাকেন, মায়ের হাতের পরমার, এ যে খার মাই, সে বুঝবে না। জাহাজের পরিবর্তে নিত্য খেতে এক লত পাত পড়ে—আমি কি বসে সারাদিন থাকতে পারি? তা, তোমরা একালের অজ্ঞাত কেবোড়া বায়ুনদের মত নও—তোমাদের নিয়মনিষ্ঠা আছে, পূজা ভালই হবে।

হরিশঙ্কর দামার বাসার অলস বাহিরে ঘূব ঘূব নেই। ভবানীর কানে কথাগুলি আসে, ও কৌতুক বোধ হয়। মিত্রপরিবারের ঐক্য ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দাদা বোঁঠান খাতির করেন বটে কিন্তু মিত্রগৃহিণী কি এঁদের তাঁর সমক মনে ভাবেন? না হো! তবে আসেন কেন? সম্ভবতঃ নিজের ঐক্যের ভবিষ্যৎ ওমতে তাঁর ভাল লাগে। মধুর বোধ হয়। ঐক্যের বহির্গর্বে বড় হয়, তবে ঐক্যের গর্ব করতে পারেন মিত্রগৃহিণী। ফের না, অদ্যে তু-সম্পত্তি ও টাকা-পয়সা তবু নয়, সোনা ও হুব্যান অলঙ্কারও অনেক তাঁদের। পোষোয়া পরিবার হস্ততল হয়ে বাবার প্রান্তালে মিত্র-গুপ্তার অলঙ্কার ও সোনার বাসন গুলতে কিনেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে। সোনা ধার, তার মধ্যে বহুল্য প্রেরণাদিও আছে।

বর্তমানে মিত্রদের অবস্থা তুলী। জাহাজ-পরিবহনই রূপার বাসনে আগ্রহণ করেন তাঁরা।

উলিগ্রাক ও সরকারী ডাক-গুণবা কাকীরকেই কোঁকী রেজিস্ট্রার হতে রেজিস্ট্রারে কি ভাবে লেখা চলছে এই সময়ে—বিবরকর কল

তার পতি। বারানসী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে ক্যান্টনমেন্ট। শুধু বহু দূরে দাবানল জ্বললে বাতাসে তার উত্তাপ পেয়ে বুন্দো খোঁজা যেমন খাড়া বাকিরে বাতাস পৌঁকে বাদ বার—এখানকার কোঁজের মধ্যেও সেই ভাব। তবে সে খুবই সতর্কভাবে।

চন্দন একটা ভাড়া করে রেজিমেন্টের বাগিচা শোভারামের পলীতে উপস্থিত হলো। সন্ধ্যার বীথানো শুভ্রা সড়কের দুখে শাশুরি কাছে গিয়ে বললো—শোভারামজীর স্বতঃপ্রসব থেকে আসছি। জরুরী দরকার। কথা বলবার সময়ে শাশুরি কাছে বসে। বসেই বসে। শুধু ঐ কথা বলবার ক্ষণেই অত নৈকট্য প্রয়োজন হয় না। শাশুরি সে কথা বলতে সে বললো—মারে ভাই, তোমাদের সহরে এসে আদর কারো কাছে সেলাম। বলে তার পকেটে টুপ করে একটি টাকা কেসে দিলো। চৈত্রাম জৈত্রাম মগনরামের টাকা খরচ করতে তার কোন বিবেক নশন হলো না। কেন না, এ টাকা কি-ই বা।

মাথার টুপি ঠিক করে নিয়ে সে শোভারামের বাড়ীতে গিয়ে চুকলো। যে গলী, সেই বাড়ী শোভারামের। চুকে বললো—কানপুর থেকে আসছি। গোলাপলাল খবর দিল। বললো অতিথ্যের মানকে তনুহুস্তি মনুহুস্তি করতি আপনাদের ছুড়ি নেই।

শোভারাম উঠতে না উঠতে বললো—না, না, ভাই বলে ব্যস্ত হবেন না।

—কোনো কিছু জানলেন সজে ?

—এনেছি বৈ কি, গরম গরম গল্প—আমরা মইল মজুব। তার তো বইতে পারব না। তাই গোলাপলাল কোন জিনিষ দিয়ে তার বাড়ায়নি। তবে গল্পের তো তার নেই জী! আর কলিজা আমার এত বড়, যে অনেক গল্পের ঠাঁট আছে সেখানে—জানলেন ?

—যেমন।

—একলা আপনাকে বলে কি সুখ? একদিন একটা বহুজনের আসর হয় না? মজুব মা পেলো বলে কি সুখ? একটু ভাবে শোভারাম। তার পর বলে—এখানে থাকছেন কোথায়?

তখন ক্র ক্র টকে বার। বলে—বাঙ্গালীবাংলা সাহেবদের সঙ্গে এককটা। তাদের সঙ্গে কেন ?

চন্দন চোখে চোখ রেখে বলে—দরকারের সময়ে সব চলে, জানলেন? তবে প্রয়োজন কুরোলে আর না টানাই ভাল দোতি। তবে এ-ও ত বাংলা মুলুক।

—বলতে পারেন। আচ্ছা, তবে চোটা করব আপনাকে খবর দিতে। শেঠ বীকলাসের যা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। ও দিন তাঁর বাড়ীতে অটাই ভাগবত গান, বাহার পাঠ, ও নিমন্ত্রণ। সেদিন সুরোগ হতে পারে।

বীকলাসের বাড়ীর সে ঠেঁকে নয়। উৎসর্গীকৃত আয়বাসানে পাড়িয়ে কথা হয়। 'সুখিরামা শিখ' এম নিহাল সিং প্রেতলাল ও বিদ্যাসাধ সেকেন্দ্র বিদ্যাসাধ সেকেন্দ্র অরব সিংকে দেখা বার আলোড়িত হয়ে পাড়িয়ে থাকতে খোঁজার পাল। নিহাল সিংকে বলা দেখি। জারী শরীফ—গজীর কই—ক্রোড়ী বেকাজের বাহুবতি। বললো—হরমন্দির প্রায় আর হরমন্দির মন্দির পাতের গর ভবি

না। সে গল্প এখানে পুরনো হয়ে গিয়েছে। এত পুরনো হয়ে গিয়েছে, যে সে গল্পকে গোবের তলার পাঠের কিয়েছি বলতে পার।

চন্দন বলে—দিনকাল খুব তাড়াতাড়ি কাটছে বলতে হবে। এক মাসের কহানী, সে বুড়া হয়ে গোবের তলার চলে গেল? শাহী জারগা আপনাদের বাগানগা।

হাত দিয়ে বাতাসকে কাশট মারবার মতো একটা ক্রত অসহিষ্ণু ভলী করেন নিহাল। বচন—বলবার মতো কিছু থাকে ত' বলো। যদি বুঝি খাঁটি কথা বলছ, তবে ঠিক আছে। আর, আর যদি বুঝি কীকি মিছ, কোন বদমাসের হয়ে ভাড়াতে এসেছ বদমস্তলনে, তবে বুঝ ঐ স্লেচ্ছ কিরীণীদের নিমক খেয়ে এ কাজ করছ। আর তবে, তবে তোমাকে নিয়ে গিয়ে টকর সাহেব (Henry tucker) এর কাছে বসিয়ে দেব। বললো এই বদমাসের সিপাহীদের কানভারী করতে এসেছে। বেশিরে তুলতে চায়। টকর সাহেবের এক হুকুমে তোমাকে লটকে দেবো, তোমার ঐ জওয়ান চেহারা আর হাসি মুখ কালো হয়ে যাবে। ঝুলে যাবে ঐ পলা। জানলে?

চন্দন গলা থেকে পরিহাস ত্যাগ করে। বলে—না। অনেক কথা বলবার দরকার নেই। অল্প কথার শুধুন। আটার শুভব বা রটেছে, মিথ্যে নয়। কানপুরে শুনে এলাম, বগিয়ারাই আটা নিয়ে হগাগাণি করছে। কিসের মিশাল আছে, কোন হাফের শুড়ো অথবা আরো আরো খাণাপ কিছু—সে আটা কেউ ছোঁবে না।

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



• কল্ল প্রস্তুত
• ক্ষীমে সেকা
• মেশিন প্যাক
• ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি ও সন্তোষ রক্ষা করিতে

আর্য বেকারি অ্যান্ড কনফেকশনারি
কলিকতা - ২৯

—এখনই কথা হচ্ছে। আর কাঁড়ের কথায় ভুল কিছু নেই। কাঁড়ের কাগজ কি মাথিয়ে দিয়েছে, আমরা নাম বলতে পারি না, অথচ কাঁড়ে না কাটলে উপায় নেই।

—রেজিমেটের হাল কি রকম?

—রেজিমেট গরম হয়ে আছে। শুধু কি রেজিমেট? সহরের মাঝি হিন্দু, আর নামী মুসলমান, কে চায় বলুন এ তিরিকীদের? আর এতদিন এ খবর চাপা ছিল, এখন আমরা কানপুরে বসে নিশ্চয় জেনেছি যে অংরেজরা হেরে ফৌজ হয়ে গিয়েছে কলশের কাছে। কৌজের অবস্থা জানেন, আমরা কালা আলমী, আমাদের জানের দাম নেই। রেল বসাচ্ছে কেন? মানুষে এমনিতে হাংকার করছে, ভাল চাল, ভাল গম, ভাল ঘি, শব্দী—সব তোমরা দাম চড়িয়ে দিয়েছ। আর বা আছে সব লুট্টে নিয়ে বাবে? কানপুরের বাতাস খুব গরম, এত গরম, যে একবার সাহেব ভাবছে গড় সামিল করি, আবার করছে না। ভয় পাচ্ছে। ভাবছে গড় সামিল যদি করাই কোন বারাকে আর সেখানে যদি শহরের অংরেজ লোক বিবি বাচ্চা নিয়ে চলে যায়—তবে এক নিমেষে ফৌজ রুখে বাবে।

—তাদের ভেতরের খবর কেমন করে জানিলে?

—কেমন করে জানিল চন্দন? চন্দন বলে—আমাদের লোক আছে সেখানে।

—যদি ফৌজ বোঝে, তবে তাদের পেছনে কে আছে?

—অনেকে আছে। লুহুর বড় বড় মানুষ আছে। চোট খায়নি কে, আর যে মানুষ, বার শরীরে লাচ্চা রক্ত আছে, সে কখনো দিনের পর দিন পড়ে পড়ে মার খেতে পারে? না লাগাব। আমরা আবার নিজেকে রাজ চাই। ফৌজী রেজিমেটে সাংঘ, আপনি সুবাদার, আপনি রিসালদার—সিপাহীর কি আছে বলুন? কতদিন সে খাতার সাত টাকার টিপ ছাপ দেবে, আর খালি হাতে চার পরগা ছয় পরগা বকশীষ নিয়ে সাহেবদের তাঁধুর বাজনা বাস্তির নিকে চেয়ে চেয়ে তুখাপেটে পেটি বেঁধে নিজেকে শায়েস্তা করবে?

নিহাল সিং বলেন—এখানে কৌজের বাতাস খুব গরম। আমরাও জা জানি। তবে এখানে শহরের বড় বড় আমরা লোকেরা বিশেষ বড় বড় বাজালী বাবুরা ভাঙ্গা কি আমাদের পেছনে থাকবে? মনে হয় না। তবে এখন অবস্থা যে রকম তাতে একবার কিছু হলেই রুখে বাবে সিপাহী সওয়ার।

অমর সিং এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, এবার বলেন—হুগুয় হুগুয় হাট বসছে ব্যাগানীতে, রামনগরে—তুনেছি সাধু-মকির-গম্বাসী লকেশ্বরও সেই সব কথাই বলছেন।

এবার তিনজনে চলতে থাকেন আমবাগানের সুঁড়িপথ ধরে। পায়ে পায়ে শুকনো পাতার শব্দ হয়। নিহাল সিং চন্দনের দিকে আড়ে আড়ে তাকান। হিঙ্গাটা বেন শুকনো মেলাতে পায়ছেন না। বলেন—তুমি কি কখনো ফৌজে ছিলে?

—না।

—এবার কি করবে?

—কিরে বাঁ ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে।

—কোথায়, কানপুর?

—হ্যাঁ।

—তোমার বাড়ী সেখানে?

—যখন বেখানে থাকি, সেখানেই ঘর—তবে আমার নিজের ঘরও কানপুরের কাছেই।

একটার শব্দ হয় খপ, খপ, করে। চলতে চলতে চন্দন ভাবে তার ঘরের কথা। তার দাদা পরদাদার যে ঘর, সেই তো তারও ঘর হতে পারত। তার আর চম্পার ঘর। একদিন চম্পাও সেখানে বসে হয়ে আসতে পারতো। তার ক্ষেতের পাক। গমের ওপর—চম্পাও তো তার মার সঙ্গে মাড়িয়ে মাড়িয়ে গমগুলির খোঁসা ছাড়তে পারতো। সে ক্ষেতের কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে এলে—চম্পাই তো তার শ্রান্ত দেহে বাতাস করতে পারতো। বরক বাইরে বাইরে ঘুরে চন্দন বোঝে, তাদের জীবনবাজার সমৃদ্ধি আছে ঠিকই, কিন্তু সুরচি নেই। পরিস্থিতি নেই। তাদের ঘরে ঘি ও চুপ পড়ে একটা কটু গন্ধ হয় গরমের দিনে। রোজকার সংসারের জঞ্জালগুলি তাদেরই দরজার পাশে জমতে থাকে। রামনবদীর আগে তাদের জমরা জঞ্জাল কেটে পুড়িয়ে দেয়।

সে চম্পাকে নিয়ে হয়তো অল্প ভাবে সংসার করতো। তাদের সংসারে সব স্ত্রমর ও পরিস্থিতি হতো। সেও চম্পা সজ্জায় নবীষ খায়ে বসে গল্প করতো। মেলাপুর্নবের দিনে অমন লুকিয়ে চুরিয়ে নয়—গোছাভরা চুড়ি কিনে সে নিজের এস্তিয়ারেই চম্পার হাতে তুলে দিতো। চুড়িওয়ালা হাত টিপে পরাতে গেলে চম্পার যদি ব্যথা লাগতো, তার দিকে চেয়ে চম্পা সে ব্যথা সহ্য করতো। হয়তো তাও নয়—চম্পা আর সে নাকো ভাড়া করে ভেসে ভেসে বেড়াতো। যখন জল দেখে দেখে মন খারাপ হতো, চম্পাকে নিয়ে সে পাড় নামতো। হেটে বেড়াতে সবুজ বাসের মাঠে।

এই সবই হতে পারতো। হুগো না। চন্দন বুঝতে চেষ্টা করে, সে কেন এল এই পথে। কেন এই ঘরছাড়া, ঠিকানা ছাড়া, অনিশ্চেষ্টার স্রোতে ভাসলো। শুধু কি ঘোঁষনের বোম্বাকশ্রিততা, না কি অস্ত্র কাণ্ড আছে? সে ত সিপাহী নয়!

চম্পাই তাকে টেনে এনেছে। তার চম্পা—একান্ত তারই—কিন্তু চম্পার জন্তে আর, ঘরের পটভূমিকা সম্ভব হলো না। এই বিকৃত তরঙ্গের অন্তর্ভুক্ত রঙ্গমঞ্চ চম্পা বিকশিত হয়ে উঠেছে পূর্ণরূপে রঙে—চন্দন সেই জন্তই এসেছে। মনে করে নিতে হবে এই তাদের ঘর।

চম্পা—মনে করতই চম্পার নিশ্চিন্দ সপ্রেম স্বপনের সৌরভে বেন তারও স্বপ্নর ভয়ে উঠলো। কেন বেন নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে হলো চন্দনের।

[ক্রমশঃ]

বিশ্ববের সঙ্কাতে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের প্রথম ছ'দিনের যে অভিজ্ঞতা সবল করে বাকুড়ার চললুম,—সেটা নেহাৎ তুচ্ছ নয়। বসন্ত অভিজ্ঞ দাদাদের সঙ্গে থেকে এবং জেলের সরকারী ব্যবস্থায় আমাদের কাঁচা এবং রকমারি চরিত্রে পাক ধরার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ইতিমধ্যেই একটা সাধারণ পাকা রঙের ছোপ ধরেছে। আমরা জেটলম্যান, আমাদের জীবনযাত্রার একটা মিনিমাম ট্যাণ্ডার্ড স্থানিষ্ঠি, রাজবন্দী হিসাবে আমাদের ব্যবহারের এবং সরকারের নিকট থেকে ব্যবহার পাওয়ার মধ্যে আমাদের আত্মসম্মানের দাবী সর্বাগ্রগণ্য, তার কাছে সুখ-সুবিধা তুচ্ছ, তার জগৎ সংগ্রামে আপোষ নেই, এই সব ধারণা ও চেতনা আমাদের বাইরের জীবনের সকল বিভ্রান্তিকে একাকার করে দিতে সক্ষম করেছিল—সর্বপ্রকারে একভাবে চলার প্রয়োজনীয়তা সকলের মনকেই কমবেশী দখল করেছিল।

যেদিন প্রথম সেন্ট্রাল জেলে প্রবেশ করলুম সেট দিনই জেল কর্তৃপক্ষ বেন আমাদের প্রত্যেকেরই এক একটি সংসার সাজিয়ে দিলে। এটা মনে রাখা দরকার, ১৬ থেকে ২০ সাল এবং ২৩-২৪ সালের মাকামাফি পর্যন্ত অল্প পরিমাণে নানা যত্না ভোগ এবং অবিরাম মরণবাচন লড়াই করে রাজবন্দীরাই সরকারকে বাধ্য করেছিল রাজবন্দীদের জন্যে একটা নির্দিষ্ট মানের সুখসুবিধা ব্যবস্থা করতে।

প্রত্যেকের জন্য একখানা লোহার খাট, চারটে গদি ও ৬খল ছাড়া তোষক, চাদর ও বাগিচা এল,—একখানি ছোট গ্লেন টেবিল ও চেয়ার এবং একটি লকার (ছোট আলমারী) দেওয়া হল,—কাপড় জামা-জুতা, সেজিসেট, টুথপেস্ট ও ব্রাস খালা-বাটি-গ্রাস এবং এ ছাড়া কারো ট্রাক, কারো স্টকেস কবচাস অলুয়ারী এসে গেল। এই initial expenses ব্যবস বহুত্রে ২৫০ টাকা নির্দিষ্ট ভাতা। তা ছাড়া পড়াশুনা, খেলাধুলা এবং কুচাকচা জিনিসের প্রয়োজনে পৃথক মাসিক ভাতাও নির্দিষ্ট। আর খাই-খরচের সাধারণ ভাতা দৈনিক ১।০, কোন জেলে বা ১।১০ আবার কোথাও বা ১।১০ পর্যন্ত।

প্রথম দিনই প্রত্যেকের জন্য এক প্যাকেট করে কাঁচি সিগারেট এসে গেল। সেটা খাই-খরচের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত বলে' পরের দিন সিগারেটের ছাড়ব catering-এর বকেয়াভদ ইত্যাদি করল

প্যাকেট কম আনা হল—বারা খায়, তার এক এক প্যাকেট পেল'। আমি দাদাদের সঙ্গে সোতলায় থাকি, সিগারেট খাই না। নীচের ঘরে রমেন দাস এবং নুরেশ জরখাক সিগারেট খান—অন্তবাবু, রজিত, গণেশ ঘোষও খায় না। নীচের বারান্দায় রমেনবাবু, নুরেশবাবু, রজিত এবং আমি তাদের আড্ডা করলুম, এবং সেইখানে রমেনবাবু ও নুরেশবাবুর পার্শ্বের পড়ে জীবনে প্রথম সিগারেট খেলুম এবং তারপর ক্রমে ধূমপানে পকতা লাভ করলুম।

প্রথম কয়েকটা দিনের বিভিন্ন ঘটনার হৃদয়ঙ্কিত ভাবনার অবসর ছিল না—পরে ধীরে ধীরে বাইরের জীবনের সঙ্গে এই নতুন পরিবর্তনগুলোকে মিলিয়ে দেখে বেশ খানিক বোম্বাক অহতব করলুম—যেন পলৌরতি হয়েছে।

মূল্যগত খাবার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে কয়েকদিন কলকাতায় থেকে যেতুম। জীবনের সঙ্গে রোজ রাতে কলেক্টর হোম্বারে মিলতুম। সে এক খোটার রুটার লোকান আকর্ষিত করেছিল—অলেকট মিশনের বিপরীত ফুটপাতে—সেখানে বড় বড় মোটা রুটা পাওয়া যেত হ' পয়সা করে—তার সঙ্গে মিলতো ডাল, ভাজি (বাট) এবং চাটনি (ভেঁতুল গোলা) তিন টীজ। চার পয়সার আমাদের পেট ভরে যেত। তাই খেয়ে মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে অভুলদাসের বাড়ীতে (কে শি বাসের বাড়ী) নীচের একটা ঘরে চুপি চুপি গিয়ে শুয়ে পড়তুম। যেদিন একটু সকাল সকাল হত—সেদিন বরানগরে ফিরতুম। এক একদিন বরানগরে বাব বলে টালা পর্যন্ত গিয়ে আটকে যেতুম গোপাল ভট্টাচার্যের বাসার—তিনি তখন আমাদের বাড়ী ছেড়ে টালার ননী গোসাইয়ের বাড়ীতে ঘর ভাড়া করে যা ও ভাইদের এনেছেন। '২৪ সালে কলকাতার চলে আসার পরও মাঝে বরানগর বেতে গিয়ে রাত করে কেলে গোপালবাবুর বাসার ডাকডাকি করে লুম থেকে তুলে, তাঁর ভাইয়ের মশারি তুলে হুকে শুয়ে পড়তুম তার পাশে।

বাংলায় নাম গন্ধ বিধাতা পুঙ্খ আমর কপালে লেখেনি—অনেকগুলো টাকাই তো নিজের হাতে হুকৈছি,—কিন্তু একটা দামী সাবান, এক নিপি এসেল কখনো ব্যবহার করিনি,—গ্যালারী ছাড়া, সবচেয়ে সস্তার টিকিট ছাড়া কখনো ব্যারোবোশ-খিরেটের লেবিনি। এখন একটু বাঙালি করার বরল এবং অবহা,—তখনই

তো নমকোশর্শিনের আদ্যোপদ্যে godly হয়ে যুখে চাপকাড়ি পলিয়েছে, পিণ্ডের ধর্মের খোঁড় এবং নাগরা বা ত্রাতেল সন্ধ্যা—plain living and high thinking এর যুগ।

এ-হেন আমি না চাইতেই কাঁচি নিগারেট, Snow, Cream—অতের কথার দরকার কি?—আমার গোমাক হবেনা? না নিয়েও লাভ নেই, পড়ে বাবে পাওনা। নিয়ে রাখলে বক কাক দিতে পারে।

বাই হেঁক, মেমিনীপুরবাড়ী অম্বুজলা, গিরীনালা এবং অণ্ডবাঁহু (মলদ্বার) আর বাঁকুড়াবাড়ী আমি, রক্তিত আর গণেশ ঘোষ একসঙ্গে হাওড়া ট্রেনে এলুম—সঙ্গে নেওয়া হল ট্রাক, বিছানা ও ভৈরবসপত্র। মেমিনীপুর ও বাঁকুড়ার পৃথক escort—একজন করে ইউরোপীয়ান officer ও ৪ জন করে armed police, হাওড়ার কিছুকণ একসঙ্গে থাকার পর পৃথক হলুম—বেন নতুন পৃথক সংসার থাকে পড়লো আমায়ই,—কারণ আমিই বয়োজ্যেষ্ঠ।

বিকালে ঝড় গপরে নাথলুম—রাতে অস্ত্র পাড়ীতে বাঁকুড়া যেতে হবে। পথে আমাদের খাওয়ার বরাদ্দ কত তাও জানি না—officer বোটা সব হাতিরে রেখেছে। আমাদের চাও খেতে দেয় না সেখে ভাগ্যপালা করতে হল। কিছু ব্যবস্থা হল সন্ধ্যার সময়। পুলিশগুলো কিছু খেলে কিনা, জানতেও পারলুম না। কিছু officer-এর যুখে মনের গন্ধ টের পাওয়া গেল—বোটার কিছু উপরি পাওনা হয়েছে।

পাড়ীর অনেক দেরী দেখে তাম নিয়ে বসা গেল, এবং রাগ চলে officer বোটকে নিয়েই ব্রীজ খেলে সময় কাটানো হল। রাত্রের ধাবার সময় পায় হয়ে গেছে, কিষে পেরেছে—ব্যাটাকে বললুম। সে বলে এখানে খানার কোন ব্যবস্থা নেই। একটু ইতস্তত করে শেষে বললুম, দেখছি তোমার নাম হিশোটেই করতে হবে—তোমার profit বদা বেড়িয়ে বাবে। বোটা গজ গজ করতে করতে চলে গেল, খাওয়ার ব্যবস্থা হল। কাইটের হাতেখড়িও হয়ে গেল। লজ্জারও আঁড় তুললো।

সকালে বাঁকুড়ার পৌঁছে জেলে প্রবেশ করলুম। গেটের অফিসে প্রায় ধাম দেখা হল,—জিনিসপত্র তরাসী করে ছাড়া হল,—আমাদের তরাস দেওয়া হল,—তার পর চললুম ডেয়ার। সেটা কিম্বল ইয়ার্ড—যেহে করেদী ছিল না বলে আমাদের জায়গা করা হয়েছে সেখানেই। একটা সেলের সারির পিছনে, জেলখানার একটা প্রান্তে ধানিকটা খোলা জায়গার পর একটা বড় ঘর। ঐ খোলা জায়গাটার আর এক পাশে আর একটা বড় খালি ওয়ার্ডও আছে এবং একটা বড় ইয়ার্ড আছে। সেখানে আসে ধোবীখানা ছিল, এখন খালি।

আমাদের ঘরটার মধ্যে দু'গািরিতে অনেকগুলো মাটির বেলী ছিল, তার চারটে যেনে থাকিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে,—ঐ চিনি চারটেকে দিকিরে পরিষ্কার করা হয়েছে আমাদের জিনিসপত্র রাখবার জন্য,—এক ঘরের আর একদিকে আমাদের জন্যে লোহার খাট, ট্রিকল প্রকৃতি খানা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে ঘরে থাকবে একজন “কালতু”—কয়েদী attendant, সে সেখান থেকে কখনও বাইরে যেতে পারবে না। বাইরে থেকে আমাদের ঘরে যে সব কয়েদীরা জল বা খাদ্য নিয়ে আসবে,—যোগা বা লাগিত আসবে,—সকালে একবার ডাক্তার আসবে, একবার সন্দিকসে দু'পারিসিকিওটী আসবে,—তাদের দরজা খুলে দেওয়ার জন্যে একজন

warder সর্বদা মোতায়েন থাকবে বন্ধ করবার বাইরে। ঘরটার অপরিষ্কারের দরজা দিয়ে একটা ছোট্ট ঘেরা ইম্পাউন্টের মধ্যে পায়খানা—সেই কম্পাউন্টের পিছনের দরজা দিয়ে সেখান বাতয়ারি করবে—তারও সঙ্গেই পাহারা সে দরজা খুলবে এবং বন্ধ করবে। সকালে ও বিকালে দু'বার সামনের দরজার পাহারা ওয়ার্ডার আমাদের বাইরের কম্পাউন্টের মাঠে বেড়াতে কিংবা Badminton খেলাতে নিয়ে বাবে, দরজার তালাবন্ধ থাকবে, কালতু ওয়ার্ডার আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং কিরিয়ে এনে আবার তালাবন্ধ করবে। অজুত জীবন—কতদিন চলবে কে জানে।

জেলার জ্যোতির্ময় বন্ধ সেকেন্সে ডাকসাইটে হুঁদে জেলার, পাঁড় মাতাল এবং জেলখানার মধ্যে সবচেয়ে বড় চোর। সে কথা পরে হবে।

২১১ দিনের মধ্যেই তিনি আমাদের গরম জামা নেই দেখে গারের মাপ নেওরাসেন—বললেন, এখানে তরতর সীত পড়ে, গরম জামা না হলে চলে? তারপর ২১২ দিনের মধ্যেই জামা নিয়ে এলেন, খেলা পট্টর half-lining দেওয়া জামা—সেখে পা ছলে গেল। ওর চেয়ে গরম জামা না থাকাতো ঢের ভাল। কিছু বাঁহু অমায়িক বচনের কাছে হার মানতে হল। বুকলুম, ডবল লামের বিল দিয়ে অনেকগুলো টাকা মারলে। ছেলেমাছুষ পেয়ে ভোগা দিয়ে আরো কত মারবে কে জানে। মনটা খিঁচড়ে গেল।

মাঝে মাঝে তিনজনই তাস নিয়ে বসি—আর পৃথক ভাবে আমি একটু পড়শোনার চেষ্টা করি—বাঁকুড়া জেলেই প্রথম প্রায় ৩০ বছর বয়েসে শরৎ চাটুজের প্রাণবলী পড়লুম, ইতিপূর্বে টুকরো টাকা ছাড়া পাড়িনি। রক্তিত বেশ ধীরস্থায়, সে কালতু আঁড়কে নিয়ে ঘটীর পর ঘটা তার মতন ভাবে গল্প করে কাটায়। বিকুপুয়ে রেল থেকে নেবে সিওডের আড় নাগিত বললেই সবাই চিনবে। সে অমাবস্ত্যার রাতে কাগের ঠাণ্ড এনে মলে তালো খুসে দিতে পারে এমন শুণীন। রক্তিত গদগদ হয়ে শোনে। আর গণেশ যেন একটা ছব্ব ভুল-পালানো ছেলে, একটা না একটা হুতোহুটি নুটি করে নিয়েই আছে। একটা বেরাল ছিল পাঁজা চোর—আমাদের ঢাকা দেওয়া ধাবার সকলের সামনে থেকে সে ঢাকা সরিয়ে কিছু খেয়ে পালার তোজ—গণেশ তাকে ধরবার জন্যে একটার পর একটা র্যান নিয়ে চেষ্টা করে চলেছে—হঠাৎ হরতো Badminton Racket ছুঁড়ে তাকে মারতে গিয়ে ঢাকা ধাবাইই হুতাকার করে দিলে।

আমাদের ঘরটার মতন ঘর বোধ হয় কোনো জেলে আর একটা নেই। ঘরটা খুব পুরানো—জেল তৈরী হওয়ার আগেকার। পিছন দিকের প্রকাণ্ড দরজাটা এবং জানালাটা পুরানো সেকেন্সে—জানালাটাতে খড়খড়ি লাগানো এবং দুটোই ক্রেন কাঠের। দরজার ক্রেনটা ৮ ইঞ্চি X ৬ ইঞ্চি বোটা বীম দিয়ে তৈরী, তাতে লাগানো আছে প্রকাণ্ড দুটো কাঠের পাঁজা। সেই কাঠের ক্রেনের সঙ্গে জেলের বোটা পরাসেওয়ারা একটা প্রকাণ্ড দরজা গেঁথে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে ভাব হড়কো (লোহার) বন্ধ করে তালো লাগিয়ে দেওয়া হয় বাইরে। রাত্রের প্রয়োজনের জন্যে ঘরের এক কোণে দুটো টুকরী থাকে। লোহার হড়কোটা যে হকে আঁটকে তালো দেওয়ানো হয়, সে হড়কো বোটা বোটা ইজুপু বিনে দরজার কাঠের ক্রেনের একদিকের খাঁটা।

কামির
মূল কারণ দূর
করুন



সিরোলিন
খান

নিরাপদ
পারিবারিক
ওষুধ

সিরোলিন কেবল যে কামি
'খাখিয়ে দেয়' তা নয়—
কামির মূল কারণ হুটে-
জীবাবুগুলিকেও ধ্বংস করে।

একমাত্র প্রস্তুতকারক: ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

একদিন দেখি, গণেশ সোহার খাটের ডাঙা ছত্রীর একটা ডাঙা খুলে নিয়ে জানালার ছিটকিনি আটকাবার হকের মধ্যে গলিতে চাড় দিয়ে ভাগছে। বললে, দেখুন না, কি করি। হকটাকে খুলে অনেক ধন্যবাদান্তি করে পিটিয়ে সোজা একটুকরো সোহার পাত করে নিয়ে তার একটা ধার শিছনের সিঁড়ির ধাপে জল দিয়ে ঘষতে শুরু করে দিলে। বলে, দেখুন না—শালাকে ইচ্ছাপ ডাইন্ডার করে দরজার হুড়কোর ইচ্ছাপ খুলবে। সে অসীম ধৈর্যসহকারে যবে; আমরা বলি, একটু ঠাণ্ডা আছে, থাক ঐ নিয়ে।

একদিন দেখি রাত্রি পিছনের দরজার ভালো লাগানোর পর সে হারিকেন থেকে একটা পালকে করে তেল নিয়ে ইচ্ছাপগুলোকে ভিজিয়ে তার ইচ্ছাপ ডাইন্ডার চালাতে শুরু করেছে—গরাদের কীক দিয়ে হাত গলিয়ে। কয়েক ঘটা খেঁটে শেষে একটু খুলো দিয়ে ইচ্ছাপের তেল ঢাকা দিয়ে দিলে। এমনি চললো দিনের পর দিন—আমরা দেখিও না, কিছু বলিও না! থাক ঐ নিয়ে বউদিন পারে।

ছুটো মাটির টিবির মাঝের গলিতে মেঝের বিছান। করে আঙ শোর। তার করেশী-খানা জেলের কিচেন থেকে আসে, আমাদের রান্না হয় হাসপাতালে। আমাদের খানার কিছু ভাগও আঙ পায়। সে বেশ খুশী আছে। কিন্তু গণেশের কাণ্ডটা তাকে লুকিয়েই করতে হয়।

একদিন রাত্রে আমাদের খাওয়ানোওয়ার পর আঙকে খাটেরে ছুট্টয়ে গণেশ দরজা নিয়ে পাড়ছে। আঙ এটুকু টের শেয়েছে যে ফবুবা দরজার কাছে কি বেন করে। সে উঁকি মেয়ে দেখার ভল্টে ঘুমিয়ে পড়ার ভাপ করে পাড় থাকে। একটু মাথা তুললেই দেখতে পায় রক্তিত সামনে বসে আছে। সেদিন কিছু ঘটনাটা হল একটু অন্তরকর। গণেশ আমাদের ডাকলে—আঙ ঘুমিয়েছে দেখে আমরা উঠে গেলুম। ইচ্ছাপ ঘুরছে, বলে গেছে। কিন্তু হুড়কোর মাথাটা পালের দেওয়ালে এমন ঠেসে ঢুকছে যে তাতেই দরজাটা খোলা বাজে না। কাজেই দেওয়ালের বালি কুরে কুরে একটা নালীর মত করা হল—দরজাও খুললো।

ইতিমধ্যে রক্তিত আঙকে নিয়ে একদিন এক কাঁঠি বাধিয়েছিল। আমরা যে রাতে খেলতে বাই সেখানে একটা বড় বেলপাছ ছিল এবং তার গোড়টা মাটি দিয়ে বাধিয়ে একটা বেলীর মত করা ছিল। একদিন সেটাকে একটু সোবরমাটি দিয়ে নিকিয়ে পবিত্র করা হয়েছে, আঙকে দিয়েই। আঙ জিজ্ঞাসা করেছে, ওখানে কি হবে? রক্তিত বলেছে, আসছে অমাবস্তায় আমরা ওখানে কালীপূজা করবো, আর নরবলি দেব। বেশ নির্খুঁত কালো একটা লোক চাই। তা আঙ লোক পাওয়া না গেলে তোকে দিয়েও হবে। তুইও তো বেশ কালো আছিস। তুই বর্ষে চলে বাবি।

আঙর জো ভুলে শিলে চমকে গেছে। সে বা কিছু প্রশ্ন করে, রক্তিত আরো হা চড়িয়ে জবাব দেয়। শেষে আঙ কীদতে কীদতে বলে, আমার বা আছে—আমি জেল থেকে আমার চেয়ে কালো একটা লোক এনে দেব—আমাকে মারবেন না। রক্তিত বলে, বা থাকলেও আমরা পোদন করে নোব। আঙ আরো কীদে।

সে দিন দরজা খোলা হয়েছে—সেদিন আঙ ঘুমের ভাপ করে দেখেছে। দরজা খুলে একখানা চোর বার করে তার ওপর উঠে

কম্পাউণ্ডের দেওয়ালের মাথা ভিজিয়ে দেখা গেল না। তারপর চোরের পাশে আমি পাঁড়ালুম এবং চোরের থেকে আমার কাঁধে উঠে গণেশ দেখলে, দেওয়ালের ওপার সামনেই এক লাঠি এবং হারিকেন নিয়ে এক ওয়ার্ডার বসে পাহারা দিচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে কোরো হল। হুড়কোর ইচ্ছাপও এঁটে দেওয়া হল। কিন্তু বালিভালা নালী মেয়ামত্তের উপায় কি?

যে পানের সরঞ্জাম ছিল। খানিক চুপ নিয়ে বালির সঙ্গে মেখে নালী ভরাট করা হল, কিন্তু দেওয়ালের মরলা হললে রংয়ের সঙ্গে মিললো না—বেন দাঁত বার করে হইলো। ভেবেচিন্তে একটু খয়ের গুলে লাগিয়ে মিলুন,—কিন্তু তাতে বেন সাধা দাঁত লাগ হস মাত্র। শেষে অগত্যা তারই ওপর কিছু খুলো চাশা দিয়ে তালটাকে বেড়ে ঝড়ে হুর্গা বলে শুয়ে পড়লুম।

ভোরে জমাদার দরজাটা খুলে দিয়ে যায়। রোজকার মতন সেদিনও খুলে দিয়ে গেছে—“দাঁত” নজরে পড়েনি। দিনের বেলা আমরা আর একটু মেয়ামত করে কেললুম।

অনবরত দরজা খোলা আর বন্ধ করার ডিউটি দিতে দিতে সামনের দরজার পাহারা ওয়ার্ডার একটু ঢিলে হয়ে গেছে। রোজকার মতন সেদিন সকালে বখন সে আমাদের মাঠে চরাতে নিয়ে গেছে,—দরজাটা বন্ধ করে বেতে ফুলে গেছে। আমরা ফিরে এসে দেখি আঙ নেই। ওয়ার্ডারের মহা বিপদ! সে আমাদের বন্ধ করে বেথে ছুটলো আঙর খোঁজে। পরে জানা গেল, দরজা খোলা পেয়েই আঙ এক ছুটে পালিয়ে গেছে একেবারে গেটে।

সেখানে গিয়ে গেটের দরজার গরাদে চেপে ধরে হাউ হাউ করে কীদে আর বলে, লীগ গির গেট খুলুন, আমাকে বাঁচান। জেলার ভেতর থেকে হমক দেয়, বলে, কি হয়েছে বল,—ও বলে, আসে আমাকে বাঁচান,—সব বলছি। তারপর তাকে তাল খুলে অঁকসে নিয়ে গেলে সে বলেছে,—বদলী বাবুবা ভাদি গুণীন,—কালী সাধনা করে,—রোজ রাতে দরজার তাল খুলে সারা জেল ঘুর বেড়ায়, এই আমাবস্তাতে কালীপূজা করবে,—আমাকে কেটে লবলি করে দিয়ে বলেছে।

দারোগা তো এসব কথা বিশ্বাস করতে পারে না,—কিন্তু ভূ সাবধান হওয়া ভাল। সেই দিনই আমাদের সে ঘর থেকে সরিয়ে ইনারার ধারের বড় ঘরটাতে নিয়ে যাওয়া হল। সে ঘরটারও দরজাটা কার্টের,—তার ওপর গরাদে দেওয়া সোহার দরজা বসানো। ইনারার পাড়ের চারিদিকে বেশ চকড়া করে শানবাঁধানো। প্রকাণ্ড ঘর, বড় বড় জানালা অনেকগুলো, এক এক জানালার সামনে এক একখানা খাট পড়লো। ঘরে দিনরাত বন্ধ থাকতে হয় না, উঠান খোলা, আগের চেয়ে অনেক ভালো। রাতে ঘরে তালান্দ করা হয়, জোরে খুলে দেওয়া হয়, এবং ওয়ার্ডার বেড়াতে নিয়ে বার আগের মাঠেই। ঘরটার সঙ্গে সংলগ্ন একটা ছোট ঘরে টুকরী আছে,—পায়খানা। সেটারও বাইরের দিকে একটা গরাদে লাগানো খোলা জানালা আছে—সেটাকে কুতুল টাঙ্গির ঢেকে দেওয়া হয়েছে। একজন নতুন “কালতু” এস,—তরুণ—জাতে, জ্বিয়জ—নাম মল্লয়া। নর, ক, বুদ্ধিমান, এবং গান গাইতে পারে।

সেখা ন গিয়েই গণেশের চোখের অস্ত্র হল—গড়াতলো মোটেই কল্পতে পারে না—মাথা ঘরে, চোখ টানটান করে—জীবন অবস্থা—

কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে চোখ পরীক্ষা করানো একটি দরকার। দরখাস্তের পর দরখাস্ত চলিলো এবং শেষ পর্যন্ত একদিন তাকে কলকাতার পাঠানো হল।

স্ত্রোতপাই সেখানে এলেন সত্যেন্দ্রনাথ—সত্যেন্দ্র মিত্র। তিনি খানিক জরায়। পরমা দিয়ে ঘিরে নিলেন—একটু সাধন ভজন করেন। তার কয়েকদিন পরেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হল অজিত মৈত্র এবং অধিকা থাকে। দমদমার কাছে রেল লাইনের ওপর এক শান্তি চক্রবর্তীকে কেউ বাড়ি ভোজালীর কোণ ঘেরে খুন করেছিল, আগে বলেছি। সেই খুনের দায়ে ধরা পড়ে মামলার খালাস হয়ে অর্ডিন্যান্স আটক হয়ে এঁরা দুজন এসেছেন। দুজনই তরুণ—অজিত নিতান্ত ছেলেমানুষ, আর অধিকা একটু বড়।

সত্যেন্দ্রনার একটু অনুবিধা বোধ ছিলই এবং এসেই বঙ্গীর জন্তে তিনি লেখালেখি শুরু করেছিলেন। এখন আরো অনুবিধা বোধ হল এবং তিনি জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ঐ ঘরের সালন্য পাশের আর একটা বড় ঘরে একা থাকার বন্দোবস্ত করলেন এবং কয়েকদিন পরেই বঙ্গী হয়ে গেলেন।

তিনি দৈনিক দশ টাকা food allowance পান—জেল খন্দ মছ-মাংস-ডিম-দুধ নেন, করমাস দিয়ে কিছু কিছু রান্না করিয়ে নেন, একটা ইকমিক-কুকারও আছে, আর কলকাতা থেকে নানা রকমের tinned food আনান—বোঝ দশ টাকা খরচ করা চাইতো। কাজেই একটু সাধন-ভজনের জন্তে পৃথক না থাকলে চলে না।

বাই হোক, তিনি বাওয়ার পর এক দিন আমরা চারজনই ইলারায় পাড়ে বসে ভটলা করছি, আর মহুয়ার গান শুনিছি—রান্নার সময় হয়েছে। মহুয়া পাইছে—

আর বাঁশী বাজাও গ্রাম কেনে

ও গ্রাম কেনে হে

তুমার বাঁশী কুল তোরা আলা দেইছে পানে হে—

লিব তুমার বাঁশী কাছো—

(আর) বুনতে লিব ছাড়ো—হে—

লিব তুমার চুড়া খোঁড়া করবো অপমানে হে...

তুমার বাঁশীর এমন ধারা

(আর) শিরষিকার মন তোরা হে—

(এই) পাচাই শেখকে চরণ ছাড়া ক'রা না আর যেনে হে।

পচাই শেখ একজন কুসন্তত ডুম্বি জাতীয় মুলমান জোলা তার বাঁধা আরো গান মহুয়া গায়। সেই পচাইকেও মহুয়ার সঙ্গে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, এক মিথ্যা মারামিয়ার মামলার।

আমরা তেল মাখছি, মহুয়া পিঠে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে, এমন সবর ডেপুটি জেলায় হাজির—গেটে অফিসে পুলিশ সাহেব (S. P. Bankura) বসে আছেন আমাকে আর রজিত বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমরা বললুম, একটু বসতে বলুন, আমরা ট্রানটা সেবেই বাছি। তিনি কিরে গেলেন এক কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক slip নিয়ে কির এসেন তাকে পুলিশ সাহেব লিখেছেন—You are ordered to come at once.

আমরা পরামর্শ করে slip-এর উপর পিঠে লিখে দিলাম—

We shall not go untill we finish our bath unless we are physically forced to go.

ডেপুটি জেলার slip নিয়ে চলে গেল এবং আবার একটু পরে কিরে এসে পাড়িয়ে থাকলো—বললে চান করে নেন, আমি পাড়ছি। আমরা বেশ বীরে স্নেহে দেবী করে ব্রান সেবে পেলাম। পুলিশ সাহেব রেগে লাল হয়ে বসে আছে। আমি আগে অফিসে ঢুকলুম। সাহেব জিজ্ঞাসা করলে Narayan Banerjee? আমি—yes. সাহেব একখানা চোখা এগিয়ে দিয়ে বললে—Here are the charges against you—you can write your answer here if you like—বলে চোখার নীচের দিকটা দেখিয়ে দিলে। চার্জ হল—Conspiracy to wage War against His Majesty's Government, organising terroristic activities ইত্যাদি—

জবাব দিলুম—The charges are vague, false and without any foundation whatsoever. You note it down if you like.

বাগে গর গর করতে করতে ডেপুটি জেলারকে ইসারা করলে, ডেপুটি জেলার আমায় বললে, আশুন—আমি বাইরে এলে রজিত ঘরে ঢুকলো। সে বাইরে থেকে সব শুনেছিল—আমারই মতল জবাব দিয়ে চলে এলো।

ঘরে এসে জল্পনা করলো—ব্যাটার নামে রিপোর্ট করতে হবে—একেবারে বড়লাটির কাছে—আমরা ভারত সরকারের কবী—ব্যাটা আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আচরণ করেছে—কৈফিয়ত দিতে হবে, বাট মানতে হবে।

আনাজী তো! Caseটা গোছাতে পারছিলাম না। order মানাতে পারিনি, ওতেই তো জন্ম হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত খেরাল হল, বসতে ঢেয়ার তো ঘেরনি!

একটা লড়াইয়ের জন্তে মন ছটফট করছিল। ঠিক করা হল, ৭ দিনের নোটিশ দিয়ে hunger strike করবো যদি ব্যাটা না মাপ চায়।

দরখাস্ত দেওয়া হল। ৭ দিন কেটে গেল, কোন জবাব নেই। স্থির হল, hunger strike শুরু করবো। অজিত এক অধিকা বললে, আমরাও যোগ দেব। আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলুম, বরং তোমাদের ভক্ত সরিরে নিতে বলি, তোমরা আমাদের সঙ্গে ভাড়িতো না। তারা বললে আমরা এ জেলে থাকতে আপনায় hunger strike করলে আমরা পৃথক থাকলেও যোগ দেবই।

সুতরাং আমাদের দুজনের নামে hunger strike ঘোষণা করে Superintendent-এর কাছে লিখে পাঠানো হল, ওরা দুজনও লিখে দিলে আমাদের প্রতি সহানুভূতিতে ওরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে।

পায়েও কিছুদিন আগে থেকে চুলকানি হয়েছিল এবং সেজন্তে সকালে চিরেতা ভিজ আর মিছরি জল একটু করে খেতুম। স্থির হল, ওটা চালিয়ে যেতে হবে। রজিত বললে, ঐটুকু থাকলে হ' মাস চালানো যাবে।

Hunger Strike-এর খবর পেয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্ট, জেলার, ডাক্তার এসে সেকচার শুরু করলে। শেষ পর্যন্ত S.D.O.—আমি

বোম্ব হর সন্তান বন্ধ—এসে বোঝাতে লাগলেন,—সন্তান মিন্ন আমার বন্ধু, ততরাং আমি আপনাদের দাদার মতন, আমার কথা শুনুন—নিপোট বখান করেছেন, S.P.-কে কৈকিয়ৎ দিতেই হবে—সেই ওর শাস্তি ইত্যাদি—

আমরা সব কথা উড়িয়ে দিলাম। রোজ হ'বেলা স্বীকৃতমন্ত খাঁ! ভৈরী করে টেবিলে সাঁজিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখে, আবার কুবেলা যেমন-কে-তেমন আছে দেখে সরিয়ে নিয়ে যায়। কতক দিন এমনি চলার পর একদিন সকালে ডাক্তার এসে খবর দিয়ে গেল, আজ আ-নাদের পৃথক পৃথক সেলে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে, একটু পরেই নিতে আসবে—আমি পালটি।

আমরা পরামর্শ করে দরজার কপাট ভেজিয়ে দিয়ে তার ওপর ঠেসে সোহার খাট টেবিল, চেয়ার, ট্রাক জুপাকার করে আটকে রেখে যে বার বিছানার শুয়ে থাকতুম।

খানিক পরে সুশারিটেণ্টেট সমলবলে এসে দরজা ঠেলাঠেলি করে জানালায় এসে আমাদের বললে, দরজা খোল। আমরা চুপ করে পড়ে থাকতুম। শেষে সুশারিটেণ্টেট চলে গেল এবং খানিক পরে S.P. এবং armed force নিয়ে কিরে এল। তারাও দরজা ঠেলাঠেলি করলে, খুলতে পারলে না। শেষে S.P. আমাদের ভয় দেখিয়ে warning দিয়ে সেপাইদের জানালায় সামনে সাজালে—তারা গুলী চালাবার চরে হাঁটু হুড়ে বসলো। আমরা দেখছি শুয়ে শুয়ে নির্ভীকার।

সুতরাং এ ঢা ছেড়ে আবার দরজা ঠেলাঠেলি করে শাবল এনে দরজার কাঁকে চুকিয়ে চাড় দিয়েও সুবিধে করতে না পারে শেষে দরজার পাশের দেওয়াল ভাঙতে শুরু করলে। S. P. রেগে আঙুন হয়ে গেছে,—এদিকে দরজার কাঁকেও শাবল চালিয়ে কাঁকি দেওয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দরজা একটু কাঁক হল এবং তার মধ্যে শাবল চালিয়ে খাট সরাবার চেষ্টা করতে করতে খাট সরালো—সবাই মিলে ঢেলে দরজা খুলে ফেললে।

S. P. আমাদের খাটের কাছে এসে একে একে জিজ্ঞাসা করলে will you get up or not? আমরা বললাম, we won't। S. P. সুশারিটেণ্টেটের মুখের দিকে চেয়ে ইসারায় permission চাইলে গায়ে হাত লাগাবার—সুশারিটেণ্টেট ইসারায় বারণ করলে। ওরা খোঁজা মুখ ভোঁতা করে গর গর করতে করতে চলে গেল। সুশারিটেণ্টেটও হুখে এবং সত্যমুখিত প্রকাশ করে lecture দিয়ে চলে গেল। আমরা উঠলাম—নেন লড়াই কতে করছি।

আমাদের সেলে পোরা হল না, কিন্তু ২১ দিন পরেই আমরা বদলীর অর্ডার এল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেই। আমি বরোজ্যেট এবং spokesman বলে আমাকে পৃথক করার বন্দোবস্ত হল। রক্ষিত বলে দিলে, আমরা হাক্কর ট্রাইক চালিয়ে বাবো, বতদিন না আপনায় কাছ থেকে খবর পাই—আমরা বলবো আমাদের সঙ্গে পৃথক ফরশালা করলে চলবে না, ফরশালা করতে হবে দাদার বাবুর সঙ্গে, আমরা তাঁর ফরশালা মেনে নেব।

গেটে গিয়ে দেখি, রক্ষিতের দাদা এসেছেন রক্ষিতের সঙ্গে interview করতে। তাঁরা গোড়া থেকেই চোঁটা করছিলেন, কিন্তু দব্ব হরুহে হাক্কর ট্রাইকের পর, বাঙে বাঙীর লোকের শীড়াপীড়িত হাক্কর ট্রাইক ছাড়। সরকারের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

আবার সময় একখামা ছোট চিঠিতে আমাদের খবর লিখে, আলমবাজারের বীরেন চাটুজ্যের নাম ঠিকানা লিখে হাঙাওয়ালা সোয়েটারের হাতা উলটে তার মধ্যে লুকিয়ে নিয়েছিলাম, পথে কোনো রকমে সেটা ফেলে দিতে পারলেও হয়ত কেউ কুড়িয়ে নিতে পারবে এবং ঠিকানার পাঠিয়েও দিতে পারবে।

আমার সঙ্গে চললেন জেলের ডাক্তার এবং I B officer—নাম বোম্ব হর সন্তান লোধ। গাড়ীর কিছু ঘেরি ছিল, দেখি রক্ষিতের দাদাও সাফাং সেরে এসে গেছেন। ভরসা হল,—কিন্তু তিনি পাশের গাড়ীতে উঠলেন। কিন্তু হাঙোর নামলুম একসঙ্গে—এক তিনি একই ঘুরে ঘুরে থেকে শিছন শিছনই চলতে লাগলেন আমাদের দিকে নজর রেখেই।

মোটরে গুঠার সময় আমি এক কাঁকে চিঠিটা ফেলে দিলাম ঠিক মোটর ছাড়ার সময়। রক্ষিতের দাদা চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বীরেন চাটুজ্যের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি সেটা কাগজে ছাপিয়েও দিয়েছিলেন—কাউলিলে তা নিয়ে প্রশ্ন করাও হয়েছিল। সুতরাং কাজ হয়েছিল,—কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বখন ষ্ট্রেট ইয়ার্ডেই নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল, তখন সবাই এসে ঘিরে ধরলেন খবরের জন্তে এবং খাঙরাবার জন্তে। তখনও ওরা জানেন না, আমি হাক্কর ট্রাইক করে এসেছি। তখন উপেনদা, অমরনা (চাটুজ্য) প্রভৃতিকে ফিল্ম ইয়ার্ড থেকে নিয়ে এসে ষ্ট্রেট ইয়ার্ডেই সকলের সঙ্গে রেখেছে। সকলে বাঁকুড়ার কথা ভনলেন, এবং তারপর নানা মন্তব্য এবং ট্রাইক ছাঙার পরামর্শ এবং খাঙরাবার জন্তে শীড়াপীড়িত শুরু হল। তাঁদের সুখের সঙ্গারে এ কি উপাত্ত!

আমি বিপদে পড়লাম। একদিক থেকে উপেনদার ঠাট্টা এবং শীড়াপীড়ি, আর একদিক থেকে অমর যোবের (অকুলদার ভাই) গুরুপন্থীর মন্তব্যের মাঝখানে টাইট হয়ে বসে থাকটা যে কি রকম বিপদ অবস্থা, তা কেউ হয়ত বুঝবেন না। জলন্তেটা পেয়েছে, অথচ বলতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত ওরা এক কাপ লেবুর রস এনে ঢেপে ঘরে মুখে ঢেলে দিয়ে বললেন, এতে মোম হবে না, এ জলেরই সামিল। বললাম বাঁকুড়ার ওদের কে শীড়াপীড়ি করে কলর রস খাঙরাচ্ছে? মনটা খিচড়ে গেল।

ওদিকে দাদারা গেটে লিখে পাঠিয়ে বন্দোবস্ত করছিলেন, একটু পরেই লোকজন এল, আমাকে লটবহর সমেত নিয়ে গেল হাসপাতালে। একটু হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম। দাদারাও—

হাসপাতালে একটা বড় ঘরে তখন একা থাকতেন কুমিল্লার অতীন দায়,—বিনি পরে কুমিল্লার এক সেবার হাউস সার্জন করেছিলেন। তিনি অল্পশীলন পাঠির লোক, কিন্তু কলগেভিক বিদ্রোহ তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল। কুমিল্লার অল্যা হুখার্জী (টিটাসক বোমার মাকলার পাকল হুখার্জির দাদা), বোসেশ জেমুদী প্রভৃতি অতীন বাবুর সঙ্গে সেবার হাউসে বাগ দিয়েছিলেন। অল্পশীলনের এই Junior Sectionই বর্তমান R. S. P-র গোড়া।

বাই হোক, আমাকেও সেই ঘরেই নিয়ে ফুলসে—সেটাই রাজবন্দীদের রাখার ঘর। অতীন বাবুর সঙ্গে আলাপ হল। সন্ধ্যার আগে কয়েকজন দাদা ষ্ট্রেট ইয়ার্ড থেকে সেবতে এসেন এবং আর একবার সেকটার, মন্তব্য এবং খাঙরাবার জন্তে শীড়াপীড়ি চললো।

শেষ পর্বত আবার এক কাপ কলের রস,—এক চুম্বক খেয়ে রেহাই পেলুম। সে রাতটা অতীত বাবর সঙ্গেই কাটলো।

সকালেই অতীত বাবর সন্নিবেশ নিয়ে গেল। কয়দিন একা থাকলুম একটা বড়ো ফালতু পায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দেব,—জান করিয়ে দেব, আর বকর বকর করে সভ্যদুর্ভিত্তি প্রকাশ করে। ৮।১০ দিনে চুকল চক্কে, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে উঠে ২।৪ মিনিট পাইচারী করি। ওজন ক্রমশই কমছে। মাথাটা হালকা লাগে।

ছু'-এক দিন পরেই আগর আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ড নামক একটা ছোট ঘরে। সেখানে attendant একজন জাপানী কয়েদী, নাম ওকিমা, সম্ভবত উকুনায়, ভাল মাতৃসিগান। তার কাছে ২।৪টে তারের খেলা শিখলুম। পরে শুনেছিলুম, ডাক্তারের বন্ধাবন্ধে, ওকিমা আমাকে ভাল খেতে সিত গু'কোস যেখানে ভাল। কথা বলতো পরিষ্কার বাজল।

১১ দিন হল। বীকুভার ওদের কথা ভাবি, কুলকিনারা পাই না—কিন্তু বুঝি, ওরা টাটটাই আছে। আমার মনের অবস্থা বহুবিস্মিত তত্ত্বনিহাতি। এমন সময় হঠাৎ এলেন non-official visitor মণিলাল নাহার (বিজয় নাহারের কাকা বোধ হয়)। তিনি বললেন, সরকার বীকুভার পুলিশ সাহেবের কৈফিয়ৎ তলব করেছিল, তিনি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, ডেপুটি জেলার নাকি তাঁকে বলেছিল, The state prisoners were not actually bathing when they were summoned to the office—তাই তিনি misled হয়েছিলেন—ইত্যাদি—

মণিলাল নাহার খুব সহজদুর্ভিত্তি প্রকাশ করে প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে নানা কথা বোঝালেন, বললেন, বীকুভার ছেলেরা কারো কোন কথা শুনতেই চায় না, বলে, নাগান বাবুর কাছে যান, তিনি হাক্সার ট্রাইক চেড়েছেন জানলেই আমরা ছাড়বো, না হলে ছাড়বো না। এ অবস্থায় আপনার যাড়েই সব দারিদ্র। পুলিশ সাহেবকে যে ডেপুটি জেলারের যাড়ে অনেকটা দোষ চাপিয়ে দিয়ে পাশ কাটাওয়ার চেষ্টা করে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে, এটা তার পক্ষে বখেষ্ট লজ্জার কথা। এর চেয়ে বেশী কিছুর জন্তে জেদ করে বসে না থেকে—ছেলেগুলোকে কষ্ট না দিয়ে, আপনার উচিত একটু নরম হওয়া। এত অভায় ছুনিয়ার আছে যে, একটু compromise করে না চললে বেঁচে থাকাই অসম্ভব—ইত্যাদি—তিনি বললেন, আপনি কিছু খান, প্রথমে এক গ্রাস সরবৎ খান, আমি দেখে যাব।

অনেক ভাবলুম দাদাদের যতিগতির কথাও ভাবলুম এবং শেষ পর্বত তাঁর কথার রাজী হলুম। ইতিমধ্যেই তাঁর ইজিতে এক গ্রাস ঘোলের সরবৎ এসে গেছে। চোখ কাপ বুজ ওবুর গেলা করে সেটা খেয়ে নিলুম। নাহার অনেক ভাল কথা বলে বিদায় নিলেন।

তারপর এক চিঠি লিখলুম গভর্নমেন্টের কাছে এবং যেন আহত বিবেককে চাকা করার জন্তেই তাতে লিখলুম, অতঃপর এ ধরনের ব্যাপার ঘটলে I shall take the law into my own hands and not wait for the government—ইত্যাদি—

তারপর চিন্তা হল বীকুভার ওদের জানাবো কি করে? অত কাছো কথার ওর বিধান করবে না—অতঃপর রাজবন্দীদের মধ্যে পরামর্শ বিদিত। যদি আমরা চিঠি ওদের কাছে এই বিশেষ

অবস্থার জন্তে পৌঁছানো,—অতঃপর কয়েক দিন দেহী চাইই কর্তাদের decision এর জন্তে। তেঁদের চিন্তা বীকুভার জেলের Superintendent Dr. manu এর নামে এক চিঠি লিখে সব জানীলুম এবং লিখে দিলুম, চিঠিটা বীকুভারের না দেখালে তারা হাক্সার ট্রাইক ছাড়বে না। ওদের হাক্সার ট্রাইক ছাড়তে আরো দুদিন দেহী হয়েছিল।

হাক্সার ট্রাইকের কাগজকারখানার একটা ভাল অভিজ্ঞতাট হল। প্রথম দিন পেট চুঁই চুঁই করে,—দ্বিতীয় দিন পর্বত অভাববশে ৫০ বায় খাওয়ার কথা মনে হয়,—তৃতীয় দিন থেকেই easy হয়ে আসে।

হাসপাতালে আমাকে ইউরোপিয়ানদের ওয়ার্ডে সরাবার পর রাজবন্দীদের ঘরে আনা হয়েছিল নলিনী গুপ্তকে,—খোঁড়া নলিনী গুপ্ত,—সভা প্রেশার হয়ে এসেছিলেন। বিলেত, রাশিয়া প্রভৃতি ঘুরে এম এন রায়ের লোক বলে পরিচয় দিয়ে তিনি গোপনে ভারতে ফিরে কিছু দিন সপত্নীপ্রতিম দুই বিপ্লবীদের নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এবং ভিন্ন ভিন্ন বন্ধুদের কথা বলে ভাল বুলিয়ে পরে প্রেশার হয়েছেন। দাদাদের কারো মতে তিনি একজন political adventurer মাত্র—কারো মতে international spy,—আরো কত কি। ভগবান জ্ঞানে। তবে পুলিশের চোখে বুলা দিয়ে বিনা পাসপোর্টে এদেশ-ওদেশ করে বেড়ালো,—যরা পড়ায় পরেও পালালো,—এমনি নানা কথা তাঁর নামে প্রচলিত ছিল।



রেজিটার্ড ট্রেডমার্ক

বিশ্বব্যাপ্ত
‘শঙ্খ ও গদ্য’

মার্ক গঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বঙ্গুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—ব্রিটেন ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কোন : ৩৪২১১৫

হাসপাতালে কয়েক দিন রাখার পর তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শুনেছিলুম তাঁর জেল হয়েছিল,—কিন্তু পরে আবার শুনেছিলুম, তিনি আবার পালিয়ে ভারত ত্যাগ করেছেন!

আমাকে কিছু দিন হাসপাতালে রেখে chicken soup খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। ওকিমা নৃপ তৈরী করার পর মাসটুকু বেঁচে থেকো গোপনে, আমাকেও এক আধ টুকরো দিত। কয়েক দিনের মধ্যেই শরীর ভাল হল, ওজন বাড়লো, তারপর আমাকে সরানো হল misdemeanor yard-এ। সেটা Bomb yard-এর পাশেই।

খাওয়ার ব্যবস্থা হল State-yard-এর সঙ্গেই—সেখান থেকেই কালাতুরা খাবার দিয়ে যেত। খাল একেবারে বাদ, ভাল ভরকারী সবই মিষ্টি, এক দিন বিরক্ত হয়ে কি বলেছি,—কালাতুরা দিয়ে কি বলেছে, কে জানে—উপেনদা এক slip পাঠিয়েছেন,—“ভায়া হে, ১ টাকা ৬ আনার এর চেয়ে ভাল খাওয়া হয় না।”

দাগে গা জ্বলে গেল,—ডেপুটী জেলারকে ডেকে বললুম,—আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে Bomb yard-এর ভূপেন দাঁর সঙ্গে—নইলে আমি আবার খাওয়া বন্ধ করবো। তাই হল।

এদিকে নৃপেন মজুমদারকে আনা হল সেই ইয়ার্ডে এবং আমাকে পাঠানো হল ঐ State yard-এ। রগড় হল বেশ—সকলে আলাদা খায়দার, আমি আলাদা। ডেপুটী জেলারকে এবং ভূপেনদাকে বলে গিয়েছিলুম, আমার খানা Bomb yard থেকেই বাবে, নইলে খাবো না। তাই চললো দিন দুই-তিন। আমি ওদের চেয়ে ভালই খাই—লজ্জা চুপে থাকি। ব্যাপারটা হল অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ—উপেনদার একটু জব-জব ভাব। শেষে একদিন অমরনা আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে গারে হাত বুলিয়ে সন্তপসে বললেন, এখানে খেলে কি তোমার কষ্ট হবে?

পোনো কথা! উপেনদাকে লক্ষ্য করে অমরদাকে দুটো মিষ্টি কথা শুনিতে রাগ জল হয়ে গেল। ডেপুটী জেলার এবং ভূপেনদাকে লিখে দিয়ে ওখানেই ভিড় গেলুম।

উপেনদার সঙ্গে বনিষ্ট আলাপ জমলো তারপরে, এক কথা-বার্তার আমার এলোমের পরিচয় পেয়ে তিনি appreciation হিসাবে বললেন, “তোমাকে আমাদের old cows association এর junior member করে নিলুম। আমাদের কাজ হল, খাওয়া-খাওয়া আর জাবর কাটা।” অতুলনা ছিলেন, তাঁকে দেখিয়ে উপেনদা বললেন, “ওর নাম কেটে দোব,—বাক ও ভরল জিনেদের দলে।” তখন উপেনদা অতুলদাকে একটা বিংয়ে বাগ মানাবার চেষ্টা করে শেষে উঠেছেন না—সে কথা বৎসমরে আসবে।

দিন কতক বেশ কাটলো। হোক একটু বেড়েছে। অমরনাও ভালবাসিতে শুরু করেছেন। এমন সময় একদিন ২৫ সালের পোড়ার দিকেই, হঠাৎ order এল মেদিনীপুর জেলে বন্ডার। যদে হল, এইবার একটু “মিড” হবে। কার্য মেদিনীপুর জেলে বাছ-বাছ অনেক দালা আছেন। কিন্তু আমাকে সেখানে পাঠাবার কারণ কি?

জবতে ভাবতে যদে হল, হালার-টাইক হাড়ার পর গর্ভদেউকে

বে চিঠি লিখি, সুপারিন্টেন্ডেন্ট সেটা কেবল পাঠিয়েছিল improper language বলে। তাতে আমি তার নামেই এক রিপোর্ট করে আর একটা দরখাস্ত করি অনধিকার চর্চা বলে। তখন সে আমার আগের চিঠিটা পাঠিয়ে রাখী হয়—পাঠিয়ে দেয়। আমরা India Govt. এর prisoner বলে তার হাতবন্দি খাটেনি। লোকটা ছিল অত্যন্ত পাকী, নাম গলিসবেরী। সম্ভবত সেই চেষ্টা করে আমার মেদিনীপুরে বন্ডারী ব্যবস্থা করেছে। মেদিনীপুরে পাঠানোর অর্থ, নীজ বেরোতে পারবো না।

বাই হোক,—উপেনদা তখন লেখালেখি ও দরবার করছেন খালিস পাওয়ার জন্তে। ১২টা বছর আন্দামানে কাটিয়ে এসে তিনটে বছরও না যেতে, আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্তে জেলে পড়া—তাও কিছু না করেই, অর্থাৎ না পেরেই, এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারছিলেন না।

অতুলদারও কিছু না করেই—কট্টাঠারী ব্যবসা মাটি হতে বসেছে—তাঁর ভাই ২৪ সালে তাঁর সঙ্গে জনবরত interview করে ব্যবসাটা চালাচ্ছিলেন,—তিনিও (অমর যোব) শ্রেণ্ডার হওয়ার ব্যবসা শিকের ভঁটার যোগাড়। উপেনদা তাঁকেও সঙ্গে রাখতে চেষ্টা করছিলেন,—এক অমরদাকেও (চাটুজো)।

তখন I. B. বর্জ্য ভূপেন চাটুজো আর S. B. বর্জ্য নলিনী মজুমদার। তিনি মাঝে মাঝে জেলের Office-এ গিয়ে বসে উপেনদাকে ডেকে পাঠান,—সেখানে সেখানে কোলাহুল চলে। এমনি ভাবে একদিন উপেনদা Office গেছেন, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে কিরে এসেছেন। জিজ্ঞাসা করলে বললেন, “বড় পারখানা লেগেছে” বলে পালিয়ে এসেছি।

ব্যাপারটা হচ্ছে, বখন অবনী মুখার্জি মন্ডো থেকে এম এন দায়ের চিঠি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন উপেনদা তাঁকে লুকিয়ে রাখার জন্তে কার কাছে যেন এক পোটকার্ড লিখেছিলেন ইস্যার। নলিনী মজুমদার উপেনদাকে সেই পত্র পোনালে তিনি অস্বীকার করলেন। তখন নলিনী মজুমদার মুখ চিপে হেসে ধীরে ধীরে সেই intercepted পোটকার্ডখানা বার করে তাঁকে দেখায়। তাই তাঁর হঠাৎ বড় পারখানা পেয়ে গেল।

আমার মেদিনীপুর বান্ধার কথা শুনে বললেন,—বেশ হল, ভেসে ভেসে বেড়ানোর চেয়ে পাকা বন্দোবস্ত—ভালই হল। আমারও বে একটা উৎসাহের আদম্ভ না লেগেছিল, তা নয়।

আমি বখন মেদিনীপুরে গেলুম, তখন state yard-এ আছেন ১০১২ জন রাজবন্দী—প্রায় সকলেই বাছাবাছা দালা। মুখার্জির দলের আছেন বাহাদুর, মনোহরজি দা (গুপ্ত), ভূপতিলা, নরেশলা—অনুশীলনের প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, অমৃত সরকার, সতীশ পাকড়াশী এক সুকেশ ভরদ্বাজ—মলদার অম্বুল্লা, গিরিনাথ, অণ্ড বানার্জি। আমার পরে একে একে গিয়ে জুটেছিলেন গণেশ যোব, পাকানন চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সেন।

ঘরটার একপাশে কুলবাগান করা হয়েছে—জায়গাটা নেহাৎ ছোট নয়। সেই দিকের বড় বড় জানালার সামনে জোড়া জোড়া খাট—দু জন করে দাদার—রাখে রাখে Passage—সেই দিকই আমার খাট পড়লো। সামনের দরবার বিপরীত দেওয়ালেও বড় জানালার সামনে এমনি খাট। কুলবাগানের উট্টাপিকে ধরে

বাইরে বিজ্ঞান, এবং অনেক মধ্যে ট্রাক প্রভৃতির গাল, রাজের জন্তে পরল দিয়ে বোকা lavatory এবং তারপর খানিকটা জায়গা খালি—বাসনপত্র, জল প্রভৃতি থাকে। ইরার্ডের এক কোণার পায়খানা—টুকরী সাজিয়েই বানানো হয়েছে। আর দরজার সামনে দ্বারের “হাওল” অনেক খানি লম্বা শান বাঁধানো জায়গা—হাখে একটা চওড়া নালী জলের—রোজ সকালে করেদীরা ভায়ে ভায়ে জল বয়ে এনে ভরে দিয়ে যায়—তার দুপাশে ছোটো চাতাল—বার নিক চালু—বসে স্থান করার জন্তে। তার দুইদিকে ছোটো চওড়া নালী জল বেরিয়ে বাওরায়।

মেদিনীপুর কলকাতার চেয়ে গরম, শুকাক্রান্ত জায়গা, জলকষ্ট জেলেও আছে। করেদীদের স্থান করার জল মাশা সোহার সরার হুঁসরা। কাজেই—অভাবে স্বভাব নই—তার আমাদের স্থানকরা জলটা পানের ছোটো নালীতে আটকে রাখতো,—বেরিয়ে যেতে দিত না—এবং সেই জলে পরে নিঃশ্রান্ত স্থান করতো—প্রথম প্রথম মনটা পাক দিয়ে উঠতো, মনে মনে মনে তাদের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হত—কিন্তু সময়ে সব যোগই নিরাময় হয়—কয়েকদিনেই সরে গেল।

আমিপুরে লেখাপড়ার atmosphere ই ছিলনা—ছিল খেলাধুলো এবং exercise এর রেওয়াজ। খেলার মধ্যে indoorভাস আর Outdoor Badminton—দুটোই অভ্যাস হয়েছিল।

মেদিনীপুরে পড়াশুনোও প্রচুর, আর খেলাধুলার ব্যবস্থাও যথেষ্ট। ইরার্ডের মধ্যে, Badminton খেলা চলতো, আর জেলের একদিকে একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল, সেখানে বিকালে আমরা ওয়ার্ডারের পাহারায় খেলতে যেতুম—টেনিস, ক্রীটবল, সব কিছু। ডেপুটি জেলার জিভেন বাবুরও খেলাধুলা অভ্যাস ছিল, তিনিও অবসর করে নিয়ে এসে জুটতেন, খেলতেন। খেলা ও বেড়ানো অন্ততঃ ফটা দুই। আমাদের মধ্যে ভূপতিলা ছিলেন সব খেলার ওস্তাদ।

আমার ভুঁড়ি গজিয়েছিল, এবং পা ছোটোর জোর কমে গিয়েছিল। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে হাসের পর হাস বেঁধে

য়েখে দিলে বোধ হয় এমনিই হয়। রবি সেনের ওজন তখন ২১৬ পাউণ্ড, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে পৌড়ে পারতুম না। ফুটবল খেলতে গিয়ে খানিক দৌড়াবার পর হাঁটু ছুটোর বেন বিল খুলে যেত, ঝাঁড়াতে পারতুম না। ভেবে চোখে আর জল এসে পড়ার বোগাড় হ’ত।

ক্রমে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছিল। এই অবস্থার একবার এক রীতিমত tournament খেলার ব্যবস্থা হল। টেনিস single ও double কে কার সঙ্গে খেলবে, সেটা lottery করে ঠিক হল। এক অপূর্ণ tennis singles match হল, আমি আর ভূপতিলা। আমি সে খেলার বর্ণনা লিখতে পারবো না—আপনারা আশ্চর্য করে নেন। শুধু এইটুকু বলতে পারি, শেষ পর্যন্ত খেলেছিলুম, আর দর্শকেরা সারাদেশ লুটোপুটি করে হেসেছিল।

পড়াশুনো চলতো রীতিমত—২১ জন ছাড়া সকলেই রীতিমত মনোযোগ দিয়ে প্রচুর লেখাপড়া করতেন। একখানা হস্তলিখিত মাসিকপত্র চালানো হ’ত, তাতে প্রায় সকলকেই কিছু না কিছু লিখতে হ’ত। আমার জীবনে লেখাপড়ার একটা বিরাট সুযোগ এল। সে কথা পরে লিখবো। মাসিকের নাম “ভাস্কাকুলো”।

মেদিনীপুর জেলাটা যেমন সর্ববৃহৎ, জেলাটাও তেমনি সর্ববৃহৎ। এইখানেই সেই বিখ্যাত—কুখ্যাত বলার চেয়ে বিখ্যাত বলাই ভাল—১০০ ডিগ্রী নামক সেল—বার বীভৎসতার ফুলনা হর বোধহয় কবালী বাস্তিলের সঙ্গে, বদিও বাস্তিলের বীভৎসতাটা আমার অনুমান মাত্র। মনে করুন একখানা সোতলা ইমারৎ পাথরের ইট সাজিয়ে গাঁথা একটা বিরাট বদ্ধ বাস্তের মতন। তার হুঁ হুড়োর আছে দুটি সোহার দরজা, এবং দুই পাশের দেওয়ালের মধ্যে দুই সারিতে দুই তলার ২৫টা করে ১০০টা গরমে ও দোটা জাল লাগানো ঘলঘলি জানালা। দারুণান দিয়ে একটা পথ এবং দুই ধারে ২৫টা করে সেল, দুই তলার ১০০টা সেল। দিনরাত অমাবস্তা। এই সব সেলে একসময় রাজবন্দীরা দিনরাত তালাবদ্ধ থাকতেন।

[ক্রমশঃ]

বোর্টনের সাক্ষ্য-প্রতিলিপি

[টি. এস. এলিয়টের “Boston Evening

Transcript”এর অনুবাদ]

আন্দোলিত হ’লো

পাকা কলসের মাঠের নত আন্দোলিত,—

বোর্টনের ‘সাক্ষ্য-প্রতিলিপি’র

উৎসাহী পাঠকরা।

এদিকে ছায়ার সন্ধ্যা নামল রাত্তার,—

বর্ধমান রান অন্ধকার;

সে অন্ধকার

রাতের অলস বশ আশার

কারো স্রোতে, কারো দেহে—

বিস্ফোজ বিকৃত করে উজ্জ্বলিত কারনা আছে

উজ্জল বিপুল বঙ্গার।

রক্তের গভীর স্রোত দিয়ে

শুধু এক রান শূন্যতা। বিচ্ছেদ-বিবাদ—সব;

ভবুও সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে

আমি উঠলাম। এবং জমাত দরজার

ফটা বাকিরে,—স্নান ভাবে ঘুরে ঝাড়িয়ে বললাম:

হেরি এই যে সাক্ষ্য-প্রতিলিপি!

(ঠিক যেমন কেউ ‘রচিকাউবুদ’কে বিদায় জানিয়ে বলত,

যদি ঐ রান নির্জন রাত্তাটা হ’ত সময়

আর সে ঝাড়িয়ে থাকত ঘির

অনিশ্চিত শেষ প্রান্তে।)

অনুবাদক—আশিস বোধ-রায়

হাল ছুঁনি আলিয়া

আন্তর্ভাব সুখোপাখ্যায়

লোহার বেড়িতে পা ছড়িয়ে বসে অলস কৌতুকে বীরাপদ
যেন হৃদয়শূন্য এক কালের কাণ্ড দেখছিল এতক্ষণ ধরে।

পাকস্থলীর গা-ঘলনো অস্বস্তিটাও টের পাচ্ছে না আর।

সন্ধান করে চাঁটা মেহেন্দীর বেড়ায় থেবা এই ছোট অবসর
বিনোদনের জায়গাটুকুতেও কাল তার পসার খুলে বসেছে। ভেউ
লেখছে না। কিন্তু দেখলে দেখার মতই। বীরাপদ দেখছে। আর
এইটুকু দেখার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে এক ধরনের আত্ম-বিশুদ্ধির
তৃপ্তিতে বিভোর হয়ে আছে।

খানিক আগে অদূরের দ্বিতীয় কীচা বেড়ীচাতে এসে বসেছিল
এক বিরাট-বনু কাবুলীওয়াল। কীন্তের পডন্ত রোলটুকু মিষ্ট লাগছিল
বীরাপদের। ডেবেছিল, কাবুল নকনটিরও সেই লোভেই আগমন এবং
উপবেশন। কিন্তু না। স্মৃতির হয়ে বসতে পারল না বেশিক্ষণ। উঠে
এ-মাথা ক-মাথা টকল দিল একবার। জোকার জেব থেকে বড়সড়
একটা স্ফটচটা পকেট বাড়ি বার করে সময় দেখল বার দুই। আবার
হসল।

একটু বাদে প্রতীকার অবসান। অতি নম্র বিখ্যাত চরণে
যে-লোকটি তার কাছে এসে পীড়াল, বীরাপদের দেখে মনে হল সে
বাহালী। পরনে যোগ-দ্রবজ টাইজার আর বনু সাট। চকচকে
পরিপাটি হোথার। হাতের মজবুত লাঠিটা হগুধারী বিচারকের মতই
মাটির ওপর সোজা করে ধরে বুকটান করে বসল জীবিকাধেবী প্রবাসী
পুঙ্খ। সেই মুহূর্তে পুরুষোত্তম। আর রমণীহলভ শরণাগত নৃতি
ভঙ্গলোকের।

কান পাতলে এখান থেকেও শোনা যায় কিছু। কিন্তু শোনার
সিকে মন নেই বীরাপদের। দেখার সিকে বোঁক। ভনতে গেলে
দেখার তদুন্নয়ন হ্রস পড়ে। শোনার চেষ্টা ছেড়ে বীরাপদ দেখতেই
লাগল।

কি কথা হল ওঠাই জানে। হঠাৎ মাটির ওপর সজোরে লাঠিটা
চুক একটা চাপা হস্তার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল কাবুলীওয়াল। প্রায়
অসীল কাঁপুনির হুঁ তিনটে ভাবার একটা টপবগানি কানে এলো
জুপ। ঠাস ঠাস করে পাক। বাঁধানো লাঠির বা পড়ল বেঁকটার ওপর।
আলাউদ্দিনের পোছের কিছু একটা বলে সরোবে লণ করে আবার
দেখির ওপর বসল সে।

তারপর বাঁধা নেড়ে ভঙ্গলোকের নীচর বীহুতি জাপন এক
বিনীত প্রবাসী। প্রায় ধীরে ধীরে আঁহে বীরাপদ। কাবুলীওয়াল

মুখ তুলে দেখল একটু, হাসল একটু। পকেট থেকে আবার সেই
বাড়ি বার করে সময় দেখে উঠে চলে গেল।

ইটু মুড়ে ভলপেটে চাপ রেখে বিশ্বতপ্রায় অস্বস্তিটা উপেক্ষা
করতে চেষ্টা করল বীরাপদ। নতুন খোরাকের খোঁজে অলস হুঁ চোখ
চারদিকে ঘুরে এলো একবার। অপেক্ষা করতে চল না। এবারেরও
হজপট সামনের ওই খালি বেড়ীচাই। আবার এক ভঙ্গলোক এসে
বসেছে। পরনে দামী স্মাট, পায়ে চকচকে জুতো। আর হাতে বাস-
রজা সিগারেটের টিন সজ্জে এক নজরে বাহালী বলে চেনা যায়। তার
চকল প্রতীকা কাবুলীওয়ালার থেকেও স্পষ্ট। কোটের হাতা টেনে
হাত-বাড়ি দেখছে, এক পায়ের ওপর অঙ্গ পা তুলে নাচাচ্ছে মুহুহুহু,
আধ-বাঙরা সিগারেট সজ্জারে মোহেরি বেড়ায় ওপর ছুঁড়ে মেরে একটু
বাসেই টিন খুলছে আবার।

কিন্তু এবারের প্রতীকা সার্থক বার আবির্ভাবে, তাকে দেখেই
বীরাপদ প্রায় দতভব। চ্যাঙা আধবরসী একটা মুলমান, পরনে
চেক-লুঙ্গি, গায়ে লাঙ্গার ওপর লাঙ্গা ডোরাকাটা আধময়লা পাতলা
জামা, খোঁচা খোঁচা লাড়িভরা মুখের কবে পানের ফোঁপ। সব
মিলিয়ে অন্তত নৃতি একটি। কিন্তু তাকে দেখা মাত্র সাগ্রহে উঠে
দাঁড়িয়ে সাধারণ অভ্যর্থনা জানালো স্মাটপরা ভঙ্গলোক। তারপর
হজনেই বৈষাধেবী হয়ে বসল বেঁকিতে। কিস কিস কথাবার্তা।
হাতমুখ নেড়ে ভঙ্গলোকটিই কথা কইছে বোল। অঙ্গ লোকটি
অপেক্ষাকৃত নিবিকার।

কথার মাঝে লোকটা নিজের পকেটে হাত দিতেই ভঙ্গলোক
তাড়াহাড়ি সিগারেটের টিন খুলে ধরল। কিন্তু লোকটা নিরাসক্ত।
সিগারেটের টিনের প্রতি জল্পনাপ না করে পকেট থেকে
বিড়ি বার করে বিড়ি ধরালো। তারপর পরিচুপ্তি সহকারে
বিড়িতে গোটা দুই তিন টান দিয়ে কি খেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে
ভঙ্গলোক বেঁকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটের টিনমুখ হুঁ হাত
মাথার ওপরে তুলে সৌর্যাস্তের মতই নাচ জুড়ে দিল।

দেখার বৈচিত্র্য প্রায় ঘরে বসেই বীরাপদ। জুপিঙ্গা লোকটা
নিম্প্রহমুখে সেই নাচের স্বাক্ষরানে আবারও কি কলার সঙ্গে সঙ্গে
দহ-কুরানো কলের পুতুলের মতই নাচ খেলে গেল। শিখিল
ভঙ্গিতে তার পাশে বসে পড়ল আবার। টিন খুলে সিগারেট
ধরাল। কোটের পকেট থেকে একটা কীতকার পাস বার করে
সৌর্যাস্তের লণ টাকার মোটা তার কোলের ওপর ছুঁড়ে মেরে পাস

পকেট চালান করল। তারপর আর একটি কথাও না বলে শুধু একটা উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উঠে চলে গেল সে।

বিড়ি কেসে নোট ক'খানা গুলে পকেটে রাখল লোকটা। বীরাপন্নর মনে হল গোটা সাতেক হবে। মনে মনে একটু খুশি হল সে। অমন নাটকীয় প্রাপ্তির কারণে নয়, একুনি উঠে চলে যাবে বোধ হয় লোকটা—এই বাচ্ছে। মনে মনে এবারের জোরালো রহস্তের জাল বুনে বীরাপন্ন। সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম। সময় না কাটলে দুর্বল বোঝার মত, কিন্তু কাটাতে জানলে চোখের পলকে কাটে। বীরাপন্ন জানে। তার ওপর বিমলা হবার রসম পেরেছে মনের মত। এই জন্তেই আসা এখানে। এই জন্তেই এসে বস।

কিন্তু শুরুতেই মেহেরি বেড়ার ওধারে একটা চেঁচামেচি শুনে রহস্তের বুননি ডিলে হয়ে গেল। বাক, দেখার মত নয়ুন কিছু ঘটে যদি। উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল বীরাপন্ন। এতক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়ানোই কলে সর্বাঙ্গের সব ক'টা দায় একসঙ্গে বিমিশ্রিত করে উঠল। চোখে লাগচে অন্ধকার, পায়ের নিচে ভূমিকম্প। তাড়াহাড়ি বেঁকিতে বসে পড়ে দুচোখ বুজে কেলল বীরাপন্ন। একটুখানি সামলে নিয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে তাকালো। সব ঠিক আছে, কিছুই ভুলট পালট হয়নি। উঠে দাঁড়ানোর দরকার ছিল না। চেঁচামেচির কারণ বসে বসেই অনুমান করা বাচ্ছে। বেড়ার ওধারে বসে নানা রকমের চাট বেচছে একটা লোক। তার সামনে দশ বারিট খুঁকরের বসনা চলছে। তাদেরই কোনো একজনের সঙ্গে হিলেবের গরমিল এবং বচসা।

অনেকগুলো কচি গলার কলকলানি কানে আসতে লাগে।

বীরাপন্ন। রবারের বল নিয়ে কিরিলী শিশুরা খেলতে এসেছে জনাকিতক আহার তছাবধানে। বেড়ার ভিতরে তারপর চাকরে দিয়ে তছাবধানকারিগীর। সকলে ঠাসঠাসি হয়ে বসল এই বেঁকিটাত্তে। কেউ বিড়ি ধরাশা, কেউ সন্ডা সিগারেট, কেউ কিছু না। তাদের উগ্র প্রাণধনটুকুও চোখে এড়ালো না বীরাপন্নর। কালো মুখে পুঙ্ক পাউডারের প্রলেপ, কারো চোঁট আর নখ রাঙানো, কারো কারো চোখে গাঢ় কালল, কারো বোঁপায় ফুল একটা ছুটো। বীরাপন্নর মজা লাগছে দেখতে। কিন্তু ওরা আবার আড়ে আড়ে দেখছে ভাক্টেই আর একজন আর একজনের গায়ে ঢলে পড়ে হাসছে।

কিরিলীদের ফিটকাট বাচাগুলো মাটি বার করা ঘাসের ওপর ছটোপুটি করছে একদিকে। তাদের মধ্যে সব থেকে সবল বাচাটা সর্দারী করছে আর সকলের ওপর। একে হাঙা দিচ্ছে, গুকে ঠেলে কেসে দিচ্ছে—কারো পিঠে দুমশাম বসিয়ে দিচ্ছে দু'খা, কারো চুলের বুট্টে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসছে। সবলের এত দাপট বরদাশ করতে পারছে না অল্প বাচাগুলো। সববে অথবা নীরবে অব্যাহ হুচ্ছে তারা। কলে দেখা গেল, ডানপিটে বাচাটা একজনকে মাটির ওপর কেল তার কুকের ওপর চেশ বসে আছে। নিচের ছেলেটা হাত পা ছুঁড়ছে শুধু, চেঁচাত্তও পারছে না। দরবন্ত হবার উপক্রম। বীরাপন্ন ভাবছে—উঠে ছাড়িয়ে দেবে কি না। অল্প ছেলেগুলোর উত্তেজিত কলরবে আরাধের হাসাপাণে ফ্রেন পড়ল। তারা ছটোপুটি করে উঠে এসে ছেলেগুলোকে ছাড়িয়ে গিল, মুহুমন্ড শাসন করল, পায়ের খুঁলো বেড়ে গিল। আহার হাতে বন্ধী হয়েও রাগে ফুঁসছে সেই সবল ছেলেটা।

শীতের দিনে-ও

ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন
আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

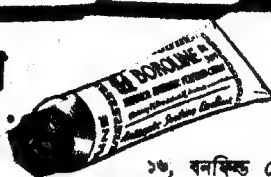
শীতের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে বাতাবিক সৌন্দর্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ক্রম। নিরমিত ব্যবহারে, ত্বকবিগুণ-যুক্ত, হ্রস্বিত বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, নরম ও সজীব করে তুলবে আর আপনার অন্তর্গত বাতাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোজ্জ্বল করুন।



বোরোলীন

পঞ্চম প্রসঙ্গ

পরিবেশ



বোরোলীনে—ল্যানোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও চোঁটকটার হাত থেকে রক্ষা করে আর রক্তওম বকের-ও লাখটা বৃদ্ধি করে।



১৬, বনবিন্দু লেন • কলিকাতা-১

বেশ লাগছিল বীরাপনর। প্রকৃতির দাঁতখানার প্রকৃতির কারিগরি দেখছিল। গাছে নতুন পাখা দেখা দিলেই মালী ভাবে তথ্যবাদের কল আর কুসের কথা। এই নতুন শিকড়ের অতি স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও তেমনি একটা অনাগত কালের ছবি লেখছে বীরাপন। তার এই আত্মব চিন্তার কথা জানতে পেলে লোকের হাসবে। কিন্তু লোকের কথা ভেবে সে চিন্তার লাগামে বাধ টেনে ধরে না কখনো। এই এক ব্যাপারে বেগবোরা স্বাধীন।

দিনের ছোট বেলা পড়তে না পড়তে সন্ধ্যা। বিকেলের আলোর কালছে ছোপ ধরেছে। এরই মধ্যে বেলা পড়ে আসছে দেখে মনে মনে খুশি। দূরে চৌরঙ্গীর প্রাসাদ চূড়ার ঘড়িটাতে পাঁচটা বাজে। ওই ঘড়িটাকে মনে মনে ভাল বেসে কেলেছে বীরাপন। মাঝে মাঝে অচল হয়, নশ বিশ মিনিট শিথিয়ে চলে প্রায়ই। বীরাপনর তাতে আপত্তি নেই। এগিয়ে চলেই আপত্তি। ঘড়িটাতে ঢালাও ব্যবসা ছিল ইংরেজদের, এখন মালিকানা বদলেছে। কিন্তু ঘড়িটা এক ভাবেই চলেছে। চলেছে আর বন্ধ হচ্ছে। দেশেরও মালিকানা বদলেছে। কিন্তু বীরাপন এক ভাবেই চলেছে। চলেছে আর ধামছে।

অথচ বদলেছে তো সব কিছুই। এই কার্জন পার্কই কি আগের মত আছে? আগের থেকে অনেক সংকীর্ণ হয়েছে, অনেক ছোট হয়ে গেছে। শোভা বেড়েছে বটে—কিন্তু অনেক ছাড়তে হয়েছে তাকে। নরম ঘাস আর নরম মাটি খুঁড়ে খুঁসে পিচ দিয়ে বাঁধানো হয়েছে প্রায় অর্ধেকটা। দেহের শির উপশিয়ার মত ঝকঝকে তক্ততক্তে ঝাঁকা ঝাঁকা অল্প ইম্পাতের লাইন বসেছে তার ওপর। সেগিকের সবুজের ওড়না খসেছে। লোহা আর শিঙের বাঁধনে শক্ত মজবুত হয়েছে তার স্থাপিত। আর, সঙ্গে সঙ্গে সাদা রোমালের হাওহাও বদলেছে এখানকার। আগে সাদা হতে না হতে জোড়া জোড়া দহিত দহিতর আবির্ভাব হত। পরস্পরের কটি বন্ধন করে হাঁটতে নয়ত গুথ্য ঝোপের আড়ালে বা কুশিরির মেহেদি বেড়ার নিরিবিঘি পাশটিতে বসে বার' মাস বসন্তের হাওয়া লাগাত গারে। বৈধি ধরে বসে থাকলে আরো গাঢ়তর অল্পরোগের আভাসও পাওয়া যেত। বসন্তের সেই সব অল্পতর সহচরীরা কোথার এখন?

বোধ হয় অল্প আশ্রয় নেছে নিজেই।

ভাবনাটা এবারে এক্ষেমে লাগছিল বীরাপনর। আর সেই সঙ্গে পাকস্থলীর অস্বস্তিকর বাতনাটা চর্ম্মিরে উঠতে চাইছে আবার। হাঁটুতে চাপ রেখে আর একটু ঝুঁকে বস। বেড়ার ওধারে দিনগত কর্মকোলাহলের দিকে চোখ ফেরাল। হঠাৎ কিছু একটা ত্রাসের কাবল ঘটল বৃষি সেগিকে। ব্রহ্ম চকিত আতঙ্কিত। হু' হাত চার হাত দূরে দূরে পসার সিরে বসেছিল ফলগুলা বাসান্দ্রালী খেলনাওয়াল চাটওয়ালারা। কোথা থেকে কি করে বেন একটা মনের গন্ধ পেয়ে হুড়ুড়িয়ে পসার তুলে নিয়ে বে বেসিকে পারে উধাও ২-৩ লাগল। কিন্তু, শিশেছারা তৎপরতা তাদের।

কি ব্যাপার?

হুলা আসছে, হুলা। ট্রাম লাইনের আলো পাশে পসার নিয়ে বসে বসে-আইনী। বারা বসে তারা শুধু পেটের আইন বোঝে। অন্ধকিতে হুলা পুলিশ এসে এদের নীতির আইন বোঝায়। পাছে কুসে হর সেই রাসে বোঝা নিয়ে ছোটো তারা।

চট বিছিয়ে চিনেবাঁদারের ছুপ সাজিয়ে বসেছিল একজন। কেনা-বেচার মশগুল ছিল বসেই বোঝার বিপার সম্বন্ধে লোকটার বট চেননা সজাগ ছিল না তেমন। টের গেল বখন দেবি হয়ে গেছে। এক টানে বাঁদামশুদ্ধ চট গোটাঁদোর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত একখানা কালো বুট উঠে এলো সেই চট-মোড়া চিনেবাঁদারের টালের ওপর।

ভারপর দৃষ্টি বিনিময়।

সেই বিনিময় দেখে বীরাপন হুহু। বাঁদামওয়ালার হাস ছাড়া সমর্পণের চকিত-চকোর দৃষ্টি, হুলা সিপাইয়ের এক পা মাটিতে, এক পা বাঁদারের টালে হু' হাত কোমরে আর পৌর্বভরা হুই চোখ অবলা প্রতিম তীক বাহিতের মুখের ওপর।

কালের কাণ্ডর এই অক্লান্তিতে এসে প্রায় হাততালি মিটে ইচ্ছে হচ্ছিল বীরাপনর। পেটের ওপর থেকে নিজের হাঁটুর চাপ শিথিল হয়ে গেছে খেতাল দেই।

দেখতে দেখতে অফিস ফেরত জনতার ভিড়ে সমস্ত এলাকা ছেয়ে গেল। সার বেঁধে চলেছে। বাতালী অবাকালী, খেতালিনী, ভাসান্দ্রিনী। মুখের দিকে ভালো করে তাকালে তাদের গৃহ প্রত্যাভর্নের তাগিদটুকু উপলব্ধি করা যায়। সমস্ত দিনের খাটুনির পর এই অধিকারটুকু অর্জন করেছে তারা। এটুকু মূল্যবান। নিম্প্রহ চোখে বীরাপন ধানিকরণ ধরে এই জনতার মিছিল দেখল চেয়ে চেয়ে। কেউ যত্নসম্মত, কারো গতি বীর মধুর। অফিসের চাপে শুধু ওই ফিরিলী মেয়েগুলোরই প্রাণচাকলা জ্বলিত হয়নি মনে হল। কলহাস্তে নেচে কুঁদে চলেছে তারা দল বেঁধে। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন বাতালী মেয়ে চলেছে একটি ছুটি। তাদের চলন বিপরীত। জীবনীশক্তিটুকু বেন অফিসের কাজে নিঃশেষ করে এসেছে। কোনরকমে এখন ট্রাম বা বাসের গম্বীরে একটুখানি ঠাঁই পেলে বাঁচে। এরই মধ্যে এক-একজনের মোটাটুকু রকমের স্ত্রী নারী-অঙ্গে বহুজোড়া চোখের নীরব বিচরণ লক্ষ্য করল বীরাপন। সামনের ওই ফসমিত বিবাহিতা মেয়েটিকে এক-চাপ জনতা বেন চোখে চোখে আগলে নিয়ে চলেছে। বীরাপন হাসছে একটু একটু। প্রাকৃতিক চাহিলার কোনটা না মিটল চলে? কোন ছালাটা কম?

দেখতে দেখতে দিনের আলো ডুবল। চৌরঙ্গীর প্রাসাদ চূড়ার ঘড়িটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না আর। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোর মেলার চৌরঙ্গী হেসে উঠবে। একটা ছুটো করে আলো ঝলতে শুরু করেছে। নিয়ন লাইটের বিজ্ঞাপন-তরঙ্গও শুরু হয়ে গেছে। তবে এখনও চোখে পড়তে না তেমন।

বেঞ্চির একধারে সরে এলো বীরাপন। শুট তিনেক নব্যকান্তি বাকি জায়গাটুকু দখল করেছে। বীরাপন উঠেই বসে, কিন্তু তাদের মসালো আলোচনা কানে বেতে কান পাতল। আবহা অন্ধকারে হুহু ভালো দেখা যাচ্ছে না। বিদেশী ছবির জড়ির উচ্চাসে কান জরে বাঁছে। একজনের এই দুয়ার দেখা হল, একজনের ভিনেবার—আর একজনের পাঁচ বাঁহ। ছবির মত ছবি, তাই দূরে কিংবা নার বার আসছে। বার বার এসেও পুরনো হচ্ছে না। কি নাম বলছে—হুবিটার। একটু দূরেই বসল বীরাপন।

...বীটা-ই-ই-ই-

বীটার রাইস। এককর্মী হর

আম। ছবি রাই-বন্ধু, বার-সহ-হয়ে-বীর কোলো ছবি

নাম ১০০-বীটার রাইস।' বাংলা কি হবে? তেতো চাল? কটু চাল? দুঃ...! বাংলা হয় না। বাংলা করলে রাহু ওপর শব্দ দুটো তেমন করে কনখনিরে ওঠে না। বীটার রাইস। বাসা নাম। একবার দেখলে হত ছবিখানা। পারলে দেখবে।

কি বলে ওরা। ও হরি, শেখ পবিত্র আত্মত্যাগ করল বৃষ্টি ছবির নারিকা? সিলভানা ছবির নারিকাই হবে বোধ হয়। আরো খুশি হল বীরপদ। ওদের খেদ শুনে হাসি পায়। বীটার রাইসের নারিকা আত্মত্যাগ করবে না তো কি। ছবিখানা দেখার আশ্রয় দিওণ বাড়ল বীরপদের। কিন্তু কোন দেশের ছবি? কারা জেনেছে বীটার রাইস-এর মর্ম?

ছবির প্রসঙ্গ থেকে নারিকার সৌন্দর্য আর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের দিকে ঘুরে গেল ওদের আলোচনা। এবারে, দু'বার তিনবার আর পাঁচবার করে দেখার তাৎপর্য বোঝা গেল। বীটার রাইসের নারিকা মরেছে, সিলভানা মরেনি। কাচিনীর নারিকা মরেছে, ছবির নারিকা মরেনি। বর্ষাকের অতঃ-মনে উর্বরীর পরমায়ু সেই নারিকার। তার বেশবাসের নতুন বা শুনছে, সেটা বোধ হয় ছবির প্রত্যোজনে। কিন্তু বীটার রাইসের প্রয়োজন আর আর্টস্ট অত্যন্ত বেশবাস উপছে-পড়া নারী-স্তন-মাগুর্ঘের আবেদনে যেমন তফাৎ। সেই আবেদনে এই তিন দশকের অন্তত মেজাজ রাঙা।

হায় গো সাগরপাথের সিলভানা, তোমার ছায়া এমন, কুমি কেমন?

হাসি সোপান করে বীরপদ আন্তে আন্তে উঠে দাঁড়াল। আবার না রাহুওমে বিম বিম করে ওঠে হঠাৎ। মাথাটা ঘুরছে একটু,

পরীটাও ঘুরিয়ে উঠছে কেমন। কিন্তু ও কিছু নয়। হ' পা হাঁটলেই সেয়ে যাবে। হালকা লাগছে অনেক। লাগবেই। যেহেতু সবক্ষে সচেতন হলোই যত বিড়ম্বনা। ওইটুকু খাঁচার মধ্যে মনটাকে আবদ্ধ রাখতে চাইলেই যত পোলা। এত বড় ছনিয়ার দেখার আচ্ছন্ন কত। সেই দেখার সমারোহে নিজেকে ছেড়ে লাগে, ছড়িয়ে লাগে, মিশিয়ে লাগে। শুধু নিজের সঙ্গে যুক্ত হতে চেষ্টা করো না। তাহলেই সব বিড়ম্বনার অবসান, সব মুশকিল আসান। পনের থেকে পয়ত্রিশ পর্যন্ত বলতে গেলে এই দেখার আটটাও বস্তু কতটুকু বীরপদ। বস্তু করে জিতেছে। যেমন আজকের দিনটাও জিতল।

সেই ভেতর আনন্দে বড় বড় পা ফেলে ট্রাম ডিপো আর রাস্তা পায় হয়ে চৌরঙ্গীর ফুটপাথ এনে দাঁড়াল সে। আর সেই আনন্দেই আজকের মত ছেলে পড়ানোর কর্তব্যটাও অনায়াসে বাতিল করে দিতে পারল। শুক-কর্তব্যটার প্রতি বিবেকের তাড়না নেই একটুও। নিজেকে মেনে ছাত্রের জন্তে বিজ্ঞা কেনেন তার অভ্যাস। মাসে তিনশ টাকার বিজ্ঞা। প্রতি দিনের কামাই পিছু এক টাকা কাটান। এর বাইরে আর কোনো কৈকিয়ত নেই।

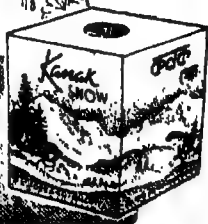
সন্ধ্যারান্তর চৌরঙ্গী। সন্ধ্যা-বোঝা কিশোরীর প্রথম অভিনয়ের তাকিয়া। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর দেখছে বীরপদ। তবু নতুন মনে হয় যোজাই। কবে একদিন নাকি এই চৌরঙ্গীতে বাঘ ডাকত। বীরপদের হাসি পায়। আত্মকায় সিংহের রাজত্ব ছিঃ শুনলেও চরম ঘুরের কংশধরেরা হামবে এবারিন।

হাতের চৌরঙ্গীর এ আলোয় কি এক মর্মির উপকরণ আছে। এখান দিয়ে হাঁটতে হালকা লাগে, নেশা ধরে। বীরপদ পায় পায়



আনন্দ ডায়মন্ড
ক. হোডের

প্রসাধন সামগ্রী



ক. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১০

এসির চলে আর লোকজনের আনাগোনা দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এখানকার কী-সবন এমনি আলোর প্রতিবিম্বিত মহিমা। নারী-পুরুষেরা আগছে, বাচ্ছে। হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ। পুরুষের বেশবাসে তারতম্য নেই খুব। তকতকে, ফিটকাট। কিন্তু নারী এখানে বিচিত্ররূপিনী। তাদের বাসের ওধারে অস্ত্রবাসের ভাঙ্গকাঁচটুকু পর্যন্ত স্পষ্ট। চার আঙুল করে কোমর দেখা যায় প্রায় সকল আধুনিকারই। উপকরণের মহিমার মাঝবয়সী রমণীরও যৌবন উজ্জ্বল। রূপবাহার রূপের মেলা। রাতের চৌরঙ্গী আভিষেকের পরভব জানে না।

বীরাপদর মনে হয় খুশির দূত-দূতী এই নারী-পুরুষেরা। কিন্তু তবু কোথার একটুখানি অসম্পূর্ণ লাগে তার। কিছুকাল আগেও এই একই চৌরঙ্গীর একটু বেন ভিন্ন শোভা দেখেছে। এই সেদিনের ইংরেজ আমলে। সেই শোভা আরো উজ্জ্বল, আরো মহিমাচ্ছন্ন। কিন্তু তার বেন বনিয়াদ ছিল একটু। নামজাদা বাইজীর সঙ্গে তার আধুনিক। কভার যেমন তফাত। সবই আছে, সাধনাটুকু নেই তবু। কালচাষের ছটা আছে, বনিয়াদটুকু থাকেই। নারীতে বা স্বাভাবিক, শিল্পের নাকি তা নিকটবর্তী। কিন্তু এখানে নারীর স্বাভাবিকতার শিল্প খুঁজতে গেলে ছন্দপতন।

তার থেকে এই ভালো। যেমন দেখছে সেই ভালো।

বীরাপদ পাড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

—বাস-ষ্টপে সেই মেয়েটা আজও পাড়িয়ে।

বাসে লিগুসে স্ট্রীট, সামনে রাস্তা। রাস্তার ওধারে বাস-ষ্টপ। সেই ষ্টপের কাছে মেয়েটা পাড়িয়ে। যেমন সেদিন ছিল। একের পর এক বাস আসছিল, থামছিল, চলে বাড়ছিল। কিন্তু কোনো বাসেই ওটার তাড়া নেই মেয়েটার। নিরাসক্ত মুখে বাস্তবের ওঠা-নামা দেখছিল, পথচারীর আনাগোনা দেখছিল। বীরাপদর প্রথম মনে হয়েছিল কারো প্রতীকার পাড়িয়ে আছে। প্রতীকারই বটে, কোন্ ধরনের প্রতীকার সেটাই সঠিক বুঝে ওঠেনি।

বহুর কুড়ি-একশ হবে বয়েস। স্নীপাঙ্গী। পরনে চোখ-ভাতানো ছাপা শাড়ি আর উৎকট-লাগ সিল্কের ব্লাউজ। বুকের দিকে চোখ পড়লেই চোখে কেমন লাগে। কিন্তু তবু চোখ পড়েই। মুখে আর ঠোঁটের রঙে আর একটু সুপটু-সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলে, অথবা, ওই পদাৰ্থটুকু পরিহার করলে মুখখানা প্রায় সুক্লিই বলা যেত। সুক্লি আর শুকনো।

মেয়েটিও দেখেছিল তাকে সেদিন। একবার নয়। একটু বাসে বাসে বারকতক। শেষে ঘুরে পাড়িয়েছিল মুখোমুখি। ছুঁপা এসিয়েও এসেছিল। মাঝে রাস্তা। রাস্তা পেরোয়নি। থমকে পাড়িয়ে আর একবার তার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখেছিল। তারপর কিংগে গেছে যেখানে পাড়িয়েছিল সেইখানে।

বীরাপদ দেখতে জানে। দেখার মত কয়েই দেখতে জানে। সেই দেখার ভুল বড় হয় না। কিন্তু সারাক্ষণ ভ্রমজনক অভ্যন্তর ছিল সেদিন। সোনা বৌদি প্রথম বোকাপড়া শুরু করেছিল সেই দিনই। সেটা যেমন আকস্মিক তেমনই অভিনব। বীরাপদ আশ্চর্য গায়নি, অথক হয়েছিল তবু। আর ভেবেছিল। সেই ভাবনার কীকে সেদিন অনেক দেখাই অসম্পূর্ণ ছিল। এই মেয়েটার হাবভাবও ভুলিয়ে বোঝেনি। ভাঙ বুঝত, যদি না

মুখখানা অমন শুকনো দেখাত। বীরাপদ হঠাৎ করে ভেবেছিল, মেয়েটি কি কোনো বিপদে পড়ে তাক কলতে এসেছিল কিছু? তাহলে এসেও ওভাবে কিংগে গেল কেন?

সঙ্গে সঙ্গে নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চোখ পেঁদে তার। ভ্রমলোক মনে হওয়া শুরু বটে। পাগেও খোঁজ খোঁজ বাড়ি। তিন চারদিন শেত করা হয়নি। কাছাকাছি এসে এই সব লক্ষ্য কয়েই কিংগে পেছে মেয়েটা, ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি বোধ হয়।

কিন্তু আজ? আজ তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কে-বন বলে দিল ওই মেয়েটা কে। কোন প্রত্যাশার পাড়িয়ে আছে। সেই সাক্ষ্য শোনা, সেই সূচ-সেই শুকনো মুখ। বাস আসছে, পাড়িয়ে, চলে বাচ্ছে। বাস্তবের ওঠা-নামা দেখছে, পথচারীর আনাগোনা দেখছে। মাঝের রাস্তার একিকে পাড়িয়ে বীরাপদ হেসে উঠল নিজের মনেই। বীটার রাইস। এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছিল ছবিটার কথা। ছবিটা দেখতে হবে। বেশ নাম।

কিন্তু মেয়েটা যে কয়েই আছে তার দিকে। কুড়ি একশ বছরের অপূর্ণ মেয়ে। সর্বাঙ্গে আলগা পুষ্টিসাধনের কার্যকারী। মোহ হুড়ানোর প্রয়াস। তবু মুখখানা শুকনো। তাই না নাকি জীবনের প্রতিবিম্ব। দেখানে টান ধরলে প্রতিবিম্ব তাক। হবে কেমন করে? বীটার রাইসের নারিকা আশ্চর্য্য করেছিল, আসল রমণীটা তাক। কিন্তু এই মেয়েটা তবু আশ্চর্য্যই করেছে, ওর মধ্যে সিলভানা কোথার? ওর কি প্রত্যাশা?

প্রত্যাশা আছে নিশ্চয়। এক পা ছুঁপা করে এসিয়ে আসছে মেয়েটা। নিজের দিকে তাকালো বীরাপদ। জামা কাপড় পরিহারই বটে, আজ সকালের কাচ। পাগেও এক-খোঁজ বাড়ি নেই। নিজেরই ভ্রমলোক ভ্রমলোক লাগছে।

আজও মাঝের রাস্তাটার ওধারে পাড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ আর খুঁটিয়ে দেখার জন্তে নয়। পাড়ি বাচ্ছে একের পর এক। লাল আলো না হলুদ পর্যন্ত পাড়িয়ে হলে। তারপর আসবে। আসবেই জানে। কিন্তু তারপর কি করবে? বীরাপদর জানতে লাগত হচ্ছে। কিন্তু আর সাহসে কুসোজে না। আশ্চর্য্যতার পরেও বার বার থেকে তার কেমন কে জানে।

হন হন করে লিগুসে স্ট্রীট ধরেই হাটতে শুরু করে দিল সে। বেশ ধানিকটা এসে কিংগে তাকালো একবার। লাল আলো জ্বলে এখন। পাড়িয়েলো পাড়িয়ে আছে। মেয়েটা এখানে চলে এসেছে। আর, ঘুরে পাড়িয়ে তাকেই দেখছে। একসময় তাকিয়েই বীরাপদর মনে হল, দেখছে না নীরবে অনুযোগ করছে বেন। কিন্তু প্রেতের অনুযোগ অমন ঝটকিরে বেঁধে। বীরাপদর বিংবদে কেন? তবু মনে হচ্ছে, মুখখানা বড় শুকনো আর বড় কঠিন। অপটু প্রসাধনের প্রতি বীরাপদর বিহ্বল বাড়ল। ওই মেয়ে কোন্ মন ভোলাবে? কিন্তু নিজের মাথা ব্যথা দেখে বীরাপদ আবারও হেসেই কেলল।

ফুটপাথের পো-কেন্সে বেঁধে চলেছে। বা চোখে লাগে বেঁধে, না লাগলে পাশ কাটার। ও-ভুলে যে কোনার জন্ত একবারও মনে হয় না। যেতে বেশ লাগে।

মাথাটা বিয়-বিয় করছে আশ্চর্য্য একটু। বহু রাস্তা কন হনন করে ধানিকটা হাটতে পড়লে ঠিক হত। এই মেয়েটার

পূজাসাল করে গিলে। সুখের বিসিতি বাজনা কানে আসছে একটা।
মিশি হোক বিসিতি হোক, কানে বা ভালো লাগে তাই ভালো।
বাজনা অল্পস্বপ্ন করে সামনের একটা লোকানের সামনে এসে পীড়াল।
হাল কাশানের মন্ত প্রামোফোন বেডিওর দোকান। শো-কেসু এ
মানা মকবের মকবকে বাজত। ভিতরটা আলোর আলোয়
একাকার। সেই আলো কুটপাথ পর্বত এসে পড়েছে। ভিতরের দিকে
তাকালে চোখ ধাঁধায়।

বাজনাটা মিষ্টি লাগছে বীরাপন। বঙ্গশাসনিক কতর ওপর
ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়লে যেমন লাগে। বাধা মরে না, আরামও লাগে।
বাজনাটা করণ অচ্য মিষ্টি। অভিজাত সঙ্গীতরসিকের
ভিত্তি এখানে। আসছে, বাজে। কেউ মোটর থেকে নেমে
লোকানে ঢুকছে, কেউবা লোকান থেকে বেরিয়ে মোটরে উঠছে।
আবাতালী ঘেরে পুকুরের স্থাণ্ড কম নয়, সাতের মেমও আছে।

মুখ তুলে ভিতরের দিকে তাকালেই বীরাপন হঠাৎ বেন হকচকিয়ে
গেল একেবারে। বিস্মিত, বিভ্রান্ত।

লোকান থেকে বেরিয়ে আসছেন একটি মহিলা। হাতে
খানকতক বেকর্ড। পরনে গ্লেন চাপা রঙের সিন্ডের শাড়ি, সিন্ডের
ব্লাউজ—গায়ের রঙ বৈরা প্রায়। বৌবন হরত গত। বৌবন-ঐ
আট।

মহিলা বেরিয়ে আসছেন। আর স্থানকাল তুলে নিষ্কামনের
পথ আগলে প্রায় হী করে চেয়ে আছে বীরাপন। নির্বাক, বিষত

মরজার কাছ এসে মহিলা স্ক্রু কুটকে ওর দিকে তাকালেন
একবার। জ্বালায় মত একটা লোককে এভাবে চেয়ে থাকতে দেখলে
বিস্মিত হবারই কথা।

খবরমত খেয়ে বীরাপন সবে পীড়াল একটু। মহিলা পাল
কাটিয়ে গেলেন। বীরাপন সেই দিকে ঘুরে পীড়াল। তার চেতনা
বেন সক্রিয় নয় তখনো।

হুঁপা গিয়েই কি ভেবে মহিলা ফিরে তাকালেন একবার।
তারপর খেয়ে গেলেন। বীরাপন চেয়েই আছে। মহিলার হুঁচোখ
আটকে গেল তার মুখের ওপর। হুঁচোর মুহূর্ত। তারপরই বিবম
এক ঝাঁকুনি খেলেন বেন। এক বলক রক্ত নামল মুখে। কুটপাথ
ছেড়ে ভরতরির রাঙাটা পার হয়ে গেলেন।

বীরাপন দেখল ক্রম কালারের চকচকে একটা পাড়ি পাড়িয়ে।
তকমা-পর্যায় ক্রাইতার দরজা খুলে গিল। পাড়িতে উঠতে গিয়েও
আবার থামলেন মহিলা। ফিরে তাকালেন।

বীরাপন চেয়েই আছে। তার দিকেই ঘুরে পীড়ালেন।
দেখলেন। বোধহয় ভাবলেনও একটু। হাতের রেকর্ড ক'খানা
পিছনের সীটে রেখে রাঙা পেরিয়ে এসিয়ে এলেন আবার।
বীরাপন দিকেই, বীরাপন কাছেরই। একই মধ্যে সামলে
নিয়েছেন বোকা দার।

বীরাপন—বিক না?

চোঁ কবেও দলা গিরে একই শব্দ বার করতে পারল না
বীরাপন। কাসকেস-একটু হাঁপরা স্কেল শু। বাড় নাড়ল।

কি আশ্চর্য! আমি তো চিনতেই পারিনি এখানে, তুমি
এখানে। কলকাতারই থাকো দাঁকি?

বীরাপন হাসল। হাসল না—একটু হাসল। হাসল নাড়ল।

হী করে দেখছে কি, চিনতে পেরেছে তো আমাকে না কি?
বীরাপন হাসতে চোঁ করল একটু। বাড় নেড়ে জানালো
চিনেছে।

বলো তো কে?

চাকরি।

বাক্য। হাসলেন। কতকাল পরে লেখা, এখানে কি করছ,
বেকর্ড কিনবে নাকি? ও বাজনা শুনছিলে বুঝি, আর তুমতে
হবে না, ওদিকে পাড়িয়ে কথা কই এসো।

ওদিকে অর্থাৎ মোটরের দিকে। চাকরি আগে আগে রাঙা
পার হলেন। বীরাপন পিছনে। এমন বোগাবোগের লজ প্রস্তুত
ছিল না। এমন বোগাবোগ ঘটে বসেই বোধহয় দেখার এক
সমারোহ আজ। কিন্তু কালের কাণ্ডর মধ্যে এ আবার কোন্
অধ্যায়? বীরাপন খুশি হবে কি হবে না তাও বেন বুঝে উঠছে
না। কিন্তু চাকরিকে ভালো লাগছে। আসের থেকে অনেক
মোটো হয়েছে চাকরি, তবু ভালই লাগছে।

মোটর যৌঁ পাড়িয়ে একগাল হেসে চাকরি বললেন, তারপর
খবর বলো, আমাকে তো চিনতেই পারনি তুমি, ভাগ্যে আমি এসে
জিজ্ঞাসা করলাম।

জিজ্ঞাসা করার আগে তাঁর চকিত কিংবদন্তি বোলেনি বীরাপন।
বলল, আমি ঠিকই চিনেছিলাম, তুমি পালাছিলে।

তা কি করব। অপ্রস্তুত হয়েও সামলে নিলেন, ভাবলাম কে না
কে, এককাল বাদে তোমাকে দেখব কে ভেবেছে। তার ওপর
চোখাখানা যা করেছ তেনে বার সাধা! চোখ দেখে চিনেছি; আর
কপালের ওই কাটা হাস দেখে।

কপালের কাটা হাসের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত বীরাপন মায়ের কথা
মনে হল চাকরি। মায়ের হাতের তপ্ত-খুঁটির চিহ্ন ওটুকু।
ছেলেবেলার দস্তিনার কল। পাখর ছুঁড়ে খুঁড়তু ভাইয়ের মাথা
কাটালেও এমন কিছু মায়াবদ্ধ হয়নি সেটা। কিন্তু ওই চাকরি না
আগলালে ওকে বোধহয় মা মেরেই স্কোল সেদিন। খুঁটির এক
ঘরেই আঘাত করেছিল। একটু হেসে চাকরি জিজ্ঞাসা করলেন,
মাসিমা কোথায়? এখানে? আর নৈল! সব এখানে?

তাঁর মুখের ওপর চোখ রেখে আঙুল দিয়ে শুধু আকাশটা দেখে
ছিল বীরাপন।

ডাঃ বসু
মেমোরি কার্ডিয়েল
গার্লার স্বাস্থ্য, শক্তি
ও পৌরুষ বর্ধন করে
প্রথম প্রস্তুতকারক:
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিমিঃ
কলিকাতা-৯

আ-হা, কেউ নেই! চাকরি অপ্রস্তুত। একটু বিয়গও। কি করে আর জানব বলো, কানো সন্দেশ তো—

খেমে প্রসঙ্গ বললে ফেসলেন চট করে, তুমি আহ কোথায়? কি করছ আশ্চর্য! সাহিত্য করা ছেড়েছ না এখনো আছে? নাম-টার তো দেখিলে...

শেখের প্রসঙ্গটা সব ক'টা প্রসঙ্গটো জবান এড়ানোর পক্ষে অক্ষুণ্ণ। তা ছাড়া এক সঙ্গে একাধিক প্রশ্নের সৃষ্টি এই যে একটাও জবাব না দিলে চলে। ৬-জালা প্রসঙ্গ ঠিক নয়, এক ধরনের আবেগ বলা যেতে পারে। দ্বিধা কাটিয়ে সামনে এসে পাড়ানোর পর থেকেই চাকরির এই আবেগটুকু লক্ষ্য করছে বীরপদ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেও একটু হেসেই জবাবের দায় এড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি বাবে কন্দর?

অনেক দূর। সাগ্রহে আরো একটু কাছে সরে এসেন চাকরি। তুমি বাবে আমার সঙ্গে? চলো না—গাড়িতে গেলে কতদূর আর! চলো, আজ তোমাকে সহজে ছাড়ছি না, ভাইভার তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে'খন—তারা নেই তো কিছু?

বীরপদ তারা নেই জানাতে একেবারে হাত ধরে গাড়িতে তুললেন তাকে। নিজেরও তার পাশে বসে ড্রাইভারকে হিন্দোতে বাড়ি ফেরার নির্দেশ দিলেন। এমন দামী গাড়ি দূরে থাক, মোটরেই শীগগির চড়েছে বলে মনে পড়ে না বীরপদের। মধ্যমল কুশনের আরামটা প্রায় অসম্ভব। নরম আদরের মত। বীরপদ অভ্যস্ত নয়। সেই সঙ্গে মিলি গন্ধ একটু পার্শ্ববর্তনের সূচক প্রসাধনে কুটি আছে বলতে চবে। আরো বৃকভার নিঃশ্বাস টানতে টিচ্ছে কব্জিল বীরপদের, কিন্তু কোন্ সৎকাচে লোভটুকু ধমন করল সেই জানে।

গাড়িতে উঠেই চাকরি তাঁর চূপ করেছেন একটু। বোধহয় এই অপ্রস্তুত শিশু বোগাবোগের কথাই ভাবছেন। বোধহয় আর কিছু ভাবছেন। ভিড় কাটির গাড়ি চৌকীতে পড়তেই সময় লাগছে। মোড়ের মাথায় আবার লাল আলো। বীরপদ ভাড়াভাড়ি বুকে সেই বাস-টপের দিকে তাকালো। ওই মেয়েটা নিশ্চয় পাড়িয়ে আছে এখনো। কালই দেখতে হবে ছবিটা—বীটার বাইস—কোথায় হচ্ছে কে জানে। মনে মনে এখনো নামটার ছুঁতসই একটা বাংলা হাতড়ে বেড়াচ্ছে বীরপদ।

তার এই দেখার আগ্রহটা চাকরি লক্ষ্য করছেন।

...নেই। বীরপদ অবাকই হল একটু। সঙ্গী পেল? ওই কী! তবু আর উগ্র প্রসাধন সঙ্গেও! শুকনো মুখখানা অবশ্য চান্নে। কিন্তু সে তো অল্প জাতের টান, সঙ্গী জোড়ানোর নয়। বীরপদেরই তুল। নারীতে বা ছাত্তাবিক শিল্পের তা নিকটবর্তী বটে। কিন্তু এই বস্ত্রের চৌকীতে শর খুঁজছে কে? এখনো নারীতে বা অজ্ঞাতমিক বাসনায় তা আরো নিকটবর্তী। নিজের কথা মনে হতেই বীরপদের হাসি পেয়ে গেল। ওই মেয়েটা সঙ্গী পেয়েছে আর-ও নিজেও কি সঙ্গিনী পেল! চাকরির মত সঙ্গিনী! এও জে অল্পক হবার মতই—

দীল আলো দিয়েছে। গাড়ি ভাইয়ে দুল।

কি এখানেই অমন করে?

পিছনের কুশনে শরীর এলিয়ে দিল বীরপদ। সেই দক্ষই ইবদক অসম্ভবক নরম স্পর্শ। কিছু না—

কাউকে খুঁজছিলে মনে হল?

না, এমনি কেবছলাম—

চাকরি টিল্লনী কটিলেন, আগের মত সেই ভাবিত্যাব করে সেখে বেড়ানোর অভ্যাসটা এখনো আছে বুঝি।

চাকরি বদলি জানতেন এত ভাঙ থেকেও একেবারে দূর বসে তাঁকেই নিনিমেখে খুঁটিয়ে দেখার ইচ্ছাটা বীরপদ কি ভাবে ঠিকিয়ে রেখেছে, তাহলে বোধহয় এই ঠাট্টা করতেন না। তার অভ্যাসের খবর জানলে চাকরি হয়ত গাড়িতে টেনে তুলতেন না তাকে। হয়ত প্রথম দর্পনে গ্রামোফোন সোফানের সামনে তাকে চিনে কোয়ার পর বিধা আর সফোচ কাটিয়ে কাছে না এসে শেষ পর্যন্ত না চিনেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতেন। অস্তুত সেই রকমই ধারণা বীরপদের নিজের সম্বন্ধে। চাকরি আর একটু হাসলে, আর একটু দূরে বসলে, ওই মিলি গন্ধটা আর একটু বেশি ছড়ালে বীরপদ ওই দেখার প্রোভান্ডন আর বেশকণ আগলে রাখতে পারবে না। চাকরি হয়ত তখন গাড়ি ধামিয়ে নামিয়ে দেবেন গুকে। অবাক হয়ে নিজেকেই দেখছে বীরপদ। চাকরিকে আজও ভালো লেগেছে তার। চাকরি অনেক বালচে, তবু। অনেকটা মোটা হয়েছে, তবু। এত ভাল লেগেছে, কারণ চাকরিও এখন বিয়বণ করে দেখার মতই। কিন্তু ওর বিল্লবণ অন্তর বরফত হওয়া সহজ নয়। তাই ভরে ভরে সরেই বসল আর একটু তারপর জবাব দিল, অভ্যাসটা আরো বেড়েছে।

তাই নাকি! ভালো কথা নয়। চাকরি দূরে বসলেন। বতটা দূরে বসলে বীরপদের মুশকিল, ততটাই। বিয়ে করেছ?

সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়তে ছোট মেয়ের মতই হেসে উঠলেন। মনে পড়েছে বীরপদেরও। অল্প হেসে মাথা নাড়ল।

ও মা, এখনো বিয়ে করেনি। বয়েস কত হল?—পাঁচাত্ত, আমার এই চুম্বাশিশ, আমার থেকে ন' বছরের ছোট তুমি—তোমার পরিত্রিশ। এখনো বিয়ে করেনি, আর করবে কবে? আবারও বেশ জোরেই হেসে উঠলেন চাকরি। বললেন, ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে এখনো?

মুহু হেসে বীরপদ পিছনের দিকে মাথাও এলিয়ে দিল এবার। উত্তর কলকাতার পথ ধরে চলেছে গাড়ি। বীরপদের দূর পাচ্ছে। মাথা টলছে না আর গা-ও ফুলেছে না—রাজের অবসাদ তবু। শরীফটা শুধু দূর চাইছে। চাকরি কখনো ধামছেন একটু, কখনো অনর্গল কথা বলছেন। কখনো এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করছেন। বীরপদ কিছু গুনছে, কিছু গুনছে না। কখনো হাসছে, কখনো বা ধী-না করে সাড়া দিচ্ছে একটু। কিন্তু ভাবছে অল্প কথা। চাকরির চুম্বাশিশ হয়ে গেল এতই মধ্যে! চৌকিশ বললেও জো বে-মানান লাগত না। ওর ছেলেবেলার কথা মনে হতে চাকরি হেসে উঠছেন। হাসিরই ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্য, চাকরির মনে আছে এখনো!

বীরপদ ভোলেনি। তার সেই ছেলেমাছবি সন্দের তপস অনেকবার অনেক দস্তাবেজ হয়ে গেছে। তবু না। কাল জলে কভই তো গুহ-গুহে গেল কিন্তু এক-একটা দৃতির পরমাণু বড় অক্ষুণ্ণ। চোখ বুজলেই সব বেন ধরা-ধোঁয়ার মধ্যে। কত হল তার? পরিত্রিশ? অথচ তার আর একটা বয়েস বেন সেই কবেকার



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিস্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটি কত সুখী, কত সুস্থ। কারণ ওর মেরুদণ্ডী বা গুকে নিয়মিত অষ্টারমিস্ক খাওয়ায়। অষ্টারমিস্ক বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত খাদ্য এতে মায়ের দুগ্ধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিস্ক তৈরী করা হয়েছে।

বিশ্বাস্য-অষ্টারমিস্ক পুষ্টি (ইংরেজীতে) আধুনিক পিণ্ড পরিচর্যার সবরকম তথ্যসম্মিত। ডাক্তারদের জন্য ৫০ মরাপসার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়—“অষ্টারমিস্ক” P. O. Box No. 202 বোম্বাই ১।

...মায়ের দুগ্ধেরই মতন

ক্যারের শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। বৃহৎ বৈজ্ঞানিকের জন্ত চার থেকে পাঁচ মাস বয়স থেকে দুগ্ধের সঙ্গে ক্যারের খাওয়াও প্রয়োজন। ক্যারের পুষ্টিগত লব্ধিজাত খাদ্য-সামগ্রী করত করনী—শুধু দুধ আর চিলির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চানচে করে খাওয়ায়।



পদ্মপাতনের ওধারেই আটকে আছে। এক একসময় এমনও মনে হয়, বরেন কি হাজারের সত্যিই বাড়ি? চাকরির খেড়ছে?

পদ্মপাতনের মেরে চাকরি।

মোটী ছিল না এমন। বেতের মত দোঁহাটা গড়ন। কলকাতা কল্যাণ, একদাখা লাগতে চুল। সেই চাকরিকে এক একসময় আগুনের কুলকির মত মনে হত ন' বহুরের বীরাপদ। পাশাপাশি লাগালগি বাড়িতে থাকত। কীক সেলেট পালিয়ে এসে চাকরির পা বেঁধে বসে থাকত। ইচ্ছে করত ওই লাল চুলের মধ্যে নিজের ছ' হাত ঢালিয়ে দিতে। ওকে হা করে চেয়ে থাকতে দেখলেই চাকরি খুব হাসতেন।

কি সেখিস তুই?

ভোমাকে।

আমাকে ভালো লাগে তো?

খুব।

এই হ'বুর আসেই সে ঘোষণা করে বসে আছে, বিয়ে এখন করতাই হবে একটা, চাকরিকেই বিয়ে করবে। এটা সাব্যস্ত করার পর থেকেই চাকরির ওপর বেন আধিক্যও বেড়ে গিয়েছিল তার। ওর বিয়ের কথা ভিজালা করতে গিয়ে চাকরি হেসে কেসেছিলেন এই লজ্জাই।

তুই এই নয়, আরো আছে। চাকরির বিয়ের হাতে মস্ত একটা লাঠি হাতে বিয়ের পিঁড়ির মরকে সরাসরি ভাড়া করেছিল বীরাপদ। এক বড় বিলাসবাতকতা বরলাভ করতে পারেনি সেদিন। ধরে না কেলো একটা কাণ্ডই হত ঘোষ হয়। আঁইসের মাথা বে কাটত কোনো সম্ভব নেই।

বিয়ের পর চাকরি শুধুবাড়ি চলে গেলে। এই কলকাতার বহুরবাড়ি। কিন্তু বীরাপদ কাছে কলকাতা তখন রূপকথার বেশ। না আর তার নিজের দিগির হুখে চাকরির স্বামী জীবটির অনেক প্রশংসা শুনত। শুনে মনে মনে জলত। মস্ত বড় কোক ধতন, মস্ত বাড়ি গাড়ি—চাকরির বৎও নাকি বিলেত কেরত চাকরি। অমন রূপের জোরেরই নাকি অমন ঘর শেরেছেন চাকরি। ঘর বাড়ি গাড়ির কথা জানে না, চাকরির ঘর লোকটাকে দৈত্য পৌছের মনে হত, বীরাপদ। যেমন কালো তেমনি রূপরূপে। রূপকথার বেশ কলকাতা থেকে সেই দৈত্য বরকে বধ করে চাকরিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার বাসনা জাগত ওর। সেহাভ ছোট, আর ঢাল ভলোয়ার নেই বসেই কিছু করতে পারত না।

বহুর একবার হ'বার আসতেন চাকরি। ধবর পেলে তিন হাত আগের থেকেই বুম হত না। শেরার কাঁধরাড়া পেড়ে পেড়ে টাল করে রাখত। চাকরিকে দেবে। কিন্তু সেই চাকরি আর নেই। একবার কাছে ডাকতেন কি ডাকতেন না। অথচ সারাক্ষণ কাছে কাছেই বুর বুর করত সে। কাছে গেলে আরও অস্ত করতেন। কিন্তু বীরাপদ অভিমানও কম ছিল না। না ডাকলে বেশি কাছে বৈত না। সোত হলেও না। সোত তো হবেই। রূপকথার বেশ থেকে আরো ঢের ঢের সুন্দর হয়েছে চাকরি। আগুনপানি ঝু হলেই শ্রীর। আগুনপানি ঝু আর আগুনপানি চুল।

কিন্তু তুটো বহুর না বেতে একদিন বীরাপদ সবাক। এ বাড়িতে যা পড়ার, দিগি পড়ার। ও-বাড়িতে চাকরির হাঙ্গর

করাবাকি। ক্রমে ব্যাপারটা ভাল বীরাপদ। চাকরির স্বামী শেকটা রাঁধা বেছে। বীরাপদ ভাবল বেশ হয়েছে। এবারে চাকরি এসে আর ডাকে কেউ নিয়ে যাবে না।

এবারে চাকরির আসার আনন্দটা শুধু বেন একা তারই। চাকরি আলিছে অথচ কারো একটুও আনন্দ নেই, হুখে এতটুকু হাসি নেই।

চাকরি এসেন। কিন্তু ধরে কাছে ঘেঁষার সুযোগ পেল না বীরাপদ। আসার সঙ্গে সঙ্গে কাচাকাটির খুব পড়ে গেল আবার। বীরাপদ মনে হত ঝামেলা কি করাই ধাঁড়তে পারে চাকরির যা। তুই কি তাই। কলকাতা বেন একটা মহার জমিস। এ বাড়ি থেকে যা আর দিগি পর্বত গিরে গিরে বেঁধে আসছে। কারা কারা খেলা বেন।

অথচ হুঁতন দিনের মধ্যে চাকরিকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেল না বীরাপদ। বখনই ঘর চাকরির ঘর বন্ধ। অভিমানও কম হল না। স্বামী মরেছে কিন্তু ও তো আর মরেনি। এ কেমন-খায়া ব্যবহার। বীরাপদও ঘরে ঘরে থাকতে চেষ্টা করল ক'টা দিন কিন্তু কেমন করে বেন বুল হাজার অভিমান হলেও চাকরি এবারে নিজে থেকে ডাকবে না ওকে। তাই ঘর খোলা দেখে পারে পারে হুকুই পড়ল সোমন।

একটু আগে দাঁদ হুকুছেন। শৈলদি। তাই দেখতে পাওয়ার আশা নিয়েই এসেছিল বীরাপদ। কিন্তু এমনটি দেখবে একবারও ভাবেনি। দেখে হুঁচোখে বেন পাতা পড়ে না। মেখেতে হুখ গৌজ করে বসে আছেন চাকরি। পাশে দিগি বসে। দিগির চোখে জল ঝলমল। হুঁজনেই চুপচাপ। বীরাপদ ঘরে হুকুছে টের পেয়েও একবারও হুখ বুলকেন না চাকরি। নাই হুকুছ। তুই চোখ ফেরাতে পারছে না বীরাপদ। চাকরির পরনে কোরা ধান। লালচে রঙের সঙ্গে বে মিশে গেছে। আর তার ওপর একপিঠ ভেল-না-পড়া লালচে চুল। এই বেশে এহম সুন্দর মেথার কাউকে ভাবতে পারে না। পারে পারে দিগির কাছে এসে ইঁড়াল। যেমনই হোক, একটা শোকের ব্যাপার ঘটছে অতুল্য বয়েই একটু সাধনা দেবার ইচ্ছে হল তারও। বলল, তোমাকে এখন খুঁজব হুন্দর দেখাচ্ছে চাকরি।

সঙ্গে সঙ্গে দিগির হাতের ঠাস করে একটা চড় গালে পড়তে হতভব। অপরাধে চোখে জল এসে গেল, হুটে পালান সেখান থেকে।

ভেবেছিল, স্বামী মরেছে এখন, চাকরিকে আর কেউ নিতে আসবে না। স্বামী হাড়াও বে নিতে আসার লোক আছে জানত না। চাকরি আবারও চলে গেলেন। এর পরে তার বহুরের নিয়মিত আসার ছেল পড়তে লাগল। শেষে হুঁতন বহুরেও একবার আসেন কি আসেন না। হুঁততে আর একটু রত হয়েছে বীরাপদ। শুনেছে, চাকরির আসার বহুরবাড়ি থেকে কোনো বাধা নেই। এখন খুশি আসতে পারেন। কিন্তু নিজেই ইচ্ছে করে আসেন না চাকরি।

এ-বহুরের ইচ্ছা-বৈচিত্র্য বীরাপদ ধাব্যাতীত।

খ্যাট্রিক পাস করে বীরাপদ কলকাতার পড়তে এসে। লোকি-এ থেকে পড়া। অবিশ্রান্ত স্বামীতা।

কিন্তু কলকাতার আর রূপকথার বেশ মনে হয়নি তখন।

চাকরি আছে বলকাতার এটুকুই রূপকথার বোঝাধের মত। বীরপদ প্রায়ই আলত চাকরির সঙ্গে দেখা করতে। চাকরি খুঁশি হতেন। আগের মতই হাসতেন। তাঁর ধান পোষাক গেছে। মিহি শাদা জামির পাড়ওলা শাড়ি পরতেন। বেশ চওড়া নকশাশেড়ে শাড়ি। হাতে বেশি না হলেও গরনা থাকতই। গলার সন্ম হার আর কানে চুলও। বীরপদের তখন মনে হত ঠিক ওই টুকুতেই সব থেকে বেশি মানার চাকরিকে।

চাকরি গল্প করতেন আর জোরজোর করে খাওয়াতেন। আগের সন্দর্ভ নিয়ে একটু আটু ঠাটুও করতেন। তার কাঁচা বরসের লেখার বাস্তবতা একদিন কেমন করে বেন টের পেয়ে গেলেন চাকরি। টের পাওয়ায় চোটা অবশ্য অনেকদিন ধরেই চলাছিল। এখানে আসার সময় সন্ম সন্ম সব দেখাই বীরপদের পকেটের সঙ্গে চলে আসত। চাকরির উৎসাহে আর আগ্রহে সে ছোটখাট একটি লেখক হয়ে বসেছে বলেই বিশ্বাস করত।

মাঝে মাঝে এই বাড়িতে আর একজন অপরিচিতের সাক্ষাৎ পেত বীরপদ। স্ত্রী, সুউন্নত পুরুষ। বীর পত্নীর, অথচ সুখানা সব সময়ে হাসি হাসি। কসাঁ নর, পুরুষ নর, কিন্তু পুরুষের রূপ বেন তাতেই বলে। মার্জিত, অনমিত। গলার ঘরটি পর্যন্ত নিটোল ভরাট। চল্লিশের কিছু কমই হবে বয়েস। কিন্তু এইই মধ্যে কানের হুশাশের চুলে একটু একটু পাক ধরেছে—এই বয়েসে ওটুকুও ব্যক্তিগত কম নয়।

তুখু চাকরিকেই গল্প করতে দেখত তাঁর সঙ্গে, আর কাউকে নয়। মোটের এক আধদিন বেড়াতেও দেখেছে তাঁদের। একদিন তো চাকরি গুকে দেখেও সুখ বুঝির নিয়েছিলেন—বেন দেখেন নি। তারপর আর এক সপ্তাহ বায়নি বীরপদ। চাকরি চিঠি লিখতে তবে গেছে। চাকরি না বললেও বীরপদ জেনে নিয়েছিল, তাঁর বাহারি সা থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ভ্রমলোক।

কিন্তু এ নিয়ে মনে কোনরকম প্রশ্ন জাগেনি বীরপদের। সত্যের আটের বছর বয়েস মাত্র তখন। ছেলেদের মুক্ত বয়েস ওটা। আর ওই নিয়ে ছেলেবেলার মত ঈর্ষাও হত না। সেই হাতকর ছেলেবেলা আর নেই। তাছাড়া সেখান থেকে ভ্রমলোকের তুলনায় নিজেকে এখন নাবালাক মনে হত যে তাঁকে নিয়ে মাথাই বাঁধাত না বড় একটা। তুখু চাকরির একটু আদর বহু পেনেই খুশি। সেটুকুর অভাব হত না।

এক বছর না যেতে সেই নতুন বরসের পোড়াতাইই আবার একটা ছাড়া খেল বীরপদ। দিন দশ বারো করে পড়ে ছিল, কিন্তু চাকরি লোক পাঠিয়ে বা চিঠি লিখে একটা খবরও মেনে নি। অসুখ ভালো হবার পরেও অভিজ্ঞান করে কাটালো আরো দিন কতক। বীরপদ বলে কেউ আছে তাই বেন তুলে গেছেন চাকরি। সেবে একদিন গিয়ে উপস্থিত হল চাকরির খবরবাড়িতে।

তখন চাকরি নেই।

কোথায় গেছেন, কি রকম কিছাই বুঝল না। বাড়ির লোকের বকমসকম দেখে অবাক হল একটু। কেউ কখনো হুঁয়বহার করেন নি তার সঙ্গে। এত হুঁয়বহার ঠিক নয়। তুখু কেনে বেন। এর পর আরো দু'দিন মিল গেছে। সেই এক কথাই। চাকরি নেই। কোথায় গেছেন কখন কিভাবে কেউ কিছু জানে না।

বীরপদ হতবশ।

ছুটিতে বাড়ি এসে চাকরির কথা তুলতেই না বলেন, চূপ চূপ। মিহি বলে, চূপ চূপ।

এই চূপ চূপের অর্থ অবশ্য বুঝেছিল বীরপদ। চূপ করেই ছিল। কিন্তু ভিতরটা তার চূপ করে ছিল না। বলকাতার এসেও অনর্থক বাস্তব বাস্তব বুঝেছে। অভ্যন্তরীণ মত হুঁচক তার কি বেন খুঁজেছে। আর মনে ধরেছে, এই রূপকথার মেলে কি বেন তার হাযিরে গেছে।

খুঁশিরে পড়েছিলো নাকি ?

চাকরির কথার চমক ডান্ডল বীরপদের। বড়মুড় করে সোলা হয়ে বসল। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একটা একতলা বাড়ির সামনে—ছোট লন-এর ভিতরে। রাত বলে ঠিক ঠান্ডা না হলেও বাড়িটা স্নানরই লাগল চোখে ১০০-কিন্তু সে কি সত্যিই খুঁশিরে পড়েছিল নাকি ? কোথায় এলো ? কি বলেছিলেন চাকরি এতক্ষণ।

এই বাড়ি ?

এই বাড়ি। মাঝে।

চাকরি আগে নামলেন। পিছনে বীরপদ। বাবুকে বাড়ি পাঁছে দেবার জন্যে ডাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে তাকে নিয়ে চাকরি ভিতরে ঢুকলেন। সামনের অরের আলো কলাছিল। বোম-পোড়ার একজন বড়ী মত মেয়েকে বসে। কজীর সাড়া পেয়ে উঠে ভিতরে চলে গেল।

বোসো, এখুনি আসছি।

রেকর্ড হাতে চাকরিও অরেরে ঢুকলেন। এই অবকাশে বীরপদ অরের ভিতরটা দেখে নিল। স্বকৃতক তবৃতক সাঝানো গোছানো ঘর। মেঝেতে পুরু কার্পেট। নরম গদির সোফা সেট। বসলে শরীর ভুবে যায়। বসে বেন অবশ্যি বাড়ল বীরপদের। অরের হুঁ কোথার হুঁটা কাচের আলমারি। নানারকম শোখিন সন্ম তাতে। উল্টো দিকের দেওয়ালের বড় আলমারিটা বইএ ঠাসা। এই রকম ঘরে আর এই রকম জোড়ালো আলোর নিজের মোটামুটি কসাঁ জামা-কাপড় পর্যন্ত বেখানো রকমের মূল আর মিলন ঠেকেছে বীরপদের চোখে।

দিনের বেলা এসো একদিন, ভালো করে বাড়ি দেখাব তোমাকে—বাগানও করেছি। ভালো ডালিয়ার চারা পেরেছি, মত ডালিয়া হবে দেখো।

চাকরি কিরে এসেছেন। গুকে বরখানা খুঁটিয়ে দেখতে দেখেই হরত খুশি হয়ে বসেছেন। বড় একটা সোকার শরীর এলিরে মিলেন তিনি। কাব্য করে বসলে বলতে হয়, অলস শৈথিল্যে তত্ত্বতার সমর্পণ করলেন। বীরপদ দেখেছে, এওই মধ্যে শাড়ি বদলে এসেছেন চাকরি। মিহি শাদা জামির ওপর টকটকে লাল ডেলভেট পাড় শাড়ি। আটপৌরে ভাবে পরা। বুখে চোখে জল দিয়ে এসেছেন বোকা যায়। বুছে আসা সন্মও ভিত্তি ভিত্তি লাগছে। কপালের কাছের চুলে হুই এক কৌটা লল আটকে আছে দুজোড় মত। অরের সালা আলোর বীরপদ লক্ষ্য করল, চুল আগের মত লজ্জা তবৃতক লাল না হলেও লালতাই বটে। এই অর ঠিক বেনমতি

বানান কেন্নিই লাগছে চাকরিকে। ভারী বাতাবিক। শিল্পের কাছাকাছি আর।

কিন্তু এই শিল্প উপলব্ধি করার মত বসিক বীরপদ নয়। ময় বে, এই প্রথম টের গেল। কোনো কিছুইই কাছে আসতে পারছে না সে। বাড়ি না, গাড়ি না, বাগান না, ডালিয়া না—এমন কি চাকরিকে না। এমন হল কেন। মাথাটা কি টুছে আবার? গা যুলোচ্ছে? কিন্তু হাও তো এখন টের পাচ্ছে না তেমন।

৬৪ টুই অঙ্গুসরণ করেই বোধহয় চাকরি বললেন, মুখ-হাত দুয়ে এলাম—খটায় খটায় জল না দিয়ে পারিনি, মাথা পরম হয়ে যায়।

জনে একটু খুশি হল কেন বীরপদ ১০০—এই একটি কথার মাটির সঙ্গে যোগ আছে বলেই বোধ হয়। কালো মোটাসোটা কম বরসের আর একটি চেয়েছিলে যার এসে ঝাঁপাল। এও পরিচায়িকা বা বঁধুনি হবে। হজুমেব প্রতীকার কত্রীর দিকে তাকালো।

তোমাকে চা গেবে তো?

বীরপদ মাথা নেড়েছে। কিন্তু হা বলছে না না বলছে? বোধহয় না-ই বলছে। মাথা নাড়ার সময় খেয়াল ছিল না, মেয়েকেলটিকে দেখছিল। পরিচায়িকা ফোক আর বঁধুনি ফোক, আসলে শেখতব রক্তিনী হিসেবেই এই পুরুষপুত্র গুচে বসাল আছে সে। একেবারে বাজালী পুতল হয়েব মেয়ের মত আধমরলা লাড়ি না পরলে পালাইতেনি ভাবত। অতুমান মিথো নত, ইজিতে থাকে বিদায় দিয়ে চাকরি হেসে বললেন, কেনন কেনলে ভাবার বড়িপার্ট?

ভালো। কিন্তু তব পার্ট দরকার নেই?

চাকরি হাসলেন খুব। অত হাসবেন জানলে বলত না।

বীরপদর মনে হল অত হাসলে চাকরিকে ভালো দেখায় না। খুব বেন সহজ মনে হয় না।

চাকরি বললেন, কি মনে হয়, দরকার আছে? ধায়ে-কাছে বেঁবেবে কেউ? আগে শরতের মধ্যে থাকতুম বখন, দুই-একজন লুপ্তর করত বটে—তাদের একজনের সঙ্গে ডাক-কাটা না নিয়ে দেখা করতে এগিয়েছিল পার্বতী। তারপর থেকে আর কেউ আসেনি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে পার্বতী সমাচার শুনেতে হল বীরপদকে। পায়ল-গোছের পার্বতী নয়। পাহাড়ী পার্বতীই বটে। বছর দশেক বয়সে চাকরি শিলঙ পাহাড় থেকে কুড়িয়েছিলেন ডকে। সেই থেকে এই পনের বছর ধরে চাকরির কাছেই আছে। এখন এক বাংলা ছাড়া আর কিছু বড় বোঝেও না, বলতেও পারে না।

তারপর তোমার খবর বসো দেখি, শুনি। পার্বতী-স্বর্গদা শেষ হয়ে প্রসঙ্গান্তরে ঘুরলেন চাকরি।—কিছুই তো বললে না এখনো। যাচ্ছেতাই চেষ্টা হয়েছে, থাকার মধ্যে শুধু চোখ চুটো আছে—সেও আগের মত অত মিষ্ট নয়, বরং ধার ধার—কে দেখে শোনে?

চাকরি হাসলেন। বীরপদও। দেখা-শোনার কথার কেন জানি সোনারবাঁধর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ফলে

আরো বেশি হাসি গেল বীরপদর। কিন্তু নিজের সবচেয়ে কিছু করতে হলেই বত বিড়ম্বনা ১০০-বৎ তো নিজের কথা বলছিল চাকরি। এবারের বিড়ম্বনাও কাটির দিল পার্বতী যবে চুক। জানালো, টেলিকোন এসেছে। কত্রী বাঘেন না কোন এখানে আনা হবে?

কত্রীট গেলেন। কিরও এলেন একটু বাঘেই। বীরপদ ঠিকই আশা করেছিল। কি ভিজাঙ্গা করেছিলেন চাকরি ফুলে গেছেন। চাকরি শুনেতে চান না কিছু, বলতে চান। বলে বলে আগের বড়ই হাফা হতে চান আর সহজ হতে চান। বীরপদর সেই বকমই মনে হচ্ছে। মনে করছে, মনের সাথে কথা বলার মত লোক চাকরি বোধহয় এই সতেরো-আঠারো বছরের মধ্যে পাননি। শেষ দেখা কতকাল আগে ১০০-সতেরো-আঠারো বছরই হবে।

কির এসেই চাকরি গল্প জুড়ে গিয়েছেন আবার। অঙ্গলার, এক-তরপা ১০০-শহরের হাটের মধ্যে পাগল পাগল করত সর্বদা, তাই এই নিবিবিলিতে বাড়ি করেছেন। মনের মত বাড়ি করাও কি সোজা চাচামা, বিবম থকল গেছে তাতোও। টাকা কেনলে লোকজন পাওয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাস কাউকে করা যায় না। বতটা পেরেছেন নিজে দেখেছেন, বাকিটা পার্বতী। কেনা-কাটার জন্তে সপ্তাহে দু'তিন দিন মাত্র শরতে হান—ভার বেশি নয়।

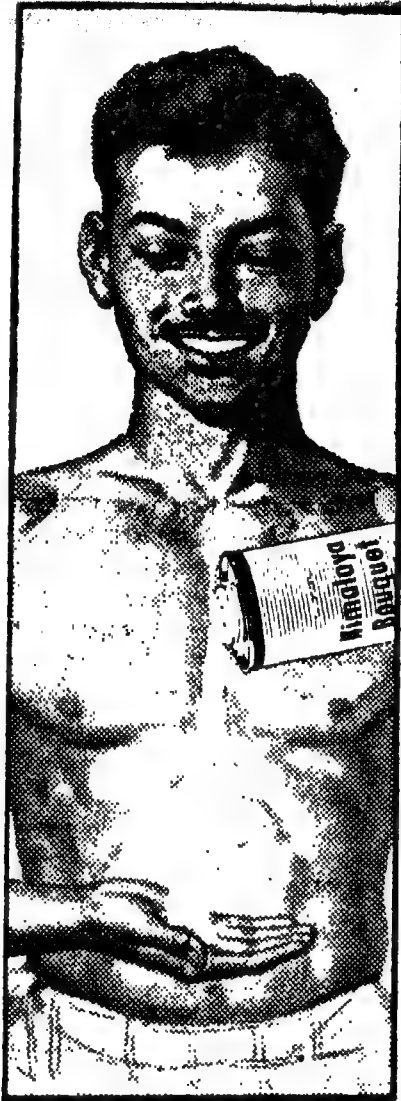
শুনেতে শুনেতে বীরপদর আবারও কিছুনি আসছে কেনন। গা-এলাতে সাচস হয় না আর।

—অনুত বেকর্ড পড়ল, অনুত অনুত লেখকের লেখা। বীরপদ লেখে না কেন, বেশ তো মিষ্ট চাত ছিল লেখার—লিখলে এতদিনে জামডাক হত নিশ্চয়। অনুত কুলের চাচা খুজছেন, নিউ মার্কেট জর তর করে চলেছেন—নামটী শোনে নি কেউ। তবে কে একজন জানিয়ে দেবে বলেছে ১০০-মালীটা ভালো পেরেছেন, বাগানের বক-আঁতি করে। ডাইভারটাও ভালো—তবে ওদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা কইতে হয় বলেই বত মুশকিল চাকরির। হিন্দীর প্রথমভাগ একশানা কিনেছেনও সেই ভক্ত, কিন্তু ওলটানো আর হয়ে ওঠে না। এখন বিশ্বস্ত একজন বন্ধুকলা গোট-পাহাাড়দার পেলেই নিশ্চিত হতে পারেন চাকরি। পার্বতীকে নাকি বলছেন দেখেও পছন্দ মত একজনকে জুটির নিতে—ঘর-জামাই হয়ে থাকবে আর বন্ধু কাঁধে বাড়ি পাহারা দেবে।

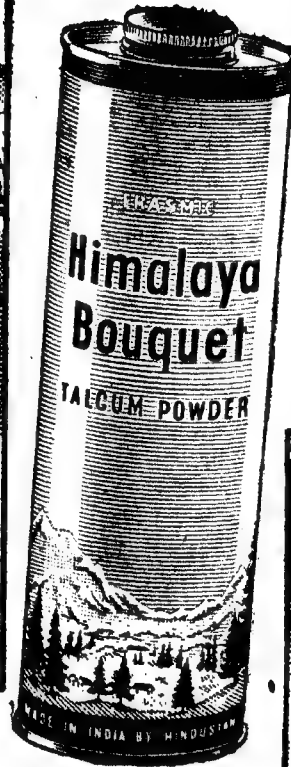
চাকরি হেসে উঠলেন। কিন্তু এবারে স্রোতার মুখের দিকে চেয়ে একটু সচেতনও হলেন নেন।—ও হা, আমি তো সেই থেকে একাই বকে ময়তি দেখি, তুমি তো এ পর্যন্ত সবসময় দশটা কথাও বলানি ১০০-কথা বলাও ছোড়েছো নাকি? শুধু দেখেই বকাও?

কি যে হল বীরপদর সেও জানে না। কিছুনি ভাবটা কেটে গেল একবারে। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। চোখে চোখ রেখে হাসল একটু। বেন মজার কিছু বলতে থাকে।—না, কথাও বলি। তবে, বড় গদ্য কথা ১০০-আমাকে কিছু খেতে দিতে পাঠো?

[ক্রন্দন]



ব্যবহার করুন
হিমালয় বোকে
ট্যালকাম পাউডার



স্বাস্থ্য
সুখে
থাকুন জন্মে



- এত সুগন্ধ
- এত কম খরচ
- জালা পরিবারের
পক্ষেই আদর্শ



ভবানী মুখোপাধ্যায়

তেজশ্রী

ফরাসী সাহিত্যিক জঁরী বারবুস লেখক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, আবিষ্কারক, গায়ক প্রভৃতিদের সম্বন্ধ করে একটি বিশ্বজনীন মূহুরিবাধী সঙ্ঘা গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই সম্ভার রাজনীতিকদের স্থান নেই। বার্নার্ড শ'র হাতে যখন বারবুসের চিঠিখানি এয়ারটে এসে পৌঁছালো, ঠিক সময়েই টি, ই, লারসনের ১৯৩১-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে একখানি চিঠি পেলেন সার্লেট সেট চিঠিতে লেখা ছিল—In one world I would put the creatures that create (and G. B. S. crowned amongst them) while in another world, working for them would be the cooks and shoe makers and boatmen and soldiers, who might swell a chest only for the hour after they had been of use to them.

এর কল বার্নার্ড শ' সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অবজ্ঞা প্রকাশের একটা সুযোগ পেলেন। তিনি বারবুসকে লিখলেন যে জিরমিনে লন্ডা করেছেন তথাকথিত লজনিমূলক প্রতিভার অবিকারীনের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি কিংবা কম। কেবিরান লোলাইটিম যে কতি এইচ, জি, ডবলস করেছিলেন তা পরিষ্কার করতে তাঁকে দীর্ঘদিন পরিশ্রম করতে হয়েছে।

এর ফলেই জঁরী বারবুস জানালেন—যে তিনি ইতিমধ্যে আলবার্ট আইনস্টাইন, ইলিস ম্যান, আপটন সিনক্লেয়ার, ম্যাকসিম গোর্কী, ব্রুন্টা ব্রল্যান্ড লরবর্ন কেব্রেন, বার্নার্ড শ'র সহযোগিতা লাভ করলে শান্তিবিধার প্রচেষ্টায় সহায়তা হবে।

এর এক হাস পয়ে লগুনে এসেন মহাত্মা গান্ধী, রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগ দিতে। মহাত্মা গান্ধীর ওপর বার্নার্ড শ'র প্রভাও অস্বাভাবিক ছিল। তিনি সাক্ষাৎকারে অস্বস্তি প্রকাশ করলেন।

নাইটসজিক গান্ধীজীর সঙ্গে লশ মিনিটের জড় আলাপ করার

অস্বস্তি পাওয়া গেল।

গান্ধীজী মাটিতে বসে তাঁর সেই অতি পরিচিত তলিতে হাত কাটছিলেন। মাটিতেই বসলেন বার্নার্ড শ', চরকার বরষার শব্দের মধ্যেই হৃদয়ের কথাবার্তা শুরু হল।

বার্নার্ড শ' মরণ করিয়ে দিলেন—আপনার সঙ্গে আমার আসে আর একবার আলাপ হয়েছিল মনে পড়ে?

মহাত্মাজী মরণ করতে পারলেন না।

শ' বললেন—আপনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন কোথায় ভালোভাবে নাচ শিখবার সুবিধা হতে পারে। আপনার নিখুঁত নর্তন পদ্ধতির প্রতি আগ্রহ ছিল।

গান্ধীজী হেসে বললেন—রীতিমত কেন্দ্রীয় ইংরাজ জেটেলম্যান হওয়ার বাসনা আমার মনে প্রবল ছিল। আমি ব্যারিটারি পড়ার জন্য ইংলণ্ডে এসেছিলাম, সেই সঙ্গে সভ্যতার সব আলীবাঁদ (graces of civilization)। আচ্ছা, আপনাকেই কি প্রায় করেছিলাম শ্রেষ্ঠ ইংরাজ লরজির নাম কি?

বার্নার্ড শ' হাসলেন।

গান্ধীজী আবার বললেন—আমি এ কথাও জানতে চেয়েছিলাম, কি ভাবে ইংরাজী উচ্চারণ উচ্চারণ শুদ্ধ করা যায়, শিক্কের সাহায্যে ইংরাজীনাথী হওয়ার বাসনা ছিল সেদিন।

বার্নার্ড শ' বললেন—ভাগ্যক্রমে আমরা উভয়েই 'সভ্যতার আলীবাঁদ' থেকে সরে আসতে পেরেছি। সভ্যতার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি।

দেখতে দেখতে লশ মিনিট কেটে গেল।

১৯৪৮-এ গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটলো আততায়ীর গুলিতে। এয়ারট সেট লরেন্সের টেলিফোন সেলিন মুহুর্তে বাজতে লাগল। সবাই চায় বার্নার্ড শ'র মুখ থেকে মহাত্মাজীর মৃত্যু সম্পর্কে কিছু শুনে। এর কিছু দিন আগেই দেবদাস গান্ধীর সঙ্গে বার্নার্ড শ'র দেখা হয়েছিল। তখন পরিস্থিতি বার্নার্ড শ' বলেছিলেন—তোমার বাবা আমার কাছে শিল্প, আমি বুড়ে হয়েছি, তোমার পিতৃদের উপবাস প্রকৃতির দ্বারা শরীরটা যেভাবে স্বস্থ রাখছেন, তিনি এই প্রার্থনা আর উপবাসের ফলেই অস্বস্ত: হুশো বছর বাঁচবেন। তাঁকে আমার কথা জানিয়ে।

তার পরেই এল এই নিরাশ্রয় হুসংবাদ। বার বার সবাই তাঁর শোকোচ্ছ্বাস জানতে চাইছে। বার্নার্ড শ' টেলিফোনেই জানালেন—

I always said that it was dangerous to be good!

বার্নার্ড শ'র শোকের সঙ্গে কিছু কৌতুকও ছিল। তিনি বার বার জানতে চাইলেন আততায়ীর কি শাস্ত হল? তাকে কি কমা করা হবে? গান্ধীজীর অহিংসা ধর্ম কি ভাবে সম্মানিত হবে, এই তাঁর চিন্তা।

এই বছরের ২১শে ডিসেম্বর সার্লেট আর বার্নার্ড শ' কেপটনউল জমশে বাত্মা করলেন। এই সফরে কোনোরকম বক্তৃতা করবেন না স্থির করলেও সেখানে উপস্থিত হয়ে নবীন রাশিয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন। পোট এলিজাবেথের পক্ষে এক দুর্ভাগ্যের হৃদয়েই প্রাণবিরোধের সম্ভাবনা ঘটেছিল। বার্নার্ড শ'র ধারণা ছিল, তিনি

বাড়ি চলেতে অভিনয় বন্ধ, পূর্বে এক জারপায় নিজে ড্রাইভ করার চেষ্টা করলেন। বেশ জোরে চালিয়ে চলেছেন, হঠাৎ এক জারপায় বামার প্রয়োজন হওয়ার জেকের বললে একসিলেটেই পা দিলেন, এটা তাঁর বল অভ্যাস ছিল। সেইখ, ভাগ্যক্রমে পাড়িবোঝাই হান্ডর বেঁচে গেল। ওয়াশিংটনবাসী নায়ক জারপায় পৌঁছে তাঁদের প্রায় মানসিক কাল থাকতে হল। সার্জেটের অবস্থা অতি গুরুতর হয়েছিল, তাঁর বিজ্ঞানের প্রয়োজন ছিল।

সার্জেট শিহনের সিটে ছিলেন বসেই তাঁর আঘাতটা বেশী হয়েছিল। জার হতেই তিনি সর্বপ্রথম জানতে চাইলেন শ' কেমন আছেন? বখান হিসেব সার্জেট শ'কে রিসলা নামক শহরে নিয়ে যাওয়া হল তখন তার চৈশ্বায়েচার উঠছে ১০৮' ডিগ্রী।

বহুদাল হোটেল রিসলা থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ এই তারিখে দেবী এ্যাটরকে পেনসিলে দেখা এক চিঠিতে শ' লিখেছেন—

সামান্য একটু-আধটু আঘাত হাড়া আমার তেমন কিছু হয়নি, আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তাঁরও নয়, গাড়িটারও নয়। কিন্তু, আহা বেচারী সার্জেট। মোটরবার্টর ভূণ থেকে তাকে বখান উদ্ধার করছি তখনই মনে হল বিশদীক হলো, এমন সময় আমার আইত হয়েছি কি না জানতে চাইল। ওর মাথাটি ভেঙেছে, চশমার রিম চোখে ঢুকছে, বা হাতের কব্জি মচকছে, পিঠটা ছড়ে গেছে বিজ্ঞীককম, আর ডানদিকের পায়ের গোড়ালিটার একেবারে গর্ত হয়েছে। এখান থেকে হোটেল পনের মাইল।

এ সব আট দিন আগেকার ঘটনা, এখন আর তেমন উবেগ নেই। তবু এখনও উনি শয্যাশায়ী, পায়ের সেই গর্তটার যত্নশা, কাল ১০৩

বর উঠেছিল (আমার প্রাণ একেবারে জিভের তগার এসেছিল), বাক, আজ অবস্থা ভালো, বর ১০০' ডিগ্রীতে নেমেছে। বড়ই কান্না করে আছে। এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছানোর আসেই হবত আমতা ওয়াশিংটনবাসী পিয়ে হাওয়া বলল করবো। আমি তার না করলে জেনো আমার সব কুশলসেই আছি।

বার্ণার্ড শ' বলেছেন, এইখানে এক মাস কাল সার্জেট শ'র আশ্রয় করে ছিলাম, আমি প্রতিদিন জ্ঞান করতাম আর The Adventures of the Black Girl in her search for God লিখতাম।

এটি বার্ণার্ড শ'র বহুবারতন প্রদ্যাবলীর অন্যতম। পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বাইবেলের একটি ঘটনা সার্জেটের যোগশকার্য বসে তাঁর মনে হল। তিনি ঈশ্বরতত্ত্বের একটি দৃষ্টি দ্বারা দেখে এছাড়া ঘটনা করলেন। ১৯৩২-এর ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হওয়ার পর এই গ্রন্থ এক বছরে ২০০,০০০ খণ্ড বিক্রী হয়েছে।

আফ্রিকার নয়লহা কালো মেয়ে মিশনারী মহিলার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল বাইবেল, সে ঈশ্বর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। তাঁকে ধরা সহজ নয়, তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জেনেসিসে ঈশ্বরের সন্ধান বখান পাওয়া গেল তখন তিনি দুলার মিলিয়ে গেছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তখন লুপ্ত। জবের ঈশ্বর জেনেসিসের ঈশ্বরকে কনস করে, তার হাতে নষ্ট হয় মিকার ঈশ্বর।

বিরতনশীল ঈশ্বরের বিচিত্র জগতি! কালো মেয়ে তবু আর তথ্যের ধূহজাল ভেদ করে বেখানে পৌঁছায় সেখানেও তার প্রবেশ জবাব মেলে না। ঈশ্বরবেষণ অসম্পূর্ণ থাকে। ঈশ্বরকে পাওয়া

বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দি, কাশি, বুক-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্লেষ্মা জমে বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন



পরিবেশক :

জি. বসু এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১



উইল জা, এখন তাঁকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, আর সেই অসামান্যত্ব
দেবত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। বার্গার্ড শ'র মতো
একজন ভাল মানুষকে বিবাহ করে বহু সম্মানের ভরসা হয়ে সে
স্বপ্নে ভিনে কাটায। ইডেন উদ্যানে আদিভ্রমণী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর
সম্পর্কে যতটুকু জান লাভ করেছিলেন তার চেয়ে এক কৌটা বেশী
জান লাভ তার অর্থে ঘটে না।

বার্গার্ড শ' তাঁর বক্তব্য পরিবেশনে কালো মেয়ে নির্বাচন
করেছিলেন, তার কারণ হাটবেল সম্পর্কে তার মন সজাগ—
an unbiased contemplation of the Bible with its
series of gods marking Stages in the development
of the conception of God from the monster
Ragey-man, the everlasting Father to the Prince
of Peace.

তাই কালো মেয়ে এক হাটল বাগদার পর দেখে জটিল ধীর
কীমে নিয়ে চললে এক বিস্ময় পিজ্জার।

দোড়ে বার কালো মেয়ে তাকে সাহায্য করতে, বলে—হ'সিয়র,
কোমার ধাঁধা না ভেঙ্গে যায়।

প্রাচীন ধীর তেমে বলে—ভয় নেই, আমি হলুম পাগড়,
আমার ওপর এই চার্চ গড়া হয়েছে।

উদ্বিগ্ন কালো মেয়ে বলে উঠে—কিন্তু সত্যিই ত' তুমি আর
পাগড় নও, এই গির্জা অতিশয় ভারী, তুমি কি করে বহবে?

তার মনে সর্বদাই ভয়, লোকটি এই গুরুভার ধ্বংস পড়বে।

ধীর যথার ভলীতে হেসে বলে—ভয় নেই, কিছু হবে না, এই
দিগ্ভাটা কাগজের তৈরী।

এই বলে সে বুড়োর তালে তালে চলে যায়, চার্চের সব ঘটাবলি
বেশে ওঠে।

The Adventures of the Black Girl in her
search for God—এ বার্গার্ড শ' দেবত্বের বিভিন্ন ক্রমবিকাশ
দেখিয়েছেন। এই সবেদাই পরিণতি কিন্তু ভুল বা অতিশয়োক্তিতে
পরিণত। বার্গার্ড শ' ঈশ্বরের ব্যক্তিবস্তু স্বপ্ন এবং তিনি এখনো
চরমতর পর্যায় পৌঁছে সর্বাসম্মত হননি। মাথার চুল গণনা করা
বা পাখির মুণ্ডা লক্ষ্য করার মত অবসর তাঁর নেই। আসল কথা,
তিনি এখনও পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেন নি। তিনি
বিবর্তনশীল ঈশ্বর, আয়ত্তা যেমন পদে পদে ভুল করে শিখি, তিনিও
এখনো শিখছেন, কটা সংশোধন করছেন। বার্গার্ড শ'র মতে তাই
ঈশ্বরেরও ভুল হয়। Man and superman সম্পর্কে যখন
টলষ্টয়ের সঙ্গে পত্রবিনিময় হয় তখন টলষ্টর ভাই বার্গার্ড শ'কে
লিখেছিলেন—You seem yourself to recognise a God
who has definite aims comprehensible to you—
শ'র চটুলতার বিরুদ্ধ হয়ে তিনি সেদিন অপ্রসন্ন হয়েছিলেন।
কিন্তু বার্গার্ড শ' চটুল নন, এক তাঁর ঈশ্বরও টলষ্টরের বিশ্বাস মার্কিক
বস্তু নন। Methuselah প্রকাশিত হওয়ার পর বার্গার্ড শ'কে
প্রশ্ন করা হয়—do you believe there must be some-
body behind something? তার জবাবে সেদিন তিনি
বলেছিলেন—No. I believe there is something behind

the somebody. All bodies are product of the
Life force.

তাই বার্গার্ড শ' নির্দেশ দিয়েছেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে
ঈশ্বর কোথায়? ঈশ্বর কে? উঠে দাঁড়িয়ে বলবে—আমিই—ঈশ্বর।
এই সেই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এখনও ক্রমবিকাশের
থমে।

কালো মেয়ে আইবিশ ভ্রমলোককে প্রশ্ন করে—তাহলে কুহি
ঈশ্বর অল্পসম্মানে আসেনি?

আইবিশ ভ্রমলোক—সম্মান চূড়োর বাক্য, ঈশ্বরের যদি প্রয়োজন
থাকে তিনি আয়ত্তা সম্মান করে মিল। আমার নিজের ধান্দা
তিনি তা মন বা হতে চান। এখনো তাঁকে ঠিকমত গড়া হয়নি,
তিনি অসম্পূর্ণ। আমাদের অসামান্যত্ব কোনো বস্তু তাঁর দিকে চলেছে
আর আমাদের অস্বাভাবিকতা কোনো পদার্থ তাঁর অভিমুখী হয়ে
আছে। এ কথা সুনিশ্চিত। আর একথাও সত্য যে, তাঁর অভিমুখী
হতে গিয়ে অনেক ভুল জাতি বহু। আমাদের স্যামন্ত একটা পথ
খুঁজে বার করা উচিত। কারণ অনেক লোক নিজেকেই উদ্বিগ্ন
আর কোনো কিছুই কখনো ভাবেই না।

এই কথা বলে নিজের হাতে নিদ্রাবন ত্যাগ করে তিনি খনন
কর্মে ব্যস্ত হলেন।

বার্গার্ড শ'র সেক্রেটারি জীমতী ব্রাঞ্চি পাচ বলেছেন, ডিসেম্বর
মাসে (১৯৩২) এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর, ভাষণ সাফল্য লাভ
করল, বড়দিনের উপহার হিসাবে প্রাপ্ত হল। ডিসেম্বর মাসের
মধ্যেই পাচ বার মুদ্রিত হল। জন ফারলে অঙ্কিত স্মরণ কার্ড
খোদাই বইটির সৌষ্ঠববৃদ্ধি করেছিল। এই সময় জটিল ক্যাথলিক
বার্গার্ড শ'কে বললেন—এই গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করুন। বার্গার্ড শ'
বললেন—১০০,০০০ কপি ইতিমধ্যেই বিক্রী হয়েছে, পাঠিত হয়েছে,
সুতরাং যদি কোনো জটী হয়ে থাকে তা হয়েছে। তিনি বললেন,
দেবত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা অনেক উঁচু পদার বিধা।
তিনি সেই নিরামিষবিবোধী দেবতাকে বিশ্বাস করেন না—যিনি
সমগ্র মানবজাতিকে প্রাবল্য ধ্বংস করে পোড়া মাসের গন্ধে তৃপ্ত
হয়েছিলেন।

বাইবেলে আছে—And Noah builded an altar
unto the Lord; and took of every clean beast,
and of every clean fowl, and offered burnt
offerings on the altar. And the Lord smelled a
sweet savour.

বার্গার্ড শ' বিশ্বাস করেননি যে নোয়ার তগবানের কোনো
অস্তিত্ব ছিল, বা থাকতে পারে।

বার্গার্ড শ' ক্যাথলিকের অভিযোগের উত্তরে লিখলেন—You
think you believe that God did not know what he
was about when he made me and inspired me to
write the Black Girl, for what happened was that
when my wife was ill in Africa God came to me
and said—“There are women plaguing me night
and day with their prayers for you. What are

you good for any how?' So I said I could write a bit but was good for nothing else. God said then 'take your pen and write what I shall put on your silly head'—and that was how it happened.

বার্ণার্ড শ'র ইষর বুটামের ইষর নয়, মানবিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে পড়া মানবিক স্রবতা। বা আনন্দ তাই ইষর, ইষর আনন্দের প্রতীক, আনন্দের প্রতীক।

চৌত্রিশ

বার্ণার্ড শ'র নতুন নাটক Too True To Be Good দেখা চলেছিল 'ম্যালভার্ন কলেজ'সহ অঙ্কবোধে। এই ম্যালভার্ন নাট্য উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা বাহিরাই বেশাবলি থিয়েটারের তার ব্যারী জ্যাকসন। দক্ষিণ প্রতিষ্ঠা করলে তার তত্ত্ব প্রতিমা চাই, তার ব্যারী জ্যাকসনও তাই তেবেছিলেন বার্নার্ড শ'র নাটককে কেন্দ্র করে ম্যালভার্ন উৎসব জমিয়ে ফুলবেন। এর আগে তিনি Back to Methuselah রচনা করে বার্নার্ড শ'র প্রীতি অর্জন করেছিলেন, তাই বার্নার্ড শ' সানকে সচরোগিতা করতে রাজী হলেন। তাঁর মনে চলেছিল, বাংলা সঙ্গীত ও ছবি যনকে যেমন নাড়া দিত হট উৎসবে সেট পুরাসন লক্ষ্য ফিরে পাবেন, পেশাদারী রচয়কের লাভকতির হিসাব নিকাশ সে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়।

ম্যালভার্ন উৎসবের উদ্দেশ্য নতুন কিছু করার। তাঁরা প্রতি বছর বার্নার্ড শ'র একটি করে নতুন নাটক অভিনয় করবেন। পূর্ববর্তী কৃতি বছর এমনই চলে, এই তাঁদের আশা ছিল। তখন বার্নার্ড শ'র বয়স ত্রিযাত্র। বার্নার্ড শ'র প্রতিভার প্রতি এ এক বিচিত্র প্রেক্ষিত, বৃদ্ধা বয়সের প্রতি প্রভা। বার্নার্ড শ' এদের লক্ষ্য প্রথম নাটক রচনা করেন Apple cart তার কথা আগে বলা হয়েছে।

নতুন নাটক Too True To Be Good নাটকে বার্নার্ড শ' দেখাত চলেছেন অতিমানব যে কোনও অবস্থার মধ্যে পড়লেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। টি. ই. লরেন্সের মতো যে নিয়ন্ত্রণ পড়ে প্রতিষ্ঠিত থেকেও তার ওপরওলাদের চালিত করবে। এই ভারী মানুষ বার্নার্ড শ' উত্প্রসঙ্গিক, খনিপ্রসঙ্গিক, রেলকর্মী ও কেরাণীদের মধ্যে দেখেছেন। তারা সেই নিয়ন্ত্রণ অবস্থা থেকে শক্তি ও প্রেরণা দিয়েছে।

আগস্টাস জন অঙ্কিত বার্নার্ড শ'র ছবির মাধ্যমে টি. ই. লরেন্স ও জর্জ বার্নার্ড শ'র মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সে সময় আগস্টাস জন ও এই বিখ্যাত মানুষের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। লরেন্সেরই শান্তখানি ছবি আগস্টাস জন একেছিলেন, আর বার্নার্ড শ'র তিনখানি। তাঁর মধ্যে একটি ইংলণ্ডের হাটী কিনেছিলেন, তার সিডনী ককার একটি নিয়েছিলেন কেমব্রিজের কিংসউলিফিয়া মুক্তিযায়ের জন্য আর একটি গ্রায়টের শাসভবনে ছিল। যেদিন এডেলকা-টেরাসের বাসায় এই ছবিটি নিতে এসেছিলেন প্রার সিডনী (২৫শ মার্চ, ১৯২২) তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন টি. ই. লরেন্স। বার্নার্ড শ'র প্রতি তাঁর প্রভা ছিল, কিন্তু দু'র থেকেই বড়মানুষ দেখা ভালো, লরেন্স এই নীতির সমর্থক ছিলেন। তাই প্রথমে যেতে চান নি। আশা করেছিলেন শ' হয়ত বাড়ি থাকবেন না, কিন্তু দেখানো পৌঁছে দেখা গেল শ' বেরোবার উদ্দেশ্য করছেন।

প্রথম দর্পনেই প্রেরণা—'friends from the first বলেছেন প্রার সিডনী। এই সিডনির পর সেপ্টেম্বর মাসে 'Seven Pillars of wisdom' নামক লরেন্সের বিখ্যাত গ্রন্থ এসে হাজির। পাণ্ডুলিপিটি বার্নার্ড শ'কে পড়তে তত্ত্ববোধ করতেন লরেন্স। আরবে ১৯১৪-র মধ্যে লরেন্সের বিচিত্র জমিতা এই গ্রন্থের উপজীব। ৩০০,০০০ পদবিশিষ্ট এই বিরাট পাণ্ডুলিপি পড়া কঠিন। মল সপ্তাহে মতো একটি শাইনও পড়েছিল শ' কিন্তু লরেন্সের আগ্রহাঙ্গিম্যে শেষ পর্যন্ত সবটুকু পড়ে ফেলে বড়দিনের সময় লিখাসন—a great book। বার্নার্ড শ' অনেক পরিতর্কন করেছেন, নিজ একে দেখ দিয়েছেন, লরেন্স বলেছেন—Left no paragraph without improvement—লরেন্স শ' লরেন্সের এই প্রত্যয় অনেক দূলাবান হওয়া ও উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমে বুঝে সাচারা কারভেন, তাই উত্তরে মধ্যে বয়সের পর্যন্ত থাকলেও একটি মদ্রব অঙ্কবোধের পট্ট হয়েছিল। গ্রায়ট থেকে লরেন্সের টিকনার নিয়মিত চিঠিপত্র আসত।

Too True To be good নাটকে অনেকগুলি কার্যকরী পরিতর্কনের উপদেশ দেন লরেন্স, বার্নার্ড শ' তাঁক প্রতিটি তত্ত্ব পড়ে শুনিয়েছিলেন। প্রাইভেট নিক চরিত্রটি লরেন্সের ব্যক্তিমানসের রূপায়ণ। লরেন্স এই নাটক শোনার চাইতে অভিনয় দেখে আরো সম্মত হয়েছিলেন।

কার্ণেল লরেন্স বখন টি. ই. শ' হয়েছিলেন তখন আনন্দ হয়ে করেছিলেন যে, তিনি বার্নার্ড শ'র ভাড়াই। তবেই ফলপর্কে শ'-দম্পতির তত্ত্ববোধ ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছিল, সাফল্য শ' এবং লরেন্সের বন্ধু ঐতিহাসিক, লরেন্স তাঁকে বেসর টিপিগ্র লিখেছিলেন তা বৃটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে।

লরেন্স করাটা থেকে ফেরার পর বার্নার্ড শ' ও সার্কেট একটি মোটর-সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন পরিচয় কজাত থেকে। সেই মোটর-সাইকেলটি লরেন্সের মৃত্যুর কারণ হয়, তার ছ' বছর পরে। আকস্মিক দুর্ঘটনার টি. ই. লরেন্সের মৃত্যু শ'-দম্পতির কাছে পুত্রশোকের মর্মান্তিক জালা বহন করে এনেছে।

[ক্রমশঃ]

স্ট্রীরোগ, ধবল ও বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের ব্যবহার রোগ ও স্ট্রীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ চার্লসের রাশনাল কিওর সেণ্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১১

সন্ধ্যা ৬টা—৮টা। ফোন নং ৪৬-১৩৫৮



ক্রিয়োতিষ্ময় ঘোষ (ডাক্তর)

ক্যাম্বোজা দ্বীপের একটি ভেতলা বাড়ীর একতলা ফ্ল্যাট।
সামনে বড় একটি সাজানো বাগান। একটি গোলাকার
লাল ফুলকির রাস্তা। সেটাই হইতে গাড়ীবাগান পর্বত বিস্তৃত। এই
বৃক্ষের দ্বায়ে নানা প্রকার ফুলের গাছ, ফুলের করিয়া সাজানো।
ফুলের বাহিরে একটিকে একটি টেনিস লন, অপরদিকে ছোট একটি
বাগানের ওপারে পাঁচিল বেধিয়া চাকর বাকরদের থাকিবার জন্য একটি
একতলা ঘাটাকের মত বাড়ি। পাঁচিলের গায়ে পর পর তিনটি
দরজা। তিনতলার তিন ফ্ল্যাটের অধিবাসীদের এক একখানি
গাড়ী এখানে থাকে।

একতলা ফ্ল্যাটের অধিবাসী মাত্র তিন জন। বৃদ্ধ মিঃ চ্যাটার্জি
হাতে অর্ধপত্ৰ। ধীরে ধীরে এবার ওখব করেন। সিঁড়ি ভাঙিতে
পারেন না। বাড়ীর বাহিরেও ইটেরা বেড়াইতে পারেন না। হায়ে
হায়ে গাড়ীতে চড়িয়া পড়ের মাঠে গিয়া একটু আধটু পাখচাষি করেন।
এ বাড়ীতে আর আছেন মিঃ চ্যাটার্জির কন্যা নন্দিতা আর তাহারই
একটি পিতৃ পুত্র বীতের, ডাক নাম খোকা। বসন্ত মাত্র দুই বৎসর।
খোকায় জন্ম আয়া আছে। সর্বদাই দেখা যায়, খোকাকে
প্যান্থারকুলেটেই পোয়াইয়া বা বসাইয়া আয়া তাহার সহিত বেড়াইতেছে
বা খেলিতেছে, কখনও বারান্দায়, কখনও লনে, আবার কখনও লাল
ফুলকির রাস্তায়। একটি বয় আছে, ঝাড়-পৌছ করে, বাজার করে,
কাঁই কুমার খাটে আর দুমায়। একটি পাচক বা বাবুচি আছে,
দান্না-বায়া করে, আবার বয়ের অসুস্থতায় এটা-ওটা করে। ডাইভার
গাড়ী চালায়, গাড়ীর বন্ধ করে, আবার দরকার হইলে ডাকঘরে যায়,
ব্যাংক যায়, হার্বোর্টে যায়। এমন করিয়া বীর মন্থরগতিতে চলে এই
শান্ত ছোট পরিবারটির দিনগুলি।

একদিন বিকালে ডাইনিং রুমে টেবিলের উপর তিন জনের
জন্ম চায়ের সরঞ্জাম সাজান হইয়াছে। চার-পাঁচটি পাত্রে নানা প্রকার
খাবার টেবিলের মাঝখান বরাবর রাখা হইয়াছে। স্ট্রেট, চায়ের
কাপ, প্রভৃতি সবই নন্দিতা নিজে সাজাইয়া রাখিয়াছে। খোকা
আবার সহিত লনে বেড়াইতেছে। নন্দিতা এক একবার বারান্দায়
আসিয়া সেটের দিকে চাহিয়া আবার নিজের কাজে মন দিতেছে। মুখে
হেঁ একটু উচ্ছ্বাস ছায়া। "তবে মনে হয় বেন তেমন বেশ কিছু নয়।
একটু পকেট সেক্টর বাহিরে যেটাদের দূর্বল শব্দ শোনা গেল।
নন্দিতা কবের দিকে চাহিতেই সে ভাড়াভাড়ি গিয়া সেটের দরজা খুলিয়া
নিজ। একখানি বৃদ্ধর হিলম্যান গাড়ী ধীরে ধীরে আসিয়া দরজার

সামনে দাঁড়াইল। গাড়ীর মন্থর-গ্রেটের পাশেই আর একখানি গ্রেট।
তাঁহাতে ইংরাজিতে লেখা জি. বি। গাড়ী বিনি চালাইতেছিলেন,
তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া বারান্দায় উঠিলেন
এবং নন্দিতাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, এই যে, সব ধর ভাল
তো ? আমার চিঠি পেরেছিলেন ? কালই কলকাতায় পৌঁছেছি।
এসেই আপনাকে ফোন করেছি।

নন্দিতা বলিল, আশ্রন, একবারে চায়ের টেবিলেই বস। বাক।
বাঁবা বাঁব বাঁব গুঠা বসা করতে পারেন না। ওঁকে কোনমতে
চায়ের টেবিলে এনে বসিয়েছি। আচ্ছা মিঃ গাজুলি, আপনার বন্ধুর
ধবর কি ? তিনি এসেন না ?

মিঃ চ্যাটার্জি টেবিলের পাশেই বসিয়াছিলেন। বলিলেন, এই
যে অনিল, এস। ধবর সব ভাল ?

নন্দিতা ও অনিল চোরায়ে বসিল, প্রায় মুখোমুখী। নন্দিতার
বাঁদিকে তাহার বাবা।

অনিল বলিল, হ্যাঁ, ধবর সব ভালই। মোহিতকেও বসেছিলাম,
চল দিন কতকের জন্ম কলকাতায় বেড়িয়ে আসি। কিন্তু তার ওই এক
কথা, পরীক্ষাগুলো শেষ না করে আমি যাব না। ওর বৃষ্টি আর একটা
পরীক্ষা বাকী আছে, সেটা শেষ করতে প্রায় এক বছর লাগবে।

মিঃ চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কত লু ? কটা
পরীক্ষা আর বাকী ?

অনিল একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, আমার আরো তিনটে
বাকি। মানে প্রিলিমিনারিটা পাশ করবার পর আর পরীক্ষা দেওয়া
হয়নি। অন্যথের জন্ম একটা পরীক্ষা দিতে পারলুম না। আর
একটা পরীক্ষার সময় দেখি, পড়াশুনা যা হয়েছিল, তাতে পরীক্ষা না
দেওয়াই ভাল। এবারও দিতে পারলুম না, দেশের জন্ম বড়ই মল
কেমন করতে লাগলো।

নন্দিতা বলিল, আপনি এর মধ্যে দু'বার এসে গেছেন। অন্য
তিনি একবারও এসেন না ! আপনি বললেন, উনিও লিখেছেন,
সামনের পরীক্ষার এখনও এক বৎসরের বেশি দেরি আছে। এবার
একবার কেন এসেন না, তাই ভাবছি। এখন বাতারাভের সময়
কত করে গেছে।

নন্দিতা একটু বেন গাড়ী হইয়া গেল। অনিল বলিল, আপনি
খুব তাবলেন। আমিও যে না ভাবছি, তা নয়।

নন্দিতা এক একবার তাড়াতাড়ি গ্রেট, কেরের গ্রেট, সলসল

স্টেট অফিসের সামনে আনিয়া ঘরিতে লাগিল। অনিল কিছু কিছু ফুলিয়া লইয়া খ্যাঙ্কস্ বসিয়া তাহার সম্বাহার করিতে লাগিল।

চা-পার্শ্ব শেষ হইলে মিঃ চ্যাটার্জি বরের কাঁধে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বারান্দার গিয়া একখানি ইলিচেয়ারে বসিলেন। বর একটি বাগ্ চুকট ধরাইয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিল।

অনিল ও নন্দিতা ডাইনিং হল হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। নন্দিতা অনিলের পাড়ীর দিকে এমন ভাবে তাকাইল, যেন অনিল এখন পাড়ীতে গিয়া উঠিবে। কিন্তু অনিল সেদিকে না চাহিয়া নন্দিতাকে বলিল, চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি। এবার এই পাড়ীখানা কিনেছি—ঠিক আসবার আগে।

থাক, মিঃ গান্ধী!

কেন? আমরা কি আগে কখনো পাড়ী করে বেড়াতে বাইনি?

নন্দিতা একটু কুণ্ঠিত হইয়াই বলিল, মিঃ গান্ধী, এখন ওসব কথা তোলা কি বিসঙ্গল নয়?

অনিল বলিল, আপনায় মনটা আজ ভাল নেই, মনে হচ্ছে। আজ্ঞা, আজ আসি তাহলে?

নন্দিতা একটু যেন ব্যগ্রতার সঙ্গেই বলিল, আজ্ঞা, সত্যি বলুন তো, উনি বেশ ভাল আছেন?

হ্যাঁ, বেশ ভালই আছেন।

মনে কোন অশান্তি নেই? আপনায় কাছে উনি সব কথাই

বলেন নিশ্চয়? উনি রাগা-চাকার লোক নন। বিশেষে আপনাকে পেয়ে উনি কত খুশি হয়েছেন, কত নিশ্চিত হয়েছেন, একই বার বার আমাকে লিখেছেন।

অনিল বলিল, বিশেষে কিছু বন্ধুর কাছ করবে, এটা স্বাভাবিক। আমি এমন আর বেশি কি করেছি। তবে—

তবে কি?

না, এমন কিছু নয়।

কি যেন বলতে গিয়ে বলছেন না। বলুন না!

আজ্ঞা, আজ আমি আসি। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খাবার কথা আছে।

ডিনারের এখন অনেক দেরি।

এমন আর বেশি দেরি কি? আজ্ঞা, আমি কাল আবার আসব।

নিশ্চয়ই আসবেন?

নিশ্চয়ই আসবো।

হ্যাঁ, যে কদিন কলকাতায় আছেন, একবার করে এখানে আসবেন। বুঝলেন? আমার বড় ইচ্ছে করে, ওখানকার সবায় সব কথা শুনে। কাল আসছেন তাহলে?

হ্যাঁ, আসব। তবে চাইরের পরে। আমার এক বন্ধু কাল চাইরে নিমন্ত্রণ করেছে। আজ্ঞা, আসি।

অনিল পাড়ীতে উঠিয়া ধীরে ধীরে সেটের বাহির হইয়া গেল।

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতিষার্থবিদ, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (গভন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিম্নে ভারত বলিত ও পণ্ডিত সত্য নন্দাপতি এবং কাশীর বারানসী পণ্ডিত মহানন্দের দ্বারা সত্যাপতি। ইনি দৈবশক্তির মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও রূপালের রেখা, কোষ্ঠি বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও শুভ এইগুলির প্রতিকারকল্পে শাস্তি-স্তোত্রাদি, তান্ত্রিক জাদুবিদ্যা ও প্রত্যেক কলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ভাবের কবিতার পরিত্যক্ত কষ্টের হোমাদির নিরাক্ষর অলৌকিক কলতানন্দ। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংল্যান্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের নবীকৃত্য তাহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ দিরাগুলো পাইয়েন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে বাহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিঙ্গ, হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মানসীরা যতমাতা মহারাজী জিপুরা টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মানসীরা জার মধ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সত্যোবর মানসীরা মহারাজা বাহাদুর জার মধ্যনাথ রায় তৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মানসীরা বি. কে. রায়, বকীর গণ্ডমেটের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীওসরগেব রাজকত, কেউনবড় হাইকোর্টের মানসীরা জম রাজসাহেব মিঃ এস. এ. হাস, আসামের মানসীরা রাজাপাল জার ফজল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে. ফেলগ।

প্রত্যেক কলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তত্ত্বোক্ত অভ্যাসকর্তব্য কবচ

কবচ কবচ—বারেনে অমরাসে প্রভৃৎ ধনদাত, মানসিক শান্তি, প্রীতি ও মান বৃদ্ধি হয় (ভক্তোক্ত)। সাধারণ—১৮/০, পশ্চিমালী মুখ—২০৮/০, মহাপশ্চিমালী ও সমর কলপ্রদক—১২০৮/০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও সম্বরী কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক পুত্রী ও যাকদারীরা অস্ত্র ধারণ কর্তব্য)। সমরজাতী কবচ—বরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীকার দ্বন্দ্ব ২৮/০, বৃহৎ—৩৮৮/০। মোহিনী (বন্দীকরণ) কবচ—বারেনে অভিজিহিত দ্বী ও পুণ্ড্র বন্দীকৃত এবং চিরপুণ্ড্র মিঃ হয় ১১৮/০, বৃহৎ—৩৮৮/০, মহাপশ্চিমালী ৩৮৮/০। বরণজাতী কবচ—বারেনে অভিজিহিত করোয়তি, উপরিঃ দানবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার হানকার জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ২৮/০, বৃহৎ পশ্চিমালী—৩৮৮/০, মহাপশ্চিমালী—১৮৮/০। (আবাসনে এই কবচ ধারণে ভাবগাল সম্বরী জরী হইয়াছেন)।

(সাপ্তাহিক ১০-৭) অল. ইন্ডিয়া এন্টোলজিক্যাল এন্ড এন্টোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (খ), কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (এবেশ পথ ডারেনলেসী স্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। কোব ২৫—৫০৫৫।

সমর—কোবান স্টা হইতে পটা। হাফ জলিস ১০৫, রে স্ট্রীট, "সমর নিবাস", কলিকাতা—৫, কোব ৫৫—৩৬৫৫। সমর প্রোভে ১টা হইতে ১১টা।

বাক্সে ডিনারের পর খোকার ঘরে গিয়া নন্দিতা খোকার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বেন সন্দের একটি ফুল। কি চমৎকার ছই বোঝান চোখ ছুটি, বেন পদ্মের পাণড়ি। খোকার দিকে একটু চাহিলেই নন্দিতার সব উদ্বেগ, সব ভাবনা বেন কোথায় চলিয়া যায়। কিন্তু আজ বেন কিছুতেই তার মন শান্ত হইতেছে না। একখানি কই হাতে করিয়া তার পড়ার টেবিলে গিয়া টেবিল-ল্যাম্পের পাশে বই রাখিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মন দিতে পারিল না।

উঠিয়া গিয়া ভ্রমার হইতে কতকগুলি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। পত্রগুলি পড়িয়া তাতার মুখে-চোখে বেন একটু খুশির আভাস ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিল, এর মানে কি? কেন সে একবার আসে না? পত্র অবশ্য লিখিয়াছেন, 'পরীক্ষা ক'টা শেষ করেই বাড়ী যাব। তুমি একটু ধৈর্য ধরে থাক। আমি পড়াশুনার জন্য ভীষণ পরিশ্রম করছি', ইত্যাদি। চিঠিগুলিতে সবই আছে, অচ্যুত কেমন বেন একটু, কি বলিব, উদাসীনতা? আ, অচ্যুত কিছু? কিংবা নন্দিতার নিজেরই মনের ভুল? মোহিত যে পড়াশুনা লইয়াই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে, তাহা নন্দিতার অজানা মাই। পর পর পরীক্ষাগুলি যেমনভাবে পাশ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রমাণ। তবু কেন উদ্বেগ আসে মনে?

নন্দিতা আসলে নিবাইয়া একখানি মোড়া লইয়া জানালার পাশে গিয়া বসিল। বাহিরে শান্ত প্রকৃতি। আকাশে তারার বিন্দু ছড়ান। এক পাশে আত্মখানি টাই নীচের হাসিতেছে। গাছের পাতার মধ্যে কোন কোন স্থানে পাখীর ডানা বাগটার শব্দ শোনা যাইতেছে। বোধ হয় গোট বন্ধ করার শব্দ একটু কানে গেল। চাকরদের ব্যারাক ছই একবার মোটা গলার কথা শোনা গেল। সন্দের মধ্যে ডালিয়া প্রকৃতি ফুলগুলির মুখ বেন আবছা জ্যোৎস্নায় একটু ভিজিয়া উঠিল।

নন্দিতার মন একটু শিহন কিরিয়া চাহিয়া দেখিল। কলেজে পড়ার সময় মিঃ চ্যাটার্জির বন্ধু পুত্র অনিলের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। তার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার সান্নিধ্য, তাহার বন্ধু নন্দিতা চব্বি আগ্রহে উপভোগ করিয়াছে। তাহার ফুটনোমুখ বোহনের বিমুগ্ধ চতনার সম্মুখে অনিল তাহার কাছে অনিন্দ্যনীর মাধুরী লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাদের মিলন প্রায় অবস্তাবী বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিঃ চ্যাটার্জি বাকিয়া বসিলেন। একটি দূতসম্পর্কার আত্মীয়ের নিকট মোহিতের সংবাদ পাইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনিলেন। মোহিতের সহিত নন্দিতার পরিচয় হইল। মোহিত অনিলেরও পরিচিত। উইজনের বুলে তিনজন হইল। তাহারা প্রায়শই একসঙ্গেই বেড়াইত, পিকনিকে বাইত। এমন কি একদিন একসঙ্গেই সিনেমাও দেখিয়া আসিল। মোহিতের সঙ্গে পরিচয়ের পর হইতেই নন্দিতার মনে ঝড় উঠিল। ছই জনের প্রকৃতি ভিন্ন, কিন্তু দুই জনই তাহার কাছে বেশ ভাল। মিঃ চ্যাটার্জি বেন ইচ্ছা করিয়াই নন্দিতাকে ছইজনের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করত। মনের ইচ্ছা, নন্দিতা নিজেই তাহার প্রেরণ পথ চিমিয়া লইতে পারিবে।

ইহাদের মধ্যে পার্থক্য নন্দিতার চোখে এবং মনে রেখাপাত করিত। অনিল লঘুচিত্ত, মোহিত অপেক্ষাকৃত গভীর। অনিল

উৎসাহ, মোহিত বীর। অনিল অধ্যয়নবিমুগ্ধ, মোহিত পুস্তকের কীট। এই সকল বাহিরের পার্থক্যবাহ মনের দিক হইতে নন্দিতা ইহাদের মধ্যে কোন বিভেদ বোধিতে পারে না। বিশেষতঃ তাহদের সহিত ব্যবহারে উভয়েই সমান সম্মত, সমান আন্তরিকতাপূর্ণ, সমান আগ্রহশীল।

নন্দিতার মনে মনে ভয় হইল, যদি তাহার বাবা তাহার মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সে কি বলিবে? অনিলকেই গ্রহণ করিবার পক্ষে মত দিবে, না মোহিতকে? বহু দিন ধরিয়া চলিয়াছিল এই মানসিক দ্বন্দ্ব। তবে শেষ নির্বাচনের সময় নিশ্চিষ্ট ছিল না বলিয়া নন্দিতা জোর করিয়া একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার চেষ্টা করে নাই। মাঝে মাঝে মনে দ্বন্দ্ব উঠিয়াছে, আবার তাহা স্বাভাবিক মৈনামিন কর্মপ্রবাহে সমতা লাভ করিয়াছে। এমন কিরিয়াই তাহার দিনগুলি কাটিতেছিল।

নন্দিতার মনে পড়িল, একদিন সকালে পিওর একখানি এনভেলপের চিঠি গিয়া গেল। নন্দিতা উন্মীয়া পাণ্টাইয়া দেখিয়াও লেখক কে, তাহা অনুমান করিতে পারিল না। চিঠি মিঃ চ্যাটার্জির নামে। নন্দিতা চিঠিখানি তাহার পিতার হাতে দিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। চিঠিখানি খুলিয়া পড়িয়াই মিঃ চ্যাটার্জি একেবারে নির্বাক হইয়া গেলেন। নন্দিতা লক্ষ্য করিল, তাহার বাবার মনে বেন আকস্মিক আঘাত লাগিয়াছে। সে কোন কথাই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল না। মিঃ চ্যাটার্জি সমস্ত দিন কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া মিঃ চ্যাটার্জি বয়স্ক ইশারায় ঘর হইতে চলিয়া বাইতে বসিলেন। পরে নন্দিতাকে পাশের চেয়ারে বসাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, অনিলের সঙ্গে বেশ বনিষ্ট ব্যবহার করো না।

কেন বাবা?

সে কথা থাক। আমি ওকে এ-বাড়ীতে আর আসতেই বাধণ করে দিতাম, কিন্তু ডেব দেখলাম, সেটা হয়তো অন্যায় হবে না। মাঝে মাঝে আসে আশ্রয়, কিন্তু ক্রমে ওর সম্পর্ক ভাগ্য করত হবে। অনিল সবকিছু এরূপ আশঙ্কা না করিলেও নন্দিতা গৃহেই একটু আভাস পাইয়া ছিল, যে অনিল সম্পর্কে তাহার পিতার মনোভাব ভাল নয়। আজ হইতে তাহার মনে আর দ্বিধা রহিল না। কিন্তু এত দিনের এত বনিষ্ট পরিচয় কেমন করিয়া সে তুলিয়া বাইবে, তাহাও ভাবিয়া পাইতেছিল না।

বাহা হউক, মূল সমস্যা অর্থাৎ তাহার বিবাহের সমস্তার সমাধান হইয়া গেল। পিতা আর নন্দিতার মত চাহিলেন না। কয়েক দিন পরেই কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া মোহিতের পিতার সহিত সাক্ষাৎর ব্যবস্থা করিলেন। তিনি অতি জানকের সতিভাই এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তাতো কিছুদিন পরে স্বাধীনি বিবাহ হইয়া গেল। নিকট বন্ধু হিসাবে অনিল অতি তৎপরতার সঙ্গেই বিবাহের সকল প্রকার আয়োজন ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগদান করিল। বিবাহের সময়ে নিজের মনের কোণে কোন দ্বন্দ্ব আভাস নন্দিতা খুলিয়া পাইল না। মোহিতকে সে সন্তোষকরই গ্রহণ করিল।

নন্দিতা জানালার বাইরে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। মনে হইল চাঁদটি যেন একটু সরিয়া গিয়াছে। পাছের যে ডালটির মাথার কাছে ছিল, সেখানে নাই। রাত্তা মিয়া হস করিয়া একখানি মোটর গাড়ী চলিয়া গেল। চাকরদের ব্যাংক প্রায় নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে। নন্দিতার স্মৃতির স্মৃতিস্রোত বহিয়া চলিয়াছেন। থোকা নীরবে ঘুমাইতেছে। জানালা দিয়া একটু চাঁদের আলো তাহার ছোট বিছানার উপর পড়িয়াছে, একটু পরেই বোধ হয় উহার মুখের উপর আসিয়া পড়িবে।

মোহিতের বিলাত বাতরা স্থির হইল। নন্দিতা যুগপৎ অনিশ্চিত ও বিম্ব হইল। একদিন মোহিত নন্দিতার চোখের কোণে জমা অক্ষয়িলু হুছাইয়া তাহার অনাগত সন্তানের কল্যাণ কামনা করিয়া ইলোঙে বাত্ম করিল। অনিল ষ্টেশন পর্যন্ত গিয়া তাহাকে শী-অব করিল। নন্দিতাকে সাধনা দিল।

মোহিত চলিয়া বাইবার পর অনিল প্রায়শই বার নন্দিতার কাছে। গল্প করে। পূর্বের মত তাহাকে লইয়া গাড়ীতে বেড়াইতে বাইবার বা সিমোয়ায় বাইবার প্রস্তাব করে। নন্দিতা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মিঃ চ্যাটার্জিও অনিলের প্রতি একটু ঔন্যাসীক্তের সঙ্গেই কথাবার্তা বলেন। কিছুদিন পরে অনিল আসিয়া নন্দিতাকে বলে, সে-ও বিলাত বাইতেছে, কি যেন কি একটা পড়িবার জন্ম। তাহার শিতার অগাধ ঢাকা। তাহার বিলাত বাইতে বাধা কি? যাত্রার প্রাক্কালে নন্দিতা বলিল, লগুনই তো থাকবেন। আপনার বন্ধুর একটু খোজ-খবর নেবেন। ঠিক স্বভাব জামেন, বই নিয়ে অভ্যাস হয়ে থাকেন। শরীরের দিকে পর্যন্ত একটু নজর নেই।

অনিল বলিল, নিশ্চয়ই। আপনি একটুও ভাববেন না।

দুই বছর দেশ ছাড়িয়া চকিয়া গেল। নন্দিতা একা পড়িল। কয়েক মাস পরে থোকা আসিয়া তাহার একাকী বৃচাইলোও, তাহার মন সম্পূর্ণ ভরিল কই? এই কয় বৎসরে মোহিতের মনের কি কিছু পরিবর্তন হইল না কি? মাছবের মন! কিন্তু মোহিত—মোহিত তেমন ছেলে নয়। নন্দিতা আর ভাবিতে পারে না।

ঘুম যেন তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। থোকা একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিতেই তাহার কাছে গিয়া বিছানা বদলাইয়া, ইজের বদলাইয়া, তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া নন্দিতা শুইয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে তাহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিল।

পরদিন অনিষ্ট খবাসময়ে নন্দিতাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী দাখিয়া ব্যাংকার উঠিতেই নন্দিতার সঙ্গে দেখা। নন্দিতা বলিল, চলুন ওইখানে গিয়ে একটু বস। থাক। নন্দিতার মুখখানি উল্লসে ও আলস্যের ক্যাশে হইয়া গিয়াছে। লনের মধ্যে দুইখানি বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া কয়েক মিনিট তাহার হইকনেই চুপ করিয়া বসিল। তারপর

অনিল বলিল, আমাকে বাধ্য হয়েই একটা অভ্যস্ত অপ্রীতিকর কথা উত্থাপন করতে হচ্ছে।

নন্দিতা একটু কঠিন সুরেই বলিল, যা বলবেন, সংক্ষেপে এবং সোজা কথা বলুন। আমি বেশিক্ষণ এখানে বসতে পারবো না। খোকার শরীরটা তেমন ভাল নেই। শীগগিরই আমাকে যেতে হবে তার কাছে।

অনিল একটু ঢোক গিলিয়া বলিল, ঠ্যা, তাই বলছি। মানে, মোহিত ওখানেই একটা মেয়েকে ভালবেসেছে। তার সঙ্গেই বিয়ে প্রায় ঠিক। কিন্তু শুধু আপনার জন্যই ইতস্তত করছে। আপনি তাকে ছেড়ে দিলেই সে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

নন্দিতা ক্রুদ্ধ আবেগে বলিয়া উঠিল, আমি তাঁকে ছেড়ে দেব? ছেড়ে দিলেই তিনি—উঃ।

অনিল বলিল, আপনার বাবা প্রথম থেকেই ভুল করেছেন। মোহিতকে আমাদের দুজনের মধ্যে টেনে না আনবেন আর কোন অশান্তি হত না।

নন্দিতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে। ওকে আপনি ছেড়ে দিন। আমরা আবার আগের মতই—

ধামুন। আমাকে এখনি উঠতে হবে।

আচ্ছা, এক কাজ করুন। আপনি নিজেই গিয়ে সব ব্যাপারটা দেখে আসুন। তাহলে আমাকে আর কোষ দিতে পারবেন না।

নন্দিতা বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি। আপনি আজ আসুন।

এই কথা বলিয়াই নন্দিতা উঠিয়া গেল। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অনিলও উঠিয়া গেল।

কয়েক দিন পরে অনিল আবার নন্দিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিল, আমি পরন্তু কিয়ছি। প্যালেস বুক করেছি।

নন্দিতা বলিল, ও!

অনিল বলিল, আমি আমাদের দুজনের ভালের জন্যই এসব

কো. এল. সিংহ এণ্ড সন্স

১৬৭ বি. বঙ্গবাজার ট্রাট কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪-৫০০২

কথা আপনাকে বলেছি। আপনি একটু মন স্থির করতে পারলে মোহিতের সমস্তাও মিটে যায়, আমাদের সমস্তাও মিটে যায়।

আমাদের সমস্তাটা কি, বুঝতে পারছেন।

দেখুন, আর নিজের মনকে ঠকাবেন না।

আমার নিজের মনের কথা আমি বেশ জানি। সে সবকিছু আপনার উকেগের কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করিনে।

ও কথা এখন থাক। আপনি সব্বিধে মত একবার একটা রিটার্ন প্যাসেজ বুক করে ঘুরে আসুন।

সেখা যাবে।

আচ্ছা, নমস্কার।

নমস্কার।

লণ্ডনের সাউথ কেনসিটন অঞ্চলের একটি চারতলা বাড়ীর সোতলায় একটি ছোট সাভানো স্ট্রাট। বৈকালিক চা-পানের পর অনিল তাহার ড্রই-রুমে বসিয়া আছে। দরজার দুই-তিনটা টোকা শুনিয়া অনিল উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। মোহিত খসে হুকিল। অনিল বলিল, এই যে এস। তোমার জন্তই আসে।

মোহিত বলিল, না। আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে। বার বার চা খেলে আমার রাগে ভাল হয় না।

তা' হলে একটা ড্রিক কিছু ?

না, কিছুই দরকার নেই। তুমি কি জন্ত ডেকেছ, তাই বল।

একটু বস, বলছি।

অনিল বসিয়া ছিল একখানি সেটির এক কোণে। মোহিত বলিল তাহি পাশে একখানি সোফায়। অনিল প্রায় শেষ-করা একটি সিগারেট অ্যান্ড্রে-তে ফেলিয়া দিল। তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভাই, আমাকে একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে।

মোহিত বলিল, বিপদ ? কি বিপদ হ'ল ?

দেখ, লুসির সঙ্গে থাকা আর চলে না।

সে কি ? এই তো মাত্র এক বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে।

এহি মধ্যে—

না, আর চলছে না।

এ ভারি আশ্চর্য। কই, মিসেসকে দেখছি না যে ?

তিনি এখানে নেই।

সে কি। কেন ?

এখান থেকে চলে গেছে।

না, তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ। কি আশ্চর্য। আমার অবস্থা লুসির সঙ্গে তেমন খনিষ্ঠ আলাপ নেই। কিন্তু বড়দর দেখেছি আর শুনেছি তোমার কাছে, অপরের কাছেও, তাতে সে বেশ ভাল মেরে বলেই মনে হয়েছে। লেকিস্টের গ্র্যাডুয়েট। তাছাড়া একেবারে রাজার মেরেও সে নয়। পড়াশুনার' পরে খুব বোঁক, তুমিই আমাকে কত বার কত প্রশংসা করেছ। ও সব চিন্তা রাখ। লুসি ভাবুকতবে বেতনও রাশি, বা খুব কম মেরেই হয়ে থাকে। তুমি বরঞ্চ একশ এখন ছাড়। লুসিকে নিয়ে দেশে যাও। সেখানে গেলে তোমার এ সব উদ্ভট খেয়াল সেরে যাবে।

না, আমার এদেশ ছাড়া চলবে না।

কেন ? তুমি এখানে এলে কেন, তা আমি এখনো বুঝতে পারি নি। এগজামিনগুলো হয় দিচ্ছ না, না হয় দিয়েও কেল করছ। সমস্ত দিন প্রায় তোমার রেস্টোরাঁয়, বিলিয়ার্ডরুমে, না হয় নাচঘরে কাটে। ছুটি হলেই কটিং-নেটে ছোট, না হয় সী-পাইডে। সে সব অবস্থা তোমার খুশি। কিন্তু একি ! একটা মেরেকে এমন করে নির্বাসন কেন করবে ?

আমার সংকল্প স্থির হয়ে গেছে। তুমি কিছুতেই আমার মত বদলাতে পারবে না।

কি আর বলব, বল ?

তোমাকে কিছু বলতে হবে না। শুধু আমাকে একটুখানি সাহায্য করতে হবে।

আমি কি সাহায্য করতে পারি তোমাকে ? আমার আর্থিক অবস্থা ত জান ? ক্লারিশিয়ার' পরে নির্ভর। একবার যে দেশে একটু বেড়িয়ে আসব, তাও পারিনে।

কেন, তোমার খন্তরমশায়কে লিখলেই পার।

তখন দরকার হ'লে লিখতে বাধ্য নেই। কিন্তু শুধু বেড়ানোর জন্ত—বোঝাই তো।

অনিল বলিল, সে কথা থাক। আমি টাকা চাইনে তোমার কাছে। কলকাতা থেকে যা আসে, তা আমার পক্ষে যথেষ্ট।

মোহিত বলিল, কি রকম কি সাহায্য তুমি আমার কাছে আশা কর ?

মানে, লুসিকে ডাইভোর্স করব। এ জন্ত তোমার একটু সাহায্য চাই।

আবার সেই কথা ? দেখ আমার অভ্যস্ত বিজ্ঞি লাগছে এসব আলোচনা। আমি উঠি।

না, না, তোমাকে একটু সাহায্য করতেই হবে। নইলে—

নইলে হয়তো আমাকে আর জীবিত দেখতে পাবে না।

কি সাংখ্যাতিক কথা। তোমার মনে যে এত সব ভয়ানক কল্পনা উঠেছে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি তোমাকে আবার অনুশোধ করছি, তুমি লুসির সঙ্গে একটু শান্ত মনে বোঝাপড়া কর। আমি-স্ত্রীর কগড়া—কথায়ই আছে বহুবারস্ত লঘুক্ৰিয়া। সব ঠিক হয়ে যাবে।

অনিল বলিল, ব্যাপারটা একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তুমি আর আমাকে বোঝাতে চেষ্টা না।

আচ্ছা, লুসি কি কোনরকম বিশ্বাসঘাতকার কাজ করেছে ?

না, অবস্থা করেনি কিন্তু—

আবার কিন্তু ?

অনিল দৃঢ় স্বরে বলিল, তোমাকে আমি বলছি, আমাকে আর বোঝাতে চেষ্টা কর না। আমি বুঝব না।

তা' হলে আমার আর কি বলবার আছে ? আমি—আমি— এখন।

না, আমাকে একটু সাহায্য করবে, বল ?

বড়ই দুঃখের ফেলো, দেখছি। যে কাজটা আমি একেবারেই অনুমোদন করিনে এবং কোন দরকারও মনে করিনে, তা নিয়ে তুমি অনর্থক এত বড় অশান্তি সৃষ্টি কেন করবে ?

ওসব কথা শেষ হয়ে গেছে। এখন, তোমার সাহায্যটা আমি চাই।

মিষ্টি স্নরের নাচের ডালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-হর্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুট এর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

কি করতে হবে আমাকে ?

বিশেষ কিছুই না। একদিন সন্ধ্যার পর একটা হোটেল তোমাকে দেখাব। সেখানে একটা একা থাকতে হবে।

কি সর্বনাশ। এমন একটা প্রস্তাব তুমি করতে পারলে ? তুমি আমার লোক পেলো না ? শেষে আমাকে দিয়েই এমন একটা ভয়ঙ্কর কাজ করতে হবে ?

অনিল বলিল, তোমাকে সত্যিই কিছু করতে হবে না। আমি লাক্স ট্যাক্স সব ব্যবস্থা করব।

মোহিত বলিল, আমার দ্বারা এসব হবে না। আমি চললাম।

এই কথা বলিয়া মোহিত উঠিয়া পাড়াইল। কিন্তু অনিল কিছুতেই ছাড়ো না। সে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল।

মোহিত কাতরকণ্ঠে বলিল, অনিল, তুমি আমাকে ছাড়।

তোমাকে ছাড়তে আমি পারিলে, মোহিত। এটুকু উপকার তোমাকে করতেই হবে।

এইরূপে বহুবর্তী ধরিয়া উদ্দেশ্যে বাসার দিকে চলিল। মোহিতের মনে বিভ্রান্তি মনের উপর যে কল্যাণ চলিতে লাগিল।

অনিল বুঝিতে লাগিল, লুসি তোমার একেবারে অপরিস্রব নয়। তার সঙ্গে একদিন একটু ঘনিষ্ঠতার অভিনয় করিলে তোমার কোন কষ্ট হবার আশঙ্কা নেই। তুমি আর না বল না। আমাকে বাঁচাও মোহিত।

শেষ পর্যন্ত বহুবর্তীই জয় হইল, মোহিত সম্মতি দিয়া ফেলিল।

অনিল মোহিতের দুইখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তুমি আমাকে বাঁচালে। আমি তোমার কাছে চিরদিনের জন্য খবী হয়ে থাকব। আমি স্থান-কাল সব ঠিক করে তোমাকে জানাব। ঠিক হয়ে থাকো। সেখা, শেষ মুহুর্তে যেন আমার ভেত্রে পড় না।

মোহিত কোন কথা বলিল না। কোন মতে নিজেকে যেন টানিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল এবং কনকনে নীতে গভীরকোটের কলার চাপিয়া ধরিয়া নিজের বাসার দিকে বাত্মা করিল।

নন্দিতা অন্তত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। মিঃ চ্যাটার্জি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি হইয়াছে। মোহিতের চিঠি পাইয়াছে কি না, সে কেমন আছে, সব খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু নন্দিতার উদ্বেগের কারণ ব্রিজে পারেন না।

নন্দিতা কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না, মোহিত তাহাকে প্রতারণা করিতে পারে। অথচ অনিলের এমন স্পষ্ট এবং সহজ কথাগুলি বা সে কেমন করিয়া মুছিয়া ফেলে ? মনের মধ্যে সমস্তের বীজ একবার উপ হইলে তাহা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতে থাকে, তাহাতে শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হইতে থাকে। নন্দিতা ঘুমাইতে পারে না, খাইতে পারে না, এমন কি খোঁকাতে ভাল করিয়া আদর করিতে পারে না। সর্বদা উঠিতে বসিতে তাহার মনের মধ্যে যেন কাঁটা বিধিতে থাকে। এইরূপ মনের অবস্থা লইয়া তাহার পক্ষে দিন বাপন যেন অসম্ভব হইয়া উঠিল।

একদিন ডাইনিং টেবিলে বসিয়া নন্দিতা ছুরি-কাঁটা নামাইয়া বলিল, বাবা !

মিঃ চ্যাটার্জি বলিলেন, কি মা ?

আমি কয়েক দিনের জন্য একঘর লণ্ডন বাব, ছিন্ন করছি।

তা, বাও। কিন্তু লণ্ডন কই হবে যে ?

একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তোমারও কিন্তু কই হবে কয়েকটা দিন।

আমার জন্য ভেবে না। এরা সব আছে, পুরানো লোক। দেখেছ তো, আমাকে কত বড় করে এরা। তুমি সে জন্য ভেবে না। কথা এখানেই ছিন্ন হইয়া গেল। নন্দিতা তাহার এক বিধবা মাসিয়াকে কয়েকদিনের জন্য এ বাড়ীতে আনিয়া রাখিবে, ছিন্ন হইল। আদ্যাটিও খুব ভাল। নিজের ছেলের মত খোঁকাতে বড় করে।

য়েনে যাওয়াই ছিন্ন হইল। প্যাসেন্স ঠিক করিয়া নন্দিতা অনিলকে জানাইয়া দিল। মোহিতকে কিছু লিখিল না। অনিলও তাহাই পরামর্শ দিয়াছিল। তবে এক বিষয়ে নন্দিতা অনিলের সহিত একমত হইতে পারে নাই। অনিল চাহিয়াছিল, নন্দিতা তাহার ল্যাটাই ওঠে। একটা ঘর তাহার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিবে। কিন্তু নন্দিতা তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। সে বলিয়াছে, তাহার জন্য অন্য কোম একটা হোটেল বা লজ ঠিক করিয়া রাখিবে। অনিলকে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে।

নন্দিতা নির্দিষ্ট সময়ে পিতার নিকট এবং মাসিমার নিকট বিদায় লইয়া, খোঁকাতে অনেকগুলি ধরিয়া আদর করিয়া, পুনরায় পিতার কাছে আসিয়া তাহার পদগুলি লইয়া মোটরে উঠিল। ডাইনিং বিয়ার মনে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিল। নন্দিতার জীবনে এই প্রথম ক্যামাক স্ট্রিটের বাড়ী হইতে একা-একা বাহির হওয়া। ইহার পূর্বে অনেকবার এখানে ওখানে বেড়াইতে গিয়াছে। সব সময়ই তাহার বাবা ছিলেন সঙ্গে। যতদিন মা বাঁচিয়া ছিলেন—সে অনেক দিনের কথা—মায়ের আঁচল ছাড়িয়া সে স্বপ্নও বাড়ীর বাহির হয় নাই। আজ এক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত কারণে সে একা কলিকাতা হইতে লণ্ডন যাত্রা করিতেছে। তাহার বুক দুহু দুহু করিতেছে। কি দেখিবে সে দেখান গিয়া ? অনিল কেমন ব্যবহার করিবে ? বিদেশে একাকী পাইয়া কোন অশোভন আচরণ করিবে কি না কে জানে ? আর মোহিত ? সে কি করিতেছে ? কি ভাবিতেছে ? তাহাকে না জানাইয়া সহসা লণ্ডনে উপস্থিতিতে সে কি মনে করিবে ? নন্দিতা অনিলের কাছে বাহা শুনিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয় ? কি তরানক কথা, সে যেন সে পরিস্থিতি ভাবিতেই পারিতেছে না। আর যদি সব মিথ্যা হয় ? ভগুবান তাই যেন করেন। সব যেন মিথ্যা হয়।

য়েনের সীটে কোমরে ক্রাপ রাখিয়া লইয়া মাঝে মাঝে এদিক ওদিক একটু দোল খায়, হোটেলের হাতে কিছুক্ষণ পর পরই এটা ওটা খায়, কোন বার ফেবও দেয়। কখনো ছবিওয়ালার খবরের কাগজের উপর চোখ বুলায়। কখনও পাশের জানালা দিয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখে। এই নৃতন যাত্রা, নৃতন যাত্রা তার কাছে অসুখ স্বপ্নের হইয়া উঠিত, যদি তার মনের মধ্যে উদ্বেগের বোকা না থাকিত। মাঝে মাঝে ভাবে, খোঁকা যেন কি করিতেছে, আদ্যা তাহাকে ঠিকমত বন্ধ করিতেছে কি না, মাসিমা খোঁজ খবর করিতেছেন কি না, বাবার বাঁ পায়ের ব্যথাটা এর মধ্যে আবার বাড়িয়া না যায়।

বিরাট আকাশের গায়ে একটি দুহু পতঙ্গের মত ভাসিয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়াছে যেনখানি। তাহারই মধ্যে অসংখ্য যাত্রীর সহিত

হাসিয়া নন্দিতা আপন মনের ডিটার ভাল হুইতেছে আর লগনে পৌছিবায় জন্ম আকুল হইয়া উঠিতেছে।

য়েন লগনের মাটি দুইতেই নন্দিতা নামিয়া পড়িল এবং বখারিতি কাগলপাশ দেখাইয়া অনিলের সহিত বাহিরে আসিয়া ট্যান্ডিতে উঠিল।

নন্দিতার লগনে পৌছিবায় যে তারিখ, ঠিক তার পরদিনই নির্দিষ্ট হোটেলের নির্দিষ্ট ঘরে নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অল্পস'রে মোহিত এবং লুসি উপস্থিত হইয়াছে। মোহিত অভ্যন্ত গভীর হইয়া আছে। লুসিও তাই। লুসি বলিল, মিঃ যুথার্জি, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, আপনাদিগের মত লোককে ওই গাছুলি এমন একটা ভরানক থিট্রী পরিস্থিতিতে এনে ফেলল। মোহিত সম্পূর্ণ নীরব। মাথা নীচু করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া আছে। পাশে একটি সেটিতে লুসি হেলান দিয়া আঁখ-সোয়া অবস্থায় বসিয়া আছে।

তখন বোধ হয় রাত্রি নয়টা সাড়ে নয়টা হইবে। দরজায় দুইটি টোকা শুনিয়া দুই জনই উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। লুসি সেটির উপরে সোজা হইয়া বসিল। মোহিত কিংকর্ষাবিমুগ্ধ হইয়া জড় হইয়া রহিল। এমন সময়ে আবার দুইটি টোকা। লুসি বলিল, দরজাটা খুলেই দাও। হয়তো হোটেলের কোন লোক হবে। কোম কিছুই দরকার বোধ হয় আছে। মোহিত ধীরে ধীরে গিয়া দরজার হাতল ঘুরাইয়া একটু কীক করিতেই চমকাইয়া উঠিল এবং দেখিতে পাইল, নন্দিতা দরজার কীক দিয়া তাহার দিকে এবং লুসির দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াই ত্রুণপণে চলিয়া গেল। মোহিত যেন পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া দরজার হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লুসিও প্রাণপণে দরজার কীকের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে মোহিতকে বলিল, একজন ইণ্ডিয়ান মহিলা যেন মনে হ'ল। ব্যাপার কি? এলই বা কেন, আবার অমন করে চলেই বা গেল কেন? কিছুই তো বুঝতে পারছি নে।

মোহিতের মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। অতিকষ্টে বলিল, ও আমার স্ত্রী।

লুসি আকাশ হইতে পড়িল। আপনাদিগের স্ত্রী? আপনি বিবাহিত? অনিল আমাকে সে কথা বলেনি। কিন্তু ঠিক এমনি সময়ে এ আয়গায় ইনি এলেন কেমন করে?

লুসি একটু ভাবিল। তার পরই দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, ঠা, বুঝছি। সব বুঝছি। এখন চলুন এখান থেকে। চলুন, লাউকে গিয়ে একটু বস। যাক। তার পর আমরা আমাদের বাসায় চলে যাব।

মোহিতের মূর্ত্যব তখনো কাটে নাই। লাউকে চুকিয়া দুইজনে পাশাপাশি বসিল। মোহিত বলিল, মিসেস গাছুলি, কি ব্যাপার বলুন দেখি? আমার স্ত্রী এখানে এসেন, অচ্য আমিই জানতে পারলাম না। করে এসেন, কেন এসেন, ঠিক এখানে এসে অগ্রসৃত্ত হয়ে কিসে পেলেন। সবই আমার

কাছে অচ্যুত মনে হচ্ছে। কোথায় রয়েছেন তাও জানিয়ে যে গিয়ে খোঁজ নেব।

লুসি এতকণে বেশ সরল, স্বাভাবিক ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। চোখ-মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন সন্দেহ, খিণ বা অনিশ্চয়তা নাই। লুসি বলিল, এতকণে আমার কাছে সব দিনের মত পরিচায় হয়ে গেল। ওই স্বাউপেল, ওই গাছুলি এক চিলে দুই পাখী মারবার চেষ্টায় আছে। তোমার সাহায্যে আমাকে ডাইভোজ' করবে, তারপর তোমার স্ত্রীকে দিয়ে তোমাকে ডাইভোজ' করিয়ে তোমার স্ত্রীকে বিয়ে করবে, এই ওর অভিশপ্তি। ও অনেকবার আমাকে বলেছে, ও একটি ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বহুকাল ধরে ভালবেসেছে। তাকেই বিয়ে করবে। সব ঠিক হয়ে আছে। শুধু আমি সবে দাঁড়াইলেই তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

কি সর্বনাশ। এমন কাজ অনিল করতে পারে? কিন্তু এখন উপায়? আমার স্ত্রী কোথায় আছেন, কেমন করে জানবো? তাঁর সঙ্গে এখনি দেখা না করতে পারলে, হয়তো অনিলের বড়বুড়ই সকল হয়ে যাবে। তাঁকে দেখে আমি এমনই অতিক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, যে তখনি তাঁর সঙ্গে কথা বলবার বা তাঁর শিঙনে ছুটে যাবার চেষ্টা পর্যন্ত করতে পারিনি।

লুসি বলিল, আপনি বাড়ী যান। আমি এখনই বাছি অনিলের কাছে। কাল সন্ধ্যার সময়ে আপনি অবশ্য আসবেন আমার বাসায়। আমার সঙ্গে চা খাবেন। আশা করছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মোহিত বলিল, নন্দিতার খোঁজ পাবার উপায় কি? অনিল কি বলবে, তিনি কোথায় আছেন?

লুসি বলিল, আপনি বাড়ী যান এখন। আমিই আপনাদিগের স্ত্রীকে খুঁজে বের করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মনে থাকে যেন, কাল সন্ধ্যার সময়ে অবশ্য আসবেন আমার গুহানে।

নিশ্চয়ই যাব।

উহার দুজনই হোটেল হইতে বাহির হইয়া পরস্পরের কাছে "গুড নাইট" বলিয়া নিজেদের বাসার দিকে বাত্মা করিল।

নন্দিতা যখন হোটেল হইতে বাহির হইল, তখন তাহার মাথা রীতিমত ঘুরিতেছে। কোনক্রমে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিয়া অপেক্ষমান ট্যান্ডিতে উঠিয়া বসিল। পাশে অনিল।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা তির্যদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
দ্বারা বিশুদ্ধ
মতে প্রস্তুত

বাকলা

ভারত গণ্ডা রোজি: নং ১৬৮৩৪৪

অম্বশূল, পিত্তশূল, অম্বপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেঁকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দ্যাদি, বুকজ্বালা, জ্বালায় অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত প্রকটনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও আশ্চর্য্যের সেরন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বম্লে শুল্ক্য ফেরলং। ৩২ ভোলাল প্রডি কোটা ও টাক, একত্রে ৩ কোটা - ৮-১১- আশা। ডাঃ. মাও পাইকদীঘর পুথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-বালিশাঙ্গা (দুর্গ পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪২, মহাশা গাঙ্গা রোড, কলি: -৬

ট্যান্ডি চলিতে লাগিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই।
একই পরে অনিল বলিল, এখন আর কোন কথা নেই মনে?

চুপ করুন।

এখনও চুপ করে থাকব?

নন্দিতা নীচের এক কোণে সরিয়া গিয়া পিছনে হেলান দিয়া
হুই হাতে মাথাটা ধরিয়া শুক হইয়া বসিয়া রহিল।

অনিল বলিল, তা'হলে আজ আমার ফ্যাটেই চলুন না?
আপনার মনটা ভাল নেই। বাসার একা-একা থাকবেন?

নন্দিতা সহসা উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া ডাইভারকে বলিল,
ডাইভার, এইখানেই ট্যান্ডি থায়াও।

ডাইভার একটু বিম্বিত হইয়া বলিল, এখানে কোথায় থামব?

এখানেই থায়া, প্রাণ, শীগগির থায়া।

গাড়ী থামিল। ডাইভার গাড়ী হইতে নামিয়া দরজা খুলিয়া
বিল। নন্দিতা ওভারকোটটা ভাল করিয়া চাঙ্গিয়া ধরিয়া গাড়ী
হইতে নামিয়া ফুটপাথ বরাহিয়া হাটিতে আরম্ভ করিল।

অনিলও তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া তাহার সহিত চলিতেই
নন্দিতা বলিল, আর এগুলো আমি এখনি টেরির লোক জড় করবো।
শীগগির গাড়ীতে উঠি সরে পড়ুন।

আপনি পথ চেনেন না। একা কোথায় যাবেন?

আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

নন্দিতার দৃঢ় স্বর শুনিয়া অনিল আর অগ্রসর হইতে চাহিল
না। ট্যান্ডিতে উঠিয়া চলিয়া গেল। লণ্ডনের শীত ও কুয়াসার
মধ্যে নন্দিতা একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তখনও
পথে অবিরাম লোক চলাচল করিতেছে। একটু অগ্রসর হইয়াই
একজন কনেটবলকে দেখিয়া তাহার কাছে গিয়া নিজের বাসার
ঠিকানা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ট্যান্ডি কোথায় পাওরা যেতে পারে?
সে নিকটবর্তী একটি মোড়ের কথা নন্দিতাকে বুঝাইয়া দিয়া বলিল,
ওখানে গেলেই ট্যান্ডি পাওয়া যাবে।

নন্দিতা বাসার ফিরিয়াছে। শরীর ভাল নাই, এই জব্বহাতে
বাড়ীতে বলিয়া দিল, সে ডিনার খাইবে না। নিজের ঘরের দরজা
বন্ধ করিয়া ওভারকোটটা আর হাতের মন্তানা দুইটি খুলিয়া ফেলিয়া
বিল। তারপরে একটি পাতলা ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়াইয়া চিমনির
পাশে বসিয়া আগুনটা একটু খোঁচাইয়া দিল। চেয়ারে বসিয়া
হাত-পা একটু গরম করিয়া লইয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়া শ্লীপিং সুট
পরিয়া বিছানার পা এলাইয়া দিল। গায়ের উপর চারিখানি লেপ,
পায়ের কাছে একটি গরম জ্বলের ব্যাগ। এগুলি পূর্ব হইতেই
বাড়ীর গিরা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ঘরখানির তিন দিকই বন্ধ। একদিকে একটি জানালায়
উপরের দিকে একটু ঝাঁক। সেইখান দিয়াই বাতাস আসে করে।
নন্দিতার মনের উত্তেজ, ভাবনা প্রবল ভাবে তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া
তুলিয়াছে। এ কি ভয়াল পরিস্থিতি! বাহার উপর নির্ভর করিয়া
সে একা এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহার মনে কোন দুঃখভিঙ্গি
আছে কি না, বুঝিতে পারিতেছে না। এরিকে তাহার চোখের সামনে
সে বাহা দেখিয়া আসিয়াছে, ওঃ! মোহিত এমন কাজ করিতে
পারিল? বিশেষে আসিলেই কি মানুষ সহসা এমন অমায়ুষ্য হইয়া
বাইতে পারে? না, কিছু একটা গোলমাল বেন কোথায় আছে।

কিছু নিজের চোখে যা দেখিল, তার সঙ্গে অনিলের কথা ঠিক মিলিয়া
বাইতেছে। তা মিলুক। হয়তো মোহিত একটি সাময়িক মোহে
আত্মবিশ্রুত হইয়াছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সব ঠিক হইয়া
বাইবে। নন্দিতা মনে মনে প্রার্থনা করিল, ভগবান, তাই বেন হয়।
মোহিত তাহার মোহ কাটাইয়া উঠিয়া আবার বেন সন্ত হয়। নানা
প্রকার চিন্তা করিতে করিতে, ভয়, সন্দেহ, আশা ও নিরাশার
সোলায় দোল খাইতে খাইতে নিজের অজান্তসারেই ঘুমাইয়া পড়িল।

এদিকে লুসি হোটেল হইতে সোজা অনিলের বাসার গিয়া তাহার
দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলিল। অনিল বলিল, ভিতরে
এস। কিন্তু এমন সময়ে? হোটেল থেকে এখনই চলে এসে যে।

বিশেষ দরকার আছে বলেই এসেছি। মিসেস মুখার্জি কোথায়?
এখানেই আছেন নাকি?

মিসেস মুখার্জি! কোন মিসেস মুখার্জি?

জাকামো কর'না। তোমার কোন কথা জানতে আমার বাকি
নেই। শীগগির বল, তিনি এখানে আছেন কি না।

যদি না বলি?

বলতেই হবে। নইলে পুলিশ ডাকবো।

দেখ, অস্থির হয়ে না।

চুপ কর। মিসেস মুখার্জি এখানে আছেন কি না, আমি এই
মুহুর্তে জানতে চাই।

না, তিনি এখানে নেই।

তার ঠিকানাটা?

কি দরকার তোমার?

দরকার আছে। তার ঠিকানাটা আমাকে দাও।

অনিল দেখিল, আর লুকোচুরি করিবার পথ নাই। মোহিত
এক লুসি দুজনেই নন্দিতাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। নন্দিতা বতটা
সাবধানতা অবলম্বন করিবে অনিল আশা করিয়াছিল, অত্যধিক
উত্তেজনা বশত নন্দিতা তাহা পারেন নাই। সুতরাং এখন আর
কথা বাড়াইয়া কোন ফল হইবে না।

অনিলের নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া পরদিন অতি প্রত্যবেই
লুসি নন্দিতার বাসায় গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল।
অপরিস্রুত একটি মহিলাকে এত সকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিতে
দেখিয়া নন্দিতা একটু অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।
তারপর সাধারণ সৌজন্য বশতঃই বলিল, আপনি কাল আপনার স্বামীর
সঙ্গে ঝাঁকে দেখেছিলেন, জানিই তিনি।

নন্দিতা বিশ্ববিক্ষুব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। লুসি
বলিল, আপনি কি আপনার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান?

নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু ব্যাপারটা যে কিছুই বুঝতে পারছি নে?
আপনি নিজেই এসেছেন আমার কাছে একথা বলতে?

আপনি আজ সন্ধ্যার সময়ে আসবেন আমার বাসায়। সেখানেই
মোহিতের সঙ্গে দেখা হবে।

কিন্তু আপনার বাসায় কেন? মোহিত কি সত্যই আমাকে
ভ্যাগ করবে স্থির করেছে, আর আপনাকে—

আপনি একটুও উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনার মোহিত সম্পূর্ণ
আপনারই আছে। ঠেকে আমি নিজের সহোদরের মতই প্রভা করি,
ভক্তি করি।

নন্দিতা বলিল, অথচ—

আপনি একবার আশ্রম না আমার বাসায়। যদি নিতান্ত আপত্তি থাকে, তাহলে না হয় আমারই এখানে আসব।

না না। আমিই বাব আপনার ওখানে। তাই যখন আগে থেকে ঠিক করেছেন, তাই হবে। আমার মনে হচ্ছে, আমি আপনাকে সত্যিই বোধ হয় কোনরকম ভুল বুঝছি। কি জানি, আমি কিছুই সহজ করে ভাবতে পারছি নে।

লুসির বাসা। বেশ সামান্য ছোট একটি ভাইকুম। সোফা, সেটি, মেডিও, পিয়ানো সবই আছে। সোফা ও সেটি কয়টির মাঝখানে একটি গোল টেবিল, স্থলর একখানি টেবিল-রথ মিয়া ঢাকা। তার মাঝখানে চীনাঘাটির একটি ভাস। আর ভাসটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনটি গ্রেট, কাঁটা, চামচ ইত্যাদি সামান্যই হইয়াছে। একটু পরেই এখানে চায়ের আয়োজন করা হইবে। এখানে একটি বড় জানালা। তার দুই পাশ ছড়িয়া একজোড়া স্থলর সেসের কাজকরা পর্দা। একপাশে একটি ছোট শেলকের উপর অনেকগুলি বই রহিয়াছে।

সন্ধ্যার উপক্রম হইতেই লুসি এই ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। মেডকে বলিয়া দিয়াছে, অভ্যাগতেরা আসিলেই যেন চায়ের ব্যবস্থা করে। মেড আস্তে আস্তে চায়ের জন্ত বাধা কিছু প্রয়োজন, সব ক্রমে ক্রমে আনিয়া শুছাইতে লাগিল এবং তিনটি স্থানের পাশে তিনখানি ছোট হাতহীন চেয়ার আনিয়া রাখিল। লুসি একটি সেটির এক কোণে বসিয়া প্রতীক্ষমান দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে দরজার দিকে চাহিতে লাগিল।

বর্ষাসময়ে মোহিত দরজার টোকা দিয়াই নব ঘুরাইয়া ঘরে ঢুকিল। লুসি ষাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে লইয়া তাহার পাশেই বসাইল। তাহার সঙ্গিত দুই চারটা কথা বলিতে বলিতেই দরজায় আবার টোকা। লুসি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই নন্দিতা ঘরে ঢুকিল।

লুসি বলিল, আশ্রম, আমরা একবারে চায়ের টেবিলেই বসে পড়ি। যা খেতে খেতে কথা হবে।

খাবারের আয়োজন দেখিয়া মোহিত বলিয়া উঠিল, ওরে বাপ, এ যে একবারে হাই-টি।

তাহারা চায়ের বসিল, মেড খাবারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

লুসিই প্রথম কথা বলিল, মিঃ এবং মিসেস মুখার্জি, আপনারা আশা করি ব্যাপারটা সব বুঝেছেন?

নন্দিতাকে একটু চিন্তাবিহীন দেখিয়া লুসি বলিল, আপনি এখনও বোধ হয় সশয্যাধিত রয়েছেন। শুধুন, আপনার স্বামী অত্যন্ত সজ্জন। এমন সজ্জন লোক সংসারে অল্পই আছে। আমার স্বামী ওই অনিল, ঠিক ঠিক উঠা। আমি তার স্ত্রী হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বিদেশী ছাত্রীরা এদেশে এসে যে সব বদভ্যাস অর্জন করে, সবই সে অর্জন করেছে। সে সব তো আছেই, তার পরে কিছুদিন থেকেই আমাকে বলছে, ইণ্ডিয়ান। আমার আসল স্ত্রী আছে। তার সঙ্গে বিয়ে না হলেও, আমরা পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসি। তোমাকে ভাইভোস' করে আমি তাকেই বিয়ে করব। সে যেরকম বকে তা আমি এখন বুঝতে পারব। ও এত বড় পাবও যে ওর এই ছুরভিন্দী সাধনের জন্যে এই সব বড়বন্দ্য করেছে। মিঃ মুখার্জি আমি আমার ভাইয়ের মতই প্রভা করি, সম্মান করি। জু এই বন্ধুর কবলে পড়েই তিনি এমন একটা বিলম্ব অভিনয়

করতে রাজি হয়েছিলেন। মিসেস মুখার্জি, আমার কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিল না। মোহিত এবং নন্দিতা হয়তো নিরিবিলা কথা বলিতে চায়, এইরূপ অস্বাভাবিক করিয়া লুসি বলিল, আমি একটু আগছি ওপর থেকে। ডিনারের ব্যবস্থাটা মেডকে একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসি, আপনারা কিছু এখানেই আঁজ ডিনার খেয়ে যাবেন। কোন আপত্তি গুনবো না। লুসি চলিয়া গেলে নন্দিতা এবং মোহিত একটি সেটিতে আসিয়া বসিল।

মোহিত বলিল, বড় অস্ত্রায় করে কেলেছি। আমার কমা কর। অস্ত্রায় তুমি করনি। তবে এমন একটা বন্ধুর পাঠ্যর পড়ে আমাকে একটু হরষাণি করালে, এই বা।

তারপর উভয়ের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ যে সকল কথা হইল, তাহাতে বুঝা গেল, উভয়ের মন বেশ হালকা হইয়া গিয়াছে। নন্দিতা বলিল, আমি ভেবেছি, থোকাকে এখানে নিয়ে এসে তোমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই তোমার সঙ্গে থাকব।

মোহিত বলিল, আর বৎসর খানেক মাত্র বাকি। এর মধ্যে আর ষষ্ঠাট বাড়িয়ে লাভ নেই। তোমার আর কোম ভয় নেই। নিশ্চিন্ত থেকে। তবে কালই তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে।

থোকাকে ছেড়ে আমি বেশ দিন থাকতে পারবো না। আমাকে ছেড়ে তো বেশ ছিলে?

বাও। আজ, দিন পনের থাক, এর মধ্যে আমি তোমাকে এসেশের অনেক কিছু দেখিয়ে দিতে পারব। দেশটাও একটু ঘুরে দেখতে পারবে।

বা হয় কর। লুসি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, সব ঠিক হয়ে গেছে, কেমন? নন্দিতা বলিল, ঠ্যা। কিছ তোমার?

আমার কথা থাক। ওর মতি-গতি না বলান পর্যন্ত আমারকে এ দুর্ভোগ সহ্যেই হবে। তবে যত দিন ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে ও বাতে আপনারদের কোন অশান্তির কারণ না হয়, তা আমি দেখব।

নন্দিতা বলিল, এ আপনার অত্যন্ত উচ্চস্বরের পরিচর। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনারদের অশান্তিও দূর হয়ে যাক। সে আমার কপাল।

আপনার মত স্ত্রী পাবার সৌভাগ্য যার হয়েছে, সে যে হীন হ'তে পারে, তা কল্পনা করতেও বাধে। আমাদের খুব বিশ্বাস, ও একদিন সত্য সত্যই অমৃতপু হবে।

কথা আর বেশি হইল না। রেডিওর চাবি খুলিয়া কতকগুলি গান, সংবাদ ইত্যাদি শোনা হইল। আরো কিছুক্ষণ গল্প-শব্দবের পর মেড আসিয়া খবর দিল, ডিনার তৈরী হইয়াছে।

ডিনারের পালা শেষ করিয়া মোহিত এবং নন্দিতার বাইবার সময়ে লুসি বলিল, আমার আঁজ সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনারদের একটা মস্ত অশান্তি কেটে গেল। আর আমিও আপনারদের মত লোকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলাম। আশা করি, মিসেস মুখার্জি বত দিন এখানে থাকবেন, মাঝে মাঝে দেখা করবেন।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমারও যে কত আনন্দিত হয়েছি, তা মুখে বলে বোঝাতে পারব না। আজ, আজ আসি। শুভ নাইই।

শুভ নাইই।



শ্রীগণেশচন্দ্র দাস

চলমান জনতার একটা প্রবাহমান শ্রোতা ট্রাফালগার স্কয়ারের প্রশস্ত রাজপথটার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একটু চোখ মেলেই দেখা বাবে কিশি, আফ্রিকান, ফ্রেন্স থেকে আরম্ভ করে ইজিপ্তিয়ান, ভারতীয় ইত্যাদির। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় লোকের এক অপূর্ণ মিলনক্ষেত্র এই—কসমোপলিটান সেন্টার—ট্রাফালগার স্কয়ার। আমরা তিনজন অজ্ঞানবোধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রীষ্মের ছুটিতে কিছু দিনের জন্তে লগুন এসেছি। আমরা তিনজন—আমি মোহন আর সনৎ যেন গতিশীল ভাবেই পার্শ্ববর্তী সকলের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে এগিয়ে চলেছি। লগুনের মনোরম রাস্তা-ঘাট দর্শন ছাড়াও ইজিপ্তিয়ান মজলিসের শ্রোতা হিসেবে বাড়িলাম কিন্তু হোটেল ছেড়ে বেরিয়েই শুশলায়, যে কোন কারণে বিতর্ক-সভার আয়োজন আজকের মতো স্থগিত রাখা হয়েছে। ভাবলাম হোটলে ফিরে গেলে ঠিক হবে না, কারণ কবিগুরুর অমোঘ বাণী মনে পড়ে গেল—‘সময় বখান হয়েছে এবার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে হবে।’ তাই সময়ও বখান হয়েছে আর বাঁধন বখান ছিঁড়ে তখন পুরোনো আন্তানায় ফিরে যাওয়াটা ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আপাততঃ বসিও তিনজন উদ্ভাস্তর মতো চলেছি, এতটা সময়ের কি করে অপব্যয় করা হবে তা নিয়েই পরস্পরের মধ্যে উঠছে মহাতর্ক। সন্দের পূর্জি বখান সামান্য, আর ফুগার ভাড়াটাও বখান প্রবল তর্ক—মনোরম পারিপার্শ্বিকতার হাতছানি যেন মনকে প্রলুব্ধ করতে পারলো না। আমি প্রস্তাব করলাম, সন্দের ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসের বিতীরা টেস্ট ম্যাচ দেখতে গেলে কেমন হয়? লাঞ্চার পর থেকে নিরপেক্ষ টিকিট অনার্সেই পাওয়া বাবে। এখান থেকে লর্ডসের ক্রিকেট এটাও কতটুকু বা হু?

কিন্তু অপর দু'জনের কাছ থেকে সেলাম তীব্র প্রতিবাদ। তাই আবার মোহন বখান লগুনের সিনেমা-পাড়ার লিটল স্কয়ারে গিয়ে রিচমন্ড সিনেমায় এম. জি. এম প্রযোজিত ও হলিউডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো অভিনীত কোঁভুক-চিন্ন বাস-টপ, দেখবার প্রস্তাব এবং সনৎ উইলকিন্সন গিয়ে টেনিস খেলা দেখবার প্রস্তাব করলো তখন আমিও প্রত্যুত্তরে তেটো

পাওয়ার প্রয়োগে বিধা করলাম না। এই ভাবে চলেছিলো প্রস্তাব উত্থাপন আর বাস্তবের পালা। সামনেই এসেছে রেন্ডেলম্যানস রেন্ডেল (Rendelmann) উদ্ভুক্ত তোষণদানের পাশের গ্রাস কেসে একটা যন্ত্রাঙ্গিত প্রকাণ্ড পুতুল ঠিক একটা জীবন্ত রিসেপ-সানিটির মতো অদ্ভুত কার্যকার হাত নেড়ে পথচারীদের ভিতরে আসতে আহবান জানাচ্ছে। একজন প্রিয়দর্শন যুবক জাতিতে বোধ হয় ফ্রেন্স হব, তারই একজন সঙ্গীকে ইংরেজি ভাষায় বললো—রিসেপসানিটকে জিজ্ঞাসা করতো বুদ্ধবুদ্ধের অন্নদানের ব্যবস্থা আছে কি না শুনে সজোরে হেসে উঠলো—সেও হেসে উঠল।

দেখতে দেখতে কুইন অব দি লাইথ পার্কের রাস্তার এসে পড়লাম। অদূরে দেখা যাচ্ছে বুটেনের কৃতপূর্ব বিজয়ী নৌসেনাপতি নেলসনের প্রতিমূর্তিসহ বিজয় স্তম্ভ। ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ানের প্রতাপশালী নৈনিকযুদ্ধকে পরাভূত করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার দ্বারা বংশবাসীর

হৃদয়ে তিনি যে আসন স্মৃতিস্তম্ভ করেছিলেন তারই প্রতীকস্বরূপ সত্যেরো ফিটেম লম্বা নেলসনের স্তম্ভের প্রতিমূর্তি একশো বোল ফিট স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান থেকে পার্শ্ববর্তী সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানছে। স্তম্ভের নিচের চারদিকে রয়েছে ট্রাফালগার যুদ্ধের চারটি দৃষ্ট—এগুলি যুদ্ধে অধিকৃত ফরাসী কামানগুলিকে গুলিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের অনতিকাল পরেই নিচের চারদিকে চারটি স্তম্ভনির্মিত সিংহ সংযোজিত হয়েছে। এদের প্রকাণ্ড সর্বগ্রাসী মুখের দাঁ আর চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি যেন তাদের জীবন্ত স্তম্ভের চেয়েও মারাত্মক করে তুলেছে। মোহন বলে ওঠে—নেলসন নৌযুদ্ধে জয়লাভ করে যে খ্যাতি, ধন ও মানের অধিকারী হয়েছিলেন তার এতটুকু অংশ না হয় নাই বা সেলাম কিন্তু সম্রাট তৃতীয় জর্জ তাঁর বিজয়ী নৈনিককে সম্মানিত করার জন্তে যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভোলসভার আয়োজন করেছিলেন তার একটা ক্ষুদ্র অংশ সেলোও অদ্ভুতঃ আজকের মতো দিনে ধন্য হওয়া। ইতিহাসের ছেলে মোহন কবে, কোথায়, কি কি খাজ সামগ্রী সমেত যে ভোলসভার আয়োজন হয়েছিলো তা সেই ভালো জানে। ওতে আমার এতটুকু প্রয়োজন নেই। এই ট্রাফালগার স্কয়ারের ঠিক মাঝে দণ্ডায়মান নেলসন স্তম্ভ দেখতে দেখতে হঠাৎ তিনজনের মাথায় একই প্রশ্ন এলো—আজকের দিনটা প্রবীরদার বাড়ীতে গিয়ে উঠলে কেমন হয়? তিন মতই বখান এক তখন আর সময় নষ্ট না করে একটা কাব ভাড়া করে উঠে বসা গেল। তাছাড়া ইশাণ কোশে বাধা-বন্ধনহারা গুরু মেঘ আড়ম্বরের সঙ্গে সমবেত হয়ে গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করছে।

প্রবীরদা হচ্ছেন একজন খ্যাতনামা ধনপতি ব্যারিষ্টারের ছেলে। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমরা একই সঙ্গে পড়তুম। কিন্তু ঠিক সহপাঠী বলা চলে না। কারণ তিনি বখান চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন সবমাত্র আমরা কলেজে প্রবেশ করি। উল্লেখ্য গৌরবর্ণ স্বন্দর বাহ্যবান চেহারা, ডাগর ডাগর চোখ আর চাপা পুরু ঠোঁট দেখলে মনে হয় তিনি নিতান্ত স্বল্পভাবী কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে, বর্ধমণ্ডিক পক্ষে তিনি এমনই অজন্ম কণা।

বলতেন আর শুল্লার বৃত্তিতর্ক করতেন যে—যার কলে তিনি বার কয়েক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর পর প্রেসিডেন্সি কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি শিশুমেবের পাশ্চাত্য অনুসরণ করে ব্যারিষ্টার হবার উদ্দেশ্যে বহু বার সাতকে আগেই লগুনে এসেছিলেন। দেশে থাকার সময় তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বন্ধুগণ পাঁচাপাঁচি করে কেলেকিলাম। হ্যাঁ, এই তো সেদিন পর্যন্ত তিনি ইউরান মজলিসের ডিবেটিং সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন কিন্তু কেন জানি না, হঠাৎ তিনি এই সম্মানজনক পদ কিছুদিন আগে ত্যাগ করেন বিনা কারণেই একরকম।

প্রবীরদার বাড়ীটা ছিলো সেন্ট জার্মেন এ্যান্ডিনিউতে—ট্রাকলগার থেকে মাইল দুয়ের পথ। পিকার্ডালিতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বারিপাত শুরু হয়েছে। আর বেশীক্ষণ দেবী নেই, প্রবীরদার বাগানবাড়ীটা দেখতে দেখতে এসে গেল। প্রকাণ্ড বাড়ীটার মাত্র দু'টি প্রাণী—প্রবীরদার আর বাটলার শিখ। ধনী পুত্র, তাই তিনি আমাদের মত ল্যাণ্ডলেডীর কৃপাপ্রার্থী না হয়ে আর পদে পদে ল্যাণ্ডলেডীর সম্বন্ধিবিধান ও জরুরিবিধি থেকে রক্ষে পেয়ে আরামে দোস্তলা বাড়ীটার বসবাস করছেন। কিন্তু গিয়ে বিকল-মনোরথ হলাম। কারণ বাটলার শিখ জানালো যে তিনি কিছুক্ষণ আগে বেরিয়েছেন। শুধালুম কোথায় গেছেন? সে বললো—হিনিবের তো আজ্ঞাপান্না চাচ্ছ ওই ভনক্রাম কাফে, সেখানে একবার খোঁজ নিম না। আপাততঃ সেট দিকে তদ্রসর হওয়া গেল। পিকার্ডালি বটটা সেবা রাস্তা সেন্ট জার্মেন এ্যান্ডিনিউ, তারই একধারে ভনক্রাম কাফে। বিভিন্ন বস্তুর কালেক্‌শন সজ্জিত প্রকাণ্ড কাকোটারে ঢুকে পড়েছি, বটটা গুরুত্ব করে ঝাঁপছে সজ্জের পুঞ্জির কথাটা ভেবে—যদি প্রবীরদাকে না দেখতে পাই তবে এক কাপ করে কফি নিয়েও যে “শনিপাত্রে তুফান তুলে” (Storm over a cup of tea) খানিকটা সময় কাটাবো তাও হবে না। কারণ এই খানতান্না জাদুঘর কাকোটার চার্জ এতই বেশী যে আমাদের মত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেরা তার নাম শুনেই যেন চৈতন্যহীন হয়ে পড়ে। এতগুলো ভুললোক তদ্রসহিলাব দৃষ্টির সামনে দিয়ে মাথা হেঁট করে চলে যেতে হবে। একটু লাউড স্পিকারের মারফৎ রেডিওগ্রামের মাধ্যমে জনপ্রিয় জাদুঘর অরকেষ্ট্রা বাজছে।

কিন্তু ভাগ্যবদী শেষে প্রসন্ন হয়েছেন। কসিমুকের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার একটা স্থানে প্রবীরদা বড় একটা ধুমায়িত ককির কাপ নিয়ে বলে আছেন এবং অল্পমনস্ক ভাবে কঁপিল কাপকে উপেক্ষা করে জাজাজের টাইম টেবিল দেখছেন। গিয়েই সকলে একসঙ্গে বলে উঠলাম, প্রবীরদা ভালো আছেন তো? অনেকদিন বাদে আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো। একটা ছোট্ট হ্যাঁ বলে কহিতে মনোযোগ দিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, প্রবীরদার সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় কিন্তু তার এমন গম্ভীর রূপটি কখনো দেখিনি।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—প্রবীরদা, আপনার হাতে জাজাজের টাইম টেবিল কেন?

তিনি গম্ভীর ভাবেই বললেন—সামনের বুধবার দিন বাড়ী দিয়ে থাকি।

সকলেই একেবারে হতভম্ব। একে প্রবীরদার এইরকম অস্বাভাবিক মূর্ত্তি, তারপর এই স্বদীর্ঘ সাত বছর লগুনে থাকার পর বিনা পত্রোত্তরানার হঠাৎ কলকাতায় ফিরে যাওয়াটা যেন এবার রহস্যটিকে ক্রমেই ঘনীভূত করে তুলছিলো। আমাদের সকলেই একসঙ্গে বললাম, কেন?

তিনি যেন এবার একটু ধাতস্থ হয়ে চারটে জাদুঘর ডিমের জর্ডার দিয়ে বললেন—স্বদেশপ্রত্যাগ আসে তোমাদের সবকিছু বলে যেতাম—যাচোক এখানে যখন কষ্ট করে এসেছো তখন এখানেই শুরু করা যাক। একটু থেমেই বললেন হ্যাঁ, তোমাদের ভেতর জহরকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আমি বললাম সে তো আমাদের সঙ্গে থাকে না, সে তো পরশু থেকেই টেটামাচ উপভোগ করছে। তিনি বললেন—টেসিভিশানে দেখলে হতো না বুঝি? ওই তো T V সেটে দেখা না ভারতীয় দল কেমন ইনিংস পরাজয়ের ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। সত্যিই দেখলাম চাপানের বিরতির পর খেলা শুরু হয়েছে। যাক সে সব কথা, তবে জহরকে সব কথা জানিও।

অনেক ভূমিকার পর প্রবীরদা শুরু করলেন, তোমরা বোধহয় জানো পঞ্চালেশ্বর ব্যাপারে ও অস্ত্রান্ত নানা কারণে প্রায়ই আমাকে উষ্টারকাউন্টিতে যেতে হতো। মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিন করে থাকতাম ওখানে—আমার কাকামণির বাড়ীতে। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে কালক্রমে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম—তাছাড়া কাকামণি প্রদত্ত মোটাসোটা টাকা খাতিরে আমি কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় গ্রাহ্যগণের ও ডিবেটিং সোসাইটির সেক্রেটারি, মোটারনিটি হাসপাতালের অনারারি ডিক্টার, জনকল্যাণ সমিতির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইত্যাদি আবেল-তাবোল কত কি সম্মানসূচক পদে অবলীলাক্রমেই অধিষ্ঠিত হলাম। ডিউক ডিবেটিং সোসাইটির কথাই আজ বলবো। সেটাও ছিলো আজকের মতোই গ্রীষ্মের একটা ধূসর রান পাশ্চটে শনিবার। সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দিবস স্থানীয় মেয়র থেকে আরম্ভ করে গণ্যমান্য সকলেই এসেছেন সবচেয়ে পুরনো ডিবেটিং সোসাইটির রক্ত-জরজী প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে। বিতর্ক-সভার বিষয়বস্তু ছিলো “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,” তোমাদের মতো অলঙ্কারে বিবহিষ্টালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে দল গঠন করলুম। অবশ্য তারা সকলেই ভারতীয় ছিলো। বিপক্ষে ছিলো বেশ শক্তিশালী দল। মহামান্য মেয়রের সঙ্গে সকলকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। “দ্রাণ ছিল অপেরা গেটারে” বেশ জমকালো পরিবেশের মধ্যে এবার সভার কাজ শুরু হলো। বিপক্ষদল প্রথমে শুরু করলো—“মুহুর্তেই উঠলো ধূলোর ঝড়” সমগ্র এশিয়াবাসী প্রধানতঃ ভারতীয়েরা কুসংস্কারগ্রস্ত, প্রাচীনপন্থী, উচ্চভাবান্বিত, চরিত্রে বীরত্বের অভাব, গৃহযুদ্ধী স্বভাব, বিজ্ঞানের ভাবধারার অপরিপুষ্ট—ইত্যাদি আগে কতো কি? ঈর্ষাই প্রাচ্যের লোকগুলোকে যেন তীব্র বিষম্বাধানে শর দিয়ে ধরাশায়ী করলো—প্রোভাতের মৃতদেহ; করতালি যেন ভারতীয়দের বিজয়ের মাত্রটাকে বাড়িয়ে তুলেছিলো। আর শ'হুয়েক মাননীয় প্রোভাতর মধ্যে মাত্র দুটিমের ছিলো ভারতীয়, তবে বুঝেই পারছি। আমাদের অসহায় অবস্থার কথা। অনর্গল বকবকানীর উপর বটা দেড়েক পরে বনিকার বোঝা পড়লো।

এবার আমাদের পালা। দুর্নিবার গতিতে “হিটলার” করবার স্কন্ধ নিয়েই মাইক্রোকোনের সামনে গেলুম। রাগে-অপমানে সর্বোচ্চ কীপছে, মনে হচ্ছিলো যদি হাতে কোন ডুবনবিজয়ী মারগাঙ্ক থাকতো তবে কীভাবে সবলকে বশীভূত করতাম। বাই হোক আরম্ভ করলাম—প্রাথমিক সম্ভাষণের পর :—

বহুরপাঙ্ক ইংলণ্ড। ঠিক সমতল নয়, অযুত-সমতল। মাটি যেন Law আর Order এর ধার ধারেনা, সব ঋতুতেই বর্ষা। রাজি-সন্ধ্যা, মিলন-দুপুরে, শুভলগ্নে-অশুভলগ্নে সব সময়ই বর্ষা। কিন্তু হলে কি হবে—বর্ষার জল পাঁড়ার মত অসমতল দেখানো নেই। আর সে বর্ষা যে কখন ক্রটিন মাসিক কাজ আর মেজাজ বিগড়ে দেবে তারও কোন ছিঁড়তা নেই। বহিঃপ্রকৃতিতে Law আর Order এর অভাব—ইংলণ্ডের মানুষের মনকে Law আর Order এর জন্তে এক ব্যাকুল করে তুলছে। শয়নে-দুপনে ভোজন-বিলাসে শৃংখলাকে যেনে চলাই যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। আর জীবনে সেই শৃংখলাকে যেনে চলাই যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। আর জীবনে সেই শৃংখলাকে বলায় রাখতে গিয়ে এরাশে মহুযাবোধ, মমত্ববোধ ও মানবিকতার উচ্চ আদর্শের সুরটাকে আপনারা ফেলেছেন হারিয়ে। ফলে আপনাদের জীবন্ত স্বপ্নটাই হয়েছে নীরস ও নিষ্করণ পাখাদের মতো।

মহুযা সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়টা—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। মানুষে মানুষে সহযোগিতার ভিত্তিতেই এই সংগ্রামের সূচনা। সেই পুরনো দিনের সুর ধরেই মানুষ আজও মানুষকে সহযোগিতা করে আসছে। কিন্তু ইংলণ্ডে ঠিক তার একটা মহৎ বৈপরীত্য দেখা যায়—এখানে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার নেশাটাই বেশী—স্ট্রী-পুকারে, শিশুতে-যুবকে, আর প্রবানে-মরীচি প্রতিযোগিতার ফলে আপনাদের জীবনের ক্ষিপ্ৰতাটা বেড়ে গেছে ষিগুণ। কতকটা যেনের মাঠে ঘোড়াগুলো মতো—কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনাটা হয়েছে লুপ্ত। ফলে পাশ্চাত্যের লোকেরা উল্লেখ্যের মতো পৃথিবীর চারিদিকে ঘরে বেড়াচ্ছেন অসম্ভবকে পাবার জন্তে—কিন্তু পায়নি এবং পাবেনও না।

পৃথব্বের মতো যেনেরাও যেন এক একটা Type আমাদের দেশের যেনের মতো কল্যাণকামী মূর্তিটা তাঁদের মধ্যে নেই বরং ক্ষত্রমূর্তিটাই অধিক মাত্রায় পশিষ্ট। গৃহজীবনের শান্তিময় পরিবেশ তাহাদের কাম্য নয়—পাতিব্রত্যকে উপেক্ষা করে ডাইভোর্সের নেশার ঘোরে মত্ত। Western, ideas, ideas—of individualism—তাঁদের স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দিয়েছে—কিন্তু উপদেশ নিয়েছে অশাস্তিকে মনের মধ্যে পোষণ করে শান্তির জন্তে মেকি তত্ত্বামির বুখা চেষ্টা করছে—আর তার জন্তেই বোধ হয় জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সীমার মধ্যে তাঁরা আঁধার হয়ে পড়েছেন। সব সময় সব কাজ করতে প্রস্তুত—একটু এদিক ওদিক হলেই দেখে নোব জাবটাই যেন আজ তাঁদের মজাগত হয়ে উঠেছে। এদেশের সুদীর্ঘ সভ্যতার ইতিহাস—আমাদের দেশের সীতা-সাবিত্রী-বেহুলার মতো একটা নিমর্শনও মিলবে না। মিলেই বা কি সোটা কি তারা অম্লকরণ ক'রবেন? কবে সেই “স্ট্রোরেল নাইটিংলেস”র দুটো বটে গেছে—আজও তার জল ধুয়ে থাকছে, আর হুণ হুণ ধরে থাকবেও। জীবনে সমস্তা এঁরা সহ করতে পারেন না কিন্তু এঁদের জীবনেই সমস্তার প্রাচুর্যটা বেশী।

এই কথা না বলতে অভিযন্ত্রের মধ্যে বীরা মহিলা ছিলেন তাঁদের গুঞ্জনধারির মধ্যে একটা তীব্র অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পেলে। একটু শান্ত হতেই আবার শুরু করলাম।

অসমতল ইংলণ্ডের বৃষ্টির জল যেমন সমতল খুঁজেছে কিন্তু পায় নি। তেমনি যুগে যুগে এরা সাম্যের জন্তে চেষ্টা করেছেন এবং এখনো করছেন কিন্তু পায় নি এবং অবশু ভবিষ্যতও পাবার আশা নেই। তাই সাম্যের জন্তে hanker করার অভ্যাসটাই যেন আপনাদের হৃদয়ের পাজরা হয়ে উঠেছে।

নিত্য অনিশ্চিতের মধ্যে বাস করে আপনাদের জীবনের Philosophy গেছে পাস্টে। স্তব্ধের সময় দুঃখ, তুণের সময় আনন্দ, কাল দিয়ে হাসিকে এবং শত্রুতা দিয়ে বনিকের উচ্চাভিলাষকে চাপা দেবার চেষ্টাই যেন আপনাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে।

প্রাচ্যের যে গুণগুণি আছে পাশ্চাত্যের তা নেই। আবার পাশ্চাত্যের বা আছে প্রাচ্যের তা নেই। কর্ণের পরিণতির আকাঙ্ক্ষার আমরা ভাবমুখীন ও বিশ্বাসী, Prefection এর সাধনায় আপনারা দিনে রথ দেখেন। পাশ্চাত্যের মানুষেরা অর্থি আপনারা beautyর কাছে Utilityকে বলি দিয়েছেন আবার brutalityর জন্তে beautyকে কীসির মতো সমর্পণ করেছেন। কলেক্ত-জীবনে ইকনমিক্সের ক্রাসে Law of Diminishing and Increasing Utilityর কথা শুনেছি এবং পড়েছি কিন্তু পাশ্চাত্যের লোকেরা এত তাত্ত্বতাড়ি Law of Increasing Brutalityর নুশ্র তত্ত্বটা আবিষ্কার করেছেন, তা বিলাতে পদাৰ্পণ করবার আগে জানতাম না। যার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলো তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির জন্তে সুবিধিত হয়ে পড়েছেন। আর তারই কুণায় পাশ্চাত্যদেশে আজ তার আশেপাশের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছে অশান্তির বিষ আর নিজেকেও জালিয়েছে বিস্তারের আগুনে। সব কিছু থেকেও যেন কিছুই নেই—এই ভাবটাই যেন জাতীয় জীবনে শেকড় গেড়ে বসেছে।

প্রয়োজনের কাছে পরাসিত হয়ে অপ্রয়োজনের কোন অস্তিত্ব নেই—কিন্তু সে অভাব পূরণ করেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সেই রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সামাজ্য কর্মক্ষেত্রের আওতার ওপর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সীমাহীন প্রভাব বিরাজমান। হাউস অফ কমন্সের সিট থেকে আরম্ভ করে সামাজ্য কেবাণীর চাকরির জন্তে চলেছে যেন এক অবিশ্রান্ত নির্বাকচনের পালা। ভাবপ্রবলতা এ জাতটার ধাতো নেই—কিন্তু তাঁর শৃঙ্খলান নির্যেছে—ভোগবিলাসিতা। যোগ্যতমের উর্দ্ধতনে আমাদের একান্ত বিশ্বাস কিন্তু শারিরিক শক্তিকেই আপনারা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন।

প্রকৃতির কাছে আত্মকুল্যা না পেয়ে আপনারা অভিনব আবিষ্কারের নেশায় উম্মত্ত হয়ে বিজ্ঞানের অন্ধকারময় পায়ণওহার হাডড়ে মরছেন। আর সেই ল্যাবরেটোরির সালফিউরিক নাইট্রিক ও ক্লোরিন ডাইঅক্সাইড ম'শরুম গ্যাসের হৃদয়বিধারক পরিবেশে আরও অস্ত্রাঙ্ক যাতে বিনাশ হয়, সেই জন্তে শত্রু-মিত্র সবলকে আহ্বান জানাচ্ছেন। এই ভাবে আপনারা কলঙ্ক গোপন করবার বুখা চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভারত পরোপকারধর্মী প্রজাতি অল্পপ্রাণিত হয়ে দুঃখিত্তি বিশ্ববাসীকে শোনাচ্ছে তাঁর পথিত্র তপোবনের আশ্রয় ও শান্তির চিরন্তন বাণী।

দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে
দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



দাঁত ওঠার সমস্যা? বাড়ীর ব্যথা? একটা নরম কাপড়ে আপনার
আঙ্গুল ভড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙ্গুলটা ডুবিয়ে
দিন তারপর আঙুলে আঙুলে শিশুর মাজীতে মালিশ করে দিন
এবং তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে আর এর মিষ্টি ও সুস্বাদু
শিশুর প্রিয়। এটা বিশুদ্ধ এবং গৃহকর্মে, ওষুধ হিসাবে, প্রসাধনে
ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের
কাছেই একটা বোতল রাখুন।

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কুশনটা ভরে নীচের ঠিকানার পাঠান :
ফিল্মস্থান লিভার লিমিটেড, পোস্ট অফিস বক্স নং ৪০৯, বোম্বাই।

আমাকে অসুখের করে পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীনের গৃহকর্মে ব্যবহার
এখানী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার ওষুধের দোকানের নাম ও ঠিকানা

P.M.C

ডিষ্ট্রিবিউটারস : আই. সি. আই. (আই) প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

PYG. 13-X30 BG

আমরা বাগীচ বটে, অমুরাগীও বটে কিন্তু বৈরাগী নয়—কিন্তু আপনারা বাগীচ বটে, কিন্তু অমুরাগী নন—আবার ধনশোষণের আশা তিরোহিত হলেই বাজকের পদ নিয়ে বৈরাগী সাজেন।

একটু থামতেই প্রচণ্ড কোলাহল উঠলো—নানারকম প্রশ্ন আমাকে জর্জরিত করে ফেললো—কোন রকমে ফের শুরু করলাম—ইউরোপ হাড়ে হাড়ে পুরুষকার হতে চেষ্টা করেছে ধর্মকে ঠেকিয়ে রেখে কিন্তু আমরা হাড়ে হাড়ে দৈব। আপনাদের নীতি হচ্ছে একা খাটো, খেলো আর খাটো—আমাদের নীতি খাটো পরের জন্তে, খেলো অনেকের সঙ্গে এবং খাটো সকলের সঙ্গে। আপনারা নিজদের সমর্থন করছেন একনায়কত্বের কাছে, আমরা গণতন্ত্রকে মানসে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমাদের হাড়ে হাড়ে সন্ধিভাব—মিত্রভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি কতাই আমাদের কামনা। কিন্তু আপনাদের হাড়ে হাড়ে স্বতন্ত্রতাব শত্রুভাবের সাধনায় আপনারা সত্যের উপলব্ধি করতে চান। ভারতের চরিত্রের মূল কথা সময়, আপনাদের জীবনের মূলমন্ত্র বিনিময়। আমরা দরজা উন্মুক্ত করে সবাইকে গৃহে আহ্বান করি, আপনারা সবাইকে ঠেলে পথে বার করে দেন। আপনারা সব কিছুই খোঁজেন আমরা খোঁজার শেষ বলে দিই। আপনারা সব কিছুই প্রশ্ন করেন কি কেন? আমরা কি কেনের জবাব দিই। রক্তে কৌলীজের মোহে আপনারা বেন মিউজিয়ামের মিসিকার মমির মতো হতে চলেছেন। আমরা কিন্তু পথের শেষ জেনে শান্তির অগ্রদূত সেজে বসে আছি।

প্রবীরদা এমন উত্তোজিতভাবে ধারা বিবরণ দিয়ে চলেছেন, যেন মনে হচ্ছে তিনি সত্যি সত্যি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পঁড়িয়ে লোকচান দিচ্ছেন আর কাকের বেন অর্গণিত লোকজন তার শ্রোতা। ছ-একজন মাঝে মাঝে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েও দেখছেন কিন্তু সেদিকে প্রবীরদার ভ্রমকেন্দ্র নেই।

আবার তিনি শুরু করলেন—আপনাদের ছেলেদের মধ্যে আছে পুরুষ হবার কামনা কিন্তু সাধনা নেই—মেয়েদের মধ্যে আছে কল্যাণকামী জননী না হয়ে পুরুষদের সঙ্গে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আশ্রয় চেষ্টা। আমাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আছে বৌটা বদ-সয় তার পেছনে ঘোঁরা অভ্যাসটা। আপনারা দেশে বেকার সমস্তার সমাধান করতে গিয়ে দেশের লোকগুলোকে একটা না একটা কাজে জুড়ে দিচ্ছেন বেতন পাক আর নাই পাক। কিন্তু আপনারা জানেন অথচ বুঝতে চান না যে—বলদকে বেশী দিন অনাহারে রাখলে কেবল ঘানিই ঘূবে এবং ভাতবে কিন্তু তেল বেরবে না। আমরা বাগ্যতা অমুরাগী কিছু না হওয়া পর্যন্ত সব কিছুই পেতে চাই না। পূর্বের সমৃদ্ধিতে আপনাদের গলগ্রহ—যে খেলার মাঠ থেকে রাজনীতির ক্ষেত্র পর্যন্ত এই নীতি অপ্রতিহত। দেখছেন না অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এ্যাসেজ'হেরে কেমন আপনারা আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছেন? এবারে হৈ চৈ আর থামলো না—শেষে বাধ্য হয়েই মক থেকে নামলাম। পুরুষ আর নারীর দল আমাকে ঘিরে ঘরে একবার এদিকে একবার ওদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—নানা রকম প্রেমপূর্ণ তীব্র প্রতিবাদ আর "ক্যাটকল" (Catcall) উঠছে। কার কথার যে উত্তর দেবো কিছু ভাবতে পারছি না। কোন রকমে রাস্তার বেরিয়ে পড়তে পারলে যেন প্রাণে বেঁচে হাই। সত্যি কথা বলতে কি, নিজেকে বেন মনে হচ্ছেলো

উইলি ডেভিডসকে অনুপ্রাণিত এক, এ, কাপের (F. A. Cup) ফাইনাল খেলার আমি কোন বিজয়ী টিমের গোলকিপার। বিপক্ষ দলের কসভার্ডার চারিদিক থেকে অব্যাহিত স্টট করছে আমার দিকে আর আমি সিটাজেল (Citadel) রকে করতে গিয়ে পেনাল্টি বক্সে কোণঠাসা হয়ে পঁড়িয়ে রয়েছি। কি করে যে বেরিয়ে রাস্তার এসেছিলাম ঠিক তাও মনে নেই।

তারপর মাসখানেক ধরে স্থানীয় পত্রিকার আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রতি-সমালোচনা চলতে লাগলো। ভেবেছিলাম, ইউরোপীয়দের ঐর্ষ্যহীনতা সব্বন্ধে একটা চিঠি কাগজে বার করবো, যে একজন বক্তাকে তার ভাষণ সম্পূর্ণ করতে না দেওয়াকে কি বলে? চিঠির খসড়াটাও করে ফেলেছিলাম কিন্তু ওই পর্যন্তই, আর এগুতে সাহস হয়নি। আবার যদি একটা বিভ্রান্তি ঘটে।

কাকামণি বেগে বললেন—এমন বদমাশ ছড়াবার জন্তে তোমাকে লগুনে নিয়ে আসা হয়নি। মনে দুঃখ পেলাম, আর তাই চলে যাচ্ছি। কিন্তু বাবার আগে এই লুপথ করছি আর কোন দিন কোন সম্মেলন বা বিতর্কসভার বোগদান করবো না, এমন কি শ্রোতা হিসেবেও নয়।

বড় হাসি পেলো কিন্তু প্রবীরদার সামনে হাসতে পারলাম না। এতক্ষণে "ইণ্ডিয়ান মজলিসের" বাগ্যারটার পদভাগের কারণ স্পষ্ট হয়ে গেল। সনৎ বলে ওঠে, আর সেই অনার্যারি পোষ্টগুলো কি আপনি ছেড়ে দিলেন?

প্রবীরদা বললেন আরে ভাই, এত কাণ্ডের পর কি আমার আর রাখে, সেই রাড্রেই আমাকে বাতল করা হয়েছে। মোহন বলে উঠলো প্রবীরদা, আপনি রাগের মাথায় সবই বাজে কথা বলছেন?

প্রবীরদা বললেন, তা জানি না, তবে এর বেশীর ভাগটাই যে সত্য নয় এটা তুমি নিশ্চয় জেনো। হঠাৎ প্রবীরদা বললেন, আমি খুব জোরের কথা বলে ফেলেছি, না? আমরা বললাম কেন? প্রবীরদা বললেন, যদি কেউ শুনে নেয়? আমরা বললাম, আপনি তো বাঙাল্য বলছেন। তিনি বললেন, তা হোক কাছেই *** সোসাইটির একটা ব্রাক আছে। যদি কেউ সভ্য *** আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে।

আমি পুনরায় বললাম প্রবীর দা, ঘটনাটা কবে ঘটেছিল আর তারপর কি কখনো আপনি উঠার কাউন্টিতে গেছেন?

প্রবীরদা বললেন, সেটা প্রায় মাস দেড়েক আগে ঘটেছে আর তারপর খুব একটা জরুরি কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে বাধ্য হয়েছি উঠার কাউন্টিতে। সেও এক মহা বিভ্রান্তি, যতই উঠার কাউন্টি কাছে আসছে আর দূরের ইম্পিরিয়াল ক্যাথিড্রাল স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে, ততই বেন হুংপিণ্ডের প্রতিক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে আসছে। ঠিক হয়ে না বসতে পেরে উলখুস করছি দেখে একজন অস্ট্রিয়ান সহবাত্রী বলে উঠলেন, আপনাদের কি অন্তঃস্ববোধ হচ্ছে? নিজের অন্ত্যাত্তেই বলে ফেললাম, হ্যাঁ। তৎক্ষণাৎ তিনি এয়ার হোটেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—যত তিনি কাছে এসে সহানুভূতি দেখিয়ে প্রস্রবের কথা জিজ্ঞাসা করেন ততই বেন মনে হয় হ্যাঁ একেও বেন সেই ভিড়ের মধ্যে দেখেছিলাম—খুব খিঁচিয়ে কি জিজ্ঞাসা করেছিলো। কি জানি বাবা, সমবেদনা দেখাতে গিয়ে মিছুরি ছুরি মারবে না তো?

অকাজের কাজ

সুবোধ রায়

আব্বা! আলো! অন্ধুট! নৃব গুঠনি তখনো বালিগজের আকাশে। মুহু মুহু ঝিক-ঝিক বাতাসে সীতের আমেজ। পূজা আসছে, তারই পূবাভাস। হোস পাইপের জল বকবকে কালো, পীচের রাস্তায় তখনো শুকোয়নি।

প্রাতঃমণের উদ্বেগেই বেরিয়েছিলাম। রোজ বেরোই। হঠাৎ থমকে থেমে গেলাম। কোঁকোদ্বীপক দৃষ্টই বটে। তা ছাড়া সর্ব ব্যাপারে আমি আবার একটু বেশি মাত্রায় কোঁতুলী। এমনতর আগ্রহাভিষা ভালো কি মন্দ ঈশ্বর জানেন। তবে বরাবর লক্ষ্য করেছি আমার অস্থিতে সজ্জায় মিশে আছে ঔৎসুক্যের অন্তঃসলিলা ফল। কোঁতুললের ত্রুণিবার নেশা। অতএব দাঁড়িয়ে গেলাম। দাঁড়লাম নিদারুণ উৎকর্ষায়। ইচ্ছাসন্ধেও আর একটি পা-ও অগ্রসর হতে পারলাম না। কি ব্যাপার! কে লোকটি?

যথাসম্ভব নিজেকে আড়াল করে লোকটা বসেছে একটা গাছের গুঁড়ি বেঁধে। কোলের ওপর খাবারের একটা মস্ত চ্যাঙারি। কচুরি, নিমকি, শিঙাড়া, জিলিপী, রসগোলা, রসকদম আরও কতো কি যে রকমারি খাবার। ঠাঙ্গা চ্যাঙারি ঝাঁক নেই কোথাও। একেবারে রাজসিক, রাজকীয় খাবারের আয়োজন। কি আশ্চর্য!

এত রকমের লোভনীয়, মুখরোচক খাবার সামনে অথচ লোকটা থাকে খুঁটে খুঁটে। থাকে সাবধানী হাতে। কপণের মতো। হাতের কাছে অমন সব সস্তেস জিনিস। কোথার টপাটপ গপাগপ এক ধারসে সাঁটিয়ে যাবে, তা না, খুঁটে খুঁটে থাকে শুধু চিলকে আর শুড়ো শুড়ো ফুলকিগুলো। জিলিপী হাতে নিয়ে থাকে শুধু জিলিপীর বাড়তি প্যাচ আর ফুসে দাঁড়াগুলো। রসগোলা মুখে কেসে, মুহূর্তের জন্ত রাখছে শুধু মুখের ভেতর। তারপর আবার উগরে কেসেছে, আন্ত, গোটা রসগোলাটাই। লোভকেনিও তাই।

কি অন্ধুট! এ আবার কোন দেশী খাওয়া? এমন ঠাস বুনান, উজ্জ্বল ত' আর দেখিনি কখনো, লোকটা পাগল নাকি? কিন্তু চেহারা আর সাজ-শোশাক দেখে ত' একেবারে ভিখারি কিংবা পাগল বলেও মনে হয় না। তবে? এক চ্যাঙারি এতো রকমের ভালো-মন্দ খাবার। এই মাগ'গি গুণ্ডার বাজারে কি সোজা কথা! বলিহারি শব্দ বটে। কিংবা হতে পারে, বোধহয় ক'দিনের জমানো পরস খরচ করে আজই একটু খাচ্ছে প্রাণের আশ মিটিয়ে। বোধহয় কোনো কারখানার মিস্ত্রি। রেইরেট কিংবা হয় ত কোনো মিস্ত্রির দোকানের কর্মচারী। ঠিক তাই। চুরি করেছে। লোপাট করেছে। খিড়কি দুয়ের দিকে পাচার করেছে মাল। এ নির্ণাত হাত সাফাই। আবার ও কি কাণ্ড! শালপাতার মোড়ক নয়, এবার অর্ধ

কিপ্রত্যয় হাঁটুর কাপড়টা তুললো লোকটা। দগদগে যা। জাহুসন্ধি থেকে উল্লস্রাস্ত পর্বস্ত। অসংখ্য বিজবিজে মাকড়সার ডিমের মতো যা। ঈষৎ ইরিত্রাজ। খোস পাচড়া? দাদ? কে জানে! কাউর-খাও হতে পারে।

আহার ছেড়ে এবার শুরু হল চুলকানি। বসর বসর সে কি বিরামহীন, প্রাণান্তকর চুলকানি! একান্ত তন্ময়। সম্পূর্ণ তৃতীয় ভাব। কোনোমিকে দ্রুতগত নেই। একেবারে বাহজ্ঞান শূন্য। আরও আরও জোরে। পাঁত-মুখ ঝিঁচিয়ে দু হাত দিয়ে পাংগলের মতো চুলকোচ্ছে ত চুলকোচ্ছেই। চিড়ঝিকানি বোধহয় বেড়েই চলেছে ক্রমশঃ। পোড়া বামা কিংবা একটা কোবরা পাংগলের ঢাকনা যদি পেত হাতের কাছে। কিংবা হাতের নখগুলি যদি ভয়ঙ্করী নৃপংখ্যার মতো ক্ষুরধার হস্ত—একেবারে কুরিয়ে কুরিয়ে মনের সুখে লোকটি বোধহয় চুলকোতো জ'হলে।

এইবার—আঃ, এতোক্ষেণে নিঃসৃত। এবাম তুফী ভাব। মুখে চাপা স্বগীর হাসি। বেন ভোর হয়ে এসে দুর্ধোগের রাত্রি। ফাকাশে, জোসো রক্ত চুষে পড়ছে উরু বেয়ে, দাগড়া দাগড়া যাকলো খোপ খোপ হয়ে ফুলে উঠছে। কবানি গড়াচ্ছে। রোগা, শীর্ণ আত্মলগ্নোতোও মাশামাধি।

নখাঞ্জে আঠার মত আটকে আছে পাঁশুটে রক্তের ঘায়ের খোসা। হাতের নীল নীল শিবার জটগল আরও রক্ত, প্রথম হয়ে উঠছে। ইলেকট্রিক-পোষ্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছি সব। নির্নিমেষ, রুদ্ধশ্বাস, ঐ আবার। একটা রসগোলা টপ করে পূরে দিল মুখে। বার করলো খানিক বাদেই। তেমনি গোল, আন্ত রসগোলা। রসের খুরিতে একটা রাখে আরেকটা মুখে পোরে! কখনো চমচম, কখনো বা রাজভোগ। আবার রাখে আবার খায়।

ভারি-মজা! এ এক আশ্চর্য রগড় বটে! চর্বেণ অনিচ্ছা! ভক্ষণে অঙ্গুচি। রসে টাই-টব্ব রসগোলা আর রাজভোগের কুহরে কুহরে যে পুঞ্জিত রস। শুধু তার রসায়ননেই লোকটার তৃপ্তি বোধহয়! আলতো টোকা দিয়ে আঁঠুনের মুহু চাপে এবার মুচড়ে দেয় মুচমুচে নিমকি আর শিঙাড়া। শিঙাড়ার পেট কেটে শুধু ধোঁয়া নয়, মশলামাখা হলদে হলদে আলুর টুকরোও বেরিয়ে পড়ে। একেবারে টাটকা। মানে হাতে-গরম।

নিমকির ভাজা পাণিড়ি আর ঘায়ের পাঁশুটে রক্তের খোসা একাকার হয়ে যায় সব। কিছু কিছু সেঁটেও যায় রসগোলা আর লেডিকিনির গায়ে।

কুংসিত শ্রাকারজনক দৃশ্য! বিরক্ত লাগে। গা যিনযিন করে। তবু আশ্চর্য! তবুও ঠায় দাঁড়িয়ে দেখি।

যড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম, রাত্রি প্রায় আটটা বাজে। সকলে একসঙ্গে প্রবীরদার জ্যান্তার গাড়ীতে উঠে বসেছি। পিকাডালি বিভিন্ন রক্তের নিওন সাইনের আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে অপক্লপ রূপের দ্বারা ছড়িয়ে দিয়েছে! অবিশ্রান্ত ঝিরঝিরে বৃষ্টি পথচারীদের রেখাকোটে মুড়ে দিয়েছে। বাড়ির কাছে ছেড়ে দিয়ে প্রবীরদা চলে গেছেন, আকাপটা আরও গাঢ় লাল হয়ে আসছে।

বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে সনৎ বলে উঠলো, প্রবীরদা যে এত ভীতু লোক তা জানতাম না, আহা বেচারী!

আমি বললাম আরে থামো থামো, ইঁপুয়ান মজলিসে না গিয়ে ভালোই করেছি, প্রবীরদার জাখান ডিস আর লেকচারের দৌলতে বেশ ভালো ভাবেই জমে উঠেছিল ক্যাকের মজলিসটা।

এখন আর বাস্তা তেমন জনবিরল নয়। চকচকে গাছের পাতায় আলোর অরুণিমা। সিঁদূর-রঙা সূর্য উঠছে পূব-আকাশে। শুরু হয়েছে লোকচলাচল। এক বিশালকায় অ্যালসেসিগান নিয়ে যাচ্ছে এক তরী আধুনিক। আঁটসাঁট ব্যতককে বোবন। রোজ যায় এই সময়। হটকটে অ্যালসেসিগানকে কিছুতেই সামলাতে পারে না মেয়েটা, হিমসিম খায়। কুকুটাকে কাছে আসতে দেখেই বোধ হয় লোকটা ছড়ছড় করে উঠে পাড়ায়। ছড়ানো শালপাতাগুলো কুড়িয়ে নেয় মাটি থেকে। তারপর চ্যাটারিটা শালপাতায় ঢেকে শুরু করে পথ চলা।

একটু ব্যবধান রেখে আমিও অনুসরণ করি যন্ত্রচালিতের মতো। রাসবিহারী এভিনিউ ছাড়িয়ে লেকভিউ রোড। তারপর দক্ষিণমুখী সার্ভার এভিনিউর দিকে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে বেঁকে যায় লেক রোড। হাল ক্যাসানের মস্ত বাড়ি। মোজাইক করা বোর্ডে গোল গোল মস্তুর কালো খাম। ভেতরের নহনাভিগায় বীক। সিঁড়ি ছবির মত দেখার বাইরে থেকে। আর বুলবালার কিনারে সারি সারি কতো রকমের যে ফুলের টব। পিটানয়া, ডায়নামাস, ভার্নো, হলব্রুজ কসমস, ক্যালোগুলা আর হেলিয়ানথাস।

গেট খুলতেই প্রতীক্ষমান ছেলে-মেয়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। একবারে ঘিরে ধরে; হেঁকে ধরে লোকটিকে। ভবানী এসেছে—ভবানী এসেছে রাজাদি, ফুলদি, বাবলু, মিটু আর ঈগণির। পদ। সরির ঘুম ঘুম চোখে ব্রথবাসা হুট তরুণীও আসে পিছন পিছন। হাতে জড়ানো কাঁপানো আলগা খোঁপা। হু-এক পাছি চূর্ণকুন্তল ফুলে কপালে। বোঁপার নিচে মস্ত খেতাব গ্রীবা। আরেকটি মেয়ে এলোকেঈ। তারপর হুডোডি, টানটান, কাড়াকাড়ি। কে আগে পায়। কে বেশি পায়। সকলের কণ্ঠ ছাপিয়ে ওঠে রাজাদির বোধ হয়।

কাঁড়া, কাঁড়া, আমি ভাগ করে দিচ্ছি। এই পল্ট—মীনা কোথায় রে? হুঁচকান, বুলবুল, শম্পা, চিত্রা তোর সব কাঁড়া ঠিক হয়ে। কে কার কথা শোনে। খাওয়ার নেশায় ভখন মস্ত সব। কোলাশিবল গেট পেরিয়েই কোঁচ, সোকা ছড়ানো অধঃস্থাকার বারান্দা। সেখানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই চ্যাটারির খাবার ছত্রখান হয়ে পড়ে।

এ কি, আজও যে দেখছি ভাড়াচরো খাবার। খিঁচিয়ে ওঠে রাজাদি : কোনদিন ফুরো তাজা করে, কোনদিন তোর রিক্সার ধাক্কা লাগে—খানার পড়িস, কোনদিন বা হোটেল খেয়ে—আজ কি হয়েছে শুনি? রসগোল্লাটা টপ করে মুখে ফেলে দিয়ে রাজাদি আবার কঠিন কণ্ঠ বলে : আজ কি হয়েছে বল ঈগণির।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে আমন্ত্রণ আদায় করে প্রায় কান্নার মতো বলে ভবানীচরণ : চিল হেঁ। মেরেছিল দিমিগি।

একবারে মিনকে রাত। রাগে বাঁ বাঁ করে ওঠে আমার সর্বাঙ্গ। বটে যে হারামজাণ। মিথ্যুক শরতান। বদমাইসি করবার আর জায়গা পাও নি?

প্রকটানু পর্বন্ত জলে উঠছে আমার : পুলিশে দেব। খুন করবো। হাড় ভেঙে তোর গুঁড়ো করে দেব হারামজাণ, শূয়ার কা বাচ্চা।

তাই শু কি করা যায়! হট করে বাওয়াটা সমীচীন হবে কিনা তাই ভাবছি। বাবো? কতি কি? বাই, বলেই আসি। একবার ঘনস্থির করি, আবার পিছিয়ে আসি লজ্জায়। মোবটা কোথায়? খুঁজকে বা কিছু দেখছি, সব খুলে বলবো। আমি ত আর বানিয়ে কিছু বলতে বাচ্ছিনে?

কিন্তু ওরা যদি—

বয়ে গেল। আমার কর্তব্য ত আমি করে বাই। নাঃ, অনর্থক ঘেরি হচ্ছে। এখানে খাওয়াও প্রায় ওদের শেব হ'য়ে এল।

ঐ আবার। ডুয়েশাডি একসঙ্গে মুখে পুরেছে হুঁ-হুটো রসগোল্লা। এলোকেঈও তাই। মুখ চলছে সবার।

নাঃ, আর এক হুহুও ঘেরি নয়। কৃতসংকল্প। মূঢ়প্রতিজ্ঞ আমি। বৃকে অপরিচীত সাহস সঞ্চর ক'রে হুঁ পা কেবল এগিয়েছি, এমন সময়—

এমন সময় ভীরবেগে নিকশিত হ'ল সেই মর্মবিদারী, মৌক্ষ্য মারণান্ত্র। লোকটা কি বেহায়া দেখেছিল? ভখন থেকে হাঁ করে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। জুড়িয়ে লাট ক'রে কিলে তবে জব্ব হয়।

বলে কি? কি সর্বনাশ! এ যে তাজব কাণ্ড। বার জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর। কিন্তু আমাকেই কি? না বোধ হয়। অস্ত্র কাউকে। মনগড়া সাহুনা লাভের আশায় চারদিকে নির্বোধের মতো ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকাই খানিক। না। আশেপাশে আর ত'কেউ নেই কোথাও। বিবেকদীপ আমারই উদ্ভ্রমে। লক্ষ্য বস্তু আমিই। নিঃশব্দ নিঃসংশয়ব্রতে পারি পরক্ষণেই। চিলকণ্ঠে কে বেন বলে : সিতে হয় চোখ দুটো গলে, তবে ঠিক হয়। অসভ্য লোখার। জুতোটা ছুঁড়বে নাকি? ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। আলুখানু বেশ। রাগের চোটে রেলিঙের ওপর যুঁকে পড়ছে মেয়েটা। পারবে ত'লাফায় আর কি। জুতোটা এবার সত্যিই খুলছে পা থেকে। আর সে কি বিকট দীর্ঘনিশ্বাস : হাঁ ক'রে গিলছে ত্যাক না? বেন বাশের জন্মে মেয়েমাছুষ ভাখেন। রায়েল—জানোয়ার কোথাকার।

এর পর এখানে আর কাঁড়াবে কোন্ আহ্বায়ক? এর পর বা ঘটবে, সে ত জলের মতো স্পষ্ট। সে কথা জানতে কানো দিব্যদৃষ্টি কিবা অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। আসবে ঠাকুর, চাকর, দরোয়ান। হকিষ্টিক হাতে স্পোর্টসম্যান দানার দল এক সেই গৌরব-গৌরব নোজের সঙ্গে সহযোগিতা করত বিপুল উৎসাহে এগিয়ে আসবে অগণিত পাড়াচুতো দানাবাহিনী। শুণ্ডা, বোম্বটে, রকবাজ। তার পর মেয়ে তক্তা বানিয়ে সিতে আর কতোক্ষণ? কে যুববে সেই মায়মুখো অক্ষৌহিনীর সঙ্গে? সব সাইকোলজি আমার জানা আছে। কে স্তমবে? কে তখন বিশ্বাস করবে আমাব কথা? জ্বীলোকের পক্ষে ওরা বাবেই বাবে। আগে এলোপাখাড়ি, বেথড়ক মার, তার পর অস্ত্র কথা। কীসি আগে, তার পর বিচার।

অন্তএব চোঁচা পোড় হাড়া উপায় কি?

তাই করলাম। হুটলাম উর্ধ্বধাসে। দিবিদিক-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে। ল্যাণ্ডাউন পেরিয়ে মহারাজা নন্দকুমার রোড, তার পর বতীন দাস, জনক রোড—সদ'র শব্দ নিয়ে একে-বৈকে বড়ের বেগে ছুটেছি। পায়ে ভখন আমার অলিম্পিক-বিজয়ী সদ'র মিলাখ সি-এর শক্তি। লেক-মার্কেটের সামনে এসে তবে নিশ্চিন্ত। বাঁচলাম হাঁপ ছেড়ে। যথাক্ত শরীর। দ্রুত নিঃশ্বাস। বৃকটা তখনও আমার গড়কড় করছে। করক। জবর একটা কাঁড়া কাটলো বাহোক ১০-কিন্তু তাই ত, কি সর্বনাশ! শুণ্ডা ঈহু নর, খোয়া গেছে আরও একটি মূল্যবান জিনিস। আবার হাতড়লাম পকেট। না কোথাও নেই। আমার জতো সাধের লাইকটাইম পার্কার। হার রে, কোথায় কখনো যে ছিটকে পড়লো।

পঁচাত্তর টাকা দিয়ে কিনেছিলাম কলমটা এই সেদিন।



দীর্ঘ, কৃষ্ণ ও

উজ্জ্বল

কেশরাশির জন্য...

এরাসমিক

পারফিউমড

কোকোনাট হেয়ার অয়েল

এখন এই নতুন আকর্ষণীয় বোতলে।

হুই রকম সুন্দর সুগন্ধে
গোলাপ ও যুঁই





[Fulton Oursler এর 'Modern Parables' থেকে]

(সত্য ঘটনা)

অমিয় ভট্টাচার্য

কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। চারদিকে বোমা-বৃষ্টি। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে সহর থেকে সহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে। বিভীষিকা, আতঙ্ক।

গ্রামপ্রান্তে বিল আর টেলার ছোট কুটিরখানি। বড় স্তম্বেই ছিল তারা। কিন্তু সেই শান্তির হুটিরও আগুন লাগলো। ছাই হয়ে গেল স্তম্ভের সসার-....

বিল তখন তার সঙ্গীদের সঙ্গে পাহারা শিখিল এক বাঁটিতে। বুম্-বুম্-বুম্। স্তম্ভ হ'ল ধসসোলা। বিলের সাথীরা উড়ে গেল হিন্ন-ভিন্ন হয়ে।

বিল কিন্তু মরলো না। বাড়ী থেকে যাত্রা করবার সময় ট্রেলাকে সে বলে এসেছিল, ভয় নেই ডালি, আমি ফিরে আসবেই। তাই বৃষ্টি বিলের জীবন কেড়ে নিতে পারলো না সর্কবিক্ষাসী বোমা।

ডাক্তার, নার্স, সবাই কিন্তু বললো, বিল মরেছে। হ্যাঁ, মৃত্যু নয় তো কি? কি থাকলো বিলের? পক্ষাঘাতে সম্পূর্ণ পঙ্গু, চলছক্তিহীন, বাড়ি নড়াতে পারে না, মুখের বাণী চিরকালের জন্য শুক হয়ে গেছে। মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ এই জীবন।

ট্রেলা কান্ডের শেষে সন্ধ্যার এসে বসে স্বামীর শয্যার পাশে। মাঝে মাঝে বিলকে ডাকে। বিক্ষারিত চোখে বিল দেখে ট্রেলাকে, অকুট আর্তনাদ বেজে ওঠে কণ্ঠে, তারপর অবসাদে ঢলে পড়ে শয্যার। বিলকে নিয়ে এমনি ক'রে জীবন ও মৃত্যু অকরণ খেলা খেলতে থাকে।

ট্রেলার মনিব বড় ভালো মানুষ। বিপত্নীক প্রৌঢ়। ট্রেলাকে সাহায্য করেন। পার্কে রেষ্টোরাঁয় নিয়ে যান। সিনেমায় নিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। না ভুললে, নিজের হাতে ট্রেলার চোখের জল মুছে দেন। এক রাতে—পার্কের আলোগুলো জ্বল হয়ে এসেছে আকাশে। ফিকে জ্যোৎস্না এক মোহময় পরিবেশ রচনা করেছে। ট্রেলার নরম হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে মনিব বললেন, বুধা চেষ্টা! ট্রেলা! তোমার সেবা, তোমার স্বামিভক্তি, সব কিছু তুচ্ছ করলো করাল নিয়তি। কোন আশা নেই। বিল কোনদিনই আর ভালো হবে না। ঐ জীবমৃত অবস্থায় তাকে হয়ত দীর্ঘকাল থাকতে হবে। তুমি কি তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করতে চাও অকারণ প্রতীক্ষায়? তোমার সমুখে অক্লান্ত সত্যবান, উজ্জল

ভবিষ্যৎ, তুমি অকালে নিঃশেষ হতে চাও পঙ্গু, অধর্ম্য স্বামীর সেবা ক'রে?

ট্রেলা যেন পাণাণ। সমুখে দুটি প্রসারিত ক'রে যেন অনাগত ভবিষ্যৎকেই নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

ট্রেলা অবশেষে বুঝলো, মনিব ওকে বিয়েই করতে চান। বিনিময়ে ট্রেলা পাবে অগাধ ঐশ্বর্য, আর বিপত্নীক প্রৌঢ়ের ভুক্তাবশিষ্ট ভালবাসা। ট্রেলা যেন জীবন-পাথের এক বাঁকে এসে পড়েছে। দুই দিকে পথ। একটা পথ তাকে বেছে নিতে হবে।

তারপর এলো সেই ভয়ঙ্কর রাত। স্বামীর পাশে বসে ট্রেলা ভাবছে। সত্যি তো, নতুন জীবন, উজ্জ্বল যৌবন, অক্লান্ত আশা, শরীত স্বপ্ন, সবই সে বিসর্জন দেবে এক পঙ্গু, অধর্ম্য স্বামীর নিষ্ফল সেবায়? কি ক্ষতি হয়, যদি সে নিঃশেষে মুছে ফেলে দেয় স্বামীকে তার জীবন থেকে? অবোধ জড়পিণ্ড, ওর কাছে না এসেই বা কি ক্ষতি? ও তো দেখতেও পায় না, বুঝতেও পারে না। ওই তো মড়ার মত পড়ে আছে বীভৎস মূর্তি নিয়ে।

ট্রেলা উঠলো। বিলের মুখের দিকে একবার তাকালো। 'না—না।' হঠাৎ স্বদর মথিত ক'রে এক আকুল কান্না বেজে উঠলো তার কণ্ঠে। বিল যে তার জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনে জড়িয়ে আছে। দুই হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মত কঁদে উঠলো ট্রেলা।

আর ঠিক সেই সময়েই বিশ্বনিয়ন্ত্রার ইঙ্গিতে পট পরিবর্তিত হলো। অতীতের সেই স্তম্ভের জীবনে বিল ট্রেলার কান্না মোটেই সইতে পারতো না। অভিভূত হয়ে পড়তো, ট্রেলার চোখে জল দেখলে সেও কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো ট্রেলার সঙ্গে—

আজ আবার যেন সেই দিন ফিরে এলো। দ্বীর কান্না শুনে হঠাৎ নড়ে উঠলো বিলের নিখর দেহটা। এক অব্যক্ত কান্নার গোটা অঙ্গ চলে উঠলো, মুখ থেকে বেকলো এক তীব্র আর্তনাদ আর সঙ্গে সঙ্গে—

হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে ভাওয়াও। কথা বলে উঠলো বিল—যেন শান্ত সমুদ্রে বড় উঠলো, বিদ্রুদ্ধ তরঙ্গ গজ্জন ক'রে উঠলো, ট্রেলা, ট্রেলা, তুমি ফিরে বাও, ফিরে বাও, তুমি সখী হও।

তারপর আবার কঠিন স্তম্ভতায় ঢলে পড়লো বিল। চোখের দুটি ঝাপসা হয়ে এলো, পাণ্ডুর মুখে নামলো মৃত্যুর ছায়া—চোঁচিয়ে উঠলো ট্রেলা, 'নার্স', ডাক্তার, কে আছে, শীগ্গির এসো, সব বৃষ্টি শেষ হয়ে গেল—'

ডাক্তার, নার্স এসে ট্রেলাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেলো।

ট্রেলা পাগলের মত বলতে বলতে চলছে, 'ভগবান, ওকে কেড়ে নিয়ো না, ও যে আমার কান্না শুনেছে—ও যে আমাকে চিরকাল ভালোবাসে এসেছে, তাই তো আমার কান্না সইতে পারে না, তাইতো আমাকে ও যেতে বলছে।

কিন্তু যেতে বললেও তো বাওয়া যায় না? চিরকাল যারা ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা, তাদের ছাড়তে তো ভগবানও পারেন না। বাহুমন্ত্র নয়, সে দিন চলে গেছে। কিন্তু বিশ্বাস, প্রেম, নিষ্ঠা তো আজও মরে নি? তাইতো অবচল আজও ঘটে। তাই তো চরিত্র ঘটার মধ্যে বিল উঠে বসলো, হাঁটতে শিখলো—ট্রেলার হাত ধরে! অপরাধিত প্রেমিক হুঁ ধরে আনন্দ ছড়িয়ে ফিরে গেলো চির-নতুন প্রেমের নীচে।

প্রাণজলি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যান্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

চীন ও জাপান

১১১৬ সালে হরীশ্চন্দ্রনাথ ঠাকুর জার্মানকে ও উইলি পিয়ার্সনকে নিয়ে জাপান ভ্রমণ করলেন। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমি কবির সঙ্গে এই প্রবাসভ্রমণের যোগ দিয়েছিলাম। চীন ও জাপান,—এই দুই দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতার উদার প্রবাহ,—এই দুই দেশ দেখার আগ্রহ আমি অনেকদিন থেকেই মনে পোষণ করে আসছিলাম। এই দুই দেশের ভাবনামূলক ও ধ্যানধারণার অস্তিত্ব অশ্রু বৈশিষ্ট্য। কোনো প্রতীচী দেশবাসী যদি মানব সভ্যতার বিবর্তনকে অনুধাবন করতে চান তাহলে প্রাচ্য ভূগতের এই দুই দেশকে নিষিদ্ধভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। তাহাড়া জার্মান আগ্রহের আরো কারণ ছিল। বহু প্রাচীন কাল থেকে চীন ও জাপান বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ অনুগামী, এবং এই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকেই চীন জাপানে প্রচারিত হয়েছিল। জাপানী লেখক ওকাকুরা কাহু থেকে এই দুই প্রাচ্য সংস্কৃতির অনেক শিক্ষা আমি লাভ করেছিলাম। ভারত ও চীন-জাপানের সাংস্কৃতিক মৈত্রীর বোধনুত্র আমি লক্ষ্য করব,— এই ছিল আমার প্রধান অভিলাষ।

প্রাচ্য ভূগতের বৌদ্ধভাষ্য ও প্রতীচী ভূগতের বুটান সভ্যতা নিয়ে গভীর করে বংশের ধর্ম আমি পড়তাম ও চিন্তা করছিলাম। সমগ্র পৃথিবী বুড়ে মানবজাতির ইতিহাস ও বিকাশ এক নসময়সময় আগ্রহের পথে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্মমতের উর্ধ্বে মানব ধর্মের গভীরে এক মৌলিক ঐক্য বর্তমান, এও সত্য। দক্ষিণ-আফ্রিকার যতাদু বাসীরা সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আমি ভারতের সেই মহান জাদুঘরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, যার নাম অফিস্ট্র। এই জাদুঘর বুড়ের পুরনো বাসী। ভারতের অফিস্ট্রা ধর্ম ও বুটানের প্রেমধর্মের মধ্যে মৌলিক বন্ধনকে আমি দিনে দিনে উপলব্ধি করেছিলাম। আমার কেবল মনে হতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মবোধের এই মানবিক ঐক্যকে যদি অন্ধর দিয়ে হাছুর বিশ্বাস করে তাহলেই অন্ধ-মন্দিরে জীবনসংসারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়, তাহলেই জীবন মানব সমাজ যের বিজ্ঞান বিহীন এক মহান ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপিত করতে পারে।

জাতিগত জন্মে জাপানীদের সমান বোধ, বীর্য ও নৈতিক শক্তির কথাও আমি অনেক ভুলেছিলাম। কবে জার্মান ভ্রমণে গিয়েছিলাম।

ভারতবর্ষ থেকে আমন্ত্রিত কবিকে জাপানীরা মন-প্রাণ দিয়ে বুঝতে পারবে, অকুণ্ঠ হৃদয়বোধের সঙ্গে অভ্যর্থনা করবে।

ভবিষ্যতে দুই প্রাচ্যে আরো কয়েকবার ভ্রমণের পর আমি দেখছি যে আমার ধারণা সত্য। কিন্তু কবি যখন এই প্রথমবার দুই প্রাচ্যে গেলেন, তখন নিত্য প্রতিকূল সময়েই তিনি গেলেন। রবীন্দ্রনাথের তাপ তখন শিথিলে উঠেছে। যে সব কারণে পাশ্চাত্য সমাজের জিজ্ঞাসা পূর্ণাঙ্গ বিনষ্ট হয়ে বসেছে, সেই সমস্ত কারণকে জাপান তখন অন্ধ ভাবেই অনুকরণ করছে।

কবি ও উইলি পিয়ার্সনের সঙ্গে একদিন আমি কোবে শহরে এক শিল্পবিদ্যালয় দেখতে গেলাম। ছোট ছোট শিল্পের ইউনিফর্ম পরে মিলিটারি ছিল করতে। জাপানীরা প্রতিটি জামায় বেশ কৌতুকব লাগল। কিন্তু কবির গভীরতর হৃদয়ভুক্তিতে প্রাচ্যের মনো বাস্তব এই বুড়ে। বুড়ের উদ্ভেদনার শিল্পচিত্রকে কী ভাবে কল্পিত করা হচ্ছে তা তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। পক্ষ বিজয়ের নানা নিদর্শন বিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো হয়েছে। সেইগুলির প্রতি কবি আমাদের বুটী আকর্ষণ করলেন।

জাপানের প্রতিটি শহর তখন কর্মীর বুদ্ধবুদ্ধতির কর্কশ নির্ধোরে ধনিত হচ্ছে। সৈন্যবাহিনী করছে অবিরাম কুচকাওয়াজ। প্রতিটি সংবাদপত্র প্রতিদিন ভঙাছে ঘুরে ঘুরে জমী উদ্ভেদনা। দেশের সমস্ত আবেগেরা বুড়ের বুদ্ধি বাশে ভরপুর। কবির সঙ্গে প্রথম প্রথম জাপানী নাগরিকেরা সাক্ষাৎ করতে এসেন। তাঁদের আদর এ কথা বললাম। উত্তরে তাঁরা বললেন যে এই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কৃপকর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ হাড়া উপায় নেই। পাশ্চাত্য ভূগতের বর্ণপ্রভৃতি হতো সিন বর্ণিত থেকে বর্ণিত হলে ততো সিন প্রাচ্যের কোনো দেশের পক্ষেও এই একই পদা অনুসরণ করা হাড়া বলা নেই।

ভ্রমণে কিছু দিন কাটাবার পরই অল্প আয়রা বুঝতে পারলাম যে জাপানের যে সমস্তকার বাহ্যিক রূপটা বতো কুসিই দেখাক বা কেন, এই কল্পনা বেশি দুই গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি, বিনষ্ট করতে পারেনি জাপানের জাতীয় আত্মকে। জাতীয় সভ্যতার নিষ্ঠিত প্রাণবস্ত্র ঠিকই আছে, অপরিবর্তিত অমান।

একটি গভীর হৃদয়বোধী ঘটনা উল্লেখ করি। জাপানের পার্শ্বভুক্ত অঞ্চলে আদর প্রদান করছিলাম। বেশ কতৃপক্ষের নির্ধো

একটি ক্ষুদ্র অখ্যাত ট্রেনে আমাদের গাড়ি থামল। সেখি একমল বৌদ্ধ পুরোহিত সেখানে অপেক্ষা করছেন, পরনে তাঁদের ধর্মীয় পোশাক। কবিত্ব সন্ধান জানাতে উপচার হাতে তাঁরা এগিয়ে এসেন। কারুণ্য-বেদনার বলিরেখায় পুরোহিতদের মুখমণ্ডল আকর্ষণ। করুণাঘন প্রভু বৃদ্ধের প্রেমকন্ড তাঁদের অন্তরে প্রবহমান, যিহের বেদনাধকনার ভাবে মন্থর তাঁদের দৃষ্টি। এই বৌদ্ধ সাধুদের সৌম্য মণ্ডলীকে ঘিরে ঈড়াল ভল্লী পোশাকপরা জাপানী সামরিক কর্মচারীর দল। এদের পুরোভাগে এসে ঈড়ালেন কবি—অন্ত জগতের এক আশ্চর্য মহাপুরুষ। মুখে তাঁর করুণার প্রেমের ও সহানুভূতির এক অপূর্ণ অমুগায় দিয়াভাতি। বৌদ্ধ সাধুদের শান্ত হারাঘন মুখের বিনয় শ্রদ্ধা কবির মুখমণ্ডলের উজ্জল গৌরবের আশীর্বাদে আনন্দোজাসিত হয়ে উঠল।

এইখানে জাপানের অজ্ঞাত শব্দপ্রান্তের এই অখ্যাত ট্রেনে যে বৃদ্ধ আমি দেখলাম, তাতে আমার মনে হোলো, আমার পরমকারুণিক প্রভু বৃদ্ধের উপস্থিতিতেই যেন আমি অমৃতভব করছি। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় অহিংস সন্তাগ্রহীদের মুখের নিকে তাকিয়ে ঠিক এমনি ভাবেই বৃদ্ধের উপস্থিতিতে আমি অমৃতভব করেছিলাম। এই দুই অমৃতভূতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বিশ্বমানবের বেদনার আসনে আমার প্রভুর স্থান।

ইন্সপিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে কবি কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতাগুলো প্রসঙ্গে জাপানী সংবাদপত্র এমনই এক দায়িত্বহীন উক্তি করল যে কবির অবস্থান কালেই জাপানী জলীয়া প্রবলতম আকার ধারণ করল। কবি তাঁর বক্তৃতার জাপানের বর্তমান আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দিলেন—বললেন, এর সঙ্গে জাপানের প্রকৃত সভ্যতার সৌন্দর্য নষ্ট হতে চলেছে। সেই উক্তিতে বৃহত্তে এমনি যত্নব্য কবির পক্ষে অত্যন্ত সাহসের কাহ্ন হয়েছিল। কিন্তু সভ্য ভাবেরে অচ্য সাহস ছিল কবির মনে। কবির এই সমালোচনার বিরুদ্ধে উচ্চ প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে কালবিলম্ব ঘটল না। জাপানী সংবাদপত্র দেশবাসীকে এই বলে সাবধান করে দিল যে কবি “পরাজিত জাতির গুরু”—তাঁর কথা বেন কেউ না শোনে,—যদি শোনে তাহলে তারতবর্ষ যেমন বিদেশীয় হুণকার্ণ নিজেদের স্বাধীনতাকে বলি দিয়েছে, জাপানেরও সেই দশা হবে।

জাপানী জাতির প্রতি অকৃত্রিম অমৃতভাগ নিয়ে কবি এসেলে ভ্রমণে এসেছিলেন। যে প্রেমের অমৃতবাণী ঘিরে ঈশ্বর কবির অন্তর ঘুরে দিয়েছিলেন, সেই বাণীই তিনি ঘোষণা করতে এসেছিলেন জাপানে। সেই সঙ্গে জাপানবাসীদের কাছ থেকে তিনি নূতন করে শিখতে এসেছিলেন বৃদ্ধের বিশ্বজনীন অহিংস মন্ত্র। তাঁর আগমনের প্রথম কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি জাপানবাসীদের কাছ থেকে অভুলনীর অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। একমাত্র টোকিও ট্রেনে তাঁকে বাগত সভ্যদের রক্ত আড়াই লক্ষ জনসমাবেশ হয়েছিল। কিন্তু যখন প্রকাশ পেল যে তিনি বর্ণবৈরিতা ও উগ্র জাতীয়তার পরিপন্থী, বৃদ্ধ তাঁর কাছ হুণ্য,—তখন তাঁর বাণীর বিরুদ্ধে জাপানী সংবাদপত্র কুশা প্রচার আরম্ভ করল। কয়েক দিন মেতে না যেতেই আমরা সেমলার, মাত্র কদিন পূর্বে যে দেশের লোকে উদ্রাহাগ্রহে তাঁকে বরণ করত্রে, সেখানে তিনি বহুপরিহৃত, নিঃসঙ্গ।

জাপানী যুদ্ধবানীরা তাঁর বশেষকে বলেছিল পরাজিত দেশ। এই নিলা তাঁর কোমল অন্তরে গভীর ভাবে আঘাত হয়েছিল। কিন্তু এই আঘাতকে কবি অচিরে ভ্রম করলেন, পরাজয়কে গৌরবান্বিত করলেন তিনি, তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হোলো পরাজিতের গান—

THE SONG OF THE DEFEATED

My Master has bid me, while I stand at the road side, to sing the song of Defeat, for that is the Bride whom he woos in secret;

She has put on the dark Vail, hiding her face from the crowd, but the jewel glow on her breast in the dark;

She is silent, with her eyes downcast; she has left her home behind her; from her home has come that wailing in the wind.

But the stars are singing the love song of the eternal to a face sweet with shame and suffering.

The door has been opened in the lovely chamber, the call has sounded, and the heart of darkness throbs with awe because of the coming tryst.

[“Fruit gathering”]

কবির সেই বৃহত্তে নিলাকণ অন্তর্বেদনা আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আর একটি “পরাজিত জাতির” কথা আমার মনে পড়েছিল। সেই পরাজিত জাতির ক্রোড়েই জন্মলাভ করেছিলেন আমার প্রাক্ত বীতবৃষ্টি। কতো দায়িত্ব কতো অবজ্ঞা তিনি সহ করেছিলেন,—কতো দুঃখের ধারা, কতো অপমানের কালিদা বর্ষিত হয়েছিল তাঁর উদার ললাটে।

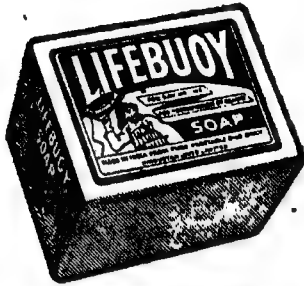
আর একবার সন্তুস্তবাক্তা করলেন কবি। এবার বাত্মা চীনদেশে। কবির এই ভ্রমণেও কিছুদূর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পিকিং শহরে উপস্থিত হয়ে কবি অকুণ্ঠ উদাত্ত কণ্ঠে গভীর সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন প্রতীচ্যেব বস্তুতাত্ত্বিক জরোমান্দার বিরুদ্ধে। চীনা হাজারের সভায় তিনি বললেন,—

পাশ্চাত্য দেশ তোমাদের শিখিরেছে পাশব শক্তির সভ্য, এই শক্তির উপরে আর কিছু নেই। বলে তোমরা, বৃকে হাত দিয়ে বসো, এই সভাই কি চরম সভ্য? বহু শতাব্দী পূর্বে প্রাচীন ভারতের এক

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করেন ।

খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্মই
বলুন আমরা কখনই ধুলোময়নার থেকে
নিরাপদ নয় । আর ময়লা বহন
করে রোগের বীজাত্ম যা সবসময়
আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-
কর । লাইফবয় সাবান এই
বীজাত্মগুলি ধুয়ে সাফ করে
দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য
সুরক্ষিত রাখে ।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—
এটি আপনাকে এত ব্যয়বশ্রমে করে তোলে ।



কবি কবি যোগ্য করেছিলেন—অত্যাশ্রয় দ্বারা মানুষ তার বাসনার নিশাস তার হৃৎসর্গের পরিভূতি লাভ করতে পারে, কিন্তু তার আত্মার মর্মস্বল, তাতে বিপুল বিনষ্ট হয়ে যায়। বহুতাত্ত্বিক কবিতার শিখরে নৈতিক সত্যকে স্থান দেয়নি বলে পৃথিবীর কতো প্রাচীন সভ্যতা বিপ্লবিতর অন্ধকার লুপ্ত হয়েছে। সেই অবলুপ্তির বিপদের সমুদ্রে আশ্রয় প্রার্থী পৃথিবীর আধুনিক সভ্যতা। এই প্রত্যাশার ধ্বংসই কি প্রেরণ করেননি মানুষ যদি সমস্ত পৃথিবীকে জয় করে ও তার বিনিময়ে আপন আত্মাকে হারায় তাহলে কী তার লাভ? এমন কী কাক্ষিত সম্পদ আছে যার বিনিময়ে মানুষ আপন আত্মাকে বিলিয়ে দিতে পারে?

সে সময়ে চীনদেশের জনসাধারণের মনেও উত্তেজনার অভাব নেই। সেই পরিহৃদিত কবি বেভাবে যে সুস্থিতি দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর অন্তরের সত্যকে চীনজাতির সামনে ঘোষণা করেছিলেন তা কেবল তাঁরই মতো মহাপুরুষের পক্ষে সম্ভব। যে অভিজ্ঞতা, যে অদ্বৈততা ও যে সত্যধারণের ফলে এ যুগের ঘনায়মান সভ্যতার সাক্ষরির বিরুদ্ধে তীব্রতম সাবধান বাণী উচ্চারণ করা যায়, তার একমাত্র অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেখ পর্বত রবীন্দ্রনাথ চীন ও জাপানের জয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জয় মাথুখে ও নৈতিক মহত্ব এই দুই প্রচাদেশ অতিক্রম হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখনই তিনি আবার এই দুই দেশে গেলেন, প্রকৃত সভ্যতাক্ষেপে তিনি সমানিত হয়েছেন, সপ্রস্তুত সৌভাগ্যের সঙ্গে দেশবাসী তাঁর কথা শুনেছে।

হৃদয় অসুস্থতার জন্তে আমি ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। উইলি লিয়ার্সনকে সঙ্গে নিয়ে কবি আমেরিকা যাত্রা করতেন। একটি জাপানী জাহাজে আমি স্থান পেলাম। প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার কোনো সঙ্গী নেই, শুধু নিজের মন নিয়েই আমার কাটল। মানব সভ্যতার যুগ-যুগান্তের ইতিহাসে ঘরের কি স্থান, এই একটি বিষয় নিয়েই আমি অহরহ চিন্তা করতে লাগলাম। অন্যতম থেকে বর্তমান মানব সভ্যতার বিবর্তনে ঘরের অবদান কী? ভাববাৎ মানব-সমাজকে কী অহুপ্রেরণাই বা প্রদেবে? বিভিন্ন ধর্মমতের নানা কোলাহলের মাঝখানে সত্যের পন্থা ধরানিট মানবাত্মার কানে কবে বাজবে?

এই সমুদ্রযাত্রার পথে এক পরে আরো একবার আমি যবদীপে কিছুদিন আতিবাহত করেছিলাম। সেখানকার বিখ্যাত মহাবুদ্ধিশীল বোরো-বুহুর আমি দেখতে বাই এক এই মানবছায়াতলে কয়েকটি আবেগপূর্ণ নিঃশ্বাস দান বাপন করি। এখানকার ভাস্কর্য আমার মনস্তত্ত্ব সমুদ্রে এক আশ্রয় সত্যকে উদ্ঘাটিত করে। [বসুমানবের ধর্ম-ইতিহাসের মৌলিক ঐক্যের সন্ধান ছিল আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা]। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই মানুষ এক, মনুষ্য এক,—মানবতার মূল্যায়ন এক, এই ছিল আমার বিশ্বাস। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো, এই বিশ্বাস জয়ী হলো। এই মন্দিরের আলিঙ্গন পর আলিঙ্গন পরিভ্রমণ করতে করতে ও ভাস্কর্যের অগণিত জিনিস দেখতে দেখতে আমি সেই প্রাচীন অতীতের ধর্মকাহিনীকে প্রত্যক্ষ বাস্তবে অবলোকন করলাম।

ভাস্কর্য এক সুবিশাল সংগ্রহশালা এই বোরোবুহুর।

মন্দির-প্রাঙ্গণের প্রতিটি কোণার কোণার শান্ত সৌন্দর্য বুদ্ধের মূর্তির পর মূর্তি। শিলাময় ভাস্কর্যের রেখার রেখার বুদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি প্রস্তরচিত্রে বুদ্ধের করুণাঘন মহত্বের প্রকাশ। কোথাও প্রেমের প্রশান্ত বুদ্ধকে ঘিরে রয়েছে মুক পশুপক্ষী দল, তরাণে শুভে তাঁর করুণার বাণী। কোথাও তাঁর শিষ্যরা আত্মিক আদিবাসীদের মধ্যে তাঁর করুণার বাণী প্রচার করছেন। অসংখ্য শিলাচিত্রে মূর্তিমতী করুণা। আমি বুঝলাম, প্রতীচ্য জগতের কৃষ্ণযুগে যীশু খ্রীষ্টের শুভ প্রভাব যেভাবে ইউরোপকে বর্ধিতা থেকে মানবতার পথে পরিচালিত করেছিল তেমনি যুগযুগান্তে পূর্বে বুদ্ধের করুণাও প্রাচ্য জগতের মানবতাকে বিকশিত করেছিল।

মানবতার পরম বাণী এই ভাবেই যুগে যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। এই বাণীর অমৃত মানব-স্বপ্নের গভীরতম কক্ষকে নিবিষ্ট করে মানব-জীবনকে মধুর করেছে,—অতীতের প্রেরণায় মানবতায়াকে আশ্রয় বিবর্তনের পথে অগ্রসর করে নিয়ে গেছে। এই বাণীর প্রেরণা সমাজের নৈতিক উজ্জীবনের প্রাণবল্লা। প্রেমই কলাপ, প্রেমের শক্তির কাছে পানব শক্তির পরাজয় সূচীভূত,—এই অমোঘ অস্তিত্বের এই বাণী। কখনো প্রাচ্যে কখনো প্রতীচ্যে যুগে যুগে এই বাণী ঘোষণা করেছে যে বিশ্বমানবের কল্যাণে অকুণ্ট আত্মবিসর্জন মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ অবদান।

সামুদ্র জন তাঁর পতাবলীতে এক প্রাচীন নির্দেশ ঘোষণা করে বলেছেন যে এই নির্দেশ পূর্বাত্তমতম আবার এই নির্দেশ চিরন্তন। কর্ণের মধ্যে করুণার প্রকাশ—এই চোখো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু। এই শ্রেষ্ঠ চিরকালের। কর্ণিক কল্লুরা, প্রেম চিরন্তন। তাই বুদ্ধ জন বলেছেন,—ত্রে প্রিয়তমগুণ, এস কামরা পরম্পরকে প্রেম করি। কারণ, প্রেম ঈশ্বরের আশীর্বাদ। যে প্রেম করে, সেই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান, সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে। যে প্রেম জানে না, সে ঈশ্বরকেও জানে না, কারণ ঈশ্বরই—প্রেম।

এর পর আমাকে আরো বহুবার দেশান্তর যাত্রা করতে হয়েছে। সমুদ্রপথে বা কলপথে পৃথিবীর দূর দূর দেশে আমি ভ্রমণ করেছি। কখনো আমি গিয়েছি কবির সঙ্গে কখনো বা প্রবাসী ভারতীয়দের প্রয়োজনে আমি গিয়েছি।

বর্তমানে কেনিলওয়ার্ড কাসল ভাড়াতে চড়ে আমি দক্ষিণ-আফ্রিকায় চলেছি। এই নিয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমার সপ্তমবার ভ্রমণ হলো। দক্ষিণ-আফ্রিকাকে হাতোটা চিনেছি পূর্ব ও মধ্য-আফ্রিকাও আমার প্রায় হাতোটাই পরিচিত। এই সমস্ত দেশান্তর ভ্রমণের মাঝে মাঝে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস করেছি। দিনে দিনে তাঁর প্রতি আমার "স্নেহ ও প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। যুগ যুগ ধরে ভারতবাসী মানা অজায় ও নানা অত্যাচারে নিশ্চিষ্ট হয়েছে, প্রতিকারহীন নিত্য নিশ্চেষ্টের কলঙ্ক তাঁর মুখের জীর্ণ বলিরেয়ার। কিন্তু তাঁর অন্তরের নিষ্ঠুর মণিকোঠার নিত্য অনিবার্য সৌন্দর্য-প্রাণী কলঙ্ক, অজান তাঁর অতীতের মাধুরী। ভারতবর্ষের অন্তরঙ্গত্বের সেই চিন্তন সৌন্দর্যকে আমি শান্তিনিকেতনের শান্তির পরিবেশে, হৃদয় উপলব্ধি করতে পারছি।

আমার সমগ্র জীবন ভরে বৃষ্টি আমাকে কী দিয়েছেন, কী অপূর্ণাঙ্গতা অকল্পনীয় ভাবে বুকের প্রতি আমার জীবন সমর্পিত, সেই কথাটিই নানা ভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছি এই গ্রন্থে। আমার কর্মব্যস্ত জীবনে বুকের কল্পনাধারার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করতে আরো অনেক পরিশ্রমেই প্রয়োজন। জীবনে যদি সুযোগ পাই তাহলে পরবর্তী কোনো সময়ে সে সব কাহিনী লিখব। আমার এই সামান্য জীবনকে আমার প্রকৃত তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশে অভিজ্ঞতার নব নব পথে আবহান করে নিয়ে গেছেন, এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রেমের গভীরতাকেই দিনে দিনে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেছি। এই শরম উপলব্ধির কথাই আমার নতুন করে আমি লিখব।

আফ্রিকার একটি ঘটনার কথা এখন আমি বলব। এই কাহিনীটি আমি এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের জন্তে সঞ্চয় করে রেখেছিলাম, কেন না এই কাহিনী সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ব-আফ্রিকার উগাণ্ডা রাজ্যের রাজধানী কম্পালার ঠিক উপরে ন্যায়েরামের হাসপাতালে তখন আমি আছি। বৃষ্টির সামনে ডিক্টোরা ন্যায়াওহা বৃষ্টি। জীর্ণ সেই ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি হচ্ছে। এখানকার খুঁটান মিশনারীদের যেহে মমতা আমাকে গভীর শান্তি ও আনন্দ দিয়েছে। তখন বাগাণ্ডা খুঁটানদের সম্পর্কে আমি এসেছি, তারা বন্ধু বলে আমাকে তাদের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

কম্পালা থেকে আমি ঠিক দুই ঘণ্টার দূরে জিজা নামক একটি স্থানে গেলাম। অন্যতমের রিপন জলপ্রপাত। সেখানকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের অল্পবয়সে আমি ইগাংগা নামক এক ক্ষুদ্র শহরে গেলাম। সে শহরে বৃষ্টিমেয় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাদের লোকদের স্থান নিয়ে অনুবিধায় পড়েছে। তাদের যদি কিছুটা সাহায্য করতে পারি সেই জন্তে এই বাত্র।

ঘোড়ার আমার ইগাংগা বাত্র। করলাম। আমার সঙ্গে দু'জন হিন্দু ও একজন পার্সী বন্ধু। অনেক দূর পথ অতিক্রম করার পর বন্ধুরা আমাকে পথ ছেড়ে অরণ্যে প্রবেশ করতে অনুরোধ করলেন। সেখানে নাকি যেতকার মিশনারীদের একটি আশ্রম আছে।

গভীর অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আশ্রম। সেখানে রয়েছেন এক বৃদ্ধ রোমান ক্যাথলিক সাধু। আর রয়েছেন দু'জন বৃদ্ধা দরিদ্র-সাম্রিক। তাঁদের দ্বিধে রয়েছেন স্থানীয় শিশুর দল। সভ্যতার সাম্রাজ্যতম আলোকও সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেনি। তবু ঐতিহাসিক হুস্ত বর্ষরতা, উদ্ভাস নিশ্চয় নয়। সেই কঠোর বন্যতার মধ্যে সভ্য জীবনবাহ্যার সাম্রাজ্যতম উপচারও নেই। সেই আদিম আরণ্য পরিবেশের মধ্যে এই সাধুগোষ্ঠী তাঁদের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন। এখান থেকে কিংবা বাবার বিশুদ্ধ বাসনা তাঁদের মনে নেই। সভ্য জগত তাঁদের তুলে গেছে। জীবনের সারাংশ উপস্থিত। এখানেই তাঁরা দেহত্যাগ করবেন, অবজ্ঞাত সমাধির উপর হস্তোক্ত বা কিছুদিন জেলে থাকবে এক একটি সামান্য ক্রুস-চিহ্ন।

সমুদ্রের সীমানা থেকে বহু দূরে অসঙ্গ হানন-গম্বাজের মাঝে রয়েছে এগুলি অখ্যাত খুঁটান সেবামন্দির জারো নানা স্থানে আমি দেখেছি। আমি দেখেছি খুঁটান সেবামন্দির অল্পপ্রকাশে স্বল্প স্বল্পতম হানন-গম্বাজের কী কিছু আশ্রয় উন্মোচিত করে, সমস্ত

সমস্ত বাসনা কামনার অল্পপ্রকাশ করে আনন্দের কী অনির্বচনীয় আবেগে খুঁটান সাধু প্রেমের আবহানে কল্পনায় আনন্দে উৎসর্গ করে নবর জীবন।

আমার হিন্দু ও পার্সী সঙ্গীরা আমাকে জানালেন যে, ব্যবসা উপলক্ষে তাঁদের নিত্য নিরমিত ইগাংগাতে যেতে হয়। প্রতিবাহী তাঁরা বড় রাস্তা থেকে নেমে এই আশ্রমবাসীদের সঙ্গে দেখা করে যান। এঁদের আকর্ষণ এড়িয়ে সোজা শহরে চলে গেছেন এমন ঘটনা একটি বারও ঘটেনি।

বৃদ্ধ ক্যাথলিক কাদার আমাকে বললেন, এই হিন্দু ও পার্সী বসিকরা তাঁদের কতো বড়ো বন্ধু। কতো সাহায্য তাঁরা করছেন, আশ্রমবাসীদের ও আশ্রিত অসভ্যদের রোগ ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে কতোবার তাঁরা রক্ষা করেছেন। এই প্রবাসী ভারতীয়দের বন্ধুত্বের কথা বলতে বলতে চিরপ্রবাসী বৃদ্ধ সাধুর চোখ অশ্রুভরা হয়ে উঠল। তাঁর কথার উচ্চারণ শুনে বুঝলাম, আশ্রমবাসী ও তাঁর মাতৃভাষা। বাল্যকাল তাঁর অতিবাহিত হয়েছিল আইরিশ ভূমি-কোড়ে। সেই প্রেমময় মাতৃকোড়ে তাঁর বাল্যকাল যে সে অন্ততমরী কল্পনার অভিব্যক্তি হয়েছিল, আজও এই বৃদ্ধ প্রবাসী তাঁর পরিণত চিত্তে সেই কল্পনাধার নিত্য প্রবাহিত।

আমাদের সঙ্গ শেরে বরীদী দারুন-সাল্কাদের আনন্দের বেশ শেষ নেই। সামান্য তাঁদের সঞ্চয়, তবু তাঁদের কাছ থেকে কিছু আমাদের খেতে যেতেই হবে। বিস্তারিত সেই আভিযাত্রার অনুল্ল প্রবাহ। আমাদের কুঠা হোলো পাছে আমাদের বাগাণ্ডাতে গিয়ে তাঁদের সামান্য বাতুত্বও ফুরিয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের সেই অকুঠ আনন্দ থেকে বাতুত্ব কীর কী করে? কুককার শিশুর দল নিশ্চয় নির্ভয়ে আমাদের ঘিরে ধরল। সাধু ও সাধিকাদের তারা একান্ত আপনায় জন বলে মনে করে। আমাদেরও আপন করে নিতে তাদের ঘেরি হোলো না।

পূর্ব-আফ্রিকার অসঙ্গ অরণ্যভাষ্যে এই খুঁটান আশ্রম ও এই সাধুদের দেখে আমার মনে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরের সোলাকাই দীপে কুঠরোগীদের নিত্যসেবক কাদার ভাসিদের কথা। করে হোলো এমন কতো মহাপ্রাণ হানবর্তী সমস্ত পৃথিবীর দুর্গম গহন-প্রাঙ্গণ ভাতিধর্ম-নিবিশেষে জীবনকে ডিলে ডিলে গান করছেন, বুকের নামে বুকের প্রেরণার তাঁরা উন্মোচিত, মানবপুত্রের নামে বিশ্বমানবের সেবার তাঁদের জীবন উৎসর্গিত।

একবার আমি তখন অলক্ষ্যে। এক ভারতীয় হাজি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে আমাকে একটি গ্রন্থ করেছিল। সে বলেছিল—কেনন, ব্রহ্মপ্রেমের প্রেক্ষাপটে অস্বাভাবিক বৃত্তে পারি, যে প্রেমের মরনারীর ব্রহ্মপ্রেমের জন্তে বহা বীরত্ববাহক কাজ করতে পারে। কিন্তু একটি জীবন আমি বৃত্তে পারি না, আপন বৃত্তির সেবক?

আমি বলেছিলাম,—কী ভূমি বৃত্তে চাও?

হাজিটি বললো,—কুঠরোগীদের মধ্যে কাদার ভাসিদের জীবন-বাহ্যার কাহিনী আমি পড়েছি। এখানে অলক্ষ্যে এসে আমি অনেক জঙ্গলী কী মরনারীর কথা শুনেছি বাস্তব নিত্য অখ্যাত জামে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পরিবেশে জীবন হান করছেন সেতক সারিয় অকৃত্য অধিবাসীদের বললেন জন্তে। কিসের আকর্ষণ এমন

কাজ তাঁরা করতে পেরেছেন? বীতর নামে তাঁরা এমনি ভাবে জিহ্মশয়ে আত্মবিসর্জন করেছেন, কিন্তু কোন্ মন্ত্রবলে বীত তাঁদের এমন পরম আত্মবিলুপ্তির পথে টেনেছেন?

এই ছাত্রটিকে আমি কেবল আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পেরেছিলাম। বলেছিলাম খুঁট প্রাচীন নন, খুঁট মৃত নন। চিরজীবী খুঁটকে যে তত্ত্ব প্রাচীন অন্তরে অম্লভব করে, প্রত্যেকরূপে প্রতিদিন সে তার স্বল্পে তাঁর প্রেমস্পর্শ লাভ করে। সেই প্রভুর নিত্যপ্রেমের বিনিময়ে আপনি প্রেমকে মানবসন্তানের মধ্যে বিসর্জিত করে দিতে পারে। কেননা খুঁট বলেছেন,—আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমি তৃপ্ত হইলাম, ক্ষুধা নর আবহাওয়ায় হইলাম আমি বসুধালায়। আমার বারা জ্ঞাতা তাঁদের থাকেই তুমি সামাজ্যতম সাহায্য করো, সেই সাহায্য করো আমাকে।

ইগাংগার ক্যাথলিক ক্লাব ও ঐ সেবিকা দুইজন তাঁদের প্রতিদিনের প্রেমসাধনার মধ্যে নিবিড়তম বাস্তব রূপে খুঁটের জীবন্ত সারিত্বকে অম্লভব করতেন, তাই পৃথিবীর অবজাত অকস্মাতে বাস করেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আনন্দের উদ্ভাসিত আলোকে তাঁদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। দিন শেষ হয়ে আসছিল, ছুরিরে আগছিল জীবন-সারাছায়ায় তাঁদের মুখে ফুটে উঠছিল অজ রক্তের স্বপ্নের বিজা।

টেনিসন তাঁর এক কবিতায় প্রভুর এই নিত্য উপস্থিতির কথা যত্নে স্মরণ ভাবে অংকিত করেছেন। শিশু-হাসপাতালের একজন নার্স, তাকে রক্তভার্য এক ডাক্তার বিক্রম করে বলেছে যে বীত জে শত শত বৎসর পূর্বকার একজন ক্রুশবদ্ধ মৃত যাহু। কোথায় আবার বীত? কোথায় পুনরাবর্তিব?

পরিম্রাভা খুঁটের প্রতি অন্তরের একনিষ্ঠ প্রেম নিয়ে সেবিকাটি উত্তর দিচ্ছে।

কে বলে প্রাচীন? কে বলে মৃত? এই জে সব মন প্রভাত। এই জে আগমনী।

বহি মিথ্যা হোতো নবজীবনের স্বপ্ন, নবীন জগতের আদর্শ বহি হোতো হুয়াশ, তাহলে কেমন করে আমি হাসপাতালে কাজ করতে পারতাম?

কেমন করে সহ করতে পারতাম রোগের বীভৎস বৃত্ত আর পুষ্টিগন্ধ, বহি না প্রভুর বাণী আমার কানে বাজত, যে সেবা তুমি এসব কসো সেই সেবা তুমি কসো আমাকে।

পরমপ্রভু বীতখুঁটের নিত্যস্পর্শ মহাযজ্ঞান্তির প্রাণে যুগ যুগ ধরে এক অম্ল প্রেরণা লক্ষ্যিত করে এসেছে, এই প্রেরণা সেবার, এই প্রেরণা কল্যাণধর্ম অকুণ্ঠ আত্মবিসর্জনের। খুঁটের অমৃত মন্ত্র এই প্রেরণা থেকে বহি আমরা বাক্ত হতাম, তাহলে মানব ভবিষ্যৎ অন্ধকারের গভীর অতলে তলিয়ে যেত। যে অতলে থেকে উদ্ধারের আশা নেই।

খুঁট আমার সর্বত্র

আমরা বারা খুঁটের অবিদ্যাসের কোড়ে জরলাভ করেছি এবং সহ শতাব্দীব্যাপী খুঁটের ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছি, খুঁটের বহিষা প্রতি যুগে মানবজাতির মধ্যে কী আলৌকিক প্রভাব বিস্তার করে,

তা আমরা নিবিষ্ট মনে উপলব্ধি করতে পারি। খুঁট করুণা আলৌকিক উজ্জ্বলী মন্ত্র পিতা থেকে পুত্র, পুত্র থেকে পৌত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, মৃত্যুহীন সেই মন্ত্র প্রাতঃ যুগে নবীন আশায় উৎসাহে মননরাকে অম্লপ্রাণত করে। এই অমৃতমন্ত্রের জরাজ্ঞা যুগ থেকে যুগান্তরে প্রবাহিত।

এই মন্ত্রের প্রত্যেক পরীক্ষাও প্রতি যুগে। খুঁটানভ্যন্ত প্রতি যুগে অকুতোভয় আত্মদানের পরাক্ষয় উত্তীর্ণ হয়েছে, সপ্ত আর পরীক্ষার দাহনে খুঁটার আদর্শ যুগে যুগে নিঃস্বল্প স্ববর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে।

খুঁটের সমসাময়িক শিষ্য পল বলেছিলেন, মহান যুদ্ধে আমি নিজেকে ব্রতী করেছি, সম্পূর্ণ করেছি আমার ব্রত। বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হইনি মুহূর্তের জন্তেও।

অ্যাপোক্যালিপ্সাসতে উল্লিখিত আছে তাঁদের কথা, বীরা নৃসংসত্তম দেশের যজ্ঞা আত্মকর্ম করেছেন, বীরা মেঘ-রক্তে তাঁদের পোষাক ধৌত-শুদ্ধ করেছেন। সেই সব খেতাবধারী শহীদদের কথা অবিমবণীয়, বীরা নীরা ও ভূমিনিটানের অবর্ণনীয় অজাচারকে সহ করেছিলেন। মাহুয়ের সহনশীলতার শেষ সীমায় প্যাড়রে তাঁরা মাহুয়ের অশেষ মহত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন।

পরম আনন্দে ইগ্গোশিয়াস রোম মহানগরীতে বাক্সা করলেন, সেখানে সম্রাটের নির্দেশে ইংরেজ পতরুল তাঁর দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে থাকে। বিশুমাত্র ভয় নেই তাঁর প্রাণে, উন্নতিত আবেগ ভরে তাঁর অন্তর গান করে উঠল, এতো দিনে আমি প্রভুর একান্ত শিষ্যদের পাশে পা বাড়ালাম।

আর একজন অধ্যাত খুঁটান নারী পার্গিডিয়া। তাঁর অজ-প্রত্যঙ্গও ছিন্নাভর করোহল সম্রাটপালত নরখাদক সিংহকুল। তিনিও ভয় পান নি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জপ করোছিলেন সর্বভরহারা খুঁটনাম। এঁরা ছিলেন খুঁটাবাসের প্রথম সন্তান। এঁদের আবির্ভাবের জন্তে পৃথিবী বৃষ্টি তখনো প্রস্তুত ছিল না, সমসাময়িক সমাজ এঁদের আসন দেয়নি, রাজশাস্ত্র এঁদের ধ্বংস করতে চেয়েছে। এঁরা ছিলেন পরিচরহারা বাস্তহারা অপারাজ্জের, নিপীড়িত নিবাত্তিত, প্রভুর নামে উন্মুখ হৃদয়ে এঁরা শত নিবাত্তিত সহস্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

এমনি কতো কাহিনী আমরা জানি, কতো কাহিনী আবার বিলুপ্ত হয়েছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। কিন্তু যুগে যুগে সব কাহিনীর পিছনেই সেই একই সবেদন, একই প্রেমের সেই আলৌকিক রোমাঞ্চ। বা ছিল দুঃখের কালো তা হয়ে উঠেছে আনন্দের আলো। বা ছিল মৃত্যুর হতাল অন্ধকার, তা রূপান্তরিত হয়েছে উদ্ভাসিত আশার পুনরুজ্জীবনে।

অকুতোভয় আত্মবিসর্জনের কতো উজ্জ্বল কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। আরো আছেন কতো শত সব্যাতীত নরনারী, কোনো ইতিবৃত্তকার বীনের স্মরণ করেনি, কাল বীনের ফুলে সেজে, বীরা শুধু প্রভু খুঁটের নামে খুঁটের প্রতি অকুণ্ঠ প্রভাষেমের আবেগে নীরবে সর্বস্বাবীহীনতাকে বরণ করেছেন, বিশেষ আত্মনিবেদনে খুঁটানিষ্ঠ সেবারে অজলি দিয়েছেন জীবন। প্রতি শতাব্দীতে প্রতি যুগে এই সর্বত্র আত্মত্যাগী মহাপ্রাণ পৃথিবীতে জয়প্রশংসা করে মানবজাত্যকে পবিত্র করেছেন।

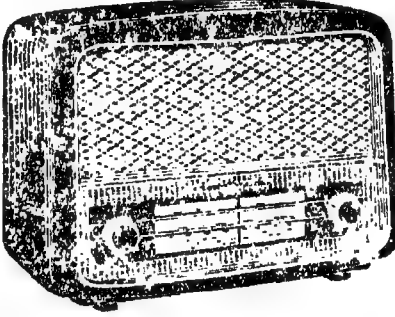


২৭৫০ ক্রড পোশ হ'লে

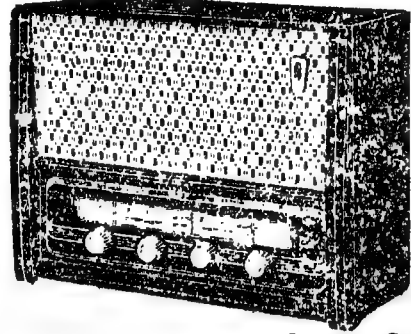
কাজে সেরা ও দামে জুবিধে ব'লেই ক্রাশনাল-একো রেডিও এবং ক্রিয়ারটোনের জিনিস বিখ্যাত। আর তা-ও এত বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায় যে আপনার যেমনটি চাই বেছে নিতে পারবেন।

ন্যাশনাল একো

রেডিও



ক্রাশনাল-একো রেডিও মডেল ইউ-৭১৭-এসি/ডিসি; ৫ ভোল্ট, ৩ ব্যাণ্ড, ক্রাশনাল-একো-র বড় সেটের মত অনেক বিধি-ব্যবস্থা এতে আছে।
মনহুসাইজড ৭০০ টাকা



ক্রাশনাল-একো মডেল ৭২২-এসি অথবা এসি/ডিসি; ৬ ভোল্ট, ৩ ব্যাণ্ড; খুব ভাল কাজ দেয়; এই ধরনের রেডিওর মধ্যে সেরা।
মনহুসাইজড ৩০০ টাকা

Kleerone ক্রিয়ারটোন বাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম

ক্রিয়ারটোন
বৈদ্যুতিক
ওয়াটার হীটার—
কল ঘুরালে গরম জল
পাওয়া যায়; ৫ থেকে
১৮ গ্যালন জল ধরে



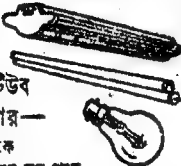
ক্রিয়ারটোন
সিংক্রোনাল
বৈদ্যুতিক
দেওয়াল ঘড়ি—
অসাধারণ নির্ভরযোগ্য।
৭ রকম সাইজে এবং কলর
হুন্দর রঙে পাওয়া যায়



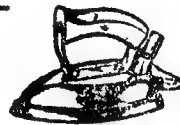
ক্রিয়ারটোন
কুকিং রেঞ্জ—
ছোটো মেটো দেওয়া
উত্থান, প্রত্যেকটির
আলাদা নিয়ন্ত্রণ
ব্যবস্থা আছে।
শক্তি ৫, ৫০০ ওয়াট পর্যন্ত



ক্রিয়ারটোন
বাতি,
ফ্লুরোসেন্ট টিউব
এবং ফিল্ডার—
পরিষ্কার থাকুক
আলো অপচ খরচ কম পড়ে



ক্রিয়ারটোন
ঘরোয়া ইস্ত্রি—
ওজন ৭ পাউন্ড;
১০০ ভোল্ট—
৫৫০ ওয়াট; খুব
পুঙ্খ কেমিয়ারাম
কলাই করা



ক্রিয়ারটোন
বৈদ্যুতিক
কেটলি—
কোমিগাম কলাই করা;
৩ পাউন্ড জল ধরে;
২৩০ ভোল্ট—৫৫০ ওয়াট



কেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড

৩, মাদান ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১০ • অপেরা হাউস, বোম্বাই-৫ • ১/১৮, মাইল
রোড, বাম্বাই-২ • ক্রোকার রোড, পটিনা • ৩৩/৭২ সিলভার হুইলি পার্ক রোড
বাহাদুর • বোম্বাইরান কলোনি, চাবনী চক, দিল্লী • রাইপতি রোড, সেকেন্দরাবাগ

তারা পরিচর্যায় শোভমান, বীন তাঁদের জীবনযাত্রা। যুক তাঁদের আধিনি। তাঁরা বিশ্বের বেলনকে অক্ষরিত তপস্তার আপন বকে বহন করেছেন, তাঁদের ধর্ম ও কর্মে ধ্যানে ও উদাহরণে মানব লবাকের পূর্ণীকৃত অক্ষরকে খুঁটের কমান্বন্দব চরণছারার উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেছে।

কোথা থেকে এতো শক্তি তাঁরা পেয়েছেন? এই শক্তির উৎস আনন্দ, সর্বস্থানে জড়ের আনন্দ। প্রাচীন সাধুরা সবচেয়ে উৎসাহিত হয়েছিলেন—এবং নৃশংসতম উৎসাহিতের মধ্য দিয়ে খুঁট-প্রেমের গভীরতম আনন্দকে উপলব্ধি করেছিলেন। এই শক্তির রহস্য তারা তাঁদের অমর প্রেমগাথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে গেছেন। তাঁরা যে গান গেয়েছেন সে গানের সমাপ্তি নেই, যে যন্ত্রোচ্চারণ করেছেন সেই যন্ত্র অবিনশ্বর। একমাত্র প্রভু খুঁটের বাণীর পরেই সাধুগণের এই সব গাথার স্থান। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার অনুদিত হয়ে এই সব গাথা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির অসংখ্য নরনারীর প্রাণে অমিত আনন্দের সঞ্চার করেছে। সাধু বাণীরে সীতিগুরু, সাধু ক্রান্তিসের পুষ্পস্তবকাবলী, সাধু টমাস কেম্পিসের খুঁটীসরণ, এগুলি অমর সৃষ্টি, এরা বারে বারে খোষণা করে যে ক্রুসের অত্যাচারের পিছনে আনন্দ ও শক্তির ন্তন রাজ্য সমাসীন। এই রাজ্য কোনো অবাস্তব স্বর্গরাজ্য নয়। এরা বলে পরমানন্দের অমর রাজ্যলাভ এই মরুভূমিতেই সম্ভব। খুঁট যুগে যুগে আহ্বান করছেন, বলছেন, আমাকে অঙ্কসরণ করো। বারা প্রেমিক বারা সর্বজনহারা নিতীক খুঁট-পথযাত্রী, তারাই এই রাজ্যের স্বর্গসিংহাসরে উত্তীর্ণ হন।

আমাদের এই বর্তমান যুগেও খুঁট-পথযাত্রীদের অকুণ্ড শিরাসার পথিক্স আমরা দিকে দিকে লক্ষ্য করে লভ্য হয়েছি। প্রভু বীতর জন্তে আত্মোৎসর্গকারীর অভাব এ যুগেও নেই। প্রবল অরাকান্ত দেশে নভল্লাহু হয়ে সমুখে নিউ টেটামেট গ্রন্থ স্থাপন করে মধ্য

আফ্রিকায় নিঃসঙ্গ ব্রহ্মা বরণ করেছেন লিভিটোনি। বাসের সমা জন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন মিলানোসিয়ার সেই অজ্ঞ আদিবাসীকে হাতেই নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করেছেন কোলরিজ প্যাটারসন। উগাণ্ডায় জ্বালিটনের ভাগ্যেও জুটেছে একই প্রকার আত্মবলিদান। সাধু মন্দের সি জীবন-পণ করে নিক্কেল যাত্রা করেছেন ভিক্সেট। জাপানের দীনতম বীনজনের দুর্গতির অঙ্ককারকে দুরীকরণের প্রচেষ্টায় আপন জীবনকে হতভু শিখার যতো দানন করছেন। কাগাওয়া। বর্ণবৈরিতার নিষ্ঠুর আঘাত-জর্জর আফ্রিকান জাতির হুঃসহ ক্ষতব্রণা খুঁট-প্রেমের প্রাণে বিদূষিত করার ভক্ত অনির্বাপ অমাহুধিক পরিভ্রম করে চলেছেন আদ্রে। আর উগাণ্ডায় এই সব খুঁটবিশ্বাসী ওরুন্দল, বারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পূর্বস্ত পরিভ্রাতার জয়গান গেয়ে খুঁটের নামে জীবনান্ততির সংকল্প নিয়ে যাত্রা করেছে। আরো আছে কতো অসংখ্য অপরিচিত নরনারী, বুদ্ধ তরুণ ও শিশু, তারা নিভান্ত সম্প্রতি কালো খুঁট বিশ্বাসের পরম দাবীকে পালন করছে প্রতিদিনের কল্যাণব্রতে। তারা রয়েছে আমাদের আশেপাশেই, হাত বাড়ালেই তাদের প্রিয় করস্পর্শ আমরা লাভ করি, তাদের যুগ থেকেই আমরা স্তনতে পাই কী তাদের যন্ত্র, কী তাদের জীবনী শক্তির রহস্য-উৎস। এ রহস্য কোনো গোপন রহস্য নয়, এ শুধু ভক্ত-হৃদয়ের একটি মাত্র চিন্তন পরম অঙ্গীকার, যে প্রভু আমার ভক্ত জীবন দান করেছেন, এ জীবনকে নিবেদন করেছি শুধু তাঁরই জন্তে, তাঁরই পথে তাঁরই ব্রতে এ জীবনের সারাংশসার।

এই প্রব্দের পেয়ে এই যে সব মহান সর্বাঙ্গিক সাধকদের নাম করলাম, এট সম্ভে আরো দু'জনকে আমি বরণ করি। আত্মোৎসর্গ ও প্রেমব্রতের জীবন্ত উদাহরণে সর্বপ্রথম তাঁরাই খুঁট-প্রেমের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের প্রতি আমার খুঁট উন্মোচন করেছিলেন। বীতখুঁটের প্রতি আমার যা লগ্ন, সেই লগ্ন আমার তাঁদের প্রতিও। তাঁরাই আমার খুঁট-নিবেদিত জীবনের জনক-জননী, আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী।

অনুবাদক—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সমাপ্ত

বিবাদ

(ডি. এইচ. লবের)

হ' আঙলে চেপে-ধরা
ভুলে-বাওরা সিগারেট থেকে
একটি ধূসর খোঁরা ভেসে বার,
—কী অপান্তি মনে।

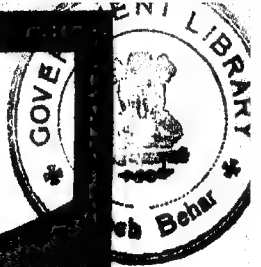
তনবে? বুকে কুঁচি:
আমার-বাবের ব্যাধি নরক হল
বুহ পক্ষাঘাতঃ

সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে বেতে
চাকা সেতুখানি তার,
আমার কোটেব বুক চড়িয়ে জড়িয়ে গেল
কয়গাছি পাকা চুল,
আমার শক্তিকে ক'বে বৃহ তির্যকারঃ
কালো চিমনি দিয়ে দেখি,
এক এক শূঁড় পেল ভেসে।

অনুবাদক—অমির ভট্টাচার্য

ডু স্ব র্গ প রি ক্র মা

শ্রীশিবপ্রসাদ নাগ



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্বাভাবিক নিম্নোক্ত কল্যাণী। বললাম—পার্কোড়ি ধাবে ?

এবার চোখে খুঁসি বিলিক। দুই মনে বাস্তব ওপাশে বেয়ে তেলোভাজার প্রাচ্য করলাম। বাঙ্গালীদের মত কাশ্মীরীরাও তেলোভাজা খেতে খুবই ভালবাসে। তাই স্বতন্ত্র এখানে তেলোভাজার দোকান দেখতে পাওয়া যায়। পার্কোড়ি প্রসঙ্গে একদিনের কথা মনে পড়ল। অনন্তনাগে সদল ঘুরে বেড়াছি। হঠাৎ দেখি একটা তেলোভাজার দোকান। শুক হয়ে গোলাম—পার্কোড়ির রূপে নয়—বিনি বসে বিক্রী করছেন তাঁকে দেখে। কালো শাড়ী পরে বিনি বসে আছেন তাঁর মুখের লাবণ্য—টিকোলো-আর্ধ নাক, “চকিত-প্রেক্ষণ” কালো ছুটি ভ্রমর-চোখ আর পাতলা টুকটুকে (লিপটি-মাথা নয়) ঠোঁট ম্যাগনেটের মত আকর্ষণ করলো। পার্কোড়ি কিনতে এগিয়ে গেলাম। সঙ্গিনীরা কলহাস্তে ভেঙ্গে পড়লেন।

পরের দিন প্রথমেই আমরা মহিলাদের স্কুল আর কলেজ দেখতে গেলাম। শ্রীনগরের স্কুল-কলেজগুলি বেসিডেন্সী রোডের পার্কটির ধারে কাছে। বিলামের উপরে বিখ্যাত। মেয়েদের কলেজটির পরিবেশ চমৎকার না হয়ে যায় না। এমন চীনার আর পপুলারের মেশে শিক্ষার পরিবেশ মনোমগ্ন হতে বাধ্য। কলেজটি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রীসংখ্যা সাত শ’। সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা আছে। মার্চের শেষে বা এপ্রিলে সমাপ্তি পরীক্ষা হয়। বিজ্ঞানশিক্ষার জন্তে একটি নতুন ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। লেকচার-হলটি সুসজ্জিত আর সুবৃহৎ। ল্যাবরেটরীও গড়ে উঠছে, তবে কলকাতার কলেজের তুলনায় যন্ত্রপাতির অভাব। সংস্কৃতের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মনমোহিনী কাউল আমাদের নিয়ে সব বিভাগগুলি দেখালেন। অধ্যাপক সঙ্গেও গরিচয় হল। অধিকাংশ অধ্যাপিকাই পাঞ্জাবী। এও অল্পতব করলাম যে, কাশ্মীরী বৈয়েরা এখনও অবরোধের বাধা সরিয়ে উচ্চশিক্ষা তেমন ভাবে নিতে পারছেন না। শ্রীমতী কাউল পাঞ্জাবী হিন্দু হলেও, জন্ম কাশ্মীরেই, নিবাসও শ্রীনগরেই। নামে আর কাজে এমন মিল খুব কমই দেখেছি। স্কুলের চেহারার সঙ্গে মধুর ব্যবহারে তিনি আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন।

কলেজ-স্কুলর মেয়েদের স্কুল। শ্রীমতী কাউল প্রাধান্য শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করিয়ে দিলেন। এক হাজার ছাত্রী এখানে পড়ে। স্কুল-কাইরাস পায়ের সংখ্যা গড়-পড়তা ৭৫%। প্রাধান্য শিক্ষিকা পাঞ্জাবী হিন্দু। প্রবীণত্বি দুই দুই বয়সে। শুকতারা মতে পড়ানোর চেষ্টা করে। বিদ্যুত বন্ধ, কলার উত্তানময় পরিবেশ।

যানের ভাব আপনা হতেই আসে। বিশ জনের বায়পার পঞ্চাশ জন ছাত্র বা ছাত্রী ঢুকিয়ে ব্র্যাকহোল ডব্লি করলে ট্রাফেডি ত হবেই। দেখলাম প্রাইমারি ক্লাসগুলি বাগানের মাঝে উন্মুক্ত আকাশের তলায় নেওয়া হচ্ছে। কাছাকাছি এক একটা শ্রেণী বসেছে কিন্তু গোলমাল নেই।

শ্রীমতী কাউলকে জিজ্ঞাসা করলাম—কাশ্মীরী ভাষার পাঠ্যপুস্তক আছে কি ? শুনে কি ভাষার মাধ্যমে পড়ানো হয় ?

তিনি বললেন—পাঞ্জাবের গুরুমুখীর মত কাশ্মীরী ভাষাও আগে কথ্যভাষাই ছিল, লেখ্যভাষা ছিল না। এখন কাশ্মীরীভাষার প্রাইমারী পর্যন্ত বই লেখা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের বইগুলি এখনও ইংরাজী আর উর্দুতে লেখা। পড়াবার মাধ্যম কাশ্মীরী আর উর্দু—হুই-ই। মাধ্যমিক পুস্তকগুলিকে কাশ্মীরীভাষায় লেখার চেষ্টা চলছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কাশ্মীরী ভাষাটি আসলে কোন্ ভাষা ? মৌলিক ভাষা না মিশ্রণ-জাত ? লিপিটিই বা কি ধরণের ?

শ্রীমতী কাউল বললেন—সংস্কৃত আর পারসিক ভাষার সম্মিশ্রণে কাশ্মীরী ভাষার জন্ম। মুসলিম-বিজয়ের আগে হিন্দু-আমলে সংস্কৃতই ছিল পাঠ্যভাষা আর কথ্য ভাষা ছিল সংস্কৃতজাত প্রাকৃত। কাশ্মীরী লিপি উর্দু হরফকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।

বললাম—আপনাদের ভাষা বৃষ্টি না, কিন্তু শুনে মনে হয়েছে বড়ই ক্ষতিমুখ, যদিও উচ্চারণে কিছুটা কলকাতাই স-এর হুড়াহুড়ি আর আকগানী টনিও আছে। আপনাদের কথা শুনে বুললাম, কাশ্মীরী ভাষার লাগিত্যের মূলে আছে পৃথিবীর তিনটি স্থললিত বা লিফুইড্, ভাষার ছুটি—সংস্কৃত আর পারসিক। চর্চা চললে এ ভাষায় ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল।

শ্রীমতী কাউল হেসে বললেন—হ্যাঁ, এদেশের মাটির আর রমণীয় পরিবেশের সঙ্গে ও-ভাষাটা বেশ খাপ খায়। এর ভবিষ্যৎ আছে বলে আমিও বিশ্বাস করি।

দেখালীমিকে বললেন—আপনারা যদি একদিন আগে থেকে খবর দিতেন, মেয়েদের নিয়ে নাটগানের ব্যবস্থা করে আপনাদের একটু আনন্দ নিতে পারতাম। আকশ্যের রয়ে গেল।

দেখালীমি বললেন—ভবিষ্যতের জন্তে তোলা রইল। আর একবার কি না এসে পারব ? মনটাকে আপনাদের দেল কেনে পেলাম।

বললাম—বাবা হৃদয়ের অবস্থা আমারের। পদতলায়

ছেড়ে যেতে মন চাইছে না, কিন্তু নগরে রাজাকে যেতেই হবে।
“গচ্ছতি পুংঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ”—শরীর যাচ্ছে
নগরপানে কিন্তু চক্ষু মন চলছে পশ্চাতে ঘেরে।

সংস্কৃতের অধ্যাপিকা শ্রীমতী কাউল হো হো করে হেসে
উঠলেন। ‘কিন্তু ফটকের কাছে এসে আমরা ছলছল চোখেই
পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

এস. পি. কলেজ বা শ্রীপ্রতাপ কলেজ শ্রীনগরের সবচেয়ে বড়
কলেজ। প্রাচীনতমও বটে। বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুত নৃপউদ্দিন
জিলানী কাম্বারেরই অধিবাসী। আগে শিক্ষা বিভাগের সহকারী
ডিরেক্টর ছিলেন, সম্প্রতি কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন।
আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে চা-পানে আপ্যায়িত করলেন।
দলের মহিলাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা জানবার জন্তে উৎসাহ দেখে খুসী
হয়ে বাঙ্গালী মেয়েদের নানা প্রশংসা করলেন।

অধ্যক্ষ নৃপউদ্দিন সঙ্গে করে বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখালেন।
কলেজের পাঠাগারটিতে বই কম নেই—সবই বেশ সাজান গুছান।
ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু, কাম্বারী, পাঞ্জাবী—এই ছটি ভাষার
নানা বই আছে। গ্রন্থাগারিক সবিনয়ে বললেন—স্থানের অভাবে
বইগুলোকে তেমন সাজিয়ে রাখতে পারেন নি। অধ্যক্ষ বললেন—
কলেজ ছাত্রসংখ্যা বড় বেশী হয়ে গেছে—কলেজের ঘর না বাড়ালে
আর চলেছে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের এখানে ছাত্রসংখ্যা কত?

অধ্যক্ষ জানালেন—১০৪০।

বললাম—এতই, এত বড় বাড়ী নিয়েও বিব্রত বোধ
করছেন? কলকাতার কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা কথ্য তুললে
নিশ্চয়ই অবাক হবেন। তিন সিক্টে সকাল থেকে হাত্তি
পর্যন্ত ক্লাস চলে। ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে এক একটি কলেজে
১৫১৬ হাজারও আছে। একটা ক্লাস ঘণ্টা চলে থাকে
তখন আর একটা ক্লাস রাত্তার পানবিড়ির দোকানে আড্ডা
জমায়। সরকারী স্কুল ছাড়া এত বড় কমনকম পাওয়া যাব
আর কোথায়? হরি ঘোষের গোয়ালে কত গরু ছিল জানিনা,
তবে কর্তৃপক্ষেরা কলেজগুলিকে তাই করে তুলেছেন বলে অভিযোগ
উঠেছে। আপনারা হয়ত এখানে সত্যিকার কিছু ছেলেদের মগজে
চোঁকাবার চেষ্টা করেন, আমাদের এখানে ইচ্ছে থাকলেও তা করার
উপায় নেই। অধ্যাপকেরা হিমসিম খেয়ে যান—ক্লাস কটৌল
করবেন না তবু আলোচনা করবেন—সুতরাং বেগাবনে হুতোম ছড়ান
চলেছে। বেশীর ভাগ কোর্সই অপ্রাচীন থাকে, ছেলেমেয়েদের পড়ে
নিতে হয়।

অধ্যক্ষ অবাক হয়ে বললেন—বলেন কি? আপনাদের দেশে
ত কলেজ অনেক, তবু এত ভিড় কেন?

বললাম—কলেজ অনেক সত্যি তবে প্রয়োজন অনুপাতে নয়।
তা ছাড়া নতুন কলেজ গড়বারও উপায় নেই। সরকার নিজের
খরচে কলেজ গড়তে চান না—অর্থভাবে অজুহাত দেন। কলেজ
কর্তৃপক্ষ কিছু টাকা চালালে তাঁরাও কিছুটা চানেন। সম্প্রতি
সরকার শ্রান্দর্প কলেজের ভিম গ্রহণ করেছেন। অচলায়তনের
শুকর্পিত প্রকল্প হয়েছে।

নৃপউদ্দিন বললেন—মেয়েদের কলেজের অবস্থা কেমন?

বললাম—পুরুষদের কলেজের মত ওভারকাউন্ডেড না হলেও,
আসন একটাও খালি থাকে না। তবে আগামী ২৪ বছরের মধ্যে
পুরুষদের অবস্থা বদলেবে। মেয়েরা অতি উৎসাহে এগিয়ে আসছে।
বেশীর ভাগই জীবিকার প্রয়োজনে, কেউ কেউ বিয়ে না হওয়া
পর্যন্ত সময় কাটাবার জন্তে। তবে শিক্ষার হার বেড়েই চলেছে।
এটা আশেয়ে ভালই করবে।

অধ্যক্ষ বললেন, কলেজগুলোকে মকঃসলে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছেনা
কেন?

বললাম—সে চেষ্টা যে অস্বাভাবিক হয়নি তা নয়। আরও তিনটি
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে। তবে কলকাতার জনসংখ্যাকে
যতদিন না মকঃসলে আর সহরতলীতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ততদিন
কলেজগুলি হরি ঘোষের গোয়াল হয়ে থাকবেই।

পুষ্প জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের এখানে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা
আছে কি? এ-সেশনের মেয়েরা শিক্ষার কেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে?

অধ্যক্ষ বললেন, সহ-শিক্ষার প্রচলন এই কলেজেই আছে।
শিক্ষার মেয়েদের উৎসাহ যথেষ্ট। এখনও তারা ছেলেদের উল্লিখে
যেতে পারেনি, তবে বাবে হয়ত।

বললাম—সে সুদিন যেন সর্বত্র আসে; তবে যদি ছেলেদের
মধ্যে পৌরুষ জাগে!

মেয়েরা হেসে উঠলেন।

কয়েকটি প্রশ্ন করে জানলাম যে, এস. পি. কলেজে ‘অনাস’
আর পোষ্ট গ্র্যাডুয়েট ক্লাসও নেওয়া হয়। ইংরাজী আর অর্থনীতিতে
মাত্র ‘অনাস’ পড়ানো হয়। উর্দু, হিন্দী আর ইংরেজীতে এম, এ
পড়ার ব্যবস্থাও আছে। ছাত্রসংখ্যা বেশী হওয়ায় জন্তে এই
কলেজকে ভেঙ্গে ১৯৪২-এ আর একটি কলেজ—এ এস কলেজ গড়া
হয়েছে। ১৯৬১ সাল থেকে তাঁর কলেজে ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স
চালু হবার সম্ভাবনা।

অধ্যক্ষ জিলানীর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে, জন্ম ও
কাম্বারী রাজ্যে ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। ৬টি সরকারী ডিগ্রী
কলেজ, ২টি সরকারী কলা ও বিজ্ঞান কলেজ, ২টি এডেড কলেজ,
৪টি ইন্টারমিডিয়েট, ২টি ট্রেণিং এবং ১টি বেসরকারী কলেজ আছে।
একটি পলিটেকনিকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪১-এ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জম্মু ট্রেণিং কলেজে এম, এড, পড়ারও ব্যবস্থা
আছে।

অধ্যক্ষ দুঃখ করে বললেন যে, শিক্ষা বিনা বেতনে দেওয়া সম্ভব
দরিদ্র কর্মীরা তার সুযোগ গ্রহণ করতে চায় না। তাদের ভয়,
লেখাপড়া শিখে ছেলেমেয়েরা বাপ-ঠাকুরদার কাজ আর করবে না,
বেকার হয়ে বুঝে নয়ত বাবু হয়ে যাবে। অনেক কষ্ট করে বুঝিয়ে
সুঝিয়ে ছুটেন জন্তে ছেলেমেয়ে বোঁগাড় করতে হয়। তবে ক্রমশঃ
ভুল ভেঙ্গে বাচ্ছে, উৎসাহও আসছে।

সহজে আমাদের ছাড়লেন না তিনি। ধরে নিয়ে গেলেন
সরকারী আর্ট এম্প্লয়ারিয়েম। কাম্বারের নানা শিল্পজাত দ্রব্যের
ছাত্রী প্রদর্শনী এটি। মনোময় উজ্জানময় পরিকল্পণের মধ্যে একটি
অটালিকাতে অবস্থিত। ঘুরে ঘুরে আমরা সব বিভাগগুলি দেখলাম।
এর একটি শাখা আছে কলকাতার চৌরঙ্গীতে। জিনিবপাড়া এখানে
কেনাও হয়। বাজার-স্থলের তুলনায় লাম কিছু বেশী হলেও,

জিনিবতলি সবই খাটি। অথচ জিলানী পেপারমাসির উপর সুলব কাজ করা করেকটি জিনিব সজিনীসের উপহার দিলেন—অধমকেও। ফেরবার পথে রেসিডেন্সী রোডের এক বড় রেস্টোরাঁর আর এক দফা আপ্যায়ন করে তবে বিদায় দিলেন। এঁর আর শিক্ষা-বিশ্বের অধিকর্তাদের বিনয়-নম্র আন্তরিকতা। আমাদের শুধু আনন্দ দেখনি, কাজীজের প্রতি আমাদের মনকে শ্রদ্ধালুও করেছে।

ফেরবার দিন ঘনিরে আসছিল। আমরা সবাই কেনাকাটার ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। শাল-দোশালা, পেপারমাসি ইত্যাদি না নিয়ে গেলে দেশে মান থাকবে না। তা ছাড়া বাংলা দেশে পশমের জিনিব এত সস্তায় মেলেনা। কয়েকদিন ধরে শ্রীনগরের বাজারে ঘুরে কিরে দাম সবচেয়ে একটা মোটামুটি ধারণা আমাদের হয়েছিল। ক্রিলামের ওপারে সরকারী একটা বড় মার্কেট খোলা হয়েছে। শুনেছিলাম, দাম সেখানে সস্তা, মূল্য নির্ধারিত। দেখলাম—একদাম ঠিকই তবে সস্তা নয়। রেসিডেন্সী রোডের বা আশপাশের দোকানগুলির মত এত বৈচিত্র্যও নেই। পশ্চিম বাংলার “কল্যাণী”র মতই তার দুর্দশা। ৮টায় বন্ধ হবার কথা, ৬টাতেই অর্ধেক দোকান বন্ধ হয়ে যায়। বেশী জেতা নাকি সেখানে যায় না। তবে পরিবেশ দেখে মনে হ’ল উন্নত করার স্বেচছা আছে প্রচুর।

রেসিডেন্সী রোডের পরিবেশ অনেকটা আমাদের চৌরঙ্গীর মত। শাল, পেপারমাসি, আখরোটি কাঠের জিনিব, বেতের খুড়ি ইত্যাদির দোকান আছে। রেস্টোরাঁ, হোটেলও প্রচুর। মেয়েদের খুঁতখুঁতে মনকে সন্তুষ্ট করবার জন্তে পশমের কারবারীরা প্রচুর আয়োজন

রাখে। শ্রীনগরে আর কলকাতার শালের দামে তফাৎ খুবই—প্রায় হুগুণ।

শ্রীনগরের সবাই রসিক কিনা বলা শক্ত। তবে দোকানদারও যে রসিক হয় তার প্রমাণ পেয়েছি। একটা বড় রেস্টোরাঁর আমরা প্রায়ই ছুঁবেলায় আহাৰ সমাধা করতাম। চা-লন্ডিও পাওয়া যায়। প্রতিদিনই সাত আটটা প্লেটের জর্ডার দিয়ে এগায়ে জনে ভাগ করে খাওয়া হোত। এক প্লেটের ভাত একজনের পক্ষে খেয়ে শেষ করা সম্ভব নয় বলেই এ ব্যবস্থা মেয়েরা করেছিলেন। বলা বাচ্ছল্য, এতে খরচের দিক থেকেও সঞ্চার হোত। একদিন শেকালীদিক এক দ্বাস লন্ডার জর্ডার দিলেন। বখারীতি তা এল। দেখা গেল সেলাসে হুটী ষ্ট্রে দেওয়া আছে।

শেকালীদিকে বললাম—ব্যাপার কি? থাকেন ত আপনি একা! হুটী ষ্ট্রে কেন?

তিনি হেসে বললেন—ওরা বোধ হয় ভেবেছে এরও অংশীদার আছে। হুঁ বোলা প্লেট ভাগাভাগির ব্যাপারটা দেখে একটা ত্রৈণ-ওয়েভ এসে গিয়েছে হয়ত।

মনোজ বাবু বললেন—মেওয়ার দেশ কি না, রস ত থাকবেই। বললাম—অন্ততঃ রসটা মাজিত, ঢাকার কুঁটিনের মত হাঙ্ক-জালানো নয়।

গ্রামার আট বড় শালের কারবারী। কলকাতার চৌরঙ্গীতে বটেই লগুনেও শাখা আছে। এঁদের বিরাট কার্পেট কারখানা আছে শ্রীনগরে। একদিন কারখানা দেখতে আমাদের নিয়ে গেলেন। বহু

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ...



খাওয়ার সারাংশ সম্পূর্ণ শরীরের
প্রয়োজনে নিয়োগ করলেই
অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়।
ডায়া-পেপ সিন ব্যবহার করলে
এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন,
কারণ ডায়া-পেপ সিন খাদ্য
হজমের সাহায্য করে।

ডায়াপেপারসিন

ইউনিয়ন ড্রাগ কলিকাতা

ছুবেলা খাবার সময়
নিয়মিত ছোট এক
চামচ খাবেন।
ডায়া-পেপারসিন
কখনো অভ্যাসে
পড়ায় না।



তীত, আড়াইশো কারিগর। হ্যান্ডেলার নক্সা বিভাগে নিয়ে গেলেন।

বললেন—কাপেট তৈরীর আগে কাগজে নক্সা তৈরী করতে হয়। ফেল মেসে নির্ধৃত কাজ। অঙ্কশাস্ত্রের নিখুঁত হিসাব। প্রত্যেকটি নক্সার সঙ্গে নানা রং-এর পশমের নমুনাও এঁট দেওয়া হয় যেখানে যেমন্টি দরকার। নক্সা তৈরীর পর সেটিকে বীজগণিতের মত একটা কম্পিউটারে ফেলা হয়।

আমরা কাগজের ওপর সেই ফর্মুলাও দেখলাম। সেই আন্থিক হিজিবিজি আদৌ বোধগম্য হল না।

হ্যান্ডেলার বললেন—আপনারা পি, আর, এস বা পি, এচ, ডি হলো ও সব বুঝবেন না। ও হচ্ছে একটা আলাদা বিত্ত।

বললাম—অস্বীকার আদৌ করছি না। সেজ্ঞে অভিমানও আমাদের নেই। এই বিপুল বিশ্বের কতটুকুই বা জানি আমরা!

তীতঘরে যেয়ে দেখি, প্রত্যেকটি তীতের ঠিক মাঝামাঝি কম্পিউটার লাগান আছে। কারিগররা তাই দেখে দেখে বিড় বিড় করে কি বলছে আর হাত চালিয়ে যাচ্ছে।

হ্যান্ডেলার বললেন—কাপেট তৈরীর রহস্ত পোরা আছে ঐ কাগজটুকুতে। ওর ভাষা ওরা বোঝে। তাই দেখে হিসাবমত কাজ করে যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—এক একটা তীতে তিন-চারজন করে দেখছি কেন?

বললেন—এক একটা কাপেট এক একটি পরিবারের হাতে থাকে। বাপ ছেলের নিয়ে বা কয়েক ভাইয়ে মিলে এক একটি তীত চালায়। এদের অভিজ্ঞতা বংশগত। ছেলেবেলা থেকে বাপ-মুড়ার সঙ্গে কাজ করতে করতে এরা দক্ষ হয়ে ওঠে, যেমন উঠত আপনাদের দেশের মসলিনের কারিগররা। এক একটা পরিবারের এক একটা বিশেষ ধরনের কাপেট তৈরীর অভিজ্ঞতা আছে।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম—বেশীর ভাগ কাপেটই বোখারা বা পাশরিনার নক্সা ও রীতি অনুসারে তৈরী হয়। কারিগররা সকলেই কান্দীরী মুসলমান। ৩৪ জনে পরিপ্রায় কয়েক প্রতিদিন আথ ইফির বেশী তৈরী করতে পারে না। রং-এর সঙ্গে রং মিলিয়ে, নক্সার চুলচেরা হিসাব ঠিক করে তৈরী করতে হলে এর বেশী সম্ভবও নয়। একটা ৬'২'৩ হাত কাপেট তৈরী করতে সময় লাগে কমপক্ষে আড়াই ঘণ্টা। খাঁটি পশমী আর মিশেলী—হু'রকম কাপেটই তৈরী হয়। একটা ৬'২'৩ হাত খাঁটি পশমীর দাম কমপক্ষে আড়াই শো টাকা।

হ্যান্ডেলার বললেন—আড়াই তিন হাজার টাকার কাপেট আমরা হামেশাই তৈরী করছি। দেশভাগের আগে হুঁড়পালের সর্বাধিক তীত হবি দিয়ে একখানা কাপেট তৈরী করিয়েছিলেন। দাম পড়ছিল দশ হাজার টাকা। বিদেশেও আমাদের কাপেট চালায় বার।

জিজ্ঞাসা করলাম—কারিগরদের মজুরি কত? দৈনিক কত বন্টীর রোজ হয়?

বললেন—বারো বন্টীর রোজ, মজুরী তিন চার টাকা।

—পরিবার-প্রতি না জন-প্রতি?

—পরিবার-প্রতি।

অবাক্ হলাম। বারো বন্টী খেতে এরা প্রতি পরিবার ৩৪

টাকা রোজগার করে। এর নাম শোষণ না শোষণ? বেকারদের নেই কিন্তু দারিদ্র্য ঘুচে না কেন, বুঝতে কষ্ট হয় না। শালের কারখানাতেও দেখছি, চোখ নিচু করে বারো বন্টী হাতে ছুঁচুতো চালিয়ে যাচ্ছে, আট বন্টী খেতেও তারা দশ আনা থেকে দেড় টাকা হু' টাকার বেশী মজুরী পায় না। কান্দীরী সরকার আজও এদের মজুরী বাড়িতে পারেন নি।

ঐতকালে ভুবারপাতের সময়ও গ্রীনগরে কাপেট আর শালের কারখানা বন্ধ হয় না। অবশ্য কাজ চলে তখন ঢিমে তালে। দারুণ শৈত্যে আজুল অসাড় হয়ে যায়, মজুরীও যায় কমে।

কান্দীরীর শিল্পকে বারা ভগতে সমাদৃত করছে, তাদের ভাস্যে কি খিল জীবনের আয়োজন!

এক কারিগরের পাশে একটি পাঁচ বছরের কুটকুটে ছেলে বসেছিল। হঠাৎ তার বাবা গালে দিলে এক চড়কবে।

বললাম—মারলে কেন শুধু শুধু?

উত্তর এল—বাবু, চোখ ঠিক রাখছে না। আমার হাতের দিকে নজর রাখতে হবে। কেমন করে আমার হাত চলেছে তা ওকে দেখতে হবে।

বললাম—ঐটুকু ত ছেলে! ও বোঝেই বা কি আর মনোবোগই বা কতটুকু? এ তোমাদের অত্যাচার। আর, নজর রেখে লাভ কি?

—এই বয়স থেকে নজর না রাখলে, কাজ শিখবে কি করে? এখন হু' তিন বছর নজর রাখবে, তারপর আমার সঙ্গে কাজ করতে করতে শিখবে। এ কাজে মনোবোগই আসল। না থাকলে হিসেবে ভুল হবে।

—বিনা বেতনে ত লেখাপড়া শেখান বার। ছুলে লেগে না কেন?

—কি হবে তাতে? ছুঁচু ঘুচবে। ও লেখাপড়া শিখতে গেলে আমার সহায় হবে কে? এমনিতই ত পেট চলে না, তখন ত শুকিয়ে মরতে হবে। আর, লেখাপড়া শিখে এসব কাজ শিখতে পারবে না—ইচ্ছেও হবে না।

বললাম অধ্যক্ষ নূরউদ্দিন কেন বলেছিলেন, নানা লোভ দেখিয়ে পড়ুয়া সংগ্রহ করতে হয়।

গ্রীনগর সহরটির কথা বলেছি। দৈর্ঘ্যে প্রাচ্যে কলকাতার ধারে কাছে যায় না। কিন্তু সৌন্দর্য্যে এর ভুলনা নেই। তেরতলা আঠারতলা বাড়ী আর ফ্যানস প্যারেড দিয়ে এর অভিজ্ঞাত্যের নথ্যটুকুও স্পর্শ করা যায় না। ডাল, বিলাস, পুরুতমালার চীনারকে ভিত্তি করে লড়ে উঠেছে এই সহর। টাকার সেনসেন নগণ্য হলেও, দিনের বেলায় কন্যবৃত্ততা বড়োজার বা ডালহৌসী স্কয়ারের চেয়ে কম নয়। বাড়ী-ঘরগুলি অবশ্য এখনও উন্নতির অপেক্ষা রাখে—বিশেষ করে বিলাসের তীরের। পথ প্রশস্ত আর শিট-ঢালা হলেও সহরের উপকণ্ঠে আর সেতুলির কাছ হুবিধের নয়।

গ্রীনগরে কান্দীরী আর পাঞ্জাবী ব্যবসারীই আধার চোখে পড়ে। আনোখীলাসদের দেখিনি। দারুণ ভারতের মত কান্দীরীরও ঐ জাতটিকে বর্জন করে চলেছে। শাল-কাপেটের সঙ্গে হোটেল-রেজুরার ব্যবসী এখানে ভালভাবেই চলে। বাজারী একটামাত্র ব্যবসারী আছেন—প্রস্থের নির্যাসী মহাই। হেটরিশ বছর আগে ইনি এখানে আসেন ভাগ্য্যবশে। এখন তিনি গ্রীনগরের সন্ধ্যায়

বড় মোটরগাড়িই কারখানা—বেল মোটর ওয়ার্কস-এর মালিক। বাড়ীও করেছেন নিজস্ব। ভাললেকের নোহক পার্কের কাছে গগরিবালে আর এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী পরিবার আছেন। পরিবারের কর্তা বিশ্বাস সাহেব স্বর্গত। তাঁর বাড়ীটির পরিবেশ রমণীয়। এঁর এক ছেলে কান্দীর বিধানসভার স্পিকারের পি-এ।

নিয়োগীবাবু আর বিশ্বাস সাহেবের পরিবারের সবাই বাঙ্গালী পোলে আদর আশ্রয়ন করতে ছাড়েন না। নিয়োগীবাবুর কাছে ওনলাম, কান্দীর সরকার এখন আর কোনও অকান্দীরীকে জমি কিসে বাড়ী করতে দেন না। কাজটা নিশ্চয় বললে মনে হয় না। বিশ্ব-প্রেমের একটা নীমা আছে। বাঙ্গালী এই উদারতা নিয়েই মরতে বসেছে। “নিজবাসভূমে পরবাসী”। কলকাতা ভেঁগেছে, বাঙ্গালীর কলিত স্বর্গ দুর্গাপুরও অবাকালীসের ধ্বংসে পড়ে যেতে বসেছে। কান্দীরের মাহুদ স্বপ্ন নীচ করে ছুঁতে স্ততো গলিরে বাবে আর অকান্দীরীরা চোরাকারবারের টাকার জোরে বড় বড় বাড়ী গাড়ী ইকিয়ে চকবে—তাদেরই বৃক্কের উপর বসে তাদের লাড়ি ওপড়ায়ে, এতো আর চলতে পারে না! বাঙ্গালীর মত কাছাখোলা জাত ছাড়া অন্তটা উদার বা স্বপ্ন হবে কে?

কান্দীর চিরকালই রক্ষণশীল। ইউরোপে প্রশানরা বা প্রাচীন ভারতে আধার্য যেমন বর্গস্বরের ধোঁহরতর বিরোধী ছিলেন, কান্দীরীরাও তেমন রক্ত-সমিশ্রণের চিরবিরোধিতা করেছে। পীরপজাল পর্বতজেলীর মত দুস্তর বাধাও বাইরের মাহুদকে সহজে কান্দীরে আসতে দেয়নি। এই ভৌগোলিক সংস্থানই কান্দীরকে রক্ষণশীল করেছে। পাঠান আর মোগল আমলে মুসলমান হলেও, অবাধ রক্তসমিশ্রণ ঘটতে এরা দেয়নি। তাই এ-দেশের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে এখনও একটা দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেটা “শক-হুদ-পাঠান-মোগলের” একাকারকে অজ্ঞাত রাজ্যে নেই। নৃতাত্ত্বিক নই, কিন্তু লক্ষ্য করেছি কান্দীরী বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে এদেশবাসীর সুগঠিত নাসিকার। চ্যাপটা নাক চোখে পড়েনি। এই রক্ষণশীলতার জন্মেই কান্দীরবাসী বিচলিত হয়েছিল যখন ১৯৪৮-এ পাক হানাদারেরা এসে সুলতানের দিকে নজর দিতে শুরু করেছিল। মুসলমান হলেও রক্তে এরা সুনতে পায় হাজার হাজার বছর আগেকার মর্ধ-ধ্বনি। তাই মুসলমান সোদানর বলেছিলেন—বাবু, আমরা আকশ গোসাই ছিলাম, তরোয়ালের জোরে ধর্ষ বসেছি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাই বলুন, ঐতিহাসিক আর নৃতাত্ত্বিকরা বলে থাকেন যে, বর্গস্বরের না' হলে দুনিয়ার সঙ্কটভিতে নতন নতন অবদান কেউ রেখে যেতে পারে না। তাঁদের মতে রক্ষণশীল বলেই কান্দীরীরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ কিছু দিতে পারেন। পাহাড় ভেঙে করে বড়লপথে ঐশ্র্য নিয়ে বাবার মতলব হচ্ছে। এক কান্দীরী বন্ধু বললেন, ঐশ্র্য শ্রীনগর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে, দেশের দারিদ্র্য ঘুচে। হয়ত তাই। টুটিষ্ট তখন লাখে লাখে বাবে, কলকারখানা গড়ে উঠবে, টাকা হুড়িয়ে বাবে দেশদর। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে বাবে চীনায়ের লাল ঐশ্বর্য, দেবদারু আর পুরীনের জামলিমার বিজার। আর উন্নত নাক কি তখন উন্নতই থাকবে? সেদিন হয়ত সৌন্দর্য্যাস খেল বসতে হবে—“হাউ ব্রিগ ওয়া, হাই জালি।”

কান্দীর নিয়ে দুনিয়া জুড়ে এক হেঁট হয়েই এবং এখনও

হচ্ছে যে, এ দেশকে রাজনীতি থেকে বাঁচ দিতে দেখা যেন অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছে। অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন—কেমন দেখলেন? গণভোট হল টিকবে? অথচ বিশ্বের বিশ্ব এই যে, খবরের কাগজ আর চারের শোভালা হাতে আমরা কান্দীর নিয়ে বতটা মাথা বাঁমাই, কান্দীরবাসীরা ততটা আশো করে না। রাজনৈতিক হেঁট নেই বলেই হয়। মাঝে মাঝে মুসলিম লীগ সভা করলেও, উদ্ভাপের সঞ্চার করতে পারে না। শ্রীনগরের সাপ্তাহিক খবরের কাগজগুলিতে হানীর সমস্তা নিয়েই আলোচনা বেশী হয়।

১৯৪১-৪১ সালে শ্রীনগর ম্যাকনটন-প্রস্তাবে অর্থাৎ কান্দীরে গণভোটে রাজী হয়েছিলেন। এখন মত বদলেছেন। কাজটা বুদ্ধিসময়ই হয়েছে। শ্রীনগরে পুরাতন ভারতীয় বাসিন্দাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—গণভোট হলে কল কি হবে? তাঁদের উত্তরের সারমর্ম এই যে, শতকরা বিশজন যে-কান্দীরী ভারতীয় পর্য্যটকদের উপর জীবিকার জন্ত নির্ভর করেন, কেবলমাত্র তাঁরাই ভারতের পক্ষে ভোট দেবেন আর আশী ভাগ ভোট দেবেন পাকিস্তানের পক্ষে। শোবোক্তদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, দরিদ্র, অবহেলিত মদ্রুব বা কৃষক। কলকাতাতেও সুরধীমহলে এমনিধারা কথা শোনা যায়। কিন্তু পার্সেটজের এতো সাক হিসাব করা শোনা নয়। নেহরুর মিটিং-এর পঞ্চাশ হাজারকে পাঁচ লাখ করার মত এও শোনা হিসেব হয়ত! পহলগামের চারপাশের গ্রামও দেখেছি ভারতের প্রতি প্রজন্ম ভাব। রক্ষণশীলতা এদের মজাগত—অজ্ঞতঃ ইতিহাস সেই কথা বলে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হলে কান্দীরী বিবাদের কি দুর্দশা হবে, তার পরিচয় ত '৪৮ সালেই মিলেছে। তার পরেও পাকিস্তান-শ্রীতিতে ডগদগ থাকা সম্ভব নয়, বিশেষ করে গিলগিটে যে অত্যাচার চলেছে, তার কাহিনী জেনে। কয়েকজন ভারতীয়ের কাছে শোনা গেল, শেষ আবদুল্লাকে বধন কয়েক মাস আগে ছাড়া হয়েছিল, তখন তাঁকে স্বাগত জানাবার জঙ্গে সারা শ্রীনগর আলোকমালার সেজেছিল। তা হতে পারে। শেক-ই-কান্দীরের জন্তে দরদ থাকতে পারে। তার অর্ধ পাকিস্তান-শ্রীতি নাও হতে পারে। আবদুল্লার আসল মনোভাব এখনও সুস্পষ্ট নয়—অজ্ঞতঃ ভারতীয় জনসাধারণের কাছে। তিনি স্বাধীন কান্দীর চেয়েছিলেন কেন? পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্তে, না ওপাশের বৃহৎ শক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবার জন্তে? এ ইংলিশর উত্তর আজও পাওয়া যায়নি।

শোনা যায়, আভাদ হিন্দু কৌজের প্রিন্স বুরহানুদ্দিন আজও নাকি পাকিস্তানের জেলে বন্দী। তিনি চিত্রলের রাজার ভাই। রাজনৈতিক চেঙ্গবোর্ডে কি খেলা যে ওস্তাদরা খেলছেন, বোঝা শক্ত। পাঁচটা দেশের সীমান্ত বে-দেশে এসে মিলেছে, সেখানে বড়ের চাল চলেই।

আবদুল্লাকে বন্দী করা অবশ্য ভালই হয়েছে। আভন নিয়ে খেলা বা খেলতে দেওয়া, দুটোই নিরাপদ নয়। তাঁকে হাফখানে ছাড়াও ভাল হয়নি। কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়কে কান্দীরে এ মন্তব্য করতে সুনৈছি। একে ছাড়ার পর আবার জেলে পাঠানোর কলে, কান্দীরীদের মনে একটা বিষেব ভারতের বিরুদ্ধে জাগান হয়েছে বলে মন্তব্য অনেকে করলেন। কান্দীরের মত

.....
দিনের পর দিন প্রতিদিন...
.....



যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন—
আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও যত্নসম্মত, সুগন্ধবো-
ভারী, কাপড়, রেক্সোনা সাবান দিয়ে কাটা—অথবা
কয়েরটি ত্বকের এক বিশেষ সাধন যা আপনার
জীবনকে সুন্দর করে তোলে এবং আপনার ত্বকে
সুস্থ রাখে। রেক্সোনা সাবান আরও যত্নসম্মত
আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্যে... রেক্সোনা।



অক্ষন ও প্রাক্ষন



সূর্য্য-সম্ভবা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পূরবী চক্রবর্তী

মায়ের চোখের জলের অল্পবোধ আর পরিজনদের অশ্রুত উপরোধকে আর অগ্রাহ্য করতে পারলাম না আমি। তাই এক কতাপক্ষের সাগর নিমন্ত্রণকে স্বীকার করে নিলাম একদিন। আমি সুরধর্মন ধর্মন চ্যাটার্জী এক তথাকথিত ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কোনও শাখা-অফিসের কর্ণধার বিশেষ। বিশেষতঃ প্রখ্যাত বিজ্ঞানসূ ম্যাসনেটের অতিপ্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র। হাই সোসাইটিতে এক উজ্জ্বল রত্নের মর্যাদা আমার অবশ্য প্রাপ্য। পুরুষের চরিত্রগত সাধারণ ক্রটিবিশিষ্ট একেজের মনে নেয় না কেউ। অপরপক্ষে পাত্রী সুমিলিতা ব্যানার্জী ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের এক অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্ণচারীর একমাত্র কন্যা। শুধু সুশোভনা নয়—বহু গুণের আধার বলেও তার খ্যাতি আছে। পিতার প্রবাস অবস্থানকালে এখানেই কোনও আশ্রয়ের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করে গ্র্যাডুয়েট হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার এই দক্ষিণাঞ্চলেই কোথাও এক নবনির্মিত আবাসে বৃহৎপ্রবেশ হয়েছে তাদের। অর্থ কৌলীনে ঠিক সমগোত্রীয় না হলেও বংশ মর্যাদার সমতাধারণ—তাই বিয় দেখা দেয়নি কোনও। না আর বাবার মনোমত হয়েছে মেয়ে। এখন শুধু আমার মনোনিয়নের অপেক্ষা। তাই সাময়িক ভাবে অবসর নিয়ে আমাকে আমন্ত্রে হয়েছে কলকাতার। বৌদি কিছুদিন অন্তরিত হয়েছিল দাদার কর্ণস্থানে। স্বস্ববাসের সন্মুখে ছুটে এসেছে এখানে। তাঁরও অসুখা রয়ে গেছে সেই মেয়ে। তাই আমার কতাপক্ষধর্মনের পণ্য পূরবাবিনী হয়ে সেও।

মেয়ে দেখা—সনাতন ভারতের অতি বিধিবদ্ধ এক কন্যার আর অপোভন রীতি। প্রগতির পথে অভিব্যক্তি করেও তাদের সব মর্যাদার গতি যে পাত্রপক্ষের নির্বাচনের দুঃখপেক্ষীতার প্রতিহত হয়ে অপমানের দ্বানিতে রেণুগুণ হয়ে ধরণীর বুলিতে মিশিয়ে যায়—সে কথা বৃষ্টি আজও মহাভারতের ভবিষ্যগুরবিনী হাত্কারা ভুলে আছে। তাদেরই একজন আজ রূপ যৌবন আর গুণের ভরা বেসাতি নিয়ে আমার মনের অঙ্গনে ধর্না দিতে চেষ্টাচ্ছে। তাতে ক্ষতি কি। চিরদিন নারীর হুঁ হাত ভরে শুধু কামনা আর কলঙ্কের পঙ্কভার ভুলে দিয়েছি পরম উপেক্ষার। এক অনাহত যৌবনার কাছে অমনোনীতার অগৌরব কি ভারও চেরে বেশী দুর্ভার হবে। আমার অমতে বিয়ে হবে না জানি। তবু শুভাষী শ্রদ্ধাভাজনের সঙ্গে মতবৈধতা দেখা দেবে না—এই তাঁদের বিশ্বাস। সে আশ্বাসের আরোজনকে ভ্রান্ত আর বার্থ করে দিতেই হবে আমাকে। অন্তমত হবে আমার। আর অনাদৃত হয়ে বাবে ঐ মেয়ের জীবনের সব আশা আনন্দের মুকুলসম্ভার। না, স্পষ্ট করে বিয়েতে অনিচ্ছা জানিয়ে পরিবারে অশান্তির মেঘ ঘনিয়ে তুলতে চাই না আমি। তাই তো এই সুরম্য হলনার আকিঞ্চন। শুধু চোখে দেখা আর মনে না ধরার আশ্চর্য্য এক অভিনয়ের চতুরতার স্বেহের অভিজ্ঞার বারে বারে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। আর অমুকুল পরিবেশের মাঝে প্রিয় প্রতীকার প্রেহর গুণে চলব আমি, অতন্ত্র তিত্তিকার। হয় তো কত হতমানা গরবিনীর ব্যাখ্যাজঙ্ঘর মনের নীরব আকৃতির বন্ধুরতার বন্ধুগত হয়ে যাবে আমার চলমান গতি। তবু সেই কঠিন ব্রতচারণার শেষেই তো দেখা দেবে সেই মেয়ে—যার পুণ্যের প্রভার সব হলনার পাপ দূর হয়ে আলোকচকল হয়ে যাবে আমার জীবনের অনাগত সুরম্য দিনগুলির অমুকুণ।

গাড়ীতে ঠাঁট দিয়েই সামনে দেখে থমকে থেকে গেলাম আমি। বিদায়োমুখ সূর্য্যের দিকে চেরে কোন অদেখা আঘাতে বেন বিকৃত হয়েছে—আর রক্তাক্ত হয়ে গেছে অপতার সমস্ত বুক। সে বেদনার যন্ত্রিমাভা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে দিকে দিগন্তরে—আকাশের নীলিমায় ধার ধরণীর ধূসরতার। নিখিল বিশ্বের সব আনন্দচেতনা আর মালোক অনুভবের মধুরতা মুহূমান হয়ে গেছে আহত ব্যথার গভীরে। শুধু বিষন্ন সন্ধ্যা ধীরে অতি ধীরে নিশ্বতর মত তার ধূপছারা অকুল বিস্তার করে রক্তরঞ্জিত। সে দুঃখবৃত্তিকে দৃষ্টির অন্তরাল করে দিচ্ছে। মুহূর্ত্তে কোন অতলাস্ত ব্যথায় বেন আচ্ছন্ন হল আমার মন। জীবনের সব স্বপ্নস্বপ্নর কল্পনা বৃষ্টি কর্বহীন হয়ে গেল সেইক্ষণে আর অসার্থকতার অন্ধকারে একটি একটি করে হারিয়ে গেল অদেখা ভবিষ্যৎ পরিণতির মত সুখময় সম্ভাব্য-তালি। আকাশের বৃকের ঐ রক্তসঞ্চেত ডেজার নিগন্তালের মত কি বেন এক আসন্ন দুর্বিপাকের কথা জানিয়ে গেল মনে মনে। আকস্মিকতার তীব্র অভিব্যক্তি আবেগের এক অস্থির অঙ্গুরণ উঠল আমার হৃদয়ে। আর তার পরেই সব শেষ। আশা, আনন্দ, বৈধা, উৎসাহ লুপ্ত হয়ে গেল আমার চেতনা থেকে। অবলুপ্ত হয়ে গেল এই বাস্তবের পৃথিবী। অপরিণীত রক্তিত্তে এক রক্ত সর্বহারার মত এলিয়ে পড়লাম আমি স্টেটের ওপর। তারও পরে—কতকাল পরে বৃষ্টি আশ্রয় হলাম বৌদির ডাকে।

হবির মত এক বাড়ী—আর চিত্তসংসার মতই এক মেয়ে। সব জরতীর ব্যভাষণ, মধুর আলাপন আর সেয়ে হোয়াস ইত্যাদি

অকৃত্রিম আশ্রয়—বিন্দুপ্রায় হয়েছি বৃষি আমি। অরণ্যভীত হয়ে আছে শুধু অসজ্জিত জটিলকমে রুণেরসেট লাম্পের কৃত্রিমতার ধরা ভোর আকাশের নীলভি রঙ—আর তাইই মাঝে দেখা অরুণবসনা। এক মৃতমুখ্য ললিত যৌবনের বিহবল মদ্রিবতা। এক অগুরু স্বপ্নের শেষে যেন জেগে উঠেছি আমি। তার রেশটুকু এখনও আছে। কিছু ভুলেছি আর কিছু ভুলিনি। যেটুকু মনে আছে তাই নিয়েই খেলা করছি আপন মনে। বিস্ময়ণ করছি তার সব ভাল আর সব মন্দটুকু। কাম্য কি আর কাম্য কে যেন ভানতে চাইছি তাই। খুঁজি হয়েছে তো?—বৌদির সঙ্গাম প্রস্নে ছেদ পড়ল আমার চিন্তাধারায়। তিথি আজ থাকলে—। না, তিথি আজ কাছে নেই। পরের ঘরনী হয়ে ঘুরে গেছে সে। নির্বাক হয়ে গেলে যে একবারে। ঘরে ফিরে চাইলাম বৌদির দিকে। কি যেন দেখল আমার মুখে আর বিশ্বাসে বাসহারা হয়ে গেল সেও। কোয়ার পথের শুকতা এরপর আর ভালল না কেউ।

মাত্রি গভীরতর হয়েছে এখন। শান্ত হয়েছে যবিতী। শুধু অশান্ত হয়ে উঠেছে আমার মন। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘরটা। পাখার হাওয়ায় যেন আগুন ছুটেছে। ভানলাগুলোও বৃষি খুলতে ভুলে গেছে ওরা। ষাটেলারের ঘর—অত খেয়াল রাখবার দায় আছে কার। তিস্ত হেসে উঠে গেলাম—ভানলাগুলো

খুলে দিলাম—আর তারও পরে আবারও একটা সিগারেট ধরিয়ে এসে বসলাম বিছানায়। টেবলের ওপর থেকে কোলে টেনে নিলাম গীটারটা। বেত্রসুটীটা অক করে সুরের মধ্যে এবার নির্বিক্রিত করতে চাইলাম নিজেকে। বড় অগোছাল হয়ে আছে মনটা—সবকিছুই তাই কেমন এলোমেলো হয়ে বেতে চায়। একাগ্রতার সাধনা বিচলিত হয় বাবেবারে। ভাবনার অন্তলে আবার তলিয়ে গেলাম আমি। অবহেলায় ধরা সিগারেটটা শুধু ধূপের মত জলে জলে নিঃশেষ হয়ে চলল আর সৌরভদ্রা হয়ে গেল আমার ঘরের বাতাস।

কখন যেন বোধি এসেছিল। অভিব্যক্তির অমুরোখে জানতে চেয়েছিল আমার অন্তিমত। অনেক আশা আর আনন্দ নিয়েই সে এসেছিল। কিন্তু ফিরে গেল নীরবে—বিশ্ময় বেদনা আর ব্যর্থতার অবসাদে। না, এ বিয়ে অন্তত হবে না—হতে পারে না। জানি আমি, কুরু হবে দুই পরিবারের মন আর অশ্রুবিচল হয়ে বাবে এই মেয়ের আশার প্রতীকার অবশেষ। তবু সব ত্রুটি আর বিদ্যুতির কথা জেনেও কেমন করে শুকে গ্রহণ করব আমি জীবনে।

একজন আরতি। অল্প জন হত্তি—শ্রদ্ধা আর লিপ্সা, মধুরতা আর মদিরতার অনন্ত বিচ্ছেদ এ দুইয়ের মধ্যে। তবু এরা এক—অভিন্নঅন্তর! নিয়তির নির্বন্ধের মত এই বিশ্বাসের অভিজ্ঞান আমার জীবনের এক আখ্যান ডাগকে হুরীর গতিতে বিদ্যোদগত

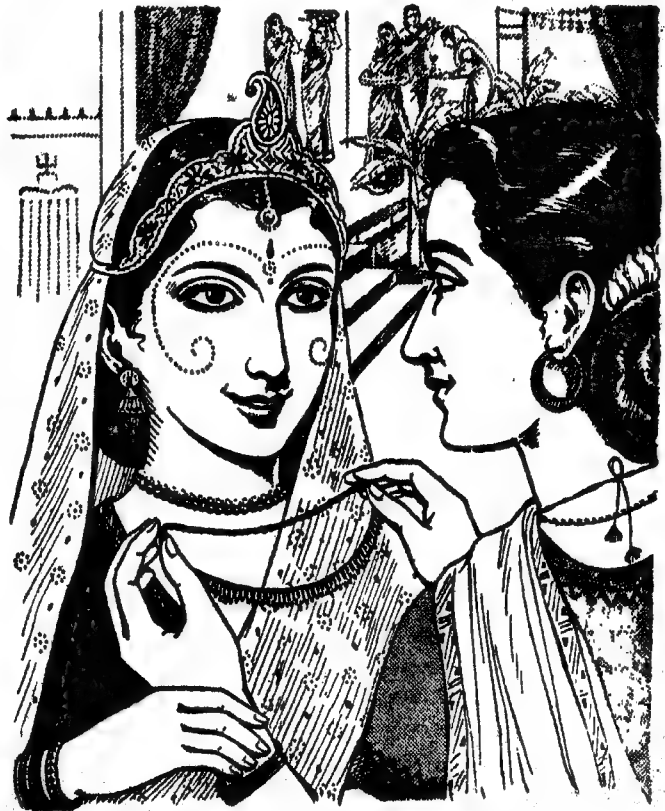
মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”
“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স
সিঁদাছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই,
মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে
ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও
দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলার্স

শ্রীমতি জমনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-ভাস্করী
বঙ্গবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৬১০



পরিচিতির পথে নিজে চলেছে। নবোদ্ভূত অল্পবয়সের মেহের ক্রিয়াকলাপে তরুণীর মধুর লাবন্যিক একদিন অল্পবয়সের অভিনয়শিল্পী জাতিয়েহিলার আমি—আজ সেই এসেছে হুতাশ সন্ধানের মনোহাঙ্গিনী এক ইন্দ্রিয়কলাবর যত কামনার ব্যাকুলতা নিয়ে আমার চোখে ধরা দিতে। আকাশের কোনও রক্তবাগের প্রসাধন নয় আর—রক্ত, লিপিক্ত, কসমেটিকের প্রসাধনে রঞ্জিত হয়েছে সে। তরুণ সূর্যের আলোর আশ্রিত নয়—পূর্বসন্ধ্যার আলো এবং আরক্ত করেছে তাকে। স্তম্ভসেই হৃদয়িত হয়েছে আত্মসমর্পণের আকুল আবেগন। আরত নয়নের শান্ত অনাগ্রহ কখন মুছে গেছে। অঙ্গলক জীবিতারার কুটে উঠেছে তার মধুরাণীর স্বরূপ। আমার গ্রহণে সকল আর সার্থক হতে চায় ও মেয়ের জীবন যৌবন। নিম্নমেঘ ক্রুর রক্তিতে তাই স্তম্ভ হয় না কুমারীর নিষ্পাপ শুচিতা। তাকেই পূর্বের প্রীতির আশ্রিত কেনে তুল করে আর সুখী হয়ে যায় ঐ ভূতর্কিত মনের আকুলতা।

ঐ অধঃপতন আমি সইব কেনন করে। দেশতার মেয়ে এসেছে যৌবিনীর বেশে এক মর্ত্যের মালুকের মন তোলাতে। অনেক প্রেমতির আয়োজন আর তপস্কার আচরণের শেষে যাকে কাছে পাওয়ার আশা করতে হয় সে এসেছে ভিখারিনীর মত আমার অল্পগ্রহে নিজেকে পূর্ণ করে নিতে। স্থায়ী সজ্জিত হয়ে গেছি আমি। হুঁ নরমে রোদের বহিঃ ছেলে জালিয়ে দিতে চেয়েছি ঐ রূপের মাথাকে। কিন্তু কি যেন এক মোহের তুলে বিরাগের সে অস্তিত্ব আর একতনের প্রাণী চোখে অল্পবয়সের আলো হয়ে উজলে উঠেছে। তাই তেখে ব্যথাতত আমি পালিয়ে এসেছি দূরে। হুসিলাতর মত ভগবতী, গুণবতী আর বিদ্যুৎ মেয়ে অনেক জিলবে। আমার আশেপাশে, পরিবেশে, পরিচিত আর বহুমহলে এমন আশা আশঙ্কায় গড়া সহজ সাধারণ মেয়ে অনেক আছে। কিন্তু আজ যিনের সঙ্গে আমার মনের আকাশ বেলনার রাস্তায় সজ্জিত হয়ে যে সূর্য্যভূতলা বিহার নিয়ে গেল—কোনও হুপ্রভাতের উদয়চন্দকে আলোকোদ্ভাসিত করতেই সে আর কিরে আসবে না। এক গোপন অপরাধবোধে ভরে উঠল আমার মন। মনে হল, আমার অবচেতন কামনার তীর আকর্ষণেই স্বর্গের অধিবাস থেকে বাসনার জগতে নেমে এসেছে আর নিশ্চয় হয়ে গেছে হুসিলাতর সুর্য্যলোকবাসিনীর গীতু। কিন্তু এ শূণ্যসত্তা হৃদয়গীরব বিসদৃশের প্রতিক্রিয়ার সন্নিবিধে যে অল্পশোচনার অন্তর্ভূতনে পলে পলে আমার প্রাণলব্ধিকের হরণ করে জীবনমৃত্তের পথ্যাবে নিয়ে যাবে আমাকে। তাই তো পলারনী মনোবৃত্তির নিশ্চিন্ত অবরোধে নিজেকে বন্ধ করতে চেয়েছি আমি। সব চাওরা পাওরার ইতি করে গিয়েছি এক কথায়—যেহা আর সাগ্রহে।

শব্দে ভরজন্তু রজনীর অন্ধ নীরবতাকে বিচূর্ণ করে গীটার বেজে চলেছে—অতশ্রায়। কিপ্রহাতের তাড়নার অসংলগ্ন কত নতুন সুরের সৃষ্টি হয়েছে হৃদয়ে। আমার অনবহিত্তি হাবেই হাবিয়ে গেছে তারা। শুধু সিগারেটের ধোঁয়া, সুরের ইন্দ্রজাল আর চিত্তার অবগাহন। তাইই যাকে একসময়ে চমকে উঠলাম আমি। অমিয়করা এক অপূর্ণ সূর্যনার আবির্ভাব হল আমার যাত্রা। আর সেই উদ্ভাবনের উত্থানায় তখনই এক অভিনব উপলব্ধিকে চিনে নিলাম নিঃশব্দে।

মর্ত্যের কোনও স্পষ্টিত কামনাকে বহা করে না আর সিদ্ধান্ত করতে পারে না বৃষ্টি অন্তের কভার দৃষ্ট গমি। তাই সাধারণীর রূপ-আবরণে এক সবুজ প্রভাতার প্রকরণে অতীতার মনের কাছে অনাবিগত থেকে যেতে চেয়েছে, ঐ হুসিলাতর জীবন দর্শন। সব ভুলের শেষে হল একতরণে—সব জ্বালার নিবন। শেষে হারানর ব্যথা ভুলে গেলাম নিমেয়ে। দর্শনকে চোখে দেখার চিনেছে কি চেনেনি এক বিচিত্ররূপিনীর আঁখিকোণ—সে কথা অপ্রকাশই থাক। তবু আমি তো চিনেছি, জেনেছি আর বুঝেছি তাকে অঙ্গলয়ে। আমার মনের ঘন জাঁধার ঘূঁচরে আনন্দ-অনুভূতির আলোকচর্চিত প্রায়সী যে আমার কিরে এসেছে। প্রায়সীর রূপে তার নব অভ্যাসের নিশ্চিত আভাস দেখেছি খোলা জানালার পথে পূর্ব আকাশের ঐ অনুস্রবের বজ্রতলেখার।

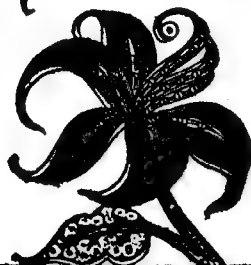
আর বিধা নেই কোনও। ভাবীকালের দিনগুলির বহনচরণ এবার শেষ হয়েছে। ব্যর্থকাম—তবু তো ব্যর্থ প্রেম নই আমি। প্রীতিবিলম্বেরও তাই প্রয়োজন নেই আর। ইস্তিতাকে একান্ত করে না পাওরার আশ্রিতে আমরণ অপরিগ্রহে দিনাতিপাত করে যাব—এমন মনের অসারতা আমার নেই। স্ব প্রেমী আর সমাজ থেকে সর্দাংশে উপযুক্ত এক মেয়েকে খুঁজে নেব আমি অন্তের সহায়তায়। আর তাইই আমার বোটার হাফের মধ্যমা দেব নিকিচারে। তার পর সকলের সুখ আর শুভেচ্ছার আশীর্ষ পথে শুভ হবে আমাদের সহর্ষ মিলনযাত্রা। বৃহত্তর সঙ্গারের ক্ষেত্রে আধুনিক আগ্রহ-স্পৃহাতির ক্রটিহীন আর অল্পকরণীর এক স্বর্ষমর দৃষ্টান্তের উপস্থাপনা করে যাব নিকিচর সাঙ্ক্যে। পূর্বরূপ নয় আর—বিবাহাতর প্রেমের দীপা নেব এবার নিঃস্রবের অনুভবে।

আকাশের অন্তরালেই তো সব আশার অবলান ময়—সে যে তরুণ দিনের অল্প আলোর ইশারা। বাল্যকর্মে রাগরূপে আর কালীর প্রভাতী বহনর সেই সত্যই আজ প্রতীভাত হয়েছে আমার সঙ্কায়। ক্ষততর হয়েছে হাতের গতি। সুরধ্বনির সুরধ্বনি থেকে মনের মধুরপাখী বেড়ে সুরলোকের মল্যাকীর্নতে এসে পড়েছি কখন। আর অলীম আনন্দের ধারায় হুস্তিহান করে—বাসনার স্লিষ্টতা, বেলনার খিটতা থেকে পঠিত হতে—ততল হতে গেছি আমি। সিদ্ধান্তরূপে দেখে নিয়েছি আমার দেবোপমা জীবন নারিকাকে। না, আর লজা নেই কোনও। মিলনাত না হোক—বিবাহ করণও হবে না এ কাহিনীর পরিণতি। হৃদয়ের বর্ষজটীর সাহায্যিনী প্রাণীকে অল্পবৃত্তিত করে সন্তানের রূপে দিবাকর এবার এসে পড়িয়েছেন ধরণীর শিরদণ্ডে। তার কল্যাণকরসম্পর্কে সোনার হাসিতে উজলে উঠেছে বহুবার হু। চেয়ে চেয়ে দেখছি আমি তাই। এখন আমি নিতে যাব। গিরে পীড়ার আমার বাহির হুয়ার প্রান্তে। স্তব্র পাঠখানি পূর্ণ করে নেব রূপ বয়োব্রত প্রকৃতির ঐ গন্ধে বর্ণে হৃদয়ে গানে আর আনন্দের অভিধারে। আজ আর কোনও মধুর-বিচিত্রা বহুবর্ধিনী আসবে না তপন-নন্দিনীর গৌরবে ঐ তপসীপূর্ণ পথ বয়ে আমার নয়নকে আকুল করে বেতে। কিন্তু সে তো আছে প্রতিকরণ আমার মনে—অল্পবয়সের নিরবনে।

মর্ত্যের প্রগলভ অভিজটীর অধিষ্ঠিত হয়ে গেছে ঐ সুরীলী দেবতলারীর প্রবরধর্মে প্রাধ্বনে। সিন্দীম আমার অপরায়—



জোদর্যে মাদুর্য



গিরি চান্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

এম.বি.সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৩-১৭৬১ ১৩৭/সি ১৩৭/সি/১ কলকাতা টাই কলিকতা-২ গ্রাম-পুষ্টিপুর
৩৩-৩৩/সি ৩৩/সি/১ মাসখিয়া এলিভেড কলিকতা-২ ফোন-৪৬-৪৬৬৬
কলকাতা পুষ্টিপুর কলিকতা ৩৩-৩৩/সি/১ কলকাতা টাই কলিকতা-২
কলকাতা পুষ্টিপুর কলিকতা ৩৩-৩৩/সি/১ কলকাতা টাই কলিকতা-২
৩৩-৩৩/সি/১ কলকাতা টাই কলিকতা-২ ৩৩-৩৩/সি/১ কলকাতা টাই কলিকতা-২

অন্তরীণ বৃষ্টি তার প্রায়শ্চিত্ত। তবু সেই সর্কোত্তমার বিভাসার সঙ্গে সঙ্গেই তো মনের আদিগন্ত উত্তাসিত হয়ে গিয়েছিল একদিন—সব অবিজ্ঞা আর অনাচারের তমসা থেকে স্বভাবের অজ্ঞাত দিকটার উন্মোচন হয়েছিল আমার—আর নব জাগরণের অধ্যায় সংযোজিত হয়েছিল জীবনে। সেই প্রথম উদয়বের পরম মুহূর্তটি যে প্রতিদিনের অন্তরে স্মৃতির হয়ে গেছে—সে কথা আমি অস্বীকার করব কেমন করে। এক মাটির মেয়েকে নিবিড় আল্পেষে বুকের মাঝে ধরেও জনমের সন্ধানপনে যে এক অপাখিব ত্রোপানীয়ার স্পন্দন আবেশেই উৎপল হব আমি—এম চেয়ে সত্য তো আর কিছু নেই। আগামী দিনের কত অলস অবসরে, অবসাদের চিত্তবিক্ষেপে মানসলোকের উন্মুখতার নিশ্চকচরণে অবতীর্ণ হবে এক অতছুকা মেয়ে। সাধুনার হাস্যে ব্রহ্ম শান্তির চন্দন অবলোপে জুড়িয়ে দেবে আমার সর্কদেহের, তাপনন্ত অন্তরের বত প্রেরণতার ছালা—আর জীবন তখন উদ্দীপিত হয়ে বাবে নতুন প্রেরণার উচ্ছলতায়।

ব্যবাস্তবতা, কাছের চাওয়ার তোমাকে আমি পাইনি—কিন্তু ব্যাসের পাওয়ার যে তুমি ধরা দিয়েছ আমার মনে। যোগ্যজনের আবরণে দ্রীত হও তুমি, অনিশ্চিত। আমার জীবনে অনির্বাক্য হয়ে থাকুক শুধু তোমার দিব্যজ্যোত্সব অরুণ লেখা।

গজার ধার

কল্যাণী বসু

গজার ধার।

সামান্য দুটি শব্দ। কিন্তু এ শব্দ দুটোই অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই গজার ধারটাকেই নিশিকান্ত বাবু শেষ বয়সের বন্ধু বলে ঘোষে নিয়েছেন।

ভোরে উঠে খটখামেদের জন্তে তিনি গজার ধারে গিয়ে বসেন, বিকালের দিকেও বেশ খানিকক্ষণ, মেহের ব্যস্তা রাস্তা মনের হস্তে গ্রাসি সব দুঃ হয়ে যায় গজার মিষ্টি হাওয়ার। সময়টাও কাটে ভালই। একে একে চার পাঁচ জন ছুটিও ফিলে যায়।

এঁরা নিশিকান্ত বাবুর গজার ধারেরই বন্ধু। গজার ধারে এঁদের বন্ধুত্ব আবার গজার ধার থেকেই এঁদের বিদায়।

কোন কোন দিন তাদের আড্ডা বসে বিকালের দিকে, কোন কোন দিন গল্প—সংসারের কথা, দেশের কথা। বর্তমান যুগ নিয়ে আলোচনা। ঠাকুর দেবতাও বাদ পড়ে না এ থেকে।

দলের মধ্যে নিশিকান্ত বাবুই প্রথমে এসে বসেন এখানে।

এই গজকে আনবার জন্ত ভগীরথকে তপস্বী কোরতে হয়েছিল। এই গজার জলে স্নান কোরে লোকে মুক্তি পায়। গজার হাওরা কেমন বিতুড় ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী।

গজার সবচেয়ে নানান প্রশ্ন জেগে উঠে নিশিকান্ত বাবুর মনে, তার পর একে একে এসে জমা হয় সাজোপাড়ার।

একটা চাতাল আধকার করে বসেন নিশিকান্ত বাবুর দল।

বিকালের দিকে নিশিকান্ত বাবু যখন একলা বসে থাকেন দেখতে পান কত ছোট ছোট ছেলেরা মেয়ে বড়োতে এসেছে এই গজার ধারে। বুকের দলও মল নয়।

সন্ধ্যার দিকে আসে সবাই জোড়া জোড়া, বামি-জী-কেউ কেউ বা জ্ঞা কিছু। ছেলে ছোকরার দলও বেশ আসে।

সেদিন গজার ধার থেকে ফিরতে বেশ রাত হল নিশি বাবুর। বাড়ীর সবাইএর ভাবনা হয়নি যে তা নয়। কি একটা কথা কাটাকাটি হয়েছিল বিকালের দিকে জী সৌদামিনী দেবীর সঙ্গে।

তাই সহজেই তিনি অসুস্থ হয়ে নিয়েছিলেন দেবী করে ফেয়ার কারণ—কারণটা হঠাৎ সহজ মনে হয়েছিল ততটা সহজ নয় কিন্তু। বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে গজার ধারেরই ঘটনা বলা চলে।

নিশিকান্ত বাবু বলতে কাগলেন, রাত তখন আটটা হবে। অল্প অল্প শীত এখন পড়েছে। গজার ধার প্রায় খালি খালি। নিশিকান্ত বাবু উঠে আসছেন বাড়ীর উদ্দেশ্যে। এমন সময় একটি মেয়ে এসে তার পায়ে চুটিয়ে পড়ল, কোলে একটি মাস দুয়েকের শিশু।

এত রাতে এমনভাবে আসার কারণ জিজ্ঞেস কোরলেন নিশিকান্ত বাবু। মেয়েটি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো।

গল্প শুনে তখন ডিবে থেকে একাখালি পান খেয়ে নিলেন সৌদামিনী দেবী। তারপর আবার মনোবোগ দিলেন।

নিশিকান্ত বাবু আবার বলে চলছেন। গায়ের লোমকুপুলো খাড়া হয়ে উঠেছে ঠাণ্ড। মেয়েটি ধাতু হয়ে বলতে আরম্ভ কোরলে। গজার ধারটা কিন্তু তখনও ভাঙা ভাঙা। মেয়েটির অবস্থা দেখে নিশিকান্ত বাবুর মন গলে গেল। সাধুনা মিতে এঁগিয়ে এলেন।

ব্যাপারটা কিন্তু তখনও রহস্যময় হয়ে রয়েছে। সৌদামিনী দেবী আবার একাখালি পান দিলেন। তারপর উঠে বসলেন খাটের উপর। মেজছেলে মাসিক তখন ওষুধ ঘুমেছে অঘোরে। হাওরা-দাওয়ার পাট সবাইই চুকে গেছে।

নিশিকান্ত বাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আবার আরম্ভ করলেন ঘটনাটা। শিশুটিকে তাঁর হাতে তুলে দিল মেয়েটি। নিশিকান্ত বাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। হয়ত কোন বিপদে পড়েছে।

কি সাহায্য চাও আমার কাছে? প্রশ্ন করলেন নিশিকান্ত বাবু। সাহায্য? সাহায্য নয়, অসুগ্রহ, আধকার এই বকেই মেয়েটি আবার কান্দতে আরম্ভ করলো। বাস্তব তখন অনেকটা গাড়িয়ে গেছে। নিশিকান্ত বাবু বাড়ী ফেরার জন্ত ব্যস্ত হলেন।

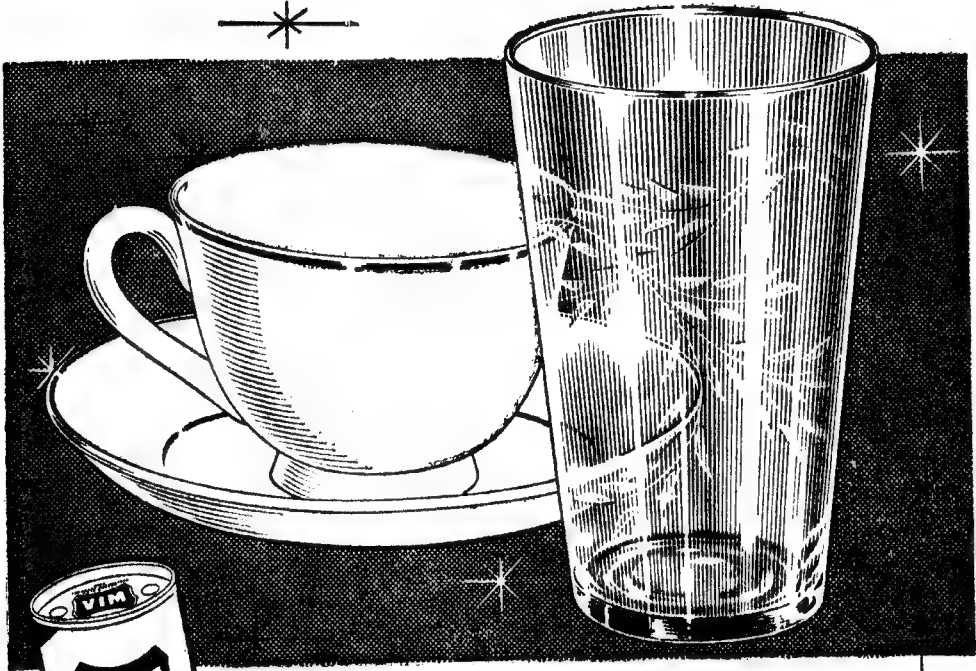
কালো থামিয়ে মেয়েটি তখন বললে আইনজ্ঞ আমি আপনায় দ্বিতীয় পুত্রবধূ। আর শিশুটি আপনায় বংশধর। এইটুকু জানিয়ে তখনকার মত মেয়েটি চলে গেল শিশুটিকে নিয়ে।

ঐ শীতেও নিশিকান্ত বাবুর কপাল ঘাম দেখা গেল। কাহিনী শুনে সৌদামিনী দেবী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

Doubt thou the stars are fire,
Doubt that the sun doth move,
Doubt truth to be a liar,
But never doubt I love,

—Shakespeare

ডিমের পরশ লাগলে পরে - দেখুন ক্রমেন ঝলমল করে



ডিম অল্প একটু ব্যবহার করলে পরেই সবজিনিষের চেহারা বদলে যায়। কাচের বাসন-কোসন, রান্নার ডেক্টা, হাড়ী, বেসিন থেকে ঘরের মধ্যে সবই এক নতুন জলুবে অকমক করে। ডিম দিয়ে পরিষ্কার করলে পরে জিনিষপত্রে কোনরকম আঁট লাগে না।

আর কত সোজা ও কম খাটুনিতে হয় ভেবে দেখুন। ডেকা ন্যাকড়ার একটু ডিম দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষুন-দেখবেন যত ময়লা আর দাগ নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। ডিম ব্যবহার করলে আপনার বাড়ী আপনার গর্বের কারন হবে।

ডিম সব জিনিষেরই উজ্জ্বলতা বাড়ায়।



৪

শ্রদ্ধা

সারা রাত ভাবতে ভাবতে বাড়ী ক্রিয় কমলেশ। কে এই পত্রলেখক, অমিতাভর সঙ্গে তার সম্বন্ধটাই বা কি?

বাড়ী ঘিরে দেখে প্রশান্ত ঘাটের ওপর আরাম করে বসে মন দিয়ে গল্পের বই পড়ছে। কমলেশকে আসতে দেখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, কি রে কমল দেবী করলি বে?

—কাজ ছিল। কমলেশ এড়িয়ে হাবার চোঁটা করে।

—আবার সেই বুড়োর পান্নার পড়িসনি তো?

—কে বললে?

—এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

কমলেশ তামা কাপড় ছেড়ে সহজ হয়ে বসে বলে, একটা বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে বে।

কমলেশের গলায় স্বর শুনে প্রশান্ত মুখ তুলে চায়, কি ব্যাপার?

—চল মিলির কাছে চল। ঐখানেই সব বলব।

প্রশান্ত আর দেবী করে না, তাড়াতাড়ি চাঁট পরে মিলে কমলেশের সঙ্গে বেহিরে পড়ে।

বেঁকা তক্তাও ঘরে বসে পড়াগুলো কমলেশ, প্রশান্ত আর

কমলেশকে এই সময়ে আসতে দেখে বিস্মিত: না হয়ে পারে না, পড়াগুলো নেই বুঝি, আড্ডা মেয়ে বেড়াচ্ছিল বে?

প্রশান্ত উত্তর দেয়, কমল কিছু বলবে বলে এসেছে, নিশ্চয় কোন সিরিয়াস ব্যাপার। বে স্বকম মুখখানা ধমধমে করে দেখেছে।

—কি হয়েছে বে কমল?

কমল একে একে সব কথা বলে গেল, বুড়োর বাড়ীর ভেতরে বাঁওরা, জল খেতে চাওরা, অমিতাভর চিঠি কেনো বাড়ী, বা কিছু। প্রশান্ত আর বেঁকার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এর কিছু বুঝতে পারছ? বুড়োর সঙ্গে কার যোগাযোগ থাকতে পারে?

প্রশান্ত বলে, অমিতাভর ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে, ছেলের মধ্যও সে ও গোলমাল পাকতে চাইছে সে তো আমরা আগেই দেখেছি। নিশ্চয় ওর পেছনে কোন লোক আছে।

—কিন্তু কে সে?

—তাকেই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

দিন কেটে যায়। নিয়ম মত কাজও চলছে কিন্তু আগের সে উদ্দীপনা বেন নেই। বেশীর ভাগ ছেলেরাই মনমরা হয়ে বসে থাকে, পড়াগুলো করে কিছু হাসে না। কমলেশ বোঝে এর কারণ অবশ্য সদাশঙ্কর, সদাশঙ্কর সদাশাস্ত্রময় পুরুষ, কখনও তাকে মুখ ভরি করে থাকতে দেখেনি কমলেশ, হৈ হৈ আনন্দের সে প্রত্যেক, কিন্তু এ কদিন তাকে বড় বিষম লাগছে। সব সময় চিন্তাগ্রস্ত, ছেলেরের সঙ্গে ভাল করে কথা পথ্যন্ত বলেন না, অস্বস্তি হয়ে যুঁয়ে বেড়ান।

রাত্রিবেলা কমলেশের ঘুম ভেঙে গেল, প্রশান্ত পানের ঘাটে শুয়ে আছে। বাইরে চাঁদনী রাত, বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসছে। মিঠে দেহাতী সুর।

কমলেশ জানালার কাছে উঠে এসে ঠাঁয়, বড় চমৎকার লাগছে বাইরেটা দেখতে। জ্যোৎস্নার আমেজে রূপালী রাতের মোড়া গাছপালা, সাদা সাদা ফেনার মত পাতলা কুয়াশা। কমলেশ একদৃষ্টে মাঠের দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ মনে হল, কে যেন মাঠের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। প্রথমটা মনে সন্দেহ আগলেও, ভাল করে দেখে নিয়ে বুঝল, সে আর কেউ নয়, শঙ্করদা। কমলেশের মনে হল সদাশঙ্কর-এর সঙ্গে কথা বলার এই তার প্রথম সুযোগ। আশে পাশে কোন লোক নেই, নিবিড় সে কথা বলতে পারবে।

কৃত্ত পায়ে কমলেশ নীচে নেমে আসে। সদাশঙ্কর-এর কাছে গিয়ে জাবির হয়।

—শঙ্করদা।

দিন আগত ঐ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

—কে কমল ? এত রাতে উঠে এলি যে ?

—ঘুম হচ্ছিল না। আপনি কি কচ্ছেন ?

সদাশঙ্কর হাসে, আমায়ও ঘুম আসছিল না, তাই বীথীর খুব শুনে চলে এলাম। কি মিষ্টি বীথী বাজছে না যে কমল ?

কমলেশ সে কথার উত্তর না দিয়ে একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব শরীর ?

—কি কথা কমল ?

—আজকাল আপনি বড় গভীর হয়ে থাকেন। আগের মত আর হাসেন না। কি হয়েছে আপনার ? শরীর ঠিক আছে ? সদাশঙ্কর হেসেই উত্তর দেয়, দিবিখা খাচ্ছি রোজ, শরীরের আবার কি হবে ?

—তবে কি হয়েছে বলুন ?

—কিছুই হয়নি তো।

—না আপনি বলতে চাইছেন না।

—তাইলেই বোক, কেন আমি বলতে চাইছি না। বলে কোন লাভ নেই বলেই তো। একটু খেমে কলোনীর বাড়ীজন্মার দিকে তাকিয়ে স্থির গলার সদাশঙ্কর বলে, নিজের হাতে কোন জিনিষ গড়ে যদি আবার তা ভাঙতে হয় তাহলে যে বড় কষ্ট।

—ভাঙতে হবে কেন ?

—তা তাদের কি করে বোঝাব। ভাঙার মাস্তবের লোভ, ভাঙার মাস্তবের স্বার্থ। থাক্ গে ও সব কথা, অনেক রাত হ'ল শুয়ে পড়।

কমলেশ তবু ছাড়ো না, আমাদের সব কথা খুলে বলুন না, দেখি যদি কিছু করতে পারি।

—যদি কখনও দরকার হয় নিশ্চয় বলব। সদাশঙ্কর কমলেশের কাঁধের ওপর হাত রাখে, পাণ্ডু গলার বলে, তোরাই আমার সবচেয়ে বড় ভরসা, জানি আমার পাশে তোরা সব সময় এসে পাঁড়িবি।

ঘরে ফিরে এসেও কমলেশ ঘুমেতে পারে না।

সেমিন পনিবার। মাঠে খেলা শেষ করে ছেলের দল বাড়ী ফিরছিল। কলোনীর কাছ বরাবর এসে দেখে কয়েকটা জীপ আর লরী পাঁড়িরে য়েছে। বিজ্ঞানভবন-এর পূর্বদিকে যে বিরাট ঘাটটা পড়ে আছে, সেখানে চারীয়া যাবে যাবে কলস বোনে, সেখানে জন পনের লোক বাস্তু হয়ে মাপ লোক করছে। ছেলেরের কোঁকুলক হয়, এগিয়ে যার তাদের দিকে।

নীল রক্তের কাপড়ে জাঁক একটা নজ্জা দেখে এরা কান্ন করছে। সাহেবী পোষাকপরা হ'জন ভরসোলক যে রকম হকুম করছেন সেই রকম কান্ন করছে অন্তরা।

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করে, এরা কারা রে ?

কমলেশ উত্তর দেয়, বায়া নজ্জা দেখছে ওরা নিশ্চয় ইঞ্জিনীয়ার।

—কিন্তু এখানে কি করছে ?

—তা তো বুঝতে পারছি না। কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখলে হয়।

একটা রোগা, লম্বা লোক কিন্তে হাতে করে এক কোথায় পাড়িয়েছিল, কমলেশ তারি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিসের মাপ নিচ্ছেন আপনারা ?

লোকটি উত্তর দেয়, এখানে বাঁকী বর লব তৈরী হবে যে।

—কাদের জন্তে ?

—এক মস্ত বড় কোম্পানী, তারা এখানে চিনির কল বসাবে।

—চিনির কল ?

—হ্যাঁ, সুগার মিল। বিরাট ব্যাপার হবে। দেখতে দেখতে এ জায়গা সহর হয়ে যাবে। দোকান পত্তর, সিনেমা-হল কত কি। কম লোক তো এখানে বাস্তু করবে না।

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোথায় থাক ?

—এই খুলের হোটেলে।

—খুলের চেহারাও বদলে যাবে। মিল টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। দেখবে কত বড় ইকুল হয়ে যায়।

লোকটি কথা শেষ করতে পারে না, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব মাপ নেবার জন্তে ডাকায় সে চলে যায়। ছেলের দলও খানিকক্ষণ পাঁড়িরে থেকে আশ্চর্য আশ্চর্য চলে আসে। অনেকে বলে, এ কিন্ত বেশ ভালই হল, খুব চিনি খাওয়া যাবে, বাড়ীর পাশেই চিনির কল, কি মজা !

অমিতাভ জোব দিয়ে বলে, ভালতো হবেই, সহরে যাবার আর আমাদের দরকারই হবে না। এখানটাই তো সহর হয়ে যাবে। প্রত্যেক রোববার আমরা সিনেমা দেখব, কি মজা।

কমলেশ কিন্ত গভীর হয়ে বলে, আমার কিন্ত ভয় লাগছে, আমি সহরের ছেলে কি না।

অমিতাভ রুখে ওঠে, ভয় আবার কিসের ?

—যে শাস্ত্রির মধ্যে আমরা পড়াশুনা করছি। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যে মধুর সম্পর্ক তা সব নষ্ট হয়ে যাবে। আমরাও কলকাতার ছেলেরের মত শুধু হৈ হৈ নিয়েই মেতে থাকব। পড়াশুনা আর কিছু হবে না।

—শুধু পড়াশুনা নিয়েই থাকলে তো হবে না, বাইরের জ্ঞান আমাদের কি করে হবে ? বাইরের জগতের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক আমাদের। এখানে বেশীদিন থাকলে আমরা তো কুশলভূত্ব হয়ে যাব।

কমলেশ রাগের সঙ্গেই বলে, পাঁচটা রাজনৈতিক আন্দোলন করলেই বাইরের জ্ঞান হয় না, ছাত্রদের পড়তে হবে, হাতে কলমে গঠনমূলক কাজ করতে হবে, বা আমরা এখানে করছি। হুখীর দুখে কাঁদতে হবে, হুখীর আনন্দে হাসতে হবে, সেই বেন আমাদের আদর্শ হয়।

অমিতাভ থ্যাক থ্যাক করে ওঠে, ওতো সব শব্দরসার কথা, তুই কণচাচ্ছিস কেন ?

কমলেশ ধীরভাবে উত্তর দেয়, উনিই যে আমার গুরু। অমিতাভর সঙ্গে হু' একজন ঠাটা করে হেসে উঠলেও বাকী সবাই চুপ করে শোনে, তারা বোঝে কমলেশের কথাগুলোর মধ্যে শুধু গুরুভক্তিই নয়, কতখানি আন্তরিকতা লুকিয়ে রয়েছে।

বাড়ী ফিরে কাপড় ভাষা বসলে কমলেশ আর প্রশান্ত গেল রেংকার কাছে। রেংকা বাড়ী ছিল না, কিন্ত যদিবা তাড়ের ভেতরে ডাকলেন, হ্যাঁরে, শব্দরসাকে দেখেছিল ?

—কই না তো !

—কোথায় যে চলে গেলেন।

কমলেশ উদ্বিগ্ন হয়, কেন কি হয়েছে ?

—ক'দিন থেকেই শরীর খারাপ, ওষুধ পত্র কিছু খাচ্ছেন না।

আজ একবার এলেন, কি যে বিড় বিড় করে বলতে বলতে চলে গেলেন কিছু বুঝতে পারছি না।

কমলেশ গম্ভীর গলায় বলে, আমি ক'দিন থেকে তাই দেখছি।

অথচ জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেন না। আপনি নিশ্চয় সব কিছু জানেন মনিকামি। আমাদের সব খুলে বলুন। কি হয়েছে শঙ্করদার, কেন এত ভাবছেন ?

মনিকামির বলবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু কমলেশ আর প্রশান্ত এত বেশী পীড়াপীড়ি শুরু করল যে তিনি আর চূপ করে থাকতে পারলেন না, বললেন, বলছি, কিন্তু কাউকে একথা বলিস না, এমন কি শঙ্করদাকেও না। যদি শোনেন আমি তাদের বলেছি তাহলে বিরক্ত হবেন।

—না, না, আমরা কাউকে বলব না।

মনিকামি জানালার কাছে উঠে গিয়ে পুশদিকে হাত দেখিয়ে বলেন, ঐ ঘরের ওপর বিরাট এক কল বসবার কথা হচ্ছে।

—সে আমরা জানি, ইঞ্জিনীয়াররা মাপ-জোক করছে।

—যদি ঐ কল বসে যায় তাহলে শঙ্করদার একদিনের পরিশ্রম সব নষ্ট হবে। এ আদর্শ স্থল আর থাকবে না। সেই জগ্গেই তাঁর মনে এত স্নেহ।

কমলেশ অসচার্য্য কর্ত্তে জিজ্ঞেস করে, এই কল বসান বন্ধ কবা যায় না ? তার কি কোন উপায় নেই ?

—উপায় নেই তা বলব না, তবে তা এক রকম অসম্ভব।

—কি, তা বলুন ?

—ঐ যে পুশদিকের জমি, ওটা হ'ল ঐ বক-বুড়োর। সে তারি সাংঘাতিক লোক, আমাদের মোটেই ভাল চোখে দেখে না, তাই ঐ জমি বখন আমরা কিনতে চেয়েছিলাম দেয়নি। এখন গুনছি চিনির কলওয়ারীদের নাকি বিক্রী করছে।

কমলেশ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, বিক্রী এখনও হয়নি তো ?

—না।

—সেখি, আমি যদি কিছু করতে পারি।

মনিকামি হান হানেন, তুই কি করবি, সে একটা পিশাচ আর শুধু তো ঐ বুড়ো নয় আমাদের মধ্যে থেকেও কেউ ঐ কলওয়ারীদের সঙ্গে বোপ দিয়েছে।

—কি করে বুঝলেন ?

—তা না হলে হঠাৎ এই কলোনির পাশে বিশেষ করে যেখানে এক বড় হেলিকপ্টার স্থল রয়েছে সেখানে কি মিল বসতে পারে ? আমাদেরই মধ্যে থেকে কেউ কলোনির বাসিন্দাদের রাজী কবিয়েছে, তাদের কাছ থেকে মিল বসাবার অসম্ভব পেয়েছে কোম্পানীর মালিকরা।

—কিন্তু কে সে ?

—তা আমি জানি না। হয়ত শঙ্করদা জানেন, কিন্তু কাউকে বলতে চান না।

—আমরা তাকে খুঁজে বার করব। এ স্থল আমরা ভাজতে দেব না। যে রকম করে হোক শঙ্করদার আদর্শকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব।

মনিকামির বাড়ী থেকে কমলেশরা বাড়ী ফিরল না। দু'খানা টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শহরের রাস্তায়। বেতে বেতে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করে, বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে যে কমল, এখন কোথায় যাচ্ছিস ?

—সেই বন্ধপুত্রীতে।

—এত রাত্রে গিয়ে কি লাভ হবে ?

—বক-বুড়োর সঙ্গে আজ আমি সরাসরি কথা বলতে চাই। এ জমি আমি তাকে কিছুতেই বিক্রী করতে দেব না।

হুঁ হুঁ করে পা চালিয়ে তারা বখন বন্ধপুত্রীর সামনে এসে দাঁড়াল, তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে। বাইরের গেট দিয়ে না ঢুকে কমলেশ সেদিন বুড়োর সঙ্গে বেড়ার যে ঝাঁক দিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকছিল সেই পথ দিয়ে চলতে শুরু করল। নীচু গলায় প্রশান্তকে বলে, খুব সাবধানে পা কেলিস, বেশী শব্দ যেন না হয়। তাহলেই বুড়ো টের পেয়ে যাবে।

প্রশান্ত ভয়ে ভয়ে বলে, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না যে কমল, আরো লোক নিয়ে আসা উচিত ছিল। যদি একবার বুড়ো ঘরে ফেলে তাহলে আর প্রাণ নিয়ে পালাতে পারব না।

খিড়কীর দরজার কাছে এসে কমলেশ আন্তে ঢেলে দেখে দরজা খোলা। প্রশান্তকে কাছে টেনে নিয়ে বুঝিয়ে বলে, আমি ভেতরে ঢুকছি, তুই ঐ বড় গাছটায় পেছনে লুকিয়ে থাক, যদি আমার ফিরতে দেয়া হয় শঙ্করদাকে গিয়ে খবর দিস।

—আমি কি একলা থাকতে পারব ?

—খুব পারবি।

কমলেশ মুখ পায়ে বন্ধপুত্রীর ভেতরে ঢোকে, প্রকাণ্ড বায়ালার ডানদিকের ঘরে আলো জ্বলছে, আর সমস্ত বাড়ীটায় অন্ধকার। কমলেশ ধীর পদক্ষেপে সেই দিকে এগিয়ে যায়। টুকরো কথাবার্তা কানে ভেসে আসে। বুড়োর গলা সে চেনে, খনখনে গলায় কাকে যেন জিজ্ঞেস করছে, সকলের মত আপনি পেরেছেন ? পরে কেউ আপত্তি করবে না ? হৃদয়ে কে উত্তর দিল—না।

—জমি আমি বেচব না ঠিক করেছিলাম। তবে এত টাকা বখন দিচ্ছে, দশগুণ টাকা, তার ওপর ঐ লোকটার দস্ত চূর্ণ হবে। সেই বে সলাশঙ্কর না কে ? আমাকে হুমকী দিয়ে বলেছিল, ভাল চানতো জমি আমাদের বিক্রী করে দিন, পরে আর লোক পাবেন না কেনবার। তখন আমরাই জোর-দখল করে বলব। এখন সে কি বলে।

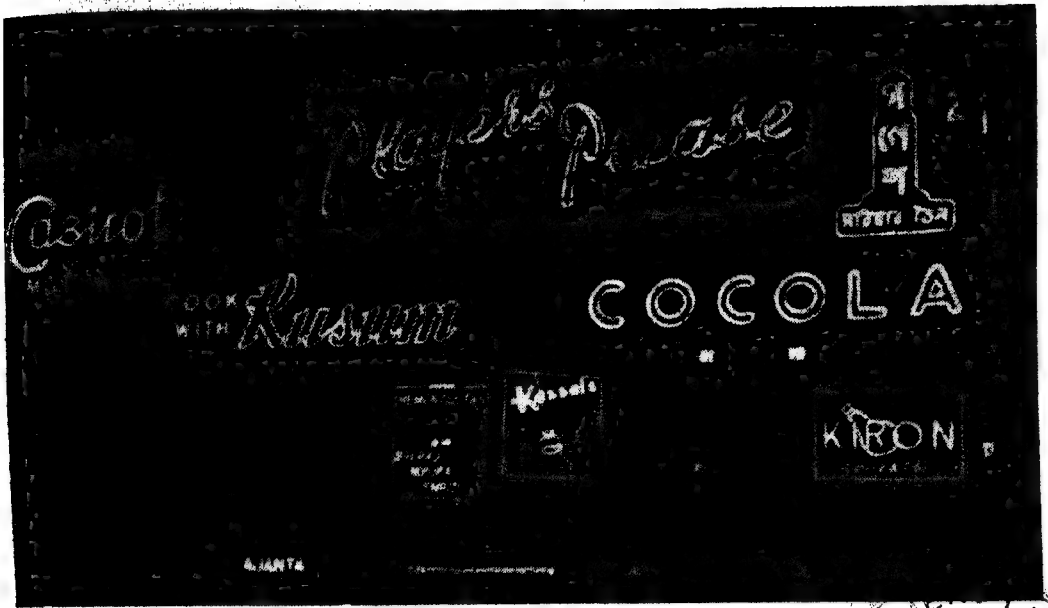
—যুথ তুকিয়ে চূপ হয়ে গেছে।

—হবে না ? সব বড় বড় কথা, আদর্শ। এইবার কি করে ইচ্ছল ঢালায় আমি দেখব। ঠিক আছে, আমার আর কয়েকটা দিন সময় দিন, এই শেষ হাসটা কেটে যাক। তাহলেই সই-সাবুদ করে দেব।

—আপনি বখন কথা দিতেছেন আর আমাদের ভাবনার কিছু নেই। সামনের শনিবার এই সময় এসে আমি সব কাগজপত্র আপনাকে দেখিয়ে দাব।

—ঠিক আছে।

কমলেশ কান খাড়া করে থেকেও অনেকদূর আর কোন কথা

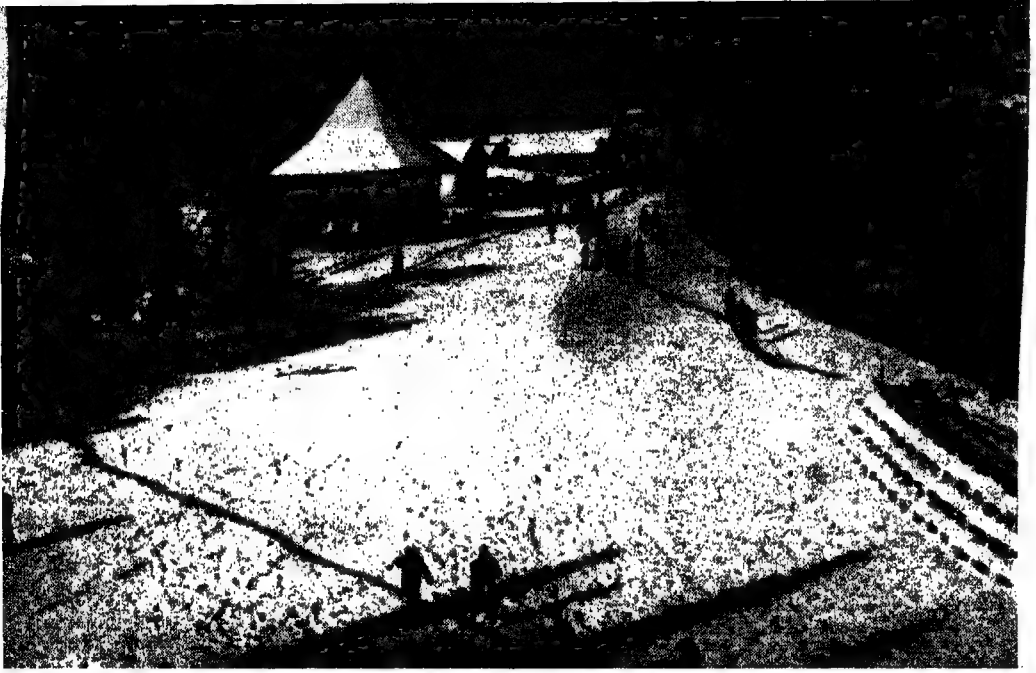


রাতের কলকাতা

॥ আ নো ক চি ত্র ॥

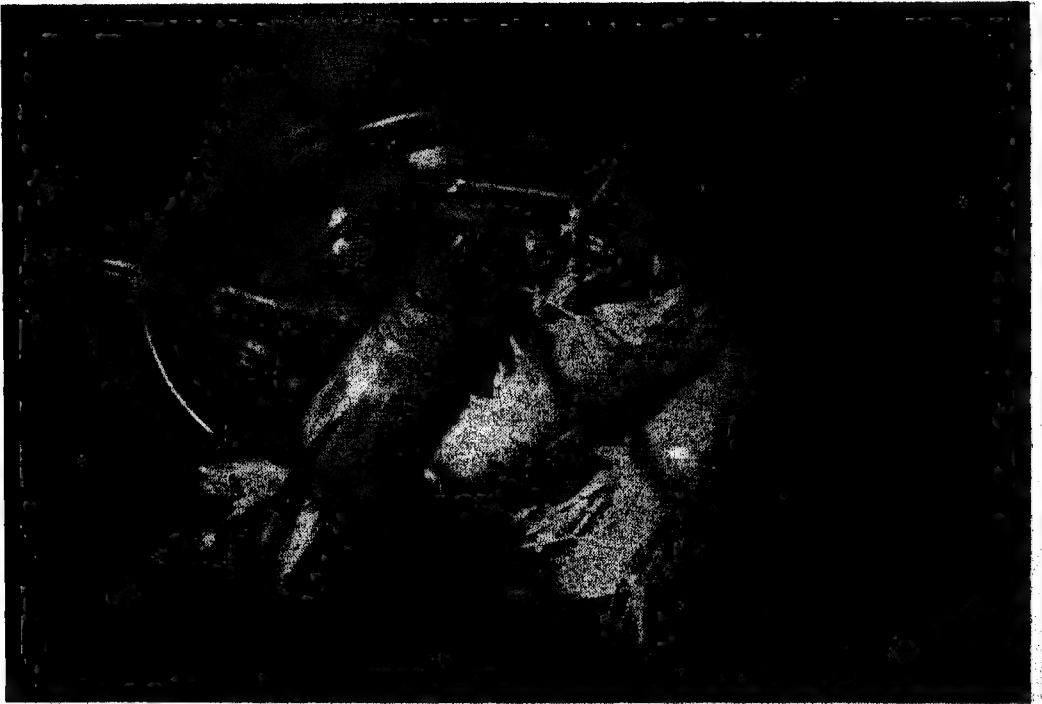
দিনের কলকাতা





গিরিৰাজ
খান্ধকীট

—রাধাগোবিন্দ বসাক
—বান্ধদেব কুণ্ডোপাধ্যায়





সিমলা পর্বত

—পাণ্ডিত্যময় গুপ্ত

রাজসীর তীর্থ

—কেশবব্রজ পাল





আলোক-বর্ণা

—স্বকিশোর বসু

ভনেতে পায় না, বোনের বুড়ো বোকাবোকা লোককে নিয়ে অল্প দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর এখানে ঠাঁড়িয়ে থাকা বুদ্ধির কাজ হবে না ভেবে কমলেশ খিড়কীর দরজা দিয়ে আবার বেরিয়ে আসে। প্রাশান্তকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, বুড়োর সঙ্গে কাউকে বেহুতে দেখেছিলি?

প্রাশান্ত চুপিস্বরে বলে, ঘুরে পারের দরজা পান্ছি, মনে হচ্ছে সদর রাস্তা দিয়ে কারা যাচ্ছে।

—তুই এক কাজ কর, আমরা যে রাস্তা দিয়ে এসাম সেই রাস্তা দিয়েই খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যা, হয় ত লোকটাকে ধরতে পারবি। শুধু মুখটা চিনে রাখসেই হবে।

—আর তুই?

—আমি এখন এখানেই থাকব, বক-বুড়োর সঙ্গে দেখা না করে আমি বাব না।

—যদি কোন বিপদ হয়?

—ভগবান আছেন।

আর কোন কথা না বলে কমলেশ আবার খিড়কীর দরজা দিয়ে চুক যায়। প্রাশান্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মনস্থির করে ফেলে। সদর দরজার কাছে মিসিরে বাগুয়া পারের দরজাকে লক্ষ্য করে দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করে। [ক্রমশঃ]

কেন টাক পড়ে

আছার্য্য চৌধুরী

তোমাদের কারও মাথায় কি টাক পড়েছে? তোমারা বলবে, নিশ্চয়ই না। কিন্তু টাক পড়েছে এমন মানুষ নিশ্চয়ই তোমারা দেখেছ। টাকগুলো মানুষের কথা মনে পড়ে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব হাসি পাবে। কিন্তু হেসো না। যে কোন মানুষেরই টাক পড়তে পারে। অতএব, সাধু সাবধান।

কিন্তু টাক পড়ার কারণ জানো কি? এবার সেই কথাই বলবো।

সাধারণতঃ কোন আঘাত অথবা গভীর হুখে হলে মাথার চুলগুলো সব উঠে যায়। আমেরিকায় পেনসিলভানিয়াতে ডাক্তারদের এক সভায় পিটসবার্গের Dr. Charles L. Schmitt এ তথ্যকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতেও হঠাৎ কোন গুরুতর আঘাতে মাথার টাক পড়ে।

তাঁর কাছে যে সমস্ত রোগীরা এসেছেন—তাঁদের শুধু মাথার চুলই পড়ে যায়নি—এর সঙ্গে সঙ্গে ত্বক, চোখের পাতা সব ঝরে পড়ে গেছে। পঞ্চাশ জন রোগীর মধ্যে প্রায় অর্ধেক রোগীরই চুল পড়ে বাগুয়ার কারণ হল, শারীরিক অথবা মানসিক কোন আঘাত।

সব চাইতে অল্পত প্রায়শ পাণ্ডুরা গেছে একজন রোগীর কাছে। তিনি নৌবহরের একজন চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। একবার তিনি খুব জোরে একটা মোকো চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা যে কখন থাক্সা খেয়ে কেটে গেছে তা তিনি লক্ষ্যও করেন নি। এত বেগে তিনি চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ একসময়ে জলের মধ্যে মিলেছে। আশ্চর্য্যের সঙ্গে তিনি জীবন-অধাক হয়ে বন।

এই ঠিক আঠারো দিন পরে, এক সোনালী সকালে উঠে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর মাথার সব চুল বাগিশের উপরে পড়ে আছে। শুধু কপালের সামনের দিকটার সাধারণ কিছু চুল তখনও অবশিষ্ট আছে। ভাবো ভা একবার তাঁর অবস্থাটা।

এর প্রায় ছয় মাস পরে, কোন চিকিৎসা না করলেও, আবার তাঁর চুল গজাতে থাকে। টাকও ঢেকে যায়। এর কয়েক বছর পরে, বরফের উপর 'স্কি' করার সময়ে হঠাৎই তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারে একটা পাথরের উপর জোঁহ থাক্সা খান। এর ঠিক উনিশদিন পরে, আবার তাঁর সব চুল ঝরে যায়, অবশ্য কয়েক মাস পরে আবার তাঁর চুলগুলো বখাওয়ানে কিংবে এসেছিল।

Dr. Schmitt-এর মতে নারী-পুরুষ সকলেরই টাক পড়ার একই রকম কারণ। বাইশ বছরের এক বাঁহাবতী স্থলী তরুণী বিমান-বাহিনীর এক সৈন্যকে বিয়ে করে। বিয়ের নয় মাস পরে, হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে স্বপ্নাদ এল, 'কার্য্যরত অবস্থার ভোমার স্বামী বীতর সান্ধ্য লাভ করেছেন।'

চু-সপ্তাহ পরে তাঁর দায়বিক দুর্বলতা দেখা দিল। এর পরেই তাঁর সমস্ত চুল উঠে গেল। মাথায় দেখা দিল মস্ত টাক।

এদিকে বাস্তবিক তার স্বামী মারা যারনি শুধু বন্ধী হয়ে বিশক শিবিরে বেতে বাধ্য হয়েছিল। ষ্ট্রীট স্ট্রাইট এ খবর গেল। কিছুদিন পরে, যুদ্ধ থামলে, তাঁর স্বামী ঘরে ফিরে এল—আর আশ্চর্য্য, তাঁর মাথার চুল আবার আশানা-আপনিই গজাতে শুরু করলো। কিন্তু শান্তিভীর অভ্যাচারে গভীর হুখে আবার মেয়েটির মন ভেঙে পড়লো। আবার তাঁর চুল সব উঠে গেল। কিন্তু এক বছর পরে, বখন সে স্বামী নিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে গেল আবার তখন চুল বাড়তে লাগলো।

এসব ঘটনাই পরীক্ষিত সত্য। কাজেই ভাবো ভা, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথায় হাত দিয়ে দেখলে চুলগুলো সব আপনা-আপনি উঠে বাগিশের উপর পড়ে আছে, তাহলে কেমন হয়?

অভিশপ্ত ম্যাম

দেবব্রত ঘোষ

বিশ শতাব্দীর অতিমাত্রায় বিজ্ঞান-সচেতন ও জড়বাহী মানুষ তার বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আজ পর্য্যন্ত যে কয়টি দুর্জয়ের রহস্যের কোন সমাধান করতে পারেননি মিশরের "পিরামিড রহস্য" হল তাদের মধ্যে অন্যতম। কথিত আছে, তিন হাজার বছর আগে ফারাওদের সমাধি অর্থাৎ পিরামিডের দ্বায় রুদ্ধ করার সময় মিশরীয় পুরোহিতরা এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ উচ্চারণ করেছিলেন—যারা পিরামিড বিকৃত অথবা অপবিত্র করবে দেবতার অভিশাপে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। পৃথিবীর কোন শাস্ত্রই তাদের রক্ষা করতে পারবে না। অবশ্য প্রাচীনকালের মিশরীয় পুরোহিতদের এই অভিশাপকে আজকের দিনে নিছক কুসংসার বলেও হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। তাহলে সত্যের অপসাণ করা হবে। কারণ পুরাতত্ত্ব ও ঐতিহ্য বিবরণে উৎসাহী ধারাই এ বাবৎ এই নিবেদন অমাত্য করে মিশরের পিরামিড খোঁড়াই করেছেন তাঁরই অত্যাচারিত মৃতদেহের রক্ষণ।

বহুসংখ্যক পণ্ডিত হয়েছেন। এমন কি, পিরামিড লুণ্ঠনকারী হুম্মাও এর হাত থেকে বেঁচেই পারিনি।

বিশ্বস্ত্রের বস্ত্র জানা বাব, এই অভিশাপের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বলি হলেন আরবের মরুভূমি বেহুইন হুম্মাওর হালেক ইবন আব্বাস। তিনি ধনবস্ত্রের লোভে তাঁর হলবল সহ অপবণ রূপলাবণ্যময়ী সম্রাজ্ঞী তাকাতোহ-এর পিরামিড লুণ্ঠন করেন। কিন্তু তারপরই শুরু হয় এক বহুস্ত্রময় মৃত্যুলাল। প্রথমেই লুণ্ঠিত ধনবস্ত্রের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে এক ঋণযুদ্ধের ফলে দলের প্রায় অর্ধেক লোক প্রাণ হারায়। অবশিষ্ট যারা জীবিত ছিল তাদের মধ্যে সাতজন কলেরার, তিনজন জলপিণাসের ও একজন সর্পিণাঘাতে মৃত্যুবরণ পতিত হয়। একমাত্র হালেক ইবন আব্বাস জীবিতাবস্থায় কোনক্রমে ছুঁয়া মরুভূমির ওয়াদি হাফার পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। সেখানে তিনি এক অল্পমত সর্পারের মকদ্দামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাতে এক ভয়ঙ্কর হৃৎস্পন্দ দেখে তাঁরও মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে ও তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে মরুভূমির মধ্যে নিকরিত হন।

১১১০ সালে বিখ্যাত জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ হাইনৎস্ কোহলার-এর নেতৃত্বে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে লাক্সারের ফারাও-প্রেরণী কুবনমোহিনী স্মারী নেকারতিতর মামি আবিষ্কৃত হয়। কয়েক মাস পরে জার্মানিতে হঠাৎ দূরবোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ডাঃ কোহলার। কিছুদিন পরে তাঁর সঙ্গকারী ছেরন এগোন রাইডমান অজ্ঞাত কারণে পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। সর্বশেষ, মিশরতত্ত্ববিদ প্রাকেরস নিদার কুর্ট ডুসলডর্কে এক ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনার নিহত হন। এইভাবে ডাঃ কোহলার-এর দলের সকলেই একে একে দেবতার অভিশাপে প্রাণ হারান।

এর পর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃটিশ পুরাতত্ত্ববিদ মিঃ হাওয়ার্ড কার্টার অষ্টাদশ মিশরীয় রাজবংশের বালক-রাজা টুটেনখামেনের মামির সন্ধান মিশরের লাক্সারে আসেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, মিঃ কার্টার তাঁর পূর্ববর্তী অমুসন্ধানকারী ডাঃ কোহলার-এর দলের “রহস্যজনক কহিনা” বেশ ভালো ভাবেই জানতেন। তবুও এতগুলি মৃত্যুকে তিনি কাকতালীয় (accidental) বলে উপেক্ষা করে বালক-রাজা টুটেনখামেনের মামি আবিষ্কারের আশায় লাক্সারে সমাধি খননকার্য শুরু করেন।

কিন্তু ছয় বৎসর ধরে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেও যখন টুটেনখামেনের সমাধির কোন হমিশ পাওয়া গেল না তখন ভয়ংকর সাহ হয়ে মিঃ কার্টার মনস্থ করলেন, বন্ধ করে দেবেন এই নিষ্ফল অমুসন্ধান কার্য। আর ঠিক সেই সময়ে বেন ইচ্ছে করেই সুরপ্রসন্ন হলেন ভাগ্যদেবী।

সেদিনটা ছিল ১৯২২ সালের ৪ঠা নভেম্বর। ঋরুঁকার, পক্ষকেশ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ মিঃ কার্টার এতাই লাক্সারে প্রাচীন মিশরের রাজকীয় সমাধিক্ষেত্রে (Royal Necropolis) খননকার্য পরিচালনা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর নভরে পড়ল বর্ষ রামেশিসের সমাধির কাছে একসার চুপা পাথরের সিঁড়ি। ছত্রিশ ঘণ্টা এক নাপটুঁ খননকার্য চলার পরে জানা গেল বর্ষ রামেশিসের সমাধির কাছাকাছি আরো একটি সমাধি আছে। তবে তার প্রবেশপথ প্রায়ই এককমিষ্টিত কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। লন্ডন কপাটের কাছে

উৎকীর্ণ রাজকীয় প্রতীক। স্থির হাজার বছরের বুসো-বাটির করে বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু বাহু পুরাতত্ত্ববিদ মিঃ কার্টারের চোখ সহজে প্রত্যাহিত হবার নয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জরুরী কেবল গ্রাম করলেন ইংল্যাণ্ডে লর্ড কারনারভনর কাছে। তিনি তখন দেশে বিবাহ-সম্পত্তির তদারক করছিলেন। বাই হোক, কেন্সলগ্রাম শেষে তিনি সপ্তাহের মধ্যে মিশরে ফিরে এলেন লর্ড কারনারভন। ২৬শে নভেম্বর নথিপত্রের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করলেন, ডেইটাই বালক-রাজা টুটেনখামেনের সমাধি। অবশ্য এ সংবাদটি প্রথম দিকে তিনি নিজের জন্ত বিশেষ কারণে গোপন রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে মিঃ কার্টার ও লর্ড কারনারভন তাঁদের কয়েকজন বিশ্বস্ত সচকারীর সাহায্যে সমাধির বহিঃস্থ কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করতে সক্ষম হন। তার পর ভূগর্ভস্থ গুপ্ত কক্ষের সূত্রীভেদে অন্ধকারের মধ্যে সূত্রী টর্চের আলোর ভায়া যে দৃশ্য দেখলেন তিন হাজার বছরের মধ্যে কোন মন্দিরের চোখ সে দৃশ্য দেখেনি। নিস্তব্ধ প্রেহরীর মত চণ্ডারমান অসংখ্য পূর্ণাবয়ব প্রস্তরমুষ্টি, স্বর্ণসিঁহাসন, রথ, অসংখ্য কারুকার্য সম্বলিত পেটিকা, আলবাষ্টার-নির্মিত পাত্র, বিভিন্নবর্ণে রঞ্জিত মুদ্রার আধার, বহুমূল্য কিংখার ও আরো নান্য প্রোবোজনীয় ব্রণ্যাদি। নবাবিস্কৃত মহাদেশে এসে অভিজাতীয় দল যেমন শুল্কনিষেধ মুক হয়ে চেয়ে থাকে তেখনি এই দৃশ্যর দিকে তাকিয়েছিলেন মিঃ কার্টার, লর্ড কারনারভন ও তাঁদের দলবল। ভুলে যাওয়া এক অতীত ইতিহাসের সন্ধান এ তারা কোথায় এসে উপস্থিত হলেন?

১৯২২ সালের ৩০শে নভেম্বর এই চাকলাকর আবিষ্কারের সংবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে বড় বড় ভরক ছাপা হলে সারা পৃথিবীর পুরাতত্ত্ববিদদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার হয়। সকলেই জানতে পারলেন—মিঃ কার্টারের নেতৃত্বে নীল নদের পশ্চিম তীরে রাজবংশের উপত্যকায় অষ্টাদশ মিশরীয় রাজবংশের বালক-রাজা টুটেনখামেনের সমাধি-সৌধ আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। বৈশি টুটেনখামেনের সমাধির মূল কক্ষটি উন্মুক্ত করা হল সেদিন আবার বলসে উঠল পুরাতাত্ত্বিকের হৃদয়বশে বিশ শতাব্দীর ধনলোভী মানুষের চোখ। কক্ষের অভ্যন্তরে দাক-পেটিকার কোটি কোটি টাকা মূল্যের হীরা-জহরত, এক সার বেদিকা ও লক্ষার বাঁপির মত দেখতে একটি সুদৃশ্য আলবাষ্টার-নির্মিত পাত্র পাওয়া গেল। পাত্রের চাকনাটি খুলতেই মন মাতানো গোলাপ-গন্ধে (aroma of roses) প্রাবলিত হয়ে গেল কক্ষ। লর্ড কারনারভন আগ্রহ সহকারে হাতে তুলে নিলেন পাত্রটি। সত্যিই তারিক করবার মত তার গঠনসৌকর্য্য ও বহুতা। সামান্য দেশলাই কাঠির আলো পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল পাত্রটির ভিতর দিয়ে। লর্ড কারনারভন ও তাঁর সহকর্মীরা হৃদয়-বিষয়ে চেয়েছিলেন পাত্রটির পানে। কিছুক্ষণ পরে নিছক কোঁড়ুলের বশেই তিনি হাত দিলেন পাত্রটির ভিতরে। যাত্র এক সেকেন্ড। তার পরই তীব্র আর্দ্রতা করে হাত বার করে নিলেন লর্ড কারনারভন। তাঁর আঙ্গুলের ভগ্নার দ্বারা এক বিলুপ্ত রক্ত। সাত সপ্তাহ পরে তিন দিন বাব জীবন-বৃত্তার মাঝে হোল হোলার হলে ১৯২৩ সালের ৪ই এপ্রিল দ্বারা গেলেন লর্ড কারনারভন। বৃটিশ অমুসন্ধানকারী দলের প্রথম বলি। সকলেই কলসেন—টুটেনখামেনের সমাধি-সৌধের

পুরোহিতদের অভিশাপ। হরত হাই। কারণ পরবর্তী তেরো বৎসরের মধ্যে লেখা গেল সমাধি খননকার্যে প্রথম উত্তোগী একুশ জনের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া আর সকলেই অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। অধিকাংশই দুর্ঘটনা, অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা ও হাল্লে স্ট্রীটের ডাক্তারদের কাছেও অজ্ঞাত এমন ধরনের রোগে মৃত্যু। অথচ মৃত্যুকালে এরা সকলেই যথাবয়স, সুস্থ ও সবল ছিলেন। কাজেই এতগুলি মৃত্যুকে কোনমতেই স্বাভাবিক বলা চলে না।

বাই হোক, স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বিরোধবিধুরা লেডী কারনারভন তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে বাবার জন্তে কার্যেরা খেঁচ লগুন পর্যন্ত যে জাহাজে প্যাসেঞ্জ বুক করেছিলেন বহু বাড়ীই সেই জাহাজে ভ্রমণ করবার পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। কারণ, তাঁরা সকলেই স্ববারপত্র পড়েছিলেন প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিতদের নিবেদাজ্ঞা অমান্ত করার ফলেই নাকি লর্ড কারনারভনের মৃত্যু হয়েছে। তাই প্রাচীন অভিশাপের হোয়াচ এড়াবার জন্তে তাঁরা এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

লর্ড কারনারভনের পর আবার যিনি অভিশপ্ত মৃত্যুর ভিমনীতল আলিঙ্গনে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তিনি কিছ লেডী কারনারভন নন। তিনি হলেন লেঃ কর্ণেল অগুস্তে হার্বার্ট। প্যারামেন্টের জৈনক রক্ষণশীল সমস্ত ও পরলোকগত লর্ডের জ্ঞাতিক্রান্ত। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে (একটি অপারেশন-এর পর) তাঁর মৃত্যু হয়। লাল্লায়ে টুটেনখামেনের সমাধি খননের সময় তিনি পার্শ্ববর্তী এক দণ্ডাংমান ব্যক্তিকে বলেছিলেন—আমাদের পরিবারে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে।

অভিশাপের তৃতীয় বলি মার্কিন যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট বেল-শিল্পপতি ও লর্ড কারনারভনের অন্তরঙ্গ স্ত্রীদ্বয় মিঃ ওর্ক জে ওড। তিনি গোড়ার লিকে সমাধি খননকার্য দেখতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ মারা বান মিঃ ওড রহস্যময় তাঁর মৃত্যু। কারণ আজো জানা যায়নি।

কয়েক মাস পরে ১৯২৪ সালে মিঃ কার্টার ইংরাজ বেডিয়োলজিষ্ট তার আর্চিবল্ড ডগলাস রীড-কে আহ্বান জানান টুটেনখামেনের সমাধি এক্ষেত্রে করার জন্ত। কয়েক দিন পরে তিনিও মারা বান। তাঁর বয়স তখন বাহার।

এক মাস পরের ঘটনা। সমাধির মধ্যে বসে কাজ করছিলেন কলেজ ডক্টরের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পল ক্যাসানোভা। কাজ করতে করতে হঠাৎ সেখানেই মারা গেলেন তিনি। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন—মৃত্যুর কারণ স্বরোগ। পুরোহিতরা বললেন অভিশাপ।

সাত মাস পরে বিখ্যাত পণ্ডিত ও মিশরতত্ত্ববিদ মিঃ এইচ, জি, এডলিনহোরাইট অজ্ঞাত কারণে একটি ট্যাক্সির মধ্যে রিক্সবায়ের ওলীতে আত্মহত্যা করলেন। তাঁর পোর্টফোলিয়ার কাগজপত্রের মধ্যে একটি চিরকুট পাওয়া গেল। তাতে তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন—আমি জানতাম আমার উপর একটা অভিশাপ ছিল।

অভিশাপের পরবর্তী বলি মিশরের অভিজাত কবীর প্রতিপত্তিসালী কবিদায় প্রিন্স আলি কাহরী যে। তিনি লাল্লায়ে টুটেনখামেনের

সমাধি-গোধ দেখতে গিয়েছিলেন এক সেখানে খননকার্যের সুবিধায় জন্ত প্রচুর অর্থও দান করেছিলেন। কিছুদিন পরে একদা নিশীথ কালে তাঁরই দ্বী তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন। অবশ্য বিচারে মুক্তি পান প্রিন্সেস। জুরীরা এই বলে রায় দেন—তিনি আত্মরক্ষার্থে গুলি চালায়েছিলেন। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই মারা বান প্রিন্সের একান্ত সচিব হান্নাহ বেন। তিনিও টুটেনখামেনের সমাধি দেখতে লাল্লায়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুও রহস্যময়।

এই ভাবে বছরের পর বছর ধরে চলল এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু-কাল্প। প্রতিটি মৃত্যুর পর ভীতি-বিহ্বল, ত্রস্ত পৃথিবী উমুখ হয়ে থাকতো, এর পর কার পালা? টুটেনখামেনের অভিশাপের পরবর্তী বলি কে?

১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনারবল রিচার্ড বেথেলকে লগুনের বাথ ক্লাবের একটি ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বাড়ীতে কয়েকবার আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল এবং প্রতিবারই তিনি অগ্নির জন্ত রক্ষা পেয়েছিলেন। সমাধি খননকার্যের সময় মিঃ বেথেল ছিলেন মিঃ কার্টারের সেক্রেটারী।

চার বৎসর পরে। ১৯২৮ সালে মার্কিন যুক্তরাজ্যের টেক্সাস রাজ্যে এক মেটর দুর্ঘটনার নিহত হলেন আর্থা হুজেন পুরাতত্ত্ববিদ। আর্থার যেস ও ডাঃ জোনাথন ডব্লিউ কার্ভার। এরা দুজনেই ছিলেন কার্টারের সহকর্মী।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ কার্টারের মল্লের আর একজন সমস্ত লর্ড ওয়েট্টেরী লগুনে সেটজেন্স হোয়ারে তাঁর ক্লাবের জানালা থেকে ৭২ ফুট নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন—এই আতঙ্ক আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এমন কি তাঁর শব্দেহাবাই শকটের ধাক্কায়ও একটি ঝট বৎসরের বালক নিহত হয়।

ওয়েট্ট বেরী মৃত্যুর পর আরো একটি বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত হল। টুটেনখামেনের সমাধি উদ্ধৃত হবার পর হুজেন করাসী সাংবাদিক ও সাহিত্যিক স্টেট দেখতে গিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁরা সকলেই রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবার সেই বছরই মাত্র অটচলিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ মারা গেলেন মিশর তত্ত্ববিদ মিঃ হারভিন হার্বার্ট। চার বৎসর পরে অভিশাপের মৃত্যুবাণে বিদ্ধ হলেন প্রফেসর আলবার্ট লিথগো। ইনি সর্বপ্রথম টুটেনখামেনের সমাধির সন্ধান পেয়েছিলেন।

অভিশাপের মৃত্যুবাণী শক্তির বেন কোন শেষ ছিল না। কলে সমাধি-দর্শকদের মধ্যেও অভিশপ্ত মৃত্যুর বিভৎস তাণ্ডলীলা শুরু হল। বিশিষ্ট মার্কিন মহিলা এডলিন ওয়াডিংটন ক্রীল লামার থেকে চিকাগোয় ফিরে গিয়েই আত্মহত্যা করলেন অজ্ঞাত কারণে। আমেরিকান ফটোগ্রাফার চার্লস নিকোলস নিউইয়র্কের এক গগনচুম্বী হোটেলের জানালা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন। তাঁর মৃত্যুও রহস্যময়।

লগুনে এই অভিশাপকে কেন্দ্র করে নাট্যকার লুই সিগলিন একটি রোমাঞ্চকর নাটক লিখেছিলেন। নাটকটি যক্ষ্ম হবার এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। কয়েক ভীত প্রবোধক সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে গেল উক্ত নাটক।

কোন অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, এতগুলি মৃত্যু কি সত্যিই কাকতালীর না সম্রাট টুটেনখামেনের অস্ত্রোৎক্রিয়া সম্পাদনকারী প্রধান পুরোহিতদের অভিশাপ? বাই হোক না কেন, একজন কিন্তু এ সমস্ত কিছুই বিশ্বাস করতেন না। তিনি হলেন হরগার্ড কার্টার। টুটেনখামেনের সমাধির মূল আবিষ্কার। ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে স্বাভাবিক ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাহলে সত্যিই ব্যাপারটা কী? এ নিয়ে অবশ্য অনেক লেখালেখি ও আলোচনা গবেষণা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে ইতালীর জার্নালিক বিজ্ঞানী ডাঃ লুই বুলবারিনি বলেন—আমি নিঃসন্দেহ যে, সমাধির দ্বার রুদ্ধ করার আগে মিশরীয় প্রধান পুরোহিতরা সেখানে সম্রাট পরিমাণে ইউরেনিয়াম লবণ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে দিতেন। এর অর্থ এই যে, হাজার বছরের মধ্যে কেউ সমাধিতে প্রবেশ করলে তার শাস্তি মৃত্যু। আর তার পরে বারো প্রবেশ করবে তারিও নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর মিকে এগিয়ে যাবে, তবে ধীরে ধীরে।

বিশিষ্ট প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ডাঃ হারভার্ড ১৯৬০ সালে ঘোষণা করেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাচীন মিশরীয়রা সত্যি হাজার বছর ধরে রাসায়নিক একটা গভীর শক্তি (Dynamic Force) দিয়ে দ্বিবে রাখার গুপ্ত কৌশল জানতেন। বার সম্রাটের অভিশাপ হাজা আমরা আর কিছুই অন্বেষণ করতে পারি না।

Coincidence or curse? Radio-activity or some equally deadly supernatural force? The arguments go on—and always in the background is the unexpected trail of death that followed the invasion of Tutenkhamen's tomb.

অর্থাৎ—কার্যকারণ সম্বন্ধহীন ঘটনা-সমষ্টি না অভিশাপ? তেজস্ক্রিয়তা না ঠিক ওই জাতীয় কোন মারাত্মক অভিশাপক শক্তি? টুটেনখামেনের সমাধি অন্বেষণকারী দলের এই ব্যাখ্যাহীন মৃত্যুসীল সন্দেহের তরঙ্গ ও গবেষণার আবেগে শেখ হয়নি।



লেখা ও লেখক

সাহিত্যরচনার গোটাকতক নিয়মকানুন আছে। দেখতে হয়, রসবত্ত অঙ্গুলিতা-পর্য্যায় এসে না পড়ে। স্রীলতা অঙ্গুলিতার মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্মরেখা আছে, যার এক ইঞ্চি-ওমিকে পা পড়লেই সব vulgar—নষ্ট হয়ে যায়। একটু পা টললেই আর রক্ষা নাই। অবশ্য আমি রসিক লোকের কথাই বলছি। vulgar সাহিত্য সব সময়ে বর্জনীয়। মনোরঞ্জনর জন্ত আমি কখনও মিথ্যা কথা বলবো না। এ ছিনিবটা আমি পারতপক্ষে করি না। কঠোর সমালোচনা আমি খুবই পোয়েছি। গালাগালির বজা বয়ে গেছে। দেশ আর দেশবাসীর অনেকে বোঝে না, গ্রন্থকার কবি চিত্রকর—এঁদের জীবন সাধারণ থেকে একেবারে ভিন্ন। এদেশের লোক তা বোঝে না। জানে না যে, এঁদের স্নেহের প্রকাশ দিয়েই বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মাহুদ চার—এঁদের অভিজ্ঞতাও লাভ হোক আর আমাদের রক্ত শাস্তিষ্ট জীবনও বাপন ককক। তা হয় না। আর সবচেয়ে ব্যথার বিষয়, আমাদের দেশের সমালোচনার মধ্যে ব্যক্তিগত ইজ্জতই থাকে বারো আনি। এ-সব সমালোচনা হয় মাহুদচাঁর, বইটার নয়।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।





অর্থ-বিনিয়োগ—কয়েকটি বিধি

উত্তমশীল লোক বা ব্যবসায়ী অর্থ-বিনিয়োগ করে থাকেন আশায়, এ জানা কথা। কিন্তু এই বিনিয়োগ ব্যাপারে মুনাকার কয়েকটি সাধারণ বিধি অনুসরণ না করলে নয়। কেন না, ষোল্লপশুি মতো অর্থ-বিনিয়োগে কার্যক্ষেত্রে আশাহত হবার সম্ভাবনাই থাকে বেশি রকম।

ব্যবসা-বাণিজ্যের আসল কথাই হলো—মূলধন অল্প রেখে এগিয়ে যাওয়া। এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে বাজারের সাথে নিবিড় পরিচিতি চাই আর সেটি সর্বসময়ের জন্তে। ছোট হোক কি বড়ই হোক, ব্যবসা-সম্ভা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাম বাতে ক্রমেই বেড়ে যায়, অর্থ-বিনিয়োগকারীর প্রধান লক্ষ্য থাকতে হবে এই। লাভ বা মুনাকা অর্থবিনিয়োগের বা হলো নিম্নলিখিত চুড়ান্ত লক্ষ্য, সেটি তখন দেখা যাবে আপনি পূরণ হচ্ছে।

পুঁজি নিয়ে নিজেই ব্যবসারে নাম। যেতে পারে, আবার অপরের ব্যবসারেও পুঁজি-বিনিয়োগ করা চলতে পারে। শিল্প বা ব্যবসারে অঙ্গীদারগণও অর্থ-বিনিয়োগের একটি চিরাচিত্র মাধ্যম। মোটের ওপর, ব্যবসা পরিচালনার লাগামটি ধীর হাতে থাকে, অর্থ খাটানো ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা কিংবা কোন সূত্র ধরে চললে বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে প্রাপ্তি হবে অধিক, সেইটি দেখার প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁরই। লোকসান খেতে হবে বুঝলেই হ'লিয়ার হয়ে যেতে হবে এক জনে নিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে কোন পথটি আসলে জের।

ব্যবসায়ী যে শিল্প বা মাল নিয়ে কাজ-কারবার করবেন, সে সবেই কেনাবেচার প্রয়োজনীয়তা চাই বিশেষ রকম। কখন কি লাগে কতটা পরিমাণ জিনিস ক্রয় করে মজুত করা সম্ভব হবে, এ যেমন দেখা দরকার, তেমন ঠিক কোন সময়টিতে ভাড়া মূল্য শেষে মজুত জিনিস ছেড়ে দিতে হবে, তাও ভালরকম না বুঝলে নয়। বাজারের চাহিদার মুহূর্তটিতে সরবরাহের নিশ্চয় ব্যবস্থা থাকলে আর সরবরাহকৃত সামগ্রী নির্দিষ্ট মাসিম্পন্ন হলে, অর্থের বিনিয়োগে অর্থ ঘরে আসবেই।

অর্থ-বিনিয়োগের একটি বড় কেন্দ্র হলো ষ্টক-এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার বাজার। শিল্পসমূহ সকল দেশেই নগরী সমূহে এই বাজার রয়েছে, আমাদের কলকাতা মহানগরীতেও। শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম ওঠা-নামা করছে প্রতিবৃহৎ। বৃত্তান্ত শেয়ার কেনা-বেচা করে পুঁজি বাড়তে হলে হিসেব-জান চাই খুব বেশিরকম আর তার চেয়েও বেশি চাই সতর্কতা। অর্থ বিনিয়োগের সঙ্গে লাভালাভের

প্রশ্নটি জড়িত আছে বলেই অর্থনীতিবিদরা এই দাবী রেখে আসছেন বিশেষভাবে।

শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী লম্বীকৃত অর্থের ওপর লাভ চাইবেন, এ খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটি বড় প্রশ্ন—লাভ কেন লাভের নামান্তর হয়ে না ষ্টাডার। অতি মুনাকা কোন অবস্থাতেই সমর্থযোগ্য হতে পারে না—আইনতও ইহা গ্রাহ্য নয়। বরং কম মুনাকা রেখে কাজ-কারবার করে চললে প্রতিষ্ঠানের মুনাম যেমন বর্ধিত হবে, পরিশেষে দেখা যাবে মুনাকার মোট পরিমাণও ষ্টাডিয়েছে অনেক। অপর দিকে অর্থ ঘরে যেন বেশি সময় আটকে না থাকে, সেদিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। একটা টাকাকে বতবার খাটানো। সম্ভবপর, ততবার খাটাতে পারলেই টাকার সম্ভাবহার হয়, প্রমেরও হয় সার্থকতা।

যে কোন উত্তমের আসল মূলধন নিষ্ঠা ও সততা। শুধু অর্থ-বিনিয়োগ করলেই হল না—ব্যবসা-বাণিজ্যে সাক্ষ্যের জন্ত সর্বোপরি এ দুটি পুঁজি না হলেই নয়। শেরারে যেখানে অর্থ-বিনিয়োগের আগ্রহ হবে, সেখানে সঠিক সন্থা সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজখবর নিতে হবে আগেরভাগেই। ঘরের টাকার আরও কিছু নিয়ে ঘরে কিংবা আসবে, এ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার মূল্য খুব বেশি। সহজ কথায়, নিছক আশাবাদী হলেই হবে না, অর্থ-বিনিয়োগের ব্যাপারে বেশ জেব চিন্তে গুরুত্বপূর্ণ করাই মুক্তিগদত।

এদেশে কারিগরী শিক্ষা

আধুনিক শিল্পায়নের যুগে কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব খুব বেশি। দেশকে নতুন করে গড়বার জন্য বিজ্ঞানী যেমন চাই, তেমন চাই বহুসংখ্যার বাস্তবিক বলা-কোশলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা টেকনিসিয়ান। টেকনিক্যাল ট্রেনিং বা কারিগরী শিক্ষা ব্যতিরেকে এই দাবী মিটতে পারে না কখনই। ভারতেও এই শিক্ষার আরও দ্রুত সম্প্রসারণ একই কারণে না হলে নয়।

কাজ-বিজ্ঞান ভারতীয় কারিগরগণের দক্ষতার স্বাক্ষর অতীত যুগের বিচিত্র শিল্প ও ভাষ্যে লক্ষ্য করা যায়। সে যুগে অবশ্য নির্দিষ্ট স্থান বা কলেজে টেকনিক্যাল ট্রেনিং-এর (কারিগরী শিক্ষা) ব্যবস্থা ছিল না এখনকার মতো। এতে একটা বড়রকম অসুবিধা ছিল এই—প্রয়োজন হলেও শিক্ষা-সম্প্রসারণ সম্ভবপর হতো না। আজকের দিনে কাজ-বিজ্ঞানীর চাহিদা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, ভারী সাথে সাথে কারিগরী শিক্ষালয়েরও।

এ দেশে নিরমিত পন্থায় কারিগরী শিক্ষার সুস্পাত রয়েছে,

কিন্তু এটা কথাই আছে। আজ কলকাতা, বালুগাতি, পূণা, কড়কি প্রভৃতি নানা স্থানে কারিগরী তথা ইঞ্জিনারিং স্কুল-কলেজ আছে। সিভিল, মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল কাঙ্ক্ষা-শিক্ষার্থীরা শিক্ষালভের সুযোগ পাননি এখন পূর্বে চেয়ে বেশি। কিছুদিন আগে অবধি দেশ ছিল বিদেশী শাসনাধীন। তখনকার শাসন-কারীদের ভারতীয়রা এই বিশেষ ক্ষেত্রে পায়ের তাল দিতে পারতেন না। এক্ষেপে জাতীয় সরকার জাতীয় প্রয়োজনেই কারিগরী শিক্ষার দিকে খানিকটা মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন, এ কথা ঠিক।

দেশের শিল্পায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন বহু পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এর ভেতর। কিন্তু এ বলায় অসুখী রাখে না যে, সে পরিকল্পনাগুলোর বাস্তব রূপায়ণের জন্য কারুবিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনারিং পণ্ডিত চাই-ই। বিশেষ থেকে স্বল্প পরিমাণে ব্যবসায়িক শিল্পায়নের কাজ সম্পন্ন করা একটি কঠিন ব্যাপার। সুতরাং এ পরিদায়ক যে, দেশের অভাবের থেকেই ট্রেনিং প্রাপ্ত কারিগর বা ইঞ্জিনারিং বহুসংখ্যক সংগ্রহ করতে হবে।

বিগত বছর দশকের মধ্যে ভারতে কারুবিজ্ঞানীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, এ অনস্বীকার্য। কারণ, হিসাব করলে দেখা যাবে, যে সকল সরকারী বা বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এক্ষেপে চালু, সেগুলোতে বেশির ভাগ কারিগরী কর্মীই ট্রেনিং প্রাপ্ত আর এ ট্রেনিং বা শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন ভারতীয় ট্রেনিং-কেন্দ্রগুলোতে। এর অর্থ এই যে, কারু-বিজ্ঞানী তথা টেকনিশিয়ান ও ইঞ্জিনারিংয়ের প্রয়োজন এক্ষেপে কমে গেছে। পরন্তু উল্টো দিকে বলা চলে, এই প্রয়োজন এখনও বৃদ্ধি পাইয়াছে—টেকনিশিয়ান ও ইঞ্জিনারিংয়ের অভাব নানাক্ষেত্রে প্রকট।

দেশে কারু-বিজ্ঞানী বা কারিগরী-কর্মীর যে অভাব রয়েছে, প্রধান মন্ত্রী নেত্রক থেকে আরম্ভ করে অনেক নেতাই একথা বলে আসছেন। কিন্তু দেশে এ ব্যবস্থা বর্তমানকার ইঞ্জিনারিং কলেজ পলিটেকনিক স্থাপিত হয়েছে, এতে সে অভাব সামান্যটুকি মিটতে পারে। এর জন্য প্রচুর অর্থ, সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির প্রয়োজন, সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে শিল্পায়ন বঞ্চিত চাই, সেখানে শিল্পায়নের সঙ্গে যে যে বাধা আসবে, তার অপসারণ ব্যবস্থা চাই। কারুবিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনারিংয়ের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সরকারী উদ্যোগ ও সহযোগিতা এমন সীমিত হলে চলেবে না।

সরকারী তথা ও পরিকল্পনা পর্যালোচনা করেই জানা যায়—দেশে কারিগরী-কর্মীর অভাব যেমন রয়েছে, কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের অভাবও তেমনি বিস্তারিত। কি ভাবে তাড়াতাড়ি এই অভাব মিটতে পারে, সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগরকে সেইটি বিশেষভাবে না ভাবলে হয়। এই ব্যাপারে দেশের শিল্পপতিদেরও সহযোগিতা থাকতে হবে অনেকখানি। ইঞ্জিনারিং কলেজ বা পলিটেকনিক যেখানে টাঙ্ক, নিকট অল্পে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারখানা থাকলে খুব ভালো হয়। কারণ, কারুশিক্ষার্থীদের সেক্ষেত্রে শুধু পুষ্টিগত বিভাগ ওপরই নির্ভর করতে হবে না, হাতে-কলমে শিক্ষালভের সুযোগও তাঁরা পাবেন।

কারিগরী শিক্ষার দিকে তৎপরতা বাহাতে আকৃষ্ট হতে পারে, সেজন্য সরকারের দিক থেকে আরও উৎসাহ জোগান নিশ্চয়ই উচিত। দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোও এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন,

কম নয়। তাঁরা উদ্যোগ ও কৃতি হস্তক্ষেপ করে নানা ধরনের সুবিধা ব্যবস্থা করতে পারেন—বাতে শুধু তাঁদের পড়াশুনার সাহায্য সমেত সকল ব্যয়ই নির্ধারিত হতে পারে। আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলো টেকনিক্যাল শিক্ষা ও উপসারণে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকেন। সে সব ব্যয়ই যথাযথ কারু-শিক্ষার্থীদের শিক্ষানবীশ অবস্থাতেই ভালরকম রোজগারের ব্যবস্থা আছে। ভারতে এই ধরনের ব্যবস্থা নাইবা আছে—সরকার ও শিল্পপতিদের মনোযোগ সেভাবেই চালী করা হচ্ছে বেশি নয়।

আধুনিক ছিনিয়া ও শিল্প-বিপ্লব

বিজ্ঞান ও কারুবিজ্ঞান অঙ্গগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবও ঘটে চলেছে সারা বিশ্বময়। আগে যে ধরনের শিল্প মাছুরের কাঁচ ও প্রয়োজন মেটাতে, এখন ঠিক তেমনি হলে চলে না। সব দিকেই উন্নততর ব্যবস্থা না হলে যুগের সাথে তাল রেখে চলা কঠিন হতে বাধ্য।

শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শিল্প-পরিবর্তিত কি বীড়িয়েছে, তা জানবার কৌতুহল জন্ম দেয়। ব্রুটনের কথাই ধরা যাক—একদিন যে দেশের প্রাধান্য ছিল সারা ছিনিয়ায়। অল্পকাল আগে অবধি বিশ্বের বহু অংশের দেশ ব্রুটন পশ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আমাদের ভারতও ছিল ব্রুটনের নানাবিধ শিল্প ও ব্রুটন-সামগ্রীর একজন বড় ক্রেতা। কিন্তু আজ অবস্থান্তর ঘটেছে বৃদ্ধকম—অজ্ঞাত দেশের ভার ভারতেও শিল্প-বিপ্লব হয়ে চলেছে বাবিনতা অল্পকালের পর থেকেই।

জাপান, জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ থেকেও ভারতে এককালে কম পণ্য আসতো না। বহু প্রসাধন ও বিলাস-সামগ্রী ও খেলনা জাতীয় জিনিষ বাহির থেকে আমদানী হতো এখানে। কিন্তু এখানে দেশের চাহিদা দেশের অভ্যন্তর থেকেই মেটাবার চেষ্টা হচ্ছে। কলে একসময়ে হাদের বাজার ছিল বিস্তৃত, সেই সব শিল্পোন্নত দেশসমূহের বাজার হ্রাসিত হয়েছে অনেকটা। রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোতেও প্রকাণ্ড শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে—বার প্রভাব অল্পকালে হচ্ছে সমগ্র ছিনিয়ায়।

একটা জিনিস আজ পরিদায়ক হয়ে গেছে আবিষ্কার নিয়ে, কোন দেশের পক্ষেই একটা শিল্প তৈরী করে নিশ্চিন্ত বসে থাকা সম্ভব মনে। কেন না, শিল্পটি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে তার বাজার পাওয়া সেলেও, কিছুদিন বাদে সে বাজার হ্রাস টিকে থাকবে না। এর কারণটি স্পষ্ট—বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞান সহায়তার সেই শিল্পটি প্রয়োজনীয় হলে অপর দেশেও ইত্যাবসরে তৈরী হয়ে যাবে। সেজন্য তিনানতুন শিল্প উদ্ভাবন ছাড়া এ যুগে বাজার বাজার রাখা একরকম অসম্ভব।

আধুনিক যুগে ছিনিয়াবাসী যেখানে শিল্প-বিপ্লব ঘটে চলেছে, সে অবস্থার ভারতকেও সব সময় সজাগ না থাকলে নয়। ভারতীয়ের স্বাধীনতা এখনও তাকে বহল পরিমাণে আমদানী করতে হয় বাইরে থেকেই। কিন্তু এ অবস্থা স্বাধীনভাবে চলেবে, এমনটি চতে পারে না। বরং এখানেও শিল্প-বিপ্লব চড়াতে হবে, সকল দিক থেকে। লক্ষ্য রাখতে হবে, শুধু আভ্যন্তরীণ শিল্প চাটনা মেটালেই যথেষ্ট হবে না, বহির্দেশে উন্নত মানসম্পন্ন শিল্পের রপ্তানী মারকত বৃদ্ধি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করতে হবে। বাইরের ছিনিয়ায় সাথে তালে তালে পুঁজি কেলে বাবিন ভারত এগিয়ে যাক, শিল্প-ক্ষেত্রে সে সুদায়ক আনন্দের সম্ভাবনা অল্প কাল, এই প্রত্যাশা যেন অতিরিক্ত হয়ে না হয়।

না, না !
এ 'ডালডা' নয় !
'ডালডা' কখনও খোলা
অবস্থায় বিক্রী হয় না !

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডালডা বনস্পতি আপনি কেবল শীলকরা
টিনেই কিনতে পাবেন। এই জনোই এতে কোনও ধুলো
ময়লা লাগতে পারে না আর না পারা যায় একে নোংরা
হাত দিয়ে ছুঁতে। তাছাড়া খোলা অবস্থায় 'ডালডা'
কেনার দরকারই বা কী যখন আপনার সুবিধের জন্য
ভারতের যে কোন জায়গায় আপনি ১০, ৫, ২, ১ ও
½ পা: টিনে 'ডালডা' কিনতে পাবেন।

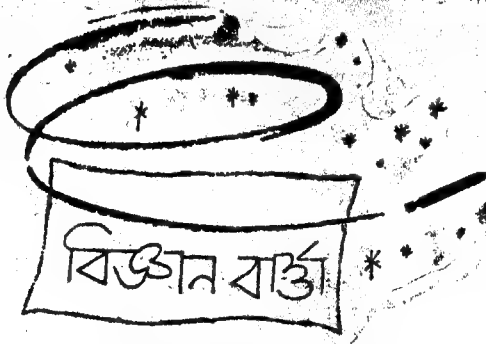


হ্যাঁ, এই তো 'ডালডা' !
এর হলদে টিনের ওপোর
খেজুর গাছের ছবি দেখলে
সবাই চিনতে পারে।

মনে রাখবেন 'ডালডা' কেবল একটি বনস্পতির নাম।
আপনার এবং পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য অরক্ষিত
রাখতে সব সময়েই ডালডা বনস্পতি কিনবেন শীলকরা
বন্ধ টিনে। কেন না কোন রকম ভেজাল বা দোষযুক্ত
হবার বিপদ এতে থাকে না আর যা কিছু এই দিয়ে
রাখবেন সেই সব আবারের
শ্রুত স্বাদ বজায় থাকবে।



ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন—আর
স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন।



গ্রহ-উপগ্রহে জীবনের কথা

সৌরজগৎ যেক্ট চাঁদকে ছুঁয়েছে হয়তো তাতে কবীর চাঁদের মহিমা কুর হয়ে গেছে। চাঁদের একদিককার আলোকচিত্র সমস্ত সবারপক্ষে ছাপা হয়েছে, তাতে যে চাঁদের সঙ্গে মহাকাবি কালিদাস 'কুরারসম্ভবে' উরার মুখের তুলনা করেছিলেন সে চাঁদের চাঁদর আর কি স্ফার আছে আগের মত? প্রিয়ার মুখের সঙ্গে, এমন কি প্রিয়ার সঙ্গে চাঁদের তুলনা, এ নিয়ে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য মশগুল। কবি ওদর বৈরাগ্যের কথা মনে পড়ে, প্রিয়ারকে সোধোদন করে তিনি বলেছেন : moon of my delight that knowest no wane, the moon of the heavens is rising again প্রিয়ারকে স্মৃতি করবার মনোবৃত্তি নিয়ে কবি এখানে 'চলংচিৎসং চলংবিত্তং চলংজীবনবোধনম্' এই শাখত সত্য সত্যে উদাসীন হয়ে তাঁকে অনন্তমোহনা বলে কল্পনা করেছেন। কিন্তু এমন যে চাঁদ আমাদের মায়ের তার সৌন্দর্য ও মহত্বকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে অনেকাংশে অপমান করেছে, তাকে দূর আকাশ থেকে একেবারে সাধারণের পর্যায়ে টেনে এনেছে।

ভরু চাঁদে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনের (intelligent life এর) অস্তিত্ব আছে কিনা, বৈজ্ঞানিকরা অনেক চেষ্টা করেও সে সত্যকে এখনও হনহির করতে পারেন নি। এ্যামেরিকার কোন একটি বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ পৃথিবী থেকে ১৬টি light year অর্থাৎ ১..... মাইলের মধ্যে যে ৪২টি নক্ষত্র অবস্থিত তার মধ্যে মাত্র তিনটে নক্ষত্রে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনের সন্ধান পেয়েছেন।

এই তিনটি গ্রহের মধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের সূর্য এবং অন্য দুইটি এগোরা এবং বারো light year এর মধ্যে অবস্থিত। একটির নাম Eridani (এরিডানি)। অস্ত্রটির নামকরণ করা হয়েছে toucell (টাইসেল)।

উপরিস্থিত জ্যোতির্বিদ আধুনিকতম জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী শুধু পাঁচটি গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনের অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছেন। তাঁর আবিষ্কার সাধারণ নাকল্লিক ক্রমবিবর্তন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তিনি আমাদের পৃথিবীতে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবন (intelligent life) সম্ভব হতে কত দিন লেগেছে এই বিষয় নিয়ে ১..... বৎসর আগে পর্যন্ত গবেষণা করেছেন। এবং উপরিস্থিত বর্ণাখ্যা থেকে যে সমস্ত নক্ষত্রের বয়স কম, তাদের তিনি বাহ দিয়েই, তাঁর সিদ্ধান্তে উপনত হয়েছেন। তারপর তিনি উপরিস্থিত প্রত্যেকটি গ্রহ উপগ্রহকে বৌন করে জীবনের পক্ষে যে বাসোপযোগী অঞ্চল (Habitable zone)

আছে সেগুলির সত্যকে গবেষণা করেছেন। অর্থাৎ ঠিক কতখানি শক্তি গ্রহ উপগ্রহে এই বাসোপযোগী অঞ্চলে আছে বাঁতে বুদ্ধি-আধ্রিত প্রাণ ধারণ করা সম্ভব, তার গবেষণাগারে বসে তিনি এই তথ্যই বার করবার চেষ্টা করেছেন। এই যে জীবনের পক্ষে বাসোপযোগী অঞ্চলের পরিধি, এটা তাঁর মতে নির্ভর করে গ্রহ উপগ্রহ কতখানি জ্বলো (luminosity) বিকীর্ণ করতে পারে, অতএব যে সব গ্রহের বত বেগী আলো, সেখানেই বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনের বেঁচে থাকার মত তত বড় পরিধি এবং ঠিক এই কারণেই নিশ্চয় নক্ষত্রকে বাহ দিয়েই গবেষণা করেছেন উপরিস্থিত জ্যোতির্বিদ।

তিনি পৃথিবীর কাছাকাছি যে সব গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জ আছে সেই সবগুলিই প্রথমে পরীক্ষা করেছেন। পৃথিবী থেকে বেগাটি light year-এর মধ্যে যে সব গ্রহ উপগ্রহ আছে তাঁর প্রাথমিক পরীক্ষা তাদের নিয়েই। পূর্বেই বলা হয়েছে সূর্য ও Eridani এবং toucell এর মধ্যেও তিনি আবিষ্কার করেছেন যে এই তিনটি গ্রহে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবন ধারণের উপযোগী অঞ্চল রয়েছে। অবশ্য শোষোক্ত দুইটি গ্রহেরই আলো সূর্যের আলোর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, অতএব তাদের মধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনের থাকার মত অঞ্চল সূর্যের চেয়ে নিশ্চয়ই কিছু ছোট।

এর পরে উক্ত বৈজ্ঞানিক আর এক কাজ করেছেন, তিনি আমাদের জানা জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী নিয়ে সৌর জগতের বাইরের গ্রহ উপগ্রহকে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর গবেষণার এইটাই প্রমাণ হয়েছে যে এ কাজ সম্যক ভাবে করতে গেলে যে সব বস্তুপাতির প্রয়োজন সেগুলি মায়ের এখনও তৈরী করতে পারেনি।

মনের ওপর প্রভাবের কথা

পেটের ঘা (Duodenal ulcer) যাদের হয় তাদের সত্যকে একটা কথা বললে হয়তো সকলেই আশ্চর্য হয়ে যাবেন। কথায় বলে, কর্ত্তা বেধায় সঃ গিল্লি বেধায় সার, তার নাম স্ফার। কথাটা অস্ত্র হালকা করে না বললেও যা বাবার চেয়ে বেথানে বেশী শক্তিসম্পন্ন ও প্রভাবশালিনী তাঁদের ছেলে-মেয়েরাই এ আত্মিক ঘা (Duodenal ulcer) এ ভোগ।

একদল গবেষণাকার ২৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার আগে কতকগুলি রোগীকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাঁদের জননীরা বেশ প্রবল ও সবল প্রকৃতিসম্পন্ন এবং তাঁদের সংসারে তাঁদের মত ও কথাই বেশী চলে। তাঁদের নিন্দা করবার কোন কারণ নেই। কেন না তাঁদের কর্ত্তব্য জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল এবং নিজের সংসার সত্যকে খুব গরিত্ত ও নিয়মামুখবদ্ধ খুব বেশী পছন্দ করেন। তাঁদের মধ্যে তিনটে খুব প্রবল ইচ্ছা দেখা যায় :—তাঁরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের অত্যন্ত বেশী রক্ষা করার চেষ্টা করেন এবং তাদের খুব বেশী শাসন করেন কিংবা খুব বেশী রকম আদর দেন।

গবেষণাকারগণ যোল এবং ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বত্রিশ জনকে পরীক্ষা করেছেন বাঁদের এই জাতীর পেটের ঘা আছে। এবং অপর পক্ষে এ বয়সের আরও বত্রিশ জনকে পরীক্ষা করেছেন বাঁদের এই রকম ঘা নেই।

অত্যন্ত কারণের মধ্যে এই রোগীদের শিশুদের সত্যকে অনেক তথ্যগ্রহণ করা হয়েছে। বিবরণে প্রকাশ, এ শিশুরা লল বহলাগে স্থির প্রকৃতির এবং নিজেরের জায়গার করবার জন্যে তাঁরা মোটেই ব্যস্ত নন।

কোন প্রকার পারীক্ষিক বেলা কি

বার্ষিকের কল?

যাঁরা পরিণত বয়সের তাঁরা অল্পবয়স্কদের চেয়ে পারীক্ষিক বস্ত্রা সহজে সহ করতে পারেন।

যে অস্থানে অল্পবয়স্করা এক কথার চাক্ষুরের সত্যতা নিতে চান তা যদি কোন প্রকার দৈহিক বেলা হয়, তাহলে বস্তুবা ব্যাপারটাকে নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁরা মনে করেন এই বেলা তাঁদের পরিণত বয়সের অপরিহার্য লক্ষণ।

চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন বিশিষ্ট ঔষধজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। দশ জনের মধ্যে নয় জন যোগীই মনে করেন বার্ষিক হলেই নানা রকম দৈহিক বেলাই অবশ্যস্বাভাবিক। উপরিউক্ত চিকিৎসক আবিষ্কার করেছেন যে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কুড়ি জনের মধ্যে সতের জনই বাড়িতে প্রায় এক মাসের ওপর অনস্থ হয়ে থাকেন। তাঁরা ডাক্তারের কাছে যান না। তার প্রধান কারণ যোগী নিজের যোগের চিকিৎসকের মতই নিজেই সুব্যবস্থা করতে পারেন।

লক্ষণভিন্না সাধারণতঃ কি বিষয়ে কথা বলেন?

এ কথার উত্তর দিতে হলে আগে জানতে হয় যামিন্দ্রীর বয়স কত, এবং কত দিন তাঁরা বিবাহিত জীবন বাপন করছেন।

বিবাহের প্রাথমিক অবস্থায়, অর্থাৎ তাঁদের সন্তানাদি হবার পূর্বে পরস্পরে বেশী কথা কন—বেশী দিন বিবাহ হয়ে গেলে কথার স্রোত কমে আসে। প্রথম জীবনে তাঁরা মানসিক ব্যাপারে (Subjective subjects) কথা কন বেশী, অর্থাৎ পারস্পরিক উচ্ছ্বাস, বোঁদ জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধীয় কথা বেশী বলেন।

একটু বেশী বয়স হয়ে গেলে, অর্থাৎ হাজারি বয়সে বাঁদের অন্তত দুইটি সন্তান হয়েছে, তাঁরা পরস্পরে মন জানাকানি কমই করেন। তাঁরা বেশীর ভাগ শিশু সন্তানদের সন্ধে এবং সন্তানের সন্ধে কথা বলেন, বিশেষ করে সন্তানদের যখন কোন ভুলে দেওয়া হয়নি। সন্তানরা একটু বড় হলেই যামিন্দ্রীর মধ্যে সামাজিক ব্যাপার নিজেই বেশী আলোচনা হয়।

পঁচিশ বৎসর বাঁদের বিবাহ হবে গেছে তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে তাঁরা বেশী আনন্দ পান, যদিও অল্পদিন বাঁদের বিবাহ হয়েছে তাঁদের কথোপকথনই সকলের চেয়ে বেশী আনন্দপ্রদ হয়।

বাঁদের বার্ষিক্য হয়েছে তাঁদের কথাবার্তা খুব কমে যায়। তাঁরা দ্বিগুণের মধ্যে পরস্পরে এক কটাও কথা কন না এবং বেশীর ভাগ তাঁরা বহুসংখ্য কথা বা সমাজ সংক্রান্ত আলোচনা করেন।

যিনি এই সব কথা আবিষ্কার করেছেন তিনি জানিয়েছেন কুড়িজন বিভিন্ন বয়সের লক্ষণভিন্না সঙ্গে তিনি কথা করেছেন, তাঁরা বেশীর ভাগই সহরে লোক, একবারই বিবাহ করেছেন এবং সকলেই কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

পরিণত বয়সের নরনারীর পক্ষে কর্তব্যপালন হওয়া

বিশেষ প্রয়োজন

ডাক্তাররা বলেন, ৩৫ বৎসরের নরনারী আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে নিজেদের কর্তব্যপালন ও উপযোগী করে রাখেন।

জীবনের প্রথম বৎসরগুলি বাস্তব কর্মের দ্বারা ব্যবহৃত হয়—

দ্বিতীয় নিজেকে গুটিয়ে ফেলে সকলে অতীতকে সক্রিয় করে তোলে।

বার্ষিকের সিন্ড্রোম পড়াশোনা দিয়ে কাটানো উচিত—তাকে গতি ও শ্রাব্য দুই প্রভাব নষ্ট করে দিতে।

বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্য কারিক ও মানসিক পরিভ্রম না করলে জীবন সক্রিয় এসে পড়ে।

৪০ বৎসর বয়স থেকে শরীরের প্রতিক্রিয়াকে সক্রিয় রাখতে হলে ক্রমশঃ দিন কাটানো বিশেষ আবশ্যিক। নানা রকম শখ (hobby) নিয়েও মনকে সক্রিয় করে রাখা উচিত।

বৃদ্ধ বয়সে নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করলে ভালো হয়:—

(১) খাবারে সব উপাদান থাকা উচিত। প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, পানীয় এবং তাপ উৎপাদক আহাৰ্য্যগুলি।

(২) অল্পে কখন মদ্য ভোজ্য দেওয়া উচিত নয়।

(৩) শরীর ও মনের প্রচুর বিশ্রাম প্রয়োজন।

(৪) মন খাতে ভাল থাকে এই রকম কার্যকলাপ খুব উপকারী।

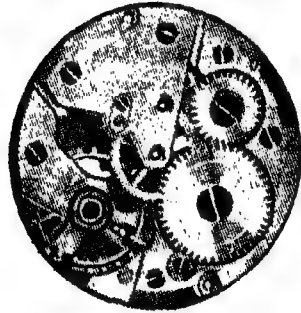
(৫) অত্যধিক মানসিক উচ্ছ্বাস সর্বদা পরিহার করা কর্তব্য।

(৬) বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সম্প্রীতি রাখবেন এবং যে কাজ করেন তাতে বিরক্তির পরিবর্তে গর্ব বোধ করবেন।

(৭) সামাজিক কাজ করা ভালো।

(৮) পড়াশোনা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি আপনার পরামর্শ বৃদ্ধি করবে।

GUARANTEED



WATCH REPAIRING
UNDER EXPERT
SUPERVISION

ROY COUSIN & CO

JEWELLERS & WATCHMAKERS

4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

OMEGA, TISSOT & COVENTRY WATCHES



উত্তরবাংলার ময়নামতীর গান

কোন এক স্বপ্নাভীত কাল হ'তেই উত্তরবাংলার ময়নামতীর

গান বাংলার পূর্বপ্রান্ত হ'তে শুরু করে বাংলার বাইরে ভারতের অধিকাংশ স্থানে গীত হ'ত। উত্তরবাংলার রংপুর জেলার আশে এই গানের সর্বাধিক প্রচলন চোখে পড়ে। এই গানের বহুলাংশে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম বহন প্রায় ভিত্তি সেই সময়ে এক সুন্দর কাহিনী অবলম্বনে ময়নামতী গানের উদ্ভব ঘটে, কোথাও বা নাথ বৌদ্ধদের ধর্মমত এই গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। নাথ বৌদ্ধদের 'মহাজান' ধর্মমত অবলম্বনেই ময়নামতী গানের সূচনা। বৌদ্ধপ্রভাব ছাড়া জালালপ্রভাব থাকার ফলেই ময়নামতীর গান এক সুদীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে বেঁচে রয়েছে।

বাঁধী ময়নামতীর পুর গোপীচাঁদের সন্ন্যাস অবলম্বন কাহিনী দিয়েই ময়নামতী গানের সৃষ্টি। এ'র সর্বপ্রথম রচয়িতা ও রচনা-কাল সঠিক ভাবে নির্ণীত না হ'লেও এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন মতের অবতারণা ঘটলেও, তা' যে রংপুর অঞ্চলের গ্রাম্যকবি দ্বারা পঞ্চদশশতাব্দীতে রচিত, সন্দেহ নেই। কোন কোন গানে খ্রীষ্টতত্ত্বেরও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তবাবী দাস রচিত গোপীচাঁদের পাঁচালীতে এমনি ধরনের বহু স্বাক্ষর বিদ্যমান।

"কেশব ভারতী শুরু কথা কইতে আইল।

কি না মন্ত্র দিয়া নিমাই সন্ন্যাসী করিল ॥"

যে অল্পত কাহিনী নিয়ে ময়নামতী গানের বিকাশ, তা বর্তমান যুগের মানুষের কাছে সত্য্য ঘটনা বলে মনে না হ'লেও, তা'র মধ্যে তৎকালীন যুগের ইতিহাস, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদির স্পষ্ট আলোড়ন নিহিত রয়েছে। একমাত্র ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিকতাই এই কাহিনীকে এক অমূল্য ধর্ম ও তাত্ত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এর গানগুলি সেকালের গ্রাম্যকবির রচনা হ'লেও তাতে কোন জড়বৃত্ত নেই। হুর্কোয়া ভাষার সম্পর্ক হ'তে গানগুলি সম্পূর্ণ মুক্ত। গ্রাম্যকবির বর্ণনাবিধিও অত্যন্ত সাবলীল।

ময়নামতীর গানগুলিতে গ্রাম্যকবির অত্যন্ত কাব্যিক ধর্ম-প্রভাব

হৃদয়ে রয়েছে। তৎকালীন সমাজজীবনের আশা-আকাংক্ষা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-দ্বেষ ইত্যাদি ভাবধারা গ্রাম্যকবির নিম্নপুণ লেখনীতে অত্যন্ত সরল ও সুন্দর ভাবাবিকাশ গানগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাই এ'গুলি লোকসঙ্গীত পর্ব্যায়ের পল্লীগাথা হিসেবে পল্লীবাংলার আকাশ-বাতাসকে সুগ সুগ ধরে স্থখিত করে রেখেছে।

কল্প অথচ যথু রসমিশ্রিত ময়নামতীর গানগুলি আজো পল্লীবাংলার মানুষের মনে অপূর্ণ দোলা দেয়। নাথধর্মাবিশিষ্ট গৌরকনাথ, ময়নামতীর বালাকালে তাঁর পিতৃগৃহে আগমন করে শিশু ময়নামতীকে মহাজানে দীক্ষিত করেন। পরে বিবাহিতা ময়নামতী তাঁর স্বামী মাণিকচন্দ্রকেও এই দীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর নিকট হ'তে দীক্ষা গ্রহণে মাণিকচন্দ্রের ঘোরতর আপত্তি থাকার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ ঘটে এবং মাণিকচন্দ্র ময়নামতীকে পরিত্যাগ করেন। কিছুকাল পরেই পুত্র গোপীচাঁদ দাতা ময়নামতীর আদেশে হাড়ি সিঁদুর শিষ্য গ্রহণ করে বারো বছরের জন্য সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। গোপীচাঁদের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের সময় তাঁর স্ত্রী অমুনী-পহুনার স্বয়ং কল্প ও মর্মান্বিত কাহিনী নিয়েই ময়নামতী গানের অবতারণা।

গৃহ হ'তে বাক্সার বাজার ঠিক পূর্ব হুহুর্ডে অমুনী-পহুনার স্বয়ং নিঃসৃত বেদনা অত্যন্ত সরল ও কাব্যিক প্রতিভার মাধ্যমে গ্রাম্য কবি পল্লীবাংলার মানুষের মনে তুলে ধরেছে। স্বপ্নাভীত যুগের সেই কল্প আবেদন আজো বাংলার জল-মাটি আকাশ-বাতাসকে অনুরণিত করছে :—

না বাটও, না বাইও রাজা দুই দেশান্তর

কার লাগিয়ে বাড়িলাম শীতল মল্লির ঘর।

শীতল পাটি বিছাইয়া দিই, বালিশে হেলান পাও,

হাউস মসৌ। বাঁতিয়ু তোমার চন্দ্র পাও,

প্রীতকালে বনোতে দিই দণ্ডপাখা বাও,

মাঘ মাসের শীতে বেঁধিয়া রই পাও।

অমুনী-পহুনার মনের খুব গোপন অথচ প্রকৃতিগত ও স্পষ্ট কথাগুলি গ্রাম্যকবির নিম্নপুণ লেখনী, প্রোক্ত ভাষা ও বর্ণনা মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এই গানগুলির প্রতিটি শব্দের মধ্যে এক কল্প রসের উৎস ছড়িয়ে রয়েছে। তৎকালীন সমাজ ও কৃষ্টিগত প্রচার জন্মভূমির বৃক্কেই জন্মদ্রব্য ধারণ করে ঘর বেঁধে থাকবার এক দুরন্ত প্রতিজ্ঞা এই গানগুলির বিষয়বস্তু। সামাজিক বন্ধনকে না এড়িয়ে, সভ্যতার প্রতিক নিয়ে স্বজন পরিবারের মধ্যে একত্র বসবাস করার এক হৃদয় প্রেরণ, তৎকালীন যুগধর্ম হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে, সে যুগের কবির রচনার ছন্দে ছন্দে।

অমুনী-পহুনার প্রাণের কল্প বাধা উপলব্ধি করে গোপীচাঁদ বোগ-জীবনের বিভিন্ন রকম দুঃখ ও বাধা-বিপত্তির কাহিনী তুলিয়ে তাঁদেরকে তাঁর সঙ্গে হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। তৎকালীন যুগে নির্ভা ও পরিত্রাণের সঙ্গে ধর্ম অবলম্বনে যে বিরাট আত্মত্যাগের উল্লেখ রয়েছে তা এ যুগে স্বেচ্ছাপ্রাণ ও অসৌক্য বলে মনে হয়। বহুরূপের বৃক্কে কশাঘাত করে আত্মপ্রাণলব্ধিতে অতি-মানবতীর উদ্রেক, তৎকালীন যুগের গ্রাম্যকবি রচিত এই গানগুলিতে আজো স্নানুর আলোড়ন হয়ে উঠছে। অতিপ্রাকৃতের স্পর্শযুক্ত এই প্রাচীন বাংলা কাব্য সাহিত্য এক নতুন

অধ্যায়ের অবতারণা আজ চৌথ পড়ে, বা বর্তমান যুগেরে নিহক অসৌজন্য বলে মনে হয়। এক গভীর দার্শনিকতার ছাপ গানগুলিতে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে রয়েছে :—

আমার সঙ্গে বাবু বাণি, পাঁচু শোন কাহিনী।

ঝিলা লাগলে অন্ন পাবু না, পিরাস লাগলে পানী।

খাটবে না খাটবে বাঘে ফালাবে হারিরা।

বুধা কাজে ক্যান ঘরবু আমার সঙ্গে বাটরা।।

গোপীচাঁদের এই কথাগুলি অহুনা-পহুনার মনে ত্রাস সৃষ্টি করলেও পরক্ষণেই তাদের মনে অল্প এক চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এমন সময় তাঁরা সমস্ত ভয় ত্রাস মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন একমাত্র রাজার সাহাচর্য মন প্রাণের সঙ্গে নিজস্বেরকে বিলীন করে দিয়ে। স্বামী গোপীচাঁদের প্রতি স্ত্রী অহুনা-পহুনার ঐকান্তিক অনুরাগ প্রেমাবেগ প্রামাণ্যবিরসের স্তনিপুণ লেখনীতে অভিব্যক্তি পেয়ে শীর্ষ পর্যায়ের উপনীত হয়েছে। স্বামীর প্রতি বঙ্গ কুলনারীদের পবিত্র প্রেম ও রমণ্যবোধ ভক্তিমূল্যবদ্ধ রসে পরিণতি লাভ করেছে, স্বামীর অধ্যাত্মবাদ থেকে পৃথকীকরণ চলে না। সেই যুগীয় বঙ্গ কুলনারীদের এক নিরুদয়, সত্যের স্বাক্ষর মিলেছে প্রামাণ্যকবি রচিত এই গানগুলির ভাস-গভীরতার।

থাক না ক্যান বনের বাঘ তার না করি ভয়।

নিরুদয় মরণ হউক বোয়ামীর পদের পর।

পল্লীকবির অভিনব লেখনী স্পর্শে কোথাও বা অহুনা-পহুনা বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত স্ত্রীস্বামীর রূপ গ্রহণ করেছেন। স্ত্রীকৃষ্ণের কৃদাবল হ'তে মধুর প্রহ্বানের সময় স্ত্রীস্বামীর হৃদয় বিগলিত ব্যাকুল প্রেমাবেগ সাধারণ মাহুয হ'তেও অনেক উর্ধ্বে এক অতীমানবের উদ্ভেদে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। এমন এক পরিবেশের উত্তর ফটেছে, গোপীচাঁদের উদ্ভেদে অহুনা-পহুনার হৃদয় নিঃসৃত আত্মল প্রেম নিবেদনে। বিরহিনী স্ত্রীস্বামী যেমন বলেছেন :

হাস হাস করি বহব পমাঙল,

হেঁড়লু জীবনক আশা।

এমনি তাইবৈ বিরহিনী অহুনা-পহুনার কক্ষ বিলাপ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে পল্লীকবি রচিত গানের সুরে ও স্বভাবে :

কতকাল রাখিব বৌদন অকলে ব্যক্তিরা।

বাহের হৈল বৌদন হৃদয় কাটিয়া।।

রাজা গোপীচাঁদের সংসার ত্যাগের পর অহুনা-পহুনা যে বিরহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তাঁদের সেই কক্ষ রূপ মরনামতীর গানের স্বভাবে আজো বেঁচে রয়েছে। কতো যুগ যুগ পরে আজো সেই হৃদয়জোঁ পুর পল্লী-বাংলার আকাশে বাতাসে ও যন্ত্রির কণায় কণায় মিশে রয়েছে। বাঙালী মাহুযের কোমল প্রাণবীণার কক্ষ সুরের সেই লহরী, থেকে থেকে আচমকা বেজে ওঠে। প্রাচীন বাংলার স্বপ্ন হুং-হাসি আলস, করণ্য-বিশাদ ইত্যাদিতে ভরপুর সেই গানের হৃদয়গুলি বর্তমান প্রগতিশীল বাংলার লোকসাহিত্যের ভাঙানে এক অসাধারণ স্থান লাভ করেছে। প্রাচীন বাংলার এমনি লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে আরো যে কত সহস্র রকমের লোকগীতি বাংলার প্রতিটি মূলকণার সঙ্গে অখ্যাত অমহার পড় রয়েছে, তা' বলা স্বকটিন।

—হুগলু মুখোপাধ্যায়।

রেকর্ড পরিচয়

এবার “হিজ মাস্টার ভয়েস” ও কলম্বিয়ার যে রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে, তার স্মৃতিপুত্র বিবরণ :—

হিজ মাস্টার ভয়েস

এন ৮২৮৪০—মাস্টার দে'র কণ্ঠে আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪১—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪২—স্রীমতী উৎপলা সেনের হু'খানি আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪৩—হু'খানি পল্লীগীতি গেয়েছেন সনৎসিংহ।

এন ৮২৮৪৪—ভ্রামল মিত্রের আধুনিক ও পল্লীগীতি।

এন ৮২৮৪৫—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪৬—মহম্মদ রফিক গাওয়া আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪৭—বাসুদেব দত্তের কণ্ঠে আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪৮—ভাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, তপসী বোষ ও পবিত্র মিত্র অভিনীত কৌতুক নম্রা।

এন ৮২৮৪৯—স্রীমতী ইলা চক্রবর্তীর (বসু) হু'খানি আধুনিক গান।

কলম্বিয়া

জি-ই ২৪১৬৬—হু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

জি-ই ২৪১৬৭—আশা ভোঁসলের আধুনিক গান।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা
খুবই খাড়া-
বিক, কেমনা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮-৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের আভি-
জতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার
কলম লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এন্সল্যান্ড ইন্স, কলিকাতা - ১

জি-ই ২৪১০৬—ভূপাধ্যায়ের পাঁচরা আধুনিক গান।

জি-ই ২৪১০৭—আধুনিক গান—গেয়েছেন গীতা দত্ত (বাব)।

জি-ই ২৪১১০—পাশ্চাত্য ভট্টাচার্যের কণ্ঠে ভাস্কর্য।

জি-ই ২৪১১১—গীতগীত হবি বঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কীর্তন গান।

জি-ই ২৪১১২—হু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন শ্রীমতী লতা হু'খানি।

জি-ই ২৪১১৩—গীতগীত সত্য হু'খোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পল্লী ও আধুনিক গান।

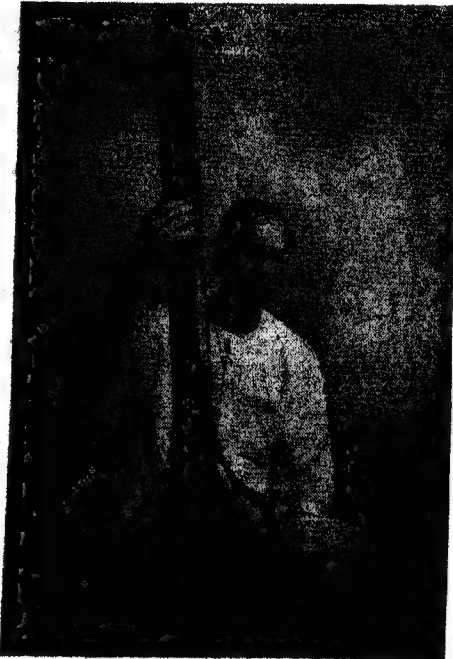
জি-ই ২৪১১৪—হালাত মামুদের গায়রা আধুনিক গান।

আমার কথা (৫৮)

শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য

একপদ—একক—একপদ—এক জিনিষ। ধামার তাল ছিল একপদের। এখন ধামার হয়েচে হোগী। সারাভারতে বর্তমানে মাত্র কয়েকজন আছেন ষাটি একপদগায়ক। তন্মধ্যে পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক একদলী শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় অন্যতম।

মত কলিকাতার তাঁহার ঘরে বসে ভট্টাচার্য মহাশয় জানালেন : ২৪ পরগণা জিলার হরিনাভি গ্রামে বাবার মাতুলালয়ে ১২১১ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার আমি জন্মাই। হরিনাভির জমিদার বোম্বাইয়ের সহিত আমাদের পারিবারিক বন্ধুতা বহুদিনের। বাবা কলীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহারাজা সৌরভমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত



শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য

নর্দাল সঙ্গীতবিদ্যালয়ে গান শিখিতেন। সহপাঠী হিসাবে পেরেছিলেন সঙ্গীতরত্নাকর ৬ অধ্যায়নাথ চক্রবর্তী (তাঁর আদি শিষ্য), গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কনাসভাকার ৬তমাল অধিকারী, আলোবন্দ, অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির। তখন সঙ্গীতকেশরী ক্ষেত্রমোহন গৌরামী ও সঙ্গীতবিদ হরিচরণ বঙ্গোপাধ্যায় বাক্যকয়ে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাসচিব ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মা ৬মোক্ষনা দেবী ছিলেন ছোট জাঙলিয়ার উপাধ্যায় বংশের তনয়া। মামা ৬ক্ষেত্রমোহন উপাধ্যায়ের সহিত ছোট জাঙলিয়ার সোনারায় চন্দ্র বহু (বোসজা) ও ৬হেম বিবাস (অভিনেতা হবি বিবাসের পিতামহ) মহাশয়দ্বয়ের গৃহে খুবই বেতাম। খুব ভালবাসা পেয়েছিলেন দুজনের, নারায়ণ বাবু ও তাঁহার পত্নীর আদরকন্ডের কথা কখনও ভুলির না। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি Anglo Sanskrit স্কুলে প্রথমে পড়ি। হরিনাভিতে তখন অভিনয় ও সঙ্গীতের খুব বড় আসর বসত প্রায়ই। পরে বাবা কলিকাতার বহুবাজারে বাসা করায় স্থানীয় বালা স্কুলে ভর্তি হই ও তথা হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০২ সালে বেলাতচন্দ্র ইনঃ হইতে এন্ট্রান্স পাশ করি। কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা কম্পট্রোলার অফ পোষ্টাফিসের দপ্তরে চাকুরী লই এবং ১৯০৬ সালে নাগপুর হইতে অবসর গ্রহণ করি।

বাবা গান করতেন ও ছাত্রদের শেখাতেন। বাতাবিকভাবে গানের নিকে ঝোঁক এসেছিল আমার। কিন্তু বাবার কঠোর নির্দেশ ছিল পড়াতনা করার। মনে মনে গুণ্ডগুণ্ড করতাম। কলিকাতা বহুবাজারে থাকার সময় জমিদার সরকার বাবুদের (গোবিন্দ সরকার লেন) বাড়ীতে প্রায়ই সঙ্গীতের আসর বসত। সেখানে আসতেন অযোয়নাথ, পাথোয়ারাজী বরদা দত্ত, ত্রিগুণা দত্ত, সারকী রমজান খাঁ। কাছেই ছিল ধরবাবুদের ৬কগল্লাখমেবের ঠাকুরবাড়ী। সেখানে গান শুনতুম মিয়া হুদাদ আলি খাঁ, মিয়া আলি বক্স, টল্লাবিদ ভোলানাথ দাস প্রভৃতির। সরকারবাবুদের সহিত ঘনিষ্ঠতার কারণ ছিল গোবিন্দচন্দ্রের গৃহস্থী হরিনাভি গ্রামের যোববংশের কস্তা—তাকে আমি শিসিমা বলে ডাকতুম। এই সময় আশাত্তভাবে গান শেখার সুযোগ এল। সরকারবাড়ীর নরেনবাবু আমাকে গান শেখানর জন্ত বাবাকে পরামর্শ দিলেন। বাবা আমাকে একদিন ডেকে আমার কণ্ঠ পরীক্ষা করেন ও স্বরলিপি সাধন প্রণালী অবহিত করান। নর্দাল সঙ্গীত বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর আমার বাবা, অযোয়নাথ ও অন্যান্য কয়েকজন মিয়া আলিবক্স সাহেবের শিষ্য হন। গজা বাবার নাকি গায়কের পক্ষে উপযোগী বস্তু—তজ্জত গুরুকে এঁরা গজা খাওয়ারহিতেন—অর্থের দরকার হত না খাঁ সাহেবের। এঁদের মধ্যে আলিবক্স সাহেব অযোয়নাথকে তাঁর সমস্ত সঙ্গীতসম্পদ অর্পণ করেন। পরে সেই ভারতবরণ্য সঙ্গীতসাধক অযোয়নাথকে আমি সঙ্গীত-গুরু হিসাবে পাই এক তাঁর সঙ্গে বহু বিশিষ্ট আসরে উপস্থিত থাকিতাম। পাথুরিয়াবাটার রাজপ্রাসাদে একবার আমি কুশালী দাগের 'নৈত্র কিশাল' 'বাত্ত ডকবীণ' হু'টি একপদ ও ধামার গান করি—সদন্ত করেন কাবীর হু'লী কুতরায়। উপহার পাই কতিন স্বরপ্রায় সাধন প্রণালী সম্বিত একটি পুস্তক। রাজচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় আমাকে তাঁর 'স্বরক' হারমনিয়ামটি দেন। বাবার কাছে শেখা

বিক্রপের বহানার গানগুলি কিছুটা সংকর করে ও বরচিত গান আমার
সেখানেই আধোনাথ। তাঁর নিয়মিত শিক্ষায় এসে সঙ্গীত
সাধনার ক্ষেত্রে আমি সার্থকতার পথ খুঁজে পাই। বাবার মৃত্যু ও
অযোবনাথের ৮কালিধামে হাওরার পর আমি প্রাসাদ ধামার
বিশনাথ হাওরীর দিব্যধ গ্রহণ করি। আমি প্রায়ই ৮কালিধামে
বেতাম—তথায় হরিনারায়ণ যুগোপাধ্যায়, মিঠাইলালজী, আসসর
জলী খাঁ, মিয়া আসাদ আলী খাঁ প্রমুখ সঙ্গীতজগৎপের সান্নিধ্যে
আমি। চাঁতুরাছলের প্রভের সতীশ দত্ত (হানী বাবু) ও প্রখ্যাত
মুদ্রক-বাদক নগেন্দ্রনাথ যুগোপাধ্যায় আমাকে সঙ্গীত চর্চায় সাহায্য
করিতেন। এগার বর্ষ নিয়মিত সঙ্গীত সাধনা করেছি—বর্তমানেও
বহুকণ করে থাকি। নিখিলবজ সঙ্গীত সম্মেলনে প্রথম থেকে
হুতুত আছি। নাগপুর সঙ্গীতসংসদে ককর বংসর ও কালী সঙ্গীত-
গম্বাজ সম্মেলনে ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে অংশ গ্রহণ করি। সেখানে
ছোট ও বড় রামদাসজী, আনোখীলাল, কণ্ঠে মহারাজ, ওকারনাথ
প্রভৃতির সহিত বসিত্ত হয়। আন্তঃকলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়
ষ্মিণ বংসর বিচারক হিসাবে বহিরাছি। ১৯৫২ সালের নভেম্বর
মাস হইতে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের আমি একজন নিয়মিত গায়ক।
১৯৫৮ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক—অধ্যাপক

(সঙ্গীত) রূপে শাস্ত্রনিকেক্তনে ছিল। ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে
কেন্দ্রীয় সঙ্গীতনাটক আকাদেমী আমাকে সঙ্গীতে (একদ) অংশ
গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বারানসীর ভারত ধর্মমহামণ্ডল
আমাকে “সঙ্গীতরত্ন” উপাধিতে ভূষিত করেন। সাতনা (বেগুয়া
ট্রেট) উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ৮লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্যর তনয়া
বটী দেবাকে ১৮১৮ সালে বিবাহ করি। সেখানে আমার সঙ্গীত
জলসায় যোগ দিতে হয়। ওস্তাদ দিলওয়ার খাঁ খেয়াল গাইতেন।
একবার তথায় সত্যাবালা দেবী আমার গানের সঙ্গে বীণা বাজান।

তিনি বলেন যে, প্রতি বংসর কলিকাতায় যে গানের
আসরগুলির আবেশন হয়, তা থেকে বাংলা দেশের সঙ্গীতশিল্পী
ছেলেমেয়ের বিশেষ কিছু শেখা হয় না।

চলে আসার আগে তিনি জানানেন যে, বাবা ও অজ্ঞাত যে
সমস্ত গুণী সঙ্গীতজগৎপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিল—তাদের ব্রহ্ম,
ভালবাসা, দরদ পেয়েছি—তাদের সাধনাকে অধুসরণ করার চেষ্টা
করেছি—কিন্তু বোধ হয় পূর্ণভাবে। নজকে প্রকাশ করতে পারিনি।
তার জন্য আমার মনে নেই কোন ক্ষোভ, কোন হুঃ, কোন
আশ্চর্যমাননা। কারণ আমার সঙ্গীতজগতে চলার পাথের হয়েছে
তাদের সকলের আশীর্বাদ।

এহের গতি

ঈশ্বরস্তুতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণে রাতের হাওরার বিজলীর সজল পরশ,
পৃথিবীতে দুই নামে, মনে হয় সবাই অলস।
সময়ের শিহরণ
কি জানি কখন
দিয়ে গেল দোলা।

প্লেক্টের কলিঙ্গীমাথা ঘন মেঘে
বিজলীর খেরালী আঁচোড়ে
স্বরের বেথলা।

হুঁ একটা নামহীন তারা
কেন জুত দিশাহারা ?
সিকন লাড়ীর আড়ালে
মুটিয়ার ব্লাউজের কোলে,
জন্মির কারুকার্যে বৃষ্টি
প্রকাশের প্রাসব বেদনা।

নামহীন! গোত্রহীন।

তবু
অনন্তের কক্ষপথে নিবু নিবু তোখে,
উতলা মেঘের কোন অরক্ষিত কীকে,
বিশ্বদে দেখেছিল পৃথিবীকে।

সভাতার রত্নপণ্যভারে বোঝাই জাহাজ—
কীর্তির কেতন আর শতাব্দীর ইতিহাস আলোয়;
সাগরের তুহিন আঁধারে কোন পথে যায় ?

সাহারা মরুভূমিকে মরীচিকা পিছে,
পথভোলা মলহারা বেহীন বণিকের বেতন,
একাকী চলছে কোন নীহারিকালোকে।

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

যে কোনও কার্যেই হোক আমাদের সহায়তা হুঁচি বা ইনিষ্ট্রক্ট করলিল যে গোটা বায়ুই ছিলেন এই হজ্যাকারের ব্যাপারে সেকেন্ড ইন্স কন্যাও এবং কোর্টো বায়ু ছিলেন থার্ড ইন্স কন্যাও। আমাদের অভ্যস্তা এই কথাও বললিল যে প্রব সত্বেও



আগামীরা প্রস্তুতি

খোকা আজ আর খোকা নেই। আজ সে বড় হয়েছে। ছ'দিন পরে বাবার মতো তাকেও অনেক হাতিব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে সংসারের মরা-বাঁচার সংগ্রামে।.....
বুড় বাবা আজ ক্লান্ত। কপালের তালু তালু তার বাড়িকায় হাস।
জীবনের সব অবিজ্ঞতা, সব সঙ্কর নিয়ে খোকাকে সে বড় করে তুলেছে। তার বুক ঢালা মেহের ছায়ার মিলে মিলে ছোট চাষাটির মতো বেড়ে উঠেছে খোকা, আর কেনেছে জীবনের কঠিন মতাকে—খুঁচে থাকার কঠিন সংগ্রাম।
এ শুধু আগামীরাই প্রস্তুতি। আজকের এই মহান সংগ্রামই যে একদিন স্নাত্তিমর, স্নাত্তিমর পৃথিবীকে আনন্দ ছুঁবে উজ্জ্বল হাসি গানের উৎস করে গড়বে।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পন্যজন্ম এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের এতেটে। এগিয়ে চলেছে আগামীরা পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে বিশেষ সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি, আমাদের মজুদ মত, মজুদ পথ আর মজুদ পণ্য নিয়ে—

আজও আগামীতেও দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR. 4-X52 BQ

উঃ। প্রধানকার পেশাবতী নারীদের ভিন্ন বকদের উপস্থিতি বা বাবু আছে। বধা, (১) ছুটা অর্থাৎ বাবা থাকে তাকে অর্ধের বিনিময়ে ককে হান দেয়। (২) টাইমের, অর্থাৎ বাবা দুই বা তিন ব্যক্তিকে মাত্র আমল দেয়। অর্থাৎ একজন হয়তো এলো সেম ও মকল বার এক অপর জন হয়তো এলো বৃথ ও ভুলবার এবং ছুতীয় জন হয়তো এলো শনি ও রববার। এমন নিয়মত এদের বাবু আসা বাওয়া করে। অজানা ও অচেনা কাউকে এরা ককে হান দেয় না। (৩) বাধা, অর্থাৎ বাবা বামিন্দ্রীয় মতন থাকে। এক কথার একজনেরই মাত্র জাত থায়। অল্প কাউর মিকে এরা কিরও তাকায় না। তবে আমার সঙ্গে বাড়ীউলার অল্প বকদের সম্পর্ক। আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসি। আমার কোনও চাকুরী বাহুরী নেই। বাড়ীউলী আমাকে জা করতেও দেয় না। এর বেশী আমি আপনাদের আর কিছু বলতে পারবো না। আপনারা আমার নমস্ত গুরুজনহানীর। এ' সব কথা তাই আপনাদের কাছে বলতে আমার লজ্জা করে। বেস্তানারীরা বেস্তা হলেও তারা মারী। এই জন্ম ভীষেরও মধ্যে মধ্যে মনের মানুষের প্রয়োজন হয়। এর বেশী আর আমাকে আপনারা কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে বাড়ীউলী ওপরের ঘরে থাকেন বলে তিনি গোপী বাবুদের সবচে কোনও খোঁজ খবর রাখেন না। তাঁকে আর এই সব ব্যাপারে আপনারা জড়বেন না। সাক্ষী টাক্ষী যা বেবাব তা তাঁর হয়ে আমিই দেবো, বাবু।

উপরের এই সংবাদ অনুযায়ী আমি তৎক্ষণাৎ এই বাড়ীতে এসে ওখানকার বেস্তা নারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকি, কিন্তু এরা এ'ওর বুথ চাওয়া চাওয়া করতে থাকে মাত্র। বহু পীড়াপীড়ি করেও এদের নিকট আমি একটি মাত্রও প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি নি। আমার এই অক্ষমতা সত্যকে এই দিনের মামলা সম্পর্কীয় মারকলিপিতে আমি একটি বিবৃতিও লিপিবদ্ধ করি। আমাদের ইনস্পেক্টার সুনীল বাবু ছিলেন একজন প্রাচীনতম অফিসার। তিনি আমার নিকট হতে এই সব কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে। তুমি গিয়েছিলে সেখানে পুলিশ অফিসার সঙ্গে। এই জন্ম তারা কেউই তোমার কাছে কোনও বীকারোক্তি করে নি। এইবার আমি সেখানে বাবো ছদ্মবেশে তাদের একজনের উপস্থিতিরূপে। এইবার দেখবো তাদের কাছ হতে প্রকৃত সত্য সংগ্রহ করা যায় কিনা? আমি অবাক হয়ে ইনস্পেক্টার সুনীল রায়কে বলেছিলাম, সে কি সত্য? এরা আমাকে কিছু বললো না, কিন্তু এরা আপনাকে সব কথা বললো—এই তথ্য আলালতে গেল করলে তো জুয়ীরা আমাদের দুজনার কাউকেই বিশ্বাস করবে না। অবশ্য যদি আপনি আলালতে বলতে পারেন যে সেখানে আপনি তাদের উপস্থিতিরূপে গিয়েছিলেন তাহলে তা স্বত্ত্ব কথা। কিছু বার অপ্রতিভ না হয়ে ইনস্পেক্টার রায় আমার এই প্রস্তাব উত্তরে বললেন 'যুগোপে যদি বুঝতী নারীরা শত্রুপক্ষের ঘোরায়েজনের উপস্থিতি হয়ে থাকে যশেশের জন্ম ঘোপান তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসে যশেশবাসীর নিকট বশুধী হতে পারেন তাহলে একটি সাংবাদিক রায়লার ফিয়ার করা বর এইরূপ এক ব্যবস্থা যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে আমি আপনাদের লক্ষ্যের কি আছে? তা হুঁক

আমি একজন পুলিশ অফিসার ও সেইসঙ্গে একজন পুঙ্খ নায়কও তো বটে। এই দিনই ইনস্পেক্টার রায় দিশী দৃষ্টি, দীর্ঘায় অকুণী ও সোনার বাড়ি পরে ও সিংহের পাঞ্জাবী ও ওড়না সারে দিয়ে ও লপেটা পামস্র পরে সাহা গারে উগ্র সেট মেখে হাতীর দাঁতের ছড়ি বুঝতে বুঝতে এই বেস্তাবাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিলেন। এর পর সেখানে সারারাত্রি বাস করে সেখানকার তিনটি বেস্তানারীর নিকট হতে নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি সংগ্রহ করে তবে কিংব এঁসেছিলেন।

“আমরা তিন জনেই এই বাড়ীতে নিজ নিজ ঘরে পেশা করি। আমাদের বাধা বাবু নেই। টাইমের বাবু দু'জন থাকলেও মাঝে মাঝে আমরা ছুটাও করে থাকি। আমরা সকলেই গোপী বাবু নামে একজন ফরাসি রঙের মানুষকে চিনি। সে এই উত্তর মিককার একখানা ঘরে তার বাধা জ্বলোক ডলিরাগীকে নিয়ে বাস করতো। এই সেপ্টেম্বর (খুনের রাতে) ১১৩৬ ভোরবেলায় আমরা ডলিরাগীকে একটি জামা ও একটি দৃষ্টি তার ঘরের বারানকার বালতির কাছে ছুঁয়ে পরিচয় করতে দেখেছি। এই বালতির সব জলটা লাল হয়ে উঠছিল। ডলিরাগীকে জিজ্ঞেস করার সে বলে গোপী অর্শের রোগ আছে। এর কিছু পরেই গোপী ডলিরাগী ও তার মা'কে নিয়ে তাদের দু'টা ঘরেরই তালি বন্ধ করে কোথায় চলে গিয়েছে। তাদের এখনকার বাড়ীর ঠিকানা সত্যকে আমরা কিছুই বলতে পারবো না।”

পরদিন সকালবেলা আটটার সময় ইনস্পেক্টার সুনীল রায়ের নিকট হতে উপরোক্ত সংবাদ পেয়ে আমি তাঁর নির্দেশ মত আসাবী গোপীনাথের বস্তুতার প্রধানকার ঘর দুইটি তল্লাস করার জন্ম বধাশীজ বওনা হয়ে গেলাম। ঘর দুইটি তালাবদ্ধ থাকার তালি ভাঙবার জন্ম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে উপস্থিত হয়ে এই ঘর দুইটির তালি ভাঙবার আমার কোনও প্রয়োজন হয় নি। আশাতীত ভাবে আমি দেখতে পেলাম যে ঘরের দুইটি ঘরই খোলা এবং দেখানে ডলিরাগী ও তার মাতাঠাকুরাগী জিনিসপত্র শুছিয়ে নিয়ে পুটলী পোটলা বাঁধছেন। একটু দেরী করলে এরা একেবারে আমাদের বাগালের বাইরে যেতো আর কি? আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে এই ঘরে উপস্থিতি মসীবর্ণী কুঙ্গরা বুঝতীর নামই ডলিরাগী। এরূপ একটি কুংসিত নারীর এরূপ একটি সূক্ষ্ম নাম আমার সেইদিনকার তরুণ মন আদর্শেই পছন্দ করেনি। আমি একরকম ক্ষেপে উঠে বলে উঠেছিলাম, কে তোমার এই নাম রেখেছে? ভীতব্রজা হয়ে ডলিরাগী বলে উঠলো, আমার মা। ‘এঁা তোমার মা’ অলক্ষ্যে আমার বুথ হতে বেরিয়ে এলো ‘এই পাকড়ো ইনকো’। আমার এই ছদ্মকার অভিনয়ের ফল ফলতে একটুও দেরী হয়নি। ভীত ব্রজা হয়ে একরকম কীপতে কীপতেই ডলিরাগীর বুঝা মাতা বলে উঠলো আমাদের কেন ধরবে বাবা। আমরা তোমাদের গোপীর হাওড়ার নতুন বাসা একুশি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এইবার একটু পোটনার পড় গেলাম। একুশি এদের নিয়ে হাওড়ার চলে বাবো, না প্রায়ে ডলিরাগীর একটি বিবৃতি এখানেই লিপিবদ্ধ করে দেবো। পরিশেষে চিন্তা করে ডলিরাগীর নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে নিলাম।

‘৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭০ রাত্রি আদালত এক ঘণ্টার সময় [হুঁ হুঁ রাত্রি ১২টার পর তারিখ বদলায়] আমায় ধরিত গোপীবাবু আমায় ধরে এসে উপস্থিত হলো। এই সময় আমি দেখতে পেলাম যে সে প্রচুর মতপান করেছে। এই অবস্থায় তাকে আমি দেখে জিজ্ঞাস করেছিলাম, ‘আছা।’ তোমার কিরতে আর এতো মেরী হলো কেন? আমায় এই প্রশ্ন গোপীবাবু বেশে উঠে উত্তর করলো, চূর্ণ কর শালী। একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। কাল সকালে খবরের কাগজে দেখতে পাবি। পরদিন প্রত্যয়ে আমি তার হুঁহুতে রক্তের দাগ দেখতে পাই। এই থেকে আমি বুঝতে পারি যে রাঙে একটা খুনখারাপি হয়ে গিয়েছে। গোপীবাবুর জম্বোবোহে আমি কাপড়খানা এক বাসন্তি জলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করে ফেলি। এর পরই গোপী আমাকে নিয়ে হাওড়ার একটা বাসাবাড়ীতে এনে তুলে। আমায় মাও আমায় সঙ্গে চলে আসে। এর পর এই দিন আমি মায় সঙ্গে এখানে এসেছি এখানকার জিনিসপত্র সব ও বাড়ীতে নিয়ে বাবার জন্তে। ঐ কাপড়টা আমি খোবার বাড়ী না দিয়ে হাওড়ার বাড়ীতে একটা হাকের মধ্যে রেখে দিয়েছি। এ ছাড়া ঐ খুন সবচে আমরা আর কোনও খবরই আপনাদের দিতে পারি না।’

এর পর আমি সাক্ষীদের সামনে গোপীর ঘর হুঁটি ভালো করে জ্ঞান করি কিন্তু সেখানে আশস্তিকর কোনও দ্রব্য পাওয়া যায়নি। এর পর ডলি ও তার মাকে নিয়ে আমি নেমে আসছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম যে একটা ফরসা রক্তের প্রকৃষ্ণা উপরে উঠছে। ছোকরাটি আমাদের দেখামাত্র পৌড়ে পালিয়ে বাজিল, কিন্তু আমি তার পিছু পিছু তাড়া করে জ্ঞান করে ফেললাম। তার গায়ের রঙ ও চেহারা দেখে ইতিপূর্বেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে, সে গোপীবাবুর ছোট ভাই সুদাম। ডলি ও তার মায় কিরতে মেরী হচ্ছে দেখে গোপী তাকে এখানে খবর নেবার জন্তে পাঠিয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ ডলি ও তার মাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্তে থানার কারখানা হাটখানকে নিয়ে হাওড়ার রওনা হয়ে পড়ি। থানার কিরে এসে সেখান থেকে এক ট্রাকজন্তি সশস্ত্র শত্রীও সঙ্গে নিয়েছিলাম।

গোপীর ভাই সুদাম নিজেই আমাদের পথ দেখিয়ে তার দাদার হাওড়ার নতুন বাসা-বাড়ীটি দেখিয়ে দিয়েছিল। এই ভাবে তার দাদাকে ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া তার অন্য উপায়ও ছিল না। তা ছাড়া এতে তার দাদার কিরকম বিপদ ঘটতে পারে, সে সবচে তার কোনও দ্বিষ্ট ধারণা ছিল না। আমরা ধরিতগতিতে সশস্ত্র সিপাহী-শত্রীর সাহায্যে গোপীর ঐ বাড়ীটা ঘেরায়া করে ফেললাম। বাড়ীর দরজা বার হতে খোলাই ছিল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, গোপীনাথ একটা তক্তপোষের উপর অধোরে ঘুমাচ্ছে। আমরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ামাত্র সে তড়া করে উঠে পড়ে তক্তপোষের পাশ হতে একটা ভোজালী বার করে আমাদের দিকে ছেড়ে এসে। ছাত্রা পূর্বে হতেই প্রকৃত থাকার ভিন-চারটা চৌচৌ-ভরা রিডলভার কলিকের মধ্যে তার দিকে উঁচিয়ে ধরতে পেরেছিলাম। বেগতিক বুঝে গোপীনাথ ভোজালীটা বিছানার উপর রেখে ধরা নেবার জন্তেই এনে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে। কিন্তু আমরা আমাদের পিছল ছত্রটি পুরনার পকেটে পুরামাত্র সে আমাদের উপর তড়াহুতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো। এর পর আমাদের সঙ্গে লড়াই হলো তীব্র যুদ্ধাধি।

এতে আমাদের মধ্যে হুই-একজন আহত হলো গোপী নিজেই অধিক আহত হয়েছিল। কিন্তু সে যে সেদিন ইচ্ছে করলেই আহত হয়েছিল, তা আমি সেই দিন আকসেই বুঝতে পারিনি। পরদিন হাসিককে নিজের মেহের আঘাত দেখিয়ে পুলিশ হোপাকতি এগিয়ে জেল হোপাকতিতে বাবার জন্তে সে সুপরিকল্পিত ভাবে এইরূপ যত্নাধিত্তে আহত হতে চেয়েছিল। পাছে পুলিশ হোপাকতিতে থেকে তাকে একটা স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি দিতে হয়, তার জন্ত তার এ ছিল একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। বাই হোক, আমরা হুইজন স্থানীর সাক্ষীর সমুখে গোপীবাবুর ঐ বাড়ীর ঘর কর্তি পুখাহপুখ রূপে তল্লাসী করে একটা বাল্লো থেকে তার রক্ত-বোত কাপড়খানি উদ্ধার করতে সমর্থ হই। তখনও পর্যন্ত (খোয়া সবচেও) ভাতে সামান্য সামান্য রক্তের চিহ্ন লেগে ছিল। এ ছাড়া ঐ ঘরের অপর একটি বাল্লো থেকে আমরা একটি গণধকারের ছক-আঁকা কাগজও উদ্ধার করতে পারি। এই পত্রিকাখানি হতে বুঝা যায় যে গোপীবাবু ইতিমধ্যে এক গণধকারের কাছে ভাগ্য শুণিয়ে এসেছে। ঐ কাগজের টুকরাটিতে লেখা ছিল যে অতো তারিখের মধ্যে গোপীবাবু পুলিশের হাতে ধরা না পড়লে তার আর কোনও বিপদের আশঙ্কাই থাকবে না। হুর্ভাগ্যক্রমে ঐ নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই গোপীবাবুকে আমাদের হাতে ধরা পড়তে হলো।

গোপীবাবুকে সঙ্গে করে থানায় এনে দেখলাম ইনস্পেক্টার রায় নির্বিষ্ট মনে এই মামলার কল্যাকার তরন্ত সম্পর্কে স্মারকলিপি লিপিবদ্ধ করতে মহাব্যস্ত। আমাদের তাঁর কক্ষে ঢুকতে দেখে তিনি উৎক্ল হুয়ে বলে উঠলেন, ‘বাক্।’ গিয়ে গিয়েছে। গুকে তাহলে। তুমি গুকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দাও। আমি ততক্ষণ এই মামলার লেখাপড়ার কাজটা সেবে ফেলি।’ আমি গোপীকে তাঁর নিকট পেশ করে বললাম ‘তা হলো তো ভালোই হতো। কিন্তু আসামী ভীষণ ভাবে জবম হয়েছিল। গুকে একবার হাসপাতালে পঠিনো এখুনি দরকার। এছাড়া আমরাও তার সঙ্গে যত্নাধিত্ত করে এখুনি দরকার। শেষে কি টাটেনাস হয়ে যারা বাবো। আহত হয়ে পড়েছি। শেষে কি টাটেনাস হয়ে যারা বাবো। প্রত্যেক পুলিশ অফিসারেরাই ফাট এইড সবচে অভিজ্ঞতা থাকে। ইন্সপেক্টার রায় তাড়াতাড়ি আমলারী থলে তুলে আইডিন প্রকৃতির সাহায্যে আমাদের একটু প্রাথমিক তত্ত্বা করে বললেন আছা। তাহলে বাও। হাসপাতালটা ঘুরে এসো।’ হাসপাতাল থেকে বখারীতি নিজেদের ও সেই সঙ্গে আসামীকেও পাঠি ধরিয়ে ফিরে এসে আমি গোপীবাবুর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। কিন্তু কিছুতেই সে এই খুনের তদন্তে আমাদের সাহায্য করতে রাজী হলো না। তবে সে একবার মাত্র দস্ত্যেজি করে বলেছিল, ‘আজ্ঞে হাঁ। আমি ও কেট্টো পাগলার হুই হাতে চেপে ধরি। আর সেই সুবাসে থোকা সমুখ থেকে তার বুক ছুঁই বসায়। আমাদের সঙ্গে খুবলো ও কলী প্রকৃতি আরও করেকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা সাক্ষ্য ভাবে খুনের ব্যাপারে কোনও প্রকারে আমাদের সাহায্য করে নি। তবে পাগলকে ট্যাঁজি করে ঘুরে আনবার সময় তারা আমাদের সাহায্য করেছিল।’ এইটুকু মাত্র স্বীকার করে হঠাৎ কি ভেসে গোপী বাবু তড়া করে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। লগ্নে পালিয়ে

সিপাহীরা সতর্ক হয়েই তাকে ঘিরে রেখেছিল। পালাবার কোনও উপায় না দেখে সে আমাদের গাল পাড়তে পাড়তে চীৎকার করে বললো 'না না না। আমি আর একটি কথাও আপনাদের বলবো না।' এর পর আমরা তাকে অনেক বুঝলাম ও জব্বার করলাম, কিন্তু ভবী কিছুতেই ভোলবার নয়। আমরা কিছুতেই তার কাছ হতে খোঁকা বাবু ও কেউ বাবুর ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারলাম না। আমি তখন সোপীকে লক-আপে পুরে দিয়ে আমার সহকারীদের বৃথিরে বললাম, যে এর কাছ হাত একপাশে আর একটি কথাও বার করা বাবে না। একে এখান খুন সবচেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিরর্থক। এ জন্ত আমাদের ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

আমার এইরূপ অভিমতের মধ্যে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত ছিল। অভিজ্ঞতা হতে আমি জেনেছিলাম যে এই সকল পুণ্ডিত অপরাধীরা এক অসাধারণ মানসিক অবস্থার সন্নিবিষ্ট। এদের বিবিধ সুকুমার বৃত্তি কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। একপাশে এদের মধ্যে মাত্র অলসতা ভাবপ্রবণতা দাঙ্কিততা এবং নিষ্ঠুরতা রূপ বৃত্তি চতুষ্টয় স্থূল ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। এরা উত্তেজিত হলে এদের এই বৃত্তি চতুষ্টয় এদের মনের পাখে উঠা নামা করে, অর্থাৎ কখনও এরা থাকে অলস, কখনও এরা হয় ভাবপ্রবণ, কখনও বা এরা নিষ্ঠুর হয়ে উঠে। এখান নিদারুণ উত্তেজনা একে এর মনের দাঙ্কিততার রাজ্য থেকে নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এনে ফেলেছে। এই জন্ত আমি বুঝতে পারলাম যে পুনরার ভাবপ্রবণতার রাজ্যে উপনীত না হলে এর কাছে কোনও স্বীকারোক্তি আদায় অসম্ভব। এই জন্ত আমি বিবৃতির জন্ত সোপীনাথকে আর একটু মাত্রও গীড়াগীড়ি করা উচিত মনে করি নি।

আমার এই ধারণা অমূলক ছিল না। এই জন্ত পরদিন আদালতে তাকে হাজির করার সময় পর্যন্ত তার নিকট হতে আর একটি সংবাদও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ তখনও পর্যন্ত সে তার মনের দাঙ্কিততার রাজ্যেই অবস্থান করছিল। আদালতে সে তার অথমেই জন্ত পুলিশকে দোষী করে একটি বিবৃতিও দেয়। এর পর হাকিম বাহাদুর তাকে পুলিশ হেপাজতিতে না রেখে জেলহাউসে প্রেরণ করায় তাকে আর আমরা এই তদন্ত সম্পর্কে বিশেষ কোনও কাজে লাগাতে পারিনি। এ ছাড়া এই সময় পর্যন্ত খুন সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে অকোটা কোন প্রমাণও আমরা দাখিল করতে পারিনি। এইজন্ত আদালতের এই আদেশ আমাদের মেনে নেওয়া ভিন্ন আর কোনও উপায়ও ছিল না। তবু এই যশের ভালো এই যে, সোপীবাবু জামিনে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এই কারণে আমরা বরং খুশী হয়েই সেইদিন আদালত হতে থানায় ফিরেছিলাম। কিন্তু তদন্তকার্যে আর দেরী করা যায় না। তাই আমি ফিরে এসে ছ' বুটো মাত্র অর দুখে পুরে খবল ও কালীর সন্ধান পুনরার ধানা হতে বেরিয়ে পড়লাম।

এই খবল ও কালীর ডেরা খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে কঠিন হলেও তাঁ অসম্ভব হয়নি। এদের জন্ত কয়েকটি সন্ধ্যা স্থানে স্থানে ঘেঁষার পর আমরা পরিশেষে মালিকতলা অঞ্চলের একটি বড়ী গ্রামের মধ্যস্থলে এসে উপস্থিত হলাম। এখানে বহন আমরা পৌছলাম রাত্রি তখন একটি বেগে গিয়েছে। দাঁকানে সারা বতীটি খোঁজ

করে উঠার মধ্যকার উঠানে এসে গাঁড়ানো মাত্র আমরা সহসা একটা ঝুপ করে আগুয়াক শুনেতে পেশাম। আমাদের অন্ততম ইনফরমার রাধানাথ আমার পাশেই গাঁড়িয়েছিল। সে একটি ঘরের চালের উপর দণ্ডায়মান একটি মহুযাকৃত্তির প্রতি আকুল দেখিয়ে একরকম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেই বলে উঠলো, হজুর। ধাঁধা—আ। আমাদের সকলেরই জানা ছিল যে, ধাঁধা ওরকে খোঁকার হাতে সকল সময়েই একটি গুলী-ভরা পিঙ্কল থাকে। আমাদের এ-ও জানা ছিল যে, সে নিম্নেবে শত্রুনিখনে সর্বদাই তৎপর থাকে। একথা সত্য যে বিপদে ধৈর্য্যহারা হওয়া বিচক্ষণ পুলিশ অফিসারের পক্ষে অস্বচিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মুখ হতে বার হয়ে এলো, কাহার। আমাদের থানার পাশেই একটি গ্রাট সাহেব আমার ডান পাশে গাঁড়িয়ে ছিল। হজুর পাওয়া মাত্র সে তার পেটী হতে টোটাভরা পিঙ্কল বার করে লোকটিকে লক্ষ্য করে উপস্থাপুরি দুইবার গুলী করলে। চারিদিককার রাত্রিকালীন নিশ্চলতা ভেদ করে আগুয়াক হলো, দড়াম, দড়াম। আমরা সকলে লক্ষ্য করলাম যে চালের উপরকার লোকটা উপর থেকে ঝুপ করে নীচের উঠানে গড়িয়ে পড়লো। আমরা লোকটাকে ঘিরে তার উপর টর্চের আলো ফেলার পর আমাদের ইনফরমার জানালো যে লোকটা আগুয়েই বেঁধা নয়। এমন কি ঐ লোকটা খোঁকার কোনও সাক্ষরেন কি'না তাও সে জানে না। আমি বিস্মত হয়ে সার্জেট জি গ্রাটকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি না দেখে গুলী করলে কেন? গ্রাট সাহেব তার সকল দারিদ্



জীবনে আমার প্রবেশ উভয়ে বললো, আপনি তো গুলীর জন্ত
হুজুর ছিলেন। তাই তো আমি একে গুলী করে মেরে ফেলেছি।
এইরূপ বিপদে আমি ইতিপূর্বে কখনও পড়িনি। খুনের তদন্ত
করতে এসে নিজেই খুনের হায়ে পড়ে যাবো তা আমি কল্পনাও
করতে পারি নি। আমাদের সঙ্গে মুহত্তরাসীর জন্ত বাহির হতে
শাকিলসে আনা একজন প্রোট ডক্টরলোক ছিল। পূর্বে তিনি
কোনও এক জমিদারীর নায়েররূপে বহমিন কাজ করেছিলেন।
এখন তিনি জনৈক মোস্তারের মুহত্তর কাজ করেন এবং এই
মুহত্তরই বহমিনের একটি দুইটি কক্ষে সপরিবারে বাস করেন।
ডক্টরলোক আমার এই বিপদ দেখে একটি ছুরি কিনে মৃত ব্যক্তির
হাতে ওঠে দিয়ে রাইট অফ প্রাইভেট ডিসেম্বরের একটা প্রমাণ
শৈলী করার জন্ত উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁকে আমি সুশীল রূপেই
জানিয়ে দিলাম যে, যে কার্যের জন্ত আমি দারী তার সম্মুখীন আমি
নিজেই হবো কিন্তু তা সঙ্গেও আমি এইরূপ কোনও জবাব মিথ্যার
আজ্ঞার কিছুতেই নেবো না। এর পর আমরা মৃতমন্ত ব্যক্তির
দাঁড় স্পর্শ করা মাত্র সে ধড়মড় করে উঠে বসে আমাদের
সকলকে অবাধ করে দিলে। আসলে সে ভয়ে কিছুক্ষণের
জন্ত বেহুশ হয়ে পড়েছিল, শিশুদের একটি গুলী তার
পায়ে লাগেনি। এমন কি সে একজ্ঞ মুতাম্বুখও পতিত হয় নি।
লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার পা ছুঁতে জড়িয়ে ধরে নিরস্তরে
জানালো যে নবল ও কালী এই বাড়ীরই একটা ঘরে শুয়ে আছে।
তাদের নির্দেশ মত সে সারা রাত্রি বাইরে কাঁড়িয়ে পাহারা দিতে।
পুলিশ দেখলে আগে ভাগে তাদের খবর দেবার জন্ত তার উপর
নির্দেশ ছিল। কিন্তু আমরা অতর্কিতে এসে পড়ায় সে পালাবার
জন্ত চালের উপর উঠে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, এই লোকটির
বিবৃতি অস্বাভাবিক নবল ও কালীকে প্রেক্ষার করতে আমাদের
একটু মাত্রও সন্দেহ হয়নি। তবে এদের খবর শুদ্ধাসী করে খুন
সম্পর্কে কোনও প্রামাণ্য ব্যবস্থা আমরা উদ্ধার করতে পারিনি।

খানার আনার পর খুন সবচেয়ে জিজ্ঞাসিত হলো এরা খাঁকা
করেছিল যে তারা পাগলাকে ঘরে এই মেঘের বুলি পর্যন্ত পৌঁছে
দিয়েছে মাত্র। এর পর খোকা গোপী, কেট ও পাগলাকে সেখানে
রেখে খোকায় নির্দেশে এই স্থান থেকে তারা নাকি চলে এসেছিল।
যে কোনও কারণেই হোক আমার মনে হয়েছিল যে, এরা মিথ্যা
বলছে। কিন্তু জানিনা কেন ইনেসপেক্টর সুনীলবাবু তাদের এইটুকু
বিবৃতিই সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে এদের আর
পুলিশ হেপাজতীতে না নিয়ে জেলহাজতে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো।
খোকা ও কেট ধরা পড়ার পর এদের পুনরায় পুলিশ হেপাজতে
নিলেই হবে। সেই সময় সত্য নিরূপণার্থে প্রকৃত বিবৃতি এদের
জন্ত তাদের গীড়াগীড়ি করা যেতে পারবে আশুন। ইনেসপেক্টর
সুনীল বাবুর মতে এরা কোনও ক্রমেই খোকাবাবুর দলের কোনও
বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হতে পারে না। এঁরাও এমনি কতকগুলি
আনইম্পটেট আসামী দ্বারা খানা ভর্তি করে রেখে তদন্তের
ব্যাপারে সময় নষ্ট করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। অগত্যা
ইনেসপেক্টর সুনীল রায়ের উপদেশ শিরোধার্য করে তাদের জেল
হেপাজতীতে পাঠিয়ে আমি কেটবাবু ও খোকাবাবুর সন্ধান
আন্তর্নিয়োগ করলাম। কিন্তু তাদের সন্ধান আমাকে কে বলে
দেবে? ইতিমধ্যেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে বর্তমান দলটি
খোকার অধীনস্থ বহু উপদলের মধ্যে একটি মাত্র উপদল। খোকাবাবু
ইতিমধ্যে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যারও কয়েকটি স্থানে তার
অপকার্যের জাল বিস্তার করেছে। অপকার্যের সুবিধার জন্ত সে
এখানে ওখানে কয়েকটি সুশিক্ষিত বাঁটিও স্থাপন করেছে। খোকা
বা খোদাকে বাহা বাহা জানে বা চিনে তারা সকলেই একমত যে,
কয়েকটি প্রাণের বিনিময়ে তাকে মাত্র মৃত অবস্থায় প্রেক্ষার করা
সম্ভব। বিনা যুদ্ধে যে খোকাবাবু প্রেক্ষার বরণ করবে না তা আমারও
জানা ছিল। কিন্তু এইরূপ একটা নিগারন বিপদের সম্মুখীন হওন
ছাড়া আমার আর অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। [ক্রমশঃ]

পূর্ণ যদি, শূন্য হবো

পরেণ মণ্ডল

জলে আলপনা একে হারিয়ে যাবে
মরেছে কেবল। এই বাসন্তী রোশ।

এসো, আজ বাসে-জলে এক ফালি রোশে
নিবন্ধ প্রদীপখানা উজ্জলি তুলি
রঙে-রঙে। আমি আর তুমি পরিশোধে।

আবিরার কবি এক আশ্রয়ের বুলি
কেনখানে—কেন নতুন অপরাধে
তুচ্ছ হওয়া কেবলো আত্মরিক দেশ।

পূর্ণ যদি, শূন্য হবো। ত্যাগমন্ত্রে হয়ে
পড়ে নোবা নীড় কোনো অজন্মিত কবে।



পিয়াস

...সুন্দরী

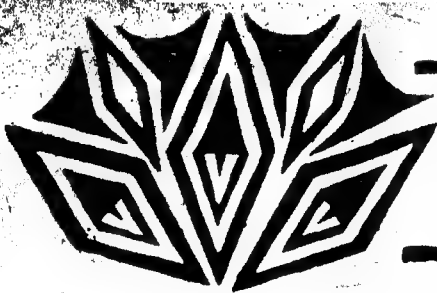
নারীদের

ঐতিহ্য

“পিয়াস” নামটি সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল পিয়াসে
তাদের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্যই তাঁরা পিয়াস সাবানের সাহায্যে
তাদের লাগণ্যের স্বপ্ন মেন — পিয়াস আসল
মিসারিণ বৃক্ক সৌন্দর্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর স্বকের পক্ষে এত বিত্ত্ব এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আর্শ সাবান।
মথমলের মত মোলায়েম পিয়াস ট্যালকম
পাউডারে অপূর্ব সুগন্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিত্ত্বতা।



আপনার সৌন্দর্য
চর্চায় নিঃশব্দ
পিয়াস ব্যবহার করুন



সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

চাইবুড়োর পুঁথি

আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার জনকরূপে ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের অমরত্বের দাবী অনস্বীকার্য। সাহিত্যেরও একটি বিশেষ অধ্যায় গঠনে তাঁর অবদানের গুরুত্ব বিচার করলে তাঁর জনকত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যায় না এবং সে ক্ষেত্রে তিনি শুধু জনকই নন, তিনি এককও। অবনীন্দ্রনাথের তুলির পুষ্প টানে ভারতীয় শিল্প যেমন নবজন্ম লাভ করল তেমনি তাঁর লেখনীর নৈপুণ্যে বাঙলা-সাহিত্যের একটি নতুন পথের দ্বারোদ্ঘাটন ঘটল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরপ্রভাবমুগ্ধ। অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যে অভিনব আঙ্গিকের সৃষ্টি করলেন—বাঙলা সাহিত্যের মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তা প্রভূত সহায়তা করল। এক কথায় বাঙলা সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। সাহিত্যাচার্য অবনীন্দ্রনাথের অনবদ্য বৈশিষ্ট্যমুক্ত গ্রন্থগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি করল সম্প্রতি প্রকাশিত চাইবুড়োর পুঁথি। এর পটভূমিকা লক্ষ্যপূরী—রাবণরাজা এবং ক্রীড় পারিপার্শ্বিক আবহেট্টা এবং সেই সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ সীতা এবং ষোল্লরবাহিনী অপরূপ ভঙ্গিমায় চাইবুড়োর পুঁথির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের গভীরশৈলী ও ছন্দের রঙ্গার। বর্ণনার সূক্ষ্মতার বিশ্লেষণে অবনীন্দ্রনাথের গৌরব “চাইবুড়োর পুঁথি” অস্বল্প ব্রহ্মেছে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান হ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ গান্ধী রোড। দাম ছ’টাকা মাত্র।

স্থাপত্যশিল্পের ভূমিকা

সুহৃদায় কলাগুলির মধ্যে স্থাপত্যশিল্পের গুরুত্ব ও প্রাধান্য উপলব্ধির নয়—এ শিল্পে বাঙালীর ব্যুৎপত্তি কারো থেকে কোন আশ্রয় কল্পও নয়—ভার এ ক্ষেত্রে তার পারদর্শিতা আজকের নয়—যতকালের (স্থাপতি মৌদের স্থাপনা করেছে বরভূবরের ভিত্তি—সত্যেন্দ্রনাথ)। বাঙলা ভাষার শিল্পকলা সম্বন্ধে অসংখ্য গ্রন্থ এ ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে কিন্তু স্থাপত্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনাপ্রবন্ধ একরকম আত্মপ্রকাশ করে নি বললেই চলে। পরলোকগত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এ অভাব দূর করে গেছেন। লেখক গতায়ু হয়েছেনও বরফাল পূর্বে ১৯২৬ সালে। এই গ্রন্থে স্থাপত্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে নিখুঁত বিস্তারিত ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থটি প্রাপ্যনে লেখককে বহু ঋণ স্বীকার করতে হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে লেখকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়। সুবীক্ষণ এবং সজ্ঞিত মনসে এই গ্রন্থ সন্ধান সমাধির লাভ

করবে। লেখকের আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মানবজীবনে স্থাপত্যবিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে লেখকের ধারণা বিশেষ ভাবে প্রাধান্যবোধ্য। বিভিন্ন কালে, যুগে, সময়ে স্থাপত্যবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ বর্ণনায় লেখক প্রভূত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি আলোকচিত্রের সাহায্যেও এক অধ্যাপক শ্রীনিবাসকুমার বসুর ভূমিকা গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। প্রকাশক—পুরোগামী প্রকাশনী ১০০১ ভূপেন্দ্র বোস স্ট্রাটিনিউ। দাম—চার টাকা মাত্র।

নৃত্যবিজ্ঞান (মুদ্রা)

চৌধুরি টি কলার মধ্যে নৃত্য অন্ততম প্রধান কলা। মানব-জীবনে নৃত্যের প্রভাবও যথেষ্ট। নৃত্যশিল্পের মাধ্যমে বহু জ্ঞানী ও গুণীর আবির্ভাব ঘটেছে। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীদের তালিকায় প্রহ্লাদ দাসেরও নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষরস্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। নৃত্যের মূর্ত্যের ভঙ্গি, কৌশল বিভ্রাস প্রভৃতি বিষয়গুলি বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করে এই বিরাট শাস্ত্রের দুর্লভ অংশগুলিকে সাধারণের কাছে সহজবোধ্য করে তুলেছেন প্রহ্লাদ দাস তাঁর এই গ্রন্থটিতে। মানবজীবনে নৃত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও প্রহ্লাদ দাস যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্যানুযায়ী এবং উচ্চ বিভ্রাসম্বন্ধীয় পাঠ্যগ্রন্থকারীর দল এই গ্রন্থ পাঠে যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হবেন, এ আশা আমরা রাখতে পারি। প্রকাশক—প্রভাত কার্যালয়। ২-সি নবীন কুণ্ড লেন, কলকাতা—১। দাম—ছ’ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

সাধক কমলাকান্ত

রাজর্ষি রামমোহনেন অভ্যাসের ঠিক পূর্বসূর্যত্বেরে যে বৃগুটি শেষ হ’ল (মধ্যযুগ) তার ইতিহাসের পাতায় বলতে গেলে শৈবী উল্লেখযোগ্য আবির্ভাব সাধক কমলাকান্ত। অষ্টাদশ শতাব্দী বহন সমাপ্তির দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলছে—সেই রকম কোন এক সময়ে বাঙালীর জাতীয় জীবনের রঙ্গমঞ্চে ভক্ত্যশ্রেষ্ঠ কমলাকান্তের আবির্ভাব। বাঙলা শাস্ত্রশাসকালী সাহিত্য বীথের কল্যাণে গড়ে উঠেছে তাঁদের মধ্যে কমলাকান্ত অন্ততম। যারের এই মানস সন্ধানের পরমপুণ্য জীবনকাহিনী গ্রন্থাকারে রূপ নিয়েছে। লেখক শ্রীনিবাসকুমার তাঁর সুবন্দেই প্রকাশ করেছেন যে এটি জীবনীও নয়, উপজ্ঞানও নয়। তিনি একে জীবনোপজ্ঞানের পর্দায় বেলেছেন। গ্রন্থে কমলাকান্তের বাল্যজীবনী প্রাধান্য পেয়েছে এবং প্রসঙ্গতঃ বর্ধমানের রামকবিরামের

প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। আজকের বিশ্বজোড়া গ্রাহ্যকারের দিনে কমলাকান্ত প্রমুখ সাধকাজেদের জীবনী যত এসার ও এচার হয় দেশ ও দেশ উভয়ের পক্ষে ততই মঙ্গল। গ্রন্থটি রচনার লেখক বখেই পরিমাণে নিষ্ঠা, শ্রম ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—এস, চক্রবর্তী য্যাণ্ড সাল, ২-বি জামাচরণ মে ট্রিট। দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পরসী মাত্র।

বন্দরের কাল

কলকাতার ডক অঞ্চল মহানগরীর একটি বিরাট ও তথৈধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বন্দর হিসেবে কলকাতার জগৎব্যাপী খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি সম্বন্ধেও নতুন করে কিছু বলার নেই, এ তথ্য বিশ্ববিদিত। এই বন্দরের আশেপাশে যে কত বৈচিত্র্য, কত ভিজ্যাসা, শিল্পস্থলির কত উপাধান ছড়িয়ে আছে তা সম্যক উপলব্ধির জন্যে স্পন্দন প্রয়োজন। এই বন্দরকে কেন্দ্র করেই বাঙালার তরুণ সাহিত্যসেবী শ্রীবিক্রমকন্দ ভট্টাচার্য প্ৰথম সুপাঠ্য উপদ্রোক্ত গ্রন্থটি রচনা করে যত্নবান ভাষন হয়েছেন। তাঁর লেখনীতে বন্দরের ইতিকথা, সেখানকার মানুষ, তাদের জীবনের সুখ দুঃখ তথা বাত প্রতিঘাত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই সব মানুষদের লেখক কেবলমাত্র চোখ দিয়েই দেখেন নি, দেখেছেন হৃদয় দিয়ে তাই তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তাদের চরিত্র-চিত্রণ সার্থকতার পর্যবসিত হতে পেরেছে! বন্দরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ধারা কোতুলী—উপভাসটি তাঁদের কোতুললও নিরসন করার ক্ষমতা রাখে। তাঁর হৃদয়স্বাক্ষরিত ও অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ে এই বলিষ্ঠ উপভাসটি রচনার ক্ষেত্রে লেখক অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পাঠকমহলে উপভাসটি বখেই সমাদর পাবে এ বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি। প্রকাশক—পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন, ৮১ গান্ধী রোড। দাম—চার টাকা মাত্র।

রাজা ও মালিনী

আজকের দিনের বাংলা উপভাস নানারকম পরীকা নিরীকার সমুখীন হচ্ছে আর সেই পরীকার গতি যে সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছে তার অন্ততম প্রমাণ বারীন্দ্রনাথ দাসের রাজা ও মালিনী। বারীন্দ্রনাথ দাসও শক্তিমূল লেখকরূপে অনেককাল পূর্বেই আলোচ্য উপভাসটির মাধ্যমে সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠার আসন লাভ করেছেন। একটি শাস্ত্রমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করতে বারীন্দ্রনাথ দাসের লেখনী সর্বতোভাবে সক্ষম হয়েছে। উপভাসের পাতায় পাতায় লেখকের অন্তরের ব্রহ্মতা ও স্বচ্ছতার ছাপ পাওয়া যায়। এই উপভাসটি সব চেয়ে বেশী আনন্দ দেবে কবিতাসুপারীসেব। কারণ অসংখ্য কবিতার উদ্ধৃতিতে উপভাসটি পরিপূর্ণ। উপভাসটির প্ৰথম রমণীয় সর্বশেষ কবিতা দুটি আরম্ভে লীধ এবং লেখকের কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। সমগ্র উপভাসটি বেন কবিতার আবরণে আরও শোভনীয় হয়ে ওঠে। নায়ক-নায়িকা চরিত্র দুটিই বেন দুটি কবিতা। দুটি অপরূপ কবিতা—আর এই আশ্চর্য চরিত্র দুটির রূপলাভে লেখক অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন যে, উপভাসটি গতানুগতিক হাঁচে গঠিত নয়—বখেই পরিমার্জিত স্বাক্ষর সম্পূর্ণ বহন করে। প্রকাশক

—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বডিন চার্চার্স ট্রিট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

গীতিমুখর ভিয়েনা

সৌন্দর্য্যে বৈচিত্র্যে ললিতককার যে সকল নগরী পৃথিবীকে শোভাময়ী করে তুলেছে ভিয়েনা তাদের মধ্যে অন্যতম। ভিয়েনার জন্ত বিশ্বের দরবারে সারা ইউরোপ গর্ববোধ করতে পারে। ভিয়েনার প্রধান সম্পদ সঙ্গীত। সুরে ছন্দে গানে বাজে বজারে ভিয়েনা মধুময়ী। ভিয়েনা সম্বন্ধে বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকার সামনে একটি পুরনু সুখপাঠ্য গ্রন্থ তুলে ধরেছেন শ্রীমতী শেফালী নন্দী। শ্রীমতী নন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগতা নন, ইতিপূর্বে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। গ্রন্থটিতে শ্রীমতী শেফালী অষ্ট্রীয়ার আত্মপুঙ্খিক ইতিহাস বখেই দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। ভিয়েনার সুরসম্পন্ন সম্পর্কে তাঁর আলোচনাও মনোরম। গ্রন্থটি এ দেশ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যের আকর। লেখিকার রচনাশৈলী মনকে আকৃষ্ট করে। তাঁর রচনার মধ্যে এক শাস্ত্রমুখর ভাবে ছাড়াপাত লক্ষ্যীয়। তাঁর ভাষা বখেই জোরালো, সতেজ ও স্পষ্ট। কয়েকটি আলোকচিত্র গ্রন্থের শোভাবর্ধন করছে। প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন শ্রীপ্রমোদচরণ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—পণ্ডার লাইব্রেরী, ১০৫১-বি কর্ণওয়ালিস ট্রিট। দাম দু'টাকা মাত্র।

নববন্দাবন

সাহিত্যজগতে রম্যরচনার মাধ্যমে নীলকণ্ঠের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটলেও উপভাস রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা অসীম। উপভাস রচনার তাঁর দক্ষতার চিহ্ন বহন করছে নববন্দাবন। আজকের দিনের সমাজের আশেপাশে এমন একটি বিবাক্ত পরিবেশ গড়ে উঠেছে যার বিববাস্য এক একটি পরিবারকে সর্বনাশার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কিছুকাল আগেও যেখানে ছিল সম্ভাবনার উজ্জল প্রতিজ্ঞাতি সেখানে আজ ব্যর্থতার গহন অন্ধকার, আর এই ক্ষয়সমুখীন জগৎসংসারের মূল রহস্তের উৎস সন্ধান লেখকের চিত্ত ব্যাকুল। আজকের মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বেদনাকে নিখুঁতভাবে সাহিত্যের পাতায় ছড়িয়ে তুলতে নীলকণ্ঠ সিদ্ধহস্ত। জগদীশ, ভদ্রপুত্র, সৌমিত্র, এক-একটি আশ্চর্য চরিত্রসৃষ্টি। লেখনী ছাড়াও আরও দুটি বিরাট সম্পদের অধিকারী—দরদ ও অমৃত্যু—নববন্দাবনই এ উক্তির স্রেষ্ঠ প্রমাণ। জীবনের অনেক কিছু ঝাঁক। শূন্যতা, রিক্ততা নীলকণ্ঠের সন্ধানী চোখকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। সৌমিত্রের মায়ের চরিত্র অল্পে নীলকণ্ঠ অভিনন্দনীর নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। আজকের দিনে সাহিত্য-জগতে যে প্রেরণালি আত্মপ্রকাশ করছে নীলকণ্ঠের নববন্দাবন তাদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখনীয় একটি বিশ্বরকর সাহিত্যসৃষ্টি। প্রকাশক—সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ১ বাহবাগান ট্রিট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

ফরিয়াদ

বাদের উপভাস পাঠক-পাঠিকার দরবারে একটি বিশেষ আসন অধিকারে সমর্থ হয়েছে দীপক চৌধুরী তাঁদেরই অন্ততম। দীপক চৌধুরীর মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্য একটি তেজোবৃদ্ধ লেখনীর সন্ধান পেয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। বক্তব্যও ব্যক্তিরূপে আজকের

হুমিত যে জল ও কথাও যেমনই সত্য, তেমনই অর্থ অনেক কিছু অনর্থেরও মূল, এ কথাও মিথ্যা নয়। এই পটভূমিকে ভিত্তি করে উপজাসটি রচিত। উপজাসটি রচনার ক্ষেত্রে দীপক চৌধুরী এক অজিনব আজিক অবলম্বন করেছেন। নায়ক প্রথিতকথা ব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তুবান কিন্তু তাঁর সব কিছু হারিয়ে গেছে, প্রিয়তমা সহধর্মিণীও, তাঁর মনও এই অর্থ আর সেই সব হারানোর পর যে জীবন শুরু হল আর যেখানে তার পরিত্যক্ত দীপক চৌধুরীর লেখনী সেই অধ্যায়টি ফুটির তুলেছে ব্যাধিগ্রস্ত জগতের বিচারমঞ্চে আইনব্যবসায়ী নন—সেখানে তিনি করিয়ালী আর সে যামলা অর্থের বিক্রেতা। উপজাসটি রচনার প্রসঙ্গক্ষেত্রে একটি সার্বিক ও বৈশিষ্ট্যবান উপজাসের পর্দায়ে স্থানলাভ করেছে। লেখকের বর্ণনাকৌশলটির বারোবর্ষ চরিত্রের রূপায়ন প্রশংসার দাবী রাখে। জীবনের যে বিরাট প্রশ্ন, বিরাট সমস্যা, বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্ব—যার অভিনয় প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে জীবনের রঙ্গমঞ্চে তার সম্যক প্রকৃষ্টন ঘটছে সাহিত্যের পাঠ্য দীপক চৌধুরীর লেখনীর কল্যাণে। প্রকাশক—নাতানা। ৪৭ পশ্চিম রাস্তাভিনউ। দাম—চার টাকা মাত্র।

সমান্তরাল

বর্তমান কালের বাঙলা সাহিত্যকে সার্বিকতার অভিমুখে অগ্রগমনে বাকের বলিষ্ঠ রচনা সহায়তা করে চলেছে, প্রশান্ত চৌধুরী তাঁদের সঙ্গোড়। তাঁর উপরোক্ত উপজাসটি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রধানতঃ চাওয়া পাওয়াকে কেন্দ্র করেই উপজাসটির কাহিনী রূপ নিয়েছে। আর এই চিরন্তন চাওয়া পাওয়া থেকে যে আনন্দ বেদনা হাসি-কান্নার উত্তর তার বখাও, প্রকাশও ঘটেছে সমান্তরালের মধ্যে। জীবনের একটি বিশেষ দিকের মনোব্যাচন করেছেন প্রশান্ত চৌধুরী এই উপজাসটির মধ্যে দিয়ে। লেখক তাঁর উত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর উপর মনোভাবের ও দরদী অন্তঃকরণের পরিচয়ও স্পষ্ট করে রাখলেন উপজাসটির মধ্যে। তাঁর ভাষা লাভ্যময়, বর্ণনা মনোহর, বক্তব্য মর্মস্পর্শী। প্রচুর সংখ্যক চরিত্র আবির্ভূত হয়ে উপজাসটিকে ভারাক্রান্ত করেনি, সংখ্যার দিক দিয়ে অল্প হলেও প্রতিটি চরিত্র মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। গ্রন্থের নামকরণটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশক—প্রীতুল লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

অনিকেতা

সত্য শিব ও সুরম্যের জগৎ আজ ছেয়ে গেছে বন্ধনায়, তুমি বন্ধনাই নয় এখানে প্রভাবধারণ অংশও অনেকখানি, আর এই প্রভাবধারণ সঙ্গ্রাসী বহুমুখিক উপেক্ষা করে বাওয়ার মত শক্তি না থাকায় মানুষ আজ নিঃশব্দ, রিক্ত, শূন্য। সীমাহীন সমুদ্রের বুকে বিশালাকা মানুষ আজ ভেসে বেড়াচ্ছে—বুজু চলেছে অজ্ঞাত পা দুটো ছোঁয়াবার মত কোথায় পাওয়া যায় একটুখানি মাটি। এই পটভূমিকে আশ্রয় করেই আলোচ্য উপজাসটি জন্ম নিয়েছে মিহির আচার্যের লেখনী থেকে। জীবনের এই ভরাহ অথচ সম্পূর্ণ বাস্তব চিত্রটি উপজাসের মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন। জরাজীর্ণ, সেবপ্রিয় দ্বিতীয়ার্থ, রক্ত, স্নেহলতা, বীরবেশ, সুবন্দা প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্য দিয়েই লেখক নিজের ধারণার রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। লেখকের চিত্রাঙ্গীল মনোবিশ্ব উপজাসের প্রাক্তর পাতায় ফুটে ওঠে। আর তাঁর চিত্রাঙ্গীল অঙ্গারও নয়। যথেষ্ট সারবান এক তাৎপর্যপূর্ণ।

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়, বক্তব্য রসপট, আবেদন মনকে বিধে ভাবে স্পর্শ করে। পরিকল্প গঠনে তিনি যথাযথ নিপুণতা প্রদর্শন করেছেন, তাঁর বর্ণনাকৌশল মনোহর, ভাষা প্রাজ্ঞ, বাধাবদ্ধহীন, সমগ্র উপজাসটি সাবলীলতার পরিপূর্ণ। উপজাসটির সারমর্ম পাঠকচিহ্নে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জুগিয়ে তোলে। প্রকাশক—ক্যালকটী পাবলিশার্স, ১০ স্ট্রামচরণ দে স্ট্রীট, দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

গোয়েন্দা ভূত মানুষ

শিশু ও কিশোর-সাহিত্যের বাহুরক বলে বহুমান সাহিত্যশিল্পী হেমেন্দ্রকুমার রায়কে অভিহিত করলে বিন্দুমাত্র তুল হয় না। সাহিত্যে এবং অজ্ঞাত কয়েকটি ললিতকলা সকল বিভাগে হেমেন্দ্রকুমারের অব্যাহত গতিবিধি। শিশু ও কিশোর-সাহিত্য হেমেন্দ্রকুমারের অবদানে যে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে এ বিষয়ে স্মিত হবার কোন কারণ নেই। হেমেন্দ্রকুমারের সাহিত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান হ'ল যে নাবালকদের মনকে তিনি যথেষ্ট বলিষ্ঠভাবে গড়ে তুলেছেন। হেমেন্দ্রকুমারের রচনার প্রভাবে বালকমন রীতিমত সাহসী, যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণময়ী হয়ে ওঠে। বহু বিষয়ক প্রচলিত অন্ধ কুসংস্কারের মূল কূঠাখাত করে হেমেন্দ্রকুমার তাঁর স্বল্প উপস্থান করে নিজের রচনাকে যথেষ্ট মর্যাদাযুক্ত করেছেন। তাঁরা রচনা পাঠকচিহ্নে যুগপৎ ভাবে গোমাঞ্চ ও শিহরণ সৃষ্টি করে। তাঁরই কয়েকটি রচনা সংকলিত হয়ে আলোচ্য গ্রন্থটির রূপ নিয়েছে। ছোট ও বড় উভয় স্প্রায়রকই রচনাগুলি সমগ্ররিমাণ আনন্দ দেবে। ময়স, প্রাজ্ঞ, বর্ণনাময়ী রচনাগুলি তাঁর লেখনীর সাববতাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করে না, পাঠকচিহ্নে গভীরভাবে রেখাপাত করে এক বিশেষ করে ছোটদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ গান্ধী রোড। দাম হ' টাকা মাত্র।

ছুটি চোখ ছুটি মন

রমাপদ চৌধুরী—বাঙলা সাহিত্যে একটি উজ্জল স্বাক্ষর। প্রায় আঠারো বছর আগে লেখকরূপে তাঁর প্রথম আবির্ভাব—সেই থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্যের মানোন্নয়নে ইনি নানাবিধ সহায়তা করে চলেছেন। তাঁর সার্বিক রচনার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ—ছুটি চোখ ছুটি মন। প্রথম-মধুর একখানি মনোহর উপজাস। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, যাচ-প্রতিযাতের মধ্যে দিয়ে যে প্রণয়ের বিকাশ—তাঁরই সার্বিক শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর দ্বারা। তিমিরকে রক্তা জীবনের দৌলরূপে চেয়েছিল—ঠিক পাওয়ার মুহূর্তে কোথা থেকে কি বেন হয়ে গেল—তিমির হারিয়ে গেল তাঁর জীবন থেকে—তারপর বহুবিধ ঘটনার বেড়াভাল অভিক্রম করে এক পুণ্য প্রভাতে সে গুনল যে তিমিরের পাশেই তাঁর স্থান করে দিচ্ছেন উত্তরণক্ষের অভিভাবকেরা। স্বপ্নের গল্পটি চমককারভাবে সাজিয়েছেন লেখক। তাঁর রচনার মধ্যে আন্তরিকতা, স্নিগ্ধতা লালিত্যের ছাপ বেলে। তাঁর বক্তব্য অন্তর স্পর্শ করে। স্মৃতির দিক দিয়েও এই মনোহর উপজাসটি যথেষ্ট বেসবান। রচনার ভাষা কাব্যময় হওয়ার উপজাসটি এক অল্পমাত্র মাত্রেরে ভরে উঠেছে। সাহিত্যাত্মবোধের দরবারে উপজাসটি সামরে গৃহীত হবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি। প্রকাশক—ত্রিবেদী প্রকাশন, ২ স্ট্রামচরণ দে স্ট্রীট। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।



ক্রিকেট

অষ্ট্রেলিয়া দলের ভারত ও পাকিস্তান সফরে ক্রিকেট আসর এখন বেশ গরম হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়াকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন দিলে বোধ হয় অস্বাভাবিক হবে না। অধিনায়ক রিচি বেনড সফর আরম্ভের পূর্বেই বলেছেন যে অষ্ট্রেলিয়া দলটি বিশেষ শক্তিশালী এবং এই দলের খেলোয়াড়রা বিশ্বের যে কোন দেশে যে কোন অবস্থাতেই খেলতে পারেন। তিনি আরও বলেছেন যে গত বছর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ার রুতিমূর্ণ শাকল্যের পর দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় বিশেষ অহুপ্রেরণা লাভ করেছেন।

পাকিস্তানে তিনটি টেস্ট খেলার মধ্যে দুটি "নারিকেল দড়ির" ম্যাচ উইকেটে ব্যবস্থা থাকায় বেনড বলেছেন—তাতে দলের খেলোয়াড়দের খুব বেশী অস্থবিধা হবে না। অষ্ট্রেলিয়াতে "তৃণাচ্ছাদিত" (টাক) উইকেটে টেস্ট খেলা হলেও দলের খেলোয়াড়রা "নারিকেল দড়ির" উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত। অষ্ট্রেলিয়ার সকল স্থল ও জুনিয়র ম্যাচ ম্যাচ উইকেটে অধ্যুগিত হয়। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়ার দলের খেলোয়াড়দের কাছে ম্যাচ উইকেট অজানা নয়।

বেনড খেলার পূর্বে যে মন্তব্য করেছেন—এরই মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পাকিস্তানে দুটি টেস্ট জয় হয়ে অষ্ট্রেলিয়া দল "রাবার" লাভ করেছে।

পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলাটি ঢাকায় "নারিকেল দড়ির" ম্যাচ উইকেটে হয়। দলের খেলোয়াড়দের এইরূপ উইকেটে খুব বেশী অস্থবিধা হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রথম টেস্টে অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী হয়। লাহোরে দ্বিতীয় টেস্ট খেলা "তৃণাচ্ছাদিত" (টাক) উইকেটে হয়। এই খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়লাভ করে। পর পর দুটি টেস্টে পরাজিত হলেও পাকিস্তান প্রমাণ দিয়েছে যে তারা ক্রিকেট খেলায় খুব বেশী শিখিয়ে নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় টেস্টে অষ্ট্রেলিয়া দল যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্মুখীন হয়, তা তাদের বহুদিন মরণ থাকবে। খেলা শেষ হবার কয়েক মিনিট আগে খেলার কলাফল নির্ধারিত হয়। পাকিস্তানে আর একটা টেস্ট খেলার পর অষ্ট্রেলিয়া ভারত সফর আসবে।

অষ্ট্রেলিয়া দল ছোটখাটো কয়েকটা খেলা ছাড়া ভারতে পাঁচটি (সিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর ও কলকাতা) টেস্ট খেলার বোগদান করবে। এই খেলার আসর গরম হওয়ার কয়েকদিন আগে ভারতের ক্রিকেটের রাজনীতির আসর বেশ গরম হয়ে উঠেছিলো। আন্তর্জাতিক মহলে ভারতীয় ক্রিকেটকে পুপ্রতিষ্ঠা করার লোহাই দিয়ে বীরা রাজনীতির প্রেরণ দিয়ে থাকেন—তারা ই আবার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তব্য হিসাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন অর্থাৎ ভারতীয়

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সাম্প্রতিক সাধারণ বার্ষিক সভার সেই পুরাতন কর্তৃত্বতারা ই আবার নির্বাচিত হয়েছেন। রাজনীতির খেলা করে বীরা গত ইংলণ্ড সফর ভারতীয় ক্রিকেটকে অপমদ্ব করেছেন সেই সব ধুরন্ধর ব্যক্তিত্ব ই আবার খেলোয়াড় নির্বাচনী কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। গতবার এই কমিটিতে অমরনাথ ও এম. দত্তরায়ের রাজনীতির বেড়াফালে দু'জন সদস্যকে পদত্যাগ করতে হয়েছিলো। এবার গোপালন ও বিজয় হাজারিকে এই দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করলেও হাজারি মানে মানে সরে পড়েছেন। কুটিল জগতের নাটকের গুরু এম, দত্তরায়কে নেওয়ার ক্ষমতা ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড় স্টুটে বানার্জীকে ভোটের জোরে বাধ দেওয়া হয়েছিলো। এখন আবার হাজারির জায়গায় স্টুটে বানার্জীকে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অনেকে এরও মধ্যে কোন অভিসন্ধি আছে বলে সন্দেহ করছেন।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। তার রিপোর্টও পাওয়া গিয়েছে। এই সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক, এটাই সকলে দাবী করেন। তা না হলে ভারতের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার বলে মনে হয়।

গত শুভেষ্টি ইণ্ডিয়ান দলের বিরুদ্ধে শারীরিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অল্পযুক্ত খেলোয়াড় গোলাম আমেদকে অধিনায়ক করে নির্বাচক-মণ্ডলী সকলের হস্তাক্ষিপদ হয়েছিলেন। গোলাম আমেদ সব টেস্ট শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করে তাদের মুখে চূর্ণকালি মাখিয়ে দেন। অধিনায়ক নিয়ে অনেক ভ্রামসা দেখা যায়। এবারও অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে বেশ রাজনীতির খেলা চলে।

পাকিস্তান ও অষ্ট্রেলিয়ার টেস্টের কলাফল।

পাকিস্তান ও অষ্ট্রেলিয়া দলের দুটি টেস্ট খেলার কলাফল নিয়ে প্রস্তুত হইল :—

প্রথম টেস্ট

পাকিস্তান ১ম ইনিংস ২০০, (হানিক মহম্মদ, ৬৬, ডানকান সার্ণ ৫৬, সৈয়দ আমেদ ৩৭, ডেভিডসন ৪২ রাশে ৪ উইঃ ও বেনড ৬১ রাশে ৪ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ২২৫, (নীল হার্ডে ১৬, গ্রাউট নট আউট ৬৬, ফজল মহম্মদ ৭১ রাশে ৫ উইঃ, নাসিমুল গণি ৫১ রাশে ৩ উইঃ ও ইসরার আলি ৮৫ রাশে ২ উইঃ)।

পাকিস্তান ২য় ইনিংস ১৩৪, (ডানকান সার্ণ ৩৫, ম্যাকে ৪২ রাশে ৬ উইঃ ও বেনড ৪২ রাশে ৪ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংস (২ উইঃ) ১১২, (ম্যাকডোনাল্ড নট আউট ৪৪ ও নীল হার্ডে ৩০)।

অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী।

দ্বিতীয় টেবিল

পাকিস্তান—১য় ইনিংস ১৩৬ (হানিক মদ্রাক ৪১; ডেভিডসন ৪৮ রাশে ৪ উইঃ, ম্যাকিক ৪৫ রাশে ৩ উইঃ; বেনড ৩৭ রাশে ২ উইঃ)।

অস্ট্রেলিয়া—১য় ইনিংস (৩' নীল ১৩৪, ম্যাকডোনাভ ৪২, নীলস হাফ্রি ৪৩, ফ্যাভেল ৩২, ডেভিডসন ৪৭, বেনড ২১; হাশিব ১১৫ রাশে ৩৬ উইঃ)।

পাকিস্তান—২য় ইনিংস ৩৬৬ (সৈয়দ আমের ১৬৬, ইমতিয়াজ আমের ৫৪, মুজাউদ্দিন ৪৫; স্কিন ৭৫ রাশে ৭ উইঃ)।

অস্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস (৩ উইঃ) ১২২ (ভার্ভে ৩৭, ও'নীল নট আউট ৪৩; মহম্মদ নূরাক ৩৬ রাশে ২ উইঃ)। অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী।

খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার অভিনব পদ্ধতি।

টেবিল ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া দলের খেলা সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার এক তামাক ব্যবসায়ী-সংস্থা ৮.০০ টার্লিং (প্রায় ১,০৬,৬০০ টাকা) পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। ভারত ও পাকিস্তান সর্বের জন্ত উক্ত ব্যবসায়ী-সংস্থা ১৬৪০ টার্লিং (প্রায় ২৪,৮৬০ টাকা) বরাদ্দ করেছেন। উপরে উল্লিখিত টাকা তাহারই একাংশ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি টেবিল ম্যাচে অহলান্ডের ফলে অস্ট্রেলিয়া দল ৩২ টার্লিং (প্রায় ৪২৬০ টাকা) পুরস্কার লাভের অধিকারী হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান সর্বের টেবিল খেলার জন্ত উক্ত ব্যবসায়ী-সংস্থা ১৬৪০ টার্লিং (প্রায় ২৪,৮৬০ টাকা) পুরস্কার বরাদ্দ করে রেখেছেন। খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার সত্যই অভিনব পদ্ধতি। ভারতের ব্যবসায়ী মহলের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সকলেই খুশী হবেন।

সম্ভরণ

বোম্বাইয়ের মহাত্মা গান্ধী সুইমিং পুন্ডে জাতীয় সম্ভরণ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বাবটি রাজ্য দলের পুরুষ বিভাগে ১০৭ জন ও মহিলা বিভাগে ২২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। সার্ভিসেস দল ১০৪ পরেট পেয়ে উপাধিপতি তিনবার পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। বোম্বাই দ্বিতীয়, বাঙ্গালা তৃতীয় ও কেরালা চতুর্থ স্থান পায়, মহিলা বিভাগে বোম্বাই ২১ পরেটে পেয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে, বাঙ্গালা দ্বিতীয় স্থান পায়।

এবারকার প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দলের রামমণ্ডে সিং, রাম সিং, কপটান ও বজরজি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। পুরুষ বিভাগে বাঙ্গালার কোন প্রতিযোগী সুবিধা করতে পারেন নি। মহিলা বিভাগে কল্যাণী বসু ও মীরা কারিয়ারা তবু কিছুটা বাঙ্গালার মুখ রক্ষা করেছেন। ওয়াটার পোলো ফাইনালে বাঙ্গালাকে বোম্বাইয়ের নিকট পরাজয় বরণ করতে হয়।

বাঙ্গালা দলের এবারকার প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার কারণ কি? কর্তৃকর্তাদের অন্তর্ভুক্তের জন্ত বাঙ্গালার সম্ভরণ জগতের জল এবার বেশ খোলা হয়ে উঠে। এই কোলসকে কেন্দ্র করে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উত্তর হয়। নিকীতিসম্মত সীতারদের মধ্যে বাঙ্গার পূর্বে অনেক রানেন না বলে বৈক বসেন। শেষ পর্যন্ত অনেক মারপিট করে করেজুজুকে পাঠাবার ব্যবস্থা হলো বাঙ্গালা দলের

অপ্রতিদ্বন্দ্বী সীতার সন্ধ্যা চন্দ্রের বোম্বাই বাঙ্গা সম্ভরণ হয় নি। সন্ধ্যা চন্দ্রের অসুস্থস্বস্থিতে ক্রীড়া মহলে বিশেষ কৌতুহলের সৃষ্টি হয়। এর পিছনে যে রহস্য রয়েছে—তা আজও উদ্ঘাটন হয় নি। সন্ধ্যা চন্দ্রকে পাঠাবার জন্ত ক্রুটবল জগতের কুটনীতি বিশারদ এম, জন্-রায়কে ডাকা হয়। বাঙ্গালার মান রক্ষার জন্ত তিনি কেঁবে ভাগিয়ে নেন। বিমানে পাঠাবার চৌপ কেলা হ'লেও তাতে কোন ফল হয় নি। সেনুটাল সুইমিং ক্লাবের কর্তৃপক্ষরা পাঠাবার ব্যাপারে বেশ কিছুটা রসিকতা করেছেন। পাঠাতে কোন আপত্তি নেই বলে সন্ধ্যা চন্দ্রের শারীরিক অসুস্থতার মোহাই দিয়ে তাঁরা সরে পড়েন। সম্ভরণ জগতের কর্তৃকর্তাদের রাজনীতির খেলার বাঙ্গালার একজন উদীয়মান সীতারক যেভাবে বলি পড়েছেন এটা সত্যই লজ্জার কথা। এই বিষয়ে তদন্ত দাবী করাটা অভায় হবে বলে মনে হয় না।

জাতীয় প্রতিযোগিতায় নূতন রেকর্ড

জাতীয় সম্ভরণ প্রতিযোগিতার বিগত অমুহুর্তে নিম্নোক্ত ছয়টি রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে:—(১) ১৫০০ মিটার ক্রি টাইলে ২০ মিঃ ২২'৫ সেকেন্ডে রাম সিং (সার্ভিসেস দল) (২) ৪০০ মিটার ক্রি টাইলে ৫ মিঃ ১'১ সেকেন্ডে রাম সিং (সার্ভিসেস দল) (৩) ২০০ মিটার বুক সীতারে ২ মিঃ ৪৭'১ সেকেন্ডে রামমণ্ডে সিং (সার্ভিসেস দল) (৪) ১০০ মিটার বুক সীতারে ১ মিঃ ১৭'৩ সেকেন্ডে রামমণ্ডে সিং (সার্ভিসেস দল) (৫) ৪×২০০ মিটার ক্রি টাইল রিলেতে ১০ মিঃ ৫'৩ সেকেন্ডে সার্ভিসেস দল (৬) ৪×১০০ মিটার ক্রি টাইল রিলেতে ৪ মিঃ ১১'১ সেকেন্ডে বোম্বাই দল।

ফলকাতায় ডেনমার্কের ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়

ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় আহল্যাও কমপ সম্প্রতি পূর্ণভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্ত ফলকাতায় এসেছিলেন। তিনি পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে পাকিস্তানের আক্রমণ বেগকে পরাজিত করে উপাধিপতি সুইশার চ্যাম্পিয়নশিপ পান। পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে বাজত ব্যানাজী ও অরুণ ব্যানাজী ট্রে সেমে পাকিস্তানের আক্রমণ বেগ ও মাহমুদ খানকে পরাজিত করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। জুনিয়র সিঙ্গলসের ফাইনালে প্রোবুব বহু সহজেই গোবিন্দ দে'কে পরাজিত করেন।

ব্যাডমিণ্টন খেলার উন্নতিকল্পে শোভাবাজার ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের অর্থদান সত্যই প্রশংসনীয়। এই সংস্থা প্রতি বৎসর বহু অর্থব্যয়ে বিশেষ খেলোয়াড়দের এখানে আনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের এই সংস্থার সঙ্গে মোটেই সহযোগিতা করেন না, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। বিশেষ চেষ্টা সঙ্গেও ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন না। তাহারের এই মহৎ প্রচেষ্টা বানচাল হবার উপক্রম চলেছে। আশা করা যায়, নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন এই সংস্থাকে উৎসাহিত করবে। ভারতের সেরা খেলোয়াড়দের এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের যে অন্তরায় রয়েছে, তা অতিক্রম হুর হবে।

যুগ্মপট

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

সামনা বস্তু

ঠিক সেই সময়ে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হরেনদা নিয়ে এসেন উত্তর-ভারত ভ্রমণের প্রস্তাব। উদ্দেশ্য উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের সম্প্রদায় কর্তৃক নৃত্যকলার প্রদর্শন। 'দীনাকী' শেব হতে সম্প্রদায়ের দলভুক্ত হয়ে আমরা বাজা শুরু করলাম। যধু লক্ষ্মী পর্বত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল। কিন্তু তার চেয়ে বেশী দূর বাঙলা তার পক্ষে তখন সম্ভবপর হয়ে উঠল না, নতুন একটি ছবির চিত্রনাট্য তৈরীর ব্যাপারে তাকে বেশীদিন কলকাতার বাইরে রাখতে পারা গেল না—অগত্যা লক্ষ্মী থেকে সে কলকাতার দিকে বৃথক ফেরল, আমাদের দৃষ্টি তখন উত্তর থেকে উত্তরে স্থিরনিবদ্ধ। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে। লক্ষ্মী থেকে যধু কিরে এল আবার লক্ষ্মীতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন হরেনদা—সিমলা পর্বত তাঁর সাহচর্য পাওয়া গিয়েছিল, তাঁকেও আমাদের সহযাত্রী ত্যাগ করতে হল; কারণ অল্পটানাদির ব্যাপারে E. N. S. A. র সঙ্গে তিনি আগে থাকতেই চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, সেই ক্ষেত্রেই।

তিমিরবরণ এবং আমি—আমরা অতিথি হলুম মিঃ খান্নার। ইনি সেই মিঃ খান্না। ধীর খান্না টকাজে আমরা অল্পটান করেছিলেন। পৃথিবীতে কাপুতেরও ইনি নিকট আত্মীয়—সম্পর্কে ঠাই। আমাদের সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে তিনি অনেকখানি সম্ভবপরতার পরিচর দিয়েছিলেন। আগামী উল্লেখ করেছি যে সিমলা থেকেই হরেনদাকে আমরা বিদায় দিয়েছিলেন—সিমলায় কালীমন্দিরেও আমরা অল্পটান করলাম—এসময় উল্লেখ্যর যে এই কালীমন্দিরের নামকরণ হয়েছে আমার নন্দা দেবী প্রতিমা মিত্র মহাশয়ের নামানুসারে।

একটা কথা এখানে আগেই বলা উচিত ছিল কিন্তু একেবারে ভুলে গেছি—ভোলাটাও বোধ হয় খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। বিলম্বমান এই পার্শ্ববর্তী জীবনের অনেক ঘটনা অনেক কাহিনীর সমন্বয়ে পুষ্ট হয় স্মৃতির মিছিল—কয়েকটি ঘটনা বা কয়েকটি কাহিনী কখনও বা পাক্‌জট হয়ে পড়ে স্মৃতির এই মিছিল থেকে—কখনও বা পরেরটা এগিয়ে আসে আগে আবার কখনো বা আগেরটা পিছিয়ে যায় পরে—সেই কারণেই তাদের বসাবস্তু সম্প্রদায়ের দায়িত্বের গুরুভারও কম নয়। ধী—যে এসঙ্গে এতগুলি কথা বললুম সেই এসঙ্গেই কিরে বাঙলা থাক। আমরা তখন দেহাঘরে, একটি ট্রাক কল পেলুম বোম্বাই থেকে—সে কল এসেছিল আমার পূর্বতন প্রবোধক চিত্রনালাল লোহাওয়ার কাছ থেকে—বক্তব্য, তাঁর পূর্ন সুরেই শোনাই কর্তৃক পরিচালিত তাঁর আগামী হার্যটিয়ে আমাদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।

এক এক করে সমগ্র পাঠ্য এবং উত্তর-ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি আমরা ঘুরলুম—আমাদের ভ্রমণমুঠী থেকে হুথ্য হুথ্য পার্শ্বতানস্বরগুলিও বার পড়ল না। সেই সব ভ্রমণের ছবিগুলো এখন আজকের অপরাহ্নভুলিতে ভেসে ওঠে, জীবন পায় আর জীবনের প্রতিটি পাতায় করে চলে হার্যাপাত—তখন সব চেয়ে মনে পড়ে কান্দীর কথা। ভূবর্গ কান্দীর। সারা পৃথিবীর বিশ্বর কান্দীর, যেখানে প্রকৃতির অক্লপ দান হুঠে হুঠে ছড়িয়ে রয়েছে—বাগ



যুগ্মপট

আকাশ বাতাস অভিনব সৌন্দর্যের স্পর্শবাহী, বার ফুল ভগ্নতের পুষ্প-সম্পদকে করেছে সমৃদ্ধ, বার নিসর্গ শোভা কত পবিত্রকে আকর্ষণ করে এনেছে তার কোলে সেই কান্দীর ভারতের গৌরব—আমাদের সমগ্র ভ্রমণতালিকার উজ্জ্বল হয়ে আছে কান্দীরের স্মৃতি—তার কারণ কান্দীর ভ্রমণই হয়ে উঠেছিল আমাদের সব চেয়ে মনোহর।

তখনকার কান্দীরের রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপ আজকের তুলনায় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেদিনকার কান্দীর আজকের মত ছিল না, সে কান্দীর ছিল স্বতন্ত্র এক করদরাজ্য। কান্দীরের প্রথম সবার প্রেক্ষাগৃহ অমরেশ টকীজ আবার ব্যালে দিয়ে তার উদ্বোধন হয়েছিল—অমরেশ টকীজের আগে সারা কান্দীর রাজ্যে সবার ছবি দেখানোর কোন প্রেক্ষাগৃহ ছিল না। অমরেশ টকীজের হাটোমোচন করেছিলেন কান্দীরের তদানীন্তন মহারাজা জীহরি সিং এবং তাঁর পরিবারবর্গ। সে কি শাস্যাতিক ভীড় সেদিন! জনতা বেন বাধা মানতে চায় না, কোন সীমা বা বেড়াভাল দিয়ে বেন তাদের আর আটকে রাখা যায় না, সব কিছু বাধা সীমা প্রতিবন্ধক উপেক্ষা করে তারা বেন এগিয়ে আসতে চায়, ঠেকানো বেন আর তাদের যায় না। বিপুল সম্মানারও ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। আমাদের অল্পটান জানাশের সঙ্গে বলছি যুক্ত করতে সেদিন সক্ষম হয়েছিল মহারাজা এবং তাঁর আত্মজনদের, তাঁরা অভিব্যক্ত হয়ে পড়েছিলেন সেদিন আমাদের নৃত্যাল্পটান দেখে। অনেককাল আগের কথা তো, আঠারো বছর তো হতে চলল—তাই আজকের দিনের কান্দীরের যিনি সদর-ই-রিসায়ং সেই যুগ করণ সিং সেদিন ছিলেন বালক বুদরাজ—তখনকার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে কান্দীরের ভাবী অগীশ্বর। বছর বারো তখন তাঁর বয়স। সঙ্গীতের তথা অভ্যস্ত ললিতকলার প্রতি তাঁর অল্পরপের কথা বর্তমানে সর্বজনবিদিত—সংস্কৃতির অল্পতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আসক্তির পরিচর তখনই পাওয়া গিয়েছিল। অমিরকান্তি ভট্টাচার্যের সেতার এবং তিমিরবরণের স্বরোগ সেদিনই তাঁকে এতদূর অভিভূত করে ফেলেছিল এবং তাঁর অন্তরে তা এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে শেষ পর্বত মহারাজা আমাদের প্রস্তাব পাঠানেন যে হুঁজনের অন্তরে একজনকে বুদরাজকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত বেন সেখানে রেখে অমির কিং এই দুই গুণী প্রতিভাধর শক্তমান শিল্পীর একজনকেও অনিচ্ছিতকালের জন্যে অল্পতরেই বানা সম্ভবপর ছিল না। কারণ

তাদের আরও কল্যাণের মধ্যেই বহুল পরিচরিত কল্যাণ স্থাপন করবে—এই আশঙ্কাই ছিল আমাদের সব চেয়ে বেশী। এই সব কারণেই রহস্যজ্ঞের অনুরোধ অস্বীকারই হয়ে গেল, তা বন্ধা করা সম্ভবপর হল না আমার দ্বারা।

শ্রীনগরে দেখা হল আমাদের পুরোনো বন্ধু শ্রীমতীজলাল নেহরু, (প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীর নিকটতম কাম্রী) শ্রীমতী নেহরু এবং তাঁদের পরিচরিত সঙ্গীত সদস্যদের সঙ্গে। আমাদের “লিঙ্গ কটেজ” তাঁরা ভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন। প্রায় একটি বছরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত তাঁরা লিঙ্গ কটেজের বাসিন্দা ছিলেন। আমার সম্মানার্থে পাঞ্জাব সাহিত্য-সঙ্ঘ (পাঞ্জাব লিটারারি সোসাইটি) যখন সম্মাননায় আয়োজন করেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন শ্রীমতীজলাল নেহরু। স্ত্রী এবং তার আশে-পাশে সমাজতান্ত্রিক হিসেবে শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু তো যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারিণী। আজকের দিনের দেশবাসীর কাছে রামেশ্বরী নেহরুর সমাজসেবা সবচেয়ে নতুন করে কিছু বলবার নেই। বর্তমান কালে সাধারণ্যে তাঁর কীর্তি যথেষ্ট প্রচারিত।

ঠিক ছুরি ভোজন বলতে আমরা—বাঙলা ভাষায় ঠিক ছুরিভোজন বলতে যে পরিমাণ খাদ্য বোঝানো হয় সেই পরিমাণ প্রচুর খাদ্যস্রাব আমার জন্তে প্রস্তুত হল তাঁদের শ্রীনগরের বাড়ীতে। ভোজ্যবস্তু বলদেহীয় বা সাগরপারের নয় খাঁটি কাম্রী—সোজা কথায় কাম্রী খানা স্বভাবতঃই শুষ্ক খাদ্য। খাওয়াও হয়ে গেল যথেষ্ট প্রচুর মাত্রাতিরিক্ত। সেই দিন আমার আমার নাচের অনুষ্ঠানও ছিল, অনুমান করুন সন্ধ্যার নৃত্যানুষ্ঠান আর সেই মধ্যাহ্নে ঐ রকম শুষ্ক ভোজন আর ঐ রকম শুষ্ক ভোজনের পর মঞ্চের উপর নৃত্যপরিবেশন করা কি খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার? কি করা যায়, কিংকর্তব্যম্? শেষকালে সময়টি কিছু পিছিয়ে দিলুম, মূল সময়টি অবশ্য যথাযথই রইল। অনুষ্ঠানস্থলটি কিছু অলংকরণ করতে হল, অস্ত্রান্ত চার পাঁচটি টুকরো অনুষ্ঠান আমার নাচের আগে এগিয়ে দেখানো হল, ঐ টুকরো অনুষ্ঠানগুলির পর আমার নাচ শুরু হল—কি আর করা যায়, এ পরিবর্তন ছাড়া উপায় কি ছিল? বিশেষতঃ যখন নৃত্যের সঙ্গে অলংকার সঞ্চালনের প্রায় গভীরভাবে জড়িত।

[ক্রমশঃ]

অনুবাদ—কল্যাণাঙ্ক বঙ্গোপাখ্যায়

রাতের অন্ধকারে

কলকাতার আরকা বাহিনীর সঙ্গে রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংযোগ দীর্ঘকালের। সুনামের সঙ্গে আরকা বাহিনীর সাধ্যমে, জনসেবা তিনি করেছেন দীর্ঘকাল। জীবনে বহু বিচিত্র ও চরমপ্রান্ত ঘটনার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে একাধিক বার, প্রচুর অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে হয়েছে সঞ্চিত। জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি স্বয়ং লেখনীর সাধ্যমে রূপ দিয়েছেন “রাতের অন্ধকারে” নাম দিয়ে—যার চিত্ররূপ শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রদর্শিত হচ্ছে।

চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীকেশব মিত্র। ছবিটি প্রযোজন করেছেন রায়বাহাদুরের পুত্র শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

একটি হত্যাকে কেন্দ্র করেই ছবির গল্পাংশ গড়ে উঠেছে—একটি বাঙ্গালী নিহত হয়—স্বভাবতঃই অনেকের উপরই এ বিষয় সন্দেহ হয় বিশেষতঃ যারা রাণী বাইজীর সম্পর্কে এসেছিল এবং এই নিয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান তল্লাশী চালানো হয়—এদিকে আসল যে খুনি সে দিবিয়া মুখোপাধ্যায় এঁটে সমাজে রাধা উঠে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর একটি হত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আসল খুনি পালাতে গিয়ে ঘরা পক্ষে এবং মৃত্যুশয্যায় তার শেষ জবানী দিয়ে বাওয়ার সময় লক্ষ্যের চোখের সামনে পরিচরিত হয়ে যায় কে প্রকৃত খুনি।

এই হল সংক্ষিপ্ত গল্প। পরিচালনা দেবমুখ্য নন্দ—ছবির বিজ্ঞান এবং গল্পের গতি আড়ষ্টতার দোষ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। একটি রহস্তচিত্রে যে পরিমাণ প্রথমদিকে ভাব আনা দরকার—সারা ছবিতে সে ভাব অনুপস্থিত, শেষাংশে দেখা গেল যে শহরের একজন দীর্ঘস্থানীয় পুরুষ বলে বিনি স্বীকৃত, সমাজের একটি বিশিষ্ট আসন বীর অধিকারভূক্ত—নগরের বড় বড় মহলে বীর অবতারিত গতিবিধি—প্রকৃত হত্যাকারী এবং তিনি অভিন্ন—আরও জানা গেল যে লোকটি বর্তমানে এত ব্যাতিমান তাঁর পূর্বজীবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন—তিনি আত্মমানের একটি কয়েদ-পালানো খুনে ফেরারী আসামী। এখন প্রশ্ন এই যে, একটি আসামী আত্মমান থেকে নিঃসৃত বিজ্ঞ কপর্দকশূন্য অবস্থায় এ দেশে এসে, কি করে কোন পথে—কোন উপায়ে সে এত বিরাট বশ অর্থ, প্রতিপত্তির অধিকারী হ'ল? ছা'টি গাড়ী থেকে পরস্পরকে লক্ষ্য করে অসংখ্য গুলী ছোঁড়া চলছে—মজার ব্যাপার এই—একটা গুলীও কি কাউকে লাগছে না? প্রত্যেকটি গুলীই বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে, অসমর্থ। ব্যোমকেশ এই হত্যার ব্যাপারে যখন নিঃসন্দেহ তখন কি কারণে সে হত্যার রহস্যানুসন্ধানের সর্বদা অন্ত গোপনতা সহকারে নিচ্ছে—এ গোপনতার কি অর্থ? সবচেয়ে বিরক্তিকর যে জিনিষটি ছবিতে পরিবেশিত হয়েছে তা হচ্ছে হেলেনের নাচগুলি—যে নাচকে “খিচুড়ি নৃত্য” বলেই যথার্থভাবে অভিহিত করা যায়। ঐ বিভিন্নভাঙের নৃত্য এক অপরাধঘর্মী ছবির মধ্যে চুকিয়ে ছবির গাভীর বা ছবির মূল রস যে কতখানি নষ্ট করা হয়েছে তার ভুলনা নেই। নাচ দেখছি না ভেলকী দেখছি না ম্যাজিক দেখছি, আসলে কি যে দেখলুম সেইটেই তো বোকা গেল না! বিভিন্ন নাচের আসরে যে সব লক্ষ্যদের বেশভূষা ঐ সব আসরের উপযোগী নয়—বাজারের মধ্যে চায়ের দোকানের বেঞ্চির উপযোগী।

অভিনয়ে খুব একটা উল্লেখযোগ্য অভিনয় কেউই করেন নি, সকলেই আপন আপন চরিত্রগুলির রূপ দিয়ে গেছেন মাত্র। অগ্রণী পরিচালিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকার অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অসীমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, জহর রায়, নবদীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রাম লাহা, ডাঃ হরেন, বীরাঙ্গ দাস, রাজা মুখোপাধ্যায়, শিবেন বঙ্গোপাধ্যায়, মলয় বিশ্বাস (ছবি বিশ্বাসের পুত্র), সুনীত মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুরা সেন, সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বেলাই), হেলেন, রাজলক্ষী ও রাণী প্রভৃতি।

ভূতবিবাহ

সচরাচর কেউ কেউ 'ভূত' বলতে বা মনে করেন অস্ত্রের জীবনে যে তার অভ্যাস ভূতভূতি নিয়েই ঘটবে, এমন কথা কখনই জোর করে বলা যায় না, কিন্তু অপর বুদলেও তাঁরা নিজেই একথা কিছুতেই বুঝতে চান না বা এ বুদ্ধি যেনে নেওয়ার মত শক্তি তাদের নেই—আর সেই নিয়েই সমাজের মধ্যে বিরোধের আবির্ভাব। বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বন্ধন ভুল পথ থেকে একজনকে সরানো যায় না তখন নিজেকে সেই সর্বনাশা ভুলের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে সরিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজন হয় বিরোধের। ভূতবিবাহ ছবিটির গল্প এই পটভূমির উপর রচিত। বংশধরাদা, অর্ধগত কোলীজ, সামাজিক রীতিনীতির চেরে গুলমে ধর্মের আসন যে অনেক উচ্ছেদ—এক তার আসনের যে এরা রান, সেই দিকেই বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই ছবিটির মাধ্যমে। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র ইতিপূর্বে 'একদিন রাজের' মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে প্রভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, চিত্রাঙ্গোষ্ঠীদের কাছে 'ভূতবিবাহ' তাঁদের দ্বিতীয় উপহার—তাঁদের পূর্বসূরী ভূতবিবাহ এটাই রান করবে বলে মনে হয় না। যে বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবের পরিচয় এদের প্রথম ছবিতে এঁরা দিয়েছিলেন—আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্যের যে, তার ছাপ এ ছবিতেও অক্ষুণ্ণ আছে, গল্পটি বলায় মধ্যে ভুলের দিক দিয়ে খেঁচি কুড়িঘের পরিচয় পাওয়া গেছে। চরিত্রগুলি স্ক্রলিত এবং সুরক্ষায়িত। ছবিটির সংগঠন অর্থাৎ চিত্র নির্মাণের দিক দিয়েও পরিচালকেরা অভিনব দেখিয়েছেন।

গায়ত্রী এবং নাটিকা। অভিনায়কেরা নিজাদের সম্মানের কথা চিন্তা করে বিয়ের ঠিক করলেন তার, সে চায় অরুণের জীবনসঙ্গিনী হতে, তার বাবা সম্মান-প্রতিপত্তি-অর্থসম্পদাদির কথা চিন্তা করে অরুণের সঙ্গে গায়ত্রীর বিয়ে হতে পাবে না বলে সিদ্ধান্ত দিলেন—এক অরুণেরও বাড়ী আসা বন্ধ হল—বিয়ের দিন ভোগবলার গায়ত্রী নিখোঁজ হল—অরুণের ওখানে উঠল—সেখান থেকে কি ভাবে কি পরিবেশে সে বাড়ী এল এবং কেমন করে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সে অরুণেরই হাত ধরে নতুন জীবনের পথে পা দিল ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে।

ছবিটির সময়সীমা যাত্রা একবেলা—সকাল থেকে বিকেল। গানের বালাই নেই—ছবিটিকে অবশ্য ভার্যাক্রান্ত করা হয়নি গান চুকিয়ে। সেওজীতাই আলোকচিত্রায়ণে পূর্বসূরী অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অভিনয়শাণ্ডে অভাবনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন বাঙালার সার্বজনীন অভিনেত্রী শ্রীমতী হুসি মিত্র। শ্রীমতী মিত্র বাঙালার অভিনয়-জগতের এক বিরাট সম্পদ, তাঁর অনন্তসাধারণ অভিনয়শক্তি ছবিটিকে মর্যাদাবুদ্ধির কেন্দ্রে বসে

সহায়তা করেছে। তাঁর পরেই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্তাল, শম্ভু মিত্র ও অমর গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা তিনজনেই খেঁচি প্রশংসার দাবী রাখতে পারেন। এঁরা ছাড়া ছবিটিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিধান, গঙ্গাপন বসু, শান্তি দাস, নির্মল চট্টোপাধ্যায় পদ্ম মিত্র, ছায়া দেবী, করুণা বঙ্গোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কমলা মুখোপাধ্যায়, সুকি গোস্বামী, রেবা দেবী, অপরূপা দেবী, রাজলক্ষী দেবী, তারা ভাড়া প্রভৃতি।

রূপপট প্রসঙ্গে

কবিত্তর ববীজনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' বাথলা সাহিত্যের এক অনবদ্য সম্পদ। অগ্রদূত গোপীন্দ্র পরিচালনায় এর চিত্রায়ন হচ্ছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, অসিতবরণ, শিশির বটব্যাল, দীপ্তি রায়, সুরচিত্রা সান্তাল, সীতা মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। সুরযোজনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। * * * বাঙালার সুখ্যাত পরিচালক অর্বেণ্ড মুখোপাধ্যায়কে বেশ কিছুদিন বাদে 'রায়বাহাদুর' ছবির পরিচালকরূপে দেখা হবে। 'রায়বাহাদুর' একটি সুশঠিত রচনা। বিভিন্ন অংশে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, শিশিরকুমার, জীবন বসু, সন্ধ্যাকুমার, জহর রায়, মালী সিন্ধা, রেণুকা রায় প্রভৃতি। * * * 'হুই বেচারা' ছবিটি পরিচালনা করেছেন দিলীপ বসু। গানের সুর দিচ্ছেন ভূপেন হাজারিকা। এই ছবিটির অভিনয়শাণ্ডে যে সব শিল্পীদের আপনায় দেখতে পাবেন তাঁদের মধ্যে কমল মিত্র, কালী বঙ্গোপাধ্যায়, অমৃশকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। * * * সুনীলবরণ পরিচালিত অজানা কাহিনীতে অভিনয় করছেন বলে বানের নাম জানা গেছে তাঁদের মধ্যে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্তাল, অসিতবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক তরুণকুমার, সন্ধ্যা মজুমদার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, নমিতা সিংহ, চিত্রা মজুমদার নাম উল্লেখনীয়। * * * প্রখ্যাত পরিচালক দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় যিনি যে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে তার নাম 'বেথানে জাঁধার নেই।' কাহিনী লিখেছেন বিজয় গুপ্ত। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অজিত বঙ্গোপাধ্যায়, গুলদাস বঙ্গোপাধ্যায়, রবীন রায় (বাধা বতীন খ্যাত) অমৃশকুমার, মলিনা দেবী, করুণা মুখোপাধ্যায় ও বাণী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা ও খ্যাতনামা শিল্পবর্গ।

... এ মনের প্রহরদণ্ট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে জনৈক বাঙালী-কতার আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীমতা পাল।

◉ দেশে-বিদেশে ◉

কার্তিক, ১৩৬৬ (অক্টোবর-নভেম্বর, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা কার্তিক (১৯শে অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গা সমস্ত সম্পর্কে নিবিড় পর্যালোচনার জন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নদী বিশেষজ্ঞদের হইয়া কমিটি গঠনের সরকারী সিদ্ধান্ত—সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

২য় কার্তিক (২০শে অক্টোবর) : প্রধান মন্ত্রী জিনেহর কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জিম্মী পদ্মজা নাইডু, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও খাতিয়াচিবি জি.একরচন্দ্র সেন সহ হোলকটায় বেগে রাজ্যের বঙ্গা-বিক্ষত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন।

৩রা কার্তিক, (২১শে অক্টোবর) : বঙ্গা-বিক্ষত বাংলাকে বাঁচাইবার জন্ত জাতির প্রতি ব্যাকুল আহ্বান—বিমানযোগে বিপর অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনান্ত রাজত্বকলে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী জিনেহর বিবৃতি।

৪ঠা কার্তিক (২২শে অক্টোবর) : নাসা পাহাড় ডুয়েনসার প্রশালন এলাকাধীন কোহিমা জেলার চাকাসার অঞ্চলে নাসা বিদ্রোহিগণের অতর্কিত আক্রমণে নয়জন ভারতীয় সৈন্য নিহত।

৫ই কার্তিক (২৩শে অক্টোবর) : শিল্পী ও চাকার পঙ্ক-ভারত বৈঠকান্তে পূর্ব-সীমান্তের প্রধান তিনটি বিরোধ সম্পর্কে মতৈক্য হইয়াছে বলিয়া উত্তর রাষ্ট্রের বৃদ্ধ ইন্ডাহাসে ঘোষণা।

ভারতীয় এলাকার (দক্ষিণ লাডাক) চীনা সৌজের আক্রমণে ১৭জন ভারতীয় টহলদার পুলিশ নিহত হওয়ার সংবাদ সরকারীভাবে প্রকাশ—চীনা দূতের নিকট ভারতের প্রতিবাদ প্রকাশন।

৬ই কার্তিক (২৪শে অক্টোবর) : লাডাকের বন্যার কলে চীন-ভারত সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিয়াছে—বীরাটে বিরাট জনসভায় প্রধান মন্ত্রী জিনেহর ঘোষণা।

৭ই কার্তিক (২৫শে অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বন্দর স্থাবিয়ার আয়িক নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষী কোম্পানীর সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি অব্যাহত থাকিবে—কলিকাতার কেন্দ্রীয় প্রমুখমন্ত্রী জি.ও.লজারীলাল নন্দের উক্তি।

৮ই কার্তিক (২৬শে অক্টোবর) : হস্তকার্যে প্রতি দাসে ছয় শত করিয়া উচ্চতর কৃষক পরিবারকে প্রেরণকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি কেন্দ্রের নির্দেশ দান।

পূর্ব লাডাকের সংঘর্ষে নয়জন ভারতীয় সীমান্ত পুলিশ নিহত—ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চীন কর্তৃক প্রেরিত নোট সর্বশেষে সংবাদ।

৯ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবর) : নয়া দিল্লীতে রাষ্ট্রপতির সভাপত্যে অনুষ্ঠিত রাজ্যপালদের বার্ষিক সম্মেলনের প্রধান দিনের অধিবেশন শেষের অর্ধ মৌকিক ও খাতিয়া-পরিষিদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা।

ভারত সরকারের অধীনে ভারত শাসিত 'নাসাডা' (বড়দা রাজ্য) পূর্বের দাবী বন্ধক—এ অনুষ্ঠিত নাসা সম্মেলনের প্রস্তাব।

১০ই কার্তিক (২৮শে অক্টোবর) : নয়া দিল্লীতে রাজ্যপাল

সরকারে ভারতের উত্তর ও উত্তর পূর্বসীমান্ত বন্দর বিষয় অবলম্বনের উপর তদন্ত আরোপ।

১১ই কার্তিক (২৯শে অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র দক্ষিণাংশে অবিরাম বাত্যা ও বৃষ্টিতে বাত্যাভিক ভীষণবায়ু বিপর্যাস।

১২ই কার্তিক (৩০শে অক্টোবর) : চীনা চাকাসার বিক্ষত প্রতিদোষের মতন নীতি সম্পর্কে নয়া দিল্লীতে দেশরক্ষা মন্ত্রণ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণের উদ্ভূত পর্ষায়ে আলোচনা।

১৩ই কার্তিক (৩১শে অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী হলগুলায় নেতৃত্বক কর্তৃক ট্রাম কোম্পানীর ভাড়াবৃদ্ধির (প্রতি টিকিটে এক নয়া পয়সা) সিদ্ধান্তের বিরোধিতা।

১৪ই কার্তিক (১লা নভেম্বর) : ভাবার ভাঙতে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিখিলা রাজ্য পুনর্গঠনের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংস্কৃত পরিষদের দক্ষিণ কলিকাতা শাখার উদ্যোগে দ্বিতীয় দিবস পালন—এই উপলক্ষে ময়দানে মহানগরীর মেঘর জীবিতরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপত্যে বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান।

১৫ই কার্তিক (২রা নভেম্বর) : বোম্বাই-এর হাসপাতালে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডাঃ জন মাখাই-এর জীবনদীপ নির্বাণ।

ট্রামওয়ার কোম্পানীর ঘোষণা অনুযায়ী ট্রামের ভাড়া প্রতি টিকিটে এক নয়া পয়সা বৃদ্ধি।

১৬ই কার্তিক (৩রা নভেম্বর) : কানপুরে এক ছেদ কনট্রোল কর্তৃক জনৈক জীলোক নিগূহীত হ হার পর কয়েক সমস্ত লোকের এক উত্তেজিত জনতার থানা আক্রমণ—এই সময় পুলিশের গুলীচালনার ১১জন নিহত ও প্রায় ১৪০জন আহত।

১৭ই কার্তিক (৪ঠা নভেম্বর) : পূর্ব লাডাকের ঘটনা সম্পর্কে চীনের নিকট ভারত সরকারের কতিপূর্ণ দাবী ও চীনা নোট বর্ণিত অভিযোগ সমূহের তীব্র প্রতিবাদ সহ লিপি প্রেরণ।

১৮ই কার্তিক (৫ই নভেম্বর) : প্রধান মন্ত্রী জিনেহর কর্তৃক পাক-ভারত বৈধ প্রতিদোষ ব্যবস্থার প্রস্তাব প্রকাশ।

১৯শে কার্তিক (৬ই নভেম্বর) : খাতিয়া সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রাজ্যের খাতিয়া উৎপাদন সচিব জীতেন্দ্রকান্তি ঘোষ কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট পেশ।

২০শে কার্তিক (৭ই নভেম্বর) : থিমিরপুর ডকে হলদিয়া হইয়া আগন্ত বর্মী চাউল বোকাই 'ভারতবাসী' আহাজ বরকট—পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডক প্রসিকদের ধর্মঘট।

২১শে কার্তিক (৮ই নভেম্বর) : সিকিম সীমান্ত বরাবর বিপুল চীনা সৈন্তের সমাবেশ—বীরাট বিরাট বাঁটি স্থাপন ও বহু পরিধা বননের সংবাদ।

২২শে কার্তিক (৯ই নভেম্বর) : ভারত-চীনের সীমারেখা ম্যাকমোহন লাইনের দুই মিকে ২০ কিলোমিটার (প্রায় ১২ মাইল) দূরে নিজ নিজ দেশের সৈন্ত সরাইয়া লওয়ার জন্ত চীন কর্তৃক ভারতের নিকট প্রস্তাব পেশ।

২৩শে কার্তিক (১০ই নভেম্বর) : কেন্দ্রীয় রেল সচিব জীতেন্দ্রকান্তি ঘোষ কর্তৃক চেনুয়া হইতে বুরি পর্যন্ত নতুন রেলপথের উদ্বোধন।

২৪শে কার্তিক (১১ই নভেম্বর) : ভারতে আক্রমণ চালাইয়া

চীন মারামুদ ক্রম করিয়াছে এবং ইহার জন্য চীনকে শাস্তি পাইতে হইবে—কুবলেখের জনসভায় কেন্দ্রীয় বরাট্ট সচিব পদে উক্তি।

২৫শে কার্তিক (১২ই নভেম্বর): বিশ্ব বায়ু সঙ্ঘা, যিশনের পক্ষ হইতে যুক্তরাজ্যের কলিকাতার জল সরবরাহ, আবহাওয়া পরিষ্কার ও জল নিষ্কাশন এবং বায়ু সরবরাহি ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে কোটি টাকার পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে পেশ।

২৬শে কার্তিক (১৩ই নভেম্বর): ডিলাই ইম্পাত কারখানার রু.মি. মিলগুলির কাজ আরম্ভ—রু.মি. মিলসমূহ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিলাই কারখানাটির কাজ চূড়ান্ত পর্ষায় পুঙ্ক।

২৭শে কার্তিক (১৪ই নভেম্বর): হট স্প্রিং এর নিকটে চীন সৈন্য এককর্তৃক একজন ভারতীয় পুলিশের হাতে পুলিশ অফিসার শ্রীকরম শিং সহ দশজন আটক ভারতীয় পুলিশ ও নয়জন নিহত পুলিশের মৃতদেহ প্রত্যর্পণ।

২৮শে কার্তিক (১৫ই নভেম্বর): কলিকাতার জনসভায় নিখিল ভারত কংগ্রেস ব্রুক সঙ্গীত শ্রীকেশবকুমার বসু, এন্-এল-এ'র ঘোষণা—কংগ্রেস ব্রুক ভারতীয় কনুনিষ্ট পার্টির সহিত একযোগে আর কোন আন্দোলনে যোগ দিবে না।

২৯শে কার্তিক (১৬ই নভেম্বর): চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সীমান্তের জন্ত চীনের প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ এন লাই-এর প্রস্তাব অবাস্তব ও গ্রহণের অযোগ্য—লোকসভার শ্রুতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেতৃক ঘোষণা।

ভারত-চীন বিরোধ প্রসঙ্গে লোকসভার শ্রীনেতৃক কর্তৃক দ্বিতীয় বৈতপত্র পেশ।

৩০শে কার্তিক (১৭ই নভেম্বর): ১৫ মাস পাকিস্তানী দখলে থাকার পর ভারতীয় গ্রাম কাছাড় জেলায় টুকেরগ্রাম মুক্ত।
বহির্দেশীয়—

১লা কার্তিক (১১শে অক্টোবর): সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ মহনাথ কর্তৃক বি-বি-সি'তে নতুন মাস্ত্রিসভা সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের জন্য ব্রুটনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকী প্রদান।

২রা কার্তিক (২০শে অক্টোবর): পূর্ব সীমান্তের প্রান্তবলী সম্পর্কে চাকার পাক-ভারত সম্মেলনের তিন দিবসব্যাপী অধিবেশনের পরিসমাপ্তি।

৪ঠা কার্তিক (২২শে অক্টোবর): তিরুতের ঘটনাবলীতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে হালার ও আহালগুওর উপস্থাপিত প্রস্তাব ভোটাক্ষেপে গৃহীত।

৬ই কার্তিক (২৪শে অক্টোবর): নিউইয়র্কে এক ভোক্তাসভার ভারতের দেশরক্ষা সচিব শ্রী ডি. কে. কুমারেননের ঘোষণা—চীনকে ভারতীয় এলাকা ছাড়িয়া বাইতেই চাইবে।

৮ই কার্তিক (২৬শে অক্টোবর): জাকার্তায় কলম্বো পরিকল্পনাকৃত ২১টি সমস্ত রাষ্ট্রের তিন সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন শুরু।

পাক প্রোসিডেন্ট জেনারেল মহম্মদ আবু বখান কর্তৃক সমগ্র পাকিস্তানে 'মূল গণতান্ত্রিক বিধান' প্রবর্তন।

১১ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবর): কনুনিষ্ট চীনের ক্রিয়াকলাপ বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক—আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মৌখিক ইচ্ছাধারা বঙ্গবন্ধু।

১২ই কার্তিক (৩০শে অক্টোবর): নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের নিকট ভারতীয় দেশরক্ষা সচিব শ্রী ডি. কে. কুমারেননের ঘোষণা—আপন অফিসের প্রতিরক্ষার ভারত বঙ্গবন্ধু।

১৩ই কার্তিক (৩১শে অক্টোবর): মস্কো-এ সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মি: নিকিতা ক্রুশ্চেভের উক্তি—ভারত-চীন সীমান্তের ঘটনাবলীর জন্য কলম্বো অত্যন্ত দুঃখিত।

১৪ই কার্তিক (১লা নভেম্বর): বেলেজিয়াম কংগ্রেস অব্যাহত দাখাংকিয়া—হুই মিলে ৭০জন নিহত ও দুই শতাধিক আহত।

১৫ই কার্তিক (২রা নভেম্বর): ১১শে ডিসেম্বর প্যারিসে পাকিস্তানী (আমেরিকা, ব্রুটন, ক্রাল ও পশ্চিম জার্মানী) সীর্ঘসম্মেলনের অন্ত্যস্তান সম্পর্কে পাকিস্তানী মহলে ঘোষণা।

ভারতের স্বকর্তৃক কমনওয়েলথ দেশগুলি প্রেরণকারী সাহায্য করিতে প্রস্তাব—ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেতৃক নিকট ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মি: ম্যাকমিলানের পক্ষ।

১৬ই কার্তিক (৩রা নভেম্বর): রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের মূল রাজনৈতিক কমিটিতে নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত ৮২টি রাষ্ট্রের একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

১৭ই কার্তিক (৪ঠা নভেম্বর): ওয়াশিংটনে প্রে: আইসেনহাওয়ারের ঘোষণা—ভারত সরকারে ১১ই ডিসেম্বর নয়ায়িল্লাতে তিনি আন্তর্জাতিক কৃষিমেলার মাকিন প্রশংসারী ঘারোষ্যটান করিবেন।

১৮ই কার্তিক (৫ই নভেম্বর): ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রমিক দলের সদন্ত শ্রী কিলিপ নোহেল বেকারের বর্তমান বর্ষের (১৯৫১) নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভের খ্যাতি অজ্ঞান।

১৯শে কার্তিক (৬ই নভেম্বর): ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ সীমান্তের জন্য প্রধান মন্ত্রী মি: ক্রুশ্চেভকে প্রস্তাব বিশ্ববৈষম্যের অল্পদোষ—আফ্রো-এশীয় সংঘটি সংস্থার পক্ষ হইতে তার প্রেরণের সিদ্ধান্ত।

গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ অভিধানকারী সমগ্র জাপানী অভিযাত্রী হল নির্বোধ।

২১শে কার্তিক (৮ই নভেম্বর): ২০০১ সালের মধ্যে মায়ুদের পরমায়ু দেড়শত হইতে দুই শত বৎসর বৃদ্ধি করা বাইবে—জর্নেক সোভিয়েট বিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণী।

২৪শে কার্তিক (১১ই নভেম্বর): বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দলগত রাজনীতি, ব্যবসা এবং মন্দিরের জমি পরিচালনা হইতে দৃষ্টি রাখার সুপারিশ—সিংহল সরকার নিযুক্ত সাদান'কামিশনের রিপোর্ট।

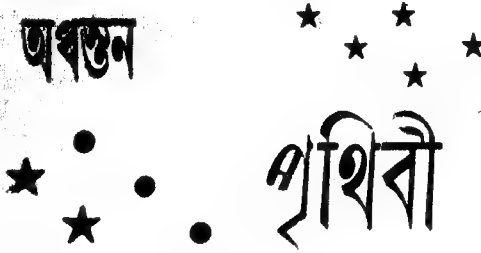
২৬শে কার্তিক (১৩ই নভেম্বর): সাংবাদিক বৈঠকে মাকিন পররাষ্ট্র সচিব মি: ক্রিশ্চিয়ান হাটারের বিবৃতি—আমেরিকা মনে করে যে, চীনের সহিত সীমান্ত বিরোধের ভারতের দাবী সম্পূর্ণ বৈধ।

সাহারার আগবিক অস্ত্র পরীক্ষা যেন না চালান হয়, সেই উদ্দেশ্যে ক্রালের প্রতি রাষ্ট্রসংঘ রাজনৈতিক কমিটির আহ্বান।

২৮শে কার্তিক (১৫ই নভেম্বর): ভারতীয় এলাকা হইতে চীনের হটাইতে শান্ত প্রয়োজ হইতে পারে—বিভিন্ন ভারতীয় দূতের নিকট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেতৃক পত্র প্রেরণের সবাদ।

৩০শে কার্তিক (১৭ই নভেম্বর): রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের মাকিন আক্রমার বর্ণিব্যয় মূলক নীতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত—প্রস্তাবের পক্ষে ৬২টি রাষ্ট্রের বিপক্ষে ৩টি সমস্ত রাষ্ট্রের ভোটদান।

অবসান



ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

রাত্রি আটটা বেজে আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

প্রণব বাবু ও চিরঞ্জীব বাবু উৎসুক হয়ে বড়বাবুর জন্ত তখনও পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। ইতিমধ্যে খোদ ডেপুটি সাহেব হু' হু'বার বড়বাবুকে টেলিফোনে খুঁজছেন, কিন্তু তিনি যে এখন কোথায় তা ধানার কেউই বলতে পারেনি। অফিসাররা খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে, মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্ত লক্ষ্যাবলা তিনি বড়সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তার পর তিনি সেখান থেকে কোথা যে চলে গিয়েছেন তা কেউ বলতে পারেনি। এমন কি মটু মল্লিকের বাড়ীতে লোক পাঠিয়েও তাঁর কোনও পাতা পাওয়া যায়নি। অথচ ডেপুটি সাহেব বলে দিয়েছেন যে ধানার ভিন্নলেই তিনি যেন তাঁকে ফোন করেন। বড়বাবুর সাময়িক অবর্তমানে সেকেণ্ড অফিসার প্রণব বাবু ভাভাবিক ভাবেই কর্তৃত্ব লাভ করে থাকেন। সেই কর্তৃত্বের বলে তিনি অস্বস্তি অফিসার রহমান সাহেব ও সমর বাবুদের উপর হুকুম চালিয়ে তাঁদেরও বড়বাবুর খোঁজে পাঠিয়েছিলেন। তারাও সকলে সম্ভাব্য সকল স্থানে বড়বাবুর তাঁবোদার সিপাহী-সমাপারদের সাহায্যে তাঁকে খোঁজাখুঁজি করে একে একে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ধানার ফিরে এসেছেন।

সময়ের ব্যবধানে মাহুকের উৎসেগ স্বভাবতই হালকা হয়ে যায়। তা'ছাড়া বড়বাবুর প্রতি তাদের যা কিছু ছিল তা কর্তব্য কার্যে দৃষ্ট ভাবেই সমাধা করা হয়েছে। তবুও বড়বাবুর জন্ত তাদের কান্দরই চিন্তা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়নি। এঁদের মধ্যে সমরবাবু বড়বাবুর সর্বাধিক অগ্রগত ছিলেন। প্রণব ও চিরঞ্জীববাবু এক রহমান সাহেবের মত তাঁর আদর্শের বালাই ছিল না। একটু বিরক্তির সহিত গলা থেকে সমরবাবু বললেন, 'এই যত কিছু গুপ্তগোলা চিরঞ্জীববাবুর কর্তৃত্বের জন্ত। এলাকার জুয়া চলা না চলার বা কিছু দায়িত্ব তা বড়বাবুর। খামকা আপনি উদ্যোগী হয়ে জুয়া ধরতে গেলেন কেন বলুন তো মশাই? এখানে আপনাদের তুলে জন্ত আমাদের সকলকে ক'দিন ধরে যে সাবধানে থাকতে হবে তা কে জানে? বায়যোগ খিয়েটারে বাওয়া তো আমাদের একেবারে বন্ধ। পুরানো পুলিশকে রিক'ম করবেন আপনি একা? এলাকার জুয়া কোলেন একেবারে বন্ধ হোক তা আপনাদেরও চান আর আমাদের বড়সাহেবও মনে প্রাণে তাই চান। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাদের সকলে একযোগে কাজ করতে পারছেন না। উপরন্ত বড়সাহেব যা চান

তাই করতে গিয়ে আপনি তাঁরই বিরুদ্ধে কাজ গেলেন। কোনও ভালো কাজ করতে হলে প্রথমে বন্ধন করতে হবে নিজের মনের অন্তর্নিহিত 'নিত্য'। তুলে বাবেন না যে পৃথিবীতে দান্তিক ভালো লোকদের দ্বারা যত কতি হয়েছে ততো কতি মন্দ ব্যক্তিদের দ্বারা কোনও মুগেই সমাধা হয়নি। আমি বা বড়বাবু মন্দ লোক হতে পারি কিন্তু আমাদের দ্বারা মাহুকের বা কতি হয় তা সীমাহীন নয়। আমাদের দ্বারা কৃত কতি সকল সময়েই একটা সীমানার মধ্যে থাকে। এই তুমি আর প্রণব যত গুপ্তগোলা আরম্ভ করেছো আমাদের এই ধানার, ঠিক ততো গুপ্তগোলা আরম্ভ করেছেন পার্শ্ববর্তী জোড়াপাগান ধানার তোমাদের বন্ধু প্রশান্ত বাবু ও তার দলবল। এখানে তোমরা নিজেরা পুকুর কেটে গরল তুলে তাতে স্নান করে নিজেরাই এক অশান্তির আগুন পুড়ছো। আর সেই সঙ্গে আশে পাশে আমরা বার নিদোষ মাহুকের আছি তাদেরও তোমরা জোর করে সেই আগুনে অকারণে পুড়তে চেষ্টা করছো। কে তোমাদের পুলিশে ভক্তি হতে বলেছিলো? বাও বাইরে গিয়ে মাষ্টারী বা প্রক্সারী করে প্রথমে জনসাধারণকে রিক'ম করোগে হাও। যদি পারো তা হলে দেখবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুলিশও আপনা হতেই রিক'মও হয়ে গিয়েছে। আমরা কেউ হনলু বা ক্যামাসকাটকা থেকে আসিনি। আমরা এসেছি এই দেশেরই দোষগুণ সহনিত জনতার মধ্য থেকে। প্রত্যেক ভালো বা মন্দ কাজের জন্ত একটা উপযুক্ত সময় আছে। সেই সময়ের জন্ত অপেক্ষা না করে কাজ এগুলো বিপর্যয় আসতে বাধ্য। অসময়ে কাজ আরম্ভ করে তোমরা আমাদের বড় সাহেব ও ডিপুটি সাহেবের মধ্যে একদিকে বিভেদ এনেছো। অপরদিকে তোমরা হাঙ্গের মধ্যে শুধু একটা স্থায়ী বিবাদের সৃষ্টি করে কাজ হওনি। সেই সঙ্গে তোমরা তোমাদের হঠকারিতা ও অনুপ্রাণিত কার্যের দ্বারা তোমাদের বড়সাহেব ও নিজেরদের মধ্যেও একটা বিভেদের সৃষ্টি করেছো। তোমাদের এই সব রিক'মের কাজ গায়ের জোরে কোনও দিনই সমাধা হবে না। এ জন্ত ভালোমন্দ নির্বিশেষে প্রতিটি মাহুকে ভালোবাসতে হবে ও দীর্ঘদিন ধরে তাদের সেবাও করতে হবে। এ'ছাড়া কিছুকাল বাবু তাদের অন্তর অন্ত্যচারও তোমাদের সহ করতে হবে। রাশি রাশি মন্দের মধ্য হতে ভালটুকু খুঁজে বার করে তা তুলে নিতে হবে। এখানে প্রয়োজন হচ্ছে ইভোলিউশনের, রিভোলিউশনের নয়। এ সব কাজের জন্ত দরকার দীর্ঘমেয়াদী সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার। তোমাদের স্বল্পমেয়াদী নীতির জোর এখানে জল।

সমর বাবুর সুদীর্ঘ ও অসংলগ্ন বক্তৃতার মধ্যপথে প্রণব বাবু লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর চোখ চুষ্টো জবাজুলের মত টকটকে লাল। বড়বাবুকে খুঁজতে গিয়ে সুবিধা মত কোথা থেকে তিনি অতি আবশ্যকীয় পানীয় পান করে এসেছেন। সমর বাবুর মুখের দিকে তাঁর দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে প্রণব বাবু অল্পব্যাপ করে বললেন, 'আবার আপনি সমরবা মিনের বোলা এসব খেলে? বড়বাবু কতবার আপনাকে এ জন্ত বকাবকি করেছেন না? আমাদের বড়বাবুও তো এ সব

একটু আঁচটু খান। কিন্তু আপনাব মত ধ্বন তখন তো তিনি খান না? দেখছেন যে চারদিকে এখন অন্ধন জ্বলে। এর মধ্যে নতুন কোনও গুণগোল বাধাবেন না। হাত জোড় করে আপনাকে বলছি।

এতো কথা সময় বাবুকে বলবার প্রণব বাবুর একটা কারণও ছিল। সেই দিন রাতে বাউণ্ড সেবে এসে জেনারেল ডায়েরীতে নেশার বোকে তিনি লিখে ফেলেন। চ্যালেঞ্জ কনষ্টেবল নম্বর ৮৭২ গ্রাট জাংসন অফ কনজাংসন। তাই নিয়ে শুধু এক মাত্র সময় বাবুকে নয়, বড়বাবুকেও দশ বাবু কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। এখানে পরামর্শ জীবের বিপাকে একটা সিদ্ধি গীত মামলা বিচারবারী। বড়বাবু সেদিন তাঁকে সাঙ্গান করে বলে দিয়েছেন। শাপু হু. মদ যদি খেতে হয় আমার সঙ্গে পড়ে। তোমার মিক থেকে একটা পরমাণু এই বাপায়ে খরচ করতে হবে না। অন্তিমিক আমিও তোমাকে মাত্র দশো চণ্ডে বন্ধ কলঙ্ক পাবো। সেদিন তাদের বড়বাবু গেলের সঙ্গে তাঁকে আরও বলেছিলেন, 'মদ তুমি তোমার ইচ্ছামত খাও কিন্তু দেখো মদে তোমাকে না খাও।' সময় বাবু সেদিন বড়বাবু গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তিনি তাঁর উপদেশাধ্যায়ী কাজ করবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব বন্ধও কেনেও কীক পাওয়া মাত্র সময় বাবু কিনা কোথা থেকে বেশ একটু লাগানির মোতাক্ত করে ফিরলেন।

সময় বাবু কিন্তু তখন অপ্রস্তুত হবার মত মনের অবস্থা ছিল না। নেশাটা ইতিমধ্যেই তার ভাঙ্গে ভাবে জমে এসেছে। সরস্র মন তাঁর তখন তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ। অবচেতন মনের জানভাণ্ডার উজাড় করে তিনি তার বক্তব্য সকলকে শুনে দিতে চান।

একটা জেলের হাসি হেসে সময় বাবু বললেন, 'এ্যা! কেন আমি মদ খেলাম। আচ্ছা, বলছি। পোন তাহলে। 'না আমার কিছু গুনবা না', প্রণব বিরক্তির সহিত উত্তর করলেন।

প্রণব বাবু শুনতে না চাইলেও সময় বাবু তাঁকে গুনাবেনই। সময় বাবু তখন বাক বলে নাছোড়বান্দা। চেয়ারটা একটু টেনে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'এ্যা! গুনবেন না মানে? কৈফিয়ৎ বখন আপনি চেয়েছেন, তখন কৈফিয়ৎ আমি দেবোই। প্রস্তুত হচ্ছি এই যে কেন আমি মদ খাই? এই একটা কথা তো আপনাব গুনতে চান? এর উত্তর হচ্ছে এই যে মদ একমাত্র বস্ত বা কারো সঙ্গে কখনও বেইমানী করে না। মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু সকলেই বেইমানী করে। মাত্র দুটো জিনিস পৃথিবীতে কখনও বেইমানী করে না। এদের একটা হচ্ছে ভূমি বা জমি আর অপরটা হচ্ছে এই পবন বন্ধু মদ।'

সামান্য একটু জমি কোথাও কিনে রাখুন, দেখবেন কিছু না কিছু সে আপনাকে দেবেই। তারপর হচ্ছে এই মদ খান এক পেগ। সব দুঃখ কষ্ট আলা ও বস্ত্র আপনাকে সে ভুলিয়ে দেবে। অন্ততঃ এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে সে একটুও বেইমানী করবে না। তবু শুধু বড়বাবু কাছে দেওয়া কথা বজায় রাখবার জন্তে আমি ধীরে ধীরে এটা ছাড়বো ঠিক কতেছি। কিন্তু একবার ধরলে কি সহজে একে ছাড়া যায়? বড়বাবুর কাছ থেকে বলসী হয়ে অস্ত্র কোথাও চলে গেলে চাকরী যে আমার থাকবে না তা আমি জানি।

কিন্তু সব বুঝেও এই অতি প্রয়োজনীয় ঐক্যটা আমি ছাড়তে পারছি না।

আমি আশ্চর্য্য করতে চাই। আরও কিছু দিন বেঁচে থেকে একটা জীবনের শেষ দেখে যেতে চাই। এই উজ্জ্বল শুষ্ক আমি ভাই মদ খাই। চাকরী বাবার ভর তোমরা আমাকে দেখিও না। মা যতী রাগ করলে ছেলে কেড়ে নেবে। এর বেশী তো তেনা কিছু করতে পারবেন না। আসল কথা এই যে, আমি নিজে চাকরী ছাড়তে চাই না। তার চেয়ে বরং ওরা আমাকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দিক। কিন্তু এই চাকরীতে বচাল না থাকলে মাছবের জীবনের শেষ দেখাব এতো সুযোগ আমি আর পাবো না। তাই বত দিন পারি এই চাকরীতেই আমি থেকে যেতে চাই।

সময় বাবুর আসল বাধা কোথায় তা উপস্থিত সকলের জানা ছিল। মধ্যে একমাত্র প্রণব বাবুর জানা ছিল। প্রণববাবু জানতেন যে পুলিশে চোকার পূর্বে সময় বাবু ছিলেন একজন প্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী শিক্ষক। একজন জনহিতব্রতা যুবক বলে তিনি দু'নাম অর্জনও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম ঘোবনে নববিবাহিতা স্ত্রীর কাছে একটা নিমজ্ঞণ আঘাত পেয়ে তিনি না ভেবে চিন্তে দুটো কাজ করে ফেলছিলেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁর পৈত্রিক বিবরণসম্পত্তি বা কিছু ছিল তা নিশেধে বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি একজন এম্. এ ডিগ্রিধারী হওয়া সত্ত্বেও দিক্‌বান্দক জ্ঞানশূন্য হয়ে পুলিশে চুক পড়েছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি এই ভাবে মন্তপান স্বস্ত্র করেন নি। পুলিশের কাছে বড়বাবু সম্ভব তিনি সাধামত পূর্বের জায় জনতার সেবা করে চলতেন। এর পর একদিন রামবাগানের হেস্তাপন্নী অঞ্চল হতে তদন্ত সেবে এসে সময়বাবু তাঁর আঁকসের আসনে এসে গুম হয়ে বসে পড়লেন। প্রণববাবু সেই দিন নিকটেই বসে একটা জটিল মামলার ডায়েরী লিখছিলেন। সময় বাবুর দিকে লক্ষ্য পড়তেই তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকী ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। নিকটে এসে প্রণববাবু দেখতে পেলেন সময়বাবু ভারতীয় দণ্ডবিধির পাতা উন্টিয়ে—হত্যা সম্পর্কীয় আইনের ৩৩২ ধারাটি নিবন্ধি মনে পড়ে দেখছেন। এর পর অস্ত্র কেনেও খানায় বন্দী হবার জন্তে একটা লম্বাশস্ত্র লিখে তিনি প্রণব বাবুকে বলেছিলেন, একটা দশ টাকার নোট ধার দিতে। পারো ভাই? প্রণববাবুর জানা ছিল একাধারে 'কুক বা ভূতা' ভিথুরাম ছাড়া জিভবনে তাঁর আর কেউ নেই। তাই একটু আশ্চর্য্য হয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন, আজকেই তো সকলে আপনি মাইনে পেলেন। এর মধ্যে অস্ত্রগুলো টাকা কোথায় পাঠালেন? সময়বাবু তাঁর ঠোট দুটো আশ্রয় কামড়ে ধরে ধীরস্থির ভাবে প্রণববাবুর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, হুদির দোকানের মাসিক বেহর টাকা আর আমার চাকরটির মাইনে দিয়ে বাকি টাকাটা আমাদের পত্নীর কয়েকটা জনহিতকর কাজের জন্ত পাঠিয়ে দিয়েছি। তা' ছাড়া আমাদের দু'লিাবু বন্ধীদ্বিনের ছেলের অপারেশনের জন্ত আমার মাইনের বাকী টাকা একটু আগেই তাকে আমি দিয়ে দিয়েছি। সময় বাবুর কথায় প্রণববাবু সেদিন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। যে কথ ভাদের সকলের মিলিত ভাবে করা উচিত তা সময়বাবু একই করে

সন্ধ্যা। একটু অপ্রসন্ন হইয়া প্রণববাবু উৎকর্ণাৎ পকেট থেকে দুইখানা লম্বা টাকার মোটা টাকে বার করে দিয়েছিলেন। এই টাকা দিয়ে মদ কিনে সময়বাবু সেই দিন প্রথম তা পান করেন। সেই থেকে অধিকেষ্টেলে একটু আধটু তিনি খেয়েই চলেছেন। কিন্তু তাঁর ক্রিয়াজীবন মিত্র ছিল এতো পরিমায়ণ যে এই ভক্ত টাকে কখনও কেনই ভুগা করতে পারে নি। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কেউ তাঁর কাছ থেকে তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ জানতে পারেন নি। তবে সেই দিন থেকে সময়বাবু রামবাগান ও উৎসাহিত সেন্টাল এ্যাভিনিউ অঞ্চলের কোনও তলস্ত নিজে হাতে নিতে বাজী হন নি। তার পরিবর্তে এলাকার অন্তর্য তিনি বিশপ ত্রিশপ হামলা নিজে হাতে নিয়ে তাঁর সত্যীর্ষের ভারসূচ্য করেছেন।

সময়বাবু জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে না জানা জন্মের কোনও মীমাংসা আজও হয় নি—সেই না জানা তথ্যের কথা স্ট্রোমিকার সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চঠাৎ প্রণববাবুর স্মৃতিপথে উদ্ভিত হলো, সময় বাবু যে একজন জানী ও গুণী ব্যক্তি তাতে সন্দেহ ছিল না। সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় সময়বাবুর সুখ-নির্গত বহু বাণী স্মৃতিবাক্যের জায় প্রণববাবুরের ভবিষ্যৎ চরিত্র পঠনের কার্যে সহায়ক হয়েছে। এ কথা প্রণববাবুরা মুখে লাগলেও মনে মনে তা স্বীকার করে থাকেন। সময় বাবুর প্রতি তাঁর এই দিনের এই বিস্ময় বাহক্যের লজ্জিত হয়ে উঠে প্রণববাবু সময়বাবুকে বললেন, মাগ করবেন সময়বাবু? আমি মাত্র এই কথা বলছিলাম কি? এই গোলমালের সময় একটু সাবধানে থাকার ভালো। এখানার কাউও কোনও দোষ পেলে বড়সাহেব তাকে আর ছাড়বেন না। তবে মদ তো ধরে আবার অনেকে ছেড়ে দেয়।

এত দূর এগিয়ে এসে কাটা বড় শক্ত হবে প্রণববাবু। আমি ছাড়লেও মদ আমাকে ছাড়বে না। তুলে থাকবার জন্ত আরও কিছুটা পণ্য। তা'হলে আমাকে বেছে নিতে হবে, একটু স্নান হারি হেসে সময়বাবু উত্তর করলেন, আমার ছাত্রাবস্থায় আমার এক সহপাঠী ধনীও ছিল বড় ছিল। হঠাৎ সে একদিন মদ খরসো। মিন রাত ঘরে বসে সে শুধু মদ খায়। কাউর কোনও উপদেশ সে কোনও তুলে না। একদিন বাড়ীর লোক নাচার হয়ে তাদের কুলগুরুকে খবর পাঠালে। গুরুদেব এসে তাকে বহু বশীকরণ দিলে। পৃথিবীটা একটা ঘোঁকর টাটি ইত্যাদি চোখা চোখা বনজোলানা "কথা তিনি তাকে শুনাগেল। পরিণেয়ে তাদের বিকৃত হয়ে আমার বন্ধু গুরুদেবকে বললে বেশ আমি মদ ছাড়বো। আপনাকে এক সহস্র মুদ্রা প্রণামীও দেবো। আমার বাড়ীর লোকের বা আপনাকে দেবে তা বাদ দিয়ে এই মুদ্রা আপনি পাবেন। কিন্তু প্রণব দেওয়ার হবে এক সপ্তে এই যে আপনি সাত দিন এই ঘরে আমার জায়গার বসে আমার মত মদ পান করবেন। অতোগুলি মুদ্রার মোট পরিভ্যাপ না করতে পেরে গুরুদেব এই ভাবে মদ খেতে বাজী হয়েছিলেন। সেই দিন হতে আমার বন্ধু মদ আর একটুকুও খায় নি। কিন্তু কখনই যে তার গুরুদেব আঁড় পৰ্যন্ত ঐ অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। মদ খাওয়ার অভ্যাস এক এসে তা ছাড়া যায়। কিন্তু মোত অহমিকা বেননা, শোক বা ছাধের সঙ্গে

তা এলে তাকে ছাড়া শক্ত হয়ে পড়ে। মদ ছেড়ে দেবার মত মনের জোর আবার আছে। কিন্তু তা ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ভগ্নাভ্যাস, উদ্ভাঙ্গনা বা ভূত, এই তিনটির একটি বরণ করে নিতে হবে। তোমরা তা না চাইলেও আমাকে তাই একদিন বেছে নিতেও হবে। কিন্তু তার আগে বেঁচে থেকে আরি একটি মধ্যস্থত কাহিনীর শেষ দেখে বেতে চাই। তাই এখন এই মদ খাওয়াও আমি ছাড়তেও পারছি না।

উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হয়ে অপরাধীর মত এক রকম গিলে গিলেই সময় বাবুর কথাগুলি শুনিছিলেন। তাঁর এই সকল কথাই কোনও উত্তর কাউর মুখেই যোগাচ্ছিল না। এমন সময় সকলকে সচকিত করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন পার্শ্ববর্তী জোড়াবাগান খানার নূতন সেকেন্ড অফিসার হুশাভ বাবু। বিভাগীর বড় সাহেব মহীন্দ্রবাবু তাঁকে টেলফোনে ডেকে পাঠিয়ে একটা বিশেষ কাজের জন্ত তাঁকে এই খানার প্রণব বাবুর সঙ্গে সযোগে স্থাপন করবার জন্ত পাঠিয়েছেন। ঘরে ঢুকে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার সময় বাবুর মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন। তার পর রহমান সাহেব ও চিরঞ্জীব বাবুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সাহনের একখানা চেয়ার প্রণব বাবুর দিকে টেনে এনে একটু এদিক ওদিক চেয়ে উল্লসিত করতে করতে প্রণব বাবুকে বললে, এই এসে পড়লুম। এই দিক দিয়েই বাড়িলাম তাই। তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল, ভাই। এর পর সকলের দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে তিনি আবার বললেন, বাক তার পর আপনাদের সব খবর কি বলুন? একেবারে এখানে যে একটা জমাটি মিটিং বসিয়ে ফেলেছেন।

অতদিন প্রশান্ত বাবুর সাহচর্য রহমান সাহেব, চিরঞ্জীব বাবু ও প্রণব বাবুর কাম্য মনে হলো এইমনি এখানে তিনি হঠাৎ এসে পড়ায় তাঁরা একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাদের মনের মধ্যে কর্তব্যবোধ এবং বন্ধুত্ব ও তৎসহ আত্মগোষ্ঠার যেন একটা অস্তবোধ উপস্থিত হলো। সকলেরই মনে হলো আজকে তিনি চলে গেলেই ভালো হয়। তাঁরা ভাবছিলেন প্রশান্ত বাবুকে এখন তাঁরা কি বলবে। সচসা তাঁরা তাঁর প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁদের হয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন সময় বাবু। তার চোখ তুলে দুই হাতের মুঠি একবার মুখে নিয়ে সময় বাবু বলে উঠলেন, আরে! এতো ভণ্ডতা না করে সোজা কথা বললেই তো হয়? আসল কথা হচ্ছে বড় সাহেব দূত করে আপনাকে পাঠিয়েছে এখানকার খবর নিতে। এখন আপনার দরকার গোপনে প্রণব বাবুর সঙ্গে ছুটা কথা বলবার। বড় সাহেবের আত্মকুলো আপনি এই খানার প্রণব বাবু, রহমান সাহেব ও চিরঞ্জীব বাবু এক অন্তর্য খানার ওদের মত আশ্রয়বানী ছোঁকরা অফিসারদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। উদ্দেশ্য আপনাদের পুলিশের পুরানো বুককে কেঁটে দিয়ে ফিদের করে এখানে একটা নূতন বৃগের সৃষ্টি করে সমতার আশু সমাধান করা। আমি অসহ্য আপনাদের নবীনপন্থী ও প্রাচীনপন্থীদের মধ্যবর্তী মধ্যপন্থীর লোক। এই ভক্ত আমতা এই উত্তর পছন্দেই চক্কুল। উত্তর দলেরই অত্যাচার আমার যেনম মুখ বুজে সহ্য করি তেমনি উত্তরকে উত্তরের কল্লরোধ থেকে আমতা বন্ধা করি। তা আমাকে না হয় আপনি বিশ্বাস করতে মতি পারলেন। কিন্তু আপনার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে চিরঞ্জীব বাবু ও রহমান

সাহেবকেও এখনি আপনাদের মনের কথা আপনি বলতে বেন নাযাক। আপনি এখন বাবুকে নিযুক্ত ডেকে নিয়ে নিজের মনের কথা বলতেও পারছেন না। আমাদের এখানে চলে যেতে বলবারও আপনাদের সাহস নেই। প্রাচীনপন্থীদের মত আপনাদের পদস্পর্শ পরস্পরকে বিশ্বাস করতেও পারেন না। তাঁদের মত আপনাদের ছোঁসও স্পর্শও চলবে নেই। পুলিশকে রক্ষা করতে বত আপনাদের চান তার চেয়ে অধিক পরিমাণে চান আপনাদের বড় সাহেবকে খুশী করতে। তাও আপনাদের পৃথক পৃথক ভাবে একে অপরের অভ্যাসে একের সঙ্গে অপর পাড়া দিয়ে করে থাকেন। আপনাদের ভয়েকজনের মধ্যে যে আঁতার কারোই চলাছে তার যে খবর আমি জানি তা নয়। আপনাদের উপর এ বিষয়ে আমার যে একেবারে দৃষ্টিভঙ্গি নেই তাও নয়। তবু আমি বলবো, এই যে এই সব চক্র কাছে ভাত বেগুনার আগে নিজেদের চরিত্রের সব দিকটা সমান ভাবে গড়ে নিতে হবে। মনে রাখবেন যে একটা অভ্যাস দিয়ে অপর একটা অভ্যাসকে কখনও ঠেকানো যায় না।

বড়সাহেবের বলে বলীমান সুলভ বাবু এতোকণ দাঁতে দাঁত দিয়ে সময় বাবু কথাগুলি হজম করে বাচ্ছিলেন। ঠিক এই সময় বড় বাবু এসে স্ত্রীজার সিপাহীকে ডিজাসা করলেন 'বাহারকো কোহি আদমী ইহাশরি আরে যে?' প্রত্যুত্তরে একটা সেলাম কুঁকে সিপাহীজী উত্তর দিয়ে 'মোসরী কোহী ইহাশরি নেহী আয়া। লেকেন জোড়াবাগান ধানকে সিকিও অকসার সুলভ বাবু অফিসকো অন্দরমে বৈঠকে বাতচিত্ত করতা ছার।' সিপাহীর এই শেষ জবাবে হুণ বৈকিরে

বড় বাবু এখন বাবুদের ঘরের পর্দার আড়ালে এসে কিছুক্ষণের জন্যে গাড়ােলেন। তারপর সময় বাবু এই নাতিনীর্ষ বহুটাটি পেরে হওয়া যাত্র তিনি ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন, 'এই যে সুলভ যে। তা কতকণ? শুনেছি আমি কিছুটা আড়াল থেকে। তা'র ঠিকই বলেছে। এখানে এখানে পারচেনে করলেন কতটা? আর সে' করলেই বা কতোখানি? তা বাবু স্পাইসিরী করে কি আর পুলিশকে রক্ষা করা যায়?

হিঃ হিঃ হিঃ! একি আপনি বলছেন স্ত্রীর! আমি এরমিই এসেছিলাম এটিকে, তাই প্রণবের সঙ্গে একবার দেখা করে সেলার, সুলভ বাবু সঙ্কতিত ভাবে উত্তর করলেন, 'আপনি মিছামিছি আমাকে সলোহ করছেন। আপনি এখন বাবুর মত আমাকেও বিশ্বাস করতে পারেন। এখন বাবুর মতই আমিও আপনাদের একজন অঙ্গুত অফিসার, স্ত্রীর।'

'তাই নাকি?' প্রত্যুত্তরে ক্রু কুঁকে বড়বাবু বললেন তা করে আসছো এই ধানার ভাব নিতে? একি বলছেন আপনি, স্ত্রীর? এ ধানার ভাব নোবো মানে? সুলভ বাবু যেন চমকে উঠে বলে উঠলেন, 'আপনি তো, স্ত্রীর, আছেন এখানে।

গ্যা! আহি তো আমি এখানে। তবে কতদিন থাকবো তা জানি না, বড় বাবু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাকে উপবেশন করতে করতে বললেন, 'কিন্তু তুমি এতে অবাধ চলো কেন? এই একটু আগে তো বড় সাহেব তোমাকে ডিজাসা করছিলেন, 'কি সুলভ! স্ত্রীর বাবুকে বলে দিয়ে তুমি জোড়াসাঁকে।

স্পেশাল সিওর গ্রিপ

এই ট্রাক্টর টায়ারে বাবু টাইপ (মার্টিন লেগ) ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেড ও গ্রেডার টাইপ লাগ রয়েছে আর এগুলি দু'রকম উদ্দেশ্যই সাধন করে—দুর্গম সড়ক ও রাস্তার বাইরের জমিতে অতি অনায়াসে চলাচল করে। যেসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট মাটি আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন বেশী সেসব ক্ষেত্রে এগুলি খুবই লাভজনক।

লাভের ক্ষেত্র

সুপার সিওর গ্রিপ

কলার-স্ট্রেট বার-লাগ আছে বলে এই ট্রাক্টর টায়ারে আকর্ষণ ক্ষমতা বেশী হয়। এতে গভীর ভাবে মাটি আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা। সুপার ওয়েজ-গ্রিপের ব্যবস্থা রয়েছে আর এর ট্রেড আপনা-আপনি পরিষ্কার হয়ে যায় বলে অতিরিক্ত কয় বন্ধ হয়।



১৯৩৩ ২৪

৩৮. ৩৯. ৪০. ৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০. ৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০. ৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০. ৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০. ৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০. ৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.

খান চালাতে পারবে তো ? আর তুমি তাঁকে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিয়ে এসে, যা স্ত্রীর 'নিশ্চরই পারবো'। তা শুনে তুমি কোনও অশ্রদ্ধা করে নি। তুমি অশ্রদ্ধা করেছো এই আমার ও তোমার মজুদের কাছে মিথ্যা কথা বলে। এই মিথ্যা কথা তুমি আশ্রয়কার্যে যা নিজের বা আর কাউর উপকারের জন্যও বলে নি। সেই জন্য একে আমি প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা কথাই বলে অভিহিত করবো। তুমি নিশ্চরই লজ্জা করেছিলে যে, ওখানে একজন বাউরের লোকও উপস্থিত ছিল। তোমার চরিত্রের সঙ্গে সেই বাউরের লোকটির চরিত্রের আমি কোনও তফাৎ দেখছি না। তবু সে আমার কাছে এসে প্ররোচিতভাবে সত্য কথা বলে গেছে। আর তুমি বিনা কারণে প্ররোচিতভাবে এসেছো মিথ্যা বলে যাচ্ছে। আরওও অসত্য মিথ্যা কথা প্ররোজন করে বসি। কিন্তু তা বলে আমরা প্ররোজন কাউর সঙ্গে করি না। এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমার প্ররোজন কোনও উদ্ভব না দিয়ে তোমার হৃদয় করে থাকা উচিত ছিল। আগে তোমরা নিজস্বের ক্যারেকটার বাস্তবতাকে বলে চরিত্র তা গঠন করে। তার পর তোমাদের এই তথাকথিত বিকর্মের কাজে হাত দিতে যেও। এই ডিপার্টমেন্টের আমি বড় সিনের লোক। তোমাদের বড়সারদের পিতাও এখানে বড়সারেরী করে রিটারির করেছেন। আমি তাঁর কাছের কিছুদিন কাজ করেছি। আমি তোমারও বাবার সঙ্গে একত্রে ফেরা ছলে কিছুকাল পড়তে গিয়েছি। সঙ্গের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা তোমাদের চেয়ে বেশীত হবে। আজ পর্যন্ত এই শহরে বা কিছু পরিবর্তন আমি দেখেছি তা যুগ বা সময় করেছে। এই সব ভালো বা মন্দ পরিবর্তন কোনও মানুষের দ্বারা হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের মাধ্যমে যুগ বা সময়ই তাদের করণীয় কার্য করে দিয়েছে। এই খানার এলাকায় ৩১০ জন পুরাতন দাসী চোর বাস করে। তাদের মধ্যে আবার ৩০৭ জন বা ৭ গৃহে ভাঙিয থাকে। তুমি কি মনে করো একদিনেই শুধু শাসন দ্বারা এই সব চোরদের ও এখানকার অগণিত বেজানারীদের তাদের স্বার্থ থেকে তাদের বিরত করবে ? তোমরা বা ভালো মনে করো তা তারা ভালো মনে করে না। কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তা তাদের বোঝাবার মত তোমাদের মৈথ্য নয় বা সুবিধেও নাই। যে চোর সে চুরি করবেই, মাতাল মদ খাবেই, বেজা বেজাবুতি করবেই, জুয়াড়ী জুয়া খেলবেই। এখান দেখতে হবে শুধু নতুন কোনও জুয়াড়ী, বেজা, চোর বা মাতালের সৃষ্টি না হয়। নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে মদ হবার সুযোগ ও সুবিধা নষ্ট করে তবে এ বিষয়ে তোমরা সফল হতে পারো। অজ্ঞাধার তোমরা শুধু এদের এক স্থান হতে অপর এক স্থানে সাময়িকভাবে শুধু তাড়িয়ে দিতে পারো। কিন্তু এতে মূল সমস্যার কোনও দিনই সমাধান হবে না। আমি প্রণবশাস্ত্রেরও এই কথাই বার বার বুঝতে চেয়েছি।

সুশাস্ত্রবান্ধু বুদ্ধিছিলেন যে আজ আর তাঁর এখানে কোনও কাজ হবে না। তাই একটু কিছু কিছু করে তিনি বললেন, স্ত্রীর আজকে তাহলে উঠি। বড়বাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে সুশাস্ত্র বাবু এবার সবে পড়বার প্রবৃত্তি করছেন। তিনি এইবার একটু স্নেহের স্বরে বললেন, আরো, বসো বসো। হঠাৎ এতো লজ্জা কেন ? এসেছো এখন একটু গাটা খেয়ে বাও। এই ডিপার্টমেন্টে আমাদের আর ক'দিন। তোমারাই তো এবার কাজকর্ম বুঝে নেবে।

এর পর বড়বাবু নরনার সিপাহীর উল্লেখ করে উঠে বললেন, এই সিপাহীর ভাই। খোঁজা লসী উপী কি চা'উ তো ভাই মজাও। বড়বাবুর গলার স্বর কানে যেতেই নরনার সিপাহী এগিয়ে এসে সেলাম করে বললো, ভী হজুর। আজি মাজারে সেতা—

চা পান করে সুশাস্ত্রবাবু বিলম্ব নেওয়া মাত্র সকলে বেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সবাই এবার নিনিমেধ নয়নে শুধু বড়বাবুর দিকে চেয়ে থাকে। তাঁরা সকলেই ভুলতে চান তাঁর মুখে একটু স্বপ্নের। কিন্তু বড়বাবু কোনও কথা না বলার প্রণব বাবুকেই প্রথমে কথাটি পাড়তে হলো। একটু ইতস্তত করে প্রণব বাবু বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলো, বড় সাহেবের বাড়ীতে গিয়েছিলেন স্ত্রীর ?

হাঁ ভাই গিয়েছিলাম। কিন্তু সুবিধে হলো না। তত্বলোকের শুধু লম্বা লম্বা কথা। মনে করছেন এতদিন পরে হাতী থাকে পড়তে, জু হুটো বাবু হুটু হুটু করে নিয়ে বড় বাবু উত্তর করলেন, তত্বলোক বলেন কিনা আমি ডিসলুয়েট ও বৃহৎধার। আমিও দিয়ে এলাম ছ'কথা গুনিয়ে। বাবার আগে একটু যৌতাত করে গিয়েছিলাম। তাই বলতে কিছু মুখে বাধে নি।

কি বললেন স্ত্রীর, আপনি, ব্যস্ত ভাবে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, যগড়া টগড়া করে আসেন নি তো ?

আরে ওপরের সাজ যগড়া করে কি আর পাওয়া যায় ? উত্তরে প্রসন্ন মনে বড় বাবু বললেন, আমি শুধু তাঁকে মনে মনে বলে এলাম, 'মশাই'। আপনাদের বাবা হু'থ খেয়ে অনেক টাকা বেখে গেছেন। তাই তাঁর ছেলে আপনি আজ হতে পেরেছেন অনেক। এখান আমি যদি এট ভাবে কিছু টাকা রাখতে পারি তা'হলে আমার ভেলেও ঠর মত অনেক অফিসারই হবে। হ'। শাস্তিভাঙ্গা বোডের বাড়ীখানা ওঁদের কি ভাবে তৈরি হলো তা কে না জানে ? আমিই ওব লজ কতো ইট যোগাড় করে দিয়েছি। ছাত্রাবস্থায় রকে পাঁড়িয়ে পাঁড়িয়ে শু উনি দেখতেন। এখান সব ভুলে শুনে কই উত্তরাধিকারী হচ্ছে পাণ্ডা বাড়ীখানার জন্তে তো উনি না দাবী দিচ্ছেন না ? একে তো অনেক বলা যায় না ? বরং একে আশ্ব প্রবন্ধনা বলা যেতে পারে। বাক, আমি অল্প এক ব্যবস্থা করে এসেছি।

'কিন্তু স্ত্রীর, প্রণব বাবু এইবার বললেন, 'ডেপুটি সাহেব যে আপনাকে ছ'দুবার খুঁজিয়েছেন'। 'তা আমি জানি', বড় হেসে বড়বাবু উত্তর করলেন, 'আমি একজায়গা থেকে ফোনে ঠর সঙ্গে কথা করে নিয়েছি। মটু মল্লিক তাদের বাড়ীতে কাল মাজে ঠকে নিমন্ত্রণ করেছে। তাই উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন সেখানে তাঁর বাওয়া উচিত হতে কিনা। আরে মটু মল্লিকের মাঝখ ওখানে তাঁর নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা তো আমিই করিয়ে এলাম। তিনি যে আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চেয়েছেন সে খবর আমি ঠিক সংগ্রেই পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই এক জায়গা থেকে কোন করে তাঁকে আমি বলে দিলাম 'নিশ্চরই সেখানে যেতে পারবেন স্ত্রীর। লোক ওরা খুব ভালো। আমিও গেটে আপনাদের জন্তে অপেক্ষা করবো এখন। এখান দেখা তো বাক কি হয়। এতে সুবিধা না হলে পরে অল্প আর একটা ব্যবস্থা করা হবে আশুন, দেখ তো থামকা একটা বেহিসেরী মিথ্যা কথা বলার জন্য কি যে গেরো পোয়াতে হচ্ছে। একেই না বলে আর বাঁড় ওঁতবি আর। এ বেন বাঁড়কে ডেকে ওঁতাবার বন্দোবস্ত করা হলো। [অবসর।

“সোমবারে লোকসভার সংস্থান সংশোধনের জন্য উপস্থিত বিলটি বিবচনার প্রস্তাবের উপর ভোটগ্রহণের অন্তিমপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছে। সংস্থান সংশোধনের প্রস্তাব পাশ করাটীবার জন্য যে বিশেষ বিধি আছে সে-তত্ত্বাবধি প্রথমত উপস্থিত সমস্তগণের মোট সংখ্যাও ৩ অংশের ভোট চাই এবং সেই সঙ্গে লোকসভার মোট সমস্তসংখ্যাও সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্থান চাই। লোকসভার মোট সমস্তসংখ্যা ৫০৫, তাহাটী বিশেষ বিধির দ্বিতীয় নির্দেশ অনুসারে সংস্থান সংশোধনের অধিক ২৫০টী ভোট প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে গণনার দেখা যায়, সংশোধন প্রস্তাবের অধিক ২৪২ জন সমস্তের ভোট পড়িয়াছে। স্বয়ং স্বাধীশ্রমী যে বিল উপস্থান করিয়াছেন লোকসভার কংগ্রেসের নিবন্ধন সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে সে বিল প্রয়োজনীয় ভোটের সমর্থন পাটল না। ইহা কেবল অভূতপূর্ব নয়, অন্যতম বিষয়ের বিষয়। এক্ষণ ঘটনার জন্য শেষ কভার স্বাক্ষরটী সে প্রায় উদ্বিগ্নহে। লোকসভার কংগ্রেস সমস্তগণ সংস্থান সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধী নিশ্চয়ই নহেন। লোকসভার কোন কোন কংগ্রেস সমস্ত অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভোট দিবার স্বত্বক্রির মধ্যে তাঁহাদের কোন বৈধতা হয় নাই। অর্থাৎ নিষাক ছাটীয়াছে স্বত্বক্রির ব্যস্তের নিষ্ক্রিয়তা। বেচারী স্বত্ব উপর দোষ চাপাইয়া কিন্তু এই অভিনব পরিস্থিতির কারণ নির্ণয় করা যায় নাই। দেখা গেল, স্বত্বক্রির ব্যস্ত মাত্র তখন সমস্তের ভোট বৈধতা করিতে গোমাল হইয়াছে। এই ছুটি ভোট যোগ দিলেও বিশেষ বিধান অনুযায়ী প্রস্তাব গৃহীত হইত না। স্বস্ত্রের ক্রটি নহে, কংগ্রেস-সমস্তগণ প্রয়োজনমত অর্থাৎ সংখ্যার ভোট দিবার সময়ে লোকসভার উপস্থিত হন নাই। অর্থাৎ লোকসভার অনেক সমস্ত এইভাবে তাঁকদের কর্তব্য অবহেলা করিয়াছেন। কংগ্রেস দলকেই কিছুসংখ্যক সমস্তের অনুপস্থিতির ফলে স্বাধীশ্রমী অপদায় হইয়াছেন, ইহা অন্যতম সত্যের কথা এবং ইহা দ্বারা দলীয় শৃঙ্খলার অভাবও বুঝিত হইয়াছে।” —আনন্দবাবুর পরিচয়।

আজগুণী খবর

‘চীন-ভারত সীমান্তে ম্যাকমোহন লাইন ঘরাবর চীনা কোঁজ হাইন পাতিয়াছে এবং শুধু পাতে নাই, ইতিমধ্যেই মাইন বিকোরণের কসে বহু লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া কোন কোন ‘জাতীয়তাবাদী’ পত্রিকার ক্লাণ্ড করিয়া স্ববাদ প্রকাশিত হওয়ার প্রকাশ মন্ত্রী নেহরু তাক্ষব বনিয়া গিয়াছেন। লোকসভার তিনি কথারি বলিয়াও ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তাক্ষব বনিবার কারণ আমরা বুঝিয়া পাইলাম না। ইতিমধ্যেই এই ধরনের ‘জাতীয়তাবাদী’ পত্রিকা ‘ভিভান এক্সপ্রেস’-এ প্রকাশিত কামউনিট পাটির পচ্চিন্নরক কমিটি, মাদ্রাসা কংগ্রেসীয় ব্লক ও সোভালিটি টিউনিটি সেটায়ের ব্লক উভয়গে অঙ্গীকৃত সমাবেশ ও মিছিল সম্পর্কে একটি সর্টব বিধা ও ভিত্তিটান রিপোর্ট একেবারে খাটি বেসবাকোর মত বিশ্বাস করিয়া প্রধানমন্ত্রী কামউনিট পাটির উপর গায়ের খাল খাড়িয়া লইয়াছেন। তবু প্রধানমন্ত্রী নেহরু মন্তব্যে ‘জাতীয়তাবাদী’ সংবাদ-পত্রগুলি কিছুটা বিব্রত বোধ করিতেছেন, বোধ হয় রুটও হইয়াছেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে দাবাইবার এক কমিউনিষ্ট চীনকে জব করিবার ভঙই তাঁহাদের মোটা মজিনার স্তম্ভিত ভূতাব্দ মাত্রি জাগিয়া কত পরিশ্রমে বোমতর্কক সংবাদ বানাইয়া দিতেছে, তবু নেহরু একেবারে লোকসভার কথারি কাস করিয়া দিলেন।”

—স্বাধীনতা।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

‘বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর হইতে মেসিনীপুরবাসীরা বাহির হইয়া আসিয়াছেন, এই বৃহৎ জেলার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ রক্ষা পাইয়াছে। উত্তরপাড়া আশ্রিত করিয়াছে, কিন্তু কল হয় নাই, ভায় কারণ মেসিনীপুর কোমরে যে কোর নিয়া প্রতীবাদ জানাইয়াছে জাব কেহ তাহা পারে নাই। বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় বাহুরী, কিন্তু উহার আইন যে ভাবে কয়েকটি ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার মতলবে স্টিত হইয়াছে তাহাতে উহার বিলুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র এবং কঠোর প্রতীবাদ বর্ধমান হইতেই আসা উচিত ছিল। কতকগুলি প্রোফাইড কেহাণী এবং কতকগুলি কারখানার জুম্ব বরদার একটা ‘বিশ্ববিদ্যালয় চালাইবে, এত বড় খুঁজুনোচিঙ কল্পনা ভা: বিধান রায় করিতে পারেন, কিন্তু হগলী, বর্ধমান, বীরভূম, ঝিকুড়া, পুকুরিয়া তাহা সহ করিবে কেন? একটা বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র একটি টেকনিক্যাল স্কুল নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্সেসই তার কাজ থাকিবে অধ্যাপনা এবং গবেষণা। উহা চালাইবে কয়েকটি কারখানার ম্যানেজার এবং সরকারী সেক্রেটারী হসানোচ গুটি-কয়েক ধামাধরা অধ্যক্ষ? ডেপুটিকাসির চাপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতি দেখিয়া উহা বাদ দেওয়াই যদি বিদ্ব হইল তবে এই ধরনের এক উক্ট বন্ধ খাড়া না করিয়া সর দক্ষিণ গঙ্গার প্রবীত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি অঙ্গুরণ করিলেই হইত? সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় কিঞ্চ হয় তাহা তো বিশ্বভারতীতেও দেখা বাইতেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আইনের

পরিমানে ইলেকটিক ট্রেন টপা চলিবে ইহা আরবা দিয়া চক দেখিতেছি। এখন কলিকাতার হেলেরা মকবল কসজে পড়িতে বার, তখন মকবলের হেলেরা কলিকাতার আসিবে। কলিকাতার ডিউ আরও বাড়িবে। একটা কথা, এই জাতীয় ভক্তায়জনক একটা বিশ্ববিদ্যালয় বিল সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাটল কমিশনের কি কোন বক্তব্য নাই? একজন জমিদারের বাড়ী কেনা এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এসের চাকুরি সংস্থানের জন্য একটা গোটা ডিভিসনের জেলেঘেরেরে সর্বসম্পন্ন করিতে হইবে? বিশ্ববিদ্যালয় হটক, কিন্তু ভাড়া মার্টিন কোম্পানীর ভ্রাক কারখানা (জুতপূর্ব আই, সি, এসের ম্যানেজারিতে) কেন হইবে?”

—বুলাখী (কলিকাতা)

দারিদ্র্য

‘জান্ন দলের নিশান উড়াইয়া জনসেবার স্বতী হইতে দেখিলে আমরা বেদনা বোধ করি এতভক্ত যে, প্রেক্ষাপক্ষে ইটা দলের সেবা না জনসেবা। দলে বিভক্ত দেশে জনসাধারণের তাই মোটেই ভরসা নাই। আমরা বিশ্বস্ত হই এই ভক্ত যে, তুর্গত ভ্রম্ব জনসাধারণকে যে দুটি লটকা দেখা প্রয়োজন সেই দুটি আমাদের উচ্চ মহলে আদৌ নাই। তাই মনে হয় বত কথা, বত বড় যড় বুলি সমস্তই ঝাঁকা ও অসার। দেশের দারিদ্র্য দূর না হইলে এবং যে দারিদ্র্য দুর্নিবার গতিতে চলিয়াছে তাহা বন্ধ না হইলে আমরা দেশের কোন ভরসা দেখিতে পাই না। বিশ্বস্ত হই ইটা দেখিয়া যে, সামান্য পরিশ্রম, সামান্য ব্যবস্থা, দুটিভাজির সামান্য অমল বচল করিতে পারিলে যেখানে বহুলোকের কল্যাণ করিতে পারা যায় সেখানেও ইহার অভাবে কিছুই হয় না। কল্যাণজনক ব্যবস্থা চোখের সম্মুখে বার্থ হইতে দেখা যায়। এই বার্থতার গ্লানি সারা দেশকে বহিতে হয়। এই যে গ্লানিময় অবস্থা ইহা দিন দিনই বাড়িয়া বাইতেছে। এই দেখে ধনী ও দরজ্ঞ সকলেরই দেশ। ধনের প্রাবল্যে সর্বপ্রাণের স্পর্শ হা দেশে কি পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা সামান্য লক্ষ্য করিলেই বেশ ও বেশবাসীর দারিদ্র্যের কারণ অবগত হওয়া যায়।”

—ত্রিশ্রোতা (জলপাইগুড়ি)

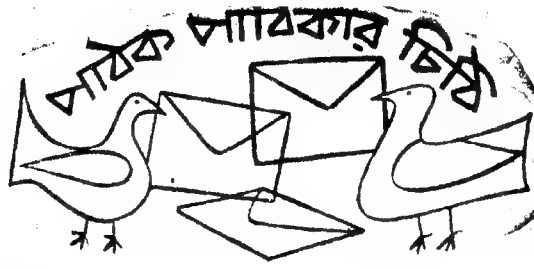
শোক-স্ববাদ

নিরঞ্জন পাল

যনবী রাষ্ট্রনেতা স্বর্গত বিগিনচন্দ্র পাল মহোদয়ের পুত্র ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের বিরাট পুরুষ নিরঞ্জন পাল গত ২২শে কাশিক ৭০ বছর বয়সে বোম্বাইতে পরলোকগত হয়েছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতের পুষ্টির ইতিহাসে এর অবদান অবিমরণীয়। চিত্রনির্মাণ হিসেবে ভারতীয় ছাত্রাছবির মনোমুগ্ধনে ইনি যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রায় আশিযুগ থেকে ইনি তার সঙ্গে জড়িত থাকায় চলচ্চিত্রলোক নানাভাবে তাঁর খারা উপভূত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে চলচ্চিত্রজগতের এক বিরাট অভাব ঘটল।

সম্পাদক—প্রোগ্রামেডার খটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিশিষ্টবাহারী গারলস ট্রিট, “বন্ধুসভা রোটারী ক্লাবে” প্রচারিত হইয়াছে।



পত্রিকা সমালোচনা

মাননীয় মহাশয়, আপনার সুসম্পাদিত মাসিক বসুমতী বর্তমানে বাংলার সর্কশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা, এ বিষয় সন্দেহ নাই। ইহার আরও জীবন্তি কামনা করি এবং আশা করি অধিক ভবিষ্যতে তা দেখে যেতে পারবো। তবে একটি জিনিষ আমার প্রায়ই মনে হয়। বহু শব্দের গুণীজন আমাদের দেশে ভ্রমগ্রহণ করেছেন কিন্তু বর্তমানে তাঁদের ন্যায়ের সঙ্গেও অনেকের পরিচয় নেই। বিশেষত ছোটদের সেটা একান্ত দরকার বলে আমার মনে হয়। ছোটদের আসরে এটাকে একটা নিয়মিত প্রবন্ধে প্রচার করা উচিত। প্রতি মাসে বিভিন্ন মনীষীর ভাবনী প্রকাশিত হলে দেশের উপকার হয় বলে আমার বিশ্বাস। যেমন জীবিতদের নিয়ে 'চাবস্তন' গায়ক বালক নর্তককে 'নয়ে 'আমার কথা', যেমনি ছোটদের আসরে বাংলার মনীষীদের একটা বেখাচিত্র বুদ্ধিত হওয়া আবশ্যিক। তাঁদের কণ্ঠের জীবন থেকে ছোটরা রস রূপ গন্ধ আহরণ করে গড়ে উঠুক, ইহাই আজ সর্বোচ্চ তামনা। আপনার পত্রিকার প্রবন্ধগুলি অভ্যস্ত উৎকৃষ্ট, এমনি প্রবন্ধ আরও প্রকাশ করলে সাধারণের মমনীলতা বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যে প্রবন্ধগুলি বেয়েয় সেগুলিও অত্যন্ত বড় সহকারে লেখা। শব্দ জিনিষকে সহজে বুঝাবার একটা চেষ্টা আছে আর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। বিজ্ঞানবাহী সভাই আমাদের আগ্রহের। নার্স-গান-বাক্তনার মধ্যে সুরের অনুবরণ একটু কম মনে হচ্ছে। আগের মত সতেজ বন্ধার বেনে আর পাইনা। 'চার জন' আরও সুচিন্তিত হওয়া উচিত নয় কি? শিশির বাবু সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ইচ্ছা করি। ঐ চুক্তিটাকিতে মন ভরে না। আপনার পত্রিকার একটি অমুদ্রাগী পঠক বলে সমালোচনা করলাম। যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তো মাার্জনা করবেন। আমার সর্কশেব কথটি জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আমার মনে হয়, বায়বাহিক লেখা নেবার সময় কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার একটা চুক্তি থাকা উচিত। কেন না প্রায়ই দেখা যায় নুত্ন জিনিষটি ক্রমশঃ ধাক্কা সামলিয়ে আর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। ইন্দ্রনাথ মিত্র,—মাদ্রাজ।

মাসিক বসুমতী আমার আন্ত আপনজন। তার প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে আছে মূল্যবান সাহিত্য সঙ্গ্রহ আর উৎকৃষ্ট রচনাসম্ভার। অসীম আপনার বৈদ্য, জিহ্বাচির লোকের ভিত্তে এত বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা চকন করা বোধ করি সম্ভাব্য পরিজ্ঞয়ের কাঁধ নয়। আমার মনে হয়, বর্তমানে বাঙালি উপভাসের অন্ধকার না হোক প্রাধিকারক যুগ চলছে। কেন না, সুচিন্তিত ও সম্পূর্ণ উপভাস আর সমাচর চোখে

পড়ে না, যদিও বা পড়ে তো কেন জানি না দেশী বিদেশী অস্ত্র কোন একটি উপভাসের সঙ্গে সাদৃশ্য আঁত সহজেই মনে আসে। অবশ্য এই ব্যতিক্রমও আছে। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত উপভাসশ্রেণীর মধ্যে এই ব্যতিক্রমটাই বৈধি চোখে পড়ে। তবে এখানে একটি কথা না বলে পারছি না—আপনার লেখকশ্রেণীর মধ্যে মৌলিকত্ব বুদ্ধিটি সৌন্দর্যবোধ আর বস্তুবান ভণ্ডী বখেই পরিমাণে থাকলেও লেই ধামায় মাত্রাজ্ঞান। মানুষের জীবন অশেষ, কারণ এক বায় এক আসে। স্বাকার করছি মানুষের জীবনের অমূল্যপি হচ্ছে সাহিত্য কিন্তু তার ধারাবাহিকতার সীমা আছে। সে সীমাবোধ বীর বত নুত্ন তাঁর লেখা তত রসোত্তীর্ণ। খামতে জানাই কেশব শেব জানা। সব নাম না করলেও আপনার দীর্ঘমেয়াদী কেশবগুলির মধ্যে থেকে আমার বস্তুবোধ উদ্ভবের চিনে নিতে নিশ্চয় আপনার অনুবিধা হবে না। বিপ্লবের সম্মানে, শিশির সান্নিধ্যে, অথও অমির জীর্ঘোবাক্ত খুব ভালো লাগে। ছোট ছোট গল্প বা রচনাগুলি বাদ্যবনকে বাদ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভাল থাকে সাধারণতঃ। বিদেশীনা আমাদের মন হরণ করেছে তবে একটু বিলাসিত লয়। বর্তমানের সর্কশ্রেষ্ঠ রচনা 'চল্লা তার নাম' সম্পর্কে কিছু লিখব না। 'ভালো লাগে চমৎকার', একথাগুলো ভালো লাগছে যেন; তাই বলার বাইরেই বাখলাম ওটা। ভালো ও বিখ্যাত সাহিত্যের শুভবাদ পড়তে খুব ভালো লাগে কিন্তু প্রায়ই নীরস বোধ হয়। ভালো একটা আন্ত ককন না? চিত্রসমালোচনাটা বন্ধ করলেন কেন, শুধু গল্পটাকে কি সমালোচনা বলে? ঐ সঙ্গে বিদেশী বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের শিল্পী-জীবন। রম্য রচনা ও ভ্রমণ-কাহিনীর স্থান শূন্য আর কতদিন থাকবে? রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রভৃতির সাহিত্যের যে সমালোচনা মাঝে মাঝে সেগুলি খুব ভালো লাগে। ঐ রকম সাহিত্য আলোচনার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথার আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। ইতি—ভবদীয়া প্রকৃতি রায়, মুম্বের।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

বহাশয়,

বিশেষ কারণে ও ইচ্ছার তাগিদে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। মাসিক বসুমতী—আমার প্রিয় পত্রিকা। গত চার মাস যাবৎ মাসিক বসুমতীর সম্পূর্ণ আসতে পারিনি। কারণ চার মাস হোল ভ্রমরভবের মাটি ছেড়ে বিদেশে এসেছি। নানান প্রবল চিন্তার পর অবশেষে মনস্থির করে আপনাকে চিঠি লিখছি।

মাসিক বসুমতীকে আমি গত চার মাস থেকে ডোবে বেধার সৌভাগ্য লাভ করিনি—যখন আমি নিয়মিত পাঠিকা। বাই হোক আমি পুনরায় শুধু নিয়মিত পাঠিকা নয়, গ্রাহিকা হতে চাই। গত বৈশাখ মাস থেকে সম্পূর্ণ বছর গ্রাহিকা হতে হলে আমাকে কত টাকা দিতে হবে জানালে বিশেষ বাধ্যতা হবে। বার্ষিক টাঙ্গাটি আমাকে পাউণ্ড শিলিং পেন্ডের হিসেবে জানাবেন। আমি সেইমত এখন থেকে মনিঅর্ডার করবো। সম্পূর্ণ বছরের টাঙ্গার সাথে গত শারদায়া সংখ্যারও নামটা বোগ করে দিতে ভুলবেন না। রেজিস্ট্রী ডাকযোগে পাঠালেই ভাল হয়। আপনার কাজের ভেঁড়ে আশা করছি আমার মাসিক বসুমতীর পাউণ্ড শিলিং পেন্ডের হিসাবটা হারিয়ে যাবে না। অত্যন্ত উৎসাহে আপনার চিঠির আশায় থাকলাম। আপনার চিঠির উত্তর পেলে আমি আগামী ডিসেম্বরের প্রথমে আপনাকে সম্পূর্ণ টাঙ্গা পাঠিয়ে দেবো। আমার সম্ভব নমস্তার জানবেন ও অভ্যর্থনা করিসৌজীকে জানাবেন।—Mrs. Anjana Lahiri, 8, Castellain Road, Maida-Vale, London W-9 U. K.

করা করে আপনার মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টাঙ্গা Air Mail সহ কত জানালে উপকৃত হবে। উত্তর পেলে এক বৎসরের টাঙ্গা আমি M. O. করে পাঠিয়ে দেবো।—Amal Kumar Sinha, Tavilon Street, London.

মাসিক বসুমতীর ১৩৬৬ সালের কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত ৬ মাসের টাঙ্গা বাবদ ৭১০ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—অশিমা রায়, হাজারিবাগ।

Subscription to Monthly Magazine sent herewith.—Janakinath Mitra, Balasore.

এই সঙ্গে মাসিক বসুমতীর জন্য এক বৎসরের টাঙ্গা পাঠাইলাম।—Saumya Nandi, Digboi, Assam.

I have remitted by M. O. Rs. 15/- being the advance subscription for M. Basumati for one year. If copy of Aswin is not available, you may

send from the month of Kartick.—Sm. Suparna Devi, Saharanpur.

আমি আপনার মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হইতে চাই। সমস্ত নিয়মাদি সখর জানাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীরাধেন্দ্রনারায়ণ দাস-মণ্ডল, মেদিনীপুর।

আমি মাসের বসুমতী ডি. পি. পিতে পাঠাইবেন। পাইবার পর পরবর্ত্তী ৬ মাসের গ্রাহক হইবার টাকা মণি অর্ডারে পাঠাইব।—শ্রীএম. সি. গুহ, Hirakud Colony, Sambalpur.

আমেরিকাতে বাস করছেন আমার এমন এক বন্ধুকে মাসিক বসুমতী পাঠাতে চাই Sea Mail, Book Post ডাকের ব্যবস্থা ও পত্রিকার মূল্যসহ বার্ষিক টাঙ্গা কত পড়ে, জানালে খুবই বাধিত হবে।—রত্নজিৎকুমার দত্ত, Calcutta.

I want to be a regular subscriber of your monthly Basumati. Please let me know the subscription rate of the periodical.—Ram Chandra Das, Keonjhar.

আমি আপনার মাসিক বসুমতী কার্তিক মাস থেকেই নিতে ইচ্ছা করি, নিয়মাদি বিশদভাবে সখর জানাবেন।—আড়বালায়া উচ্চ বিদ্যালয়।

১৩৬৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে এ পর্যন্ত প্রকাশিত মাসিক বসুমতীর সব কয়টি সংখ্যা অমুদ্রিতপূর্বক V. P. বোনে পাঠাইয়া আমাকে এক বৎসরের জন্য গ্রাহকশ্রেণিকৃত করিয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীসুকুমার নাথ, Narsingpur, Cachar (Assam).

এই কার্তিক সংখ্যা হইতে আমাকে মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা করিয়া লইলে বিশেষ বাধিত হইব।—শ্রীমতী উষা দেবী, পাটনা।

Please let this office know the rate of annual and half-yearly subscription of your Magazine. I intend to be a subscriber for Information Bureau at Block Head Quarter.—Assistant Project Officer, Salchapara Developement Block.

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মূল্য)	
বার্ষিক রেজিস্ট্রী ডাকে	— ২৪
বাৎসাবিক "	— ১২
প্রতি সংখ্যা "	— ২
ভারতবর্ষে	
(ভারতীয় মূল্যমানে) বার্ষিক সডাক	— ১৫
" বাৎসাবিক সডাক	— ৭.৫০

ভারতবর্ষে	
প্রতি সংখ্যা	১.২৫
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিস্ট্রী ডাকে	— ১.৭৫
পাকিস্তানে (পাক মূল্য)	
বার্ষিক সডাক রেজিস্ট্রী খরচ সহ	— ২১
বাৎসাবিক " " "	— ১০.৫০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " "	— ১.৭৫

● মাসিক বসুমতী কিছুল ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বলুন ●

সূচীপত্র

৩৮-শ বর্ষ]

১৩৬৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আখিন সংখ্যা পর্যন্ত

[১ম খণ্ড

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
যুগবাণী—		
১. আমাদের সৌন্দর্যবুদ্ধি	দেবেন্দ্রনাথ মিত্র	২১৫
২। আফ্রিকার সিংহ	পি. সি. সরকার	৪০৩
৩। আলোচনা নিফল করার আলোচনা	ভরুণ চট্টোপাধ্যায়	৫৭২
৪। উন্টারমিডিয়েটে অন্তীল পাঠ্যপুস্তক	সুধাকর চট্টোপাধ্যায়	৮
৫। কালীদেবী ও কালীপূজার ইতিহাস	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৭৬৪
৬। চিত্র-চরিত্রে বর্ণবোধ ও সামান্যদর্শন	গোবর্দ্ধন আশ	৪০১
৭। জাৰ্মাণিতে প্রথম ভারতের মুক্তিকামী	অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৮৬
৮। জন্মান্তর কি সম্ভব?	ব্রজচাঁদী মেধাচৈতন্য	৩২৮, ৪৫২
৯। জননী জগদ্ধাত্রী ও		
ঈশ্বরসারসামি	যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৫৬২
১০। জীবন-সীতা	গোতম সেন	১৩৩
১১। জাখো	পি. সি. সরকার	৩৩
১২। নট্যাচার্য শিশিরকুমারের সঙ্গে কিছুক্ষণ	অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়	৩৮২
১৩। প্রাচীন ভারতে পণিকা	বৈভনাথ ভট্টাচার্য	৫৬৪
১৪। বক্রিমচন্দ্রের ধর্ম-জিজ্ঞাসা	সুশীলকুমার গুপ্ত	১২
১৫। বেকুবাড়ী আইনের চোখে	শঙ্কুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১০
১৬। বৈশালী	নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	৪০৫
১৭। বৌদ্ধ দেবী	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৫৫৪
১৮। বাঙলা অভিধান সংকলন	শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ	৫৬৯, ৭৭৬, ১০৬২
১৯। বজ্রমণ্ডীর মৌনবিক্রম	নির্মলচন্দ্র চৌধুরী	৭৪৯
২০। বাঙালী কেরাণীর মুখ পরিচালনা	নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৭৪৬
২১। বাঙলা শাক্ত পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলী	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৯২২
২২। মিঃ সোমেন হত্যার নায়ক বিনয় বসু	ঈশপতিপ্রসন্ন ঘোষ	১৩১
২৩। স্বপ্নানব না স্বপ্নদেবতা	ভরুণ চট্টোপাধ্যায়	১৬
২৪। রত্নভাষা বিজ্ঞান ও বিচারপদ্ধতি	পুলিনবিহারী বসু	৩৭০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
২৫। শিক্ষা ও শিক্ষায়তন	অবিনাশচন্দ্র রায়	১৯৩
২৬। সাহিত্য ও শিল্পে চিরস্থায়িত্ব	জ্যোতির্ময় রায়	১১১
২৭। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বনাম ক'লকাতা পুলিশ	পঞ্চানন ঘোষাল	৩৫৬
২৮। সনাতন গোবামীর গৃহত্যাগ	উদ্যাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত	৩৭২
বিবিধ রচনা—		
১। না-জানা-কাহিনী	তাল বেতাগ	৩১, ২৪৭, ৪৪৬
২। বিপ্লবের সন্ধান	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৬, ২৯৬, ৫১৯, ৫৭৭, ৮৫৬, ১০১৫
৩। ভেরা ফিগ'নার	অমল সেন	৯৩৭
৪। শিকার কাহিনী	কমলেশ ভাটজী	৩৪১
উপভাস—		
১। অনিকেত	সাত্যাকি	১৩, ৪১৩
২। অগস্ত্য পৃথিবী	পঞ্চানন ঘোষাল	১৪৪, ৪৫৮, ১০৮২
৩। ইন্দ্রাণীর প্রেম	নীলিমা দাশগুপ্ত	৫৩, ২১৭, ৪২৬
৪। চম্পা তার নাম	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৪৬, ১৪৬, ৪২৪, ৬৬২, ৭১০, ১০৬৮
৫। পাগলা হত্যার মামলা	পঞ্চানন ঘোষাল	৪১৮, ৫৯৮, ৭৮৩, ১১০০
৬। বন কেটে বসত	মনোজ বসু	১৩৮, ৩৩২, ৫০০, ৭৩২, ৭৭৯, ৯৫৭
৭। বর্ণালী	সুলেখা দাশগুপ্ত	১৫২, ৪৬৮, ৬৯৬, ৮৯৩
৮। বাতিঘর	বারি দেবী	৪৮৬, ৬৮০, ৮৭৪, ১০৫০
৯। বিদেশিনী	নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত	৫২৪, ৭৮৬, ৯৬৮
১০। ভাবি এক হয় আর	ফিলিপকুমার রায়	৩৮, ২৩২, ৫৪২, ৬১৬, ৮২২, ৯৭৪
জন্ম-কাহিনী—		
১। ভূষর্গ পরিক্রমা	শিবপ্রসাদ নাগ	৮৩৭, ১০০৬
২। লগুনের পাড়ার পাড়ায়	হিমালীশ গোবামী	১০৪, ৩১১
আলোকচিত্র—	৩২ক, ১৬৬ক; ২১৬ক, ৩৪৪ক; ৪০০ক, ৫০৪ক; ৫৪৮ক, ৭০৪ক; ৭৮৪ক, ৮৮০ক; ৯৫২ক, ১০৫৬ক;	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কবিতা—					
১। অথবা	ভগ্নতী চট্টোপাধ্যায়	১৩১	৪৫। বোটানিকেল গার্ডেন-এ	অশোক ভট্টাচার্য	৬৬৮
২। অভিযান্ত্রিক	অনিল চক্রবর্তী	২৩৯	৪৬। বেশ লাগে	বকুল বসু	৮৩৬
৩। অথচ	সন্তোষকুমার অধিকারী	১১২	৪৭। বহুসঙ্গী	তরুলতা ঘোষ	৮৮৯
৪। অজয়নদীর চর	আইতি রাগ	১২৪	৪৮। বাসবো ভালো	সাধনা বসু	১০৮৭
৫। অপারগ	মায়া মুখোপাধ্যায়	৮৩৬	৪৯। ভুল	কাকলী চট্টোপাধ্যায়	১৩৭
৬। অজ্ঞানের রূ	রথীন্দ্রনাথ সেন	১৬০	৫০। ভুল	বকুল বসু	৬৪৬
৭। আশ্বিনের ভোর	পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০০	৫১। ভালোবাসা	অঞ্জলি দাশগুপ্তা	১২৯
৮। আকাশ : মাটি	কুন্তী সোম	২৭৩	৫২। ভোরাই	সজনীকান্ত দাস	১৫৮
৯। এক মুঠো ভিক্ষে পাখে না	বীরেন বসু	১০০৫	৫৩। মেমোরিয়ালের মাঠের		
১০। উন্নয়ন মেয়ে	শেফালি সেনগুপ্তা	৫৪৬	সেই মেয়েটি	বিমলচন্দ্র সরকার	৩০
১১। একটি কবিতা	অবন্তী সান্ডাল	৫৬১	৫৪। মানসতীর্থে	বাণী পাল চৌধুরী	১৫৬
১২। এসো নববর্ষ	মধুসূদনা দাশগুপ্তা	১১০	৫৫। মনের আকাশে	সুপ্রিয়া	১১২
১৩। কাজী নজরুলকে	গোয়াল ভৌমিক	১৬০	৫৬। মন	নীহাররঞ্জন হাসদার	২০১
১৪। ক্রান্ত বীণায়	কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৬	৫৭। মহাপ্রহেলনের পথে	প্রভাবতী বিশ্বাস	৩৩১
১৫। কোন একজনকে	জগৎকুমার বিশ্বাস	৭৫২	৫৮। মন	বীরেশ্বর বসু	৭৮২
১৬। খেয়ালী	মাধবী ভট্টাচার্য	১১	৫৯। মৃত্যুর অথচ প্রেম	জয়ন্তী রায়	৮১২
১৭। ধর রেখে বলসিত	সত্যধন ঘোষাল	৪৩	৬০। দ্বান দৃষ্ট নয়	শিবশঙ্কু পাল	১১৪
১৮। গ্রামে	কেশব চক্রবর্তী	১৬৯	৬১। যে পাখী ফেরে না আর	উমাপদ রায়চৌধুরী	৮৮
১৯। গরীব	অশোকা দেবী	২২৫	৬২। রাজধানীর পথে পথে	উদা দেবী	১১৮, ৪৩৮, ৫১৩, ৭৬৩, ১৪৩
২০। গীতাংশ	শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৩	৬৩। রমণী	তৃপ্তি সোম	৬৮
২১। গৃহপালিতের কথা	মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১১৭০	৬৪। রঙহরিণ	জয়ন্তী সেন	৭৭০
২২। ছুটি	অমিতা বসু	১৫	৬৫। শিশিরকুমার	কবজাক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪১
২৩। ছবি	সঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৭৬	৬৬। শুধু বাতটু পার হলে	কৃষ্ণা ধর	৩১৫
২৪। জীবন-ছড়া	চণ্ডী সেনগুপ্ত	৫২	৬৭। স্তানটোরিয়াম	শক্তি মুখোপাধ্যায়	৭
২৫। জলছবি	মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	৭৮৯	৬৮। সূর্য কাঁপ	আবদুল মজিদ	২২৫
২৬। টিয়াপাখি রঙ	রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	১০৫৭	৬৯। সেই প্রাগৈতিহাসিক মেয়ে	বিমলচন্দ্র সরকার	৫৩১
২৭। ক্রয়ী	বিমলচন্দ্র ঘোষ	৩৮১	৭০। সকলই কবিতা	নন্দলাল বেরা	৬০৩
২৮। তুমি আছ	ঈতিহাস্য বন্দ্যোপাধ্যায়	৬১৫	জীবনী—		
২৯। তৃতীয় নয়ন	দেবব্রত চক্রবর্তী	৭৭০	১। অথচ অমির জীগোবিন্দ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২৫, ২০৬, ৩৮৮, ৫৮৪, ৭৫৩, ১৫৩
৩০। তুমি এসো	সুমিতা মিত্র	৮২১	২। বীর রমণী জুড়িখ	অমল সেন	১৯
৩১। দামোদর	অবীর সরকার	৫১৬	৩। দ'	ভবানী মুখোপাধ্যায়	১০০, ৩১৬, ৪৬২, ৭০২, ৮১৮, ১০৮৮
৩২। নীল পাখি	জয়ন্তী সেন	৩১৩	৪। শিশির-সান্নিধ্যে	রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু	৩৭৭, ৫৮৮, ৭৫১, ১৪৪
৩৩। না তুমি বেয়ো না চলে	গোপাল ভৌমিক	১০৩	৫। সাধী অযোরকামিনী	সুধীর ব্রহ্ম	৩৬
৩৪। প্রভু-শিষ্য সমাচার	বিমলচন্দ্র ঘোষ	৫৬৮	সংগ্রহ—		
৩৫। প্রতীক্ষা	সুদীন চট্টোপাধ্যায়	৫৮৩	১। পূণ্যভূমিভারত		৩৭৬
৩৬। পরাজিত	সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত	৬৩৬	২। হে অমিকবুদ		২১৬
৩৭। পুরীর বাউবনে	অমলেন্দু দত্ত	৭৭৫	সাহিত্য-পরিচর—	১৫৭, ৩৪৫, ৫৩২, ৭২৫, ১০৩, ১০১৪	
৩৮। ফুল কোটানোর গান	অশোক ভট্টাচার্য	৩৪৪	দেশে-বিদেশে—	১৭১, ৩৫৪, ৫৩৬, ৭০০, ১১০, ১০১৭	
৩৯। বার্ষ সাধনা	বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪	পত্রসংগ্রহ—	৮১, ২০২, ৩৮৪, ৬৩৭, ৭৫৬, ১০২৮	
৪০। বিদায়	তরুলতা ঘোষ	১৫০			
৪১। বারিষরা আবাড়ে	কাকলী চট্টোপাধ্যায়	২৬৭			
৪২। বৈষ্য	সঞ্জয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২১			
৪৩। বেকার	বীণা বসু	৩২৬			
৪৪। বৃন্দাবন	দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৫২৫			

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ছোটদের আসর—			অজল ও প্রাণ—		
উপক্ৰাস—			প্রবন্ধ—		
১। দিন আগত ঐ	ধনঞ্জয় বৈরাগী	৬৪৮, ৮৪৮, ১০৭৪	১। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম	শান্তি ভট্টাচার্য	৮৭০
২। সোনালি বরণ	শৈল চক্রবর্তী	৩২, ২৫৬, ৪৩৯	২। কবিতা ও তার জনপ্রীতি	ইন্দুমতী ভট্টাচার্য	৮৭১
গল্প ও কাহিনী—			৩। ববাহিতা স্ত্রী পার্শ্বতী সখা	অমিয়বাণী দাস	১৩২
১। শ্বশি বিধামিত্রের শিক্ষা	সুলতা কয়	৬৪	৪। মেয়েদের ক্যাম্পে থাক	ইন্দুমতী ভট্টাচার্য	৪৮১
২। চেকোভোভাঙ্কিয়ার রূপকথা	" "	৮৫৩	৫। শবৎচক্রের সমাজ-চেতনা	অরুণিমা মুখোপাধ্যায়	৬৭৩
৩। হুই বোন	পুষ্পদল ভট্টাচার্য	৬৫৪	ভ্রমণ-কাহিনী—		
৪। নাইটিংগেল (অনুবাদ)	বকুল ঘোষ	৬৭	১। একটি নির্জলা		
৫। নামের শক্তি	সদানন্দ ভট্টাচার্য	৪৪৩	ভ্রমণ কাহিনী	ইন্দুমতী ভট্টাচার্য	১৩৪
৬। প্রান্তবের সুর	অশোককুমার চৌধুরী	১৬২	২। জলবাচ্চা	কুমা দেবী	২১১
৭। হৈমবতী উমা	অমিতাকুমারী বসু	১০৭৯	৩। পথে পথে	সুনীতা দত্ত	২৮৯
প্রবন্ধ—			জীবনী—		
১। অভিশপ্ত সুর বার্কারোল	দেবব্রত ঘোষ	৪৪১	১। ভক্তকবি জয়দেব ও		
২। আকাশপাখির দেশে	সুধাংশু ঘোষ	২৫৮	ভাগ্যবতী পদ্মাবতী	পুরবী পাণ্ডা	২১১
৩। কিশোর-সাহিত্যে রোমান্স	হায়া দেবী	৬৫৫	২। মহিলা কবি চন্দ্রাবতী	বহু চক্রবর্তী	২৮৮
৪। কাউ	বিনয় চক্রবর্তী	৬৭	গল্প ও কাহিনী—		
ভ্রমণ—			১। কল্যাণী	অপরাজিতা ঘোষ	৮৬৬, ১০৩৪
১। আধুনিক আফ্রিকাতে			২। বাউদারের বো	অমিতাকুমারী বসু	৪৭৮
পাঁচ মাস	পি. সি. সরকার	১০৭৬	৩। মুবারিকা বিবি	শিবানী ঘোষ	২৮৪
জীবনী—			৪। মাফুচাক বেগম	শিবানী ঘোষ	৬৭০
১। গিরনের আত্মজীবনী	সুনীলকুমার নাগ	২৬৪	৫। মাইল মশায়	আশা দেবী	১০৩৮
২। ভক্ত কবীর	বানুদেব পাণ্ডা	২৬২	৬। রক্তগোলাপ	গীতা চক্রবর্তী	৬৭৬
৩। বাহুবল্লভ সরকার	বীণাদেবী সেন	৬৫২	৭। মুন্সেরীশ্রেষ্ঠা হেলেন	এ্যাণ্ডোলো	৪৭৪
৪। শব্দগীর ধারা	কবি কর্ণপূর	১০৮০	৮। সূর্যসম্ভবা	পুরবী চক্রবর্তী	১০৪০
কবিতা—			কবিতা—		
১। ছোট গিরী	বৃন্দাবন বাগচী	৮৫২	১। অব্যক্ত	প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়	৬৭১
২। পত ও পাবী	রঞ্জিতকুমার দত্ত	৮৫৪	২। এককালি বোধদূর	স্বপ্না গুপ্তা	ঐ
যাদুতথ্য—			৩। ছুটি	বীণা মিত্র	ঐ
১। কালি থেকে লক্ষ্মণ	এ. সি. সরকার	১০৭৯	৪। দিন-রাত্রির কাব্য	সম্মিত্রা রায়	ঐ
২। গ্রাস অদৃষ্ট করার বাহু	" "	৪৪১	৫। যুতুর পথে	বিশাখা ঘোষ রায়	ঐ
৩। নয়া পরসার নয়া বাহু	" "	২৬০	চারুজন (বাঙালী-পরিচিতি)—		
৪। বোতামের বাহুফুল	" "	৬৫২	১। মৃণালিনী সেন, অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায়,		
৫। কুমার আর পোদ্দিলের ডেকা	" "	৮৫২	বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহারকুমার মুকী		১৭০
রঙিন চিত্র—			২। হরিন্দাস ভট্টাচার্য, শিবপ্রসন্ন মিত্র,		
১। নৃত্যমঞ্চ (জলরঙ)	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	বৈশাখ	বতীন্দ্রনাথ সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ মাল্লা		২১১
২। জননী (স্কেচ)	মহীতোষ বিশ্বাস	জ্যৈষ্ঠ	৩। বোগেশচন্দ্র গুপ্ত, বিকুচরণ বাগচী,		
৩। পুষ্পবিচিত্রা (ডেলরঙ)	সুচাক দেবী	আষাঢ়	রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, আবদুল সাভার		৩১৪
৪। ভক্তিশ্রীক্ষা (স্কেচ)	অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্যৈষ্ঠ	৪। হরিন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,		
৫। রঙ বাহার (জলরঙ)	বিশ্বপতি চৌধুরী	ভাদ্র	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদকুমার বসু		৬০৪
৬। হাট বাজার (স্কেচ)	অরবিন্দ দত্ত	আশ্বিন	৫। সরোজ আচার্য, অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়,		
খেলাধুলা—			নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, কল্পনা বোসী		৭৭১
১৩০, ২১৪, ৫২৬, ৭১৪, ৯০১, ১০৯৩			৬। বাজেন্দ্রলাল আচার্য, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য,		
সাময়িক প্রসঙ্গ—			অমিয়কুমার সেন, শিবেন্দ্রবিনোদ সিংহ-বায়		১৪৮
১৮১, ৩৩৪, ৫৪৭, ৭৪২, ৯১৪, ১১০৮					

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
গল্প—		
১। একটু অজ্ঞান জন্তে	শচীন বিশ্বাস	২৩৮
২। একটি আদিশ কান্নার ইতিকথা	আবদুল আজীজ আল আমান	৮৮৬
৩। কুমারী সুরা মিত্র	রাণু ভৌমিক	১১৬
৪। দুষ্টবাণ	বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০
৫। দর্শন	মণীন্দ্রনাথ রায়	৬০৯
৬। পদ্মপাতের খেয়া	শচীন্দ্রনাথ অধিকার	২
৭। প্রেতলিপি	রজত সেন	৫০৮
৮। মমতাময়ী	সুশীল রায়	১১০
৯। মেলা	বিক্রমজ্ঞান ভট্টাচার্য	৫১৪
১০। মরুসুখী	প্রমুদ রায়	১০০
১১। বাক্স	স্পেনসার সুরত দত্ত	৬২৩
১২। শ্রীমন্তের পড়ন্ত বেলায়	মাদবী ভট্টাচার্য	৩০২
১৩। শ্রেষ্ঠ উপদেশ	অরবিন্দ দাশগুপ্ত	৬৮৭
১৪। শাপমুক্তি	হারেশচন্দ্র শর্মাচার্য	৯৮৬
১৫। সত্য	অরুণ সেনগুপ্ত	৬১৪
১৬। হাইড পার্ক কর্ণার	সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য	২৮০

অনুবাদ—**উপন্যাস—**

১। অন্তঃসারী সূর্য	ওসামু সোজী : কল্পনা রায়	৮২, ২২৬, ৪৩২, ৬২০, ৮০০, ১৭৮
--------------------	--------------------------	-----------------------------

জীবনী—

১। স্বপ্নাঙ্গলি	সি. এফ. এণ্ডার্স : ১২৩, ৪০৭, নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৬৪০, ৮১০, ১৬১
-----------------	---

গল্প—

১। জুলি রোয়েন	মোপাসাঁ : রমেন চৌধুরী	২৭৪
২। রূপকথা	জেল্লা : তুষার সাক্তাল	৮১০

কাব্য—

১। আনন্দ বৃন্দাবন	কবি কর্ণপুর : ১১২, ২৫২, ৩৯৯, প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৮৮, ৮৩২, ১০২৪
-------------------	---

কবিতা—

১। অন্ধকারে উপবিষ্ট ধূসরপঙ্কী হাতি	: সুনীতিকুমার গুপ্তা	২৮৩
২। ইলিষ্ট মাইট	কোলরিজ : সুরা মুখোপাধ্যায়	১১০
৩। একটি আদর্শ কবিতা	আইশেনবর্ক : ইলিরা চট্টো : ও মানস রায়	৩১০
৪। খেয়াল	সরোজিনী নাইডু : মজুমদার দাশগুপ্ত	২৭৮
৫। দুলনা	হো, ডি, কান্ড : অজয় বসু	৮১৭
৬। তোমার বৃদ্ধকালে	ইয়েটস : কল্যাণ সরকার	২৪৬
৭। তিমিরাজিয়ার	ব্রাউনিং : প্রকৃষ্ণা দাশ	৪২১
৮। স্বাধীনতা	শেলী : জীবনকৃষ্ণ দাশ	৭১১

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
নাট্য-গান-বাজনা—		
প্রবন্ধ—		

১। কবিগানের সাংস্কৃতিক ভূমিকা	দিলীপ চট্টোপাধ্যায়	১৩৬
২। কবি ও গীতিকার নজরুল ইসলাম	কালীপদ লাহিড়ী	৩৪৯
৩। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা	নিমাইচাঁদ বড়াল	৫২৮
৪। বাউল পদ্যসোচন	জয়দেব রায়	৮৮০
৫। বাজীগানের ইতিকথা	দিলীপ চট্টোপাধ্যায়	৭২০
৬। সঙ্গীতশিল্পী শরৎচন্দ্র	বলাইকৃষ্ণ সরকার	১০৫৮

রেকর্ড-পরিচয়— (শিল্প-পরিচিতি)

১। ইলা বসু	১০৬০	২। কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৫২
৩। কুমুম গোস্বামী	৫৩০	৪। প্রমুদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৮
৫। পরেশ দেব	৮৮২	৬। বাণেশ্বরী দেবী	৭২২

রঙ্গপট—**আত্মস্মৃতি—**

১। স্মৃতির টুকরো	সাধনা বসু	১৭৫, ৩৬১, ৫৪০, অনুবাদ : কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০৮, ৯০৭, ১১০৪
২। রঙ্গপট প্রসঙ্গে—		১০৯, ১১০৭

বিবিধ—

১। চলতি ছবির বিবরণী		৭৪০
২। জেনিফার জোল	দেবব্রত ঘোষ	১০৬
৩। নাট্যগুরু দেহরক্ষা		৫৩৯
৪। নতুন আঙ্গিকে মিনার্ভার পুনরুদ্বোধন		৭৩৯
৫। নকল আকাশপাতাল জাল খেলাঘর		৭৪০
৬। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্যকল্পে রঙমহলের প্রচেষ্টা		১১০৬

মঞ্চ ও চিত্রে-সমালোচনা—

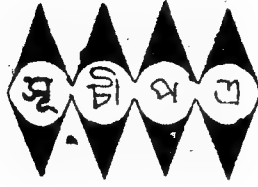
১।	অপূর সঙ্গার	৩৬২	
২।	ইন্দ্রনাথ, ব্রীকান্ড ও অরুণাদি	১১০৫	
৩।	ইন্দ্রজাল	১০৯ ৪। একমুঠো আকাশ	১৭৭
৫।	সুখা	৩৬৩ ৬। ডাকবালো	১৭৬
৭।	দীপ জ্বলে যাই	১৭৮ ৮। সোনার হরিণ	১১০৬
৯।	হেডমাষ্টার, নৃত্যরই তালে তালে ও অগ্নিসম্ভবা	১০৮	

প্রবন্ধ—

১। অলকনন্দা	বিভাস মিত্র	বৈশাখ
২। কান্দীর	বিভাস মিত্র	জ্যৈষ্ঠ
৩। শিশিরকুমার	পরিমল গোস্বামী	আষাঢ়
৪। পাঠবতা	বিশু চক্রবর্তী	শ্রাবণ
৫। বাঙালী মেয়ে	সত্য পাল	ভাদ্র
৬। দুই বোন	রামকৃষ্ণ সিংহ	আশ্বিন

বিজ্ঞান-বাতা—

১। কেনাকাটা—	৪৪, ২৬৬, ৭০৮, ৮১৮, ১০৪৫, ১৬২, ৩২২, ৫১৭, ৭১৬, ৮৮৩, ১০৬৫
--------------	--



বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কথাসমূহ	(সুগবাণী)	১৮৫
২। ভারতের অর্থনৈতিক বাণীবাজার অগ্রদূত—জিলাই	(প্রবন্ধ)	১৮৬
৩। আরহেনিহুস শতবার্ষিকী	(প্রবন্ধ)	১৮৬
৪। ডেলি প্যাসেজার	(কবিতা)	১৯০
৫। সাগরবেলায়	(কবিতা)	ঐ
৬। বঙ্গবন্ধুর মৌন বিক্রম	(কাহিনী)	১৯১
৭। ভারতীয় ডাকবাসোয় ইতিকথা	(প্রবন্ধ)	১৯৬
৮। রোগপ্রতিষেধকের আবিষ্কার	(প্রবন্ধ)	১৯৮
৯। সেখা আছে এক জীর্ণ পুরী	(কবিতা)	২০০
১০। বন কেটে বসত	(উপভাস)	২০১
১১। অখণ্ড অমির শ্রীগোবিন্দ	(জীবনী)	২০৬
১২। পত্রগুচ্ছ		২১০

নতুন-প্রকাশিত কয়েকখানি সুপাঠ্য বই

লীলা স্বপ্নমণ্ডলের নতুন লেখা
বায়ের চোখ

মন-অরুণা কান্তিনী। উল্ল প্রচ্ছদ। ২°৫০ ॥

শ্রোমন্ত্র মিত্রের অসামান্য রচনা
ড্যাগনের নিঃশ্বাস

পরিবর্তিত। সঙ্গে "পিপড়ে পুবাণ"। ২°৫০ ॥

বুদ্ধদেব বন্দুর যুগান্তকারী উপভাস : সাড়া

নতুন সন্সার। নতুন পরিমার্জিত সংস্করণ। ৩°০০ ॥

বিশ্বের বিশ্বাসের
পর্বতাবোদ্ধ কান্তিনী

কাকনজজ্বার পথে

নতুনতর বই। সজ্জ। ২°৫০ ॥

—জাপানী সাদে বেজাছে—

চাকচর্য বন্দোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রতিভা বন্দুর

প্রেমের গল্প

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মতে—“অচিন্ত্যকুমার শক্তিমান লেখক। বিশেষত, সহজ ও সরল বাচনভঙ্গী ও সিঁচুয়েশন খুঁটি করার ক্ষমতা তাঁর অপরূপ।”

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অসামান্য নাট্যরচনার দীপ্ত স্বাক্ষর

ন তু ন তা রা

কয়েকটি সার্থকসুইট একাত্তিক। নবন্যাটো আলোচনের প্রথম অভিযাত্রী।

অশ্বর্ষ ঘটনা সংস্থাপন। পরিবর্তিত শোভন সংস্করণ। ৩°০০ ॥

বঙ্গের বৈরাগীর ইখান নতুন মূল্যের উপস্থাপন
এক মুঠো আকাশ। বিভিন্ন বাস্তবধর্মী কাহিনী। ৫°০০
সমুদ্রবাই। নানী কামের মূর্তির অভিযাত্রী। নতুনতর কাহিনী। ২°৫০

অভ্যন্তরীণ উল্লেখযোগ্য বই : কিশোরবাহার বারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপভাস তরুণ রোহিণীকে। ৬°০০ ॥ মৈত্রেয়ী দেবীর অসামান্য রচনা সংপুষ্টে রবীন্দ্রনাথ। ৬°০০ ॥ পরিমল গোস্বামীর অভিজিতি। ৬°০০ ॥ শচীবিলাস রায়চৌধুরীর ভাটকটিকিটের জলকথা। ৬°০০ ॥ জ্যোতির ঘোষের ভক্তহরির জংলায়। ৬°০০ ॥ ভারতবর্ষ বন্দোপাধ্যায়ের লক্ষ্যপূর্ণ পাঠশালা। ১°৫০ ॥ মেঘের বিহীন লাক্ষ্মীকে চড়াই। ১°৫০ ॥ বিহারক জটীচাঁচের অজ্ঞানিতার চিঠি। ৩°০০ ॥ পরিমল গোস্বামীর ভুলের মেঘেরা। ২°০০ ॥ শ্রীশ্রীর পুণ্ডা কলকাতার কেল্লা আত্মকল্প। ৩°০০ ॥ ডেল কাপেগির স্বাধীন পৃথিবী-বিখ্যাত জড়নীর গ্রন্থের বাংলা রূপান্তর :—প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ (how to win friends & influence people)। ৫°০০ ॥ হুজিঙ্গাহীন মজুন জীবন (how to stop worrying & start living)। ৫°০০ ॥ নাটক : এক মুঠো আকাশ (বনজর বৈরাগী)। ২°০০ ॥ একাত্তর নাটক সংকলন (অবীজ চৌধুরীর হুসিকা)। ৩°০০ ॥

একাত্তর পরিবেশক : পত্রিকা সিঙিকট। ১২১, লিওনে ষ্ট্রিট, কলি : ১৬

চূড়াপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১০। নদীটি এখন শান্ত	(কবিতা)	২১০
১৪। পাংগলা হত্যার মামলা	(রহস্যোপভাস)	২১৪
১৫। আলোকচিত্র		২১৪(ক)
১৬। নিকোবর ইতিবৃত্ত	(প্রবন্ধ)	২১৭
১৭। ব্যর্থতা	(কবিতা)	২২০
১৮। প্রাচীন ভারতের লিপিকলা	(প্রবন্ধ)	২২১
১৯। হঠাৎ পাওয়া	(কবিতা)	২২২
২০। বাইলা অভিনয় সদলন	(প্রবন্ধ)	২২৩
২১। প্রহরের প্রার্থনা	(কবিতা)	২২৬
২২। কাল তুমি আসোরা	(উপভাস)	২২৭
২৩। বিপ্লবের সন্ধানে	(বিপ্লব-কাহিনী)	২৩৫
২৪। ভেরা কিং'নার	(বিপ্লব-কাহিনী)	২৪১
২৫। বিদেশিনী	(উপভাস)	২৪৮
২৬। চম্পা তার নাম	(উপভাস)	২৫৪
২৭। জীবন-গীতা	(প্রবন্ধ)	২৫৮
২৮। বাতিঘর	(উপভাস)	২৬২
২৯। লিপিকা	(কবিতা)	২৬৯
৩০। আমার চাতক-চোখ	(কবিতা)	৩



দে এণ্ড দত্ত
 জ্যোতির্ষ এণ্ড বুলিয়ার্স মার্কেট
 ৩৩৭/২- বঙ্গবাজার স্ট্রীট : কলিকাতা-৩২

বিশ্বস্ততার
 আধুনিকতায়
 ও
 মনোমোহন
 নিপুণতায়।



লক্ষ্মী এড্‌বল্ডী

৪৩/১, ফ্র্যাঙ্ক রোড - কলিকাতা-৭

আর একখানি উপহার গ্রন্থ

ছত্রপতি শিবাজী

৮সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত

যে বীরবর স্রষ্টার উচ্চ শোণিত প্রদান করিয়া জননী ভগ্নহৃদয় পূর্ণ
 করিয়াছিলেন, সেই চক্ৰগণবরণে, অনুদিন স্বর্গীয় ছত্রপতি মহাশয়
 শিবাজীর উদার-চরিত্র জহাঙ্গির ও তারতীয় বীর চরিত্র পরে
 অমরত্ব মহাদায়িগের করকমলে প্রদান সহিত অর্পণ করেন অর্ধ-
 শতাব্দী পূর্বে বিপ্লবী সত্যচরণ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৩০০ পৃষ্ঠার
 বৃহৎ গ্রন্থ, কার্ডবোর্ড বঁধাই। মূল্য দুই টাকা।

বহুমতী সাহিত্য মন্দির : কলিকাতা - ১২

নৃত্যপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৩১। আনন্দ-বৃন্দাবন (সংস্কৃতকাব্য)	কবি কর্ণপুর—অনুবাদ : শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১০
৩২। বিজ্ঞানবার্তা		২১৬
৩৩। শেষের কবিতা: (কবিতা)	সোমনাথ মুখোপাধ্যায়	২৮০
৩৪। অভিজ্ঞান (কবিতা)	শ্রেয়কণা বসু	ঐ
৩৫। শিশির-সান্নিধ্যে (জীবনী)	রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু	২৮১
৩৬। জাবি এক, হয় আর (উপক্ৰাস)	শ্রীদিলীপকুমার বসু	২৮৮
৩৭। প' (জীবনী)	ভবানী মুখোপাধ্যায়	২৯৪
৩৮। অজ্ঞান ও প্রাজ্ঞ—		
(ক) একটি চিঠি ও তার উত্তর (গল্প)	বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০০
(খ) রাজ্যমাটি (গল্প)	বিভা সরকার	৩০৬
(গ) এক নিঃশ্বাস জীব' (গল্প)	ইন্দুপ্রভা ভট্টাচার্য	৩০৮
৩৯। নবায় উৎসব (কবিতা)	পঙ্কজিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৯
৪০। মাচ-গান-বাজনা—		
(ক) বাংলার সংস্কৃতিতে গৌড়ীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি	শ্রীহাসীশঙ্কর লাহিড়ী	৩১০
(খ) আমার কথা (শিল্পপরিচিতি)	শ্রীশুভ গুহ-ঠাকুরতা	৩১২
৪১। কেনা-কটা (ব্যবসা-বাবিষ্ঠা)		৩১৪
৪২। তিনটি স্বপ্ন (গল্প)	রমজত সেন	৩১৮
৪৩। অতৃপ্ত তৃষা (পাঞ্জাবী গল্প)	কেশব সিং আত্মজ—অনুবাদ : মিহিরকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩২৪

— লোক-বিজ্ঞানের কয়েকটি বই —

দ্রষ্টব্য প্রকাশিত

প. ম. বেরমান

মানুষ কি করে গুনতে শিখল

প্রাচীন অবস্থা থেকে আজকের গণনার স্তরে মানুষ এসে পৌঁছল তারই বিবরণ গল্পের মত চমকপ্রদ ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এই বইটিতে। শুধু ছোট ছেলেদের নয় বড়দেরও ভাল লাগবে বইটি। কাগজে বাঁধাই ০'৭৫ ও বোর্ডে বাঁধাই ১'২৫

লোক-বিজ্ঞানের অধ্যাঙ্গ বই

ইলিম ও সেনালের

মানুষ কি করে বড় হল ৩.৫০

কলকব্জার গম্প ০.৬২

ভি. আই গ্রামভের

এক, আই, চেন্তনভের

অতীতের পৃথিবী ১.৬২

আয়নোশ্ফিয়ারের কথা ১.৫০

রূপ বিজ্ঞান কাহিনীকারদের

চাঁদে অভিযান ৩.০০

গ্র্যাশনাল বুক এন্ড্রেসি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বার্লিন স্ট্রাট, কলিকাতা—১২ ।। ১৭২ ধর্মভাড়া স্ট্রাট, কলিকাতা—১৩

৪৪।	চ্যুত নক্স	(গল্প)	ঈশ্বরী উমিলা দাস-মহাপাত্র	৩২৬
৪৫।	আলোকচিত্র			৩২৮(ক)
৪৬।	আমাদের ঘরে	(কবিতা)	বকুল বসু	৩৩২
৪৭।	খেলাধুলা			৩৩৩
৪৮।	ছোটদের আসর—			
	(ক) দিন আগত ঐ	(উপভাস)	ধনঞ্জয় বৈরাগী	৩৩৬
	(খ) খটখিড়ি	(বাহুতথ্য)	বাহুরডাকর এ. সি. সরকার	৩৩৯
	(গ) ইংরেজী মাসের নামের অর্থ	(সংগ্রহ)	গোপালচন্দ্র সীতবা	৩৩৯
	(ঘ) কিশোর স্নভান	(নাটিকা)	ঈশ্বরচিহ্নালা দাস	৩৪০
		(কবিতা)	শ্রুতি নাহা	৩৪৩
৪৯।	কাছ			৩৪৪
৫০।	সাহিত্য-পরিচয়			৩৪৪
৫১।	আন্তর্জাতিক পরিব্রিতি	(রাজনীতি)	ঈগোপালচন্দ্র নিরোগী	৩৪৮
৫২।	চার জন	(বাজালী-পরিচিতি)		৩৪৮
৫৩।	ব্লকপট—			
	(ক) শ্রুতির টুকরো	(আত্মশ্রুতি)	সাবনা বসু জহুরান : কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫১
	(খ) শি. এ (পার্সোন্সাল ব্যাবিষ্টেট)			৩৬০
	(গ) কবিতার অতিথি			৩৬০
	(ঘ) নতুন নাটক : বস্তুমহলে			ঐ
	(ঙ) নতুন নাটক : মিনার্ভায়			ঐ

স্বাধীনতা-জিন্দগিরির মহাকাব্যিক-সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের জীৱনানুস্মৃতি-কলির হানবের মুক্তিৰ ও অসৌকিক সিঙিলাঙের একমাত্র বৃগৰ
পুৰা-অসংখ্য তত্ত্বশাস্ত্র-সমুদ্র জাগোড়িত কৰিৱা সাৰথ্যৰ সকলনে-প্রত্যেক সত্য-সত্যকথাৰ সাধনাৰ অগুৰু সমধৰ।

তত্ত্বশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাসীনা শ্রীমৎ কুব্জানন্দেন্দ্র

ସହ ଓ ତନ୍ତ୍ରସାର

—ଅବିଦ୍ଧତ ବଳାଶୁବାଦ ମହ ବୁଦ୍ଧ, ମଂଦରା—

সেবাদিগের মহাদেব বীর শ্রীমুখে বসিয়াছেন—কলিতে একমাত্র তত্ত্বশাস্ত্র জগৎ—সত্ব-রজ-তম-বীরের-হৃদিত্বাভা অত শাস্ত্র নিম্নিত—ভাবের সাধনা নিম্নল। ক্ষুদ্রাণে সাধনামগ্ন মহাদেব পঞ্চমুখে কলিযুগে তত্ত্বশাস্ত্রের মাহাত্ম্যাকীর্ণ করিয়া—সাধ্যাতীত তত্ত্বশাস্ত্র প্রদর্শন করিয়া—হৃদিত ও সিদ্ধির পথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই সৌম্যাতীত তত্ত্বসমুদ্র মথিত করিয়া, মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ সরল সহজ বাহ্যগম্যভাবে সাধকসম্প্রদায়ের শক্তি-বীজ নিহিত অমূল্য রত্ন এই বৃহৎ তত্ত্বসার আভ্যন্তর সাধনায়—জীবাত্তর পরিশ্রমে সংগ্রহ—সকল সারাস্থার সমাবেশ করিয়া মানবের মজলবিধান করিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্ব-তত্ত্ব ও তত্ত্ব-রহস্য—পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ? শুণ্ডসাধন কাহার দায়? অঙ্গসিদ্ধির সকল প্রকারের সাধনা—ভাস্করিক সাধনার শাস্ত্র তত্ত্বগণের সকল সিদ্ধিই তত্ত্বসাধনে সন্নিবেশিত।

ମରଳ ଥୋଇଲ ବଳାହୁବାଦ—ନୂତନ ନୂତନ ସମ୍ମତିରେ ସୁଶୋଭିତ—ଅନୁର୍ଥାନଶକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষা—বহু ব্যয়ে—আধুনিক তাত্ত্বিক পণ্ডিত যাহাশয়গণের সহায়তার কাঁধে হইতে পুঁথি আনিয়া কলমতী সাহিত্য বন্ধির পরিশোধিত পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ করে। পুণ্ড, পুরস্কার, ধোঁব, বাগমজ, বসিমান, সাধনা, সিদ্ধি, বহু, জল, তপ, তত্ত্বসারে কি নাই ? হাইকোর্টের জানবুদ বিচারপতি—অসংখ্য আইনগ্রন্থ-প্রণেতা উত্তরক সাহেবের অধীশল—মহানির্বাণ তত্ত্বের অত্ববাদ প্রণয়ন ও প্রকাশকালাবধি তত্ত্বগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সমাজস্যের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে, তাহার্য্য বেধিবেস কি অসৌক্যিক সাধনার সিদ্ধি—অভীক্ষির অরুচ্য সমাবেশ—সর্বতত্ত্বের সমন্বয়—কল্যায়নের তত্ত্বসারে বহু তত্ত্ব আছে, সকলেরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য নশ টাকা।

बन्धुमती साहिब्य मन्त्रिण : : १७६, विभिन्न विहारी गार्हपत्य, १८, मन्त्रिणता—१९

১৪। দেশ-বিশেষে

(ঘটনাপঞ্জী)

১৫। সামগ্রিক প্রশ্ন—

- (ক) আমাদের পরিসংখ্য
- (খ) লেখাপড়া করে যে
- (গ) কামতায় যত্ন
- (ঘ) কোলায় নির্বাচন
- (ঙ) জীবিতের স্মৃতি
- (চ) ক। কত পরিবেশনা
- (ছ) সেচ ব্যবস্থা
- (জ) পীচ রাস্তার সংস্কার ব্যবস্থা
- (ঝ) জাহারমের পথে
- (ঞ) আগের কাজ আগে
- (ট) বিমান অবতরণ কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ
- (ঠ) বাজারী কি বাঁচবে ?
- (ড) ইঁদুর
- (ঢ়) খাদ্যকল গঠনে সমস্তা সম্মান ?
- (ণ) শোক-স্বাধ



৩৬৪
৩৬৫
৩৬৬
৩৬৭
৩৬৮
৩৬৯
৩৭০
৩৭১
৩৭২
৩৭৩
৩৭৪
৩৭৫
৩৭৬
৩৭৭
৩৭৮
৩৭৯
৩৮০
৩৮১
৩৮২
৩৮৩
৩৮৪
৩৮৫
৩৮৬
৩৮৭
৩৮৮
৩৮৯
৩৯০
৩৯১
৩৯২
৩৯৩
৩৯৪
৩৯৫
৩৯৬
৩৯৭
৩৯৮
৩৯৯
৪০০

বস্ত্রশিল্পে

মোহিনী
মিলের

অবদান অতুলনীয় !

মূল্যে, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন

১ নং মিল—

২ নং মিল—

কুটুম্বা, বদায়ী। বেলবরীয়া, ২৪ পরগণা

হ্যাংমেজিং এজেন্টস্—

চক্রবর্তী, সঙ্গ এণ্ড কোং

রেজিঃ অফিস—

১২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিবার-নিয়ন্ত্রণে

যাবতীয় পরামর্শ ও “প্রয়োজনীয়” জ্ঞান বেলা ১—৭টার মধ্যে সাক্ষাৎ করুন। রবিবার বন্ধ। মহিলাদেরও ব্যবস্থা আছে। পরিবার-নিয়ন্ত্রণ (৩য় সং) সর্বাধিক বিক্রিত, তথ্যবহুল ও বিবাহিতের অবস্থা পাঠ্য পুস্তক। মূল্য গড়াক ৭৮ নং পঃ মনি-অর্ডারে অগ্রিম প্রেরণযোগ্য। এত অল্প মূল্যের বই ভিঃ পিঃ হয় না। কিছু টাকা অগ্রিম M.O.তে পাঠালে মফঃস্বলে ঔষধপত্রও ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। ফোন : ৩৪-২৫৮৬।

মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন্

(Best Family Planning Stores in West Bengal)

১৪৬, আমহাষ্ট স্ট্রীট, রুম নং ১৮, টপক্লোর, কলিকাতা।

অ মেরিকার বিদ্যুৎ হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ

প্রতি জুলাই ২২ নং পঃ ও ২৫ নং পঃ, পাইকারগকে উচ্চ কমিশন দেওয়া হয়। আমাদের নিকট চিকিৎসা সঞ্চয়ী পুস্তকাদি ও যাবতীয় সরঞ্জাম স্বল্প মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। যাবতীয় পীড়া, স্থায়িক দীর্ঘকাল, জন্ম, আনন্দ, অম, অজীর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় জটিল রোগের চিকিৎসা বিচক্ষণতার সহিত করা হয়। অক্ষঃক্ষল রোগীদিগকে ডাকঘোষে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক ও পরিচালক—ডাঃ কে, সি, দে এল-এম-এক, এইচ-এম-বি (সোভিওলোজি), কৃতপূর্ণ হাউল কিজিসিয়ান ক্যাথেন হাসপাতাল ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এও হাসপাতালের চিকিৎসক। অনুগ্রহ করিয়া অর্ডারের সহিত কিছু অগ্রিম পাঠাইবেন।

জ্যামিহান হোমিও হল ১০২, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৩৫।

বিমল মিত্রের রাজপুতানী ৩।০	অবোধ চক্রবর্তীর সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত ৩।০	অবীরণম মুখোপাধ্যায়ের স্মরণচিহ্ন ৪
বাংলা উপন্যাসে বিমল মিত্র বহু একট অদ্বায়। তাঁর রচনার সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর এই সামাজিকতম গ্রন্থে পরিণততর রূপ পেয়েছে।	'রমানি বীমা'-খ্যাত লেখকের প্রথম উপন্যাস 'সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত' রক্তবাস ঘটনাগ্রবাহের নিপুণ বিন্যাসে অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি।	অতীতের অন্ধকার থেকে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি কিরে পাথর মধুর বেদনাকে বাহ্যর করে তুলেছেন অবীরণম।

নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হলো	অরুণাশঙ্কর রায়
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভাসুভ ৪ প্রতিভা বন্ধুর প্রথম বসন্ত ২ রম্যপদ চৌধুরীর প্রথম প্রহর ৫	যার যেখা দেশ ৫, অজ্ঞাতবাস ৬, বল্লভবতী ৫, মা ২।০, কল্যা ৩, কর্তৃত্ব ৩, দুঃখমোচন ৫, মতে ৩র স্বর্গ ৫, অপসরণ ৫, আধুনিকতা ২, বিদ্যুর বই ২, উড়কি ধানের মৃড়কি ২, যৌবনজালা ২, পুতুল নিয়ে খেলা ৩, প্রত্যয় ১।০, ইশারা ১।০, জীবনশিল্পী ১।০, জীষনকাটি ১।০, আশুত নিয়ে খেলা ৩, চতুরালি (নাটক) ১।০, তারুণ্য ১।০, দেশ কাল পাত্র ১।০, রত্ন ও শ্রীমতী ১ম ও ২য় ৩।০

অমৃত্যু বই	দীপক চৌধুরী
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কল্লোল যুগ ৬, বিবাহের চেয়ে বড় ৪।০ পাখানা ২।০, যায় যদি যাক ৩, উর্নান্ড ৩।০ তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাগিনী কল্লার কাহিনী ৪, পঞ্চপুস্তকী ৪, স্বর্গমর্ত ৪, মাটি ২ বুদ্ধদেব বন্ধুর কালো হাওয়া ৬, নির্জন স্বাক্ষর ৩, পরিক্রমা ৩।০ মোলিনাথ ৩।০, যবনিকা পতন ৪, বন্দীর বন্দনা ২।০ বনফুলের উদয়-অস্ত ৬, অগ্নীশ্বর ৫, নিরঞ্জনা ৫, মহারানী ৩।০ ভুবন সোম ২, বিষম জ্বর ১।০, পঞ্চপর্ক ৫, নির্মোক ৫।০, কষ্টিপাথর ৩, ডানা তিন খণ্ড ১২	দাগ ১ম ও ২য় ৪ রূপদর্শন রত্নব্যঙ্গ ৩।০ গ. চ. নি. ব অথ সংসার চরিতম্ ২ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিসারিকা ৩

গোপালদাস মজুমদার সম্পাদিত	অমৃত্যু বই
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৫।০ সুবোধ বোবের ত্রিষা ৬, শতভিষা ২ মধুসূ বোবের আজব নগরের কাহিনী ৮	অজাত গোখারীর সংস্করণ ৫, অমরেন্দ্র বোবের কমকপুয়ের কবি ৪, জোটেই মহল ৩।০, ইন্দ্র মিত্রের পক্ষাৎপট ২।০, গোপাল হালদারের জোয়ারের বেলা ৪।০ দিলীপকুমার রায়ের কোলা ৮, নীহাররঞ্জন ভট্টের এপারে পক্ষা ওপারে গছা ৫।০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধৈর্য ৩।০, সমরেশ বহুর পুতুলের খেলা ২।০, শান্তা সেনীর জীবনকোলা ৫, দলিলাপ রাজভক্তের আত্মদর্শন ২।০, দৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আমি বড় ছা ৩, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতিতন্ত্র ৪।০, রাগিনী ৪

অমৃত্যু বই	গুস্তাবকুমার বোবের
দারিণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে ছোটগল্প ৮, সঞ্চারিণী ৩, ট্রফি ২ দীর্ঘদর্শন ৩, সত্রাট ও শ্রেষ্ঠী ২।০, মহানন্দা ৪ শেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ বৈঠক ৩।০, বিদ্যুৎ ভাষা ৪।০, যোভুক ৪, অভিজ্ঞান ৬, শশীনাথ ৫, অন্তরাগ ৪।০, অমলা ৩ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাটি যে সা মানুষ ২।০, শুভাসুভ ৪, পেশা ৩ চালচলন ২, সার্বজনীন ৪, সহরতলী ২	কিন্তু গোয়ালার গলি ৩।০ জ্যোতিষ্ম নদীর প্রিয় অপ্রিয় ২।০ বিমল কবের দেওয়াল ১ম ৪।০, ২য় ৬ বুদ্ধদেব বন্ধু কালো হাওয়া ৬ পরিক্রমা ৩।০

রম্যপদ চৌধুরীর লালবাই ৫ অরণ্য আদিত্য ৩	মরেন্দ্রনাথ মিত্রের সহদয়া ৪ শুরুপক ৩	মণীন্দ্রলাল বন্ধুর সহযাত্রিনী ৪ জীবনারণ ৪।০	প্রমথনাথ বিশ্বাস চাপাটী ও পদ্ম ৩ নীলমাণর স্বর্গ ৩
--	---	---	---

ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট : কলকাতা ৬

॥ সাপ্তাহিক প্রকাশনা ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

জজ' বার্গাড শ

ঃ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ তুরহৎ জীবন-কথা ঃ

॥ দাম সাড়ে আট টাকা ॥

● পাকানিড়ি, লাল চুল, জলন্ত উজ্জল নীল চোখ, সুদীর্ঘ ঋজুদেহ, বৃদ্ধের বেশে চির-তরুণ জজ' বার্গাড শ বিংশ শতকের বিরাট বিষয়। চিন্তানায়ক, বিদ্বৎ ও নাট্যকার জজ' বার্গাড শ।

● বাট বছর ধরে শ বা বলেছেন, সবাই তা শ্রদ্ধাভরে শুনেছে, সমস্ত লক্ষ্য করেছে প্রতিটি পদক্ষেপ। বিশ্ব-মানবের মনে জজ' বার্গাড শ'র বিচিত্র রসিকতা, ক্ষুরধার-বক্রোক্তি জ্ঞান-সাধকের বাণী হিসাবে গৃহীত।

● জজ' বার্গাড শ মনীষী, মহাপুরুষ ও মহাজন হিসাবে স্বীকৃত, স্মরণীয় ও বরণীয়। সেই মহামানবের বিষয়কর জীবনেতিহাস বিচার, বিশ্লেষণ, তথ্য ও গবেষণায় সমৃদ্ধ। সাহিত্যাত্মরূপী ও শিক্ষার্থীর অপরিহার্য গ্রন্থ।

শোভন প্রচ্ছদ :: সুন্দর বঁধাই

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা—বারো

সেই বিখ্যাত ভাষাশিক্ষার একমাত্র বইখানি
বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাইতেছে

বাংলা পূর্বে অর্ডার পাঠাইয়া হতাশ হইয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহাদের চাহিদা জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। শারদীয়া পূজার পূর্বে বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দিরের আর এক অনন্ত অবদান আত্মপ্রকাশ করিল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা ইংরেজী শিখিবার—বলিবার—
শিখিবার সর্বজন পরিচিত ও স্বনাম প্রসিদ্ধ চূড়ান্ত গ্রন্থ

রাজভাষা

(স্বর্ণিত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শিশু, কিশোর, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধজন
ইংরেজী ভাষা শিখিতে, বলিতে ও লিখিতে পারিবেন।

বাঙলা দেশের মনীষী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যাপক কর্তৃক
উচ্চ প্রশংসিত

শিক্ষাপ্রণালীভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত

নামমাত্র মূল্য তিন টাকা।

বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির : ১৬৬, বিগিন বিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

আধুনিক হিন্দী সাহিত্য যে একান্তভাবে বাংলা সাহিত্যের
প্রভাব পরিপুষ্ট তা ভাল করে জানতে গেলে পড়ুন

ডক্টর ত্রীমুখ্যাকর চট্টোপাধ্যায়-এর

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান

প্রথম খণ্ড ৩.৫০ নং পং.

অল্প পুস্তকালয় : ৩, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা ১২

বহুকাল পরে পুনরায় প্রকাশিত হইল

—রোমাঞ্চ-রহস্য-গ্রন্থ—

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্ত নদীর ধারা মাসিক বঙ্গমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমাঞ্চ ও রোমাঞ্চব সত্তা ঘটনার বহির্ভূত কাহিন্যপাতি পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, জীবন-পাথের দিক নিদেশ। তাই প্রসঙ্গনা, ইঙ্গিত ও প্রেমের লীলার চাকলাকর বইটি চাকলা তুলেছে সকল সমাজেই। সোমহর্ষণ সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

জনতার দরদী নিপুণ কথাসিদ্ধী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মানিক গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ

ইহাতে আছে দুইটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং পঁচিশটি সুনির্বাচিত গল্পসিদ্ধি। মূল্য দুই টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ

ইহাতে আছে দুইটি সুখ্যাতি উপন্যাস এবং বহুপ্রশংসিত চৌকটি গল্প। মূল্য দুই টাকা।

প্রখ্যাত কথাসিদ্ধী শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপদ গ্রন্থাবলী

—নিম্ন গ্রন্থগুলি সম্বলিত—

- ১। শাখত, পিপাসা, ২। প্রেম ও পৃথিবী, ৩। মায়াজাল, ৪। স্বপ্নমন্ডার যুদ্ধ, ৫। সংশোধন, ৬। ক্ষত, ৭। প্রতিবিম্ব, ৮। জোয়ার ভাঁটা, ৯। মৃত্যু জগতে ও ১০। ভয়।

মুদ্রাল ৮ পেন্সী ৩৯২ পৃষ্ঠার সুবহু গ্রন্থাবলী

মূল্য তিন টাকা

কথা ও কাহিনীর বাহুর প্রেমেন্দ্র মিত্রের

প্রেমেন্দ্র-গ্রন্থাবলী

—গ্রন্থাবলীতে সম্বলিত—

মিছিল, প্রতিশোধ, পরোপকার, একটি কড়া টোটে, নিরুদ্দেশ, পাশাখালা, মহানগর, অরণ্যপথ, ছল ভাষা, মড়ক বাসা, কুষ্টি, নির্ভরমবাস, ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ (এবং), জিজ্ঞাস কবিতা (এবং)।

মূল্য আড়াই টাকা

বলিষ্ঠ কথাসিদ্ধী শ্রীজগদীশ গুপ্তের

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

লঘুগুরু (উপন্যাস), রুতি ও বিরতি (উপন্যাস), অসামু সিদ্ধার্থ (উপন্যাস), রোমন্থন (উপন্যাস), ছল ভাষার দোলা (উপন্যাস), মল্ল ও কুকা (উপন্যাস), গতিহারী ভাষ্করী (উপন্যাস), বখাভ্রমে (উপন্যাস), জগদানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা, স্মৃতিমী, শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয়।

মূল্য তিন টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রবারে উৎসর বসে কোথাও প্রোৎসাহিত হয় নাই। এমন প্রেমের ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন প্রেমের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

বাঙ্গালার নব শৈল্পিকবিতার এই প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষর বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবহু গ্রন্থ মূল্য তিন টাকা

বসুমতীর শ্রেষ্ঠ অবদান

শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

প্রখ্যাত কথাসিদ্ধী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সুনির্বাচিত এই ৭খানি গ্রন্থের সমিধানিক্য

- ১। ধরজোতা, ২। রাত্র-চৌধুরী, ৩। ছায়াছবি, ৪। সত্যের কীট বা গলা-বহুনা, ৫। অরুণোদয়, ৬। কলংপথের বাজী এরা এবং ৭। করলা কুটি।

মুদ্রাল ৮ পেন্সী, ৩২৮ পৃষ্ঠার সুবহু গ্রন্থ।

মূল্য দাঁড়ে তিন টাকা

রোমাঞ্চ উপন্যাসের বাহুর

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

ইহাতে আছে ৫ খানি সুবহু ডিটেকটিভ উপন্যাস

বলিদী রজিঙ্গী, মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা, কুতাবের দপ্তর, টাকের উপর টেকা, ঘরের ঢেঁকী।

মূল্য ৩।০ টাকা

উপন্যাস-সাহিত্যের বাহুর

অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী

বায়ন বাগলী, রক্তের টান, পিপাসা, প্রণয় প্রতিমা, কামিখোর ঠাকুর (বোকাগড়া), বন্ধন, বাত্মক প্রভৃতি।

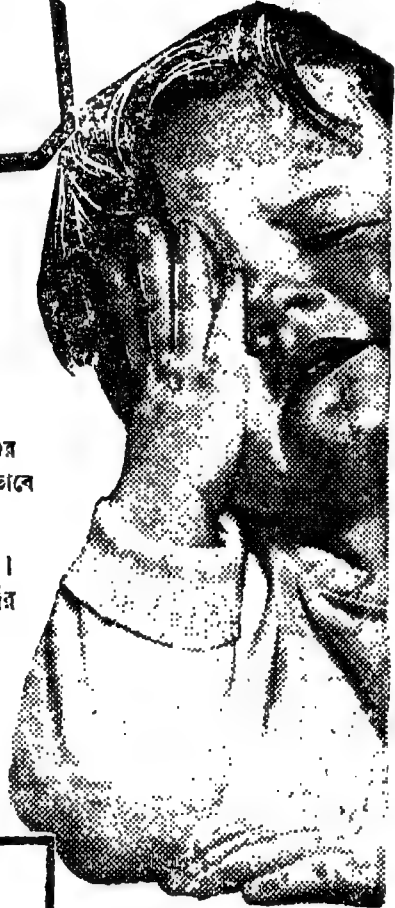
মূল্য তিন টাকা মাত্র

স্বাধীন!

আপনার শিশুর আজকের সর্দি
কাল ক্লু, ব্রুকাইটিস কিম্বা
নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে।

ওরুডের কোন রোগে পড়বার আগেই আপনার শিশুর
সর্দির যত্ননা দূর করুন। সর্দি সারাবার জন্য বিশেষভাবে
তৈরী এই শক্তিশালী ওষুধটি মালিশ করুন।

আপনার শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহেলা করবেন না।
হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া কিম্বা গলা খুসখুস করা সর্দির
এইসব লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বকে
গলায় ও পিঠে ভিকস ভেপোরাব মালিশ করুন।
তারপর আপনার শিশু যখন সারারাত ঘরে শান্ত
হয়ে ঘুমতে থাকবে, এই পরীক্ষিত ওষুধটি সর্দির
জ্বালায়না দূর করতে থাকবে। সকালে দেখবেন
তার সর্দিটলে গেছে ও সে আবার সুস্থ বোধ করছে!



ভিকস ভেপোরাব ২ ভাবে সর্দি সারায়।

১ এটি বাকের
মধ্য দিয়ে
বাক করে।



২ এটি বাকের
মধ্য দিয়ে
বাক করে।



ভিকস ভেপোরাব থেকে যে
অতিশালী ওষুধের বাষ্প বেরোয়
আপনার শিশু খাসের সঙ্গে
একত্র করে তার সর্দির ও গলার
ব্যথা দূর করতে পারে।

ভিকস ভেপোরাব আপনার শিশুর
বুক গরম রাখে ও তাকে আরাম
দেয়-দমবদ্ধতা ও যন্ত্রণা দূর করে।
আপনার শিশু ভাবতর্কি মুহ-
বোধ করে।

বড় নীলমণ্ডের কোঠা



নতুন
সবুজ টিন



ভিকস ভেপোরাব

বুকে, গলায় ও পিঠে মালিশ করুন। সকলের পক্ষে উপকারী।



শেড়িশান মিস্ শাটম

কালজ ক্রীট মাটী • কলিকাতা



মেজোরময় ঐতিহ্যের অধিকারী ভারত...



... স্বর্ণ শিল্পে আমরা তারই দাবী রাখি

এইচ.পি. প্রবকার

এও কোং

স্বর্ণ শিল্পী ও মণিকার
১২৫ এ, বহু বাজার স্ট্রীট • কলি ১২



১৬২, বহু বাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-৩২

গ্রাম - এইচপিএস • ফোন ৩৪-৪৮৪৮

— अन्तर्गत में वर्तमान



(संलग्नक)



संलग्नक संख्या
११११११, २०००



(Insects)

Forest of the

অরুণ ৭ই • অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থিধি
প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের মূতন বই প্রকাশিত হয়

৭ই পৌষের বই

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস ইম্পাতের ফলা ৩.৫০

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের লাবণ্যের এনাউন্সি ৩.

হিমালীশ গোস্বামী লঙ্কনের পাড়ার পাড়ার ৩.

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল ৩.



গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

ক ল ক ত র কা ছে ই (উপন্যাস) ৫.৫০

বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বিবেচিত হওয়ায় (১৯৫৬-৫৮ সালের মধ্যে)

১৯৫৯ সালের সাহিত্য অকাদমী পুরস্কার লাভ করেছে

৭ই অগ্রহায়ণের বই

দীপক চৌধুরীর নূতন উপন্যাস নীলে সোনার বসতি ৩.৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস মাঝির ছেনে ২.৫০

বীরেন্দ্রনাথ রায়ের মনের-বাইরে নামেন্দ্রসুন্দর ৫.৫০

আমাদের প্রকাশনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিবিধ গ্রন্থ :

রাজশেখর বসুর বিচিত্রা ২।০ ॥ মোহিতলাল মল্লিকের বাংলা নবযুগ ৩. : সাহিত্য-বিচার ৫. ॥ হুমায়ুন কবীরের শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব ১।।০ ॥ ইন্দ্রা দেবী চৌধুরীর পুরাতনী ৫. ॥ দেওয়ান কার্তিকচন্দ্র রায়ের আত্ম-জীবন-চরিত ৩. ॥ রাসহন্দারী দাসীর আমার জীবন ২।।০ ॥ ভ্রামণ-চক্রবর্তীর অলঙ্কার-চক্রিকা ৫।।০ ॥ দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমার ও তাঁহার ৩।০ ॥ শ্যামসেব যোবের ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি ১. ॥ সুরোধ যোবের অমৃতপঞ্চমাত্রী ৩।০ : ভারতের আদিবাসী ৫. : ভারতীয় কোজের ইতিহাস ৫. ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩।।০ ॥ বিতরণ ওহের শিক্ষার পথিকৃৎ ৪।।০ ॥ অপর্ণা দেবীর মাস্টার চিত্ররঞ্জন ৫।।০ ॥ প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবনীন্দ্র-চরিতম্ ৫. ॥ অসমক মুখোপাধ্যায়ের শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ২।।০ ॥ মলিনীকান্ত সরকারের প্রজ্ঞাপদেস্থ ২।।০ ॥ বাহুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিগ্নবী জীবনের স্মৃতি ১২. ॥ উমা দেবীর গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রঙ্গের অলৌকিকত্ব ৩. ॥ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৩. ॥ নিরঞ্জন চক্রবর্তীর উনবিংশ শতাব্দীর কবিত্তরলা ও বাংলা সাহিত্য ৮. ॥ মেজাল করিমের বক্তৃতাচক্র ও মূলমান সমাজ ১।০ ॥ য়েনে গঙ্গোপাধ্যায়ের তখন আমি জেলে ৫. ॥ গৌরবিশ্বাস যোবের এই কলকাতায় ২. ॥ ধারাজ ভট্টাচার্যের যখন নায়ক ছিলাম ৫।।০ ॥ 'ইন্দ্রনাথ'-এর মিহি ও মোটা ২. : দেশান্তরী ২।।০ ॥ দিবাকর শর্মার দিবাকরী ১।০ ॥ জ্যোতিষ রায়ের হৃষ্টকোণ ২।০ ॥ সাগরময় যোব সম্পাদিত পরমরমণী ৪. ॥ ঐনিবাস ভট্টাচার্যের শিশুর জীবন ও শিক্ষা ৪।০ ॥ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রজ্ঞানার : কন্নী ও পাঠক ১. ॥ শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ২।।০ ॥ শ্রীভাঙ্করের আপনার বিবাহ-যোগ ২।০ ॥ নরেন্দ্রনাথ বাসল জ্যোতিষাচার্য ভারতে জ্যোতিষ-চর্চা ও কোজি বিচারের সূত্রাবলী ১. ॥ অনাথনাথ বসুর মীরাবাই ২. ॥ হুমায়ুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞোহে বাঙালী ৫।০ ॥ আপতোষ ঘটকের কলকাতার পঞ্চ-ষাট ৩. ॥

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম : কালচার

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৬৪১



ধন-ঐশ্বর্য

যাশা চাওয়া যায়
তাশা পাওয়া যায়না

কিন্তু

আপনি ইচ্ছামত একটি সর্বজন সম্পন্ন কেশতৈল
অনারসে পাইতে পারেন। আয়ুর্বেদাচার্য্য
কর্তৃক উক্ত প্রস্তুত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার
কেশতৈল নির্বাচন-সমস্তা সমাধানে সক্ষম।
- ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ
নিরাসয় ও যত্নিত শীতল হয়। দীর্ঘদিন
নিয়মিত ব্যবহারেই আশাহত
কল পাওয়া যায়।

ভেষজ বিশারদ মণেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

আয়ুর্বেদীয় হিমমিষ্ট সুরভিত কেশতৈল।

অন্যান্য প্রসারনী

● পামিকোকো

সুরভিত নারিকেল তৈল

● হিমকল্যাণ

ক্যাফর অয়েল

সুগন্ধিত কেশতৈল

● ভূজামলা মহোপকারী কেশতৈল

● যোজনগন্ধা সুরভি নিধ্যাস



হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ

কলিকাতা

UPCO



সামিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬]

। স্থাপিত ১৩২৯ ।

[দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

মনে রাখিও, কাপুরুষ ও দুর্বলগণই পাপাচরণ করে ও বিখ্যা
কথা বলে। সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ।

যাচাতে উন্নতির বিষ করে বা পতনের সহায়তা করে, তাহাই
পাপ বা অধর্ম, আর বাহাতে তাহার মত হইবার সাহায্য করে,
তাহাই ঐশ।

কারণ বিনা তর্ক হয় কি? পাপ বিনা সাজা মিলে কি?

সর্বশাস্ত্রপুরাণেই ব্যাস্ত বচনধর।

পরোপকারে পুণ্যের পাণ্যের পরশীড়নম্।

—সমুদ্রের শান্ত ও পুরাণে ব্যাসের দুইটি বাক্য আছে—
পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরশীড়ন করিলে পাপ, উৎপন্ন হয়।
সত্য নয় কি?

সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়।

যে বলে আমি ভুজ্য হইব, সেই ভুজ্য হইবে। যে বলে আমি
মৃত, সে বড় হইবে। পীতবীরজাণ আচার মতে পাপ এক অজ্ঞতা।

আসল কথা, ঐ কাপুরুষের অপেক্ষা পাপ নাই; কাপুরুষের
উদ্ধার হয় না—ইহা নিশ্চিত।

মত প্রকার দুর্বলতার অন্তর্ভবকেই পাপ বলা যায় (Weakness
is sin)। এই দুর্বলতা হইতেই হিংসাবোধবির উদ্বেগ হয়। তাই
দুর্বলতা বা Weakness—এই নাম পাপ।

এই সকল পাপ দুঃখ আর কি?—এগুলি শু দুর্বলতাই বল।
লোকে ছেলেবেলা হইতেই শিক্ষা পায় যে, সে দুর্বল ও পাপী। অসৎ
একপ শিক্ষা দ্বারা দিন দিন দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়াছে।
তাহাদিগকে শিক্ষাও যে, তাহারা সকলেই সেই অমৃতের সম্মান—
এমন কি, বাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি কৌশল, তাহাদিগকেও
উদ্ধা শিক্ষাও। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্কে এমন সকল
চিন্তা প্রবেশ করুক, বাহাতে তাহাদিগকে সবল করিবে, বাহাতে
তাহাদের একটা বর্ধার হিত হইবে। দুর্বলতা ও অবসাদকারক
চিন্তা বেন তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে।

—বাণী বিবেকালসের বাণী হইতে।

ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অগ্রদূত—ভিলাই

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দেশজোড়া বৈপ্লবিক আন্দোলনের কলে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের নেতাদের সঙ্গে আপোষ পাচনার মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে দিতে বাধ্য হইল। তারপর কাউকে কাউকে প্রায়ই বলতে শোনা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ আর সাম্রাজ্যবাদ নেই।

হাই হোক, সে কথাই বিশ্বাস করলে মানতে হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী-চিতাবাঘ সাব্বের ভয়ভীতি থেকে কালো কুটিলতায় বৃহৎ কলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছে। বেচ্ছার ও সদিচ্ছার সে আমাদের ছোট্ট দিলে ঢলে গিয়েছে।

হাই হোক, সে কথাই বিশ্বাস করেছি—স্বাধীন হয়েছি স্বাধীনতায় কেন্দ্রে। কিন্তু স্বাধীনতায় কেন্দ্রে? বিজ্ঞান ব্যতীত হিসাববদ্ধ এখনো ভারতে ৩০ কোটি পাউণ্ড ব্রিটিশ মূলধন খাটছে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ভারতে ব্রিটনের ১৮২ কোটি টাকা মূলধন খেটেছিল। তাছাড়া প্রতি বছর ব্রিটন নানা আকারে ১০০ কোটি টাকা ভারত থেকে পাচার করে।

ভারতের লোহা ও ইস্ত্রিনীয়ারি শিল্পে এবং কয়লা শিল্পে ব্রিটিশ মূলধন এখনো থেকে বসে আছে অথচ সেই সব শিল্পে আধুনিক আ-কৌশল চালু করেনি, আর কলে ভারতীয় খনিমজুরের কয়লা উৎপাদন ক্ষমতা ব্রিটিশ মজুরের সিকি ভাগ মাত্র।

ভারতবর্ষের পাঁচ সালা পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ব্রিটন সাহায্য করা তো দুয়ের কথা, প্রাণিক কমিশনের ভাবার ব্রিটন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে গেরি করার পরিকল্পনার সব কাজ ঠিকমত শেষ করতে পারা যায়নি। অবশ্য এক ব্রিটনকে কেন লোব দিই। আমেরিকাও কিছু কম বায় না। আমাদের দেশে মূল শিল্প গড়ে তোলা বা স্বতন্ত্রীয়ের তালিম দেওয়ার রাজ্য মাড়তে ভার্য রাজী নয়। স্বতন্ত্রীয় সম্পর্কে তারা গোপনীয়তা রক্ষা করে, পূজা হাল চালিয়ে দিয়ে আমাদের সর্বনাশ করে। সেই সঙ্গে কারিগরী সাহায্য দেবার সময় তারা নানারকম সত্ চাপিয়ে দেয় আমাদের ওপর। যেমন ধরুন 'বারী শেল' ও 'ট্যাগোর্ড ভ্যাকুয়াম' কোম্পানীর সঙ্গে আমরা তৈল পরিশোধনাগার নির্মাণের যে চুক্তি করেছি তাতে ২৫ বছর নেতুলি রাষ্ট্রীয়ত্ব করা চলবে না, বিনা শুদ্ধে অশোধিত তৈল আমদানী করার অধিকার দেওয়া হয়েছে তাদের এবং প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার অধিকার ভারত সরকারের হাতে থাকবে না। হার্কিন সরকার আমাদের মূল শিল্প প্রসারের জন্য এক পরস্যাও ধায় কেননি। বা নিয়ন্ত্রণে সবই তথাকথিত কমিউনিটি প্রোজেক্টের জন্তে, আর এজিটার প্রোমোয়শন ও কৃষির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আমাদের ২২-পাঁচসালা বসোবস্তের সাকল্যের জন্য দেড়শো কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রার প্রবকার ছিল। কিন্তু আমেরিকা ঋণ দেয় মাত্র সাড়ে ২২ কোটি ডলার, বসিও ঐ একই সময়ে সে ১১৩ কোটি ডলার ঋণ দেয় তার সিরাটো জোটের অঙ্গীকারবশত।

একটি মাত্র কেন্দ্রে হার্কিন ডলার আমাদের দেশের পছন্দী প্রদর্শিত্যের পিছুনে ঢালা হয়েছে। সেই কেন্দ্রটি হচ্ছে টাটা কোম্পানী।

সেই ঋণ দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য খোঁসসা করে হার্কিন 'করেন রিপোর্ট বুলেটিন'—এ বলা হয় যে ঐ ঋণ রাষ্ট্রীয়ত্ব অর্থনীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করবে—যার কলে ভারত মূলধনের জন্তে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকবে না।

১৯৪৫ সালের ১৫ই নভেম্বর ভারতে ব্রিটিশ মূলধনের স্থপতি 'ক্যাপিটাল' মন্তব্য করে :—

ঐ দেশটি থেকে কেটে পড়বার কোন অভিজ্ঞতার ব্রিটিশ ব্যবসায়ী মহল পোষণ করে না।

ক্যাপিটালের ঐ উক্তির প্রতিফলন হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্স—এর সভাপতি ভ্রায় রেনউইক ছাত্তোর নিয়ন্ত্রাধিত মন্তব্য :—

ব্রিটনে এমন অনেক শিল্পপতিই আছেন, যাদের ভারতে কল-কারখানা তৈরি করতে আগ্রহ নেই। কিন্তু তাঁরা এমন সবছার টাকা দিতে রাজী নন যাতে সেই টাকার ওপর ঋণ কারো অধিকার জন্মতে পারে বা সেটা ঋণ কেউ খরচ করতে পারে।

কিন্তু তবু আজ দুর্গাপুরে ব্রিটিশ কোম্পানী ইম্পাতের কারখানা তৈরি করতে রাজী হোল কি করে এবং কেন? রাজী হোল সোভিয়েতের সঙ্গে টেকা দেবার জন্তে এবং পাছে সেটা ভারতবর্ষের মাছব সোভিয়েতকেই একমাত্র প্রকৃত বন্ধু বলে ভাবে সেই ভয়ে। ব্রিটিশ ও জার্মান কোম্পানী দুটি বহুকাল ধরে গড়িয়ে গিয়েছিল, শতকরা ১০।১২ ভাগ মুদ্রা লাভ করছিল। কিন্তু সোভিয়েত বণন শতকরা মাত্র ২ই ভাগ মুদ্রা ১২ বছরে শোধ দেওয়ার সন্তে ভিলাই কারখানা নির্মাণের জন্য ঋণ দিল তখন ব্রিটিশ ও জার্মানদের সুদের মাত্রা অন্তত কিছুটা না কমিয়ে আর উপায় রইল না এবং টালবাহানা বন্ধ করে জমিতে নামতে হল। কিন্তু আমরা মুদ্রা দিছি জার্মানদের (রাউরেকের কারখানার জন্তে) শতকরা ৬ ভাগ এবং দুর্গাপুরের বসে-বাওয়া কারখানার জন্তে শতকরা ৫ ভাগ।

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের সুযোগ নিয়ে ঐ সব সাম্রাজ্যবাদী দেশের ধনকুবেরগোষ্ঠী নিজস্বের মুনাফার রাজ্য পরিকার করতে চায়। যেমন ধরুন আন্তর্জাতিক ব্যাংক মিশনের সমস্ত মি: রাল্ফ রেনেট ১৯৫৮ সালে ভারত সরকারের পর মন্তব্য করেন :

ভারতবর্ষ বর্ধি মূল সাজ সরঞ্জাম আমদানীর লাইসেন্স ব্যবস্থা আমূল তলাতে রাজী হয়, তবেই সে ঋণ পাবার আশা করতে পারে। এ যদি আমাদের স্বরোয় ব্যাপারে নাক গলানো না হয় তবে নাক গলানো কার্কে বলে?

এবার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যটা কি রকম সেটা বিচার করে দেখা যেতে পারে। ভিলাই কারখানা দেখতে গিয়ে ঐ বছরের শোড়ার দিকে সোভিয়েত নেতা মি: আন্ড্রিয়েক এক বক্তৃতার বলেন :

দীর্ঘকাল উপনিবেশবাদীদের শাসনের কলে আপনাদের দেশে শিল্পপ্রসার হয়নি। এখন আপনাদের ঋণ সময়ে লবা রাজ্য পায় হতে হবে। কিন্তু আমরা জানি, সেই অসাড় আপনারা সাক্ষ্য করতে পারবেন।

সোভিয়েত সরকারী প্রতিনিধিদের সমস্ত মিঃ মুখিবীনক সেই সময়ে বলেন : প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করার পিছনে সোভিয়েতের কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক হতলব নেই। সোভিয়েত সরকার এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় সাহায্য করতে চান। ভিলাই কারখানার প্রথম অংশটির উদ্বোধন ভারতবাসীর এক বিরাট সাক্ষ্য, কারণ ধাতুশিল্প হচ্ছে যে কোন দেশের উন্নতি করার ভিত্তির ভিত্তি।

শুধু ভারতবর্ষ কেন, ইন্দোনেশিয়া বা ব্রহ্ম বলুন, মিশর, আর্জেন্টিনা বা হানা বলুন, নতুন স্বাধীনতা পাওয়া এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে সোভিয়েত সরকার মাত্র শতকরা ২'৫ ভাগ মূল্যে ১২ বছরের মেয়াদে ঋণ দিচ্ছেন এবং সেই টাকা দিয়ে সোভিয়েতের যন্ত্রকৌশল ও যন্ত্রবিদদের সাহায্যে যে সব শিল্পায়তন তৈরি হচ্ছে সেগুলি তৈরি হয়ে থাকার এক বছর পর থেকে কিস্তিতে ধার শোধ করার ব্যবস্থা। সেই ধার শোধ করার জন্যে ডলার বা ষ্টালিং ব্যালানে বা সোনায় টান পড়বে না। দেশীয় মুদ্রা দিয়ে এক ভারতীয় পণ্য সোভিয়েতের রপ্তানী করে সেই ঋণ পরিশোধ করা চলেবে। আমরা চা, পাট, চামড়া, লাক্ষা ইত্যাদি সরবরাহ করে সেই সেনা ১২ বছর ধরে মেটাতে পারব। সোভিয়েতের সাহায্যে যে সব প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে বা হতে চলেছে সেগুলি তৈরি হবার সময়ের এক তৈরি হয়ে থাকার পর পরিচালনার বেলা জানা দারিৎ ভারত সরকারের। যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, কারখানা তৈরি করা, পরামর্শ দেওয়া এবং কর্মীদের কাজ শেখানো ছাড়া সোভিয়েত সরকার আর কোন দারিৎ নেই। ভারতীয় কর্মীদের সঙ্গে তাঁরা সর্ব ব্যাপারে সমাসনে প্রতিষ্ঠিত, কোথাও কোন প্রভেদ নাই, সাঙ্গা ও কালোর বৈষম্য নেই। সব শেষে কারখানা তৈরি হয়ে গেলে সোভিয়েতের কোন রকম স্বত্ব তার ওপর থাকবে না। সেটি হবে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

আমরা ভিলাই কারখানাটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে বিচার করব। প্রথমে ভারতের শিল্পের ইতিহাস একটু দেখা যেতে পারে। মিঃ ডি. বুকানন তাঁর "ডেভেলাপমেন্ট অফ ক্যাপিটালিস্ট এন্টারপ্রাইজ ইন ইণ্ডিয়া" বইখানিতে লিখেছেন (১৯৩৪ সালে) :—

ভারতে অল্প তৈরির জন্য ইম্পাত ব্যবহার করা হোত, অজ্ঞাত যন্ত্রপাতিও তৈরি হোত এবং সেগুলি খুই উচ্চ মূল্যে—এমন কি দামাঙ্কাস তরবারালের কল্লও হাতরাবারের ইম্পাত দিয়ে তৈরি হোত।

সুতরাং ব্রিটিশ লোক বীকার করছেন যে, তাঁদের রাজস্বের আগেও আমরা উৎকৃষ্ট ইম্পাত তৈরি করতাম। কিন্তু ১৯৪৪ সালেও বিজলাজী "ইন্টার ইকনমিষ্ট" পত্রিকা আক্ষেপ করে :—

সব কিছুই তৈরি করার সাধ্য আমাদের ছিল কিন্তু শুধু কিছুই তৈরি করতে পারিনি। যে কোন জিনিষের, সব জিনিষের জোপানবার আমরা কিন্তু কোন

জিনিষেরই করনেওহালা নেই। তবে কি আমাদের শিল্প পড়ে তোলায় মত প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না? এই সম্পর্কে ১৯৪২ সনের মার্কিন কারিগরী মিশনের উক্তি তুলে দিই :—

ভারতের আকরজ লৌহসম্পদ বাধ করি অল্প যে কোন দেশের চেয়ে বেশি এবং সেই লোহা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ধাতুশিল্পের জন্য অয়োজনীয় কোক উৎপাদনের উপযোগী ৪০ কোটি টন কয়লা ভারতের ভূগর্ভে আছে।

কমিষে ধরলেও ভারতের খনিতে ৩০০ কোটি টন লোহা আছে। বুটেনের আছে ২২৫ কোটি টন। কিন্তু বুটেন থেকে সোভিয়েত স্বাধীন হবার আগেও বছরে ১ কোটি ৬২ লক্ষ টন ধাতু উৎপাদন করত, সেক্ষেত্রে ভারত উৎপাদন করত ১৫ লক্ষ টনের মত অর্থাৎ পোল্যান্ডের চেয়েও কম। ব্রিটিশ শাসনের ২০ বছরে ভারতের কয়লা উৎপাদন ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ২ কোটি ২০ লক্ষ টন হয় এবং ভারত তার সবে ধন নীলমাণি টাটা কোম্পানীর দৌলতে বছরে মাত্র ৮ লক্ষ টন ইম্পাত উৎপাদন করত। সেক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৭ সালে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টন কয়লা এবং ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টন ইম্পাত উৎপাদন করে, যদিও সোভিয়েত ১৯৩৭ সালের আগে আমাদেরই মত অল্পমাত্র কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। একটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক নীতির এবং অন্যটি সমাজতান্ত্রিক নীতির ফল। আমাদের তখন সব থেকেও কিছুই ছিল না। ২০ কোটি লোক নিয়ে সোভিয়েত তার ইম্পাত-শিল্পকে যে তরয়ে নিয়ে সেল ৪০ কোটি লোক নিয়ে আমরা তার ১১ গুণ পেছিয়ে বইলাম। এই সব দেখে সোভিয়েত দেশ ঘুরে এসে আমাদের কবি লিখলেন : 'বশিকরাজের লোভ ভারতের ধন-উৎপাদনের বিচিত্র শক্তিকেই গড় করে দিয়েছে। বাকি রয়েছে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয় এবং পস্যার হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।'

ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে এখন শিল্প প্রসারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বাস্তব পা বাড়াবার জন্যে



সোভিয়েত দেশগুলির কাছে হাত পেতে কোন ফল পেল না, তখন সোভিয়েত দেশ প্রস্তাব করে যে সে ভারতের শিল্প প্রসারের সাহায্য করতে রাজী আছে। সেই প্রস্তাবের প্রথম-বাক্তব রূপায়ণ ভিলাই কারখানা। পশ্চিমী মহল এবং তাঁদের ভারতীয় মোসারেবরা তখন ধূয়া তুলে ছিলেন যে সোভিয়েতের কলকজা-আধুনিক নয় এবং যন্ত্রকৌশলে 'সে অনেক পেছিয়ে আছে। সুতরাং ভারতের শিল্প প্রসারে সাহায্য করার যোগ্যতা তার নেই। এই প্রচেষ্টার জবাব পাওয়া বাবে একবার ভিলাই ঘুরে এলেই। আমি সেপ্টেম্বরে ভিলাই দেখে এসে এই প্রবন্ধ লিখছি। যা দেখলাম তা চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। ১ বর্গমাইল জুড়ে এই নির্মীয়মান কারখানা। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কারখানার প্রথম বাতায়নোড়িত চুল্লী গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে লোহার চৌপল উৎপাদন করছে। আপাততঃ এই বকম তিনটি চুল্লী নির্মাণ করার কথা ১৯৬০ সালের মধ্যে, যেগুলি মিলিয়ে বছরে ১২ লক্ষ টনের মত ইস্পাত উৎপাদন হবে যদিও পরিবর্তন। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ১০ লক্ষ টন। প্রথম চুল্লীটিতে কাজ শুরু হবার পর প্রথম মাসে সেটি ২৪ হাজার টন চৌপল উৎপাদন করে। কিন্তু রাউরকেলা কারখানার চুল্লীটি সমান মাপের ৩৩শ সত্ত্বও সেই মাসে অর্থাৎ মার্চ মাসে তার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১২৬০০ টন। আর দুর্গাপুর কারখানা তো আজও কোক ছাড়া আর কিছু পরনা করতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে যে, ভিলাই কারখানার সোভিয়েতের সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশলে কাজ হয় কিন্তু রাউরকেলায় হয় আমেশনপূরের মত সেকলে পদ্ধতিতে। বাতায়নোড়িত চুল্লীর মাধ্যম দিকে হাওরর অর্থাৎ অক্সিজেনের অত্যধিক চাপ দিয়ে 'হাই টপ প্রেসার' লোহা উৎপাদন করার কৌশল পৃথিবীতে এক সোভিয়েত ছাড়া অন্য কোথাও নেই। এতে শতকরা ১০ ভাগ কোক কয়লার মিতব্যয় হয় এবং উৎপাদন বেশি হয়। এর পরে সিটারিং প্র্যাট বসানো হলে কয়লা মিতব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে শতকরা ৩০ ভাগ এবং এখন যে প্রচুর চুপে পাথর দরকার হয় ঝাপ্টা দেবার গ্যাস তৈরি করার জন্য তা আর লাগবে না। তখন চুল্লী ও কোক ব্যাটারীর গ্যাসকেই ঝাপ্টা দেবার কাজে লাগানো যাবে। এখনকার হিসাব মত ভিলাই কারখানার বছরে ২৫ লক্ষ টন আকরজ লোহা, ২০ লক্ষ টন কয়লা এবং প্রায় ৮ লক্ষ টন চুপে পাথর দরকার। 'হাই টপ প্রেসার' ও সিটারিং প্র্যাটের কল্যাণে এই সব কাঁচামালের খরচ অনেক কমে যাবে অথচ উৎপাদন বাড়বে। আকরজ লোহার গুণগত উন্নতি করার জন্যে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা ভিলাই থেকে ৪৬ মাইল দূরে রাজহারা খনিটি খন্যচালিত করছেন। সেখানে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টন লোহা আছে। কয়লা ও কাঁচা ধাতু বোঝাই করা থেকে চৌপল লোহা উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ স্বয়ংচালিত। একজন মাত্র রাশিয়ার শিক্ষিত বাক্সী বুক কনট্রোল ঘরে বসে একটি বক্সের হয়েক বকম আলোক সংকেতের সাহায্যে সেটা কাজটার তদারক করে। এমন কি, সে সেখানে বসে-সময়ের বই পড়তে পারে।

চৌপল লোহা উৎপাদনের সময় অত্যধিক উত্তাপে কয়লার অক্সাইডেশনের ফল তাই থেকে আয়োনীয়া, আলকাত্তর, বেল, দ্রাব্যাসেন, কেল ও সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যাচ্ছে।

সেগুলির মোট ওজন বছরে ৫১২১৫ টন, যার মধ্যে এ্যাসিডের ১২ হাজার টন।

প্রতিটি বাতায়নোড়িত চুল্লীর জন্যে একটি করে ২৫১ ফুট লম্বা, ৪৬ ফুট চওড়া এবং ৩১ ফুট উঁচু কোক ব্যাটারী। সেটিও স্বয়ংচালিত। প্রতিটি কোক ব্যাটারী ২০১২৫ বছর গরম থাকবে এবং বছরে ১২৬৮০০০ টন কোক উৎপাদন করবে।

গত ১২ই অক্টোবর ভিলাই-এর প্রথম উন্মুক্ত চুল্লীতে ইস্পাত উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে দিনে ২৫০ টন করে। সেটিও পুরোপুরি স্বয়ংচালিত।

সম্প্রতি ভারত সরকার ভিলাই কারখানা সম্প্রদায়ণ করে তার উৎপাদন ক্ষমতা বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টন নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন। এর জন্যে মোট ৫টি বাতায়নোড়িত চুল্লী নির্মাণ করা হবে, যেগুলির মধ্যে ৩টি চালু হবে যাবে ১৯৬০ সনে।

বাতায়নোড়িত ও উন্মুক্ত চুল্লী ছাড়াও যেসব ব্রুমিং মিল, রোলিং মিল, ফিলটিং মিল ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে সেগুলি নিচের জিনিষগুলি উৎপাদন করবে:—

বছরে—১১০০০০ টন বেলের লাইন

" —২৮৪০০০ টন অক্সিজেন ভারি জিনিষ

" —১০০০০ টন স্লীপার

" —১৫০০০০ টন ফিলট

এক অক্সিজেন জিনিষ।

সোভিয়েত যন্ত্রকৌশলের বিরুদ্ধে অসম্মত অবস্থার কলঙ্ক হচ্ছে দেবার পক্ষে বা বললাম তাই মর্মেই।

আর একটি কুংসা আছে। অনেকে বলেন, সোভিয়েতের পুঞ্জিবাদী ভারতকে সাহায্য করার পিছনে কোন মন্তব্য আছে। মন্তব্যটা কী বকম? আমাদের আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং শিক্ষা দিয়ে তাদের কোন মন্তব্য হাসিল হবে? এ পর্যন্ত আমাদের ৫০০ জনেরও বেশি ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রকর্মীকে সোভিয়েতের নিয়ে গিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এরাই আমাদের শিল্প ভবিষ্যতের আশা।

ভিলাই কারখানার মাত্র তিনভাগের এক ভাগে কাজ হচ্ছে। কিন্তু সেইটুকু থেকে আমরা কি পেরেছি, পাচ্ছি বা পাব? ১৯৬০ সালে মোট ১১১৮০০০ টন চৌপল লোহার ৩ লক্ষ টন বেচে আমরা ৬০ কোটি টাকা পাব (এক টনের দাম ২০০ টাকার মত)। লোহার বাজারের ইতিমধ্যেই উন্নতি দেখা যাচ্ছে। গত ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ১৩১৪২৫ টন ভিলাই-এর লোহা দেশের প্রায় ৫০০টি প্রতিষ্ঠানকে বিক্রি করে ভারতের রাজকোষের ২৮২৫৬৩৭৫ টাকা লাভ হয়েছে এবং বর্তমানে দৈনিক ২ লক্ষ টাকা মূল্যের চৌপল লোহা উৎপন্ন হচ্ছে। ভারতের মত এতদিনকার অসম্মত দেশ আজ আমাদের মত শিল্পোন্নত দেশের কাছ থেকে পর্যন্ত লোহার অর্ডার পেয়েছে। এ কথা কি কেউ 'কান দিন ডাবতে পেরেছিল? আজ বিশেষ পণ্যের হাটে ভারতীয় শিল্প পণ্য দিয়ে মূল্য বেবার শক্তি দিয়ে পাবার সুখে এসে দাঁড়িয়েছে ভারত সোভিয়েত সাহায্যের কল্যাণে।

আমাদের কবি পরমেশ্বর ভারতের প্রসন্ন সোভিয়েত রাষ্ট্রের দেশবের অবস্থা বর্ণনা করে লিখছিলেন:—

আরহেনিয়াস শতবার্ষিকী

নীলরতন ধর (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)

বিখ্যাত রসায়নবিদ সোডা আরহেনিয়াস সুইডেনের ভিক নামক শহরে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হল্যান্ডের যে, এটেক ডাইরেক ও জাভারীর এমিল কিশার-এর পর ইনিই রসায়নশাস্ত্রে তৃতীয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি ইক্সল্যান্ড এবং উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। প্রসঙ্গত বল্যার যে, উপসালা পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার প্রচুপার সারা বৎসর দিব্যাজি খোলা থাকে।

ইহার ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য প্রবন্ধের বিষয় ছিল Electric conductivity of different solutions at various temperatures. এই ক্ষেত্রে ইহার প্রকৃষ্ট আবিষ্কার যে electric conductivity সল্যুশনকে যত তরল করা যায়, ততই একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাড়িতে থাকে এবং chemical activity ও electric conductivityর মধ্যে একটি বিশেষ পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে এবং শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রমাণ করেন যে salts, strong acids ও bases ইহার সকলেই মুক্ত ions এ বিভক্ত হয় এবং এই ionsগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির বাহকে পরিণত হয়।

ইহার আবিষ্কার করাগী রসায়নবিদ এক, এর, রাউন্টের অগ্রবর্তী গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। রাউন্ট আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, salts, strong acids ও bases জলে মিশিলে তাহার freezing point নিম্নাভিযুক্ত হয় ও boiling point বাড়িয়া যায় কিন্তু চিনি urea ইত্যাদি non-electrolytesএর সল্যুশনে একে রূপ পরিবর্তন হয় না। আরো যেসব সল্যুশনের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি চালনা করা যায় তাহার osmotic pressure অন্তপ্রকার সল্যুশনের চেয়ে বেশী হয়। ডাচ physical chemist Vant Hoff এই বিশিষ্টতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিখ্যাত জার্মান রসায়নশাস্ত্র অধ্যাপক Wilhelm Ostwald সল্যুশনে Law of Mass Actionএর প্রয়োগ সর্বপ্রথম আলোচনা করেন।

আরহেনিয়াস ১৮৮৩-৮৪ সালে তাঁর electrolytic dissociation বিষয়ক প্রবন্ধ উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য প্রদান করেন কিন্তু তাঁহার বিষয়টি এতই নূতন ও যুগান্তকারী ছিল যে পি, টি, ক্লিভের (P. T. Cleve) ভ্রাতৃ জগদ্বিখ্যাত রসায়নবিদ ও উপসালায় প্রধান অধ্যাপকও ইহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং আরহেনিয়াসকে মাত্র একটি তৃতীয় বিভাগের পি এইচ ডি ডিগ্রী দেওয়া হইল। এই অবিচারের কলে আরহেনিয়াসের সুইডেনে যথাসাধ্য ক্ষুব্ধ হইল বটে। কিন্তু Ostwald, Vant Hoff এবং Kohlrausch ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদের

প্রশংসা পাইয়া আরহেনিয়াসের আবিষ্কার সারা ইয়োরোপ ও আমেরিকায় উচ্চ স্বীকৃতি লাভ করিল। ভবিষ্যতে নোবেল পুরস্কার কমিটিকেও আরহেনিয়াসের আবিষ্কারের যথাসাধ্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং প্রফেসর পি, টি, ক্লিভকে নোবেল কমিটির সভাপতি হিসাবে নোবেল পুরস্কার প্রদান করিবার সময় তাঁহাকে তৃতীয় বিভাগের Ph. D. degree দিবার অবিচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। কিছুদিন পরে একটি Physico Chemical Laboratory ইক্সল্যান্ড স্থাপনা করা হয় ও আরহেনিয়াসকে তাহার কর্তা নিয়োগ করেন। বিদেশের বহু ছাত্র এখানে আসিয়া আরহেনিয়াসের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার অধীনে শিক্ষালাভ করেন।

আরহেনিয়াস চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞান শাস্ত্রের জটিল তথ্যগুলিকেও তাঁহার applied physico chemical principlesগুলি প্রয়োগ করেন এবং নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। তিনি problem of Immunity বিষয়ে জাতিগত বৈজ্ঞানিক পল এহরলিক P. Ehrlich বিনি সালভারসন আবিষ্কার করেন তাঁহার সহিত গবেষণা করিয়াছিলেন। আরহেনিয়াসের আর এক ছাত্র টি ম্যাডসেন বিনি পঁচ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে আসেন কোপেনহাগেনের Serum Instituteএর প্রথম ডাইরেক্টর ছিলেন। আরহেনিয়াস immuno chemistry বিষয় একটি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন।

জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও জাগতিক নিয়ম সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আরহেনিয়াস Physics and Chemistry of the Universe বিষয় একটি বিশাল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি নিজের মাতৃভাষার ভ্রাতৃ ইংরেজী করাদী ও জাতিগত ভাষার নিজেকে প্রকাশ করিতে পারাতেন। তিনি বলিতেন যে বিশেষ ভাষা বলিবার জন্য শতকরা পাঁচভাগ সে বিষয়ে জ্ঞান ও পটানকরই ভাগ সাহসই যথেষ্ট।

তিনি অত্যধিক পরায়ণ ও বন্ধুবৎসল ছিলেন এবং বিশেষ ভ্রমণ ও প্রবন্ধ পাঠ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার জীবনকালের প্রচলী উচ্চমানের ছিল এবং তিনি করাদী মদের একজন সমর্থক ছিলেন, তাঁহার করাদী বন্ধুরা বলিতেন il bois se'e (তাঁহার জন্য মদে জলের দরকার হয় না)।

আরহেনিয়াসের ভারতবর্ষের বিষয় জানিবার আগ্রহ ছিল ও তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের History of Hindu chemistry বহু সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন।

কাজের জন্য এদের প্রকৃত টাকার দরকার। ইউরোপীয় বড় বাজারে এদের হস্তী চলে না। তাই পেটের ক্ষয় দিয়ে এরা জিনিষ কিনেছে।

আমাদের দেশেরও এই কথাই ছিল। সোভিয়েতের সাহায্যে আমরা আজ এই কথা কট্টরে ওঠার ভরসা পাচ্ছি। কিন্তু এই সাহায্য করার উদ্দেশ্য কী? সেই উদ্দেশ্য আমাদেরই কবির ভাষায় :—

‘এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাসী। আজ পৃথিবীতে অন্ততঃ এই একটা দেশের লোক স্বাভাবিক স্বাধীন উপায়ে বহু মানুষের স্বাধীন কথা চিন্তা করছে।—স্বাধীনতার সমস্ত সর্বত্র মানুষের সমস্তের অন্তর্গত, এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা।—এরা বিবর্তন। অতএব এদের বিশ্বস্ত হওয়া চাই।’

১৯১৬ সালে তিনি Journal of nobel Institute এ প্রকাশিত আমার লিখিত The theory of solutions প্রবন্ধের উপর একটি বড় নিবন্ধ প্রকাশ করেন এবং আমি যখন তাঁহাকে জানাইলাম যে আমি তাঁহার ইনস্টিটিউটে গবেষণা-করিতে ইচ্ছা করি, তখন তিনি জানাইলেন যে North Sea-তে ছুবে জাহাজের তৎপরতার জন্য ভীষনের আশঙ্কা আছে এবং সুইডেনে খাড়াভাবও আছে এবং বাহ হাড়া কিছু পাওয়া যায় না। সুতরাং আমার বাওরা স্থগিত রাখিতে হইল।

আরহেনিয়াস দুই বার বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র ডাঃ ওলাফ আরহেনিয়াস আমার একজন বিশেষ বন্ধু ও সুইডেনের একজন বিশিষ্ট ভূমিবিজ্ঞানবিদ। Stockholm-এর নিকটে তাঁহার বড় form এ আমি কয়েক বার থাকিয়াছি। ডাঃ ওলাফ আরহেনিয়াস অনেক বার বলিয়াছেন যে তাঁহার ত্যাগ ও বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা অনেকাংশে সুইডেনের মহত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে।

যশোর ডাঃ শান্তিধরশঙ্কর ভট্টনাগর Indian science congress-এর রসায়ন বিভাগে তাঁহার সভাপতির ভাষণে আমাকে Founder of Physical Chemistry in India বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এখন যখন পৃথিবীর সকল physical chemist সুইডেনের এই মহান ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন তখন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে আমারও কর্তব্য যে এই অমর বৈজ্ঞানিকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

সুইডেনে আরতন বড় হইলেও তাহার লোকসংখ্যা দ্বিতীয় বাহাজুর লক্ষ কিন্তু সুইডেনে অনেক বড় বড় নেতা ও বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জন্মস্থান। অষ্টাদশ শতকের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক শেল লিলিয়াল (Scheele Linuens) একজন শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদবিজ্ঞানবিদ, Berzelius, Swedenborg, Arrhenius, Svedberg Siegborn ও আছে ইহার সকলেই সুইডেনের গৌরব ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ডেলি প্যাসেঞ্জার

দর্শন সেন

ঐ—ঐ ওরা কারা, বর্ধালী কতায় জলের মত
এই দিকে এলোমেসো আসছে এগিয়ে ?
সকলের দুমতালী আঁক্সা জীবিতে অচেনা হলো
সমষ্টিগত ওরা সকলের বহু ভেনা—‘ডেলি প্যাসেঞ্জার’।
সকলে জানে, চাকার চক্রেই ওরা প্রতিদিন চলে
সব্বরের নিষ্ঠুর হান-চক্রে হাতে জড়িয়ে

‘পৃথিবীটা ঘুরছে’—পরীক্ষিত এই সত্য কথা—
সত্ত্ববস্ত্র ওরাই তা সঠিক জানে।
বেহেতু, যখন ঘুরে শুকতার স্রাজ জাঁখি বোজে,
জাগরক চিরকীবী বেখে ওরা জেসে উঠে বলে
নির্দিষ্ট সময়ের সচল চাকীতে।

ভারপর ?—ভারপর কি যে হয় ওর। তা লেনেও জানে না।
তবু জানে ঝট্টু—গাইবেরিয়ার মত কনকনে দীত
কোথা থেকে লাগে যেন বৈকে-ওঁটা মেলকণ্ডতে।

হায় রে আকাশ ! বুঝি সেই নোবে তবু সেই বৃত্ত
বিনয়ের চোখেই ভাবা।

ভারার প্রৌণিষ খেলো ডাই চাকো—‘জলা, নিজে চলি
ভোমাদের নখরী সীমার চৌকোষে।
বধিও দেখানে হুব—অন্তরবর হিজ হস্তর,
হস্তি তবু, লভ্যতঃ সেলে দানে হীন ধীমন্তর
বাখিকর জানে।’

সাগরবেলায়

শ্রীমতী সর্বিতা সরকার

আমরা দুজনে এসে আগামী দিনের আলোর
কুড়াবো অশান্ত ওই সাগরবেলায় বিহুকের রাশি।
বালির বুক থেকে খুঁজে খুঁজে
ছড়াবো তোমার রক্তে রঙিন আঁচলের কোলে।

পাহাড়ের মতো ফুলে ওঠা সাগরের ঢেউ
মায়ের কোলে উঠে আসা ছেলের মত বেখানে শান্ত স্নানর
সেখানে ক্রমাল পেতে আমরা বোসবো।
ভনবো, দূরে ক্ষুদ্র সাগরের গর্জন
আর তোমার কোল থেকে এক একটি বিহুক ছাড়িয়ে
সেখবো, মুক্তো আছে কি না !

খুঁজতে খুঁজতে এক সময় একটি মুক্তো পেয়ে যাবো—
আমরা দুজনে যেনো একটি বিহুকের ছটি পাভা,
ওই অশান্ত সমুদ্র বিচিত্র সংসার
কমালবানী আমাদের ছোট খর।

কোথা হ’তে এসেছি জানি না, কেন জানি না, তবু আমি
আমরা দুজনে এসে ছব মিলেছি সাগরের মাঝে।
এখন গড়তে হবে দুজনের মাঝখানে
একনি এক স্নানর, পখির, মুক্তোর মতো জোয়।

বঙ্গরমণীর মৌন বিক্রম

[দ্বিতীয় পর্ক]

ঐনির্মলপ্রাণ চৌধুরী

যে সময়ে বঙ্গরমণীর অন্তর্ধারণ করিবার আবশ্যকতা ছিল না, সে সময় তাঁহাদের সকল সাধনা, সকল চিন্তা, সকল কার্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সাহিত্য সমাজের পদ প্রার্থিতার মন্দিরতলে সমবেত হইত। তাঁহাদের এই শান্তিময় জীবনের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, কুলক্রমাগত বাহুবল তাঁহাদিগকে একেবারে পরিভাগ করে নাই। রণদুর্ভিত্ত তাঁহাদের সে বিক্রম বোধগা করে নাই—অস্ত্রের কন্খনীও তাঁহাদের সে শক্তির পরিচয় প্রদান করে নাই; কিন্তু তাঁহাদের সে মৌন বিক্রম আজিও বজ্রাতি ও বিজ্রাতি কর্তৃক সসম্মানে প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে।

নারী জাতির রূপাশে পশুপশু, সহশুপশু, লক্ষশুপশু, কোটি শুপশু মহত্বের গুণ আছে। তাঁহারা মৃদুস্বভাব, স্নেহিত, ভক্তি ও শ্রীতি, বাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা শুক্রবা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিতকার কিকিং পরিচয় পাইয়াছেন। বাঁহারা কখন কোন দুঃখবীরকে পতিপুত্রের জন্ত জীবন বিসর্জন, ধর্মের জন্ত বাহু সুখ-বিসর্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দূর বুঝিয়াছেন যে কিরূপ শ্রীতি ও ভক্তি ব্রহ্মদেবে বাস করে। তাঁহাদিগের অসাধারণ মৌনবিক্রম প্রতিদিন প্রতিগৃহে গোপনে প্রকাশ পায়, তাহার সহিত জয়নিনাদের সম্পর্ক নাই। আশুপ্রচারের চেষ্টা নাই। পাছে আর একজনের কোতুল মৃদু আকর্ষণ করে। এই ভয়েই উহা সর্বদা সঙ্কটিত হইয়া থাকে।

এসময়ের কয়েকখানি পুণ্যে বহু মহীয়সী মহিলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, বহু রমণী পুরুষের মতই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ধর্মের জন্ত অর্থ-ব্যর্থ পায়ের ঠেলিয়াছেন, ভিক্ষুণী হইয়া কঠোর সাধনা করিয়াছেন। তাহার পরে বর্মপ্রচারের জন্ত কেহ কেহ দূর বিদেশে সাগরপারেও চলিয়া গিয়াছেন। স্বাভাবিক প্রথম সংখ্যক সাক্ষ্যকথার প্রত্যক্ষ বা তৌরণ নির্বাণের ব্যয় বাঁহারা নির্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালার পুণ্ড বর্দ্ধননগরের একজন মহিলার নাম উল্লিখিত আছে। লিপিটি এই—“ধমতায় দানং পুণ্ডবদনীয়ার” অর্থাৎ পুণ্ড বর্দ্ধনের ধমতা বা ধর্মদত্তার দান। ইনি গৃহী উপাসিকা ছিলেন। সেকালে বৌদ্ধ তানলীগণ জনসমাজে বহুমানের পাত্রী ছিলেন। তাঁহাদিগের বিজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা কৌশল, সজ্ঞা পথিব্যবে গতিবিধি তাঁহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিচয় প্রাপ্তবাহ্য প্রভৃতি সঙ্কট নাটকের ছানে ছানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা নিজ নিজ বিভাষিত ও পুণ্যবলে প্রথমপদে আরুহ হইতে পারিতেন, এমন কি তিনি অর্থ হবারও অধিকারিনী ছিলেন। বৌদ্ধমন্ত্রদ্বারের মধ্যে ভিক্ষুণীসমাজের এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। ভিক্ষুণীগণ প্রচলিত রীতি ও নিয়মাদ্বারা নিজেদের সম্ভব পরিচালনাকার্য নিজেরাই সম্পন্ন করিতেন।

বৌদ্ধযুগের পরে, বৈষ্ণবযুগেও বঙ্গরমণীগণের কীর্তিগাথা অবগত হওয়া যায়। বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে কয়েকজন ভক্তিমতী ও ভক্তবিনী

নারীর জীবনের কথা জানিতে পারা যায়। তাঁহারা স্বাধীকে ভালবাসিয়াছেন, স্বামীকে সেবাও করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভব জন্ত, ধর্মের জন্ত, অস্ত্রবহিত বিবাহে অটল থাকিবার জন্ত তাঁহারা স্বামীর কুসংস্কারপূর্ণ মতের বিরুদ্ধে চলিতে এবং অজ্ঞার কার্যের প্রতিবাদ করিতে সোটেই ভীত হন নাই। একান্ত প্রথমে তাঁহারা বহুবিধ নির্যাতনও ভোগ করিয়াছেন কিন্তু তাহার পরে ঐ সকল সাক্ষী নারীদিগের মনের বল, অস্ত্রের পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও ভগবানের প্রতি ভক্তি সেবিয়া বিরুদ্ধশক্তিরেবাও তাঁহাদের মস্তক অবনত করিতে সক্ষম হন নাই। বৈষ্ণব সমাজে পতিতা রমণীর অভাব ছিল না—জাহ্নবী দেবী, শিখি মাইতির ভগিনী মাধবী প্রভৃতি অনেকের নাম করা বাইতে পারে।

রাজসাহী জেলার খেতুরী গ্রামে ঐনির্মলপ্রাণ চৌধুরী কর্তৃক ঐঐগৌরাদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দ্বারা ঐগৌরাদেবের অবতার প্রচার বাঙ্গালার ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। ব্রহ্মবন হইতে সমাগত ঐনিবাস আচার্য্য বিগ্রহের অভিব্যক্তি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। অবত্যাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুর তখন তিব্বাতের হইয়াছে; তাঁহার অধর্মমানে তনয় সর্বাধর্মী ঈশ্বরী জাহ্নবী দেবী ব্রহ্মসহ হইতে খেতুরীগ্রামে শুভাগমন করিয়া এই বৈষ্ণব মহা শিল্পনীতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নির্দেশানুসারে সে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও তৎসংক্রান্ত বাস্তব কার্য নির্বাহ হইয়াছিল। বৈষ্ণবপ্রাণ পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। ইহা হইতে তৎকালে যোগ্যতানুসারে বর্ধনগতে এবং বিশ্বক্সন সমাজে স্ত্রীলোকগণ নিজ নিজ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন, ইহা অন্তর্ধান করিলে অসম্ভব অস্থান না-ও হইতে পারে। ঐতিহ্যসম্পন্ন অবতার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার বঙ্গরমণীর অবদান প্রদানিত শিরে স্বরূপ করিবার যোগ্য।

ঐনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা দেবী শিতার জীবৎকালেই বৈষ্ণব সমাজে নেতৃত্বের অধিকারিনী হইয়াছিলেন। বোদ্ধ শতাব্দীর শেষপার্শ্ব হইতে বৈষ্ণব আচার্য্য বাড়ির মহিলাগণ অনেকেরই ভাল বকম শিক্ষালাভ করিতেন—নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্রবধূ হুভঙ্গাদেবী সন্তোকে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—অনঙ্গকদম্বাবলী। হেমলতা দেবীর রচিত পদও পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডীমাসের প্রেমিকা রামীরও অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত “কবীন্দ্রবচনসমুদ্র” নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ভাবদেবী (বা ভাবাকদেবী) এবং নারায়ণলক্ষ্মী নামী দুইজন মহিলা বঙ্গ কবির নাম পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার সর্বপ্রাচীন পুঁথি চর্যাপদের দুইটি পদের ভাষা ও ভাব দেখিয়া মনে হয় নারীর রচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আনন্দময়ী দেবী একজন সুপণ্ডিতা মহিলা ছিলেন। তিনি বঙ্গ হইতে অগ্নিপ্রায় যজ্ঞের অনেক বৃত্তান্ত ও বক্তব্যের আকার প্রকৃতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। চন্দন শাঙ্কাদোচনার প্রিয়বন্ধ দেবী ও বৈষ্ণবদেবী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সকল বৃত্তান্তই বঙ্গরমণীর মৌন বিক্রমেরই পরিচায়ক।

মুসলমান নবাবের কাটোয়ার ফৌজদার দেবকীন্দন রায় ধনী এক প্রবল অভ্যাচারী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী গৃহস্থ বৈকুণ্ঠের কন্যা, বুদ্ধিমতী, তেজবিনী ও ধর্ম্মশীলা। পিতৃগৃহে থাকিতেই তিনি বৈকুণ্ঠের লীলা লইয়াছিলেন। তাঁহার গুরু ছিলেন পরমভক্ত শ্রীনিবাস আচার্য্য। গুরুর নিকট তিনি যে শুধু শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন তাহা নহে,—তিনি পুস্তকসিঙ্গের সজিত রীতিমত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার করিবার শিক্ষাও পাইয়াছিলেন। স্বামীর তাত্ত্বিক বামচারণ ধর্ম্মের সুপ্রাণ ও আত্মবৃত্তিক সকল ব্যাপার তাঁহার ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। ইহার প্রতিকার চেষ্টা করিলে—

“স্বামী তাহা তুমি বহু ভংগনা করয়।

তুমি মোর গুরু হইলি কহিয়া কহয়।”

কিন্তু গুরু না হইলেও এই দৃঢ়চিত্ত তেজবিনী রমণীর প্রভাব তিনি যেই দিন অকস্মেৎ করিতে পারিলেন না। তিনি বৈকুণ্ঠ ধর্ম্মে লীলা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন। দেবকীন্দনের পক্ষী কিন্তু গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। গৃহই তাঁহার ভক্তি সাধনের কেন্দ্র ছিল। তিনি বনন বাঁয়লী, তখন ভগবানের প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল; তাঁহার গভীর ভক্তি ও উন্নত ধর্ম্মজীবন দেখিয়া জনসাধারণ তাঁহাকে আশ্রয় রমণীরূপে বরণ করিয়া লইল।

বর্তমান জেলার ময়লকোট অঞ্চলে দরবেশ মহিলা বিবি চামেলীর কাহিনী আজও জনসাধারণের লক্ষ্য ও ভক্তির সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে এতদঞ্চলে এই মহীয়সী মুসলমান রমণীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তৎকালে পশ্চিমবঙ্গের নিম্নলিখিত-নিম্নত পল্লীপুত্রের বৃকে বসে তিনি যেভাবে ইসলাম ও মানবতার খেদমৎ করে গিয়েছেন মুসলমান ও ভারতের ইতিহাসে আজও তার ভূমিকা নেই। কর্ণের সঙ্গে ধর্ম্মের নিবিড় সংযোগ সাধন করে তিনি তৎকালে হুকের সমাজ গড়বার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেয়েছিলেন সে স্বপ্নকে হুসলিম জাতির মধ্যে রূপায়িত করতে, সেয়েছিলেন মানবতার কল্যাণকামী একটি যোগদানগার তৈরী করতে। তা পরিপূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি সত্য, কিন্তু তাঁর মহান আদর্শের কথা চিন্তাশীল মানুষেরা আজও বিবৃত হয়নি। বনন বিবি চামেলী অকস্মেৎ সময়ে প্রেমের হুসলিম জেনানাসেরকে পরিণত ইসলামে মহনা হুদায়ের এক বিধি-বিধান শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। তাঁর অলঙ্কার চোঁটা ও পরিগ্রহে ধর্ম্মের কুসুমদার ও শের বেলাতের কালো অন্ধকার গায়ে হয়ে দেখানো কুটে উঠল তাও হুদের উজ্জল আলো আর ইসলামের অপভ্রংশ রূপ। তাঁর যিষ্টমুখ ব্যবহার এক সেবা সাধনার জুঁ হুসলমান জেনানারাই আকৃষ্ট হয় না। বহু অহুসলমান নারীও তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ল। তাঁর প্রচেষ্টার প্রভাবকালের বহু অন্ধকার গৃহে জলে উঠেছিল ধর্ম্ম ও শিক্ষার আলো, গড়ে উঠেছিল একটি নোবাবতী হল। জাতি-ধর্ম্মবিরোধে হুহ নরনারী এবং অন্যায় আত্মবিরোধের সেবা করতেন তাঁরা। তিনি নিজে একজন কামেন দরবেশ ছিলেন। আরবী, ফার্সী প্রাকৃতিক ভাষার ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার। হাফিজ ও কৌশলসরক তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন বেশ ভাল ভাবেই। কাটোয়া ময়লুয়ার যে সকল তেজবিনী নারীর পরিচয় আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাঁদের মধ্যে হানিলা বিবি চামেলী ছিলেন সর্বপ্রথম শিক্ষিত এবং ধর্ম্মপ্রবর্তনা। তিন শত বৎসর

পূর্বের একজন বাঙ্গালী মুসলমান রমণীর এই সৌরবগাথা প্রভাব সহিত গ্রহণযোগ্য।

দক্ষিণাধারে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যিনি জগতে অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট বাঁহার নাম সুপরিচিত, সিপাহী বিদ্রোহকালে সেই স্বামী রাসমণিও একদিন অসিহস্তে দেবমন্দির রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে পোরা সৈন্তগণ স্বামীর জানবাজারে প্রোঙ্গনভুল্য অট্টালিকা লুণ্ঠ করে—স্বামীরানোরা বখালাথা বাধাপ্রদান করিয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহে পরাভূ হয়, কিন্তু স্বামী এই সময়ে শাবিত কৃপাণ-করে ব্রহ্মনাথ জাঁউর মন্দিরে তৈরী হুস্তিতে মন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন।

স্বামী প্রভাব বিবরণীসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার তেজবিতার এক বিকসে ‘বাংগে-পল্লভে জল ধায়’ বলিয়া লোকে বলিত। এক কথার স্বামী ছিলেন রক্ত ও সন্তের অপূর্ণ সমীক্ষণ। অশেষ গুণ-সম্পন্ন স্বামী একহস্তে প্রভুত সম্পত্তির বখাবথ রক্ষাবক্ষণ এবং অপর হস্তে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া স্বামী আনন্দ উপভোগ করিতেন। এত বড় সম্পত্তির অধিকারিনীবৃদ্ধি ও তেজবিতার অধিতার রাসমণির হৃদয় য কত মহৎ ছিল ও কত উদার ছিল, তাহা প্রমুখ্যন করা যায়। নিজ মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণের ঈশ্বরপ্রিয়ে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অভ্যন্তরে সকল কার্য অহুমোহন করান। এই মিক দিয়া বিচার করিলে স্বামী রাসমণিকে শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যাশ্রয়ের মূল কারণ বলা বাইতে পারে। বর্তমানকালে যে হুগলধর্ম্ম প্রবর্তকের প্রচারিত ধর্ম্ম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনোবিগের মনোবাজ্যে বৃগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাঁহার আবির্ভাবের মূল কারণ হওয়া নারীর পক্ষে পরম পৌরবের বিষয়। স্বামী রাসমণি সাধারণ নারী ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেবীর অষ্টনায়িকার অন্ততমা বলিয়া অভিযত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধিমতা, তেজবিতা, গুণগ্রাহিতা ও ধর্ম্মভাবে তিনি নারীজাতির শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। পুণ্যবতী স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণসেবের কৃপার দেবীর নর্নলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে দেহত্যাগের পূর্বে তাঁহাকে গল্গাভারে আনয়ন করা হইলে সমুখে কতকগুলি আলো জলিতেছে দেখিয়া তিনি সন্তোষা বলিয়াছিলেন—“সরিয়ে মে, সরিয়ে দে, ওসব যোগনাই আর ভাল লাগছে না; এখন যা (শ্রীশ্রীসন্নাতা) আসছেন, তাঁর শ্রীজ্ঞানের প্রভাব চারিদিক আলোকময় হয়ে উঠছে।” শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দেব প্রবর্তিত ধর্ম্ম তথা ভারতের নবজাগরণে এই মহীয়সী নারীর দান চিরস্মরণীয়।

বৃগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রী-জ্ঞক গ্রহণ প্রমাণ করিতেছে যে, পূর্বের স্রাব নারীও সান প্রভাবে হুদের সর্কোচতবে উপস্থিত হইতে পারেন। অসাধারণ আধ্যাত্মিক দক্ষিসম্পন্ন তৈরী যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণী নামে পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার যেমন ছিল শাস্ত্রজ্ঞান, তেমনই ছিল সাধনশক্তি। চৌধুরীনা তত্ত্ব ও বৈকুণ্ঠান্ত তাঁহার কেবল অধিগত ছিল না, তিনি ঐ সকল সাধনে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহাই নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ রমণী রাইয়ে মাতৃভাব সর্কতোভাবে অকুর রাখিয়া সকল তত্ত্ব সাধনা এবং বৈকুণ্ঠান্তের পক্ষ ভাবে সাধনার এক এক সিদ্ধিসাধ করিয়াছিলেন। এইরূপে যোগেশ্বরী তৈরীই শ্রীরামকৃষ্ণসেবকে নানা পথ দিয়া সমুদয় সাগরে লইয়া গিয়াছিলেন। একজন রমণীর পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণসেবের স্রাব

জন্মপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তিশালী অবতার পুরুষের গুণগণে অভিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ সাধন শিক্ষাদান সমগ্র নারীজাতির গুরু দ্বাধার বিবর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দ্বিতীয় রাসদণ্ডির আশ্রিতা মধুরবাবু প্রথমে মানসিক বিকার বলিয়া মনে করিয়া উহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মী শাস্ত্রাবলম্বী উদ্ভার করিয়া এই দেবমানবের শরীর ও মনের লক্ষণ সমূহের সহিত শ্রীমতী রাধাদাসী ও শ্রীচৈতন্যদেবের মহাত্ম্যের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখাইয়া বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ সাধকদের নিকট ইহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। এই মহিমামयी নারীই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া সর্বপ্রথমে ঘোষণা করেন এবং বলেন, এবার 'নিষ্ঠান্যকের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।' আজ দেশ-বিদেশের সহস্র সহস্র নরনারী বাহাকে অবতাররূপে পূজা করিতেছেন, তাঁহাকে সর্বপ্রথম চিনিরাছিলেন যোগেশ্বরী ভৈরবী। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ তাঁহার তথা সমগ্র নারীজাতির উদ্দেশে চিরকাল প্রচার অর্থ প্রদান করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘবন্দননী সারদাসেবী, ভক্তিমতী গৌরী মা প্রভৃতি রামকৃষ্ণভক্তগণের কাহিনী বঙ্গরমণীর অপরিণীয় গৌরবের কাহিনী। ইহাদের সকলের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে পারিলে একখানা দুখপাঠ্য গ্রন্থ হইবে এবং উহাতে বঙ্গরমণীর মৌনকিত্তমে দশমিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। ভরসা করি কোন যোগ্য ব্যক্তি এ প্রচেষ্টার হস্তক্ষেপ করিবেন।

ব্রাহ্মী পাঠ্যর নাম রাজপুতনার ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বালকলাদেশেও বা ঐরূপ প্রভুভক্তিপরাধনা কোন রমণী ছিলেন, বাল্যালী সে কথা আজ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। ইতিহাস বলিয়া থাকে, ক্রোড়ী হস্তে মেদিনীপুর জেলের দুঃখাজাতীরদের সর্গার ত্রিভঙ্গ শিখের মৃত্যু হইলে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও তাঁহার শিশুপুত্রের প্রাণরক্ষার জন্ত এক নারী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অকলঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছেন। নিজ সহায়-সম্পদ, স্বামী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া শিশু রাজপুত্রের জীবনরক্ষা তিনি করিয়াছিলেন। দুঃখের বিবর, বীরেন্দ্র-সমাজ বহাগীরা এই রমণীর নাম ইতিহাসে লিখিত হয় নাই। কিন্তু দুঃখগণ আজিও তাঁহার বৃত্তি প্রচার সহিত শ্রবণ করিয়া থাকে।

কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে এক বাল্যালী বালিকার মৌনবিক্রমের এক অপূর্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "জাকিসককে বসিয়া মোকদমার বিচার করিতে বসিলাম। সমুখে একটি অসামান্য রূপশী চতুর্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা উপস্থিত হইল। সে কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা। সেই বালিনী, তাহার অভিবাগ—সে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত তাহাদের কুটারের সম্মুখে প্রোভে উঠানে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিল। এমন সময় বিবাহী ৫০ জন লাঠিয়াল সহ তাহার বাড়িতে উপস্থিত হইল। বিবাহী সম্প্রতিশালী ব্রাহ্মণ হইলেও অকুলীন এক তাহার বর ৬০ বৎসরের কাছাকাছি। সে নবদ্বীপীয় রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বালিনীর শিতা নিতান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও উপরোক্ত কারণে বিবাহে অসম্মত হইয়াছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ঠিল মেঘপ পাকারার শব্দক লইয়া দায়, সে ৫০ জন

লাঠিয়ালের দ্বারা তাহাকে বলপূর্বক অহুমান ১০ মাইল পথ লইয়া গিয়া একেবারে বিবাহবেদীতে উপস্থিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলে চতুরা ও প্রথরা বালিকা অবগুষ্ঠন কেলিয়া সমবেত ব্রাহ্মণ শত্ৰুতগণকে সন্ধান করিয়া বলিল—'আপনারা কাহার সঙ্গে আমার বিবাহ করাইতেছেন? চাটুয়া (বিবাহী) আমার বন্ধুত্ব শিতা।' ব্রাহ্মণগণ তখন দায়। দায়। বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং বিবাহও সেখানে শেষ হইল। তখন বালিকা বিবাহীর নীলকণ্ঠের বিষ হইয়া পড়িল। এ চতুরাকে রাখা অসাধ্য। ছাড়িয়া দিলেও বিপদ। তাহাকে ৭ দিবস বাবত নীলকণ্ঠের কয়েদীর মত স্থানে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল এক বহু অর্থের বহু স্বর্থের প্রোভোজন দেখাইয়াছিল। কিন্তু গরিবতা বালিকা তাহা ভুগবৎ তুল্য করিয়াছিল।

সে ত এজাহার দিতেছিল না। একটি দলিত যশা কথিনী যেন কোড়ে কোড়ে গঞ্জন করিয়া বিব উদ্বীর্ণ করিতেছিল। তাহার হুই আরম্ভ আরম্ভ নয়ন হইতে অনর্গল বারিধারা পড়িতেছিল। এবং সে পরিপূর্ণ বিশাল নয়ন হইতে যেন বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। সমস্ত কক নীরব। আমলা, উকিল, মোক্তার তাহার অদ্ভুত উপাখ্যান, গরিবত ভাব ও তেজস্বিনী বুদ্ধির ক্রীড়া দেখিয়া ভূমিত হইয়াছিল। বালিকা এজাহার শেষ করিয়া বলিল যে পুলিশ যে সাক্ষী আনিয়াছে তাহা তাহার সাক্ষীও নহে। ধনী ব্রাহ্মণ বিবাহীর কাছে বিশেষ দক্ষিণা পাইয়া একটা মোকদমা গড়িয়া তুলিয়াছে। যদি আমি নিজে তদন্ত করিতে বাই। কিবা একজন বিবাহী পুলিশ ইনস্পেক্টর পাঠাই, তাহাকে যে পথে লইয়া গিয়াছিল, যে যে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সে সকলেরই চিহ্ন রাখিয়াছে, সকলই দেখাইয়া দিতে পারিবে এবং তাহার সকল কথা প্রমাণ করিতে পারিবে।

"পুলিশের সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়াও বুদ্ধিলাম যে, বালিকার আশঙ্কা অমূলক নহে। বাহাতে বিবাহী অন্যদলে অব্যাহতি পাই, পুলিশ কিছু গুরুতররূপে দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া এ ভাবেই মোকদমার্টী চালান দিয়াছে। কেবল বালিকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এবং তেজস্বিতার ভয়েই যেন চালান দিয়াছে এবং বাহা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে তাহার যেন ব্যতিক্রম না করে, তৎসম্মুখে তাহাকে খুব শাসাইয়া দিয়াছে। বালিকা যে সকল কথা পুলিশের মুখের উপর ক্রোধে কীলিতে কীলিতে বলিয়াছিল। ভলিময় কিছু না বলিয়া মোকদমার্টী পর দিবসের জন্ত স্থগিত রাখিয়া রাহি ১১টার সময় আমার একজন আরদালী পাঠাইয়া বালিকাকে ও তাহার শিতাকে ডাকাটীয়া আনিলাম এবং তাহারিগকে নৌকার উঠিতে বলিলাম। ব্রাহ্মণ তাহার কুলীনঘের এক দীর্ঘ কাহিনী আরম্ভ করিল; কিন্তু প্রথম বৃত্তি বালিকা তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল, তুমি কেন এতকাল করিতেছ? হাকিমের সঙ্গে বাইব তাহাতে ভর কি? মাধারীপুর হাড়িয়া গেলেন বালিকাকে কুমার নদীর যে ঘাটে পার করিয়া লইয়াছিল, সেই ঘাটে নৌকা রাখিতে বলিলাম। প্রভাতে সেই ঘাটে পহুছিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—সেই ঘাটে পার করিয়া তাহাকে লইয়াছিল। সে বলিল অদূরে একটা কালীবাড়ি আছে। কিছুক্ষণ পরে বর্ষাই সে একটা কালীবাড়িতে লইয়া উপস্থিত করিল। তাহার পর তাহাকে কোন দিকে লইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া একটা গ্রামে গিয়া

উপস্থিত করিল। এক এক বাড়িতে প্রবেশ করে এক সে বাড়ি নহে বলিয়া আর একবাড়িতে আমাকে লইয়া বাইতে লাগিল। একটা বাড়ি শেষে চিহ্নিত করিলে সেখানায় সমস্ত পুঙ্খ পলারন করিয়াছে। একটা বুঝা মাত্র আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সকল কথা অব্যাহার করিল। তখন বালিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের ছোটবেলা যে আমাকে ঐ জায়গার দ্বান করাইয়াছিল সে কোথায়? বুঝা তাহার চাকুরী বৃত্তিতে না পারিয়া বলিল—সে তাহার বাপের বাড়ি গিয়াছে। ধরা পড়িয়া বৃদ্ধি আভোপাত্ত সমস্ত কথা অব্যাহার করিল। পরে পুত্রেরা আসিয়াও সাক্ষ্য দিল।

বালিকা তাহার অব্যাহারবৃত্তিতে বলিয়াছিল যে একবাড়িতে একটা বউ তাহাকে বলিয়াছিল বিবাহী তাহাকে আর লুকাইয়া না রাখিয়া একেবারে কাশী পাঠাইয়া দিবে। বালিকা তাহাতে ভীত না হইয়া বলিয়াছিল যে তাহার শরীর পাঠাইলে তাহার মন ত বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। সে লেখাপড়া জানে—সে হাকিমের কাছে পত্র লিখিয়া সুবাদ দিবে। তাহাতে বউটি তাহার কলিকাতাবাসী স্বামীর একখানা পত্র আনিয়া পড়িতে দিলে বালিকা বলিয়াছিল বউ! আমি আজ কর দিন পর্যন্ত কিছু খাই নাই। আমার মন বড় অস্থির। আমি বাইবার সময় তাহার পত্র পড়িয়া দিয়া বাইব। আমি তাহা শুনিয়া বালিকা কি লেখাপড়া জানে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল যে লেখাপড়া জানেনা। কেবল অক্ষর লিখিতে শিখিতেছিল। তবে লেখাপড়া জানিলে যদি ভয়েতে আসামীর তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, সে ভয় মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সে আরও বলিয়াছিল যে সেই পত্রখানি সে সেই বাড়ির বেড়াতে গুঁজিয়া রাখিয়াছে। সেই বাড়িতে আমাকে লইয়া গেল। এখন বাড়ির লোকেরা সকল কথা অব্যাহার করিল, তখন বালিকা চুপে চুপে গৃহস্থে প্রবেশ করিয়া আমাকে ডাকিল এবং আমি গেলে আমাকে সে পত্রখানি দেয়া হইতে আনিয়া দিল। তখন বাড়ির লোকেরা অপ্রতীক হইয়া সকল কথা স্বীকার করিল। কোন কোন গ্রামে গিয়া কোন বাড়িতে তাতাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, বাড়িতে আসা-কাণ্ডের নকল বাহির হইতে চিনিতে না পারিয়া সে সে কখন জিলাপিলী, কখন বা বৈদ্যপিলী বলিয়া বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিয়া আমাকে নির্দিষ্ট বাড়িতে লইয়া গেল। এ এক নৃশংস সাক্ষীর প্রকাশ লইয়া মোকদ্দমা সেসময় অর্পণ করিয়া। বালিকার রূপের ও বুদ্ধিমত্তার গুণে সমস্ত জেলা তোলপাড় হইল। সেসম বিচারে মতামত, চাটুয়া ও তাহার সচিববর্গের পাঁচ বৎসর করিয়া এ অপূর্ণ বিচারের বাসবাসের আশ্রয় হইয়াছিল।

বিবাহী পক্ষ হইতে চাটকোট্টে আসিল কহিল ঐ বীর বালিকার আত্মসমর্পণ ও সত্যস্বকায় অপরূপ কাহিনীতে চাটকোট্টের উকিলদলের মধ্যে তোলপাড় উঠিয়াছিল এবং ভীতান্ত টাঙ্গ ভুলিয়া ৬৭ শত টাঙ্গ সংগ্রহ করিয়া শুদ্ধাঙ্গা বালিকাটির বিবাহ দেওয়াইয়া নিয়াছিলেন। সামাজিক কোন ভাগ ও প্রতিবন্ধক নুহি করে নাই। এই বীর বালিকার অসাধারণ যৌনবিক্রমের ইতিহাস শুধু যে নারীহরণ প্রসিদ্ধিত বহুদেশের রমণী সমাজের পথনির্দেশের কাজ করিবে এবং জন্মে আশা আনিয়া দিবে তাহা নহে। ইহা পৃথিবীর সকল জাতির, সকল কালের রমণী-পৌরোহ ইতিহাসে একটি অভ্যুদয় ঘটনা বলিয়া

বর্ণিত হইতে পারিবে।

বর্তমান জেলার কালনা মহকুমার মহকুমার আদিনিপুর পঞ্চপাশ উট্টো বা আবাজি হুগাঁপুৰ একখানি জুজ গ্রাম। এই গ্রামের বৈদ্য চৌকিলায়ের শুক্লর পর তাহার স্ত্রী ব্রহ্মরী স্বামীর চাকুরী পাইবার জন্য বর্তমানের পুলিশ-সাহেবের নিকট আবেদন করিল। ব্রহ্মরী পাইয়া পুলিশ-সাহেবের ঘড়াপুলী। তৎকালে ম্যাট্রিষ্ট-সাহেবের কাছে থবর দিলেন, এক বাজালী মেয়ে লাঠিখেলায় পরীক্ষা দিয়া তাহার স্বামীর চৌকিলাতী হইতে আসিয়াছে। জেলায় মহা গোল উঠিল। দুই কর্তার হুঁখানা তেলারা আনিয়া কাছারীর মাঠে বৈঠক করিলেন।

ব্রহ্মরী কোমরের কাছে কাপড় বাঁধিয়া মহিবমর্দিনী হুঁধিতে পাঁড়াইয়া উঠিয়া সাহেবকে জ্ঞতি বিনীত স্বরে বলিল—হুজুর। এখলা ত লাঠি খেলা হয় না। কে আমার সঙ্গে খেলিবে, আশুক। কেহই আসিতে চায় না। আওরতের সঙ্গে খেলিা কি সত্তম নষ্ট করিবে? শেষে পুলিশ সাহেবের সঙ্কেতে একজন কনষ্টেবল অগ্রসর হইল। ঠকাঠক, ঠকাঠক—কনষ্টেবল বড় দৃঢ়; কাণ্ডখানা একটা প্রহসনর মত করিয়া তুলিল। সর্দারনী তাহা বৃষ্টি; বলিল—হুজুর। আমাকে কি সন্ত সাহায্য তাহালা দেখিতেছেন? এক লাঠিখেলা হইতেছে? পুলিশ-সাহেব জবাব জার এক সঙ্কেত করিলেন। বড়ি দেখিলেন—বশ মিনিট খেলা হইল—সর্দারনীর লাঠি কনষ্টেবলের লাল পাগড়ি স্পর্শ করিল। সাহেব খেলা বন্ধ করিয়া সর্দারনীর প্রশংসাচার করিলেন। সর্দারনী কিন্তু এখনও সন্তুষ্ট নহে; কয়বাড়ি বলিল—খেলোয়াড় দুইজন আমাকে দ্বারিতে আশুক; নেখুন আমি নিজেকে সামলাইতে পারি কি না। তাহাই হইল—দুই দিক হইতে দুইজন আক্রমণ করিতে আসিল। ব্রহ্মরী হুঁপাইয়া লাঠি দুই হাতে লইয়া তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট পরে সাহেব খেলা বন্ধ করিলেন। ব্রহ্মরী স্বামীর চাকুরী পাইয়া বৃষ্টিস লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল। বাজালীর হুঁপায় যে, এইরূপ কড় শত ব্রহ্মরীর ইতিহাস এখনও সাংগৃহীত হয় নাই।

ব্রহ্মরী যে একদিন বীরবীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ব্যাধ বধ করিয়াছিলেন, সে কথা এখন বলিলে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু প্রাচীন সংবাদপত্র পাঠে জানিতে পারা যায় যে ১২১৮ সালেও কলিকাতার পূর্ব-বর্ধিণ বাগানের অভ্যুদয়িত জয়নগরের নিকট চৌর মল গ্রামের এক গৃহস্থ গৃহে বেলা এক প্রহরের সময় এক ব্যাধ আসিয়া ঐ গৃহ প্রবেশের উদ্দেশে গৃহের চত্বাক্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহস্থের স্ত্রী ব্যাধের ঐ সমস্ত উদ্ভোগ দেখিয়া ভীত হইয়া নানারূপ ভাষিতে লাগিল। উদ্যতসনে ব্যাধ কোনমতে হার না পাওয়া বন্ধ দিয়া পিড়ার চালে উঠিয়া চালের খড় উঠাইয়া বন্ধকিৎ হার করিয়া মুখ দিল; কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল না। পরে পশ্চাতের চই পা ও লাঙ্গুল অগ্রে দিল। এই সময় ঐ স্ত্রী ভীতানশা ভাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শ্রীত-নিবাসক কাঁথার এক ভাগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া অগ্নে অগ্নে ব্যাধের অগ্নিতে ধরিল। তখন ব্যাধ ব্যস্ত হইয়া পুনরুত্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু লম্বা আনি শরীর নিরাশ্রয়ে দোহলুমান হওয়ার্তে উপানে সর্প হইল না। পরে প্রলয়কালীন গর্জন শুণ্য হার হার বৃষ্টি পদ করিতে লাগিল। ইহাতে প্রহস্তু লোকেরা ভীত হইয়া বধ গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহস্থে থাকিল। ঐ স্ত্রী ক্রমে ক্রমে গৃহস্থ

না হয়, কেবল ব্যাধি দূর হয় এইজন্য অগ্নি ধারালিতে লাগিল। কিছুকাল পরে ব্যাধি নিশেষ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে রাজসাহী সহরের সিপাহীপাড়ায় বিত্তা পোয়ালিনীর গোয়ালগৃহে ব্যাধি প্রবেশ করিয়া গাভী আক্রমণ করিলে গাভীদিগের ভীত চিৎকারে আতঙ্ক হইয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য বিত্তা পোয়ালিনী গোয়ালঘরে আগমন করে। কিন্তু ব্যাধি দেখিয়া ভীত না হইয়া রামা দিয়া ব্যাধিকে আক্রমণ করে। রামদাসের আঘাতে ব্যাধি নিহত হয় এবং এই ঘটনায় সমুদয় রাজসাহী সহর তোলপাড় হয়। বঙ্গরমণীর এই প্রত্যাংগরমতি ও মৌন বিক্রম অনেক আয়েয়াছারী সাহসী বীরপুত্রদেরও অমুচরণযোগ্য।

প্রাচীন বাঙ্গালার পাল ও সেন আমলের লিপিস্থলিতে মনে হয়, লক্ষ্মীর মত কলাপী, বহুধার মত সর্বসহা, বারিভ্রতনিরত। নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালী নারীর চিত্তাঙ্গ, এবং বিশ্বতা, সহায়তা, বঙ্গুসহা এবং দ্বৈধা, শান্তি ও আনন্দের উৎসবরণ। স্ত্রী হওয়াই ছিল তাঁহাদের একান্ত কামনা। স্বামীর ইচ্ছাঅনুগতি হওয়াই তাঁহাদের বাসনা এবং শায়ক যেমন প্রেম করে স্ত্রীকে তেমনিই স্ত্রীস্বরূপ বীর ও স্ত্রী পুত্রের প্রেমবিনী হওয়াই সকল বাসনার চরম বাসনা। লিপির পূর লিপিতে এই সব কামনা, বাসনা ও আশ্রয় নানাপ্রসঙ্গে বার বার ব্যক্ত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে স্ত্রীমাত্রেয় পুত্রের সম্মান ও মর্যাদা এই ক্ষেত্রে বেশ উচ্চই ছিল, সন্দেহ নাই। লিপিস্থলিতে উল্লেখ্যই সম্বন্ধ ও সম্মান উল্লেখ্য তাহার সাক্ষ্য; কোনো কোনো রাজকাব্যে রাজার অমুমান প্রেম ও তাহার অন্ততম সাক্ষ্য।

সাধারণ পত্নী ও নগরবাসী দরিদ্র-গৃহস্থ মেয়েরা গৃহকন্যাদি তো করিতেন, মার্চ-বাটও তাঁহাদের খাটিতে হইত সঙ্গার-জীবন নির্বাহের জন্য, হাট-বাজারেও বাইতে হইত, সওয়া কেনা-বেচা করিতে হইত, আবার স্বামি-কন্ডা পরিজনদের পরিচর্যাও করিতে হইত। মোটামুটি ইহাই ছিল পুরবর্তীকালের বঙ্গরমণীর অবস্থা, অত্যন্ত অনেক বিষয়ের সহিত দুস্তারের, দরজার, ছুতা প্রভৃতি, কুশিল, পুটিকর এবং চরখা কাটিয়াও সঙ্গার পরিচালনা করিতে হইত। অনেক রমণী স্বর্ণকার ও কণ্ঠকারের কার্যেও লক্ষ্য লাভ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমের স্বামীর মৃত্যুর পরে চরখা কাটিয়া সমস্তই সঙ্গার প্রতিপালন ও দুই-তিনটি কন্ডার বিবাহ দিবার বিবরণও সরাসাময়িক সংবাদ-পত্র হইতে অবগত হওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে সেকালের কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না। ১২৩৪ সালের সরাসাময়িক সংবাদ-পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কোচজাতির ব্রীলোকেরা যুবতী না হইলে বিবাহ করে না এবং কন্ডা আপনি কন্ডাবাধি বাস্তবক যত্নভর ভাব্য ব্রীলোক লইয়া বিশেষতঃ যত যুবতী একত্রিত হইয়া কন্ডাকে বেঁধে করিয়া বনের বাগীতে বিবাহ করিতে বার এবং কন্ডা বন্ধ বনের ভগ্ন-শোষণ করিবে এই প্রতিজ্ঞা দিয়া বন্ধক বিবাহ করে। এই প্রথা প্রাচীন সমাজের রমণী বিক্রমেরই বৃত্তি বহন করিবে সন্দেহ নাই।

১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ববঙ্গের ঢাকা নগরে বঙ্গ হিন্দু ও মুসলমান সম্মেলনের মধ্যে পোয়ালী দাঙ্গা আরম্ভ হয়, তখন ঢাকার কয়েকজন বিখ্যাত নবী-পরিচারকের পুত্র মুসলমানগণ আক্রমণ করে। এই সময় ভয়েনগর দুই কোশ ও প্রায়চার উপর থেকে হঠাৎ

ছুড়ে আক্রমণে বাধা দিতে থাকে। তাঁহারা দীর্ঘকাল হুঁ-তিসবার মুসলমানের আক্রমণ প্রতিরোধ করে নিজের বন্দ-বাড়ি ও ইচ্ছান্ত বন্ধা করেছে। অনিন্দবাসী সমুখে ছিল, সে দুর্বৃত্তদের লাঞ্চিত আশ্রয় হয়। নিখিল-ভারত হিন্দুহাসিনার পক্ষ হইতে বীরবলী অনিন্দবাসীকে তাহার বীর্য ও বৈর্যের জন্য একটি সুবর্ণপদক প্রদান করা হইয়াছে।

১১২৬ সালের এপ্রিল মাসে এক নিশীথ রাজা ঢাকা জেলায় মানিকগঞ্জ মহকুমার রামনগর গ্রামের কৃষ্ণকুমার সাহার গৃহে প্রায় কুড়ি জন দস্যু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রবেশ করে। পার্শ্ববর্তী গৃহের কয়েকজন পোয়ালী লাঠি লইয়া দস্যুদলকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় তাহাদিগের ভগিনী হেমলা। জাতগণ লাঠি হস্তে দস্যুদলকে আক্রমণ করিয়াছে—ঠাকুর লক্ষ্মী লাঠি ভাঙিয়া পড়িতেছে। দস্যুদলকে সাহায্য করিবার কেহ নাই, কিন্তু জাতগণকে হেমলা লাঠি সরবরাহ করিতে লাগিল এবং একখণ্ড বস্ত্রে কোরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে আগ্নেয়াগ্নি করিয়া ঐ স্থান আলোকিত করিয়া তুলিল। পুনঃপুনঃ বাধা পাইয়া এবং আহত হইয়া দস্যুদল পলায়ন করিতে থাকে। পোয়ালীগণও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। এবারও হেমলা লক্ষ্মী হস্তে জাতগণকে আক্রমণ করিতে সাহায্য করে। জাত ও গৃহস্থীয় সমবেত প্রচেষ্টায় ও বীর্যে একজন দস্যু বন্দী হয়। মোকদ্দমার বিচারকালে ঢাকার এডিনব্রাল জজ গভর্ণমেন্টকে হেমলার জন্য পুরস্কার প্রদান করিতে অনুরোধ করেন।

বরিশাল জেলার কনহতলা গ্রামের বীরজান বিবির গৃহে কয়েকজন দস্যু প্রবেশ করিলে বীরজানের পুত্রবধূ জোলেখা া হস্তে বরফার পিছনে পাড়াইল। এক ব্যক্তিকে রামা লইয়া আসিতে দেখিয়া সে তাহার মাথার দা বার আঘাত করিল। সে ভেঁা পৌড়। আর একজন ডাকাত বীশ হস্তে বাসাবার ঢুকিতেছিল, বীর রমণী তাহার মাথাও এক দারের দা লাগাইল; সে ব্যক্তিও পলায়ন করিল। তৎপরে জোলেখা লাঠীকে এক ব্যক্তি উৎপীড়ন করিতেছে দেখিয়া সেখানে বাইরা ডাকাতের পুত্র এক দা বসাইল। রমণীর আক্রমণে ডাকাতগণ পলায়ন করিল।

পাবনা জেলার রাইগঞ্জ থানার অধীন চরণলক্ষা গ্রামে এক নিশীথ রায়ে ২০।২৫ জন ডাকাত-লাঠি, সড়কি ও মশাল লইয়া যহিরদার বাটা আক্রমণ করে। দস্যুদলের আক্রমণে যহিরদার আহত হইলে যহিরদার স্ত্রী একথানা দা লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হয় এবং এক আঘাতে এক ডাকাতের দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলে। ডাকাত চিৎকার করিয়া বাহিরে আইসে এবং বক্তান্ত অবস্থার ছুটিতে থাকে। বিশৃঙ্খল দেখিয়া সমুদয় ডাকাত বাড়ি পরিত্যাস করিয়া চলিয়া যায়। বিপদের সময় রমণীর এইরূপ প্রত্যাংগরমতি ও বীর্য পুত্রেরও অমুচরণীয়। অমুচরণ করিলে এইরূপ কত শত বীরজানার কীর্তি কাহিনী জানিতে পাইা যায়। তাহাদের কোন বাহাদুরিকতা না থাকিলেও সাহসে, প্রত্যাংগরমতিতে ও বীর্যে তাহা সাধারণ রূপে পরিগণিত হইয়া আজকার অপেক্ষিত সমাজে স্ত্রী উৎসাহ আনয়ন করিবে, নিজেই প্রদর্শন উদ্বীর্ণনা প্রাপ্ত করিবে। সেই বিধ হইতে বিচার করিলে বঙ্গরমণীর এই সকল জৌহরিক কাহিনীর দৃষ্ট অপরিসীম ও অমূল্যসাধন।

ভারতীয় ডাকবাংলোর ইতিকথা

ডি, আর, সরকার কর্তৃক সংকলিত

ভারতবর্ষের ডাকবাংলো—তার পেছনে রয়েছে বহু পুরনো এক ইতিহাস। প্রাচীনকালে পাশ্চাত্যের আশ্রয়ের সন্ধান খুব অল্পই পাওয়া যায়। আর যে সকল বিদ্রোহগুহগুলি নিজেদের আশ্রয় করার বেধে ঠাড়িয়েছিল, পরবর্তীকালে অর্থাৎ এখন হ'তে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে "জন কোম্পানী" সেই বিদ্রোহগুহগুলির সংস্থাস্থান করেন। উপরন্তু যে সকল পাদে-হাটা-পথে লোকজনের বিশেষ সমাগম ছিল, সে রাস্তার পাশে নতুন নতুন পাশ্চাত্য ও নির্দাশ করেন। এই বিদ্রোহগুহগুলিকে ডাকবাংলো নামে অভিহিত করা এবং তাদের তত্ত্বাবধানের ভার ভারতীয় ডাক বিভাগের উপর তুলে দেওয়া জন কোম্পানীরই কাজ। তখনকার কালে রেলগাড়ী কিংবা পাদে-চলা পথে ভ্রমণ, ডাক চলাচল ও ভারবাহী প্রেরণ—সবকিছুর দায়িত্ব ছিল সেই একই বিভাগের উপর। আজকাল ডাকবাংলোর সঙ্গে ডাক অথবা ডাকঘরের কোন সম্পর্ক নেই। একথা ভালো কৌতুকপ্রিয় বলে মনে হয়। ডাকবাংলোর এই 'ডাক' কথাটি আজও কালের স্রোতে নিজের আভিষেক বজায় রেখে বেম ডাকবাংলোর ইতিহাসকে প্রসবিত করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, তখনকার পাদে-চলা পথে ভ্রমণ ও পথচারীদের বিদ্রোহগুহের সঙ্গে ভারতের ডাকঘরের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, সেই স্মৃতিতে মনে জাগিয়ে তোলে।

রোমাকর অতীত

লোকালয়ের বাইরে গীতের রাতে অথবা কুঠি-বাঁদলের দিনে এই ডাকবাংলোগুলিতে অবস্থানের সময় পথিকদের মনে এক রোমাকর অতীত জেগে উঠত। পাশ্চাত্যগুলিতে জনহীনকালে হঠাৎ বিদ্রোহকারীদের মন ঘুরে বেড়াত অতীতের আদ্যে কানো—হত বা মনে হত কত না অজানা পথিক এই আদ্যে কিছু সময় অভিযুক্ত করে গেছে। তার স্বাক্ষর শুধু ডাকবাংলোর এই ইট-পাথরগুলো। নৈশভোজনের সময় দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ খানসামাগুলো নানা রকম আঙ্গুণি গল্প বলতে বলতে হঠাৎ শুরু করে দিত কোন এক সাহেবের গল্পি বাপনের কাহিনী, আর গল্পি নিদ্রাবস্থায় কোন এক অশ্রুচরিত্র সঙ্গে সন্ধ্যাতের কথা। এই রকম কাহিনী নতুন আগন্তুকদের মনে জাগাতো আলোড়ন। এই অজানা অশ্রুচরিত্র প্রাপ্তিগুলো দ্বারা যাতে বিদ্রোহকারীদের কোনরকম বিদ্রোহ ব্যাধিত না হয়, তার জন্য এই খানসামাগুলো থাকত কড়া প্রহরার। তাতে তাদের কিছু বাড়তি মুনাফাও হত।

ডাকবাংলো ও বর্ধশালা

ডাকবাংলো ও বর্ধশালার মধ্যে প্রভেদ শুধু এইখানে যে, শেখোক্ত প্রতিষ্ঠানটি হল বর্ধীর সংস্থা, বর্ধপ্রাণ, দানবীল ব্যক্তিগণ তার নিবাস। বর্ধশালার রয়েছে নানাপ্রকার বিশি-নিবেদ। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ ডাকবাংলো হল একটি বর্ধসিরশেক সংস্থা, সেখানে কোনপ্রকার বিশি-নিবেদ নেই। ঐ-পূর্ব জাতি-বর্ধ-নির্দেশে, দিনে-রাতে সকল সময় সকল প্রকার পরিদর্শিত পথিকদের নিকট ছিল ইহার দায়িত্ব।

পথচলা ও পাকী

১৮৫৭ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত ভারতের জন জনবহুল ও পরিদর্শিত স্থানগুলির মধ্যে ডাকবাংলোর দায়িত্ব ছিল

ডাকঘরগুলোর উপর। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ডাকঘরগুলোর এলাকা সীমাবদ্ধ ছিল প্রাণ ও কিছু বড় বড় রাস্তাগুলোর মধ্যে। যে সকল রাস্তার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ভার ডাকঘরের উপর লিপ্ত ছিল, তাদের সংখ্যার চেয়ে ডাকঘরের নিয়ন্ত্রণ এলাকার বাইরের রাস্তার সংখ্যা ছিল বহুগুণে বেশী। ডাকঘরের নিয়ন্ত্রণ-এলাকার বাইরের রাস্তাগুলোতে বাতারাভের সময় ভ্রমণকারীদের নিজ নিজ গাড়ী ও পথপ্রদর্শকের ব্যবস্থা করতে হ'ত। ডাকঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন রাস্তা দিয়ে বাতারাভ করা হনহু করলে, নির্দিষ্ট দিনের দুই তিন দিন পূর্বে ভ্রমণকারীকে তাঁর ভ্রমণের পূর্ণ বৃত্তান্ত ও নিজ নিজ প্রয়োজন সবকিছু জানিয়ে পাঠমাঠার বা ডাকঘরকে জানাতে হ'ত। এই সবকিছু প্রাপ্তির পর পাঠমাঠার বা ডাকঘরই রাস্তার ভ্রমণকারীদের রাস্তার নির্দিষ্ট দিন অথবা নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনাক্রমে পূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি প্রস্তুত করে রাখত।

চার-চাকার গাড়ী থাকে বোড়া টেমে নিয়ে বেত, তাকে বলা হ'ত অচালিত ডাক। তাদের চলাচল নিবদ্ধ ছিল বড় বড় রাস্তাগুলো রাস্তাগুলোর মধ্যে। তাছাড়া, অজান্তে রাস্তা দিয়ে বাতারাভের একমাত্র পথ ছিল পাকী। কেবল মাঝে মাঝে বোড়ার পিঠে চড়ে বাতারাভ করা হ'ত। আর কোন ব্যতিক্রম ঘটত না। পাকীগুলো দেখতে ঠিক একটি কাঠের বাজের মত, তার ভিতরে আছে প্রচুর জারগা, একজন ভিতরে বসে, এমন কি গুলে পর্যন্ত থাকতে পারে। আর বাইরের দিকে চার প্রহর থাকে চারটি কাঠ-বগু, চারজন বাহক কাঁধে ফেসে বয়ে দিয়ে যায়।

পাকীগুলোর আনন্দের কথা বিশপ হিবার (Bishop Heber) ও তৎকালীন অজান্তে ভ্রমণকারীরা বেশ সুশ্রুতি ভাবার বর্ণনা করে গেছেন। অধিকাংশ অভিযাত্রী লোকেরা নিজস্ব পাকী রাখত, বিশেষতঃ বাড়ীর মেয়েদের বাতারাভের জন্য। বাতারাভের সময় পাকী সরবরাহ করার দায়িত্ব ডাকঘরের উপর তুলে দেওয়া পাকী সংগ্রহ ভ্রমণকারীদের নিজেদের করতে হ'ত। পাকী জাড়া পাওয়া যেত। আর ডাকঘরই সরবরাহ করত আটজন পাকী-বাহক বা পাকীবর্ধার। রাস্তা বাতারাভের সময় ডাকঘরই দুইজন মশালটি বা আলো-বাহকের ব্যবস্থা করতেন। বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মালপত্র থাকলে, দুইজন মালপত্র-বাহকও পেওয়া হ'ত। সেই বাহকদের বলা হত বাহালি-বর্ধার, কারণ তারা জিনিবপত্রগুলি বাহালির সাহায্যে বহন করে নিয়ে যেত। বাহালি হ'ল লম্বা কণ্ঠশ। বাহকেরা কাঁধে ফেসে নিয়ে যায়। আর তখন দুইপাশে কুলোয়া থাকে জিনিবপত্রগুলি। গ্রামাঞ্চলে এই বাহালিগুলিই হ'ল মালপত্র বহন করে নিয়ে বাওরার সুশ্রুতি ও জমজির মাধ্যম। কিন্তু খুব ভাড়া জিনিব উঠা যায় বহন করা চলে না। আটজন পাকী-বাহক। দুইজন মশালটি ও দুইজন বাহালি বর্ধার—এই সমগ্র সময়ে প্রাণি লাইনে কল্লী ছিল এক শিলিং বা প্রায় বারো আনা। বহুবিধ তাদের আশ্রয় দিত হ'ত। বাতারাভের সময় যদি কোন ভ্রমণকারীর কোমরখানে নির্দিষ্ট সময়ের অধিক অর্থ রাখা হয়, তখন বাহকেরা লীলাভিত্তিক সময় দায়িত্ব হ'ত, তাদের অভিযুক্ত কল্লী দিতে হ'ত।

অবচালিত 'ডাক' বা বোড়ার 'ডাক'

সমগ্র রাজ্যের মাঝে মাঝে বোড়া স্থাপন করে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল পোষ্টমাস্টার বা ডাক-বুনী মহাশয়ের উপর। কারণ, বহু দূর-পাল্লার বাতারাতে একদল বাহক বা একই বোড়ার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। রাজ্যের মাঝে মাঝে বাহক বা বোড়া বদলী করা হ'ত। এই ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করার জন্য যে স্থান হ'তে বাতারা শুরু হ'ত সেখানকার স্থানীয় পোষ্টমাস্টার মহাশয় পশ্চিমঘে ডাকঘরগুলিতে পূর্বে জানিয়ে দিত, যাতে নির্দিষ্ট সময়ে বোড়া বা বাহকের ব্যবস্থা প্রস্তুত থাকে। গড়ে প্রায় দশ মাইল পর-পর বোড়া এক বাহকদল বদলী করা হ'ত, আর সেই দাতাড়ুকু বেতে সময় নিত প্রায় তিন ঘণ্টা। এক একটি বিশ্রাম-স্থানের শেষে বায়জনের বাহকদলকে বদলী করে অনুরূপ আর একটি দলকে ডাকবহনের কাজে দেওয়া হ'ত, এবং প্রথমোক্ত বাহকদল ফিরে আসত তাদের নিজস্বের ডাকঘরে, আর অগত্যা তারা কাজ করত।

পাছশালা বা বিশ্রামগৃহ

পশ্চিমঘে ভ্রমণকারীদের অবস্থানের জন্য পনের বা বিশ মাইল দূর দূরে অবস্থিত বিশ্রামগৃহ বা ডাকবাংলোগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল ডাকঘরগুলির উপর, আর এই ডাকবাংলোগুলোর অবস্থিতি নির্ভর করত লোক চলাচলের উপর। ডাকবাংলোতে অবস্থানকারী বাতীরের সুখ-সুবিধার দিকে নজর দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ডাকবাংলোতে থাকত একজন দ্বিতমতগার বাহক বলা হ'ত কৃত্য। কিন্তু এই দ্বিতমতগার বা কৃত্যগুলি হ'তে কাজ ও সুখসুবিধা আদায় করতে হলে, অবস্থানকারীকে মাঝে মাঝে তাদের নিজস্বের হাতেরসে বোগ দিতে হ'ত, এবং সবচেয়ে বড় পছা ছিল তাদের বকশিস দেওয়া। আদেশ অনুযায়ী রাজা করা ও পরিবেশন করার ভার ছিল দ্বিতমতগারদের উপর। সেখানে একজন হুটে থাকত। রাজার জন্ত ও শীতের দিগে অগ্নিকুণ্ড জালিয়ে রাখার জন্ত যে কাঠের প্রয়োজন হ'ত, তা সরবরাহ করত এই হুটে। রান ও রাজাবাহার জন্ত জলও সে সরবরাহ করত। ঘণ্টি ব্যবহার করার জন্য ভ্রমণকারীকে নির্দিষ্ট ভাড়া দিতে হ'ত।

ঘড়ের হাউস বা ঘর

ডাকবাংলোগুলো নিশ্চিত হ'ত ঘড়ের হাউসিতে। ঐ ঘরগুলি ছিল একতলা, কিন্তু তাতে ছোটো থেকে তিনটে কোঠা থাকত, আর প্রত্যেকটি কোঠার সলর ছিল একটি করে সানাসার। প্রত্যেকটি কোঠার দরজার পর্দা লাগানো হ'ত, আর এক একটি কোঠার থাকত একটি নতুন বিছানা, ছোটো চেয়ার এবং একটি টেবিল। যে সকল রাজ্যের ডাকঘরের উপাত্ত ছিল বেশী—আর তাহা সংখ্যার দ্বারা পরিচয় ছিল না—সেখানকার ডাকবাংলোতে

সুদৃঢ় প্রহরার ব্যবস্থা ছিল। ঘরদ্বা ও দিল্লীর দাখানাবি এইরূপ দৃঢ় প্রহরাসূক্ত একটি ডাকবাংলোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেখানে একদা জন সুরমন সাহেবের দৃতদের সঙ্গে ডাকঘর দলের একবার সংঘর্ষ হয়। জন সুরমন (John Surman) সাহেবের নেতৃত্বাধীনে দৃতগণ পাটনা থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী কারুকীরার (Farukshiyar) রওয়ানা হ'ন। দিরাট ও দিল্লীর মাঝে রাজ্যখাটি ছিল জনমানবশূন্য, কেবলমাত্র লুণ্ঠনকারীদেরই রাজত্ব চলত সেইখানে। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড দুর্গাকৃতি সরাইখানা দেখা যেত। তাদের দেওয়ালগুলি ছিল ছিন্নবিধিষ্ট, যাতে তোপ দাগবার সুবিধে হয়, আর ছিল উচ্চ চূড়া, এবং সুউচ্চ প্রবেশদ্বার। সেখানে ভ্রমণকারীরা রাতে আশ্রয় নিত।

প্রতিরক্ষার এত সব আয়োজন থাকা সত্ত্বেও রাজ্যখাটগুলি প্রায় পাঁচ শত সৈন্তেরই একট দলের পক্ষে নিরাপদ ছিল না বলা চলে। জন সুরমন (John Surman) ও তাঁর দৃতদল চৌমুহা (Choumuh) নানক স্থানে সূর্য্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসূক্ত একটি বিশ্রামশালায় দাখিবাশনের সময় শতাব্দী দ্বন্দ্বমূল তাহাঙ্গিকে পর পর তিনবার আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাহারা দস্যবের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাতে তাঁদের দলের প্রায় পাঁচজন আহত হয়।

বর্তমানকালে বিশ্রামগৃহগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—কতকগুলি ডাকবাংলো আছে বাহার দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানের ভার থাকে স্থানীয় কোন সচিবের উপর। অফিসাররা এমন কি সাধারণ লোকও এই ডাকবাংলোগুলো দৈনিক ভাড়ার পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, আর কতকগুলি বাংলাকে 'পরিদর্শন বাংলা' or Inspection Bungalow বলা হয়, সেইগুলির তত্ত্বাবধানের ভার শুধু আছে রাজ্য সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের উপর। এইগুলি সরকারী কর্মচারীদের সফরের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর কতকগুলি আছে বাহক বলা হয় 'সার্কট হাউস' (Circuit House)। বিশ্রামগৃহগুলির মধ্যে এইগুলিই হল উচ্চপদের, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বা বিশেষ সম্মানিত ভ্রমণকারীরা এই বিশ্রামগৃহগুলি ব্যবহার করতে পারেন। সার্কট হাউস প্রত্যেক জেলার সদরে অবস্থিত থাকে। তাহাদের তত্ত্বাবধান করেন জেলা-অফিসার বা জেলাশাসক। সাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনেও কতকগুলি বিশ্রামগৃহ আছে। তাহাঙ্গিকে ধর্মশালা বলা হয়। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ পুণ্য সঞ্চয়ার্থে ধর্মশালাগুলি নিৰ্ম্মাণ করে থাকেন।

এই ঘরদের বিশ্রামগৃহ বা ধর্মশালা বিশেষভাবে দেখা যায় তীর্থস্থানগুলিতে। সেগুলি তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য নির্মিত। এই সকল ধর্মশালার থাকতে হলে ঘর এর আসবাবপত্র ব্যবহার জন্ত কোন ভাড়া দিতে হয় না।

'Reading maketh a full man,
Conference a ready man,
And writing an exact man.'

—Francis Bacon

রোগপ্রতিষেধকের আবিষ্কার

শুধাংশ ঘোষাল

ভ্রাতৃকাল আমাদের অন্তঃ-বিশ্বের সবচেয়ে বা ধারণা আছে,

আসে তেমন ছিল না।

আমি মাত্র বয়স তের, কয়েক শ বছর আগে অস্ত্র সবচেয়ে বহু প্রচলিত ছিল। সেখানেও ও অস্ত্র অত্যন্ত শক্তির দোহাই দিয়ে বা তৎকালীন ডাক্তার কবিরাজের ওষুধ খেয়ে অনেকে প্রাণহানি করতেন। কখন কখন দেখা যেত, ওষুধ না খাওয়া সত্ত্বেও অনেকে গেরে উঠেছেন। এই ঘটনা হতে অনেকে অস্বস্তি প্রকাশ করেন যে ডাক্তার কবিরাজের ওষুধে যেমন রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা আছে, আমাদের শরীরেও তেমন রোগরুদ্ধকর ব্যবস্থা আছে। অবশ্য কি ভাবে রোগরুদ্ধকর হওয়া যায়, জীবাণু বলে কিছু আছে কি না, এসব খবর জানতে অনেক বছর লেগেছে।

রোগপ্রতিষেধকের আবিষ্কার হিসাবে বীসের মায় করতে হয় জীসের মধ্যে ইংলিশের লন্ডনপ্রান্তে ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার-এর মায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে জাল হতে ১৫ বছর আগের কথা। তখন রোগজীবাণু সবচেয়ে কারো কোন ধারণা ছিলো না। জেনার লন্ডন করেন, পঞ্চম দশে এক ধরনের ক্ষত বা ঘা হয়, যেগুলি সাধারণতঃ পুঁই খাওয়া পূর্ণ থাকে। যে পোয়ালিনীরা পঞ্চম দশে লোহন কোরভো জীসের হাতের আঙ্গুলেও অল্পরূপ ক্ষত দেখা যেত। কিন্তু আন্দর্যের বিষয় এই যে, বহন সারাংশে বসন্ত রোগ মহামারীরূপে দেখা পিত্তা, তখন অত্যন্ত সকল বসন্ত-রোগাক্রান্ত হলেও হাতে ক্ষতবিশিষ্ট পোয়ালিনীদের মধ্যে বসন্ত রোগ দেখা যেতো না। ঘাপাঘটা জেনারের কাছে বেশ অল্প ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তিনি ভাবলেন, গো-বসন্তের পুঁই (বা গো-বীজ) হাতের ক্ষতের মাধ্যমে পোয়ালিনীদের হাতে মিশার কলে এমন কোন ঘটনা ঘটে যায় জন্মে পোয়ালিনীরা বসন্তরোগের আক্রমণ হতে বন্ধ পায়। জেনার ভাবেন, ধারণাটা যদি সত্যি হয় তবে পরীক্ষারুলকভাবে মাইসের হাতে গো-বীজ মিশিয়ে দিয়ে কল দেখতে কতি কি? ১৭১৬ সালে তিনি এক পোয়ালিনীর হাতের গো-বসন্তের ক্ষত হতে কিছুটা লালাবৎ অংশ তুলে নিলেন এবং সেই তরল পদার্থটি জেমস্ কিশ্‌নোমে একটি ছেলের হাতে বসে দিলেন। ছেলটিকে এভাবে পোয়ালিনীর টীকা দেবার পর তিনি এক বসন্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষত হতে লালা ছেলোটর শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। যদিও জেনার বা তৎকালীন চিকিৎসকেরা জীবাণুর নামসহ জানতেন না, তবুও তারা সবিস্ময়ে দেখলেন যে ছেলোটর শরীরে বসন্তের কোন লক্ষণ দেখা দিলো না। জেনারের এই আবিষ্কার চিকিৎসা-ক্ষেত্রে যুগান্তকর এক দিলো। এই আবিষ্কারের পর 'বসন্ত' বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে, তবুও পোয়ালিনীর টীকা দিয়ে বসন্তের আক্রমণ হতে মিত্তি পাবার সেই পূর্বতন প্রথা আজও প্রচলিত রয়েছে।

জেনার বসন্তের টীকা আবিষ্কার করলেও গো-বীজ মায়কমে প্রবেশ করে কি ভাবে বসন্তরোগের আক্রমণ হতে বন্ধ করে তার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। জেনারের বৃহত্তর প্রায় ১০ বছর পর লন্ডনপ্রান্তে কবাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর প্রমাণ

করেন, ক্ষত জীবাণু হতে রোগের উৎপত্তি হয়। রোগের জীবাণু হতে উৎপন্ন হয় তৎকালীন চিকিৎসকেরা তা এই প্রথম জানলেন। আরোগ্যতত্ত্বের মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে পাস্তুরের দান অপরিমেয়। পাস্তুরের সুযোগ্য শিষ্য প্রাণ্ডলুয়া রুপ বৈজ্ঞানিক মেধানিক্‌ এ সবচেয়ে বহু তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার করেন। পাস্তুর ও বর্তমান ব্যাবস্থাবিজ্ঞানের আলোচনার উপর চিহ্নিত করে শরীর কি ভাবে রোগ আক্রমণ হতে বন্ধ পায় সেটা মোটামুটি ভাবে লক্ষ্য করা যাক। পাস্তুর-পারীকারা সকলেই জানেন যে, আমাদের রক্ত লাল হলেও সেটা কিছু লালকালি বা জালতার মতো একটা সমস্ত দ্রব নয়। অপরূপ হস্তের নীচে দেখা যাবে যে এক বর্ণহীন বা বাসের মতো বর্ণবিশিষ্ট তরল-পদার্থ অসংখ্য কোর প্রলম্বিত আছে। এসেই মধ্যে কোহিতকণিকা ও যেতকণিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কোহিতকণিকার ক্ষেত্রে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে কোহিতকণিকার সংখ্যা সাধারণতঃ ৪৫ লক্ষ এবং পুষ্কণিকার ক্ষেত্রে প্রায় ৫০ লক্ষ। পাস্তুরের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে যেতকণিকার সংখ্যা সাধারণতঃ প্রায় ১০০০; তবে এই সংখ্যা হ্রাস হতে পারে হাজার হাজার পর্যন্ত হতে পারে। যেতকণিকার অনেক কাজ আছে। শরীরকে রোগ আক্রমণ হতে বন্ধ করা সেগুলির অন্তর্গত। আমাদের চারিদিকে অসংখ্য রোগজীবাণু ঘুর বেড়ায়। এগুলো সর্বদা কোন না কোন উপায়ে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, যার ফলে জীবাণুর সঙ্গে যেতকণিকার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ধন, পেলিল কাটতে কাটতে কোন লোকের ছুরিতে হাত কেটে গেলে। ছুরিটা ধারালো ও চকচক হলেও এর পায়ে সত্ত্ববস্ত্র হাজার হাজার রোগজীবাণু লেগে আছে। এগুলি কাটা অঙ্গের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে প্রবেশ কোরলো। যেতকণিকার হল যেই জানতে পারলো বাইরে হতে শক্ত এসেছে, অমনি তারা সকলে সেখানে এসে জমা হলো। যেতকণিকা অনেক রকমের। এখানে যে যেতকণিকাগুলো এসেছে, তারা যে শুধু অ্যামিবার মত চলার কোরতে পাবে তা নয়, এরা অ্যামিবার মতো নিজের কোষটিকে 'কীট' করে শিকার ধরে গিলে ফেলতে পারে। এরা এই কাটা অঙ্গের রোগজীবাণু বিশেষতঃ ব্যাক্টেরিয়া দ্বিবি খোসমজ্জা থেকে আরম্ভ করে। কেটে বাবার পর অনেকে শরীর হতে কিছুটা রক্ত বের করে দিতে বলেন। কারণ কাটা অংশ দিয়ে যে রোগজীবাণু প্রবেশ করেছে তারা আলিক বা সংক্রান্তে বেরিয়ে যায় ও ক্ষতস্থানে সঞ্চে। বৈজ্ঞানিকদের মতে বাহির হতে শরীরে যে জীবাণু (অথবা সাপের বিষ) প্রবেশ করে তারা সকলেই প্রোটিন। এই বহিঃপ্রাপ্ত প্রোটিন (যাকে অ্যান্টিজেন বলে) রক্তে প্রবেশ করা মাত্র রক্তের যেতকণিকাগুলি উত্তেজিত হয়। খাড়াব্র্য বাবার পর পাকস্থলী ও খাদ্যদানী উত্তেজিত হওয়ার কলে যেমন পাচকস্র নিগত হয়, তেমন শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করার যেতকণিকা উত্তেজিত হবার জন্য এক বিষয় রাসায়নিক পদার্থ (অ্যাক্টিভেট) বের হয়। বিশিষ্ট অবস্থার এই বিষয় পদার্থটি রোগজীবাণুর সঙ্গে সঙ্গায় করে ভাবে হাফির ফেলতে পারে।

কখন কখন দেখা যায় যে কোন লোক রোগাক্রান্ত অবস্থায় ডাক্তার কবিরাজের সাহায্য না নিয়ে দিবা সূর্য হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা এই রোগজীবাণু শরীরে বাবার পর এত অ্যাণ্টিবডি তৈরী হয়েছে যে তার দ্বারা সমস্ত রোগজীবাণু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, শরীরের মধ্যে যদি রোগের সঙ্গে লড়াই করে এমন পদার্থ তৈরী হয়, তবে টাকা বা ইনজেকশন নেবার দরকার কি? রোগজীবাণু প্রবেশ করলে বিবর পদার্থ তৈরী হয় বটে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদার্থটি তৈরী হতে সময় লাগে আবার কোন কোন ব্যক্তি বিশেষে এই পদার্থটি খুব কম পরিমাণে তৈরী হয়। এইরকম আরও কয়েকটি কারণে শরীরের মধ্যে রোগজীবাণু জয়লাভ করেও রোগ দেখা দেয়। সুতরাং শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করার আগে যদি আমরা কৃত্রিম উপায়ে দেহের মধ্যে বিবর পদার্থ সঞ্চিত রাখি, তবে রোগের হাত হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আমরা টাকা বা ইনজেকশন দিয়ে (শরীরে নির্দিষ্ট পদার্থ প্রবেশ করিয়ে) শ্বেককণিকাকে উদ্বেজিত করি। সেজন্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিবর পদার্থ তৈরী হয়। এবারে জেনারেল পদ্ধতিতে টাকা দিয়ে আমরা বসন্তরোগ আক্রমণ হতে কিভাবে রক্ষা পাই সেটা একটু দেখা যাক। বসন্তরোগটি যে জীবাণু হতে সঞ্চিত হয়, সেগুলি সাধারণ জীবাণু হতে বহুগুণে ছোট। এদের বসন্তরোগের “ভাইরাস” বলে। জীবাণুটি গরুর (বা অন্য কোন ইতর প্রাণীর) দেহে প্রবেশ করলে, তার রোগ উৎপাদন শক্তি কিছুটা কমে যায়। গরুর দেহ হতে যদি রক্তের লালারং রক্ত অংশটি বের করা যায়, তবে সেই লালার এই হৃতবীৰ্য বীজগুলি পাওয়া যাবে। টাকা দিয়ে মাছের রক্তে এই লালার মিশিয়ে দিলে, লালার মাধ্যমে হৃতবীৰ্য বীজগুলি শরীরে প্রবেশ করে। সেজন্তে প্রচুর পরিমাণে বিবর পদার্থ তৈরী হয়, যা বহিরাগত বসন্তরোগের জীবাণুকে নির্মূল করতে পারে।

জেনারেল পদ্ধতির প্রায় ৩০ বছর পরে প্রতিভাবান ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন আলোকপাত করেন। পাস্তর প্রথম প্রচেষ্টা করেন, রোগ নির্দিষ্ট জীবাণু হতে জন্মায়। জেনারেল মতো পাস্তরও রোগজীবাণু বিভিন্ন ইতর প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করিয়ে হৃতবীৰ্য কোরতে থাকেন, এবং তাই দিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা আরম্ভ করেন। জলান্তর রোগের টাকা তিনি এইভাবে আবিষ্কার করেন। বসন্তরোগের মতো জলান্তর রোগটির উৎপত্তি হয় এক ভাইরাস হতে। এখন কোন জলান্তররোগগ্রস্ত কুকুর মাছ (বা অন্য কোন স্তন্য পুত্র) কে কামড়ায়, তখন রক্তস্থানের মধ্য দিয়ে উক্ত প্রাণীর শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করে। পাস্তর এই টাকা দিয়ে সূর্য কুকুরের উপর পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন যে, টাকা দেবার পর সূর্য কুকুরটিকে যদি কোন পাগলা (জলান্তর রোগগ্রস্ত) কুকুর কামড়ায়, তবে সূর্য কুকুরটি স্বাভাবিক ভাবেই বেঁচে থাকে। তার দেখে জলান্তররোগ কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না। পাস্তর মাছের উপর পরীক্ষা কোরবেন ঠিক করেছিল। তবেই তার উপর কোরবেন সেটাই হলো সমস্যা। ১৮৮১ সালে তিনি এক স্তন্য পুত্র চিষ্টা দেখেন—“যদি কুকুরের উপর নবাবিকৃত টাকা দিয়ে রোগ দূর করতে সক্ষম হয়েছি। তাহলে এবারে স্তন্যপুত্রের উপর পরীক্ষা চালাবো। যদি মাছের না পাই তবে নিজের উপর পরীক্ষা

কোরবো, কারণ, আমার স্থির বিশ্বাস আমি সফলকাম হবো।” এ ঘটনার প্রায় দশ তিনেক পরে লোকেরা পাস্তরের নামে ন’বছর বয়ে একটি ছেলেকে নিয়ে এসে। ‘ছেলেটির নাম জোসেফ য়েটায়, তাকে পাগলা কুকুরে বহু বার কামড়িয়ে। পাছে ছেলেটি চিকিৎসভাবে মাথা যায় এই ভেবে তিনি ছেলেটিকে পর পর বারো বার ইনজেকশন মিলেন। শোনা যায়, বতরিন ছেলেটি তাঁর চিকিৎসারীনে ছিলো তত দিন রাতে তাঁর ভালো ঘুম হতো না। তদুপরি যোরে বিছানার ত্তরে তিনি প্রায়ই ছেলেটির কথা মরণ কোরতেন। দু’মাস পরে ছেলেটি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাতলেন।

পাস্তরের মৃত্যুর পর চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাধিতত্ত্ব বিবরের গবেষণা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগলো। বর্তমানে নির্দিষ্ট রোগে নির্দিষ্ট প্রতিষেধক ব্যবহার করা হয়। টাইফয়েড রোগটির উৎপত্তি হয় টাইফয়েড ব্যাসিলা হতে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বসন্ত বা জলান্তররোগের হৃতবীৰ্য জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার কলে যেমন ব্যাধির পদার্থ তৈরী হয়, তেমন স্তন্যরোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে অল্পকাল ভাবে বিবর পদার্থ তৈরী হতে পারে। শোষিত পদ্ধতিতে টাইফয়েডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মসণ তৈরী করা হয়। হৃতবীৰ্য বা স্তন্য জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার অ্যাণ্টিবডি তৈরী হয়। মনে করুন, যদি আমরা স্তন্য বা হৃতবীৰ্য জীবাণুর বালসে শরীরের মধ্যে সরাসরি বিবর পদার্থ ছুটিয়ে দিই, তবে কি হবে? একজন ব্যাধিতত্ত্ববিদ বলেন যে অ্যাণ্টিবডি যদি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে, তবে এইরকম পরীক্ষার সাফল্যলাভ করা উচিত। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলে যে যত হতে কণিকাগুলি পৃথক করা সম্ভব হলেও এই বিবর পদার্থ পৃথক করা সম্ভব নয়। চামারপের যুগে হুয়ান বিশল্যাকরনী গাছ খুঁজে না পেয়ে গুম্বাদিন পাখাড় নিয়ে এসেছিলেন। এক্ষেত্রেও তেমন ইতর প্রাণীর রক্ত হতে বিবর পদার্থ পৃথক না করে, ঐ প্রাণীর রক্তলালা মানবদেহে প্রবেশ করানো হয়। করণ রক্তলালাতে অসংখ্য অ্যাণ্টিবডি থাকে। এই ইতরপ্রাণী হতে সংগৃহীত ব্যাধির রক্তলালাকে “অ্যাণ্টিটক্সিন” বলে। ডিপথেরিয়া রোগের চিকিৎসা এই ভাবে করা হয়। প্রথমে একটি বোডার দেহে ডিপথেরিয়ার টাকা দিয়ে পর্যাপ্ত বিবর পদার্থ তৈরী করা হয়। পরে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার অবশেষে হতে রক্তলালা নিষ্কাশিত করে সরকণ করা হয়। ডিপথেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে এই ব্যাধির রক্তলালার ইনজেকশন দেওয়া হয়। রাণাপ্রভাশের মতো চৈতকের ভাঙে ক্ষণী না হলেও, এইভাবে রোগযুক্ত লোকটি যে কোন এক অজ্ঞাত বোডার কাছে গুণী—তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

টাইফয়েড রোগটির চিকিৎসাপদ্ধতির আবিষ্কারে রাইট সাহেবের দান অবিম্বাণীয়। রাইট সাহেবের স্নায়োগা শিষ্য হলেন পেনিসিলিনের আবিষ্কারক আলেকজান্ডার ফ্রেমিং। ফ্রেমিং-এর দেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধ বহু পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে। রোগ উৎপাদনকারী ব্যাক্টেরিয়াকে কি ভাবে শ্বেককণিকা প্রতিহত করে এটা তাঁর প্রথম প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ। চোখের জল বা রক্ত দিয়ে পরীক্ষা করার সময় তিনি দেখান যে আমাদের চোখের ভলে “লাইসোজাইম” নামে এক রাসায়নিক পদার্থ আছে। এই পদার্থটি বহু রোগজীবাণু

বিনীত কোমরে পড়িল। একতরফা আমাদের কোমর অহরহ যোগজীবীবাণু কুমোরাগিলি নামে পড়লো, কবিতা: তেঁখ কতিএক হয় না। জেমি: এক পায়ে অকস্মাৎ ব্যাট্টিরিয়া পূর্ণ দুধের মত বোলাটে এক তরল পদার্থ মেল। তরল পদার্থটিতে মাছের চোখের জল দিয়ে তিনি মাত্র ৩০ সেকেন্ড ইং উরু রাখলেন। অল্পকণ পরে তিনি সন্নিহনে দেখেন যে বোলাটে তরলপদার্থটি স্বচ্ছপ্রায় তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে। অপরীক্ষণ বস্তু দিয়ে দেখে তিনি বুঝলেন, বরফ যেমন গলে জল হয়ে যায়, ব্যাট্টিরিয়াগুলি কতকটা সেই ভাবে গলে তরল হয়ে গিয়েছে।

জেমি তখন লগুনে সেন্টমেরী হাসপাতালে পূর্ব উপাধনকারী জীবীবাণু (ট্রেকাইলোকক্সাস) নিয়ে পরীক্ষা করছেন। এমন সময়ে তাঁকে পূর্বজীবীবাণু নিয়ে এক প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়। এজ্ঞে তিনি আর একবার পূর্বজীবীবাণু সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি করতে লাগলেন। জীবীবাণুগুলি কাচের ডিসে ঢাকা দিয়ে রাখা হলো। ঢাকাটি এত সতর্কতার সঙ্গে দেওয়া হলো যাতে কোন বহিরাগত পদার্থ এ ডিসে না পড়ে।

জীবীবাণুগুলিকে এক পুষ্টিকর খাতপনার্ধের (আগার) উপর রাখা হলো। এটা ১১২৮ সালের কথা। সে বছর লগুনে দারুণ শীত। দীর্ঘকালান্তে আর্দ্রতার জন্মে আমাদের জুতোর বা ভিত্তি পাউকটির উপর ছাত্তা বা ছত্রাক পড়ায়। সে সময় এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। একদিন জীবীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করার সময় তিনি বখন ঢাকাটি খুললেন, তখন হঠাৎ কোথা হুঁতে এককাতীয় ছাত্তার আশ্বিনেব (শোব) ফিলট্রিতে এসে পড়লো। জিনিবটি কি, বা কোথা হুঁতে উড়ে এসেছে, তিনি প্রথমে তা বুঝতে পারেননি। সম্ভবত: কোন গৃহস্থর ডাঁড়ার বয় বা ছাত্তাকরের ডিক্রে ফটি বা পনীর হতে ছাত্তাটি উড়ে এসেছিল। জেমি সন্নিহনে দেখেন, ছাত্তাটি যে স্থানে পড়েছে তাই আশেপাশের সব জীবীবাণু অজীর্ণ হয়ে আছে। তিনি এই ছাত্তাটি একটি পূর্ব-জীবীবাণু পায়ে রাখলেন এবং এই একই কল লক্ষ্য করেন। (তাঁর এই প্রথম ডিসটি আর্কও তাঁর মিউজিরিয়ে সুরক্ষিত আছে।) পরে তিনি জানতে পারেন ছাত্তাটির নাম "পেনিসিলিয়াম নোটোটা"—এক খুব নিম্নস্তরের উদ্ভিদ। এই গাছটি হতে তিনি যে নির্ধারিত বের করেন, গাছটির নামাঙ্কন করে তাঁর নাম মেল পেনিসিলিন।

পেনিসিলিন নিয়ে এর পর বহু পরীক্ষা চালানো হয়। দেখা গেলো যে, পেনিসিলিন যে কেবল পূর্বউপাধনকারী জীবীবাণু বিনষ্ট করে তা নয়, রোগজীবীবাণুও (যেমন নিউমোনিয়া, ম্যানিনজাইটিস, ট্রিপথেরিয়া ইত্যাদি) নষ্ট করতে পারে। জেমি তখন, পেনিসিলিন

বিয়ে বহু রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এমন এক প্রত্যক্ষ পেনিসিলিন পরীক্ষার মধ্যে গিয়ে রোগজীবীবাণু নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে দেখাযায় কোমর রক্তের কবিকার কোন ক্ষতি করে কিনা। কারণ যদি ক্ষতি করে তবে মাছের পক্ষে এই ওষুধটি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। জেমি একটি পায়ে রক্তের খেতকবিকা, রোগের ব্যাট্টিরিয়া ও পেনিসিলিন মিশালেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ব্যাট্টিরিয়াগুলি বিনষ্ট হলেও খেতকবিকার কোন ক্ষতি হলো না। এর পর মাছ ও বহু প্রাণি দেখে পেনিসিলিন প্রবেশ করিয়ে তিনি কোন ক্ষতিকর বিধিক্রিয়া দেখলেন না। জেমি-এর আবিষ্কারের ঠিক তেরো বছর পরে ১৯৪১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী মাছের উপর প্রথম পরীক্ষা করা হয়। এক পুলিশের ক্ষত দিয়ে পূর্বউপাধনকারী জীবীবাণু শরীরে প্রবেশ করেছিল এবং সেগুলি রক্তে রক্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোন চিকিৎসার কোমর না হওয়ার তাকে ক্রমাগত পাঁচ দিন ইন্সেকশন দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: ওষুধটি ফুরিয়ে যাওয়ার সে ওষুধের অভাবে মারা যায়। জেমি হুঃখিত হলেন, কিন্তু দমলেন না। তিনি চিকিৎসকদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পেনিসিলিন মজুত রাখতে অনুরোধ করেন।

এবারে পনেরো বছর বয়সের একটি বালকের উপর পরীক্ষা করা হয়। বালক আরোগ্যলাভ করে। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পেনিসিলিন উপাধন করা হচ্ছে। এ যুগের বিশ্ব—পেনিসিলিন-এর আবিষ্কারক হিসাবে জেমি বহু লোকের গুডেচ্ছা ও অভ্যর্থনা পেয়েছেন। তিনি বিনীত ভাবে বলতেন, "লোকে আমার গুণবান ফের, তারা বলে আমি তাদের বাঁচিয়েছি। কিন্তু আসলে হাজার হাজার বছর ধরে যে গাছটি আমাদের সামনে ছিল, সেটি কোন এক মুহূর্তে আমার ডিসে এসে পড়ে, আর আমি এক আবিষ্কারক হয়ে গেছি।"

জেমি ১৯৫৫ সালে ৭৩ বছর বয়সে মারা যান। বর্তমানে বিভিন্ন ছাত্তা ও ভাঙলাজাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা হচ্ছে। ট্রেপটোমাইসিনও অনুরূপ এক ভেদক পদার্থ। স্পষ্টতঃ বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্মে বিভিন্ন রেডিও আইসোটপও কাজে লাগানোর কথা চিন্তা করা হয়েছে। সেই অতীতের ভূত, প্রেত, দেব-দেবী হতে গাছগাছড়া ও তাঁরপর আজকের মাছ—এদের কত তফাৎ। আজ তবুও ব্যাট্টিজেন-অ্যাণ্টিবডি, সিরাব, রেডিও আইসোটপ নিয়ে মাছের রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষ হয়নি। নতুন নতুন পদার্থ ও কলাকলার জন্মে পৃথিবী অপেক্ষা করে রয়েছে। নতুন নতুন রোগ প্রতিরোধক বিশ্বের সমস্ত মাছবকে রক্ষা ও সফল করুক, এটাই আমাদের কামনা।

সেখা আছে এক জীর্ণ পুরী

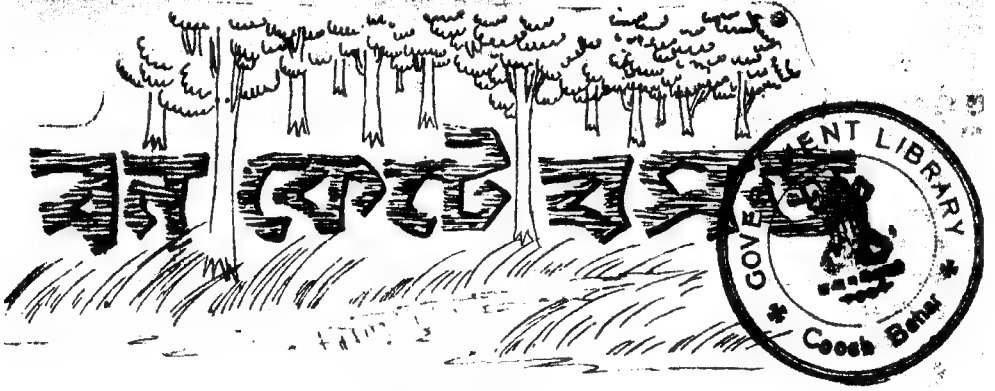
[জার্মান কবি Karl Bulcke-র কবিতা "There is an old city" অবলম্বনে]

এ কড় নগর হতে বহুদূরে আছে সেখা এক জীর্ণ পুরী,
বাড়াস বেধার গর্জিয়া বায়, সাগর লাফায়, ঘের কি তুড়ি।

সেখা নয় এক জীর্ণ আবাস—সেই বারো মাস বহু থাকে,
আগোছার ভরা দেওয়ালেতে তার সবুজ লতাঝা ডিগে ঝাঁকে।

সেখা আছে এক সাধীমারা প্রাণ—কি যে নির্জন, আতঙ্কিত,
বাল্যবৃত্তির পাইন-ছায়ার কত না নিভুতে স্মারিত।

অনুবাদ : মধুবন চট্টোপাধ্যায়



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

পঁচিশ

চৌধুরী কল্পন নেই। দুই গরুতে টানছে, আর জগন্নাথও ঠেলেছে পিছন থেকে প্রাণপণে। কাদা মেখে ভুতের চেহারা। গাড়ি হাত দশেক এগল এমনি ভাবে। জল আরও বেড়েছে। তার পরে কালায় ঢাকা এমনি এঁটে গেল, খাঙাখাঙিতে আর এক চুল নড়ে না। প্রবধর ভিতরটা রাগে টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু পথের মাঝখানে বিপদ—ঐ ছোঁড়া ছাড়া অজ্ঞ কোন মানুষ কাছে পিঠে নেই। অতঃপর ঠোঁটে কুণ্ডল এঁটে আছেন তিনি, এবং বাণু-বাছা করছেন। একবার কোন রকমে চৌধুরী-আলার চৌহাদির ভিতর নিয়ে তুলতে পারলে হয়। তখন নিজ-মুষ্টি ধরবেন, ফা-ফা করে হাসার-গজা দেখিয়ে দেবেন।

কি হল রে বাপধন ?

এতখানি কাদা, আগে ঠাঁহর হয় নি। নোনা কাদা কি না—চাকা একেবারে কামড়ে ধরেছে। ঘেন কুমিরের কামড়, ছাড়ছে না। প্রমথ বললেন, ঘুর হয় হোকগে। সোজা সড়কে কাজ নেই। গাড়ি ঘুরিয়ে নে তুই বাবা। তেলিগাঁতির পুল হয়ে বাব।

জগা হেসে গুঠে : বললেন ভাল কথাটা। চাল বাড়ন্ত—আছা, তবে ভাত্ত-ভাত্তই চাপিয়ে দিগে। গাড়িই যদি ঘুরবে, আর দশ হাত এগুলেই তো কাদা পার হওয়া বেত।

নিবারণ হাত-মুখ নেড়ে বলে, বলিহাযি গাড়োয়ান তুই বাপু। ঘেন মানা সোয়ায়ি তুলেছিস। খালের মাঝখানে গাড়ি নামিয়ে বলে, আর নড়বে না। আমরা এখন কি করব, সেটা বল তবে।

জগা বলে, বায়ড়ান কি জন্তে ? পৌছেই তো গেছেন। চৌধুরীগরু কতই বা হবে—হু-ক্রোশ কি আড়াই ক্রোশ বড় জোর। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে বান দিবি ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায়। গাড়ি-গরুর অচুটে বা আছে তাই হবে।

প্রমথ সত্যতরে বলেন, যে এই চাপড়াশি দশায় পায়বে। সমন নিয়ে জল-আঙাল ভাড়া অভ্যাস, গায়ে লাগবে না। আমার তো বাপু ফরাসে বলে হুকুম ঝাড়া কাজ—কলের ইঞ্জিন নই যে কল টপলে এমনি পৌ করে বেরিয়ে পড়লাম।

জগা বেশলাই জেলে একটা বিড়ি ধরাল। কাঠিটা ধরে প্রমথর দিকে চেয়ে থাকে। বলে, সে কথা একশ' বার। ফরাসে বলে বলে গরুর পর্ষত হয়েছ। এতখানি গরুর বাঘি কুঁকিনি,

গরুও বোঝেনি। গাড়ি তা হলে খালে নামাত না। অ্যান্ডিন বধ করছি ওদের নিয়ে, হেন অবিবেচনার কাজ ওরা কখনো করে নি।

প্রমথ বলেন, গরু একেবারে ঘুমিয়ে পড়ল মনে হচ্ছে। হাল ছেড়ে দিলেন বাপু, পিঠে দু-চারটে বাড়ি দে, আর খানিক টানাটানি করে দেখুক।

জগা প্রবল বেগে বাড়ি বাড়ল : না, হজুর, ঠিক ঠিকটা। বিগড়ে বাবে গরু। ডাইনের এই মাটেনজারকে দেখেন—বেটা বিবম মানী। মান করে শুয়ে পড়বে জলের মধ্যে। গাড়িও কাত হয়ে পড়বে, শুয়ে বসে জুত হবে না হজুরের। তার চেয়ে যেমন আছেন চুপচাপ থাকুন। গরু বাঁটাতে যাবেন না, ওরাও এমনি স্থির হয়ে থাকবে।

আবার বলে, থাকুন একটু বসে। আমি বরঞ্চ লোকজন ডেকে আনি। আর জোরার অবধি থাকতে পারেন তো, নির্বন্ধাটে কাজ হয়ে যাবে। জল বেড়ে গিয়ে ঝাঁসার খাঁটাখাঁটি থাকবে না। দু-দশ ঠেলায় গাড়ি উঠে যাবে। ঠেলেতেও হবে না, গরু দু-জনে টেনে তুলে ফেলবে।

প্রমথ বলেন, আরে সর্বনাশ—জোরার অবধি ঠায় বসিয়ে রাখবি ? লোক ডেকে নিয়ে আয় তুই।

নিবারণ বলে, লোক কদুর ?

তার কোন ঠিকঠিকানা আছে ? চৌধুরী-আলা অবধি যেতে হতে পারে, আবার পথও মাছমায়া লোক পেতে পারি।

জগাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা নয়। কিন্তু তা ছাড়া উপায়ও দেখা যায় না কিছু। প্রমথ পৈতে বের করে ফেললেন : দেখ বাবা, ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি। ভাঁওতা দিয়ে সরে পড়তিস নে, পা ছুঁয়ে দিবি করে না। তবে ছেড়ে দেব। ছুটে বাবি আর ছুটে চলে আসবি—কোনখানে জমে বাবি নে। কেমন বাবা, এই কথায় রাজি ?

নিবারণ তাড়াতাড়ি বলে, মানবোয়ার বাড়িস তো চিড়ে-মুড়ি বা-হোক কিছু নিয়ে আসবি। খালি হাতে আসিস নে। দুপুরবেলা কখন সেই পদাধরের হোটেল গণ্ডা করবে ভাতের দানা পেটে পড়েছিল, তারপরে গরুর গাড়ির থকল—কিথের নাড়ি পটপট করে।

হুটু-হুটু হুটু-হুটু জ্যাং-জ্যাং জ্যাং-জ্যাং—চাকের বাজনার জোর দিয়েছে এখন। জগা ছুটল সেই বাজনার কান রেখে। কালীভদ্রার বাজনা স্নেহে নেই। নিশিয়ারে করালীর কুলে বাতাসের বড় জোর, বাজনা তাই একেবারে কাছে মনে হচ্ছে। ভীষের মতন ছুটেছে জগা-বাঁধের নিচে দিয়ে—কালার মধ্যে পড়ছে, ঝাঁটাবনে দিয়ে পড়ছে। তা সে উপায় নেই—সব বাঁধের উপর দিয়ে ছোটো বার না, পড়ে গিয়ে একতলে হাড়গোড়-ভাঙা হ'লে থাকত। আশ্রয়-সন্ধান প্রমথর কাছে কথা দিয়ে এসেছে, সেই জন্মেই কি ছুটাইট এত ?

সীতিকা এসে গেল। পাড়ার মধ্যে পা দিল কত দিনের পর। কী আশ্চর্য, কেউ নেই। পুঙ্খ না হর জালে ঢলে গেছে, কিন্তু বউ-বিরা ? ঘরের দরজার নিকল কুলে দিয়ে গেছে কেউ কেউ। বেশির ভাগ ঘরে আবার দরজাই নেই। ভ্রমপাড়া—হলে চোর-ছাঁচোড়ের মজা বেধে-বেধে। পাড়া বেঁটিয়ে নিয়ে সেলেও তো কথা বলার কেউ নেই। কিন্তু বাশরাজের পাড়ার চোর আসে না। ধন-সম্পত্তির মধ্যে মাটির গাড়ি-কলসি, কলাইয়ের বাসন ছ-একখানা, আর কাঁধা-মাহু। ঝাঁটপাট দিলে দেবার ধূলা মিলবে, অস্ত-কিছু নয়। দিন আসে, দিন খার। চাল-ডাল ছন-তেল ঘরে কিলে মজুত করে রাখে না। কপাল জোরে বেশি লজা হলে খাওয়াটা জাম্বিকি-বকমের হবে সেদিন, ছোটো পরসা ঝাল তো কপূর কিনে জলে দিয়ে থাকে। কম চল তো সেদিন আধপেটা খাওয়া। না হল তো কাঠ-কাঠ উপাস। চোবকে তাই খোসামোদ করেও পাড়ার মধ্যে বেওয়া বাবে না। কিন্তু বুঝত কি ? পুঙ্খ না হোক, ঘেরোয় সব গেল কোথায় ?

গগনের নতুন-আলার নিকে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখানো চূর্ণচাপ একেবারে। ছাড়া বাড়ির মতো। আগে কত দিন তো পুণ্যধরে কীর্তনানন্দ চলছে এমন সময় অবধি। জগা ছিল না—এই মধ্যে বাক্স-এসে বেঁধে ধরে সপকথার রাজবাড়ির মতো করে বেধে গেল নাকি ? ভাল হয়, চাকবালাকে খাড় ছুড়ে বেধে গিয়ে থাকে যদি—হুঁ-বিরে বেরাকের কককানি না বেবোয় আর কখনো !

চুকে পড়ল জগা আলো বেধের মধ্যে। বেজেই হবে। এক ছুটোছুটি করে এল ওবেই জন্মে ভো—গগন হাসের কথা মনে করে। নিজের কোন পরজ ভেবে নয়। তাকিয়ে দেখে, কামরার ভিতরে বের আলো। বড় কবাটের জোড়ের কীক দিয়ে আলো আসে। আলো বখন, মাহুও তবে ভিতরে আছে। এবং খুব সম্ভব ননক-ভাঙ দেয়লোক হুটি। জগা তখন ডোবার ধারে। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠছে কাঁধা মাথা সেহঁটার নিকে হঠাৎ নজর পড়ে বার। অভিনয় বিলি দেখাচ্ছে। এতদিন পরে এসেছে—ওঁরে বুয়ে ওঁদের সামনে হাজির হওয়া উচিত। চাকটা নয়তো হি-হি করে হাসবে। বলে বসবে হরতো কি কথা—রক্ত চড়ে বাবে জগার মাথার।

নয়ে বুয়ে ভিজা কাপড়ে জগা আলোর, উঠল। এদিক ওদিক ডাকাল একবার। গগন, নগেনশর্মা, এমন কি বাপাবিরেও একজন কেউ নেই কোনদিকে। দরজার খা দিল। সাদা নেই। জোরে জোরে বাঁকাতে লাগল। অবশেষে ভিতর থেকে কবরর করে উঠল—আবার কে ?—চাকবাল।

এসে ছুটেই কালীভদ্রা থেকে ? বা ভেবে এসেছে, একলা নই। শক্তিক আছে। বে ঠাংখানা আছে, চোটাও নেব আজকে।

ঠ্যাংয়ের কথা ভুলেছে, ময়ূর্ববটী অতএব নগেনশর্মা সম্পর্কে। আনন্দে জগা খই পাচ্ছে না। একচল হয়ে ওরা বাহাবনে চক্কাও হয়ে ছিল, হলের মধ্যেই এখন বুটোপুটি বেধে গেছে। কবাটে জোরে জোরে করাঘাত করে জগা বলে, আশি-শো, আশি জগগায়া। বয়্যারখোলায় পড়েছিলার, বাজা গাইতায় কারও কোন কতি-লোকসান করিনি, আমার কেন ঠাং ভাঙতে বাবে গো ? মোর খোল, বড় জকরি খবর, সেজন্ত ছুটেছে ছুটেছে এসেছি।

চাকবাল। বরজা বুয়ে দিয়ে ঝাঁড়াল : তুমি কোথা থেকে হঠাৎ ? কাপড়ের জলে ভোমাদের নিকানো ঘর কালা-কালা হয়ে গেল। আগে শুকনো কাপড় লাগে। বলছি সব।

চাক বোঝাখুঁজি করল একটুখানি। বলে, হুতি পাচ্ছি নে। হর বড়ুইয়ের সঙ্গে দালা সন্দরে গেল। একটা হুতি পরনে, আর পুটলি বেঁধে নিয়ে গেছে গোটা দুই।

নগনা-বোড়ার হুতি নেই ?

ওর জিনিসে চাত সিতে ঝোরা করে আমার।

জারি খুশি জগগাথ। অনেকদিন পরে আকী-আলাঘরে পা বেওয়া অবধি নগেনশর্মা সম্পর্কে চাকর মনোভাব পাওয়া যাচ্ছে, বড় াস লাগছে তার কথাবার্তা। জগা সার দিয়ে বলে, ঠিক বলে ছ। পাচ্ছি লোক।

কিন্তু কাপড়ের কি করা বার ? কালা-পেড়ে শাড়ি আমার—এটাই পর। শাড়ি পরে বউ হয়ে বোসো, আর কি হবে।

কিক করে হেসে হাসান দেয়, জগগাথ নয়, জগমোহিনী।

জগগাথ বলে, হু-বেটাকে বেধে এলার খালের মধ্যে। পতোয়ানা নিয়ে ভোমাদের এখানে শিল করতে আসছে। কড়ল নেই—কিন্তু তার কাছেই এসেছি। চৌবুরি বাবু বাড় বোকর'রা সাজিয়েছে। ফলাবলি করছিল, পাড়ি চালাতে চালাতে, কানে গেল।

চাক বলে, দালাও তো গেল ওই বোকর'মার ব্যাপারে। গোপাল ভরখাক এসে মেখেত্তনে গেল, সেই সব শহতানি করছে। ধবরটা আবার চৌবুরি-আলা থেকেই বেকল। কালোসোনা ভড়পাচ্ছিল : এপারের সমস্ত নাকি চৌবুরিদের খাস এলাকা, করালীর খাল-পারে সাপ-বাঘের হুখে নাকি ছুড়ে দেবে আমাদের। হর বড়ুই বলল, সময় ন-বাস হ-বাবের পথ নয়, সাপ-বাঘও নেই সেখানে। কালোসোনার হুখে কাল না খেয়ে নিজেরা সেবেস্তার বৌজখবর করে আসিগে।

জগা বলে, নগনাটা গেল না রে। ভায়ই তো এই সবে মাথা খেলে ভাল।

সে বাবে রাজ্যিপাট ছেড়ে—বয়ে গেছে। নশজনে ভোমরা বোপাফবস্তার করে দিলে, দালা তো মালিক শুধু নামেই। তৈরীকি করা দিচ্ছে ওই লোক এখন।

জোয়ার হুখে ধবের কাহিনী—এ সব কী বলে চাকবাল। গগন হাসের লশ জন হিতাখার একজন তবে অন্তত জগগাথ। চাক তা খীকার করল। আর নগেনশর্মা'কে তো পাঁতে-পাঁতে চিনাচ্ছে। আনন্দে কী করবে জগা ভেবে পায় না। আগেকার দিন হলে মনেও না ভাবতে পারত না, সেই কাল সে কবে বলল। খাওয়ার কথা কাল চাকবালার

কাছে। নিবারণ বা বলে গিয়েছে—আর সেই কথারই আবৃত্তি করে বলে, কিসের নাড়ি পটিপটি করছে। চাট্টি ভাত বাড় চাকুবালা। খেয়েমেয়ে তারপরে কাজ আছে বিত্তর খাটনির কাজ।

ভাত কোথা? হু-হাস পরে আজকে আসা হচ্ছে, খবর দেওয়া ছিল কি কাজকে দিয়ে?

বিশ্বয়ে চোখ কপালে তুলে জগা বলে, জামব কেমনে যে বাগারাক্ষের মধ্যে মশাররা পুড়ে বায়ু হয়ে গেছেন। সন্ধ্যার যৌক না কাটতে রান্না-খাওয়া থতম। আগে তো দেখি পেছি, হরিষ লুষ্ঠের হরিষনি পড়তে পোহাতি তারা উঠে যেত।

চারিদিক ইতস্তত তাকিয়ে দেখে আবার বলে, আসর বলে না আজকাল? বড়লা সদরে, তা বউটাকরুন গেল কোথা? চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নগেন-কর্তাও তদারক করছে না। ব্যাপার কি বল দিকি?

চাক বলে, রত্নাঙ্গীপুত্রো কালীতলার। বাবলা গুনতে পাওনা? পাড়াগাও সব দেখানে। বউদিদির উপোস, সে তো বিকাল থেকে সেখানে পড়ে থেকে গোছগাছ করছে। রান্নাবান্না হয় নি, ভাত মিই কোথা থেকে? ও-বেলার চাট্টি পাড়া ছিল, তাই খেয়ে আমি ঘরে হুতোর দিয়ে গিয়েছি।

জগা বলে, বাবলা হয়নি তো হোক এখন। হাতে বাধা কিসের? চৌধুরিসের ম্যানেজার চাপড়াশি আর মাহুবজান নিয়ে ভোরের মুখে শিল করতে এসে পড়বে। তার আগে খাটনি আছে সারা রাত্তির ঘরে। পেটে না খেয়ে খাটতে পারব না।

পাড়াগায়ের লোকের—পুরুষ হোক, আর মেয়ে হোক—শিল কখাটা বুঝতে দেবি হয় না। আগলত-খাটত ব্যাপার—সাধুভাবার বার নাথ অধাবব ফোক। সেনার বাবদ ডিক্রি হয়ে আছে—চাপড়াশি এসে সেনাপরের মালপত্র ধরবে, সেই সমস্ত নিলামে বিক্রি হয়ে টাকা আদায় হবে। রাঁধে বাড়ি ঢোকবার নিয়ম নেই। অতএব ভোরবেলা এসে নিশ্চর তার হানা দেবে। আর এই পক্ষের কাজ হল, ঘরের বাবতীর জিনিষপত্র এবং গোয়ালঘর গরু-বাছুর মাতারাক্তি অস্ত্র সরিয়ে কেস। জগরান্থ এই খাটনির কথাই বলছে। ম্যানেজার সফলবলে এসে দেখবে, বাড়ির জিনিষপত্র সব পাচাক হয়ে গেছে, মাহুব ক'টি আড্ডে কেবল। মাহুবেরা কা কা করে হাসবে, বেকুব হয়ে লজ্জার মুখ ঢেকে সরে পড়বে পাওনারেদরা। খালি পেটে এত সমস্ত হবে কেমন করে?

চাক বলে, চিড়ে খেয়ে নাও। ঘরে চিড়ে আছে।

চিড়ে তো লোকামেও থাকে। চিড়ে খাব তো গৃহস্থবাড়ি এসে উঠলাম কেন? চিড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে মাড়িতে খিল ধরে, পেটের কিছু হয় না। চিড়ে আমি খাটনে।

চাক বলে, চিড়ে কুটতে গিয়ে ঢেঁকিতে হাত ছেঁচে গেছে। রাঁধা বাড়ি করি কেমন করে বল।

হঁ, বুঝলাম—

কি বুঝলে শুনি?

ছমোর কাঁকিরে কাঁকিরে ভেঁকে তুলেছি। বুয়ে যৌক কাটনি। বুখ-চোখ ছাই বেঁটে উঠুন ঘরতে মন নিচ্ছে না।

ভারী গলায় চাক বলে, মরছি হাতের জগরান্থ—বলে কিনা বু। বুমেংগর কোথাকলো জে বিত্ত না বুমেংগর! তবে আয় বলছি কি।

নগনা-খোড়া দু-বার এর মধ্যে এটা-ওটা ছুতো করে কালীতলা থেকে এসে হুঁ মেয়ে গেছে।

চাকুবালা কাপড়ের নিচে থেকে ডান হাত বাড়িয়ে ধরল। বলে, হাত ফুলে ঢাক হয়েছে, দেখ—

খাল-পায়ে জলসের মাথার চাঁদ, হাড্ডা জোংরা সোয়-সোড়া অবধি এসে পড়েছে। নগেনশশীকে দৌব দেওয়া বায় না, বাগাবনের নির্জন রাস্তা এই মেয়ে দেখে মাথার ঠিক রাখা দায়।

বলছে, হাতের টাটানিতে বসে বসে শিলিমের সৈক সিঁছিলাম। নইলে ঘরে থাকতাম বুঝি। তল্লাটের সব মাহুব কালীতলার, আমি একলা পড়ে থাকবার মাহুব।

জগা বলে, টাটানি-অশুনি বাইরের লোক দেখে না। আমি একখানা কাপড় জড়িয়েছে তো হাতে—সত্যি বটে, ও-হাত উঠু করে তুলে ধরে বলে থাকতে হয়, কাজকর্ম হয় না ও-হাত দিয়ে।

দেখাচ্ছি তবে বুলে। মাহুবকে রেখে খাওয়ারানোর ব্যাপার—তাই নিয়ে কেউ ছুতো ধরতে বায়।

গরগর করতে করতে চাকুবালা ভ্রাকড়ার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলতে গেল। জগা হি-হি করে হাসে। হাত ধরে কেসে বলে, একটুখানি কেশিয়ে দেখলাম তোমায়। কপড়া না করলে মেয়েমাহুবের বাহার খোলে না। মেনি-বিড়ালের মতো মিন-মিন করছিলে, চেনা তখন হুশকিল। তাবহিলাম, বড়লা'র বোন কি এই—না অত কেউ?

আবার বলে, আন চিড়ে—চিড়ে ভিজিয়ে নাও। তাড়াতাড়ি কর, নয়তো নাড়িভুড়ি সব হজম হয়ে যাবে। খালের মধ্যে সে হু-বেটা পেটের জ্বালায় এতকল আঘাত ব্যাপাঙ্ক করছে।

রান্নাঘরে গিয়ে চাকুবালা জগাকে ডাকল। আয়োজন পরিপাটি। চিড়ে ভিজিয়ে গিয়েছে। নলেমেব স্বগন্ধ পাটালি। কলাগাছের নতুন বাড়ে কাঁদি পড়ে পেকে গিয়েছে এক কাঁদি মস্তমান-সবরি। এর উপরে কড়াইতে সব-জাটা ছুখ আছে। ভাত নেই, তা বলে খাওয়ার কোন অসুবিধা গৃহস্থ-বাড়ি?

জগা থিঁচিয়ে ওঠে: রোগা না খোকা যে আমি ছুখ খেতে বাব?

এমনি সময় ডোবার জলে পাকিও হয়ে তিন জোড়া পা চলে এল উঠানের উপর। জগা তাকিয়ে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে, আরে বাস, বড়লা এসে পড়েছে, আর ভাবনা কিসের? বড়লা'কে না বলতে পেরে কখাগুলো টগবগ করে ফুটছিল গলা পর্বন্ত এসে।

গগন বলে, জগরান্থ নাকি? জ্বালা, উঠছে কেন পাও। চৌধুরি বাবুদের কাণ্ড শুনেছ? নতুন ঘেরির খাজনা বলে তিন-শ বাইশ টাকার একতরফা ডিক্রি করেছে আমার নামে। সাবের থেকে উচ্ছেদের নাশিল করেছে। দেওয়ানি আর কোর্টদারিতে তিন নম্বর এক সঙ্গে কলঙ্ক করেছে।

জগা বলল, জানি। আরও বা-সব করবে বলে মনে হয়ে মতলব ভাজছে, তা-ও জেনে কেসেছি বড়লা।

গগনের সঙ্গে হর শুভুই। আর একটা নতুন লোক—নিতাভই অস্থিরব, বিখাটা হাড়ের উপর মাস হোঁরাতে ফুলে গেছেন, লোকটিকে দেখে তাই মনে হয়। নতুন লোক দেখে জগরান্থ বলতে বলতে খেল গেল।

গগন বলে, চক্কাভি মশায়। স্নানের পুণ্ডরীকবাবু উকিল—তার সেরেস্তায় বসেন। টোনিগিরি করেন। বরাপোতার কিছু অধিকনিবেশ আছে, অবশেষে এসে থাকেন। আমরা চক্কাভি মশায়কে এই অবধি টেনেটুনে নিয়ে এলাম। রাতটুকু থেকে বরাপোতা কাঁচ-সকালে বাকেন। হামলা-মোকদ্দমা আমরা কিছু বুঝি। নস্কেরলী পাটোয়ারী মাহুদ—তার সঙ্গে সামনাসামনি পরামর্শ হোক চক্কাভি মশায়ের, সে কি বলে শোনা বাক। নগেনও বুঝি কালীতলার পড়ে আছে? খেয়ে নাও জগা, আমরাও চলে। বাই চক্কাভি মশায়কে নিয়ে। তুমি কি জেসে এসেছে, তাও সকলে মিলে শোনা বাবে।

চাক তিক্ত কঠ বলে, যেতে হবে না দাদা। চূপচাপ থাক। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেই-ই কতবার চক্কার দেয় দেখ।

জগা বলে, কি গো চাকবাবা, ভাত রান্নার তো উপায় নেই—টোনি চক্কাভি মশায়কে বড়দা ডেকে নিয়ে এলো, এবাও চিড়ে খেয়ে রাত কাটাতে নাকি?

চাকবাবা হারবার—মেয়ে নয়। চোখ-মুখ নাচিয়ে সে বলে, ভাই তো হল চক্কাভিকে ডেকে এনে। বায়ন মাহুদ উনি বাঁধবেন, মিচু জাতের আমরা মজা করে খাব।

ছাখিশ

এরা তো বেশ হাসাহাসি করছে চালের নিচে জমিয়ে বসে। মুখকিল ওদিকে—খালের মধ্যে প্রমথ আর নিবারণের নড়াচড়ায় পাড়ির ঢাকা আরও অনেকখানি বসে গেছে। জগা লোক ডাকতে গেছে তো গেছে। ক'কটা কিবা ক'দিন লাগায় তাই দেখ। শৈতেধারী স্ফ্রাঙ্কণের কাছে কথা দিয়ে গেল, তা বলে দৃকপাত নেই। গরুর গাড়ি ঠেসার্তলির পর রাত দুপুরে কোনখানে গুটী-গুটী হয়ে পড়িয়ে পড়ল নাকি? কোন কিছুই বিচিত্র নয় জ্বলে ঐ বিছুলোর পক্ষে।

নিবারণ, কি কথা বায় বল তো?

জ-স্ব-বু করে নাক ডেকে নিবারণ জবাব দিল। বিচালির খাঁটি ঠেশ দিয়ে আরামে দিবা সে গা ঢেলে দিয়েছে। রাগে প্রমথের গা-জগা করে। থাকা দিয়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে খালের জলে। কিছু আদালতের চাপডাশি হলেও সরকারি মাহুদ। সমাই না করে উপায় কি।

নিবারণ, তুমি বাপু নয়সেহে নারায়ণ। খই-খই কিরোদ সয়দুর—তার মধ্যে নাক ডেকে ভূমি দিচ্ছ। বালিশ অভাবে নারায়ণ একটা পটোল মাল্লার দিয়েছিলেন, তোমার কিছুই লাগে না।

বাইরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখেন প্রমথ। আরে সর্বনাশ, হুগ্গেলর আসক্ত কিছুই ঠাহর করেননি একমুণ। জোয়ার এসে গেছে, খালের জল হুহু করে বাড়ছে। খরশ্রোত আবর্তিত হয়ে ছুটছে। পাড়ির পাটাতনের উপর বসে তাঁরা—জলতা অনতিপরেই হৌব-হৌব করবে। বোটা গাফোয়ান ডুবিয়ে মারবার কিফিরে এইখানে পাড়ি আটকে সরে পড়ল নাকি? মতলব করে খালে এসে কেলেছে?

ওহে নিবারণ, উঠে দেখ কাণ্ড। জীবন নিয়ে সড়ক, এখনো তুমি চোখ বুজে পড়ে আছ?

অনেক থাকাথাকির পর নিবারণ অবশেষে চোখ কলসে বাড়ী হয়ে বসল।

ভাঙার চল নিবারণ। আর খানিকক্ষণ থাকলে টানে জাসিয়ে নিয়ে বাবে।

ভাই তো বটে!

ভড়াক করে নিবারণ পাড়ির পাটাতন থেকে লাফিয়ে পড়ল। এবং হালকা মাহুদ—পাড়েও উঠে পড়ল পলকের মধ্যে। কিন্তু ম্যানেকার প্রমথের পক্ষে সহজ নয় ব্যাপারটা। নিবারণের পুরো দেহখানা পাল্লার তুলে দিলে বা ওজন পাঁচবে, ম্যানেকারের শুধুমাত্র ছুঁড়িখানিই বোধ করি তাই। তার উপর সাতারের কারখানাকান্নে জানা নেই। আর জানলেই বা কি—হিমালয় পর্বত জলে ভাসবে না বত কারখানি করা বাক না কেন।

ভুকনো ভাঙার উপর পাড়িরে নিবারণ হাঁক পাড়ছে: হল কি ম্যানেকার মশায়। পা চালিয়ে চলে আহুন। জায়গাটা গরম বলে মাগুম হয়। বদ্বত একটা গন্ধ পাচ্ছেল না নাকে?

বেথানে বাঘের চলাফেরা, তেমনি সব জায়গাকে গরম বলে। ভাড়াভাড়ি পার হয়ে যেতে প্রমথের কি অসাহ? কিন্তু এক একখানা পা ফেলছেন, ভারী হুয়হুশের মতো গিয়ে পড়ছে—সেই পা তারপরে টেনে তোলা দায়। নিবারণ ভাঙার উপর পাড়িরে নিবারণ ভয় ধরাবে না কেন—তার পালানোর মুখকিল কিছু নেই।

ভাঙার কাছাকাছি হতে নিবারণ খানিকটা নেমে এসে হাত বাড়িয়ে হিড়-হিড় করে প্রমথকে টেনে তুলল। ভালমাহুদের মতো বলে, গন্ধ কেন বেরোয়, জানেন তো ম্যানেকার মশায়?

বিরক্ত মুখে প্রমথ থিচিয়ে ওঠেন: না, জানিনে বাপু। রাত দুপুরে কে তোমায় ওসব মনে করিয়ে দিতে বলছে?

নিঃশব্দে কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ নিবারণ পাড়িরে পড়ল। বার কয়েক সলজে নাক টেনে বলে, গন্ধটা বেশি-বেশি লাগে। আর এগোব না। ওই দিকে আছেন হয়তো ওং পেতে।

কিন্তু একা নিবারণই গন্ধটা পাচ্ছে, প্রমথের নাকে কিছু লাগে না। রাগ করে তিনি বলেন, পথের উপরে কু-ডাক ডাকছ, হয়েছে কি বল তো চাপডাশি?

নিবারণ বলে, একটা-কিছু উপায় দেখবেন তো। চূপচাপ এগিয়ে চলব, আর পথের উপর থেকে জলজ্যান্ত ছটো প্রাণী টুক করে ওয়া জলবোণ সেবে বাবেন, আপোষে তাই বা কেমন করে হতে দিই?

একটা উঁচু কেওড়াগাছ তাক করে বলে, আমি মশার দোজালার উপর উঠে বসি গে। বলি কিছু দেখতে পাই, বলব বরক আপনাকে। সমন নিয়ে রাতিয়বলা জলল ঠেলে পায়ে ইটতে হবে, এমন কি কথা ছিল? বলুন।

দীর্ঘ ওড়ি—ভাল উঠেছে অনেকটা উপর থেকে। প্রমথ অসহায়ভাবে তাকান পাছেহি দিকে। জায়গা নিরাপদ, সলজে নেই। নিবারণের বড় সুবিধা—সেই নয়, যেন লিকলিকে বেত একপাড়, বেদিকে যেমন খুশি নোয়ানো যায়। হালকাচা মেয়ে সে গায়ে ওঠার জোপাড় করছে?

প্রমথ কাঁহর হয়ে বসেন, হুজরে একমুণে থাকি। আমরা

বাধে থাকে, আর ডালের উপর বসে বসে মজা করে দেখবে তুমি।
এই বাণু ধর হল? ভাল লাগবে দেখতে?

নিবারণ হাঁ-হী করে ওঠে: সর্বনাশ, কী করলেন, অসময়ে বড়-মিঞার নাম ধরে ডেকে বসলেন! গাছ তো কেউ ইজারা নিয়ে নেয় নি, সবাই উঠতে পারে। আশপাশে উঠে পড়ুন না মশায়।

প্রমথ মুখ ভেঙে ঘরের অসুস্থতা করে বলেন, উঠে পড়ুন না মশায়। এমনি হবে না, মশায়কে উঠতে হলে কপিকলে খাটতে হবে গাছের মাথায়। উঠেও তার পরে পলকা ডাল ভর সইতে পারবে না, নক্কমড় করে ভেঙে পড়বে।

যে-কেউ সেটা আশঙ্ক করতে পারে। অলক্ষ্যে নিবারণ হাসি চেপে নিল। অদূরের জঙ্গলটার কি-একটা শব্দ এমনি সময়। ভয়ানক কণ্ঠে নিবারণ বলে, পচা গন্ধ পাচ্ছেন তো এবারে? বড়ই যে কাছে এসে গেল।

প্রমথ শিচ্ছেন তাকিয়ে বলেন, তুমি ঢিল ছুঁড়লে নাকি নিবারণ? আমার ভয় দেখাচ্ছে?

নিবারণ কথা শেষ হতে দেয় না: লোড়ন মশায়। এলো। এক গাছে না উঠে দিল সে চোঁটা লোড়। এ কর্ণেও ওস্তাদ—দুই পায়েও ঈশ্বর এত ক্ষমতা দিয়েছেন। সাঁ-সাঁ করে ছুটছে। প্রমথ কি করেন—মিশ্রল সেহ নিয়ে তিনিও যথাসাধ্য ছুটেছেন পিছন ধরে। ব্যবধান বাড়ছে ক্রমেই—এমন হল, ভাল করে নজরই আসে না এখন। তবে জঙ্গলটা গিয়ে কাঁকার এসে গেছেন এবার। দু-পাশে বাঁধা ঘেরি, মাথখানে বাঁধ। একদিকে সাহস পেয়ে প্রমথ হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকছেন: একটুখানি দাঁড়াও চাপড়াশি। আর পারছি নে। কাঁকার মধ্যে আর এখন ভেঙে আসবে না।

নিবারণ বলে, আসবে না কি করে বলেন? কপালে যদি থাকে, ঘরের মধ্যে ছুরোয় খিল দিয়ে তক্তাপোষের উপর বসেছেন, সেইখান থেকে মুখে করে নিয়ে যায়। এমন কত হয়ে থাকে।

প্রমথ আঙন হয়ে ওঠেন: ভয় দিও না চাপরাশি, বলে দিচ্ছি। যোরাযুরির কাজ তোমার, খাতাপস্তার খুলে আমরা এক জায়গায় বসে থাকি। এমনি পেয়ে উঠিলে, তার উপরে আজোবাজে কথা বলে আরও দাবড়ে দিচ্ছি।

চাকের বাজনা খেমে ছিল অনেকক্ষণ, আবার বেজে উঠল। তাই তো, পাড়ার মধ্যেই এসে গেছেন একবারে। অদূরে আলো মিটমিট করছে, ঘরবাড়ি বলেই তো মাণুষ হয়।

মাটির পাঁচিল। নিবারণ বলে, বাবারনের এই রীত। ঘর হোক না হোক, পাঁচিল আগে তুলবে। পাঁচিল তুলে বাস্তব গতি ঘিরে নেওয়া। রাতবিরেতে হাওয়া খেতে যেতে ওঁরা যাতে ঢুকে না পড়েন।

প্রমথ ঠাঠর করে দেখে বলেন, কিন্তু এটা কি করেছে—সামনের দিকে আলপা কেন অভটা? পাঁচিল দেওয়ার তবু কি কল হল—বাসের বাবার তারা তো এই পথে ঢুকে পড়বে। যেমন এই আমরা।

নিবারণ বলে, শেষ তুলতে পারেনি ঝানিকটা এই বাধ রহে গেছে। সামনের বার হয়তো শেষ করে ফেলবে। তা বলে কল কিছু হয়নি, অমন কথা বলবেন না। বালাবলে যত আছেন, ছুপেরে জীবকে ভয় করেন সবাই। তা সে জঙ্গলজানোয়ার হোন, আর জিন-পরীই হোন। গতি ঘিরে মাহুবে খাঁটি করে আছে, এগোবার মুখে অনেক বার আঙশিছু করবে।

দু-জনে উঠানের উপর চলে এসেছে। যুহু কথাবার্তা আসছিল ঘরের ভিতর থেকে, মাহুব দেখে চুপ হয়ে গেল।

কারা এখানে?

আমরা—

আমরা বললে কি বোকা বার? আসছে কোথা থেকে? বাড়ি কোথায় তোমাদের?

শিল করতে বিরিয়ে আদালতের চাপরাশি কখনো আত্মপরিচয় দেবে না। দস্তর এই। শিলের চাপরাশি এসেছে—খবর যেন বাতাসের আগে ছোট! বেনদার সামাল হয়ে যায়। নিবারণ কাতর হয়ে বলে, পথ-চলতি মাহুব। ঘুরতে ঘুরতে এগিকে এসে পড়েছি। রাতটুকু কাটিয়ে যাব—খেতে চাইনে বাবা, শুধু একটু শুয়ে থাকব।

দয়া হল গৃহকর্তার। দয়া ঠিক বলা চলে না—বালা অকস্মেৎ এই সেওয়ার। রাত্রিবেলা অতিথ এসে কিরিয়ে দেওয়া চলবে না। দিতেই হবে আশ্রয়—নইলে জানোয়ারের মুখে যাবে নাকি সে মাহুব? ঘুরতে ঘুরতে আসেও অনেক মাহুব—ভাগ্য খুঁজতে নতুন যারা জঙ্গলরাজ্যে এসে পড়েছে।

ঘরে ঢুকে এগিক-ওগিক তাকিয়ে দেখে প্রমথ বলেন, কোথায় এসে পড়লাম মাণুষ হচ্ছে না তো। কোন জায়গা, কার বাড়ি? এ দিকটা এই আমার প্রথম আসা কিনা।

সাঁইতলা ডাক এই জায়গার। অঘানের নাম শ্রীগগনচন্দ্র দাস। নতুন একটা ঘেরি বানিয়েছি বলে সকলে আজকাল ঘেরিদার গগন বলে।

কী সর্বনাশ! প্রমথও নিবারণে চোখো-চোখি হল। তখন একেবারে ঘরের মধ্যে উঠে পড়েছেন। এবং বাইরে বেরলেই তো নিবারণ চাপরাশির নাকে পচাগন্ধ আসবে, ও জঙ্গলে নড়াচড়া হবে। নইলে প্রমথ সেই মুহূর্তেই দুড়দাড় ছুটে বেরতেন।

চক্রবর্তী দেয়াল ঠেশ দিয়ে আবেক চোখ বুজে ভুড়ক-ভুড়ক তামাক টানছিলেন। আর গণ্ডগোল সম্পর্কে নিরকণে বৈধবিক উপদেশ দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। মাহুকের সাড়া পেয়ে খেমে গিয়েছিলেন। সেই মাহুব ছটো করে উঠে পড়ল তো সোজা হয়ে বসলেন তিনি! প্রমথ ব্রাহ্মণ বলে নিজের মাহুকের প্রোক্তের জায়গা দেখিয়ে গিলেন তাঁর। নিবারণ চাপরাশি বড়ুয়ের মাহুকে গিয়ে বসল!

হাঁকোর মুখ মুছে চক্রবর্তী প্রমথের দিকে এগিয়ে গিলেন: তামাক ইচ্ছে করুন।

মউজ করে এবারে আলাপ-পরিচয়।

[ক্রমশ:]

[মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিব্রাস ও নির্ভরযোগ্য]

অন্তিম স্মৃতি শ্রীমতী অন্তিম স্মৃতি

১৭

তাড়াতাড়ি প্রতিমা বললল করছে, এ মেয়েটি কে ?
না, বিয়ে হয়নি তো ! কার মেয়ে ? আমার
নিমাইয়ের সঙ্গে কি মানাবে ?

‘তোমার বাবার নাম কী ?’ জিজ্ঞেস করলেন
শ্রী দেবী ।

‘সনাতন মিশ্র ।’

‘আর তোমার নাম ?’

লজ্জায় গলে গেল মেয়েটি । বললে, ‘বিষ্ণুপ্রিয়া ।’

‘বা, বেশ নাম । কী আর আশীর্বাদ করব ! সুন্দর
কর হোক তোমার । বিষ্ণুর মত বর ।’

লজ্জায় আরো মধুর হয়ে উঠল মেয়েটি ।

তাকে আশীর্বাদ না করে কি থাকে যায় ? যখনই
শ্রী যান গঙ্গানানে, দেখেন মেয়েটিও এসেছে ।
রোজ রোজ তারও জ্ঞান করা চাই । শরীর সঙ্গে
দেখা হওয়া মাত্রই মেয়েটি এগিয়ে আসে, প্রণাম করে
নম্র হয়ে । মামুলি বিধিতে নয়, হৃদয়ের ডাক শুনে ।
কেমন ইচ্ছে করে শ্রী দেবীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, ছোটো
মিষ্টি কথা শোনে, একটু বা আদর কুড়োয় । যদি
জ্বলেন একটু বা সেবা করে । বড় ভালো লাগে
শ্রী দেবীকে ।

আর এগারো বছরের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া যেমনি
শ্রীমার লতিকা তেমনি লজ্জার নবমঞ্জরী । সব চেয়ে
বড় কথা, ভক্তিতে ভরপুর । দিনে তিন বার গঙ্গানান
করে বালিকা, প্রতিবারই স্নানান্তে পূজা করে তীরে বসে ।

ভগবানকে বলা হয়েছে অপবর্গ-বন্দ্য । তার মানে
কোন দিকে অগ্রসর হলে পথেই অপবর্গ বা মোক্ষের
সঙ্গে দেখা হয় । কিন্তু যে ভক্তি করে সে এড়িয়ে যায়

মুক্তিকে । মুক্তিতে তার রুচি নেই, স্পৃহা নেই । তার
স্পৃহা প্রেমে তার রুচি সেবায় । ভগবান তাকে
মোক্ষ দিতে চাইলেও সে নেবেনা । দীর্ঘমানস গৃহস্থি
বিনা মৎসেবন জনাঃ । তুমি যদি আমাকে মোক্ষ
দিয়েই উড়িয়ে দিতে চাও তা বলে আমি দাঁড়াই
কোথায়, তোমার সেবা করি কি করে ?

এই মেয়েকে ঘরে নিয়ে গেলে কেমন হয় ?
নিমাইয়ের বউ করে ?

‘এ কথা আমার পুত্রে হউক ঘটনা ।’

ঘটক কাশী মিশ্রকে ডেকে পাঠালেন শ্রী । এলে
জিজ্ঞেস করলেন, ‘সনাতন মিশ্রকে চেন ?’

‘চিনি বৈ কি । বৈদিক জ্যেষ্ঠীর ব্রাহ্মণ । পদবী
রাজপণ্ডিত ।’

আদান-প্রদানের ঘর । মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল
শরীর ।

‘সম্পন্ন গৃহস্থ । চরিত্রে লোককান্ত । উদার,
অকৈতব, সত্যবাদী ।’ কাশী মিশ্র গুণের কিরিত্তি
খুলে ধরল ।

মুখ স্নান হয়ে গেল শরীর । এত বড় কুলীন,
সজ্জিমান, সে কি আর আমার মত কাড়ালের ঘরে
মেয়ে দেবে ? পিতৃহীন বালককে কি সে পছন্দ করবে ?

তবু মনের কথা ব্যক্ত করল শ্রী । বললে,
‘সনাতনের একটি বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে ।
সুচরিতা, সুশ্রী মেয়ে । তাকে নিমাইয়ের জন্তে এনে
দেবে ?’

কাশী মিশ্র মুনের মত তাকিয়ে রইল ।

‘বড় ইচ্ছে তাকে বউ করে ঘরে নিয়ে আসি ।’
শ্রী দেবী বললেন আকুল হয়ে, ‘গঙ্গার ঘাটে ডেকে দেবে

দেখে ওর উপর ভারি মায়া পড়ে গেছে। দেখলেই ইচ্ছে করে কোলের কাছে টেনে নিই। আদর করি।’

‘বড় কঠিন কাজ দিলেন।’ কাশী মিশ্র মাথা চুলকোতে লাগল। ‘এক নিঃশব্দ পরিবারের সঙ্গে কি সনাতন ঘনিষ্ঠ হতে চাইবেন?’

‘তবু তুমি দেখো চেষ্টা করে। আমার নিমাই কি তুচ্ছ, অকিঞ্চন?’

হুগাঁ বলে রওনা হল কাশী। তাকে দেখে সনাতন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, ‘আমুন, আমুন। কী মনে করে?’

আসন গ্রহণ করে কাশী মিশ্র বললে, ‘আপনি বিশ্বস্তর পণ্ডিতকে চেনেন?’

‘সে আবার কে?’

‘বা, আমাদের নিমাই পণ্ডিত। তার নাম শোনেনি?’ চমকে ওঠবার ভাব করল কাশী।

‘না, না, নাম শুনেছি। কোন এক কাশ্মীরী পণ্ডিতকে তর্কে হারিয়ে দেবার পর তার নাম খুব ছড়িয়ে পড়েছে। আমার কানেও এসেছে সেকথা।’

‘দেখেননি তাকে?’

‘নব্বীপে কত লোকের বাস, সবাইকে কি আমি দেখেছি?’ সনাতন উৎসুক হয়ে বললে, ‘কেন দেখতে কি খুব মনস্ক?’

‘সে বর্ণনার নয়। বেড়াতে বেড়াতে যাবেন একদিন গঙ্গার ঘাটে, স্বচক্ষে দেখে আসবেন। দেখবার পর কয়েক পা ফিরে এসে আবার যাবেন। ফিরবেন ঘুরবেন আবার যাবেন। শেষে আর সরতে ইচ্ছে করবে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।’

‘যাব একদিন।’ বললেন সনাতন।

‘কী চোখে দেখবেন তা আপনিই জানেন।’ কাশী মিশ্র উঠে পড়ল: ‘কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে যাই। নিমাইয়ের মতন দ্বিতীয় পাত্র নেই নব্বীপে।’

কয়েক দিন পরে খবর দেবেন জানানেন সনাতন।

শচী ভাবলেন নিশ্চয়ই সনাতন মত করবে না। নিমাই সহায়সম্বলহীন এক টোলার পণ্ডিত, তাকে কি সনাতনের মত লোক মেয়ে দেয়?

সনাতন দেখলেন নিমাইকে। স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। এ কি মানুষ না দেবতা? দেখেই মনে হয় সমস্ত রূপই তার কৃষ্ণবিলাস, সমস্ত স্বচ্ছাই তার কৃষ্ণভক্তি।

শুভ ও অশুভ হুই কর্মই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। ততকর্ম মানে পুণ্য, অশুভকর্ম পাপ। সে কি? পুণ্যও

ভক্তির প্রতিকূল? হ্যাঁ, পুণ্য আর পাপ দুইই ভক্তির বিসবালী। কেন, পুণ্য কেন? পুণ্য লোকে করে কী আশায়? নিজের সুখের আশায়। পুণ্যের পিছনে শুধু আত্মপ্রিয়-প্রীতির বাসনা। তাই পুণ্য শুধু হলনা মাত্র। তাই পুণ্য কৃষ্ণভক্তির বাধক। পুণ্যের ফলে যখন সুখভোগ হয় তখন তাতে মত্ত হয়ে পুণ্যবান কৃষ্ণভক্তের কথা আর মনে করে না। আর পাপের উদ্দেশ্য তো শুধু ইন্দ্রিয়তর্পণ। আর কিছুতেই তৃপ্তি হয়না। বলেই তো পাণীর যন্ত্রণা। কি করে এই যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাবে তারই জন্তে পাণী থাকে চঞ্চল হয়ে, কৃষ্ণভক্তের কথা ভুলে যায়। তাই শুভ ও অশুভ দু রকম কর্মই কৃষ্ণভক্তির বিরুদ্ধ।

নিমাইয়ের সমস্ত দেহ থেকে জ্যোতি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এ যেন প্রাকৃত জ্যোতি নয়, চিন্ময় জ্যোতি। যেমন জ্যোতিষ্মান বস্তু তেমনি তার জ্যোতি। সূর্য প্রাকৃত বলে তার জ্যোতিও প্রাকৃত। কিন্তু নিমাই যেন অপ্রাকৃত চিদবস্তু আর তার জ্যোতিও অপ্রাকৃত চিন্ময়। এ যেন এক মায়াতীত অবস্থান।

সনাতনের মনে হল এ-হেন অসামান্য কি আমার মেয়েকে মনোনীত করবে?

বাড়ীতে এসে গৃহিণীকে বললে। বললে, ‘মেয়েকে পাত্রস্থ করবার জন্তে পাণ্টা ঘর পেয়েছি।’

‘পাত্র কে?’

‘জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে নিমাই।’

‘করে কী?’

‘প্রকাণ্ড পণ্ডিত।’

‘পণ্ডিত? আহা, খুব ভালো। কিন্তু সে কি আমার মেয়েকে পছন্দ করবে?’

তখনকার দিনে ধনবানের চেয়ে বিদ্বানের মাহ বৈশি। কোলীশ কাকনে নয়, কোলীশ পাণ্ডিত্যে। তাই সেদিন, ধনী হয়তো দোলা করে যাচ্ছেন পাশে দেখা হল এক পণ্ডিতের সঙ্গে, তক্ষুণি দোলা থেকে নামল ধনী, পণ্ডিতকে বহুমানে নমস্কার করল। তখনকার দিনে বরাসন পণ্ডিতকে, বিত্তশালীকে নয়। পণ্ডিতই অভিজাত। পণ্ডিতই সর্বজয়ী, অভিজিৎ।

কাশী মিশ্রকে খবর দিলেন সনাতন। সনাতন, বললে, ‘বহু পুণ্যে নিমাইয়ের মতন জামাই মেলে। আপনি শচী দেবীকে গিয়ে বলুন আমরা মেয়ে দিতে রাজি আছি। এখন তিনি যদি নেন কৃপা করে তবে আমাদের নন্দীয়াবসতি সার্থক হয়।’

বিষ্ণুপ্রিয়ায় হৃদয়ে নবদীপচন্দ্রের উদয় হল। নবদীপরাগে পাগলিনী হল কিশোরী। চতুর্দিকে শ্রামলকে দেখবার জন্মে নবীন মেঘের নীল অঞ্জন চোখে লাগল শ্রীমতীর। কিন্তু দুই চোখে তাকে ধরে রাখতে পারছি কই? মাধুর্য্যবতের সমুদ্র দৃষ্টির কূল ছাপিয়ে উঠলে উঠলে পড়ছে।

অবিদক বিধাতাকে নিন্দা করছে শ্রীমতী। ‘অতৃপ্ত ইইয়া করে বিধির নিন্দন, অবিদক বিধি ভাল না জানে সৃজন।’ কোনো কিছুই ভালো করে বুদ্ধি খরচ করে সৃষ্টি করেনি ভগবান। যাকে দেখব সে অসুস্থহীন গোমর্ঘের সিদ্ধ জেনেও তাকে দেখবার জন্মে মাত্র দুটি নেত্র দিয়েছেন। কোথায় কোটি-কোটি চোখ দৈশেন, তা নয়, কপণের মত দুটি শুধু চোখ। কৃষ্ণমুখ দর্শন করতে বলে, হায়, দুটি শুধু চোখ দেওয়া। আর এমনই বিধাতা অকুশল, এমনই অনিপুণ, চোখকে আচ্ছাদন করবার জন্মে দিলেন আবার পশ্ম। চোখের পশ্ম যদি না থাকত, যদি পলক না পড়তে পেত, তবে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দেখতে পারতাম কৃষ্ণকে। বিধাতা শিক্কেই ঙ্গবুদ্ধি, নিতান্তই রসবোধশূন্য। নইলে যে রূপ প্রতিকণে নতুন হচ্ছে তাকে দেখবার জন্মে কিনা এই বিশীর্ণ ব্যবস্থা! কিন্তু কে না জানে কৃষ্ণদর্শন ছাড়া দৃষ্টির তৃপ্তি নেই, নেই বা একবিন্দু সার্থকতা।

না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিল আঁখি দুটি
তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদন।

বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সে সৃজন।

শ্রীমতী বৃন্দাকে বললে, প্রিয়সখি, কোথেকে আসছ? বৃন্দা বললে, শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল থেকে। কী কূতঃ? তিনি কোথায়? শ্রীমতী ব্যাকুল হয়ে তাকাতো লাগল চারদিকে। বৃন্দা বললে, রাধাকৃষ্ণের কাছে নির্জন বনে আছেন। তিনি সেখানে কি করছেন? নাচ শিখছেন। বলো কী! তাঁর বৃত্তান্তিকার গুরু কে? বৃন্দা বললে, তুমি। তুমিই তাঁকে নাচাচ্ছ। সে কী কথা? আমি কোথায়? তুমিই তো, তোমার মূর্তিই তো অরণ্যের সমস্ত গুরুলতায় পরিস্ফুট। তোমার মূর্তিই তো উত্তম নটীর মতো শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পিছে-পিছে নাচিয়ে-নাচিয়ে ঘুরিয়ে মারছে।

শ্রীকৃষ্ণ বেদিকে তাকায় সেদিকেই রাধাকৃষ্ণ।
হাওয়ার গাছের শাখা হলছে, লতা হলছে, শাখা-লতার

ছায়া হলছে, আর শ্রীকৃষ্ণ ভাবছে—সদানন্দবিধারিনী রাধিকাই বৃষি নৃত্যপরা। নৃত্যগুরুর অতুল্যরূপে শিকারী নট যেমন নাচে তেমনি শ্রীকৃষ্ণও নাচছে তালে-তালে। বাজিকরের ইজিতে পুতুলের মত।

‘রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।

সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।’

আমি পূর্ণতত্ত্ব, পূর্ণানন্দ। সমস্তরসাত্ম্য। আমি চিন্ময়, স্বপ্রকাশ। আমাতে কোনো অভাব নেই, অভাব পূরণের জন্মে চাকল্যের অবকাশও নেই, অথচ দেখ, রাধাপ্রেমের কী অচিন্ত্য শক্তি, আমাকে বিহ্বল করছে, উন্মত্ত করছে, কত অদ্ভুতরূপে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি সর্বনিয়ন্তা হয়েও প্রেমে নিয়ন্ত্রিত। আমি সর্বেশ্বর হয়েও আতীরবালিকার পদপ্রান্তে পড়ে বলি, দেহি পদপল্লবমুদারম্। তার চরণযুগল অলঙ্কারে রঞ্জিত করেছি। সকল ভয়ের ভয়স্বরূপ হয়েও জটীলা-কুটিলার ভয়ে মরি। সত্যস্বরূপ হয়েও ছদ্মবেশ ধরি। গোপপল্লীতে দেয়াশিনী নাপিতানী সেক্ষে কৃপাকটাক ভিক্ষে করে বেড়াই।

আর কিছু নয়, একমাত্র প্রেমই আমার পরিচালক।
‘কৃষ্ণের নাচায় প্রেম, ভক্তের নাচায়।’

বারে বারে গঙ্গাস্নান করতে আসে বিষ্ণুপ্রিয়া, যদি একবার স্থূল চোখে দেখতে পায় তার বরকে, তার গৌরানন্দরূপকে। শচীকে দেখতে পেলেই দুটে আসে কাছটিতে। প্রণাম করে। প্রণাম সারবার পরেও সরে যায় না। অধোমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ স্নেহাঞ্চলচ্ছায়া ছেড়ে যাব কোথায়? যেন বলে, আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো, নিয়ে চলো আমার আরাধনার মন্দিরে। আমার চিরজীবনের নিবেদনে।

গণক ঠাকুর চলেছে সনাতনের বাড়ি। পথে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

‘এ কি, এত হনহন করে চলেছেন কোথায়?’

‘বলো তো কোথায়?’ গণক ঠাকুর মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

‘তা আমি কী করে জানব!’

‘তা তো ঠিকই। যাচ্ছি সনাতন মিশ্রের বাড়ি।’

‘সেখানে কেন?’

‘তার মেয়ের বিয়ে হবে। বিয়ের দিনকণ লগ্ন ঠিক করতে যাচ্ছি।’

‘ভালো কথা।’

নিমাইয়ের কথার সুরটা যেন কেমন লাগল। চলে

হাচ্ছিল, ডাকল তাকে গণক ঠাকুর। বললে, ‘মৈয়ের
বিষে ক’র সঙ্গে হচ্ছে জানো না?’

‘কী করে জানব?’ নিমাই অবাক মানল।

‘সে কি! তোমার বিষে আর তুমিই কিছু
জানো না?’

‘আমার বিষে?’ হাসতে লাগল নিমাই। আমার
বিষে অথচ, কি আশ্চর্য, আমি কিছুই জানিনি!’
চলে গেল হাসতে হাসতে

গণকের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সনাতনের বাড়িতে
পৌঁছে নিকুঞ্জের মত বসে রইল চুপচাপ।

সনাতন বললে, ‘পাঁজি-পুঁথি দেখুন। লগ্ন
স্থির করুন।’

লগ্নমুখে গণক বললে, ‘এই খানিক আগে পথে
নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে আমার দেখা হল—’

‘সত্যি?’ উৎসাহিত হন সনাতন। ‘কথা হল?’
‘হল।’

‘কী বললে নিমাই?’

‘যা বলল তাতে মনে হল এ বিষেতে তার মত
নেই। বিষের কোনো খবরই সে রাখেনা। আকাশ
থেকে পড়ল বিষের কথা শুনে। তার মানেই এ
মেঘেতে মন উঠছে না। গণক আরো ব্যাখ্যা জুড়ল :
‘বিষেতে যে মত নেই এ ভাবে পরোক্ষ ব্যক্ত করাটাই
বোধহয় সম্ভব।’

মাথায় হাত দিয়ে মুখ নামিয়ে বসল সনাতন।
নিমাই এখন বড় হয়েছে, তার নিজের স্বাধীন মত
থাকাটাই তো স্বাভাবিক। শচী দেবীর প্রতিজ্ঞার
দাম কী! ছেলের মত প্রবল হবে। আর, ছেলের
যখন মত নেই তখন এ বিষে আর হলনা।

অন্তঃপুরে খবর পাঠাল সনাতন। গৃহিণী কাদতে
বসল। আর বিষ্ণুপ্রিয়া? মলিন মৌনে নিমগ্ন হয়ে
গেল। কী হবে আর গঙ্গান্নানে, কী হবে ঠাকুরঘরে
দিন কাটিয়ে? কী হবে বা দেখা দিয়ে শচী দেবীকে?
তার দিকে চাইবার আর চোখ কোথায়! হায়, বামন
হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়েছিলাম, বালি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে
চেয়েছিলাম সমুদ্র বাঁধতে!

এর প্রতিকার কী? সনাতন পথ খুঁজে গেলনা।
আত্মীয়বন্ধুরা বললে, এর কোনো প্রতিকার নেই।
শচী দেবীকে মোকাবিলা করেও লাভ হবেনা। নিমাই
ডেওয়ান পুরুষ, তার মতের বাতস্ত্য আছে, আর সে
বাতস্ত্যের স্বীকার কখনো করেনা।

সনাতনের সমস্ত সংসার শোকশয্যা নিল।

কে একজন অতিথি এল সনাতনের ঘরে। বললে,
‘আমি নিমাইয়ের কাছ থেকে আসছি। আমাকে
নিমাই পাঠিয়েছে।’

‘কেন? কী খবর?’ উঠে বসল সনাতন।

‘সে বলে পাঠিয়েছে বিষের উত্তোপ করুন।’

‘সত্যি?’ সনাতন দাঁড়িয়ে পড়ল। তবে যে
শুনছিলাম—’

‘ভুল শুনছিলাম। শচী দেবী যে নিমাইয়ের সবক
স্থির করেছেন তা তখনো নিমাইকে জানাননি শচী দেবী।
তাই গণক ঠাকুরকে অমনি করে বলেছিল নিমাই।’

‘এখন বুঝি জানতে পেরেছে?’ ঢেঁক গিলল
সনাতন : ‘কিন্তু তার তো একটা স্বতন্ত্র মত আছে?’

‘না, নেই।’ আগন্তুক বললে, ‘তার মায়ের মতই
তার মত। নিমাই তার মায়ের আজ্ঞাবহ। তার মা
যা স্থির করেছেন তাই সে আনন্দে নেবে মাথা পেতে।
সুতরাং আবার ডাকুন গণক ঠাকুরকে। দিনকণ
ঠিক করুন।’

সনাতনের গৃহিণী উলু দিয়ে উঠল।

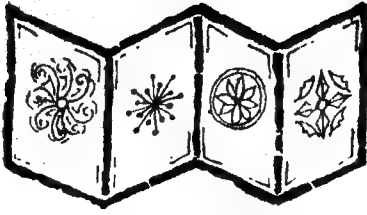
আর বিষ্ণুপ্রিয়া? সে শুধু বাঁশি শুনেছে, আর
কিছুই তার কানের মধ্যে ঢুকছে না। ‘আন কথা
নাহি শোনে কান।’ সে বাঁশির শব্দ একবার বার কানে
ঢুকছে আর কোনো শব্দই পথ পায় না সেখানে।
অবিচ্ছিন্ন সেই বাঁশির স্বরেই কান ভরে থাকে। যদি
বাঁশি স্তব্ধ হয় ধ্বনি স্তব্ধ হয় না। যদি অগ্নি শব্দ হয়,
তবুও সেই শব্দে সেই বশীধ্বনিই বেজে চলে। শব্দে-
অশব্দে শু এক নাম, জীগোরাঙ্গ।

শুনেছেও গৌর বলছেও গৌর। গৌর ছাড়া মুখে
কথা নেই। মনে ভাবনা নেই। চোখে স্বপ্ন নেই।
বুকে নিশ্বাস নেই।

আমি গৌরপতিচিন্ত। গৌরপাদপদ্মই আমার প্রাণধন।
নিমাইয়ের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিষে ঠিক হয়েছে
এ খবর রাষ্ট্র হতেই সমস্ত নবদ্বীপ মেতে উঠল। কায়স্থ
জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ বললে, ‘এ বিষেতে যত খরচ
লাগে, আমি দেব।’

মুকুন্দসঙ্কয়, বার বাড়িতে নিমাইয়ের চৌক, বললে,
‘না, সব আপনি দেবেন কেন? ব্যয়ভারের কিছু অংশ
আমি নেব।’

নিমাইয়ের পড়ুয়ারা বললে, ‘সায়রাও হাত
বুড়িয়ে থাকব না।’ [অসম্পূর্ণ]



পত্র

ফিটজেরাল্ডের প্রথম উপন্যাস

[বিখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক এক, বড় ফিটজেরাল্ড প্রথম জীবনে মার্কিন সেনাবাহিনীতে বোগ গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর (১৯১৭ সালে) প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রকাশক ফ্রিবারকের দ্বারা। সেই উপন্যাস সম্পর্কে সানি লেসলির কয়েকটি পত্র-বিনিময় হয়েছিল। এখানে তার দুখানা চিঠি প্রকাশ করা হল।]

১৭নং ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার, ক্যাম্পমোরিডান

(২)

প্রিয় মি: লেসলি,

৪৫নং ইনক ক্যাম্প পর্ডন পা
৮ই মে, ১৯১৮

এই সঙ্গে বোড়শ অধ্যায় 'দি ভেলি' এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠালাম। গল্পটা না জেনেও আপনি যাতে বিষয়টা বুঝতে পারেন, সেই জুড়ই আমি এই অধ্যায় দুটো মনোনিবেশ করেছি। আশা করি আপনি এটা পড়ে আপনার মতামত জানাবেন। দ্রুততার এবং ঠাইলের সামান্যতার এটা আধা নভেল গোছের।

এখন আমি এক সপ্তাহের ছুটিতে আছি। বইটা নতুন করে লেখবার জন্য প্রিন্সটনে বাছি; ওয়াশিংটন দিয়া বাবার সময় ৭ই অথবা ৮ই অথবা ৯ই ফেব্রুয়ারী আমি এই নভেল সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে দেখা করব। ঐ তিন দিনের মধ্যে কবে আপনাকে ফিলেডেলফিয়ার একলা পাওয়া যাবে জানাবেন কি? আমার পক্ষে ওর যে কোন দিনই সুবিধাজনক হবে। আপনাকে দেখাবার জন্য আমি উপন্যাসের সেটা ছ'য়েক অধ্যায় নিয়ে যাব। ফ্রিবার এই বই ছাপবে কিনা সেটা আপনার কাছে জানতে চাই।

সব জিনিষ যখন থেকে শুরু হয়, এই নভেলেরও শুরু সেখান থেকে এবং সব কিছু যেখানে শেষ হয়, এই নভেলেরও শেষ সেই জুড়ে। ত্রয়োদশ অধ্যায় ভালো ভাবে পড়লে খাপছাড়া লাগবে। ২৬শে সোমবার আমি বাত্মা করছি। তাৎপর্য আমার ঠিকানা হবে—কটেক্স ক্লাব, প্রিন্সটন।

কোন দিন বিকেল বেলায় আমার সঙ্গে দেখা করা আপনার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক হবে, সেটা জানতে পারলে আমি বিশেষ বাধিত হব।

বিশ্ব

এক, বড় ফিটজেরাল্ড

একটা অদ্ভুত মিল আপনার নজরে পড়েছে কি? বার্বার্ড শ'র ধরন ৩১ বছর, এইচ জি ওয়েলস-এর ৫১, ফ্রি-কটেক্সটনের ৩১, আপনার ৩১ আর আমার ২১। বিশ্বের সমস্ত বড় বড় লেখকই ধর্মিক অধ্যয়নের পথে রয়েছেন।

প্রিয় মি: লেসলি,

আপনার পত্র আমার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য বিষয়ক আবেগ সৃষ্টি করেছে—আমার প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে আপনিই প্রথম মতামত প্রকাশ করেছেন।

এটা যে অসংস্কৃত এবং কোথাও কোথাও অস্বাভাবিক রকমের ভুল দেখা দেয়, তাই হলেও সত্য। কেন যে আমি প্রথম ভাগে শৈশবের একঘেয়েমি নিয়ে আবল তাল বকেছি, তা বুঝতে পারি না। দুই এপেন্ডিসাইটসের মত ওটা কোট উড়িয়ে মিলেই ভাল হয়।—প্রিন্সটনের কাছে বড় বেশি চমকিত আমদানী করা হয়েছে এবং বড় বেশি স্থানীয় সামাজিক রীতিনীতির বর্ণনা করা হয়েছে।

বাই হোক, আপনার আগ্রহের জন্য এবং ফ্রিবারকের কাছে অমন চমৎকার একখানা চিঠি লিখে দেবার জন্য আমি অত্যন্ত বাধিত হয়েছি। সে যদি মনে করে বইখানা সংশোধন করলে প্রকাশের উপযোগী হবে, তাহলে আমি তাই করব। আর যদি সে অপছন্দ করে, তাহলে আমাকে কোনকম রক্ষণশীল প্রকাশকের দ্বারা হতে হবে।

আপনি কি মার্টিন লুথারের ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত আছেন? তরুণ চরিত্র নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখুন। "ডেঞ্জিং উইথও"র বাসি বাদ তুলিয়ে দিন। অথবা আধ-ছদ্মবেশী একখানা আত্ম-জীবনী লিখুন।

আমি বইয়ের জন্য পাগল হয়ে উঠছি কিন্তু একখানাও পাচ্ছি না। বিশেষ ধরনের উপন্যাসের সুখা মেটাবার জন্য আমি আমার উপন্যাস লিখেছি (ফ্রিডেনসন যেমন লিখেছিলেন ফ্রিবার আইল্যান্ড)। পাঁচ বছর আগেকার নভেল (টোনো বান্দি, ইউথস্ এনকাউন্টার, ম্যান এলাইভ, দি নিউ ম্যাক্সিক্যান্টেলি) সব গেল কোথায়? বুঝ কি সমস্ত সাহিত্যকে গুলুগুলাখী ও জর্জ রুবার বেড়াগুলো আটক করেছে.....

জলবান ককন, সেট বার্ট (বেনসন) যের ফ্রিবারকের চোখে ধাক্কা পড়ুন।

বিশ্ব

এক, বড় ফিটজেরাল্ড

মধুসূদনের ইংরেজী পত্রাবলী হইতে

[মাত্রাজ হইতে হাইকেল মধুসূদন ৪৬ তাহার বন্ধ গৌরদাস বসাককে ইংরেজী ভাষায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্র হইতে কিছু অংশ নিয়ে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হইল]

“আমার জীবন এখন বিভাগের দ্বারা অপেক্ষাও অধিক কাৰ্য্যে ব্যস্ত। আমার কর্মসূচী এইরূপ—সকাল ৬ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত হীন্ড; ৮ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিভাগের কাৰ্য্য; বেলা ১২ ঘটিকা হইতে ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত তেলের এবং সন্ধ্যা ২ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ল্যাটিন; এবং ৭ ঘটিকার পর হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ইংরেজী। উহার পরও কি তুমি বলিবে যে, আমি আমার মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রয়াস করিতেছি না?”

[১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ক্রান্তের ভাগসি-এ থাকাকালীন হাইকেল মধুসূদন দ্বারা সাগর বিভাগের কাৰ্য্যকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে অনুবাদ করা হইল]

“যে আমার পরম বন্ধু, আপনি মনে করিবেন না যে আমি আলস্যে দিন অতিবাহিত করিতেছি। রাসী ও ইতালীয় ভাষাকে আমি আরম্ভের মধ্যে আনিয়াছি—একপ্রকার ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি, এই ভাষাগুলি কোন শিক্ষকের সাহায্য না লইয়াই শিক্ষা করিয়াছি এবং এখনও কলিতেছি—উহার পর স্পেনের কিম্বা পর্তুগালের সাহিত্য প্রবেশে আর বাধা থাকিবে না।

“—লোকের বাক্য বলে দেশটার আমি তার শত্রু।—আমি জগৎকে একটা নূতন কিছু শিক্ষাদান করিতে চাই। ইহাতে তুমি বিরূপ হইও না। দেখ, আমি অমিত্রজ্ঞকেই এক ‘সনেট’ লিখিয়াছি। ইহা কি অসাধারণ পরীক্ষা নহে? উহার দৃষ্ট লনিগ্রহে; কারণ, পাখির পক্ষাধর্মকেই আমি বুঝা করি।”

[—মধুসূদনের ১৭১৮ বৎসর বয়সের রচনা]

“তোমরা ‘রামনারায়ণে অনুবাদ’ বলিয়া বাহা বুদ্ধি থাক, তাহা আমাকে নিরাশ করিয়াছে। আমি তাহার সাহায্য লইব না বলিয়া স্থির করিয়াছি। আমাকে চলিতে হইলে নিজের পায়ে উপর ভর করিয়াই চলিতে হইবে। যদি পড়িতে হয়, তবে নিজেকেই পড়িতে হইবে। আমার লেখার পাণ্ডুলিপি আমল পরিবর্তনের অধিকার রামনারায়ণকে দিই নাই—কখনই তাহা দিই নাই। আমি রামনারায়ণকে দিয়া কেবল আমার লেখার কোন ব্যাকরণ তুল থাকিলে ঐ সমস্ত সংশোধন করিতেই চাহিয়াছিলাম। তুমি জান, মাদ্রাসের রচনানীতির মধ্যে তাহার মন-প্রাণের প্রতিবিম্বটাই পড়ে। তোমাকে বলিতে কি, আমাদের বন্ধুর সঙ্গে এই অধর্মের কোন দিক থেকেই কোন কিছুই মিল নাই। তবে আমি উহার কয়েকটি সংশোধন গ্রহণ করিব।”

[১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ]

“মনে রাখিও, আমি এই নাটক এমন সকল লোকের জন্যই লিখিয়াছি, বাহারা আমার ভাবেরই ভাবুক; বাহারা নুনাবিক পাণ্ডিত্য শিক্ষার দিকিত এবং পাণ্ডিত্য নিয়েই চিন্তা করে। প্রাচীন সংস্কৃতি-আদর্শের দৃষ্টিতে অনুসরণ হইতে আমাদের চিন্তা শক্তির চাপে যে নূতন পদ্ধতি, উহাকে বর্ণনায় যত্ন করাই আমার উদ্দেশ্য।”

“তোমাকে বলিয়া রাখি, ইহাতে বেশী আলোচনা কাব্য নাই—এই নাটকে আমি তোমার প্রাচীন পণ্ডিততাকে একেবারে ভুলিত করিয়া দি।”

[গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ]

“আমি রক্তের আশ্রয় পাইয়াছি। আমি পুনরায় আর একটি নাটক রচনার সাগর গিয়াছি।

“আমি আমি বন্ধু যে আমার এই নাটকে কিছু না কিছু বিদেশী ছাড়া থাকিবে। কিন্তু ভাষা যদি বিস্তৃত হয়, ভাব যদি অক্ষর এবং প্রাণের হয়, উহার ঘটনা যদি চিত্তাকর্ষক হয়। চমকিত হয় যদি অচাক্ষর্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার মধ্য বিদেশী আবহাওয়া থাকিলেই বা কি আসে যায়? যুগের কবিতায় প্রাচ্যভাবের আধিক্য বলিয়া, বয়সের কবিতার এশিয়ার বাতাস আছে বলিয়া, কিম্বা কালসিহনের লেখার অধীণ ভলী আছে বলিয়া কি কেহ অশ্রদ্ধা করে?”

[—গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্রাংশ]

“তুমি জান, এখনও জাতীয় খিচোরী বলিয়া কোন সম্ভা আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নাই। অর্থাৎ এখনও আমরা যথেষ্ট সংখ্যক নাটক, নৃত্যের শিল্প আদর্শের এবং উন্নত আদর্শের নাটকই রচনা করিতে পারি নাই—বাহাতে দেশের নৃত্যটি গঠন এবং পরিচালনা করিতে পারব। আমাদের এখনও গ্রহণ রচনা করার সময় আসে নাই।”

—রাজনারায়ণ বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ]

“ভিলোভা মীত্রে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু প্রায় হইতেছে, তাহা কখনও পঠ করবে? দুঃখের বিষয়, তুমি এখন কলকাতায় নাই। তুমি কলকাতায় থাকিলে এ বিষয়ে কয়েকটি কল্পনা না দেখাইয়া ছাড়িতাম না।—আমার আশঙ্কা হইতেছে, তুমি উহার লেখার ধরণ কঠিন বলিয়াই মনে করিবে। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি কখনও জবরদস্ত হইবার জন্য চেষ্টাই করি না। যেমন বর্তমানকালের অবিকার্য অ-বসিকেরা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া থাকেন সাহিত্যের এই নবচেতনার যুগে। শব্দগুলি অবাচিত ভাবে, যেন স্রোতের মতই ভাসিয়া আসে—উহাকে ‘অন্তর্যামস’ নাম দিতে পারি। প্রকৃত অমিত্রজ্ঞকে তিনি ইংরেজী গৌরবেই মহাব্যক্তি আকর্ষণ করা চাই এবং অমিত্রজ্ঞকে ভেদ করি যিনি উহার সঙ্গীতকে ‘কঠিন’ কবি বলিয়াও অভিহিত করা যায়—আমি মিলটনের কথাই বলিতেছি। ডাঙ্গিল বা হোমার—সরল কবি বলিতে বাহা বৃত্তিতে পারা যায়, ইহাদের কেহই তাহা নহেন। বাটাই হউক, তুমি বন্ধুর প্রথম কবিতার বহু সৌন্দর্য্য মার্জনা করিবে। আমি খেলার স্থলে কবিতাটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, উহাতে এমন কিছু করিয়া বলিয়াছি, বাহাতে আমাদের কাব্য সাহিত্যকে উন্নতির লিকে একটা প্রবল প্রেরণাই দিতে সমর্থ হইবে। অন্ততঃ উহা ভবিষ্যতের বাংলার কবিগণকে কখনও পথের সেই সজ্জিত (কলকাতায়)। কষ্ট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটা নূতন শিক্ষা।

তিনি এসেছে একটা জঘন্য রকমের কাব্য প্রণালীরই জন্মদাতা, যদিও তাঁহার প্রীতি ছিল স্নেহ।”

[—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাংশ]

“আমি আরও তিন চারটি ‘রাসিক’ আদর্শের নাটক রচনা করিয়াছি। ইচ্ছা করি, বাহাতে আমার দেশবাসী বুঝিতে পারে উন্নত রসিকসাহিত্য কাহাকে বলা যায়। ইহার পরেই ঐতিহাসিক এবং অন্য বিষয়ে হাত দিব। তুমি ‘জাতীয় কাব্য’ রচনার পক্ষে যে বিশ্বাসটুকু দিলে আমার দুই আশ্বাস করিলে, বলিতে পারি, উহা স্নেহের অতি স্নেহ। কিন্তু আমার এখনও সন্দেহ আছে, উহাকে গ্রহণ করিবার উপযোগী শিল্পশক্তি আমার জমিরূপে কি না। তোমাকে আরও কয়েকটি বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে আমি আমার প্রিয় ইন্দ্রজিতের মৃত্যুগান রচনা করিতে বাইতেছি। ভয় নাই বন্ধু, আমি পাঠকবর্গকে ‘বীররসে’ আকৃষ্ট করিতে বাইব না। আমি এইরূপে আরও কয়েকটি কাব্য রচনা করিতে দাঁও। আমার হাত পাক হউক।”

[—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাংশ]

—“ইন্দ্রজিৎ মহাশয়, কিন্তু তুমি ‘বীরবংশের’ জন্ত তিনি বানরসৈন্যকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। কবিশক্ত যদি তাঁহার দৃষ্টান্তকে কেবল কতকগুলি মনুষ্য-অনুচর দিতেন, তাহা হইলে মেঘনাদের মৃত্যুতে ইলিয়ডের মত মহাকাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইতাম।”

[রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মনুষ্যবনের পত্রাংশ]

“আমি আশা করি যেমনদিনব্য কাব্যে বস্তুব সম্বন্ধ হিন্দুর জননী আদর্শের চরিত্র আঁকিত করিয়াছি। আমি তোমার নিকট কিছু গোপন করিতে চাহি না, বাহাতে তুমি কখনই চলিতে পারিবে না—যদি আমি বলি যেমনদিন একটা মহিমাময় কাব্য হইতে চলিয়াছে। ইহার প্রসঙ্গেরও সঙ্গীতের তত্ত্বকে অপরূপ ভাবেই আয়ত্ত করিতেছে। আমার এই ভাল যেমন ভাঙ্গিলের ক্ষণের মতই মনুষ্যত্বের বিহারা চলিয়াছে। তেমন সরল এবং কোমল ভাবকেও অবলম্বন করিতেছে। তুমি এই কাব্যের মধ্যে ‘তিতোত্তমাসম্বন্ধ’র সেই স্বর্ণাঙ্ক সমুদ্রটি আর দেখিতে পাইবে না।”

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

“তোমার নিকট গোপন করিব না, এই কাব্যের স্থলবিশেষ আমার হৃদয়কে আত্মপ্রাণভাঙেই পূর্ণ করিয়াছে। হে আমার বন্ধু, আমার হাততালি আমার হস্তে এমন অক্ষুণ্ণ ভাঙার দিবনে বলিয়া জেত কখনও ধারণা করিবার পারি নাই। আমার মধ্যে চিন্তা এবং কল্পনার উদ্বেগ মাত্রই যেন ভাঙা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়—এমন সমস্ত কাণ্ড, বাহা কখনও জানিতাম না বলিয়াই মনে করি নাই। ইহা একটা গভীর রহস্য—তোমাকে বলিলাম।”

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

“বে কবির সৌন্দর্য্যভান আছে, যে কবি কোমল-মধুর এবং কল্পন বসে মনুষ্যের হৃদয়কে সমুদ্রত ভাবলোকে উত্তীর্ণ করিতে পারে, সে কবির তবুই কালক্রমে আপনার বৈজ্ঞানিক উচ্চাঙ্গ চলিয়া যায়। পট্টক সমাজ একত্র হইয়াই সে কবিকে প্রীতি—স্বাধা

অর্পণ করে। সত্যতঃ কালিদাস, লাটিনের ভার্জিল এবং ইটালীর টাসোস দিকে চাহিয়া দেখ—আমার বিশ্বাস, ইংরাজী-সাহিত্যে ইহাদের সমকক্ষ একজন কবিও নাই। ইংলণ্ডের মিলটন মহত্তর জীব। তাঁহার নিজের শ্রমভানের মতই মিলটন উচ্চতম ভাবে ভ্রমপুর। কিন্তু ‘মধুর’ বলিতে বালা বুঝার, মিলটনে তাহার বেশ মাত্র নাই। মিলটন—মধুরের চিত্তকে উচ্চতম ভাবে লিখবে তুলিয়া ধরিতে পারেন; কিন্তু মনুষ্য হৃদয়কে তিনি স্পর্শ করিতে পারেন না বলিলেই হয়। উহার কল কি হইয়াছে। মিলটনের নাম পরম উজ্জ্বল হইয়া আছে—কিন্তু তাহার পাঠকসংখ্যা কত পরিমিত। মিলটন তাঁহার শ্রমভানের মতই অন্ততলীয়। আমাদের স্বাকার করিতেই হয় যে, মিলটন সম্পূর্ণ উন্নত ক্ষেত্রের জীব—কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত যোগাযোগ নাই। তাঁহার স্বর্গীয় কঠোরিত আমরা ভয়ে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত দেখে তুলিতে থাকি, যেন গভীর বনের নিষ্কল তুহা হইতে গিরের গর্জন কানে আসিতেছে।”

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

“আমার কাব্য পাঠ করিতে প্রথমতঃ দেখিবে উহার চিন্তাধারা; দ্বিতীয়তঃ, যে ভাবের ভাব এবং চিন্তাধারা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ প্রত্যেক বাক্যপ্রাকারের গতি এবং উদ্বেগ। সমগ্রের ক্ষণিকালের জন্ত চিন্তাই করিও না—কাল উহার বিচার করিবে। যদি আমি উক্ত সকল দিকেই সাফল্যলাভ করিয়া থাকি, অর্থাৎ যদি গ্রন্থটিতে প্রকৃত কবিত্ব থাকে, ভাবমধুর এবং বিস্তৃত ভাবের প্রকাশিত হইয়া থাকে, যদি উহার ভাবের মধ্যে প্রকৃত সঙ্গীত থাকে, তবে বহুসংখ্যক উহার জন্য চিন্তিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। আল না হয়, না হয় গ্রন্থ বৎসর পরে আমার কাব্য স্বীকৃতি পাইবেই।”

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

“আমি জগৎসিংহকে ইতিহাসে যেমন পাইয়াছি, তেমনই করিয়াছি—দুঃস্বপ্নেতা এবং বিলাসী ব্যক্তি। ভীমসিংহ বিংশ প্রকৃতি এবং গভীর চরিত্রের লোক; রাণা ভীমসিংহের মহাবীরা তাঁহার মতই বিংশ চরিত্র এবং গভীর না হইয়া পারেন না।”

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

“ইহা যখন বিবাসান্ত নাটক, আমি কেবল হস্তব্রসের উদ্বেগের উদ্বেগে কোন দৃষ্টের অবতারণা করি নাই। উহাতে নাটকটির দ্বারীভাব বিনষ্ট করিত। কিন্তু চলিবার পথে যখন কোন হস্তব্রস কথা সহজে আসিয়া গিয়াছে, তাহাকেও উপেক্ষা করি নাই। এ বিষয়ে আমার উপদেশ এই হইতে পারে যে বিদ্যোগান্ত নাটকে ইচ্ছা করিয়াই হাসি তুলিবার চেষ্টা করিও না, তবে যদি কোন হাসির কথা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তা’ হইলে গৌণ দৃষ্টান্তিতে উহাকে উপেক্ষাও করিবে না, উহাতে বরং একটা আনন্দজনক বৈচিত্র্যই আসিবে। সেক্সপীরের তাহাই ছিল প্রণালী। তাঁহার স্রষ্টা বিদ্যোগান্ত নাটকগুলিতে সেক্সপীরের কখনও ইচ্ছা করিয়া হস্তব্রসিক হইতে বান নাই।”

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

“প্রিয় জি, আমি এখানে তোমাকে বলিতে চাহি, আশা করি তুমি আমাকে অনুমোদন করিবে। আমার এগিরটিও আতি,

ইউরোপীয়দের চাইতে আমরা ভাবপ্রবণ। তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেক্সপীয়রের মহিমময় নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি প্রদান কর। 'Mid-Summer Night's Dream' এবং 'রোমিও জুলিয়েট' ও অপর দুই একটা ব্যতীত এমন নাটক নাই বাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে 'রোমান্টিক' বলা যায়। রোমান্টিক কি না, যে ভাবে 'লুডলু' রোমান্টিক। উক্তশ্রেণীর ইউরোপীয় নাটকে তুমি মন্থ্যজীবনের কঠোর সত্যসমূহের চিত্তাধারা দেখিতে পাইবে, সমুদ্র তাড়কতা এবং ভাবধর্মী বীরাচারই পূর্ণ পরিমাণে পাইবে। আমাদের মধ্যে কেবল মন্থরতা, কেবল কোমলতা, কেবল 'রোমান্স' আমরা জগতের সত্যমুষ্টি বিস্তৃত হইয়া কেবল পশুরাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেই লাগিয়া আছি। এদেশে প্রকৃত নাটক এখন সামান্তমাত্রও উন্নতি কিম্বা পরিপূর্ণলাভ করিতে পারে নাই। আমাদের কাব্য নাটকীয়। এমন কি আমাদের প্রাচীন ভাবার বিশেষ সমর্থক মিঃ উইলসনও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।"

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

"শান্তি নাটকে আমি অনেক সময়ে নাট্যকারের ক্ষেত্রে অতিক্রম করিয়া কবির ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, কবিদের অনুরোধে আমি সত্যকে বিস্তৃত হইয়াছি। বর্তমান নাটকে আমি নিজের দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমি কবিদের জন্ত চারিদিক খোঁজ করিয়া চলিব না—অবশ্য আপনা আপনি আসিয়া পড়িলে আমি উহাকে ছাড়িয়াও বাইব না। তবে, এভাবে চলিতে গিয়া কবিদের সঙ্গে অনেকবার দেখা পাইব, আশা করি। আমি এমন সকল চরিত্র সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিব, বাহ্যিক বাস্তবিক ভাবেই কথা কয়, কেবল কবি কণ চাতেই চার না। সেক্সপীয়রের উহাই ত আদর্শ ছিল।"

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

"হে বহু বিশ্বাস কর, আমাদের বাংলা ভাষা সভ্যই অতি সুন্দর। প্রতিভাবন লোক কর্তৃক সংস্কার সাধন মাত্র ইহার প্রয়োজন। আমাদের শৈশবের শিক্ষার খুঁত থাকার জন্য ইহার সম্বন্ধে খুব সামান্যই

জানিতাম। এক উহা অবজ্ঞা করিতে শিখা করিয়াছিলাম। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভুল। বাংলা ভাষার বৃহৎ ভাবার উপাদানগুলি সমস্তই রচিত। আমি আশা করি, উহার উন্নতি বিধানে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু তুমি অবগত আছ যে সাহিত্যিকের জীবন বাপন করার জন্য যে অর্থ ও সামর্থ্য প্রয়োজন আমার তাহা নাই। আমি দরিদ্র এবং সর্বদা দারিদ্র্যতা বরণেই পূর্ণ অন্তর্ভব করিয়া থাকি। এ দেশে টাকা ব্যতীত কোন সম্মান নাই। তোমার যদি টাকা থাকে তাহা হইলেই তুমি বড় মানুষ, যদি টাকা না থাকে তবে কেহই গ্রাহ্য করিবে না। এ জাতি এখনও অর্থ অথবা অতিক্রম করে নাই। এ দেশে বড়লোক কে? চোরবাগান এবং বড়বাগানের আশ্রয়স্থান ব্যক্তি সমূহ। টাকা চাই তাই, টাকা। যদি মনে কর, আমি সাহিত্যে কিছু করিয়া বাইতে পারিতাম আমার শক্তি ছিল। কিন্তু আমি অবস্থাগতিকে শক্তিকে চূড়ান্ত ভাবে কাজ লাগাইতে পারিলাম না। আমি বাছা করিয়া পেলাম, হে আমার স্বদেশ, উহাতেই সমস্ত হও।"

[ভাস্করাসিন হইতে গৌরদাস বসাককে লিখিত]

"আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়া রাখ, অমিত্রজ্ঞান বসন্তাচার মহীরান হইবে। কালে, আধুনিক ইউরোপীয়দের ভায়। আমরা প্রাচীন 'ক্লাসিক' কবিগণকে অতিক্রম করিতে পারি বা না পারি, অন্ততঃ তাহাদের সমকক্ষ হইব। আমাদের সাহিত্যে ইদানীং এমন সকল লোকের প্রয়োজন, বাহাদের প্রাণে উদ্বোধন আছে, বাহারা উৎসাহের সহিত 'তপঃখণ্ড' বরণ করিতে পারে। নিজেকে মধ্যে যদি প্রতিভা না থাকে, আমরা অন্ততঃ ভবিষ্যৎ কণ্ঠধরের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়াই বাই। কখনও কি ম্যাকভির্জির নাম শুনিয়াছ? ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার রচিত 'গারবোডাক' নাটকই প্রথমতঃ ইংরাজী অমিত্রজ্ঞানের প্রবর্তন করে—পরবর্তীকালে সেক্সপীয়র যে ছন্দকে মহীরান করিয়াছেন। বাস্তি জালো—জালো তাই, নিজে জালিয়া যাও। ইহাই আমার আদর্শ।"

নদীটি এখন শান্ত

তুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীটি এখন শান্ত : পাশে হ্রাস্ত এলাহিত বালিয়াড়ি চর,
সারা দেহে জাঁকাঝাঁকা, কী অধীর পরিণত বয়সের বেধা,
সহস্র-সহস্র স্বপ্নে অনর্থক কল্পনার প্রকৃত-বহর—
কারার কল্পনাপথে কেটে গেছে প্রবীরী'প্রিয় রূপ বেধা।

আজো সে সবুজ খোঁজে, ঘান করে লজ্জার আয়ত-রজন,
এখনো সে উষ্ম, রূপের গরবে অন্ধ, উচ্ছল-কেনিল-মদ্রি,
নিঃশব্দে মর্যর তোলে লোভনীর প্রেমাক্ষর মারাবী-অঙ্গন
পরস্পর টেট হবে, এই স্বপ্নে জালীবন ব্যাপক—গভীর।

অথচ বিচ্ছেদ-নদী তাবেনি অন্ধরে বৃষ্টি এত হ্রাস্ত এত হ্রাস্ত সে,
কোমল পিত্তভ দেহে বীচার আনন্দ কত না পেয়ে জীবনসীমায়,
সারা পায়ে শীতপ্রোত নিমীলিত প্রদোবের স্মৃতিকে কীপায়;
পায়ে না পাগল হতে অভিজাতী জীবনের ঘটনা-বিশেষ।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

ত্রৈলোক্যের পর আরও কয়েকটি দিবস অতিবাহিত হয়ে গেল। আমাদের বেতনভুক্ত গোয়েন্দারা কলিকাতা ও হাওড়ার লক্ষ্যস্থানে গিয়ে থাকা ও কেই বাবুর জন্ত খোঁজাখুঁজি করলো, কিন্তু তাদের সোশন আত্মনা সত্বেও তারা কোনও সাফল্যই সংগ্রহ করে উঠতে পারলো না। হঠাৎ এই সময় আমার বাঁদার বড় হরিপদর দায়িত্ব মনে পড়লো। সাকী দেবেনের বৃদ্ধ এই হরিপদ সরকারের লাল আমরা ইতিপূর্বে জেনেছিলাম। ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, সকাল সাড়েটার সময় আমরা হরিপদ বাবুকে লোক মারকু ডাকিয়ে খানায় এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। হরিপদ বাঁদার ও কেরোর প্রকৃতির জন্ত আমাদের সাহায্য করতে দুইটি বিশেষ সর্গে রাজী হয়েছিল। তার প্রথম সর্গ ছিল এই যে, যদি প্রয়োজন হয় তো শোকা বাবুর প্রেতারের পূর্বদিন পর্যন্ত তাকে খানায় আশ্রয় দিতে হবে। তার দ্বিতীয় সর্গ ছিল এই যে, সদাসর্বদা তার সঙ্গে একজন লম্বা সিঁপাহীকে তার মেহরকী করে নিযুক্ত করতে হবে। আমরা তার এই উভয় সর্গেই রাজী হওয়ার পে এই মামলার তদন্তে সাক্ষ্যের জন্ত নিজের জীবন বিপন্ন করতে সন্মত হয়েছিল। এই সময় আমি সাকীর কোয়ার্টারে একাই বসবাস করতাম। আমার অল্পবয়সে জন্মিত বাবু এই দিনই তার বিদ্যনাগজসহ আমার কোয়ার্টারে এসে আজর গ্রহণ করেন। তিনি সকালসন্ধ্যার আমাদের সঙ্গে আলাপ করতেন এবং সারারাত্তর আমাদের সঙ্গে আলোচনার সন্ধানে জল্পনা, কলিকাতা ও চাকর পরামর্শের নানাভাবে ঘুরে বেড়াতেন।

আরও দিন সপেক্ষ এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন লম্বা ছরটার সময় আমরা ইন্সপেক্টার সুনীল রায়ের সঙ্গে এই মামলা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। সুনীল বাবু আমাদের পুনের রায়ের এক ঘটিকার সময়টির গুরুত্ব সবচেয়ে আমাদের বোঝাচ্ছিলেন। তাঁর মতে এই পুনের পারিবেশিক প্রমাণের জন্ত এই রাত্রি এক ঘটিকা সময়টির মূল্য অসাধারণ। এই রাত্রে এক ঘটিকার খোকা মলিনাকে নিতে আসে এবং এই রাত্রি এক ঘটিকাতো গোপীও ডলির বাড়ী ফিরে আসে। ইন্সপেক্টার এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রমাণের কথা আমাদের বুঝিয়ে বলছিলেন, এমন সময় কুমুংটুলী অফিস হতে জন মশ বারো লোক হস্তান্তর হয়ে খানায় এসে জানালো যে, খোকাতে তারা ওখানেতে সেই মেধরসলির পুনের কারাগারের দিক হতে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। খানার বাইরে বড়বাড়ার উপর লম্বা সিঁপাহী সহ লরীটি তৈরী করে রাখা ছিল। আমরা তৎক্ষণাৎ সেই লরীটিতে উঠে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুমুংটুলীতে এসে উপস্থিত হলাম। সেইখানে তখন পথচারীরা ভীত হয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছিল। ইতিমধ্যে সেখানকার বাসিন্দারা আতঙ্কে তাদের বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। জলস্থানে আমরা

জানলাম যে, খোকা তার পুনের কারাগারটিতে জে এসেছিলই, তা ছাড়া স তাদের কুপানাথ সেনের বাসা-বাড়ীতে এসে সেখানকার সাকী ও সাকিনীদেরও ধমকা-ধমকি করেছে। আমরা কিছু সারা রাত্রি ধরে কুমুংটুলী অফিসের প্রতিটি অলি-গলি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাঁদার কোন সন্ধানই পাইনি। পরদিন সকাল বেলা আমরা খবর পেলাম যে খোকাতে হাওড়ার একটা বস্তীর একটি ঘরে জটনৈক গোয়েন্দা দেখে এসেছে। কলা বাহলা যে আমরা তৎক্ষণাৎ সশস্ত্রবাহিনী দ্বারা ঐ বাড়ীটি ঘেরায়া করে ঐ ঘরের দরজা ভেঙে সেইখানে ঢুকে পড়। এই দিন হরিপদ অসহ্য থাকায় সে আমাদের সঙ্গে আসতে পারিনি। তবে খোকাতে জেন এমন একজন গোয়েন্দা আমাদের সঙ্গে সেখানে এসেছিল। ঘরে ঢুকেই আমরা জটনৈক ব্যক্তিকে সেখানে একটি খাটির উপর শুয়ে থাকতে দেখতে পাই। তাকে দেখামাত্র আমাদের সেই গোয়েন্দা দুই পা' পিছিয়ে এসে চীৎকার করে বলে উঠ, ভুল্লর। খোকাবাবু ঐ—আমরা তৎক্ষণাৎ সকলে মিলে গুলীন্দ্রা পিত্তল উচিয়ে তার উপরে বাগিয়ে পড়লাম। আমরা আশঙ্কা করেছিলাম যে, তখনই একটা খণ্ডবুদ্ব পুঁজ হয়ে যাবে এবং আমাদের দলের অন্ততঃ দুই একজন সেই বৃদ্ধ প্রাণ হারাবে। খোকাবাবুকে বিনা বৃদ্ধে একজন শাঙ্ক-শিষ্ট ব্যক্তির ভায় বরা দিতে দেখে আমাদের সন্দেহ হলো হয়তো জটনৈকই সে খোকাবাবু নয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে একজন অফিসার, দুইজন সিঁপাহীও আমাদের সেই লোকটী 'নিঃসন্দেহ' রূপেই তাকে খোকাবাবু বলেই সনাক্ত করলো। খোকাবাবুকে কটো-চিহ্ন সনাক্ত করে একটি পুলিশ সেক্টরে আমরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। এই সেক্টরে প্রকাশিত খোকাবাবুর সমুখের ও পার্শ্বদেশের কটো-চিহ্নের সহিত আমাদের এই হত্যাকৃত আসামীর সমুখের ও পার্শ্বের চোহারার হবহ মিলেও আমরা দেখতে পেলাম। এই সেক্টরে খোকার বাম হাতে উজীর দ্বারা একটি নারকল গাছে জড়ান একটি সাপ এবং তার ডান হাতে একটি পোলাপ ফুল ও তার নিয়ে 'প্রাণের খোকা'—এই ব্যক্তিটি উজীর দ্বারা উৎকর্ষ আছে বলে লেখা আছে। এ'ছাড়া ঐ সেক্টরের পাতার খোকার বাম দিককার কপালের ক্ষর নিকট একটি কাটা সাপ ও তার নিজের ঠোঁটটি কাটা ও সেলাই করা আছে বলে লেখা আছে। শু্য তাই নয়, ঐ সেক্টরে তার গার্ভার ও উচ্চতার সাপ ও অস্ত্র বিবরণের সবচেয়ে বহু তথ্য সিঁপিবদ্ধ করা ছিল। আমরা পুলিশ সেক্টরে উল্লিখিত ঐ সকল বিবরণের সঙ্গে হত্যাকৃত আসামীর দেহের আকৃতি ও অস্ত্র চিহ্নের সহিত তুলনা করে দেখলাম যে, উভয়ের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বিষয়ে হবহ মিল আছে। কিন্তু এতো সবের আদি কিবাস করতে পারলাম না যে খোকাবাবুকে এতো সহজে প্রেতার করা

সদ্য হতে পারে। নিজেদের মধ্যে কিছুকণ আলাপ-আলোচনা করে আমরা অকুহলে নিজেরের মোতায়েন রেখে কয়েকজন সিপাহীসহ আমাদের ট্রাকটিকে খোকার বাল্যকালের বন্ধুর দেবেন ও হরিপদকে আনবার জন্য কোলকাতার পাঠিরে ফিলাম। দেবেনবাবু বাড়িতে উপস্থিত না থাকায় আমাদের লোকচেনেরা কেবলমাত্র কলিকাতা থেকে হরিপদ বাবুকে নিয়ে খট্টা সেড়েকের মধ্যে আমাদের কাছে তাঁকে পৌঁছিয়ে দিলে। অন্তর্কিতে হৃতীকৃত আগামীকে দেখানে দেখে হরিপদবাবুও কশিকের জন্য সত্যয়ে দুই পা পিছিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরে তার দিকে কিছুকণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর হরিপদবাবু—নিশ্চিন্তমনে আসামীর দিকে এগিয়ে এসে আমাদের ভানালো যে, হৃতীকৃত ব্যক্তি আসপেই সেই খোকা গুরুকে খেঁদাবাবু নয়। তবে সে খোকাবাবুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তার একজন দলের লোকও হটে। এই সম্পর্কে হরিপদ আমাদের কাছে ঐ দিন যে উল্লেখযোগ্য বিবৃতিটি দিয়েছিল তা নিয়ে উদ্ধত করা হলো।

“আমি, দেবেন, খোকা, কেট ও গোপী—এই কয়জনে এককালে একটি হানীর হাটছুলে কিছুকাল পড়েছিলাম। খোকাই সাধারণতঃ আমাদের ক্লাসের মধ্যে পড়াভুনা ও খেলা খুলাস মধ্যে কাটাবর বলে প্রখ্যাত ছিল। কিন্তু পরে বাধ্য হয়ে সে ঐ খুল ছেড়ে চলে আসে এবং ঐ খুলের ছাত্র কেট ও গোপীকে সঙ্গে ভিজির একটা ডাকাত দলের সঙ্গী করে। প্রথমে তারা দেশ উদ্ধারের জন্য একটি যুক্তিসেনা সৃষ্টি করার জন্য ঐ দলটির সূচনা করে। কিন্তু উদ্ধাতে পরে বহু পুরান পাণীকে ভর্তি করার ফলে ধীরে ধীরে উদ্ধা একটি সাধারণ ডাকাত দলে পরিণত হয়ে পড়ে। এরা ঐ খুলটী ছাড়া আরও বিশ্ব বিশিষ্ট খুন করেছে বলে আমার শুনা আছে। তবে পাগলা ও শিউচরণ হত্যার ক্ষেত্রে যে একমাত্র এরাই দায়ী তা আমি হলপ করে বলতে পারি। এরা আমাদের ও দেবেনকে সঙ্গে ভর্তি করার জন্য বহু বন্ধবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের ঐ সকল অপকার্যে যোগ দিতে আমরা রাজী হইনি, তবে বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-বন্ধনরা তাদের অপস্রুত ক্রবোর উদ্ধারের জন্য আমাদের কাছে কৈদে পড়লে এদের সাহায্যে আমরা কয়েকবার তাদের চুরি বাওরা ও হারানো জবাবদি উদ্ধার করে দিতে সমর্থ হয়েছিলাম। এক বৎসর পূর্বে কুহুটুলীর বিখ্যাত জমিদার অরুণ বাবুর বাড়ী থেকে একটি টোটা জমা রিকলবার সময়ে ৫০ হাজার টাকা মুদ্রের গহনা যে এরাই তাল ভেদে চুরি করেছিল তা আমার অন্যান্য ছিল না, তবে ঐ সময়ে আমি থানার কোনও সর্বাঙ্গ দিলে আমাকে তার পরদিনই আপনাদের ইনকরমার শিউচরণবিরার মত ইরসগার পরিত্যাগ করে চলে যেতে হতো। আমি এও জানি যে এদের সঙ্গে ৭০ বা ৮০ জন লোক সংযুক্ত আছে, এবং এরা একাধারে ডাকাতি, খুন ও বাজারী বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা ও ঐ ভিত্তি প্রদেশের বেলগরে সময়ে সমাধা করে থাকে। কাহারও এদের অপকার্যে সামান্য রূপও প্রতিবন্ধক হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র থাকলেও এরা নির্ভীকভাবে এদের ছলে বলে হত্যা করে এই মরুতপ থেকে তাদের সরিয়ে দিতে রত্নপরিচর হয়ে উঠে। আমার সঙ্গে খোকাবাবুর পুণিবীর এই সহস্রের গুপ্ততলা ও নিরুপ তলা—ঐ উদ্ধার পরিবেশেই বহুবার দেখা হয়েছে। কিন্তু ঐ কথা আমি আমার বালা বহু

এক দেবেন ছাড়া আর কাউকেই কোনও দিন প্রকাশ করতে সাজসী হই নি। কয়েক দাস সে সময়ের গুপ্ত তলার বাস করে পুরনার সে কয়েক দাসের জন্য উদ্ধার নীচের তলার কিংবদন্তি। বখন সে সময়ের গুপ্ত তলার গুপ্তমোজার ঘরে বেড়িয়ে ভখন আপনারা বুঝাই তাকে সময়ের নিরুপ হানে বুঁকে বেড়িয়েছে।”

এর পর আমি হরিপদ বাবুকে কয়েকটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য তার কাছ হতে জেনে নিই। নিম্নের প্রশ্নোত্তর হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

প্রঃ—আপনি সময়ের উপবতলা ও নীচের তলা বলতে কি বুঝাতে চান? খোকাবাবু একাই সময়ের ঐ উদ্ভূততলার অধিবাসী না তার সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গদেরও সময়ের ঐ উত্তর করে আনাগোনা আছে?

উঃ—খোকাবাবু মধ্যে মধ্যে তার দলের তার গোপী বা কেটবাবুর উপর ছেড়ে দিয়ে সকলের অজ্ঞাতে কিছুকালের জন্য কোথায় উঠাও হয়ে যায়। ঐ সময় পুলিশের ভায় তার দলের লোকেরাও তার কোন হালিশই পায়নি। ঐ সময় সে সহস্রের উদ্ভূত অংশে ক্যাটি ভাড়া করে সেখানকার ভাঙ্গে ভালো লোকেরের সঙ্গে কেলাক্ষা করেছে। এমন কি, সে ঐ সময় কিলাতী স্ট্রিট পরে সে গণ্যমাত্র লোকের দ্বার ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মেথার হয়ে বিবিধ পার্ট ও মিটিং বোগদান করেছে এবং ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি ক্রীড়া ও অজ্ঞাত সভ্যজন-স্রলভ আমোদ-প্রমোদেও সভ্য ও নিরপরাধ মানুষের ভায় বোগদান করেছে। এর কয়েক দাস পরে হঠাৎ সে একদিন পুরনার সূত্রী ও ছেঁড়া গেলী পরে সহস্রের পক্ষিল বস্তীর মধ্যে অবস্থিত তাদের ডোঁতে কিংবদন্তি তার সাধী চোর-ডাকাতদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আমার মনে হয়, আপনারা তাকে কোনও মামলার ব্যাপারে বেশী খোঁজখুঁজ করতে শুরু করলে সে আত্মসোপানের উদ্ভূত কিছুকালের জন্য ঐভাবে সময়ের গুপ্ততলার এসে গা ঢাকা দিতো। ঐ অবস্থায় তাকে কেউ দেখলে তাকে চিনেও চিনতে না পারবারই কথা।

প্রঃ—হঁ, ব্রলম। খুঁউব সম্ভবতঃ তার মধ্যে অবস্থিত বৈত ব্যক্তিগের জন্যই সে প্রয়োজন মত ঐভাবে ভোল বদলাতে সক্ষম ছিল। কিন্তু ঐ হৃতীকৃত আসামী স্তরীয়কে সে পেলো কোথায়? তুমি কি ইতিপূর্বে কখনও ঐ আসামীটিকে কোথায়ও দেখেছিলে?

উঃ—আজ্ঞে হার! গুকে মাত্র একদিন আমি খোকা বাবুর সঙ্গে ব্রাক কোয়ারে দেখে ছিলাম। ছুঁজনকে একত্রে দেখে সত্য সত্যই সেদিন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার জানি যে, কখনও কখনও দুইজন মানুষের মূখ ও দেহের মধ্যে একপ্রকার আলস দেখা যায়। কিন্তু এদের মত হবহ এক বকমের চোঁচোর মানুষ ইতিপূর্বে আমি দেখিনি। পরে আমি খোকার মূখ শুনেছিলাম যে, তার মত একই বকম চোঁচোর ঐ মানুষটির সম্ভাব পরে তাকে বহু চোঁচোর তার ঐ অপসলের মধ্যে ভর্তি করে দেয়। তাদের দলের জন্য একজন ড্রিপকেট খোকা ভৈরী করে তাকে কয়েকটি কলে লাপাকার জন্য সে এইরূপ কাঁচা করেছিল।—গুর্ন, জীবন

বাবু মেয়ে খোকার মেয়ের অঙ্কন ঐকণ কাটাছুটি ও উচ্চ চিত্রাঙ্গি ছিল না। পরে খোকা বাবুর নির্দেশে সুখীর বাবু ঐকণি নিজ মেয়ে ধারণ করেছিল। এমন কি সে ধরা পড়ে জেলে গেলে সে ধানার খোকার নাম লিখিয়েই জেলে গিয়েছে। আপনাদের এই পুলিশ স্টেশনে যে খোকার প্রতিভাটি দেখেছেন, আসলে ওটা এই সুখীর বাবুই প্রতিভাটি। এই ভক্ত সুখীর জেলে থাকলে আপনারা মেয়ে নিয়েছেন যে খোকাই জেলে আছে। এই ভক্ত এই সময়ের মধ্যে সমাধিত কোনও অপকার্যের ভক্ত স্বভাবতঃই আপনারা খোকা বাবুকে দায়ী করতে পারেন নি। তা'হাড়া জেলেশেপী ঐকণ তার কটাচিহ্নে মাছবের প্রকৃতি ও চরিত্র পূর্ণাপুরি প্রকৃতিত করা যায় না। এইভক্ত দুটি মাছবের কটা বহু কেন্দ্রে একটি মাছবের মত অবিশেষজ্ঞদের কাছে প্রোতঃ হতে থাকে।

আমরা সকলে হরিপদবাবুর এই বিবৃতি শুনে সত্য সত্য আশ্চর্যবিত্ত হয়ে গিয়েছিল। বৃত্তিকৃত আসামী সুখীরকে ধানার এনে ইলপেকটার সুখীল বাবুর কাছে তাকে পেশ করে আভ্যোপাঙ্গ ঘটনাটি তার নিকট বিবৃত করলে তিনি বিচক্ষণ চিন্তা করে কলসেন, হুঁ! তারলে একে এখুনিই হাকিমের কাছে পেশ করে নির্দোষ বলে তাকে বেকসুর খালাস করে দেবার ভক্ত সুপারিশ করা কলসের। সুখীলবাবুর এইরূপ অভিঃতে একটু বিরক্ত হয়ে আমি তাঁকে কলসেছিলাম, সে কি স্তার। এতো কষ্ট করে এই লোকটাকে আমরা ধরে আনলাম। খুনের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হলেও লোকটা একের এই প্যালেসে একজন মেঘার, তা হাড়া এ একটা ইন্টারেস্টিং ফিলারতো বটে। অভিক্ত ইলপেকটার সুখীল বাবুর খেকের উঠে আমায় এই উক্তিঃ উত্তর বললেন, কিন্তু একে এই মামলার ভিত্তিরে রাখলে তুমি মূল আসামী খোকাকে কিছুতেই বিচারে সাজা দেওয়াতে পারবে না। এই মামলার বিচারের সময় জুরীরের মনে সন্দেহ জাগবে যে, এটি নিরীহ সুখীর না এই চূর্ণাঙ্ক খোকাবাবুই এই নৃপাস হত্যাকাণ্ডের মূল হত্যাকারী। এই অবস্থায় মোড়ল্যামান চিন্তে ভায়া খোকাবাবুকে সন্দেহের অবকাশ বা বেনিফিট অফ ডাউট দিরে খালাস করে দিয়ে নিতে পারে। এইরূপ একটা বিচার প্রেসনের কোক্সি আমি নিতে আসশেই রাজী নহ। এ পাশ বাপু এখুনিই আমায়ের এই মামলাঃ হানো থেকে তুমি বিচারে করে দাও। এর পর আমরা সকলে ইলপেকটার সুখীল বাবুর এই বৃত্তিরে জীবিক রা করে থাকতে পারি নি। এই ভক্ত এই মামলার ভক্ত অকারণে কোনও জটিলতা সৃষ্টি না করে আমরা সুখীল বাবুর উপদেশ শিরোধার্য করে এই মামলার সহিত সম্পর্ক রহিত আসামী সুখীর বাবুকে জামীনেই বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে দিয়ে ছিলুম। এর পর স্বভাবতঃই আমরা খোকা বাবুর শিহনে আমাদের কর্মক্ষমতা নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। অপরাধিকে খোকা বাবুও একিকে আমাদের এই প্রোভাঃ প্রতিরোধ করতে বধ্যপরিবর। যে স্থানটিতে এই নির্ধর হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছিল সেই স্থানে প্রতিটি রায়ে সে বায়ে বায়ে কিরে এসেছে। বৈজ্ঞানিকরা বলে থাকেন যে, মাছবের শোণিতস্পর্শ অপরাধ স্পষ্টতার তার একটি আদিঃ স্পর্শ। একদিন আদিঃ মাছব ভাবনঃ পূর্বপূর্ব হিয়ে জীজনঃ তার বধ্যপানে অভ্যত ছিল। সত্যকার উদ্দেশ্যে সম কালক্রমে ধীরে ধীরে আমরা আমাদের সেই

আদিমতম অভ্যাস পরিভ্যাস করেছি। কিন্তু তা লক্ষ্যে তা আমাদের মনের অন্তর্দেশে বিভিন্ন মাত্রার নিহিত আছে। অভ্যাস বাহ্য একবার উহা অভিঃমাত্রার নির্গত হয়ে এসে উল্লোকে সহজে নিবৃত্ত করা যায় না। সময় বিশেষে এই বধ্যপানের দেশাঃ বধ্য নর্শনের নেশাতঃ বধ্যভ্যতঃ হতে দেখা গিয়েছে। এইভক্তই খুনের পর খোকা বাবুর মধ্যে উৎপত্ত এই উগ্র শোণিতস্পর্শই বোধ হয় তাকে বায়ে বায়ে হত্যাহতলটি দেখে আসতে বাধ্য করছিল।

খোকাবাবুকে বখনই কেউ রায়ে কুরবটুলি অঞ্চলে দেখতে পেরেছে, তখনই ভীত পশ্চাৎগাঃ ও নিরীহ লোকজনলারা চারিরিকে ছুটাছুটি করেছ। পুলিশও তার আগমন সম্পর্কে খবরাখবর পাবামাত্র অকুরলে ছুটে গিয়েছে কিন্তু সেই হত্যাহতল সহ আশে-পাশের বধ্যাঞ্চল ও অলিগলি ভক্ত তর করে খুঁজেও তার কোনও হারিসই তারা পেতে পারি নি। শেষের দিকে ঐ অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকগণ খোকা বাবুকে এক অপরাধী জীব মনে করে তার অবস্থান লব্ধে আমাদের নিকট কোনও সংবাদই আর পৌঁছে দিত না। এইসব কারণে আমরাও বহুদিন রাত্রিকালে ঐ এলাকায় আর রাউণ্ড দেবার ভক্ত বহিঃগত হই নি। শেষে এইরূপ সরগরম ভাবটি কথকিং কমে এলে এক রায়ে রাউণ্ডে বেরবার ভক্ত দহোঃগাঃগার সিপাহীকে একটা রিক্সা ডাকতে বলে আমি অকিসে বসে তৈরী হচ্ছিলাম। সিপাহী ভাইটি আমার ভক্ত রিক্সাটি আনার পর আমি সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের প্রতিবেকী বাহুশাল কোর্টের এক উকীল গোপাল বধ্যোপাধ্যায় একটা বাবুলারী মামলার আসামীর জামীনের ভক্ত আবদন করতে এলেন। এই মামলাটি জামীন-গ্রাহ না থাকার আদি কিছুতেই উহার আসামীকে জামীন দিতে চাইলাম না। তার সহিত এইরূপ বাক্ষিতঃগার মধ্যে আমার রাত্রিকালীন রাউণ্ডের সময় এক ঘটনাঃ উদ্ভাঃ হয়ে গেল। এর পর বিরক্ত হয়ে আমি আমার নিজের চেয়ারে এসে বসলাম এবং উকীল বাবু গোপাল বধ্যোপাধ্যায়ও রাগে গজসজ করতে থান হতে বার হয়ে আমায়ই ভক্ত আনা রিক্সাটিতে চেপে বসলেন। এর লক্ষ মিনিট পরে আমাদের ঐ প্রতিবেকী উকীল বাবু হস্তদস্ত হয়ে থানার এসে একটা অকুর এক ভীতপ্রদ বিবৃতি প্রদান করলেন। তার এই অত্যন্ত বিবৃতিটি নিয়ে উক্ত করে মিলাম।

আপনি আজ বধ্য বেঁচে গেছেন পক্ষান বাবু। আপনাকে আমি সাবধান করে দেবার ভক্ত থানার ছুটে এসেছে। আজ রায়ে রাউণ্ডে বেরলে আপনার বৃত্ত্য স্থানিচিত। এই রিক্সাটার চড়ে হাঃ মাত্র রিক্সাপুলার হাঃ নাড়তে নাড়তে ভ্রতগতিতে জামবাঃগারের াঃগাঃ ধরে চলতে শুরু করলো। এখনি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমি তাকে আমাদের বাড়ীর দিককার রাস্তার দিকে বৈকতে ক্লাঃ মাত্র সে অবাক হয়ে এই সর্বপ্রথম আমার দিকে চেয়ে দেখলো। এর পর সে আমাকে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেবার পর রিক্সা থেকে নেমে তাকে আমি ভাঃগার পরগাঃ ঘিটাতে বাচ্ছিলাম, কিন্তু সে পরগাঃ না দিয়ে হাঃগাঃ হয়ে বুক চিঃগারে বাড়ীঃগারে বলে উঠলো, আমাকে চিনতে পারছেন গোপাল বাবু। আমার দিকে চেয়ে দেখুন, আমিই হচ্ছি কো। পক্ষান বাবুকে কলসেন যে



অচলায়তন

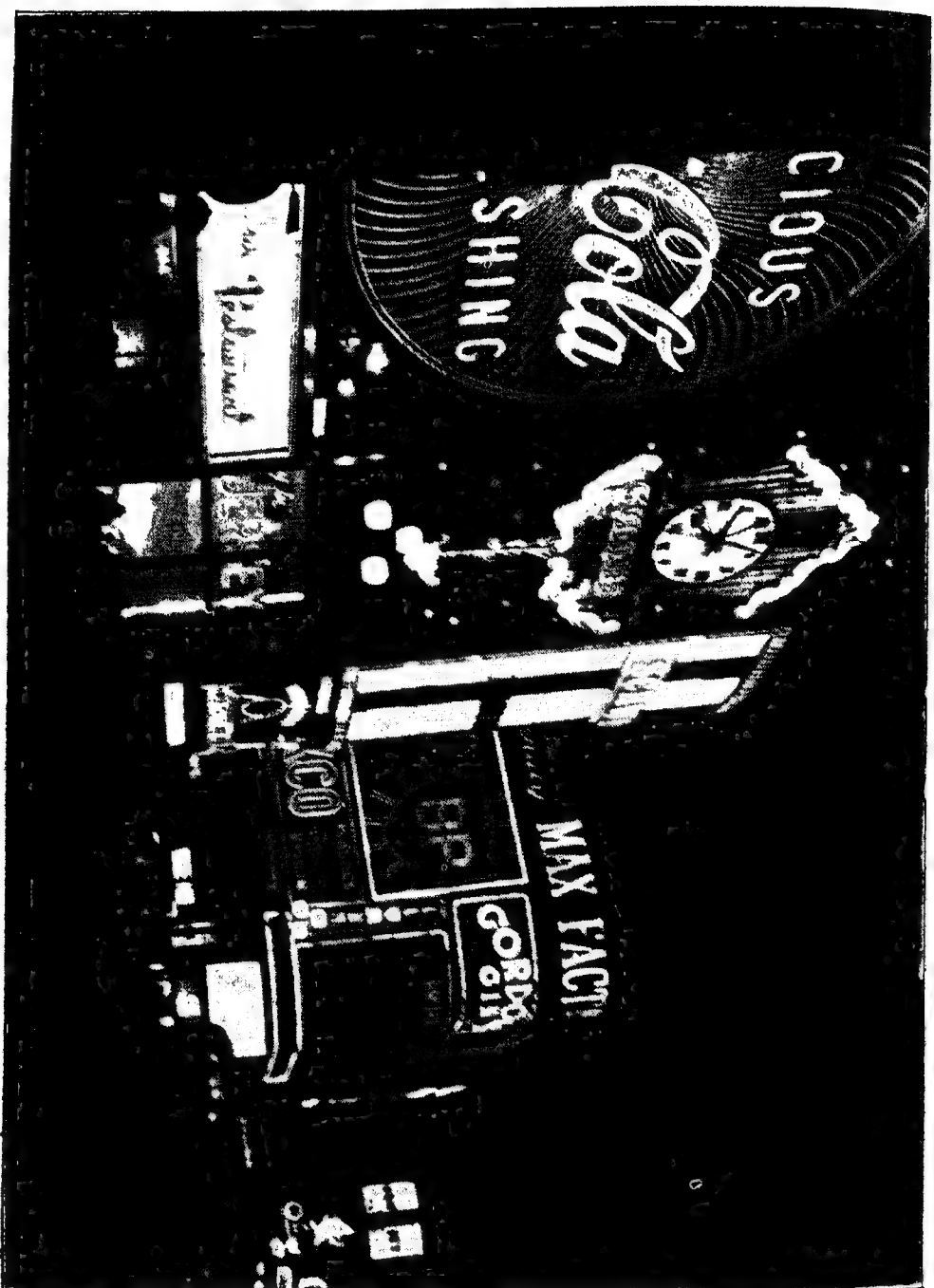
—বীর্ষ ভট্টাচার্য

॥ আলোকচিত্র ॥

অতিথি এসেছে দ্বারে

—মঙ্গল চট্টোপাধ্যায়



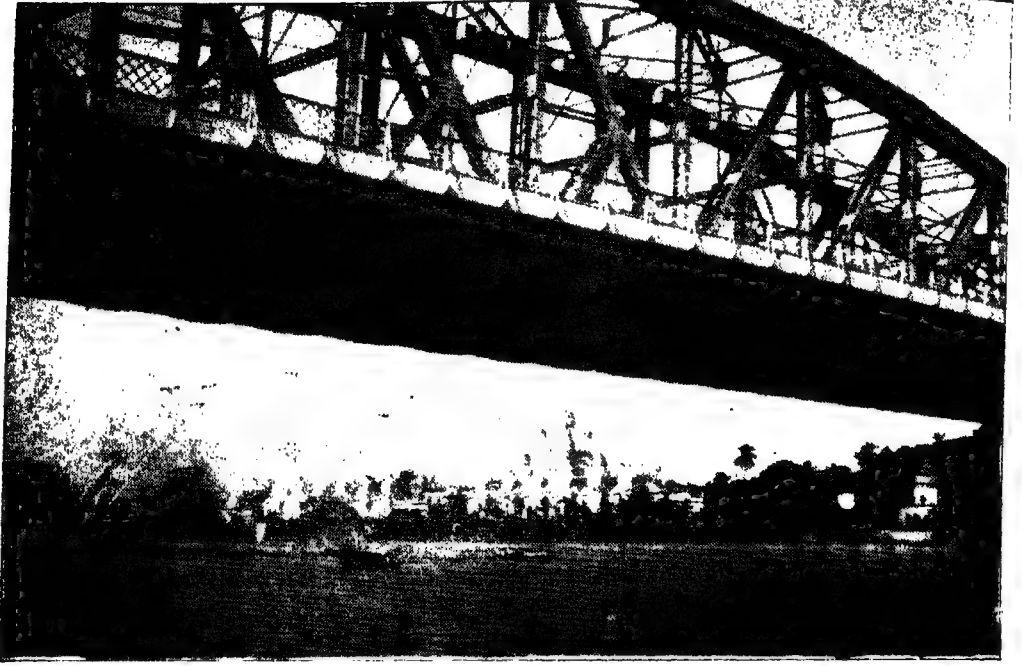


পিকাবেল সার্কাস (কলন)



ভাষ্কর্য





শ্রী বীকানন্দ ব্রিজ

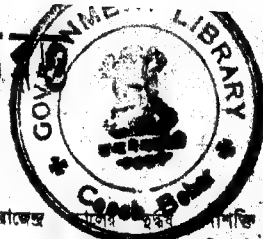
—নীলু পাল



অপভ্রংশ

—বিশ্ব রূপ সিং

শ্রীকৃষ্ণবিহারী সাহা



এই সভাব্যবস্থার, বহুতালানাবৃত বীণারাজ্যের প্রকৃত পরিচিতি
কী,—সভা ভগ্নের সহিত তার ঐতিহ্যের যোগাযোগ বা বহিষ্ঠতা
কত দিনের, তা এক্ষণে ঐতিহাসিকের ভাববার বিষয় বটে।
আমোদনা করলে সন্ধান মিলে যে, একাদশ শতাব্দীর
শেষে গান হয় পরাক্রমশালী রাজবিরাজ রাজধানী সরাই

সিদ্ধিযন্ত্রী রাজেন্দ্র সিংহের দুইজন পুত্র, যিনি কর্তৃক
বঙ্গোপসাগরস্থ আন্দামানিয়ার অন্তর্গত নীপরাজ্য সহ আশোচ্য
দীপপুঞ্জ অনায়াসে বিজিত হয় একদিন। তদবধি কয়েক
দশাব্দী কাল তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে ভারতীয় অধিকার।
ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় কৃষ্টি ও ভারতীয় ভাষাভাষা প্রভাবে নীপবাসী
হ'য়ে যায় ভারতীয় ভাষাভাষ সর্ব প্রকারেই। কিন্তু পরবর্তী বুল
তার যোর খনস্ফটিক—আবার যে ভিত্তিরে সেই ভিত্তিরেই। নৌশক্তি
বিহীন প্রায় মুসলমান আমলে ভারতীয় অধিকার তদকালে সুরক্ষণ
করা সম্ভব হয় না আর। ইত্যবসরে ভারতীয় বোগবৃদ্ধহারা অসহায়
নীপমালা হারিয়ে ফেলে তার আত্মপ্রতিচ্ছবি, হারিয়ে ফেলে তার সমুদ্রজল
আশ্রয়মালা, হারিয়ে ফেলে তার শিক্ষা-দীক্ষা, হারিয়ে ফেলে তার ধর্ম-
জ্ঞান। যখন ঘনিষে আসে তখনই দুর্জনিম তার, তখন আসে আর
এক গুরুতর পরিবর্তনের উত্তাল তরঙ্গ পশ্চিম জগত থেকে। ঐ
তরঙ্গানীত পাশ্চাত্য বনিকগণ আসতে আরম্ভ করে দলের পূর্য নল।
প্রাচ্যাভিমুখে বিশেষ করে ধন-ধান্ত ভরা ভারতভূমির অন্বেষণে,
বাণিজ্য ব্যপদেশে। সেই যুগে পটুগিজ, সিনেমার, ওলন্দাজ প্রভৃতি
হুসাধনিক নাবিকগণ ভারতভূমির দক্ষিণ জলপথের দ্বারমুখে
উপনীত হয়ে স্তব্ধ-বিময়ে আকৃষ্ট হন এই নীপমালায় প্রতি, প্রথমতঃ
এর অসূর্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে, তিত্যতঃ এর অশ্রমিত প্রাকৃতিক
সম্পদ দ্বারা প্রভুত ধনোপার্জনের উচ্ছল সম্ভাবনা লক্ষ্য করে। তাই
প্রলুব্ধ বনিকগণ কাঁচবিলাস না ক'রেই অবতরণ করেন এই দীপ-
ভূমিতে। অনায়াসেই সমগ্র নীপরাজ্যের অধিকার লাভও সম্ভব হ'য়ে
ওঠে তাঁদের। নানা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বনিকদের নানা অভিসন্ধির,
নানা প্রয়োজন্যের বিবিধ উদ্ভোগ আরোহণও চলতে থাকে অবিরাম
ব্রহ্ম গতিতে। নৌবাণি স্থাপনের চিন্তাও উপজায় হয়ে তাঁদের মনে।
অন্যদেশে তদকালে উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্নও দেখেন স্বযোগ পেরে।
কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয় না কোন দিকেই, নানা প্রতিজ্ঞা অসম্ভব
উদ্ভব হয় তাঁদের সমস্ত আশ্রয় প্রচেষ্টার পথে। অগত্যা ব্যর্থ-
মনোরথ হ'য়ে তল্লভজ্ঞা গুটাতে হয় তাঁদের একদিন। তারপর
আসে আর এক যুগান্তর। যেদিন ভাগ্যানান ইংরেজ বনিকের মানদণ্ড
রাস্তারান্তি ভারতের রাজসভেও রূপান্তরিত হ'ল সহসা কোন বাহু বলে
তখন স্বল্পকাল মধ্যেই দীপাঙ্গলটিও বাধ্য হল ব্রটিশ ভারতের সঙ্গে
প্রাচীর সম্পর্কে আবদ্ধ হ'তে অর্থাৎ ইংরেজের অধীনতা পাশে আবদ্ধ
হ'তে। আশ্চর্য্যের, দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধীন থাকার
মালে কোন উল্লেখই হয়নি নীপবাসীদের। নীপরাজ্যের পূর্ণ অধিকার
দাপ্তর হয় বাণীন ভাঙে। আজ আর নিকোবর নহে অবশেষেই অথবা
নীপবাসীরা আজ ঐ নীপবাসীরা বারী ভারতের আশীশরাজ্যে
বিপণিত। আশ্চর্য্যেভর ভারত আজ সম্যক উপলব্ধি করতে সমর্থ
হচ্ছে নগণ্য নিকোবরের রাজনৈতিক গুরুত্ব। ক্ষুদ্র হ'লেও ইহা যে
অশেষলা ভারতরাজ্যের দক্ষিণ জলপথের ওকলপূর্ণ অস্তিত্ব
বেশাধা ড় ভারতবাসীর আর অজ্ঞাত নয়। আজ ঐ অজ্ঞাত

দীপবাসীর আশার বিবর যে, বিরাট ভারত রাষ্ট্রের প্রাপ্তিসম্বল উন্নয়ন পরিকল্পনার সীতিকা এক সূত্রে প্রথিত ভাষায় ভাগ্য। বৃহত্তে পেরেছে তারা যে বৃহৎ ভরতই তাদের মাতৃভূমি।

এই দীপবাসীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বীণ হ'ল নিকোবর, নানকোবর ও কঁচর নিকোবর। ঐতিহাসিক বীণই গিরিপর্বতসমূহ। কোন কোন পর্বত আবার বেশ উচ্চও বটে। কতিপয় মাত্র বীণ সমতল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবর যে, প্রায় সকল বীণই—সবুজপত্র-পত্রব পোড়িত নানা জাতীয় তরু-লতা-গুচ্ছাদি সমাচ্ছন্ন। কোন কোন জাতীয় বৃক্ষ অতিশয় বিশালকার। বীণমালার পর্বত—সাহুদেশ হ'তে আরম্ভ করে সমস্ত উপত্যকাংশ জুড়ে নারিকেল ও সুগারি বৃক্ষের অসীম অগণিত শ্রেণী। তমকলে তরুলতার এমন নিবিড় ও ঘন সন্নিবেশ পর্যায়ের এমন জড়াজড়ি এমন মেঘামেঘি ঘন মেঘ ও গ্রীষ্মের দৃঢ়ালিকমাবস্থ সবাই। সমগ্র বনভূমি বৃক্ষলতা রচিত ঘন জালে আবৃত। তার অভ্যন্তরভাগ ও তলদেশ নিবিড় তমসাম্বল—চিরাকারময়। দিনের পর দিন—অন্ধকারগুণ বনভূমিতল—বৃক্ষপতিত পত্র-পত্রব কল-পুষ্প গলিত হয়ে এমন হৃৎকমর ও অস্বাভাবিক হ'য়ে পড়েছে যে, কুত্রাপি মনুষ্য-বাসযোগ্য বোধে না। বীণবাসীরা তাই বনভূমি সন্নিহিত অঞ্চলে বাস করে না; বাস করে তারা সমুদ্রতীরে—উষ্ণ তটভূমিতে। বনভূমির গভীরতম প্রদেশে এমন গগনস্পর্শী বিশালকার বৃক্ষ জন্মায় যে, তাদের গোলাকৃতি শৃঙ্গের পরিধি বিশতি হস্তেরও অধিক পর্য্যাপ্ত হ'য়ে থাকে। এই জাতীয় বৃক্ষের সারাংশ এমন দৃঢ় ও কঠিন যে, তা নৌশিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই কাঠের ব্যবহারও খুব লাভজনক বটে।

বহাদেশীয় ভূভাগের দ্বার এখানে হস্তাদি বৃহৎকার জন্তু জায়গারের অভাব থাকলেও সাধারণতঃ ব্যাঘ্র, চিত্রক, বীণি, শূঙ্গাল, কুঁকুর, শূকর, গা, মহিষাদি এবং শিকারোগ্যোগী নানা পশুপক্ষী বহুই পরিমাণে দৃষ্ট হয় এখানে। পূর্বকালে বীণাকলে গো-মহিষের বাস ছিল না। পাশ্চাত্য বণিকগণই ঘরীয় প্রয়োজন বশতঃ তাদের মাতৃভূমি থেকে কতিপয় সংখ্যক উত্তর জাতীয় গো-মহিষ এই বীণাকলে আনয়ন করেন। বহন তাঁরা বীণভূমি ত্যাগ করে যথেষ্ট প্রত্যাবর্তন করেন তখন ঐ গবাদি জন্তুকে বৃক্ষ ক্ষয়ে দিয়ে বান বনাঞ্চলের দিকে। পরবর্তীকালে স্বাভাবিক নিয়মের ফলে তাদের সংখ্যা বর্ধিত হতে থাকে এবং কালক্রমে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি কর হয় না। নানা জাতীয় গর্পের বাসও আছে সব বীণেই, তবে তেমন বিরাট সর্প নেই বলাইই হয় এখানে, এর চতুর্পাশ'ই সমুদ্রকলে বাস করে অসংখ্য বিশালকার কুম্ভীর হাঙ্গরাদি জলজন্তু। বিভিন্নবর্ণের নানাপ্রকার স্তম্ভের স্তম্ভের শব্দ শব্দকল্পিতও দৃষ্ট হয় প্রচুর পরিমাণে বীণের কুলে কুলেই। এই সকল সামুদ্রিক প্রাণী বহুদূরাদেশে ও বহু সময়ে মনোহর সঙ্গীত হ'তে পারে।

অধিকাংশ বীণেই ভূমি উর্বর ও নানা জাতীয় তরুলতা বৃক্ষাদি পুষ্পোদ্ভিত। ইহা 'সুজলা সুকলা মলয়জলিতলা'—বনভূমির দ্বার 'জৈব-কিন্ধলা মাতৃমহীর' প্রতীক বলেই মনে হয়। কিন্তু পরিচালকের বিবর যে, অতিশয় উর্বর হলেও কৃষি-শিল্প কিছুমাত্র উৎকর্ষতা লাভ করেনি এখানে। কৃষিজ দ্রব্যের অসংখ্য বর দ্রব্যবস্তু বনজ দ্রব্যের উপরই নির্ভরশীল এই বীণবাসীরা। এই বীণপুঙ্খক 'কলা

রাজ্য' বলা হয়। ইহা যে নারিকেল সুগারি অসংখ্য তা সর্বজন-বিদিত। কমলী, আনারস, পেঁপে, লেবু, প্রভৃতি বিবিধ ফল ও সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হয় এখানে বহুই পরিমাণে। তেঁতুল ও এক জাতীয় শিষ্টক ফলের বৃক্ষও (mellary) অসংখ্য। শিষ্টক ফল বীণবাসীদের প্রধান ও প্রিয় খাদ্য। ইহা যেমন সুস্বাদু তেমনই পুষ্টিকর। কৃষির দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চূড়ি আলু ও নানাপ্রকার কলাই প্রধান। ম্যাঙ্গান্টিন (mangasteen) প্রভৃতি আরও বিবিধ সুস্বাদু ফলের বৃক্ষও ছড়িয়ে আছে বীণময়। প্রয়োজনীয় অগ্রয়োজনীয়,—কুড় বৃহৎ—নানা জাতীয় বৃক্ষ—এমন কি ভেষজ জাতীয় তরুলতা গুচ্ছাদিও অভাব নেই কিছুমাত্র এ বীণভূমিতে। স্থানি স্থানি অসংখ্য প্রদেশে এমন গভীর ও নিবিড় যে, তৎপ্রদেশে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারেনা কখনো কালেও।

বীণ সমূহের গ্রামবিকাশ অতি চমৎকার। সাগরোপকূলে ক্ষুদ্র বৃহৎ বাসভূমির ওপর (বালিয়াড়ির শীর্ষদেশে) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূর্ণকূটরগুলি ছবির ভায় সুদৃশ্য ও চিত্তাকর্ষক রূপে প্রতীয়মান হয়। কোন প্রায়েই অধিবাসীর সংখ্যা অধিক নয়—পঞ্চাশ বাট, কি বড় জোর এক শত হবে। আত্মল সমুদ্রের পর্বত প্রমাণ তরুলরাশি অহরহ কুটীরশোভিত টিলাভূমির তলদেশে পৌঁছে দেয় কি যেন এক অব্যক্ত মনের কথা, বৃষ্টি অস্পষ্ট ভাবায় চলে তাদের কত কানাকানি—হাসাহাসি—মনের গোপন কথা'র বিনিময়। বড় মধুর দৃশ্য। সমুদ্রের সঙ্গে অধিবাসীদের বান্ধি সম্পর্ক—অন্তরঙ্গতা—পরস্পরের অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধন। প্রকৃতি দাতার যেরূপ চমৎকার বীণবাসীরা। উষ্ণ জলবায়ুর তলে—বিশাল বিহীন সমুদ্রকোড়েই জন্ম তাদের। অনন্ত বাসুকাভীর্ণ সাগর-বেলাই তাদের শৈশবের ক্রীড়াভূমি,—যৌবনের উজ্জলতার রঙ্গাল তার শেষের দিনেরও শান্তিময় শয্যা, চিরদিনের সুখময় স্বপ্ন। অসীম সমুদ্রতটে, প্রকৃতি দাতার স্নেহাঙ্কলতলে বাস করে তারা গরম সুখে, মনের আনন্দে বিভোর হ'য়ে; নেই কোন হুহু কষ্ট, নেই কোন নিরাশ্রয় অভাবের নিশীড়ন। অটালিকা বা ঘন সম্পদের অধিকারী নয় তারা কোনদিনই কিন্তু নেই তাদের তা বলে, কোন অভিবোগ। মাতৃদেহের বা সবার ওপর শ্রেষ্ঠ সম্পদ—শ্রেষ্ঠ কাম্য—স্বাস্থ্য আর মনের সন্তোষ—তা উপভোগ করে তারা বোল আনাই—মনের সুখে। বিলাস ব্যসনের সর্বনাশক বস্ত্র পৌছনি কোনদিন তাদের দ্বারে। তাই অস্থ সবল দৃঢ় পরিপূর্ণ সুগঠিত দেহ তাদের। পুষ্কর্যের বর অলস ও প্রমথিবুধ কিন্তু নারীরা কঠোর প্রমথপরায়ণ। আশ্চর্য যে, যে কেশদাহ রমণীর শিরোশোভা সেই প্রিয় কেশের ছেদনে কিছুমাত্র দুঃখিত বা দুঃহ হয় না এদেশের নারী। চিরচিরিত নিয়মে নারী জাতির সর্বক মুক্তি অথবা মৃত্যুর কেশ ক্ষুদ্রাকারে কল্পিত থাকে। অত্যন্ত অভিধিপারায়ণ এই জাতি। এদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ যে এরা অতিশয় সৎ ও সত্যবাদী। সত্য কথনের খ্যাতি এ জাতির চিরদিনের; বোধ হয় আরিমবুগ থেকেই এরা সত্যচায়ে অভ্যস্ত। লম্বা বা নরহত্যা বা সভ্য সভ্যের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা—তার সঙ্গ অপরিচিত এই সভ্যের সরল—বর্ধক জাতি। কিন্তু সভ্যতাসম্মান পাশ্চাত্যের সম্পর্কে সঙ্গর্গ বোধ—এদের দৃষ্টিতে অসংগত পদার্থ। কিন্তু অপরাধ প্রবণতা। বহুই হারকেন এসে কলকাতা

পরিবর্তে দুর্দশার একশেষ করেছে তারা—একবারে নিঃস্বার্থেই বীণবাসীরা; এমন কি—বীণরাজ্য থেকে কতিপয় শতাব্দীর স্তম্ভাধিত ভারতীয় সভ্যতার চিহ্ন পর্যন্ত অবলুপ্ত করে দিয়েছে পাশ্চাত্য বনিকগণ। বীণবাসীরা স্বভাবতঃ পানাসক্ত হলেও স্থলীর উত্তেজনা বা মত্ততার হাস নয় তারা কবিন্ কালেও। এদের পানের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো অনাবিল আনন্দ এবং নির্দোষ আয়াদের মধ্য দিয়ে জীবনকে মধুর করে উপভোগ করা। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহচর্য ও পাশ্চাত্য অধুকারণের বিব-ক্রিয়ার অবজ্ঞাবী পরিণামস্বরূপ নানারূপ দুর্ভাগ্য সাধনের প্রবৃত্তি—এমন কি কদাচিৎ নরহত্যার ভ্রায় ভয়াবহ গর্হিত আচরণের কিছু কিছু সংক্রমণও প্রবেশ করেছে এই নিরীহ জাতির রক্তে। বেশভূষার দিক দিয়েও এরা হয়েছে কতকটা পাশ্চাত্যের অধুকারণপ্রিয়। নিত্যব্যবহার্য কতিপয় ইংরেজী শব্দ প্রবেশলাভ করেছে এদের মাতৃভাষায়। চল্লিশোর্ধ্ব সখ্যা গণনে অল্প নিকোবরবাসী এদের সংসর্গে ‘উলারের মূল্য জ্ঞান’ অজ্ঞান করেছে কিয়ৎকাল মধ্যে।

গভীর পরিতাপের বিষয় যে, এই সরল জাতিকে প্রচারিত করতে বা শোষণ করতে কিছুমাত্র কসুর করেনি কেউ। প্রতিবেশী দেশবাসীরাও করেছে এদের সর্বনাশ সুযোগ সুবিধা পেলেই। মালয়, চীন ও ব্রহ্মদেশীয় জলদস্যুগণ সাধু নাবিক বা সরল বণিকের ছদ্মবেশে হানা দিয়েছে বহন তখন বীণতুলিতে খাতাপাখোয়ী পক্ষী অধোবরণে অঙ্কিত—অশেষে করেছে বীণবাসীদের সর্বস্বাধিপত্য হলে, বলে বা কোঁশলে। অকথা অবমাননা—অশেষ অপদৃষ্টি, অমানুষিক অত্যাচার এবং নির্দয় উৎপীড়নও করেছে নিল্জের ভ্রায় নির্মমভাবেই। বন্ধু সোজা এসেছে শূন্য জাহাজ নিয়ে—প্রত্যাবর্তন করেছে জাহাজ পূর্ণ করে—দীপের উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার দ্বারা;—অবশ্য মূল্য হিসাবে বিশেষ কিছু না দিয়েই। এইভাবে হয়ে এসেছে অসহায় দরিদ্র বীণবাসীর সর্বনাশ দিনের পর দিন।

দিনেমার জাতি—উপনিবেশ স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াস প্রোদোষিত হয়ে বার বার করেছে অভিযান এই বীণপুঞ্জ। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁরা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন কয়েকটি বীণে। সাময়িকভাবে কত লাশা আকাঙ্ক্ষার উৎকল হয়েও ওঠেন তাঁরা। তাঁরা বীণপুঞ্জের নুতন নামকরণ করেন—‘ফ্রেডারিক’ বীণপুঞ্জ। কিন্তু তাঁদের সকল প্রচেষ্টা সকল প্রয়াস হয় স্বল্পকাল মধ্যে বিফলতার পর্যাবসিত নানা কারণে বশতঃ। বীণের অস্বাভাবিক জলবায়ুর প্রভাবে নিদারুণ মহামারীর প্রকোপে অধিকাংশ বনিককেই প্রাণ হারানো হয় বীণভূমিতে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টাব্দ প্রচার নীতি সহ বাণিজ্য পরিচালনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা গৃহীত হয় পুনরায় নুতন উৎসাহ ও নবীন উদ্দেশ্যে। অবশেষে এ উদ্ভোগও হয় ব্যর্থতার পরিণত একই দুর্নিশাক তেজ। উভয় দলের অধিকাংশ দিনেমারকেই মৃত্যু বরণ করতে হয় এবারোও। পূর্বোক্ত বর্ষে সম্মিলিত দলের মাত্র ২২জন দিনেমার এবং ১৪জন মাল্যাবার জাতীয় ভৃত্য জীবিতাবস্থায় এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে শেষ পর্যন্ত। এই দুঃসাহসিক পাশ্চাত্য জাতি এতেও পচাপদম না হয়ে পুনরায় ভূতীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এবারোও পূর্বকং ব্যর্থকায় হয়ে—চিরন্তনে পরিত্যাপ করতে বাধ্য হয় তাদের এই সাজে পবিত্রতা। অতঃপর প্রায় সেপে কলহমত্ত

পথে—উক্ত জাতির বাণিজ্যতরী সমূহ বিগ্রামার্ধ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বীণপুঞ্জ সাময়িকভাবে নোজর করত মাত্র।

দিনেমার জাতির প্রত্যাবর্তনের ফলে বীণবাসীরা একদিক দিয়ে যেমন হাঁক ফেড়ে বেঁচেছে—তেমনি আর একদিক দিয়ে তাদের সমূহ বিপদের সমুখীন হতেও হুয়েছে। ব্রহ্মদেশীয় নাবিকগণ মন্ত্র-বিকারী ব্রুথোশ পরে তখন থেকে আসতে থাকে দলে দলে, আর অপহরণ বা জোর জবরদস্তি করেই নিয়ে যেতে আরম্ভ করে অধিবাসীদের শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তু।

প্রসিদ্ধ ভূগর্ভটিক মার্কেপলোর ভ্রমণ কাহিনীতে (১২১৫ খৃঃ) এই বীণপুঞ্জের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বীণবাসীদের চারিত্রিক বিশেষত্ব এই যে, তারা স্বভাবতঃ শান্ত, সরল, শিষ্টাচারী ও অনাক্রমণীয়। ধ্বংসকারী কোন অশ্লীল ব্যবহারে তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অনভ্যস্ত। মন্ত্র শিকার এবং চতুষ্পার্শ্ববর্তী বীণরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময়ই এদের প্রধান উপজীবিকা। দ্রোণাতির অবশ্য কর্তব্য হল গৃহস্থালী ও কৃষিকার্য পরিচালন করা।

ইউরোপীয় বণিকগণের প্রস্তুত বিবরণে জানা যায়—বীণবাসীরা ইউরোপীয় বণিকদের নিকট প্রাপ্ত বিবিধ দ্রব্য বথা—বস্ত্র, সৌভদ্রব্য প্রভৃতি এবং বীণভূমির উৎপন্ন কতিপয় দ্রব্যের আন্তর্ভৌগিক বাণিজ্য পরিচালন কার্যে অভ্যস্ত। নারিকেল, সুপারি, গৃহপালিত মুগী শূকর, পাখীর বাসা, ‘সামুদ্রিক মোম’ (amberggris), কঙ্কণের হোথবরণ, লম্বুকাড়ি এদের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। রেজুনগানী জাহাজ এখান থেকে নিয়ে যায় প্রচুর নারিকেল। নারিকেলের উৎপাদন যেমন প্রচুর, তেমনি সস্তাও খুব। একটি মাত্র তামাকপাতার পরিবর্তে চারিটি নারিকেল বিনিময় হয়ে থাকে। এক হস্ত পরিমিত নীলাভ বস্ত্রের পরিবর্তে একশত পর্যন্ত নারিকেল মিলে। বীণভূমিতে কাঁঠাল জাতীয় একপ্রকার ফ্রাষ্ট, রসাল এবং পুষ্টিকর ফল (mellari) উৎপন্ন হয় প্রচুর। পটুগিজদের ইহা অতি প্রিয় ও উপাদেয় খাদ্য। তাঁরা এই ফল নিয়ে বান স্বদেশে জাহাজ বোঝাই করে। এখান থেকে বস্ত্র দ্রাকচিনিও দুস্ত্রাপ্য এবং মূল্যবান—ডেবজ বুদ্ধক্ক সংগ্রহ করে চালান করেন স্বদেশে। এখানকার নারিকেল ও সুপারি এত কোমল এবং সুবাস্ত্র যে মুহুর শূকর পর্যন্ত তা ভক্ষণ করে পরম তৃপ্ত সহকারে। বীণাকলের বাণিজ্য পরিচালনের একমাত্র মাধ্যম হল তামাকপাতা।

এদের গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। কোন গ্রামেরই কুটিল-সখ্যা ১৫ বা ২০ থেকে অধিক নহে। গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে একজনকে গ্রামপতি নির্বাচিত করা হয়। তার মাধ্যমেই জাহাজের সহিত বাণিজ্য কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। এতে অল্প তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, গ্রামবাসীর স্বার্থ সংরক্ষণই তার প্রধান কর্তব্য। তাঁর প্রতি জীবিত দায়িত্ব তার জন্ত করা হয়। সে একাধারে পুরোহিত, চিকিৎসক এবং ঐশ্বর্যালমিক (ওক্স)। বিশেষ কোন কর্মই এরা পালন করে না। ইহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে এদের বিশ্বাস ও ধারণা দুর্বোধ্য। এদের ভাষাও তেমনি দুর্বোধ্য। বিশেষী ইউরোপীয় বণিকদের সহিত এরা মনোভাব বিনিময় করে আকারে ইজিতে, নানারূপ সন্কেত প্রয়োগে। অজ্ঞতাভাব হেতু এরা স্বল্পবাক বাক নির্বাক কালেই টিক হয়। এদের জাতীয় ভাষার শব্দসখ্যাও খুব কম। হস্ত একতাই এরা কতকটা নিরস্তিত-বাক। নারীজাতি

মুখগতঃ সর্ব সময়ে দোষাত্মক থাকে এবং এই হেতু তাদের মুখ দিয়ে শব্দোচ্চারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হ'তে পারে না। এদের একাংশভঙ্গিও অত্যন্ত ক্রান্ত এবং অস্পষ্ট। এই হেতু এদের মনোভাব নবাগতের নিকট সম্পূর্ণ দুজ্ঞেয়। অধিকন্তু শব্দোচ্চারণ কালে এদের মুখ থেকে প্রচুর নিঃস্রবন নির্গত হয়। ইংরাজী এবং মালয় ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ প্রচলিত আকস্মিক-স্ববল ভাষা এই বীণবাসীর অঙ্গভাষা।

প্রাণ-প্রাচুর্য্যে সত্য ভরপুর এই বীণবাসীরা। সত্য প্রাণ-চাক্ষু্যে উজ্জ্বল, অনাবিল আনন্দে যাতোয়ারা এরা। এরা পানাসক্ত সত্য, কিন্তু এদের পানের উদ্দেশ্য মত্ততা নয়, জীবনকে আনন্দ দিয়ে উপভোগ করা। নেই এদের কোন সাহিত্য—নেই এদের কোন সংস্কৃতি—নেই উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পকলা (কারণ এরা এক্ষণে সর্বহারা) ; কিন্তু এদের নৃত্যে, গীতে, আমোদে, প্রমোদে সত্যে আনন্দমুগ্ধ এই বীণভূমি। প্রকৃতি নাতা নিপুণ হস্তে সাজিয়ে দিয়েছেন এই বীণাঞ্চল অকুরন্ত জামলিমা দিয়ে—অকুরনীর স্রবমা দিয়ে বহুতে প্রিয় সন্তানদের জন্ম বেখানে বা মিলে হয় অশোভন, ময়েহর, তেমনি করেই। দিয়েছেন এর কুঞ্জে কুঞ্জে মধুর বিহগ-কুজন-গীতি, দিয়েছেন এর বনে বনে পুষ্পভরা শাখী, দিয়েছেন এর বায়ুমণ্ডলে স্নিগ্ধ সীতল নির্মল সমীরণ, দিয়েছেন এর মস্তকোপরি আলোরলম্বল বহু আকাশ! এসকলই এদের স্বর্গীয় সম্পদ। হোক এরা দরিদ্র, হোক এরা ধূর্ণ, হোক এরা অধীন—এদের ভায় জায়বান কারা? স্বর্গের নন্দন ত অবাস্তব—তু ধু কবিকল্পনা, কিন্তু এ হল সত্যভূমির বাস্তব-নন্দন। অকূল সমুদ্রবন্দে—অভ্যহীন—বিভার হীন জলরাশি নাবিকদের মনে বধন এনে দেয় অবসাদ,

চক্রে বধন এনে দেয় ক্লান্তি; যখন তাঁদের স্মৃতি নরন একমুণ্ড জামল ভূভাগ ধরনের জন্ম করে ছটকট, তখন সমগ্র সমুদ্র সমারোহপূর্ণ এই স্বপ্নবেশে নিকোবর তাঁদের নিকটে প্রতীকীয় হয় এক অগুরুপ রঙিন আনন্দলোকরূপে। তখন অশূন্য পুলকের দোলা দিয়ে বার তাদের প্রাণভ্রমরে—ক্লান্ত নরনে এই ভারসিরাযাত নিকোবর।

অপরিসিত সম্পদ, অজন্ম ঐশ্বর্য্য পুঞ্জীকৃত আছে বীণবাসীর জলে ফলে, বনে জলে। এর নারিকেল-অশপারি, এর কুমারকুম নুকসমূহ, এর বিবিধ ভেজাজ উদ্ভিদ, এর অগণ্য শব্দ শব্দকারি শিল্প দ্বারা প্রভূত ধনাগরের সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হবে। ঐ সকল মূল্যবান সম্পদ দ্বারা আধুনিক উপায়ে শিল্প গড়ে তুলতে পারলে ভারতবর্ষের ধনাগার ফীত হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা আজ চিন্তার বিষয় বটে! আশা করা যায়, কৃষির উন্নয়ন ও শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই নগণ্য বীণপুঞ্জ অচিরে হ'য়ে উঠবে ধনে সম্পদে সমৃদ্ধ, সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ। আজ ভারতবর্ষের কর্তব্য—এই বৈশ্ব জাতগণের পিপাসিত হৃদয়ে প্রবাহিত করা আনন্দরসের উৎস। এই মুক ভাবাহীন জাতগণের কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলা মধুর বাণী। এই বহির জাতগণের জড়বিহীন কর্তৃত্বহরে দান করা স্বত্ব-সমীচ-কল্পার প্রবণের শক্তি। ভারতবর্ষকে দিতে হবে এদের আকূল হৃদয়ে জাতগণের সাধুর্য্য ঢেলে, দিতে হবে এদের প্রাণে নব নব আশা, দিতে হবে এদের কুটীরে কুটীরে নব-জ্ঞান বিজ্ঞানের সমুদ্রল বীণশিখা প্রবাহিত করে। তবেই সার্থক হবে ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের সাম্য জাতির গণতন্ত্র।

ব্যর্থতা

[Wilfred Owen-এর FUTILITY কবিতার ভাবানুবাদ]

ওকে রোজের নিরে বাও
মুহ রোজের পরশ
আর কেতের সরস
মাটি, আজকে কি তারা উজা—
মুহ থেকে জাগাতো তাকে বারা ?
পশুক্ষেত্রে বীজ যে ছড়ান থাকি :
সকালে হুর্ষ করতো ডাকাডাকি
ক্রাঙ্গে,—আজকে মিনটা ছাড়া।
আজকে যদি হুমটা তার ডাঙে,
বুড় দরবী হুর্ষের আলো বাণে।

ভেবে দেখ, হুর্ষের তাপে বীজেরা ঘোমটা খোলে,
কি ভাবে একদা প্রাণ জেগেছিল শুক মাটির কোলে।
মাছুষের দেহ, স্নেহ, অল, সবল রাই ও পেশী,
এখনো বাতে রক্ত উদাম,—এমন কি কাজ বেকী
তাতে প্রাণ সঞ্চার করা ? হেন' পরিণতি হবে যদি অবশেষে
তবে মাটির শরীর বেড়েছিল কেন বীরে বীরে ডিলে ডিলে ?
আর কেন বা এতদিন ধরে নির্বোধ-হালি হেসে
ডাঙিয়েছিল পৃথিবীর ঘূর্ণ আঁখির চুম্বায় ধূলে ?

অমুবাদক—দিলীপকুমার জট্টাপান্ডার

প্রাচীন ভারতের লিপিকলা

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অত্যন্ত বহু বিষয়ের মতো লিপিকলার প্রসঙ্গটিও অত্যন্ত বিতর্কিত। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ আছে। উপাদানের অপ্রতুলতার জন্য উৎপন্ন এই সব বিভিন্ন মতের সন্নিবিষ্ট আলোচনা না করে মোটামুটি কয়েকটি প্রধান মত নিয়ে আলোচনা ও ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্ব নির্ধারণ কর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

ম্যাক্স মুলার, বার্নেল প্রমুখ উনিশ শতকের প্রাচীনত্বজ্ঞানের মতে ভারতীয় লিপিকলার নৃচনা খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম অথবা চতুর্থ শতকের আগে সম্ভব নয়। তাঁদের পরে ভট্টর বুদ্ধার, বিনি ভারতীয় লিপিকলা সম্পর্কে পশ্চিম-প্রান্তিক ও গ্রন্থীয় গবেষণা করে গেছেন, দীর্ঘদিনের গবেষণা-অন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সর্বপ্রাচীন ভারতীয় লিপি অর্থাৎ 'ব্রাহ্মী'-র বিবর্তন খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অথবা তারও আগে, আনুমানিক ৮০০ অব্দে সম্পূর্ণ হয় এবং তাহলে 'ব্রাহ্মী' লিপির প্রবর্তন-কাল খৃষ্টপূর্ব দশম শতক অথবা তারও আগে বলে ধরা যেতে পারে।

এই মতের পণ্ডিতদের গবেষণার পর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য ও উপাদান পাওয়া গেছে। এই তথ্যের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রাগৈব শিল্প-সভ্যতার অস্তিত্ব। প্রাগৈব শিল্প-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে যে বিশিষ্ট এক ধরনের লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা 'ব্রাহ্মী' লিপির আদিরূপ কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও এটুকু বলা যায়, ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্ব খৃষ্টপূর্ব দশম শতকের বহু আগে পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্ব, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-যুগ ঐতিহ্য থেকে প্রমাণ হয়। নারদ-স্মৃতির (খৃষ্টীয় ৫ম শতক) সাক্ষ্যে এবং বৃহস্পতির উক্তিতে ('আহ্নিকতত্বে' উক্ত) মনে হয় ভারতীয় সাহিত্যের জন্ম-সময় থেকেই ভারতবর্ষে লেখার চল ছিল। বৃহস্পতির উক্তিতে আরও প্রমাণ হয়, লেখার সর্বপ্রাচীন এবং সর্বপ্রচলিত উপাদান ছিল তালপত্র, কুর্শপত্র জাতীয় 'পত্র' বা 'পাতা'। জৈন-গ্রন্থ 'সদবায়লসূত্র' ও 'পদ্মবনাসুত্র' এবং বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিতবিস্তার' লিপিকলার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সরব। মহাকবি কালিদাসও 'রঘুবংশে' বলেছেন, লিপিকলার ধ্বংস জ্ঞান থাকলেই সাহিত্যের বিরাট ভাঙারের সামান্য লাভ করা যায়। ভারতীয় শিল্পকলার প্রাচীন নিদর্শন সমূহেও (যেমন, বাদামি-তে ব্রহ্মার ভাস্কর্য) দেখা যায় তালপত্রের ভবক বা গ্রন্থের প্রত্যেকের উপস্থিতি। সর্বস্বতীয় হাতে বই থাকার রীতিও খুব প্রাচীন। সূতরাং ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতে লিপিকলা অনেক দিন আগে থেকেই প্রচলিত ছিল; প্রাচীন ভারতীয়রা যে সব জিনিস মুদ্রণ করে রাখত কিছুই লিখত না, এ ধারণা ঠিক নয়।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আর একটু বিশদ আলোচনা করলে এ তথ্য প্রমাণ হয়। রাবারল ও মহাত্মাজেত, খৃষ্টপূর্ব

চতুর্থ শতকেই বাদে মোটামুটি চোহা ষাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে ধরা হয়, 'লিখ', 'লেখ', 'লেখন' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায় এক ব্যাসদের যে মহাভারত রচনার সময় গণেশকে লিপিকার হিসাবে নিযুক্ত কবেছিলেন, এ কিংবদন্তী তো সর্বজনবিদিত। কোঙ্কিলের 'অম্বশাস্ত্র' (খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক), মৃত্যু-সাহিত্য (খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতক) এবং দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বার উৎপত্তি ও বিবর্তন) পাবিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতক) বাদে 'নিরুক্ত' (পাবিনির কিছু পূর্ববর্তী), 'উপনিষদ' 'আরণ্যক' ও 'ব্রাহ্মণ' সমূহ এমন কি 'বেদ' সমূহের সাক্ষ্যও লিপিকলার প্রাচীনত্ব নিরূপিত হয়। 'উপনিষদ' 'আরণ্যক' ও 'ব্রাহ্মণ' সমূহের অধিকাংশই গুপ্তে লিখিত; দার্শনিকতা-সমৃদ্ধ আচার-আচরণ সম্বলিত এই বিরাট গুপ্ত-সাহিত্যের পুরোটাতে যে শুধুমাত্র বৃত্তির মাধ্যমেই কণ-পরম্পরায় রক্ষিত হতো, এমন কথা মনে হয় না। শিক্ষণ ও স্মরণের জন্য অন্ততঃ এদের কিছু অংশ লিখিত হতো, এমন ধারণা অস্বাভাবিক নয়। 'উপনিষদ-আরণ্যক'র আদ্যের মুগ্ধে অর্থাৎ বেদের সময়ও যে লেখার চল ছিল, এ কথা 'বেদ'-সমূহের সাক্ষ্যই মনে হয়। যেমন, ঋগ্বেদে (১০, ৬২, ৪) আছে, সাবর্ণি রাজা যে এক হাজার গরু দান করেছিলেন, তাদের কানে '৮' সংখ্যাটি লেখা ছিল। যজুর্বেদের 'বাসুদেবী' সৃষ্টি-র পুরুষমেধ-সংক্রান্ত লোকজনদের মধ্যে গণক বা জ্যোতির্বিদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া 'তৈত্তিরীয় সাহিত্য'র 'অন্ত' 'প্রাথ' প্রভৃতি বিরাট বিরাট সংখ্যা বা 'শতপথ ব্রাহ্মণ'র দিন-রাত্রির যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ, বা ঋগ্বেদ যজুর্বেদ নানাবিধ ছন্দর উল্লেখ থেকে মনে হয়, বৈদিক সাহিত্যের রচয়িতাগণ লিপিকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। হুন্স পাণ্ডিত্যক হিসাব-নিকাশ (অন্ত- ১,০০,০০,০০,০০,০০; প্রাথ- ১০,০০,০০,০০,০০,০০) প্রভৃতি তার প্রমাণ ইত্যাদি করতে হলে লিখতে জানা চাই, হুন্স রাজা বতি ইত্যাদির তাত্ত্বিক বিচার লিপিকলার জ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। সাহিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ধীরে আছে তাঁরাই এ সব বিচার করতে পারেন এবং লিখিত সাহিত্য ছাড়া এ সব বিচার করার মতো জ্ঞানার্জন অসম্ভব।

বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহ ষাঁটলেও ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যের প্রাচীনতম ভূত মোটামুটি ভাবে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। 'সুত্তান্ত'তে 'অকরিকা' নামে এক ধরনের খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়; একজনের পিঠে আগুন দিয়ে লেখা অক্ষর চেনা ও বলতে পারাই ছিল শিশুদের এই খেলার বিষয়। ভিক্ষুরা এ খেলা খেলতে পারত না। অজ্ঞ পক্ষে 'বিনয়পিটকে' লেখন বা লিপিকলাকে নিষেধ গণ্য করে ভিক্ষুদের কাছে অন্ত্রসোদন করা হয়েছে। 'জাতক' সমূহে ব্যক্তিগত ও সরকারী চিঠিপত্র, রাজকীয় ঘোষণা, পত্রক বা পাতুলিপি ইত্যাদি প্রসঙ্গেই শুধু লেখার উল্লেখ নেই, পশত লেখার উপাদানরূপে বর্ষক নামক দান্দ-লেন্দনী ও দান্দ-কলদেরও উল্লেখ আছে। 'মহাবসসে' লেখ অর্থাৎ লেখা পণনা অর্থাৎ পণ্ডিতবিত্তা এবং

রূপ অর্থাৎ কলিত গণিতবিজ্ঞা বিশেষতঃ বৃত্তা-সংক্রান্ত গণিতবিজ্ঞা বিভাগভ্রমের পাঠ্যক্রম হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। এদের পরবর্তী 'ললিতবিজ্ঞা' নামক গ্রন্থ পাঠ্য জানা যায়, বৃহৎসংকে লিপিকলার (অর্থাৎ যেখানে লিখতে দেখানো হতো) গিরে বিদ্যাবিত্ত নামক শিক্ষকের কাছে লিপিলিখা করতে হয়েছিল। এ ভাবে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের সাক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং চতুর্থ শতকের মধ্যেই লিপিকলা সম্পর্কে ভারতবাসীরা উল্লেখ্য স্বকর্মের জ্ঞানার্জন করেছিল এবং খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের অনেক আগেই লিপিকলার প্রবর্তন হয়েছিল। চৈনসেদের গ্রন্থেও যে ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্বের কথা আছে, তার উল্লেখ নিবন্ধের গোড়ার সিকে করা হয়েছে।

তত্ত্ব ভারতীয় সাহিত্য নয়, আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় যে করেকজন গ্রীক লেখক তাঁর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের রচনা থেকেও ভারতে লিপিকলার প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। আলেকজান্ডারের ক্ষতম সেনাপতি নিয়ার্কাসের বিবরণী থেকে জানা যায় যে ভারতীয়রা তুলো এবং ছেঁড়া কাপড় থেকে কাগজ তৈরী করতে জানে এবং তারা কাগজ তৈরী করত, নিশ্চয়ই লেখার জন্য। মেগাস্থেনিসের বিবরণীতে রাজ্যের সরাইখানার দূর-নির্দেশক খোদাই করা পাথরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুট্টাস কাটিয়াস লেখার উপাদান হিসাবে এক ধরনের পাথরের নরম ছালের কথা বলে গেছেন। কেউ কেউ কাটিয়াস-প্রোড্রো এই ছালকে প্রাচীন-সাহিত্য উল্লিখিত কুর্পপাতা বলে মনে করেন। গ্রীক লেখক ছাড়া, অজ্ঞাত বৈদেশিক পণ্ডিতদের বিবরণীও এ সম্পর্কে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়। যেমন, প্রখ্যাত চৈনিক পণ্ডিত হিউয়েন সাঙ এবং আরব পণ্ডিত আল-বিরুনী ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্বের কথা বলে গেছেন। চৈনিক মহাকাব্য 'কংওয়ান-সু-লিন'-এ আছে, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লিখতে হয় যে ডাক্তারী লিপি তা 'কন' বা ক্রম্য কর্তৃক আবিস্কৃত এবং লিপি হিসাবে তা সর্বোত্তম।

এতকম শুধু গ্রন্থ-প্রমাণ বা পদ্যক-প্রমাণের কথা বলা হলো। এখানি প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রসঙ্গে আসা বাক। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো লেখ-খালা। অশোকের শিলা ও ভক্তলেখনসমূহের পূর্ববর্তী কয়েকটি লেখ এ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করে। এরাদে (সগমর জেলায়, বধ্যপ্রদেশ) প্রাপ্ত একটি বৃজার লেখ, ভীটপ্রোলু লেখমালা,

তক্ষশীলার প্রাপ্ত বৃজার লেখ, মহাহানসক্ষে (মাজসাই জেলায় বজ্জার) প্রাপ্ত শিলা-লেখ, সোহসোরা তাজ্র-লেখ, শিপরাভরা বৌদ্ধ পাত্র-লেখ, বজ্জিতে প্রাপ্ত (আজমীরে) লেখ ইত্যাদি অশোক-পূর্ব লেখনসমূহ এবং অশোকের লেখমালা থেকে সপ্রমাণ হয়, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে লিপিকলা বর্তমান ছিল এবং ব্রাক্সিলিপি নামক সে সময়কার এই লিপির বিবর্তন হতে নিশ্চয়ই আরো বেশ কয়েক শতক আগেছিল।

অশোকের লেখ-সমূহে অক্ষরগুলির আকস্মিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে বৃজার বলেছেন যে, আকস্মিক চরিত্রের এত বিভিন্ন অক্ষর এবং দ্রুতবহতা বৃক্ত অক্ষর এত বেশি এই কথাই প্রমাণ করে যে অশোকের সময়ের লিপিকলার ইতিহাস সীর্ণদিনেও এবং সেই সময়ে অক্ষরগুলি পরিবর্তনশীল ভাবে ছিল। একটি লেখতে অশোক বলেছেন, অম্মশাসন পাথরে খোদাই করার কারণ পাথর সীর্ণস্থায়ী; একবার তাৎপৰ্য অচিরস্থায়ী জিনিসেও সে সময় লেখার কাজ চলত। বৌদ্ধ প্রথম ও সাধারণের পাঠ ও আবৃত্তির জন্য ধর্মশাস্ত্রসমূহও যে অশোক নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তা তাঁর আর একটি শিলা-লেখ থেকে জানা যায় এবং ঐ ধর্মশাস্ত্রসমূহ নিশ্চয়ই পাতা, গাছের ছাল, কাগজ ইত্যাদিতে লেখা হতো। বীরা প্রের করেন, ভারতবর্ষে লিপিকলার ইতিহাস খুব প্রাচীন হলে তার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? তার উত্তরও এখানেই নিহিত। অর্থাৎ পাতা, গাছের ছাল ইত্যাদি বিনাশশীল পদার্থ বলেই তাদের উপর কোন সুপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া, প্রাচীন ভারতে বিশেষত বৈদিক যুগে নৃতিশক্তির উপর জোর দেওয়া হতো। শাস্ত্র-পারঙ্গমতা বলতে তখনকার দিনের ভারতীয়রা বুঝতেন, অর্থাৎ শাস্ত্রে নৃতি-নির্ভরতা। রাজবন্দ্য-শিক্ষায় লিখিত শাস্ত্র দেখে শিক্ষাদান অসম্মানজনকরূপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নৃতি-নির্ভর ছিলেন বলে ভারতীয়রা শাস্ত্রাদি লিখতেন না বা লিখতে আদৌ জানতেন না, এটা কোন হুজি নয়। সত্যাক রাজবন্দ্য-শিক্ষা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

উপরি-উল্লিখিত পদ্যক ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসমূহ—ভারতীয় সাহিত্য-প্রসঙ্গ ও বিশেষীদের বিবরণী প্রসঙ্গ এবং লেখমালা থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে লিপিকলার ইতিহাস অভিন্ন প্রাচীন।

ইঠাৎ পাওয়া

কুমারী নিখারাপী সিংহ-রায়

নিখর নিখর হাত।

কুন-আপা চোখে তুমি আছি,

হঠাৎ কি কেন পেরেছি মনে

বেলেছি অনেক কানসারি

অজান্তে ভেঁসায় মনের-কল।

নাক পেরেছ তুমি—কি দরকার!

অস্থির মনে ছায়ে বসলাম।

মাথার 'পরে একখালা জোনাকী জলছে

ওদের প্রোভু বায়ু কানে কানে বলছে

তোমারই কথা অতি সজোপনে

কিরে তাকানোর, অস্থির মনে

অজিলিকে প্রেম তবু তোমার দায়।

বাঙলা অভিধান সঙ্কলন

ঐনোরীজুম্মার বোম

“সুবাদ অল্পবান” সুবাদপত্রের সম্পাদক জগন্নাথরায়
বুখোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত অভিধানের নাম ‘নূতন অভিধান’।

অভিধানখানি ‘সুবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ মুদ্রাক্ষর থেকে প্রকাশিত।
প্রকাশ-সাল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২০ ও শব্দসংখ্যা
১২০০০। এই অভিধানখানি প্রায় ১৮ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৬
খৃষ্টাব্দে (১৭৭৮ শকাব্দে) পণ্ডিত ব্রজরায় বিজ্ঞাবাগীশ মহাশয়ের
সহায়তায় বহু শব্দ বোঝনা হয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়। তখন
পৃষ্ঠাসংখ্যা গাঁড়ার ৬৫৮।

এই ১৮৩৮ সালেই আরও দু’খানি অভিধান দেখা যায়।
একখানি পারসিক অভিধান। সঙ্কলিতর নাম অজ্ঞাত।
অপরখানির নাম ‘বঙ্গাবিধান’।

হলধর ঞ্জায়রত্ন ‘বঙ্গাবিধানের’ সঙ্কলয়িতা। এতে ৬২৬৪টি শব্দ
আছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় ১০০। দু’খানিতে কেবলমাত্র বাঙলা
ভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত প্রসিদ্ধ শব্দগুলি দেওয়া আছে। কিছু সেগুলি
প্রচলিত শব্দ বলে তাদের অর্থ দেওয়া হয়নি। কৈকিয়ৎবরূপ
ঞায়রত্ন ভূমিকায় বলেছেন “...কিন্তু অল্প অভিধানের রীতি মত ইহায়েত
শব্দের অর্থ দেওয়া গেল না আমার এই ক্রটি বিজ্ঞ মহাশয়েরা গ্রাহ্য
করবেন না, যে হেতুক ইহাতে যে যে শব্দ লিখা গেল সেই সেই
শব্দের অর্থবোধ এতদ্দেশীর সমস্ত বিশিষ্ট লোকেরি আছে, তবে ইহার
অর্থ লিখনে কেবল পুস্তক বৃদ্ধি মাত্র হয় তবে এই পুস্তকের এই বুখ্য
প্রয়োজন বিনি শুদ্ধ ভাষা লিখিতে ও কহিতে চেষ্টা করেন তাঁহার
উত্তম উপকার এবং বাসকদের শিক্ষা বিবয়ে অত্যন্ত উপকার হয়
ইতি। ঐহলধর ঞ্জায়রত্নত্ব।”

হলধর ঞ্জায়রত্নের আর একখানি অভিধান ‘শব্দার্থ-প্রকাশ্যভিধান’।
ইহা ১৮৪৩-৪৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

এরই কিছু আগে কবিরাজরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ‘অমর ভাষা’
নাম গিঠে ‘অমরভাষ্যের’ বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন (১৮৩০-৪০)
‘কবেছি অমর ভাষা শব্দ অনুমান’। তর্কালঙ্কার মহাশয় হরিনাভি
গ্রামে বুখোপাধ্যায় বংশে আত্মমানিক ১৭১৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং
তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৪৫এর কাছাকাছি। তাঁর কবিত্বাতি ছিল এক
কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন।

বিবিধ দ্বায়জ্ঞ পণ্ডিত অধিকা-নিবাসী পণ্ডিত হারাননাথ
বাচস্পতি (১৮১২—১৮৮৫) সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন
(১৮৪৫—১৮৭৩)। অধ্যাপনা করার আগে তিনি বহুবিধ
ব্যবসায় অবলম্বন করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা
করেন। বহুত অভিধানও করেন। নাম—‘শব্দার্থবিশু’। প্রকাশ-
কাল—ভাদ্র ১৭৭৩ শক (১৮৫১)। ‘শব্দভোম’—১ম খণ্ড প্রকাশ
হয় ১৮৬১; ‘লিঙ্গানুশাসন’। তৎপরে তিনি এক বৃহৎসংখ্যক অভিধান
সঙ্কলনের মনস্থ করেন। ১২ বছর কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে নিজেকে
নিরোক্ত করে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করে এক সুবৃহৎ অভিধান
‘বাচস্পতিভিধান’ তৈরী করেন। ইহা ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়
(১৮৭৩—৮৪), পৃষ্ঠাসংখ্যা গাঁড়ার ৫৮৮২। এত বড় ব্যয়বহুল
অভিধান তৎকালে বিরল বললেও চলে।

ব্রজরায় বিজ্ঞাবাগীশ মহাশয় (১—১৮৫০) বিখ্যাত পণ্ডিত
ছিলেন। প্রথমে কিছু কলেজে ও পরে কলকাতা স্কটসন ইংরেজি
হুসের পণ্ডিত রূপে (১৮৪৩—৫০)। তিনি আত্মীয় সহিত

সাধনা করে গেছেন। ‘সুবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়’ পত্রিকার সম্পাদক
অধৈতন্ত্রে আজ ব্রজরায় বিজ্ঞাবাগীশের সহায়তায় বহু গ্রন্থ সম্পাদনা
করেন। তন্মধ্যে তিনখানি অভিধান প্রকাশ করেন।

(১) শব্দার্থবিধি। অর্থাৎ বিবিধ কোষ হতে সঙ্কলিত বহুতর
সংস্কৃত শব্দ সহস্রত সৌভাগ্য সাধু ভাবান্তর্গত বহুল শব্দের অর্থ
প্রকাশক গ্রন্থ। শকাব্দ ১৭৭৫ (১৮৫৩ খৃঃ)। পৃঃ ৬০৪।

(২) নূতন অভিধান। পূর্বে বলা হয়েছে। সন ১৭৭৮
(১৮৫৬ খৃঃ)।

(৩) অমরার্থবিধি। অর্থাৎ কবিরায় অমরসিহ
কৃত্যভিধানস্থ শব্দ সকলের নাম লিঙ্গ প্রকাশিকা। পূর্ণচন্দ্রোদয়
সম্পাদক কর্তৃক কোলকাতার অভিধান হতে সঙ্কলিত। সন ১২৬৩
(১৮৫৬) পৃষ্ঠা ১২৫ + ১১০।

১৮৫৬ সালে ‘কবিতা-কুসুমমালা’ রচয়িতা বৈদ্যনাথ দাস
‘শব্দার্থবৃত্তাবলী’ নামে একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন।

১৮৬০ সালে ২৪-পরগণার রাজপুর গ্রামের গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞানন্দ
(১৮২২—১৯০৩) ‘শব্দসার’ নামে একখানি ব্যুৎপত্তিবৃত্ত সংস্কৃত-
বাঙলা অভিধান প্রকাশিত হয়। তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাচ্যধ্যাপক
ও পরে অধ্যাপক হন। অভিধান ব্যতীত আরও কয়েকখানি কই
তাঁর ছিল।

বিজ্ঞানসাহী রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের (১৭৮৫—
১৮৬৭) নাম কাজলা সমাজে বিশেষ পরিচিত। তিনি তাঁর
বিরটি গ্রন্থ সংস্কৃত অভিধান পর্যায় শব্দ সমেত ‘শব্দকল্পদ্রুম’
সঙ্কলন আরম্ভ করেন ১৮২২ সালে। বর্ষ ৩০ বছর কঠোর পরিশ্রম
করে উহা শেষ করেন ১৮৫২ সালে। রাধাকান্ত দেবকে জু
আধিধানিক বললে তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে বোঝা যায় না। তৎকালীন
য়েনেশাল যুগে রাধাকান্ত দেব বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি
সংস্কৃত, বাঙলা, আরবী, ফার্সী, ইংরেজি ভাষার বিশেষ পারদর্শী
ছিলেন। তাঁর অভিধান ‘শব্দকল্পদ্রুম’ পণ্ডিত সমাজে বিশেষভাবে
সমাদৃত হয়। অভিধানখানি প্রকাশ হয় খণ্ডাকারে। ১ম কাণ্ড
১৮২২ সালে। ২য় কাণ্ড ১৮২৭, ৩য় কাণ্ড ১৮৩২, ৪র্থ কাণ্ড
১৮৩৮, ৫ম কাণ্ড ১৮৪৪, ৬ষ্ঠ কাণ্ড ১৮৪৮ ও ৭ম কাণ্ড ১৮৫২।
পরে এর পরিশিষ্ট সংবোধন করেন ১৮৫৮ সালে।

এর পরে ১৮৬৬ সালে ‘প্রকৃতিবাদ অভিধান’-এর আবির্ভাব হয়।
সঙ্কলন করেন প্রসিদ্ধ বারকরল বিভালঙ্কার। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা
যেতে পারে, তৎকালীন সংস্কৃত বাঙলা অভিধানের মধ্যে প্রকৃতিবাদের
অভিধানের প্রশংসা ও প্রাধান্য হয় খুব বেশী। এর শব্দসংখ্যা ২৭০০০।
তার মধ্যে প্রায় ৮০০ দেশজ শব্দ আছে। এই অভিধানের ৩টি
পরিশিষ্টে অকারাবিক্রমে ব্যবহৃত, পৌরাণিক জীবনচরিত, ঐতিহাসিক
জীবন-চরিত আছে। অভিধানের মধ্যে বিভিন্ন জাতব্য বিবর দেওয়ার
সুত্রপাত এই অভিধান থেকেই দেখা যায়। তার পরে বহু অভিধানে
বিভিন্ন জাতব্য বিবর দেওয়ার রীতি লক্ষিত হয়।

ঢাকা থেকে ১৮৩১ সালে সোমনাথ বুখোপাধ্যায় সংস্কৃত
‘মেঘনিকোষ’ সম্পাদন করেন। বই পুঁথি থেকে পুঁথ্যপুঁথ্যকণে বিশিষ্ট

এস্থানি সম্পাদিত। দেব-নাগরী অক্ষরেই মুদ্রিত। এস্থানিতে সংস্কৃত ও ইংরেজি দুই আখ্যা পত্র আছে—‘মেদিনী। ঐয়মেদিনী কর প্রণীত। ঐসোমনাথ শর্মা পরিমার্জিত। কলিকাতায়। নূতন সংস্কৃত প্রস্তুত। ঐহরিসোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুদ্রিত। সংস্কৃত ১৩২৫।’ ইংরেজি আখ্যা পত্র ‘Medini, or, a Dictionary of Homonymous word, By, Medini Cara, Edited by Somanath Mukhopadhyaya, Calcutta: New Sanskrit Press, 1869.’

এই সালেই ঐয়ামপুর থেকে কুলহাট্রদের জন্ত একখানি ইংরেজি বাঙলা অভিধান প্রকাশ হয়। মুদ্রাকরের নাম থাকে বি. এম. সেন, ঐয়ামপুর ১৮৬১।

কুল বুক সোসাইটি থেকেও একখানি ছোট বাঙলা অভিধান ঘোষার এই সালে। সেখানি নাকি খুব ভাল ছিল। কিন্তু হুশপাশ।

১৮৭০ সালে রাধামাধব শীল একখানি অভিধান সংকলন করেন। এই বৎসরেই কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার কৃত ‘শব্দার্থপ্রকাশিকা’ নামে একখানি অভিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বইখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৬৩।

১৮৭৪ সালে জে. সাইকস (J Sykes) নামে একজন ইউরোপীয় জেরলোক ‘English and Bengali Dictionary’র এক পরিবর্তিত সংস্করণ বের করেন। রামকমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই সালে ‘নূতন শব্দার্থপ্রকাশিকা’ নামে এক সংস্কৃত ও বাঙলা অভিধান প্রকাশ করেন।

১৮৭৬ সালে যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অধিকাচরণ বিশ্বাস এই তিনজনে মিলে একখানি অভিধান সংকলন করেন। এখানির নাম ‘শব্দসারমহানিধি’।

১৮৮৩তে গোপালচন্দ্র মিত্র বাংলা-ইংরেজি অভিধান ‘A Dictionary in Bengali & English’ প্রকাশ করেন।

১৮৯০ সালে লণ্ডনবাসী চট্টোপাধ্যায় ‘বাংলা অভিধান’ এবং ১৮৯২ সালে বলরাম পাল দু’খণ্ডে সম্পূর্ণ ‘প্রকৃতিবিবেক অভিধান’ প্রকাশ করেন। ১৮৯৪ সালে রামিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় ‘ভারত বর্ণন’ নামে অভিধান প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ শীল তারানাথ বাচস্পতির পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ‘মেদিনীকোষ’-এর (নানার্থশব্দ কোষ) এক সুসংস্কৃত সংস্করণ বার করেন। বইখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০১।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ‘সমর্থকোষ’ নামে একখানি বাঙলা অভিধান প্রকাশিত হয়। এই অভিধানখানি ২ খণ্ডে ডিগ্রাই ১৪ সাইজ। তিন কলামে ছাপা। ১ম কলামে সংস্কৃত ইংরেজি অভিধান, ২য় কলামে ইংরেজি-ইংরেজি ও বাঙলা অভিধান, ৩য় কলামে উদ্ভিদ ও ত্র্যযন্ত্রের অভিধান। ৫৫২ পাতার পর থেকে পৌরাণিক চরিত্তাভিধান। ১ম খণ্ড ও ২য় মিলে প্রায় ১৫০০ পাতা। প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্র এইরূপ—

‘সমর্থকোষ’ বাঙলা অভিধান। English and Bengali Dictionary,। সাহিত্য-বর্ণন বা ত্র্যযন্ত্রাভিধান। এক পৌরাণিক চরিত্তাভিধান। বিবিধ প্রসিদ্ধ ইংরাজী, বাঙালী ও সংস্কৃত দ্ব্যর্থবোধক গ্রন্থাবলির সমষ্টি। Vol. I. প্রথম খণ্ড।

জীবনবুদ্ধ সেন কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ৬১ নং মসজিদ বাড়ী ট্রাট, সমর্থকোষ প্রেসে। ঐকুন্সবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত। তারিখ পাওয়া যায়নি কারণ আমার হাতে যে খণ্ডটি এসেছে সেটির আখ্যাপত্র ব্যতীত কয়েকটি পাতা ছোঁড়া।

নানা রকমের অভিধান সংকলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষাকে পুষ্ট করার জন্য বাঙলা শব্দ সংকলনের একটা বেগবাক্তি হয়। অনেকেই এই শব্দ সংকলনে হাত দেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় খাঁটি বাঙলা শব্দ সংকলনের প্রয়াস পান। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একখানি খাঁটি বাঙলা অভিধান করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। কিন্তু উহা ঘটে ওঠে নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি ‘প’ পর্বন্ত ছেপেছিলেন। তিনি কিঞ্চিদধিক ১০০০ বাঙলা ও সংস্কৃত শব্দের একটা সংকলন করেন এবং সেগুলি অ-কারাদিক্রমে সাজান। তাতে ‘হ’ পর্বন্ত শব্দের সংগ্রহ থাকে কিন্তু সেগুলি তার জীবদ্দশায় হস্তলিখিত কাগজেরই থেকে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র ‘সাহিত্য’-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুত্ব লিখিত শব্দ সংগ্রহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দান করেন। উক্ত পত্রিকায় (১৩০৮ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যায়) উহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু অ-কারাদি শব্দগুলির হাতে লেখা পাতার কতক অংশ কপি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে উহা অসম্পূর্ণই থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খাঁটি বাঙলা শব্দগুলির কিছু নয়না নিচে দেওয়া যেতে পারে—অকাছ্যা, অচিনা, অজ্জল, অটল, আবাস, অব্য, অমনি, আখন, আউল, আএব, আত্রাবি, আত্রএস, আকাট, আগনা, উদমালা, উপজ, একসা, এলখেল, গুগারহ, গুড়নপাঙ্কন, ওলদ, ওসার, কড়খা, কাউই, কাতার, কাফুতু, কারচোপ, কারিনা, খড়ু, বিলখিল, গপগপ, ঘড়াকি, মারথেকুড়া ছোঁ-আচ, টসটস, টঙ্কান, ঠঙঙ, ঠাকুবাগি, ঠাড়, ডিডান, ঢেমনা, ডাউই ইত্যাদি।

খাঁটি বাঙলা শব্দ সংগ্রহের সঙ্গে আকস্মিক শব্দগুলি এর পর থেকে সংকলন হতে থাকে। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় পুরানো খণ্ডগুলির এবং পঞ্চপুণ প্রভৃতি মাসিক পত্রগুলির মধ্যে অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন সতীশচন্দ্র ঘোষ—গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ, রজনীকান্ত চক্রবর্তী—মালমহের গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ, রাজকুমার কাব্যভূষণ—গ্রাম্য শব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্য শব্দ, মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য—বশোহরের গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ, পরমেশ্বরপ্রসন্ন রায়—ঢাকার গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নবদ্বীপ জেলার গ্রাম্য শব্দের অভিধান, দেবেন্দ্রনাথ বসু—নদীয়া ও ২৪-পরগনা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ—ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার লেখ্য ও কথ্য শব্দ, কৃষ্ণনাথ সেন—ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইলের অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষার অভিধান, সুরেশ দাশগুপ্ত—বগুড়া জেলার প্রচলিত কতিপয় প্রাদেশিক শব্দ, বোজা ববীউদ্দীন আহম্মদ—শব্দ সংগ্রহ, চিত্তাহরণ চক্রবর্তী—করিমপুর কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ, গৌরীহর মিত্র—বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ, রাখালরাজ রায়—গ্রাম্য শব্দ ইত্যাদি। কবিত্তক ববীন্দ্রনাথও কিছু শব্দ সংকলন করেছিলেন। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ৪র্থ ভাগে উহা প্রকাশ হয়। এই যে আকস্মিক শব্দাভিধান সংকলন এতে অভিধানকারের অনেক বারিষ ও গ্রন্থ কাল পেয়েছে।

ঐকুন্সবিহারী দাসের সংকলনের রীতি এক অমায়িক বিভাগ এক

বিভিন্ন শব্দ-সঙ্কলের কয়েই অভিধানিকদের মনে একটা নতুনধর্মের সুর বাজল। তাঁরা নতুন চক্ষে বৈজ্ঞানিক রীতিতে অভিধানগুলিকে সমাজে লাগিয়েন বিবিধ জাতীয় বিষয়গুলি দিয়ে। এখন আর শুধু সংস্কৃত শব্দের অভিধান নয়। সংস্কৃত ও অসংস্কৃত উভয় শব্দ মিলিয়ে। এই প্রকৃতিবাহকে অল্পসংখ্য করে খুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' প্রকাশ করেন ১১০৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে। ১ম সংস্করণে সাধারণ সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দার্থ ছাড়াও ভাষাবিচার, অর্থবিচার, হিন্দু সঙ্গীত প্রভৃতি পরিশিষ্টে কয়েকটি বিষয় পৃথকভাবে প্রকাশিত। কিন্তু ২য় সংস্করণে (১১০৭) ইহার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়—তাতে পরিশিষ্টে ৬টি ভাগ সম্বোদ্ধিত হয়। (১) শব্দার্থ ও জীবনচরিত, ঋতু প্রকৃতি, ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি। (২) প্রায় ৭০০ বাঙলা ও সংস্কৃত বইয়ের সাক্ষিপ্ত বিবরণ। (৩) বৈজ্ঞানিক কবিতার পলাবলী 'মৈথিলী বা প্রাকৃত শব্দার্থ'। (৪) সংস্কৃত প্রবাদ (পরবর্তী সংস্করণে বাঙলা প্রবাদও সম্বোদ্ধিত হয়)। (৫) অপ্রচলিত আরবী, ফারসী ও ইংরেজি ভাষার ব্যাখ্যা ও অর্থবাদ।

১১০৭ সালে রজনীকান্ত বিভাবিনোদের 'বঙ্গীয় শব্দসিদ্ধি' প্রকাশিত হয়। এই অভিধানে বাঙলা শব্দই দেওয়া হয়। এতে সংস্কৃত শব্দ বার দিয়ে শুধু অ-তৎসম বাঙলা শব্দ দেওয়া হয়।

এই সালে বৌদ্ধাধার গঙ্গোপাধ্যায় 'Beginner's Dictionary of English Words, Phrases and Idioms done into Bengali' (১১০৭) একখানি অভিধান প্রকাশ করেন।

১১০৮ সালে সত্যীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'An up to date Bengali to Bengali Dictionary' (২য় স্ক) প্রকাশ করেন।

১১১০ সালে আচার্য বোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হাতে প্রকাশ করেন। 'বঙ্গীয় শব্দসিদ্ধি' প্রকাশের পর বোগেশচন্দ্র অসীম সাহসে বাঙলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সংকলন করেন। বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের পরিচয় শুধু আভিধানিক বলে নয়—তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, শিকারি, গণিতবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক, ও জ্যোতির্বিজ্ঞানিক ছিলেন। অভিধান সংকলনের ইতিহাসে আচার্য বোগেশচন্দ্রের নাম স্বয়ংপ্রকাশ হৃদয়ের মত আপন ঐক্যে দীপ্যমান। পূর্ববর্তী অভিধানকার যেমন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে বাছা বাছা শব্দগুলিকে অভিধানে স্থান দিয়েছেন—তেমনি আচার্য বোগেশচন্দ্র একটা মূল উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর অভিধান থেকে ঐ সব বাছা বাছা শব্দগুলিকে বিসর্জন দিয়েছেন। এই অভিধানের শব্দগুলি সমস্তই অ-তৎসম বাঙলা শব্দ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭১। এই অভিধানের বানান ও ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—'বাঙলা ভাষার বহু বহু সংস্কৃত শব্দ চলিতেছে, বস্তুত বিভক্তিহীন বাবতীর সংস্কৃত শব্দ বাঙলা সাহিত্যে চলে। যে সকল শব্দ স্পষ্ট সংস্কৃত, উচ্চারণে না হইলেও বানানে সংস্কৃত, সে সকল শব্দের নিমিত্ত সংস্কৃত শব্দকোষ আছে। কিন্তু বাঙলা প্রয়োগে যে সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটরাছে সে সকল শব্দ এই কোষে পাওয়া চাই।' এত কোষে স্বর্গ বিভাস রীতি, বানান, নতুন অক্ষর, শব্দ বিভাস, ব্যুৎপত্তি প্রত্যেকগুলি স্বে গবেষণার তিনি সাধিয়েছেন। উচ্চারণের ক্ষেত্রে নতুন অক্ষরের প্রচলনও করেন।

অভিধানকারের দাবির সম্বন্ধে আচার্য বোগেশচন্দ্র বলেছেন—

সত্যিকারের অভিধানকারের দাবির দৃষ্টি—একটি হচ্ছে শব্দের অর্থকে বেঁধে দেওয়া, আর হচ্ছে তাকে প্রকাশ করা। অভিধানকারকে শুধু শব্দার্থ প্রকাশ করলেই চলবে না—শব্দার্থের উচ্চিৎ-অনোচ্চিৎ, তার প্রয়োগের সীমা অভিধানকারকেই নির্ণয় করে দিতে হবে। শব্দার্থের প্রয়োগের সীমা বেঁধে দিতে গিয়ে আর একটা জিনিস দেখতে হবে—অনেক অপপ্রয়োগ, অনেক গ্রাম্যতা, অনেক শব্দরূপের ভাবের অনর্গলভাবে ঢুক বাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত বার জোর বেশী তা টিকবেই; কিন্তু অভিধানকার সহজে এই শিথিলতাকে প্রদ্রব দেখেন না—এ বিষয়ে তাঁকে গোঁড়া না হয়ে দৃঢ় হতে হবে। বাঙ্গালীর বেলাতেও অতিরিক্ত শব্দরূপ, মাত্রাতিরিক্ত কথা চলে, এমনি নানা জিনিস প্রদ্রব পাচ্ছে, এগুলোকে একটু দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা দিতে হবে—অথবা অনুনাসিক, অবধা ওকার, অবধা ব-ল্লা, অবধা চলু চিহ্ন এসব বর্জনীয়।—অভিধানের শাসন সম্বন্ধে ভাষার আপন প্রকৃতি তার পথ তৈরী করে রাখে। অভিধানকার ভাষার নির্ধাতা নন, নিয়ামক মাত্র।

১১১১ সালে খুবলচন্দ্র মিত্রের 'The Students Bengali English Dictionary' প্রকাশ হয়। এতে বাঙলা, সংস্কৃত এবং বৈদেশিক শব্দ বেগুলি সাধারণতঃ বাঙলাভাষার মধ্যে চলে আসছে—যেমন ইংরেজি, পতঙ্গীজ, ফার্সী, আরবী, হিন্দী প্রভৃতি—সেগুলিও দেওয়া আছে। গ্রাম্যভাষা, প্রবাদ প্রভৃতির ইংরেজি অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। উপরন্তু এতে ভাষাতীর অনেক গাঁহ গাঁহড়ার ইংরেজি নাম দেওয়া আছে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' প্রকাশ হয় ১১১৭ সালে। বইখানিতে ৭৫,০০০ শব্দ থাকে। এতে দেশী, বিদেশী, সংস্কৃত, অসংস্কৃত, গ্রাম্য, প্রাদেশিক, তৎ-সম, তৎ-ভব, মিজ-শব্দ সব স্থান পায়। বহু পারিভাষিক শব্দও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শব্দোচ্চারণ দেওয়া আছে। ১ম সংস্করণের ২০ বছর পরে বৃহৎকারি নিয়ে এই বইখানির ২য় সংস্করণ হয়। শব্দসংখ্যা বেড়ে গিয়ে পঁচাত্তর ১,১৫০০০। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩৮৮+৬১। এর এক বিষয়টি পরিশিষ্ট আছে তার অনেকগুলি ভাগে নানা জাতীয় বিষয় দেওয়া আছে। যেমন—সমোচ্চাৰ্হ শব্দাবিধান, বাংলা ভাষার স্ত্রপ্রচলিত দুটো স্থানীয় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক ব্যক্তির নাম ও পরিচয়, ঋতু ও ধর্মার্থ, বাংলা ভাষার প্রচলিত সংস্কৃত, হিন্দী, ইত্যাদি অবজীয প্রবচন ও শব্দাদির অর্থ, বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান নরনারীর প্রচলিত নাম সংক্ষেপ ও উচ্চারণ সহ ডাকনাম বোধক শব্দাবিধান, বাঙ্গালা সাহিত্যে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ স্থানের ভৌগোলিক সংস্থান, প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রা, পরিমাপ, সংখ্যা ও পরিমাণবাচক শব্দাবিধান, মুদ্রা বিনিময়ের হার, গ্রন্থ সংশোধন, সাংকেতিক বর্ণমালা, বিদেশী নামের প্রতিবর্ণীকরণ, বাংলা বানানের নিয়ম।

১১১১ সালে ঢাকা থেকে চারুচন্দ্র ভট্ট ও যশো এক ইংরেজী-বাংলা অভিধান সংকলন করেন। অভিধানখানিতে প্রায় ১০০০ উদাহরণস্বরূপ দৃষ্ট আছে। পূর্ণ নাম—The Modern Anglo Bengali Dictionary, A Comprehensive Lexicon of Bi-lingual literary, scientific and technological words and terms, with over one Thousand illustrations, Bengal library, Dacca, 1919.

১৯২৯ সালে রাজশেখর বসু মহাশয় অভিধান সম্বন্ধে শব্দ নির্বাচনের একটি পথ দেখালেন ‘চলচ্চিত্র’ প্রকাশ করে। তিনি শব্দ সংগ্রহকে প্রাণান্ত সেন্নি যেমন যোগেশ বিজ্ঞানি মহাশয় শব্দ নির্বাচনে জোর দেন বেশী। শব্দগুলির সব রকম মানে দেবার চেষ্টে তিনি চলতি মানে দেওয়ার রীতি করেন। ‘চলচ্চিত্র’ আর একটি বিশেষ এই যে, এর পরিশিষ্টে অনেক ইংরেজি বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা দেওয়া আছে। অভিধানে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বিভাগীয় ভাবে একত্র সংযোজন এই অভিধানেই প্রথম মনে হয়। অল্প বর্ণালৈক্যিক শব্দের মধ্যে অনেক অভিধানে বৈজ্ঞানিক নাম ও তার পরিভাষা দেওয়া আছে যেমন চারুচন্দ্র ভূহ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতির অভিধানে আছে। চলচ্চিত্রকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৫০, শব্দসংখ্যা ২৬,০০০ কিছু বেশী।

১৯৩২ সালে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘বকীয় শব্দকোষ’ প্রকাশ হয়। বইখানি সঙ্কুত ও অসঙ্কুত শব্দের প্রকাশ অভিধান ৫ খণ্ডে। এক এক খণ্ডে প্রায় ৮৫০ পৃষ্ঠা। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি দেহ রক্ষা করেছেন। তিনি আজীবন একটি স্তম্ভ সংগ্রহযোগী অভিধান রচনার সঙ্গ গ্রহণ করেছিলেন ১৯০৫ সালে এবং তাহা উদ্ভাষণ করেন ১৯৪৬ সালে। বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর উৎসাহিত করেছিলেন এই কার্যে, আর গ্রন্থের প্রথম প্রকাশে বলেছিলেন, ‘ঠাকুর এই অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়াছে, আমার বিশ্বাস সকলেই জাহার সমর্থন করিবেন।’ এই অভিধানে প্রাচীন ও নবীন বঙ্গলা পদ্য, পদ্য, নাটক প্রভৃতি থেকে উল্লেখযোগ্য শব্দ, ব্যুৎপত্তি, প্রাদেশিক ভাষার প্রচলিত শব্দের রূপ, বিশেষী ভাষাস্বরের রূপ, শব্দগুলির অর্থ প্রভৃতির জন্য প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রেরণ, বঙ্গলায় প্রচলিত শব্দ, বিভিন্ন শব্দ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গলা শব্দ সহ রচনীকৃত বিভাবিনোদ, যোগেশচন্দ্র বিজ্ঞানি ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের আশীষাবারী সংযোজিত হয়েছে। বইখানি আয়ত্ত্বভাষ্যে প্রকাশ না হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান্যাকারে প্রকাশ হয়। ২২ সংখ্যা প্রকাশ হয় আশ্বিন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

‘আত্মবোধ’ নামের প্রচলিত কবচগুলি অভিধান আছে ‘আত্মবোধ’ ‘হৃদবোধ’ ‘জ্ঞানবোধ’ ‘শব্দবোধ’ প্রভৃতি তন্মধ্যে ‘নূতন বাঙ্গালা অভিধান’ নামে একখানি বড় অভিধান প্রকাশ হয় ১৯৩৭ সালে।

এই অভিধানে আছে শব্দার্থের পর চরিত্রমালা, সাহিত্য পরিচয়, প্রবচন, বিবিধ জ্ঞাতব্য, পরিশিষ্টে ব্যাকরণ। বানান প্রভৃতির নিয়ম।

১৯৫৩ সালে কাজী আবদুল ওহুদ ‘ব্যবহারিক শব্দকোষ’ নামে একখানি সাধারণে প্রচলিত চলতি শব্দের অভিধান প্রকাশ করেন।

১৯৫৪ সালে খুশি দাস ‘আধুনিকী’ অভিধান বার করেন। ইনি অনেক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকার অনুসরণ করেন।

এর পর ১৯৫৫ সালে ‘সুন্দর বাঙলা অভিধান’ সম্বলন করেন শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এবং ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত উহা সম্পাদিত করেন। এই অভিধানখানিতে শব্দসংখ্যা ৪০ হাজার। বইখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০০। বইখানিতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আছে।

এত বিভিন্ন ধরনের অভিধানের মধ্যে ১৯৫৫ সালে ‘মাসিক বহুমতী’ সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের সাক্ষিপ্ত সনস্কৃত অভিধান ‘রত্নমালা’ প্রকাশ হয় এক নতুন বৈশিষ্ট্যে। এতে একটি শব্দের প্রচলিত অনেকগুলি সমশব্দ দেওয়া আছে। প্রাচীনকালে এই পর্যায় শব্দ গ্রন্থের নাম ছিল নিষক্ট এবং তা বিভাষীরা কঠোর রাখত। ‘অমরকোষ’ও সমার্থক শব্দ আছে, ‘মোহনিকোষে’, ‘শব্দকল্পদ্রুমে’ ও ‘ব্যুৎপত্তিমালাতে’ও আছে কিন্তু তাদের ব্যবহারের যেওয়াজ এখন উঠে গেছে। অল্প লেখকের রচনাক্ষেত্রে একটি সমার্থক শব্দের জুড়ি দুখা কালক্ষেপ করতে দেখা যায়। এরকম একখানি অভিধান হাতের কাছে থাকলে শব্দ নির্বাচন সহজতর হয়। এই পকেট সাইজের বইখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪৮। আকাশে সূর্য হওয়ারই ইহা সহজ ব্যবহারযোগ্য।

প্রবন্ধের পরিশেষে আমি জানাচ্ছি, বহুগুলি অভিধানের নাম ও পরিচয় এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে সম্পূর্ণ ঐ অজ্ঞান নয়। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হুস্তান্তর অভিধানের মধ্যে কয়েকটি অভিধান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রবন্ধে শুধু বাঙলা দেশের অভিধানের কথাই বেশী বলা হয়েছে। বাঙলার বাইরে জ্ঞাত প্রদেশেও বহু সংকুত ও প্রাদেশিক অভিধান সম্বলিত হয়েছে—তাদের আলোচনা এখানে হয়নি। অভিধান সম্বলন ধারা কয়েক দশক ধারা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যে মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তা অবর্ণনীয়, বিবর্তন সময়ে প্রত্যয় পাঠ্য ভাষা—এই কথা বলে আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করলুম।

সমাপ্ত

প্রহরের প্রার্থনা

মঙ্গলিকা দাশ

আখিন-শিতলিগুণো করে গেছে মাঠে, দরবারী—আকাশে
মেঘের থেকে নেমে আসে শীতকল্প সন্ধ্যার প্রেহর, ক্রমে গাঢ়-বিধুরতা
বিস্তার-মননে। বঙ্গা-দিন চাওরা-পাওয়া শেষ করে

কিরে গেছে দারুণ হতাশে।

বটপাহ একা সাকী হয়ে থাকে তবে, পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার

আলো নিয়ে গেলে

বুড়ি হয়ে থাকে শুধু গাছের ছায়ায়,

দেখাও, পশ্চিম-চোখে জড়িতের পাঁজরা—

মায়াবীবি হয়ে কোনদিন কবে ওঠে কি না।

আকাশের নীলতার ভালবাসা হয়ে থাকে,

দেখাও, ভূবিত বৃকে ভূমির কলসখানি

—কিরে হুটো সিদ্ধ হাত ঢেলে দেয় কি না,

প্রত্যাপা গভীর হয়, দেখি ঢের,—

একখানি তৃণের মাঠ সবুজ সঙ্গার—

নিরে আসে নাকি

পথ ভুলে বাসি-সাহারায়। নইলে, বুঝতে হবে,

ভালবাসা অভ্যস্তিৎ দেখা—পাওয়া

আলোয়ার কাকি।

হাল ছুনি আলিয়া

আওহতার মুখোপাধ্যায়

হুই

সুখী রাজার প্রাসাদের লাগোয়া এক কামার বাড়ি। রাজার বোলকলা সূত্রে মধ্যে পনের কলা পূর্ণ। কিন্তু বাকি এককলা যেন রাহুর মত ওই পনেরকলা প্রাস করতে চলেছে।

তার কারণ, কামারের হাতুড়ি। রোজ ভোর না হতেই সেই হাতুড়ির ঘরে রাজার সুখ-নিদ্রা টোটে। কিন্তু রাজা বড় দয়ালু। রাজা কি করেন?

কি আর করবেন। কোনরকম কষ্ট না দিয়ে বীতিমত আদরবদ্ধ করে কামারকে শুলে চড়ায়ে। তারপর অবশ্য সূত্রে বোলকলা পূর্ণ হওয়ার একঘণ্টা কালিভেই রাজা শেষ পর্যন্ত পনের আনা পুকাই ছেঁটে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সে অনেক পনের কথা। রাজার বোল আনা সূত্রে মতই বীরাপদর একবাতের রাজকীয় সুখনিদ্রার শেষ ক্ষুণ্ণিতুক বাঁধান হয়ে গেল লুকুনি ভট্টাচার্যের পাঁজর ভূমড়নো প্রভাতী কালির শব্দে। প্রথম ভোরে নাকি সর্বত্র স-কলরবে পাখি জাগে। এই স্থলতান-কুঠির প্রথম ভোরে স-কাশি লুকুনি ভট্টাচার্য জাগেন। বাবোরারী কলডলার এক বালতি জল নিয়ে বসে বিপুল বিরুদ্ধে প্রার কটোখানেক ধরে কাশেন। অন্ধকারে শুক হয়, আলো লাগলে শেষ হয়। রোজই শোনে, তনতে তনতে আবার পাশ কিরে ঘুমের। কিন্তু এই একটা রাত স্থলতানের মতই স্থলতান কুঠিতে ঘুমিয়েছিল বীরাপদ। ঘুমের থেকেও বেশি। স্তম্ভি ঘোরে আছুর ছিল।

একটানা ঠনঠন কাশির শব্দে ঘোর কেটে গেল। সেই কাশির ঘরে সাগর রাতের সর্গাল-জড়ানো নরম অমৃভূতিটুকু মিলিয়ে বেতে লাগল। হুই চোখ বন্ধ রেখেই হাতড়ে হাতড়ে অমৃভব করে নিল, গা-ডোবাণো পাঁজর নর—সে লহান মেয়ের শতরঞ্জি-শয্যা। হুই চোখ লম্বা করে বুজিয়ে সেই বিশ্বস্তির অন্তরে ডুবতে চেষ্টা করল আবারও। কিন্তু সাধ্য কি। এই প্রথম বীরাপদও ভাবল, কোনরকম কষ্ট না দিয়ে সেই কামারের মত লুকুনি ভট্টাচার্যকেও শুলে চড়াতে পারলে, অর্থাৎ, এই বাড়ি থেকে নির্বিঘ্নে ভাড়াতে পারলে কাজ হত।

বীরাপদ চোখ মেলে তাকালে। আবহা অন্ধকার। খুশি হল। স্থলতান কুঠির বাস্তবের ওপট আলোকপাত হয়নি এখনো। এক ওই বেদম কাশি ছাড়া। সোনারউদি বলে ঘাটের কাশি। --সোনারউদিকে নিয়ে চাকরির সামনে পাঁড় করিয়ে দিলে কেমন হয়? শিল্পের কতটা কাছাকাছি হয় তাহলে? মনে

মনে ওই দুজনকে মুখোমুখি দেখতে চেষ্টা করে বীরাপদ হেসে ফেলল। সোনারউদির বয়েস বছর তিরিশ, আর চাকরির চুয়াল্লিশ। কিন্তু মেয়েদের আসল বয়েস নাকি যেমন দেখায় তেমন। সোনারউদির বয়েস বখন যেমন মুখ বোলে, তখন তেমন।

ভরে ভরে বীরাপদ গভ রাতের ব্যাপারটাই ভাবছে এখন, আর বেশ কৌতুক অমৃভব করছে। এরকম একটা কাণ্ড করে বসল কেন। শুভাবে খেতে চাওয়ার পরে চাকরির সূত্রে চকিত কাকরকারি ভোলবার নয়। আগে চাকরি অনেক খাইয়েছেন, কালও যদি ও সহজভাবে বলত, চাকরি বিদে পেয়েছে, কি আছে বার করো—কিছুই মনে করার ছিল না। এতকম না বলার লজ্জা মুহু তিনবার করে ভাড়াভাড়াই খাবার ব্যবস্থা করতেন তিনি। কিন্তু তার বদলে অশ্রদ্ধতের একশেষ একেবারে। স্বপ্নরাজ্য থেকে তাঁকে বেন একেবারে স্নান বাস্তবে টেনে এনে আছড়ে দিয়েছে ও। চাকরি একেবারে কাল কাল করে চেয়ে ছিলেন সূত্রে দিকে। এতকালের মধ্যে সেই বেন প্রথম দেখলেন ডাক। তারপর ক্রমে উঠে চলে গেছেন। একটি কথাও বলতে পারেন নি। স্মৃতিশ্রুতি অতকাল ধরে খাতের বদলে কাব্য পরিবেশনের লজ্জা ভোগ করেছেন। খাবার আসতে সময় লাগেনি খুব। পার্বতীর পক্ষ-স্বত্বাবধানে উগ্র রকমেরই হয়েছিল খাওয়াটা। কি লাগবে বা কতটা লাগবে একবারও জিজ্ঞাসা করেনি। সরাসরি দিয়ে গেছে। ভিতর থেকে কতটা সেই রকমই নির্দেশ ছিল বাবহর। পার্বতী স্বর ইজিতে যে-টুকু জানিয়েছে, তার মর্ম, কতটা নিজে হাতে খাবার তৈরি করে পাঠাচ্ছেন।

চাকরির ওই ভর-ভরতি আশ্রয়তার মধ্যে শুভাবে খেতে চেয়ে দু'জনের ব্যবধানটা হঠাৎ বড় বিসদৃশভাবেই উদ্ঘাটন করে দিয়ে এসেছে সে। এর পরেও চাকরি আর তেমন সহজ হতে পারেন নি। চেষ্টা করেছেন। পারেন নি। ব্যবধান থেকেই গেছে। অন্ধকার আবহা চাকরি তার ঠিকানা নিয়ে রেখেছেন, বার-বার বেতে বলে দিয়েছেন, গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়েছেন—তবু। গাড়ি অবশ্য বাড়ি পর্যন্ত আনে নি বীরাপদ। আগেই ছেড়ে দিয়েছে। স্থলতান কুঠির আজনিয়ার সে ওই গাড়ি নিয়ে ঢুকলে অত রাতও বাড়িটার মোটা আবহাওয়া চকিত বিষয়ে নড়ে-চড়ে উঠত। কিন্তু এতকাল বাদে দেখা চাকরির সঙ্গে এমন একটা কাণ্ড করে বসল কেন সে? ভতরের চাহিদা তো অনেক আগেই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। আর বললেও শুভাবে বসল কেন। এমন খুশি

হুঁহু এভাবে অপ্রতীকৃত করতে গেল কেন? চাকরিকে? অথচ, বেশ জেনে গুনেই করেছে। হঠাৎ কেন জানি রুচি হুঁহুপাতন ঘটানোর লোভটা স্বেচ্ছা করতে পারেনি কিছুতে। চাকরির কথা-বার্তা, হাথি-খুশি, চিঠা-ভাঙনা, ঘরের আবহাওয়া এমন কি তাঁর বসার শিথিল সৌন্দর্যটুকু পর্যন্ত যেন কি একটা প্রতিকূল ইচ্ছা যুগিয়েছে শুকে।—স্বাধাংগি চিঠিটা টিক ওই ভাবেই প্রকাশ না করে পারেনি।

কিন্তু হঠাৎ এমন হল কেন?

বীরাগদ নিজেই মনেই হাসতে লাগল, সোনারউদির বাতাস লাগল গায়ে?

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো স্পষ্টতর। বীরাগদ হেঁজা কবল হুড়ি দিয়ে উঠে বসল। আর শুভে ভালো লাগছে না। জানালা দিয়ে চুবাবালি খসা লাগধরা দেয়ালের ওপর ভোরের প্রথম আলোর একটা তীব্রক রেখা এসে পড়ছে। দুপুরে অনেক সময় ওই ভাঙ্গা দেয়ালের দাঁপ ধরে অনেক কিছু কল্পনা করে সময় কাটে। যেমনটি ভাবে, ভালো দেয়ালের দাঁপে দাঁপে জোড় লেগে তেমনি একটা ছাপ পড়ে দেয়ালের গায়ে। হেলোবেলার মেখে মেখে অমনি জোড় লাগাডো বীরাগদ। অভয়াটো এখনো বারনি। ঘরের মত ওই বড় চাপ-ভটা জায়গাটার ওপরে চোখ পড়লে মনে হয়, মস্ত একটা ঈগল হাঁ হাঁ করছে। কল্পনার ঈগল দেয়ালে দানা বাঁধার পর এখন আর ভক্তো কুংসিত লাগেনা ডালা দেয়ালটা। ওটার ওপর সোনালী আলোর রেখা পড়তে সকালের ঠাণ্ডা মাথার এখন কোনো রূপের কারিগরি কল্যাণে বাচ্ছে না। শুধু ভাঙাই লাগছে।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। এই মূলতান কুঠিরও সকালের প্রথম রূপটা মন নর যেন। দেখা বড় হয় না বীরাগদর, বেলা পর্যন্ত ঘুমায়। বড়ো বড়ো গাছগুলো আর ওই মজলুমকুঠিও যেন এই ভোরের আলোয় শুচিমান করে উঠছে। দ্বিধ নরতাইরু চোখে পড়ার মতই। দুই একজন অভিযুক্তকেও ধুধু লাগে। সকালের এই মূলতান কুঠির পরিবেশটিও তেমনি। বৃষ্টিতে গেছে, কিন্তু একবারে বতিসুত্র হয় নি যেন।

খানিক বাসেই এই বেশটুকু আর থাকবে না। উদ্যবর্নের ওপর আর একটু আলো চড়লেই মূলতান কুঠির অতি বৃহৎ হাড়-পাঁজর শিরা-উপশিরাগুলো গজগজিরে উঠবে। মাহুবগুলো একে একে জেনে উঠলেই নিশ্চির হবে মূলতান কুঠির হুংপিও—কুংসিতই মনে হবে তখন। শকুনি ভট্টাচার জেগে উঠছেন, কিন্তু তিনি কল-পায়ে কাশছেন বলে এমিকটার মৌন হুন্ডে ছেদ পড়েনি। পড়বে—ওই কমমতলার বেঁকিতে হুঁকো হাতে একাদশী শিকদার এসে বসলেই। শকুনি ভট্টাচারের পর তাঁর জাগার পালা। গায়ে একটা বিবর্ণ তুলোর কবল জড়িয়ে ওই বেঁকিটোতে বসে গুড়গুড়িয়ে তামাক টানবেন আর আপোকা করবেন।

আপোকা করবেন খবরের কাগজের জন্তে।

তাঁর সেই সঙ্কট প্রতীকটি দিয়ে সোনারউদি অনেক হাসাহাসি করেছে, টিক-টিগনী কেটেছে। অল্প বীরাগদর কাছে। বীরাগদ নিজের চোখেও দেখেছে দুই একদিন। খবরের কাগজ পড়ার জন্তে এই ঘরসে আর এমন নিশ্চির জীবনে এক আগ্রহ বড় দেখা যায় না। তামাক টানেন আর পুস্তকখারের সাইকেল-বাগাটার দিকে চোরে থাকেন। কাগজ-আর লালকরা সাইকেলটা চোখে পড়ারমত লাগছে

হুমড়ানো মেলনও সোজা করে বসেন। জানালা দিয়ে সোনারউদির ঘরে কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বার কাগজগুয়ালো। হুঁকো হাতে শিকদার মশাই ঘুরে বসেন একেবারে। সামনের বন্ধ দরজার ওপর চটোখ আটকে থাকে। আহাবরত গৃহস্থায়ীর যুগের দিকে যেমন করে চেয়ে থাকে ঘরের পোঁরা বেড়াল—তেমনি। একটু বাসে দরজা খুলে বার। একটা ছোট ছেলে বা মেয়ে কাগজ দিয়ে বার তীকে। কাগজ নয়, উপোসী লোকের পাতে রাজভোগ দিয়ে বার যেন। হুঁকো বেঁকির কোণে রেখে শব্দযন্তে কাগজ খোঁসেন শিকদার মশাই।

কিন্তু আরো অবাক কাণ্ড, এত আগ্রহের পরে কাগজখানা পড়ে উঠতে পুরো মন মিনিটটো লাগে না তাঁর। পড়লে কটাখানেক লাগার কথা। কিন্তু তিনি পড়েন না, দেখেন। দেখা হলে কাগজখানা ভাঁজ করে পাশে রেখে দেন। ওই ঘর থেকে আবার কোনো বাচ্চা-কাচ্চা বেরিয়ে এলে দিয়ে গেলেন। বীরে মূহুে শিখল হাতে তামাক সাজেন আবার। একটা বাদামী রঙের ঠোড়ার বাড়তি টিক তামাক মজুত থাকে পাশে। ওদিকে কল-পারের কাশিপর্য সম্পন্ন করে শকুনি ভট্টাচার জ্বাল জ্বোজ্ঞ আগুড়তে আগুড়তে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকেন। কীসর ঘটী বাজিয়ে আরো খানিক ভগবানের নাম করেন। পাশাপাশি ঘরের বাসিন্দাদের নিত্রান্ত হয় তখন। অস্ত্রের খেলনা-বাটির মত খুব ছোট একটা এনামেলের বাটি হাতে জবাবুহুম সন্ধ্যা উপলব্ধি করতে করতে কমমতলার বেকএ এসে বসেন শকুনি ভট্টাচার।

বাটিতে গজাভল।

শিকদার মশাই তাড়াহাড়াই হুঁকো এগিয়ে যেন। গজাভলে হুঁকো শুদ্ধ করে নিয়ে তামাক খেতে খেতে শকুনি ভট্টাচার সেদিনের খবরের কাগজের খবরবার্তা শোনেন। মন মিনিটে পড়া কাগজের মর্ম হুঁকটা ধরে বলতে পারেন একাদশী শিকদার। কিন্তু তাঁর বলা না বলাটা শ্রোতার আগ্রহের উপর নির্ভর করে। আলোচনা জমে উঠলে হুঁকো হাতাহাত হতে থাকে ঘন ঘন, নতুন করে সাঁজা হয় তামাক। ছোট বাটির গজাভলে হুঁকো শুদ্ধ হতে থাকে বারবার। ইতিমধ্যে শ্রোতা এক হুঁকোর ভাগিদার আর একজন বাড়ে। কোণা-ঘরের রমণী পণ্ডিত। রাজ্য না হোক, প্রায়ই আসেন তিনিও। প্রায় অপরাধীর মতই গুটিগুটি এসে বেঁকির একেবারে কোণ-বেঁচে বসেন। বয়েস এঁদের থেকে কিছু কমই হবে। বাতিকুঁ দার্শনিক বৈদ্যিক অথবা ঘরোয়া আলোচনার সব কিছুতেই তাঁর অজুতমূলত বিমহ-মন্ত্র আগ্রহ। বোবা-মুখে বসে বসে তত্ত্বকথা শোনেন, আর মাঝে মাঝে একটু-আধটু নিরীহ শব্দ অথবা নির্দোষ বিষয় প্রকাশ করে বসেন। আলোচনাটা তখনি জমে। শকুনি ভট্টাচার আর শিকদার মশাইয়ের রসনা চড়তে থাকে। কারণ, রমণী পণ্ডিত মাহুবটা বত নিরীহ হোন, তাঁর যুগের অজ্ঞ কৃষ্ণের হাবভাষটুকু খুব সহজে বিলুপ্ত হয় না। কলে অজ্ঞ দুজনের মতব্য আর টিগনী প্রায় কটুস্তির মত শোনায়। কিন্তু অভিজ্ঞতার জেব গার বেঁচে না রমণী পণ্ডিতের। শুনে শুনে জ্ঞানার্জন করেন তিনি, এক আয়ো বায় দুই জিন তামাক সাজার কট্টা তিনিই করে বান। তিন হাতে তখন হুঁকো বলাডে থাকে আর গজাভলে শোম হতে থাকে।

শকুনি ভট্টাচারের ঘরে পতিতপাখীর অনিদেশ্য জুড়াই।

স্বলভান কুঠি থেকে গজা অনেক দূর। বীরাপদর বারণা পুণ্যও। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে পুণ্য চরন অথবা গজাজল সংগ্রহে বেশ পেতে হয় না একটুও। গজোদক এবং পুণ্যদানের ভাণ্ডারীও শকুনি ভট্টাচার্য। ব্রিগদ্যাক্সরী শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। পুণ্যের টুকুই হলেও হাতে পানেন। কিন্তু গজাজল? বীরাপদ বোকার মতই ভাবত আসে, কত গজাজল আসে কোথা থেকে?

এ বাড়ির যে-কোনো মহল্লার বা যে-কোনো ঘরের বারমাসি আচার অমৃতানি ক্রিয়া-কলাপের সমস্ত গজাজল শকুনি ভট্টাচার্য সরবরাহ করে থাকেন। এ বেলায় বুদ্ধবন্ত তিনি। পাত্র হাতে এসে ধাঁড়ালেই হল। এমনকি আপোপাশে কোনো পরিবারের খুড়িকা-ঘর পরিপোদনের জন্য একসঙ্গে দু'তিন বাগতি গজাজল দরকার হলেও সেটা অনায়াসলভ্য। অথচ ন'মাসে ছ'মাসে কোনো বিশেষ বোগ-ভিখা এলেই শুধু শকুনি ভট্টাচার্যকে কমগুলু হাতে গজাজলনে বেড়ে দেখা যায়। যাবার সময় খানিক ধৈর্য, খানিক ট্রামের সেকুও ক্লাসে চড়ে বান। কেরার সময় কমগুলুতে গজাজল নিয়ে ধৈর্যই করেন। ট্রামে বাসে চাপলে গজাজল অন্তঃ হয়ে বাবে। কিন্তু তাঁর গজাজলের কমগুলুটাও কি যথুহুদনদাদার ঘরের ভাঁড়ের মতই!

বীরাপদর অজ্ঞতা দেখে সোনারউদির একদিন হেসে সারা। এমন বুদ্ধি না হলে আর এই অবস্থা হবে কেন—এক সের দুধের সঙ্গে দু'সের জল মিশিয়ে তিন সের খাঁটি দুধ হয়, আর এক কমগুলু গজাজলের সঙ্গে কলের জল মিশিয়ে দশ বাগতি খাঁটি গজাজলও হতে পারে না?

ওই বকমই কথা-বার্তা সোনারউদির। সোজা কথা সোজা ভাবে বলে না বড়। তবু ব্যাপারটা বুকেছে বীরাপদ। কিন্তু গজাজলের সমস্তা স্বখন এত সহজকই মিটেতে পারে, শকুনি ভট্টাচার্যের ঘরের গজাজলের ওপরেই এত নির্ভর কেন সকলের সেটুকুই শুধু বোঝেনি।

ভূমি-মধ্যার উঠে ধাঁড়িয়ে বীরাপদ একচুপি বাইরেটা দেখে নিল। তারপর আবার বসল। একাদশী শিকদার এখানে আসেন নি। বেকিটা খালি। শ্রীহের সকাল আর একটু তাজা না হলে হাড়ে কুলোর না বোধ হয়। আজ এত ভোরে উঠেই পড়েছে স্বখন তাঁর সুখখানা একবার দেখার ইচ্ছে আছে বীরাপদর। কলে আজ আহাির না জোটে না-ই ছুটুক। ভুল্লোলকের নাম একাদশী নয়, শকুনি ভট্টাচার্যের নামও শকুনি নয়। স্বলভান কুঠির নামকরণ ও-হুটো। কুঠির এক দলল কাজিল ছেলের আবিষ্কার। প্রায় আট দশ বছর ধরে এই নাম হুটো প্রচার হয়ে হয়ে ছািহি লাভ করেছে। ওই নামে তাঁদের কাছে ডাকে চিঠি পূর্বত পাঠিয়েছে হুটু ছেলেরা। কিন্তু গোড়ার গোড়ার ভুল্লোলকের সব বাগ গিয়ে পড়েছিল বীরাপদর ওপর। তাঁদের ধারণা সেই পালের গোদা। কারণ, ও তখন ওই বাউগুলো-ছেলেগুলোকে একত্র করে একটু আধটু সংস্কার কাজে মন দিয়েছিল। খবরের কাগজ হাতে থাকলে এই স্বলভান কুঠির সংস্কার সাধনই ক্লাণ্ড প্রশস্তিষপত। কিন্তু সে সব পুরনো কথা। সংস্কারের বৌক বেশিদিন টেকেনি। ছেলেগুলো বোশির ভাগই চলে গেছে। ওই অক্ষর নাম হুটি যথেষ্ট গেছে।

নামহানির অমরীপার ও বেরনার কুন্ড এর কাতর হয়ে দুজনেই তাঁরা পোপনে একে একে বীরাপদর কাছেই জায়েলন আর প্রতিবার করেছিলেন। কিন্তু বীরাপদ প্রতিবার কিছু করতে পারেনি। কলে

বিবেহ। এতদিনে তাঁদের আসল নাম সকলেই ভুলেছে। এমন কি ওই নামে বাইরে থেকে কেউ বোজ করতে এলেও তাঁরাই বেরিয়ে আসেন। কিন্তু বিবেহটুকু থেকেই গেছে। এক কুঠিতে বীরাপদ তাঁদের সঙ্গে বাগ করে আসছে ট্রেনের এক কামরার নিম্পূহ বাড়ীর মতই। বোগ আছে, ভণু বাছির। কিন্তু সে নিম্পূহ থাকলেও তাঁরা নিম্পূহ নন সকল সময়। তাঁর নিম্পূহতাও সম্ভবত কোডর কারণ তাঁদের। বীরাপদর কাছে সেটুকুও উপভোগের বস্তু।

আজ সকালে উঠে একাদশী শিকদারের সুখখানি দেখার বাসনার পিছনে কারণ আছে একটু। গত তিন দিন ধরে আসের মতই আধ মাইল পথ ঠাঁড়িয়ে একটা ঈলের সামনে ধাঁড়িয়ে কাগজ পড়ে আসতে হচ্ছে ভুল্লোলকে। সোনারউদির স্বলভান কুঠিতে ডেরা নেবার আগে যেমন পড়তেন। গত দু'বছর তই যেহেনত আর করতে হয়নি। বাড়ির আঙিনার বসে কোলের ওপর কাগজ পেয়েছেন, হুটো বহুরে বয়েলও দু'বছর বেড়েছে। এতদিনের অনভ্যাসে ধাঁড়িয়ে ধাঁড়িয়ে কাগজ দেখার ধকল সর না। ঈলের সামনে হাটু বুড়ে বসতে হয়েছে তাঁকে। সেই অবস্থায় তিন দিনের মধ্যে ছাদনই বীরাপদর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেছে। দু'দশা দেখে দুঃখও হয়েছে, হাসিও পেয়েছে। সোনারউদির বা এরকম কেন। পাঠিয়ে দিলেই তো পারে।

গত তিন দিন ধরে সোনারউদির ঘর থেকে কদমতলার বেঁকিতে কাগজ বাচ্ছে না। সেলে আর ফুটপাথে বসে কাগজ পড়বেন কেন শিকদার মশাই। সুখ ফুটে তিনিও চেয়ে পাঠাতে পারেননি বোধহয়।

স্বলভান কুঠিতে একমাত্র সোনারউদির ঘরেই বৌজ সকালে খবরের কাগজ আসে।

একখানা নয়, দু'খানা আসে। একটা ইংরেজি একটা বাংলা। গুল্লা, অর্থাৎ পেশবাবু খবরের কাগজের অফিসের পাক। পোজ্ঞ প্রফ রিডার। ইংরেজি বাংলা দু'খানা নামকরা কাগজ বেবোর সেই দপ্তর থেকে। গুল্লা বাংলার প্রফ রিডার হলেও দু'খানা কাগজই বিনে পরসায় পায়।

আর খানিক বাদেই হরত শিকদার মশাই বেকিতে এসে বসবেন। তাঁর একটু পরে কাগজওরালা জানালা দিয়ে কাগজ ফেলে বাবে সোনারউদির ঘরে। নেশাগ্রস্তের মত চনমনিয়ে উঠবেন একাদশী শিকদার। ঘরে বসে বস্তু দরজার দিকে চেয়ে থাকবেন ট্রিনিমিয়ে। দরজা এক সময় খুলবে ঠিকই, কিন্তু কেউ কাগজ দিয়ে বাবে না তাঁর কাছে।

তারপর শকুনি ভট্টাচার্য আসবেন। খবরের কাগজের খবর নিয়ে কথা উঠবে না নিতরই। শিকদার মশাইয়ের প্রাতঃকালীন খবর পাঠে একটু বিষ উপস্থিত হয়েছে তিনিও জানেন। দু'দিন ধরে সকালের আসরে যমগী পণ্ডিতকে দেখা যাচ্ছে না। এঁদের মন মোজাজ বুঝেই হরত কাছে বৈষতে সাহস করতেন না।

অবস্ত সবই বীরাপদর অমুমান। অমুমান, ভট্টাচার্য এক শিকদার মশাই গলুকে নিফুতে ডেকে নিয়ে কিছু আলোক দান এবং কিছু পরামর্শ দান করেছেন। সঙ্গাতাভিজ্ঞ ওভারী প্রতিবাসীর কর্তব্য-বোধ তো এখানে জগত থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি একেবারে। তাঁর ওপর গুল্লা নির্বিচিক মাইহ, কোনো কিছু

সাজে-পাঁচে নেই। সকলেই ভাসে গুল্ম ভাসো মাছুয়। নিজের আশিস নিয়েই ব্যস্ত সর্বনা। কোনো সপ্তাহে সকালে ডিউটি, কোনো সপ্তাহে বিকেলে, কোনো সপ্তাহে বা রাত্তিরে। রাত্তিরে অন্ধ সন্ধ্যা রাত। এর ওপর আবার বাড়তি বোজগারের লজ হাসির মধ্যে হু' সপ্তাহ ডবল শিকট ডিউটি করে। ঘর দেখার কুসস্ত কোথায় তার ?

কিছু তার নেই বলে কি আর কারো নেই। ভনী বক্তি নিজের ঘরের দিকে তাকাবার কুসস্ত না পেলেও আর দশ ঘরের নড়ির খবর রাখে। আর, কর্তব্য-চেতন ভনী পড়শী নারীনক্সের খবর রাখে। এতো এক বাড়ির ব্যাপার। অতএব কর্তব্যবোধেই উচুচাব আর শিকদার মশাই ভাসো-মাছুয় গুল্মার জটিল রমণীটির হাতচালেন ওপর ঘর দুটী রাখবেন সোটা বেশি কিছু নয়। আর কর্তব্যবোধেই তাঁরা ভাসো মাছুয়টিকে একটু আধটু উপদেশ দেনন তাই বা এমন বেশি কি।

তবে তাঁদের এই কর্তব্যবোধ সবচেয়ে একটু আভাস বীরাপদ রমণী পণ্ডিতের কাছ থেকে আগেই পেয়েছিল। কিন্তু বীরাপদ তখন তুলিয়ে ভাবেনি কিছু। অনর্থক অমন অনেক কথাই বলেন রমণী পণ্ডিত। কী-মত সকলের সঙ্গেই একটু হুতা বজার রেখে চলেতে চেষ্টা করেন। বীরাপদ সেদিন কুঠির দিকে আসছিল আর ভিনি হাঙ্কলেন কোথায়। পথে দেখা। বাড়িতে দেখা হলে না গেবেই পাশ কাটিয়ে থাকেন। পথটা বাড়ির থেকে অনেক নিরাপদ বলেই হরত গাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হাসিমুখে বেঙাবে কুলল জিজ্ঞাসা করেছেন, মনে হবে, অন্তরঙ্গ পরিচিত জনের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা। শেষে বলেছেন, আজ এরই মধ্যে বাড়ি কিংছেন ? তা কি-ই বা করবেন, বেরকম বাজার পড়েছে চট করে কিছুই আর হয়ে ওঠে না—অনেক দিন ডেবেছি আপনার হাতখানা একবার দেখব, তা আপনার তো আর ওসব বিশ্বাস টিখাস নেই—তবু দেখাবেন না একবার, আপনার তো আর পরশা লাগছে না।

বীরাপদ হাসিরখেই মাথা নেড়েছিল বোধহয়।

বাচ্ছেন ? আজ্ঞা বান-পুতুর ঘরে শিকদার আর উচুচাব মশাইকে দেখলাম বলে গু' বাবুর সঙ্গে গল্প-গল্প করছেন—

অকারণে বোকার মত একটু বেশিই যেন হেসেছিলেন পণ্ডিত। গুল্মকে বাড়ির কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতে দেখে না কেউ। কখন থাকে না থাকে হিম্ব পাওয়ারি ভায়। সেই গুল্মার সঙ্গে মজা পুতুরের ঘরে বসে গল্প করছেন একাদশী শিকদার আর শকুনি উচুচাব-ভাবলে ভাবার মত কিছু ছিল বই কি। পণ্ডিত সেদিন বোকার মত হাসেন নি। বোকার মত সে-ই বঙ্গ ওই পণ্ডিতের দুঃশার কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে কিংছিল। বড় আশা ভ্রাসোকের শহরে জাঁকজমকের মধ্যে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে গদার খুলে বসেন। জ্যোতির্বার্ষ্য হবেন। যন্ত সাইনবোর্ড মুল্যে। হু'-পাঁচ জন সাগরের থাকবে, রীতিমত অকিস হবে—চকচকে বকবকে হু'-পাঁচটা গাতিও এসে গাঁড়াবে দোরগোড়ায়। সবই হত, অভাব শু' মূল্যের। সবলের মধ্যে অনেকগুলো ছেলেপুলে আর কতী স্ত্রী। হাঁড়িতে জল কোটে, বোকারে চাল। তবু আশা পোষণ করেন রমণী পণ্ডিত।

তাঁর মোহ নেই। আশা আর বাসা ছোট করতে নেই।

পণ্ডিতের সেই বোকা-হাসির অর্থ বীরাপদ পরে বুকেছিল। এখানে দিন বাপদের একটানা ধারটা আচম্কা থাকার ওলট-পালট হয়ে বাবার পরে। বাকিটুকু বুকেছিল, সেই সঙ্গে সকালে একাদশী শিকদারের খবরের কাগজ বন্ধ হতে দেখে। একটার সঙ্গে আর একটার বোগ অল্পমান করা কঠিন হয়নি। অনেক কিছুই অল্পমান করা সম্ভব হয়েছে তারপর। সেদিন গাঁড়িয়ে শুনেলে রমণী পণ্ডিত হরত আরো থানিকটা আভাস দিতেন। কারণ এর আগে শকুনি উচুচাব আর একাদশী শিকদারের কর্তব্যবোধের থকলটা তাঁর ওপর দিয়েই গেছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ভ্রাসলোক কোথা-ঘরে পাগিয়ে বেঁচেছেন।

সচকিতে জানালার দিকে বাড়ি ফেরাল বীরাপদ। কদমতলার ঘানের আশা করেছিল তাঁরা নয়। তার জানালার এসে গাঁড়িয়েছে সোনারউদি। বুধে-চোখে সত যুগ-ভাড়া জড়িমা। চূপচাপ দেখে যেতে এসেছিল বোধহয়। ধরা পড়ে অপ্রতিভ একটু, কিন্তু এত সকালে কয়ল মুড়ি দিয়ে শস্যার ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক আরো বেশি। এগিয়ে এসে এক হাতে জানালার গদান ধরে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার। কার ঘান হচ্ছে ?

কয়ল কেলে বীরাপদ উঠে গাঁড়াল। কিন্তু দরজার দিকে এগোবার আগেই সোনারউদি বাধা মিল আবার, ধাক্কা দরজা খুলতে হবে না, এই সাত সকালে ও-ধর থেকে আমাকে বেরতে দেখলে বাটের কাশি একবারে বাটে পাঠিয়ে ছাড়েবে।

হেসে চট করে বাড়ি কিংরে কদমতলার দিকটা দেখে নিল একবার। তারপর ঐকং কৌতুকভরা হু' চোখ বীরাপদের বুধের ওপর এসে থামল। শুধু কৌতুকভরা নয়, সেই সঙ্গে প্রেমের সন্ধানীও। গারে কয়ল না থাকার একটু শীত শীত করছে বীরাপদর। কিন্তু সোনারউদির শীতের বালাই নেই। শাড়ির আঁচলটাও গারে জড়ান, জন্ত শৈখল্যে কাঁধের ওপর পড়ে আছে। রাতের নিজায় মাথার চুলও কিছুটা আবন্ত। তিনটি ছেলেমেয়ের মা সোনারউদিকে রূপসী কেউ বলবে না। গারের রঙ কসাঁও নয়, কালোও নয়। নাক মুখ চোখ সুলভও নয়, কুংসিতও নয়। স্বাস্থ্য খুব ভালও নয়, তেমন মলও নয়। তবু ওই ভারী সাধারণের মধ্যেও অত কিছু যেন আছে বা নিজের আগোচরে বীরাপদ অনেক সময় বুজেছে। আজকের প্রথম উভার জয়াজী সুলতান কুঠিরও একটা ভিন্ন রূপ দেখেছে। বীরাপদর লোভ হল, এই সকালে সোনারউদির হুখটির দিকে ভাসো করে তাকালেও সেই অত-কিছু হরত চোখে পড়বে। কিন্তু সোনারউদি যে-ভাবে দেখছে ওকে, ওর পক্ষে তিরে সেই ভাবে তাকে দেখা সম্ভব নয়।

বিস্তৃত বুধে বীরাপদ লাগধরা দেয়ালটার দিকে চেয়ে হাসল শুধু একটু।

একেবারে রাত কাবার কয়েই কোরা হল বুধি।

হালকা সুর, হালকা প্রঙ্গ। মাঝের এই ক'টা দিন হেঁটে কেলতে পারলে একেবারে স্বাভাবিক। বাড়ি কিংরেও বীরাপদ বুধের দিকে তাকতে পারল না ঠিক মত। কারণ, সোনারউদির হু'চোখ তখনো ওর বুধের ওপর বিলম্বারত। নিরন্তর দুটী ভারী কাঁধ-বেঁচে কদমতলার থালি বেকিটার ওপরে গিয়ে পড়ল। কলে

সোনারউদি চকিতে আরো একবার কির দেখে নিল সেখানে কেউ এসেছে কি না।

হাতটা কোথায় ছিলেন কাল ?

বীরাপদ জবাব দিল, এই ঘরেই।

এসেন কখন, হাক হাতে ?

সোনারউদির গলার বিক্রপে এই সুরটা শুনেতে বেশ।—না, পেছটার হাতেই।

ওমা, আমি তাহলে কি কচ্ছিলাম। ভেগে ব্লুজিলাম বোধ হয়। বড় নিশ্বাস ফেলল একটা, তারপর পলকে আর একবার আপাধ-মস্তক দেখে নিয়ে বলল, ঘটনাক্রমে বাদে একবার ঘরে আগবেল, একটু কাজ আছে।

সোনারউদি চলে বাবার পরও বীরাপদ চুপচাপ ঝাঁড়িয়ে রইল ধারিকল্প। ভাবছে, মাঝের এই কটা দিন কি মিথ্যে ? কিছুই ঘটনি ? মিথ্যে নয়। ঘটছেও। কিন্তু বা ঘটছে তার থেকেও বীরাপদ আজ অবাক হল আরো বেশি। ঘটনাক্রমে বাদে ঘরে যেতে বলে গেল ওকে। ঠিক আদেশও নয়, অনুরোধও নয়। ওই রকম করেই বলত আগে। কিন্তু আগের সঙ্গে তো এখন অনেক তফাত। আবার কি তাহলে আপস হবে একটা ? বীরাপদ আর তা চার না। সোনারউদির সব মানায়, আপস মানায় না।

জানালার দিগে বাইরের দিকে চোখ বেতে আর ভাবা হল না। হ'কো আর তামাকের চোঁড়া হাতে শিকারী বশাই আর গলাজলের বাটি হাতে শকুনি ভটচাষ এক সঙ্গেই এসে কলম্বোয়ার বেড়িতে বসলেন। আর কাগজ আসে না বলেই বোধহয় শিকারী মশাইয়ের আগে আসার ভাড়া নেই। হাত বসলে বসলে প্রথমে চুপচাপ ধারিকল্প তামাক টানলেন তাঁরা। তারপর একটা চুটো কথা। কি কথা বীরাপদ এখান থেকে জানবে কি করে। কিন্তু কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসে ছকেনেই তাঁরা বাড়িটার দিকে তাকালেন। প্রথমে গুল্লার ঘরের দিকে, তারপর এরিকে। জানালার এখানে ওর ওপর চোখ পড়তেই ভাড়াভাড়ি কির বসলেন আবার।

কিন্তু মুখ দেখে খুব কষ্ট মনে হল না বীরাপদের। বরং ভুট বেন কিছুটা। একটা ছুট বৃদ্ধি লাগল হঠাৎ। ওই বেড়িতে গিরে বসলে কি হয় ? সম্পত্তি তো নয় কারো। বসুক না বসুক, ঘরের বড় ঘরজাটা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে লাল সাইকেল হাঁকিয়ে কাগজওয়ালার আবির্ভাব। একাদশী শিকারীর হ'কো টানা বড় হল। কাগজওয়ালার কাগজ ফেল গিরে প্রস্থান করল। সত্বক নেড়ে ঘরের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। তাঁর হাত থেকে হ'কো টেনে নিলেন শকুনি ভটচাষ খেয়াল নেই। পানের ঘরের দোরগোড়ায় বীরাপদ ঝাঁড়িয়ে আছে তাও না। কাগজ পাবেন না জেনেও এভাবে ভুললোক প্রতীক্ষা করেন নাকি বোঝ।

কিন্তু সলতান হুটির আজকের এই দিনটাই বেন অভ সব দিনের থেকে আলাদা। হু'চার মিনিটের মধ্যেই বেসুজটি দেখল, বীরাপদ নিজেই হতভম্ব। আধ হাত ঘোমটা টেনে কাগজ হাতে বর থেকে বেরল ঘর সোনারউদি। কুলবুদু নর-মহর চরণে কামতলার বোঁদার দিকে এগিয়ে গেল। শিকারী বশাই বোঁদে ছেড়ে উঠে ছাড়াবল শপথকে। সঙ্গে সঙ্গে শকুনি ভটচাষ। কাগজখানা

হাতে নিয়ে একাদশী শিকারীর সসন্মুখে বসলেন কিছু। হরত নিজে কাগজ নিয়ে আসার জন্তেই বসলেন কিছু।

এটুকু দেখেই বীরাপদ অবাক হয়েছিল। পরের কাণ্ডটা দেখে ছই চোখ বিস্ফারিত তার। গলার শাড়ির আঁচল ভড়িয়ে ছ'জনকেই একে একে প্রণাম করে উঠল সোনারউদি। যেমন তেমন প্রণাম নয়। ভক্তি-লসিত প্রণাম।

বিস্ময়াভিত্ত শিকারী-ভটচাষের বৃগুপং আশিস-বর্ষণ শেষ হবার আগেই তেমনী ধীর-অন্ত চরণে কিরল আবার।

আধ-হাত ঘোমটা সম্বোধ বীরাপদকে দেখেছে নিশ্চয়। কিন্তু কোনোরকমে না তাকিয়ে সোজা ঘরটুকু গেল।

বিমুঢ় মুখে বীরাপদ নিজের বিছানার এসে বসল।

ছোটখাট একটা ভোজবাজি দেখে উঠল বেন। এ পর্বত সোনারউদির অনেক আচরণে অনেকবার হকচকিয়ে গেছে বীরাপদ। সে সবই তার স্বভাবের সঙ্গে মেলে। এ একেবারে বিপরীত।

—সোনারউদি কড়াপাকের সন্দেশ রে, লাগলে মাথা কাটে, আসলে শারাপ নয়।

খট করে 'হুয়' কথা কটা মনে পড়ে গেল বীরাপদের। বসু বলত। রবেশ। গুল্লার ছোট ভাই। এঘর সঙ্গে বোপাবোসের অনেক আগেই এই সোনারউদির কথা শোনা ছিল বীরাপদের। মস্ত সন্তুষ্ট পণ্ডিতের মেয়ে নাকি। কিন্তু পণ্ডিত হলে হবে কি, ইফুলমাঠারের আর আর কত। তার ওপর মেয়েও একটা নয়। তাই তাদের মস্ত ঘরে এসে পড়েছে, নইলে সোনারউদির মত--

তথাকার এই অদেখা সোনারউদিকে নিয়ে বীরাপদ ঠাট্টাও কম করনি।

হঠাৎ বসু কথা মনে হতে বীরাপদ জোরে বাতাস টানতে চেষ্টা করল একটু। বিরতই হল। মনে পড়ে কেন। এত নিপুণতা সম্বোধ এখানে বুকব কোথায় এভাবে টান পড়ে কি করে।

হু'তাইকে পাশাপাশি দেখল সোনারউদির ভাবা শক্ত। বেস্ট-খাট গোলগাল চেহারা গুল্লার—ধপধপ কর্স। রত। সুবী আল। বসু ঠিক উঠো। কলেজে পড়তেই বীরাপদের কেমন মনে হত ছেলোটা বেশিদিন বাঁচতে আসেনি। খুব ঘুরেব কিছুই সঙ্গে কেমন বেন বোপ ওর। আধময়লা, বোগা লখা চিরকল্প মৃতি। কথাবার্তা কম বলত, বেশিদিন টিকবে না নিজেই বুঝেছিল বোধহয়।

সোনারউদির সঙ্গে বীরাপদের সাক্ষাৎ এক পরিচয় হাসপাতাল থেকে রথুকে বাড়ি নিয়ে আসার পরে। গুল্লার বাড়ি বলতে তখন এক আধা ভক্ত-বস্ত্রী ছ'খানা পুশি ঘর। হাসপাতাল থেকে জবাব হয়ে গেছে। একটা চোঁড়া বাকি। পিঠের খুন-বরা ছোড়ের গোটা অশ্রুটা কেটে বার দেওয়া। সে-স্মারেশনও তখন রাজ্যজের কোথায় হয়, এখানে হয় না। চিকিৎসা বলতে টাকার খেলা।

গুল্লা ঘাবড়ে গিয়েছিল। আরো বেশি ঘাবড়েছিল রোষ্টিকে আপাততঃ বাড়ি নিয়ে যেতে হবে ভনে। চৌক ঘিলে কিবা একাশ করছিল, কি রে করি, ইয়ে--দামার ওখানে একটু অস্বস্তি আছে।

বিপদের সময় সেই মিনমিনে ভাব দেখে বীরাপদ চটে গিয়েছিল। জোরজোর করে রথুকে সেই একরকম ওখানে এনে ফুসেছিল। বসেছে, অস্বস্তির কথা পরে ভাবা বাবে। সোনারউদি খুব বুঝে

সেই দু'ঘন্টার এক ঘন্টা সব ব্যবস্থা করে বিতরণ ছিল। কিন্তু তার দু'ঘন্টার দিকে চেয়ে বীরপদার মনে হয়েছিল কাজটা ভালো হল না। আর মনে হয়েছিল, গুলার অনুবিধার কারণ বোধহয় ইনিই। হাসপাতালেও কোনদিন দেখিনি মহিলাকে। রত্নর দু'ঘন্টার দিকে চেয়ে হারা হত বলেই কোনদিন তার কথা ভিজ্ঞাসা করেনি। নইলে বীরপদার মনে হত ঠিকই।

তবু মনে হওয়া নয়, তারপর কানেই শুনেছে হয়েছিল অনেক কিছু। হাসপাতাল থেকে রত্নকে নিয়ে আসার দিন ভিনেক পনের কথা। বিকালের দিকে গুর বিজ্ঞানার পাশে বীরপদ বসেছিল। পাশের ঘর থেকে নারীকণ্ঠের চাপা তর্জন শোনা গেল। শোনাতে হয়ত চারদিন, কিন্তু যেমন ঘর না শুনে উপায় নেই। যেখান থেকে হোক টাকা বোপাড করে পাঠিয়ে দাও, টাকা নেই বলে কি এখন অস্তিত্ব, মরতে চলে।

আঃ, লোক আছে ও-ঘরে। গুলার গলা।

থাক লোক। আর দুটো দিন সবুজ করে বেখানে পাঠাতে বলছে ওরা একবারে সেখানে পাঠালেই হত, সাত ভাড়াভাড়ি এখানে এনে তোলায় কি দরকার ছিল?

স্বাভিভে দুটোখ বোঝা ছিল রত্নর। কানে গেছে নিশ্চয়। কিন্তু একটুও বিরত বোধ করছে বলে মনে হল না। বহু বীরপদই না বলে পারেনি। হালকা ঠাট্টার ফিসফিস করে বলছে, তোর বউদি কড়াপাকের ছানার সন্দেশ না টেটের সন্দেশ রে?

চোখ মেলে যুগ্ম অঙ্গ একটু হেসেছিল মনে আছে। নিলিগু দু'ঘন্টা বসেছিল, টাকা আদায় করার জন্য ও-ভাবে বলছে। বীরপদ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু রত্নর বিশ্বাস দেখে অবাকই হয়েছিল। সেই বিশ্বাসে একটুখি বিশ্বাস নেই।

অবাক বীরপদ আগে হয়েছিল। সেটা তার পরদিনই দু'ঘন্টার দিকেই এসেছিল—যেমন আসে। কিন্তু ঘরে ঢোকায় আগেই সোনারবউদি এগিয়ে এলো। বলল, ও বন্ধুছে, এ-ঘরে আছেন, আপনাদের সঙ্গে কথা আছে—

সংকোচ কটিয়ে বীরপদ তাকে অন্তরঙ্গ করে অন্য ঘরটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। এ ঘরটা আরো অপরিষদ। মেঝের একদিকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বন্ধুছে, অন্যদিকে একটি চার পাঁচ মাসের শিশু শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। কোণ থেকে একটা গোটাচোরা ছাড়া নিয়ে সোনারবউদি আখখানা পেতে দিয়ে বলল, বন্ধু—

অনতিদূরে নিজের মেঝেতে বসল পা গুটিয়ে। হুই এক পলক ওকে দেখে নিল তারই মধ্যে। বিপদের সময় আর লজ্জা করে কি হবে, তাই ভাকলুম। আপনাদের সঙ্গে ঠাকুরপোয় অনেকদিনের পরিচয় শুনেছি, আপনাদের কথা প্রায়ই বলত—

পরম্পর লোক বা বে জন্মেই হোক, বীরপদ যেমন উঠেছিল। সোনারবউদি আর এক নজর দেখে নিল ওকে। বীরপদার মনে হল, কিছু বলবার আগে যেন বাচাই করে নিল আর এক প্রশ্ন।

আপনি কি করেন?

কথা আছে বলে ঘরে ডেকে এনে বসিয়ে এ আবার কি প্রশ্ন। বীরপদ কীপরে পড়ল। তেমন কিছু না—

সে তো জানি, তেমন কিছু করলে আর এ বাড়ির সঙ্গে বন্ধু হবে কেন? ভাল একটু, ভীষণর গোলাবস্তি ভাঙানো

দু'ঘন্টার দিকে। বন্ধুর চিকিৎসার জন্য দাঁপাডক টাকা আদানাকে কেউ ধার দিয়েছে শুনে লোকে বিশ্বাস করবে?

বীরপদার দু'ঘন্টার অবস্থা কেমন হয়েছিল কে জানে। কারণ তার দিকে চেয়ে সোনারবউদি হেসেই কলোছিল।—ভয় নেই, আপনাকে ধার করতে বেড়তে হবে না, কাল একটু সকাল সকাল আদান, বিশেষ দরকার আছে—আর, কাউকে কিছু বলবেন না।

সকাল সকালই এসেছিল পরদিন। এসে দেখে সোনারবউদি কোথায় বেরবার জন্য প্রস্তুত। বাচ্চাগুলো ঘরের মধ্যে বন্ধুছে আগের দিনের মতই। বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে ঘরের শিকল ফুলে দিল।—আদান।

ভিনটে বাচ্চাকে এঁটভাবে ঘরে বন্ধ করে কোথায় যেতে চায় বীরপদ কিছুই বুঝল না। ভিজ্ঞাসা করারও কুরসত পেল না। বাচ্চার এসে সোনারবউদি নিজে থেকেই বলল, ভালো একটা গয়নার দোকানে নিয়ে চলুন, কলকাতার থাকলেও কিছুই চিনি না—।

বীরপদও ভেমনই—চেনে গয়নার দোকান। তবে হুই একটা দেখেছে বটে।

সোনারবউদি গয়না বিক্রি করল। সেখানে আমলের ভারী গোট তার একটা। সোনার লম চড়া। মোটা টাকাটি পেল। চুলচেরা হিসের বুকে নিয়ে, খাসের সম্ভাব্য পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে অনেক ককাকাকি করে তারপর টাকা নিল। তবু সংশয় যায় না, ঠকল কি না সারাংশ চুপচাপ তাই ভাবছিল বোধহয়।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বলল, ঠাকুরপো বা কাউকে কিছু বলবেন না—ভালো এটা গুপ্তই ভিনিস, তবু শুনেল তুংখ পাবে।

গয়নার দোকানে সোনারবউদির দর ককাকাকি কেন জানি বীরপদার ভালো লাগছিল না। বাচ্চাগুলোকে ওভাবে ঘরে বন্ধ করে আসাটাও না। রত্নর ভিনিস শোনাযাত্র মনটা বিরক্ত হবার সুযোগ পেল যেন। রত্নর মা-ঠাকুরমা খুব সম্ভব ওর নামে রেখে গেছেন। বিক্রির জন্য সেটা বিশ্বাস করে বীরপদার হাতে না ছেড়ে দিতে পারাটা অজ্ঞান নয়। কিন্তু ও-কাজটা তো গুলুকে দিয়েও হত। এত অবিশ্বাস আর এত গোপনতা কিসের? রত্নর পাশে এসে বসা মাত্র সে ভিজ্ঞাসা করল, কি রে তার বিক্রি করে এলি?

বীরপদ অবাক। সাহসে নিয়ে বলল, করব না তো কি, হার খুয়ে জল খাবি? হুই জানলি কি করে?

হাসল একটু।—আমি হাসপাতালে থাকতেই জানতুম এবার ওটা খসবে। বীরপদ বিরক্ত হচ্ছিল, কিন্তু পরের কথাটা শুনে বিষময়ে ধমকে গেল। যুগ্ম বলল, ও-টুকুই ছিল সোনারবউদির—

সোনারবউদির। কিন্তু তিনি বে বললেন ওটা তোর?

বলল, না। খুশিতে গোটা দু'ঘন্টা উঠেছিল রত্নর।—সোনারবউদি ওই রকমই বলে। প্রথম অস্থানে ওটা বার করে বলেছিল, এই দিয়ে চিকিৎসা করে। আমি বহুদিনের দরকার হলে পরে দেব। সেই থেকে ওটা আমার হয়ে গেছে।—ওটা ওর দিদিমার দেওয়া।

বীরপদার মনে আছে তুলতান কুটির এই ভূমিশবার সেই একটা রাতও প্রায় বিনিদ্র কেটেছিল তার। সমস্তকণ কি ভেবেছে আবেল-তাবেল, আর কেমন যেন হটকট করেছে। আর থেকে থেকে মনে হয়েছে, রত্নর মত সেও যদি ঠিক অবদান করে সোনারবউদি

হলে ডাকতে পারত। পারলে বলত, সোনারডাকি তোমার ওপর বড় আবিচার করেছিল। মোহ মিথ না।

বুণ্ডা মারা গেছে।

ভিকরে ভিকরে বীরপদ আবারও একটু নাড়াচাড়া খেয়েছিল। মারা গেছে বলে নয়। যাবে জানতই। কিন্তু এমন বিশেষ বিস্ময় কল্পনা করেনি। যেন কোনো যাত্রাপথের মাঝখানে দিন-কতকের জঙ্গ খেয়েছিল। সমর চল, চল গেল। তারপর কেউ এলো থবর করতে। থবর পেল, নেই—চলে গেছে।

বীরপদও থবরটা পেয়েছিল অনেকটা সেইভাবেই। বণ্ডকে মস্তাজে পাঠানোর পর আর রোজ আসত না। পাঁচ সাত দিন পরে পরে এসে খোঁজ নিয়ে যেত। কথাবার্তা গুলার সঙ্গেই হত। একটা অপারেশান হয়ে গেছে—আরো একটা হবে—তাও হয়ে পেল—হ্যাঁ ভালই আছে বোধহয়—ও, তুমি জান না বুঝি? আজ চারদিন হল মারা গেছে।

গুণ্ডার অফিসের তাড়া—তাই ছেড়ে নিজে মরলেও গ্রেস অপেক্ষা করবে না। বরের মধ্যে তেলে আব মেয়েটা ছোটোপুটি করছে, কোলের শিশুটা শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁছে। সোনারডাকি কলতলায় জামাকাপড় কাচছে।

...যে নেই, তার লাগও নেই।

গুণ্ডা বসতে বলে গেছে তাকে, সোনারডাকির কি কথা আছে মাকি।

এককালে রবি ঠাকুরের কিছু কবিতা পড়েছিল বীরপদ। স্বর্গচ্যুত কোনো শাপশ্রুত দেবতার বখান মাটিতে টান পড়ে—শোকস্তীন স্থিতিতন স্বর্গভূমি নিম্নলক উল্লাসীন ভুখনো। কিন্তু মাটির শেকল-ছেঁড়া মাড়বের শোকে বশুধবার আকুল কান্না। কবির চোখে সেই শোক হাসরের সম্পদ। স্বর্গের সঙ্গে মর্তীর এইটুকুই তফাত।

বীরপদের হাসি পাচ্ছিল, ভুখাত বচতে থব দেখি নেই।

আড়ত গারে লাড়িটা বেশ করে জড়িয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সোনারডাকি এসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা এবারে শেব হল বোধহয়?

জবাব না দিবে বীরপদ চপচাপ মুখের দিকে চেয়েছিল। নিজের অগোচরে শোকের লগ খুঁজছিল হয়ত...গভীরই দেখাচ্ছে বটে। ছেলে-মেয়ের চেচামেচিতে মহিলা একবার শুধু কিরে তাকাতাই সভরে থব রেড়ে পালালো তারা। ভয়টা স্বাভাবিক হাফের হাতে তাদের নিগ্রহ বীরপদ নিজের চোখেই দেখেছে। সোনারডাকির হুঁচোখ তার মুখের ওপর নিবন্ধ চল আবার। আপনায় লাল হলেন, হস্ত বড় বাড়িতে নাকি থাকেন আপনি, আর, একটু চোঁটা করলে আমালবও সেখানে জায়গা হতে পারে। তাঁর ধারণা আমি আপনাকে বললে আপনি সে চোঁটা করবেন—বলছি না বলে রাগ। কিন্তু, বন্ধ থাকতেই করেননি বখান এখন আর কেন করবেন বুঝি না।

বীরপদ ঠা করেই চেয়েছিল ধানিকঙ্কল। ঠোনো বণ্ডকে ঠোন ভুলে দেওয়ার আগে পর্যন্ত অফিস কামাই করেও গুণ্ডা হায়ে হায়ে স্থলতান কুঠিতে আসত বটে। ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে পরামর্শ করত, মিনমিন করে নিজের সুবিধে-অসুবিধের কথা বলত। বাড়িটাও একদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছিল যখন পড়ে।

৩০—৩

ঠিক এই মুহুর্তে এই বার্ষিক কথাগুলো না তুললে বীরপদ কিছু মনে করত না। এমন কি, বণ্ডর এসেছে হুঁচোখ কথা কলার পট্টেই যদি বলত তাহলেও ব্যাথা লাগত না। কিন্তু লম্বা সম্বন্ধে সোনারডাকির বলার ধরনটা বিচিত্র মনে হয়েছিল।

গুণ্ডা মনস্তাত্ত্বিক নয়, থবরের কাগজের এক বিভূয়। সোনারডাকি বললে সে চোঁটা করবে এটা বুঝেছিল কি করে? কিন্তু কে-কবেই হোক, বুঝেছিল ঠিকই। বীরপদ চোঁটা করেছিল। যে চলে গেছে তার শোক আঁকড়ে কে কদিন বসে থাকে? স্বাধী কার নেই... বণ্ডর জায়গা দখল করার একটুখানি প্রবন্ধ লেখা কি ওর ভিতরেও উদ্ভিক দেখান? না দিলে সোনারডাকির কথাগুলো অলঙ্কার তাগিনের মত অমন আঁতরত মনে লেগে থাকত কেন। আর, তাদের এখানে নিয়ে আসার জঙ্গ বীরপদ অমন এক অদ্ভুত কাণ্ডই বা করে বসেছিল কি করে।

বসাতকমে কোণা-থব দুটো খালিই ছিল তখন। বালির অযোগ্য নয়; তবে স্থলতান কুঠির অতটু ঠাই পেলে ওখানে সাধ করে ঠাই মেওও না কেউ। সপরিবারে গুণ্ডাকে ওখানেই এলে তোলা যেত। আর ভুললোক থাক ফেলে বাঁচত তাহলেও।

কিন্তু বীরপদের বাসনা অস্বাভাবিক।

রমণী পণ্ডিতকে ওখানে ঢালান করার সুযোগটা ছাড়েনি সে। বীরপদ নিজের মনে হেসেছে আর নিজেকেই পাখও বলে গাল দিয়েছে।

তার পাশের ঘরেই সোনারডাকির সঙ্গার—সেখানে তখন থাকতেন রমণী পণ্ডিত। অনেকগুলো ছেলে-মেয়ের মধ্যে মেয়েটি বড়। বড় বলতে বড়র তের চৌদ্দ বয়স তখন। রমণী পণ্ডিতের সাধ ছিল মেয়ে দেখাপড়া শিখবে, চাই কি আই-এ বি-এ পাশ করবে। ছেলের থেকেও আজকাল দেখাপড়া ভাল। মেয়ের কলর বেশি। বীরপদ অনেকবার তাঁকে বলতে শুনেছে, মেয়ের হাতটিতে বিভ্রান্তি বড় শুভ। কিন্তু মেয়েকে বিভ্রান্ত খোঁজাড়ে চলে দিতে না পারলে সরস্বতী ঠাকুরান বেচ এসে হাতে বসবে না। আশা পূরণের একটাই উপায় দেখেছিলেন রমণী পণ্ডিত। যবে মেয়ে বীরপদ যদি মেয়েটাকে প্রথম ধাপ অর্থাৎ, স্থল কাইজালান পার করে দিতে পারে তাহলে বাকি ধাপগুলো মেয়ে নিজেই টপাটপ টপকে যাবে।

বীরপদ রাজি হয়েছিল। রাজি হয়ে আঁথ জলে পড়েছিল। মেয়ের হাতে বিভ্রান্তি বড় শুভ। হগেজ ততো নয়। বোঝই পড়তে আসত। মুখ বুক পড়ত বা পড়া শুনত। চৌদ্দ বছরের মেয়ে কুমুর ঠেঁয়ের অপবাদ দিতে পারত না বীরপদ। সে অপবাদটা বরং ওর নিজেই টপা। সে নিজেই হাল ছেড়েছিল।

কিন্তু কুমুর হাতে বিভ্রান্তি বরং বড় শুভ, রোজ সকালে একগালা বই হাতে তার কাগমন ঠেঁয়াকি কি করে? দিনকে দিন বীরপদ নিজেই হতাশ হয়ে পড়ছিল।

নি-খচায় মেয়ের বিভ্রান্তিভের ব্যবস্থা করার সময় স্থলতান কুঠির নীতির পাচারদার চুঁচি কথা মনে হয়নি রমণী পণ্ডিতের। একাদশী শিকার আর শকুনি ভট্টাচারের কথা। দিনকতক চপচাপ দেখলেন ঠায়া, তারপর ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন। বীরপদের অবস্থা টের পাওয়ার কথা নয়, কোরের মাথার রমণী পণ্ডিতই একাশ করে দিয়েছেন। কি বকর মাছের ঠায়া বলুন জে—ওই

কীট মেয়ে—আর আপনি এমন একজন বিশিষ্ট জরাজীর্ণ, কারো সন্তান সেই পাতে সেই, আমার অল্পবয়স্ক ঠেকতে না পারে নয় করে মেয়েটাকে শক্তাচ্ছেন একটু—তাতেও ওদের চোখ টাটার। নীচ নীচ, একদম নীচ। বুঝেন? আমি নিজে হাত দেখছি ওদের—কোথাও কিছু ভালো নেই, কুসলেন?

বুকে একটু আশঙ্ক হয়েছিল বীরশপ। কিন্তু পরদিনও দশদুর্গ বিভাহানে বিভার বোকা সহ কুহুকে এসে পাঁড়াতে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে। একভাবেই চলছিল। ঠিক একভাবে নয়, একাদশী শিকদার আর শকুনি ভট্টাচার্যের টিকা-টিগ্নী আর গল্পনার সজ্জা যে বাড়ছে সেটা বীরশপ অস্বাভাবিক করেছিল রমণী পণ্ডিতকে দেখে। মেয়ের পড়ার সমস্তটার প্রাইট ব্যাঙ্গ্যায় পাঠচার্য করতেন তিনি, অকার্যে এক-আবাবের ঘরেও ঢুকতেন। কন্যমতলার বেকির ভক্তারা হুঁন ভালর ভালর তাকে কোণা-ঘরে উঠে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন, এ ধরটাও কেমন করে যেন বীরশপের কানে এসেছিল।

ঠিক এই শুভ-বুহুর্ভে সোনাবউদির মায়কত গণ্যার সেই ঠাইয়ের জাদি।

ঘর বাসি থাকলে শুলতান কুঠিতে কাউকে এনে বসাতে হলে কোনো বাড়ি-জলার কাছে দরবার নিশ্চয়োজন। বাকি খুশি এনে বসিয়ে লাও আগ, পরের কথা পরে। কার বাড়ি কে মালিক সে বয়স এখানে ভালো করে জানা নেই কারো। বাড়ির তদারক করে বিহারী দরবারন শুকলাল। কুঠি-কলর একটা পোড়ো-ঘরে থাকে সে। জাড়াটের কইকরমাস খেটেও হুঁ-পাঁচ টাকা বাড়তি মোজার হর তার। শুলতান কুঠিরক্ষক দরবারনের মোজার নয় শুকলালের। ঠাণ্ডা মোজার ভালো মাহু। পুরানো বাসিন্দা হিসেবে বীরশপের সঙ্গে খাতিরও আছে। হাসকাবারে মনি-জর্ডার কর লেখানো বা মোকসালে খাম-পোষ্টকার্ডে ঠিকানা লিখে দেওয়ার কাজটা তাকে দিয়েই হয়।

কাজেই সেদিক থেকে বীরশপ নিশ্চিন্ত। কিন্তু সোনাবউদির জন্য ওই কোণা-ঘর হুঁটা তার শরঙ্গ নয়।

হঠাৎ তার পড়ানোর চাক দেখে শুধু ছাত্রী নয়, ছাত্রীর বাবা পর্বত হকচকিয়ে গিয়েছিলেন।

সকালে বই হাতে কুহু এসে হাজির হবার আগেই তার

ডাকডাকি শুরু হল। কাকজোরে ওঠা আর সকাল সকাল পড়তে বলার স্রবণ কল-প্রসঙ্গে মুখ বুজে মেয়েটাকে অনেক বক্তৃতা শুনতে হয়েছে। পড়ানোর সময় কল্পিত পৌলোমের কাহিন্যে ঘরের চরজা চানভাগের তিনভাগ আটকানো হয়েছে। ছাত্রী পড়া না পারার ফলে বীরশপের হাসিটা বাইরে রমণী পণ্ডিতের চকিত কানে অনেকবার গুলিত শিশার মত গিরে ঢুকছে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের পাঠ দান আর ঘরে বসে স্রবণে হয়নি তেমন। ওই মহাপুরুষের ঘরে একাদশী শিকদার আর শকুনি ভট্টাচার্যের চোখের নাপালের মধ্যে ছাত্রীসহ বিচরণ করতে করতে সেই পাঠ সম্পন্ন হয়েছে। ক'দিনে অনেক শিখেছিল বিষয়-বিমুক্ত চতুর্দশী কুহু। কেমন করে আকাশে মেঘ হয়, মেঘ গরায় কেন, সকালের বাতাসে স্বাস্থ্যোপযোগী কি কি উপাদান আছে, কোনটা উপকারী কোনটা নয়, পাহ-পালা বেঁচে থাকে কি করে—এমন কি, মহাপুরুষের সেওয়া দেখে সেওলা আসে কোথা থেকে, হাসিমুখে সে-সম্বন্ধেও নিজের মৌলিক পবেষণামূলক কিছু তথ্য শোনাতে কার্ণাধ্য করেনি বীরশপ।

সেই বেগবোরা পড়ানো দেখে ছাত্রী হস্তভব, ছাত্রীর বাবা শুটক, কন্যমতলার বেকির শুভার্থীরা নির্বাক। বেগতিক দেখলেও ভরসা করে মুখ খুলবেন রমণী পণ্ডিত, তেমন খোলাসুখ নয় তাঁর। কিন্তু শেষে রাত্রিতেও অন্ধ পাঠ সমাপনের জন্ত পাশের ঘরে মেয়ের ডাক পড়তে তাঁর অঙ্গের হিসেবটা একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। সেই রাতে অন্ধ শেখা শেষ করে শ্রান্ত ছাত্রী ঘরে কিয়ে বেতে না বেতে ও-ঘরের চাপা হোষ চাপা থাকে নি। এ-ঘর থেকেও তার কিছু আভাস পাওয়া গেছে। মায়করও করেছে বোধহয়, মেয়েটা কান্না চাপতে পারেনি।...সেই রাতে সত্যিই নিজে একেবারে পাবও মনে হয়েছিল বীরশপের।

এর হুঁদিনের মধ্যেই সপরিবারে রমণী পণ্ডিত কোণা-ঘরে আগ্রহ নিয়েছেন।

হুড়দাড় পায়ের শব্দে বীরশপের চমক ভাঙল। গণ্যার আঁট বছরের বড় মেয়েটা ঘরে ঢুকল। বীককা' মা ডাকছে। জলদি—! তলব জানিয়েই যেমন এসেছিল, তেমনই চলে গেল।

বাইরে রোদ চড়েছে। কন্যমতলার বেকি থেকে শিকদার আর ভট্টাচার্য মশাইও কখন উঠে গেছেন... [ক্রমশঃ]

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিদ্বয়ের দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধ-বাকবীর কাছে সামাজিকতা বন্ধ করা যেন এক দুর্ভিহ বোকা বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মাহুকের সঙ্গে মাহুকের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, মেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বার্ষিকীতে, নরতো কারও কোন কৃতকার্যতার, আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী' এই উপহারের জন্য অল্প আবারনের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থাকা। প্রাপ্ত ঠিকানার প্রতি রাসে পত্রিকা পাঠানোর তার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে খুশী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এক একমাত্র করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যে-কোন জ্ঞাতব্যের জন্য লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।

বিপ্লবের সন্ধানে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪ সালে আমরা ধরা পড়ার আগে ছুটি দফার যে ২২ জন বিপ্লবী নেতা ধরা পড়ে রাজবন্দী হয়েছিলেন—১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে ১৭ জন, এবং ১৯২৪ সালের জানুয়ারীতে ৫ জন—তাদের মধ্যে অনেকে প্রথমে মেদিনীপুরে ট্রেট ইয়ার্ডে ছিলেন। সেখানে পর-পর ব্যক্তিগত বিশেষ অভিজ্ঞতার আলোচনা-আলোচনার সুযোগ হয়েছিল—তার মধ্যে ২৪ জন অম্মশীলন পার্টির নেতাও ছিলেন।

আমাদের ধরা পড়ার পর লর্ড লিটন হাসান্দে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাংলার দুটো বিপ্লবীদেরই সারাদেশে দলগড়ার কাজ রীতিমত চলছিল—একটা দল অবিলম্বে কিছু করার মতলব করছিল, এবং আর একদল তখনই কিছু করার বিরোধী ছিল এবং সংগঠন আরো শক্তিশালী করার পরে কাজে নামার পক্ষপাতী ছিল। লিটনের ইঙ্গিতের প্রথম দলটা অম্মশীলন এক বিতীর দলটা যুগান্তর পার্টি।

কিন্তু তখন পর্যন্ত কার্যত সকলেই স্বাভাবিক বৈপ্লবিক কার্য-কলাপ এড়িয়েই চলছিলেন। সত্যতঃ তাঁদের প্রেষণার কারণ সন্ত্রাসের জন্তে সরকার একেট প্রোভোকেটর দিয়ে এখানে সেখানে ২৪ জন করে বৈপ্লবিক ভাবপ্রবণ তরুণকে রিডলভার দেখিয়ে রিকুট করে বৈপ্লবিক সংগঠন তৈরী করে তাদের দিয়ে কিছু কিছু স্বাভাবিক কাজ করার বাস্তবতা করেছিল।

দাঁদারা বন্দুক-শিশুল সব গায়েব করে রেখেছিলেন, তরুণরা ছুটকট করে বেড়াচ্ছিল, কেমন করে একটা রিডলভার হাতানো যায়। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, হার হাতে একটা রিডলভার আছে, সেই একটা দল তৈরী করে ফেলছিল। একটা রিডলভারের জন্তে নিজস্বের মধ্যেই খুনোখনি শুরু হয়েছিল। শান্তি চক্রবর্তী খুন হয়েছিল এমনি কারণেই। সন্ত্রাস মিত্রের দলও এই অবস্থায় মধ্যেই গড়ে উঠেছিল।

এদের স্বাভাবিক কার্যকলাপে দাঁদারাও সম্মত হয়ে উঠেছিলেন, এবং সন্ত্রাস মিত্র বিপ্লবীদের চেলা হিসাবে বিপ্লবীরা'র নেতৃত্বের দোহাই দিত বলে দাঁদারা বিপ্লবীরা'র উপরও চটে গিয়েছিলেন। বিপ্লবীরা'র বসভেন—ওর ওপর আধার হাত নেই—এক ভাবে নিরস্ত করারও চেষ্টা করতেন না।

বিপ্লবীরা'র এক জ্যোতিষ ঘোষ (মাষ্টার মশাই) সন্ত্রাস মিত্রের ছুই নেতা—এঁরাও ছিলেন মেদিনীপুরে। সেখানে সকলের

অভিজ্ঞতার stocktaking এর পর তাঁরা নিঃসন্দেহে বুঝেছিলেন, ছোকা স্বাভাবিক বিপ্লবীদের শিক্কে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের একেট প্রোভোকেটরদের হাত আছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা দুজনকে একেট প্রোভোকেটর বলে সিদ্ধান্তও করেছিলেন—একজন হচ্ছে শিশির ঘোষ—তার কথা আগে বলেছি—আর একজন, ভূপেনবাবুর দত্তের বইয়ে (বিপ্লবের পটভূমি) তার নাম দেওয়া হয়েছে টুই সেন (ছদ্মনাম—আসল নামটা বলার বাধা আছে)।

২৪ সালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ আমার বসগোরা খেয়ে, জীক, ভূপেন বাবু, পূর্ণ দাশ, সত্যীন্দ্র (চক্রবর্তী), বিপ্লবীরা'র এক মাষ্টার মশাই বাম্বার বদলী হন—জীবন ও ভূপেন দত্ত বান বেগিন সেটাল জেলে। সেখানে দুজনে পরামর্শ করেন যে, একেট প্রোভোকেটরদের ব্যাপারটা দেশের লোকদের জানিয়ে দেওয়া দরকার। তখনই তারা Memorial to White-Hall নামক বিখ্যাত ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিবরণী লিখে গোপনে বাইরে পাঠান এবং সারা দেশে তাই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। তারই একটা কপি দেশবন্ধুর কাছে যায়, এবং তিনি মহাত্মাজীকে সেটা দেখালে, মহাত্মাজী সেটা পড়ে বিবৃতি দেন যে, স্বরাষ্ট্রপাটিকে বেকারগা করার জন্তেই যে সরকার মিথ্যা অভ্যুত্থানে তার শ্রেষ্ঠ কর্মীদের বিনাবিচারে আটক করেছে, সে বিষয়ে তাঁর আর সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্র-পাটির নেতা শ্রী মতিলাল নেহেরুও সেটা প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে শ্রী শরৎ বসু কর্তৃক প্রকাশিত Lawless Laws নামক বইয়ে সে বিখ্যাত বিবরণীটাও দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতার ভূতপূর্ব পুলিশ কমিশনার, এবং তাঁর পরে আসিপুর সেটাল জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্নেল মুলভেনি দ্বিতীয় কক্ষ বিল্ডে গিয়ে ১৯১৬—২০ সালের রাজবন্দীদের সম্পর্কে কলতে গিয়ে সরকারী একেট প্রোভোকেটর নিয়োগ এবং তাদের কাজের দ্বারা সহজে কিছু বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন, এবং জীবন ও ভূপেন বাবু তাঁদের memorial to whitehall এ তাঁদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে নিজস্বের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বেগিন জেলের কর্তাস্যে এ নিয়ে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়। তখন জীবনবা বদলী হয়েছেন মাঝালর জেলে। পরে জীবন ও ভূপেন বাবুকে পৃথক করা হয়—ভূপেন বাবুকে মাঝালর জেলে থেকে বদলী করে। এ ব্যাপারগুলো খটে ২৪ সালের শেষাংশে।

একিঞ্চ বহুদলপাঠ প্রথম সঙ্গীতী অথবা পাঠ হয়ে তৎকালীন ইতিহাস সত্ত্বে সত্ত্বে চরকপ্রদ বৈদ্যবিক ধরনের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা প্রদান: তাঁরা হয়ে আসছিল এবং ধনিক ভবিষ্যতের প্রকার প্রদান: স্বাধীন আকার ধারণ করছিল। তৎকালে এক সময় বলেছিলেন, তাঁর স্বাধীনতার আদর্শ লক্ষ্যের ১৮ জনের ভিত্তি স্বাধীন। ক্রমশঃ এসব কথাও তাঁর হৃদ থেকে পোনা যেতে লাগলো যে—কৃষকদের প্রতি সুরিচার অবস্থা চাই, কিন্তু তার ভিত্তি ভবিষ্যতের প্রতি অবিচার করলে চলবে না। রতিলাল মেত্রে তাঁরা কোলোনিয়াল ভিত্তি বরাবর গুলুয়েন, কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় ভিত্তি কিছুই করেননি।

স্বাধীনতাটির উদ্দেশ্যের পর নীতিটির নাম পাড়িয়ে গিয়েছিল, তাইমিসের ভিতর থেকে সবকিছুকে "বাধাসীন নীতি"—obstructionist policy—কথাটার দোস্তবাক ভাবেই শিক্ষা দলদলপাঠের উপদেশ-সেতাবা—এম, সি, তেলকার, মাধবহরি আম্বে, ভট্টর মুক্তে প্রভৃতি তাইমিসলপাঠী হয়েও পৃথক একটা দল খাড়া করে ফেলেন, সবকিছুর সব কাজে বাধাসীন ঠিক নয়, আমবা সবকিছুমত সবকিছুর সঙ্গে ভাল কাজে সহযোগিতাও করবে। তাঁদের নীতিটির নাম হল Responsive Co-Operation।

কাউন্সিলপাঠী কংগ্রেসদের মধ্যে এই ভেটটাও বহুদলপাঠী ক্রমশঃ তাঁরা হয়ে এল এবং ১৯২৫ সালের মে মাসে যখন বিলোতে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেডে বসছেন,—তিনি ১০০ বছরের মধ্যেও ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব হয়ে যাবে না, তখন দেশবন্ধুর ফরহাদ কলকাতার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে আপোষ ও সহযোগিতার কথা খোঁজা গেল। বার্কেনহেডের সঙ্গে দেশবন্ধুর নাকি এক রাউণ্ড-টেবল কনফারেন্সের কথা চলছে, এমন কথাও শোনা গেল। কিন্তু ঠিক এই সময়েরই দার্জিলিংয়ে হঠাৎ দেশবন্ধুর মৃত্যু হল।

বেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—সারা দেশ দোকাছন্ন—বাংলার কংগ্রেস মহল কিংকর্তব্যবিমূঢ়—দাদাসাহেবও প্রকাজ বাহিনীভিক্রের প্রবান অবলম্বন বেন ভেঙ্গে পড়লো। হাজার গাছী ককতাতার এসে যে, এর, সেনগুপ্তের মাথার দেশবন্ধুর তিন মুকুট পরিয়ে দিয়ে পেলেন—কাউন্সিল জীভার, প্রাথমিক কংগ্রেস সভাপতি, কর্ণায়েশমে মেয়র। শ্রুতগার দাদাসাহেব ভরসী চোপে পড়লো হাজার বাবুর ওপর—বেন অজের নড়ি। এসব ঘটনা আমার মেমিনীপুর বাঙালীর ঠিক পরের কথা।

হাট হোক, মেমিনীপুরে পড়াশুনার ব্যেট স্বযোগও ছিল, ভাল ভাল বইও অনেক ছিল, আমি এ সুযোগ পুরো মাত্রায় গ্রহণ করলুম। ইকনমিক্সের জ্ঞান প্রয়োজন, এটা তাঁর ভাবে অনুভব করতে শুরু করেছিলুম। মনোরঞ্জননা'র কাছে Kale র Indian Economics ছিল, বললুম পড়তে চাই, আপনাকে পড়াতে হবে। তিনি খুশী হয়ে পড়াতে লাগলেন। আমি ছাত্র বরাবরই ভাল, এবং ভাল ছাত্র পেয়ে মনোরঞ্জননা'রও যে উৎসাহ বেড়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বীতিমতন খেটে বইটা পড়িয়ে ছেড়ে দিলেন। আমার জীবনে একটা নতুন দিকের বিকাশ শুরু হল। মনোরঞ্জননা'র খণ্ড আমি জীবনে ভুলতে পারি না।

কবে তাঁর সঙ্গে আর একখানা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ের বই পড়লুম রাস্কিনী ও অর্থনীতির উত্তমোত্তম মিশ্রণ, প্রকৃত প্রভাবে applied economics বলা যেতে পারে—Reverse council

Bills and other organised plunders—একজন স্বাধীন অর্থনীতিবিদেব লেখা, নামটা মনে নেই, হকুমদারী আচার হতে পারে। ২০ সালের শাসন সংস্কার গানের মূল্য হিসেবে ব্রিটিশ সরকার যেমন করে ভারতের ৮০০ কোটি টাকা গাঁড়া ঘেরেছে, তাইই বিশ্ব নিবারণ। আমার ভাল করে economics পড়াটা হয়ে গেল।

ভারতের পড়লুম গুব্বারহের Indian Finance, ঠিকতায় Railway Finance প্রভৃতি। স্বাধীনতা গানের Roads to Freedom ব্রেন্সেলোভের Russian workers' Republic ও পড়লুম। এ বইগুলো মনোরঞ্জননা'র কাছে ছিল। আমি নিয়ে কিনলুম Factory Legislation in India, আর কে দানের তিনখানা বই—Labour movement in India, Hindusthani workers in the pacific coast (America), এবং Production. এই বইগুলো পড়বারেই চাট ও টেবল ছিল দুনিয়ার Comparative production সবকিছু। আমি অনেক টেবল-চাট থেকে ভিতরে বড় টেবল তৈরী করে দুনিয়ার নামা দেশের তুলনায় ভারতের সর্বাধ উৎপাদনের তুলনামূলক তথ্য দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম আমায়ের "হাফ-লেখা" মাসিক "ভাঙ্গাভুলোতে",। অত বই চুটো অল্পবার করে রেখেছিলাম। স্বাধীনতা একখানা মাল্টিচার বই বোগাড় করেছিলেন Contour and Map Reading—আমি তাঁর সঙ্গে সে বইটাও পড়লুম। প্রায় বহুদলপাঠী ছিলুম—পতীকাখী ভাজের মতন খেটে পড়োঁছ—শিখি, আমক পেছোঁছ—মাল্টিপুর জেল ভাঙ্গাবার।

"ভাঙ্গাভুলোতে" ২১তম ছাত্র সবকিছুই জিগতে চ'ত—আমিও লিখতুম—এক এ সম্পর্কে এত হকুমদারী ও মানোভারী ঘটনা আছে, যা লিখতে গেলে একটা বই হয়ে যায়। আমি এখানে তার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চাই।

ভূপতিলা' গান লিখতেন, আমি স্তব দিয়ে গাইতুম। একটা মনুনা—

কে জানে সাজ হবে কোন দিনে ভাই—

মোদের এই চলিই চলা অবিরত।

কবে যে সাজ হবে কে জানে ভাই—

আমাদের এই জীবনের সাধা ব্রত।

আগের বস্ত বাস্তি পেছে,—চরণরেখা তেখে পেছে—

তাই জেনেছি এই পথেতেই মটরে আশা মনোমত—

শুধু যে লোকে যেতে শোন বলি ভাই—

সহে না ব্যাকুলকরা দেবী এত।

স্বভাব বাবুকে মুক্ত করার নামা চৌধুরী মধ্যে শরৎ বহু মহাদ্বাভীকে এক চিঠি লিখে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি অনেক কথার পর শরৎ বহুকে নিরমিত ভাবে চককা কাটার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ভূপতিলা' এক কবিতা লিখলেন—

হয়েছে এক মতোবিরি আবিভার

মাঝে মাঝে একটি ডোলে সর্বব্যাপি পরিভার

• • • • • ঠাঁত কনক পেটের ব্যাধ

মিনিট চু-চার তেটো মূতা, আশায় পাবে সত্যিকার।

তখন আমবা খাঁখি প্রাণ্ডিমনের গিহবোড় পিওর বহুদল

কাপড়-কাঁচা পাই। 'কুণ্ডলিনা' বলল, so-chagorun এইবার আমাকে জব্ব করবে। চমকা ও খবরের ওপর মনোহরজনা'র এবং আমার ভক্তি ভবনও আর সকলের চেয়ে বেশী। 'কুণ্ডলিনা'র কবিতা পড়ে আমার হৃদয়েই প্রাণে একটু বাধা পেল। তার পরের দ্বাদশে আমার এক প্রবন্ধ বেলসো এবং 'কুণ্ডলিনা'র কবিতার প্রতিবাদে ভাতে লেখা হল, চরকাপট্টের দ্বি আমায়ের ঠাট্টা করে কবিতা লেখে,—

হয়েছে এক মর্ত্যবির আবিষ্কার—

হায়ে হায়ে একটি ভোকে সর্ববাহি পরিভার

হতা, হারী কি হৃদিকে মরছে হাছব লকে লকে,

"হ্রাতচোল হ্রাতচি" বিপকে কসে কব যে টিৎকার।

লিকা হাছা অরচারা, কুলছায়ে দেশটা তথা—

জাতিভি টিকটিকি মাহ: এসব বোগেব প্রতিকার।

পাতীষাটায় মিলে কবে চরকা-বিষেব ঢালাও জোরে

হাসায় গিরে থাকবে মরে বৃষ্টিসিংহ হুয়াচায়।

তাহলে কেমন হয়? চরকা কাটলে স্বাক্ষর না লোক, বর্তমান অবস্থার আমাদের বিলম্বী কাপড় বরকটের এবং বহুসম্রাট সমাধানের আংশিক সত্যবা যে হচ্ছে, একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে?

মনোহরজনা'র দেখে ভাসিমুখে ভিত্তবাবের স্তবে বললেন, এটা কি করেছেন। 'কুণ্ডলিনা' চটে গিরে আমায় বৃদ্ধিরে দিলেন, আমি এ-টি আকাট—আমায় একটুও সহবোধ নেই। কিন্তু আমার ওপর 'কুণ্ডলিনা'র সমত্যাও যে বেড়ে চললো, তাও টের পেতে থাকলুম, বত দিন একসঙ্গে ছিলাম।

একটা দুর্ভিক্ষ মাথায় এল। আমাদের মাসিক পত্র সবই আছে, নেই শুধু প্রেমের কবিতা—একটা প্রেমের কাহিনী লিখতে চলে। চললো একটা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি ব্যাপার। বহুনা এবং অভিজ্ঞতা, ছবিতেই দারিদ্র্য—কিন্তু ধনভাষ্য করে বা বেলসো, নেহাৎ নিষেব নয়।

প্রণব যদি টুটেই সখা, হৃৎ কি—

হৃৎ তো হার আছেই জীবন ভরিয়ে

জীবনটা তো অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামই

প্রণব সেখা হৃৎগতির বিরাম জে।

কাজের হাছব, কাজের ভগ্নঃ ?—হার সখা

জগৎ, হাছব তৈরী শুই ইট-কাঠে ?

বুক টলে ঐ প্রাণের নাচন বার সেখা

গড়ে রঙে হাতিয়ে জগৎ কুল কোটে।

জ্বর ময়, শোভা, স্মৃণ গিলিয়ে হার

একটি দিনেই জীবন বার শুকিয়ে বার

হুট অলি নাইগা যদি কিংবই চার

জগৎ বার অবচেলার পায় চলেই—

জ্বর টটে, খুঁটার লুটে—নাই কতি

একটি দিনের আগর-সোগণ বর্গ সেই।

একটা চমক—'কুণ্ডলিনা' appreciate করে বললেন,—ছেড়েছো একটা ?

মেডিক্যাল সন্ধ্যার আবেব পত্রিক আকর্ষণ যেনেব জ্বর ও সহাবোধ তেখেত, ভাব কখনো কোথাও জা দেখিনি। মনোহরজনা'র গী কবে কবে কবে বেছেভেল। এবং দেখ পর্বত ভিনিও এক কবিতা লিখে কেসেছিলেন—

হাড়া মেঘ চড়িয়ে লকে আকাশের গার

হুঁহাডায়া তুব তুব কল্লচলে বার—ইত্যাদি।

শুধু তাই নয়, মাঠে বেড়াতে গিরে আমাকে চুপি চুপি বললেন,—এটাকে গানের মতন খুব চিরে পাওতা বাব না? আমি একটু ভাব করে গেয়ে তাঁকে ভূমিয়ে গিলুম, তাঁর মৌতাত হয়ে পেল—ও মিলে জার বেশী দূর এলোনে জা।

হাছল' এবং নারজনা' (চৌধুরী) লিখতেন গল্প বা মক্কা।

মনোহরজনা', প্রভুল গাছলী, সতীশ পাকড়াগী লিখতেন প্রবন্ধ।

গিরীন্দ্র' লিখতেন হুসকমানুষের ধারাবাহিক ইতিহাস। অল্প

সরকার জটিল শিল্পী ডানড্রাম বাংলা অল্পবাহ' করতেন—হাছ-

মক্কা হিসেবে। গাশল ঘোষ ওখারে হাছবায় পর তাকে ধবে-ধবে

লেখানো হল—ইট ইটিয়া কোম্পানীর আমল সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ

লিখলো এবং সেখা গেল, মক্কা লকচ ডিলেবে লেবার চাত চমৎকার।

অল্পবাহ' ছিলেন একজন ভাল আর্টিস্ট, বহুত জামেকেই জামেন

না। তিনি ছবি আঁতহেন water colour বস্তুর বহুত বাজ

এক সব বহুত সবজামই ছিল—বহী সেন সেখা এড়াণায় মতলবে

অল্পবাহ'র কাঠে ছবি আঁকা লিখতেন এবং দেখ পর্বত

লিখেছিলেনও বেশ।

নিবন্ধন সেন ওখানে 'হাছবায় পর তাঁকেও লিখতে বাধা করা

হল, এক তাঁর প্রথম লেখাটা খেকে বোঝা গেল, তিনি কয়েকটি

school boy লেখাক যে নে-হাছল অবস্থার ফেলে এসেছেন,

সেজন্তে তাঁর মনটা হাতিমহন উলল।

লেখাপড়া, খেলাধুলায় তাঁকে তাঁকে দ্বিত সকলেই মনেন

একটা চমক জটিলবানে ভার হঠাৎ উচ্চাচাচা হাছ হাছতো—

মিনের পর দিন একটু ব্যাপারের পুনরুক্তি জার পুনরাবৃত্তি,

একটু সেট কোকের বৃথ হুহুত দেখতে দেখতে বেন হঠাৎ

হাডি চৌড়ার জাছ প্রাণটা লাফ দিরে ওঠে। বেন সকলেরই

একটু পাগলের দ্বিত।

গিরীন্দ্র'কে বাগা জামেন, তাঁরা কি বহুনা করতে পারেন যে,

ভিনি এক হাছ কোমার বহে জার এক চাত মাথায় ওপর তুলে

হবে কবে নাচতে পারেন? এবং হার সজ গান—ভিসুকা কাটে,

উন্মুকা কাটে, হারোকা কোথা ভাট।

অল্পবাহ'র বোজ বেলো চমটায় সময় হারের হাটের গিরে তাঁর

খাটের সামনের জানালার ধারে এসে আগন মনে ডাকেন—অল্পবাহ

বাব বাতী আছেন?

পাঁচ দিন দেখতে দেখতে আমি একদিন ভেতর থেকে বললুম,

ভিনি বেরিয়ে গেছেন। 'অল্পবাহ' সটান বললেন, কায় সজ্ঞ।

কাজেই আমায় বলতে হল,—সোমায়ান সজ্ঞ।

সতীশ পাকড়াগীকে বাগা জামেন তাঁরাও ধারণা করতে পারতেন

না, মেডিক্যাল জেল তিনিও গান গাটতেন। তবে সে এক লাটন

মাত্র—'সে কোন মনের হাছ ছিল আমার মনে,—কে হার বাঁধলো

অকারণে?'

একজন বান্দু সবে আমার আগে থেকেই আলাপ-পরিচয় ছিল। তিনি দাঁতে দাঁতে আমাকে টেনে নিয়ে একটা জানালার বাইরে একান্তে কয়েক মিনিট ভাবতে চাইতেন—আর একটা, আর একটা করে অন্ততঃ কীটখানেক কাটাতেন। আমি বৃদ্ধুম, কোন কারণে মনটা উতলা হয়েছে—সেটা ভোলবার জন্যে চেষ্টা করতাম।

রবী সেন এক অসুস্থ সরকারের সঙ্গেও আমার খুব ভাব হয়েছিল। রবী সেন ছিলেন কেটামিং ম্যানেজার, অল্পকালপা' রাজ্যের ওস্তাদ—হাফে হাফে feast হ'ত, সবচেয়ে বেশী খাইয়ে তিনজনের মধ্যে আমি ছিলুম খাঁড়—ওঁরা দুজন হাড়া আর সবাই আমার নীচে।

একবার ওঁরা ঠিক করেছেন, বাজার থেকে দুধ আনিতে যাবে হান্না ভাটের সঙ্গে। বানীবেন, কারণ বাজারে সঙ্গেসহের দর অত্যধিক। আধ ঘণ্টা দুধ এসেছে এক হান্না-কাটানো হয়েছে। হরি হরি। সাত পোয়া হান্না হয়েছে। আমাদের আল্লাউয়েল দেখে ধীর মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করেছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই লজ্জা হচ্ছে।

অসুস্থ সরকার আমাকে কখনো 'নাকুদা', আর আমি তাঁকে 'ডাক্তার আমিত্রিলা' বলে। বালুনার অসুস্থ ভিকিগীকে বলে আখিতি। একবার তাঁর পায়ে একটা চোঁচ ফুটেছে, তিনি একটা ছুঁচ নিয়ে গোড়ালী খোঁচাচ্ছেন। এমন অবস্থায় বা হয়ে থাকে—একে একে অনেকে এসে "আমি দেখি" বলে কিছু কিছু খুঁচিয়ে গেছেন, আমি তখনও বাকি, এমন সময় চোঁচটা বেরিয়ে পড়েছে। আমি বললুম, বা রে। আমার ভাগের খোঁচানিটা মারা যাবে, তা হবে না। তাই নিয়ে বেশ খানিক স্বস্তিপ্রসূতি করে ছুঁচ কেড়ে নিয়ে গোড়ালীতে ফুটিয়ে দিয়ে তবে ছাড়লুম। "আমাকে ভাল না বেসে উপায় আছে?"

এত সব খুচুরা পাগলামির পরও এক একদিন রাত্রে হঠাৎ সবাই মিলে পাইকিরী পাগলামি শুরু হত—বাহুদা' মড়ায় থেকে এক ব্যাঙ পাটির প্রোম্পশন হত ভালাবন্ধ ঘরের মধ্যে। বাহুদা' extempore বা মুখে আসে তাই গান বেঁধে এক লাইন করে গাইতেন, সকলে প্রাণপণে গলা ছেড়ে কোরাসে সেটা repeat করতো। গানের নমুনা হচ্ছে—

চুরি করে কত কাল কাটাবে রক্তনী—

গোকুলে গোপিনী কঁাদে যশোদা-জননী।

হোকরা বা হান্নাদের আর মনতে চায় না,—এই ব্যাঙটা নিয়ে বাহুদা' এক গান বেঁধেছিলেন লক্ষণ বর্মন—যার মোকদা কথা হচ্ছে রামচন্দ্র বনবাসে গিয়ে নিজে পক্ষী মেরে খেতেন—সে পক্ষীর নাম রামপাখী—আর লক্ষণকে খেতে দিতেন কলা-মুগো। লক্ষণ কাজেই রাগ করে চোদ্দ বছর উপোস করেই থাকলো। রাম সেটা টের পেয়ে রাগ করে লক্ষণকে বর্জন করলেন। শেষ কথা হচ্ছে—সতএব কেউ ক'রো না আর হান্নার সেবা অকার্য।

যদি ছবেলা হয়তো খেতে পায় না,—আরই তাদের খান জ্ঞান,—ভারা মনে করতে পারে, এরা বেশ খেয়ে পরে' মুখে আছে,—কিন্তু পেটের কিংবা মস্তিষ্কের প্রাথমিক প্রয়োজন মাত্র—সেটাই সব দর। তারপর আছে মনের কিংবা। তারও ওপর বানের থাকে একটা আদর্শ ও সাধনা,—তারও একটা দাবী আছে। বিনা বিচারে বানের বন্দী করে রাখা হয়, তাদের বাবিন চলা-কেন্দ্র হাড়া আর

সবই যোগাবার দারিদ্র্য নিতেই হয়। কিন্তু বশিষ্ঠবনের অস্বাভাবিকতার মার কেউ এড়াতে পারে না।

সুখু তাই নয়, আমাদের ডাটাগুলোর মূল্য যে বাজারদরের চেয়ে কম, তা তো ঐ আধ ঘণ্টা দুধে সাত পোয়া হান্না দেখেই কতকটা আঁকাজ করতে পেরেছেন। এখন বিষয়টার আর একটা দিকের চিত্র দেখুন।

আমাদের কুচোকালা জিনিসের প্রয়োজনের তখন কোন নির্দিষ্ট ডাটা ছিল না—সুপারিন্টেন্ডেন্ট পাশ করলেই কনস্টেবলের সেগুলো সরবরাহ করতো। সেগুলোর দাম বা বিল পাশ সবচেয়ে আমাদের কিছু জানার বালাই ছিল না। হঠাৎ I. G. of Prisons এর এক হুকুম এল—সুপারিন্টেন্ডেন্ট কোন জিনিসই দিতে পারবেন না—আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের কথা I. G.-র কাছে দরখাস্ত করে যত্ন করিয়ে আনতে হবে। কারণ ঐ কুচোকালা জিনিসের ব্যবহার নাকি অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। হবে না কেন? হু'পরসার একটা জিবছোলা সরবরাহ করে দটা করে tongue scraper লিখে যদি বারো আনা বিল করা হয়, এবং সে বিল নির্দিষ্ট পাশ হয়ে যায়,—তাহলে ১৫১৬ জন লোকের তেল-সাবান থেকে ছুঁচ-মুতো পর্যন্ত যোগাতে যে অনেক টাকা খরচ হবে, সে আর বিচিত্র কি?

আমরা সকলে মিলে দরখাস্ত করলুম অনুবিধা জানিয়ে এবং অনাবলকভাবে বিবাহ টেনে আনা ঠিক নয় বলে—কিন্তু কোন কল হল না। সুতরাং আমরা পরামর্শ করে এক অভিনব লড়াই শুরু করলুম—দরখাস্তের লড়াই।

একটা কঠিন তৈরী করে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল—বোম্ব তিনখানা করে দরখাস্ত পাঠানো চাই—সোমবার অসুস্থ তিনজনের পালা, মঙ্গলবার অসুস্থ তিনজনের, ইত্যাদি। ঠিক হল, দরখাস্ত লিখতে হবে বাংলাভাষার এক I. G. of Prisons-এর কাছে বা নামে নয়, বোম্ব Additional Deputy Secretary Govt. of Bengal-এর নামে, যিনি আমাদের দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। তারপর চললো এক রীতিমত কম্পিউশন—কে কত মজাদার দরখাস্ত লিখতে পারে। I. G.-র পার্শ্বাঙ্গীতাল আফিসিটাইটের মাধ্যমে বাড়ি—তাকে এই সব দরখাস্ত ইংরেজীতে অনুবাদ করতে হবে, কিংবা note লিখে I. G.-কে বুকিয়ে দিতে হবে। তাঁর মঞ্জুরী এলে, তবে সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন।

বাহুদা' এক দরখাস্ত লিখলেন,—“কুলগাছে আঁচল বাধিয়ে বগড়া”—“পাড়া-কু'হলীর মতন” ইত্যাদি। ভূপতিলা' এক দরখাস্ত লিখলেন—তিনি পাড়া সাহিত্যিক ওস্তাদা—“প্রাচীনকালে যখন মানুষ জুতার ব্যবহার জানিত না” থেকে শুরু করে কেমন করে জুতার আবিষ্কার হল, জুতা মানুষের কত উপকারী, কত রকমের জুতা কত সুখপ্রদ, ইত্যাদি এক প্রবন্ধ লিখে, তার উপসংহারে লিখলেন—“কিন্তু, অহো দুর্ভাগ্য, আমার জুতার সুখতলা খুলিয়া গিয়াছে এক আমি আজ তিনদিন বাত ক্রম মনোকাষ্টে কাল কর্তন করিতেছি, তাহা মহাশয়কে কেমন করিয়া বুঝাইব? অতএব মহাশয় অবিলম্বে আমাকে চারিটি ককককীলক (কাঁটাপেরক) সরবরাহ করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন। কিম্বিকিম্বি—”

এইভাবে কেউ চাইলেন সার্টির জন্য কিছুকের বোতাম, কেউ ছুঁচ-মুতো, কেউ কানখুঁচী কিছু দরখাস্ত প্রকাশ-প্রকাশ।

Additional Deputy Secretary-র বাংলা হল "অতিরিক্ত উপসম্পাদক"। "মহামহিম জিল জিহুত"—"অবীনের বিনীত নিবেদন" প্রভৃতি লিখে আমি এক দরখাস্ত লিখলুম, ব্যয় সংক্ষেপেই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আপনি গণভাগ করুন,—আপনার কাজ ৫০ টাকা বেসতনের একজন কেরানীই পারিবে। ইত্যাদি—আমি লিখেছিলাম "আবহকাতিরিক্ত অণ-সম্পাদক"।

কয়েক দিনের মধ্যেই লড়াই কতে—সুপারিন্টেন্ডেন্টের হাতেই কমতা করে এল, এবং পরে মাসিক ৭ টাকা ভাতা নির্দিষ্ট হল।

বাই হোক, গণেশ ঘোষের কাছে তার দ্বিতীয় কীর্তির গল্প শুনলুম। আমাদের হাস্যর ষ্টাইক মিটে বাঙালীর পর গণেশকে আবার বাঁকুড়ায় ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল—কলকাতায় চোখ পরীক্ষার পর। বাঁকুড়া জেলে হাসপাতালে আমাদের থানা বেঁধে বসে দিয়ে বেত মিনডুমের একজন শ্রোত্র পুরানো চোর করেশী। তাকে দিয়ে গণেশ বাইরে থেকে একটা লোহাকাটা করা সঙ্গ্রহ করেছে, এবং আমাদের ঘরের সজল পায়খানার যে গরাদে দেওয়া জানালার কবল ঢাকা দেওয়া ছিল, তার একটা গরাদের দুহুড়ো কেটে খুলে ফেলেছে। তারপর খাটের একটা লোহার ডাঙা বৈকিয়ে ইংরাজী এস (S) অক্ষরের মতন একটা প্রকাণ্ড হুক বানিয়েছে। তারপর দুখানা কাপড় বেঁধে বসি করেছে। খাটের একটা সজ লোহার ছত্রীর এক মুখ বৈকিয়ে নিয়েছে, যাতে বড় হুকটাকে জেলের দেওয়ালের ভপর আটকে দেওয়া যায়।

তারপর এই সব সাজ সরঞ্জাম নিয়ে পায়খানার জানালা দিয়ে রাত্রে বেরিয়েছে। জেলের ঐ প্রান্তে দেওয়ালের ধারে একটা সেকলে পাকা ছোড়াপায়খানা ছিল। তার পাশে জেলের দেওয়ালের ধারে যে গলিটুকু ছিল, সেখানে গিয়ে ছত্রীর ডগায় কাপড়ের বসি-বীণা হুকটাকে তুলে দেওয়ালের মাথার আটকে কর্তা বসি বেয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁর ভাবে কাঁচালোহার ডাঙার হকের এক মুখ সিঁথে হয়ে গিয়ে কর্তা ঢিপ করে পড়ে গেছেন, এবং সাজসজ্জা নিয়ে পালিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকে কাগজের গুঁজি দিয়ে কাটা-গরাদেটা সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন। পরের দিন আবার একটা চেষ্টা করার ইচ্ছে।

কিন্তু, অহো দুর্ভেব! সকালে মেখর পায়খানার চূণের পৌচড়া দিতে এসে হঠাৎ সেই কাটা গরাদেটাই চোপে ধরেছে, এবং গরাদেটা খুলে গেছে। মেখরের তো চক্ষু স্থির।

মুহুরা কীড়ি প্রকাশ হয়ে পড়লো। বাবুলা বললেন, আমরা কিছুই জানিনি। মম্বুরাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বেধম প্রহার করলো। সে জানতো, কিন্তু কিছুই বললো না—মুখ বুজে মার খেলো। তারপর রাঁধুনীকে প্রহার দিতেই সে সব বলে দিলে। তারপরই গণেশের মেদিনীপুরে আগমন।

মেদিনীপুরে বেশ সংসার পাতিয়ে প্রেমোদ্যে আছি। ক্রমে ক্রমে বাড়ী থেকে খবর আসছে ভায়াঁর কালাভর, যথোচিত চিকিৎসা হচ্ছে না, শয্যাপারী অবস্থা, ক্রমে খারাপ হচ্ছে।

প্রভাস লিখলে, হুলাপুঞ্জ ভাষাভাষা হুল উঠে গেছে, ভায়েকে জিভেন কুশারী তাঁর বাহেরকের সত্যাক্রমে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন—প্রভাস কলকাতায় চলে এসেছে, এবং কংগ্রেস-কর্মীদের বাড়ীতে

আছে। সুরেশ বহুভাষার, মাখন সৈর এবং তাঁর সঙ্গে হুলাপুঞ্জ নলের সুরেশনা' (নাম) মিলে কংগ্রেসকর্মীদের গড়েছেন।

ক্রমে খবর এল, ১৬০০০ টাকার দাবীতে আমরা মহাজন নাগিন করেছেন—বাড়ী বুঝি বার। দরখাস্ত করি, আমাদের কোর্টে হাজির হতে দাও,—দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না। নিয়মিত ভাবে চিঠি আসে, প্রভাস উকীল দিয়ে আমাদের তৃপ্তি করাচ্ছে, সময় নিয়ে, আমরা দরখাস্ত করে চলেছি—একটা dead lock চলছে।

ওদিকে ভারীজামাই I. B. Office এ ঘোরাবুরি করে দরবার করে, তারা হাঁকিয়ে দেয়, সে আমাদের চিঠি লেখে, আমি সব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি, লোখাপড়া এবং খেলাখেলার মন দিতে চেষ্টা করি।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এল, মনোরঞ্জননা', ভূপতিদা', নরেশনা', প্রভুভাব, ববী সেন, অমৃত সরকার প্রভৃতিরকে বন্দী করা হয়েছে দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন জেলে। তাঁরা চলে গেলেন। আমাদের সংসারে ভাঙ্গন ধরলো। মনোরঞ্জননা' বাঙালীর সম্বর আমাদের হুখানা বই নিয়ে গেলেন—Roads to Freedom এবং Russian workers Republic—আমি বললুম, আমি বই দুটো বাংলায় অনুবাদ করবো।

ওঁদের বাঙালীর দিন feast হল এবং বিলায় অভিনন্দন জানানো হল। ভূপতিদা' গান বাঁধলেন এবং আমি গাইলুম—

যড় তুফানের সঙ্গী মোরা, মোদের যে এই পরিচর
জীবন ভরে মনের মাঝে সকল কাজে জেগে রয়
হয়ত কঠিন যাত্রাপথে, হয়ত বন আঁধার রাত্রে
কঠোর কারা শৃঙ্খলেতে বর্ষ যুগও গন্ত হয়।
যতক্ষণের হোক না দেখা, আমরা সবাই চিরসখা
মৃত্তির বুকে রয় যে আঁকা সবার ছবি প্রেমময়।

আমার প্রেমময় ছবিটা যে তাঁর মৃত্তির বুকে এখনও আঁকা আছে, সেটা এখনও মাঝে মাঝে টের পাই।

অম্বুকুলা' রোজ সিদ্ধি খেতেন—লেখালেখি করে সরকারী মম্বুরী এবং সাপ্লাই—accustomed—medical grounds. সেদিন আমি একটু চেয়ে নিয়ে খেয়েছিলাম এবং প্রায় বেহাল হয়ে পড়েছিলাম। গান আর ধামে না—এক লাধা বললেন, তোমার আজ হয়েছে কি! আমি বললুম অম্বুকুলা'র প্রসাদ পেয়েছি। অম্বুকুলা' বললেন এই, খবরদার, confess করছো! স্বযোগ পেয়ে উঠে গিয়ে ভয়ে পড়লুম।

ক্রমে আমাদের জেলের সংসারের ভাঙ্গন বেড়ে চললো। ওঁর বাঙালীর পর বাহলা' মাঝে মাঝে একা গান ধরেন—

'বাড়ীর পাশে আরসী নগর (ও তাতে) পড়নী বসত করে
একদিনও না দেখিলাম তাকে—'

"রাকপুত্রীতে বাজায় বাঁশী" গানটার একটা প্যারডি লিখেছিলাম—

রাত হুপুবে বাজায় বাঁশী কালাপালা কান
পথে বেতে পড়ে চলে কি করেছে গান

যতরবাড়ী আমার বেলা

কি খাওয়া...শালা

রাত হুপুবে তারি ঠেলায় প্রাণ করে আনচান

কসে আবার কত দুটো বোঝই আসেন বাস
কতাইক, কতই বৃত্তো, কেউ বা কখন বাস
নেপার দুখে দেবার ভবে
কি চাট আছে, তোমার ঘরে—

এই পৃথিবী লিখে শেষ লাইনটা মনের মতন করে মেলাতে পারছিলুম
না—বাড়না' তলে পেরে মিলিয়ে গেলেন—

সব আঁছে যেটুকু মাল হবে ছুঁ-চার টান।

একজন কয়েকটা নাপিতের কাজ "করতে আসতো, বাড়না' তাকে
নিরে মেদিনীপুরী ভাষায় অনেককণ গল্প করে কাটাতেন। তার
নাম "মহেশ" (মহেশ)—বাঁইরে হালচাষ করতো—তলে বাড়না'
বলেন—সেটা তোমার কামাবার হাত দেখেই বুঝতে পারছি।
আমাদের সেকাট রেজার নিরেই কামিয়ে দিতো—বলতো
কামাবার বড়বড় (সংজ্ঞা)।

একদিন সে বলছে—লাডাজালের সাজার ছেলে হয়েছে—
জেলখানাটা রাজার কিনা, তাই রাজা গরমেটকে বলেছে ১০০০
কয়েক ছেড়ে দিতে হবে—না হলে আমার জেল ছেড়ে দাও।
—তুমি তোমার নাতার ওয়া মুক্তির স্বপ্ন দেখে।

সেই সময়ে কুইন আলেকজান্ডার মাঝা মাঝার খবর এসেছে—
মরেন বাড়না'কে জিজ্ঞাসা করলে—ছরান হবে তো? বাড়না'
বললেন, ছরান হবে নি? ছরান হবে, বেবুগো উদ্ধৃত্ত হবে,
পতিভদের এক এক বড়া তরে টাকা বিসের দেবে।

মরেন জিজ্ঞাসা করলে—রাজারা নাচি খিতান?—বাড়না'
বললেন, হ্যা—তা হলই বা খিতান—মায়ের কাজটি করতে হবে নি?
—মরেন বললে—বটে বটিকি বাবু।

ছাৎ একদিন বাড়না'র সময় এল—কলকাতার বদলী। ক্রমে
ক্রমে গিরীন্দা' অহুতুলনা' অন্তবাবুও চলে গেলেন।

বাড়নার চিঠি পাই প্রভাসের চিঠি পাই, দরখাস্ত করি, কিছু
হয় না। মনে মনে কল্পনা করি—ভাগ্যী ম'লো,—মহাজন বাড়ী
বেচে নিলো—ভাগ্যীমায়ী শিতপুর নিরে—

ছত্তোর বলে সব কথা মন থেকে বেড়ে গেলে দেওয়ার জন্তে মনে
করলুম, এগা দিন নেহি রহেগা। মনটা চাপা হল—একটা কবিতা
লেখার মনস্কোপ করলুম —এগা দিন নেহি রহেগা—

আলিঙ্গ সন্ধ্যা মিথি আঁধার বকী
চিনের আ লাক হাফল ভামল বকী—
তাই বলে দুট কাদিল কেন গো কবলে?

বিবই বেমনা ঘাটার মধুর মিলনে
দিনমনি পুনঃ হাসিবে নুতন কিরণে—
হাসিবি আবার গরবে সোহাগে হেসেদুলে।

নিমেষ সাঁঝের তপ্ত আকাশ খেরিয়া
বন্ধ বাহুব তত্ত্ব আকার হেরিয়া
কাঁদিসনে—ওলো নিরাশ হসনে চাতকী—

আসিবে বরষা নবীন নীরব সজে—
ঢালিবে অমৃত পিপাসিত তোর অঙ্গে—
চিরদিন তোর কণ্ঠ শুভ হবে কি?

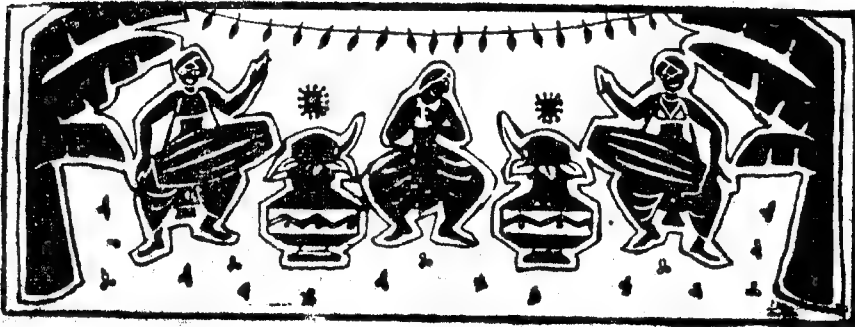
ছাই কবিতা, কিন্তু সেদিন এই ছাই-ই আমার দুখবোচক
লেগেছিল—এগা দিন নোচ রহেগা—

শেষে একদিন দরখাস্ত করলুম, আমাকে কলকাতার জেলে বদলী
করা হোক,—যাতে আমি বাড়ীর মামলার তত্ত্বিকারকের সঙ্গে
দরকারমত দেখা করে উপদেশ নিতে পারি। না হলে আমার বাড়ী
গেলে গভর্ণমেটকে অন্ততঃ স্থায়ত দায়ী হতে হবে।

কিছু দিন কেটে যাওয়ার পর ছাৎ খবর এল, দরখাস্ত মঞ্জুর
হয়েছে—আলাপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলীরও ছকুম এসে গেল।
চললুম আবার আলীপুরেই।

গণেশ ঘোষ তখন ডানড্রীন পড়ে লালাতে শুরু করেছে—এই
বকম একটা কণ্ঠ করতেই হবে। ৩০ সালের চট্টগ্রাম অন্ত্রাপার
লুঠন সম্বন্ধে অনেক নেতার নাম শোনা গেছে (মায় চাকরিকার দত্ত
পর্বন্ত) কিন্তু আমার এ বিশ্বাস কেউ টলাতে পারবে না যে, গণেশ
ঘোষই ছিল কাণ্ডটার prime mover—বহু জিগেশ ঘোষ
অবাকার করলেও আমি মানবো না।

[ক্রমশঃ]



ভেরা কিগ্নার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অমল সেন

একটা টোলাগাড়ীতে করে ভেরাকে পুলিশের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে বাওয়া হ'ল। পুলিশের কর্তারা তো মহা খুশি।

ওর 'বডি সার্চ' করো—

একটা আইডেট খরে ভেরাকে ঢোকানো হ'ল। সঙ্গে দুজন জীলোক।

ভেরা লোকচরিত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। দেখেই বুঝতে পারলো, এরা মেহাং কাঁচ। এ ব্যাপারে বিশেষ হাত থাকেনি।

বেমনি বোঝা, আর কি—চটপট পকেট থেকে রসিদ আর নোটবুকের সেই কাগজখানা নিয়েই যুথের ভিতর।

জীলোক দুটো চীংকার করে উঠলো। পুলিশরা দুটে এসে বললো, কি? কি? ব্যাপার কি? পকেট থেকে তুলে কী একটা যুখে বিল। একটা পুলিশ এসে গলা ট্রেনে ধরলো ভেরার। ভেরা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

অনেক রকম হাসি আছে দুনিয়ার। এ হচ্ছে সেই হাসি যা খুব সঠিক করে বলে দাখবকে, বন্ধু, ভাবি ঠকে পেছ এবার।

এ হাসি দেখে পুলিশদের সন্দেহই রইলো না যে, কাগজটা তাদের আদার আসেই পেটে তলিয়ে গেছে। অপ্রতিভ হয়ে কিরে গেল তারা।

ভেরার গালে কিছু তখনো সেই কাগজ। তখনো কাগজ গেলো যায় কখনো? এইবার ভেরা তা নষ্ট করে ফেললো।

বিশোর্ট লেবার পালা। জনৈক পুলিশের কর্তা এসে কী লিখতে লাগলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, তোমার নামই ভেরা কিগ্নার?

ভেরা হুটকি হেসে বললে, কি রকম হয় আপনার?

কর্তা বেগে টেকেন চাপড়ে বললে, ইয়ারকি রাখো, এটা থানা, ক্লাব নয়।

ভেরা বললে, ও থানা। আমি ভাবলুম ক্লাব।

কেন, এটা থানা কল সঙ্গে হয় না?

ভেরা পতীয়ভাবে বললে, কি করে হবে? থানার লোকরা কি একে অপসর্গ যে, ভেরা-কিগ্নারকে ধরে এনে আবার তার নাম জিজ্ঞেস করবে।

পুলিশের কর্তা বললে, তাহলে তুমি ককুল করছো, তোমার নাম ভেরা কিগ্নার?

না করে কি আর জরি?

কেমন আছেন? নমস্কার! ভেরা চেয়ে দেখে মাকুলত। কুশল, রাগে তার সমস্ত শরীর বি-বি করে উঠলো।

দুনিয়ার শয়তান বলে যদি কিছু থাকে তো তা এই কৃত্রিম বিশ্বাসঘাতকের দল।

ভেরা চীংকার করে উঠলো, কৃত্রিম, বিশ্বাসঘাতক। কি অস্বিহয় দুটি ভেরার চোখে। মাকুলত ভরে পালিয়ে গেলো। তারপর, হাজত-পর্ব। এ হাজতের একটু বৈচিত্র্য আছে।

অজ্ঞাত দেশে—মোকদ্দমার জন্ত প্রস্তুত হ'তে যে-কদিন সেটি হয় সেই কদিন অভিব্যক্তকে হাজতে থাকতে হয়। অজ্ঞাত তাই নিরম। কুশিয়ার নিরম তা ছিল না। সেখানে হাজতবাসিও ছিল একটা শাভি। শুধু শাভি নয়, খুব বড় রকমেরই একটা শাভি। বিপ্লবীদের প্রায় প্রত্যেককেই প্রথমে দু'বছর হাজতবাস করতে হ'ত। তারপর আদালতে তার বিচার। তারপর জেল।

হাজত আর জেলে তফাৎ থাকা উচিত, কিন্তু তা ছিল না। কল সরকার একে নাম দিয়েছিল প্রাথমিক বন্দি।

ভেরাকে এবার তার জন্ত প্রস্তুত করা হ'ল। কয়েদীর পোষাক। তারপরই একবার দুখ।

দুখ কেন? এতো আলয়ে কাজ নেই।

জনৈক কর্তা বললে, যেতেই হবে।

কেন?

কর্তা পকেট থেকে ভেরার চাকার খসেটা বের করে তার ওলা থেকে ভাঁড়ো ভাঁড়ো কি বের করে বললে, এ কি?

ভেরা দেখলো, হলদে পট্টাশিয়ার, অদৃষ্ট কালি করার জন্ত সঙ্গে সঙ্গে রাখতো সে। কিন্তু এসের কাছে ওলা হবে না কিছু। আমি কি জানি?

পুলিশের কর্তা ব'ললে, কিন্তু আমি জানি। এটা পটাস-সান্নানাইড। জীর বিব। আবার সন্দেহ সত্য কি না, তাই বোম্বার জন্ত এই দুখ খেতে হবে তোমার।

অগত্যা ভেরা দুখ খেলো।

পরদিন সকালে পুলিশের কড়া পাহারার ভেরাকে রাজধানীতে চালান করা হ'ল।

পেত্রোপ্রোনে—পুলিশের হাজতে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেলো। একটা সেলে ভেরাকে ঢাচি দিয়ে রাখা হ'ল।

পরদিন রবিবার—নরকেও বোধ হয় ছুটি কারণ নরকের চাইতেও ভীষণতর পুলিশ-হাজাতেই সেদিন ছুটি।

কর্ষনীর বিবস। বৈপ্লবিক জীবনেরও হয়তে আজ শেষ। দীর্ঘকাল পরে বিচারের গ্রহসন হবে। তার পবেই কীসি।

ভেরা কল্পনা-নেত্রে দেখলো, সে কীসিকাঠে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে লাচতে লাচতে, পুলিশদল, সরকার পক্ষ শৈশাটিক উল্লাস চেপে রাখতে পারছে না বেন। কীসির গড়ি পগার প'বেছে, বুলবে, এমন সময়ে আকুল কণ্ঠ থেকে উঠলো পশ্চাতে, ভেরা।

এ মায়ের কণ্ঠস্বর। ভেরার একমাত্র দেবী। ভেরার জন্ম চৌধুর জল ফেলার একমাত্র জন।

ভেরার প্রাণ মায়ের জন্ম কৈদে উঠলো। মাকে একবার যদি দেখতে পেতো।

পরদিন একজন এসে বললো, চলো—
কোথায় ?

উত্তরে। তোমার কোটো নিতে হবে।

কোটা তোলা হ'ল—অনেক কপি। কর্তার কোটাগুলি বারে বারে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন।

ভেরা হেসে বললে, অতো কি দেখছেন? জলজ্যান্ত লোকটাই তো খাড়া আপনাদের সামনে।

জটিল কর্তা বললে, একজনকে পাঠাতে হবে।

কাকে ?

বাকে সবচেয়ে ভালো জিনিষটি পাঠাতে হয়।

ও, জারকে। আমি মনে করলুম, আমার হবু বয়ের জন্ম পাঠিয়েছি ব'হি ?

তোমার এমন মনে করার কারণ ?

বখটে। বহুসতীরা বাহি।—জাগে বিদে হবে না ?

কর্তা বললেন, হী, বিদে হবে। তবে বয়ের সঙ্গে নয়, শূখলের সঙ্গে।

সে কোটা জায়ের কাছে পাঠানো হ'ল। সরকার পক্ষের আজ মহাসমারোহ। আর হীক ছেড়ে বাঁচলেন, তগবানকে ধন্যবাদ। উজ্জ্বর স্ট্রোলোকটা এতোদিনে ধরা পড়লো।

দলে দলে সরকারী করচারী পুলিশ-অফিসে গিয়ে ভিড় ক'রে কীতালো—ম্যাজিক দেখতে লোকে যেমন ভিড় করে। সবার চোখেই উৎকর্ষ। না জানি সে কেমন। রক্তপাত করতে করতে তার হাত লাল হ'য়ে গিয়েছে। তার চোখ দিয়ে হয়তো আঙনই ছোটে। দেখতে হয়তো সে তাড়কা দাকসী। এমনি সব জল্পনা-কল্পনা করবারীদের মধ্যে।

ভেরা এসে হুকলো বখন অকসমবে, কাকুরই বেন বিশ্বাস হয় না, এই সেই ভাবনা বিব্রোহিলী ? এ বে স্রবরী, অত্যন্ত স্রবরী। যৌবন বে এখনো এর আগে আগে উছলে পড়ছে। কী শান্ত সমাহিত তার।—এ বে ভক্তকর একটা তবিত্য:ত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এষ নিশ্চিততা দেখলে তা কল্পনাও করা যায় না।

আকর্ষ। ভেরা-কিগনার বে এমন, তা তো ভাবে নি কেউ।

পুলিশের কর্তা একসারি ভেরার দেখিয়ে দিলে কন্দভাবে বললেন, রোসো।

ভেরা নীরবে ব'বে পড়লো।

কর্তা বললেন, এবার বোধহয় বুঝতে পারছেন। বিব্রহীরা পুলিশের কিছুই কর্তে পারবে না। তুমি অনর্থক ছাত্রসমাজকে কেনিয়ে দেশের অনিষ্ট করছো।

ভেরা হেসে বললো, আপনারা দেখি সবাই সবজান্না।

কর্তা বললেন, কেন, তুমি দেশময় ঘুর ঘুরে ছাত্রদের কানে বিপ্লবমন্ত্র দাওনি ? আমরা যতো ছাত্র ধরেছি তারা সবাই তোমার নাম করেছে।

বটে।

হ্যাঁ, এবার ঠাণ্ডা হ'লে তো। অনেক আগেই তোমার এ শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল।

ভেরা হেসে বললে, ঠিক, ঠিক। কিন্তু কি করবো ? আপনারা উত্তোগ করলেন না এখন আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কর্তা তাক্ষদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, মনে হচ্ছে জীবনযুদ্ধে তুমি অত্যন্ত রান্ড হ'য়ে পড়েছ।

কেন বলন তো ?

নইলে মরণের ভয় কেউ এতো আনন্দিত হয় ?

ভেরা খিল খিল ক'রে হেসে বললে, বা-ই বলুন, খুব নৃশ্বর দৃষ্টি কিন্তু আপনাদের।

টলটল ব'লে একটি সরকারী করচারী ছিলেন সেখানে। ইনি নিশ্চয়ই সেই জগৎপুত্রা অধি টলটলের কণ্ঠস্বত্ব নন। এর কেরামতি অনেক। প্রথমে ছিলেন শিকা-রত্নী। এর হাতে তখন বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠছিল একটা কাল—কলেজের ছেলেদের তো ইনি জালিয়ে পুড়িয়ে ধেরোচ্ছিলেন। হালে ইনি ইন্টারমিডিয়েট—বিপ্লবীদের ধর। অথচ আত্মসম্মতি আছে যোলো আনা। ছেড়ে আঠায়ে আনা।

তিনি ভেরার সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন নেহাৎ গায়ে পড়ে।

পুরানো শিকা পছাত খুবই ভালো ছিল। নয় কি ? অথচ তোমার বিপ্লবীরা তা পছন্দ করতে না। একবার আমার প্রাণদান করার উপক্রমও করেছিলে তার জন্ত। এরকম নরহত্যা কি ভালো ? বিশেষতঃ মহামান্ব সম্রাট—তীক—ছিঃ। ছিঃ।—আর এতে লাভই কি হ'ত তোমাদের ? একজন জার সেলে আর একজন জার বধন হবেই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠাকুর। বেন কচি দুই নাতনীকে বকছেন, বোকাছেন। কিন্তু নাতনীটি বে একেবারে চুপ, কোন কথাই হী-না বলে না। এরকম একতরফা কতকণ কথা-বাহি করা চলে ? কাজেই ভেরাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলো ?

কিছুই না।

অর্থাৎ তুমি আমার একটা কথাও স্বীকার কর না ?

ভেরা একটু হাসলো মাত্র।

টলটল নিরাশ হ'য়ে বললো, কি করবো ? সমস্র নেই। নইলে আমার হুক্তির সাযবজ্ঞা দেখিয়ে তোমার আমার যতে আনতে পারতুম।

ভেরা পঙীর হ'য়ে বললো, বটে। আমার কিছু খুব বিশ্বাস অপনিই বরু আমাদের বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিতেন।

টলটল বেগে সেখান থেকে চলে গেলেন।

অনেক পুলিশের কর্তা হেসে জিজ্ঞেস করলো, এটা কি আপনাদের নীতি-নীতিই বললেন ?

কোথিটা ?

ঐ বে, তাঁকে বিদ্রববলে চান্না ?

হী।

এও কি সম্ভব ?

কেন নয় ? বাবা শুধু তর্ক করাই কান্ড হয় না, তর্কের সিদ্ধান্ত মেনে চলে, তাদের বিদ্রবমত্রে দীক্ষিত করবার পক্ষে যুক্তি আমাদের দিকেই প্রবল।

এ বিদ্রবীদের কথা। তারা বলে, মাছুষ—ভয়, বার্ষ যে কোনো প্রযুক্তির বশেই হোক না কেন—যা সত্য বলে বোঝে তাই করে না। মনে স্বীকার করলেও মুখে সে স্বীকার করে না।

তা যদি করতো তবে জাতির মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলে জেনে বিদ্রবকেই তারা অবলম্বন করতো। ভেয়া এই বিশ্বাসের বশেই ও-কথা বললো।

এর পরে ভেরাকে হাজতবাসের জন্য ‘সেট পিটার এণ্ড পল’ জেলে নিয়ে যাওয়া হ’ল।

‘সেট পিটার এণ্ড পল’ জেলে ভেরা বন্দি। নির্জন সেলে একাকিনী দিন কাটে তার। প্রায়ই পুলিশ-অফিস থেকে ডাক আসে তার। ভেরা পুলিশ-অফিসে উপস্থিত হলে সরকারী এটর্নীর ভেরা করতে বসে। তারি বিরক্তিকর ব্যাপার এ।

ভেরা একদিন বললে, সেখান, আমি বা বলার লিখে দেব। আমার আর এখানে এনে জালাতন করবেন না আপনারা।

সব লিখে দেবেন ?

হী। ১৮৮১ সাল পর্যন্ত বিদ্রবাকোলন সবকিছু আমার বা কিছু জানা আছে, সব লিখে দেব।

ভেরা জেলে ফিরে এলো। জটিল কর্মচারী এসে কাগজ-কলম-কালি দিয়ে পেলো। ভেরা বীরে বীরে কল-বিদ্রবের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে পেলো। এখন তো আর কোনো বাধা নেই বলার। লুকানোও কোনো আবতকতা নেই। শুণ্ডচরের ফরশায় তা পুলিশ প্রায় সবই জানে। বাদের নিয়ে বিদ্রব শুরু তারা তো অনেক আগেই হয় প্রাণ দিয়েছে, নয় নির্বাসিত বা ব্যবসায়িক কার্যদণ্ডে দণ্ডিত। তার এ বর্ণনার কারো কোন বিপদ হবে না। বরক এ তার কর্তব্য। অধুনালুপ্ত এই বিশেষ বিদ্রববীল ক্রমের জনসাধারণের জন্য কতো কি করে, তার ভবিষ্যৎ অথচ সৌরবর্ম ইতিহাস তাকে প্রকাশ করে যেতেই হবে। সে ইতিহাসমুখ বিদ্রবের গর্ভে লুপ্ত হতে দেওয়া যায় না। সেই দলের শেষ সভা হিসাবে এ তার কর্তব্য।

দীর্ঘে বীরে প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে, তারার সমস্ত অলংকার প্রেরণ করে বিদ্রবীর বুকের রক্তে রাজ্য বিদ্রবের ইতিহাস ফুটিয়ে তুললো ভেরা-কিংনার। এক বধাসময়ে তা কর্তাদের কাছে পেলো।

কয়েক দিন পরে ভেরার সে কাহিনী সকলের হৃদে। উপজ্ঞানের মতো এক নিঃশ্বাসে পড়ে কেলেছে সবাই—এমনি বিভিন্ন, এমনি প্রিয় সে কাহিনী।

বাসবানেক পরে এক ভরসাক এসে ভেরার ঘরে হাজির। চোখা বেশ ভার, একটা বিশিষ্টতা আছে। পরিচয় দিয়ে বললেন,

আমার নাম পেরেদ। সৈন্তবিভাগে বিদ্রবীদের কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান করবার জন্য সরকার কর্তৃক আমি নিযুক্ত।

ভেরা কোনো কথা বললো না। পেরেদা একবার চাইলেন ভেরার দিকে। তারপর বীরে বীরে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতখানা তুলে নিলেন। ভেরা বাধা দিতে গেলো, কিন্তু তার আগেই পেরেদা ঘুরে পড়ে হাতখানিতে চুই খেলেন। তারপর বললেন, এতো সুন্দর আপনার স্বভাব। অথচ এতো দুর্ভাগ্য। আপনি। একটি সম্ভাবন পর্যন্ত আপনার নেই ?

ভেরা পেরেদার এ অদ্ভুত ব্যবহারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। অন্য কথা পাড়লো, আপনিই তাহলে সৈন্তবিভাগের বিদ্রবীদের বিচারের জন্য উপস্থিত করছেন।

হী।

সকলেরই শান্তি হ’চ্ছে তা হ’লে ?

না। সবাইকে জড়িয়ে একটা মস্তবড় কাণ্ড বাধানো আমার ইচ্ছে নয়। সেখান, অথবা নিধাতনের পক্ষপাতী আমি নই। পুলিশদের এ অত্যাচার আমি আরো সমর্থন করি না।

ভেরা বললে, তাহলে সরকারের পোলামী করছেন কেন ?

পেরেদা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, স্বপ্নের দ্বারে। নইলে এখানে থেকে এ বেদনাময় কর্তব্যের ভার বহন করিতে হত না। কিন্তু, তাও বলি। এ শুণ্ডহত্যা পছন্দ করি না আমি।

কী পছন্দ করেন তা হ’লে ?

খোলাখুলি লড়াই। হারজিত বা-ই হোক।

ভেরা চুপ করে রইলো।

পেরেদা আবার বললেন, হী, ভালো কথা, আপনার বিদ্রবকাহিনী পড়লুম আমি, চমৎকার। ইচ্ছে হল, লেখিকার সংগে একবার দেখা করে জীবন সার্থক করি।

পেরেদা চলে গেলেন। ভেরা একাকিনী বসে রইলো। অকুবন্ত অবসর চিন্তার। দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি আসে, যায়—অনন্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে। খেরাঘাটে বসে বাউ কড়ি গোশে। সমস্ত দিনের লাভ লোকসান, পথের ব্যথা, আশা নিরাশা, সব বড় হয়ে জাগে তার মনে।

ভেরাও আজ জীবনপথের শেষপ্রান্তে এসে পঁড়িয়েছে, জীবিত জীবনের কথা ব্যর্থকোণের হবির মতো মনে জাগে, মন হাসে, মন কাঁদে, মন গালিত ধাতুপ্রান্তের মতো টগবগ করতে থাকে, মন নবীন যুগের নব স্বপ্নাবলয়ের দিকে চেয়ে নিজের ব্যথার জড়-জরকার করে। কথা কইবার সঙ্গী নেই।

মা ও ছোট বোন দেখতে এসেছে ভেরাকে। হু হুগার একবার করে দেখতে চেওয়া হয় তাদের। কুড়ি মিনিটের দেখা। বে মায়ের কোলে মাথা রেখে প্রহরের পর প্রহর কাটতো, তাকে আজ মাত্র কুড়ি মিনিট পেয়ে বুসি থাকতে হবে।

আর, তাও কি পাওয়া ? না, মা ও সন্তানের সম্পর্কের উপর নিষ্ঠুর পরিহাস। মায়ের কোলে মাথা মাথা ঘুরে কথা, মায়ের হাতখানিতে চুই খাওয়ার উপায়ও নেই। মা নাগালের বাইরে। মাঝখানে হু সারি সোহার বেগিঙ।

একদিন। ছাদর মেন আর কিছুতেই বাধা দানছিল না।

হাস্যে পূর্ণ পানীয় আকর্ষণীয় উদ্ভাবিত করে পুলিশ-অফিসারকে বললে, একবার হাসের হাতখানার চুই খেতে দিন।

পুলিশ-অফিসার গভীরভাবে বললে, হকুম নেই।

তবু একবার।

হকুম নেই। বাসে বাসে সেই একই উত্তর, হকুম নেই। সন্তান

হাসের কাছে বাসে একটা বার, তারও হকুম নেই?

ভোরার মদর গভীর নিরাশার ভরে গেলো।

একদিন বোন ফুল নিয়ে এসো। দিদি ফুল ভালোবাসে, তাই টাটকা ফুলে ভরা একটা লতা নিয়ে এসেছে সে, ভোরাকে দেখে।

হকুম নেই।

কি হকুম নেই?

ও সেবার।

আচ্ছা, ফুলগুলি নয় হিঁড়েই দিচ্ছি, লতা সেব না?

ফুল দেবারও হকুম নেই। কোন কিছুই বাইরে থেকে সেবার হকুম নেই।

ভোরা মনে মনে কিন্তু হ'লে উঠলো। এ তো জেলখানা নয়, এ জীবন্ত সমাধি।

হা দিন কয়েক পরে দেশে ফিরে গেলেন। বোন গেলো অল্পসে চিকিৎসার জন্য। ভোরার জীবনে আবার বাক্যহীন দিনরাত শুরু হ'ল। নীরব, নীরব, সম্পূর্ণ নীরব। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

একদিন ভোরা শুনে পেলো, পাশের ঘরে কে পড়ছে। হঠাৎ তারই হঠাৎ হতভাগ্য কোন বন্দী। নিজের কণ্ঠস্বরকে কথা বলে আটট রাখার জন্য ঘোরে ঘোরে পড়ছে।

ভোরার মনে হল, তার কণ্ঠস্বর লুপ্ত হয়ে গেছে। গলা বেন অসাড় হয়ে গেছে, কথা কোটে না।

একদিন পাশের ঘরের সেই পাঠ্যত বন্দীর কাহিনী জানতে পেলো। সেপ্টিমিটারবার্গে ১৮৪১ সালে পিত্রাজেভস্কির বাড়ী ঘেরাও করে কয়েকজন বুঝকে বন্দী করে। বিপ্লবী বলে তাদের কঠোর দণ্ড হয়। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডট্টরভস্কিও ছিলেন সেই দণ্ডিতদের মধ্যে একজন। এ বন্দী বুঝকও তাদেরই একজন।

একদিন ভোরা কথা বলতে চেষ্টা করলো। স্বাধীন শব্দ—তার সে উচ্চাৎ কান্ডবিনিমিত্ত কণ্ঠস্বর বেন আর নেই। হাঙ্ক, সব চলে হাঙ্ক। গভীর নীরবতা এসে আচ্ছন্ন জীবনে। নীরবতাই এখন তার জীবনের সাধনা।

পরতে হা আবার এসেন

হকী এসে বললে, যা দেখা করতে এসেছেন।

ভোরার মনে হল, এ নীরবতার অন্তরাল ভাঙলে সে আর বাঁচবে না। হা—হা—এখন হা তার—কিন্তু তাঁকেও বেন দেখতে সাহস হচ্ছিল না তার। হা কেন এসেন? বেশ তো চলছিল জীবন অন্ধকারে, হৃদয় হতে স্নিগ্ধ নীরবতার কোলে। কেন তার হৃদয়বাসে এসে হা জুই? না, বাবো না, বাবো না। তার পরেই মনে হল,—হা, বোন তাইলে সে বড় আশাত পাবে মনে, বড় চিন্তিত, বড় হৃদয়াকুল হবে।

ভোরা বীয়ে বীয়ে দেখা করার ঘরে গিয়ে পড়লো। আবার

মাদে-সভানে, বোনে-বোনে সেই বেননার দৃষ্টি-বিনিময়। ব্যাধুয় অনিচ্ছাময় বিদায়।

তারপর আবার—বীর্ণ, দুর্বীর্ণ কারাবাস। হঠাৎ একদিন পুলিশ-অফিস থেকে ডাক এসো আবার। একটা ঘরে টেবিলের উপর রাখিত কাগজপত্র নিয়ে ব'সে আছেন নোত্রিজিকি এক শেরো।

ভোরা ঢুকতেই একটা অ-বীর্ণানো নোটবই দেখিয়ে নোত্রিজিকি বললেন, দেখা কার চিনতে পারেন?

ভোরা দেখে বললো, না।

নোত্রিজিকি তখন প্রথম পূঁঠা খুলে ভোরার চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

ভোরার মুখ বেননার পান্ডবর্ণ হয়ে গেলো। এ কী দেখছে সে? সাক্ষি ডিগারেভ? না, না, এ হতে পারে না। ডিগারেভ,—হাকে এতো বিশ্বাস ক'রেছে সে—সে বিশ্বাসঘাতক! অসম্ভব! কিন্তু প্রমাণ—অলঙ্ঘ্য প্রমাণ সামনে।

ভোরা নোটবুখানা ফুলে নিয়ে পড়তে লাগলো। পড়ছে, আর তার মুখে ফুটে উঠছে হৃদয় ছবি। বিশ্বাসঘাতক পত্ন—সব লিখে রেখেছে এতে—প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেক বিপ্লবীর মর্মে, প্রত্যেকটি ফিল্ম-কিকির। এতো জব্দ হ'তে পারে হাঙ্ক? এতো নীচ?

ভোরা নোটবইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল টেবিলের উপর। তারপর শিল্পাবদ্ধ সিঁহিনীর মতো ঘরঘর পাইচারি করে বেড়াতে লাগলো। ডিগারেভ! ডিগারেভ! ডিগারেভ বিশ্বাসঘাতক!

নোত্রিজিকি একটু হেসে বললেন, আরও আছে। এই বলে একতারা কাগজ দিলেন ভোরার হাতে। সেগুলি দ্বন্দ্বী সৈন্ত-বিপ্লবীদের বর্ণনাপত্র।

পাতা ওপটাতেই চোখে পড়লো, 'আমার জন্ম বুঝতে পেরে নিয়মিত বর্ণনা রাখিল করছি আমি।'

হৃদয় ভোরা আর একটা পাতা ওপটালো, এ একই কথা, একই গুণ। সকলেই নিজের জন্ম বুঝতে পেরে মনের সকল কথা অকাতরে পুলিশকে জানিয়েছে। অশ্রু এসের উপর কত নির্ভর, কত বিশ্বাস করেছিল সে! কত বড় একটা ভবিষ্যৎ এসের নিয়ে গড়তে বাচ্ছিল। লপথ করে একদিন বেছায় বিপ্লবের মন্ত্রে লীলা নিয়েছিল এরা, প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল, সমস্ত বিরোধ আদত করবে—কৃত্রিমের দল।

কিন্তু তবু এরা ডিগারেভের মতো নয়। সে কৃত্রিমের রাজ। তার যোগ্য বিশেষণ নরকের অভিধানেও মেলে না।

ভোরার মনে হ'ল হাঙ্কযে এই কৃত্রিমতা দেখার চাইতে বৃহত্তম প্রেম।

মরতে চাই, আমি মরতে চাই! তবু মরা হবে না তার। এখনও কাজ বাকি।

পুর শিতার হৃদয়টি করে। ভোরাও বেন এই কৃত্রিমতার মহাশক্তিতে বাঁড়িয়ে আছে, তার শেষ কাজ—অগ্রিমডিকা ফুলে বড় বিপ্লবের সমস্ত হৃদয় ভীষণ এই বিপ্লব সমস্ত বিপ্লববিরোধী মহানারীকে প্রাণধারণ করা।

ডাকে বাঁচতেই হবে। কিন্তু এ কতটা ফুলে কী করে?

হাতের কাছে আর কোন কাজ না পেরে ডেরা-কিপনার ইংরাজি শিকার সেসে গেলো—টিক দেশাখানের মতন। ইংরাজি সে কিছু কিছু শিখেছিল আগে, এবার ভালো করে শিখতে লাগলো। বই পড়ার বরাবরই তার খুব আনন্দ। একদিন দেশের ডাকে সে আনন্দ থেকে নিজেকে ব্যক্তি করেছিল সে। আজ আবার ফুলে গেলো তাতে। তার মনে হল, এই প্রিয়সঙ্গীনের ভরে আসন্ন বৃষ্টিও তরে শিখিয়ে গেছে।

একদিন একটা ভাতা ল ফুলে উঠেছে, তামাক বাখা। ডাক্তার এসেন। ডাক্তারটির নাম উইলমস। পাখরের দেয়াল, আর লোহার গবাদে দেখে তার মনটাও হয়ে গিয়েছিল অমনি কটিন।

ডেরাকে দেখে তার মনটাও বেন গলে গেলো। বললেন, অপারেশন করতে হবে।

ডেরা বললো, কখন।

অপারেশন করা হল। ডেরাও কয়েক বছর হয়ে এলো।

ডাক্তারবাবু তখন হাঁক ছেড়ে বললেন, বাঁচা গেলো। আমার খুবই ভয় হয়েছিল ধূমপানের হয় না কি।

ডেরা একটু হুহু হাসলো। এ কি ডাক্তারের বুদ্ধি। জেলখানার ডাক্তার, বারা কয়েদীর প্রাণের দায় এক কানাকড়িও দেয় না, ডানেরই একজন—

ডেরার চিন্তাম্রোতে বাধা দিয়ে ডাক্তার সহসা বলে উঠলেন, জী, এ কি ঘর বাবা। অন্ধকার, ডাম্প, নোড়বার একশেষ। এখানে কী করে আছে! যা?

ডেরা হেসে বললো, যেমন করে আমার আসে হাজার হাজার বন্দীরা এখানে থেকে গেছেন।

ডাক্তারবাবু মাথা নাড়লেন, বেন এতো দীর্ঘকাল জেলের ডাক্তারি করে, এ ঘর দেখে দেখে, আজ হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল—এ ঘর ডাম্প, এ ঘর মাছবের অব্যবস্থা। বললেন, তোমার তো এখানে থাকা হতে পারে না যা। আমি বন্দাবান্ড করছি।

তার পরদিনই ডেরা একখানা শুকনো বস্ত্রবস্ত্র পরিষ্কার ছোট ঘর পেলো। দক্ষিণ-পশ্চিম খোলা, জানালা খুললেই একটা বারান্দা। বারান্দার একটু দূরেই দেয়াল, খুব দেখা যায় না,—কিন্তু হৃদয়ে তার তির্যক আলো এসে খেলা করে ঘরের জানালায়।

ঘরের এক কোণে জীটা একটা লোহার টেবিল, তার উপর ঝড়িয়ে একটা ছিন্ন দিয়ে বাইরের খানিকটা দেখা যায়—কটিন পাখরের, উপর ছোট একটা চায়াগাছ। যোজ তই দেখে ডেরা।

পাহাড়ের সঙ্গে বেন তার কতদিনের বন্ধু। একদিন দেখে, তার শাখায় শাখায় ফুঁড়ি ফুটেছে। বুঝলো, বসন্ত এসেছে।

বসন্ত এলো। পাখরের বুক ফুলের পাণ্ডি ছড়িয়ে পড়লো।

ডেরার মনে পড়লো বহুদিন আগেকার কথা—কুল অমনি করেই ছড়িয়ে পড়তো তার সর্বাসে—কিন্তু আজ? জীবনব্যাপী শিশির-নিশা সঞ্চে তার। কবে এর অবসান হবে? সে কবে? সে কবে?

একদম দাঁত ঝাঁকিয়ে কারাবাস। তারপরে কোর্টবাণী—

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ সাল। ডেরাকে অভিযোগপত্র দেওয়া হল। মোট চৌদ্দজন আসামীর বিচার হবে। সবদেরই উকীল নিযুক্ত হয়েছে। ডেরার পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন উকীল এলো।

ডেরা হাসিমুখে বললো, ধর্মবাদ আপনাকে। কিন্তু আমি তো উকীল নিযুক্ত করবো না?

করবেন না? তাহলে যে—

ডেরা বললো, আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার যা বলবার, আমি নিজেই বলবো।

উকীলবাবু দেখলেন, প্রেহরীরা একটু দূরে। এমিক-ওমিক চেয়ে ঘর ঘিরে বললেন, শুনেছেন, পুলিশের গুপ্তচর, দানব সুবকিন খুন হয়েছে।

সে কি? কে খুন করলো তাকে?

ডিগারেড। খুন করেই পালিয়েছে।

ডিগারেড। ডেরার চোখের সামনে সমস্ত ছনিরাটা বেন ফুলে উঠলো। মন তার অস্থির—বেন বৃষ্টিতে পায়ছে না, হাসবে কি কীভাবে।

ডিগারেড। ডিগারেড। কি সে? কে সে?

না, মাছবের চায়র সত্যই দুর্ভেদ্য।

কিন্তু এর মধ্যে কোন কারসাজ নেই তো?

২১শে সেপ্টেম্বর। একজন দক্ষী এসে ডেরাকে একটা কোর্ট আর টুপি দিয়ে বললো, চলো।

কোখার?

অন্ত হাজতে।

ডেরা প্রমত্ত হল। অন্ত একটা জেলের একটা সেলে তাকে এসে আটকে রাখলো।

রাত হয়েছে। তবু ঘুমোবার যে নেই। সমস্ত রাত দুটো দক্ষী গল্প করলো তার সেলের সামনে ঝাড়িয়ে।

পরদিন ৯শতাং—অন্ধকার সন্ধ্যা জেলের আলিঙ্গিত গোলকর্বাঁরা ঘুরিয়ে একটা প্রশস্ত ঘর নিয়ে বাওয়া হল।

ডেরা চেয়ে দেখে, আর ডেরোজন আসামী হাজির, আর প্রত্যেক আসামীর হু-পাশে খোলা ডেরোয়াল হাতে নিয়ে হু' হুজন দক্ষী। বহু বন্ধুকে আলিঙ্গন করা তো ঘুরে কথা, স্পর্শও করতে পারে না। কী করণ মৃতি তাদের। চোখ জল কামে। ঈর্ষ, মর্দিন হুখ, বেদনার ভায়ে শরীর বেন ভেঙে পড়েছে। অথচ এরা হু বছর আগে ছিল—বোবনদীপু, সুন্দর, সবল, জীবনাবেগপূর্ণ। আজ এরা তারই ধ্বংসাবশেষ।

ডিগারেড। ডিগারেড। এই তোমার কীর্তি।

ডেরা বেন বাসে গর্জাতে লাগলো মনের ভিতর, কিন্তু বাইরে সে শান্ত, বীর, হির, গভীর।

আদালত লোকে লোকাব্য। সেবা আসামী ডেরা কিস'র। সকলের চোখ তার দিকে নিবদ্ধ। বিচারের অভিনয় শুরু হল। সরকার পক্ষে সাক্ষী অসম্মত,—প্রমাণ অপরাধ।

আসামীর কেউ প্রতিবাদ করে না। শেষে নৃত্যোক্ত তবু তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলো।

সুদীর্ঘতার ভাব বেন, যা হবার তা হতে হবে। তবে আর কি? একটু গল্প করে নিই। কীভাবে গল্প শুরু—

সভাপতি গর্ভে উঠলেন, আসামী লুইসিলা, কথা বন্ধ কর।

মিনিটবান্দে চুপচাপ। আবার শুরু গল্প, এবার একটা চাপা ধরে।

আসামী লুইসিলা, কিস-কাস বন্ধ কর। স'রে ব'স।

লুইসিলা লম্বা হেলের মতো স'রে ব'সলো। এক মিনিট যেতে না যেতেই আবার শুরু। এমনি চললো।

ডেরা জড়ের মতো ব'সে সব শুনছিল।

হা ও বোন এসেন। ডেরার কক্ষ অক্ষ এবার বেন-উথলে পড়লো পরম প্রিয়জনের দর্শনে। হা, হা, তুমি বাও, আমি লইতে পারছি না।

হা বুঝলেন মেয়ের অন্তরের ব্যথা। কত বড় ভবিষ্যতের সামনে প্যাঁড়য়েছে আজ তার মেয়ে। তিনি নীরবে আশীর্বাদ করিতে লাগলেন মেরেকে।

বেন একজোড়া গোলাপ হাতে নিলো। কী সুন্দর গন্ধ, কী চমৎকার রং। কিন্তু কতক্ষণ স্থায়ী এ?

ঠিক মাস্তবের জীবনের মতো। অমনি স্থলর হ'য়েই কোটে সে, পক্ষ ফিলার সে, তারপর ক'রে পড়ে ধারে ধারে।

ডেরারও তো অমনি ক'রে ক'রে পড়ার দিন শুরু হ'য়েছে।

জোয়া ফুলগাল বুক চেশে ধরলো। আঃ, কি আশায়। পরম প্রিয়জনের ভালোবাসা বেন সমস্ত হেঁচ দিয়ে অল্পভব করছে সে।

জমেকা কমলী মহিলা এতোকণ একদৃষ্টে ডেরাকে দেখছিলেন, এইবার বেন নিঃসঙ্গেই চিনতে পেরে সানন্দে বলে উঠলেন, ডেরা-কিগুন্যার, আমার চিনতে পারছো না?

হা, আপনি মাগাম তলান। রডিওনডি ছুলে আমার পড়িয়েছেন।

হাশম খুশি হয়ে বললেন, আমি তোমার আশীর্বাদ করছি।

কিন্তু আশীর্বাদ কী করলেন, তা পোনা গেলো না—সকল আশীর্বাদ তো আর হুখ কুটে প্রকাশ করা চলে না। শুধু তার হৃদয়ে অক্ষপাতি হয়ে গেলো। কি মনে করে তা তিনিই জানেন।

আসামী ডেরা-কিগুন্যার, তোমার কী বলবার আছে?

ডেরা উঠে প্যাঁড়লো।

চারিদিকে কবরের মতো শীতল মিস্ত্রিতা, শিশুর মতো আগ্রহ, এই বিজ্ঞানী নারী না জানি কি-ভাষণ কাহিনী ব্যস্ত করে।

অবিচলিত কণ্ঠে ডেরা-কিগুন্যার বলে চললো তার বক্তব্য—

কোর্ট ১৮৭১ সাল থেকে আমার বিপ্লব-জীবনের আলোচনা করেছেন। সরকারী উকীল বিমিত হয়েছেন আমার বিপ্লব-জীবনের ভীষণতা এবং ব্যাপকতা দেখে।

কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। আমার এ বিপ্লব-জীবন আকস্মিক নয়, ১৮৭১ সালে একদিন ঘুর থেকে উঠে হঠাৎ বিপ্লব-মঞ্চে নীকা নিইনি আমি। এর পিছনে একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

আমার অভ্যন্তর জীবনের কথা ভালো করে জেনে দেখেছি—আমি ইচ্ছে করে বিপ্লব-সাগরে কাঁপিয়ে পড়িনি, লক্ষ লক্ষ রক্ত নরনারীর জায়গায় বার হাতে সেই রক্ত-সরকার আমার বিপ্লবী হতে বাধ্য করছে। আর কিছু হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আমার জীবন-নাটকের প্রথম অংক ছিল আনন্দে ভরা। প্রাণ-প্রাণ-মেহ-বিলাসিতা, শিক্ষা-নীকা-বংশগৌরব, আভিজাত্য,—কোন কিছুই অভাব ছিল না আমার। নিজের আনন্দে মনে করতুম, সুনিদ্রায় ঘরে ঘরেই বুঝে এমনি আনন্দের ছিটকাল।

একদিন ভুল ভাঙলো। দেখলুম, আমারই পাশে পাশে লজ্জা নরনারী পুত্তর মতো জীবন-বাণ করে, পেট ভরে খেতে পায় না, পরিধের শতছিন্ন, কুটার অর্ধভয়।

আর আমি ডুবে আছি বিলাস-প্রবাহে। কে বেন কশাঘাত করলো প্রাণে। ভাবলুম, এঁদের এই শোচনীয় দারিদ্রের জন্ত আমিও দায়ী,—সকল অভিজাতই দায়ী। এদের সেবা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো—এই উদ্দেশ্য নিয়ে ডাক্তারি শিখলুম।

আরও একটা কথা শিখলুম,—শুধু ডাক্তারিতে রোগ বার না। রোগের আসল কারণ হারিয়ে। আর দেখলুম, লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনের ওপর দারিদ্রের জগদল পাথর চাপিয়ে দিয়ে তার পথ উৎসবে মত্ত হয়েচে যে সেই হচ্ছে রক্ত-সরকার। রক্ত-সরকারকে ধ্বংস না করে মাস্তবের হুখ-হুখ করা বাবে না। সমাজতন্ত্রবাদে আমার সেই থেকেই নীকা, আর সেই থেকেই আমি কারয়নোপ্রাণে বিপ্লবী।

আমি ইচ্ছে করে বিপ্লব করিনি। রক্ত-সরকার নিয়ে অন্ত্যাত্মার রক্তগংগা বইয়ে আমার বিপ্লবের দিকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

ডেরা তার জবাববন্দী শেষ ক'রে বসে পড়লো। তারপর বিচার-বল—ডেরা এবং আর সাত জনের কীসি। ডেরা বেশ সহজ ভাবে গ্রহণ করলো সে দণ্ড। জেলে জেল-সুপারিনটেন্ডেন্ট তার সঙ্গে দেখা করতে এলো।

কি চান?

একটা পরামর্শ। দণ্ডিত আসামীরা ছিন্ন করেছে আপীল করবে।

কিন্তু ব্যারণ ট্রোমবার্গ ঠিক করবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না।

আপনি এ বিষয়ে ঠিক উপদেশ দেন, তাই তিনি জানতে চান।

ডেরা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আপনি তাকে বলবেন, ডেরা-কিগুন্যার নিয়ে যা করে না, অন্তকেও তা করতে উপদেশ দেয় না।

ডেরার আপীল করার মত নেই জেনে সুপারিনটেন্ডেন্ট বললেন, কি নিষ্ঠুর আপনি!

কীসির আসামী।

হা আর বোন দেখা করতে এসেন। শেষ সাক্ষাৎ। কার্যর হুখে কথা নেই, শুধু গভীর স্থলরভেনী গুটি। অবিরল অক্ষ-বরষণ। স্বপ্নাবিষ্টর মতো বিদায়—চিরবিদায়!

ওঃ, অসহ্য। লম্বা দোর বন্ধ হয়ে গেলো। ডেরা অভিজুতের মতো ব'সে রইলো। তার মনে হল বেন সে আবার ছোট মেয়েটি হয়েছে, মায়ের আদর কাড়বার জন্য লোলুপ, কী স্থলর তুমি হা। কতো ভালোবাসি তোমার। হা শুনে আদর ক'রছেন তাকে।

বেন ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে—এবারকার সৌন্দর্য আরও স্থলর, আরও স্থলর।

হঠাৎ তালো বোলাব কড়-কড় শব্দে বন্ধ তেড়ে গেলো। করে চুকলো রক্তিসহ ইরাকোসেল।

ডেরাকে কয়েকটি গোলাব পলাত হলে। পালকি একটা ঘর

ছিল। কবীরের পোষাক নিয়ে একটি দ্বীলোক সেখানে হাজির।
ভেরা সেখানে গিয়ে পোষাক বললে এলো।

তারপর অতীতের চিন্তা, আর মহাভবিষ্যতের ভয় অপেক্ষা।

মৃত্যু। কত দুঃখ। কত গরিমাময়, কত আকাঙ্ক্ষিত।

প্রভুত্ব, সম্পূর্ণ প্রভুত্ব সে। কীসির ভিখি। বীরে বীরে তাল।
খুলে গেলো ঘরের। ভেরাও হেসে উঠে ঝাঁড়ালো। চলুন।

আগন্তুক বাধা দিয়ে একখানা কাগজ পড়ে গেলো।

মহামান্ন সম্রাট অসীম অমুকম্পার বশবর্তী হয়ে জোয়ার মৃত্যুদণ্ড
কমিয়ে থাকজীবন কারাদণ্ড করেছেন।

ভেরার চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে এলো।

অমুকম্পা। জোয়ার এ অমুকম্পার চাইতে মৃত্যুও বে ডালো
জার। এ তিলে তিলে মরণের চেয়ে কীসির দড়ি অনেক, অনেক
বেশী লোভনীয়।

ভেরার মনে হল, সে নববধূর বেশে অভিসারে চলেছিল
মরণ-বধূর সংগে। জার তার অভিসার বার্ষ করেছে। কবে কোন
পথ দিয়ে, কোথায় আবার সে বধূর সংগে দেখা হবে, কে জানে!

‘সেই শিটার এণ্ড পল’ জেলখানা।

একটি সেলের কাছে ভেরাকে নিয়ে আসা হল। গার্ড দোর খুলে
মিল। ভেরা ঢুকতে পেলো।

হ্যাঁ, শোনো একটা কথা, এখানে গান গাওয়া নিষেধ।

ভেরা অবাক হল। বেশ একটু কৌতুকও বোধ করলো। বলে
কি? এই কি গান গাওয়ার স্থান, না সময়? কতো স্বদেশপ্রেমিক
বন্দীর অজ্ঞানসিক্ত পবিত্র স্থান এ। এখানে গান গাওয়ার কথা
হুনেই তো আসে না।

ভবে, ওর সতর্ক করে দেওয়ার মানে? লোকটা বোধহয় পানোর
ওপর কাপা।

১২ই অক্টোবর। ভেরা তখনও বিছানায়। একজন এসে
একটা চামড়ার কোট আর একভোড়া বুট বিছানার উপর ফেলে
দিয়ে বললে, ওঠো, চটপট পোষাক পরে চলো।

কি হয়েছে? ব্যাপার কি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

জবাব নেই।

অগত্যা পোষাক পরে ভেরা চললো সেই গার্ডের সংগে।

তার ভক্ত বৃদ্ধি কীসিকার্টারই ব্যবস্থা হয়েছে আবার।

কিছুদূরে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। অনেক বন্ধী বললে, হাত
দেখি।

ভেরা হাত বাড়িয়ে মিল, কিছু বুঝতে পারলো না, কী এসে
উদ্দেশ্য? এরা কি ডাক্তার? নাড়ী দেখছে?

তারপর যা দেখলো তাতে তার দেহের রক্ত চন্দ্র করে উঠলো।
একটা লোহার শিকল। মাঘুষ সে, তাকে বাঁধবে ঐ লোহার
শিকল দিয়ে। এতো বড় স্পর্ধা। এরা মনে করেছে কি? শিকল
দিয়ে তার হাত বাঁধতে পেরেছে বলে কি তার মনকে বাঁধতে
পারবে?

না, না, না। যেন এই কথাটাই বোঝাবার জন্য সজ্ঞাথে মাটিতে
পদাঘাত করে বন্ধীকে বললে, মাকে বলো—বড় অত্যাচারই আমার
ওপর হোক না কেন, আমার মত কখনো বলাবে না।

বেশ, বলগে।

আর বলো, আমার ভক্ত কীদেন না যেন তিনি। দু-চারখানা
কই, আর মাঝে মাঝে তাঁর সবার পেলোই আমি আনন্দে থাকবো।

আচ্ছা, সবই বলগে।

[ক্রন্দন।]

মাসিক বঙ্গমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	—	২৪
সাপ্তাহিক "	—	১২
প্রতি সংখ্যা "	—	২

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	—	১৫
" সাপ্তাহিক সডাক	—	৭.৫০

ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১.২৫

বিজ্ঞিত প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে — ১.৭৫

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ	—	২১
সাপ্তাহিক " " "	—	১০.৫০
বিজ্ঞিত প্রতি সংখ্যা " "	—	১.৭৫

● মাসিক বঙ্গমতী কিছুদূর ● মাসিক বঙ্গমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বন্ধন ●

বিদেশিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নিরবরজন দাশগুপ্ত

পাঁচ

পূর্বের দিন সকালবেলা রেকফাট খেয়ে টুকি ছেড়ে বগুয়ানা হলো—‘লু’র অভিমুখে। সেট রকমট ছিঁব ছিল। একটু সকাল-সকালই রেকফাট খেতে গিয়েছিলো—সে লোকটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। স্বস্তির নিখাস কেসেছিলো—বলাই বাহুল্য।

সকালবেলা উঠেই দেখলাম—মনটা ভারী হয়ে আছে, লাড়িয়ে কাল রাত্রে বাপাঘটার দুনি মন থেকে তখনও বায়নি। বুল। এরাগিন এসেছে বাস করছি—এরকম স্পাটস্পাট জবজ্ঞা ও বুণার ইকিড কোনও ইংরেজের কাছ থেকে কোনও দিন পাটনি। মোটের উপর সম্ভবতাই শেষে এসেছি। মানায়কর বুদ্ধির দিক দিয়ে মনটাকে শাড়ি করার চেষ্টা করলাম এক বুদ্ধির অভাবও হল না। লোকটা ইতর, লোকটা দাতাল, এককিড ছিল না—এ সব কথা সত্যকই মনে এল। অতএব ও লোকটিকে অজ্ঞা করার শক্তি আমার থাকে উচিত। এক কাল রাত্রে লাউক্সের বাকী সকলটি লোকটি বেগিরে গেলে ঐ কথা বলেই আমার কাছ থেকে কমা চেষ্টা করেন। কিন্তু তবুও মনটা ঠিক সহজ হচ্ছিল না—কোথায় যেন একটা কি কাটা কুটেই রইল।

কাটাটা যে ও লোকটির বাহ্যিকের দিক দিয়ে মোটেই নয়, অল্প দিক দিয়ে কুটেছে—একথা চঠাৎ পরিচায় হল ককমকে পূর্বের আঙ্গার পাণ্ডা চালাতে চালাতে, টুকি ছাড়িয়ে হাটল জিনিস বেতে না বেতেই। মার্লিন। মার্লিন কি আমার উপর নির্ভর করে না যে ভাবে জীব বাবীর উপর নির্ভর করা উচিত? কাল রাত্রে লোকটি যখন মার্লিনকে স্পাটই অপমান করল, মার্লিন উঠে দাঁড়াল—মার্লিন ত আমাকে কিছু বললে না, আঙ্গরকার আবেদন জানাল ক্ষমের অঙ্গ ইংরেজের কাছে। কেন? সর্বত্রিক দিয়ে মার্লিনকে বলা করার পূর্ব সামর্থ্য কি আমার নাট এক মার্লিনকে কি তাই বিশ্বাস? আমার কি উচিত ছিল, মার্লিনের আবেদন জানাবার পূর্বেই উঠে দিয়ে লোকটাকে সহ্য করা? কেন করিনি? তাই কি মার্লিন আমার প্রতি ভরসা হারাল? কিবা—ভাকতে মনটা শিউরে উঠল যন্ত্রিকারের বিশেষ মাহু আপনার লোকের কাছেই

ছুটে যায়—মনের গভীরে রক্তের টানে ইংরেজই কি মার্লিনের বোই আপনার? আজ যদি মার্লিনের বামী একটা মাহুয়ের মতন মাহু ইংরেজ হত, তাহলে হয়ত মার্লিনকে অঙ্গ ইংরেজের কাছে আঙ্গরকার আবেদন জানাতে হত না—এই কথা মনে হতেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস আমার বুক ছাপিয়ে পড়ল। মার্লিন ত পাণ্ডাতে আমার পাশেই বসেছিল। যুহ হেসে বলল, বাবা। দীর্ঘনিশ্বাসে উড়ে বাচ্ছিলো যে।

হেসে বললাম, লীনা। কাল রাত্রে বাপাঘটা কুলতে পারছি না।

মার্লিন বলল, কেন তুমি ও নিয়ে অত জ্বাঝ? একে লোকটাকে মাহু বসেই ধরা চলে না—তার উপর দাতাল। ওর কথা কি কোনও মূল্য আছে?

বললাম, তা ঠিক। কিন্তু তোমাকে অপমান করার পর, লোকটাকে আমার একটা ভাল রকম শিকা দেওয়া উচিত ছিল।

মার্লিন বলল, না—না। তুমি যে কিছু করনি, তালই করেছ। লোকটা শুভ। হয়ত তোমাকে ভীষণ গ্রাহার দিয়ে বলত এক তোমাদের হুজনার দন্দে কোনও ইংরেজই বোঝ হব এদিয়ে আসত না।

উৎসাহ, ওঃ, তাই বুঝি তুমি ইককসের কাছে আবেদন জানালে?

হেসে আমার বা বাহুতে মাথাটি রেখে বলল, ঠ্যা, পরব কয়ে নিলাম—কাটা দিয়েই কাটা তোলা যায় কি না।

মনটা অবজ লাভ হল, কিন্তু আমার মনের কাটাটি একবারে উঠে গেল কি?

লু।—কর্ণধরালের সম্ভবতীরে মোট সম্ভট—সেই লু। কেবালে আমার হাজীকরনে পনেরোটা দিন কী আনকেই না কাটিয়েছিলো। সম্ভরের বায়ে পাহাড়ের উপর সেই হেডলাও মোটসেই দিয়ে উঠলাম। কুলা। মোতালার সম্ভরের দিকেই যা গেলাম। সেই মানেকার—অর্থাৎ চুলটা অবজ করেকাটা পোক বেড়ে—আমাকে

ନାମିକ କରବଣୀ—ବିଶ୍ୱାସୀ



ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ

ତେଲ

ଏମ. ଏଲ. ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଓ କୋ. ପ୍ରାଏଭେଟ୍ ଲି:
ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ ହାଉସ, କଲିକତା-୨

সেইই চিনতে শেষে এসিয়ে এসে সবার অভ্যর্থনা জানাল। হার্লিনের সঙ্গে তার পাকিস্তান করিয়ে দিলাম।

আমাকে বলল, আপনি চিঠিতে সেই খবরখানিই চেয়েছিলেন। কিন্তু এবার যে আপনারা দুজন, তাই পানের দুজনার উপযুক্ত একটা বড় ঘর বেছেছি।

সুঁতে প্রায় একটা মাস কী অনাবিল শান্তিতেই না কাটল। সেই সেবারকার মতন সকালবেলা ত্রেককাঠি খেয়ে দুজনে বেরিয়ে যেতাম, সমুদ্রের ধার দিয়ে পাহাড়ের উপরের রাস্তাটি ধরে লোকালয় ছাড়িয়ে যাবে—বসন্তাম গিয়ে নির্জন বনভূমিতে। পাহাড়ের পারের জলায় অনেক নীচে বিশাল সমুদ্র এসে বারে বারে জানিয়ে যেত প্রশান্তি—কুহু হরে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। বিকেলেও বেড়াইতাম—মনে হত, আকাশ বাতাস ভুবন আলোও বেন আমাদের দুজনকে বিশেষ করে ভাল বেসেছিল সেই সময়টা কণ্ঠবালের সমুদ্রতীরে।

সুঁতে হাওয়ায় প্রায় পনের দিন পরে একদিন সকালবেলা যিঃ লালকাংকার চিঠি এল—ভিনি ব্রেসকে কিরিয়ে নিয়ে গেছেন সেল-এ। চিঠিখানি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অভিলক্ষ্যে ভরা। হার্লিনও চিঠিখানি পড়ে খুবই খুশী হয়ে উঠল।

ত্রেককাঠি খেয়ে দুজনে গিয়ে বললাম—পহর ছাড়িয়ে নির্জন বনভূমিতে—সামনেই সমুদ্র। মিনটা উজ্জ্বল ছিল না—বেঙা। এবং একটি হাওয়াও ছিল—সেটা অবশ্য এসেপের প্রায় বারোমাসের নিত্যকারের ব্যাপার। তবে হাওয়াটি উত্তর-পূর্ব কোণের নয়—বে হাওয়াটি ঐতকালের দিকেই বেশী বহে—এবং বা বাইরে বসে সন্ধ্যা করা অনন্তর। হাওয়াটি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের, সেটা মোটের উপর তত ধরাপ লাগে না—বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে। হার্লিন বসেছিল আমার গা বেঁধে আমার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে—বেতাবে বসতে সে চিরদিনই ভালবাসত এবং আজও বাসে। আমি একটি হাত দিয়ে হার্লিনকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম।

হার্লিন বলল, হাক। ব্রেসের বিক গিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া পেল।

বললাম, গ্যা। আপাততঃ।

তুখাল, কেন ?

বললাম, তুমি বাই বল, ব্রেসের যে লালকাংকার প্রতি একটি অঙ্গভীর ভালবাসা—আচ্ছা, এ আমার বিশ্বাস হয় না। প্রাণের উতাপ হয়ত তার খুব বেশী কিন্তু তাই বলে লালকাংকারে নিজেই যে সে উতাপ—তা নাও হতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার কথা যদি মেনেও নি, আর সে তুল করবে না। একবার মুখ পুড়িয়ে বুকেছে পোড়ার কি জালা।

বললাম, তা কি বলা যায় ? এবার হাক নিয়ে মুখ ণ্ডাফাল সে ওর আসল মাহুই নয় তাই সহজেই জালা টের পেল। ওর সত্যিকারের মাহুইটি যদি কখনও আসে ওর জীবনে, প্রাণের প্রবল উতাপে আবার হয়ত বেহ'স হবে।

একটু চুপ করে থেকে হার্লিন বলল, না। বরস ত ক্রমেই দাড়াবে বৈ কমবে না। মনের উতাপ ক্রমেই আসবে, বেহ'স আর হবে না। তার উপর বরও বড় হবে উঠছে।

ব্রেসের কথা ফেঁদ গিয়ে তুখালাম, আচ্ছা লীনা। তুমি যদি কোমরিস প্রে আমি তোমার প্রতি দাক্ষ উপাসীর—

কথা ধামিয়ে দিয়ে তুখালাম হেসে বলল, সেই দুহুতে এই পাহাড়ের উপর থেকে ঐ নীচে সমুদ্রে বাঁপ দেব।

বললাম, কেন ? এত করে ব্রেসকে বোঝালে—ভারতীয়দের মন অন্তরুখী, অমৃতুতির প্রকাশ অনেক কম ইত্যাদি ?

তুখাল, তাই কি ?

তুখালাম, তবে সমুদ্রে বাঁপ দেবে কেন ? আমার অন্তরে ভুব গিয়ে একবার দেখবে না ?

বলল, তা ত দেখবই, তবে সেখানে যদি মণির সন্ধান না পাই—সমুদ্রে ভুব দেওয়া ছাড়া উপায় কি ?

হেসে বললাম কেন ? ব্রেসের মতন—

আমার কথা ধামিয়ে দিয়ে বলল, না—না। তা আমি পাবই না। তাহলে শুধু ত আমার মুখ নয়, তোমার মুখও যে পুড়বে—তা আমি কিছুতেই সহ্যইতে পারব না।

কথাগুলি বলে আরও যেন আমার বুকের মধ্যে এল সরে।

একটু চুপ করে থেকে তুখালাম, আচ্ছা লীনা ! তোমার কথাটা কি ঠিক ?

তুখাল, কোন কথা ?

বললাম, ঐ যে ব্রেসকে বলেছিলে—ভারতীয়দের মন অন্তরুখী ইত্যাদি।

বলল, কেন ? তুমি নিজে জাননা ?

বললাম, ঠিক বুঝতে পারি না।

বলল, সোখা কথাটাই ধরনা—তুমি আমাকে লীনা বলে ডাক। ক'বার ডালিঃ বা ডিয়ারেষ্ট বল ? অথচ এ দেশে আমি-দ্বারী পদম্পর বগড়া এমন কি মারামারির মধ্যেও সম্বোধনে—ডালিঃ বলে নিজের মনেই হেসে উঠল।

এবারেও একদিন পলপেরো বেড়াতে গেলাম। ব্লা ! মনে আছে ত সেই পাহাড়েরা ছোট্ট জেলসের গ্রামখানি ? বাইরের জগতের সঙ্গে বেন তার কোনও স্পর্শক নাই। সেবার নামটা লিখতে একটু তুল করেছিলাম—নামটা পরপেলাম নয় পলপেরো।

সেবারের মতন এবারেও সকালবেলা ত্রেককাঠি খেয়ে লু থেকে মোটরবোর্ডে পলপেরো রওয়ানা হলাম। জানই ত লুঃ দাক্ষখান দিয়ে একটি ছোট্ট নদী বয়ে গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে। নদীর যে পারে আমাদের হোটেল সেই পারেই পাহাড়—সমুদ্রের ধার দিয়ে পাহাড়ের উপরের রাস্তাটা এবং তার ধারে ধারে পাঁচ সাতখানা বড় বড় বাড়ী, বেশীর ভাগই হোটেল, হেল্ল্যাও হোটেল তারই অন্তর্ভুক্ত। এই রাস্তাটি ঘুরে গিয়ে নদীর উপরের একটি সাঁকো পেরিয়ে ওপারে বাওয়া যায়। ওপারে সড়ক সব বাঁধান রাস্তার ধারে ধারে সব ছোট ছোট দোকান এবং নদীর ধারে ধারে সব জেলসের কুটির। সমুদ্রের ধারটা বেশ চওড়া করে বাঁধান—সারি সারি বসবার বাঁধান কেক রয়েছে—বসে সমুদ্রের শোভা উপভোগ করার জন্য এবং এই পারেই লোকের জিড়। বাঁধান—ভারশাটিন নিচেই নদী এবং সমুদ্রের সর্বোপর হুসে বাঁধান ঘাট এবং এইখান থেকেই মোটরবোর্ডে উঠতে হয়—আদরাত তাই উঠলাম।

বড়বুর মনে পড়ে, বোর্ডে লু থেকে পলপেরো বেতে বটা সেতুক লাগে—সমুদ্রের উপর দিয়ে হেলতে হুলতে বোর্ডখানি বহর ফিরাতে

এই যেসে যেসে। এবারে বোট চলার সিরে একটু পরিবর্তন হইল। বঙ্গলায়—একবারই বার, সকাল ১০টার ছাফে, এবং বিকেল ৪টার পলপেরো ছেড়ে এটা আলাদা হুঁতে কিরে আসে। অতঃপর বাক্সের সঙ্গে ১০টার আমি ও মার্লিন বোট উঠলাম—তবে এবার বাক্সের ভীক মোটেই বেশী ছিল না।

পলপেরো গিরে পৌঁছলাম। ঠুটি পাহাড়ের কাঁক গিরে সমুদ্রের জল ভিতরে গিরে চুকছে, বহু করেছ পাহাড়-ঘেরা ছোট একটি জলাশয় এবং তারই ধারে ধারে পাহাড়ের মধ্যে বৃক্ষ ছোট পলপেরো গ্রামখানি। জলাশয়ের পাড় গিরে সন্ধ্যা একটি বাঁধান রাস্তা এবং তারই ধারে ধারে জেলের সব ছোট ছোট কুটার, আর কিছু নাই। জলাশয়ের চারিদিকে জেলের সব জাল শুকোছে।

জলাশয় থেকে কিনারার উঠে মার্লিন একবার গ্রামখানির দিকে চেয়ে দেখল। আমার দিকে চেয়ে বলল, বিকে। সেবার বা দেখেছিলাম—এবারেও তাই, একটুও ত এসেছিল।

বঙ্গলায়, এসেবে কি করে। এ কি জগতের সঙ্গে পা ফেল চলে? এ বে নিজেই সৈতে সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরিরে ঘুরিরে কোন দরমে বাঁচে।

বঙ্গল, বহু বেন আরও সচ্চিত হয়ে গেছে—সেবারে ত একটা-আটা জলাধারের লোকান দেখেছিলাম। এবারে ত কিছুই দেখছি না।

বঙ্গলায়, ভাগ্যে হোটেল থেকে কিছু লাফ সঙ্গে এনেছিল—নাইলে এখানে ত কিছুই পাওয়া যেত না।

আমরা আসার সময়ে হোটেল থেকে কাগজের বাসে মধ্যাহ্ন ভোজনের উপযোগী কিছু খাবার সঙ্গে এনেছিলাম। মার্লিন চারিদিকে চেয়ে চেয়ে বলল, তা বেন হল, কিন্তু তোমার ত চা নইলে চলে না—চা পাবে কোথায়?

বঙ্গলায়, চল, খুঁজলে ভিতরে একটা কিছু পেরেই বাবে।

বঙ্গল, এর ত ভিতর-বার কিছুই নাই। সব গ্রামখানিই ত একনজরে দেখতে পাচ্ছি।

বঙ্গলায়, কোন জেলের বাকী গিরে বলব—আমাদের চা খাওয়াও।

মার্লিন বেন নিজের মনেই বলল, হোটেল থেকে ক্রাফে কিছু চা সঙ্গে নিয়ে এসেই হত। কিন্তু একটাও বে চারের লোকান পাওয়া বাবে না—সেটা ত বুঝিনি। সেবারে ত ছিল।

বাই হোক, গ্রামখানি ঘুরে আমরা গ্রাম ছাড়িরে একপাশ গিরে পাহাড়ের উপরে উঠলাম, বঙ্গলায় গিরে একটি নিরিবিলা এলুম পাহাড়ের তলার—সেখান থেকে বাইরের খোলা সমুদ্র স্পষ্ট দেখা বার। গ্রামের মধ্য গিরে বেড়াবার সময় একমল ছোট ছোট জেলেরে ছেলে-বেরে আমাদের সন্ধ্যা গিরেছিল, বঙ্গলায় গ্রামের মধ্য হিলাম চলছিল পিছু পিছু—অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, সেটুকু লক্ষ্য করেছি। বোধ হয় এর পূর্বে তারা কালো লোক দেখেনি। চলতে চলতে মার্লিন হেসে মাঝে মাঝে তাদের হুঁ-এক অন্যর সঙ্গে হুঁ-চারটে কথা বলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের কাছ থেকে হ্যাঁ-না হ্যাঁজি বিশেষ কোনও সাক্ষ্য পায়নি।

পাহাড়লাই বঙ্গ মার্লিন বঙ্গলায়, সেবারেও এইখানটিকে বঙ্গলায়—কি?

বঙ্গলায়, তা ঠিক মনে নাই, তবে এই দিকটাতে বটে। একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বঙ্গলায় দেখ, বঙ্গলায় সবই বঙ্গলায়। কিন্তু বাইরের জীবনের রহস্য কোনও রহস্যের চেয়েই কম নয়।

বঙ্গলায়, তার মানে?

বঙ্গলায়, বাইরের জীবনের গতিব্রহ্মে একটি নিবিড় রহস্য আছে। তার ধারা কোনদিক গিরে কি ভাবে বার আসে থেকে কেউ জানেনা, বারখাও করতে পারেনা।

বঙ্গলায়, হঠাৎ একথা তোমার মনে হল?

বঙ্গলায়, সেবারেও ত তোমাকে গিরে এইখানে এসে বঙ্গলায়। তখন ভূমি ছিলে আমার পর। অতঃপর তোমাকে বঙ্গ আপনাই করিনা কেন, বাইরের দিক গিরে আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড আলাদা ছিল, তাকে ভালবার কোনও উপায় ছিল না সেদিন। সেদিন কি কল্পনাও করতে পেরেছিলাম যে তুমি একদিন অতঃপর বাইরে একাধা আমাদেরই হয়ে আমার পাশটিতে এইখানে এসে বঙ্গবে?

আমার হাতখানি তুলে নিল হাতে। হেসে বঙ্গলায়, নীনা। তোমার ভাবুক মনে সেদিনও পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল আমাকে একাধা আপনায় করবার।

বঙ্গলায়, কি রকম?

বঙ্গলায়, মনে নাই, সেদিন কি বঙ্গলায়? বঙ্গলায়—জগৎটার দিকে একেবারে শিখন কিরে তোমাকে গিরে এই পলপেরো গ্রামে এসে আমি কেন জেলে হইনি।

মার্লিন বিলম্বিত করে হেসে উঠল।

ক্রমে বেলা দুটো বাজল। লাফ খাওয়া আমাদের শেষ হয়ে গেছে। মার্লিন সেই পাহাড়ের আমার পাশটিতে গুরে পড়ছে—আমি পা ছাড়িরে আছি বসে, ঘরে আছি মার্লিনের একখানি হাত। মাঝে মাঝে মার্লিনের মুখের দিকে চেয়ে দেখছি, মার্লিন কি ঘুরিরে পড়ল? নিশ্চিন্ত অবশ মুখখানা, চোখ দুটি বোজা।

চারিদিকে চুপচাপ নিস্তব্ধ—আমাদের ভাইনে কিছুদূরে পাহাড়ের তলার পলপেরো গ্রামের ছোট ছোট কুটারগুলির চাল দেখা বাজে, ঘিরে আছে সেই নীল জলাশয়টিকে, আমার সমুখে পারের তলার বহু-বিভাগিত নীল সমুদ্র।

হঠাৎ দেখতে পেলাম, গ্রামের দিক থেকে একটি লোক উঠে আসছে পাহাড়ের উপরে। আমরা দেখানো হিলাম তার মার্লিন কিছু নীচু গিরেই একটি পারেরলা পথ এঁকে বেঁকে পাহাড়ের উপরের দিকে উঠে গিরেছে—লোকটি সেই পথেই আসছিল। ক্রমে লোকটি এল আমরা দেখানো হিলাম, তার কাছাকাছি।

লোকটি আমাদের দিকে কিরে তাকাল—মনে হল, হঠাৎ কেন ধমকে পাড়িরে একদুটো চেয়ে হইল মার্লিনের মুখের দিকে। মার্লিন তখনও সেইভাবেই চোখ বুজে ছিল গুরে।

লোকটিকে দেখে পলপেরো গ্রামের জেলে বঙ্গলায় মনে হল। বঙ্গলায় বঙ্গলায়—চলিগ হব। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—অসুখ, সে বিবর কোনও সন্দেহ নাই, তবে মুখে পাতলা পাতলা রক্ত লাড়ী ও সৌক মুখের বাজাবিক সৌন্দর্যটুকু বেন ঢেকে দিয়েছে। আমাদের উপর লগান একটি গোল কাল টুপি। পরিবারের শোষক এসেলে পরীক্ষার শোষকই হত। একটু দূর করে বঙ্গলায়

লিঙ্গ ঐক্যীয় পরিধানে—তার কোনও ইচ্ছা বাহান নাই, পাখলায়া বসে যেতে পারে। গারে একটি অর্ধ কাল কেট—পলায় একটি দুর্ভাগ্য গলাবন্ধ জড়ান। নতিবীর্ণ একহারা পক্ষের শব্দেই বাতাবিক ছন্দ ও বাতায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকটি খানিকক্ষণ মালিনের বুকের দিকে একদৃষ্টে বইল চেয়ে।

আমিও লোকটির দিকে চেয়ে আছি, ভাবছি—মালিনের বাতাবিক জপের মাধুর্য্য লোকটিকে আকৃষ্ট করেছে। থাকে ত পলপেরো গ্রামে—এত জপ বোধ হয় সেখেনি কখনও। ক্রমে লোকটি চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইল। তারপর ঈষৎ হেসে এগিয়ে এল আমাদের কাছে। হাথার টুপিতে হাত দিয়ে শুভাল, আপনায় বুঝি পলপেরো বেড়াতে এসেছেন?

এসেই জেলেদের কথা বলার ধরণ ত শুনেছি—লোকটির তত্ব কথা বলার উচ্চারণে একটু অবাক হলাম।

বললাম, হ্যাঁ। সু থেকে এসেছি। এই চারটের বোটেই ফিরে যাব।

হঠাৎ মালিন বড়মুড়িরে উঠে বলল—একদৃষ্টে চেয়ে বইল লোকটির বুকের দিকে।

লোকটি একটু চুপ করে থেকে আমার শুভাল, মাশ করবেন—আপনারা কি বাসিন্দা?

হেসে বললাম, হ্যাঁ।

লোকটি আর কোনও কথা না বলে চুপ করে বইল গাড়িরে। কিন্তু এবার আমার বা মালিন কারও প্রতিই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। নিজের মনে বেন ভাব হয়ে কি ভাবছে।

আমিই কথা কইলাম। শুভালাম, আপনাদের 'গ্রামে' কি চা খাওয়ার কোনও জায়গা আছে?

লোকটি চাইল আমার দিকে। বলল, 'চা খাবেন? মিনিট দশেক অপেক্ষা করুন। আমি এখনই ঘুরে আসছি। তারপর যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে—আমার বাড়ীতে আপনাদের নিয়ে যাব।

বললাম, বেশ ত। আমাদের আর আপত্তি কি? এই বলে পাহাড়ের উপর দিয়ে চলতে লাগল।

মালিন ভক্তিতের মতন বসে আছে। বুখে কোনও কথা নাই। বললাম, দেখলে ত, চা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। মালিন কোনও কথা বলল না।

লোকটি সত্যিই মিনিট দশকের মধ্যে ফিরে এল—কাঁধে এক বোরা শুকনো কাঠ, একটা হাড়ি দিয়ে বাঁধা। আমাদের কাছে এসে বলল, চলুন।

আমি ও মালিন উঠলাম। চললাম লোকটির সাথে সাথে গ্রামের দিকে। সত্যিই চা খাওয়ার জন্ত তখন আমার প্রাণ আতুল হয়ে উঠেছে। বুখে বললাম, আপনি আমাদের কথা করবেন—আমরা অথবা আপনার অন্তর্বিধার কারণ হলাম। লোকটি শুধু বলল, ওঁহা আমার গভীর আনন্দ।

ক্রমে আমরা গ্রামে এসে পড়লাম। যে রাস্তাটি বললামের দিকে রয়েছে লোকটির বাড়ী সে রাস্তার উপর নয়। তারই এক কানেক আর একটা সরু গলি যে পাহাড়ের ভিতরের দিকে চলে গিয়েছে, এর পুরো

লক্ষ্য করিনি। লোকটি সেই গলির মধ্যে আমাদের নিয়ে চুকল। মেহাত সরু বাঁধান গলি—কোনও রকমে হুতন পাশাপাশি বেতে পারে। সেই গলি দিয়ে কিছু ঘুরে একটি অর্ধ কুটীরের সামনে লোকটি দাঁড়াল। সদর দরজার কড়া মেড়ে ডাকল, হেঁটা, হেঁটা।

একটি বছর কুড়ি-বাইশের মধ্যে এসে দরজা খুলে দিল। মেয়েটির দিকে চেয়ে ভালই লাগল—গোলগাল গড়ন, সুখখানির মধ্যে হাসিমুখের ভাবে মাধুর্য্য পাওয়া যায়। পরিধানে শোবারের বৈদ্য সহজেই চোখে পড়ে। দরজা খুলে মেয়েটি অবাক হয়ে আমাদের দিকে বইল চেয়ে। আমার দিকে চেয়ে লোকটি বলল, আমার স্ত্রী।

আমি নতমস্তকে অভিবাদন জানালাম। তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, শীঘ্র চাদের ব্যবস্থা কর। মা কোথায়?

মেয়েটি বলল, মা ঘুমুচ্ছেন।

মেয়েটির কথার মধ্যে এসেই জেলেদের কথার টান স্পষ্ট। এবং অবাক হয়েছিলাম কিনা মনে নাই, যখন তখনলায় মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে লোকটির কথার মধ্যেও সেই টান স্পষ্ট কুট উঠল।

লোকটি আমাদের দিকে চেয়ে বলল, আশ্রন ভিতরে।

ভিতরে গেলাম। একটি ছোট ঘর—খানকয়েক মোটা মোটা কাঠের চেয়ার রয়েছে, মাঝখানে একটি গোল টেবিল। বুললাম—এইটেই বোধ হয় এদের বসবার এক খাবার ঘর, পিছনে বোধ হয় শোবার ঘর আছে। ঘরখানির চারিদিকে দারিদ্রের নিষ্ঠুর হাস স্পষ্ট। বসে শুভালাম, এ বাড়ীতে আপনারা কে কে থাকেন?

বলল, আমি, আমার স্ত্রী ও আমার মা। তবে আমার মার বখেই বয়স হয়েছে এবং তিনি লক্ষ—বৈদ্য ভাগ বিধানার ভয়েই থাকেন।

শুভালাম, আপনার পরিচর্যা ত পেলাম না?

বলল, আমার নাম বুলার—জন্ম বুলার।

আমি বললাম, আমরা চৌধুরী। আমি ডাক্তার।

শুভাল, কোথায় ডাক্তারী করেন?

বললাম, সেল-এ—ম্যাক্‌কোয়ের কাছে। কিছুদিন ছুটি নিয়ে লুতে বেড়াতে এসেছিলাম।

লোকটিকে ক্রমেই আমার ভাল লাগতে লাগল। কথাবার্তা লোকটি খুব বেশী বলে না কিন্তু ব্যবহারে ভয়ভীর ক্রটি নাই। বুকের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম—কালো ছটি চোখ, অগাধায় গভীর।

শুভালাম, আপনিও কি মাছ করেন?

সুহ হেসে বলল, ঘর বৈ কি—আমার একটা নৌকা ও দুখাল জাল আছে।

হঠাৎ ভিতর থেকে ছোট শিকার কাঁদা শোনা গেল। এবং একটু পরেই সেই মেয়েটি একটি শিককে কোলে করে ঘরে চুকে পুঙ্খটর কোলে দিয়ে বলল—ও উঠে পড়ছে, ভুঁমি ওকে সামলাও, আমি ততক্ষণ চা করছি।

এতক্ষণ মালিন বেন বতাবিষ্ট হয়ে চুপচাপ বসেছিল—কোনও কথা বলাই, হঠাৎ বেন জেলে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পুঙ্খটর কাছে গিয়ে পুঙ্খটর বুকের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে শিকটিকে তার কাছ থেকে নিজের কোলে দিল ফুলে।

শিঙটকে একটু আদর করে পুরুষটিকে ডালা, তোমার মেয়ে ?

পুরুষটি মাথা হুলিয়ে জানিয়ে দিল, হ্যাঁ।

মালিন শুধাল, বরষ কত ?

পুরুষটি বলল, এই মাস ছয়েক হবে।

মালিন শিঙটকে নিজের বুকের মধ্যে ঢেপে নিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। শিঙটিও স্থির বীর ভাবে মালিনের বুকের মধ্যে বইল উঠে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি ট্রিতে চা এবং কেক নিয়ে এল ঘরে—টেবিলের উপর রাখলো মালিনের। ছুটি চায়ের পেরালা এবং দুটি কলাইকরা ছোট রপ। একটি এ্যালুমিনিয়ামের কেটলিতে ভেঁড়া করা চা।

তারপর মালিনের কাছ থেকে শিঙটকে নিজের কোলে নিল তুলে। হেসে শুধাল, এককণ আলাপ্তন করেছে ত ?

মালিন সে কথাই কোনও উত্তর না দিয়ে মেয়েটির হাত ধরে তাকে বসাল নিজের কাছে। শুধাল, তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ?

বলল, এই গ্রামেই। আমার বাবা ভাইরা মা সবই আছে। তাদের মস্ত বড় মাছের ব্যবসা। জলের ধারেই তাদের বাড়ী।

মেথলাম—মেয়েটি কথা বলার সুবিধা পেলে কথা কইতে ভালবাসে।

মালিন শুধাল, কতদিন তোমার বিয়ে হয়েছে ?

বলল, এই বছর দুই হবে।

মালিন শুধাল, তাহলে ছেলেবেলা থেকেই তুমি তোমার স্বামীকে চিনতে ?

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলল না—না। জনরাত্ত এ গ্রামের আদিবাসী নয়। এই বছর মশেক হল, মা ও ছেলে এসে এ গ্রামে বসবাস শুরু করল। আমার ত তখন মাত্র ১৪ বছর বয়স।

পুরুষটি ইতিমধ্যে চা ঢেপে আমায়ের দিয়েছিল—চা খাওয়ার পরও সঙ্গে সঙ্গে চলাতে লাগল। ছুটি পেরালাতে আমাকে ও মালিনকে চা ঢেপে দিয়ে ছুটি রপে নিজেদের চা নিল ঢেপে।

হঠাৎ একটা অত্যন্ত কর্কশ ভাঙ্গা গলার পাশের ঘর থেকে ডাক এল, হেটা। হেটা। খালি বরের সঙ্গে প্রেম করলেই হবে না, বুড়ো শাওকীটাকেও দেখতে হবে।

হেটা তাড়াতাড়ি উঠে পাড়ল। কিন্তু পুরুষটি ইতিমধ্যে উঠে পাড়িয়ে হেটাকে বলল, তুমি গল্প কর—আমি বেগছি। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেটা হেসে হেসেই বলতে লাগল, একে চোখে দেখতে পান না, তার উপর মাথারও ঠিক নাই। আমি জনের সঙ্গে একটু কথা কলাছি দেখলেই রোগে বান। বলেন—খালি ছুটোতে পরামর্শ করছে, লাভানক বিধ খাইয়ে দিয়েছে।

মালিন শুধাল, তা জন্ম মুখি মায়ের খুব বয় করে ?

মেয়েটি বলল, ও বাবা। এক বে বাবা বলেন কিন্তু একটা কথা বলার উপায় নাই। এ রকম না-অন্ত গ্রাম আমি ত আর দেখিনি। আমার মাও ত বুড়ো, কই আমার ভাইরা ত আর সিকে কিয়েও ডাকায় না।

কই চুপ করে থেকে মালিন শুধাল, তা জনরাত্ত এ গ্রামের আদিবাসী নয়—কোথা থেকে এসেছিল এ গ্রামে, জান ?

মেয়েটি বলল, শুনেছিলাম—করী থেকে।

মালিন শুধাল, করী—সে কোথায় ?

মেয়েটি হেসে বলল, তা ত জানি না।

আমার জানা ছিল। করী কর্ণওয়ালেরই সমুদ্রের ধারে আর একটি ছোট সহর—লু থেকে বেশী দূরে নয়। ডেভন্ কর্ণওয়াল বোটের বেড়াবার জন্য ম্যাগ দেখে দেখে এসব জায়গার সঙ্গে ম্যাগেই আমার পরিচয় ঘটেছে।

বললাম, করী কর্ণওয়ালেরই সমুদ্রের ধারের আর একটি ছোট সহর—লু থেকে বডানিক কেরীতে নলী পেরিয়ে যেতে হয়।

মালিন আমার চুপ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে পুরুষটি ঘরে এসে ঢুকল। বসল চেয়ারে। আমাকে শুধাল, সেলে ত আপনি ডাক্তারী করেন—ম্যাগেটার থেকে কতদূর ?

বললাম, কাছেই। বাসে ম্যাগেটার থেকে তিন কোয়ার্টার আলাদা লাগে। ট্রেনও বাওয়া যায়।

লোকটি চুপ করে গেল। আমিই বললাম, ১৭নং ওভার হল সেলে আমার বাড়ী—বদি কখনও গরিকে বান—বাকেন। লোকটি কোনও জবাব দিল না।

হঠাৎ মালিন মেয়েটিকে প্রের করল, তা তোমার মেয়ের নাম কি বেগছে ?

মেয়েটি হেসে বলল, মালিন। ও নামটা জনের বড় পছন্দ। জন্ম বলে—ও রকম মিল্লি নাম আর একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সকৌতুকে চাইলাম মালিনের দিকে। মেথলাম—মালিন মাথাটি নিচু করে চুপ করে বসে আছে, বুধে কোন ভাবেই অভ্যস্ত পোলাম না।

কিরে বাওয়ার সময় বোটের বখন উঠে, জন্ম এল বোট পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। বিবাহ অভিনন্দন জানিয়ে বলল, বদি সুবিধা হয়, আর একদিন যেন লু থেকে পলপেরো বেড়াতে আসি।

বিশেষ যত্নবান জানিয়ে বললাম, আর ত মাত্র পাঁচ-সাত দিন আছি লুতে—বোধ হয় সুবিধা করে উঠতে পারব না।

বোট ছাড়ল।

মালিনকে বললাম, খাসা লোকটি—না ?

মালিন শুধু বলল, হ্যাঁ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, মালিন ভীষণ গভীর। সেই অভলম্পর্শী কালো ছুটো বিষণ্ণ চোখ মেলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে—নিজের ভাবেই তময়।

কিছুক্ষণ পরে শুধালাম, সীনা। কি হল তোমার ?

বিষণ্ণ চোখের নিচে বৃহৎ হাস মাখিয়ে আমার দিকে চেয়ে কলল, কিছু না।

শুধালাম, অত গভীর ?

একটু চুপ করে থেকে বলল, একটা যেন বয় বেগে উঠলো বলে মনে হচ্ছে।

শুধালাম, এ কথাই মানে ?

সকলক্ষে উত্তর দিল, কি জানি—জেনে বলব।

[কলস:]

চন্দ্রা তার নাম

। ধারাবাহিক উপন্যাস ।

মহাশেতা ভট্টাচার্য

১২

১৮৭৭-র সে ইতিহাসের পাতা উলটে গেলে পরবর্তী দিনের অল্পসন্ধানী মনে একটি কথাই বার বার মনে হবে। তা হলো—হুই আড়ির পরস্পর সম্পর্কে সুগভীর অজ্ঞতা। সুগভীর অজ্ঞতাই বেন ইন্দন ছুগিরেছিলো জড়ুগুহের সে বহুত্বসবে।

বৈশাখ পেরিয়ে কৈষ্ঠ এসে পড়লো। উৎসেগে অস্থির এক উত্তেজনা সওয়ার ও কোজের মধ্যে সঞ্চারিত। কি প্যারেডের সময়ে—কি অভ সময়ে—খোঁজা অকিসারদের চোখে-বুখে কি বেন খোঁজে তারা। হয় তো ব্যবহারে কোন উচ্চতা আছে কি না, তাই বোঝে। দেখে, কোনভাবে তাদের ছোট করা হলো কি না। জোখের সে কথা বুঝতে পারেন না কেউ।

ক্যান্টনমেন্ট বাসেও কানপুরের সিভিল লাইন্স-এ এক সুবৃহৎ হোষ্টেল বসতি। দৈনন্দিন জীবনে ভারাই ভারতীয়দের সম্পর্কে আসে বেশী। হুইলারের কাছে তারাও বাঙালী-আসী নুহ করলো, প্রয়োজনে নিরাপত্তা চাই। নৌকার খোঁজববও চলতে লাগলো। এক হরশিরাবা আহীরেরই ছোট বড় মিসিরে প্রায় দেড়শো নৌকা আছে। মাঝ মাসে প্রায়শে ত্রান্নে বার তীর্থযাত্রীরা, নৌকা ভাড়া দিয়ে তখন আহীর বেশ কিছু হোজগার করে। দেখা গেল, এবার নৌকা ফুরাবের ভাগ্যচোটা বেশী। ভাড়া নিয়ে কোন ধরনস্তর নেই। আগাম টাকা নিয়ে নৌকা হু করতে আর ফুটোকাটা সারতে বাস্তব হয়ে পড়লো আহীর। ধবর পেয়ে তার ঘরে গিরে শাসিয়ে এসো করজন। তার মধ্যে সম্পূর্ণও ছিলো। একে গরম পড়েছে। তাতে আজকাল দেশাটী জমছে ভালো। সম্পূর্ণের ভাবাটা খুব জ্বাভার বার বেঁচে গেল না। প্রথমেই সে গালি পেড়ে বসলো গুজব ঘটনাকারীসহ, তাদের সঙ্গে গ্রীষ্ম পুরে নিকটতম সম্পর্কটি পাড়িয়ে মিসে কলসো—শাসে গোপ কি বলে জান ?

—কি বলে ?

—বলে আহীর নৌকা ফুরবে মিছে ঐ ভাটরা পুথিবিদ্যে রাখিবের। সাতকনের প্রকাশ গিরে বাবে। আমি কলিই তা কখনো হয় ? নাম রাম, আহীর তা করতে পারে কখনো ? তা হ'লে ঐ সাতসহর নৌকা একসঙ্গে ঝালিয়ে দেবে না মাছ ?

আহীরের এক পা বোঁড়া। ছোটপাটো কালো মাছবাটী। কি ঠিক, কি গ্রীষ্ম, কানমাথা গিরে এক প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধা। তার হেঁট হেঁট চোখ দুটো তলে মিটমিট করে। কল—সে কি কথা ?

—কথা ঐ রকমই।

বলে সম্পূর্ণ আরো কতকগুলো গালি পাড়ে। বলে—এ শহরের মানুষগুলোকে তুমি বিবাস কর ? এদের ভাবগতিক কি রকম, দেখছ না ?

আহীর তাকাতাড়ি লাঠি আর ছাতি নিয়ে বেদোর। আবগারী কুটির বাবু সঙ্গে দেখা করতে বার। বলতে বার, না—নৌকা সে মিটে পারবে না।

বসন্তের পর সমারোহ ক'রে গ্রীষ্ম আসে। অল্পব বিপ্লব দেখা যায় এখানে সেখানে। হুহুমানজীর কল্যা উড়িয়ে যিভিবসতিতে মহানারীর আশঙ্কার ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজা চলে।

মগনলালের সে গুণামকনী আটা এ হাতে সে হাতে বাজার তলে ছড়িয়ে পড়ে। ক্যান্টনমেন্টে বাজার-চৌধুরী সন্তার ছাড়তে থাকে আটা। অল্পদিকে বধন দ্রব্যসূতা বাড়ছে ছাড়া কমছেন, আটার দর নেমে বার। টাকার পরজিহ্ন ছড়িয়ে সের মিলতে থাকে। আগুনে পড়তে রুটি থেকে দুর্গন্ধ বেদোর। শুধু রুটি আর ডাল বাসের শান্ত, তারা বিক্রোহী হয়ে ওঠে। বাজার-চৌধুরীর কাছে গিরে তারা হুলা লাগায়। বলে—কি খাওয়াচ্ছ আমাদের ? আমবা বুঝতে পারিনা ? এ আটা কোলো মাছবে খায় ? আমবা কি জানোয়ার ?

চৌধুরীও ট্যাচামেটি করে। বলে—আমার কেতের পুসের আটা ? আমার ওপর হুলা করছ কেন ?

ভারতীয় কোলো বড় অকিসার এসে সে গোলমাল সাময়িক ভাবে যেটান—আবার নতুন করে আটা থরিত করতে বার বাজার-চৌধুরী। তবে গুজব শুড়ে প্রথম বর্ষীয় কড়িসের মতো কঁাক করে—পাখা মেলে। শহরে, বাজারে, ক্যান্টনমেন্টে—কোথাও আর জানলে থাকি থাকেনা যে জাতমারবার জন্তে এই কাণ্ড করছে সাম্বেবরা। সাম্বেবের ধমকে বাজার-চৌধুরী বলতে নুহ করে অবত,—এ তুমি বনিয়াদের দোষ।

কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়না। পুথিবিদ্যে আর পড়েবিদ্যা বেশব সিপাহী জন্ম থেকে 'বুড়ু' গালি ভুলে আসছে, তাইতি চালাক হয়ে গিয়েছে। তারা হুই কান জুড়ে বিক্রী চালাক চালাক কেনে বলে—বানিয়াদের ববি বোলখানা দোষ হবে, তবে তুমি সে কোথ কাটাধার জন্তে গোরে দোরে দুহু কেন ? মিসেবী লোক কি মিষ্টকর ঢাক মিসে বাজার ?

লক্ষ্য থেকে আটক ইংরেজদের হইলো। চরিত্র জন সওয়ার
আর পণ্ডার জন সাহেবকে দেখে কেণে হার রেজিস্ট্রেট। কেন তাদের
বিবাস করে না সাহেবরা? তাদের সরিয়ে দিয়ে সাহেবদের সে
জারপার আসবাব কি কারণ? নতুন আমলদার সওয়ারদের ভাষা
টিটকারী বের।

ইভানস বুঝতে পারেনা হইলার কি চান। যদি ইংরেজদের
আমদানকার এবং নিরাপত্তার জন্তই গড় দিতে হয়, তবে বেশ
সুস্থ করে কেন দেওয়া হবে না প্রাচীর, সে বুঝতে পারে না।
হইলার শু শু তার কাছে ভারতীয় চরিত্র বোঝান। বলেন, এমন
কিছু করা চলবে না, যাতে সম্ভব হয় ভারতীয়দের মনে।

ইভানস বোঝাতে চেষ্টা করে বার বার। বলে—একটা ব্যারাক
তুললেও বা সম্ভব হবে, একাধিক নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করলেও
তাই-ই হবে।

হইলারও নিজেকে বোঝাতে পারেন না। তিনি ভারতবর্ষের
সঙ্গে নিজেকে বড় বেশী জড়িয়েছেন। শিনি ভারতীয় কোঁক, সওয়ার
সহরের পণ্যমাত্র লোক, এদের কাছে বড় বেশী প্রিয় বলে যে গর্ব
করতেন, তা সত্যি। তাঁর সে ভুল হয়নি। ঠ্যা—হাজার হয়েছে
ধমসে, বহরমপুরে, মীরাতে। হাজারের সে খবর পেয়েও তিনি
অবিশ্বাস করেননি তাঁর রেজিস্ট্রেটকে। তাদের নাকী-নকজ তিনি
জানেন—তাদের উৎসবে আমোদে প্রমোদে তিনি যোগ দেন।
উৎসাহ দেবার জন্যে লক্ষ্যী, বেনারস, মীরাত, মিল্লী থেকে ভাল
কুড়ীগীর, বা জাহ্নকর বা নাচ-গানের মেয়ে এলে তিনি তাদের অনেক

টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেট এনে বারনা দিয়েছেন। উৎসাহ দিয়ে
সিপাহীদের মধ্যে থেকে ভালো ভালো কুড়ীগীর তৈরী করেছেন।
হাজারের মেজর, লেফটেন্যান্ট, হাবিলদারদের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক, সে
কি প্রভু-কৃত্যের? সে তো কল্পের সম্পর্ক।

কিন্তু সব বেন ইদলে গেল। এত বছরের সম্পর্ক, যা হাজারের
অপান-প্রদানে কতদিন ধরে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিলো, তা বেন
তাঁর হাতের মুঠো থেকে পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে। পচা আটার
ব্যাপারটা এতদূর পড়াবে, তা কি তিনি ভেবেছিলেন? হাবিলদার
মেজর নেকনিহাল সিংকে তিনি একটু ভৎসনাই করলেন।
বললেন—সমস্ত ব্যাপারটা এতখানি হবার আগে আমাকে জিজ্ঞাসিত
পারেননি আপনি? আমি গোড়া থেকে অতুলমান করতাম?

—কি লাভ হতো? বলে নেকনিহাল চুপ করে বইলেন।
হইলারের বরস হয়েছে। মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না।
হুটো চারটে কথা বলতে তিনি বাধ্য হলেন। নেকনিহাল
কিছু না বলে শু শু শু শু গেলেন। হইলার কি হাবিলদার মেজরের
চোখের ভাষা বোঝেননি? হাবার সময়ে চোখ-তুলে একবার ক্রমে
অভিবাধন করে বেরিয়ে গেলেন নেকনিহাল। সে চোখে লেগে
ছিলো একটা দৃষ্টি। একটা অবিশ্বাস—একটা আশ্চর্য ভাব—বেন
হইলারকে নতুন করে চিনছেন নেকনিহাল।

এই অবিশ্বাস ও এই দৃষ্টি সবকিছের চোখেই দেখছেন হইলার।
আশাত সেগেছে মনে। বিরূপ করলেন এ দেশের মেয়ে, ভালবাসলেন
এ দেশের মাছুষ, তবু, পকাশ বহর বাসে বেন মনে হচ্ছে তাঁর,

শীতের দিনে-ও

ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন
আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

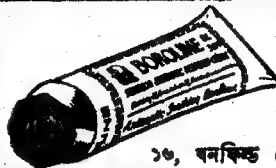
শীতের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে বাতাবিক
সৌন্দর্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ক্রম।
নিয়মিত ব্যবহারে, ত্বক-বিগ্ন-যুক্ত, হ্রস্তিত
বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, মৃদু ও
সজীব করে তুলবে আর আপনার অন্তর্গত বাতাবিক
সৌন্দর্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের ঘরে
নিজেকে রূপোদ্ভল করুন।



বোরোলীন

পশ্চিম প্রসাধন

পরিবেশক : সি, দত্ত এণ্ড কোং



বোরোলীনে—ল্যানোলিন আছে বলে
শীতের দিনে-ও গল, হাত ও
চৌকিটার হাত থেকে রক্ষা করে আর
রক্তের বহর-ও সজীব রাখে।



১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১

এসব বনের কাছে তিনি পৌঁছতে পারেননি। এ-ও এক বনের প্রবালরই কি।

হুইলার তাই চোঁটা করছেন এসব বিশ্বাস অর্জন করতে। এসব তিনি চটতে চান না। নইলে সেদিন সে দুর্ভাগ্যের সওয়ার কাঁড়বাজের পর বুধে বুধে উদ্ভত তর্ক করেছেন তাঁর অফিসারের সঙ্গে। তাকে শান্তি দেননি তিনি। তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। সে জড় বেতাল অফিসাররা অসন্তুষ্ট হলো। তা হোক। কিন্তু ভারতীয়দের তিনি খুঁচি করতে পারলেন কি? মনে ত হচ্ছে না।

আর নিরাপত্তার জন্য এই ব্যারাক তোলা। তিনি এটাকে মিসে বাড়িবাড়ি করে মিউটিনী ডেকে আনতে চাননা। ইভানকে তিনি বোঝান আছে আছে। বালকের সঙ্গে বৃদ্ধ বেতাবে কথা বলে। বলেন—নিরাপত্তার ভেতন দরকার করবে না। লক্ষ্য থেকে এসেছে সাহায্য। আবার কলকাতা থেকেও আসবে দরকার হ'লে। দরকার হলে আমরা নানাদ্রুপদ-এর কাছ থেকেও সাহায্য পাব। আসলে ভর পেয়েছে সিভিলিয়ানরা। তারা রাতে এসে থাকবে এখানে। সেই রকমই একটা কিছু খাড়া করে। ইটের গাঁথনী তাকিয়ে বাবে তাকাতাড়ি, যে গরম পড়েছে।

এমনি করে তৈরী হয় ব্যারাক। তাতে খড়ের ছাউনী পড়ে। বিকাল চলে আসে সেখানে বেশীকাল বাসিন্দারা।

কিছু হুইলার পারেন না পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আরও জানতে। মিউটিনীর কথা মাথায় নিয়ে গরম হয়েছিলো তাঁর অফিসাররা। মত অবস্থার একমিনি অধিক উৎসাহী একজন বন্ধু চালিয়ে বলেন প্রহরায়ত 2nd. Cavalry-র সওয়ারদের উপর।

ক্ষেপে যায় সওয়াররা। শান্তি দেওয়া উচিত সাহেবকে, এই নিয়ে কথা হয়।

কোন শান্তি হয় না সে অফিসারের। মাঝরাতে মাথায় কর বাঁধি জল ঢালতেই দেশার সঙ্গে সঙ্গে মিউটিনীর ভূতটাকে নেমে যায় মাথা থেকে। নেহাৎই ছেলোমাছুব অফিসার। ধমক দিয়েই কাজ সামনে তাঁর অফিসার।

এবার গাঁজা আর ভাঙ খেয়ে রক্তচক্ষু সিপাহীসওয়ার টেটিকের হাঁ বলে, ভাঙ কানে আসে বশাসময়ে। তারা বলে—আমরা যদি এ কাজ করতাম, তাহ'লে কীসীতে লটকে যেতাম। না হয় জানে মরেনি, তবু হাডখানা তো ভেঙে গেল। পাক্কাইর জখম হয়ে পড়ে তো রইলো বিক্রম সি। তাদের সে জখমের নাম কে দেয়?

বিক্রম সিরের পাক্কাইর ঢেরও ঘোড়ার শোক লেগেছে বেশী। আঁতত সে ঘোড়াকে শেষ অবধি গুলী করে মারতে হলো। বড় লখের ঘোড়া। তার শোকটাই সে ফুলতে পারে না।

আর এরই ওপর লক্ষ্য-এর মিউটিনীর খবর আসে। লক্ষ্য থেকে যে অফিসাররা এসেছিলো, তাদের কোন্ পাক্কাইর হুইলার।

এখন আর বুঝতে বাকি থাকে না কার, যে জড়গৃহ যখন লগাও হয়েছেন—অগ্নিসংকার হয়েই হয়।

মনে যে কি অস্থিরতা হয়, কি লগাণ জাগে, বলতে পারেন না ইভানুস। চম্পা বলে—তুমি এ রকম বললে বাছ কেন? ইভানুস বলে—গাধাচক্ষু, আর মরচেপড়া ডলোয়ার নিয়ে এরা সাহেবদের তাকিয়ে যায়? নিজেরের রাহ কাঁপের করতে চায়? এরা কি পাগল?

চম্পা বলে—সে সব ভনে তোমরা অস্থির হচ্ছ কেন? তোমরা কি এদের ভয় পাও?

—না। ভয় পাব এসব? এরা ত' ভীত। শারীরিক যন্ত্রাকে ভয় পায়। হুই যা বেত খেলে কীয়ে।

চম্পার দিকে চেয়ে সে বলে—তোমার কথা আলাদা। তুমি ত' ওদের মত নও।

—আমি কি?

—তুমি, তুমিই চম্পা।

কিছুক্ষণ অস্থির হয়ে আদর করে চম্পাকে ইভানুস। ভাবে, এতে ব্রি বা শান্তি পাবে। কিন্তু কি যে আছে চম্পার মধ্যে, চম্পা শান্ত করতে পারে না ইভানুসকে। আরো বেন অশান্ত হয়ে ওঠে ইভানুস। বলে—যে রকম দিনকাল, হঠাৎ যদি চলে বাই কোথাও, তোমাকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগবে চম্পা।

প্রেমের স্বীকারোক্তি ভুলেই হাসি পায় চম্পার। বলে—কেন তো, এখন কিরবে, খবর পাঠিও—আমি সেজন্তে তোমার জন্যে পাড়িয়ে থাকব রাস্তার।

—তুণু উপহাস।

—বাজনা বাজাব সাহেব, গান গাইব—তুমি যে পথ দিয়ে আসবে, ফুল দিয়ে ঢেকে দেব।

—তোমরা ফুল ভালবাস না। ফুল দিয়ে তুণু পূজা করতে জান। আর কিছু জাননা।

—কেন, তোমার জন্যে সাজতে জানি না?

—চম্পা, তুমি বড় হালকা। তুণু হাসতে পার।

চম্পার কাছে ছুটো মন-প্রাণের কথা বলে হালকা হতে চান বিজহুলারী। সে-ও সেই একই অভিযোগ করে। বলে—বড় তুমি হাস চম্পা—সব কথাই এত হাসা কি ভাল?

—কীভাবে কেন বল? আমার কি কোন দুঃখ আছে?

না। কোন দুঃখ নেই চম্পার। দুঃখ মনে নিয়ে কেউ এমন সহজ হয়ে হেসে বেড়াতে পারে? এমনি সময়ে—যখন যে কোর বৃহতে ক্ষেপে বাবে সিপাহীরা আর কেটে কুচিকুচি করে সাহেবদের গঙ্গার ডাসিয়ে দেবে। চম্পা বলে—ভয় পাবে তুমি। তোমাকেও ওরা ছাড়বেন।

বিজহুলারী হাসে। বলে—তুমি ভাব, আমি ভয় পাই? আমার মতো মাছুবের জানের কি নাম আছে চম্পা? আমি মরলে কার কিছু এসে বাবে না।

—সকলের জানেরই দার আছে, নেই?

—সকলের কথা আমি জানি না।

—এত ভাব কেন? আমার মতো থাকতে পার না?

মাথা নাড়ি বিজহুলারী। না, সে পারে না। কিছুক্ষণ বলে এমনিই চেয়ে থাকে শূন্যবৃত্তে। মনে হয় চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে মনে বেথেই বিজহুলারী কোন অন্তরক রেফনার ছবি ভাবপরে যে কথা বলতে এসেছিলো, বিজ্ঞাসা করে বিজহুলারী। বলে—কখন হবে আসবে চম্পা? জান?

চম্পা বলে—কখন করে জানব? জাননা, ওদিকের কি হল? এদিকের দোকা যদি না পায় জে কেউ আসতে হবে।

—ও।

আর প্রাণ করে না ত্রিভুজলারী। চলে বার করে। হতভাগা
এই মেয়েটার দিকে চেয়ে চম্পার শুষ্ক হৃৎক হয়, কল্পনা হয়।
মনে হয়, এমনধারা শরীরমনে রিক্ত সে কারকে দেখেনি।
সম্পূর্ণকে সে না বলে পারেনা—বুড়া, তোমরা গুর টাকা আর
গহনার জাঁকজমটাই দেখলে আর কিছু চোখে পড়লো না তোমাদের।
মেয়েটা শুধু হুশী, তা জান ?

—তা, ছেড়ে এলেই পারে ওর সাহেবকে ?

—ছাড়ব বললেই ছাড়া যায় বুড়া ?

—যায় না ?

—না।

তুই নিজেকে দিয়ে বিচার করিস চম্পা—ওই সব মেয়েকে তুই
কেমন করে বুঝি ?

—বুড়া, তুমি সব বুঝতে পার না।

ত্রিভুজলারীকে ব্রাইট-ই ছেড়ে যায় ক'দিন বাদে। লক্ষ্যে এ যে
কি হয়েছে, সঠিক খবরের চেয়ে গুজব আসে বেশী। তবে হুইলার
এটুকু বোঝেন—লক্ষ্যে বোহাভ—কানপুর এখানে তাঁর হাতে আছে।
হুইলার অবিসার আর পঞ্চাঙ্গজন সওয়ার পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করতে হয় বাতাবাতি। বৃত্তজন সাগ্রহে নাম দিতে আসে
নিজেকে—সকলকে তিনি ছাড়তে চান না। এট একবার
ব্যর্থপর হতে চেষ্টা করেন হুইলার। ব্রাইট এবং ইভান্স সম্পর্কে
তাঁর কোন আপত্তি হয় না। তারা দুজন এখান খুব প্রয়োজনীয়
কি না, সে সব কথাই মনে মনে নাড়াচাড়া করেন বার বার।

চলে যাবার প্রাক্কালে ইভান্সের এত বেশী উৎসাহ দেখা যায়
যে চম্পা না বলে পারে না—

—এই ভোমার ভীষণ হৃৎক ?

—হৃৎক করবার কি আছে ? বাচ্ছি চল্লিশ মাইল দূরে।
মিউটিনি করে সিপাহীগুলো বলছে আমরা বাবী সিপাহী—তাদের
অঙ্গ করে আসতে আর ক'টা দিন লাগবে ?

Desperate time needs desperate action—

জরুরী এক সমুদায় অবস্থার উদ্ভব এখন হলো—হুইলার সব
কিছুই করলো। কিন্তু কোথায় যেন দেবী হয়ে গেল।

এদিকে লক্ষ্যে, মীরট, মিল্লী—ওদিকে খবর এলো বহুনা
পেরিয়ে দক্ষিণে বাঁসি থেকে। সেখানেও ক্রমশ গিরেছে কোঁড়।
ইংরেজরা অবলুপ্ত হুর্গে।

শেষ অবধি ট্রেকারী থেকে আনা হলো এক লক্ষ টাকা। বৃদ্ধি
বৃদ্ধি বসল এনে বোকাই করা হলো সেই ব্যারাকে। ইভান্সের
হেলোমাহুবা উৎসাহের কথাগুলি মনে করে করে সৈন্ধ্যাক কি
হাত কামড়ালেন না ? এই ইটের গাঁথনী অনেক মজবুত হতে
পারতো—পাঁচলি হতে পারতো উঁচু। হালকা কামানগুলি
আনা বেত ভেতরে। আধারি থেকে বসুক এনে সিভিলিয়ানদেরও
গেত্তা বেতো।

কিছুই লম্বব হলো না। বিটুর থেকে পোমোয়ার বে তিনশো মারাঠা
সৈন্য পাঠানলেন, তারা গিরে বোঙ্গ দিলো বাবী সিপাহী সওয়ারদের সঙ্গে।

জমিদার শেঠ, ঠাকুরসাহেব, ছোটোখাটো রাজা নবাবদের
ভালোবড় ডোরবর থেকে বেকলো বাপদাদা পরদার আমলের
তুলোমাখা অঙ্গশর। পলকে দিয়ে ধরাবার ধানবসুক—লম্বা লম্বা ভারী

ভবোয়াল—বহুকাল তারা অবহেলিত ছিলো। বৃদ্ধ ঠাকুরসাহেব
ও তালুকদাররা খুলপাড়া কপাল ও ক্র তুলে ধরে পাগড়ী
দিয়ে বেঁধে বওনা হলেন কল্যাণপুর নারায়ণপুরের পথ দিয়ে।

কানপুরের খেতাজরা সবাই ব্যারাকে।' জখনো কিছু কিছু
রেজিমেন্ট বিখন্ত বইলো। কিন্তু কোথাসা হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেল
শাসকসম্প্রদায়। ৫-ই জুনের রাতে, ব্যারাকের বাইরে বখল
রান্নার জন্ত উনোন আলিয়েছে 53rd রেজিমেন্ট—গুলী কর
বললো তারা তাদেরই ওপর।

ভারপর আর কারকেই ক্রমে রাখা সম্ভব হলোনা। হিন্দু
সিপাহীরা হব হব মহাদেও বলে রক্তচিহ্নিত পতাকা তুললো—
মারাঠা কোঁজ নিয়ে এলো তাদের ভগবাবাঙা—মুসলিম সিপাহীরা ওয়ার
দীন দীন শব্দে বামশাহী পতাকা তুলে তার নিচে গিরে ধাঁড়ালো।

চলতে লাগলো কোঁজ ও টাকা সংগ্রহ। সাহেবদের পরিত্যক্ত
কুঠি লুট হয়ে গেল বাতাবাতি। ব্রাইটের কুঠি লুট করেই কাঁচ
হলোনা সিপাহীরা—আলিয়ে দিলো কুঠি। ত্রিভুজলারীকে মাথা হুড়িয়ে
শহবছাড়া করবার একটা সাধু সংকল্প ছিলো তাদের—তবে
ত্রিভুজলারীকে কোথাও পাওয়া গেলনা। আর টাকা মিললোনা
সিম্পুকে। এখানে অনেক টাকা পাবার আশা ছিলো।

ত্রিভুজলারী মাথার গায়ে চাদর হুড়ি দিয়ে চলে এলো
চম্পার বাড়ী।

সম্পূর্ণ ঘরে ফিরতে মাঝরাত হলো। আঁধার ঘরে প্রেক্ষমুর্তির
মতো কে বসে আছে ? বাতি জ্বাললো সে। ধাঁড়ালো ত্রিভুজলারী।

খাটিরার ওপরে লাল একটা কবলে ঢেলে দিলো তোড়া-
বাঁধা টাকা, গহনা সব। নিজেকে নিরাভরণ করে টেনে
টেনে থললো হাত, কান, গলার গহনা। এক অর্থলোভী মনমত্ত
বর্ণসঙ্ঘরী পুরুষের অনেক পাপের সঙ্ঘর। বললো—বা ছিলো,
সব দিয়ে দিলাম সম্পূর্ণ। টাকার দরকার তোমাদের—এখানে
অনেক টাকা আছে

আশ্চর্য হয়ে সম্পূর্ণ চেয়ে বইলো ত্রিভুজলারীর দিকে। আজকে
ত্রিভুজলারী নিঃসন্দেহে হাসতে পারলো। আজকরাণ্য হাসি নয়।
গর্বিত উজ্জল হাসি। বলতে পারলো—জানটাও তুলে দিলাম।
রাখতে চাও রাখবে—নষ্ট করতে চাও, নষ্ট করবে—এই গহনাগুলোর
মতোই এই প্রাণটাও আমার কাছে বঁটা হয়ে গিরেছে সম্পূর্ণ।
আমি ভয় করি না।

কিছুক্ষণ কাটলো চুপচাপ। তারপর উঠে ধাঁড়ালো ত্রিভুজলারী।
বললো—আমি এখন চললাম চম্পা।

—কোথার ত্রিভুজলারী ?

—হয়তো বাব বেনারস।

—সেখানে তাদের পাবে না।

—আবার খুঁজব, এখানে সেখানে—যেখানে হোক। আর
দেবী করব না চম্পা।

বেরিয়ে গেল ত্রিভুজলারী। আঁধারে গা মিলিয়ে বহুদিন পর
গর্বিত মাথা উঁচু করে এই যে মেয়েটি চলে বাচ্ছে, চম্পার মনে হলো
তাকে সে এই প্রথম চিনলো—আসে কোন দিনও জানেনি।

এই গহনাগুলো বেন আঁড়াল করে রেখেছিলো ত্রিভুজলারীকে—
ব্রাইটের প্রতিকৃতি হয়ে।

[ক্রমশঃ]

জীবন-গীতা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ঐগৌতম সেন

জগৎ প্রয়োজন কেন ?

জগৎ প্রয়োজন শিক্ষার জন্তে নয়। ব্যাখ্যা রয়েছে তোমারই ভেতরে। তাকে বিকশিত করবে তুমি নিজে। কেউ অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় না—নিজেকে নিজে শিক্ষা দিতে হয়। বাইরের আচার্য্য দিতে পারে শুধু উদ্দীপনা। দিতে পারে তোমাকে জগৎবাব হস্ত। যে জাগে, সে নিজেকে দেয়। দেওয়াই তো বস্তু।

যজ্ঞ ছাড়া কর্ম নাই

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, যজ্ঞ কি ?

যজ্ঞ হলো নিজেকে দেওয়া। দেওয়া কি ? কর্মের সমুদয় ফল ভগবানে অর্পণ করা। যা কিছু দেখছো, অল্পভব করছো—জনছো বা করছো, সব তাঁরই জন্তে। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজেরও ফল কামনা করবে না। কি পেলাম চিন্তা করাই তো কামনা। নিশ্চিন্তি তোমার নয়, সবকিছু অর্পণ করো তাঁকে। অর্পণ করো তোমার পাপপুণ্য সব কিছু। সকল কাজই তো তাঁর।

যা কিছু করো, যা কিছু ভোজন করো, যা কিছু হোম করো, যা কিছু দান করো, যা কিছু তপস্বী করো সমুদয়ই আমাতে অর্পণ ভগবানে অর্পণ করো। অর্পণ করো শরীর মন সবকিছু অনন্ত বসি-ভসে। অগ্নিতে দ্ব্যতাহুতি দিয়ে নয়, নিজের অহংকে নিবারিত্ব আত্মত্বরূপে প্রদান করে তুমি তোমার মহাবস্তু সম্পূর্ণ করো। জগতে ধন-অধ্বন্য গিয়ে তোমাকেই একমাত্র ধনরূপে জেনেছি, তাই তোমাকে আমি আত্মসমর্পণ করলাম। জগতে একজন প্রেমাম্পদ খুঁজতে গিয়ে দেখলাম তুমিই একমাত্র প্রেমাম্পদ, তাই ওগো প্রেমের আকর, আমাকে তুমি গ্রহণ করো—আমি আমাকে অর্পণ করলাম। আমার জন্তে কিছু নয়—সুত নয়, অন্তত নয়, কোনো বড়ই আমার জন্তে নয়—আমি চাইও না ঐ মিথ্যাবস্তু, আমি আজ সবকিছুই সমর্পণ করলাম তোমাকে।

এই তো দেওয়া। দিতে পারলেই তো হয়ে গেলো। কর বসো, জান বসো, ভক্তি বসো—সকল তপস্বীর শ্রেষ্ঠ কথা নিজেকে দেওয়া। কিন্তু দেবে কাকে ? সেই আমি। আমাকেই দেবে। ভগবানকে। আমিই প্রকৃতিরূপে সর্বত্র বিরাজ করছি। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এরাই হলো আমার প্রকৃতি। অপরা নয়, বিনি পরা—চেতনাময়ী, তিনিই তো জগৎ-ধারণ করে আছেন। সেই আমি বিশ্বের পরম কারণ, একমাত্র কারণ। আমিই প্রলয়কর্তা। আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। বস-রূপে গলিলে আমি, পূর্ব-চক্ষে আমিই তেজ, সর্ববলে আমিই ওজার—আমিই আকাশে শব্দ, আমিই পুরুষের প্রাক্রম। পৃথিবীতে আমিই বৃক্ষ, অগ্নিতে আমিই তেজ—সর্বদ্রব্যে জীবনরূপেও সেই আমি। আমিই তপস্বীর তপস্বী, হে পার্শ্ব, সকল জীবের সনাতন বীজই আমি।

আমি বুদ্ধিদানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ—আমিই কাম-বাস-বুদ্ধি বস্তুদের বল, ধর্মহীন কামও আমি। সাম্বিক, বাসবিক,

তামসিক যা কিছু ভাব দেখছো, সবই আমার থেকে উৎপন্ন। তার আমারই অধীন, আমি তাদের অধীন নই।

এই ত্রিগুণাত্মক ভাবে মুক্ত-মানব আমাকে জানতে পারে না। সমস্ত রজঃ তম এই তিনটিই তো আচ্ছন্ন করে আছে মনুষ্যকে। ঐ তো মারা ; আমাকে আচ্ছন্ন করো, মারা দূর হবে।

মারার কথা শুনে অর্জুন চমকে উঠলেন। কে এই মারা ?

ভগবান বললেন, এই মারাই জ্ঞান অপহরণ করে। যাকে পারে না সে তো জ্ঞানবান। জ্ঞানবান ব্যক্তিই আত্মার স্বরূপ। জ্ঞানবান কে ? যে জানে। দৃত্ত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সকল কালকেই আমি জানি। কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।

আমি যজ্ঞের সংকল্প, আমি যজ্ঞ। যজ্ঞের বনস্পতি আমি, মন্ত্রও আমি। আমি আহুতি, আমি অগ্নিহবন দ্রব্যও আমি।

আমি জগতের পিতা, আমি মাতা, আমি ধারণকারী—ধারণ করে আছি সব-কিছু। কেউ কি তা জানে। আমি পবিত্র ওজার। আমিই স্বক-সাম-যজুর্বেদ।

আমি গতি, আমি পোষক। আমি প্রকৃ, আমি আচ্ছন্ন, হিতেচ্ছ। আমার উৎপত্তি-নাশও আমি, স্থিতিও আমি। আমি ভাণ্ডার, অব্যয়-বীজও আমি।

আমি উত্তাপ দিই, আমার বর্ষণও দিই—প্রয়োজনে সেই বৃষ্টি সংহরণও করি'আমি। আমি অমরতা, আমি মৃত্যু। আমিই সৎ, আমিই অসৎ। তাই হে অর্জুন,—

‘যা কর আর যা কিছু খাও

যা ভাব আর যা কিছু দাও

সকল কাজেই আমার দ্বার

দাঁও আমারে কলের তার।’

অর্জুনের মনকে জাগ্রত করতে বাচ্ছল ভগবান, কিন্তু অর্জুনের মন থেকে সশর বাহ্য ন।

জীবন-বৃক্ষে মানবাত্মার চির-সারথি ঐক্যক সাহুসেই কল্যাণে তাঁর নিগূঢ় বহন প্রকাশ করছেন। এই প্রকাশের মধ্যে একটি সুর তিনি সকল সময়েই ধরে রেখেছেন—সেটি পরম ভগবানের তত্ত্ব। তিনি সাহুসের মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করছেন, কিন্তু তিনি সাহুস ও প্রকৃতি থেকে মহত্তর। আত্মার নিখ্যতিক ভাবের ভিতর দিয়ে তাঁকে পেতে হয়, জানতে হয়। কিন্তু নির্ব্যক্তিক আত্মাই তাঁর সমগ্র সত্য নয়।

তবে সত্য কোথায় ?

একই ভগবান যিনি বিশ্ব-আত্মার, সাহুসে ও প্রকৃতিতে—সেই একই ভগবান স্বাক্ষর অর্জুনের সারথি, সেই একই ভগবান যিনি ওজ, যিনি বহু।

তিনি বলছেন, আমি তোমার অন্তরে রয়েছি—মানব-শরীরে রয়েছি। আমার জন্তেই সবকিছুর অস্তিত্ব, সকল কর্ম-কৌরব মধ্যেও আমি।

অজ্ঞানের সমুদ্রে আত্মজ্ঞানের উচ্চতর আলোক এক ভগবান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বড়ই বেশি উদ্ঘাটিত হচ্ছে ততই তাঁর বুদ্ধির সঞ্চার পরিচয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেবল বুদ্ধির সঞ্চার পরিচয় হলোই তো তাঁর চলেবে না—তাকে দেখতে হবে। অজ্ঞানত্ব নিয়ে দেখতে হবে, বা তাঁর বহির্ভূতী মানবীর দৃষ্টিকে আলোকিত করবে—যাতে তিনি কর্ম করতে পারেন সমগ্র সত্তার সম্ভবিত্বের সঙ্গে, তাঁর প্রতি অজ্ঞের পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে। দেখতে হবে, তাঁর মধ্যে যে আত্মা তাঁর জীবনের অধীশ্বর, সেই আত্মাই বিশ্বের কি না—বিশ্ব-জীবনের অধীশ্বর কি না!

অহং মন, সোহহম্

ভগবান বললেন, তোমাকে বাঁচতে হবে—কর্মের মধ্য দিয়েই বাঁচতে হবে। বাঁচাকে সার্থক করে কর্ম—সেই কর্ম, যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণের সঙ্গে বলতে পারো সোহহম্। এ শক্তি অর্জন করতে হয়।

আমার যে ব্যক্তিগত আমি তাকে ব্যাণ্ড ক'রে আছে বিশ্বগত আমি। যে আমি সকলের, সেই আমি আমারও। এটা সত্য। কিন্তু এই সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিই আমার ব'লে সকলের মধ্যে জানা।

কিন্তু জানতে দিচ্ছে, কই? রিপু এসে এই সোহহম্ উপলব্ধিকে ভাগ করে দিচ্ছে। এই বিচ্ছেদের কলৌ অহং মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। লোভ করে না। লোভ বিশ্বের মানুষকে ভুলিয়ে বৈষয়িক মানুষ করে দেয়। যে ভোগ মানুষের ভোগ্য তা সকলকে নিয়ে—তা বিশ্বভৌমিক।

আমার ভোগ সকলের ভোগ। এই কথাটা অতিথিক দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে। তার ঐশ্বর্ষের সংকোচ দূর হয়। সংকোচ দূর হয় অহংের। ব্যক্তিগত মানবের যার সর্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে আসে অতিথি। তার গৃহস্থীমাকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। একেই বলা হয়েছে 'বহুধৈব কুটুমকম্'। এই আতিথ্যের মধ্যেই আছে সোহহম্ তত্ত্ব। অর্থাৎ আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলে আছি, যিনি আমার এক আমার অতিরিক্ত।

আমার মন আর বিশ্বমন একই। এই কথাই সত্য-সাধনার মূল, আর ভাবান্তরে এই কথাই সোহহম্।

অহং নিয়েই তো অহংকার। সে তো পত্তভেদ করে। অহং থেকে বিবৃত আত্মার কুমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য। কুমা লাহারে বিহারে আচার্যে বিচারে ভোগে দৈবভেদ মন্ত্রে ভ্রান্ত নয়, কুমা বিম্বদ জ্ঞানে, বিম্বদ প্রেমো, বিম্বদ কর্মে। বাইরে দেবতাকে দেখে ভবে অজ্ঞানে পূজাপচারে শাস্ত্রপাঠ বাহ্যিক বিধি-নিষেধ পালনে উপাসনা করা সহজ, কিন্তু আপনায় চিন্তায় আপনায় করে পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা। 'নায়দাশা বলহীনেন লভাঃ'। তারা সত্যকে অজ্ঞের পায় না, বারা অজ্ঞের দ্বর্ষ। অহংকারকে দূর করতে হয়, তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাকে পৌছান যায়।

অহং লোপ করার অর্থ, সমাজে জড়ের মতো নিরহংকার হওয়া। আমি কবি না, আমি ঠাট্টা মাত্র—প্রকৃতিই কর্তা, ভগবৎ কর্তা। গুণের

বশে সব কিছু হচ্ছে, এই জ্ঞান নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, অহং লোপ পাবে। এর নাম নিরোপ—কর্ম করেও লিপ্ত না হওয়া।

বুদ্ধের মধ্যে তার পদ্ম-পুশে যে কৌশল ও সৌন্দর্য রয়েছে—বুদ্ধ কোনোদিনই বলে না, সে সুন্দর। বলতে পারে না বলে বলে না তা নয়—তার সে জ্ঞানই নেই। সে জানেও না, সে কেমন দেখতে। মানুষ জানে। তাই মানুষকে জেনেও, না-জানতে হবে—তাকে নির্লিপ্ত হতে হবে। তাকে অজ্ঞতব করতে হবে, এই দেহ, দেহের সৌন্দর্য বা কিছু তা তার দেহেরই, আত্মার নয়—প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনে তা সৃষ্টি করেছে।

শিশীলিকা যুগ-যুগান্তর থেকে একই ভাবে গৃহ-কার্য সম্পন্ন ক'রে আসছে। তার লোভও আছে, ক্রোধও আছে, কামও আছে। আবার সে বুদ্ধও করছে, বাস করবার গৃহও নির্মাণ করছে। সে গৃহ-নির্মাণে তার কি পরিকল্পনা, কি নিপুণ তার গঠন! তবু মানুষের জ্ঞান কিন্তু শিশীলিকাতো নেই। তার অহংজ্ঞানও আবহা, সম্বন্ধও অস্পষ্ট। শুধু রক্তের তাড়নায় তার জন্ম, প্রজনন বা কিছু।

মানুষকেও ঐ নিপুণতার সঙ্গে অথচ উদাসীনভাবে কাজ ক'রে যেতে হবে—নিরন্তর, অপ্রমত্ত, অবিচলিত, নিরহংকার হয়ে কাজ করতে হবে।

মানুষ যখন মানুষের মতো বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ করতে পারবে, ভালো-মন্দ বিচার ক'রে কর্মের কলাকল স্থির করতে পারবে, বুদ্ধের মতো বা শিশীলিকার মতো নয়, পরিপূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে কর্ম করতে পারবে—অথচ প্রকৃতিকে তার কর্তা ব'লে জানবে, তখনই তার 'অহং' লোপ পাবে।

ভগবান বললেন, মানুষের আছে 'অহং', কিন্তু জড়ের নেই।

অজ্ঞান বললেন, এই যে জ্ঞান, মানুষের ভেতরে, না বাইরে?

জ্ঞান কোথায়?

ভগবান বললেন, জ্ঞান অজ্ঞের। কোনো জ্ঞানই বাইরে থেকে আসে না—জ্ঞান আছে ভেতরে, অজ্ঞের অস্তিত্বে। তাকে আবিষ্কার করাই হলো জানা।

চকমকির আশুনকে বাইরে থেকে জানা যায় না—ঘর্ষণ করলে জানা যায়। মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, একেও জানতে হয় বাইরের আঘাত থেকেই। এই আঘাতই হলো কর্ম। আত্মার অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকে প্রকাশ করতে, জ্ঞানের আলোককে বিজ্জ্বলিত করতে যে মানসিক আঘাত সে-ও কর্ম। শারীরিক মানসিক সকল ক্রিয়াই কর্ম। এই কর্ম বলে মানুষ জগতের সকল শক্তিকে সে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে দিচ্ছে—তাকে আশ্বস্ত ক'রে আবার তাকে প্রক্ষেপ করে দিচ্ছে।

অজ্ঞান জানতে চাইলেন, এ প্রক্ষেপ করার অর্থ কি?

তার কানের প্রবাহকে জগতে রেখে বাবার জন্তেই সে প্রক্ষেপ করছে। একটা টিল কেলো, দেখবে তরঙ্গের সৃষ্টি হলো। প্রক্ষেপ করলেই তার তরঙ্গ আছে। তুমি কথা বলছো এ-ও তো প্রক্ষেপ—তারও আছে তরঙ্গ, শব্দতরঙ্গ। জগতে কোনো তরঙ্গই নষ্ট হয় না—দাঁগ রেখে যায়। শব্দতরঙ্গ, জলতরঙ্গ, বায়ুতরঙ্গ, সাধন-তরঙ্গ এমন অসংখ্য পরবর্তী প্রয়োজনের জন্তে অপেক্ষা ক'রে আছে। একজন চলে যায়, তার একিষ্ট শক্তি তরঙ্গ পরবর্তী জীবনে কাজ করে। তাই কালের প্রবাহ চলছে জীবন থেকে জীবনান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে।

তুমি বলছো আজকের কাজ, আমি বলছি ওর পিছনে রয়েছে কল্যাণের ইতিহাস। আজ কে-কাজ সম্পূর্ণ হলো, সে-কাজ কল্যাণের চিত্তার প্রকাশ, ইচ্ছার প্রকাশ। এই-ইচ্ছা, তার চরিত্র-উদ্ভূত। বার যেমন চরিত্র। কর্ণাহুয়ারী চরিত্র—যেমন কর্ম, ইচ্ছার প্রকাশও সেইরকম।

ভগবান বললেন, তখন যেমন আছে তেমনই, অনন্ত শক্তিও রয়েছে তেমনই তোমার মধ্যে। শক্তি বাইরে থেকে আসে না। কে বলে শক্তি আছে বাহ্যে? শক্তি তোমার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে অব্যক্তভাবে। তাকে জাগরিত করে, বিকশিত করে; শক্তি পাবে।

মাস্তা

অর্জুন বললেন, মাস্তা কি?

মাস্তা মাস্তবের চারদিকে ঘিরে রয়েছে। এই মাস্তাকে অতিক্রম করে তাকে কাজ করতে হবে। এই অতিক্রম করার মধ্যেই আছে পথ, পথ সেই মাস্তার মধ্যে।

ভগবান বললেন, প্রকৃতিকে সাহায্য করতে তো মাস্তব জয়গ্রহণ করেনি। মাস্তব তার প্রতিবাদী।

প্রকৃতি বলছে, বনে গিয়ে বাস করো। মাস্তব তা করলো না, বানালো বাড়ি। প্রকৃতির সঙ্গে মাস্তবের এ নিয়ত সংগ্রাম। এ তার জাতির ইতিহাস, জয়লাভ করার ইতিহাস। অন্তর্গতও সেই একই যুদ্ধ চলছে—পশুমানুষের সঙ্গে, আধ্যাত্মিক মাস্তবের সংগ্রাম। আলোকের সঙ্গে অন্ধকারের সংগ্রাম।

তবু লক্ষ্য সেই যত্ন। যত্ন সকলের লক্ষ্য। জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্যের লক্ষ্য, ঐশ্বর্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, ধর্মের লক্ষ্য। সাধুও মরে, রাজা-ভিক্ষুকও মরে। সকলেই এগিয়ে বাচ্ছে সেই যত্নের দিকে। তবু নিশ্চিত যত্নকে কেনেও জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে মাস্তব। এ তার মমতা—জীবনের প্রতি মমতা। কেন সে জানে না, ত্যাগ করতে পারে না কেন, তাও সে জানে না। তবু মমতা। এই মাস্তা।

অর্জুন বললেন, মাস্তব চেষ্টা তো করছে তবে পারে না কেন?

পারে না মাস্তার জন্তে। মাস্তাই তো আচ্ছন্ন করে আছে মাস্তবের সকল কাজে।

এ মাস্তা কি?

মমতা। সত্যানের প্রতি মাস্তার মমতা। পুত্রের কাছে নিপুণীত হয়েও, তাকে সে ত্যাগ করতে পারে না। এ স্নেহ নয়, এক অশ্রিভের শক্তি তার স্নায়ুশৃঙ্খলকে অধিকার করে আছে। যা তা বুঝ করতে পারে না—চেষ্টা করেও পারে না সে বীধন ছিঁড়তে। এই মাস্তা।

জবে সত্য কি? অর্জুন বললেন।

বৈরাগ্য এক ত্যাগ জীবনের একমাত্র সত্য বস্তু। চেষ্টা করেও তুমি দ্বিতীয় উপায় খুঁজে পাবে না। ত্যাগ করো, আনন্দ পাবে, ভোগ করো—ভোগের স্পৃহা বেড়ে বাবে। ঐ স্পৃহাই তো দুঃখের মূল। কাম্যবস্তুর উপভোগে কখনো বাসনার নিবৃত্তি হয় না—আনন্দে থি থিলা আনন্দ বেড়েই চলে। সকল আনন্দ, সকল পুণ্যই তাই মিথ্যা—মাস্তার অধীন। সব কিছুই এই সংসারপাশের মধ্যে, তাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। অনন্তকাল ধরে মাস্তব হুটেছে তাইই মধ্যে দিয়ে—শেষ পাবনি।

অর্জুন বললেন, এই মাস্তাপাশ থেকে বন্ধন অব্যাহতিই নেই, তখন ভোগ থেকে বঞ্চিত করাই বা কেন?

জীবন কাকে বলে? সে কি শুধু ঐ পক্ষ ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই আবদ্ধ? ইন্দ্রিয়স্বাদানে মাস্তব পত্ত থেকে কতটুকু তির? সেখানে পত্ত মাস্তব একই। মাস্তব ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু আত্মা তো নয়।

এই আত্মাই মহৎ আর্ষণ ও পূর্ণতার দিকে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাই জীবন শুধু ভোগাভিযুগী নয়, স্রব-স্রবকে অতিক্রম করে সে বেরিয়েছে আর্ষণ-অবেশে।

অবেশণ করো, সত্যের অবেশণ করো—নিরত ধনিত হচ্ছে, এই নবর জগতের মধ্যে কি সত্য আছে, তুমি অবেশণ করো। এই দেখ, বা কতকগুলি অণুর সমষ্টিমাত্র—তার মধ্যে কিছু কি সত্য আছে? মাস্তবের মনে এই তত্ত্ব নিরত জিজ্ঞাসিত হচ্ছে।

বহু মন এক

কয়েকটা অণুর সমষ্টি যদি দেখ হয়, তবে এই দেখকে চালায় কে?

ভগবান উত্তর দিলেন, দেখকে চালায় দেহাতীত আর কিছু।

এই 'আর কিছুই' হলো আত্মা। আত্মা মন নয়, মনের ওপর সে কাজ করে। মনের মধ্য দিয়ে শরীরের ওপরও কাজ করে এই আত্মা। আত্মার নেই আকৃতি। বার আকৃতি নেই, সে সর্বব্যাপী।

অর্জুন বললেন, সর্বব্যাপী বলেই তাকে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।

এই সর্বব্যাপীকে জানতে হলে, দেশ কাল নিমিত্তকে জানতে হবে। এই দেশ-কাল-নিমিত্ত তো মনের অন্তর্গত।

কাল মনের পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায়, যখন যেমন মুহূর্তের মধ্যে কয়েক মাস অতীত হয়ে থাকে।

তবে এ কাল কি?

তোমার মনের অবস্থার ওপরই তা নির্ভর করছে। দেশ সবক্ষেত্রে ঠিক সেই একই কথা। দেশের স্বরূপ কি কেউ জানতে পারে? তবু সে রয়েছে। কোনো পদার্থ থেকে সে পৃথক হয়ে থাকতে পারে না। নিমিত্ত বা কার্য-কারণ ভাবও তাই। তুমি কি এমন দেশের কথা ভাবতে পারো, বার কোনো রূপ নেই, সীমা নেই—চারদিকের কোনো বস্তুর সঙ্গে বার কোনো সংস্রব নেই? পারো না। দেশের কথা ভাবতে হলেই, হুটী সীমার মধ্যস্থিত অথবা তিনটি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশের কথাই ভাবতে হবে। তার মানে দেশের অস্তিত্ব অন্তঃবস্তুর ওপর নির্ভর করছে। কাল সবক্ষেত্রে তাই। কালের ধারণা করতে হলেই একটি আগের, একটি পরের ঘটনা নিতে হবে। নিমিত্ত বা কার্যকারণ ভাবের ধারণা এই দেশ-কালের ওপরই নির্ভর করছে। তার স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই। আবার ওরা কিছুই নয়, একথাও বলা যায় না। কারণ, ওদের ভেতর দিয়েই জগতের প্রকাশ হচ্ছে।

ভগবান বললেন, এই কাল ছাড়া কার্যকারণ ভাব থাকতে পারে না। আবার ক্রমবর্তিতার ভাব ছাড়া কার্যকারণভাবও থাকে না। তাই দেশ-কাল-নিমিত্ত মনের অন্তর্গত—আত্মা মনের অতীত এবং নিরাকার, স্রবতঃ দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত। আত্মা বন্ধন দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত, তখন অনন্ত। অনন্ত কখনো হুটো হয়

না। তাই আত্মা অনন্ত এক এক। আত্মা বেহেও নয়, মনও নয়—কারণ তাহের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। শরীর ও মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। নদীর জল-পরমাণু সাদা ঢকল, কিন্তু নদী সেই এক। সেহে প্রত্যেক পরমাণুই নিয়ত পরিবর্তনশীল হয়েও এক-শরীর। মনও তাই। কণে সুখী, কণে দুঃখী—কণে সবল আবার কণে দুর্বল। তাই মন আত্মা হতে পারে না। আত্মা অনন্ত। পরিবর্তন হয় সসীম বস্তুর। অনন্তের পরিবর্তন হয় না। তাই অনন্ত ‘একমেবাধিতীয়ম্’—অপরিণামী, অচল, পূর্ণ। সুতরাং অনন্তের ভেতরেই সত্য আছে, সান্ত্বের ভেতরে নয়। তুমি সকলের ভেতর দিয়েই কাজ করছো। তোমার চরণ আর অপরের চরণ পৃথক নয়, তোমার মুখ আর অপরের মুখ ভিন্ন নয়। তুমি সকলের মুখ দিয়েই কথা বলছো।

ভগবান বললেন, বার জীবন জগতব্যাপী সেই জীবিত। মৃত্যু-ভর মানুষ ভখনই জয় করতে পারে, বখন মানুষ উপলব্ধি করে সে সকলের মধ্যেই রয়েছে। সেই ‘আমি’ সকল বস্তুতে। সকল সেহে মধ্যো ‘আমি’—সকল জন্মের মধ্যে ‘আমি’। ‘আমি’ই এই জগত। সমুদয় জগতই আমার শরীর। একটি পরমাণুর অস্তিত্ব, আমারই অস্তিত্ব। অর্জুন প্রার্থনা করলেন, আমাকে সেই উপলব্ধিই করাত, সেই জানই আমাকে দাও।

এই জগতকে জানি আপন বোধ দিয়ে। যে জানে সেই আমার আত্মা। সে আপনাকেও আপনি জানে। এই স্ব-প্রকাশ আত্মা একা নয়। আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা—এমন কত আত্মা। তারা যে-এক-আত্মার মধ্যে সত্য, সেই তো পরমাত্মা। ইনি আছেন সর্বদা জন্ম-জন্মের স্থলরে।

তিনিই ব্রহ্ম। ভগবান বললেন, তীরে ঝাড়িয়ে সমুদ্র দেখা।

সমুদ্রও দেখা, সমুদ্রের তরঙ্গও দেখা। তরঙ্গটা কি সমুদ্র থেকে পৃথক? ওটা একটা রূপ। তরঙ্গও চলে যায়, রূপও থাকে না। তরঙ্গ ছিলো ব’লেই রূপ ছিলো। ওটা মায়া। ব্রহ্ম হলো সেই সমুদ্র। তুমি, আমি, দুর্ব—সকলেই সেই সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ। সমুদ্র থেকে তরঙ্গগুলোকে পৃথক করে কে? ঐ রূপ। রূপ বেশ-কাল-নিমিত্ত। সেই বেশ-কাল-নিমিত্তও আবার সম্পূর্ণরূপে ঐ তরঙ্গের গুণের নির্ভর করছে। তরঙ্গও চলে যায়, তারাগও অজ্জহিত হয়। জীবাত্মাও বখন মায়া পরিত্যাগ করে তখন আর সে তা থাকে না, সে মুক্ত হয়ে যায়।

এই বেশ-কাল-নিমিত্তই তো নিয়ত বাধা দিচ্ছে—সেই বাধা ঠেলে তোমাকে মুক্ত হতে হবে।

মানুষ এই চেষ্টাই করছে। সারা জীবন ধরে চেষ্টা করছে, কি করে মনকে সবল করা যায়। দুখে গ’লে গেলে চলাবে না, দুঃখকে জয় করতে হবে। নীতি কি? নিজেকে দৃঢ় করা। ক্রমশঃ সকল অবস্থাকে সহ্যের নেওয়া, তবেই তো জয় হবে।

ভগবান বললেন, মানুষের জয়যাত্রা এখানেই শেষ হয়নি—সে প্রকৃতিকে জয় করতে চেয়েছে। কিন্তু বাইরের বিষয়বস্তুতে কোনো পরিবর্তন এনে প্রকৃতিকে জয় করা যায় না। ছোট্ট মাছ জলের শত্রুর কাছ থেকে নিয়ত আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে, শেষে আর কিছু না পেরে, ডানা বিস্তার করে আকাশে উড়ে যায়। এ চেষ্টা—চেষ্টাতেই সে এই পরিবর্তনকে আনলো। কোনো পরিবর্তনই বাইরে থেকে আসে না। পরিবর্তন সর্বদাই নিজের ভেতরে হচ্ছে। জীব-জগতের ক্রমবিকাশও হচ্ছে ঠিক এই নিয়মে। নিজের পরিবর্তনের ভেতর দিয়েই প্রকৃতিকে জয় করছে মানুষ। [ক্রমশঃ]

বাস্তাচর্যে যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দি, কাশি, বুক-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্লেষ্মা জমে বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন



পরিবেশক :

জি. হস্ত এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১





বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

বাড়ী ফিরতে ওদের প্রায় দুটো বেজে গেলো। সুদ'ম উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলো—মিতা এলো ঈগসির। দেখো কাকি ধরে এনেছি।

কোমরে কাপড় জড়ানো, খুঁটি হাতে রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো সুমিতা। আগুনের আঁচ লেগে মুখখানা আগুনের দগ্ধ হাডা হয়ে উঠেছে। কপালে চিক্ চিক্ করছে বিন্দু বিন্দু ঘাম—ও বা। ছোট মামা তুমি? কি মজা, সকাল থেকে তোমার কথাই অনেকবার ভেবেছি, বিশ্বাস করে।

তাই নাকি? তোর হস্তভাণা মামাকে হঠাৎ ভাবতে গেলি কেন? তাকে আজ দেখে ভারি অবাক লাগছে রে মিতা। এমন অসুস্থিস্থির বেশে আগে কখনও দেখিনি তো।

তুমু তোমাকে নয় গো, আজ সবাইকে অবাক করে দিয়েছি। সহাস্তে বললো সুমিতা। তোমাকে ভেবেছি কেন বলছি—তুমি যে যেতে বড় ভালোবাসতে ছোট মামা, দিদিমা তোমার জন্তেই বোজ নতুন খাবার তৈরী করতেন, আমি আর ছোটমামীও কতদিন করেছি ঈর সঙ্গে। তাই আজ যখন রান্না করতে এলাম, সবার আগে তোমার জন্তেই মনটা কেমন করে উঠলো।

তুমু তোমরা দুজন কেন? দাদা কৈ? আমার স—ব রান্না শেষ হবে-গেছে, খালি চপগুলো ভাজলিলাম।

তোমার দাদা এখন আসছেন—মানে জানেন তো বাজিতে হার হবেই, তাই খোকনের পেরাফুলেটার নিয়ে তবে বাড়ী ঢুকবেন। তোমার খোকনের জিনিবগুড়োর সব এনে দিয়েছি, এবারে মিলিয়ে দাও, আর পছন্দ হলো কি না বলো। আমি আর তোমার দাদা মার্কেট চলে গেলে তবে জিনিবগুলোর নাগাল পেলাম। কখনও এ ব্যাপার হয়নিতো, তবে হাতেখড়ি। ছোট মামাকেও দেখলাম মার্কেটে ছুটোছুটি করছেন,—দাদা ছাড়ে কে? পাকড়াও করে নিয়ে তবে এলাম। হাতেতে হাতেতে বললো সুদ'ম। এবারে খেতে লাগলো, বড় খেটেছি তোমার খোকার জন্তে মিতা!—প্রচণ্ড ক্ষিপের আগুন জ্বলছে পেটে, দেখো যেন আবার আধপেটা খাইয়েনো, আমি কিন্তু আজ জীবণ খাবো বলে রাখছি আসের ভাগে।

তোমার খাওয়া আমার জানা আছে গো? খাও না কত খাবে। বাড়ি বৈকি রে মিতা হাসির সঙ্গে জবাব দিলো সুমিতা।

আমারও জীবণ ক্ষিপে পেয়েছে মিতা! আগে খেতে দে, তার পর তোর খোকাকে দেখবে। সত্যি কথাটাই মনে করে দিয়েছিল রে মিতা। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বললো অনিল, কত দিন যে মায়ের হাতের রান্না খাইনি—এখন বাবুটির হাতের একধেরে খাবার খেতে খেতে দারুণ হারে আমার চোখে জল আসে রে।

তোমরা ওপরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বসো ছোট মামা, এখন আমি তোমাদের খাবার নিয়ে বাছি। চোখের জল ঝাপড়ে চাপড়ে ছুটে রান্নাঘরে চলে গেলো সুমিতা।

কোমরে কাপড় জড়িয়ে পরম উৎসাহভরে ওদের পরিবেশন করলো সুমিতা। যখন দেবীও মাকে মাকে ওর সহায়তা করছিলেন, কিন্তু অনিরুদ্ধ হৈ হৈ করে তাঁকে বাধা দিয়ে বললো—তা হবে না মাসীমা, আমি যখন বাজি হেরেছি, মিতা! তেমনি একলা হাতে সব করবে।

পেরাফুলেটারের ভেতর ভেলভেটের বিছানা পেতে সুদ'ম সাধা সিঁকের ব্রক পরিয়ে খোকাকে শুইয়ে রেখেছেন যখন দেবী। সেমিকে চেয়ে চেয়ে এক অনাধারিত আনন্দে মনটা কানায় কানায় ভরপুর হয়ে উঠেছিলো সুমিতার। সেই উজ্জ্বল আনন্দ ওকে সজীব চকল করে তুলেছে।

ও, ভারি তো খাইয়ে বসেছেন দু'জন? টোট ফুলিয়ে বললো সুমিতা, ভাগ্যিস ছোট মামা এসেছিলো, তাই আমার এত পরিশ্রমের জিনিবগুলো নষ্ট হলো না, তা না হলে সবই কেলা যেতো দেখছি।

মুগু দুটি মেলে ওর দিকে চাইলো সুদ'ম। সুমিতার আগের রূপের সঙ্গে আজকের রূপের যেন কোনো মিল নেই। বিরবিরে পাহাড়ী বরণা যেন আজ বিপুল জলোচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল, দুকুলপাখিনী তরঙ্গময়ী এহানদীতে পরিণত হয়েছে।

তোমার প্রত্যেক রান্নাটাই চমৎকার সুবাহ্ব হয়েছে মিতা, তবে এত রকম একসঙ্গে যদি না করতে, তাহলে ভালো করে খাওয়া যেতো। প্রত্যেক জিনিব একটু করে চাখতে চাখতে যে পেটটা ফুটবলের মতো ফুলে উঠলো, তার কি করি বলো? নিরামিষ রান্না যে এত উত্তম, তা এই প্রথম জানলাম। এবারে দেখছি বাবুটি ভাড়িয়ে খাঁটি খোঁটা বাবুন রাখতে হবে আর তাকে তোমার চোলা করে দেব মিতা—তাহলেই এই সব দেবভোগ্য সুবাহ্ব, সুপের খাবারগুলো বোজ খেতে পাবে। সহাস্তে বললো অনিরুদ্ধ।

হাতা-খুঁটির সঙ্গে তোমার পরিচর আছে, তা তো জানতাম না মিতা। কৌতুকভরা গলায় বললো সুদ'ম—এমন চমৎকার রান্না শিখলে কবে? কোনটা দেখে যে কোনটা খাবো, এমন সুখিল বাড়িয়েছো তুমি, সব রান্নাগুলো ভালো করে।

কলকণ্ঠে হেসে উঠলো সুমিতা। তুমিই তো বলেছো দাদীমা! আজ তোমার অবাক দিন। খালি পর পর অবাক হয়ে বাবে। এও সেই রকমই আর কি। একটু-আটটু দিদিমার সঙ্গে জোগাড় দিয়েছি বটে, তবে হাতা-খুঁটি নিয়ে কসরত করে রান্নার প্রথম হাতেখড়ি আজই আমার কাকীমার কাছে। দেখছো তো উপযুক্ত গুরু পেলে একদিনেই সিদ্ধিলাভ করা যায়?

তোমার বাবুনের অবস্থা সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হবে দাদা, কারণ গুরুসিঁরি করবার যোগ্যতা আমার কোনো দিন হবে কি না সন্দেহ! এই একদিন তো হাতা-খুঁটি জ্বললাম, আবার সব চূপচাপ। তখন হবে কি জানো? রকমারী রান্নার নিয়মগুলো আমার মাখার মগজে বসে থেকে থেকে রূরুত ধরে ভেঙে টুকরো হয়ে মিলে সব এক হয়ে বাবে। সেই সময় তোমার বাবুনকে—একবারে রান্নায় আমি ব্রহ্মক করে ফুলবো, সব রান্নার হবে একটা ট্রে।



প্রিয়াস

সুন্দরী
মহিলাদের
ঐতিহ্য!

প্রিয়াস সাবান—বিশুদ্ধ সিসারিনবৃত্ত সৌন্দর্য সাবান—আপনার
ছকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্যের পক্ষে এত নিরাপত্তা।
হৃদয় প্রিয়াস সাবান আপনার সৌন্দর্যচর্চার দিত্য সঙ্গী হোক।
শিশুদের কোমল ছকের পক্ষেও প্রিয়াস আদর্শ।
প্রিয়াস ট্যালকাম, এত স্বচ্ছতার মত মোলায়েম, এত অপূর্ণ হৃদয়—
আপনাকে সারাদিন সতেজ, স্বন্দর রাখে। হৃদয় হৃদয়—সবুজ—
সোনালী টিনে প্রিয়াস ট্যালকাম কিসের।



হো, হো, হা, হা, হি, হি—সমবেত কণ্ঠের মিলিত হাসির
ফুলান করে পেলো খাবার টেবিলে।

অনিল এককণ নিশ্বাসে বসে থাকছিলো। হৃদয়ের জ্বালা ওর
চোখে-মুখে। একটি একটি করে বাটি টেনে নিয়ে গোব্রাচল খেয়ে
বাড়িছিলো কোনো কথা না বলে।

তোমার ভালো লাগছে ছোট মামা? তুমি তো মাছ-মাংস
হাড়া কিছু খেতে পারতে না, আজ তোমার খাওয়ার অসুবিধা হল
তো? বললো সুমিতা।

না যে মিতু অসুবিধে নয়, বড় ভালো লাগলো খেয়ে। চোখ
তুলে সুমিতার দিকে চাইলো অনিল।

কি গভীর রাত্রি চোখ দুটোতে ওর। বেন কতদিন অসুখে
তুলেছে—তেননিধায় বসে বাওয়া চোখ দুটো পাণ্ডু বিবর্ণ।

সুমিতার সারা অস্তরটা বেন হায় হায় করে উঠলো ছোট
মামার জন্তে। কি সুস্থিবাছ আনন্দ-চকল ছিলো ছোট মামা। এই
কটা বছরে ও বেন নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে। কোন এক মধ্যাহ্নিক
বেদনার হুর্হু বোঝাটাকে বহন করে গভীর রাত্রি ভারে অবসন্ন
হয়ে পড়েছে।

আরেকটু হানার কালিয়া আর দুখানা চপ আমাকে দে তো
মিতু। ভারি চমৎকার হয়েছে রাগাঙলো—খেতে, খেতে আজ
খালি মার কথাই মনে পড়ছে যে—বরাগলায় বললো অনিল।

এই যে আনছি ছোট মামা। তুমি আস্তে আস্তে খাও। চকল
পকক্ষেপে চলে গেলো সুমিতা।

মিতার জীবনের পরম রমণীয় মুহূর্তগুলো খরচ করে দিয়ে বাড়ির
কাঁটা সন্ধ্যা ছুটার ঘরে গিয়ে পৌঁছেলো। ওরা সকলে গল্প করছিলো
সুদামের ঘরে বসে। খোকায় পরিচর্যায় ছিলেন যমুনা দেবী।

কোথায় গো আমার মিতু দিদি? কার ভারি গলায় ভাক
ভরে বিশ্বর ভরে বারান্দার বেয়িরে এলো সুমিতা। ওর সামনে
পাড়িয়ে ছোট মামী আর দিদিমা।

দিদিমা? অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে অকুট ঘরে বললো
সুমিতা—দিদিমা আপনি এসেছেন? হেঁট হয়ে দিদিমার পায়ের
ধুলা নিয়ে প্রণাম করলো ও।

ওক হুহাতে বুক জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কঁদে ফেললেন
দিদিমা।

ওর আমার ননীর পুতলী; এত হুংবরাতে ছিলো তোর।
ওমা, তুই শিব গড়তে বীদর গড়লি। বাছা যে, কি হাল হয়েছে
তোর?

সব আমার বরাতের দোষ দিদিমা। কান্নাভরা গলায় বললো
সুমিতা।

বরাতের দোষ নয় রে দিদি। সব দোষ আমার। অভিমান
বন্ধ হয়েছিলো। তোর দিকে কিরে চাইনি যে, তাই একটা ছিন্ত্র
জন্ম এসে তোকে চুনি করে নিয়ে গেলো। তোকে তো তোর বাপ
আমার হাতেই দিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু কি মতিবদ্ধ হয়েছিলো
আমার। মহাপাপ করেছি আমি দিদি। তার প্রতিশ্রুতিও পালি।
আমার অনিল, আমার বড় আদরের বনকে ডাইনীতে ধরে দিয়ে
গেছে।

ভারি অপ্রস্তুত ভাবে একপাশে প্যাড়িয়েছিলো অনিল।
সেই খবর দিয়ে এসেছিলো ওঁদের এখানে আসবার জন্ত। আজ
কতদিন বামে মিতার সঙ্গে ওঁদের দেখা হবে, ভারি খুশি হবে মিতা।
কিন্তু একি হলো?

করবী এসে সুমিতার হাতটা ধরে টান দিয়ে বললো—ওমা,
এতদিন বামে দেখাটা হলো কি শুধু কাদবার জন্তে? আর আর,
ঘরে বসিগে, কত কথা যে জমা হয়ে আছে তোর জন্তে।

যমুনা দেবী এসে প্রণাম করলেন দিদিমাকে। শান্ত গলায়
বললেন তিনি—আপনি তো অনেক বোঝেন যা। হুং দিয়ে তপ্তবান
পরীক্ষা করেন মাহুবকে। হুংখের আশ্রমে সব খাদ পুড়িয়ে, বাঁটি
সোনা করে নেন আমাদের। তাই মহাভারতে কুন্তি দেবী
বলেছিলেন—হে বৃক। তুমি সদা সর্বদা আমাকে হুংখ দিও।
তাহলে আমিও তোমাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পারবো। সুখের
মোহে আমাদের তোমায় ভুলিয়ে রাখে।—এ সব তো আপনার জানা
আছে না, তাঁরা আমাদের শিক্ষার জন্তেই এসব দুষ্টাঙ রেখে গেছেন।

অঁচলে চোখ মুছে যমুনা দেবীর চিবুক ধরে চুমো খেলেন দিদিমা।
গদগদ করে বললেন—এত অল্প বয়সে এমন জ্ঞান কোথায়
শেলে যা? তোমার কথা শুনলে যে বুকটা জুড়িয়ে যায়। আমার
না হলো এমিক না হলো ওমিক। সারা জীবন শুধু অন্ধকারে হাতড়ে
মলাম—তা শুনলুম অনিরুদ্ধর মুখে, মিতু না কি রাত্তার অজ্ঞান থেকে
একটা ছেলে কুড়িয়ে এনেছে? কোন জাতের ছেলে কে জানে যা?
কোন নষ্ট মেয়ের কুকর্ভি। মুখ বিকৃতি করলেন তিনি, বেন
আচমকা কিছু নোংরা বস্তু মাড়িয়ে ফেলেছেন।

সুদাম উঠে এসে প্যাড়িয়েছিলো মায়ের পেছনে। জবাব সেই
দিদো।

শিশুর কি জাত আছে দিদিমা? সে যে কুলের মতই
পবিত্র। ঠাকুর ঈশৈতন্ত্রদেব বলেছিলেন, “ভগবানের জাত নেই
ভাই, তাদের কেন জাতের বালাই।” বলতে বলতে এগিয়ে এসে
দিদিমাকে প্রণাম করলো সুদাম।

কে? চকু বিস্ফারিত করে দেখলেন দিদিমা।

ওমা, এবে আমার বায়ুহা। রক্তকাল পরে তোমার
চাঁদমুখখানি দেখতে শেলাম ভাই। কান্নাভরা গলায় বললেন তিনি,
তোমার জিনিষ তোমার হাতে দিতে পারলাম না সুদাম, চিরকাল
অপরোধী হয়ে রইলাম তোমাদের কাছে।

আর ওকথা কেন যা? উককটে বললো করবী—রাছুর বা
ছির করে সব ক্ষেত্রে তা কি সফল হয়েছে কখনও? কপালে ধার
বা থাকে তাই হয়।

আমার কপালে কি সবই বিপরীত হলো যা? ক্রমাগত চোখ
মুহুর্তে মুহুর্তে বললেন মায়ী দেবী। বড় সাধ ছিলো সুদামের হাতে
মিতুকে তুলে দেব, আর ভালো একটি জামাই আর মনের মত একটি
বৌ আনলো—কিন্তু বিধাতা আমার সব আশার এমন করে ছাই
চলে দেবেন যেনও তো ভাবিনি কখনও। আমার খোকা আমার
অনিলকে হারিয়ে আমি আতঙ্ক কি আশ্রয় বুক নিয়ে দিন কাটাচ্ছি,
কে বুঝবে আমার যন্ত্রণা?

চোখের জলে ভেসে গেলো তাঁর মুখখানা। ওর হাত ধরে
ঘরে নিয়ে গেলেন যমুনা দেবী। সেখানে কেমনে বসেছিলেন

অনিল, ঠেহিসের ওপর হুহাতের কহুই বেখে সাংসে খুঁকে পড়ে হুহাত মাথাটা চোপ করে গভীর চিন্তার বেন ময় হয়েছিলো সে।

অনিল! খোকা! বাবা তুই এসেছিস? ব্যাকুলভাবে হুহাত বাড়িয়ে ডর দিকে সেঙ্গের মায়া দেবী।

হা, হা গো! বলতে বলতে অনিল উঠে এসে জড়িয়ে ধরলো তাঁকে।

ওরে আক কার মুখ দেখে রাত প্রভাত হয়েছিলো আমার। তোমার সকলকার টানবুখগুলো একসঙ্গে বেখেতে পেলাম। ভেটে ভেটে করে আবার কেঁদে উঠলেন তিনি।

হির হও হা! কেঁপোনা। তোমাকে ছেড়ে আমিও বড় কষ্ট পেরেছি না!

কিরে বাবো,—আমি আবার তোমার কোলেই কিরে বাবো হা, ব্যাকুলকণ্ঠে বললো অনিল।

তাই কিরে আর বাবা! তোর মায়ের কুঁড়ে ঘরে ভুট কিরে আর। তোকে ছেড়ে আমি কি আর ঠেঁসে আছি বাবা?

অনিলের হাত ধরে তাকে সোকার বসিয়ে পাশে বসলেন তিনি। ক্রমালে চোখ-মুখ হুড়ে লাল লাল চোখ ছুটো মেঙ্গে সকলকার বুখগুলো ভালো করে দেখে বললেন—

আমার কি কথা দিনরাত মনে হয় জানো তোমরা? মনে হয় চিরটা কালই আমি তুল পথে চলছি, তাই নিজেও কখনও মুখ পেলাম না আর তোমাদের কারুক সুখী করতে পারলাম না।

ও! কি আকোপ, কি অমৃতাপের আঙন যে দিনরাত আমাকে পুড়িয়ে থাকছে, তোমাদের বোঝাতে পারবো না তার জালা কি। তোমরা সবাই আমাকে কমা করো।

মহাবিরর ভরে দেখেছিলো সুনাম সিংহিকে। এই কি সেই এটিকে-হুত কমতারসিজিতা, লালকুটির সর্বস্বী কতী?

এ যে একজন অসহায় শোকার্তী সামাজ্য বুঝা মাজ। কোথায় সেল তাঁর বিপুল কমতার একমুহুর সিংহাসন? বুড়ার প্রতি লম্বকেনার মনটা ভরে উঠলো ওর।

ওদর কথা বলে আমাদের আর অপরাধী করবেন না সিংহা।

গভীর ঘরে বললো সুনাম, বাবার কাছে শুনেছি লিখর পরম মঙ্গলময়। হা তিনি কয়েক, জা আমাদের মনসের জন্তেই। তবে তাঁর কর্তের মুদ্রতথ বোকাবার পক্তি আমাদের মত সাধারণ মানুষের মৈই:— তাই আমরা হুংব পাই। আমাদের এই কুয় জীকনে বা কিছু অমঙ্গল, অন্তত, তারই তেজসে হয়তো মহাজীবনের পরম কল্যাণের পুন্দা রয়েছে। এই আমার মনে হয় সিংহা।

সে বিশ্বাস থাকলে কি আর এত কষ্ট পাই হানা? সারা জীবনটা তো খালি সঙ্গের সঙ্গার করে হলো, সংসার তো আমার মিলে জুঁ ছাট। এবাবে মনে বড় সাধ হয়েছে তীর্থভ্রমণ করবার, কিন্তু কার সঙ্গেই বা হাই। কয় হয়েছে, একা বেতে বড় জর পাই। সত্যক বললেন সিংহা।

খুব ভালো কথা বলেছেন সিংহা, বললো সুনাম। সামনের বৈশাখী পূর্ণিমার কাঁকাবাবুর কল্যাণ সেগঙ্গনের উষোখন করতে ওফসেব তো আসছেন। তিনি দিন তিনেক পরেই পুরীতে বাবেন, আপনি অনায়াসে বেতে পারবেন তাঁর সঙ্গে। তীর্থভ্রমণ, সাধুসঙ্গ একসঙ্গে ছুটাই হবে।

আমাকেও সঙ্গে নিও হা! সিনেমা টিনেমা সব এবাবে ছেড়ে দেব, শুধু তোমার কাছে থাকবো—আর কাউকে চাই না আমার হা। মায়ের কাঁধের ওপর মাথাটি রেখে রান্না ঘরে বললো অনিল।

আর আমি বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি? ভুল তুলে বললো করবী।

পরম আনন্দের আভা বিকসিত হলো মায়া দেবীর চোখ-মুখে। খুশিভরা গলায় বললেন তিনি—এই তো চাই। আবার সকলকে কিরে পাবো, সকলকে তোমাদের বহু করবো, খাঁওগাবো, এয় কেরে বড় সাধ আমার কোনোগিন ছিলো না। তুমিও চলো না হাবী। মিতুর ওপর তো আর অধিকার নেই আমার। ওকেও যদি পেতায় সঙ্গে, তাহলে আর কোনো হুংবই থাকতো না আমার।

আপনার সঙ্গে আমিও বাবো সিংহা। কখনও সমুদ্র বেধিছি, ভীষণ ইচ্ছে হয় দেখবার। বাবা আমি আর মানবো না—আমি বাবোই। আঙে করে বললো সুনাম।

আস তোর বাচ্ছাটা? সে বাবে না? খোকাকে কোলে এনে ঠাড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন বনুনা দেবী।

বেধি। বেধি। ছুটে গিরে ওকে হুহাতে জড়িয়ে ধরে বললো করবী—ও হা। কি চমৎকার। টিক বেমন মিতার সেলুবেয়েজেন ডল্টা আছে আলমারীতে তেমনি দেখতে। পারের রঙটা কিছুই মতো লাগে—চোখ ছুটো নীল। টুকটুক লাল গাল আর ট্রাট। কে বলবে এ মিতার ছেলে নয়।

বেধি জো—সে আমার কোল, বললেন সিংহা। হুঁ হাত বাড়িয়ে। করবী খোকাকে হায়ের কোলে নাহিয়ে গিলে।

ও হা তাই তো। এ যে একেবারে রাজপুত্র দেখছি। উঁহুঁ। হা ডেবেছিলাম, তা নয়। হেঁজি-পেঁজির পেট থেকে পড়লি,



জুয়েলাস্

কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স

১৬৭ বি. বঙ্গবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪ ৫০৬২

কোনো বন্ধু-বন্ধুর জিনিষ এ। বাবু এক এক রকম জালানি হলো।
তুমিই লাক্সা কথা বললে। পুরানো—ভগবানই মিত্রকে দিয়েছেন
এমন পছন্দসের মতো খোঁজাট। ওর ভীষনে আর কি পুখ আছে
কলো? একে বুকে করে তুমি শান্তি পাবে।—হু হাতে খোঁজাকে
সাতোড় নাচাতে বললেন তিনি—তুমিও আমার সঙ্গে বাবে তো
সারেব?

এক পলায়ী পোলের জল-বড় হয়ে গিরে সকলকার মনের খন
মের খানেকটা চাড়া হয়ে গিয়েছে। খুশির আলো খিলিক দিচ্ছে
জলের চোখে-বুকে, কথাবার্তার। আশ্রয় হয়ে এককণে কথা
বললো অনিলক।

সকলকে পুরী বাবার জন্তে নেমস্তর করলেন দিদিমা, কুদে
সারেবটাও বাবু পেল না শুধু বাতিল হলো এই কালো আশ্রয়ীটা।

ভাবা, সে কি কথা বাবা? তোমার বাবু দেখে? তুমি যে
জামাই হুজিরের সহায়। তোমার মা পেলে আমার চানের হাট
হানাবে কেন বাবা?—আমি নিজে গিয়ে তোমাকে আর তোমার
বাক্যে নিয়ে আসবো। গঙ্গার জল কথা ক'টি বলে—পলার পুর
পাটে আবার বললেন দিদিমা—অজিতার তো খুব ভালো বিয়ে
হিলেন দিদি,—তা বিজির বিয়ের কি হলো বাবা? সেই তো
বক।

—ওর কথা আর বলবেন না দিদিমা, মতো মুন্সল
বাণিরে গেছেন আমার বাবা! মোহমের নামে, পকাশ চাকার
করে টাকা আর একখানি করে বাড়ী দিয়ে গিয়ে। অলকাপুরীর
হাসীয়া এমন শ'নাশো মাল কোনো দিন হাতছাড়া করেন না,
জাই একটির একেবারে গ্রাস কর বেললেন। অজিতা চিরকলে জাঁকু
আর ভালোমানুষ মোহের।—তাই বেঁচে গেছে ওর খবর থেকে
—আমাদের পছন্দ মত করে বিয়ে দেওয়াও সম্ভব হলো।—কিন্তু ঐ
খিচড়ির বাবা উনি একেবারেই খেরেছেন। এখন ওকে সিনেমার
দায়িত্বেরে। তার উপযুক্ত শিক্ষা দিচ্ছেন। দিনরাত এখন সে
সিনেমার কথা দেখছে আর কি।

আজ—হা। তোমার মায়ের তো তাহলে মনস্তাপের সীমা
নেই। আক্ষেপের পুরে বললেন দিদিমা। একেবারে সাক্ষাৎ
হাফুসী তোমাদের ঐ হাসীয়াটি। কত ছেলে-মেয়ের কচি-কচি
হাসীয়াগুলো খেরেছেন তিনি তার আর হিসেব নেই গো। আগে
জানল, কি মিথাকে তার আজ্ঞার বেতে দিতাম বাবা। ওবে
হুজবই ডান, তা কি বুঝেছি আসে?

তা তিনি এখন আরো কোথায়?

অজিতের জালোই—দনপতি কেন্দ্রের বরানগরের বাগান-
বাগানে আছেন। রোজ গলাহান করেন। কৌটা-তিলক কাটেন।
সন্ধ্যেকাল কেন্দ্রিক খবরী বাজিরে কীর্তন শোনান। তনছি
একো উনি একটি খাঁটি কীর্তনীয়ার দল তৈরী করবেন।

বাটা মায়ো, হুখে আঙন দাও, অমন কীর্তনীয়ার উঃ। কি
কালিদাস, শুধু বিব চাকতে জানে। বিকৃত কণ্ঠে বললেন দিদিমা।

এ প্রলম আর নয় বা। একটু কুদে থাকতে দাও।
আজিও কলো অনিল। তারপর একটু কলম হাসির সঙ্গে বললো—
আমিও কলম কি মনে হচ্ছে জানো বা। আহরা কেন সাত বছর
খিচিরে রেছি।

পুরানো বিলতে বাতনি, আমিও ভক্তভার্যকে বিয়ে করিনি,
অসীমও মিথাকে লম্বল করেনি, তুমি আর হুজিও বাড়ী থেকে চলে
বাগনি। আমবা ঠিক সেই আসের মতোই আছি। সেই যে
ছোটবেলায় পাড়হিলাম—‘হায়াধনের সাতটি ছেলে গিরেছিল বলে।’
তবে তারা ধনরত নিয়ে বাড়ী কিরেছিলো, আর আমবা কিরেছি
জজাল কুড়িরে, এই বা তফাৎ।

জজালটাকে শুধু আমিই বাড় থেকে নামাতে পেতেরি অনিল
বাবু। সে ঠিক থেকে তারলে আমাকে লাকি বলতে হবে। হা-হা
শাখে উচকণ্ঠে হেসে উঠলো অনিলক। বরভক্ত সকলে বোপ দিলো
ওর হাসিতে।

হঠাৎ বড়ির মিকে চেয়ে হাসি থামলো সুমিতা। বিষমকণ্ঠে
বললো, ন'টা বেজে গেছে—এবারে যেতে হবে মাসীদা।

তাড়া কিসের, বাজুক না ন'টা। আমি থেকে সঙ্গে নিয়ে
বাবো, বললো অনিল।

সেই ভালো। হাসিমুখে বললে সুমিতা। তানো ছোট
হালী, কত ভালো বাবা শিখেছি কাকীমার কাছে? চল, বাবারল্লভী,
মলো, হানাব কালিয়া সব আছে। একটু গরম করে নিয়ে আসি,
খেরে বলো কেমন হয়েছে। আপনাকও খেতে হবে দিদিমা।

খাবো বৈ কি দিদি! তোমার হাতের মিষ্টি খাবার অবতাই
খাবো। একমুখ হেসে বললেন দিদিমা।

হাজি সাড়ে দশটা। সুমিতা আর অনিলকে লালকুটির গেটের
সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো অনিলক, দিদিমাকে পৌছে
দেবার জন্ত।

অজিত সন্ধ্যাবে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো সুমিতা।
সামনেই অসীম। চুপচাপ পেতেই হুজিবদ্ধ করে শিল্পাবদ্ধ সিঁহের
মত ভারি ধমধমে হুখ দিয়ে শিশপে পাচচারী করছে বাবাঁকার।

বারমকলের প্রেকাণ্ড ত্রুটি-হুজা এখন অসীমের শোবার ঘর
হয়েছে। রাতে সাধারণতঃ সে সেখানেই থাকে,—ভেতরে আসার
প্রয়োজন মনে করে না। পাশের ঘন্টি তার ত্রুটি-কম—তার
তার পাশে ওর খাবার ঘর। বাড়ার ভেতর মরলেক বীজিকের
বরভক্তো ব্যবহার করে সুমিতা। বাকি বরভক্তা চাষি সেওটা থাকে।
নিচের প্রেকাণ্ড হলবটী আগের মতোই মূলজিত আছে।
ডানদিকের নিচের তিনখানি ঘরে অনিল আর ভক্তভার্য থাকে।

অনিল ডাড়া দিহত চেয়েছিলো; কিন্তু অসীম নেহনি। উদ্বেত,
তার দিদিমাকে আর কবরীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে ভক্তভার্যকে
কাছে রাখা। ভক্তভার্য ওর হাতের মুঠো থেকে বেচিরে থাকে,
এ হুটেই পারে না, অনিলের সাধ্য কি ঐ আঙনকে হজম করে?
সে শক্তি একমাত্র তারই আছে।

মায়ের মাকে সুমিতার ঘরে আসে অসীম। কথার জালে জড়িয়ে
ওকে, হাতছাড়া সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে।

কপট প্রেমের অভিনয়ও করতে হয় ওকে। বহি মিত্রী মূলি
দিয়ে ডেকানো বার, নিরীকো মেরেটার মনটিকে।

কিন্তু বুধা চৌ। কুদের বিব একবার পাম করেছে সুমিতা
অনিরীকো হাফুসী তার ডিলে ডিলে হুমে ককহে ডাকে। আর



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটি কত সুখী, কত সুস্থ! কারণ ওর মেরুময়ী মা ওকে নিয়মিত অষ্টারমিক খাওয়ান। অষ্টারমিক বিত্তক দুধজাত খাদ্য। এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিক তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিক পুঁজিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সবরকম তথ্যসম্বলিত। ডাক খরচের লগ্ন ৫০ ন্যা পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই টিকানায়—“অষ্টারমিক”, P. O. Box No. 2257, কোলকাতা-১।

...মায়ের দুধেরই যতন

ক্যারের শিশুরের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। হৃদয় দেহপর্চনের লগ্ন চার পাঁচ মাস ধরুন থেকেই দুধের সঙ্গে ক্যারের খাওয়ানও প্রয়োজন। ক্যারের পুষ্টিকর শব্দজাত খাদ্য-রাস্য করতে হলে—ওধু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশির, শিশুকে চানচে করে খাওয়ান।



কুল করবে সে কোন গ্রামে? তাই বখন মিটি মিটি কথা শোনার ওকে অসীম, তখন জামি ভর করে ওর। ওর হিঙ্গ্র কুটিল, নিষ্ঠুর রূপটি তার পরিচিত। কিন্তু বখন সে শান্ত স্বয়ংবান প্রেমিকের হৃদয়ে বারন করে আসে ওর কাছে তখনই মনে হয় ওর, বাঁধ এসেছে হরিণের চামড়ার আড়ম্বরণ করে। তখন ওর মনটাও অজানি ভাবে নজর হয়ে ওঠে। বৃকতে ওর দেহী হয় না যে কোনো গুপ্ত অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে লোকটা।

কোনো দিন ওকে একটু আদর করে বলে অসীম—আমার কথাগুলো ভালো করে চিন্তা করে দেখো মিঠা! অতগুলো টাকা, আর বাড়ী তোমার বাবা অনারাসে বিলিয়ে দিলেন তোমাকে বঞ্চিত করে? ছুটি একবার বলে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমার, আটনের ভোরে ও-সব আদর হয় কি না। আইনই বলবে এসবের একমাত্র মালিক তুমি।

খোলা জানলার দিকে মুখ তুলে, ধূ ধূ করা আকাশের পানে চোখ মুটি বেলে কি ভাবে হুমিতা! হানে অসীম। সিগারেট ধরিয়ে আদর করে টান দেয়। ওকে ভাবতে সময় দেয়।

কিন্তু বেশীকণ বৈধ্য থাকে না ওর। একটু বাঁধের সঙ্গে আবার বলে, কি হাজি তো?

—হ্যাঁ। চোখ কোয়ার হুমিতা। শান্ত বহু কণে বলে, অনেক আছে তো আমায়। এর বেশী সম্পত্তির আর প্রয়োজন কি?

বাঁতে বাঁত হবে ওর দিকে রক্ত দৃষ্টিপাত করে অসীম। দগ দগ করে আসে ওঠে মাথার ভেতরের নিবিধে বাঁধা বাঁধগুলো।

পলার হয়ে বিব ঢেলে বলে—তোমার সরকার নেই, আমার আছে। তোমাকে বিয়ে করেছিলাম কিসের ভুলে? কি আছে তোমার মধ্যে? তোমার চেয়ে ঢের বেশী লোভনীর ছিলো আমার কাছে শুকতার। সেন। এটা মনে রেখো, আমারও বৈধের একটা সীমা আছে। তোমার এই আত্মমুক্তি আর বেশ কিছু করে খোঁচাতে হয়, দেখিয়ে দেবে অসীম হালকার। হুদ, হুদ করে পা কেলে মেসিনী কাণিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দায় অসীম। এর পর দিন পনেরো কুড়ি আর ভেতরে আসে না। আবার হয়তো কোনো দিন আসে,—সেকলে এত বড় বাড়ীটা রেখে কি হবে? অত সোনা-রূপোর বাড়ি লঠন, আসাসোটা, বাতিঘান আড়ম্বরণ, আর কোন প্রয়োজন লাগবে? সব বেচে দিয়ে ভাল-ক্যাসাদের ছোট একখানি বাড়ী করলে, গুণের দু জনের অনারাসে চলে বাবে। আর প্রচুর টাকাও হাতে থাকবে। বীরে হুদে কথাগুলো বলে অসীম—হুমিতাকে।

কিন্তু একটি জবাবই যায় বার সে শোরেছে হুমিতার কাছ থেকে—বাঁধা বতলিন আছেন, ততদিন এসব থাক। তাঁর অবর্তমানে যা ইচ্ছে হয় করো, বাঁধা দেব না।

ক্রেডি কেটে বসেছে অসীম—তিনি আবার কোনদিন সরকার না কি? অদর হয়ে কুড়ি পোটার জন্তই নাগাবাবাদের শেহু দিয়েছেন।

এখন এখন এ বজরর পালাপালি ওনলে কেঁদে ভাসিয়ে দিতো হুমিতা। কিন্তু এখন আর কীদে না। সরে গেছে সব। যাকে মাঝে একটা ভর হুটকট করে বাণ-বৈধ পাবীর হতো। কত দিন? আর কত দিন বইতে হবে এ হুর্দে জীবনের বোঝাটাকে?

মিষ্ট লেখনে সোমনাথ দায়ে দায়ে, ওকে আর হুলাহুতে।

“কমলা সেবাসনের” উষাধনের সম্বন্ধ আসবেন, জানিয়েছেন। সেই আশায় দিন গুচ্ছে হুমিতা। এবারে বাঁধা এসে, তাঁর হুটি পা জড়িয়ে ধরে বলবে সে—আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি আজও হয়নি বাঁধা? এবারে আমাকেও আপনায় সঙ্গে নিয়ে চলুন। আপনায় মত কর্তার সাহায্য আমিও করবো। তাহলে সর্বপাপমুক্ত হয়ে আমিও আপনায় মতো শুদ্ধশাশি লাভ করতে পারবো। আমার সারা মন প্রাণ, যে বলে পুড়ে থাকি হয়ে বাঁধে বাঁধা। আমাকে এ হলুদ নরক থেকে মুক্তি দিন।

আজ অসীমকে এমন সময়ে ভেতরে দেখে মনে মনে বখেই ভীতা হলো হুমিতা।

ওর পাশ কাটিয়ে বয়ের দিকে করেত পা বেতেই, ওনতে পেলো অসীমের হৃদয়,—বাঁ-ডা-ও।

কিরে পাঁড়ালো হুমিতা। ওর সামনে এগিয়ে এসে পাঁড়ালো অসীম। হুতোখে হলুদে ওর বিষেববহি।

রাত প্রভাত না হতেই দেখছি অভিসারে বাঁধা হুদ হয়েছ? পূর্ব-পরিবর্তিত ভুলতে পারোনি আজও? উত্তপ্ত লাভা হয়ে পড়ছে যেম অসীমের কণ থেকে।

হুদ তুলে স্থির হয়ে পাঁড়ালো হুমিতা। হঠাৎ একটা হুসাহস সাপের মতো কণা তুলেছে ওর অন্তরে। চিরকালের শান্ত নীরব চিত্ত আজ চম্বন করে উঠলো উজ্জিত মত একটা কিছু জবাব দেবার জন্তে।

—কি, হুদে কথা জোপাচ্ছে না বুঝি? চাপা গর্জনের সঙ্গে বললো অসীম—গিয়েছিলে তো, সেই কাউন্সেল হুলাটটার কাছে? বুধা আর লুকাচুরি কেন?

হ্যাঁ তাই। গুপ্ত কণে জবাব দিলো হুমিতা, লুকাচুরি করবো কেন? পূর্ব-পরিবর্তিত হুমিই কি ভুলতে পেরেছে? বাড়ীর ভেতরে বসে অবাধে চালিয়ে বাছো সব কিছু। সেকথা অজানি আর কার আছে?

জড়িত হয়ে পেলো অসীম ওর হুদে স্পষ্ট জবাব শুনে। এ কি অসম্ভব ব্যাপার। হাজার কুৎসিত পালাপালি যে ভীক মেয়েটা নিঃশব্দে হজম করে গেছে, আজ ওর হুদে ওপর জবাব দেবার মত এমন হুসাহস পেলো কোথা থেকে?

চিন্তার করে করেত পা এগিয়ে এসে অসীম—ওরাওঁরকুল। হুদাদের মস্তুর দেবার শক্তিকে তারিক না করে উপায় নেই। শরতানটা একদিনই তোমাকে শরতানী বানিয়েছে। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। বিকট হাসির বড় বইরে দিলে বললো অসীম—কিন্তু সে জানে না যে, শরতানের ওপরও বাঁধা শরতান আছে।

শুকতারকে তুলবো? কোন হুদে? পেভার তোমার বাবার সম্পত্তিটা সব—সব তুলতে পারতাম। কিন্তু তা তো হোল না। সন্ন্যাসিটা যে আমার বাড়ীভাতে ছাই নিলে। তোমার মতো একটা জোলে মেয়েতে কি মন ভেঙ্গে অসীম হালকার। তার চাই তাই তাপের এই শুকতারকে। তবে এ-ও সাবধান করে দিচ্ছি তোমার, আমার বাড়ীতে মনে—আমার বকে ছুটি চাপানো তোমার লগবে না মিঠা।

তুমি আর তোমার বাপ বেদন আমার বুকের প্রান্তে কেড়ে নিয়েছো, তেমনি তিরটাকান তোমার বুকের পথে আমি কীটা হয়ে ক্রোশে থাকবো। কিন্তু যে আমার চলার পথে বাধা দেবে, তাকে এমনি করে পায়ের তলার পিবে মারবো। সে হিংস্র একমাত্র আছে এই অসীম হালদারের।

হুহাতে বুক বাজিরে বীরর প্রকাশ করলো অসীম হালদার।

আলকোহলের উগ্রগন্ধে জারি হয়ে উঠলো সেখানকার বাতাস।

বীর, বন্ধু বীরে। চমকে উঠলো অসীম। একটু দূরে দেয়ালে হেলান দিয়ে পাঁজিরে আছে অনিল।

দুই তুচ্ছ কুঁচকে মহা বিস্কিত্তরে বললো সে—আমাদের পানেশীল ব্যাপারে আর কাকর মাথা গুনানো পছন্দ করি না অনিল। তুমি যেতে পারো।

করেক পা এগিয়ে এসে ওর হুখোমুখি হয়ে পীড়ালো অনিল। জগদ্ব দৃষ্ট মেনে চেয়ে রইলো করেক সেকণ্ড। তারপর স্থপাত্তা কণ্ঠে বললো—তোমার বাড়ী যলে শাসাচ্ছিলে কাকে বেরাকুব? বার বাড়ী তাকেই? আর কোন মেয়ের সঙ্গে বেন তার তুলনা দিচ্ছিলে আর কাকে বেন শরতান বোলে, পায়ে পিবে হারবার জন্তে আকালিন করছিলে? দূষিত পত্ন। আর বুঝলাম, আমি বত বড় পাশীই হই না কেন, তোমার তুলনার আমি দেবতা।

পীতে পীত ঘরে হু' হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো অনিল—তোমাকেও আমি সাবধান করে দিচ্ছি অসীম হালদার, গুলী-বাওয়া বাধ হর বেদন ভয়তর, তার মরণ কামড়ও তেমনি অবার্ষ। এইটুকু মনে রেখো স্মৃতিতা, আর থেকে নিঃসঙ্গ্য নয়। তার মধ্যদারকার জন্ত, তার হতভাগা মামার এই লোহার সাঁড়াশির মত হাত হুটো সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে।

চকুর অসীম হালদার, কাঠহাসি হেসে মোলারেম স্বরে জবাব দিলো—আচ্ছা, আচ্ছা মানছি তোমার সব কথা। কিন্তু কি আরন্ত করেছো বল দেখি? এটা একটা অভিজাতপত্নী—ভ্রম সংসার, সব যে বাপের মাথায় বিষময় হয়েছো দেখছি? নিজের জীব সঙ্গে

একটু হাস-অভিমান করারও কি অধিকার নেই আমার, বলতে চাও?

জী? কে তোমার জী? স্মৃতিতা? কখনই নয়। জীব কোন অধিকার, কোন মধ্যাঙ্গ তুমি নিয়েছো তাকে? তাকে কাঁধ পেতে ধরে এনেছো তুমি, আর তোমার সেই জ্বর কাল সাহায্য করেছে তার এই হতভাগা মামা। ভ্রম সংসার? কে বললে এটা ভ্রম সংসার? যে সংসারে বাস করে একজন কুলাঙ্গার অভিনেতা, একটা কুলাটা ব্যক্তিত্ববিধা অভিনেত্রী, একজন প্রত্যাক নীচ শরতান, সেটা কি একটা ভ্রমসংসার? হো-হো করে হেসে উঠে বললো অনিল একখানা হাত নেড়ে—আমি চ্যালেঞ্জ করছি অসীম, যদি সংসার থাকে তো আমার কথা প্রত্যাহার করে।

—স্মৃতিতা এগিয়ে এসে আনলের হাত হুটো জড়িয়ে ধরে কঁপে বললো—তোমার পায়ে পড়ি ছোট-মামা। আর কথা বোলো না, বজ্র উত্তেজিত হয়েছো তুমি, বাও ঘরে গিয়ে একটু শান্ত হবার চেষ্টা করো। হু'চোখের জলের ধারা ওর, বর বর করে বজ্রতে লাগলো অনিলের হাতের গুণথ।

অভিনেতা মামার তায়ীও চমৎকার অভিনয় জানেন দেখছি। প্রয়োজিত করলো অসীম। ট্রেজে খুব ভালো মানার ওগুলো, অনেক হাততালি মেলে।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন অনিল, কিরে পীড়ালো ওর কথাগুলো তনতে পেয়ে—জলো দিশমাল, বিলাত ত্রাপ্পেন হবার চেষ্টা করছে বুকেছো? মানে তার দিকেই তোমার লোভটা বেশী কি না। তবে ভুলেও তোমার আর শানাবে না অসীম হালদার, এবারে তোমার দরকার দৌঁকো বিব। উত্তকণ্ঠে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে অরতায়রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো অনিল।

স্মৃতিতা চট করে ঘরে ঢুকে দড়ায় করে খিল লাগিয়ে দিলো বন্ধ দরজার। অপরাধের জাগার জ্বলতে জ্বলতে ছিলে ব্যাপসের মত বিশেষ পরদাকারে প্রস্তুত বাহাদুর ঘুর বেড়াতে লাগলো অসীম হালদার। মনের পর্দায় অঙ্কিত হতে লাগলো তার রকমারী ধরনের প্রতিশোধ গ্রান। [কবিতা]

লিপিক।

জগন্নাথ ঘোষ

আঁড়ালে দুকালে হুখ। জগন্নের বস্তা স্বপ্নসার
হু' হাতে জড়িয়ে দিলে। প্রতীকার প্রান্তে এসে
হুহুস্তের তীজতার কেটে দিলে বস্তার বাঁধ।
অন্তস্ত বৌবন ভাবে, একদিন কলকণ্ঠে হেসে
আমাকে জামিয়েছিল জগন্নের বাগত সজ্জার।
দেঁ হলি বস্তের দেশে অধঃস্থ কীপিরে যেমিনী
দেঁ এস অতর্কিতে, বুকে দিয়ে সহুয় উদ্ভাস।
দীর্ঘায়ত্রে কেনে ওঠে কবেরকার কুদারী বন্ধনী
একধা পরবকশে। যে দারী, তোমাকে বার বার
চাইনি নারিকাকপে। তুমি হও কল্যাণী প্রেমদী।
কলক জামিনি আমি। বর্ষা এসেছি উপহার।
হু হাতে দিলে না তুলে। আকস্মিক হলে না প্রেমদী।

আমার চাতক-চোখ

সমরাদিত্য ঘোষ

চাতক আকাশে চার মেঘবৃত্ত জলের সজ্জানে
আমার চাতক-চোখ চেয়ে থাকে দূর পথ পায়ে।
সবুজ ঘাসের বুকে এক ফালি পায়েরলা পথ
বেখানে দিশন্ত শেষে ভিড় করে শিরির-অশ্বথ।
একটা দীর্ঘির পাড়, ঝাউ গাছ দেয় হাতছানি
গুণানে গুণটির কেতে বেগুনী ফুলের আশানি।
এখানে কাকের তাজা গুথানে বিরাট অবসর
মধ্যাহ্নে নিমের ছায়া, বাতে সেখা জ্যোৎস্না-আসর।
এখানে অস্তার শুণু তমি রাশি রাশি অভিব্যোম
ওখানে উষণ-হীন মশমরী প্রকৃতি সন্তোম।
আমার চাতক-চোখ কাঁচবার সবুজ কুবার
এখানে কাকের চাপে নকশা ভানি বাপটায়।

কবি কণপূর-বিরচিত আনন্দ-বন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—ঐ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

১১। কিরিরে নিরে যেতে আভীরেরা দল বেঁধে এসেন। ঢেঁটা পরিষ্কারে কিছুই বাঁক রাখেন না। বখন পারলেন না তখন চারদিকে তাঁরা চাইলেন। ঐ তো, ওখানে তাঁদেরি দুঃখহারী পুত্রেরা গলায় হার নাচিয়ে খেলে বেড়াচ্ছেন। দেখাও যেই, অমনি তাঁদের মধ্য দিয়ে বেহুদের বাৎসল্যের চেয়েও সমধিক প্রবাহিত হয়ে গেল বাৎসল্যরস। তাঁরা বেন পান করতে লাগলেন সৌন্দর্য। দৌড়ে ফেলেন সেখানে। হুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে পুত্রদের তুলে নিলেন মুক্ত। বাধায় ঠেকল-না, মুখ মুখে, চোখের জলে ধুয়ে যেতে লাগল মুক্ত। বেন একখানি পটে-জাঁকা ছবি।

ব্যাপার দেখে কেমন একটু বেন ভ্রম সন্দেহের আবির্ভাব হল—বলজব্রের নিজের দেহেও তিনি অহুভব করলেন হৃৎ ও বিময়ের সন্ধার। খেয়, রাখাল ও রাখালবালকদের সকলের দিকেই আর একবার চেয়ে দেখলেন। অপরূপ আলোচনা চালল তাঁর মানসিক লক্ষ্য।

এ কি ব্যাপার। আগে তো এমনটি কখনও দেখিনি। হুৎ ফেলেছে যে বাছুর তার উপর এখন যে বাৎসল্যের বজ্রাটা দেখছি,—হুৎ টানছে যে বাছুর তার উপরে তো এতটা—আগে দেখিনি একদেহের। আভীরদের মধ্যেও তো এত শিতব্রহ্ম আগে দেখিনি। আয়ার নিজের মধ্যেও তো এত রেহ অহুভব করিনি। এ নিচর আয়ার প্রকৃষ্টিই কোনো মায়ার খেলা। মায়াই খটাচ্ছে। তা না হলে, চক্রপাশ্রিতঃ ঐক্যের আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমার সামনে সাহস দেখাতে আসে কিনা দৈবী বা আত্মরী একটা ময়া? যোর মায়াবি-চক্রের যিনি কৃত্যমণি তাঁর কাছেই বাই, তাঁকে প্রশ্ন করাই মঙ্গল।

১০। তাবতে তাঁকে ঐক্যের কাছে উপস্থিত হয়ে গেলেন ঐক্যরায়। বললেন—

বলি, ও মহোত্তরবুদ্ধি, এ সব কী কাণ্ড দেখছি, এ সব যে আমারও মুক্তির অঙ্গোচর হয়ে দাঁড়াল। সম্প্রতি আমার বুদ্ধি বলছে, এই সহচরগুলি হচ্ছেন পাগললী অমরপ্রেরিত দল, আর এই বাছুরগুলি নীতিপান্ডিত্য বুনিসল। অতএব হে লক্ষীকান্ত, দিগ্বি দিয়ে বলতে পারি—এ কেন্দ্রে ঐমানই এইসব। তত্ত্বটি আমাকে এখন বলুন।

ঐক্যরায়ের প্রশ্ন শুনে ঐক্যবাদাক্রমার তখন ইতিহাসের মত করে আত্মপূর্ণিক বলে চললেন সমস্ত ঘটনা। বলতে বলতে চলতে হইল খেলা। অনন্ত খেলা।

১১। পূর্ব একটি বৎসর চলল এই বৎসর-সকলের উৎসব-কৌতুক।

কমলাসনে সমাধীন হয়ে এতকাল প্রজাই প্রবৃত্ত ছিলেন ভগবানের হৃদয়-হিস্তারের পনমার। সহসা তাঁর মনে পড়ল—তিনি মিকে একদিন বাছুর ও রাখালদের চুরি করেছিলেন। সত্যিই তো, কি হোলো তাবদ্য? আর কিই বা হল তাঁর, বীর মুদকিন্দার সেই দীলার?

নিভীক একটি সাধুগাধু ভাব অবলম্বন করে সুধিবীরে নেমেছিলেন ব্রহ্মা। এসেই হুৎ থেকেই দেখতে গেলেন,—বেদনকার সব তেমনই রয়েছে, সেই বাছুর খেলছে, সেই রাখাল ছুটছে। বিষয়ে ব্রহ্মার হারিয়ে গেল হাসি, বিমনা হয়ে পড়লেন, ভাবলেন—

সেখান থেকে এরা এখানে এল কেমন করে? এরা কি তাহলে জিন্ন? বাদের চুরি করেছিলার সত্যিই কি এরা ভায়া? বাস্তবিক এরা কি তবে অবাস্তব? সমস্তই অলীক? হার যে, পদ্মাসনের আজ গলে গেল সব সর্ব?

নিজেকে গল্পনা দিতে দিতে তিনি তখন পরমমারাবী ঐক্যরায়ের নিবেদন করে দিলেন নিজের মায়। শান্ত হল আহতের। কিন্তু তত করেও আত্মপ্রীতি লাভ করতে পারলেন না তিনি।

১২। অনাভক্ত যেমন নিজের দোষে ব্যর্থ হয়ে নিজের মায়ার কাঁধে নিজের আঁচকা পড়ে বার, তেমনই হল ব্রহ্মার এই কীর্তিচিহ্নও হুৎনা। বৈকল্যের দ্বারে মিথ্যা হয়ে পড়ল।

১৩। এবার ব্রহ্মা বৎসক পুনবার তাদের দিকে ভালো করে চাইলেন তখন, দেখলেন—

সকলেই শব্দ-চক্র-সমাপনকারী,

সকলেই ঐক্য চতুর্বাছ,

সকলেই অনন্ত আনন্দধন চৈতন্যময়; সকলেই ঝলমল করছেন।

কোটি পূর্ব কোটি ইন্দু পরবাক্য। আর তাঁদের দীপ্যোন্নতি লোমকূপের কুহরে, ডুবছে-ভাসছে ভাসছে-ডুবছে, বর্ষজলের অম্লত্ব কণিকার মত অস্বাদ্যভাণ্ডের সব অস্বাদ্যতা। এমনকি—তাঁরা—

সকলেই ভ্রাম, সকলেই হুৎল মণিহুৎলকারী। সকলেই হাতে কেঁদুয় সকলেরই গলায় নিকহার; কখন বাজছে হুৎনহুৎন, যেখলা বাজছে কনুখ, নুপুয় বাজছে হুৎনহুৎন।

আর সকলেরই কণ্ঠে, আভ্যন্তরীণত জমরবজ্রত তুলসীর হাস্য, সকলেরই চোখে, বিদ্যুৎ-পর্বজার্যনী ঐ।

১৪। আর দেখলেন—তাঁদের প্রত্যেককেই মৃতিগ্রহণ করে উপাসনা করছেন এক পরমেশ্বরি, হুই আশ্বিনীকুমার, তিনগুণ, চতুর্বেদ, পঞ্চ তদ্যাত্র, ষড় ষড়, সপ্ত ষড়, অষ্টাশ্বত, ও বজ্র, নব নিধি ও এই, দশ বিশ্বদেব, একাদশ রক্ত, দ্বাদশ আদিত্য, বাহরত্বর ইঞ্জিরের জ্যোতিষ আঘিষ্ঠাভূদেব, চতুর্দশ ময়ূ, পঞ্চদশ তিথি, এবং ষোড়শ বিকার। অপারিমেয় সকলেই। এবং দেখলেন,—তাঁদের প্রত্যেকেরি নয়নকোণে টেটে তুলেছে কুপা, আসন পেতেছে সৌন্দর্যের সমস্ত সম্পদ।

১৫। দেখতে দেখতে ব্রহ্মার জ্ঞান হল—তাহলে ত সমস্তই বাস্তবসময়। এবং তখন তিনি তাঁদের মধ্যে দেখতে গেলেন তাঁকে, বীর হাতে ছিল দণ্ড-অস্ত্রের গ্রাস, বলকারক রসায়নের মত যিনি হৃদয়রক্তন করছিলেন সখ্যাবের, মনে বীর সম্ভোদ ছিল না, আগের মতই যিনি নিজের ঐক্যপ্রীতিক রিষ্ট করছিলেন বাহল্যে, সত্যি কিরছিলেন বাছুরদের, রাখালদের, ককে বার বেত বিবাপ, জয়পটে হুৎলী, অলীক সন্মোবেদনার যিনি বিমনা বিশ্বাস হয়ে এদিকে ওদিকে চাইছিলেন, বিচরণ করছিলেন একাকী। তাঁকে দেখেই ব্রহ্মার মনে হল, তিনি মৃতিমত্ত বিকসিত, দেখতে গেলেন একমেবাবিশীর্ষ ব্রহ্ম এই মন্ত্রাধিক। এগটি অপরাধে অপরাধীর মত, পরাকৃত হয়ে পড়লেন চতুর্দ্ব। এক হুৎতও কিলে না করে দত্তব্য হয়ে তিনি মৃতিরে পড়লেন হুৎতলে। চতুর্দ্বাছ বর্ষ-পর্বতের মত পড়ল হল।

দিনে দিনে

দিনে দিনে দি



রেক্সোনা সাবান

আপনার স্বকের স্নায়ু বাড়িয়ে দেবে

রেক্সোনা সাবানে
'ক্যাডল' বলে একটি বিশেষ
ধরনের স্বকের জীবাণুনাশক
তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে যার
ফলে আপনার স্বক আরও
কোমল, আগুও সহনশীল...
লাবণ্য এনে ধরে।

সৌন্দর্য্য সাধনায়
রেক্সোনা ব্যবহার
করুন !



১০। অতঃপর তিনি দেখিলেন,—বিনি সকল ভাষায় তিনি
বসিত করেছেন নিজের সকার, এবং তাক ঘিরে কেলেছে অদ্ভুতপূর্ণ
এক পাখীরা। বিবিধ শক্তি যে নাটো নটকীয় হস্ত নাচন সে
নাট্যের তিনিই যেন পুত্রধার। তমালতরুর অঙ্কুরের মত তিনি
পাঁড়িয়ে রয়েছেন নিশ্চল।

১১। চতুর্ভুজের চতুর্ভুজটের মচামণীকে থেকে ভেসে এল,
জ্যোতির্ময়ের মল। ভগবানের চরণকমলের স্পর্শকামনার তারা
কেসে গেল, কিন্তু অন্তরিকারী বলে বাধা গেল ভগবানের চরণনখর,
মণিরঞ্জরীর নিকটে। নিবারণিত হয়ে বধন তারা কুণ্ঠিত হল,
অখন ব্রহ্ম প্রকাশ করলেন নিজের সত্যবীণ্ডি, এক বায়বায়
উঠে উঠে মত হয়ে হয়ে অপরাধ বীকার করে স্তব কবে উঠলেন
সমুদ্রালয়ের—

হে ব্রহ্মপুন্দর-নন্দন, জর হোক, তোমার জর হোক। তোমার
হাতে রয়েছে ঘনি-অয়ের গ্রাস; বেণুবিধাণ; তোমার মাথায়
রয়েছে অলকাভি চন্দ্রকের নীলম্বরক, গুজার হার; তোমার গলায়
রয়েছে চকল বনমালা। কী অদ্ভুত রসৈকমর তোমার জীবন।
ঐ হলেই অববোধন হয় জানের। জর হোক তোমার জর হোক।

নাশাপ্রকারে আমাকে অমুগুণীত করবার উদ্দেশ্যে হে প্রভু,
তুমি প্রকট করছ তোমার এই অদ্ভুত বাহুর বাধালম্বর তত্ত্ব। সে
মহিমার কণামাত্রও গ্রহণ করতে পারেনি আমার বুদ্ধি। সে কেমন
করে প্রাধিকান করবে তোমার এই হেন লক লক বিকাশের ও বিকাশের
কক্ষায়া?

ঐ বাহুর ঐ বাধালের মল—এর। সকলেই লখচরুগাপাতধারী,
সকলেই চতুর্ভুজ, ঘনরস চিহ্নর, সকলেই মিথিল ঐক্যধার আধার।
কিন্তু যে অজিত, তুমিই কেবল বিকৃত, ধারণ করে রয়েছ ললিত
লোপের তত্ত্ব। হে বিশ্বকাণ, তোমার প্রকৃতির বিকৃতি নেই।

অভিসববধি তোমার ঐ পলাতকভাবের প্রাণালীটিকে পরিভ্রাণ
করে বিনি প্রহরী হন জানের, পরিভ্রাণ ব্যতীত তিনি অসুখাতও
লাভ করতে পারেন না অভঙ্গল। কুহ বা দুব বেড়ে কলর আশা
করা কি দুঃখা নয়?

যে সব সুবিবৃণ বিশেষ জ্ঞানের বিধান নিয়ে সাধনপথে
অগ্রসর হন তাঁদের একদিন বিশেষরূপে গিতে হয় সাধনা। তাঁরা
সকলেই চান তোমার ঐ জীৱনধের কমল হতে। স্বাধীন ও
অভিকৌতুকী হওয়া সবেও তখন কিন্তু চকল হয়ে উঠে তোমার
কুণাসমুদ্রের তত্ত্ব। হে অপরাধিত প্রভু, তখনই তুমি বস্ততা
বীকার কর, তাঁদের কাছে তুমি তার মানে।

পূরাকালে রাজ্য করেকটি পরমহংসাবস্তাসংগত হয়েছিলেন। বীরা
তাঁদের সমুদ্রবাণের সমস্ত বিলাস তোমার জীৱনপথে সিলে দিয়ে
কেল চরিতাকৃতির প্রবণ কীর্তন ও চিন্তনমূলেই, সুখপ্রদায়
করেছিলেন তোমার সনাতন পথে।

ভাঙ্গলেও তে পূর্ণাঙ্গবর্ষ দি, নির্ভণ তোমার মহিমা বোঝা
জ্বর। বাঁদের আভা স্তবক কীরের পক্ষেও তা সত্য নয়। তোমার
প্রকৃতির বিকৃতি নেই, অস্তের বিবোধও তুমি নও; তাই কেবল
অজ্ঞবোধ মধ্য দিয়েই জানে হয় তোমার মহিমার স্বরূপ। যদি
হয়, তবেই হয়, নতুন নয়। অত উপায় নেই।

হে ইন্দ্র, হিতকর তুমি অবতীর্ণ হয়েছ। কালবলে সত্ত্ব

হতেও পারে ধরীর মুসিকার, আকাশের মন্দ্রপুঞ্জের দুর্ভা
কবিকারাবির গণনা, কিন্তু যে গুণাগণ, কার সাধ্য আছে তোমা
একটিমাত্র গুণেরও আনন্দত্যাগ গণনা করে শেষ করে?

যে পথ দিয়ে তোমার অমুগ্ধ আসে সেই পথের পানে চো
রেখে নিজের নিজের নিয়তিক্রমে বীরা উপভোগ করেন দুঃখ-সুখ
এক কার্যমনোবাক্যে অমুসন্ধান করেন তোমার জীৱনপন্থা, তাঁরা
কৃতার্থ হন। তোমার সনাতন ধামে তাঁরাই বহে নিয়ে যা
বৌতুক।

অতএব হে নাথ, ধ্বংস করুন আমার এই ভগবিরল অন্তর্যাতা
আপনি পরমেশ্বর, প্রক্ষিত মারাবিংগণের আপনি কীরীচমপি।
আপনি যে ক্ষেত্রে বিরাজমান সেখানে আমি এসেছিলাম, হার রে,
মারা রচনা করতে? শেষে নিজের মারাত্মেই বিমোহিত হয়ে গেল
নিজের বুদ্ধি। কোথায় স্মৃতি আর কোথায় মহাপ্রলয়ের আভন!

হে অসীম কুণাময়, আমার অপরাধ মহান হলেও কমাযোগ্য
আপনার। আমার মধ্যে রয়েছে সহজাত রাজসিকতা, আমার মধ্যে
বিবৃত রয়েছে পৃথক ঈশ্বরভাব, আমি 'অজ্ঞ'—এই অজ্ঞতাই আমার
মধ্যে নিয়ে এসেছিল মহতী ছবুদ্বি। 'এ আমার কাঙাল'—এখন
এই ভেবে হে প্রভু বর্ণন করুন আপনার কুণা।

কোথায় এই মন্ত এই অজ্ঞতার এই ক্রিয়াপ, তেজ মন্ত বোম
দিয়ে বেগ জগৎগুণ্ডানের অন্তর্গত সমুচিত্তিত তবু আমি, আর
কোথায় আপনার ঐ ঈশ্বরতা হার রোমনুপের পথ দিয়ে পরমাপু-
কৃত্য অমন কত হার কত আসে পরাধি সন্ধ্যা কল্লী।

মায়ের পেটের মধ্যে শিত যদি পা হেঁটে তাতে জননীর
কাছে অপরাধী হয় না শিত। হে বিদু, আপনার উল্লেখ মন্তও
রয়েছে এই বিশ্বমিথিল জীৱ-মর্টা। অতএব আপনিই জগৎ-
প্রসবিতা। আজ আমার প্রত্যক রয়েছে এই অজ্ঞতব।

আপনার জলপারী ও ভাগবত তত্ত্ব থেকে বেহেতু আমি সত্তা
লাভ করেছি, সেইহেতু আমারও আপনি শিত। পুত্রেরা যদি
অলং হয়, অপরাধও যদি হবে তাঁদের কখনও পরিহার করেন না
শিত। স্বভাবতই বাৎসল্যকুল হন শিত।

মিথিল দেহধারীদের আপনি আত্মা, তাই মর-সমাজের আপনি
অরণ। ঐ লক্ষণটির বৈশিষ্ট্যই আপনি নারায়ণ। অতএব হে
অবীণ, আত্মক হলেও আমি আপনার আত্ম-তব। কল্পা করুন
হে প্রভু, করা করুন আমার অপরাধ। অজ্ঞ আপনায় কেঁট।

হে তগবন, জলধারী আপনার তত্ত্ব—এ কথা পদ্য সত্য।
কিন্তু সেই তত্ত্বই যে নিরত ললিত-পরিহরি হয়ে থাকবে এমন তো
না-ও হতে পারে। তারপর আমি তো আপনাকে একবারই
দেখেছিলাম, আরতো দেখা পাইনি। সেও আপনাদি কুণা
আপনাদি অকুণার মহিমার।

প্রায় উঠবে, তাহলে কেমন করে আপনার জননী আপনার
জন্মের অভ্যন্তরে থেকে দেখতে পেলেন এই বিশ্বজগৎ? উত্তরে
বলব,—হে অবীণ, এই বাটের জগৎ অলং বলেই প্রতিভাত হয়,
কিন্তু আত্মা, আপনার জটরগত জগতের অলং-প্রতীতি নেই।
কোথার বন-চেতন আর কোথার জড়-প্রলেশের মহাকাল।

আপনার জটবর্তী যে জগৎ স্ব-সংহিত এখানে আপনি
নিয়েছিলেন, সে জগৎ এই বহির্লগতের প্রতিবিম্ব হতে পারে না।

কি হয়, তাহলে এই ভগ্ন আপনার ভগ্ন-গত ভগ্নতের দিকে মুখ
কিরিয়ে থাকবে। বেন আর সে মায়িক নয়। নরপে কি নরপ
গোষা যায়? হে অসীম কুশাম্বর, অনিবার্য আপনার এই বিনোদন।

আপনি নিজে যেমন জানবসৈকমর বিকৃত গ্রহণ করে অবতীর্ণ
হয়েছেন, তেমনি ঐ বাচুর ও বাখালেরও কে বিকৃত জানবসৈকমর
বৃত্তি নিয়ে একে একে আবিকৃত হয়েছে। যদি তাদের জড়ের
প্রমিতি থাকে তাহলে ভায়াও মায়িক। তাদের জড়ের স্বীকার করা
জড়বসিদ্ধির বিকৃত।

অতএব, বর্তমান এই সব কিছুই আপনি কোনো সম্প্রদায়
(ইহুতী)। আপনার ঐ ত্রিকবন-মোহন ঐশ্বর্য তাই এত নিরুপম।
মানবতার বল মন, অমরসচিত্রর বলেই বহির্বিষ হন আপনি।
অন্ত যোগীদেব ও আপনার মধ্যে এইখানেই মহানুভব।

এবম আপনি এককরণেই সম্ভাবন হয়েছিলেন, তারপরে
আপনিই হলেন বহু, তারপরে আপনাই আবার হলেন এই সচর
এই বাচুর। আমি উৎপন্ন হয়েছিলাম চতুর্ভুজ বৃত্তিতে, এতে জীব
আমার স্ত্রীত পেয়েছে। কিন্তু আপনি সেই একই রয়ে গেছেন।
এও আপনার কোতুক, কুহক নয়।

আপনার এই পদবা ধারা অবগত নন, তাদের মনঃকুহরে আপনি
পৃথক পৃথক রূপেই প্রতিভাত হয়ে থাকেন। সৃষ্টি:স্থিতিলয়কারী
একক আপনিই একা বিষ্ণু মহেশ্বর। এইটিই হে স্বরূপ, আপনার
কুহক।

স্বর-মুনিমানবদের মধ্যে আপনীর বামনাকিরূপে আবির্তাবের
উৎকৃষ্টই হচ্ছে সাধুদের হিতসাধন এবং অসাধুদের আচিস্তান।

সেই সমস্ত অনন্ত: হস্তেও হে বিষ্ণু, কুহক নয়। অবদবীর
অবরবত্তন কি কখনও বিরূপ চর?

হে নাথ, তুমিই পরাংশব, তুমিই সত্যসত্যি-কথনবর।
পরমেশ্বরবাহিনী বলেই তুমি নিখিল ঈশ্বরদের নিবোধনি। হুটি
তুমি ঘটাও, স্তবঘটও তুমি ঘটাও। আমার মত অবদবীর
বিষয় ভতে পারে না তোমার মহিমা।

হে ভগবন, বহুতমের মধ্যে তুমি উত্তম, পরমান্বিত্তি যোগীদেব
মধ্যে তুমি পরম। কে আছে এমন এত পৃথিবীতে যিনি তোমার
লীলা বৃত্তে পারেন? এক ভগাও কেউ পারেন না। কে জানে,
কোথায়, কবে, কেমন করে, কতরূপে তুমি জোর কর। তোমার ঐ
যোগ-কলার বিস্তার মূলে শিব-ব্রহ্মারও অসাধ্য লীলা একটু করতে
করতে বিচীর কর।

হে ঈশ্বর, নিখিল ভগ্ন বহিও মনব, বহুতর স্থাপন এক
পরিণাম-মিচল, তবুও তোমার ঐ রসবোধমিত্রা সেই একটু
হয়ে বিলাস করতে করতে অগ্নও পাশ্চাতিক হয়ে ওঠে—তোমার
মিত্রাধামের মতই।

তুমি অনন্ত পুরাণ-পুত্র। নিজেই আখ্যাতোজোবাসির প্রসারণ,
মূলে সিগুত তাবে অধিবোধন করে রয়েছ সমগ্র ঈশ্বর-ঘন। তুমিই
যমস্বয়, তুমিই চৈতন্য-রস, রসের বিলাসে তুমি বৈশিষ্ট্যময়।
অসীম তোমার করুণা। তুমি কি কাউকে কটাক্ষ করতে
পারো?

মিরুপাধি চিত্রবসের আবেশে সৌন্দর্য নাটক তোমার মেহে।
বিশ্বের তুমি উপাত্ত। তাই তোমার মত গুণবিশিষ্ট চরকমলে



আনন্দ ঈশ্বরে
ক.হোডের

প্রসাধন সামগ্রী



ক.হোড ১৩ কোং * কলিকাতা

ভাল করে নেবে সুখীকর্ষের দণ্ড ধর্মস্বয়ং। সন্তুষ্কর করণার
ভোমার ভাষা করেন তাঁরা।

ভোমার চরণকমলের অঙ্গুগ্রহ লাভ করে ধীর নিরল হয়েছ
কোন্না, যে প্রভু, সেই পদম স্তম্ভভিমান পূর্ববই বিলিত হন ভোমার
নিকটস্থ। কিন্তু যিনি নিগম-আগমাদি অখিল শাস্ত্র-বিচারণের
মাধ্যমে ভোমাকে জানতে চান, তিনি প্রজ্ঞাবান হলেও, সুনিপুণ
হলেও মহান হলেও,—বার্ষ হন।

অনেক ভাগ্যের কলসে এই সমস্ত জন্মেছে এই বৃন্দাবনে।
যেখানে ভোমার আপন জনেরও পায়ের ধূলা পড়ে সে স্থানও
কৃত হয়। কারণ তুমিই যে ভোমাং আপনজনের জাতি মীল কুল-
হীন ধন সব। সমগ্র বেদ তখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে ভোমার চরণ-
ধূলি। সে অঙ্গুলিকানের অর্থ্য নেই।

যে প্রভু, আমারও বেন জন্ম হয় এই বৃন্দাবনে। এই মহুয়া-
মেলিতেই বেন জন্ম হয় আমার। যদি না হয়, তবে বেন এই
বৃন্দাবনের তরলতা পত্ত বা পানী হয়েও আমি জন্মাই। ভোমার
চরণকমলসেবীদের অঙ্গুসংগ করে তবেই তো আমি নিরহঙ্কার হয়ে
জন্মা করতে পারব ভোমার চরণপদ্ম।

জ্ঞানবাসীদের কী অশ্রু রহস্যের সোঁতাগ্য। যিনি বৃহৎ,
যিনি চিৎ-রসময়-তত্ত্ব, যিনি মহন্তস্বের, অহন্তস্বের, এমন কি
প্রভূত্বিকময়ও অজীত তিনি তাঁদের পরম প্রস্তুতম। এত নিকটম
হয়েও তুমি তাঁদের এত আপন।

বিশ্বের অতুলনীর এই সুদর্শনা গাভীরের কথাই বা কী বলব?
তারা বহু হয়ে গেছে। আপনি জগতের অধীশ হয়েও বৈষ্ণবধামালী
হয়েও, বাহুর ও রাখালময় তত্ত্ব গ্রহণ করেও আশ্চর্য্য, গাভীরেরও
পান করছেন অত্যাশ্চর্য্য তত্ত্ব।

ব্রজকুসুম—ধারা মহুসের আকৃতি গারণ করে ররেছেন, জানি
আমরাই তাঁদের ইন্দ্রিয়গ্রামের আশ্রয়স্থল। কিন্তু যে প্রভু,
বিশ্বের হতবাক হতে হয় বখন দেখি, তারা পান করছেন আপনায়
ঈশ্বরচরণের মধু আর আমরা লাভ করছি তার অবশেষটুকু।

একদিন ভনে বিব মাখিয়ে শুলব মাড়বেশে আপনায়
কাছে এসেছিলেন পুতনা। কনিষ্ঠ জাতা বকাগ্রবের সন্কে তিনি
জাভ করেছিলেন আপনায় শুভধাম। আর এই ব্রজবাসিনগ,
যারা আপনাকে সর্পণ করেছেন তাঁদের ধন জন জীবনাদি সমস্ত
জীবে যে আপনি কী বর দেবেন, তাহতেও লোপ পাচ্ছে আমার
মুখি।

যে পরমেশ্বর, মহুসের লোভ কোথ দন মাংসর্বা কাম ততক্ষণই
মালিত ছড়ায়, মহুসের গৃহও ততক্ষণই কারাগার হয়ে থাকে,
ততক্ষণ না সে মাংস আপনায় চরণকমলে নিবেদন করে পিচ্ছেন
তাঁর সেবা।

ধারা স্তম্ভভিমান, ধারা অতিবিলম্ব ধীমান, তাঁরা চিরমিল বিচার
করুন আপনায় মহিমা। তা নিয়ে আমাদের বিবাদ নেই। তাঁদের
প্রতি আমাদের কৃপাও নেই। কিন্তু প্রভু, আমি শুধু এই জেনেছি,
আমরা এই সেহের এই স্থানের এই বাস্তব অসোচন আপনায়
মহিমা।

যে কৃপাকমল, এখন আমাকে অমুখতি বিন, আমি বাই
কই নজরোদয়, যেখানে আপনায় কৃপাতেই চলছে আমার

পরমেষ্ট্রেরে হুটি ব্যবসায়। আপনি এক-টিং, এক-রস, অখিল
জগদ্বাণীর আপনি অন্তরবিশ্ব। এবং আমার স্বরূপ আপনি
জানেন। যে যে, যে প্রভু, গ্রহণ করুন আমার প্রণাম।

৮৮। ভব শেষে প্রজ্ঞান করলেন শ্রবতু। এবং ততপন
চক্রপাশি ঈকুৎ দেখতে পেলেন, সুখিমল ব্রজকুমিতে পূর্বের দণ্ডই
বাহুরের দল লাফাচ্ছে, নবকৃপাহুর খাচ্ছে, চরে বেড়াচ্ছে উদার
আনন্দে।

৮৯। মহুজাকৃতি পরব্রহ্ম তখন চলন-সংকত মিলেন তাঁর
বাহুরের। কী কোমল, কী মধুর, কী গভীর সেই হাম-হাম রাবী
সংকত। আর সেই ধ্বনির কীক-কীকে কী অশ্রু সেই আলতো
আলতো বাতাস বুলিয়ে ছড়ি বোরানোর নৈপুণ্য, সসন্ত্রমে চলতে
লাগল বাহুরের দল। তাদের মুখ থেকে বরে-পড়া অর্ঘ্যচরিত
কৃপাহুরে খচিত হয়ে গেল বনতল। পাছু-পাছু চললেন নন্দহুলাল
পূর্বের সেই বনভোক্তাদের হুলে। ব্রজমোহনের অব্যবহিত পরেই
ঈকুৎকের এই অনন্তরমধীর রহস্ত দেখে হাত সঘরণ করতে পারলেন
না পরমোপযোগী বোয়ীরাও।

৯০। তাঁকে দেখেই সহচরদের কোথায় বেন মিলিয়ে গেল
তাঁকে না-সেখার উৎকর্ষিত চিত্তা ও রেখনা। স্ফাতি বনে তাঁদের
প্রতীতি হল এ একটি বছরের অন্তর্ধানিক। সর্পন-পহারী মুদ্রচরিত
ঈকুৎকে তাঁরা চোখ মেলে দেখেন, আর তাঁদের মনের বিশ্বর বলে
ওঠে—উঃ, সখার সত্যিই মহিমা বোকা ভায়, অতুল্য এঁর মহিমা।
তাই তিনি নিকটে আসতেই তাঁরা ছুটে গিয়ে বললেন, শত্রুগৈনিক
বিলম্ব করে এলেন তো আমাদের সখা। আপনাকে ছেড়ে একটি
গ্রামও মুখে তুলিনি কিন্তু আমরা। বলতে বলতে তাঁরা বেন
নিজদের অধরেই ছুটিয়ে ফেললেন মাধুর্যের মঞ্জরী। চৌদিক থেকে
তাঁরা তখন ছুটে এসে ঘিরে ফেললেন, ধরণীর ভাবহরণকারী
বনমালাধারী ঈকুৎকে।

৯১। মধুরতর বাবীর আশ্রয়ে তাঁদের স্বরূপলিকে ছেয়ে
কেলে প্রণয়তর দহুজগমন তখন বললেন—তোমরা চিরদিনই আমার
প্রণয়লোভী। আমার উপর তাই আমার সখাদের ভালবাসা—
সৌরভের মতই এত স্বরূপহারী।

বলতেই এক পলকে বেন খণ্ডিত হয়ে গেল সখাদের অখিল
ভারা। লতার বলয়-পরা তাঁদের চাতুস্তলি অবার আবেশে ধরে
ফেলল ঈকুৎগবানের করকমল। তারপর তাঁরা বখন সমস্তর বলে
উঠলেন, এবার ভাই তাললে শেষ করে কোলা বক বনভোক্তাদের
ভোজ। বড় সেবী হয়ে বাচ্ছে। কৃপা ওপারে চল বাই।

তখন তাদের কৌতুক বোধ করলেন নন্দহুলাল এবং আনন্দে
আনন্দ মিলিয়ে বলে উঠলেন—

“তাহলে এখন বনভোক্তা উৎসবের পরিসমাপ্তি করা হউক।”

৯২। বখন শাস্ত্র হল সকলের ভোজন-রসিকতা, তখন আকাশে
কাঁ কাঁ করছে বোদ। বিলাস করে খেলে অলস হবেই অলস।
ঈকুৎকেরও হল তাই। তিনি প্রয়োজন যেন করলেন জনকাল
বিভ্রাঘের। খেলায় খেদ মিটিয়ে পরসেখ থেকে সরে এসে আশ্রয়
মিলেন প্রজ্ঞান-বীতল তরুণে। পলার কাকুলের উদার হাস,
সহরের উচ্ছল রাধার বলিল তরে পক্ষসেন, তিনি বেন লুটিয়ে
পড়ল ঈকুৎ হনুদীয়া দেবীর সর্বস্বদ।

১৩। ক্রমে গঙ্গাস্রোতে দেখা গেল—পশ্চিম তীরবর্তী স্থান অল্প-বাপ-
হীন অবলোকন করে বাতাস হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক। প্রথমে
এমন মতিরা তাঁর গৃহে আতিথ্যের আশায় পা বাড়ানোর বিনয়।
বিশ্রাস্তাশ্রমবিধি স্থগিত হওয়ার অসম্ভাব্যে মলিন হয়ে পেলেন
কমলিনী।

ক্রমে যখন স্বর্বাধিকারিক দেখতে হল—গঙ্গা-পারাবার-পাড়ি-
সেওয়া একক খেয়ানোকার মত, তখন দিঘলর জনিত হয়ে উঠল
বেশুবিধাধের জনিত। বরষা হল সহচরদের উদাসী মন।
হৃদয়রাজকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সকলেই ভাক দিয়ে বিয়ে জড় করে
কেলেন বাতুরদের। আনন্দের আবেশে ক্রমে দিকে তাঁরা ঘের
চলেন। ভায়ল বেবের সঙ্গে বেবন ভেসে চলে প্রাণ হাসের
সিন্ডাল।

যেতে যেতে পথের বাক তাঁরা দেখতে পেলেন সর্পাস্রের
পূর্ণবিভার দরী। সেই দরী দেখে তাঁদের সীমা বইল না
কৌতুক। হেসে হেসে বলাবলি করতে লাগলেন—

“কী আশ্চর্য্য, কী অদ্ভুত, বুকেলো হে, এটি এবার আমাদের
মহোৎসব কীভাঙ্গব হয়ে বইল।”

উভয়ের মত যিনি ব্যাখ্যায়, সেই ঐক্যকে পুরোভাগে নিয়ে
তাঁরা সকলে উপস্থিত হয়ে গেলেন ব্রজপুরের উপাড়ে।

১৪। এক সেখানে এসে পৌছতেই অবাক কাণ্ড, মহুদ হয়ে
গেল সমস্ত বাতুরদের পতিবেগ। মাড়ভক্ত পান করবার আশায়
তাঁদের সামনের পা-গুলি এগিয়ে ছুটে চায়, কিন্তু কেমন করে তা
সম্ভব, তাদের বে পিছনে আসছেন—ঐক্য ভগবান, যিনি রথধরী
খেলোয়াড়। তাই তাদের পিছনের পাগুলো যেন পিছিয়ে থাকতে
চায়।

একটিকে হতা, অজ্ঞানিক অধরা, দুয়ের মাঝখানে পড়ে সহজেই
মহুদ হয়ে গেল তাদের পতিবেগ।

১৫। ব্রজপুরে প্রবেশ করেই ব্রজব্রহ্মনন্দন বাড়িয়ে গেলেন তাঁর
মুখলী। আখো, আখো মধুর মধুর সেই মুখলীরবের মধুরা
যেন ভিজিয়ে দিয়ে গেল ব্রজবাসীদের কান, যেন বিলিয়ে দিয়ে গেল
এক ভূপিতার। আত্মাদের অন্তরীন মধুরতা। প্রাণের মতই ঐক্য
প্রবেশ করলেন ব্রজবাসীদের দেহে। হেহাভিক্ষা গলে গেল ঐনন্দ
ও ঐরশোদার হৃদয়। মুখলীরবের গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা নেয়ে
এলেন প্রতৌলীতলে।

১৬। চরাচরগুহা ব্রহ্মনন্দনের এই বৎসরব্যাপী কীর্তিটি
গতিই সহচরবো মনে করেছিলেন—যেন আত্মই সব ঘটেছে। তাই
তাঁদের গায়ের বুলা যখন ঝেড়ে দিতে লাগলেন জননীর দল, তখন
অনন্ত আত্মায়ে তাঁরা বলে যেতে লাগলেন—

“জানো মা, আজ এক ভীষণ মহার কাণ্ড করেছেন আমাদের

সখা। সে সে কাণ্ড গর, বাতুরের কোথ কপালে গুঠে, আশার হাসিও
পায়। অসম সাহস। ভীষণ মজা। বিবম বিব। আত্মদের হত
হলুকা। আমরা তো সবাই পুড়ে মরেছিগুন। সখাই আমাদের
টপ করে বাঁচিয়ে কেলেন। একটি কোন্ডাও পড়নি গায়ের।
চকুরের শিরোমণি বটে।” বৎসর বাঁদের কাছে কণ, বৎস-
পালনে ধীরা সুনিপুণ, সেই সব বাবাশ্রিতরাও তাঁদের
মায়াদের কাছে আত্মপুর্নিক ব্যাখ্যা করতে লেগে গেলেন
অজকার অভ্যাসেরা ঘটনা।

১৭। ঘোষরাজের হৃদয়-করের আদেশ গেরে হাজিরচিত পরিচয়
হাতে নিয়ে এগিয়ে এল পরিচারকের দল। অন্ধ-মরায়
শুচাচ-বয়ান কীর্তিমহান প্রভু জনকে তাঁরা মনপানাহারাবিধি
সেবা দিয়ে, দূর করে দিল তাঁর দৈচিত্র্য খেদ।

মা বশোনা তখন হেলের সর্বাঙ্গে তাত বোলাতে বোলাতে কলসেন,
এত গমগমে বেয়ে পোড়া কি আমার হেলের সর ? শিরীষফুলের
হত তুলতুলে তোর গা, লকা চান আমার, আর বাসনে বেয়ে
খেলতে। ঘোষরাজ তখন বিজ্ঞানের আদেশ ছিলেন পুরকে।

১৮। ধীর ভাব ও জীলা সহস্র অধাবসারের কলেও অপ্রবিশের,
বৌগীন্দ্রবৃক্ষের অসাধকর্মণ যিনি অবলীলাক্রমে সাধন করে ফলেন,
সেই ঐক্যগবান যখন গৃহাত্যক্তরে প্রস্থান করেছেন, তখন ব্রজনাথ
সাহসে বুক বেঁধে এক বেশ একটি উৎসাহভরেই মহিলাকে বললেন—

১৯। বলি ও কৃষ্ণের মা, দাসদাসী আর সাতশোবকের মতই
কৃষ্ণের জন্তে এবার একটি আলাদা বাড়ী তৈরী করার প্রয়োজন হয়ে
পড়েছে। হঠাৎ এই কথা শুনে হেসে ফেললেন ঐক্যজননী।
বললেন—কত দিনেরটি আর হয়েছে। এই তো সেদিন জয়াল।
নিজের গায়ের জালা এখনও নিজে মুছতে পায় না। কোল খালি
করে আমি থাকতে পাব না।

১০০। অতি কোমল এবং অমল ভাবার ব্রজব্রহ্ম বললেন—
মহিলা, তুমি বুঝতে পারছ না। এখনও তুমি তো বিজ্ঞা হয়ে উঠনি।
অবিস্মরণেও একটি সামান্য অভিমানস্বর থাকে। হেসে কদমালৌ
সম্পন্ন বাপ-মা চায়, হেলের ধন হয়ে বাড়ী-ঘর-শোর হবে। এও তো
একটা মুখ। কোল খালি হবে কেন ভোমার এতে ?

বুচকি হেসে চুপ করে বইলেন জননী। কুকীর অবধি—
অহুমোহন। অতএব আমাকে ভয়ে উঠল মহারাজের মন।

পরের দিন থেকেই তিনি কৃষ্ণের জন্তে নিজ প্রাসাদভুল
আর একটি প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

রাজপুরীর সলগ্রেই গড়ে উঠল কৃষ্ণপুরী।

ইতি আমলবৃক্ষের কৌমার-লীলা বিস্তারে কলক-বকাবাহর-
বধ-পুলিনজোজন ব্রহ্মমোহনা নাম সপ্তমঃ স্তবকঃ।

[ক্রমঃ]

“Some books are to be tested others to be
swallowed, and some to be chewed and digested.”

—Francis Bacon



রকেট ও মহাশূন্যচারী যান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান

জগতের পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। দ্রুততম যন্ত্রপাতি, অতুল সমুদ্রগর্ভ, ছিদ্রহীন স্নেক-ক্রেশন প্রযুক্তির রহস্য আর আর মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয়, কিন্তু অসীম রহস্যময় মহাকাশ আরও মানুষের মনে অপার বিশ্ববের অস্বস্তিই শুধু এনে দেয়। তাই বিজ্ঞানী মহামুগ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার শক্তি ও সাধনা কেন্দ্রীভূত করল মহাপ্রত্য সন্ধান। রকেট আবিষ্কার এ কাজে মহালক্ষ্যকর হল। অবশ্য এই সাধনার পূরণাত হয়েছিল আরও অনেক। বিমান নির্মাণবিদদের সঙ্গে বায়ু সঙ্কুল ছিলেন তাঁদের গুণের আশিত হল নতুন দাবি। মহাশূন্যচারী যাননির্মাণে তাঁদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেকখানি কাজে লাগল। তাঁরা দেখলেন বিমান ও কেপপলারের মূল কৌশলগুলি এই নভোচারী যানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাই হোক, রকেট-বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি হতে লাগল, তাঁদের একনিষ্ঠ চেষ্টার।

স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে সুরুতেই এট প্রশ্ন ওঠে যে, রকেট কি? রকেটকে কি কেপপলার বলা যায়? মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, যে অস্ত্র নিক্ষেপ করা যায় তাকেই কেপপলার বলা যায়। তাহলে এই অর্থে রকেটকেও তো কেপপলার বলা চলতে পারে? কিন্তু আধুনিক সমরবিজ্ঞান অস্ত্রসারে কেপপলার হচ্ছে বহুজিহ্বা ও বহুচালিত। এই অর্থে রকেট মাত্রই কেপপলার নয়, কাল্পনিক রকেট অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় না। আবার অনেকগুলি ইকি পরিচালিত হবে মানুষের দ্বারা, কাজেই সেগুলিকে বহুচালিতও বলা চলেবে না।

লক্ষ্য কেপপলারকেও রকেট বলা যায় না। কারণ, আধুনিক কেপপলারগুলির মধ্যে কতকগুলি রকেটচালিত, একটিকে অবশ্য রকেট নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু কতকগুলি কেপপলার জেটচালিত। প্রশ্ন উত্থে, জেট ও রকেটের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? জেটগুলি তাদের জ্বালানি প্রবাহিত করার জন্য বাতাসে যে অক্সিজেন গ্রহণ করে তা ব্যবহার করে। কাজেই বুঝা যাবে, শূন্য আবহমণ্ডলে ব্যবহার পর্বত অক্সিজেন পাওয়া যায় জেটগুলির উৎসর্গত সেই পর্বতই লীলাবদ্ধ। কিন্তু রকেট তার নিজের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ইত্যাদি সিলিন্ডারে বহন করে। কাজেই মহাপ্রত্য বেখানে বেখানে অস্ত্র বাতাস নাহে অথবা আদৌ বাতাস নেই, রকেটগুলি সেখানেও কার্যকর থাকে।

আধুনিক কালে এই রকেট ও কেপপলারের প্রভূত উন্নতি হয়েছে

লগ্না, কিন্তু বেশ কয়েক দশাব্দী পূর্বেও যে এগুলি মানুষের কাছে একবারে অপরিচিত ছিল তা তার প্রমাণেরও অভাব নেই। বিখ্যাত জ্যোতিষজ্ঞানী কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীঃ) মহাপ্রত্যের মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যার প্রবর্তন করার হুঁশতাকী পূর্বে বহুজিহ্বা ও বহুচালিত রকেট জাতীয় অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

নির্ভরযোগ্য প্রাচীনতম প্রমাণ বা পাণ্ডা পেছে তা থেকে জানা যায় যে ১২৩২ সালে চীনারা কাইকাং নামক নগর অবরোধকালে মোকলীয়দের বিরুদ্ধে রকেট কেপপলার বা "উড়ন্ত অগ্নিবান" ব্যবহার করেছিল। আর এই সময়সাময়িক কালেই ইউরোপে রকেট প্রবর্তিত হয়েছিল এবং তা দৃশ্যবৃত্তীয় বিভিন্ন যুগ্মমান জাতির সামরিক বাহিনীর বাণক স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

অবশ্য আরও উন্নত ধরনের রকেট আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৭৮০ সাল নাগাদ এবং তা হয়েছিল ভারতেই। ১৭৯২ সালে মহাপ্রত্য যুদ্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নেতৃত্বে পরিচালিত বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে রকেট ব্যবহার করে মহাপ্রত্যের টিপু সুলতান পরিস্থিতি স্বীয় সৈন্যবাহিনীর অসুস্থতায় আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য শতাব্দীর প্রারম্ভে বুটেনেও তার উইলিয়াম কলব্রিকের কৃতিত্বে আরও দৃশ্যপটায় রকেট উদ্ভাবিত হল। উল্লেখ্য শতাব্দীর রকেট ব্যবহারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য চূড়ান্ত পাণ্ডা যায়। ১৮১২ সালের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী জাহাজ থেকে ম্যাকহেনরী চর্চের গণর রকেট নিক্ষেপ করেছিল। এর ঐতিহাসিক প্রমাণও রয়েছে ক্যালিস হট কী-র লেখা কবিতায়।

১৮৩০ সাল নাগাদ উইলিয়াম হেল নামে এক আমেরিকান জরুলোক রকেটের প্রাভুতগো পাখনার মত বস্ত্র জুড়ে দিয়ে রকেটগুলিকে আরও অক্ষুণ্ণ করে তুললেন। পরবর্তী বিশ বছরে এর আরও উন্নতি হল।

বিশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের গবেষণার ফলে কেপপলারের প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। অরভিল রাইট ও উইলবার রাইট বহিঃ বহুজিহ্বা অস্ত্র নিয়ে সরাসরি কোন গবেষণা করেন নি, তবে রোয়ামান নিয়ে তাঁরা যে গবেষণা করেছিলেন কেপপলারের অগ্রগতির পথে তা প্রচুর সহায়তা করেছিল।

নিরস্ত্রিত কেপপলার সর্বপ্রথম আশুপ্রকাশ করল ১৯১৫ সালে। এর মূলে ছিল মার্কিন নৌবাহিনী ও একটি বেসরকারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বোখ প্রচেষ্টা। "শূন্যচারী টর্পেডো" নামে অভিহিত এই কেপপলার একটি পূর্বনির্দিষ্ট পথেই বিচরণ করত। পরে এর পরিচালনার জন্য বেতার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যবিভাগ "বাস" নামে বেতার-নিয়ন্ত্রিত চালকবিহীন বিমান নিয়ে ক্রমাগত অনেকগুলি পরীক্ষা-কার্য চালায়। পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এর ফলে বেতার-নিয়ন্ত্রিত কেপপলারের সন্ধান আর দূরত্বক হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে কেপপলারের জন্য বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি নিয়ে বর্ধিত গবেষণা চলছিল, অবশ্য এর অধিকাংশই প্রাধানতঃ বিমানের দ্বাৰাই করা হয়েছিল। বেতার-নিয়ন্ত্রিত কেপপলারের প্রথম যুগে পিটন ইকিন ব্যবহার করা হত। তার পর আভিবিজ্ঞান সুবিধা হিসাবে টার্বোজট ইকিন সংযুক্ত হল। বিশ শতকের চতুর্থ দশকে গ্রেট ব্রিটেনের জ্যাক হুটটল ও জর্জারী হাশপ জন ওয়েন এই টার্বোজট ইকিন উদ্ভাবন করেন।

১৯১৩ সালে ক্রান্স রায়কেট ইঞ্জিনের পেটেন্ট পেতেন। বিশেষ শক্তির ক্ষুদ্রতর লম্বকের শেষ দিকে ও ক্ষুদ্রতর লম্বকের প্রথম দিকে ক্রান্স ও হাজেরীতে রায়কেট ইঞ্জিন সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল, তবে তা বিশেষ কল্যাণ হয় নি। প্রথম সাক্ষাৎজনক রায়কেট আবিষ্কার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর কৃতিত্ব জনস্ব হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কলিত পরীক্ষিত। গবেষণাগারের। ১৯৪৫ সালে পরীক্ষামূলক উদ্ভাৱন হয় ও তা সফল হয়। জার্মানিক রকেটের গবেষণা শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে। ঐ সময় তথা বর্তমানে পণ্ডিত এমন একটি নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী কৃত্রিম জালানি আবিষ্কার করলেন যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না।

কিন্তু তখন পণ্ডার্তের অল্পসংখ্যেই এখানেই শেষ হল না। জার্মানিক শক্তির জন্য তিনি অধিকার গবেষণা চালিয়ে গেলেন। মহাশূন্যবান জালাবার উপযোগী জালানির সত্যের স্তর স্তর উন্মুল জালানির প্রতি। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে তিনি উন্মুল জালানি চালিত রকেট মহাশূন্যে প্রেরণ করলেন। এটিটিই বিশ্বের সর্বপ্রথম সফল রকেট যা তখন জালানি দ্বারা চালিত হয়েছিল। জার্মানিও অল্পকাল গবেষণা চালিয়েছিল এবং তারিখ ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে এ বিষয়ে সাক্ষাৎলাভ করে। জার্মানরা ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে সর্বদিক উন্নত হয়েছিল সত্য, তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাদের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি ছিল না। জাপানী বিজ্ঞানীরাও পিঠিয়ে ছিলেন না। রকেটের ক্ষেত্রে তাঁদেরও কিছু অবদান আছে।

জার্মানির মত অভ্যর্থানি উন্নত না হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নিরস্ত্রিত অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে কিছু গবেষণা করেছে।

জার্মান বিজ্ঞানীদের গবেষণাসহ তথ্যাবলী থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এই উত্তর দেশের বিজ্ঞানীরাই যুদ্ধোত্তরকালে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন।

মার্কিন বিমানবহন ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিকের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করে, কিন্তু ১৯৪৯ সালে প্রতিক্রিয়া রপ্তারের বাজেট ব্যাপক হ্রাসের ফলে এ কাজের অগ্রগতিতে বাধা পড়ে। অন্তশেষ একটি বিমান কারখানা গবেষণার উদ্দেশ্যে বীর অর্থে এ কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

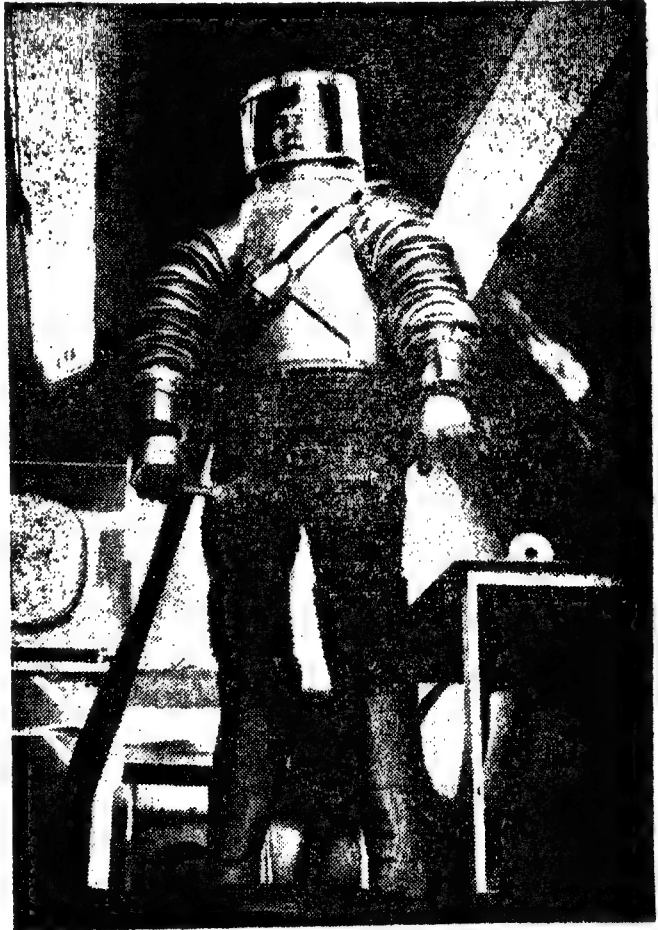
১৯৫০ সালের পর প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে জার্মানিকার যুগ্মাঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র পরিকল্পনা রানা কারণে যথেষ্ট প্রেক্ষা লাভ করে। প্রথম মহাশূন্য সত্যের আমেরিকার

বে গবেষণা ফলে ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কে প্রাণ্ড তথ্যাবলী লই কয়েক অনেকখানি সহায়তা করেছে।

রকেটগুলি কি তাবে কাজ করে

রকেটগুলির তীব্র গতিবেগ আসে কোথা থেকে আর কি তাহলে বা এগুলি মহাকাশে উঠিত হয়? প্রকৃতি খুবই সরল, কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এমন ভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে রকেট ইঞ্জিনীয়ারসকল যিম্মির খেয়ে হ'ল।

আইজাক নিউটনের আবিষ্কৃত সূত্রটি আমাদের সকলেরই জানা আছে। সূত্রটি হল, প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের এই মৌলিক সূত্রই রকেট নির্মাণের



শোস স্ট—এই শোস স্ট নামক পোষাকটি লিটন ইনডাস্ট্রি স জ্যাকুয়ার সেবরেটকিতে পরীক্ষিত। এই সরঞ্জাম পোষাকের উপরকার অংশটি হস্ত এবং বাহ সঞ্চালনের লোপ কয়িয়ার জন্য গুলিয়া রাখা হয়।

কৃত্রিম। আলানির মনোরম রঙে উক প্যাস প্রবলবেগে দক্ষসামিহিত হয় এবং রকেটের একটি নির্দিষ্ট দশ দিয়ে তীব্রবেগে নির্গত হয়। যে ভিত্তিয়ার রঙে এই প্যাস শিহুন দিকে ধাক্কা খায়, তার সঙ্গে সাময়িক বেগে একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে চর, বা রকেটটিকে নীচের দিকে ঠেলে দেয়। স্বতরাং দেখা যাচ্ছে, রকেটভাঙরহ প্যাস রকেট থেকে নির্গত হলে শিহুনে বাতাসে ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে রকেটটি পায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে যে চলতি ধারণা আছে তা বর্ধাৎ নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এই প্যাস রকেটটিকেই ধাক্কা

দিয়ে নামনের দিকে এগিয়ে দেয়। বিশালকার রকেটে এই ধাক্কার শক্তি পাউণ্ডে ময়, টেনের তরফে পরিমাপ করা হয়। শিহুনে বাতাসেও রকেটভাঙরহ প্যাস ধাক্কা দেয়, তবে তা খুব ক্ষুদ্রপূর্ণ নয়। স্বতঃ নির্গত প্যাসের বেগ কমিয়ে নেওয়াই এই বাতাসের কাজ, অর্থাৎ এই প্যাস রকেটকে নামনের দিকে এগিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেয় ধাক্কা দেয়, বাইরে বাতাস ধাক্কা দেয় সেই ধাক্কার বেগ প্রশমিত হয়। তাই যেখানে বাতাস সেই রকেট সেখানে ভালভাবে চলতে পারে। রকেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল খাঁর



চালু করে উপযুক্ত পেশ ট্রেন। কেনার ডিনামিকসের কন্ডেইং ডিভিসন নাবক এটলাস ইনটাং কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলস নাবক কেমপাংগের প্রকৃতকারক পৃথিবী হইতে চার শত মাইল উপরে এই পেশ ট্রেন পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করিবেন।

কেট ইঞ্জিনে ব্যবহারের ক্ষমতা প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এ নিজেই বহন করে নিয়ে যায়, কাজেই আবহমণ্ডলে যেখানে বাতাস নেই সেখানেও এগুলি অকোচা হয়ে যায় না।

রকেটের কঠিন আলানি ও তোল তোল তরল আলানির মধ্যেই অক্সিজেন থাকে। স্বতরাং অপরের সাচায্য ব্যতিরেকেই তা প্রযুক্তি হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ তরল আলানির মধ্যে অক্সিজেন নেই, যেমন অ্যালকোহল ও গ্যাসোলিন। এক্ষেত্রে তরল অক্সিজেন সরবরাহ করতে হয়। স্বতরাং তরল আলানি বিশিষ্ট অধিকাংশ রকেটের মধ্যেই হুঁ প্রকার তরল পদার্থ রয়েছে—একটি আলানি ও একটি অক্সিজেন।

প্রযুক্তি আলানি গতি সঞ্চালক যন্ত্র বা মোটরের বহন কক্ষে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বংসের আয়ন-মণ্ডলে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা এই রকমের উচ্চতাপ বিশিষ্ট তরল আলানি রকেট ব্যবহার করা হচ্ছে।

এরূপ তরল আলানি রকেটের বহনকক্ষে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপে ধাতু ও অনেক যুগ্মগ্রন্থ বিগলিত হতে পারে এবং রকেটভাঙরহ গতিসঞ্চালক যন্ত্রের বা মোটরের পাত্রাবরণ ক্ষীণত্ব করার কোন ব্যবস্থা না থাকলে একটি রকেট যাত্রা কয়েক সেকেন্ডের ভিত্তি এই তাপ সহ করতে পারে।

বিশ শতকের চতুর্থ দশকে যুগপৎ গ্রাফিন যুক্তগাট্রে ও গ্রাফাইটে এর প্রতিকার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হল। গ্রাফিন যুক্তগাট্রে এর কৃত্রিমলাভ করলেন জেমস ওয়াইল্ড। ইনি পূর্বে মিয়াকশন মোটরসের সঙ্গে সানিট ছিলেন। ওয়াইল্ডের পদ্ধতি অনুসারে গতিসঞ্চালক যন্ত্রের পাত্রাবরণ বিগলন পূর্ণ হল।

রকেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য এর স্বয়ংক্রিয় পরিচালনা ব্যবস্থা। রকেটের মধ্যে কোন চালক থাকে না, থাকলেও বাহ্যিকের শক্ত রকেট চালনা সম্ভব নয়। কারণ যে

ক্রান্ততার সঙ্গে রকেট নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কোন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। রকেটের মধ্যে স্থাপিত আইরকোপ বহুই রকেট পরিচালনার কাজ করে। আইরকোপ প্রদর্শিত পথে রকেট চলতে থাকে। চলার পথে রকেট কোন সময় যদি তার নির্দিষ্ট গতিপথ পরিবর্তন করে তাহলে আইরকোপ তার সেই ভুল সংশোধন করে এবং গতি সফলকর হচ্ছে সুবাদ শেষ বাত্রে এই ক্রটি সংশোধন করে রকেটটিকে সঠিক পথে কিরিয়ে আনা হয়। আইরকোপ হচ্ছে রকেটের হৃদয়, আর মোটরটি হচ্ছে তার মাস্‌সেলী।

মহাশূন্য সন্ধান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে কারিগরি বিজ্ঞান ক্রান্তগতিতে অগ্রসর হতে থাকার বিমান ও কেপণ্ডার নিম্নোক্তাদের ওপর একটা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ল এই দায়িত্ব হল মহাশূন্য সন্ধানের কাজে সহায়তার জন্য মহাশূন্যচারী যান নির্মাণ করা।

বিমান ও কেপণ্ডার নির্মাণের কাজে পঞ্চাশ বৎসরাধিক কালের অভিজ্ঞতার যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল তা থেকে এই নতুন কাজে অমূল্য সহায়তা লাভ করা গেল। কারণ বিমান ও নিয়ন্ত্রিত কেপণ্ডারের মূল উপাদানগুলি প্রায় একই।

অবশ্য গবেষণা বত এগিয়ে চলেবে এই উপাদানগুলিরও বহুল পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। মনুষ্যচালিত প্রথম মহাশূন্যযান আধুনিক জেট অগ্নী বিমানের প্রায় অগ্ররূপ। তবে মানুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের খণ্ড গভীরে প্রবেশ করবে ততই এই মহাশূন্যযানের গঠন, পরিকল্পনা ও পরিচালনা বহুগতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন হবে।

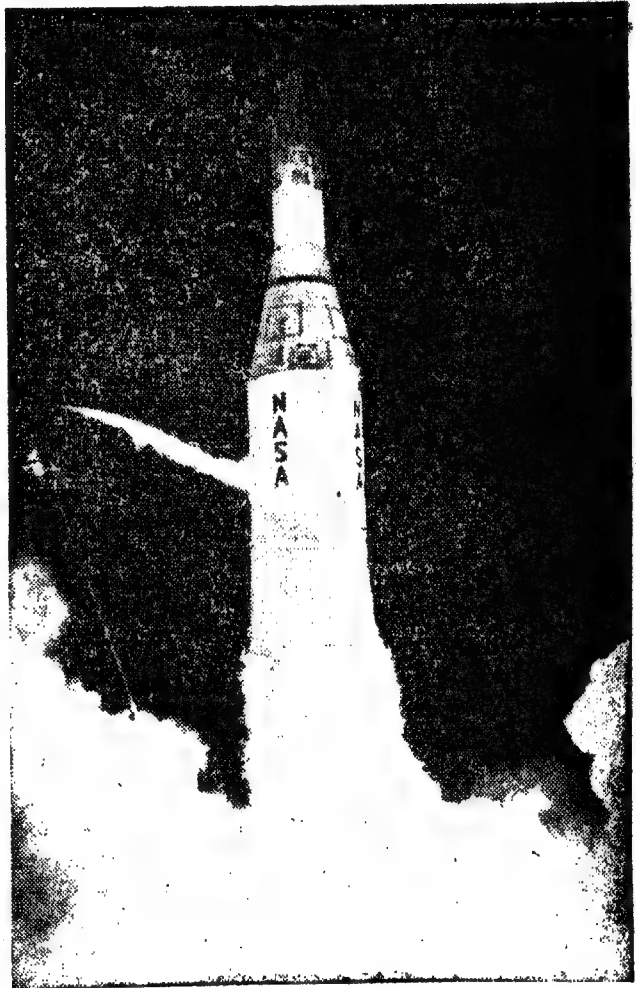
কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন, চন্দ্রে রকেট প্রেরণ, সূর্যবেষ্টনকারী উপগ্রহ, এ সমস্তই নিঃসন্দেহে আধুনিক বিজ্ঞানের অতুলনীয় অবদান, কিন্তু মহাশূন্যের বিশালত্বের কথা বিবেচনা করলে এই অবদানও তুচ্ছ বলে মনে হবে।

মহাশূন্য বিজ্ঞানের কথা মানুষ বহন বলে তখন সে অনেক কিছুই চিন্তা করে। যে সৌরজগৎ অবিরাগ পূর্বক প্রদক্ষিণ করছে, আমাদের পৃথিবী সেই সৌর জগতের পঞ্চম সূর্যজন্ম গ্রহ। সূর্যের এই মাধ্যাকর্ষণের বলেই সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একশ দুইশাব্দী যে ৩৬৮ কোটি মাইল দূরবর্তী প্রত্যেকও সে সৌরজগতের মধ্যে

আকর্ষণ করে রেখেছে। পূর্ব থেকে সব থেকে দূরবর্তী গ্রহ হল প্লুটো, আর সব থেকে নিকটবর্তী হল বুধ গ্রহ। পূর্ব ও পূর্বের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ হল ৩,৬০,০০,০০০ মাইল।

এই ছুটি গ্রহ “ছায়াপথ” নামে নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। ১০,০০০ কোটি নক্ষত্রের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই ছায়াপথ। এর আয়তন এত বিশাল যে আলোকের গতিতে অগ্রসর হলে ছায়াপথ পরিভ্রমণ লাগবে এক লক্ষ বৎসর। আমরা জানি, আলোকের গতি হল সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে এই ছায়াপথ তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের নিজস্বের সৌরমণ্ডল কল্পসন্ধান করলেই বুঝে স্পষ্টতর আমাদের যে ধারণা জন্মায় তা আমাদের কল্পনার বাইরে। পৃথিবীর



বুন্দো ২ম—বুন্দার্ট সেনাবাহিনীর প্রথম অন্তরীক্ষ সন্ধানী যন্ত্র : ব্যাটারি যন্ত্র প্রস্তুত করা হইতেছে

পরিচালনা নিকটস্থ প্রতিলম্বিত ভাষ্যের দ্বারা পৃথিবী থেকে ২,০০,০০,০০০ মাইল। আলোকের গতিতে ভ্রমণ করলে এই দুইটিই অতিক্রম করতে অবশ্য দ্বিগুণ করে মিনিট সময় লাগবে, কিন্তু হাইড্রোজেন আকাশযাত্রার এ পর্যন্ত সর্বাধিক যে গতিবেগ অর্জন করা গেছে তা হল সেকেন্ডে ৭ মাইল। এই গতিতে ভ্রমণ করলে এই পথ অতিক্রম করতে তিন মাসকাল সময়ের প্রয়োজন হবে।

মহাকাশচালিত কোন মহাপ্রকল্পকে এই পথ পাড়ি দিতে হলে তার যান্ত্রিক ব্যবস্থার কতখানি কারিগরি পরিপূর্ণতা প্রয়োজন হবে তা চিন্তা করে দেখার বিষয়। দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট গতিবেগ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থা করা, মহাপ্রকল্পে যন্ত্রচরের সংযোজিত যন্ত্রকর্তৃত্ব হয়ে যাতে বৈমানিকের কোন বিপর্যয় না দেখা দেয়, সেজন্য বিমানের সেটটি প্রথমত অনেক সম্ভবত করে গড়ে তোলা। আন্তর্বিষয়ক নিষ্কূল

পরিচালনা ব্যবস্থা করা, বৈমানিকের জন্য বিমানের মধ্যেই পৃথিবীর অধুনা পরিবেশ গড়ে তোলা, এবং পৃথিবী থেকে কোনরূপ সহায়তা না পেয়েও বিমানের প্রতিলম্বিত ভাষ্যে দীর্ঘকাল বায়বীয়ভাবে কাজ করে যেতে পারে, সেইরকম নির্ভরশীলভাবে বিমানটি নির্মাণ করা—এ সমস্তই কারিগরিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা সূচিত করে।

মহাপ্রকল্প জয় করা যে সহজ নয় তা বলা বাহুল্য। মহাপ্রকল্পসাধনে আংশিক সাফল্য লাভ করতে হলেও দীর্ঘ সময়, প্রচুর অর্থ এবং কারিগরি জ্ঞান প্রয়োজন প্রমথীকারের প্রয়োজন আছে।

বিশ্বজ্ঞানোদ্ভব সত্যের যে পরিচালনা মানুষ করেছে হাইড্রোজেন বায়ু তা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে জানাবের কথা, প্রাথমিক, প্রমথিল্লের মালিক, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, সরকার সবলেই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে আর জনসাধারণের আগ্রহে ও সমর্থনে তা ক্রমশঃ সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে।

শেষের কবিতা

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

রাতের কবিতা শেষ করে দাও কবি,
ঘনঘাসে ঝরে থাকুক
আধফোটা কালের মঞ্জরী
গন্ধরাজের কারা ছড়াক
শেষ রাতের ছায়ার তথী।

নিবিড় গভীর ঘূমে জড়িয়ে থাকুক
অপরাজিত রত স্বপ্নের চক্ৰমাক
সাপেরের ঝংখটে পড়ে থাকুক
কত শত বিহ্বলের ধনি।

কালের তেপান্তর ছেড়ে, হে কবি,
হাইড্রোজেন নিষ্কূল গুহাচির রতওলি
সে ত' বুহুর্ভেৎ অসম্পূর্ণ ছবি—
পানিতিক দিষ্টান্তায়
আর প্রকৃতির ভূমিকম্পে
মনে হয় ভুল হয়ে গেছে কবিতার তুলি।

শিখনে পড়ে থাক অসম্মান, অপবিত্র
আর জীবনের রত কালি
জীক ঘরে ভুল না কোলাহল
ভুল না জীবনের জোরবালি।

রাতের কবিতা শেষ করে দাও কবি,
হাইড্রোজেন হয়ে গেছে কবিতার ছবি।

অভিজ্ঞান

জ্যেয়কণা রায়

এই নির্মল বানী বিছানাটা রেজ শেষ রাতে
নিচুর ব্যঙ্গের মতো আমার মুঠি থেকে খুলে দেয়
গাথা চার দেওয়ালের বুক।
মনে হয় শুধুনি রম আটকে আসবে
ভবু বেঁচে থাকি সময়কে কবাজুলে গুলে,
কখন সকাল আসবে, কখন কখন?
নারী আসে বিধবার বেশে, খাত সালা হুব।
জীবনের রত বেন জলে-বোঁরা তুলির আঁচড়।
মৃত্যুর কারা স্তনতে পাই না—তোপ তো কানেকও।
সেবিকার অর্থহীন হাসি আমার চোখে
কখনও ভুলে ছায়া ফেলে না—
চোখের চশমায যে আর পাণ্ডয়ার বাড়ানো চলে না।
তবু মাঝে মাঝে পুষ্ট বৃক্কের বোতামের মিকে
চট্টতে চট্টা করি, সে ভাবে বুঝি জল চাইছি।
একটু একটু করে চলে দেয়।
জোর করে ধাঁত চেষ্টে থাকি
পাশ দিয়ে পড়ে থাক সেই ভাগো,
হুজিরে দেবে হাতে ধরে।
আঁচল নেই বিশ্রী পোষাক।

একদিন বায়ু হয়ে উঠতে হলো
মইলে ওরা তাড়িয়ে দেবে।
অথচ আমার স্তরে থাকাই ভালো।
মান করার ঘরটাতে গিয়ে কি দেখলাম—
ওরা কি আমার মেয়ে কেলবার চোঁটা করছে।
হু হাতে বুধ ঢাকলাম।
জানালার একটা কাচ কেটে গেছে
সোনা একটা কাগজ দিয়ে জোড়া—হলো কাগজ।
হলুদের নান বুদ্ধি।

শি শি র=সা নি থ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

৬

এবার ঠিক করলেন পণ্ডিত কীরোরপ্রসাদ বিজ্ঞানবিদ্যার কোন বই পড়বেন। ঐর আসন্নপীর নিয়েই লিঙ্গিকুমার প্রথম সাধারণ রচনাকে অবতরণ করেন। কাজেই ঐর সম্বন্ধে মনে মনে হরতো কিছু দুর্বলতা ছিল। কিন্তু মাটিক পড়ার সময় বললেন 'জী' পড়বেন।

৪টা সেপ্টেম্বর জী পড়তে এসেন। এই সাত দিনের ভিতর অনেক দিনের পর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এখানকার সন্তানের সঙ্গে 'মিথরা' করেছেন। পুরানো পরিবেশে তাঁর অভিন্ন দেখতে জীষ জড় হয়। প্রথমেই সেই কথা বললেন—ইনস্টিটিউটে খুব জীড় হয়েছিল, তা হু-তিন হাজার লোক হবে, হাওয়া বেরোবার সার্ভা পথ নেই, জীষ অবস্থা। বললুম—এ যে death trap করেছ। ঢাকার একবার ঐ অবস্থার একদিনে হুখানা বই করার পর অজান হয়ে বাই। শেষ দৃষ্টে শেষ কথা বলার পরই আমাকে তুলে আনতে হয়, ডাক্তারও ডাকতে হয়েছিল। ঢাকার আমি বেশ ভাল পরগা পেয়েছি। ওখানকার ব্যবস্থা যিনি করতেন, ডক্টরকেই নামটা মনে নেই, তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল খরচ খরচ। বাদ দিয়ে ৩০—৭০ ভাগ হবে। তা বা দিভেন তাই নিতুম, তবে তাও খুব কম নয়। একবার পাঁচ রাত্রির জন্য 'রীতিমত নাটক' করতে গেছি, পাঁচ রাত করার পরও করতে বললেন।

বললুম—তা কি করে হয়? ননি রবিবার কোলকাতার করবার কথা রয়েছে। তাতে বললেন—কত বেশী দিতে হবে?

কোলকাতার তখন মোটে বিক্রী নেই, কাজেই কিছু বেশী দিতেই আরো তিন রাত বললুম।

সেটা ১৯৩৭-৩৮ সালের কথা। তখনও খুব বুড়ো ছিলাম। একদিনে তিন আরগার বড়ো। তার মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও একবার ছিল। তার পর ৬টা থেকে ১টা, আবার ১টা থেকে ১২টা ঘুটো নাটক করেছি। অবশ্য তার কলে কষ্ট বা আমাকেই পেতে হয়েছে। কম বয়সীদের বিশেষ কিছুই হয়নি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভারী মজা হয়েছিল। আমার আয়ত্তি করতে বললে। একটা কবিতা হুচোর লাইন পড়ার পর বললুম, এইটে বলো? সবাই সম্বন্ধে টেচিয়ে ওঠে—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পড়ুন। বললুম—কোন বইতে আছে বল? তা সবাই চুপ। এখনি বার করে কবিতা পড়ব তখন যিনি ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন—মুহাম্মদ ডক্টর, নামটা বোধ হয় রহমান, হ্যাঁ রহমান, বললেন, তুমি যা হয় আয়ত্তি কর, ওদের আর legpull কোরো না। সেদিনকার উপস্থিত বর্ণকদের মধ্যে মোহিতলাল, প্রবীল দে এরা সব ছিল। এসব যে বইগুলো পড়া ছিল না এখন নয়। কিন্তু আসল

কথা কি জান, হঠাৎ একটা কথা জিপোস করলে সব মাতিয়া হয়ে পড়ে, তাহাজে যে বইগুলো ছাত্রপাঠ্য সেগুলো ছাড়া অন্যতমের ভাল করে চর্চাই থাকে না।

অবশ্য বাবুর বুদ্ধিসত্যের সত্যাপতি হ'ল ভাষাসম্বন্ধ। জা নামকরা লোক না ডাকলেই বা চলে কি করে। আরোমের আবার এক এক মন্থন বোধ হয়েছে, বহুর বহুর আঁধার কল্প। ওদের দেখে অরন হবনা, এক সেজনীরদের কেনে ছাড়া। তা তারও করে টাকা পার বলে।

ইচ্ছলে পাঠ্যালে ভাল করে ছেলেমেয়েদের পড়ানো প্রকার। এখন ত তারা কিছু দেখেনা। গিরিশবাবু মাটিক লিখতে শুরু করলেন বহুর আর মাটিক পেলেন না। তিনি সব কিছু পারতেন ত। বিরাটখানা মাটিকের যবো শেষ ১০ বছরে ৫ খানার বেশী লেখেননি। বাকী সাতাত্তরখানা ১৮৮২ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে লিখেছেন। তার মধ্যে কতকগুলো অবশ্য ভাল নয়।

একজন মন্তব্য করলে—প্রকৃত ত একটা অস্বাভাবিক বই।

বললেন—প্রকৃতক অস্বাভাবিক বলছ, অস্বাভাবিক কোনখানটা বলতে পারো? ঐ যে মজা মেয়েটা—কি নাম যেন, জগমণি না চিত্তামণি, হ্যাঁ জগমণি অস্বাভাবিক, রমেশ ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বোকে ত ও মারতে চারি, but the leader is some time led, জগমণি কম্পানীর জেই ত মারতে গিয়েছিল। তাও শেষ পর্যন্ত বললে—নাও, এক কৌটা জল দাও।

এই সময় একটু আলোচনা হল, বার মূল কথা হল—সদস্যের values এখন rapidly change করছে, তখন চিরন্তন নাটক রচনা সম্ভব নয়। সবায়ের কথা শুনে বললেন—তোমরা বলছ আজকের এই Changing values এর সময় চিরন্তন নাটক লেখা সম্ভবপর নয়। কিন্তু সেজনীর আরও Popular কেন? ওদের ট্রিট্রিট জন আড্ডন এ এখনও এত টাকা আর হয় যে কল্যাণ করা যায় না।

ঐর অভিনীত 'জীবনরঙ্গ' নাটকটা সত্য ছাপা হয়েছে, তার কথাতেই বললেন—জীবনরঙ্গ নাটক হিসাবে খুব ভাল কিছু নয়, কিন্তু অভিনয়ের সময় জমে। নাটকটা যেমন অভিনয় হয়েছিল, তেমন ছাপা হয়নি। ছাপাটা ত আর আমার হাতে নয়। কালি বইটা আমার কাছেই ছিল, কিন্তু আমাকে ত বলেনি, তা হলে না হয় দেখে শুনে দিচ্চুম। নাটকটা বড় বেশী ব্যক্তিগত।

—নাটক আর আজকের দিনে লেখা হচ্ছেনা। গিরিশবাবুর নাটক খুব ভাল নয় বটে, কিন্তু কিছু বাবুর সামাজিক নাটক তার চেয়েও ধারণ। অথচ ওরকম নাটকই-খা লেখা হচ্ছে কই?

‘কীলসমের’ নামক পত্নী তার স্ত্রী ভাল পেছে এই কথাটা একই মুহুর্তে কহে বলে একজন অজ্ঞান কলসেন—ওখানটা কি সন্ধান করে বলা যেত না ?

কলসেন—বৌ যেখানে গেছে—কাজে পাওল কথাটা বুঝি জোয়াসো হয়। তবে, বলতে না পাখাটাও খুবই বাতাসিক।

আমাদের দেশে ‘বৌ-এরা’ বেশ হারে বার না, তাদের বেশ কজন দেখা যায়। মোহর বেশ আমাদের মেয়েরা ক’জন করছে ? বরং বড়বড়ার অভ্যাচারে অনেক বেশী মেয়ে বর হাড়তে বাঁধ হয়।

পশ্চিমের দেশে মানুষ Individualistic অনেক বেশী আর আমাদের দেশে family unit অনেক বেশী চুট। ওদের ছেলেমেয়েরা ১৭১৮ বছর বয়স হলে আর বাপের ছাত্ত বার না। আমাদের দেশের ছেলে সাইক্লিস বন্ধর বয়সেও বলে,—এখানে বলে দাঁত, ওখানে বলে দাঁত। না বলে দিলে চলবে কি করে ?

একটু থেমে হঠাৎ বললেন—একটা মাটক লেখা উচিত মাকবরনী কোম মেরেকে নিয়ে। সারাজীবন সে ত্যাগ স্বীকার করেছে ‘আমি’ ছেলেমেয়েদের হুখ চেয়ে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে, এখন আর তার কোম কাক নেই; সে শুধু হুটো কথা শুনেতে চায়, ‘আমি’ ছেলেমেয়ের জন্তে যা করেছে তা যে তারা জানে, এইটুকুই চুকতে চায়।

আর একটা মাটক লেখা যায়, একটি বুড়ো মানুষের সিসকল নির্দেশে। নিজের করার এসে এবার—অভিনয় করার বৌক আমার করাবিয়ে। তখনকার মাটকের production-এর দোষগুলো আপিসা থেকেই মনে হয়েছে আর দূর করতেও চেষ্টা করেছে। কিন্তু পেশাদার মকে নামবো এ ইচ্ছে কখনো হয়নি। পেশাদার মকে নানাটা সম্পূর্ণ accidental.

আর একজন নিজে অভিনয় না করলেও অভিনয় বুঝতেন। অভিনয়ের দোষ-জটী বুঝিয়ে দিতেন, তবে মানুষটি বড় observative ছিলেন। বিশেষ-বিশেষ বাঙা পছন্দ করতেন না। স্বাভাবিক আমেরিকা বাঙাও তাঁর পছন্দ ছিল না। অবশ্য বিশপিন্ডে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তাঁর অভয়ের বোগ ছিল না।

বহুবলীর মাটক ত বেশ ভাল চলত। ঐক্য একটা মাটক আছে, মার কল না—অপূর্ণ। তাতে বেশী বয়সের আমার জন্তে বেশ ভাল একটা পাট আছে।

এবার জীয়ে এসে এসে—কীয়েগ্রেসাদের জীয়ে কিছুবাবুর জীয়ে এসে অনেক ভালো। কিছুবাবুর পৌরাসিক বইগুলো কোলটাই আর আমার ভাল লাগেনি, এক পাখানী ছাড়া। ঐটোতেই অভিনয় করেছে। জীয়ে কিছু হোটেলের অভিনয় করেছে, আর তখন ভাল লাগেনি বলেই ইস্ট্রিটিউটে যা মকে অভিনয় করিনি। মক্কে অনেকবার বলেছিল ছাও করিনি (কারণটা অবশ্য কল না)। কীয়েগ্রেসাবুকে ছালাতে পারলে খুব বড় নাট্যকার হতে পারতেন। সত্যতঃ বেশ ভাল পড়া ছিল—কালী সিংহর কথাভাষ্য পুরোপুরি কঠিন ছিল। তাই তো বলেছিলাম কলসেন মহাশয়ের লিখতে।

ঐক্য মহাশয়ের সত্যিকারের ভাল বই। কলসেন তাঁর বই কবিতা কিন্তু মহাশয়ের লম্বা আবার বাড়িতে বস

লেখা। ওখান বাঙা বাঙা করতেন, বসে বসে লিখতেন আর আবার জিনজনে কেমন হুয়েছে বলেছি। ঐক্য বেশী পোটকর্ড আমার ‘কাছে’ আছে, বলেছেন—যা ভাল বোঝা কোনো।

হঠাৎ কলসেন,—নতুন কপিরাইট আইনে কি গোলমাল কেটেছে ? শরৎদার বই করা বাবে ?

আবার কীয়েগ্রেসাদ এসে কলসেন—একবার আমার পুস্তকিরা বাছি, উনি বললেন,—‘আমি ত’ বাঁকুড়া বাব, আমার একটা টিকিট কেটে গাওনা ভাড়া।

কলসেন আমাদের সঙ্গে। গাড়ীতে আবার, হালুয়া টালুয়া চেয়ে খেলেন, তারপর বললেন—এ ত বেশ ভাল ব্যবস্থা, তা আমিও কেন তোমাদের সঙ্গে পুস্তকিরা বাহিনা ভাড়া। হাত তিনটের সময় বাঁকুড়ার আর নামলেন না।

উনি ছিলেন আবার কৈল—তান্ত্রিক। আমারও তখন ঐ মোবাই বল আর গুণই বলা ছিল। সেদিন রাতে আমার থেকে ভাগ নিলেন। তারপর পুস্তকিয়ার মেবে সনতক বললেন—দেখ ভায়া, আমার জন্তে একটু ‘আলাপা’ নিরিবালি জাহালা দিও, আর একটা বোজলের ব্যবস্থা কর—একটু মারের পুছা করবো। তোমরাও জোপ পাবে।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, জীয়ে শের অংশ পড়তে এসে। প্রথমে বয়ে হুকেই বললেন—শরৎদার হুকেই কেমন একটা জাপসা গন্ধ লাগে, অবশ্য হাওয়া বেরোবার বাঁধা নেইও। পূর্বদিকে একটা জামলা কর না কেন ?

বলা হল পেছনে বাড়ী আছে। একটু আতর্ভ হলেন—পছনে বাড়ি ? একটা গলি ছিল না ?

জানালাম গলিটা বাড়িটার পরেই। আপন মনেই বললেন—তা হবে। বাঁধা সব জুড়ে গেছি। অবশ্য এককালে রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে বহুদিন ছিলুম।

এবার আমাদের বললেন—কলকাতা সহরটা ঠিকভাবে বাড়তে পেলোনা। ইমকলভমেন্ট ট্রাষ্ট করে প্রথমেই সাবানসে আমি কি করে বাড়ি-টাড়ি বানাদো উচিত ছিল। তা নয়, প্রথমেই সেল বড়বাজার অকলে, সেটাল এডিনিউ তৈরী করতে।

হু-তারগিন আসে কাগজেই মেবেছিলাম অথবা নিজেদের মধ্যে তর্ক হয়েছিল—মনোমোহন খিরেটার বর্তমান বিজন ষ্ট্রীট পোট অকিলে এসে না সেটাল এডিনিউ-এর ওপর। তর্ক এ সবচেয়ে মথ্য মনি। হল। বললেন—মনোমোহন খিরেটার ছিল এখন যেখানে সেটাল এডিনিউ মিশেছে বিজন ষ্ট্রীটের সঙ্গে—তারই উত্তর অংশে। বিজন ষ্ট্রীট পোট অকিলে ছিল বেঙ্গল ভূপানাল খিরেটার।

ঐটাই একবার খিরেটার বা গিল্লিবাবুকে বাদ দিয়েও চলেছে। তরা বেশ পরদাও করেছিল, বিশেষ করে এসোকেন্দ্রীর গল্প নিয়ে মাটক লিখিয়ে।

ওটা ছিল ছাড়ুবাবুর জমি, খিরেটারটাও ছিল ওদেরই। দ্রাসিক বাবার পয় অপর লম্বা ওখানে কিছুদিন অভিনয় করেছিলেন। দ্রাসিক ছিল কলোমহলার পুখারী দার, তারও অংশ তার দার ছিল প্রায়শঃ খিরেটার।

আগের দিনই বোর হয ট্রায় কোম্পানী জন্ম বাতাসের মোচল
হিসেবে, ভারী প্রসঙ্গ ফুলফুল,—সেখ সোনারবাথ আহারের হয়নি।
এই সেখ না, ট্রায় ভাড়া বাতাসের কথার সরকারের ব্যবহারটা কেমন
নীচতার পরিচায়ক। সরকার না জানলে কি ট্রায় কোম্পানী হই
করে ভাড়া বাড়িয়ে দিতে পারে?

আমাদের এই চান পাওরা স্বাধীনতার জন্মেই আহার্য সেপকে বড়
করে দেখতে শিখলুম না। একজন লোককে জেকে বললে—ওহে
আমরা সেলায়, ভার দেবে ত নাও আর ভার নিয়ে গিলে। তাতে
কি আর কিছু হয়। স্বাধীনতা বহি বিপ্লবের পথে আসতো ত কল
ভাল হত। হু চার জন কায়ু বলে তারা বিপ্লব করবে কিন্তু তারা
কিছু করতে পারছে না।

কোন কিছু করতে চলে ভাগ্য প্রজন্মের থাকা চাই। স্বাধীন না
কায় কথা আছে—স্বাধীন বহুরে এমন একজন দায়িত্ব আসে বার জন্মে
সেখ, সমাজ, ধর্ম, ধর্মমারক সবাই পথ করে সেখ—আমার সে ভাগ্য
ছিল না। চাটিলের সে ভাগ্য ছিল। নেপোলিয়ন সোফটা খুবই
পাকী ছিল—কিন্তু তাকেও সারাটা জীবন বিপ্লব ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই
করতে হয়েছে।

ধর্মের চেয়ে সেখ বড়। নিজাই ভট্টাচার্যকে বললুম, ঐ নিয়ে
একটা বই লিখতে। Religion বলতে বা বোঝার ধর্ম ঠিক
তা নয়। ধর্ম অর্থে ধারণা করা। নাটকের কাহিনীটা বলেছিলুম

বিশ্বনাথ আর বৌদ্ধবর্মের মতত মিল। একজন জেলে পাঠান
শক, হবকে—সেখ পবিত্র একজন সেনাপতির হৃদয়ে ফুল কখনো জন্ম
নেওয়া। স্বাধীন করে চেয়ে সেখ বে বড় একখাটা ঠিক বলা হ'লনা,
কিন্তু ভাবটা থাকল। ভালে থাকল না। একজন সত্যিকারের
ভাল নাট্যকার সেলুম না। এক হতে পারতেন কীরোব বিভাবিনোব
—বমেই পড়াভনা ছিল তাঁর, বুদ্ধিও ছিল কিন্তু চালাতে হত।
তিনজনের জন্ম তা চলনা—ওঁর দুই হোসে আর মহেন্দ্র বাবু।

মহেন্দ্র বাবু আহার্য আত্মীয় ছিলেন। তাঁর কাছে আহার্য জগতের
সীমা-পরিসীমা নেই। খুব ভালমাত্র ছিলেন, মনোমোহন পাণ্ডেকে
লাগা বলতেন বলে নাশিশ পবিত্র করলেন না। তাঁর নিমিত্ততার
বাড়ীতে গিয়ে আহার্য করে আসেনি এমন অভিনেতা তখনকার
গিলে ছিল না। কিন্তু চলে কি হবে, নাটকের তিনি কিছু বুঝেন না।

এই তিনজনের জোরে কীরোবাবাবু ভাবলেন—কে জেড়ের জেড়ে
শিল্পের জাদুড়ি যে'তার কথা শুনেতে হবে।

—কীরোবাবাবুর 'আলমগীর' পাবার পর জারী মজার। বইটা
অপেক্ষে বাবু নিরোজলেন। যখন কোম্পানীর ওখানে আমি কোন
বই-ই পছন্দ করছিলাম ওখাও আহার্যে ভাড়াতে তৈরী; এমন সময়
মহেন্দ্র বাবু বললেন—কীরোবাবাবুর নাটক গেল।

ধোঁয়া কয়ালে উনি বললেন, বই ত আছে, কিন্তু সেটা যে
অপেক্ষেবাবুর কাছে রয়েছে। বললুম—পড়তে পারেন?



উ-আর-সি-এল এর

কুমারেশ

লিভার ও পোট্টো পীড়না

১২৫

দি ওবিয়াক্যাল বিসাক্স অগাঙ্ক চমিকাল লাবরেটরী লিঃ



কোলকাতা বগাম মধুপুর



চন্দ্র মৌকদে বেতায় ভর্তি 'জলহিন'। ভুতোদা থাকেন
হুত্রে। কোলকাতার বেড়াতে এসেছেন করেবিসের
ভক্ত। তাঁকে কেপাবার চেষ্টা করছিল হোসেহোকার হপ।
বিলক কি ভুতোদা, লহর দেখতে এসেছেন? লাসলে
জাবেন। রাতার টার চাপা পড়বেননা।

ভুতোদাঃ (অগ্রসর হুখে) হ্যাঃ বা তোদের লহরের হিরি।
বিলকঃ সেকি ভুতোদা, কোলকাতার হত এত পোনার
লহর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদাঃ লহর না ছাই। রাতার বেরোনের জো নেই।
একটু বীরে হুখে চলেছো কি হুড়িজন খাড়ের ওপর হাফলে
পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম। বিমলা তুই
কল্যা—তুই তো ছিল আমার সঙ্গে।

বিলকঃ ভুতোদা চৌরহীতে রাবরাতার দাড়িয়ে একটু
অগ্রেস করে পানজর্দা খাচ্ছিলেন। আর বাবে কোথায়।
খাঁচ খাঁচ করে প্রায় পকাশটা গাড়ী গুর ইকি কয়েক হুখে
অটকে গেল। উনি পানজর্দা হুখে দিয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে
'ভাল আশা' বলে বিরক্তহুখে রাতা পেরিয়ে এসেন। ট্রাফিক
পুলিসেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন
কেটন দিয়ে হী করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।
ভুতোদাঃ আচ্ছা তোরাই বল। বিকলে বেড়াতে গিয়ে
একটু অরাম করে পানজর্দাও খেতে পারবনা? একি
লহরের হিরি! আমার হুখের চেয়ে বতি ভাল।

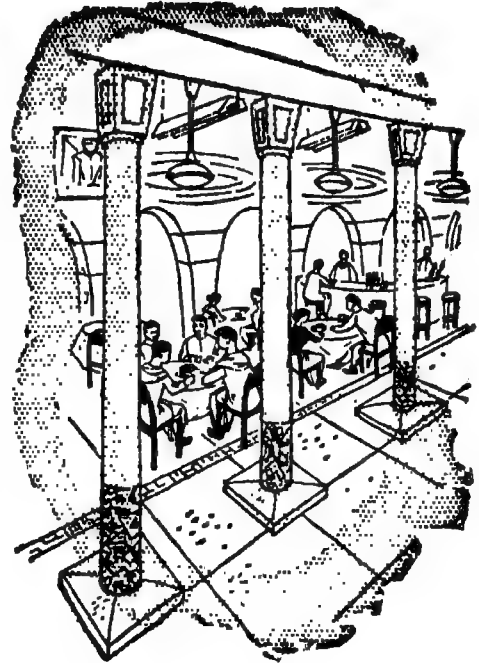
বিলকঃ হুত্রে আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতার
পুলার হিরে বাঁদের হুত্রে পর্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার
অকল্যাচারী—

ভুতোদাঃ হাঃ হাঃ তোদের কোলকাতার পয়সা হিরেও
কম পায়রা যায়না।

বিলকঃ বিলক (একসঙ্গে) : কি! কি! :

বিলকঃ বলুন কি চাই আপনার—এরোনের? চাখইসের
ভিন্ন? এমদাইলোখিভিয়া?

ভুতোদাঃ (হাসিমুখে) কাকা হুত্রে হাওয়া। বিলক আর



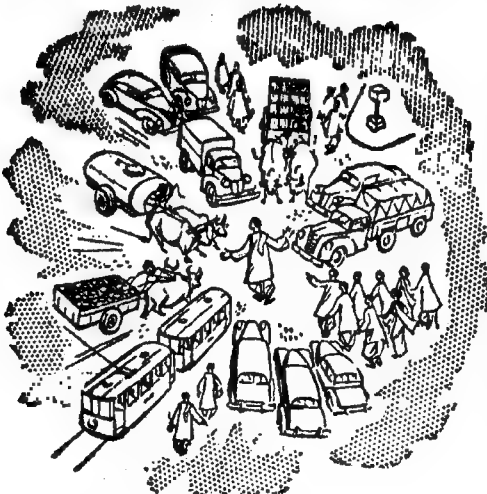
বিলক একেবারে হুপলে গেল।

ভুতোদাঃ সকালবেলা বখন পাহাড় জঙ্গল নদীর ওপর
থেকে হাটার পথ বেধে সে হাওয়া সর্বাঙ্গে আদর করে
হাট্র তখন হুত্রে হুত্রে কাছি।

এ খোঁজা কালি সিমেন্টের গরাদখানার সে হাওয়ার মর্গ
তোলা বুঝিবারে। কিন্তু শুধু খোলা হাওয়াই না। আরও
অনেক কিছু পাওয়া যায়না তাদের এ সহরে।

ভুতোদাঃ কাল বাজারে গিয়েছিলাম। সব হোল একটু মাছটা
কলটা ফেনার। কিন্তু মূল্যের দোকানে বা ব্যাপার দেখলাম।
দিমল আর বিনয় দাবড়ে এ গুর মূখের দিকে তাকাল।
কোয়ার ভব করছেন ভুতোদা কদমর। আবার কি যে
ছাড়েন।

বিনয়ঃ কি ব্যাপার ?
ভুতোদাঃ এক খন্ডের হুইকে কি নাভেহালটাই করলে ?
যেব আদামের মধুগুর হুই ফেলাকাঠি নিয়ে পেটাতো।



বিনয়ঃ কলুই না কি করলে ?

ভুতোদাঃ খন্ডের চেয়েছে 'ডালডা'। মূদী যেই 'ডালডার'
টিনে হাতাটা ঢুকিয়েছে খন্ডের রেগে খুন। বলে "তুমি
লোক ঠকাবার কারগা পাওনি ? 'ডালডা' তো পাওয়া
হায় শীলকরা টিনে। খোলা আজেবাজে কি গছাচ্ছ
আমায় ?" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে "দেখুন তো
হশাই 'ডালডার' এত কাটতি বলে এরা সব আজেবাজে
জিনিষ 'ডালডার' নামে বিক্রী করছে। 'ডালডা' কখনও
খোলা অবহার পাওয়া যায়না।"

বিনয়ঃ আপনি কি বললেন ভুতোদা ?

ভুতোদাঃ আমি তো হেসেই অস্থির। ভুতোদাককে
বললাম—হশাই আপনার এ সহরের হালচালই আলাদা।

মধুগুরে বিশিষ্ট হুইর কাছ থেকে খোলা 'ডালডাই' কো
আমরা কিনে থাকি।" ভুতোদাক খেলের বেজার চটে।
কালেন—“আপনি 'ডালডা' কেনেন না আরো কিছু।
কেনেন বড খোলা জিনিষ হাতে খুলোময়লা আর হাঙ্গি
কলে” বলে গাটগট করে চলে গেলেন। (ভুতোদার আটহানি)
বিনয় আর বিনয় আরো কোরে হেসে উঠল। ভুতোদার
হাসি গেল দিলিরে। উনি ভেবেছেন কোয়ার ভব করছেন
ভবের কিন্তু ভবের হাবভাব দেখে তো তা মনে হচ্ছিল।
বিনয়ঃ খোলা হাওয়া আর খোলা 'ডালডা'—অ্যাছা
কি ডারেট—হাঃ হাঃ

ভুতোদাঃ হাসির কি হোল ?
বিনয়ঃ ভুতোদাক আপনাকে ঠিকই বলেছেন। 'ডালডা'
কখনও খোলা অবহার বিক্রী হয়না। ভুতোদা (চটে)
ভবে মধুগুরে আমরা কি খাই ? বিনয়ঃ ভুতোদাক বা
বলেছেন তাই। কারণ 'ডালডা' কোন কারগাতেই খোলা
অবহার পাওয়া যায়না।

ভুতোদাঃ দ্যাখ ! বাদাগকে হাইকোট দেবাজিস ? বিনয়ঃ
আপনি এই রেটুরেটের মালিক হরেনদাকে জিজ্ঞাস করবেন।
বাড়ীতে মিহ্মদিকেও জিজ্ঞাসা করবেন।

হরেনদাঃ হ্যা, ওরা ঠিকই বলেছে। আমার 'ডালডা' নিয়েই
তো কারবার 'ডালডা' পাওয়া বার একমাত্র শীলকরা
বায়রোধক টিনে—হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।

বিনয়ঃ শীলকরা টিনে 'ডালডা' তাজা ফুরুরে হাওয়ার
মতই ডাল অবহার পাওয়া বার।

ভুতোদা চুপসে গেলেন। মিনমিন করে একবার বললেন
“খোলা হাওয়া তো নেই এখানে।”

বিনয়ঃ একটা লেগেছে ভুতোদা। সেকেওটা মিসকারার
হয়ে গেল।



হিন্দুস্তান লিটারেচর, খোলাই

ভালো উনি কলসেন—সেখা ত আমার কাছেই আছে।

পড়া হল, খুব বাখান লাগলো না। ঠেকে বললুম—কিছু কলসোনা মকরান।

কলসেন—না ভায়া কেটো টেটোনা।

আমি আর ললিত মিলে বেশ করে কাটলুম। ভবন বটীয়ার দাঁধ ছিল 'ভীমসিংহ'। এখন বা সেখা আছে ডাডাডা আরও চারটি বৃত্ত ছিল—ভীম সিংহ জয়সিংহের কপড়ার কার্পণটা ভাতে বর্ণনা করা ছিল। রাজসিংহ যে হরিবীর প্রেমে পড়ে অস্তর করেছিলেন ভীমও বর্ণনা ছিল।

হাই হোক, অভিনয় করার ব্যবস্থা হল। মহেন্দ্রাবাবু পাঁচশ টাকা দিয়ে right কিনে নিলে ম। কিন্তু সবাই বললে—ও বই পাঁচশে না। কিন্তু প্রথম দিনেই বহু বৃত্ত থেকে বইটা আলোড়ন ফুলল।

মহেন্দ্রাবাবুর গলা খুব ভাল ছিল। আজকের দিনে আমার হাতা অমন গলা কারো নেই। তবে সামাজিক নাটকে খুব সুবিধে করতে পারতেন না। গলা ছিল অল্প মিষ্টিবের। অনেক বয়েসেও গলা একই মত ছিল। তবে, খেলাতে পারতেন না। ঠাঁর তুলনায় গিরিশবাবুর গলা নিবেশ ছিল। তবে, অল্পত বোস যশার বলেছিলেন—বয়েস কালে গিরিশবাবুর গলা ত শোনি ভায়া। অল্পতর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। কিন্তু তিনি যে গলা দিয়ে গিয়েছিলেন। লোক যেমন ভগ্নরাথকে কল বা হাত ঘের, উনি তেমনি গলা দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় অত্যধিক বক্তৃতাতে গলা নষ্ট হয়েছিল তাঁর।

অল্পতাবাবু আবার এসব অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্বাস করতেন। গিরিশবাবু ঠাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন না, ছিলেন spiritual গুরু। ঠাঁর ঠাঁটে হাত দিয়ে কি সব বেন ঘটিয়েছিলেন। উনি আবার আমার খুব ঘেঁষ করতেন। বলতেন—সব কথা তোমাকেই বলে বাব। তুমিই তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

আমাকে দ্রোহ করার কারণ ছিল। আমি ছাড়া ত ঠাঁকে কেউ জ্ঞানকমি। নাট্যমঞ্চের খেলার পর, সেল পূর্ণিমার রাতে 'বসন্তলীলা' অভিনয়ে ঠাঁকে নিয়ন্ত্রণ করে কপালে কাগ মাখিয়ে দিলুম ঠাঁকে হুকিয়ে। দানীবাগুতেও ঠাঁকে এনেছিলুম, কিন্তু তিনি ঠাঁকে মারলেন না। বললেন—আমি কিছু থাকবো না আমার কাজ আছে। সেখানে আবার ছাফগাটী পাড়িয়ে, কলমে—ঠাঁ ঠাঁ ঠাঁর কাজ আছে। গিরিশবাবুর সময় গিরিশবাবু, হুই অল্পত আর অর্জুনবাবু ছাড়াও হু-পাঁচজন অভিনেতা ছিলেন বাঁয়ে কমতা ছিল না কিন্তু অশিক্ষিত-পটুই ছিল। আমার ভাই তারাকুমারেরও ঠাঁ পটুই ছিল। একটা ভূমিকা হু-চারবার পড়ার পরেই জমিষটা বুদ্ধতে পারলে করতে পারতো। অভিনেতার কতকগুলি মূল বিবর জানতে হয়। প্রথম কথাট হচ্ছে, ভূমিকাটার অর্থ ধরা আর সেই অনুযায়ী অভিনয় করা। এর জন্য কিছু লেখাপড়া করা দরকার। আবেদার দিনে লেখাপড়ার চর্চা অনেক বেশী ছিল। আমাদের বাড়িতে এক বেশী ছিল যে অল্প বয়সেই বেশ পাকা হয়ে উঠেছিলুম। আমার এক মাস্টার ছিলেন—বি-এর ছাত্র, আর এক দাদা ছিলেন। ঠাঁর কাছ কিছু-বি-এ লেখা করা।

শৈলেন (ঠাঁবী) ভাল অভিনেতা ছিল। কিন্তু কমতা করে

ভীম বুঝেই মাথা পেল। কিন্তু বেশ ভালই অভিনয় করতো।

কীর্ত্তোবাবুর কবিতা খুবই ভাল। ববীন্দ্রনাথের সমানই প্রাণ। হবিবাবু আমাদের দেশের চন্দ্র, লুৎ, প্রহরাদা, সমর সৌরভপল বট, কিন্তু পৃথিবীর চিত্তাধারার তাঁর লান কতটা? শেলী আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের বা মূল্য আছে, হবিবাবুর সেখানে কি তা আছে?

আমার এক আত্মীয়ও খুব ভাল অভিনয় করতেন, অল্পত সামাজিক নাটকে সুবিধে হত না। কিন্তু অভিনয়ের প্রকৃত পরীক্ষা হয় সামাজিক নাটকে।

আমার বক্তৃতামা বোলপুরে থাকেন, ঠাঁর খুব কবিতা পড়ার চোঁক। সেদিন চণ্ডীদাস, বিভূষণের বই পাঠালুম—তা পড়ে গিগেভেন—কি মন্দম সেখা, আজ-কাল ত' কই এমন সেখা হয় না।

বিভূষণের সেখার লোবের কথা বললে মটু আবার হুখ করবে। কিন্তু কীর্ত্তোবাবুর 'ভীম' মজাভাবের অভ্যুত্থান, কাজেই বেশ ভাল সেখা হয়েছে। সেখাটা বসিও সবটাই কবিতা নয়, তবু মাঝে কিছুটা অংশ সত্যি সত্যি কবিতা হয়েছে। নয়দারারণ ত' আরও ভাল সেখা।

কীর্ত্তোবাবুর হব্বীর মল্লন ভো-পানীতে করিয়েছিল। খুব ভাল সাঙ্গোক্ত করিয়েছিল, হব্বীরকে মাখার পালক-টালক পরিচয়ছিল, কিন্তু হব্বীর যে ব্রাহ্মণ সে কথা ভুলে গিয়েছিল।

—একভিসনে 'সীতা' করার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। বট্টাট ইনস্টিটিউটে করার কথা হয়েছিল। কিন্তু বিভাসালের দিন তিন-চারজনের বেকী কেউ এল না। ইতিমধ্যে একভিসনের কর্ত্তারা এসে বললেন—সাত দিনে চারটে বই করতে হবে। আমি জানি ওসব হবে-চাবে না। সীতাই বিভাসাল গিলুম। ঠাঁর কিন্তু খুব ভাল সাঙ্গানো হয়েছিল। বৃত্তপট অপরূপ হয়েছিল। প্রত্যেক দিন চল ভর্ত্তি থাকত।

ঠাঁকে ১৯২৪ থেকে ১৯২৮-২৯ পর্যন্ত আমার বোহরর কোন বই রূপ করেনি। পাখাঘাটে শেষ দিনেও সামল (৭০০) টাকা বিক্রী হয়েছিল। কিন্তু অল্পত কাশে অভিনয় বন্ধ করতে হয়েছিল। (আগর কোন বই-ট ভুলিয়ে বেকী লাগেনি, ভীম কিন্তু তিনদিন পড়তে লাগল। ১৮ই সেপ্টেম্বর পড়া শেষ করলেন মট্টা।)

সেদিন প্রথমে এসেই বললেন ভাট্টা বড় কষ্ট মিছে। আমরা বললাম—ভাট্টা চন্দ্রকে দেখান না কেন?

বললেন—ভাট্টা চন্দ্রব সঙ্গে সেখা করিমা, উত্তরলোককে শুধু শুধু বাস্ত করা হবে বলে। উনি প্রভুভ ভাল, বোকা হাভির দশটা সাড়ে দশটার সময় ওপাশ ভাঁর আসে আমার সঙ্গে গল্প করে যেতেন। এমিকে লিকলে সাড়ে চাকটার সময় কাজকর্ম শেষে হুমাতে যেতেন, উমাতেন সাড়টা স'সাড়টার; তাহবপর আমার কাজ শুরু করতেন। কাজ শু খুবই করতেন কিন্তু সেখানেন কাক? উনি যেমন অল্পলোকের কাক শিখেছিলেন তেমনি নিজের শিষ্যশ্রেনী করতেন কই? সাহেব ডাক্তারবা কিছু চোঁটা এ বিষয়ে বরক করেছিলেন। ওদের সেখা এ ভিনিষটা অনেক বেশী আছে।

—আমাদের দেশে সত্যিকারের বড় নাট্যকার হল না।

কীর্ত্তোবাবু হতে পারতেন কিন্তু ঠাঁর ভিনিয়াল হতে বিল না।

৩য় ফেলো 'জ' নিজেদের জিনিয়াস বলে মনে করত। যোবাও, এ বৃত্ত লেখ, ও বৃত্ত লেখ; এখানে এ কথা দাঁড়, ওখানে ও কথা দাঁড়; আর তুমি এত বড় নাট্যকার তোমার কি না ডেকের ডেকে শিশির ভারিফির কথা ভনে চলেতে হবে।

লোক বলে—আমি সেকলে পুথোনে। বইতেই অভিনয় করতে ভালবাসি। কিন্তু আজকালকার দিনে নাটক কই? নতুন নাটক বলতে তো কমুয়া বোরে নীলদর্পণ কিন্তু নীলদর্পণও ১৮৭২ সালে অভিনয় হয়েছে।

শিশিরবাবু 'ঐক্যসিদ্ধি' পড়ে দেখ মনে হবে আজকের দিনের ঘটনা নিয়ে লেখা। অথচ মনে রেখো বইটা লেখা হয়েছে ১৮৮২-৮৩ সালে, ঠিক কোন বছরে লেখা হয়েছে মনে নেই, স্মৃতিক্রান্তি আজকাল বড় কম হয়ে বাছে।

ফেলোদের পড়াশোনা করানো হয়কার। তার জন্য হ্যাটার দশারের Sincerity প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসররাও Sincere নয়।

শশীবাবু বলে এক ভয়লোক আছেন না, এখন রায়তল্ল অধ্যাপক। আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে গেলেন ফেলোদের কাছে কিছু বলার জন্যে। গিরে বেশি গল্প বলে আছে। তাকে যে আমি আসব এ কথা বলা হয়নি বুলুম।

বাই হোক, আমি উঠে পাড়িয়ে ছুঁ-চারটে বাঁধিগৎ নিলুম—ফেলোদের নাটক পড়া দরকার, বড় নাটক পড়বে ভত্ত জ্ঞান বাড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলার পর শশীবাবু এসে বললেন—চলুন এবার একটু চা-টা খাবেন।

বললুম—শব্দ বাবে না?

তা ভয়লোক আমতা আমতা করে বললেন—না মানে উনি এখন কিছু বলবেন। বললুম—কেন? শব্দ আমার সামনে বলতে পারে না? তা শব্দ কিছু বললো না। উঠে শুধু বললেন—উনি যা বলেছেন তারপর আমার বলা সাজে না। উনি যা বললেন তাই করা দরকার। এর পর আমার 'মহাপ্রস্থান'-এর কথা উঠল, বললেন—এ বই লিখতে পারতেন ক্ষীরোদবাবু। শিশিরবাবু লিখলে অল্প বয়সে পঁড়াতো। সন্তোষ বাবু যে মহাপ্রস্থান লিখেছেন তার পুরটা ছিল বড় চমৎকার।

আমরা এর করলাম—ওটা লেখাতে আপনি কিছু সাহায্য করেছিলেন কি?

বললেন—সাহায্য করেছিলুম কি না কি করে বলব বল, প্রমাণ কোথায়? বললে আমার কথা কে বিশ্বাস করবে? প্রমাণ অবশ্য সবই ছিল কিন্তু এমন সব লোক দিয়ে চারপাশে পরিবৃত্ত ছিলুম, যে কারকে দিয়ে কোন কাজই হয়নি। মহাপ্রস্থানের অভিনয়ে সার্টি আমার কাছে নেই, আর ছাপা বইটা অভিনীত নাটক থেকে অনেক পৃথক।

'নীলদর্পণ' করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাইশটা মেরে আর পেচুম না। তোমরা আমাকে তিন-চারটি মেরে আর সাত-আটটি ফেলে দাও, একটা কিছু করি। এত দিন ধরে কি আর করেছি, কত করবার ছিল। কত দিন আর বাঁচব একটা বাড়ি দাও, কিছু করি।

পটল প্রথমে গাছদারী করেছিল, ভালই করেছিল কিন্তু পটলের পছন্দ হল না। তাই বিত্তীয় দিন থেকে নীহাংকে বেওয়া হ'ল। নীহাং কিন্তু ভত্ত ভাল করেনি। এখন যিসেই কাপড়ে আসল লোক

বাওরার কি চোনেটি, বলে—ভর্তস্বামিকে শাপ দিয়ে, আমার এই হয়বহা। পূর্বকন নায়াংবকে আমার মেরে শাপ দেওয়ালে, কত বড় শাপ করলে।

ডাঃ আধিকারী এককণ চোখ বুজে সিগারেটান দিচ্ছিলেন—এবার গভীর ভাবে শেখটুকু খোস করে দিলেন—হ্যাঁ, বললই হাউমাউ করে সে কি কারা। ভায় পড়া খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছিল। নিত্যকার মত চা খাবার পর কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। ডাঃ আধিকারী হঠাৎ—কাবতা আবৃত্তি করল না। একটু অপাতি করে থাকা হয়ে গেলেন। পালের ঘর থেকে পুরবী এল, তার থেকে সত্যোক্তনাতকে উদ্ধৃত করে লেখা কবিতাটি পড়ে বললেন—এই কাবতাটি অত্যন্ত সুন্দর। এর পর 'আবাহন' কবিতাটি আবৃত্তি করে বললেন—কাবতাটিতে যে রাসসমুদ্রবীর কথা আছে তা কোন নারীর কথা নয়। কাবর inspiration অনেক দিক থেকে আসতে পারে আর তারই তপ হ'ল রাসসমুদ্রবীর।

রবীন্দ্রনাথের এই কাবতার শেলীর প্রভাব বেশ দেখা যায়, কিন্তু গভীরতার দিক থেকে শেলী অনেক বড়। শেলীর Hymn to intellectualityতে যে গভীরতা আছে রবীন্দ্রবাবু লেখার তা দেখা যায় না। লোকে অবশ্য বলে, রবীন্দ্রবাবু গান আর গীতিকবিতা খুব ভাল, কিন্তু গভীরতার দিক থেকে তিনি পৃথিবীকে কড়ী দিয়েছেন সে কথা কেউ বলে না।

[কমলা]

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



প্রতি প্যাকেট
২৪ টি
বড় মোড়ালের

- কলমে প্রস্তুত
- ফ্রীজে সেকা
- মোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সঞ্চয় রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্সল্টেশনারী

কলিকতা - ২৯

ভাবি এক, হয় আর

ঐলিপিভূমার রায়

বাইশ

হঠাৎ শাপিরোর কাজের চাপ বেড়ে গেল। পর পর পাঁচ-ছয় দিন ও সন্ধ্যারও কিয়তে পারল না। শুধু সকালে একটাবার দেখা হত প্রান্তরাসে।

যদি সাতকে অভিরিক্ত পরিভ্রমের কলে শাপিরো দখা নিল। মাঝার জ্ঞানার সে তাকাত পায়ত না—আত্মবাহক বর ও যদি। পরব হোটেলে নিজের বরকে একটি বড় বর নিয়ে শাপিরোকে আনিবে তার পালের বিধানার তত। শাপিরো মাঝে মাঝে 'জল জল' ক'রে চিককার করলে তার কাজ ছিল তাকে জল নেওয়া ও হাওয়া করা।

ডিম তার যদি বাদে সে বিধানা থেকে উঠতে পরব বলল। শাপিরো, সাত ভাড়াভাড়ি কাজ আরম্ভ করলে মাঝা বাবে। চলো তার চেয়ে ছুটি মিলে সাত আট দিনের জন্তে কোথাও বেড়াতে—ভেনিসে বা ব্রুকলিং-তে বা আর কোথাও—যেখানে তোমার ইচ্ছা।

শাপিরো হান হেসে বলল যে তার হাতে টাকা খুবই কম হ'লে কোথাও বেড়াতে যাবার সময় খরচ-সকলান করা তার সাধ্যাত নয়।

বদী পিতার একমাত্র বংশধরের অনুরূপতার পরেও অর্থাভাবে কোথাও বেড়াতে বাওয়া অসম্ভব ভেবে পরবের চোখের পাতা ভিক্সে উঠল। সে বলল : শাপিরো, তুমি জানো এক্সচেঞ্জের সুরিধের একল আদাসের কাছে ইতালির লিরা এখন সস্তা। তাই তোমার কোনও আপত্তি আমি জ্ঞানব না। আমার—তোমার বন্ধুর—অভিবি হ'লেই তোমাকে বেতে হবে। বাধ 'না' বলা তাহলে বুঝব বন্ধুর তোমার কাছে বড় নয়, বড় সেই সামান্য টাকা, বাকি ফুঙ্ক করতে পিছেই বলে তুমি কথার কথার বড়াই করে।

অনুহ শাপিরোর চোখ হলহল করে উঠল। সে আর একটিও কথা না বলে হাঙ্কি হল। কেবল বলল : একটি বার ভেনিস দেখবার আমার অনেক দিন থেকে সাধ।

এসে উঠে শাপিরো ও পরব একটি কুপেতে পাশাপাশি বার্ষে কল। শাপিরো হঠাৎ বলল : কসারে আশ্চর্য জিনিসের ভাই অবধি নেই। কিন্তু তবুও আশ্চর্যের মধ্যে একটি লেগা আশ্চর্য কী হলো তো ?

পরব হেসে বলল : তোমার কাজ থেকে ছুটি নেওয়া ?

শাপিরোও হাসল : বটে। কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার ভাব। ভেবে দেখ : কোথায় তুমি আর কোথায় আমি ? তুমি ভগবান জানো, আমি মানি না। কলমভিকের তুমি নিষ্ঠুর ও ভ্রান্ত মনে করো, আমি মনে করি হৃদয়ের বন্ধু ও জানী। শাস্ত্রবাক্যে তোমার আদ্বা আছে, আমার নেই। নিরীহতাকে তুমি ধর্ম মনে করো, আমি মনে করি অধর্ম। একক ভোমায় আমার মধ্যে বিলম্ব হল—এর চেয়ে আশ্চর্য কী হতে পারে, কলম তো ? যেহে ভালোবাসার আমি বিলাস বাসাতে

বসেছিলাম, তবুও আর ভাবিই কাঁচ হয়ে এসেছিল। শুধু তোমার হোঁচকার মনে হচ্ছে নয়, পাছের ভালে কেবল কুল কুল না।

ডেইল

ভেনিসে ট্রিপ পৌঁছল সন্ধ্যাবেলা। এপ্রিল মাস—বসন্তকাল, তার উপর গুরুপক। পরব ও শাপিরো ভেনিস দেখে উচ্ছলিত হয়ে উঠল। শাপিরো বলল সর্বস্ব : দেখ, মাদ্রুয়ের কাঁড়ি

কীতিই বটে। মনে হয় সত্যিই কলনার ডেলায় ওরা এসে পড়েছে কোন অচিন-চেনা স্বপ্নরাজ্যে।

সন্ধ্যা আটটার ওরা দুজনে একটি গাওলা ভাড়া করে বেয়িরে পড়ল। জলের হাওয়া, দুধারে সাব সাব বাতিলুলিতে বেন বোরালি দিরেছে। এখানে কি প্রতিভাতের উৎসব নীপালি ? বলল পরব। শাপিরো বলল : সত্যি, সৌন্দর্যে তুলিয়ে দেব নীপনের বড় সৈন্ত, গ্রানি।

পরব হেসে বলে : তবে যে কথার কথার বলো হুজি চাওনা তুল ? মাদ্রুয় প্রতিদিনই চার লক্ষ বন্ধন থেকে মুক্তি। আদ্বা থিয়েটার দেখে তুলে থাকি, উৎসবে তুলে থাকি, কোমো চমৎকার বই পড়তে পড়তে তুলে থাকি। তবু হুম'মি বটাবে তোমরা কখনই বত অপরাধ করেছে সেই।

শাপিরো উত্তর নিল না। কেবল চেয়ে চেয়ে দেখে। পরব ও দেখে। কথার বেশ যেন আপনা আপনি খেমে যায় কপাখিট ভয়রতায়।

মাথার উপরে নির্মল আকাশে চাঁদ হেসে গড়িয়ে পড়ছে। হুপাশে ভ্রাম্যন্ত হর্ম্যরাজি কুলাত জলের বুকে দাঁড়িয়ে কোন এক অপক্লপের স্বপ্নে বিভোর। মাঝে মাঝে এক একটা মেঘের ছায়া জলের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে সামনে, পিছনে, কাছে দূরে। আলে পাশে ছোট বড় গুপ্তোলা। কোনোটার কেউ গাইছে। কোনোটার বাজছে ম্যাগোলিন, গিটার বা বেহালা। কোনোটার ফুলমুগ্ধি পাশাপাশি বলে পরশবের কটি বেটন ক'রে। এখানে ওখানে কেউ বা প্রিয়সঙ্গিনীকে চুমন করছে। কোথাও বা একটি মাত্র বাজী অর্ধশায়িত হ'লে শুয়ে—চাঁদের নিকে চেয়ে। এক একটা বড় গুপ্তোলায় মিলিত রূপালি হাসির বান ডেকে যায়।

ওরা জলপথ অভিক্রম ক'রে সহজে গিন্ন পড়ে। ওপাশে লিজো নগরী। সেখানে একটি কাঁকতে দু পেরালা কবি খেয়ে কিংবে ওরা গুপ্তোলায় এসে বসে—ভেনিসে কিংবে। মাঝে মাঝে পাল দিয়ে টিমার সাইরেন বাজিয়ে হু হু ক'রে চলে যায়। বাজীরে কোরাস গান বাতাসে ভেসে আসে। অনুরে ভেনিসের তটের কালো জোয়ার উপরে লক্ষ নীপমালার বিকিমিকি। ওরা চুপ ক'রে হুগ নেজে দেখে চেয়ে চেয়ে।

হঠাৎ পাশের একটি গুপ্তোলায় নারীকণ্ঠের কলহাস্ত। পরব তাকাতই দেখে একটি গুরুবন্দা একজন পুরুষের পাশে ব'সে হাসতে হাসতে গুপ্তোলায় প্রায় শুয়ে পড়ে আর কি। সঙ্গে তার ছুটি সঙ্গী। পুরুষটি ইতালিয়ার ভাষার মেয়েটিকে বলে : কী করো ? গুপ্তোলা ডুবিয়ে দেবে না কি ?

বলতেই অর্ধশায়িতা কেন হেসে উঠে বলে : তোমারো এত তব ? তুমি না বিখ্যাত সীতাক ? পরবের কুকের বক্ত বেন হির হয়েছিল। আর তো কলমের পথ নেই। এখানে এছাড়া

মিষ্টি স্নরের নাচের তালে মিষ্টি স্নরের খেলা
আনন্দ-হর্ষে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্মুটের

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্মুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

কেবল একজনই হাসতে পারে—এ বর তো আর কার হতে পারে না। এ হাসি, এ বর আহাবে-বিহারে যে ও চলতে-কিনতে শুনেছে সিন্ধুর পথ দিন—স্বপ্নেও শুনেছে হাতের পর হাত। বার সাধারণ কাহিনীকে জপ করে এসেছে ওর প্রাণি রক্তবিন্দু—না, না—এ কি সম্ভব? এখানে আইরিন কেমন ক’রে আসবে এ ভাবে, আর একজন পরপুরুষের সঙ্গে? এ পারে শুধু বিলাসিনী, বিবাহিনী নয়। উদ্ভবনার ও গণ্ডোলায় উঠে পড়ালো।

হঠাৎ সুহাসিনীর চোখ পড়ল ওর পানে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠল। কেহও গণ্ডোলা—কেহও।

মাঝি আশ্চর্য হ’য়ে বলল : কেন? ভেনিস তো এই দিকে।

আইরিন বলল : হোক—কোথো।

পল্লবের মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল। ও বসে পড়ল।

চবিশ

আইরিনদের গণ্ডোলা কিংবা লিভার দিকে চলে গেল। পল্লব বিহঙ্গের মতন চূপ ক’রে বসে ঐ রানায়মান গণ্ডোলাটির দিকে তাকিয়ে রইল একমুগ্ধ। যিনিট পাঁচেক পরে নৌকাটি একটি ছোট্ট বিলুপ্ত-জন্তু দেখায়—পরে তাও মিলিয়ে বার।

আর লম্বার পথ কোথায়? আইরিন তাকে ভুলেছে নিশ্চয়ই এই নবলক প্রণয়টির টানে। সব পরিষ্কার হ’য়ে গেল। প্রথম দিকে ছোট্ট ছবি-কার্ড পাঠালো, পরে তাও বন্ধ। নাতাশা নিশ্চয়ই দুইজকে সব বলেছে, সে ওকে ব্যাখ্যা দিতে চারনি বলেই কিছু লেখেনি।

পল্লবের মন এক দুবিধ তিক্ততার ভরে উঠল : এরই নাম রমণীর প্রেম। দ্বিধাশরীর—

শাপিরা ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল, কিন্তু কথা কইল না।

পল্লব গাঢ় কর্তৃক বলল : শাপিরা—আমি—কথাটা অসমাপ্তই থেকে যার।

আইরিন? তোমার ভুল হয়নি?

ভুল?

শাপিরা কের নিশ্চয়।

একটু পরে পল্লব বলল : এ কি ভাবা যায়, শাপিরা?

কী?

যে আইরিন আমার ভালোবাসেনি শুধু ভালোবাসা, অভিন্ন—শাপিরা ওর হাতের উপর চাপ দিয়ে বলে : হিঃ, ভাই। এমন অস্বাভাবিক কথা আমি অল্পত তোমার কাছে আশা করিনি।

অস্বাভাবিক?

নয়? আমি জানি না—ঐ পুরুষটিই ওর প্রণয়ী কিনা। হ’তেও পারে—বহিঃ না-ও হ’তে পারে, এই কথাটিও ভুলো না। কিন্তু যদি হয়ও—আর যদি এই কথাই সত্য হয় যে, ওর জন্মেই আইরিন তোমাকে জাগ্রত করেছে, তাহলেও কেমন ক’রে তুমি জোর ক’রে বলতে পারো যে, এখন তোমাকে ও ভালোবেসেছিল তখন সেটা তুমি অভিন্নই ছিল?

পল্লব কঠিন হেসে উঠল : এ তোমার বন-ভোলানো কথা শাপিরা। সত্যি ভালোবাসাও অনেক সময়ে স্থায়ী হয় না, ভুলেছি

—কিন্তু তাই ব’লে এত চুপে হয় না—হ’তে পারে না। দু’দিনও তবু সইল না?

শাপিরোর মুখে কল্প হাসি ফুটে ওঠে : ভাই, সঙ্গারে কিসে লকী হয় কেউ কি জানে? আমরা কয়েকটা খিওরি খাড়া ক’রে চলি নিজের ইচ্ছা বা পুবিদ্যার অমৃত ইজিতে বৈ তো নয়। পরে যখন দেখি যে, সঙ্গারে সে খিওরি খাটে না তখন অকারণ ক্ষুব্ধ হই সঙ্গারের উপর—এটিই না বুঝে যে, সঙ্গারকে আমরা জানতে, বুঝতে চিনতে শিখি না ব’লেই যা খাই। তোমাকে একটি মাত্র উদাহরণ দেব।

সোনিয়ার কথা তোমাকে বলেছি। আজ আমার মনের বাসনাব সব কুয়াশা কেটে গেছে ব’লে আমি ভাবি, অনেক সময়েই যে তাকে কোনো দিনই আমি সত্যি ভালোবাসি নি—বেহেতু তার পুতি আমার মনে আর এতটুকুও ক্ষোভ কি পুঙ্ক জাগায় না। কিন্তু একদিনের কথা বলি শোনো। আমরা তখন পরস্পরের প্রতি ভেমনি আনন্দে চেয়ে থাকতাম, যেমন আনন্দে ঐ চাঁদ চেয়ে আছে এই সমুদ্রের পানে। আমাদের মনে হ’ত যে, একজন দু’দিনের জন্তেও অপরের চোখের আড়াল হ’লে এ জীবন উভয়ের পক্ষেই হ’য়ে পড়াবে ভুলই বেঁচে থাকে—শুভ অর্থহীন। বিজ্ঞরা শুনে মুহূর্তে বলেবন হয়ত যে, এরি নাম উচ্ছাসের মাত্রা—যে নয়কে হয় করে। কিন্তু সে টানকে নিজের উচ্ছাসের মধ্যে মাসাই বা বলি কেমন করে? যে টানের ফলে—কিন্তু ভবিষ্যৎ রেখে বলি ঘটনাটা।

সোনিয়াকে নিয়ে সেদিন সকালে আমি বেরিয়েছিলাম বনভোজন করতে—ভলগার তীরে এক মাঠে। চারদিকে ফুল ফুটেছে। নির্ঘেষ আকাশ নরম আলোর ছেয়ে গেছে। গাছে গাছে কত পাখিই যে জান ধরে দিয়েছে, কী বলব? আমার মন গান গাইছে—স্বর্গ শুধু কবির কল্পনা, কে বলে? এইই তো স্বর্গ—ধরা দিয়েছে প্রেমের ডাকে। আর হাস ছুয়েক বাসেই বাগমতী হবে পরিত্রা—তখন কী হবে ভাবতেও আমরা আত্মহারা। হাক।

আমরা বনভোজনের পর হাতধরাধরি করে চলেছি—এমনি লক্ষ্যহীন আনন্দে—এমন সময়ে চঠাৎ হৈ হৈ শব্দ। চেয়ে দেখি কি—সামনের মাঠে একটা লালক বসন হঠাৎ কেশে ছুটেছে। তার কর্তা কৃষক ভাবে ধরতে যেতেই বললটা কিংবা তার গুলপেটে এমন গুঁতো মিলে যে সে পড়ে গেল। সোনিয়া ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বললটা ছুটে এল ওই দিকে হয়ত আরো এইজন্মে যে, সোনিয়া পরেছিল টকটকে লাল পোশাক।

বললটা ছিল অতিভার, আর তার শিং ছুটো বারালো। দেখলাম, হুঁশো ছাত ঘুরে ভূমিশাখী কৃষকটার চারিদিকে শুধু বজ্র আর বজ্র—সে টোচ্ছা ছাতঘুরে, আর আশপাশের লোকে ভয় পেয়ে ছুটেছে যে বেদিকে পারে। এমনি সময়ে সোনিয়ার চীৎকার শুনে বললটা শিং নীচু করে ওর দিকে ছুটে এল। সোনিয়া ভয় পেয়ে ছুটল—বললটাও পৌ পৌ করতে করতে ওর পিছু নিল। চক্ষুর নিম্নে ঘটে গেল কাণ্ডটা। আমার মাথা ঘুরে উঠল—কিন্তু দু’তিন সেকেন্ডের জন্তে। তারপরই দেখি, সোনিয়ার মাত্র আট লম্বা হাত ঘুরে সেই বললটা। আমি পাগলের মত ছুটে গিয়ে লাফিয়ে পিছন থেকে ধরলাম সেজ। সঙ্গে সঙ্গে সে বিকট হাস্যরস করে কিংবা সোনিয়াকে ছেড়ে আমার দিকে। আমি ধরলাম ওর শিং। কিন্তু আমি জে পালায়নি নই,

দুর্ভাগ্য যতদূর সম্ভব পেরে উঠবে কেন? তার ঠেলায় পড়ে গেলাম। তারপরেই হঠাৎ ভান কীভাবে এসে বিধল ওর শিশু। ঢোল ও আমাকে শিঙে করে ঠেলে করে পা। ভাগ্যক্রমে সেখানে ছিল একটা ছোট ডোবা মতন। আমি পড়ে গেলাম ডোবার জলে। তারপর আর মনে নেই।

বখন জ্ঞান হল—দেখলাম আমি হাসপাতালে শুয়ে। পাশে সোনিয়া, কেঁদে কেঁদে ওর চোখ-যুথ ফুলে উঠেছে। তিন মাস হাসপাতালে থেকে মুক্তি পাই। ঐ ডোবাটা না থাকলে হয়ত প্রাণে বাঁচতাম না সেদিন। সোনিয়া বলল: আমি ঝপাৎ করে জলে পড়ে যেতেই বলদটা সেই শব্দে চমকে ভয় পেয়ে ছুটে গেল আরেক দিকে। তারপর আশেপাশের কুখবরা আমাকে নিয়ে আসে হাসপাতালে। ঠাা স্তন্যদায় বে অস্ত্র কুখবরা বঁটা ছয়ের মধ্যেই মাঝা যায়।

বলে একটু খেমে: এখন কী বলবে? যে, সে সময়েও সোনিয়াকে আমি ভালোবাসিনি, শুধু মোহের টানেই ওকে বাঁচাতে ছুটেছিলাম—প্রাণের ভয় ছেড়ে। বলবে কি যে শুধু উদ্ধাসের বশে মানুষ আর একজনের জন্তে পায়ে নিজের প্রাণ বিপন্ন করতে? যদি বলে, তাহলে আমি উত্তরে শুধু বলব যে এর নাম যদি মোহও হয় তবে সে প্রেমের এমনি বমজ—যে কে প্রেম কে মোহ চেনার কোনো উপায়ই নেই।

পল্লব যুথ নিচু ক'রে ভাবে। শাপিরো ব'লে চলে: এতটাই বখন বললাম তখন আরো একটু বললামই বা। সোনিয়ার দিক দিয়েও দেখা দাক ব্যাশারটাকে। তোমাকে বলেছি, সে আমার

আঁটি কিরিয়ে দিয়েছিল ভয় পেয়ে। তার বাবা ছিলেন হোরাইট রাশিয়ান—বলশেভিকদের 'পরে তাঁর হাতের রাগ। তিনিই সোনিয়ার মনে ভয় ঢুকিয়ে দেন যে আমাকে বিবাহ করলে সর্বনাশ, হ'দিন বাদে বলশেভিকরা হারবেই হারবে—তখন? সোনিয়াও বলশেভিকদের পছন্দ করত না, কাজেই বাপের কথায় রাজি হ'তে তার বাবে নি। আমার আঁটি কিরিয়ে দিতে আমি ক্লান্ত হ'য়ে তাকে বললাম যে সে আমাকে কখনোই সত্যি ভালোবাসে নি। সে জবাব না দিয়ে কেঁদে বেরিয়ে গেল। আমার মনে এল দুর্বল যুথ—এরি নাম ঐকান্তিকার প্রেম। দিচ্।

তারপর তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। কারণ সোনিয়ার সবাই বলশেভিকদের ভয়ে ঠিকহলমে পাগিয়ে গেল আমার বাবার কাছে। বছর দুই পরে বাবা আমাকে লিখলেন যে সোনিয়ার ঠিকহলমে বিয়ে একটি সুইডেনে সঙ্গে। এর এক মাস পরে বাবা লিখলেন—বিয়ের পরে সোনিয়ার হিষ্টেরিয়া হয় ও কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে প'ড়ে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। একটি সোনার হারে লাগান লকেট সর্বদাই খুলত তার বুকে। সে লম্বা ক'রে মাটিতে প'ড়ে যেতেই লকেটটির ঢাকনাটি খুলে যায়। বাবা লিখলেন: লকেটের মধ্যে একটি ছবি—তোমার। এই মেয়েকে তুমি ত্যাগ করলে এক মিথ্যে বুলির মোহে।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে ভিজ্ঞান করল: সোনিয়া এখন কোথায়?

ঠিকহলমে সে এখন একজন নামজাদা বদিকের আদরিণী স্ত্রী। বাইরে থেকে দেখতে সে সুখী বলব। একটি ছেলেও হয়েছে।

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ...

খাদ্যের সারাংশ সম্পূর্ণ
শরীরের প্রয়োজনে
নিয়োগ করলেই অটুট
স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়।
জায়া-পেপসিন ব্যবহার
করলে এ বিষয়ে নিশ্চিত
হতে পারেন, কারণ
জায়া-পেপসিন খাদ্য
হজমের সাহায্য করে।

জায়াপেপসিন



চুবেলা খাবার সময় নিয়মিত ছোট এক চামচ খাবেন।
জায়া-পেপসিন কখনো জডাসে দাঁড়ায় না।

ইউনিয়ন ড্রাগ • কলিকাতা

কিন্তু—বাধা আমাকে লিখেছেন—একদিন সে তাঁকে কোঁচ
বলেছিল যে সে বাধীকে ভালোবাসতে পারে নি 'তবু' আমাকে
ভুলতে পারে নি ব'লেই।

পল্লব কথা কইল না। শাপিরো বলল : 'খুঁটসেবের কোনো
কথাই আমার মন নেয় না ভাই, কেবল একটি কথা ছাড়া :
যখন তিনি বলেছিলেন সেই পতিতা মেয়েটিকে দেখে যে, 'জীবনে
যে কখনো 'কোনো পাগ করে নি তবু' সেই বেন তাকে ঢিল ছুড়ে
শাস্তি দিতে সাহস করে'।

পঁচিল

পল দানিয়েলি হোটেল কিরেই তার পেল এলিওনোরার যে
সালভিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই রোম ফিরছেন। সামনের মাসে
তাদের বিবাহ—পল্লব বেন তার আসেই ভেনিস থেকে ফেরে।
ও ঠিক করল সামনের রবিবারে কিরবে রোমে।

ঠিক এই সময়ে শাপিরোর নামেও এক তার এল রোম ঘুরে।
তারটিতে ছিল—ওর বাবা হঠাৎ পক্ষাঘাতে শয্যা নিয়েছেন, শাপিরো
বের তার পেয়েই উড়ে টকহলম চলে আসে।

শাপিরো পল্লবকে বলল—সে দিন সাতকের মধ্যেই টকহলম
থেকে রোমে ফিরবে।

পল্লব একে ঠোলে তুলে দিতে গেল—রোম থেকে ও গ্লেন নেবে।
ঐন ছাড়বার আগে শাপিরো ওকে আলিঙ্গন করে বলল :
তোমাকে কখনো কোনো অস্বরোধ করি নি ভাই, কেবল একটি
অস্বরোধ থাক না করে পারছি না : সে যদি তোমার সঙ্গে দেখা
করতে আসতে চায় তবে তাকে ফিরিয়ে দিও না। মনে রেখো
তোমারি গান : 'তোমার কাছে জিতিলে হারি হারিলে সেই জয়।'।
এ-পালাটি আমি কোনোদিন ভুলব না।

পল্লব একা হোটেল কিরে এল। শাপিরো চ'লে হাবার সঙ্গে
সঙ্গে ওর মনে বিবাহ এল হয়ে। সেই ভেনিস, সেই গণ্ডোলা, সেই
টানের আলো সবই আছে কেবল এসবে যে আনন্দ শুবে নিত
প্রতি রোমকূপ দিয়ে সেই আশার যদি আইরিনের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা
হয়। নিজের পরে ওর খুব বাগ হ'ল : এত দুর্ভাগ্য! যে মেয়ে
চায় না তার আলাপখ চরে থাক! বিক্। কিন্তু তবু
কোনোমতেই পারল না ভেনিস ছেড়ে যেতে। এই ভাবে আরো চার
পাঁচ দিন কাটাল।

এদনি গমরে এল কুহুমের এক চিঠি রোম ঘুরে। পল্লব পড়ল
সম্রায়ে :
'ভাই পল্লব,

আমাকে ওরা কেন ছেড়ে দিয়েছে। সিত না হয়ত, যদি না ওদেরি
ভালবাসার কলত যে আমার এবার খুব শক্ত অন্তঃ—পাঠানো দরকার
কোনো টি-বিনার্সিং হোমে। ভিনজন ভাঙলর একমত যে বন্দার
কুলপাত হয়েছে—কাজেই ওরা একরকম ব্যথা হ'লেই ছেড়ে দিয়েছে
আমাকে।

আমার বন্ধু সবাই আমাকে 'হুইজল'ও বেতে বলছেন। কিন্তু
আমি রাজি হই নি, কারণ আমার এ আদো ভালো লাগে না।

পরিবাসের যখন বন্দা হয় তখন কে তাদের 'হুইজল'ও পাঠায় তিনি।
আমাদের দেশের পরিবাসের জন্যে যে-যাবস্থা আমার জন্যেও সেই
ব্যবস্থাই হোক। বাবার টাকা আছে ব'লেই তার সুবিধে নিয়ে
আমি 'হুইজল'ও বেতে পারব না। 'আমার এই দেশেতে জন্ম—নে
এই দেশেতেই মরি।'—একশোবার।

আমি খুব দুর্ভাগ্য—হু পা ইটতেও পারি না। হয়ত মদন পল্লীর
বন্দা 'আনিটোরিয়ামে' আমাকে বেতে হ'তে পারে। কিন্তু আমি
তাও চাই না। আমার মনে হয়, যতদূর কি গিরিভি গেলেই আমি
সেরে উঠব। তাছাড়া এখানে শুয়ে শুয়েও তো কিছু কাজ করতে
পারি। অনেক কর্মী দেখা করছে 'আসেন—তাদের বলতে পারি'কত
কথা বা বলা দরকার। সবার উপর, দেশবন্ধু আছেন। তাঁরও শরীর
খুব খারাপ হচ্ছে। তাঁকে ছেড়ে 'কোথাওই' আমার বেতে ইচ্ছে
করে না।

কিন্তু বাজে কথা থাক। তোমার খবর কি? কবে ফিরবে
ভাই? তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। তুমি মোহনলালকে
তোমার শেষ চিঠিতে লিখেছিলে যে সালভিনির সঙ্গে দেখা করেই
দেশে ফিরবে। দেখা হয়েছে কি তাঁর সঙ্গে? যদি হয়ে থাকে
তবে এবার ফিরে এসো ভাই! দেশের অনেক কাজ আছে।
তাছাড়া এখন আমার হাতে অল্পও সময়—শুয়ে শুয়েই দিন কাটে,
তুমি এসে তোমার মুখে গান শুনব, গল্প শুনব—কোথার কী দিগ্গজয়
করলে গান গেয়ে। প্রার্থনা করি—আমাদের পানের চারণ হয়ে
যেন তুমি আমাদের দেশের মুখোচ্ছল করো। তোমার কাছে আমার
অনেক আশা ভাই। ওখানে জড়িয়ে পড়ো না। ইতি

তোমার বোহাখাঁ কুহুম।'

পল্লব চোখের জলে চিঠি পড়তে পারে না। তবু বার বার
পড়ে। ওর আদর্শ কুহুম, বন্ধু কুহুম, দেশের বরপুত্র কুহুমের
বন্দা। ও তৎক্ষণাৎ এলিওনোরাকে তার করে দিল : Kumkum e
ammalato. Urgente. Devo partire subito.
Addio।

তার পরের প্রশ্ন : জাহাজ? ও ছুটল ভেনিসে আমেরিকান
এম্ব্রেসে আপিসে। তারা সতর্কভাবে বাধা দেড়ে বলল : এক মাসের
আগে কোনো জাহাজেই বার্ষ বাসি পাওয়া যাবে না। কী সর্বনাশ!
এক মাস অপেক্ষা করতে হবে—যখন কুহুমের বন্দা? ছুটল লয়েত
ক্রিয়েন্ডোনা আফিসে। ওদেরও সেই এক কথা—এখন বড়ই ভিড়,
তবে সিন্ড্রেয়ে যদি জেনোয়ার গিরে অপেক্ষা করেন তো সাত আট
দিন বাদে সেখান থেকে 'নাপোলি' বলে যে জাহাজ ছাড়বে তাতে
একটা বার্ষ পেলেও পেতে পারেন। শেষে যুহুতে এক-আধজন বার্তা
আসতে পারেন ঠা—তাদের বদলি হয়ে। তবে সেক্ষেত্রে বিধি হচ্ছে
জেনোয়াতে গিরে বৈধ হবে অপেক্ষা করা। পল্লব সেই দিনই
জেনোয়া রওনা হল।

[ক্রমক।]

১। কুহুমের অন্তঃ। জরুরি। এগুলি রওনা হতেই হবে।
বিদায়।

[মাসিক বঙ্গমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিবাস ও নির্ভরযোগ্য]



আপনারও চিত্রতারকার মত কুসুম ফেইসলে লবন্য

সুন্দরী সুপ্রিয়া চৌধুরী বলেন—“সবচেয়ে ভালভাবে লাগেলে বড়
নেওয়ার জন্য লাক্স টরলেট সাবানই আমার মতে সবচেয়ে ভাল।
এটা এত সুগন্ধি ও বিশুদ্ধ।” আপনার লাগবেও ওই রকমই সুন্দর হয়ে
উঠতে পারে যদি আপনি বিশুদ্ধ শুভ্র লাক্স টরলেট সাবান ব্যবহার
করেন। মনে রাখবেন লাক্স সাবানের সময় সত্যিই আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুভ্র **লাক্স টরলেট সাবান**

চিত্রতারকারের সৌন্দর্য সাবান





ভাবনী মুখোপাধ্যায়

পঁয়তাল্লিশ

১৯৩৩-এ ম্যামিভারশন কেসটিভালাসে বার্গার্ড শ' কোনো নতুন নাটক দিতে পারলেন না। তার বারী জ্যাকসন সেই বছর জেমস ব্রিডি নামক জনৈক ভদ্রপ নাট্যকারের A Sleeping Clergyman মঞ্চস্থ করলেন। সেই নাটক সফল হল। বার্গার্ড শ'র সেই বছরের নাটক On The Rocks লণ্ডনের উইনটার গার্ডেন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল। এই নাটকে বার্গার্ড শ' আঘাত করলেন গণভক্তকে। প্রধানমন্ত্রী তার আর্থার চ্যাভেত্তার এই নাটকের প্রধান চরিত্র, তিনি তেমন অবরম্ভ সমাজসেবক নন বলে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এই নাটকের ভূমিকায় বার্গার্ড শ লিখলেন যে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে 'খতম' (extermination) করা সম্পর্কে নাটকে যে কথা তিনি বলেছেন, সে তাঁর প্রতিষ্ঠিত অভিমত, নিছক বসিকতা মাত্র নয়। রাশিয় জয়যাত্রায় শ' গুলেছিলেন, জনৈক কবি কমিশ্যার বানিয়ান বিভাগের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হ'ন, যে সব ট্রেন মাঠার তাঁর অংশ এবং নির্দেশ পালন করেন নি, তাঁদের তিনি বহুস্ত্র কলী করলেন। এই 'লৌহমানবীর' ভঙ্গী বার্গার্ড শ'কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেছেন—If we desire a certain type of civilization and culture we must exterminate the sort of people who do not fit in it.

এই বৈকি, বার্গার্ড শ'র এই উপদেশ পৃথিবীর সর্বত্র গৃহীত হয়নি, তাই এক পারম্পরিক নিধন-বক্তা বাক্যে বার অগচ্ছ হত তাকে বলি দিয়া হত, এক তাঁর হাত থেকে বার্গার্ড শ' বরাহ হত নিষ্কৃতি পেতেন না।

সংলাপে জয়যাত্রায় Man and superman-এর ভঙ্গীতে একটি নতুন নাটক Village wooing রচনা করলেন। বার্গার্ড শ'র প্রতিভার খণ্ডসংগিত বহু বাগা এতদিনে শুকিয়ে এসেছে। এই নাটকের সংলাপ ক্লাস্তিকর এবং গতি অতি বীর। এই নাটক চাই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেনি।

এর পর শ'র সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড সফরে বেরোলেন। এই সময় বার্গার্ড শ' সালোমোনের জনৈক বান্ধবীর সঙ্গে একটু বনিষ্ঠ হয়েছিলেন বলেই নাকি দেশান্তরের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সফর অবশ্য উক্তদের তেমন ভূমিকার হয়নি, তবে প্রাথমিক সালোমোনের ভাবী ভালো লেগেছিল। এই কালে বার্গার্ড শ' The Millionaire নাটক রচনার হাত দেন, এই নাটকের রাশিকা চরিত্রে তাঁর এক বান্ধবীর প্রকৃতি রূপায়িত করা হয়েছে। কাজ বৈকি অগ্রসর হয়নি, কারণ এই সময় বার্গার্ড শ'র শরীর অত্যন্ত ধারাপ হয়ে পড়ে।

The Simpleton of the unexpected Isles নামক পরবর্তী নাটক রচনা করেন বার্গার্ড শ' ১৯৩৫—এই নাটকের বিষয়বস্তু আবার সেই প্রজনন সমস্যা। আবার সমস্যা যদি থাকে, যদি অবাধ বিবাহ চালু হয়, তার ফলে জাত সন্তান কেমন হবে? প্রাচ্য দেশ জয়নের পর বার্গার্ড শ' প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিশ্রণে এক নব অতিমানবের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন।

এই নাটক নিউইয়র্কের থিয়েটার গিলতে প্রযোজিত হয় এবং ম্যালিভারশনেও মঞ্চস্থ হয়। আমেরিকায় তেমন সাফল্য লাভ করেনি এই নাটক। ম্যালিভারশনে অবশ্য বার্গার্ড শ'র এই নাটক অভিনয়িত হল। প্রতীকধর্মী নাটক হিসাবে আদর্শবাহিনী বিবেচিত হল। কারণ সেখানকার সবাই বার্গার্ড শ'র গুণগ্রন্থ ভক্ত।

আশীর কোঠার পৌছে বার্গার্ড শ' নাটকের বিষয়বস্তুর জন্ত মজলৈ সন্ধান না করে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকেই নাটকের ঘটনা চয়ন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের সম্রাট জটম এডোয়ার্ড স্বধন সিংহাসন-ভাগ্যে বাধ্য হলেন মাকিনী সাধারণ রমণী এবং ভিত্তিগি মিসেস সিম্পসনের পানিপীড়নের দোষে, তখন বার্গার্ড শ' সেই ঘটনা অবলম্বন করে এক কল্পিত সংলাপ রচনা করে Evening Standard পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। তাঁর সহায়ত্ব ছিল সম্রাটের দিকে। এই সংলাপে তিনি সম্রাটকে করেছেন কিং ম্যাগনাস। সেই ম্যাগনাস আর্চবিশপকে স্তম্ভিত করে দেন তাঁর চমকপ্রদ উক্তি—

As she was an American, She had been married twice before and was therefore likely to make excellent wife for a King who had never been married before.

পশ্চিমে আবার মহাবুদ্ধির ঘনঘটা, সর্বত্র একটা সম্ভ্রান্তভাব। আঁরি বারবুস এই সময় বার্গার্ড শ'কে আবার অমরোষ করলেন বিদগ্ধজনের একটা আন্তর্জাতিক সমিতি গড়ে তুলতে, ধারা বুদ্ধ-বিদ্যোবী জনমত গড়ে তুলতে পারবেন। বার্গার্ড শ'র ধারণা, বাস্তবে পরিপূর্ণ সংসারে যে স্বয়ংস্ব মাছুষ এখনও সন্তানে আছেন, তিনি তাঁদের অস্তমত। তাঁর নতুন গ্রন্থ 'Geneva' এক বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপায়িত। আন্তর্জাতিক বিচারশালায় পৃথিবীর সকল মনের রাজনীতিক নেতাদের তিনি জড়ো করলেন, এমন কি ডিক্টেটররাও বাদ রইলেন না। সেই নিদারুণ সংকটময় যুদ্ধে এমন আন্তর্জাতিক চূসময়কে ব্যস্ত করার মত সাহস ও শক্তি শুধু বার্গার্ড শ'রই ছিল। মানবজাতির প্রতি বার্গার্ড শ'র সকল কল্পনা ও মনোভাব এতদিনে শুষ্ক, ছিল শুধু মানসিক লুপ্ততা। তাই তিনি কলমের—

'God has sent certain persons to His call.'

They are not chosen by the people ; they must choose themselves, that is part of their inspiration.

যা ঈশ্বরের কর্ম, কঠিনতম কর্ম, রাজনৈতিক কর্ম সে ত' আর সবাই করতে পারেনা, তাদের সে মস্তিষ্ক নেই, অবসর নেই, আর দৈববলও তারা পায়নি, সুতরাং—

বার্ণার্ড শ'র সমর্থক বহুবা ত বিমিত। তিনিও স্বয়ং বললেন নাটক দেখে—It made me quite ill. It is a horrible play. এমন কি বার্নার্ড শ' বলতে বাধ্য হলেন যে পৃথিবীর ওপর যে কুক-বনিকা নামে আসছে তা হাসি দিয়ে ঠিকরে রাখা যাবে না।

এই নাটক যুরোপের যমযন্ত ডিক্টেটরদের হৃদ থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। বার্নার্ড শ' এই নাটক শেষ করেই শয্যাশায়ী হলেন কঠিন রক্তাক্ততা ব্যাধিতে।

ডীন ইনজ (Inge) বার্নার্ড শ'র এই নাটক পড়ে বার্নার্ড শ'কে লিখলেন—I read it aloud to my wife and we were as much amused as it is possible to be in this ghostly time ! কিন্তু বার্নার্ড শ'র ভক্ত এবং তাঁর নাট্য-সমালোচক ডেসমণ্ড ম্যাডকার্থী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে লিখলেন—The books of the old are apt to be ramshackle, garrulous and repetitive.

বার্নার্ড শ'র এর জবাবে শুধু বললেন—

Old age is not enough ; Youth is not enough ; Patriotism is not enough ; Wisdom is not enough ; What is enough ; Faith to go through life without losing ones faith.

বার্নার্ড শ'র মতে মানব-জীবনের সব অসাক্ষ্য, সব বিচ্যুতির মূল কারণ আমাদের মানসিক অপর্যতা। শুধু মাত্র বিবাস, বিবাসে অবিস্ত থাকলে মানসিক মানসিকতা সম্পূর্ণতা লাভ করে।

Geneva সক্রান্ত বাণিজ্যবাদ অনেক অশ্রীতিকর আলোচনা করেছিল। বার্নার্ড শ'র অমুখ্যগী বহু লরেন্স ল্যানার বিশেষ করে হিটলারের ইচ্ছা হলেন নীতি সম্পর্কে লব্ধ মন্তব্যে বিশেষ বেদনাবোধ করেন। এবং বার্নার্ড শ'কে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। চিঠিখানি অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচায়ক। লরেন্স ল্যানার প্রণীত The Magic Curtain গ্রন্থে এই চিঠি ও বার্নার্ড শ'র উত্তর একত্রে দেওয়া আছে।

বার্নার্ড শ' পরবর্তী সংস্করণে একটি চতুর্থ অঙ্ক যোগ করেন, সেই অঙ্কে অনেক ক্রটি সংশোধন করা হয়েছে।

Geneva নাটকের পর লিখিত হয় মনোরম নাটিকা 'In Good King Charles's Golden Days', এই নাটিকাটি হুট অঙ্ক সম্পূর্ণ। এই নাটিকার বহু মূল্যবান উক্তি আছে। প্রথম অঙ্কের হান তার আত্মজ্ঞান নিউটনের বাসগৃহ এবং স্মরণীয়, দ্বিতীয় অঙ্ক ক্যাথরিন অফ ড্রাগান জার প্রকোটে এবং সন্ধিপ্ত। এই নাটকে বার্নার্ড শ' তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩৯ খ্রীঃাব্দে তাঁর প্রতীভার ভাঙার বে শূন্য হয়নি, এই নাটক তার প্রমাণ। কিন্তু শরীর তাঁর জীর্ণ হয়ে আসছে,

মানসিক তিক্ততা বৃদ্ধি পেরেছে, অতি সহজেই তিনি 'মানসিক হ্রাস' হারিয়ে কেনেন। কাজ-কর্ম শূন্যও অনেক কমে গেছে। অথচ একলা তাঁর মানসিক প্রশান্তি বহুকালের কাছে প্রাণসো পেরেছে। সার্লেট অতিশয় উত্তির হয়ে পড়লেন বার্নার্ড এই শারীরিক অবনতিতে। ১৯৪০-এ বার্নার্ড শ'র এই যোগ ভাঙারনা 'Pernicious anamea' বলে সিদ্ধান্ত করলেন।

বার্নার্ড অসুস্থ সেবা করে সার্লেট বার্নার্ড শ'কে রুহ করে ফেললেন। কিন্তু তাঁর শরীরও জীর্ণ হয়ে এসেছিল। তিনি অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়লেন। দুতিশক্তি ভীষণ ক্রীণ হয়ে এক, অবশ্যক্তি হৃদয়েরই ভীষণ কমে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালটিতে বার্নার্ড শ' লিখেছেন—Everybody's political what's what,—এতদিন হয়ে যে কথা বলেছেন এ বেন তারই সন্ধান। কার জন্ত লিখছেন সে কথা বার'বার ভেবেছেন শ'। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের পার্থক্য আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পার্থক্য এক নয়।

এতদিন বার্নার্ড শ' মনে-প্রাণে তরুণ ছিলেন, সেই ভাব তাঁর আচরণে এবং বক্তব্যে, কিন্তু এখন তাঁর উক্তি বৃদ্ধর বচন। যে অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে সে শুধু অতীতের কথা বলে। ১৯৪৩-এর এপ্রিল মাসে বিয়েট্রিস গুয়েবের মৃত্যু ঘটে। সর্বাঙ্গটি গুনে বিচলিত হলেন শ'। এই ঘটনাটি তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তা ছাড়া তিনি নিয়মিত ডায়েরী লিখতেন। কি যে লিখে গেছেন বার্নার্ড শ' সম্পর্কে কে জানে ?

সার্লেটকে এই মৃত্যু সংবাদ দিলেন না। কারণ, সার্লেট

for JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

এক বিবর্তন ছিলেন যদিও বন্ধু, সার্জেণ্টের তখন শরীর একেবারে
জেদ পড়েছে।

সেই বছরই তাঁর এয়ারটেল বাস ছেড়ে লণ্ডনে এসেন।
সার্জেণ্ট রোগশয্যায়। বার্ষিক শ' পথে পথে ঘুরে সমর-বিধ্বস্ত
বিশিষ্ট প্রাসাদগুলি দেখে বেড়ান শিঙর মত কৌতূহলে।

সার্জেণ্ট আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি নানারকম অসৌকর্যে ভর
পেতে শুরু করলেন, তাঁর মনে হত শয্যার আশপাশে কারা
ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি বললেন—এঁদের আসা বন্ধ করে
দেওয়া হোক।

একদিন সকালে সার্জেণ্টকে বড়ো স্নানঘর মনে হল, এমনটি
অনেকদিন দেখা যায়নি, যেন বহল কত কমে গেছে। শ' মনে
করলেন যে লণ্ডনে এসে ভালো হয়েছেন, বাছ্যের উন্নতি হয়েছে।
সন্ধ্যায় বিকে তাকে ঘরে রেখে বার্ষিক শ' বেড়াতে গেলেন।

পরদিন ভোরে দাসী এসে দেখে বিছানার নীচে সার্জেণ্ট পড়ে
আছেন, হাতে একটি খড়ি ধরা রয়েছে, বুধ দিয়ে রক্ত পড়ছে।
বিরোচিসের বৃত্তের পাঁচ মাস পরে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, সার্জেণ্ট
এই ভাবে শরণার্থী চলে গেলেন।

পরদিন সকালে দেখা করতে এসেছিলেন মিস এলিনর
ও'কলেস। শ'-পরিবারের তিনি বন্ধু, আর ছিলেন মিঃ জন
ও'কলেস। তাঁর সঙ্গে কপিরাইট সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন শ'।
সঙ্গে বাল উঠলেন—

—এলিনর, আজ কিছু নতুন বাক্য করছ?

মিঃ ও'কলেস বললেন—নতুন জুতো পরেছেন দেখছি।

শ' বললেন—না না, ও জুতো আজ দশ বছর পরছি। আমার
সব পোষাকেরই বয়স ঐ রকম। আমি ভেবেছিলাম আমার মধ্যে
কিছু নতুন বসেবে তোমরা, কাল রাত আড়াইটের সময় আমি
শিথিল হয়েছি।

বয়সী ভক্তিত। বার্ষিক শ' বলতে লাগলেন—জুতার একটু
পরিচর্যা দেখেছিলাম। বেশ হাসিখুশী ভাব। আমাকে বললেন
কতদিন ছিল হুঁশিয়ার? দেখিনি কেন? আমি বখন বললাম—
কতদিন হুঁশিয়ার তোমার। তখন একটু হাসলেন। আর বললেন
অনেক জুর হাসছেন, সেই হাসি। আমি দেখলাম তাঁর সৌন্দর্য
কিছু কমছে, কলসায় এইবার তোমার অন্তর থেকে বাবে। তিনি
আমাকে অনেক কথা বললেন। সব কথাই অর্থ হয় না। তারপর
এয়ারটেল বাড়িভেঁই আছেন মনে করে বললেন, ওপরে নিয়ে চলে।
কতকিছু না বলে ওঁকে হাত ধরে বিছানার ভেঁইয়ে নিলাম।
একটু দূরেই বলা যায়। উনি প্রতিবাদ করলেন না। ভোরে
দাসী আসলেও তাকে তুলে বাল—উনি বিছানার নীচে পড়ে আছেন,
কপাল ভক্ত। আমিও গিয়ে বিছানার ভেঁইয়ে নিলাম। নাস
এক বড় কষ্ট শেকল। হাসকট। কিন্তু সৌন্দর্য অজুত ভাবে
কিছু কমছিল, উনি হাসছেন না শেষ সময় আসন্ন। অনেক কথা
বল। বেশ খুশী হলেন। আজ সকালকাল নাস আমার ঘুম
ভাঙিয়ে বসে বসে—আপনার স্ত্রী রাত আড়াইটের সময় মায়া
সেই। দেখতে লোম্ব, যেন এক শূণ্য তরঙ্গী যুগিয়ে আছেন।
আমার সঙ্গেই হল না, তিনি চলে গেছেন। অনুবীক্ষণ দিয়ে

দেখলাম ওঁর চোঁট দুটি নড়ছে কি না। আমার কেমন যেন মনে
হল উনি কিছু বলছেন।

পোলডার এঁর সার্জেণ্টের অন্ত্যেষ্ট সমাধা হল। পোলডার
সমর দেখতে পেলেন না বলে হতাশ হলেন শ'। সঙ্গে ছিলেন
সেক্রেটারি ব্রানচ পাট আর লেডী এ্যাট্রি। সমাধি কালে প্রথমে
ফ্র্যাঙ্কলের Largo সুর বাজানো হল, তার পর প্রার্থনা সঙ্গীত—
I know that my Redeemer liveth—গীত হল।
বার্ষিক শ' বাক প্রসারিত করে বৃহৎ গলায় গান গাইলেন।
চোরাইট হল কোর্টে কোয়ার পথে লেডী এ্যাট্রি তাঁর বাড়ি বাড়ার
জন্ত আহ্বান করার বললেন—তোমার বাড়িতে গিয়ে শান্তি কোথায়,
অন্ততঃ খ্রিস্টান মেয়ে বসে আছে। আর এই বৃহৎ লণ্ডন সহরে
আমার মত পাত্র কটি আছে?

সার্জেণ্ট বলেছিলেন, যদি বার্ষিক শ'র সঙ্গেই তিনি যারা
বান, তাহলে যেন তাঁর ভবনবাশি আয়ারল্যাণ্ডে থি বক্ হাউসটনে
ছড়ানো হয়। এর মধ্যে বৃহৎ স্নক হল। আয়ারল্যাণ্ড রাজ্য
সহজ নয়। তাই বার্ষিক শ' বললেন—আমি নিজেই তোমার
ছাই দেখে দেব। আর নির্দেশ দিয়ে যাব আমার বৃত্তের পর
আমাদের দুজনের ছাই একত্র মিশিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

বার্ষিক শ' The Times পত্রিকার ব্যক্তিগত বিভাগের
বিভাগে একটি বিভাগের ছিলেন অসংখ্য সন্বেদনা পত্রের উত্তরে।
'প্রতিটি চিঠির জবাব দেওয়া আমার সাধ্যাতীত তাই এই বিভাগে।
সুখী জীবনের সুখে ও শান্তিতে অবসান ঘটেছে। এখন আমি
আমার পালার জন্ত প্রতীক্ষমান।'

ছাত্রিকা

শ' স্থির করলেন যে বৃত্তের পর তাঁর বসন্তাধি ভাষাভাল
টাইকে দেওয়া হবে। সমগ্র ব্যাপারটিকে আরো আকর্ষণীয় করে
তোলায় জন্ত তিনি সেট স্কোলের একটি রোজ বৃত্তি তাঁর বাগানে
প্রতিষ্ঠা করবেন স্থির করলেন। মৃতিটি সাধারণ আকারের চাইতে
বড়ো হবে।

প্রতিদিন বাতায়নপথে যে ইংলণ্ডীয় প্রাচ্যকালের সৌন্দর্য বার্ষিক
শ' হু চোখ ভরে পান করেছেন সেই দৃষ্টের দিকে থাকবে স্কোলের
বৃত্তি। যে শিল্পী তাঁর ছবি এঁকেছিল সেই সময় সেই শিল্পীকেই
আমন্ত্রণ জানালেন শ', মৃতিনির্মাণের ভার ছিলেন তার হাতে।

মৃতিটি গড়া শেষ হল বার্ষিক শ' লিখলেন—

Europe is crowded with images of Joan of
Arc, and this is by far the best statue of the Maid
I have ever seen, and the only one I would let
into my garden to live with.

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে বসন্তকালে The Author নামক পত্রিকায়
প্রকাশিত হল বার্ষিক শ' তাঁর উইল তৈরী করছেন। তাঁর ললিত
সম্পত্তি তিনি জাতিয় জন্ত দান করছেন, আর ৪২টি অক্ষরবিশিষ্ট
বৃত্তি বর্ণবাদার সন্মার মায়ন করা তাঁর উদ্দেশ্য। দলভাষক উদ্যোগ
এঁর বোঝানোর পক্ষে এই বর্ণবাদা সহজ। বর্তমান ২৬টি অক্ষর

পরিপূর্ণ ভাবে সেই ধর্মের বাস্তবতা প্রকাশ পায় না। এই বর্ণমালা গৃহীত হলে সময়, শ্রম এবং খরচ বাঁচবে। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, কলেজ, স্কুল, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে এই বিষয়ে অগ্রণী হওয়ার জন্য আহ্বান জানালাম। সে আহ্বান কিন্তু উপেক্ষিত হল।

বার্গার্ড শ'র এই আজীবন সঙ্কল্প কিছু ইংলণ্ডের মানুষের মনে এতটুকু দাগ কাটেনি। পশ্চিমতারা অবগত বলেন, ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ কঠিন কর। তবে তাঁরা কোনও পরিবর্তন পছন্দ করেন না। বার্গার্ড শ' জাভবার পাত্র নন। তিনি অল্প কয়েক দেখলেন শুধু মাত্র ইংরাজী—Though কথাটির শেষ তিনটি অক্ষর বাদ মিলে বহু সময় এবং শ্রম বাঁচবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ভাবে অজ্ঞাত সময় কিভাবে ব্যয়িত হবে phonetics যদি বানানে চালু হয়, তাহলে ছেলেরা কেউ আর বানান শিখবে না, শেষের প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করবে না। তবে আর একটি দিক আছে, নর্থ আমেরিকার বার্গার্ড শ'র পছন্ডিত কোটি কোটি বর্ষ সময় বাঁচে, সেখানে বানান সমস্তা সবল করা হয়েছে।

বার্গার্ড শ'র উইলে বলেছেন—সর্গীয় হেনরী সুইট (অক্সফোর্ডের কনট্রোল অধ্যাপক) প্রবর্তিত মাত্র ৪২টি ধ্বনিতে যদি বর্ণমালা তৈরী করা যায় ত' ভালো, নতুবা আমার মুক্তার কুড়ি বছর পরে আমার সন্তান:শব্দ অল্প কোনো প্রয়োজনে ব্যয়িত হবে।

জর্জ বার্গার্ড শ' জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছেন। দ্রাবিয়োগের পর শরীর আর তেমন নষ্ট, বন্ধুরাও একে একে

পূরণ করে গেছেন। কানে কম শোনে, হ্যান্ড সেট হয়েলে দর্শনপ্রার্থীর ভীড় ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তাঁর জীবনীকার ও বন্ধু হেসকেথ পীরসন আর ডক্টর মিস এলিনর ও কনলে মাঝে মাঝে আসতেন, তাঁরা কিছু কিছু মূল্যবান উক্তি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, আর আছে তাঁর সেক্রেটারী মিস ব্লানচ প্যাচ লিপিত গ্রন্থ বছরের ইতিহাসে।

হেসকেথ পীরসন একদিন বললেন—আচ্ছা, শুনেছি যে মিসেস ক্যামবেল আপনাকে The Apple cart নাটকের গুরিনথার মত বাড়ি বেতে বাধা দিতেন, সত্যি?

—নিশ্চয়ই।

—সত্যি, কোনোদিন আটকাতে পেরেছিলেন?

—ম্যাগনাস এবং গুরিনথার মেয়ে গড়াগড়ি দেওয়ার দৃষ্টটা জীবন থেকেই নেওয়া।

অনেক ইতস্তত: করে আর এক সময় প্রশ্ন করলেন পীরসন, আচ্ছা, আকৃতির দিক থেকে মিসেস বেসাট কি আপনাকে আকৃষ্ট করেছিলেন?

শ' বললেন—না, তাঁর কোনো রকম বোন আবেদন ছিল না। আমি কি বলিনি Arms and the Man নাটকের চরিত্র Raina চরিত্র মিসেস বেসাটের?

হেসকেথ পীরসন আরেকটি সন্দেশ ভজন করতে চান। সবিরয়ে বললেন—লোকে যে বলে ইসাডোর ডানকান আপনাকে বলেছিলেন যেহেতু আপনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর

শেপাল সিওর গ্রিপ

এই ট্রাক্টর টায়ারে বার টাইপ (মটিন লেগ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেড ও জেডার টাইপ লাগ রয়েছে আর এগুলি দু'রকম উদ্দেশ্যই সাধন করে—দুর্গম, রাস্তায় ও রাস্তার বাইরের জমিতে অতি অনায়াসে চলাচল করে। যেসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট মাটি আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন বেশী সেসব ক্ষেত্রে এগুলি খুবই লাভজনক।

লাভের ক্ষেত্র

সুপার সিওর গ্রিপ

রাস্তার-স্ট্রেট বার-লাগ আছে বলে এই ট্রাক্টর টায়ারে আকর্ষণ ক্ষমতা বেশী হয়। এতে গভীর ভাবে মাটি আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা সম্পন্ন ডব্লিউ-গ্রিপের দাব্বা রয়েছে আর এর ট্রেড আপনা-আপনি পরিষ্কার হয়ে যায় বলে অতিরিক্ত ক্লয় বন্ধ হয়।



GOOD YEAR

পৃথিবীর বৃহত্তম টায়ার কোম্পানী

টি. বি. গিল ক্রয় করিয়া বন্ধারোপ প্রতিযোগে সাহায্য করুন।

তিনি স্বন্দরীশ্রেষ্ঠা। আপনার সন্তান সর্বাঙ্গসুন্দর হবে, আর আপনি নাকি তাতে বলেছিলেন—আমার আকৃতি ও তোমার প্রকৃতিও ত হতে পারে। কথাটি কি ঠিক ?

বার্ণার্ড শ' বললেন—সেখ ধূমাং বহিঃ—ধূম থেকে আগুন, আগুন থেকে ধোঁয়া। আমার মনে হয় একটি ঘটনার পর এই মুখরোচক ঘটনা শুরু হয়েছে। সেভী কেনেট অফ ডেনে একদিন একটা পার্টি দিয়েছিলেন। সেখানে এক চকোলেট মার্ভা রমণী দেখলাম, তিনিই ইসাভোয়া। পরিচয় হল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শঙ্ক প্রসারিত করে বললেন—I have loved you all my life. —Come। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পাশেই বসলাম। একত্রে দুজনে এক সোকার বসেছিলাম। পার্টির সবাই ভেঙে পড়ল, যেন নাটকাত্মক দেখছে। তারপর আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন—একদিন তাঁর কাছে বেতে, তাহলে তিনি নিবারণ দেবে নৃত্য কখনে। আমি স্বীকার করেছিলাম, পরে ভুলে গেছি। এই পর্যন্ত।

হেসকথ পীরসন কি ভাবে সেভী ঐষ্টরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় জানতে চান। বার্ণার্ড শ' বলেন—প্রথম প্রথম তিনি আমাকে বৃত্ত নিয়ন্ত্রণ করতেন আমি প্রত্যাখ্যান করতাম। তারপর একদিন কোনো এক বছর বাড়ি দেখা হয়ে গেল। দেখলাম মধ্যবয়সী ভালো। সেই থেকে তাঁর নিয়ন্ত্রণ কখনো প্রত্যাখ্যান করিনি।

পীরসন বলেছেন, সেভী ঐষ্টর বার্ণার্ড শ'র জীবনে বিশেষ ভূমিকাধারী বছর কাজ করেছেন। The Times পত্রিকার সর্গ বার্ণার্ড শ' লিখিত চিঠিপত্র প্রকাশের মূলেও সেভী ঐষ্টরের প্রভাব ছিল। বার্ণার্ড শ'র কাছে এই সম্মান রাজস্বদানের চাইতে বেশী। ভিত্তিক পদের চেয়েও মূল্যবান।

শ'র বিশেষ বন্ধু সিডনী ওয়েব (পারেলট প্যামকিন্সড) ১৯৪৭-এর অবসরকালে পরলোকগমন করলেন। তৎক্ষণাৎ বার্ণার্ড শ' The Times পত্রিকার লিখলেন,—May I claim Westminster Abbey for the ashes of Sydney Webb, even should it : Paul's demand him as our greatest cockney ? বার্ণার্ড শ'র এই প্রচেষ্টা সার্থক হল, সিডনী ওয়েবের পুণ্যভূমি ওয়েস্টমিনিস্টারের রাখা হ'ল। এর পনের বছর মার্চ মাসে এলিনর ও'কনেল বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে বার্ণার্ড শ' মিস ও'কনেলকে প্রশ্ন করলেন—আমেরিকা রাষ্ট্র কেন ?

—বর্তমান ইংলণ্ডের চাইতে সেখানে বেশী স্বাধীনতা। আমি তাই চাই।

—একমাত্র রাশিয়ার তুহি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানব জাতি, আর একজন ছিলেন মাদারিক, সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছেন। রাশিয়ার আব যুদ্ধ চার না। খবরের কাগজে বা পড়ো তা ঠিক নয়। জাতি জাতি যেন যে আর একটি যুদ্ধ যানে রাশিয়ার ধ্বংস, তিনি ভুল করবেন না, কারণ সে ভুলের চরম মূল্য তাঁকে দিতে হবে। রাশিয়ার মাহুর তাঁকে গুলি করে মারবে। বললেন বার্ণার্ড শ'। মিস ও'কনেল বললেন—আপনি যদি

ইংলণ্ডে না থেকে রাশিয়ার কাটাতেন এতদিনে কবে তুলী খেতেন।

বার্ণার্ড শ' জবাবে বললেন—জাতি একজন বাঁটি কেবিরান।

এই আলোচনার ক্রমশঃ ব্যক্তিগত আলোচনার পৌঁছল। সহস্র বার্ণার্ড শ' বলে উঠলেন—I am waiting to die, I have nothing more to do. And I am very tired.

১৯৪১-এর আগস্ট মাসে ম্যালভারনে এসে প্যারিস তাঁর নতুন নাটক Buoyant Billions সূন্দরভাবে প্রবেশিত হল। এই নাটক পাঁচ সপ্তাহ চলছিল। সেই বছর অক্টোবরে লন্ডনে বন্ধ হল।

এই ১৯৪১-এ Farfetched Fables প্রকাশিত হল সেই বছরেই প্রকাশিত Sixteen Self Sketches—সেখানে প্রস্তুত অনেক আত্মজীবনীমূলক কথা আছে। এর পরবর্তী প্রহ Shakes versus Shaw, এই ছোট নাটক অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন।

তাঁর শেষতম রচনা Why she should not বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। যন্ত্র স্তরের বেটু পর্যন্ত লিখেছেন তার শেষ কথা—The world will fall to pieces about your ears.

১৯৫০ এর ১০ই সেপ্টেম্বর, সেদিন রবিবার, বার্ণার্ড শ' বাগানের একটি গাছের ডাল খেয়ে টানছিলেন, বাগানে নিয়মিত কাজ করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিছিল। এই ডালটি একেবারে শুকনো থাকার সহসা খসে পড়লো। বার্ণার্ড শ' টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন। তাঁর হাঁটুতে আঘাত লাগল, ভেঙে গেল। তাঁকে এম্বুলান্সে Luton and Dunstable Hospital এ পাঠানো হল। সোমবার রাতে অপারেশন করা হল তাঁর পায়ে। বার্ণার্ড শ' একটু সুস্থ বোধ করলেন—রসিকতা করে ডাক্তারকে বললেন—আমি সেবে উঠলে তোমার ত' ভেমন সুবিধে হবেনা। ডাক্তারের খ্যাতি বাড়ি কি করে জানো, কতজন খ্যাতিমান তাঁর হাতে পরপারে গেছে সেই হিসাবে।

এলিনর ও'কনেল দেখা করতে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—কখন আছেন ?

শ' বললেন—সবাই ওই কথা বলে। এখন আমি মরতে চাই, কিন্তু এমনই আমার শরীরের সামর্থ্য যে কিছুতেই আমাকে মরতে দেবেনা।

—আপনি কি মরতে চান ?

—নিশ্চয়ই। যদি মরতে পারতাম (If only I could die)

এ সবই অপচর, সময়ের অপচর, আহাৰ্যের অপচর, ইত্যাদি।

৪ঠা অক্টোবর তিনি বাড়ি কিয়ে এলেন। জীবনের শেষ হাসিটা শান্তিতে কাটাগেল। এই সময়টা তিনি খুব বেশী সুস্থে। তারপর ২রা নভেম্বর ১৯৫০ তাঁর মৃত্যু আর ভাঙলো না।

তাঁর মৃত্যু সংবাদে ভারতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত হল, ব্রডওয়ার্ডের আলো জ্বাল করা হল। The Times পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় রচিত হল তাঁর সবচেয়ে। এই মহানবীর মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবী সেদিন আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করেছিল।

শেষ



দীর্ঘ, কৃষ্ণ ও

উজ্জ্বল

কেশরাশির জন্য...

এরাসমিক

পারফিউমড

কোকোনাট হেয়ার অয়েল

এখন এই পল্লব আকর্ষণীয় বোতলে।

ছই রকম সুমধুর সুগন্ধে

গোলাপ ও যুই



ECHO. 4A-50 BG

এরাসমিক কো: লি: লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিটারি লি: কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

অক্ষর ও প্রাক্ষর



একটি চিঠি ও তার উত্তর

বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখোদনের আগেই ইতিতে চোখ যায় সমাদার সাহেবের।

গুরুত্ব চেয়ে শেষটায় আগ্রহ বেশি। বেন শেষটা দেখে তারপর গুরুত্ব গুরুত্ব করবেন কি না চিন্তা করে তবে অগ্রসর হওয়া। নাম যায়, পরিচয় বলতে যা কিছু সব ত ঐ ইতিতেই। সুতরাং দরকারী চিঠি ছাড়া কাজে ব্যস্ত মানুষের গোটা চিঠিটা পড়ার সময় কৈ? খৈষাই বা কোথায়? আর এমন পুরোপুরি দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা ধরে চিঠি পড়ার? ইতিতে নাম চিনলেন না। সুখোদনে নামেও খটকা লাগল। আর ঐ খটকা লাগার দক্ষয় ঈষৎ কৌতূহলী হ'রে প্রথম লাইন দুটো পড়লেন তিনি। কাজের চিঠি ছাড়া অদরকারী চিঠি বেশি বড় হ'লে বিরক্তিতে তাঁর মোটা ডুক দুটো কুটকে ওঠে। এ আবার শুধু বড় নয়, একটা খামে বাড়তি মন্তব্য দিয়ে যতটা ধরে হাস্যাহাসি প্রায় ততটা।

লাইন দুটোর উপর চোখ বুলাতে বুলাতে তাঁর সেই বিরক্তিতে কৌতূহলে জোড়া ক্র কখন সমান্তরাল হয়েছে : সে জায়গায় বিষয় জেগেছে চোখে। তার ওপরে একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছে, উপরে আবার ভাসা ভাসা একটা ছবিও বেন ভেসে উঠল। বেন বছর বার-তের কালো রোগা হিলহিলে একটি অল্পস্বপ্ন কিশোরী মেয়ে হাতের মুঠোর একটা ডাঙ্গা পেরায়া এগিয়ে ধরে তাকে সাথছে, —ভিখু খাবি? নে।

এই নাম। নামটা চিনতে পারেন নি ব'লেই তুলার নামটা চিনতে তাঁর কষ্ট হ'চ্ছিল। নইলে ইতিতে নিরুপমা লিখে বন্ধনীর কাছে পুঁটি লিখে দিতে ওর ভুল হয়নি। তবু চিনতে প্রথমটা

পারলেন কোথায়। নিজের নামকেই যে বেমালাম ভুলে যেতে পারে, অস্তুর নাম তার অত সহজে মনে আসবে কি করে?

বিশেষ ক'রে পুঁটির মত কালো কুস্মিত একটা গ্রাম্য বোকা মেয়েকে! এই দীর্ঘ চরিত্র পঁচিশ বছর পর।

বাইরে তিনি মিষ্টার সমাদার। সমাদার সাহেব। বন্ধু জনের কাছে সুরঙ্গন। আত্মীয় স্বজনের নিকটও তাই। ঘনিষ্ঠ জনের কাছে রঞ্জন। জীবিত যে ছ'চারজন গুরুজন ব্যক্তি এখনও আছেন, তাঁরাও আর তাঁর ছোটবেলার নাম ধরে ডাকেন না। বৃষ্টি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ছোটকালের ছোট নামটা এমনি ক'রেই লোপ পায়। গুরুজনেরা পর্যন্ত এখন তাকে পুরো নামে সম্বোধন করেন।

এই নিয়ে তাঁর মনে কোন কি ক্ষোভ ছিল?

না, ও সব বাজে সেক্টিমেন্টালের ধার ধারেন না তিনি। প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। কাজের মানুষ। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী। রাশভারী। দার্ভিক। কৃতী পুরুষের দম্ভ। গভীর স্বল্পবাক।

চিঠিটা হাতেই ধরা ছিল। শুধু সুখোদনে ভিখু আর ইতিতে পুঁটি এই দুটো নামেই জ্ঞানান। করল চোখ কয়েক বার। গোটা গোটা অক্ষরে পরিষ্কার সমান লেখা। পড়তে কষ্ট হয় না। স্বভাবগভীর মুখে হাসি ফুটল। হেলান চেয়ারটার পা টেলে দিয়ে বেশ আরাম ক'রে বসে নিয়ে চিঠি পড়ার মন দিলেন ভারতলক্ষ্মী অটোমোবাইল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার এস, কে, সমাদার। অল্প একটু স্বগতোক্তিও বেঙ্গল মুখ দিয়ে—“আশ্চর্য, এত দিন পর।”

ভাই ভিখু,

আমায় চিনতে পারাছিস কি? সেই জাবদাপোতার নিরুপমাকে?

না, নিরুপমাকে তুই চিনিবি না। ওটা আমার পোষাকী নাম। সেই বোগা, কালো, সামনের দুটো শাত উঁচু বস্ত্রপাড়ার পুঁটিকে? তুই বার নাম দিয়েছিলি গাবগাছের পেত্নী? চিনিবি কি? তুই হুন্দর ছিল কি না, তাই অহঙ্কারে অল্প অল্পস্বপ্ন মানুষদের বিচ্ছিন্ন সব নাম দিয়ে দিয়ে জেচি কাটতিস। মনে আছে তোর?

খুব অবাক হবি। আমি স্পষ্ট বুঝছি। বিরক্তও কি হবি? আমি ঠিক বুঝি না। আমি পঁচিশ বছর আগের ভিখুকে জানি। সে নিশ্চয়ই বিরক্ত হোত। আমার এই পত্র লেখাকে সে ধুঁকতা ব'লে মনে করত। আর শুধু মনে করাই নয়, সামনাসামনি যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করতোও কনুয় করত না। কিন্তু সে ত অনেক দিন আগের একটা অব্যবহৃত, অশাস্ত, অহঙ্কারী কিশোর বালক। এই দীর্ঘ সময়ে তার বয়সের সাথে সাথে চরিত্রেরও কি পরিবর্তন আসে নি? আমি স্পষ্টই জানি না।

মাণিককে তোর মনে আছে?

সেই দস্তপাড়ার হিরণ কবিরাজের ছেলে মাণিক? ও মাঝে মাঝে আসে আমাদের বাড়ী। আমার শব্দরবাড়ীর দিক দিয়ে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে ওর সাথে।

আর ও এসেই জানিস, আমরা দুজন জাবদাপোতার সেই পুরোনো জীবনে ছুটে বাই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এ-হেন লোক নেই বার কথা আমরা বলাবলি না করি। সত্যিই বেন আমরা বয়সটাকে টান মেয়ে ছিঁড়ে ফেলে আবার সেই জাবদাপোতার দুটো কিশোর-কিশোরী হ'ত: উঠি। কি যে আনন্দ, ভাবার তা আর আসছে না।

আমার বরসোয়ার কাজকর্ম সব পড়ে থাকে। আমার ছেলেমেয়ে দুটি হেসে কুটি কুটি হয়। বলে—মা, তুমি কি ছেলেমাছ, কেন এখনও সেই তুফন রায়েব তের বছরের বোকা অবোধ মেয়েটি আছ। ছেলেমেয়েরা আমাকে তাদের বন্ধুর সঙ্গে স্থান দিয়েছে। আমিই তাদের সে সুযোগ দিয়েছি। গুরুগম্ভীর মা হওয়া কিন্তু আমার গাজে? তুই বল।

তোরা বলতিস খোসাধুণে, বোকা। ওরা বলে ছেলেমাছ, সরল। এইটুকুই বা তাকাও। আসলে স্বভাবে আমি বোধ হয় সেই পুরোন পুটিই আছি।

হ্যাঁ, মা বসতিশূন্য। আমাদের আলোচনার কীকে কীকে তোর কথা উঠবেই উঠবে। প্রথম ত, আমি আর মার্শিক দুজনেই তোর স্নপুঙ্খ, গুপ্তুঙ্খ ছিলাম; তার উপর তুই এখন কুতা ব্যক্তি। তোর কথা শু ভাগবেই বুঝে দিয়ে।

মার্শিক সেদিন বলছিল—আমাদের সময়ে যে ক'টি ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার মধ্যে আমার মনে হয় সুরজন সমাদারই শ্রেষ্ঠ।

যদি তোর পোরাণী নামটা টপ করে ধরতে পারিনি। জানতাম, শুট করে মনে আসে না। আমি ভেবেছি, মার্শিক

বুঝি দস্তপাড়ার সুরেন সমাদারের ছেলে কেউটার কথা বলেছে। ওর ভাল নামও ত সুরজন সমাদার। মনে নেই তোর? সেই যে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে এলো? কত হে-টচ হোল গায়ে?

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠেছি—কেন, আমাদের ভিখুও ত মস্ত হয়েছ।

এ কথায় মার্শিক হেসেই সারা হোল। বলল—তুই চিরকাল এক রকমই রয়ে গেলি, আর ভিখুর নামই তো সুরজন। তুলে গেলি? ভারতলক্ষী অটোমোবাইলের জেনারেল ম্যানোজার মিটার এস, কে, সমাদার।

আমার ছেলেটি চোখ বড় করে বলল—সে কি? সেই তোমার ভিখু? এত ধীর গল্প কর? তাঁকে কে না চেনে মা? মস্ত লোক।

ভিখু, তুই যে সত্যিই এত বড় হয়েছিস, সর্কজনে তোরা নাম জানে, এ বুঝি আমার কল্পনারও আসেনি। ছেলেয় কথায় গর্কে আমার বুক ফুলে উঠেছিল, আমি ঈশ্বর তাক্ষিল্যের স্বরে বলেছিলাম—ও সব স্বত গালভরা নামই থাক না কেন, ভিখু আমাদের কাছে ভিখুই। না যে মার্শিক?

মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”
“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সত্যতা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলার্স

মিনি লোমের পথের দিগন্ত ও রাস্তা-ভরসী
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



মাণিক কিছু না বলে হেসেছিল, হাসির অর্ধটা আমি ঠিক ধরেছিলাম। ও হাসি দিয়ে এই বলতে চেয়েছিল 'ভিখুর ভোমারোহ ক'রেই তোর দিন গেছে, ভিখু বিন্দুমাত্র তোকে পাভা দেয় নি'। এ ত আমার চোখেই দেখেছি। তবে ক'কে তুই কি বলছিল?

ভিখু, ওরা তোর চোখের জলের ইতিহাস জানে না। আমি বলিনি। মাণিকের হাসটাকে আমি তাই অন্যরাসেই অগ্রাহ্য করতে পারিলাম।

তোর একনারকর আমার সবাই মেনে নিয়েছিলাম। কেন? কি ছিল তোর মধ্যে? এক মাত্র বাপের টাকা আর নিজের চোহারা ছাড়া? তুই ছিলি স্বভাবনিষ্ঠর খেয়ালী, অহংকারী বিশ্ববখাটে। বড় লোক বাপের একমাত্র পুত্র বলে কিছুটা উদ্ধতলও। সেই চোদ্দ পনের বছর বয়সেই সিগারেট খেতে শিখেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। আমাদের সামনেই খেতিল। কারণ তুই পরিষ্কার জানাতস তোর জন্মে আমরা কেউ বুঝ খলব না।

দেখ, একমল মানুষ অস্ত্রের উপর প্রতিপত্তি করার মত শক্তি নিয়েই জন্মায়। আবার তার উপটোটাও আছে। বিপরীত শক্তি নিয়ে আরেক দল মানুষ আত্মগত। স্বীকারটাকেই তাদের একমাত্র কর্তব্য বর্ণ্য বলে মেনে নেয়। ভিখু, একমাত্র চোহারা ছাড়া তোর আত্মগত স্বীকারের অস্ত্র কোন আকর্ষণ ছিল না। তুইয়ে তুইয়ে আমারই তোর গুমর বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। চটহিস? এখন আর তোক ভয় কি বল? তুই পকাশ বছরের এক প্রৌঢ়ীকীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বরী, আমি পকাশ ধরব ধরব এক প্রৌঢ়া, আত্মবিখাসে জটিল। অস্ত্র আর সব বিবরে বত আকাশ পাতাল তফাতই থাকুক না কেন, বয়স আমাদের কারকেই ছেড়ে কথা কয়নি।

তুই তুই কিছুতেই আর স্পর্ধা ভেবে কিল উঁচিয়ে ছুটে আসতে পারিস না আগের মত। আমিও আর আগের মত সে নির্ভীকতা বুঝ বুঝে সহ করতে পারি না। সময় আমাদের অনেক কিছু নিয়েছে। তবু এখনও অমন একটা দৃঢ় কল্পনা করতে আমার মোটেই খারাপ লাগছে না। তোর?

আমার মেরে বলে—মা, আসলে তোমার বয়সটাই বেড়েছে। মনটা ভাল রেখে তার সাথে বাড়তে পারিনি। সেই জাবদাপোতারই দ্বিতরী হয়ে পাঁড়িয়ে আছে।'

হয়ত। কিন্তু তাতে কার কি অস্ববিধে হচ্ছে? আমি আমার সেই মনটা নিয়েই যদি মশগুল থাকি, কার কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে?

আসলে আমার ছেলেমেয়ে দুটি আমার এই দুর্বলতার সুরোপ নিয়ে তাদের মায়ের ছেলেবেলার গল্প শুনতে আনন্দ পায়। খুশিতে প্রকক সময় ভড়িয়ে ধরে আদর করে বলে—মা, তুমি কি সাংবাদিক ভাল ছিলে মা। ভিখু, এমন কথা তোরা কেউ বলিসনি কোন দিন।

নিজের চোহার মৈক্রে এমনিতেই আমি নীচ হ'রে থাকতাম তোমার কাছে। তার গুণর আমার বাবাও ছিলেন দরিদ্র দুঃসহ্যারী। আমার গুণর নির্যাতনটা তুই তোর অধিকার বলে ধরে নিয়েছিলি। আমি ত ওটা আমার প্রাণা ব'লেই মেনে দিতাম। পাড়, নিরীহ, বোকা বলে প্রতিবাদ করার শক্তিও ছিল না।

তুই আখাত দিয়ে দিয়ে কথা বলে মলা লুটভিস, আমি রান

মুখে তাই সহিতাম। ভিখু, কি বোকা ছিলাম আমি। বাড়ীর গাছের আম, জাম, পেয়ারা আমি কখনো তোকে না দিয়ে থাকিনি। মা আমার এর জন্তে কত বকুনি দিয়েছেন। বলেছেন—ভিখুর জন্ত কি অত? ও বড় লোকের ছেলে, ওর সাথে তোমার কি অত খেলা? বড় হয়েছ এখন আর বাইরে ছুটে ছুটে বাবে না।

বার তের বছরের মেরেকে বাইরে বেরোতে নেই বললেই কি সে মানে? আমি লুকিয়ে লুকিয়ে শাড়ীর তলার আম পেয়ারা নিয়ে ছুটে যেতাম তোদের খেলার মাঠে।

সবাইকে কম কম দিয়ে তোকে অনেকটা দিতাম। ভিখু, সে সব দিন কি তোর মনে আছে? এক দিন তোরা চোর-চোর খেলছিল। তুই, মাণিক, পাচা, ভূপতি, পুশি, লভু, ময়ূ।

আমায় দেখেই পুশি চোঁচিয়ে উঠল—ভিখু, ঐ দেখ পুটি আসছে। ভিখু, তুই হঠাৎ খেলা বন্ধ করে আমার সামনে হনহন করে এগিয়ে এলি।

তোর মুখ দেখে আমার ভর হোল। কাছ এসে গজীর গলায় জিজ্ঞেস করলি—এই পুটি, তুই নাকি লুশিকে বলেছিলি আমার ছোট পিসীর চোখ টাচা?

জন্মে আমার গলা কাঠ হ'য়ে আসছিল। কোন বকমে মাখা নেড়ে 'অস্বীকার করতে চাইলাম, লুশি চোখ পাকিয়ে তেড়ে এসে—এই মিথ্যুক, তুই বলিস নি?

তুই ঠাস করে আমার গালে চড় কবিয়ে দিয়ে বুঝ জেতে বললি—নিজে কি? কেলে গুলারী। পাবগাছের পেত্নী। বা ভাগ।

ওরা উচ্চবোলে হেসে উঠল। আমি চোখে হাতচাপা দিয়ে ছুটে এলাম বাড়ীতে। ভিখু, মনে পড়ে?

আরো আছে, শোন। বাবা, মা, আমার বিয়ের জন্ত অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন। তেরর পেরিয়ে চোদ্দর পড়লাম। সবছ অনেক এসে। কতজনে দেখে গেল, কিন্তু পছন্দ আর হোল না কারো। এ নিয়েও তুই আমার আখাত দিয়ে দিয়ে কত কি বলেছিলি।

সেদিন আমি মায়ের আচারের বোহিম থেকে তেঁতুলের আচার চুরি ক'রে তাদের বাড়ীর সামনে এসে পাঁড়িয়েছি। তুই আদেশ করেছিলি আমায় তেঁতুলের আচার আনতে। সুই পড়ছিল বিয় বিয়। তাদের দক্ষিণখোলা বারান্দায় তুই আর পাচা পাঁড়িয়েছিলি। আমায় দেখে তরতর ক'রে নেমে এলি। আমি সবটা তোর হাতে তুলে দিলাম। তুই পচাকে মিলি, আমাকেও একটু।

ধুব রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছিলি। পাচা এক সময় বলল—ভিখু, কল পুটিকে দেখতে এসেছিল যে। জানিস না তুই?

তুই চোখ বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞপের স্বরে বললি—সত্যি নাকি? তা বরট কি? ভূত না রাক্ষস? না ভুভই। ভুভ-পেত্নী। একটু আগের তেঁতুলের আচার তখনও টাঙ্গরায় কেলে টাঙ্গ টাঙ্গ শব্দ করে খাচ্ছিল। আমার চুরি করে আনা তেঁতুলের আচার।

ভিখু, সত্যিই তুই অসাধারণ। সেই ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু তোর শুধু যদি ঐ চোহাই আমার স্মৃতির সখল হয়ে থাকে তবে কি আক লীফ কাহিনী লেখার প্রেরণা পেতাম নিজের অন্তর

থেকে? তা নয়। তোর পরিবর্তন অনেক দেখলাম আমি। একবার শৈশব অবস্থার আমি একদিন খোঁড়া ভিক্ষুককে খোঁড়া বলে ক্ষেপিয়েছিলাম, তুই আমার বিবেক করেছিলি। বলেছিলি—খোঁড়াকে খোঁড়া ও কানাকো কানা বলতে নাই। আমি বইতে পড়েছি। সেই তুইই আমার আর একটু বড় হয়ে ক'কে কি না বলেছিলি?

ভিখু, সবচেয়ে যে ছবিটা আঁজও—সেই জলজলে হয়ে বার বার ফুটে ওঠে, যেদিন থেকে আমি তোকে আমার কানিনী শোনার বলে স্থির করেছিলাম, সেই দিনটার কথা বলি। সেই তোর চোখের জলের দিনটির কথা। ভিখু, চোখের জলের উল্লেখ কি লজ্জা পাচ্ছিলি?

যিরে আমার হোল। পাশের গাঁ ক্ষেত্রপূর্বের অবনী রায়ের ছেলের সাথে। যিরে মিটল। পরের দিন শব্দগুণে যাত্রা। আমার চোদ বছরের জীবনে বাবা, মা, ভাইবোন, আমার খেলার সাথী তোরদের সবাইকে ছেড়ে যেতে জীবনের সব চেয়ে বেশি কান্না আমি কাঁদলাম।

বিকলের দিকে পাড়ী করে বওনা হয়েছি। স্বামী হেঁটে চলেছেন। কিছুটা এগিয়েও গেছেন। আমার পাখীর সাথে সাথে হেঁটে চলেছে আমার ছোট ভাই জম্বুলা। ভিখু, তাকে তোর বনে আছে? সে আঁবেতে নেই। গত বছর মারা গেছে।

গায়ের শিবমন্দিরটা ছাড়িয়ে 'এসে আমরা সবে বড় মাঠটার নেমেছি। হঠাৎ জম্বুলা আমার পাখীর দরজাটা একটু কীক করে বলল—সিঁদ্রি, ভিখু'।

আমি তখন আর কাঁদছিলাম না। ভাবছিলাম স্বামীর কথা, শব্দগুণার কথা। জম্বুলার কথার চমকে আমি দরজাটা আরো একটু কীক করে খুঁটা বাড়িয়ে দিলাম। একটা সাইকেল সাঁ দাঁ করে ছুটে আসছে। তোর নতুন কেনা সাইকেল।

ধামল। তুই নামলি সাইকেল থেকে আমার পাখীও ধামল। স্বামী এগিয়ে গিয়েছিলেন। ওখানেই থেমে পড়ালেন।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে তুই কি করতকগুলো তুলে আনলি। চাঁটটা সামনে ধরে বললি—বিলিতি আমড়া। তুই খেতে চেয়েছিলি। নে।

ভিখু, জীবনে অনেক পেরেছি, জানিস? স্বামীর অপাধ ভালবাসা। ছেলেমেয়েদের অপাধ ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা। কিন্তু সেদিন তুই বা গিয়েছিলি তার ব্রি আর তুলনা নেই। সে ছবিটা আমি একটু ভাবলেই চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করি। হবহ। একটুও কষ্ট হয় না। ভাবি, 'এমনি ছোট দু-একটা কথাই একটা মনের কতটা দেখা যায়; আমি'তোর সবটা দেখেছিলাম।

আমড়াগুলো হাতে নিয়ে আমি কেঁদে কেঁদেছিলাম। তোর তুচ্ছ-ভাঙিলা অবহেলা, বিদ্রূপ আমার চোখের জল টেনে আনতে পারেনি।

আজ তোর দুটো সাধারণ কথা আমার বেন বন্ধার জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ধবাগলার তুই বললি—কাঁদিস না পুঁটি, কাঁদিসনা। এই ত কাছেই। ইচ্ছে চলেই চলে আসবি। আমিও সাইকেলে চড়ে চলে বাব সাঁ সাঁ—কাঁদিস কেন?

বলতে বলতে হাতের উলটো শিট দিয়ে চোখ মুছলি তুই। মনে পড়ে ভিখু, মনে পড়ে? এর পরে ফুলশয্যের রাতে স্বামী আমার জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছেলোট কে?

আমি তখু সে রাতে তোর কথাই বললাম। কত তোর বকলোক। কত তোরের দাপট। কত তুই স্নেহ।

স্বামী হেসে আমার শিট হাত রেখে বললেন—তোমার খেলার সাথী ত ভবে মস্ত লোক। ভিখু, বিশ্বাস করবি?

খুব আশ্চর্য্য হচ্ছিল? ভাবছিল এত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা এক দীর্ঘদিনের ব্যবধানে স্মরণ থাকে কি করে?

ভিখু শোন, ভগবান বাইরে যাবের কিছু সেন না, অন্তরে তাবের এমনি দু একটা সঞ্জন ঘিরে সেন, নইলে অন্তরের মায়াবী জীবনে সুখী হয় কি করে বল?

মোট চুনীকে মনে আছে? সেই যে ছোটবেলার থাকে ক্যাকল কার্তিক বলে ক্যাপাতিস? ওর সাথে হঠাৎ সেদিন ট্রামে দেখা। জোর করে টেনে আনলাম বাড়ীতে। অনেকের খবর পেলাম। কে কোথায় আছে, কি করছে।

তোর কথাও বলল। বলল—ভিখু আজকাল কলসোক হয়ে ছোটবেলার বন্ধুদের চিনতে চায় না। ও নাকি ওর সেক্স হেলেরি জন্ত তোর কাছে চাকরির উন্মোচনী করতে গিয়েছিল। তুই নাকি বলেছিলি ম্যাস্ট্রিক কেস হেলের কোন চাকরী আপাতত; তোর হাতে নেই। থাকলে জানাবি। আর বলেছিলি, যোগ্যতর হলে হলে নিশ্চয়ই চাকরি হবে। শুধু খাতিরে তুই চাকরি দিস না। সত্যি? ভিখু, সত্যি? চুনী খব রেগে গিয়েছিল তোর ওপর। অনেক কিছু বলল কড়া কড়া। কিন্তু আমার শুনে কি বে ভাল লাগল—



এটা পত্র নয়। এটা কাহিনী।

পড়তে খুব বেশি বিরক্তিকর লাগছে? বৈধব্যের শেষ সীমার এসে যাঁসে বিরক্তিতে কি কেটে পড়তে চাইলি?

আর নেই। অম্মই। বৈধব্য ঘরে আর একটু শোন। এর পরেও দু-চারবার জাব্বাপোতার গিরে তোকে দেখেছি।

তুই তখন গাঁয়ের হুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার কলেজে পড়ছিলি। লেখাপড়ার খুব ভাল হয়েছিল। সবাই খুব অবাক হয়েছিল। আমি হইনি। আমি তোর পরিবর্তন সেই স্বপ্নবাজী বাওয়ার পথেই দেখে গেছি। আর একটা মোড় ঘুরেছে, সেই মুহূর্তেই আমি বুঝেছিলাম।

তুমি ভাবতাম, ভাল-মন্দ মোড় ঘোরাঘুরির শেষটা কি? ভাল না মন্দ? অনেকের মুখে শুনি তুই খুব দাঁড়িক। অহঙ্কারী।

আমি বলি, দম্ভ ভাল নয়। তবে অহঙ্কার করার মত সত্যিই যদি কিছু থাকে থাকে সে অহঙ্কার নিয়ে কি? কুটী পুরুষের অহঙ্কার ত একটা ভ্রমণ।

এর পর ধাপে ধাপে তুই কোথার উঠে গেলি। আমিও কি পড়ে উঠলাম? না ভিখু, আমিও "নীচে উঠলাম না। আপন সঙ্গীতে সবার উপরে আমার প্রতিষ্ঠা তোল।

স্বপ্ন-শাক্তির স্রোতে, স্বামীরা প্রেমে, ফেলেমেয়েদের ভালবাসায় আমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠলাম।

কিন্তু বুঝ কি কারো চিবকালের? স্বপ্ন-শাক্তি গেলেন। তার চাব বহু পথ স্বামী। চুটি নাবালক ফেলেমেয়ে নিয়ে আমি একেবারে অগাধ সমুদ্রে পড়লাম। চাক্তবু খোলাম, কিন্তু ডুবলাম না। আত্মবিশ্বাসের যে মূল শিকড়টি আমার মনে গেঁথে দিয়ে গিয়েছিলেন আমার স্বামী, তার জোরে আমি দ্রি় বিশ্বাসে অটল রইলাম। কুটী পাশও দিলাম। খুঁজে পেতে চাকরি বোগান্ড করলাম। তারপর দীর্ঘ বার বৎসর ঘরে সঙ্গীতবর্ষাটি বাটরে নিয়ে এসেছি। বড় আসে, ভুঁকান আসে, বৃষ্টি বায়লা। তবু এ পাশে হলে, ও পাশে কাত হর, জল শুটে। কিন্তু ডোবে না। শক্ত চোটে আমি যে তরীর চাল ধরে আছি।

এত দীর্ঘ কাহিনী শোনালাম কেন তোকে? কি লাভ? ভিখু, জীবন কি একটা লাভ-ক্ষতির হিসাব খাতা? এ একটা নেশা। গল্প শোনানর নেশা। আমি নিজেকেই নিজের গল্প শোনাই। ফেলেমেয়েদের শোনাই। তোকেও শোনালাম। কেন? আমার ফেলেমেয়ে গল্পে তুই যে অনেকটাই জুড়ে আছিস। তোকে শোনানর সুযোগ খুঁজে আমি অনেকদিন থেকে। সেই—সেদিনের স্রোতের জলের সিনটি থেকে। আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগ এসে গেল। সেটাই বলি।

ফেলেটি বড়। বি-এ, পাশ ক'রে একটা চাকরির ক্ষমত আকাশ পাতাল খুঁজে মরছে। পাচ্ছে না।

সেদিন দুপুরে কোথা থেকে ঘরে এসে হালাল হ'য়ে আমার পাশে বসার ক'রে বসে পড়ল। ক্লাস্ত বিষম হয়ে বলল—না, না, আজ-কালকার দিনে মুকলী হাড়া চাকরি হয় না। অনেক দেখলাম, অনেক খুঁজলাম। হবে না। কি করি যা, কি করি?

ওর ভেঙ্গে-পড়া চেহারাটা আমার মনে সমুদ্র-টেউয়ের মত ঝড়োছিল। আমার ফেলেমেয়ে ছুটি প্রাণবন্ত। দ্রুত অতাব

অনটনও ওদের প্রাণচাক্ষুণ্যকে দ্রান করতে পারেনি। আমি ওর মাথার চুলে হাত বুসিয়ে কি একটা সাদনা-আবাসের কথা বলতে গেলাম। তার আসেই ও একান্ত হতাশ গলায় স্বপ্নতোক্তি করে উঠল—একজন বড়লোক আদ্যারও আমাদের নেই, থাকে একটা ধরা বার—

আর তুমি, আশ্চর্য্য, সেই মুহূর্তেই তোকে মনে পড়ল ভিখু। শুধু মনে নয় বুঝ কসকে আমার বেরিয়ে এলো ভিখুকে বললে—কথাটা, খোকন আমাকে শেব করতে দিল না। এবল আপত্তি জানিয়ে ভুক কুঁচকে বলতে লাগল—না, না, না। কক্ষণও না। খবরদার না।

ভিখু তোকে গুণা দেখেনি। কিন্তু আমার মুখে তোর এত কথা শুনেছে যে, মায়ের ছোটবেলার নির্ধাতনগুলো যেন প্রত্যাক উপলব্ধি করতে পারে ওরা। ওর অশ্রুতা অভক্তির বহর দেখে আমি আশ্চর্য্য হোলাম, কুত হোলাম, ব্যথিত হোলাম।

আমি কি শুধু তোর একমিকট তুলে ধরেছি ওদের চোখের সামনে? তার চেয়ে অনেকটাই বেশি ক'রে গল্প বলেছি যে সেদিনের সেই চোখেব জলের।

খোকন আমার দিকে রাগ করে তাকাল—কক্ষণো তুমি ও কাক করতে না।

ও ঘর থেকে মেয়েও ছুটে এলো। সব শুনে বিরক্ত চাপা হয়ে বলল—ছি ছি ছি। ভিখুর তোয়ামোদ করা কি ইহজীবনে ঘূচবে না তোমার? ভিখু, ওদের কথা ক'র কোন জবাব দিলাম না আমি। কি দেব? ওদের অল্প বয়স, বাটরের চেহারাটা দেখে। তলিয়ে দেখাব বয়স, মন ওদের এখনও আসেনি। ওরা ত তোর বাটরের চেহারাও দেখেনি। শুধু শোনা কথা ক'টা লোকে আত্ম দাখ বল?

পাশিসু কোন ব্যবস্থা করতে? একটি সাধারণ ভাবে বি-এ, পাশ করা ছেলের বোগ্যতা অনুধারী কোন চাকরির সন্ধান আছে তোর কাছে?

ওরা ঘুমিয়ে আছে। আমি চুপি চুপি লিখছি। ওরা জানেন রাগ করবে, দুঃখ পাবে। এই নিঃশব্দ রাতে আমি যেন চলে গেছি সেই জাব্বাপোতার। পাকিস্থান হ'য়ে গেছে। আর বাওয়া হবে না। বড় দুঃখ হয়। হঠাৎ একটা খটকা আমার হৃৎের মত ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল।

ভিখু, তুই কি ভাবছিস খোকার চাকরির উদ্দেশ্য নিয়ে করতে এত পূর্বস্তুতি টেনে আনলাম তোর সামনে? আমার মেয়ে যা বলেছে, সেই খোয়ামোদই করছি বলে কি ভাবছিস তুই?

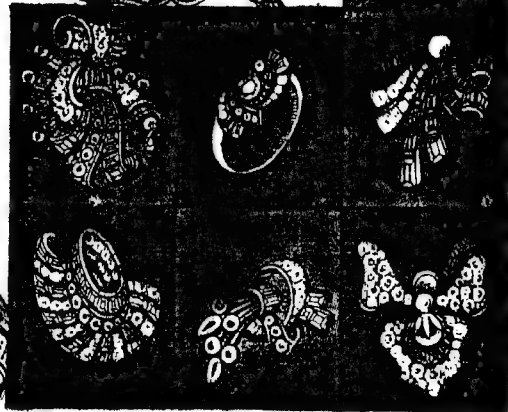
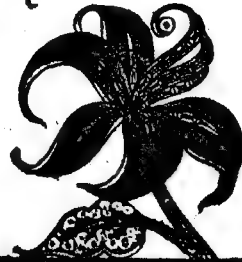
না, না, ভিখু, তা নয় তা নয়। খোকার চাকরি একটা উপলক্ষ্য, একটা সুযোগ।

দীর্ঘ পঁচিশ বছরে চিঠি লেখার সুযোগই আমি খুঁজেছি। আজ সেই সুযোগের সম্ভাবনার হোল মাত্র। খোকা বি-এ পাশ করেছে। উত্তীর্ণী ছেলে। আজ হোক, কাল হোক, চাকরি ওর হবে। বোগাড ও করবেই।

এ শুধু গল্প বলা, কাহিনী শোনান। নেশা। আমি আর আঘাতে নেই। জাব্বাপোতার ভূহন বাটের তের বছরের কালো মেয়ে পুটি হয়ে একটা ছেঁড়া ময়লা শাড়ী সর্দাকে জড়িয়ে একটা



সৌন্দর্য্য মার্ঘ্য



গিনিজাল্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম,বি,সরকার এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭০১

১৩৭/সি ১৩৭ মি/১ বকুলের ট্রাই কলিকতা-১

গ্রাম-পিলিয়ার

ব্রাহ্ম-হালি গণ-২০৭/সি মাসাউটী এলিন্ড কলিকতা-১ ফোন-১৬-৫৫০০

কোচবাজার পুরাতল ষিটনকা

১২৫,৩৭৪/১, অরুণাকান্ত স্ট্রিট, কলিকতা-১

কেন্দ্রমণ্ডল রবিবর গোলা থাকে

ব্রাহ্ম-জামসেদপুর জাম-জামসেদপুর-১ মিটি-২৫৫৮৫

B.B.

টুকটুক কাঁদাশব্দ। তোর সামনে ধরে গাছছি—নে ভিখু! আমাদের পুরুষের দক্ষিণ পাড়ের গাছের কাঁদাশব্দ। খুব মিষ্টি। নে, বা।

সবরের অনেকটা অপব্যয় হোল বলে খুব বিরক্ত হয়ে হাতের কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলিস? বিরক্ত চাপা করে কি বলছিল—বস্তু সব?

না, ভিখু, আমার তা মনে হয় না। মোড় ঘুরাবরির শেখটা যে আমি তোকে অস্ত্র বসক ভাবছি।

তোর ক'টি ছেলে-মেয়ে? কে কি করছে? খুব জানতে ইচ্ছে হয়। তোর স্ত্রী শুনেছি খুব সুন্দরী বিদ্যুৎ মহিলা। ভিখু, নইলে তোর কাছে মানাবে কেন?

তোর গল্প শোনার আশার রইল। এখনকার গল্প। ভগবানের নিকট তাঁদের সর্গাঙ্গী কুশল প্রার্থনা করি। ছেলে-মেয়েদের আমার রেহাইরীদ দিস। স্ত্রীকে আমার ভালবাসা জানাস। তুই আমার আন্তরিক ভালবাসা গ্রহণ করিস। ইতি—

নিরুপমা বার (পুঁটি)

মাইনাস কাইতের নীচে দুটিটা কাপসা ঠেকছে। ভবিষ্যৎ, বর্তমান লুপ্ত হয়ে মন ছুটে গেছে সেই অজ্ঞাতে। জাবদাশোভার। কৈশোরবোকার একটা ছবি যেন অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হচ্ছে। কাপসা দুটির ভেতর দিয়ে আবছা আবছা একটা ছবি যেন ফুটে উঠছে। যেন বিকেল গড়িয়ে-একটা সন্ধ্যা। আলো জাঁধারে। ঐ ঘরে মাঠের মাঝ দিয়ে চলকি চালে একটা পাখী চলেছে। অল্পবয়সী একটি কিশোরী বালক পাখীর পাশে পাশে ছোট চলেছে।

পাখীর দরজাটা অল্প একটু ফাঁক হোল। আরো একটু। কদে ঢকনে সাজান একটি কিশোরী মেয়ের মুখ আবছা আবছা জাসছে।

হুঁ চোখের জলে চকন প্রসাধন একাক্তার। প্রসাধিত হাতে কি কতকগুলো। পাখী আবার চলল। দরজাটা কিন্তু খোলাই রইল। পুরোপুরি।

লডাম। চমকে বিমুগ্ধির অন্তর থেকে বাতবে কিরে এলেন নিঃসমাদার। কোথায় তুলির গিয়েছিলেন। কিরে গিয়েছিলেন বুঝি সেই শৈশববেলায়। পুঁটি ঠিকই লিখেছে, চেষ্টা করলে সে সব দিন মনের অন্তর তল থেকে তুলে ফানো যায়।

কিন্তু শব্দটা কিম্বদ? উঠলেন। বেগিং বঁকে তাকালেন নীচে। বিরাট ক্যাডিলাকটা এসে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী নেমে দরজাটা বন্ধ করেছে। তারই শব্দ।

ভেসে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। আঙুলি উত্তর দেবেন। ঠিক এই বন এই ইচ্ছা থাকতে থাকতে। কাজের হাঙ্গাম, ব্যস্ত হাঙ্গামের অনেক ছালা। ফুলে যেতে পারেন। কলমের খাপ ফুলে আঁতড় করলেন—তাই পুঁটি—

রাজ্যামাটি

বিভা সরকার

ছাঃগো গাড়ী বর্ধমান—হাফের এ রাঁধাঘাট কি সের শার রক্তে রাঙা? জাহাজীদের কলকে কি এ প্রান্তর উপায়ী? হুঁ নীরব পাথ পাখী চলেছে হুমুসিয়ে কাঁচ মিলে কোন দিকে?

এমনি করেই কি একদিন সের আভাগ্যপত্নী সত্যবিধবা মেহেরউল্লিগা চোখের জলে এ ফুল মাটি ভিজিয়ে দিল্লীর পথে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন পতিব্রাতী বাঁধাশহের মহলে?

একদা নরসিংহর বুঝাঙ্ক সেলিম সেদিন শাহনশাহ জাহাজীর। সেই জাহাজীর কি সেদিন তাঁর নয়নে আর প্রিয়তমের রূপ ধরে লগ্না গ্রহণ করতে পেরেছিলেন?—ইতিহাস এর বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়। বহু প্রতীকার পর বুঝাঙ্ক বধন ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হলেন বাঁধাশাহ রূপে অজ্ঞানের বিনিময়ে তাঁর প্রেমাপন্যাকে—চমকে দেখলেন যে এল এত তাঁর সেই কবে হারিয়ে যাওয়া আকাঙ্ক্ষিত নয়। কালক্রোচে সে চিরদিনের মতই ভেসে গেছে—সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সের আকগানের সত্যবিধবা, স্বামিহত্যার বিচার চায়। বিচার চায় লায়লির জননী অকারণে লায়লিকে অনাথ করার অপরাধের। নির্দাঙ্গণ ব্যথার চমকে উঠলেন জাহাজীর, মাথা নত করে কিরে গেলেন রাজমহলে—সেদিন তাঁর ধর্মঘটা কলকধনিই করেছিলো। বর্ধমানের লোকের মুখে আজও জেগে আছে এক অদ্ভুত কিংবদন্তী সের আকগানের সমাধি ঘিরে। আজও নাকি নিশীথ রাত্তে শোনা যায় কোনও রমণীর কণ পদধ্বনি চাপা ক্রন্দনের স্বর, এই সমাধি ঘনিয়ে।

তবু মনে হয় সন্ধ্যাট জাহাজীরের এ বলাক সবটাই তাঁর কলক নয়। মহামান্ন আকবরের ইচ্ছার নওরোজার বাজার বসন্ত যোগল হারয়ে—এর ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই সন্ধ্যাতবলীর উজীর গুমরাহ অথবা রাজবরের ঘরনী বা কজা। এই প্রকৃষ্টিত পদ্যবনে একমাত্র পূর্ণ্য বাঁধাশাহ বা বুঝাঙ্ক। কত বরের কত সর্গনাশ কত অঘটনই না ঘটেছিলো এই নওরোজার বাজারে, তার সত্য ইতিহাস আজ কালের কবলে লুপ্ত। তবু কিছু কিছু আজও শোনা যায় লোকমুখে কিংবদন্তীর আশ্রয়ে।

এমনি এক নওরোজার বাজারে ঘুরে বেড়াছিলেন বুঝাঙ্ক সেলিম—ফুলগুরালী মেহেরউল্লিগার ঘোমটা গেল ফুলে বেছুর বা সৈবেছুর, তা তবু জানা রইল অস্ত্রধারীর। চারি চকুর মিলন হল—আরম্ভ হল সেই চিরন্তন লুকাচুরি খেলা। লুকিয়ে নিত্য হয় দেখা-সাক্ষাৎ—ফুলগুরালী মিহর আসে ফুলের গহনা নিয়ে মহালে মহালে রাজমহলীদের সাজাতে, পথ আটকার সেলিম—বলে ভালবাসি তোমাকে, তুমি না হলে এ জীবন বিফল। প্রপ্রয় বুঝি বা পান—সময়ে অসময়ে প্রতীকার থাকেন সেলিম—শুভ হাওরার কার আসার আশায় বার্ষ পদধ্বনির মরীচিকার উল্লাস হন? মহামান্ন সন্ধ্যাটের কর্ণগোচর হল এ কাহিনী। নির্গম হতে তিনি বাথ সাধলেন—হায়, বহু অভিজ্ঞ সন্ধ্যাট ভানতো নাকি প্রেমের বিচিত্র গতি। তোমার ছকুমে সে যে কোনও রমণীকে গ্রহণ করতে পারে পত্নীরূপে কিন্তু ভাল যদি অপরাধকেই বাসে গোব দেবার কিছু নেই—চিন্তামৌরুলোর কাছে হাঙ্গাম যে চিরশিত!

সন্ধ্যাট তাঁর আশার আশা ছিনিয়ে নিয়ে জোর করে সে ছির হুতুল পাড়ের দিলেন বালাহুতুলে সের আকগানের ঘরনী করে। নিফল আক্রোশে বুঝাঙ্ক হলেন শুক। সে অনিচ্ছ বিরহীর অন্তর বিরহের খবর কেউ রাখল না, বিফল বেদনার বার বার বুঝি সে শূন্য বাঁধাশাহের কান্নার কাল—জাহাজীর ফুল না। ফুল না মেহেরউল্লিগা।

সেলিনের অসহায় রাজপ্রতিনিধি ভবিষ্যের সম্রাট, মনে মনে বুঝি প্রতিজ্ঞা করলেন—মেহের আজ আমার পথ লোহবনিকায় হারিয়ে গেছে—আমার প্রাণপ্রবাহ কঠিন পাবাণে বাধা পেয়ে থমকে পড়িয়েছে, আজ আমার জীবন বন্ধন-কটকিত ভটিল তবু জেন, একদিন সব কটক পায়ে দলে আমি তোমার দ্বারে গিয়ে পড়াবো—সেলিন তুমি এগ সব গরল মছন করা অমৃতপাত্র হাতে নিয়ে—আজ শুধু বইলুখ প্রতীক্ষার সেই পরম মুহূর্তটি—কিন্তু এ সংসারে বা বায় তা চিরদিনের জন্যই যায়। সেদিনের সে প্রেমিক কটক পায়ে দলে দলে দরিত্রতার দ্বারে গেল না—গেল রাজসম্মত অন্তরে অত্যাচারের পথ ধরে—তাই কি বিমুখ হল মেহেরউরিসা ?

কালশ্রোতে সুবরাজ সম্রাট হলেন—একে একে হারেম তাঁর পূর্ণ হল বহু রমণীতে—মহালে তাঁর রূপশীলের সঙ্গোহ—জাহাঙ্গীর বাদশাহের মন তবু শূন্য, চিন্তের হাছাকার তবু মিটল না—কবে সেই কোন বিশেষ মুহূর্তে দেখা মামুখটির জন্ত অন্তরে তাঁর বিরহ জেগেই রইল—দিারাত্র সখল করলেন সুরাপাত্র। শূন্য নিশীথে আনমনা মুহূর্তে স্বপ্নে তাঁর আত্মব হুয়ে উঠত কাক কামনা করে ?

জাহাঙ্গীর বাদশাহ যে এত সুরাপান করতেন, সে ত মনে হয় মহামাত্র আকবরেরই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে। সুবরাজ সেলিন ছিলেন সুকবি প্রেমিক আপনভোলা দিলগিরি রাহু। বার বার প্রেমের স্বপ্ন ভগ্ন না হলে—এমন মনোবৃত্তি আঘাত না পেলে হয়ত তিনি ইতিহাসে রেখে যেতে পারতেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—হয়ত হতে পারতেন স্বনামগুণ আদর্শ পুরুষ। ইতিহাসে নবজাহান জাহাঙ্গীরকে নিয়ে এই যে কলঙ্ক—রাণের স্বাধীনতা এই যে জ্বলন্ত জাহাঙ্গীরের কাগো কালামা, এর জন্ত দায়ী কে ? এ কার কলঙ্ক ? এক দিন সুবরাজের প্রিয়তমাকে ছিনিয়ে নিয়ে পরের ঘরগী করিয়ে দিয়েছিলেন—রাজকীয় গর্বে ক্ষমতার অন্ধ অপববহারে পুত্র ও পিতার পদাঙ্ক অহুসরণ করণ বিধির বিধান অস্বীকার পরিহাসে।—হে সম্রাট আকবর, তুমি একবার নয় বার বার পুত্রের স্বপ্ন নিয়ে ছেলেবেলা করেছিলে, তাকে দিয়েছিলে নিঃস্বয় আঘাত। তার আকাজিকতাদের সে তোমার অভিলাষেই পায়নি।

অন্তে অশিষ্টস্বপ্ন সুবরাজ—চলে গেল কতপুণ্য সিক্রী তোমার ইচ্ছায়। বিরহী মনে তার সুখ নেই, নেই কোথাও সাধনা রাজমহলের এই বৈভবে। সারা বিশ্ব তার দেউলে হয়ে গেছে—

কতপুণ্য সিক্রীর রাজমালকে বসে আছেন সুবরাজ অজমনা—একটি একটি করে পায়রা উড়ে আসছে উড়ে বাচ্ছে। কাক বেঁধে আবার আসছে। সুবরাজ বড় কবুতপ্রিয়—কত যে তাঁর কবুতর, সীরাতি, সুখি লজ্জা—উড়ন পায়রা, নোটন পায়রা, গিরোজ পায়রা, কেউ বা এসেছে কাবুল থেকে। কাক বা জঙ্গলহান বোঁগাধা কেউ বা পারস্তদেশীয়। আবার লক্ষ্যে দিল্লী লাহোর থেকেও এসেছে পায়রা—কান্দাহার পেশওয়ার থেকেও কত বিদেশী বণিক মিলছে কত ভিনদেশীয় কবুতর সম্রাটপুত্রকে। একদিন এখনি কবুতর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন সুবরাজ। হঠাৎ তাঁর ডাক পড়ল বিশেষ জরুরী কাজে—কাছে ছিলেন বালিকা মেহেরউরিসা। ফুল দিতে এসে কবুতর বেগা দেখছিলেন সহজ কৌতুকে। তাই হাতে দিয়ে সেলিন এক জোড়া পায়রা গছিত। কিছু পরেই কিয়ে এসেছেন

ব্যস্ত-জন্ত। মেহের হাতে মেহেরের এক পায়রা। চোখ পাকিয়ে তেঁকে সেলিন রাজার ছেলে—আর এক পায়রা কই ? নির্ভরে কিশোরী উড়িয়ে দিল অল্প পায়রাটি—বললে—উড়ে গেছে এখনি করে !—শুধু সুবরাজ তর্জ্ঞন করবেন কি—বার বার চেয়ে দেখলেন এই নিশ্চিন্ততার পাশে। কেউ কি সেদিন অজম্যান করতে পেরেছিল সম্রাটকে করতলগত করে এই মেয়েই এক দিন সৌন্দর্য প্রতাপে রাজা দাসন করবে ?—নানা বিগত বিষ্ময় স্মৃতির চিন্তায় মগ্ন সুবরাজ শুক হয়ে বসে আছেন রাজমালকে। অন্তরে তাঁর অসহায় আত্মর দীর্ঘশ্বাস হাছাকার করে উঠছে। হঠাৎ কে দ্রুত পায়ে পাখ দিয়ে চলে গেল—যেন চমক ফুল।

বিরহীর টনক নড়ল—জাগল মনে কৌতুক। আবার পরদিন এসে বসলেন মালকে। একটু আড়ালে। বাগানে ফুল ফুলতে আসে এক-ইরাণী মেয়ে। বৃদ্ধ বাপের নয়নমণি, শৈশবে রাছুরা। ঠাই তাদের এক পুরানো ময়দানে—রাজ-অমুগুহীত তারা।

একদিন এই কলঙ্কে বাদশাহ আকবরের দরবারে উপাটকন দিয়েছিলেন এক বণিক। পিতাপুত্রকে পথে কুড়িয়ে পেয়ে এনেছিলেন, সঙ্গে করে ইরাণের এক ফুটপ ফুল। রূপমুগ্ধ সম্রাট নাম দিলেন ‘অনারকলি’ অর্থাৎ ডালিমের ফুল। নিতান্তই নাবালাকা, নয়ত বা ঠাই পেত রাজমহালে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সুবরাজ সেলিন—মেহেরউরিসা বীরে বীরে তলিয়ে গেল বিষ্মতির অন্তরে। বিষ্মতির সে কণাট বন্ধ হয়ে গেল কিছুদিনের মত। মন মেতে উঠলো অনারকলির জন্ত। হার যে রাজপুরুষ—যেন মধুকর !

একদিন দেখলেন দাদীর ঘরে সে কোরাণশরিক পাঠ করে দাদীকে পোনায়—ছলনাময়। হঠাৎ তারও ধর্গাধ্বাণ বেড়ে গেল। বখন তখন দাদীর ঘরে বাতায়ত হল স্তম্ভ। গরবী হামিরাছ সম্রাট বেগম। রাজমাতা মনে মনে মহাশুশি। নাস্তির বুঝি টান হয়েছে দাদীর প্রতি, ভক্তি হয়েছে কোরাণশরিক।

অজম্যানী হাসলেন অলঙ্ক্য। বস্ত্রোজ্জ্বল বসন পরাঙ্গরের সুখোমুখি—দুঃখিনিময় হয়। স্তম্ভ হয় মন দেওয়া-নেওয়া। অবুঝ কিশোরী আত্মদান করল। ভবিষ্যৎ দণ্ডমুণ্ডের যিনি বিধাতা সমাজ দরিকলঙ্ক করল তাকেই আরাধনা। ছিন্ন হল সে মুকুল রাজঘোষে। পদদলিতা হল অসুট-কলিকা সেই অনারকলি। জীরন্তে হল তার কবর রাজচক্রান্তে বা ডাণ্ডের অল্প কেনও বিভ্রমর, নেই তার কোনও প্রমাণ। ব্যাধার বেদনার হাছাকার করে উঠলেন সুবরাজ—হলেন জানহারা। পড়লেন জীবন-সংশয় পীড়ার।

সম্রাট বুঝি বা ফুল বুঝলেন—অখীর হলেন পুত্রের অবদল আশঙ্কার। সাধনা স্বরূপ সুবরাজকে আদেশ দিলেন অনারকলির মকবরা বানাতে। হার। সুবরাজ—তুমি অভিশপ্ত, ভালবেসে কখনও পারি পেলো না কার যেন অমৃতহস্ত পিতৃসাজা রূপে বার বার তোমার অমৃতপাত্র ঘূরে নিকেপ করল।

অনারকলির জীবনকথা—আজ শুধু আধ্যাতিক। শুধু লোক-প্রবাদ। কিংবদন্তী। ইতিবাস তাকে একবারেই ফুলছে, নেই তার মক্কত কোনও কৌতুক। আমার কৌতুকী মন বারবার বসেছিল লাহোর অনারকলি বাজারের মধ্যে অনারকলির মকবর

বা কখনে পিড়ি—কসো বুঝা। একবার তোমার অবতীর্ণ খোজো, দে তবু বহিত। তোমো তোমার এ নীল বস্ত্র রবনিকা। যে অন্যর। কথা কও। শোনাও তোমার জীবনের সংঘাতময় নির্মল কাহিনী।

এক নিঃশ্বাসে অঁকা

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

শিমলা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কীপা বিহঙ্গ সন্ধ্যা নদীর তীরে তীরে। ওপারে ধানের ক্ষেত দেখতে দেখতে। এপারে গ্রামের এবড়ো খেবড়ো। উঁচু নীচু পথে দাঁটার ক্ষেত খেতে। রোক্তাও উঠেছে বেশ চড়া। জলের পাশে যেতে যেতে তেঁরা যেন আপনা থেকেই পেরে বসছে—পা আর চলছে না, অনভাসের কৌটা আর বলে কঁকে! খুঁজছি বিজ্ঞান, খুঁজছি আরাম—ঠাণ্ডা জল এক গেলো।

কিন্তু না, জমণ কাহিনীর মত হ'য়ে যাচ্ছে লেখাটা। জমণ কাহিনী লিখতে তো বসি ন! লিখতে বসছি দুটি মেয়ের কথা আর দুটি মায়ের—একটি মা একটি মেয়ে এই গ্রামেরই—আরেকটি মা আরেকটি মেয়ে—সে কথা পরে বলছি।

তেঁরা, তেঁরা, তেঁরা—বিশ্বামের, আরামের, জলের তো বটেই!

একটা বাড়িও নেই ছাই—খালি ক্ষেত আর ক্ষেত—প্রায় জলে-আসা মটরগুটি, আলুর কান কপির—শেষ কালের রূপধতার ছাপ অবশেষে মাথা টম্যাটোর—এমন টুকটাকি, টুকটাকি—হয়ত বা বেগুনের নয়ত বা আখের।

দেখতে দেখতে অবশেষে এক চোখজুড়ান কুটির—আছা, নিকান বকরক ট্রেন, বিরাট মাচার তলে ছায়াশিখর হয়ে কি আরামের নিকেনই না গড়ে রেখেছে! আমাদের অপেক্ষারই কুঁহিবা—তাই বলা সেই কণ্ডা নেই একেবারে অবতীর্ণ হওয়া গেল রাঠের আল টপকিয়ে।

একটি দ্বীপাক মহিলা নয়—বসে বসে কলাগাছ কুঁচোছে উঠানে। এক পাশে—মাথার সাপড় রবতে কিন্তু গায়ে ও বালি নেই—আমাদের দেখে উঠে এসে—পাতের কাপড়ের আবছা পূর্ববৎ। মজা যেন সকলেই বললাম—কি অসভ্য—পাড়ার্গেয়ে ভূত একেই বলে—একগাল হেসে কাব উদ্দেশ্যে আশে ভারা করল, ওলো পিড়ি, বাইরে আর, দেখসে—বাবা—যেমন শিক্ষাদীক্ষা তেমনি নাম রাখার ছিরি, পিড়ি, আবার ভাবলাম আমরা। তারপর আমাদের ভিজ্ঞাসা কবল—বেড়তে আসা হয়েছে, তা বেশ, বেশ, ওলো ও পিঁড়, এল হারামজানী। আ: কি সন্তোষ!

এবার ঘরখানার দিকে তাকালাম—বহু চোখ পনেরর একটি একহারা কালো কুচ্ছিং ময়ে টট কবে বেহিরে আমাদের দেখে নিয়ে কুলুদী থেকে একখানা ছোট আয়না বার করে নিমেষের মধ্যে একটা সিঁদুর টিপ পরে মুখটা একলাই দেখে নিয়ে বেহিরে এল বাইরে।

হাসি এসে—খালি গা—ছেঁড়া ঠ্যাংরেতে কাপড় পড়া—তাইতে আমাদের সিঁদুর টিপ! পিঁড়ি এসে একটা চাটাই বিছিয়ে দিল আমাদের—তারপর টিপ টিপ করে প্রণাম করল সকলের পায়ের কাছে—ওর মা সমানে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধিন পাট দস্ত বিকশিত করে, কতর কার্যকলাপ সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে—কি অমান্বিত,

স্ন ডেবে পারি না—যেমন সাজসজ্জার তেমনি কার্যকলাপে কি শিখিল এরা? পিঁড়ি তো চাটাই পাড়তে কতবার বে কাপড়ের কশি ভঁজল তার নেই ঠিক।

তেঁরা পেয়েছে তখন বাটি ক'রে জল আর কলা পাতার ক'রে গুড় নিয়ে এল পিঁড়ি—ওর মা ততক্ষণে খেজুরগাছের কাঠ দিয়ে তৈরি ঘাট বেয়ে তর তর করে নেমে সরস্বতী নদী থেকে এক ঝড়া জল এনে দিয়েছে আমাদের মুখ-হাত ধোবার জন্য।

ওদের উঠানে মাত্র চারগাছা আখ ছিল নিটোল পুষ্ট—তাই কেটে দিল তারপর আমাদের খাবার সস্তা। বলল, আর কি খেতে দোব মা কেষ্টার সময়—আম কাঁটালের দিনে এলে কত মিষ্টাম।

পিঁড়ির দিদি এসেছে পাশের গাঁ থেকে মায়ের কাছে। বেড়াতে—ওদের টাটকা ভাত এখনও রাঁধা হয় নি—বেলা দুপুরেও—তাই ছেলেপিলে নিয়ে সে গরাস গরাস পান্ডা ভাত আর বাসি মাছের টুকু খাচ্ছে—মা জল খেতে দিয়েছে।—খাওয়ার ভরীটা কি কম!

দিদি খাওয়া শেষ করে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বোকা বোকা মুখ ক'রে হাসতে লাগল সমান।

জলটিল খেয়ে সুস্থির হ'য়ে আমরা আবার বেরোলাম—পিঁড়ি তার মা আর দিদি ছেলেপিলে নিয়ে হস্তক্ষণ দেখা যায় দেখল—যেন আমরা চলে যাচ্ছি বলে কত বিবর্ণ লাগছে ওদের মুখগুলো। মিনতি বলল, দূর, ওদের সে বোধ আছে নাকি—সেখ না—বিশ শতাব্দীতে বাস করেও কি অবস্থা ওদের?

ভাবলাম তাই তো! অজ্ঞতার অন্ধকারে সভ্যতার অন্তরালে থেকে আজও এরা প্রায় পুত্র জীবনই বাপন করছে—শিক্ষার আসো, সভ্যতার আশা না পেলে মানুষ মানুষপদবাচ্য হয় না।

ঐশে অতিরিক্ত ভিড়। কোন খার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে ভটা শিরের অসাধ্য। অগ্রপশ্চাৎ ভাববার সময় না থাকায় একটা প্রায় খালি খার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টেই উঠ পড়া গেল অগত্যা। যদিও খার্ড ক্লাসেরই টিকিট আমাদের। কিন্তু এ গাড়ীতে না গেলে বাড়ী ফিরতে অনেক রাত।

গাড়ীতে এক মহিলা আর একটি মেয়ে। সাজসজ্জার চেহারার তাকিয়ে দেখবার মত। সকেটের সম্মুখে প্রদ্যর বিগলিত হয়ে পড়লাম।

খার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে খার্ড ক্লাসের গদাঝাঁটা সিটে বসতে কেমন সকেট লাগতে লাগল, সেজন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাব স্থির করলাম, অনেকটা পথ যদিও বা।

মিনতিটা খালি বসতে গেল। মেয়ে তুক কুঁচকে বলল, না না, এটা রিয়ার্ড গাড়ী, মা একুশি শোবেন—বলেই আনন্দে গুটিয়ে রাখা হোলডল শুদ্ধ বিছানানটা বেশ করে বিছিয়ে দিল সিটর ওপর। আর অল্প সিটায় রাজ্যের জিনিষ ছড়িয়ে মা মেয়ে বসে হইল।

তার পর মায়ের মেয়েতে ইংরেজীতে কথা আরম্ভ হল—এক টাকা খরচ করবেও লাভিতে বাবার উপায় নেই—রেলের লোকগুলো হয়েছে যেমন—প্যাসঞ্জারের স্বপ্ন-স্বাচ্ছন্দ্য দেখাবে তা নয়—কাঁড়ি করে টাকা বাবে আর—

তার পর মা জোর দিয়ে বললেন, এ সবই উটনাস্ট টিকিটের বাড়ী—পুলিশে হাওগড়ার করে দেওয়া উচিত—হুতুতু করে উঠ পড়েছে—আবার হুতুতু করে নেমে পড়ে টিকিট কাঁক দিয়ে, সরে পড়বে।

মেয়ে বলল, কোলকাতা কিরকি ট্রেসব্যান্ডে একটা চিঠি লিখব—
রেলওয়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের এই সব গাফিলতির বিবরণ।

আমরা ওদের ইংরেজী শুনে গলোগলো! বিষয়বস্তু সেই
তদন্ততার নিমজ্জিত। এম, এ, বি, এ পাশ করেও অত সূক্ষ্ম
ইংরেজী বলতে পারি না—উঃ এরা কি সূক্ষ্ম ইংরেজী বলে!

মা-ময়ের ফাঁক খুলে চা খাওয়া হল অত্যন্ত। প্রণতির
ছোট বোন বঁকটো তাই দেখে। জল খাব—জল খাব করতে
লাগল—সন্ধ্যায় মরে গেলাম আমরা—সোবাইএ জল ছিল ওদের—
প্রণতি নিরুপায় হয়ে দু'একবার তাকাল সেমিকে কিন্তু মা ময়ের
কানে রীট-ব তুচ্ছ কথা পৌঁছলই না।

একবার গাড়ীটা হেঁকা মারতে মল্লিকা মায়ের কোলের ওপর
থুঁকে পড়ল—তিনি তুচ্ছ নাক সিটকে আড়ট হ'য়ে সিটের ঠেসানে
লেপটে গেলেন—তার পর মল্লিকা সামলে নিতে কোলের কাপড়
ঝেড়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে লাগলেন—আহা, বত নোংরাই লেগে
গেছে গুর কাপড়ে মল্লিকার কাপড়ের সম্পর্কে। এদিকে উনি
পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকায় গুর জুতো গাড়ী দোলার সঙ্গে
সঙ্গে আমার হাঁটতে অনবরত আঘাত করে চলেছে, উনি নিরীকার।

শেষে মেয়ে বালমভাষা খেতে লাগল। কোলে একথানা
তোয়ালে বিছিয়ে কাপড় ঢেকে। খোলাগুলো কিছু গাড়ীর মেঝেয়ই
ফেলল। আর খোলাগুলো ছুঁ'মিয়ে ছুঁ'মিয়ে উড়িয়ে দিতে লাগল।
বার বার আমাদের কাপড়ে গিয়ে এসে অধিষ্ঠান করতে লাগল
সেগুলো। গাঁড়িয়ে রইলাম—ঝেড়ে ফেলে দেবার মত সাহসটুকুও
হ'ল না।

বাদাম ভাঙবার পদ্ধতি—খাবার রকম—চিবোবার কায়দা—সবই
বেন অনবত্ত সূক্ষ্মর। মাহুভ কতখানি শিকা পেলে খাওয়ার মত
বাজে ব্যাপারটাকেও কত সূক্ষ্মর ভাবে সম্পন্ন করতে পারে তাই

দেখতে লাগলাম মুগ্ধ হ'য়ে। মনে পড়ল পিড়ির দিদির খাওয়ার
কথা—সত্যি শিকা মাছরক—

চিন্তার বাধা পড়ল। মিনতির ভাইটাকে মা তখন ঠাস ঠাস
ক'রে চড়াতে লেগেছেন—ছেলোটা ওঁদের পাতা বিছানায় বসে
পড়েছে কোন এক সময়। বত সব ভাট্টা নোংরা—বিছানার ওপর
বসতে এসেছে—জলী ভূত—মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে মা'র—হীপাচ্ছেন,
এক হেঁকায় মিনতির ভাইটাকে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটি ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে
গ্যাটাছি কেস খুঁজে শালিং সন্টের শিশি কার ক'রে মার নাকের
কাছে ধরল—নাও, নাও, চুপ কর—তোমার আবার ব্লাডপ্রেশার—
অজান না হ'য়ে পড়—বত সব অসভ্য অশিক্ষিত জুটেছে—পরসা
খরচ ক'রেও শাস্তি পাবার উপায় নেই—হাদেখলা ভুতোরা এসে
জুটেবেই, জুটেবে—অনর্গল বলতে লাগল মেয়ে—বালা ভাবারই—
কিন্তু উচ্চারণ করার কি কায়দা।

মা একটা পোজ দিয়ে বিছানায় আধশোয়া হ'লেন—আরও
লাল হ'য়ে উঠেছে মুখ—বস্তুর ছোপ মেয়েরও মুখে—কি সূক্ষ্ম
লাগছে দেখতে, কি সূক্ষ্ম!

গাড়ী জীবামপুরে এলে মেয়ে বলল, নেমে যেতে হবে এখানে—
শীগগিরী না হ'লে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবে। নাহি আমাদের—
মেয়ে বলছে, অশিকা আর জোচ্চুরী বত দিন থাকবে—আমাদেরও
সুখ-শান্তি নেই তত দিন।

বাবা, নিখুঁত ফেলে বাঁচলাম—আশরগুলো বিলায় হ'লো এতক্ষণ,
মা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আয়না বার করে মুখ দেখতে দেখতে বলছেন—
বত অনেক হল। ছুটো-তিনটে বাচ্চা সঙ্গে। পিড়ি
আর পিড়ির মায়ের কথা মনে পড়ল আমাদের জীবামপুর টেন্ডনে
গাঁড়িয়ে—এ গাড়ীটা তো নামতে নামতেই ছেড়ে দিল—অন্ত কায়দার
আর ওঠা হ'ল না—পরের গাড়ী ঘটানেক পরে!

নবান্ন উৎসব

পঙ্কজিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার বাংলায় আজি নবান্ন উৎসব
গুঞ্জরিত মৃদুস্বরে নব আশা রব।
কুখ্যায় পীড়িত বত অভাগার দল
নবান্নে উন্নত পুরি পাবে নব বল।
স্বর্গ হ'তে লক্ষ্মীদেবী স্বর্গরথে চড়ি
সবাচার অন্নপাত্র পরমায়ে ভরি,
স্বর্গশ্রেষ্ঠ ভরে দিতে সবার ভাগ্যের
শস্ত-ভাস্কর দেশে আসিবে আবার!

হুবাশার ছলনায় ক্ষুধিতের দল
শীর্ণ দেহে অশ্রু মাত্র লইয়া সবল,
উচ্চ দুঃখ চেয়ে আছে আকাশের পাশে
ওই বুকি লক্ষ্মীদেবী নামে স্বর্গরথে।
এসের ব্যাকুল আশা হবে কি নিঃফল?
অনাহারে ফিরিবে কি ক্ষুধিতের দল?
অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা এস কৃপা করি
সবাচার অন্নপাত্র পরমায়ে ভরি।

বাঁচাও ক্ষুধিত বত ভারতসম্মানে
জাতিক ভারত পুনঃ দেব-গুণগানে।



বাংলার সংস্কৃতিতে গৌড়ীয় সাহিত্য ও সঙ্গীত

প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হ'তে আধুনিক যুগ-সমুদয় শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা দেশ পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, বঙ্গ, বঙ্গ, ভাটরাগুপ্ত, সমতট ও বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। একসময়

পূর্ববঙ্গ বাণীচ বাংলা দেশের প্রায় অধিকাংশ ভূভাগ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। এই গৌড়ভূমিতেই কথ কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প গড়ে উঠেছে, তৎকালীন রাজা বানশাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বৈষ্ণব ও শক্তি-সাধনার সমন্বয়-ক্ষেত্র এই গৌড়-বঙ্গ ঐতিহ্যবাহী প্রদেশের প্রথম সভ্য বৃহৎ হ'য়ে উঠেছিল এই গৌড় দেশে। গৌড়ীয় কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতে বিদ্যেবিশীল আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি, মানুষের প্রতি এমন উসার মনোভাব ভাবের মধ্যে আর কোথাও ছিল না। বাংলা সংস্কৃতির এটাই হ'ল অন্ততম বৈশিষ্ট্য। সুপ্রাচীন কাল হ'তে অগণিত রাষ্ট্রিক বিশেষণের আঘাতেও তা ভেঙ্গে পড়েনি। বাংলা সংস্কৃতির সব চেয়ে বড় পরিচয় মিলবে, বাঙালীর আত্মস্থানিক ধর্মে। তা ছাড়া, অশনে, বসনে, আচারে, বিচারে আর বিশেষ করে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে সর্বত্রই অঙ্গান হ'য়ে আছে সংস্কৃতির স্পর্শ।

প্রাচীন কালে ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রধানত গড়ে উঠেছিল রাজা-বানশাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। যে ভারতীয় সংস্কৃতি ভাগীরথীর পুষ্পশ্রোত বয়ে এসেছে এই বাংলা দেশে, তারই কেন্দ্রস্থল ছিল গৌড় ও তৎপার্বত্য অঞ্চল। প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় এককালে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ ও বাণিজ্য প্রভৃতিতে বঙ্গভূমির স্বর্গদান অধিকার করেছিল এবং এর প্রভাব অসংখ্য আধ্যাতিক বিস্তৃত হয়েছিল।

দশম শতকে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার নব রূপায়ণে সৃষ্টি হ'ল বাংলা ভাষার। ক্রমে এই ভাষা বাংলা দেশ ব্যতীত মগধ, বৈশালী, চম্পা, বিখিলা প্রভৃতি স্থানেও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র গৌড়কে লাক্ষ্মী কনাই প্রাচীন ইতিহাস, আদি বঙ্গলকায়, বঙ্গসামর্য ও চতুর্বিধের

অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া, রামায়ণ ও মহাভারতের বহু মহাকাব্যেরও বলাভূবাদ হয়েছিল এই গৌড় রাজ্যের বাসে।

খ্রীষ্টীয় বর্ষ শতকের শেষভাগে স্বাধীন গৌড়রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল। এই রাজ্যের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন লশাহু। তাঁর রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গ হ'তে আকৃষ্ট করে উৎকল পর্যন্ত এই রাজ্য সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় এক্য লাভ করেছিল। তখন গৌড় নামটির ঐতিহাসিক ব্যঙ্গনা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। রাজা লশাহুর রাজত্বকালে কনৌজরাজ যশোবর্মার সভাকবি বাসুপতিরাজ গৌড়নগরের কাহিনী অবলম্বনে 'গৌড়বহু' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর পর প্রায় একশো বছর অন্ধকারের যুগ অর্থাৎ মাংসভার। পরবর্তী কালে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যপার হ'তে দ্বাদশ শতকের প্রথমপার পর্যন্ত বাংলা দেশে পালরাজগণ রাজত্ব করেছিলেন। সেই সময়ে গৌড় সাম্রাজ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশলাভ ঘটেছিল। ধর্মপাল বিজ্ঞানভারতী ছিলেন। তাঁর সময়ের সংস্কৃত পণ্ডিত গৌড়পাদ রচিত 'গৌড়পাদকারিকা' একটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ।

নবম পালের রাজত্বকালে তাঁর মহানসাধ্যক নারায়ণদেবের পুত্র চক্রপাণি বঙ্গ ১০৬ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত 'চক্রসত্ত' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি দ্রব্যগুণ সর্বসামগ্রিক, চরকটীকা, শব্দভণ্ডাবলী নামক অভিধান, মাঘ কাণ্ডব্রী এবং ভ্রায়শাস্ত্রের টীকা রচনা করে সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেছিলেন। চক্রপাণি দত্ত এবং সম্ভাটকর নন্দী, পাল যুগের সাহিত্যিকগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দশম একাদশ শতকে গৌড়রাজ দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্ব সময়ে রমাই পণ্ডিতের আবির্ভাব প্রাচীন সাহিত্য ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় ঘটনা। তিনি ধর্মবতার পূজা প্রকরণ উপলক্ষে 'শূন্তপূরণ' রচনা করে প্রভূত ধর্মের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগ্রন্থগুলিও তৎকালে ব্যতী সমসার লাভ করেছিল। রমাই পণ্ডিতের শূন্তপূরণ তৎকালীন গৌড়ীয় সাহিত্যের সুখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। একাদশ শতকের চতুর্থপাদে ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল 'রমাবতী' বা 'রমতীর' উল্লেখ দেখা যায়। দ্বাদশ শতকের প্রথমপাদ হতে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত বাংলার সেনবংশীর রাজাদের রাজত্বকাল। বঙ্গাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বাংলার তথা গৌড়ের শেষ পরাক্রান্ত স্বাধীন নরপতি। তিনি বিজ্ঞান্যসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেব, ধোয়ী, হলানুধ মিশ্র, জীৱদাস, উদ্যাপতি দাস প্রভৃতি তৎকালীন বিচক্ষণ পণ্ডিত ও মনীষীগণ তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। সেন যুগকে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। তৎকালীন রচিত বৌদ্ধ ধোয়ীগুলির মধ্যেই সাহিত্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

তৎকালীন চর্যাপদগুলির স্বধার্মতা হেতু এ যুগের চর্যাপদের কবিগণ কর্তৃক রচিত ধোয়া এবং অসংখ্য বৌদ্ধতন্ত্রক অনুপ্রকৃতভাবে গ্রহণ করতে হয়েছে। এই বৌদ্ধতন্ত্র, ধোয়া এবং চর্যাপদগুলিকে একত্র করে দেখলে একটি গোষ্ঠী দ্বারা রচিত ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। চর্যাপদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বকে রূপায়িত করা হয়েছে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হতে ঊন্থ শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বহুটি অসংখ্য বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে মিহিত আছে তাই প্রচুর ও ব্যাপ্ত। চর্যাপদ

রচিত। সুই ও রামচরিত রচিত। সফাকর নন্দী এই সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাজা বঙ্গাল সেন নিজেই সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁর রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' সেই যুগের চুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। লক্ষ্মণ সেন ও কেশব সেন প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ও বাগতুক লীলা বিবয়ক বহু কবিতা রচনা করেছিলেন। এই যুগেই মনসামঙ্গল রচিত হয়েছিল। ধর্মলঙ্গল কাব্যযুগের পরবর্তী কালেই মনসামঙ্গল কাব্যযুগের অভ্যুত্থার গোড়ায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সন্ধান। তৎকালীন শ্রীধর দাস রচিত 'বৃত্তিকামুদ' উচ্চশ্রেণীতে রচিত। বাঙালী মনীষী কবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' ছিল সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক। এই অল্পপম কাব্য সাহিত্যজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ভক্ত কবি জয়দেবের অমরকাব্য তাঁকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবিমলবীর করে রেখেছে। আজও তাঁর কাব্যের সুরমুচ্চনা বিশেষ শতাব্দীর আকাংক্ষাসুপককে সুখরিত করে তাঁর অন্তরঙ্গ কাব্যসৃষ্টিকে সার্থক করে রেখেছে।

ভাড়াডা, সে সময় ব্যাকরণ, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও তত্ত্বশাস্ত্রের এতটা উন্নতি হয়েছিল যে, তার প্রভাব সর্বত্র প্রসারিত হয়ে উঠিয়ে পড়েছিল। নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল প্রায়শঃ শতকে। এই শতকের কবি মাসিক দত্তের রচিত 'চণ্ডমঙ্গল কাব্য'ও সেকালের একটি অপরূপ সৃষ্টি। গোড়ের 'হারবাসিনী' দেবী সখা বহু অলৌকিক ঘটনা পোনা যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই দেবী অর্চনা বিষয়ক বিবরণ উল্লিখিত আছে।

প্রাচীন কালে ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রধানত রাজসভাবর্গের পুণ্যপোষকতার শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। চতুর্দশ শতক গোড়ায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। সে যুগের গোড়-অবধির রাজা কংস (গণেশ) এবং তাঁর পুত্র বহু (জালানুদিন) রাজত্ব সময়ে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভ্যুত্থার ঘটছিল। কংস রাজার পুত্র বহু মুলমানধর্মের দীক্ষিত হয়েও গোড়-বাহুবলবাহারে যে রীতির প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন, তা থেকেই বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক প্রভৃতি গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা সন্ধাননা একটি বিশিষ্ট রীতি হয়ে গড়ে উঠেছিল।

গোড় মুলতানেব রাজকাব্য প্রধানত স্তম্ভ ছিল হিন্দু হাতে। রাজ-বরেস্তার বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গোড়মরবারে উরুদুদ অধিকার করেছিলেন। এঁদের মাঝাঝে গোড়ীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের প্রাথমার্ধে বিশেষভাবে পুষ্ট লাভ করেছিল। পঞ্চদশ শতকে গোড়মরবারে আবির্ভূত হলেন জৈঠম মজাপ্রভু। তিনি মধুর বৈক্যব পাঁচালী রচনা করে বৈক্যব সাহিত্যের পুষ্ট সাধনে সহায়তা করলেন। তার পর ঐ শতকের শেষার্ধে কুতেশ্বর রাজত্ব কালে সুসাহিত্যিক প্রবালক মিশ্র 'মহাবংশাবলী' রচনা করে সাহিত্যের ভাণ্ডারে জার একটি রত্ন সংযোজিত করলেন। পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে গোড়াধিপতি হোসেন শাহের রাজত্বকালে বহু হিন্দু উরুদুদে নিযুক্ত ছিলেন। তদ্বাধ্য পরম বৈক্যব শ্রীকৃষ্ণ ও সনাতন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোড়া-অন্তর্গত রামকলি গ্রামে তাঁহার বাস করতেন। সে সময় এ স্থান জগন্নাথ সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রস্থল ছিল। বৈক্যবধর প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন গমন করল এই স্থান আবির্ভূত হয়েছিলেন। হোসেন শাহ

রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে এক পুষ্প সৌরভময় যুগ। এই সময় সর্ববিধে সৌক্য প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সে কালের কবি চতুর্ভূজ কড়ক রচিত হয়েছিল 'ইতিহাস' কাব্যগ্রন্থ।

হোসেন শাহ প্রধান অমাত্য ও শ্রীচৈতন্যের ভক্ত-শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী 'উদ্ভবসংকেশ' ও 'ইংসুত' প্রভৃতি কাব্য, বিদ্যমাধব, ললিত-মাধব প্রভৃতি নাটক এবং ভক্তিবাসনাসুত সিদ্ধ, উজ্জলনীলমণি গীতাবলী প্রহাির রচনা করে অসামান্য রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর রচনাচক্রবর্তীর নিম্নলিখিত দেখা যায় বিদ্যমাধব ও ললিতমাধব এবং তাঁর প্রৌঢ় পাণ্ডিত্যের সূক্ষ্ম বসজ্ঞানের তথ্যে ছাপ সম্পূর্ণ দেখা যায় তাঁর 'ভক্তিবাসনাসুতসিদ্ধ' ও উজ্জলনীলমণি গ্রন্থ দুটিতে। তা ছাড়া, সপ্তম কবিশেষ, জগন্নাথ সেন, কেশব ভট্টাচার্য, মুকুন্দ ভট্টাচার্য, গোবিন্দ ভট্ট, মাধব চক্রবর্তী, জগন্নাথ রায়, কেশব ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিক সে যুগের সাহিত্যাকাশের এক একটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক এবং বাংলার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

ষোড়শ শতকে জামানন্দ রচিত 'শ্রীরাধানন্দ্যাদাবলী' ও জয়ানন্দ রচিত 'সৈন্তমঙ্গল' গোড়বর্গে প্রভূত খ্যাতিলাভ করেছিল। কবিবাহু শ্রীধর রচিত 'বিভাসবন্দর' কাব্যগ্রন্থ তৎকালীন একটি অপরূপ গ্রন্থ। রামকলি নিবাসী ভায়রাচন্দ্র রচিত 'অমরবৃত্ত' কাব্যগ্রন্থ এক সুমহান পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গোড়াধিপতি হোসেন শাহ সময়ে কবি পরমেশ্বর

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোরাকিনের



কথা, এটা
খুবই আভা-
বিক, কেমনা
সবাই জানেন
ডোরাকিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জ্ঞতার কলে

তাদের প্রতিটি স্বল্প নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন বছরে প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভালিকার
লগ্ন লিখুন।

ডোরাকিন এও সন্মু প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম:—৮/২, এসম্প্রায়মেড ইস্ট, কলিকাতা-১

বহাভারতের বঙ্গভাষায় করেছিলেন এবং সেই কাব্য গৌড়বাজ-সভায় পাঠ করা হত। পরাগুলের পুত্র দুটি খানের আদেশে গ্রীষ্মের নখী জৈমিনি সাহিত্য অধ্যয়ণে পার্বেষ কল্পবাদ করেছিলেন। উক্ত পরাগুলের বিভাজ্যসাহিত্যের চট্টগ্রাম ও আরাধান অঞ্চলে বাংলা সাহিত্যের প্রচার ভাষাই হয়েছিল। এককালে গৌড় যে রাগকৃষ্ণ লীলা সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, তা সর্বজনস্বীকৃত। কি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য, কি রাগকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী, উত্তর ধারায়ই উৎস যে গৌড়, তাতে সম্ভবতঃ অধিকাংশ নেই। গ্রীষ্ম ও সনাতন সেবিত মদনমোহন বিগ্রহ ব্যতীত এই অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু মূর্তি ও চিত্রশিল্পেও এ সবেব প্রচুর নিদর্শন আছে। পূণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে যুগ যুগ ধরে যে সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল বর্ষ শতক থেকে গৌড়নগর ধ্বংস-পর্বত কাব্য, সাহিত্য ও সংগীতভাষ্যবাসী রাজস্বর্গ। তৎকালীন গৌড়ীয় কাব্যরীতি ভারতগ্রাহ্য বৈদ্যভাগীতি মানের পার্শ্বে নিজের আগুন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে।

গৌড়ীয় সংগীতের ঐতিহাসিক আলোচনা করা হয়েছে সংগীত-স্বাক্ষর গ্রন্থে। রত্নাকর বলেছেন :—গৌড়ী গীতিগুলি ছিল, গাঢ়, জিহ্বানে গঙ্গকম্পিত এবং স্থানিক্রমে অখণ্ডিত স্থিতি উদ্ভাসিত ললিতভাবে রচিত। এ প্রসঙ্গে টীকাকার কল্পনার্থের উক্তি যথা—পট্টই বোঝা যায় যে, গৌড়-গীতির উৎস ছিল এই নৌড়ে। এ সবকে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। আলাচ্য গৌড়ীয়তিকে আশ্রয় করে আছে তিনটি গ্রাম্যরাগ—বখা গৌড় কৈশিক মধ্যম, গৌড় পঞ্চম এবং গৌড় কৈশিক। উক্ত গ্রাম্যরাগের আলাপ প্রকারকে বলা হয়ে থাকে ভাষা। ভাষা রাগের আবার চারটি প্রকারভেদ আছে, বখা—মুখ্যা, ধরাখ্যা, লেশখ্যা, এবং উপরাগজ। এই আলাপ প্রকারের অর্থই হল গাইবার নানা প্রকার ভঙ্গী। এই গায়ন রীতি বা ভঙ্গীর লেশকাল ভেদে বা পরিবর্তন হয়েছিল, সেই পরিবর্তিত রূপটিই হচ্ছে ভাষা। এই ভাষা রাগের জনক পনেরটি গ্রাম্যরাগ। এই গ্রাম্যরাগের ভাষাগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও গৌড় ও বঙ্গালের উল্লেখ দেখা যায়। ক্রমে এগুলি দেশীরাগের পর্দারে এসে চারটি ভাগে বিভক্ত হল, বখা—রাগজ, ভাবজ, ক্রিয়াজ এবং উপজ। এই ভাবে বহু মিশ্রণের ফলে পুনরায় দুই অংশে বিভক্ত করা হল, পূর্বপ্রসিদ্ধ ও অধুনা-প্রসিদ্ধ নামে। এ দুটি অংশের অধুনা প্রসিদ্ধ রাগের মধ্যে গৌড় ও বঙ্গাল শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

রাগজ :—বঙ্গাল, গৌড়

ক্রিয়াজ :—গৌড়কৃতি

উপজ :—গৌড়মল্লার, কর্ণটি গৌড়, দেশবাল গৌড়, তুরখো গৌড়, জাবিগ গৌড়।

এতদ্ব্যতীত, গৌড় কৈশিক, গৌড় পঞ্চম গ্রাম্যরাগ, গৌড়ীহিন্দোল, গৌড়ী মালব কৈশিক, বঙ্গালী মালব কৈশিক, বঙ্গালী ভিন্নবৎ প্রভৃতি গ্রাম্য রাগগুলির উল্লেখও দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। তাছাড়া, এ সংগীতগুলি কি ভাবে পাওয়া হত তা জানবারও কোন উপায় নেই। তবে মোটামুটি প্রমাণ করা যায় যে, প্রাচীন ভারতে গৌড়ীয় সংগীত-সংস্কৃতির প্রাধান্য বিশেষ ভাবে সীমিত হয়েছিল। এ ছাড়াও একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে,

ক্রিয়াজ গৌড়কৃতি, উপজ কর্ণটি গৌড় এবং দেশবাল গৌড় রাগগুলির প্রধান স্বর 'বড়জ' অর্থাৎ গাউর্ণী প্রকাশক ও বীর রসাস্বক। এই স্বরপ্রয়োগ থেকে অনুমান করা হয় যে, গৌড়ীয় গীতিগুলি ওজস্বিনী ছিল এবং এগুলি নানা সাধা-প্রসাধার বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমগ্র ভারতে যেভাবে সাংগীতিক বিবর্তন ঘটেছে সেই ভাবে ঘটেছে এই বাংলা দেশে। বাংলা দেশ থেকে সোরাষ্ট্র পর্বত বিভাগী ভূখণ্ডে এই সংগীতগুলি মিশ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন মালব কৈশিক বাংলার এসে গৌড়ী ভাবার সৃষ্টি করেছে। অনুমান করা হয় যে উক্ত মালব কৈশিক এর ভাষা ও হিন্দোলার ভাষা এবং রাগ বঙ্গালের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কারণ এই তিন ক্ষেত্রেই গ্রহ অংশ ও ভাস স্বর 'বড়জ'। এদিকে কর্ণটি ও জাবিগ পদ্ধতির সঙ্গেও স্থাপিত হয়েছিল বাংলার সংগীত-সংস্কৃতির অতি নিবিড় সম্পর্ক। এই বিরাট সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অক্ষুর ছিল। পরবর্তী কালে কি ভাবে এই পদ্ধতিগুলি নানা মিশ্রণের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তা জানবার মত কোন ঐতিহাসিক তথ্য এখনও সংগৃহীত হয়নি।

বর্তমানে সংগীত-সংস্কৃতি মৃতপ্রায়, পূর্বাত্মনেই পুনরাবৃত্তি চলছে দিকে দিকে। সংগীতের এই অবনতির মূলে আছে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং গৌড়ীয়ত্বতা ও প্রাদেশিকতা। শিল্পমন নিয়ে এবং ভোগভেদ ভুল উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন যেমন শিল্পীদের, তেমনই আমাদেব কর্তব্য কলা কৃষ্টি ও সাহিত্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। আজকাল নানা প্রকার শিল্প ও কারিগরী শিক্ষার উপর যেমন জোর দেওয়া হচ্ছে, তেমন হচ্ছে না এই সব কলা কৃষ্টির অগ্রগতির উপর। তাই আজকাল সাহিত্য এবং কলাশিল্পের স্থান নির্দিষ্ট হচ্ছে পিছনের সারিতে। শিল্পী ও সাহিত্যিকদিগের স্বপ্নদ্রার চেষ্টা কিছু কিছু যে না হচ্ছে তা নয়, তবে সেটা অতি নগণ্য। —শ্রীকালীপদ সাহিত্যী।

আমার কথা (৫৯)

শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা

“দ-কি-দী” কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে মনোরম পরিবেশে এক সূর্য ও পবিত্র বরীন্দ-সঙ্গীত ও শান্তনিকতনীর ধারায় নৃত্যকলা শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান। ইহার মধ্যমাণ হলেন কলিকতর আশীর্বাদপ্রাপ্ত আর্কটপোর শান্তিনিকেতনের সহিত সংযোগস্বাকারী, বিনয়নন্দ ও বাংলার সংস্কৃতিতে প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা। শ্রীতের সকলে ‘দক্ষিণী ভবন’ এ কথার কথার জানালেন :—

বরিশাল বানরিপাড়ার গুহঠাকুরতা-বাংলার সম্ভান, কথাকার জাতীয় বিভাজনের প্রতিষ্ঠাতা ও বহুবিধ জাতীয় ক্রিয়াকলাপের উজ্জ্বলতা ও প্রসঙ্গকুমার এবং কাকরাধা গ্রামের তনয়া চাষাভিনী দেবীর সর্বকনিষ্ঠ সম্ভান হিগাবে আমার জন্ম হয় ১৯১৮ সালের ১০ই জুলাই। সেড় বৎসর বয়সে বাগকে হারানির পর আমাদের খুবই অর্থকষ্টে পড়িতে হয়। মার লরীর ভাল না থাকায় বিধবা দিদি পঞ্চদশবৎসর বয়সে লরীর ভার গ্রহণ করেন এবং আমি তাঁহাকে সাহায্যে লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যে রাখি। ছয় বৎসর বয়সে

কলিকাতার আসি। ১৯৩৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কিছুদিন বঙ্গবাসী কলেজে আই, এস, সি, পাড়ি কিন্তু সেই সময় ঢাকায় লই। ১৯৩৭ সালে পুনরায় বিভাগসগর কলেজে কমান্ডের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হইয়া ১৯৪১ সালে তথা হইতে গ্র্যাডুয়েট হই।

হেলে-বরস থেকে ছোড়ার নির্মল গুহঠাকুরদার প্রচুর ভালবাসা পাই। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি আমায় একটি পিয়ানো দেন। তিনি উচ্চ-সঙ্গীত ও পিয়ানো বাজনার নিপুণ ছিলেন। আমায়ও বোঝা হয়েছিল এই দুইটির মিকে। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় দুই হাস অহুহ ছিলাম। তখন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি কিনে নিজেই গান করতুম এবং ক্রমশঃ বুকে পড়ি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মিকে। শান্তিনিকেতনে আমায় বাতায়ত করতুম বরাবর। সেইখানে ঘনিষ্ঠ সহযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হল শ্রীশৈলজারজন মজুমদার ও জীমতী কণিকা দেবীর সহিত। তাঁরা এখন রবীন্দ্র-সঙ্গীতে একনিষ্ঠ-প্রাণ। আমার খুই সুবিধা হল তাঁদের সাহচর্য, কারণ আমি তখন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যক্তি নব প্রবেশপ্রার্থী। কবিগুরু মৃত্যুর পর শৈলজারজন জানান, রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন 'তত্তর গান সাধারণে নিলে না।' জবাবে বলি, বি, কম, পরীক্ষার পর কলিকাতা সহরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচার ও প্রচারণার জন্য বঙ্গাঙ্গীত করব আমি। তবুও নিজগৃহে একটি সভা ডাকি—প্রারম্ভিক অর্থায় করি—মতুন নাম দিই রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র 'গীত-বিতান'—১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর খুব সাহায্য করেন এ প্রচেষ্টায় শ্রীজিতবরুণ দাস, আর এগিয়ে আসেন নিঃস্বার্থভাবে শৈলজারজন ও কণিকা দেবী। তথায় প্রথম পরিচালক হই—কিন্তু মুদ্রাতিষ্ঠ এই সঙ্গীতায়তনে দেখা দিল মতবিরোধ। ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি অপেক্ষা স্রুত স্হায় মূল্য বেশী, তাই ছয় বৎসর পরে সেখান থেকে বিদায় লই। তার আগে 'সঙ্গীত-ভারতী' ও 'গীত-বিতান'র বিভিন্ন ফাণ্ড গঠন করি।

১৯৫৫ সালের ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু জন্মদিনে রবীন্দ্র-সংস্কৃতিক কেন্দ্র 'দক্ষিণী'র প্রতিষ্ঠা হল। রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও রবীন্দ্রাঙ্গণ নৃত্যকলা—এই দুটি বিষয়ে প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী এখানে শিক্ষাবীন। কোন একক বিষয়ের সঙ্গীতবিভাগে বোধ হয় এত শিক্ষার্থী নাই। কোনরূপ সরকারী বা বেসরকারী বৃত্তি ব্যতীত উহার উৎকৃষ্ট তহবিল ও অর্থায়নের আর হইতে ১৯৫৫ সালে আজকের এই নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। 'গীতভাষ্য' হল উহার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে শিক্ষার সাথে নিয়মিত বক্তৃতা, সময়স্রবস্তিতা ও সৌজন্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

'দক্ষিণী' ভবনের বিশেষ হল ইহার 'সঙ্গীত-প্রদর্শন'—দেশী ও বিদেশী ভাষায় সঙ্গীত, নৃত্য ও বাজ সজ্জা লিখিত বহু মূল্যবান পুস্তকের আহরণ। বহু গবেষণাকারীও সেখানে নিয়মিত আসেন। এ ছাড়া 'রেকর্ড-লাইব্রেরী' ইহাতে আছে প্রায় এক হাজার টেপ রেকর্ডার, বেতার ইন্ডিও রেকর্ড ও গ্রামোফোন রেকর্ড।

ইহার 'সেবাসিদ্ধি' হল কংসের বারোটি মাসিক সাংস্কৃতিক অধিবেশন হইয়া থাকে। সম্প্রদায়ী হল ২২৫।

আমার প্রথম রেকর্ড হয় আমার পঠনকার রবীন্দ্রনাথের 'হেমন্তে কোন কলহেরই রাগী'। ১৯৩৭-৪২ সাল পর্যন্ত আমি কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেছি। গত পনের বৎসরে আমার পরিচালনার উচ্চ কেন্দ্রে হতে বহু রবীন্দ্রসঙ্গীতস্রুতান, রবীন্দ্র

সঙ্গীতের ধারা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার একটি বৎসর, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ছন্দ-বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক চিত্র, বহু মার্কাকালন ও Song-programmes হইয়াছে। আমি না, স্রোতার সেগুলি কিছুপভাবে গ্রহণ করেছেন।

আমি বেতারকেন্দ্রে স্থানীয় অভিনয় বোর্ডের সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিক বোর্ডের ও সিলেবাস কমিটির সভ্য এবং রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতিও উহার কেন্দ্রভ্যাল কমিটির সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত। 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা' নামক একটি বই আমি লিখিয়াছি।

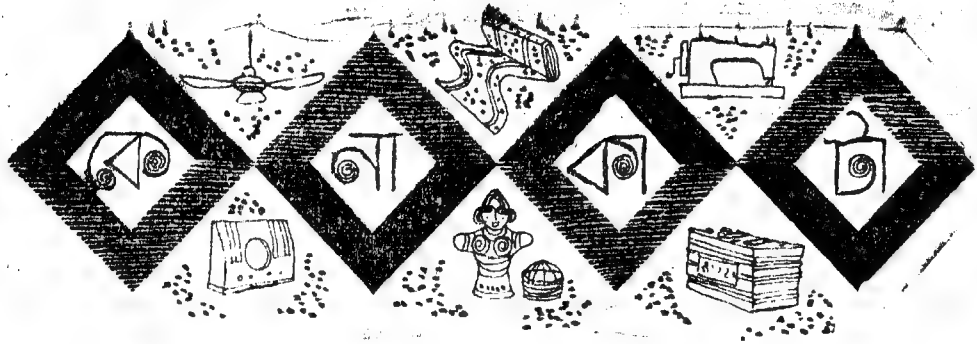
আমার সহধর্মিণী হলেন ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্তার কন্যা—রেকর্ড এবং বেতারশিল্পী জীমতী মজুমদার দেবী। ১৯৪৩ সালে আমাদের বিবাহ হয়। 'দক্ষিণী'র উদ্দেশ্যে ও আমাদের ব্যবস্থাপনার গত ১৯৪৮ সাল হইতে ত্রৈবার্ষিক রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলন হইতেছে। ভারত ও পাকিস্তানের গায়ক-গায়িকারা উহাতে যোগ দেন। ১৯৬০ সালের জুন মাসে উহার পঞ্চম অধিবেশন হইবে। পাঁচ দিনে সঙ্গীত-রসিকেরা তনবেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামগ্রিক আবেদন—উহার সুগভীর ব্যাপ্তি—উচ্চাঙ্গ ও লঘু রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনা—আর আলোচনা উদাহরণসহ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য।

আমি পেশায় শিল্পী বা শিক্ষক নহি। ছোড়ার উৎসাহ, উল্লীপনা ও সাহায্য এবং স্রোতার পৃষ্ঠপোষকতায় আমার প্রতিষ্ঠা। আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হল বতর্ক সত্ত্ব—বতর্কিন সত্ত্ব—বতর্ক সামর্থ্য—আপ্রাণ চেষ্টা করব কবিগুরু লিখিত সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচার ও দীর্ঘ প্রসার। কিন্তু বেদনা জাগে যখন মনে পড়ে যে, 'বিষভারতী সঙ্গীত সমিতি' আমার উদ্দেশ্যের প্রধান অন্তরায়।

সুশীল চ্যাটার্জি, কলিম সরাকী, তড়িৎ চৌধুরী ও স্বত্ব গুহ ঠাকুরতা, রমা ভট্টাচার্য, ইলা সেন প্রাকৃতিক শিল্পী 'দক্ষিণীতে' শিক্ষা-প্রাপ্ত। এ ছাড়া আরও কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর ভাবব্যব উচ্ছলনয়।



শ্রীশ্রী গুহ-ঠাকুরতা



জনসংখ্যা বনাম কর্মসংস্থান

জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান এই দুই-এর ভেতর সব সময়ই একটা সাম্যীয় থাকা দরকার। যেখানে কর্মসংস্থান জনসংখ্যার অনুপাতে বা তুলনায় কম, বুঝতে হবে সমস্যা দেখানো জটিল। বেকারী, অপাতি ও উষ্মেণ সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ না থেকে পারে না। এ অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখার জন্য কর্মসংস্থান বাড়ানোর উপায় খুঁজে না পোলেই নয়।

অন্ত দেশের কথা বাদ দিয়ে ভারতের কথাই পর্যালোচনা করে দেখা যাক। ভারতে বেকারী খুব ব্যাপক, এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থা এখনও কেন থাকবে? সেই প্রশ্নে বর্তমানে উঠতে পারে। সোজা বা সাধারণ উত্তর যেটি হবে—জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থানের ভেতর এখানে সামঞ্জস্যের দৃষ্টিপাত। সরকার বলতে চাইবেন ভারতে জনসংখ্যাই বেশি, তাই দেশের লোকের বেকারী ঘটেছে না। জনসাধারণের দিক থেকে অবস্থা বলা হবে—কৃষিরা প্রকৃতি সামাজিক রাষ্ট্রে জনসংখ্যাটিকে কোন সমস্যাই ধরা হয়না। দ্রুতরায় ভারতেও সমস্যাটি আসলে জনসংখ্যার নয়, কর্মসংস্থানের। এই সমস্যা দ্বিটাবার বহু সুযোগ এখনও রয়েছে, এই তাঁদের বিশ্বাস বা অভিমত।

সমগ্র ভারতে আজ লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৪২ কোটির মতো। বিগত আদমশুমারীর সংখ্যাভিত্তিক অনুসারে ভারতীয় নর-নারীর শতকরা প্রায় ৪০ জন কার্যক্ষম। এই হার বা হিসাব মেনে নিলে এক্ষণে এদেশে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হবে প্রায় ১৭ কোটি। পূর্বেরকার ৮৭ বছরে (১৯৪১-৫১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কার্যক্ষম লোকের সংখ্যাও আপন বাড়তে আর এই বৃদ্ধিত সংখ্যা (কার্যক্ষম লোক) প্রায় দুই কোটির দাঁড়িয়ে যায়। আনুপাতিক হারে দেশে কর্মসংস্থান বেড়ে যায় নি, বেশাবাসীর অভাব ও বেকারী দ্রুতই হচ্ছে তাই আরও প্রকট।

একটা কথা প্রসঙ্গতঃ বলতে পারা যায়। শিল্পায়নের জন্য ব্রতী হলেও ভারত আজও কৃষিপ্রধান দেশ। এই বিশাল দেশের অধিবাসীদের একটা বড় অংশ কৃষিজীবী অর্থাৎ কর্মক্ষম লোকদের আর্থিকশেষেই উপজীবিকা চালায়। অপিস-আদালতে (সরকারী ও বেসরকারী) এবং কল-কারখানা সমূহেও অল্প অসংখ্য নর-নারী কর্মনিযুক্ত রয়েছেন। হারিজন ও বেকারীর বিকল্পে বিশেষী আমলে অভাবান চালাবার অবকাশ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু এক্ষণে পরিবর্তিত অবস্থায় জাতীয় সরকার এই মৌল হারিজন অসীকার করতে পারেন না।

বেকারী দূরীকরণ তথা কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য অল্পকূল কতকগুলো পরিকল্পনা দরকার। নতুন নতুন শিল্প-সংস্থা ও কল-কারখানা গড়ে তুলতে হবে দেশের মাটিতে আর সে সুযোগ আছে এখানে এখনও অনেক। সরকারী ও বেসরকারী উভয় একই লক্ষ্য থেকে হওয়া প্রয়োজন আর সে লক্ষ্যটি হতে হবে—দেশের সমৃদ্ধি ও দেশবাসীর স্বাচ্ছন্দ্যবিধান। বিপুল সংখ্যক লোককে কৃষিকাজে নিবদ্ধ রেখে দিলেই চলবে না, শিল্পক্ষেত্রে তাদেরও খানককে টেনে আনতে হবে। জাতীয় সম্পদ ও মাথাপিছু আর বাড়ানোর জন্য দেশকে শিল্পমুখী করে না তুললে নয়। সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে, কর্মসংস্থানও বেড়ে চলেছে আপনি—জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা ততটা কঠিন হয়ে আর নেই।

অবশ্য এক কথা ঠিক যে, স্বাধীন হবার পর ভারত শিল্পায়নের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে এবং পর পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও করে চলেছেন দেশের কর্মধারণগণ। এর ভেতর দেশে বহু মতূর্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, এ-ও স্বীকার করতে হবে। তবুও কর্মসংস্থান আরও কোন কোন পথে বাড়ানো যেতে পারে, সেই নিয়ে পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা প্রেরণ বিশেষ জরুরী। জনসংখ্যার চাপ সব সময়ই থাকবে, এই ধরে নিয়েই ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় চিন্তা করা দরকার। গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সমূহের জাতীয়করণ এবং মাথা ভারী শাসন-ব্যবস্থার রূপান্তর মারকং এই প্রয়োগ কতটা কি দুরূহা হতে পারে, তা-ও নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে। আসল কথা যেটি দাঁড়াচ্ছে—জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের সামঞ্জস্য যে ভাবে রক্ষিত হতে পারে, সেইটির সৃষ্টি ব্যবস্থা না হলে চলতে পারে না।

তৈল-সম্পদ ও ভারত

আধুনিক শিল্পায়নের যুগে যে কয়টি সম্পদ একান্ত ভাবে চাই, এদেরই একটি প্রধান পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তৈল। এই অমূল্য সম্পদ যে দেশের বহু অধিক পরিমাণে করায়ত্ত, সেই দেশই সাধারণ ভাবে অগ্রগতির দাবী রাখতে পারে। তৈল-সম্পদের দিক থেকে ভারত আজ কোন পর্যায়, সেটি তাই নিবিড় ভাবে আলোচনার বিষয়।

পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমেরিকা, কুশিরা, মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক ও ইরান এক ভ্রম, কানাডা প্রকৃতি দেশের নাম। যেনেব ভাবে করা চলে। ভারতের কথা বাদ এই প্রসঙ্গে তেঁলা হয়, দেখা যাবে, খনিজ তৈলের উৎপাদন এখানে আজও খুবই কম পরিমিত। একটি

শিওরবোঙ্গা হিসাব অনুসারে সমগ্র বিশ্বে আজকের দিনে তৈল ব্যবহার হয় বছরে প্রায় ১০ কোটি মেট্রিক টন। এক্ষেত্রে ভারতের বার্ষিক তৈল উৎপাদনের হার তুলনায় অতি নগণ্য—শতকরা ০.১ ভাগের বেশী নয়।

ভারতের তৈল বা পেট্রোলিয়াম উৎপাদন বাতে বাড়়ে, তার জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে অল্প চেষ্টা চলছে কত কাল থেকেই। এই রাষ্ট্রের ডিগবর, ডিক্রগড, ডিগবর (আসাম) অঞ্চলেই তৈলের কয়েকটি খনি বিস্তারিত। সুদীর্ঘ উপত্যকার স্থানে স্থানেও পেট্রোলিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। আসামের নাচারাকাটিয়া অঞ্চলেও খনিজ তৈলের সন্ধান মিলেছে এর ভিতর—এ অবস্থায় ভারতীয় কৃষক বিভাগের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফল। ডিগবর খনিগর্ভ থেকে বছরে যে তৈল উত্তোলিত হয়, তার মোট পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি গ্যালন।

একথা বলবার অপেক্ষা রাখে না, ভারতীয় তৈলে ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা কিছুতেই মেটে না। পেট্রোলিয়াম (খনিজ তৈল) বা পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের ব্যবহার অল্প দেশের ভার এখানেও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাইরে থেকে আমদানীর দ্বাি এই বিপুল চাহিদা মেটানো হয়ে আসছে এরাব। ইরাক, ইরান, কোম্বোটা, মাঞ্চাট থেকে তো বটেই, মালিশি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকেও তৈল সরবরাহ হয় এখন। পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম জাত পণ্য আমদানী বাতে ভারতের এখনও অর্ধব্যয় করতে হয় বছরে ৭০ কোটি টাকার মত।

আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাবিনে তৈল উৎপাদন বৃদ্ধির কয়েকটি পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন। বোম্বাই, পান্জাব, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের অঞ্চল-বিশেষে নতুন করে খনিজ তৈল পাওয়ার উদ্ভব নিবদ্ধ রয়েছে। এখন অবধি আবিষ্কৃত খনিগুলোতেও কাজের মাত্রা বাড়ানো হয়েছে আগের চেয়ে বেশী। এই অঙ্গরায় খনিজ তৈল বা পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন এখানে ক্রমশঃ বর্ধিত হবে, এটুকু আশা রাখা যায়।

খনিগর্ভ থেকে উত্তোলিত মোটা তৈল শোধন করবার নিজস্ব ব্যবস্থার দিকেও ভারত আজ অনেকটা সজাগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবালান (বিশ্বের বৃহত্তম শোধনাগার যেখানে রয়েছে) থেকে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং তখনই ভারত সরকার ভারতের অভ্যন্তরে শোধনাগার বা রিফাইনারী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন বিশেষভাবে। ইতোমধ্যে বোম্বাইয়ে দুইটি এবং বিশাখাপত্তমে একটি আধুনিক শোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। আরও এক দুইটি রিফাইনারী বা শোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে এবং তার জন্য জগৎ আনন্দক উদ্ভোগ আয়োজনও চালিয়েছেন তাঁরা। ডিসবরে (আসাম) পূর্বে থেকেই যে শোধনাগারটি চালু আছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চলছে তাতেও। সিনথেকি পেট্রোলিয়াম বা কৃত্রিম তৈল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারতে সরকারী পর্ষায়ে উদ্বল লক্ষ্য করা যায় এবং এ সকলই নিঃসন্দেহে আশার কথা। মোটের ওপর, শিল্পায়নের পরিকল্পনা সার্থক করতে হোলো খনিজ তৈল-সম্পদের ক্ষেত্রে ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন লক্ষ্য বহনীয়।

কিশোরদের হাতে টাকা-পয়সা

টাকা-পয়সা এমনি জিনিষ, এ হাতে পেতে চায় সকলেই, কিশোররাও। কিন্তু টাকা-পয়সা পাওয়ারটাই বড় কথা নয়, বড় কথা এর সদ্যবহার, এর সঞ্চয়।

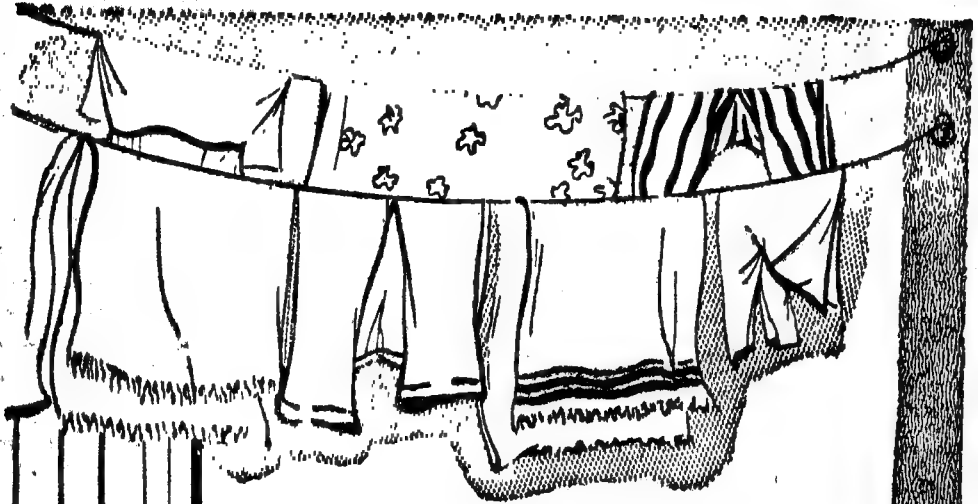
বয়স বতকণ কম থাকে, পুরো দারিদ্রবোধ তখন অবধি হয় না। আর দারিদ্রবোধ সমৃদ্ধ না হলে টাকা-পয়সার ওপর ব্যবহার বোধোচিত হবার নয়। তাতে অর্থের অপব্যয় ও অপচয় হবার আশঙ্কা থেকে যায় বেশিরকম। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, কত কিশোর হয়ত প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হলে, কিন্তু সে সম্পত্তি অধিক সময় টিকে থাকলো না। মনে জড়িত রকমই হোক কি নিজের দুর্ভিক্ষ বা বোকাবির জগতেই লোক—টাকা-পয়সা সব চলে সেলো কোথায় দেখতে দেখতে। এমনি অপব্যয় অপচয় হতে পারে বহলেই কিশোরদের হাতে টাকা-পয়সা থাকার সমূহ বিপদ।

অবিবেচনার কলে বা আবশ্যক নিয়ন্ত্রণ না থাকার কিশোরদের হাতে পড়ে কত অর্থ বিনষ্ট হয়, সে হিসাব কে রাখে? অথচ বুঝে শুনে খরচ করলে এই অর্থে ভালো কাজ হতে পারতো বা হতে পারে অনেক। সহরাকুলে বসবাসকারী কিশোর-কিশোরীরা গ্রামাঞ্চলবাসীদের চেয়ে একটু আলাদা। সহরে হাত-খরচের মার করে হলেও কিছু অর্থ চাই ছোট বড় সকলেরই। কাজেই এখানে সতর্কতা ও তত্ত্বাবধান বেশিরকম না থাকলে নয়।

কিশোর ও তরুণরা টাকা-পয়সা হাতে পেয়ে কি ভাবে উড়িয়ে দেয়, এই নিয়ে বিলেতের চিন্তাশীল মহলে সম্প্রতি বেশ আলোচনা গবেষণা হয়েছে। একথা ঠিক—আজকের দিনে অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা যতটা টাকা-পয়সা নাড়াচাড়া করবার সুযোগ পাচ্ছে, আগেকার দিনে তেমনটি ছিল না। কাজেই এই প্রসঙ্গে অভিতাবক মহলের সেদিকে দৃষ্টিস্তা ও উদবেগ ছিল এখনকার চেয়ে কম।

১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের একটি হিসাব। বৃটেনে সে সময়ে ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার। এর ভেতর বিবাহিত দেখতে পাওয়া যায় ১৫ লক্ষের মতো আর বাকি প্রায় ৫০ লক্ষ তরুণ-তরুণী অবিবাহিত। অবিবাহিতদের মধ্যে ৮০ লক্ষ জনকে স্কুল-কলেজ কিংবা সেনাবাহিনীতে শিক্ষারত দেখা যায়। এদেরও বাদ দিয়ে যে ৪২ লক্ষ তরুণ-তরুণী থাকলো, তারা কোথাও চাকুরী করে, এইটো-পবিদ্রুট হয়। সবটা অর্ধই যে তারা পরিবারে দিয়ে দেয়, এমন হিসাব পাওয়া যায়নি। কাজেই স্পষ্ট যে, তারা প্রাপ্ত বা অভিজ্ঞ অর্থ ব্যয় করে থাকে নানা ভাবে।

গোড়াতেই বলা হক, কিশোর বয়সে টাকা-পয়সা হাতে এসে অপচয় হবার আশঙ্কাই থাকে বেশি। সিনেমা-থিয়েটার, খেলায় মাঠ, রেন্টোঁরা, কফি-হাউস, সাজ পোষাক—এ সবের পিছনে কয় অর্থ ব্যয় করে না তারা না বুঝে। টাকা-পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেললে অমজল এসে হাজির হয়—এই জিনিষটি তারা বতকণ না বুঝতে পারবে, ততক্ষণ আশঙ্কা দূরীকৃত হবে না। সেজন্য অভিতাবকগণ এবং আশে-পাশে বাঁধা থাকবেন, তাঁদের সকলকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে—কিশোরদের হাতে টাকা-পয়সার জে অপচয় না হতে পারে কখনই।



সহর থেকে গারে

পূত বছর যখন আমি নির্মলাকে বিয়ে করেছিলাম আমার বাবা
মাকে না আনিয়ে তাঁরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে কিছুদিনের
ভেতরেই অবশ্য তারা এ ব্যাপারটা খুব সহজ ভাবে মেনে নিয়ে-
ছিলেন। বিয়ের প্রায় একবছর বাদে আমি আর নির্মলা আমাদের
গায়ের বাড়ীতে গেলাম।



আমার বা নির্মলার স্নান চোরা ও মিষ্টি ব্যবহারে খুব
খুশী হলেন। সন্ধ্যায় শিক্ষিতা বৌ সন্ধ্যায়ের কাজ কর



করবে না কেবে যেটুকু
হুচিকা ছিল নেটাও কেটে
গেলো এখন নির্মলা সন্ধ্যায়ের সব কাজেই নিজে
থেকে এগিয়ে গেলো।

মা সবথেকে খুশী হলেন
এখন সব মেয়ে বোঁয়েরা

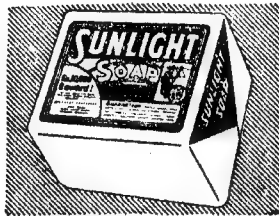
নির্মলাকে দেখতে আসতো আর নির্মলা তাদের নিয়ে
বলে বেশবিশেষের পাঁচ রকম গল্প শোনাতো। মা তাঁর
শিক্ষিতা বৌ সবকে খুবই গর্বিত হলেন।

সবে গত কালই ও পাড়ার লক্ষী মাকে বলছিলো
“আমরা ভারতীয় লেখাপড়া দেখা মেয়েরা ঘর গের-
স্থানীয় কাজকর্ম পারেনা কিন্তু তোমার বোঁমা সেধরনের
মেয়েই না।”

“কাজের কথাই এখন তুললে তখন শোন বোঁমা সকাল
থেকে কি করেছে—রাঁদাবাঁদা সেয়েছে, ঘরদোর ঝাঁট
দিয়েছে, ভিন্‌ব পতর গোছগাছ করেছে, সেলাই নিয়ে
বসেছে, দুটো চিঠি লিখেছে—এ সব সেয়েও চান
করতে বাঙার আরে একগালা কাপড় কেটেছে” বলে
মা নড়ীর ওপর টাকানো একরাশ কাপড় দেখালেন।
লক্ষী কাপড়গুলো দেখে অবাক” ওঃ মা এসব তোমার
বোঁমার কাচা—এমন কি বিছানার চাদর পর্যন্ত।

কি রকম ধ্বংসে সালা হয়েছো।

আর আমি এখন কাপড় কাচি
কাপড় থেকে ময়লা বার করতে
আমার প্রাণান্ত হয়। তবে হাজার
হোক আমাদের নির্মলা হলো গিয়ে
লেখাপড়া জানা মেয়ে।”



নির্মলা তখন চান মেয়ে কেঁদেছিলো— লক্ষী কথা শুন
কানে গেলো—“মাসীমা, এর সাথে লেখাপড়া দেখার
কি যোগ আছে। ঠিক নতুন সাবান ব্যবহার করলেই
কাপড় পরিষ্কার হবে।”

“কি সাবান বাছা আমার বলতো?” “কেন, মানলাইট
সাবান, আপনি জানেন না?” লক্ষী ভোঁ অবাক “সত্যিই
মানলাইট কাপড়কে সাঁদা ও উজ্জল করে কারণ আর
একটু ববলেই গ্রহর কেনা হয় বাতে হুতোর তেতর থেকে
ময়লার প্রতিটা কণা বার করে দেয়।”

নির্মলার কথাগুলো বেশ সকলকে একটু নতুন নতুন থবর
জানালো। মা বললেন “এতে আরও হুঁদী বা এ
সাবানে কাপড় আছড়াতে হয়না এককম—আর একটু
ববলেই কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়। শুধু খাটুনীই বাচেনা
কাপড়গুলোও বেশদিন টেকে।”

“কিন্তু এ সাবানটির
মাম বড় বেশী না
কি?” এ প্রশ্নে মা হুপ
করে গেলো নির্মলা
বলো “সত্যি কথা
বলতে এটা মোটেই বেশী
খরচা পড়েনা কারণ এতে
এত ফেনা হয় যে এক
গালা কাপড় কাচা যায়।



মেথুন টাকানো কাপড়গুলো—ছোটবড় মিলিয়ে প্রায়
২০টা কাপড় এগুলো সব কাচতে একটা মানলাইটের
আধখানা লেগেছে। তবুও কি আপনি বগবেন বেশী
খরচা পড়ে।”

লক্ষীর মুখ হাসিতে ভরে গেলো,
ও বললো, “বেঁচে থাকো মা,
তোমার গুনের শেষ নেই। যোক
তোমার কাছ থেকে আমরা কত
কিনা লিখছি।”



রক্ত সেন

গাড়িটা আঙুই বাচ্ছিল। সত-কেনা প্যাকার্ড; নতুন বসেই এখনও ফুলীন, অভিজাত, এখনও নিশ্চয় আর নিখিঁদে। তার ভালবাসা রক্ত সেনকে দেখে মনে হয়, সে-ও গাড়িটার একটা অংশ। থাকি প্যাট আর সাদা সাট। গাড়িতে বসে প্রেরিয়া হইলে হাত রাখলেই তার আর কোনো সত্তা নেই, কোনো অস্তিত্ব নেই।

খিরেটার মোটে রক্ত সেন জানতে চেয়েছিল বাড়ি ফিরবে না কি?

পিছন থেকে উত্তর পেয়েছিল : বাড়ি ত ফিরবেই, কিন্তু সাকুলার মোড়ে ধাক্কাতে হবে।

অতঃপক্ষে কলকাতার বাস্তব সারবন্ধী বৈজ্ঞানিক আলোর পাহারা ছক ছরানি, গ্যাস-বাতির নিভ, ভিমিত আলোয় তখনও ছায়ার মন্ত্রণ। কীটা বাজল একবার দেখে?

তখনও এক হাতে চুড়ি অস্ত্র হাতে খড়ি পরবার রেওয়াজ হয়নি। তাই সোজার খড়ির সঙ্গে সোনার চুড়ির রিনিখিনি শোনা গেল। ভাসি বোর্ডের আলোর দিকে হাত বাড়িয়ে রমলা বলল, তোমার দেয়ি হয়ে গেল, না?

গাড়িটা আঙুই বাচ্ছিল; আর টেক্সের বাতাস। পিছনে হাত দুদিয়ে ব্লাউজের একেবারে উপরের ছক চুটে লাগিয়ে রমলা আবার বলল, আজও তোমার হট্টেলে কিরতে দেয়ি হয়ে গেল, রোল-কলের সময় আজও কাদার প্রেরিয়া তোমার পাবেনা।

চুপ কর, মলি।

রমলা সতর্ক হল, ত'হাত বাড়িয়ে গুকে কাছ ছানবার চেষ্টা করল : কিশোর, তবু পুত্রব, তবু একজন পারিপূর্ণ মানুষ। বরসে এক বছরের ছোট, তবু দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠ একজন ভালবাসার মানুষ।

সত্তা নিবারণ, কাদার প্রেরিয়া তোমার এক-ঘর ছেলেস সামনে অপমান করবে—এ অসহ!

কিন্তু নিবারণ হট্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট কালার প্রেরিয়ার কথা একবারও ভাবেনি; সাতটার বোল-কল হল, সাড়ে সাতটা নিশ্চয় হয়ে গেছে, সে-কত উবেগ নেই তার, কিন্তু প্রতিদিন ত্রাড়াভাঙি হবার আগের দুহুটে শান্তি আর অপমানের কথা কেন অশ্রু করিয়ে দেয় মলি? এ কি তার ভালবাসার মান-নির্ধার?

হুটল-গেট ছাড়িয়ে কিছু দূর বড় গাছটার ছায়ায় অন্ধকার

গাড়ি থামল রক্ত সেন, গাড়ি থেকে নেমে রমলা খুলে ধরল নিবারণ নামল, চওড়া কাঁধ, বহু-বহু, চতুর্থ বার্ষিকের তার নিবারণ লালগুণ গাছের ছায়ায় কাঁচা ফুটপাতে একটুখানি ঠাণ্ডাল, একবারও মনে পড়লনা হট্টেলের নিয়ম-ভঙ্গের অপরাধ, বি-এ পরীক্ষার আড়াই মাস বাকি, আর শিবুকে বাবিকাগ্রাসদের কাছে বাবে অভিযোগ-পত্র, প্রেরিয়ার নিজের লেখা।

গাড়ির ইঞ্জিন তখনও ধুকধুক করছে, রমলা গাড়ির বাইরে হাত বাড়াল।

কিন্তু এক-পা এগিয়ে এলনা নিবারণ, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলনা রমলার হাত। শরীরটাকে আর একটু কিরিয়ে গাড়ির ঠাণ্ডা ইম্পাতে বুকটা চেপে রাখল রমলা, টেক্সের বাতাস-ছোঁয়া পাতার অশ্রু মর্ষর তথু, ফুটপাথের প্রান্তে গ্যাস-বাতির নিবারণ আলোর মান ছাতি তথু। দুই দীর্ঘবাসটা রমলাও হতে পারে, বাতাসেরও হতে পারে।

দুখ কিরিয়ে রমলা রক্ত সেনকে নির্দেশ দিল, বাড়ি। সাদা, লজ পাত দিয়ে পাতলা টোট কামড়ে ধরল সে; আঁধি তোমাকে তেজে ফেলব নিখি। তেজে টুকরো টুকরো করে ফেলব। টোটের নরম মাংসে পীতের পতীর দাগ বসে গেল। বুকের উপর আঁচলটা বিস্তৃত করতে লাগল সে।

পাঞ্জাবীর আভিন আরও খানিকটা গুটিয়ে লোহার গেট খুলে ভিতরে ঢুকল নিবারণ। করিডোরের বাঁ-দিকেই কাদার প্রেরিয়ার ঘর; দরজার টোকা দিল সে।

কাম ইন্। ভিতর থেকে সাড়া এল।

টেবিলের উপর রাশীকৃত ছড়ানো বই আর খাতা; নিবারণ টেবিলের কাছে এসে ঠাণ্ডাল। বইটা বন্ধ করে তাকাল কাদার প্রেরিয়া। ছোট, নীল চোখ, মাঝখানের তারা দুটি বাতির আলোয় চকচক করছে, চিন্না-নাক খুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, পুক গৌক-জোড়াকে পাহারা দিচ্ছে। ছোট কপাল, আর চওড়া কাঁধের উপর মাথা-ভর্তি চুল, আর একটুখানি ছাগল-বাড়ি। আবার চোখ নামাল প্রেরিয়া। নিবারণ ঘরটার চারদিকে দেখতে লাগল, বিশেষ কোনো আসবাব নেই। একটি লোহার খাট আর দরজার পাশে কলেক্স আলমিরা। সেখানে ক্রশবিন্দু বীণ।

ইউ! প্রায় টেচিয়েই উঠল প্রেরিয়া।

নিবারণ দুখ ফিরাইল, আরও একটু এগিয়ে এল ডান দিকে চেয়ারটার কাছে।

তোমার অব্যাহতা আর বেরাদপী ক্ষমার অব্যাহতা। চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলা দিয়ে ঠাড়িয়ে পড়ল প্রেরিয়া, চেয়ারটা উল্টে গেল মাটিতে। প্রেরিয়ার নীল চোখে সবুজ আগুন জ্বলছে। না, নিবারণ তুলে দেবেনা চেয়ার। চিলে-হাতা আলখাল্লায় আভিন কছুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিল প্রেরিয়া; চওড়া কব্জিতে লাল বন লোম; মোটা, বলিষ্ঠ আঙ্গুল, নিবারণের চাইতে মাথার কিছু লম্বা।

নিবারণ কোনো উত্তর দিল না।

এ্যাও, আবার বলল প্রেরিয়া, ইউ এ্যানয় মি লাইক মি অনিল্লেক্টেট ওডার অক এ ওগ।

নীল চোখের সবুজ আগুন আরও লপলপ করে উঠল, অস্ত্র কোনো ছাত্র কল আরি এ দুহুটে হট্টেল থেকে ভাড়িয়ে দিতার, জা জানে? তোমার বিবর ভুলকল্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তোমার

আহলকে। কি ব্যাপার? সত্যি করে বল, রাজনীতি না মেয়ে?
মেয়ে।

হোয়াট এ সেম। বেতের ঝড়মটা নাচাতে লাগল সে, টোট
কাঁপল বার করলে।

প্রচণ্ড শব্দে মোটা অভিনামটার উপর বেত দিয়ে আঘাত করল
প্রেরিয়ার।

না, নিবারণ চমকায়নি।

আমার অধ্যাপক-জীবনে অনেক শব্দ ছেলেকে আমি নব্বয়
করেছি, অনেককে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছি, তাদের তুলনায় তুমি
কিছুই নয়।

তোমার বক্তব্যে অস্পষ্টতা নেই, ফাদার।

বেমল করে বাতকের ছুরি লাফিয়ে ওঠে শূন্যে, তেমনি প্রেরিয়ার
বেত এক নিমেষের জন্য শূন্যে লাফিয়ে উঠল, ঘরের বাতাস হ'ভাঙ্গ হয়ে
গেল, একটা উদ্ভাস্ত সাপ হিন্ করে ছোঁল মারল বেন।

বেতের আঘাতে চামড়া কেটে বান্ন—এ গল্প নিবারণ আগে শুনেছে
কিন্তু আজ হাতের লিকে তাকিয়ে সত্যি বিম্বিত চল সে, কাটা চামড়ার
কাঁক দিয়ে বস্ত্র দেখা দিয়েছে, মনে হল প্রেরিয়ার হাতের জোর
আছে।

ঘর থেকে বাবার আগে দরজাটা মিঃশব্দে বন্ধ করে দিল নিবারণ।

বোতাম-জাঁটা সার্টের পকেট থেকে হালকা নীল রঙের ধামটা
বার করে এগিয়ে দিল রতন সিং।

তুমি বাও।

রতন সিং গেল না; জানাল : ভাবাব নিয়ে যেতে বলেছে।

সেই চেনা গন্ধ, ক্যালিফোর্নিয়ান পলী! সাকুলার যোড থেকে
বাউতলা যোডে রমলার শোবার ঘর পর্বত বেগুন্টা ছড়িয়ে আছে।

তুমি বাও, জবাব পাঠিয়ে দেব।

রতন সিং তলোয়ারের মত রূপালে একবার হাত ঠেকিয়ে শিখন
কিয়ল।

দুপুরবেলা ঘ্যানিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে রমলা এক লম্বায় দুপাশের
ফুটপাথে চোখ বুলায়ে নিল, না, নিবি কোথাও অপেক্ষা করছে না;
ঐ কুঁচকাল সে, বইগুলি আঁকড়ে ধরল শব্দ করে; তার পাড়ি
অপেক্ষা করছে কলুটোলা খ্রীটে।

পাশেই ছোট ট্রেননারী দোকানটার হুকে পড়ল সে, দ্রুতকে
আটকানো কলমটা খুলে এগিয়ে দিয়ে বলল, আবার পোলমাল করছে
কলমটা।

ছোকরা দোকানদার ব্যস্ত হয়ে উঠল, বলেন কি? এই ত পরন্ত
মিম সারিয়ে দিলাম, দেখি? কলমটা পরীক্ষা করল সে, সাঁলা
কাগজে কবিতার একটা পংক্তি লিখতে গিয়ে সামলে নিল, কি
অসুবিধা হচ্ছে বলুন ত?

সান্তা থেকে হুঁশ না ফিরিয়েই রমলা বলল, অনেক অসুবিধা,
ভয়ানক অসুবিধা। এক পা সিঁড়ির উপর নামিয়ে দিয়ে সান্তা হুই
প্রোড দেখতে লাগল বতরুয় চোখ বার।

শিখন থেকে দোকানদার বলল, দেখুন।



ক্যান্থারল

ক্যান্থারাইডিন কেশটৈল

অলিত অয়েলের সহিত অত্যন্ত উত্তম জৈবের বিজ্ঞানসম্মত সংমিশ্রণে প্রস্তুত
অল্পপন সুবাসিত কেশটৈল।

৫ আউন্স শিলি কার্টন সমেত ও ১০ আউন্স শিলি কার্টন ছাড়া পাওয়া যায়

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা—২৯

রমলা বুঝ না কিরিয়েই উত্তর দিল, আপনি দেখুন, ভাল করে দেখুন না? বাবা থেকে একটা হুঁচি বার করে কলমটা ঠিক করবার জন্যে কলম না কেন।

মিন, কিরিয়ে দেখে।

হাত বাড়িয়ে কলমটা নিল রমলা, ব্রাউজের আটকাতে গিয়ে সিক্তেন করল, কি হয়েছিল?

ছোঁকা দোকানদার একটু হাসল, বলল, কিছুই হয়নি, লেখার আপনার মনোযোগ ছিল না; না, কিছু দিতে হবে না।

রমলা কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে নামল, কলমটা বাঁ-ভাতের ঘুঁড়োর। লেখার কেন? কোনো কিছুতেই মন দিতে পারছে না সে, খেতে পারছে না, বা খাচ্ছে হজম হচ্ছে না, রাগে হুঁকটার বেনী ঘুমোতে পারে না, আর—সে জানে, শরীরের ওজনও কমে যাচ্ছে; হয়ত, শেষ পর্যন্ত, এমন কাঁচা শোনার রক্ত তার নষ্ট হয়ে যাবে। প্রথমে দাঁতে দাঁত বসল সে, পরে ঠোঁট কামড়াল। রক্ত না হলে সে ঠোঁটেই রক্ত বার করে দিত। খুব জোরে ধেঁটে সে এল কলুটোলা স্ট্রীটে, উঁকি দিয়ে দেখল রতন সিং ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই পাড়িতে।

সাহুল্য রোজ।

করক মিনিটের মধ্যেই সেট-জ্যান্সিয়ার হঠেলে কাছ পাছের ছায়া পাড়ি ধামল। ডেকে নিয়ে এস।

হুমিনিটেরও কম সময়।

নিবারণ এসে পাঁড়াল পাড়ির কাছে।

সারা বিকেল তোমার জন্ত অপেক্ষা করেছি, নিবি, তুমি কেন এলেনা?

পড়কিলাহ, প্রেয়ী তোমার বাবার কাছে নালিশ-পত্র পরিসরাচ্ছে।

তোমার ভাবতে হবে না তার জন্ত! এস। রমলা রমলা থুলে দিল।

কপাল থেকে হুল পিছনে সরিয়ে নিবারণ বলল, না, আমি ভাবছি না।

চল, ইডেন পার্ভেন্স কিংবা গংগার ঘরে, সাড়ে ছুটির মধ্যেই কিংব, এস। মিনতি, অল্পবোধ; রমলা বেন ভেঙ্গে পড়ল। ব্যাপ থেকে রমাল বার করে হুঁচি হুল সে; স্তম্ভ ছড়ালো বাতাসে; আসবে না?

বানিকটা বাতাস ঘুরপাক খেয়ে এগিয়ে এল, পাছের পাতা ফাঁকি হল করক হুঁচির জন্ত।

রতন সিং। প্রায় চাঁকর করে উঠল রমলা।

পাড়ি চলতে আরম্ভ করল, বাঁ দিকে মোড় ঘুরল।

নিভাভুই অশ্রু করেকটি কথা: নিবি, এর জন্ত ক্ষমা করব না তোমার, ছোঁকার আমি ছিঁড়ে কেলব! নাক তার কীত হতে লালস বার বার।

হঠাৎ যোল-কল হয়ে গেছে; নিবারণ বই গুলিয়ে পড়বার উল্লাস করছিল; রতন সিং খবর নিয়ে এল তাকে বাড়ি বেতে হবে, জরুরী ব্যবহার, সাহেব অপেক্ষা করছেন।

যোলা কলমটা তখনও তার হাতে ছিল, ক্যাপটা কলমে লাগিয়ে সে উঠে বলল পাড়িতে।

ইউক্যালিপটাস আর মোটা পাত-পাতেরে বনেনী বাড়িটা ঘুর থেকে দেখা দার, উঁচু দেওয়াল, উঁচু লোহার গেট।

পাড়ি ধামল। কেরানী-করা ফুলের বাগান। বাঁ দিকে হাট গ্যারেজ, পাশে তেমনি একটা বড় ঘর; এক সময়ে রাধিকাপ্রসাদের পিতাঠাকুর অধিকাপ্রসাদ ল্যাণ্ড-এ পাড়ি আর জোড়া টাটু রাখতেন।

চণ্ডা বারান্দাটা পার হয়ে নিবারণ সরাসরি বৈঠকখানার চুকল। বিপত্নীক, ধনবান রাধিকাপ্রসাদ ল্যাক্সারাসের দোকান থেকে কেনা ঘোরাণো চেয়ারে বসে টেবিলের চিঠিপত্র নাড়াচাড়া করছিল। চেউ-খেলানো ঘন চুল, সাধারণ আভাস দেখা গিয়েছে; উজ্জল, বনেনী গারের রঙ, উন্নত নাকের হুঁপাশে চামড়ার উপর বরসের রেখা, গিলে-করা মস্তক পাজীবীতে হীরের বোতাম লাগানো।

এদিকে এস। একবার মাত্র হুঁচি ফুলে নামিয়ে নিল রাধিকাপ্রসাদ।

নিবারণ টেবিলের পাশে এসে পাঁড়াল; রাধিকাপ্রসাদ একখানি ডাঁজকরা চিঠি ছুঁড়ে দিল তার দিকে। চিঠি ফুলে নিল সে। ফালার প্রেয়ীর অভিযোগপত্র, অপরাধের কিরিত্তি। একবার চোখ বুলিয়ে চিঠিটা রাখল সে টেবিলের উপর, তাকাল।

কি বলবার আছে তোমার?

কিছু না।

বোজ সন্ধ্যার পর তোমাদের কি এমন বাহুসেবন চলে?

নিবারণ চুপ করে রইল।

রাধিকাপ্রসাদ একটু নড়েচড়ে বসল, তুমি যে এমনই উজ্জ্বল হবে এ আর আশ্চর্য কি? তোমার বাপটিও এমনি লোকের ছিল।

এবারে বেন সে স্তনতে শেল রাধিকাপ্রসাদের কথা, বেন কেউ তাকে থাড়া দিল, বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকে; আর শিরায় রক্ত রক্ত সব এক হুঁচির জন্ত মোড় দিল হৃৎপিণ্ডের দিকে; আশ্রয় বাবা লোকের ছিলেন না, বড়লোক হতে চাননি।

চুপ কর। রাধিকাপ্রসাদের গল্পনটা এখনও জোরালো, পরীবার ছেলে পরীবার মতই থাকে উচিত ছিল, টাকা-পয়সার আওতার তারা মাথা ঠিক রাখতে পারে না, আমার মুখে মুখে জবাব দেবার স্পর্ধা আজ পর্যন্ত কাকর হয়নি, তোমার মোটা গদনিটা বঁাকা করতে আমাকে চাকর-দরোয়ান ডাকতে হবে না।

নিবারণ তাকাল, ভাল করে তাকাল এবার বাবার বড় দিকে। বাঁ-দিকের কপালে একটা শির ফুলে উঠেছে; সাবান আর স্নো-ব্রাউজিত মুখ, স্তম্ভিত তেলমাথা চিকচিক চুল, হুঁচক আপ নাকটা হয়ত আর একটু উঁচু ছিল; রক্ত চোখে তখনও লালসার আজ, পাতলা ঠোঁট ধুঁত হিসা।

তোমাকে সাবধান করে দিছি, প্রথমবার এক শেষবার, তোমাকে ভাজতে, ভেঙ্গে টুকরো করতে খুব বেশি সময় আমার লাগবে না, বাও।

নিবারণ বিরিয়ে এল।

বারান্দার প্রান্তে রমলা তার পথ আটকাল, পাঁড়াত। কল এস, এক মিনিট।

নিবারণ হাসল, বহুদল, প্রাণখোলা হালি।

হুহ চোখে রমলা বলল, নিবি, অনেক দিন এমন হাসতে তোমার বেশি।

নিবারণ তার অনাবস্তক উন্নত বৃক্কের উপর চোখ রেখে বলল, সত্যি ?

ও কি ! চলে বাহু ? পাঁড়াও এক মিনিট।

নিবারণ সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পাঞ্জাবীর একটা বোতাম এঁটে দিল।

বতন সি তবু আসে মনে হুঁ'বাব—ক্যালিকনিয়ান পণীর হুগন্ধ মাথানো চিঠি নিয়ে, তাছা গোলাপের তোড়া নিয়ে। বই থেকে মুখ তোলেন না নিবারণ, পরীক্ষা ঘনিষে এসেছে। এক ছপুয়ে রমলা এসে হাজির হল, ঠোঁট উন্টে বলল, আমি কি অপরাধ করেছি নিবি ? বই নাবিষে টেবিলের উপর উঠে বসল সে।

কাদায় প্রেরিতা জানতে পারলে হঠাৎ থেকে তাড়িয়ে দেবে। নিবারণ দেখতে গেল জামায় বোতাম লাগায়নি রমলা, মুখে রক্তাভা ; হঠাৎ থেকে কানবাব তোমার দরকার নেই, তোমার বাড়ি আছে, বাড়ি চল।

যবে বাও, মলি।

না, আমি বাব না। রমলা হুঁ'বাব বাড়িয়ে তার মাথাটা টেনে নিল বৃক্কের মধ্যে।

নিবারণ থাঙা মিল গুকে, রমলা টেবিল থেকে ছিটকে পড়ল মাটিতে, হাড়ির কাচ ভেঙে গেল তার, কয়ুইতে চোট লাগল ; সোজা হয়ে পাঁড়িয়ে সে বলল, পথের ভিখারি তুমি, বাবা তোমায় দয়া করে আশ্রয় নিরেছেন, কিসের তোমার এত গর্ব ? তোমাকে আমি ভাজতে পারি, ভেঙে টুকরো টুকরো করে খেলতে পারি। রমলা জোরে একটা চড় লাগাল নিবারণকে। বাবার সময় চৌকাঠে হোটট লেগে জুতার স্ট্রাপ ছিঁড়ে গেল তার, ক্রক্কেপ করল না সে।

পরীক্ষার আর একটি পেপার বাকি।

পৌনে বারোটোর সময় বই বন্ধ করল সে। কোন ঘরেই আলো জ্বলে না। লোহার সেট খুলে বাস্তায় এল সে ; নির্জন পথ, রাত্রির বাতাসে সে বেন আজ প্রথম হুস্তির স্বাদ অনুভব করল ; এই রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত সে অনুভব করতে চায় তার রক্তে, তার জ্বদয়ে। আর—শেষ বোকাপড়ার এই ত রাত্রি।

বাতাসের থাঙার গাছের পাতা মরবিত হারে উঠল ; এমন রাত্রি। এ রাত্রির কোনো বন্ধন নেই, কোনো উষেগ নেই, এমন কি কোনো উদ্ভাসনাও নেই। রমলা কি হতে পারে না আর এক নারী ? অস্ত্র এক নারী ?

নিবারণ হাঁটতে লাগল। শুধু তার চটির শব্দ। আর কোনো শব্দ নেই, আর আছে মন্থর বাতাসের কাহুতি।

সেই পাম আর ইউক্যালিপটাস গাছে বেরা বড় বাড়িটার সামনে এসে পাঁড়িয়েছে নিবারণ। ইউক্যালিপটাস গাছের শিঁছনে ভাঙা টায়, তারাত্তলি ঝাঁপছে। নিবারণ হাত দিয়ে দেখল লোহার সেট আজ ভাল লাগানো নেই, কিংবা হয়ত বর্ষ ইঞ্জিরের জাহ।

চওড়া বারাকার উঠে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে পাঁড়িয়ে বইল সে, আবহা আবহা করে উপরে উঠবার সিঁড়ি দেখা বাচ্ছে, জুতোর শব্দ হতে পাবে, এ কথা তার সেরাস হল না।

উপরে উঠে এল সে, আবার সেই চওড়া বারাকার। মলির ঘরের জানালা দিয়ে মন্থর, নীল আলো বারাকার এসে পড়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে রমলা এল চৌকাঠের বাইরে, দুটো হাত বাড়িয়ে দিল। না, এ আর কোনো রমলা নয়, অস্ত্র কোনো রমলা নয় ; এ রমলা, মাত্র রমলা। নিবারণ কটিন হাতে রমলার বাহির বন্ধন আলগা করে তাকে থাঙা মিল। রমলা ছিটকে পড়ল শক্ত, ঠাণ্ডা মেঝেতে। মুখ তুলে দেখল : নিবারণের শরীরটা মিলিয়ে বাচ্ছে সিঁড়ির নিচে। বিহুৎপৃষ্টার মত পাঁড়াল রমলা, এক নিমেষে পাঁড়িটা গায়ে জড়িয়ে চাঁৎকার করে উঠল, বাবা। বাবা।

পাশের ঘর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এল রাফিকাপ্রসাদ। ডরার্ড গলার রমলা বলল, বাবা, কেউ যেন আমার রমলা ঠেলছিল।

রাফিকাপ্রসাদ ঘুমের ঘোরে তাকাল এমিক সেমিক, যেসিংএর কাছে গিয়ে তাকাল নিচে, বাগানে। লাদা পাঞ্জাবী আর পাঞ্জাবী দেখে চিনতে দেরি হলনা তার, নিবারণ ততক্ষণে পেটের কাছে এসে পড়েছে, চাপাগলার ডাকল রাফিকাপ্রসাদ নিবারণ।

নিবারণ পাঁড়ালনা।

বাবা, তুমি গুকে চলে যেতে দিলে ?

টাই বোড়ার চাবুকটা কোথায় ?

আস্তাবলে।

রাস্তা থেকে দেখতে গেল নিবারণ প্রেরিতার ঘরে আলো জ্বলছে, করিডোরের সামনে সিঁড়ির কাছে পাঁড়িয়ে পাইপ টানছে প্রেরিতা।

Amico's
GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় বৈদিক ব্যাধার বহুগা পানছেন- কোথায় ?

কোমরে, হাঁটুতে, কিংবা কোন সন্ধিস্থানে ?

তবে দুই বসেন—

শারীরিক, যুদ্ধ বা পিঠের পীড়নায়,
বাতে ইত্যাদি বাবতীর ব্যাধার

এমিকো গ্রীন লিনিমেন্ট

(মুখ্য মালিণ)

ব্যাবহিক নির্ভরযোগ্য।

মূল্য : বড় শিশি—২.৭৫ নং পুট
ছোট শিশি—১.৭৫ নং পুট

"বাস্তব" বস্ত্র

ব্যবহাপ্রদেয় অন্য নিমুণ—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ

৮০ নং আবুতোলা ষ্ট্রট, কলিকাতা-১



কোথায় গিয়েছিলে ?

সাঁজার, ভাল লাগছিল না।

তুমি জাননা? রাগে হঠাৎকারে বাইরে বাবার নিয়ম নেই ?

জানি।

আবার অব্যাহতা ? নিয়ম ভাঙ্গার অপরাধ ! আবার—

সব জানি, কাশার, আমি অপরাধ স্বীকার করছি, আমার ক্ষমা কর, তা ছাড়া এই ত শেষ, কালকেই তোমাদের সংগে সমস্ত সম্পর্ক শেষ, ইচ্ছে করলে এমন তুচ্ছ আর অপ্রীতিকর কাহিনী তুমি যত্নে তুলে বেতে পার।

তুমি ক্ষমার অব্যাহতা, তোমাকে আমি সবাইর সামনে চাবুক লাগাব।

নিবারণ হয়ত একটু হাসল, অন্ধকারে বোকা গেলনা ঠিক, বেশ। তাই হবে তোমাকে আমি স্ত্রীসংগে সেব, নিশ্চয়। সুতরাং শুভ নাইট, কাশার ! নিবারণ প্রেরিত্য পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল হঠাৎ।

পরদিন শেষ পরীক্ষার খাতা দিয়ে নিবারণ বখান ইসলামিয়া কলেজ থেকে ওয়েলেসলীর কুটপাতে এসে পাঁড়াল তখন পাঁচটা মশ। হঠাৎ এল সে, কাশার প্রেরিত্যকে পাওয়া বাবে এসময়ে। গেটের কাছে উবু হয়ে বসে জাহাঙ্গীর বাবুচি বিড়ি ফুঁকছিল, খবর নিয়ে জানল, প্রেরিত্য সাহেব তাঁর ঘরেই আছেন।

দরজার টোকা দিয়েই ঘরে ঢুকল নিবারণ।

বাইবেল বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল প্রেরিত্য, ভাল করে তাকাল, নীল চোখে আগুনের ফুলকি বললে উঠল, কি চাও, তুমি ?

একটা হিসাব ঠিক করার 'নাহে। আরও এক পা এগিয়ে এল নিবারণ।

সেট আউট ! প্রেরিত্য মোটা বেতটা তুলে নিল।

চোখের নিম্নে নিবারণ প্রেরিত্যর হাত থেকে বেতখানি ছিঁড়িয়ে নিল, বাবার আগে গরমিল হিসাবটা ঠিক করে কেলা উচিত নয় কি ?

কাগজ কাটবার ছুরিটা তুলে নিয়ে কাশার প্রেরিত্য কিপ্র এক ভঙ্গিতে পাঁড়িয়ে পড়ল, আর সংগে সংগে হাতা দিয়ে নিবারণ তাকে বসিয়ে দিল চেয়ারে। নিত্যক অবিস্মৃত দৃষ্টিতে প্রেরিত্য তাকিয়ে রইল ; ইউ সোরাইন। আরও কি বলতে বাচ্ছিল প্রেরিত্য, কিন্তু—বাতাসে এক হুহুর্ন্তের জন্ম হিস্ হিস্ করে উঠল ঠোঁট উন্মত্ত সাপটা। নিবারণের হাতেও জোর আছে, প্রেরিত্যর কপালের সোনালী চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, গড়িয়ে পড়ল তার সালা আলখাল্লায়। বাড়ানের একটু মাত্র তামাটে লালক বাতাসে উড়ে আটকে রইল প্রেরিত্যর বাড়ের উপর।

অপ্রত্যাশিত আর অভাবনী। প্রেরিত্য তাকাল : এমন কি করে সম্ভব ? সত্যেরো বহর ইণ্ডিয়ানতে আছে সে। ছুরিটা ভান হাত থেকে বা হাতে বন্ধ করল সে, টেবিলের উপর পিতলের জঙ্গির পেশারেরেটটি আড়চোখে দেখে নিল, কিন্তু নিবারণ আরও শিখা, প্রেরিত্যর হাত পৌঁছিবাব আগেই সে ছেঁ। বেয়ে পেশার-করাই তুলে নিল। প্রেরিত্যর নীল চোখে খুনের নেশা। আর এটাও বুঝতে তাঁর ঘেরি হল না ঘটনাটি সহজ নয়। আচমকা সেখানে হাতা খেরে করেই হাত পেছিয়ে পাঁড়িয়ে পড়ল প্রেরিত্য।

চোখের নিম্নে চেয়ারটা তুলে নিল মাথার উপর, কিন্তু পলক পড়বার আগেই আর একখানি চেয়ার প্রচণ্ড বেগে প্রেরিত্যকে আঘাত করল।

মাটিতে পড়বার আগে প্রেরিত্যর লম্বা শরীরটা কয়েক বার টলল, মাথার উপর আর একখানি চেয়ার না থাকলে মাথাটি আঁত খাকত না। নারকেল ছিবড়ের মাছুরে একরাশি তামাটে তুল, বন্ধ নীল চোখ, মানচিত্রে দাক্ষিণাত্যের মত ছাগল-বাড়ি, পূর্ব-ঘাটের পাশ দিয়ে অতি ক্ষীণ, লোহিত ধারা, তামাটে-তুলের পাশে চেয়ারের একটা পায়া, তুলের ছোট কাঠটি। নিবারণ বেগিয়ে এল ঘর থেকে। জাহাঙ্গীর মিংগকে পাঠাল হঠাৎ-ভালবের কাছে, এখনি যেন আসে, ফাদার প্রেরিত্য অন্তহু।

সেই পায় আর ইউক্যালিপটাস গাছে-ঘেরা বনেদী বাড়ি। লোহার গেট খুলে ভিতরে ঢুকল সে, প্রায় দশটি বছর এ-বাড়িতে কাটিয়েছে নিবারণ। ভরজাঙ্গ মালী বড় কাঁচি দিয়ে মেহেরী গাছের ডাল ছাঁটছিল ; কালো-রং, অতিকার বৃদ্ধ মাছবাটি ; কঠিন, কর্কশ পেশী ; কিন্তু মনে মনে গুর হাসির হিসাব না করে পারলনা নিবারণ, তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে ? বিছানা কৈ ? চলে বাবে নাকি আবার ? ফুল নিয়ে বেগে, তামা গোলাপ।

নিবারণ বাগান পেরিয়ে চণ্ডা বারান্দার উঠল।

রাখিকাপ্রসাদ কাগজ পড়ছিল, পারের শব্দে কাগজ সরিয়ে তাকাল।

নিবারণ টেবিলের কাছে এল ; ভাল রাগে ডাকছিলেন ?

কাল রাগেই তোমাকে গুলি করে মারতাম—হাতের কাছে বহি বন্দুটো থাকত।

নিবারণ হাসল, হ্যাঁ, গুলীর আর এমন কি দাম বলুন ?

চোশবাও, উজুক ! রীতিমত টেবিলেই উঠল রাখিকাপ্রসাদ।

এবারে হাসলনা নিবারণ, হাসির একটা ভঙ্গী করল বন্ধ। এত উত্তেজিত হবার কিছু নেই, খেই হারিয়ে বাবে।

অজ্ঞ দরজা দিয়ে রমলা ঢুকল, তাকাল নিবারণ, তেলনি খেত-গুজ পোষাক, সাধা শাড়িতে জামার তেমন মন-ভাল-করা পরিকল্পিততা, একটু বাড়তি ভাঁজ নেই কোথাও। টোট উশে বন্ধ, বাবা, তুমি এই রাসকেলটাকে সহজে ছেড়ে দিও না আজ।

রাখিকাপ্রসাদ পাঁড়াল, বতখানি উকতা তার চাইতে একই বেশিই লম্বা করল শরীরটাকে, বুটাকে আর একটুখানি প্রসারিত করল ; ডারাবোটস আর হুইকীর প্রকোপে গত করেই বহর কাঠামোটা অনেকখানি ঢিলে হয়ে গেছে, কিন্তু এ হুহুর্ন্ত সেটা আর মনে রইল না তার। এস, আমার সংগে। আদেশ দিল রাখিকাপ্রসাদ।

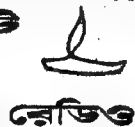
ঘরের বাইরে এল গুরা ; আগে রাখিকাপ্রসাদ, পিছনে নিবারণ, কিছুটা ব্যবধান রেখে তারও পিছনে রমলা।

বারান্দা পার হয়ে, বাগানের পাশ দিয়ে আঁতবল-ঘরের সামনে এসে পাঁড়াল রাখিকাপ্রসাদ, টান দিয়ে দরজার একটা পাঞ্জা খুলে ফেলল, আত্ম উঁচিয়ে নিবারণকে ভিতরে ঢুকবার নিষেধ দিল। নিবারণ ঢুকল ভিতরে, পিছনে রাখিকাপ্রসাদ আর রমলা। প্রথম ঘর, একপাশে তেরপল-ঢাকা ল্যাণ্ড-অ পাড়ি, দেওয়ানের গুরে মুলনো জোকা টাট্টর জীন আর লাগান। রাখিকাপ্রসাদ নীচু হয়ে চাকুটা তুলে নিল, টাট্টর চাকু নয়, রাখিকাপ্রসাদের বিরিকরা

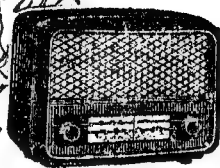
এই উৎসবের দিনগুলোয়—

সঙ্গীতে ও কৌতুকে আপনার হৃদয় আনন্দমুখর
ক'রে তুলতে স্মরণ একটি

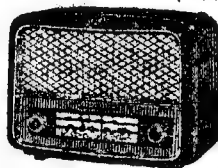
ত্যাশনাল একো



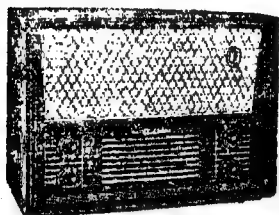
রেডিও
অন্যে রাখুন



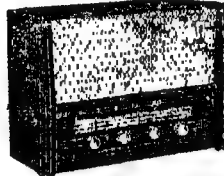
মডেল ইউ-৭১৭ : ৫ ভালভ, ৩ ব্যাট
এসি বা ডিসি। বাধানী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০ টাকা।
ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙের।
২৬০ টাকা।



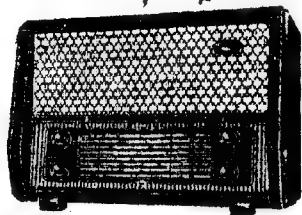
মডেল বি-৭১৭ : ৫ ভালভ, ৩ ব্যাট,
ড্রাই ব্যাটারী। বাধানী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০ টাকা। ক্রীম,
নীল ও সবুজ রঙের। ২৬০ টাকা।



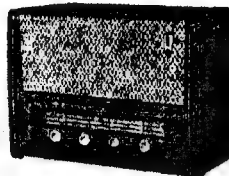
মডেল-৭৩০ : ৬ ভালভ, ৮ ব্যাট,
'ম্যাগ'নি-ব্যাট টিউনিং। মডেল এ-৭৩০
এসি; মডেল ইউ-৭৩০ এসি বা ডিসি।
৩২৫ টাকা।



মডেল-৭২২ : ৬ ভালভ, ৩ ব্যাট,
মডেল এ-৭২২—গুণ্ণ এসি। মডেল
ইউ-৭২২ এসি বা ডিসি।
৩৩৫ টাকা।



মডেল এ-৭৩১ : ৭ ভালভ, ৮ ব্যাট, এসি।
শলগ্রন্থ কমতা অত্যন্ত উঁচু রয়েছে। স্বরনির্ভরিত
আর, এক স্টেশন। সমস্ত ত্যাশনাল-একো
রেডিওর মধ্যে সেরা। ৩২৫ টাকা।



মডেল বি-৭২২ : ৬ ভালভ,
৩ ব্যাট, ড্রাই ব্যাটারী।
৩৩৫ টাকা।

সবই নেট দাম—টার আলোচনা
এক বছরের গ্যারান্টি।



জেনারেল রেডিও এন্ড এপ্লায়েন্স
প্রাইভেট লিমিটেড

৩ বাতান কুইট, কলিকাতা-১৩। অফিস
হাউস, বোম্বাই-৪। ফোয়ার রোড, পাটনা।
২/১৮, হাউস রোড, মাদ্রাস। ৩৬/৩৬,
সিলভার হুইলী পার্ক রোড, বাঙ্গালার।
কোম্পিউটার কম্পানী, টাংকী চক, দিল্লী।
হাউসিং রোড, লেকেন্সাবাদ।

ত্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা

—এগুলি 'মনসুনাইজড'—

চামড়ার চাবুক, আরও নরম চামড়া কাটাবার, মাদারের নরম চামড়া।

রমলা ইতিমধ্যে আঁচলটা জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে, বাবা, গায়ের জামাটা ওকে খুলে ফেলতে বল, ভরমাজকে ডাকব? রাধিকাপ্রসাদ যে চোখে একদিন কাটা চামড়ার কাঁকে চুইয়ে-পড়া রক্তের ধারা দেখেছে, আজ বহু বছর পরে তারই এক উত্তরাধিকারিণীর চোখে তেমনি লাল রক্তের নেশা, টোট কাঁপল তার, আর কাঁপল জামার নিচে স্ববাক্যকার স্তন—আদিম উল্লাসের স্পন্দন।

একটা হাতার কুকুরকে সায়েস্তা করতে আমায় ভরমাজকে ডাকতে হবে? ছোট। রাধিকাপ্রসাদ হাত তুলল, আর বিছাতের মত হিটকে এল চাবুক।

কিন্তু নিবারণ ধরে কেলে চাবুকের প্রোভাট; আর তখনই সে বুকে পায়ল চামড়ার ঐ বিনিটা কত শক্ত আর কত মজবুত। জোরেই টান দিল সে, বেশ জোরে। রাধিকাপ্রসাদ আর কিছু কমবার আপসেই দেখতে পেল চাবুকা দোল খাচ্ছে নিবারণের হাতে।

বাতাসে 'সাঁই' শব্দ করে উঠল চাবুক, একটু বাতাস রাধিকাপ্রসাদের কান ছুঁয়ে গেল মাত্র। কিন্তু ঐ স্নেহেতটুকুই

বখেঁট। ঘেরালে পিঠ লাগিয়ে পাঁড়াল সে। নিবারণ আবার চাবুক ছুঁড়ল বাতাসে, রাধিকাপ্রসাদ আবার কাঁপল, মনে হল, বুকের নিচে বুক-পুক শব্দটা এমন কষ্টকর, জীবনে আর কোনদিন বোধ করেনি সে। কি হল? একটা সামান্য চাবুককে এত ভয়? হাতে বন্দুক থাকলে আপনাদর ঐ পায়রা-বুকের নিচে নিজীব স্থংশিগুটা ত ধর্মঘট করে বসত। কথা শেষ করে নিবারণ হেসে উঠল। দুখ ফিরাল রমলার দিকে, বলল, না, তোমার নিবি তোমাকে জামা খুলতে বলবে না—তাহলে হয়ত কোনো ভবিষ্যৎ প্রণরীকে তোমাকে কৈকিৎ দিতে হতে পারে। বাতাসে চাবুকের সেই কিংবদন্তি, নির্মম শব্দ। রমলা হুঁহাতে দুখ ঢাকল, কিন্তু ততক্ষণে তার গালের চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

চাবুকটা রাধিকাপ্রসাদের গায়ের উপর ছুঁড়ে মারল, বেরিয়ে এল আঁজাবল থেকে।

গেট খুলে বাইরে এল সে।

পাম আর ইউক্যালিপটাস গাছে-বেরা বনেদি বাড়িটার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। কি পাখি?

অতৃপ্ত তৃষ্ণা

(পাঞ্জাবী গল্প)

কেশর সিং আজিজ

সেই আদো বলমল হিনটীর কথা বার বার কুলবীরের মনে পড়ে যায়। কুলবীর আর সুরজিং সেদিন কী হাসিটাই না হেসেছিল। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কুলবীরের টোঁটের যে এক ভিলতে হাসিটুকু ফুটে উঠল, তা যেন সেদিনের হাসিটার প্রতি বাক্য। কুলবীর মৃত্যুপংখ্যাত্রী, ডাক্তার বজাচ্ছে বড় দেয়ী হয়ে গেছে। তাই অসম্ভব। তবে চেষ্টার ক্রটি নেই। তবু কুলবীর বুকে পড়ে—দিন তার সুরিমে এসেছে। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সে বুকে পড়ে। বলে—আমায় পশুকে আজও জানলে না? সুরজিং কপট অপ্রকৃত্যের ভঙ্গী করে বলে—ঐ বাঃ! একেবারে ভুলে গেছি।

পশু ভদের একমাত্র ছেলে। সুরজিং আর ওর মা রতনী পশুকে নিয়ে সহবস্তলীর একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকে। সুরজিং পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ইন্সপেক্টরের কাজ করে। তাই তাকে প্রায়ই কর্তব্যপক্ষে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। তবু এখনই সে সময় পায় হাসপাতালে গিয়ে বসে। জ্বর গারে হাডু বুলতে বুলতে বলে ভর কী? সেয়ে উঠবে শীর্ণগিরি। কিন্তু কুলবীরের সেই এক কথা পশুকে নিয়ে আস না ভেন? তাকে যে আমার দেখতে ইচ্ছে করে। সুরজিং ভুলে বাড়িয়ার ডান করে। কোনদিন বা বলে একেবারে জব্বি থেকে আসছিঁকি না, আজ্ঞা কাল আসবো।

হু-তিন মাস কেটে গেল। কিন্তু কুলবীরের ইচ্ছে আর পূর্ণ হোল না। কুলবীরের শরীর বিশেষ ভাল বাচ্ছে না। সে বেশ বুঝতে পারে শেষের দিন আর বেশী দূরে নেই। সেদিন সে রাগ করে সুরজিংকে বলল, জাখ কাল যদি তুমি পশুকে না জান তবে যেমন করে হোক—আমি নিশ্চয়ই এখান থেকে পালিয়ে যাব। ওঃ পশুকে কত দি—ন দেখিনি।

সুরজিং তাকে বোকার। না কেঁদোনা সোনা। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, নিশ্চয়ই পশুকে নিয়ে আসব। তুমি জো জান—দানে—সুরজিং কথা শেষ করতে পারে না, মাতুরেই অন্ধ কুলবীর বলে—বুঝছি। কিন্তু তাকে আমি ছোঁব না। একবার মাত্র দেখব। আমার পশুসোনাকে আমি একবার মাত্র দূর থেকে দেখব।

সুরজিং অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। *এদিকে প্রিয়তমা জ্বর একান্ত অমরোহ। অপারদিকে এই হোঁরাতে রোগের ভয়। না না, পশুকে সে কিছুতেই জানবে না। তাদের একমাত্র ছেলে পশু। যদি পশুপুত্রও—নাঃ পশুকে জানা অসম্ভব।

সেদিন সুরজিংয়ের সঙ্গে কুলবীর কোন কথাই বলল না। সুরজিং ফলগুলো টেবিলের ওপর রেখে বলল—তাহলে আসি। কুলবীর লাফা দিল না।



ঐশ্বর্যী উর্মিলা দাসমহাপাত্র

পুজোর ছুটিতে হাজারিবাগ বেড়াতে এসেছে প্রদোষ চ্যাটার্জি। কলকাতার কোন এক সাহেবী কোম্পানীতে মোটা মাইনের চাকরী করে সে। সহরের কর্মব্যস্ততার মাঝে হাঁপিয়ে-ওঠা জীবনকে ছুটির দিনে অবসর দিতে এসেছে এই অপেক্ষাকৃত নিষ্কলন ছোট সত্ত্ব। মনটা খুঁতকে লড়ে উঠছে। হাজারিবাগের এই নিষ্কলন রাজ্য মাঝে হারিয়ে গেছে সাহেবী কোম্পানীর মিঃ চ্যাটার্জি।

খুঁত হয়েছে মিতাও। কতদিন পরে এলো কলকাতার বাইরে। বিয়ের পর সেই একবার গিয়েছিল পুরী, ছিল বহুদিন, সবুজ দেখেনি এর আগে, তাই নিয়ে গিয়েছিল প্রদোষ পুরী। অথচ হয়েছিল মিতা বেরন ঐ বিশাল নীল জলরাশি দেখে, খুঁতও হয়েছিল ভেতর। তারপর এই চার বছরের ভিতর তো কলকাতার বাইরে বাঙরাই হয়নি। কাজে ব্যস্ত প্রদোষ, ছুটি নেবার সময় নেই তার, তাই মহানগরীর 'নাগপাল' থেকে ষেরোতে পারেনি তারা। মিতার অস্বস্তিক প্রদোষে এক মাসের ছুটি নিয়ে কাছাকাছি বেড়াতে এসেছে 'এই হাজারিবাগে'। আকসরই এক বছর বাড়ী উঠেছে, ছোট স্থলর বাড়ী, সহর ছাড়িয়ে একটু দূরে। এই নিষ্কলন রাজ্যে এসে মিতার, কলকাতার বাঁধাধারা জীবনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে প্রাণ লাগে পেরেছে বেন। তাই প্রদোষের অস্বস্তিক সত্ত্বও তার কথার কান দেয়নি মিতা। বিয়ের পর সেই ক'দিনের জন্য পুরী গিয়েছিল, তার সন্তুষ্টিবোধ, সন্তুষ্টি, সন্তুষ্টি মন প্রদোষের বেশি কাছে যেতে পারেনি, আর সে লজ্জা ভেঙ্গে প্রদোষও তাকে কান দেয়নি। তার পক্ষ কলকাতার কর্মব্যস্ততার হাজার লা লাগে পেরেছে বেন।

প্রদোষ তার অধিক, তার এই নিয়ে স্নান ব্যস্ত, তাই বসে মিতাকে সে অবলোকে করেছে, একথা মিতা বলে না। প্রদোষের সঙ্গে সব কলকাতাই সে গিয়েছে, তার কখনও

পেরেছে বলে প্রদোষ বেন গর্বিত, এ কথা তো তার কাছে সে নিজেই স্বীকার করেছে। তবুও কেন প্রদোষের সম্পূর্ণ কাছে সে যেতে পারেনি, কি যেমন মনের কোণে একান্ত নিজের করে রেখে দিয়েছে প্রদোষ। মিতার অধিকার সেই সেখানে প্রবেশ করার। কতদিন মিতা মাকরাতে ঘুম থেকে উঠে দেখেছে পাশে প্রদোষ নেই, জানলার বায়ে চুপ করে পাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, ও, ঘুম আসছে না তাই, ভূমি ঘুমাও। তাই একান্ত করে স্বামীকে পাবার আশাও তার কম নয়, ভেবেছে হয়ত এই শান্ত পরিবেশে যে চিন্তা তার স্বামীকে অশান্ত করে তুলেছে, তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। অবশ্য প্রথম ক'দিন প্রদোষের এই নিষ্কলনতা ভাল না লাগলেও ক্রমশঃ ভাল লেগে গেছে, প্রদোষ বেন মিতার খুবই কাছে এসে গেছে, যে কীক তাদের মাঝে ছিল, ক্রমশঃ তা দূরে সরে যাচ্ছে।

সেদিন সকালে বেড়িয়ে কিরে চারের টেবিলে বসলে প্রদোষ, মিতা শুধন একটি কুটকুট বছর পাঁচেকের ছেলের সঙ্গে গল্পে মগন। প্রদোষকে দেখে ছেলেটি চুপ করে গেল, পা বেঁবে সরে পাঁড়াল মিতার। মিতা তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো প্রদোষকে, বসো চা নিয়ে আসতে বলি। প্রদোষ জিজ্ঞাসা করে মিতাকে, ছেলেটি কে?

—থাকে আমাদের বাড়ীর কাছেই। গেটের সামনে পাঁড়িয়েছিল, কাছে ডাকতেই ফেললো, আমাকে একটা কুল দেবে? বললাম দেবো, তবেই ভেতরে এসেছে, কথা শেষ করে মিতা। চারের পেরালার চুপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রদোষ—কি নাম তোমার থোকা? কোম উত্তর না করে মিতার কোল বেঁবে পাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটি। মিতা বলল, কই নাম বলো তোমার?

—অনুভব চ্যাটার্জি কিন্তু বা ডাকে বাবলু বলে—সন্তুষ্টি বয়ে উত্তর করে ছেলেটি।

—বাঃ সন্তুর নাম তো তোমার, তোমার বাবার কি নাম, কোথার থাক তোমরা? প্রশ্ন করে প্রদোষ।

—ঐ তো, ঐ ছোট লাল রঙের বাড়ীটা আমাদের। মা, আর লথিয়া মাসী থাকে, বাবা তো থাকে না—উত্তর করে বাবলু।

—বোধ হয় বাবা নেই, তোমার বাবার নাম জান বাবলু? বলে মিতা।

—হ্যা—ঐ প্রদোষ চ্যাটার্জি।

চমকে উঠে প্রদোষ আর মিতা, থানিকটা চা চমকে পড়ে বার প্রদোষের কাপ থেকে টেবিলের ওপর। মিতা হেসে বলে, সত্যি, কি আশ্চর্য, তবে একই নামের লোক তো কতই আছে। চোরার ছেড়ে উঠে পাড়ার প্রদোষ, বলে হ্যা, সে তো কতই আছে। বাই, আমাকে আবার ক'খানা চিঠি লিখতে হবে। পর থেকে বেশির ভাগ সে।

বাবলুই এতকাল বলে ওঠে, আমি বাড়ী বাবো। মিতা বলে—হ্যা চলো, কুল দেবে না ভূমি? বাগানের দিকে এগিয়ে বার বাবলু আর মিতা।

নিজের ঘরে অস্থির হয়ে পাঁচচারী করে প্রদোষ। এ কেমন করে সম্ভব, এ নিজেই তার মনের কুল—একই নামের তো কত লোকই আছে। তবে এত অস্থির হয় কেন মন, বা সন্তুষ্টি নয়, বা হারিয়ে গেছে অনেক দিন, বার বার তাই কেন বলে আসে? বেশির পক্ষ প্রদোষ বাড়ী ছেড়ে।

কালির
মূল কারণ দূর
করুন



সিরোলিন
খান

নিরাপদ
পারিবারিক
ওষুধ

সিরোলিন কেবল যে কালি
'খাষিয়ে দেয়' তা নয়—
কালির মূল কারণ হুই-
কীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।

একমাত্র পরিচালক: ডক্টর সিবিটেড

পরের দিন রাতে: খাওয়া শেষে শুয়েছে প্রদোষ। ঘরের ঘরখা বন্ধ করতে করতে শিখা বলে, আজ দুপুরে গিয়েছিলাম বাবুলপুর বাড়ী, যে ছেলেটি কাল সকালে এসেছিল।

—ও! তাই বল—কিছুলাহর ঘুরে বলে প্রদোষ।

—ওর মায়ের সঙ্গে আলাপ হল, বেশ বেরোট, অনেক গল্প বললে। তবে বড় দুখী মেয়েটা—সমবেদনার ঘুরে বলে শিখা।

ও, তাই তোমার সঙ্গে দুপুর পাওয়া-বাড়িল না। বলে প্রদোষ।

—হ্যাঁ জানো, মেয়েটির মায়ের বাড়ী তোমাদের গ্রাম বেখানে সেই একই জায়গায়।

—একই জায়গায়? চমকে ওঠে প্রদোষ।

—হ্যাঁ, কে এক পদেণ বাবু ছিলেন, তাঁর ভাড়া। ছোটবেলার বাবা বা মায়ার নাম, তাই মায়ের বাড়ীতেই মানুষ। নাম বললে কাকলি, ভাবী স্মরণ নাম, তাই না? তোমার বাবার নামও কাকলি। চেনে বললো। টেকলাপাশটা হাত বাড়িয়ে নিবিয়ে দিলে চেনে পকে ক্রান্ত পদার বলে, ও! পদেণ বাবু ভাড়া কাকলি, সেখানে আছে।

—এখানেই তো থাকে এখন, মিশনারী ছুলে ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ায়।

—কিছু এখানে—এখানে এলো কি করে।

—সে অনেক কথা। মায়ের বাড়ীতে থাকতো, তবে মামী কিলের হুমকিরে সেখানে না।

—হ্যাঁ, শুনেছিলাম তাই। যে বছর আমি বি-এ পাশ করি, কাকলি পাড়িয়েছিলেন, সেসের বাড়ীতে দেখাশুনা করে আসার জন্য। তখনই দেখেছিলাম কাকলিকে। মায়ের অত্যাচার ছিল, তবে মায়ের ক্ষেত্রে টিকে ছিল কাকলি। মামাই ছোর করে লেখাপড়া করিয়ে সে বছর মাস্ট্রিক পরীক্ষা দেওয়ান। সেও তো আজ প্রায় ছ' বছর আগের কথা—স্মরণ করে প্রদোষ।

—হ্যাঁ, ভাড়াপণ বিবে হর এই প্রদোষ চ্যাটার্জির সঙ্গে।

—কিছু চ্যাটার্জির সঙ্গে—পদেণ বাবু তো কার হু ছিলেন।

—হ্যাঁ, স্মরণী বলে কাকলিক নিজের বাবা-মায়ের অমতে বিবে করেছিল তখনো কিছু বিবে মাস চারেক পরে উখাও হয়ে বান তিনি আর কাকলি তখন সম্মানসম্মত। অবশ্য তার বাবীসে খবর জানায়ে না। মামা-মামীকে এই বিশেষের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য বর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কলকাতা বাবে বলে ট্রেনের স্টেশনে কাকলির উঠে এক ক্রীড়ান জ্বরহিলার সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন হাজারিবাগে। এই মিশনারী ছুলে ছোটবেলা পড়াবার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি নিজের এই ছুলের কাকলির পুত্রের টিচার ছিলেন। তবে আজ বছর মেডেক হল তিনি মারা গেছেন। নিঃশ্বাস কেলে চূপ করে শিখা।

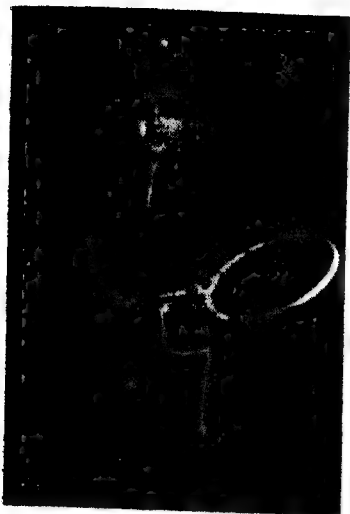
বালিশের মধ্যে হুণ্ড ভেঙে গুলে থাকে প্রদোষ, অকূট করে শুয়ে বলে কাকলি—কাকলি। চোখের সামনে ভেসে উঠে তার ছ'বছর আগের দৃশ্য—বাকি ছুলে বাবার প্রশ্রয়ণ জোঁ করেও ছুলে থাকতে পারছে না। শত কাজের মধ্যে নিঃস্বস্তি দিয়ে রাখলেও পলাপপুরের সে কটা দিনকে কিছুকোঁ হুণ্ডে ঠেসে দিতে পারছে না। শিখাকে বিবে করে কিছুটা ভুলেছিল। কিন্তু সম্প্রতি কাকলিকে হন বেড়ে হুণ্ডে ঠেসে দিতে পারেনি। অনেক মৌজাই-এক সে করেছিল,

কিন্তু তখন পান্ডি, জাজ ও সের কাকলিকে হন থেকে নিষ্কৃত করার সব থেকে প্রদোষের, কাকলির সঙ্গে তখনই এভাবে দেখা হয়ে বাবে, এ তো সে স্বপ্নও ভাবেনি। শিখা কি কিছু সন্দেহ করেছ? আর বাবলু—সে ভায়, এ বে কল্লারও বাইরে—দুহাতে কপালটা চোখে ধরে প্রদোষ। ছ' বছর আগের কথা হবির মতন ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে।

বি-এ পাশ করে বলে ছিল প্রদোষ। আন্তোব বাবু ছেলেকে পাঠালেন গ্রামে, পলাপপুরে, বা কিছু সম্পত্তি আছে তার দেখা-শুনা করার জন্য। পলাপপুরে বাবা-মায়ের সঙ্গে এসেছিল প্রদোষ কয়েকবার, কিন্তু বড় হয়ে এই প্রথম সে এলো। অনেকদিন পরে সের থেকে গাঁয়ে এসে ভারী ভাল লাগলো তার। কয়েকদিনের জন্য এসে তিন চার মাস থেকে গেল। তখনই জো আলাপ হয়েছিল তার কাকলির সঙ্গে, তার কলি। ওদের বাড়ীর পাশেই থাকতো পদেণ মন্ত, তারই ভাড়া কাকলি। বাবা-মা-মায়ের বাওয়ার পর নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন কাকলিকে পদেণ বাবু, সখ করে কাকলি নাম তাঁরই দেওয়া কিন্তু তাঁর দ্বী চাকরবালার এসব মোটেই পছন্দ ছিল না। নিজেরই তিনটি মেয়ে একটি ছেলে, তাদের কি করে মানুষ করেন তার ঠিক নেই, এর ওপর এসে ছুটেছে এই আপন। তাঁদের অবস্থা খুব ভাল নয়, কিছু জমিদারী আছে, আর গাঁয়ে হোমিওপ্যাথি করেই তাঁর দিন চলে। অনেক নিজেরই সংসার চলে না ভাল করে, তার ওপর আবার এই এক ভাড়া এসে ছুটেছে। মায়ের মায়ের কারণও অবশ্য ছিল। নিজের তিনটি মেয়ে একটিও কাকলির রূপের কাছে ঠাড়াবার বোঁগা নয়। আর পাঁচটি বাড়ালী মেয়ের মতন শ্যারলী ছিল তার, কাকলির পাশে সত্যি তাদের আরও নিপাত লাগতো। সত্যি ভাবি স্মরণ ছিল দেখতে কাকলি। পদেণ বাবু বলেন, তাঁর বোন নাকি এমনই সুন্দরী ছিলো। টুকটকে ফরসা রঙে টানাটানা চোখ, ডুক, টিকালো নাক, আর মাথাভক্তি কালো চুল। যে একবার দেখতো সেই কিরে তাকাতো। নিজের মনে বলে উঠতো, বা: কি সুন্দর, দেখে শুনে বলে উঠতেন মামীমা, পদেণ বাবুর কাছে গিয়ে বলতেন, কি বিবে দিতে হবে না, অত বড় মেয়ে খাড়ে নিয়ে বলে থাকতে লজ্জা করে না তোমার? পদেণ বাবু বলতেন, অতবড় মেয়ে আবার কোথায়? এইতো সব বোলার পা দিয়েছে—মামা আর ওতো একবঙ্গী। এইবার প্রাইভেট পরীক্ষাটা দিচ্ছে, কি না, কি অনুবিধা হচ্ছে তোমার?

হুণ্ড ভুলিয়ে চলে যেতেন মামীমা। মামা পদেণ বাবুর বড় মেয়ে, কাকলিরই লম্ববঙ্গী। রূপ না পেলেও বাবার স্বভাব পেয়েছে সে, ভারী ভাল মেয়ে। কাকলির সঙ্গে তার খুব ভাল। তখনই তেরী হছিল প্রাইভেট মাস্ট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু মামা নিশ্চিত থাকলেও, মামী চূপ করে ছিলেন না। পায়ের হটকী ঠাকলকে 'ভালো' দিয়ে পাঁচ কোলাড়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তিনি জানতেন, যদি কাকলিকে মাঝে পার করতে পারেন তবে তাঁর নিজের মেয়েদের বিবে হবে। কারণ, কাকলির রূপের পাশে তার মেয়েরা—

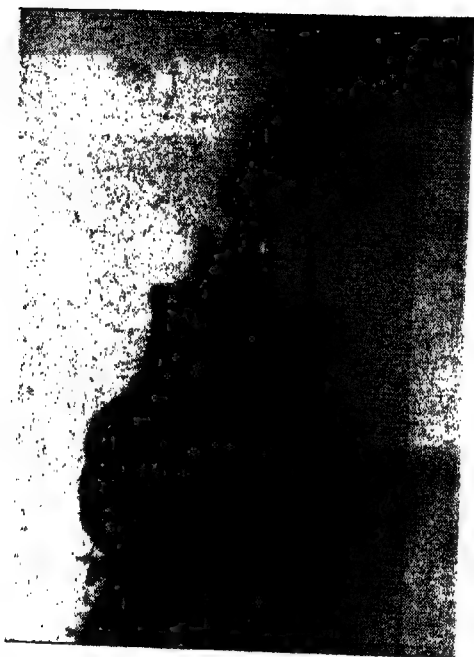
বালিশের পর্দা করে সেল হুণ্ডে, আর বাবী কোমর দিয়ে লাগলেন মেয়েদের বিবের জোঁর। পাঁচ কোলাড়ও হল, কলকাতার



—এম. গঙ্গোপাধ্যায়

॥ আলোকচিত্র ॥

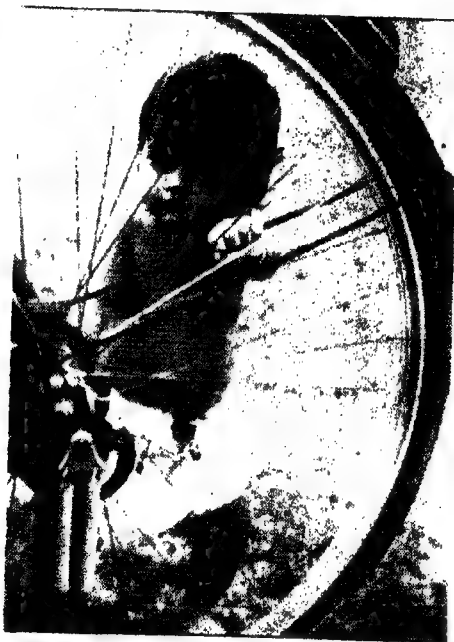
—জামল চট্টোপাধ্যায়



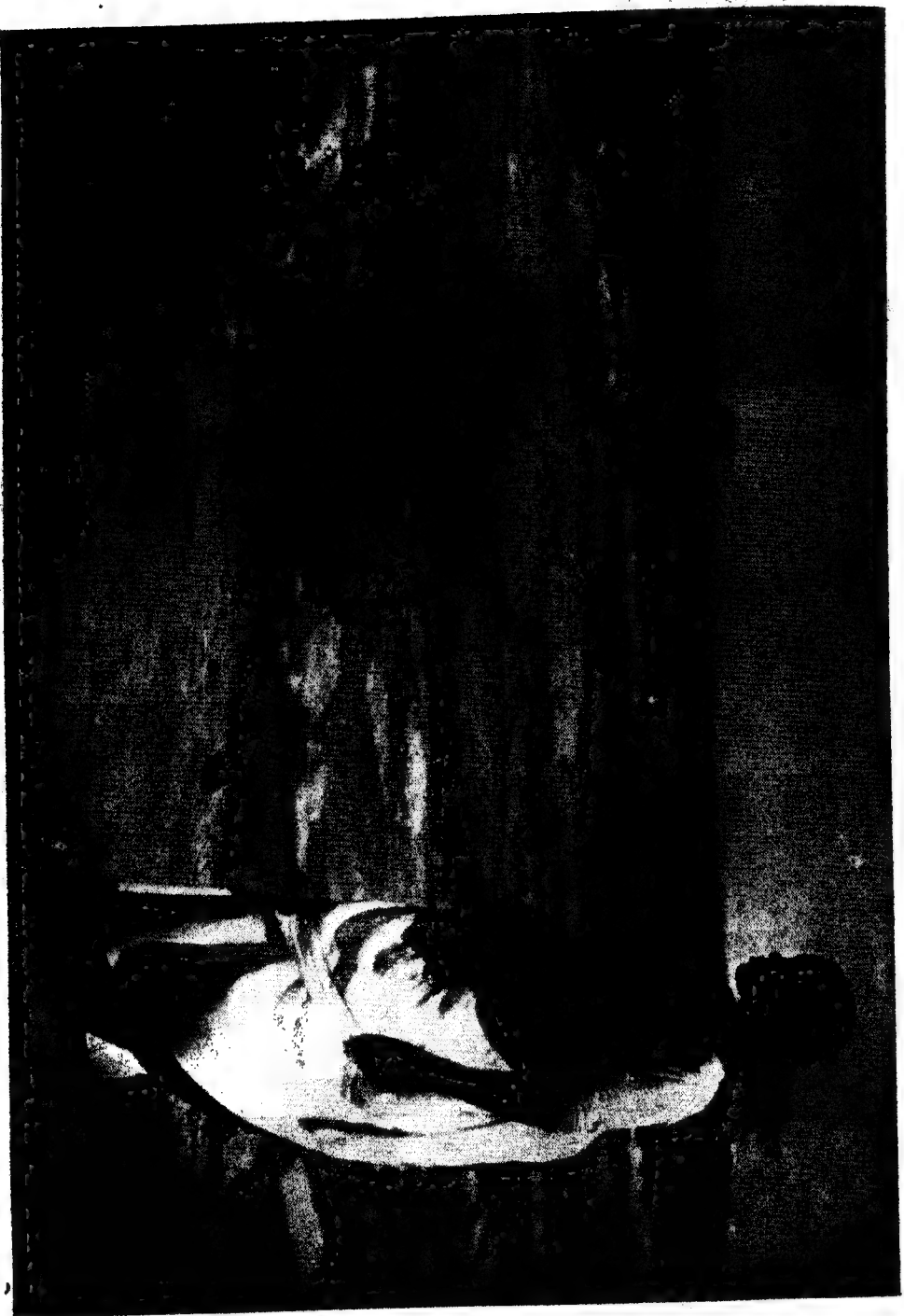
ভক্তরাঙ্গ (নেপাল)

—দিলীপ মুখোপাধ্যায়

—শ্রীগৌর (কুমিল্লাগর)



শি
উ
ম
হ
ল



ହରି ଘୋଷି

—ବିଷ୍ଣୁ ମହାପାତ୍ର



মুখশ্রী

—শ্রী, কে, হোম



ধাকে ছেলে, বি-এ পাশ করে চাকরীও করে বেটিয়াট ভাল। এই একই মাত্র ছেলে, বাপের কিছু সম্পত্তিও আছে, আর পাশের গাঁয়েই তাদের বাড়ী। খুব পছন্দ হল মাসীর এ সবক, মামাও আপত্তি করার কারণ খুঁজে পেলেন না কিছু। বাসায়ময় পাঠী লেখতে এলেন ছেলের বাবা ও মামা। কাকলিকে দেখা মাত্র এক-তর মিষ্ট কথা শুনে, তাঁরা পাকা কথা গিরে গেলেন তখনই। শুধু বললেন সামনে ছেলের জন্মমাস, সেই মাসে হবে না, তার পরের মাসে হবে।

খুশী হয়ে চলে গেলেন, ছেলের বাবা ও মামা। পরেশ বাবু খুশী হয়ে উঠলেন, শুধু মাসী, বাঁর খুশী হবার কথা সব থেকে বেশী, তিনি হয়ে গেলেন গম্ভীর। পরেশ বাবুর উচ্ছ্বাসিত কথার মধ্যে থেকে উঠে গেলেন তিনি। এ সবক তার পছন্দ হয়েছিল খুবই। তার ওপর পাত্রশঙ্কর স্বন্দর ব্যবহারে, তার মনে আর একটা ইচ্ছা বার বার উঁকি দিয়েছিল। মামা তো কাকলিরই বয়সী, লেখাপড়া সেও শিখেছে, কাজে কর্মে কিছুতেই সে কম বার না, তবে কেন এখানে তার বিয়ে হতে পারে না? মনে মনে ভাবতে থাকেন তিনি।

এই সময় পলাশপুরে এলো প্রদোষ। সহর থেকে গ্রামে এসে সে মেতে উঠলো। পুহুবে মাছ মরা, পাড়ার ছেলেদের নিয়ে খিয়েটার করা, এই সব নিয়ে সময় তার পাখা মেলে উড়ে বাচ্ছিল আর তার সব থেকে বড় আকর্ষণ ছিল কাকলি। পরেশ বাবুর বাড়ীতে বসিন সে প্রথম দেখা করতে যায়। ঘরের দরজার আগে দেখা হয়েছিল কাকলি আর মামার সঙ্গে, সজ্জাবেলার পাখা ঘরের কাজ সেয়ে পরেশ বাবুর ঘরে ঢুকলে মিলে লঠনের মুহু আসলো কি বেন সেলাই করছিল আর গল্প করছিল। সেই আগে আলো, আগে ছায়ার কাকলিকে অপূর্ণ স্বন্দর লাগলো প্রদোষের। থমকে পাঁড়ালো প্রদোষ। দরজার দিকে মুখ করে, মাথা নিচু করে সেলাই করছে কাকলি। আর তার উন্টো দিকে, প্রদোষের দিকে পিছন করে বসে আছে মামা। লঠনের মুহু আসলো মুখে পড়েছে কাকলির। কপালের ওপর ছোট কুমকুমের টিপ আর এক গোছা অব্যাহা চুল এসে পড়েছে, মুহু হাসি তখনও লেগে রয়েছে তার মুখে। অপূর্ণ! মনে মনে বলে প্রদোষ, কাকলির এই সৌন্দর্য স্বাক্তী-নন্দনের মত জলতে থাকে প্রদোষের মনে। এ বেন সুগভীর নীলাকাশে একদার তারা জলজল করছে। কাকলিই প্রথম দেখতে পায় তাকে। মুখ তুলে তাকিয়ে দরজার সামনে অপরিচিত একজন যুবককে পাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে যায়, মামাও পেছন কিরে তাকায়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, কাকে চান?

কাকাবাবু মানে, পরেশ বাবু আছেন? তিনি আমাকে আসতে বলেছেন। মামা আর কাকলি উঠে পাঁড়ায়—মামা বলে বন্ধন, আমি বাধাকে খবর দিচ্ছি। সেলাইর সরঞ্জাম গুটিয়ে হুই বোন বাড়ীর ভেতর পা বাড়ায়। হাত-পা বুয়ে পরেশ বাবু জলযোগে বসেছিলেন, মামার কথা শুনে বললেন, ও লোব হয় প্রদোষ এসেছে। আমি আসতে বলেছিলাম। তোরা গিরে একটু গল্প কর, আমি এখনি আসছি। পরেশ বাবুর দ্বী বলে উঠলেন, থাক থাক, আর বার-বার সঙ্গে বসে মেয়েদের গল্প করতে পারাচ্ছে হবে না। জলের ট্রান্সিট মুখের কাছ থেকে নামিয়ে সেয়ে বলল পরেশ বাবু, বার-বার সঙ্গে কি? ও তো আমদের আভ্যন্তরীণ ছেলে প্রদোষ, কলকাতা থেকে এসেছে, কাকলি গীরে থাকক!

মাসীর মুখ প্রসন্ন হল। মামা প্রদোষ, যা ওকে ছেলেদের নিয়ে আর, দেখি কত বড় হয়েছে। মামা গিরে ডেকে নিয়ে আসে প্রদোষকে। প্রথম করে পরেশ বাবুর দ্বীকে, বলে কেমন আছেন কাকীমা। চাকলালা হাসিমুখে বলেন, ওমা কত বড় হয়ে গেছে আমদের প্রদোষ। এর আগে বন্ধন এসেছিল, তখন তো বার-বার বছরের ছেলে।

পরেশ বাবু বলেন, হ্যাঁ, এখন কিছু প্রদোষ বি-এ পাশ করে গেছে, সে ছোটটি আর নেই। প্রদোষ হাসিমুখে বলে, হ্যাঁ সে তো আজ নয়-নয় বছরের কথা, তারপর মামা-কাকলির দিকে তাকিয়ে বলে, আর এরা নিশ্চয়ই বোনেরা, এরাও তখন কতটুকু ছিল, এখন কত বড় হয়েছে।

পরেশ বাবু বলেন—হ্যাঁ, এই আমার বড় মেয়ে মামা আর এ আমার তারী কাকলি, এরা দু'জনেই এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। কই, আর সব কোথায় গেলি, বলে ডাক বেন-তিনি। আরও ছুটি মেয়ে আর একটি ছেলে ছুটে বেরিয়ে আসে, এই আমার মেজ মেয়ে মামা এই ছোট সুপ্রিয়া আর ছেলে কল্লল। পরিচয় বেন পরেশ বাবু।

বাঃ, বেশ নামগুলি তো সবার, বলে প্রদোষ। হ্যাঁ জোয়ার কাকাবাবুর নামের বাহার খুব আছে—বলেন চাকলালা, তাঁর মুখ আবার অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছু একটার নি যে, প্রদোষের মুখ চাহনি বার বার ঘুরে ফিরে কাকলিকে দেখছে।



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
'শঙ্খা ও গদ্য'

মার্কী গেম্মী
ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—রিটেন ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৫ ২০৯৫

জিভি বকে ওঠেন—হারা কাকলি, বাও না প্রদোষের জন্য একটু
হা জলখাবার নিয়ে এসো, সেই কখন এসেছে। হারাখরে ছোট বার
হুঁদান। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে চায়ের জল বসাতে বসাতে বলে
কাকলি, বেশ লোক, না রে, কলকাতায় থাকে, অত বড় লোকের
হেসে, কোন অহঙ্কার নেই। চায়ের কাপ-ডিস্ নামিয়ে রেখে যায়।
বলে—হ্যাঁ, আর দেখতেও ভাল। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য
করেছিল কি? বলে কাকলি। একটু অসভ্য আর আদেখলা
আছে।

—কেন?

—বা রে, তোকে কি রকম দেখছিল, যেন গিলে খাবে। লক্ষ্য
পেরে কাকলি বলে বাঃ কি যে গিলে। সত্যি কথা। কিন্তু তোর
ব্যাপারও বিশেষ ভাল নয়, তুই বা ওরকম করে ওকে দেখছিলি কেন,
দেখিস সাবধান, অজ্ঞ জায়গার আর একজন কিন্তু হাঁ করে বসে
আছে তোর অপেক্ষায়।

হয়েছে, হয়েছে, তোকে আর বেশী সাবধান করে দিতে
হবে না। তাড়াতাড়ি ডিসে খাবার সাজিয়ে নে, নইলে মামীমা
এখনি বকবেন। চায়ের কাপ আর খাবার নিয়ে হুই বোনে
আবার বেরিয়ে আসে।

সেদিনের সেই দেখা যে পরে ঘনিষ্ঠতার পরিণত হবে, তা কে
জানতো! সেই প্রথম দিনেই তো, চাকরবাল্য বলে দিয়েছিলেন যে
কাকলির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এ তো তাকে সাবধান করে দেবার
জন্মই। কিন্তু তাও তো সে কাকলিকে ভুলতে পারলো না।
হুঁদাসের জায়গার সে চার মাস থেকে এলো সে কিসের জন্য?
কাকলিও তো তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল, তাকে দূরে ঠেলে দেয়নি।
প্রদোষ পথে, কত সময় তার কাকলির সঙ্গে দেখা হয়েছে, মিষ্টি
হেসেছে সে, আর প্রদোষের মনে দোলা দিয়ে বেত বায় বায়।
ভারপর সেই কুল গাছের নিচে, চুপ করে বসেছিল কাকলি, হঠাৎ
তাকে চমকে দিয়েছিল প্রদোষ পেছন থেকে গিয়ে। সেদিনের কথা
আজও মনে আছে তার, ভিত্তে গলায় বসেছিল কাকলি, হ্যাঁ
তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করবো। আরও বলেছিল, যেখানে
তার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে সে বিয়ে সে করবে না। কিন্তু এখানেই
তো সে ঘনিষ্ঠতার শেষ হয়নি! সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে নিজেকে
কাকলি সমর্পণ করেছিল তার কাছে, ক্ষণিকের দুর্বলতার যে পরিণতি
হয়েছিল তার অন্ধকার পরে সজ্জিত হয়েছিল প্রদোষ। নিজেকে
বিক্রার দিয়েছিল, কিন্তু সন্তুষ্ট হয়নি কাকলি। পরম বিশ্বাসে
প্রদোষের কাছে নিজেকে ধরা দিতে পেরেছে বলে ধরা গলায় স্পষ্ট
বলেছিল, এ তো তোমার আমার ভালবাসার স্বাক্ষর। এতে নিজেকে
দোষী মনে করায় তো কিছু নেই, আর এইখানেই তো এর শেষ
নয়? তুমি তো বিয়ে করে নিয়ে বাবে আমাকে তোমার পাশে।
স্বীকার করেছিল প্রদোষ। হুঁহুস্তে সব দিককে সারিয়ে দিয়ে কাছে
ঠেনে নিয়েছিল কাকলিকে, বলেছিল—সে দিন তো আর বেশী দূরে
নেই, কলকাতা গিয়েই বাবা মাকে বলে সব ব্যস্থা করবো আমি।

চলে এসেছিল প্রদোষ কলকাতাতে কিন্তু রাবী হননি প্রদোষের
বাবা-মা, ভ্রাক্ষণের হেলের সঙ্গে কাছের মেয়ের বিয়ে, এ তাঁরা স্বপ্নেও
ভাবেন নি, তার ওপর প্রদোষ একমাত্র ছেলে। বাবার সঙ্গে অনেক
কথাই তার হয়েছিল, অনেক দুঃখকষ্ট হয়েছিল, কিন্তু মায়ের প্রাণের

জলের কাছে, কোন কিছুই টিকলো না। রাগ করে প্রদোষ চলে
গেল বোম্বাইতে চাকরী নিয়ে। হুঁবছর পরে বিয়ে এসেছিল মায়ের
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা শেষে। কিন্তু পৌছবার পূর্বেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ
করেছিলেন তিনি।

প্রাচ-শান্তি চুকে বারার পর প্রদোষ গিয়েছিল পাশাপাশি
তোমার খোঁজ পায়নি কাকলির। মায়ের মশাইর কাছেই সব শুনেছিল
সে। বিয়ের রাতে হঠাৎ কাকলিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, সবাই অলক্ষ্যে
কোন সময় বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ী থেকে। এমিকে বর এসে গেছে কিন্তু
কানের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। চোখে জাঁপার দেখে বসে পড়লেন
পারেশ বাবু, ঘরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়লেন। একটু পরে মায়ী
এসে একটুকরো কাপড় দিয়ে পেল, বললো তার বাগিশের তলায় ছিল,
কাকলির চিঠি। হুঁ লাইন মাত্র লেখা, 'এ বিয়ে আমি করতে পারবো
না, তাই চলে যাচ্ছি। প্রণাম।' বীর্ণনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুতেন
পারেশ বাবু!

পারেশ বাবু ভেঙে পড়লেনও, চাকরবাল্য কোমর বেঁধে লেগে পড়লেন।
মারাকে নিয়ে বান ঘরের ভেতর, তারপর দরজা বন্ধ করে নিজেই
সাজাতে বসলেন ক'নে। শেষ রাতের লগ্নে, যখন গ্রামেব লোকেরা সকলে
প্রায় চলে গেছে, আঁকু ঘোমটা টেনে মারাকে লান করলেন। সকলকে
বললেন, মেয়ে হঠাৎ অন্তস্থ হয়ে পড়েছিল, তাই প্রথম লগ্নে বিয়ে মিতে
পারলুম না। মারাকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে গিয়ে দরজা আগলে
বসে ছিলেন, বললেন শুনে রয়েছে ক'নে থাক, শেষ লগ্নে বিয়ে হবে।
শেষ রাতে ক'নেকে যখন নিয়ে আসা হল বিয়ের আসরে, অদ্ভুত
বরযাত্রী ঘুরিয়ে পড়েছে ক্রান্তিতে, হুমচোখে বরের বাবা উঠে এলেন,
মাথা নীচু করে এসে বসলেন পারেশ বাবু, বিয়ে হয়ে গেল। বাসদখরে
বর-কনে এলো বসতে। নিজে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন
চাকরবাল্য।

পাশ ফিরে কার্ঠের মতন শুয়ে পড়েছিল মায়ী, কিছুক্ষণ পরে
নতুন বর অজয় জিজ্ঞাসা করেছিল মায়ীকে, যে সুলক্ষী মেয়েটির
সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল, তার কি হল? চমকে উঠেছিল
মায়ী, চকিতে উঠে বসেছিল, বলেছিল, কোন সুলক্ষী নয়, আমার সঙ্গেই
বিয়ের কথা ছিল, হয়েছেও।

সঙ্গে সঙ্গে হেসে অজয় বলেছিল, তাহলে আমার বাবাকে
অজ্ঞ মেয়ে দেখিয়েছিলে বল? চুপ করে গিয়েছিল মায়ী,
তারপর মুহূর্তে ঘরে সবই স্বীকার করেছিল তাদের এই হলনার কথা।
কিছু বলেনি অজয়, শুধু মায়ীকে কীভাবে দেখে কাছে টেনে নিয়েছিল,
বলেছিল, তোমার তো কোন দোষ নেই, কিছু ভয় নেই তোমার।
আমার বাবা-মার ভাব আমি নিলাম, তুমি ভেঁদ না।

সকাল হতেই চাকরবাল্য বলেছিলেন মেরেকে, কি বললো জামাই,
সবই খুলে বলেছিল মায়ী। গোপন করেনি কিছুই। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন
চাকরবাল্য, কিন্তু একটা ঘটনা ছিল মনে, কি বলবে খণ্ডবাকীতে
মেরেকে। বর-কনে চলে গেলে পর, পারেশ বাবু শয্যা নিলেন, কিন্তু
কোন দুঃসংবাদ এলো না বরের বাড়ী থেকে। কিছু দিন পরে প্রায়
হেঁকে চলে যায় চাকরবাল্য স্বামী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিজের বাপের
বাড়ী। সেখানেই পারেশ বাবু মায়ী-বান। মারাকেও তার খবরবাড়ী
থেকে আসতে দেখানি বিয়ের পর, শুধু এসেছিল তার বাবার কৃত্য
সংবাদ। এত সব ব্যবস্থা করেছিলেন মায়ী, মশাই, ওই দ্বীপে কই



খুশীর মেলা...

ঘরে ঘরে খুশীর মেলা। নতুন ধানে ভরবে গোলা,
নতুন কসল আসছে ঘরে;
ধূর তাই নেই অবসর, সাজায় ধূ বরণ ডালা,
আলপনা দেয় উঠান-দোরে।...
সোনার রশ্মি স্বপ্নে মেতে, সোণার বরণ-ধানের ক্ষেতে
শক্ত হাতে কাতে চালার চাষি।...

ফুরিয়ে জলো কাজ, সাক্ষ হলো আজ
এ বছরের মতো, কসল কাটা যতো।
এরই ঘরে কষ্ট ভরে চোঁটা শত শত !
চোঁটা হতেই উঠবে গড়ে,
হুঃ অনেক লাঘব করে, হুঃের সংসার কত...

আজকে শুধু নতুন ময়, অতীত দিনও সাক্ষ দেয়,
সমৃদ্ধির সৌরভে আর সাক্ষ্যেরই গৌরবে,
হিন্দু লিভারের পণ্য ভরে, ভারত মাতার ঘরে ঘরে
জাগিয়েছিল নতুন করে, নতুন পরিবেশ—পরিচ্ছন্ন, উজ্জলতা!
অনেক কথা; তবু এবার
আগামীতে চোঁটা হবে আরও নতুন পণ্য গড়ে
নতুন দিনের চাহিদাটারে, মিটিয়ে দিতে নতুন করে।

থেকে। দাঁষ্টিকে ক'নের শিঙিতে বসিয়ে বিপদের হাত থেকে তখনকার নতুন বেহাই পাবার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন চাকরবালাকে।

কিন্তু এসে প্রদোষ কলকাতাতে বিবেক করেছিল শ্রিতাকে। তারি ভাল মেয়ে শ্রিতা, সব দিক দিয়ে তাকে স্ত্রী করে রেখেছে, পরিপূর্ণ করে রেখেছে তার জীবন। তবু কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে, শ্রিতার কাছে থেকে দূরে রয়েছে সে। পাশ দিয়ে গুলো প্রদোষ, দেখলো শ্রিতা ঘুমিয়ে রয়েছে। জানলা দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। তাকিয়ে থাকে প্রদোষ, সে কি শ্রিতাকেও ঠিকিয়েছে—অসুখী করেছে তাকে? অস্থির হয়ে উঠে পড়ে সে নিশ্চয়ই জামাকাপড় বদলে বেরিয়ে পড়ে। এসে পঁড়ার কালো ছোট গেটের কাছে, ছোট লাল বাড়ীটার সামনে। দেখে বারান্দার পঁড়িয়ে আছে কাকলি—ঠিক তেমনি স্তম্ভর আছে সে, চোখের ভাবার সে আনন্দোজ্জ্বল ছায়া হারিয়ে বিস্ময় এক ছাপ, আর ভোরের আলো সেই মুখকে আরও স্তম্ভর আরও কল্পন করে তুলেছে। গেট ধুলে পায় পায় এগিয়ে যায় প্রদোষ, ডাকে—কলি! চমকে ওঠে কাকলি। পায় পায় এগিয়ে যায় প্রদোষ। হাত বাড়িয়ে মাথটা জড়িয়ে ধরে কাকলি, বলে—কে? ঘুরে পঁড়ায় সে, আরও জোরে চেপে ধরে বল, কে, কি চান আপনি?

—আমার চিনতে পারছেন না কলি, আমি প্রদোষ।

না চিনি না আপনাকে, কি চান আপনি? ধরধর করে কাঁপে কাকলি।

—তোমার অনেক খোঁজ করেছি কলি, কিন্তু কেউ তোমার খবর বলতে পারলো না। কি অশান্তিতে বে বিনগুলো কাটিয়েছি—যদি আমি জানতাম বাবলুর কথা, তবে।

প্রায় চিংকার করে বলে ওঠে কাকলি—আপনার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না, আপনি বান। কেন আপনি আমার শান্তি নষ্ট করতে এসেছেন?

—আমি তোমার শান্তি নষ্ট করতে আসিনি কাকলি, তোমার শুধু দেখতে এসেছি, আর তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি, জানিনা তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে কিনা—ভাড়াপালার বলে প্রদোষ।

ঘরের দিকে বাবার জন্তু কিরে পঁড়ায় কাকলি, বলে—আমার প্রদোষের মৃত্যু হয়েছে, আর স্তম্ভর প্রতি কোন বিষয়ই আমার

নেই—তাকে আমি অনেক দিনই ক্ষমা করেছি। আপনি বান, আমার কাজ আছে। ঘরের দিকে পা বাড়ায় কাকলি।

ব্যাকুল হয়ে প্রদোষ বলে—বাবলুকে একটু দেখাবো না?

দুট গলার বলে কাকলি, তার বাবা মারা গেছে—জন্তু পায়ে ঘরে ঢুকে মরজা বন্ধ করে দেয় সে।

দাঁটা তিনেক পরে বাড়ী কিরে এসে প্রদোষ দেখে, সব গোছগোছ করছে শ্রিতা। অবাক হয়ে বলে, কি ব্যাপার, সব গোছগোছ বে? সুটকেলে কাপড় রেখে বলে শ্রিতা—আজই কলকাতা বাবো তাই, অনেক দিন তো হয়ে গেল।

কই কাল তো এ কথা বলনি? ভিজাসা করে প্রদোষ।

—বাঃ, আজই সকালে মনে হল। তারপর মুখ তুলে বলে, এখানে থাকলে তো তোমার রাতের পর রাত ঘুম হবে না, শরীর-মন দুই-ই ভেঙ্গে পড়বে, তার থেকে কলকাতাই ভাল।

চকিতে মুখ তুলে বলে প্রদোষ, রাগে আমি ঘুমাইনি তুমি জান? হ্যাঁ জানি বই কি, তোমার মনে যে অশান্তির ঝড় বইছে, তা কি আমি টের পাই নি? এখান থেকে তোমার সরিয়ে না নিলে, তুমি যে পাগল হয়ে যাবে; বলে শ্রিতা।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, কলকাতাই ভাল, তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, আর কোন ষিধা বা সংশয় আমার মনে নেই।

—হ্যাঁ, কাকলি তার বাবলুকে নিয়ে নতুন জীবন বেঁধেছে, সেখানে তোমার কোন অস্থির নেই, তার প্রদোষের মৃত্যু হয়েছে—বলে শ্রিতা।

হাত বাড়িয়ে শ্রিতাকে কাছে টেনে নেয় প্রদোষ—তুমি সব বুঝতে পেরেছ, সব জেনেছ, তবুও আমার ওপর রাগ নেই তোমার, নেই কোন ষিধা, কোন সংশয়?

মুখ হেসে বলে শ্রিতা পাগল, তোমার ওপর আমার কোন রাগ নেই। এই জেনে এখন আরও নিশ্চিন্ত হয়েছি যে, এবার থেকে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে পাবো, আগে যে দুর্বল ছিল তোমার মাঝে, সব ধূরে-বুছে গেছে, অনেক বৈধী কাছে পাবো তোমায়।

শ্রিতাকে বুকে চেপে ধরে বলে প্রদোষ—আজ আমি সত্যি শান্তি অনুভব করছি। তোমার ক্ষমা পেয়েছি, কাকলির ক্ষমা পেয়েছি, আমার আর কোন কিছুই চাই না। আমি আর কিছু চাই না।

আমাদের দ্বারে

বহুল বহু

জীবনের ভাড়া নিয়ে সে আসে,

সে আসে ভাস্কর্যের পরিহাসে।

জীবনের বহু দ্বারে টেনে নিয়ে চলে যায় হোটে দ্বারে,

হাত পেতে কেবলি সে কল্পনার দৃষ্টি মেলে ধরে।

ব্যস্ত এ বাতবে হার

ভারি পানে কেহ নাহি কিরে চার,

ব্যথার কান্ডর কেহ তার পাশে এসে

লয় না তো কাছে টেনে তারে ভালবেসে!

সে আসে বায়ে বায়ে

আমাদের দ্বারে।



বিশ্বের ক্রিকেট জগতের শ্রেষ্ঠ দল অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকডোনাল্ড

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৩৪ রান করে জেহু প্যাটেলের বলে উইকেটের দিকে তামানে কর্তৃক ঠান্ডা আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে রচিত হ'ল এক নতুন অধ্যায়। কানপুরের গ্রীন পার্কের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হ'ল। এখানেই ভারত চূড়ব্ব অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলকে ১১১ রানে পরাজিত করে। সারা ভারতে আনন্দের বজা বধে গেল। প্রতিটি লোক এই সুবাদে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। বিশ্বের আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো ভারতের বিজয়বার্তা। ভারতীয় দলের অধিনায়ক জি. এস. রামচাঁদের কাছে পৌঁছাল শত শত অভিনন্দন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসগুলিতে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ছুটির আদেশ হ'ল। সকলেই বিজয় উৎসবে মেতে উঠলেন। সত্যি সত্যিই দিন ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫১। সাবাস, ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা! তোমাদের সাক্ষ্যে ভারতবাণী গর্ব অনুভব করছে। তোমরা সকলের অভিনন্দন গ্রহণ কর।

২৪শে ডিসেম্বর সবচেয়ে বেশী আনন্দ অনুভব করেছিলেন অধিনায়ক জি. এস. রামচাঁদ। তিনি বলেছেন যে, এই দিন তাঁর জীবনের স্মরণীয় দিন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, গত ইংলও সফরে রামচাঁদ নির্বাচিত হননি। এ সফরে নির্বাচন কমিটিই বলতে পারেন। তবে এখানকার খেলাধুলা জগতের কর্তৃকর্তাদের এই বিষয়ে বেশ কিছুটা কৃত্রিম আছে। তাঁরা কাকে কখন সামনে নিয়ে আসবেন, তা বলা কঠিন। গত বছর তাঁরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছুটা রসিকতা করেছেন। ইংলও সফরে হঠাৎ দেখা গেল, ডি. কে. গাইকোয়াড়কে অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়েছে। বাই হোক, বর্তমান নির্বাচন কমিটি এবারে নাকি তরুণ খেলোয়াড় নির্বাচন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন। উদ্বেগ মুক্ত। সত্যিই তরুণ খেলোয়াড়রা সুযোগ না পেলে কখনই খেলাধুলার উৎকর্ষতা বাড়তে পারে না। তবে দেখা বাক, দলীয় স্বার্থের খাতিরে খেলোয়াড় নির্বাচনী কমিটির উদ্বেগ কতখানি কার্যকরী হয়।

একমাত্র ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যতীত ভারত পৃথিবীর সমস্ত প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট দলকেই পরাজিত করেছে। ভারত এর পূর্বে ইংলওকে একবার পাকিস্তানকে দু'বার ও নিউজিল্যান্ডকে দু'বার পরাজিত করার ঘোষণা লাভ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে এখনও কোন খেলা হয়নি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল—অস্ট্রেলিয়া সাম্প্রতিক ইংলও ও পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট খেলার ঘোষণা করে কোন খেলার পন্থার বরণ করেনি। ভারতের কাছে অস্ট্রেলিয়াকে এই প্রথম পরাজিত হতে হল। ভারতের এই সাক্ষ্য সর্বোৎকর্ষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 'লেগে পোয়ে' হয়ে গত ইংলও সফর

ভারতকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার ইংলওর সুবাদশ্রুতি ভারতের বিরুদ্ধে যেন জেহাফ ঘোষণা করেছিলো। দিনের পর দিন তাঁরা প্রচার চালান যে ক্রিকেটে ভারত এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। ভারতের পাঁচ দিন টেস্ট খেলার ঘোষণা নেই। ভারতের সঙ্গে পাঁচ দিন খেলার ব্যবস্থা করা সময়ের অপব্যবহার। তবে আজ ভারত সম্বন্ধিত প্রস্তাব দিয়েছে ইংলওকে নাজেহালকারী অস্ট্রেলিয়া দলকে পরাজিত করে।

ভারতীয় দলের এবারকার সাক্ষ্য দলগত চেষ্টার নিম্নরূপ বলা যেতে পারে। তবুও বেগু প্যাটেল, উদ্রাগড় ও নরি কনুটস্ট্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তার সঙ্গে বলতে হবে রামচাঁদের দৃঢ় মনোবল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। বেগু প্যাটেল এই টেস্টে ১২৪ রানে ১৪টি উইকেট পেয়েছেন। তার মধ্যে সর্বোৎকর্ষ উল্লেখযোগ্য বিষয় যে প্রথম ইনিংসে ৬১ রানে ১টি উইকেট লাভ। উদ্রাগড় ২৭ রানে ৪টি উইকেট পেয়ে প্রমাণ করেছেন যেন তিনিও একজন উচ্চরের বোলার। নীল হার্ভে ও নরমান নীলের মতন খেলোয়াড়কে আউট করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। নরি কনুটস্ট্রের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৪ রান করে সত্যিই ভারতের জয়লাভের পথ সুগম করে দেন।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার প্রথম প্রয়োজন হয় কিংজি-এর দক্ষতা। এ বিষয়ে ভারতের ক্রীড়া খাতলেও এবারকার খেলার কিছুটা উন্নতি দেখা গেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ১৫২ রান ও ২১১ রানে সকলে আউট হয়ে গেলেও সুনিপুণ বোলিং ও দৃঢ়তাপূর্ণ কিংজি চূড়ব্ব অস্ট্রেলিয়া দলকে ২১১ রানে ও ১০৫ রানে আউট করে নিজদের জয়পতাকা তুলে ধরেন বিশ্বের ক্রিকেট জগতে।

ফুটবল—

ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবলের নাম শুনেই ভারতের ক্রীড়ামোদীর মনে এক উদ্দামতা জন্মে দেয়। প্রায় সারা বছরই ভারতে ফুটবলের আসর জমতি বেঁধে থাকে। কলকাতার হাট থেকে বিদ্যার নিয়ে বোভার্স' কাপের জন্ম বোঝাইয়ে আসর জমে উঠে। এখন ঢুবাণ্ড কাপের জন্ম দিল্লীর আসর বেশ গরম হয়ে উঠেছে। এবারে কিন্তু দক্ষিণ ভারতের এর্নিকুলামের মতন একটি ছোট জায়গা বেশ জমে উঠেছিল। এখানে এশীয় কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পশ্চিমাকল দীপের খেলার ব্যবস্থা হয়। ভারত আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার অস্থায়ী এই প্রথম। ভারত পাকিস্তান, ইসরাইল ও ইরান এই প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ করে। লীগ প্রথার উত্তর দলের সঙ্গে দু'বার করে খেলার ব্যবস্থা হয়। ইসরাইল "চ্যাম্পিয়ন শিপ" লাভ করে। ইরান "বানাস" জাগ" হয়। পাকিস্তান তৃতীয় স্থান পায়। ভারত সর্বনিম্ন

হানি লাভ করে। বিশেষ দরবারে ভারতের হানি খুব উঁচু না হ'লেও ভারত বিগত অলিম্পিকে ফুটবলে বেশ কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বী লাভ করেছিলো। ভারতে ফুটবল খেলার উৎসাহ ও উদ্দীপনা কোনটারই অভাব নেই। ফুটবলের জন্ত ক্রীড়াযোগ্যরা যে কোন দর্শন ব্যয় করতেও কাঁপুণী করেন না। কিন্তু দিন দিন ভারতে ফুটবলের হানি এতই নিম্নস্তরে এসে পৌঁছাচ্ছে তাতে সকলেই এই বিষয়ে আশঙ্কা বোধ করছেন। ফুটবলের উন্নতির জন্ত এখানকার কর্তৃকর্তাদের না আছে কোন সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা বা উদার মনোভাব। তাঁরা নিজস্বের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত ব্যস্ত। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের জন্ত ভারতের ফুটবলের হানি কোথায় এসে পৌঁছিয়েছে—সেই দিকে তাঁদের মোটেই দৃষ্টি নেই। ঠাা, কয়েক দিন আগে নিখিল ভারত ফুটবল কংগ্রেসনের সভাপতি শ্রীশঙ্কর গুপ্ত বলেছেন—ফুটবলের জন্ত একটা কিছু করা দরকার। তিনি রাজ্য এসোসিয়েশনগুলিকে উপদেশ দিয়েছেন যেন তাঁরা দলীয় স্বার্থের দিকে নজর দিয়ে ফুটবলে উন্নতির জন্ত কাজ করেন। সাধু শ্রীগুপ্ত। তাহলে বোধ হয় তাঁর ঘুম এতদিনে ভেঙেছে। কিন্তু যে সকল উপদেশ দিয়েছেন—তিনিই তো ভারি নাটক গুপ্ত। ক্রীড়া জগতের রাজনীতি কেন্দ্রে তিনি তো একজন হানামণ্ডল ব্যক্তি। তার উপর জুটছেন ক্রীড়া জগতের ফুটবলবিদগণ। গুরুশিষ্য মিলে ফুটবলকে এদের পথীয়ে নিয়ে এসেছেন—যাতে করে ভারতের প্রতিটি ক্রীড়াযোগ্যই চাইছেন—তাঁরা মানে মানে সরে পড়ুন। এই দু'জনকে না সন্মতে পারলে ভারতে ফুটবলের অবস্থা অন্ধকার—এই বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ব্যায়াম শিক্ষাশিবির

রবীন্দ্র-সদাশর (লোক ময়দান) বেখানে হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংলার ত্রয়োদশ বার্ষিক রাজ্য ব্যায়াম শিক্ষাশিবির। স্বয়ংসম্পূর্ণ এক তাঁরনগরী। নার "ব্যায়ামনগর।" সত্যিই

নগরই বটে। এখানে কোন কিছুই অভাব নেই। রক্তনশালা, ভোজনাগার, স্নানাগার, সভাগৃহ, পাঠাগার, অভিজ্ঞপ্রদর্শনী ও খেলাধুলা প্রদর্শনীর জন্ত ঠেড়িয়ার চিত্ত বিনোদনের ভক্ত সুসজ্জিত মঞ্চ, আর ভল্লিউ এ. সি. পরিচালিত লোক হাসপাতাল, শ্রীমদবিন্দু এ্যামুলেল ডি'ভিসন পরিচালিত প্রতিবিধান কেন্দ্র, ডাক ও তার বিভাগ পরিচালিত "ডাকঘর"। টেলিকোনেরও ব্যবস্থা আছে। এছাড়া সজ্জের মহিলা বিভাগের শিল্পসম্ভারে পূর্ণ বিপণি, সম্ম পণিচালিত ক্যাটিন ও তৎসংলগ্ন স্থলক পুষ্পশোভিত ও আলোকমালায় সজ্জিত অঙ্গন। খেলাধুলা, স্বাস্থ্য, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সামাজিক শিক্ষার প্রাচীর পত্রিকার প্রদর্শনী। এত গেল পারিপার্শ্বিক বর্ণনা। এই "ব্যায়ামনগরে" হাজির হয়েছেন পশ্চিম বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলা থেকে এক হাজার ছেলেমেয়ে। এখানে নয় দিন ধরে তাঁদের নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল, কুচকাওয়াজ, সমষ্টি ব্যায়াম, ব্রতচারী, প্রাথমিক প্রতিবিধান, কুটারশিল্প, সমবেত সঙ্গীত ও অজ্ঞাত জনকল্যাণ-মূলক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। এই "ব্যায়ামনগর" শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েকজন শিক্ষক ও দার্জিলিং থেকে কয়েকজন ছাত্রকেও হাজির হতে দেখা গেছে। শিবিরের কাজ আরম্ভ হয় সকাল পাঁচটায় আর সাতটা সাড়ে দশটায় তার পরিসমাপ্তি। সামরিক ও বেসামরিক ও সজ্জব শিক্ষকরা শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। অঙ্গনময়ের মধ্যে এতগুলি ছেলেমেয়েকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে দেখে সব সময়েই মনে জেগেছে, কে বলে বাঙ্গালীর মধ্যে বৃদ্ধলার অভাব রয়েছে? জাতীয় চরিত্রের অবনতির জন্ত তত্ত্বণ ও তত্ত্বাবধায় মধ্যে এনে দেয় উজ্জ্বলতা। নৈতিক অবনতি ঘটায় আর কল্যাণের দেশের আবহাওয়াকে বিবাক্ত করে তোলে। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি-সজ্জের কয়েকজন আদর্শবালী, প্রস্তুতিশীল দুঃসাহসী যুবক জাতিগঠনে বাঙ্গালীর তত্ত্বণ সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করার যে প্রচেষ্টা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসা পাবার যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ শ্রীমদ্বনাথ মল্লিকের কর্তৃত্বশলতার তারিক করতে হয়। একগুণ সুযোগ্য কর্মীর নেতৃত্বে জাতির তত্ত্বণ সমাজ এগিয়ে যাক, এটাই সকলে আশা করে।

মাসিক বঙ্গমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)	
বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ২৪
বার্ষিক " "	— ১২
প্রতি সংখ্যা " "	— ২
ভারতবর্ষে	
(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সতাক	— ১৫
" বার্ষিক সতাক	— ৭.৫০

ভারতবর্ষে	
প্রতি সংখ্যা ১.২৫	
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ১.৭৫
পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)	
বার্ষিক সতাক রেজিষ্ট্রী ধরত সহ	— ২১
বার্ষিক " " "	— ১০.৫০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	— ১.৭৫

● মাসিক বঙ্গমতী কিছুন ● মাসিক বঙ্গমতী পত্রন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বঙ্গন ●

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় **লাইফবুয়** সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে মেরেদুতো নবাব সবসময় হাসিখুসী সে পরিবার
জিভাই হুই। কিন্তু বাস্তব জীবন যা থাকলে লোক হাসিখুসী
থাকেন কেন? যখন যখন বাসি স্বাস্থ্যের পরম পক্ষ।
আপনি যতই মনোযোগী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই
এড়াতে পারবেন না। এই ময়লার ঝাঁকে রোগের বীজাণু।
লাইফবুয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধ্বংস করে দেয়
এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রতিদিন লাইফবুয় সাবান
দিয়ে স্নান করুন এবং
ময়লাজনিত বীজাণুর হাত
থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুর-
ক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে
ভাজা করবারে করে তোলে।





কমলেশ

কমলেশ এসে বাঁড়াল বুড়ার ঘরের সামনে, কিন্তু ভেতরে ঢোকবার তার সাহস ছোঁল না। চার দিক নিস্তব্ধ, দরজার কাঁক দিয়ে লাম্বাট আলো এসে পড়েছে বাঁড়ালার ওপরে। কমলেশ কান খাড়া করে থাকে, শুনতে পায় দূর থেকে পারের শব্দ এগিয়ে আসছে, কাছে কাছে, আরো কাছে।

অন্ধ দরজা দিয়ে বুড়ো এসে চুকল তার ঘরে, দেবাজের সঙ্গে করেটা কাগজ চাবী বন্ধ করে রেখে মুহু পায়ে বেরিয়ে আসে। দরজার কাছে কমলেশকে ঠাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুড়ো চমকে ওঠে, তুহি! এ বাড়ীর মধ্যে চুকলে কি করে?

কমলেশ ভরে ভরে উত্তর দেয়, ঐ খিড়কীর দরজা দিয়ে।

—তুমি তো আছা ছেলে! তোমাকে কত বার বারণ করেছি না, এ বাড়ীতে চুকবে না, তবু কেন আস?

—আমি একটা কথা বলতে চাই।

বুড়ো বিক্ষুব্ধ হয়ে হাসে, আমার সঙ্গে এমন কি কথা যে এত দাঁড়ে এসে বলতে হবে?

কমলেশ একটু খামে, জেবে নিয়ে সব কথা একসঙ্গে শুদ্ধিয়ে বলার চেষ্টা করে, আমাদের স্থলের পালে, জমি শুনলাম আপনি

কোন চিনির কলের মালিককে বিক্রী করে দিচ্ছেন? তারা ওখানে কারখানা বসাবে, আমি বলতে এসেছি জমি ওদের বিক্রী করবেন না। বুড়ো তাঁক দৃষ্টিতে তাকায়, কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে? সেই সলাশব্দ?

—না, আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি। আমি জানি, আমার কথা আপনি রাখবেন।

বুড়ো হাসে, সে বড় অতুত হাসি, এ বিশ্বাস তোমার হ'ল কি করে যে আমি তোমার কথা শুনব?

—সবাই আপনাকে ভয় করে, বলে আপনি নাকি কালুর কথা শোনেন না। আপনি খামখেয়ালী। আপনি স্বার্থপর। কিন্তু আমার তা মনে হয় না।

—কেন মনে হয় না? বুড়োর কণ্ঠস্বর দূর থেকে ভেসে আসে। অস্ত্রমস্ত্র ভাবে কি যেন সে ভাবছিল।

যে ক'দিন আপনাকে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে ইচ্ছে করে আপনি বাইরেটা শব্দ করে রাখেন, সহজে কালুর কাছে ধরা দিতে চান না।

বুড়ো এবার হো-হো করে হাসে, তুমি দেখছি বড়োয় সত্য কথা বলছ, তবে যদি শুধু ঐ কথা বলতেই এসে থাক, তাহলে যেতে পার। আমার আর কিছু বলার নেই, জমি আমি বিক্রী করব বলে কথা দিয়ে দিয়েছি। তারা অনেক টাকা দেবে।

কমলেশ বাধা দিয়ে বলে, কথা তো আপনি এখনও দেন নি?

বুড়ো চমকে ওঠে, কি করে জানলে?

একটু আগে আপনি ঘরে বার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি বাইরে থেকে শুনেছি। সামনের শনিবার সে আবার আসবে, তার পর আপনি কথা দেবেন, তাই না?

—তুমি তো আছা ছেলে! এখানে সোয়েলশিপি করছ, কার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম বুঝতে পেরেছ?

কমলেশ দৃঢ় স্বরে বলে, না, তবে তার গলায় স্বরটা শুনে রেখেছি। আবার কোথাও সে কণ্ঠস্বর শুনলে আমি তাকে ঠিকই চিনতে পারব।

—যাও, আর ফাজলামী করতে হবে না, জমি আমি ওদের কাছেই বিক্রী করব, তারা অনেক টাকা দেবে বলেছে।

—আপনার তো অনেক টাকা, আর টাকা নিয়ে কি হবে?

বুড়ো আর সহ করতে পারে না, বন্ধ স্বরে বলে, তুমি বিদেয় হও দেখি।

—আপনি বুঝতে পারছেন না, আমাদের সকলের মন খারাপ, শহর থেকে পালিয়ে, শান্তির মধ্যে লেখাপড়া করায় ভাঙে এখানে

দিন প্রায়ত ঐ

বঙ্গের বৈরাগী

এসেছিলাম, পাশেই ঘুমি চিনির কল বসে, সব নষ্ট হয়ে যাবে, সশশঙ্করবার' আদর্শকে আমরা বাচিয়ে রাখতে পারব না।

—আদর্শ, আদর্শ, আদর্শ, আয়েয়গিরির বেন বিকোরণ হয়, বুড়ো চীৎকার করে ওঠে, জমি বিক্রী করার আমার খুব দরকার ছিল না, ইচ্ছে করে করেছি, বাস্তব তোমাদের ঐ আদর্শের বুলি বন্ধ করা যায়, সশশঙ্করের দলকে ভেঙ্গে চূষমার করা যায়। বস্তবার আমার সঙ্গে দেখা করেছে কি চ্যাটাই চ্যাটাই কথা, এবার দেখি কি করে ও ইচ্ছা চালায়।

কমলেশেরও রাগ হয়, বুড়োর বুদ্ধিহীন কথাবার্তাতে সে প্রতিবাদ না করে পারে না। শঃ.বা'কে আপনি চেনেন না, তাই যা-তা বলেছেন। বেশ ছাড়া সে কিছু বোঝে না। নিজের খাখের সিকে সে কিরেও তাকায় না। বেশ দেখব, আপনি কি করে জমি বিক্রী করেন। আমরা, ছাত্ররা এসে আপনাদের বাড়ী বেড়াও করব। প্রয়োজন হলে ভেঙ্গে চূষমার করে দেব।

—কি, তুমি আমার ভাব দেখাচ্ছ ?

বুড়ো ঘরের মধ্যে ঢুক গিয়ে একটা লোটার রড বার করে আসে। রাগে তার শরীর ধরধর করে কাঁপছে। আজ এই খানেকই তার জাতি কবর দেব। বলে বুড়ো রডটা দিয়ে কমলেশকে আঘাত করার চেষ্টা করে, কমলেশ তৈরী ছিল, সরে যায়। রডটা গিয়ে লাগে বারান্দার খামে। বুড়ো টাল সমাধিতে পড়ে না। ঘাসিত পড়ে যায়।

কমলেশ ভরে ভরে বুকে ঠাঁড়িয়েছিল। সন্তর্পণে কাছে এগিয়ে আসে। বুকেতে পারে বুড়ো অজ্ঞান হয়ে গেছে। একবার ভাবে সে পালিয়ে যাবে কি না, কে জানে বুড়ো হরত জ্ঞান কিরে এসে আবার গাণায়াগি করবে। কিন্তু পলকপলকই তার জন্মে আমার দয়তা হয়। কে বলতে পারবে এই নির্জন প্রাসাদ পুরীতে এ অবস্থার তাকে কেসে বেখে গেলে হরত কোনদিনই আর বুড়ো চোখ খুলবে না। খাখেরা বান। তেতর থেকে হঠাৎ বেন কথা বলে ওঠে, সে কো ভল, বুড়ো হয়ে গেলে আর কোন কামেলাই থাকবে না। চিনির কলও বসবে না। কমলেশ কিন্তু এই নির্ভর জিন্দা মনে স্থান লিল না। ঘরের মধ্যে থেকে জল এনে বুড়োর চোখে-মুখে ছিটের মিল, মাখার কাছে বলে বুড়োর তত্ববার ব্যস্ত হল।

অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞান কিরে এসে বুড়োর। অকুট ঘরে বলল, আমি—কি হয়েছে আমার, এখানে কেন ?

কমলেশ সহজ গলায় বলে, আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

বুড়োর এবার মনে পড়ে, আমি তোমার দ্বারতে গিয়েছিলাম, না ?

—হ্যাঁ। এই যে সেই লোটার রড, কমলেশ রডটা বুড়োর হাতের কাছে দেব।

বুড়ো একদুইট কমলেশের হৃদয়ের সিকে তাকিয়ে থেকে বলে, সত্যিই বুঝি তোমার প্রাণের ভয় নেই ? তোমাকে আমি দ্বারতে গিয়েছিলাম কেনেও তুমি এখানে ঠাঁড়িয়ে রয়েছ ?

কমলেশ হেসে বলে, বাট, আপনাকে দেখতো কে তাহলে ?

—আমি হ'লে কিন্তু শরুকে ছেড়ে বিতায় না। এই ডাঙা ঘেরেই তার ভললীলা লাল করতায়।

বুড়োর চুলের মধ্যে আঁকুল বোলাতে বোলাতে কমলেশ বলে, শঙ্করদা' আমাদের কি বলেন জানেন, মেয়ে কেনা খুব সোজা, বাচানোটাই শক্ত।

—আশ্চর্য কথা।

—মাত্রবটাই যে আশ্চর্য।

বুড়োর বুকের মধ্যে কষ্ট হয়, হাত দিয়ে বুকেটা চেষ্টা করে বলে, ওহু খেতে হবে। বড় ব্যথা।

কমলেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ওহু কোথায় ?

—পুলুং কাছে।

—কে পুলু ?

—আমার নাতি। ঐ ঘরে থাকে, চাবি—বুড়া কোমরে-বাঁধা চাবিটা দেখায়, সঙ্গে সঙ্গে আবার অজ্ঞান হয়ে নেতিয়ে পড়ে।

কমলেশ আর সময় নষ্ট না করে, বুড়োর কোমর থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে অন্তরমহলে ঢুক পড়ে। বিরাট হল-ঘর, বহু ঠাঁঙ হাওয়ার গা শিরশির করে ওঠে, দরজার জানলার নীল কাচ বলে বাইরে থেকে আলো ঢুকতে পারে না। কমলেশের মনে হল, সে বেন আরব্য উপত্যাসের কোন এক বাদশার প্রাসাদের মধ্যে ঢুক পড়েছে। মার্বেল পাথরের নক্সাকাটা মেঝে, লারা দেওয়ালে তেলের রঙের ছবি। চারদিকে লাল ভারী রথমলের পর্দা। ভিনখানা আলোর ঝড় বুলছে। টুকরো টুকরো কাচের মধ্যে দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে চারদিকে, কোথাও বা রামধনু রঙের আভা।

বাইরে থেকে ডাঙা পুরোনো বাড়ীর চেহারা দেখে কে বুঝবে, যে তার তেতরের ঘরগুলো এত সাজানো, এত চমৎকার। বেশ কিছুক্ষণের ভয়ে কমলেশ নির্ঝাঁক-বিস্ময়ে ঠাঁড়িয়ে থাকে। তার পর হঠাৎ বুড়োর কথা মনে হতেই টেচিয়ে ডাকে—পুলু, পুলু আছো ?

কোন উত্তর শোনা যায় না। শুধু তার ডাকের প্রতিধ্বনি কিরে আসে। কমলেশ আন্তে আন্তে এগিয়ে যায়, হল-ঘর পেরিয়েই গোল সিঁড়ি উঠে গেছে। লোতলার। তাই নিচে ঠাঁড়িয়ে আবার সে জোর দিয়ে ডাকে পুলু আছো পুলু ?

ওপর থেকে কৌশ সাড়া পাওয়া যায়, কে ডাকে ?

আমি—নাচ এস।

একটু পরে পুলু সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে, কমলেশকে দেখে তার বিষরের অবধি থাকে না, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভাল করে দেখে। জিজ্ঞাস করে, কে তুমি ?

—আমার নাম কমলেশ। এবারকার খুলে পড়ি।

—এ অন্তরমহলে ঢুকলে কি করে ?

তার বিষরের বহর দেখে কমলেশ বুকেতে পারে, বাইরের লোক এ অন্তরমহলে ঢুকতে পারে না।

—তোমার দায়ব বুকে ব্যথা করছে, আমি তাই খবর বিতে এসাম।

পুলু ব্যস্ত হয়ে পড়ে, দায় কোথায় ?

—ঐ যে সামনের বারান্দায়।

পুলু হুখ গুকিয়ে যায়, বলে, আমাদের জে বাইরে বাবার হকুম নেই, তুমি তাই কোন রকমে ঠকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এস।

কমলেশের মনে পড়ে যায়, বলে, উনি কি ওহু বুজছিলেন।

পুলু দেহাভ থেকে ওহু বার করে এনে কমলেশের হাতে দেয়,

মিনতিয়া! তবে বলে—তুমি কিন্তু বাইরে থেকে চলে বেও না, নিজস্ব ভেতরে এস।

—আসব।

কমলেশ বাইরে এসে বুড়াকে ওষুধ খাওয়ার, স্নানবোধ করলে তাকে ঘরে ঘরে অন্ধর মহলের ভেতরে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে অন্ধর মহলের অনেক অধিবাসী পুসুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ছেলে-মেয়ে অনেকেই, আশ্চর্য্য তাদের চেহারা! কমলেশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। রক্তহীন কাঁকাসে মুখ, মুখে কোন ভাষা নেই, এই পুরোন সে-কলে আঁহাওয়ার মধ্যে এদের বাঁপছাড়া মনে না হলেও বোঁরা বায় পাঁচটা হাতুড়ের মাঝখানে পড়লে এদের অজুত লাগবে।

বুড়াকে ওরা ধরাধরি করে শুটরে দিলে একটা খাটের ওপর, সকলে মিলে লেসে গেল তার সেবা করতে। শুধু পুসু এসে দাঁড়াল কমলেশের কাছে। বলে, তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে, কতদিন বাদে একজন বাইরের লোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। বোঁজ একবার করে তুমি এস ভাই, আমরা বলে বলে গল্প করব, কথা বলব।

—যদি আমাকে চুকতে না দেয়?

—একবার স্বপ্ন চুকতে পেরেছ, আর তোমার দাঁড় বারণ করবেন না। কিন্তু বাইরে কাকুর কাছে আমাদের কথা বোল না। শুনেতে পেলে উনি রেগে যাবেন।

—না বলব না।

—নিশ্চয় এসে। রবজার চাবীটা তুমি নিয়ে বাও, কমলেশ বেতে বেতে বলে। বেশ, কাল আমি আবার আসব পুসু। তোমার দাঁড়ও খবর নিয়ে বাব, তোমাদের সঙ্গেও বেশ আলাপ করা যাবে, আজ রাত হয়ে গেছে, বাড়া বাই।

কমলেশ হোটেলে কিং এসে দেখে, প্রাণান্ত তখনও ঘুমোয়নি, ওইই জন্মে অপেক্ষা করে আছে। কমলেশকে চুকতে দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, এত সেরী হল যে, কোথায় ছিলি?

—ওই বুড়ার বাড়ীতেই, সে অনেক কথা, পরে বলব। তার খবর কি বল। বুড়ার বাড়ী থেকে যে লোকটার পিছু নিয়েছিলি, পারলি বুঝতে সে কে?

—না। লোকটা এত ছোরে ছোরে হাঁটছিল, কিছুতেই তাকে ধরতে পারলাম না।

—কোন দিকে গেল?

—এল তো আমাদের এই কলোনীর দিকেই। কিন্তু কোথায় যে চুক গেল বুঝতে পারলাম না।

কমলেশ চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কতদূর পর্য্যন্ত তাকে দেখতে পেরেছিলি?

—কতদূর মনে হয়, মিহিরদা'র ডিসপেন্সারী পর্য্যন্ত তাকে দেখলাম, তারপর যে কোথায় মিলিয়ে গেল।

শুনেই কমলেশ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে।

—আবার কোথায় বাচ্চিসু?

—এখনি আসছি। বলেই কমলেশ দ্রুত বেরিয়ে যায়।

কোথাও না খেমে কমলেশ সোজা এক মিহির-এর ডিসপেন্সারীতে। মিহিরদা'র মেয়েই ছিল, জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার কমলেশ?

—খরীদটা ভাল লাগছে না মিহিরদা', একটা ওষুধ দিন।

—কি হয়েছে?

—গা-হাত-পায় বড় ব্যথা। বটীখানেক আগে একবার এসেছিলাম, আপনাকে শোলাম না। মিহিরদা' নাকী দেখতে দেখতেই বলে, আমি বেরিয়েছিলাম।

মিনিট পনের কথা বলে একটা ওষুধ নিয়ে কমলেশ মিহিরদা'র ডিসপেন্সারী থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেখান থেকে সে নিজের ঘরে গেল না। হাজির হল সদাশঙ্কর-এর দোরগোড়ায়। সদাশঙ্কর টেবিল ল্যাম্প জালিয়ে কি বই পড়ছিল। কমলেশকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করে, চোখে বুঝি স্বপ্ন নেই ছেলের?

কমলেশ প্রথমে কথা বলতে পারে না। উত্তেজনার চোখ-মুখ ধর ধর করে। বলে, শঙ্করদা', আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনার আদর্শকে নষ্ট করতে চাইছে, যে এই সামনের জমিতে চিনির কল বসাবার মতলব করেছে।

সদাশঙ্কর চমকে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, কে?

—তিনি আপনার শয়ম বন্ধু।

—তার কথা বলছ?

—মিহিরদা'।

—মিহির! সদাশঙ্কর বিশ্বাস করতে পারে না, এ কি পাগলের মত বকছিস? সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমার ডাকে এখানে এসেছিল—

কমলেশ খামিরে দিয়ে বলে, সে সব কথা আমরা জানি। কিন্তু আজ আমি তাকে কথা বলতে শুনেছি সেই বন্ধু বুড়ার সঙ্গে। ওই জমির বিষয়ে, চোখে না দেখলেও, গলায় স্বর আমি ঠিক চিনেছি।

সদাশঙ্কর তখনও মাথা নাড়ি, না, না, তা হতে পারে না। মিহিরের সঙ্গে আমার অনেক সময় মতের অমিল হয় বটে, সে তার ভুলকে আরও বড় করতে, কলোনীকে আরও বিরাট করে গড়ে তুলতে, কিন্তু তাই বলে এ রকম কোন কাজ সে করবে না হাতে আমাদের আদর্শ তেজে যায়।

—বিশ্বাস না করেন আপামী শনিবার আমি হাতে হাতে ধরিয়ে দেব, মিহিরদা'র বাবার কথা আছে ওই বুড়ার কাছে।

—এ যদি সত্যি হয় তাহলে নিজের ওপরই ক্রমে সন্দেহ জাগবে, হুখোসপরা হাতুড়কে চিনব কি করে? কি সাংঘাতিক কথা।

কমলেশ ধীর স্বরে বলে, আমি কিন্তু আপনাকে কথা দিচ্ছি শঙ্করদা', এ জমি আমি কিছুতেই বিক্রী হতে দেব না। আপনার আদর্শকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবই।

সদাশঙ্কর রান হাসে।

—বিশ্বাস করছেন না? কমলেশ দ্রুত স্বরে বলে, যে লোকটাকে আপনারা কেউ ভাল চোখে দেখলেন না। হাকে বন্ধু বুড়ো-বড়ো ঠাঠা করলেন, আমার মনে হয় সেই আমাদের কথা শুনেবে।

—কি করে বুকেছিল কমল?

কমলেশ কেমন যেন আচ্ছন্ন স্বরে বলে, আমি আজ তার অন্ধর মহলে চুকেছি, সেই ডাক্তার আমাদের মধ্যে কি আসার রোশনাই, শঙ্করদা', ওই বুড়ার মুখেও একটা হুখোশ। নিষ্ঠুর হুখোশ। যদি তা আমরা খুলে দিতে পারি, তাহলে বোধহয় তার আসল চেহারাটা দেখতে পাব।

—সে কি আর সম্ভব হবে?

—হবে শত্ৰুঘাত। কেন জানি না, আমার বার বার মনে হচ্ছে, দিন এগিরে আসছে।

কতকথ তারা দু'জনে কথা বলছে নিজেদের খেয়াল ছিল না। হাতের আঁককার ক্রমশঃ ক্রিকে হয়ে এসেছে। ভোরের আলো নতুন দিনের খবর নিয়ে হাজির হয়েছে প্রকৃতির দরবারে। পাখীদের বৃহৎ কলরবের সঙ্গে মিশে দূর থেকে ভেসে আসছে আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের সমবেত কণ্ঠের প্রভাত কেরীর গান, 'দিন আগত এ।'

সঙ্গীতের আর কমলেশ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, বিদ্যুত মাঠের ওপর দিয়ে এগিরে আসা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তাদের বুকও আনন্দে ভরে ওঠে, কবির গান, ভবিষ্যৎ বাণীর মতই শোনায়। তারাও গেয়ে ওঠে, 'দিন আগত এ।'

[ক্রমশঃ]



যাত্রারত্নাকর এ. সি. সরকার

জুজাগতবুদ্ধ ম'মসেল জিলের চোখ বেঁধে গিলেন আছা করে—তুলো আর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে। ভাল করে পরীক্ষা করে

দেখে সবাই নিশ্চিত হলেন যে দেখার কোন পথই খোলা নেই। এর পরে আমি আরও করলাম আমার ম্যাজিকের খেলা : হাতের বা কিছু পেলার তারই দিকে লক্ষ্যেরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি ম'মসেল জিলেকে প্রায় করতে থাকলাম এক এক করে—এটা কী? ওটা কী?

চোখবঁধা অবস্থাতেই অবলীলাক্রমে ম'মসেল জিলে জবাব দিত্ত থাকতো নির্ভুল ভাবে। কাণ্ডকারখানা দেখে তো সবাই অবাক। চোখ বন্ধ—তবু কেমন করে না দেখে সব জিনিষের নাম বল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে? হাদার মিলে'র হাতে ছিল একটি গ্রাস—তিনি সেটা তুলে ধরলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, হাদার মিলে'র হাতে এটা কী জিনিষ? জিলে জবাব দিল, কাকের গ্রাস।

কোন কোণে রাখা ছিল একটি করাসী পতাকা, সেদিকে তাকিয়ে দিকানা করলাম, বলতো কখন কোণে যে জিনিষটা রয়েছে সেটা কী?

সঙ্গে সঙ্গে ম'মসেল জিলে জবাব দিল, করাসী পতাকা! এমন সময় ঘবে ঢুকলেন এক ইংরেজ ভ্রতলোক ছাত্তা হাতে। তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, এখন যে ভ্রতলোক এসেছে তাঁর হাতের মধ্যে কী? সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম, ছাত্তা। এমনিধারা আমার প্রতিটি প্রশ্নেরই নির্ভুল উত্তর পেলাম ম'মসেল জিলের কাছ থেকে। ঘটনাটা ঘটছিল সে বার প্যারিসের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি বাগানবাড়ীর হলঘরে। বাগানবাড়ীটির মালিক করাসীসেশের এক ধনকুবের। ধনকুবের ম'সিও এতোয়ান ছিলেন আমার বিশেষ ভক্ত। তাঁরই একান্ত অনুরোধে সেদিন ভোজসভায় যোগ দিয়েছিলাম আমি আমার করাসী সহকারিণী ম'মসেল জিলেকে সঙ্গে নিয়ে। ভোজপর্বর শুরু হবার অল্প আগে ম'সিও এতোয়ান আমাকে অনুরোধ করলেন একটিনাঃ বাহুব খেলা দেখানোর অন্তে। তাঁর অনুরোধেই এটা খেলা দেখানো। কেমন করে এই আজব খেলাটি সেদিন দেখানো সম্ভব হয়েছিল সেই কথাই বলি শোন। দেখতে খুব কঠিন মনে হলে কি হবে, খেলাটির কোশল কিন্তু তত কঠিন নয় মোটে। যে প্রশ্নগুলো আমি জিজ্ঞাস্য করছিলাম সেই সব প্রশ্নের মধ্যেই লুকনো ছিল তাদের জবাবগুলো। প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই ছিল ভিন্ন ভিন্ন রূপ আর এদের এক একটি প্রশ্নে এক একটি জিনিষকে বোঝানো ছিল। আগে থেকেই ম'মসেল জিলের সঙ্গে তালিম দিয়ে আমি কতকগুলি প্রশ্ন আর তার জবাব ঠিক করে রাখা করে নিয়েছিলাম।

এটা কী?	জবাব—করাসী
আমার হাতে কী?	লাঠি
এখন হাতে কী?	পেলিস
এখন আমার হাতে কী?	শের
এখন হাতে এটা কী জিনিষ?	গ্রাস
জিনিষটা রয়েছে সেটা কী?	পতাকা
হাতের মধ্যে কী?	ছাত্তা
এবার হাতের মধ্যে কী?	টাকা

ইত্যাদি ইত্যাদি

এখন বুঝতে পারলে তো? তোমরা নিজেরাই এখন এমনধারা নানা রকমের প্রশ্ন আর তার সঙ্গে সঙ্গে জু'সই জবাব তৈরী করে নিয়ে এই খেলা দেখাতে পারবে। তবে হ্যাঁ, সহকারীর সঙ্গে ঠিকমতন তালিম দিয়ে—ভালভাবে অভ্যাস করে তবেই এ খেলা দেখাতে হবে। ভালভাবে দেখাতে পারলে এই খেলা দিয়ে খুব নাম করতে পারবে তোমরা।

ইংরেজী মাসের নামের অর্থ

গোপালচন্দ্র সীতরা

রোমানরা তাঁহাদের দেবতা এবং সম্রাটগণের নামানুসারে মাসের নামকরণ করিয়াছেন। ইংরেজী মাসের নাম রোমানগণের নামানুসারে হইয়াছে। (১) জানুয়ারী—দেবতা জেনাসের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। রোমানরা কোন ভক্ত কার্য আদৃত করিবার পূর্বে এই দেবতার পূজা করিতেন, এই

সেবতার হুইট হু। (২) ফ্রেঞ্চমারী—প্রাচীনকালে রোমানরা এই সময়ে ফ্রেঞ্চা নামক এই উৎসব করিতেন। এই উৎসবের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। এই উৎসব করিবার পর রোমানরা আপনাদিগকে শুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। (৩) মার্চ—বৃশসেবতা মাসের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। এই সময়ে দেশে খুব বড়-বৃষ্টি হইত। (৪) এপ্রিল—এপ্রিল শব্দের অর্থ খুলিয়া দেওয়া। এই সময়ে রোমদেশে বসন্তকালের আবির্ভাব হইত এবং বৃক্ষসভা পুষ্পসভার নদীরা জলবল করিত। নির্মল আকাশ, জামল প্রান্তর দেখিয়া মনে হইত যে, পৃথিবীর কলকটিকার আবরণ কাটিয়া গিয়াছে। তাই রোমানরা এই মাসকে এপ্রিল বলিতেন। (৫) মে—‘মেইকা’ নামী প্রাচীন রোমানদের উপাত্ত সেবতার নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে। ইনি এটলাসের কন্যা। রোমানদের বিশ্বাস ছিল যে, এটলাস সেবতা সমগ্র পৃথিবীটা তাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। (৬) জুন—‘জুনো’ দেবীর নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে। (৭) জুলাই—রোমের বিখ্যাত জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। সিজারের পূর্বে রোমানদের বৎসর মার্চ মাস হইতে গণনা করা হইত, কিন্তু তিনি জাম্বারী মাস হইতে গণনার প্রবর্তন করেন। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত তিনি যে মাসে এই পরিবর্তন সাধন করিলেন সেই মাসের নাম দিলেন জুলাই। (৮) আগষ্ট—সম্রাট আগষ্টাসের নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে। (৯) সেপ্টেম্বর—পূর্বে বর্ষান মার্চ মাস হইতে বৎসর গণনা করা হইত তখন এই মাসটা ছিল সপ্তম, তাই এই মাসের নাম হইয়াছিল ‘সেপ্টেম্বর’। সিজার সন্ধার করাইয়া মাসগুলিকে বদলাইলেন, কিন্তু মাসের নাম বদলাইলেন না। (১০) অক্টোবর—‘অক্টোবর’ শব্দের অর্থ আট। পূর্বে এই মাসটি আট ছিল বলিয়া ইহার নাম অক্টোবর হইয়াছে। (১১) নভেম্বর—নভেম্বর শব্দের অর্থ নয় এবং পূর্বে নামকরণ অনুসারে এখনও নভেম্বর রাখিয়া গিয়াছে। (১২) ডিসেম্বর—‘ডিসেম্বর’ অর্থ দশ। এই মাস পূর্বে দশম মাস ছিল বলিয়া এই মাসের নাম ডিসেম্বর হইয়াছে।

কিশোর স্তম্ভ

[মাটিকা]

ঐশ্বর্যচিহ্নালা রায়

হানি—কটক, গমর—গম্বা।

জিজ্ঞাসে একাকী বসে আছেন জানকী সাহেব, (এই নামেই ইনি কটকে পরিচিত) সমুখে টেবিলের উপর সেদিনকার খবরের কাগজ ছড়ানো। সহসা সমুখের দরজার পাশে তাকিয়ে সমুখের বসে উঠলেন—

—এই যে আহন, আহন, আপনাকেই কথা ভাবছিলাম একজন।

জিজ্ঞাসে প্রবেশ করলেন দায়বাহাদুর গোপাল গাঙ্গুলী।

গাঙ্গুলী সাহেব। কেন বলুন দেখি, কি ব্যাপার?

জানকী সাহেব। ব্যাপার কিছুই নয়, Dull কয়েকো সন্ধ্যাটা, ভাবছিলাম, আপনি এসে হন, কিছু গল্প শুভব করি।

—সমুখে কাগজ দেখছি আজকের, পড়েছেন না কি?

—হ্যাঁ, তাই ত ভাবছিলাম, কি হোল বলুন দেখি দেশটার, আজ একে মারছে, কাল ওকে মারছে, এদিকে ওদিকে যেন খেলা চলছে বন্ধুকে নিয়ে, বোমা নিয়ে। যেন এমনি করেই ভর পাইয়ে দেবে সাহেবদের, কি সব ভেলেমামুদী! মাথাওয়ালা লোক কিছু রয়েছে এর ভেতর একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু ভালো কাজে তা না লাগিয়ে, আম্বাওয়া খেলা খেলছে সব বাচ্চা ছেলেগুলোকে নিয়ে, এ দেশটার উন্নতি হবে কি করে?

—হ্যাঁ দেখছিলাম কোন ছেলেটির যেন কানি হয়ে গেল, দেখি, দেখি নামটা—

—হ্যাঁ, গীতা হাতে নিয়ে বসে মাতরম্ব বলতে বলতে এগিয়ে গেল কানিকারের দিকে, এ সব কচি কচি প্রাপ্তলোককে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, এ সব করাচ্ছে কারা বলুন দেখি? আরে কতটা কালের হচ্ছে? ওদের না তোধের?

—তাই ত। নিজেদের অন্ত নেই, বুড়ে লড়বার লোক নেই, ক’টা বোমার ভরে পাগিয়ে রাখে না কি এই সব মহাপ্রভুর।

—সেই যে একটা কবিতা পড়েছিলাম—

“হাইদার শিব বত পাখও টোয়েয়ে—”

গাঙ্গুলী হেসে—তা’ আপনার আমার ভাবনা কি? কোলকাতার আলফ খেকে তা’ অনেক দূরেই আমরা।

জানকী। তা’হলেও ভাবনার আছে বৈ কি দায়বাহাদুর, ছেলেরা বড় হবে, কলেজে পাঠাতে হবে, তা’হাড়াও ওখানকার হাওয়া এখানে আসতেও বেশি সময় কি আর লাগবে?

গাঙ্গুলী। তা’ বটে, কিন্তু উপায় নেই, কালের গতিয় বুঝেই ছেড়ে দিতে হবে সব, আপনার আমার কিছুই থাকবে না কবরায়, শুধু দেখে বাওয়া ছাড়া। (একটু হেসে) একটা কথা মনে পড়ল বোস সাহেব, একদিন যবে বসে কি একটা পড়ছি, তুমি, খেলা টেলার পর তিন বছরে আমার বাগানে বসে কথা বলছে। আমার ছেলে চাক, আপনার সুবি, আর সেই যে এখানকার জমিদারের ছেলে জগন্নাথ চৌধুরী—চাক বলছে আমি ভাই বড় হয়ে জন্ম হব, সুবি বলছে আমি ভাই হব এ্যাডভোকেট জেনারেল, তুমি জন্ম হবে, বিচার করবে, কিন্তু আইন ত’ দেখিয়ে দেবো আমিই। আর তুমি জগন্নাথ? জগন্নাথ বলছে, আমি ওসব কিছুই হবে না ভাই—আমার পড়াশুনা করতেই ভালো লাগে, আমি হবে ভাই প্রোফেসর, নানা জন্ম কেবল পড়তেই থাকবে, কেবল বই, বই আর বই।

(হেসে উঠলেন হু’জনেই)

জানকী। আসেন ত, সুবিকে প্রথমে এখানকার প্রোটেষ্ট্যান্ট হুগোপিয়ান স্কুলে দিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ ছেলে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, ও স্কুলে ও আর পড়বে না, কারণ স্কুল বসবার সময় যে গান হন, ‘গড সেভ মি কি;’ ও গান ও পাইবে না, তা’ ছাড়া ব্রুটাল আর অ্যাডো ইতিহাস মেনেরাই শুধু বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারবে, সেটুকু তা’ পারবে না। তাতে নাহি এই বরসেই ওর অপমান বোধ হচ্ছে। দায় কাছে এসে হেসে কীসে হেসে অস্থির, বসে, না, আহন! ইতিহাসটা ওসব করে ছোট হয়ে গেছে, জা আহনর অসহ্য

করে আমাদের অপমান করবে? আমি ওদের খুলে পড়বো না। তারপর দিলুম তর্জি কঁটে এই ছাভেলা খুলে। এখানে এসে পোকাটাও বললে কেনেছে দেখেছেন? বসে, ওদের পোকা পরবো না, এই মুক্তিই ত আমাদের জাতীর পোকা। কী আর বলবো বলুন?

পাশুলী। সুবি আপনার চমৎকার ছেলে হবে বোম সাহেব। ওকে বলবার বিশেষ কিছু দরকার হবে না। নিজের ভেতরের একটা অদ্ভুত শক্তিই ওকে তৈরী করে নেবে। আমি ওর শাশু চেহারার ভেতরেও একটা দীপ্তি দেখতে পাই। বাপানে হাজার গাছের ভেতরেও একটা ছোট চারা দেখলেই কোন গাছ তা চেনা যায়। আচ্ছা, চলি আজ।

২

বেলা প্রায় বেড়টা। ছাভেলা খুলে টিকিনের ছুটি। ছোট ছোট ছেলেদের ছুটোছুটি, হা হু হু হু বা অজ কোন খেলা, হৈ হৈ পোলমাল সকল কিছু খেতে সবে গিয়ে উপরের ক্লাসের কয়েকটি ছেলে একটা গাছের নীচে বাদে উপর গিয়ে বসলো, এক ধীরে ধীরে ওদের করোপকথন শোনা যেতে লাগলো।

সত্যজ্ঞ। শরীরটা আজ ভালো নেই, অস্ব-অস্ব হয়েছে, মা আসতে বাধ্য করেছিলেন, কিন্তু না এসে পারলুম না, হেডমাষ্টার মশায়ের ক্লাসটা বাদ দিতে কিছুতেই পারি না তাই।

নির্মল। আমি ত ওর জন্তেই প্রোটেক্টার মুরোপীয়ান খুল ছেড়ে বিলায়। তুমি, আরোও কত ছেলে আসতে চাইছে, কিন্তু ওঁর গার্ডেনরা হত গিয়েছে না।

নরেন। জানিস তাই, পড়তে পড়তে কাল বাড়িয়ে হঠাৎ তুমতে পেলাম, বাবা কাকি বলছেন,—দিয়ে দিন এই খুলে ছেলেকে। বৌমাধব বাবুর হাতে পড়ে, কত খাড়াপ ছেলে ভালো হয়ে যাচ্ছে, মুখে মুখেই ছেলেদের কত কিছু শিখিয়ে দিচ্ছেন, শুধু বই পড়ে বা কোন কালেই হোত না, ইতিহাস বিজ্ঞান, প্রাচীন ভারতের ধর্ম ঐতিহ্য কোন জিনিষ তাঁর শেখাবার বরশ থেকে বাদ যায় না, কোন জিনিষ ওঁর জ্বল হয় না কখনো। কে রামকৃষ্ণ ছিলেন, বিবেকানন্দ কোন বক্তার কি বলেছেন, ঐশ্বরবিশ্বের বাণী, নানক, কবীর, আমি মশায় একদিন কি একটা উপলক্ষে ঐ সময়টার খুলে গিয়ে হেডমাষ্টার মশায়ের পড়াশোনা শুনে অবাক হয়ে গেছি।

সত্যজ্ঞ। তুমি তাই ওঁকে না কি ট্রান্সকার করতে পারে।

—কেন তাই?

—ওঁর ত এই খুলে অনেকদিন হয়ে গেল, তাই আর কি।

—সর্বনাশ। তাহলে তাই, আয়বাত ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ওঁর খুলে যাঁবে।

—তা কি আর হবে? আমাদের গার্ডেনরা আমাদের ছাড়বেন কেন?

—ওই যে মাষ্টার মশায় লাইব্রেরীতে বাচ্ছেন, সঙ্গে ওরা তিন জন ঠিক আছে, হজরত, ডাক, কপরা—

—কল আয়বাত রাই।

(খুলের ভিতর)

প্রধান মাষ্টার বৌমাধব। টিকিনের ছুটিতে ছেলেরা খেলা করলে না আজ। এখনো ত খটা পড়নি চলে এসে কেন?

—সার, আপনি কিছু বলুন, আয়বাত শুনবো।

মাষ্টার। (খুশী হয়ে) তুমি তা বেশ ত, ভালো কথা নিয়ে আলোচনা করতে তোমাদের এত ভালো লাগছে দেখে ভারী খুশী হোলাম। আচ্ছা, আজ এমন কিছু শোনাবো, যা আমাদেরও মনে একটা নোতুন নেশা জাগিয়েছিল। দেশের দুঃখ দুর্দশা বুঝ করার জন্তে ধারা নিজেরের মুখ চিরদিনের জন্তে বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁরা চিরদিনই আমাদের নমস্কার। ঐ ঐশ্বরবিশ্বের কথা তোমাদের আমি আগেও বলেছি, আজ তাঁরই একটা উপদেশ শোন—

—আমার অন্তরের একমাত্র বাসনা আমি দেখতে চাই, অন্তত তোমরা কয়েকজনও সন্তোকারের মহাজীবনকে বরণ করে নিয়েছ, তোমার নিজের জন্ত নয়, ভারতবর্ষের জন্ত; ভারতবর্ষ হাতে বিশ্বস্তার মাথা উঁচু করে ঝাঁপাতে পারে, ভারী জন্ত তোমাদের সহ্য হচ্ছে হবে, তোমাদের মধ্যে বাবা দ্বিগুণ পরিচরিত, তোমাদের সেই দ্বিগুণ সেই পরিচরিততা দিয়েই দেশজননীর সেবা কর।

Work that she might prosper
suffer that she might rejoice

কিন্তু, এই যে দেশজননী কে এই দেশ? দেশের কি কোন আলাদা রূপ আছে? এই পাহাড় পর্বত এই সব নদ-নদী, গ্রাম-সহর, এত সব জীবজন্তু, এক সকলের উপরে মানুষ, এই সব মিলিয়ে যে একটি রূপ তাই তোমার ভারতবর্ষ, তোমার দেশ। প্রকৃতিক ভালোবাসা, জীবজন্তুকে দয়া কর, নীচ নীচ দুঃখী মানুষকে তাদের নীচতা হীনতা থেকে টেনে তোল, তোমরা নিজেরা নানা স্বকর্মের জ্ঞান অর্জন করে, দেশের মানুষের শিক্ষা লাভের পথ দেখিয়ে দাও। এই ত হবে তোমার দেশের সেবা—দেশভক্তি। বিবেকানন্দ বলেছেন,—বহু রূপে তোমার সমুখে তোমার ভগবান জীবন্তে ধারণ করে 'বুকে বেড়াচ্ছেন, সেই জীবের সেবা, মানবের সেবা সেই ত তোমার আরাধনা।

বহুরূপে সমুখে তোমার,

ছাড়ি কোথা খুঁজি টপক!

ভারতবর্ষকে, তোমার দেশকে, তোমার ভগবানকে একই রূপে ভাবতে চেষ্টা কর, সেই তোমার পথ।

৩

জানকী সাহেবের বাড়ী।

জানকী সাহেব। কত রাত হোল, ছেলেরা সবাই পড়ছে, সুবিকে দেখছি না ত?

সুভাব-জননী। আজকাল প্রায়ই দেখছি দেবী করে কেনে, চাকরের বাড়ী বসে বই টাই পড়ছে হয়ত।

—তা হলেই বা এত দেবী হবে কেন? ঠিক সময়ে আসেই বাড়ী এসে পড়তে বসে উঠিত, বসে সিঁও আজ।

মা চিন্তিত ভাবে। বেশি কথা চটা ত' বলে না, সুবি কেন কি বকম হয়ে যাচ্ছে আজকাল।

জানকী সাহেব। হ্যাঁ, কি বকম একটু অনমনস্ক বেন হচ্ছে, আমাদের ক'দিন হয়ে হলে সে কথা, সেদিন সেবি খবরের কাগজ

থেকে কেটে নেতাসের দ্বানে, ঘনেশী হুজুরের সব গিড়ারদের ছবিগুলো কেটে, গুণ পড়বার ঘরে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। দেখে ত চমকে পেলাম। শুকুণি বোহারটাকে ত্রেকে তুলে ফেললাম সেগুলো, স্মৃতিকণ্ড সাধনান করে দিলাম, ভবিষ্যতে আর বেন না হয় ও বকর। চূপ করে মাথা নীচু করে পাড়িয়ে রইল।

মা। ঐ যে এসেছে, বাই দেখি গে।

জানকী। সারদা আছে ত' ওখানে? ওকে দেখাওনো করে ত।

মা। হ্যাঁ, সারদা ওকে বড্ডো ভালোবাসে, সুবির সমান গুণ একটা ভাইপো আছে দেখে, সেজন্তে সুবির উপর গুণ বড্ডো টান। সব সময় দেবতা দেবতা বলে আদর করে ডাকে, আর কী বড়ই করে। বাই দেখি গে—

সুভাসের পড়বার ঘর।

মা। হ্যাঁ যে সুবি, এত ঘোঁ কবলি'কেন? এত রাত অবধি খেলা কবলি না কি? এসেও আবার বই সামনে নিয়েই বসে পড়লি টেবিলের সামনে? ওঠ, হাত-বুধ ঘুরে খেয়ে দেবে পড়তে বস, পরীক্ষার ত' আর দেবীও বেশি নেই, সারদা, সে গুণ ব্যবহা করে সব। [প্রস্থান।]

সারদা। দেবতা, বড্ডো রাত করলে আঁজ, ওঠ দেখি, তোমার জন্তে জলটল সব ঠিক করে রেখে এসেছি স্নানের ঘরে, ওঠ চল। আঁজ, ঐ যে দেখেছো ত? তোমার জন্তে এ ঘরেই একটা খাটের ব্যবহা করে দিয়েছেন মা, তুমি থাকে বসেছিলে সুবি অনেক রাত অবধি পড়লে, এ ঘরেই শোবার ব্যবহাও করতে পারলে ভালো হয়, তাই তোমার বিছানাও করে রেখেছি ওখানে।

রাত অনেক হয়েছে।

সুভাসের শয্যাগ্রস্ত ছোট একটি টেবিলের উপরে বামী বিবেকানন্দের একখানি কটো। কুল দিয়ে সবুজ সেখানি সাজানো। স্নানের পড়ার বইগুলোর আগামী কালের পড়াগুলো বার কয়েক দেখে নিয়ে সুভাস অত্যন্ত প্রচুর সঙ্গে বামীজির একখানি বই কাছে টেনে নিল। তার পর পাতার পর পাতা উল্টে পড়তে লাগল—

‘বহুতপে সন্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবো দয়া করে বেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’

‘হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সর্বশ্রে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল দুখ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর। ভারতের স্মৃতিকা আমার স্বর্গ। ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ। হে পৌরীনাথ, হে জগদগুরু, আমার মন্থব্যস হাও মা, আমার হৃদয়লা, কাপুরুষতা দূর কর, আমার মান্দ্রব কর।’

পাতার পর পাতা উল্টে বাচ্ছে, সুভাসের চোখ দুটি আঙনের মত জ্বলছে। বই বন্ধ করে, করবোড়ে সুদিত নয়নে সুভাস বসে রইল কতকণ্ড ভাব হলে, তার পর উঠে পাড়িয়ে এগায় কল কতকণ্ড করে বামীজির কটোকে। বাতুল কণ্ড বায় বায় বলতে লাগল—

—হে ওক, আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর আমার, তোমারই ইচ্ছায় আমার জীবন, তোমারই ইচ্ছায় আমার সকল শক্তি বলি দিলাম মারের পারে, ভারতমাতার পারে।

তার পর জল খেয়ে ঘুরিয়ে পড়ল সুভাস।

ভোরবেলা। জানকী সাহেব বেরিয়ে এসেন বাগানের ভিতর

—প্রাণ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কে বেরিয়ে বাচ্ছে বাড়ী থেকে, কে?

—কে বাচ্ছে রে? সুবি নাকি?

—হ্যাঁ।

—কোথায় বাচ্ছিস? (নিরন্তরে মাথা নীচু করে রইল সুভাস)

কি রে? বাচ্ছিস কোথায়? এই ভোরবেলা, কাউকে বলা নেই, কওয়া নেই, কোথায় বাচ্ছিস?

—ও পাড়ার ভীষণ অসুখ-বিসুখ হচ্ছে, ডাক্তার দেখাতে পারে না ওরা, সেবা করতেও জানে না, তাই বাচ্ছি ওদের নাসি-এর জন্তে। বেশিক্ষণ থাকব না, ঘটাখানেক মাত্র।

—কি বললি? নাসি-এর জন্তে? কি সর্বনাশ! তোকে কে দেখে তার ঠিক নেই, তুই বাচ্ছিস ও পাড়ার নাসি-এ। ওসব হবে না, বা, ঘরে বা। ম্যাট্রিকের মাত্র ক'মাস বাকী, পড়াভরসা নেই, কেবল বাইরে বাইরে বোরা। অত বাচ্ছিরে বাড়ী কিবিল যোজ রোজ, বাস কোথায়? বা, পড়তে বস গে।

মাথা নীচু করে সুভাস ঘরে গিয়ে দ্বার বন্ধ করে পড়তে বসল। সন্মুখে দেয়ালে ক্যালেন্ডার ঝুলছে, ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দিন হিসাব করতে লাগল সুভাস।

সুভাস। ক'দিন বাকী আর? মাত্র দু'মাস? মাত্র? তা হোক, ভয় কি? কত বন্ধ করে পড়ালে মাস্টার মশারেরা, বুঝা বাবে নাকি সব? হতেই পারে না। চাক বলছে, কার্ট হবি তুই, দেখি চোঁকা করে—

(সেদিন রাত্রে জানকী সাহেব বলছেন স্ত্রীকে)

অতৃত হয়েছে ছেলেটা। বা বলছি, তাই করছে, কক্ষণে অব্যাহত হয় না, সারাদিন দোর বন্ধ করে রেখে একমনে পড়ে বাচ্ছে। সবই ভালো ছেলেটার, কিন্তু মনে হয়, কি বেন ভাবছে সারাক্ষণ, মনটা বেন অস্তমনস্ক। কি বেন একটা মুহূর্ত চলেছে গুণ মনের ভিতর। ছেলেটা ভাবিয়ে তুললে কিছু। পরীক্ষার পর ওকে কোলকাতার একা একা পাঠাবোই বা কি করে, যে অবস্থা চলছে দেশের।

মা। তা ঠিক, কিন্তু গুণ মনটাকে ত আঁচল দিয়ে চেপে চেপে রাখতে পারব না, সারদা বলে কত রাত অবধি বামীজির ছবিটিকে পূজো করে ম্যোম, চোখ বুধ গুণ আঙনের মত জ্বলতে থাকে পূজার সময়, ডাকলে সড়ক পর্যন্ত ঘের না, এমনি তম্বর হয়ে যায়। তুনে আমার ভয় করে।

জানকী। পরীক্ষার পর দিনকতক একটু ঘুবে আশ্রয় বাইরে, একটু পরিবর্তন হতে পারে।

পরীক্ষার পর—বন্ধুদের সঙ্গে—

সুভাস। ঘুবে খেটেছি তাই শেষ ক'টা দিন। আশা করি ভালই কোরব।

চাক। ভালো মানে? মাস্টারমশাররা ত বলছেন, উপসর্গ দিকের ট্যাঙ করবে সুবি।

সুভাষ। রেজাণ্ট বেকতে ত দেবী আছে, চলে না বাইরে ঘরে
আসি কোথাও। বাবার পারমিশান ত পেরে গেছি।

চাক। আমি ভাই জানি না পারবো না কি, চেষ্টা করব।

সন্ধ্যার পর, শিতার কক্ষে—

সুভাষ। একলাই পারব বাবা, ভয়ের কি আছে? বড় হয়েছি
ত?

জানকী। সঙ্গে একটা চাকর বাক, দেখা-শুনো করতে
পারবে ত?

সুভাষ। কিছু দরকার হবে না বাবা, বেশি দিন ত দেবী
হবে না, রেজাণ্ট বেকবার আসেই চলে আসবো।

বাক্সার পূর্বে—

সুভাষ। (হেসে) এখনই তোমার চোখ ভিলে উঠছে না?
আমি বিলেত গেলে তুমি থাকবে কি ক'?

মা। ছেলেদের মজলের জন্তে মায়েরা সব কষ্ট সহ্য করে
বাবা, সব পারবো আমি, তুমি ভালোয় ভালোয় কিয়ে এসো বাড়ী।
জানকী। বা' বা' নেবার, নিরেছ ত সব ঠিক করে?

—নিরেছি বাবা!

—সময় হয়ে এসো, এই যে চাকরা আসছে, ঠেগনে বাবে বোধ
হয় ওরা?

চাক, জগন্নাথ। এই যে Ready হয়েছ, চল, আমরা ভাই
See off করতে এলাম তোমায়, চল।

সুভাষ। চলি মা?

মা। এসো, বাবা, (ওর চলাব পথের দিকে তাকিয়ে) ঘর
হেঁফ এই ওর প্রথম বাইরে বাওয়া ছক হোল, তার পরেই ত

পাঠাছে। কোলকাতা, তারপর বিলেত। এরনি করেই ছেলেদের
ঘরের সঙ্গে যোগ কয়ে যায়।

জানকী। সুবির বাইরের দেশটাই বড্ডো বেশি, ঘরের চেয়ে।
অনেক দিন থেকেই আমি তা' কুঁতে পারছি। বাইরে বোরার দেশ
হলে, ঘরে কি আর মন টেকে? ঠিক সাধারণ ছেলের মত ও নয়,
ওর জন্তে আমার ভারী একটা ভাবনা রয়েছে।

দিন করেক পরে—সুভাষের বন্ধুর অন্ত্য আগ্রহান্বিত হয়ে
একখানা চিঠির উপর ঝুঁকে পড়ছে, মাঝখানে বসে একজন পড়ছে
সে চিঠি।

—সুভাষের চিঠি এসেছে ভাই, সবারই নাম করে লিখেছে,
আমি পড়ছি শোন সবাই—

—ঘরে বেড়াছি হরিদ্বারে, হিমালয়ে উঠবার সিঁড়িতে। কী
রূপ এখানকার, তোমরা দেখলে না, দেখলে পাগল হয়ে যেতে।
আমিও পাগল হয়ে গেছি। মনের ভেতরে নতুন দৃষ্টি খুলে গেছে
আমার। সেখানে পাচ্ছি, আমার ধ্যানের যে ভগবান, ঝাঁকে আমি
দিন-রাত ধ্যান করেছি প্রতিদিন মনে মনে তাঁর খেতে কিছুমাত্র
পার্থক্য নেই আমার চোখে-দেখা এই ভারতবর্ষের। যখন একটু
শান্ত স্থির হয়ে ধ্যানে বসতে বাই ভগবানের, মনে মনে অত্যন্ত
পরিস্কার রূপে ফুটে ওঠে আমার এই ভারতমাতার রূপ। এই বৃক-
লতা গিরি-নন্দননী, সহর-গ্রাম, গ্রাম্য জীব জন্ততে গড়া এই বিশাল
ভারতবর্ষের রূপ। আমি ধ্যান ভুলে বাই, পূজো ভুলে বাই, মন
আমার আকুল হয়ে চীৎকার করতে থাকে।

মা, মা মা, মা—আমার জননী অমৃতমি আমার ভগবান।

[ক্রন্দন]

কাজ

স্মৃতি নাহা

আমি কে? প্রশ্ন জাগে মনে,

উত্তর নাহি মেলে।

মনে হয়—কোন এক অকালের কালরাতে

জন্ম যদি আমার,

তবু কেন উত্তর মেলে না একবার!

প্রশ্ন—তোমায়

এ কি ধোঁসি? শুকনো পাতা, বয়্য ভুল

জন্মের ডিটের তাল—

না, তবু মনের কুল

বা উল্টোরথে চড়া!

কাজের বেলা চল সায়া

মন ভবু কাজচাড়া

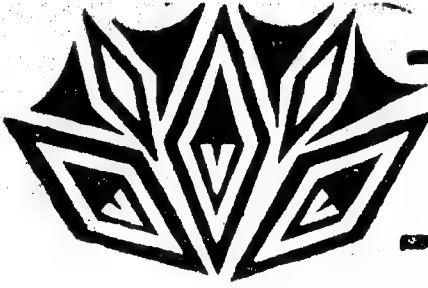
জিজ্ঞাসি, মন তুমি কীভাবে কতকণ

অজস্রায় তাকস্মি

তা তো তোমার গড়া।

তবে কেন গড় না একবার

খাঙ্ক প্রশ্ন, কাজ তুমি আর আমি হই একাত্ম।



সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

রবীন্দ্র-জীবনকথা

প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "রবীন্দ্র-জীবন" একটি অমর কীর্তি। বাঙালির সাহিত্য-জগতের রবীন্দ্র-জীবনের মত গ্রন্থের সংযোজন যে কতখানি মূল্যবান, তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। রবীন্দ্র-জীবনী মূলতঃ জীবনীগ্রন্থ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ঘটনাপঞ্জী দিয়ে পরিপূর্ণ নয়—একটি যুগের, একটি সমাজের, একটি জাতির পরিপূর্ণ ইতিহাসরূপে রবীন্দ্র-জীবনকে অভিহিত করলে অত্যাধিক হয় না। চারটি বিরাট খণ্ডে লিখিত রবীন্দ্র-জীবনের সংক্ষেপিত সংস্করণ বলে এ গ্রন্থটিকে গণ্য করলে ভুল করা হবে। ঐ বৃহদায়তন চার খণ্ড জীবনীর একটি সারসংকলন (শ্রীমতী শ্রদ্ধাময়ী দেবী কৃত) অবলম্বন করে প্রভাতকুমার রচন করে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি একটি খণ্ডেই সমাপ্ত। গ্রন্থের সর্বত্রের বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থটি আদি থেকে অন্ত চরিত্র ভাষায় লেখা। গ্রন্থের শেষার্ধ্বে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যঙ্গলতিকা, রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী ও রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী অন্তর্ভুক্ত করে গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। বাঙালীর রবীন্দ্র-চর্চায় কেন্দ্রে এই গ্রন্থটি অপরিহার্য এবং গ্রন্থটি সাহিত্যজগতে প্রভাতকুমারের এক অনবদ্য অবদান, বার ভুলনা হয় না। অদ্বৈতা জ্ঞাতব্য তথ্যে ভরপুর এই মহাজীবনীগ্রন্থটি বাঙালির সুবী-সমাজে যে প্রভুত সমাদর ও সাধুবাদে বিভূষিত হবে, একথা বলাই বাহুল্য মাত্র। প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৬৩, বাবুকালাখ ঠাকুর সেন। দাম—৬ টাকা মাত্র।

কবি তরু দত্ত

বাঙালির কালজয়ী সন্তানদের কল্যাণে দেশের সাহিত্যজগতের পূর্ন থেকে পূর্ণতর হয়েছেন—সাগরপারের সাহিত্যসম্পদও যথেষ্ট পরিমাণে ভরে উঠেছে এবং এক্ষেত্রে বাঙালির ছেলেদের তুলনায় বাঙালির মেয়েদের অবদানও কোন অংশে কম নয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে মনে পড়ে তরু দত্তের নাম। আমাদের হৃদ্যাগা যে, পৃথিবী তরু দত্তকে বেষ্টিত নয় হয়ে রাখতে পারে নি। মাত্র বাটশটি কান্ডন প্রত্যক্ষ করেই ধর্মীর বদমক থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তরু দত্তকে। অত্যন্ত অকালে এই বিরাট প্রতিভাকে সাহিত্য-জগৎ হারিয়েছে। আজকের দিনে তরু দত্তের অনবদ্য রচনার সঙ্গে কার কতখানি প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে সে বিষয়ে মনের সন্দেহ হচ্ছে কেনা যায় না। উপরোক্ত গ্রন্থটি রচনা করে শ্রীমদ্রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গ্রন্থে কবির সজ্জিত জীবনী কাব্য, উপদ্রাঙ্গ সঙ্কেত স্ফুটিত আলোচনা এবং কবির "যোগাভা

উমা" কবিতাটির বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে গ্রন্থকর্তার নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার ছাপ কুটে ওঠে। যে দেশেই কবিজীবন অতিবাহিত করুন, যে ভাষাতেই তিনি তাঁর সাহিত্যকে রূপ দেন আসলে তিনি বাঙালী, বিভ্রম বাঙালী-রক্ত তাঁর শিরায় ধমনীতে প্রবহমান—তাই তাঁর রচনার মধ্যে চিরন্তন বাঙালীসত্তাই বার বার উঁকি মারে, ফরাসী উপজাতির মাধ্যমে বাঙালী তরু দত্তই দেখা দেন—এবং রচনাগুলি যেন বিদেশী ভাষায় লেখা বাঙালী রচনাই—এই মতবাদকে যথেষ্ট দৃষ্টান্তের সঙ্গে লেখক তাঁর আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লেখকের উপরোক্ত ধারণা সম্পর্কে বিজ্ঞ পাঠক বিমত হবেন না, এ আশা রাখি। তরু দত্ত প্রায় বিবৃত হতে চলেছেন—এই সময়ে তাঁর সম্পর্কীয় আলোচনার শুদ্ধ নিঃসন্দেহে অনব্বীকার। লেখকের আলোচনাজলী ভাষা ও রচনাশৈলী প্রশংসার দাবী রাখে। প্রকাশক—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী—এ—১৩২ ও ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট হার্কট। দাম—৬ টাকা পঞ্চদশ নম্বর পরমা মাত্র।

বয়ে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর

বাঙালী দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ নাম রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেলী। সাহিত্যের কল্যাণে তাঁর আত্মনিয়োগের বিবরণ সকলেরই সুবিদিত। উনিশ শ' পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ-রহিত আন্দোলনের যুগেও তাঁর অবদান অতুলনীয়। রামেন্দ্রসুন্দর এক আতর্ষ প্রতিভা, বিজ্ঞানেও ছিল তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি। সুসাহিত্যিক শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (দালগোলা) রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট-আত্মীয়। রামেন্দ্রসুন্দরের দেহান্তের সময়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ বাইশ বছরের যুবক। সুতরাং এই বাইশ বছরের সময় পরিধিতে রামেন্দ্রসুন্দরের নিবিড় সাহিত্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছেন বীরেন্দ্রনারায়ণ, যার বাইরে রামেন্দ্রসুন্দরের যে আলোচ্য বীরেন্দ্রনারায়ণের চোখে বরা পড়েছে সেই আলোচ্যকে কেবলমাত্র স্মৃতির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে লেখকের মাধ্যমে তিনি সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিত্ব, মনীষা, স্বাভাবিক্যাদিমানের এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি রচনার মাধ্যমে অঙ্কিত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্কেত এবং তাঁকে কেন্দ্র করে প্রায় সমগ্র বাঙালীদেশ সঙ্কেত বহু তথ্য গ্রন্থটিকে সর্বতোভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে এই জাতীয় তথ্যপূর্ণ তথ্য মূল্যবান গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ছিল, বীরেন্দ্রনারায়ণ সে অভাব পূরণ করলেন। রচনার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন—এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। প্রকাশক ইন্ডিয়ান ম্যাসালিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড, ১৩ পাণ্ডী রোড। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চদশ নম্বর পরমা মাত্র।

(১) বিদ্যুত্বেষণ এবং (২) বিদ্যুত্বেষণ : মন ও মিল

বঙ্কলা সাহিত্যে এমন একটি দিক আছে, যার মিক্‌পাল হলো চলে অমর কথাশিল্পী বঙ্গীয় বিদ্যুত্বেষণ বন্দোপাধ্যায়কে। বুনটের, মিক্‌পাল, পথনির্ঘাতা প্রবন্ধ বিশেষণগুলি সাহিত্যের কেন্দ্রে থাকে নামের সঙ্গে অনার্যাসে ব্যবহার করা যায়, বিদ্যুত্বেষণ তাঁদেরই অন্তর। বিদ্যুত্বেষণ যে কত দিক দিয়ে বঙ্কলা সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছেন, তার ঠিকানা নেই। তাঁর রচনা সাহিত্যকে একটি বিশেষ রূপদানে সমর্থ করেছে, তাঁর লেখনী বঙ্কলা সাহিত্যকে এক অভাবনীয় বৈশিষ্ট্যে ভরিয়ে তুলেছে। বিদ্যুত্বেষণের সাহিত্য, সাহিত্যার্ণব, সাহিত্যচরিত্র। সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনাগ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হয়েছে। উভয় গ্রন্থেই সারগর্ভ আলোচনা পরিবেশিত হওয়ার ফলে বিদ্যুত্বেষণের স্বরূপ সাধারণ পাঠকের সামনে অল্পবাক্যেই মন আয়। যে ভিত্তির উপর বিদ্যুত্বেষণের সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত, তার গভীরে অবগতন করতে সমর্থ হয়েছে লেখকদের সন্ধানী মন। লেখকরা যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের আলোচনা স্পষ্ট, চূর্নোৎসাদিত। তাঁদের পণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাগ্রন্থ দুটি পণ্ডিতমূল ও গবেষকমূলক যথেষ্ট সমাদর পাবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি। প্রথম গ্রন্থটির রচয়িতা চিত্তবজ্রন ঘোষ। প্রকাশক—বিশ্ব শতাব্দী প্রকাশনী, ২০ প্রে প্রিট। দাম পাঁচ টাকা মাত্র এক দ্বিতীয় গ্রন্থটির রচয়িতা সোণিকানন্দ রায়চৌধুরী। প্রকাশক—বুল্যাণ্ড প্রাইভেট লি., ১ শব্দর ঘোষ লেন। দাম তিন টাকা মাত্র।

অদ্বিতীয় ঘনাল

জন্মকাল পূর্বে পাঠক-পাঠিকার দরবারে রীতিমত আলোড়ন জাগিয়েছিল প্রোফেসর মিত্রের “ঘনাল গল্প” এ তথ্য সাহিত্যাদ্বয়াদ্বয় মূল্যবান। যেটি বড় উত্তর মতলসেই অভাবনীয় সমাদর লাভ করেছিল “ঘনাল গল্প”। প্রচলিত গল্পা যে বিভাগ পটভূমি হতে বিদ্যুত হতে পারে বা কতখানি শিল্পকলায়িত ও বর্ণনামূলক হতে পারে তার উচ্চল নিদর্শন ঘনাল গল্পগুলি। বহুমূল্যে নানাবিধ মিথ্যাতারের মাধ্যমে নিজের জন্মে জীবনযাত্রা সৌরভময় এক উচ্চ আসন কথার কথার ধীরে গড়ে তোলেন ঘনাল তাঁদেরই প্রতীক। গল্পগুলির সবচেয়ে বিশেষত্ব বা চোখে পড়ল তা এই বিষয়গুলো পটভূমিকার উপর নানাবিধ রোমাঞ্চকর ঘটনার সমন্বয়ে যে গল্পগুলির সৃষ্টি, তাদের মূল হচ্ছে অতি সামান্য সামান্য করেকটি বস্তু। সামান্য একক বস্তুকে কেন্দ্র করে গল্পগুলো পটভূমির উপর গল্পগুলি গড়ে উঠেছে। ঘনাল গল্পে যে গল্পগুলি আমরা পড়ছি সেই জাতীয়ই আরও দু'টি গল্প (এ ঘনালকেই কেন্দ্র করে) আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ঘনাল সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ বলেই ইঙ্গিতকর অভিহিত করা গেল। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানবরস সমান ভাবে পরিবেশন করে গেছেন বঙ্কলার অন্তর প্রাণের লেখক প্রোফেসর মিত্র। ইহাটিকে এক অত্যন্ত সাহিত্যিক বস্তু বলে অভিহিত করতে অসুবিধা হয় না। গল্পগুলি যথেষ্ট উচ্চারণ, বস্তুনিষ্ঠতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা। সত্যলিঙ্গতার মনকে যথেষ্ট পরিমাণে ভরিয়ে তোলে। প্রোফেসর অপরূপ। এর জন্য যথেষ্ট প্রয়াসের দাবী করতে পারেন প্রাণবন্ত ভক্ত। প্রকাশক—ইন্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড

পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ পাকী হোটে।
দাম—দু' টাকা মাত্র।

অগ্নিসাকী

বাঙালিদের কথাশিল্পীদের দরবারে প্রোফেসর মিত্রের একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। চরিত্রাঙ্গাঙ্গী তাঁর সেবার বক্তৃতাগুলি বঙ্কলায় উপকৃত হয়েছে। ‘অগ্নিসাকী’ তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির সংগ্রহ। একটি আলোকপ্রাণ, সংস্কারমূলক, উচ্চল মনের সাহিত্যপ্রভাবে এক অদ্ভুতবাহুর, কৃষ্ণতার বস্তুত, ভীত প্রকৃতির তরুণ কেমন করে ধীরে ধীরে ভয়ভা, অকৃত, কৃষ্ণতার ভীতমনোভাব, পলায়নমনোভাবের চাত থেকে বৃত্তি পেল সেই কাহিনী অভিনব রকমের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটির মাধ্যমে। নানা ঘটনা-প্রত্যাহারের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে ওঠার প্রকৃতি পুরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ভাবার, বর্ণনার, পটভূমিকার সব দিক দিয়ে গ্রন্থটি প্রোফেসর মিত্রের কৃষ্ণতার অন্তরম শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষরবাহী হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ ভায়াচরণ দে স্ট্রিট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

সৌমন্ত্র সুরগি

প্রতিভার সাহিত্যশিল্পী সুরগি ঘোষের সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলতে যাওয়া এখনকার দিনে খুবই কঠিন। বঙ্কলায় উপন্যাসটি তাঁর সাম্প্রতিক সাহিত্যকীর্তি। অসংখ্য বাণীবিশিষ্টকরী আরও বহন একটি তরুণী বিধবার জীবনের চলার পথ বোধ করে গাভাল এক চোখের সামনে প্রকৃত পথ না পেয়ে সে যখন জীবনের গম্ভীর মধ্যেই দিশাহারা হয়ে বেড়িয়ে তখন কেমন করে সহজ অবতরণ তথা বাণীবিশিষ্ট অতিক্রম করে দিশাহারাভাব কাটিয়ে প্রকৃত পথের তথা প্রকৃত জীবনসঙ্গীর সন্ধান পেল এক জীবনের প্রকৃত পথ অবলম্বন করে নিজের বক্তব্যকে ব্যক্ত করে গেছেন লেখক অথচ তাইই মধ্যে অভাবনীয় প্রকাশ নৈপুণ্যের স্বাক্ষরও তিনি রেখে গেছেন। ঘটনা প্যাম্পার, ফিল্ম, চরিত্রসমূহে গ্রন্থটি সর্বতোভাবে লেখকের কৃতিত্বের স্বাক্ষরমূলক। জন্মের একটি অপরূপ চারিত্র্য। যেমনই বৈশিষ্ট্যবান, যেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। সারা গ্রন্থে কোথাও কোনরূপ ভুলেতা চোখে পড়ে না। সহজ সরলভাবে মূল বক্তব্যকে লিপিবদ্ধ করার ফলে গ্রন্থটি মধুরমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এগারটির জীবনভিত্তিক, অদ্ভুত, জন্মের কোমল-কঠিন বৃত্তিগুলি গ্রন্থে সৃষ্টির তোলার কেন্দ্রে লেখক বিশ্বরবর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। গ্রন্থের নামকরণটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ ভায়াচরণ দে স্ট্রিট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

রিক্সার গান

সাহিত্যগোষ্ঠে রক্তপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বিদ্যুত্বেষণ বন্দোপাধ্যায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী। সাহিত্যিক প্রসিদ্ধি ছাড়াও বহু জনের অঙ্গ ইনি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। বহু সাহিত্য সাহিত্যের

মাত্র তিনি। এক অভিনব পটভূমিকা আঁশ্রয় করে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে আশেপাশে উপভাসটি রূপ পেয়েছে। কর্মের মধ্যেই জীবন আর জীবনের মধ্যেই কর্ম। কর্মের মর্যাদা কথাটির সত্যতাকে কিছুকিছু উপভাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই উপভাসে লেখক বলছেন যে কোন কাজই ছোট নয়, প্রায়সংস্কৃত কর্ম কখনও ছোট হয় না। প্রায়-সংশোধন করে মানুষের ব্যক্তি বা মর্যাদা কখনও নষ্ট হয় না বরং সেই ব্যক্তি বা মর্যাদা আরও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। উপভাসের আরও একটি বিশ্লেষণ। বাংলার বাইরে সে বিজ্ঞা চালিয়ে জীবিকা অর্জন করে, চিকিৎসাকর্মের জীবিকা গ্রহণ করে জীবনের জ্ঞান পথ সে তৈরী করে নিচ্ছে, এবট মধ্যে তার ব্যক্তিজীবন সবচেয়ে বহায্য আলোকপাত করা হয়েছে। হাসি, কান্না, বাত, প্রতিবাদ, অসুস্থতা, প্রেম প্রভৃতির সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ মানুষের আলোচ্য বিকৃতভূমিরে দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। উপভাসটি কালোপাণ্ডী এর অবৈধন স্বপ্নের বোধাপাত করে, লেখকের বক্তব্য যেমনই বলিষ্ঠ তেমনই শক্ত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩ গান্ধী রোড। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

চুলচেরা শোধবোধ

শিশুর সাহিত্যরূপে শিবরাম চক্রবর্তী একটি অবিস্মরণীয় রচনা। ছোটদের আসবে শিবরাম চক্রবর্তীর প্রভাব অমলিন, বিশেষ করে তাদের স্বপ্নের সঙ্গে তাঁর যেন মিথিলা যোগ। সবদিক দিয়ে তিনি শিশুর মনের মাস্টার। তাঁর রচনার মধ্যে শিশুর নিজেকেই দেখতে পায়, নিজেকেই খুঁজতে পায়, তাদের ছোট মনের ধান ধারণা, চিন্তা বহন। ছোটদের উপযোগী গল্পে ছুটিয়ে তোলায় অনবদ্য ক্ষমতা শিবরাম চক্রবর্তীর অধিকারভুক্ত। বর্তমানে তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প একত্রে সংকলিত হয়ে উপযুক্ত পিরোনামার প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলি তাঁর রচনামূলক রচনা থেকে। ছেলেমেয়েরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করবে গল্পগুলির মাধ্যমে, গল্পগুলি প্রত্যেকটিই হাস্যরসাসিক। যে রস পরিবেশনে শিবরামের দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত, রচনার প্রসঙ্গকে প্রতিটি গল্প পরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী আইভেট লিমিটেড, ১৩ গান্ধী রোড। দাম দু'টাকা মাত্র।

হাসির গল্প

সাধারণতঃ গল্প উপভাস লেখক হিসেবে পাঠকসমাজে অসম্ভব সুখোপাধায় পরিচিত হলেও সদয় গল্প রচনাতেও যে তাঁর লেখনী অশূন্য নয়—এতখানি অনেকেরই সুবিস্তৃত। প্রবীণ কথাপিঙ্গী অসম্ভব সুখোপাধায়ের কয়েকটি হাসির গল্প একত্রে সংকলিত হয়ে উপযুক্ত প্রবেশ রূপ নিয়েছে। গল্পগুলি নিছক হাসির গল্প বললে তাদের সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না—হাসির আড়ালে অনেক চিত্তার ধোঁরাক পরিবেশন করে গেছেন দক্ষ সাহিত্যিক। গল্পগুলি বিজ্ঞপত্র লেখাগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ সমাজকে খুঁজে পাওয়া যায়—লেখক তাঁর দয়ালু অলঙ্কার স্পন্দ ও সহানুভূতিমূলক মনের পরিচয় প্রদান পাঠ্য পাঠ্যর মধ্যে পেলে। গল্পগুলির মধ্যে একাধারে

আনন্দময় অনন্য চিত্তার ধোঁরাক পরিবেশন করে লেখক সুখোপাধায়ের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মন্ডলার স্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

তীরভূমি

শক্তিমান কথাশিল্পিরূপে শতাব্দীর বঙ্গোপাধায়ের নাম আজকের দিনের পাঠক পাঠিকা মহলে সুপরিচিত। এক অবসরপ্রাপ্ত পাইলটের পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে উপভাসটি লিখিত। তারকের দুই ছোট ছবি—প্রথম যেতান্নি—দ্বিতীয় যেতান্নি। জীবনের যাত-প্রতিযাত, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না নিয়ে যে বিরাট সেনা-পাওয়ার সৃষ্টি তাই হিসাব মেলাতে নিয়মিত উপভাসের প্রধান পুরুষ সুখের সুখোপাধায়। যেতান্নি সুখাতা তার মেয়ে সোমাবুকে তার পিতৃভূমি ভারতবর্ষ হওয়ার কেমন করে পরিপূর্ণ ভারতীয় আদর্শে তার জীবন গড়ে তুলল সে সম্পর্কে সুখের একটি আলোচ্য পরিবেশন করে গেছেন শতাব্দীর বঙ্গোপাধায়। তৃতীয় পিতৃভূমির ওপর দক্ষতার সঙ্গে লেখক ছুটিয়ে তুলেছেন। উপভাসটির বৈশিষ্ট্য পাঠক-সাধারণকে আকৃষ্ট করবে। বর্ণিত রচনায়, পটভূমিকার অভিনব মিসলকে প্রকাশের দাবী রয়েছে। প্রকাশক—ক্রিবেগী প্রকাশন, ২ ভ্রামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়। পঞ্চাশ মাত্র।

নীলাঞ্জনছায়া

শতাব্দীর বঙ্গোপাধায়ের লেখনী উপভাস রচনার হঠাৎ গল্প রচনাতেও সমনিপুণ। তাঁর এতাব সুখোপাধায় আটটি ছোট গল্প একত্রে সংকলিত হয়ে উপযুক্ত পিরোনামার প্রকাশিত হয়ে আনন্দপ্রকাশ করেছে। তৃতীয় ব্যক্তি, খুঁজে ফেরা আলো, রাণীসির একটি ব্যক্তি, সেই অচেনা মেয়েটির, নীলাঞ্জনছায়া, একটি বান্ধবী স্নেহ, প্রেম ও লুপ্তপুত্র সার্বজনীন গল্পগুলি গ্রন্থে তাম্রলতা করেছে। গল্পগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, উপভাসিক, এবং চিত্তাকর্ষক। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির অভিনব সাধুবাহার। চরিত্রসৃষ্টি, সালগন রচনার এবং পরিবেশ গঠনে লেখক যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। প্রকাশক—ক্রিবেগী প্রকাশন, ২ ভ্রামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

প্রবেশ নিবেদ

চিত্রমেসিনের কাছে এ তথ্য সুপ্রচারিত যে, বাঙালি মুক্তি প্রতীকিত চরিত্রগুলির মধ্যে প্রবেশ নিবেদ একটি। সেই চরিত্র কাহিনী বর্তমানে নাট্যকারের আত্মপ্রকাশ করেছে। নাটকচিত্র আভ্যন্তরীণ দিনের মধ্যবিত্ত সমাজের একটি আভ্যন্তরীণ চিত্র ছুটিয়ে তোলা হয়েছে। মধ্যবিত্তের আভ্যন্তরীণ দিনের পৃথিবীতে বৈচিত্র্য থাকেই যে কত বড় একটি জিজ্ঞাসার চিহ্নের রূপ নিয়েছে নাট্যকার সেই দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মধ্যবিত্তের জীবনে আজকে যে সমস্ত দেখা দিয়েছে তা যেমনই হোক তেমনই ভরাবহ। তারই বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন নাট্যকার এই নাটকের মাধ্যমে। নাটকটি অভ্যন্তরীণ সমাজের একটি এবং সকল দিক দিয়েই নাট্যকার মিহির সেনের দৃষ্টি, দয়ালু মনোভাব এবং সহানুভূতিমূলক মনের পরিচয় বহন করেছে। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মন্ডলার স্ট্রীট। দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়। পঞ্চাশ মাত্র।

দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে
দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



দাঁত ওঠার সমস্যা? বাড়ীর বাবা? একটা নরম কাপড়ে আপনার
আঙ্গুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙ্গুলটা ডুবিয়ে
দিন তারপর আঙুলে আঙুলে শিশুর দাঁতেরে মালিশ করে দিন
এবং তাড়াতাড়ী ব্যথা কমে যাবে আর এর মিষ্টি ও সুস্বাদু
শিশুরের প্রিয়। এটা বিত্তহীন এবং গৃহকর্মে, গুরুত্ব হিসাবে, এসময়
ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের
কাছেই একটা বোতল রাখুন।



বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কুশনটি ভরে নীচের টিকানার পাঠান :
হিন্দুস্থান লিটারারি লিমিটেড, পোস্ট অফিস বক্স নং ৪০২, বোম্বাই।

আমাকে অনুগ্রহ করে পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীনের গৃহকর্মে ব্যবহার
প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার গুরুত্বের মোকামের নাম ও ঠিকানা

P.N.C.

ডিস্ট্রিবিউটারস : আই. সি. আই. (বোম্বাই) প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাস

HYG. 12-529 39



আগোপাচর্য নিয়োগী

আগামী শীর্ষ-সম্মেলনের পটভূমি—

আরও একটি বৎসর চলিয়া গেল, আরও চটল নতুন আর একটি বৎসর। রাশিগণসম্রাট লইয়া আর একটি মহামুহুরের আশঙ্কার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল ১৯৫১ সাল। কিন্তু বৎসরের শেষে আর একটি শীর্ষ-সম্মেলন হওয়ার সভাবনা দেখা দিয়াছে। নূতন ১৯৬০ সালে শীর্ষ-সম্মেলনে বিষয়াদি প্রতিষ্ঠার পথ প্রগম হইবে—এই আশার মধ্যে আরও চটল নতুন বৎসর। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে জেনেভার শীর্ষ-সম্মেলনের পর ১৯৬০ সালের বসন্তকালে আগের শীর্ষ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। প্যারীর Elysee প্রাসাদে এবং Rambonillet-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য এবং পশ্চিম-জার্মানী—পশ্চিমীশিয়ারের এই চারিটি বৃহৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ গত ১৯শে হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে শীর্ষ-সম্মেলন অন্ততম। এই পশ্চিমী চতুষ্পাক্ষ সম্মেলন রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রীর সহিত শীর্ষ-সম্মেলনে সমবেত হওয়া সম্পর্কে একমত হইয়াছেন। এই শীর্ষ-সম্মেলন আগামী ২৭শে এপ্রিল আরও হওয়ার প্রস্তাব করিয়া প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার, জেনারেল ডগলস এবং মিঃ ম্যাকমিলান যঃ ক্রুশ্চেভের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। সোভিয়েট ইউনিয়নও বসন্তকালে শীর্ষ-সম্মেলনে যোগদানের জন্য পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিরূপের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে। তথু সম্মেলনের তারিখ সবচেয়ে দাশিরা হস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন। শীর্ষ-সম্মেলনের প্রথম বৈঠক ২১শে এপ্রিল অথবা ৪ঠা মে আরও হওয়ার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। তারিখ সম্পর্কে একটা নীমাঙ্গা সহজেই হইবে। কিন্তু এই শীর্ষ-সম্মেলনের কলে আন্তর্জাতিক সম্রাটগুলির সমাধানের পথ কতখানি প্রশস্ত হইবে, তাহা লইয়া গবেষণা করা নিম্নয়োজন। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে জেনেভার চারি বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলন বিষয়াদি সম্পর্কে আশার সকার করিয়াছিল। এই আশা সূচক হয় ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে তহানীজন রুশ প্রধানমন্ত্রী যঃ বুলগানীন এবং রুশ কমিউনি পার্টির সেক্রেটারী যঃ ক্রুশ্চেভের বিলাত ভ্রমণে। মার্শাল টিটোর রাশিয়া ভ্রমণ এবং উদার প্রাকালে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী যঃ বলটকের পলডাপিও বিশপাতির আহবান অববাহি সৃষ্টি করিয়াছিল। আর একদিকে

নিরপেক্ষতানীতির জন্য প্রসারের কলেও শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা ক্রমেই পশ্চিমী হইয়া উঠিতেছিল। এশিয়া-আফ্রিকা-রাষ্ট্র গোষ্ঠীর সহতিও ক্রমশঃ সূচক হইতেছিল। কিন্তু বিশ্বের কর্তৃক সুরেখপাল রাষ্ট্রীয়ত করার ঘটনকে কেন্দ্র করিয়া আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মোড় আকস্মিক ভাবে ঘুরিয়া গেল।

পোল্যান্ডের বিকোডের কথাও এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন। পোল্যান্ডের সম্রাট কাটিতে না কাটিতেই হাজেরাতে আবদ্ধ হয় ব্যাপক বন্ধক অত্যাচার। কিন্তু বুটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক মিলন আক্রমণ আন্তর্জাতিক আকাগকে মেঘাকর করিয়া তোলে। পোল্যান্ডে বিকোড, হাজেরাতে প্রতিবিধির বুটেন ও ফ্রান্সের মিলন আক্রমণের সম্মুখে স্থান হইয়া পিয়াছিল। মিলন আক্রমণ করিয়া বুটেন ও ফ্রান্স জরলাত কবিলেও আন্তর্জাতিক চাপে বাধ্য হইয়া তাত্তিকগত পোট্ট সৈন্য হইতে সৈন্য অলসারপের হীনতা স্বীকার করিতে হয়। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সত্ব এবং মেহর-আটক আলোচনা যখন হস্ত আশার সকার করিবার সভাবনা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাতার অব্যবহিত পরেই ১৯৫৭ সালের ৫ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যথাক্রমী রাষ্ট্রগুলির আকস্মিক অধঃপতন ও বাহ্যনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সৈন্যনিয়োগের এক পরিবর্তন ঘোষণা করেন। উহা আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিন নামে পরিচিত। এই পরিবর্তন ঠাণ্ডাযুদ্ধের তীব্রতাকেই তথু বৃদ্ধি করে নাই, উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ হয় ১৯৫৭ সাল। এই বৎসর ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এই বৎসরই বৃহৎ চারিরাষ্ট্র প্রধানদের মধ্যে আর একটি সম্মেলন হইতে পারে, এইরূপ একটা আশারও সঞ্চার হয়। এপ্রিল (১৯৫৭) মাসে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বালিয়াছিলেন যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে তাহা ১৯৫৫ সাল অপেক্ষাও আশাবাদ। মিঃ ডালেস বালিয়াছিলেন, নিরস্ত্রীকরণ, আবহার রাষ্ট্রগুলির প্রতি ব্যবহার এবং জাতিগত ঐক্যবদ্ধ করণ সম্পর্কে রাশিয়া কি করিতে প্রস্তুত তাহাই উপর প্রাচ্য ও পশ্চাত্য শক্তিবর্গের মধ্যে নূতন সম্মেলন আহ্বান করা নির্ভর করিতেছে। তহানীজন রুশ প্রধান মন্ত্রী বুলগানীন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের নিকট যে ব্যক্তিগত পত্র দেন, তাহাও শীর্ষ-সম্মেলন সম্পর্কে আশার সকার করে। কিন্তু ১৯৫৭ সাল এবং ১৯৫৮ সালে এই আশা আলোর আলোর মত ক্রমেই ঘূরে ঘুরিয়া বাইতে থাকে।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর রাশিয়া সর্বপ্রথম প্রথম স্পটনিক মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে। ইহার একমাস পরেই রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পটনিক মহাকাশে উৎক্ষেপণ হয়। উহার সাময়িক তাৎপর্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করিতে পারে নাই। ১৯৫৮ সালের ৩১শে অক্টোবর প্রথম এনপ্রোয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মহাকাশে উৎক্ষেপণ হয়। প্রথম ভেংগার্ড ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ মহাকাশে প্রেরিত হয়। নাটোর বৈঠকের শেষে ৩রা মে (১৯৫৭) মে হুডাড ইজাহার প্রকাশিত হয় তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বিক্ষে কোন আক্রমণ হইলে তাহার সম্মুখীন হওয়ার জন্য বাধ্যতে সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায়, তাহার ফলস্বরূপ

অবতীর্ণ করিতে হইবে। ঠাঁজা বুদ্ধের ভীততা বুঝির মধ্যে ১৯৫৭ সালের শেষ চত্রে, ১৯৫৮ সালেও উভার ভীততা হাস পায় নাই। ১৯৫৮ সালের যে সকল ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তন্মধ্যে ইরাকে সামরিক অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা হরণ, লেবাননে মার্কিন সৈন্ত ও জর্ডানে ব্রিটিশ সৈন্ত অবতরণ এবং ফ্রান্সে জেনারেল ডগলস সার্কসের ক্ষমতা লাভ, কুমর বীপপুঞ্জে চীনের গোলাবর্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি যে ঠাঁজা বুদ্ধকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিবার আলঙ্কারিক বুদ্ধি করে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্যানি আরব গর্ভের প্রচেষ্টার মিলনের প্রেসিডেন্ট আবদুল জামিল মাসেনের উদ্যোগে ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৫৮) মিশর ও সিরিয়াকে সংযুক্ত করিয়া সম্মুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ২রা মার্চ (১৯৫৮) ইয়েমেনও উভাতে যোগদান করে। উভার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ইরাক ও জর্ডান লইয়া কেন্দ্রীয় শক্তির গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ইরাকে ঘটনার প্রত্যক্ষ অঙ্গভূমে প্রবাহিত হইল। ত্রিসোড়বার জেনারেল আবদুল করিম এল কাসেমের নেতৃত্বে ১৪ই জুলাই (১৯৫৮) যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তাহাতে ইরাকের রাজা খিতাব ফৈসল এবং বুবারক নিহত হন, প্রধানমন্ত্রী মুব্বি এম সৈয়দ স্ত্রীলোকের গোণাক পরিয়া পলায়ন করেন। ত্রিঃ জেঃ কাসেমের নেতৃত্বে ইরাকে নতুন সরকার প্রাতিষ্ঠিত হয়। ইরাক পরদিনই অর্থাৎ ১৫ই জুলাই লেবাননে মার্কিন সৈন্ত অবতরণ করে। ১৭ই জুলাই দুই হাজার ব্রিটিশ সৈন্ত জর্ডানে অবতরণ করে। যথাপ্রাচী একটি বাকসমূহে পরিণত হয়। ফ্রান্সে জেনারেল ডগলসের ক্ষমতা লাভ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বুদ্ধের ফ্রান্সের পক্ষিপথিতম প্রধানমন্ত্রী মঃ সিমুলিন প্রধান মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৪ই মে (১৯৫৮) বলেন যে, "আমরা বোধহয় এক গৃহযুদ্ধ কিনাবার আসিয়া পাড়াইয়াছি।" ইহা উল্লেখযোগ্য যে, উভার এই উক্তি কয়েকটা পূর্বে আলজিরিয়ায় ক্রাসী সামরিক অসামরিক বর্ধৃৎস্কের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লয় এক ফ্রান্সেও সামরিক অভ্যুত্থান প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। আলজিরিয়ার সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃবর্গ দাবী করেন যে, জেঃ ডগল ফ্রান্সের শাসনকর্ত্ত্ব গ্রহণ করুন। তিনি তাহাতে সন্মত হন। সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কার ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ জেঃ ডগলকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। অতঃপর জেঃ ডগল যে নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করেন তাহা ২৮শে সেপ্টেম্বর বিপুল গণভোটে গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে অক্টোবর মাসে (১৯৫৮) পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথাও উল্লেখযোগ্য। ৬ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাহানতুল্লাহ বাতিল করিয়া সামরিক শাসন কার্যে করেন এক জেঃ আব্দু বী প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত হন। অতঃপর জেঃ মীর্জা নিক্কেই বিতাড়িত হন এক জেঃ আব্দু বী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫৮) বঙ্গদেশে প্রথম মন্ত্রী উদ্বোধন করা হয় এক জেঃ

উইন বর্ধৃৎ নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের কথাও এখানে বহুবিধ। ১৭ই নভেম্বর (১৯৫৮) পানামা বাতিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল টোভাতিম আব্দু স্ত্রীলোকের শাসন ক্ষমতা হরণ করেন। কয়েকটি দেশে সামরিক বাতিনীর অভ্যুত্থান এক জাতীয় ক্ষমতা হরণ ১৯৫৮ সালের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে উভার প্রতিক্রিয়া অবশ্য অল্পমান করা সহজ নয়, কিন্তু ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বিতে বৃহৎ প্রাচীর ঠাঁজা বুদ্ধ যে কুমর ও মাংস বীপপুঞ্জে কেন্দ্র করিয়া উত্তপ্ত চট্টা উত্তিষ্ঠাচ্ছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুমর ও মাংস বীপপুঞ্জ চীনের দুল ভূখণ্ড হইতে ৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার প্রাচীরে অবস্থিত। এই বীপ দুটি কুমরোসার চিহ্ন সন্মতের অধীনে চিত্রিত। চিহ্নের ১০ জনের সৈন্ত কুমর বীপে অবস্থিত। অর্থাৎ চিহ্নের সৈন্তবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ এই বীপে রাখা হইয়াছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। এই বীপ হইতে আক্রমণ করিয়া পূর্ববর্তী চীন দল কুমর বীপ চিহ্ন কাটশেকের আছে। মার্কিন বুদ্ধবাহী কুমরোসা বন্দু বহিষ্ণ প্রচণ্ড করিয়াছে। এই দাবিদের মধ্যে কুমর বীপপুঞ্জ পড়ে, কি জা, তাহা অনুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় নাই। কুমারিষ্ট চীন কুমরোসা বীপ চীন রাষ্ট্রের অক্ষত্ব বলা দাবী করে। ১৯৫৮ সালের ২৮শে আগষ্ট হইতে চীন কুমর বীপের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করার অবস্থা শুভতর আবার দাবী করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মার্কিন বুদ্ধবাহী কুমরোসা প্রাচীরে নৌশক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু কুমর লইয়া বুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা কি চীন কি মার্কিন বুদ্ধবাহী কেহই চায় নাই। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫৮) আলোপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা শুরু হয়। মীমাংসা হয় নাই বটে, সুদূরপ্রাচীর বুদ্ধের আশঙ্কা প্রশমিত হয়।

১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালের উল্লিখিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই স্বীর্ষ-সম্মেলনের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যিক। ১৯৫৭ সালের শেষভাগ হইতেই সোভিয়েট রাশিয়া স্বীর্ষ-সম্মেলনের দাবী করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট কল পাওয়া না গেলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ স্বীর্ষ-সম্মেলনে সন্মত নহে। এইরূপ অবস্থার ২৭শে নভেম্বর (১৯৫৮) রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট এক নোটিশ প্রদান করিয়া জানাইয়া দেন যে,

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ডাক্তারোগীরাই শুধু জানেন।
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বাকলা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ
রোগী আশ্রয়
লাভ করেছেন

ভারত গণতা রোজি: নং ১৬৮৩৪৪

অঙ্গশূল, পিত্তশূল, অঙ্গপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, তেজুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাঘটি, বুকজ্বালা,
আহুয়ে অরুচি, শূলপানিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশান্ত।
দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, উন্নয়ন
আবশ্যকতা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বকোষে মূল্য ফেরত।
৩২ জোয়ার প্রতি কোটা ৩ টাক, একপ্রো ৩ কোটা - ৮ টা। আনা: ডা. মা. ও পাইকদীঘর পুথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-বালিশাখান (পূর্ব পাকিস্তান)
ফ্র্যাঞ্চ-১৪২, মহাশা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

হয় না। যখন মধ্যে বার্লিন শাসন পরিচালনা সম্পর্কে তৃপ্তি হইতে পারিয়া সন্ধিয়া হইবে, বোম্ব-বোম্বের সমস্ত ব্যবস্থার ভাব অর্পণ করিবে দুর্লভাধীনীয় সরকারের চক্ষে। রাশিয়া আরও প্রস্তাব করবে যে, উক্ত-মার্কিন কর্তাসী নিবন্ধনাটন পশ্চিম বার্লিনতে অসাময়িক কার্যন নগরিতে পরিণত করিতে চাইবে। উক্ত লটন-আবার ঠিকানুস্ত উত্তম হওয়ার আশা করা যায়। পশ্চিমী পশ্চিমবর্গ পরবর্তী সচিব পর্যায়ে সম্মেলনের প্রস্তাব করেন। রাশিয়া তাহা অগ্রাহ্য করে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫১) বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস ক্লার্ক-ফিলান আমন্ত্রিত হইয়া রাশিয়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি রাশিয়াতে পরবর্তী সচিব সম্মেলনে বোগদানে সম্মত কর-উত্তে সমর্থন করি। শীর্ষ-সম্মেলনের উক্ত লটন-এই সম্মেলন হইবে, উক্ত-ইহা হয়। ১৯৫১ মে (১৯৫১) পরবর্তী-সচিব-সম্মেলন আরম্ভ হয়, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছিয়া এই সম্মেলনের অবসান হয়। এই সম্মেলন চলিতে থাকা অবস্থায় মার্কিন পরবর্তী-সচিব মিঃ ডালসেসে বক্তা হয় এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন পরবর্তী সচিবের দাবি প্রস্তাব করেন।

১৯৫১ সালে রূপ সহকারী প্রধানমন্ত্রী মঃ মিকোয়োন এবং কোজলত মার্কিন-বক্তৃতা সত্তর বান। মার্কিন সহকারী প্রেসিডেন্ট মিসেস রাশিয়া সত্তর গিয়াছিলেন। এই যাত্রায় ও আলোচনার ফলে মিঃ ক্রুশ্কেভের মার্কিন বক্তৃতা সত্তর পথ প্রশস্ত হয় এবং গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫১) তিনি মার্কিন বক্তৃতা বান। আইক-কন্ডেট আলোচনা এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ মাকমিলানের প্রচেষ্টা শীর্ষ সম্মেলন হওয়া সম্পর্কে আমেরিকা সম্মত হয়। তেঃ তপল উহার পথে যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন পার্যতে গত ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমী চতুঃশক্তির সম্মেলনে তাহা অপসারিত হইয়াছে।

আগামী বসন্তকালে শীর্ষ-সম্মেলন হইবে। কিন্তু এই সম্মেলনে প্রধানতঃ নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গই আলোচিত হইবে। এই সম্মেলনে বার্লিন সমস্তা আলোচিত হইতে ডাঃ এডেনবার্গের আপত্তি। একটি শীর্ষ-সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণ সমস্তা, বার্লিন সমস্তা, সমস্তই আলোচিত হইতে পারিবে ইহা আশা করা সম্ভব নয়। ইহার জন্য একাধিক শীর্ষ সম্মেলন প্রয়োজন। আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনেই যে নিরস্ত্রীকরণ সমস্তার সমাধান হইয়া যাইবে, ইহাও আশা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এইরূপ সম্মেলন ঠাণ্ডাবুদ্ধের প্রকোপ হ্রাস করিয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করিবে, ইহাই আশা করা যাইতে পারে। গত ২১শে ডিসেম্বর (১৯৫১) বুটেন, ক্রাস ও মার্কিন বক্তৃতা-বাইরে রাষ্ট্র দূতগণ আগামী ১৬ই মে (১৯৬০) পার্যতে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সোভিয়েট পরবর্তী দপ্তরের নিকট পেশ করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভ্রমণ—

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্কেভের মার্কিন বক্তৃতা সত্তর এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত সাক্ষাৎকারের মতই মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের গণিতা, উত্তম আর্থিক এবং পশ্চিম-ইউরোপের এগারটি দেশ ভ্রমণ ১৯৫১ সালের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মার্কিন বক্তৃতা-বাইরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্রমশঃ ক্রান্তি যুব বিল বলাই প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের

এই ভ্রমণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহা অবশ্যই মনে করিবার কোন কারণ নাই। বোধ হয় প্রেসিডেন্ট ট্যাক-ইই সর্বপ্রথম মার্কিন বক্তৃতা-বাইরে সীমান্তের বাহিরে গিয়াছেন। তিনি ১৯১১ সালের ১৬ই অক্টোবর মেক্সিকোর রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যে সর্বপ্রথম ইউরোপে গিয়াছেন প্রেসিডেন্ট উল্ট উলসলন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যে সর্বপ্রথম মেক্সিকো। মেক্সিকো পরিভ্রমণ করিয়াছেন বোধ হয় প্রেসিডেন্ট ক্লাফলিন ডি ক্রজভেট। ময় বৎসরে তিনি ১৫টি দেশে গিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান পটলডায় সম্মেলনে বোগদান করিবার জন্য ইউরোপে গিয়াছিলেন। গত ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের এগারটি দেশ ভ্রমণ করায় তিনি যে সর্বপ্রথম অধিক ভ্রমণকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হইলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ৬ই ডিসেম্বর (১৯৫১) তিনি ওয়াশিংটন হইতে বার্তা করেন এবং বোম্ব, আফ্রিকা, করাচী এবং কাবুল হইয়া ১৫ই ডিসেম্বর তিনি ভারতের রাজধানী দিল্লীতে আগমন করেন। ১৪ই ডিসেম্বর তিনি ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং জেতরণ, এথেন্স, টিউনিশিয়া হইয়া তিনি পার্যতে বান। পার্যতে পশ্চিমী চতুঃশক্তির সম্মেলনে বোগদান করিয়া বার্তা হইয়া তিনি ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ১৯৫৫ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ-সম্মেলনে বোগদান করিয়াছিলেন। বারমুডায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ মাকমিলানের সহিত তাঁহার সম্মেলনও উল্লেখযোগ্য। গত আগষ্ট মাসে (১৯৫১) তিনি পার্যতে, যনে এবং লণ্ডনে গিয়াছিলেন।

ভারত তথা বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের এগারটি দেশে ভ্রমণে বাতির হইয়াছিলেন। রূপ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্কেভের প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত আলাপ-আলোচনার ফলে ঠাণ্ডা বুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের ফলে ভারতে একটা বিকৃত মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মিঃ জন ফার ডালসে পৃথিবীকে বুদ্ধের কিনারার জানিবার পারমর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকা যদিও সাময়িক ভোট গঠনের নীতি ত্যাগ করে নাই, তবু শীর্ষ-সম্মেলনের জন্য উত্তোষী হইয়া পৃথিবীকে বুদ্ধের কিনারা হইতে সরাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা প্রেঃ আটক করিতেছেন। তিনিও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ সীমান্তের পক্ষপাতী হইয়াছেন। ভারতে লোকসভা ও রাজ্যসভার সমস্তদের বক্তৃতা-বিশেষণে সেই কথাই তিনি বোঝা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্তঃসঙ্কার সমর্থনও তিনি করিয়াছেন, বলিয়াছেন— বৃহৎ সাময়িক লক্ষ্যপট্ট এক বিভাজন মতবাদ হইতে উদ্ধৃত এক আক্রমণাত্মক অভিপ্রায় প্রতিরোধের জন্য অন্তঃসঙ্কার আয়োজন করা হইয়াছে। কিন্তু অন্তঃসঙ্কার যে প্রতিবোধিতা চলিতেছে, তাহার পরিণতি বোধ হয় তিনিও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, “নিরস্ত্রিত এবং ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণ আমাদের যুগে একান্ত প্রয়োজন।”

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত ১১ই ডিসেম্বর সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। চীন লক্ষ্যকর লক্ষ্যণ-ভাবে আলোচনা হইয়াছে।



রাষ্ট্রপতি-ভবনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার! রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ যাকিণ রাষ্ট্রপতিকে গজদন্ত ও স্নানকাঠি-
নির্ধৃত কতকগুলি উপহার প্রদান করেন। উপহারগুলির সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার
গজদন্ত নির্ধৃত স্নানের কারুকর্ষের প্রশংসা করিতেছেন।

কিন্তু কাম্বীর তাঁহাদের কাটাচেনার বিঘবস্ত হয় নাই। চীন-ভারত
বিরোধ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যদি নেতৃবৃন্দের নীতির
বাচিতে হইতে না চান, তাহা হইলে বিষয়ের বিষয় হয় না।
নেতৃবৃন্দের সাময়িক জোটে বোগলান করাটতে সম্মত করা সম্ভব নয়।
প্রকাশ যে, রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ যখন যাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সঙ্কে
গিয়াছিলেন, তখন আসন্ন ঐক্য-সম্মেলনের স্বার্থে ভারত-চীন
বিরোধকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আওতার টানিয়া না আনিতে
প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এক মঃ ক্রুশ্চেভ নাকি একমত
হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত ভ্রমণের
পথে যে যুক্ত ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা
হইয়াছে যে, চারিদিন ধরিয়া আলোচনার সময় প্রেসিডেন্ট
আইসেনহাওয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুরকে জানান যে, তিনি যে সকল
সেখ ভ্রমণ করিয়াছেন সেই সকল দেশের নেতৃবৃন্দের তাঁহার নিকট
এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন, সমস্তা যে ধরণেরই হউক না কেন,
শান্তিপূর্ণ আশাবের পদ্ধতিতে উহার সমাধান করা বাটতে
পারে।—ইহা আশাশ্রয় এবং তাঁহার নিজের চিন্তাধারার সত্যও
ইহাতে পূর্ণসামঞ্জস্য রহিয়াছে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের
ভারত ভ্রমণের কলে ভারত-যাকিণ সম্পর্কে যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে,
তাহাতে সন্দেহ নাই।

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ—

আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে ১৯৫১ সালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দুইটি
ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে : একটি ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস এবং
আর একটি চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন। ১৯৫৮ সালের শেষ
ভাগে বালিন সমস্তা লইয়া যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।
২৫শে ডিসেম্বর (১৯৫৮) রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ গ্রোমিক স্প্রীক
সোভিয়েটের যুক্ত বৈঠকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, "Berlin
question will unleash a big world-war if our
proposals are not accepted by the Western
Powers" অর্থাৎ 'পশ্চিমী শক্তিবর্গ যদি বালিন সম্পর্কে আমাদের
প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বালিন সমস্তা হইতে একটি
বৃহৎ বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবে।' তিনি বালিন সমস্তাকে সারাজেভো
(Sarajevo) ঘটনার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। সারাজেভোকে
অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত হওয়ার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হইয়াছিল।
১৯৫১ সালে বালিন সমস্তা সমাধানের পথের কোন সন্ধান পাওয়া
না গেলেও আর একটি ঐক্য-সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে
ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে। চীন কর্তৃক ভারতের
সীমানা লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হইলে সমস্তার পরিণতি

একথা বলে করিলে যোগ হয় বুঝ বৈদী তুল হইবে না। তিস্তেতে দুর্ভিক্ষের বিরোধের সংবাদ ১৯৫১ সালের প্রথম ভাগে বিলাতী প্রকাশনপত্র সূত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভারতে আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারি নাই। মার্চ মাসে (১৯৫১) অসম্ভব সর্বপ্রথম একথা জানিতে পারি। গত ২৩শে মার্চ প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু তিস্তেতে হালদা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই হালদার পরিস্থিতিতে হলাইলমা ভারতে আগমন করেন এবং ভারত সরকার তাঁহাকে আশ্রয়দান করেন।

তিস্তেতে ঘটনাবলীতে ভারতে যে বিকোচ সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এখানে আমরা পাইব না। এই বিকোচের ফলে চীন-ভারত যৈত্রী সম্পর্ক কুণ্ড হয়। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীর ফলে সীমান্ত লইয়া ভারত ও চীনের মধ্যে যে গুরুতর বিরোধ সৃষ্টি হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আগষ্ট মাসের শেষভাগে আমরা সর্বপ্রথম চীনা সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘন এবং নেংফা (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এডেন) বাহাদেব সহিত তাহাদের গুরুতর সংঘর্ষের কথা আমরা জানিতে পারি। গত ২৮শে আগষ্ট (১৯৫১) প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারতের নেতা অকলের ভারতীয় রক্ষা-বীটতে চীনা সৈন্যরা হারলা করিয়াছে এবং লাডাকে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া চীন বীট স্থাপন করিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে পুনরায় চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া যায়। এই সংঘর্ষে একজন ভারতীয় নিহত হয়। চীন ভারত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু পার্লামেন্টে এক খেতপত্র পেশ করেন। চীন ভারত সীমান্ত সম্পর্কে চীনের প্রধান মন্ত্রী মি: চৌ এন লাই এবং পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে যে সকল পত্রালাপ হয়, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নাই। গত অক্টোবর মাসে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু চীনের প্রধান মন্ত্রীকে এক পত্রে জানাইয়া দেন যে, ম্যাকমোহন লাইনই চীন ও ভারতের সীমা-রেখা। তিনি আরও জানাইয়া দেন যে, আগে সৈন্ত অপসারণ করিতে হইবে, তারপর সীমান্ত বিরোধের আলোচনা করা হইবে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে সীমান্ত বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। দক্ষিণ লাডাকে চীনা সৈন্তের আক্রমণে নয় জন টেলিগ্রাফ পুলিশ নিহত হয়। এই সংবাদ ২৩শে অক্টোবর আমরা জানিতে পারি।

উল্লিখিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও চীনের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে যে পত্রালাপ হয়, সে সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা এখানে উল্লেখ করা বাইতে পারে মাত্র। চীনের প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ এন লাই ৭ই নভেম্বর (১৯৫১) তারিখের পত্রে নেহরু চৌ বৈঠকের জন্য প্রস্তাব করেন। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে সীমান্ত সংঘর্ষ বাহাতে না ঘটে তাহার জন্য দুই দেশেরই সৈন্তদল সীমান্ত এলাকা হইতে ২০ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বার মাইল সরাইয়া দেওয়ারও প্রস্তাব তাঁহার পত্রে করা হয়। নেহরু চৌ ঐ পত্রের উত্তরে নেহরু-চৌ বৈঠকে সম্মতি প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু সীমান্ত এলাকা হইতে উত্তর দেশের সৈন্ত ২০ কিলোমিটার সরাইয়া নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া উহার পরিবর্তে একটি প্রস্তাব করেন।

চীন-ভারত সীমান্তের লাডাক অঞ্চল সম্বন্ধে তিনি প্রস্তাব করেন যে, চীনের মানচিত্রে আন্তর্জাতিক সীমান্তে বসিয়া বাহা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার পশ্চিমে ভারতীয় বাহিনীকে সরাইয়া আনিতে নেহরু চৌ যুক্ত আছেন, কিন্তু ভারতীয় মানচিত্রে যে আন্তর্জাতিক সীমান্তে দেখানো হইয়াছে, চীনা সৈন্যবাহিনীকে তাহার পূর্বে সরাইয়া লইতে হইবে। ইহাতে চীনের স্বীকৃত সীমান্তে এবং ভারতের স্বীকৃত সীমান্তের দ্ব্যর্থকতা অকল no man's land-এ পরিণত হইবে। নেহরু চৌ ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, চীনা সৈন্ত যতদিন লংছু দখল করিয়া থাকিবে ততদিন কোন ব্যবস্থাই ভারত রাজ্যে হইতে পারে না। সেই সঙ্গে তিনি উত্তর দেশের সীমান্ত বীট হইতে অগ্রগামী টেলিগ্রাফবাহিনী প্রেরণ বন্ধ করার প্রস্তাবও করিয়াছেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ১৮ই ডিসেম্বরের পত্রে অগ্রগামী টেলিগ্রাফবাহিনী প্রেরণের প্রস্তাবটী তৎপ্রণয়ন করিয়াছেন। লংছু ও লাডাক সফল প্রস্তাব কার্যত: অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বন্দী ভারতীয় পুলিশের উপর অভিযানের কথাও পত্রে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি ঐ পত্রে ২৬শে ডিসেম্বর চীনের কোনও স্থানে বা যেকোন সীমান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য নেহরু-চৌ বৈঠকের প্রস্তাব করেন। তাহার ঐ পত্র পাওয়ার পূর্বে লাডাকে দ্রুত ভারতীয় পুলিশবাহিনীর উপর চীনের অভিযানের সম্পর্কে অীকরম সিং-এর বিস্তৃত বিবৃতি গত ১৫ই ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু লোক সভায় পেশ করেন। এই বিবৃতিতে অসম্ভব বন্দীদের উপর অভিযানের যে কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত মর্শ্বান্তিক। ২৬শে ডিসেম্বর নেহরু-চৌ-বৈঠকের জন্য মি: চৌ এন লাই যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, আলাপ-আলোচনা দ্বারা মীমাংসার পূত্র উত্ত্বাখনের জন্য তিনি সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু তথ্য সম্বন্ধে যেখানে এত মতানৈক্য সেখানে নীতি বিষয়ে মীমাংসা হইতে পারে না।

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের পরিণতি কি হইবে, তাহা অসম্ভবমান করা কঠিন। চীন হয়ত আর ভারতীয় এলাকা আক্রমণ বা অস্ত্রপ্রবেশ করিত চেষ্টা করিবে না। কিন্তু আর যদি আক্রমণ না করে তাহা হইলেও চীন যে সকল স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে সেগুলি সম্পর্কে কি করা হইবে? কান্টোনের অভ্যুত্থানে যেমন পাকিস্তানের দখলে রহিয়াছে, চীন যে সকল ভারতীয় এলাকা দখল করিয়াছে সেগুলিও হয়ত তেমনই মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত চীনের দখলেই থাকিরা যাইবে। আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিবর্গও যুদ্ধের পথ ছাড়িয়া আলাপ-আলোচনার পথই প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা করিতে চায়। চীনও আলাপ-আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু আলোচনার আবহাওয়া এখনও সৃষ্টি হয় নাই।

সিংহল কোন পথে—

সিংহলের প্রধান মন্ত্রী মি: সলোমন বন্দরনারক গত ২৫শে সেপ্টেম্বর আততায়ীর ওলীতে আতত হইয়া তৎপর দিন পরলোক গমন করার পর তাঁহার হত্যাকাণ্ডকে ঘেরিয়া যেমন এক গভীর রহস্যজালের আচ্ছাদন সন্ধান পাওয়া বাইতেছে তেমনই সিংহলের

রাজনীতিও ডিক্টেটরশিপের পথে চলিতেছে, এইরূপ আশঙ্কা করিবারও যথেষ্ট কারণ বর্তমান আছে। মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরন্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ইত্যাকার সম্পর্কে তৎক্ষণাত্ জ্ঞান সংবাদ প্রকাশ সবচেয়ে সেরা প্রথা প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীবিজয়নাথ চন্দ্রনাথ সিংহলের প্রথম মন্ত্রী হইয়াছেন। এমিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইত্যাকারের সহিত যে গভীর দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তাহা ক্রমে বৃদ্ধি বাইতে লাগিল। সিংহলের মন্ত্রিসভার একমাত্র মহিলা মন্ত্রী শ্রীমতী বিমলা দেবী বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রীর আসন হইতে অপসারিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সংবাদ সম্পর্কে সেলেক্টেড আলোচ্য প্রত্যাহার করা হয়। অতঃপর গত ১১শে নভেম্বর (১৯৫১) শ্রীমতী বিমলা দেবী বর্তমানে এক তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মিঃ ইরানলি ডি জরসার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মিঃ ডিক ডি জরসাকে পুলিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইত্যাকারের প্রেরণা করে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে যে পাঁচজন সংসদভাজন ব্যক্তিকে প্রেরণা করা হয়, তাহাদের মধ্যে কোনিরাই ঐতিহাসিক বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান ধর্মবাক্য বেভারেন্ড বন্দরকিত খেরো অন্তর্ভুক্ত। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীজরসা ইকোনেমিরার গিরাছিলেন। মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই তাঁহার মন্ত্রিসভার থাকার বিরোধিতা করায় তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সিংহলের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দলগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রনাথের পদত্যাগ এবং পাল'মেট ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি যে ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে সে সম্বন্ধে ভাবনা করা কঠিন ছিল। এমন কি সিংহলের যে-কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে কিছুমাত্র একমত হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না, তাঁহারাও মিঃ চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একাবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচন্দ্রনাথের কৌশলের সম্মুখে সবই ব্যর্থ হইয়া গেল।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কয়েকদিন পরেই মিঃ চন্দ্রনাথ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি মাসের মধ্যে তিনি সিংহলবাসীদিগকে বিভাগ করিয়া দিবে। তিনি যে তাহা করিতে পারিয়াছেন ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বিরোধীদলগুলি পাল'মেট ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী করিয়াছিলেন। তাঁহারা হয়ত মনে করিয়াছিলেন পাল'মেট ভাঙ্গিয়া দিলে মিঃ চন্দ্রনাথের প্রধানমন্ত্রিত্বও আর থাকিবে না। কিন্তু মিঃ চন্দ্রনাথের পরামর্শ অনুসারে গবর্নর জেনারেল গত ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৫১) পাল'মেট বাতিল করিয়া দিলেন যে, কিন্তু মিঃ চন্দ্রনাথ প্রধানমন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিলেন না। পাল'মেট বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে এই আলোচ্য অবস্থা জারী করা হইয়াছে যে, আগামী ১১শে মার্চ (১৯৬০) সাধারণ নির্বাচন হইবে এবং নতুন পাল'মেটের অধিবেশন আরম্ভ হইবে ৩০শে মার্চ। অতঃপর ১৫ ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে, ক্ষমতায় আসীন দল শ্রীলঙ্কা ক্রিডম পার্টির সহিত তিনি সম্পর্ক হির করিয়াছেন। তিনি ইহাও জানান যে, তিনি একটি নতুন দল গঠন করিবেন। শ্রীলঙ্কা ক্রিডম পার্টির কাছাকাছি সমিতি অবস্থা তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে দল হইতে বহিস্কৃত করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই। ইতিপূর্বে পাল'মেট বাতিল হওয়ার

তিনি পাল'মেটের ক্ষমতার আওতা হইতে বৃত্ত হইয়াছেন। দল হইতে বহিস্কৃত হইয়া আসার সহিত সম্পর্ক হির বন্ধন, দল উত্তর ক্ষেত্রেই সমান। অর্থাৎ তিনি দলের ক্ষমতার আওতার বাহিরে চকিয়া গেলেন। ইহার পর ১৫ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয়, মন্ত্রিসভার পাঁচজন বিরোধী মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত করা হইয়াছে এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহাকে পুনরায় মন্ত্রিসভার গ্রহণ করা হইয়াছে। এইভাবে মন্ত্রিসভাতেও তাঁহার একছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর তিনি কি করিবেন, ইহা-ই প্রশ্ন ঝাঁড়িয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তিনি কি গবর্নর-জেনারেলের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবেন, না সাময়িক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন, না নিজেই ডিক্টেটর হইবেন, তাহা বলা কঠিন। তিনি যদি নিজেই ডিক্টেটর হইয়া বসিতে চান তাহা হইলে সিংহলে গৃহযুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নহে।

বৎসরের সেরা মানুষ—

বার্ষিক বক্তৃতাষ্টের 'টাইম ম্যাগাজিন' এবার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে বৎসরের সেরা মানুষ (man of the year) নির্বাচন করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকার বর্ধিত সংখ্যার কলা হইয়াছে— ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা পরিভ্রমণ করিয়া প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সর্বাধিক পরিজ্ঞাত এবং সর্বাধিক আদৃত হইয়াছেন। সাময়িক পত্রিকাধিনি ১৯২৭ সাল হইতে প্রতিবৎসর বৎসরের সেরা মানুষ (man of the year) নির্বাচন করিয়া আসিতেছেন। এই পত্রিকা ১৯৩৮ সালে হিটলারকে বৎসরের সেরা মানুষ নির্বাচন করিয়াছিলেন। তার উইল্টন চার্লিস ১৯৪০ সালে এবং ১৯৪১ সালে পৃথিবীর সেরা মানুষ নির্বাচিত হইয়া ছিলেন। এই পত্রিকা ১৯৫৮ সালে মঃ ক্রুশ্চেভকে সেরা মানুষ নির্বাচন করিয়াছিলেন। এবারে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সেরা মানুষ নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জঁ-গল এবং পশ্চিম জাৰ্মানীর চ্যান্সেলার ডঃ এডেলবার্ট হইয়াছেন 'রাশাস' আপ'।

ধবল ও

বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল চর্চা, সৌন্দর্য ও চুলের স্বাভাবিক রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন। সময়—সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর রায়শালাল কিওয়ার সেক্টর

৩৩, একতালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

ফোন নং ৪৬-১৩৫৮



জীজগদীশচন্দ্র চ্যাটার্জী

[প্রাচ্যশাস্ত্রবিদ ও গবেষক]

সমগ্র জীবন ধরেই চলেছে এঁর জ্ঞানচর্চা ও প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ে নিবিড় গবেষণা। জীবিতপূর্ব বৃদ্ধ এই পণ্ডিত মাহুটিকে দেখলে সেরেজে আপনি প্রজ্ঞাভাব জাগে। বলতে কি, জীজগদীশচন্দ্র চ্যাটার্জী নিজেই যেন একটি মস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

১৮৭২ সালে বীরভূম জেলায় এই পণ্ডিতপ্রবর জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূমে কল্যাণ চলেও এঁর হাতকীবনের প্রাবৃত্তিক বহুরঙলো কাটে মুর্শিদাবাদের জেমো ও কান্দোতে। জেমো ও কান্দোর যে বিদ্যালয়ে বালক জগদীশচন্দ্রের পড়াশুনো হয়, আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিষদীও



জীজগদীশচন্দ্র চ্যাটার্জী

ছিলেন সেখানকারই একজন ছাত্র। তবে রামেন্দ্রচন্দ্রের বিদ্যালয়ে এঁর চেয়ে বৃদ্ধ খানেকের সিনিয়র ছিলেন।

মুর্শিদাবাদের কান্দো ও জেমোতে পড়াশুনো সমাপ্ত করে জীচ্যাটার্জী চলে আসেন কলকাতায়। প্রবল জ্ঞানপিপাসা নিয়ে তিনি উর্দু হন সরকারী সনুত কলেজে। এখানকার শিক্ষা শেষ হতে না হতেই বিদেশ সরকারের অন্তে তাঁর প্রশ্নে ব্যাকুলতা দেখা দেয়। এবং সে-ও বিভিন্ন শাস্ত্র জ্ঞানলাভের দুরন্ত তাগিদেই, এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার।

ইউরোপ ও আমেরিকার দু'টি মহাদেশের বহু জায়গা ঘুরেছেন জগদীশচন্দ্র। যৌবনের সূচনাতেই সর্বত্র তাঁর বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেতে থাকে। যেখানেই তিনি গেছেন, ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে জোরালো বক্তৃতাও বুদ্ধ করেছেন সকলকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অতীত ভারত কতটা সমৃদ্ধ ছিল, বিশ্ব সমক্ষে এটি প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁর মুখ্য লক্ষ্য।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে জীচ্যাটার্জীর ক্রসলসে প্রস্তুত ভাষণ সেদিনে যুবা-সমাজের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। এই ঐতিহাসিক ভাষণটি সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা, জাহাঙ্গীর, স্পেনার, কল, পোল প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার অনুদিত হয়ে ব্যাপক প্রচার পায়।

পণ্ডিত জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এমনি। রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাদর আমন্ত্রণ আসে তাঁর নিকট—সেখানে তিনটি বক্তৃতা করতে হবে। বক্তৃতা দেওয়া যখন শেষ হলো, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন। তখনই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন বিষয়ে একটি নতুন চেয়ার স্থাপন করেন এবং তাঁকেই সেই সম্মানিত পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

অল্পদিনের ভেতরই অবশ্য জীচ্যাটার্জী রোম থেকে একটিবার দেশে ফিরে আসেন। এই সময় ডাঃ আনি বেনাস্তের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার খ্যাতিতে তিনি এই বিদুষী মহিলার আমন্ত্রণে কান্দোরে যান। তৎকালীন কান্দোররাজ প্রচাপ সিং জগদীশচন্দ্রকে দেখামাত্র তাঁর গুণে আকৃষ্ট হন। সরকারী উত্তোগে কান্দোরে তখন একটি প্রাচ্যবিজ্ঞান গবেষণা ও পুণ্যতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয় এবং এই বিভাগের ভারসিঁপ করা হয় জগদীশচন্দ্রের ওপর। কান্দোরে প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ওদ্ধাবধানে বহু গবেষণা চলে সেই থেকে।

কান্দোরে থাকা অবস্থায় শিক্ষাহুয়ারী জগদীশচন্দ্র যে ভ্রমসংঘর্ষ কাল করেন, সত্যি তা অতুলনীয়! অবতীপূরে ধননকার্য্য মায়ক প্রত্যাশিত আবিষ্কারে তিনিই নিবেদিতলেন অগ্রণী ভূমিকা। কান্দোর প্রসঙ্গে সেই সময় তিনি ধারাবাহিকভাবে মূল্যবান পুঁথি-পুস্তক (সংস্কৃত ভাষার) রচনা করেন। গ্রিক শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে রচিত তাঁর 'কান্দোর শৈববাদ' নামক গ্রন্থখানি শুধু কান্দোরেই নয়, বাইরেও মর্যাদা পেয়েছে প্রচুর।

১৯১৯ সালে পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র আবার চলে যান ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং আফ্রানিয়োগ করেন আগেকার পরিত্যক্ত কাজেই। বিদেশের মাটিতে এই সময় তিনি বেদ ও সংগঠিত বিষয়ে গবেষণায় জন্ম একটি ঐতিহাসিক বিভাগহীন গড়ে তোলে। এই শিক্ষা ও গবেষণা-ক্ষেত্রকে তাঁর ছাত্রী অবদান ও মনোনিবেশ

বিভীত বিষম বাহলে পর জীয়াটাজীকে আপনার জরত্মিতে ফিরে আসতে দেখা গেলো। প্রাচ্যশাস্ত্র সম্পর্কিত কঠিন প্ৰবেশ্য তিনি কখনও নিরস্ত হনেন না। কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিহাস রচনার তিনি ব্যাপৃত হন সঙ্গে সঙ্গে। কণ্ঠস্বীকরণের প্রাতিষ্ঠি কেন্দ্রে তিনি সকলতা লাভ করেছেন, এ কম বোগ্যতার পরিচায়ক নয়।

পশ্চিম জগদীশতন্ত্রকে একটি দলী ও পরদ্বৈতবোধ-প্রাণ বলে জমনি চেনা যায়। দেশ ও দেশ তাঁর দৃষ্টিতে বরাবরই অনেক বড়। লোকমাত্র বালগঙ্গার তিলকে মাল্যের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত অগ্রণী। সেগিনের তাঁর ব্যাকুল জীবনের ম্যাক্সিমেলারের দ্বন্দ্বের স্পর্শ করেছিল—বুটিশ পার্লামেন্টের সমক্ষে তিসকের আও হুজির দাবী জানিয়েছিলেন তিনি (ম্যাক্সিমেলার) এইই কারণ।

হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় দর্শন বিষয়ে কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ তাঁর রয়েছে সত্য ও ইংরেজী ভাষায়। অল্প দিন মধ্যেই তিনি ৮৮ বছরে পূর্ণাঙ্গ করতেন, কিন্তু তাঁর দেখনী এখনও হচ্ছে ক্রিষ্ট ও সক্রিয়। 'A Vedic Version of the Biblical Exodus' ও 'Vedic view of Man and Universe' নামে দুইটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনার তিনি আজও ব্যাপৃত। এই জ্ঞানতপস্বীর কাছে আরও পাওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে একা সেটি নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবার নয়।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিজ্ঞ]

একটু আগাগেই ঘর। পড়ে—এই বাহুটি তাঁর বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন—বাচনভক্তি রয়েছে এঁর একটা বিশিষ্টতা। রাজনীতিক ইনি বরং কয়েক নিম্নেছেন সমগ্রতা দিয়ে আর সেটি বামপন্থী তথা বিপ্লবাত্মক রাজনীতি। আর, সি, পি, আই, নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন-প্রিয়তার মূল কারণটি বোধ হয় এই।

বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান কোড়িসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সৌম্যেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৯০১ সালের ৮ই অক্টোবর। তাঁর পিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলার একজন প্রখ্যাত কবি ও গল্পলেখক এবং সে মূহুরে 'সম্মান' সম্পাদক। সৌম্যেন্দ্রনাথের পিতামহ ছিলেন স্বপ্ন-প্রবাহের প্রচী, বাংলা বেথালপির উদ্ভাবক, স্বপ্নীয় পশ্চিমাঙ্গণ্য কবি যজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (মহাবি সৌম্যেন্দ্রনাথের বড় ছেলে)। স্বপ্নীকনাথ ছিলেন তাঁর খুরাপিতামহ, ধীর কাছে তিনি নানাভাবে স্বপ্নী। পরিবারের সকলের কাছ থেকেই অসুস্থ হলে জুটাই তাঁর ছেলেবেলায়, বৈশিষ্ট্যটি সৌম্যেন্দ্রনাথ আজও গিরে থাকেন।

কলকাতার দক্ষিণাভার সেকালে একটি বিদ্যালয় ছিল—নাম প্রোভেল ইন্সটিটিউট। বালক সৌম্যেন্দ্রনাথের হৃদয়লীলন শুরু হয় সেই বিদ্যালয়েই। তারপর তিনি পড়াশুনা করেন মিত্র ইন্সটিটিউটে আর এখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন ১৯১৭ সালে। কলেজ-জীবনের চারটি বছর তাঁর কাট প্রেসিডেন্সি কলেজে—বহুপাঠ্যের অত্যন্ত ছিলেন ভাষাশাস্ত্র। পরলোকগত কলকাতার কঠিন জীবনযাত্রা

দুখান্দী)। এই কলেজ থেকে ১৯২১ সালে তিনি বি-এ পাশ করেন অর্থনীতিশাস্ত্রে অনার্স সহ।

কলেজে পড়াশুনা শেষ হতে না হতেই শুরু হয় সৌম্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা দেশসেবা। বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেন। তখন ভারতময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন চলছে। একজন সৈনিকরূপে তিনিও এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

কিছুকালের ভেতরই গান্ধীজীর সাথে বিপ্লববাদে বিশ্বাসী দুইক সৌম্যেন্দ্রনাথের সংঘাত বাধে। ক্রমে তিনি সোভিয়েত বা সমাজ-তান্ত্রিক মতধারায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বাংলার সেমিনে শ্রীঅকুল গুপ্ত, কবি নজরুল ইসলাম, হেমন্ত সর্কার ও মুক্তকণ্ঠের আমদে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্বে 'ওয়ার্কার্স' এণ্ড শেভেন্ট পার্টি নামে 'রে রাজনৈতিক সংগঠনটি গঠিত হয়, তাতে তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। ১৯২৭ সালে তিনিই এই পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সৌম্যেন্দ্রনাথ এইখানেই অবস্র নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারলেন না। আপন রাজনৈতিক জীবনামশকে এগিয়ে নিয়ে বাবার জন্ম তাঁর মাঝে চক্কলতা দেখা দেয়। তিনি ইউরোপ সফর করে চলে—ফ্রান্স থেকে জাভাঙ্গী, জাভাঙ্গী থেকে রুশিয়া এই সব স্থানে। রুশিয়ায় তিনি সে সময় কটান পর পর দুটি বছর। ১৯২৮সালে মস্কো-এ কমুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের যে বঠ বিধ-কংগ্রেস হয়, তাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং। ইতোমধ্যে মাদ্রাস সান-ইয়াংসেনের সভানেত্রীও মস্কো-এ এশিয়াত নির্যাতিত দেশগুলির একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনও ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন এম্ এন্ড রায়ে (মানবেন্দ্রনাথ) সঙ্গে দুইক সৌম্যেন্দ্রনাথ।



শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপাধি গ্রহণ করেন ও শিতার নিকট কবিদ্বারী পাঠ সমাপ্ত করিয়া চিকিৎসা আশ্রয় করেন। পরবর্তীকালে সুখ্যাতি ক্রিংশসকলপে বিমলানন্দের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আছে স্নানায়ত্ত শিতা বাচস্পতি মহাশয়ের স্তম্ভনোচিত শিকা, অম্বুপ্রেরণা ও সাহচর্য। তাই ১৩৪১ সালে পিতৃসেবায় তিরোধান তাঁহার জীবনে চরমাবস্থা হান। সন্তে ও বাচস্পতি মহাশয়ের উদার ও সুনিপুণ বিচারমূলক মতবাদ তিনি স্মৃতি ও নিপুণভাবে প্রয়োগ করিতে থাকেন।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে প্রস্তুতিত গোড়ার সর্ববিভাগতনের স্তম্ভন অম্বুপ্রেরণা চিত্তবজ্রনের অম্বুপ্রেরণায় বাচস্পতি মহাশয়ের বিরাট আত্মিক প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিকশীর্ষ নামে জাতীয় অম্বুপ্রেরণা কলেজের সুপ্রতিষ্ঠা হইলে দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সম্পাদক, সচাধ্যক্ষ ও সর্বদা সুপরিচালনা করেছেন তর্কতীর্থ মহাশয়। এরই উজ্জ্বল ১৩৪০ সালে নিখিলবঙ্গ অম্বুপ্রেরণা মহা সম্মেলনের মাধ্যমে সমস্ত কবিব্রাজগণ এক মিলন ক্ষেত্রে মিলিত হন। ইহার পর বিভিন্ন প্রান্তের ষ্টেট ক্যাকাণ্টী বা কাউন্সেলগুলির বিভিন্ন বর্ষব্যয় সামগ্র্য বিধান ও সর্বভারতীয় সম্মেলন (Convention of All India State Boards) গঠিত হয়, তাঁহারই অল্প পরিলম্বে। লক্ষ্যে অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ঐবৎ প্রস্তুতকারীদের নিখিল ভারত সংস্থার (A. I. Pharma Congress), কলিকাতা ও দিল্লী অধিবেশনদ্বয়ে অম্বুপ্রেরণা মাধ্যম সভাপতিত্বপে তিনি পৌরোহিত্য করেন। কালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও জামনগর সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইত্যাদির অম্বুপ্রেরণা বিভাগের সহিত কোন না কোনরূপে তিনি সংযুক্ত ছিলেন বা আছেন।

সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং উহার প্রচার ও প্রসারের জন্য সঙ্গ্রামী মনোভাব থাকায় তিনি গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা সংস্কৃত এ্যাসোসিয়েশন, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, নিখিল ভারত সংস্কৃত সম্মেলন, সরকারী সংস্কৃত কলেজ, সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদ প্রভৃতির সহিত সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন বা আছেন। ইহা ছাড়া ভারতসেবক সমাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বিবেকানন্দ মিশন, ওয়াকিং মেনস ইন: প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার অচ্ছেদ্য বন্ধন রহিয়াছে। তর্কতীর্থ মহাশয়ের উজ্জ্বল কিছুকাল পূর্বে নবদ্বীপ (বিজ্ঞানসর) সর্বভারতীয় বৈকুণ্ঠ সম্মেলন অধিষ্ঠিত হয়।

অম্বুপ্রেরণা সম্মেলনী নামক দায়িক পত্রিকার পরিচালক থাকা কালীন তিনি Journalists Asscn. (অধুনা ভারতীয় সংবাদপত্রসমিতি সংস্থা) সভাপতিত্ব নিরীক্ষিত হইয়াছিলেন।

বিমলানন্দের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের সময় ছিল এক যুগ-সম্বন্ধপ। ১৯২১ সালের দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলন—বিপুল বৈভব ও বিরাট পলায় ছাড়িয়া প্রখ্যাত আইনজীবী চিত্তবজ্রন অম্বুপ্রেরণা নামে জনগণের নেতা—শরিকল্পনা করেছেন গোড়ার সর্ববিভাগতনের—সহকামিগণে পেয়েছেন সুভাষচন্দ্র (নেতাজী), কিরণচন্দ্র রায় প্রভৃতি। এই মহান নেতা সাক্ষ্য করছেন আর এক দিকপালের সঙ্গে—তিনি ইংলেন্দ দেশবিখ্যাত অম্বুপ্রেরণা পণ্ডিত ব্রাহ্মদাস বাচস্পতি। পণ্ডে উল্লভ অম্বুপ্রেরণা জাতীয় প্রতিষ্ঠান বৈজ্ঞানিক শীর্ষ। যুবক বিমলানন্দ সেই সময় তাঁহার সহিত পরিচিতি হইল এবং তাঁহারই নেতৃত্বে ১৯২২

সালে কংগ্রেসে ও স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে এক বোঙ্গে কাজে লিপ্ত হন। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় বিধান পরিষদে মহোদয় কেন্দ্র হইতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে নিরীক্ষিত হন এবং উহা ব্যকটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তথা হইতে পদত্যাগ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে এক উপনিরীক্ষাচনে কলিকাতা করপোরেশনের সদস্য হন।

১৯২২ ও ১৯২৭ সালের সাধারণ নিরীক্ষাচনে তিনি বর্তমান জেলার পূর্বস্থলী কেন্দ্র হইতে বিধান-সভার সদস্য হন। বর্তমানে তিনি কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সাধারণ সম্পাদক। নিজ এলাকার সহিত তিনি সর্বদা ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন।

বিশিষ্ট এটর্নী রম্ভকপূর নিবাসী শ্রীনবদ্বীপ রায়ের পৌত্রী ও প্রতাপ রায়ের কন্যা শ্রীমতী জ্যোতিষ্মতী দেবীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুত্র শিবানন্দ স্বর্গগত, দ্বিতীয় পুত্র ব্রহ্মানন্দ এখন জাখাগীতে গবেষণা কার্যে ব্যাপ্ত।

১৯১৫ ও ১৯২১ সালের বঙ্গাধিবাস্ত্র এলাকার সভ্যদ্বয়দের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আর্জুত্রাণে নিজেই নিয়োজিত রাখা—তথাকার বাসিন্দাদের মনে আস্থা কিরাইতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার কলিকাতার গৃহে দুঃস্থদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসা ও ভরণপোষণ অনেকের নিকট অজানা রহিয়াছে। তাঁহারই বংশগত ধর্ম অধিধাসবা আজিকার দিনেও রান হয় নাই। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পণ্ডিতাচার্য প্রভৃতির সভাপতিত্বে বহু সম্মেলনকর্তৃক তাঁহার জন্মতিথি পালনও তাঁহার লোকপ্রিয়তার পরিচয়।

নম্র পিতার সুযোগে জনন—অর্থগম যথেষ্ট—উন্নতির শীর্ষে অবস্থান—সুবিধিত বংশগরিমা—তথাকার বিমলানন্দ তর্কতীর্থ হলেন সাদাসিধা, আত্মভোলা, সংপথব্রতী, নিজেতা ও বিপদাপন্নের সহায়।



অম্বুপ্রেরণাচার্য কবিব্রাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ

ঐশ্বরেশচন্দ্র বসু

[উড়িষ্যার বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজসেবী]

বাল্যে ও ছাত্রজীবনে যিনি অর্থাভাবে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন—পঠদশার যিনি পরের আশ্রিত পুস্তকে পাঠ সমাপন করেছেন—অবসর সময়ে যিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকসম্মানের মাধ্যমে জীবিকার একাংশ সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন—পরবর্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও নিজ আয়ের এক বৃহৎ অর্থাংশের দান ব্যয়িত করেন উড়িষ্যার অত্যন্ত বিশিষ্ট আইনবিদ মানবন্দরদী ঐশ্বরেশচন্দ্র বসু।

পরেচন্দ্র ১৮৯৬ সালের ৪ঠা আগস্ট বঙ্গীয় গোনাড়ার (কাঁধি মহকুমা) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৮কুমারচরণ বসু ও মাতা হলেন ভববানিপুত্রের বিশিষ্ট বাসিন্দা ৮হরিচরণ দেবের তনয়া ৮মোক্ষানন্দিনী দেবী। ছয় ভ্রাতা ও দুই ভগিনী মধ্যে পরেচন্দ্র হলেন সপ্তম সন্তান। প্রথমে মেদিনীপুর, পরে বালেশ্বর জিলা স্কুলে ও শেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্তৃত্বল বারিশালা ঐশ্বরামচন্দ্র হাইস্কুলে পড়েন। তখন প্রথম শ্রেণীর (ক্লাস টেন) যাহিনা ছিল আট আনা। বিভাগের অত্যন্ত শিক্ক হিসাবে তিনি পেরেছিলেন ৮প্যারীচরণ সরকারের পুত্র বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ৮শৈলেন্দ্রনাথ সরকার ও ৮পরিশচন্দ্র লাহাক। তিনি ১৯১৫ সালে মেদিনীপুর কলেজ হইতে আই-এ ও ১৯১৭ সালে বিভাগাগর কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। এই সময় পরেচন্দ্র মহুবভক্ত রাজমাতা মহারাজী স্মৃতিচর দেবীর ও পরে অধ্যাপক (নাট্যাচার্য) পরলোকগত শিশিরকুমার ভাট্টা মহাশয়ের ঘৃণে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। পরে মহুবভক্ত রাজবংশের ঐশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য-গৃহশিক্ক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। অর্থাভাবে এক বৎসর পড়াশুনা বন্ধ রাখিয়া তিনি ১৯২০ সালে ইংরাজী লিখিতে এম-এ পাশ করেন। বিভাগের ও কলেজের সহকারীদের মধ্যে ঐশ্বরীলক্ষ্মী সেনাপতি আই. সি. এল. ভূতপূর্ব সিন্ডিক্যাল বর্তমানে টাটা কোম্পানীর অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর শ্রী এম. এম. ধর ও ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রী রমাশ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হওয়ার তাহাকে এক বৎসর শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। ১৯২৪ সালে শ্রী বসু সম্মানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ হইতে আইনের শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন।

দুই বৎসর মেদিনীপুর কোর্টে ইন্ফল প্রোভোসের পর পরেচন্দ্র ১৯২৭ সালে মহুবভক্ত টেট হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করিয়া অল্পসময়ের মধ্যে সুনাম অর্জন করেন এক বিহার-উড়িষ্যার অত্যন্ত বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট হিসাবে পরিগণিত হন। কলিকাতা যাদের অধ্যাত আইনকেন্দ্রের সহিত তিনি বহু মামলার জ্ঞান গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উন্নতির মূল্য হল একাধিক আশ্রিত আইনের সুস্বাভাবিক লিখন। দশন ও প্রদোষগণিতপুণ্য।

প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের বৈশািবোধ থাকার জীবন অর্ধহীন স্বাভাবিক বহু জটিল মামলা পরিচালনা করেছেন নিজস্বায়ে অথবা নিজ প্রাণা না লইয়া। অর্ধ বোভগার তথু তাঁহার কাম্য নয়—



ঐশ্বরেশচন্দ্র বসু

গৃহীত মামলার বিজয়মাল্য লাভ তাঁহার মুখ উজ্জ্বল। তাঁহার গৃহে রক্ষিত নিজস্ব গ্রন্থাগার তথু আইনের পুস্তক নহে—সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সমৃদ্ধ।

তিনি বলেন যে, মহুবভক্ত রাজ্যের বিচার বিভাগ আদর্শবানী ছিল। বহু বিশিষ্ট আইনজীবী এই রাজ্যের বিচারপতিরূপে কাব্য করিয়াছেন। ইহার ভূতপূর্ব দেওয়ান পরলোকগত ডাঃ প্রমোদকুমার সেন ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগীর সহিত পরেচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় ছিল।

১৯২২ সালে তিনি বসিরহাটের অত্যন্ত জমিদার ৮হরিমোহন মহম্মদারের কন্যা শ্রীমতী সুবীরা দেবীকে বিবাহ করেন। শাহী দীনেশ মহম্মদার, ভারতসভা ভবনের সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রনাথ মহম্মদার এম. এল, সি এবং বসিরহাটের ভূতপূর্ব পৌরাধিপতি ও এম. এল, সি শ্রীসুবীয়েন্দ্রনাথ মহম্মদার হলেন শ্রীমতী বসুর ভ্রাতা। শ্রীশ্রীগামকুমার পরমহংসদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও উড়িষ্যার প্রবীণতম আইনজীবী শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীমতী বসুর মাণ্ডল। নেতাজী-শিক্ষাঙ্ক ৮বেদীমাধব দাস শ্রীমতী বসুর কলিকাতা পিতৃগৃহে থাকিতেন। সেই সময় পরেচন্দ্রের সহিত তাঁহার খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়—কলে তিনি অনেক আন্দোলনের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন। বেদীমাধব বাবুর দুই কন্যা কল্যাণী ও বীণা দেবীর-সহিত শ্রীমতী বসুর শ্রীভার সম্পর্ক ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'সর্বোচ্চনী বহু বর্ণগদক' পরেচন্দ্রের ডাক্তার্য সুস্বাভাবিক।

নবাগতদের বর্তমানে আইন ব্যবসারে কোনরূপ সুযোগের আশা নাই এবং উড়িষ্যে অনাদৃত খনিজ-সম্পদকে কার্যে প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া শ্রী বসু মনে করেন।

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বন্ধুত্বমতীর উল্লেখ করবেন]

স্মৃতির টুকরো

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

ফিরে এলুম কলকাতার। পার্ক স্ট্রীটের উপর স্ট্রিকেন কোর্টের
অবস্থিতি। স্ট্রিকেন কোর্টেরই একটি ফ্ল্যাটে আমরা থাকতুম।

ফ্ল্যাটটিকে সাজানুম সম্পূর্ণ শিল্পকলচরিত্র করে—শিল্পবোঝা, কলিচান
ও সৌন্দর্যসম্পন্ন প্রাচীর বিশেষগুলি বীণের প্রতি ব্যবহার করা
চলে অনারাসে—আমাদের সেই বন্ধুরা অন্তত এ অভিমত প্রকাশ
করেছিলেন। ললিতকলার বিভিন্ন বিভাগে এঁদের আধিপত্য, কেউ
ক্যামেরার হাতল ধোঁরান, কারো কারবার রঙ আর তুলি নিয়ে—
কেউ বা লেখনীর মাধ্যমে সেবা করে চলেছেন বাকসেবীর আবার
কেউ কেউ বা সামাজিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাবশালী। সেই
শিল্পোৎসাহীর মতই বলতেন যে ফ্ল্যাটটির 'অলঙ্কার-কর্ম' নাকি
অনেকখানি শিল্পমূল্য বহন করে। তবে এ কথা মিথ্যা নয় যে ফ্ল্যাটটি
ছেড়ে যখন আমরা চলে গেলাম তখন স্পষ্ট অনুভব করছি যে বেমনার
এক বিরাট বোকা সমস্ত মন-প্রাণ যেন একটু একটু করে আচ্ছন্ন করে
ফেলেছে। ফ্ল্যাটটির আভ্যন্তরীণ সজ্জা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারার
পরিচয় বহন করত। 'পরগম' ছবিটির সঙ্গে তখন আমি চুক্তিবদ্ধ।
—তার চিত্রায়ণের নির্ধারিত সময়টি হারদশে করাঘাত করার
স্ট্রিকেন কোর্টের অবস্থিতির বহনকাটা চানতে হল।

আত্মবিশ্বাস বলুন বা বন্ধনই বলুন—বাই এলুম, কলকাতা শহরে
আমার কাছে এই আত্মবিশ্বাস বা বন্ধন ছিলেন আমার বাবা। বাবার
খুব আস্থার মতো ছিলুম আমি। কথা নিলুম বাবার কাছ থেকে
যে তিনি বোম্বাই আসবেন এবং শুধু আসা নয়, থাকবেনও
আমাদের কাছে।

বাবার কথা মনে পড়ছে। সেই স্নেহময় পুরুষের অনবদ্য
সন্ধান-বাৎসল্যের কাহিনী। সেই সব অসংখ্য কাহিনী যেন জীবন্ত
হয়ে আছে স্মৃতির রোজনামচায়—যত বাবাকে কেন্দ্র করে এই
সময়টার কথা মনে পড়ছে ততই বার বার একটি ঘটনার স্মৃতি
দুয়েকিরে নানাভাবে কেবলই মনের মধ্যে ভেসে উঠছে; আর
বেমনার মনকে কেবলই বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর করে তুলছে। ভাকে
স্মৃতি বলব কি অশ্রুতের নিষ্ঠুর পরিহাস বলব, আজও ভাট্টিক করে
উঠতে পারছি না। এই বিশেষ স্মৃতিটি বেঁচে আছে কল্প রসকে
জিভি করে।

বেমন কলকাতা ছেড়ে বাই, হাওড়া ঠোলে কটে বাওরা
একটি ঘটনার কথাই এখানে বিবৃত করছি—আমরা কলকাতা
ছেড়ে বাছি—বাবা এসেছেন আমাদের বিদায় দিতে। এসেছেন
অসংখ্য অমুহুরী বন্ধুর মত। পেরোতনের সঙ্গেই আলাপ-
আলোচনার সেদিন প্রায় সবটুকু সময়ই বিরোধি—আর বাবা? বাবার
প্রতি সেদিন দেখিয়েছি যথেষ্ট উল্লাস—এ আচরণ নির্বুদ্ধিতার
নিদর্শন ছাড়া আর কি? ট্রেন ছেড়ে গিল, লোকপু থেকে তার
ছাড়ার বেয়েল, ধীরে ধীরে তার সর্বাঙ্গে আসতে লাগল পড়ীর এক
দুর্দমনীয় বেগ। ভাবের রূপান্তরিত হল জন্মে। ফ্ল্যাটকর্ষ থেকে
যখন মনে হয় যে ট্রেনটা যুঁজি বা টিকি আছে, ফ্ল্যাটকর্ষটাই হয়তো
চলে শিখরে—বন্ধুরা দূরপাল্লার পৌহতে পায় অজ্ঞানের ব্যবধান
হ্রদশ বা অসংখ্য কক্ষের ভাঙা-পড়া-করা-কৃত্রিম নিঃসঙ্গ



যশপট

জন্মবর্ষ ক্রমাগতি নাড়ায়। তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি যে কখন
সেওরা সঙ্গেও শেষ পর্বত বোম্বাইতে গিয়ে আমার কাছে থাক। বাবার
পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না। বাবাকে বোম্বাইতে নিজের কাছে
রাখবার বহুব্যবসায়িত বাননা নিখুঁত রূপ নিয়ে দেখা দেবে—
কৃপাক্ষেপেও কি এ কথা ভাবা বা এ বিষয়ে চিন্তা করতে আমার পক্ষে
সেদিন সম্ভবপর হয়েছিল যে এই ক্রমাগতি দিয়ে বিদায় জানানোর
মতোই চিরবিদায়ের ইঙ্গিতটি লুকিয়ে রয়েছে। পার্থিব জীবনে
পিতা-পুত্রীর মধ্যে সেই শেষ সাক্ষাৎ, নখরলেহে বাবাকে দেখার
সেই চিরকালীন সমাপ্তি। চিরকালের জন্তে বাবাকে যে সেই
শেষবারের মত দেখছি এ চিন্তা করাও কি আমার পক্ষে তখন
সম্ভবপর ছিল?

বারোটি মাস গিয়ে তৈরী এক একটি বছর—যখন তাদের
যেহা কুরিয়ে বাওরার বিদায় নেয় তখন খতিয়ে দেখলে দেখা যায়
যে কত কি সে রেখে গেছে আমার কত কি সে নিয়েও গেছে;
জগৎকে নানাবিধ দিয়ে পূর্ণ সে করে তোলে যেমনই পৃথিবীকে
আবার নানাবিধ দিয়ে শূন্য করতেও তার বিদায় নেই। তেমনই
১১৪০ সাল আমাদের পারিবারিক জীবনে এল এক সর্বনাশা ইঙ্গিত
নিয়ে। তখন তো তেতারিঙ্গ প্রায় শেষ হতেই চলেছিল, তেইশটি
দিন পার করে গিলেই বিংশ শতাব্দী চূড়ান্তে পা দিত কিং বা
হবার তা তেইশ দিন থাকতে থাকতেই হয়ে গেল। ১১৪০ সালের
৮ই ডিসেম্বর বাবার দেহান্তর ঘটল। অনিত্য পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন
ছিন্ন করে পৃথিবীকে শেষবারের মত বিদায় নমস্কার জানিয়ে গেলেন
বাবা। আমরা চিরকালের জন্তে হারালুম পরম স্নেহময়, বরদী,
সহানুভূতিমূল আমাদের বাবাকে।

আমার কাছে বোম্বাইতে এসে থাকবেন বাবা, এই রকম কথা
ছিল। আগেই বলেছি যে কোন কারণেই হোক—কারণটি অব্যক্ত
এখানে অনুভবই থেকে থাক—তবে এইটুকু শুধু লিপিবদ্ধ থাক যে
শেষ পর্বত বাবা সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেননি। বাবার এই সব
কথা বত মনে পড়ছে অজ্ঞ যেন ততই ভিতরকার সবস্ত বীজন
অবীকার করে গেলে বোম্বাই আসতে চাইছে।

বোম্বাইতে শ্রীএস. সি. দেবাইয়ের নেতৃত্বে আমি 'পরগম' ছবিটির
কর্ম করি। ছবি প্রযোজনাটি সামকল্য হলেছিল অল্প শিল্পকর্ম

সিটিয়ে। এর পর চুক্তিবদ্ধ হলুম প্রখ্যাত প্রযোজক শ্রীচাঁদলাল শার সঙ্গ, তাঁর রচিত বিদ্য কৌশলীতে তখন প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান শ্রেণীর শিল্পী যে এক অভাবনীয় সমাবেশ, যেমন নিউ থিয়েটারের যুবকসখ্যাত অভিনয়গীর শিল্পী স্বর্গীয় কুনলাল সাংগল, অশেষ বশের অভিকাবিনী কণ্ঠ ও অভিনয়শিল্পী শ্রীমতী খুশীদ, অত্যন্ত সৌকর্যের চিত্রনাট্যক পুস্তক এবং আরও অনেকেই। সেখানে আমি হু'খামি ছবিতে অভিনয় করি। 'শব্দ-পার্বতী' ছবিটিতে আমার বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেতা অরুণ। ইনি সাগর হুটিয়েনের একজন কৃতপূর্ব শিল্পী। আমার সঙ্গে বাজনার্তকীর পর আমার প্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে শব্দ-পার্বতী একটি। অবশ্য এ বিষয়ে আমার মত অত্যন্তই হতে পারে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে অরুণ শব্দের ভূমিকার অনবদ্য অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিল। এই ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন শ্রীচতুর্ভূজ দোশী। এর পরের ছবি বিকল্প। পরিচালনা করেছিলেন শ্রীকমার শর্মা। এর কাল্পনিক নিউ থিয়েটার থেকে (পরবর্তীকালে স্বামী কী রাণী খ্যাত সোবার মোদী সহযোগিতা সহসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী মেহতাব অভিনীত 'চিত্রলেখার' মাধ্যমে দর্শকসমাজ থেকে যিনি প্রকৃত সমুদায় অর্জনে সর্বাঙ্গ হয়েছিলেন।) বিকল্পের আমার বিপরীত ভূমিকার দেখা দিয়েছিলেন দুজন বিখ্যাত অভিনয়শিল্পী পুস্তক ও পূর্ণাঙ্গ। একটি নারীকে কেন্দ্র করে মাহুবেব সনাতন স্বল্পযুগের পটভূমিকার গড়ে উঠল ছবি গল্পাং।

বিকল্পের এসঙ্গে অনেক ঘটনাই মনে পড়ছে। অভিনয়ের সঙ্গে অভিনয়ের বাইরে কত ঘটনার টুকরো টুকরো স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠছে জীবন্ত স্মৃতি নিয়ে। বিকল্পাং চিত্রায়নের সমগ্র কয়েকটি ঘণ্টে বাওয়া ঘটনার উল্লেখ করা আশা করি অসমীচীন হবে না, এবং আমার জীবনস্মৃতির সঙ্গে তাদের যোগসূত্রও কিছু কম-অধিক। বিকল্পার সেটে প্রচুর হাঁসকোকুকের মধ্যে দিয়ে সময় কাটত আমাদের। বিকল্পার নামকরণ নিয়ে পরিচালক কেমার শর্মা, হুস্তক, পূর্ণাঙ্গ ও আমার মধ্যে যথেষ্ট কৌতুকান্বিত হোত। কৌতুকটির উৎস বিকল্পার নামকরণ। বিকল্পার ইতিহাস সংক্ষেপে জানতে চাইলে ভেলেমেয়েরা প্রায় অনেকেই স্মরণিত। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের পাতার বিকল্পাংয়ের নানা স্থানে নাম উল্লেখ আছে। অন্ধকার রাষ্ট্রনায়করা রাষ্ট্রের (বা নিজেদেরও) স্বার্থের খাতিরে বিকল্পাংয়ের সাহায্য গ্রহণ করতেন। তবুও বিকল্পার গল্প বাদে অন্য কোনও ভাবেই অগত্যা বলাই যে বিকল্পাং আসলে নারী হোক কিছুই নয়। আত্মতত্তে, দৈহিক গঠনে, সলাপে অত্যন্ত সাধারণ নারীর সঙ্গে কোথাও তাদের কোনরকম বৈসাদৃশ্য নেই। এমনি অসম্ভবভাবে অত্যন্ত নারীর ভুলনার তাদের কোন বিশেষত্বই বলুন বা, তবুওই বলুন চোখে পড়বার মত, তবে তাদের বা কিছু স্বাভাবিক বা কিছু বিশেষ অত্যন্ত নারীর সঙ্গে তাদের বা কিছু পার্থক্য তার মীমাংসিত ছিল তাদের চূড়নে এবং সে বড় সর্বসাধারণ পার্থক্য, অত্যন্ত স্বাভাবিক, ভাব্যই বৈশিষ্ট্য। বিখ্যাত সৌন্দর্য স্ট্রীটের প্রেষ্ঠ নিরঞ্জন নারী। সৌন্দর্যের এমন অপরূপ আধারের মধ্যে যুড়ার এমন ভাব্যই সম্ভাবনা থাকতে পারে তা কি কল্পনাও করা যায়? বিকল্পার একটি চূড়ন ছবিতে পুরুষের সিনিলিয়ার নিরঞ্জন হয়ে দেখে। অন্য একটি চূড়ন ছবিতেও এক নারী তার উল্লস, প্রসঙ্গিক, বৈশিষ্ট্য

যাবে, অপরূপতায় বর্ণনাকার হয়ে উঠবে। শিয়ার শিয়ার খেমে যাবে রক্ত সঞ্চালন, চোখের তারা হবে স্নাতহীন, সমগ্র শরীর উঠবে বিধিরে। ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে নিজের শেষ নিঃশ্বাসটি উপহার দেওয়ার লগ তার হবে দারুণ। চূড়নে তার বিব। রক্তের তার খাঙন কেশে তার চেটে খেলেনো মেঘের বিহীন, নয়নে তার ভুবনজ্ঞানো মোহ, হাসিতে তার আনন্দের ঝিলিক, গানে তার লালিত্যের স্বর, দেহে তার লাবণ্যের স্রবমা কিন্তু চূড়নে তার পুষ্টিভূত গরল।

বিচিত্র, বিচিত্র, বিচিত্র, বিধাতা। বিচিত্র ভূমি নিয়ে, বিচিত্র তোমার ভগত, বিচিত্র তোমার স্রষ্ট। [কল্পনা]

অনুবাদক—কল্যাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পি এ (পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট)

একটি হাসির গল্প। একটি সাহায্যিক কাহিনী হাতেরসের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। সাধারণতঃ হাসির বা হাসানোর নাম করে যে জাতীয় মোহামি বা অশালীনতা তুলে ধরা হয়, পি, এ ছবিটিকে আমরা বলতে পারি তার ব্যতিক্রম। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যের রূপাণি চেয়েছিল তার পি-এ পদের কোন মেয়েকেই বহাল করতে কিন্তু যোগ্যতার সব মেয়েকেই পরাজিত করে রমা গুপ্ত সেই পদে নিযুক্ত হল। রমা গুপ্ত আসলে মেয়ে মের পুঙ্খ, সম্পূর্ণ নাম তার রমাপদ গুপ্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রূপাণি নিযুক্ত করল যিনতি মিত্র ছদ্ম নামের দ্বারা সাহিত্যিক রমা গুপ্তকে। তারপর নানাবিধ ঘটনার মধ্যে দিয়ে গল্প এগিয়ে চলেতে থাকে বিভিন্ন অংশে প্রচুর কৌতুক রস পরিবেশন করতে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় রূপাণি চাকরী দিতে গিয়ে লজ্জা দিয়ে ফেলেছে রমাকে। শেষে সেই গতাঃগতিক ভুল বোঝাবুঝি, সর্বশেষে সর্বসাধারণের অসুখের স্তম্ভকাকারী বন্ধু জয়ের প্রচেষ্টায় উপসাহায্যিক হিসেবে রমার সাহায্য স্বীকৃতি লাভ ও সর্বপ্রকার ভুল বোঝাবুঝির আসন এবং রূপাণি-রমার শুভমিলনের ইঙ্গিত দিয়ে ছবির সমাপ্তি।

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সমস্ত মেয়ে কর্মীর মাঝখানে একটি মাত্র পুরুষের অবস্থিতিই তো দর্শক মহলে যথেষ্ট হাসির সন্ধান করে। তারপর দর্শককে আরো হাসিয়েছে রমার সলাপাংশ (অবশ্য এতে শিল্পীর কৃতিত্বও কম নয়) ছবিটির মধ্যে একটি অংশে কল্পনা প্রাচুর্যের তথা উদ্ভাবনী শক্তির অপূর্ব পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পিয়ানোকে টাইপ মনে করে বাজিয়ে তার মধ্যে থেকে নতুন ধরনের এক নতুন স্রষ্টা করার কল্পনা নিঃসন্দেহে প্রাণসার দাবী রাখে। নোটশানের পরিবর্তে একটি অফিসিয়াল চিঠি বেখে টাইপ করার মত পিয়ানোর বীজগুলি বাজিয়ে বাওয়া হয়েছে—কেবলমাত্র এই একটি অংশ সমস্ত ছবিটিকে বৈশিষ্ট্য প্রদে দিয়েছে। সঙ্গীতাংশ ভালো। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অচিন্ত্য বোব। পরিচালনা করেছেন চিত্রক।

গল্পটি হারনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেখনীভাত। সলাপ ও অভিজ্ঞ সলাপ রচনা করেছেন স্বাক্ষর জ্যোতির্ময় রায় ও কুমারেশ বোব। অভিনয়শ্রেণে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন প্রধান হাট চরিত্রে তালু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমা গঙ্গোপাধ্যায়। এদের অভিনয় সর্বতোভাবে ছবিটিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। রূপাণির ব্যক্ত্য, জর ও নারীসল-পিপার বিপরীত প্রকাশকের ভূমিকার স্বাক্ষর পাহাড়ী সাত্তা, অপরূপতায় ও কল্যাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও বিশেষভাবে বিকল্প

উল্লেখ্য দাবী রাখে। এঁরা হাজা অমর মল্লিক, কুমলেন মুখোপাধ্যায়, মর্দি জীবনী, ধগেন পাঠক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সেনুলা রায়, মিঠা চট্টোপাধ্যায়, চিত্রা মন্ডল, সুরজা সেন, মলিকা বোম, শেকলি নারেক প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছেন।

কণিকের অতিথি

সুশ্রিচালক হিসেবে তপন সিংহের সুখ্যাতি সপক্ষে আজকের দিনের চিত্রোন্নয়নকে কাছে নতুন করে কিছুটা ফলার নেই। তপন সিংহের প্রায় প্রত্যেকটি ছবিই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে। ছবিকে যথাযথ বিশিষ্টতার ভরিতে তুলতে তপন সিংহ আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করে আসছেন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি “কণিকের অতিথি”। প্রেম ছবিটির গল্পের সঙ্গে অজ্ঞাতভাবে জড়িয়ে থাকলেও সেই তার মুখা উপলব্ধি নয়। ছবির মুখা উপলব্ধি হচ্ছে এক তরুণ ডাক্তার তার পূর্বপ্রণয়িনী পঙ্কু সন্তানকে সহ্য সবল করে তোলার উদ্দেশ্যে অলসভাবে সাধনা করে চলেছে। এই ডাক্তার আর নীতা প্রথম জীবনে পরস্পর পরস্পরকে জীবনের যোগ্য রূপ পেতে চেরেছিল। কিন্তু সামাজিক জটিলতাই তাঁর প্রাণ অস্ত্রায় হয়ে পড়িল, বিচ্ছেদ ঘটল হৃৎকনের—নীতার মামা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বন্দর সব নিক গিয়ে আকর্ষণীয় একটি সম্ভাবনাময় উজ্জল তরুণের সঙ্গে নীতার বিয়ে দিলেন—প্রাকৃতিক দৃষ্টিমার নীতার মামা প্রাণ হারানেন, শিশুপুত্রকে নিয়ে বিবাহ নীতা এল মামার আগ্রহে, মামার তখন ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছে, মামা তুলে দিলেন কলকাতার বাস, সেই থেকে নীতার ভাগ্যের কালোমেঘ আরও ঘনিয়ে এল। ছবিপাকে তার শিশুপুত্রও পঙ্কু হয়ে পড়ল—তারপর ডাক্তারের কাছে পুত্রের জন্ম সাহায্যপ্রার্থিনী হয়ে নীতা দেখা দিল। ছবির প্রকৃতপক্ষে এইখান থেকেই শুরু, তারপর প্রেমকাহিনী ডাক্তারের অতীত স্মরণের মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে এক নীতার আশ্মিবিয়োগ ও কঠোর জীবন-সংগ্রাম নীতার অতীত স্মরণের মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে। নীতার সন্তানকে সহ্য করে তোলার সমস্ত গ্রহণ করল ডাক্তার, তারপর কেমন করে, কি ভাবে নানা ব্যর্থতার সন্মুখীন হয়েও অল্প প্রতিকূল অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করেও কি করে সে শোকনকে ভাল করে তুলল সেই কাহিনীই এখানে পরিবেশিত হয়েছে। ছেলে যখন রোগযুক্ত হয়ে উঠল—ছেলের হাত ধরে নীতা বিদায় গ্রহণ করে ডাক্তারের কাছে, সেখানে থাকার কাজ তো তার ছবিতেছে। ছবিটিতে হাসপাতালের লুপ্তগুলিতে রোগীদের মাধ্যমে কৌতুকরস পরিবেশন করা হয়েছে। ছবিতে একটিমাত্র গান সন্নিবেশিত করা হয়েছে, গানটি অতুলপ্রসাদের রচনা, একটি গানই সমস্ত ছবিটিকে ভরিয়ে রেখেছে। সারা ছবিতে বেশ একটি গান্ধীবর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন পরিচালক। সারা ছবিতে পরিচ্ছন্নতার একটি স্নদের ছাপ পাওয়া যায়। ছবিটি স্নদরকে লক্ষ্য করার কন্মতা রাখে। যে কোন স্নদরবাল বর্ণকের

অন্তরে এই ছবির বক্তব্য আবেগন জাগাতে সক্ষম হবে। ছবির কাহিনী স্বাক্ষর করতে বাধ্য নেই। যেমনই বলিষ্ঠ তেমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

নির্মলকুমার সেনগুপ্তের রচনার নিম্নলিখিতবাহী এই কাহিনীর চিত্রায়ণে সুরবোধনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রধান ভূমিকার অভিনয় করেছেন নির্মলকুমার ও কুমা গঙ্গোপাধ্যায়। অজ্ঞাত শিল্পীদের মধ্যে অল্প আবির্ভাবে মনে দাঁপ রেখে সেছেন ছবি বিশ্বাস ও রাধামোহন ভট্টাচার্য। রাধামোহন বাবুর অভিনয় এর আগে শেখবাবের মত দেখা গেছে তপন সিংহের দ্বারাই পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের “কান্দীওয়াল” ছবিতে ১৯৫৭ সালের জামুয়াই মাসে। অজ্ঞাত ভূমিকার অভিনয় করতে দেখা গেছে স্বর্গতঃ তুলসী লাহিড়ী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, গিলীপ রায়, রসরাজ চক্রবর্তী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিয়োগী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অতুল বোম, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, গীতা দাস, প্রভাবতী ভান্ডা, অজ্ঞাত কথ প্রাকৃতিক। ছবিটির কৌতুকংশও মাঝে মাঝে এমন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যার আবেগন স্নদরকে বিশেষরূপে অভিভূত করে তোলে, অবশ্য এ ক্ষেত্রে এই কৃতিত্বের অনেকখানি অংশ শিল্পীরও দাবী করতে পারেন। ছবিটি উৎসর্গ করা হয়েছে স্বর্গতঃ শিল্পী তুলসী লাহিড়ীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

নতুন নাটক : রত্নমহলে

রত্নমহলে এক মুঠো আকাশের সাক্ষ্যপূর্ণ অভিনয় সমারোহে চলছে। বর্তমান “কতৃপক্ষ আরও একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে। নতুন নাটকটি প্রীতি শর্মা ও রবিবার মঞ্চস্থ হচ্ছে এবং এক মুঠো আকাশের অভিনয় হচ্ছে প্রীতি ব্রহ্মপতিবার। নতুন নাটকটির নাম “এক পেয়ালা কফি”। এই রত্নমহলে অপরাধমূলক নাটকটিরও রচয়িতা, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা জীতেন্দ্র রায় ওরফে ধনরায় বৈরাগী। তরুণ রায় ব্যতীত আর যে সকল শিল্পী ভূমিকালিপাকে ভরিয়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন মজুমদার, বিশ্বজিত চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, লবনকুমার, শিকলু নিয়োগী, গীতাবিতা রায়, কেতকী লস্ক ও কবিতা রায়ের নাম উল্লেখনীয়।

নতুন নাটক : মিনার্ভা

জখেলো, ছায়ানট ও নীচের মহলের পর মিনার্ভার বর্তমান নাট্যসোষ্ঠী আরও একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করবার নিবেদন করলেন। বর্তমান নাটকের নাম অজ্ঞার। নাটকটির প্রতী, পরিচালনকার ও মুখ্য শিল্পী উৎপল লস্ক। অজ্ঞাত ভূমিকাগুলির রূপ দিচ্ছেন শোভা সেন, নীলিমা দাস এবং লিটল থিয়েটারের শক্তিম্যান অভিনয়শিল্পী। নাটকটির এ হাজা বিরাট আকর্ষণ সন্নীত ও লোকসন্মত। এই ছুটি বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন বধ্যাক্রমে রবিশঙ্কর ও নির্মল চৌধুরীর মত ব্যক্তারাই ছবি মুখোপাধ্যায় সন্তান।

... এ মন্দের প্রচুদপট ...

এই সন্ধ্যার প্রান্তরে একটি তিনসরী মুক্তাহারের আলোকচিত্র
ত হইয়াছে। আলোকচিত্র অপরকুমার বৈগুহিত।

পাগল হত্যার মামলা

(১৯৬ পৃষ্ঠার পর)

কিছু কাল আপনি নিজের উঠেছিলেন বলে উগরানের দ্বারা আর তিনি বেঁচে গেলেন। তবে তাকে বলবেন যে, তাঁর জীবনের মেয়াদ ছুরি দিয়ে এসেছে।

এর পর দিন আমরা আমাদের গুপ্তচরদের মুখে সবাই পেলাম যে, খোকা বাবু আমাদের খানার উপকার কোয়ার্টারের দেওয়ালের খুঁচা বেয়ে উঠে জানালার মধ্য দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে আমাদের হত্যা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। এই সবাই ইন্সপেক্টার সুদীপ বাবু কলিকাতা পুলিশের উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনার জীনট্রন কোন্স্টেবল জানালে তিনি আমাদের কোয়ার্টারের জানালাগুলি অদ্বারদেত বা তাবের লাল দ্বারা আবৃত করে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। এর পর হতে খোকা বাবুকে জীবিত বা মৃত ধরে আনবার জন্য আমরাও আহা-নিজা ত্যাগ করে একরকম হরিয়া হয়েই কাজে লেগেছিলাম। এর কারণ এই যে, আমরা জানতাম, পিছিয়ে আসবার আর আমাদের উপায় নেই। এবং আমরা যদি তাকে হারতে না পারি তাহলে সেটি আমাদের এক সময় না এক সময় ঘেরে দেবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, তাকে জীবিত ধরবার চেষ্টা না করে তাকে দেখা মাত্র গুলী করে ঘেরে ফেলাই শ্রেয় হবে। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনি। আমাদের মধ্যে এইরূপ কার্য হত্যাকাণ্ডেরই সামিল। তবে তাকে ধৃত হতে বেকার সময় আমরা আমাদের জামার তলার লৌহবর্ম পরিধান করতাম। কোনও বাণী তলার সমস্ত মাথার লৌহ শস্ত্রাণ পরে ডান হাতে আঁক-পরিমাণ লৌহস্ত্র এবং বাম হাতে টোট-ভরা পিস্তল সহ আমরা অগ্রসর হতাম। এই সকল সাজসজ্জা ইংরাজ আমলে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের আবাস রেড্ডি করবার জন্য পুলিশ হেড কোয়ার্টারে মজুত রাখা হতো। এই মামলার জন্য বিশেষ কক্ষ নিয়ে এইগুলি আমরা লালবাজার থেকে আনিতে নিয়েছিলাম।

এমনি ভাবে আরও পঞ্চাশ কাল অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু এই মামলার অন্ততম আসামী খোকা ও কেক্টাকে আমরা বুঝাই ফেলার কবে চলেছি। আমাদের সকল আভ্যন্তরীণে আমরা সন্নিবিষ্ট না, কিন্তু আমাদের প্রতিটি আভ্যন্তরীণই আমাদের চেনে। কখনো তাদের কেউ অতিক্রমে আমাদের দিকে পিছুলা উঠিয়ে ধরা পড়ার পর আমাদের পকেট থেকে আমাদের পিস্তল বার করা বা লা করা সমান কথা। সত্য কথা বলতে কি, আমরা আমাদের জীবন ধরনের খাতাতেই লিখিয়ে দিয়েছিলাম। তবে সর্বশেষই আমাদের মনোবল আমরা অটুট রেখেছিলাম। এইদিন রাতি এগারোটার সময় খানার খবর এলো যে, খোকা বাবু চিংপুর রোডের একটি বেজাবাড়ীর ক্রিডলের একটি কক্ষ অধিবেশিত একটি গানের জলদার তার দলের লোকদের দ্বারা সংবর্তিত হচ্ছে। এইরূপ গোলমালের মধ্যে খোকারাবু পকেট নিশ্চিত করে খোকার হাতে পিস্তলের এক ছাল গানের জলদার

বোগানের কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা কালকির মা করে সেইখানে সশস্ত্র অভিযানের ব্যবস্থা করেছিলাম। এই বেজাবাড়ীর ক্রিডলে এসে আমরা দেখলাম যে, এই ঘরটি ভিতর হতে অর্জন-বদ্ধ থাকলেও তার ভিতর হতে খুঁজুরের শব্দ ও গানের আওয়াজ আসছে। আমরা আর কালকির না করে সবসে মিলে সবুট পদাঘাতে দরজাটি ভেঙে ফেললাম। এর পর উড়ুড় করে গুলীভরা পিস্তল হাতে এই ঘরে ঢুকে পড়া মাত্র দেখলাম যে, এক ব্যক্তি এই ঘরের দাঁতের দিককার খোলা জানালা গলে বাইরে লাফিয়ে পড়লো। আমাদের অনুমান এবং খোকারাবুর পূর্বতন বক্তৃতির মত সরকার অভিযানের ভায় এই দিনও আমাদের সঙ্গে ছিল। সে তাকে দেখে তার ঘরে চিংকার করে বলে উঠলো, তার ওই যে খোকা—এখনি ওকে গুলী করুন। কিন্তু আমাদের কোনও প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করার পূর্বেই সে জানালা গলে বাইরে লাফিয়ে পড়েছে। আমাদের সকলেরই ধারণা হয়েছিল যে, খোকারাবু অতো উঁচু হতে লাফিয়ে নীচে ফুটপাথে পড়ে এতক্ষণে তার ইচ্ছালা শেষ করে সে তার এ মজবীরের অবসান ঘটিয়েছে। এইরূপ উপরে আর একটুও অপেক্ষা না করে আমরা তড়, তড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তার এসে দেখলাম যে, খোকা ওরফে খোকারাবুর লাশ সেখানে পড়ে মেরে। সামনেই একটি পানের দোকান অত রাস্তাও সেখানে নিয়মিত খোলা ছিল। পানওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এগিয়ে গিয়ে আমরা দেখলাম যে, তার গাল দুটো টুকটকে লাল ও তার ওই গাল দুটোর উপর পাঁচ আঙুলের ছাপ। পানওয়াল হাবুস নয়নে কাঁদছিল ও সেই সঙ্গে সে ঠক ঠক করে কাঁপছিলও। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে নিঃশব্দ একটি বিবৃতি দিয়েছিল। তার সেই বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য বিবায় তা নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

“আমি এই সময় রাস্তার পাড়িয়ে একটি খরিদারের সঙ্গে কথা কইছিলাম। হঠাৎ একটা দর-এর আওয়াজ শুনে উপরে তাকিয়ে দেখি ভণ্ট খেতে খেতে একটা লোক নীচের দিকে পড়েছে। সে আমার দোকানের কাশির উপর ঠকুর খেয়ে নীচের ফুটপাথের উপর আঁতড়ে পড়লো। আমাদের মনে হলো যে তার হাত পা গুলো তার পেটের ভিতর সোঁদিয়ে গেলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে উঠে পাড়িয়ে নিজের হাত দিয়েই নিজের হাত পা গুলো টেনে টেনে সোজা করলো। এরপর সে আমার সমুখ এসে আমার বাম পাশে সজোরে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, সে বোটা একটা সিগারেট। আমি—তার ভয়ে ভাঙাভাঙি একটা সিগারেট তার মুখে তুলে দিলাম। এর পর সে আমার ডান পাশে আর একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বলে উঠলো,—এই সে বোটা এখনি এটা ধরিয়ে। আমি তাকে খোকা বাবু বলে চিনতে পেরেছিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি সতরে লেগলাইয়ের কাঠী জেল তার সিগারেটটা ধরিয়ে দেওয়া মাত্র সে দেওয়ালের পায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আমার সাইকেলটা টেনে নিয়ে সেটাতে চড়ে বসে সিন্ দিতে দিতে পাশের গলিটার মধ্যে অগ্রসর হয়ে গেল।”

আমরা কেহই পানওয়াল এই বিবৃতিটির সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী হতে পারলাম না। বেজাবাড়ীর পানওয়াল হাবুস

ও পুরানো পাপি ও নোনের সঙ্গে সন্তোষিত। করে। প্রাচ্যঃ
কেন্দ্রে তারা সন্তোষে কখনও সত্য কথা বলেনি। ইংল্যান্ডের
জুনালবাবু অভিজ্ঞত প্রকাশ করলেন যে, বেলা নিশ্চয়ই দেওয়ালের
ধড়া বা পাটপ ঝরে নীচে নেমে এসেছে। খোকা তাকে বোধহয়
সতর্কিত করার জন্যে তাকে হারবার করে গিয়েছে। এই ভয়ে
পানওয়ারা ভয়ে সত্য কথা গোপন করে মিথ্যার অবতারণা করেছে।
আমাদের মধ্যে একজন অফিসার তাকে খোকায়ই ভরনৈক দলের
লোক বলেও সন্দেহ করে তাকে প্রেস্টারের প্রস্তাবও করেছিলেন।
কিন্তু পানওয়ারা পালানোর সত্যবনা না থাকায় তখনকার মত
তাকে রেহাই দিয়ে আমরা খোকাবাবুর আত্ম প্রেষ্টারের জন্যে
হানটি ঘেরাও করে সেখানকার প্রতিটি গৃহ তর তর করে
খুঁজে দেখাই সমীচীন মনে করলাম। কিন্তু ডোর রাত্রি
পর্ষাৎ ইতস্ততঃ ছুটছুটি ও এই বেজা-পন্নীর বাড়ী বাড়ী হানা
দিয়েও সেইদিন কোথাও তাকে আমরা খুঁজে বার করতে
পারিনি।

আসামী স্থবীর এই হামলার সহিত সম্পর্ক-রহিত থাকলেও
আমাদের এই হামলার দায় হতে মুক্ত হওয়ার পূর্বে সে আমাদের
একটি প্রয়োজনীয় সুরাধ দিয়ে গিয়েছিল। সে আমাদের জানালো
যে, এই সময় খোকা বাবু আত্মগোপনের জন্যে শান্তিনিকেতনের
দিয়েই অতিথিভবনে বসবাস করছে। আমরা এই সংবাদটিকে
অবিশ্বাস মনে করলেও খোকায় পূর্বতন বন্ধু হরিপদ উহা অবিশ্বাস
মনে করে নি। পুলিশ বিভাগে এমন বন্ধ ব্যক্তি আছে বার প্রতিটি
সুরাধ বিশ্বাস করে পরে তদন্ত করে দেখে যে উহা সত্য সত্যই
বিশ্বাস্ত কি না, আবার সেখানে এমন লোকও আছে বার কোনও এক
সংবাদ পাওয়ার পর উহা অবিশ্বাস্ত মনে করে তদন্ত করে দেখে যে
উহা সত্যসত্যই অবিশ্বাস্ত কি না। আমরা ছিলাম শেখোক্ত শ্রেণীর
অফিসার। তাই আমরা স্থির করলাম যে, হরিপদ বাবুকে নিয়ে
একবার শান্তিনিকেতনে ঘুরে এলে হয়। পরিশেষে এই দুকহ
কাণ্ডের ভারও আমাকেই নিজের স্বন্ধে তুলে নিতে হয়েছিল।
এদিকে কর্তৃপক্ষ আমাদের নির্দেশ দিয়ে বসলেন যে, খোকা বাবুকে
সেখানে শেলও তাকে প্রেস্টার করার জন্যে আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ করা
না হয়। কর্তৃপক্ষ আমাদের সুপার্টভাবে নির্দেশ দিলেন যে, আমরা
যেন আশ্রম থেকে তাকে ফেলা করে এসে তাকে এই আশ্রম বা
বিভাগতনের বাইরে এসে যেন থরি। এই আশ্রম বা বিভাগতনের
মধ্যে খোকা বাবুর সহিত গুলী-বিনিময় করা আমাদেরও মঃপুত—
ছিল না। উপরন্তু বিশ্বকবি এই সময় এই আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন।
আমি ও হরিপদ বাবু একদিন সন্ধ্যায় এসে এই আশ্রমের ভারতীয়
অতিথিভবনে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। বলা বাহুল্য ছয়বেশে আমরা
সেখানে এসে আমাদের পর্যটক বলে সেখানে সকলের নিকট
পরিচয় প্রদান করি। এর পরদিন খোকা বাবুকে চাকিতেই
আমরা দুই হাতে উত্তহারনের নিকট হস্তার উপরে একবার মাত্র
পাঁড়িয়ে থাাতে দেখেছিলাম। কিন্তু ক্রতগতিতে আমরা সেখানে
এসে পৌঁছবার পূর্বেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমরা শান্তি-
নিকেতন, জীনিকেতন ও বোলপুর ট্রেনের নিকট বছর বোরা
কেন্দ্রে ফরও তার আর কোনও সন্ধানই পাই না। অন্ততঃ
আমাদের কোলকাতাকেই আবার ফিরে আসতে হয়। কোলকাতা

ঘরে তদন্ত দারা আমরা জানতে পারি যে, খোকা বাবু কোলকাতায়
ফিরেননি। কিন্তু তাঁরই আমরা একটি দিনের ভ্রমও নিশ্চয়
হয়ে বসে থাকিনি। বরং আমরা প্রতিটি রাতে সন্দেহমান প্রতিটি
স্থানে একবার করে খোকা বাবু ও তার বন্ধু কেউ বাবুর সন্ধান
হানা দিয়ে চলছিলাম।

এই ভাবে দিনের পর দিন বার্ষ অভিনান চালানোর পর
অবশেষে ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) তারিখে আমাদের ভ্রম্য
কর্মকর্ম হুগুসর হয়ে উঠেছিল। এতোদিন মলিনাকে আমরা সশস্ত্র
শাস্ত্রী-দারা সুরক্ষিত করে রেখেছিলাম। এই ভ্রমই বোধ হয় কেউ
বা খোকা এতোদিন সেখানে হানা দিতে সাহসী হয়নি। কিন্তু
মাত্র তিন দিন পূর্বে আমরা উচ্চা করেই খোকায় প্রেস্টার মলিনার
বাড়ী হতে আমাদের মোতায়েন সশস্ত্র শাস্ত্রী উঠিয়ে নিয়ে সেখানে
মাত্র সাগা পোষাক-পরা সিপাহী মোতায়েন করে দিই। কিন্তু
আমাদের চালানো না বুঝতে পেরে এইদিন খোকায় নির্দেশে কেউ
মলিনার বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে গোপনে খবর নিতে এসে সত্য সত্যই
আমাদের গোয়েন্দা পুলিশের হাতে অহকিতে ধরা পড়ে গেল।
সত্য সত্যই এইদিনকার এই সাক্ষ্যের কারণে আমাদের আনন্দের
সীমা ছিল না।

কেউকে ধানায় এনে আমাদের নিকট হাছির করা হলে
আমি নিব্বিমনে এই আসামী কেউকে বুঝতে চেষ্টা করলাম।
খোকায় মত কেউ কোনও এক স্বভাব বা মধ্যম অপরাধী ছিল না।
বৃত্তের বুঝা গেল, তাকে একজন অভ্যাস অপরাধী মনে হলো। এক
ধাতিক ব্রাহ্মণের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেও কুসঙ্গের কারণে বীর-বীরে
অভ্যাসজনিত সে একজন অপরাধীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে।
এইজন্যে যে দীতিতে একজন স্বভাব বা মধ্যম অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ
করা হয়, সেই দীতিতে একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কোনও লাভ হবার
কথা নয়। এইজন্যে এর সঙ্গে আমি ভিন্নরূপ ব্যবহার করার প্রয়োজন
মনে করেছিলাম।

[ক্রমশঃ]

ডাঃ বজুর
অশোক কার্ডিয়েল
নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও লৌকিক বর্ধন করে
ড্রাগের প্রেস্ক্রিপ্টকারকঃ
ডাঃ বজুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯

● দেশে-বিদেশে ●

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ (নভেম্বর-ডিসেম্বর, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা অগ্রহায়ণ (১৮ই নভেম্বর) : ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র ন্যাগা রাজ্য গঠনই ন্যাগাদের নূনতম দাবী—শিলং-এ ন্যাগা কম্বলনের সভাপতি ডাঃ ইমকানপ্রিয়ং ঘোষণা।

২রা অগ্রহায়ণ (১৯শে নভেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভার লাতাক সীমান্তে চীনা বাহিনীর আক্রমণের কঠোর সিন্ধা।

লোকসভা প্রধান মন্ত্রী জিনেহকর ঘোষণা—কালিঙ্গ ও অন্তর্ভুক্ত সীমান্ত এলাকার ভারত বিরোধী যে প্রচার-কার্য চলিতেছে, উহার সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে ভারত সরকার বন্ধপরিকর।

৩রা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর) : ভারতীয় এলাকা হইতে চীনা সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে—বিরোধী মীমাংসার জন্য চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন্ লাই-এর নিকট জিনেহকর (প্রধান মন্ত্রী) বিকল্প প্রস্তাব।

৪ঠা অগ্রহায়ণ (২১শে নভেম্বর), দেশরক্ষা সচিব জি ডি, কে, কুম্ভমেদন কর্তৃক ভারতীয়দের প্রতি দলে দলে আকস্মিক বাহিনীতে বোগদানের আহ্বান।

৫ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর) : দিল্লী প্রদেশ কংগ্রেসের স্বাভাবিক সন্মেলনে প্রধান মন্ত্রী জিনেহকর ঘোষণা—আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্ত আর পরমুখাপেকী হইয়া থাকা চলে না।

৬ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় অগ্ৰস্তিত জনসভায় বিহার ও আসামের কয়েকটি এলাকা পশ্চিমবঙ্গভুক্ত দাবী।

৭ই অগ্রহায়ণ (২৪শে নভেম্বর) : ঢেক সরকার কর্তৃক ভারতকে ২৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা—দিল্লীতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৮ই অগ্রহায়ণ (২৫শে নভেম্বর) : চীন-ভারত সীমান্ত প্রাঙ্গণ সম্পর্কে বিতর্ককালে লোকসভায় তুয়ুল হটগোল।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোচিনে বিতীয় জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের আয়োজন।

১ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর) : ভারতের সীমান্ত রক্ষার জন্ত সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে—চীন-ভারত সীমান্ত প্রাঙ্গণে বিতীয় বৈকুণ্ঠের উপর লোকসভায় বিতর্ক কালে দেশরক্ষা সচিব জি ডি, কে, কুম্ভমেদনের ঘোষণা।

১০ই অগ্রহায়ণ (২৭শে নভেম্বর) : ভারত-কুমিতে চীনা আক্রমণ ও রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিহারসহকারী জেটাইকো কোষকারী প্রস্তাব গৃহীত।

১১ই অগ্রহায়ণ (২৮শে নভেম্বর) : সকল অবস্থায় লক্ষ্যই চাইবার জন্য প্রত্যেক থাকিতে হইবে—জাতির প্রতি প্রধান মন্ত্রী জিনেহকর আহ্বান।

১২ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর) : আগুনসালের নিকট জাহাজ বিক্ষোভে ৫০ জন নিহত ও লতাতিক আহত হওয়ার সন্ধান।

১৩ই অগ্রহায়ণ (৩০শে নভেম্বর) : কেন্দ্রীয় পেশ-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১৪ই অগ্রহায়ণ (১লা ডিসেম্বর) : আইনো কাক ও শাসন বিভাগের দুর্নীতি প্রত্যেক কর কারিক কারণ—কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত প্রত্যেক কর তদন্ত কমিটির রিপোর্টে অভিযোগ।

১৫ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর) : বিতাতিক ঘোষাই রাণ্যকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যে বিখ্যাত করার প্রস্তাব—কংগ্রেস নিযুক্ত ঘোষাই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ।

১৬ই অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর) : নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী জিনেহকর ঘোষণা—আক্রমণের ক্ষেত্রে নেপাল ও ভারত একত্রে পাণ্ডা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ঘোষাইকে ছুটী রান্নো বিতন্ত করার প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অগ্রমোদন।

অন্ধ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জিসরীং রেড্ডি বিনা প্রতিদ্বন্দিতার কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্বাচিত।

১৭ই অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার রাজ্য সরকারের খাজ নীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনা।

১৮ই অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) : কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র ও হিন্দু মহাসভা নেতা জীনংকুমার রায় চৌধুরীর জীবনদীপ নির্মাণ।

বিখ্যাত টেট ক্রিকেট খেলোয়াড় ও নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি মহারাজ কে, এস, দলীপ সিংহার পরলোক গমন।

১৯শে অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর) : প্রধান মন্ত্রীর জিনেহকর উপস্থিতিতে প্রমজীবিনী জীমতী বুনৌ মেয়েন কর্তৃক পাঞ্জন বাধের (ডিভিসি'র বৃহত্তম বাধ) উদ্বোধন।

২০শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর) : দেশরক্ষা সচিব জি ডি, কে, কুম্ভমেদনের সতর্কবাণী—ভারতের কোন দৃষ্টিজোটে বোগদানের অর্থই হইবে বাহিনীভার বিপুল।

পার্লিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কর্তৃক লোক নিয়োগ—কমিশনের রিপোর্টে (১৯৫৬-৫৭) ভুক্তর অভিযোগ।

২১শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর) : পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য বিধান সভার বর্ধমান বিধিবিভাগের বিল বিনা বাধ্য গৃহীত।

মহীশূরে বিদ্রূহ ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—১ জন নিহত ও ৫ জন আহত।

পুস্তক অঙ্ক-সংস্কার নিষেধ

আশঙ্কিত
উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ
নষ্ট করছেন কি ?



এমন অনেক লোক আছেন যারা কোন সুযোগই ছাঁতছাড়া করেন না মনে ক'রে নিজেদের আধুনিক বলে গর্ব বোধ করেন। কিন্তু আসলে তাঁরাই অঙ্ক-সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে নিজেদের সুযোগ নষ্ট করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, রামার জন্তে স্নেহজাতীয় জিনিসের কথাই ধরুন। অনেকেই বলেন “বনস্পতি দিয়ে রাঁধা খাবার আমি কখনো খাই না। এটা একটা কৃত্রিম স্নেহ। কাজেই প্রাকৃতিক স্নেহপদার্থের মত ভাল হতেই পারে না।” অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র তৈরী করতে মানুষের অসাধারণ বস্তু ছাড়া এর ভেতর কৃত্রিম বলে কিছুই নেই।

আগাগোড়া কঠোর নিয়ন্ত্রণ

বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী একটি বিস্কুট উদ্ভিদ স্নেহপদার্থ। কঠোর নিয়ন্ত্রণাবীনে

পরিচালিত আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কারখানার বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়। এই বিস্কুট স্নেহপদার্থ সহজেই হজম হয় ও সবরকম রামার পক্ষেই উৎকৃষ্ট—কারণ বনস্পতি দিয়ে রাঁধা খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয় না। বনস্পতি কেনার ও ব্যবহারে খরচ কম... কারণ এর প্রতিটি আউন্সই খাঁটি ও পুষ্টিকর।

ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বাঁচার জন্তে
বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্তত দু' আউন্স স্নেহজাতীয় পদার্থ খাওয়া দরকার। বিস্কুট ও স্নেহপদার্থ বনস্পতি অল্প খরচে আপনাকে এই সুযোগ দিচ্ছে। ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বেচে থাকার জন্তে বনস্পতির ব্যবহার শুরু করা আপনার উচিত নয় কি ?

বনস্পতি — বাড়ীর গিরীর বন্ধু

প্রতি বনস্পতি স্নেহপদার্থের এলাসিয়েশন অব ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রস্তুত

১৯৫৫ ১৯৫৬

২২শে অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর): ভারতে 'শান্তি-সকর' উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নয়াদিল্লী উপস্থিতি—সম্মানিত অতিথির সর্বত্র বিপুল সন্মতি।

২৩শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর): বিশ্ব পরিবহিত সম্পর্কে দিল্লীতে নেহরু আইসেনহাওয়ারের প্রথম দফা বৈঠক।

ভারতীয় পাল'মেণ্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইকের ঘোষণা—বিশ্ব স্থানবিশেষে শান্তি ও বাবিনতার জন্য বহুসাধ্য চেষ্টা করিব।

২৪শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর): জুগার বিক্রেত পৃথিবীব্যাপী সমগ্রায় আত্মবিশ্বাস—দিল্লীতে বিশ্ব কৃষিমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভাষণ।

২৫শে অগ্রহায়ণ (১৭ই ডিসেম্বর): সমগ্র মধ্য প্রদেশে সরকারী কর্ণচারসে (কৃত্তর শ্রেণীর) বর্ষব্যট—এ ব্যবস নতাবিক ধর্মব্যট প্রেরণ।

দিল্লীতে পুনরায় প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর মধ্যে বিশ্ব পরিবহিত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা।

২৬শে অগ্রহায়ণ (১৭ই ডিসেম্বর): আটক-নেহরু আলোচনাস্তে মুক্ত ইন্ডিয়ায় প্রচার—শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল বিরোধ মীমাংসা ব্যাপারে উত্তর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য।

২৭শে অগ্রহায়ণ (১৮ই ডিসেম্বর): ভারতে পাঁচদিন ব্যাপী শুভেচ্ছা সফরের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের দিল্লী হইতে তেহরণ যাত্রা।

খিভ্রি ট্রাই ইউনিয়নের সম্মিলিত আট দফা দাবীর ভিত্তিতে পশ্চিম বঙ্গে দুই লক্ষ চটকল শ্রমিকের প্রতীক ধর্মব্যট।

২৮শে অগ্রহায়ণ (১৯ই ডিসেম্বর): ভারতীয় বন্দীদের প্রতি চীনের দুর্গবহারের তীব্র প্রতিবাদ—চীনের নিকট ভারত সরকারের লিপি প্রেরণ।

নিয় পর্ষ্যদের চাকুরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অধ্যাবসক নয়—শ্রীমাম্বামা মুশলিয়ারের সভাপতিত্বে গঠিত সরকারী চাকুরী (লোক নিয়োগের যোগ্যতা) কমিটির সুপারিশের উপর সরকারী সিদ্ধান্ত।

২৯শে অগ্রহায়ণ (১৯ই ডিসেম্বর): পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাকে লইয়া বহুস্তর খাদ্য-অঙ্কল গঠনের কাজ কার্যত: সম্পন্ন—লোকসভার কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি সচিব শ্রীএস কে পাতিলের ঘোষণা।

বহির্দেশীয়—

১লা অগ্রহায়ণ (১৮ই নভেম্বর): রুশ-চীন অভিযানের আশঙ্কায় পাক প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আব্দুর বান কর্তৃক ব্রুটেন ও আমেরিকার নিকট বর্ষ ও অল্প প্রার্থনার সংবাদ।

২রা অগ্রহায়ণ (১৯শে নভেম্বর): প্রধান মন্ত্রী বন্দরনায়কের হত্যা প্রসঙ্গে সিংহলের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতী বিমলা বিজয়বর্দন প্রেরণ।

৩রা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর): আশবিক রাষ্ট্রগুলির নিকট আশবিক পরীক্ষা বন্ধের আবেদন সম্মিলিত ভারতীয় প্রত্যাগ রাষ্ট্র-সংঘ দ্বাৰ্জনৈতিক কমিটিতে বিপুল প্রোটায়িকা গৃহীত।

৪ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর): চীন-ভারত-সীমান্ত বিরোধে চীনা পত্নতিতে যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটোর নৈরাহ প্রকাশ।

৬ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর): পশ্চিম জাভার (ইন্দো-নেশিয়া) চীনা বিতাড়ন অভিযোগে সৈল্য নিয়োগ।

৬ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর): আবগারিভান কর্তৃক মধ্য সামরিক জোটে (সেক্ট) যোগদানের পাক আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

চন্দ্র প্রেমকিণকারী উপগ্রহ প্রেরণের মার্কিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ।

১০ই অগ্রহায়ণ (২৭শে নভেম্বর): পাকিস্তানকে বাদ দিয়া চীন-ভারত সীমান্ত সমস্তার মীমাংসা চলিবে না—লণ্ডনে পাক প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আব্দুর খানের ঘোষণা।

১২ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর): উত্তর ত্রাঙ্গ পুনরায় কুওমিটায় চীনা (চিয়াং) বাহিনী পুনরায় উৎপাত শুরু করিয়াছে বলিয়া রুশ সরকারের দাবী।

১৪ই অগ্রহায়ণ (১লা ডিসেম্বর): হাঙ্গেরীর কমুনিষ্ট-সম্মেলনে রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের ঘোষণা—যে কোন সময় ও যে কোন স্থানে সোভিয়েট ইউনিয়ন শীর্ষ-সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রস্তুত।

১৬ই অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর): সিংহলে নয় সপ্তাহব্যাপী জরুরী অবস্থা প্রত্যাহত।

১৭ই অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর): সিংহলের গভর্নর জেনারেল সার অলিভার গুণভিন্দক কর্তৃক সিংহল পাল'মেণ্টে বাতিল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ঐতিহাসিক 'শান্তি সফরের' পুনরায় রোম উপস্থিতি।

২০শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর): দুই দিনের সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের করাচী (পাকিস্তান) আগমন।

২১শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর): করাচীতে পাক প্রেসিডেন্ট আব্দুর খানের সহিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

২৪শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর): ইকোমোশিয়ার চীন-বিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রে ইকোমোশিয়ার সরকারের নিকট চীনের প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ।

২৬শে অগ্রহায়ণ (১৩ই ডিসেম্বর): ইকোমোশিয়ার কর্তৃক চীনের বিরুদ্ধে ইকোমোশিয়ার বিরোধী ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ।

২৭শে অগ্রহায়ণ (১৪ই ডিসেম্বর): বাগদাদ চুক্তির স্থানান্তরিত 'সেক্ট' 'সেক্ট' জমী চুক্তি (মধ্যপ্রাচ্য) সম্মেলন—ইরানী পাল'মেণ্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইকের ভাষণ।

২৯শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর): কান্দাহার-সমস্তার সম্মেলন না হইলে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েরই বিশদ—পাক প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আব্দুর খানের বিবৃতি।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সচিব এক হিসাবে প্রকাশ, ভারতে

যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাউতেছে, তাহাতে ১৯৬১

খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতের জনসংখ্যা ৪৩ কোটি ৮ লক্ষ হইবে এবং আরও ৫ বৎসর পরে জনসংখ্যা ষাঁড়কোটি ৪৭ কোটি ১৬ লক্ষ। জনসংখ্যার হার এইভাবে বাড়িতে থাকিলে দেশে যে মানবীয় সম্রা দেখা দিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার মারক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইবার চেষ্টা যে এ পর্যন্ত আশাহীন হইয়া নাই, তাহা সুবিচিত। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি সমস্ত সমাধানের একমাত্র উপায় হিসাবে রক্ষা রাখিতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় যদি শুধু কৃষিকর্মই নয়, শিল্প উৎপাদন বেশি হারে বৃদ্ধি না পায়, তবে আগামী ১০ বৎসরে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতে বাধ্য।

—দৈনিক বহুমতী।

লেখাপড়া করে যে

"জরুলপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিক্ষা-সংমেলনের ৩৪তম অধিবেশন দাবী করিয়াছেন,—দেশের সমস্ত নিরক্ষর কারখানা শ্রমিককে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। ভাঙার সমস্ত রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়া বলিয়াছেন, প্রত্যেক শ্রমিককে সমাজ শিক্ষা দিয়া সার্বিকভাবে উন্নয়ন করিয়া তোলার অঙ্গুল পরিবেশ বাহ্যে কারখানাগুলিতে স্থাপিত হইবে, কারখানা মালিকদের এখনি তদন্তকারী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ইহা অপ্রত্যাশ। দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যাই হইলেও কৃষক ও কারখানা শ্রমিকরা এক তাহাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন প্রায় মেলে না বলিলেই চলে। কৃষকরা তবু যুক্তির সঙ্গে যুক্ত, তাই সমাজ পরিবেশ হইতে তাহারা কিছুটা শিক্ষা-সংস্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু কারখানা মজুররা নোংরা বস্তিতে অনেকটা লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন এবং দেহ ও মন কোনদিকেই তাহাদের স্বাস্থ্যের অঙ্গুল পটভূমি নাই। এই সমস্ত মাহুৎক চলনসই রকম লেখাপড়া শেখানো প্রয়োজন এক তাহাদের নিজ নিজ কাজের সঙ্গেই বিনা ব্যয়ে বাহ্যে সে ব্যবস্থা হয়, তা এখনি করা প্রয়োজন। কিন্তু দেশের নাবালক ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেককে অবস্থা নির্বিশেষে অন্ততঃ প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়া শেখানোর কথাটা সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। যেহেতু জাতির ভাবী দিনের ভালো-মন্দ নির্ভর করে জাতির উপর।"

—হুগান্ডার।

কমতার দ্বন্দ্ব

"আশা করিতেছি যে, চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১০ লক্ষ টন বাতাসের বাটতি থাকিলেও বাতের অভাব কেহু অথবা মজুরতার ও চেনালালানকারীদের জবাবদিহি কলে অব্যবস্থিত হইবে এই দাবী বাতাসের জালি আকার ধারণ করিবে না। তবে সুস্থিতবিশ্বাসে কি হয় বলিতে পারি না। আগামী ১৯৬০-৬১ সনে পশ্চিমবঙ্গে বাত-পতনের অবস্থা যদি সত্যাবলম্বক না হয় তাহা হইলে উড়িয়া ও কেন্দ্রীয় পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য সত্ত্বেও চলতি ১৯৬১-৬০ সনের শেষের দিকে রাজ্যে খাদ্যশক্তির কৃৎসি তুলিয়া বসিতে পারে। একম পক্ষে বাতের বহুলবাহক হোষ্ট-বহু মজুরতার ও পাইকারী উন্নয়ন অবস্থা অধিকতর দ্রুত করিয়া তুলিতে পারে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গে আগামী

সাময়িক প্রসঙ্গ

১৯৬০-৬১ সনেও বাতাসে চলতি ১৯৬১-৬০ সনের মত এক সপ্তাহ হইলে অধিকতর পরিমাণে বাতশক্তি উৎপন্ন হয় তৎপক্ষে এখন হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবহিত হওয়া আবশ্যক। তদা বাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কমতার দ্বন্দ্বের ফলে পশ্চিমবঙ্গে অধিকতর বাতশক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। উহা জানিয়া আমরা আতঙ্ক বোধ করিতেছি। অবিলম্বে এই দ্বন্দ্বের অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ খাদ্য লইয়া পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় বিপদ অনিবার্য হইবে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন

"কেন্দ্রীয় আবার যদি কমিউনিষ্টপার্টি বিজয়ী হইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করে তবে কি কংগ্রেস পুনরায় জনগণের রায় উপেক্ষা করিয়া তাহাকে বাতিল করিয়া দিবে? এই প্রশ্ন মাহুৎকের মনে জাগা স্বাভাবিক। সারা ভারতের গণতান্ত্রিক মাহুৎ চাহে—নির্বাচিত সরকারকে নিশ্চয়ই কাজ করিতে দিতে হইবে। এই প্রশ্নের সমাধানের উপর ১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ভাষ্য নির্ভারিত হইবে। ভারতবাসী ভাল করিয়াই জানে যে, গণতন্ত্র ও পাল্লার্মেন্টারী শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চলিলে আত্মবশাহীর পক্ষে দেশকে টানিয়া নামানো হইবে। কেন্দ্রীয় নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টির ভয়ের অর্থ ভারতের চরম প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতি-গণতন্ত্রের অগ্রগতি। কেন্দ্রীয় কমিউনিষ্টপার্টির ভয়ের অর্থ ভারতের গণতন্ত্রের অগ্রগতি। কেন্দ্রীয় কমিউনিষ্টপার্টি দেশের প্রতিক্রিয়া-শীল ও জনস্বার্থ-বিশোধী শক্তির বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই লাড়িতেছে। এ লড়াই সারা ভারতের লড়াই। দেশের মাহুৎ চাহে—শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ভার-নির্বাচনে কেন্দ্রীয় মাহুৎকে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিতে দেওয়া হউক। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন চলিলে কেন্দ্রীয় মাহুৎকে মাহুৎকে ভয় অনিবার্য, তাহারা নিজেদের পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টিতে নির্বাচনে সাম্যবাদগোষ্ঠিত করিয়া তুলিবে। গণতন্ত্র অসম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্ত পরাস্ত হউক—ইহাই সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরের কামনা।"

—বাবাজী।

জীবিতের স্মৃতি

"আর একটি সংবাদ—শ্রীমতী জামিনগীওএ এসে জরুলপুর নদীর উপরে প্রস্তাবিত পুল নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করবেন। বছর ধানেক আগে থেকেই পুল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, পর্যায়ক্রমে কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে তাও মাঝে মাঝে সঙ্গীভাবে প্রচারিত হয়ে আসছে। যে কাজ শুরু হয়েছে এক বছর আগে তার ভিত্তি স্থাপন হবে এখন—শ্রীমতী জামিনগীওএ এসে এখানেও গুরুত্বপূর্ণ অভিনব সঙ্গীত। মেহের হুসেন্দার না পেল কোনও কিছুই মধ্যমা লাভ হয় না। হবত নেহরু নামের

সমিতি সমুদয় হয়ে প্রকৃষ্ণ পূর্ণ ও ধন হয়ে উঠবে—সেই নামকরণ অবশিষ্ট প্রচারিত হয়নি, আমরা আভাসে জানিয়ে রাখলাম। কবি বহুব্রহ্মের অগ্রসর হবার পরে যদি ভিত্তি স্থাপন উৎসব চলেতে পারে তবে যুত্কার কিছুদিন পূর্বেও মানুষের নামকরণ উৎসব করা চলে হরত। আমাদের অন্তটা জানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে কবিকে দিয়ে নিজের একটা নতুন নামকরণের কথা হয়নি।

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)

কা কস্ত পরিবেদনা

“তবলুকে এখন আট-ময়দা-সজীর অভাব নাই। সেজন্ত বেশনকার্কে বরাচাধারী প্রত্যেককে দেওয়া ছাড়াও খাবার দোকানগুলিকেও তাহাদের চাহিলা মত আটা ময়দা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। খাবার দোকানীগণ মহকুমা কচৌলার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেই উহা পাইবেন। কিন্তু চিনির এ ব্যবস্থা কোন সুরাহা হইল না। শকাব্দিকাল হইতে শুনিতেছি স্থানীয় লাইসেন্সার চিনি আসিতেছে। আসিতেই তাহা নির্ধারিত মূল্যে বেশন কার্ভাধারী দেওয়া হইতে থাকিবে। কিন্তু কোথায় কি? মহকুমা বাসীরাও অতিরিক্ত মূল্য দিয়া কলিকাতার চিনি খাইতে হইতেছে। সরকারের এই আধা নিয়ন্ত্রণের জন্ত চিনিকল ও দুনাকাথের ব্যবসায়ীগুলি মুখ পাইতেছে বলিয়া আমরা ইতিপূর্বেই প্রতিবাদ জানাইরাছি। কিন্তু কা কস্ত পরিবেদনা।”

—প্রদীপ (তমলুক)

সেচ ব্যবস্থা

“পূর্বস্থলী ধানার সমগ্র অঞ্চলেই ক্যানেলের কোন ব্যবস্থা নাই।

অন্য ভবিষ্যতে ক্যানেলের কোনরূপ ব্যবস্থা হইবার সম্ভাব্যও নাই। তাইতেছে না। অথচ এই ধানায় মাটি স্বর্ণপ্রস্থ বলিলেও অত্যাশ্চর্য হয় না। বান, পাট, গম, কলাই, তরিতরকারী ও ফল-ফুলের চাব এখানে বিরাটভাবে হইত। সেচনের অভাবে উৎপাদন ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। ইহা তো গেল এই ধানার অভাবের একটি দিক। অপর দিকে আবার এই ধানার মধ্য দিয়া ছুটি তিনটি নদী প্রবাহিত হওয়ার প্রাবল্যের জলে এই ধানাদিকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। প্রকৃতির এই রোষের হাত হইতে ধানাদিকে বাঁচাইতে না পারিলে এই ধানার লক্ষাধিক জনসংখ্যা অসহায়ের জায় দিন বাপন করিবে। ক্যানেলের ব্যবস্থা এখন সম্ভবই নয় তখন নলকূপ অথবা পাম্পের সাহায্যে এই ধানার সেচকার্যের ব্যাপক বন্দোবস্ত করা অবশ্য কর্তব্য।”

—বর্ধমান।

পীচ রাস্তার সংস্কার ব্যবস্থা

“কাঁচি সহরতলী অংশে গান্ধীরোড বাস্তবিক স্প্রতি প্যাচ নিশেয়ারী ব্যবহার দ্বারা সংস্কার করা হইয়াছে। সহরের যুখে কাঁচি-তমলুক রাস্তার এক মাইল অংশটিরও সংস্কার কার্য চলিয়াছে। কিন্তু এই কার্যটি এত দ্রুত পণ্ডিত চলিয়াছে যে, উহাতে পথচারী ও বানবাহনাবির ঈর্ষু পথ ভাঙিয়াতে বিশেষ বিঘ্ন ঘটতেছে। দ্বিতীয়তঃ রাস্তার গর্ত অংশগুলির সংস্কার সাধনে অল্প অল্প পাথরকুচ ও পীচ দিয়া যে ভাবে চলনসই করা হইতেছে তাহাতে ঘোড়ার বাস বাঁজারিতে ব্যাঘাত না ঘটিলেও লোকজন চলাচলের পক্ষে বিঘ্ন কই দেখা দিয়াছে। সাইকেল ও রিক্সাগুলির চলাচলে দ্বায়ে দ্বায়ে

এমন দাক্ষা খাইতে হয় বাহাতে দাক্ষা হইতে দ্বিগুণের পড়া উপক্রম হয়। বড় বড় পাথরকুচগুলি সুরবার হইয়া রাস্তার মধ্যে পথচারীদের পাণ্ডলিকে প্রবল করিতেছে। বাসিন্দাদের চোখা গুলিল। কাঁচি সহরের পাশ্বে ঐশ্বর্য গুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করণ স্থল ভাঙিয়া ও লোকজন চলাচল ঘটয়া থাকে, তাহাতে ব্যবহারিক কর্তৃপক্ষের রাস্তার ঐ বহু অংশগুলিকে রোলের দিয়া সমতল করার ব্যবস্থা করা উচিত। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ নজর দিবেন কি?

—নীহার (কাঁচি)

জাহান্নামের পথে

“সর্বোপরি যে গণতন্ত্রের বুলি কচাচিয়া বঙ্গের জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে, কোরালার সেই গণতন্ত্রকেই যে তাহার টুটি টিগিয়া হত্যা করিয়াছে—এই সভ্যতা পতন চেষ্টাতেও কংগ্রেসীরা চাকিয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই। কোরালার কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে জনমত জানিবার বহু পদ্য ছিল। তৎসঙ্গেও প্রায় ৪ মাস পূর্বে, অর্থাৎ আরেকটি সাধারণ নির্বাচনের এখন দেড় বৎসরেরও কম সময় বাকী, তখন সেখানে, পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করিয়া, আরেকটি উপনির্বাচন তথা লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইল,—যে টাকাগুলি সাধারণ হইলে হয়ত ভারতের কোন একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থাপন সম্ভব হইত। কংগ্রেসীরা কি দাবী করিতে পারেন যে, বিগত ১২ বৎসরে তাহারা দেশকে জাহান্নামের যে দ্বারে দিয়া পৌছাইয়াছেন, কোরালার আর দেড়টি বৎসর কমিউনিষ্ট শাসন কারের থাকিলে, তাহার চাইতেও এতকর কিছু হইতে পারিত?”

—কমলিনী (আগরতলা)

আগের কাজ আগে

“ধান ও চালের দাম নিয়ন্ত্রণিতে চলিয়াছে। চলুক, আমাদের আশঙ্কি নাই কিন্তু পোটা বছরের সব সময়ে এ চলা অগ্ন্যহত থাকিবে কি না—এইখানেই আমাদের আশঙ্কা। প্রতি বছর ঠিক এমনি সময়েই ধান ও চালের দর নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকিত। দরিদ্র ও গণ্যবিশিষ্ট চাষী এই সময়ে দেনার দারে, খাজনার দারে করের দারে উন্নত প্রায় সমস্ত ধানই বাজারে নিম্নমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শস্তের মূল্য এখন যখন হ্রাস হয় তখন তাহাদেরই উৎপন্ন শস্ত দুনাকাথের এবং মজতদারদের আড়ত হইতে বাহির হইয়া আসে। পেটে গামছা বাঁধিয়া সেই চাষীকেই সেই ধান যিগুণ কড়িতে কিনিতে বাধ্য হইতে হয়। তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ তখন থাকে না। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষককুল বতকণ পর্যন্ত না তাহাদের উৎপন্ন শস্তের নেছ মূল্য পাইতেছে, সাধারণের জীবনবাজার মান ততদিন অধি উন্নত হইবার আশা নাই, বহুতা বা পরিকল্পনার ছবি দেখাইয়া তাহা হইবে না। সরকারী পরিকল্পনাকে সেই দিকেই সর্বাধিক নিয়োজিত করা উচিত। বাজারশস্ত্রের উৎপন্ন বৃত্তিও যেমন প্রয়োজন উৎপন্নকারী তাহার নেছ মূল্য পাইতেছে কিনা তাহাও দেখা ঠিক ততখানি প্রয়োজন। নচেৎ অধিক উৎপন্ন করিতে আগ্রহ জন্মিবে না। লম্বায় ধানার এবং সম্ভাব্য বিপন্ন সমিতি দায়ক—এই সমস্তার কিছুটা সুরাহা হইতে পারে।”

—বীজবর জাক

বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ

“বহু আবেগন, নিবেদন ও সম্মেলনে প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিয়া এক আশ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্যাদানের প্রতিশ্রুতিতে মালদহে বিমান অবতরণ ক্ষেত্র (Air strip) নির্মিত হয়। কিছুদিন বিমান নিয়মিত যাতায়াতও করিল। কিন্তু বর্তমানে বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে একমাত্র ঘুঘু চরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার কারণ দ্বারা এই লাইনে বিমান চালনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট এই লাইনটি ব্যবসায়ের দিক হইতে অলাভজনক বলিয়া ঘোষিত হয় এবং তাহারা বিমান চালনার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। অথচ ইহা নির্মিত হইবার কালে সারা ভারতে ঢাক পোঁতা হইয়াছিল—সকল লোক টাকার আশ্র এই লাইন দিয়া আসায়ে ও ভারতের অল্পজ্ঞ হইবে। প্রয়োজনে ভারতের বাহিরেও যাইবে। কিন্তু আশ্র ব্যবসায়ীরাও মূল বাণিজ্যিক পরিবহন হিসাবে বিমান পথকে ‘অচল’ বলিয়া ঘোষণা করিয়া রেলপথকেই লাভজনক মনে করিতেছেন। ইহার কারণ রেল অপেক্ষা দ্বিগুণ ভাড়া বিমান পথে আশ্র পরিবহনে প্রয়োজন হয়। ফলে এত আশার বস্ত্রী বর্তমানে মালদহবাসীদের নিকট সম্পূর্ণ ‘দিল্লীকা লাভ’ বলিয়া মনে হইতেছে। এ সম্পর্কে জেলা কর্তৃপক্ষ, আশ্র ব্যবসায়ী বা কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলি যে একটা বিশেষ কিছু করিতেছেন—তাঁহাও মনে হয় না। অথচ এই পরিস্থিতির অবিলম্বে পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।”

—উদয়ন (মালদহ)।

বাক্সালী কি বাঁচিবে?

“মোটরচালক ও বাস কণ্ট্রোলরূপে শিখের স্থান, রেল-ইঞ্জিনের চালকরূপে অবাক্সালীর স্থান বাক্সালী ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। বাক্সালী দেশের পুলিশ বাহিনীতে ক্রমশঃ বাক্সালীর সংখ্যা বাড়িতেছে, বিজ্ঞাচালকরূপে বাক্সালীর দেখা কম মিলিতেছে না; কিন্তু ষ্টেশনের কুলিরূপে, কলিকাতার ভিজিওয়ালা ও কলকাতার মিত্ররূপে তাহার দেখা এখনও পাওয়া যাইতেছে না। থিমিরপুর ডেকে অবাক্সালী বিশেষ করিয়া অবাক্সালী মুসলমানের প্রাধান্য। উগরা সড়কের সমগ্র বাক্সালীদেশের ব্যবসায়ের উপর চরম আঘাত হানিতে পারে। ডকের কর্তা বাক্সালী হইলেও, তিনি এবং তাঁহার সাক্ষোপাঙ্গরা ইহাদের ভয়ে তটস্থ। কলিকাতা ও থিমিরপুরের বন্দরে বাক্সালী কুলি ও মাল-খালসিয়ারের স্থান অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বন্দর মেদিনীপুরের গৌণখালিতে অবাক্সালীর স্থান যেন কোনওমতেই না হয়, সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথা জনসাধারণের কর্তব্য। এখানে বলা প্রয়োজন, বাক্সালী বলিতে শুধু বাক্সালী হিন্দু নহে, বাক্সালী মুসলমানেরও সকল কার্যে সমান অধিকার আছে, একথা বুঝিতে হইবে। বাক্সালী হিন্দু ও বাক্সালী মুসলমানের সম্মিলিত চেষ্টাতেই অবাক্সালীর হাত হইতে একে একে কাজগুলি বাক্সালীর হাতে আসিবে।”

—মেদিনীপুর হিঠেরী।

ইহুদ

“ইহুদের আকরণ এমন একটা বিরাট ব্যাপার নয় যাহা নিয়া মাথা ঘামান লোকের আছে—এই লোকই একটা ধারণা একত্রেই সরকারী স্বীকৃতি গ্রহণ মনে ছিল এক আছে। পাঁচ শতাব্দিক পরিবার

বাঙলা চিরায়ত সাহিত্যে উল্লেখ্য সংযোজন

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত এবং তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেখ সংস্করণ হইতে গৃহীত ছয়খানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস একত্রে গ্রন্থিত। বঙ্গবিজেতা, মাদ্যবীকরণ, মহারাত্রী জীবন-প্রত্যাহ, রাজপুত্র জীবন-সন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত এবং রমেশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য সাধনার কথা আলোচিত। জাইনো হরফে বরবরে ছাপা, স্বর্ণাঙ্কিত রোব্লিন বান্দাই, মনোরম প্রচ্ছদপট।

[মূল্য : ৯ টাকা মাত্র]

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

১৪ খানি উপন্যাস একত্রে [১০৭]

দ্বিতীয় খণ্ড

উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র রচনা একত্রে [১৫৭]

রামায়ণ—রুত্তিবাস বিরচিত

ডঃ শ্রীমতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত ও সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুণেপাধ্যায় সম্পাদিত। ৮টি বহুবর্ণ ও ১৫টি একবর্ণ চিত্রে সুসজ্জিত। [৯]

জীবনের ঝরাপাতা

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেরী সরলা দেবীচৌধুরাণীর আত্ম-জীবনী ও নবজাগরণযুগের আলোচনা। [৪৭]

মহানগরীর উপাখ্যান

শ্রীকৃষ্ণাকর্ণা গুপ্তা রচিত কৈবর্তা বিদ্রোহের পটভূমিকায় একটি প্রেমভিত্তিক সুখপাঠ্য উপাখ্যান। [২১০]

রবীন্দ্র দর্শন

শ্রীহরিশ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবন-বেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২৭]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯

N অতীত পুস্তকালয়েও পাইবেন।

গৃহত্যাগী হইয়াছে, ইহাও হয়ত তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। কলস খসে হওয়ার সাথে সাথেই জুমিয়াগণ গৃহ ত্যাগ করে নাই। তাহারা নিশ্চয়ই গৃহত্যাগের পূর্বে খ খ হাসে থাকিয়াই জীবন যক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত উপায় না দেখিয়াই গৃহ ত্যাগ করিয়াছে। এক যুদ্ধে গৃহের মারা ত্যাগ করা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপেই মানুষ গৃহত্যাগ করে। গৃহত্যাগ যদি এত সহজেই করা হাইত, তবে পূর্ববঙ্গে এখনও ৮০ লক্ষ হিন্দু শক্তির থাকিত না, তাহারা দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে চলিয়া আসিত। মনে হয় স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক জুমিয়াদের বিপর্যয়ের ব্যাপারটিতে মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই অথবা গুরুত্ব আরোপ করিতে চান না। নতুবা যে সমস্ত অঞ্চলের ফসল ইহুর কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলে আর্থিক সাহায্য এবং সজ্জা দরে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা সরকার করিতেন। সংবাদ প্রকাশ ইহুর আক্রান্ত অঞ্চলের সমস্ত জুমিয়াই অস্ত্রাস্ত্র স্থানে চলিয়া হাইতে বাধ্য হইতেছে। তাদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় নাই। লুসাই পাহাড়েও ভরপ ইহুরের উপক্রমে ফসল বিনষ্ট হইয়াছে। আসাম সরকার তথ্যের খাতি সাহ সর্বপ্রকার সাহায্য প্রেরণ করিয়া জুমিয়াদের রক্ষার অগ্রসর হইয়াছেন। ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক কী গৃহত্যাগী জুমিয়াদের সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারেন না ?

—সেবক (আগরতলা)

খাদ্যাকল পঠনে সমস্তা সমাধান ??

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশক্তে ঘাটতি রাজ্য এবং একথা সর্ববানীদয়ত এবং সর্বজনবীকৃত। বৎসরের পর বৎসর এত সমস্তা লাগিয়াই আছে, কোন সমস্তার সমাধান বা নিবৃত্তি দেখা যায় নাই। কি আকাল আর কি ফসল, যে বৎসর যাই হোক এ সমস্তা যেন এটলীর জায় রাজ্যগাত্রে তথা সমাজগাত্রে বিরাজমান। এ সমস্তা রাজ্যের সাধারণ তথা মধ্যবিত্ত, দরিদ্র মানুষকে সময়ে সময়ে হতচকিত করিয়া তুলিতেছে,—সময়ে বৃষ্টির কাতর আর্দ্রনাদ আকাশ বাতাস মথিত করিয়াও তুলিতেছে। এই সমস্তায় জর্জরিত হইয়া ক্ষুদ্র যে সংঘটিত হইতেছে না এমন নয়। সরকারী দপ্তর যেন তেন ভাষ্য প্রয়োগ দ্বারা অন্তরঙ্গ বুকাইতে চাহিলেও মানুষ অরাভাবে মরিয়াছে,—মরিতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি, বেশী ফলাও আন্দোলন ইত্যাদি হরের রকম জোরদার তথা যোগানদার আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, বাণীতে বাণীতে মন মথিত করিয়াছে কিন্তু ‘বাখা পূর্ব তথা পরম’ প্রবাহ বাকাকে ফলপ্রসূ করিয়া সমস্তা একরূপই আছে।

পূর্বে পূর্বে সমস্তা থাকিলেও ঠিক এমন ছিল না, অবশ্য তার কারণও বর্তমান ছিল। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যেমন বাধা নিষেধের বেড়া জাল ছিল না, তেমনি বাংলার শস্য ভাণ্ডার পূর্বোক্ত ছিল, বর্ষাকালের খণ্ডিতরূপ ছিল না। আজ রাজনৈতিক কারণে যেমন পূর্বোক্ত হাতছাড়া তেমনি বৈবয়িক বৃদ্ধি প্রাণোদিত নেতৃত্ববাদের কলকাতাতে ভারতেরই বিভিন্ন রাজ্যে বাধা নিষেধের দুল্লভ্য প্রচার।

একই রাষ্ট্রের হরের নিয়ম, হরের কানুন, বেচার। পশ্চিমবঙ্গ তাই অত্যধিক জনসংখ্যা আর শস্যের আমদানী হীনতার বৃত্তপ্রায়। গত বৎসরও দেখা গিয়াছে যখন আগের অভাবে মানুষ হাহাকার করিতেছে, যখন চাউলের দর চল্লিশ ছুই ছুই করিতেছে, তখনও মধ্যপ্রদেশ বা উড়িষ্যার চাউলের মণ পনেরো হইতে সতেরো বা আঠারো টাকা মাত্র। একই রাষ্ট্রে এ ব্যাপার তবু কোত্থলই উল্লেখ করিবে না উপরন্তু অন্তের হাসি ও হুঃখের একই সঙ্গে উল্লেখ ঘটাইবে। এই ব্যাপার আমাদের পারস্পরিক ঐতিহ্যবোধ হীনতাই বোঝাইবে—জাতিত্ববোধে বোধহীনই বাইরের লোক বলিবে।”

—বীরভূম বার্তা

শোক সংবাদ

মহারাজী সূচাক দেবী

ব্রহ্মানন্দ বেশবচ্চর সেনের তৃতীয় কন্যা ময়ূরভঞ্জন মহারাজী সূচাক দেবী মহাশয়া গত ২৭শে অগ্রহায়ণ ৮৬ বছর বয়সে লোকান্তরিতা হয়েছেন। বংশিনী কবি ও শক্তিময়ী শিল্পী হিসেবে মহারাজী সূচাকর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত, অজস্র জনপ্রিয় কবিতা ও চিত্র তাঁর সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন বহন করছে। বাউলার প্রথম শ্রেণীর সমাজ-সেবিকাদের মধ্যেও তিনি এক বিশেষ আসনের অধিকারিণী। জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর অবদানে ও সেবার পুট হয়ে উঠেছে।

শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাউলা তথা ভারতের অজস্র বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পপতি শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৪ই অগ্রহায়ণ ৭০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। স্বীয় অদ্বতপূর্ব প্রতিভার কল্যাণে দেশের একজন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ও ব্যবসায়ীরূপে অটল প্রতিষ্ঠার ইনি অধিকারী হয়েছিলেন। ভারতের বহু বড় বড় বাঁধ নির্মাণে এঁর কুশলী হাতের স্পর্শ রয়েছে (তদাশ্রয়ে শঙ্কর বাঁধের নাম উল্লেখযোগ্য) হিন্দুস্তান কনষ্ট্রাকশান কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আসনে ইনি অধিষ্ঠিত ছিলেন ও প্রস্তাবিত কলকাতা শোন্টস ট্রেডিয়ামেরও ইনি অজস্র টাঙ্গী ছিলেন।

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরী গত ১৮ই অগ্রহায়ণ ৭৬ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ভারতবিশ্বাখ্য চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরীর অগ্রজ ছিলেন। স্বীয় আইনসভার অজস্র সনত, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সম্পাদক ও সহকারী সভাপতি এবং আলীপুর বার ব্যাসোসিয়েশনের সভাপতির আসন এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। হিন্দু সংস্কার সমিতিরও ইনি অজস্র প্রতিষ্ঠাতা। সনৎকুমারের মৃত্যুতে বাউলাদেশ একজন জাতির একনিষ্ঠ, কল্যাণকামী ও দয়ালু সমাজসেবকে হারাল।

সম্পাদক—ঐশ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৩৬ নং বিশিষ্টকারী পাঙ্গুলা স্ট্রিট, “বহুমতী বোটারী প্রেসে” ঐশ্রাণতোষ ঘটক সম্পাদিত।

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা সমালোচনা

মাসিক বহুমতী বর্তমান বাঙলা ও বাঙালীর পক্ষেই সামগ্রী হিসাবে আমরা গণ্য করি। কয়েকটি লেখা (বা সাম্প্রতিক লেখ্যগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে), বাঙলা সাহিত্যের অভাব শুধু পূরণ করেনি, বাঙালীর সংস্কৃতি ও সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকালীন কীর্তিক্রমে প্রশংসা গ্রহণ করবে, এ বিষয়ে আমরা সন্নিহিত। কঙলা পত্র-পত্রিকার জৈবীভাগ আমরা করতে চাই না, কিন্তু নানা কারণে মাসিক বহুমতীকে মনে হয় সর্বাপেক্ষা বেশী জীবন্ত ও প্রাণবন্ত তাই বহুমতীর জন্তে আমাদের বড় আবেগ আর অমুদ্রাগ। অধিকন্তু অদর্শন সম্বন্ধে পারি না। মাসিক বহুমতীকে আমাদের শ্যাসন করছি। তুষ্টি আর আরামের আকর এই পত্রিকাটির পৌরব মনে দিনে বর্ধিত হোক। বাঙলা ও বাঙালীর অগ্রগতির প্রত্যেক মাসিক বহুমতী ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করুক। এখন লেখাগুলির নামোদ্ধে করি। 'যেমন শিশির-সান্নিধ্যে' স্মৃতিরচনা। নটনটা ও নটক সম্পর্কে এমন সারগর্ভ লেখা সহজে খুঁজে মেলে না। লেখাটিতে লেখকব্বরের অপরিণীম নির্ভা ও বৈষ্যের প্রশংসা করতে হয়। লেখকব্বর বাঙালী জাতির অভিযান গ্রহণ করুন। আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'বিপ্লবের সন্ধানে'। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কোন প্রাণীয়া বই এখনও রচিত হয়নি। যা হয়েছে তার অধিকাংশই পক্ষপাতভূত ও অভিসন্ধিমূলক লেখা। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার চিহ্ন তাদের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। বাঙলার বিপ্লব কাহিনী পৃথিবী বিখ্যাত। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথে (দিল্লীর সরকার স্বীকার করুন চাই নাই করুন) বাঙালীর দান অসংখ্য লেখা থাকবে। লিখবেন হরতো কোন সং ও সজ্ঞন ঐতিহাসিক। 'বিপ্লবের সন্ধানে' লেখার যেন কোন কীক ও কীকি নেই। পোপনতা নেই। এমন সহজ সরল নিঃস্বার্থ গল্পরচনা আমরা বহুকাল পড়তে পাইনি। কত অজানা তথ্য, যা হরতো কখনও জানতে পেতাম না। কত অসংখ্য চরিত্র ও হাল্ধব—তার হরতো বিশ্বত থাকতেন চিরকাল। কেউ তাঁদের সন্ধান জানতো না। 'বিপ্লবের সন্ধানে' বাঙলা সাহিত্যের একটি অব্যাস সম্পদ হয়ে থাকবে। লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে নিশ্চয়ই। লেখক ব্রাহ্মণ, আমাদের শত সহস্র প্রশংসা গ্রহণ করুন। মাসিক বহুমতীর অন্ততম প্রধান আকর্ষণ (আমাদের কাছে) 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগটিতে। বিখ্যাত মনীষীদের সম্পর্কে আসার এমন বিশ্বয়কর মাধ্যমকে কোন পত্রিকায় দেখতে পাই না। 'পত্রগুচ্ছ' সজ্ঞনটি যেন চিন্তন। প্রতি মাসের প্রতীক্স আমরা বার্ষ হয় না। সে ঠিক আসবেই। 'পত্রগুচ্ছ' আসে যেন মাসে মাসে এক অনন্ত দরিত্রের মত। আমরাও মনে মনে জানাই 'প্রহাসগতম'।

আমাদের সঙ্গে বাবের পরিচয়, জীবনপথে চলতে চলতে বাবের লেখা পাই, পরিচয় পাই, তাইয়েই বলি আমরা একটি কথা, 'মাসিক বহুমতী' পড়ুন। বাঙলা তথা ভারতবর্ষকে জানতে ও চিনতে চান তো 'মাসিক বহুমতী' পড়ুন। মাসিক বহুমতী আমাদের জাতির

'এনসাইক্লোপিডিয়া বেলিকা'। সনমদ্যার ইতি—জীবনী বিবলা দেবী। শ্রামপুত্র ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৪।

মচিত্র সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা আমাদের দেশে একাডাই নগণ্য। শ্রেষ্ঠ নিউজ প্রিণ্টে ছাপা সাময়িক পত্রিকাগুলিতে ছাপা ছবি দেখতে দেখতে আমাদের সত্যিই হাসি পায়! না আছে কোন পরিকল্পনার বলাই, না আছে কোন শিল্পবোধ। যা খুলী তই, যা ইচ্ছা তাই ছবি ছেপে দিতে পারলেই বায়েলা চুকে যায়। ইদানীং আবার কয়েকটি পত্রিকায় যে সব ত্রিধর্ষ ছবি প্রকাশিত হচ্ছে, তাদের বিষয়বস্তু, রঙ-বাবহার, ছাপার টেকনিক দেখলে মনে হয়, বাঙলা দেশে বার্ষা শিল্পী নেই বললেই হয়। কাগজ ও রঙের এমন অপব্যবহার কেন যে করেন পত্রিকার কর্তৃপক্ষ, আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। লাইনের উইং বা রেখাচিত্র তবুও যা হোক কিছুটা স্পষ্ট, কিন্তু গল্পের মাধ্যম ছবি মানেই কি নায়ক-নায়িকার ছিন্নমুণ্ডের সঙ্গে লেখার হেজি? অশ্লষ্ট বিশেষ লেখা ও রেখার সম্মিশ্রণ ক্রমে কত উন্নত পর্ধ্যায়ে উঠেছে, শিল্পী ও সম্পাদকরা কি দেখতে পান না? হাকটোন ছবির কথা না বলাই ভাল। লাল, নীল, সবুজ, কালো কালিতে ছাপা চিত্রতারাকাদের ইন্ডিও কটো দেখতে দেখতে কি হাসি সঞ্চার করা যায়?

আর্ট ডাইরেক্টর বলতে আমাদের পত্র-পত্রিকার কোন কেউ থাকেন কি না, আমরা সঠিক জানি না। তবুও আমরা প্রশংসা করতে পারি বাঙলা দেশের চারটি পত্রিকাকে। 'মাসিক বহুমতী' আনন্দবাজার ও যুগান্তের 'রবিবাসরীর সংখ্যা' এবং 'দেশ' পত্রিকায় শিল্পচরিত্র বেষ্ট পরিচয় থাকে। মাসিক বহুমতীর বড়ী ছবি, গল্পের illustration এবং বিভাগীয় হেজিগুলি সত্যি সত্যি শিল্পকৃষ্টি সম্মত। মাসিক বহুমতীর বড়ী চিত্রসমূহের বিষয়বস্তু এবং টেকনিক আমাদের চোখ ও মনকে বেশ তুষ্টি দেয়। গল্পের illustration এবং lettering চোখের পক্ষে সীড়াদায়ক নয়। আলোকচিত্র আকর্ষণ ভাল ছাপা হওয়া সমীচীন। মাসিক বহুমতীর প্রচ্ছদপটের বেশ অভিনব থাকে। পত্রিকার শিল্পবুদ্ধ এবং সম্পাদককে আমাদের সজ্ঞা নমস্কার জানাই। শুলেখা সেনগুপ্তা ও বজা মুখোপাধ্যায়। (গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্রী)। কলিকাতা।

প্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Remitted Rupees seven and annas eight for six months. Please acknowledge the amount and credit it to my account.—Sm. Krishnakumari Debi, P. O. Rata, Birbhum.

আমার দেব চাঁদ পাঠালাম। সবাদ দিয়ে স্তবী করবেন। Sm. Aradhana Ghose. Sarada Cottage, Patna—4.

Herewith I am sending subscription for Masik Basumati—Sm. Latika Chatterjee.

C/o Miss K. Chatterjee, Artist. D. C. M. Silk Mills, New Delhi.

Please accept subscription for monthly Basumati.—Sri J. N. Dey. Civil Supplies Office. Balasore.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক গ্রাহকমূল্য পাঠালাম। নমস্কারান্তে ইতি—কৃষ্ণি বসু। 33, Nayagaon. Lucknow. U. P.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ সাড়ে সাত টাকা পাঠালাম। কালীতারা দেবী। ৭১, অভুলকুমার বানার্জী লেন; কলিকাতা—৩৬।

১৩৬৬ সালের কার্তিক থেকে চৈত্র মাসের গ্রাহকমূল্য পাঠালাম। অবিলম্বে কার্তিক সংখ্যাপত্র পাঠাবেন। অভিবাদন প্রচণ ককন। জীমতী অনিয়া শেঠ। Choukidingipara. Dibrugarh. Assam.

Please send Monthly Basumati to the following address. Mrs. Namita Choudhury, G. P. O. Box No 191. Bangkok. Thailand.—S. Choudhuri. Sector No 18, Rourkela—3.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠালাম। প্রাপ্তি জানাবেন।—সতী দেবী। Post Box No 17. Raxaul. Champaran.

কার্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত গ্রাহিকা হইতে চাই। টাকা পাঠালাম।—জীমতী বীণাপাণি বিশ্বাস। Dhalkar. Jalpaiguri. বাৎসরিক চাঁদা পাঠালাম।—জীমতী তরু ঘোষ। বাণীগঞ্জ। বর্ধমান।

I am sending herewith Rupees seven and annas eight being the renewal subscription.—Mrs. Amala Mukherjee, Kamtaul. Darbhanga.

বসুমতীর গ্রাহিকা মূল্য পাঠালাম। বসুমতী পাঠিয়ে বাঞ্ছিত করবেন।—শেফালী বার। Nazerbagh. Lucknow.

এক বৎসরের অগ্রিম মূল্য পনেরো টাকা পাঠাইলাম। দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্লুরবা রোড। Bangalore.

চয় মাসের চাঁদার টাকা পাঠালাম। কার্তিক মাস থেকে পত্রিকা পাঠাবেন।—নিলীমা আব্রাহাম। Emokulam, Kerala.

প্রাপ্ত মাস থেকে চয় মাসের চাঁদা পাঠালাম। প্রাণ ও তাত্র সংখ্যা একত্রে পাঠালে ভাল হয়। নমস্কার। জীমতী কনক দে। Sekhbazar, Cuttack.

চাঁদা বাবদ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাঞ্ছিত করিবেন।—মুকুন্দ জৈবরী। Malleswaram, Bangalore.

Remitting Rupees 7-50 n. p. being half-yearly subscription of my above quoted name—Nilima Bose. Thanjhora Tea Estate, Thanjora.

This is the subscription of the Monthly Basumati.—D. K. Laha. Tilak Nagore Thana, Bombay.

I am sending Rupees fifteen in advance for monthly Basumati—Mrs. Kalpana Basu. Kopri Colony. Thana Bombay.

কার্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত আমাকে গ্রাহিকা প্রেরীভুক্ত করিবেন।—অর্পিতা দাশগুপ্তা। Secy, Bengali Mahila Samiti, Byronbazar, Raipur.

চয় মাসের মাসিক বসুমতীর অগ্রিম মূল্য পাঠালাম। নিয়মিত বসুমতী পাঠাবেন।—জীমতী শান্তি চট্টোপাধ্যায়। Po. Guraru Mills, Gaya, Bihar.

Please continue sending me Monthly Basumati for another six months.—Dr. (Mrs.) H. Misra. Hirakud Hospital, Orissa.

Being the half-yearly spbscription for Monthly Basumati.—Mrs. Alo Sengupta. 254. Sion Road, Bombay-22.

বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা পাঠালাম। নমস্কার।—শৈলবালা দেবী। Harem Road, Ranchi.

মাসিক বসুমতীর চাঁদার লজ সাড়ে সাত টাকা পাঠালাম।—ইলারাবী পাল। Poona.

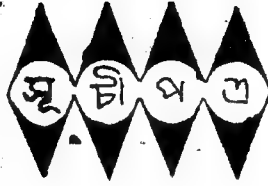
Sending Rupees fifteen being our renewal subscription for one year.—Kalyani Roy-Choudhury. Armapur, Kanpur.

আমাদের বঙ্গলীর কামেলার দরুন সময়মত টাকা পাঠাতে না পারায় বিশেষ লজ্জিত এবং দুঃখিত।—জীমপর্ণা সান্ডাল। Barhi, Hazaribagh.

মাসিক বসুমতীর চয় মাসের চাঁদা পাঠালাম।—মঞ্জু বসু। Monoharpur, Singhbhum, S. E. Rly.

আমি মাসিক বসুমতীর একজন গ্রাহিকা। বসুমতীর ১৩৬৬ সালের কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত ৬ মাসের চাঁদা ৭।।০ টাকা পাঠালাম (গ্রাহিকা নং ৫২৭৮২) ছোটবেলা থেকেই মাসিক বসুমতীর সঙ্গে আমার পরিচয়। মাসিক বসুমতী পাঠ করে আমি খুব আনন্দ পাই। অতএব নিয়মিত পত্রিকা পাঠাতে ভুলবেন না।—Mrs. Alo Chatterjee C/o Dr. N. C. Chatterjee, 155, Basant Lane, Paharganj. New Delhi.

Please receive Rs 7-50 N. P. as subscription of Monthly Magazine Basumati for the period from Kartick to Chaitra 1366 B. S. and arrange to send the same as usual. The delay in sending the subscription is regretted.—Protiva R. Gupta. Thana Health Centre, Ranibar. Bankura.



বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কথাবৃত্ত	(যুগবাণী)	৩৩১
২। সত্ত্ব কবীর	(জীবনী)	৩৭০
৩। সত্যবচন ও স্ববীজনাথ	(প্রবন্ধ)	৩৭৫
৪। ইংরেজি কবিতার অন্তর্ভুক্ত সত্যোজনাথ	(প্রবন্ধ)	৩৭৭
৫। অথও অমির ঐগৌরব	(জীবনী)	৩৮৪
৬। বিপ্লবের সন্ধান	(কার্যকাহিনী)	৩৮৮
৭। মুক্তি	(কবিতা)	৩১৪
৮। আধুনিক বঙ্গদেশ	(প্রবন্ধ)	৩১৫
৯। একটি বছর	(কবিতা)	৪০০
১০। চার জন	(বাঙ্গালী-পরিচিতি)	৪০১
১১। বাঁসীর রাণী	(কবিতা)	৪০৫
১২। পত্রিকা		৪০৬

দবাইকার ভালোলাগার মতো গল্প-প্রকাশিত কয়েকটি বই

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

'ভাঙা' যুগের এই বনামধন্য সাহিত্যিকের ভালো গল্পগুলি বহু আয়ালে সংগ্রহ করে এই প্রথম একত্র করে ছাপানো হল। বাংলা-সাহিত্যপাঠ্যবাহীরা অবতরণ। ৫.০০ ॥

বুদ্ধদেব বসুর অবিদ্যার উপভাস সাত্তা নতুন আকারে পরিমার্জিত সংস্করণ। ৩.০০ ॥	অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের অনিন্দ্য নাট্য-খুঁটি নতুন তারা সাতটি একাত্তিকা। পরিমার্জিত সংস্করণ। ৩.০০ ॥
শ্রোতৃমণ্ডলের হৃদয় উপভাস একত্রে ভ্রাপনের নিঃশব্দ সঙ্গ "শি'পড় পূর্ণা"। ২.৫০ ॥	লীলা মজুমদারের নতুন লেখা বাঘের চোখ অনেকের কাহিনী। উত্তম প্রচ্ছদ। ২.৫০ ॥
	বিষমের বিশ্বাসের অভিব্যক্তি কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে নতুনতর সচিত্র কাহিনী। ২.৫০ ॥

বিষমের চর্যাপাঠ্যের পূর্বাবস্থার বিভিন্ন প্রবন্ধ-বন্ধ-উত্তর-কাহিনী। বাংলা সাহিত্যে নতুনতর খুঁটি।

অমৃতের উপাখ্যান

ভট্টর হাথবলার দায় জীবনের তথ্যপূর্ণ ক্রমিকা। অনবদ্য সন্ধ্যা। উপহারের উপযোগী। ৩.৫০ ॥

অজ্ঞাত উল্লেখযোগ্য বই : মিলিগম্‌হার হারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপভাস ভরত রোহিণীকে ৬.০০ ॥ সৈয়দী দেবীর অনামত-রসনা অংগুতে স্ববীজনাথ। ৬.০০ ॥ পরিবল সোনারীরা স্বভিতিপ্রব ৬.০০ ॥ শতাব্দীর হারচৌধুরীর ভাঙাটিকিটের অজ্ঞানতা। ৬.০০ ॥ জ্যোতিষের পোনের ভাঙাটিকিটের লংকার। ৬.০০ ॥ ভাষণের বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্যপন্ন পাঠ্যশালা। ১.৫০ ॥ শ্রোতৃমণ্ডলের হৃদয় উপভাস একত্রে। ১.৫০ ॥ বিহারক ভট্টাচার্যের অজ্ঞানতার চিহ্ন। ৬.০০ ॥ পরিবল সোনারীরা ভুলের মেয়েরা। ২.০০ ॥ বিশ্বাসের সত্য। সত্যের কথা আজও অমরী। ৬.০০ ॥ ডেল কার্ণেলের হৃদয় পৃথিবী-বিশ্বাভি অকুলবীর প্রবন্ধ দ্বারা। ২.০০ ॥—একটি ক্রমিকা (how to win friends & influence people)। ৬.৫০ ॥ মুক্তিভাঙাটিকিটের নতুন জীবন। ২.০০ ॥—একটি ক্রমিকা (how to stop war & start living)। ৫.০০ ॥ নটক : এক হুঁচকি জাকাশ (বঙ্গের বৈরাগী)। ১.২৫ ॥ অজ্ঞানতার ভাঙাটিকিটের নতুনতর। ৬.০০ ॥

॥ একত্রে পত্রিকা ও পত্রিকা লিভিংকট। ১২১, লিভিংকট, কলিকাতা, ১৯৭১ ॥

বঙ্গের বৈরাগীর হৃদয় নতুন যুগের উপভাস
এক হুঁচকি জাকাশ। বিভিন্ন পাঠ্যবাহী কাহিনী ২.৫০
সত্যোজনাথ। নটক ক্রমের সত্যের কবিতা। নতুনতর কাহিনী ২.৫০

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১৩। আলোকচিত্র		৪০৮(ক)
১৪। ভারতীয় সাধনার গুরুবাব	(প্রবন্ধ)	শ্রীশ্রবণেশ্বর ভট্টাচার্য্য
১৫। শেষ বেলা	(কবিতা)	শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায়
১৬। জীবনসীতা	(প্রবন্ধ)	শ্রীসোমেন সেন
১৭। বিশেষিনি	(উপভাস)	নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
১৮। স্বপ্নের রাত্রির মাঝে	(কবিতা)	শ্রী দম্পূর্ণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
১৯। ভাবি এক, হয় আর	(উপভাস)	শ্রীদীপকুমার রায়
২০। কাল তুমি আলেয়া	(উপভাস)	আন্তোভায় মুখোপাধ্যায়
২১। প্রবাহকল্পা	(কবিতা)	সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
২২। তেরা কিগনার	(কাব্য-কাহিনী)	অমল সেন
২৩। অমৃতভব	(কবিতা)	অধীর সরকার
২৪। বাতিঘর	(উপভাস)	বারি দেবী
২৫। বেগনা	(কবিতা)	বকুল বসু
২৬। আনন্দ-বৃন্দাবন	(সংস্কৃতকাব্য)	কবি কর্ণপূর : অমৃতবাব—শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৭। অমৃতভব	(কবিতা)	মধু গোহাটী
২৮। বিজ্ঞানবার্তা		বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়
২৯। একাডেমির অব কাইন আর্টসের শিল্পপ্রদর্শনী	(প্রবন্ধ)	অশোক ভট্টাচার্য্য

বিস্তারিত-৩৪-৪৭৬০ • গ্রাম-অসমুদ্রণ

দে এণ্ড দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড সুবিলিয়ন মার্কেট

২১৭/২-বহুবাজার স্ট্রীট-কলিকাতা-৩২

বিশুদ্ধতায়
আধুনিকতায়
গুণে
মজারমসিল্প-
নিপুণতায়।

শ্রীরামপুরের
এস.চন্দ্রবর্মা

স্পেন্সাল
XX
নমুনা

লক্ষ্মী এডেন্সী

৪৩, ১/২ নং রোড - কলিকাতা-৭

আমেরিকার বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ও
বাইওকেমিক ঔষধ

প্রতি জায় ২২ মঃ পঃ ও ২৫ মঃ পঃ, পাইকারসকে ছাড়
কমিশন দেওয়া হয়। আমাদের নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি ও
বাণিজ্যীয় সরঞ্জাম হুল ও নুসো পাটকারী ও গুচরা বিক্রয় হয়। বাণিজ্যীয় পুস্তক,
মাসিক দৌলতা, অক্ষা, অগ্নি, অর, অর্জুন প্রভৃতি বাণিজ্যীয় জিনিস যোগ্যের
চিকিৎসা বিজ্ঞানজ্ঞতার সহিত করা হয়। অক্ষা-হুল হোমিওপ্যাথিক
ডাকঘোষে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক ও পরিচালক—
ডঃ কে, সি, দে এল-এম-এফ, এইচ-এম-বি (পোস্ট মেডিসিট),
ফুলপুর হাউস ফিজিয়ান কলেজ হাসপাতাল ও কলিকাতা
হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এও হাসপাতালের চিকিৎসক।
আমাদের করিমা অর্জনের সহিত কিছু অগ্রিম পাঠাইবে।

আমাদের কোরিমিট্র ১৮৫, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৭/৮

যুগীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৩০। অজ্ঞান ও প্রাজ্ঞ—		
(ক) অপরূপ	(গল্প)	ঐতনিয়া ঘোষাল ৪৬৫
(খ) প্রাচীন নারী ও আচার-অনুষ্ঠান	(প্রবন্ধ)	বেলা দে ৪৬৬
(গ) মাতৃজ্ঞানি কোন্ পথে ?	(প্রবন্ধ)	ঐমতী কণা দেবী ৪৬৭
(ঘ) মেঘমল্লার	(গল্প)	সাধনা বসু ৪৬৯
(ঙ) চিরন্তনী	(কবিতা)	মাধবী ভট্টাচার্য্য ৪৭৫
৩১। চম্পা তার নাম	(উপভাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য ৪৭৬
৩২। কপালকুণ্ডলা	(কবিতা)	ঐমতীজনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৮৫
৩৩। ছোটদের আসর—		
(ক) দিন আগত ঐ	(উপভাস)	ধনঞ্জয় বৈরাগী ৪৮৬
(খ) কিতে কেটে জুড়ে দেওয়া	(বাহুতথ্য)	বাহুরত্নাকর—এ, সি, সরকার ৪৮৯
(গ) ব্যারোমিটার	(গল্প)	সুভাষ চট্টোপাধ্যায় ৪৯০
(ঘ) খুঁজ চাঁদ ধরা	(গল্প)	ঐনন্দহুলাল সরকার ৪৯১
(ঙ) কিশোর প্রভাব	(নাটিকা)	ঐরুচিবালা দাস ৪৯২
(চ) জুজুড়ির গল্প	(কবিতা)	সুভাষা নাশাদ ৪৯৩
৩৪। হামাম	(গল্প)	প্রতিমা দাশগুপ্ত ৪৯৮
৩৫। শুধু এই অছুরোধ	(কবিতা)	প্রতিভা রায় ৫০৮
৩৬। মেঘের ওভারকোট	(গল্প)	শিটার নান্‌জেন—অন্নবাদিকা : য়েণ্‌কা দেবী ৫১০
৩৭। আলোকচিত্র		৫১২(ক)

॥ ন্যাশনাল বই ॥

প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক সাহিত্য

অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের

সাহিত্যবীক্ষা

সাহিত্য বিশ্লেষণে মার্কসবাদ, বাংলা সাহিত্যের পটভূমি, শেক্সপীয়ার, বঙ্কিমচন্দ্র, মেঘনাদবধ কাব্য-সমাজবাস্তবতা, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি প্রভৃতির আলোচনাক্রমে সাহিত্য-বিশ্বাসে এমন সব মূল প্রশ্ন এ-গ্রন্থে উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে যার মূল্য চিরকালীন। দাম ৩.০০

নরহরি কবিরাজের

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা

ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে বাঙলা দেশের অবদানের তথ্য-সমৃদ্ধ বিবরণ। দাম ৫.০০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ

আদিম সমাজের গোড়াপত্তন থেকে আধুনিক সমাজতন্ত্রের আন্দোলন পর্যন্ত মানব-ইতিহাসের প্রত্যেকটি পাতা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয়েছে। দাম ৩.৫০

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

ভাষাতত্ত্ব মার্কসবাদ

মার্কসবাদের আলোকে ভারতের জাতি ও ভাষা-সমস্যার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক আলোচনা। দাম ০.৫০

শ্রী বীর হর্ষ

পুস্তকমাল মিত্রের

১৮৫৭ ও বাংলাদেশ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ । ১৭২ বর্মডেন স্ট্রীট, কলি—১৩

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৮। শিশির-সান্নিধ্যে (জীবনী) রবি মিত্র ও শেখজাহার বক্স ৫১৪	
৩৯। ভাপসী-প্রতীকিতা (কবিতা) জীবনলাল ঘোষ ৫১৮	
৪০। মাচ-গান-বাজনা—	
(ক) ওস্তাদ জাম্বুদীন খাঁ (প্রবন্ধ) কাজী নজরুল ইসলাম ৫১৯	
(খ) তুঙ্গীত (প্রবন্ধ) দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ৫২০	
(গ) আয়ার কথা (শিল্পপরিচিতি) জীশলিল চৌধুরী ৫২২	
৪১। মোহরী মন (কবিতা) উমিমালা চক্রবর্তী ৫২৩	
৪২। সাহিত্য পরিচর ৫২৪	
৪৩। কেনা-কটা (ব্যবসা-বাণিজ্য) ৫২৭	
৪৪। আন্তর্জাতিক পরিহিতি (রাষ্ট্রনীতি) জীগোপালচন্দ্র নিয়োগী ৫২৯	
৪৫। বন কেটে বসত (উপভাস) মনোজ বসু ৫৩৫	
৪৬। মাঝি (কবিতা) নগুচি—অম্বাবাদ : চণ্ডী সেমগুণ্ড ৫৪০	
৪৭। পাগলা হত্যার মায়ালা (রহস্যোপভাস) ডঃ পকানন ঘোষাল ৫৪১	
৪৮। আকাশের প্রতি (কবিতা) সুধাভরদ্বজ ঘোষ ৫৪৫	
৪৯। দেশে-বিদেশে (বটনাপত্র) ৫৪৬	
৫০। রক্তপট—	
(ক) “সেহু”—বিবরণ ৫৪৮	
(খ) রাজা সাল ৫৫১	
(গ) রাজ্যভূগ ৫	

মহাবোধী—ত্রিসোকের মহাত্মিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের জীবনানিঃস্মৃতি—কলির মানবের বুদ্ধির ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভের একমাত্র সূত্র
পূর্বা—অসংখ্য তত্ত্বশাস্ত্র-সমূহ আলোকিত করিয়া সারাসংসার সকলকে—প্রত্যেক সত্য—সত্যকল্যাণ সাধনার অসুখ সম্বন্ধ।

তত্ত্বশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাসীশ জীমৎ কুকানন্দ

বহু তত্ত্বসার

—সুবিহিত বঙ্গভূবাদ সহ বহু সংকল্প—

প্রবাদিমেব মহাবীর বীর জীবনে বলিয়াছেন—কলিতে একমাত্র তত্ত্বশাস্ত্র আগ্রহ—সত্য কল্যাণ—জীবনের বুদ্ধিবৃত্তি। অতঃপর নিম্নিত—তাহার
সাধনা নিম্নলি। অশানে সাধনায় মহামেব পঞ্চমুখে বলিয়াছেন তত্ত্বশাস্ত্রের বাহ্যিকাকীর্ণন করিয়া—সংযাতীত তত্ত্বশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া—
বুদ্ধি ও শক্তির পথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই সীমাতীত তত্ত্বসমূহে যথিত করিয়া, মহাত্মা কুকানন্দ সরল সহজ বোধগম্যভাবে সাধক-সম্প্রদায়ের
শক্তি-বীজ নিহিত অদ্ব্য রত এই বহু তত্ত্বসার আজীবন কঠোরতম সাধনায়—জীবনাত্মক পরিচয়ে সঙ্গ্রহ—সকল সারসংসার সমাবেশ করিয়া
মানবের মঙ্গলবিধান করিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্ব-তত্ত্ব ও তত্ত্ব-রহস্য—পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ? গুণসাধন কাহার দায়? অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের
সাধনা—তাত্ত্বিক সাধনায় শাস্ত্র তত্ত্বগণের সকল সিদ্ধিই তত্ত্বসারে সন্নিবেশিত।

সরল প্রোঞ্চল বঙ্গভূবাদ—সুতন নূতন বঙ্গচিহ্নে সুশোভিত—অমুঠানপদ্ধতি সহজিত

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষা—বহু ব্যয়ে—আনুষ্ঠানিক তাত্ত্বিক পণ্ডিত মহাশয়গণের সহায়তার কাশী হইতে পুঁবি আনাইরা বঙ্গবন্ধী
সাহিত্য বঙ্গির পরিণোবিত পরিবর্তিত সংকল্প প্রকাশ করে। পূজা, পুরস্কার, হোম, বাগবত, বলিদান, সাধনা, সিদ্ধি, বহু,
কপ, ভপ, তত্ত্বসারে কি নাই? হাইকোর্টের জামবুদ বিচারপতি—অসংখ্য আইনজ্ঞ-প্রণেতা উভয়ক লাহেবের অঙ্গীকরণ—
কলানীকরণ তত্ত্বের অঙ্গবান প্রণয়ন ও প্রকাশকালাবধি তত্ত্বগণের প্রতি শিকিত সম্ভারের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে, তাহার
কেন্দ্রিক কি অলৌকিক সাধনার সিদ্ধি—অতীতের অমুঠান সমাবেশ—সকলতত্ত্বের সম্বন্ধ—কুকানন্দের তত্ত্বসারে বহু
তত্ত্ব আছে, সকলেরই মিত্র প্রবর্ত হইয়াছে। সুতরাং দশ টাকা।

বঙ্গবন্ধী সাহিত্য বঙ্গির : ১৩৬, বিশিষ্ট বিহারী সাকুলী ট্রাট, কলিকাতা - ১২

সূচীপত্র

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
(ক) কৃষ্ণ		৫৫০
(খ) বঙ্গবীণা		৫৫১
(গ) শ্রুতির চক্র	(আত্মবৃত্তি)	৫৫২
(ঘ) দ্বাদশবর্তী সংকলিত নাট্যাভিনয়	(একক)	৫৫৩
৫১। খেলাধুলা		৫৫৪
৫২। সাময়িক প্রসঙ্গ—		
(ক) দেশের অবস্থা		৫৫৫
(খ) বাবাজীর মৃত্যু		৫৫৬
(গ) নারীর কথা		৫৫৭
(ঘ) শাক-ভাতের মৈত্রী		৫৫৮
(ঙ) জেলার সরকারী অফিসপূর্ব কোথায় হইবে		৫৫৯
(চ) পৌষমাসেই সর্বনাশ		৫৬০
(ছ) রেল কর্তৃপক্ষের খেয়াল		৫৬১
(জ) নিয়মের কথা		৫৬২
(ঝ) শিশুর-সাম্রাট্য সম্পর্কে		৫৬৩
(ঞ) শোক-সংবাদ		৫৬৪

বঙ্গশিল্পে মোহিনী মিলের

অবদান অতুলনীয় !

মূল্যে, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীত

১ নং মিল—

২ নং মিল—

কুষ্টিয়া, বদৌয়া । বেলবরিয়া, ২৪ পরগণা

ম্যানেজিং এজেন্টস্—

চক্রবর্তী, সঙ্গ এণ্ড কোং

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

“আটচল্লিশ বছর ধরে অভিনয় করছি, ১১০৮ থেকে ১১৫৬ সাল । দুটো মৃগকে বেঁধে রেখেছি । আমার থিয়েটারের দরজা খোলা থেকেছে । কত নদী ব’য়েছে, শুকিয়ে গেছে । কত লোক এসেছে, কত লোক গেছে । আমি অভিনয় ক’রে গেছি । একবার শুধু বাইরে গেছি—নিউইয়র্কে গিয়ে ছ’ মাস ছিলাম, অভিনয় করলাম ১০০-সেই ছয় মাসের প্রতিটি দিনের ঘটনালেক্সাই ডায়েরীর আকারে লিখিত ।

নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্রের

● আমেরিকায় শিশিরকুমার ●

॥ দাম—পাঁচ টাকা ॥

বাংলায় শিশিরকুমার নাটক আছে, বঙ্কিমের নাটক আছে; কিন্তু রাস সেভেন থেকে রাস টেনের ছেলেরের মিলে শুনের দুটি প্রোজেক্ট বা উৎসবে দু’ঘণ্টা অভিনয় করার মতো কোন নাটক নেই । এই হাসির নাটকে শিক্ষকেরাও হোপ দিতে পারবেন ।

মধু সংসাপী বিশ্বাসক ভট্টাচার্য্যের

দাম আড়াই টাকা ● শুনে পুণ্যবান ● ভাকমাতল আলদা

দেশ পত্রিকা বলেন :—“অন্যে গরিবটি বিধায়কবাবু আদর্শ বই ।”

সুশান্তর বলেন :—“ছোটদের মহলে তাঁর অবিস্মরণীয় চিত্রিত অদ্বৈত-এর নতুন ক’রে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই ।”

বুক এ্যাণ্ড বুক : ৮৭, থর্মডলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

প্রকাশিত হলো—

নীলকণ্ঠ-এর

একটি অশ্রু

ছটি রাত্রি

ও কয়েকটি গোলাপ ৩.০০

তিমির লগন

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য-এর নতুন উপস্থাসের নারিকা
বাসবী নামকে দেখেছিল এক রাহুগ্রস্ত চাঁদের
আলোয়। রাহুগ্রস্ত সে প্রেমের দাম কে দিল?
বাসবী? না এডিথ বিশ্বাস?.....৪.৫০

❖ জাগো বৈশাখ ❖

শ্রীদ্ব্যামল

জ্যোতিষ শতকের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত
রোমাঞ্চকর প্রেমের কাহিনী।.....৫.০০

ছবিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	॥ অতুলজ	৩.০০ ॥
"	॥ চন্দন কুমুম	২.০০ ॥
"	॥ প্রান্তিক	২.০০ ॥
নীলকণ্ঠ	॥ বসন্ত কেবিন	২.৫০ ॥
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	॥ এতটুকু আশা	৩.০০ ॥
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	॥ সুধা সঙ্কেত	২.৫০ ॥
বিত্তভূষণ মুখোপাধ্যায়	॥ রেলরজ	২.৫০ ॥
নীলকণ্ঠ	॥ দ্বিতীয় প্রেম (যজ্ঞহ)	২.৫০ ॥

কল্যাণ প্রকাশনী

১১, ভ্রামারণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সদ্য প্রকাশিত দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

VEDANTA PHILOSOPHY

স্বামী অভেদানন্দ

ইংরেজী ১১০১ খ্রষ্টাব্দে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের
হইলার হলে এই বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। তদানীন্তন অধ্যাপক
হাউইসন, অধ্যাপক জোসিয়া রয়েস, অধ্যাপক উইলিয়ামস জেমস
এমুথ আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ অধ্যাপকের সামনে
ফিলজফিক্যাল ইউনিয়নের উদ্দেষ্ঠ বক্তৃতাটি দেওয়া হয়। ক্যালি-
ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইক্রোক্সিলম করে এই বক্তৃতা আনিয়া
ছাপা হ'ল। হইলার হল, অধ্যাপক হাউইসন, রয়েস, জেমস ও স্বামী
অভেদানন্দের ছবি এতে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মাইক্রোক্সিলম
প্রিন্টের একটি ফটোও এতে দেওয়া হ'ল। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ও
স্বত্ব মশাটযুক্ত। ॥ মূল্য : তিন টাকা ॥

॥ মন ও মানুষ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনের ঘটনা ও বিভিন্ন বিজ্ঞানের
আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। স্বামী অভেদানন্দের জীবনী, তাঁর
বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বিচিত্র চিন্তাধারার সমাবেশ। বিভিন্ন ছবি সংবলিত
৪৫০ পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের বই। ॥ মূল্য : সাত টাকা ॥

স্বামী অভেদানন্দ

(কালী-ভগবতী)

সহজ ও সরল ভাষায় বহু উপদেশাবলী সংযোজিত ও বহু অপ্রকাশিত
ছবি সংবলিত প্রামাণ্য জীবনী। মূল্য—১১.০০

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

মরণের পারে	৫.০০	পুনর্জন্মবাদ	২.০০
কাম্মীর ও ভিকবতে	৫.০০	ভারতীয় সংস্কৃতি	৬.০০
শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম	২.৫০	কর্ম বিজ্ঞান	২.০০
আত্মজ্ঞান	২.০০	আত্মবিকাশ	১.০০
স্বামী বিবেকানন্দ	২.৫০	স্তোত্ররসিকর	২.০০
হিন্দু নারী	২.৫০	যোগশিক্ষা	২.০০

মন্দের বিচিত্র রূপ ২.৫০

ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম ১.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১০-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-১৮০৫

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার

সান্নিধ্য	চিন্তামণি কর	৪'০০	স্বাচ্ছন্দ্য পদে পদে	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২'৭৫
পশ্চিমমহল	আশাপূর্ণা দেবী	৪'০০	গ্রীষ্ম বাসর	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২'৭৫
তীরভূমি	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪'৫০	মিতে মিতিন	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩'০০
নীলাঞ্জনছায়া	"	৩'০০	অপরূপা	"	৪'০০
জনপদবধু (২য় সঃ)	"	৪'৫০	বধুবরণ (৩য় সঃ)	"	৩'০০
আপন প্রিয় (৪র্থ সঃ) রমাপদ চৌধুরী	"	৩'০০	পলাশের নেশা (৩য় সঃ) সুবোধ ঘোষ	"	৩'০০
কথাকলি (২য় সঃ)	"	৩'০০	রূপসাগর (৩য় সঃ)	"	৪'৫০
দুটি চোখ দুটি মন	"	৪'৫০	শুক্লসন্ধ্যা	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৫'০০
চীনে লষ্ঠন (২য় সঃ) লীলা মজুমদার	"	৩'২৫	একান্ত আপন	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪'০০
ইষ্ট কুটুম	"	৩'৫০	রাধা (৪র্থ সঃ)	তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৭'০০
আকাশলিপি	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৪'০০	ধূপছায়া (৬ষ্ঠ সঃ)	সৈয়দ মুজতবা আলী	৪'০০
ভৃগু (২য় সঃ)	সমরেশ বসু	৩'০০	কলিতীর্থ কালিঘাট (৭ম সঃ) অবধূত	"	৪'০০
বনভূমি (২য় সঃ)	বিমল কর	৩'০০	হৃদয়ধুর (৪র্থ সঃ)	মুজতবা আলী ও রজন	৩'৫০
অনুবর্তন	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫'০০	অগ্নিসাক্ষী	প্রবোধকুমার সাত্তাল	৩'৫০
মন মানে না	গৌরকিশোর ঘোষ	৩'৭৫	আমার কঁাসি হল (২য় সঃ) মনোজ বসু	"	৩'৫০
পরমায়ু	সন্তোষকুমার ঘোষ	৩'৫০	মাটির মানুষ (অম্ববাদ) কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী	"	২'৫০
মুখের রেখা	"	৫'০০	তু কুনকে ধান (অম্ববাদ) শিবশঙ্কর পিল্লাই	"	৩'০০
হরিণ চিত্তা চিল	প্রমোদ মিত্র	৩'০০			

প্রকাশের আপেক্ষায়

জল পড়ে পাতা নড়ে	গৌরকিশোর ঘোষ	অম্বর মহল	সুধীরজ্ঞান মুখোপাধ্যায়
প্রথম প্রণয়	বিক্রমাদিত্য	হিরণ্য পাত্র	জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
কাবুলজল	সৈয়দ মুজতবা আলী	ক্রীম	অবধূত

বর্ষীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনুবাদিত

মহাভারত

প্রথম খণ্ড—মূল্য ৮ টাকা

সত্বর সংগ্রহ করুন

পরমভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

শ্রীকৃষ্ণ

ডাক্তার মঙ্গলকিনী—প্রেমের অলকানন্দা—জ্ঞানের আকাশগঙ্গা।

—বঙ্গ-সাহিত্য এরূপ মহাগ্রন্থ দ্বিতীয় নাই—

॥ শ্রীনারায়ণে নিবেদিত এই ভক্তি-নৈবেদ্য বর্ষাপাঠে সুসজ্জিত ॥

এরূপ চিত্র-সমৃদ্ধ—প্রশোভন—সম্বোধন-সংকরণ

এ পর্যন্ত ভগ্নরূপে প্রকাশিত হয় নাই।

মূল্য পনের টাকা

আর একখানি উপহার গ্রন্থ

ছত্রপতি শিবাজী

৮সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত

যে বীরবর জনরের উচ্চ শোণিত প্রদান করিয়া জননী জম্বুদ্বীপ পূজা করিয়াছিলেন, সেই উজ্জ্বলবরণে, অদ্বৈত বরপীর ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর উদার-চরিত্র জম্বুদ্বীপজাত ও ভারতীর বীর চরিত্র পাঠে অমূল্য মহাত্মাদিগের কবকমলে প্রভার সহিত অর্পণ করেন অর্জুনভক্ত পুর্বে বিদ্রব্যী সত্যচরণ। ডকল কাউন ১৬ শেখী ৩৫০ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ, কার্ডবোর্ড বাঁধাই। মূল্য দুই টাকা।

বহুকাল পরে পুনরায় প্রকাশিত হইল

—রোমাঞ্চ-রহস্য-গ্রন্থ—

রক্তনদীর ধারা

ডাক্তার পঞ্চানন ঘোষাল

রক্ত নদীর ধারা মাসিক বহুমতীর পৃষ্ঠার প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমাঞ্চ ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনার বইটির আভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা ময়, জীবন-পথের দিক নির্দেশ। তাই প্রবন্ধনা, হলনা ও প্রেমের লীলার চাক্ষু্যকর বইটি চাক্ষু্য তুলেছে সকল সমাজেই। সোমহর্ষণ সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

গ্রন্থাবলী

ব্রহ্মজ্ঞাননাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহজভাবে উৎসর্গ মত কোথাও প্রোৎসাহিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুবোধের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

বাঙ্গালার নব নৈতিকবিতার এই প্রবর্তক, ব্রহ্মজ্ঞাননাথ, অক্ষর বড়াল, রাক্ষুস রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুণ কবি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ প্রবৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা

বহুমতীর প্রের্ত অবদান

শৈলজ্ঞানেন্দ্রের গ্রন্থাবলী

প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী

শৈলজ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সুনির্বাচিত এই ৭খানি গ্রন্থের মণিমাণিক্য

- ১। ধরপ্রোতা, ২। রায়চৌধুরী, ৩। ছান্দাহবি,
- ৪। সতীল কাঁটা বা গঙ্গা-যমুনা, ৫। অল্পশোভন,
- ৬। ধ্বংসপথের যাত্রী এরা এবং ৭। কয়লা ছুটি।

মূল্য ৮ শেখী, ৩২৮ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ।

মূল্য দ্বায়ে তিন টাকা

রোমাঞ্চ উপন্যাসের বাহুর

দীনেন্দ্রকুমার ব্রায়ের গ্রন্থাবলী

ইহাতে আছে ৫ খানি প্রবৃহৎ ভিটেকটি উপন্যাস

বলিনী রমণী, মূল্য কয়েকটি গুণকথা, কুতাহলের লগুন, টাকের উপর টেকা, ঘরের তেঁকী।

মূল্য ৩।০ টাকা

উপন্যাস-সাহিত্যের বাহুর

অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী

বায়ুন বাগলী, রক্তের টান, গিলাসা, প্রণয় প্রতিমা, কামিন্যের ঠাকুর (বোকাপড়া), বন্ধন, মাতৃকণ্য প্রভৃতি।

মূল্য তিন টাকা মাত্র

বীরেশ্বর বসু চা মাটি মানুষ

দাম চার টাকা।

কয়েকটি অভিমত:

সমস্ত জীবন বাংলা দেশের উত্তর প্রান্তস্থ দেশে চা বাগানে কাটাইয়া কবি ও কথাগাহিত্যিক শ্রী বীরেশ্বর বসু চা-বাগানের মাটি ও মানুষকে বাংলা সাহিত্যে এই উপজ্ঞাসে চিরস্থায়িত্ব দান করিলেন। বীরেশ্বরবাবু মুন্সিয়ানার সঙ্গে মাটির মর্যাদা ও মানুষের মহত্বকে যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন ইহাতেই আমরা গীত চইয়াছি। চা মাটি মানুষ কাহিনী পাঠকের আনন্দ এক চিত্তাশীল পাঠকে চিন্তার খোরাক দিয়াছে।

—শ্রীমজুমদারীকান্ত দাস

বীরেশ্বরবাবু যে সাদর অভ্যর্থনার যোগ্য এটুকু অসংকোচে বলা যায়। চারের বাজেই তাঁর বেশীর ভাগ জীবন কেটেছে। চা-বাগান থেকে কিন্তু জীবিকা শুষ্ক নয়; তার চেয়ে আশ্চর্য কিছুও আহরণ করে এনেছেন। সে আশ্চর্য কিছু হ'ল জীবনের অক্লান্ত বৈচিত্র্যের এতটী নতুন স্বাদ। সেই স্বাদই তিনি বাংলা সাহিত্যে যুক্ত করে দিলেন। তাঁর চা মাটি মানুষ-এ চা-এর নির্দেশ মানুষের মাটির স্রষ্টা স্রজনতা আর মানুষের বহুস্ত জটিলতার ইঙ্গিত, সবই বর্তমান।

—প্রমোদ মিত্র

‘চা মাটি মানুষ’ উপজ্ঞাসে এমন একটি অনবগত স্থানের এমন কতকগুলি মানুষের কথা বলা হইয়াছে,—বাসাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের দূরত্ব ছিল অসম্ভব। দেখানকার সেই অপরিচিত মানুষগুলির জীবনযাত্রা শুধু দৃশ্য বোধনযোগ্য, নিজস্ব স্বকীয়তায় এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের প্রত্যেক অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব সত্যের প্রতিফলন পুস্তকখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এ দেশে চা-বাগানের ইতিহাস এক পুরাতন কাহিনী, কিন্তু এ কাহিনী লিখে এর আগে আর কেউ এমন সহস্রভূতির সঙ্গে এমন রসোজ্ঞ হুবি জাঁকেন নি। শূন্য পর্ববেকশ দৃষ্টি, চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা ও জীবনগতীর প্রবেশ করার অনায়াস কৌশল লেখক আনন্দ করেছেন; নায়ক ভাওনাখের দার্শনিক অর্থও দৃষ্টিতে খণ্ড ছবিগুলিও এক বিস্তৃত জীবনভাষ্য হয়ে উঠেছে। লেখকের সুপতীর বাস্তবদৃষ্টি, পর্ববেকশ দক্ষতা হানবীর সহস্রভূতি ও প্রসঙ্গ জীবনবোধ আমাকে বিম্বিত করেছে। আমি এই নিপুণ শিল্পী ও জীবনভাষ্যকারকে আনন্দ ও সম্রদ অভিনন্দন জানাই।

—অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়

প্রকাশিত হল

মুনীলকুমার ধরের উপজ্ঞাস

জোয়ার এলো

দাম—২.৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপজ্ঞাস

মানুষের মতন মানুষ

শিউলীতলা গেলের অসংখ্য মানুষের ভিত্তি থেকে যে-চরিত্রটিকে শৈলজানন্দ আলোয় টেনে এনেছেন তাঁর চাবপাশে আত্মীয়-অনাত্মীয় হাজার মানুষ। নিজের সম্মানকে তিনি অন্যায়সে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন।—এ উপজ্ঞাস শৈলজানন্দের সাম্প্রতিক-কালের সাহিত্য-রচনার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করবে। দাম ৩.০০

শিবরাম চক্রবর্তীর উপজ্ঞাস

প্রিসিলার বিয়ে

প্রিসিলার প্রেম এক পরে তার বিয়ের সম্বন্ধিত ব্যাপার নিয়ে একখানি অপূর্ব হাসির উপজ্ঞাস। দাম ২.৭৫

..... অ জ্ঞা ত্ত প্র হু

বিমল কর	কানুসের আয়ু	৫.৫০
মুখোদ ঘোষ	মনোবাসিন্তা (২২ সঃ)	৩.০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ভাটিয়ালা (২য় সঃ)	২.৫০
বীরেশ্বর বসু	রাস	২.০০
প্রমোদ মিত্র	বর্ষের যুগের পর	২.৫০
প্রবোধবন্ধু অধিকারী	বিহঙ্গবিলাস	৩.০০
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	জীবন স্বপ্ন	৪.০০
শৈলজানন্দ	ভাল লাগার নেশা	২.৭৫
অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্নার প্রহর	২.৭৫
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	ভাগ্যবলাক	৬.০০
হরপ্রসাদ মিত্র	কবিতার বিচিত্রকথা	৮.০০
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের	কবিতা ও কাব্যরূপ	৮.০০
শিবরাম চক্রবর্তী	বিয়ের প্রাক বউ	২.৭৫

কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ, কলেজ স্ট্রাট, কলকাতা ১২

প্রকাশিত হল

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর উপগ্রাস

উপকর্ষ

...অক্ষম আহত জন্তুর মতন হয়ে গিয়েছে বাবা। মা এখন মন্দ-অদৃষ্ট এবং ছুঃখের মতন সত্য। বাইশ বছরের নীহার আত্মহত্যা করল। বৃকভরা ভালবাসা নিয়ে কমলা যা চেয়েছিল, পেল। পেয়েও তার ক্ষুধা ক্ষুধাই থাকল, মিটল না। কমলা তার মনের তলার পলাতক প্রবৃত্তিকে ধরতে পারল...

এই শতাব্দীর সভ্যতার এক বিশেষ অমুভবের সুবৃহৎ উপগ্রাস। বস্তুত রীতিতে ভাষায় দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ও উল্লেখযোগ্য। দাম : ৪.০০

..... অ গা গ ব ই
জ্ঞানময় বিমল কর ৩.০০, রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা! আদিত্য ওহদেয়ার ৭.০০, প্রবন্ধ-সংকলন রমেশচন্দ্র দত্ত ৫.০০, বুজ্জিয়া নিখিল সেন ২.৫০, অনেক জ্বর দক্ষিণারঞ্জন বহ ৩.০০, সাপের মাথার মণি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩.০০

এডারেস্ট বুক হাউস : এ১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

: উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি বই :

অসিতকুমার হালদার

রবিতীর্থে ৫

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী ৩

—ছখানি নূতন উপগ্রাস—

শিপ্রা দত্ত

চেনা অচেনা ২

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আকাশ কুসুম ২।০

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

মধ্যরাতের সূর্য ১

—পরিবেশক—

পাইওনিয়ার বুক কোং

৮, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নূতন বই বাহির হইল

শ্রীমন্ত লুৎফাওয়ার সঙ্কলিত ২.৫০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাদান ৩.০০

কান্দনী মুখোপাধ্যায়ের

প্রজাপৎ স্বপ্ন ৩.০০

ওপার-কথা ৩.০০

আকাশ-বনানী জাগে ৩.০০

পথের ধুলো ৪.০০

বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস

৮, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অভিজ্ঞ চিকিৎসক

দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা

করাইয়া ভ্রাম্যমুদ্রা

পছন্দসই চশমার জন্ত

নির্ভরযোগ্য স্থান :—



বোমের আই ক্লিনিক এণ্ড অপটিক্যাল ইনস্টিটিউট

৪১, জি, টি, রোড, শিবপুর, হাওড়া

সেই বিখ্যাত ভাষাশিক্ষার একমাত্র বইখানি

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাইতেছে

বাহার পূর্বে অর্ডার পাঠাইয়া হতাশ হইয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহাদের চাহিদা জানাইতে অমরোধ করা হইতেছে। শারদীয়া পূজার পূর্বে বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দিরের আর এক অনন্ত অবদান আত্মপ্রকাশ করিল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা ইংরেজী শিখিবার—বলিবার—

শিখিবার সর্বজন পরিচিত ও সন্মানপ্রসিদ্ধ চূড়ান্ত গ্রন্থ

রাজভাষা

(স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত)

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শিশু, কিশোর, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধজন ইংরেজী ভাষা শিখিতে, বলিতে ও লিখিতে পারিবেন।

বাঙলা দেশের মনোবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

শিক্ষাপ্রণালীভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত

সাময়িক মূল্য তিন টাকা

বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির : কলিকাতা-১২

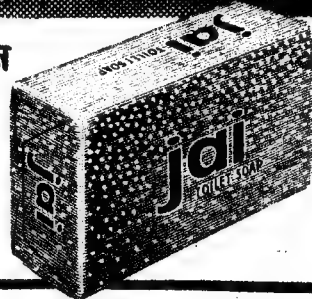


এই তরুণীটি জয় সাবান ব্যবহার করেন

জয় ব্যবহারে সৌন্দর্য্য আপনার
হাতের মূঠোর...কত নরম
কোমল...গন্ধমন্দির ভবুও স্নিগ্ধ।
সর্বদা ব্যবহার করুন।

○ ○ ○ ○ ○

আর
আপনি?



○ ○

টী টার তৈরী - জয় নিশ্চয়ই ভাল

TJY - 2 BBN

কুটনীয়তম্

ঐকানীর মহামণ্ডল মহামণ্ডল

রাজা জয়পীড় মন্ত্রিপ্রবর

দামোদর গুপ্ত কবি বিরচিত

মূল বজ্রাবাদ ও টিপ্পনীনন্দ

প্রায় ১১৫০ বৎসরের সুপ্রাচীন ভারত-বিখ্যাত এই কাব্য এসেছে
এতদিন প্রায় অপ্রচলিত ছিল। ৫৭ বৎসর পূর্বে মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে প্রাচীনতম বঙ্গাক্ষরে লিখিত
এই কাব্যের যে পুঁথি আবিষ্কার করেন (যাচা বর্তমানে এসিয়াটিক
সোসাইটির গ্রন্থাকারে রক্ষিত), তাহার সহিত বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত
সংস্কৃত ভাষার সংস্করণ মিলাইয়া অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায় বর্তমান
এতদ্বয় মূল কাব্যের সম্পাদন ও অর্থবাদ করিয়াছেন।

এই বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে বাংতায়নের কামনুজের বৈশিষ্ট্য অধি-
করণটি প্রায় সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত। ইহাতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের ভারতীয়
বর্ণননীতি ও অর্থশাস্ত্র, নাট্য, সঙ্গীত ও কামশাস্ত্রাদির নিপুণ চিত্র
চিত্রিত। [মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠ্য]

মূল্য চারি টাকা

নূতন প্রকাশিত হইল

বিশ্ববিখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ

হাভেলক এলিসের

যৌন-মনোদর্শন

STUDIES IN THE
PSYCHOLOGY OF SEX

মহাগ্রন্থের ভারতীয় ভাষায় প্রথম অনুবাদ

অনুবাদক—ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, এল-এল-বি,

প্রথম খণ্ড (১ম ভাগ) [লঙ্কার ক্রমবিধি] ৩ টাকা

" (২য় ভাগ) [বহু রতি] ৫ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড (১ম ভাগ) [কামাবেগের বিরোধ] ৩ টাকা

" (২য় ভাগ) [প্রেম ও পীড়া] ৫ টাকা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রবাসিনী

বিখ্যাত খ্যেষ্ঠ চিত্রাবীরদের

বিশ্ব-প্রসিদ্ধ রচনার সমাবেশ

টলটল—কুৎসার সোনাটা

এ-মুগের অভিধাপ

গোঁকর—মাজার

মা

কেনে মারার—বাতোয়াল

ভেরকরসের—কথা কও

চক্র ও চক্রান্ত

রূপ বলাশেখিক বিদ্যব ও সোভিয়েট পণ্ডনের
মারামারি কর বৎসরের রোমহর্ষক কাহিনী।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

সেই বিখ্যাত ও বহু প্রয়োজনীয় মহাগ্রন্থ

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

বা

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

বাকীক-মহর্ষি প্রণীতম্

ভারতীয় অধ্যাপনাশ্রমের চির উজ্জ্বল মুকুটমণি; সর্বজনের অনাহারসলভ
জ্ঞানশাস্ত্র; সর্ব-সংহিতার সার; ঋতি নামে অভিহিত এই
মহারামায়ণ গ্রন্থে মানবজাতির মোক্ষলাভ অবশ্যস্বাভাবিক। সর্বাপেক্ষা
সহায়ক ও চিত্তাকর্ষক এই মহাগ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ। কথোপকথনের
মূলে নানা আখ্যায়িকার মাধ্যমে মোক্ষের বরণ, মোক্ষলাভের উপায়
বিবরণগুলি সবিচারে বিবৃত ও বর্ণিত হয়েছে। ভক্তজ্ঞানের নীরসতার
অভাবই যোগবাশিষ্ঠের চমৎকারিষ। মাদ্রবের কাম্য ও প্রার্থনা—
চতুর্দর্শলাভ। মোক্ষ উন্নত্যাগে শ্রেষ্ঠতম। মোক্ষের স্তম্ভ বিদ্রোহ এই
মহারামায়ণের প্রতিপাত বিষয়। মূল সংস্কৃতের সঙ্গে

সহজ পদ অনুবাদ।

প্রথম খণ্ড : বৈরাগ্য ও মুরহু প্রকরণ

মূল্য সাড়ে সাত টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড : স্থিতি প্রকরণ

মূল্য সাত টাকা

বহুমতী সাহিত্য মন্দির : ১৩৬, বিপিন বিহারী গান্ধলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা - ১২



আমাদের তাড়াতাড়ি চিঠিপত্র বিলি করান দিন

মুদ্রাদার
কলেক্টর
কলিকাতা



ঠিকানায় ডাক বিভাগের
অঞ্চল সংখ্যা
দিন

ডাকবিলির সুবিধের জ্ঞান বেশীর ভাগ বড়ো বড়ো সহরকেই বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

এই রকম ভাবে অঞ্চল ভাগ করার উদ্দেশ্য হোল পর্বত প্রমাণ চিঠিপত্র এক জায়গায় না বেছে, ঠিকানা অনুযায়ী বিভিন্ন বিলি কেন্দ্রে বেছে এক ডাক পিওনের বিলিপত্রের দূরত্ব কমিয়ে, তাড়াতাড়ি ডাক বিলি করা।

ঠিকানায় অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে ডাকে যে সব জিনিষপত্র পাঠানো হয়, সেগুলি সরাসরি সেই অঞ্চলের বিলিকারী ডাকঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অঞ্চল সংখ্যা থাকলে চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি বেছে ফেলা যায়, এই সংখ্যা না দিলে সেগুলি দেরীতে পৌঁছবার সম্ভাবনা বাড়ে। ডাক বিভাগীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এমন কোন সহরে যদি আপনি থাকেন, তাহলে আপনার কাছে যারা চিঠি লেখেন তাঁদের অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে চিঠির ঠিকানা লিখতে বলুন।



আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

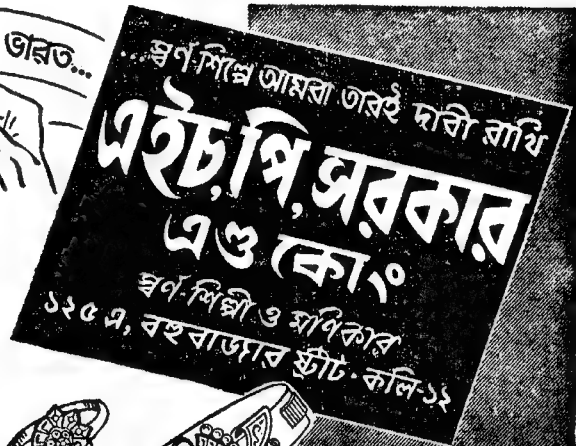


ইঞ্জিয়ান মিস শ্রুটম

কালজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা



যে গৌরবময় ঐতিহ্যের আধিকারী ভারত...



স্বর্ণশিল্পে আমরা ভারত দাঁড়াই
এইচ.পি. প্রবাক্ত
এও কোং

স্বর্ণ-শিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ার
১২৫ এ, বহুবাড়ার স্ট্রীট • কলি-১২



১৬২, বহুবাড়ার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

গ্রাম- এইচপিএম • ফোন ৩৪-৪৮৪৮





ସାମ୍ବିକ ବହୁସତୀ
॥ ମୌସ, ୧୦୭୭ ॥

(କଳାକାର)

ନବାଗ୍ନ-ବରଣ
ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାହିନ ଅନ୍ଧିତ

স্বর্ণীয় ৭ই • অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রহতিথি
আমাদের বই পেয়ে ও দিবে সমান তৃপ্তি

৭ই শৌষের বই

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস **ইস্পাতের ফলা** ৩.৫০

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের **লাবণ্যের এনাটনি** ৩.০০

হিমালীশ গোস্বামীর **লঙেনের পাড়ায় পাড়ায়** ৩.০০

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের **উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল** ৩.০০



নবরূপে
পুনঃপ্রকাশ :

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'সাগর সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ

SONGS OF THE SEA 4.00

অনুবাদ করেছেন স্বয়ং লেখক ও শ্রীঅরবিন্দ (পণ্ডিতেরী)। তা' ছাড়া 'সাগর সঙ্গীত' (বাংলা) মূল কাব্যগ্রন্থটি দেবনাগরী হরফে এ-বইয়ের সর্বশেষে সন্নিবেশিত হইল

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **কলকাতার কাছেই** (উপন্যাস) ৫.৫০

১৯৫১ সালের সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

৭ই অগ্রহায়ণের বই

দীপক চৌধুরীর মৃতন উপন্যাস **নীলে সোনায় বসতি** ৩.৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃতন উপন্যাস **মাঝির ছেলে** ২.৫০

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের **ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর (জীবনালেখ্য)** ৫.৫০

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিমতের কতকাংশ :

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **রিকশার গান** (উপন্যাস) ৫.৫০

••• রিকশার গান বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অন্ত ধরণের উপন্যাস। 'নীলসুখীর মনঃসমীক্ষা', 'রামুর প্রথম ভাগ'-এর হাস্যরস বা 'জননী জন্মভূমি'র বিধুরতা এ উপন্যাসে অনুপস্থিত। একটি বাস্তব সমস্তা এই উপন্যাসের উপজীব্য। কাছেই এর ছক একটু আলাদা ধরণের। ••• সমস্তাপ্রধান হলেও উপন্যাসটিকে চটিলতা নেই তেমন, সহজ সরল পথে তরতর করে এগিয়ে গিয়েছে কাহিনী ••• বিভূতিভূষণের গল্প জমাবার আভাবিক ক্ষমতা উপন্যাসটিকে মুখপাঠ্য করে তুলেছে •••

প্রশান্ত চৌধুরীর **স্বগতোক্তি** (নবোপন্যাস) ৩.২৫

••• প্রশান্ত চৌধুরী শক্তিশালী লেখক। এই সামান্য পরিসরে তিনি গল্পছলে ভারতবর্ষের আদি নাটকের অভিনয় থেকে শুরু করে কলকাতার টেকের ছোট ইতিহাস, বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্ক সহস গল্প, এবং পর্দার অন্তরালে বার্য থাকে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা অত্যন্ত নিপুণভাবে বলেছেন। বইটিতে একই সঙ্গে গল্প এবং রম্যরচনার স্বাদ পাওয়া যায়। •••

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **অভিষেক** (উপন্যাস) ৫.৭৫

••• এই উপন্যাসের কাহিনীর ঘটনাস্থল বঙ্গদেশ। সেখানকার ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম দিকের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিতে পাত্র-পাত্রীরা বিচরণ করছে। ••• হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় অভিজ্ঞ লেখক; ••• বইও একটি ঘন প্রেম-কাহিনী আছে, শুধু এ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু প্রেম নয়, রাজনীতি। সত্যবাদকে তিনি ঐতিহাসিকের মত নিলিপ্ত চোখে না দেখে রোমাঞ্চিক চোখে দেখেছেন। তবে উপন্যাসের কাঠামোটি বেশ শক্ত, ঘটনার গতি কোথাও লুপ্ত হতে পারেনি। অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। •••

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম : কালচার

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৬৪১



ধন-ঐশ্বর্য

যাশা চাওয়া যায়
তাশা পাওয়া যায়না

কিন্তু

আগনি ইচ্ছামত একটি সর্বজন সম্পদ কেনভৈল
অনারসে পাইতে পারেন। আহুর্কোবাচার্য্যস্ব
কর্তৃক উক্ত প্রকাশিত 'হিমকল্যাণ'ই আগনার
কেনভৈল নির্বাচন-সমতা সমাধানে সক্ষম।

ইহার কল্যাণ পরশে দাবতীর কেশরোম
নিরামর ও মজ্জিত শীতল হয়। লীধদ্বিধ
নিরমিত ঘনহারেই আশাহুত
কম পাওয়া যায়।

ভেষজ বিশারদ মণেন্দ্র নাথ দাশীর

হিমকল্যাণ

আহুর্কোবীর হিমসিদ্ধ সুরভিত কেশভৈল।

অন্যান্য প্রসারনী

● পামিকোকো
সুরভিত নারিকেল তৈল

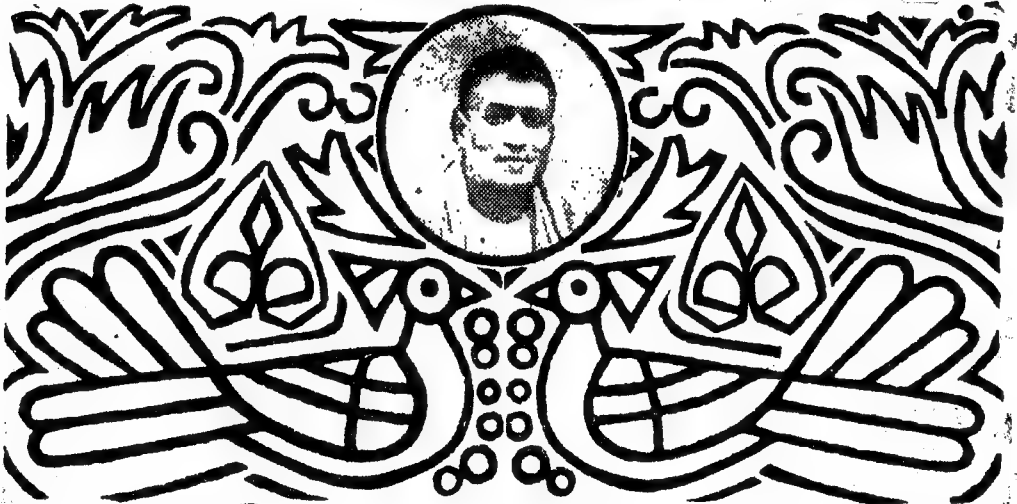
● হিমকল্যাণ
ক্যাক্টর অয়েল
সুরভিত কেশভৈল

● ভূসামলা মহোপকারী কেশভৈল

● মোজনগন্ধা সুরভিত নির্ধাস



হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা



সামসিক বসুসতী

৩৮ বর্ষ—পৌষ, ১৩৬৬]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥



কথামৃত

মাহুদের প্রকৃত বরণ আশ্বা কর্তারনের অতীত বলিয়া, দেশকালের অতীত বলিয়া অবতাই মুক্তবতাব।

আশ্বা বেহন অনন্ত আনন্দবরণ, উহা তেমনি লিঙ্গবর্তিত। আশ্বাতে নর-নারীভেদ নাই। যেহেতুই নর-নারীভেদ। অতএব আশ্বাতে স্ত্রী-পুংলোপোপ ভ্রমমাত্র—স্বরীয় সখ্যেই উহা সত্য। আশ্বার সখ্যে কোনরূপ বরসণ নির্দিষ্ট হইতে পারে না; সেই প্রাচীন ধর্ম্ব সর্বলাই একরূপ।

আশ্বা বসুসত: জাতা নহেন। 'সক্তিনামন' সজ্জার তাঁহাকে আশিকভাবেই প্রকাশ করা হয় মাত্র, 'নেতি নেতি' সজ্জাই তাঁহার বরণ বখাষধ বর্ণনা করে।

এই আশ্বার মধ্য দিহাই আমি তোমার জ্ঞানলাভ করি—সমুদয় জগতের জ্ঞানলাভ করি। অতএব আশ্বাকে অজ্ঞাত বলা প্রলাপ-বাঁকি মাত্র। আশ্বাকে সমাইয়া লও, সমুদয় জগৎই উড়িয়া বাইবে; দীর্ঘায় ভিতর দিহাই সমুদয় জ্ঞান আসে, অতএব ইহাই সর্বলক্ষণা অধিক জ্ঞাত। ইহাই 'তুমি' বাহাকে তুমি 'আমি' বল।...সেই অনন্তের উপর বেন একটা আঘরণ পড়িয়াছে আর উহার কতকাল এই 'আমি'—জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সেই

অনন্তের অংশ। বাস্তবিকপক্ষে অসামি কখনও সসীম হন না—সসীম কথার কথামাত্র। অতএব এই আশ্বা নর-নারী, বালক-বালিকা, এমনকি পুত্র-পুত্রী সকলেরই জাত। তাঁহাকে না জানিয়া আমরা কখনোই জীবনধারণ করিতে পারি না। সেই সর্ববিশ্ব প্রকৃতি না জানিয়া আমরা এক বৃহৎ ও বাস-প্রবাস পর্বত কেলিতে পারি না; আমাদের গতি, শক্তি, চিন্তা, জীবন—সকলই তাঁহারই পরিচালিত।

আশ্বা জ্ঞানেন তাহা নহে, আশ্বা জ্ঞানবরণ; আশ্বার অস্তিত্ব আছে তাহা নহে, আশ্বা অস্তিত্ববরণ; আশ্বা যে স্ত্রী তাহা নহে, আশ্বা স্ত্রীত্ববরণ। যে স্ত্রী তাহার স্ত্রীত্ব অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত—উহা আর কাহারও প্রতিবিম্ব। বাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে, উহা প্রতিবিম্ববরণ। বাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সেই অস্তিত্ব অপর কাহারও অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। যেখানেই তপ ও তপীর ভেদ আছে, সেখানেই বৃষ্টিতে হইবে, সেই তপতলি তপীর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান, অস্তিত্ব বা আনন্দ—এগুলি আশ্বার ধর্ম নহে, উহারা আশ্বার বরণ। —স্বানী বিবেকানন্দের বাণী হইল

স ন্ত কবীর

যামিনীকান্ত গোস্বামী

[১]

কবীরের নাম কে না জানেন? নূতন করে বলবার কিছু নেই। তবু কিছু বলবার আগে শুধু এই বলি যে, সন্ত কবীরের মতো মহাকাবি, মহাসাধক আর একজনও কি ছিলেন? তাঁর বিষয়ে বহু বলা হয়, ততই ভাল।

গান বা কবিতা বা ধোঁহা সর্বসাধারণের কতই না প্রিয়। একটি গান শ্রবণ :

স্বপ্নসাগরে ডুব দিয়েছি
অরুণ রতন আশা করি ;
খাটে খাটে ঘুরবো না আর
ভাসিয়ে আমায় জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় যে এবার
ঢেউ খাওয়া সব ঘুটিয়ে দেবার
স্বপ্নায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে সব মরি।
যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান কোথায় নিত্য থাকে,
প্রাণের বিপা নিয়ে বাব
সেই অন্তরের সত্যমায়ে।
ভিরগিলের সুরটি বেঁধে
শেব গানে ভার কাড়া কেঁদে
নীরব যিনি তাঁরার পারে
নীরব বিপা দিব ধরি।

এই অপূর্ণ গানটি হল কবি রবীন্দ্রনাথের। অনেকই তাঁকে দেখেননি। তেমনি, বার কথা আজ বলবো, আমরা কেউই তাঁকে দেখিনি। তিনি হলেন সন্ত কবীর।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ যেমন গানের রাজা, কবীরও ছিলেন তেমনি গানের রাজা। কবীরের কত যে শব্দ, কত যে ধোঁহা, শব্দী, চৌপাই আছে, তার সীমা-পরিমীমা নেই। কবীর এক বিখ্যাত ছিলেন, এত সব গান, শব্দ, ধোঁহা প্রভৃতি গেরে পেছেন যে, তার সীমা-সংখ্যা করবার মতো লোক এখন মেই। কবীরের গানে বৃদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কতকগুলি গান সংগ্রহ করে একখানি বই করেছেন। এই বইখানির নাম—“কবীরের স্তব গান,” “One Hundred Poems of Kabir”। বইখানি অল্প ইংরেজীতে।

অধ্যাত্মমার্গে কবীর ছিলেন একজন পরম সত্যপ্রিয় পুরুষ। তাঁর সাধনার দ্বারদ্বিহীন আত্মা, অর্থাৎ তাঁর আত্মিকতার আগে এই সাধন-মার্গ ছিল না ছিল ভুল। কবীর ছিলেন সন্ত। তিনিই এই সত্যমার্গের প্রবর্তক। বাণীর মধ্যে আছে :

রহ, করনী কা ভের হৈ
নহি বুদ্ধি বিচার।

বুদ্ধি ছোড় করনী কবো

তৌ পাও কুছ সার।

‘করনী’ করতে হবে অর্থাৎ সাধন-ভজন করতে হবে। সে সব করবে কে? সে মনোবৃত্তি কি আছে? বার আছে, সে ভ্রাম্যকর। সাধন-ভজনের প্রবৃত্তি নেই, অথচ প্রবৃত্তি আছে শুধু উপর-উপর বোকাবার। একে কলগাড আর কিছুতে পারে?

কবীর ছিলেন পরম সাধক ও সত্যপ্রিয়। তাঁর বাণী-বচন জো শুধু কথার কথা নয়। তিনি যে সকল তত্ত্ব বা বস্তু উপলব্ধি করেছেন—ধ্যানবলে দেখেছেন, বুঝেছেন—যে অবর্ণনীয় শব্দ শ্রবণ করেছেন, সে সকল তিনি মধুরভাবে প্রকাশ করেছেন, নিজের সমস্ত ভাষার স্বাধা দিয়ে। বীরা সাধক নন, কেবলমাত্র “বাচকজানী”, অর্থাৎ শুধু পুঁথি-পড়া-জান বাদে, তাঁরা সন্ত কবীরের বাণী-বচন জান-বুদ্ধি দ্বারা জান-বুদ্ধির দ্বারাই বুঝতে পারেন। সাধনার স্তরে উঠে প্রকৃত সত্য বা গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করতে বা বুঝতে সমর্থ হবেন কিরূপে?

রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে যেমন অতি গূঢ় ইঙ্গিত সকল আছে, সন্ত কবীরের বাণীর মধ্যেও তেমনি অতি উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম-সাধনার ইঙ্গিত সকল আছে। পণ্ডিত বা জ্ঞানীরা সে সকল এখন অনুধাবনের জন্য চেষ্টা ও বস্ত করছেন, এ এক বিশেষ আশা ও আনন্দের কথা।

কবীর জন্মেছিলেন ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৬০ বৎসর পূর্বে পূণাছড়ি কাশীতে। তখন এই ভারতবর্ষ ছিল অন্ধৃত রকমের। ভারতবর্ষে তখন ধর্মমত নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে এত বেদী মতভেদ, এত রকমের দলাদলি, মনকথা-কবি ছিল যে, তার হিসেব করা যায় না। এই দেশটি তখন খুব পেছিয়ে ছিল। সেই পেছিয়ে থাকা যুগেই হয় কবীরের আবির্ভাব। কবীর নানা ধর্মমতের প্রচার করবার চেষ্টা করেন। এইটি ছিল তাঁর বিশেষত্ব। এ বিষয়ে তিনিই ছিলেন প্রধান। সেই সকল কথাই আলোচিত হচ্ছে।

সে হল তখনকার কাল, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচশ বছরেরও আগেকার কাল। তখনকার ইতিহাস প্রভৃতি বুঝে বুঝেই চলতো। সেই মৌখিক কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয়, কবীর জন্মেছিলেন কাশীতে এক জোড়ার ঘরে। আবার এমন কথাও শোনা যায় যে, ঘোঁট একটি শিশু কাশীর সন্নিকটে লহরতাল্লাও নামক সরোবরে এক পয়পাতার উপর ভেসে বাঁজিল। এক জোলা বস্পতি তাকে লেগেছে পার, দেখতে পেয়ে তুলে এনে তাকে প্রতিপালন করে।

গল্পটি এই। লহরতাল্লাও ছিল কাশীর দক্ষিণপ্রান্তে অতি প্রান্তিক-কালের এক বৃহৎ সরোবর। লহর অর্থে ঢেউ, তাল্লাও অর্থে সরোবর। পাঠান আমলে কাশীর এই অঞ্চল লোকালব্ধ এক জন কবিদের পরিগৃহ্য ছিল। বন-জঙ্গল-পূর্ণ এই স্থানটি তখন বৃদ্ধকালজের দ্বারা শোভমান ছিল। এই সরোবরে তখন অনেক কমল-ফুল প্রভৃতি প্রকৃতি দ্বারা থাকতো। বৃদ্ধ ছিল কবীরের মনোভাবী।

ঘটনাটি এই রকম। একটি জন্মের শিশু সরোবরের জলে পদ্মপাতার উপর ভাসছে। সে সময় নীমা ও নৌক নামে এক জোলা-দম্পতি বিবাহের নিমন্ত্রণ সেরে সে পথ দিয়ে আসছিল। তারা ঐ শিশুটিকে দেখতে গেরে অবাক হল। চেরে-চেরে দেখতে লাগলো, ভাবতে লাগলো। তারপর অতিবাহিত শিশুটিকে তুলে নিয়ে অনন্যমনে বাড়ীতে এনে নিজস্বের ছেলের মতো প্রতিপালন করতে লাগলো। এই দম্পতি ছিল অপুত্রক।

তারপর বধাসময়ে এক মৌলবীকে ডাকা হল শিশুর নামকরণের জন্ত। এই দৈবপ্রাপ্ত শিশুর জ্যোতির্ধরুপ দেখে মৌলবী অবাক হলেন। খুললেন পুণ্য পুঁথি কোরাণ। নাম বেরুলো 'কবীর' অর্থাৎ পরমেশ্বর। 'কবীর' আরবী শব্দ—অর্থ মহান, অতি বৃহৎ বা পরমেশ্বর দ্বিতীয়বার কোরাণ খুললেন, আবার বেরুলো ঐ 'কবীর' নাম।

কবীরের জন্ম সম্বন্ধে আরো গল্প আছে। বললুম, তখনকার ইতিহাস বুঝে মুখের টলতো। এও মুখের কথা। এ গল্পও শোনাই। তিনি পূর্বজন্মে ছিলেন এক সাধক ব্রাহ্মণ। গেছলেন কাপড় কিনতে এক জোয়ার ঘরে। কিন্তু কাপড় না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। বাড়ীতে এসেই তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। মরবার সময় জোয়ার কথা, কাপড়ের কথাই তাঁর মনে ছিল। আর সেই ক্ষেত্রে পরজন্মে তিনি এসেন জোয়ার ঘরে। তখনকার এই জোয়ার নামে মাত্র মুসলমান। তাঁত বোনা এদের জীবিকা। জোয়ারা মুসলমান হলেও অল্প মুসলমানদের সঙ্গে এদের মৌলিক প্রভেদ বিদ্যমান। এই সব জোলা নাথ-পন্থী বৌদ্ধ-সমাজ থেকে উদ্ভূত। আদিত্য নাথ-পন্থীরা যোগসাধনা করতেন। তাঁরা বেদ, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র—এসব মানতেন না। তাঁরা হিন্দু আচার-ব্যবহার মানতেন না, বর্ণাশ্রম মানতেন না, ছুঁৎ বিচার করতেন না। তাঁদের উপাসনা ছিল নিরাকারের উপাসনা। মধ্যযুগে এই নাথ পন্থী বৌদ্ধদের অবিকাল মুসলমান হয়ে যান বাধ্য হয়ে। এরাই হলেন জোলা।

কবীর বড় হতে লাগলেন। হিন্দু পাড়ার তাঁর বাস। হিন্দু ছেলের সঙ্গে খেলা-খুঁচা করতেন। তাঁর খেলা ছিল, ভগবানের পূজা আর ভগবানের নামকীর্তন। লোকে তাঁকে ব্যঙ্গ-বিরূপ করতো, কেননা তিনি জোলা অর্থাৎ তাঁতী। কবীর এর উত্তরে বলতেন :

কবীর তেরে জাত কো, সব কোঁই হাসন হার।

বলিহারী ভয়া জাত কো, জো সিন্ধে সিরজন হার।

ডরে কবীর, তোরে উপহাস বিরূপ করে লোকে, তোর জাতের জন্ত। বলিহারী সেই জাতকে, যে সৃষ্টি কর্তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কারন, সৃষ্টিকর্তা ভগবান একজন মহাতীত।

তাঁর জাতির কাক হল কাপড় বোনা। সেই কাপড় বোনা কাজই হল তাঁর ভরণ-পোষনের উপায়। কবীর তাঁতও বুনাতে, আর সেই সঙ্গে তত্ত্ব-কথাও বলে যেতেন। বলতেন তিনি :

সব সে হিলিয়ে, সব সে মিলিয়ে

সব কা গিজিরে নাউ।

হাজী হাজী সব সে কিজিরে

বৈঠে অপনা গাঁট।

সকলের সঙ্গে হেল-হেল করতে, সকলের নাম নেবে। সকলকেই করবে—হাজী হাজী, কিন্তু নিজের ঠাইয়ে ঠিক বসে থাকবে।

কবীর ছিলেন দরিদ্র। পরিবার পোষণের ভার তিনি ঈশ্বরের উপর অর্পণ করে নিশ্চিত।

বলেছেন তিনি :

দীন হুয়াল ভরাসে তেরে।

সত পরবাক চটাইরা বেড়োঁ।

হে দীনদয়াল, তোমারই উপর আমার ভরসা। আমার সব পরিবারকে তোমারই নৌকায় চড়িয়ে দিলুম।

এক গল্প শোনাই। একদিন কবীরের ঘরে ছিল না অন্ন। কবীরের মা তাঁর হাতে একখানি কাপড় দিয়ে হাটে বিক্রী করতে পাঠালেন। সে সময় শীতকাল। ভারি শীত। পথে দেখলেন, একটি কাঙাল-গরীব শীতে জড়সড় হয়ে পড়ে রয়েছে পথের ধারে। এই দেখে তাঁর কণ্ঠে কবীরের মন গলে গেল। তিনি কাপড়খানি সেই কাঙালের গায়ে বেশ করে জড়িয়ে দিলেন। দিয়ে, তাঁর কণ্ঠের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে গেলেন। বাড়ীতে এসে দেখেন, তাঁর মা তাঁর জন্ত রাগা করছেন। এই দেখে কবীর আশ্চর্য হলেন। বললেন, মা খাবার তৈরী করছো কি করে? কিছুই তো ছিল না। মাও এই কথার অবাক হলেন। বললেন, সে কি! এই যে তুমি সব কিনে-কেটে এনে আমার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি কোথায় গেলে। এই শুনে কবীর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, মা তুমি খুব ভাগ্যবতী। ভগবান আমার রূপ করে তোমায় দর্শন দিয়ে গেছেন। কাপড় তো আমি বিক্রী করিনি। এক কাঙালকে দান করেছি।

এটি হয়তো নিছক গল্প নয়। কবীর ছিলেন উক্ত। উক্তের উপর ভগবানের অল্পগ্রহ এভাবে হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়।

কবীর ছিলেন গুরু রামানন্দের শিষ্য। তাঁর তখন অনেক শিষ্য। অনেকেই তাঁরা পতিত ভাত। যেমন, তাঁর এক শিষ্য, নাম সেনা। তিনি হলেন জাতিতে নাপিত। আর এক শিষ্য ছিলেন ধরা, জাতিতে ইনি জাঠ চাষ। আর এক শিষ্য রবিরাস জাতিতে চামার। কবীর হলেন জোলা। জাতিতে কি হয়? এরা ছিলেন মহাভাগবত :

বিকৃভক্তি-বিহীনা যে

চাঙালা: পরিকীর্তিতাঃ।

চাঙালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা:

হরিভক্তি-পরায়ণাঃ।

যে জন বিকৃভক্তি-বিহীন, সে চাঙাল বলে পরিকীর্তিত হয়। আর হরিভক্তি-পরায়ণ চাঙালও হয় শ্রেষ্ঠ।

মেয়েরা তখন দীন বলে গণ্য হতেন। গুরু রামানন্দকিছু মেয়েদেরও শিষ্য করেন। মেয়ে শিষ্যার মধ্যে পদ্মাবতী ছিলেন প্রধান। আর একজন শিষ্যা ছিলেন, নাম তাঁর মেয়ে রামানন্দের ৮৪ জন শিষ্য ও উক্তের মধ্যে নীচজাতি ছিলেন অনেক। কবীরও এই শিষ্যদের একজন। এই ছিল তখনকার ধারা। তবে এ সকল কি হঠাৎ হয়েছিল?

গোড়াতেই বলেছি, তখন ধর্মত নিজে ছিল খুব বেশী দলোদল। আর কবীর সমস্ত দলের তেমন একটা আনবার চেষ্টা করতেন।

কবীর কাছে জাতির বিচার ছিল না। অর্থাৎ এ ছোট জাত আর ও বড় জাত, এর বিচার তিনি করতেন না। অথচ তখনকার কালে জাতির বিচার ছিল এক মস্ত বড় কথা। বলেছেন কবীর :—আমি যেখান হতে এসেছি, সে দেশ হল অমর দেশ। সেখানে ব্রাহ্মণ নেই, শূত্র নেই, সেখা অর্থাৎ মুসলমান নেই। সেখানে ব্রাহ্ম নেই, বিষ্ণু নেই, মহেশ্বর নেই। সেখানে বৌদ্ধ নেই, জৈন-নরবংশও নেই। কবীর বলেছেন, আমি সেই দেশেরই বার্জ নিয়ে এসেছি। তোমরা সেই-দেশে চলে।

আরো বলেছেন তিনি :

জাতি হমারী বাণী
কুল করঃ উর মাহি।
কুটুম্ব হমারে সন্ত ছার
কোই সুবধ সধবল নাহি।

অর্থাৎ আমার বাণীই হল আমার জাতি, আর স্তন্যদেখই আমার কুল, এবং সন্তাই আমার কুটুম্ব। কোন মূর্খই একথা বুঝলো না।

তার গুরু হলেন রামানন্দ, কিন্তু তার সত্যগুরু হলেন ভগবান স্বয়ং। তিনিই তাঁকে দিয়েছেন অসীমের তৃপ্তি, আর দেখিয়েছেন সত্যপন্থ।

[২]

কবীর লিপ্তে-পড়তে জানতেন না। তিনি যা বলতেন সব হিন্দী ভাষায়। পাঁচ শ বছর আগে গজ ভাষার চলন ছিল না। তখন সব কিছুই হত গজ। কবীরের ভাষা ছিল বিস্তৃত হিন্দী। তা ছিল সহজ, সরল, প্রোঙ্গল ও প্রোঙ্গপ্পশী। কবীর বলেছেন :

সংস্কৃত কুণজল
কীর ভাষা বহুতা নীর।
বব চাহৌ ভবহি ডুবো
শান্ত হোর শরীর।

অর্থাৎ সংস্কৃত হল কুণজল। কুয়া খোঁড়, খুঁড়লে যদি জল ওঠে। আর জল উঠলেও ঘটিতে করে জল তোল আর ব্যবহার কর। অল্পবিদ্যা কত। আর আমার ভাষা অর্থাৎ হিন্দী, ঠিক বজ্র নীরের স্তম্ভ প্রবাহিত হচ্ছে। তা অতি নির্মল ও পবিত্র। তাতে বখন ইচ্ছা ডুব দাও। শরীর শান্ত হয়ে যাবে। ভাষার বলা হলে অতি সাধারণসেও বুঝবে। লাভ কত ?

একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। সমস্ত কবীরের পুর হতেই পুরবর্তী যুগে ভারতের সামুদ্রিক কবীরের পন্থা অনুসরণ করে চলিত ভাষার ঠাঁদের বাণী-বচন ও ধর্মপুস্তক সকল রচনা বা লুকলন করতে আরম্ভ করেন। যেমন—হিন্দুধর্মের তুলসীদাস, ভক্তগানের দাদু, পাণ্ডবের শিখগুরু নানক, মহাভারতের তুকারাম ও রামদাস বামী এবং বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্যদেব হতে আরম্ভ করে সকলেই।

কবীরের বাণী-বচন নিয়ে কত জনে কত আলোচনা করেছেন। কবীরের ভাব অকুরন্ত, কথা অকুরন্ত। তাঁর গৌড়া, শব্দ, শাবী, গান, বাণী-বচন ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। সে সকল এখন এক জায়গার করা অতীব দুঃস্থ ব্যাপার অর্থাৎ অসম্ভব।

এ দেশ তখন এক দলের গজ আর এক দলের কণ্ডা—কোমল নিয়ে বিভ্রত। কবীর তাই বললেন :

হিন্দু কহত হৈ রাম হমারী,
মুসলমান রহমানী।
আপস মেঁ দোউ লড়ে মরত হৈ,
মরম কোই নহি জানী।

হিন্দু বলেছে আমার রাম, মুসলমান বলেছে আমার রহিম। হুঁদলে লড়াই চলছে খুব। কিন্তু মর্থ কি, কেউ জানে না।

পুরাণ কুয়াণ সব দান্ত হৈ,
যা ঘটকা পরমা খোল দেখা।
অমুভব কি দান্ত কবীর কহৈ
রহ সব কুটা পেল দেখা।

পুরাণ কোয়াণ সব তো কথা আর কথা। আমি পরমা খুলে তাড়ের আসল রূপ দেখেছি। কবীর অমুভবের কথাই কেবল বলেছে, আর এও দেখেছে যে, অস্ত্র সব মিথ্যা—সব ভুল।

আরো বলেছেন :

যো খোলা মসৃজিদ মে বসন্ত ছার,
ওর মুলুক কেহি কেরা।
তারখ মুবত রাগ জিবাসী
বাহর করে কো হেরা।

খোলা যদি কেবলমাত্র মসৃজিদেই বাস করেন, তবে অস্ত্র মুলুকগুলি কার ? রাম যদি কেবল তীর্থের ভিতর ও মূর্তির ভিতর বাস করেন, তাহলে বাহিরটাকে কে দেখে ?

কবীর বলেছেন :

অবধু বেগম দেশ হমারা।
রাজা মংক ককীর বাদসা,
সবসে কহৌ পুকারা।
কো তুম চাহো পরম পদে কো,
বসিগো দেশ হমারা।
কো তুম আরে বীনে হো কে,
তজো মনকী ভারা।
এসী রহন রহো রে প্যারে,
সহজ উত্তর জারো পারা।
ধরণ আকাশ গগন কছু নহী,
নহী চন্দ্র নহী তারা ?
সত্য ধর্ম কো হৈ মহতাবে,
সাহিব কে দরবারা।

হে অবধূত, চুঃখহীন হল আমার দেশ ! রাজা, কাউল, বাদশাহ, ককীর, সকলকে ডেকে আমি বলছি—পরম পদ যদি চাও, আমার দেশে গিয়ে বাস কর। যদি বীনা হরে অর্থাৎ হৃদয়ভাব মিলে এসে থাক, তবে মনের ভাব ত্যাগ করে যাও। হে আমার শ্রিয় তাই, এখানে এমন করে থাকো, যাতে সহজেই পায় হতে পায়। ধর্মী, আকাশ, গগন—কিছুই নেই আমার দেশে। না আছে বেথানে চন্দ্র, না আছে তারা। আমার প্রভুর দরবারে শুধু কেবল সত্য ও ধর্মের জ্যোতি দেবীপায়ান।

এই চর ভগ্ন জ্যোতি বরত হৈ
সুসজ্জ রাগ নিয়ত তার বাঁজে।
নৌবাতিয়া যুবত হৈ যেন সিন সুন মে
কঠৈ কবীর পিউ গগন গাউজে।

এই, চর, ভগ্নের জ্যোতি জ্বলছে, প্রেমের রাগ ও বৈরাগ্যের
তান বাজছে, ঘড়াপুতে সর্বক্ষণ নহবত বাজ চলছে। কবীর কহেন—
আমার প্রিয় সখা গগনে বিদ্যাতের ভার প্রাণীপু।

অধর আসন্ন কিয়া অগম পালা পিয়া
জোপ কী মূল গাচ জুগতি গাউ।
পহু বিন জর চল সহর বেগমপুর
দয়া জগ দেব কী সহজ আউ।
খান বর দেখিয়া নৈন বিন পেখিয়া
অগম অগাধ সব কহত গাউ।

অন্যে আমার আসন করেছি, অগম্য পোয়ালা পান করেছি,
রইতক জেনে যোগের মূলকে প্রাপ্ত হয়েছি। বিনা পথেই
সেই দুঃখহীন অগম্যপুরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। সহজেই সেই
জগদেবের দয়া লাভ হয়েছে। অগম্য অগাধ বলে সকলকে ধীর
গান করতে, খান ধরে তাঁকে আমি দেখেছি—বিনা নয়নে তাঁকে
প্রত্যক্ষ করেছি। সবাই বলেন, সে হল অগাধ।

রবীন্দ্রনাথের এক উক্তি এখানে উদ্ধৃত করি। ভাবুক
কবি বলেছেন : “...ভারতবর্ষের একটি স্বকীয় সাধনা আছে।
সেইটি তার অন্তরের জিনিষ। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক
নশাবিশিষ্টের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে।
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির উত্থানের
দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি
থাকে তা সে অতি অল্প, বস্তুত, এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে
অশাস্ত্রীয় এক সমাজসংশোধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস
জনসাধারণের অন্তরভূত হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উন্মোচিত
হয়েছে বিস্মিন্বেষের পাখরের বাণ ভেদ করে। বীড়ের চিত্তক্ষেত্রে
এই প্রবাহের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য প্রেমের লোক,
তাঁরা বা শেরেছেন ও প্রকাশ করেছেন ‘ন মেধা ন বহুনা জ্ঞাতেন’।”

কবীর বেদ-কোরাণ জানতেন না। পুরোহিত-মোদা জানতেন
না। মণি-মসজিদ, তীর্থ-হজ, স্যাফিক-নমাজ, ব্রতোপবাস-
রোজা—এসব কিছুই জানতেন না। তিনি হৃদ্যপূজা, দেবদেবীর
উপাসনা, অবতারবাদ প্রভৃতির শিক্ষা করেছেন। বলেছেন :

দেবতা পথর তুটীরা ভবানী।
হৃদ মারগ তৈরানী চলন কী।

অর্থাৎ সত্য সৃষ্টিকর্তা বিনি, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আছেন—
সৃষ্টির মধ্যে তেই। তিনি যে পথ লাভ করেছিলেন, তা
কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। কোন বন্ধ বাছাছাটান
তাঁর ছিল না। তাঁর সমন্বিত বৃণে সবাই মায়াক্ষেপে পড়ে যুরে
বেড়াছিল। ভারতবর্ষের একটি স্বকীয় সাধনা আছে। সেইটি
হল তার অন্তরের জিনিস। সেই জিনিস তিনি লাভ করেছিলেন।
তিনি প্রচার করেছেন প্রেম-ভক্তির কথা। এই প্রেম-ভক্তিতে কোন
সাম্প্রদায়িকতা নেই। কাজেই হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই তাঁর
শিষ্য হয়েছিল।

তিনি তো ছিলেন নিরঙ্কর স্বর্গ। শাস্ত্র-তাঁর তাঁর পড়া ছিল না।
তবে তিনি পরমতত্ত্ব লাভ করেন কি করে? কি করে?—

সন্ত ন পড়তে বিদ্যা কেই।

উমকে অহুভব সন্থ সমানী।

সন্ত বিনি, তিনি কোন শাস্ত্র পড়েন না। তাঁর অহুভুতিই হল
সন্থের মতো অগাধ।

এখন ‘সন্ত’ কথাটিকে অতি সাধারণভাবে ধরা হয়। ‘সন্ত’
মানে কি? ‘সন্ত’ মানে সত্যজ্ঞী। কথাটি অতুলনীয়। আর
কবীর সাহেবই ছিলেন সর্বপ্রথম সন্ত।

কবীর হিন্দীভাষার প্রাণ প্রেতিষ্ঠা করেন। জড়ের সহিত চৈতন্যের,
চৈতন্যের সহিত জড়ের, সাকারের সহিত নিরাকারের, নিরাকারের
সহিত সাকারের সমন্বয় তিনিই করেন সর্বতোভাবে। এমন ভাব
নেই, যে ভাব তাঁর হৃদ দিয়ে না বায় হয়েছে। কাউকে তিনি
অনুগ্রহ করেন নি বা অনুগ্রহণ করেন নি। তাঁর বস্তুত, তাঁর
কথিত বাণী সকলই মৌলিক। কবীরের বাণী তখন সাধারণের মনে
ধর্ম-বিপ্লব উপস্থিত করেছিল।

কবীরের কথায় কাশীর পণ্ডিতেরা খুব বিরোধী হলেন।
কবীরের উক্তি আগ্রহেই তাঁরা মানতেন না বা পছন্দ করতেন না।
অথচ কবীর অগ্রবর্তী হয়েই চলেছেন। এতে ব্রাহ্মণদের হল হিসা।
কবীরকে জব্দ করার জন্য একদিন তাঁরা চারদিকে প্রচার করে
দিলেন যে, কবীর সকলকে ভোক্তার নিমন্ত্রণ করেছেন। নিমন্ত্রণের
স্বাধ শেয়ে লোকজন এসে জমায়েত হল। কবীর তখন কি
করলেন? তিনি একটি হাঁড়ির ভিতর, ঈশ্বরের নাম মরশ করে,
কিছু ভোজন-সামগ্রী রাখলেন, আর তাতে একখানা কাপড় ঢেকে
দিলেন। বললেন, নিমন্ত্রিতদের সকলকে খেতে বসিয়ে লাও।
আর হাঁড়ি থেকে নিয়ে পরিবেশন করতে আরম্ভ কর। লোকবেশন
সুস্থ হল, কিন্তু খাতবস্ত্র আর কুরায় না। শত শত পেরি খেয়ে
গেল, কিন্তু হাঁড়িটি বইলো ভরপুর। নিমন্ত্রিতেরা আকর্ষণে খুশি
হয়ে চলে গেল। বিরোধী ব্রাহ্মণেরা এই দেখে অবাক হয়ে গেলেন।
এটি গল্প কথা হলেও অবিদ্বান্ত নয়। কারণ, ভক্তজন সম্বন্ধে এরকম
ব্যাপার খটা আশ্চর্য নয়।

কবীরের কথা বা বাণী-বচন তখন হিন্দুদেরও যেমন ভাল লাগতো
না, মুসলমানদেরও তেমন ভাল লাগতো না। মহা রাগ তাদের।
মুসলমানেরা বিদ্বেষ করে অভিযোগ জানালো দিল্লীর বাদশাহ
সিকন্দর শাহ লোদীর কাছে। প্রবাদ এই যে, বাদশাহের
হুকুমে ভক্ত কবীরকে ধরে নিয়ে বাওরা হল, বাদশাহের খোঁনপুকের
দরবারে। বাদশাহের সামনে উপস্থিত হয়ে ভক্ত কবীর তাঁকে
সেলাহ করলেন না। এতে তাঁর উজীরেরা বলে উঠলেন,—“ওরে
কাকের, বাদশাহ হলেন বড় পীর, তাঁকে তুই সেলাম জানালি না?”

কবীর বললেন :

কবীর তেই পীর হার

বে জানে পর পীর।

বে পর পীর ন জানে হী

তে কাকের বে পীর।

তিনি হলেন পীর, বিনি পরের কথা অনুভব করতে পারেন। পরের
বেশা যে অনুভব করতে পারে না, সেই তো কাকের অর্থাৎ বিধর্মী।

বাগশাহ' তাকে প্রসন্ন করলেন,—‘তুমি হিন্দু না মুসলমান?’

কবীরের উত্তর—অদ্য রহস্তের খেলা চলেছে। হিন্দু ধ্যান করে মলিনে, আর মুসলমান ধ্যান করে মসজিদে। আর এই দলে কবীর ধ্যান করে এ দু'য়ের মিলনস্থানে।

বাগশাহ সিকন্দর শাহ লোক বিচক্ষণ লোক। তিনি কবীরের কথা বুঝলেন, তাঁকে খাতির করলেন, আর তারপর তাঁকে সম্মানে বিদায় দিলেন।

তমু ধর্মমত নিয়েই কবীর আলোচনা করেছেন, তর্ক করেছেন। তাঁর তর্ক বা আলোচনা অতি চমৎকার। এতে তাঁর মনের উদারতা, হৃদীর স্নেহতা ও স্বপ্নের গভীরতা প্রতি কথার প্রকাশ পায়।

কবীর ক্রমশঃ নূতন ধর্মমতের সৃষ্টি করেন। সে ধর্মমতের নাম হল ‘সন্ত মত’। কবীর হলেন প্রথম ‘সন্ত’। আগেই সে কথা বলা হয়েছে। সন্তমত হল এক নূতন ধর্মমত। কবীরের ৭১ বছর পরে গুরু নানক আবির্ভূত হন। দাদু সাহেব ১৪৬ বছর পঞ্চম। এঁরা ছিলেন কবীরের অনুবর্তী। নাতা সাহেব, মীরাবাই প্রভৃতি এঁরাও ছিলেন কবীরের অনুবর্তী।

কবীরকে এক জন ভিক্ষাঙ্গী করেছিল, তুমি কোন্ সম্প্রদায়ের? উত্তরে কবীর বলেছেন :

প্রথম হি রূপ জোলহা কিহা।

চারি বরণ মোহিঁ কাহিঁ ন চিহা।

রামানন্দ গুরু নীকা দেহ।

গুরুপূজা কিছু হমুঁ সোঁ লেহ।

এখানে আমি জোলা ছিলাম। চারিবর্ণের ভিতর কেউ আমাকে চিনতে না। গুরু রামানন্দ আমাকে দিলেন নীকা। আমিও কিছু গুরুপূজা করলুম।

আর একজন কবীরকে ভিক্ষাঙ্গী করলো,—কি তোমার জাতি, জাতি কল। কবীর উত্তর করছেন :

সন্তন জাত ন পছো, নিরঙনিয়।

সাধ ব্রাহ্মণ সাধ ছত্তরী, সাধে জাতি বনিয়।

সাধন ম। হস্তীস কোম হৈ, টেটী তেরী পুস্তনিয়।

সাধে নাউ সাধে ধোবী, সাধ জাতি হৈ বনিয়।

সাধন ম। রৈলস সন্ত হৈ, স্মৃশচ কবি সো ভঁগিয়া।

হিন্দু-তুর্ক দোই দীন বনে হৈ, কিছু নহিঁ পহচনিয়।

গুরু-নিষ্ঠা, সন্তের জাত কি ভিক্ষাঙ্গী কোনো না। সাধু ব্রাহ্মণ, সাধু কজির, আর সাধুর মধ্যে বেধেও আছে। হস্তি জাত আছে সন্তদের মধ্যে। তোমার এই প্রশ্ন একেবারে টেড়া। নাপিত সাধু, ধোপাও সাধু, বারিজাতির লোকও সাধু। আবার সেখা সাধুর মধ্যে রৈলস হলেন সন্ত। স্মৃশচ কবি হলেন মেথর। দুইটি ধর্ম—হিন্দু আর তুর্ক অর্থাৎ মুসলমান, এদেরও আলোচনা করে চিনবার উপায় নেই। সাধু সাধুই—।

একদিন এক পণ্ডিত কবীরকে প্রশ্ন করলেন :

কঁহাতে তুম জো আইয়া, কোন্ তুম্হারা ঠাম্।

কোন্ তুম্হারা জাতি হায়, কোন্ পুরুষ-কো নাম।

কোন্ তুম্হারা কোন্ ছায়, কোন্ তুম্হারা নাম।

কোন্ তুম্হারা ইষ্ট হায়, কোন্ তুম্হারা গায়।

কোথা থেকে তুমি এসেছ? তোমার ঠাই কোথায়? তোমার

কি জাত? বংশের কি নাম? কি ধর্ম? কি নাম? তোমার

ইষ্ট কে? কোন্ গ্রামে তোমার বাস?

কবীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন :

অমর লোকতে আইয়া, স্মৃধ কে সাগর ঠাম্।

জাতি হামারী অজাতি হায়, অমর পুরুষ কো নাম।

জাতি হামারী আছা, ঐশ্য হামারা নাম।

অলখ হামারা ইষ্ট হায়, গগন হামারা গ্রাম।

অমর লোক হতে আমি এসছি। স্মৃধনাগর আমার ঠাই।

অজাতিই আমার জাতি। অমর পুরুষ আমার বংশ। আছাই

আমার ধর্ম, ঐশ্যই আমার নাম। অলখ নিরঞ্জন আমার ইষ্টদেব।

গগন (ত্রিকুটি) আমার গ্রাম।

একক ভগবানই এঁদের উপাস্ত। আর গুরু ভিন্ন জগতে

প্রত্যক্ষ আর কোন ঈশ্বর নেই। মানুষ ভালবাসতে পারে কেবল

মানুষকেই। জড়কে বা মৃতকে ভালবাসবে কি করে? ভালবাস্ত

হয়, প্রেম হয়—এক-জাতীর বস্তুর উপর। কবীর বলেন,—

ভগবানকে মানুষ ইন্দ্রিয়ের গোচরে আনতে পারে না। সেজন্য

দরময় ভগবান গুরুরূপ ধারণ ক’রে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

গুরু আর শিষ্য সবুধে কবীর অনেক—অনেক কথা বলেছেন।

বলেছেন :

কাচ পোকা জানে না ভ্রমরকে। ভ্রমর কিন্তু কাচপোকাকে

বেমন নিজের মতো করে নেয়, তেমনই গুরুও শিষ্যকে নিজের

সমান করে নেন।

গুরু না হলে মালা জপ করেও ফল হয় না। দান করা হয়

বুঝা। এ শুধু কথার কথা নয়, এক কথা শাস্ত্র-পুরাণেও বলে।

আর বললেন—গুরুর সমান দাতা নেই, আর শিষ্যের সমান

বাচক নেই। কেন না, চার লোকের সম্পত্তি যে ভগবান, সেই ভগবান

রূপ অপূর্ণ ও অমূল্য সম্পত্তি গুরু দান ক’রে থাকেন শিষ্যকে।

কাজেই, শিষ্যের এ বকম চাই, কি গুরুকে বর্ষাসর্বধ দিয়ে দেওয়া।

আর গুরুও এ বকম চাই, কি শিষ্যের কাছে কিছুই না নেওয়া।

আগেই বলেছি, কবীরের মনের উদারতা, হৃদীর স্নেহতা ও

হৃদয়ের গভীরতা প্রকাশ পায় তাঁর প্রতি কথায়। ধর্মমতগুলি

নিয়ে তিনি অতি চমৎকার—চমৎকার বিচার ও আলোচনা করেছেন।

আর এমনভাবে বুঝিয়েছেন, বাখ্যা করেছেন যে, সেই সকল মতের

লোকেরা আগে তা ধরতে বা বুঝতে পারে নি। কত ধর্ম-

সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে যে তাঁর তর্ক হয়েছে, আলোচনা হয়েছে,

তা বলে শেষ করা যায় না।

নানান দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। তিনি ভ্রমণে গেছেন

তিব্বত, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, খুরাসান, বালখ, বুখারা,

ইরাণ ইত্যাদি দূর দূর দেশে। তাঁর ‘কবীর কামোটা’ ও ‘কবীর

মনশুর’ বইতে এই সব আছে। কবীরের অনুবর্তী অনেক রাজী

এখনো ভ্রমণে যান এই সব দেশে।

কবীর বলেছেন,—সাধকের আবার দল কি? জাতি কি?

সাধকের আবার দলাদলি হবে কেমন করে? সকল দেশের

সাধকেরাই এক দলের। সবাই চায় ভগবানকে। সবাই সন্তকে

সবাই প্রেমী, সবাই ভ্যাপী, তাই সবাই এক। কবীর ছিলেন সন্ত

সাধক।

[কবীর]

সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের গুরুত্ব, সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের নেতাজী
এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যে দুইটি মহাপুরুষের সমগ্র জীবনের
বীজ রহিয়াছে।

এখনই রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে কী চক্ষে দেখিতেন, তাহা
জানাইবার চেষ্টা করা হইল।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে, ১৯৩১ সালে জাম্মুয়া
মাঙ্গে যখন শান্তিনিকেতনে বান, তখন আত্মকৃত্তে তাঁহার মানব
সম্বন্ধনার জ্ঞত যে আয়োজন করা হয়, তাহাতে কবি তাঁহাকে
অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

কবি তাঁহার "তাসের দেশের" শিত্তির সংস্কার সুভাষচন্দ্রকে
উৎসর্গ করেন, "কলাবীরী জ্ঞান সুভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিত্তে নতুন
প্রাণসংকার করবার পুণ্যভূত তুমি গ্রহণ করছ, সেই কথা স্মরণ
করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলাম। আজ
তবু বাংলা তথা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সুভাষচন্দ্র;
তিনি আজ নিজীব প্রাণে সংগ্রামের মন্ত্র দিতেছেন", কবির তাসের
দেশের মর্মকথা 'আধমরাদের বা দিরে তুই বাচা', সুভাষচন্দ্র সেই
বাহীর বাহক বলিয়া কবির ভরসা,—"তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেসের মাধ্যমে
দেশের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হইবে"।

জিশুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের কার্যাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে
রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, যে মহাত্মজীর নেতৃত্বে ভারতের যে অভাবনীয়
পরিবর্তন হয়েছে, তাহার কথা বায়ে বায়ে স্বীকার করিয়াও বলিলেন,—
"তবু তার বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে, এমন
কথা প্রত্যাশা নয়। অত কোনো কর্মবীরের মনে নতুন স'ধনার
প্রেরণা যদি আসে এবং যদি কোনো কৃতী নতুন পথ খুলতে যেরকম,
আমি অনভিজ্ঞ ও তাঁর সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তার কামনার
অভিযাত্রী—কিন্তু ঘুরে থেকে।"

তিনি লিখিলেন "আজ আমি জানি, বাংলাদেশের জননায়কের
প্রদর্শন সুভাষচন্দ্রের, সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের
সাধনা করে আসছেন সে পলিটিক্সের আসনে। আজকের এই
পৌলম্যালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে—যে
বঙ্গদেশকে আমরা বড় করব, সেই বাংলাকে বড় করে লাভ করবে
সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর
করবার সাধনা গ্রহণ করবেন—এই আশা করে আমি সুভাষচন্দ্রকে
জ্ঞানবাক অভাবনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা
প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ
শক্তি তাই দিবে, বাংলাদেশের সার্বকতা বহন করে বাঙালী প্রবেশ
ক্রমে পায়বে সমসামানে ভারতবর্ষের মহাত্মজীর রাষ্ট্রসভার। সেই
সার্বকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।"

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টের পদে সুভাষচন্দ্র
পাক্ষীকীর অমতে বিতীর্ণবার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু
শেষ পর্যন্ত, সুভাষচন্দ্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ
সুভাষচন্দ্রকে যে টেলিগ্রাম করেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"The dignity and forbearance which you

have shown in the midst of a most aggravating
situation has won my admiration and confidence
in your leadership. The same decorum has still
to be maintained by Bengal for the sake of
her own self-respect and thereby so help to
turn your apparent defeat into a permanent
victory." [May 4, 1939, United Press]

রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন দেশের মধ্যে প্রবীণ ও নবীনের স্বদেশ
সময় সুভাষচন্দ্রই দেশনায়কত্ব করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। সুভাষচন্দ্রের
রাষ্ট্রপতি-পদত্যাগের পরই (১৯৩১ মে) কবি 'দেশনায়ক' নামক
এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতে চাহিয়াছিলেন,
তাঁহার ভাষণ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াও বিশেষ কারণে, কবির
জীবিতকালে প্রচার করা হয় নাই।

এইবার রবীন্দ্রনাথ সৎকে সুভাষচন্দ্রের অভিমত জানাইবার
প্রয়াস করা যাক। একবার ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের নিকট
সুভাষচন্দ্র তাঁহার কয়েকজন তরুণ বন্ধুকে লইয়া গিয়াছিলেন 'স্বদেশ'-
সেবার জন্ত উপদেশ লইবার জন্ত, কিন্তু তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বাণীর
পরিবর্তে গ্রাম-সংগঠনের বিষয়ে উপদেশ পাইয়াছিলেন। এ কথাগুলি
তখন তাঁহারের মোটেই ভাল লাগে নাই। কিন্তু বহুদিন বহিতে
হাসিল, ততই রবীন্দ্রনাথের সেই উপদেশের মর্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি
হইতে লাগিল।

শরে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তাঁহার এক
ভাষণে বলেন যে, "শান্তিনিকেতন ও শ্রীমন্তেন রবীন্দ্রনাথের
জীবিতকালের পর বর্তমান থাকিবে না, ইহা সত্য নয়। ইহার
বর্তমান আকার স্থায়ী না হইতে পারে, কিন্তু ইহার সত্য অংশ
ভিন্নরূপে চিরস্থায়ী হইবে।"

সুভাষচন্দ্র মহাত্মাসমূহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবার জন্ত
চরিত্রকে অল্পবোধ করিয়া পাঠাইলেন। মহাত্মাসমূহের ভিত্তি-প্রস্তর





স্থাপনের সন্ধ্যা পাইয়া সুভাষচন্দ্রকে কবি একপাশে লিখিয়া পাঠাউলেন—“তোমাদের সংকল্পিত কংগ্রেসভবনের পরিকল্পনাটিই বর্ণোচিত হয়েছে বলে মনে করি। এই ভবনের প্রয়োজনীয়তা বিচিত্র এবং ব্যাপক, সর্ববনের আত্মকুলো এবং প্রতিষ্ঠা উপযুক্তরূপে সম্পন্ন হবে আশা করে আগ্রহাধিত হয়ে আছি, এই পুণের সম্পূর্ণতার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যের এবং পৌরবের রূপ দেখতে পাব।”

মহাভাতিসন্দের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবার অন্তর্গত সুভাষচন্দ্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সর্জন্য উপলক্ষে বলেন “গুরুদেব, আপনি বিশ্বমানবের স্বাক্ষর কর্তে আমাদের সুপোষিত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল সুভাষ্যরী যৌবন-শক্তির বাণী শুনিতে আসছেন। আপনি শুণ্ড কাব্যের বা শিল্পকলায় রচয়িতা নন, আপনার ভাবের কাব্য এক শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুণ্ড ভারতের কবি নন—আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে, তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অন্তর্গতের জন্ম আমরা এখানে সমবেত হয়েছি—তার তোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যে বরণ করে গন্ত হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা ‘মহাভাতি সন্দের’ ভিত্তি স্থাপনা করুন। যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আশা পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এ গৃহ ভারতই জীবন-কেন্দ্র হয়ে ‘মহাভাতি সন্দের’ নাম সার্থক করে ভুলুক—এই আশীর্ব্বাদ আপনি করুন। এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম-পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাভাতির সাধনাকে সকল বকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।”

রবীন্দ্রনাথের “বিশ্ববিশ্বের ব্যক্তি” উপলব্ধি করিয়া বাংলাদেশের করেখানি কাগজে যে মহাভাতি প্রকৃৎ হয়েছিল, তাঁর ঐ মর্ম্মস্পর্শী প্রবন্ধটি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত হীন ও নিলম্ব প্রচারকার্যে ব্যবহৃত হইতছিল লক্ষ্য করে কবি এক বিরক্তিতে বলিলেন, “অল্প কয়েক দিন তোলা আমার কোনো ভাবের আমি দেশের লোকের কাছে যে বেদনা জানিয়েছিলাম, সেটাকে বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে একটা অসম্মান সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে।” সেটা আমার পক্ষে লক্ষ্যার বিবরণ, কারণ ঈজিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেধে ব্যক্তি বিশেষকে অবকম গল্পনা দেওয়া আমার স্বভাব সংগত নয়।

“মোকাবিলার আমি সুভাষকে কখনো ভৎসনা করিনি তাঁর, করেছি তার কাণ্ড তীক্রে শ্রেহ করি। কিন্তু সেদিন আমি সাধারণতঃ বাংলাদেশের ঐ শ্রেণীর লোককেই শিকার জানিয়েছিলাম, ধীর কাজ করেন না, কলহ কখনে, দল বীণতে গিয়ে দল জায়েন, ব্যক্তিগত ভাবে সুভাষকে আমি ঘেহ করি।... তিনি দেশকে অন্তরের গঞ্জে ভালবাসেন এবং দেশ-বিশ্বের রাজনীতি চর্চা করেছেন, সেইজন্য তাঁর কাছে আমি আশা করি এবং দাবি করি তিনিও দেশকে তার বর্ধমান চরুগতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, তার সাংখ্যাতিক অনেক-গহবরের উপরে সেতু বন্ধন করবেন, তাঁর প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্ধৃত্ত করবেন, তাঁর দেশসেবা সার্থক হবে। চাহিলিকে বলীয় আঘাতে অভিধাত তাঁর মনকে উদ্বাস্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই শুভকামনা।”

ঐ সময়ে, হলওয়েল ময়ুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের জন্ম সুভাষচন্দ্রকে বাংলা গভর্নমেন্ট প্রোপার করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্ম ১৯৪১ সালে জাম্মুয়ারী মাসে স্বগৃহে বন্দী থাকার কালীন অন্তর্ধান করেন। ঐ বৎসরেই গুই আগষ্ট কবির মহাপ্রয়াণ হয়। কবি এই পৃথিবী ত্যাগ করে হাইবার পূর্বে, তাঁহার প্রিয় দেশনাথক সুভাষের বিশেষে অবস্থিতির সন্ধ্যা জানিবার সুযোগ পাঠাউলেন কিনা জানি না।

সুভাষচন্দ্র বিশেষে হাইবা স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁহার আজীবন হিন্দু বাহিনীর জন্ম ‘জনগণমন’কেই জাতীয় সঙ্গীত বলে নির্বাচন করেছিলেন।

ভারতবর্ষের জন্ম জনগণমনকেই জাতীয় সঙ্গীত বলে লোকসভায় স্থির করা হইয়াছে। পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীতগুলির মধ্যে ক্রান্তের এবং ক্ষয়িয়ার ছাড়া সাহিত্যিক গরিমা ও সার্থভৌম আবেদন সম্বলিত গানের খুবই অভাব—তাহাড়া কোনো দেশের জাতীয় সঙ্গীত সে দেশের শ্রেষ্ঠ কবিশেষে রচিত নয়, রবীন্দ্রনাথ জনগণমন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

আর নেতাজী ভারতবর্ষকে নবজীবন মস্ত্রে নীকিত করিয়াছেন—“জয়হিন্দু”, সবশেষে দুই মহামানবকে প্রণাম জানিয়ে প্রবন্ধ শেষ করলাম।

—অনাথী

“The childhood shows the man—
As morning shows the day.”

ইংরাজি কবিতার অনুবাদে সত্যোজ্জনাথ

ভট্টর অনুবাদের চট্টোপাধ্যায় এম. এ., ডি. বিল.

অনুবাদকে অনেক সাহিত্যিকের সম্মান দিতে সক্ষম।

কারণ ভাবের ক্ষেত্রে তাঁরা পরম্ব্যাপেক্ষী। অনুবাদের দ্বারা খেকে বতাবতঃই কিছুটা আড়ষ্টতা এসে যায় বলে অনুবাদ অপেক্ষা মৌলিক রচনার ভাষা সাধারণতঃ স্বরকরে। কিন্তু সাধারণ অনুবাদের ক্ষেত্রে একথা সত্য হলেও অসাধারণ অনুবাদের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ কি অসত্য হবে না? দেশ-বিশেষের সাহিত্যের মধ্যে এমন অনুবাদ কি পাওয়া যায় না যা সরস্বতী-কঠাতরণ বলে স্বীকৃত হয়েছে আর যা অনুবাদকে দিয়েছে অমর, দিয়েছে নিরবধিকাল ও বিপুল পৃথিবী রসলোকে পাখতী প্রতিষ্ঠা?

মানতেই হবে তুমে থাকা ভোলা নয়। কারণ অনুবাদকে সাহিত্য স্বীকৃতি দিতে বীরা নারাজ, বীরা সত্যোজ্জনাথের অনুবাদগুলিকে মৌলিকরচনার পাশে তুলতে চান না, তাঁরা কিছুক্ষণের জন্য তুমে যান প্রাগৈতিহাসিক বাংলা সাহিত্যের গৌরব কুতিবাস, কবিরাম, আলিগল অনুবাদকই। এঁদের রচনা মূল্যহীনতা হ'তে কিছুটা মুক্ত হ'লেও চিঃসংক্ষেপে অনুবাদ-সাধারণতঃ। আবার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উত্তাপপর্বের প্রধান পুণ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা শঙ্কুচল, বেতাল পঞ্চবিশতি, প্রান্তিবিলাস সংস্কৃত হিন্দী ইংরাজি অনুবাদের মাত্র। মূল্যের সঙ্গে মিল বস্তুপ্রতিবন্ধক না বিশ্বপ্রতিবন্ধক তা বিচার না করেও বলা যায় বাংলা গল্প-সাহিত্যে (বেনামী রচনা বাদে) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জনকত্বের দাবী অনেক পরিমাণে অনুবাদেরই। আর যদি অভিযোগ ভোলা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে, তবে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা শ্রবণ করতে পারি। আধুনিক বাংলার গুরুবাক্য সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবিখ্যাতির শিউনেও কি অনুবাদের অবধান নেই। এখানে কবি অবজ্ঞা নিজেই নিজের অনুবাদ করেছেন। ভাবের জন্য অপরূপ বস্তুভাবার কাছেই এসেছেন তিকাপাত্র হস্তে বৃত্তাকার। কিন্তু তবুও অনুবাদ-অনুসরণ, 'miracle of translation' এর মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বিশ্বকবির সভার—একথা ত অস্বীকার করার নয়। আর কিংকোত্তর? তিনি ত বরহিমায় প্রপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর অনুবাদ প্রকাশ আর কবিতাকৃতির মধ্যে যে কালের ব্যবধান তা মহাকালের পটভূমিকার আমরা সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ হ'তে পারি, এক একথা আমরা মনে রাখতে পারি যে, যসিক ইংরাজ তাঁকে স্বীকার করেছেন কবি বলে, পারস্তের ফারারী তাঁকে অনুবাদক হিসেবে স্বীকার করলেও। জয়দেবের সীতগোবিন্দ যদি মূলভঃ প্রাকৃত হ'লে থাকে তাহ'লে সংস্কৃত অনুবাদে কবির কবিত্ব কি ভাবে স্বীকৃত হয়, তার উদাহরণ আমাদের ঘরের মধ্যেই আছে। অবজ্ঞা সীতগোবিনদের দ্বিত্ব সম্বন্ধে দ্যাসক-পিসেল এর কথা সর্বজনপ্রিয় হয়নি। এ বিবরণে রচকের উপায় প্রায়োক্তপাত করতে পারেন বিখ্যাতপুস্তক কি প্রায়োক্তপাত? কিন্তু পৈশাচী প্রায়োক্তপাত হারিয়ে রাখা গেল।

সত্যের অনুবাদের মধ্যে অমর্য লাভ করেছে—এ প্রমাণ ত আমাদের কাছেই রয়েছে। সত্যের অনুবাদকে সাহিত্য বলে স্বীকার করা নানা দেশে নানা কালে হয়েছে। আর সে অনুবাদ-সাহিত্যে যদি সত্যোজ্জনাথ আপন অসামান্য স্বকীয়শক্তির পরিচয় দিতে পারেন, তাহ'লে আপা করি, অনুবাদের ক্ষেত্রে কবি হিসেবে সত্যোজ্জনাথকে স্বীকার করতে কেউ আপত্তি জানাবেন না। আপা করি ঘুরে ঘুরিয়ে রাখা হবে না এমন সব কবিতাকে যার মূল অন্তর্দেশের মাটিতে থাকলেও আমাদের সাহিত্য-নিবন্ধে স্থান হ'লে কুটে রয়েছে। যা বাতাস করেছে সুরভিত, আমাদের প্রীতিকে করেছে প্রসন্ন। যার মধ্যে পেরেছি আমরা আনন্দ, পেরেছি পরিতৃপ্তি। যেখানে ভাবের দিক থেকে তিনি অপরের কাছে স্বপ্ন হ'লেও রূপান্তরে তিনি যে ভূমি, তার পরিচয় রেখে গেছেন। সত্যোজ্জনাথের অনুবাদ বিপুল, বিচিত্র, বিবর্ত, বিশিষ্ট। 'মণিমুখা', 'তীর্থমলিনী', 'তীর্থমুখ'ে তাঁর সাহিত্যিক বিশ্ব ও বিশ্বজনক সাহিত্যপ্রবীণতার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তিনি পৃথিবীর কবি। তাঁর সাধনা পৃথিবীর বিচিত্র আনন্দবোধনাকে বাস্তব করে প্রকাশ করার সাধনা। আর সত্যোজ্জনাথ পৃথিবীর কবিতার অনুবাদক কবি। দেশ-বিশেষের কবির চিত্ত-মূল-ময় নিয়ে তিনি রচনা করেছেন মধুচক্র। সৌভজন তার সুধাপানে আনন্দিত হ'লেই তিনি সুভার্গ। পৃথিবীর আর কোনও কবি দেশ-বিশেষের এই অসংখ্য ভাষা থেকে অনুবাদ করে মাড়ুভাবার পরিপূর্ণ প্রদান পেরেছেন কি না জানি না। অন্ততঃ পৃথিবীর যে-কোনো ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে তার কোনও অনুবাদকের মধ্যে বিশ্ব-কাব্যাত্মসজ্জার এত প্রবল প্রকাশ লক্ষ্য করিনি। বলা বাহুল্য যে, চীন-জাপান থেকে সূত্র ক'রে দক্ষিণ-ভারতের কবিতার অনুবাদে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই মূল্যের ইংরাজি অনুবাদের অনুবাদ করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে, কতকগুলি ভাষা থেকে তিনি সরাসরি অনুবাদই করেছেন, যেমন ইংরাজি, সংস্কৃত, চিনী, ফারসী বা ফারসী প্রকৃতি। এ-সব ক্ষেত্রে তিনি ইংরাজি অনুবাদ থাকলে দেখেছেন হয়ত, কিন্তু অনুবাদক্ষেত্রে মূলকে অনুসরণ করার কথা তুমে যান নি। আর তবু তাই নয়, ফারসী—ফারসী—ইংরাজি-সংস্কৃত হ'তে হলে চালাবার চেষ্টাও করেছেন। জানি না পৃথিবীর আর কোন অনুবাদকের এতগুলি সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পরিচয় ঘটেছিল, আর ঘটে থাকলেও তাদের হাতে মাড়ুভাবার ভাবের হৃদ পর্বাণ অনুসরণের চেষ্টা হয়েছিল। আমরা সকলেই শিরোনাম থেকে জানি যে, সংস্কৃত হ'তে মালিনী, মনাক্রান্ত, পঞ্চামর প্রকৃতি, ইংরাজি young lochinvar-এর হৃদ; ফারসী 'পাশু' ; আর মালিয়ারের ভাষা-প্রকৃতিতে মূল ফারসী হৃদ বজায় রাখবার চেষ্টা তিনি করেছেন। এটি পুরোনো খবর অর্থাৎ খবরই নয়। কারণ এমসএর মধ্যে এমস কিছু না থাকলে চলে না। পুরোনো খবরের স্বয়ংস নেই তা জানি কিন্তু শ্রবণ করলে সত্যোজ্জনাথের কৃতিত্ব সম্বন্ধে স্থল করার হাত থেকে বা তুমে থাকার হাত থেকে সত্যোক্তি পাব। কারণ

সাধারণতঃ অল্পবাক্য বিশেষের ভাবসম্পাদকে মাতৃভাষার প্রকাশ করে বিশেষকৈ সমৃদ্ধ করতে চান। অসাধারণ অল্পবাক্য সত্যোক্তনাম বিশেষী হৃদকেও বিশেষী-সংকতি-পন্থার ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রয়াস পেরেছেন।

বলবেন, ভাবের লগতে দেশ ও বিশেষের সাহিত্যের মধ্যে কি তিনি অল্পবাক্যের গাঁটছড়া বেঁধে মিলন খুঁটিয়েছেন। বলব, মূল বিচারে মূল্য বিচার অল্পবাক্যের ক্ষেত্রে অবলম্ব্য করণীয়, কিন্তু যেখানে মূল আমাদের চাতুর্যের কাছে নেই, সেখানে অল্পবাক্যটি অমূল্য হয়েছে কিনা তার অনুমান করাও ত বার। বলবেন, সে আবার কি? তার উত্তরে বলি, চীনের সাহিত্য ও ভাষা, জাপানের সাহিত্য ও ভাষা, তামিল সাহিত্য ও ভাষা আমাদের কাছে অচিনপূরের। কিন্তু অচিনপূরের কাব্য এসে অল্পবাক্যের সোনার কাঠির মাধ্যমে যদি আমাদের অজ্ঞান অবস্থার ঘোর কাঠিরে দেয়, তাহলে তাকে আমরা বরণ করে নেব না আমাদের চিত্তক্ষেত্রে? ধরুন অচিন চীনের কবিতা। সত্যোক্তনামের নিম্নোক্ত কবিতাংশটি—

আমার আঁধার ঘরে
রাতে এসেছিল হাফা বাতাস
কান্টনী লীলা ভরে।

কোথায় চম্পাপুর।
কোথা আমি, হায়, তুমি বা কোথায়,—
শতকধ বোজন দূর।
মাঝে ব্যবধান গিরি নদী প্রায়
পথে বাধা শত শত।
নুগ্ন হৃদয়ানি ছুঁয়ে এছ তবু,—
চকিতে হাওয়ার মত।

—(বাসন্তী স্বপ্ন : ৭ সেন ৭ সান)

অথবা—

পাখীর আকৃতি আমিও জেনেছি কিছু,
পিঙ্কনে তবু আহি করি মাথা নীচু।

—(ব্রোডে : লি, পো)

চমৎকার নয় কি? রোমান্টিক মনের স্বপ্নাভিসারজনিত আনন্দ, স্বপ্নাভিসারী মূর্খ পিপাসু মনের বাস্তব-বন্ধনজনিত হতাশা দুইটির ক'ল ধরা পড়েছে উদ্ভূত হুটি অংশে। আবার নববর্ষের আশা ও আশঙ্কা নিম্নোক্ত জাপানী কাব্যোচ্ছবাসের মধ্যে কি ধরা পড়ে নি?

ঘরে দেবদাক মাথা,—
চিহ্ন অচিন পথে;
কারো তরে ফুল ঢাকা,
কারো—ভিত্তে অজ্ঞতে।

—(নববর্ষ : ই হু হু)

নীচের পক্ষেই পড়েছেন তামিল হ'তে অনুরূপ "বুদ ভালা"। নীচে উদ্ধৃত 'ল' একটি ভেদেস্ত ছড়ার সত্যোক্তকৃত অল্পবাক্য—

"খোকারদি মায়ের গলাব মাছলি।
খোকারদির খোঁটি হ'ল কুঁহলি।
কুঁহলিক খোকা সাহেব কোনে দিলেন চেনে,
কুঁহলিকদিগের পেনে খোকারপলি কল।"

বির্বির্বি উপর নিচের পংক্তিগুলি দেখুন—

ভরে বিঁ বিঁ। এতটুকুন বিঁ বিঁ,
আনমনে কি বকিসু হিঁজিবিজি?
কেমন করে হ'লি এমন কালো?
মুখ কোটনা থাকতে দিনের আলো?
সন্ধ্যা হ'লে মিলে চাঁদের সাথে
দিন মজুরের গান কিসে গাঁস রাতে?

হেলোমাস্তুরের মন, হেলোমাস্তুরের কৌতুহল কি চমৎকার ভাবেই না ধরা পড়েছে? শেষের কবিতাটি করণী কবিতার সরাসরি অল্পবাক্য কি মিত্রালের ইংরাজি অল্পবাক্যের বাংলা অল্পবাক্য তা আমার জানা নেই, তবে অল্পবাক্য যে ভাল হয়েছে সে কথা কি অস্বীকার করা যায়?

আপনারা বলবেন, ধান ভানতে শিবের গীত কেন? কথা ছিল সত্যোক্তনামের অল্পবাক্যে ইংরাজি কবিতা কি রকম কাঁড়িয়েছে তারই বিচার করবার, কিন্তু সে-আলোচনা কোথায়? উত্তরে বলব, আমি ধানও ভানছিলাম শিবের গীতও করছিলাম। আমি আপনার কাছ থেকে এতক্ষণ সত্যোক্তনামের "হাতে (ইংরাজি হ'তে) অল্পবাক্য কি রকম হয়েছে তারই অচেতন মনের স্বীকৃতি আদায় করছিলাম। উপরে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে তার মূল হ'ল চীনা, জাপানী, তেলুগু এবং কন্নড়ী ভাষায়। এর একমাত্র শেষের ভাষাটি ছাড়া অন্ত ভাষাগুলি সত্যোক্তনাম জানতেন না এবং অনুমান করা যেতে পারে অল্পবাক্য কার্যে তাকে ইংরাজি অল্পবাক্যের সাহায্য নিতেই হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি বা অল্পবাক্য করছেন বলে আলোচনা করছিলাম, তা ইংরাজি হ'তেই করেছেন, এক উদ্ভৃতিগুলি বিচার করে সাহিত্যিক মূল্য যে এগুলির কম তা আপা করি কোনও বিবন্ধ পাঠক বলবেন না। কাব্যসম্প্রদায়ের নিচের কবিতাটি অনেকবার আপনারা পড়েছেন—

প্রণাম শত কোটি—

ঠাকুর! যে খোকাটি

পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে,

সকলি ভাল তার

কেবল—কাঁদে, আর

কীত তো দাঁও নাই তাকে!

পারে না খেতে, তাই

আমার ছোট ভাই

পাঠিয়ে দিও কীত, বাপু।

জানাতো এ কথাটি

লিখিতে হ'ল চিঠি।

ইতি। শ্রীবড়খোকাবাবু।

বড় খোকাবাবুর এই চিঠিটি বরংকরে চমৎকার হয়েছে। (আমেরিকান) ইংরাজি ভাষা হ'তে সরাসরি এ-অল্পবাক্য অল্পকৃতির মালিত্ব হ'তে বৃত্ত হয়ে রসকচিরা কবিতা হ'তে দেখা দিয়েছে।

অভিব্যোগ হ'তে পারে এতক্ষণ যে অল্পবাক্যগুলি নিয়ে আলোচনা করা সেল তা ইংরাজি সাহিত্যের বাইরের জিনিষ বা ধার করা জিনিষ। ইংরাজি সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ করে তার মূল পংক্তিগুলির কাণ্ডার এ অল্পবাক্যগুলির মধ্যে নেই। শুধুমাত্র ইংরাজি

হ'তে সত্যেন্দ্রনাথের অম্ববাদ বিচারে সে দিকে প্রবলেই মগন হওয়া উচিত ছিল। ঠিকই তা। ইংরাজি সাহিত্যের সজ্জা ধীরে সজ্জা নিকট তাঁরা শ্রেষ্ঠ ইংরাজি কবিতার, বহু পঠিত ইংরাজি কবিতার সাহায্যে সত্যেন্দ্রনাথের অম্ববাদের মূল্যায়ন করবেন। এদিক হ'তে সত্যেন্দ্রনাথ যদি তাঁদের বিব্রত, বিরক্ত, হতাশ করেন তাহলে সত্যেন্দ্রনাথকে ইংরাজি কবিতার সঠিক অম্ববাদক কি ক'রে বলা যায়। সত্যই তা সেন্সপীয়ার-এর "এ্যাক ইউ লাইক ইউ"-এর "জাওয়ার দি ব্রীন উড ট্রি"র গান আর সত্যেন্দ্রনাথের—

সবুজ বনের সবুজ ছায়
আর গো কে তোরা মেলিবি কার,
পাখীর কণ্ঠে মিলায়ে তান,
পাহিবি মধুর মধুর গান,
আর গো হেথা, আর গো হেথা, অমর।
এখানে নাই
কোনো বালাই

তুধু শীত তুধু শীতের বার।

—(বনজায়ায় : সত্যেন্দ্রনাথ)

নিঃসন্দেহে পাশাপাশি পড়া যায়না। কীটসের *La Belle Dame Sans Merri*র অম্ববাদ অপাঠ্য। ইংরাজি সাহিত্যের বসিক পাঠ্যক ব্রাউনিংয়ের কবিতার অম্ববাদে (বঙ্গভাষী) আচমকা আঘাত থাকেন যখন দেখবেন সত্যেন্দ্রনাথ স্তব্ব করেছেন এই ভাবে—
"চলেছিল অচিন পাখী এই ডালের এই কঁকড়িতে"।
বিরক্ত ভাবে, বিব্রতভাবে এক বিরাগভরে তাঁরা মরণ করবেন হয়ত "এসেছিল বকনা গরু পর-গোয়ালে জাবনা খেতে"। ইংরাজি ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যামৃতাস্বাদের প্রচেষ্টা এবিধি অনবিকার চর্চা। কিন্তু অন্তরিক হ'তে বিচার করুন সত্যেন্দ্রনাথকে। ইংরাজি অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতার ব্যর্থ অম্ববাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ এ কথা সত্য। আবার এও সত্য যে ইংরাজি হ'তে সত্যেন্দ্রনাথের অসংখ্য অম্ববাদও আছে বা মূল্যায়ন হয়েছে, হৃদয় হয়েছে অর্থাৎ এককথায় অমূল্য অম্ববাদ হয়েছে। মূল ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতা অবলম্বনে বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে, অনুদিত শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে মূল্যায়ন সজ্জা বিচার ক'রে মূল্যায়ন করলেই, সত্যেন্দ্রনাথের অম্ববাদ-কৃতিত্ব সজ্জা আমাদের সন্দেহের নিরাসন হবে।

কীটস-এর *Happy Insensibility*র কয়েকটি পঙ্ক্তি মরণ করুন—

In a drear-nighted December,
Too happy, happy tree,
Thy branches ne'er remember
Their green felicity :

—Happy Insensibility : Keats

এর পাশে স্থাপন করুন সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পঙ্ক্তিগুলি—

"হুশ দরবরী মায়ে
বড় হুশী তরলতা ;
পাশে আর নাহি আসে
জ্বলন পোড়ায় কথা।"

শেলীর পঙ্ক্তিগুলি দেখুন—

Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory—
Odours, when sweet violets sicken
Live within the sense they quicken.
Rose leaves, when the rose is dead
Are heaped for the beloveds' bed ;
And so thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on.

সত্যেন্দ্রনাথের 'স্মৃতি' এর পাশে স্থাপন করুন :—

অন্তরে কাঁদিয়া কিবে মোহমর তান,
খেমে গেলে গান।
বকুল তুকারে গেলে,—তবু তাঁর আশ
হুক করে প্রাণ।
গোলাপ খরিলে তার পাণড়ি বিছার
প্রিয়ার শয্যায় ;
ছুরি গেলে ভালবাসা পড়িবে ঘুয়ায়ে
স্মৃতিটি জড়ায়।

শেলীর 'স্মৃতি' হ'তে উদ্ধৃত নিম্নের পঙ্ক্তিগুলি ও অনুদিত পঙ্ক্তিগুলি দেখুন।

Like a rose embower'd
In its own green leaves,
By warm winds deflower'd,
Till the scent it gives
Makes faint with too much sweet those heavy-
winged thieves.
Sound of vernal showers
On the twinkling grass,
Rain-awakened flowers,
All that over was
Joyous, and clear, and fresh, thy music doth
surpass.

We look before and after
And pine for what is not :
Our sincerest laughter
With some pain is fraught ;
Our sweetest songs are those that tell of
saddest thought.
—To A Skylark : Shelley

সত্যেন্দ্রনাথের অম্ববাদে (চাতকের প্রতি)—

পুষ্পপত্র কুসুম ভিতরে
গোলাপের নত নিয়গন ;
বতকণ পদ না বিতরে,—
তবু বাহু করে আলিঙ্গন ;
শেবে সেই দাঁড়তনি ভাবে ক্লান্ত পদ হৃদয় পদন।

বসন্তের বর্ষপের হল
কম্পন ঢকল তুপপরে,—
বর্ষণ জাগ্রত কুলে সব,—
বস্তু নুব নিখিলে বিহরে,—
ফ্রেমহীন, উজ্জ্বলে নবীন—তব স্মরে জিনে সকলোরে।

আগে পাছে চাহি চারিভিত্তে
কামনা—কোথাও বাহা নাই;
আমাদের প্রাণের হাসিতে
মিশে আছে বেদনা সমাই;
সবচের 'হুমবুর গান—সব চেয়ে চখের কথাই।

সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলন সঙ্কেত' শিল্পীর "Lines to an Indian Air" এর সার্থক অনুবাদ। বিশেষ ক'রে নিচের পঙ্ক্তি দুটি—

নিখর নিবিক্ত কালো নদীর 'পরে
চলিতে চলিতে বায়ু মুখি পড়ে,—

আর Shelleyর

The wandering airs, they faint
On the dark, the silent stream—

পাশাপাশি দেখুন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের "The Reverie of poor Susan" এবং সত্যেন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ "সিরা বধ" সবচেয়ে আলোচনা আনি অতঃ (শায়রীর মধুরাংক, ১৩৩৬) করেছি। এখানে তার দুটি পঙ্ক্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

Green pastures she views in the midst of the dale
Down which she so often has tripped with
her pail,

সত্যেন্দ্রনাথ কি স্মরণ হয়েই না ধরা দিয়েছে—

সবুজ পোড়ের ছবি, তাহার পাহাড় দুটি ধারে,
সে পথ দিয়ে গেছে কত কলসী নিয়ে ভ'রে।

সমকালীন আর একজন কবির বহুপঠিত কবিতার (T. Hoodএর The Bridge of Sighs) উক্তৃতালের অনুবাদ-কৃতিত্ব বিচার করুন। সত্যেন্দ্রনাথের "আত্মব্যাধিনী" আর তার মূল পাশাপাশি দেখুন—

আরেক হুস্তাশিনী
গেতে কদম্ব থেকে,
জীক্স হাডনা হানি
হুস্তা নিয়েছে ভেকে।
ধব গো আভে ধব
সাকবানে ভোল বাহা
হুস্তাশিনী হুম্ব
করল নেহাং কীর।

One more unfortunate
Weary of breath
Rashly importunate
Gone to her death!
Take her up tenderly,
Lift her with care;
Fashioned so slenderly,
Young and so fair!

ভীষণ চাহিয়া আছে
হুস্তা হস্তাশিনী
ভবিষ্যতের পানে
যেন সে দৃষ্টি কানে
প্রানির হাকারে থাকি।

দুটি হাত বীরে বীরে
হাথ গো বুকের পরে
মরণ নদীর তীরে
যেন ঈশ্বরের মেরে।

Dreadfully staring
Thro' muddy impurity
As when with the daring
Last look of despairing
Fix'd on futurity.

Cross her hands humbly,
As if praying dumbly,
Over her breast.

কবিতাটির মূল অপেক্ষা উক্তৃত অংশের অনুবাদ আবার কাছে স্মরণ বলে মনে হয়। মূলের থেকে ভাল হয়েছে বললে যদি অপরাধ হয়, মূলের থেকে খারাপ হয়নি অনুবাদ একথা নিশ্চয়ই অপবাদ দেবেন না। [এ কথা মনে পড়ে গেল মেঘনাদবধ কাব্যের হিন্দী অনুবাদ প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর হিন্দীবিভাগের একজন কর্মচারী-শ্রমীর আচার্য্যকে। তিনি বলেছিলেন, "হিন্দী আমি মূল মেঘনাদবধ পড়িনি, তবু আমার মনে হয়, মেঘনাদ বধের অনুবাদ মূল অপেক্ষা ভাল হয়েছে।" এ ধরনের না-পড়ে তুলনা-মূলক বিচার বে দারিদ্র্যলীল লোকেরা কখনও কখনও আরও না করেছেন ভা নয়।] মূল কবিতাটি কোনও গভীর করুণরস বহি করে না, জাগরণ করুণা। এই করুণা-জাগরণের কাজে সত্যেন্দ্রনাথের ভাবা ও মূল আত্মব্যাধিনক সাক্ষ্য অর্জন করেছে বলে আমার মনে হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের হাতে রাউনিং কি ভাবে বিশগম্য হয়েছেন তার উদাহরণ পূর্বেই দিয়েছি। আবার সত্যেন্দ্রনাথ বে রাউনিংয়ের ভাল অনুবাদও করেছেন তার প্রমাণ হাতের কাছের "কাব্যসংকলন"-এই আছে। রবার্ট রাউনিংয়ের "Summum Bonum" ও "সংসারের সার" পাশাপাশি রেখে বিচার করুন। নিঃসন্দেহে কবিতাটি একটি সার্থক অনুবাদ বলে আপনাতা সিদ্ধান্ত করবেন।

সত্যেন্দ্রনাথের হাতে টেনিসনের কোনও ভাল কবিতা অনূদিত হয়নি। একটি অনুবাদ কাব্যসংকলনে দেখছি, কিন্তু টেনিসনের কোন কবিতার অনুবাদ বে "গোপিকার গান" তা এখনও বুঝতে পারিনি। টেনিসনের অসীম কোনও নাটকের গানের অনুবাদ নাকি এটি? কিন্তু টেনিসনকে বাস গিলেও খুইনবার্ণকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদের ক্ষেত্রে।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসংকলনে হান পেয়েছে "জিন্নোকা" খুইনবার্ণ হ'তে একটিমাত্র অনুবাদ। অনুবাদটি উত্তমযোগ্য নানা কারণে—

জিন্নোকা

অসীম ব্যোমেরে হুস্তা কি কথা বলে?
সাকর কি কথা বলে গো হাডনার কাজে?
কৌন কথা ঠাণ বলে হুপি হাডিরে?
কৌন-জন ভায়া জালে

পোঠ পোথেনে কি করে গানের হলে ?
কোন সুরে মধু বোঝাই টেনে আরো ?
অভল কি গান ভনায় হিমালয়ে ?

কে জানে এ ভিন গানে ?

কান্ডন বেই লিপি লেখে চৈত্রেয়ে,
বৈশাখ বাহা পড়ে গো আখর চিনে,
জ্যৈষ্ঠে দিয়ে বার বে লিখন শেষে,
ভাহার ভগ্নগিলে ।

Triads : A. C. Swinburne.

The word of the Sun to the sky
The word of the wind to the sea,
The word of the moon to the night
What may it be ?

The song of the fields to the sky,
The song of the lime to the bee,
The song of the depth to the height,
Who knows all these ?

The message of April to May
That May sends on into June
And June gives out to July
For birthday boon ;

মূল কবিতা হ'তে পরিবর্তন অল্পবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল বলে April, May, June কে চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে রূপান্তরিত করে কবি উচিত্য বোধের পরিচয় দিয়েছেন। এ-জাতীয় পরিবর্তন সত্যোক্ত্যের অস্তিত্বও করেছেন, যেমন "দিবাবস" এ Pail হলে "কলসী"। অস্তিত্ব violet হলে "বকুল"। অস্ত ভাষা হ'তে অল্পবাদেও এ ধরনের পরিবর্তন করেছেন কবি (এ প্রসঙ্গে আমার "অমর অল্পবাদক সত্যোক্ত্য" গ্রন্থে)।

সুইনবার্ণ-এর আর একটি কবিতার অল্পবাদ কাব্যসংকরন-এ স্থান পায়নি, কিন্তু এ কবিতাটি পূর্বের অল্পবাদের চেয়ে মূল্যবান ও মূল্যবান বলে আমার মনে হয়। ("কাব্য সংকরন"-এ সত্যোক্ত্যনাথের অনেক ভাল কবিতার মূল ব্যর্থ কবিতা অধিকার করেছে বলে আমার মনে হয়। অর্থাৎ সংকলিতভাবে বরফটি বিষয়ে কিছুটা সশর জ্ঞানে প্রবৃত্তি প্রবর্তিত ও সংকলিত করেকটি কবিতা দেখে।) অল্পবাদ ও মূল কবিতাটি পরে উদ্ধার করা হ'ল।

সত্যোক্ত্য পূর্বক

জগো। দিনের নাশাল ভূঁয়ে,
আর সন্ধ্যার এই পাথে,
কিছু বহিরা পাঠিয়ে ছুঁয়ে
আঁখি ভূঁয়ে বার একবারে ;
হার্য মোলায়েম আলো বৃহ
পড়ে পথে বাটে হয়ে হয়ে :—
যদি হৃদয়ে গেছে যে সীত,
বালক যে মূল দিয়েছে ধরে ।

এই দিক্ত নিমেষভঙ্গি
সে কি বুঝাই বহিরা বাথে ?
মরণ আছে যে মরণ ভুলি
শেষে প্রেমের অশ্রু পাথে ?
ভবে কুলেরা দেখুক, অরি ।
এই ভরা প্রেম নিমেষের,
ভগো ভালবাসা হ'ক অরী
আজ মরণের পরে কের ।

মূল কবিতাটি :—

Before Sunset : A. C. Swinburne

In the lower lands of day
On the hither side of night,
There is nothing that will stay,
There are all things soft to sight ;
Lighted shade and shadowy light
In the wayside and the way,
Hours the Sun has spared to smite,
Flowers the rain has left to play.

Shall these hours run down and say
No good things of thee and me ?
Time that made us and will slay
Laughs at love in me and thee ;
But if here the flowers may see
One whole hour of amorous breath.
Time shall die, and love shall be
Lord as time was over death.

—Before Sunset : A. C. Swinburne

চমৎকার অল্পবাদ !

অথচ এটি বাদ দিয়েছে "কাব্য সংকরন"-এর ।

সত্যোক্ত্যনাথের আর একটি কবিতার অল্পবাদে সুইনবার্ণের নাম না থাকলেও কবিতাটি সুইনবার্ণ হ'তে অল্পবিত বলে আমার মনে হয়। আমি যে কবিতাটির কথা বলছি তাহ'ল "কাব্য সংকরন"-বৃত্ত "সাগরে প্রেম" কবিতাটি। এটি কবি "ভেরোকিল গভিয়ে" হ'তে অল্পবাদ করেছেন বলে উল্লিখিত। গভিয়ের এই কবিতাটি কবিতার মূল আমার পড়া নেই, তবে এই মূল কবিতাটির অনুকরণে সেই সুইনবার্ণ Love at Sea নামে যে চমৎকার কবিতাটি লিখেছেন, সত্যোক্ত্যনাথের কবিতাটি তারই অল্পবাদ হ'তে পারে, অথচ এটি আমার এখন পর্যন্ত অল্পবাদ। যদি ইতোমধ্যে মূল কবিতাটি কবিতাটি আমি হাতের কাছে পেয়ে বাই তাহ'লে এ-বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত উপনীত হ'ত পারব। আমার নীচে প্রথমে "সুইনবার্ণের" কবিতা Love at Sea এবং পরে সত্যোক্ত্যনাথের "সাগরে প্রেম" কবিতা উদ্ধার করছি।

Love at Sea

We are in love's land to-day ;
Where shall we go ?

Love, shall we start or stay,
Or sail or row ?
There's many a wind and way,
And never a May but May ;
We are in love's hand to-day ;
Where shall we go ?
Our landwind is the breath
Of sorrows kissed to death
And joys that were ;
Our ballast is a rose ;
Our way lies where God knows
And love knows where.
We are in love's hand to-day—
Our seamen are fledged loves
Our masts are bills of doves
Our docks fine gold ;
Our ropes are dead maids' hair,
Our stores are love-shafts fair,
And manifold.
We are in love's land to-day—
Where shall we land you, sweet ?
On fields of strange men's feet
Or fields near home ?
Or where the fire-flowers blow,
Or where the flowers of snow
Or flowers of foam ?
We are in love's hand to-day—
Land me, she says, where love
Shows but one shaft, one dove,
One heart, one hand,
A shore like that, my dear,
Lies where no man will steer,
No maiden land.

—Love at Sen : Swinburne
(Imitated from Theophile Gautier)

স্মারক প্রেম : সত্যেন্দ্রনাথ

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে
বল, এখন কোথায় বাব আর ?
থাকবে হেথা ?—যেতে কোথাও হবে ?
পাল ভুলে দিই ?—যদি তবে দাঁক ?
নানান দিকে বহে নানান বার,
কাজল চিরদিনই কাজল হার,
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা হার
এখন বল, কোথায় বাব আর ?

চুনিম চাপে যে দুখ পেছে বরি,—
অন্ত অথের শেষ নিশাসে ভরি,—
এসাদি পবন মোদের হবে সে।
ফুলে বোঝাই হবে নৌকাখান,
পদ্ম মোদের জানেন ভগবান,
আর জানে সেই কুহুম-ধ্বজ যে।
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হার
এখন বল, বাব আর কোথায় ?
দাক্ষি মোদের প্রণব গাথা বত,
কাজে দু'টি কপোত প্রণয় ব্রত,
সোনার পাটা, সোনার হৃদয় ভই,
রশ্মিরাশি বসিক জনের হাসি,
নয়ন কোণে হবে রসম্ রশ্মি,
রসম্ হবে অধর প্রান্তে সুই।
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হার।
এখন বল, বাব আর কোথায় ?
কোথায় শেষে নামাব, বল, তোর,—
বিশেষী সব বেষায় নিতি যোর ?
কিছা মাঠের শেষে গায়ের ঘাটে ?—
বেদেশে ফুল কোটে অনল মায়ে ?
কিছা বেথার তুবর বৃকে সাজে ?
কিছা জলের কেনার সাথে কাটে ?
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হার।
এখন বল,—বাব আর কোথায় ?
কর সে হীয়ে, "নামিহো মোরে সেখা,
প্রেমের পাখী একটি মাত্র বেথা,—
একটি শব, একটি মাত্র হিয়া।"
তখন পুরী বেথায় আছে, হার,
নবের ভরা বায় না গো সেথায় ;
নারী সেথায় নামতে নাবে, প্রিয়া।

কবি "dead maids hair" এর ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটয়েছেন।
সেটিকে অল্পবয়সের ক্ষেত্রে গ্রহণ করলে এক কবিতাটির সাহিত্যিক
বৃত্ত্য বিচারে শেষের দুটি শব্দক বাদ দিলে অনুদিত কবিতাটি
চমৎকার বলে মনে হয় না কি ?

এতক্ষণ ইংরাজি সাহিত্যের সেরা সাহিত্যিকদের রচনা অবলম্বন
ক'রে অর্থাৎ শেলী, কীটস, ডার্বিনসওয়ার্থ, ব্রাউনিং, আইনবার্ণ প্রভৃ
কবির কবিতাংশ অবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথের অল্পবয়স-সাক্ষ্য সত্যে
আলোচনা করলাম।

সর্ব প্রথমে আলোচনা করছিলাম, ইংরাজিতে অনুদিত অল্প
ভাষার কবিতার সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত ভাষান্তরনের দৃষ্টান্ত।

এবার আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন
মনে করি। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে পরিণত মনের পাশেই শান্তিপূর্ণ
সহ-অবস্থিতি করেছে শিশুমন। একদিকে তিনি বিশেষী সাহিত্য
হ'তে রসের সারঞ্জী এনেছেন, অন্যদিকে তিনি বিশেষী সাহিত্যের
দিকে দুটো দিরেক্ট লাইন কোঁচুলে দল। সেখানে তাঁর মন

রচনার রসবিচার করেন। শিল্প রচনা যেমন অপরিচিতের সঙ্গে
জানাবা মিলনের ক্ষেত্রে মনোপাঠ করে—

রসনাকে রসিয়েছ এর বেশী মানে
আর কে তা জানে ?

সত্যোক্তনাথের বিষয়-প্রবণ মন বেগমের উত্তেজনার খোরাক
পেয়েছে সেদিকেই বাত্মা করেছে। অর্থাৎ রসিকের রসবিচার আর
শিবির বিশ্ব-বিস্ময়, দুই তাঁর মনকে অভিভূত করেছিল। ইংরাজি
সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-মন বাত্মা করেছে সে কেবল রস-বিচারকে
লক্ষ্য করেনি, বিষয়কেও সঙ্গী করেছে। আর তাই ত তিনি দেখেন
সেদের ইংরাজি কবিতার, ওয়ারেন-হেস্টিসের কবিতার (সংস্কৃত ?
“বন্দ্যোত্তরম” এর বঙ্গাভূতবাদ) বাংলাতে অনুবাদ করেছেন। বাংলার
বিখ্যাত কবি দেখেন সেন মল্লিকের ইংরাজিতে কবিতা লিখেছিলেন। সে
সংবাদের উত্তেজনার বিষয়-বশে অনুবাদ করেছেন সত্যোক্তনাথ,
বিচার-বশে নয়। কঠোর শাসক ওয়ারেন হেস্টিসের কবিতাও
অনেকের কাছে news, নিয়ের বঙ্গাভূতবাদে তার স্বেচ্ছা পরিবেশন
করেছেন কবি, রসবিচার করেন নি—

কৌজলাব : ওয়ারেন হেস্টিস

বিবস্ত্র বিবস্ত্র কৌজলাব

আরামের আরাধনা করে,

দুঃস্থ গরম হবে আর

কাছারিতে লোক নাহি ধরে।

এই বিষয়ই তাঁকে নিয়ে গেছে বিদেশী ভাষায় বাংলালীর লেখা
কবিতার দিকে। নিয়ে গেছে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ইংরাজী
রচনার দিকে, তরুণতর কবিতার দিকে। কবিতা কবিতা
নিয়ে এখানে আলোচনা করব না। শ্রীঅরবিন্দ-এর কবিতার
দিকে সত্যোক্তনাথের বিম্বিত মন বাত্মা করলেও, বিচারনিষ্ঠ মন
তার অনুগামী হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের কবিতা, কবিতাই, এবং
একজনে সত্যোক্তনাথ উপেক্ষিত ইংরাজি কবি শ্রীঅরবিন্দের স্মরণ
কবিতার অপূর্ণ অনুবাদ করেছেন। “সাগরের প্রতি” কবিতাটি
কাব্যসঙ্করনে স্থান পায়নি। তার কয়েকটি পংক্তি দেখুন :—

যে পিঙ্গল মত্ত পারাবার

মোর তরে মত্তভাবী তুমি এনেছ এনেছ সমাচার।

বিপুল বিস্তৃত পৃষ্ঠ তুলি

চলেছে তরঙ্গ-ভঙ্গ তব ; মাঝে মাঝে ক্রোড় সজ্জ্বলি

অতল পাতাল-গুহা প্রায়,

তারি পরে অশ্রুত স্বপ্ন তরী চলে স্পন্দিত পাখার।

তুনি আমি গর্জন তোমার,—

কহ তুমি, “তীরে বসি বিলস করিছ কেন মিছে আর ?..”

হে সরু হরত কেশরী

তোমারে জানিব নিজ বশে হেলার কেশরগুচ্ছ ধরি ;

নহে তুবে বাব একবারে,

লবণাত্র গভীর গহ্বরে অন্ধকার অতল পাখারে।

—সাগরের প্রতি : সত্যোক্তনাথ

মূল কবিতার আদর্শ পংক্তিগুলি দেখুন—

O grey wild sea

Thou hast a message, thunderer for me

Their huge wide backs
Thy monstrous billows raise, abysmal cracks
Dug deep between.
One pale boat flutters over them, hardly seen
I hear thy roar
Call me, “Why dost thou linger on the shore

I will seize thy mane,
O lion, I will tame thee and disdain
Or else bellow
Into thy salt abysmal caverns go....

—To the Sea : Aurobindo Ghose

শ্রীঅরবিন্দের আর একটি কবিতার খুব চমৎকার অনুবাদ করেছেন
সত্যোক্তনাথ। কবিতাটি হল ‘কাব্যসঙ্করন’-রূপে বহিঃস্থ। এ-
সবধে আলোচনা আমি অন্তর্য করছি। এখানে কেবল মূল ও
তার অনুবাদ হ’তে কয়েকটি অক্ষর পাক্তি উপহার দিয়ে আলোচনা
দেব করব। সত্যোক্তনাথের নিয়োক্ত পংক্তিগুলি কি স্মরণ—

“মায়াবী সে মজ্জ্বাক ! গন্ধরাজ চম্পার সৌরভ

ছত্রো ছত্রো উড়িয়েছে ; ছত্রো ছত্রো হয় অজুতব

রমণীয়া রমণীর ককণের সুরম্য বন্ধার ;

হে বজ্রের জলজ্বল ! হে চির স্মরণ ! সুশোভন !

মধুর তোমরা হবে ; মধুর দক্ষিণ পবন—

বজ্রের নিকুঞ্জবনে,—শিক কণ্ঠে আছে মধু জ্বলি,

তা হ’তে অধিক মধু মজ্জ্বাক বহিঃস্থের বণী।

এর পাশে মূল হ’তে আদর্শ পংক্তিগুলি দেখুন—

O master of delicious words ! The bloom
Of Champuk and the breath of King-perfume
Have made each musical sentence with the noise
Of women’s ornaments....

O plains, O hills, O rivers of sweet Bengal,
O land of love and flowers the spring-birds call
And southern wind are sweet among your trees
Your poet’s words are sweeter far than these.

—Bankim Chandra Chatterji : Sri Aurobinda

সত্যোক্তনাথের অনেক অনুবাদই লক্ষ্য অনুবাদ নয়, লক্ষ্য অনুবাদ।
এই অনুবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সত্যোক্তনাথকে লিখেছিলেন :—

‘অনুবাদ পড়িয়া বিম্বিত হইয়াছি। কবিতাগুলি এমন সূক্ষ্ম
ও সরস হইয়াছে যে..অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। সুন্দর হলে
কোনো মতেই অনুবাদে ঠিকমত সফল করা যায় না। কিন্তু
তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃত্তবরণ আশ্রয় করিয়া বাকীর
বসনোপযোগ্য সুচিত্রা উঠিয়াছে—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ
মৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং মূল কাব্য।’

সত্যোক্তনাথ একই কালে অসামান্য অনুবাদক ও কবি।



অনেক বড়-বড়
শ্রীমদ্রামায়ণ

অনিন্দিত হৃদয়

১৮

শেখুলি লয়ে নিমাইয়ের বিয়ে।

বরুন্দেরা এসে তাকে সাজাতে লাগল। তার আগে এরোরা তাকে স্নান করিয়ে দিয়েছে। সর্বাঙ্গ মার্জনা করে মাথিয়ে দিয়েছে হলুদ আর আমলকি। গৌরাল-অঙ্গ সাজিত করতে গিয়ে নিজেরা সাজিত হয়েছে। গৌরাল-অঙ্গ নির্মল করতে গিয়ে নিজেরা নিম্ন লীকৃত।

গলাটে অর্ধচন্দ্রাকৃত চন্দনের কোঁটা, মধ্যস্থলে কুমুদনের তিলক। নয়নে কাজল, ঐ অঙ্গে সুগন্ধের প্রলেপ। বাহুতে রত্নবাজ, ঐতিমূলে সোনার কুণ্ডল। গলার কুলের মালার সঙ্গে মতির মালা। ত্রিকচ্ছ করে পুষ্প পীতবস্ত্র পরা, মাথায় মুকুট, ধান চুর্বা দিয়ে হাত বঁধা, সেই হাতে দর্পণ। গায়ে পট্ট চাদর।

ব্রাহ্মণ করতে লাগল বেদকনি, ভাট পড়তে লাগল রায়বান। বুদ্ধিমত্তা দোলা সাজিয়ে নিয়ে এল। সজ্জিই বুদ্ধিমত্তা। কমলার সঙ্গে নারায়ণের বিয়েতে তার সমস্ত ধন নিয়োগ করল। 'কনকের দ্বারা করি বাধকের সেবা।' ছোপাড়া করে আনল নানা হাঁদের নানা শব্দের বাতভাণ্ড। শব্দ বংশী করতাল যুদ্ধ মাদল তো আছেই, সঙ্গে পট্ট দগড় শিলা—জয়ঢাক, বীরঢাক। নাচ-কাচের লোক, নর্ডক আর বিদূষকও জমেছে অনেক। বাজী পুড়ছে। দীপ জ্বলছে হাজার হাজার।

মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে গৌরহরি দোলায় এসে উঠল। আগে পদাভীরে চলো। পদাপ্রণাম সেরে সর্ব নমস্কার করে পরে কড়াঘরে উপস্থিত হব। পদাভিকেরা হুই গারি হও। হুসে নাও নানাধর্মের পতাকা।

‘অনেক বড়-বড় বিয়ে দেখেছি, এমনটি আর হয় না।’ বললে জনে-জনে। আবার তারাই ব্যাখ্যা করলে : এ কি মাহুকের বিয়ে? মাহুকের মূর্তি?

‘ঈশ্বরের মূর্তি দেখি যত নরনারী।

মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা পাসরি।

লক্ষ লক্ষ শিশু বাতভাণ্ডের ভিতরে।

রঙ্গে নাচি যায়, দেখি হাসেন ঈশ্বরে।’

এই সেই বৃন্দাবনের ‘অপ্রাকৃত নবীন মদন।’ শত গেলেও যাকে আরো-আরো পেতে ইচ্ছে করে, শত স্বাদনেও যার সাধন ফুরায় না কোনো দিন। ‘এ মাধুর্যময় পাম সগা যেই করে, তৃষ্ণা শাস্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।’ প্রাণির কামনাকে প্রতি মুহূর্তে যে নতুন করে, প্রতি মুহূর্তে যে নতুন উদ্দামতা দেয় শক্তিতে, আর প্রতি মুহূর্তে চিন্তে আনে নতুন উদ্বুদ্ধতা, সেই তো চিন্ময় কামদেব। সাক্ষাৎ মন্থথমন্থ। ব্রজাঙ্গনার কাছে নটবর নবকিশোর, মাধুর্যধনবিগ্রহ। মহাভাববতী রাধিকার মধ্যে প্রেমের সর্বাভিশারী বিকাশ, সেই কারণে মাধুর্যের সর্বাভিশারী বিকাশ মহাভাবময় ঐক্যকে। তাই ঐক্যক অপ্রাকৃত নবীন মদন।

শুধু পুরুষ যৌবন নয়, স্থাবর জন্ম নয়, সেই সর্বচিন্তাকর্ষককে দেখে স্বয়ং মদন বিমোহিত। শিশু মদনমহন, কিন্তু কৃষ্ণ মদনমোহন। ‘রাধাসঙ্গে বলা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।’ শৃঙ্গার বা মধুরসই সমস্ত রসের রাজা, তাই শৃঙ্গারের আরেক নাম রসরাজ। রসরাজময় যে মূর্তি তাই ঐক্যক। সক্তিদানন্দতত্ত্ব। সর্বচিন্তা তো বটেই, অস্বচ্ছিত্ত পর্বত মুগ্ধ করে বলে আছে। - ‘আম্ব পর্বত সর্বচিন্তনঃ।’

বৈকুণ্ঠের নারায়ণ আর লক্ষ্মীও কৃষ্ণভিক্ষু। দুজনের কাছেই কৃষ্ণ মধুমস্তম।

কৃষ্ণরূপে লুক হয়ে ধৃতব্রত হয়ে লক্ষ্মী তপস্কার বসল।

কৃষ্ণ জিগপেস করলে, এ তপস্কার তেতু কী?

লক্ষ্মী বললে, গোপী হয়ে গোষ্ঠে বিহার করব, এই আমার বাসনা। সেই বাসনার পূর্তির জ্যেই এই তপস্কা।

কৃষ্ণ বললে, এ তুলভ, এ তোমার হবার নয়।

তাহলে এক কাজ করো। বললে লক্ষ্মী, তোমার বৃকে সোনার রেখা করে আমাকে রেখে দাও।

কৃষ্ণ বললে, তাই হোক।

সেই থেকে লক্ষ্মী স্বর্ণরেখারূপে কৃষ্ণবন্ধে বিরাজিতা।

দ্বারবর্তীতে এক ব্রাহ্মণ ছিল, তার নয় পুত্র মারা গেল পর-পর। এক-একটি পুত্র মরে, রাজদ্বারে এসে অভিযোগ করে যায় ব্রাহ্মণ। রাজাকে বলে, তোমার দোষেই আমার এ পুত্রশোক। রাজাকে নিরুপায় দেখে ব্রাহ্মণ অর্জুনের কাছে সাহায্য চাইল। কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠ অর্জুন অভয় দিল ব্রাহ্মণকে। বললে, আমি তোমার পুত্রকে রক্ষা করব। দেখি কি করে যম তাকে স্পর্শ করে।

পারবে বাঁচতে? ব্রাহ্মণ উৎসাহিত হয়ে আকুল-কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

যদি না পারি—অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করব। অর্জুন প্রতিজ্ঞাবাগী উচ্চারণ করল।

ব্রাহ্মণীর পুনর্বীর গর্ভসঞ্চার হলে ব্রাহ্মণ সংবাদ দিল অর্জুনকে। অর্জুন শরজালে দিগ্বাণুল আচ্ছন্ন করল, নিবিড় করে আরত করল স্মৃতিকাগৃহ। কার সাধ্য এই শরবেষ্টনী ভেদ করে।

যথাকালে ব্রাহ্মণীর পুত্র হল। কিন্তু কয়েকবার কেঁদে উঠেই শিশু শুক হয়ে গেল। শরজাল মৃত্যুকে অবরোধ করতে পারেনি।

ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণ অর্জুনকে তিরস্কার করতে লাগল। মিথ্যাবাদী, কপট, উদ্ধত।

অর্জুন বললে, লোকান্তর থেকে উদ্ধার করে আনব তোমার ছেলেদের। শুধু কনিষ্ঠকে নয়, এক থেকে দশ, সবগুলিকে।

যমালয়ে এসে উপস্থিত হল অর্জুন। কিন্তু, কই, সেখানে নেই ছেলেরা। যত লোক আর পুরী

আছে সব খুঁজল একে-একে, কোথাও কাউকে মিলল না।

এবার তবে অগ্নিতে প্রবেশ করি। প্রতিজ্ঞা পালনে প্রস্তুত হল অর্জুন।

কৃষ্ণ বললে, চলো, আমি তোমাকে এক জায়গার নিয়ে যাচ্ছি। ব্রাহ্মণের ছেলেদের দেখতে পাবে সেখানে। তুমি এখনি অগ্নিতে প্রবেশ করো না।

দিব্যরথে চড়ে অর্জুনকে নিয়ে বেরুল কৃষ্ণ। অনেক গিরিনন্দী সমুদ্র পার হয়ে মহাকাল-আলয়ে এসে উপস্থিত হল।

সেখানে আছে ভূমাপুরুষ। সে বললে, ব্রাহ্মণের দশ ছেলে আমার কাছেই আছে। তাদের সন্ধানে কৃষ্ণার্জুন আসবে, আর এলে কৃষ্ণকে আমি দেখতে পাব, সেই লোভেই ওদের অস্ত্র রাখিনি। আমার এতদিনের উৎকর্ষ আজ নিবৃত্ত হল। চরিতার্থ হল প্রতীক্ষা। কৃষ্ণকে দেখতে পেলাম।

এই ভূমাপুরুষ আর কেউ নয় স্বয়ং নারায়ণ।

মণিভিষিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল কৃষ্ণ। সবিস্ময়ে বলে উঠল, এ তো কখনো দেখিনি। আমি এত মধুর। এত চমৎকারকারী! এ মাধুর্য আমি আশ্বাদন করি কি করে? লুকুচিরা রাখি না হয়ে আমার উপায় নেই। রাখিকার ভাব না ধরলে কৃষ্ণ-মাধুর্য, আত্মমাধুর্যও বোঝা যায় না।

বর সনাতনের বাড়ি এসে পৌঁছল। সনাতনও কম আয়োজন করেনি। তারও তুমুল বাত, উচ্চও আলো। ভাট-বিপ্রও কম নয়।

নিমাইকে নামানো হল দোলা থেকে। পুষ্পবৃষ্টি লাজবৃষ্টি হতে লাগল। শব্দের রোল উঠল চারিদিকে। আর ললিত-কলিত হলুধনি।

অবগুণ্ঠিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সভায় আনা হল। সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার, স্বভাবসুন্দরী, বিনোদামঙ্গলভারী। কিশোরবয়সোজ্জ্বলা। লজ্জালতিকা। সর্বভক্তির প্রতিমূর্তি।

মুখচন্দ্রিকা হবে। বিষ্ণুপ্রিয়ার পিঁড়ি উচু করে তুলে ধরা হল। বর-কন্ডার মাথার উপর দেওয়া হল বস্ত্রের আবরণ। নিভৃত্তে এবার দেখ পদম্পর্শকে। নিভৃত্ততমকে।

লজ্জায় হু চোখ বুজে আছে বিষ্ণুপ্রিয়ার। পরম-পরিচিতকে তা হলে দেখি কি করে।

‘ওকি, চোখ চা।’ পাশ থেকে এয়ার দল বললে

বিষ্ণুপ্রিয়াকে। 'বরের মুখ না দেখলে দোষ হয়।
লজ্জা কী! আপনজনকে দেখবি।'

বিষ্ণুপ্রিয়া চোখ চাইল।

মিলন হল চার চোখে। একটিমাত্র নিমেষ কিন্তু
অনন্তকালের দর্শন দিয়ে ভরা।

নিমাইয়ের বাঁয়ে এসে দাঁড়াল বিষ্ণুপ্রিয়া। একটু
বুঝি ঐ সাহস বেড়েছে, ঘোমটার আড়াল থেকে আড়
চোখ দেখছে বরকে। কখনো বা চোখে চোখ পড়ে
যেতে ধরা পড়ার আনন্দে শিউরে উঠেছে। তাকাচ্ছে
পায়ের দিকে আর সমস্ত হৃদয় জলের মত ঢেলে দিচ্ছে
অনর্গল। ছুখানি হাত দেখছে আর ভাবছে সমস্ত
সুখ বুঝি ঐ হাতের মুঠোয়। কিন্তু অত সুখ কি আমার
সইবে? ধরতে পারব হুই হাতে?

এ কি সত্যিই ঘটছে বাস্তবে না কি এ স্বপ্ন
দেখছি? এ কার সঙ্গে কার বিয়ে? এ কি মাটিতে
আছি না কি গন্ধর্বনগরে।

সর্বগুণখনি রাধিকা। গুণৈরতিবরীয়সী। মহাভাব-
ধরুপা, সব সাধিকা। সুহৃৎকাম্যধরুপা। কেশদাম
সুসুজিত, দীর্ঘায়ত ময়ন দুটি চকল, বক্ষ সুশোভন,
মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্বরূপদেশ অবনমিত, হাত দুখানি
মধরস্বন্দর।

রাধিকা মধুরা, নববয়স, চলাপাঙ্গা, উজ্জলস্মিতা।
তার হাত-পায়ের রেখা খুব সুন্দর ও সৌভাগ্যের সূচক,
তাই সে চারুসৌভাগ্যরেখাচ্যা। তার অঙ্গগন্ধে মাধব
উদ্ভাসিত, তাই সে গন্ধোদ্ভাসিতমাধবা। সঙ্গীতনিপুণা,
রম্যবাচী, নরমপণ্ডিতা, বিনীতা। শুধু তাই নয়,
সে করুণেশ্বরী, বিদগ্ধা, পাটবাগিতা, লজ্জাশীলা।
দৈর্ঘ্যগাভ্রাধশালিনী, সুবিলাসা। গুণবপিতগুরুস্নেহা,
অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় স্নেহপাত্রী। কৃষ্ণবিষয়ে
তুষ্ণবতী। সমস্ততাত্ত্বিকেশবা, সবদা কেশব তার
অঙ্গুগত, তার আজ্ঞাধীন।

রাধিকার ছাদশ আভরণ। চূড়ায় মণীষ্ম, কানে
কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলদেশে পদক, কর্ণধোরে
শলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠমালা, আঙুলে অঙ্গুরী,
বক্ষে তারকোপম হার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে নুপুর,
পদাঙ্গুলিতে গুঞ্জরিপঞ্চম।

রাধিকার ঘোড়শ শৃঙ্খার। রাধিকা স্নাতা, নাসাগ্রে
মণিরাঙ্গ, পরিধানে নীলবসন, কটিতে নীলী, মাথায়
বন্ধবেণী, কর্ণে উত্তাস, অঙ্গে চন্দনচর্চা, চিকুরে কুমুম,
হাতে পদ্ম, মুখকমলে তামূল, নয়নে কঙ্কল, কপোলে

রঞ্জন, ললাটে তিলক, গলদেশে মালা, অলকে
কন্তুরীকন্দু, চরণে অলস্তরেখা।

রাধিকাই কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি। 'কৃষ্ণপ্রেমভাবিত
যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণনিজশক্তি রাখা—ক্রীড়ার
সহায়।' ভাবিত কী? সর্বতোভাবে অমুপ্রবিষ্ট
হলেই ভাবিত। জলের মধ্যে কপূর দিলে কী হয়?
জলের অগুতম সূক্ষ্মতম অংশেও কপূরের অমুপ্রবেশ
ঘটে। জল তখন কী? জল তখন কপূরবাসিত।
জল তখন কপূরভাবিত। লোহাতে যখন আগুন
প্রবেশ করে, তখন লোহার কণিকতম অংশেও আগুন।
তখন লোহাতে আর আগুনে পার্থক্য নেই। তখন
লোহাতে-আগুনে তাদাস্য। তখন লোহা অগ্নিভাবিত।
তেমনি রাধিকায় আর কৃষ্ণপ্রেমে ভেদ মেই। রাধিকার
কায় মন বাক্য সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমের ভাবনা। সমস্ত
অস্তিত্বই কৃষ্ণপ্রেমের পরিণতি।

শ্রীকৃষ্ণের লীলায়-খেলায় সহায়কারিণী কে হবে,
কে হতে পারে? তাঁর লীলা কী? তাঁর লীলা
আনন্দন, কান্ত্যারসের আনন্দন। এ খেলায় সেই তাঁর
সঙ্গী হবে যে তাঁর নিজের শক্তি, স্বরূপশক্তি।
শ্রীকৃষ্ণ তো আত্মারাম, স্বতন্ত্র পুরুষ, তাই তিনি এমন
কোনো শক্তির সাহায্য নিতে পারেন না, যা তাঁর
থেকে পৃথক। তেমন সাহায্য নিতে গেলে তাঁর
আত্মারামতা থাকে কোথায়? তাই অখিলাবৃত্ত
শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজশক্তি, তাঁর আনন্দচিস্তায়সের
প্রতিক্রিয়া রাধিকাকে, হলাদিনীকে ডাক দিয়েছেন।
রাধিকা ছাড়া কে আর তাঁর খেলা জমাবে? কে
তাঁর আমুভূত্যাবিধায়িনী?

বিয়ের পর বর-কনে, গৌরান্স আর বিষ্ণুপ্রিয়া,
চলল বাসরঘরে। ভয়ে-আনন্দে প্রায় অবশ বিষ্ণুপ্রিয়া।
চলতে পারছে না পা বেঁকে। নিমাই এয় তাকে
টেনে নিয়ে চলেছে। হঠাৎ বনাৎ করে একটা শব্দ
হল। অক্ষুট আতর্জন করে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়া। চলে
পড়ল স্বামীর আশ্রয়ে।

কী হল? কী হল? সবাই উৎসুক-উদ্বিগ্ন
হয়ে উঠল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠে উচুট লেগেছে।
এ কি, রক্ত পড়ছে যে আঙুল থেকে। কী হবে?
আঙুলের থেকেও মর্মে বেশি যন্ত্রণা বিষ্ণুপ্রিয়ার।
বাসরঘরে যেতে এ কী অমঙ্গল।

কিন্তু এখন রক্ত খামবে কী করে?

নিমাই তার অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্ষতস্থল চোপে ধরল। রক্তক্ষরণ থেমে গেল। ব্যথাবেদনা চলে গেল নিমেষে।

অঙ্গুষ্ঠে-অঙ্গুষ্ঠে প্রথম প্রেমালোচন।

কিন্তু ভয় তো যায় না। কেনই বা এই রক্তক্ষরা আঘাত? কিসেরই বা এই মধুক্ষরা উপশম?

তখন মিশ্রকে কাশীবাসের পরামর্শ দিল নিমাই। বললে, যাও, বেশি দেরি নেই, সেখানেই আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। কেন দেখা হবে? তার অর্থই, ভাবী সন্ন্যাসগ্রহণের কথা তখন নিমাইয়ের মনে ছিল। তাই যদি হবে, তবে নিমাই জেনে-শুনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করল কেন? এমন তো নয় যে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করবার পর তার সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প হয়েছে। আসেই যখন হয়েছে, তখন লক্ষ্মীর বিরোধানের পর, গৃহত্যাগ করলেই হত। কী দরকার ছিল বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদাবার? জেনে-শুনে তার জীবনে ছুঁই ছুঁইয়ের ভার চাপিয়ে দেবার? নিমাইয়ের কি মায়ামমতা নেই?

সন্ন্যাসের মহনীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জগোই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করবার প্রয়োজন ছিল। বিরাট ত্যাগের উত্তর দৃষ্টান্ত রাখবার জগো। সন্ন্যাস না নিলে কুতর্কনিষ্ঠ ভগবৎ-বিদ্বের আকৃষ্ট করব কী করে? 'সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ। যতক পলাঞা ছিল তাকিকাদি গণ।' কী উপায় অবলম্বন করলে ও সব নিম্নদুঃপাশুণীর দল আমাদের প্রণাম করবে? আর প্রণাম না করা পর্যন্ত নির্মল হৃদয়ে ভক্তির উদয় হবে কী করে? প্রণতিতেই পাপক্ষয়। আর মেঘক্ষয়ে যেমন চন্দ্রিকা তেমনি পাপক্ষয়ে ভক্তি।

'অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।

সন্ন্যাসীর বুদ্ধে মোরে প্রণত হইব।

প্রণতিতে হইবে ইহার অপরাধক্ষয়।

নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়।'

লক্ষ্মীর অন্তর্ধানের পরেই যদি নিমাই সংসার ছাড়ত, লোকে বলত, বিপত্তীক হয়েছে তাই বৈরাগ্য এসেছে। এর মধ্যে বাহ্যহরি কী! বড় জোর করুণা

করত, কেউ প্রশংসা করত না। ঘটত না চিত্তাকর্ষণ-চমৎকৃতি। আর যে প্রশংসিত নয় সে আকর্ষণ করবে কি করে? তা হলে নিমাইয়ের সন্ন্যাস হতনা এমন ফলদায়ী। কত বড় সে যন্ত্রণা, তরুণ বয়সের প্রেমিক স্বামী হয়ে কিশোরী বধু বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে যাওয়া। বড় দুঃখ না হলে বড় প্রাপ্তি ঘটে কি করে? সাধ্য কি এ ঘটনার পর নিম্নদুঃপাশুণীর দল বিমুখ থাকে? পারবে তারা হৃদয়ের মাংস ছিন্ন করে নিতে? সাধ্য কী মূল্য না দিয়ে চলে যায়? সমস্ত বিরুদ্ধপ্রোত নিমাইয়ের পায়ের উপর এনে না ফেলে।

তা ছাড়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া আর কে বইবে এই অপার বেদনা? কে জ্বালাবে ভক্তিতৃপ্তির জ্বালা-প্রদীপ? প্রভু সন্ন্যাসী বাইরে, বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসিনী গৃহে। প্রভুর প্রেমভক্তির বিতরণ বাইরে, আর ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার সাধন কি করে সেই প্রেমভক্তিকে ক্ষয় করে ধরে রাখা যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরঙ্গের স্বরূপশক্তি যেমন রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের। গৌরমুখে হরি হরি, বিষ্ণু-প্রিয়ার মনে গৌর-গৌর।

'আমার কন্ঠা তোমার দাসী হবার উপযুক্ত নয়।' বিবাহান্তে যুগলে প্রত্যাবর্তনের সময় বললে সনাতন। 'তুমি নিজগুণে একে কৃপা করবে।'

নিমাই মনে মনে হাসল। ও কি আমার দাসী? ও আমার নিত্যকান্তা।

সর্বমাত্রাণে নমস্কার করে দোলায় এসে উঠল বরবধু। হরি-হরি বলে সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল

দ্বীগণ দেখিয়া বোলে, 'এই ভাগ্যবতী।

কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্বতী।'

কেহ বোলে 'এই হেম বৃষ্টি হর গৌরী।'

কেহ বোলে 'হেন বৃষ্টি কমলা শ্রীহরি।'

কেহ বোলে 'এই ছই কামদেব রতি।'

কেহ বোলে 'ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি।'

কেহ বোলে, 'হেন বৃষ্টি রামচন্দ্র সীতা।'

এই মত বোলে সব সুকৃতি-বনিতা।

[ক্রমশঃ]

... এ ক্ষণের প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর স্মরণমূর্তির আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মুক্তিপট্টনকারী ভাষ্য ও যুগ্মশিল্পী শ্রীরমেশ পাল।

বিপ্লবের সম্মুখে

[বৃৎ-প্রকাশিতের পর]

আমায়ন বন্দোপাধ্যায়

২৬ সালের গোড়াতাই বাহুল্য আসিপুর সেন্টাল জেলে বন্দী হয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরেই আমি বন্দী হয়ে এলাম। তখন পরভাস সলিসবেরীর হলে জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে এসেছেন ক্যান্টেন মালেকা—বোধ হয় মাজাজী—গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়ের পূর্ণাঙ্গ করেছেন মাজী—চমৎকার লোক—বাহুল্যর সঙ্গে খুব খাতির। তিনি রোজ সকালে রাউণ্ডে বেরিয়ে আমাদের ইয়ার্ডে এসে বাহুল্যকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে যেতেন।

একদিন হাসপাতালে বাওয়ার সময় তিনি বাহুল্যর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন—পাশে পাড়িয়ে শুনলুম, হাসপাতালে সে দিন মালেকা স্বহস্তে একটা মেজর অপারেশন করবেন—অর্ধ—ডিনটে-ডিতরবলী কেস। আমি বাহুল্যকে বললুম, আমার বে দেখতে ইচ্ছে করছে। মালেকাকে বলে বাহুল্য আমাকে সঙ্গে নিলেন। অপারেশনে মালেকার কেরামতি খচকে দেখলুম।

তখন বন্ধিপথের বোমার মামলার আসামীরা আমাদের দরজার পাশের ইয়ার্ডেই বন্ডভোগ করছেন। B class (পরবর্তী কালের Div. II) কয়েকটির পোঁবাক—জেলের কাপড়ে তৈরী ফুল-প্যাট ও সাট। বোমার তৈরীর ওস্তাদ হরিনারায়ণ চন্দ্র আছেন। তিনিই ওদের মধ্যে বহোজ্যেষ্ঠ—প্রায় আমারই বয়সী—এবং ১৯১৬ সালের শেষে ডিকেল আট্টে অস্বাভাবিক হয়েছিলেন। চুঁচুড়ার লোক—প্রোফেসর জ্যোতিষ বোমের (রাষ্ট্রীয় মশাট) চেলা।

আমাদের ইয়ার্ডে লোভলার বাহুল্য, অমর বোম, আমি, অজুলাল, অজু বানার্জি, রঞ্জিত বানার্জি—চার কে ছিল মনে নেই। বোধ হয় বনোমোহন ভট্টাচার্যও ছিলেন। নীচের ঘরে অজুলাল পাঠের নেতা নরেন সেন (রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী), মল্লার মরেন বানার্জি (রজা কেসে দণ্ডিত), অজুলালের জুনিয়ার অরুণ ভরবাক ও তিরুণ দে, অম্বিকা ধী—(আমার হাজার ট্রাটকের সাথী), সুপেন সম্মুখদার, পান্না মুখার্জি এবং আরো কেউ কেউ—মনে নেই।

আমাকে পেরে রঞ্জিত বললে, নারায়ণা, কুস্তি লড়ার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? আমি রাজী হলাম। কুস্তির আখড়া হল—অজুলাল লডান—আমি, রঞ্জিত এবং অরুণ ভরবাক লড়ি। বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলা হয় এবং তারপর বেড়ানো—ইয়ার্ডের বাইরে বড় পাঠিলের কোল দিয়ে সেটের কাছ পর্যন্ত রাস্তায়। প্রেক্ষার হুড়োর ওরার্ডার পাড়িয়ে থাকে—পাহারী।

ইতিমধ্যে ২৫সালে আমি মেসিট্রীপুরে বাঁড়োর পর কুপের মুখার্জি বলে যে তরুণটি ছিলেন ইয়ার্ডে উপেননা, অমরনা (চ্যাটার্জি) ও বনোমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে ছিল, এবং তাঁদেরই সঙ্গে ষ্টেট ইয়ার্ডে এসেছিল, (আমায়ের ইয়ার্ডের আদিনাম সিগ্রেশন ইয়ার্ড) সে এসেছিল জেলে গেছে—সেখান থেকে সন্তোষ মিত্র, বীরেন বাগটি ও সুবোধ লাহিড়ী সেন্টাল জেলে এসেছে এবং পরে দার্জিলিং জেলে বন্দী হয়েছে।

উপেননা অকারণ জেলভোগটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। আই বি-র কর্তা রাববাহাতুর কুপেন চ্যাটার্জি জেলের অফিসে আসা শুরু করেছিলেন, এবং উপেননা তাঁর কাছে দরবার শুরু করেছিলেন—তেন দাদা বুড়ো ভ্রাক্ষণকে—এক ভ্রাক্ষণকেও—অকারণ কষ্ট মিচ্ছ—ইত্যাদি।

তিনি অমরনাও সাধিল রেখেছিলেন এবং অজুলালকেও (বোধ) রাজী করতে চেষ্টা করছিলেন—বদি একটা undertaking দিলে ছেড়ে দেয়, তাহলে সে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা। অজুলালার ব্যবসা শিকের ওঠার উপক্রম হয়েছে—ছট ভাই-ই জেলে—তাঁর ছাড়া পাওয়ার প্রয়োজন ছিল সব চেয়ে বেশী—কিছু তিনি undertaking দেওয়ার ideaটা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তাই উপেননা তাঁকে বলতেন—ও একট senior ওরুপ ইপেন—old cows association থেকে ওর নাম কেটে দোব। undertaking দিয়ে বেরোবার ব্যবস্থা পকে উঠেছিল।

উপেননা বলতেন, আমরা কি গান্ধী নাকি? পুলিশের কাছে কথা দিলে, কথা রাখতেই হবে কেন?

নরেন সেনকে (রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী) ভেঙেও রাববাহাতুর—undertaking এর কথা বলেছিলেন। তিনি ভাববে বলেছিলেন, সরকার দর চেয়ে বড় হিংসাবাদী—বিপ্লবীরা তাঁর জবাবে হিংসার আশ্রয় নেয়। অহিংস আছেন একমাত্র গান্ধীজী। সরকার যদি তাঁর কাছে অহিংসার undertaking দেয়, তাহলে আমিও তাঁর কাছেই undertaking দিতে রাজী আছি।

—Hopeless Case বলে রাববাহাতুর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত আমি আমার আগেই উপেননা, অমরনা এবং অজুলালও undertaking দিয়ে মুক্ত হয়েছেন।

আমি আমার অজবান পরে—বোধ হয় বাঁড়োর শেষদশ

কলকাতার কিছু-কুসংস্কার দালা হল। করেকলো দাঁড়াবাড়ী প্রেতার হল—কিন্তুদের আসলে সেটা হল জেলে এক কুসংস্কারদের পাঠালো প্রেসিডেন্সি জেলে। একদিন সকালে দেখি under trial ঘের ছুটো ইয়ার্ডভরা লোক গিজ গিজ করছে—জনলুম লাকার কথা। সরই প্রায় কিছুহানী। ভাগ্যও বসেবী বাবুলের খবর পেয়েছে।

আমাদের ইয়ার্ডের পর কীসির ইয়ার্ড, এবং তারপরই under trial ইয়ার্ড—সেখানে থেকে তারা “বলমহাত্মম” বলে সম্বোধন করছে। কয়ে ২।৪ জন পিছনের দরজা দিয়ে (হিন্দু ওয়ার্ডারদের মেহেবদীতে) আমাদের বেড়াবার রাস্তায় ইয়ার্ডের কাছে এসে বলমহাত্মম বলে সম্বোধন করে হাত পাতে—বিড়ি না পেতে পেরে হেঁচিয়ে উঠেছে। অন্ধকুলার চোমা লোকও দেখা গেল। আমরা আমাদের stock উজাড় করে বিড়ি-দ্রব্যাদি লাই ছুঁড়ে দিলাম। তারা ভারি খুশি।

যেখ ইয়ার্ডের সরেদে খোঁচাখুঁচীও হারবার্ডারদের সঙ্গে জেলের দ্বন্দ্ব জামাবার হল করে দেখা করতেন। তিনি যে মিতে জেলের ওয়ার্ডার-জামাদারদের হাত করে প্রায় একটা under-ground রাস্তা খোঁজা করে কেলেঙ্কিলেন। সেটাকে ক্যানোয়াজ করাটী ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁদেরই কেসের ১০ বছর বড়প্রাপ্ত সাক্ষকুল চ্যাটার্জি বলতেন—Lifer (দাবজীবন বড়প্রাপ্ত) ঘের বিশ্বাস করতেন না।

কুপেন মনুষ্যদাকও রায় বাহাদুরদের সঙ্গে দেখা করতো, ছুটি পেরে বাড়ীও যেতো। কিন্তু সে তো তাঁর সঙ্গে দেখা করে করে একাধিকবার হাট পেরে দেশে ঘুরে এসেছিলো। অধিকা খাঁও তাঁর সঙ্গে দেখা করতো।

এদের সকলের ওপরই আর সকলের মন ছিল একপ্রসন্ন,—কাটিকে কাটিকে কেউ কেউ বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখতেন। অধিকার ওপর বিরাগটা ছিল বেশী—বিশেষতঃ আমাদের দলের। একে বো-পার্টের লোক, তার তরুণ, সম্ভ্রাসবাদী কাব্যিকলাপের সঙ্গে সন্নিহিত—শান্তি চক্রবর্তীর খুনের কথাটা কারো অজানা ছিল না—তার ওপর রায় বাহাদুরের সম্পর্ক।

তাকে অনেকেই এড়িয়ে চলতো এবং সে প্রায় কোণঠাসা হয়ে ছিল। অবস্থা দেখে নরেন সেন তাকে আশ্বাস দিতেন, ওমা ভোরাকো বন্ধন করে তো ভূমি যেখানে আমাদের সঙ্গে কাজ করো। বহুতে খুন করার মতন এসেম যে তরুণের আছে,—তাকে অহুশীলন পাটি ভখনও appreciate করতো, ঠিক যে ব্যাপারটা ছিল—তখন অহুশীলন পাটির ওপর আমাদের দাদাদের বিরাসের অন্ততম কারণ।

আমায় কিন্তু তার ওপর একটা সহানুভূতির ভাব বরাবরই ছিল, সে আমার হাজা-টাইকের সাথী ছিল বলে। গণেশের কাজের পর বাঁকুড়ার আড্ডা ভেঙ্গে দিয়ে গণেশকে পাঠানো হয়েছিল যেদিনীপুরে,—অজিত মৈত্রকে পাঠানো হয়েছিল বরমপুর্বে, এবং রঞ্জিত ও অধিকাকে পাঠানো হয়েছিল আলিপুরে। অজিতের সঙ্গে হাড়াহাড়িটাই তার বড় ভূৎ—সে অজিতকে খুব ভালবাসতো। হারবার্ডারদের কাছে তার দরবার ছিল—অজিতকে আর আমাকে একতরফে থাকতে দিন।

কলকাতায় হারবার্ডার এই দুসোনে তার কাছ থেকে কিছু

কথা বার করবার চেষ্টা করেছেন,—এক অধিকাও, অজিত হারবার্ডারকে ঠাকুরার মলেব করবে, তাঁকে সন্তাই করার মত কিছু না কিছু বলেছে—সতাই হোক, অজিতসাই হোক।

সে চট্টাং, যেন অকারণেই, বাছা বাছা ২।১ জনের দিকে চেয়ে খুব হাসতো। বাহুল্য তাকে “পাপলা” বলতেন। হাসিটা অনেক সময় বাহুল্যের সামনেই বেশী হ’ত। আমার মনে হ’ত—তার দুটোটা অর্থপূর্ণ—এক সজবত কারো কিছু কাচুচুপি বা গ্যাডাকল আবিষ্কার করেছে,—এক কাটিকে সে-কথাটা বলতে পারছে না বলে একাই হাসছে।

দেব পৃথক একদিন দেখা গেল, অজিত মৈত্র আলিপুর স্টেটাল জেলে বন্দী হয়ে এসেছে। নীচের ঘরে অধিকা নিজের কাছে তার খাট পাড়লো—ভাবি কুড়ি।

অজিত বাহাবান খুবক, কখনো হলে তাকে গুরুত্ব বলা যেত। শান্ত ও গভীর প্রকৃতি, পড়াওনোর ঐক্য খুব। ছেলে কিছুটা কথা বাকের পেশা, তাদের পক্ষে মোতদীর টার্গেট। অমর ঘোষের বিশেষ নজর পড়লো তার ওপর। “কুসক” থেকে তাকে তিনিই আমার জন্তে বাহুল্যের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি অজিতের শিড়রে লাগলেন, এবং অজিতকে রাজী করে তাকে মোতদীর আমাদের ঘরে আনার ব্যবস্থা করলেন। তিনি জামন্তেন না, ছেলেরা ভেতরে পেকে পাড় হয়ে গেছে।

সাধারণ চৈতন্য এবং অধিকার Sentimental প্যাচাল ও ইয়ার্কির মধ্যে তার পড়াওনোর ব্যাখ্যা হচ্ছিল বলে অজিত মোতদীর অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আসার জন্তে অমরবার বখায় রাজী হয়েছিল, এবং এইটেই হয়েছিল অধিকার সবচেয়ে মর্গাভিক অভিমানের কারণ।

অজিতকে কেউ একথাও বলেনি যে অধিকাকে কেউ স্পাই বলে মনে করে—কারণ বাদের অনেকে ভাল চোখে দেখতো না, অধিকা ছিল মাত্র তাদের মধ্যে একজন। অমরবারও (ঘোষ) অজিতের পড়াওনোর সুবিধার অজুহাতেই তাকে উপরে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। অধিকাকে স্পাই মনে করে তার হাত থেকে অজিতকে উদ্ধার করা হচ্ছে—এটা জানতে পারলে অজিত তাকে ছেড়ে উপরে আসতো না নিশ্চয়ই।

যাট হোক, প্রথমে অধিকা অজিতকে কাছে রাখার জন্তে বুঝিয়ে চেষ্টা করে বখন বার্থ হল,—তখন বাহুল্যের কাছে দরবার শুরু করলে,—কারণ তিনিই লীডার। বাহুল্য তাকে হাঁকিয়ে নিলেন—তিনি সাতোও নেই, পাচোও নেই—তিনি হস্তক্ষেপ করতে বাবেন কেন?—তা ছাড়া এতে চয়েছেই বা কি?—অজিত ওপরে থাকলেওতো তোমার কাছেই থাকবে।

তখন সে বাহুল্যের হাতে পায়ে ধরা শুরু করলে, তার খাট খানিও ওপরে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্তে। ভাও হল না। সেদিন অধিকা কিছু খেলে না। বিকালে বখন বাহুল্যের সঙ্গে গলিতে বেড়াছি, তখন অধিকা এসে আবার বাহুল্যের পায়ে পড়তে লাগলো। তার মুখে কিন্তু হাসি—সে যেন কান্না চাপা দেওয়া হাসি। বাহুল্য সরে সরে পাশ কাটালেন।

সমগ্র ব্যাপারটা দেখলুম। ভাবতে লাগলুম, ভালবাসার সেক্সিমেন্ট—যেন একটা অন্ধ জের চড়ে গেছে। দরকারী হার্ডল পায়

হয়ে এসে আবার এক কঠিন হার্ডল। ভাবতে লাগলুম, সারাদিন খেলে না, কারো কথা শুনে না—বললে হাসে। ভাবতে লাগলুম, এ অবস্থায়, অজিহেতু ওপর নিদারুণ অভিযানে আত্মহত্যার চেষ্টা করাও বিচিত্র নয়।

রাতে বন্ধ হওয়ার পর খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছি, সবেমাত্র ঘুম এসেছে, এমন সময় চঠাৎ নীচের ঘর থেকে এক বিরাট হৈ হৈ আওয়াজ। আশনারা বিধাস করুন,—আমার সেই মুহুর্তেই মনে হুত্থে—It must be Ambika, পরমুহুর্তেই বাইরের পাহারা ঘরারি এসে বললে নীচের এক বাবু গায়ে আগুন লাগিয়েছে। নরেন ব্যানার্জিও চাইকার করে বললে, অধিকা গায়ে আগুন লাগিয়েছে।

হুইল বাজলো, পাগলা-বাঁচি বাজলো, সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেলার, ওয়ার্ডারের দল ছুটে এল। আগুন তখন সেতানো হয়ে গেছে। ওরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে চলে গেল। নীচের ঘরের ওরা বলতে লাগলো তরুণ পুড়েছে, বাঁচে কিনা সম্ভব।

সকালে তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নীচের ঘরে গেলুম—সব তখনলুম। দরজার পাশেই যে পরলা ঘেরা রাতের পায়খানা ছিল—অধিকা তার মধ্যে গিয়ে সারা গায়ে কাপড় জড়িয়ে বেরোসিন তেলে (জারিকেন থাকতো কয়েকটা) অগুন ধরিয়ে দিয়েছে। লাউ লাউ করে জলে উঠছে বিরাট আগুন। বয়সীর সে বেরিয়ে পড়ে ঘরের মাঝখানে দিগে শেষ পর্যন্ত দৌড়ে গেছে। হুশাশে মশারি খাটানো—একটা মশারিতে আগুন ধরে গেছে।

নরেন ব্যানার্জি বললে—“আমি তখনো ঘুমিয়ে পড়িনি—সবেমাত্র ঘুম আসছে—চোখ বুজে পড়ে আছি—হঠাৎ একটা আওয়াজ চোখ চেয়েই দেখি একটা বিরাট আগুনের খাম ছুটে এগিয়ে আসছে। এক লাফে উঠে পড়ে ‘হেই’ শব্দে চাইকার করে আগুনটার সামনে ঝাড়িয়ে পড়তেই সেটা ঘুরে আবার দরজার দিকে ছুটলো। আমি মশারির দাড়গুলো পটপট ছিঁড়ে ফেলে, মশারির আগুন চাপড়ে নিবিয়ে কবল টেনে নিয়ে দলন্ত আগুনটাকে চাপা দিয়ে মেয়ের পেড়ে ফেলেছি। একজন ফালতুও (কয়ের্না attendant) কবল নিয়ে আমার সঙ্গে আগুনের ওপর চাপা দিলে। আগুনটা নিভিয়ে ফেলা হল। সকলে ভিড় করে জ্যাভাচাকা খেয়ে দেখছে—একটু পরেই সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতি এসে পড়লো,—এক ভাড়াভাড়ি ২।১ কথার ব্যাপারটা শুনে নিয়ে ডকে খাটে শুইয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল।”

অধিকার বিধান থেকে একটা চিঠি পাওয়া গিয়েছিল—সেটা সরিয়ে ফেলা হল। ছোট চিঠি—বেশ মনে আছে—কারণ তাতে একটা ইংরাজী শব্দ ছিল, এবং তাতে বানান ভুল ছিল। তার মধ্যে একটা কথা ছিল—“বন্ধুর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে কেউ বিধাণ করে না। তাই এই Step নিলুম।” এই Step কথাটাই বানান ছিল Stape.

“আমি দোষ” “আমি দোষ” করে অনেকেই চিঠিটা দেখলো—সকলকে দেখতে দেওয়া হলনা—লুকিয়ে ফেলা হল। তারপর সেটাকে বধ ইয়ার্ডের নরেন ঘোষ চৌধুরীর মাধ্যমে বাইরে “Forward” কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া হল—সঙ্গে দেওয়া হল এক ঘোষালো বিবরণ—অধিকার গুণ্ডগুরুবৃত্তির বিবরণ।—কয়েকদিন

পরে “Forward” কাগজে অধিকার চিঠির ফোটোগ্রাফ কপি এর সে বিবরণ ছাপা হল। বেশকিছু লোক জানলো, আলিপুর সেটাই জেলে এক রাজবন্দী স্পাই আত্মহত্যা করেছে। অজিত খাটত ব্যাপার কেউ জানলো না।

বাই চোক, হাসপাতালে অধিকারকে বাঁচাবার কথামাথা টোঁ করে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাদের ইয়ার্ডে এসে বাহুরার সঙ্গে বখন বধা কইছেন, আমি গিয়ে পীড়ালুম। তখনলুম, পুড়ে গেছে সর্বাঙ্গ, এবং ভীষণভাবে—বাইরে না। সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহুরাকে বললেন—But I can't understand why he punished himself like that!

আমরা কেউ হাসপাতালে তাকে দেখতে বাইনি। কিন্তু তার জান ছিল। মেলা প্রায় নটার সময় হাসপাতাল থেকে কে একজন এসে খবর দিলে—অধিকা অল্পকালকে ডেকে পাঠিয়েছে। অল্পকাল তখন পীত মাজছিলেন। মুখ ঘুরে চা খেয়ে বেতে তাঁর একটু হেরা হয়েছিল। তিনি হাসপাতাল থেকে কিয়ে এসে বললেন—“হয়ে গেছে—যে আমাকে ডেকে পাঠাল, সে যে এত শীঘ্র মরবে, তা কেমন করে বুঝবে—আমাকে ডেকেছিল একেবারে অজিহ সময়—তার শেষ কথাটা আর শোনা হল না—কোনাই থেকে গেল।”

অল্পকাল বাঁচ বাঁচ আকস্মিক করত লাগলেন। আমরা কেউ তখন জানতুম না, অধিকার সঙ্গে অল্পকাল বাইরে পরিচয় ছিল। তিনি ঘটনার স্বরিত বিকাশে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চূপ করেছিলেন। এখনও চূপ করেই থাকলেন। ফরোয়ার্ডে খবর বেরোনোর পরও চূপ করেই ছিলেন।

মরণের সময় অধিকা অজিহকে ডাকেনি—তার মৃত্যুতেই সে আগুন লাগিয়েছিল। ঘটনার পরিণতি দেখে অজিত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সেও চূপ করেই থাকলো।

আমার মনটা কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না যে, অধিকা স্পাই ছিল। কিন্তু এই সায় না দেওয়াটা ছিল সিডিন-বিশেষ। আমি সামগ্র জোক—পার্টিয়ান—শাসনের বিরোধী মতোভাব মহাপাণ—মন থেকে সেটা ঝেড়ে ফেলারই চেষ্টা করলুম। কিন্তু অল্প আগুগত্যের অস্পষ্টতার মধ্যে যেন মাঝে মাঝে একটু আলোর ঝিলিক দেখা দেয়—দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর যেন একটু নতুন জ্ঞানের রেখাপাত আমাকে মাঝে মাঝে একটু অন্তরমনস্ক করে দেয়—আবার সে কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলি। কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা পুরোপুরি হয়ে বিশ্বস্তির রাজ্যের এলাকার প্রায় অদৃশ হয়ে গেল।

মেদিনীপুর থেকে পড়াশুনোর যে বিপুল আগ্রহ এক অভ্যাস নিয়ে আলিপুরে এসেছিলুম,—তার জের এখানেও চলছিল—এখানেও সুযোগের অভাব ছিলনা। আমি Collectorate Library থেকে বই আনিতে পড়তে লাগলুম। প্রথমে পড়লুম Royal Commission এর Report গুলো—Currency Commission, Fiscal Commission প্রভৃতি। পড়ি শুধু Recommendation গুলো। ১৬ সালের Industrial Commission এর রিপোর্ট থেকে মালব্যের Note of dissent পড়লুম—সুবিখ্যাত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দলিল। বীরে বীরে একটা ধারণা গড়ে উঠছিল, দেশের অবস্থার কথা বিজ্ঞানে বিচার করতে হয়—কত কথা জানতে হয়।

বুঝি, না বুঝি, মিথস্রকারে পড়ে বই। মনে হয়, ভারত উদ্যম ব্যাপারটাকে আমরা যেমন over-simplify করে বসে আছি—ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক জটিল।

ক্রমে রমেশ চন্দ্রের Economic History of Ancient India এবং Victorian Age পড়লুম। কিছু জ্ঞান হল, জানকিও হল। শেষে আমায় Census Report—এক তার নানাবিধ পরিসংখ্যানের চার্ট-টেবল মিরে বেশ কিছু দিন যেতে থাকলুম। একখানা মোটা এক্সাইজ বুক ভরে নতুন নতুন চার্ট-টেবল তৈরী করে লিখে রাখতে লাগলুম। তার একটা মনোহারী নমুনা এখানে না দিয়ে পারছি না।

১৯২১ সালের Census Report হইতে—

বিভিন্ন জাতি হিসাবে জেল-কয়েদীর সংখ্যা (বঙ্গদেশ)—			
জাতি	লোকসংখ্যা	কয়েদী সংখ্যা	
ব্রাহ্মণ	১৬১৪৪৬০	—	৪২৫
কায়স্থ	১২১৫১০৬	—	৫৪১
বৈজ্ঞ	১০২৮৭৫	—	৩৫
কৈবর্ত (চারী)	২২০৬৩৪৮	—	১৭০
• (জৈল)—	৩৮০২২৫	—	৪৭
পোহ	৫৭৫১১৪	—	৭৮
রাজবংশী	১৬৬৩২৪৮	—	১১৫
মমঃশূর	২০০৪১১১	—	২১০
বৈক্য	৩৭৭৩১২	—	৮৮
সাঁওতাল	৭১০৭৭০	—	৬২
বাউরী	৬১৬০১০	—	২৫
বাগদী	৮৮৩৮২১	—	২০৬
ধোপা	৫২৭২১৫	—	৬৮
কাওরা	১১০১৪১	—	২১
মুচি	৪১৭২২৫	—	১০৭
চামার	১৪৭৬৫৪	—	৬৫
হাড়ি	১৪৬৫৬৬	—	৫০
ডোম	১৪৭৮৫১	—	৮৫

জাতি, লোক ও কয়েদী সংখ্যার অনুপাত ও অপরাধপ্রবণতা—

জাতি	লোক	ও কয়েদী	সংখ্যার অনুপাত	ও অপরাধপ্রবণতা—
ডোম	১৭০১	জন প্রতি ১ জন কয়েদী	—	১ম
চামার	২২৭১	"	"	২য়
কায়স্থ	২৩১৫	"	"	৩য়
হাড়ি	২৮৭২	"	"	৪র্থ
বৈজ্ঞ	২১৩১	"	"	৫ম
ব্রাহ্মণ	৫০১০	"	"	৬ষ্ঠ
বাগদী	৩৭৫৭	"	"	৭ম
কাওরা	৩৭১৮	"	"	৮ম
মুচি	৩৮১১	"	"	৯ম
বৈক্য	৪২১২	"	"	১০ম
ধোপা	৫১৮১	"	"	১১ম
মমঃশূর	৬৮৪৩	"	"	১২ম
সাঁওতাল	৭০৮৪	"	"	১৩ম

কৈবর্ত (জৈল)—	১৮১৫৪ জন প্রতি ১ জন কয়েদী	—	১৪শ
সাঁওতাল—	১১৪৬৪	"	— ১৫শ
বাউরী—	১২১২০	"	— ১৬শ
কৈবর্ত (চারী)—	১২১৭৮	"	— ১৭শ
রাজবংশী—	১৪৪৪৩	"	— ১৮শ

মন্তব্য—দেখা হইতেছে যে, অপরাধপ্রবণতার ত্রাণ, কায়স্থ ও বৈজ্ঞ অন্তর্গত তথাকথিত নিয়বর্ণকে পরাক্রান্ত করিয়া হাড়ি, ডোম এবং চামারের সঙ্গে Neck to Neck চলিয়াছে। ইহার সঙ্গে যদি ধরিয়া লওয়া যায়, উচ্চবর্ণের শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রভাবের সুযোগে তাহাদের অনেক অপরাধ আদালত পর্যন্ত পৌছায় না, এবং অনেক অপরাধ আদালতে প্রমাণ হওয়াও কঠিন হয়,—তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, তাহারাই অপরাধপ্রবণতারও শীর্ষস্থানীয়।

হাই হোক, আমার সখ্যাত্মক গবেষণার এই সূত্রপাত যে উৎসাহব্যঞ্জক, তা স্বীকার করিতেই হবে। বা কিছু পড়ি, তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি, কিছু কিছু note সংগ্রহ শুরু করলুম। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একখানা অদ্ভুত চমৎকার বই সে সময়ে বেরিয়েছিল "Our Empire in Asia"—by Torens-M P. বইটা অনেককাল আগের লেখা,—অনেকদিন Out of print থাকার পর এলাহাবাদের পাণিনি প্রেস থেকে Reprint হয়ে বেরিয়েছিল। কোম্পানীর আমলে ইংরাজদের বেইমানী, বিশ্বাসঘাতকতা, জাল-জুহুরী ইতিহাস। একজন ইংরাজ এম পি যে এমন বই লিখতে পারে, তা না লেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। বইটার বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস লিখতে হলে আজও সে বইটা হবে একটা অপরিহার্য উপাদান।

প্রোক্সের দক্ষিণবঙ্গন শাস্ত্রীর লিখিত একখানা ছোট বই চার্লস বস্টি (ইংরাজী) কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল। আমি সেটা কিনেছিলুম এবং পড়ে কিছু জ্ঞান এবং প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলুম। —মহামহোপাধ্যায় ভাগবত শাস্ত্রীর ভূমিকাও চমৎকার। বস্তুবাদী দর্শন যে প্রাচীন ভারতের জনজীবনে গভীর ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করে বৈদিক যুগেই বৈদিক ধর্মের আদর্শ এবং আচার-অনুষ্ঠানকে বহুদিনব্যাপী প্রতিবন্ধিতার আব্বাহের পর আব্বাহত হেনে চলেছিল,—পরবর্তী যুগের দার্শনিক পণ্ডিতের দল যে এককটা হয়েও মিথ্যা অপপ্রচারের সাহায্য ছাড়া চার্লস বা লোকায়ত দর্শনকে কোণঠাসা করতে পারেনি,—“বর্ণং কৃত্বা মৃতং শিবং” কথাটা যে চার্লসের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্ত ঐ বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতেরাই তাঁর উক্তি বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন,—এসব কথা বিংশ শতাব্দীর দুইজন সর্বজনমাত্র বাঙ্গালী পণ্ডিতের লেখার প্রথম জানতে পেরে আমার বস্ত্রবদ্যুতী মনোভাব ও চিন্তাবাহা যেন একটা মৃত্তভিত্তির ওপর পাড়ালো। পরবর্তীকালে মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে ধনবাণী হুনিয়ার ভাববাহী দার্শনিকদের অপপ্রচারের বহুল বুঝতে তাই আমার বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

এ যাইটো বাংলার অনুদিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। আমি যাইটার, সাক্ষর মঞ্জুরাব লিখে রেখেছিলাম, সেটা আজও আছে।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার দৃষ্টিত আসামীরা আমাদের পাল্পের ইয়ার্ডেই থাকতো, ব্রলেছি। তাদেরই সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকজন কিছুদিন পরে ধরা পড়ে ডেটিনিউ হয়ে আমাদের ইয়ার্ডে এল, এক নীচের ঘরে আড্ডা গাড়লো—উত্তরপাড়ার বিখ্যাত আটিষ্ট চৈতন্যদেব চ্যাটার্জি, ভূমেশ চ্যাটার্জি, বক্রিম চ্যাটার্জি, ডারকেশ্বরের শতীন দত্ত, ভবানীপুরের বিশ্বনাথ মুখার্জি (ইনি এসেছিলেন সকলের শেষে) প্রভৃতি।

চৈতন্যদেবের একটা প্রিয় গান ছিল “আমার মাথা নত করে নাও হে তোমার চরণ-ধূলির তলে।” আমি ঠাটা করতুম—“বাড় বয়ে” বলে। একদিন এক প্যারাড়ি লিখ ফেললাম—(তোমার) মাথা নত করে নাও হে আমার চরণ ধূলির তলে কানদলা খাও নাকে খে নাও ভাসে চোখের জলে।

তখন তোমার গৌরব তান
ফালাপালা হল আমাদের কান
(এবার) বানিগাছে মিরে ঘুরারে ঘুরারে ভাজিব তোমার তেলে।
আপনার আর ক’রেনা প্রচার নিজ ঢাক শিটাইয়ে
মেখাইব মজা এবার তোমায়—হয়েছে বড়ই ইয়ে।

সকলের সাথে করিয়া চালাকি
বড় বেঁচে গেছ—আমি ছিলাম বাকি—

আমার চরণে লইয়া শরণ এবারে বাঁচিয়া গেলে।

একদিন গেয়ে শুনিয়ে দিলাম। বক্রিম কানদলা খেয়ে নমস্কার করলে—পাশকথা কানে গেছে। এখন তার গলার তুলসীর মালা—সর্বকণ হরি হরি করে।

কয়েকদিন থেকে বাঙারার পর রায় বাহাদুর ডুপেন চ্যাটার্জি আবার জেল গেটে এক ক্রমশ আমাদের ইয়ার্ড পৃথক বাতায়ত স্তর করেছিলেন। প্রথম প্রথম জেলের নিয়ম অনুসারে তাঁর সঙ্গে একজন ওয়ার্ডার পাহারা আসতো। ক্রমে তিনি পাহারা সঙ্গে না নিয়েই আসতেন। এই যাড়াবাড়িই শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁর কাল হল।

নরেন সেন ওরফে রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে ওখান থেকে বদলী করা হবে,—রায় বাহাদুর তাঁকে একবার আপ্যায়িত করতে এসেছেন। নরেন সেন নামটা সরকারী কাগজপত্রে বা পুলিশের মুখে শুনেই তিনি হঠাৎ মুগ্ধি যেতেন। বলতেন ও নাম শুনেই একটা ভীষণ রক্তাক্ত স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে,—আর আমার ঘাতে এখন সেটা হয়েছে অস্বাভাবিক। এসব কথা এমন গভীরভাবে বলতেন যে, লোক তাঁর মস্তক সবচেয়ে সন্দেহান হত। অনেকে তাঁর মাথাটা ধারণ হয়ে গেছে বলই যেন করতো, এক তিনি যেন সেটাই চাইতেন। পুলিশেরও যেন জেদ, তাঁকে কিছুতেই রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী বলবে না। এমন চলছিল।

সেদিন বিকালে রায় বাহাদুর এসে নরেনবাবু বলে আলাপ করতেন তিনি মুগ্ধি গেছেন। বানিকেশ্বর থেকে রায় বাহাদুর আমাদের ইয়ার্ড থেকে যেয়েই গলিতে এক শাখলের ঘায়ে বসপারী হয়েছেন। এই স্থানে জনসভার এবং প্রচারের বন্ধনের

(দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের) কানী হয়। সে বিবরণ সত বঙ্গের অগ্রগায়ণ মাসের বহুমতীতে “বিরবের সন্ধান” প্রথম সেবার দেওয়া হয়েছে

ইতিমধ্যে শতীন পাকড়াই এসেছিলেন এবং নীচের ঘরেই উঠেছিলেন। নীচের ঘরটার রীতিমত ভিড় হয়ে গিয়েছিল। চট্টগ্রামের নির্মল সেন ও অম্বরুপ সেন এসে উপরের ঘরে ছিলেন। ডুপেন চ্যাটার্জি নিহত হওয়ার পর নরেন সেন এবং নরেন ব্যানার্জিকে বদলী করা হয়েছিল। কানীর পর অতুল রায় (বর্তমানে জালিপুরে ওকালত করেন) এবং চট্টগ্রামের চাক্ষিকান দত্ত এসে নীচের ঘরে ছিলেন। বতীন দাস এবং সুকেন্দ্র এসেছিলেন এক উপরের ঘরে ছিলেন। কিছুদিন পরে বতীন দাসকে লাহোর বড়দফতর জড়িয়ে সেখানে পাঠানো হয়।

সুখ সেনের একটু তাসখেলার বৌক ছিল, এবং তিনি ছিলেন সেই প্রেমীর খেলোয়াড়, ঝাঁদের Partnerদের বকাবকি করার ব্যতিক্রম। একদিন আমি বসেছি তাঁর Partner হয়ে, এবং আমি ভুল খেলেছি বলে তিনি চটে আঙন হয়ে আমাকে idios বলে বসেছেন। আমিও তাঁকে এক পাশটা গালি দিয়ে বসেছি। খেলাটা ভেঙ্গেই গেল। বাহুল্য আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে একটু বৃহ তিরস্কার করলেন—তিনি একটা পাটির লীডার, তুমি এটা কি করলে?

এসব খুটিনাটি কথা অবাস্তব হলেও একটা প্রয়োজন বোধে লিখছি। বখাসময়ে সেটা বোকা যাবে।

একজন হিন্দুস্থানী ওয়ার্ডার—তেওয়ারী ছিল এক অকৃত লোক। সে কখনো কারো সঙ্গে কথা কইতো না, কিন্তু নীরবে আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতো—বাইরে থেকে নোজ “করোয়ার্ড” কাগজ এনে দিত। একদিন গেটে হঠাৎ তাকে সার্চ করা হল,—তার উল্লতে জড়ানো “করোয়ার্ড” বেরিয়ে পড়লো—তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ বাবুর জন্তে কাগজ নিয়ে বায়? সে জবাব দিলে “নাই বোলেগা।” তাকে বলা হল “তুমার জেলেস হোগা”—সে জবাব দিলে “হামার মালায় হায়।”

মালেকদার আমল বলে তাকে জেল দেওয়া হল না,—ভিসারিস করা হল। সে নীরবে চলে গেল।

একজন আইরিশম্যান ওয়ার্ডার এসেছিল,—মুখ এবং সরল,—শেষে সে জেলের ওয়ার্ডার ছিল এবং সিনডিন বন্ধী পেয়েছে—বলতো, তারা অল্প রকম লোক—সেলে ঢুকেই আগে খালাসটি ভেঙ্গে বিছানাপত্র ছিঁড়ে একাকার করতো। তোমাদের ঘটনা নয়। বলে সে পিছন দিকে হাত পেতে ঘুম মেওয়ার জএ বলতো ‘রায় বাহাদুরকে ঘুম দিয়ে ছুটি নিয়ে বাড়ী বাও ট্রাক বোকাই জিনিসপত্র নিয়ে, আর কিরে আস ছাতা হাত করে।’

শতীন ছিল খুব চকল আর দরদ—আর ঐ ওয়ার্ডার Swan তার সঙ্গে সর্বাধুনীয় করতো। শতীন বমকাভো, ফোকাভো,—আর Swan হাসতো। একদিন আন্ত ব্যানার্জি Swanকে তাকে চুপি চুপি শিখিয়ে দিলে “বোনাই” বললে শতীন ভাবি হাস করে। দরদার Swanএর ভাবি সুবিধে হল,—সে শতীনকে দেখিয়েই খুব খোর দিয়ে বলে “বোনাই”—আর শতীন রাগের জ্বল করে ফোকার নামে deposit করলে।

Swan তখন বাংলা বা কিশী একবারেই আসে না—একটা একটা করে শব্দ শিখছে। এক চিন্তাবানী হুসমান বেখের কাছ করতো—সে ইংরেজ দিন নমাজ পড়তে বাবে, Swanকে বলছে, বরফা খুলে পাও। Swan ভিজাস করছে office? চাচা কহছে, নমাজের বাহাণ। Swan কহছে godown? চাচা ঈ বলে স্বকট মিটিয়ে দিলে। Swan শিখে নিলে, নমাজ মানে godown।

এই চাচা লোকটা ছিল অদ্ভুত। আমাদের ইয়াডেই সারাদিন থাকতো এবং ইয়াডটিকে সর্বদা পরিষ্কার রকমকে করে রাখতো—কাজ না থাকলে দেওয়ালের নিচের দিকটাতে লাল রং লাগাতো—চোখাও বা চুনকাম করতো। খাঁটা honest লোক। অথচ ২৬ বার জেল পেটেচে—ছেলে বেলা থেকে বড়ো হয়েছিল। সকাল বেলা খালাস হইত যেখানে সেখানে কারো একটা পোঁটলা নিয়ে ঈটা দিয়ে ঘরা পড়ে ২।৪ ঘা মাং খেয়ে খানায় গিয়ে তাগালা করে চালান করে কোট থেকে লণ্ড নিয়ে সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নে জেলে ফির আসতো। বলতো কেয়া করণা?—কোই খানে দেখা? কাম দেখা?

কামির পরে আমায়র ফালতুদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন এক মেট ফালতু দেওয়া হয়েছিল। সকালে দেখি এক অফিসার বৃদ্ধ উঠান বাঁটা দিচ্ছে। চোবাবাটা ভক্তলোকের মতন। গিয়ে আলাপ করে ডার কেস শু-লুম। বিবাহ জড়ুধু ছিল নটেরিয়া। একটা লোক আশাব্যঙ্গ্য করতো—বৃদ্ধের জোরান জেলে একদিন তাকে এক গায়ের কোপে সাবাড় করে। বৃদ্ধ গ্রামে কবিরাজী করতে—কিছু জমি এক চাষাবাগও ছিল। ছেলোটাকে বিচাৰব জন্তে সকলকে বুঝিয়ে লুকিয়ে বৃদ্ধ “জামি খুন করেছি” বলে বাবজানির কারাদণ্ড নিয়ে এসেছে। জেলের কঠোর বৃদ্ধ তখন অদ্ভুত।

পরে বখন আমায়র অনেক পোলমাল করার কলে পুরোদো কালজুসর ফেরৎ পেলাম, তখন আমায় বৃদ্ধকে ডাডলুর না—বললুম, বা কাক পায় করবে, না হয় কসেই থাকবে। আমায়র তাকে কবিরাজ মশাই বলেই ডাকতুম।

বিলেত থেকে টেসাট (তখন দুটিতে ছিল) বালেরাকে prosecute করার পরামর্শ দিয়েছিল, বার বাহাদুর সবচে পাকিস্তানী করার হারে। সে অস্বপ্ন খাটেনি। বালেরাকে বললী কহা হল—চার্লিস নামক এক I. C. S. Superintendent হয়ে এসেন। I. M. S. বা অল্পতপকে I. M. D. হাফা এর আসে জেলের হয্যে কখনো I. C. S. এর শাসন ছিল না।

ইনি এসে, জেলের অবস্থা-ব্যবস্থা কিছু পরোয়া না করেই বাহারকর order চালাতে শুরু করলেন। জেলের officerরা বুঝিয়ে কুল পার না—সকলেই অসন্তুষ্ট। আমায়র হাতে গান সাই ফুলে হুকুম মিলেন বলীরা জেলে গান পাঠাতে পারবে না। কল হল, রাত দুপুরে সগাই মিলে গান শ্রুত করে দিতুম। Officerরা ব্যাণ্ডারটাকে বেশী লুৎ পড়াতে দিলে না। হাচিন্সকে বহিষ্ঠ নাম দিয়েছিল) বুঝিয়ে দিলে State prisonerদের বিপক্ষে দিলে ভাণ্ড সন্নয় জেলের কর্মসূচীর বিপক্ষে সেবে—সাহসলাতে পারবে না।

এই সময়ে একদিন বহিষ্ঠ চার্লিসের পিতৃবিধবাসের খবর এস। শ্রাদ্ধ করার জন্য বাড়ী বাড়ীর হুজুর বরণাও যত্ন হল না।

ইয়াডের মধ্যেই হবিষের জারগা করা হয়েছিল, কিন্তু জ্বাফের ব্যবস্থা হতে পারে না—অথচ জ্বাফের তারিখ এসে পড়লো। হাচিন্সের সঙ্গে পোলমাল বাখলো। শেব পর্বত ঠিক হল—খালি female yardএ জ্বাফের ব্যবস্থা হবে। বাইরে থেকে পুরোচিত আসবে—কিন্তু হোগাড় বস্ত্রের সাগাব্যর জন্তে চৈতন্যদের ও জুয়েপকে চাইলে বাকম। হাচিন্স অপার্ণিত করে আর এক লকা পোলমাল করে কিছু করতে পারলে না। ওয়া গেল,—শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও জ্যোতিষোক্তন না হলে শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হয় না—সে ব্যবস্থা ওখানেন্ট করার জন্তে বহিষ্ঠ পুণ্ডপীড়ি করলে। হাচিন্স চটে গিয়ে তাকে ওখানেন্ট আটক করে চৈতন্য জুয়েপকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে। কল বাহমের খাওয়া বন্ধ হল, এবং খবর পেয়ে আমায়রও জানিয়ে দিলুম, আমায়রও খাওয়া বন্ধ। পাঁচেক্ট্রে একটা হাজারটাইক লেগে গেল।

রাজকমার পিতৃজ্ঞাতো বাধা—জালা-ষ্ট্রাইক—বাইরে খবর হুড়িয়ে পড়লো—চৈ চৈ শ্রুত হল। হাচিন্সের প্রথম পরামর্শবাটা যে I. B. ইনস্পেক্টর পুরোচিত নিয়ে গিয়েছিল, সে পোলমাল বাধিয়ে দিয়ে সরে পড়েচে—হাচিন্স একা পাড়ে গেছে। ওল্ডমেষ্টের কাছে কৈফিয়ত দিয়ে সারতে পার না। আমায়র ইয়াডে বখন রাউণ্ড আসে, আমায়র বিজ্ঞানায় শুয়ে ঠাংএর ওপর ঠাং তুলে নাড়া দিয়ে লুচ্চনা কর। গৌ গৌ করতে করতে বেরিয়ে যায়। কিন্তু পরের দিন আবার আসতে হয়—duty। ওপরকারালাও মিটিয়ে কোয়ার পরামর্শ দেয়।

এমনি কয়েকদিন চলার পর একদিন অমরলা I B officeএ গিয়ে একজন officer নিতে জেলে এসে সভালর সঙ্গে দেখা করে ব্রাহ্মণ-জ্যোক্তনামির ব্যবস্থা করে গণ্ডমোলটা মিটিয়ে দিয়ে গেলেন। হাচিন্স খানিকটা চিট হল।

আমায়র বাড়ীর মামলায় আমাকে কিছুতেই কোটে হাজির হতে দিলে না। মাঝে মাঝে প্রেতাস দেখা করে যায়। তার কাছে একদিন খবর পেলাম, ডাক্তার অবস্থা খারাপ, একবার আমায়র দেখতে চায়। জামাই I B office এ ঘরবার করছে—আমায়রও একটা চরখাত করা চরকার। আমি ডেবে-চিঙে এক দংখাত করলুম “through D.I.G. I.B. C.I.D.” কয়েকদিন পরে এক order নিয়ে escort এসে হাজির—আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে, একদিনের জন্তে।

বৃদ্ধ I.B. Inspector হবিলাস বুঝাতি এক দুতন Armed Police সঙ্গে চললো। বাড়ী গিয়ে ঘরে চুকাতি, হবিলাস বাব সঙ্গে সঙ্গে ঘরে চুকতে চান—বলেন, লোক কি? উনি কো আমায়র মেয়ের মতন! আচ্ছা আচ্ছা—আমি চরকারেই থাকছি।

ডাক্তার সঙ্গে কথা বহে একটু মাথার হাতটাত বুড়িয়ে সাধনা নিয়ে বেরিয়ে আসছি—হবিলাস বাব তাড়াতাড়ি আমায়র পাশ কাটিয়ে আসতে গিয়ে দালালের খামের গোড়ার একটা কোণে হুক এক হোট্টে পেয়েছেন। ফিরে লোখ, পায়ের একটা আঙুলের নখ উঠে গিয়ে বন্ধ বেছেছে—দেখে আমি বা লুম—বা—বাঁচা গেল।

হবিলাস বাব হুকচিঙে হুকপানে চোরে বলালেন,—বলেন কি! আমি বললুম—বিখাতা পুরুষের লেখা ছিল, আমায়র বাড়ীতে I.B. Officer-এর হুকপাত হবে—কত সন্ধ্যায় সেয়ে পেয়ে—

ভেবে দেখুন। তখন হরিদাস বাবু এক-পাল হেসে বলেন—তা বটে—বেশ কষ্টেছেন!

তিনি আমাকে বাইরের ঘরে রেখে পাহারা বসিয়ে দিয়ে চলে এসেন—পূর্ণদিন বিকালে এসে জেল করিয়ে আনবেন। ওদের ওপর হুকুম, ওরা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি ওদের সঙ্গে গল্প শুরু করে আলাপ জমিয়ে নিলুম। রাজে এখন বাড়ীর ভেতর খেতে যাচ্ছি—ওরা বলাবলি করছে,—এখন কি আমরা বাবুর সঙ্গে খাওয়ার জায়গায় গিয়ে বসবো? আর আমরা যদি না বাই, আর বাবু যদি পালিয়ে যায়, তাহলে আমরাই হব দ'রা। যেমন চাকরী, তেমনি হুকুম! বাড়ি মাংস।

আমি ওদের আশঙ্ক করে খেতে গেলুম। প্রভাস পাশের বাড়ীর পুতুবাবুর সঙ্গে বংশোদ্ভূত করে তাদের বাড়ীর মধ্যে দিয়ে গিয়ে শিছনকার পাটাল ভিজিয়ে একেবারে হঠাৎ হাঙ্গামে আমার সামনে হাজির। তার সঙ্গে সব বিষয়ে নানা কথাবার্তা হল। সে চলে গেল। আমি বাইরের ঘরে ফিরে এসে পাহারাদের খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলুম এবং শেষ পর্যন্ত কিছু খাবার আনিতে দিলুম দোকান থেকে।

সকালে ওদের সঙ্গে নিয়ে গজাবান করে এলুম—বাড়ীর কাছেই গজা। লোকে ধী করে চেয়ে দেখছে, দেখে ভালই লাগলো—বেন একটা নতুন ঐশ্বর্য!

বিকালে জেল করিবে এলুম। ২৭ সাল এসে পড়েছে। বাইরে internment-এ পাঠানো শুরু হয়েছে। হঠাৎ একদিন আমারই internment এর order এসে হাজির। বাড়ীর বামলা বেখানে ছিল, সেইখানেই রইলো। চললুম পাততাড়ি গুটিয়ে পাবনা জেলার কামারখন্দ গ্রামে।

২৪ পরগণার দুজন ছোকরা I.B. watcher সঙ্গে চললো আমাকে শিয়ালদার গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসার জন্যে। ঐশনে মালপত্র নামিয়ে টিকিট কিনে ট্রাকের জন্তে একটা তালো কেনার ছল করে ওদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে বৌবাজারের মোড়ে এসে ক্রমে একটু করে এগিয়ে কাঙালদার খাবারের দোকানের সামনে এসে হঠাৎ বললুম, কিছু খাবার খেয়ে নেওরা বাক—চলে এস। আমি দোকানে চুকে পড়লুম—ছোকরা লজ্জার বাইরে পাড়িয়ে রইলো।

কাঙালদা জানতেন, আমি জেলে। তিনি বললেন, কি ব্যাপার? আমি বললুম internment-এ চলেছি—পাকদার—গাড়ীর এখনো দেহী আছে—আপনি একবার কর্মসূত্রে প্রভাসকে খবর দিন।

বলে কিছু খাবার খেয়ে ঐশনে ফিরে এলুম। একটু পরেই প্রভাস এসে হাজির। বেন হঠাৎ দেখা—এমনি ভাবে আলাপ শুরু করলো।

[কথনঃ]

মুক্তি

মহু দাশগুপ্তা

সামান্য পাখরের হুড়ি,—

ছোটদের খেলার ঢিল থেকে, উঠে এসে।

ভগবানের নিশ্চিন্ত আসনে।

জড়ত্ব বুলি তার,

নিত্য গঙ্গাবাসি সিন্ত হয়ে

পূজা উপচার ফল-মূল অর্থাৎ

বস্ত্র হয়ে,

পাখরের হুড়ি অবস্থান করে

অশথ গাছের তলার।

তবু স্বপ্ন দেখে হুড়ি,

বুঝি বৈবল্লী কুপার—

অতীত জড়ত্ব-জীবনের গুলকসিন্ত

দিনগুলিতে, ফিরে বাবার আশার

কোনও এক সমুদ্রবেলার পড়েছিল

তার কণা-কণা হয়ে

হৃদয় ঢেউয়ের সাথে হেসেছে উড়েছে

কত কথা যজ্ঞে

নিহুতে নিরাশার।

অনিশ্চয়ের বড় এল একদিন

বিচ্ছিন্ন হল তারা

ভেসে গেল, জীবনের আর এক

পরিণতি আশার, আশঙ্কার।

বৌত বধী স্বীকৃতপ-বৈচিত্র্য, নিয়ে এল

নতুন বাস্তবতা

কণা কণা বাবু জন্মে জন্ম নিল তারা

আজকে যে উঠেছে

পাখরে বেবতার,

শিউরে ওঠে হুড়ি

বস্তুমানের ধোঁকা দেওয়া জীবনটার

মুখোস টেনে কেলে

গন্ধিয়ে পড়ে নীচে—

টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

ভারপর।

একদম হৃদয় বুঝি তার

উড়ে বার আদ্যের সন্ধান, সমুদ্রবেলায়—

সেই সাথে হুড়ি পাখি বন্দী ভগবান,

জন্ম তার বাবুর কুপার।

আধুনিক বঙ্গদেশ

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

বাংলা দেশ উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় সমতলভূমির পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। ভৌগোলিক ভাবে একে তিনটি পৃথক অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে। উত্তরে হিমাচল পর্বত, তার পাশে বিস্তীর্ণ অরণ্য। এখানে প্রচুর বারিষাৎ হয়। যে নদীগুলো দক্ষিণ সমতলভূমিতে এসে পড়েছে, সেগুলো পৃথকভাবে গতি পরিবর্তন করে দেশের এই অংশে মাঠ ও ধান্যের ব্যাপক কৃতি করে। রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ভূতাত্ত্বিকভাবে দক্ষিণ-বিতারের পূর্ব মালভূমির সম্প্রসারিত অংশ। এখানে প্রাচীনকালে হুই হ'হু জলাশয় গুলোর মধ্যে মধ্যে রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় ও খনিজ পদার্থের ভূশ (Schistose)। শেবোক্ত গুলোর মধ্যে আছে করলা। প্রায়ই দেখা যায়, এইগুলোর উপরিভাগ কাঁকর ও কামা মাটির দ্বারা আবৃত। এর ভিত্তি এখানকার মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত খারাপ। বাংলা দেশের অবশিষ্ট অংশ সৃষ্টি হয়েছে পলিমাটি জমে জমে। এর কোন কোন অংশের উপর দিয়ে শীর্ণা মন্বর নদী এক কোন কোন অংশে প্রোতখতী নদী হয়ে গেছে। তার ফলে ক্রমাগত নতুন নতুন পলি জমে ভূপৃষ্ঠ উঁচু হয়ে উঠেছে।

ভারতের ভৌগোলিক মানচিত্রে বাংলার অবস্থান কোথায়, তা এবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত গাঙ্গেয় সমতলভূমির মধ্যভাগ ব্রাহ্মণ সঙ্কুতির চিরাচরিত আবাস স্থল। দক্ষিণাভ্যে এবং উপবীপের দক্ষিণ অংশে অতীতে অসংখ্য রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। মোটামুটি ভাবে বিজ্ঞা পর্বতমালা এবং তার সম্প্রসারিত পূর্বাঞ্চল আর নিরবচ্ছিন্ন অরণ্যভ্রমী উত্তর দিক থেকে এই হু'টি অঞ্চলকে পৃথক করে রেখেছে।

যে যে পথে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতের উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রবাহিত হয়েছিল তার প্রধান প্রধান কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :—

(১) একটা সড়ক গিয়েছিল পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশ থেকে চবল উপত্যকার নেমে মালওয়া মালভূমি অতিক্রম করে হয় সমুদ্রের দিকে ক্যাথে, ব্রোচ অথবা সুরাটে অথবা পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্বদিকে। শেবোক্ত বারগায় প্রাচীন বৌদ্ধ যুগ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বহু রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে।

(২) এলাহাবাদ, মোর্দাপুর ও বারানসীকে কেন্দ্র করে উত্তর-প্রদেশে পূর্বাংশ থেকে আর একটি পথ গিয়েছিল প্রধানটির সঙ্গে বোটাট্টী সমান্তরাল রেখার অল্পবিত্তর উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে, কেন ও যেতোরী নদীর গতিপথে সমান্তরাল রেখার জবলপুর ও নীলপুরের দিকে অথবা হরিশ্রগড় সমতলভূমির আরও পূর্বদিকে।

(৩) যখন হয় প্রাচীনকালে হরিশ্রগড় সমতলভূমি থেকে মহানদী উপত্যকা হয়ে শেবোক্ত নদীর ব-বীপ পর্বত বিস্তার পথের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। মহানদী উপত্যকা পূর্ব উপকূলের সমতলভূমির অংশ।

(৪) চতুর্থ পথ গিয়েছিল পশ্চিম বাংলার মধ্য দিয়ে উপকূলস্থ সমতলভূমির ভাটিতে, উজ্জ্বা হয়ে দক্ষিণাভ্যের রাজ্যগুলির দিকে।

দক্ষিণাভ্য উপবীপের ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থা এমন যে নর্মদা, তাপ্তী এবং পশ্চিম ঘাটের পশ্চিমাংশ থেকে উদ্ভূত ছোট ছোট পাহাড়ী নদীগুলো চাড়া আর সব নদীই গোদাবরী, কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মত পূর্ব সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই সমস্ত নদী এবং তাদের শাখানদীর পলিমাটি জমে ব-বীপ সৃষ্টি হয় এবং মাঝে মাঝে সক্রিয় উপকূল প্রোতের চাপে সেই পলিমাটি বিভিন্ন স্থানে আংশিকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে উড়িয়া। থেকে মাস্তাজ পর্বত পূর্ব উপকূলের সমতলভূমিতে উর্বর ভূখণ্ডের সৃষ্টি করেছে। এখানকার জনসংখ্যার অভাবমুক্ত ঘনত্ব উত্তরের গাঙ্গেয় উপত্যকার জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনীয়।

চওড়া-চওড়া অসংখ্য নদী এবং তাদের উপনদীগুলির দ্বারা উপকূলস্থিত সমতলভূমি বহুধা বিভক্ত হওয়ার ফলে এখানে অসংখ্য রাজ্যের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল এবং সেগুলো কিছু পরিমাণে নিরাপদেই নিজেদের পৃথক এবং বিভিন্ন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এ অঞ্চলে প্রচুর বারিষাৎ হয় এবং এখানকার জমিতে নদীবাহিত পলিমাটির পরিমাণ বেশি বলে খাজনাৎ উৎপাদন সহজসাধ্য। তাই রাজ্যগুলি আর্থিক দিক থেকে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ।

পূর্ব উপকূলস্থ সমতলভূমির এই বৈশিষ্ট্য হেতু পশ্চিম বাংলার মধ্য দিয়ে যে পথটা উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়েছিল, সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ছিল না। সুতরাং উত্তর থেকে দক্ষিণে সাংস্কৃতিক ভাবধারা প্রেরণের ব্যাপারে : ২ং ও ২নং পথ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, বাংলার ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

কয়েকটি সাংস্কৃতিক লক্ষণ

তার অর্থ এই নয় যে, সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পূর্ণরূপে ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার ভাষা উত্তর ভারতের ভাষাগুলোর সঙ্গে সখ্যবিশিষ্ট। (লিভি প্রি-এরিয়ান এণ্ড প্রি-ড্রাভিডিয়ান ইন ইণ্ডিয়া, ১৯২৯) এখানকার ভাষায় বহু অনার্য লক্ষ আছে। সেগুলো প্রাক-আর্য যুগের ভাষার অবশিষ্টাংশ বলে ধরে নেওয়া হয়। মোটের ওপর দক্ষিণ-ভারতের চেয়ে উত্তর-ভারতের সঙ্গেই বাংলার আত্মীয়তা বেশী। বাংলার হিন্দু্য একই জাতিভেদ প্রচার পদ্ধতিতে আত্ম এবং এমন ধর্মীয় আচার-পদ্ধতি এবং রীতি-নীতি পালন করেন যা' উত্তর-পশ্চিম সূত্র থেকেই উদ্ভূত। এখানকার প্রাচীন মন্দিরগুলো, উত্তর-ভারতের রেখা-দেইলের সঙ্গে সখ্যবৃত্ত। তবে বৌদ্ধ শতক থেকে এখানে মন্দির নির্মাণে এমন এক নিজস্ব কৌশল গ্রহণ করা হয় যা' আগেকার মন্দির নির্মাণ-প্রণালী থেকে পৃথক।

উত্তর ভারতের সঙ্গে সাম্প্রতিক এই সমস্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এখানকার এমন কতকগুলি সাংস্কৃতিক লক্ষণ আছে যাতে সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের ব-বীপের সম্পূর্ণ ভিন্নপথের সন্ধান দেয় এক তার শিকড় সূত্র অতীতের মধ্যে প্রথিত।

চাল বাংলা দেশের প্রধান খাদ্য; বাংলায় অধিবাসীদের ধর্মীয় আচার-অচরণ এক তুচ্ছতাক বাহ্যিকতার ক্ষেত্রে চালেও একটা বড়

কৃষিকা আছে। তেলও খাদ্যের একটি প্রধান উপকরণ। বাংলা, আসাম ও বিহার সংস্কার তেল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষিত। তেলের ব্যবহার উত্তর-প্রদেশের নিকে এগিরি ক্রমে ক্রমে করে আসে। অথচ এই তেলের ব্যবহার বাংলা থেকে উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ এবং পূর্ব উপকূলের কোরল ও মহীশূরের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও গুজরাট পর্যন্ত চলে গিয়েছে। কোথাও কোথাও সংস্কার তেল ব্যবহার হয়, কোথাও তিলের তেল কোথাও বা নারিকেল তেল। কোন এলাকার কি তেলের ব্যবহার হয় তাই ভিত্তিতে পরিবারভাৱে উপ-প্রদেশের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায়।

ভারতে তেলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের পদ্ধতি মোটামুটি চারকয়। এক বকম পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত তেল নিষ্কাশন-যন্ত্রের তলা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বোম পাতেই মথো। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তেলের বীজ চামানবিদ্ধ। অথবা টেঁকিতে ছেঁতে ছাটার করে তেলটা তুলে নেওয়া হয়। তলানিটুকু কাপড়ে ভিত্তি হানিয়ে নেওয়া হয়।

শেখোক্ত পদ্ধতি সিঙল থেকে পূর্বে বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে প্রায় গুজরাট পর্যন্ত চালু আছে। তামিল দেশে কাঠের নিষ্কাশন-যন্ত্রের বদলে পাথরের জাঁতাকল ব্যবহার করা হয়। বিচারে তেল নিষ্কাশকে বলে 'কোলহ' এবং তেল নিষ্কাশন যন্ত্রকে বলে ঘানি। বাংলা দেশে তেল নিষ্কাশকারী জাতিকে বলা হয় কলু আর নিষ্কাশন যন্ত্রকে বলে ঘানি। (নির্ভল কুমার বসু—হিন্দু সমাজের গড়ন, ১৩৫৬ সাল, ৪৪-৬১)

হাই চোক, বাংলার অধিবাসীদের ধর্মীয় আচার আচরণ এবং কুসৃত্যকে বৈশিষ্ট্য অঙ্গনকারী প্রধান দুটি খাদ্যবস্তু চালু আর তেল এমন এক সম্পর্কের নির্দেশ করে যা ভাষা ও ইতিহাসের সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সারা ভারতের বিভিন্ন এলাকার ভাত বাধার পদ্ধতি, সোলাই-ইইন পোষাক এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরণের চটি এবং জুতো ব্যবহার ইত্যাদির নিকে নব্বই দিলে অনায়াসে এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। বহুটি আর বেশী বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। (বসু, ১১৫৬)

আর এক বিবরণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। উপরে যে ক'টি বৈবাহিক সংস্কারবিধির জিনিষের উল্লেখ করা হল, সেগুলোর মত চাল ও তেল উত্তর ও পশ্চিম ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক সাধুত্বক পটভূমি করে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। অতীতের ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক্য আমাদের দেখিয়েছেন যে, ভারতের অধিবাসীদের মত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকেরাও পান, তুপারি ও হলুদ ব্যাটার করেন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে মোর গাং হুংগী পোষে। এইসব দেখে মনে হয় বহু শতাব্দী আগে বৈবাহিক সংস্কারের বিভিন্ন উপাদান এবং সেগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান ভৌগোলিক সীমানা আতঙ্কিত করেছিল। তার কলে উড়িষ্যার মত বাংলা দেশেও উত্তর-দক্ষিণ এবং সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কারের বিভিন্ন উপাদান পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে, অথবা বিভিন্ন সংস্কারের বহুদূরী মিশ্রণ সংঘটন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্লান্ত রেখেছে।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, যে ভাষা ও ধর্মীয় সংলগ্নতা অনুযায়ী

হিন্দু বাংলা অনুশাসিত হয়, তাতে উত্তর পশ্চিমী সংস্কারের সম্মিশ্রণ ঘটেছে।

কথিত আছে, আমিশুর নামে বাংলা দেশের এক রাজা উত্তর-প্রদেশের কনৌজ থেকে সন্ধ্যার পাঁচ জন মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে বাংলা দেশে বসবাসের জন্য আশ্রয় করেন। দুই অথবা তিন শতাব্দী পরে বাংলা দেশে সে-বংশের শাসনাধীন হয়। সেনেরা দক্ষিণাংশের কানাজী-ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে বাংলা দেশে আসেন। প্রবাদ আছে, এই বংশের ফ্যাল সেন (১১৫৬—১১৭৮ খ্রীঃাব্দ) বাংলা দেশে কৌলীজ-প্রথা প্রবর্তন করেন; কিন্তু তার কোন ঐতিহাসিক নজির নেই। (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান কলেজিও কালচার অফ দি ইণ্ডিয়ান পিপল: মজুমদার, ১৯৫৭: ৩৫—৩৮)। কৌলীজ-প্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণরা তাদের পাণ্ডিত্য ও গুণাবলীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্ত। সামাজিক মর্যাদার অপেক্ষাকৃত চের পরিবারবর্গ কৌলীজ-প্রথা অনুযায়ী উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারবর্গের সঙ্গে বৈবাহিক সংঘর্ষ স্থাপন করে নিজেকে সামাজিক মর্যাদার উন্নীত করার চেষ্টা করত এবং এইচটি শেষে প্রথা হয়ে গিয়েছিল। এর কলে বর্ণসঙ্কর বিবাহ ও বহুবিবাহ দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত হয়। সামাজিক গুণাবলীর ভিত্তিতে পরিবারের গুণবিচারের এই প্রথা অত্যন্ত ভাঙ, এমন কি বিস্তৃত শূদ্রদেরও প্রভাবিত করে। এইভাবে বাংলার হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ্যধর্মের হাঁচে আমূল রূপান্তরিত হয়েছে।

যেচুঁহান ও কান্দীর থেকে দক্ষিণ উপদ্বীপের শেষ হিন্দু পর্যন্ত এবং পূর্বে বাংলাদেশ ও আসাম পর্যন্ত দক্ষিণ-প্রদেশের এই তীর্থক্ষেত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তারিত। শেখোক্ত দুটি রাজ্যে এর সংখ্যা বেশী। সেই সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের খ্যাতি সর্বত্রব্যতী। (দীনেশ চন্দ্র সরকার—১৯৪৮: ১—১০) দি দাক্ষিণী পীঠ, জে, এ. এস. বি. লেটার্স, ডলুস ১৪, সংখ্যা ১) বাংলা দেশে পোড়া হিন্দু প্রাচীনত্বের সময় প্রাচীন করে 'হে গঙ্গা, বহুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা সিদ্ধ ও কাবেরী নদী, এই কলে অধিষ্ঠান হও'

ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচারবিচার, ঐতিহ্য, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার-আইন এবং জাতিভেদের মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে ঐক্যের যে সূত্র আছে, তাই বাংলার অধিবাসীদের বেঁচে রেখেছে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংগঠন-পদ্ধতি এই সাংস্কৃতিক ঐক্যের মূল। বহু শতাব্দী ধরে তা এই বিরাট দেশের সকল প্রান্তে প্রচলিত হয়েছে। (দিত্যেশ্বর দাস রায়চৌধুরীর 'ধর্মী বিবেকানন্দ ও বাংলার উদ্বোধন শতাব্দী, ১৯৩৪ সাল: ২৬১—২৮৫)।

ভিন্নমতাবলম্বন

একথা বলা যেতে পারে যেমনবাণী, বিষ্ণুপুর অথবা শ্রীহরীর টোলার মত বাংলা দেশে বিভিন্ন সংস্কার-শাখা-প্রাচ্য থেকে এসেছে এখানে কিছু পারমাণে উল্লার মত প্রচলিত ছিল। বৈবাহিকাল থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিস্তারিত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কৃষ্ণ অভিজ্ঞত এই যে, বাংলার একটি বিশেষ

বিশিষ্টতা আছে, তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহ্যে নিমজ্জিত হবার আশা পূর্ব-ভারত (বিহার, আসাম ও গাজের বন্দী) এমন এক সভ্যতার সীমান্ত ছিল, বা যথা-সাক্ষর বন্দীশের সভ্যতা থেকে পৃথক। (চরপ্রসাদ শাস্ত্রী: প্রাচীন বাংলার পৌরন, ১৩২০ সাল)। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম যথা-গাজের সমতলভূমির পৌড়া ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি কেন্দ্রের পূর্ব দিক থেকে প্রসারিত করেছে এবং উভয়েই বেদের কর্তৃক অস্বীকার করেছে। এই দুটি ধর্মীয় প্রাচ্য ভাবনায় সম্ভ্রান্ত এমন একটি সমালোচনাপূর্ণ ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে, বৈদিক আচারবিচার অথবা যম তত্ত্বে যার সন্ধান পাওয়া যায় না।

যেহেতু এই মানবীয় ধর্মতত্ত্বই পরবর্তীকালে বাংলা দেশে কতকগুলি উদারমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিল, তাদের কাছে মানুষের দেহটি ঈশ্বরের মন্দির। চরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে, তারা ধর্ম-উপাসক মানুষকেই দেখেই আসন দেয়। (চরপ্রসাদ শাস্ত্রী: ১৩২২ সাল, বহুমতী, ১—১৩)। মানুষের উপর এই দেখে আরোপ সম্ভবত: অবিবেচনা ও বিচ্ছিন্ন প্রসূত, কিন্তু এর ফলে ছিল মানবতার প্রতি পবন মল্যারোপ। বৈদিক আচার-বিচারে কিন্তু যমতত্ত্ব এবং জাতিসংস্কৃতিই সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রী এই দুটি সম্প্রদায়কে ওড়জু ও দেউড়ী সম্প্রদায় বলে বর্ণনা করেছেন। ওড়জু অর্থাৎ শুকর উপাসক আর দেউড়ী অর্থাৎ দেবের উপাসক। তিনি নেপালে এই দুটি কথার ব্যাচীর লক্ষ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সংস্কৃতির বহু প্রাচীন ঐতিহ্য নেপালে এখনও বিদ্যমান।

বাট হোক, ভারতের পূর্ব প্রান্তীয় সংস্কৃতির এই বহুমুখী চরিত্র প্রাণবানযোগ্য। জননিক মূল্যবোধের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপেই এর বৈশিষ্ট্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিভরণ দলগুপ্ত দেখিয়েছেন, বিভাবে সজ্জা, মাখ ও বাউল সম্প্রদায় প্রভৃতি বিভিন্ন উদার ও বিচ্ছিন্ন ধর্মমত বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে তুলেছে। (দলিভরণ দলগুপ্ত: অস্বীকারের বিশ্লিষ্টতাঃ ৩৮। এক ব্যাকরণাউপলব্ধি বেকালি লিটারেচার, ১৯৪৬: ৪৮-৬১)। বাংলার কবি চণ্ডীদাস একলা গেরেছিলেন, "তুমি হে মানুষ ভাট, সবার উপরে মানুষ সভ্য, তাহার উপরে নাট।" কেউ যেতে বলেন চণ্ডীদাসের "ম'জুর"-এর সঙ্গে আমাদের এতুগর মানবতা ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এর একটি অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য আছে, যা আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত। (সেই মানুষের আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে একাক্ষর। সে বাট হোক, সবার উপরে মানুষকে স্থান দেওয়ার মধ্যেই পবন বত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য সৃষ্টি হয়েছে। এইই প্রেমায় পাওয়া যায় যে, উত্তর-ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ব প্রান্তীয় সমগ্রত্বের সংস্কৃতির বেশ একটু পার্থক্য রয়েছে।

পরবর্তীকালে এই বিশিষ্টতা ভার সাহিত্য ও কলাভিত্তিক প্রকাশ পেয়েছে। যেখানেই (উত্তর ভারতীয় মন্দির গঠন প্রাণী) পড়তে পড়তে যে অথবা দেবতার পাখি বাসস্থানের প্রত্যেক। এর বিভিন্ন অঙ্গের নামকরণ চর মানুষের শরীরের হাত, পা, বাড়, মেরুদণ্ড, মাথার বুল প্রভৃতি অঙ্গবাহী অথবা দেবতার হিমালয়ের বাসস্থান অঙ্গবাহী। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতের দেবতারের

বাহ্যিক মন্দির আছে, কিন্তু যথাক্রমে থেকে বাংলার সন্ত ও কবির দেবতারের মন্দিরের সঙ্গে সমান আসন বসিয়েছেন।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রথম প্রকাশিত বাংলা বহুমতী করেন। তাতে শিল্পের মন্দির ও পার্শ্বভুক্তি স্থানবলে মন্দিরকে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা দেশে পার্শ্বীয় মন্দির শিল্পের উৎসে মন্দির মন্দিরে পূজা করা হয়। ভারতের অঙ্গার স্থানেও এই সমগ্র পার্শ্বীয় পূজা আচারের সঙ্গে সম্পর্ক করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ পূজার বৈশিষ্ট্য হল, এখানে দেবীকে মন্দিরের থেকে বহুদূর দূরে পিতৃগৃহে অঙ্গার কলিকাতা: কলকাতা করা হয়। চাংগিন পূজার পরে যখন প্রতিমার বিদ্যমান দেওয়া হয়, তখন সকলেই মনে করেন যেন তাদের আত্মিকতা কল গঠন মন্দির করে শিল্প নিয়ে

বাংলার গ্রাম্য অধিবাসীরা যে ধর্মের গোড়া হয়ে বাস করে, গোড়ায় মন্দিরের মূর্তি থেকে ভারতীয় মন্দিরকে এদেশে মন্দির নিমিত্ত করেছে। সেই সব মন্দিরের মাঝখানে কখনো কখনো কোথায় কোথায় কখনও গুরুত্ব পেতে পাওয়া যায়। কারণ মন্দির হচ্ছে দেবতার বাসস্থান, মানুষের অতীন্দ্রিয় দেহের প্রতীক নয়।

এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ বাংলার সংস্কৃতির কোন বড় রকমের পার্থক্য ভারতীয় মন্দির নয়, কিন্তু এর থেকে বাংলায় বাংলার সংস্কৃতি নিঃসন্দেহভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি শাখা হলও তার কতকগুলি স্বকীয় বিশেষ আছে।

এই উদার মত আছে: কিছু পরিমাণে ভিন্নমতাবলম্বী বাংলার মনীষাকে গোঁড়ামির দাঁশ না হয়ে স্বাধীনভাবে নতুন নতুন ভাবধারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ভারতের এই অংশে নতুন নতুন চিন্তাধারা ও নতুন নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার এটা একটা প্রধান কারণ। এর ফলে বাংলার সংস্কৃতিতে নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে মানবতার দিকে ঝুঁকছে, তা সে মানবতা আধ্যাত্মিক হোক, বৈদিক হোক আর বুদ্ধিবাদী হোক।

মোটের ওপর বাংলাদেশে লোক বসতি দু' ধরনের। কোথাও বাঙালীরা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে, কোথাও বহু মনস্কভাবে।

দক্ষিণ জেলাগুলোর বিশেষত: যেখানে নদীর মোহনায় ঘিরে ঘিরে নতুন নতুন বাস গড়ে উঠেছে, সেখানে কৃষকরা ছোট ছোট গুলে বিভক্ত হয়ে বাস করে, মাঠে মাঠে গৃহনির্মাণ করে এবং বাড়ীর চারপাশে নানাবিধ গাছপালা লাগায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, খুলনা, বাধরগঞ্জ এবং নোয়াখালী জেলা সম্পর্কে এই বিবরণ একেবারে সত্য। বাসগৃহে একটি মূল্যবান প্রাণী থাকে বাসের ঘর, ভাঁড়ার ঘর ও রান্নাঘর হাঁড়ির করা হয়। বিশুদ্ধ কৃষকদের মাঝখানে এখানে সেখানে ছড়ানো বাসগৃহ নিয়ে এক একটি গ্রামের সৃষ্টি। কোথাও স্থানীয়কল্পিত বাসবাট নেই; কৃষকত সমস্ত সমগ্র পটভূমিকার কৃষিগোলা প্রাধান্যভুক্ত করে।

বাংলার পর্বতময় উত্তরাংশে গোলাবাড়ী—অথবা কৃষকদের বাসগৃহ সর্পি, সিঁড়ির মত কেন্দ্রের মধ্যে ইচ্ছাকৃত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। বাড়ী চালু জায়গার উপর অসম পরিমাণে তা নির্মিত হয়। যে সব এলাকার মধ্যে সমতল ভূমি নেই সেখানে কৃষকজন কৃষক পরিমণের খুব কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ করে। পথের ধারে বিশেষ করে চৌমাথার সারিবদ্ধ মোকানপাট সহ বাড়ীর মধ্যেতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কিছু সংখ্যক খুব গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দূরে দূরে ইচ্ছাকৃত নিকট ভাবে নির্মিত হয়, কিন্তু সাধারণত কল্প বিস্তার শুদ্ধবদ্ধ ভাবেই গৃহ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। শেখোক্ত এলাকার গ্রামাণ্ডাগুলো এবটু বৈশিষ্ট্যের লাভ করে। এই সমস্ত গৃহে বাস করে উচ্চ অথবা নিম্নবর্ণের লোকেরা। দুটি সম্প্রদায় নিজ নিজ এলাকার নিজেদের পৃথক রাখতে চেষ্টা করে।

অধিকাংশ গ্রামেই অধবাসী কৃষক, ব্যবসায়ী এবং ছোট ছোট কুটিরশিল্পী। কিছু কিছু গ্রাম প্রশাসন কেন্দ্র, ভার্সিটী অথবা শিল্প কেন্দ্র।

বোকাপুর শান্তিনিকেতন থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত বাতির একটি জনপূর্ণ গ্রাম। সেখানে সমৃদ্ধ ভূখানীরা নিজেদের ইটের তৈরী বাড়ীতে এবং দারিদ্র লোকেরা খড়ের চাওরা মাটির ঘরে বাস করে। ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর মজিসপুরে কিছু সংখ্যক কৃষক বাস করে, কিন্তু সেখানে ভূখানীদের অট্টালিকা এবং কয়েকটি ইটের তৈরী মন্দিরও আছে।

বীরভূম জেলার বোলপুর অথবা সাঁইঃঘটার মত কায়গা ব্যসাকেন্দ্র হিসাবে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জনবহুল জেলার গুটি সাম্প্রতিক বাজারের মধ্যে দু'ঘ তিন অথবা চার মাইল। অপেক্ষাকৃত দারিদ্র দেশে উড়িষ্যার পুরী জেলার দক্ষিণে এই দূরত্ব গড়ে ৭ মাইল অথবা তার চেয়ে বেশী।

এই বৃক্স গ্রামে সপ্তাহে একবার অথবা দু'বার বাজার হয়। এছাড়া গ্রামে দোকানপাট সপ্তাহের প্রত্যেক দিনই খোলা থাকে। বাংলা ভাষার প্রথমটিকে গাট ও বিটচটিকে বাজার বলে। নদীর পাড়ে, বাজার ঘারে অথবা রেল ষ্টেশনের কাছেই বহু গ্রাম যোতান পাট, ডামি এবং অন্ত নানাবিধ বসবাসী নিয়ে সচরে জপান্তরিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যে জনপদে লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার, প্রতি বর্গ মাইলে এক হাজার লোকের ঘনবসতি এবং যেখানে অন্ত তিন চতুর্থাংশ লোক কৃষিবাজে লিপ্ত না হয়ে অল্প পেশার নিবৃত্ত—তাকে সাধারণত সচর বলে গণ্য করা হয়।

প্রাচীনকালে যে গ্রামগুলো ব্যবসায়ের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সেখানে নানানপ্রকার কারিকর আকৃষ্ট হত। গরুর গাড়ী, নৌকা কোষ্মন্তের কার্বে লিপ্ত ছুতার-কাষার, তাঁত, কাঁসারী প্রেমীর শিল্পীরা সব কাছাকাছি বসবাস করতো। বাজার থেকে পুরো সংগ্রহ করে উৎপন্ন তাঁত-বস্ত্র বাজারে পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করা তাঁদের পক্ষে সহজ হত। সমস্ত ব্যবসায়িকেন্দ্রে পাইকারী ব্যবসায়ীদের গুণময়র থাকতো। হুগলী জেলার রাজবলহাটের লোকসংখ্যা ৫২২৫ জন, তার মধ্যে ২১২০ জন কৃষি ছাড়া অন্ত বৃত্তিতে নিবৃত্ত এবং ১৩৫ জন ব্যবসা করে। এটি কার্ভত একটি শিল্পবৃদ্ধ গ্রাম, প্রধান বৃত্তি হচ্ছে তাঁত বস্ত্র তৈরী। বর্ধমান জেলার কামার পাড়ার অসুখা কামার জাতির বাস। গত তিন পুরুষ ধরে তারা শিষ্টকরা পিতলের অলঙ্কার তৈরী করে আসছে। দেশ বিভাগের আগে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে এর খুব সমাদর ছিল। গ্রামে প্রচুর জিনিষ, তা রাজবলহাটেই হোক অথবা কামারপাড়াতেই হোক, এক শ মাইল দূরে কলিকাতার ব্যবসায়ীদের মারকতই তা প্রধানতঃ বিক্রী হয়।

উপরোক্ত ধরণের কৃষি ব্যবসা এবং শিল্পবৃদ্ধ গ্রামের সঙ্গে আছে কৃষিকার অব্যবহিত কিছুটা প্রশাসনিক অধিকারসম্পন্ন গ্রাম। প্রাচীন ধরণের কোন কোন গ্রামে আছে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-শক্তিশ্রম প্রাধান্য। সেখানে প্রাচীন ধরণের সঙ্কট শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ধমান, জিঃই ও ঢাকার কয়েকটি গ্রাম এই ধরণের। অবশ্য এর রূপ সম্প্রতি পরিবর্তিত হয়েছে। হুগলীর তারকেশ্বর অথবা বীরভূমের বক্রেশ্বর দেখান। সেখানে দেশের নানান স্থানে থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে এবং ব্রাহ্মণরা পুরোতিহের কাজ করে।

পরস্পর নির্ভরশীলতা

যে সমস্ত ছোট ছোট গ্রামে ক্ষেত মজুর ও ডমিইন মজুর আছে সেগুলো ছাড়া কোন গ্রামেই এংটি মাত্র বৃত্ত নেই। কোন কোন গ্রামে দুটি এবং কোন কোন গ্রামে বহু বৃত্ত আছে। আগের বর্ধমান অধুয়ারী ব্যবসা কেন্দ্রিক গ্রামগুলো শুধু নিকটবর্তী স্থানে নয়, দূরবর্তী অঞ্চলেও পণ্য সরবরাহ করে। সাম্প্রতিক হাটে বিক্রয়ের জগৎ আসে গরাদি পাত। এই হাট ঘন ঘন হয় না; বটে, তবে এটা এ ধরণের বাজারের স্বাভাবিক সীমারেখা অতিক্রম করে সমগ্র এলাকার চাঙ্গি পূরণ করে।

কৃষকরা বছরে একবার মাত্র যে জিনিষ কেনে সেগুলো তারা মরশুমী মেলা থেকে সংগ্রহ করে। কোন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে এইরকম মেলা হতে পারে, কিন্তু তা গ্রামবাসীদের আর্থিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। বিশেষ করে কসল কাটার পর এইসব মেলা অল্পকিছু হয়। বরিশালের কলিঙ্গনরী মেলা বিখ্যাত। সেখানে বিক্রয়ের জগৎ আসে হাজার হাজার নৌকা। বীরভূমের বৈরাগীতলার লোকে শুধু আমোদ প্রমোদের জগৎ আসে না। সেখানে প্রচুর পরিমাণে ভাল লাঙ্গল, দরজা, জানালা, কড়িকাঠ কিনতে পাওয়া যায়।

একজন কৃষক তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সপ্তাহ সপ্তাহ বেনে, অন্তঃ জিনিষগুলো সে বছরে একবার মাত্র ক্রয় করে। এই সমস্ত বিশিষ্ট গ্রাম, হাটবাজার এবং ধর্মস্থান বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোর মধ্য দিয়ে গ্রাম-বালার অধিবাসীদের সেবা করে আসছে। কৃষক, ব্যবসায়ী কারিকর, পুরোহিত ও শক্তিশ্রম এইভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কাঠামোর মধ্যে বসতি অথবা অল্প সম্পর্ক সঞ্চিত।

ভারতের বিভিন্ন অংশের গ্রাম অর্থনীতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে জাতিভেদে প্রথা গ্রামের আর্থিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অতীত জিনিষপত্র বিনিময় করার প্রথা ছিল। এই সেনেদেনে অর্থের বড় ভূমিকা ছিল না। তখন ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালখুশী অল্পাধারে সম্পদ নিয়ে কাটাকাটি হত না। ব গ্র গ্রাম অথবা বিশেষ একটি জাতের প্রয়োজন অল্পাধারে সম্পদের আদান প্রদান হত।

বখন গ্রামে লোকসংখ্যা কম ছিল এবং গ্রামেই তাদের কাজকর্মের অভাব হত না, তখন কৃষকরা তাদের উৎপন্ন জিনিষপত্রের বিনিময়ে ছুতার, কাষার, দাপিত, কুমার, মুলমোটার, জোড়িবাঁধের প্রভৃতি ক্রয় করত। এর সঙ্গে পুরুষাবৃত্তের বৃদ্ধি বৃদ্ধি ধরে গ্রামসমাজের লোকের মধ্যে একটা নিরাপত্তার আব বজায় ছিল।

এইরকম বিভিন্ন জাতের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মত সমান্তরালভাবে পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যেও একটা পারস্পরিক বন্ধন গড়ে উঠে। দুর্ভিক্ষবরণ বলা যায়। দুর্শিখারান জেলার কৃষকদের মধ্যে প্রথা আছে, বন্ধন কোন কৃষক একা অথবা সপরিবারেও তার ভ্রমি চাষ এবং কসলকাটার কাজ করে উঠতে পারে না, তখন প্রতিবেশীরা তাকে সাহায্যের হস্ত এগিয়ে আসে। তেমনি অপর কোন প্রতিবেশী কৃষকের প্রয়োজন হলে তাকেও অমূল্যভাবে সাহায্য করা হয়। উড়িষ্যার পুরীতে মুলিয়া জেলার মধ্যে সমগ্র গ্রামটি কতকগুলি ওয়ার্ডে ভাগ করা আছে। বিবাহ প্রকৃতি অনুষ্ঠানের সময় তারা রাষ্ট্রাবায়া ইত্যাদি ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করে। জাতিগত পারস্পরিক নির্ভরতা ছাড়াও এই প্রতিবেশীমূলত বন্ধন অত্যন্তে পল্লী-ভারতের পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তি ছিল। এর ফলে একই সমাজের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও একটা পারস্পরিক নির্ভরতা বজায় আছে।

পরিবর্তনের ধারা

পত দু'শত বছরে বাংলা দেশে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা পৃথকভাবে অথবা সমগ্রগতভাবে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সরকারী নথিপত্রের ভিত্তিতে যে সমস্ত রিপোর্ট এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখা হয়েছে, তা পাঠ করলে সাম্প্রতিক কালে বাংলা দেশে কি ঘটেছে, তার নির্ভরযোগ্য ছবি পাওয়া যায়। (নরেন্দ্র সিংহ : ১৯৪৬, 'রি ইকনমিক চিষ্ট্রি অফ বেঙ্গল ক্রম পলজী টু দি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট')। গ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকার বিশেষ বিশেষ পরিবারের ইতিহাসের টুকরো টুকরো অংশ নিয়েও সেই কাহিনী গড়ে তোলা যায়। ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন পরিবারের ক্ষেত্রে অবশ্য কোন গড় তোলা যায় না। কিন্তু ধনী পরিবারের ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তরের অথবা সম্পত্তি বিভাগ সংক্রান্ত মামলার নথিপত্র থেকে উপযুক্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়।

দুর্ভিক্ষবরণ আমরা রায়পুরের সিংহ-পরিবারের কথা বলবো। এই গ্রামটি বীরভূম জেলার বোলপুরের চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অজয় নদের তীরে অবস্থিত। এই নদীটি বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমানা ও কাটোয়ার কাছে গজায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। এক সময়ে নদীতীরে সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র, সুসজ্জিত মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র ছিল। কবি জয়দেব (‘দ্ব্যংশ শতাব্দী’) অজয় নদের তীরে কেন্দ্রীভূত বাস করতেন। তাঁর সম্মানার্থে প্রতি বছর সেখানে একটি মেলা হয় এবং বাউল সম্প্রদায়ের সাধুরা প্রাচীন বটগাছের তলার বসে ভক্তিমূলক গান করে। সেউলি ও নুপুর গ্রামে একাংশ ও দ্ব্যংশ শতাব্দীর পাখরের ভাস্কর্যমূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। ইছাই ঘোবের বিরাট ইটের মন্দির বোম্ব হয় পরে নির্মিত এবং আরও পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়। এখন গভীর জলদাকীর্ণ হয়ে আছে। নুপুরে একগুণ সামান্য উচ্চজমিকে ছুনডাঙ্গা বলা হয়। সেখানে সম্ভবত বিক্রমের জন্ত লবণ মজুত রাখা হত। কয়েক মাইল সম্ভবত বিক্রমের জন্ত লবণ মজুত রাখা হত। কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ইলামবাড়ার এক সময় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যস্থান ছিল। পশ্চিমে অবস্থিত ইলামবাড়ার এক সময় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যস্থান ছিল এবং সেখানে নীলের চাষ আর পালায় খেলনা তৈরী হত। এক হাজার এবং সেখানে নীলের চাষ আর পালায় খেলনা তৈরী হত। এক হাজার বছর ধরে অজয় নদের তীর এইভাবে ধ্বংস বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে আছে। এখানে মূলত গ্রামের উত্তরে জন টীপ নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন প্রমোদ একটা বাড়ী তৈরী করেন।

রায়পুরের সিংহ পরিবার

রায়পুরের সিংহরা এসেছিলেন মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থেকে। তারা উত্তর-পূর্বী প্রদেশীয় রাজসূর। চন্দ্রকোণার লাটচাঁদ সিংহ অজয় নদের তীরে প্রাচীন নুপুর গ্রামের কাছে বসতি স্থাপন করেন। কিঞ্চদম্ভী আছে, আসবার সময় তিনি মেদিনীপুর জেলা থেকে এক হাজার সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। লাটচাঁদের ছেলে খামকিশোর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন হিসাবে কাজ করতেন এবং ইউরোপে রপ্তানীর জন্য জন টীপকে কাপড় সরবরাহ করতেন।

কালক্রমে খামকিশোর প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেন। ‘রাজা’ উপাধিধারী একটি ক্ষুদ্র মুসলিম পরিবার তখন বীরভূমে সন্নিহিত করতেন। জেলার বর্তমান হেডকোয়ার্টার শিউড়ির কাছে রাজনগরে ছিল তখন সদর দপ্তর। বীরভূমের এই রাজা খামকিশোরের কাছে গৃহ গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে তাঁর জমিদারীর শিউড়ি থেকে রায়পুর পর্যন্ত অংশ খামকিশোরের হাতে তুলে দেন।

খামকিশোরের চার ছেলে—জগমোহন, ব্রজমোহন, ভুবনমোহন ও মনোমোহন। বড় ছেলে জমিদারীর ভার পান, তৃতীয় ভুবনমোহন ব'বার অধিসত্ত্বাবধান করতেন। ছোট মনোমোহন সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনার সময় কাটাড়েন। মনোমোহনের চার ছেলে। তার মধ্যে সিতিকণ্ঠ সত্যেন্দ্রপ্রসাদের পিতা। ব্রিটিশ আমলে সত্যেন্দ্রপ্রসাদের একটি প্রদেশে প্রথম ভারতীয় গভর্নর নিযুক্ত হন। খামকিশোর তাঁর সময়ে কাশ্মির ভাষার সুশীল বলে বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁর নাতি সিতিকণ্ঠ শিতামহের মত কাশ্মিরি ভাষা ছাড়াও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন।

এইভাবে সিংহরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ একজন থেকে জমিদার হন। আসে-পাসে শ্রমিকের মজুরী ছিল খুব সস্তা। চুসাহারী ইংরেজ সওদাগররা এখানে নীল আর বেশমের ক্যাট্টরী বানাতে শুরু করে। ডেভিড আর্সকিন নামে এক ব্যক্তি রায়পুরের কয়েক মাইল পশ্চিমে জন টীপের সহায়তায় একটি নীলের ফ্যাক্টরী তৈরী করেন। টীপ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এবং ডেভিড আর্সকিন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মারা যান এবং ডেভিড আর্সকিনের ছেলে হেনরী আর্সকিন পিতার ব্যবসার মালিক হন। কথিত আছে সিতিকণ্ঠ অনতিবিলম্বে হেনরী আর্সকিনের ব্যবসার অংশীদার হয়ে যান। এর ফলে সিতিকণ্ঠ যেমন বাণিজ্য এবং জমিদারী থেকে অর্থ নিয়ে বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদনে লগ্নী করার সুযোগ পেলেন, তেমনি হেনরী আর্সকিনও তার দলে স্থানীয় একজন শক্তিশালী জমিদারকে পেয়ে গেলেন। এটা আর্সকিনের পক্ষে কম সুবিধার কথা নয়।

পাটনারের সাহায্যে সিতিকণ্ঠ তাঁর ছেলে নরেন্দ্র ও সত্যেন্দ্রকে শিক্ষার জন্ত ইংলণ্ডে পাঠান। সত্যেন্দ্র আইনশাস্ত্রের দ্বারা শিক্ষিত হন। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই বিলাতে লর্ডের মর্যাদায় ভূষিত হন।

রায়পুরের সিংহ পরিবার এখনও সেখানে আছেন, কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর প্রাপ্ত। তাঁদের পরিবারভুক্ত লোকেরা এখন কলিকাতা এবং অন্যান্য সহরে চলে গিয়ে আইন, শিক্ষা প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। যদি তাঁরা তাঁদের বংশগত বৃত্তি—সরকারের অধিনে কেবাবী ও হিয়ারারকদের কাজ নিতেন, তবে সিংহ পরিবারের ইতিহাস এক রকমের হত। কিন্তু সিংহরা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে কলে কমিয়ারী ও শিল্পে প্রবৃত্ত হওয়ার পরিবারের লোকেরা বুটশ শাসনাধীন সহরে আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের জীবন কম সঙ্গে প্রতিবেশীর তুলনায় নিজেদের উন্নত অবস্থার তুলতে সক্ষম হন।

শান্তিপুর সহর

উপরে যে ইতিহাস দেওয়া হল, তা' চার পৃষ্ঠা ধরে অর্থাৎ কিকিঞ্চিৎ একশো বছরে ঘটেছে। পরিবারের এক বিরাট অংশ প্রথমে চন্দ্রকোণা থেকে রাহপুর আসেন; তারপর রাহপুর থেকে আসেন কলিকাতা ও কলকাতা সহরে। বাংলার তরেকটি অপেক্ষাকৃত পুরনো সংহে বহু লোক দেশান্তরী হওয়া সঙ্গেও পরিবারের কিছু কিছু লোক তাঁদের পৈত্রিক ভিটা জাঁকজড়িয়ে আছেন। তবে সমগ্র প্রদেশের অর্থনৈতিক শক্তিশালী পরিবার হওয়া ও ফলে তাঁদের বৃত্তির মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে।

গঙ্গাতীরবর্তী শান্তিপুর-পূর্ব পাঁচশ' বছর ধরে ব্রাহ্মণ শিকার কেন্দ্র, ব্যবসা-স্থল ও জীবনকেন্দ্র। মুসলমান শাসকদের রাজত্বকালে সহরের পূর্ব ও পশ্চিম দিক চুটি ছোট ছোট কোলা নির্মিত হয়। উত্তর জায়গা থেকে আগত পাঠান ও রাজপুত সৈন্য সেখানে বাঁটি করেছিল। আজ এই কোলার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু শেখোক্তাদের বাংলা-ভাষাভাষী বংশধররা অতীত গৌরবের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও এখানে বাস করছে। তপনকার মসজিদ ও কাফকাগ্য করা কবরগুলো বর্তমানে বড় বড় বৃক্ষ সমাকীর্ণ অঞ্চলে ইতস্তত সমাহিত এবং ভ্রমশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছে।

উনবিংশ শতকের গোড়ার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এই অঞ্চলে স্বত্বাধীন প্রতিষ্ঠান পোড়ে তোলেন। বীজকর্মের মত নাল এবং সুতীর কাপড় শান্তিপুরের গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিণত হয়। তিল, তক্তবার প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতিগুলো সহরের হুই-কুতীরাংশে বসতি স্থাপন করে। তাদের পাড়ার বড় বড় টিটের বাড়ী অঞ্চল জুড়ে

মন্দির আছে। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, পণ্ডিত, কীসারী, সমস্ত জাতি নিজ নিজ পাড়া আছে এবং তাদের নাম অনুসারে সহরের বিভিন্ন মহল্লার নামকরণ হয়েছে।

সহরের উন্নতি ও অবনতির মধ্যে টানা পোড়েন হয়েছে। এক সময়ে সেখানে ত্যালেরিয়ায় প্রকোপ ছিল এবং ভয়ংকর। মধ্যে হ্রাস পায় এবং বাড়ী জনশূন্য হয়। তবে পূর্বের জাতিগত বসতি বর্ধাধর ভাবেই আছে।

জাতিভেদ প্রথা এবং মাদ্রাসার জীবিকা চিত্রিত করে যদি কোন মানচিত্র জাঁকায়, তাহলে তৎকর্তৃকিত তৎপূর্ণ বৈষম্য প্রকাশ পাবে! সহরের পশ্চিমে একটি মহল্লার গোয়ালদার বাস অঞ্চল তারা গবাদি পশু পালন এবং দুধ, ঘি প্রভৃতি তৈরি করত। এখন তারা তাঁত বোনা শুরু করেছে। শান্তিপুর দুধ থেকে তৈরী মিষ্টায়ের ভগ্ন বিখ্যাত। আগে গোয়ালদারা এই ব্যবসারে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল, যেমন হয়েছে ময়রাগা। বাজারের মাঝখানে তাদের দোকানপাট আছে। বিদেশী গুঁড়োগ্রন আমদানী হওয়ার ফলে ময়রাগা সন্তানদের গোয়ালদারের গুঁড়ো দুধ দেখে এবং তারা এই গুঁড়ো দুধ ভলে সিদ্ধ করে ঘরে পানির তৈরী করে। গোয়ালদার নিজেদের গবাদি পশুর দুধ বিক্রী করে আগে যে পরিমাণ আয় করতো, এখন এই শিল্পে তার চেয়ে আয় কম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু গবাদি পশু বিক্রী হয়ে যাওয়া এবং বিশেষ থেকে গুঁড়ো দুধ আমদানী হওয়ার এক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই গোয়ালদারা এখন বেশগত বৃত্তির বদলে তাঁত বোনা জারি করেছে।

ব্রাহ্মণ, তিল, কাবুজ ও অভ্যন্তর জাতিও তাদের পেশা পরিবর্তন করেছে। এই সমস্ত জাতের লোকেরা যেখানে বাস করতো, এখন সেখানে আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং অভ্যন্তর পেশাদারী লোক পাওয়া যায়। জাতের সঙ্গে সংযুক্ত বংশগত ব্যবসা-বাণিজ্য পরিম্পর প্রথিত ছিল, তার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু জনসংখ্যা প্রায় একই রকম আছে। [ক্রমশঃ]

একটি বছর

বন্দে আলী মিয়া

জীবনের শাখা হতে খসে গেল একটি বছর
একটি চরণ-চিত্র জাঁক হলো কালের পাতায়—
অনীয় প্রবাহ থাকে যিশে গেল একটি নিশাস
প্রাণীপ নির্বিদ্যা গেল রক্তনীর বিনিত্র প্রহরে।

একটি বছর ঘোর হারান্ট নিখর উভার
সাতটি রঙের ছবি হুড়ে গেল যথেষ্ট আড়ালে—
একটি বীজের গান খেয়ে গেল আজিকে শুধা
আম্বার উল্লস দিন ইতিহাসে লেখা করে গেল।

স্বপ্নে অনাধি পথ—গভীরীন খুসর সাদারা
পথের দু'পাশে কীপে পুতান মীতের কুদারা।
আমার সন্ধ্যা আসে চুপি চুপি বৃষ্টির মতন
জীবনের দিকে দিকে কেঁদে কেঁদে নদীর জীবন।

আমার দুখের গান পেলো নাস্তা মনের ক্রিয়ান
তোঁর দলনে তুলে পালে পালে হলো নিঃশেষ।
একটি বছর গেল—যেখ গেল কুতিন পথ—
যাতন করিয়া জীবন জীবিতকে আনন্দ বিজিত।

শ্রীশীকান্ত চক্রবর্তী

[প্রখ্যাত ত্রানিটরি ইঞ্জিনীয়ার]

আট মনোবল ও পর্যাপ্ত যোগ্যতা—জীবনে সাফল্যলাভের জরুরী। এ দুটি জিনিষ চাই-ই। বিশিষ্ট ত্রানিটরি ইঞ্জিনীয়ার শ্রীশীকান্ত চক্রবর্তী কর্মক্ষেত্রে যখন এগিয়ে আসেন, এর কোনটাই কমতি ছিল না তাঁর। প্রত্যাশিত ফলসহ পেয়েছেন তিনি তাই—অনেকের কাছেই অমনি বা বিশ্বাসের বস্তু।

শ্রীচক্রবর্তীর সমগ্র ছাত্রজীবন নিরলস সাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বরিশালের হাটপাকিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান তিনি—১৮৮৪ সালের মে মাসে তাঁর জন্ম। পিতা গঙ্গাচরণ দ্বারবর ছিলেন তৎকালীন একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। মাত্র চার বছর বয়সে বয়স তখনই শীকান্ত শিশুতারা হন। এগারো বছর বয়সে তিনি মাতৃও (আনন্দময়ী দেবী) হারান। এইই মাঝখানে পড়াশুনো চলতে থাকে তাঁর, বিভিন্ন পরীক্ষায় সূচিত হতে লাগলো তাঁর বিশিষ্টতা।

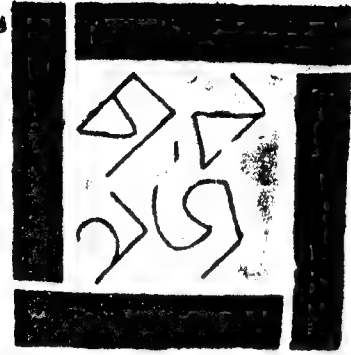
ছাত্রজীবনের গোড়াকার দিনগুলো শীকান্তের অতিবাহিত হয় মামার বাড়ীতে—বরিশালেরই গাঙ্গিপু ব্রহ্মে। এখানে থেকেই ছাত্ররুপে পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হন। তারপর চলে যান তিনি বরিশাল জেলা স্কুল, সেখান থেকে ১১-৩ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন আর সাত বৃত্তিসহ। ১১-৫ সালে ঢাকা কলেজ থেকে তিনি কাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেবারও স্বাভাবিক বৃত্তি পেলেন একটি।

বৃত্তিসহ একে, এ পাশ করেই শ্রীচক্রবর্তী শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে এসে ভর্তি হলেন। যেন যেন দুটসহস্র তখন—যে ভাসেই হোক ইঞ্জিনীয়ার হতে হবে। ১১-১০ সালে পরীক্ষা দিলেন তিনি এই লাইনে—শীকা ও অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ বি, টি, ডিগ্রী তাঁর হাতে এসে গেলো একবারের চেষ্টাতেই।

অজিত জ্ঞান এখন কর্মজীবনে প্রয়োগ করার পালা। প্রথমটায় শীকান্ত কিছুদিন বাংলা সরকারের অধীনে কাজ করেন প্রিন্সার্স সার্ভে ইনস্ট্রাক্টররূপে। বেঙ্গল ত্রানিটরি ইঞ্জিনীয়ারিং অফিসেও (সরকারী) তিনি কিছু কাল নিযুক্ত থাকেন। তারপর কলকাতা কর্পোরেশন এসে পড়েন তিনি—এখানে ওয়াটার ওয়ার্কস-এর অগ্রতম ইঞ্জিনীয়ার, রেসিডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার (ডেপুটি) চেড পাইপ লেয়ার (ওয়াটার ওয়ার্কস) প্রভৃতি নানা দায়িত্বশীল পদে কাজ করেন।

১৯১৭ সাল পর্যন্ত শ্রীচক্রবর্তীর জীবন এমনি ধারার প্রবাহিত হয়ে চলে। হঠাৎ এক মোটর সাইকেল (নিজের চালিত) দুর্ঘটনায় পড়ে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। বেশ কিছুকাল চিকিৎসায়ীরা থেকেও সম্পূর্ণ স্বস্থ ও সবল হওয়া তাঁর হল না। উপায়চীন অবস্থায় তিনি কর্পোরেশনের চাকরি ছেড়ে দেন। চেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু এর পরই মাথার ভাবনা—এবারে কি করা যায়?

শীকান্তের মনের বল তখনও অটুট, তাই উপায় স্থির হতে বিলম্ব হল না। প্রাচীর ও ত্রানিটরি ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত সমস্তাংশে তিনি এতটা ব্যসাশ্রয় করে দিলেন। ব্যবসা প্রসার হয়ে চললো তাঁর দেখতে দেখতে। ত্রানিটরি ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যাপারে তিনি বহু ডিজাইন আবিষ্কার করেন এবং সেগুলোর বেশির ভাগই পেটেন্ট সার্টিফিকেট লাভ করে। শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও বিশেষ করে ইংল্যান্ডে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে ধার। সেখানে তিনি 'তানইকুইপ'



লিমিটেড নামক যে কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন, আজও রয়েছে তা চলতি। এ দেশের ত্রানিটরি ইঞ্জিনীয়ারিং ক্ষেত্রে করেকটি মৌলিক অবদান রয়েছে তাঁর।

শ্রীচক্রবর্তীর যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য তাঁকে মর্যাদা এনে দিয়েছে আরও নানা ভাবে। প্রাচীর সম্পর্কে মৌলিক প্রবন্ধ (থিসিস) লিখে লণ্ডন প্রাধাস ইনস্টিটিউট থেকে তিনি এম, আই, সি অনোয়ারী ডিগ্রিতে ভূষিত হন। ভারতীয় ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ার্স প্রতিষ্ঠানের তিনি পূর্ণাঙ্গ সদস্য হন ১৯২১ সালে। প্রায় ৮ বছর শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অনায়াসী লেকচারারের পদ অলঙ্কৃত করেন তিনি। ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ার্সের বাংলা কেন্দ্রের তিনি ছিলেন এক সময় ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ৯৭ বৎসরের অধিককাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলে ও সেনেটের সদস্য ছিলেন।

শীকান্ত একজন সত্যিকারের কর্মী-পুরুষ—আপন সীমিত কর্মক্ষেত্রে তিনি যা করেছেন, তুলনা হয় না। আজ তিনি ৭৬ বৎসরের



শ্রীশীকান্ত চক্রবর্তী

বুঝে, কিন্তু চোখে-মুখে বলছে এখনও আত্মবিশ্বাস ও কর্তৃত্বভিত্তিক হাপ। সম্পূর্ণ আত্মসমীক্ষার গঠিত এই বাহুরটি বিভিন্ন কারণে সত্যিই লজ্জাকর।

শ্রীমাতৃকড়িগতি রায়

[প্রবীণ লেখকসহ ও আইনজ্ঞ]

বাংলার নেতৃত্ব বহন বেশবহুর হাতে, সে সময় তাঁর একান্ত নিকট অঙ্গদারীদের অন্তর্গত ছিলেন এই মাতৃবী। আইন জগত আন্দোলনের সংগঠনে সেদিনে দেখা গেছে তাঁকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের পুরোধাগে। সেহে ও মনে কী সত্যের ও বলিষ্ঠ ছিলেন তিনি গোড়া থেকেই—উচ্চ ও দৃঢ়তার অটুট অভাব দেখা যায়নি কখনও। কংগ্রেসের উদ্ভূত শ্রীমাতৃকড়িগতি রায়ের নাম বলতে গেলে তখন বহুর অবস্থা হুঁতুয়ে।

মেদিনীপুরের প্রাচীন গ্রাম জাড়ার (এককালে হগলীর অন্তর্গত) বিখ্যাত রায়বংশের কুতী সন্তান মাতৃকড়িগতি। পিতা পরলোকগত বোসেন্দ্রচন্দ্র রায় ছিলেন সেকালে মেদিনীপুরের অন্যতম উকিল। মেদিনীপুর সহরেই মাতৃকড়িগতি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ সালের বে মাসে।

বাংলাদেশের ভাষাবর্ণানে বঙ্গদেশের বিভাজন শুরু হয় তাঁর। মেদিনীপুরের হার্ডিঙ্গ স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন অস্বাভাবিক। এই সময় পিতৃহারা হওয়ার চলে আসতে হয় তাঁকে জাড়ার। প্রথম প্রবীণ পর্যন্ত গ্রামের স্কুলেই তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান। তারপর ১৮৯৮ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট হ' থেকে। কলাকল বহন বের হল, দেখা গেল তিনি বৃত্তি পেয়েছেন এবং ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করে পঞ্চম লাভ করেছেন একটি। ক্রমে এক-এ, বি-এ, (অনার্স), এম-এ-সব করাটি পরীক্ষার তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ফাট আর্টস পরীক্ষা দেন তিনি মেদিনীপুর কলেজ থেকে এক অক্ষপাতের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। শেষের করাটি পরীক্ষা কিন্তু যেন তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। ১৯০৪ সালে তিনি আইন-শাস্ত্রের পরীক্ষার (বি-এল) উত্তীর্ণ হন—যার এইখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্তি।

জাড়ার জমিদার বসন্ত হলে মাতৃকড়িগতি কর্তৃ-জীবনেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করবেন, এ বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু বৈচিত্র্য বটেই একটি ক্ষেত্রে যেখানে তাঁর ভেতরী মন খুশি থাকতে পারে নি ধরাবাঁধা একটা বৃত্তিক নিয়মে। আইন পাল করে প্রথমেই তিনি ব্যবসা শুরু করেন মেদিনীপুরের প্রাদেশিক। পরামর্শে মনে

উঠল তাঁর মেথডে মেথডে কম নয়। কিন্তু বেশি-দিন এতে জাঁকড়ে থাকা হল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (বঙ্গবী) হুঁতুর তিনি এগিয়ে এসে গ্রহণ করেন বিশিষ্ট ভূমিকা। কিছুদিন বেতে না বেতেই ভৎসালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই পদে থাকা অবস্থায় তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বে বাতস্ত্র প্রদর্শন করেন, তা সত্যি অসাধারণ মনোবলের পরিচায়ক।

শেষ অবধি এই সরকারী পদেও মাতৃকড়িগতি রায়ের থাকা হল না। নীতিগত প্রায় দেখা দিলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং জাড়ার শুরু করেন মেদিনীপুরে আইনজীবীর পেশা। ১৯১৪ সালে মেদিনীপুর থেকে তিনি চলে আসেন কলকাতা হাইকোর্টে। এখানে আসার আগের সময়ই সংগঠিত হকল তাঁর খ্যাতি হুঁতুয়ে পড়ল। সেদিনে বারীন্দ্রচন্দ্র বসু, উপেন্দ্রনাথ বসু, পাণ্ডুরাম প্রমুখ বিপ্লবীগণকে আশ্বাসদানের নির্বাহিত জীবন থেকে হুঁতুয়ানের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি—এই প্রমাণিত তাঁর জাঁকও হয়েছে।

হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করার সময়ই জাড়ার লেখক চিত্তব্রজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। পরলোকগত রাণের (ম্যাজিস্ট্রেট) জুনিয়র হিসাবেও কাজ করেছেন তিনি বহুদিন। একদিকে ছিল আপন বোগাতা, অন্যদিকে জুটছিল এই সুবর্ণ সুযোগটি। ব্যবসার অর্থ ও প্রত্যয় পেতে তাই বিলাস ঘটেছিল তাঁর।

প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মাতৃকড়িগতির পক্ষে হাইকোর্টের গভীর ভেতর নিজেকে বেশি দিন আটকে রাখা সম্ভব হল না। ইত্যাকসরে নির্মম জালিগান ও গোলাবাস ইত্যাকাক ঘটে গেছে—দেশের চলেছে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আলোড়ন। ১৯২০ সাল—কলকাতা মহানগরী বকে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন কল—গৃহীত হল সেখানে গান্ধীজির ঐতিহাসিক আইন জমাত আন্দোলনের প্রস্তাব। হাইকোর্ট থেকে অমনি বেরিয়ে পড়লেন মাতৃকড়িগতি এবং আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন সক্রিয়ভাবে।

বেশবহু চিত্তব্রজ তখন বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর বিবর্ত অঙ্গদারীদের মধ্যে হয়েছেন দেশপ্রাণ বীজেন্দ্রনাথ শাসন (প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক) ও মাতৃকড়িগতি (কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক)। এই দুইজন সহচর মিলে মেদিনীপুরে শক্তিশালী কংগ্রেসসংস্থা গঠন করে তুলেন। অব্যাহত সংগ্রামের দল ও কর কতক পরিণতিতে ইউনিয়ন বোর্ডগুলো বাতিল হয়ে গেল সেখানে। ইত্যাকসরে (১৯২১) শাসন অসহ্য হওয়ার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদকের তত্ত্বাবধি এসে পড়ে জাড়ার ওপর। জিল্প অব ওয়েলস্ বরকট আন্দোলন চলতে একই সময়ে তখন জোর। এই আন্দোলনকে জরাজীর্ণ করার জন্ত মাতৃকড়িগতি রায় অবিরাম খেটে চলেন—যার কলহতাপ বাংলায় সেদিনে প্রায় বেক লক্ষ বেজাসময়কর নাই তালিকাকৃত হয়েছিল।

১৯২৬ সাল পর্যন্ত জাড়ারকে নিরলস ভাবে বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করতে দেখা গেছে। এই সময় মুক্তচন্দ্রের (প্রকাশী) সম্বন্ধে রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ বর্ণিত। হর। উত্তরবঙ্গ জাতীয় কমিটিতে (যার সভাপতি হিসেবে পাণ্ডুরাম প্রমুখ) সভাপতিত্ব ও সভাপতি পাণ্ডুরাম রায়ের সক্রিয়



শ্রীমাতৃকড়িগতি রায়

ছিলেন সম্পাদক। দেশবন্ধু গঠিত স্বাধীনতা পার্টিতে সম্পাদকের গুরু দায়িত্বও ছিল তাঁরই বলিষ্ঠ হাতে। আইন অমান্ত আন্দোলনে দেশ গ্রহণের জন্য তাঁকে কারাজীবন বাপন করতে হয়েছে কিছুদিন।

আগুন বৈপ্লবীকরণ কর্তৃকীনে বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিষিদ্ধ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন সাতকড়িপতি। ১৯২৩ সালে কলকাতার বড়বাজার কেন্দ্র থেকে তিনি বন্ধীর ব্যবস্থা পরিষদের সমস্ত নির্বাহিতা ছন। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সমস্ত ও কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন তিনি বেশ কিছুদিন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সমস্তপক্ষে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন কয়েক বার। পান্ডীত্বের আশ্রয়ক্রমে তিনি বাংলার হরিজনসেবক সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব নেন ১৯২৪-৩৫ সালে। স্বাধীন আদলে পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংস্কৃত পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব ভ্রম হয় তাঁরই ওপর।

স্বাস্থ্যের কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সাতকড়িপতি অবসর গ্রহণ করেন বলতে গেলে ১৯৩৪ সালেই। কিন্তু এর পরও প্রয়োজনের মুহুর্তে দেশের ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন নি বা আকণ্ড পারছেন না। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময়ও তাঁকে নিজ জেলার কাজ করতে দেখা গেছে।

অশীতিবর্ষীয় এই বৃদ্ধের মনে আকণ্ড রয়েছে প্রচুর উদ্বোধনা ও দেশ পটনের আবেগ। দেশবন্ধুর নেতৃত্ব ও আদর্শ এখনও তিনি মরণ করে থাকেন কথার কথায়। ১৯২০ সালে হাইকোর্ট ছেড়ে দিয়ে আসলেও আবার পরবর্তী যুগে নতুন উদ্ভবে আইন ব্যবসা চালান সেখানেই। এখনকার অবসর জীবনে তিনি বহু জনসংস্কার সহিত সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট। মেদিনীপুর স্মিলনীর তিনি আজীবন সভাপতি, কলিকাতা রিলিফ কমিটি, অরবিন্দ সেবক সমিতি, বর্তমান বিভাগীয় জেলা স্মিলনীর নেতৃত্বও তাঁরই হাতে। দেশকর্মী ও সমাজসেবী সাতকড়িপতি একশে করেকথানি গ্রন্থ রচনার ব্যাপ্ত রয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে জাতি আরও কিছু বহি পাৱ, ভাত্তে বিখিত হবার নয়।

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী

[পশ্চিমবঙ্গের অন্ততম বনপাল]

নিরন্তরবিত্ত অবস্থার বাড়ালী ঘরেব একটি ছেলে—সহায়সবল বলতে ভেমন কিছুই নেই। আছা বেটুকু, সে মনের জোর আর অধ্যবসায়। বাজা সুর হয় এই মূলধন নিয়েই, সকলভাও ছুটে থাকে রাপে রাপে। এই অধ্যবসায়ী ও সকলকায় পুরুষটি হলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্ততম বনপাল শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী।

পাকনা জেলার ভাঁড়বন্দ গ্রামে শ্রীচৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন ১৯১১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। তাঁর পিতৃদেব শ্রীকুমারনাথ চৌধুরী সে সময়ে একটি ব্যাক্সের সহিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট। সীমাবদ্ধ আর ছিল তখন তাঁর, অখচ পরিবার নেহাৎ ছোট ছিল না। ছেলেকে মাহুয় করতে হবে, তাই পাবনা নগর স্কুলে (সোপালচন্দ্র ইন্সটিটিউশন) তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন এং টু বৎ হতেই।

কুমুদনাথের পড়াশুনো এগিয়ে চলে এমনি ভাবে—স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি আপন নকতা প্রদর্শন করতে থাকেন। প্রকৃতকেন্দ্রেই তাঁর ওপর দায়ের (শ্রীকুমার বান্দী দেবী) প্রভাব

পড়ে যুব বোধিরকর। অকুন্ড উত্তর ও অধ্যবসায়ের চির-উৎস তাঁর পুণ্যময়ী জননী। শ্রীচৌধুরী আকণ্ড মনে করেন যে, তাঁর মাত্রে বা কিছু উত্তম, সে তাঁর মাত্রেব দান।

কুমুদনাথের সমগ্র জাতাজীবন কৃতিত্বের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। গ্রন ও নিষ্ঠার কল্যায়ক তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করতে সমর্থ হন আর সেটি ১৯৩৫ সালে। বৃত্তি নিয়ে তিনি পাবনা থেকে চলে আসেন কলকাতার ও জর্জি হন এখানে রিপন কলেজে (বর্তমান হুয়েঞ্জেনাথ কলেজ)। এখানে সাধনা চললো আরও কঠিন—সাবনে এককমাত্র আদর্শ রাখা হলো 'হাজারিমা অধ্যয়নঃ তপঃ'।

ইত্যবসরে (১৯৩৭) আই-এস-সি পরীক্ষা দিয়েছেন শ্রীচৌধুরী। কল যখন বের হল, সেখা গেলে তাঁর নাম উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সকলের শীর্ষে। মনে জোর পেলেন তিনি প্রচুর, ভাবলেন—অধ্যবসায় থাকলে প্রত্যাশিত সিদ্ধি না এসে পারে না। রিপন কলেজ থেকে এর পর তিনি চলে যান প্রেসিডেন্সী কলেজে—বোতানিতে (উত্তীর্ণ শাস্ত্র) অনার্স নিয়ে তিনি সেখানে ছ'বছর বি-এস-সি পড়েন। ১৯৩৯ সালে তিনি পরীক্ষা দিলেন একই এবারেও নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার মর্যাদা জুটল তাঁরই।

শ্রীকুমুদনাথ বহাভীতি এম-এস-সি পড়া সুর করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু অর্ধনৈতিক এমনি বন্ধ হয়ে সেখা গিল, তাঁকে তখনই একটা ভাল কাজ না নিলে নয়। বরাবর কৃতী ছাত্র তিনি—কর্মক্ষেত্রেও পিছনে থাকবেন না, এই দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর ছিল। জংকালীন বাংলা সরকারের বন বিভাগে একটি অফিসারের পদ পেয়ে যান তিনি অল্পদিন মধ্যেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়ে তিনি অমনি যোগদান করেন সেই কাজে ১৯৪০ সালে।

কর্মজীবনেও শ্রীচৌধুরী সুনাম অর্জন করেছেন, বলতে বিধা মেই। প্রথমাবস্থায় দেয়াত্বনে গিয়ে ট্রেনিং দেওয়ার পর তিনি



শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী

কর্মে নিরুক্ত হন জলপাইগুড়িতে—ডিভিশনাল করেন্ট অফিসারের (বিভাগীয় বন অধিকর্তা) দায়িত্ব ভার তখন তাঁর ওপর। এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি চটগ্রাম, কলকাতা, কাশিগাং, বাঁকুড়া এসকল স্থানে বহুদিন কাটিয়েছেন। বখন যেখানে থেকে এসেছেন, বোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে তাঁর সেখানেই। ১৯৫৩ সালে রাজ্য সরকার তাঁকে কনসার্টের অব কন্সট্রল বা বনপালের পদে অধিষ্ঠিত করেন আর তাঁর অফিস নির্দিষ্ট করা হয় কলকাতাতে। আজও তিনি সম-বোগ্যতার সঙ্গেই এই পদের গুরু দায়িত্বভার বহন করে চলেছেন।

বনবিজ্ঞা ও ভূমি সংরক্ষণ সম্পর্কে শ্রীচৌধুরী নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করতে পারেন। এবিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্ত ১৯৫০ সালে রাজ্য সরকার তাঁকে পাঠিয়েছিলেন অক্সফোর্ডে। সেখান থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন, এখানে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগের জন্ত চেষ্টা রয়েছে তাঁর। তিনি মনে করেন যে, ভূমিকময় নিরোধ ও বন সংরক্ষণ জাতীয় স্বার্থের দিক হতে একান্তভাবে প্রয়োজন—বঙ্গাবিবাক্ত বাংলা ভাষা ভারতের জনগণকে এবিষয়ে এখনও অনেকখানি সচেতন হ'ত হবে।

বনবিজ্ঞা ও বন সংরক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণনাথ মারের মাঝে দেয়াছেন থেকে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইন্ডিয়ান কংস্টার' নামক দাসিকপত্রে প্রবন্ধটি লিখেছেন এবং সেগুলি নানাদিক থেকে মূল্যবান। হরিণবাটার যে সংরক্ষণী কুবি মহাবিদ্যালয়টি আছে, সেখানেও বনবিজ্ঞা ও বন-সংরক্ষণ বিষয়ে তিনি বছরে কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা করে থাকেন। এ সকল নিশ্চরই তাঁর প্রতিভা ও বোধাত্মক পরিচায়ক।

জরাসন্ধ

লৌহ-কারাগারের অন্তরালে যে বিমরকর জগৎ—বর্তমানে যাকে বুদ্ধ আকাশের নীচে সমাজ-নিরঞ্জিত সভ্যমণ্ডল বিস্তৃত, সেই চিরকাল স্থগাই করে এসেছে, বাঙ্গের জীবন নিরন্তর লোকের অভিশাপে অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী অধিবাসীদের মুখ-হৃৎ আশা-আকাংক্ষা আনন্দ-বেগনার বিচিত্র রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন জরাসন্ধ—তাঁর লৌহকপাটে।

জরাসন্ধ—লৌহকপাট। বাংলা-সাহিত্যের রাজহরদ্বারে এই সেধিন আসন গ্রহণ করেছে এই নাম ছুঁটি, জরাসন্ধ সাহিত্যে নবাগত। লৌহকপাট প্রবর্তে নবীন। চলতি সমাজের ধারাবাহিকতার যে জীবন ঠাই পায়নি, যে চিন্তের মহৎ প্রবর্ত পাশিয়ার্থিক বিকলতার সৃষ্টিত, যে স্বপ্নের কাননা-বাসনা বার বার কারাগারীত্বের অন্ধ গারে যা থেকে থেকে রক্তাক্ত সেই সমাজ-বহিষ্কৃত পথভ্রান্ত-জীবনের রূপ-রস-ভাব-ভাষা চিত্তবৃত্তির স্রষ্টাভিহীন বোধই জরাসন্ধের লৌহ-কপাটের প্রধান উপলব্ধি।

জরাসন্ধ সাহিত্যে হৃদয়নাশ—আগল নাম শ্রীচাক্রক চক্রবর্তী। করিবপুর জেলার নগরকাশা থানার ব্রাহ্মণভাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম, চার ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ।

তিনি বখন তিন মাসের শিশু তখন তাঁর পিতা অধিকাচরণ চক্রবর্তী পরলোক গমন করেন। অধিকাচা যেই ছিল তার বারাই



জরাসন্ধ

তাঁদের বৃহৎ পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে যেত। কিন্তু সেখাপড়ার জন্ত উদ্ভূত বিশেষ কিছুই থাকতো না।

কলে প্রথম কয়েক বৎসর পড়াশুনার ব্যাপারে তাঁকে আত্মীয়-বন্ধনের আশ্রয়ের আহ্বান গ্রহণ করতে হয়েছে। এমন কি তাঁর মা নিজ হাতে কোলাল চালিয়ে তরিতরকারি করে তার কিছু কিছু বিক্রী করেছেন এবং সেই অর্থ দ্বারা চার বাবুর বই-কাগজপত্র কেনা হয়েছে।

শিক্ষার প্রাথমিক জীবন এমনি অনিশ্চিত কষ্টের মধ্যে কাটানোর পর তাঁর তৃতীয় ভ্রাতার কর্মহল বসন্তপুর পাকড়াশীরে স্থলে কিছুদিন পড়াশুনা চালিয়ে তিনি এসে ভর্তি হন কোলাকাতায় হেয়ার স্কুলে।

১৯২০ সালে কোলাকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। স্কুলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্ত অনেকগুলি পুণ্ডারের মধ্যে এক সেট রবীন্দ্র রচনাবলীই তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। দাসিক ছুড়ি ঠাকুরা বৃত্তি সহ প্রবেশ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

আই-এ, অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি-এ, জরাসন্ধে এম-এ পাশ করে ১৯৩০ সালে বি, সি, এস, পরীক্ষা কেল এবং চুকে পড়লেন জেলখানায়।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় চার বাবু হিন্দু বোয়ালে থাকতেন। ভীষনের সে-কটা দিন তাঁর কাছে আজও অবিস্মরণীয়। সত্যিই বাঙ্গের পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও সাহস্য অর্জন করেছেন। আজও তাঁরা চার বাবু অকৃত্রিম স্রষ্টা। এখানে উল্লেখযোগ্য, ৬ প্রমুখ বড় হাক ডিগ্রি সত্যিই হিসেবে পেয়েছিলেন।

বাংলা দেশের ব্যাভুতানামা অস্ত্রত কয়েকজন সাহিত্যিকের হস্তে তাঁরও স্থলে পড়ার সময় সাহিত্যিক প্রতিভা সূচিত হয়।

পারনার প্রকাশিত “সুরাজ” পত্রিকার ছাপার অক্ষরে প্রথম তাঁর লেখা বের হয়। খেঁট ছিল একটি কবিতা। তখন তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

হেয়ার স্কুলে ভর্তি হবার পর স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা গল্প প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ৬ কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত “মালকে” “পাড়াগায়ের চিঠি” নাম দিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ তিনি দেখেন। সে রচনাগুলি তখন খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু কলেজে প্রবেশ করার পর তৎকালীন অভিভাবকদের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে বিচার বিবেচনার পর ঐতিহ্য অনুযায়ী চার বাবুকে সাহিত্য সাধনা স্বগিত রাখতে হয়। পাঠ্যক্রমবলে কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রতীক্ষিতও দিয়েছিলেন। তাই তাঁর অভিভাবকগণ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এক জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রভূত ধন্যমেঘের উপযোগী গদ্য সরকারী কর্মচারী হিসেবে দেখতে চাইলেন। ফলে স্কটল্যান্ড চিত্তবৃত্তি ঢাকা পড়ল, রাঁগিয়ে পড়লেন চাকুরী-জীবনে—জেলের নিয়ম বাঁধা কঠোর নিয়মানুযায়িতায়।

কলেজ-জীবনে ‘বণিও সাহিত্যচর্চা’ করেননি, তবু গারে সাহিত্যিক গন্ধ থাকার কলেজের বাংলা সাহিত্যসভার তিনিই সেক্রেটারী নির্বাচিত হন, এই সময় কথাসিন্নী শব্দচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

‘লৌহকপাটের’ দ্বার উন্মোচন করেই চার বাবু যুগান্ত সাহিত্যিক ও পাঠক সমাজে সুপরিচিত। এর আগে মাসের মাসে উপেন

গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বিচিত্রার’ তাঁর লেখা ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে, এবং শিত্তসের দু’ভিন্দাখানা গল্পসম্বন্ধে স্থানলাভ করেছে। তবু কিন্তু সেগুলি লৌহকপাটের তুলনায় সমাধিক গুলসম্পন্ন।

দীর্ঘকাল নিশেখে চাকুরী জীবন অতিবাহিত করার পর অকস্মাৎ ভারতবর্ষ-সম্পাদক জীবনানন্দনাথ যুগোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কারাজীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু লেখার তাগিদ আসে। তখন চার বাবু কক্সবাজার জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। বলা চলে তখনই লৌহকপাটের জন্ম।

অত্যন্ত বিধা ও সংকটের সঙ্গে সাহিত্যসভার তাঁর প্রবেশ। দীর্ঘকালের চেষ্টা কিংবা সাধ্যসাধনার প্রয়োজন তাঁর ঘটেনি। বৈঠকী আসরে তিনি রসালাপী; চাকুরী-জীবনে জবরদস্ত অফিসার, সাহিত্য আলোচনার সিরীষ। তবু আপন পরিচয়ের বেলায় কৃতীর অন্ত নেই।

বর্তমানে ইনি বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। সরকারী কোয়ার্টার্সে বসে ‘অবসর’ সময়ে সাহিত্য সাধনার মগ্ন। তাঁর “ভাসনী” এবং “লৌহকপাট—এর পর” ধারাবাহিক ভাবে বৎসিক্রমে মাসিক বহুমতী ও শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হচ্ছে। “লৌহকপাট—১ম পর্বের” চিত্ররূপ বিচ্ছেদ বনামখান্ড পরিচালক জিতেশ সিংহ।

সরকারী জীবনের দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কর্তব্য আর সাহিত্যিক জীবনের অনল স্নানয়ের সাধনা—এই দুই বিপরীতমুখী কর্মধারার এক আশ্চর্য সমন্বয় তাঁর জীবনে।

বাঁসীর রাণী

ঐতিহ্যভিত্তিক বাগটী

ভুল-ধুল আকাশে বিহ্বললেখা শৈলতরঙ্গ হও পার—
খুন্সেতে সুলিঙ্গ ছোট নাসারন্ধ্রে নীলকেন্দ্র আঙ্গোলিত সহস্র কেশর।
বাঁসীর ভোরগম্বুক ছিন্নভিন্ন শতাব্দীর বন্ধন দুর্বীর,
মালবের প্রতি প্রান্তে সেলিহান অগ্নিশিখা দীপ্ত ধ্বংসর।

ব্যারাকে ব্যারাকে বাকদের জড়গৃহে উত্তম শতীন,
শক্তি বুদ্ধি পণ্য বেধা অবরুদ্ধ প্রত্যাহার প্রত্যাশা রঙীন;
অবিচ্ছিন্ন বেড়াভালে নাগপাশে যে মানস নিশ্বেষণ কণী
অনন্ত আতঙ্কভরে প্রাণশক্তি সুপ্তপ্রায় ছিল যেই দিন।

সেই দিনে পলাশীর শতবর্ষ পরে, আজ হ’তে শতবর্ষ আগে
কি বুদ্ধি ভালোলে ভূমি, যে বিদ্রোহী বীর, বেশহুজি রাগে!
তোমার সে প্রচণ্ড সংঘাতে তুর্ষ হোলো লৌহ-বনিক।

রক্ত স্পর্শা গিগন্তে বিলীন
হুজির কন্ডাল গানে জাগিল অনন্ত প্রাণ আশা অস্তহীন।

সেই প্রাণবস্তুর প্রাণ কালিন্দী, জাহ্নবীকূলে, ইন্দ্রপ্রস্থে,
দোয়াবে, বিহারে

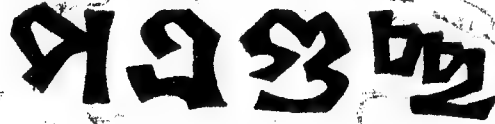
দীর্ঘাটে, লক্ষ্যাবতী, কানপুর, দূরবিদ্যা আরাবলী পারে।
সে বিপুল হুজিরোত্তর ভেঙে পড়ে বেতোয়ার ঢলোনি শিখার—
চলল রাগতে বজা কালীসিদ্ধ দর্শনার প্রবাহ জগার।

দাতিয়া-গুজরা-ধর রাণী-পান্না নাগোদ-রতলায়,
চারখেরী-ইকোর-রঙরা, শিল্পী-কালী হোউ-মালাখান;
সগর কুন্দলা জাগে, বালা টুক শিপ-লিঙ্গ পাতান;
কোটারী দেবাই জাগে, জাগে ধামো, বারোদিয়া বিজয়ী স্মরণ।

হে সৈনিক, রাণী লক্ষ্মীবাই, মরণ মনন ক’রো জীবনের জয়যাত্রা পারে,
আজ স্তম্ভ শতলক বিকশিত চিত্তে পোড়াত আঙনে এ জঘাট অন্ধকারে।
ছালাও অনল, সেই দীপ্ত হুজির মশাল, শতাব্দীর ধারে—
দিকপূর্ণ আলোর প্রবাহ, প্রতি ক্রান্তি পরে অবিচ্ছিন্ন ধারে।

মালবের কুকুম্বিকার ব্যথা ছিল বন্ধ জুড়ে বহ দিন,
হে “মহিকর্ণিকা”, তখন কি জাগে কেহ সেই ব্যথা বহিতে রঙীন
একদিন ভরে যাবে হুজিকা আকাশ—সে এক সুলিঙ্গ অনির্গাণ,
ভারতের ভবিষ্যৎ-দ্বার—সে এক ভরসারীপ্ত প্রাণ অস্তহীন।

আজও তাই আরাবলী, বিজ্ঞানশৈল ভাগীরথী-তীরে
মধ্যভারতের সেই মালভূমি জুড়ে আধ্যাত্ম দাম্পত্য ঘিরে
অরণ্যে প্রান্তরে ধ্বনিত খুরের শব্দ নিত্য অবিরাম;
সে ধূসর ভূরঙ্গের পরে, সে হুজির-সৈনিক আজো তুর্ষ ধাবমান।



(୨୧ ମସିହା ୧୯୨୧ ।—୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୬)

(১২ মে ১৮২৭। ৩০ বৈশাখ ১২৩৪)

তৎসম্বন্ধে বিবেচনার প্রথম প্রকরণ এই : ইদারী কলিকাতায়
যে নূতন ইষ্টাঙ্গবিহীনক আইন এক সম্মততঃ কৃতীয় জর্জের ৫৩

(১৯ মে ১৮২৭ । ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪)

শিখিত্র ঐটি পৌনঃসরিক সাহেবের নিবেদনপত্রদ্বারা কার্যকালে কলিকাতার চৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইংল্যান্ডের সেওয়া গিরাহে সে সভা ১৮১৭ সালের ১ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা প্রেসেটে যেমত আজ্ঞা আছে যে এ সকল বিষয় প্রথমতঃ গবর্ণমেন্টকে জানাইতে হয় সেমত বিবর্তিতব্যে গবর্ণমেন্টকে জানান যায় নাই অতএব গবর্ণমেন্ট আশ্রয় নিকট জাহার করণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অপর ঐপ্রিন্টেড বাইনি প্রিন্টিংয়ে ইন কোলেন সে সভা অব্যবহার করিয়াছেন অতএব আদি এক ইংল্যান্ডের গিরাহি যে সেই দিনে সে সভা চৌনহালে বসিবে না।

দ্বিতীয়। প্রধান সেক্রেটারী শ্রীযুত লসিটন সাহেব বখন এতদ্বিধে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা আমার নিকট প্রেরণ করিলেন তখন তিনি আরো এই কহিলেন যে তোমারদের দরখাস্তের প্রথম প্রকরণে যে যে বিষয়ের ঐ সভাতে বিবেচনা হইত সে ২ বিষয়ের বিবেচনা করিবার নিমিত্তে যে কোন সভা বসে ইহাতে শ্রীযুত কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্সের নিবেদন আছে অতএব শ্রীযুত সে নিবেদনগ্রন্থ সজা করিতে অমুমতি দিতে পারেন না।

তৃতীয়। কিন্তু শ্রীশ্রীযুত আমাকে এই কহিতে অমুমতি দিয়াছেন যে যেসব সভা বসিতে ইচ্ছা হোবার মেওয়া গিয়াছিল সেসব সভা বসিবেক না বটে কিন্তু ইষ্টাংশ আইনের বিকটে পালিমেটে দিবার নিমিত্তে কোন দরখাস্ত অতঃস্থানে প্রেরণ করিয়া বাকিদের কারণ টৌনহালে রাখিতে বাধ্য নাই।

চতুর্থ। শ্রীশ্রীযুত আরো আমাকে এই কহিতে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমারদের দরখাস্তের শেষ তিন প্রকরণের বিবরণ বিবেচনা করিবার নিমিত্তে সভার অমুমতি যদি আমার দ্বারা শ্রীশ্রীযুতের নিকট বাঞ্ছা কর তবে শ্রীশ্রীযুত সে সভা করিতে অমুমতি দিবেন ইতি। কলিকাতা ১২ মে ১৮২৭ সাল।

পূর্ব লিখিত পত্রদ্বারা টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইচ্ছা হোবার মেওয়া গিয়াছিল সে সভা হইতে পারিবে না অতএব নীচে স্বাক্ষরকারীরা সকলকে জানাইতেছেন যে আপাদি বৃন্দাবন ২৩ মে তারিখে দ্বিবা দুই প্রহরের সময় একসঙ্গে যবে এক বৈঠক হইবেক এবং সচিব সাহেবের প্রতি প্রথম দরখাস্তে যে যে বিষয় লিখিত ছিল তদ্বিষয় সম্পর্কীয় যে দরখাস্তের সে সভাতে প্রেরণ হইবেক সে দরখাস্তের বিবেচনা হইবেক।

গোপাল দাস মনোহর দাস ১০০ চন্দ্রকমার ঠাকুর। শিবচন্দ্র দাস। আততোষ দে। রাধাকৃষ্ণ মিত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ হরিশোহন ঠাকুর। জান পায়র। রামগোপাল মল্লিক। রামরত্ন মল্লিক। বৈকুণ্ঠ মল্লিক। বীর নৃসিংহ মল্লিক। রামচন্দ্র মিত্র। ১০০

(৫ জানুয়ারি ১৮২২। ১৩ পৌষ ১২২৮)

প্রশংসা পত্র।—স্বপ্রীকোটের প্রধান জজ শ্রীযুত স্যর এডম' হৈড ইষ্ট সাহেব ইংলণ্ডে বাইতেছেন তিনি এতদ্বাক্ষরী অনেক লোকের অনেক মত উপকার করিয়াছেন অতএব তাঁহার তুল্লির বিবেচনা কারণ যোগ্য। তাঁহার টৌনহালে ২১ দিসেম্বর শুক্রবারে কলিকাতার ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন তাহাতে সেই সভার মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরিশোহন ঠাকুর কহিলেন যে অত্কার সভার প্রধান শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ইহাতে সভার সকলেই অমুমতি করিলেন। পরে তাঁহার চালা করিয়া টাকার বিলি করিলেন যে সে টাকার দ্বারা শ্রীযুত সাহেবের প্রতিমূর্তি স্থাপন হয়। এবং তাঁহাকে তনাইবার কারণ তাঁহার এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে শ্রীযুত বাবু হরিশোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু কৈতন্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু বিজয়চরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র স্বাক্ষর করিলেন।

(১১ জানুয়ারি ১৮২২। ৭ মাঘ ১২২৮)

প্রশংসা পত্র।—কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান লোকেরা শ্রীযুত স্যর এডম' হৈড ইষ্ট সাহেবকে পত্র জনাইতে গত মঙ্গলবারে সকলে একত্র হইয়াছিলেন। এবং দুই প্রহর এক বটা বেলায় কিঞ্চিৎ পরে সাহেবের নিকট সুখ্যাতি পত্র দিলেন সে পত্র চর্চা লিখিত চতুর্বিধে বর্ণ মণ্ডিত। পারস্য ও বাঙ্গালা ও ইংরেজী এই তিন ভাষাতে লিখিত। শ্রীযুত বাবু হরিশোহন ঠাকুর কহিলেন যে পত্র পাঠ করিয়া তনাই কর্তব্য। তাহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ক্রমে তিন ভাষাতে পাঠ করিয়া পত্র জনাইলেন সে পত্রের বরান।

আমরা হুজিলায় যে আপনি আট বৎসর পর্যন্ত এ দেশের এই প্রধান কর্তৃ করিয়া অভিশ্রী এ দেশে ভাগ্য করিবেন ইহাতে আমরা অভিশ্রী খিতমান হইলাম ইহাতে আপনাকে কৃতজ্ঞ করিতে আমরা সকলে একত্র আসিয়াছি। আপনায় আমলে আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি এবং আপনায় বর্ষা বিচারদ্বারা অভিশ্রী সুখ্যাতি হইয়াছে এবং আপনি যে হিন্দু কালেক করিয়াছেন তদ্বারা আমরা নিগের বালকেরদের অনেক উপকার হইয়াছে। এখন আমরা নিগের এই প্রার্থনা যে আমরা নিগের এ দেশের কারণ আপনি যে উপকার করিয়াছেন তাহার কারণ এইখানে আপনকার প্রতিমূর্তি স্থাপন করি। বখন আপনি অমৃত হইবেন তখন এই প্রতিমূর্তি দর্শনে আপনাকে স্মরণ করিব।

ইহার পরে হিন্দু কালেকের চাকররা এক প্রশংসা পত্র আনিয়া মিল সে পত্র এক ছাত্র শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর পাঠ করিল যে আপনায় অমৃতপ্রভেত আমরা নিগের জানোয়ার হইতেছে এইক্ষেণে আপনায় গমনে আমরা নিগের খেদের অনেক কারণ। যেহেতুক তদ্বারা কহি যে আমরা নিগের কালেকের বিশেষ ভাল বিবরণ ইংলণ্ডে কহিলেন এবং এই প্রার্থনা যে এ কালেকের সৌভাগ্য সাধাভরণ চেষ্টা করিলেন। এবং ইংলণ্ডের নিকট এই প্রার্থনা যে আপনি নিগের বন্ধন পছন্দিয়া পরমসুখে চিরকাল বাপন করুন। এই সকল ভবিষ্য কহিলেন যে আমি তোমার নিগের প্রতি অভিসমুদ্র আছি এবং তোমার নিগের প্রত্যেক জন আমার মরণে থাকিল। এইক্ষেণে বালকের নিগকে সম্মান করিয়া আপনি উঠিয়া আতর ও পান লইয়া তাঁকে ভাগ্যবান লোকের হস্তে দিয়া বিদায় করিলেন।

সম্রাচার দর্পণ প্রভৃৎ হওন কালে এই প্রশংসা পত্রের বিবরণ পছন্দিল অতএব অনবকাশ প্রযুক্ত স্থাপন সেল না আসাদী সভাতে স্থাপন হইবে।

পুনর্বার সম্রাচার আইল যে শ্রীযুত স্যর এডম' হৈড ইষ্ট সাহেব ১৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার চান্দপালের বাটে পীনাস অরোহণ করিয়াছেন পদাঙ্গুণে জাভাকে আরোহণ করিয়া ইংলণ্ডে বাইবেন।

(২৬ জানুয়ারি ১৮২২। ১৪ মাঘ ১২২৮)

৩ মাঘ মঙ্গলবার বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় শ্রীল জিচিক জটন প্রধান বিচারকের সুখ্যাতিপত্র প্রধান কারণ কলিকাতার এক তলিকট প্রায় সমুদ্র দ্বারা বাক্ষ প্রাধান হিন্দু হুজুমান বর্ক জলাতনামক গৃহে প্রেরণ হইলেন। সার্বৈক বর্কায় সময় শ্রীশ্রীযুত ঐ গৃহে শুভাগমন করিলেন তখনকার চতুর্দশ বর্ষ চিত্রিত মূর্তি নির্মিত পাঠে সুবিধিত ইংরেজী বাঙ্গালা পারস্যী ভাষা এর অক্ষরিত লক্ষ্যপ্রিয় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব কর্তৃক পাঠনোক্ত শ্রীযুত

ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦ୍ମେ ବାନ୍ଧବକାରି ।

জগমোহন বহু
 রামকাল বে
 রসময় মন্ত
 ষ্টক প্রসাদ বহু
 ঙামকক বে
 ভাৰ্গৱাৰ বহু
 ব্ৰহ্মশেখৰ মিত্ৰ
 ঙ্ৰবকম্ৰ মিত্ৰ
 বিশ্বনাথ বার
 লক্ষীনারায়ণ মন্ত
 ভোলানাথ মিত্ৰ
 ৰায়চন্দ্ৰ বাব
 নীল ক মজুমদার
 বৈকুণ্ঠাস মল্লিক
 কৃষ্ণচন্দ্ৰ বার
 ৰাজনারায়ণ সেন
 স্বৰ্ণচন্দ্ৰ বে
 মননমোহন মল্লিক
 হৰনাথ বে
 মৌলিৰ আবদুল হামিদ
 মৌলিৰ মোহম্মদুল্লি
 সেৰ আবদোলা
 মৌল মৌলবজালি আলি আবকব
 মৌলি মফম্ম মৌদাৰ
 মৌলিৰ মফম্ম বাবৰ
 সেখ মৌলায় ভাসেন
 মিৰ বক্কৰাফি ঙা
 শেৱাজ্জোৰ ঙালী ঙা
 ঙক শেৱা
 ঙান হেন্ৰি-

যহ স্বাক্ষর করণার্থী হানাদকার স্বাক্ষর করিতে পারেন।



তাজমহল

—বতীন্দ্রনাথ পাল

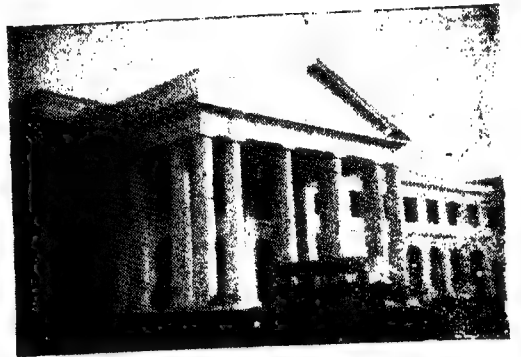


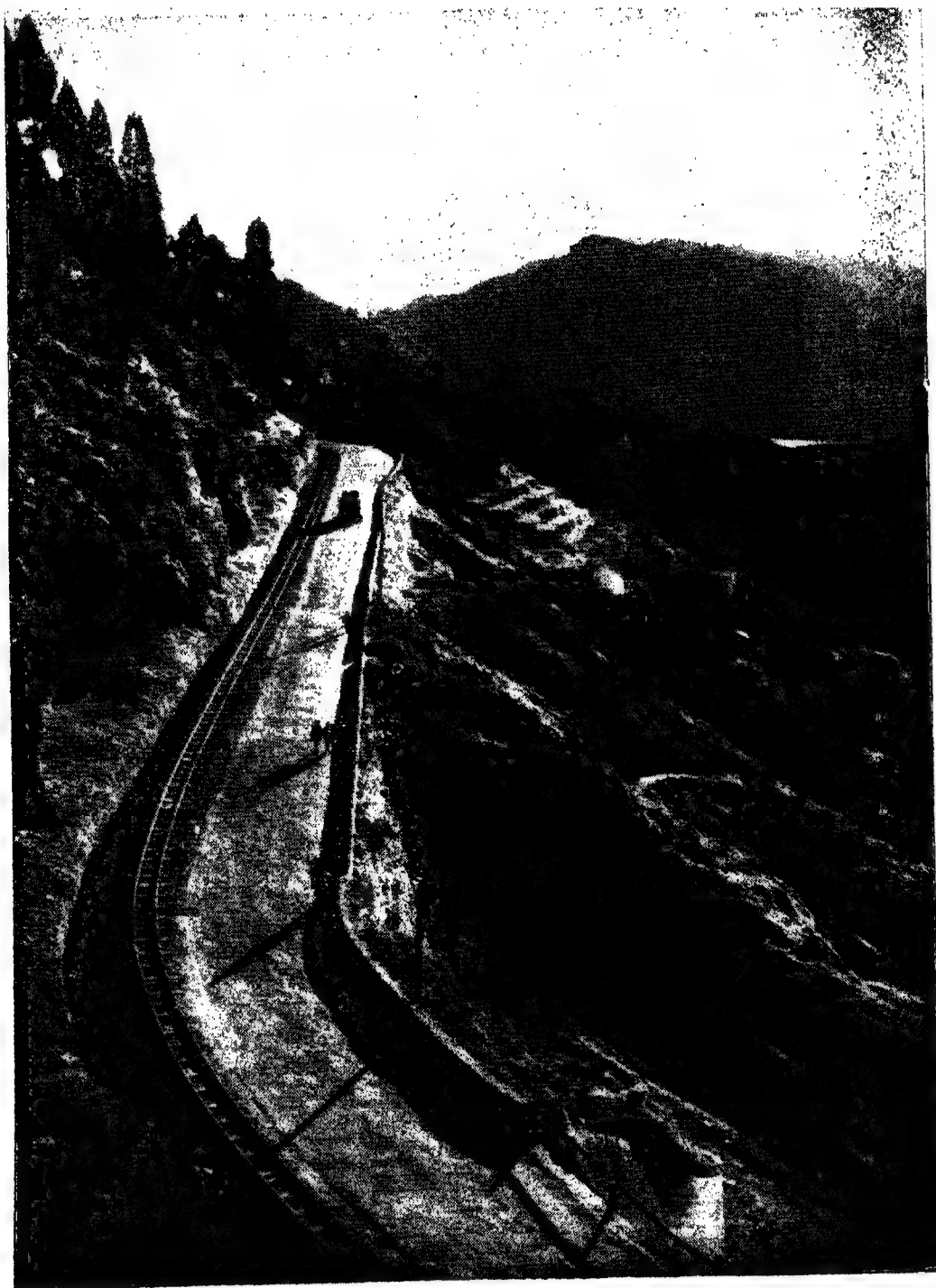
ইসাবেলা থেবোর্ণ কলেজ (মহা)

—শ্রীমতী তৃপ্তি দাস

জোনা, রাঁচি

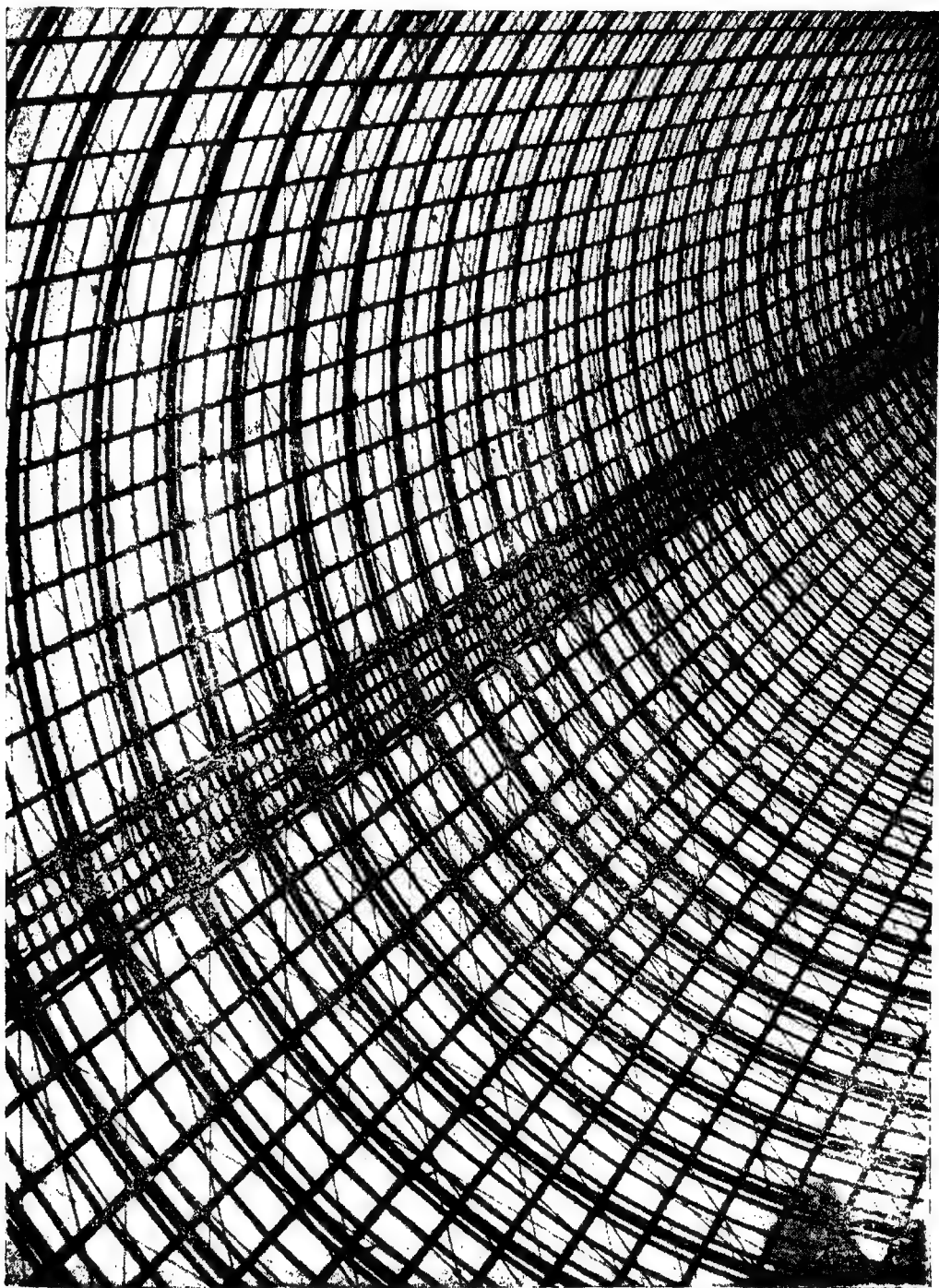
—এফ. ক্রিস্টিয়ান





সাবধান ! সামনে বাঁক !

—বুদ্ধদেব গান





বাঙলার ছেলে

—অমিত মিত্র

ভারতীয় সাধনায় গুরুবাদ

ঐপ্রণবেশ্বর ভট্টাচার্য

পূর্ণ সাধনার ক্ষেত্রে একজন পুণ্যপ্রাপ্ত গুরু প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষীয় সাধক সমাজ ও শাস্ত্রসমূহে আবহমান কাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ভাগবতে ঐক্য বলিতেছেন—“আত্মনা গুরুমাত্রেণ”—আপনিই আপনার গুরু হও। (১২: ভাগবত—১১, ৭, ২০) সুতরাং সাধনার অগ্রসর হইবার নিমিত্ত গুরু প্রয়োজনীয়তা ঐক্যসাধন ও স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রদায়গত সাধনাব্যায় জিন্ন হইতে পারে কিন্তু তাহাদের বক্তব্য এক। বস্তুত: পক্ষে—

না তথা হিন্দু দেখ্যা ন তথা তুষ্ক মনোতি।

হাৎ আটপু আপ হৈ নহী তথা বহ যৌতি।

অর্থাৎ সেখানে হিন্দুর দেবালয়ও নাই, মুসলমানের মসজিদও নাই। সেখানে তিনি (ভগবান) আপনি বিরাজিত। ফলে সম্প্রদায় ও শাস্ত্রগতিকতার স্থানও ভাঙার মাই। তাই কবীর বলিয়াছেন, ‘নিষ্ঠে নির্ণয় হোই’—সম্প্রদায়বৃত্তি বিমুক্ত হইয়া নির্ভর হও। কারণ, ‘মানব ইতিহাসে তাঁহার (ভগবানের) অখণ্ড বেদ উচ্চারিত।’ (রব্বানী) তত্ত্বও এই অখণ্ড বিশ্ববাস ও মানব সমাজকে আপনার গুরুত্বান্নে নম্রকার কথিত বলিতেছে—“ওকব্দা নমেং সর্বকৈ রৈলোক্যঃ সচরাচরঃ” গুরুবৃত্তিতে সর্বত্র বিশ্বজগৎকে ও মানব সমাজকে নম্রকার কর। সুতরাং ভাগবত বা তত্ত্ব কেহই গুরু প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাই।

কালক্রমে হিন্দুধর্মের আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও ক্রমাবনতির ফলে নূতন ধর্মের উদ্ভব হয়, জন্মলাভ করে বৌদ্ধধর্ম। জন্মের প্রাক্কালে বৌদ্ধধর্ম ছিল হিন্দুধর্মেরই নূতন এক সঞ্চরণ। কারণ উঠা হিন্দু ধর্মের জন্মগ্রহণ ইত্যাদি বহু বিবরণের দ্বারা ত্রিগুণ গুরুবাদকেও আচ্ছন্ন করে। আগার বৌদ্ধধর্মের অনাদিক্রম ক্রমাগতগদ ও বৈদিক শূত্রবাদ বস্তুত:পক্ষে একই। বেদের দশম মণ্ডলে নামসীত শূত্র বৌদ্ধ শূত্রবাদের মূল বহিরাছে বলা হইতে পারে [৩: চাক বক্ষ্যোপাখ্যায়ের শূত্রপূরণ, ক্ষিত্তিমোহন সেনের, ডাঃ মধ্যস্থ শূত্রবাদ] এই শূত্রবাদের সাধনা অতি জটিল এক সাধন-প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। ইহাকে বৌদ্ধ সিদ্ধাসাধন প্রক্রিয়া বলিতে পারি। এই সিদ্ধাসৎও তাহাদের রচিত চর্যাপদে একাধিক বার স্বেচ্ছ সন্ধানের কথা বলিয়াছেন। শাস্তিপাদ নামক জটনক বৌদ্ধ সিদ্ধার এক পদে পাই—

যা আমোহে সন্থায়ে অম্ব ন ব্রহ্মি বাহা।

আগে নাং ন ফেলা বীসই তত্ত্বি এ পৃচ্ছসিঁনাহা।

অর্থাৎ যারা বোধে তরা এই সমুদ্রের তো অম্ব নৌ। ইহার ঐ পাওয়া যায়। আগে যদি কোন নৌকা দেখিতে পাও তহা হইলে সন্ধানী লোককে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লও। এখানে ‘আগের নৌকার সন্ধানী লোক’ গুরু ব্যতীত আর কেহ নহেন। গুরুকে সর্বজ্ঞ জ্ঞানে দেখিবার যে অতীন্দ্রা তাহা এই সময় হইতেই ধর্ম ও সত্যকে প্রকট হইয়া উঠে। বৌদ্ধ সিদ্ধান্তবোরা প্রায় নব শত চত্রে একাধিক শতকের শেষভাগ অবধি বর্তমান ছিলেন। ইহাদের পরবর্তী তিন শত কালের ভারতীয় সাধনার ধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হইতে পারে মাই। কারণ বৌদ্ধধর্মসত্ত্ব পাল রাজাদের রাজত্বকালে যে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য

ধর্মীয়ধর্মী সেন রাজবংশের রাজত্বকালে তাহার গতি ব্যাহত হয়, শক্তিও হ্রাস পায়, বিশেষ করিয়া জম্বোদ্বীপ শতকে তুর্কী আক্রমণের ফলে বাংলার মাটিতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হইতে থাকে। এই ইসলাম ধর্মের একটি শাখা হইল সুকীবাদ, সুকীবাদের সহিত হিন্দু বৈষ্ণব মতবাদ এমন কি উপনিষদের বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদেরও বিশেষ মিল ঘটে হয়। ফলে সুকীবাদ বাংলার মাটিতে বিশেষ প্রেড়িতা লাভ করে। এই সুকীবাদে মুসলিমদের স্থান হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের গুরু প্রায়ই অতি উচ্চে। মুসলিমবাহ ও গুরুবাদ তাই সাধারণ লোকচিত্তে অতি আকর্ষিত হইতে পূহিত হয়। [বিশেষ করিয়া কক্করীয়ান বৌদ্ধধর্ম যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাবল্যে ক্রম অবলুপ্তির পথে চলিয়াছিল, তখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জনসাধারণ তাহাদের বিশিষ্ট ধর্মচর্চা ও ধ্যান ধারণাকে নুতন করিয়া প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু হিন্দু ধর্মের কঠোর বিধিবিধান অতিক্রম করিয়া তাহারা সহজে হিন্দু ধর্মের সহিত মিশিয়া বাইতে পারিল না। আগার ইসলাম ধর্মকেও অন্তরের সহিত গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য হইতে এই সময় অর্থাৎ জম্বোদ্বীপ শতকের অবসানের অব্যবহিত কাল পরেই এক নূতন ধর্মমত ও সম্প্রদায় জন্ম লয়। নব উদ্ভূত এই ধর্ম সম্প্রদায় বাউল নামে পরিচিত। মুসলিম মনস্তত্ত্ব উদ্ভাবন বলেন, বাউলের জন্ম চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগ কি পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগ। বাউল জন্মগ্রহণ করিয়াছে সিদ্ধা ও মুসলমান কবীর হইতে। এই মুসলমান কবীরের হইলেন সুকীবাদের পূজারী। বস্তুত: পক্ষে বাউল মতের মধ্যে সমভাবে কাজ করিয়াছে শূত্রবাদ, সহজবাদ (বৌদ্ধ সহজবানবাদ) ও গুরুবাদ বা মুসলিমবাহ। বাংলার বাউলের ইতিহাস সূত্র হইয়াছে বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিপীড়িত বৌদ্ধরাই বাউল। পরবর্তী কালে এই বাউল সম্প্রদায়ের সহিত বহু সংখ্যক মুসলমান সাধকও যুক্ত হন। তাই বাউলের মধ্যেও গুরুবাদের প্রাধান্য খুব বেশী। বাউল মূলত: সেহকেন্দ্রিক শূত্রবাদের সাধক, কিন্তু গুরুকেন্দ্রিক সে সাধনা। শূত্রবাদ ভিত্তিক বৌদ্ধধর্মেরও গুরুবাদের প্রভাব অপরিহার্য। বৌদ্ধ সাধকদিগের সাধনমন্ত্র ছিল তাহাদের সূত্র সূত্র পদাঙ্কী—চর্যাপদ সমূহ, বাউলের সাধনারও প্রধান অবলম্বন ময়মী সাধক জন্মেরে অন্তরনিঃসারিত গীতলহরী। বাউলের ধর্মমত সম্পর্কে অন্ত কোন মুক্তি বা অমুক্তিত পুঁথি বাউল সমাজে প্রচলিত আছে বলিয়া জানা যায় না। চর্যাপদের দ্বারা এই সব গানগুলিতেও গুরুবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে গুরুবাহী বাউল সম্প্রদায় কায়দাধিক শূত্রবাহী বৌদ্ধ সিদ্ধান্তবাদের সাক্ষ্য বসবস। এই সবচে এই হই সম্প্রদায়ের অনাদিক্রম ক্রমাগতবাহী ধর্মমতের নিকট সাধুজ্ঞ ও একা লক্ষ্যনীর।

হুই

আমরা দেখিরাছি, বাউল ধর্ম বা মত চতুর্দশ শতকের কাছাকাছি সময়ে উদ্ভূত। এই সময় বাউলার সাধনাব্যায় যে গুরুবাদের দ্বারা বিশদ প্রভাবিত ছিল তাহা আমরা পক্ষান্তে দেখাইব।

সমকালীন ভারতবর্ষীয় অসত্য সম্প্রদায়ের সাধকবৃন্দের সহিত
জরুরী সঙ্গর্গ প্রদর্শন মানসে আমরা হুঁ-চর কথা বলিতেছি।

যথার্থে ইসলামিক মতবাদের মাজবুদের পৌরবে বহন ব্যাপক
ভাবে জনচিত্তে আঘাত হানিতে থাকে, সেই সময়ে অসত্য
সম্প্রদায়গুলি য য মতবাদের ভিত্তিকে সুরক্ষিত করিতে
যুগেই হন। এই সব সম্প্রদায়িক ধর্মোপাসারিগণের মধ্যে এই ধারণা
বিস্ময়কর হয় যে, 'সম্প্রদায় না হইলে সাধনা সুরক্ষিত হয় না।'
আবার এই সময়েই আবির্ভূত হন সকল প্রকার সম্প্রদায়-চিন্তা-বিমুক্ত
সাধক কবীর, দাদু, তুলসী, দ্বারী, তাজ, কায়ম ইত্যাদি সমস্তের
নাম। ইহারও গুরুবাদেরই সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ইহার সম্প্রদায়
ভিত্তিতে আপনাদের ধর্মকে পণ্ডিত করেন নাই। ইহার হিন্দু-
মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে য য ইচ্ছামতে গুরু নির্বাচন ও
ধর্মোপদেশের নির্দেশ দিতেন। কলে ইহাদের মধ্যে অনেক মুসলমান
সাধকেরও হিন্দু জ্ঞানক শিষ্য রহিয়াছে দেখা যায়। আবার বহু
মুসলমানও হিন্দুর সাধনাকে অস্ত্রবে বরণ করিয়া লন। মহারাত্রির
ব্রাহ্মণ-সন্তান সাধক তুলসী একই কালে লিখিয়াছেন, 'সবি ঘটনে
হবি বসন্তেরই সিবিস্তভর্মে' এবং 'সব খুশা ভরপুর হৈ, কহ যে
নিকট দিল দেখ জাউ'—'খোলা আছেন সব পরিপূর্ণ করিয়া, আশ্রয়
মাগে দেখ খুঁজিয়া, ভ্রমের মধ্যে দেখ হাইয়া।' এই তুলসীও ছিলেন
জরুরী সঙ্গের পথিক। তিনিও বলিতেন, 'পরিপূর্ণ সমর্থ গুরুর সঙ্গে
যুক্ত হ, যে গুরু সন্তোষ, সন্তোষের ও ঐশ্বর্যের সাধনার সিদ্ধ। তিনি
ভোকে মিলন-নাড়ী পাইবার সন্ধান দিবেন।' আবার মুসলমান
সাধক কায়ম ও দ্বারী হোলির গান রচনা করিয়াছেন। এবং
ইহারও ছিলেন জরুরী সঙ্গের পথিক। বসন্ত: পক্ষে, এই সব সাধক
সম্প্রদায়ের নিকট 'হিংস্র তরুণ ন হইয়া সহিব সেতী কান'—প্রায়
হিন্দু-মুসলমানের নয়, ভসবানকে পাওয়াই হইল কান। আর তাই
কায়মকে আমরা গাইতে শুনি—

গুরু বিনে হোরী কোন খেলাটে।

কোই পংখ নমায়ে।

কঠে কোন নির্ঘল বাজী কে।

মায়া মন হৈ হড়াটে।

গুরু বিনে কে খেলাটে হোলী, খেলাটেই পংখ ? কে করিবে
জীবন আমার নির্ঘল, ছুটাইবে মন হইতে মায়া ? সত্যই গুরুহীন
সামান্য 'ব্যর্থম্ উবরে বশনম্ বধা।' পবিত্র কোরাণ শরীফও
বলে, 'মানলার শা সাহসরখো কশর গুপুশ শরতানে' অর্থাৎ বাহার
পিত্র বাই তাহার পীর শরতান (হারামি-মু মনসুর উরদীন)।
জরুরী এই ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।
সকল ধর্ম সম্প্রদায়েরই য য সাধনগুরুর হান স্বীকৃত
হইয়াছিল।

তিন

এইবার আবার বাউল ধর্ম ও বাংলার জরুরী সাধনার
কেন্দ্রে কিরিয়া আসিতেছি। আমরা দেখিয়াছি: কোরাণ শরীফ বলেন,
পীরহীনের পীর শরতান। এই ইসলামী মতবাদের স্বকীয়ানের মধ্য দিয়া
বাংলার বাউলকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। কয়ল বাউলকে আমরা
গাইতে শুনি—

বাহার বুবেশে নাই সে নাই কোনকিনে।

অবস্ত লইবে তারে ঘরিয়া শরতানে।

অর্থাৎ বাউল গুরুকে শুধু আশ্রয় করিতেই চাহে না। গুরুহীনের
সাধনাকে শরতানের ক্রিয়াকলাপ বলিয়া মনে করে সে। গুরু তাহার
সাধনার প্রথম ও প্রধান কথা। গুরুই তাহার আরাধ্য—প্রথম
অনুসন্ধানের বিষয়। 'মনের মাছব' সন্ধানেরও আগে তাই প্রয়োজন
পাটনী ঠিক করা। তাই বাউলকে গাইতে শুনি—

ঘরবি যে অঘর জানবি যে অঘর

ঘরবি সে আলেক মাছব,

আগে তার পাটনী ঠিক কর।

পাটনীই হইল বাউলের সাধনার সেই গুরু—বাক অবলম্বন
করিয়া সে 'জাইব পুন জিনউরার'। (সিদ্ধা ভৌষীপাদ) গুরু তাই
'আলেক নিরঞ্জন' সাধনার আগেই নির্বাচন প্রয়োজন। এই মত
শুধু বাউল নয়, হিন্দু-মুসলমান এমন কি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাধকগণের
পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুসলিম সকল
বাউলই এই মতের পথিক। তাই 'অবীন পাছু' যেমন বলে,
মুরশির, আয়ার কেলে না, চরণ দিতে তুল না
আমি পড়ে পড়ে অপরাধী গো।

তেমনি হীরালাল বাউলও বলে—

দয়াল গুরু আমার পায়ে লগে চল,

তুমি হীনহীন কাঙ্গালের বাড়ব,

কে আছে আর বল বল।

এখানেও গুরুকে সেই পাবের কাতারীরূপেই দেখা হইয়াছে।

গুরু সাধন শক্তি অজিজ্ঞাত। তিনি শুধুই পাবের কাতারী নহেন,
তিনি স্বয়ং ঈশ্বর সমান। তাই জো বাউল গায়—

গুরুগণ বে দিয়েছে নয়ন

যে কেনেছে ব্রহ্মাও মাঝে গুরুগণে সেই নিরঞ্জন।

অর্থাৎ গুরু শুধুই পাবের কাতারী নহেন—সাধারণ সঙ্গে অভিন্ন
তিনি। মানুষ হৃদয়ের 'গোপীচন্দ্রের সরাসরে' সিদ্ধা হাবিপাদ রান্না
গোবিন্দচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন—

সর্ব সেব হইতে বাছা গুরুদেব বড়।

গুরু তজ, জ্ঞান শিব, মায়াজাল ছাড়।

বরণ থাকিতে পাবে, মানুষ হৃদয় উনকিশ শতকের প্রথম
ভাগের লোক ছিলেন। তিনিও গুরুকে সাধ্যের সঙ্গে এমন পরিচয়
ভাবে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, গুরুবাদের সুরঞ্জস্যরী
প্রভাব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। গুরুকে
এই ভাবে 'আলেক মাছব' নিরঞ্জনের সহিত এক কঠিনা দেখা
স্বকীয়ানের একটি বৈশিষ্ট্য। বাউল এই স্বকীয়াবাক আশ্রয়
করিলেও গুরুর সম্পর্কে বাউলের চিন্তার দ্বারা আরও ব্যাপক।
হিন্দুজ্ঞানাত নলীয়ার বাউল সালন কবীর বলিতেন, 'গুরুকে যে
মহুয়া জানে তার অঙ্গগতি নরকে স্থান।' গুরুকে মহুয়া কল্পনার
নরকস্থিতির বিধান প্রকৃতপক্ষে গুরুগণের অস্বীকৃতিটুকুকেই প্রকাশ
করিতেছে। গুরু মনে করিবে, 'যে হরি সেই গুরু, তজের কল্পনা,
কল্পনার মতক'। (গোবিন্দ বাউল) আর তাই—

হুশিণ নাই বার সন্দের সাধী

এ অপূতে সে অনাথী,

ঘাটে বেয়ে যে দুর্গতি সে বলিবার নয়।

(গোশাল বাড়িল)

আর তাইতো বাড়িলের সাধনার, আর শুধু বাড়িল কেন, সকল সাধনারই প্রথম কথা হইল, 'গুরুত্বপূর্ণ চিনে ভুল যে তারে।' সত্যই ভক্তের কাছে 'গুরু বলে বার প্রাণ কাঁপে তার তুলনা আছে কোই?'

গুরুকে সাধার সঙ্গ একান্ত করিয়া দেখিবার রীতি বাড়িলের অসংখ্য গানের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইলেও বাংলার অন্তরাত্ম সম্প্রদায়ের সাধনাতেও এই গুরুবাদের ভূমিকা অপরিসীম। বৃষ্টিভ্রমররূপ বৈক্য সমাঞ্জ গোষাধিপতির প্রভাব ও সাধারণ গৃহস্থ হিন্দুসম্প্রদায়ের জীবনে কুলগুরু হ্রানের কথা উল্লেখ করা বাইতে পারে।

চার

ভারতীয় সাধনাবাদ্য ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমরা গুরুবাদের প্রভাব দেখাইলাম। গুরুবাদের এই প্রভাব ভারতীয় সাধনার ধারাকে যেমন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, তেমনি ভারতীয় সাহিত্যের একটি ধারাও এই গুরুবাদের মহিমা কীর্তনের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। আমরা ভারতীয় সাধন সাহিত্যের কথাই বলিতেছি। ভারতীয় সাধকগণের মধ্যে অসংখ্য মরমী কবি সাহিত্যিক ইত্যাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব সাধনার অঙ্গ হিসাবেই দেখিয়াছেন সঙ্গীত ও সাহিত্যকে। এই সব সাধকেরা তাঁহাদের অন্তরের বিচিত্র ভাববিশিষ্ট মহাবল্য কাব্য-সঙ্গীতের আকারে অক্ষর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন উত্তর-সুবীর্ণগিরিজন্ত। এই স্থষ্টির একটি বৃহৎ অংশই হইল গুরুবাদের মহিমা কীর্তনে ভরপুর।

গুরুবাদের প্রভাবে যেমন হিতসাধন হইয়াছিল তেমনি একথাও সত্য যে, গুরুবার সময় সময় ইশাককেও অতিক্রম করিয়া সাধনা ও সাহিত্যের বর্ণেই ক্ষতিসাধন করিয়াছে। ভক্তের আকৃতির সুরোগ হইয়া এক শ্রেণীর 'ধর্ম-পথিক' ধর্ম ব্যবসারী হইয়া উঠে। কলে বর্ধের সহজ সফল রূপ ক্রমবিকৃতির মধ্য দিয়া কালক্রমে বহিরব্রহ্ম আচার-সর্বস্বতায় পরিণত হয়। ইহার ফলে এক শ্রেণীর সাধক গুরুবাদের প্রভাব হইতে ধর্মকে মুক্ত করিবার জন্য প্রচার করিতে থাকেন, গুরুবাদের বিরুদ্ধবাদী। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধ সিদ্ধাধিপতির আমল হইতেই বর্তমান রহিয়াছে। সিদ্ধারা এই গুরুকরণের পক্ষে যেমন ছিলেন, তেমনি তাঁহাদের মধ্যে বিরুদ্ধবাদেরও অভাব ছিল না। একটি চর্যাগমে পাই—'যবে' আত্মই বাহিরে পুছই। পই দেখুই পড়িবেশী পুছই।'—যবে যে, বহিরাছে তাহাকে বাহিরে কি খোঁজ করিতেছ? আগে ঘর না দেখিয়া প্রতিবেশীদিগেরই বা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তাহাদের মতে যে প্রতিবেশীকে সর্বজন জ্ঞানে জিজ্ঞাসা কর, সেই সর্বজন 'পশুজ সজল সত্য বন্ধুদানই'—বাহির হইতেই সেই পশুভেদ্য সত্যের ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। কারণ ব্রাহ্মণ-পশুভেদ্য আসল ভেদের কথা জানেন না; তাঁহারা এমনই চারি বৈদ পড়িয়া বান—'বহুশ্রেণি ন জানও হি ভেদে। এবই পড়ি বউ এ চ বউ।' অর্থাৎ তাঁহাদের সেই বাহু আড়ম্বর দেখিয়া সাধারণ মানুষের মন প্রকৃত পক্ষেই সত্য-ধর্ম জট হইয়া নানা ভাবে বিভ্রান্ত হয়—'কম্বাই বুধুদাই জণ বদী।' পরবর্তীকালে এই বিভ্রান্ত মন ক্রমে ক্রমে 'বহিঃ-সংশয়িত-গুরু-ব্রহ্মণ্য'

সকলের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে সকল শ্রেণীর সাধক সমাজেরই কণ্ঠে। এই ভেদের কথা বরণ করিয়াই বহিঃসাধা পথের পথিক মরমী বাড়িল মনকে আমরা পাইতে গনি—

তোমার পথ চাইক্যাছে মলিনে মসজিনে

তোমার ডাক শুনি নাই

চলতে না পাই

কইখা ণ্ডার গুরুতে মোহলোনে।

ভুইখা যাতে অল জুড়ায়

তাতেই যদি অগণ-পুড়ায়

বলতো গুরু কোথায় ণ্ডার, অজেন সাধন-মরল ভেদে।

তোম দুখায়েই নানান তাল। পুরাণ কোরাণ তসবী মাল।

ভেক-পথই তো প্রধান ভাল। কইসে মদন মরে খেদে।

পাঁচ

গুরুবাদের এই বিকৃতি হিন্দুধর্মের মধ্যেও ব্যাপক ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার ফলে সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম পুনরায় দেব-দেউল-ব্রাহ্মণ-পূরোহিতের কৃপাগত হইয়া পড়ে। কল, 'ধর্ম নয় সম্পদের হেতু, নহে সে সৃষ্টির সেতু, বর্ধেই ধর্মের শেষ'—ধর্ম সম্বন্ধে এই যে সনাতন বোধ ও সত্যনিষ্ঠা, ধর্মব্যবসারীদিগের হাতে পড়িয়া তাহা ক্রমশই বিনষ্ট হয়। এই সন্তোষিত ও বিনষ্টের মূলে রাজনৈতিক কারণও যে কাজ করিয়াছে, বরন-হরিদাসের নিষাভাসের কাহিনী হইতে-তাহা জানিতে পারা যায়।

এ সম্বন্ধে প্রথম চৌরী মহাশয় বাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহা বরণ করা বাইতে পারে। তাঁহার মতে, খুব সম্ভবত 'মূল্যের অধিপতি হ্রদ'ে বরন হরিদাস ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাণ্ডুরাই আনেন। 'অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা হরিদাসকে রাজস্বও দণ্ডিত করিয়া তাঁহাদের বৈষ্ণব-হিংসা চরিতার্থ করেন। বিশেষ করিয়া ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল জনৈক মুলমান কাছীর অলজ্য অভিযোগ, 'হরিদাস বরনকুলে অমহিমা আনিবেক' অর্থাৎ রাজার হাতের prestige নষ্ট করিবে। স্তব্ধতা দেখা বাইতেছে, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এই উভয়বিধ কারণেই ধর্ম বিনষ্ট ও বহু সম্প্রদায়ের বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সব সম্প্রদায়গুলি তাহাদের স্ব স্ব নিয়ম আচারের দ্বারা ধর্মকে ক্রমেই সূক্ষ্মচিত্ত করিয়া আনেন এবং কালক্রমে দেখা যায়, 'বেহাউনীর খেতকো বেহাউ খেত খার' যে বেড়া বেগুয়া হইল ক্ষেত্র রক্ষার নিমিত্ত তাহাই অবশেষে ক্ষেত্র ভরিয়া তুলিল, ধর্মের এই আচারসর্বস্বতা দূর করিয়া তাহার প্রকৃত রূপ পুনরুদ্ধারের জন্য রামমোহন রায় পরবর্তীকালে চেষ্টা করেন। ইহাতে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ কতটা হইয়াছিল তাহা বিতর্কের বিষয় হইলেও একথা নিঃসংশয়ে সত্য যে, নবজাগরণের মূলে ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনর উদার নৈতিক মতবাদ বর্ণেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

সর্বশেষে গুরুবাদ সম্পর্কে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল অসঙ্গতি ও অত্যাচারকে ছাড়িয়াই গুরুবাদ ভারতীয় সাধক সমাজের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছিল। এবং তাহারই ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধার্থাধিপতির কাল হইতে গুরুবাদবিরোধী ধারার অর হইলেও আজিও তাহা গুরুবাদকে নিমূল কল্পিতে পারে নাই। আজও গুরুবাদ অব্যাহত পড়িতেই চলিয়াছে। অবশ্য প্রাচীন গুরুবাদী সাধনার সহিত বর্তমান গুরুবাদের পার্থক্য নিঃসন্দেহে একটি লক্ষ্যবিন্দু

বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তার গতি-প্রকৃতি দেখিয়া বলা
দুইতে পারে, হিন্দু সমাজে বর্তমানে সন্ন্যাসীকেই মন্ত্রনাতা গুরুরূপে
গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা একটি হইয়া উঠিতেছে। গৃহী কুলগুরুত্বপূর্ণ এখা
আজ ক্রমাগতই অবলুপ্তির দিকে চালিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর
গুরুত্বপূর্ণ বীতি আজও অব্যাহত রাখিয়াছে। আজও শত সহস্র
ভক্তকণ্ঠ ধ্বনিত হইতেছে গুরুর অপার মহিমা—

বস রে মন গুরুর কাছে
ও সে, গুরুবিনে ভবে কি ধন আছে।
ও যে গুরু বস্তু চিনিলি না যে মন,
ও অবোধ মন বস রে গুরুর কাছে।
ও সে গয়া পূজা কানী, তীর্থ বায়দসী,
সকল তীর্থ গুরুর প্রিয়গণে আছে।
গুরু হাজা শিব্য বাঁচে কিসে ?
বস রে মন গুরুর কাছে।

ও সে গুরু বিনে ভবে কি ধন আছে ?
যে জন সাধন করেছে, গুরু ধরেছে,
অবধ মাইব ধরে বসে আছে
ও সে বস রে মন গুরুর কাছে।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

- ১। হারামশি—মহম্মদ মনসুর উদ্দীন, কলি: বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত।
- ২। হিন্দুগুরুমানের যুক্ত সাধনা—কিতমোহন সেন, বিশ্বভারতী।
- ৩। প্রা: বা: সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান—প্রমথ চৌধুরী, ঐ।
- ৪। শূদ্রপুরাণ—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৫। বঙ্গবর মুহম্মদ সাহেব।
- ৬। মহানীকায় তন্ত্র।
- ৭। তুলসীদাসের দৌল।

শেষ বেল

ঐশ্বরী চট্টোপাধ্যায়

জীবন যখন অন্তগমন পথে শেখার তাকাবে

এ ধরাপানে

শেষবেলাকার সূর্য, তোমার তরে রেখে বাবে

ভার সবশেষ ভালবাসা।

মনে করিবে কি, তোমার আলোর রঙ,

কত দিন তার কত হাসি কত গানে

অমরাবতীর স্বপ্ন ছুঁয়েছে তারে, জাগায়েছে মনে

সুখের বিধার আশা ?

এই ধরপীর আলোছালা কতদিন, তারার সেশের

ইশারা-সুখের-বাতি,—

এ সবে তাহার কত জ্বলিয়াছিল ভাল,

কতবার করে মেখেছে তাহার নেশা,

সুখের আকাশ শুধু জ্বলিয়াছিল তাহা,

আর জ্বলিয়াছিল গৃহকোণে শিশুরাতি—

হে বহুধা, বসো স্মরণে কি কলকাল,

ছোট সে জীবনে হাসি-অশ্রুতে মেশা ?

তটিন, তোমার মজুল কলগীতি পাতাবরা

কত বেতসবনের ছায়ে

হলহল কত না-বলা-কথার সুরে

ভাসিয়ে নিয়েছ তাহার স্বপ্ন-বেলাটী

আলোর চুম্বকী বসান রূপালী শাতি,

গহন বনের ছায়া উত্তরী পারে ;

ভালোবেসেছিল সে তোমায়ে, তুলোনো গো,

তোমার সাথেই ছিল তার বস্তু খেলা।

আর মনে রেখো, দিসন্তে গুরুভাষা,

সাঁঝ-আকাশের রূপালো রূপালী টিপ,

আঁখি-জলে-ভেজা কত যে সন্ধ্যা চায়,

তোমা পানে চাহি কেটেছে সঙ্গোপনে ;

তার জনহীন গৃহ-অন্ধনভলে মলিত না হবে

সোনার সন্ধ্যাপীপ

তুমি তুলিয়েছ তার সে আঁখির-শাখা,

মিটালি করেছে তার সারথ মনে মনে।

জীবন-গীতা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীগৌতম সেন

জগত সৃষ্টি করলো কে ?

তুমি জানতে চাইলে জগতের সৃষ্টিকর্তা কে, আর এই
সৃষ্টির রহস্যই বা কি ?

ভগবান বললেন, এ প্রশ্ন তোমার, এ প্রশ্ন সকলের। একটা উদ্ভিদের দিকে চেয়ে দেখো, সে ধীরে ধীরে মাটি তেলে উঠছে। একদিন দেখা গেলো, সেদিনের সেই ছোট পাছটি একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সে বৃক্ষও একদিন মরলো। মরবার সময় বেঁচে গেলো তার বীজ। এই বীজ থেকেই বৃক্ষ—বীজে তার পুনঃ পরিণাম। ডিম থেকে পাখি হয়, রেখে বার সেই ডিম—ভবিষ্যৎ পক্ষিকুলের বীজ। প্রত্যেক পদার্থেরই দুল উপাদান হলো বীজ। হৃদয় আকার থেকে হুল্লরপে, আবার হৃদয়রূপেই তার লয়। বৃষ্টির একটি ফোঁটাই বরফ হয়, আবার সেই বরফ জল হয়ে সমুদ্রে মিশেছে। প্রকৃতির সকল বস্তুই এই একই নিয়মে চলেছে। নদীর প্রোত পাহাড়কে গুঁড়ো করে বাসিতে পরিণত করে—সেই বাসি বাজে সমুদ্রে, ত্বরে ত্বরে জমে উঠছে, আবার পাহাড়ে পরিণত হচ্ছে। আবার পাহাড় গুঁড়ো হবে, আবার শক্ত হবে। বালুকা থেকেই শৈলমালার উদ্ভব, আবার বালুকাতেই তার পরিণতি। আকাশের নক্ষত্রও এসেছে সেই এক ধারাকে অমূল্যরূপে। এসেছে পৃথিবীও, নীহারিকাময় পদার্থ-বিশেষ থেকে—শীতল থেকে শীতলতর, তারপর ভূমিরূপা ধরিত্রী, আবার সেই ভূমি-শীতলসেই তার লয়। প্রতিদিন ঘটেছে এই ঘটনা—মরণাভীত কাল থেকে। একই ইতিহাস মাছুষেরও, প্রকৃতিরও।

পৃথক্রে উৎপত্তি বালুকা থেকে, বালুকাতেই তার পরিণাম। বাপ থেকে নদী, বার আবার বাপেই, উদ্ভিদ আসে বীজ থেকে, বীজেই তার পরিণাম। মানব-জীবন আগে মহাব-জীবাণু থেকে, বার আবার সেই জীবাণুতেই। গ্রহ-উপগ্রহ নন্দ-নন্দী যে অবস্থা থেকে এসেছে, সেই অবস্থাতেই আবার কিরে বাজে। অর্থাৎ দুল অবস্থা তার কার্য, হৃদয় তার কারণ। ‘নাশ কারণে লয়ঃ’ পৃথিবী ধ্বংস হলে, যে ভূতে তার আকার তাতেই সে পুনরাবর্তন করবে। একেই নাশ বলে—কারণ লয়। কার্য কারণ থেকে ভিন্ন নয়—কারণের পুনরাবর্তিই যাত্র।

তুমি বুঝতে পারছেন, কোনো কিছুই কারণ ছাড়া আসে না। কারণ কার্যের ভিতরেই পুনরূপে বর্তমান।

ভগবান বললেন, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডও এসেছে সেই ‘স্বপ্ন’ ব্রহ্মাণ্ড থেকে। যেমন বীজ থেকে বৃক্ষ এসেছে। বীজেই সে বর্তমান ছিলো পরে ব্যক্ত হয়েছে। এই ‘স্বপ্ন’ থেকে হুল্লো বাগ্গার নামই ক্রমবিকাশ। ক্রমবিকাশ বখন আছে, তখন ক্রমসংকোচও আছে। প্রত্যেক বস্তু ক্রমবিকাশের আসে তার ক্রমসংকোচের প্রক্রিয়া রয়েছে।

অতীত বললেন, সে তো অতীত।

না, প্রত্যক্ষ সত্য। কে কখনো অতীত পরে মহাপূর্বক হলো, তা ঐ ধাপে-ধাপেই ক্রমসংকুচিত ভাব। হৃদয় অব্যক্ত ভাবে গতি, ক্রমবিকাশের কারণ। সমুদ্র প্রকৃতিতেই এই ক্রম-সংকোচ

ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া চলছে। সুতরাং সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের পূর্বে অবস্থাই ক্রম-সংকুচিত বা অব্যক্ত অবস্থার ছিলো। বীজ থেকে বৃক্ষের উদ্ভব, আবার বীজে তার পরিণাম। সুতরাং আরম্ভ ও পরিণাম সমান। পৃথিবীর উৎপত্তি তার কারণ থেকে, আবার কারণেই তার লয়। সকল বস্তু সবচেয়ে এই এক কথা—আদি অজ্ঞ উদ্ভবেই সমান। আরম্ভ জানতে পারলেই তার পরিণাম জানা যায়, আবার অজ্ঞ জানতে পারলেই তার আদিও বার জানা। এই ক্রম-বিকাশশীল জীব-প্রবাহের—বার এক প্রোত জীবাণু, অপর প্রোত পূর্ণমানব, তারা একই বস্তু। অজ্ঞ বখন পূর্ণমানব, আদিতেও তাহলে তিনি। জীবাণুও তাহলে উচ্চতম চৈতন্যের ক্রম-সংকুচিত অবস্থা। এই ক্রম-সংকুচিত চৈতন্যই আপনাকে ব্যক্ত করবার আগ্রহে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলাই ধর্ম।

জগত সম্বন্ধে সেই এক কথা। জগতের শেষ পরিণামও তাহলে চৈতন্য। জাগতিক ক্রমবিকাশের কলে চৈতন্যই যদি সৃষ্টির শেষ হয়, তাহলে সৃষ্টির কারণও চৈতন্য। চৈতন্যই জগতের শেষবস্তু—সৃষ্টি-ক্রমের শেষ বিকাশ। অজ্ঞ বখন আছে, তখন আদিও আছে। চৈতন্য ছাড়া জগত নয়—কোথাও ব্যক্ত, কোথাও অব্যক্ত। এই সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। সেই ক্রমসংকুচিত বিশ্বজনীন চৈতন্য নিজেকে ব্যক্ত করছেন যতদিন না তিনি পূর্ণতা লাভ করছেন।

লবই ছুরে আলে

ভগবান বললেন, জগতে কিছুই ধ্বংস হয় না। নতুনও কিছু নেই—ক্ষিণ হয়েও না। সেই একই জিনিস বারে বারে পুরে আসছে। জগতে বস্তু গতি আছে সবই তরলকায়ের একবার উঠছে, একবার পড়ছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হৃদয়তর রূপ থেকে প্রসূত হচ্ছে, আবার হুল্লরপ ধারণ করছে। পুনরায় লয় হয়ে হৃদয়তর ধারণ করছে। এই হৃদয় থেকে হুল্ল—হুল্ল থেকে কারণে গমন। এই নিয়ম।

কিন্তু বায় কি ? বায় রূপ, বায় আকৃতি।

একটিমাত্র প্রাণ, একটিমাত্র জগত। মনে হয় বহু, কিন্তু বহু নয়। লোকও বহু নয়, জীবনও বহু নয়—বহু সেই একেরই বিকাশ। সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করছেন।

ভগবান বললেন, আদ্যার কথা শোনো—সিবারাত্রি শোনো যে, তুমিই এসেই আছা। দিন-রাত তা আগুতে থাকে—যে পবিত্র না ঐত্তার তোমার প্রতি বস্তুবিশুদ্ধে, প্রতি শিরা-কমনীতে খেলতে থাকে, যে পবিত্র না তোমার মজাগত হয়ে বার। সমস্ত কেঁটাকোঁটে ঐ এক আদ্যের ভাবে পূর্ণ করে কেলো—আমি অজ্ঞ, অবিদ্যাই, জাননরহ, সৎজ্ঞ, সর্বশক্তিবান, নিত্যজ্যোতিষের আছা। দিন-রাত্রি চিন্তা করো, চিন্তা করো যে পবিত্র না তোমার প্রাণে ধীরে চিন্তা করো, ধ্যান করো। জলব পূর্ণ হলেই হুৎ কথা বলে, জলব পূর্ণ হলে হাতও কাজ করে।

যোগের পথে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর পর অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। কারণ, জ্ঞান প্রকোপলভি হয় না। সাধনা ছাড়া সিদ্ধি নেই। যোগ মানেই তো অভ্যাস। অভ্যাস করলেই মাহুত সব পাবে। অভ্যাসে সেহের পৌষকে বহন ইচ্ছামত চালনা করা যায়, তখন সেহের অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণ তাদের ইচ্ছামত চালনা করা যাবে না কেন? এই মন এবং প্রাণকে ইচ্ছামত চালনা করাই হলো যোগ।

অর্জুন বললেন, এই সাধনায় হয় কি?

শ্রীকৃষ্ণ জানা যায়। জানে কে? মন। এই মনকে বাঁধা, তবে তো জানবে। তোমার চক্ষু-মনকে বাঁধবার জন্মেই এত আয়োজন। মনকে কেন্দ্রায়িত করতে হবে। একাগ্র হয়ে চিন্তা করো—সেই চিন্তা, যাকে তুমি চাও। সেই তো ধ্যান। ধ্যান মানেই তো মনকে স্থির করা। কোথায় স্থির কর? আশ্রয় মন স্থির করে। কিন্তু মনকে স্থির করা কি সহজ কথা? চিন্তার চক্রে জোর করে না ধামালে একাগ্রতা কোথা থেকে আসবে? বাইরের চক্ৰ হয়তো ধামানো যায়, কিন্তু ভিতরের চক্ৰ? সে যে নিরন্তর চলতেই থাকে। তবে?

এই 'তবে'র কথাই অর্জুন জানতে চাইলেন।

এই জন্মেই মরকার জীবনের পরিমিততা। নিরমিত আচরণই হলো জীবনের পরিমিততা। আর চাই সমদৃষ্টি। সমদৃষ্টি কি? সমদৃষ্টি। সমদৃষ্টি লাভ না হলে চিত্ত একাগ্র হয় না। সর্বত্র মঙ্গল দেখার অভ্যাস করো। দেখবে, চিত্ত আপনা থেকেই শান্ত হবে।

ভগবান বললেন, মনের এই একাগ্র-শক্তিকে বাড়ানোই যোগীর কাজ। প্রকৃতির বাহ্যিকের আঘাত করো, প্রকৃতি নিজে তার রহস্যের দ্বার খুলে দেবে।

অর্জুন ভিজ্ঞান-দৃষ্টিতে চাইলেন। ভগবান হাসলেন, বললেন, একে জানাই তপস্বী। মাহুতের এই মনের শক্তির কোনো সীমা-পরিমিতা নেই। মন বতই একাগ্র হয়, ততই তার শক্তি একটি লক্ষ্যের ওপর আসে। এই মনকে বহির্বিষয়ের স্থির করা সহজ, কারণ, মন স্বভাবতই বহির্বিষয়ী।

এই মনই হলো আসল বস্তু। কারণ, মনই তো জ্ঞান। জানা মানেই তো অবেষণ—মনস্তত্ত্বের অবেষণ। মনই সেই মনস্তত্ত্ব পরীক্ষণ করার বস্তু।

এই মনের এমন একটা ক্ষমতা আছে, বৈশিষ্ট্য যাঁরা সে নিজের ভেতরে বা ছাড়া দেখতে পায়।

ভগবান বললেন, এই যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, আমার এই 'আমি' আর-একজন লোক হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে বা করছি তাকে জানিছি, তুমি। তুমি একই সময়ে কাজও করছো, চিন্তাও করছো। কিন্তু তোমার মনের আর-এক অংশ, সেই লবণ তুমি বা চিন্তা করছো তাই দেখছে। মনের এই সঙ্গ শক্তি একত্র করে মনের ওপরেই প্রয়োগ করতে হবে। মনই তোমার অন্তরতম রহস্য প্রকাশ করে দেবে। তখনই জানতে পারবে আজ্ঞা আছেন কি না, ভগবান আছেন কি না।

এই মনের সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ কি?

মন কেবল শরীরের দ্বারা আবদ্ধ-বিশেষ মাত্র। মন বহন শরীরের

ওপর কাজ করে, তখন শরীরও মনের ওপর কাজ করে। শরীর অসুস্থ হলে, মন অসুস্থ হয়। আবার শরীর সুস্থ থাকলে, মনও সুস্থ সম্ভব থাকে। দেখানি, মনের অস্থিরতার শরীর অসুস্থ হয়?

এই মনকে ইচ্ছামত নিয়োগ করা মানেই, শরীর ও মন উভয়কেই জয় করা।

অর্জুনের মনে বহু প্রশ্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি একটি করে তার প্রশ্ন করেন। বলেন, তোমার শরীর ও মনের ওপর অধিকার স্থাপন করো। সাধনা তো এখনো নেই। এই সাধনার শরীর ও মনকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা যায়। মনকে আয়ত্ত করতে পারলেই তাকে ইচ্ছামত কাজে লাগানো যায়। তাকে একদৃষ্টী করা যায়।

অর্জুনের কৌতূহল বর্ধিত হলো।

ভগবান বললেন, মন সশা পরিবর্তনশীল। সে সবসময় একদিক থেকে অন্যদিকে দৌড়ছে, কখনো বা সে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোতে সলসল থাকছে, আবার কখনো একটিতেই বৃদ্ধ হয়ে আছে। আবার কোনো ইন্দ্রিয়তেই নেই—এমনো তো হচ্ছে।

তুমি লক্ষ্য তুলছো, চোখ খোলা রেখেও তুলছো। কিন্তু তুমি তুলতেই পাচ্ছো, কিছু দেখতে পাচ্ছো না। এই দেখতে না-পাওয়ার কারণ, তোমার মন তখন দর্শন-ইন্দ্রিয়ে নেই। ঠিক এই নিয়মেই মন সকল ইন্দ্রিয়ে একই সময়ে সলসল হতে পারে। মনের এই শক্তি শুধু বাইরের জগতেই নিবদ্ধ নয়, তার অন্তর্দৃষ্টিশক্তিও আছে। এই অন্তর্দৃষ্টিশক্তির বিকাশ-সাধন করাই যোগীর কাজ।

অর্থাৎ যোগের দ্বারা সূক্ষ্মাভিভূতি লাভ। অর্জুন বললেন,

হাঁ। ঐ সূক্ষ্মাভিভূতিতেই মানসিক অবস্থাপনকে প্রত্যক্ষ করা যায়। মানসিক অবস্থাপনকে পৃথক করে দেখো। কেমন করে তোমার দেখার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে—চক্ষু-বস্তু কেমন করে মনের কাছে সেই আঘাত পৌঁছে দিচ্ছে, মন কিভাবে তা গ্রহণ করছে এবং কিভাবে বা বৃদ্ধিতে গমন করছে, তারপরেই বা কি হচ্ছে, এইগুলোকে পৃথক পৃথক প্রত্যক্ষ করাই যোগীর কাজ।

ভগবান বললেন, বলতে পারো, এ প্রত্যক্ষ করার কল কি? কল, প্রকৃতিকে জয় করা। যোগের দ্বারা এ জয় সম্ভব।

প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধীন করাই মাহুতের লক্ষ্য। প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করতে হবে, প্রকৃতিকে তোমার ওপর প্রভুত্ব করতে দিলে চলেবে না। শরীর বা মন কিছুই যেন তোমার ওপর আধিপত্য করতে না পারে। শরীর তোমার, তুমি শরীরের নও।

প্রাণশক্তি

কিন্তু মনের সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ জানতে হলে শরীরকে আগে জানতে হবে। তাই ভগবান বললেন, দেহ তো একটা বাঁচ। তার ভেতরেই রয়েছে আসল রহস্য। শরীরকে বাড়া দেখছে কে? মেক্সগু। এই মেক্সগুয়ের চারদিকে আছে অসংখ্য তত্ত্বজাল। এরাই বহন করে নিয়ে যায় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ। এ শক্তি বিদ্যুৎশক্তি।

কিন্তু আসল হলো প্রাণশক্তি। ভগবান বললেন, সূক্ষ্মরূপে জগতে যে শক্তি ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তারই নাম প্রাণ। জগতে বা কিছু দেখছো, বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাশ্রম করছে, অথবা বার জীবন আছে, সবই এই প্রাণের বিকাশ। সূক্ষ্ম জগতে যত শক্তি প্রকাশিত হয়েছে, তার সমগ্রই হলো প্রাণ।

ভগবান বললেন, এই প্রাণ যুগোপশতির প্রাক্কালে গতিহীন অবস্থার ছিলো, স্থির হয়ে হলো ব্যক্ত।

প্রাণ কি? গতিরূপে বা প্রকাশিত, তাই প্রাণ। স্রাবীর গতিরূপেও এই প্রাণ। এই প্রাণই প্রকাশিত হচ্ছে চিন্তার, অজ্ঞাত শক্তিতেও। স্রাবীর জগত এই প্রাণ ও আকাশের সমষ্টি। মানুষের দেহও তাই। যা কিছু দেখেছো, অনুভব করছো, সকল পদার্থই আকাশ থেকে উৎপন্ন। আর প্রাণ থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে বিভিন্ন শক্তি। এই প্রাণকে বাইরে ত্যাগ করা ও ধারণ করার নামই প্রাণারাম।

ভগবান বললেন, প্রাণ বলতে খাস-প্রবাস নয়। যে শক্তিবলে খাস-প্রবাসের গতি হয়, যে শক্তির খাস-প্রবাসের প্রাণবরূপ, তাই প্রাণ। কিন্তু প্রাণের জর্ষ শক্তি নয়, কারণ, শক্তি ঐ প্রাণের বিকাশরূপ। শক্তি তো প্রাণ থেকেই আসে।

অজুন নির্ধাক-বিস্ময়ে চেয়ে আছেন—একটু একটু করে তাঁর চোখের সমুদ্রে রহস্যময়তার দ্বার উদ্ঘাটিত হচ্ছে।

ভগবান বললেন, এই শক্তিও বিভিন্ন গতিরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। মন অল্পরূপ হয়ে চারিদিক থেকে প্রাণকে আকর্ষণ করছে এবং এই প্রাণ থেকেই শরীরকায় কার্যকরিতা ভিন্ন ভিন্ন জীবনী শক্তি সৃষ্টি করছে। চিন্তা, ইচ্ছা, অজ্ঞাত শক্তিও ঐভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাণারাম দ্বারা মানুষ তার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শক্তি প্রবাহ-গুলিকে বশে আনতে পারে।

অজুন স্থির দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছেন ঐক্যের মুখের দিকে। ভগবান বললেন, জগতে বস্তুত্বের তেজ বা শক্তির বিকাশ আছে, সব ঐ প্রাণের স্রবণ থেকে তৈরি হচ্ছে।

তবু এই প্রাণের শক্তি সেকের সর্বত্র সমান নয়। কোনো দিকে বেশি, কোনো দিকে কম। এটা অসামঞ্জস্য, অনিয়ম। যুগোপশতির কারণও এই। এই অসামঞ্জস্য দূর করার ক্ষেত্রেই প্রাণারামের প্রয়োজন।

প্রাণারামের দ্বারা মানুষের অল্পত্ব-শক্তি বাড়বে—মন তখন বৃকতে পারে, কোথায় কতটুকু প্রাণ আবর্তক।

তারপর ভগবান বললেন, স্রাবীর শক্তিগুলিকে স্রবণ করা মানেই সেকের প্রাণকেই স্রবণ করা। ধ্যান করার মধ্যেও রয়েছে সেই প্রাণের স্রবণ।

সাধনা ও তার প্রয়োজন

অজুন বসন বললেন, সাধনার প্রয়োজন কি, আশঙ্ক্য হলো। উত্তরে ভগবান বললেন, মহাপ্রসঙ্গের দিকে চেয়ে দেখো, তাগলে দেখতে পাবে, সেখানে রয়েছে অসংখ্য তরঙ্গ—বড় ছোট নানা তরঙ্গ। তরঙ্গ আছে, বৃন্দও আছে। কিন্তু ওদের সকলের পঙ্কাজে রয়েছে এক অনন্ত মহাপ্রসঙ্গ। কৃত বৃন্দও সেই অনন্ত মহাপ্রসঙ্গের সঙ্গে বৃন্দ, আবার তরঙ্গগুলিও বৃন্দ। তেমনি এক মহাপ্রসঙ্গের সঙ্গে জীব-মাত্রেরই অন্তর্গত স্রবণ। যেখানেই দেখবে জীবনীশক্তির প্রকাশ, জানবে তার পেছনে রয়েছে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার।

একটি ব্যক্তির হাত—কুম্বাদি কৃত, কিন্তু সেও অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার থেকে ক্রমশ শক্তি সংগ্রহ করে আর এক আকার ধারণ করছে। হাতে তা একদিন উত্তমর আকার নেবে। উত্তম

আবার একদিন পত্তর আকার নেবে, পত্তর হবে মানুষ—এই মানুষই হবে একদিন ঈশ্বর।

ভগবান বললেন, প্রাকৃতিক নিয়মে এই রূপান্তরে পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যাবে। রূপান্তর হবেই। কারণ, এই নিয়ম। তবে মানুষ সাধনার দ্বারা সেই ক্রমকে এগিয়ে নিচ্ছে।

অজুন সেই সাধনার কথাই এর পর জানতে চাইলেন, যে-সাধনার ঈশ্বর উপলব্ধি হয়।

ভগবান বললেন, সাধনার প্রথম কথা একাগ্রতা। একাগ্রতা কি? শক্তি-সকলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সময়কে সংকোচ করে আনা। কিন্তু সেই শক্তি-সংকোচ করতে হলে ভোমার সেকেরে জানো—সেকেরে খাড়া রেখেছে যে মেকদণ্ড, সেই মেকদণ্ডকে জানো। তার বহুপকে জানো, জানো তার ক্রিয়াকে।

ভগবান বললেন, এই মেকদণ্ড—যার দুই পাশে আছে দুটি স্রাবীর শক্তি-প্রবাহ, ইড়া এবং পিজলা। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিজলা। আর মধ্যে মেকদণ্ডের মধ্যাঙ্গী—তিনিই স্রাবী। এই স্রাবীকে নিয়েই যোগীর তপস্যা। তপস্যা হলো স্রাবী-বাহীর বন্ধ দরজাকে উন্মুক্ত করা—যে দ্বার সর্বদাই বন্ধ থাকে।

অজুন বললেন, বন্ধ থাকারটাই যখন নিয়ম তখন তাকে খোলা কেন?

ভগবান বললেন, এইখানেই সকল রহস্যের চাবিকাঠি। যুগ-যুগান্ত ধরে স্রাবী এই চাবিকাঠির সন্ধান করেছেন—তঁারই জানালেন, এই পথে সন্ধান করা, পাবে।

অজুন সেই পথের কথা জানতে চাইলেন।

ভগবান বললেন, স্রাবী হলো নালী-পথ—যে নালী-পথ মস্তিষ্ক থেকে মূলাধার পর্যন্ত নেমে এসেছে। নেমে এসেছে মেকদণ্ডের শেষ প্রান্ত অবধি। এই মূলাধারে আছে কুণ্ডলিনী-শক্তি, যিনি নিমিত্রিতা। যোগী সেই নিমিত্রিতা-শক্তিকে জাগরিত করেন। এ শক্তি, তড়িৎ-শক্তি। জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তি স্রাবীর নালী-পথ বেয়ে উর্ধ্বমুখে মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়। শক্তি বন্ধ উর্ধ্বে উঠতে থাকে, মনের দ্বারও একটির পর একটি খুলে যায়। এই কুণ্ডলিনী-শক্তি সর্বশেষ ধাপ মস্তিষ্কে এসে পৌঁছলে যোগীর সাধনা সম্পূর্ণ হয়। তখন তিনি শরীর ও মন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যান।

অজুন এবার একটি একটি করে প্রশ্ন করেন—সেহ কি? সেক-ব্রহ্মই বা কি, তাদের চালায় কে এবং মনের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে কার কতটুকুই বা স্রবণ?

ভগবান সাগ্নিধ্যে অজুন দিবালোকের মতো সমস্তই প্রত্যক্ষ করলেন। প্রত্যক্ষ করে বিম্বিত হলেন, অভিভূত হলেন এবং যিনি এই অপরাধের শ্রুতি তাঁকে বার বার জানালেন প্রশংসা। বললেন, এদের কাজ কি হলো?

এই যে কুণ্ডলিনী, মেকদণ্ডের সর্বনিম্ন মূলাধার—এখান থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত যে পথ, সেই পথের মাঝে মাঝে রয়েছে কেন্দ্র, যে কেন্দ্রের সঙ্গে রয়েছে ব্রাহ্মণ্ডের যোগ। অসংখ্য এই ব্রাহ্ম—যা ভূমি এইমাত্র প্রত্যক্ষ করলে।

ভগবান বললেন, এই ব্রাহ্ম হৃদয়কেন্দ্রের। অন্তরীক প্রবাহ আর বহির্লী প্রবাহ। একটি জানাঘর, অন্যটি গজাঘর। একটি

কেজাতিবৃত্তি, অপরটি কেজাপশারী। অর্থাৎ কেউ বহুকাতিবৃত্তিবে স্ববাহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বহুকাতি থেকে সেই স্ববাহ অঙ্গের সর্বত্র নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে বাই কক্ষক, বেগ রয়েছে বহুকাতির সঙ্গে সকলেরই।

অজুন বললেন, বহুকাতি এখন সব তখন বহুকাতির প্রয়োজন কি ?

বহুকাতির প্রয়োজন খাঁস-প্রখাঁসকে নিয়মিত করে। বহু-প্রবাহের ওপরে তাড়ের প্রভাব আছে।

অজুনের জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠলো। এই বহু-প্রবাহের কাজ কি ?

নিয়মিত খাঁস-প্রবাহের গতি উৎপাদিত করলে দেখতে পাবে, শরীরের সব পরমাণুগুলির গতি এক দিকে হয়েছে। তখন নানাবিধগামী মন নানাবিধে না গিয়ে, একমুখী হয়ে একটি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হচ্ছে। বহু-প্রবাহও পরিণতিতে হয়ে বিদ্যুৎপতি লাভ করতে। যখন শরীরের সমস্ত গতিগুলো একমুখী হয়, তখন ইচ্ছাশক্তিও হয় একল বিদ্যুতের আধার।

তাইতো ভগবান অজুনকে বললেন, তুমি ধোঁসী হও। তাহলে সবকিছু জানতে পারবে। বললেন, কুণ্ডলিনীকে জাগানাই শুদ্ধ-জ্ঞান—জ্ঞানাতীত অহুত্ব বা আত্মাহুত্বের একমাত্র উপায় এই কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

কুণ্ডলিনী জাগে কিসে ? অজুনের উৎসব প্রশ্ন।

তাকে জাগাতে হয়। এই জাগানো-ক্রিয়ার নামই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম হাড়াও জাগে—মহাপুরুষের স্মরণে। সে ত্যাগের কথা।

অজুন জানতে চাইলেন, এই প্রাণায়ামের কাজ কি ?

স্বরূপে ঘর জিঘাটন। ঘর খোলা পেলেই ব্রাহ্মীর শক্তি-প্রবাহ ওপরে উঠবার চেষ্টা করে—চিৎরও তখন উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করে। একেই বলা হয় অতীন্দ্রিয় স্বাভাৱ।

ভগবান বললেন, প্রাণায়ামের কাজ হলো কৃষ্ণকৃষ্ণের গতিতে জর করা। গতি জর হলোই বৃদ্ধতর-গতিও তখন আরও আসে।

কিন্তু আসন হাড়া প্রাণায়াম হয় না। ভগবান বললেন, সেই আসনই আসন, যে আসনে বসে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

প্রাণায়াম মানে, খাঁস-প্রবাহের ক্রিয়া নয়। খাঁস-প্রবাহ হলো একটা উপায়। প্রাণায়ামের অর্থ—প্রাণের সংরক্ষণ। প্রাণকে জর করতে হবে।

ভগবান বললেন, এই প্রাণশক্তিকে জানবার আগে, আকাশকে জানো। আকাশ কি ? আকাশ সর্বব্যাপী সর্বাহুত্ব একটি সত্তা। এই আকাশকে নিয়েই জগত তৈরি হয়েছে। আকাশই বায়ু হয়, তরল পার্শ্ব হয়, আবার কঠিন পার্শ্বও হয়। এই আকাশই সূর্য, পৃথিবী তারা ধূমকেতুর রূপ পরিগ্রহ করেছে। সর্বপ্রাণীর শরীর—তাই এই আকাশ থেকেই হচ্ছে। জগতে বা কিছু—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা অহুত্ব করা যায়, সকল বস্তুই এই আকাশ থেকে নিমিত। অথচ আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানবার উপায় নেই। অহুত্বের অতীত হয় সে। তার মূল রূপকেই দেখা যায়—যেখা যায় না স্পষ্ট রূপকে। তবু আদিত্য এই আকাশই হলো একমাত্র। এই আকাশই

আবার লয় পাবে জগতের বা কিছু নয়। আবার বৃষ্টি হবে, আবার হবে লয়। এই পরিবর্তনই বৃষ্টিবহন।

অজুন জিজ্ঞাসা করলেন, কেন শক্তির প্রভাবে আকাশ হচ্ছে জগত ?

সে শক্তি প্রাণের শক্তি। আকাশ যেমন এই জগতের কাঁচীকৃত অনন্ত সর্বব্যাপী মূল পার্শ্ব, প্রাণও সেই রকম জগতের শক্তির কাঁচীকৃত অনন্ত সর্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিত্য ও অন্তে সকল বস্তুই যেমন আকাশে বিলীন হচ্ছে, জগতের সমস্ত শক্তিও তেমনি প্রাণে লয় হচ্ছে। পরকল্পে আবার এই প্রাণ থেকেই সকল শক্তির বিকাশ হবে।

ভগবান বললেন, এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হয়েছে, আবার এই প্রাণেই আছে বাধ্যকরণের শক্তি, চূরক-আকর্ষণের শক্তি। এই প্রাণই ব্রাহ্মীর শক্তি-প্রবাহরূপে, চিত্ত-শক্তিরূপে—বৈহিক সকল ক্রিয়ারূপেও এই প্রাণ প্রকাশিত হয়েছে। সকল শক্তিই প্রাণের বিকাশ।

ভগবান বললেন, এখন কিছু ছিলো না, তখন আকাশ ছিলো—গতিমূল আকাশ। প্রাণের প্রকাশ ছিলো না, কিন্তু তার অস্তিত্ব ছিলো।

অজুন নিরুত্তর। শিষ্যের মতো গুরু-পদপ্রাপ্তে বসে তিনি শুভছেন।

ভগবান বললেন, জগতে বসে কিছু শক্তির বিকাশ হয়েছে, তাহলে সমগ্র চিরকাল সমান। তারাই কল্পান্তে শক্তি এক অব্যক্ত থাকে, আবার তারাই একদিন ব্যক্ত হয়ে আকাশের ওপর কাজ করে। এই আকাশ থেকেই বা কিছু সাকার বস্তুর উৎপত্তি। ভগবান বললেন, এই আকাশ পরিমাণ প্রাপ্ত হতে আরম্ভ করলে, প্রাণও নানাবিধ শক্তিতে পরিণত হয়। এই প্রাণের প্রকৃত তত্ত্ব জানা ও তাকে সংরক্ষণ করার চেষ্টাই প্রাণায়াম।

অজুন জিজ্ঞাসা করলেন, এই প্রাণকে জানলেই কি আমরা সকল জানা সম্পূর্ণ হবে ?

ভগবান বললেন, হ্যাঁ, প্রাণকে জানলেই ঈশ্বরকে জানবে।

কিন্তু প্রাণ তো ঈশ্বর নয় ?

ভগবান বললেন, প্রাণ শক্তি। কি করে এই প্রাণশক্তিকে জর করা হবে, প্রাণায়াম তাই বলেছে। প্রাণায়ামের বা কিছু গান, বা কিছু উপদেশ সেই একই উদ্দেশ্যে। নিজের অভ্যন্তর নিকট বা তারকই জর করা। নিকট কে ? দেহ। দেহই মানুষের সবচেয়ে নিকট, আবার মন তার চেয়েও নিকট।

কিন্তু তার চেয়েও নিকট কে ? ভগবান বললেন, যে প্রাণ জগতের সর্বত্র ক্রীড়া করছে, তার যে অংশটুকু এই শরীর ও মনকে চালাচ্ছে, সেই প্রাণ মানুষের আরো নিকটে। এই যে ব্রহ্ম প্রাণশক্তি—বা মানুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তি, তা অনন্ত প্রাণশক্তির সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তরঙ্গ। মানুষ যদি প্রাণশক্তিকে জর করতে পারে, তবে সমগ্র প্রাণশক্তিকে জর করতে পারে।

এই জর করাই হলো সিদ্ধিলাভ। তখন আর কোনো শক্তিই তার ওপর প্রভাব করতে পারে না। তখন এই মানুষই সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হতে পারে।

বিদেশিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলদরজা দাশগুপ্ত

ছয়

লুতে ফিরে গিয়ে দু-তিন দিন কেটে গেল কিন্তু মার্গিনের সেই গভীর অজমনির ভাবটি কাটল না। প্রশ্ন করলে কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাট না—কথাটি যেন উড়িয়ে দেয়।

লু ছেড়ে রওয়ানা হওয়ার আশে সাত-আট দিন বাকি, এমন সময় একদিন সকালবেলা মার্গিন বলে বলল, বিকো! লুতে আমার আর একেবারে ভাল লাগছে না—চল ফিরে বাই।

বললাম, ফিরে যাওয়ার আর ত মাত্র সাত-আট দিন বাকি।

বলল, চল, কাল কি পঞ্চমি চল বাই।

গুলালাম, কি হল তোমার বল দেখি—লু প্রাতি হঠাৎ এত অকুটি হল কেন?

সাক্ষেপে বলল, অনেক দিন ত হয়ে গেল।

হেসে বললাম, তাই অকুটি হল? এত সাংঘাতিক কথা! কিছুদিন পরে সেল-এর বাড়ীতে অকুটি হল। এত সাংঘাতিক কথা! কিছুদিন পরে সেল-এর বাড়ীতে অকুটি হলে তখন কি উপায় করব? বলল, নিজের বাড়ী, নিজের সংসারে মেয়েদের কখনও অকুটি হয় না।

গুলালাম, লু—তোমার এত প্রিয় লু—তা-ও গেল?

একটু চুপ করে থেকে বলল, দেখলাম—নিজের ঘরে নিজের মাছুষটিকে নিয়ে নিরিবিলা থাকার মধ্যেই শান্তি। বাইরের জগতের সঙ্গে বেশি সংঘাত ভাল নয়। তাতে শান্তিভঙ্গই হয়।

মার্গিনের কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার চোখের আড়ালে কিছু কি ঘটেছে? হেডলাগ হোটলে অনেক ইংরেজ গুরু ও মাহলা থাকে, তাদের মধ্যে কেউ কি মার্গিনকে কিছু বলেছে? মনে পড়ে গেল টকীর সেই অসজ্জা লোকটির কথা। আমাকে বিবাহ করার দরুন সেই ধরনের ইঙ্গিত কি কেউ আমার দিয়েছে মার্গিনকে?

গুলালাম, লীনা! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে। হোটলে কি কেউ কিছু বলেছে তোমাকে?

বলল, না না। হোটেলের সবাই খুব ভয়।

গুলালাম, তবে হঠাৎ তোমার এ রকম মনোভাব হল কেন?

একটু সরে এসে আমার বুকে মাথাটা রেখে বলল—বিকো! আমার জীবনের সমস্ত শান্তি এই বুকের মধ্যেই রয়েছে—কি দরকার আমার বাইরে গিয়ে?

হেসে বললাম, তা তোমার লুকোন ধন ত এখানেও তোমার কাছেই র যছে।

বলল, তবুও ভয় করে—যদি লুই হয়ে যায়। নিজের ঘরে নিশ্চিন্ত নাকি?

কথাটার তাৎপর্য একেবারেই বুঝতে পারলাম না।

এই কথাবার্তার পরের দিন লু ছেড়ে রওয়ানা হল। তাই মার্গিন যেন অস্থির হবে উঠল লু ছেড়ে যাওয়ার জন্য। তাই আমিও আর পীড়াপীড়ি করিনি।

পুরের দিন, অর্থাৎ যেদিন রওয়ানা হই তার আগের দিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সেরে মার্গিন বলল, বিকো! চল আজ সেইখানটাতে বেড়াতে বাই। শেষবারের মতন একটু বসে আসি। গুলালাম, সহর ছাড়িয়ে সবুজের ধারের সেই গাছতলায়?

বলল, হ্যাঁ।

দুজনে গেসাম সেখানে। বললাম, যে রকম করে বসতে মার্গিন ভালবাসে—অর্থাৎ আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে আমার পাশে বৈবে। আমিও এক হাত দিয়ে মার্গিনকে জড়িয়ে ধরে বসলাম। দিনটা খুব পরিষ্কার ছিল না—একটু মেঘলা মেঘলা ভাব। পাহাড়ের নীচে পায়ের তলায় সবুজের জল বেন আরও গভীর নীল বলে মনে হল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। হঠাৎ মার্গিন ডাকল, বিকো!

গুলালাম, কি লীনা?

বলল, তুমি আমাকে কোনওদিন ভাল বুঝবে না ত?

গুলালাম, হঠাৎ এ প্রশ্ন?

বলল, জীবনে ভাল বোঝাবুঝি বলে একটা আভিধান আছে—একটা দুঃখ ব্যাধির মত। জীবনটাকে অত্যাধিকতর করে সুখিত করে দেয়। সেটাকে আমি বড় ভয় করি।

গুলালাম, লীনা! তুমি কোমরে মনে এ সব কথা নিয়ে পেরে

একটু চুপ করে থেকে বলল, বিকে। তোমাকে নিয়ে আমার জীবনটা পরিশূর্ণ হয়ে আছে, কোথাও একটুছুঁ জগতাব নাই—তাই ভয় পাই।

শুধালাম, কেন ?

জিজ্ঞাসা করল, এত পরিশূর্ণতা কি জীবনে সইবে ?

বললাম, কেন সইবে না লীনা ?

বলল, মানুষের ভাগ্যবিধাতা যে হিংস্রক—জীবনে পরিশূর্ণ পাণ্ডি তিনি সইতে পারেন না।

চুপ করে গেলাম। মার্লিনের কথা শুনে আমার মনটাও বেন ধাক্কাপ হয়ে গেল। কেন জানি না, চমকে মনে পড়ে গেল—সুখার কথা। তার শেব নিঃশ্বাসের অভিশাপ—তার মূল্য কি আমাদের সত্যিই দিতে হবে ?

হুখে বললাম, লীনা ! লীনা ! ও সব কথা ভেব না। আমাদের দুজনের ভালবাসার জোয়ারের পরিশূর্ণতার কোনও দিন ভাঙা পড়বে না।

সুহ হেসে বলল, তাই যেন হয়। নইলে আমি বাঁচব না।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে লু ছেড়ে বগরান্না হতে বেলা প্রায় এগারটা বাজল। সমস্ত দিন পাড়ী চালিয়ে রাখে আল্লার নিলাম—ডটমুয়ের টু ব্রিজেস হোটেল। (Two Bridges Hotel) হোটেলটি দেখে খুসী হলাম—বেশ বড় হোটেল, দোতলার আমাদের শোবার ঘরটিও বেশ বড়, সুন্দর সাজান। রাত্রে সামান্য কিছু জলযোগ করে শুয়ে পড়লাম। স্নাঙ্ক ছিলাম নিশ্চয়ই—সহজেই পড়লাম ঘুমিয়ে।

সকালবেলা উঠে তৈরী হয়ে আমি ও মার্লিন নীচে নেমে এলাম ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য। তখন বেলা ন'টা বেজে পনের মিনিট। মিনটা বড় সুন্দর ছিল, সূর্য্যের তরঙ্গ আলোর বলমলিয়ে উঠেছিল দিক-বিশুদ্ধ। নীচে নেমে মার্লিন বলল, সাড়ে দশটা পর্যন্ত ত ব্রেকফাস্ট, চল জায়গাটা আশে-পাশে একটু ঘুরে দেখে আসি।

আমার তখন ব্রেকফাস্টে চা খাওয়ার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠেছে। হুখে বললাম চল, কিন্তু মিনিট পনের'র বেশী নয়। আমার দিকে পেয়ে গেছে।

মার্লিন হেসে বলল, তাই হবে।

জুজনে বাইরে এসে হোটেলের প্রাঙ্গণে পাঁড়লাম। হু'পা এগিয়ে গিয়ে চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভাসিত হলাম।

বুলা ! সত্যিই প্রকৃতির এ ভূপ এর পূর্বে আমি কখনও দেখিনি। এ এক অদ্বুত রূপ। বতহুর লুটি বার চারিদিকে বৈ-বৈ করছে লাভি-উত পাহাড়ের তরঙ্গ—চূপচাপ নিম্বত, কোনও দিকে জনমানবের বাড়ীর চিহ্ন পর্যন্ত নাই। শুধু তাই নয়, লক্ষ্য করার মত গাছ নাই, লতা নাই, ঘূরে নীল আকাশের বিপদ পর্যন্ত পাহাড়গুলি যেন একটি সবুজ বাসের প্রসঙ্গে ঢাকা—আর কিছু নাই। মনে হয়—এ যেন এক সরসেই বিস্ত সন্ন্যাসী নিজেই শুধু স্থানের পরিশূর্ণতার নিজেই বস।

এই পাহাড়গুলির উপর দিয়ে একটি হাডা এঁকে-বঁকে চলে পিয়েছে ঘুর হতে ঘুরে এবং এই হাডাটির একটি মোড়ে একটু নীচু জায়গায়—টু ব্রিজেন্স হোটেল। এখানে একটি ছোট বরফা বৈকে স্নিগ্ধ হয়—টু ব্রিজেন্স হোটেলটির জিন্দ পান দিয়ে। হাডা

থেকে বরফাটার উপর দিয়ে হু'পাশে দুটি দেহু—হোটেল-প্রাঙ্গণে খাওয়ার জন্য। তাই বোধ হয় হোটেলটির নাম—টু ব্রিজেন্স হোটেল।

বললাম, সত্যিই বড় সুন্দর !

মার্লিন বলল, ডটমুয়র ত ইংল্যান্ডের বিখ্যাত জায়গা—এর পূর্বে কখনও দেখিনি। অনেক দেখতে আসে।

শুধালাম আচ্ছা ! এখানে এত বড় একটা হোটেল করেছে কি জন্য ? চারিদিকে বতহুর দেখা যায় জনমানবের ত বসতি নেই ?

মার্লিন বলল, পাঁথকদের আগ্রহের জন্য। দেখছ না—কত গাড়ী—বাইরে প্রাঙ্গণে পাড়িয়ে আছে।

ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছি—একতলার মধ্য বড় সুন্দর খাবার ঘর যেমন হয়, চারি দিকে ছোট ছোট খাবার টেবিল ধবধব করছে সালা চাকর ঢাকা। আশে-পাশে কিছু কিছু লোক বসে খাচ্ছে—আমরা চায় জন্মের মত একটি টেবিলে বসেছি, দু' জনার মতন টেবিলগুলি তখন সবই ভরা।

হঠাৎ মার্লিন আমার হাতের উপর হাত রেখে বলল, দেখ দেখ ?

অবাক হয়ে শুধালাম কি ?

মার্লিন বলল মিঃ রোলাও না ?

শুধালাম, কৈ ?

মার্লিন বলল, ঐ যে ঘরে চুকলেন।

খাবার ঘরে ঢোকায় একটি দরজার দিকে চেয়ে দেখি, সত্যিই মিঃ রোলাও, খাবার ঘরে ঢুকে চারি দিকে চেয়ে দেখছেন, কোন টেবিলে বসবেন। ক্রমে তাঁর লুটি পড়ল আমাদের দিকে। তিনিও একটু অবাক হয়ে যেন চাইলেন। মার্লিন হাত তুলে মিঃ রোলাওকে অভিবাদন জানাল। তিনিও এগিয়ে এলেন আমাদের টেবিলের দিকে। আমরা উঠে পাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্মান করলাম। সেই মিঃ রোলাও বুলা। মনে আছে ত ? সেই ইংল্যান্ডের বনেদী বড়লোক সার হেনরী রোলাওয়ের ছেলে। সুমর্শন, সুমাজ্জিত, সুশিক্ষিত রোলাও। মনে আছে ত লজ্জেল প্রায়ে মার্লিন যখন তার মার'র সঙ্গে বাস করত এই রোলাও, মার্লিনের কাছে প্রেম নিবেদন করে মার্লিনকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেছিল, মার্লিন রাজী হয়নি। কেন, সবই ত জান।

রোলাওয়ের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। অনেক দিন ত তাকে দেখি না। দেখলাম, চেহারার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি, তবে একটু যেন ভারি হয়েছেন। তার নরম চেহারার আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য আরও বেড়েছে বই কমেনি।

রোলাও বললেন কি আশ্চর্য্য। আপনারা সঙ্গে যে এখানে দেখা হবে এ ত একবারেই ভাবিনি।

মার্লিন বলল, আপনি এই টেবিলেই বসুন না।

‘অনেক ধন্যবাদ’ বলে মিঃ রোলাও আমাদের টেবিলেই বসলেন।

ক্রমে তাঁর ব্রেকফাস্ট এল।

মিঃ রোলাও শুধালেন, জা আপনারা এখানে ? ডটমুয়র বেড়াতে এসেছেন বুঝি ?

বললাম, ঠিক তা নয়। আমি ত সেলে ভাঙারী করি। দুটি দিকে কর্তব্যসে দু' বেড়াতে গিয়েছিলাম—কিরে বাছি।

মার্লিন বলল, জা আপনি কি বেড়াতে এসেছেন ?

হেসে বললেন, না। বছরে অন্ততঃ একবার আমাকে এখানে আসতে হয়—প্রিন্সটোনে জেল দেখবার জন্ত।

মার্লিন সহজভাবেই শুধাল, কেন ?

বললেন, পাৰ্লামেন্টের একটি কমিটি আছে—তারের কাজ দেশের বিভিন্ন জেল দেখে নিজের মতামত গভর্ণমেন্টের কাছে পেশ করা।

মার্লিন শুধাল, তা আপনি কি পাৰ্লামেন্টের সভ্য হয়েছেন নাকি ? যুহু হেসে বললেন হ্যাঁ,—বহু তিনেক হল।

মনে হল—মার্লিন বেন সন্ত্রস্ত যুগ্মবৃত্তিতে রোলাণ্ডের দিকে চেয়ে রইল।

মার্লিন শুধাল, তা আপনি কি একলাই এখানে আছেন ? মার্লিনের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, হ্যাঁ। দোকলা আর কোথায় পাব ?

মার্লিনের কথাটা সহজ করে আমি শুধালাম, তা আপনার বিবর সব জানতে বড় ইচ্ছে করে—সেই ডাউন্টন হাসপাতালে ত আপনার সঙ্গে প্রথম আসাপেই যুহু হয়েছিল।

যুহু হেসে মিঃ রোলাণ্ড শুধালেন, কি জানতে চান ?

সোজাই প্রশ্ন করলাম, যদি কিছু মনে না করেন—আপনি বিবাহ করেন নি ?

মাথা নীচু করে বললেন, না।

মার্লিনের দিকে চাইলাম। মনে হল—মার্লিন বেন একটু গভীর হয়ে গেল।

মিঃ রোলাণ্ড শুধালেন, তা আপনারা এখানে কত দিন আছেন ?

বললাম, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি, আজই লঞ্চ খেয়ে রঙরানী হব ভাবছি।

শুধালেন, প্রিন্সটোনে দেখেছেন ? যেখানে জেল ?

বললাম, না। তবে কিরে বাগার সময় ত প্রিন্সটোনের যথ্য ঘিরেই বাব।

মার্লিন শুধাল, প্রিন্সটোনে এখান থেকে কত দূর ?

রোলাণ্ড বললেন, বেশী দূর নয় এই পাঁচ-ছ' মাইল হবে।

চলুন না, ব্রেকফাস্ট খেয়ে, যদি আপনারদের অসুবিধা না হয় আপনারদের প্রিন্সটোনে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। আমাকে ত একবার যেতেই হবে আজ সকালে।

বুলা। কথাটার মন সার দিল না। রোলাণ্ডের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি খুশী হয়েছিলাম কি না জানি না। তবে তার সঙ্গে বেশী মেলায়েশার মন সন্তুষ্টি হচ্ছিল। কেন, সঠিক তোমাকে বলতে পারব না। মনে হচ্ছিল মনে, মানে, এমন কি রূপেও বোধ হয়

রোলাণ্ড ত সব দিকেই আমার চেয়ে বড়। তাই কি আজ বিশেষ করে নিজেকে ছোট মনে হচ্ছিল রোলাণ্ডের সামনে মার্লিনের কাছে ?

রোলাণ্ডকে বিবাহ করা ইত্যাদির যে কোনও মেয়ের পক্ষে সৌরবের কথা অথচ মার্লিন একদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আত্ম-বঞ্জন

এমন কি নিজের বাঁও মস্তের বিরুদ্ধে আমারই জন্ত। তাই কি এখন আমার ভর হল পাছে মার্লিনের মনে একটুকুও অসুখোচনার দাগ লাগে অতীতের দিক দিয়ে ? তাই কি বন রোলাণ্ডকে এড়িয়ে চলতে চায় ?

পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। বুলা। কিন্তু ঠিক কারণটি খুঁজে পাইনি। যুহু বললাম, অনেক বতাবাদ কিন্তু করা করবেন।

আমাদের ত লঞ্চ খেয়েই কেমন হবে তাই—

মার্লিন শুধাল, আপনি এখানে কত দিন থাকবেন ?

রোলাণ্ড বললেন, আরও দিন দুই আছি।

মার্লিন শুধাল, তারপর কি হাইটনে কিরে যাবেন ?

বুলা। লন্ডেল গ্রামের কাছাকাছি হাইটন গ্রামে রোলাণ্ডের বিরাট প্রাসাদ ও বিস্তার্ত বাগান ও অকলের একটা দেখার জিনিস, জানই ত ?

রোলাণ্ড বললেন, না। লন্ডনে কিরে বাব, সেখানে অনেক কাজ।

শুধালাম, লন্ডনেও ত আপনারদের বাড়ী আছে ?

বললেন, হ্যাঁ।

ক্রমে ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ হল। খাবার ঘর থেকে আরম্ভা বেরিয়ে এসে বসলাম লাউঞ্জে। একটু পরেই রোলাণ্ড উঠলেন, বললেন, এইবার আমাকে প্রিন্সটোনে যেতে হবে।

মার্লিন শুধাল, তা লঞ্চ খাওয়ার মধ্যে কিরে আসবেন ত ?

হেসে বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই খাবার দেখা হবে।

রোলাণ্ড বিদায় সন্ধ্যায় জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রোলাণ্ডের প্রকাণ্ড গাড়ী ও উদ্ভিদপরা ড্রাইভার ইতিমধ্যে হোটেলের কটকের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

মার্লিন বলল চল, আমরাও একটু হেটে বেড়িয়ে আসি।

বললাম, চল।

বেড়াতে বেড়াতে মার্লিন বলল, কি সুন্দর শান্তিপূর্ণ জায়গা, খুব ভাল লাগছে বিকো !

বললাম, সত্যিই ভাল।

মার্লিন বলল, তোমার ত ছুটা আরও করেক দিন আছে, এস, দিন দুই তিন এখানে থেকে বাই।

মনটা হঠাৎ বেন চমকে উঠল। লুতে মার্লিন বাড়ী বাগারের জন্ত কি রকম ব্যস্ত হয়েছিল—ভুলিনি ত। সেই অল্পসারেই বন্দোবস্ত হয়েছিল পথে কোথাও থুথু অপেক্ষা করব না, সোজা বাড়ী ফিরব।

হঠাৎ এখানে এসে মনের পরিবর্তন হল কেন ? তবে কি রোলাণ্ডকে—

মনকে চাবুক মেখে বললাম, ছিঃ ছিঃ, এ তোমার কি দৈন্ত ? যুহু বললাম, তা তুমিই ত বাড়ী বাগারের জন্ত ব্যস্ত হয়েছিলে ?

বলল, এমন জায়গা পাব ত ভাবিনি। এখানে বড় ভাল লাগছে। একটু চুপ করে থেকে বললাম, বেশ ! তোমার যদি ইচ্ছে হয় ত তাই হবে।

আমার হাতটা ধরে বলল বিকো ! তোমার তুলনা নাই !

দুপুরে লঞ্চ খাওয়ার জন্ত খাবার ঘরে ঢুকে দেখি—মিঃ রোলাণ্ড ইতিমধ্যেই খাবার ঘরে এসে টেবিলে বসে আছেন, সেই সকালের টেবিলে। মার্লিন রোলাণ্ডকে দেখেই হেসে এগিয়ে গেল, আমিও গেলাম পিছনে।

বখারীতি সন্ধ্যায়ের পর, বসে মার্লিন বলল, আপনি ত খুব ঈগুপিও কিরে এসেছেন। রোলাণ্ড বললেন, কাজও বেশী ছিল না—

সামান্য। মার্লিন শুধাল শেষ হয়েচে ?

রোলাণ্ড বললেন না—পরও আর একবার যেতে হবে।

মার্লিন বলল জ্বলেন—আমরা ঠিক করেছি, আমরাও দিন দুই তিন এখানে থাকব।

রোলাও হেসে বললেন চমৎকার! এখানে আপনাদের গল
শেলে আমার সমস্তা খাশা কাটিবে।

ক্রমে মনে হল মালিন যেন রোলাওকে পেয়ে উল্লসিত হয়ে
উঠল। বৃহস্পতি পূবে হারিয়ে-বাওয়া একান্ত আপনায় লোকের
সঙ্গে দেখা হলে কথার-বার্তায় মাধুর্য যেমন হয় কতকটা সেই রকম।
সুখ শেষের দিকে মালিনের সেই মুখভেদা ভাব রোলাওকে পেয়ে
যেন গেল কেটে।

মালিনের ঐ ভাবান্তরে মনটা কি আমার খুসী হয়েছিল?

মালিন কথার কথায় একটু যেন আবলারের সুরে বলল,
আমাদের একদিন প্রিন্সটাইন দেখাতে নিয়ে যাবেন না?

রোলাও বললেন নিশ্চয়ই—আনন্দের সঙ্গে। আজই চলুন।
—আজকের পরে বাই।

বললাম, না না। আজ থাক। আজ আপনি সকালে ঘুরে
এসেছেন—আবার বিকেলে কেন?

বললেন, তাতে কি হয়েছে?

মালিন বলল, আজ থাক। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে
বাওয়া যাবে।

রোলাও বলল, বেশ, যা আপনাদের সুবিধা হয়।

এমন সময় হোটেলের কত্রী একটি বর্ষারী মূল্যবান মহিলা খাবার
ঘরে ঢুকে আমাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এসেন। এসে রোলাওকে
সহজ অভিযান জানিয়ে বললেন সার আর্থার! আপনাকে
টেলিকোনে ডাকছে।

ক্ষমা করবেন—এখুনিই আসছি বলে রোলাও টেবিল ছেড়ে
চলে গেলেন।

মালিন বলল, সার আর্থার। তাহলে সার হেনরী মরে গেছেন
বোধ হয়। উত্তরাধিকারী সুরে উনিই নাইট হুড পেয়েছেন।

বললাম, হবে।

দুজনই খানকক্ষ চূপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম, দেখ লীনা! ওরা বড়লোক।
আমাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে না। ওদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা
না করাই ভাল।

মালিন বলল, কিন্তু ঠিক মধ্যে তা বড়লোকী ভাব কিছুই নাই?

বললাম, সেটা ঠিক ভ্রমতা—বাইরের মুখোশ। মালিন যেন
ঈষৎ একটু উত্তেজিত ভাবে বলল।

এ কথা বলা তোমার অভ্যাস। শুঁকে ত অনেক দিন ধরেই
জানি—ভ্রমতাটা ঠিক বাস্তবিক, মুখোশ একেবারেই নৈর।

মালিনের কথায় কি রাগ হল? মনের মধ্যে একটু একটু রাগ
কি ইতিমধ্যেই পূজাভূত হচ্ছিল? বলি বলি করে শেষ পর্যন্ত
কলই কেললাম

ভাড়াটা অত্যন্ত তোমার সঙ্গে ঠিক বা ব্যাপার ঘটছিল তাতে
করে ওর সঙ্গে তোমার সহজ মেলামেশায় একটা লজ্জা হওয়াই
যাচাযিক।

মালিন চূপ করে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না। তারপর গভীর ভাবে বলল
কেন, তাই যদি তোমার মনে হয়—ওর সঙ্গে আমি আর কথা
বলব না।

বললাম, আমি ত সে কথা বলছি না। আমার মতে
বাড়াবাড়িটা শোভন নয়।

বুলা! হাজার হলেও ত আমার ভারতীয় মন—ভারতীয়
মাপকাঠিতেই সব বিচার করি। ইতিমধ্যে ভারতীয় মাপকাঠিতেই
মালিনকে বাচাই করে নিয়ে একথা আমার বার বারে মনে
হয়েছে—ভারতীয় মেয়ে এ অবস্থায় রোলাওকে এড়িয়ে চলত,
সহজ মেলামেশায় লজ্জা পেত। তাই কি রোলাওর সঙ্গে মালিনের
সহজ আশ্রয় ভগ্ন ব্যবহারে আমার মন সার দেয়নি?

কিছুক্ষণ দুজনই চূপচাপ। মালিনের মুখের দিকে চেয়ে
দেখলাম, অসাধারণ গভীর মুখে বিষন্ন চোখ দুটি যেন একটু সম্ভল হয়ে
উঠেছে। মালিনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্রমে আমার মনে
মালিনকে কথটা ওভাবে বলার দরুণ একটা লজ্জা এল।

হাস্তের উপর হাত রেখে ডাকলাম লীনা! চোখ তুলে আমার
দিকে চাইল।

বললাম লীনা! আমাকে ভুল বুঝ না। মূহু হেসে মাথা
তুলিয়ে বলল, না।

অতি সহজভাবে এই ‘না’ কথাটি বলার দরুণ আমার
মনটা যেন একেবারে গুলে গেল। হাতখানি চেপে ধরে বললাম,
লীনা! আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি দুঃখিত।

সেই বিষন্ন গভীর চোখ দুটি তুলে খানকক্ষ চেয়ে রইল
আমার মুখের দিকে—টোটে মাখান ছিল সেট মৃদ হাসিটি।

তারপর ধীরে ধীরে বলল, বিকে! তুমি একটু ডালি।

এমন সময় রোলাও ফিরে এল। এসে বললেন, আমি দুঃখিত।
এতক্ষণ আপনাদের বসন্ত হয়েছে।

বললাম, না না। তার জন্ত কি?

কথার কথায় মি: রোলাও বললেন, তাহলে কাল ত প্রিন্সটাইনে
যাব সকালবেলা। আজ চলুন, বিকেলবেলা গাড়ী করে ডাউনটো
বেড়িয়ে আসি।

তাড়াতাড়ি বললাম, বেশ ত। কিন্তু বিকেলে আমার গাড়ী নিয়ে
বেকুব—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

হেসে বললেন, বেশ—যদি তাই আপনার ইচ্ছে হয়।

* * *

বিকেলে চাই খেবে বধাসময়ে বেড়াতে বেরুন হল আমার
গাড়ীতে। মালিন অবশ্য তার ব্যবহারে আগার খবর সহজই হয়ে
উঠেছিল কিন্তু তার সেই হাসিমুখী ভাবটা যেন আর নাই—একটু শান্ত
সমাহিত ধরণ-ধারণ।

আমার গাড়ীর ত ডাইভার নাই—তাই আমাকেই বসতে হ’ল
ডাইভারের আসনে। ডাইভারের পাশে দুজনাব বসা চলে না, তাই
একজনকে বসতে হয়। মি: রোলাও বাইরের দরজা খুলে মালিনকে
অনুবোধ জানাল আমার পাশে বসবার জন্ত। মালিন অতি সহজ
ভাবেই বলল, না, চলুন আমরা দু’জনে ভিতরে বসি।

মি: রোলাও হাসিমুখে ‘অনেক ধন্যবাদ, বলে মালিনকে
নিয়ে ভিতরে বসলেন। আমি অবশ্য একটি কথাও বলিনি।
আমাদের ভারতীয় মনের গতি বাই হোক, এদেশের ভ্রমতার দিক
দিয়ে মালিনের কাজে ক্রটি ঘটা চলে না কিন্তু তবুও মনটা যে একটু
অনমনস্ক হয়ে গেল, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নাই। কলে যদিও

অনেক দূর পৰ্ব্বাত ডাউনরের উপর গিয়ে বেড়িয়ে এলাম, ভিতরে ওদের কথাবার্তার আমি তেমন কানও নিই নাই, কিংবা বিশেষ যে বোগ গিয়েছিলাম, এমন কথা বলতে পারি না।

ক্রমে মনটাকে পেরে বলল—দুপুরে লাঞ্চার সময় মার্লিনের সঙ্গে আমার যে কথা হতেছিল তাই নিয়ে। মনে হল, আমার মনের কথাটা মার্লিনকে ঠিক বুঝিয়ে যেন বলা হয়নি বরং এমন একটা বেকাস কথা বলে ফেলেছিলাম—যাব জন্ত মার্লিন আমাকে কি ভাবল কে জানে। একথাটা ভাবতে একটা গ্লানি এস মনে। ভেবে ঠিক করলাম, আজ রাত্রে মার্লিনের সঙ্গে একটু বিস্তারিত কথা বলতে হবে—জিনিষটা পরিষ্কার করে কোলা দরকার।

কিন্তু কি পারিবার কংব? আমার মনের কথাটা ঠিক কি? ভাবতে গিয়ে কোনই কুল-কিনারা পেলাম না, সবই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।

* * *

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মার্লিনকে বললাম, লীনা! তুমি ঠিকই বলেছিলে, বাইরের জগতের সঙ্গে বেশী সংযাত ভাল নয়। তাতে শান্তিভঙ্গই হয়।

মার্লিন শুধাল, হঠাৎ তোমার একথা মনে হচ্ছে কেন?

বললাম, লু-তে তোমার যে বকম হয়েছিল আমারও তাই হচ্ছে। মনটা আকুল হয়ে উঠেছে আমাদের সেই নিরিবিধি শান্তিপূর্ণ 'বিকোলনা'য় গিয়ে বাস করবার জন্ত।

মার্লিন বলল, তাই ত বাব।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, লীনা! দুপুরে তোমাকে যে ভাবে কথাটী বলেছি—ভুল করেছিলাম।

মার্লিন বলল, ও কথা আর কেন?

বললাম, কথাটা কি জানি—রোলাগুকে এবার আমার সে বকম ভাল লাগছে না।

শুধাল, কেন?

বললাম কি জানি—ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না। ডাউটনে প্রথম আলাপে যে বকম মুখ হয়েছিলাম—সে জিনিষ ঠিক যেন ওর মধ্যে পাক্কি না।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, তোমার যদি ভাল না লাগে, দরকার কি ওর সঙ্গে মেলামেশা করাব?

বললাম, না! দু'একদিন বা আছি ভ্রমতাটা বজায় রেখে চলাই ভাল।

মার্লিন বলল বেশ। যা তোমার ইচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, কথাটা কি জান লীনা, আমিও ত খুব বড় বয়েসী বংশের ছেলে—জান ত সবই। কিন্তু আমি ত সেই গর্বে লেগে ফির গিয়ে ক্ষীণ হয়ে উঠিনি। সেই দেশকেই অনায়াসে ছেড়েছি, তোমারই জন্ত। তোমাকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাসি বলে।

মার্লিন চুপ করে রইল। কোনও কথা বলল না।

একটু পরে আমিই বললাম, কিন্তু রোলাগুর মধ্যে সেই আদর্শের দিকটা এখন আর যেন নেই। নিজের উন্নত অবস্থার সে যেন ভারি হয়ে উঠেছে, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার শক্তি যেন হারিয়েছে। তাই ওর সঙ্গে আমার মনের মূর মিলছে না।

মার্লিন বলল, ওর সঙ্গে মনের মূর মেলাবার কি দরকার?

বললাম, আমার মনের মূর মিলছে না—তাই বোধ হয় আপা করেছিলাম তোমারও মনের মূর মিলবে না। তোমার আমার মন ত এক স্তরেই বীধা।

মার্লিন চুপ করেই রইল। বললাম, তোমাকে ত আমি জানি লীনা। তুমিও ত বিশিষ্ট ভ্রমত্বের মেয়ে। তোমার বাবা ব্রাহ্মপুত্রের বিখ্যাত লোক ছিলেন—সেখর হওয়ার কথা ছিল। তোমার বাবা কলঙ্কহীন।

কলঙ্কহীন এই কথাটা যেন বিশেষ ক'র ব্যত্কার করেছিলাম। কেন? বৃল! মনে আছে ত বোলাগুর কলে, তার একজন পূর্বপুরুষ একটি বিবাহিত স্ত্রীলোককে নিয়ে আট্টাঙ্গার পালিয়ে যান এবং সেখানেই তিনি দেহভাগ করেন। বোলাগুর বংশের এই কলঙ্কটিও কথা তখন কি আমার মনে বিশেষ করে সজাগ হয়ে উঠেছিল? মার্লিনকে একটু ঘুরিয়ে সেলিকেরও একটু ইঙ্গিত দেওয়ার প্রবৃত্তি কি জেগেছিল মনে?

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস মার্লিনের বুক ছাপিয়ে পড়ল।

আবার বললাম, তাই তোমাকে বিবাহ করে আমি ত আমার কামমর্ষণায় কোনও ত্রুটি ঘটাইনি! সেইটুকুই আমার মনের অভিজ্ঞাতের দিক দিয়ে যথেষ্ট। আর আমি কিছু চাইনি। অনায়াসে সব ছেড়েছি তোমার জন্ত। তাই ত আমাদের প্রেম এক মধুর হয়ে উঠেছে।

মার্লিন চুপ করেই রইল। একটু চুপ করে থেকে বললাম, লীনা! আসল কথাটা হচ্ছে তাগের মধ্য দিয়েই জীবন মধুর হয়, ভোগের মধ্য দিয়ে নয়। বোলাগুর মধ্যে সেই ত্যাগে—

কথা খামিয়ে দিয়ে মার্লিন যেন একটু বিরক্তির মূরে বলল, বোলাগুর কথা থাক না বিকো।

কথাটার কি মনে লাগল? অভিমান হল। আর কিছু বলিনি, ক্রমে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * *

পরের দিন সকালবেলা উঠে দেখলাম—মনটা ভাল নাই। কারণ খুঁজে নিতে দেবী হল না। কাল রাত্রে মার্লিনের কাছে কি যা-তা আবেল-তাবোল সব বকেছি, ভাবাত মনটা যেন একটা দৈন্তে ভরে গেল। কিছু না বললেই ভাল হত।

পাশে চেয়ে দেখলাম—মার্লিন হুসুখ বলে মনে 'চল। মার্লিনকে না ডেকে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পরে যখন আমি তৈরী হয়েছি তখনও মার্লিন চোখ বুজে শুয়েই আছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—পৌনে ন'টা বেজে গেছে। মনে পড় গেল—ব্রহ্মাষ্ট খোর আজ সকালে প্রিন্সটন হাওয়ার কথা। মার্লিনের কাছে গিয়ে সম্বোধে মার্লিনকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম লীনা! লীনা! ন'টা বাজে উঠবে না?

মার্লিন চোখ মেলে চাইল—লজ্জা করলাম, চোখ দুটি লাল হয়ে রয়েছে।

বলল, আমার শরীর ভাল নেই—বড্ড মাথা ধরেছে। আমি আজ আর ব্রেকফাস্ট নাযব না।

ব্যাকুল ভাবে বললাম, হয় হল নাকি ? কপালে হাত দিয়ে দেখলাম—কপাল ঠাণ্ডা।

মার্লিন বলল, না না। একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। বললাম, আজ বে ব্রেকফাস্ট খেয়ে প্রিন্সটাইন বেড়াতে যাওয়ার কথা।

বলল, এ বেলা ত পারবই না। পরে দেখা যাবে।

গুথলাম, এ্যাসপ্রিন খাবে—সেব ?

বলল, হ্যাঁ।

মার্লিনকে এ্যাসপ্রিন খাইয়ে আমি নীচে নেমে এলাম। মার্লিন জেয়েই রইল। যাওয়ার সময় বলল এলাম, আমি তোমার ব্রেকফাস্ট উপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মার্লিন বলছিল, শুধু চা ও একখানা ট্রাষ্ট—আর কিছু নয়।

বলা। তখন কি একটুও টের পেয়েছিলাম যে একটা মানসিক দৃশ্যে মার্লিন প্রায় সমস্ত রাত ঘুমেতে পাবেন ?

সকালবেলা ব্রেকফাস্টে টেবিলে রোলাণ্ডকে বধন মার্লিনের অন্তহতার কথা বললাম, রোলাণ্ড সত্যি অন্তস্ত হুঃখিত হয়ে উঠলেন। বললেন, তাহলে আজ উনি সমস্ত দিন বিশ্রামের উপরেই থাকুন।

বললাম, না—না। তেমন কিছুই নয়, বোধ হয় লক্ষের মধ্যেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

হলও তাই। মার্লিন বধন লাগে নেমে এল, তখন সে স্নহ হয়ে উঠেছে—শুধু একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। লাগ টেবিলে মিঃ রোলাণ্ড কথায় কথায় মার্লিনকে বললেন, আপনাকে এখনও একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আজ আপনি বিশ্রাম করুন। যদি স্নহ বোধ করেন কাল সময়ে প্রিন্সটাইনে বেড়াতে যাওয়া যাবে।

মার্লিন সজ্ঞ ভাবেই বলল, না। আমি এখন বেশ ভাল আছি। যদি আপনার অন্তবিধা না হয়—আজই চলুন লাগ খেয়ে প্রিন্সটাইনটা দেখে আসি।

সেই কথাই ঠিক হল। লাগ খেয়ে মিঃ রোলাণ্ডের গাড়ীতে আমরা প্রিন্সটাইন রওনা হলাম।

টু জিক্সেস্ হোটেল থেকে মাইল পাঁচ-ছয় ডিট্রয়ের উপর দিয়ে গেলে প্রিন্সটাইন পাওয়া যায়। প্রিন্সটাইন ছোট একটি সহর, বেশী লোকজনদের ভিড় নাই। একটি মাত্র প্রধান রাস্তা—তার ধারে দু-একটি বড় বড় বাড়ী দেখলাম, আর সবই ছোট ছোট বাড়ী চারিদিকে ছড়ান, তাও খুব বেশী নয়।

এই রাস্তার উপর করেকটি ছোট ছোট দোকানও চোখে পড়ল। কিন্তু প্রিন্সটাইনের বিশেষত্ব হচ্ছে—তার জেল। সহরের একটা পাশ দিয়ে একাধিক টুঁচু প্রাচীরে বহুবর্ষ পর্ষদ ঘেরা প্রিন্সটাইনের বিখ্যাত জেল। মিঃ রোলাণ্ডের কাছে গুনলাম, এইটেই ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রধান জেল। বুনি, ডাক্তারি প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধের জন্য যাদের দীর্ঘকাল মেয়াদের শাস্তি হয়, তাদের প্রিন্সটাইনেই রাখা হয়।

প্রিন্সটাইনে পৌঁছে রোলাণ্ড ও বালেন, জেলের ভিতর দেখলেন ? আমি আপনাদের জেলের ভিতর নিয়ে যেতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে মার্লিন উত্তর দিল, না। কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমি ও মার্লিন দুজনেই অবাক হলাম। সহরের

চারিদিকে কয়েকদূরীয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কাল করছে—কেউ কেউ বা পাখর বয়ে নিয়ে বাচ্ছে, কেউ কেউ বা কয়লা-বোঝাই গাড়ী নিয়ে বাচ্ছে ট্রেনে—ইত্যাদি। এক একটা দলের সঙ্গে হয়ত এক একটা জেলের পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোনও কোনও কয়েককে একা ঘুরে বেড়িয়ে কাল করতেও দেখলাম, তাদের গোঁষক মেখে তারা যে জেলের কয়েদী, চিনতে আমাদের ঘেরী হয়নি। আমাদের গাড়ী বধন এই সব কয়েদীর পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে বাচ্ছিল—কেউ কেউ বা আমাদের দিকে ধী করে চেয়ে দেখছিল এক তালের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের দিকে চেয়ে বিকৃত মুখকল্লীও করতে বিধা করেনি। কিন্তু অনেকই মার্লিনের দিকে চেয়ে হেসে নিজেদের মনে। বড় বিড় করে কি যেন বলছিল।

হঠাৎ মার্লিন বলল, আমার এ সব দেখতে ভাল লাগছে না। চলুন কোথাও গিয়ে একটু চা খাওয়া যাক।

মিঃ রোলাণ্ড একটু হেসে বললেন, বেশ ত।

মিঃ রোলাণ্ডের নির্দেশে তাঁর ড্রাইভার গাড়ী ঘুরিয়ে একটা চায়ের দোকানের সামনে রাখল। আমরা গাড়ী থেকে নেমে দোকানে ঢুকলাম—চা খাওয়ার জন্য।

দোকানটি ছোট, তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে সাদির জানালা এবং ঘরের মধ্যে দরজা, জানালার পর্দাগুলিও ভাল। চারিদিকে সাজান ছোট ছোট চেয়ার, টেবিলগুলোও বেশ ভাল ভাবেই রাখা হয়েছে।

চা এল—চা খেতে খেতে আমি ও রোলাণ্ড কথাবার্তা বলছিলাম—মার্লিন গভীর। কথায় কথায় রোলাণ্ড বললেন, মিসেস চৌধুরী আর না এলেই ভাল হত, শরীরটা ত—

মার্লিন কথা ধারিয়ে দিয়ে বলল, না না, আমার শরীরের কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

গুথলাম, তবে এত চুপ করে আছ ?

বলল ভাবছি—কি দুর্ভিক্ষ নিরাশ্রয় এদের জীবন।

রোলাণ্ড বললেন, আমরা ওদের জীবনকে একটু আনন্দময় করার জন্য অনেক ব্যবস্থা করেছি। সন্ধ্যার পরে জেলে খেলাধুলো, এমন কি সিনেমা পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেখান হয়।

মুহু হেসে মার্লিন বলল, তাতে করে আর কতটুকুই বা হয়।

একটু চুপ করে থেকে রোলাণ্ড বললেন, আর কি করা যায় বলুন ? সমাজে অপরাধের শাস্তি ত নিতেই হবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মার্লিন বলল, এদের মধ্যে কত নিরপরাধী আছে—বিচারের ভুলে এই শাস্তি পাচ্ছে—নয় কি ?

রোলাণ্ড বললেন হয়ত বা আছে। কিন্তু তার আর কি উপায় আছে বলুন ?

মার্লিন চুপ করেই রইল—একথা নিয়ে আর আলোচনা করল না। আমরা চুপ করেই গিয়েছিলাম। শিতায়হ রশ্মিদর্শন কথা কি আমরা মনে পড়েছিল ?

হঠাৎ মার্লিন গুথলাম আচ্ছা, এরা পালায় না ? যে রকম ঘাবীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্যায়সে ত পালাতে পারে ?

মুহু হেসে রোলাণ্ড বললেন, ডিট্রয়ের থেকে পালান সোজা নয়। চারিদিকে হাইলের পর মাইল খেঁ খেঁ করছে 'হু'—জনবান্ধবের কলি নেই। পালানো না খেতে পেয়েই মনে বাসে কিংবা

রাতে ঠাণ্ডার বাবে জমে। তাও ঘুরে ঘুরে গ্রামগুলিতে পুলিশের পাগারা আছে। এইজন্যই ত বিশেষ করে ডিট্রুয়ে প্রধান জেল তৈরী করা হয়েছে।

মার্লিন শুধাল, কেউ কি কখনও পালারনি?

রোলাণ্ড বললেন, আমি যতদূর এ জেলের ইতিহাস জানি—বহুর নয়-নশ আগে একটি লোক পালিয়েছিল। তার আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বোধ হয় ডিট্রুয়েই প্রাণ দিয়েছে।

মার্লিন চুপ করে গেল। পরে হঠাৎ শুধাল, আচ্ছা, আপনি ত জেলের আইন সব জানেন?

হেসে রোলাণ্ড বললেন, সব জানি না—তবে কিছু কিছু পড়তে হয়েছে।

মার্লিন শুধাল, আচ্ছা, যদি জেল থেকে পালানো লোকের কেউ সন্ধান পায়, সে কি করবে?

রোলাণ্ড বললেন, তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেবে।

শুধাল, আর যদি না দেয়?

রোলাণ্ড বললেন, সে বিষয়ে আইন বড় কড়া। তাহলে দারুণ শাস্তি পেতে হবে। পলাতক কয়েদীর খবর জেনে চেষ্টা রাখা জরুরী অশরায়।

মার্লিন চুপ করে গেল। আর কোনও কথা বলল না।

* * * * *

প্রিন্সটন থেকে ফিরে এসে মার্লিন সোজা বিছানার ওয়ে পড়ল। বিছানার পাশে বসে শুধাল, লীনা! তোমার শরীর কি আবার খায়াপ গোধ হচ্ছে?

বলল, না। একটু রক্ত লাগছে।

বললাম, আজ তোমার না গেলেই ভাল হত।

সে কথাই কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, বিকো। চল এখন থেকে চলে যাই। আমার আর ভাল লাগছে না।

বললাম, বেশ ত। তোমার যা ইচ্ছে—

বলল, চল। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই যাই চলে।

তাই ঠিক হল। মার্লিনের এই চলে বাওয়ার আশ্রয়ে আমার মনটা কেন যে খুসী হয়ে উঠল—জানি না।

ক্রমে ডিনার খাওয়ার সময় এল। বললাম লীনা। তুমি বিশ্রাম কর। তোমার ডিনার আমি উপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলল, না—নীচেই যাই। মি: রোলাণ্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট দেখা না-ও হতে পারে।

মি: রোলাণ্ডের কাছ থেকে বিদায়—এমন কি একটা বড় ব্যাপার যার জন্য মার্লিনকে রক্ত শরীরে নীচে যেতে হবে? মন সার দিল না।

বললাম, তার কি দরকার। আমি না হয় তোমার হয়ে কমা চেয়ে রোলাণ্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেব।

বলল, না। চল আমিও যাই।

খেয়ে-দেয়ে রাতে বিছানার ওয়ে অনায়াসেই ঘুমিয়ে পড়লাম—আবার ভোরে উঠে পোড়পাছ করে বগুনানা হতে হবে।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল—যেন মনে পেলো, পাশেই একটা চাপা কান্নার আওয়াজ। চমকে মাথা তুলে চেয়ে দেখি, মার্লিন পাশেই বাসিনে মুখ ওঁড়ে শুয়ে আছে চুপচাপ, নিশ্চল। কিছুক্ষণ মার্লিনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম—যত্নে বললই শু মনে হল। আমায়ই ভুল—এই মনে করে আবার বাসিনে মাথা দিয়ে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। [ক্রমশঃ]

স্বপ্নের রাত্রির মাঝে

ঐতপূর্বকৃত ভট্টাচার্য

জীবনের কথা যত অক্ষজলে হোলো লেখা

একে একে হারিয়েছে দুঃস্বপ্ন সমীরে।

ছায়াভরা গোধূলিতে দিক্‌চক্রে ছিন্ন রেখা

দেখেছি বর্ণময় নীল সিঁদুরীয়ে।



জন্মের স্বপ্নের সাথে অতীতের স্মৃতি ভাসে

দুঃস্বপ্নে হোতে ডেকে গেল যাবার পাখী;

স্বপ্নের রাত্রির মাঝে সময় বিমারে আসে

অধীর দুঃখা নিয়ে কেন জেগে থাকি?

ভয়-ভয় স্তম্ভি মৌর, কণ্ঠ স্বর বায় খেমে,

অকৃষ্ণির হাটাকায়ে ডুব গেল চাঁদ।

ম্রোত্তের বিদ্রোহ শুনি মেঘেরা এসেছে নেমে,

অনায়েছে বালুচয়ে রক্ত অবশ্য।

অসহায় এ অস্তরে একা বাক্য অবকাশ,

স্বপ্নের নীরবতা ঘিরেছে আমায়।

ভেসে গেছে মধুশাখা—মাধবীলতার ত্রাস,

বীথিকার আর্দ্রনাদ-সঙ্কল আঁধারে।

অবসর লীর্ণচিত্তে নৈরাশ্রের নিশাচর

বিচলিত করে কেন অশান্ত আবেগে?

মনের ভূগোলে বড় উঠিতেছে নিরন্তর,

উৎসবের অবসর নাহি আর জেগে।

আগামী দিনের নীচে প্রভাতী ফুল-খানি

পশ্চিমের দিকে কাল মৌর বজলীর সাথে যাবি?

ভাবি এক, হয় আর

ঐদিলীপকুমার রায়

ছাফিফ

পূর্বব জেনোয়ার পৌড়ল সন্নিহিত রাতে। প্রান্ত চোটেলে

রাতট কাটিয়ে পরদিন সকালে উঠেই গেল সোজা লয়েড ব্রিগেডিয়ানো অফিসে। তার খাতাপত্র দেখে একগাল হেসে বলল : এক আমেরিকান ভাইই তার করেছে। রোম থেকে যে তিনি নাপোলিতে যেতে পারবেন না তার দাবীটি পেতে পারেন—Signore e fortunato, ma deve Comprarlo liglietti—Subito—di prima class... ১

পল্লব বাবা দিয়ে যথাবিধি Multi graxic ২

চোটেলে ফিরে স্বস্তির দর্শনিন্দাস ফেল প্রথমেই তার করে দিল কুহুমকে। তার পরে লিখল—এলিওনোংকে, যুসফকে, ফ্রাউ ফ্রোয়ারকে ও শাপিবাকে। প্রত্যেককেই লিখেছিল—নাপোলি জাগজে বনো হচ্ছে ঠিক এক সপ্তাহ পরে—এর মধ্যে আশা করি উত্তর পাবে... ইত্যাদি

হুম্বের চিঠির শেষে পুনরুত্থার গুণু জুড় দিল : খুব লোক কিছ। কথা দিয়েও কথা রাখল না—জানালে না কোনো খবর। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি—হঠাৎ—সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। কী ভাবে বলল না—তুমি যখন বলো না কিছু, আমিই বা বলব কেন ? গুণু বলি—ভালোই হ'ল যে আইরিন সময় টের পেয়েছে তার পথ আলো, আমার পথ আলো। বাকি ভালোবেসেছে সে যেন ওকে পূর্ণতার দিকে ঠেলে দেয়। ও স্বধী হোক—এই প্রার্থনা।

তিন দিন পরে প্রথম উত্তর এল হুম্বের কাছ থেকে।

প্রিয় পল, তোমার চিঠি পেয়েছি। আইরিন দিন দুই হ'ল ফিরেছে ডেনিস থেকে। তোমাদের কী ভাবে দেখা হয়েছিল তাও শুনলাম। এ সবকিছু আমি কিছু লিখতে চাই না ; কারণ আইরিন সম্ভবত তোমাকে নিজেই লিখবে। কিন্তু যদি না ও তেঁকে তবে ব'লে রাখি—তাৎসু ভুল ভেবে মিথ্যে কষ্ট পেয়ে না। দেশে ফিরে তোমাকে সব বলব—যানে যদি সে নিজে না লেখে। কেবল আর একটা কথা : বাটবের যোগাযোগে অনেক সময়ই মাতৃবের এমন ছবি ফুটে ওঠে যা তার স্বরূপ নয়। এর বেশি আজ আর বলব না।

প্রার্থনা করি—তুমি সফল হও, সার্থক হও। তোমার কাছে আমি যে কতখানি কণী তা তুমি জানো না।

আজ কদিন থেকে তোমার একটি গান তেবলি ফিরে ফিরে আমার কানে বাজছে—যে-গানটি তুমি আইরিনের কাছে দেখা একটি কণ গানের হৃদে স্তরে অঙ্কন করে গাইতে—তোমার ভাবে ভরা কণ্ঠ :

১। মহাপর পৌত্তায়াব, কিন্তু আপনাকে এখনি টিকিট কিনতে হবে—প্রথম শ্রেণীর।

২। কল্ল কল্ল।

কে বা শুধন জানিত বলে প্রবৃত্ত করে সফল

সমীপে যে-বাণী নাহি জানে ?

আজ যে বেদনা দেখে আনে কাল তারি বরণান

জাগে বল কুল গানে গানে।

ইতি। হুম্বক।

সাতাহ

একদিন—দু'দিন—তিনদিন কেটে গেল—কিন্তু কই আইরিনের প্রত্যাশিত চিঠি ? মনের মধ্যে ওর ব্যথা ওঠে ওম্বের ওম্বের—সময়ে সময়ে কোভের বলে তাকে পায়ে দাবিয়ে রাখতে—কিন্তু আবার ভেগে ওঠে—নিরাশার সঙ্গে আশা, ক্লান্ততার সঙ্গে কৌমল্য। আইরিনকে ও ভুল বুঝছে ? কিন্তু কেমন করে ? স্বরূপে দেখে নি কি ?

এল সোমবার। আজ সন্ধ্যা সাতটার জেনোয়ার থেকে নাপোলি ছাড়বে। পল্লব সকালে হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করল : কোনো চিঠি ?

ম্যানেজার একগাল হেসে বললে : Si, Signore ! ও ধামে ষ্টকহলমের ছাপ।

প্রিয়, পল ! তোমার চিঠি পেলাম। তুমি যে এত হঠাৎ দেশে ফেরা স্থির করবে ভাবি নি। কিন্তু তোমার প্রিয়তম বন্ধুর এমন কঠিন অনুরোধ—তুমি অপেক্ষা করবেই বা কেমন করে ? এদিকে আমার বাবারও অনুরোধ কঠিন। কবে সাধবে—বা আরো সারবে কি না—কেউ বলতে পারে না। তোমাকে আরো অনেক কথা বলবার ছিল—হ'ল না। আমার অন্তঃ। হয়ত—কর একদিন দেখা হবে—কোথায় কে জানে ?

কিন্তু হয়ত কোনদিনই আর আমাদের দেখা হবে না। ভাবতে এখনো ব্যথা বাজে। আমি মাস কয়েক আগেও ভাবতাম যে বন্ধুত্ব পূর্ব আমার জীবনে শেষ হ'য়ে গেছে—কর্মের মধ্যেই আমাকে খুঁজতে হবে—কী যে সে ইষ্টার্থের নাম—এখনো জানি না। কেবল এইটুকু জানি যে যদি নিজের কাছে খাটি থাকি তবে একদিন না একদিন জানতে পারবই পারব।

এক একবার ভাবি—তোমার সঙ্গে দু'দিনে যে-স্নেহকল্লটি এমন স্বচ্ছন্দে গ'ড়ে উঠেছিল—মার্চ ঘাটে আপনা থেকে ফুটে ওঠা খাসের ফুলের মতনই—তার সার্থকতা কোথায় ? জানি না। কেবল একটা কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না : যে এ সবকিছের মধ্যে যে স্রবমটি আমাদের কাছের কোনো চাঁড়য়ার অপেক্ষা না রেখেই ফুটে উঠেছিল নিতৌল হয়ে—সে আকস্মিক অর্থহীন কোনো কিছু হ'তে পারে। মনে হয়—তোমার সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে তোমাকে যে ভাবে পেয়েছিলাম, তোমার আগশের মধ্যে দিয়ে তাকে পাব হয়ত আরো নিবিড় করে, পূর্ণ করে। তাই হে আমার জীবনপথের পথিক বন্ধু, তুমি যে আমার অচিন পথ-চলার মাঝে কণিকের অস্তিত্ব হয়ে এসেছিলে সে জন্যে তোমার উদ্দেশে নমস্কার করি।

তোমার স্নেহকল্ল বন্ধু লাপিয়ো।

পল্লবের চোখ জলে কাপসা হ'য়ে আসে।

৩। কল্ল কল্ল।

আটাল

সন্ধ্যা সাতটা। তেঁ।

জাহাজ ছাড়ল। পল্লব একদুটে ইতালির প্লানারমান ভীয়ে
সিকে চেয়ে থাকে—বলিডের উপর হেসে।

হঠাৎ চমকে ওঠে : সিনিয়োর বাচ্চি।

হ্যাঁ।

টুয়ার্ড ওর হাতে একটি চিঠি দিল।

অবশেষে খামে ঠিকানা : নাপোলি, জেনোয়া। ওর বুকের
রক্ত ফুলে উঠল আটালিন।

চিঠিটি খুলতে ওর হাত কঁপে ওঠে।

‘প্রিয় পল,

জানি না তোমাকে কী লিখব আজ। শুধু একটা ভীত
যথা আমার সমস্ত মনকে ছেঁচে আছে। তাই কী লিখতে
কী লিখব বলতে পারি না।

সেদিন ডেনিস তোমাকে গণ্ডোলার দেখায় পরদিনই আমি
বাগিনে কিরে আসি—বসিও ডেনিসে গিয়েছিলাম মাসখানেক থাকব
ভেবে।

সেদিন সমস্ত রাত ঘুমতে পারি নি। জামি মা একথা বিশ্বাস
করবে কি না। তবু দু-চারটে কথা আজ লিখব—বিশ্বাস না
করো—নিরুপায়।

দুহুকে যে চিঠি লিখেছ প’ড়ে হাসি এল। গণ্ডোলার
সে-ভুললোকটি আমার প্রণয়ী নয়—আমার দাদা, মাত্র সেদিন মরছে
থেকে বার্সিন এসেছেন।

অথচ তুমি ধরে নিলে আমি তোমাকে ফুলে গেছি আর একজনের
জন্তে? কেমন ক’রে ভাবতে পারলে? না—হয়ত ভাবটা
অস্বাভাবিক নয় তোমার পক্ষে। কিন্তু আমার মন ব্যথিয়ে ওঠে
ভাবতে যে এমন কথাও তুমি মনে টাই দিতে পারলে—যে-তোমাকে
আমি আমার স্বপ্নেও ভুলতে পারি না?

তবু কেন তোমাকে ছাড়লাম? কী দুখ’তা এ?
বলব আজ, বসিও বিশ্বাস করবে না হয়ত। তবু না লিখে
পারছি না।

প্রথমে ভেবেছিলাম—আমি বা স্থির করেছিলাম সেই সংকল্পই
বজায় রেখে ধীরে ধীরে তোমার মন থেকে লুপ্ত হয়ে যাব—আমার
অস্তিত্বের কোনো দ্বারকই তোমাকে পাঠাব না—কোনো অছিলায়ই
না। কিন্তু পারলাম না সে-সংকল্প বজায় রাখতে। এমন দুর্বল মন
আমাদের : ভাবি অনেক কিছুই পারি, কিন্তু করতে গেলে দেখি—
অসমর্থ। দেখ না : আমাকে তুমি ফুলে যাও এইই তো
আমি চাই? অথচ আমাকে তুমি তাই ভাববে বা আমি
নই—এ চিন্তা আমাকে অশান্ত করে ফুলেছে। বিজেরা বলবেন :
এরি নাম—উজ্জাস, দুর্বলতা। হয়ত তাই, কিন্তু তবু বলব
এ-দুর্বলতা আমার শুধু লজ্জাই নয়, গৌরবও বটে। তুমি
কী জাছুতে দুদিন আমার ক্ষয় জুড়ে বসলে আমি আজো
জানি না—জানতে চাইও না—কী হবে জেনে? কেবল
এইটুকু না চেয়ে পারছি না আজ যে তুমি অন্তত আমাকে
অসার ভেবে না, ভেবে না আমি তোমাকে ভালোবাসিনি
কোনো দিনও। একদিন কে-তুমি আমাকে ভালোবাসেছিলে তার

জোরে এটুকু চাওয়াও কি বড় বেশি দাবি? কিন্তু না—দুর্বল উজ্জাস
রেখে বা লিখতে আজ কলম ধরেছি, বলি।

তুমি চলে যাবার পরদিনই ফ্রাউক্রামারের কাছে পড়তে গিয়ে
তোমার সম্বন্ধে সব কথাই খ’লে ফেলোছিলাম খোলাখুলি। এখন
সময়ে সময়ে মনে হয়—কেন বলতে গেলাম?

ফ্রাউক্রামার আমার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করলেন। খুব
কোমল সুরেই কথা কইলেন। কেবল শেষে বললেন শুধু একটা কথা
ভালো করে শান্ত হয়ে ভেবে দেখতে : যে, আমাকে নিয়ে যদি তুমি
এখন দেশে ফেরো তা হ’লে কলকাতা কী কাঁড়াবে। বললেন : এখন
তোমাদের দেশে যোর স্বদেশীর যুগ, বিদেশী কাপড়-চোপড় পৰ্ব্বন্ত
‘বন-কাহার’ করে পোড়ানো হচ্ছে। বললেন : দুহুকে একদিন
টাকে ফেসে বলেছিল—কাশান কী বকম বললার দাতারাজি—
‘মেমসার’ সম্বোধনটি এখন সহস্রমের নয়—কুশার। তাই, বললেন
ফ্রাউক্রামার, এ সময়ে আমি তোমার সঙ্গে দেশে ফিরলে শুধু
তোমার আত্মীয়-স্বজন নয়, তোমার বন্ধুরাও দুখ ফেরাবে। বিশেষ
করে নিরাশ হবে—তোমার প্রিয়তম দুহু কুশুম—যে আজ বাংলা
দেশের হিরো ও এখন জেলে। কিন্তু যদি সে তোমার আমার
প্রতি বিশ্বাস না-ও হয় তা হলেও এই সময়ে, যখন সারা দেশে
বিজ্ঞাপ্তিবিষয়ের বান ডেকেছে, হয়ত আমাকে মিরে হবে তোমার
উভয় সংকট—আমাকে না পারবে ছাড়তে, না রাখতে।

সেদিন সারা রাত আমি বিচিনার ভুতে পৰ্বন্ত পারি নি, ঘুমলো
তো বুঝেই কথা। সত্যি কি তোমাকে ছাড়তেই হবে তোমার মজলের
জন্তে? একবার মনে হ’ল—যাই তোমার কাছে ছুটে। এ ইচ্ছাকে
যে কেমন করে নমন করলাম আজও আশ্চর্য হয়ে ভাবি সময়ে সময়ে!
শুধু এই চিন্তাই আমাকে জোর দিয়েছে যে তোমার কাছে গিয়ে পড়লে
তুমি আমাকে উপদেশ দেবে নিজের কথা ভেবে নয়—আমার কথা
ভেবে, অথচ আমি কিছুতেই পারব না তোমার কথা ভেবে তোমাকে
ঠেলতে।

কিন্তু ভাবব কী—বত ভাবি তত বুক ঠেলে ওঠে কান্না? কেমন
এমন হল...কেন এমন হল?

মনকে বোকাবার চেষ্টা করলাম যে আমার ভালোবাসা দিয়ে
তোমাকে ঘিরে রাখব—সব আশ্বাত থেকে বাঁচাব। কিন্তু মনে হল
যে ফ্রাউক্রামারের কথা : পুরুষের জীবন শুধু প্রেমকে নিয়ে স্বয়
করতে পারে না—যেমন নারীরা পারে। পুরুষের সার্বিকতার জন্তে
চাই কর্মের ক্ষেত্র, দেশসেবার সুযোগ, উচ্চাশার সমলতা—হয়ত আরো
অনেক কিছু বা আমার অজানা। তোমাদের সার্বিকতার কতটুকুই
বা আমরা কল্পনা করতে পারি বলা?

হঠাৎ একটা গভীর কঠিন স্বর যেন বুক ঠেলে উঠল, বলল : এর
একটি মাত্র সমাধান আছে—তোমার বিকাশের জন্তেই তোমাকে
বিসর্জন দেওয়া। এ স্বরটি গুনবামাত্র একদিকে যেমন অনুল-পাথারে
পেলায় ফুল, অন্যদিকে বুকের মধ্যে যে কী করে উঠল—কেনন করে
বোকাব তোমাকে? আমি একলা নিজের ঘরে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম :
এ আমি পারব না, পারব না, পারব না।

তাই তো তোমাকে খোলাখুলি লিখতে পারলাম না, ভালোবাসা—
সময় নিই একটু, দেখি মাসখানেক তোমাকে চিঠি না লিখে। যদি
একান্ত না পারি জে তোমার পরশ নেওয়ার শেষ সমাধান জে

আছেই। আর যদি এর মধ্যে তোমার মনে আমার প্রতি বিতৃষ্ণতা জেগে ওঠে তাহলে হয়ত তোমাকে ছাড়া আমার সঙ্গে একটু সহজ হয়ে আসিতেও পারে।

ভাবতে ভাবতে আমি অন্তরে পড়লাম। ছর দেখতে দেখতে বিকারে পড়লাম। নাতাশা ভয় পেয়ে দানাকে তার করল। তিনি এসে পড়লেন। সুনলাম, প্রলাপের মধ্যে কেবলই বলেছি—পারব না পারব না পারব না তোমাকে ছাড়তে। তাই তো ওরা সবাই জেনে ফেলল—যাপার কী।

নাতাশা ও প্রাণিক্রমাবের সঙ্গে পরামর্শ করে দানার স্থির করলেন, আমি সেয়ে উঠলেই আমাকে মছা ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তুমি তখন বোম্বে—আমি মছা ফিরি কোন্ প্রাণে? ভাবো কী অসঙ্গতিতে ভরা আমাদের জীবন। যদি তোমার অঙ্গলনেই কাটাতে হয় তবে আমি মছোতেই থাকি বা বালিনেই থাকি একই কথা তো? কিন্তু ঐ যে একটা আশার আলোকণা মনের আঁধার কোণে তখনো জ্বলছিলো—হয়ত বা তোমার সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে। হয়ত তুমি হঠাৎ আসবে ফিরে বালিনে। দেখ দুর্বল মনের কারসাজি—ছেড়েও পারে না ছাড়তে—বিদায় দিয়েও চায় আরো আঁকড়ে ধরতে।

কিন্তু তার পরেই জেগে উঠল আত্মদ্বন্দ্ব—এ কী থিয়েটার করছি। যদি তোমাকে ছাড়তেই চাই তবে এভাবে নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার মানে কী? ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম—বালিনে আর থাকা নয়। দানাকে বললাম—টিবোলে ও সুইজল'ও দেখার আমার বড় সাধ, তারপরে যাব মছা। দানার সানেক্ষেই রাজি হলেন। আমাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন বললেন : ভালোই তো, একটু হাওয়া বদল হবে।

কাতরা ও মাণাকে নিয়ে আমি হলাম দানার সহযাত্রী। পেলাম প্রথম ইন্সপেক্টর। সেখান থেকে সুইজল'ও। তোমাকে কার্ড-চিঠি পাঠালাম, নৈলে হয়ত তুমি বালিনে এসে পড়তে—আর তাহলে আমার সব সঙ্কল্পই বেত ভেসে—বানের জলের স্যামনে বালির ধীরে মত্তনই। তোমাকে কার্ড-চিঠি দেবার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল—আমি যুয়ে বেড়াচ্ছি বলে তুমি আমাকে ধরতে পারবে না।

যা ভয় করেছিলাম তাই হল : কয়েকটি বড় চিঠি লিখে তুমি চিঠি লেখা বন্ধ করলে শেষ চিঠিতে শুধু লিখে : আমি বালিনে ফিরে তোমাকে বড় চিঠি লিখলে তবে তুমি আমাকে চিঠি লেবে, নৈলে নয়। আমি আর পারলাম না। গভীর রাতে উঠে তোমাকে একটি সুদীর্ঘ পত্রে লিখলাম সব খুলে—আর পারছি না, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তুমি ফিরে এসো, যা হবার হবে।

ঠিক পরদিনই নাতাশার এক চিঠি পেলাম। সে লিখল, দুঃস্থ বালিনে ফিরেছে ও তার সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা হয়েছে। লিখল : দুঃস্থ যদিও আত্মজাতিক বিবাহে বিশ্বাস করে, তবু মনে করে যে, হয়ত একটু অপেক্ষা করা ভালো, কেন না ঠিক এসময়ে আমাকে নিয়ে দেশে ফিরলে তোমাকে উঠতে বসতে আঘাত সহ্যে হবে মনে-বাইরে। তাছাড়া—লিখল নাতাশা—দুঃস্থকে তুমি মোহনলাল ও কুহুমের বে-চিঠি দেখিয়েছিলে সে নিয়ে ওরা অনেক আলোচনা করে স্থির করেছে যে তোমাদের দেশকে যদি আমি দর্শনাত্মকভাবে ভালোবাসতে না পারি তবে আজকের দিনে তুমি যে

আমিই সুখী হব না তাই নয়, তোমাকে করব আরো অসুখী—ঠিক যে-কারণে মোহনলাল ও রিতা অসুখী হয়েছে। এরও পরে আর একটা কথা ভাববার আছে : কুহুম এখন অসুস্থ, বিষয় যা থাকবে। নাতাশা এ-ও লিখল যে রিতা না কি এতই অসুখী হয়েছে যে হয়ত তাকে মাস খানেকের মধ্যে একলাই ইতালি কিংবা সুইজল'ও পাঠাতে হ'তে পারে—কে জানে?

নাতাশার এ-চিঠি টি প'ড়েই আমি আমার চিঠিটি ছিঁড়ে ফেললাম। পূর্ণ নিলাম—আর গড়িমসি নয়—তোমার জন্তেই আমাকে চাইতে হবে যে তুমি আমাকে তুলে যাও। দানাকে বললাম—তখন আমার জেনেভাতে—চলো ভেনিস—তারপরই সোজা মছা ফিরব।

ভেনিসে পৌঁছে মন আমার একটু শান্ত হ'ল। কিন্তু কেন সুনালে তুমি হ'সবে : তুমি কাছেই আছ ভেবে। কেবলই মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করতাম—হয়ত যাব 'বোম্বে, হয়ত দেখা হবে, কে বলতে পারে? বলবে হয়ত—কী উল্টো-পাল্টা কথা। সত্যিই তাই। অথচ মিথ্যা নয়—বিশ্বাস করো। কিন্তু থাক এসব বাজে কথা। যা বলতে কলম ধরা—বলি।

ভেনিসের সৌন্দর্যেও আমার মন ঝানিকটা জুড়িয়ে এল। তা ছাড়া একটু একটু করে বলও তো পাচ্ছিলাম। শোক ছাড়ার তীব্র হ'লেও ধীরে ধীরে ক'রে আসেই আসে—নৈলে কি মানুষ বাঁচতে পারত এ-জগতে? কিন্তু ঐ জোর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে জমে উঠল একটা গভীর ঔদাসীন্য নির্বোধ, বা হয় হোক কী যায় আসে? অনেক দিনের পর আমি একটু বেন শাস্ত্রের আভাস পেলাম। তোমার জন্তেই তোমাকে ছাড়ছি ভাবতে ব্যথা বাজলেও মনে হ'ল ঠিকই করেছে—নিজের সুখ-স্বার্থের কথা না ভেবে তোমার মঙ্গল চিন্তাকেই আঁকড়ে ধরে। বেগনার মধ্যে জেগে উঠল একটা মধুর বৈরাগ্য।

ঠিক এই সময়েই হঠাৎ তোমার সঙ্গে ভেনিসে দেখা। আর কোথাও যদি দেখা হ'ত হয়ত পারতাম না নিজেকে কখনো। কিন্তু তবু আজো ভেবে পাই না কেমন ক'রে এ পারলাম?

জানি না, এখন আমার প্রতি তোমার মনের ভাব কী। তবে আশা করি আমার স্মৃতি তোমার মনে এতদিনে ক্ষণ হ'য়ে এসেছে, তাই তুমি যদি দূর বোধ করে ব্যথা বেশি পাবে না। অথচ এ কথা ভাবতেও আমার মন আস্থার হ'য়ে ওঠে—দেখছ আমাদের দুর্বল মনের অসঙ্গতি : থাকে ব্যথা দিতে চাই না সে ব্যথা পাবে না ভাবতেও বাজে। কিন্তু থাক, মধ্যে উজ্জ্বল, শেবটুকু বলি।

ভেনিসে তোমার কাছ থেকে দু'বে থেকে বিদায় নেবার পর আমার মনের মধ্যে শূণ্যতার সঙ্গে সঙ্গে একটা—কী বলব, রিক্ততা মত্তন জেগে উঠল : মনে হল বেন জীবনটা একটা ছায়াবাঁজ।

কেবল একটা গভীর সাধনার আলো আমার মনে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছিল যে, আমি তোমাকে ছেড়েছি, ব্যথা দিয়েছি শুধু তোমারি কথা ভেবে। অবশ্য অভিমান ক'রে হয়ত তুমি বলতে পারো, কেমন ক'রে আমি জানলাম যে তোমার আমার মিলন অকৃতার্থ হ'তই হ'ত? এ প্রশ্নের উত্তর নেই শুধু এই ছাড়া যে আমরা পথ চলি বেটুকু জানি তাকেই সলল ক'রে—কিসে কী হয় তার কতটুকুই বা জানি বলো?

তারপর? তারপর আর কী? বাইরের দিক থেকে আমি সেই

আইবিনই আহি। কিন্তু সময়ে সময়ে নিজের অন্তরের নিকে বহন
তাকাই চিনতে পাবি না নিজেকে। আমার মধ্যে কই সে আমি-
আমি ভাব? সর্বত্রই যে তুমি! তোমার হৃৎ, তোমার হাসি, তোমার
অশ্রুপ কণ্ঠ থেকে থেকে মনে পড়ে যখন ভেসে আসা হারানো সুখ-
বায়ের স্মৃতির মতন।

আমি কেবল একটা কথা আজও ভেবে পাঠি না: তোমার
জন্মে তোমাকে হৃদয়ে হবে, আমার এ পণ আমি শেষ পর্বন্ত বজায়
রাখতে পারলাম কিসের জোরে? আমি তো জানি, আমি ভিতরে
ভিতরে কী দুর্বল। এ প্রপঞ্চের একটি মাত্র উত্তর আছে: এ বল
আমি পেয়েছি তোমাকে সত্যি ভালোবেসেই বলে; তুমি বলতে
না—যেহেঁদা 'শক্তি'। হ'তে পারে, কিন্তু এ শক্তি তারা নিজের
সামান্য ভাগ্যতে পারে না। তাই বলব, তুমিই আগিরে তুলেছ
আমায় দুগুণ শক্তি, দুগুণ শক্তি। সেই তোমাকে আজ চিরবিদায়ের
দিনে অন্তর থেকে জানাই প্রণাম।

কিন্তু বল পেয়েও তবু আমরা কী দুর্বল ভাবো? আমি খুব
ভালো করেই জানি যে, তোমাকে এ চিঠি লেখা আমার উচিত ছিল
না। ভালো হত যদি আমার সহজে তুল ধারণা নিয়েই তুমি দেখে
কিরে যেতে, কেন না তাহলে আমাকে তুলে বাওঁরাও তোমার পক্ষে
সহজ হত। কিন্তু সেদিন তেনিসে গণ্ডোলায় তোমার উঠে দাঁড়িয়ে
একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকার স্মৃতি আমাকে এক অস্থির করে
তুলেছে যে আমি কিছুতেই তোমাকে না জানিয়ে থাকতে পারলাম
না যে আমাকে তুমি সেদিন বা ভেবেছিলেন—যে কথা যুগ্মফল
লিখেছ—আমি তা নই। তুমি আমাকে তুলে যাবে, এ চিন্তায়
বাখার আমি অধীর হয়ে পড়লেও সে-বাখা সইবার ও বইবার শক্তি
আমি বাখার মধ্যে দিয়েই অর্জন করেছি: কিন্তু তুমি আমাকে
তুলে ভেবে যুগ্মফল সন্ধান করে এদেশ থেকে বিদায় নেবে, এত বড়
শেল সহ করার মতন কঠিন বৃত্ত বিধাতা আমাকে দেন নি। তাই
বার বার এ-চিঠি ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও পাবি নি।

তোমাকে আমার আরো কত কথাই যে বলবার ছিল—কত
আশা-স্বপ্ন, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, সাধ-আকাংক্ষা—তোমার কাছে আমার
প্রতি কামনা-বাসনার নিবেদনে দিনে দিনে কত কী পাথেয় পেয়েছি
জানাবার জন্যে আমার মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি, কেমন করে
বোঝাব তোমাকে?

হয়ত তুমি বলবে—কেন চাই বোঝাতে বহন আমি নিজেই
তোমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি? এ প্রশ্নের উত্তর আছে কি না
আমি জানি না। শুধু জানি যে আমি ধন্য যে চ'দিনের জন্যেও
তোমাকে কাছে পেয়েছিলাম—স্মৃতির মণিকোঠার চিরদিনের জন্যেই
অমিয়ে রেখে দিতে।

তোমার আইবিন।

সামনেই পূর্বদ্বার চাঁদ। কিন্তু পল্লব জলভরা চোখ ফিরিয়ে
দেয়। এত হাসি কিসের জন্যে? এ কি পরিচায়ক নয়?

চটাই সামনে চোখ পড়ে। দু'টি ইতালিয়ান বালিকা হাততালি
দিয়ে ডেকের উপরেই নাচ শুরু করে দিয়েছে লেওপার্ডার বিখ্যাত
গানের সুরে:

Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?

ঘুরে ঘুরে গার ওরা এই চাঁদ চরণ। পল্লব চোখের জল
মোছে: এই গানটিই একদিন আইবিন উজ্জ্বল হ'য়ে পেয়েছিল
বাঁকিনে। সে গানের আনন্দরেশ আজ কোথায়? আজ মনে
হয় সব আনন্দই পরিচায়ক... নীরব চাঁদ করছে কী—শুধু হাসছে দেখে
মাটির হাড়ের মিথো উজ্জ্বল।

গান খেয়ে যায়... ডিনারের ঘণ্টা বাজে... পল্লব ওর ডেকেরদ্বারে
তরুণী চেয়ে থাকে আকাশের পানে... কিন্তু চাঁদের দিকে নয়—
একটি তারার দিকে। কী সুন্দর!

কখন যে ও ঘুমিয়ে পড়ে... স্বপ্ন দেখে বড় বিচিتر!

এলিওনোরা যেন গাটতে পল্লবের একটি প্রতিমার দিকে চেয়ে:

"Ach, im Traumen und im wachen

Shwebt mir vor Sein liebes Bild:

Und in Schlummerlo"sen Na"chten

Qua"lt mich Sehnsucht ungestillt..."

ধীরে ধীরে এলিওনোরা যেন রূপান্তরিত হয় যাব... গাটছে এই
গানটিই আইবিন... শিচ্ছেন পল্লব দাঁড়িয়ে অথচ আইবিন ভাবন না...
পেয়েই চলে: Ach, im Traumen und im wachen...
সঙ্গে সঙ্গে পল্লব যেন ধরে দেয় এই বিখ্যাত রূপসুরের রচিত অর্পণ
গানটির বাংলা প্রতিরূপ:

"জাগরে স্বপনে ভেসে ওঠে শুধু

স্বপ্নের ঝুঁকু মধুর ছবি:

ঘুমহারা এই নিশীথেও মধু

তারি অতৃপ্ত কামনা জপি।"

কেব স্বপ্ন যায় দলে... আইবিন মিলিয়ে যায়—সামনে কুসুম...
বিছানায় শুয়ে। পল্লবকে দেখে কোনামতে উঠে ওকে আলিঙ্গন
করে। পল্লবের সব তাপ যেন জুড়িয়ে যায়... কিন্তু এ কী?...
এ তো কুসুমের বাহুবন্ধন নয়?... আইবিনের। সে বলে ছেসে:
কেমন? বাঁধন কাটাতে চেয়েছিলে না?... হতই আমাকে ঠেলবে
দূরে—ততই হৃদয়ের কাছে... গাও...

এবার ওরা দু'জনে ধরে এক সঙ্গে:

জাগরে, স্বপনে ভেসে ওঠে শুধু...

বৃষ্টির ছাটে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

আকাশে চাঁদের চিহ্নও নেই... কড় উঠেছে... চাণ্ডিকি শুধু

কালো ঢেউ...

ই.হার্ড বলে: Scusi, Signore... uragano...

পল্লব দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ওঠে: Grazie...

৪। ঐ আকাশে করছ কী গো, চাঁদ! বসো আমার—

করছ তুমি কী—ও নীরব চাঁদ!

৫। কথা কহবো... স্বপ্ন... ৬। দরবার।

হাল ছুনি আলিয়া

আন্তর্জাতিক যুগোশাখ্যায়

ভিল

পাঁচের ঘরের দোর-পোড়ার এসে পাড়ালেই সোনারউদির
গোটা সংসারটা চোখে পড়ে।

মত ঘর। আঁধার-বড়ির যে-দুটো ঘরে থাকত এই একটাই
তার চারপাশ। কালের জরির ঘরের জলুস গেছে, কাঠামো বা
আছে তাও তাক লাগার মত। বীরাপদর মনে আছে ঘর দেখতে
এসে সোনারউদির দুচোখে আনন্দের বজা দেখেছিল। রাজ-পুরুষের
আলসে এটা নাকি ছিল মজলিস কোঠা। ভিতরের দরজা দিয়ে
সঙ্গে একটা খুশির ঘর। এটার তুলনার বে-খাজা ছোট।
সোনারউদি আরো খুশি, এটা মজলিস ঘর আর ওটা কী?

ওটা কি বা কেন, বীরাপদ ভাববার অবকাশ পায়নি তখনো।
কি করেই বা পাবে, একাধাশী শিকদার আর শতুনি ভটচাঘের গল্পনার
আর ওর ছাত্রী পড়ানোর দাপটে নাজেহাল হয়ে তার আগের দিন
মাত্র মজলিস ঘরের অধিবাস তুলেছেন রমণী পণ্ডিত। আর তার
পরদিনই গুল্ম আর সোনারউদিকে ঘর দেখাতে নিয়ে এসেছিল
বীরাপদ। সোনারউদির আনন্দ দেখে তারও আনন্দ হয়েছিল।
বসেছিল, এটা বোধহয় রসদ-ঘর, মজলিসের রসদ মজুত থাকত...।

এই রসদ-ঘর এখন গুল্মার শয়ন-ঘর।

প্রথম দিন থেকেই সেই ব্যবস্থা সোনারউদির। প্রজ্ঞাবনাটা
বীরাপদ আজও ভোলেনি। গুল্মার দিকে চেয়ে বেশ হালকা
করেই বলেছিল, বে-বসদই হোক যোগাচ্ছ বখন—তুমি ওই ঘরটাতেই
থাকো।

যে ঘরে এতকাল থেকে এসেছে সে-তুলনার ওই খুশির ঘরও স্বর্ণ।
তবু এমন গড়ের মাঠের মত জায়গা পড়ে থাকতে তাকে ওখানে
ঠেলায় ব্যবস্থাটা গুল্মার মনঃপুত হয়নি। বৃহৎ আশঙ্কিত করেছিল,
এত জায়গা থাকতে আবার ওখানে কেন, ও-ঘরে জিনিস-পত্র—

শেষ করে উঠতে পারেনি। কানের সরঞ্জামগুলো দুছে দুছে
সোনারউদি তাকের ওপর ফুলে রাখছিল। সেখানে থেকেই কিরে
তাকিয়েছিল শুধু। গুল্মা আমতা আমতা করে বলেছে, ও-ঘরটার
তৈম্ন বাতাস লাগবে না বোধহয়—

থাক, আর বেশি বাতাস লাগিয়ে কাজ নেই।

বীরাপদর কানে ঠাণ্ডা বিজ্ঞপের মত লেগেছিল কথাগুলো। ওর
চোখে চোখ পড়তে সোনারউদি হেসে কেসে তাকিয়েছে, স-এর

একটু আগে বেশি যত্ন হওয়ার জন্ত তাইই তাক। খেয়ে বীরাপদ
চুপচাপ পাড়িয়ে ছিল।

সোনারউদি ঘরদী পট। একতরফে ঘরটাকে বেশ সুবিশুদ্ধ তানে
কাজে লাগিয়েছে। একটা রিক তাগ করে নিয়ে গৃহস্থালি পেতেছে,
মজলিসে নিজের আর হেলমেয়েরের পোবার জায়গা। মাঝখানটা
ঝাঁক। তার ওখানে এককালি ঢাকা বারান্দার বারান্দা বা-হা।

বীরাপদ ঘরে ঢুকল। এক কোণে বোড় ঠোঁড়ে মেয়ে উমারানী
হাতের লেখা মজা করছে। ঘরের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে মুখ দিয়ে
একটা কলিত এতিন চালাচ্ছে পাঁচ বছরের টুম। আর তার পরের
বাচ্চাটা মিমির পাশে বসে নিবিড়চিটে একখণ্ড কাগজ বহ খণ্ডে
ভাগ করছে।

ওদিক কিরে বসে সোনারউদি বাটিতে দুধ ভাগ করছিল।
কারো পদাৰ্পণ অস্বাভাবিক করেই কিরে তাকালো হয়ত। তোলা
উত্থানে ছোট জলের কেটলিটা চাপিয়ে দিয়ে ঘরে এসে মেয়েকে
বলল, খেয়ে নে সে বা, ওদের নিয়ে বা—

বীরাপদর দিকে কিরল। আবার ঘূমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?
না...।

সেই কখন থেকে তো উঠে বসে বাচ্ছেন দেখলাম, এতকণ কি
করলেন?

আপনার প্রণামের যটা দেখে ভক্তিত্বের কুলকিনারা
পূঁজছিলাম—

হেসে কেসেও সামলে নিল। পেলেন?

না। চৌকির একধারে বসল সে।

পাণী-তালী মাছ, পাবেন কি করে—অমন সং জ্ঞান, পায়ের
ধূলা পাওয়াও ভাগ্যি—বহন, চা করে আনি।

উত্থানে কেটলি চাপাতে দেখে মনে মনে বীরাপদ এই
ভরটাই করছিল। বতটা সম্ভব সহজভাবেই বাধা দিল, চা
থাক, কি কাজ আছে বলছিলেন?

হ' বছরের মধ্যে সম্ভবত এই প্রথম চায়ে অরুচি। বাধা পেয়ে
সোনারউদি পাড়িয়ে গেল। প্রজ্ঞার কৌতুকাভাস। ছুই এক দুহুত
মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, চা থাকবে কেন, এ কটা
দিন দিইনি বলে?

এই প্রথম বীরাপদ এভাবে চেয়েছিল। আজ এই ঘর আবার



লক্ষ্মীবিলাস

তৈল



এম, এল, বসু য়াও কোঃ প্রাইভেট লি:

লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

নয় বলেই বাইরের সহকর্মীকে বলার রাখার তাগিদ। তাছাড়া, মিল ভাঙ্গ একেবারে ধাওয়া হচ্ছে না সেরকম একটু আভাস সোনারউদি পাক, কেন জানি তাও খুব অব্যাহতি নয়। মিলিগু জবাব দিল, কাল রাতের খাওয়াটা বড় বেশি হয়ে গেছে...এখনো ভাব ভাব লাগছে।

সোনারউদি সেখান থেকেই মেয়েক নির্দেশ দিল চায়ের কেটলিটা উঠুন থেকে নামিয়ে রাখতে। তারপর টেবের ডগায় হাসি ত্রোপ বেশ সামাসিখেভাবেই ভিজাসা করল, কাল রাতের খাওয়াটা অমন বেশি হয়ে গেল কোথায়?

আর কথা বাড়িতে আপত্তি সেই বীরাপন্নর।—অনেককাল ধরে এক বিধির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তার ওখানে।

আপনার বিধি আছে জানতুম না তো।

নিজের বিধি নয়।

পাতানো বিধি? কেনে কেনেও চট করেই গভীর আবার। প্রাতিবাহ শব্দ করে ত্রোলেমের ঘরে ঢুকছে। সোনারউদি মেয়েকে আদেশ দিল বাপের পুশরি ঘরে বসে পড়তে। মায়ের মেজাজ মেয়ে, ছেলে, এমন কি ওই ছ'বছরের বাচ্চাটাও বুঝতে শিখেছে। যোনেব সঙ্গে সঙ্গে তারও সরে গেল। সোনারউদির উৎসর্গ হাসি তারপর।—আপনার বিধি একটুও জানগমি থাকত, পাতানো বউদি দেখেও শিকা হল না, আবার পাতানো বিধি!

বীরাপন্ন হাসিমুখেই জানিয়ে দিল, পাতানো বিধিটি তিরিশ বছর আগের।—কি বলবেন বলুন, একটু বেরুব—

বিধির ওখানে যাবেন?

না...।

বেশ একটু চিন্তিতমুখেই সোনারউদি ওকে ডাকার কারখটা যাক্ত করল এবার। বলল, এমন দিনেই ব্রত সাজ হল, শং ব্রাহ্মণ ছ'জন আহাির করবেন, কিন্তু কাকে দিয়েই বা ব্যবস্থা করি।

বীরাপন্ন অবাক।—ভট্টাচার মশাই আর শিকদার মশাই?

মুখের নিকে তাকালেই বোঝা যেত সোনারউদির চিন্তাটা বাহিক। হাসি ত্রোপ জবাব দিল, হ্যাঁ, কপাল গুণে ওঁরাই আজ সোপাল ঠাকুর।

আমাকে গিরে নেমস্তর করতে হবে?

ওকে জাঁতকে উঠতে দেখে সোনারউদি এবারে হেসেই কেলল।

—আপনার নেমস্তর ওঁরা নেবেন কেন? সে কাজটা আপনার দায়। কাল রাতেই সরে রেখেছেন। কিন্তু বাজারটা করাই কাকে দিয়ে, আপনার আবার বিধি জুটে বাবে জানলে ব্রতটা আপাতত সাজ না করলেও হত।

ভোরবেলার ব্যাপারটা স্পষ্ট হল এতক্ষণে। তিন দিন কাগজ না পাওয়ার পরেও একাদশী শিকদারের আজ কাগজ পাবার প্রত্যাশা। সোনারউদির নিজের হাতে কাগজ দিয়ে আসা আর ভক্তিরে প্রণাম। শেষের ঠাট্টাটা ওকেও খেতে বলার আভাস বোঝায়। সন্ধ্যার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ঘরে, ব্রত-পার্শ্ব পালন অব্যাহতি কিছু নয়। তবু কেনন দুর্ভাগ্য লাগছে বীরাপন্নর। হু বহুনের ঘরে কোনরকম আচার-অনুষ্ঠান দেখা হবে থাক, এসবে বড়ি আদর বলেও বলে হয়নি কখনো।

কিসের ব্রত ছিল?

তোরক থেকে টাকা বার করে এনে সোনারউদি ঠাট্টার মুখেই কিরে ভিজাসা করল, ক'টা ব্রত আপনার জানা আছে? নিন, আর দেবি করবেন না।

টাকা নিয়ে বীরাপন্ন উঠে পঁড়াল। কি আনতে হবে?

হাতী খোড়া বাথ ডাসুক বা পান—হেসে কেলল, বা ভালো বোকেল আনবেন, নিজে না হলেই হল, আর একটু বেশি বেশিই আনবেন—

বাজার করা এই প্রথম নয়, সপ্তাহে তিন চারদিনই করতে হত। কিন্তু টাকার সঙ্গে কি আনতে হবে না হবে ভাবও একটা চিরকুট থাকত সোনারউদির। আজ নেমস্তরের দিনেও সেটা সেই কেনে অনুমান করা খুব শক্ত নয়। বাজারের পথে যেতে যেতে বীরাপন্ন সেই কথাই ভাবছিল।...ওর ওপর নির্ভরতা দেখালো। আজ অনেক কিছুই দেখিয়েছে সোনারউদি। সকালে প্রণামের খটা, দুপুরে আবার ওই দুজনেরই নেমস্তর।...একাদশী শিকদার আর শকুনি ভট্টাচার—ভীরা এখন থেকে তুটুই থকবেন বোধহয়। বীরাপন্ন বাইরে শান্ত, কিন্তু ভিতরটা তার তুটুই নয় একটুও। তার সঙ্গে নতুন করে এই আপসের চেষ্টা কেন সোনারউদির, সেও কি ওদেরই একজন। ডাকলে কাছে আসবে, ঠোলে দিলে ধুবে সরে যাবে? সোনারউদির ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সহস্ততার মুখোশটা আপনি খসে গেছে। কি করবে স্থির করে নিতে এক মুহূর্তও দেবি হয়নি।

বাজার নিয়ে কুটি-সলঙ্গ দায়োয়ানের পোড়ো বরটার সামনে এসে পঁড়াল সে। এখান থেকেও তাদের ঘর বেশ খানিকটা পথ। ডাকল, শুকলাল আজ?

মাঝ-বয়স দায়োয়ান শুকলাল তখনু বেরিয়ে এলো। নোমস্তার বীকবাবু, কি খোবর বলেন—

খবর ভালো, আমার বিশেষ তাড়া আছে, তুমি এগুলো একটু পৌঁছে দিয়ে এসো তো—

ওনেক বাজার দেখি! ছুটিচিপে শুকলাল খলে ফটো নিল। কোন ঘরে কার কাছে পৌঁছে দিতে হবে তার জানাই আছে।

নিশ্চিন্ত মনে বীরাপন্ন বড় রাস্তার এসে পঁড়াল আবার। ভিতরে ভিতরে তারও এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে বইকি। বাজার পৌঁছে দিয়েই শুকলাল কিরে আসবে না। রাস্তার বাগান্দার কাছেই গ্যাট হয়ে বসবে। বাজার দেখে তারিণি করবে। তাই থেকেই জিনিস-পত্রের দুই'লোর কথা উঠবে, দিন-কালের কথা উঠবে। চুটো আসল, একটা বেগুন, এক টুকরা কুমড়া ইত্যাদি তার নিকে এগিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ওঁর তাড়া দেখা যাবে না। কিন্তু মুখ ফুটে চাইবে না কিছু, দিলে বরং সলঙ্গ আপত্তি জানিয়েই গ্রহণ করবে সেগুলো।

সে এসে বসলেই সোনারউদি হাসে।

...আজ হাসবে?

বীরাপন্ন খুশি চোটে চোটে করছে, কিন্তু তবু কোথায় বেন অব্যক্তি একটুখানি। মাঝে মাঝে বিমনাও হয়ে পড়ছে। নিজের ওপরেই বিরক্ত হল সে, বা করেছে বেশ করেছে—ও নিয়ে আর মাথা ঘামানো কেন, তার এখন অনেক কাঁধ।

কিন্তু তার মনে একটা চিন্তা ছিল।

কাজ বলতে বিজ্ঞাপন লেখার কাজ। সেও বীরাণবা কিছু নয়, ইথম জোটে। আর বিজ্ঞাপন বলতেও ফলাও কোনো ব্যাপার নয়। ছোট ছোট ছোট কবিরাজের দোকান আর একটা পুরনো বইয়ের দোকানের সঙ্গে কি করে একদিন যোগাযোগ হয়েছিল আজ আর মনেও নেই। বাইরে থেকে দেখলে ওই দোকানের আয়ে মালিকের নিজেরই ভরণপোষণ চলে কি না বোঝা শক্ত। হয়ত চলে না বলেই বীরাণবা যে-রকম বিজ্ঞাপন লেখে সেই রকম বিজ্ঞাপনের দরকার। কবিরাজদের নতুন নতুন গুণ উদ্ভাবনে রোগ সারক আর না সারক, বিজ্ঞাপনের চটকে যে কাজ হয় সেটা নিজের চোখেই দেখেছে। রোগীও তুষ্ট চিকিৎসকও তুষ্ট। তাছাড়া, প্রকাজ রোগের থেকেও অপ্রকাজ রোগের সংখ্যা কম নয়। গুণের সংখ্যাই বা কম হতে যাবে কোন ছুখে। চিকিৎসা না হোক, চিকিৎসার আশা তো। সেই আশাহতর সংখ্যাই কম নাকি?

বিজ্ঞাপন আশা-সম্ভাবনী।

গুণ পুরনো হলে পুরনো বিজ্ঞাপনও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নতুন করে লিখতে হয় আবার। নতুন বিজ্ঞাপন লেখার পারিভ্রমিক ছটাকা হলে পুরনোর আট আনা। নতুন পাওয়ার আশায় অনেক সময় বিনা পারিভ্রমিকেও করতে হয় সেটা।

বইয়ের দোকানের বিজ্ঞাপন লেখার কাজটা একটু অস্তরকমের হলেও মনে মনে বীরাণবর সেটা আরো অপছন্দ। পুরানো বইয়ের দোকানে পুরানো বই মেলেই—সেই সঙ্গে বটতলার কাগজে ছাপা রক্ত-বেরঙের মলাট দেওয়া নতুন বইও মেলে অনেক। স্বর্ণ-নরজার কাছাকাছি শৌছে দেওয়ার মত আচার অক্লান্ত ক্রিয়া-কলাপ বিধি-বিধানের পুস্তিকাও আছে, আবার সম্মোহন বশীকরণ দেহ-বিজ্ঞান নব বৌবদলান্তের সুলভ তথ্যের রসও মজুত। দোকানের মালিক নিজেই পছন্দমত লেখক সংগ্রহ করে সুযোগ সুবিধেমত এ ধরনের ছুই-একখানা করে বই ছেপে ফেলেন।

গুণের বিজ্ঞাপন লিখতে হলে গুণ খেতে হয় না, কিন্তু বইয়ের বিজ্ঞাপন লিখতে হলে বইগুলো পড়তে হয়। এই জল্পেই এ কাজটা বীরাণবর ততো পছন্দ নয়। পড়ার পরে আর লিখতে মন সরে না। এখানকার বিজ্ঞাপন স্কুলিকের পতঙ্গ কাহা সেও নিজের চোখেই দেখেছে। দেখে দেখে বীরাণবর এক এক সময় মনে হয়েছে, এই কাজটাই ব্যাধিগ্রস্ত।

বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবু বলেন মশ না। আভাসে ইজিতে অনেকবার টাসটে জোরালো কিছু একটা লেখার প্রেরণা দিয়েছেন তাকে। জোরালো বিজ্ঞাপন নয়। জোরালো আর কিছু। শেষে হাল ছেড়ে বলেছেন, আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না—আরে মশাই, যে মদ খায় সে থাকবেই, এ দোকানে না পেলে অন্য দোকানে থাকবে—কোথাও না পেলে নিজে তৈরি করে থাকবে—তাহলে দোকান খুলে বসতে দোষ কি।

খব্ব দূর।

জোরালো অন্যকিছু না হোক, সে-দিন জোরালো বিজ্ঞাপন লিখে অন্তত দে-বাবুকে খুশি করেছিল বীরাণবর।

মশাই বে। কবে ফিরলেন?

প্রত্যাহারী জনের প্রতি অধিকা কবিরাজের বতাবল্লভ বিজ্ঞ।

তার নিজের যেখানে প্রত্যাশা সেখানে ঠাট জোড় করতেও পারবে না। তাঁকে আর একটু খুশি করার জল্পেই বীরাণবর গবিরে বলল, কোথাও বাইনি তো, এখানেই ছিলাম...

এখানেই ছিলেন। হুঁসুধা দেখা নেই দেখে ভাবলাম হিজি-দিজি চেনেই গেলেন বৃথি।

বীরাণবর আমতা আমতা করে ভিজাসা করল, কাজ ছিল নাকি? না। এটা ছা-পোষা দোকানের কি আর কাজ—পাঁচজনে এসে জালতন করে, তবু পুরনো লোককে না খুঁজে পারিলে বলেই যত বামেলা—কাল একবার আসবেন।

অধিকা কবিরাজ ঘুরে বসলেন, বেন আর তার মুখামশিও করতে চান না।

বীরাণবর বেরিয়ে এলো। এরকম অভ্যর্থনা গা-সওয়া। কাজ থাক বা না থাক, অনুগ্রহভাজনেরা দিনান্তে একবার এসে দেখা না দিয়ে গেলে নিজেরাই একটু তর্ক বোধ করেন বোধহয়। দ্বিতীয় কবিরাজের দোকানেও কাজ নেই কিছু, কিন্তু ক'টা দিন একবারে ডুব দেওয়ার ফলে সেখানকার মালিকও তার কাজকর্মের নিষ্ঠার প্রতি সন্মিহান। বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবুর অন্ত অভ্যর্থণা। কাজ তো আছে মশাই, কিন্তু আপনাকে দিয়ে হবে কি না ভাবছি—আপনার লেখাগুলো বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে, আর তেমন টানে না।

ভীরাণবর রায়ে সবে যে শ্রমসংবাদ জ্ঞাপন করলেন তার মর্ম, এবারে থাকে বলে টাকা বর্ধনো বই-ই বার করছেন তিনি—সরল বৈশিক ব্যাঘ্রমের বই একখানা, মাইনর পাস বিজ্ঞে নিয়েও গু-বই অমূল্য করলে মনের জোরে পাঁচড় টালবে আর অনেক অপচয়েরও পূরণ হবে। ছাপা প্রায় আধাশ্রাশি শেষ, চারখানা মলাটের গুণর এবারে এমন কিছু লিখতে হবে বাতে করে একবার হাতে নিলে গু-বই আর হাত থেকে না নামে। ভিতরে ভিতরে অন্ত বইয়েরও বিজ্ঞাপন থাকবে কিছু কিছু—আর, খবরের কাগজের অল্পকুল মস্তব্যও কিছু পাওয়া দরকার।—তারা লিখবে না কেন, এ তো আর খারাপ বই কিছু নয়, কি বলেন?

গুদার সহায়তায় একবার তাঁর কি একটা বইয়ের হুঁসাইন সমালোচনা বীরাণবর কাগজে বার করিয়েছিল। এবারে একটু নিরীহ রসিকতার লোভ ছাড়তে পারল না। বলল, তা লিখবে না কেন, ভালো বই-ই তো...বিজ্ঞাপনের কাজটাও অন্ত কাউকে দিয়েই করিয়ে দেখুন না, অন্তহাতে অগ্ররকম তো কিছু হবেই।

ভুরু কুঁচকে ঝপ করে কাগজ-পত্রে মন দিলেন দে-বাবু। বীরাণবর উঠে পাঁড়তে মুখ তুললেন আবার।—ব্যবসার নামলে পাঁচটা দিক ভাবতেই হয়, বুঝলেন? সামনের হস্তায় একবার আসবেন—

আপাতত পাঁচটা টাকা দেবেন?

টাকা চাইলেই বিরক্তিতে মুখখানা বেশ-রকম করে কেতল, অভ্যাসবশত দে-বাবু সেই রকমই করলেন প্রথম। সে-সমু বহুতর জল্পে। এ-যাচনা অব্যাহত নয় খেদাল হল বোধহয়। ছির চোখে দেখলেন একটু।—কথা শুনে তো মনে হচ্ছিল আপনার হুঁপকে ভরতি টাকা।

কাঠের টেবিলের দ্বারায় খুলে আধমরলা একটা পাঁচ টাকার মোটাই

সাইকেল-কেল-মিলের। সাধারণত পাঁচ টাকা চাইলে বড় কোর ভিন্দ টাকা মেলে।

বাইরে এসে হাঁপ ফেলল বীরাপদ। যুখে এঁরা যে বাই বসুম দিচ্ছিল কনকটীও মনে মনে ভালই জানে সে। এত শক্তির আর এমন সুখ বুঝে কাজ করার লোকও সব সময় মেলে না। হঠাৎ চাকরির কথা মনে পড়তে হাসি পেয়ে গেল, সাহিত্য করা ছেড়েছে কি না জিজ্ঞাসা করেছিল, সাহিত্য কোথায় এসে ঠেকেছে জানলে কি কলত?

কাজ পাক না পাক, এদিকে এসে আত্মো হুঁ-পাঁচটা দোকানে ঘোরে সাধারণত। কিন্তু আজ আর ভালো লাগছে না। বেলা বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে জরুরের তাগিদও বাড়ছে।...সেই পরিচিত হোটেলসেই বেতে হবে, নতুন করে আবার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে। মশ বছরের পুথনো খন্দের সে। সাত পরসার 'মিল' হুঁবছর আগে হুঁ আনার ঠেকেছিল। এই হুঁবছরে সেটা কতর ঠাকিরেছে জানা নেই।

হোটেলের ম্যানেজার পুথনো খন্দেরকে দেখেই চিনলেন। আদর বন্ধুও কলসেন একটু। পুথনো খন্দেরের খাতিরের নিজে থেকেই অচিৎ আনায় মিল রফা করলেন। আর, হস্ততা-হৃৎক দসিকতাও করলেন একটু, চেহারা-পাতা তো দিবি কিরে গেছে আপনায়, দেখেই মনে হয়েছিল বে-বা' করেছেন বুঝি—

চেহারা কেন কিরেছে সেটা বলে ফেললে আর ম্যানেজারের খাতির জুটেবে না। খেতে বসে বীরাপদ খাওয়ার তাগিদটা অমৃতব করছে না তেমন। এ হুঁ বছরে সুখ বসলে গেছে। আজ ভালো না লাগলেও হুঁ দিন বাদে এই বেশ লাগবে। সে ভজ্ঞে নয়, শুকলালের হাতে বাজার পাঠানোর পরের সেই অশ্বজিটাই আবার উঁকি'কি মিছে। থেকে থেকে মনে হচ্ছে, নিজের অগোচরে কিছু একটা তুল হয়ে গেল। কোনো কারণ নেই, তবু সেই রকমই অমৃতভূতি একটা। শুকলালের হাতে বাজার পাঠাতে দেখেই সোনারবউদি বা বোকার বুকে নিয়েছে। আর সেটুকু তাকে বোঝানো দরকারও ছিল। তা'ছাড়া ও তো আর তার ব্রত-সাজর ভ্রাম্ভ নয়। বীরাপদ নিজেকেই চোখ রক্তালো, আসলে এ ওর নিজেরই দুর্বলতা...ভিতরে ভিতরে নিজেরই প্রাণী এখনো...।

হুঁ বেলার খাওয়ারটা সোনারবউদির ওখানেই বরাদ্দ ছিল। বীরাপদই বরং তাতে আপত্তি করেছিল প্রথম প্রথম। সোনারবউদি শোনেনি। বলেছে, যে টাকটা আপনি খাওয়ার পিছনে খরচ করেন, সেটা বরং আমাকে দেবেন। তার আগে অবজ্ঞা হোটেল যে কি খায় না খায় পুখুপুখুভাবে শুনে নিয়েছিল। আর কলছিল, হোটেলের থেকে ভালো খাওয়ার ভর নেই।

প্রথম ক'মাস ছেলে পড়ানোর টাকা হাতে এসেই তার থেকে কুড়িটি করে টাকা সোনারবউদির হাতে দিয়েছে। সম্প্রতি গুণ্ডার চাকরির মোড় বুকেছে হঠাৎ। সাংবাদিক রাজ্যের নতুন বিধি ব্যবস্থার কলে মাইনে রাতারাতি অনেক বেড়ে গেছে। প্রাক রীডারও নাকি সাংবাদিকের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু তখন বেশ অনটনই ছিল। কলে সোনারবউদির মেজাজ বিগড়াতো প্রায়ই। গুণ্ডাকে যে ভাবে খোঁচা দিয়ে কথা বলত, এক এক সময় বীরাপদর এমনও মনে হয়েছিল কেলেসি ভুই গুণ্ডার উদ্দেশ্যেই নয়। আর, সে রকম একবার মনে

হলে তার দ্রাবিও কম নয়। এরকম হুই একবার শোনার পর বীরাপদ ছেলে পড়ানোর তিরিশ টাকাই সোনারবউদির হাতে তুলে দিয়েছে। অমৃতপুষ্টির নকল মাইনে হুঁতার টাকা কাটান গেলে পরে তাও উত্তল করে দিয়েছে। বিজ্ঞাপন লিখে মাসে গড়পড়তা বিশ পাঁচশটা টাকা আসেই।

প্রথমবার টাকা বেশি দেখে সোনারবউদি অবত একই অবাক হয়েছিল। তিরিশ টাকা কেন?

বীরাপদ বলেছে, রাখুন না, তিরিশ টাকাই বা কি এমন...।

সোনারবউদি খানিক তার সুখের দিকে চেয়ে ছিল শুধু, আর কিছু বলে নি। আপত্তিও করেনি।

পরাক্রমে অনটনের গল্পনা আর শুনতে হয়নি। এর থেকে সোনারবউদি বাদ সরাসরি শুকে এসে হলত, বীজবাবু, কুলির উঠতে পারছি না, আরো কিছু দিতে পারেন কি না দেখুন—বীরাপদ খুশি হত। সেটা অনেক সহজ হত, শ্রমোভনও হত। তবু সে দ্রাবি কেটে যেতে ছুটিনও লাগেনি। মূলতান কুটির এই মলভূমিটুকুতে এ পৃথক অনেক কৃপণতা দেখেছে, অনেক সস্কীর্ণতা দেখেছে। সেখানে সোনারবউদির আসাটা উত্তর যুক্ততার মধ্যে একটুখানি সবুজের আভাসের মতন। নিজের অগোচরে অল্প আসার আর অল্প কিছু মায়ার বীরাপদর শুকনো বুকের অনেকটাই ভরে উঠেছিল। সেখানে ওইটুকু ছায়ার অবকাশ না থাকলে তেমন ভালও লাগত না বোধহয়।

কিন্তু এক থাকার সব তলচ হতে গেছে। বীরাপদর মোহ ভেঙেছে। নিজের নিবৃত্তিতার নিজেরই হেসেছে শেষ পর্বত। বা হবার তাই হয়েছে, বা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে। উপাসী নদের তাগিদে সে একটা মায়ার জাল বুনছিল শুধু। সেটা ছিঁড়েছে ভালই হয়েছে। ও মোহ তো রোগের মোহর মতই। আবার সে ওতে জড়তে বাবে কেন? কিরে আবার ডাকলই বা সোনারবউদি...।

খাওয়া অনেককল সাধ। খেয়াল হতে উঠে তাড়াতাড়ি হাতবুখ ধুয়ে বাইরের সন্ধ বারান্দার হাতল-ভাড়া একটা কাঠের চেয়ার এসে বসল। পড়তি বেলায় হোটেলের কর্মস্বত্বতা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

বীরাপদও সুস্থ বোধ করছে একটু।

না, শুকলালের হাতে বাজার পাঠিয়ে দিয়ে সে কিছু অস্তার করেনি। সোনারবউদির পরাক্রম আমন্ত্রণ এ তাতে প্রত্যাখ্যান করাটা কিছুমাত্র অস্তার হয়নি তার।

...সোনারবউদি নিজে একদিন তার সঙ্গারে ডেকে নিয়েছিল ওকে। আর, বিদায় করেছে গুণ্ডাকে দিয়ে।

বিদায় করেছে একাদশী শিকড়ার আর শহুরী ভর্তাচাবের ভরে? আর বেই বিবাস ককক বীরাপদ বিবাস করে না। গুণ্ডা বিবাস করেছে কিন্তু ও করেনি। বক্তব্য শোণ করতে এসেও বিভ্রমনার একশেষ গুণ্ডার। ভিনবার টোঁক গিলে ভবে ব্যস্ত করতে পেরেছেন...তোমার বউদির মেজাজ তো জান ভাই... একেবারে কেশে পালে, আর এসব শুনলে কেই বা... পাঁচজনের সঙ্গে বাস, বুঝতেই তো পারছ...তোমাকে জই ওই হুঁবেলার খাওয়ার ব্যবস্থাটা আবার...।

আর বলার দরকার হয়নি। কলতে পাকেনি গুণ্ডা।

কথা হাছিল বীরাপদর দোরসোড়ার ঠাকিরে। দ্রাবি উদ্দেশ্যে গুণ্ডা হঠাৎই একটা ঠাক দিয়ে বসেছিল তার পর। কই গো, কলহ—

আসবে বীরপদ ভাবেনি। কিন্তু সোনারউদি তার দরজার হাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর সেই ধমধমে মুখের দিকে বীরপদ নির্দিষ্ট তাকাতো পেরেছিল। ডেকে ফেসে বরং একটু বিব্রতবোধ করেছিল গণ্ডা নিজেই। ১০০ বীরকে বুঝিয়ে বললাম সব-ও আপনজন বুঝবে না কেন। কই আজ ওকে চা দিলে না এখনো?

চারের বদলে দুটোকে আঙন ছড়িয়ে সোনারউদি আবার ঘরে ঢুকে গেছে।

গণ্ডার ভাষায়, তার ঘরনী কেপে যে গেছে, সেটা নিজের চোখে দেখেও বীরপদ বিশ্বাস করেনি। কবেনি কারণ, অল্পকৃতির রাজ্যে হুক্তি অচল। ওর সেই অল্পকৃতির ইশারাটা অশ্রুতকম। শকুনি ভট্টাচার আর একাদশী শিকদারের রসনার বক্তৃতাভাস শুক হয়েছিল তাদের সূসারটিকে ওখানে এনে বসানোর দিনকতকের মধ্যেই। সোনারউদি সে-সব গায়ে মাখা কুয়ে থাক, হাসি-বিজ্ঞপে নিজেই পাকস্থলি। বসেছে, তিন ছেলে-মেয়ের মা তাতে কি, মেয়েরা মেয়েই—কদর দেখুন একবার। চোখ পাকিয়ে তর্জন করেছে, আপনি নাকি রমণী পশুভের চোদ বছরের মেয়েটার দিকে পর্যন্ত চোখ দিয়েছিলেন? জ্যা?

দু'-বছরে এই নিরুদ্বেগ-সস্তীতি বেড়েছে বই কমেনি। ওই শিকদার আর ভট্টাচার মশাই বরং হাল ছেড়েছিলেন। বন্ধ জলাতেই আলগা আগাছা পড়ে, কিন্তু মোতের মুখে কুটোর মত ভেসে যায়। তাঁদেরও উত্তম ফুরিয়েছিল। এক দিন পরে রাতারাত্তি হঠাৎ আবার তাঁরা এমন সবল হয়ে উঠলেন কোন্ মন্ত্রবলে? হলেও

সোনারউদি গণ্ডাকে দিয়ে এভাবে বলে পাঠাতো না। নিজেই এসে বলত। বলত, আর পাঁচা গেল না বীরবাবু, এবার নিজের ব্যবস্থা নিজে দেখুন। সেই বকমই ধরন-ধরন তার। আসলে যা ঘটছে, সেটা কোনো অপবাদের ভয়ে নয়। ভর বা করে, সেটা আজ তার প্রণামের বহর দেখে, আর বেছে ওই বৃদ্ধ হট্টকেই নেমন্তন্ন খাওয়ানোর ব্যবস্থা থেকে আসে ভালো করে বোঝা গেছে। এত সহজে এমন কুটনৈতিক পন্থা অবলম্বন সোনারউদির ধারাই সম্ভব।

অপবাদ উপলব্ধি মাত্র। আর কোনো হেতু আছে যা প্রকাজে বলার মত নয়, যা বীরপদ অনেক ভেবেও সঠিক ঠাওর করে উঠতে পারেনি। যে স্থল কারণটা বার বার মনে আসে সেটাই সত্যি বলে ভাবতে এখনো ভেতরটা টনটনিয়ে ওঠে। গণ্ডার অনেক মাইনে বেড়েছে, অনটনের দুর্ভাবনা গেছে—বাইরের লোক এখন বাড়তি ঝামেলার মতই—তাই কি?

হোটলে বিকলের সাড়া জাগতে তাদাতাড়ি উঠে পড়ল। সন্ধ্যার একেবারে ছেলে পড়ানো শেষ করে ঘরে ফিরবে। শীতকালের বেলা, দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হবে। বীরপদ চৌরঙ্গীর দিকে পা চালিয়ে দিল। অশ্রুমনস্ক তথ্যনা। গণ্ডার চাকরির উন্নতিতে সেও মনে মনে খুশি হয়েছিল। সোনারউদি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে ভাবতে ওর নিজেরই হাড্ডা লেগেছিল।

মায়ের কথা মনে পড়ছে বীরপদর।

বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে পর্বন্ত পরিচয় ছিল না, ভালো করে একখানি

শীতের দিনে-ও

ল্যামোলিন-যুক্ত বোরোলীন

আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

শীতের কনকরনে হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ কেমু ক্রীম। নিয়মিত ব্যবহারে, ওষুধিগুণ-যুক্ত, সুরক্ষিত বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, মন্থ ও সজীব করে তুলবে আর আপনার অন্তরীণ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোৎসব করুন।



বোরোলীন

পঞ্চম প্রসাধন

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং



বোরোলীনে—ল্যামোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও চোঁটকাটার হাত থেকে রক্ষা করে আর রূপভদ্র স্বাক্ষর-ও লাভ্য হৃদয় করে।

১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১



চিঠিও পড়ে উঠতে পারত না। বাবা বড় না হোক, ছোটখাট উকীল ছিলেন। আর সসারেও প্রাচুর্য না থাক, অনটন ছিল না। সেই সঙ্গার মা চালাতো। কিন্তু হিসেবপত্র ঠিক মত রাখতে পারত না, কি দিয়ে কি করছে না করছে সব সময়ে মনেও থাকত না। ফলে এক এক সময় বাবার ওকালতি-জেরার পড়ে মাকে প্রায়ই ফাপরে পড়তে হত। বাবা কখনো বিরক্ত হতেন, কখনো বা মায়ের বিজ্ঞে-বুদ্ধি নিয়ে প্রকাজুই ঠাট্টা বিক্রপ করতেন। এরই মধ্যে মফঃস্বল ইকুলের চাকরি খুঁয়ে সপরিবারে কাকা তাদের গুহানেই এসে উঠেছিলেন। কাকিমাকে বোধ হয় তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন শহরে গেলেই চট করে কিছু একটা ছুটে যাবে। কিন্তু দিগগীর জোটেনি। বাবা যুখে কিছু বলতেন না, কিন্তু মাসের খরচ ঠিক মত কুলিয়ে উঠতে না পারলে বেশ গভীর হয়ে যেতেন। মা তার বিপরীত, কাকা কাকিমা এসে আছেন এ যেন তাঁদেরই অনুগ্রহ। কিন্তু ভুলেপুলে নিয়ে আর একজনের কাঁধে ভর করে অনুগ্রহ দেখানোর বাসনা কাকিমার অন্তত ছিল না। কাকাকে প্রায়ই গল্পনা সিত। অশান্তি আর খিটখিটের লেগেই থাকত দু' জনায়। আর তাই শুনে মা কোথায় পালাবে ভেবে পেত না।

সেই অশান্তির অবসান হয়েছিল। দু' মাস না যেতে কাকিমার যুখে হাসি ফুটেছিল। সামান্য হালও লসার খরচের জন্য কিছু টাকা দ্বারের হাতে তুলে দিতে পারছে সেই আনন্দে। মাকেও উৎফুল্ল যুখে টাকা নিতে দেখেছে বীরাম আর বলতে শুনেছে, ঠাকুরের পায়ে ভরসা রাখ, ঠাকুর যুখ তুলে তাকাবে না তো কি ?

কাকিমার সেই টাকা দিতে পারার সহস্রটা বীরাম অনেক পরে জানতে পেরেছিল। বাবার যুখে শুনেছিল।

তখন মা নেই।

বাবার কাছেই মা বসে পড়েছিল। কাকিমার হাত দিয়ে দেওয়ার জন্য কাকার হাতে মায়ের টাকা গুঁজে দেওয়াটা বাবার কাতোও কীকি দিয়ে সারতে পারবে এমন চৌকস মা নয়। বসে পড়ে তাই বিভগ্ন কাণে পড়তে হয়েছিল মাকে। হাসিযুখে নিরঙ্কর স্ত্রীর সেই কাণ্ডকারখানার কথা বলতে বলতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বাবা কি একটা ওকালতির বই খুঁজতে শুরু করেছিলেন। দিগিটা পালিয়েছিল। আর ও নিজেও বাপসা চোখে খবরের কাগজে কি একটা খুঁজছিল বেন।

সে যুগ তো গেছে। সেই কাল তো গেছে। তবু খেয় কেন ? সেই অজ্ঞ যুগের স্বপ্নের বস্ত্র আজও ঠিক তেমনি করেই স্বপ্নকে নাড়। ঘের কেন ?

পড়ের মার্ঠের একটু নিরিবিলা দিক বেছে নিয়ে বীরাম বসল। খুব ভাড়াভাড়িই হেঁটে এলো বোধহয়। এখনো দিনের আলো ল্পষ্ট। এত ভাড়াভাড়ি গেলে ছাত্রের দেখা পাবে না। কিন্তু শীত শীত করছে। সোনাবউদির ব্রাজল ভোজনের বাজার করা আর বাজার পৌঁছে দেওয়ার পরনে বিকলের জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরনোর কথাটা মনে ছিল না।

কি একটা বইয়ে বীরাম পড়েছিল, প্রথম কৈশোরে মেরেদের টান বাপের দিকে আর ছেলের টান মায়ের দিকে বেশি হয়। তার পর নতুন বয়সের শুরু থেকেই নাকি নিজের অপোরে তার

বিগার নেই। সে ব্যাপারে সামঞ্জস্য না হলে অনেক সময় মনের দিক থেকে বড় রকমের গুণ্ডপোলও বেঁধে যায়। আর সে ব্যাপারে থাকে খেলে চট করে নাকি সরও না।

সোনাবউদিকে দেখে কখনো কি নিজের হাড়ের কথা মনে হয়েছিল বীরামের ? মনে পড়ে না। তবে রুগ্ন অস্থি গোট-হার বিক্রি করার পর সুলতান কুঠির সেই বিনিম্ন হাতে একটা বড় প্রাপ্তির সন্ধানে ভিতরটা ভরে উঠেছিল। কিন্তু তা বলে মায়ের মত করে ভাবতে গেছে তাকে ? দিগির মতও না। আরো কাদের কারো মত ভাবা আরো হান্ডকর। তাহলে কার মত ? ওই সকলকে মিলিয়ে আরো শক্ত সবল কারো মত কি ? তারই নায় মনের জন আর সেইজন্মেই গুহান থেকে থাকটা এমন করে বুকে লাগছে ?

বীরাম হাসতে লাগল। তাই যদি হবে তুলটা গোটগোট ওর নিজের ছাড়া আর কার ? ওর প্রত্যাশার জন্য দারী আর কাকে করতে হবে।

হঠাৎ ধমকে গিয়ে একদিকে চেয়ে রইল বীরাম। একটা ঘের একটি পুত্র। এদিকেই আসছে। পড়তি দিনেব বোলাটে আলোয় দূর থেকে চেনা শব্দ। তবু বীরাম এক মজরেই চিনেছে। সেই চোখ-ভানো চাপা শাড়ি, সেই উৎকট লাল সিঁচের ব্লাউস, সেই সন্ন্যাসযুধি কীর্ণাকী তলু।

বাস-টপের সেই মেয়েটা।

সলীল হাতে হাত জড়ানো। হাসছে খুব। যুখখানা ততো শুকনো লাগছে না আজ। তেমন দুর্বলও মনে হচ্ছে না। বেশ হালকা পায়েই হেঁটে আসছে। বীরাম চেয়ে আছে ক্যাল ক্যাল করে। মেয়েটাকে দেখে মন, তার সলীকে দেখে। কোথায় দেখেছে ? দেখতে নিশ্চয়ই। কোথায় ? পরনে স্বকলকে ছাট, হাতে বাস-বস্ত্রা সিগারেটের টিন, চকল হাবডাব—কোথার দেখল ?

মনে পড়েছে। চকলদি পুরা সেই অজ্ঞ-বুদ্ধি ঢাড়া মুসলমানটার প্রতীকার কার্জন পাকের বেকিতে বসে থাকতে দেখেছিল। সেই লোকটার কথা শুনে একেই হুঁহাত মাথার ওপর তুলে নাচতে দেখেছিল আর তারপর হানিবাগ থুলে সাতখানা লশটাকার মোটা বার করে দিতে দেখেছিল।—সেই তো !

পাঁচ সাত হাত দূর গিয়ে তারা পাশ কাটিয়ে গেল। বাবার আগে হুঁজনেই কিরে তাকালো একবার। শীতের আসন্ন সন্ধ্যার এমন নিরিবিলাতে কাউকে একা বসে থাকতে দেখাটা খুব প্রত্যাশিত নয় বোধহয়। মেয়েটির কটাকে চক্কর বিরাঙ্কির আভাস। ছালায় মত কেউ ধ করে কেই আছ দেখলে ঘরের মেয়েরা, বৈদ্য-রমণী-সুলভ কোণ প্রকাশ করে, অনেকটা তেমনি। সলীল কাছে হরত নিজের কদর বাড়ল একটু। হুঁপা এগিয়ে গিয়ে সলী হরত বসালো কিছু মন্তব্য করলে, কারণ হাসিযুখে মেয়েটা আবারও তার দিকে কিরে তাকালো একবার। তেমনি নিশ্চয়, লিগুনে ট্রাটের সেদিনের সেই হতাপাও মনে করে বসে থাকার কথা নয়। পণ্য-পথে কতজনের আনোগোনা, কতজনের বাচাই বাছাই। ক'জনকে মনে রাখবে ? সলীল বসিকতার পুরোণে আর একবার খাঙ্ক কিরিয়ে দেখার কীকি এবারে বোধহয় একে ভিনে রাখতেই—

বীটার রাইস। কি আশ্চর্য, ছবিটার কথা আর মনেই ছিল না বীরাপদর। এখন কটা বাক্যে, আর সময় আছে? বাড়ি করিয়ে দূরের সেই বাড়ি বাড়ির দিকে তাকালো। এই আলোয় এত দূর থেকে বাড়িটাই চোখে পড়ে না। আজ আর সময় নেই বোধহয়, কোথায় হচ্ছে ছবিটা তাই জানে না।...তেতো চাল-...করা চাল-...কটু চাল-...বীটার রাইস। স্ন্যাকবার ঝুঁকু কামারের এক যা। বাংলা হয় না।

কিন্তু আর একটা কথাও ভাবছে সই সঙ্গে। কথা ঠিক নয়, বিপরীত অর্থভূত। তেতো হোক, করা হোক, কটু হোক—দুনিয়ার বেঁচে থাকার শাকটীও বড় অল্পত।

শীত করছে বেশ। ছোট বেলো, দেখতে দেখতে অন্ধকার। বীরাপদ উঠে পিড়াল, ছাত্র পড়ানো আছে। দূরের বাস্তব আলো ঝলছে, ওখানে পৌঁছুতে হলেও অন্ধকার মাঠ অনেকটা ভাঙতে হবে। সে-বাবুর পাঁচ টাকার বেশির ভাগই অবশেষে আছে, ট্রান্স-বাসে বাওয়া হবে। কিন্তু ছেলে পড়ানোর নামে মাঠ ভেঙে ওই বাস্তব পবিত্র পৌঁছুতেও পা হুটোর বেজার আগন্ত। তার ওপর শীত। শীত করছে মনে কেতেই বীরাপদ বুপ করে বসে পড়ল আবার। এই অবস্থার ছেলে পড়তে বাওয়ার কোনো মানে হয় না। ঠাণ্ডার সে হি-হি করবে আর ছেলেটা অবাক হবে। ভাববে হয়ত, মাষ্টার ছেঁড়া চামড়াও বেঁচে দিলে নাক।

আজকের মতও থাক ছেলে পড়ানো। শীতের প্রতি কৃতজ্ঞ। মাস কাগরে সোনারউদির হাতে তিরিশ টাকা শুনে সেবার তাগিদ তো আর নেই। নিশ্চিন্ত। ছেলে পড়তে যাবে না ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা আর ভেমন কনকনে লাগছিল না। তবু বিবেকের কাছে চম্পলজা আছে একটু—কাপড়ের খুঁটটা টেনে জামার ওপর দিয়েই গারে জড়িয়ে নিল। আর একটু বাদেই ওঠা যাবে, তাড়া নেই।

...সোনারউদি, না সোনারউদি থাক। চাকদি। সকাল থেকে সোনারউদির কাণ্ডকারখানার চাকদিকে আর মনেই পড়েনি। ঠিকানাপাত্তর নিয়ে রেখেছে চাকদার, বার বার আসতে বলছে আবার, সম্ভব হলে আজই যেতে বলে দিয়েছিল। ওইভাবে খেতে চাওয়ার খাড়া সামলে সহজ হবার জন্যে চাকদির সেই অন্তরঙ্গ আগ্রহ দেখে বীরাপদ বেশ কৌতুক বোধ করেছিল মনে মনে। কালকের মত আজও অমনি একটা যোগাযোগ হয়ে গেলে কেমন হয়! শীতের সন্ধ্যার ঘোঁরাটে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে একা ওকে এইভাবে বসে থাকতে দেখলে আঁতকে চাকদি উঠত বোধহয়। বাড়িতে অল্পত আর আমন্ত্রণ জানাত না তাহলে...

কিন্তু হঠাৎ আঁতকে উঠল বীরাপদ নিজেই। গারের সমস্ত ঘোঁষে ঘোঁষে কাঁটা দিয়ে উঠল। এক ঝটকার একেবারে উঠে পিড়াল সে। বিকৃত উত্তেজনার বলে উঠল, কে? কে তুমি?

খানিক দূরে চূপচাপ পাড়িয়ে একটু মেয়েই। না চাকদি নয়। বীরাপদর হঠাৎ মনে হয়েছিল প্রেতিনীর মত কেউ যেন। অন্ধকারে লশ হাত দুয়েও ঠিকমত চোখ চলে না, কখন এসে পাড়িয়েছে টের পায়নি।

জবাব না দিয়ে মেয়েটা হুঁতুতচরণে আগেরা হ'পা এগিয়ে এলো

বীরাপদ চিনল। বাস ঠপের সেই কীবাণী মেয়েটাই। কনিকের সঙ্গীর হাতে হাত মিলিয়ে খানিক আগে যে এইখান দিয়ে গেছে। স্বাভাবিক স্থলে এইটুকু একটু মেয়েকে দেখে দ্বাধু হতটা বিড়খিত চন্দ্রার কথা নয়। কিন্তু অন্ধকার মাঠের মধ্যে হঠাৎ এই পারাঘাততে পড়ে বীরাপদ উত্তেজনা দমন করতে পারল না। শীতের বদলে যেমে ওঠার লাখিল। বিকৃত রুঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই? ঘিঘাখিত কাতর আবেদন কানে এলো, বাস্তব ওই আলোর বার পর্যন্ত একটু এগিয়ে যাবেন...

ওই তো আলো দেখা বাচ্ছে চলে যাও না, এগিয়ে দিতে হবে কেন?

অসুট জবাব শুনল, বড় অন্ধকার...অনেক রক্ত লোক থাকে...। বীরাপদ আবারও রুঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, অনেকরকম লোক থাকলেও তোমার অন্তরোধে কিসের?

তবু পাড়িয়ে আছে দেখে কেবার ভক্ত নিজেই তাড়াতাড়ি পা বাড়াল। কিন্তু পারল না। বিকেলে সঙ্গী-লাভের প্রগলভ চম্পলতা নয়, বাস-ঠপের সেই শুকনো দুখটাই মনে পড়ে বীরাপদর। এই অন্ধকারে দুখ অবশ্য দেখতে পারিনি, তবু গলা শুনে সেই দুখই মনে পড়েছে। ওই দুখের মতই নিরুপায় আর কচি।

বীরাপদ দূরে পিড়াল। আমার পিছনে আসতে পারো—কোনরকম চালাকি করতে হবে না, তোমাদের আমি চিনি।

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



প্রতি প্যাকেজ
২৪ টি
বুড আকারের

- কলমে প্রস্তুত
- স্ট্রিমে সেকা
- মেশিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, চুস্তি
ও সন্তোষ রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্সাল্টেশনারী

কলিকাতা - ২৯

হনহনিয়ে মাঠ ভেঙ্গে রাস্তার দিকে এগলো সে। একবারও কিসে তাকালো না। তার সঙ্গ ধরে আসতে হলে মেয়েটাকে যে প্রায় ছুটতে হবে সে খেয়ালও নেই। স্নায়ুগুলি বশে আসেনি তখনো। অন্ধকারে কোনো লোক চোখে পড়েনি। চোখে পড়তে পারে সেভাবে চোখ ফেরায়নি কোনদিকে। অন্ধকারের গর্ভবাস থেকে আলোর কাছে আসার এমন তাগিদ আর বৃষ্টি কখনো অনুভব করেনি বীরাপদ।

মাঠের ধারের দিকটা অত অন্ধকার নয়। বানিকটা পর্বত রাস্তার আলো এসে পড়েছে। বীরাপদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। উত্তেজনা কমে আসছে। গতি মন্থব হল। রাস্তার একটা লাইট-পোস্টের কাছে এসে তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে।

পিছনে পিছনে মেয়েটাও এসেছে। নিষ্ফল্যে আসার তড়নাতাই এসেছে। এসে হাঁপাচ্ছে। কিন্তু মুখের ওপর চোখ পড়তেই বীরাপদ আবারও বেশ বড় বকমের ধাক্কা খেল একটা। মেয়েটা শুধু হাঁপাচ্ছে না, সেই সঙ্গে কাঁদছেও। কাঁদতে কাঁদতেই এসেছে। চোখের জলে মুখের উগ্র প্রসাধন ধকধকে কুণ্ঠিত দেখাচ্ছে। ওই মুখে জীবন ধারণের বিড়বনা আর বুকভাঙা হতাশার ছাপ শুধু। বীরাপদ বিমূঢ় মুখে চেয়েই রইল কিছুক্ষণ। তারপর এক নিমেষে বুঝল ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, পসারিনীর পসারই শুধু লুট হয়েছে, নাম মেলেনি। এছাড়া অমন জরবিকারী হতাশার আর কোনো কারণ নেই।

বীরাপদের সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলো যেন কাঁপছে আবারও। অন্ধকারের খাপদ মাছুষদের হামলার ভয়ে প্রাণের ধারাই এর সঙ্গ নিয়েছে বোঝা যায়। মেয়েটা কাছে এসে মাথা গৌল করে ঝাঁড়িয়েছিল, এবারে মুখ তুলে তাকালো। একটু কৃতজ্ঞতা, আর সেই সঙ্গে একটু আশা। আশা নয়, আশার আকৃতি। যেন আন্ধকের মত বাঁচন-বরণটা ওরই অলঙ্কারের ওপর নির্ভর করছে। চোখের জলে ভেজা রঙ-পালিশ করা মুখে হাসিছাড়া রাস্তা।

নিজের অগোচরে বীরাপদ পকেট হাত ঢুকিয়েছিল। সে-বাবুর গুপ্তা টাকা কটা আড়লে ঢেকেছিল। তারপরেই সচেতন হয়ে হাত ধর করে নিয়েছে। এক ষটকার অনেক দূরে চলে এসেছে। কোথাও বাবার তাড়ার যেন উল্লেখ্যাসে চলেছে সে। তেতরে কেমন একটা আলোড়ন হচ্ছে, কিছুতে ধামানো যাচ্ছে না। লোকজন আসছে যাচ্ছে, কারো দিকে কারো চোখ নেই। বীরাপদ কি করবে? হাসবে হা হা করে? না কি এক-একজনকে ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করবে, মশাই বীটার রাইস ছবিটা কোথায় হচ্ছে বলে গিতে পারেন?

কিছুই না করে সোজা একটা বাসে উঠে বসল। জানালা দিয়ে দাঁখাটা বাইরের দিকে বার করে দিল। শীতের ঝাঁপ হাওয়া দুই কানের ভিতর দিয়ে যেন মগজে ঢুকতে লাগল। বীরাপদ আরামে চোখ বুলল।

সন্ধ্যা পেরুলেই স্থলতান কুঠির রাত পড়ার। কোনো ঘরেই ইলেকট্রিক নেই, লঠন ভরসা। তেল খরচ করে সেই লঠনও অকারণে জ্বালার না কেউ। বড় বড় গাছগুলো যেন আরো বেশি করে অন্ধকার হড়ার। লজ্জা পা না হলে পারে পারে চৌকর দেয়।

কে, ধীরবাবু নাকি?

বীরাপদ অশ্রমমগ্ন ছিল বলেই চমকে উঠল। নইলে চমকবার মত কেউ নয়, রমণী পণ্ডিতের গলা। কদমতলার বেকিতে বসে আছেন। অন্ধকারে বসে আছেন বলেই ওকে দেখতে পেরেছেন, বীরাপদের তাঁকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেকির সামনে এসে দাঁড়াল, এই ঠাণ্ডার বসে যে। এমনি—ঘরে কি আর নিরিবিলিতে হাত পা ছড়িয়ে হুদুগু কলার জো আছে।...তা, এই কিরলেন বৃষ্টি, বেরিয়েছেন তো সেই সকালে?

হ্যাঁ...।

বসবেন? বসুন না একটু, ছুটো কথা কই, কি আর এমন ঠাণ্ডা—

স্থলতান কুঠির এলাকায় বসে রমণী পণ্ডিত ইন্দানীকালের মধ্যে ওর সঙ্গে গল্প করার বাসনা প্রকাশ করেছেন বলে মনে পড়ে না। রাত্তি একাদশী শিকদার আর শকুনি ভট্টাচার নিজেদের ঘরের বাইরে গলা বাড়ানেন না এটুকুই ভরসা বোধহয়। বীরাপদ বলল, না আর বসব না, ঘরে বাই।

ও, আচ্ছা—খুব ক্লান্ত বৃষ্টি? বাস তাহলে, আর আটকাবো না।

কিন্তু একেবারে কিছু না বলার জন্তে যে ডাকেন নি তাও বোঝা গেল। বীরাপদ ঘরের দিকে পা বাড়ানোর আগেই নিরর্থক হাসলেন, তারপর চাপা গলায় বললেন, ইয়ে—এদিকে তো আজ খুব ঘটা করে হঠাৎ এক ভ্রতভঙ্গ হল গুনলাম, ভট্টাচার মশাই আর শিকদার মশাইকে খুব ষাইয়েছেন নাকি। আবারও হাসলেন একটু, এরগোহিপি প্রমায়ভে—যে রাজ্যে গাছ নেই সেখানে আড় গাছও গাছ—স্থলতান কুঠিরও ব্রাহ্মণ বলতে ওঁরাই। তা বলিহারী বুদ্ধি মশাই। ভ্রততর কথা কিছু জানতেন নাকি? গণ্ডারবুর সঙ্গে এত কথা...দানে, কত সময় কথা হয়, ভ্রততর কথা তো কখনো শুনিনি। বীরাপদকে নিম্শূহ দেখে সামান্য গিতে চোঁটও করলেন, অবশ্য নিজের কিছু নেই, আত্মান সত্যত রক্ষক—আত্মরক্ষা তো করতেই হবে, যেভাবে পিছনে লেগেছিলেন ওঁরা, তাছাড়া থাকতেও পারে ভ্রত—কি বলেন?

কিছু না বলে বীরাপদ কেয়ার উত্তোগ করল। কিন্তু রমণী পণ্ডিতের বক্তব্য শেষ হয়নি তখনো। হঠাৎই যেন মনে পড়ল এইভাবে সামনের দিকে আর একটু খুঁকে বললেন, আপনাকে আবার শোনাচ্ছি কি, আপনি তো সবই জানেন। আপনিই তো সকালে বাজার করে গিয়ে গেছেন গুনলাম, কে যেন বলছিল—ওকলাল... ওকলাল বলছিল আপনি নাকি অনেক বাজার করে গিয়ে গেছেন। ব্যবসার জন্তে একটা ঘরের খোঁজ করার কথা বলতে গেলাম ওকলালকে—ওই বলল। তা আপনারও তো তাহলে নেমন্তন্ন ছিল, অথচ কিরলেন তো দেখি একেবারে সন্ধ্যা কাবার করে।

বীরাপদ কিছু বলার আগেই সপ্রাণে আরো হাতখানেক সরে এসে উৎসুকচোঁ জিজ্ঞাসা করলেন, জবাব দিলেন বৃষ্টি? অ্যাঁ? বেশ-করেছেন। আপনাকেও ওঁদের মতই হা-ভাঙে ভেবেছে আর কি। হাত না দেখলেও কপাল দেখেই বুঝতে পারি আমি, আপনাদার অনেক ঘরে—আমার কথা বিলিয়ে দেবেন প্রবৃত্তির।

খাচ্ছা করে বান আশনি, আর বিস্তৃত করব না, আমিও উঠব জাবি।

যে দুকে বীরাপদ হাঁপ ফেলে বাঁচল। কই করে আলো জালার তেমন দরকার ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না। তবু ঘরে ঢুকেই ঘরের কোণের হারিকেনটা খেলে নিল। গড়ের মাঠের সেই অন্ধকারটাই যেন চেপে বসে আছে। এখানকার এই অন্ধকারের জাত আসালা অবত, তবু অন্ধকার অন্ধকারই।

ভূমিশাখা পাঠাই আছে। পাঠাই থাকে। সরাসরি কবলের নিচে ঢুক পড়ল। এখন শীত করছে বেশ ১০০-বেচারার রমণী পণ্ডিত। দুটো লোককে নেমস্তন্ন করে এই একটা লোককে বান দিল কেন সোনারউড়ি। ওর বদলে না হয় তাঁকেই বলত। সব জেনে শুনেই এরকম এক একটা কাজ করে সোনারউড়ি। বললেই বামেলা চুকে যেত। ঘরের খোঁজে আর তাহলে শুকসালের কাছে যেতেন না ভরসালোক, এই ঠাণ্ডার বাইরেও বসে থাকতেন না হয়ত। কোত হতেই পারে, ওই অন্ধ দু'জনের থেকে একটু ঠাণ্ডা মেজাজের বলে নেমস্তনের বেলারও অবহেলা।

দরজা ঠেসে-সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল আট বছরের উমারাগী। ঘরের বাসিন্দাটি কিরেছে টের পেয়ে শুভাগমন। বাতে ভাড়াভাড়ি কিরলেই ও গল্প শুনেতে আসে। গত ক'টা দিনের মধ্যে আজই সকাল সকাল কিরেছে বীরাপদ। কিন্তু আজ যেন ঠিক গল্প সোনার তাগিমে আসা নয় উমারাগীর। ভাগব ভাগব চোখ দুটিতে

কিছু একা কোতুল উকিঝুঁকি দিচ্ছে। মাছটা চেয়ে আছে দেখেও সরাসরি একেবারে বিছানার না এসে একটু দূর থেকেই জিজ্ঞাসা করল, বীরাপদ ঘুমুচ্ছ নাকি?

বীরাপদও প্রায় গভীর ঘুমেই জবাব দিল, কি মনে হয়, ঘুমুচ্ছি? না।

আর, বোস—

ইচ্ছে হোল আনা, কিন্তু ঠিক যেন সাহসে কুলোচ্ছে না।

কিরে আধা-ডেজানো দরজার দিকে তাকালো একবার, তারপর আর একটু এগিয়ে এসে বসেই ফেলল, মা যদি বকে?

এইটুকু মেয়েও জানে কিছু একটা গোলেযোগের ব্যাপার ঘটেছে। বীরাপদ হাকা সুরেই জিজ্ঞাসা করল, মা বকবে কেন?

উমারাগীর আর ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। মাটির ধার বেঁধে শয্যার এসে বসল। তারপর অল্পযোগের সুরে বলল, তুমি যে আজ খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছ—

এর পর আর কথা বাড়ানো উচিত কি অল্পচিত ভাবার আগেই পনের প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কি রকম খারাপ কাজ?

উমারাগী গড়গড়িয়ে বলে গেল, তুমি খেতে এসে না, তাই মা-ও খেল না। বাবা তখন মাকে বকল আর মাও বাবাকে খুব বকল। বাবা তারপর অফিসে চলে গেল আর মা সমস্ত দিন না খেয়ে শুয়ে থাকল—কত কি খাবার হয়েছিল আজ, জানো?

কাকা একটা ভালো রকমের ভোজ কসকেছে এটুকুই বঙ্গবন্ধু।

অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতির্বার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লণ্ডন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

বিখল ভারত কলিত ও পণ্ডিত সভার সভাপতি এবং কাশী বারানসী পণ্ডিত মহাসভার হারী সভাপতি। ইনি দৈবীমাত্র মানবজীবনের কৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোঁঠি বিচার ও প্রকৃত এবং অকৃত ও দুষ্ট প্রহাতির প্রতিকারকরে শাস্তি-বস্ত্রানাদি, তাত্ত্বিক ক্রিয়াসি ও প্রত্যক্ষ কলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ভাতার কবিরাজ গণিত্যক কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, বং—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রকৃতি দেশ মনীষীকৃপ তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

কিং হাইনেস মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস মাননীয়া ঘটমাতা মহারাগী ত্রিপুরা স্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয়া ভার স্বমখ্যাত মুখোপাধ্যায় কে-টি, সন্তোষের মাননীয়া মহারাজা বাহাদুর জার মদখনাথ রায় চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয়া বি. কে. রায়, বঙ্গীর গভর্নমেন্টের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীমঙ্গলেশ্বর রায়কর্ত, কেউনকড় হাইকোর্টের মাননীয়া জজ রায়সাহেব সিং এল. এম. রায়, আসামের মাননীয়া রাজাপাল জার ফজল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর সিং কে. রূচপল।

প্রত্যক্ষ কলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তত্ত্বোক্ত অত্যাদর্শ্য কবচ

রত্নকবচ—ধারণ কর্তব্যে প্রকৃত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (ভরোজ)। সাধারণ—৭১/০, শক্তিশালী—২০১১/০, মহাশক্তিশালী ও সম্বর কলপ্রদ—১২২১১/০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্যের কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কবচ)। লক্ষ্যকবচ—ধারণকৃত বৃদ্ধি ও পরীক্ষার মূল্য ২১/০, বৃহৎ—৩৮১/০। মোহিনী (বশীকরণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত ব্রী ও পুংব বশীকৃত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১১/০, বৃহৎ—৩৪১/০, মহাশক্তিশালী ৩৮১১/০। বঙ্গলাঘুহীন কবচ—ধারণে অভিলষিত বর্ষোর্বাসি, উপরিব মনিবকে সম্ভট ও সর্বপ্রকার মামলার জয়লাভ এবং প্রবল লক্ষ্যনাশ ২১/০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪১/০, মহাশক্তিশালী—১৮১১/০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাওয়াল সম্রাটী জয়ী হইয়াছেন)।

(হাপিভাষ ১০-৭ ধঃ) অল ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিটার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ব), ধর্মলা স্ট্রীট “জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন” (এবেশ পথ গুলেনেসলী স্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০০৪।
সদর—বৈকাল ৫টা হইতে ৭টা। ব্রাঞ্চ অফিস ১০০, ব্রো স্ট্রীট, “বল্লভ বিমান”, কলিকাতা—৪, ফোন ৫৫—৩৬৭৬। সদর প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা।

কিন্তু শেখটুকু আর কানে বারনি। সকালের সেই অস্বস্তিটাই যুহুতে বিকশিত হয়ে উঠল। গুজবের হাতে বাজার পাঠানোর পর থেকে ধরা হোঁয়ার বাইরে সেই কিছু একটা ভুল করে ফেলার অস্বস্তি। কিন্তু তা বলে এরকম পরিবর্তিত গাড়িতে পারে ধারাপদর কলনার বাইরে। বিকৃত বোধ করছে বলেই বিরক্ত আরো বেশি। নিজেরা কগড়া-কাটি করে বত খুশি না খেয়ে থাকুক, ওকে নিয়ে টানাটানি কেন।

মেয়েটাকে বড়মড়িয়ে উঠে গাড়িতে দেখে ধারাপদ দরজার দিকে তাকালো। সোনাবউদি। গম্ভীর। মায়ের গা বেঁধেই মেয়ে ছুটে পালসো। সেইদিকে চেয়ে ভুল কৌচকালো সোনাবউদি, মেয়ের বাওরা দেখা না, বেন ওকে কেউ মারতে এসো—।

ধারাপদ গারে কবল জাড়িয়েই উঠে বলল। সাক্ষাত মন্তব্য করল ও সেই বকমই ভেবেছে।

ওর দিকে চোখ রেখে সোনাবউদি দরজার কাছ থেকে ছুই এক পা এগিয়ে এসো। নিস্পন্দ গলায় জিজ্ঞাসা করল, আপানি কতক্ষণ? এই ঠাণ্ডা চাউনি আর বাকা কণ্ঠস্বর ধারাপদ চেনে। এরই থেকে মেজাজ-গাভক জালই বোঝা যায়। কিন্তু মেজাজ সম্প্রতি ধারাপদও খুব ঠাণ্ডা নয়। তেমন সকেপে জবাব দিল, এই তো—।

আপনার সেই দাঁড়ির ব্যাড পেছলেন?

না। একটা জুতসই জবাব দিতে পারলে ভালো লাগত, তবু সে চোটা না করে জবাবটাই দিল শুধু।

সোনাবউদির এবারের ব্যঙ্গোক্তি আগের থেকে একটু হালকা শোনালো। আদ্য ভাবলায় আজও বুঝি দাঁড়ির ওখানে ভার খাওয়া হয়ে গেল, তাই সাত তাড়াতাড়ি এসে ওরে পড়েছেন, আর নড়তেচড়তে পারছেন না।

ধারাপদ কথার পাঠে টক করে কথা ফলাতে পারে না। এই একজনের সঙ্গে অন্তত পারে না। ভিতরে ভিতরে তপ্ত হলো চুপচাপই বসে রইল। কিন্তু মহলা তারও অভ্যাস পেল বোধহয়। আরো হালকাতাবে কতব ওপর এবারে বেন ছুন ছাড়িয়ে দিল একপ্রহর।—আজ সকাল থেকে এ পর্যন্ত শুধু মাত্রই হাওয়া খেয়েই কাটল তাহলে?

এইবারে জবাব দিল ধারাপদ, বলল, হ্যাঁ। কিন্তু আপনার তো জাও জোড়ানি শুনলান—

কাজ হয়েছে। খতমত খেয়েছে একটু। হারাকনের অঙ্গ আলোর বুখানা কঠিন দেখাচ্ছে আবার।—ওই বুখণ্ডি মেয়ে বলে গেল বুখ।

একুনি গিরে বোধহয় মেয়েটার চুলের খুঁটি ধরবে। সেই দ্বায়েই ধারাপদ এবারে একটু লক্ষ্য কটেই বলল, মেয়েটার দোষ সেই, ওইটুকু মেয়ে—না বললেই বাক্য ভাবনার কথা হত। আপনাদের বোঝাপড়াটা এবার থেকে ওদের চোখ-কানের আড়ালেই করতে চোটা করবেন।

সোনাবউদির বুখতার বলল আবার। ছুই চোখে ঈষৎ কৌতুকের ছায়া, চোখের কীক হাসির মত। মেয়েটার কীড়া কাটল বোধহয়। চুপচাপ দেখল খানিক, তারপর লম্বা বিজ্ঞপের হয়েই বলল, পুঙ্খবাহ্যেই ঠমক তো একটু-আটু আছেই দেখি, তবু অন্য অর্থ কেন?

চকিতে মুখ তুলে তাকালো ধারাপদ আর সঙ্গে সঙ্গে সুর পালটে সোনাবউদির কাঁধে উঠল প্রাচর, দয়া করে উঠে হাত-বুখ ধোবেন না সব জেনে ঢেলে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হব?

মুহুর্তে একটা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে ধারাপদ একেবারে বেন হাবুডু খেতে লাগল। এইখানেই সোনাবউদির জিত আর এইখানেই ধারাপদর হেরেও আনন্দ। এইটুকু যেতে বসেছে বলেই বত যশ। তবু থাক, ছদ্মের এ-বস্তুর ওপর আর ভরসা করে কাজ নেই। সেই সোভে ডিকার গ্লানি। যাতনা কেমন মর্মে মর্মে জেনেছে। এই একটা দিনের ব্যাপার এক দিনেই শেষ হোক, মিছিমিছি ওকে উপলব্ধ করে আর একজনও না খেয়ে থাকবে কেন।

আপনি যান, আমি আসছি।

থাক, অত কষ্ট করে কাজ নেই। এখানেই নিয়ে আসছি।

ধারাপদ উঠে হাতমুখ ধোবার কথাও তুলে গেল। আশ্চর্য্যাবশেষক বাদে সোনাবউদি আসন পেতে খাবার সাজিয়ে দিতে তাড়াতাড়ি উঠে হাতটা ধুয়ে এসো শুধু। আগে হলে এত খাবার দেখে খুশিতে জাঁককে উঠত। সবই গরম করে আনা হয়েছে সেই জন্তও মহিলার একটু জ্বাট প্রাণ। কিন্তু সহজ প্রাণের চোটা ছেড়ে ধারাপদ শুধু মাথা সোজ করে খেতেই লাগল।

তাও অস্বস্তিকর। অলুর বসে সোনাবউদি চুপচাপ দেখছে। খানিক বাদে ধারাপদ সহজভাবেই খোজ নিতে চোটা করল, আপনার নিয়ন্ত্রিতরা খেয়ে খুশি হলেন?

ওরা আপনার মত নয়, যেঠের বাহা বস্তির দাস—খেয়ে সেয়ে খুশি হয়ে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেলেন।

আগে মুখ তুলে তাকালে ধারাপদ দেখত ওদিকের গাছের অনেক আগেই তরল হয়েছে। ফলে নিজেও সহজ বোধ করল একটু। মুখের পরস জঠরে চালান করে সেও এবার হাসি মুখেই বলল, ওদের আশীর্বাদ না হয় আপনার দরকার ছিল কিন্তু আমাকে নিয়ে এভাবে টানা-ঠেড়া কেন?

জবাবে সোনাবউদি চোখে চোখ রেখে একটু চুপ করে থেকে হাসি চাপতে চোটা করল বোধহয়। একটা ছদ্ম নিঃশ্বাস কেলে তারপর। বলল, দখা বার স্মরণ, তার সঙ্গে কি লাজে মন—

আহারের দিকেই ঝুকতে হল আবারও। সোনাবউদি সংকল্পিত পাক্তের মেয়ে শুনেছিল। স্থলতান কুণ্ডিতে সংকল্পিত বুলি দুই একটা লুইনি তটচাপ আর রমণী পাক্তই আওড়ায়। কিন্তু সোনাবউদির বাংলা বচনের ভাঙারটি বড় ছোট নয়। মেজাজ এসার থাকলে কথার কথার হুড়া পাঁচালির খায়ে অনেককেই নাজেহাল করতে পারে। এমন অনেক শুনেছে ধারাপদ। তবু আজ অবাক হল একটু, ওর আজকের আচরণে মহিলার শেষ পর্যন্ত খুশির কি কারণ ঘটল।

নিরীহ মুখে এবারে সোনাবউদিই জিজ্ঞাসা করল, ওদের আশীর্বাদ আমার দরকার ছিল কেন?

প্রশ্ন আর নেত্রের দেখে ভাবলায়—

হঃ।

যে-ভাবে তুমি কুঁচকে শব্দটা বার করল, তার শব্দ অর্থ, যুধির নৌক তো এই।

ধারাপদর ঠিক বিপদ হল না, তবু এ দিল কথার ব্যাচাল না।

হঠাৎ রমণী পশ্চিমকেই মান পাড় গেল কেমন। বলল, যে ভাঙেই নেমস্তর করুন, আর এক বেচারীকেই বা বাদ দিলেন কেন? হৃৎকরছিল।

হৃৎকর প্রায় কপালে তুলে ফেলল, কাঁকে বাদ দিলুম, ওই বিটলে গণ্ডকারেক?

মাকথান থেকে এই লোকটাক ওপর এমন বিরূপ তেন, হীরাপন্ন বুলল না।—হ্যাঁ, এই ঠাণ্ডাও কমমতলার বেঞ্চিতে চূপচাপ বসেছিলেন দেখলাম, শোকটা ভুলতে পাবেন নি। মনে বড় লেগেছে।

শোনামাত্র চকিতে সোনারউদি বাইরের অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। একটা দরজা ভেজানো ছিল, চোখের পলকে উঠে গিয়ে সেটাও সটান খুলে গিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হীরাপন্ন অবাক।—এতক্ষণে উঠে গেছেন...

দরজা খোলা রেখেই সোনারউদি ফিরে এলো। মুখ এরই মধ্যে গভীর আবার। বলল, অন্ধকারে দেখা বাচ্ছে না, কিন্তু বাজি রাখছি, গিয়ে দেখে আসুন এখনো ঠিক বসে আছে। আপনাকে আসতে দেখেও উঠে যাবে। কতটা বড় আন্তি করছি দেখবে না—জায়গামত জ্যোতির্বা ফলাবে কি করে তাহলে! দেখুক, ভালো করে দেখুক।

রাগের মাথাযও তেলেই ফেলল। হাঁ করে দেখছেন কি? কাঁক পেলেই পুতুর ধারে কিসকিন কিসকিন—গণনার চাকরির ডবল উন্নতিটা কলছে, দ্রাব অবনতিটাই বা কলবে না

কেন? মন্ত জ্যোতির্বা বে। বহু খালা বয়েব খালা, নইলে ওই দুই বুড়োকে আমি কোয়ার কবি ভাবেন নাহি।

হীরাপন্ন চেয়ে আছে আর হাঁ কবেই আছে নির্ধাক।

খাওয়া হয়ে গেছে। জায়গাটা বুড়ে দিবে খালা-বাটি নিয়ে সোনারউদি চলে গেল। হীরাপন্নও উঠেছে, হাতমুখ বুড়ে আবার লম্বায় এসে বসেছে। কিন্তু বাহজান লুপ্ত বেন তখনো।

এমন এক ওলট-পালটের মধ্যে গুলুও কথা তো একবারও মনে হয়নি তার। একটু স্বার্থপর হলেও সাধাসথে মান্নব বসেই জানে। কিন্তু আসল খাটা এগেছে সেখান থেকেই। তারই কান বিবিরেছে রমণী পশ্চি ৫।

তাঁই তো স্বাভাবিক, হীরাপন্ন ভাবেনি কেন।

রমণী পশ্চি শোখ নিরেছেন ওই তো চকাক কলে কোণ-করে টেলেছে কীকে, ওই দুই বুড়ার কাছে নাজেহাল করে বব-ছাড়া করিয়েছে। বাগ জার তাঁই কার ওপর।

ভাবনায় ছেদ পড়ল সোনারউদি আবার এসেছে। হাত কতক দূরে বসে ভনিতা বাদ দিবে সোভাপ্রতি বলল, কথা আছে, মন দিয়ে শুনুন—

মন দিবে শোনার মন মনের অবস্থা নয়, হীরাপন্ন তাকালো শুধু।

—এভাবে শরৎ ঘাটি করে ক'টা দিন আর চলবে, কালই একটা কুকার কিসে মিন, কিছু লজ্জ কাক নয়, দুই একদিন দেখলেই পাববেন—এই টাকটা রাখুন।

হাত বাড়িয়ে একটা পুরনো থাম এগিয়ে দিল। সেটা নেওয়া দূরে থাক, শোনামাত্র হীরাপন্ন সকেচে টটখ।



আনন্দ ডিঙ্গারে
ক, হোড়ের
প্রসারিন সামগ্রী



ক, হোড় ২৩ ক্রাং • কলিকাতা-২০

খামটা সোনারউদি তার কোলের ওপর কলে দিয়ে বলল, লজ্জা করতে হবে না, আমি দান-খরচা করতে বসিনি—ওটা আপনাই টাকা। মাস খরচ বারদ দশ টাকা করে বেশি দিতে শুরু করেছিলেন কেন, কথাবার্তাগুলো বিধত বৃষ্টি? সেই টাকা সরিয়ে রেখেছি, আপনার কাছে থাকলে কি আর থাকত। অবস্থা আমারও খরচা হয়ে গেছে কিছু, দেড়শ টাকা আছে ওখানে, গোটা তিরিশেক টাকা আপনি আরো পাবেন—

এত বড় ঘরে ওই লুঠনের আলোটুকুও কি বড় বেশি জোরালো মনে হচ্ছে বীরাপদর? তুই হাতে করে নিজের মুখটা ঢেকে ফেলতে ইচ্ছা করছিল বার বার। নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হলে বিধম লজ্জা। যাবার আগে সোনারউদি আবারও কুকারের সংস্ক কি বলে গেল কানে ঢোকেনি।

একসময় খেয়াল হতে দেখে, শূন্য ঘরের শয্যা স্বাধীন মত বসে আছে সে। উঠে আলো নিবিয়ে কবল টেনে সটান শুয়ে পড়ল। আর কোনো ভাবনা নয়, কিছু না। শ্রায়ুর ওপর দিয়ে আঁধা অনেক বকল গেছে, কাল ভাববে। কাল—

কিন্তুর জোর করে ঘুমের চেষ্টা বিড়ম্বনা। ঘুরে ফিরে সেই ভাবনার মধ্যেই আবার ডলিয়ে গেল কখন। বাইরে একটানা ঝিঝির ডাকে নৈশ স্তব্ধতা বাড়ছে। আর, ওর আচ্ছন্ন চেতনা যেন সজাগ হয়ে উঠছে ক্রমশঃ—রমণী পণ্ডিত ভুল বলেন নি,

সোনারউদির ব্রতটুকু কিছু নয়, বিধ ভুল তাঁর অন্তর হয়েছে। নেমন্তন্ন করে বাইরে শকুনি ভট্টাচার আর একাদশী নিকদারের মুখ বন্ধ করতে চায়নি সোনারউদি, মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে রমণী পণ্ডিতেরই। শুধু গগুনার কানেই বিব ঢেলে ফাঙ্ক হননি ভ্রাতালোক, ওই দু'জনকেও রসদ যুগিয়ে এবারে উনিই সক্রিয় করে তুলছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সোনারউদি কেয়ার করে না, কিছু গগুনা করে। সেই জন্তেই অমন প্রণামের বহর আর সেই জন্তেই অমন অভিনব ব্যবস্থা।

...আর সব কিছুই শুধু ওরই জন্ত, শুধু বীরাপদরই জন্ত।

কবল কলে দিল। গরম লাগছে। ঘরের বাতাসও যেন কমে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে অসম্ভব। বালিশের নিচে টাকার খামটা—। হাতটা যেন পলু হয়ে ছিল, তুলে ওটা ফেরত দিতেও পারিনি। থেকে থেকে ওটাও যেন মাথায বিধছে।—

যেদর মধ্যে নিঃশব্দচারী কার যেন আনাগোনা

কে? কে রে তুই? রণু?

বোবা আলোড়ন। বীরাপদর মনে হল রণু এসে বসেছে তার শিরের কাছে। যেমন ও বসত তার রোগশয্যায়। মেকদণ্ডে ঘুণধরা রণু নয়, নিঃশব্দ তরতাজা। নিটোল দুর্ভেদ অন্ধকারে হুঁচোখ টান করে চেয়ে রইল বীরাপদ। কান পাতল। একটানা ঝিঝির ডাক, আর ফিসফিস জিজ্ঞাসা, কি হে, সোনারউদি কেমন?

[ক্রমশঃ]

প্রবাহকথা

সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ-কোড়া পর্জন্ত-চূড়ায়
তুলা-শুভ্র অযানো জল
সোনালি বোধের প্রভায় গলে
মরা আশ্রয়গিহির
আলাহুধের দিকে ছুটে চলল।
লুট হল একটা হুল।

কোনো এক সুপ্ত যুগুর্বে
পাষণ্ডপ্রহরীকে কঁাকি দিয়ে
একটা কীণ প্রবাহ-শিঙ
হামাগুড়ি দিয়ে নামতে লাগল
সবুজ মাটির দিকে
বনানীর সজীবতা,
মাটির কোমলতা
আর চন্দ্রকলার মেহালোকে
পুই হল একটা অসবকস পিঙ।

আলতো পারের
আঁকা-বাঁকা পদচিহ্ন রেখে
নগ্না হরিণীর চোখের দিকে তাকিয়ে
কাঁখে কলসী, ঘোমটা নেওয়া
পল্লীবধূর দিকে পিছন দিয়ে,
চলতে লাগল সে
টলমল করে।

সুখ-দুঃখের সাগর-সন্দেশে
মিডালি পাতালো হাসি-কান্না।
হাড়-কনকনে শীত আর
জিভ-ভকানো গরমের সন্ধি স্বকূতে
অতলাস্তের কল্লোলরা,
জোয়ার-ভাঁটায় মালা পাবে-
হাতছানি দিয়ে বলল,
আর, আর, আর।



ভেরা ফিগ্‌নার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অমল সেন

মার্চ।

বন্দিনী চ'লেছে মার্চ ক'রে—খুশল বাজছে ঝন্-ঝন্।
হু'শাশে বকীল...বিবেক যারা বিক্রয় ক'রেছে জ্বাবের
কাছে।

গুণ্ড একজন...ভেরা তার দিকে চেয়ে দেখলো। খর্বাকৃতি,
মুখের বর্ষ ভামার-রক্তে মেশানো, বাঁ-গালে বড় একটা লাগ চোখের
পাল দিয়ে কপাল পর্যন্ত গিয়েছে। চোখে তার অসীম দরদ।
নীরব ভাষার বন ব'লছে, নারী, নারী, কেন যাচ্ছে তুমি মরশের
পথে? জীবন যে মধুর, বড় মধুর!

ও হয়তো জানে না—

“যবের মংগল-শংখ নছে তোর তরে

নছে সন্ধ্যার দীপালোক।”

ভেরা চমকিত হ'ল। কিন্তু ঘুণা সওয়া যায়, অত্যাচার
সওয়া যায়, কিন্তু এই দরদ...এ যে ধৈর্যের বীধ ভেঙে গিয়ে চায়।
যেন সে কীমতে পায়েল বাঁচে।

আবার সেই লোকটির দরদভরা দৃষ্টি। এবার যেন ব'লছে,
কৈলো না, গুণ্ডো কৈলো না। কৈলো সকলের উপহাসের পাত্র হ'য়ে না।
ভেরা উদ্ভ্রান্ত অঙ্গ যোধ ক'রে পাড়ীতে গিয়ে উঠলো।
বিদায়কণ্ঠে হৃদয়ের এই দরদ তার মনে গেঁথে রইলো।

গাড়ী চললো।...জাহাজবাড়ী পর্যন্ত।

তারপরে জাহাজ। জাহাজ এসে থামলো এক ভীষণ জেলের
সম্মুখে। ম্‌শ্বেলবার্গ জেল।

ভেরার হাতের শিকল খুলে দিয়ে তাকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া
হ'ল। একজন স্ত্রীলোক আর ডাক্তার বসে সেখানে। ডাক্তার
ভেরার দিকে শিহন দিয়ে বসলো। স্ত্রীলোকটি একে একে ভেরার
সকল কাণড়-চোপড় খুলে নিল।

ডাক্তার তখন বেশ ক'রে দেখতে লাগলো, তার দেহের
কোথায় কোন্‌ বিশেষ চিহ্ন আছে।

ভেরা কোনো কথা বললো না, কোন বাধা দিল না—কার্টের
পুতুলের মতো ঠাঁড়িয়ে রইলো। তার প্রাণ যেন কোথায়
আত্মসোপান করেছে। যে দেহটা পড়ে আছে তার অমৃত্যুত্ব নেই,
লজা নেই, কিছুই নেই।

তার যোনী ইতঃভিষিককে প্রোত্ত্ব ক'রে হ'ল কন্যাতারী একদিন
কবিতা রচনা করত কবে। ভেরা করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। হুশ

সরকার আজ বুধি তাই এমনি ভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে সেই
প্রতিবাদকারিণীর উপর।

ডাক্তার চলে গেলো। ভেরাও এলো কুঠরীতে। ছোট ছোট
কুঠরী...সারি সারি সাজানো...অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন। তাই
ছায়ায় নবর কুঠরী ভেরার। অস্ত্রাভ কুঠরীগুলিও সব বিপ্লবী
কয়েদীতে ভর্তি।

সে ভীষণ জেলের কাহিনী ভাষার বর্ণনা করা যায় না। হৃদয়
সেখানে পাগল হয়ে যায়, আত্মহত্যা করে, লোহার গরাসেতে মাথা
ঠুকে ঠুকে মাথা বজ্রাস্ত্র ক'রে তোলে। সেখানে প্রবেশ করে
বৌবনের প্রথম সাহস...মার বে রয়ে আসে বিজ্ঞ-বৌবন,
শংকাভূর শ্মশানযাত্রীর বেশে।

ভেরা আজ তাইই অধিবাসিনী।

ভর নাই, ভেরা ভর নাই। চিত্তকে দৃঢ় করে, তুমি কোন্‌ ব্রত
উপাধানে এমন জীবন বরণ ক'রে নিয়েছ, তাই মনে করে। তোমার
জাতি—লক্ষ লক্ষ রূপ নরনারী, কী শাচীনয় জীবনযাত্রা তাদের।
তুমি তাদের মুক্তি-দীপ বোণাবার ব্রত নিয়েছ 'মজের জীবনকে—
মুখ-দুঃখ, হাসি-গান, প্রেম-উচ্চাশ। যেশানো তোমার সমগ্র জীবনকে
—বতিকার মতো জ্বালিয়ে দিয়ে। ছানদায় সবচেয়ে চতুর্ভাগ্য বাধ্য,
পতিপ্রমত্ত, বোণাতুর মেহ, আত্মহীন খাদ্যাহীন জীবন, অসহন
দারিদ্র্য, তাদের কথা আজ মনে করে ভেব।

তুমি এ অংশে তত জ্বাতর একনিষ্ঠ মুক্তবোদ্ধা। এই আপাত
পরাজয়ে চোখের জল কেলো না, শোক করো না সেই সংসীদেব জন্ত,
যারা মুক্তি-যুদ্ধে আত্মবলিদান করেছে। ভেরা, মৃত্যু তাদের কণ্ঠ বন্ধ
করেছে, কিন্তু তাদের আত্মার আগুন নেবাতো পাবেনি। এই
পারাবণাবার স্তব্ধ, ভীষণ, সর্বব্যাপী অন্ধকারে কান পেতে শোনো,
তোমারই মস্তোক্ত বোদ্ধা এই কাণার ককে ককে হুতুর তপস্বী
করছে। তুমি একা নও, একা নও ভেরা।

চিত্তার স্রোত ভেরার হৃদয়তটে আছড়ে পড়তে লাগল অম্লি
ভাবে। এ কাণাগারে বসে মনে হয়, জীবন যেন একটা স্ত্রী
বয়স, যাকে সত্যিকারের জীবন ব'লে ভুল হয়।

ভেরা বুঝতে চেষ্টা করলো, কিন্তু বুদ আসে না। কেবল যবের
পর যব।

কী ভয়াবহ।

সে যেন বেশ কয়েক পালিয়েছে। জেলের পাগল। হুতুর শব্দ,

রক্ষীদের কোলাহল, ষোড়ার খরসনি, বস্ত্র-থেকে। কুহুরের আকস্মিক
বেউ বেউ, বন্যকের গুলী, গুলীবিন্দ হয়ে পড়ে গেলো সে।

ভেড়া বৃক হাত দিয়ে চাঁৎকার করে জেগে উঠলো। তারপর
আবার স্বপ্ন।

গুপ্তকথা ব্যক্ত করার জন্ত নির্ধাতন! একটা বড় খাঁচায়
সে বন্দিনী, তপ্ত বাষ্প খাঁচাকে প্রাবিত করেছে—কী দাহ! লক্ষ
লক্ষ লুচ এক সংগে ফুটিয়ে দিচ্ছে কে যেন দেখে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে
ছুটে যায়, কিন্তু নাই, নাই,—পালাবার উপায় নাই, চারিদিকে লোহার
গরাদে। মুছিত হয়ে পড়ে গেলো। তাতেও রেহাই নেই। সত্য
জাতির সভ্য ব্যবস্থা।

কে যেন তাকে নিয়ে কাঠের চেয়ারে বসিয়েছে। চেয়ার ছেড়ে
উঠতে পারে না। অন্তঃকাল থেকে কে যেন কল টিপে দিচ্ছে, আর
বিহ্বলের স্রোত কাঁটার মতো শরীরের প্রতি অণু পরমাণুকে বিশেষ
বিশেষ বয়ে বাচ্ছে, অস্বাভাবিক স্পন্দনে পায়ের মাংসপেশী হয়ে উঠেছে
লোহার মতো শক্ত। কাদার উপায় নেই, সহবার উপায় নেই,
প্রতিবিধান করার উপায় নেই।

শেষ দৃশ্য—

তাকে শৃংখলাবদ্ধ করে কীসির মধ্যে তুলে দেওয়া হয়েছে, চারিদিকে
উত্তপ্ত বিকৃত অর্ধচক্র অসহায় জনশ্রোত। সময় হল, কীসির
দড়ি মরণ-বঁধুর দেওয়া বরণ-মালার মতো বীরে বীরে তার অঙ্গ স্পর্শ
করছে, প্রেমের কঠিন আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত করছে।

কী আরাম। কী আরাম! এমন করে রাত কাটে।

বীরব, নিস্তব্ধ,—কবরের মতো। হঠাৎ হয়তো একটা শব্দ
জাগে, অসামান্যিক, ভয়ংকর। চকিতে আসে, চকিতে মিলিয়ে যায়।
বন্দীর মনে আতঙ্ক জাগে।

এ, এ আবার ও কিসের শব্দ! কঁোস-কঁোস! একটা সাপ
আসছে গর্জাতে গর্জাতে—এই লোহার খাঁচায় নিঃসহায় শিশুর মতো
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে হবে তার। কিন্তু না, ও কি না, ও যে
জলের শব্দ। পাইপ চুইয়ে জল বেরুচ্ছে, তারই আওয়াজ। কিন্তু
কী ভীষণ।

কে ঐ ক্ষণস্থিরে কানছে না? যেন হিমালয়ের শৃংগ ভেঙে
পড়েছে বৃকের উপর, ঠেলে-ফেলে সরিয়ে দিয়ে উঠতে পারছে না।
উ, কি হয়েছে তোমার? কি হয়েছে? বন্দী, ওতো পাখাণ-
চাপির ব্যথা নয়—তার চেয়ে ভীষণ ব্যথা, মৃত্যুপথযাত্রী ক্ষয়দোগীর
শব্দ অলঙ্ঘন—যার মা কাছে নেই, স্ত্রী কাছে নেই, বোন কাছে
নেই,—যাকে শেখ-বিলায় নিতে হবে অন্ধকারের মুখ দেখে দেখে!

উ, অসহ্য।

কন-বন্দ, কন-বন্দ! ও কিসের শব্দ? কে ভূমি মুক্তি-উদ্গার
বন্দী, লোহার পরায়েতে সবলে আঘাত করে শৃংখল ছেঁড়ার নিফল
চেষ্টার নিজের দেহকে রক্তাক্ত করে তুলছে? বহু! মুক্তি নাই,
হুজি নাই। এক বর, জাহান্নাম, এ কংকাল তৈরির কারখানা।

কিন্তু, ওতো শৃংখল-বন্দি নয়, বাসন পড়ার কন-বন্দ শব্দ।

এমন শব্দ, এমন স্বপ্ন, এমন অন্ধকার, এমন বিভীষিকাকে
কী করে ভেয়ার জীবনযাত্রা শুরু হ'ল।

সহীদে সূর্যে কোন সম্পর্ক নেই, সাহসালতা, পণ্ডপাণী, নদী
সমাপ্ত করে দিল।

নির্বর, চন্দ্র-সুখ, আকাশ-আলোক, গিরি-সমুদ্র,—মা-বাপ, ভাই-বোন,
বন্ধু-বান্ধব, সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন,—সর্বরিক্ত জীবন! সময়
আর কাটে না। বাড়ি নেই,—শুধু রক্ষীদের পাহারা বদলের শব্দ—
তাই থেকে সময় আদ্যাক্ত করে নিতে হয়। চিঠিলেখারও উপায়
নেই, চিঠি পাওয়ারও উপায় নেই।

দুনিয়ায় ক্রশ-সরকার ছাড়া আর কেউ জানে না কে কোন্ কবরে
সমাহিত।

একবার ভেয়ার মা গিয়ে কেঁদে পড়লেন এক কর্তার কাছে,
একটিবার বলুন, আমার মেয়ে কোথায় আছে? কেমন আছে?
একটা খবর বলুন তার।

কর্তা জবাব দিলেন, হাঁ, খবর তার পাবে। একেবারে শেষ
খবর, অশ্রুনাশ্রীর খবর।

কী পৈশাচিক আঘাত! মাতৃদেহের কী দারুণ অবমাননা!

দুশূলবার্গ জেলখানা। ও কে পাগলের মতো ছুটাছুটি
ক'রছে কুঠরীর ভিতর? কংকালদার দেহ, সর্বাঙ্গে যন্ত্রণার
চিহ্ন! অস্থির! উদ্গার! শাস্তিহারা!

কবি মিনাকভ! রাজকোষে আজ তার এই অবস্থা!

বন্দী করে প্রথম তাকে পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায়। মিনাকভ
সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আবার ধরা পড়ে। শেষটা এই জেলে
আসে। অর্থাৎ নিশ্চিত-মৃত্যুর কাছে এসে দাঁড়ায়।

এ অসহ্য! পংক-নিমগ্ন কাঠখণ্ডের মতো প'চতে প'চতে মরা।
আমি মামুদ, আমার মামুদেব মতো বাঁচতে দাও,—চিঠি লিখতে দাও,
প্রিয়পরিজনদের সংগে দেখা ক'রতে দাও, বই দাও, ধূমপান
করতে দাও।

নিফল দাবী। ক্রুদ্ধ হ'য়ে মিনাকভ অনশন শুরু ক'রলো।
কিন্তু পারলো না অনশন চালাতে। ক্ষুধায় নাতী পূর্বন্ত
হজম হচ্ছিল তার। নিরুপায়ের মতো সেই অনাদরের অন্ন
আবার গ্রহণ ক'রতে হ'ল তাকে।

তার পর বীরে বীরে দেখা দিয়েছে আজ উদ্গারের লক্ষণ।
খাবার আসে, ধায়—মুখে অরুচি, ভালো লাগে না। নিশ্চয় বিষ
মিশিয়ে দেয় ওরা। তাকে মারবে বলে।

মিনাকভ, ক্রিপ্ত হ'য়ে উঠলো। আজ—মাজ একটা কিছু করা
চাই তার।

ইঙ্গপেষ্টার এসে কুঠরীতে ঢুকছে—মিনাকভ সবলে মুঠাঘাত
ক'রলো তার মুখে।

এর শাস্তি হ'ল মৃত্যু। বন্দী, যদি কমা চাও।

কমা! মিনাকভ, গর্জে উঠলো, কমা চাইব? অত্যাচারিত
চাইবে অত্যাচারীর কাছে কমা? পদাঘাত করি, পদাঘাত করি,
ও কমা।

তবে মৃত্যু।

মিনাকভ, চূপ ক'রে দাঁড়ালো। মাঝে মাঝে চেসে
ওঠে হো-হো করে। বিষ খাইয়ে মারবে ভেবেছিলে
বাহু—

কথা শেষ হল না—এক সংগে অনেকগুলি এসে কবির জীবন-হুল

ভেরা খাবার খেতে বাচ্ছে, হঠাৎ হাত কেঁপে উঠলো, খালা পড়ে গেলো হাত থেকে।

ও কে, বুকফাটা ক্রন্দনে কারাকক্ষ ভরিয়ে তুলেছে? ওগো শিশুশাই, আর মেরো না, আর মেরো না। আমার খুন কর, খুন কর, আমি তা সহ্যে পারবো। আমার মেরো না।

কে ও? কেন ভাগ্যে ওর আজ এতো নির্ধাতন?

ওর নাম মিস্ট্রিন। সমস্ত জীবন কারাগারে নির্ধাতনে কাটিয়েছে ও। বালোই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ছাপাখানা ছিল একটা, তাতে বিপ্লব-পুস্তিকা ছাপানো হত। কাজেই পুলিশের ঘোষদুটি পড়লো। মিস্ট্রিন সেখান থেকে পালালো।

তার পর নির্ধাসিত নেতা শানিশেভস্কিকে গোপনে মুক্ত করবার ফলি করে পুলিশের ছদ্মবেশে ক্রেলখানার কর্তার কাছে একখানা চিঠি নিয়ে গেলো। শানিশেভস্কিকে এক সংগে পিটার্সবার্গে পাঠিয়ে দাও। জেলের কর্তার সন্দেহ হ'ল। ছু-জন সৈন্তের সংশ্লে গভর্ণরের কাছে যেতে বললো। মিস্ট্রিন দেখে, সর্বনাশ! ধরা পড়ে বুঝি। কিন্তু স্বাবড়লো না। পথে গুলী চালানো, একটা সৈন্ত মারা গেলো, আর একটা পালালো।

অনেক দিন পরে ১৯৩ বিচারে মিস্ট্রিন ধরা পড়লো। ১৯৩ জন বিপ্লবী একটা বিপ্লবাস্ত্রক বর্ণনা দেবে স্থির করে মিস্ট্রিনকে তাদের

মুখপাত্র করলো। মিস্ট্রিন অগ্নিগর্ভ ভাবার সে বিপ্লব বর্ণনা করে গেলো।

বিচারে হ'ল তার দশ বছর কারাদণ্ড। হ' বছর পরে মিস্ট্রিন জেল থেকে পালানো—ভ্রাদি ভোষ্টকের দিকে। সেখানে বাতারাতের কোন সুবিধা নেই, পাগলের মতো ছুটাছুটি করেও সে শখ পেলো না। কাজেই ধরা পড়লো।

এবার জেলে গিয়ে সবাইকে বিদ্রোহী করে কর্তাদের মেরে, জেল ভেঙে পালাতে উত্তেজিত করতে লাগলো।

তারপর এই শুলেশবার্গে কবরখানায়।

মিস্ট্রিন বিরক্ত হ'লে গেছে এই স্থগা জীবনে। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো! মৃত্যু চাই, মৃত্যু চাই...

একদিন দেখলো, জেল-ইন্সপেক্টর কয়েকীদের উপর অত্যাচার করছে। মিস্ট্রিন বাঘের মতো আড়ি পেতে বইলো। বেই ইন্সপেক্টরের তারহরে আসা, অর্নি দমাদম মার।

ইন্সপেক্টর ঐ তার পাটা জবাব দিচ্ছেন মিস্ট্রিনকে মেয়ে। মিস্ট্রিন চাঁৎকার করছে, আমি মৃত্যু চাই, আমার মৃত্যু দাও, মৃত্যু ভো জাচ্ছেই...

মিনাকভ যেখানটিতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে, ঠিক তিন মাস পরে সেইখানটিতে দাঁড়িয়ে মিস্ট্রিনও প্রাণ দিলো। মরবার মুখে চাঁৎকার করে বলে গেলো বন্দীদের উদ্দেশ্য করে,

ও-আর-সি-এল এর

কুমারেশ

নিজের ও পেটের পীড়ার

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড কমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

বহুশূণ্য। আমি পথ দেখিয়ে গেলাম, তোমরা একযোগে আমার মতো প্রতিবাদ কর, মরো যদি একসঙ্গেই সবাই মরবে।

এই তার শেষ বিদ্রোহী।

সেই অন্ধকার কবর দীপ্ত করে একদিন আলোয় বিভীষিকা জলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণ আত্মনাদ। এক হতভাগ্য বন্ধী আজ নিজের গায়ে আত্মনাদ দিয়ে টিকল মুক্তার কোলে ঢল পড়েছে।

নাম তার প্রোভেডিকি। আবালা বিপ্লব-ভক্ত, দেশসেবক। এই অপরাধে প্রথমতঃ হু হুবার জেল হয় তার। তারপর নির্ধারন। কর্তৃপক্ষের চোখে ধূলি দিয়ে জেল ভেঙে সে পালিয়ে আসে হাজরানীতে। বিপ্লবরসে বেগ দিয়ে বিক্ষোভ—বোমা, ডিনামাইট তৈরির কারখানা খোলে গোপনে।

একদিন ধরা পড়লো। বিচারে চল প্রাণদণ্ড। কেন জানি পেলো না, তা কহিয়ে করা চল বাবজীবন কয়েদ।

যাব যখন বন্ধী হয় কিছু বশ মানে না, গর্জন করে, প্রতিবাদ করে—সেও তাই শুক কলসো জেলে এসে।

কিন্তু প্রতিবাদ নিফল সঙ্গে আত্মীয় ত্যাগ করলো। আঠার দিন বার, তবু অলস অটল। কর্তৃপক্ষ গোলমালের ভয়ে তাকে খুঁয়ে অল্প একটা কুঠীতে নিয়ে গেলো।

সেখান থেকে মেজারদের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত তার পুলিশের কর্তারা কাছে এক চিঠি লিখলো। পুরানো আসামীর চিঠি লিখতে পারতো। কিন্তু এই অপরাধে তার কাগজ কালি কলম বন্ধ হয়ে গেলো—সে চিঠি তো বখাছনে পৌছোলই না।

কত আর সহ্য করা যায়। নাঃ, এবার কাজকে অপমান করা যাক। তা হলোই কোর্টমার্শাল হবে। তখন সব ব্যস্ত করা যাবে।

জেল-ডাক্তারকে সেদিন সে ভীষণভাবে আঘাত করলো। কিন্তু কোর্টমার্শাল হল না।

সে নাকি পাগল। হ্যাঁ, পাগলই বটে—তবে মুক্তার জন্য। এই মুতুপাগল বন্ধী তাই গায়ে কেরোসিন মাখিয়ে নিজের প্রাণ নিজের হাতে নিয়েছে।

লাল টুকটকে তাজা রক্ত। হুথ থেকে কেশে কেলছে আর ধীরে ধীরে পা বাড়ান্ছে ইমারেড। হুথ তার ঘনায়মান মুক্তার বেথা, চোখে তার অপূর্ণ হাসি। উদ্দাস। বন্দারোগী। বিদায়-পথের পথিক।

কাশির লব্ধ, বেন শূঙ্গর্ভ পাড়ে থেকে থেকে কে আঘাত করছে।

ভেরার মনে হ'ল, ও-লব্ধ বেন তার নিজের বুকও এসে লাগছে প্রবল বেগে। উঃ, ভাবতেও পারা যায় না, সেই বুক ইমারেড আজ এই নামনে পাকিয়ে তার।

হোট উঠান—শালা গোলাপের পাগড়ির মতো তুবার এসে ছেদে কেলছে—তার উপর রক্তের চাপ—কেউ তা পরিহার ক'রে দিচ্ছে না, বরক দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে না, এ বেন এক ভীষণবীরী মহাবীরা মহাবীরা—বক্তাগোলাপ হুপানো হুড়িয়ে জালিয়ে বাচ্ছে—এ কুলায়মান রক্ত বেন আর লাল হবে না, জেদনি হে বন্ধু, হে

বান্ধবি, আমিও চ'লেছি জিবিদার দিয়ে—আর কিরবো না, আর কিরবো না। বিজ্ঞান আমার কথতে পারবে না, জ্ঞান আমার রাখতে পারবে না, শক্তিসম্বিত কল-সরকার আমার রাখতে পারবে না।

বিদায় বন্ধু। বিদায় বান্ধবি। বিদায়। বিদায়।

ভেরা সভয়ে চোখ বুজলো। উঃ, কোন্‌দিকে চাটবে? যেদিকে চায় সেই দিকেই রক্ত। কেউ নেই ও রক্ত ঢেকে দেয় বরক দিয়ে?

আর ইমারেড? কে ওর বন্ধু আছে? ওকে এক কোঁটা বিধ দিয়ে লাও। ওর মুক্তার পথ সহজ হোক, ও ম'রে বাঁচুক।

ওঃ, কেউ নেই। কেউ নেই বিপ্লবীর বন্ধু।

অন্ধকার রাত—বিগ্রহর। কাতর আত্মনাদ, ক্ষণ বিদায় বাণী—তারপর—সব চূর্ণ। অভিশপ্ত বন্ধী সগ লভেছে তার মরণ-বঁধু। এই মুতু—এই নিধাতন চোখের উপর দেখে ভেরা। আর নিজেকেও প্রেরিত করে এই নিশ্চিত এবং নিঃস্বর্ণ জবিষ্যতের জন্ত। মারে মারে মায়ের জন্ত কীদে। এতোদিন অল্প কাজের ব্যস্ততার মাকে কাছে পেতেও পানি সে। আজ ভেরার সারা অন্তর ছুঁড় মা। অজান্তে চোখের জল পড়ে তার জন্ত।

কিন্তু অল্পতাপ নেই ভেরার হৃদয়ে। বা ক'রেছে সে ভালো ক'রেছে। এখন যদি মুক্তি পায়, আবার তাই করে। অল্পতাপ নেই।

আছে শুধু একটা শূন্যতা—মহাশূন্যতা। তা পূর্ণ করার মতো কিছু নেই এ কারা-জীবনে।

এমনি ক'রে হ'ব্বর কটলো। তার ব্যবহারে খুসি হ'য়ে কর্তারা তাকে একটা সুবিধা দিলেন। লুশমিলা তার পানের কুঠরীতেই থাকে—তার সঙ্গে বেড়াতে পারবে যেক। ভেরা সজিনী পেয়ে খুসি হ'ল। সোজ বেড়ার—কুঠরীর সামনেই ছোট উঠান—সেইখানে।

দিন করেক পরে লুশমিলা বললে, ভেরা, এই সঙ্গী নিয়ে বেড়াবার সুবিধাটা হু-চারজনকে দেওয়া হ'য়েছে, তা দেখেছ?

ধা।

বে সুবিধা আমাদের বন্ধুরা পাবে না, তা কি আমাদের ভোগ করা উচিত?

ককনো নয়। আমরা আজ প্রতিবাদ ক'রবো এর।

ইন্সপেক্টার এসে ভেরা বলতে গেলো, আমাদের বে সুবিধা দিচ্ছেন আমাদের বন্ধুদের—

বন্ধু। ইন্সপেক্টার দাঁত খিঁচিয়ে বললে, এখানে বন্ধু-টুকু নেই, খ নিজের কথা বলো।

না, আমি আমার বন্ধুদের কথাই বলবো।

কলতে পারবে না।

পারবো।

ইন্সপেক্টার রেগে চলে গেল।

ভেরা লুশমিলা হুজনেই বেড়ানো বন্ধ ক'রে দিল। সেও বহন কেউ বেড়ার না সঙ্গি-সঙ্গিনী নহ। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অলস অটল।

বিশদে পড়লে বুঝি বেদার। প্রাণদণ্ড তাই হ'ল।

যদি আপনি
জীবনযাত্রার মান
উঁচু করতে চান

—পড়ে দেখুন!



আজকাল ভানভাবে বাঁচার কত সুযোগ হয়েছে—তবু পুরণো সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে কত লোক সে সব সুযোগ নষ্ট করে।

চুটাতবরণ, আমাদের খাবার অভ্যাসের কথাই ধরুন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স গ্রেহপদার্থ খাওয়া ضرকার। বনস্পতির তেতর এই গ্রেহপদার্থ আমরা সহজেই পাই। তবুও বনস্পতি দিয়ে রান্না করতে এখনো অনেক লোকের সংস্কার বাধে। তারা মনে করে যে এই উত্ত্বিক্ত গ্রেহপদার্থ কেবল ভারতেই তৈরী হয়—কিন্তু মোটেই ভেবে দেখে না যে সারা পৃথিবীতেই স্বাস্থ্যবান লোকেরা বিশেষ প্রণালীতে তৈরী উত্ত্বিক্ত গ্রেহ দিয়ে রান্না করা পছন্দ করেন। এমন কি ডেনমার্ক, হল্যান্ড ও আমেরিকার মত পৃথিবীর মধ্যে নামকরা মাংসের দেশেও দুচ্ছজাত গ্রেহপদার্থের চেয়ে বনস্পতির

মত উত্ত্বিক্ত গ্রেহের ব্যবহারের চেষ্টা বেশী। কেন বললো? কারণ লোকে জেনেছে যে এই সব উত্ত্বিক্ত গ্রেহ দুচ্ছজাত গ্রেহপদার্থের মতই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং এতে খরচও কম।

পুরোপুরি পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী। কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত কারখানার বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়—যাতে আপনার কাছে তা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ ও বনীকৃত উপকারিতার আকারে পৌছয়। উপরন্তু, বনস্পতির প্রতি আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন স্বক ও চোখ ভাল রাখবার পক্ষে একান্ত অয়োজনীয়।

যে সব লোকের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু তাঁরা রান্নার জন্যে বিশুদ্ধ গ্রেহজাতীয় পদার্থ পছন্দ করেন—আপনারও বনস্পতি ব্যবহার স্বক করা উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিরীর বন্ধু

নিবৃত্ত রাত্রি। হঠাৎ শব্দ হচ্ছে, টক্-টক্, টক-টক্-টক্।

বকীরা ভবে, কে আবার পাগলামি করছে। বকীরা সচকিত হ'য়ে শোনে সেই শব্দ। শব্দেয় ভাবা ঠিক করে নিয়ে তারা এমনি করে কথা বলে একে অজ্ঞের মতো, একের প্রাণের ব্যথা অজ্ঞকে জানায়।

বকীরা একদিন কিন্তু বুঝলো বাপাশরটা। বুঝলো প্যাঁচারি লাগিয়ে মিল। কিন্তু তারই কীকে কীকে শব্দ ওঠে, টক্-টক্-টক্। বকীরা রাগে পাগলের মতো খুঁজে বেড়ায় দেয়ালে শব্দ করে কে? খোঁজ পায় না।

একদিন ভেরা প্রান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়েছে, হঠাৎ শব্দ শুক হ'ল।

শব্দেয় ভাবায় কথা! ভেরা, জেগে আছে?

হাঁ।

আমি পোপোভ, ঘুম আসছে না।

না, ঘুমোও, বকীরা একুনি খেয়ে আসবে।

আত্মক। তবু তোমার সঙ্গে কথা বলবার লোভ ছাড়তে পারবে না।

তার পর শব্দ বন্ধ।

হঠাৎ পোপোভকে আসতে দেখে ভেরা শব্দ করে জিজ্ঞেস করলো পোপোভ!

উত্তর নেই।

তার পরেই ইন্সপেক্টরের ক্রুদ্ধ গর্জন,—শরতান, তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে রাখবে যেখানে কোনো জীবিত প্রাণী তোমার সাড়া পাবে না। তার পরেই নির্মম প্রহার। মারতে মারতে পোপোভকে পিউনিটিভ সেলে নিয়ে গেলো।

পোপোভের গায়ের প্রত্যেকটি আঘাত ভেরার বুকে এসে বাজলো একশো গুণ হয়ে। ওরা পশু, সবাই মিলে পোপোভকে মেরে ফেলবে। আমিও যাবো পিউনিটিভ সেলে। পোপোভকে একা থাকতে দেবো না।

ভেরা দোরে যা দিতে লাগলো।

একজন বকী এসে বললে, দোরে যা দিচ্ছ কেন? কি চাও?

ইন্সপেক্টরকে।

বকী ইন্সপেক্টরকে ডেকে নিয়ে এলো। দোরের ছোট জানালাটা খুলে বাইরে দাঁড়িয়েই ইন্সপেক্টর বড়া মূরে বললে, কি চাই তোমার?

আমারও পিউনিটিভ সেলে নিয়ে চলুন।

কেন?

কথা চুজনে বলেছি। একজনেরই শুধু শাস্তি হবে কেন?

বেশ! বেশ!

বকী এসে দোর খুলে ভেরাকে বের করে আনলো। ভেরাকে বের করা হ'ল দেখে সব বকী চাঁৎকার করে উঠলো, আমাদেরও নিয়ে বাও, আমাদেরও নিয়ে বাও। সমগ্র কক্ষের লোহার পরাশগুলি বন্-বন্ করে উঠলো—উত্তেজিত করে দীনের পলায়ন।

নিরর্থক সে বিক্ষোভ।

বকী একটা কুর, ড্যান্স, আসোহীন কক্ষে ভেরাকে এনে জড়ি দিয়ে চলে গেলো। শূন্য মেঝে, বিছানা নেই। বাথার নেই।

সমস্ত রাত অনাহার অনিদ্রায় কাটিলো।

পরদিন খাবার এলো—এক টুকরো পুরানো, শক্ত, কালো রুটি। বিছানা আলুও এলো না।

ঐ রুটির একটুখানি ভেঙে যুখে দিতেই বমি এলো। খাওয়া হ'ল না। বড় দুর্বল, না শুয়ে আর পায় বার না। পায়ের জুতো খুলে তাই শিয়রে দিয়ে সেই অনাবৃত মেঝের উপর শুয়ে রইলো সে। কতক্ষণ এরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলো, তা ঠিক ছিল না তার। হঠাৎ একটা শব্দ সে সচকিত হ'য়ে উঠলো।

ধস্-ধস্-ধস্। ভেরা কিগনার।

ভেরা উঠে বসলো। বুঝলো, পোপোভের ঝাঁপু এ। এখানে এসেও টেলিগ্রাফ চালিয়েছে সে। কিন্তু আর সাড়া নেই কেন?

কান পেতে শুনলো, বকীদের কোলাহল, প্রহারের শব্দ, শৃংখলের বন্-বন্। উঃ ওরা নিষ্ঠুরের মতো মারছে পোপোভকে!

ভেরা জোরে যা দিয়ে চাঁৎকার করতে লাগলো, থামো, থামো, তোমরা কি মাছুর নও? একেবারে মেরে ফেলতে চাও?

কিছুক্ষণ পরে গোলমাল থামলো। ভেরা শুয়ে পড়লো।

আবার শব্দ—ধস্-ধস্-ধস্—ভেরা কিগনার—ঐ পর্তুগীজ!

আবার সেই বকীদের কোলাহল, আবার সেই প্রহার, হতভাগ্য পোপোভ! কী তোমার বলার আছে, তা কিছুতেই ওরা তোমার বলতে দেবে না।

পোপোভ বেপরোয়া। মারো যতো খুসি। জীবনের শেষকণ পর্তুগীজ এ শব্দেয় ভাবায় কথা বলে বাবো।

ধস্-ধস্-ধস্, ভেরা কিগনার! আমার সর্বশরীরে ব্যথা কিন্তু মন আনন্দে ভরা। ভেরা কিগনার, তুমি খেয়েছ?

ভেরা উত্তর দিতে গেলো—কিন্তু তার আগেই বকীরা পোপোভের ঘরে ঢুকে পোপোভকে হড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগলো।

ভেরা দোরের কাছে গিয়ে আবার চাঁৎকার শুরু করে দিল, ইন্সপেক্টর! ইন্সপেক্টর! ওকে মেরো না, ওকে মেরো না, ও ম'রে যাবে। ইন্সপেক্টর ভেরার ঘরের কাছে গিয়ে বললেন, টোচ্ছ কেন তোমরা?

ওকে তোমরা আর মারতে পারবে না।

কে মারছে? ওকে বাঁধা দিচ্ছিল, ও বাঁধা দিচ্ছিল, তাই।

না, তোমরা ওকে মেরেছো, আবার মারবে, আমি জানি বেশ।

ভেরা এবার হতাশকণ্ঠে বললে, না, না, আর মেরো না ওকে। আমি ওকে বলবো ও আর শব্দ করবে না।

আচ্ছা। ইন্সপেক্টর চলে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে ভেরা শব্দ করলে ধস্-ধস্-ধস্। পোপোভ!

উত্তর নেই।

পোপোভ!

এবার কী শব্দ—ধস্-ধস্-ধস্—ভেরা কিগনার, আমার হাত-পা বাঁধা, ভালো করে শব্দ করতে পারছি না।

পোপোভ! শোনো! তোমার ওরা মারে, আমি সইতে পারি না। আর শব্দ করো না পোপোভ!

তা হয় না ভেরা কিগনার।

কেন পোপোভ?

তা হলো আমি পাবল হয়ে যাঁবো।

না, না, আমার অমরোহ তুমি রাখবে না গোপোত ?

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর উত্তর এলো—আচ্ছা ভেরা কিগনার, ভেরা কিগনার, ভেরা কিগনার !

তারপর যুদ্ধের মতো নিম্নকতা শুরু।

ভেরা আবার আছরের মতো এলিয়ে পড়লো নিম্নকতার কোলে। একদিন সেদিনও সে এমন রাস্তা হ'য়ে গুয়ে পড়ে আছে। অন্ধকার বায়নি ভালো ক'ঙ্গে—উষা উ'কি দিচ্ছে দূর থেকে সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে এক মধুর কণ্ঠ বীরে বীরে বেজে উঠছে। কী সুন্দর গান। কী শুভ মুহূর্ত !

কিছু কে গাইছে ?

এ পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে যে গান বাজে, তা তো ব্যথার গান, মরণের গান, বিদায়ের গান—স্বরহীন গান।

এ তো তা নয় ! এ যে বাস্তব গান। কে তুমি ভক্ত ? সমস্ত জগৎ টেলে দিয়ে আরাধ্যের উদ্দেশ্যে জগুণ করছো গানের অঞ্জলি। কে তুমি ?

এ তো পরিচিত, স্বর। বন্দীদেরই একজন। পাষাণ-কারার তীর শাসন তার কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে পারেনি।

ভেরা যুদ্ধ হয়ে শুনতে লাগলো।

দু' দিন পরে ভেরার ঘরের দোর খুলে গেলো। চলো, তোমার আগের ঘরে।

ভেরা ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে বসলো, না, আমি বাবো না।

কেন ?

আমার বন্ধুকে আগে নিয়ে চলো।

রক্ষী একটু হেসে বসলো, তাকে আগেই নেওয়া হ'য়েছে।

ভেরা আ আপত্তি করলো না।

বন্দিজীবনের পাঁচ বছর কেটে গেছে।

কর্তারা বাণ্ডুল-কে বাণ্ডিল শাসা কাগজ আর কালি এনে দিলেন বন্দীদের হাতে।

এগুলো লিখে দিলে আরো পাবে।

লিখে দিলে তার মানে লেখা পুলিশরা প'ড়বে। কি লেখা বার ? বেশ চমৎকার কোন কিছু। গল্প, কবিতা, উপহাস কি লিখলে ভালো হয়।

বন্দীদের ইতিমধ্যে একটি লাইব্রেরী তৈরি হ'য়েছিলো। ভেরা তারই হু-চাখানা কবিতার বই-এর বাজাবাজ লাইন খাভার তুলতে লাগলো। একদিন এক বন্ধু এক টুকরো কাগজ টেলে দিলে তাকে, ভেরা তুলে দেখে, লোপাটিন কবিতার ভাবায় জিজ্ঞেস করছে—

কোন সে অন্তত লগ্নে জানি না

পার হ'য়ে এলু কারার ঘার।

পাষাণ-প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরে

হুস্তির আলো বারবার।

কোন সে অন্তত তিথিতে জানি না

অগ্নিহু আমি ধরার'পর ?

কেন মাতা মোরে রাখিল বাঁচারে

হুগে সহিতে হুগের পর।

ভেরা বুঝলো, লেখক এ বন্দীরা, এ বন্দীরাই হুস্তির মনে

ক'রে নিরস্তর কই পাচ্ছে। কিন্তু সে তো এতে হুস্তিত নয়। পৃথিবীতে জ'য়েছে ব'লেও সে হুস্তিত নয়, বশিনী হ'য়েও তো তার হুগে নেই। ব্যথা সে বা সহিছে সে তো বেজারিত। তা বার্থের জন্ত নয়, দেশের জন্ত তাতে আনন্দ আছে, গানি নেই। হুস্তি আছে, অহুস্তাপ নেই। কাজেই ভেরা জবাবে লিখলো,—

হুস্তির লাগি জীবন সঁপিয়া

ধক্ত হ'য়েছি, ধক্ত ভাই !

আনন্দ বেদনা, আনন্দ হুস্তি,

মা ভৈ বদ্ধ, হুগে নাই।

বীরে বীরে—ওই আসে মহানিশা,

আনন্দ, তা ব'লে বদ্ধদল

কাণিবি কি ভয়ে মেঘের মতন ?

ফেলিবি কি শোকে অশ্রুজল ?

হুস্তি আসিছে মায়ের মতন

নিম্ব, ঐতল, সৌম্য কোল,

বীরে বীরে তার কোলে দাও ধরা

শোক ভোল ভাই, হুগে ভোল।

যে গান আমরা গেয়ে গেছ ভাই

নিরব কণ্ঠে জীবন-ময়।

পাষাণ-প্রাচীরে কে কবিবে তারে ?

মেঘে কে কবিবে সুবোধন ?

শুনিয়ে এ ডাক নব-বীরদল

হুস্তি জ্বায়ে যুদ্ধে ভাই !

বাঁপ দিয়ে তার। যে বন্দীদল,

আর সেদিনের বিষার গাই !

সবাই এ কবিতা প'ড়ে ব'ললো, হী, হী, এই ঠিক কথা।

কশের পূর্বাকাশে ঐকজি নবীন স্রব উঠছে। সেদিন প্রমাণ হয়ে, আমরা বুঝা লড়িনি, বুঝা মরিনি।

এর পর থেকে কবিতার ছড়াছড়ি। নেহাৎ যে গভয়র লোক সে-ও কবি হ'য়ে উঠছে কালি-কলমের দৌলতে।

ভেরা প্রায়ই মা-বোনকে উদ্দেশ্য ক'রে কবিতা লেখে।

আজ এক বন্দীর জগতিথি উৎসব। লোপাটিন, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলো,—

কবরখানায় বন্দী হ'লেও

শোন হে স্রাব্য ! বদ্ধ প্রিয় !

প্রেম আমাদের ঘিরে আছে তোমা,

সেই প্রেম আজি তুলিয়া নিয়ে।

নাহি মন্দির, নাহি দীপমালা,

আস্তায় কেহ কাছে তো নাই—

না থাকুক তাতে কিসের খেদনা ?

বদ্ধ মোরা তো র'য়েছি ভাই।

কে বলে বদ্ধ সবহারা তুমি

কে বলে গো তুমি রিক্ত দীন ?

বদ্ধ মোরা তো রয়েছি তোমার,

প্রেম তো রয়েছো অদ্বীন।

এমন করে পর-পরের ভাবের আদান-প্রদান চলে কবিতায়।
 দুর্ভিক্ষে,—পুলিশ-বিভাগের ডিরেক্টর,—এলো একদিন কারাগার
 পরিদর্শন করতে। লাইব্রেরিতে চুকেই দেখে, করাসী বিপ্লবের
 ইতিহাস। রেগেই আশুন। এসব এলা কোথেকে? এ রাখতে
 পারবে না।

বইখানা বাজেয়াপ্ত হল। শুধু ওখানি নয়, আরও বই।

বন্দীরা তো ক্ষেপে গেলো। এ অত্যাচারে প্রতিবাদ-কল্পে একটা
 কিছু করা চাই।

অনশন-ব্রত অবলম্বন করা বাক। এ নিয়ে মতভেদ হল।
 অধিকাংশ লোকের অমত। কিন্তু অল্পসংখ্যকরা রেগে বিকল্পমূলকে
 কাপুরুষ বলে অনশন শুরু করে দিলে। তারপর সবাই শুরু করলো
 —তিন-চায়জন বোগী আর দুর্বল বন্দী বাদে।

ভেরাও অনশন-ব্রত গ্রহণ করলো।

কিন্তু এই ব্রত কারুরই টিকলো না বেশী দিন। সবাই একযোগে
 অনশন ত্যাগ করলো বাধ্য হয়ে।

অবশ্য এর কিছুদিন পরেই গংগাট বলে একজন কর্মচারীর
 সহায়তায় আবার তারা অনেক বই পেলো পড়তে। শুধু বইপড়া নয়,
 জ্ঞান-বিজ্ঞান পাঠেরও সুবিধা পেলো অনেকে।

ভেরা ডাক্তারী, এবং সংগে সংগে বিজ্ঞান-শিক্ষায় মন দিলো।

কবিতা লেখাও চলেছে সংগে সংগে। একদিন একটা কাগজে
 সে লিখে রাখলো—

এলো বসন্ত উষ্ণ উজ্জল

আলোক-ধারায় নেয়ে,

চেয়ে আছে ধরা বৃষ্টির মতো

পাখী গুঞ্জে গান গেয়ে।

বন্ধু, আমারই হৃদয়ের কেন

হল না কো অবসান?

নির্মল-নীল সৌন্দর্য আকাশ

কেন করে বাধা দান?

বেদনা-আত্মীয় শ্রান্ত দিবস

আসে বায় অবিরাম,

এই যে রবির কনক-কিরণ

সুন্দর অভিহাস,

তারই তলে কেন শুধু আমি যান

রিক্ত আনন্দ-চোখ?

কারার আঁধারে কেন চুটে বাই

ভাগ্য করে এ আলোক?

লিখে চাপা দিয়ে অস্ত্র কাজে মন দিলো ভেরা। এ কবিতার
 কথা আর তার মনেই রইলো না।

অনেক দিন পরে দেখে কাগজের ওপার্শ্বে তার উত্তর।

ব্যথা বখন বড়ই বাজে বৃকে

উখলে বখন গুঞ্জে চোখের জল,

তখন বন্ধু ভ্রম হয়ে ভরে

এই কথাটা ভেরা অবিরল—

তোমার লাগি প্রীতির ভাঙ্গি হাতে

তোমারই পথ চাই অহঙ্কর

বলে আছে বন্ধু তোমার বতো,

বলে আছে প্রাণের প্রিয়জন।

আশার বাতি নিবিয়া না কো সুখি।

মরণ-নিশা আরও অনেক দূর—

এখনো যে আছে তোমার তরে

যৌবন আর প্রণয় স্রবধর।

কীভাবে কেন? এই আঁধারের বৃকে

এ দেখে সহি, জাগছে ঘুরে আসো,

হায়ার কারা মিলিয়ে গেলো কৈশে,

বন্ধু, আজ আশার বাতি জ্বলো।

তলার স্বাক্ষর—এই।

মিথায়লোভি লিখেছে তাহলে! ভেরার প্রাণ আনন্দে ভরে
 গেলো। এমন বন্ধু পেলে সে খুশি। কিন্তু বন্ধু, বুধা তোমার এ সাধনা।
 যৌবন, প্রণয়, আশা আর তার ভাগ্যে নেই। সে যে চিরবন্দিনী।
 একদিন কয়েক জনের মুক্তির খবর এলো। তাদের মধ্যে একজন
 লুদামিলা—ভেরার সঙ্গিনী।

বন্দীজীবনের সর্বপ্রিয়জন আজ চলেছে মুক্ত হ'য়ে। কিন্তু
 তা বেন আনন্দের না হয়ে হয়ে উঠলো একটা শোকের ব্যাপার।
 লুদামিলার কারা বেন কিছুতে থাকে না। ভেরা অনেক কষ্টে তাকে
 সাধনা দিয়ে বিদায় দিলো।

জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের শেষবার দেখতে দেখতে লুদামিলা মুক্ত
 জালোয় এসে পাড়ালো।

ভেরার জীবনে এমন দিন কি আসবে কখনো? সে যে
 বাবজীবনের জন্ত বন্দিনী।

ভেরা এখন চিঠি লিখতে পারে—হৃদয় অন্তর একখানা।
 চিঠি পায়ও আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু পড়া হয়ে গেলেই কতীয়া
 কেড়ে নেয়।

আজ তেরো বছর সম্পূর্ণ নীরব থাকার পর কী বলে শুরু করবে
 সে? বোনের একখানা চিঠি এল ১৬ পৃষ্ঠা।

ভেরা তা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললো।

কিন্তু চিঠি লিখতে ইচ্ছা হয় না তার। কী লিখবে? লেখার
 কী আছে? আত্মীয়-বন্ধনদের কাছ থেকে আজ বেন সে ঘুরে—
 বহু দূর সরে গেছে। দীর্ঘ তেরো বছর কেটেছে। আরো কাটিতে
 লাগলো। অধ্যয়ন, বাগানের কাজ, এ সবের মধ্য দিয়ে তার জীবন-
 প্রবাহ বয়ে চললো ধীরে ধীরে।

১৮ বছর। যৌবন-স্বর্ষ অন্তর্ধান। অলক্ষ্যে ছেড়ে আসছে
 জরার অহঙ্কার হারা। কারা-জীবনে বেন আর কোন কষ্ট নেই।
 অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে এ জীবনে। সেই শান্ত সমুদ্রে একদিন
 তরণে উঠলো।

পাঁচটা পর্বত বেড়িয়ে বে-বার কুঠরীতে এসে ঢুকছে।
 খানিক পরে ইনস্পেক্টরের সাড়া পাওয়া গেলো। প্রথমেই সে
 ভেরার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সংগে তার দু-তিনজন রক্ষী। দুখে
 ক্রোধের ভাব। বতপুর সত্বে পড়ার অমুদ্র কষ্টে ভেরাকে বলল,
 কর্তব্য-অধিকার বিকল্প দেখে রোদে নেহেন। আর জা
 চলবে না। প্রথম প্রথম কুঠরীতে বসে বসে রক্ত-হীন।

কর্তার এ আকস্মিক উত্তেজনার কারণ না বুঝতে পেরে ভেড়া বললে, কি হয়েছে? বিশৃংখলা কিসের? কই, আমাদের তো কোন অপরাধের কথা বলোনি এর আগে? হঠাৎ এ কথা বলার মানে কি?

ইন্সপেক্টর রোগে বললে, মানে আবার কি! কর্তার হুকুম।

এমন হুকুম হবার কারণ কি?

আর কিছু বলার হুকুম নেই।

জেলের বাইরে তা হলে কিছু হয়েছে নাকি?

জানি না।

তুমি তো কিছুই জানো না। এ হুকুম কোথেকে এসেছে জানো? রাজধানী থেকে? না, এখানকার কর্তাদের মর্জি?

এখানকার কর্তাদের হুকুম।

ইন্সপেক্টর বর থেকে চলে বাবার জন্ত পা বাড়ালো। ভেড়া বাগা দিয়ে বললে, শোনো, আমরা এ হুকুম মানতে পারি না।

কেন?

আমরা মাহুদ, কাঠের পুতুল নই। তোমরা আমাদের হাত-পা বেঁধে রেখেছো, নিঃশাস পৰ্বন্ত নিতে দাও না, আমরা কি করে মানবো তোমাদের নিয়ম?

না মনলে শাস্তি কি জানো?

হা, পিউনিটিভ সেল তো? আমরা বাবো। তাই থুলে রাখো তোমরা।

দরকার হলে রাখবো বই কি।

ইন্সপেক্টর অস্ত্র কুঠরীতে চলে গেলো। ক্রমে সবাই গুনলো এ হুকুম। সবার মনেই বিকোভ। এ এদের কারসাজি। উপরওয়ালাদের জানালে প্রতিবিধান হতে পারে। কিন্তু জানাবার উপায় কি?

আচ্ছা, একটা চিঠি লেখা যাক। এমন ভাবার রচনা করতে হবে যেন উপরওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভেড়া লিখলো,—

‘মা গো,

তোমার চিঠির জবাব দিতে বাচ্ছি, হঠাৎ একটা ভীষণ ব্যাপার ঘটলো জেলে। সব ওলট-পালট হয়ে গেলো। তুমি মজ্জী বা ডিরেক্টরকে এসে আমাদের তদন্ত করে যেতে অনুরোধ করো।

—তোমারই ভেড়া।’

এক বজু বললে, এ চিঠি তো ওরা পাঠাবে না ভেড়া!

সেখা বাক।

কয়েক মিনিট পরে ইন্সপেক্টর এসে হাজির। তোমার এ চিঠি বাবে না। নতুন চিঠি লেখো।

কেন? কেন বাবে না? নিশ্চয় বাবে। বাবে না বাবে তা

বাদের উপর চিঠি পরীক্ষা করার ভাব, তারা বুধবে।

প্রথমে আমরা দেখবো।

কি দেখবে?

তুমি নিজের কথাই লিখেছ কিনা। নিয়ম হচ্ছে তাই।

নিয়ম আমি খুব ভালো করে জানি। তোমরা চিঠি পাঠাও।

পারি না। আমি নিয়ম একে দেখাছি তোমার।

ইন্সপেক্টর একদা বই এসে পড়ে মোনালো নিয়ম।

‘ভেড়া চিৎকার করে বললে, পোজার বাক তোমাদের নিয়ম। চিঠি পাঠাতে হবে। উপরওয়ালারা বিচার করবে।

উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে না। আমি ভয়ভয়ে কথা কইছি। তুমিও ভয়ভয়া রক্ষা করে চলো।

ভয়ভা! তোমরা গলা টিপে মারবে, আর আমরা একই পোরে প্রতিবাদও করতে পারবো না তার? জা হবে অভয়ভা!

অনর্থক চিৎকার না করে আর একথানা চিঠি লেখো, পাঠাচ্ছি।

আর কোনো চিঠি লিখবো না।

তা হলে আর লিখতেও পাবে না কোন দিন। সেখার সুখিা খেড়ে নেওরা হবে।

কেন? আমি তো কোন অপরাধ করিনি?

কয়েক। তুমি হুকুম মানছো না।

কি হুকুম?

বলছি চিঠি লেখো।

ওঃ!

আর চিঠি লিখতে পাবে না কোনো দিন।

ভেড়া ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো বাগে। ইন্সপেক্টর ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো, কী করছো তুমি? তারপরে চলে গেলো।

ভেড়া ভাবলো, এইবার কর্তৃপক্ষের কানে যাবে। সত্যিই গেলো। জোর তদন্ত হল। ইন্সপেক্টর এক অজ্ঞাত অসেক কর্মচারী বদলি হল।

সঙ্গে সঙ্গে গুজব শোনা গেলো, রক্ষীরা তক্তা নিয়ে বাচ্ছো উঠানে। কীসিকার্ত তৈরি হচ্ছে বুধি।

কার জন্ত? নিশ্চয়ই ভেড়ার জন্ত। সবাই মনে মনে ভাবলো, এইবার ভেড়াকেও বিদায় নিতে হবে। ভেড়াও প্রতীকার রইলো মুঠার।

ঠা যে—সে কীসির মঞ্চে অস্ত্র একজনের কীসি হয়ে গেলো। ভেড়া মরবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে মরতে পারলো না। কিন্তু কোন শাস্তিই কি আসবে না? কর্তারা কিছুই বলবে না তাকে? এ কখনও সম্ভব?

একদিন জেলের কর্তা রক্ষিস্ত ভেড়ার কক্ষে ঢুকলেন।

ভেড়া প্রস্তুত হল,—এতোদিন পরে তাকলে শাস্তি দিতে এসেছে! কর্তা কিন্তু একটা কাগজ বের করে নিয়ে পড়তে লাগলেন—

‘মহামান্ন সম্রাট বন্দিবার মারের আবেদনামুহুরী অমুগ্রহপূর্বক তার কস্তা ভেড়া ফিগনারকে ব্যবস্জীবন কারাদণ্ড কমিয়ে কুড়ি বছর করলেন। তদমুহুরী তার মুক্তি হবে ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ সাল।’

কর্তা চলে গেলো। ভেড়ার কানে কে যেন তরল বক্ষিয়ারা ঢেলে গিলে! কেবল বুঝে ফিরে বাজতে থাক মনে—মায়ের আবেদনামুহুরী—হায় মা! এ কী করেছ তুমি? কস্তার হুখ বুঝ করতে গিয়ে তার জীবনে অপরাধের কালিমা লেপন করে দিয়েছ? একদিন কারাবাসী মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে না মায়ের জন্ত কোন অমুগ্রহ/ভঙ্কা চাইবে না ক্শ সনকারের কাছে? সে প্রতিজ্ঞা তুমি ভংগ করলে? এ হুখ বাখবার মে ঠাই নেই মা! ভেড়া মনে মনে মায়ের উপর বিরক্ত হল।

তারপর একদিন খবর এলো, মা নেই। রেহমরী কস্তাকে আশীর্বাদ করতে করতে বিদায় নিয়েছেন।

ভোরের জীবন এক পলকে ঝুঁপ চলে গেলো—মনস্ত শূন্য।
না নেই। সব শেষ, আজ সব শেষ। সব আশা-আকাংক্ষা
আজ লম্বাি রাতের সংগে-সংগে।

যুক্তির দিন। ২১শে সেপ্টেম্বর, ৪টা। ভেঁরা অন্ধ কবর থেকে
সন্ধ্যার কাছে চোখের জলে বিষার নিয়ে, চললো যুক্তির পথে।
ভার পা কীপছে। সেহাল বেন ক্রমাগত ঘুরে স'রে বাচ্ছে, বাটরের
মুক্ত আলোর বেহুতে বেন ভর হচ্ছে ভার। কী প্রথর, কী আশ্চর্য,
কী দুচন এই আলো। ভেঁরা এই প্রথম কৈসে ফেললো জীবনে,—
আমি চলতে পারছি না। সেহাল সরে বাচ্ছে।

মুক্ত! বাগার উপক্রম। বন্ধুরা ধরে ফেললো। হঠাৎ মুক্ত
হাওয়ার এসে পড়ার দরুণ এ বকমটা হ'য়েছে।

ভেঁরা মুহূর্তে আবার চলতে লাগলো। এই লোহার বাঁচা,
এই অন্ধকার, এই জাহাঙ্গির,—এ সব বড় প্রিয় ছিল তার। এ ভেঁড়ে
কোথায় বাচ্ছে সে? আগর মুক্ত-জীবনের কথা ভাবতে বেন ভর
হ'তে লাগলো তার।

জা পাম কবরেন ভেঁরা কিগনার?

না, বজবাজ!

ভেঁরা কিগনার। ভেঁরা কিগনারই বটে। কিছু দীর্ঘ কুড়ি বছর
এ রাম কার তো মনে পড়েনি তোমাদের? তোমাদের চোখে আমি
ছিলুম, ১১ বছর। আর আজ? ভেঁরা কিগনার! চাই না
আমি চা তোমাদের। তোমাদের ছায়া মাড়ানো পাপ।

বহু বন্দিগত ভেঁরাকে সে জেল থেকে বের করে রাজধানীতে 'সেই
পিটারি এণ্ড পল' জেলে আনা হল।

জাই-বোনেব সঙ্গে সাক্ষাৎ। দেখা করা হবে এসে ব'সেছিল
ভার। ভেঁরা এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। কার মুখে কোন
কথা নেই, সবাই নীরবে চেয়ে আছে পরস্পরের দিকে।

এই ভাট, এই বোন, কুড়ি বছর আগে বহন সে বিহার দিয়েছিল
এদের কাছ থেকে, তখন এরা কত ছোট, কত অল্প, কত দুদর
ছিল।

আর আজ?—সে বুক নেই, সে বাসিকা নেই, সে পোন্দর
নেই। সব ভাই বোন আজ পূর্ণবয়স্ক। হরকো ভেঁরাকে জেলে
গেছে অনেকে। আজ বেন অপরিচিতদের সামনে দাঁড়িয়ে
আছে সে।

ভেঁরা নীরবে চেয়ে রইলো।

কী গভীর, ভাবামণ্ড-আবেগময়নর সে দৃষ্টি! তার প্রাণের সমস্ত
আশীর্বাদ বেন সে উজাড় করে দিল এই দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তার
ভাইবোনদের মাথা উপর।

টাইম হ'য়ে গেছে।

বেমন এসেছিল, তেমন উঠে চলে গেলো ভেঁরা—নীরবে শুক
চোখে।

তার পর রুশ-সরকার একদিন তাকে চালান দিলো সাইবেরিয়ার
নির্বাসনে। লোকালয় থেকে ঘুরে, বহুঘুরে। ভেঁরা কিগনার নীরবে
বিহার নিলো।

সেদিনও কেউ তার চোখে এক বিন্দু অন্ধ দেখতে
পেলো না।

সাইবেরিয়ার লম্বা বছর নির্বাসিতের জীবন কাটিয়ে ভেঁরা কিগনার
সোভিয়েট যুগে মুক্তিলাভ করেন।

যুক্তির পরে সোভিয়েট রাশিয়ার নিযুক্ত পল্লী-নিকুজে ভেঁরা
কিগনার তার শেষ জীবন অতিবাহিত করেছেন। এখানে তিনি
তার আত্মজীবনী রচনা ক'রেছেন।

কয়েক বছর আগে এর মৃত্যু হ'য়েছে।

সমাপ্ত

অনুব্রব

অধীর সরকার

বে-অজ্ঞাতে কারার বান জাকে
সে-বানের জলে সারা দিন নিজে নিজে
কী মধুর সুখে আনমনে খেলা কর
খেলা কর তুমি কারার জলে ভিকে।

বে-অজ্ঞান সারা রাত আমি কাঁদি
বে-অজ্ঞানে পুড়ে ছলি সারা নিশিদিন,
সে-অজ্ঞান আগুনে দেখেছি তুমি
কেমনে বাঁজাও তোমার প্রাণের বীণ।

হৃৎস্পন্দে তব চোখে জল আসেনাক'
আনন্দে দেখি হওনিক' উত্তরোল;
বেদনার তুমি শুধু নীরব থাক
প্রশ্নেও কি তবে আগায়ে না বজ্রাণ।



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিন্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটা কত সুখী, কত সুস্থ! কারণ ওর মেরুময়ী মা ওকে নিয়মিত অষ্টারমিক খাওয়ান। অষ্টারমিক বিশুদ্ধ দুধজাত খাদ্য। এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিক তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিক পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সবরকম তথ্যসম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নম্বর পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়—“অষ্টারমিক”, P. O. Box No. 2257, কোলকাতা-১।

...মায়ের দুধেরই মতন

কারের শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। হৃদয়-মেহগর্ভের জন্য চার পাঁচ মাস বয়স থেকেই দুধের সঙ্গে কারের খাওয়ানও প্রয়োজন। কারের পুষ্টিকর খাবারজাত খাদ্য-স্বাস্থ্য করতে হয়না—শুধু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চাষতে করে খাওয়ান।



বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

দিন হতে দিন এক রবিবারে বাগানের কাছে লেগেছে
—সন্ধ্যা। রবিবারে হাসপাতালে তার সকালে ডিউটি নেই, তাই
এই বিশ্রামের দিনে বিশেষ ভাবে দেখা-শোনা করে।

কাল থেকেই আকাশে জমেছে ঘন কালো মেঘের খুঁপ। হ
হ করে হঠাৎ জোলা বাতাস। গুরু গুরু মেঘগলানে বেন কার
চাপা বোঝাচ্ছিল শুয়ে উঠেছে,—আর তার সঙ্গে ঝিকঝিকি
ঝিকলীর তরুরেখার চমকে উঠেছে তার হুটল ক্রুটি। বড় বড়
কোঁটার চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামলো।

তার বৃষ্টিচাপা ধীরে ধীরে চাতাকার করে উঠলো—খুবালী বাতাস।
কোন বেলুনায়ের অশান্ত কন্দনগুলো মুগ্ধিত হয়ে উঠলো ধরণীর
বিলম্বিত? হঠাৎ চিন্তে হাতের খুঁপীটা ফেল বাগান ছেড়ে
জান্না চলে এলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরের বারান্দায়।

তার তারি গলার আগুনকে থমকে পাঁড়লো মায়ের ঘরের
হরোকার সামনে। একটু মুখটা বাড়িয়ে দেখলো, চেয়ারে
শোঁধ দিয়ে বসে আছে অসীম।

তারি আকর্ষণ? ওয় দেড় বছর সে কিরে এসেছে।
একদিনও তো আসেনি কাকা। হঠাৎ আজ? ঘরের ভেতরে পা
বাড়তে গিয়ে থমকে পাঁড়লো শ্রুমা অসীমের কথা শুনে।

—চমৎকার। চমৎকার বৌদি। মারে-ব্যাটার মতলব করেছে
কল-কলসেই। এখনও বোলাতে চাও, মিঠা ছেলোটাকে ডাউনিং থেকে
কুড়িয়ে তোমার বাড়ি চাপিয়ে গেছে?

—হিঃ! হিঃ! বাড়ি চাপিয়েছে, বসিন্তো আমি ঠাকুরপো।
ব্যক্তি কঠে বললেন য়ুনা দেবী—সেদিন এখানে আসবার পথে
হাতের ছেলোটাকে কুড়িয়ে পেয়ে মিঠা সোজা এখানেই এনেছিলো,
সে ছেলে মাম্বব করতে শেখেনিতো, তাই আমাকে দিয়ে গেছে
একটু বড় করে সেবার জন্তে। এতে বিরক্ত হচ্ছ কেন ভাই? কি
জংকার দেখতে বাচ্চাটা দেখানো? একটু শক্ত-সামোখ করে
তোমাদের জিনিষ, তোমাদেরই দিয়ে দেব। সোনার টান ছেলে,
তোমাকে বাবা বলে ডাকবে—পাঁচ ছ'বছর বিয়ে হয়েছে একটাও
তো হলো না মিত্তর। এই থোকনই যা বলে ডাকবে ওকে।

—থাক্। থাক্ চের হয়েছে, থেকিয়ে উঠলো অসীম। বুঝলে
বৌদি, অসীম হালদার কচি থোকাটি নয় যে তাকে আমড়া দেখিয়ে
লুটাকা আন বলবে। বাবা আমাকে বোলাবে কেন তোমার নাতি?
বাগ বোলাবে ঐ রাফেল শ্রুশমটাকে।

কলো তো একবার, ভেতর ভেতর তলে তলে মিত্তর কাছে
কত দিন আনাসোণা করছে শরতানটা, ওঃ! এবারে বুঝেছি মিঠা
মিনবাত আর ঘরের কোণে শুয়ে বসে থাকতো কেন? আর
শেখলি হা হাত থাকতে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছিলো।

কি জন্তে! কোন পাটকে ঠিক করেছিলো! কুড়ি বা কলসের
ধর আমি ঠিকই পাবো বুকেহো! তবে তোমার যেসেই তো
ডাক্তার, বাইরের লোক ডেকে জানাতামিটা বোধ হয় কত লাগনি
মনে হচ্ছে। বুজোমিতে তুমি স্বয়ং মহাভারতের লুকনি নামাকেও
হায় নামাতে পারো, এ সাটিকিকেট তোমার দেওয়া বার বৌদি।

—চূপ করো, চূপ করো ঠাকুরপো! কলো উঠলে উঠে বহুনা
সেবীর কঠুধর—অমন মিথো রাধুণার মনকে তেতো কোবানো।
হা সত্যি তাই বলেছি তোমার। হা তুমি ভেবেছো মহাভুল,
মহাপাপ, মহামিথো।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। অসীমের বিরূপপূর্ণ উল্লেখ
হাসিতে থরথরিয়ে কঁপে উঠলো। মুগ্ধ শিঙটি। কচিয়ে কঁপে
উঠলো বিহ্বানায়।

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে, বিহ্বান থেকে থোকাকে তুল দিয়ে
বুকে ফেললো শ্রুশম। আঙে আঙে পিঠি চাপড়ে ওকে লাড়
করলো। তারপর মায়ের কোলে ওকে মামিয়ে দিয়ে কাকার
সামনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ধীর-গম্ভীর হয়ে বললো
—আপনি আমার কাকা। শিক্ততুল্য। কোনোদিন আপনার
কাজের বা কথাই প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু আজ আপনিই
তা করতে আমার বাধা করিয়েছেন। ইতর ভাবার আমার
মাকে যথেষ্ট অপমান করেছেন, আর একটি বর্ণও উচ্চারণ না
করে আপনি চলে যান। হা সত্যি তাই বলেছেন আমার মা।
বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা।

—চমৎকার। মুখ বিকৃত করে জবাব দিলো অসীম, একেবারে
হুঁপিত্তর বৃষ্টিটির। সত্যিকথার মহাজন। হারামজানো,
বইমান। আমার খন্তরকে ঠকিয়ে বাড়ী আদার করেছিস, আমার
লম্পান্তিতে জবরদস্তি করে ভাগ বাসিয়ে, সেই বাড়ীতে বাস করে
আমারই সর্বনাশের কলি আঁটছো। মিনবাতের মারে-ব্যাটার?
আবার একটা ভাগীলারকেও খাড়া করেছিস খুদ কুড়ো হা
আছে তা মথল করবার জন্তে?—হু' হাত মুষ্টিবদ্ধ করে পাঁড়িয়ে
কছ আক্রোশে ফুলতে লাগলো অসীম।

ঘন ঘন বিদ্যুৎশিখা আকাশের বুক চিরে বিলবিলিয়ে চলে
উঠলো। বজ্রহুকারে থরথর করে কঁপে উঠলো বিশ্বচরাচর।
কামানের গোলা বেন পর পর দুটো ছিটকে পড়লো মহাপুত্রের
গহ্বর থেকে।

দ্বি বৃষ্টিতে চেয়ে বুকব ওপর আড়াআড়ি হাত বদ্ধ করে
পাঁড়িয়েছিলো শ্রুশম। অমন কুৎসিত ভাবার প্রাত্যন্তর মুখে তার
জোপাচ্ছে না আর।

ওর মুখের ওপর হলুদ দুটিপাত করে কীত বন্ধে পাঁড়িয়েছিলো
অসীম ক্রুখাণ্ড নেকড়ে বাঘের মতো। অরোণ শেলই বৃষ্টি
খাঁপিয়ে পড়ে বাড়ের বন্ধ চুবে খাবে।

—হো, হো, হো, হো। কার প্রমত্ত হাসির থাক্তা থেয়ে চমকে
উঠলো ওরা দুজন।

মরোকার সামনে ভিজে লপসে হয়ে পাঁড়িয়ে হাসছে অনিল।
ওর সর্বকণ দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে পড়িয়ে বাচ্ছে মেঘের ওপর।
বেন বাইরের বৃষ্টিকে ঘরে ডেকে এনেছে ও।

—এক বৌদি, পাইলিগার, হারামজান। ঐ একবার এনেছো।

দুসে অসীম হই। হাঁ। হাঁ। হাসির আশ্রয় একেবারে উঠে ওর দেহটা—মিতার ক্রমে, বাসু, আর ওর কোনো পরিচয় নেই। এবার বলে মরে। শুধু আভন বাসিরেছে। এতদিন, এবারে নিয়ে আসে-পড়ে মরে।

কৃত সাপের উত্তর করার বেন স্বরূপ সাপুড়ে বিবাহের লেখক হোঁরাগে। হুৎ-হুৎ পরিচয়ের হোঁপ লাগিরে ওর কাছে এগিরে এসে বলসো—হুহি দেখছি একেবারে জাত অভিন্নতা। ঠিক ঠিক জায়গার কুটীকোঁঠ হয়ে আবির্ভাব তোমার, চমক লাগার স্বরূপের মনে। এ বড় কম সজ্জির পরিচয় নয় কে।

—কতজন এসেছেন? বলসো দুদাম। ভীষণ ভিজে গেছেন যে। হেঁকে কেলুন তিরে কাপড়-জামা। আমি আনছি—আমার কাপড়।

—আরে গাড়াও, গাড়াও। অত ব্যস্ত কেন? কাল মিতার জাবি হন খাওয়া লাগছিলো খোকার জন্তে, ওই সকালেই ঘেরিয়েছিলাম ওর খবর নিতে। বাস থেকে নেমে এইটুকু পথ আসতে আসতে ভিজে গেলাম।

—বা, কি বলছিলে অসীম? অভিনেতা? তুল চল বড়। অভিনেতা নয়, ওরা। সাপের গন্ধ পেলেই যে ওখানে মেড়েতে হয়। তা মিতার খোকাটিকে কেনম দেখলে, বলো?

—দেখলাম মানে? চোখ পিট পিট করে জবাব দিলো অসীম—নিরে বাগে। মিতার খোকা এখানে মাছ হলে কোন্ চুখে? তার বাড়ী-ঘর নেই, না আমার পরমা নেই আরা, রাখবার। দাও বোঁহি ওকে আমার কোলে—বাইরে গাড়ী আছে, নিয়ে যাও। বতটা যত্ন ডাবছে আমায়, ততটা নই, ছবর নামক পদার্থটা আমারও আছে।

—সত্যি নিয়ে বাবে ঠাকুরপো? আ, বাঁচলুম। তোমাদের জিনিষ তোমাদের কাছেই বাবে বৈ কি। আঁচলে চোখ মুকে উঠে গাড়িরে ধলসেন বহুনা দেবী—সেই লম্বা, খোকার জিনিষগুলো গাড়ীতে ফুলে—বড়ী বাবে আলোক বাবু।

আকর্ষণ হরেছিলো অনিলও খুব। অবাক হয়ে দেখছিলো হঠাৎ বলসে-বাগেরা মাছবটার সুখখানা এখন কি শান্ত, কোমল। চোখে-হুৎ ঘেঁষসিক হাসি। খুশি হয়ে বলসো সে দুদামকে—দাও তো একখানা হুতি আর তোয়ালে চট করে? খোকন বাবুর জিনিষপত্তর আমিই ফুলে হিচ্ছি গাড়ীতে।

হির দৃষ্টি মেলে দেখেচো দুদাম অসীমের সুখখানা। বেন কোন অনিশ্চিত রকম পাঠ করলো ওর চোখ চুটেতে। তার পর বলসো—আজ খোকা বাবে না যা। বাব গচ্ছিত জিনিষ তুমি হাত পেতে নিয়েছো, ফুলে দিও তারই হাতে।

—বেশ, বেশ, তাই হবে। মিতাই আসবে ওকে নিতে। আছ! আজ চলি। মশ মশ করে জুতো বাজিয়ে নিচে নেমে গেলো অসীম।

পরদিনই বিকেলে এলো সুমিতা অসীমের গাড়ীতে, সঙ্গে ওর একজন নেপালী আরা।

—খোকনকে নিতে এলাম কাকীমা। বহুনা দেবীর গলা ভাড়িরে করে হাঙ্গিরুখে বলসো সুমিতা, জানেন? কাকীমা, আপনার দেওরের বড় ভালো মেয়েছে ওকে—তিনিই আরা ঠিক করে আমাকে খোর ভাত-পানির দিলেন, খোকনকে নিয়ে বাবুর করে।

—বেশ তো। ভেলেপলে চরনি, টেকেও জো করে। তবে আমার ভাবি ভয় হয়েছিলো ততটা কত বাগাবাসি করবে ঠাকুরপো, ওকে বহন কুই নিয়ে বাবার কথা বলবি। তা ও নিজেই বহন নিয়ে যেতে চাইতে, মনে হয় পত্নকুলের মত ভেলেটার ওপর ওর দীর্ঘা পাড়েছে। ভালোই হবে যে মিতা। এই বকম মেত-বন্দিতা করে ভাগলে মাছবের কুক ডাব চলে গিরে মন খুব কোমল হয়। ঠাকুরপোরও তাই হবে।

পত কালের ভয়ত ইতিপূর্ণ অসীমের কথাবার্তাগুলো ক্রমে গেলেন বহুনা দেবী সুমিতার কাছে। আছ! বেচারী, তখনও কাকীমাত পায়ে দান।

আলোককে কোলে নিয়ে খুশি উপচে-পড়া কর্তে বলসো সুমিতা—এই ক'টা দিনেই কত বড় চরে গেছে খোকন, কারো সুখের হুতুহু। ওকে নিয়ে গেলে আপনার মনটা খুব খাখা লাগবে না কাকীমা?

—তা একটা লাগাব বৈ কি? অনেক কাল বাবে ওকে পেয়েছিলাম কি না। শুধু আমার কেন বহুকণ বাড়ী থাকে তোমার লম্বাটা, ওকে নিয়েই থাকে। একটা বিয়ে-খাও যদি করতো, কচি-কচা হয়ে আসতো হু-একটা। কিন্তু তা আর হতো কই?

—কেন হবে না কাকীমা! খুব ভালো দেখে একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিন না লম্বাটা। আপনাকেও দেখাশোনা করতে পারবে বউ এসে।

—চোঁ কি করিনি যে। করেছিলাম কিন্তু ফল চরনি। বিবাহ কর্তে জবাব দিলেন দুদাম-জমনী। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলসেন, একটু বসবি তো। লম্বা এখনও জেবনি, কিরতে এখনও বস্তুখানেক দেবী আছে। রাতে একেবারে খেয়েই বাবি—তবে ঠাকুরপো আবার রাগ করবে না তো।

—না, না কাকীমা। মেজাজ এখন খুব ভালো আছে, আমি রাতে খেয়েই বাবো।

বহুনা দেবী গেলেন রাগাবার। খোকনকে আবার কোলে গিরে কোমরে কাপড় ভাড়িরে মেখলা দিনের কলাগী ছলে চুটে নেমে গেলো বাগানের দিকে সুমিতা।

খুঁখুস্বের রঙিন আলো ঝিল মিল করছে ফুলে ফুলে, পাতায়, পাতায়। বিরহিরে হাওয়ায় ফুলে ফুলে ফুলে ভরা লতাগুলো বেন হাতছানি গিরে ডাকছে ওকে।

খুঁই, চামেলী লতার বাড়ে কে বেন বুটো বুটো শালা খেঁচিটেরে গিরেছে। ওর সঙ্গে মিতালী কবেছে বেগুনি রং বাগানভেলিয়া। ওরা চাইতে হু জন, হু জনকে। ব্যাকুল বাহ ওদের দুটিক থেকে বাঁপিরে পড়ছে পরস্পরকে পাঁচার জন্তে। কিন্তু নাগাল পায় না কেউ কারো। স্বর বুর করে ঘরে পড়ছে ওরা বার্থ বেদনা বুরে নিয়ে। হুৎ হুৎ মেলে ওদের পানে কিছুকণ গাড়িরে রইলো সুমিতা। অতশ্র ফুলের রাশ বিছিরে রয়েছে ওর পায়ের কাছে। এক বুটো খুঁই ফুলে নিলে হাতে। করে গেছে তবুও অপূর্ণ স্বরভিটুকু উজাড় করে গিরে বাছে বিদায়বেলায়।

কত নয়ম, কত দুঃ, কি অস্বাস্থ্য এই ফুলগুলো, কিন্তু কি মহানুভবতা ভরা এই ছোট জীবনটুকু। কবিকের জীবন, তবুও জো বার্থ নয়।

আমি, আমিও যদি পায়তায় ওদের মতো নিজেকে উজাড়

করে দিতে কোনো যত্ন করছে। আমার এই ক্লম কলঙ্ক
কিন্তু যদি এই ক্লমের মতোই পারতো তখনকে কিছু দিয়ে বেতে।
অজলিভা ক্লমের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে সুমিতা।

একপা, একপা, করে ধীর পায়ে গাঁড়ালো গিয়ে গোলাপ গাছের
পাশে। বন্ধ-লাল-গাউ-গাউ গোলাপ কুড়ির পাশেই,—কুড়ত গোলাপ
ক্লমের রূপ, গড়ে বলমূল করছে। আর ঠিক তারি পাশে বরা
গোলাপ হুঁতিনটি। বর, বর, করে হাতয়ার দোলা লেগে করে
পড়ছে ওদের পাণ্ডিত্যলো। প্রতিটি বাসে বাসে ওরা ট্রেলে বিচ্ছে
হুত্ব বন্ধ বাতাসে।

এই তো জীবন। কণিকের চাওয়া-পাওয়াটাই সত্যি নয়;
ক্লমের রূপের সভা জনকল্যাণে, বিশ্ববন্ধে নিজেকে আহতি দেওয়া।
হিতের হয়ে গেছে সত্যতা কোন এক মতাতায়ে। ক্লম পড়ির
ক্লম বেন সে আর বন্ধ সেই। অনন্ত মহাকাশে ছড়িয়ে গেছে
তার ক্লম জীবনের সত্যটুকু। হু-হু করে বঠে বন্ধনটান উভার
চাঁচলি ভর সমস্ত মনটা বেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে এই মহাবায়ু।

মহাজীবনের মাঝে বেন ঘটেছে তার আত্মবিলোপ। তাই
কল্যাণে, বাতাসে, কলে কুলে, অনন্ত সৃষ্টির মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে
সে। একাকার হয়ে গেছে সবায় সঙ্গে, আলো লাভিছুট নয়, একটি
প্রাণের হৃদয়ের বেন অনন্ত বিশ্বচরাচর গাঁথা রয়েছে। সেই
মহাসত্যের প্রত্যক্ষ অতীতটি পাওয়াই বোধ হয় চরম পাওয়া।

নিজের কর্তব্য কথ্য সমাধা করে কখন চলে গেছেন হৃদ্যসেব।
সম্ভার রান আঁধার চুপি চুপি এসে ছেয়ে কেলেতে ছোট বাগানটিকে।
সিনের আলোর শেষ হাসিটুকু এখনও ব্রহ্মে বায়নি আকাশপট
থেকে। শিমূলগাছের ঘন পল্লবের ভাঁজে-ভাঁজে ঘরে-ঘেরা
পাখীদের আনন্দ-কাকলী ধ্বনিত হচ্ছে। একটা কাঠবেড়ালী সর-সর
করে সুমিতার পায়ের ওপর লাফিয়ে ছুটে চলে গেলো পাঁচিলের
তপালে।

চমকে উঠে চারিদিকে চাইলো সুমিতা। একটু দূরে টাণা
পাহাড়ের সোলান দিগে গাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভ।

—বঃ। কতকাল গাঁড়িয়ে আছো দামীনা? আমার ভাকোনি
কেন? ওর সামনে এগিয়ে এসে হৃৎকণ্ঠে বললো সুমিতা।

—অনেককাল এসেছি মিতা। তুমি যে অজলিভা ক্লম নিয়ে
ক্যানকর ছিলে, তাই ডাকিনি তোমার। কোন সেবতার আরাধনা
করছিলে মিতা?

তুমিও দামীনা? আমার আলোকের মতো শত শত
শিকতপবানের পূজা করছিলার আমি মনে-মনে। আমি বেন
সেবছিলাম,—এ লালকুটির প্রকাণ্ড মরোজা-লানলাঙলো সব
ক্লম পেছে। গাছে গাছে কুল কুটেছে, পাখী ডাকছে। আর ঘরে
বাক্সের, বাগানে খেলা করছে ক্লমের মত কচি কচি ছেলে-মেয়ের
কল। আর আমি ওদের সেবার ভেতর দিয়ে পূজা করছি সেই
বিশ্ববৈভবতার।

—চমকান। এ কি অপূর্ণ সাধারণ ভুল তোমার মনে ভেগেছে
মিতা? পারবে, তুমিই পারবে এমন পূজা করতে—সেদিন আমাকেও
কিছু একটু অবিকার তোমার সঙ্গে এই মহাপুত্র বোধ দেবার।

—একি কথা বললে দামীনা? অবিকার তোমার বেন আমি?
এই সোলা সিন আমার এ বন্ধ সলল হুত্ব, সেবির এ পূজার পুণ্যোহিত

তো তোমাকেই হুত্ব হুত্ব। তুমিই আমার লেখালে এই সাধারণ
মত। আমি যে কিছুই জানি না,—তুমিই হাত ধরে আমাকে পথ
দেবিরে নিয়ে বাবে। গভীর বেননাভা কণ্ঠে বললো সুমিতা—
আমার আর কে আছে বলো দামীনা? সবচেয়ে চেয়েছে নিজের
বার্ঘ; কেউ চারনি আমার। কান্নার কাছেরে আমি পাইনি কিছু,
তুমি একমাত্র তোমার কাছেই পেয়েছি দামীনা। তোমার নামেই
আমার জীবন ভরে আছে; সেখানে কিছুমাত্র কাকি নেই। ভাটি
সেই শিকতাল থেকে আমি তোমার ওপরই শিখেছি নির্ভর করতে
ভালোবাসা, ভক্তি, প্রভা সব আমার এই একটি জায়গাতেই করে
পড়ছে সে যে আর কোনো টাই পারনি দামীনা?

—মিতা। বরাগলার ডাকলো স্তম্ভ।

—বলতে লাগে, আমার দামীনা। জীবনের এই পুরন লাগি
আর হয়তো পারো না আমি। আজ এই মহাকাশের তলার
গাঁড়িয়ে মনের গহন অন্ধকারে হঠাৎ আমি দিব্যজ্যোতির বর্ণ
পেয়েছি। কত মিথো আমাদের এই বাইরের নাম, রূপ, সম্বন্ধ।
সবায় ওপরে আছে যে মহাসত্য,—তাকে উপলব্ধি করতে হলে,
আপে নিজেকে নিশেপে সমর্পণ করা চাই।

তাঁই আজ নতুন করে বুঝলাম, সেই পুরন-কল্পনাময় যে আমার
হৃৎ ধিয়েছেন, আমার জীবন বিস্তৃত, শূন্য করেছেন,—তাঁ আমার
মজলের জন্তেই। ছোট খেলাঘর আমার ভেত্রে দিয়ে তাঁর বিরাট
বিশ্ববিশ্বাসের বেন তিনি হাত বাড়িয়ে ডাকছেন আমার দামীনা।

শুভ-বিরয়ের ওর কাণ্ডালো তুলছিলো স্তম্ভ। হুহাতের বন্ধ
অজলিতে কুল নিয়ে ছির হয়ে গাঁড়িয়ে আছে সুমিতা। হুটি চোখের
দুটি তার স্পন্দ মহাকাশে নিবন্ধ। বেন অচঞ্চল, উজ্জল হুটি
আরতিপ্রার্থীপ জলরহে অনন্তসেবের উদ্দেশে।

—তোমার এই মহৎ সত্ত্ব সার্বক হোক মিতা। আমি
সর্বাত্মকরণে তোমার সক্ষমতা কামনা করছি। স্তম্ভের কণ্ঠে
বললো স্তম্ভ। চরম হৃৎকণ্ঠে তুমি যে পুরন কল্যাণময় রূপটির
বর্ণন পেয়েছো, এখানেই জীবনের সার্বিকতা লাভ করেছে তুমি।

তোমার এই আলোর মতো, কত আলো যে অকালে নিবে
যায় কে তার সন্ধান রাখে মিতা? হালপাতালে প্রতিদিনই সেখানে
পাবে হাতুহীন অরাধ শিকতসেব। রাত্তার কুটপাথে, বস্তিতে,
আবজানায়, এঘনিবাধা কত কুল, কোটবার আসেই করে দায়,
একটু হেঁ-বয়েস অতাবে। এসেই তুমি হাতুহেনেই বাঁচিরে তোলা
মিতা। কিন্তু এ কাজের জন্তে যে চাই প্রচুর টাকা, অনেক বৈধব্য
আর পরিশ্রম। তার ওপরে চাই তোমার ব্যক্তিগতবীমতা। কাকা
কি রাজি হবেন লালকুটিতে এ কাজ করতে দিতে?

—বোধ হয় রাজি করতে পারবে দামীনা। কেন বলছি
শোন—আমাকে কাল বলছিলেন—ছেলে চাই তো আমাকে
বলানি কেন? এই বন্ধ কত ছেলে রাত্তার বাটে গড়াগড়ি
খাচ্ছে। একটা কেন? একশোটা এনে দিচ্ছি। এই সব
অরাধ শিকতসেব নিয়ে তুমি একটা আশ্রয় তৈরী করতে পারো।
লালকুটিটা বিক্রি করলে প্রচুর টাকা পাবে। তা হুহা সোনা
রূপা, হুলাবান অতাদ আসবাব চেলেও অনেক টাকা আসবে,
এ দিয়ে ছোটোখাটো বাড়ী কিনে আশ্রয় করা বাবে।

—কিন্তু লালকুটি...

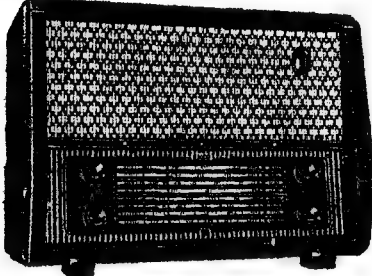
স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্য মুন্দর জিনিস

কাজে ভালো অথচ দাম বেশী নয় বলে
জাশনাল-একো রেডিও এবং ক্লীয়ারটোন
সরঞ্জাম বিখ্যাত। আর তা-ও এত হরেক
রকমের পাওয়া যায় যে আপনি অনেক
সস্তা জিনিসটি বেছে নিতে পারবেন।

জাশনাল-একো রেডিও



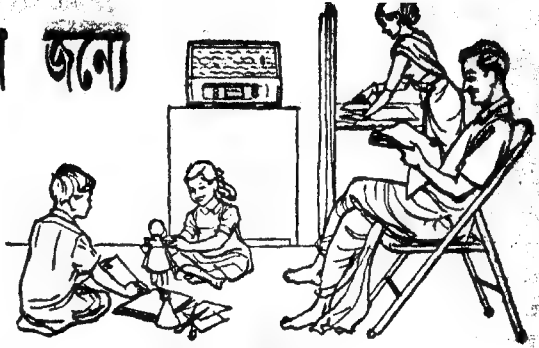
জাশনাল-একো-মডেল এ-৭২২ : এসি।
৩ ভালত, ৩ ব্যাট; কয়েক চমককার; এই প্রকার রেডিওর
মধ্যে সেরা, 'সম্মুখাইক'। দাম ৩৩৫, নীট



জাশনাল-একো মডেল এ-৭৩১ : এসি।
'লিউ গ্রুপ' ৭ ভালত, ৮ ব্যাট। এর শব্দগ্রহণশক্তি
অসাধারণ। পরিশুদ্ধিত আর-এক-স্টেশন সংযুক্ত,
এছাড়া একটেকনিক স্টিকার ও প্রোসোকোন
সিঙ্-আপের ব্যবস্থা আছে। 'সম্মুখাইক'।
দাম ৩২৫, নীট



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড
৩, মাদান স্ট্রিট, কলিকাতা-১০ • অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪ • ১/১৮, বাউন্ট
রোড, বারোহা-২ • ফ্রেজার রোড, পাটনা • ৩৩/৭৯ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড
বাকরগঞ্জ • পোখিরায় কলোবী, টাঙ্গী চক, দিল্লী • রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাব



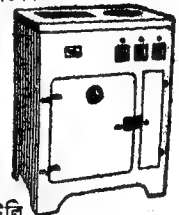
Kleertone ক্লীয়ারটোন বাতি ও সরঞ্জাম

ক্লীয়ারটোন ওয়াটার বয়লার—সঙ্গে সঙ্গে
পরম বা ফুটন্ত জল পাওয়া যায়। সাইজ : ৩.৫
৩ ৮ গ্যালন। এগিডে চলে।



ক্লীয়ারটোন
ঘরোয়া ইলেক্ট্রিক
ওজন ৭ পাউন্ড, ২৩০ ভোল্ট,
৪৫০ ওয়াট; এসি/ডিসি।
ব্যাকলাইটের হাতল।

ক্লীয়ারটোন কুকিং রেঞ্জ
হুটো হুটো ও উত্তম আছে—প্রত্যেকের
আলাদা কন্ট্রোল। সর্বোচ্চ লোড
৫,০০০ ওয়াট।



ক্লীয়ারটোন
বৈদ্যুতিক কেইলি
৩ পাইট জল ধরে; ফ্রেশিং কলাই করা।
২৩০ ভোল্ট, ৭৫০ ওয়াট। এসি/ডিসি।

ক্লীয়ারটোন টুইন হুট প্রেট
স্ন্যাক জন্মে। এন্টি মেটের আলাদা
কন্ট্রোল। ২৩০ ভোল্ট—এসি/ডিসি।
সর্বোচ্চ লোড ৩,৫০০ ওয়াট।



ক্লীয়ারটোন ফোল্ডিং
স্টীল চেয়ার ও টেবিল
দামা রঙের পাওয়া যায়।
আরামের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি।
গদি মোড়া কিংবা গদি
ছাড়া পাওয়া যায়।

তোমাকে বলছি, আর কেউ জানে না বাবা ছাড়া—আমার ঠাকুরমার বাড়ি বাবার ঠাকুরমারের প্রচুর গঠনা আছে। দেওয়ালের ভেতর বাঁই কেটে তার ভেতর সব রেখে এমন ভাবে বন্ধ করা আছে যে বহিরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। আরো আছে সোনার ইট অনেকগুলো, এসব বাবা আমার গোপনে দেখিয়ে গেছেন। বাবাই বলেছিলেন, নিজের ব্যবহারের জন্য এতে হাত দিও না। জনকল্যাণে উৎসর্গ করো, তাঁর ঠাকুরমা এই আদেশ দিয়ে গেছেন তাঁকে। তোমার কাকা জানলে লুঠ করে নিতেন। আমার শোবার ঘরে খাটের পাশে দেওয়ালে যে প্রকাণ্ড আয়নাটা ঝুলছে তারি পেছনের দেওয়ালে আছে এসব। আরো কিছু দিন বাক, তুমি আর 'অনিচ্ছন্দা', ওগুলো বিক্রি করে টাকার বোগাড় করে নিও। তারপর আমার বাচ্চাদের খুঁজে তুমি জানবে দামীদা। তুমিই লালকুটি গাঞ্জাবে তাদের জন্তে মনের মত করে। আর আমাকে হাথের জোমার পাশে, তোমার সঙ্গে আমিও কাজ করবো। যেটো মামী আর দাদা থাকবে, দিদিমা, আর কাকীমা থাকবেন, সকলে মিলে আমরা গড়ে তুলবো শিশুনারায়ণের মন্দিরটা। তখন হিন্দু ঐ লালকুটি নামটা বদলে খুব ভালো একটা নাম দিতে হবে 'দামীদা'।

—বাবা! এই তো সব ব্যবস্থা হয়ে গেলো মিডু! কমলা সেবাদানের উদ্বেগধন হবে, সামনের বৈশাখী পূর্ণিমা—মাঝে তো মাত্র মাস দেড়েক সময়, কাকাবাবুকে জানিয়েছি, গুরুদেবকে নিয়ে তিনি আসবেন।

—হাস—তার পরেই লেগে যাবে, তোমার নারায়ণের মন্দিরের কাজে। নাম? হ্যাঁ নাম তো ওর তুমিই ঠিক করে গেছে। মিডু!

—মামী ঠিক করেছে? কবে দামীদা? কি নাম? বিস্ময়ভরা চোখ ছুটি তুলে শুধালো সুমিতা।

—সেই যে, সেদিন বলছিলে তুমি মিতা—

—প্রায়ই স্বপ্নে দেখি এক ভীষণ সমুদ্রে ডুবে বাড়ি আমি, দূরে দেখি অশ্লীল বাতিঘরটা, তার উজ্জ্বল আলোর দিকে প্রাণপণ স্নাতার দিয়ে যেতে চাই কিন্তু সে যেন ক্রমেই দূরে সরে যায়, আমি ঐ বাতিঘরটার কিছুতেই যেতে পারি না দামীদা! কি রহস্যময় স্বপ্ন!

—রহস্য নয় মিডু! ঐ বাতিঘর সত্যিই তোমার ডাকছে। কত হাজার হাজার প্রাণ ঐ ভয়াবহ সমুদ্রে যখন অসহায় ভাবে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে, বাতিঘর থেকে তখনই সবাই বায় তাদের মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনবার জন্তে। বাতিঘরের ঐ উজ্জ্বল আলো বহু দুর্ভাগ্যের প্রলয় অবসরকে হত্যা মানুষের মনে আশার আলো ছাট্টিয়ে দেয়। সেই রকমই এই ক্ষমার সমুদ্রে অকালে প্রাণ হারায় যে শিশুরা, তাদেরই জীবন রক্ষা করবার জন্তে তুমি যে মন্দির স্থাপনা করবে মিডু! তার নাম থাকবে 'বাতিঘর'।

—দামীদা! সত্যিই আমি বাতিঘর পৌঁছুতে পারবো? হ্যাঁকলকটে ওগুলো সুমিতা।

—পারবে বৈ কি মিডু! আলোর তীর্থ যে তোমারই জন্তে। মেহের কণ্ঠ জবাব দিলো সুদাম।

—আমার আলোর দেশের দিশারী তুমিই দামীদা! তাই আমার কবরের প্রাণ, অন্য ভাসোবাসা আমি তোমাকেই নিবেদন করলাম।

হেট হয়ে অজলিভরা কুলগুলো সুদামের পারের ওপর ঢেলে দিয়ে ওকে প্রণাম করলো সুমিতা।

চিন্তাসায়বে জেগেছে এ কি অদ্ভুত আলোড়ন! মহাপুলক আর বেননার উদ্ভিলালা উত্তাল তরঙ্গে আছাড়ি পিছাড়ি ঝাঞ্চে সুদামের বুকের ভেতর। ওরা সকল মিথ্যা সন্সারের বাঁধ ভেঙে চুরমার করে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সব বিধা-বন্দ্য ক্ষুদ্র লাভ-কামতির ঘুলামাটিকে।

মহাৰাণ বেন নেমে এসেছে মহাপারের বুকে। এক বা এক রূপের মাঝে বিলোপ হয়ে গেছে দুই-এর সত্তা। তবু জেগে আছে এক মহাসত্যের প্রত্যক্ষ অবিনশ্বর অমৃত্যু। আর সেই অমৃত্যু, অজস্র আনন্দধারা বর-বর করে সুদামের হুটি চোখ বেয়ে বয়ে পড়তে লাগলো সুমিতার মাথার ওপর।

লালকুটি আলো করেছে সুমিতার আলোককুমার। বৃহত্ত প্রাসাদের বুকে যেন হঠাৎ প্রাণচাঞ্চল্য জেগেছে। ক্লক পাখানের বুকে যেন সহসা ব্যাপিয়ে পাড়েছে কলমারিনি স্বর্ণার সহস্রধারা।

কোন কীক দিয়ে দিনরাতগুলো হ হ করে পালিয়ে যাচ্ছে, আজ কাল জানতেই পারে না সুমিতা।

—আর এই কিছুদিন আগের সময়গুলো কি বিবম পাখাণ-ভার নিয়ে চেপে বসতো ওর বুকে—পল, অমূল্য, সেকেন্ড, মিনিট, বট্টা সবগুলো ওর বুকে লগ্ন কেটে কেটে তার পর যেত একটা দিন—আসতো সেই অসহ্য বাতী। সেই বট্টাটো কালো ভুড়ড়ে রাতটা তার খুলির বুগটা খুলে, মুঠো মুঠো ঘুম বার করে ছড়িয়ে দিতো সব মাহুতের চোখে। আর ওর চোখে নিক্ষেপ করতো কোন এক জ্বালাময়ী চূর্ণ। উঃ কি অসহ্য জ্বালা তার? সাতা রাত ঘরে চোখের জল আরও নেবানো যেত না সেই দুঃসহ জ্বালাকে। যদিই বা ঘুমের ছিটেকাটা কখনও লাগতো চোখ হুটোতে ওর, অমনি ঐ তিংস্টে রাতটা ওর স্বপ্নের জালে আটকে দিতো কত রকমারী বিভীষিকার ছবি। সভয়ে ঘুমটা পালাতো ওর হু চোখ চেড়ে, তাই প্রাণটা ছটকট করে উঠতো ওর, কখন পোয়াবে গো এ অজগর রাতটা। কখন ফুটেবে ভোরের আলো। আবার নিঃসঙ্গ দিনের বার্থ মুহুর্তগুলো বহন পাখরের সমাধি রচনা করতো ওর ওপর তখন আবার-অবসার ভারাক্রান্ত মনটা বলতো—দিন যে আমার কাটে না গো।

সেই দিন-রাতগুলো কেমন করে এমন সুখায় হয়ে উঠলো? আলো হাসে, কীদে, হাত-পা নেড়ে খেলা করে অশ্লীল চোখে পাশে বসে দেখে মিতা। হাতে থাকে কাঁটা উল, বোনে থোকনের জাল্পার। নিজের হাতে ওকে খাওয়ার রান করার। পাউডার মাখিয়ে, লগ্ন বার ওর জামা পাট্টে, হু-চোখ করে দেখে-দেখে পাশ আর মেটে না মিতার। চাকরমা এসে ভিড় করে পাড়ায় থোকনের কাছে, সবার মুখে সন্তোষের হাসি। বুড়া ভজন সিং খণ খণ করে লাঠি ঘরে ঠাকতে ঠাকতে সেদিন এসেছিলো ওপরে ওকে দেখবার জন্ত। হ হাতে ওকে তুলে নিয়ে ওর সে কি নাচন।

—মেয়ে লাল। মেয়ে পোপাল, মেয়ে বশোলা মাইকি জ্বালা। আকাশের চান, সৌন্দর্য্য দিকিরা।

হেসে লুটিয়ে পড়েছিলো। সুমিতা ওর নাচ দেখে—ভাগিন্স খোকন এসেছিল, তাই তোমার নাচ দেখতে শেলাম ভজননা। তুমি যে এত ভালো নাচতে জানো, তা তো আগে জানতে পারিনি?

—এ লাচ তো লাচই নয় রে দিদি। লাচবো সেই দিন, যেদিন আমার বাঁকাবাবু হাঁতি চড়ে বোঁ আনতে যাবে, তার সাথে জরি হাইলেণ্ডার পোষাক পরিয়ে লাচতে লাচতে যাবে এই বুড়ো ভালুকটা। সোবাই এ বাথ বলবে, এইত! লাচ কতি নেহি দেখা। ঘরে ঘরে ঝপঝপিয়ে নেচে বললো রামভজন সিং।

—ওরে বাপ রে, উচরোলো হেসে উঠে বললো সুমিতা—অভ্যনিন তুমি এখনও বঁচে থাকবে ভজননা? নাচ দেখাবার জন্তে?

—কেনে রে দিদি? কটা দিন? তোমার দাছুর বিয়ে এই তো সেদিনের কথা, চোখ বুদলে এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই—হামার লালাবাবুর সাদি ওমনি দেখতে দেখতে ছোয়ে যাবে।

সুমিতার অমন উচ্চরালের হাসি শোনেনি অসীম এর আগে। তাই কৌতূহলী হয়ে সে-ও এসেছিল সুমিতার ঘরে। ওকে দেখে ঘর ছেড়ে চলে গেলো সকলো।

খোকাকে খাটো উইয়ে দিয়ে ঘরের এক পাশে, বসে হাঁকাতো লাগলো রামভজন।

অসীম এসে ঠাঁড়ালো খোকনের খাটের পাশে হেঁট হয়ে দেখলো খোকনকে।

ব্রহ্মে আনন্দে ছলছল করছে সুমিতার অন্তরটা। সকল দুঃখ ভুলে গিয়ে সহাস্তে বললো সে—কেনন দেখছো? দিনে, দিনে খোকন আরো সুন্দর হয়ে উঠছে, তাই না?

—তা তো হবেই। স্নেহভরা কণ্ঠে জবাব দিলো অসীম, মা, বলা-কাকর চেহারা তো মন্দ নয়। ওই বা না হবে কেন?

ওর বিষ ছড়ানো কথাগুলোর অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে বিষমভরা চোখ-দুটি তুলে চাইলো সুমিতা ওর মুখের দিকে।

দুই চক্ষু মুদিত করে অসীমের কথাগুলো গুনছিলো রামভজন সিং। কালো কৌচকানো মুখখানা ওর আরো কুঁচকে গেলো। বলে পড়া তুলোর নক শাদা ভুরু দুটো টান করে তুলে ধরে কোটরপুত চোখ-দুটোকে অসীমের চোখের ওপর বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে শুধালো সে—ই, লাল বাবুর মা বাপকে আপ দেখিয়েছে জামাই সাব? এ বাচ্ছিকা বাপ কোন হায়?

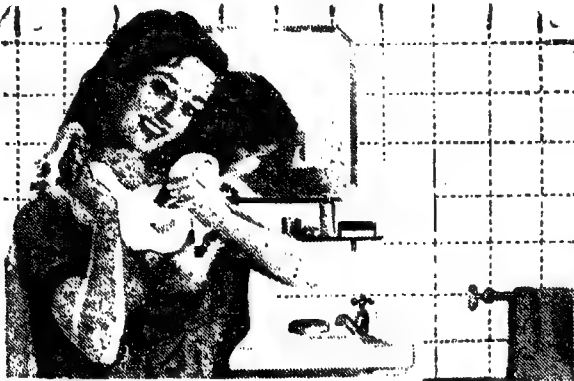
বুকের চোখে কোটর থেকে বেন দুটো সার্কলাইটের তীত্র শিখা ঠিকরে এসে পড়লো অসীমের চোখের ওপর।

গর্জন করে উঠলো বরষের খোঁচাখোঁচা বাথ।—শালা বাচ্ছা, সে থবরে তোমার কি দরকার? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? জুতিয়ে মুখ খেঁতো করে দেব। মনিবের সঙ্গে বাত চিত করতে শেখোনি উদ্ভ্রুক কাঁধাকা?

—ভজননা! আর্জকণ্ঠে ডাকলো সুমিতা। তুমি নিচে বাও ভজননা!

—বাচ্ছি দিদিভাই! লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে ঠাঁড়ালো ভজন সিং। তারপর বুক বাজিয়ে একটা হুড়ার দিয়ে বললো—জামাই সাব!

—আপকো বাচ্ছা হামি না আছ জামাই সাব। আপনাকো একটুকরা রোটি থাইনি হামি। এ হাত কতি আপকো পাশ ডিখ



জীবগুণাশক নিম্নতল থেকে তৈরী, সুগন্ধি মার্গো সোপ কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সোপের প্রচুর নরম কেনা রোমকুপের গভীরে প্রবেশ করে ত্বকের সর্বকম মালিন্য দূর করে। প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপেই উৎকর্ষের জন্ত বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিষ্কার ও প্রফুল্ল থাকবেন।

পরিবারের
সকলের পক্ষেই
ভালো



মার্গো সোপ

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-৩

যাক্কে নি। মহারাজ! রামনাথ ত্রিবেদীর বাবা আমি—কুমার ইন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, কুমার সোমনাথ ত্রিবেদীর বাবা আমি জামাই সাব। তাঁদের পায়ে হস্তান্তর করি। এঁদের ছাড়া এ হুনিয়ার আঁউর কোনো যরণকে পরোয়া করে না এ বাবা! আর কাকুর কাছে শির নামার না। আপকো নকরি হামি করি না জামাই সাব। মহারাজার বাবা হামি; আপনার নই।

—দারুণ উত্তেজনার ধর ধর করে কাঁপছিলো বৃদ্ধ। স্মৃতি। ছুটে গিয়ে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কান্নাভরা গলায় বললো—জানি ভজনদা! সে কথা জানি আমি, তুমি বাবা! নও, তুমি যে আমার দাদাভাই, তোমার মর্যাদাহানি হলো আমার জন্তে আজ। ক্ষমা করে ভজনদা! ক্ষমা করে।

—চের হরেছে ভাকামি। থাক। থেকিয়ে উঠলো অসীম,—চাকরের গলা জড়িয়ে দাদাভাই! দাদাভাই! ইতর কোথাকার।

—দিঘিভাই! কাঁপাংলার বললো রামভজন, যা ভাই রাজাবাবু কানছে কোলে নে। এ বৃদ্ধো অনেক লাগা পেয়েছে—ও দুটো কথাই আর কিছু হবে না।

বিতার মাথার গায়ে হাত বুলিয়ে একবার ওর মুখখানা বুকে চেপে ধরে, বৃকভাঙা একটা নিঃশ্বাস ফেললো বৃদ্ধ। তারপর ঠুক ঠুক করে লাঠির শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

চোখের জল বৃছে খোকনকে কোলে তুলে নিলো স্মৃতি। অসীম কপালের ঘাম বৃছে একটা সিঁগারেট ধরালো।

—হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ শুনে চমকে উঠলো স্মৃতি। একটা কোনো ভারি জিনিষ বেন হুড়হুড় করে পড়ে গেলো।

কি হোল? কি হোল? যুহ চীৎকার করে আলোককে বুকে জড়িয়ে ধরে কিশ্রপণে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চললো স্মৃতি।

সিঁগারেটটা আঁহাম করে টানতে টানতে অসীমও মহা বিরক্তি নিয়ে নামতে লাগলো ওর পেছন পেছন।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ছবির দেহটাকে সামলাতে পারেনি রামভজন সি। গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে একেবারে সিঁড়ির তলার স্রোজের ঠ্যাচুটার ওপর। ঠ্যাচুর একটা কোণের ওপর সজোরে পড়েছে মাথাটা—রক্তের ধারার লাল হয়ে উঠেছে সৈনিকের পা দুটো।

—উঃ মা গো, একি হল? কেঁদে উঠলো স্মৃতি, ভজনদা! ও ভজনদা! ব্যাকুল হয়ে ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলো স্মৃতি।

—কেঁদে লাভ কি? বিরক্ত হয়ে বললো অসীম, চাকরের পাঠিয়ে দিছি ওর মাথার জল চালুক, ঠিক হয়ে যাবে। পাঁচা বাহু হাড়, সহজে কিছু হয় না ওদের। হস্তো সব বাজে কামেলা।

—ভাক্তারকে একবার কোন কর না—কোনো সাড়া—শব্দ নেই যে! ব্যাকুল ভাবে বললো স্মৃতি।

—তাই করছি। কপালে আছে অবদণ্ড থণ্ডাবে কে? বাইরে চলে গেলো অসীম। টেলিকোন আছে ওর নিজের পোবার ঘরে।

চাকররা এলো। জল, বরফ, পাঁচা, তারপর ভাক্তারও এলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। পড়ে বাবার সঙ্গে সঙ্গেই হার্টকেল করেছিলো ও।

অপমানের গুলী খেয়ে বীর সৈনিকের মতো, সৈনিকের প্রতিমূর্তির পায়ে তলার প্রাণভাগ করলো লালকুটির পরম বিশ্বস্ত চিরঅগ্রগত শেষ ভৃত্য রামভজন সি।

বৃকভাঙা কান্নার সঙ্গে ওকে বিদায় দেবার সময় দেখলো স্মৃতি, সিঁড়ির ছাঁচেরের হুঁটি নীরব সৈনিককে। ওরা বেন, তার আবাল্য সাথী, ছারার মত নিভাসনী, গভীর স্নেহ-মমতার আঁকর, প্রণিতামহর শেষ অগ্রচর রামভজন সিঁকে ঈষৎ নত হয়ে কপালের কাছে হাত টান করে তুলে শ্রাণুট করে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছে।

[ক্রমশঃ]

বেদনা

বকুল বসু

আবার আকাশে আজি বেধ—

প্রেরণার সব বেগ

কবিরাজে স্বপ্ন-পাখারে,

বিলয়ের পথে আপনাকে

হাবাহু আমি আপন উজ্জ্বে

অজানার দেশে

ওগো ক্ষমর!

তোমার অগণিত সক্ষর

তীব্র বেদনার হেথা

হারিয়েছে ভাবা, হারিয়েছে কথা,

প্রাণ হ'রে আছে লীন,

যাহা ছিল সব হ'য়েছে বিলীন।

পথহীন প্রান্তরে আজি

ভক্ত কুলে লাগিয়েছি গাজি।

বিচার অতীত তীরে

বত বার বাই ধীরে ধীরে

বস্ত আশা-বেশা আসি ভিত্তে

নহন অজ্ঞাধারে।

দৃষ্টির অনলে হার

এ প্রাণ বস্তু হ'য়ে বার।

এ নিরাশা সীমারে

কেবল ক্যাপট আঁধার ঘনারে আছে।

কবি কণপূর-বিরচিত আনন্দ-বন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর



অষ্টম স্তবক

১। ধীরে ধীরে অস্ত্রধান ঘটল শ্রীকৃষ্ণের কোমার-সীতার, এবং বয়েযুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতনামা পারিষাটের বিস্তার-স্থপে প্রকট হল তাঁর শৌণ্ড-সীতা। উজ্জ্বল গণ্ডের শিখরে টলটল করে উঠল মন্দহাসির ঢেউ।

শ্রীকৃষ্ণ ভুলে গেলেন ধুলোখেলা, মেতে উঠলেন কন্দক-খেলায়। ভ্রমর বসলে যে ফুল কোটে সেই ফুলের মঞ্জরী হল তাঁর খেলার গোলা। আর তাঁর আনন্দঘনরস-মুগ্ধ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল সকলের এবং তারি কুপার বেন উৎসবে মেতে উঠলেন ধরনী। বহর ঘুরতেই শ্রীকৃষ্ণ বিসজ্ঞান দিয়ে দিলেন অমলপ্রাণ সহচরীর নিয়ে তাঁর বাছুর চরাণের উৎসব; এবং তার বসলে বিস্তার করলেন ধেনুপালন-সীতারবলীর লাভণ্য।

২। কৈশোরের প্রাকভাবের মতই শৌণ্ডগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ধীরে ধীরে বিরল হয়ে এল তরলতা। তাঁর চলন দেখে মনে হল শ্রীচরণ হুটি যেন এই আরম্ভ করেছেন গাভীরোর স্বাধার। শৈশবলপা-স্বরূপিণী সহচরীর বিরহে হঠাৎ স্নানমুখী হয়ে পড়ল লোমলতিকা।

"কোথায় গেল এর বালাচাপল্য?"...ভাবতে ভাবতে স্তম্ভ-বিচ্ছেদেই বেন ধীরে ধীরে ক্রীণ হয়ে এল কটদেশ। "কোথায় গেল এর শৈশব-ভারল্য?"...খুজতে খুজতে বেন চাপসা অভ্যাস করতে লেগে গেল যুগল চোখ। এবং স্রবকের কাব্যের মত তাঁর বাক্যে বহিত হয়ে গেল অজ্ঞান-পদপ্রয়োগ ও পটৈকলেশ-বোঝ।

মেখেতে দেখতে অগুর স্তম্ভর হয়ে ফুটে উঠল শ্রীকৃষ্ণের দেহ-ভুস্ম। বসন্তের দিনে নবীন তমাল-ভাঙির গাটে গাটে সৌন্দর্য্যে কেটে পড়ে যে নবাবুর তার সৌন্দর্য্যকে হার মানিয়ে দিল এই রূপের কূল। প্রতিপ্রত্যঙ্গে তরল তুলসি এর মসিগী মাধুরী। বেন এই কূল তার অস্তরের মকরম আর পরাগ নিয়ে পোতে চায় ভ্রমরের ডালবাসা, অথচ বুকুল-বিধার সে কিছু সাবধানী। রূপের-কূল-না জানি কেমন করে আবার রূপের কল হয়ে পড়ল ভ্রামলভার লভার। সে কল বেন পাকল না, অথচ কবারও রইল না, বৃহমধুর হয়েও লোভনীয় হয়েই রইল।

রয়ের লাভণ্য বেরন রত্নাভয়ের বিশেষ লাভণ্যকে পরিবর্তন বাটয়ে বাড়তেই থাকে, তেরনি আপনা থেকেই শ্রীকৃষ্ণের শরীরও তরে উঠতে লাগল লাভণ্যের অনন্ত-বস্তার। তাঁর ঐক-কূল বন্ধ-কূলে অভিনব আলোড়ন নিয়ে এল নব-বিজ্ঞ। বন্ধের লম্পট ভলিয়ার ও স্বদেশ মাসলতার মাধুরী দেখে সকলের মনে হল, এ দেহ বেন সে দেহ নয়। এ বেন এক অসমান-মজুল বিশ্বনয়ন-চমকানো অজ্ঞ দেহ। চমকে উঠলেন ব্রহ্মবাসীরা।

৩। ইচ্ছাবন্ধের ধবলিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীজগদামের

প্রিয়তমারা। শ্রীজগদামের উপমান যদি হয় নীলমণি, মেঘ ও নীলোৎপল, তাঁদেরও উপমান তাই হলে কনক, বিদ্যুৎ ও চম্পক। কেউ মাস কেউ পক্ষ গড়ে হয়েছিলেন অবতীর্ণ। তাঁদের সৌন্দর্য্যের কাছে, হিমালয়-কন্ডা পার্বতীর সৌন্দর্য্যও বেন স্বল্প। তাঁরা ছিলেন শ্রীজগদামের নিত্যসঙ্গিনী এবং তাঁর শূন্য-রসের অঙ্গিণী। তাঁরা নেমে এসেছিলেন নির্বরণার মত রসের।

৪। তাঁদের কাছেও বধন বিদার নিয়ে গেল কোমার, তখন প্রথমে সরল হয়ে বেড়ে উঠে পড়ে মঞ্জরীর মত বেকে ছুয়ে পড়ল তাঁদের দুটি; হেমন্তের দিনগুলির মত হাসি পেল হাসি; কাব্যের গুণবিশেষের মত বাক্যার্থও একটি পসেরই প্রয়োগ করতে লাগল আলাপ। ঘরের ছাঁচ থেকে বেরে পড়া বিনু বিনু বর্ণন-জলের মত নীর অতি দীর হয়ে গেল চলন; নীরের মহাবলু লাভের মত... লোক-লোচনের সজ্জা আচ্ছন্ন হয়ে গেল বন্ধ এবং খোঁকেপোয়ে ঢাকা নৈবেত্তের খালার মত গুণনাবৃত হয়ে গেল তাঁদের শিরোভাগ।

কোমার বিশায় নেওদাতে তাঁদের মানসের দশা হল অস্ত্রবস্তি-রত্ন শলাকা মৃণালধণ্ডের মত; না জানি কোন দেবতা এসে তাঁদের টুকরো মনকে বেন জুড়তে বসেছেন সেবা দিয়ে। যে সব বিবরগুলির সঙ্গে তাঁদের পরিচিত ঘটেছিল কোমারে, সেগুলিকে এখন অপরিতের কোঠায় কেলে দিতে তাঁদের নব-জ্ঞানের আর বাধা না এবং আচর্য্য, নটি গ্রহই বেন এক এক করে গ্রহণ করলেন তাঁদের বরণশ্রয়। কাব্য, তাঁদের করতলে প্রকাশ পেল রবির আকর্ষণ, বদনবিধে চম্ভের জ্যোতিরা, জনকে মঙ্গলের অঙ্গদান, দুটিপাতে বৃষের সৌম্যতা, শ্রোণিতে বৃহস্পতির গুরুত্ব, বচনে শুক্রের কাব্যতা; চরণে শনৈশ্বরতা, কেশপাশে রাহব তারসিকতা এবং গুণাবলীতে কেতুর কেতনতা।

৫। এমন কি—চরণের চাক্ষু্যটিকে চুরি করে নিয়ে গেল নয়ন, কটির গৌরবটিকে শ্রোণীভার। জ্ঞানের কুশতাটিকে উদর এবং বাক্যের প্রাচুর্য্যটিকে মাধুর্য্য। হার রে শৈশবের অবিচার নষ্ট হয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে কি অঙ্গগুলির মধ্যে আসে পরগুণ লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি!

৬। এমন কি, অষ্টসিদ্ধিও তখন প্রাচুর্য্য হতে গেলেন তাঁদের পরিবেশে। কটিতে উদয় হলেন অগ্নিমা, শ্রোণীভারে মহিমা, বাণীতে লঘিমা, লজ্জায় প্রান্তি, মানাস কাব্যবশায়িতা, লাভণ্যে ঈশিতা, অপাঙ্গে বশিতা, এবং মাধুর্য্যে প্রাকাম্য।

৭। হঠাৎ বেন কোথা থেকে বলা নেই, কওয়া নেই, তাঁদের স্বরয়ে স্বরয়ে তার পর অজ্ঞ নিয়ে বসল এক মোহন বিকার। আর সেই বিকারের কুপাড়েই বেন ফুলের গন্ধে মাছোরা হারে উঠল ব্রজনগর, রতীন হয়ে গেল বিশ্ব, সকল হয়ে গেল গুণধন্যর অঙ্গ, শোণিত হয়ে গেল শূন্যর রস, মাঞ্জিত হয়ে গেল সর্বভাব, সহসীকৃত

হল শ্রীকৃষ্ণের নীলাবিলাস, কৃতার্থীকৃত হল কবিদের বাক্য-নির্মাণ।
এবং সেই হৃদয়-বিকারের অঙ্গগ্রহেই প্রিয়তমাদেরও মনে ফুল ফুটল
উৎকর্ষার, মনোভূমে ঠাই নিলেম মনোভূ, মানসপথেই ছুটে
লাগল মনোরথ, নিতান্ত দীর্ঘ হল রতি, পারশূজা হল লজ্জা,
একান্ত অগ্ন হয়ে গেল জনশঙ্কা, ক্রত ও ভীষ্ণ হল অনিবৃত্তি,
চুচিকিৎস হল অমুংগাহ এবং মনে মনেই শিকল দিয়ে রইল
মনান্তর।

৮। কিন্তু এই হৃদয়-বিকারটি ভিতর-পাকা হলেও বহির্বিকাশী
হল না,—বাটশালি ধাত্তের মত। পরিজনদের হাজার অমুযোগেও
বুঝ লুকিয়ে রইল। রস-কি কখনও শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায়?
স্বার্থার্থের মত এটিও অলঙ্কাই রইল সর্বদা। নিরুপলব্ধ্যার্থের মতই
ব্যঞ্জনার বা বাঙ্গের রইল বাইরে। অন্তর্বিদ্যমান হলেও সূক্ষ্মতার
কিন্তু অভাব ঘটল না এটির। উৎসেপ জমাল সত্য, কিন্তু এর
নিজের কোথায় উদ্ভেজনা। কেবল সান্নিপাতিক অরুর মত অস্থিসন্ধি
শিখে দিল, নিয়ে আস্তে লাগল নিত্যভূষণ।

৯। কাঁচা বাঁশের মধ্যে ঘূর্ণের মত প্রেমিকাদের অন্তরটিকে
কুরতে লাগল, এই বিকারের মোহনতা।

১০। এই হৃদয়-বিকারের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীভগবানের
প্রিয়তমাদের কপোলতলা লবলী কলের মত হলদেটে-সাদা হয়ে গেল,
ওষ্ঠাধরের চেহারা হয়ে গেল রোদে-কলসানো নতুন পাতার মত
চুঁকচুঁক। হৃদয়নের আকৃতি—যেন হিম-ঢাকা নীলপদ্মের পাপড়ি।
বৈশাখ-বাসরের মত তপ্তদীর্ঘ হল নিঃশ্বাস। অজ্ঞ জনের
জন্মের মত অন্তঃশূঙ্ক হয়ে গেল চাহনি। সব কিছুই কেমন যেন
বলিয়ে গেল।

আত্মারামের প্রস্থানের মত উদ্বেগশূঙ্ক হল পদ-চারণ। কী
বলতে গিয়ে কী যেন তাঁরা বলে কেলেস, গ্রহগ্রস্তের মত আচরণ
হল ঘটনের। ঘরের কাজে আর মন বসে না, আচার-ব্যবহার হল
নির্বিধি বাহুরের স্বভাবের মত, মরতে পারলেই যেন বাঁচেন।

শ্রীভগবানের প্রতি তাঁদের এই মনোভাব ক্রমে যখন সহজ ও
স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল, যখন ভীত হয়ে উঠল তাঁদের স্বপ্নের প্রতি
দৃষ্টি, যখন এই মনোভাবের আলোর ভাষাটি নতুন ব'লে লক্ষ্যমান
হলেও প্রকাশে কোথাও আর বক্ষ্যমান হয়ে উঠল না, তখন একদিন
তাঁদের সহচরীরা আর থাকতে না পেরে কাণ্ড বাধিয়ে বললেন—হঠাৎ।
নিজের নিজের প্রিয়সখীর, হ্যাঁ, হৃদয় যে তাঁরা জানতেন এ কথা
নিশ্চয় ঠিক, তবু ঠিকটি যে কতখানি ঠিক সেটি জানবার আগ্রহই
বোধ হয় তাঁদের মাঝার মধ্যে নিয়ে এল এই বুদ্ধি।

তখন প্রসাধনের সময়। তাঁরা তাঁদের প্রিয়সখীদের সামনে
এনে ধরলেন,—ইন্দ্রনীলমবির অলঙ্কার, সুরঙ্গন নীলাজন ও কনি-
পাশার ফুলে আয়োজিত নীলপদ্ম। সব কটিতেই শ্রীকৃষ্ণের তম্বু-
প্রভার সাদৃশ্য। বললেন—“বলি ও প্রিয়সখীরা, এবার জুড়োক
তাহলে আপনাদের হৃদয়নের ছালা। গৌরবরণ গায়ে এই গয়নাই
মানায়। কৃষ্ণের লাবণ্যের মতই এগুলি স্নায়ক।”

কুর্বাণবর্ণের মত সেই উপচারগুলিকে দেখেই, এবং ক্ষতিপথে
কুম্ভনায় প্রবেশ করতেই, প্রিয়সখীদের পুলকাকিত হয়ে উঠল
সর্বদা, চোখে টলটল করতে লাগল কাজলযোরা জল, প্রাণের
সঙ্গে সঙ্গে যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল নিঃশ্বাস। তাঁদের

দশা দেখে এক সহচরী প্রশংস-পরিহাস উড়িয়ে আর এক
সখীকে বললেন—

১১। “আঃ কি কষ্টে লো সেই কি কষ্ট! আমার স্বপ্নের নিশ্চয়
ময়লা জমেছে। শুধু একবার দেখে তাতেই কিনা তোমার এই
অজ্ঞান জলের বাপটা মেয়ে চোখের পথটাকে কিম্বিয়ে দিলে গো!
পরতে না পরতেই এই ইন্দ্রনীলমবির গয়নাটা কিনা পুলকে শিউরে
দিলে গো! শুঁকিও নি, তাতেই কিনা দূর থেকেই ঐ নীলপদ্মগুলো
নাক ভরিয়ে দিলে গন্ধে। আমাদেরি চোখে নাকে এমন ঘটল,
না জানি এঁদের আবার কি ঘটায়। রীতিনীতি কিছুই জানিবে
সই, আমার মত সখী-মাগুয়ের এ আবার কি হল? ওমা, তোমারও
যে সেই দশা। মুহুর্তে পড়লে নাকি? তুমিই এখন বল ভাই,
তম্বু-কথাটি শোনোও, এ সব কি এইগুলোর কোনো শক্তি বিশেষ না
আপনাদেরি মহিমাময় মনের কোনো বিকার।”

পরিহাসের ভাষা ঝাঁর কানে তুললেন, তাঁরা সকলেই আবার
বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গুরাগিণীদের পরমগুণোত্তরা
সহচরীর দল। হ্যাঁ, তাঁরাও কেউ কম রূপসী নন। লক্ষ্মীবেও
তাঁরা হার মানিয়ে দেন সেবার স্বাভাবিকতায়।

তাঁদের উরুদেশে রক্তাধর আরম্ভটিকেও হস্তশোভা করে।
তাঁদের শ্রোণীর তুলনায় শ্রীকামদেবের সিংহাসনও হস্ত জনক।
ডম্বর মাঝখানটিকেও ধিকৃত করে তাঁদের বটিদেশ। আর
তাঁদের কুচ-কোরকগুলির সৌন্দর্য! বিকল হয়ে যায় ডালিম-
লতার ফল। ঠোটগুলিও অমুগম যেন তাঁরা আত্মসাৎ করেছে
বাঁধুলি ফুলের রক্তিমার ও সৌরভের আত্মা। মানিক্যজয়ী
দশন। নাসাগুণের শোভার কাছে ও কটাক্ষের ভঙ্গির কাছে
অপমানে অধোমুখ হয়ে যায় শ্রীমদনের তুণীর ও ধিঘা। আর
তাঁদের নয়ন। মন থেকে মুছিয়ে দেয় কালিন্দীর নীল জলে
সুখের ভোমরা ভোলা নীল পদ্মের দোলায় ছবি। আর তাঁদের
চন্দ্রায়মান বদন। অজল ভাসা পল্ল বনের যেন স্বপ্নের কল্পন।

এই হেন রূপসী সহচরীরা আপন আপন যুগ্মসখীর মুখের দিকে
চেয়ে নির্ভয়ে পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন তাঁদের ভাব।

১২। কিন্তু ভাবের পরীক্ষা করা কি এতই সহজ? শ্রীভগবানের
প্রিয়তমারা যে নিত্যসিদ্ধা, তাঁদের রস-রীতিটিও যে নিত্যসিদ্ধা।
সে রসরীতির পক্ষে কি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে অমুদ্যুতানতা থাকতে পারে?
যেমন পারে না, তেমনি এই রসরীতির জন্তও দারী হতে পারে না
এবং তার ইতিকর্তব্যতার জন্তও দারী হতে পারে না প্রাকৃত
লোকের মত লৌকিক বয়স। অতএব কৈশোর সমাগমে তাঁদের
এই অমুবাগ-মেঘুরতায় অবকাশ কোথায় বিষয়ের? তাঁদের
জয়কালের সমকালেই যে জন্মেছিল এই রাগ-নিবিড়তা। কৈশোরে যে
কোনো সময়ে তাই তার অভিযুক্তি। এই এর রহস্য।

এবং তাই সহচরীদের বিহবলতা দেখে, অকৃতবলীর শাখার মত
বিচলিত হয়ে উঠলেন স্নান্যরী বিশাখা। বিদগ্ধভাব দুঃসমুদ্র নিজের
প্রিয়সখী বাধাকে লগ্নভাবার তিনি বললেন—

“মুখটিতে স্নায়ক করে রেখেছ, তবে মনে হঠাৎ এই বিকার এল
কেন? বলি, সখীদের যে প্রাণ বায় বায় অবস্থা জমালাও যেই পাকলও
সেই, এমন বিকার যে চতুরদর অগম্য তর্কের।

কোথার গেল তোমার অঘরনের কৌতুক? শুক-শারীকে পাঠ

নেওয়া নেই, ময়ূরকে নাচ-শেখানো নেই, বৈশ্য বন্ধার তোলা নেই, হাসিঠাটাতামসা নেই, প্রিয়সখীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি নেই! ...বলি সই তবে কি বনমালী...তোমার মনের মাণিকটিকে চুরি করে সরেছেন?

১৩। অসম্ভব না-ও হতে পারে। সত্যিই তো চাঁদ নাথাকলে কি খুসি হয় কুমুদিনী? খুঁধি না থাকলে তো পদ্মিনীকে হতেই হবে রান। মেঘের গান ছাড়া অঙ্গীতে আনন্দ কোথায় চাতকীর? মেঘের কোল ছাড়া শোভা কোথায় দামিনীর?

ওলো সখী, তুমিই বল,—মধুমাস না এলে কি গন্ধ ছোটো মাধবীর? উয়না হয় কি কোকিলা? শুক্লপক্ষ চাই, তবেই না খোলে জ্যোৎস্না; পদ্মবীণা চাই, তবেই না ভোলে রাজহংসী; কষ্টপাথর চাই, তবেই না নিজেকে চিনতে পারে কনকরেখা। কত আর বলব বল, হা গো ঝাঁ, চাঁদেই কেবল জ্যোৎস্না থাকে, বজ্জেই থাকে প্রভা, কুসেই থাকে মউ।

আর তাও বলি সই, আমার কাছেই বা লুকিয়ে রেখে তোমার লাভ কি? যদিও বারি বরিক, তাদের কাছে কি অপোচর থাকে মণির মনের খবর? লুকিও না সই, বলেই কেল। ভালবাসার সব কিছুই বলার।

১৪। বিশাখার কথা শেষ হতে না হতেই সর্বগুণললিতা ললিতাসখী পরম প্রণয়ভরে বলে উঠলেন—

“সই, বিশাখাটি আমাদের উল্লস প্রণয়ভরব পাখা কিনা, তাই ভাষার ফুল কেটানোর তিনি বিচক্ষণ। তবে যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। বিচিত্র নয় সেটি। চাঁদের রূপাতেই তো আরও রূপসী

হয়ে ওঠেন রাত্রি। তাকে ছাড়া আর কারেই বা বল বরণ করবে চকোরী?

১৫। জীরাধা উত্তর দিলেন—বড় যে সাহস বেড়ে গেছে আপনাদের, অসম্ভাব্যকেও সম্ভাব্য করে তুলতে চান আপনারা! বৈশাখের বিশাখার মত—মাধবের (মাধব: কৃষ্ণ: পক্ষে বৈশাখ:) জীসহায়িনী হয়ে মিলনের ভাবটিকে কিছুতেই আর ত্যাগ করতে পারছেন না দেখছি আমাদের বিশাখা।

১৬। কথা শুনে প্রকৃত হয়ে উঠল ললিতার মন। তিনি পুনর্বার বলে উঠলেন—ওলো সুন্দরি, যা হবার তা চিরকাল ধরেই হবে। তা, সই তোমার নামটিও তো রাধা, অর্থাৎ বৈশাখ। রাধা আর বিশাখা যেহেতু এক পর্যায়ের, সেইহেতু রাধাই এখন তাঁর সহায়।

১৭। রাধার অমৃতমধুর হাসিখানি বলে উঠল—ললিতে, আকাশলতার ফুল আর কাশলতার ফুল কি কখনও সমান হয়? মিথ্যে বিভণ্ডা তুলে আমাকে আর বোঝাবার চেষ্টা করিসনে ভাই ললিতুখে।

১৮। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন সখী ‘শ্রাম’। রাধাকে আরাধনা করতে প্রতিদিনই তাঁর আসা চাই। হৃদয়ের টান। নীতকালে তাঁর শরীর উফ হয় আর গ্রীষ্মে হয় নীতল—এই লক্ষণেই তাঁর এই শ্রাম-নাম। রাধাপিত্ত তাঁর স্বয়ং।

তিনি আসতেই কোমল-হৃদয়া জীরাধিকার হৃদয়খানি যুদ্ধ হয়ে গেল, মুদিত হয়ে গেল, অতিবিক্ত হয়ে গেল।

১৯। তারপরে বখন কলাবতীরা পরস্পর মিলিত হয়ে এক

বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দি, কাশি, বুকে-পিঠে ঠাণ্ডা লাগে
গ্লেয়া জমে বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন



adarts ৭৭-১



পরিবেশক :

জি. দত্ত এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১



আরসার বসে পড়লেন তখন একটু মুচকি হেসে এবং একটু গভীর হয়ে এবং একটু সুখের হাবভাব গোপন করে শ্রীরাধা বললেন—বলি ও পদ্মকুল, বলি ও প্রিয়সই ভ্রাতা, আমার মনের গুজনখানি কি এবার কানে নেবেন ? আমার দেখা দিয়ে কপূরের পিঙ্গির জ্বলেছে সেই আমার মনরমে। তারপরে—এই যে আমার সখীরা কী বেন সব কান-ভোলানো কথা বলছেন তাও কি একটু কানে নেবেন ? এই বলে শ্রীরাধা ভ্রাতার কাছে প্রকাশ করে দিলেন বিশাখা ও ললিতার কথাপকথন।

২০। শুনে ভ্রাতা বললেন—

“হৃদয়ের মত সরল-সরল চোখ করে মিছে আর দোষ দেবেন না সখীদের। গোকুলের কুললনাদের আপনি ললাটভূষণ। আপনায়ি গুণ গাইতে গিয়ে এই গান-গাওয়ার, মত ব্যাপারটি ঘটেছে। যা ঘটেছে তা ভালই ঘটেছে। চান আর কুহুদিনের মত তাঁর আর তোমার সেই সেই স্বভাবটাই ভাব। সারা পোকুল লগ্নী হাতিরে খুবাস ছড়িয়ে পড়েছে সেই ভাবে।

২১। রাধার মুখে চলে উঠল হাসি; বললেন—সত্যিই তো, সেই মাছুষটির উপর দেখছি আপনাদের তাহলে লোভ পড়েছে। তানা হলে আর নিজের কথা অন্তের বলে আপনি মেন চাঙ্গিরে, ফুটে ওঠেন বোলকলার। এইই বা কেমন করে সম্ভব হয় ? জিজ্ঞাসা করি, এমন কোন্ রমণী রয়েছে বিনি চান বা খুব্যকে হাত বাড়িয়ে ধরতে বাম ? কাচমণি দিয়ে মহামণি বদলাতে চান ? লব্ধের সমস্ত বড় হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে চান ? বলি, সাপের মাথার বখান ভগ্নমগ্ন করে মাণিক, কোনো রমণী কি সোটির লোভে তখন কণা ধরতে ছোটেন ? কিশোর সিংহের কেশর ছিড়ে কেউ কি চুল বাঁধে সেই ? ও সব সখী ঠকানো মিথ্যে গল্পের ঢের হয়েছে সেই ঢের হয়েছে।

২২। ভ্রাতা বললেন—“তোমার ভয়মুটি বে সত্যিই ভ্রাতাহত, বেশ জয়দম হচ্চে তোমার কথার। আর প্রভাবণায় কাজ কি সেই।

২৩। ভ্রাতার কথা শুনে আতুর হয়ে উঠল রাধার প্রভাবণ-চাতুরী। নিজের আলোর ফুটে উঠল তাঁর স্বভাবের ভাব-প্রবণতা, ভাবের কুশলতায় আবার বেন সৌভাগ্যে চিত্তিরে উঠল তাঁর স্বপ্নের

বৃত্তিদল। রোমাঙ্কের শোভার বক্সি চটল হয়ে গেল কপোল। কপোল-পালিতে বীরে জমল এসে ছ’নয়নের কাজল-ধোয়া জল। বেন ছ’নয়নের পদ্মকোণ থেকে বেরিয়ে এল কুক্কাক্ষির মধু; আর হেনু সেই গালের বাটি ছুটিই হল তাঁর মৃত্যুর কুক্কাক্ষির-সৌন্দর্য্য ধারণের শ্রেষ্ঠ আধার। নিখিল সৌভাগ্য-সম্পদের বিজয়িনী পতাকার মত কাপতে লাগলেন শ্রীরাধা। তাঁকে দেখে দ্রব হয়ে গেল সখীদেরও মন। তাঁদের আশ্রিত করে শ্রীরাধা হঠাৎ বলে উঠলেন—ভ্রাতা, বলতে পারিস, কোথায় আমার কনকন করে বাজছেন সেই সৌভাগ্য-কঙ্কণ ? ওলো সেই, ওর চিত্তমণি বেজায় দামী ; লোকান্তর মণীজ্ঞদেরও সোটি বন্দনীয়। আর আমার সেই অম্বরূপ-...ভূবমণির মত কেবল খড় টেমেরি বেড়ায়। সে মণি কেনবার মত মূলখন কোথায় তার ? বলতে বলতে কানিতে লাগলেন রাধা।

২৪। ভ্রাতা বললেন—কেনে কেনে এমন প্রশ্নর চোখ দুটি আর কোলাতে হবে না সেই। আমার মত সখীর কথাগুলো কখনও মিথ্যে হয় না। নির্ভুল বলেই বিশ্বাস করে নিও। আশ্চর্য হও। তোমায় অম্বরূপের মত খেকেই পরিচয় পাচ্ছি তাঁরও মনোমাণিক্যের। এমনও কোনো কোনো লতা আছে বার আপনা হতেই নিখিপ্রদেশে খুরি নামে। তখন আর দুজের থাকে না নিধি। সেই, যে তাকে পেয়ে সেইই জানল।

২৫। বিশাখা আর ললিতা দু’জনেই তখন বলে উঠলেন—

“ভ্রাতা, বলিহারি বাই তোমার নশনের। এর আগে নিশ্চয়ই তোমার আর তাঁর মধ্যে এমন কিছু একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটেছে যার দোলতে আজ তোমার ঠোঁট করছে এমন বাক্যের মধু। অত আর মিষ্টি মিষ্টি হাসতে হবে না। নিশ্চয়ই গোপন কিছু খবর...তোমায় কানে অতিথি হয়ে রয়েছে।”

ভ্রাতা বললেন—

বলি খবরটি বলি সে বড় সাহসের কাজ হয়—

২৬। দু’জনেই তখন বলে উঠলেন—

আমাদের মাথার দিবিয় ভ্রাতা, তোমার বলতেই হবে। রসান্তর ঘটলেও বলতে হবে অসঙ্কোচে। কুলচন্দন পড়ুক তোমার [ক্রমশঃ।

অনুব্রব

মধু গোস্বামী

অনেকেই অনেকের মত
চোখের জলের দিকে কিয়ে
অকালে নিহত।

ভেবেছে সবাই :
মাঠের বাসের শীঘ্র
বাস ফড়িংয়ের মত
সহজ সকাল যেন পাই।

দেখনি’ক মোটে,
সে-সকালও ব্যর্থ হয়
শালিক কি চড়ুইয়ের ঠোঁটে।

তাই, চোখের জলের দিকে কিয়ে
অনেকেই অনেকের মত
অকালে নিহত।

তুমি ছয় সেকেন্ডের প্রয়াস

আমাদের অনেকের কাছেই শারীরিক ব্যায়াম একটা

বিরক্তিকর ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু সবল ও কর্মঠ করা এবং

সেই সজ্জা মাংসপেশীগুলির বখোপযুক্ত উন্নতি সাধন, ইচ্ছা করলেই এই কাজকে আনন্দপ্রদ ও মনোরম করে তুলতে পারা সকলের পক্ষেই সম্ভব। ব্যায়ামাগারে গিয়ে কঠিন ব্যায়াম করে গলদঘর্ষ হবার প্রয়োজন নেই, শরীরকে সুস্থ ও কর্মঠ করে রাখবার জন্তে যিনে বা বাতের এমন সময়গুলি ব্যবহার করা যেতে পারে যখন আপনাকে কোন না কোন কারণে অলস হয়ে থাকতেই হবে—এই ধারণা না, আপনার মোটর গাড়ীর সুস্থকে লাল আলো জ্বলে উঠেছে, অতএব আপনার গাড়ীর গতিবেগ রুদ্ধ করে কয়েক মিনিট ধাঁড়িয়ে থাকতে হবে, সেই সময়ে, কিংবা যখন টেলিফোন করতে গেলে আপনার লাইন পেতে দেয়ী হচ্ছে সেই অবসরে, কিংবা যখন “কিউ”—এর মধ্যে আপনি অলস হয়ে ধাঁড়িয়ে যাচ্ছেন সেই সুযোগে।

একটা জার্মান পরীক্ষাগারে গবেষণা করে জানা গেছে, মাংসপেশীর বেড়ে ওঠার একটা নিয়ম আছে এবং অত্যন্ত অল্প ব্যায়ামে মাংসপেশী বেড়ে উঠতে পারে। দিনের মধ্যে মাত্র ছয় সেকেন্ড যদি আপনি আপনার মাংসপেশী সঞ্চিত করতে পারেন তা হলে সেটা বতর্নিত্র গড়ে ওঠা সম্ভব ঠিক সেই সময়ের মধ্যে ততখানি গড়ে উঠবে।

প্রতিদিন ছয় সেকেন্ডের অবসর সকলেরই আসে। এক ইচ্ছা করলে এই অল্প সময়কে আপনি আপনার জীবনে প্রচুর প্রভাব সৃষ্টি করার শক্তি হিতে পারেন। পেটটা ভেতরের দিকে টেনে ধরুন, চিবুককে সোজা অবস্থায় খাড়া করে তুলে ধরুন। সমস্ত শরীরটাকে নিয়ে আড়মোড়া ভাঁজুন। হাই তুলুন, বসে বসে বতখানি শোয়া যার তার চেষ্টা করুন। হঠাৎ একটু সময় পেলে এই সব ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করুন। প্রতিদিনের অন্ততঃ ছয় সেকেন্ডকে প্রাণময় করে তুলুন।

আগেককার heavy weight boxing champion Gene Tunney বলেছেন : কঠিনসাধ্য ব্যায়াম করার কোন প্রয়োজন নেই, তুমি নিয়মিত লঘু ব্যায়াম করলেই শরীরকে সুস্থ ও সবল করে রাখতে পারা যায়। যেমন পীত পরিষ্কার করেন তেমনি প্রতিদিন একটু আর্থু ব্যায়াম করবেন।

চিত্তভারকারী ঠিক এই বকম ছোট ছোট সেকেন্ডগুলিকে শরীর মনের উন্নতির জন্তে ব্যবহার করে থাকেন। টেলিভিসনে কথা কইবার সময় কোমরের নিচে এক হাত ঘুর্তা করে অল্প হাতের ওপরে চেপে ধরুন। এতে হাতের মাংসপেশীগুলির শক্তিবৃদ্ধি হয়। জেন পাওয়েল, ফ্রান্সিসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পায়কগণ লাল আলোয় সুস্থকে পথের ওপরে যখন তাঁদের গাড়ী ধাঁড়িয়ে থাকে সেই কটা সেকেন্ড ব্যায়াম করে নেন। বৌগিক ব্যায়ামের মত বসে বসেই তাঁরা ভেতরের দিকে পেট টেনে ধরে এবং পরে বীরে বীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। তবে এরূপ ব্যায়ামও খুব সতর্ক হয়ে করতে হবে। মিস পাওয়েল এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন : আন্তে আন্তে আরম্ভ করুন, তবে প্রতিদিন নিয়মিত অভ্যাস করে যান। অল্প-প্রত্যক্ষকে হ্রসবরূপে করবার ও উল্লয়ের বের হ্রাস করবার এর চেয়ে ভালো উপায় আমরা জানা নেই।



মাংসপেশীকে সবল করার জন্তে কোন একজন বিশেষজ্ঞ দান করার পর কয়েক সেকেন্ড তোহালে দিয়ে গা মোছবার সময় কতকগুলি ব্যায়াম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোহালেটা ঘেঁষে প্রোছে ঘাড়ের ওপরে রেখে চিবুক তুলে দক্ষিণ বামে পরিচালিত করুন, তোহালের শেষের দিক ছুটো ধরে ঘাড়ের ওপরে জোর দিয়ে চাপুন কিন্তু এ প্রক্রিয়া ছয় সেকেন্ডের বেশী করার প্রয়োজন হবে না। পিঠ দিয়ে তোহালেটা নীচের দিকে টেনে উন্নত ও নিতম্বের মাংসপেশীগুলি সঞ্চিত করুন। এই বকম করতে করতে মনে মনে ছাঁবার ওজন। পায়ের তলার তোহালেটা দিয়ে দু'হাত দিয়ে টানুন সেই সঙ্গে পোড়ালি দিয়ে তোহালেটাকে নাবিয়ে ফেলতে চেষ্টা করুন। এই ব্যায়াম পরের পর ছুটো পা দিয়েই করতে হবে তুমি ছয় সেকেন্ড ধরে। বীরা সাবমারিনের অল্প পরিসর জরিগায় আবদ্ধ থাকেন, তাঁরা কেবল মাত্র কয়েক ইঞ্চি নড়ে চড়ে নিজের শরীরকে কর্মঠ রাখেন, তাঁরা বাতের ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত ছুটো মাথার তলার রাখেন এবং ঘাড় দিয়ে চাপতে চাপতে মাথাটা তুলতে থাকেন বতরূপ না চিবুক এসে বুকের ওপরে ঠেকছে। তারপর তাঁরা মাথাটা আন্তে আন্তে নিচের দিকে নাবিয়ে ফেলেন। কিংবা শোয়া অবস্থা থেকে আন্তে আন্তে উঠে বসবার চেষ্টা করেন তাগপর আবার আগেকার মত শুয়ে পড়েন। এই ব্যায়ামগুলি যে কোন লোকের পক্ষেই উপকারী।

এ ব্যাপারে আপনিও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। রাত্তির বেলা বিছানার ওপরে হাত পা বেশ ভালো করে ছড়িয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ুন। তারপর গোড়ালি থেকে আরম্ভ করে চোখের পাভা ছুটো পর্যন্ত সক্রিয় করে তুলুন—প্রত্যেক মাংসপেশী একবার সঞ্চিত করে তারপর সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসুন। কতক্ষণই বা সময় লাগবে এ ব্যায়াম করতে। কিন্তু হযত দেখবেন তার পরই বেশ আরামে আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন।

সকাল বেলায় একটু নিঃশ্বাসের ব্যায়াম করলে আপনি নিজেকে কেঁই প্রাণময় হয়ে উঠবেন, সমস্ত আড়ট ভাব এক মুহূর্তে আপনাকে কেঁই কেটে যাবে। আঙো ঘূমে আঙো জাগরণে যখন আপনাকে বিছানার ওপরে পড়ে আছেন তখন বেশ গভীর ভাবে নিঃশ্বাস টেনে শাসনরুদ্ধ হাওয়া দিয়ে তরে তুলুন। তারপর সুখ ও নাক বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে শুয়ে থাকুন। ক্রমশঃ দেখবেন আগে বতটা পায়তেন তার চেয়ে বিস্তৃত সময় আপনি নিঃশ্বাস ধারণ করে থাকতে পারেন। এক পরে যখন আপনি নিঃশ্বাস ছাড়বেন, দেখবেন আপনি অসাধারণরূপে প্রাণময় ও কর্মঠ হয়ে উঠছেন।

তা' ছাড়া আরও অল্প ব্যায়াম করতে পারেন। বিছানার ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দু'টো ওপর দিকে বেশ প্রবল ভাবে ছড়িয়ে ধরুন বতর্কণ না কোমর পর্যন্ত মাংসপেশীগুলির টান অল্পতবে করেন। কয়েক সেকেন্ড পরেই হাত দু'টো ধীরে ধীরে নামিয়ে নিন। তারপর পা দু'টো উঠু করে ব্যায়াম করুন। পরে পা নিচু করার সময় সতর্ক থাকবেন যেন আপনার গোড়ালি বিছানা না স্পর্শ করে। এই প্রক্রিয়া ক'বার করলেই দেখবেন আপনার পেটের পেশীগুলির ওপরে টান পড়ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় ব্যায়াম করলে পেটের মেদ কমে গিয়ে আপনার শরীরের মধ্যভাগটা বেশ সবল হয়ে উঠবে।

শোষক পত্রবার সময় এক পায়ে ঝাঁড়িয়ে জুতো পরবেন ও

জুতোতে কিত্তে বাঁধবেন। প্রথম প্রথম এই রকম করার সময় দেয়াল ধরে অভ্যাশ করবেন। পরে দু'টার দিন করবার পরই দেখতে পাবেন দেয়াল না ধরেই এ কাজ আপনি অনায়াসেই করতে পারছেন।

ভেবে দেখলে আশ্চর্য হবেন, প্রতিক্রিয়ার কতগুলি অঙ্গল কর্মহীন সেকেন্ডে আপনাকে নষ্ট করতে হয়। কোথাও বাঁচেন, কোন দোকানের কাউন্টারে ঝাঁড়িয়ে আছেন, কাজ করতে করতে আর ভালো লাগছে না, চেয়ারে চূপ করে বসে আছেন, বা বসে থাকতে থাকতে বিরক্তির ধরে গেছে, তাই চেয়ার ছেড়ে ঝাঁড়িয়ে উঠেছেন খানিকক্ষণ। এই সব অঙ্গল মুহূর্তগুলিকে আপনি ইচ্ছে করলেই প্রশাসনিক সম্পন্ন করে তুলতে পারেন।

—বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়।

একাডেমি অব ফাইন আর্টসের শিম্প-প্রদর্শনী

অশোক ভট্টাচার্য

চিত্রাঙ্গদী মাত্রই প্রতীক করে থাকেন বহুদিকে আয়োজিত একাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীটির জন্তে। এবার হয়তো তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়েছেন একাডেমির নিজস্ব নিকেতনে এই প্রদর্শনী উদ্বোধিত হয়েছে জেনে। কিন্তু প্রদর্শিত শিল্পসম্ভার দেখতে গিয়ে তাঁরা কতটা তৃপ্ত হবেন সে বিষয়ে সন্দেহান্বিত হতে হয়।

অল্প উত্তোক্তারা প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্তে ভারতের বিশিষ্টতম শিল্পীদের কিছু কিছু সৃষ্টিকর্ম সাজিয়ে ধরেছেন। তবু একথা না বলে পারা যায় না যে, নবীন শিল্পীদের শিল্পনিদর্শনগুলি কোনোক্রমেই আশাহরুপ নয়। তুলনামূলক ভাবে তবু স্থিতি বিভাগের কাজ নজরে পড়ে।

আচার্য নন্দলাল বসুর ছবি চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ—'সন্ধ্যাশীপ' ও 'প্রোক্তের মাছ'। সন্ধ্যাশীপ ছবিটি দেখলে বোকা যায়, রেখার বিনিমূল্যের সেই মহান শিল্পী কী অসামান্য দক্ষতার সঙ্গেই না ঘন অলসভাবে পশ্চিমী ইন্সপিরেশনটি শিল্পীদের নৈপুণ্যে একটি নেহাত বাঙালী বিষয়বস্তুকে শিল্পায়িত করেছে। দ্বিতীয় ছবিটি টানের কাজ—জাপানী পদ্ধতিতে অরণ করার।

এর পরই আসে গোপাল ঘোষ, রামকিরণ বেইজ, গণেশ হালুই প্রমুখ প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীদের কথা। গোপাল বাবুর প্যাট্রনে আঁকা ছবি নিরঙ্গ চিত্র টাঙ্গানো হয়েছে। প্রতিটি ছবিতেই শিল্পীর গীতিধর্মী মন মূর্ত হয়ে উঠেছে। দিনের বিশেষ এক মুহূর্তের আলো ছায়া ও নরকে শিল্পী বাস্তব করে তুলেছেন বসন্ত-হৃদয়ের Composition ও রঙের আবরণীও প্রয়োগে। বিষয়বস্তুতে নয়, রচনাপদ্ধতিতেই ব্যস্ত হয় গোপাল বাবুর খাতজ্ঞা। রামকিরণ বেইজের ছবিতে এক অল্প ভগ্ন প্রভাবাত হয়েছে। প্রকৃতির সাদৃশ্যকে অতিক্রম করে আধুনিক কিতাবিসের ধারায় রেখা ও রঙের ছন্দ সৃষ্টি করেছেন তিনি। সাধারণের অনধিগম্য তাঁর শিল্প-নিদর্শনগুলিতে তৃপ্ত হবেন তাঁরা বীরা সৌন্দর্যকে পরিহার করে

চান আকৃতি বা রূপের (form) সেবা। গণেশ হালুই রচিত ছবিগুলির মধ্যে সব থেকে মনোহর হলো 'অমরত্বের গুহ' (১২৭)।

বাংলার বাইরের যে সব শিল্পীদের চিত্রাবলী প্রদর্শিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য আলমেলকর। তাঁর পাঁচটি ছবির মধ্যে সব থেকে ভালো লাগলো 'সাধী' ছবিটি—রঙের ব্যবহারে সংযমের জন্তে। 'বোটজেরি' ছবিটির কম্পোজিশন শুল্কর কিন্তু অবিরক্ত চড়া বং চোখে লাগে। মনহার মাকোরানোর 'গুরু বাজার', কান্ডির 'সোরাট্রের গোয়ালিনী', প্রেলিক জেনের 'পানিহকন' এবং মুদৈবরের 'নির্জন নৌকা' ভালো লাগে, কিন্তু কানওয়ারলের ছবি মনে দাগ কাটে না।

বাংলার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সব থেকে মনোহর মনে হয় মণিলাল দত্তগুপ্তের 'বাজনদার'। দিলীপকুমার দাসের 'ঘরহুখো' এবং শ্রুতমল শাসুরের একটি ছেঁচ (২৫২) ও চিত্র সরকারের একটি কাঠখোদাই (২৪১) উল্লেখযোগ্য।

সামগ্রিক ভাবে জলরঙের কাজ তেলরং বা প্রোটারীতির (ওরিয়েন্টাল) বিভাগ দুটির তুলনায় উজ্জলতর। ওরিয়েন্টাল বিভাগের গুণগত ও সংখ্যাগত দৈব থেকে একথা স্পষ্ট যে, আজকের শিল্পী আর কোন এক বাঁধনধরা রীতিতে চিত্রাচারিত বিষয়বস্তু একে বেতো রাজি নয়। নতুন বিষয় ও নতুন আলোকের প্রতি তার লক্ষ্য—সে লক্ষ্যে পৌছনো কঠিনসাধ্য হলেও।

মুতিগুলির মধ্যে রামকিরণের বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ও মধুর সিং-এর প্রতিকৃতি ছাড়া চিত্রাচারিত্যের 'প্রতিকৃতি' এবং প্রথম দৈবের 'ইউনিট' সবিশেষ উল্লেখ্য। কণিভূষণ ও সুনীল পালের কাজও আনন্দদায়ক।

পরিশেষে একথা না বলে পারছি না যে, উত্তোক্তারা চিত্র নির্বাচনের ব্যাপারে আরও একটু কঠোর হলে হয়তো বাংলার একাডেমির মান ঠিক থাকতো।

স্বর্ণ অঙ্কন করব প্রাচীন বাংলার সমাজে নারীর স্থান কেমন প্রায়শঃ সম্বন্ধে দু'-চার কথা। তখনকার দিনে মেয়েরা স্বল্পপাখ্যক। মিল ছিল তা সঠিক জানা যায় না। 'পবনবৃন্তের' আলোকসজ্জা। শ্রীমতী গণের রাজধানী বিজয়নগরের বে বর্ণনা করেছেন দিব্যানু স্তম্ভ নারীর অবাধ মিলনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সময় সে নিজের জগদ্বারীর মিলন সম্বন্ধে তখনকার নীতি ও ধারণা যে সবই সাক্ষ্য আগবের ভিন্ন ছিল এবং আজকাল যাকে আমরা বিদেশী গল্পগুস্তব করে বাঁধি কবি তা যে প্রাচীন কালও প্রচলিত ছিল, এ অভিমান করে বলে, বলা। নারী সম্বন্ধে সেকালের ও একালের মিলেবু হয়তো চেনে স্বয়ং আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। চিত্তকুহর্যকে এক মল্লিকা স্বপ্নশিক্ষিত্যের মত মন্দিরে দেবদাসী পায়ে ম'। এই নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন

দিব্যানু-মল্লিকার এক নমুনা ছিল। এই সব দেবদাসীরা মুখ্যতঃ বিবাহের গাঁটছড়া নেগাইই শক্ত ব ব্যবসায় করতো। কান্দীরস্ব দৈব সম্বন্ধেই হিন্দু দিব্যানু উপর। তার কথা কবি কহান অসদ্ব্যেতে ও লাভ করেছে একটি কল্প। মেয়েটি গা খোকার করতেই হবে বে, হয়েছে।

প্রতিদিনের মত সময় মন আজকে ছিল না দিবে, পক্ষেও প্রানির বই হাতে করে চুপিগাড়ে ওপরে উঠতে থাকে। যে উচ্চ এড়ায় না। বলে ওটা কি বই? এখানে করি,

রাশি বাশি গল্পের বইয়ের পাঠিকা হিসাবে মাল্লিকাকে নিঃ- গ্রন্থকীট আখ্যা দিতে পারা যায়। স্বামীকেও তাই গোটা দুই লাইব্রেরীর মেথার হতে হয়েছে নেহাই পর্যাধে। অর্ধ-অঙ্গের অধিকারী হিসাবে মল্লিকার স্বামী হয়েছেন সভ্য, পক্ষী পাঠিকা। বাই হোক, আজ ছিল বই বঙ্গের দিন। লাইব্রেরীতে বড় ভাঁড় ছিল। নতুন বই নেওয়া আর হলনা। দিব্যানু বছর কাছ থেকে পাওয়া বইখানা শক্ত করে ধরে গৃহে ফেরে। বাস্তব আজ তার কাছে বড় ভাগ্রত, তার তীব্র নখর ভরাবহ মুখভঙ্গী। নাটক নভেলের জাকবি আজ অসহ্য।

—হ্যাঁ গোটা কি বই? মল্লিকার সাংস্রক প্রশ্ন। উঃ! উজ্জ্বল বৈদ্যাতিক আলোকে কি কীকী দেবার উপায় আছে? দিব্যানু গভীর মুখে ভানায় ওটা গল্পের বই নয়—তরুণী ভাস্করী বই। মল্লিকার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে ওঠে। শায়দীয়া সখ্যাত্যাতর হাড়া বই কি কখনও একটা ভাস্করী বই হয়? দিব্যানু স্বয়ং অবসর নেই কোনদিকে দৃষ্টিপাত করায়। সে নিজের ঘরে চলে যায়।

নরেন্দ্রা একবারে রায়েল। কি দরকার ছিল ওকে দেখানয় 'দীপালোক'খানা? এত বই আছে হস্তভাগীর চোখে ধরা পড়ল ঠিক ঠিক। নরেন্দ্র শত্রু তার, হ্যাঁ একবারে শত্রু।

সারারাত হুটকট করে অনেক সবালেই উঠে পড়েছে দিব্যানু। সাধারণতঃ নটার আগে সে পুহসংলগ্ন ডিসপেনসারিতে নামে না। সকাল সাড়টা। দিব্যানু পোষাক পরে তৈরী হয়।

মল্লিকা ব্যস্ত হয়ে বলে ও কি, এত সকালে কোটপ্যাট পরেছ কেন? আজকের দিনে বাজারীরা সাধ নিতে হয়। খুঁসি বৃষ্টি হলে সন্ধ্যা।

অস্বস্তি পালন করতো। লোকে অবশ্য তাদের সঙ্গ অবলম্বনকার বলেই মনে করতো এবং কোনো শুভ কাজে বা অশুভানে তাদের যোগ দেওয়ার অধিকার ছিল না। শাস্ত্র ও সমাজ মৃত স্বামীর সঙ্গে সহযোগে বাবার জন্তই তাদের উৎসাহ মিত। মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তারা যে মোটামুটি জানতো এবং চিঠিপত্র লিখতে পারতো তার প্রমাণ আছে। অনেক মেয়েরা আবার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ দিয়ে আজীবন ভিক্ষুত্বের ব্রতপালন করতো। এদের নিষ্ঠা, সংযম ও চরিত্রের পবিত্রতার কথা চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইংসিয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়। এ ছাড়া হিন্দুদের নানাপ্রকার আচার-ব্যবহার রীতিনীতি বিষয়ে সমসাময়িক গ্রন্থে ও তাত্রাশাসনে উল্লিখিত হয়েছে। ভট্টসেব প্রভৃতির গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন শাস্ত্রোক্ত নিয়ম প্রণালী দ্বারা বিধবদ্ধ ছিল। শিশুর মাতৃগর্ভে স্থান পাওয়ার সময় থেকে জন্মিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সমস্ত অশুভানই পিতামাতা সম্পন্ন করতেন। শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই 'জাতকরণ' করার বিধি ছিল। তার ছয় মাস বয়সে অন্নপ্রাশনে উৎসব সম্পন্ন হোত। এ ছাড়া এক বছরের মধ্যে নামকরণ অশুভিত হোত। নামকরণের সময় পিতা হোম বজ্র ইত্যাদি করার পর, শিশুর যে নাম রাখা হিব হোত, তাই মাতা শিশুর কর্ণে উচ্চারণ করতেন। এ ছাড়া উপনয়ন এবং ত্তকগৃহে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করা এ সবও তখন আচার-অশুভানের অঙ্গ হিসাবেই মনে করা হোত। স্বামীর বিশেষ ব্যক্তির সময় মেয়েরা তাঁদের মঙ্গল কামনায় নানা রকম ব্রত করতো। কিন্তু স্বামী আবার অশুভের চোখে সন্দেহভুক্ত করবার জন্য তাঁকে 'জয়পত্র' লিখে দিয়ে যেতেন। তাই প্রাচীন সাহিত্যে দেখি, মাঃ, স্বখন রাজার আদেশে সিংহলে যাবিঃঃ বাছেন তখন সিন্ধে গর্তবতী বুলনাকে 'জয়পত্র' লিখে দিয়ে গেছিলেন।

কপালে অনেক 'তোরে আশীর্বাদ মোর পরম পীরিত'। বসে থাকে।

এ কি! চমকে ওঠে দিব্যানু। কীর্ষন মল্লিকা এসে তার গলায় মালা পরিয়ে দিল, সে খোয়ালট করেনি। মল্লিকা পায়ের ধুলো নিয়ে প্রশংসা করছে তাকে। আড়ষ্ট করে দিব্যানু বলে—থাক। সুরভিত কুসুমদ্বার আনাদরে টেবিলে রেখে বলে, আর এসব করবার মত আমাদের বয়স আছে মল্লিকা? আর ধর, আমি প্রতিবাদের মত, তোমাকে যদি এটা পরিয়ে দিই, তোমার কি ভাল লাগবে? নেহাই ভাল-ভাতের মতই একঘেয়ে স্বামীর কঠোর মালা।

মল্লিকা খতমত খেয়ে যায়। দিব্যানু কি রসিকতা করছে তার সঙ্গে? কিন্তু এই সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করা কি ঠিক?

বিচিত্র হাসি হেসে বলে দিব্যানু—ঠিকই বটে মল্লী—পতিভ্রাতা স্ত্রী কি কখনও স্বামীর দেওয়া মালাকে অবহেলা করতে পারে? আমি রসিকতাই করছিলাম।

দুপুরে আহাযের পর দিব্যানু ঘরে থিগ এটে 'দীপালোক'খানা খুলে বলে। মল্লিকার মায়ের ছবি—ত্রিশ বছর আগেকার। ঠিক মল্লিকার মত। কণিকা রঙ্গমকর নামকরা অভিনেত্রী। কেবলমাত্র অভিনয়-কুশলীই নয়, কণিকা নৃত্য-পাণ্ডরী। এই যে নৃত্যদ্বন্দ্ব হবি রয়েছে, দিব্যানু চম্ভায় চোখ বোজে। পুনরীয়া স্বপ্নমতীর জীবন-কাহিনী পড়তে থাকে। বিবধা পঞ্চদশ কণিকা সিন্ধে-অসুতে প্রবেশ করেন।

তা' হাড়া আরও অল্প ব্যায়াম করতে পারেন। ব্রিহানার ওপরে চিহ্ন হয়ে ওয়ে হাত দু'টো ওপর দিকে বেশ প্রবল ভাবে ছড়িয়ে ধরুন বহুভূমি না কোমর পর্যন্ত মাংসপেশীগুলির টান অনুভব করেন। কয়েক সেকেন্ড পরেই হাত দু'টো ধীরে ধীরে নাবিয়ে ফেলুন। তারপর পা দু'টো উঁচু করে ব্যায়াম করুন। পরে পা নিচু করার সময় সতর্ক থাকবেন যেন আপনার গোড়ালি বিছানা না স্পর্শ করে। এই প্রক্রিয়া ক'বার করলেই দেখবেন আপনার পেটের পেশীগুলির ওপরে টান পড়ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় ব্যায়াম করলে পেটের মেদ কমে গিয়ে আপনার শরীরের মধ্যভাগটা বেশ সবল হয়ে উঠবে।

সোম্বাক পরিবার সময় এক পায়ে দাঁড়িয়ে জুতো পরবেন ও

জুতোতে কিতে বাঁধবেন। প্রথম প্রথম এই কঠোর খেলা দেখাল ধরে অভ্যাস করবেন। পরে দু'চার দিন দেখতে পাবেন দেয়াল না ধরেই এ কাজ আপনি অসুখ বাতায়নে পারছেন।

অশান্ত দেহের ভেবে দেখলে আশ্চর্য হবেন, প্রতিদিনের কল্যাণ! মল্লিকে কর্তৃক সেকেন্ড আপনাকে নষ্ট করতে হয়। কেবল শুয়ে আছে কোন দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছেন, কাজ হলে আর ভালো লাগছে না, চেয়ারে চুপ করে বসে

থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে, তাই হেঁয়ালি মন দিয়ে উঠেছেন খানিকক্ষণ। এই সব অলস মুহূর্তগুলোকে বিদায় দিয়ে করলেই প্রাণশক্তি সম্পন্ন করে তুলতে পারেন। প্রস্তুত হয়ে বইখানা

বের মন কে বুঝবে?

শুধি তো অবাক্তি বিদায়

এই ওতো চেয়েই দেখেন।

একাডেমি অব ফাইন আর্টসের শিল্প-প্রদর্শনী

অশোক ভট্টাচার্য

চিত্রায়োগী মাত্রই প্রতীক্ষা করে থাকেন বহুদূরত্ব আয়োজিত একাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীটির ক্ষেত্রে। এবার হয়তো তাঁরা যিশু উৎসাহিত হয়েছেন একাডেমির নিজস্ব নিকেতনে এই প্রদর্শনী উদ্বোধিত হয়েছে যেন। কিন্তু প্রদর্শিত শিল্পসম্ভার দেখতে গিয়ে তাঁরা কতটা তৃপ্ত হবেন সে বিষয়ে সন্দেহান হতে হয়।

অবশ্য উদ্বোধনকার প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় করে তোলবার চেষ্টায় ভারতের বিশিষ্টতম শিল্পীদের কিছু কিছু স্ট্রীকও সাজিয়ে ধরে আঁক তবু একথা না বলে পারা যায় না যে, নবীন শিল্পীদের শিল্পগুরু আহ্নারে প্রদর্শিত শিল্পের মতো হৃদয়ঙ্গর হয়ে উঠল না দিব্যোন্মুখ? না চোখের ভুল—দিব্যোন্মুখ মত স্বাধীন ভালবাসার সন্দেহ কেন তোমার? চিত্রায়োগী মল্লিকা চমকে ওঠে—একি, তোমার খাওয়া হয়ে গেল—লক্ষ্যটি তোমার পায়ে পড়ি, বল তোমার কি হয়েছে?

ট্রিক মনে হচ্ছে মল্লিকা অভিনয় করছে। ক'দিন আগে দেখা 'বাস্তবতা' ছবিটা দিব্যোন্মুখ চোখের সামনে জেগে ওঠে। নারিকা স্বামীকে পীড়াপীড়ি করছে আর একটু আহ্নার করার জন্তে অখণ্ড মন তার চকস হয়ে আছে কখন স্বামী বিদায় নেবে।

দিব্যোন্মুখ মল্লিকার দিকে তাকায়—অপ্রসঙ্গিক ওর ঘন-পদ্ম নয়ন। মল্লিকার চোখে জল—ইচ্ছা করে ওর অপ্রসঙ্গিক মুখখানা বুকের মধ্যে টেনে নেয়। নাঃ নেহাই বোকা সে। শিল্পপরিচর্য কবিকার মেয়ের চোখের জলে ভুলবে না আর, কতকক্ষণ ছলকলা জানে ওরা।

একবার ভাঃ গুপ্তক ডাকাই—হয়তো ভেতরে ভেতরে ধর হচ্ছে, উৎসাহকূল কঠ মল্লিকার।

—এ বোগ আবার কেউ সাহায্যে পাঠাব না—বুধা ভেবে কঠ পোক না।

প্রায় প্রতিদিনের মতো। মল্লিকার কাছের পাকসজ্জা নয়নই-

দাঁড়ে সেই অন্তত পত্র, যেখানে প্রকাশ করে দাঁড়িয়ে আছে ওঠে দিব্যোন্মুখ—তার পর কখন ইতিহাসের গর্ভে।

তথ্য দুটি চরণসম্ভার নুপুরের কিস্কিনী শোনার চান আকর্ষণীয় শিল্পের অধার আরও প্রতীক্ষা করছে আর ছবিগুলির মূর্খণে আবহু রাবার জন্তে হয়তো দিব্যোন্মুখও লজ্জিত বাংলা-আর বলা যায় না, মল্লিকার শিরা ধমনীর মধ্যে যে উগ্র তাঁতে-শ্রোত বইছে সেও তাকে ডাকছে এস এস। স্মৃতি কুমতির ভাষে হয়তো স্মৃতিরই জয় হবে কিন্তু এমন একদিনও আসতে পারে যেদিন মল্লিকা এ সবেব মোহজাল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে না কিন্তু সেদিনের দুঃখ লইবে কি করে দিব্যোন্মুখ?

হাল্কার পাঁচেক টাকা মল্লিকার নামে ট্রান্সফার করে দিল দিব্যোন্মুখ। মল্লিকার বিমিত্ত দৃষ্টি দেখে দিব্যোন্মুখ হেসে বলে,—তুমি ভো আমাকে খোলা বুল—মনে কর এও একটা খেলা। কোলকাতার বাজীও মল্লিকার নামে কেনা। এত বড় বাজীর কিয়দংশ ভাড়া দিলেই অনায়াসে চলে যাবে মল্লিকার। অবশ্য হয়ত দিব্যোন্মুখ টাকারও দরকার হবে না ওর। সে বাকি—অরিসাক্ষী করে থাকে দ্বী বলে গ্রহণ করেছে তার উপর স্বামীর ভো একটা কর্তব্য আছে? তারপর ছলকাকে নিয়ে চলে যাবে এমন এক ভায়গায় যেখানে প্রোডেনের উগ্রতা নেই।

রাত্রি একটা। দিব্যোন্মুখ ছোট একটা চিঠি লিখে টেলিফোন চাপা দিয়ে রাখে। খাটে শায়িতা পত্নী, দিব্যোন্মুখ নিশেজে তাকিয়ে থাকে তার দিকে—বর বর করে ক' কঁটা জল ধরে আসে চোখের কোল বেয়ে।

তার পর সে নিশ্চিন্তা কতাকে বুকে করে নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল অজানার পথে।

প্রাচীন নারী ও আচার-অনুষ্ঠান

বেলা দে

সুহাসে নারীর জীবন দেশের একটি প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ কোন দেশ সভ্যতার কোন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছিল তা জানতে হলে সেই দেশের নারীর মর্যাদা ও জীবনবাহ্য প্রণালী কেমন ছিল তা

সকলেই জানা স্রকার। এই প্রবন্ধের শিরোনাম হাই থাক না কেন, আমি শুরু করব প্রাচীন বাংলার সমাজে নারীর স্থান কেমন ছিল, আগে সে সৰ্ব্বত্র দুঃ-চাব কথা। তখনকার দিনে মেয়েরা কতটা পর্দানশীন ছিল তা সঠিক জানা যায় না। 'পবনদূতের' কবি খোয়ী সেন-রাজগণের রাজধানী বিজয়নগরের যে বর্ণনা করেছেন তাতে পুরুষ ও নারীর অবাধ মিলনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ঘোড়ার উপর নরনারীর মিলন সৰ্ব্বত্র তখনকার নীতি ও ধারণা যে একালের থেকে ভিন্ন ছিল এবং আজকাল যাকে আমরা বিদেশী অমূল্য বলি মনে করি তা যে প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। নারী সৰ্ব্বত্র সেকালের ও একালের মনোবৃত্তির গুরুত্ব প্রভেদের আঁচনা অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সেকালের বাংলা দেশে দক্ষিণাত্যের মত মন্দিরে দেবদাসী রাখার প্রথা ছিল। এদের অনেকেই নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন সুকুমার শিল্পে বিশেষ পারদর্শিনী ছিল। এই সব দেবদাসীরা ব্রূহতঃ না হলেও গোপনতঃ রূপোপজীবিনীর ব্যবসায় করতো। কাম্বীরাজ জয়শীল'র সঙ্গে কুমলার যে সখ্যতার কথা কবি কল্লান অসহ্যে ও বিশগভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই প্রেমীর মেয়েরা তখন সমাজে খুব ঘৃণিত ছিল না। এমন কি, প্রকৃষ্টভাবে তাদের নজর ঘনিষ্ঠতা করা রাজাদের পক্ষেও গ্রামির বিষয় বলে গণ্য হতো না। ঘোড়ার উপর, নারীর চতুর্ভাষার যে উচ্চ আদর্শিক আমরা নারীর একমাত্র মর্যাদার বিষয় বলে মনে করি, প্রাচীনকালের আদর্শে তা বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না।

তখনকার দিনে মেয়েরা কতটা পর্দানশীন ছিল, তা সঠিক জানা যায় না। পবনদূতের কবি খোয়ী সেন-রাজগণের রাজধানী বিজয়নগরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলোমেল, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। আর এটি যে কেবলমাত্র নিরপ্রেমী অথবা দুঃচরিত্র নরনারীর গোপন অভিসারের চিত্র তা মনে করবার কোনো কারণ নেই। অস্তিত্বঃ রাজকবি খোয়ী সাধারণ ভাবেই বাঙ্গালী নরনারীর চরিত্র এঁকেছেন এবং তার চিত্রটি যে অতিরঞ্জিত বা অসাধারণ, এমন কোনো ইঙ্গিতও করেন নি। বিজয়নগরের নাগরিক ও নাগরিকারা ফুলের মালা পরে উপবনে লোমনার চড়তো, লীখির জলে ভলকড়া করতো, এমন অনেক রকম আমোদ প্রমোদেরও উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন জায়গায় দেখা যায় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা চিকের আড়ালে থেকে বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপ করতেন, কিন্তু রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে মেয়েদের ফুল বোগাবার অস্ত্র নগর-রাজ্যদের অবাধ গতি ছিল। বাস্তবায়নের এই উক্তি থেকে মনে হয় না যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারেরও পর্দাপ্রথা খুব কঠোর ছিল।

ফুলবধুর জীবন ও আদর্শ যে এখনকার মতই খুব উঁচু ছিল, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। হিন্দুযুগের শেষকালে মেয়েদের সাধারণতঃ অল্প বয়সেই বিবাহ হতো, তবে বেশী বয়সের বিবাহের কথাও কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ আছে। যথাস্থিতির ঘরের মেয়েরা খুতো তৈরী করে কাপড় বুন ও নানারকম শিল্পের দ্বারা স্বামীর সাহায্য করতো। নৃত্যগীত জলকীড়া প্রভৃতি উৎসব গৃহবধুর পক্ষেও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহাধীন এখনকার মতই সকল প্রকার পুণ্য-বাহাদুর, বিলাসিতা ত্যাগ করে কঠোর

জগদ্যব পালন করতো। লোকের অল্প ভাসের সঙ্গে অকল্যাণকর বলেই মনে করতো এবং কোনো শুভ কাজ বা অহুতানে তাদের বোগ দেওয়ার অধিকার ছিল না। শাস্ত্র ও সমাজ বৃত্ত স্বামীর সঙ্গে সহস্রগণে বাবার জন্তই তাদের উৎসাহ দিত। মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সৰ্ব্বত্র বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তারা যে মোটামুটি জানতো এবং চিঠিপত্র লিখতে পারতো তার প্রমাণ আছে। অনেক মেয়েরা আবার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বোগ দিয়ে আজীবন ভিক্ষুসী ব্রতপালন করতো। এদের নিষ্ঠা, সংযম ও চরিত্রের পবিত্রতার কথা চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইংসিয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়। এ ছাড়া হিন্দুদের নানাপ্রকার আচার-ব্যবহার রীতিনীতি বিষয়ে সমাদারিক গ্রন্থে ও তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে। ভট্টদেব প্রভৃতির গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন শাস্ত্রোক্ত নিয়ম প্রণালী দ্বারা বিধিবদ্ধ ছিল। শিশুর মাতৃগর্ভে স্থান পাওয়ার সময় থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সমস্ত অহুতানেই পিতামাতা সঙ্গায় করতেন। শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই 'জাতকরণ' করায় বিধি ছিল। তার ছয় মাস বয়সে অন্নপ্রাশন উৎসব সম্পন্ন হতো। এ ছাড়া এক বছরের মধ্যে নামকরণ অহুতি হতো। নামকরণের সময় পিতা কোম বস্ত্র ইত্যাদি করার পর, শিশুর যে নাম রাখা হির হোত, তাই মাতা শিশুর কর্ণে উচ্চারণ করতেন। এ ছাড়া উপনয়ন এবং ওকগৃহে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করা এ সবও তখন আচার-অহুতানের অঙ্গ হিসাবেই মনে করা হতো। স্বামীর বিদেশ যাত্রার সময় মেয়েরা তাঁদের মঙ্গল কামনার নানা রকম ব্রত করতো। কিন্তু স্বামী আবার অস্ত্রের চোখে শঙ্কেহমুক্ত করবার জন্ত স্ত্রীকে 'জয়পত্র' লিখে দিয়ে যেতেন। তাই প্রাচীন সাহিত্যে দেখি, ঘনপতি বখন রাজার আদেশে সিংহলে বাগিচা বাছন তখন ছয় মাসের গর্ভবতী খুন্নাকে 'জয়পত্র' লিখে দিয়ে গেছেন।

"তোরে আশীর্বাদ মোর পরম শীর্ণ।"

সন্দেশ ভাঙ্গন পত্র হইল লিখিত।

বখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস।

হেনকালে নৃপদেশে বাই পরবাস।"

বহুবিবাহ প্রথা তখনো ছিল এবং স্বামীর দুই তিন স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতেও দেখা যেতো। এমন কি, দুই সতানের ঝগড়ায় অনেক কাহিনী আমরা প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করলে দেখতে পাই। বিশেষ করে সহনা ও খুন্নার মধ্যে আমরা সেই চিরন্তন কোন্দলের রূপ দেখি।

গৃহকর্মকে মেয়েরা কোনদিন অবহেলা করেনি। সে যুগের মেয়েরা শত ব্যাপারের মধ্যেও গৃহকর্মকে তুলত না। সকল রকম সামাজিকতা ও আচার-অহুতানের মধ্যে দিয়েই সেকালের মেয়েরা একটা সূত্রে চরিত্র পরিচয় দিয়ে এসেছে।

মাতৃজাতি কোন্ পথে?

শ্রীমতী কণা দেবী

মাতৃজাতি-জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, আর সেই ভিত্তির ওপর অভিব্যক্তির সাধনা গড়ে উঠলি। ভিত্তি প্রতিষ্ঠা যদি সার্থক হয়, তবেই তার ওপর প্রাসাদ আশীর্বাদ দ্বারা

হাতে পাই, নয়তো শিল্পীর সকল সাধনা নিতান্ত অসময়ে সর্বাধিক হয়ে যায় তরত্পুরে চলে।

সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন—‘মা হওয়া কী সুখের কথা।’ বড় সত্য কথাই বলেছিলেন কবি। মা হওয়া সুখের কথা নয়। সন্তান মায়ের কাছ থেকেই জীবনের বীজমন্ত্র শেখে, শেখে পথ চলে। সেই আশি-শিক্ষা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তা হ’লে সন্তানের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে যায় ব্যর্থ এবং সেই ব্যর্থতার, মানব-জীবনের চরম অপচয়ের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী সন্তান-জননী। এই দোষ কালনের কোন পথ নেই।

কিন্তু মাতৃজাতির এই ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্য মাতৃজাতিটুকী দায়ী? এখন অনায়াসে বলা চলে—না। এদেশের মাতৃজাতিকে পিতৃজাতি সে কোন অন্তর্ভুক্ত থেকে মানবীর অবাধ্যা জীবন দিয়ে রেখেছেন। বুগের পর বুগ এমন চরভাগ্যের বোঝা ব’য়ে ব’য়ে এ দেশের সাধারণ মায়েরা ভুলে গেছেন নিজের জন্ম-উদ্দেশ্যের কথা। তাই কল্যাণ সৃষ্টি না করে তাঁরা সৃষ্টি করছেন অকল্যাণ। চরুপা এদেশ তাই আজো।

মা নিজে শালীনতার আখ্যায় পাননি, নিয়মবহুতির কথা তাঁর অজানা। তাই তাঁর সন্তান অবিনীত, উচ্ছ্রাস। এখানে অবস্থা বলা প্রয়োজন যে, ভারতের সকল মা ও সন্তান এই পর্যায়ভুক্ত নয়, ব্যতিক্রম নিম্নতরই আছে। কিন্তু তা নয়গণ্য। রাজ্যের রাজধানী আর গুটিকতক শহরের বাইরে যে শত শত পল্লীগাম—শিক্ষা সভ্যতার স্পষ্ট আলোকহীন লোকালয় আছে, সেখানে মানবতার আর্জবরই ধ্বনিত হয় রাত্রিদিন। মা সেখানে নিজের অকল্যাণপ্রতী জীবনধর্ম পালন করে বান, বা থেকে সন্তান বোণ্য উত্তরাধিকারই লাভ করে চলে। যে জাতি জননীদেব দেশের স্বসন্তান সৃষ্টিকারীরূপে তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি করে থাকেন, সেই জাতির মা ও সন্তানদের সঙ্গে এ দেশের বিশেষ পরিবেশের মা ও সন্তানদের তুলনা করলেও আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, আমরা কোথায় পড়ে আছি।

করেক বৎসর আগে এক সম্ভায় কলকাতার কার্জন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছি। মরত্মনী ফুল ফুটেছে এখানে ওখানে। কত স্ত্রী পুরুষ, ছেলে-ময়ে ভাবতের ও বাইরের। একটি অ্যালো-ইণ্ডিয়ান শিশু, বছর তিনের হয়ে, একটি ব’য়ে পড়া কলকে ফুল কুড়িয়ে, বন্ধ করে ধরে, হাসিমুখে দেখতে দেখতে চললো, অঙ্গুর পীড়ানো তাঁর মায়ের কাছে। শিশুর শিশু-সঙ্গীরা ফুল দেখে বড় খুসী। কিন্তু মায়ের চোখে এ দৃশ্য পড়তেই তিনি সন্তানের দিকে মেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। আর শিশু সহজ ভাবেই গিয়ে ফুলটিকে ধখান্ধানে সঞ্চয় রেখে এলো। সঙ্গীরা নীরবে সাহায্যই করলো তাকে। আমাদের কাছেই বসেছিলেন এক ভয়, সুখী তরুণ দম্পতি, সঙ্গে একটি তিন-চার বছরের সুকুমার ছেলে। দম্পতিও দেখলেন এ শিশুদের কাজ। কিন্তু তখনই তাঁদের সন্তান মায়ের হাতের বীধন ছাড়ানোর জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার চকল দৃষ্টি এ ফুলের রাজ্যে। এক সময় সে মুক্তি পেল এবং ছুটে গেল সামনের কেয়ারির কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই তুলে ফেললো কটা ফুল। মুহূর্তের মধ্যে মালী এলো ছুটে, অভিযোগ জানাতে থাকলো, শিশু ততক্ষণে ফুলগুলি হিঁড়ে চটকিরে ফেলেছে। মায়ের মুখে প্রথমে হাসি; পরে মালীর কথার বিরুদ্ধে দেখা দেয়। জয়লোক বেশ লজ্জিত হয়ে পড়েন। তিনি

ছেলেকে সরিয়ে আনতে গেলো ছেলে কেঁদেই অঙ্গুর, আর মা অস্থির ছেলের দৃষ্টিতে।

সাধারণ ঘরে কী দেখি? ট্রেন ছুটেছে বাড়ী নিয়ে। অঙ্গুরে পাড়িয়ে কতকগুলি শিশু, বালক-বালিকা। হঠাৎ তাঁরা সবাই ট্রেনের দিকে পা তুলে লাগি দেখতে থাকে—মুখ ভেঙতে থাকে। একটি মা তাঁর শিশুকে নিয়ে এসেন কুটিরের বাইরে, পাড়ি দেখতে। পাশের শিশুদের অঙ্ককরণ করার দৃষ্টি এই শিশুর তখনো হয়নি; মা জোর হালি হাসতে হাসতে তাই তাঁর শিশুর পা তুলে ধরলেন পাড়ির দিকে। শিশু পরে নিজে নিজে পা নাড়তে থাকে। আমাদের কামরার হাসির রোল উঠলো।

একখানি চায়না সাময়িক-পত্র একবার দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। একখানি ছবি ছিল তাতে—দরিদ্র পল্লীর পাশ দিয়ে রেলপাড়ি বাবার ছবি। শীতের দিন, সকাল বেলা। গরীব মা-বাপের ছেলেদের গায়ে বোণ্য শীতবস্ত্র নেই। একটি খামারে কতকগুলি ছেলে বোদ পোহাতে এসেছে। বয়ীসী মাহল ও ক’জন আছেন। ট্রেন বেতে দেখে শিশুরা দেশীয় বীতিতে বাড়ীদের নমস্কার জানাতে লাগলো। এক প্রৌঢ়া দেখেন বুঝি তাঁর সন্তান নিষ্ক্রম, তাই তিনি তাকে তার সঙ্গীদের অঙ্ককরণ করতে শোখাচ্ছেন। আর বাড়ীরা? তাঁরা ‘শ্রালিউট’ করছেন শিশুদের, আনন্দের হাসি ফেলে।

আমাদের দেশের মা ও সন্তানদের ছবি আর বিদেশের মা ও সন্তানদের ছবি দেখা গেল।

রবীন্দ্রনাথের জীবনযুতির পাতায় বেঙ্গল আর্কাডেমী ও ব্রাইটন স্কুলের ছাত্রদের যে ছবি আঁকা আছে, তা থেকেও পূর্ববর্তিত বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত হয়—একটি কল্যাণকর এবং অল্পটুকু অকল্যাণকর। বেঙ্গল আর্কাডেমীর ছাত্ররা হাতের তেলের কালি দিয়ে অস লিখে ‘ছেলো’ ব’লে আদরের ভান করে, তাঁর পিঠে এ কথা ছেপে দিত, অব ব্রাইটনের স্কুলের ছাত্ররা লুকিয়ে তাঁর পকেটে তেবু, আগুন প্রভৃতি ফল দিয়ে দিত। এ শিক্ষা তাঁরা জন্মের সঙ্গে আনেনি, এ শিক্ষা পেয়েছে তারা ঘরে—প্রধানতঃ মায়ের কাছেই। মায়ের কাছেই যে সন্তানের সব কিছুই হাতেখড়ি হয়। তার ওপর রঙ ফলিয়ে থাকেন পরবর্তী-কালের শিক্ষাপ্রদাতা।

আমাদের দেশের মা ও ভাবী-মা, অর্থাৎ সাধারণ নারীজাতির মধ্যে চৈতন্য-উদ্বীপক গণশিক্ষার প্রসার আজ তাই অপরিহার্য হয়ে পাড়িয়েছে। সে-শিক্ষাদানের জন্য পল্লীতে পল্লীতে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে না, প্রয়োজন—গণশিক্ষাদাত্রী সেবিকার। আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন যদি কাম্য হয়, তবে নারীজাতিকে আত্মসচেতন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে দেশ বড় হয়েছ—সে দেশে নারীজাতি অজ্ঞানের অন্ধকারে, আত্মচেতনাহীন খুশিখার নেই পড়ে। সেখানের সকল নারীই বিশেষ জীবন যাত্রা পরিচালনা শিক্ষার অশিক্ষিতা, তাঁরা জানেন—নারীজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কী, নারীজীবনের সার্থকতা আসে কিসে। ভারত আজও যেন এ দিকে অমনোবোণী, সমাজকে উপেক্ষা করে ব্যষ্টির উন্নয়নের দিকেই প্রধানতঃ কর্মসজ্জিকে নিবৃত্ত করা হচ্ছে।

কিন্তু এ তো কাজের কাজ হচ্ছে না? মহামানবের তাঁর ভারত—অতীতের এই নারী জাতির এই চকল মুখে আর প্রতিষ্ঠা

মিলবে না। বাগ্য সাধনায় ভাবতঃক আবার মহামানবের
তীর্থ করেই তুলতে হবে, তাই গোড়া কেটে আগায় জল না ঢেলে,
গোড়াতেই জল দেওয়া সমীচীন। নানীদের আত্মশক্তিতে সচেতন
করে না তুললে ভাবতে সুদৃষ্টান্ত জন্মাবে না। নিশ্চয় নক্সে
আকাশ ভরে গেল—চাঁদ নেই।

মেঘমল্লার

সাধনা বসু

মুখারিতি রাউণ্ড শেষ করে আলস্ত-মহুৱ পায়ে বিজ্ঞান নিতে
চলেছি, চোখের পাতাগুলোয় একটু ঘুমের আভাস—আলো-
আঁধারী বায়ান্ধা পেরিয়ে কোণের ঘরটার চুকতে বাবার মুখে পিছন
থেকে ভেসে এলো আত পরিচিত মেয়েলি জুতোর মহুগ সংগত। কবের
পাঁড়াতেই মাথুষটাকে চোখে ঝুটলো। একটু এগিয়ে এসে দ্রুত
গলায় বলল—ডক্টর চৌধুরী, সন্তেবো নম্বর কেবিনে একবার আসুন,
তাড়াতাড়ি।

এবার বিস্তৃত হবার পালা আমার। সে কি, একটু আগেই যে
ওই পেসেটকে দেখে আসছি, কোরাইট নবাল।

নার্সের গলায় প্রচ্ছন্ন মনতি যবে পড়ে—কিন্তু আমি এখনই
ওখান থেকে আসছি ডক্টর, একবার চলুন।

ঠোঁটোটা গলায় নামিয়ে সেই-মনের জড়তা ছেড়ে কেলে নার্সের
সঙ্গে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে।

হাসিপাতালের রাতগুলিকে যেন অতীতের বিশাল একটি
শব্দাব্য বলে মনে হয় আমার। শ্রেণিবদ্ধ শব্দাব্য মৃতকর স্তব্ধতার
গহ্বর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠা বস্ত্রপাক্তর জনমের আত্মি যেন
প্রাগৈতিহাসিক স্থবির কোন জীবনের দুর্ভাগ্য মস্তোচ্চারের
মতো কয় আবহমণ্ডলের অর্থও নৈশদকে বার বার বিদীর্ণ
করে দিতে থাকে। জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি অন্ধকার তরঙ্গ
সমুদ্রে আমরা, ডাক্তারেরা জেগে আছে একমুঠা বাতাসের
প্রিয়কণী হয়ে। কিন্তু স্থবির অমূল্য নাড়ীশল্লনকে বিজ্ঞানের
মহৎ আবিস্কৃতি দিয়ে সব সময় কি ফিরিয়ে আনতে পারছি?
তাহলে পৃথিবীতে এত অন্ধ কেন করে? এত বেদনা কেন জ্বল
ওঠে?

নার্সের আহ্বানে চিন্তার বেশটুকু ছিঁড়ে বার সহসা—
ডক্টর, আপনি ভিতরে বান, সিষ্টার দাশ ওখানেই আছেন।

পদীর একটি কোণ তুলে ভিতরে ঢুকতে প্রতীক্ষমান সিষ্টার
চোখের ইঙ্গিতে যোগিনীর প্রতি আমার বিম্মত দৃষ্টি আকর্ষণ
করলেন। বেডের কাছে এগিয়ে এসে প্রথমেই মেটেটির পালস
পরীক্ষা করলাম। নাড়ীশল্লনের গতিপথে কোথাও কোনরকম

মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”
“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স
দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, ভাই,
মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে
ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সত্যতা ও
দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলার্স

শ্রীনি আনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-কর্ম
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



অব্যতীকৃত্য লক্ষ দেখতে না পেয়ে প্রাষ্টারকরা হাতটা সন্তর্পণে
বিছানার উপর নামিয়ে বেখে মেয়েটির দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে মুহূর্তে
প্রায় করি—আপনার কি কষ্ট হচ্ছে বলুন তো ?

কেবিনের ভুট্ট নৈশেদের বুক থেকে খসে পড়লো একটি
বিষয় স্নেহের পল্লব—ডক্টর আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি ঘুমোতে
চাই।

মেয়েটির সুখের জ্যোতি কিছ আশ্চর্য স্বাভাবিক—তার
অনিদ্রাজনিত কষ্টবীকারের কোন পরিচয়ই সেখানে মুদ্রিত নয়।
জুঁ চোখের নীলাভ মণি দুটো যেন অন্ধরের কোন পুঞ্জীভূত
স্বস্ত্যবস্থাকে ঘিরে মাঝে মাঝে কেমন বায়ুর হয়ে উঠছে।

সিষ্টারকে মরকীরা ইনজেকশনের ব্যবস্থা করতে বলে যখন প্রস্তুত
হতে বাচ্ছি, আবার ঘর-ভগানো সেই বেননার্ড ঘর জগে উঠলো—
ডক্টর, আমার মরকীয়ার দরকার নেই, ভতে আমার ঘুম আসে না।

এবার শুধু বিষয় নয়, একটু বিরক্তি এলো মনে। অজুত
স্বভাবের এই মেয়েটি কি বলতে চায় ? আমার রোগশিকারী দৃষ্টিকে
সিষ্টারের সুখের উপর কয়েক মুহূর্ত মেলে দিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা
করলাম সন্তোরা নব্ব কেবিনের অভাবনীয় হাঃপাঃটুহু। কিছ
সেখানেও শুধুই অর্থহীন শূন্য দৃষ্টির কুশাশা ঘনীভূত হতে দেখে শিছু
হটে এসে আবার সহজ হবার চেষ্টা করলাম—মরকীয়া আপনার হুট
না করে আরো অনেক রকম নাৎকোটিক ড্রাগস আছে, তাই না হয়
একটা ট্রাই করি। অথবা কষ্ট শেষে শান্ত কি বলুন ?

মেয়েটির নীলাভ চোখের অন্তলম্ব চাউনিটা কেমন বেন স্তিমিত
ও নিম্ন হয়ে গেল হঠাৎ। টানা চোখের কিনারায় মনে হলো, একটি
বোঝা কাগা হুস্তার মত অলক্ষিতে জমাট বেঁধে উঠছে। কয়েকটি
উপভাস-কল্প মুহূর্ত নিঃশেষে পার হয়ে গেল। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে
দেখি, সাড়ে বাগোটা বেজে গেছে। সারাদিন খাটুনির পর দুপূর্বের
দিকে একটু বিশ্রামের অবসর পেয়েছিলাম, আবার রাত আটটা থেকে
ডিউটি শেষ করে ক্লাস্তির বোঝা নিয়ে তত বাচ্ছিলাম, কিছ এমন
অকল্পনীয় মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের মাঝে আমাকেই যে আজ ছুটে
আসতে হবে এবং কর্তব্য করতে হবে, একথা মনে হতেই সমগ্র
মানসিক পরিমণ্ডলটি অহেতুক ভাবনায় ছেয়ে গেল। মেয়েটির দিক
থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবিনের শাধা দেওহালের গায়ে দুটিনিবন্ধ
দেখে বলি—আপনি বরং একটু চিন্তামুক্ত হয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবার
চেষ্টা করুন, ঘুম আপনিই এসে বাবে। মিষ্টার দাশ তো আছেই,
কোন দরকার পড়লে নিঃসঙ্কোচে ঠেক জানাবেন। আর স্বাচ্ছন্দ্য
দিক থেকেও আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই দেখেছি।

কেবিনের দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই আবার বাধা পেলাম—
ডক্টর, আমার একটি অল্পরোধ রাখবেন ?

কিবে এলাম বেড়ের কাছে। দেখি, নীলাভ দুটি চোখের সমুদ্র
দুড়ে অব্যক্ত ব্যাকুলতার অস্ত্র চোটে ভাঙছে, কিছ পাংলা টোট দুটি
ঘিরে 'ল্যাগুন'র নিটোল প্রোশাভ।

মেয়েটি তার প্রাষ্টারকরা ডান হাতটি বাড়িয়ে আমার একটি হাত
ঘরে আঙুল আঙুলে বলল—ডক্টর গোবুরী, আমাকে গল্প শোনাবেন
আপনি ? গল্প শুনে আমার খুব ভালো লাগে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দিবসের হাঙ্গামার কবিনে এক অবিবাহিতা তরুণীর
দাঁহ থেকে এ ধরণের অল্পরোধ শুনে প্রথমে একটু বিম্ব-বিম্বল

হয়ে পড়লেও পরমুহূর্তে সামলে নিলাম। এক্ষেত্রে বর্তমান
চিরিংসকলভদ্র মুহু ভবংসনা মেয়েটিকে করা যায় না। কারণ,
চোখ-মুখে তার আভিজাত্যের হাসি এবং কেবিনে চিৎখংসিত হাছ
প্রায় তিন মাস ধরে, আবার হাসপাতালের পরিবেশগত শোভনতার
লোভাই দিয়েও সরে আসতে পারি না। কারণ মিষ্টার দাশের
উপস্থিতিতেই মেয়েটি আমার সঙ্গে শালীনতা বজায় রেখে অত্যন্ত
সহৃদয় ব্যবহার করে গেছে।

কিছ ব্যাপারটা যখন সিষ্টার মারফৎ বাইরে বাবে, সহকর্মী
বন্ধুগন্ধব এবং প্রবীণ ডাক্তারেরা নিশ্চয়ই বিস্তৃত গল্পালাচনা হিসেবে
একে গ্রহণ করবেন না, এই ভেবে ইতস্তত করতে লাগলাম।
অপাঞ্জে একবার সিষ্টারের দিকে চেয়ে দেখি, পুরু হোটের কোলে
চাপা হাসির বিভ্রাৎ খেলছে। গভীর শ্রান্তি ও অবসাদে হেমন
আমার ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। তার উপর সিষ্টারের ঐ অভব্য
হাসি বেন আমার শিরা-উপশিরাগুলিতে আত্মন ধরিয়ে দিল।
কতকটা জ্বিন করেই বেন আরো রাগিণীর অল্পরোধ রাখতে তৎপর
হয়ে উঠলাম। বেডের সামনে রাখা টুলটার বসে মেয়েটির দিকে
চেয়ে মুহূর্তে বলি—দেখুন, আমি ডাক্তার মাহুয়—কথাশিল্পী তো
নই, আমার জীবনে এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি যা দিয়ে গল্প তৈরী
করা যেতে পারে। যে সব ঘটনা ঘটছে, তা সাধারণ মানুষের
জীবনে অস্বাভাবিক ঘটে থাকে, সে সব গল্প হয়তো আপনার ভালো
লাগবে না।

মেয়েটি কি এক গভীর প্রশান্তিতে চোখ দুটি বন্ধ করে ফেলে
আঙুলে আঙুলে বলল—ভালো লাগবে, আপনি বলুন।

ঘড়ির কাঁটা যখন দুটোর ঘরে, আমি স্তব্ধ করলাম আমার কর্মসর
জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাঘেরা নানা কাহিনী। এক ঘটনাও
কাউনি, লক্ষ্য করলাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে মেয়েটি।
টুল ছেড়ে সন্তর্পণে উঠে গিয়ে সিষ্টারকে বাইরে ডেকে এনে বললাম—
মনে হয়, পেপেট আর এখন ভাগবে না। যদি কোন কারণে
জেগেই ওঠে, আপনি আমাকে আর ডাববেন না, বড় টার্যার্ড আমি,
ডক্টর রায়কে কল করবেন। ওর ডিউটি আছে সকালের দিকে এই
ব্লকে। উনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

রাত শেষ হতে তখন আর বড় দেরী নেই। বাইরের জমাট
বাঁধা অন্ধকারের স্তূপে যেন একটু একটু করে আবহা আলোর কাঁচা
রঙ ধরছে। বাবালা শেরিয়ে যেতে যেতে এক বলক ঠাণ্ডা হাওয়া
এসে অবসন্ন দেহটাকে বেন মুহূর্তেই আতাম দিয়ে গেল।

ডক্টরস ক্রমে চুকে একটু গড়িয়ে নিতে বাচ্ছি, পাশের লম্বা থেকে
সহকর্মী ডাক্তার অরুণ সেন বলে উঠল—ভালো না ? কোথায় ছিলি
সারারাত ? কোন ইমার্জেন্সী কেসে অ্যাটেণ্ড করলি নাকি ? জুতো
জোড়া কোনক্রমে খুলে ফেলে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুম-ভরে-
আসা গলায় জবাব দিলাম—কেবিন নাথার সেভেনটান...

শুধু থেকে কথা সম্পূর্ণ খসেও নি, আচমকা লক্ষ মেরে স্থানচ্যুত
হয়ে আমার কাছে এসে বলল অরুণ—অর্থাৎ শুইট সেভেনটান ?
শেষে তাকেও পাকড়াও করল ? অবিশিষ্ট ও তোদের মত দুন্দর
লোকদেরই হান্ট করে বেঁচে আছে আফ্রো...নইলে যেভাবে এসেছিল
হাউগোড ডেক্সে, বাঁতে আর হতো না।

অরুণের কথাগুলি আমার ঘন-হরে-আসা ঘুমে হায়ে কেমন

যেন হারিশরীর ধারণ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চোখের পাঁতার ঘুমন্ত মেয়েটির ছবি একবার ভেসে উঠলো। তারপরই গভীর ঘুমে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

রাতের অন্ধকারে যা ছিল গোপন, দিনের আলোয় তাই নষ্ট হয়ে উঠতে দেখা হলো না। এ বিষয়ে আমাকে একটু মনঃস্বল্প হতে দেখে সিনিয়র হাউস সার্জেন মল্লিক আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন—ইয়া ডক্টর, ড্যান্ট বি.সি.এ.শেকি। ওটা যাই বলুক, তুমি কান দিও না। ডুইয়ের ওন্ ডিউটা এ্যাণ্ড হাভ ইয়ের প্রফিট। আমার ডাক্তার, পোস্টের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ শুধুই কি শুধু, ইন্সপেকশন আর অপারেশনের? গেশপেটের কাছে রোগ ছাড়া আমরা কি আর কিছু আশা করতে পারি না? কেবিন সেভেনটিনে আমারও মাঝে মাঝে ডিউটা পড়ে, অদ্ভুত লাগে মেয়েটিকে। অথচ মাসখানেক ধরে দেখছি এহটুকু বোচাল দেখিনি। এই জন্তই ওর নিরীহ আবদারটুকু বোধ হয় মেনে নিতে পারছি তোমাদের সিনিয়র হয়েও।

ডক্টর মল্লিকের দীর্ঘায়ত, স্বন্দর চেহারার মধ্যে এমন যে একটি স্বন্দর মন বাস করছে, ওর আগে তার পচিয় নানাভাবে পেয়েছি সত্যি, কিন্তু এ যোগ্যবীকে কেন্দ্র করে তিনি যে নিরপেক্ষ স্বচ্ছ মতামত আমার মত এক তরুণ চিকিৎসকের কাছে ব্যক্ত করলেন, এতে যেন নতুন করে তাঁকে চিনে নিলাম।

এর পর অবজ্ঞা সহকর্মী ডাক্তার বন্ধুর ঠাটা-বিরূপ আমি উপেক্ষা করেই চলতাম অধিকাংশ সময়। সপ্তাহে দু-তিন দিন ভুটী কেবিনে ডাক পড়তো এবং রাউণ্ড শেষ করে ফিফবার সময় মেয়েটিকে গল্প তুলিয়ে বেশ রাতই বিশ্রাম নিতে যেতাম। কিন্তু একদিন সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ করলাম, এভাবে এক অসুস্থ ও মানসিক রোগগ্রস্তা তরুণীর সামান্য অসুস্থতা রাখতে গিয়ে আমি ক্রমশঃ সহকর্মী বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় মহলে আলোচনার বস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছি। যা আমার কর্মজীবনের বিকাশ লাভের পক্ষে আদৌ সহায়ক নয়। অতএব এই ব্যাপারের সত্তর অবসান ঘটানোই আমার পক্ষে প্রথমঃ বলে মনে হলো।

সেদিনও বধারীতি রাউণ্ড শেষ করে ফিরে এসেই শোবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় দরজার বাইরে শোনা গেল নাসের চিরপরিচিত আহ্বান—ডক্টর চৌধুরী, কেবিন সেভেনটিনে আপনাকে একবার ডাকছেন। ঘুম আসছে না তাঁর...

সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত বিজ্ঞানমত ডাক্তার বন্ধুর দল নানা রকম অভ্যর্থনা টপ্পনী কেটে উঠলো। একজন তার মধ্যে মিহি গলায় গান ধরলো—
'হয়তো কিছুই নাই পায়ে।

তবু তুমি আর আমি দু'হাতে ভালবেসে যাবো।'

একজন নাস' বাইরে দাঁড়িয়ে আর তার উপস্থিতিতে এসে এমন অদ্ভুত ব্যবহার আমাকে কিছুক্ষণের জন্য নিঃসাড় করে দিল। পরে বেরিয়ে এসে প্রত্যক্ষমানা নাসকে কঠিন স্বরে বললাম—কেবিন সেভেনটিনের পেশটিকে বলে দিন মাসের পর মাস একজন হাউস সার্জনের পক্ষে রোগীকে ঘুম পাড়বার জন্য নিজের বিজ্ঞান আর ঘুম বাধ দিয়ে অবশ্যের গল্প বলার মতো পাগলামি করা সম্ভব নয়, শোভনও নয়। দ্বিতীয় দিন যেন আর আমাকে এই অদ্ভুত জম্মরোধ দা করা হয়। বান—

ঘরে ঢুক চূপচাপ করে পড়লাম দেখে দু'একজন কিক রসিকতা করতে গিয়ে হরিষা করতে না পেরে থেমে গেল। আমিও বস্তির নিঃশাস ফেলে মন থেকে কণপূর্ণের বিষাদ মুক্তিটুকু কেড়ে নিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সে রাত অবজ্ঞা নির্বিঘ্নে কেটে গেল, পরদিন কয়েকজন ডাক্তার ও নাসের মুখে খবর পেলাম মেয়েটির অবস্থা নাকি গত রাত থেকে গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে কোন ডাক্তারকে ওর কেবিনে ঢুকতে না দেওয়ায়—ডক্টর মল্লিক নিজেই নাকি দেখাশোনা করছেন।

খবরটা শুনে মনের মধ্যে একটা দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। মেয়েটি শুনেছিলাম অগ্রমনস্কহার দরুণ চারতলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে কয়েক খাস আগে হাসপাতালে এসেছিল চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায়। হয়তো বা বিস্তারিত পিতামাতার একমাত্র মেয়ে, কাজেই একটু বেশী মাত্রায় খেয়ালী ও আবেগের হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু সেজন্য গতরাতে আমার অন্তটা রুচ হওয়া মোটেই উচিত হয়নি। ডক্টর মল্লিকই বা কি ভাবছেন, যদি শুনে থাকেন সব কথা?

আমার কাছে কিছু গল্প শুনে যদি মেয়েটা একটু আনন্দই পেতো, আর ঘুমোতে পারতো—আমি কেন বার্ষিকের মতো নিজের কথা ভেবে ওর রোগের যত্না বাড়িয়ে দিলাম? মনের মধ্যে যে চিন্তাটুকু এলো, মস্তিষ্কের উপলব্ধি-কাণ্ডে তাই অসংখ্য হয়ে আমার সমগ্র চেতনাকে যেমন আচ্ছন্ন করে ফেললো। জোর করে নানা কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম—রাত ও সব অপ্রত্যাশিত মুহুর্তি আমার আর ভাবাক্রান্ত করে না তোলে। রাতের ডিউটি-চাট বেকলে দেখা গেল আজ আমার জরগার ডক্টর অশোক মৈত্রকে বহাল করা হয়েছে। একটা অন্তর করে কেলে আর ও-মুখো হবার ইচ্ছেই ছিল না। সেজন্য মনোগত অভিশাপকে এত সত্তর কাঁকরী হতে দেখে বুক থেকে ভায় নেমে গেলেও মনের দৃষ্টি কিছু ঘুল না।

রাত্রে আজ কোন ডিউটি না থাকায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা কোয়ার্টারে চলে গেলাম। পরদিন সকালে ডিউটি দেবার জন্য হাসপাতালে এসে ঢুকতেই সিঁড়ির মুখে দেখা হলো অশোক মৈত্রের সঙ্গে। আমাকে দেখে ভ্রমলোক ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন—এই যে গুামল বাবু, শুধুমাত্র আপনাদের স্থাবধ্যাত সত্তরো নম্বর কেবিনের কীর্তি! ওই ধবনের মেয়েরা তোমার চিকিৎসা করাত্তে এসে পরে আমাদেরই এক একটা হুগী বানিয়ে দিয়ে ধায়, বুঝলেন? আপনাদের আর কি, ভগবান একখানা চেহারা জিয়েছেন, সেই দোলাতে আপনারা সবখানেই রাজা-বামশা বনে গেছেন—হত গণ্ডগোল আমাদের মত হতভাগাদের নিয়েই। না পেয়েছি হীরা হবার মত চেহারা, না শোম জীবনে কোন চান্দ। আমাদের সমস্ত জীবনটাই ট্রাক্‌ডি, মশাই।

দেহের উচ্চতাসহ ভ্রমলোকের চেহারা সুন্দর ককো বেসিনের অধিবাসীদের কথাই শ্রবণ করিয়ে দেয় সত্যি, কিন্তু তার অন্ত চিকিৎসায় আটকাতে কেন?

সুস্থরবে প্রশ্ন করি—কি ব্যাপার বলুন তো?

অশোক মৈত্রের রুদ্ধ অভিমান এবার গলিত হুবারেব সত্তর করে পড়তে থাকে—এরকম অদ্ভুত পেসেন্ট আমি আর দেখিনি, জানেন? কাল রাত্রে নটা নাগাদ বধারীতি ঐ ব্লকটায় রাউন্ড

দিয়ে যেমন চুকেছি সন্তোষে। নম্বরে, মেয়েটি একেবারে ভুত দেখার মত বিকট চিৎকার করে উঠে সিঁটার দাশের মত সিনিয়র নাসকে কী বকনীটাই লাগাল। আর আমাকে দেখে তার চোখ মুখ জুড়ে কি বাগ আর বিরক্তি, যদি দেখতেন। এদিকে সমস্ত দেহটা প্রাণীর যোড়া, উঠ বসতে গিয়ে জরুও হয়েছে, তবু আমাকে কাছে বৈসতেই দিল না। বলে কি জানেন, আমার প্রাণ বেঁচে গেলেও আপনাব হাত থেকে কোন সেবা আমি নেবোনা। আপনি চলে যান এখন থেকে, নয়তো আমি আবার চিৎকার করবো। অগত্যা সম্মান নিয়ে পালিয়ে যাঁচ। উঃ কি ক্রুয়েল নেচার্ড মেয়ে য়োবা। শরীরের ভাঙগোড় ভেঙেছে বলে কি মনের দয়াময়া ভালবাসাগুলোও গুঁড়িয়ে গেছে?

আশোক মৈত্রের কাছ থেকে সবে এসে লিফটে চেপে উপরে এলাম। ডক্টর মল্লিক ও আরো দুজন সিনিয়র হাউস-সার্জেন লিফটের গোড়ায় ঠাঁয়ে কথ্য বলছিলেন। আমায় দেখে মল্লিক একটি আশ্চর্য সংবেদনময় হৃদয় হাসি হাসলেন। ওর প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা মুট্টয়ে বীরে বীরে চলে গেলাম সেখান থেকে। কিন্তু গোপন বেদনার কত মনের মধ্যে জেগে রইল মল্লিকের হাসিটুকু। আমার অন্তমনস্কতা ধরা পড়লো অরুণের কাছে—কি রে শ্রামল, তোকে আজ এমন বিমর্ষ দেখছি কেন? শরীর খারাপ না মন উধাও?

গভীরভাবে জবাব দিই—তোর কি মনে হয়?

পাল কাটিয়ে চলে যাওয়া একটি তরুণী নাসের দিকে চোখ রেখে বৃহৎ হেসে অরুণ বলে—তুই এত দিন পরে সত্যি সত্যি প্রেমে পড়েছিস শ্রামল, ভাবতে বেশ লাগছে কিন্তু। অরুণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আন্তে আন্তে বললাম—জানিস কেবিন সেভেনটিনের আমি আর বাই না গল্প শোনাতে? -তারপরও এ ধারণা করতে পারছি?

প্রথম সূর্যাস্তের মত বহুশ্রম হাসির অভা খেলে বার ওর টোটে, সেইজন্মই তো বলছি।

সবুজ সবুজ একটি সিনিয়র নাস এসে ঠাঁয় আমাদের কাছে। চোখ-মুখে একটা চাপা হাসির ছোপ—ডক্টর চৌধুরী, আপনি এখানে? ওদিকে ভাঙায় উঠে যে মাছে খাবি খাচ্ছে তার খোঁজ রাখেন?

বিগতযোবনা হতজী নাসটির কালো মুখের দিকে বিরক্তিদূর্ণ দৃষ্টি ফেনে কঠিনকণ্ঠে বললাম—আপনারা হলপিটালের সিনিয়র ঠিক নাস, আপনাদের কাছ থেকে এ ধরনের অন্তায় রসিকতা প্রত্যাশা করি না। একজন হতভাগ্যা, নিরীহ পেশেন্টের সঙ্গে আপনার নাম জড়িয়ে আপনারা কি মুখ পাচ্ছেন বলতে পারেন, মিস বোস?

অরুণ ও নাসটি কিছু বলার আগেই দ্রুত পদক্ষেপে সেখান থেকে সবে গিয়ে নীচে নেমে গেলাম।

প্রাপ্তবয়স্কের পর একদিন ঐ দ্রুতগতিতে আমার হাউস শেষ করে ফিরে চলেছি, সন্তোষে নম্বরে কেবিনের কাছাকাছি আসতেই চোখ পড়লো ঐ কেবিনের নতুন সিঁটার জন্ম ঘোব হাত ইসারায় আমাকে ডাকছে। এগিয়ে যেতে পদীর বাইরে এসে চাপা গলায় বললাম—ডক্টর চৌধুরী, পেশেন্ট এখনো যুবোনি, হুটু হুটুট করছেন, রক্তের হার খুব বেশি হয়েছে।

গভীরভাবে বলি—ঠিক আছে, আমি ডক্টর মল্লিককে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ততক্ষণ—

কথা শেষ না হতেই পদীর ওপার থেকে ভেসে এলো একটি ক্ষীণ বর্ণের সিঁটার—

জন্ম ঘোব কিপ্রপদে ভিতরে ঢুকে যেতে আমি দ্রুতপাথে সেখান থেকে চলে এসে ডক্টর মল্লিকের খোঁজ করতে গিয়ে শুনি, তিনি বস্টা-খানেক ধবে লেবার রুমে একটা এ্যাবনরমাল ডেলিভারী কেস নিয়ে বাস্তব আছেন। সন্তোষ তীর আশা ভাগ্য করে অরুণের শরণাপন্ন হলাম—ভাই আজকের রাতটা তুই একটু স্পোর্টস করবি কেবিন সেভেনটিনের জন্মে? মেয়েটি নাকি এখনো ঘোমায় নি।

কড়া সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ ঢেকে কলে নিশ্বাস গলার অরুণ জবাব দিল—তোর অনুরোধমত গেলেই তো হবে না শ্রামল, ওর পছন্দমত লোক হওয়া চাই।

এই সময় ঘরে ঢুকলেন সিনিয়র হাউস সার্জেন ডক্টর হিম্মন্ত অধিকারী। চল্লিশোর্ধ্ব বয়স, কিন্তু দেহ এখনও যুবকের মত নিখুঁত। দীর্ঘায়ত স্তম্ভের ব্যক্তি, সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্র সন্দেহ বিশেষ সন্ধান না থাকার ভক্ত পরিচিত মহলে তত্রলোক ততটা জনপ্রিয় ছিলেন না। আমার চিন্তারূপে মুখ দেখে বৃহৎ হেসে প্রশ্ন করেন—what's wrong with you, doc?

আমার কিছু বলার আগেই অরুণ মুখের সিগারেটটা ছাউনানে ফেলে দিয়ে এক নিশ্বাসে বলে গেল কেবিন সেভেনটিনের কথা। পরমুহূর্তে দরজার বাইরে নাসের গলা শোনা যায় ডক্টর চৌধুরী, ডেলিভারীর পেশেন্ট সিক করছে, শীগগির চলুন।

বৃহৎ মাথা হিম্মন্ত অধিকারীর বড়ো বেশী গভীর আর কালো চোখের তারায় ফসফরাসের চকত দীপ্তি বলসে ওঠে। হাতের টেংগোটা গলায় ফেলে দ্রুত পায়ে চল বান। আমি দ্রুত দৃষ্টিতে বাইরের জমাট আন্ধারের দিকে চেয়ে রয়েছি দেখে অরুণ আমার কাছে একটা হাত রেখে আন্তে আন্তে বলে শ্রামল, হিম্মন্ত অধিকারীর মত ডাক্তারই ওই সব মেয়ের ঠিক ওয়ুথ, দেখিস এবার মেয়েটার সব রোগ সেবে যাবে আর কেবিনও শীগগির খালি হয়ে যাবে। আমরাত বাঁচবে।

পরদিন থেকে আমার শরীরাটো অব হয়ে বেশ খারাপ হয়ে পড়ায় হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে কয়েক দিন কোয়ার্টারে পড়ে রইলাম। একটি বিকেলে ডক্টর মল্লিক এসে আমার দেখতে। ছুটার কথা বলার পর সামনের দেবদাক গাছের বৃক ঘন হয়ে আসা সন্ধ্যার আন্ধকারের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বীরে বীরে বললেন চৌধুরী, সন্তোষে নম্বরে কেবিনের পেশেন্টটি আজ একটু আগেই চলে গেল জানো? প্রায় পাঁচ মাস ছিল, না?

মনে মনে ভয়ানক চমকে উঠলাম। অরুণের কথাই কি তবে সত্যি হয়ে গেল? কিন্তু ওকে যে আমি স্বেচ্ছ মাস ধরে দেখছি, কোনদিন এতটুকু অসংযমী বা অশাসনীয় ভাবে দেখিনি? অথচ মেয়েটি স্তম্ভী, মজ্জিত কথাবার্তা সহজ বুদ্ধির আচরণ কিন্তু ওই পেলব সৌন্দর্যময়ীর অন্তরালে আত্মগোপন করেছিল ভীত নারীত্বের চিরায়ত অসম্মান সংস্কার? মাস রাত্তে গল্প শুনেও চাঁওরাটা তবে ওর একটা স্বল্প কেমোজান? অনিচ্ছার বস্ত্রাভূষিত অলৌকিক ভান যাত্রা? কিন্তু মন বিখাল করতে পার না এমন বিব্রত, সলল বহু চোখের চাহনি বিদ্যমান

কামনার পঙ্কিল হাট্ট উঠতে পারে, সুদীর্ঘ দিনের কণ্ঠহারী সাহচর্যে মেয়েটিকে মনে হইবেছিল স্বনিম্নর একটি স্মরণ করিতা, কিন্তু আজ? আজ সে কবিতা চারিয়ে গেল না কি গদ্যকবিতার তরাইয়ে?

আমার মৌনতা ভট্টর মল্লিককে স্পর্শ করলো কি না জানি না, কিন্তু তিনি আমার বুকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর গভীর হয়ে বললেন—চৌধুরী, আমার দীর্ঘকালের চিকিৎসক জীবনে এমন ঘটনা আর ঘটেনি, জানো? মেয়েটির সবক্ষে আমার নিজের মতো কত বিদ্রূপ-পরিহাস করেছি, অজ্ঞতা-স্বত্বকে মস্তব্য করতেও বিধা করিনি, কিন্তু কোনদিন ভেবে দেখিনি ওই গল্প শোনার পেছনে, ওই স্মরণ চেয়ারার আড়ালে জমা হয়ে আছে কতখানি ব্যথা আর কান্না। ঐ ইঙ্গ ক্যারিয়ারিং এ ট্রাভেলিং লাইফ! হিমালয় মেয়েটির গল্প শোনার ইচ্ছেটাকে তাঁর বায়োলজিক্যাল থিওরী দিয়ে বাচাই করতে চেয়েছিলেন, এ্যাণ্ড হি ইজ রাইটলি সার্গ'ড। এসব দেখে শুনে কি মনে হয় জানো? মনে হয়, আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত ও মার্জিত মনের আড়ালে বাস করছে যে প্রকৃতি আরণ্যসভা, যে সহজাত পশুপ্রবৃত্তি—স্বযোগ পেলেই সেটা তাঁর ধারা উঠিয়ে নবনবশব্দে বাঁপিয়ে পড়ে লক্ষ্যবস্তুর উপর। ভূমি জানো, আজ প্রায় তিন মাস ধরে আমি পার্সোনালাসি মেয়েটির কেস গ্রাউপ করছিলাম, এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছে শুনেছি, কিন্তু কান দিইনি। আমি জানি, হাসপাতালের মত বড় জগতে বাস করার ফলে ওদের মনটাও এমনি অসুস্থ আর পঙ্ক হয়ে গেছে যে আর একজনের সুস্থ-সহজ আচরণটুকু পূরুষ তারা স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারে না। রাতে ঐ ব্লকে আমার ডিউটি বেদিন না-ও থাকত, কতদিন নাসরা আমার কোয়ার্টারে গিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে গেছে। লক্ষ্য করেছি আমায় দেখামাত্র গল্পশোনার আগ্রহে ঐ বিবর্ণ স্মরণ মুখ ছুড়ে নামত কি অসীম পরিতৃপ্তি, একটার পর একটা গল্প বলে গেছি আর তাই শুনে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছে, কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে স্ত্রীর কাছে মেয়েটির কথা বলতাম, ও-ও ঠিক বুঝত না, নারীস্বলভ ঈর্ষা আর অত্যাচার অভিমানের ছায়ায় আমায় ভুল বুঝে নিজেকে কষ্ট পেয়েছে কিন্তু বাইরের কোন আঘাত, কোন ঘটনাই আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

সপ্তাহখানেক আগে মেয়েটির কাছে গিয়ে প্রথম নিজে থেকে প্রশ্ন করেছিলাম—আপনি তো রোজই অন্তর কাছ থেকে গল্প শুনেছেন, আজ আমাকে আপনি গল্প শোনাবেন? জবাবে ও কি বলল জানো? আমার গল্প কুরিয়ে পেছে বলেই আমার মনও হারিয়ে গেছে ভট্টর, আপনাদের কাছ থেকে তাই গল্প শুনে ঘুমকে ডাকি। মেয়েটির মনে রাতে আঘাত না লাগে, এমন ভাবে আবার প্রশ্ন করেছি—আচ্ছা, আমাদের মধ্যে কার কাছে গল্প শুনতে আপনার ভালো লাগে, বলুন তো? তেমন সহজ গলায় জবাব দিয়েছে—স্মরণ বাঁরা, তাঁদের কাছেই গল্প শুনতে আমি ভালবাসি। কিন্তু তাঁরা অনেকে আমার কাছে গল্পের তরে আসতে চান না, সেজন্য অধিকাংশ রাতে আপনাকে এবং সিটার হু' একজন হাড়া লাগ কাউকে পাই না।

মেয়েটিকে আর একটা প্রশ্ন করেছিলাম—ভট্টর চৌধুরীকে

আপনার মনে আছে? এস চৌধুরী? মনে হালা এবার মেয়েটি একটু ব্যথিত হয়েছে। একটু শুভ্র হয়ে থাকার পর আঙে আঙে জবাব দিয়েছিল—তাকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

এর পর বখারীতি গল্প একটা স্মরণ করে শুরু হুম পাড়িয়ে ফিরে এসেছিলাম কোয়ার্টারে। গতকাল রাতে, শুভলাল হিমালয় গুর কেবিনে গিয়েছিলেন। And that was the mistake। সিটার ঘোষকে কিছুক্ষণের জঙ্গ off করে অধিকারী একাই মেয়েটিকে নিয়ে deal করতে গিয়েছিলেন। তার পর মিনিট পনেরো না যেতেই কেবিন থেকে বিকট চীংকার শুনে ওয়ার্ড নার্স রমা তত্ব ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে মেয়েটিকে উত্তেজিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে এবং অধিকারী নাকি রাগত ভাবে কেবিন থেকে চলে যান। এরপর মেয়েটি কোনক্রমে রমার কাছে আমার নামটা বলেই নাকি সেকেন্স হয়ে বেডের উপর পড়ে যায়। রমা একজন ওয়ার্ডবয়কে নিয়ে জয়াকে ডাকতে বলে আমার খোজ নিতে শোনে আমি লেবার রুমে—জয়া এসে হাতের কাছে অশোককে পেয়ে যেতে তাকেই কেবিনে ডেকে আনে। অশোক আসবার আধ ঘণ্টা পর গুর জ্ঞান যদি বা ফেরে, কিন্তু ডাক্তারের আকৃতি দেখেই নাকি প্রাচণ্ড আত্মনির্ভর করে ওঠে—আপনাকে আমি সহ করতে পারছি না, দয়া করে আমার সামনে থেকে আপনি চলে যান।

অশোক বরাবরই মেয়েটির প্রতি বেশ অপ্রসন্ন ছিল। এবার সুযোগ পেয়ে তার সমস্ত রাগ এক মুহূর্তে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ, একজন নার্সের উপস্থিতিতে তার চেহারা সবক্ষে মেয়েটির এ হেন মস্তব্য ওকে আরো ক্ষিপ্ত করে তোলে। শু নাকি চীংকার করে বলে ওঠে—আপনার যোগ শুধু স্মরণ লোকের মুখ দেখে আর মিষ্টি মিষ্টি গল্প শুনে ভালো হবে না। এটা হাসপাতাল, বাড়ী নয়, নাইট ক্লাবও নয়—কেন মিষ্টিমিষ্টি চারদিকের একটা ব্যাংকাল করছেন এভাবে?

মেয়েটি নাকি গুর কথা শুনে শুভ্রভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে পরে সেই যে চোখ-মুখ বন্ধ করেছে, আর খোসেনি। কিছু ধায়ওনি। আজ সকালে নটা নাগাদ ওই কেবিনে গিয়ে একইভাবে মেয়েটিকে শুয়ে থাকতে দেখে কিছুক্ষণ ওয়েট করাছিলাম। সিটার দেশাই মেয়েটির কানের কাছে মুখ নামিয়ে আমার নাম করতে মেয়েটি কয়েক সেকেন্ডের জঙ্গ চোখের পাভা খুলে টুটি মেলে ধরেছিল আমার মুখের দিকে—মনে হল, একটা অসহ না বলা যন্ত্রণার গুর ভিতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। তার পর ব্যালিশের তলা থেকে এক টুকরো কাপড় বের করে আমার হাতে তুলে দিল। দেখি শিক্ষিত হাতের লক্ষ্যে ইংরিজিতে লেখা নথের একটি ফোন নম্বর। প্রশ্ন করলাম—কি বলতে হবে বলুন। চোখ বন্ধ করে শুধু জবাব দিল—আপনার নাম বলবেন। তাহলেই হবে। কেবিন থেকে বেরিয়ে ঐ নম্বরে ডায়াল করতে এক ভ্রলোক ধরলেন, তার পর আমার নাম শুনে একটা প্রশ্ন করলেন—বাড়ী কাল রাতে লুম্বাইরাল কিনা জানেন? উত্তরে বলেছি, সিটার গত রাতে পেশেন্টকে খুব একসাইটেড অবস্থায় রাত কাটাতে দেখেছে। ভ্রলোক আমার ধন্যবাদ জানিয়ে কোন ছেড়ে দিয়েছেন এবং আমিও মেয়েটির কাছে ফিরে গিয়ে আমাদের কথাবার্তা জানিয়ে চলে এসেছি, কারণ ও সেটাই চাইছিল আজ।

বিকলে ভিডিওটি আঙরারে আমার কোয়ার্টারে এলেন একজন রপূক-ও স্মরণ ইরম্যান। চেয়ারায় ও কথাবার্তার আভিভাব

হাপ। উইক্রেম তাঁকে বসিয়ে শুনে পোলায় একটি অকালবৃত্ত জীবনের প্রাজ্ঞা—স্বাভাৱী এলাহাবাদের এক বিশিষ্ট আইনজ্ঞের একমাত্র মেয়ে ও সন্তান, সত্যোরা বছর ওখানাই মাছুর হয়েছ, সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করার পর মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী ডাক্তারী পড়বার জন্য বাপ-মায়ের সম্মতি নিয়ে কলকাতার মাসীর বাড়ীতে এসে উঠে। মেসোও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, তার নিঃসন্তান, সুতরাং স্বাভাৱী তাঁর কতটা প্রেমিক স্নেহ ভালবাসা দিয়েই ঘিরে রেখেছিলেন। মেডিক্যাল কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়বার সময় স্বাভাৱী কোর্স ইয়ারের একটি ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ডাক্তারী পড়লেও ছেলের প্রতি প্রবল ব্যক্তিগত এবং সহজাত সাহিত্যিক প্রতিভা স্বাভাৱীকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, এজন্য যথেষ্ট কষ্ট সাধন করে ছেলেকে পড়াশোনা করতে হতো। বা হোক; স্বাভাৱী ওকে একদিন নিজের ঘরব্যবস্থায় সন্ধ্যা একটি পরিচিত ইঞ্জিত করলে ছেলের প্রথম হেসে উঠিয়ে দেয়। কারণ প্রথমত, দুজনের অস্বাভাবিক বিপুল বৈষম্য, দ্বিতীয়ত: সহায়সহায়ী—এক বেকার ডাক্তারের হাতে একমাত্র মেয়েকে সমর্পণ করার হুঁসোহুস বা প্রবৃত্তি স্বাভাৱী বাবা-মায়ের হৃদয়ে না। হলেও তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি চিরদিনের মতই নষ্ট হয়ে বাবে। সেটা কারো পক্ষেই স্বীকার্য হতে না। স্বাভাৱী একটু চাপা মনের মেয়ে, তাই ওর আবেগ-অনুভূতিগুলিও অত্যন্ত গভীর। দু'একবার ছেলেকে বলবার পর এখন বুঝতে পারে যে তার আশা পূর্ণ হবার নয়, এ নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি। কিন্তু মানসিক আঘাত সহ করতে না পেরে যোগে পড়ে যায়—মেনিঞ্জাইটিস।

মাসী বা মেসো এসব ব্যাপার কিছুই জানতেন না। টেলিগ্রাম পেয়ে এলাহাবাদ থেকে বাপ-মা এসে মেয়ের অবস্থা দেখে উপলব্ধি করেন, তার মনের কোথাও একটা গভীর জ্বলন ধরেছে, বার বার: প্রকাশ এই মারাত্মক রোগের মাধ্যমে দেখা দিয়েছে। সহপাঠী শ্রীমতী বাবুদেবীর কাছ থেকে জানলেন তাঁরা কিছু ঘটনা। ছেলেকে ডেকে পঠালেন। সে এসে স্বাভাৱীর অবস্থা দেখিয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাবে স্বাভাৱী হতে বললেন। ছেলের দুদিন সময় নিয়ে তৃতীয় দিনে এসে জানালো—আপনার ঘরে মেয়ে বাতে ভালো হয়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা আমি করছি, কিন্তু স্বাভাৱীকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আজ আপনারা মেয়ের মৃত্যু করে আমার মত এক গরীব ছেলেকে যে সম্মান দিতে চাইছেন, আমি জানি বিয়ের পর তা আপনাদের হাতেই ভেঙে ওড়িয়ে বাবে।

স্বাভাৱী বাবা-মা ছেলের চরিত্রগুণে আকৃষ্ট হয়ে মেয়ের জীবন ও নিজের সামাজিক প্রতিপত্তি বা প্রোজেক্টের কথা ভেবে তার প্রস্তাবই মেনে নিলেন। এর পর সূত্র হলো এক আদর্শ জীবন। কলকাতা থেকে ছেলের আস্তো স্বাভাৱীকে, প্রাণচালা সেবা আর স্বাস্থ্যের অক্লান্ত অধ্যয়ন নিয়ে স্বাভাৱীকে মুম্বই প্রাণে জাগিয়ে রাখলো প্রত্যাশিত জীবনযাত্রার মধ্য বন্ধ। রাত্তিরে তার লেখা এক একটি পত্র শুনিতে মন পাড়িয়ে বাড়ী করে যেত সে। তার একটা টুইপনী পেল, যদু বাবুদেবীর ছোটো উপহারের নিশান। কিন্তু সে মন না এতটুকু। প্রিয়জনের আত্মরিক্ততার সেবা আর প্রাণচালা ভালবাসার স্পর্শে করে মনের মধ্যেই স্বাভাৱী সেয়ে উঠলো। ছেলের মৃত্যুর তিনদিনে জানালো ওকে কিছুদিনের জন্য বইয়ের

কোথাও চেয়ে নিয়ে যেতে, তাহলে শরীর পুনরুজ্জীবিত হতে পারে।

স্বাভাৱী বাবা মা ছেলেকে তার নিঃস্বার্থ কর্তব্যনিষ্ঠার বিনিময়ে প্রতিদানের বিষয় উল্লেখ করলে সে গোপনে জানালো, বাইরে থেকে ফিরে এসে স্বাভাৱীকে নিয়ে তাঁরা বেন অবিলম্বে এলাহাবাদে চলে যান এবং তারপর তার উপযুক্ত বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

বাবার আগের দিন স্বাভাৱীকে কাছে বিদায় নিতে এসে স্বাভাৱী তার বুক মাথা রেখে কেঁদে বলল—তুমি আমার কেবলই নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাও, এবার ফিরে এসে দেখবো, তোমার চিরদিনের মত বেঁচে কেলেতে পারি কিনা।

এ কথা শুনে ছেলের বুকও সেদিন বড় উঠেছিল, কিন্তু বাইরে তার একমুখ প্রকাশ দেখেনি কেউ।

স্বাভাৱী চলে গেলে ছেলের কাঁদা পুরীকার জন্ত তৈরী হতে থাকল। কিন্তু মনের কোণে দেখা দিয়েছিল যে বিবাহ সূত্র, তারই ভায়ে সে বেন ক্রমশঃ আত্মস্থ ও কঠিন হয়ে পড়লো। বহুবাহুবীর তাকে স্বাভাৱীকে আশা দিয়ে মজা করত। অবশেষে কাঁদা পুরীকার কয়েক মাস আগে এলাহাবাদ থেকে স্বাভাৱীর চিঠি এসে পুরীকার তাকে তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করার অনুরোধ জানিয়ে। ছেলের চিঠির জবাব না দিয়ে পড়াশোনার ভূমে রইল। ইতোমধ্যে আরো কয়েকখানা চিঠি এবং শেষে একটি প্রিপেড টেলিগ্রাম আসতে তার উত্তরে জানাল—বিশেষ ব্যস্ত আছি। সময় নেই চিঠি লেখবার। পুরীকার দু'সপ্তাহ আগে স্বাভাৱী জানাল তার বাবা মা তাকে অন্তঃ পাত্র পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেছেন। ছেলের কোন জবাব না দিয়ে বিবাহসূত্র পড়াশোনা আর প্রায়টিকাল নিয়ে ভুলে রইল। পুরীকার শেষ হবার পরদিন একটি চিঠিতে স্বাভাৱীকে সব কথা জানিয়ে কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে চলে গেল সে। তারপর অবশ্য স্বাভাৱীকে কাছ থেকে আর কোন সাড়াই পাওয়া যায়নি।

পুরীকার রেকর্ড অবশ্য ভালই হয়েছিল, এজন্য সময়মত কাজ পেয়ে যেতেও অসুবিধা হলো না। মাস কয়েক ক্রমে বছরে গড়িয়ে গেল, নিরবচ্ছিন্ন কর্মশ্রোতের প্রবাহে অজান্তেই মৃত্যু এসে গান হয়ে—তবু প্রথম প্রেমের মাধুর্য কি চিরদিনের মত হারিয়ে যায়? হারিয়ে যেতে পারে বিশ্বস্তির গহন অরণ্যে?

চার বছর পর স্বাভাৱীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তিতে দেখে এই প্রেমই জাগলো তরুণ ডাক্তারের মনে। চার বছর আগেকার স্বাভাৱী হারিয়ে গেছে আজ নিদাক্ষণ মানসিক বিপর্যয়ের সর্বনাশ প্রাপ্ত—অতীত তার কাছে বিমুত, গহনীয় রাত ওর অনিবার্য কাণ্ডে, নারীর স্বাভাবিক আবেগ অনুভূতি, স্বচ্ছের সহজাত উপলব্ধি কোবলি পূর্ণ শিল্পীভূত হয়ে গেছে। ওর বাবা এলাহাবাদের বহু বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে মাত্র এই আশাটুকু পেয়েছেন যে, কোন না কোন স্তরের পূর্ণ অথবা নারীকে রাতের পর রাত ধরে স্বাভাৱীকে গল্প শুনিতে যেতে হবে—কারণ সৌন্দর্যের সঙ্গে জ্বরহীনতার একটি গভীর বোগবৃত্ত বর্তমান। এই ভাবে যদি কোনদিন ওর মানসিক সাম্য ও সহজ উপলব্ধি ফিরে আসে, তবেই ও আবার ভালো হয়ে ওঠে সমস্যা হতে পারে। স্বাভাৱী মন-মানসবহু জীবনে চার বছর আগে যে প্রাজ্ঞাটি ভুলে

অভিশাপ দেখা গিরেছিল, তাই ওর কোমল, আত্মকেন্দ্রিক মনের মধ্যে সুদীর্ঘকাল লালিত হয়ে অবশেষে অন্ধকারের বীজসত্তা ও কালিমার রঙে মিশে ওকে অসুন্দর সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তুর উপর বীজব্রহ্ম করে তুলেছে। ওর ধারণা, সূন্দর লোকদের কাহিনী বা প্রিয়বর্ণন কোন বস্তু তাদের বাহ্যিক সত্তার সঙ্গে মিলে গিয়ে অন্ধরে ও বাইরে কুল বা প্রজাপতির মতই ফুটে ওঠে, সেই মন্থন সৌন্দর্য-মাধুরীটুকুই স্বাভাবিক মৃত প্রাণে সাড়া জাগায়। আর এই কারণেই সমস্ত অসুন্দর ব্যক্তি ও বস্তুর প্রতি ওর সীমাহীন বিতৃষ্ণা।

বোধ হয় এইজন্য, কয়েকজন কুরুপা সিঁটার ওর কেবিনে নিয়োগ করার স্বাভাবিক একদিন ভয়ঙ্কর কিন্তু হয়ে উঠেছিল এবং তার পর থেকে অপেক্ষাকৃত সুখী নার্সদেরই ওর কাছে পাঠানো হয়। মাস দুয়েক আগে—ওকে কলকাতায় রেখে চিকিৎসা করার জন্য ওর বাবা-মা এলাহাবাদ থেকে চলে এসেছেন। কয়েক মাস আগে এক বছর বাসার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেয়ে তাদের বাড়ীর চারতলার ছাদ থেকে স্বাভাবিক পড়ে যায় তার স্বাভাবিক অজ্ঞানতায় কলে। বাঁচবার কোনই আশা ছিল না, শরীরের অভ্যন্তরস্থ অধিকাংশ অঙ্গ-উপাঙ্গগুলি ভয়ঙ্কর ক্ষয় হইয়াছিল—তার উপর মাথাভেঙে বেশ চোট লাগায় সেখানকার শিরা-উপশিরাগুলিও বহুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অবস্থার ওর হতভাগ্য বাবা-মা ওকে কোনক্রমে এই হাসপাতালে রেখে দিয়ে যান। প্রায় পাঁচমাস ধরে চিকিৎসা করার পর ওর শরীরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে এলেও কয়েকদিন ধরেই সে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে অহুযোগ করতো এখান থেকে নিয়ে বাবার জন্য, কেননা ওর প্রতি রাতে গল্প শোনার অভ্যাসের জন্য ডাক্তার ও সিঁটাররা অনেকেই নাকি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হতেন। অর্ধ এক রাত গল্প না শুনে ওর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট অসম্ভব বেড়ে যায়। গতরাতে ওকে গল্প শোনাবার নাম করে ডক্টর অধিকারীর মত সিনিয়র হুইটসার্জেন যে অন্তায় ও অশোভন কাজ করতে গিয়েছিলেন, তার কলে ওর মনের অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, বার জন্ত ও আজ হাসপাতাল থেকে হাড়ীতে চলে গেল। ডয়লোক একটি দীর্ঘকাল কলে চুপ করলেন।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম—আচ্ছা, এই যে উনি সূন্দর লোকদের কাছে গল্প শুনে চান, এর কলে যদি কোনদিন ওর মনে কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ভালবাসার অহুত্ব জন্মায়, তবে নিশ্চয়ই উনি আগের মত সেনসিটিভ ও ভাইটাল হয়ে উঠবেন ?

ডয়লোক অনেকক্ষণ শুক হয়ে রইলেন, জানো ? তারপর বিষমভাবে বললেন—ডক্টর মল্লিক, স্বাভাবিক জীবনে একজনকেই ভালবেসেছিল। আর সেই ভালবাসার পাত্রের হাত থেকেই পেরেছে দশচরে বড়ো শাস্তি। আজ ওর মানসিক বৃত্তার পথে ও বেঁচে আছে সেই বিস্মৃত অতীতের একটি ক্ষীণপূর ধারণ করে, গল্প না শুনে ওর কষ্ট বেড়ে যায়। কেননা, এই গল্প শুনেই একদিন ছোটো তাকে বৃত্তার পথ থেকে কিয়দূর এনেছিল। সেদিন ছিল ভালবাসার প্রগাঢ় অহুত্ব—আজ সেখানে পশু দ্বারাবিক চেতনার মসৃণ অস্তিত্ব। তাই অপরের কাছে গল্প শুনে শুনে সে তার মনসঙ্গিক দাবীটুকু মেটায়। ছোটোটির দৃষ্টি স্বাভাবিক কাছে চিরদিনের মতই লুপ্ত হয়েছে, আছে শুধু তার গল্পের দৃষ্টি, যেদিন হারিয়ে যাবে, সেদিনই ঘটবে ওর শারীরিক বৃত্ত।

লক্ষ্য করলাম, ডয়লোকের গভীর চোখ দুটি নিঃসীম ব্যথার কালো মেঘে অভলম্পর্শী হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ পল্লবগুলিতে কৃত্রিম বৃষ্টির বেদনার অভিশাপ জড়ানো—সূন্দর স্রবের পটভূমি ছুড়ে বেন একটি বিরোগাঙ্ক জীবনের সাত্ত্বিক হবি জাঁকা। আছে আছে উঠে এসে তাঁর কাঁধে একটি হাত রাখতে কিরে চাইলেন আমার দিকে। সেই নিঃশব্দ যুগুত কটির কোন ব্যাখ্যাই করতে পারবো না চৌধুরী, স্বপ্নের অতীতের অনেক দৃষ্টিকেই সেখানে শুক হয়ে থাকতে দেখলাম—যে ট্রাজেডির নায়ক উনি নিজে—

ডয়লোক একসময় উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আর একবারও আমার দিকে না চেয়ে ঘর থেকে বহিরের আলো-জাঁধারী পথে নেমে গেলেন। চৌধুরী, আমার তখন কি মনে হচ্ছিল জানো ?

জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি অন্ধকার শুক সমুদ্রে আমরা, ডাক্তারেরা ভেগে আছি একদুটো বাতাসের প্রিয়কণ্ট হয়ে। কিন্তু সৃষ্টির অমূল্য নাড়ীস্পন্দনকে বিভ্রান্তির মগ্ন আবিষ্কৃত গিরে কি সর্বসময় কিয়দে আনতে পারছি ? তাহলে পৃথিবীতে এত অন্ধ কেন করে ? এত বেদনা কেন জন্মে ওঠে ?

চিরন্তনী

মাধবী ভট্টাচার্য

শাশ্বত কালের এক খোঁয়াটে আকাশে
রক পাখীদের মতো ভ্রমের স্বপ্নে
আর জড়বাদী দ্বারুণী অস্ত্র সত্তায়—
বেসান্তি করে কিরি হাটে, নগরে, গ্রামে ও বঙ্গরে।

হু' নগু যে বসবে অবসর নেই।
হু' নগু যে কথা শুনবে তারই বা অবকাশ কই ?

শু' বিদ্রোহী মন আফালন করে—
জন্মায় আর নিতম্বে তোলে অহুত্বন,
আয়ুধান হবার ক্ষণিক সাধনা থেকে
আনে বিচ্যুতি।
আনে বিভ্রান্তি।

মনে হয় আরো আছে।
আরো আছে অরণ্য সন্ধান,
আরো আছে রোদ-সাগর, স্বীকৃত-রসা হিমাক্ত বিকেল।
আর আছে না-পাওয়ার বেদনা-রাঙানো সবুজ বাসর—
একটি বিজন ঘর,
একটি বিনিত্র প্রহর,
এবং সব-কণ্ডাওয়া শেষ-হওয়া একটি অশান্ত বিবেক।

তাই বত বৃষ্টি তত ভাবি :
পুঁজিহীন সঙ্গরপুঞ্জ অবসানে
বিষয় বিকলে
স্বপ্নের কণ্ঠিকা গোপা আবেক শেষ না হোতেই
অক্লান্ত ভাবনার স্রোতে
ভেসে বেড়াই।

বেড়াই বিভিন্ন খেয়ালে
আর শিশুসিকার পাখা দেখি স্বপ্নের সেরাসে।

চন্দ্রা তার নাম

। ধারাবাহিক উপন্যাস ।

সহস্রতা ভট্টাচার্য

বিক্রোহের প্রথম ফ্লিগিং কেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রা চাইলো কানপুরে কিরে যেতে। চন্দ্রার কাছে কিরে বাওয়া দরকার, এইমনে হলো তার।

উত্তর-ভারতের সব শহরেই ক্যান্টনমেন্ট শহর থেকে দূরে—তবে বেনারসে বেন মনে হয়, সামান্য-সামান্য দুই বিভিন্ন বৃগকে দেখা বাচ্ছে পাকাপাকি। ক্যান্টনমেন্টের সুন্দর প্রশস্ত সড়ক, বালো বাড়ী, বড় বড় গাছ—বাজনা বাজে তো উঁচির বাজনা, নয় তো ক্লাবঘরে নাচের বাজনা। শহরটা আড়িকালের সাতরঙা চামর হুড়ি দিয়ে বসে আছে ত্রিকালজ্ঞ কাল্পনের মতো। শব্দ-বটীর বাজনা-বাদ্যিতে তার আকাশ মুগ্ধ। গলিপথের দুই পাশে হুউক পাথরের বাড়ীতে জীবন চলে একেবারেই অস্ত হ'লে। ভারতের প্রাচীনতম নগরীতে জীবনবাজার চলছে কয়েক শতাব্দী ধরে আর বদলায়নি। শুধু লক্ষ্য করা যায় বারানসীধামে বর্বিজ ব্যবসারী গোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালীরা এক নতুন সংযোজন।

ক্যান্টনমেন্টের ময়দানে প্রকাণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করলো বটে কোঁজ, কিন্তু কেমন বেন হুটো দল হয়ে গেল। শহরে না হোক, জোনপুর, মুলতানপুর, আজমগড়, কৈজাবাদ ও মির্জাপুরের ছোটবড় ভূস্বামীদের দেরী হলো না। সাতকেলো গাঁদাবন্দুক, আর বড় বড় তরোয়াল নিয়ে কোঁজ সংগ্রহ করতে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শহরের মাত্রগণ্য মাস্তুমদের মধ্যে সে একতা দেখা গেল না। সারথী মিত্র কুলদা মিত্র প্রমুখ ধনী ও কৃতী বাঙালীরা বিক্রোহের কথাটাকে আমল-ই দিলেন না। সুপ্রতিষ্ঠ ধনী বারানসী শাফী ব্যবসারী কুলনলাল মিত্রকে বললেন—মিত্রজী, কটা সিপাহী রুখে ইংরেজদের হাট্টে দেবে আর আপনারা নিজের রাজ কায়েম করবেন, এ যে গল্প কথা হয়ে গেল ?

বললেন, বেনারস কলকাতা থেকে কতটুকু বা দূরে ? কলকাতা তাদের রাজধানী—সেখানে জাহাজে করে তারা আরো কোঁজ আদানাদাি করবে। নতুন নতুন কাথান জানবে। মিত্রজী, ইংরাজজাতি সকল দিকে শ্রেষ্ঠ। কোম্পানীর আমলে আমি আপনি সুখে আছি। কেন আপনি সকলের কথা শুনে মিছামিছি বালকের মতো ঢকল হচ্ছেন ?

কুলনলাল মিত্রের সুগৌরব মুখ বীরে বীরে লাল হয়ে উঠলো। ঈর্ষানাপাক জয় নিয়ে সন্ধানী দুই চোখে বাজপাখী বেমেন শিকারকে নখে বিঁধে বেলা করে তেমনই মিত্রজীর চোখে চোখ রেখে তিনি বীরে বীরে বলতে লাগলেন—মিত্র বাবু। আমরা চিরদিন জানছি আপনারা সাহেবদের সঙ্গে এককটা। সেই কথাই আবার নতুন করে

জানলাম। পুরনো কথাই নতুন করে জানলাম—নতুন কোন কথা জানলাম না। তবে আপনি জানবেন, আপনি বা ভেবে নিশ্চিত আছেন, তাই শব্দ কথা নয়। সাহেবদের কথা বলছেন ? কানপুরের কথা শোনেন নি ? দিল্লীর খবর রাখেন না ?

মিত্রজী অর্ধবৈভবে কুলনলালের চেয়ে খুব কম বান না। তাই এ কথার পরেও সমানে সমানে কথা কইতে লাগলেন। বললেন—কে রাজা হলো তাতে আমার আপনার কি মিত্রজী ? আমরা চাই শান্তিতে বাস করতে। অশান্তি চাই না।

—আপনার কথার সঙ্গে আমার কথা জড়াবেন না মিত্র বাবু ! আমার সাতপুরুষের কোম্পানীর চাকরী করেনি কেউ। আমার পরশাদাকে চৈন্যসিংহের বাবা কবলা দিয়েছিলেন—সেই থেকে আমাদের ব্যবসা শুরু। আমরা কোম্পানীর বেনিয়ানী স্বীকার করিনি—অন্ত কথা দূরে থাক।

কুলনলাল চাকরের হাত হতে সিংহের মাথা বাঁধানো রূপায় লাঠি নিয়ে উঠে পাড়ান। মিত্রজীকে বলেন—আপনার সুবিধায় জন্ম বলছি—বর্দিধ্বংস চৌধুরী লছমণ সিং বা দীয়াচাঁদ ক্ষেত্রী বা বাজোরিয়াদের কোন ভাই এসে টাকা চায়, তাদের বেন ফিরিয়ে দেবেন না। বে গরম সময় বলা যায় কি ? কিসে কার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ?

কুলনলালের কিছুকণ আগেকার কথাতে মিত্রজীর যে অপমান হয়েছে এখনো তার জের মেটেনি। মিত্রজী তাই চট করে সহজ ভাবে জবাব দিতে পারেন না। তবে মনে মনে ঝলতে থাকেন। টাকা দিতেই হয় দেবেন তিনি কিছু। তবে বুঝতে বাকি থাকছে না, এ যুদ্ধের ফলাফল কি হবে। নামে 'বশে' বিদ্রোহীদের সাহায্য করে রাজদ্রোহিতা করতে পারবেন না তিনি।

১৮৫৭তে বেনারসে যে ইতিহাস ঘটিত হলো, তার তুল্য কলঙ্কিত অধ্যায় আর কোথায় ?

কর্তৃপক্ষের আশঙ্কাই সেদিনের ঘটনাবলীর প্রধান কারণ। এত ভয় কেন ? জেলার জজ গাবিন্স, কলকটর লিও বা কমিশনার টাকার কি বখেট যোগ্য ছিলেন না ? আত্মবিধাি ছিল না তাঁদের ? কি জন্ম তবু তাঁদের কলকাতার দিকে চেয়ে থাকতে হয়েছিলো ? আরো সুযোগ্য, গুরুত্বের এক শাসকের প্রয়োজন হয়েছিল ?

পটনা ও এলাহাবাদের মধ্যে অবস্থিত বেনারস। মাত্র গভবহরই সীতেশ্বরীকে দেখে উঠেছিল বিহরে। সীতেশ্বরীর সে বিদ্রোহ সে নির্ধর নির্ভরতার সিঁপিট হয়েছিলো, তা দেখে থেকে বিবুদ্ধ হয়ে

আছে বিহারের কৃষিকারী সাধারণ মানুষ। সে অসন্তোষ গিয়ে পৌঁছিয়েছে কু-স্বাভাবীদের মধ্যেও। তাই কি ভয় পেয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ? ভেবেছিলেন এই টাল-মাটালের দিনে যদি ক্ষেপে যায় তারা, পাটনা থেকে বেনারসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনা করে, তাহলে তাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হবে।

সম্ভবতঃ তাদের সেই আশঙ্কার জটাই নীলকে বেনারসে আসতে হলো।

নীল এলেন মাস্তাজ থেকে কলকাতা। কোঁজ নিয়ে হাওড়া থেকে রওনা হবার প্রাক্কালে রেলওয়ে কর্মচারীদের উদ্ভূত সঙ্কটের ভয় দেখিয়ে হুমকি দিলেন কাজ। সমস্ত সমস্তুটি ওলোট-পালোট করে স্পেশাল ট্রেন ছাড়লো নীলের কোঁজ বোঝাই হয়ে।

বেনারসে অবস্থিত 37th N. I. রেজিমেন্ট যতই বিক্ষুব্ধ হোক তখনো তারা কণ্ঠে ওঠেনি। তখন সবে তরা জুন। লক্ষ্যে এ ঘোষিত হয়েছে জেহাদ। অযোধ্যার নবাবসাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠার জিগীষ শোনা যাচ্ছে সেখানে। আজমগড়, কৈম্বাবাদ, ও জৌনপুরের অবস্থাও সঙ্গীন।

নীলের মনে হলো, কিছু ঘটবার আগেই তিনি অবলম্বন করবেন চূড়ান্ত ব্যবস্থা। ক্ষেপে উঠবে এই সব সাত টাকা মাইনের সিপাহী আর রিসালদারগুলো। দুঃসহ এই স্পর্ধাকে তিনি দমন করবেন। এই অন্ধকার অন্তঃমহাউপনিবেশের কালো কালো মাহুগুলোর নয় বৃক্কের তলায় যে বিক্ষোভ বাসা বেঁধেছে, যে অবিশ্বাস জেগেছে শাসক শক্তির প্রতি—নীলের অভিযান তারই বিরুদ্ধে। তারা কিছু করবে কি না, সে পর্বেই তিনি অপেক্ষা করবেন কেন?

বিচলিত হলেন টাকার নীলের এই মনোভাব দেখে। কিন্তু নীল তখন কি সাময়িক কি সিঁটিস—কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলাই মানতে রাজী নন। তাঁর সম্ভবতঃ ধারণা হয়েছিলো, সিংহের খাবার সুরক্ষিত বৃটিশ-স্বকৃষ্টির মর্যাদার ভার শুধু তাঁরই হাতে দিয়েছেন বিধাতা। সেই স্বাধিকারমানেই প্রতিভূ। তাঁর শক্তিও কম নয়।

তৈয়্যুৎজ ও নামির শাহ—চৌজি ষাঁও মহম্মদ বোরী তাঁর আর কি ইতিহাস রেখে গিয়েছেন? নীল তাঁর এই সব পূর্বসূরীদের নাম মুছে ফেলতে তৎপর হলেন। টাকারকে তিনি বললেন—37th N. I.-কে নিরস্ত্র করতে হবে।

—কেন? তাদের কমান্ডার মেজর ব্যারেট ত' তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহান নন?

Just to set an example. এই হলো নীলের কথা।

সিপাহীর কাছ থেকে উর্দি আর অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া—সে এক চূড়ান্ত অবমাননা তার পক্ষে। প্রকান্ত মহম্মদে নগ্ন করে ফেলবার মতোই অবমানিত হয় তার পৌরুষ বিনা গোঁবে নিরস্ত্রীকরণ করলে।

তবু 37th N. I. আপত্তি করেনি। সিপাহীর জীবন উর্দি পরেই কেটে যায়। গ্রাম থেকে আসা, গ্রামের খলিকার হাতে বানানো সে জর্জর জামাকাপড়ের খোঁজ ত' ছুটিতে ঘর বাবার আগে ছাড়া আর কখনো মনে পড়ে না। এলো 37th এর ছয় কম্পানী সৈন্যদল। নামিয়ে রাখলো উর্দি ও অস্ত্র হুশ্রমলে।

তখন এশিয়ে এলো ইউরোপীয় টুপ—সঙ্গীন কাঁধে—বলুক উঁচিয়ে। সিপাহীরা তখন জানতে চাইলো পলনবির কাছে।

ক্যালকেমিকোল
ক্যাস্টরল
মলোরম গন্ধযুক্ত ক্যাস্টর অয়েল
ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে
সহায়তা করে

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লি:
কলিকাতা-২২

নতুন সাহেবকে তারা জানে না। পলনবি তাদের পুরনো ক্যাপ্টেন।
তীর্থ কাছে তার। জানতে চায় এই আচরণের মানে কি?

উত্তর সত্যিই নেই। তাই অসহায় বোধ করেন পলনবি।
তিনি গৌরামিল দিয়ে উত্তর দেন—যা অর্ডার, তাই মানতে হবে।
37th-কে কেউ বেইমান বলছে না। কিন্তু অস্ত্রাঙ্গ জায়গায় সিপাহী
সত্তারার বা করেছে এ-তারই শাস্তি।

হার আল্লা—হার বাবা বিশ্বনাথ—এ কেমন কথা? কেন এই
রেজিমেন্টের সৈন্যরা কবে কোন বেইমানী দেখিয়েছে? যে আজ
সমস্ত খেতাব সেনাবাহিনীর সামনে ধাঁড়িয়ে তারা নিরস্ত্র হবে? তবে
বুঝি পাঞ্জাবের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হবে এখানে? তারা ত' জানে—
যে পাঞ্জাবে বেই কোমকে নিরস্ত্র করা হলো, অমনই সমস্ত গোরাকোজ
ভালী চালাতে শুরু করলো? না। এখানে তাহলে সিপাহীরা
লে ভুল করবে না। তারা বলে—হঠাৎ নিয়ে যাও গোরাকোজ।
আমরা নিরস্ত্র হচ্ছি।

তবু এগিয়ে আসতে থাকে ইউরোপীয় সেনাদল। শিক্ষিত
যোদ্ধাগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে। চারিপাশে তাকিয়ে চূড়ান্ত অসহায়
বোধ করে সিপাহীরা। উর্দি খুলে নিয়েছে সাহেব, হাতের বন্দুক
নামিয়ে রেখেছি এ সামনে। এখন আমরা নিজেরাই অসহায়
বোধ করছি। এই উর্দি আর বন্দুকের জোরে আমরাও যে জোর পাই।
হলে হয় আমাদের একটা পরিচয় আছে। খুলে নিলে মনে হয়,
অধ্যাক্রম্যের অবজ্ঞাত অবহেলিত সেই কিবাবের মতোই
নামগোত্রহীন হয়ে গেলাম। তবে কেন সমস্ত এই কোঁজ দিয়ে
ঘিরে কেন্দ্র?

হরিয়া কোনো বুদ্ধিতে কয় জন এগিয়ে আসে। ছটকট করে
ফুলে নিতে চায় বন্দুক। হাতে থাকুক বন্দুক। নইলে এ যে গৌরা
কোঁজ ক্রমেই বেটনী ছোট করে ঘিরে আসছে, তাদের চোখে চোখে
যেন ইশ্খাতের শাণিত নিষ্ঠুর বলক।

যেমন সিপাহীরা কয়জন বন্দুক ফুলে নিতে চায় অমনই যে
জিগেন্ডার পলনবি এই রেজিমেন্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসার তার সমস্ত
ভক্ত আপত্তি ঘুরে ঠেলে কেলে নীল এগিয়ে আসেন। নীলের আদেশ
বন্দুকের মতোই গর্জন করে ওঠে আর সর্গর্ভনে বলকে ওঠে গৌরা
কোঁজের হাতের বন্দুকগুলো। নয়শো গজ পালা নেওয়া এনফিল্ড
ব্রিগেট উপনিবেশ বন্ধার্থে ব্রিটিশের নবতম আবিষ্কার নতুন হাতিয়ার
বার বার গরজে গরজে ওঠে নিরস্ত্র ছত্রভঙ্গ এক বিয়ুট জমায়তের
তপর। তাজারক্ত বিনকি দিয়ে ছোটো। আর্ডানাদ, গৌরা কোঁজের
বিক্রোধান্না, মাহুবেব ছোটোছুটি, ঘোড়ার হ্রোবাব এক বীভৎস একতান
রচনা করে নিমিষে।

—তবু নিরস্ত্রীকরণের জন্ত এই নিরুদ্ভিতার কোন প্রয়োজন ছিল?
কমিশনার টাকারের এই প্রস্তাব কোন জবাবই দিতে পারেন না
বুগেজিয়ার পলনবি। আকগান কেবং এই প্রাক্তন বোডা যুদ্ধ বোকেব
যুদ্ধ করতে জানেন—কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডকে কি বলবেন তিনি?
কোন উত্তরই বুঝে জোগায় না তাঁর। নিজেই পরাজিত বোধ করেন
তিনি।

শিখ ও ইরেগুলার সৈন্যদল এসেছিলো প্যাড করতে। ভুলী
লসে তারাও হতাহত হয়। তারাও পালাত ভুলী হোঁড়ে আত্মরক্ষার
লভ।

এমনি করে বিরত সৈন্যদের করে তোলা হয় বিদ্রোহী। ভাবপর
শুরু হয় নীলের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

কমিশনার জল, বা বুগেজিয়ার—কাক কতৃৎই থাকে না। সব
কতৃৎয়ের ভার নীলের হাতে। মাহুবেব রক্তের খাদে ব্রিটিশ সৈন্যরা
ক্ষেপে ওঠে আর মাহুবেব খনন অমাহুবেব হয় সে দৃষ্ট পতনের হিংস্র মূর্তির
থেকে অনেক বীভৎস হয়। ক্যাপ্টেনমেন্টের রাস্তার দুই পাশের গাছে
গাছে তৈরী হয় কীসীমক। কি কোঁজের সিপাহী, কি সাধারণ
নাগরিক সকলকে তাড়িয়ে এনে বিনা বিচারে গাছে লাটকে দিতে
থাকে নীলের সৈন্যদল। দুর্বল গরম। তার উপর সুরার নেশার
আগুন জলে মাথায়। আর অসহায় বালক, যুবক ও বৃদ্ধের দেহ
ঝটপট করতে করতে নিশ্চল হয়ে ফুলে পড়ছে, এ দৃষ্ট গোরাকোঁজের
শিরা-উপশিরার ছড়িয়ে দেয় টাটকা আগুন।

ক্যাপ্টেনমেন্ট থেকে শহর। বিশ্বনাথ ও শত-সহস্র দেব-দেবী
অধ্যুষিত পবিত্র ধাম বারণশীতে এমন ভীষণ দৃষ্ট বুঝি
কালাপাহাড়ও রচনা করেননি। ভীত, ত্রস্ত জনতা আর্ন্ত ক্রন্দনে
প্রাণ বাঁচাতে চায়। উন্নত গোরাদের হাত থেকে কিশোর পুত্রকে
ছিনিয়ে নিতে গিয়ে ঘোড়ার খুরের তলায় পিয়ে যায় কোনো মায়ের
বুক। ভারতের এক অর্ধনর দ্বিপ্রান্ত মায়ের বুকের বক্তব্য যে
কতখানি ভাল, তা চেয়ে দেখে না কেউ। দেবতার কাছে মাহুবেব
বুখাই আর্ন্তনাদ করে মরে। এই ভয়ঙ্কর নারকীয় লীলা দেখেও
আর্ন্তপ্রাণে নেমে আসেন না কোন সুদর্শনচক্রবর্তী নারায়ণ। বণিকের
দোকান লুট হয়ে যায়। তৈজসপত্র গঙ্গাগড়ি বার রাজপথে।

নীলের সৈন্যদল ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে। নিরীহ মাহুবেবকে
গল্প-ভেড়ার মতো তাড়িয়ে এনে কীসী দেয় তারা। যে মরবার আগে
এক বা কয়েক সারতে চায়—তাকে কামানের যুগ্মে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া
হয়। এ এক চূড়ান্ত শাস্তি। মানবদেহের সব দলিত ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
শৃগাল-শকুনেই খুঁজে খুঁজে থাকে—সে বিদ্রোহীরা কোনো গতি হবে
না—না আল্লার বেহতুে—না হিন্দুর বৈকুণ্ঠে।

তাতেও কি সম্পূর্ণ হলো না শাস্তি? না। তাতেও তো
অবনমিত হলো না এরা। আরো যেন ক'বে উঠছে সবাই। তারা
যেন সাহায্য করছে এদের। ছত্রভঙ্গ মাহুবেবকে সংযবদ্ধ করছে।
হাতিয়ার দিচ্ছে—দিচ্ছে টাকাদি।

নীল এবার এমন অভিনব এক পন্থা বেছে নেন, যাতে ব্রিটিশের
নামের ওপর এক চিরকলঙ্কের মসীলিপ্ত হয়।

সাত, আট, দশ বছরের বালকরা—যারা বড়জোর হল্লা করে—
জলদি ভাগ, জলদি ভাগ আরেজ বেইমান—এই গান গেয়ে নাচানটি
করেছে, আর ঘোড়ার খুরের লদ পেতেই এ বাড়ী ও-বাড়ীতে লুকিয়ে
পড়ছে—নীল ঘরে আনের তাদেরই।

বেনারসের মাটিতে এবার নির্বিচার শিশুহত্যার অঙ্কঠান হয়।
ভীত, মুক, মুক সেইসব গ্রামাশ্রিত—তাদের ঘরে এসে নিজের
তথ্যবানদে নীল ঝোলাতে থাকেন কীসীতে। ভয়ে তাদের দেহ
জাকজার মতোই লটপট করে। হাসতে হাসতে তাদের ফুলে টাঙিয়ে
দিতে থাকে গোরাসৈন্যরা।

মায়াদের আর্ন্তনাদে আকাশ কেটে যায়। পিতা ও ভ্রাতারা
তাকিয়ে দেখে নিফল ক্রোধের আগুন চোখে নিয়ে।

নীলের এই নারকীয় হত্যালীলার খবর পৌঁছে যায় বাতাসের

স্থখে। বর্ষা নামবার আগে যে পুবাণী বাতাস বহ্ন—তাতে এই
ধবর চলে যায় এলাহাবাদ, লক্ষ্মী, কানপুর।

নীলের এই কীর্তির জন্য প্রাণ হারানতে বাধ্য হই ইংরেজ নয়নারী
শিত, সেই সব জানগায়।

নিজের কীর্তিতে উৎফুল্ল নীল এবার অগ্রসর হতে থাকেন
এলাহাবাদের দিকে। আর বেনারস থেকে এলাহাবাদের পথের
তুই পাশে রচিত হতে থাকে মহাশ্মশান।

নীলের সে সেনাদলের সঙ্গে ভবানীশঙ্করও আছেন। চন্দন, বিজ্ঞোহের প্রাথম কুতূহপাতেই ভবানীশঙ্করের দাদার আশ্রয় ছেড়ে চলে গিয়েছিলো কুমলীলের ভাতিজা বীকালালের আশ্রয়ে। ভেলুপুর্বাতে বীকালালের তিনতলা বাড়ী। বাড়ীর নিচে তত্ত্বানায় আর একটা সম্পূর্ণ মহল। কাঠের সিঁড়ি ধরে নেমে এসে, সিঁড়ি নামিয়ে রেখে দরজা ফেলে দিলে তত্ত্বানায় এ মহলের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ থাকল না ওপরে। বীকালালের এ তত্ত্বানা, এ সময়ে ভারতীয় বৌদ্ধদের বড় কাজে লাগলো। প্রায় দুই মাস ধরে অকাতর অর্থব্যয় ও অসীম পরিশ্রমে এখানে জমা করা হয়েছে বনুক, রাইফেল, সঙ্গীন, বেয়নেট, তরোয়াল, ছোরা ও গোলাবাকন্দ।

শহরের অস্বাভাবিক গণ্যমাত্র লোকদের মধ্যে তখনই ছড়ি হুসিষ্টি
ভাঙ্গ হয়ে গিয়েছে। মিত্রজা একত্রে বর্মীক বাঙালী ও কতিপয়
ব্যবসায়ী, ভূস্বামী ও ধনী লোক সাহায্য করছেন ইংরাজদের।
আপাতত শুধু টাকা দিয়ে—তবু নিজেদের বিষমত্ব সম্পর্কে হাজারটা
প্রতিশ্রুতি জানিয়ে এসেছেন—প্রত্যেকে'ও পরোকে।

কলনলাল প্রমুখ শওরের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির—তারা যে
সহযোগিতা করছেন অশুর পক্ষের তা অজানা রইল না
কারো। তবে তাঁদের প্রতি সম্মেহটা রইল মনে মনে। প্রত্যক্ষ
সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে কিছু বলা চলো না।

তিনি চার দিন ধরে তুহখান থেকে অল্প সরবরাহে ব্যস্ত রইলো চন্দন। তারপর দেখা করলো ভবানীর সঙ্গে। ভবানী যখন বললেন, তাঁর স্ব-ত্রিগেডেব বা মেডিক্যাল অফিসারের অভাবে তিনি এখানেই বোগ দিচ্ছেন, তখন তাঁর কথাগুলি বেন ষিখাগ্রস্ত ও বিম্মিত শোনালো। চন্দন কিছু বললো না। ভবানী বললেন—কি জ্ঞান, আমি চাকরী করি—এ আমার কর্তব্য। কর্তব্য মনে করছি, তাই যেতে হচ্ছে।

—কি ডাক্তার সাহেব !

—कि इन्दन ?

কথা হচ্ছিলো দশাধমেথ বাটের দক্ষিণ দিকে—বড় বড় ভাওনোকার আড়ালে শুকনো কাঁধার ওপর দাঁড়িয়ে। নদী এক নিকটে—তার অপর তীরের বাড়িগুলির আলো আজ পড়েনি। বাটে যোগ এ সময় কত পুণ্যার্থী, কত বিশ্রামেচ্ছ নরনারী এসে বসেন। কয়দিন ধরে সমুদ্র নগরিতে নেমেছে বিপদের কালো ছায়া। বাড়ীতে আলো জ্বলে না—মায়ুষ সহজ ভাবে চলাফেরা করে না, কথা কয় না—পথবাট জনবিরল। নিশ্চল নদীতীর—তবু তারকাখচিত আকাশের ছায়া বুকে ধরে গলা এক মুহু আভা বিকীরণ করছে আজ। দুজনেই হৃৎসের 'হৃৎ' দেহতে পাচ্ছেন। আলো নেই—আধারও নেই—একটা অদ্ভুত তরল অবস্থা।

চন্দন বলে—আপনি কত সম্বর আমাকে কত কথা বলেছেন,
শিখিয়েছেন—অন্ত্যরকে আপনি কত বুণা করেন ।

—ताई कि छजन ?

— এখন এতবড় অজ্ঞারটা আপনার সে কলিজার এতটুকু নাগা দিচ্ছে না, সেই কথা ভাবি ! ভাবি যে এত অজ্ঞার এত অত্যাচার দেখেও আপনার বক্তৃতা গরম হয় না—আর আপনি কেমন ঠাণ্ডা মাথার আবার গিয়ে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ! ভাবি যে আপনিও কেমন ওদেরই সঙ্গে অথচ ভালো ভালো কথা বলে, শ্রদ্ধার করে কথা সাজিয়ে, আমাকে কতই না ধোঁকা দিয়েছেন । ভাবি আর অবাক মানি তাকার সাহেব !

নিজেকে বোঝাতে পারেন না। ভবানীশঙ্কর আর চন্দন যে তাঁকে হুঁসলিভিত্তিক এক মানবধর্মবিদ্যাক্ত কামুক যুগে জন্মে চলে যাবে, সেটাও সহ্য করতে পারেন না। বলেন—হ্যাঁ, সাহেবরা অভ্যাস করছে জানি—কিন্তু ঐ যুগের পরিণতি কোথায় চন্দন? নেতা কোথায়? কে এই বাঘবঙলার রাশ তানবের? সাহেবরা এই যে সৌবীর-নির্দেশীকে এক সঙ্গে মেরে শেষ করে ফেলছে, নির্দেশীরদের পাশে কে এসে ঠাঁড়চ্ছে? কে তাদের বাঁচাচ্ছে বল? সাহেবদের অনেক শক্তি। তারা গোটা দুনিয়াটার অর্ধেকের মালিক। তাদের রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। কিন্তু দুনিয়াই বিপন্ন হয়েচে—জাহাজ বোকাই করে ওরা কতজনকে এনে ফেলছে দেখ। ওরা কি হত্মকবচ ভেবেছে? এই বেনারস দিয়ে দেখছ না?



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
'শঙ্খ ও মদ্য'

মার্ক গেন্ড্রী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

ବଂଶିକାତା-୭

—**ବିଦେଶ ତିନି**—

হোসিয়ারি হাউস

୧୦୧୨, କଲେଜ ଟ୍ରାଟ୍, କଲିକାତା—୧୨

ফোন : ৩৪-২৯৯৫

এ সংসারে, এ বিভ্রান্তি কি চন্দনেরই মনের অভ্যন্তরে গীড়া দেয় না? বীকালালের তরুণানার আঁধার নির্জনতায় বসে বসে তার কি বাঁধ বাঁধ মনে হয় না, যে তারপরে কি, তারপরে কি? কিন্তু সে কথাকে প্রশ্নের দেয় না চন্দন। বলে—ডাক্তার সাহেব, ভাল ত আমি আপনার মতো লিখিপিড়ি মাহুয় নই। আজ আপনাকে দেখে আমার হৃৎক হচ্ছে।

—চন্দন।

—হৃৎক হচ্ছে ডাক্তার সাহেব—বে বখান আমার দেশের মাহুয় হাজারে হাজারে মরে যাচ্ছে, তবু কুণ্ডে উঠছে, আলিয়ে দিচ্ছে সাহেবদের কারখানা, সোকান, কুঠি নিজের ধর্মে নিজের রাজ কায়েম করতে চাইছে, তখনও আপনি বিচার করছেন। বিচার করছেন, কি ভালো কি মন্দ, কি হবে, কি হবে না। না ডাক্তার সাহেব—আমরা আপনাদের চেয়ে অনেক ভাগ্যবান। মরতে হরতো মরবো ডাক্তার সাহেব—এমন সুযোগ আর পাব না। জীবন একবারের। নয় কি? লেখাপড়া শিখে নয়। স্ত্রদের প্রেমলব্ধ বিশ্বাসে কথা বলে চন্দন, আর এট দ্বির লব্ধ তরুণ যুবকের মুখে ব্রতাকে এমন তুচ্ছ করে লিখে দেখে নিজেকে কেবলটি ছোট মনে হয় ভগানীর। মনে হয়, ব্রতটাকে ও বে মন্দায় করে তুলতে পারে একটা দগিষ ভারতীয় কুখ্যাপ—সে শিক্ষাটা তাঁর অনেক বই পড়া বাংলা ইংরাজী সংস্কৃত বিস্তার চেয়ে অনেক মূল্যবান।

চন্দন এবার আরো কাছে আসে। চোখ দুটো জলজল করে তার। বলে—গিয়েছিলেন ক্যান্টনমেন্টের পথে? গিয়েছেন অসিধাট ছাড়িয়ে চৌধুরীদের আমবাগানে?

—না।

—এক একটা মাহুয়কে হুমড়ে হুচেড়ে গোল পাকিয়ে তবে তাকে কাঁসী দিয়েছে ওরা। গাছের গায়ে বলছে মাহুয়গুলো, মুখ দিয়ে তাদের ধূধ আর রক্ত গড়িয়ে পড়ে ভিত্তে গিয়েছে মাটি। ডাক্তার সাহেব, একটা মাহুয় মরতে কতক্ষণ লাগে? এক মিনিটে লটকে দিয়ে মরখাটা শেষ করে বেওয়া যায় না তার? আপনি ত'এত জানেন—বলতে পারেন?

—চন্দন।

চন্দনের গলা আরো নিচু। সে বলে, সেই মাটির সামনে এখনো উটগুলো বসে আছে আর পাশে কানাত বুম্ছে ওরা। মদ খেয়ে বুম্ছে।

—চূপ কর চন্দন।

গলার জল আসছে। না কি জলের কিনারায় এসে ঝাড়িয়েছেন তাঁরা? চন্দন বলে—

এত কথা বলতাম না আপনাকে আজ। ডাক্তার সাহেব, এই ছোঁরা আপনার বুক তুঁথে দিয়ে চলে যাব, এই ছিল চকুম।

ভবানী চেয়ে থাকেন চন্দনের দিকে। মনে কোন ভয় হয় না। চন্দন হাসে। হাসিটা সামান্য ঝিলিক দেয় তরল আঁধারে। চন্দন বলে—আপনার সঙ্গে আমি বড় মিশেছি হঠাৎ কিছু বল দেন সে ভয় ছিলো। কে না জানে সুবিধে মতো খবর জোগাতে পারলে অনেক টাকা পাবেন আপনারা। পরে—কোম্পানী নার্সি আপনারদের হাজা বানিজ্য দেবে। তবে মারলাম না আপনাকে, কেন জানেন?

—না।

—মারলাম না। এইজন্তে, যে জেনেছি আপনাকে ডেকে অনেক কথা ভিত্তাসা করেছে উক্টর সাহেব আজ দুপুরে। আপনাকে নিজেরদের গার্ড পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সাহেব। বার বার আপনাকে শুকিয়েছে—আপনার সঙ্গী সে ছোঁরা কোথায় গেল? আপনি কিছু জানেন না কি? আপনি সব স্বীকার করেছেন। বলেছেন কিছু জানেন না। আমাকে বার বার সবাই বলেছে, আপনি বেইমানী করছেন, আর কৈসে যাব আমি ও অন্তরা—তা এখন দেখছি আপনাকে চিনতে বিশেষ তুল করিনি আমি। মাহুয় আপনি অনেকের চেয়ে সাজা। আজ ডাক্তার সাহেব, চলি আমি!

—চন্দন, তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

—না সাহেব।

গলটি গল্গার হয় চন্দনের। বলে—কেমন করে হবে? তুমি চলেবে ওদের সঙ্গে—আমার পথ আলো। নীল সাহেব, এই শয়তানের বাচ্চা, ও নিজে হাতে আমার বাপভাই বাচ্চাদের লটকে দিয়েছে ডালে ডালে। সাহেব, মুসলমানের মূর্খ আলিয়ে দিয়েছে—হিন্দুর মূর্খ দিয়েছে গোর। তাদের ঠাঁই হবে না কোথাও, না বেহস্ত, না বৈকুণ্ঠ। সাহেব, আমার জানের জন্ত খুব মার্য ছিল বলছি তোমায়। এই সেদিন পর্তুগী। কিন্তু সব যেন মরে গিয়েছে। সাহেব, কপালে থাকে জ্বিত যাব লড়াইয়ে নইলে আর কি হবে? মরে যাব? না ডাক্তার সাহেব, মরতে আমি আর পরোয়া করি না। তবে—

—তবে কি?

চন্দন ভগানীশঙ্করের দিকে তাকায়। ঘুণা নয়, তাজিল্য নয়, একটা বিষম গলার কোটে তার। যেন এই মাহুয়টার মধ্যে যে এক ধাম্ভি, এত ষাটটি আছে—সে কথা সে আগে জানেনি, এখন নতুন করে জানছে। বলে—সাহেব, কানপুরে সাহেবদের কুঠি আলিয়ে দিয়েছে, সাহেবরা গড়বন্দীতে আটকা আছে। চম্পা বলতো কুমি ব্রাইট সাহেবের মূল্যবোধিক ভালবাসো। কি রকম তোমার কলিজা ডাক্তার সাহেব, আমা সেই কথা ভাবি—জানো না যে তার ওপর শিপাহীদের কত রাগ? তাকেই বুঝি আগে টুকরা করে ফেলেবে ওরা। আজ চলি।

এতক্ষণে চোখে পড়ে ভবানীর—আরো কয় জন এসে ঝাড়িয়েছে। নীরবে অপেক্ষা করছে পিছনে। এবার তারা নেমে আসে। গুঠে নৌকার। নৌকা গলা পেরিয়ে যায়। লগি ঠেলে ঠেলে মাঝি নৌকাকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। নৌকার বাতি নেই। মাহুয়গুলো ছায়ার মতো নিশ্চুপ। একলা কিয় আসেন ভবানী।

ভ্রমশোকের ভ্রমহানস, শিকিত মধ্যবিত্তের মন, নানান গৌজায়িলে ভরা। হরতো ইংরেজীশিকা ও সভ্যতাপুষ্টি নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজের প্রথম পুরুষের মাহুয়। তবু তাঁরই মনে কি কম জোড়াতালি, কম শঙ্কর? যে জটিল বিবেকবোধ, টাকার সাবাবের বাংলায় তাঁর মুখ চেপে ধরেছিল—অনেক জেনেও কোন কথা বলতে পারেননি তিনি—সেই বিবেকবোধ বার বার কথায়তে রক্তাক্ত হলো ইংরেজ মালিকের অসহনীয় অত্যাচার দেখে। সেই বিবেকই তাঁকে করলো বিদ্রোহবন্দী। দশসহস্র সাধারণ মাহুয়ের অত্যাচারের মহান দৃষ্টান্তকে এই সঙ্গী

বিলম্বের খেলস থেকে টেনে আনতে পারলো না। এই বিভ্রান্ত অকুখ্যাসের পরিণাম কি, কি হবে এর পরে—এই বিচার করতে লাগলো তাঁর মন। বাইরে বখন বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে সব—তখন নিজের বর সাজিয়ে শুছিয়ে অটুট রাখবার মতো-ই নিম্নবর্গ তাঁর এই প্রয়াস। নিজের বেকিসেটের অভাবে—নীলের সেনাদলের সঙ্গেই চললেন তিনি। দেখতে দেখতে চললেন এক নতুন মহানগরনের দৃশ্য।

এমন দৃশ্য কি আর কেউ দেখেছে কখনো? শুধু কি গোরাইসঙ্গ? কসাইয়ের হাতে নিহত পুত্র কবন্ধ যেমন আর এক পঙ্ক্তিতে-ই টান—নীলের পোরা সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে রইলো। বেতনভুক কিছু দেখী সৈন্য। কোম্পানীর কাছে নিজের আত্মগত্যা প্রমাণের জন্য কতিপয় ভারতীয় ডুম্বারীর সহকর্মী করা নিজস্ব সেনাঘল। চলতো সঙ্গে সঙ্গে ডোম ও মুদকরাস।

পথের দুই পাশে বড় বড় গাছ। এই পথ তৈরী করেছিলেন একদিন নবাব সেয়ীদা। সেদিন তিনি উত্তর-ভারতের মাদ্রাসের গমনাগমনের সুবিধার কথাই ভেবেছিলেন। কোনদিন কি এমন কথা ভেবেছিলেন, যে এই পথ দিয়ে একদিন যেতাজ মালিকের কুচ চলবে? শিউপুরুষের স্থিতি অক্ষর করবার জন্য পুণ্যার্থী হিন্দু মুসলমান একদিন এই পথের দুই পাশে জমি খরিদ করে এক একটি করে বৃক্ষ রোপণ করেছেন। নামকে অক্ষর করে রাখতে চাননি তাঁরা। তাই তাঁদের নাম কেউ জানলো না। তবু পথের পাশে এই গাছগুলি বাক থেকে মহাক্রম হয়েছে। শাখাশাখা

বিস্তার করেছে। সে শুষ্ক বখন কিশোর ছিলো, কৌতুকহীন কোনোদিন কোন তরুণী গ্রামবধূ পাড়ী চড়ে টাটকটোল বাড়িয়ে এসে, আবারের প্রথম মেঘসঞ্চারের দিনে সে গাছের পাশে খুঁই চামেলির গাটা বসিয়ে দুই গাছের বিবাহ দিয়েছে। গাছকে জড়িয়ে উঠেছে লতা—তারপর সে গাছ দিন থেকে দিনে হয়ে উঠেছে সুবিশাল সমুদ্রত। তার সে লতিকাবধূ হয়তো তার পারের কাছে জড়িয়ে শান্ত হয়ে থেকেছে। বৃদ্ধ বর্ণণে সে প্রাচুট ফুলের গন্ধ ছড়িয়েছে শীতল বাতাসে—মনোরম সে কুতূহলবাস ভীক এক গ্রাম্য কিশোরীর জ্বরের সরমাবনত প্রেমের মতোই নিশ্চিন্ত ও সলজ্জ। তারপর কবে সে লতা মরে গিয়েছে—মহাক্রম হয়তো সে কথা মনেও রাখেনি। তার ছায়াতে এসে বিশ্রাম করেছে কত শ্রান্ত পথিক, কত রাখালবালক। কত পাখি পুরুষাভুত্রে তার শাখায় বেঁধেছে নীড়। বড়বাদের দিনে এই বনস্পতি তার আশ্রিত প্রাণগুলিকে বন্ধা করেছে।

আজ সেই গাছ হয়েছে কীসীমক। গ্রাম বাড়িয়ে মাদ্রাস হয়ে আনছে সৈন্যরা। তারপর হাসতে হাসতে তুলে দিচ্ছে সেই গাছের ডালে। গলায় দড়ি পরাচ্ছে মুদকরাস। পারের নিচ থেকে হাতী বা উটের গাড়ী সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রাচার আকৃষ্ট হতে হতে থেমে যাচ্ছে অসহায় শরীরগুলো। কোন বুদ্ধবাপ, কোন তরুণ কিশোর প্রাণভয়ে মিনতি করলে টিটকারী দিয়ে হাসছে সবাই নেটিভ বদমাস আর নিগারগুলোর আচরণ দেখে। প্রাণের জন্য কেঁদে কেঁদে মিনতি জানাতে লজ্জা করে না? নীলের এ আচরণ

কী ভালোই লাগে

আমার

ডিউমেত্র

বেনি ফুড!

ডিউমেত্র প্রাইভেট লিমিটেড
বোম্বাই-১



কিছু বহুদূর কোন বেছাচারীর উন্নত নরকোলাস নয়। এই আচরণের পেছনে না কি নীতি আছে। সে নীতিও নীলমুখী বিম্বিত। এই কঠোরতা বাবা নীল একটা আশ্রয় রেখে বেতে চান। বা দেখে নিগারগুলি সতর্ক হয়ে সমবেত বার। সমবেত গিয়ে তারা স্বীকার করে যে ঠাা তুল হয়েচে তাদের।

নীলের এই নীতির ফলে কানপুরে অবরুদ্ধ ইংরেজ নরনারী শিশুর ভাগ্যানিশি লেখা হয়ে যায় কালো অক্ষরে।

নীল তা জানতে পারেন না। তাঁকে অনুসরণ করে আকাশপথে উড়ে চলে শতুনির পাল। তারা বুঝতে পারে, যে তাদের খাত কোণেবে ঐ বাহুবলি।

স্বাক্ষরের অভাবে গাঁহের ভাল ভালে বুলতে থাকে মৃতসেহ। সাধারণ হরিজ কৃষাণ যে নিজের ভাগ্যের প্রতিবার না করে হুইবেলা সাধারণ ভাত-কটি ও লবণ মাত্র পেলে সন্তুষ্ট থাকতো—তাদের সে শান্তি কামনার কোন মূল্যই থাকে না। তারাও যে শিতা, জাভা, পুত্র—সে পরিচরও বোঝা যায় না সে গলিত বিকৃত শব্দেহ দেখে।

কানপুরে বা ঘটে তাতে নানাধুত্পদের প্রত্যেক কোন ভূমিকা ছিল কি না, সে প্রশ্ন একান্ত অব্যবহার্য হয়ে যায়। সত্যীচোড়াঘাটে বন্দন নৌকা জমায়েত করা হয়েছিলো, আর ইংরাজ বন্দীদের ভোলা হয়েছিলো—সিপাহীরা দেখেছিলো পাড়ে ঝাঁকিয়ে। ততদিনে একাধাবাদে পৌঁছিয়েছেন নীল। আর হুঃসংবাদ শুনে শুনে রক্ত প্রবাহ হয়ে আছে সিপাহীদের।

বেছাচারী এই বেছাচার মালিকদের প্রতি অপরিণীয় ঘৃণা নবর হলন্ত মুলিকদের কাজ করেছিলো মনে। কোনোসে ও একাধাবাদে নীলের নির্বিচার নরকতার কাহিনী তারা ভনেছে। তারা কেনেছে যে একবার মুক্তি দিলে একবার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পারলে—এই সব বন্দীরাই নীলের সঙ্গে হাত মেলাবে।

সত্বেতঃ এই সব বৃদ্ধি কাজ করেছিলো মনে। তারই ফলে সত্যীচোড়াঘাটে সে সকালে অস্বস্তি হলো এক পোশাণী ঘটনা। বন্দী নরনারীর রক্তে লাল হলো গজার জল। রবী ও শিশুদের কিরিয়ে নিয়ে বাওয়া হলো বটে বিবিকমে—কিন্তু সেও বরষেরাধেরই জন্ত।

চম্পার বিশ্বস্ততার জন্ত, নিজের জীবনের কথা না ভেবে, সে যে কল্যাণদায়ক সব সমবাহ্য করেছিলো, সে জন্ত মঙ্গললাল প্রবুধ করজন তাকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। অর্থ বা অলঙ্কারে হাম বিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চম্পা তাঁয়ের পুণ্যার্থ বিবিত্ত করলো। না, সে পুণ্যদায় চায় না। তার আচরণের পেছনে কোন প্রয়োজন ছিল না। অলঙ্কার? তার নিজের বা ছিলো, ভাই তো সে তুলে দিয়েছে সম্পূর্ণরূপে হাতে। কিছু চায় না চম্পা। সে কাজ করতে চায়। কোন কাজ?

কানপুরে এখন পেশোয়ার রাজ্য করায়। তবু কানপুরের উপর তরঙ্গ না রেখে বহুবাহর হকিমে কাজীতে তৈরী হচ্ছে বাবী সিপাহীদের বাঁটি। কামান তৈরী করবার কারখানা, সোলা, বাকর, স্নাত সব জমা বসে—সেখানে। আরো হকিমে বুকলখও টালমাটাল। অনেক টাকা পাবেন। হারদের বর্গ সেখানে। র অনেক কাজ গিয়ে ব্যস্ত রাখা চম্পাকে। নইলে বোকা হয়ে বুক চোপে বরজতা চম্পার।

—না।

সম্পূর্ণ আর তার সহযোগীরা চম্পার বাড়ীটাকে ফলে ফল। এইখানে তারা জমা করে বন্ধু, সোলা বাকর, সেখান থেকে নিয়ে চলে যায় কাবী। এখানে সেখানে কল্যাণী তাঁতিয়ার সৈন্য প্রয়োজন হয়েছে—কাবী থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারবে বাটটি সাক্ষরলাল ও বসব। তা হাড়া ছাড় চিঠির বক্তব্য খুলে বসেছে এক নরকোলাস খুনসী। প্রয়োজনে বাতে সে ছাড় চিঠি দেখিয়ে বেশিরে বাওয়া যায় শত্রুবেতনী থেকে। আরো কত চিঠিপত্র ছোট ঝিলমোহরে রটি ও পদ্মকুলের ছাপ। বুকলখওর হকিমে না কি শাদার ওপরে উত্তর একখানা লালরঙের হাত—এই ফলছে ভারতীয়ের ছাপ। সিপাহীদের লেখাপড়ার বালাই ত'কোনদিনও ছিল না—এত চিঠিপত্র আসে কোথা হতে?

সম্পূর্ণ চম্পাকে বলে, এইগুলো ভোর হোকাকত। ভুই দেখবি—আর বরকার ফলে নষ্ট করে কোলবি, খোলা থাকে।

কখনো বলে, যদি এসে পড়ে অবশেষ—ভুই নিজের গাঁয়ে পালিয়ে বাস চম্পা।

—যাব।

মনে মনে চম্পা ভাবে, গেলে একা ত'ধাব না। চকনের আগমনের প্রতীক করে চম্পা। প্রতীকটা যে এমন হবে, তার সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো শক্ত হাতে টেনে রাখবে, যখনই টনটন করবে সব—থেকে থেকে সব তুল হবে বাবে, কথা শুনে শুনে কথ্য হারিয়ে যাবে তান থেকে, সবিস্ময়ে একবার বস্তার মুখের দিকে চাইবে, আর একবার নিজের হাতের দিকে চেয়ে মনে করতে চেষ্টা করবে কি কথা, কোন কথা, তা জানতো না চম্পা।

জানতো না, যে আজকাল এত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজেকে শুণু একলা মনে হবে—প্রত্যাপ্ত কোন সৈনিককে দেখলেই ছুটে গিয়ে জানতে চাইবে সে, দেখছে কি সে সৈনিক চকনকে? জানতো না, যে হাতে শুয়ে কলিক বিজ্ঞানের মধ্যেও বনটা শুণু বস দেখবে সেই গ্রামের নরী, সেই বটাগাছ, সেই বনভূমির। তার মায়ের বুখখানি আজকাল কেন মনে পড়ে? যে সব কথা একদিন মনে হয়নি, সে সব কথা মনে আক মনে হয়? মায়ের কোলের কাছে শুয়ে তাদের ভাল। মনের জানলা গিরে আকাশের চাঁদ দেখতে দেখতে বুঝিয়ে পড়েছিলো বলে ভগবতীর সবটুকু শোনা হয়নি চম্পার। আজকাল কেন সেই ভগবতীর ব্যক্তিহু ভনেতে সাধ যায়। মনে হয় বেকী বাবা সেই ছোট চম্পা হয়ে সত্যাকো ছুটে এসে মায়ের কোলে গঠে। কলা জড়িয়ে হর কমে—কত ভর পেয়েছি বা পো। রাজ্যের ফলে একন অধীশা—আজ আর কাজ করিস না—বা—আজ আরেক ভুই গল্প বল।

মায়ের বুখখানিতে ডিবিরি লাগতে আলা পড়ে কেনন রাজ্য দেখতো মায়নকোতে জানকীমায়ের মুখের মতোই হৃদয়।

কই সব কথা মনে হয়। আর মনে পড়ে সে আর চকন হাতে হাত রেখে ঝাঁকিয়ে আছে বটগাছের নিচে। চকন তার কপাল থেকে চুলকনি সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। আবার মনে হয়, এ সেই নিশ্চিত নিরুদ্বেগ শৈশবের দিন। সে আর চকন ছুটে চকনকে—গ্রামের রাজ্যের বীক্ষণওয়াল এসেছে। কোলা দেখাচ্ছে। হুইকনের হাতে হাতে ধরা। পূর্ববর্তী বাতাসে বুখ-চোখ বুজে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে জিয়ার দেবার আগের দিনের কথা। তার এই মনে—এরনি সময়—

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুট এর

প্রস্তুতকারক কলকাতা

আধুনিকতম প্রযুক্তিপাঠের সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

বাতি জ্বালেনি চম্পা। চম্পনের বৃক মাথা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কঁটা কঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। আজ আর জ্বল চোখের জল বুছিয়ে দিচ্ছে না চম্পন। দুই বাঁহাতে ধরে আছে তাকে। নিবিড় সে আলিঙ্গনে হৃদয়ে বেন নিশ্চল হুই পাখা প্রতিমা।

মনে পড়ে সব। মনে পড়ে আর নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। বড় একলা মনে হয়। চম্পন কেন আসে না? কবে চম্পন আসবে? চম্পন এসে সে সম্পূর্ণের কাছ থেকে ছুটি নেবে। সে আর চম্পন কিরে বাবে তাদের গাঁয়ে—তাদের ডেরাপুরে। গ্রাম তাকে রাখতে চায়নি—সেও অভিমানে তার গ্রামখানির কথা ভাবেনি এত দিন। কিন্তু কোথায় ঘুমিয়েছিলো তার নাড়ীর বন্ধন। এখন সেই গ্রাম, তার মাটি, তার নদী, তাকে বার বার ডাকছে।

সহসা বদলে গেল হাওয়া। বিভ্রান্ত রক্ত সৈনিকরা দলে দলে কিরে আসতে লাগলো কানপুরে। রাস্তায় ধুলো উড়তে লাগলো মাছের পায়ে পায়ে। কিরে আসছে বাঘালিগাহীরা। বুদ্ধ, তরুণ ও বৃদ্ধ—সকলেরই পোষাকে নাগরার ধূলা—ধূলায় জাল সমস্ত শহর ভরে ফেললো। তারা নিরে এসেছে চরম বিপদের সন্ধান। কানপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে হাভলকের বিজয়ী কোঁজ। সত্যচৌড়া ও বিবিধবের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞিত সমস্ত ইংরাজ। নিহত ইংরাজের মাথা-প্রতি কত শত ভারতীয়কে প্রাণ দিতে হবে তার হিসাব তারা ঠিক করে নিচ্ছে। শোনা গেল এবার যা হবে, তার কাছে নীলের হত্যাকাণ্ডও তুচ্ছ হয়ে যাবে। খবর এসে উত্তর-পশ্চিমে পাজাব থেকে। বিদ্রোহের সূচনার ইঙ্গিত পেতেই সেখানে কুপার পাঁচ শতাধিক সিপাহী ও গ্রামবাসীকে নির্ধম ভাবে হত্যা করেছে। নৌকা বোঝাই করে নদীতে ডুবিয়ে, গুলী করে, কাঁসী দিয়ে এবং কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে। একটি কুয়োতে হত ও আহত, জীবিত ও মৃতকে একই সঙ্গে সমাধি দ্ব করেছে কুপার। সঙ্গের বোঝা করে—There is a well at Cawnpore, but there is also one at Ujnalla!

সাতার সালের হাওয়া বদলাচ্ছে দ্রুত। বিদ্রোহের ক্ষেত্র আর উত্তর-ভারত নয়—বুন্দেলখণ্ডের দিকে বেড়ে হবে। কান্নাকাতি করতে হবে প্রধান বাঁটি। কানপুরের নাম চলে গিয়েছে কালো খাতায়।

কানপুরের আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো আতঙ্ক। কানপুরের মানুষ গরুর গাড়ী, উটের গাড়ী, অথবা কাঁধে বোঝাই দিয়ে জিনিষপত্র সহর ছেড়ে সরে বেতে লাগলো। লোকানী লোকান বন্ধ করবার কথা ভাবলো না—গৃহী বর বন্ধ করতে ভুলে গেল—মরিয়া হয়ে প্রাণের আতঙ্কে তারা চলে বেতে লাগলো। ভীত-সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা শহরের মানুষের আচরণ দেখে আরো দৃশ্যবস্তুর প্রায়ে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করলো। সাধারণ শান্তিকামী মানুষ প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টার ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কার কোন কথা মনে রইলো না। গরু, ছাগল, ভেড়া—গৃহপালিত জন্তুগুলিকে তারা ছেড়ে দিয়ে গেল। কোন শিকড়টানের কথা চিন্তা করা সম্ভব নয় এখন।

সম্পূর্ণ ও তার দলবল অস্ত্রশস্ত্রের সকল সঞ্চয় নিয়ে চললো কান্দী অভিমুখে। সেখান থেকে দরকার হয় আরো দক্ষিণে বাঁসী বাক—নয়তো ছড়িয়ে পড়বে ছোট ছোট দলে—বান্দার নবাব বা বালপুর ও শাঁগড়ের রাজার দলে ধোঁসে দেবে।

আতঙ্কিত নয়নারী শিশুর হটগোলে আকাশ-বাতাস বুঝ। চম্পাকে সম্পূর্ণ বললো—সব ফেলে রেখে চল।

—আমি যাব না।

—যাবি না?

—না বুড়ো।

চম্পাকে গালি দিতে শুরু করলো সম্পূর্ণ। বললো—তাকে রেখে যাব এখানে? মাথতে মাথতে চুলের মুঠো ধরে নিয়ে যাব।

—আমি যাব না।

—হতভাগী, অংরেজ কেনে গেলে কি চেহারা ধরবে তা জানিস? তাকে ছেড়ে দেবে?

—না দিলো।

—কীসীতে মরবি? কামানের মুখে মরবি?

চম্পা সম্পূর্ণের কাঁধে হাত রাখলো নিঃসঙ্কোচে। বললো—বুড়ো, আমার জানের এখতিয়ার তোমাকে কবে দিয়েছি? আমি যাব কেন?

—দেখছ না, যে যা পাচ্ছে কাগজপত্র এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছে? সেগুলির ব্যবস্থা কে করবে? মগনলালের ডাতিজা জানতে গেল তোমাদের নক্সা আরো কাগজপত্র। মগনলালরা সবাই চলে যাচ্ছে জয়পুর, জান?

—হারামী।

—পরমাণুরা মানুষ কবে বিপদে পড়ে বল? তুমি কি জেবেছিলে পড়ে পড়ে মার খাবার ভঞ্জে সে বসে থাকবে এখানে?

—তাকে একলা কেমন করে রেখে যাব চম্পা?

চম্পা সম্পূর্ণের দিকে চেয়ে হাসে। বলে—কেন? আমার সাহেব আসবে না? অংরেজ কোঁজ যদি আসে তার সঙ্গে আমার সাহেবও আসবে।

—ঠাট্টা করিস না চম্পা।

—কে ঠাট্টা করছে? আর আমি কেন যাব বুড়ো? আমি ত কোনো অন্তর্য করিনি? তুমি একটা কাজ করে যাও।

—কি?

—আমিও পালান ঠিকই। তবে যদি অনুবিধা হয়? তুমি জালচিটি আর ভূয়াখবরের কাগজগুলির পেটিটা আমাকে জালাল করে দাও। দেখালে পরে হয়তো সাহেব বিশ্বাস করবে আমাকে। বিশ্বাস করবে যে আমি এখানে তাকেই সাহায্য করছি, আমি কোনদিনও তার সেইমনি করিনি।

সে পেটি দেয় সম্পূর্ণ। তবে সমবেদনার হৃৎ-মলিন হাসে। বলে—সাহেবরা মুর্থ নয় চম্পা। ভোর এ যৌঁকা বাঁচার খেলার মতো। এক নিমিষে ধরে ফেলবে তারা।

—ততক্ষণ আমি ঠিক বেরিয়ে যাব। জুল বোর কেন, বুড়ো? আমি মরতে চাই না। বাঁচতেই চেষ্টা করব।

সেই রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে চলে গেল সম্পূর্ণ। চম্পার অনেক দিনের সঙ্গী। একলা বোবনের অভিলাপ নিয়ে বিপদে পড়বে চম্পা, তাই ভেবে সম্পূর্ণ একদিন তার সঙ্গে এসেছিলো। নানা বাস্তব-প্রতিঘাতে কেটেছে দিনগুলো। আজ বিদায় নেবার সময়, সম্পূর্ণের পাখা বুখানার নিচে একটা অজানা অস্ত্রতুতি বা দিলে লাগলো। অবাক হয়ে গেল সম্পূর্ণ। এরই নাম যে

বেহমততা তা সম্পূর্ণ জানে না। চম্পা কীদলো। কীদবার সময় এ নয়। শুধিবে নিলো বিদ্যুয়, পাণথুব। জামার ভেতরে আঙিরিতে রাখলো ছোট্ট একটি পিঙল। রূপোর তৈরী বিলাতী জিনিষ বহু মূল্য। চামড়ার খাণে ভরে তাকে রাখলো উত্তপ্ত বুদ্ধের ঠিক ওপরে। তারপর বেরিয়ে গিয়ে কাঁড়ালো মণ্ডিতে।

সজীমণ্ডিতে বড় বড় ঘাসের সজী! শলায়নপর নাগরিক ও সিপাহীদের কাছ থেকে ঘাস বিক্রিয়ে সোনার দাম নিতে পারতো সজীওয়াল। আজ সেখানে কোন বিক্রোতা নেই। সেখানে যে খুসী আসছে, বখেছ তুলে নিচ্ছে ঘাস—চলে যাচ্ছে। কাঁড়িয়ে কাঁড়িয়ে চলে এলো বাড়ীতে।

আবার গেল বিকালে—হাত অবধি বসে থাকলো—চলে এলো আবার।

এক সপ্তাহ বেতে না সে আকাশ ঘেঁষে গড়িয়ে গড়িয়ে এলো মৌসুমী মেঘ। কালো মেঘে আকাশ মেঘর হলো মানে বর্ষা আসছে। বর্ষা এলে সুগম হবে নদীপথ। আর পাহাড়ী নদীগুলি যদি ফুলে ফেঁপে ওঠে, তবে বাধা পাবে বুটিন কোঁজের অগ্রগতি।

ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করলো। এ হলো বর্ষার অগ্রদূত। চম্পা বসে বসে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কাগজপত্র পোড়ালো একদিন। বুটিন কুটি লুইস্তরাজের আসবাব, এটা সেটা, ক্যাটিনমেন্টর বাজারে মাঝপথে আজও পড়ে আছে। সেগুলি ওরা আলিয়ে দিয়ে যায়নি কেন?

ধীরে ধীরে সহর কঁাকা হয়ে গেল। তারাই রইলো, যারা বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছে, যারা লুকিয়ে খবরাখবর দিয়েছে ইংরেজদের। আর রইলো কিছু শাস্তিকামী মানুষ। তারা কিছুতেই ছেড়ে গেল না সাতপুরুষের ভিটে। বললো, কি দোষ করেছে? পিতৃপুরুষের বাড়ী ছেড়ে যাব কেন?

বাড়ী মানে ত চালাঘর, বড় জোর একটা নিমগাছ, কি দুটো আমগাছ, সেই সঙ্গে কাক বা ইদারাগ আছে। সে সম্পত্তি ছেড়ে যেতে এতই কি কষ্ট?

সে সব মানুষকে বোঝানো গেল না। তারা যাবে কেন? তারা ত কোন দোষ করেনি।

বর্ষা আসবার আগেই হুঃসবাব এলো। এলাহাবাদে অকথা

অভ্যুত্থান। এলাহাবাদের আর কানপুরের মাকে আটকে পিয়েছে চন্দন। চন্দন আর বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডাঙাচোরা কিছু কোঁজের জন্য চল্লিশ সওয়ারের একটা দল। এখন কানপুরে আসা মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ডেকে আনা। কোন মূর্খ কানপুরে আসে এখন?

তবু চন্দন কানপুরে আসবার চেষ্টা করছে। সজীমণ্ডিতে এই কথা শুনে চম্পা চেরে রইলো বস্তার নিকে। বস্তা এক প্রোট সিপাহী। সে কিরছে জওয়ারী—তার গ্রাম। সে গ্রামে এখন বাওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু সেখানে তার স্ত্রী-পুত্র আছে। শুধুনের কাছে তাকে যেতেই হবে।

চোখ ছোট করে জামাকাপড় থেকে মূল্য উড়িয়ে সে চম্পাকে বললো—খেতে দিতে পার কিছু?

হালুইকরের দোকানে আজ তিন দিন কাঁপ বেলা। পিণ্ডে-মাছি ভনভন করছে। বেসনের লাভু মিললো ক-টা। তাই বাইরে থেকে নোংরা অংশটুকু চেঁছে ফেলে খেলো লোকটা। জল দিলো চম্পা জনশূন্য পাড়ার ইপারা থেকে তুলে। বাবার কালে লোকটা বললো—সবাই চেষ্টা করছে দক্ষিণে পাঁচিলে বাবার। চন্দন সে সব বুঝেছে বলে মনে হলো না। মনে হলো সে কানপুরে আসবেই। তোমাকে হয়তো চিঠি দিবে। সে স্বামেলো আরি নিতে পারলার না। গৌরার ছোকরা—এলে পথেই হয়তো মরতে হবে—তা সে সব কথা সে বুঝল না। ঘোড়া জখম হলো, ঘোড়া পাঁটাচ্ছে, কানপুরে না কি তাকে আসতেই হবে।

সে সিপাহী চলে বাবার পরেও চম্পা কাঁড়িয়ে রইলো একা। জনশূন্য পথঘাট। গোল-ছাগলগুলো চরছে একটা হুটে। পথের ধুলোর ওপর মাছি বসছে, মাছি উড়ছে। ঢিল মেয়ে জালাবার একটা ছেলে-ছোকরাও নেই, তাই একটা কুকুর আর একটা কুকুরের সঙ্গে নিরুপেষে খেলা করছে। শ্রেয় করবার নিশ্চিন্ত অবসর তাদের। আকাশে উড়ছে ধূলরক্তের চিল—কী-কী—তীজ সে ডাকে বেন কোন অন্তত সন্কেত। আর হুঃসহ উত্তাপ, মেঘচাপা গরম—কিন্তু এত গরমেও চম্পা উত্তাপ পেল না। শব্দার একটা ঠাণ্ডা হাত বেন কলঙ্কটোকে মুঠো করে ধরেছে। কি বেন বিপদ হবে!

[ক্রমশঃ]

কপালকুণ্ডলা

শ্রীমতীস্বনাথ মুখোপাধ্যায়

অরি চির উলাসিনী নারী চিরন্তনী
মুর্তিমতী মমুভতা,—কে তোমারে ধনি,
গৃহকোণে বাঁধি রাখি প্রণয়-বন্ধনে,
জীবন-দরিত্রা করি রাখিবে গোপনে?

তব তরে নহে নীতি সমাজ-শাসন,
ছলা-কলা রমণীর বিলাস ব্যসন
তব তরে নহে কিছু; বিযুক্ত শৃঙ্খলে
অগ্রমত্তা তুমি সজী আপনার বলে।

তাই তব পরাজয়; ধূলার ধরায়
বরপের দেবী কক্ষ স্থান নাই পায়।

সহজ সর্বমপূত বনগুপ্ত সমা
চিরশুভা তুমি দেবি, চির-অনোমনা,
তাই তুমি বৃদ্ধ নাই সমাজের নীতি,
সকল-খাঁচার শোভা মাহুদের প্রীতি;



ছদ্ম

বহিরের ডাক

কমলেশ ক'দিনের ছুটি চেয়ে নিল সন্ধ্যার ঘরের কাছ থেকে।
ঐ ক'দিন সে ছুলে বাবে না।

শঙ্করলা হেসে জিজ্ঞাস্য করে, সারা দিন করবি কি?

—আমি পুলুর কাছে বাবো।

—কে পলু?

—ঐ বুড়োর নাতি। তাকে দেখে অবধি কি রকম যেন আশ্চর্য
লেগেছে আমার।

—কেন?

কমলেশ নিজের মনেই বলে, চোখে তার স্বপ্ন, কি কল্প
মিনতি। সত্যিই সে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

শঙ্করলা কিছু সাবধান করে দেয়। খুব সাবধান, বুড়ো বিশেষ
সুবিষের লোক নয়, আমার উপর তো হাড়ে হাড়ে চটা, ভোর না
কোন ক্ষতি করে।

—সে ভয় নেই শঙ্করলা, নিজেকে সামলে চলতে ঠিক পারবো।
যদি কোন বিপদে পড়ি সরমন্ত খবরও পাবেন।

ছুলের থেকে ছুটি নিয়ে ঐ ক'দিন কমলেশ সাবানকণই প্রায়
কাটিয়েছে পুলুর সঙ্গে। সকাল থেকে পলু তার জন্তে অপেক্ষা করে
থাকে। কমলেশকে দেখলেই তার চোখ আনন্দে নেচে উঠে।

খুশি হয়ে বলে, ঠিক সময়ে এসে গেছ, তোমার জন্মেই যে বলে
আছি। কমলেশ যুহ হাসে, তুমি তো আগে আমার চিনতে না।
এত সহজে আমাকে কাছে টেনে নিলে কি করে?

পলু উদাস হয়ে বলে, কি জানি, তোমাকে আমার খুব চেনা-
চেনা মনে হয়, কোথায় যেন আগে দেখেছি।

সত্যিই বকপুরীর অন্ধরমহল এক বগ্নরাজ্য। কমলেশ অবাক
হয়ে ঘুরে বেড়ায় পুলুর সঙ্গে, চারদিক দেখে। নিখুঁত হাথির মত
সাজানো ঘর, বহুমূল্য কিংবাবের উপর দামী দামী সেকেন্দ্রে আসবাব।
কোথাও এতটুকু সরলা নেই, বকবকে পরিষ্কার।

কমলেশ খুশি হয়ে বলে, কি চমৎকার বাড়ী তোমাদের পলু!
আমার তো লোভ হচ্ছে, এখানে থাকবার জন্তে।

পলু সানন্দে লাকিয়ে গুঠে, থাক না ভাই আমাদের সঙ্গে, তাহলে
তো আমি বেঁচে বাই। একলা একলা যে আমার দিন কাটতে
চায় না।

—তোমার বন্ধু এখানে আর কেউ নেই?

—না শুধু ঐ দাদু।

—তোমার বাবা, মা?

—মারা গেছেন।

পুলুর জন্তে কমলেশের দুঃখ হয়। বলে, সত্যিই আমি চেষ্টা
করবো তোমার কাছে থাকবার, আমার মা-বাবাকে চিঠিতে জিজ্ঞাস্য
করবো। যদি ভুল—

পলু খামিয়ে দিয়ে বলে, না আমি তোমার থাকতে বলবো না।

ঐ কথাই কমলেশ অবাক না হয়ে পারে না, কেন?

—এখানে থাকলে তুমি শুকিয়ে বাবে।

—কি বলছো তুমি?

—আমি ঠিকই বলছি। একবার একটা পানী খোলা দরজা
পেয়ে এই বাড়ীর মধ্যে ঢুক পড়েছিল। আমি তাকে ধরে ফেলি।
পুঁথি। কিন্তু যে বাঁচলো না, শুকিয়ে মরে গেল।

—কেন পলু?

—এ বাড়ীর বন্ধ হাওরার মধ্যে কেউ বাঁচতে পারে না।

—তা হলে তোমরা বেঁচে আছো কি করে?

পলু ধীর স্বরে বলে, আমরা যে এখানেই মাহুঁষ। থাক সে
কথা, চল তোমার অজ্ঞ ঘরগুলো দেখাই।

পলু কমলেশকে নিয়ে গেল এক ঘর থেকে আর এক ঘরে।
দামী কাঠের আলমারিতে বোকাই করা বই দেখে কমলেশ প্রায় কয়ে,
এটা বুঝি তোমাদের পড়বার ঘর?

দিন আগত ঐ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

—ঈ। আমার ঠিকুরবার বাবার আয়ল থেকে এখনে পড়াভানো করা হয়।

কমলেশ ঘুরে ঘুরে বইগুলো দেখে, এ যে সব বই পুরোনো কই। আজকালকার কোন বই বুকি এখনে নেই। পলু দীর্ঘবাস কেসে বলে, ।

—কেন ?

—দাদু জানতে দেন না, বলেন, তাহলেই নাকি আমি নষ্ট হয়ে যাবো। বাবা মাথা বাবার পর থেকে—পলু বলতে বলতে খেমে যায়।

কমলেশ কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাস্য করে, বল, থামলে কেন ?

—না বলা ঠিক হবে না, দাদু জানতে পারলে বকবে।

—কেউ কিছু জানতে পারবে না, ভূমি বল

পলু চারদিক জলসা করে দেখে নিয়ে বলে, এটাচান জমিদার-বংশের ছেলের বাসরা। মত বড় জমিদারী। বাবা বড় হয়ে লেখাপড়া শিকতে গিয়েছিলেন কলকাতার। ছাত্র অবস্থা থেকেই বেশে কাজ করতে ভালবাসতেন। তাই বংশেই দলে নাম লিখিয়েছিলেন। দাদু জানতেন না। তারপর—

—কি হোল তারপর ?

পলুর চোখে জল এসে পড়ে, বাবাকে জেলে ধরে নিয়ে যায়।

—জেল ?

—ঈ। সেইখানে তাঁর অন্তর করে। মারাও যান। কমলেশ চমকে ওঠে, সে কি, তোমার তখন বয়স কত ?

—এক বছর। সেই থেকে দাদুর মাথা একরকম খারাপ হয়ে গেছে বললেই হয়। একমাত্র ছেলের শোক সহ করতে পারলেন না। তাই আমাকে এই বড় ঘরে মাদুর করছেন। বাইরের সঙ্গে কোন বোগাযোগ রাখতে দেন না।

—এ যে আর এক জেলখানা।

—ঠিক তাই। এ জেলখানার মধ্যে মা বাঁচতে পারলেন না। মারা গেলেন। আমি শুধু বেঁচে আছি। চোখ বড় বেঁচে আছি।

কমলেশ কি ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাস্য করে, তবে আর থাড়া রয়েছেন তাঁরা কারা ?

—ওরা আমাদের আত্মীয়-বন্ধন। কেউ বা নায়েব পোস্কা। পঞ্চাশ জন লোক ছিল, এখন কমতে কমতে পনের জনে পঁড়িয়েছে।

—এরাও বেরতে পারে না ?

পলু দীর্ঘবাস কেসে, না, কারুর বেরবার ছক্কর নেই। একমাত্র দাদুই 'মা' মাঝে মাঝে বাইরে যান। এখন তো তাঁরও শরীর খারাপ।

কমলেশের অন্তরকণে মনে হয় পলুর দাদুর কোন খবর করা হয়নি, প্রশ্ন করে, উনি এখন কি রকম আছেন ?

—আজ অনেক ভালো। বাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ?

—চল।

বুড়ো খাটে গুয়েছিল। কমলেশকে দেখে বৃহৎ হেসে বলে, কখন এসে ?

—এইতো একটু আগে।

—পলুর সঙ্গে তার হয়েছে ?

—ঈ, ও আবারো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাঁজী দেখাচ্ছিল।

কথা শুনেই বুড়ো কি রকম চমকে ওঠে, সে কি পলু, ওকে ডেউলার ঘরে নিয়ে আসনি তো ?

পলু হেসে উত্তর দেয়। এখনে কি করে যাবো, চাষি তো তোমার কাছ।

বুড়ো কোমরে বাঁধা চাবিটার উপর হাত দিয়ে হস্তির নিবাস ফেলে, না ওঘরে তোমরা কেউ বেঙ না। ভর পায়ে।

কমলেশ না জিগোস করে পারে না, কিসের ভর ?

বুড়োর চোখ দুটো জল-জল করে উঠে। সে কথার তোমার দরকার কি ? খবরকার ওঘরে কেউ ঢুকবে না। একটু খেমে অগ্রসর বলে, আবার মত আমি বলাইনি, তোমাদের ইচ্ছার পাশে চিনির কলই বসবে।

কমলেশ মাথা নীচু করেই বলে, সে আপনাদের যা ইচ্ছে, শুধু হৃৎকর এক ভেবে যে, এমন চমৎকার একটি স্থান নই হয়ে যাবে।

—যাক, তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না, পলু, ওকে নিয়ে যাও অন্তর।

অস্বস্তা কমলেশ পলুর সঙ্গে অন্তর করে চলে যায়, পলু তার হাতটা ধরে বলে, দাদুর কথার কিছু মনে কোর না ভাই, কখন যে কি বলেন তার ঠিক থাকে না।

কমলেশ সহজ গলায় উত্তর দেয়, না, না, আমি কিছু মনে করিনি।

পলু কি বেন ভাবছিল, অন্তরনয় হয়ে প্রশ্ন করে, তোমাদের তো মত বড় স্থান, তাই না ?

—ঈ। অনেক ছেলে পড়ে।

—আমার বড় ইচ্ছে করে দেখতে, কি রকম তোমরা পড়াভানো কর ?

—বেশ তো, চল না আমার সঙ্গে।

পলু ভরে ভরে বলে, দাদু যে বেরতে দেবে না।

কমলেশ হঠাৎ জিজ্ঞাস্য করে, দাদুকে না বলে যেতে পারো না ?

পলু ইতস্ততঃ করে, না বলে ? কি জানি, কখনও তো যাইনি।

—চল না আমার সঙ্গে, কেউ জানতে পারবে না, চুপ করে ঘুরে আসব।

—তাহলে আর একটু পরে, দাদু আগে ঘুমিয়ে পড়ুক।

বুড়ো ঘুমিয়ে পড়লে কমলেশ আর পলু আড্ডে আড্ডে বেরিয়ে আসে বন্ধপুখীর বাইরে। বিগাট আকাশের নীচে কাঁকা হাওরার পাঁড়িরে পলু জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। চোখে লুপে তার কি আনন্দ, চারদিকে ছুটে বেড়াতে তার ইচ্ছে করে, বার বার বলে, সত্যি ভাই কমলেশ, এরকম আনন্দ আমি জীবনে পাইনি। বাঁজীর মধ্যে বসে থেকে শরীর মন দুটোই বেন খিমিয়ে পড়েছিল, এ বেন নতুন জীবন।

কমলেশ পলুর পিঠি চাপাডায়, সত্যি তোমার দেখে মনে হচ্ছে অন্ধকারে থাকা নেড়িরে পড়া গাভের চারা, বেন সূর্য্যের আলো পেরেছে, চল, তোমার আমদের স্থলে নিয়ে বাই। সেখানে গেলে দুই আরো খুশী হবে।

সত্যিই বিভাজনের বাজীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে পলুর আর আনন্দের নীমা থাকে না। বলে, তোমাদের সঙ্গে যদি আমি

পড়তে পেতাম তাহলে এরকম চুপ করে জীবনটা কাটাতে হত না।

কমলেশ ভবলা দিয়ে বলে, তোমার দাঁতকে বলে এখানে তোমার ব্যবস্থা আমি করব।

পুলু রান হাসে, তার আর কোন উপায় নেই। দাঁত এখানে আসতে দেবে না, উনি ভাবেন একবার বাইরে এলে আর আমি ভেতরে যাব না, তারপর হঠাৎ হয়ত একদিন বাবার মত উধাও হয়ে যাব।

অন্ত ছেলেরদের সঙ্গে কিন্তু পুলু আলাপ করতে চাইল না। কমলেশকে বুঝিয়ে বলে, এদের সঙ্গে ভাব করলে নিজেরই কষ্ট হবে, একলা একলা কিরে বেতে। তোমাদের মত আমারও খুব কান্ন করতে ইচ্ছে করে।

—বাড়ীতে তুমি কান্ন কর না ?

—করি, কিন্তু জাতে কোন প্রাণের সাড়া পাই না। সে বড় একঘেরে কান্ন, কর্তব্যের তাগিদই সেখানে বেশী। কিন্তু আর দেরী করব না, চল কিরে বাই। দাঁত যদি জানতে পারে আমি তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি, তাহলে আর রক্ষে রাখবে না।

অতি সন্তর্পণে তারা আবার বন্ধপুতীতে কিরে আসে, বুড়ার ঘুম আগেই ভেঙে গিয়েছিল। তবে ভগ্না ভাল পুসুর। দাঁত তার কোন খোঁজ খবর করেননি এর মধ্যে। বাড়ীর লোকেরাও কেউ কল দেয়নি।

বুড়ো কমলেশকে এক সময় একলা পেয়ে কাছে ডেকে বসায়, বুঝিয়ে বলে, পুলু যদি এবাড়ীর বাইরে বেতে চায়, তুমি কিছুতেই নিয়ে বেও না।

—কেন ?

—বাইরে গেলে ওর অন্তর্য করবে। বড় দুর্বল শরীর ও খোলা হাওরা সহ করতে পারে না। একটু খেমে বুড়ো আবার বলে, জানতো, ঐ পুলুই আমার একমাত্র বংশধর, ওর কোন ক্ষতি হলে আমি কিছুতেই সহ করবো না।

কমলেশ ভালো ছেলের মত বলে, আপনি বখন বাবপ করছেন কেন নিয়ে যাবো ?

—বাইরের গল্পও বেশী করো না ওর কাছে। তাহলেই গর বাইরে বেতে ইচ্ছে করবে।

—করবো না।

বুড়ো হাত দিয়ে ভুফ পাকাত্তে পাকাত্তে বলে, আর একটা কথা। তুমি যে এ বাড়ীর অন্তর্য মহলে চুকোছো, জানতে পেরেছো এখানকার কথা, তা কাউকে বলবে না, এমন কি তোমাদের শঙ্করদাকেও না।

কমলেশ যে বুড়ার কাছে শুধু সুখের কথা দিয়ে এলো তাই নয়, সত্যিই সে বন্ধপুতীর অন্তর্য মহলের কথা নিয়ে কান্নার সঙ্গে আলোচনা করেনি। এমন কি, পরদিন পুলু বখন বলেছে, চল না কমল, আজ আবার বেড়িয়ে আসি—

কমলেশ জানিয়েছে, না তাই, তা হয় না।

—কেন ?

—তোমার দাঁত বাবপ করেছেন।

পুলুর চোখে জল এসে পড়ে। কাল তোমার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে

যে কি ভালো লেগেছিল, খোলা হাওরার নিশ্বাস নিয়ে কত বেশী শক্তি পেরেছিলাম।

—তোমার দাঁত যে বলছেন বাইরে গেলে তোমার অন্তর্য করবে ?

পুলু মুখ সরিয়ে দিয়ে বলে, এই জেলখানার মধ্যে থাকতেই আমার শরীর ভেঙে যাবে; তখন দাঁত বুঝতে পারবেন।

কথা ভুল নয়, কয়েক দিনের মধ্যেই পুলু অন্তর্য পড়ে। মন তার খারাপ, চুপচাপ থাকার উপর গুণে থাকে। কান্নার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। কমলেশ এলে তবু পুলু একটু ভালো থাকে, অন্য সময় আরও বেশ দৈহিত্যে পড়ে। শুয়ে শুয়ে কাঁদে। অন্তর্য মহলের ভক্তির কিছুতেই পুলুকে সুস্থ করে তুলতে পারে না। বাড়ীর সকলের ভাবনা। বুড়োও যে ভেতরে ভেতরে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে তা কমলেশ জানতে পারলো দু'দিন পরেই।

সেদিন রাতে পুলুকে ঘুম পাড়িয়ে কমলেশ অন্তর্য মহলে বেরিয়ে এল, মনটা তারও খারাপ। পুলুর চোখে সে দেখেছে কেমন যেন এক উদ্বাস দৃষ্টি, নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে সে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছন থেকে ভারী গলার বুড়ো ডাকল, কমলেশ, শোন।

কমলেশ বুড়ার কাছে এগিয়ে যায়, কিছু বলছেন ?

বুড়ো কমলেশের কাঁধে হাত রেখে বলে, পুলুকে বাঁচাতেই হবে, ও দেখছি তোমার কথাই বা একটু শোনে।

—সেজ্ঞে আমি তো রোজই আসছি।

—জানি তুমি পুলুকে ভালবাস, তাই বলছি, আমি আর কোন বাধা দেব না, বা করলে মনে হয় ওর ভাল হবে, তুমি কর।

কমলেশ একটু ভেবে নিয়ে বলে, আমার ইচ্ছে করছে দু'একজন বন্ধুকে নিয়ে আসতে, তাদের সঙ্গে গল্প করলে হয়ত পুলুর মন ভাল হবে, ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠবে।

বুড়ো কমলেশকে কথা শুনিয়ে বলে, না, সাদরে বলে, তোমার যদি তাই মনে হয় তাদের নিয়ে এল, আমার কোন আপত্তি নেই।

কমলেশ হোটেলে কিরেই প্রশান্তকে নিয়ে গেল বেগুকার কাছে, তিন জনে মিলে বসল তাদের ঘরোয়া বৈঠক। পুলুর বিষয়ে সব কথা জানিয়ে কমলেশ বলল, ওকে আমাদের বাঁচাতেই হবে, বড় ভালো ছেলে, কাল সকালে তোমরাও চল আমাদের সঙ্গে।

বেগুকা সায় দিয়ে বলে নিশ্চয় যাব, কিন্তু এখানকার কান্ডগুলো কে করবে ?

সে আমি শঙ্করদাকে বলে ব্যবস্থা করে দেব। বেগুকা নিজের মনেই বলে, আমি পুলুর ভক্ত ফুলের তোড়া নিয়ে যাব। বাইরের ফুল দেখলে সে নিশ্চয় খুসী হবে। প্রশান্ত বলে, আমি নিয়ে যাব বই, আজ লাইব্রেরী থেকে বেছে রাখব ভাল ভাল বই, যা পড়তে ওর খুব ভাল লাগবে।

পরদিন সকালবেলা বন্ধপুতীতে যেন নতুন জীবনের সাড়া এল। কমলেশ বেগুকা আর প্রশান্ত এসে চুকলো অন্তর্য মহলে, বুড়ো তাদের সায়ের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল পুলুর কাছে। নতুন বন্ধুদের দেখে পুলুর সে কি আনন্দ। সারা মুখে হাসি, চোখে আনন্দ। সাদরে

বলে, এল তাই তোমরা বোল আমার কাছে। তুমি নিশ্চয় দিদি, তোমার কথা কমলেশের কাছে কত শুনেছি। তুমি ভাল ছবি আঁকতে পার, তাই না ?

বেণুকা নীরবে সম্মতি জানায়, পলুব শীর্ণ কপালে স্নেহের হাত বুলিয়ে দেয়।

পলু প্রশান্তর দিকে হাত বাড়ায়, তুমি নিশ্চয় প্রশান্ত খুব ভাল খেলতে পার ?

প্রশান্ত ভাড়াভাড়ি বলে, এবার থেকে তুমিও যে আমাদের সঙ্গে খেলবে।

—আমি কি পারবো ?

—ঠিক পারবে। একবার সেবে গঠ, দেখ না তোমার কি করি।

আমাদের সঙ্গে এখন পড়েছ—

এতক্ষণে পলুর নজরে পড়ে ফুলের তোড়া, বেণুকা বা সমস্ত বেঁধে নিয়ে এসেছে। সোচ্চারে বলে ওঠে, কি সুন্দর ফুল, কত রকম রঙ। কি চমৎকার।

বেণুকা হেসে বলে, আমি তোমার সন্তাই নিয়ে এসেছি। যোজ্ঞ এমনি নিয়ে আসব।

—তোমরা যোজ্ঞ আসবে আমার কাছে, আমরা এ রকম বসে বসে গল্প করব।

—নিশ্চয় আসব।

বেণুকা কিন্তু এই বন্ধুত্বের মধ্যে অসন্তোষ করে। চারদিকে তাকিয়ে বলে, এ কি, সব জানালা-দরজা বন্ধ কেন ? এতে কখনও অনুধাবার ? খুলে দাও সব—

পলু দারুণ দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, না থাক, আমার যদি আবার ঠাণ্ডা লাগে।

—মোটটাই ঠাণ্ডা লাগবে না, খুলে দাও সব। পলু কিন্তু সত্যি ভয় পায়, বোঝে দাঁড় হাত অসম্ভব হয়ে এদের বার করে দেব। তাই মিনতিভরা চোখে দারুণ দিকেই তাকায়। আশ্চর্য্য, দাঁড় কিন্তু আজ রাগ করেননি, শুকনো হাসি লেগে রয়েছে তাঁর মুখে, ধীর স্ববে তিনি বললেন, তাই কর কমল, জানালা খুলেই দাও।

তবু এই কথাটুকু জন্তেই বেন কমলেশরা অপেক্ষা করছিল, ছুটে গিয়ে খুলে দিল জানালা, সবিয়ে দিল বিঘটি ভারী মধ্যমলের পর্দা, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে হুচুড়ু করে ঢুকে পড়ল এক বলক বোল আর তারই সঙ্গে ঠাণ্ডা মিষ্টি প্রভাতী হাওয়া। এক মিনিটের মধ্যে সারা ঘরের চেয়ারা গেল বদলে, সেই হিসেলে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে এল জীবনের উষ্ণতা। পলু সাগ্রহে খাটের ওপর বসেই—এর ভর দিয়ে উঠে বসে। হাতজোড় করে প্রণাম করে বাইরের আলোকে, হাওয়াকে, অন্তরের সবটুকু ভক্তি দিয়ে।

সকলের মুখেই হাসি। আজ্ঞে আজ্ঞে বাড়ীর লোকেরা সবাই এসে হাজির হয়, সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে, চোদ্দ বছর বাদে এই নিরমের ব্যতিক্রম, আরও অবাক হয় তারা বুড়ার দিকে তাকিয়ে, শাঙ্ক, সোম্য সে চেয়ারা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পলুব দিকে। গোখে তার অকুণপ রেহ।



যাত্রাঘরকার এ, সি, সরকার

একটা সিকের ফিতের ঠিক মাঝখানটাতে বসিয়ে দেওয়া হল কাঁচির এক পাচ—কচ, করে কেটে গেল ফিতে ছ' টুকরো হয়ে। এর পরে ম্যাভিকের মন্ত্র পড়লাম—

চটপট চটপট
লাগ লাগ ভেলকী
ফিতে কেটে জুড়ে দেওয়া
তুই তা' খেল কি ?
জুড়ে বা জুড়ে বা
কাটা ফিতে ঝটপট
চটপট বড় লাগ
বাত্ত লাগ চটপট

ফুস মস্তুরে জুড়ে গেল ফিতেটা। দেখে তো সবাই অবাক ! কেমন করে এই আজব কাণ্ডটা ঘটে গেল সবাই চোখের সম্মানে বলতে পার ? এই খেলাটা দেখাতে হলে আগে থেকেই ফিতেটার ভেতরে একটু কারসাজি করে রাখতে হয়। করতে হয় কি জানো ?

—একটা হাত দুইকে লম্বা সিঁদু লম্বা নৃতীর বটনি ফিতে নিয়ে তার ধার থেকে আঙ্গুল ছ'য়েক লম্বা একটা টুকরো কেটে নিতে হয়। এর পরে একটুখানি মোম (মোটাকের) নিয়ে তার ছোট্ট ছোট্ট গোলা বানিয়ে তা লাগাতে হয় এই টুকরো ফিতের দু'প্রান্তে একই পিঠে। যে ফিতেটা দিয়ে খেলা দেখাবে তার ঠিক মাঝখানটাতে ছবিতে যেমন দেখানো আছে তেমন করে এখন বসিয়ে দিতে হবে এই ফিতের টুকরোটাকে আঙ্গুল দিয়ে চেপে। ধারে মোম লাগানো থাকার ফলে সজ্জেন্ট এটা বড় ফিতটার সঙ্গে মেটে বাবে। টুকরো ফিতের মাঝখানটা কিন্তু থাকবে আলগা। খেলা দেখানোর সময়ে বড় ফিতের এক প্রান্ত ধরে এমন উঁচু করে ধরতে হবে যাতে এই টুকরো ফিতে লাগানো দিকটা থাকে নরকদের উপরে দিকে। ফিতেটাকে ভাঁজ করে এখন মাঝখানটা বা হাতের বুড়ো আঙ্গুলের উপরে তুলবে তখন কিন্তু আসল ফিতের মাঝখানটা না তুলে

টুকরোটীর মাঝখানটা ফুলে ধরবে আর সেইটাকেই কাঁচির পোচ লাগাবে। আসল ফিতের মাঝখানটা বা হাতের আঙ্গুলের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকার ফলে দর্শকেরা কিছুই বুঝতে পারবে না। কচাচক কাঁচি চালিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ফিতের টুকরোটাকে আর সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুলের টানে মোমের টেলার সঙ্গে লাগানো ফিতের অবশিষ্টাংশ ছুটোও ফেলে দেবে। [তোমাদের সহকারী যেন সঙ্গে সঙ্গেই এই টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যায়]

বাঁকীটুকুন তো খুবই সহজ। হাত পরিষ্কার দেখিয়ে ফিতোটাকে খুলে ধরা। মোম খুব কাঁচা হলে ফিতের গায়ে চটচটে দাগ পড়ে যেতে পারে। কাজেই জুড়ে ধাওয়া ফিতোট দর্শকদের হাতে দিতে সাবধান।

ব্যারোমিটার

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ব্যারোমিটারের নাম তোমরা সকলেই শুনেছ। আবহাওয়ার খবর আমরা ব্যারোমিটারের সাহায্যেই জানতে পারি।

আজ তোমাদের আর একরকম ব্যারোমিটারের কথা বলছি। এ ব্যারোমিটার তোমরা নিজেরাই তৈরী করতে পার। এর নাম দেওয়া যেতে পারে ফুলের ব্যারোমিটার।

এর জন্যে চাই রঙীন টিন্স কাগজ। সবুজী পূজার সময় যে কাগজ দিয়ে চাষাবিক সাজানো হয়। আর চাই সামান্য কোবল্ট ক্লোরাইড (Cobalt Chloride) এর দামও খুব বেশী নয়।

বেশ বড় দেখে দুখানা টিন্স কাগজ যোগাড় কর। একখানা কিকে গোলপী (Pink) রঙের আর একখানা নীল (Blue) রঙের।

এইবার এই কাগজ নিয়ে ফুল তৈরী করতে হবে। বস্তগুলি খুবী ফুল তৈরী করতে পার। তবে তার অর্ধেকটা এ কিকে গোলপী রঙের, বাকি অর্ধেকটা নীল রঙের হওয়া চাই।

আজ্ঞা, এইবার যে কোনো রঙের কাগজ থেকে ৩৬ ইঞ্চি লম্বা আর ৩ ইঞ্চি চওড়া করে একটি ফালি কেটে নাও।

এই ফালির ধর এক প্রান্ত ক অস্ত্র প্রান্ত খ। এইবার ঐ ফালিটির মাঝখানে ভাঁজ কর, যেন ক প্রান্ত খ প্রান্তের ওপর পড়ে। ঐভাবে আবার মাঝামাঝি ভাঁজ কর। মোট চারটে ভাঁজ করা চাই। এইবার ঐ ভাঁজকরা প্রান্তের শেখ দিকের মাথাটা কাঁচি দিয়ে ভাল করে কেটে দাও। তারপর সমস্ত ভাঁজটা খুলে ফেল। কাগজটা ফুলে যোলাট ইংরাজী 'ইউ'এর মত মাথা (উটানো অবস্থায়) পাবে। এইবার ঐ ফালি কাগজটি আঙুলে ধরে আস্তে আস্তে জড়ানো বেশ স্থলর একটি ফুল তৈরী হবে।

এইভাবে হু রঙের কাগজে ৬টা করে ১২টা ফুল তৈরী কর। এখন ঐ কোবল্ট ক্লোরাইডের মেশানো জলে ডুবিয়ে শুকিয়ে নাও। অন্ততঃ দুবার ভিজিয়ে নিলে ভাল হয়।

এখন ঐ ফুলগুলি টেবিলের ওপর ফুলদানিতে রেখে দাও। কখন আবহাওয়া ভিজে বা সূর্যাস্তে থাকবে, যেমন বর্ষাকালে, তখন ঐ ফুলগুলির রঙের কোনো পরিবর্তন হবেন। অর্থাৎ কিকে গোলপী রঙের ফুলগুলির ঐ রঙই থাকবে আর নীল রঙের ফুলগুলি নীল রঙের থাকবে। কিন্তু যখন আবহাওয়া শুক থাকবে

যেমন গ্রীষ্মকাল কিংবা শীতকালে, তখন ঐ কিকে গোলপী রঙের ফুলগুলি আস্তে আস্তে গাঢ় লাল রঙ হতে থাকবে আর নীল রঙের ফুলগুলি সবুজ হয়ে যাবে। বেশ মজার ব্যাপার না?

এর ফলে ঐ ফুলগুলি দেখেই তোমরা বলতে পারবে আবহাওয়া শুকনো থাকবে না জল-বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

যেভাবে ফুল তৈরী করবার কথা বললাম, তাতে অসুবিধা হলে অন্য যে ভাবে ইচ্ছা ফুল তৈরী করে নিতে পার। আর ইচ্ছা করলে ছোট পাতার মত সবুজ কাগজ কেটে লাগিয়ে আরও বাহারী করতে পার। ফুলগুলি সন্ধ্যা তবের সঙ্গে গের্বে নিলে নাড়াচাড়া করবার সুবিধা হবে।

এখন কেন ফুলগুলির রঙ বদলায় সে কথা বলছি। কোবল্ট ক্লোরাইডের গুণ হচ্ছে বাতাসে আর্দ্রতা কমবেশী হওয়ার সঙ্গে ওর রঙ বদলায়। টিন্স কাগজের রঙগুলি খুব হালকা। জলে ভেজালেই দেখবে রঙ উঠে আসবে। এখন কোবল্ট ক্লোরাইডে ভেজানো ফুলগুলোর ওপর ঐ ক্লোরাইডের একটা পর্দা পড়ে যায়। বাতাসের আর্দ্রতার পরিবর্তনে তাই ফুলের রঙও বদলায়।

পরের বারে তোমাদের আর এক রকম ব্যারোমিটার তৈরী করা শেখাবার ইচ্ছে রইল।

খুকুর চাঁদ ধরা

শ্রীমদতুলসী সরকার

খুকুমণি ছুটছে, ছুটছে—খুব ছুটছে। আগে আগে ছুটছে একটা দুধ-বেড়াল—তার পেছনে পেছনে ছুটছে খুকুমণি।

আর তারও পিছু পিছু তুড়ুক তুড়ুক করে লাফাতে লাফাতে ছুটছে পশি, খুকুর পোখা কুকুরছানাটা। তিন জনে মিলে সে কি ছুটোছুটি! কে কাকে ধরতে ছুটছে কে জানে? যেন দীতিমত রেস শুরু হয়ে গেছে। ছুট ছুট ছুট ছুট—

রোজ ভোরবেলায় ননী গোয়ালার ঘর বড় বাড়ীতে দুধ বেগান দিতে। আজও যাচ্ছিল সে। হঠাৎ সাত সকালে খুকুমণিকে এই রকম ভাবে মৌড়তে দেখে সে তো অবাক। বললে, বলি ও খুকুমণি! এই সন্ধ্যাবেলায় এমনিঘরা ছুটছো কেন? বলি যাচ্ছো কোথায়?

খুকুমণি থমকে দাঁড়ালো। বললো, চাঁদ ধরতে। বলেই দৌড়—

চাঁদ ধরতে? ও মা, সে কি গো? চাঁদ কি কখনো ঘরা যায় না কি? কে কার কথা শোনে! থুং তখন অনেক দূরে দৌড়ে চলে গেছে। নিজের মনেই ননী বললে, বোকা মেয়ের কণ্ঠ দেখে দেখি? চাঁদ কি কখনো ঘরা যায় রে বাপু? মেয়েটা মিথ্যেমিথি ছুটে ছুটে হররাণ হয়ে, তেঁতা পাবে। চটপট বড় বাড়ীতে দুধ দিয়ে যেটুকু বাঁচবে আ-হা-হা। বাই, সেটুকু খুকুমণিকেই দিয়ে আসি। ননী পা চালালো তাড়াতড়ি।

থুং তখন ছুটছে ঘরঘা পাড়ার ভিতর দিয়ে।

বসময় ময়রা যাচ্ছিল মিঠাই মগুন নিয়ে বিক্রী করতে শহরে। শাহনে দিয়ে হঠাৎ খুকুমণিকে দৌড়তে দেখে সে চিৎকার করে উঠলো, আরে আরে খুকুমণি যে! ছুটে ছুটে বাচ্ছা কোথায়?

চাঁদ ধরতে।

এঁটা, চাঁদ ধরতে? কি কাত? চাঁদ কি গাছের ছোট কল না কি? যে চূপ করে পেড়ে আনবে? কিন্তু থুমুগণি তখন সোজা দৌড়ছে। কথা তার কানে গেলো তো। রসময় বড় ভালো লোক। সে মনে করলে মিছেমিছি ছুটে ছুটে মেয়েটা ক্রিকে-ভেটায় কষ্ট পাবে। বাই শুকে ছুটো মিঠি দিয়েই না হয় শহুরে যাবো। রসময় থুমুকে ধরতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো।

বড় রাঙা দিয়ে থুমুগণি তখন পাই পাই ছুটছে পছিবাগানের দিকে।

বেড়িয়ে কিরহিলেন ভূগোলের মাঠায় ভুবন বাবু। পাশ দিয়ে থুমুগণিকে সোড়ে যেতে দেখে তিনি ডাকলেন, থুমুগণি! ও থুমুগণি! ভোর না হতেই ওদিক পানে কোথায় ছুটে যাচ্ছে?

থুমুগণি দৌড়তে দৌড়তেই উত্তর দিলে, চাঁদ ধরতে।

সে কি থুমুগণি? চাঁদ কি এই হাতের কাছে না কি? চাঁদ পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক দূরে। বুঝলে? কে তার কথা কানে নেয়। থুমু তখন ছুটছে উর্ধ্বমুখে। ভুবন বাবু ভাবলেন ছোট মেয়ে থুমু। চাঁদ যে পৃথিবী থেকে ২,৩১,০০০ মাইল দূরে, তা তো আর সে জানে না। বাই, তাকে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে আসি। তিনিও তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন থুমুকে ধরতে।

পছিবাগানের শিউলি তলায় থুমু তখন বসে। তার চার পাশে শিলিম-ভেজা ঘাসের উপর সালা সালা শিউলি ফুল ছড়ানো। সকালের বাতাসে ভেসে আসে মিঠি মিঠি গন্ধ।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে ভুবন বাবু, রস, ননী তিন জনেই সেখানে এসে হাজির। ননী বললে, চাঁদ ধরার সখ মিটলো তো? এবার এই ছবটুকু খেয়ে ফেলো দেখি।

বললে রস, থুমুগণি! চাঁদ ধরার খেয়াল তো মিটেছে এখন এই মিঠি ক'টা খেয়ে নাও।

সবার শেষে ভুবন বাবু শুধালেন, কি গো থুমুগণি! চাঁদ ধরতে পারলে?

হঁ। পেরেছি। এই তো। বলে ঘাড় নেড়ে থুমু দেখালো কোলের দিকে। কোলে তার সালা ধবধবে মোটাসোটা সেই দুখে-বেড়ালটা।

ঐ বা! বলতে একদম ভুল হয়ে গেছে। চাঁদ থুমুগণির ঐ দুখে-বেড়ালটার নাম। তোমরাও জানতে না, ভুবন বাবুও না।

কিশোর সুভাষ

[নাটিকা]

ঐশ্বরকিবালা রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৪

দুই মাস পরে।

সুভাষ। কিসে এলুম ভাই, ভারতমাতার যে রূপ দেখে এলুম গঙ্গার পারে পারে, হিমালয়ের গার গার, এখানে ঘরে বসে থেকে যে রূপ তোমরা দেখতে পেলো না।

বহুবা। (হেসে) আমরা ভাবছিলুম, তুমি বোধহয় সন্ন্যাসী হয়ে ওখানদেই থেকে গেলো।

—হরত থাকতুম, কিন্তু বাঙ্গালীকে ওখানকার হিন্দুসান্ন্যাসী 'মহলী খাতা বাঙ্গালী' বলে যে বকম খোঁচা করে ভাই, সইতে পারলুম না। পারলুম না থাকতে।

—ওদের বন্ধবাদ, তাইত তোমার আমরা ফিরে গেলুম।

চাক। শোন সুভাষ, এই যে ছেলেটি, এর নাম হেমন্ত, কেঠনগর ফুল থেকে মাঠার মশায়ের চিঠি নিয়ে এসেছে তোমার কাছে।

সুভাষ। তাই বুঝি? মাঠার মশায়ের চিঠি? দাঁও, তুমি কোথায় পেলো ভাই?

—আমি যে তাঁর কাছে পড়ি। কত তোমার কথা শুনেছি তাঁর কাছে। কী ভালোবাসেন তিনি তোমার, এই নাও চিঠি।

সুভাষ চিঠি খুলে পড়তে লাগল, কিন্তু হুটী তার ঝাণসা হয়ে এলো চোখভরা জলে।

চাক। সে আমায় সে, আমি পড়ি তুই শোন।

—তোমার হরিবার থেকে লেখা চিঠিখানি আমি পেলাম, কাজ কাজ করে তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন?

এখন নয়, এখনো সময় হয়নি, এখনো তোমার তত বয়স হয়নি বাবা, আগে পড়াশোনা শেষ কর, জ্ঞান অর্জন কর, তার পরে কাজ। তোমার জ্ঞান এবং দিব্যকই তোমার কাজের সক্ষম বলে দেবে। ততদিন অপেক্ষা করতেই হবে। মনে রেখো ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি না থাকলে মানুষ বড় হতে পারে না, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টান্তে তোমরা প্রকাশীল হও, দেশের কুসংস্কার ভেঙ্গে নতুন সংস্কৃতির রূপদান কর। তাই হবে তোমাদের কর্মক্ষেত্র। মনে রেখো, শুধু ভাল ভাত রুটিতে মানুষ বাঁচতে পারে না, সে বকম বাঁচা পুস্তর বাঁচ। সত্য এবং জ্ঞানের পথ ধরে, জীবন এবং জাতিকে সত্যক করে তুলতে তুলতে এগিয়ে যেতে হবে বিশ্বসভায়। মনে রেখো, সে বাঁচাই হবে সত্যিকারের বাঁচ।

চাক। কী সুন্দর চিঠি লিখেছেন, মনে হচ্ছে কাছে বসে মুখে যে ভাবায় উপদেশ দিতেন, এ যেন সে বকমই শুনিছি, বুকে লাগ কেটে যায়।

সুভাষ। এসো ভাই, মনে মনে আজ পণ করি সবাই, বাঁচতে হবেই আমাদের, সত্যিকারের বাঁচ।

মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে থেকে মনে প্রাণে সকলেই সে কথাটা অনুভব করতে লাগল।

সুভাষ। তোমার নামই বুঝি ভাই হেমন্ত? কেঠনগরে পড়?

—হ্যাঁ ভাই, হেমন্তকুমার সরকার, শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে, এখানে চেঞ্জ এসেছি চাক্রদের বাড়ী। মাঠার মশাই তোমার সঙ্গে আলাপ করে যেতে বলেছেন আমার।

(দুই হাতে চেপে ধরলো সুভাষ হেমন্তের দুটি হাত)

এসো ভাই আমাদের বাড়ী, আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করবে চল। এসো, চাক।

(বাড়ীর পথে যেতে যেতে রাস্তায়)—চাক—সুভাষ আমাদের ছেড়ে এবারে কত দূরে চলে যাবে ভাই, ভাবতে কী মন খারাপ হয়ে যায়, হেমন্তের সঙ্গে ভাল করে আলাপ করে নাও ভাই, কোলকাতার বন্ধু হবে তোমার। ঐ যে দেখা যাচ্ছে ঐটেই আমাদের বাড়ী।

—বাঃ কি সুন্দর বাগান তোমাদের ভাই? ঐ ফুলগুলোকেই ত কদম গোট মি নট বলে?

—কবলেট মি লট কুলটাকে দিয়ে একটা ভাবী মিটি গরো আছে, জানা ত ?

—ভাই ব্রু! হলো ত গল্পপোটা। (ছোট ঘরখানায় দ্রুত প্রবেশ করে) এইটে ব্রু! ভাই তোমার পড়ার খবর? বাবা: জন্ম নব বই, লব তোমার? সব পড়েছে? সব? তাহলে ত কত কি তোমার জানা হবে গেছে, কত জান কতকে তোমার।

জুভা। (হেসে) আর না না, বই আছে বলেই কি সব পড়া হয়ে গেল? পড়বার ইচ্ছেটা অবিশ্যি থুই আছে সত্যি, কিন্তু সব পড়বার সময় কোথায়? জাননায়ের পারে পীড়িয়ে রক্ত তোলার খুপুই দেখছি, কোন কালে রক্ত সত্য হবে তগবান জানেন।

চাক। তুই ভাই, কথার কথার বড়ো গভীর হয়ে রাস।

জুভা। (হেসে) একটু গুপ্ত শস্যবনের দ্যত কথা বলে ফেললাম, মা যে ?

হেমন্ত। মাইর শস্য একদিন বলছিলেন তোমরা হও নতুন ফুলের অগ্রদূত, অজানতার অন্ধকারে দেশ ছেয়ে আছে, আলোর নিশান দিয়ে পথে বেরিয়ে পড় তোমরা, তবেই দেশ জাগবে। ভায়পার কি বললেন জানো? সেই আলোর নিশান আমি দেখেছি জলাহ স্বভাবের চোখে।

জুভাবের চোখ দ্রুততে বিদ্যুৎ হলতে লাগল, যে বিদ্যুৎ আলো করবে সুভাবের অভয়, সুভাবের গৃহ সংসার সুভাবের দেশ, যে বিদ্যুৎ বাঁহ করবে রিপূর প্রমত্ত ভেল।

হাঙ্গি গভীর হয়েছিল, ছটকট করছে সুভাব শস্য, ঘুম আসছে না। কানের জ্যাগ থেকে জল খেয়ে সুভাব, ধাতের পাশে ছোট টেবিলটতে সেখানে স্বামীজির ছবিখানি বাইরের জ্যোৎস্না এসে আলোয়ন হয়ে আছে, সেখানে পীড়িয়ে করবোড়ে একান্ত মনে আবেশন জানালো,—হে গুপ্ত, তে দেবতা, তুমি আজ বেঁচে নেই, চকল মনে জীবনের পথ খুঁজে পাচ্ছি না, তোমার দেবলোক থেকে তুমি আমার পথ দেখাও।

চাক। আচ্ছা সুভাব, কি তুই ভাবিস বলসিকি দিনরাত, কি জিজ্ঞেস করি, কি বলি, চুনতেই পাস না নাকি বুঝতেই পারি না আমরা, হেমন্তও তাই বলছিলো, কি ভাবিস বল দিকি, বেজাণ্টের কথা?

সুভাব (হেসে) বা বে, তোরা ব্রু! ভাবিস নে তা? বত দিন এসিয়ে আসছে, ভাবনা ত' হচ্ছে।

হেমন্ত। সবাই কিন্তু বলে ভাই, তুমি First হবে সমস্ত ইউনিভারসিটিতে।

সুভাব। First হই বা নাই হই, পাস করলেই, কোলকাতায় যেতে পারো সেই আমার আনন্দ, তুমি সেদিন বলছিলেন হেমন্ত,—কোলকাতায় তোমাদের লিভার সুরেশচন্দ্র বসোপাধ্যায়, তাঁর কথা আরও ভালো করে বলত ভাই, বড়ো চুনতে ইচ্ছে করছে।

হেমন্ত। পাস করে এবারে কোলকাতার চল, নিজেই ত' দেখতে পাবে, কী অদ্ভুত রকমের মানুষ সুরেশনা, সুরেশনা পণ করেছেন, ডাক্তারী পাস করে, দেশের কাজেই লাগাবেন তাঁর সেই বিদ্যে। সুরেশনা বলেন, আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে, দেশের কাজেই করে থাকেন। বলেন, সমস্ত দেশটাই হবে আমার সংসার, এত সব গরীব দুখী ভাই বোন আমার, তাদের খিদেয় ভাত ছোটো না, অল্পবে

দুখ বেলে মা, স্নিগ্ধে কপড় পায় মা, তাদের দেখাই হবে আমার কাজ। সুরেশনার সঙ্গে তাঁর আরও কত বন্ধুতা ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করবার পণ করেছেন সবাই। চল এবারে নিজের চোখেই ত সব দেখবে।

অবশেষে একদিন ছেলোদের বহু আকাঙ্ক্ষিত শরীকার হল বেলো।

প্রথম দেখা হতেই সুভাব বললো বন্ধুদের—চুনেনিচি হেমন্ত First হয়েছে।

—আর তুই সেকত ?

—হ্যাঁ।

—কোন দুঃখ হয়নি সেকতের ভোর ?

—ভাই, হেমন্ত First হয়েছে, সেটাও আমারই আনন্দ।

—এখন ত' কোলকাতার চলি ভারলে আবারের ছেড়ে ?

—বাঁহি নতুন পথের সন্ধান, বাঁহি যুবকর কর্তব্যজ্ঞের ভিতরে।

কটকের কলেজেও নতুন বছর আরম্ভ হয়েছে, দেশ বিশেষ থেকে আগত অনেক নতুন নতুন বন্ধু, উঁচু স্তরের অনেক রকম বই, মহা-উৎসাহে ছেলেরা কলেজের নতুন জীবনে প্রবেশি কোল, এমনই দিনে একদিন সুভাবের চিঠি নিয়ে চাক বন্ধুদের শোনাতে এলো।

(চিঠি)—নতুন দেশ, নতুন সব মুখ, নতুন রকমের কথাবার্তা, অভিভূত হয়ে গেছি ভাই! জুলজীবনের বহু বাধা-বিশৃতি বহু নিষেধ এবং কড়াকড়ির গভীর আতিক্রম করে অতি প্রশান্ত সীমাহীন একটা রাজপথে এসে পীড়িয়েছি। সুরেশনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, একটা বিশ্বকর বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি। পরিচয় হয়েছে আরও অনেকের সঙ্গে, ঐরা সবাই নিয়েছেন ব্রহ্মচর্য ব্রত। সুরেশনা বলেন, ভিক্ষের খুলিতে কেউ চিরদিনের চাউত্রখ্যা চলে দেখ না, ভিক্ষের ভাতে চিরদিনের ক্ষিদে দূর হয় না, দেশের দারিদ্র্য যাত দূর হয় সে উপায় বের করে নিতে হবে। দেশের সকল লোক নিজের ঘুণে তাদের দুঃখে হৃদঙ্গা অভাব অভিযোগ জানাতে বাবে রাজস্ববাবে। সে রকমের যোগ্যতা লাভ করতে হবে। স্বাধীন মত প্রকাশ করতে হলে স্বাধীন মনও তৈর্যের করতে হবে। সেই স্বাধীনতা লাভ করবার চেষ্টাই আমরা করছি, তার জন্তে হত ভ্যাগই স্বীকার করতে হয় আমরা করব। সকল রকমের দুঃখই বরণ করে নিতে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছি—এই আমাদের জীবনের ব্রত।

একদিন হেমন্ত জিজ্ঞেস করল—কেন লাগছে ভাই নতুন জীবন ?

সুভাব। অদ্ভুত লাগছে, কলেজের ট্রেনিং কোরে ভর্তি হয়ে বন্ধু ধরতে লিখেছি, জীবনের মজো বড় একটা কামনা পূর্ণ হোল ভাই। মত এক মন হুই বৃত্তর হচ্ছে।

—ক'দিন যে ঘুরে এসে বাইরে, পলাশীর বাঁহ দেখে এসে, লিখেছো চাককে ?

—লিখেছি, কি লিখেছি, জানো ?

: হায় মা, ভারতভূমি কেন স্বর্ণপ্রস্থ বিধি করিল তোমারে ? আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস পাহাড় হতে যদি, তবে রাস্তা।

তোমার সন্তান হইত না এইরূপ কাঁপ কলেবর।

ধমনীতে প্রবাহিত হোত উত্তর বন্ধনোত্ত।

হোত বক বীর্যের আধার।

আমি এ ভারতভূমি হইত পুত্রিত সজীব পুত্রবরষে।

বিগনিপুত্র ভারতগৌরববৃদ্ধ হোত বিভাবিত।

বাংলায় ভাগ্য আজি হোত অন্ততর।

হেমন্ত (হেসে)—একবারে কবি নবীনচন্দ্র ?

—হ্যাঁ, পলাসীর মাঠ বেধে এসে আর কোন ভাষা মনের মত হোল না ?

—কেন কথা থাক, পড়া হচ্ছে কেমন ?

—কমন্সের মত সমু।

—সে কি ?

—হ্যাঁ ভাই, এত সহজ অল্প বকম মনের মত জিনিষে মন জড়ি হয়ে আছে, ক্রান্তের জিনিষগুলো মনে ঢুকতেই পারছে না।

—দিন কিন্তু আর সেই বেশি

—হ্যাঁ, আজ তোরে উঠেই মনে হোল, প্রায় আড়লে গোপায় তেজের, পুতরাং এবারের পড়ার একটু মন দিতে হবে।

মাস দুই পরে। পরীক্ষার চল থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেরা পরস্পর আলাপ আলোচনা করছে,—

—বাবা! বেচেছি, মাথার বেন বমলগু বুলছিলো।

—কোস্টেনপেশার খুলে, একটি ছেলে। আজ্ঞা, এটার কি লিখলে বল দেখি ?

—আঃ, এখন আর ওসব নয়, রেখে দাও পকেটে ও কাগজগুলো।

—হ্যাঁ যে, রেখে দে, রেখে দে, রেজাল্ট বেকলেই জানা যাবে, এখন আর ও-চিন্তাই নয়।

—চল্ বেঠ রেটে খেয়ে সিনেমায় বাই।

—বাড়ী না গেলে আবার ভাববে যে সব।

—আর বাড়ী গেলেই এখন জিজ্ঞেস করবে সব, কি লিখেছিল বল! বাবা: ও-মুখো এখন বাবাই না, সিনেমা-টিনেমা দেখে সেই মাত বাবোটোর আগে বাড়ী নয়।

—চল্ চল্ তবো, ঐগগির চল্—

(হৈ হৈ করতে করতে একদল বেরিয়ে গেল।)

(একান্তে দাঁড়িয়ে সুভাষ এবং আরও কয়েকটি ছেলে)

—কেমন হোল সুভাষ ?

—শেষের দিকটার মাস দুই খানিকটা খেটেছিলুম ভাই, তারই জোরে পাশ করে বাবো নিশ্চয়ই, তবে বীরা আশা করেছিলেন আমার উপর, তাঁরা নিরাশ হবেন একটু, ডেবে দুখ হচ্ছে। (কোস্টেনপেশার দেখে আলোচনা করতে লাগল ছেলেরা।)

আরও ক' মাস পরে—আই-এ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, সুভাষের ফল আশাযুক্ত হোল না। মনে খানিকটা অভূর্ণির ভাব নিয়ে এসে জড়ি হোল প্রেসিডেন্সি কলেজে। ক্লাসের পর ছেলেরা আলোচনা করে—কেমন লাগছে বল ত ?

সুভাষ। প্রোক্সেররা এক একজন বেন এক একটি পুলিশ কমিশনার।

হেমন্ত। বেশ বলেছিস ত।

অনন্। ওরা বেরনেটের খোঁজ দিয়ে দিয়ে মনের তেজঘটার আর যা কিছু আছে, সবই একেবারে নির্মূলভাবে ধ্বংস করে দিতে চান। তার পর কলেজ-জীবন শেষ করে এখন

বাইরে বেরিয়ে আসে সব, বেশির ভাগই হয়ে যায় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কথার, ভারে চালভলনে, পোষাক পরিচ্ছদে, এমন কি নামে পণ্ডিত। যেমন বাবার এক বন্ধু ছিলেন নীলবরণ, মেয় বিরে করে গবে হয়েছেন মি: নীল বহারণ—

হেসে উঠলো সবাই।

—অসম্ভব। সে দিনের মোহর চলে গেছে, আর তা' হবে না।

—কিন্তু এখন কি করা যায়, বল দেখি—ওটেনের ব্যবহার অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

—কংগ্রেসকে আর চিন্দুখর্ষকে কি বিভিন্ন ভাষায় গালাগালি করে, আজ কংগ্রেসের লিডারদের কি সব বা' জা' বলে গালাগালি করছিল ওটেন তুনেছিলে ত ?

অনেকে একসঙ্গে—জারজা ভাই জার ক্লাস করবো না কাল থেকে, যদি না ওটেন তার কথা ভিরিয়ে দেয়, তখন প্রকাশ না করে।

হেমন্ত। আমাদেরও তাই হচ্ছে, সুভাষ কি বলিস ? আর তোমাদের সবাইই ত' এই মতই ভাই, কাজের সময় শিখিয়ে দাবে না ত' কেউ ?

সকলে সম্মত। নিশ্চয় না, নিশ্চয় না কাল থেকে আমরা ধর্মঘট শুরু করে দেবো। ওটেন তার কথার জন্য দুখ প্রকাশ যদি না করে, তাদিন ত নিশ্চয়ই।

সুভাষ। আমি কি ভাবছি শোন, তার আগে চল আচার্য বোসের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আগে সব জানাই, তিনিও ত আমাদের প্রোফেসর, নিশ্চয় আমাদের তিনি সহায়ত্ব জানাবেন, কি করা উচিত আমাদের, তাও আমাদের বলে দেবেন।

—আচার্য বোস ধর্মঘট করতে পরামর্শ দেবেন না আমাদের।

—তবু একবার জিজ্ঞেস করা কর্তব্য।

সেদিন ছেলের কাছ সব শুনে আচার্য বোস বললেন—অগ্রায় গালাগালি করণো সহ্য করবে না, কিন্তু যা অস্তায় তাও স্তোমসা করতে যেনো না।

ক'দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা—

সুভাষ। হেমন্ত, চল একবার সুরেশদার কাছে

হেমন্ত। হ্যাঁ ভাই আমিও ভাবছিলাম,

সুরেশদার ঘরে—

সুভাষ। সুরেশদা, ওটেন তার কথা ভিরিয়ে নিয়ে দুখ প্রকাশ করেছে। আমাদের ধর্মঘটও ভেঙ্গেছে, আজ ক'দিন আমরা ক্লাস করছি, কিন্তু আবার মাঝে মাঝে বা জা কথা বলে বসছে—

হেমন্ত। আমাদের উপর ওর ভয়ানক রাগ। নিজস্ব সব কিছুই বিসর্জন দিয়ে, একান্ত ভাবে ওদের অহুগত হোতে পারলেই ওরা খুশী, কিন্তু আমাদেরও অসহ্য হয়ে উঠেছে সুরেশদা, কি করব বলে দিন।

সুরেশদা। (হেসে) নিজের প্রেসক্রিপশন নিজেরাই বেশ করবে, আমি বলে দেবো না কি ?

সুভাষ। কাল আবার মিটিং হবে আমাদের সুরেশদা, ছেলেরাও ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, অনঙ্গ কি বলে জানেন ? অন বুলের বুলডগি গো। আবার হাসলেন সুরেশদা।

—আপনি কেবল হাসছেন সুরেশদা, কি করতে হবে আমাদের বলে দিন না ?

বসেবস। না, আমি কিছু বলবো না, আমি শুধু লক্ষ্য করে বাইরে তোমাদের শক্তি, নিজের শক্তি আর নিজের বিবেক এর চেয়ে কিছু দেখা দেই তাই।

নতমস্তকে উত্তরেই খানিকক্ষণ চুপ করে বইল—

তার পর উঠে পাড়িয়ে—আচ্ছা, আজ আমরা বাই সুরেপদা কাল দিচ্ছি—এর পর আপনাকে জানিয়ে বাবো সব।

কেটে গেল আরও দু'-তিন দিন।

ভট্টোনের অস্বাভাব্য ভাষায় গালাগালি চলেছে অব্যাহত ভাবেই।

ঠান্টা একদিন নির্দিষ্ট দিনে নামবার সময় ভীষণ ভাবে একটা আঘাত পেয়ে ভট্টেন সাহেব মাথা ঘুরে সেখানেই বসে পড়ল। দলভ কলেজের ভিতর একটা হলুদল কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল। খ্রিস্টিয়ান জেনন্ সাহেব ক্রোধে উদ্ভাসের মত হোরে উঠলেন। হুজুর হোল আরোহিতিকিসান প্যারেডের।

কিন্তু অফিসের বেরোয়ার সাক্ষ্য ধরা পড়ল সুভাষ। সুভাষ বাবাজীবনের অন্য রাষ্ট্রকেটেও হয়ে গেল। কটক বাবার আগে চিঠি লিখল বহুদেব—

—ফিরে যাচ্ছি কটক। জীবনটা যেন তীব্র একটা ঝড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে, কিন্তু যেন ঘুমড়ে ভেঙ্গে না পড়ি আমার গুরুর কাছে, এই আমার প্রার্থনা। ফিরে যাচ্ছি—আমাদের স্বপ্ন হুশিয়ার হয়েছেন, আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য এসেছে তাঁদের মনে, তোমরাও হুশিয়ার হবে, কিন্তু তাই আমার কি সাধনা জানো? উদ্ভূত এবং দলভ যে আমরা যেনে নি না, এবং নেবো না, সে কথা স্পষ্ট জানিয়ে যাচ্ছি প্রকৃতির।

আবার সেই কটক, সেই সমস্ত প্রিয় পরিবেশ এবং প্রিয় বসবাস। পথ চলেতে কোথ পড়ে কত কালের কত চেনা সব, কত যেন প্রিয় সবাই! কেউ হেসে সাধবে কত প্রসন্ন করে, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি গভীর ভাবে জিজ্ঞাস্য হয়ে এটা সেটা বলেন। তারপর, সারাদিনের পর, গভীর রাত্রি পর্যন্ত সেই আশ্চর্য্যের মত ধ্যানে বসে কেটে যায় তার স্বামীজির পায়ের নীচে কেবল এক চিন্তা তার, একই ধ্যান—পথ দেখাও, পথ দেখাও!

দিনকতক পরে সুভাষ চিঠি লিখছে হেমন্তকে—

—ভাই, মনের ভিতর একটা বিপ্লব চলেছে, সেটা কি রকম, তোমার আমি তা বোঝাতে পারবো না। মনে হয়, কোলকাতা জাতি এ একরকম ভালোই হয়েছে, মনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসে কার্যপন্থা স্থির করে নেবো। আবার গুরুজনদের আমার সম্বন্ধে একটা নৈরাশ্যের বেদনা, সেটাও মনে একটা ব্যথা দেয়।

সম্প্রতি, কতগুলো কাজ বেছে নিয়েছি, পড়ে তুলেছি একটা ছাত্র সমিতি, একটা পাঠাগার, একটা ব্যাডামাগার সকল কিছুই সর্বাধিক আমি। স্বামীজির বাগী নিরন্তর অন্তরের ভিতর আহ্বান দিচ্ছে,—শেষকে পড়ে তুলতে হবে, শেষকে পড়ে তুলতে হবে!

আমাদের জাতি বড় দুর্বল, তাই, সবল দেশের রাজার-জাত এসে আমাদের উপর অভ্যাস করে। বিদেশের দিকে কুচকাওয়াজ করতে করতে বাগী ও নারাজের জল পর্যন্ত বাই, আবার মার্চ করতে করতে ফিরে আসি সহরের ভিতর। সবাই মিলে, পান

পাইতে পাইতে মার্চ করা, গায়ে এবং মনে একটা জোয় এসে দেয়। তোমার মনে আছে কি আমরা সেই সৌকর্য্য করে পদার ভাসতে ভাসতে পাইতাম—

“আমরা বুঢ়ারো মা ভোর কালিমা,

মাহুয আমরা নহি ত’ মেঘ,

সেবী আমাদের, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার
আমার দেশ।”

জীবনটা ভাই, একটা উত্তেজনার ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে, কিন্তু এটা কাম্য নয়। অন্ধকার ভবিষ্যতের ভিতর একটুখানি আলোর রেখা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কটক, জানকী সাহেবের গৃহ।

আপন পাঠককে বলে কি একখানা বই নিয়ে সুভাষ তখনই হয়ে আছে পাঠে। পিতার প্রবেশ সে জানতে পারল না। টেবিলের উপরের বইগুলির নাম দেখে নিয়ে বখাছানি বেধে দিয়ে ডাকলেন।

—সুবি!

—ওঃ বাবু? (সুভাষ উঠে পাড়াল)।

—কি পড়ছিলে? কি নামটা? উক্তিযোগ? বিবেকানন্দের উক্তিযোগ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ ভালো বই ওগুলো পড়, কিন্তু এখন থেকে কলেজের বইতেও একটু মন দিতে হবে। রায় বাহাদুর তোমার কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে যে রকম চেষ্টা করছেন, মনে হচ্ছে হয় ত’ হয়ে বাবে, তা’ হলে যত নীগগির সম্ভব চলে যেতে হবে কোলকাতা।

—বাবো।

বহুর দেড়েক পরের কথা।

প্রেসিডেন্সি কলেজের হোষ্টেলে ছেলেরা যখন কেউ বা পাঠ কেউ বা গানে গল্পে মগন হয়ে আছে, তেমনই সময়ে সহসা সকলকে সচকিত করে দিয়ে সুভাষ এসে পাড়াল সকলের সম্মুখে।

—এ কি এ কি, এ যে সুভাষ! কোথেকে এলি যে সুভাষ? কটক থেকে?

একজন গানের স্বরে—এ কি স্বপ্ন এ কি মায়া, এ কি হলনা!

—গ্রাই, থাম্ থাম্ শুনি আগে, কি হোল ভাই সুভাষ? মিটে গেল সব? কলেজ নেবে তোকে?

সুভাষ। না ভাই, এই রাজপ্রত্নদের আল্পের নয়। এঁরা নিজেরা ত’ নিলেই না, অন্য সব কলেজেও যাতে ভর্তি না হতে পারি সে চেষ্টা এঁরা করেছেন ক্রমাগত। আমাদের নিচ্ছেন ষ্টিশের আজ্ঞাটাই সাহেব। এঁরা খুটান মিশনারী, স্বচ পাদরী, এঁরা শু ভর পান না কাউকে, ইনিই আমাদের নিচ্ছেন।

—আমাদের সকলের অপরাধের বোঝা একলা তুই বয়ে বেড়াচ্ছিস, ভাবতে এত মন ধারাপ লাগে।

—না ভাই, সেটা কোন দুঃখের কথা নয়, আমাদের ইচ্ছাক্রান্তি যে একটা জোর আছে আমাদের বতটুকু ক্ষমতা, ততটুকু যে করতে পেরেছি, সেটাই আমার আশঙ্ক, আর ঠগাও যে তা ভালো করেই বয়েছেন, সেটা আমার মহা আশঙ্ক।

—তুই আমাদের গুরু, তুই আমাদের মমত। অন্তরের বিরুদ্ধে লড়াইর মত শক্তি চিরদিন তোর জুট থাকুক, আমরা তোকে অঙ্গসংগ করে চলবো।

—কি যে বলিস! সবাই সব করতে পারে ভাই, সবাইই সমান শক্তি আছে, তবে একজোটা হওয়া চাই।

—তা ঠিক, সবাইই হয়ত সব শক্তি আছে, সবাই পারে ওসব, কিন্তু ভাই তবুও একখণ্ড ঠিক যে সবাই কিছু সুভাব হোতে পারে না।

যি এ পরীক্ষা ভালোই হোল। আত্মীয় স্বজনদের একান্ত আগ্রহে সুভাব সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বণ্ডনা হয়ে গেল বিলোতে।

বন্ধুরা বললে। মাত্র আট মাস সময় আছে, এত অল্প সময়ে পাশ করা, সুভাব এ শুধু তোতেই সম্ভব। তার পর সিভিল সার্ভিস পাশ করে এসে সিভিলিয়ান হয়ে বসলে, তোর সঙ্গে আমাদের তখন আকাশ পাতাল পার্থক্য হবে সুভাব।

সুভাব। নী ভাই ও কথা বলো না, আমি বাচ্ছি জীবনের আরও কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করতে। ওরা কোন ক্ষমতা শুধে ভারতবর্ষকে বেখেছে ক্রীতদাস করে, ওদের কোন মহাশক্তির বলে আজ হুশ বছর ধরে ভারতবাসী নিঃশব্দ নিরস্ত্র স্ত্রী ও পুরু। নিরস্ত্র জনতার উপর ওরা অপ্রতিহত ভাবে কামান চালায়, নিজের স্বদেশ, নিজের মাতৃভূমিকে মা বলে ডাকলে ওরা বেয়নেট চালায়, বীপান্তরে পাঠিয়ে বাড়ি ফুটিয়ে দেয় শূঁচ,—কোন্ মহাশক্তির বলে ভাই, সে কথা আমি ভাবি মাঝে মাঝে। বাচ্ছি সেখানে পড়তে, পরীক্ষা দিতে, ঠিকই, কিন্তু আমার অন্তর সেখানে এই প্রবল শক্তিমান বুটিশের বুটিশের উৎস কোথায় তারি সন্ধান ঘুরে বেড়াবে—রাষ্ট্রের মাঝে মাঝে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় ভাই, আমার হিন্দু ভারতের সাথের দিল্লী মোগল বাহাদুর লালকোলা সেখানে বসে শাসনচক্র ঘোরাচ্ছে বুটিশের বড়লাট, আর লালচামড়া গোরো সৈন্ত বন্দুক হাতে পাহারা দিয়ে রক্ষা করছে বুটিশের ঘন জন শ্রোণ। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, কী করে এটা সম্ভব হোল।

—সুভাব, ভীষণ এক্সাইটেড (Excited) হয়ে গেছিস ভাই! আমরা তোকে একটুও ভুল বুঝি নি, মনে কিছু করিস নি ভাই! তোর স্বপ্ন সফল হোক, তুই সার্থক হয়ে ফিরে আর, আমরা সে প্রার্থনাই করব চিরদিন। তোর চেষ্টার এই হৃদবৎ দাসত্ব থেকে মুক্ত হোক ভারত।

অলশেষে একদিন, সমুদ্রে ভাসলো সুভাবের জাহাজ। তারদের পর তারদের বাক্সার জাহাজ এগিয়ে চলল গভীর সমুদ্রের বুকে। বিদায় দিতে আসা প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ-শব্দিত আকুল দুইগুলি অশ্রুটি থেকে অশ্রুটিতারা এক ক্রমে একেবারেই জ্বলন্ত হয়ে গেল। সুভাবের মনটাও বিবর হয়ে বইলো। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনদের কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা। ভবিষ্যতের উন্নতির আশার, পুরুষ সম্মানের উজ্জ্বল আশীর দেখবার আশার কত বিচ্ছেদের দুঃখ সহ করেন পিতা মাতা। সুভাব তার কতটুকু পূর্ণ করতে পারবে?

রাষ্ট্রকে চিঠি লিখতে বসল সুভাব বন্ধুরে:

—বুঝ যে একটা ধারণা লাগছে, তা নয়, সবচেয়ে অগুরু লাগছে সমুদ্রটাকে, চকল, উদার, উচ্ছ্বল। অসংখ্য অলজ্ঞা কথা তুলে

তুলে পৃথিবীটাকে বেন গ্রাস করে কেলতে চলেছে। সমুদ্রের কোন বাধা একে রোধ করতে পারে না, আগুন তেজে এগিয়ে সমুদ্রের সূক্ষ্ম কিছু ধ্বংস করতে করতে চলে! মনে মনে ভাবছিলাম, এই শক্তির আরাধনা করা কি বায় না?

মনের ভিতর ভাবনার খুব স্থিরতাও কিছু একটা নেই। আই-সি-এস ফেল করব কিংবা পাশ করব তা জানি না। কিন্তু আই-সি-এস-এর স্বর্ণশৃঙ্খল আমার কতখানি বেধে রাখতে পারবে তা জানি না। কোন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকা কি করে বেশি দিন সম্ভব হতে পারে, আমি তা ভেবে পাই না।

একটু আগে স্বামীজির একখানা বই-এর কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ছেলোবেলার বোটা প্রতিদিন মন্ত্রের মত পড়ে বাওয়া আমার জীবনের আদর্শ ছিল। আজ বার বার তারই একটা কথা মনে পড়ছে, যে সৌরানীথ, যে জগদগুরু, আমার মনুষ্যত্ব দাঁড়, মা, আমার হৃদয়লতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমার মানুষ্য কর।

এ প্রার্থনা তোমাদেরও জীবনের কাম্য হোক।

দীর্ঘ দিন সমুদ্রভ্রমণের পর শেষ হোল সুভাবের যাত্রা। আই-সি-এস পরীক্ষার্থী সুভাব বিলোতের মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াল।

সুভাবের বাসস্থান নির্দিষ্ট হোল কিটন উইলিয়াম হলে। প্রথম অবসরে সুভাব চিঠি লিখতে বসল চাককে।

—ভাই, ইংরাজ আমার জুতা সাব্ব করে দিচ্ছে, বখনই কেবি আমার আনন্দ হয়। ভারতবর্ষে আমরা এর বিশরীত দেখতেই অভ্যস্ত।

পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি। কিন্তু, আই-সি-এস পরীক্ষার অকৃতকাণ্য হলে কি যে করব, আরও কোন বিশেষ পরীক্ষার জন্য তৈরী হবে কি না এখনো স্থির করতে পারছি না। কোন্ পন্থা অবলম্বন করলে কাজ করতে পারবো অনেক বেশি, সে ভাবনাই হয়েছে এখন বড়।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। আট মাস পড়েই সুভাব সমস্ত পরীক্ষার্থীর ভিতরে চতুর্থ স্থান অধিকার করে পাশ করল। কিন্তু পাশ করার পরেও, আরও একটা ছোটখাটো পরীক্ষা দিতে হোত, সেই ছোটখাটো পরীক্ষা দিতে গিয়েই সুভাবের জীবনে একটা মস্ত বড় বিপর্যয় ঘটে গেল, জীবনে বা কেউই কখনো করে নি, সুভাব সে কাজই করে বসলো, আই-সি-এস চাকরী ত্যাগ করল সুভাব।

অত্যন্ত চকল এবং উতাক্ত মনে বাড়ী ফিরল সুভাব, (কিটন উইলিয়াম হলে ওর প্রবাসের বাসস্থানে।) সমুদ্রেই দেখা হলো এভোটেটের সঙ্গে।

—এসো সুভাব, তোমায় বংগুচ্যালেসন করছি, তোমায় এই আশ্চর্য্য রকমের কৃতকাণ্যতার জন্যে, এত অল্প সময় পড়ে—

—না, স্যার, আমি দুঃখিত আপনাকে হতাশ করছি বলে, আমি চাকরী ত্যাগ করে এলাম।

—বলছি কি সুভাব, এ রকম একটা অসম্ভব ব্যাপার যে আমি কল্পনাও করতে পারছি না, কিন্তু কেন, বল দেখি?

—দেখুন স্যার, বই-এর এই লাইনগুলো, কিনা কারণে আমার দেশের সমস্ত নিরস্ত্রাভীর লোকলোককেই অসামান্য পর্যায়ত্ব কর হয়েছে, এত ভীষণ অন্তর আমার সম্বল হোল না।

—হ্যাঁ, এই লাইনটা? এটা কিছু ভেবে শু লেখা হয় নি, এখানে একটা কথা মনে, এর জন্যে তুমি নিজের জবাবদিহি নষ্ট করবে? তা তুমি লাইনটার জন্যে একটা প্রতিবাদ করলে ত পারবে?

—করেছিলাম, কিন্তু এজমিনাররা বললেন, জবাবিতে ওটা উঠিয়ে বেলা বেতে পারে, এখনই ওঠানো সম্ভব নয়, আমার জবাবের পরেও ওরা পরীক্ষা দিয়ে দিতে, কিন্তু সার, আমার এত অপমান বোধ হচ্ছে, পরীক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হোল না। সিভিল সার্ভিস পাশ করে যে সমস্ত ইউরোপীয়ান আমাদের বেশ শাসন করতে যায়, তারা এখনই এটা কেনেই যায় ভারতবর্ষীয় নিয়ম জাতীয় লোকেরা সকলেই অসহ্য? সত্যি, আমি ভাবতে পারছি না, আমার মত গরম হয়ে গেছে।

—শান্ত হও সুভাষ, এসো ভেতরে এসে বসে নাও, অন্তর টিয়ারিয়ে আঁদার, সেটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু, তবু... I was surprised that an Indian could give up an appointment in the I.C.S., I was sorry that you gave up the job over a trifling matter. But I am glad that a man of your calibre has been freed from the shackles of service.

সেদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত শান্ত হতে পারল না সুভাষ। ঠিক মনে বহুকাল সারায়ের পায়চারী করে অবশেষে চিঠি লিখতে বসল চাকরকে—পরাবীণতার দ্বারা সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাই, কর্তব্যের আহ্বানে এত সহজে I. C. S. চাকরী ইত্বকা দিয়ে এসেছি। আমাদের একটা বই পড়তে হোত, তাতে আছে Indian syce is dishonest আমি ঐ Sentence সহজে আপত্তি উপস্থাপন করি, কারণ ঐ Sentence পড়ে পাঠকের মনে ধারণা হবে যেন ভারতবাসীরা dishonest, কর্তৃপক্ষ next edition এ কথাটা তুলে দেবেন বলেন। আমি বলি, যখন জিনিষটা সত্যি, আমি ঐ লাইন পড়ব না। কর্তৃপক্ষ বলেন, তোমার পড়তেই হবে। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম আমি তাহলে চাকরী ছেড়ে দিলাম। ভাই, যদি কখনো আমার জন্যে প্রার্থনা কর, তাহলে এই প্রার্থনাই করো। যেন নীচতা ও স্বার্থপরতা আমার মনকে কলঙ্কিত না করে, তা হলেই আমি জীবনে সুখী হবো। ভাই, Power prosperity, wealth (ক্ষমতা, সমৃদ্ধি ও অর্থ) সংই আমার হাতে এসেছে, কিন্তু আমার মনের অন্তরতম স্থান থেকে আহ্বান আসছে যে এ সব আমার কোন সুখ নেই। আমার একমাত্র আনন্দ। আমার জীবনভরীটিক অনন্ত সাগরের উন্মীলনার মধ্যে জন্মিয়ে দিতে।

কিবে আসছি দেশে কিন্তু কি করব বল ত? একবার মনে হচ্ছে কবির নিকট বিখ্যাতরীতে থাকবো। একবার মনে হচ্ছে Journalist হবো। আবার কখনো ভাবছি সন্ন্যাস নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনেই চলে যাই। জীবনটা ভেসে বেড়াচ্ছে যেন গভীর সমুদ্রে, মাটিতে ঠাঁড়াবার ঠাঁই পাচ্ছি না। সব চেয়ে বেশি কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে, আর কেখাও নয়, চলে যাই আমাদেরবাবা বাপুজীর পাবের কাছেই। মনে হচ্ছে ওখানেই যেন আমার প্রকৃত আশ্রয়। মনে হচ্ছে ঐ মহাপ্রাণের গভীর

হৃদয় চোখের পানে তাকালেই আমি যেন আমার সকল জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে যাবো।

কিন্তু তবু কেন মারের মারে রামকৃষ্ণ মিশনের গৈরিক পতাকা অগ্রের ঘোরে আমার হাতছানি দিয়ে ডাকে?

কিন্তু, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সে আহ্বানের যে অত নির্দেশ ছিল, সুভাষ সেদিন তা বোঝেন নি। কৈশোরের যে আদর্শ ধুমায়িত হয়ে ছিল এতদিন বুকের ভিতরে, আজ বোঝেন তাহাই থাকে থাকি করে জলে উঠছে বুকের ভিতরেই। বিবেকানন্দের নির্দেশের সেটাও যে একটা অন্তরূপ সুভাষ সেটা সেদিন বোঝেন নি। চাকরীতে ইত্বকা দিয়ে যখন ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র সেনে, তখন সন্ন্যাস তাঁর দীপ্তময় হয়ে উঠেছে সেই আশ্বিনের মতো। গৈরিকের নিশান তুলতে মিশন তাঁকে আর আহ্বান দেয়নি।

সেদিন তাঁর চেখে আসো জলছে বাধীনতার ঐ অরবিন্দের দ্বীপ মন তাঁর সেদিন উজ্জায়ণ করছে বার বার—

Work that she might prosper.

Suffer that she might rejoice.

সেদিন যম তাঁর আকুল আগ্রহে, দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে দিল্লীর লাল কেল্লার দিকে, সেদিন তিনি আর ছোট্ট স্থাব বা বসুন্দের প্রিয়তম সুভাষ নন, সেদিন তিনি বাংলার এক ভারতের নেতাজী! গৈরিক নিশান তুলতে মিশনে চলে যেতে হয়নি সুভাষকে, আপনি ইচ্ছে মত সমস্ত বিশ্বময় মিশন গড়ে তুলেছেন সুভাষ। তাঁরই মিশনের পতাকা উড়ে চলেছে দেশ দেশান্তরের আকাশে। মালয়, ব্যাঙ্ককে, জাভায়, ব্রহ্ম, কোহিমায়। সুভাষের পতাকা চমকিত করে দিয়েছে সেদিন সারা বিশ্ব।

সেদিন তাঁর আকুল আহ্বান—'চলো দিল্লী'

ব-ব-নি-কা

জুজুবুড়ির গল্পে

মুস্তাফা নাশাদ

জুজুবুড়ির নাম শুনেছ জুজুবুড়ির নাম?

জুজুভাণ্ডার শুজুপাড়ার জুজুবুড়ির গ্রাম।

যাতপূরে উঠে বড়ি মাথায় পরে সিঁদুর,

তাক খিনাখিন নাচে লখে—হাসে নেংটি ইদুর।

নাচতে নাচতে যখন বড়ি হয়ে পড়ে কাবু,

সানলাইটের সিরাপ দিয়ে ধায় বাজি-সাবু।

যৌতুধোতানি শোনের পিঠে তড়াক করে গুঠে,

বাঁই কিড়কিড় বাঁই করে সে আকাশ পানে ছোটে।

টিকিট খিনা চড়ার গোবে শুব্বেরা দেয় শুতো,

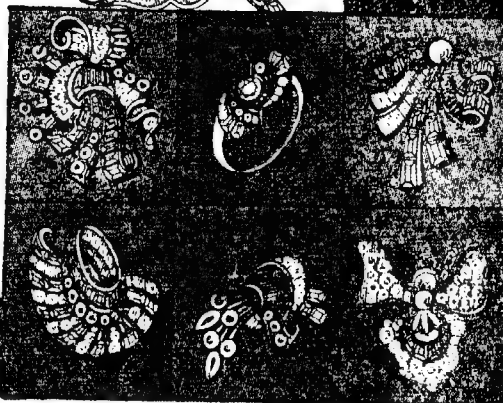
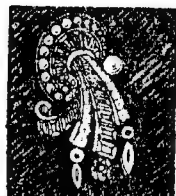
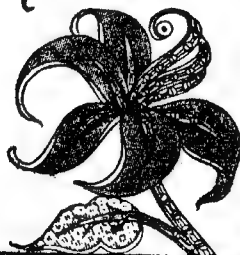
হুথ থুগড়ে পড়ে বড়ি কিছুটি নয় ছুতো।

পরশা বাঁচল চড়া হ'ল যোবা হ'ল বেশ,

কত মজার জুজুবুড়ি জগৎ পেরে না বেশ।



জৈদ্যো মাদ্র্য



গিনি গাল্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম.বি.সরকার
এণ্ড সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলাস

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ চক্ৰগোপ টুইট কলিকাতা-১২ গ্রাম-শিল্পায়কস
ব্রাও-বালি গজ-২০০/সি মাসবিহাতি এভিনিউ কলিকাতা-২২ ফোন-৪৬-৪৪৬৬
সোভিয়েত পুরাতন চিত্রনা ১২৪,১২৪/১, বঙ্গবাজার টুইট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ

B.B.



প্রতিমা দাশগুপ্ত

বোগদানের রাজপথে পাড়িয়ে উড়িয়েযোবনা মনোয়ার বিবি একটা খরবোজা খাচ্ছিল। পূর্বনে পায়ে পোড়ালী পর্যন্ত লম্বা গাউনের মতো একটা কুর্তা, তার উপর গোলগা রেশমী উড়না, তার হালিয়ারে বড় বড় সোনালী জরির ফুল। তেলবিহীন কুক চুলের ভার কাঁধের ছইদিকে কৃষ্ণিত বোঁদ বন্ধ। তার সামনে পাড়িয়ে ইজার, চোগা, বেজ পরিহিত একজন যুবক অচুনয় করে বলছিল, ভাখো বিবি আমার জানে আর কুলায় না। বাদশাহের নিত্যি নতুন কশাইশ খাটতে খাটতে কাহিল হোয়ে সেলাম।

চোখ মুখের এক অপূরণ ভঙ্গী করে মনোয়ার বিবি বললো, তোমার বাদশাহের ফর্দাইশ খাটতে খাটতে তোমার জান কাহিল হবে তাকে আমার কি? আমার জান তো তাতে কমজোরি হবে না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ইশাক বললো, হুনিয়ার বেজরাজই এই। কাকর ছুংখ কাকর দিল নরম হয় না।

মুখভর্তি খরবোজা নিয়ে অস্পষ্টভাবে মনোয়ার বললো, ভাখো মিঞা, আমার কাজ কাম কেলে তোমার বাকচাতুরী তখনতো তো এখানে আসিনি। যদি কাকের কথা কিছু থাকে তো বল আর না হোলে বল আমি ফিরে বাই।

অচুনয়ের ঘরে ইশাক বললো, বিবি, মড়বড় করোনা, জেরা মগজ ঠাণ্ডা করে আমার বাত শোনো। হামেহাল বাদশাহের শিকমংসির করতে করতে আমার হাচ্চিতে কালী পড়ে গেল, আর এখন জানে কুলায় না। বাদশাহের হামামের জন্ত রোজ নিত্যি নতুন হরী কোথা থেকে আমদানী করি বল দেখি?

দূর গজবেক। হামাম না বলে হায়েম বল।

না পো বিবি হামাম। বাদশাহের খোরাল তার হামামে রোজ একজন করে খুশ সুরং আওরত তার ওসল-এর সরজাম জৈয়ার রাখবে, ওসল-এর সময় বখন বা দরকার হাতের কাছে এসিয়ে বেবে, সময় সময় গা-ও দলাই মলাই করে দেবে। ভবে এক আওরতের হুনি আসা চলবে না।

মনোয়ার উড়নার নীচে মুখ লুকিয়ে থুকথুক করে হেসে উঠলো, জেরার বাদশাহ দেখছি বন্ধ সময়দারি আদরী।

জাভে বিবি জাভে। তোমার বাত কাকর কানে গেলে তোমার আমার ছুজনেরই বর্দানী হবে। জা দেখ কত সোদোকা চিড়িয়া কা মাকিক কুর্দিস্তান কা আওরাং, বরক কা মাকিক সকেল রথকা ইরানী আওরং, কেতনা ইছলী আওরং যিসুকা পাও মে ওদাবি গুডকা জেরা এনে এনে হাজির করিয়েছি বাদশাহ হামামে। এখন সারা বোগদাদ আর বাকি নেই, আর আমিও হররায় হোয়ে গেছি, আর তালশ করতে পারি না।

মনোয়ার অধৈর্য্য কর্তে বললো, তা এসব বাত আমাকে জনিয়ে তোমার কোন ফাইদাহ হবে?

বিবি থাকা হোরো না, আমার ফাইদাহ তো তোমার হাভেই। টাটকীসের পানির ভেতর নিজের মুখখানা একবার দেখে এসো তো তোমার চেয়ে খুশসুরং আওরত সারা বোগদাদের মধ্যে আর কেউ আছে না কি?

খেং বেজহল বেউকুক, অবশিষ্ট খরবোজার টুকরোটা ইশাকের গারে ছুঁড়ে দিলে মনোয়ার কোঁড়ে পালালো। ইশাক কিছুক্ষণ একঘুটে সেহিকে তাকিয়ে থেকে হুশিত মনে বিপরীত পথে হাঁটতে লাগলো।

বোগদানের পোলক ধাঁধার রত গলির পর গলি পার হোয়ে মনোয়ার নিশ্চয়ন সন্ধ এক গলিতে এসে পৌঁছলো। সেই গলির মোড়ে বহ পুরানো একখানা বাড়ীর সামনের রোয়াকে বসে এক বুঝা ম্রোলোক কুরসী টানছিল। মনোয়ারকে দেখে কুরসীর নল মুখ হতে নামিয়ে বললো, কোখার গিয়েছিলি এই রোজু?

তার পাশে বস করে বসে পড়ে মনোয়ার বললো, নানী, সে এক মজার বাত। ইশাককে মনে আচে তোর? সেই যে যুবাক চাচার লেডকা, বাকো উমরে আমাদের বাড়ী খেজতে আসলো।

ওয়াহিদান বিবি কপাল কুঁচকে বললো, যুবাক চাচা ইশাক?

মনোয়ার রাগত সুরে বললো বুঝো হোয়ে তোর দিমাগ খরাব হোয়ে পেছে নানী। যুবাক চাচা তোর ইয়াদ নেই? যে বড় শালার লেডকীকে শাদি করলো?

ও: হো, ওলসানের মরদ? তাই বল। তা কি হোয়েছে তার?

তার কিছু হয়নি, তার লেডকা ইশাক বাদশাহ নকর, কাল রাতে আমাকে খবর পাঠিয়েছিল আজ কজিরে তার সাথে ম্রলাকাত করতে। সেখানে যেতে সে আমাকে এক মজার কিসসা শোনালো, হাসতে হাসতে মনোয়ার প্রায় গড়িয়ে পড়লো।

ওয়াহিদান বিবি কুরসীর নল দিয়ে সপাং করে তার পিঠে একটা বাড়ি দিয়ে বললো, আ মর ঢং দেখনা ছুঁড়ীর। বলি মজার বাতটা কি তাই বল না। মনোয়ারের কাছে সব শুনে ওয়াহিদান বিবি বললো তা তুই কি জবাব দিলি?

জবাব আবার কি দেবো? বললাম, তুই একটা বেজহলবুবক।

ওয়াহিদান বিবি গুডুক গুডুক করে বার কয়েক কুরসী টেনে একহুখ খোঁরা ছেড়ে বলল যুবকটা কে? তুই না ইশাক?

মনোয়ার বলল কেন? কি বুঝকি করলাম আমি?

নয়তো কি। তোর শাদি হোয়েছে তো শু নার কা ওয়াভে। বখন কপারায় জব্বং পড়ে তখন শু তোর দরর আসে কিছু

রক্ত বোগাড় করতে, তার পর তো আর তোর কোন জরানও নেয় না। আমমান হুঁড়ে যদি কিছু বিনা তকলিকে তোর হাতের মুঠায় ভেতর আসে তাকে তুই নাকচ করিস কোন নজিরে? বুড়ার বাড়ি ভেঙ্গে আর কতদিন বসে থাকি?

ভাখ নানী, বে-অকল-এর মতো বাত বলিস না। আমার মরদের কানে যদি এ বাত ঢোকে তবে আমাকে তো কেটে ছ'টুকরো করবেই, তাকেও বাত দেবে না।

ওয়ারিহান বিবি তার লম্বা বাঁকা নাকটা এক ইঞ্চি উঁচু করে বলল, মাধাই নেই তার-মাধা বাখা। তোর মরদ নাহিনার ক'বার করে আসে শুনি যে তোকে ছ'টুকরো করতে বাবে? তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলে খেঁচু করে ওয়ারিহান বিবি বলতে লাগলো: খানদান ঘর দেখে শুনে অল্প উমরে তোর শাদি দিলুম, তা ছোঁড়া বাপ মরবার পর কাঁচা রূপায় সব হাতে পেয়ে বাউতুলের মতো উড়িয়ে দিয়ে এখন হুমকির মতো রান্ডার রান্ডার ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুলা তোর নসিবে সুখ লেখনি।

অবৈধ্য হোরে • মানোয়ার বলল: তোর ঐ পুরনো বকবকানি শুনে শুনে কত কান কালাপালা হোরে গেছে। বকুনি ছেড়ে কাজের বাত যদি কিছু থাকে তো বল।

আরে সেই বাতই তো বলতে বাচ্ছি, তা তুই শুনছিস কই? খালি দড়বড় করছিস। মগজ ঠাণ্ডা করে বসে শুনিবি তবে তো। বা যদি শুসল করিস তো করে আর তার পর খেয়ে দেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে আমার কাছে এসে বোস। বাকি তার আগে—বলতে বলতে ওয়ারিহান বিবি কুঠার খানিকটা তুলে ধরে পাছামায় পিট গুলে কোমরে বাঁধা সড় একটা বলি বের করে আনলো। চারদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলির বীধন গুলে সম্বর্ণে একটা দীনার বের করে মানোয়ারের হাতে দিয়ে বললো: বা, একবার বাজার ঘুরে আর। এটা ভাসিয়ে সেরটাক হুয়ার পোস্ত, খোঁকা মৈদা আউর আটটা, চানেকা ডাল, খোঁকা পনীর, কুছ খাজুর আর খানিকটা মধু কিনে নিয়ে আর।

মানোয়ার অবাক হোরে তার দিকে তাকিয়ে বললো তোর কি হোয়েছে বল দেখি? না হোলে তোর হাত দিয়ে পানি গলে না, বেহুড়া হট করে এত খরচ করে ফেলছিস?

হেসে ওয়ারিহান বিবি বললো, বেহুড়া নয় যে ফেঙ্গী, কাইদাহ আছে। সে সব বাত পরে হবে এখন—তোকে বা করতে বলছি কর না। পোস্ত লেবিন আজমলের হুকান থেকে আনিবি না। ও বকবীর পোস্ত ছাড়া বলে চালিয়ে দেয়। আমজাদের দোকান থেকে আনিস।

পোস্তের লাম শুনে মানোয়ারের মনটা বেশ খুশি হোয়ে উঠলো—বললো: আসবার সময় দেখে এলাম আমজাদ তবুয়ে মোঠা পরাঠা সঁকছে। তোর আর আমার লজ্জা ছ'খানা নিয়ে আসবো?

ওয়ারিহান বিবি ভ্রুকৃত করে খানিকটা ভেবে নিয়ে বললো—আচ্ছা, নিয়ে আর না হয়, তোর বখন খাওয়ার দিল হোয়েছে। তা' হুখানার বললে চার খানাই নিয়ে আর, এত খরচ করছি, না হয় আর কিছু জিরানতাই বাবে। মানোয়ার

বাজারের দিকে রওনা হোলো, পিছন থেকে ওয়ারিহান বিবি কুলো, কিছু মেশান্তা আর মেওয়ারি নিয়ে আনিস, বুলি? বাজারের বেতে বেতে বাড়ি কাঁচ করে সমস্তি জানাটা।

বোঙ্গাধানের আমীর আবু সাদাং দারু পানোর বাস, বাস—মরক ইশশাক সন্ধ্যার নিজের বাড়ির বাউরের ঘরে মেবের ওপর গালে হাত দিয়ে চিন্তিত মনে বসেছিল। ঘরের চেঁচা দেখলে মনে হয় মালিকের অবস্থা বদল। ঘণ্টা বেশ প্রশস্ত। মোখ ও দেয়ালের অর্ধেক নানা রকমের টালি দিয়ে ছাওয়া। এক কোশে নীচু একখানা তক্তাপোশের ওপর ভালকা একখানা জামিম মিহি মসলুম দিয়ে ঢাকা। দেওয়ালের চারদিকে গাঁথা চারটি বড় বড় তাক। তার একটির ওপর বাখা মাঝারি আকারের একটি গোলাব পাশ ও আতর দান, আর একটির ওপরে ছ'তিনটি চড়া রং-এর কাগজের ফুলের বাড়ি আর ছুটির ওপর দুটি মাটির তৈরি পরী ছ'হাতে ফুলের মালা নিয়ে ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে কোমর বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের দিকের দেওয়ালে শেবেক দিয়ে আটকানো জলন্ত একটি দেওয়ালশিরা।

গালে হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে কোথেকে মুখে ভীষণ একটা ভ্রুকুটি করে পীতে পীত চেপে ইশাক বলে উঠলো, বাং তেবি তেরা নোকরি—সঙ্গে সঙ্গে পিচ করে খানিকটা থখু ফেললো মেবের ওপর—ঠিক সেট সময় তার বিবি মাসুদা বেগম পাঁচবায়ের বাত তাকে প্রায় করতে এলো। এইবারে তার খানা দেওয়া হবে কিনা! ধৈর্য হারিয়ে ইশাক প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলো, জাখো বিবি, দফা দফা যদি এরকম মিগদাবী দিতে আসো তো-ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। বলে দিলাম না তখন যে আমার কুখ নেই, তোমরা খানাপিনা চুকিয়ে মাও।

JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

হাস্তা বিবি সত্তর তিন পা শিখিরে গিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে যেতে আপন মনে বলে উঠলো, মর্কানা কি মিজাজ সেখানো, বেনে গবগনে তল্লু।

তার চলার পাখ ভাকিরে থাকতে থাকতে হঠাৎ ঈশাকের মুখের কঠিন তার একটি নয়ন হোলো, কি একটা কথা শুনার হোরে ভাবতে ভাবতে নিজেকেই উদ্দেশ করে বলল, বিবির আমার গায়ে গোঁত একটি বেশী থাকলে হবে কি, চলার রকমটা ভারী স্থল্লর। মগর মুখটাই একেবারে মেঘে রেখেছে। ঠিক হেন একখানা তোলো ভেগচির মাফিক—বলতে বলতে ভিত্তি ও তালু দিয়ে চুক চুক করে আক্ষেপ করে উঠলো ঈশাক। তা একটু ঘষে মেখে ঠিকঠাক করে নিলে দেহাত্ত আকলো সায়গ না হোলোও হোতে পারে। কিছুক্ষণ পর সে উঠে আস্তে আস্তে বসুইখানার দিকে এগিয়ে গেল, চৌকাঠে পা দিয়ে পাড়িয়ে বলল, ক্যারা বিবি থানা হো চুকা?

হাস্তা বিবি ভবন বসুইখানের কাজকর্ম শেষ করে থানার বর্ডন চর্চন শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেছে। সেখানে তাকে না পেয়ে ঈশাক শোওয়ার ঘরে চুকলো। দেখলো বিবি শোওয়ার ঘরের তক্তাপোশের উপর চায়ের বিড়িয়ে থাওয়ার উপক্রম করছে। ঈশাকের পায়ের আগুয়াক পেয়ে বুঝ তুলে বললো আঁভি ভুখ লাগ গিয়া?

হেসে নরম মুখে ঈশাক বললো, বিবিজান, পছলে তো বাংলাও তুমি শুদসা নেই কিয়া? মুখ ক্রিয়েরে মাস্তা বিবি জবাব দিলো, শুদসা করবো কেন? সেটা তো তোমারই একচেটিয়া।

আবার হেসে ঈশাক বললো নেহি, নেহি শুদসা তো মস্ত কবনা বিবিজী, মেয়াই কহুর হো গয়া, কি কি থানা আছে নিয়ে এসো আজ মোনো একসাথ থানা খাঈলা।

হাস্তা বিবি কথা না বলে তার খারিখ পাশে আর এক থানা খারি পাতিলো, তারপর জলন্ততি বহনা ঈশাকের কাছে এগিয়ে দিল ওজু করবার জন্ত। ঈশাক বাইরের চব্বতবার ঝড়িয়ে বহনার জলে হাত বুখ বুখে এসো, পরে হংএ এসে তোয়ালের হাত বুখ বুখতে বুখতে হাস্তাদাকে উদ্দেশ করে বললো, কি বিবি থানা ঠিক করেছে?

হাস্তা উত্তর দিল, থানা তো কখন তৈয়ার হোরে আছে। এতক্ষণে তো বোধ হয় জুড়িয়ে পানি হয় গেল।

হাক হাক একদিন না হয় ঠাণ্ডা থানাই খেলাম—বলতে বলতে তক্তাপোশের ওপর পা বুড়ে বসলো ঈশাক।

তার খারিতে বড় চমচর দিয়ে থাবার তুলে দিতে দিতে হাস্তা বললো, কিই বা থানা আছে? সেট খানামী রয়ের বড় সুবগাটা নিয়ে ঝাঁড়ি গেরেল করলুম আর কাল রাতের থানী গোঁত দিয়ে ভাল পাঁকালাম।

ঠিক আছে ঠিক আছে বিবি! যে থানা তুমি তোমার নিজের হাত দিয়ে তৈয়ার করেছো তা খোঁড়া জ্বালেও আবার কাছে নবাব-বালশাহের চেয়েও জাতি।

হাস্তা বিবি জবাব হয়ে ঈশাকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো তোমার কি হোয়েছে বলতো জনাব? হঠাৎ এমন মিঠা বাত বহলো কেন? এই খানিক আগেই তো দেখলাম তোমার দুসরা মিজাজ।

হেসে ঈশাক বললো, বিবি মিজাজের কি হকেশন ঠিক

থাকে? আমার গরম মিজাজ যদি তুমি মাক না কর তবে তোমায় দুনিয়ার আর কে করবে? বারকোশের মতো বড় কুটি থেকে খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে ভালো ডোবাতে ডোবাতে ঈশাক কালো, ভাখো আমাদের শাদি হয়েছো মোটে লো বরব। তোমার মত কীচা উমরের সেড়কীদের মনে কত সাধ আছো থাকে, কোনটাই বা তার আজ পর্যন্ত মেটাতে পারলুম? খেতে খেতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো ঈশাক পরে আবার শুরু করলো তাই ভাবছি কাল সাঁখে তোমাকে নিয়ে বেগোব হাওরাখানার। তারপর থানাপিনা বাইরে চুকিয়ে কিংবো। কাল সাঁখে ঘরে আর কোন থানাপিনার হাস্তামা করোনা।

ঈশাকের কথা শুনেতে শুনেতে হাস্তা বিবির হুই চোখ তার ঠালা হুগীর বোলের ভেতর আস্ত আস্তে আকারের মত ধারণ করছিল। কিছুক্ষণ পর বললো কি তাজ্জব কী বাত! হু' বরব আগে সেই যে তোমার কুঠিতে চুকলুম তারপর আর এক বেলার জন্তও কোথায়ও পা বাড়াতে পারলাম না। গহরারহের বোজ কারবালার মেলাতে যেতে চাইলুম, তা পর্যন্ত যেতে দিলেনা, বললে আমারা খানদানী খানমী। আমাদের আগবং এর জাঁখের সাথে দুসরা আমদারী জাঁখ মিললেই সে আগবং কে তালাক দিতে হবে, এই আমাদের খানদানী মস্তর। তুমি ইয়ার দোস্ত নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে ব্যুর্জি করে মেলা দেখতে গেলে আর আমি মুখ চুপ করে বেকুবের মতো বসে রইলুম।

হেসে ঈশাক বললো, আরে তুমি এখনও সে বাত ইয়াদ করে বসে আছে? হাওরা কি হরবখত একদিক দিয়েই বর বিবিজী? মারে মারে তার রকর কেবও আছে। কাল যে বাত বলেছি আজ সবেরে শুব্বু উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাতও আমার বললে গেছে কাল রাতের জাঁখের মতো। দুনিয়ার দস্তবই এই। সে থাক তা হোলো এই ঠিক রইলো, পাক্তা বাত। কাল আমি খোঁড়া জলাহি কাম থেকে কিংবো, তুমি তৈরি থেকে, আমি এসেই তোমাকে নিয়ে বেকুবো। যেখানে তুমি যেতে চাও যাবে, বা তুমি কিনতে চাও কিনবে, তার উপর কোন বাত আমি বলবো না। সব সে বাড়িয়া শিলওয়ার কামিজ কাল পরবে আর শাদির সময় যে মতিয়ার মালা, কানকুল, নাককুল পেয়েছিলে সেগুলোও পরবে। আমি কাল ভালো এক শিপি ইন্তবও নিয়ে আসবো তোমায় জন্ত বহৎ খুশবুওয়াল।

ভেতরে ভেতরে হাস্তা বিবির মনটা আছাদে গলে বাজিল, ঈশাকের কথা শুনে নকল অভিমন্যে মুখ খুঁড়িয়ে বললো: বলে দিলে এক বাত। বাড়িয়া শিলওয়ার কামিজ পরবে, মতিয়ার মালা লাগাবে। ঐ পুরনো বেইজিবি জবরজ শিলওয়ার কামিজ আর তোমার নানীর আমলের মতিয়ার মালা গায়ে চড়িয়ে বাইরে বেকলে খানদানী আমদারী মানটা ব্যুর্জি বহত বজায় থাকবে? আজই শুখ সোহাগ ভানাতে এসেছো, না হোলো এই হু বরবের ভেতর কোন একটা টাঁজ হাতে করে বয়ে নিয়ে এসেছো আমার ওরাস্তে? অসল বাত কি তা আমার জানা আছে। তোমার দিল কোথায় পড়ে আছে তা আমি জানি। থুলা আমাকে খুববহৎ করেনি তা কি আমার কহুর? তোমার বুড়ো আকার ওপর তার না দিয়ে তুমি নিয়ে দেখে শুনে তোমার পসন্দবস্ত শাদি করলে না কেন?

হাস্তা বিবি উত্তরায় জীলন্ত চোখে চপাখার উপক্রম করতে

ঈশাক মনে মনে প্রেমার স্তনলো, তাড়াতাড়ি বলে উঠলো বুটবুট কেন হুথ টেনে আনছো বিবি? আঁঠীতে আগে নিজের হুথ দেখে এসো তারপর বোলো খুলা কাকে সুরং দিয়েছে, তোমাকে না আমাকে? হুথে খস আমোদ করে হুটো বাত বলি না বলেই ভেবেছো তুমি খুশন্থৎ নও? মনে রেখো বিবি বার চিহ্নবাহতে সুরং সব চেয়ে বেশী আদরী সোপ তারই খুশ আমোদ সবচেয়ে কমতি করে।

এতকণ মনের খুশী জোর করে চেপে রাখছিল মান্নদা বিবি। এবার ঈশাকের কথা শুনে নকল কান্না খেমে গিয়ে খুশীর গমকে বলমল করে উঠলো তার সারা হুথ। হুথ কিরিয়ে সে ভাব ঈশাকের কাছে গোপন করবার চেষ্টা করে মান্নদা বিবি বললো আচ্ছা, আচ্ছা, হোয়েছে, মোলোয়েম বাত রেখে আগে খেয়ে নাও দেখি। কিন্তু কাপড় উগড়া, গয়না গাটির কি বন্দোবস্ত করবে?

ঐ দিয়েই এবারকার মতো চালিয়ে নাও, এত তাড়াতাড়ি কি বন্দোবস্ত করবে? কাল না হয় আমাকে একবার তোমার সব চিন্তা দেখিও, দেখি কি বন্দোবস্ত করা যায় বলতে বলতে চিন্তিত মনে ঈশাক আরও গ্রাস চাপাটি গোল হুথে পুরলো। মান্নদা বিবি প্রত্যন্তরে কি বলতে বাচ্ছিল, খেমে গেল। সদর দরজায় কার মোলায়েম করাখাত হোলো টকটক অস্পষ্ট ভাবে। ঈশাকের কান ভায় বিবির চেয়েও সজাগ। ঠুটি চিবোনে বন্ধ করে বলল দরওয়াজার কে যা দিচ্ছে না? তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার দরজায় নিতুল করাখাত হোলো। মান্নদা বিবি দরজা খুলে দেবার জন্য উঠতেই ঈশাক বলল, তুমি বাচ্ছো কেন? বব

কোই মর্দানা উর্দানা হোর ভব? বলতে বলতে ভাল ভরকারি মাথা হাত পাখামার পেছনে চুট করে মুছে কেলে ঈশাক নিজে এগিয়ে গেল দরজা খুলে দিতে।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গাঁড়ানো আপাদবস্তক বোরকার ঢাকা দুর্গিটির দিকে তাকিয়ে ঈশাকের দুই ঠোঁট এক ইঞ্চি ঝাঁক হোয়ে গেল। সারা শরীরে বিচিত্র এক দোল খেলিয়ে বোরকা পারিত দুর্গিটি ঈশাককে প্রায় খাঁচা দিয়ে ভিতরে চুকে গেল, একাণ্ড একটা কাঠের খালা দুই হাতে ধরে। তার এই চলার ভঙ্গী থেকেই ঈশাকের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল, পরক্ষণেই ভাবলো যে সে কি সম্ভব? সকালেই এত গালিগালাজ করে গেল। ততক্ষণে বোরকাখারিণী হনু হনু করে বিনা বিবার তার শোওয়ার ঘরে চুকে গেছে। কাঠের বড় খারি শুক্লপোশের ওপর ঠুক করে নামিয়ে দিয়ে সে মুখের বোরকার ঢাকনি খুললো। ঈশাক তার পেছন পেছন আসছিল বোরকাখারিণী বিবির সামনা-সামনি এসে তার মুখের দিকে চোখ পড়ামাত্র সবিনয়ে বলে উঠলো শুভানু আন্না। আর মান্নদা বিবি হুশের গ্রাস হুথে রেখেই স্কুড়ি হাতে ধাঁ করে সেই দিকে চেয়ে রইলো। তাদের খাওয়ার বাসন কোসনের দিকে তাকিয়ে চুপ্ চুপ্ করে আক্ষেপ করে মনোয়ার বলল, এঃ হে, তোমাদের খানাপানা হোয়ে গেল? নানী আবার তোমাদের জন্য আজ কিছু ভালো-মন্দ রসুই করে পাট্রিয়ে দিল আমাকে দিয়ে।

এতক্ষণে ঈশাকের হুথে কথা যোগালো। বললো, ব্যাপার কি বাত লাও তো মানোয়ার বিবি?

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ..



খাওয়ার সাধারণ সম্পূর্ণ শরীরের
প্রয়োজনে নিয়োগ করলেই
অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়।
ডাক্তার-পেশ সিন ব্যবহার করলে
এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন,
কারণ ডাক্তার-পেশ সিন খাদ্য
হজমের সাহায্য করে।

ডাক্তারপেশিন

দুবেলা খাবার সময়
নিরমিত ছোট এক
চামচ খাবেন।
ডাক্তার-পেশিন
কখনো অত্যন্ত
গাঢ় নয়।

ইউনিয়ন ড্রাগ কলিকাতা



ব্যাপার আবার কি ? কার্ঠের খারির ওপর কুর্শীকাটার কাজ করা লেনের ঢাকনা খুলতে খুলতে মানোয়ার বললো, নানী আজ শখ করে কবেকটা চিহ্ন পাকালো—বললো, দিয়ে আর কিছু ঈশাকদের, বুঝারকের লেডকা আমাদের আপনা আদমিই তো বটে।

ঈশাক মনে মনে হেসে বললো, বহুৎ যেতেবানি নানী কা—তার পর খারির দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য্য হোয়ে বলে উঠলো, ইয়া আল্লা, এ যে নবাব-বাদশার সমুচা বসুইখানা এনে হাজির করেছো। আজ কি নানীর জন্য কা দিন নাকি ?

কিৎ করে হেসে মানোয়ার বললো, তা তো পুচ্ছ করিনি। যা ভোক্ মেহনৎ করে এসব চিহ্ন বয়ে নিয়ে এলাম, কিছু কিছু তো বুঝে যাও।

জরুর জরুর ঈশাক বলে উঠলো, তুমি একটা পান্ডা এত বড় ভারি খারি বয়ে নিয়ে এসে আর আমবা খোঁড়া মেহনত করে খেতে পারবো না ? তার পর মান্দার দিকে তাকিয়ে বললো, যাও তো বিবি শুটা বর্জনগুলো বসুইখানার বেখে আর এক দফা সাফা বর্জন লে আও।

মান্দা বিবি মানোয়ারকে কোন কালেই সহ করতে পারতো না, এত হাড়ে তাকে দেখে প্রথমটা অবাক হোয়েছিল, পরে তার ঠাণ্ডা মেজাজ আবার গরম হওয়ার ঈশাকন কবছিল। তার উপর ঈশাক আবার বাসনপত্র টেনে আনবার প্রস্তাব করতে তার বিরক্তির আর সীমা হইলো না। তবে মান্দা একটা বোকাসোকা হোলও বাইরের লোকের সামনে নিজেরের ইচ্ছা বাঁচিয়ে চলতে পারতো, না হোলো ঈশাক এতক্ষণে মতা বিপদে পড়তো। মান্দা বিবি গভীর চালে বসুইখানার দিকে চলে গেল, আর ঈশাক ফিস ফিস করে মানোয়ারকে প্রশ্ন করলো, কি বিবি, নসীব কি আমার তবে খুললো ? মত বললোছো ?

মানোয়ারের মুখের ভাব পরিবর্তন হোলো না। উদাসীন ভাবে উত্তর দিল, মত বললানো আর না-বললানোর কি ? তখন তোমাকে এক হাত জিজ্ঞেস করতে তুলে গিয়েছিলাম, তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম। একটু ইতস্ততঃ করে সে বললো, আজ ফজিরে তুমি সব হাত বললো, लेकिन আমার ইনামটা কি রকম মিলবে, তাতো কিছু হাত লালো না ?

খুশিতে মুখ ভরপূর করে ঈশাক বললো, সেজ্ঞ কিছু বাবড়িওনা বিবি, আমি জামিন বইলুর। কম্বে কম শো বরষ পারের উপর পা দিয়ে বোসে খেতে পারবে।

মানোয়ার বললো, তবু একটা আলাজ দাও তো।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ঈশাক মানোয়ারের কানে কানে কি বললো।

মানোয়ার তার উত্তরে বললো—বেশক। মগর শুধু মুখের বাতে হবে না, নিয়ে এসো সি আহি, কলম আর কাগজ লিখে দিতে হবে তোমাকে।

দু'দণ্ড ঈশাক তার মুখের দিকে তাকিয়ে খেঁক বললো—মানোয়ার বিবি, এ জরুর তোমার নানীর বাত। তোমার কাঁচা যগজে এখনও এখন পাকা বৃদ্ধি গজায়নি।

মানোয়ার শক্ত গলায় জবাব দিলো—সে হার বাতই হোক, লিখে তোমাকে দিতেই হবে, আর না হোলো বল আমি ঘরে কিয়ি।

বিধা ভরে ঈশাক বললো : মগর এ লিখবার বাত বাদশাহর, তারই তো রূপায়, আমি কি করে লিখি বল ?

মানোয়ার উঠবার উপক্রম করতে করতে বললো : তা হোলো আমি উঠি।

ব্যাকুল হোয়ে বাগ দিয়ে তাড়াতাড়ি ঈশাক বললো—আজ্ঞা বিবি আজ্ঞা। তুমি যখন বলছো তোমার বাত মানতেই হবে।

নিয়ে আসছি আমি সি-আহি, কলম আর কাগজ। তুমি উঠো না—তার কথা শেষ না হোতেই মান্দা দেখা দিল দরজার কাছে এক গোছা পরিচার বাসন দু'হাতে ধরে।

তাড়াতাড়ি কথা পালটে নিয়ে ঈশাক বললো—এই বে সাফা বর্জন এসে গেছে। তোমাকেও लेकिन মানোয়ার বিবি আমাদের সঙ্গে কিছু মুখে দিতে হবে।

মানোয়ার হেসে বললো—আরে আমি আগে পেট ভর্তি করে তবে তো তোমাদের জন্ত খানা নিয়ে এসেছি।

ঘাড় নেড়ে ঈশাক বললো—তা বললে শুনছি না—বলতে বলতে নিজেই বড় চমচু দিয়ে তিনটি খারিতে মানোয়ারের আনা খানা ভাগ করতে লাগলো। আর তার কাঁকে কাঁকে বলতে লাগলো আরে বাহবা কি বাহবা ! মানোয়ার বিবি আজ খান্ জাহান খার সমুচা বসুইখানা উজাড় করে চেলে নিয়ে এসেছে। পরাঠা, কাবাব, কোকতাহ, কোখা, গুটকা, হাড়িয়া হোকা তাকা। হাত চালাও মান্দা বিবি। বরবে দু'বার এমন খানা বরাতে জোটে না।

আন্তঃপ্রসাদের হাসি হেসে মানোয়ার বললো—আমার আর কি ? সবই তো নানী বসুই করে গুছিয়ে ঠিক ঠাক করে দিল।

বহুত বরষ আউয় জিন্দা রহে নানীজি—একটি খারি মানোয়ারের সামনে এগিয়ে দিতে দিতে ঈশাক বললো। আর একটি খারি মান্দার দিকে এগিয়ে দিতেই সে তারি গলায় বলে উঠলো—আমার আর ভুখ নেই আর তবিরৎও আজ্ঞা লাগছে না। আর বসে থাকতে পারছি না, তোমরা যদি কিছু মনে না কর তবে আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি। ঈশাক এতক্ষণ তাই চাইছিল তাই দরদ ভরা গলায় তাড়াতাড়ি উত্তর দিল জরুর জরুর। আজকে তোমাকে একটু কেমন যেমন কাহিল কাহিলও দেখাচ্ছে। আর দের না করে শুয়ে পড় গিয়ে। মানোয়ার বিবির বর্জন চর্জনগুলো আমি কাল না হয় পৌছে দিয়ে আসবো।

—বাগওয়ার কাঁকে কাঁকে ঈশাকে আর মানোয়ারের কথাবার্তা চলতে লাগলো, তার পর বাগওয়ার শেষে ভিলমুচিতে হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছে ঈশাক মানোয়ারের পাশে বসলো। প্রশংসার দুরে বললো : বহুৎ বড়িয়া খানা বানিয়েছো বিবীজী ! বহুৎ ধো আন্তাহ পরাঠা হোয়েছে। মানোয়ার আগেই বাগরা শেষ করে বসেছিল। এবার একটু অর্ধা হোয়ে বললো, হাত বেড়ে বাছে মিঞা, কাজের কাজটা চুকিয়ে ফেলো, আমি বাড়ী যাই।

আরে সবার বিবি সবার। এতদিন পর এসে গরীবের ডোয়ার না হয় দু'দণ্ড বসলেই। বলতে বলতে ঈশাক উঠে পাশের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর কিরে এসো দরজা কলম আর এক কালি কাগজ হাতে নিয়ে। মানোয়ারকে লক্ষ্য করে বললো বাতলাও বিবি কি লিখতে হবে।

মানোয়ার বললো, আমি আবার কি বাতলাবো? এইমাত্র তুমি বা বললে তাই লেখো। তবে ইয়াদ রাখো বাবশাহ যদি এতে গরুর রাজী হয় তবে তুমি মউকুক পাবেনা। এর ওনাহগার তোমার নিজের দিতে হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঈশাক বললো আর বিবি, গরজ বখন আমার তখন তোমার সব বাতাই মেনে নিতে হবে।

দেওয়ালসিরির আলোর সামনে কাগজ ধরে খসখস করে খানিকক্ষণ কি লিখে মানোয়ারের সামনে কাগজখানা মেলে ধরে ঈশাক। বললো, এই নাও আমার রাজীনা। দেখে নাও ঠিক আছে কিনা।

এইবার ঈশাক এক চাল চাললো। লেখাপড়ার সঙ্গে মানোয়ারের সম্পর্কটা যে কতদূর ছিলো তা ঈশাকের অভ্যাস ছিলো না, আর তার নানী বুড়ির এ সবকিছু কে, প্রায়ই আস না। আবার এ এমন একটা কাপার যে পাড়াপড়শীর কাউকে দিয়ে পড়াতেও পারবে না, তাই তার মুকলচাতের সখার মধ্যে একটা কঁক বেখে দিল। ভারলো বাবশাহর কাছে রূপায়া গুণে নেরো ঠিকই তারপর কাছ খতম হোলো মানোয়ার বিবিকে—আচ্ছা সে পরের কথা পরে দেখা যাবে।

মানোয়ারের লেখাপড়া সামান্য বা জানা ছিলো তাই দিয়ে ঈশাকের টানা লেখাকে কোনমতেই আরম্ভে আসতে পারলেনা। কিন্তু সে কথা সে ঈশাকের কাছে বলে ছোট হতে যাবে কেন? তাব একঘণ্টে পড়বার ভঙ্গী করে খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো: এখন তো ঠিকই আছে মনে হচ্ছে, পরে যদি কোন খটকা লাগে তবে কাল সববে তোমার কাছে কের আসবো।

তামাম ঠিক আছে বিবিজী, খাবড়াও হং। তা হোলো কাল সন্ধ্যা তোমার বাড়ীতে বাবশাহের তালায় যাবে। সাজ পোশাক একটু ভালো করে করতে হবে, সে কথা ভুলেনা। যদি কয় থাকে তবে বল, কাল সববে একপ্রহর সাজ-পোশাক কিনে আনবার বন্দোবস্ত করবো।

আচ্ছা কাল আমি তোমাকে জানাবো। এখন আমি বাই, অনেক রাত হোলো, বলতে বলতে মানোয়ার উঠে দাঁড়ালো।

ঈশাক বললো আমি তোমার পৌছে দিয়ে আসি?

না না, না, এই তো এতটুকু পথ, আমি একাই বেতে পারবো, যোরখাটা ভাঁজ করে কাঁধের ওপর বসিয়ে উড়নায় মুখ ঢেকে মানোয়ার বেরিয়ে গেল। এক হাতে জলন্ত চিরাগ ধরে অন্ধ হাতে উড়না সামলাতে সামলাতে দ্রুত গতিতে মানোয়ার পথ চলছিল, হঠাৎ পেছন থেকে তার নোল খাওয়া লম্বা কিছুনিটাতে হ্যাচকা একটা টান পড়লো। পড়তে পড়তে টাল সামলে নিল মানোয়ার, হাতের চিরাগটা মাটিতে পড়ে দগদগ করে ছ-একবার জলে নিবে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে কার বিদ্রপভরা গলার আওয়াজ শুনে পেলো। কি ধার সে সন্দেহ খতম কর আতি হো মানোয়ার বিবি?

তার গলার আওয়াজ শুনে এক লহমার মধ্যেই সে বুঝতে পারলো লোকটা কে। অন্ধকারের মধ্যে আবার তার কথা পৌঁছা গেল, কি হুখে যে বাত নেই? বলি এই আঁধারে হুপ

রাতে ঘরে বেকানোর তরিরটা কি শাতির আগ থেকেই ছিলো নাকি মানোয়ার বিবির? এইবার মানোয়ার উঁচু গলার জবাব দিল, যেখানেই সফর করতে যাইনা কেন তাতে তোমার কি?

আমার ভ্যাক্ত কি? রাতে রাতে চোপ লোকটা বললো, একদম জানসে খতম কর তুঙ্গ। আঁধারে মিটুতে পুঁতে ফেলবো, একটা চিড়িঙ্গাও জানকে পাহারনা।

মুখ ভঙ্গিয়ে মানোয়ার বললো: ইং তব দেখাতে এসেছে, জানসে খতম কর তুঙ্গ। খানা, কাপড়া দেবার মুঠান নেই, বাত আঁছে লম্বা চোঁড়া। এত দিন বাসে কোথা থেকে ভাজির হোলো? জেবে বুঝি বখেয়া সেলাই ছাড়া আর কিছু বাকি নেই?

মানোয়ারের মরদ আজিজ হুরগাণী অসতীকু ঘরে উত্তর দিল মধুরা করেনা। তোমাদের বাড়ী যেতে তোমার নানী বলল, তুমি তোমার চাচা আখার বাড়ী গিয়েছো। কোথায় যে তোমার চাচা, খালা আকাজ করতে পারলুম না। সদর রাস্তায় কিছুক্ষণ ঠাঁড়িয়ে পারচারি করতে করতে এগিয়ে গেলাম। ফিরে আসবো ভাবছি তখন দেখলুম ঈশাক মিঞার বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। ঈশাকের আখা করে মরে জিন হয়েচ্ছে, তবে কোন চাচা আখার কাছে ফিরা খেতে গিয়েছিলে?

ভয়ে মানোয়ারের বুকটা চিপ চিপ করছিল, শুকনো ঠোট ফুটা জ্বিত দিয়ে চেটে বলল, জাখো রাস্তায় ঠাঁড়িয়ে হুলা করো না, বাকী ফিরে বা বলবার বলো।



কিছুকণ কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে আজিজ ত্বরান্বিত হলো, বেশ ভাই চল।

বাকী হুকে মানোয়ারের কাঁধ থেকে ঘোরথানী পর্যন্ত নামাযার অবসর না দিয়ে আজিজ বললো, এইবার তো বাড়ী চোকা গেছে, এখন বল।

বাকী এসে মানোয়ারের সাতল বেড়ে গেল, বাড়ীতে নানী আছে, আর পাকা মাখার বুদ্ধি আজিজের মত তিন জনকে এক হাতে কিনে আর এক হাতে বেচতে পারে। তাই হুখ থেকে উত্তরটা থলতে থলতে নির্ভীক গলার উত্তর দিলো : কি বলবো ?

ঠাণ্ডা গলার আজিজ বললো, বলাব কত দিন থেকে ঈশাক মিঞার সঙ্গে তোমার আশনাটী লেছে ?

লুপ করে চটে উঠে মানোয়ার বললো, জিরাজা বাত মং করো।

ওয়ারহিদান বিবি কোথায় বসেছিল, তাদের চড়া গলার আওয়াজ তনে আঙে আঙে ঘরে ঢুকলো। মানোয়ারকে ধমক দিয়ে বললো, কি লাগিয়েছিস ? এত দিন পর আজিজ ঘরে এলো, কোথায় আদর করে ওষু করবার পানি দিবি, খানাপিনা ঠিক করবি, না স্বগড়া লাগিয়েছিস।

মানোয়ার বলল, আমি কোথায় করছি ? ঐ তো শুক করেছে স্বগড়া বঁটি বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই।

জরুর করছে, তক্তাপোশ থেকে লাক দিয়ে উঠে পাড়িয়ে কুঁচ গলার আজিজ বলে উঠলো, পুছো উলুকা নানীকী বাতকো আঁড়ার মে কারা জরুর ছায় ঈশাককা পাশ ?

ওয়ারহিদান বিবি মিঠি হেসে আজিজের মাখার উপর হাত রেখে বললো, আরে শির তো মং গরম কর না ভাইয়া। ঈশাকের আওরং এম সঙ্গে ওর দোস্তি আছে; তাই আজ রাতে এক সাথে খোড়া খানা পিনা করতে ডেকেছিল, এর মধ্যে ওর কনুরটা হোয়রেছে কোথায় ? বাও শির ঠাণ্ডা করে হাতে বদনে পর্দনি দিয়ে এসো, তার পর ফের বা কিছু খানা আছে তাই খাও।

আজিজ আপন মনে গজগজ করতে লাগলো। ওয়ারহিদান বিবির শিখন শিখন মানোয়ারও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রসুই-খানার হুকে মানোয়ার আর ওয়ারহিদান বিবি দু'জনে একবার চোখ চাওরা-চাওরি করলো আর মানোয়ার বলল, নানী বা তর করেছিলুম ঠিক তাই ঘটলো।

ওয়ারহিদান বিবির মুখেও চিন্তার ছায়া বনিয়ে এসেছিলো, হুখ তা একপাশ না করে শুধু মানোয়ারকে বলল বা, এক সোটা পানি দিয়ে আর আগে তার পর ভাষা বাবে কি করা যায়। লেকিন কপড়কাটি করবি না। ও কড়া বাত বললেও চুপ করে থাকবি। মেজাজ গরম করে সব ভেঙে দিবি না।

নানী, ও আমাকে ওর দেখিয়েছে খুন করে কেলেবে বলে।

ওয়ার্ড ঘুরে মানোয়ার বলল।

আজ্ঞা, আজ্ঞা তোকে এমন ডরানতে হবে না। খুন করা অমনি হুখের বাত, বললেই চলো আর কি।

বলতে বলতে ওয়ারহিদান বিবি একটা চ্যাটালো বর্তনের থেকে খানিকদূর ছাড়া বের করে একটা বড় খারিতে রাখলো, কলাই করা বড় বাটি থেকে খানিকটা চানার ডাল আর একটা ছোট বাটিতে চালসে। তার পর খানিকটা হালুয়া, কদরকাই শুকনো খারির

পাশে রাখলো। ছোট বাটিতে করে খানিকটা বহুও চালসে। তার পর মানোয়ারকে বলল পাড়িয়ে ইউলি কেন ? বললুম না এক সোটা পানি দিয়ে আসতে ? ভুই এসো, আমি খানাতলে ওড়িয়ে নিয়ে যাবি।

মানোয়ার বলল : শুধু এই দিবি ? আরো তো কত খানা বেরেছে।

বুদ্ধি দেখোন! হারামজাদীর। চাপা রাগের সুরে ওয়ারহিদান বিবি বলল, দুশর রাতে ঘর থেকে শোলাও, কোদী, পরাঠা বের করলে তোর মরম তোকে খুব সোচাগ করবে না ? খানিক খালি ওকে বললাম না ঈশাকের আওরং তোকে খানা খেতে ডেকেছিল ? আর কোন কথা না বলে পানির সোটা হাতে নিয়ে মানোয়ার বেরিয়ে গেল।

ওয়ারহিদান বিবি খানার খারি হাতে করে ঘরে ঢুকে দেখলো মানোয়ার একা পাড়িয়ে আছে। নানীকে দেখে বলল, জলু করতে গেছে।

আর কোন কথা কাটাকাটি করিস নি তো ?

নীরবে মানোয়ার ঘাড় নাড়লো। খানার খারি হাতে করে পাড়িয়ে থাকতে থাকতে ওয়ারহিদান বিবি ক্রান্ত তালে হাতের খারি মেঝেতে বেখে তক্তাপোশের একধারে বসে পড়লো। মানোয়ারের চোখ ঘুমে চুলে আসতে লাগলো, আজিজ শুধু করে আর কিরে এলো না। আবার হুস্তন চোখ চাওরা-চাওরি করলো। গতক বড় আমি সুবিধার ব্যক্তি না নানী—বলতে বলতে মানোয়ার রক্তার বাটরে একবার উঁকি দিল। কান্নের কোন চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলো না। ঘরের ভেতর ঢুকে সবজিটা বড় করে দিতে দিতে বললো, কি হবে নানী ? ও বখন আসে এমনি তো চলে যায় না, কিছু রেষা যোগাড় করে তবে যায়।

ওয়ারহিদান বিবিও মনে মনে বখেণ্ড ভাব পাচ্ছিল, মানোয়ারের কথাব উত্তরে বললো, থল বা করে তাই হবে। বা এখন ভবে পড় গিয়ে—বলতে বলতে খানার খারিটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে শোওরার ঘরে ঢুকলো। ঘরের এক কোণে খারিটা রেখে ছোট একটা চানার জিরে ঢেকে রাখতে রাখতে ওয়ারহিদান বিবি বলতে লাগলো, সবই নানী। না তোলে এত দিন পর, দিন বুকে বুখে আজই বা আসতে বাবে কেন ?

কিন্তু নানী কাল যদি ও আবার আসে ?

সে ভাবনা আমার, ওয়ারহিদান বিবি ধমকে উঠলো, বড় বড় না করে এখন ঘুমে খেঁখি—তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললো, ঈশাকের কাছ থেকে লিখিয়ে এনেছিল ?

হ্যাঁ, এই নাও। অন্ধকারের মধ্যে কুঁড়ার ভেতর হাত চালিয়ে মানোয়ার একটুকরো কাগজ ওয়ারহিদান বিবির হাতে ওঁড়ে দিল।

নিশ্চিন্ত মনে পালকে শুয়ে ঘুচ্ছিল ঈশাক, হঠাৎ কিসের আওয়াজ শোনে তার এমন মিত্রা ঘুমটা ভেঙে গেল। কান খাড়া করে বুঝতে চেষ্টা করলো আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে, চোর-চামার ঢুকলো নাকি ? বালিশ থেকে মাথা উঁচু করলো ঈশাক কিন্তু আওয়াজটা ঘরের ভেতর থেকে আসছে না, বাসছে বাইরে থেকে। আর চোর হুই করতে এসে বাইরের রক্তার ক্রীক দিয়ে কবর বাড়িকবর এক

ভাবে থাকে না। সেই ক্রমাগত চৌকর আছান উপেক্ষা করা যায় না, তাই আবারের ঘর ছেড়ে উঠেই বোলো ঈশাককে। আশঙ্ক করলো নিশ্চয়ই মানোয়ার বিবি। আবার কি মনে পড়তে তার মনির, তাই হুপুর রাতে আবার পাঠিয়েছে তাকে। বিরক্তিতে ক্রুদ্ধি করলো ঈশাক। তার পর বিছানা ছেড়ে এগিয়ে গেল সমর দরজার দিকে। একেবারে হাট করে ধুলে না দিয়ে অল্প একটু কীক করে জিজ্ঞাসা করলো, কে?

বাইরে কিস-কিস করে পুরুষের গলার আওয়াজ ভেসে এলো, ঈশাক মিলে। খোঁড়া মেহেরবানি কর বাহার মে আনা। হুবে আপকো সাথ ভারী জরুর হার।

ঈশাক আশ্চর্য্য হোলো, ভরও পেলো সেই সঙ্গে। তার ঈতত্ত্বঃ তার টের পেয়ে বাইরে আবার সেই গলার আওয়াজ শোনা গেল। ভর তো মং করনা জনাব, হুবে আপকো দোস্ত হার।

এবার দরজাটা অর্ধেক কীক করে শুধুমাত্র হুতুটা বের করে ঈশাক প্রের করলো, কোন হার আপ?

এইবার লোকটা একেবারে দরজার কাছ বেঁচে ঈতালো। বললো, মেরা নাম আজিজ হুবরাণী মানোয়ার বিবি কী মরদ হ।

সত্যে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিতে গেল ঈশাক কিন্তু ততক্ষণে আজিজ শক্ত হাতে দরজার পাশাটা চেপে ধরেছে আর এক হাতে ঈশাকের কাঁধটা চেপে ধরে সে নরম হুবে বললো, হার তো পছলেই বোলা চুকা আপকো দোস্ত হৈ কুছ লোকসান আপকো নেহি করল।

ঈশাক একটা ট্রোক গিলে বললো, ক্যার জরুর হার আপকো মেরা সাথ? এইবার সরাসরি ভিতরে ঢুকে গেল আজিজ। তারপর ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলে কিছুকাল ভূমিকা না করে বললো আজ তোমার ঘরে কি ছিল? রাতে মানোয়ার বিবিকে খানা খাওয়ার জন্য তোমার বেগম নাচেবা দাওরাত দিয়েছিল কেন?

ঈশাকের হুখ দিয়ে চঠাং বেরিয়ে গেল আমার ঘরে মানোয়ার বিবিকে খানার দাওরাত কই না তো।

এক দণ্ড চুপ করে থেকে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলো আজিজ হুবরাণী—নিজের মনে বলে উঠলো, আমি ঠিক আশঙ্ক করেছিলার সব ঝুট বাত। এইবার ভূমি বল দেখি ঈশাক মিলে, তোমার বিবিকে যদি হুপুর রাতে আমার ঘর থেকে বেরতে দেখতে তাহলে ভূমি কি ভাবতে?

বাপারটা চট করে ঘরে নিতে পারলো। ঈশাক কিন্তু হুখের কথা আর হাতের ছিল একবার বেরিয়ে গেলে আর তো কিবিরে নেওয়া হার না। সচসা আজিজ হুবরাণীর ভীষণ হাসি খেয়ে গেল। তার চেয়েও জোরে হেসে উঠেছে ঈশাক। হাসির গমকের কাঁকে কাঁকে তার হুখ দিয়ে বেরলো সমর সিঁদা কিহার ভূমহার দিল তড়পতা। লোকের মেবা উপর তো নারাজ মং হোনা ভাইয়া। তারপর হাসি থামিয়ে গলার স্বর নীচু করে বললো আজিজ মিলে, কসদ থাকি, আমার কোন কল্পর নেই। যদি বল তো তোমার সামনে কান মলাও বেতে পারি। মানোয়ার বিবির ও কোন কল্পর নেই, যদি কল্পর কালর থেকে থাকে তবে তা তোমার।



স্বর্গীয় শেঠ বনজামদাস ভগৎ কলিহাতার একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ উচ্চতরের ব্যবসারী ছিলেন। তিনি নিজ চেষ্টায় ও কঠোর পরিশ্রমে সামান্য অবস্থা হইতে বিরাট ধন ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি নৈহাটী জুট মিলস্ কোং লিঃ, যথরা ইলেকট্রিক সান্দ্রাই কোং লিঃ-এর পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন এবং ক্যালকাটা স্প্রাওয়ার মিলস্, লক্ষী অয়েল মিলস্ ও আরও বহু প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন। তিনি খুব ধর্মপরায়ণ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও দুইটি ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। গত প্রাবনের সময় তিনি বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মারফৎ দৈনিক দুই হাজার পাউরুটী বজারদার বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গত ১০ই জানুয়ারী ১৯৬০ তিনি ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার স্ত্রী, একমাত্র পুত্র শ্রীমান কালীচরণ ভগৎ, পৌত্র-পৌত্রী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমি? আজিকার আত্মা হোলে বললো।

কবর ভোঁরায়। এত বড় খানদারী ঘরের সেকেন্দা হয়ে তুমি জানোনা খরকা ভর আউর বাটারকা গর কোনো এক সমান। হুটোয়ট বাস আসলগা করবো কি তারা বিগড়েছে।

আজিক হুন্সবীর হুন্সের হুন্সে শক্ত হোরে উঠলো, বললো—মিঞা, সমস্ত বাপারটা আমার কাছে কেমন গোলমেলে ঠেকছে, একটু খুশাসাত করে বল।

বললো। যগর এখন নয়। এ রাতের জীবাণে বলবার মত কথা নয়, দিনের আলোর হু' চোখ দিয়ে দেখবার মত বাপার। জাই তোমাকে দেখাবো। কাল তুমি মোলাকাত করো আমার সাথে সাঁর হবার খানিক আগে। আমার ঘরে নয়, বাগশাহের ইমারতে। তুমি সাধারণ জানো আমি বাগশাহের খাস বিমংগার। কাল সাঁর হবার আগে বাগশাহের মন্জিলের পেছনে শনের গোচাল ঘরে থাকে সাত্তির বিশশতীওয়ারা, সেখানে গিয়ে জাকে আমার নাম শুণলে, সে আমাকে ডেকে দেবে। তখন আমি তোমার সাথে মোলাকাত করবো, বা বলবার বলবো, বা দেখাবার দেখাবো। এখন বাও।

আজিক চুরগী বললো, কাল সাঁর হোতে তো বন্ধ হেরি ঈশপাক মিঞা। এখনই তোমার বা বলবার বলে কেলো না, না হোলে সাংগবাত লো জীবাণের পাত এক করতে পারবো না।

খোজা সব্ব করো। বা শুনতে চেয়েছিলে তার চেয়ে বেশি দেখতে পাবে—সেকিন কমু' খেরে বাও জুসার মাখার মাদোয়ার খির ঘরে গিয়ে খুন্সারাপি করে বসবে না, আজ এত রাত্রে ওখানে পা-ই দেবে না। মজদিগেই আছে বাগশাহের হুসাকিবখানা। সেখানে গিয়ে হাকি হাকটুকু কাটিয়ে লও। কেট-সুখলে মাদোয়ার বিবি ঘরে আজ আর কাল এই হুন্সের মাখে উঠবে না।

আজিক চুপ করে খানিকক্ষণ কি ভাবলো, পরে বললো : বেশকু জাই কবে, ঈশপাহ।

ইশপাহ।

সাহিব বিশশতীওয়ারা তার লম্বা পাখামার পা হুটো হাঁটুর ওপর পর্যন্ত উঠিয়ে, নীল কুর্তায় হাত হুটো কলুই-এর ওপর পর্যন্ত উঠিয়ে মাখার টুপি খুলে, গামোছাটাকে মাখার পাগড়ির মত জড়িয়ে ঘর থেকে মশকগুলি একটার পর একটা বাটরে বের করে রাখছিল। ঠিক সেই সময় দিনের পড়ন্ত আলোর তার উঠানে একটি লোক এসে ঈড়ালো—প্রায় কবলো সাহিব বিশশতীওয়ারা ?

হায় হ'। আপ ঈশপাক মিঞা কি সাথে মোলাকাত করলে মাজতে হে ?

লোকটি ঘাড় নাড়লো। হাতের মশক মাজিতে রেখে গোজা হোরে ঈড়িয়ে সে বললো, চক্ষির ঘেরা সাথে।

কলের পুতুলের মত লোকটি সাহিব বিশশতীওয়ারায় পেছন পেছন চললো। প্রায় খানিকটা বোলা জায়গা পার হোরে তারপর গলির পর গলি এককোণে পার হোতে লাগলো। গলির তপালে বড় বড় উঁচু ইটের বেয়াল—তার বাকে বাকে বড় লোহার কটক আর দিনের বেলাতেও সেখানে লজ্জার। প্রায় পনরো মিনিট চলার পর হঠাৎ ভোঁরবাখির মতো লজ্জার হু হোরে গেল,

পড়ন্ত সূর্যের এক বলক রদ্দিন আলোর, হির-বিহির হোরে গেল তার কলো পর্কাটা। প্রায়মটা চোখ বীঘিরে গিয়েছিলো আজিক চুরগীর। হঠাৎ সে শুনতে পেলো সালাম আজিক ডাইরা।

চোখ বগড়ে ভালো করে চেয়ে দেখলো সালা পাখরের তৈরি কোট একটি কবর ভিতরে সে ঈড়িয়ে আর তার সাধনে ঈড়িয়ে ঈশপাক হাসছে, ঠিক সময়েই এসেছে আজিক মিঞা, একটুও হেরি চরনি।

বিবুত লজ্জার আজিক এমিক ওমিক ভাভাতে লায়লো, পরে বললো, বেশি সময় আমি নই করতে পারবো না, কি বলবে বলেছিলে বল, কি দেখাবে বলছিলে দেখাও।

ঐ তোমার কোব! অনুযোগের সুরে ঈশপাক বললো—খোজাও সব্ব করতে পারোনা, যখন জবান দিয়েছি তখন জেনো তার নড়চড় কখনও হবেনা। আগে চলো বাগশাহের ইমারত তোমাকে হুগিরে দেখাই। জানো তো কত বড় নদী ঘোলে বাইরের লোক বাগশাহের মন্জিলে ঢুকতে পার ?

আজিক খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিল, তাই কোন কথা না বলে ঈশপাকের পেছন পেছন চলতে শুরু করলো আর বিড়বিড় করে বা কলতে লাগলো তার মর্দ্যার্থ এই—বাগশাহের মন্জিল দেখার তপাল সকলের হয়না তা তার জানা আছে কিন্তু তার মনের অবস্থাটা এখন এমন যে, তার এত ব্যগ্রা নদী কলে ভাড়াভাড়ি কাজ সেবে এখন থেকে বেরুতে পারলে বাঁচে।

ঈশপাক তাকে সাধনা দিতে লাগলো বার বার, সকুরে যেওরা কলে মিঞা। কিছুব চলার পর এমিক ওমিক চেয়ে কিসকিস করে ঈশপাক বললো আজিক, কে বাগশাহের সাহাবার দেখবে ? তুমি আমি বলেই তোমাকে দেখাবার হিম্মৎ করছি। বাটবের লোক বাগশাহের সাহাবার চুকলে তাকে আর 'জান' গিরে বেরিয়ে আসতে হবেনা। তবে আমি তোমার সঙ্গে আজি, কোন ভর নেই তোমার। আজিকের উত্তরের অপেক্ষা না করেই তার হাত ধরে প্রায় একরকম টেনেই নিয়ে বেতে লাগলো ঈশপাক।

একটা মাঝারি রকমের ঘরে এসে তারা ঈড়ালো—ঘরের প্রান্ত দেশ চানু হোরে বাঁজকাটা সিঁড়িতে নেমে গেছে। ডেরো কোন্টি সিঁড়ি নেমে তারা পৌঁছলো প্রকাণ্ড একটা ঘরে, বার এক প্রান্তে ঈড়ালে আর এক প্রান্ত দেখা যায় না। ঘরটির মেঝে আগাগোড়া হুঘের রঙের সালা মার্বেল পাথর দিয়ে বীধানো। দেয়ালের ঝ ঝাংকা সব্ব রঙের। মেঝের ওপর বিছানো লম্বা বারোটা মোটা পালিচা, হাতীর পাঁতের তৈরি মক, তার উপরে লজ্জার চাকা পড়ানো নানা রকমের ও নানা ধরনের অসংখ্য গির্দা। ঘরের কোণে কোণে কলকলি খেত পাখরের তৈরি চোঁকিও বসানো রয়েছে। ঘরটির একটি দর দরকা, কোন জানালা নেই। হাতের ওপর নয় লম্বা খিলান তাদের মাখখানে ছাঁটা করে বড় বড় চোখা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলির তেজর দিয়ে ঘরের ভেতর হাওরা বাতাসাত করে।

আজিকের হতভন তার দেখে ঈশপাক বেশ আমোদ লভুতব করলো। মনে মনে কেসে বললো কেমন দেখছে বাগশাহের সাহাবার ডাইরা ? পয়সি কালের হুগুরে বাগশাহ এ ঘরে থাকেন। দেখেছো কোনখান দিয়ে এ ঘরে বাইরের পয়সি হাওরার হলকা হুঁকায় উপর নেই।

আজিক কিছু বুঝেছি। হুঁ টিকি কীক করে রেখেছিলে ঘরের একটা দিকে—বেশদে কতকগুলি হাড়-প্রমাণ খেত পাখরের নারীমুখি সাজানো রয়েছে। ঈশাকের কথা শুনে হুঁশ চোলা তার। সে দিক থেকে চোখের দৃষ্টি তার চলে গেল দেয়ালে টাঙানো পারস্ত দেশীয় জিতগুলির উপর। সঙ্গে সঙ্গে পিচ করে খুঁকেলো মেঝের উপর আজিক হুঁহুয়াহুঁ আর বলে উঠলো, তোবা, তোবা, ক্যারা বেগমিক তসবির—

শিউরে উঠে চট করে পায়ের তলা দিয়ে খুঁচটা হুঁহু কেলে নীচু চাপা গলায় ধমকে উঠলো তাকে ঈশাক। শিরটা এখানেই রেখে বাতায়র ইচ্ছে আছে না কি? তারপর জোরে ঠালা দিয়ে তাকে ঘরের বার করে আনলো ঈশাক।

আর এক ধাপ সিঁড়ি নামতে নামতে বললো, বুঝে খোঁজা লাগাম তো কখনো আজিক মিলে। জানো শব্দশার ইয়ারতে এক দেয়ালের হাজার কান আছে।

যেতে যেতে ধমকে পিড়িরে পড়লো আজিক আর আউর কোই তরক নেহি বাড়িল।

আরে চল, চল, কি হোলো আবার?

ঈশাকের কথার বাধা দিয়ে আজিক বললো, কতি নেহি। বততকু হুঁ বুঝে যে বোলাখা উ নেহি দেখাও তো মায়র এক পাও তি নেহি চললে।

বিরক্ত হয়ে ঈশাক বললো, আরে তাই তো দেখাও নিলে বাছি।

সাঁচ?

জবাব সাঁচ।

আর কয়েক ধাপ সিঁড়ি মেয়ে গেল ঈশাক আজিককে নিয়ে। এক বলক হুঁ উক হাওয়া হুঁ জনকে একবার হুঁয়ে গেল, সেই সঙ্গে তেনে এসো প্রাণমাতানো অতি মিষ্ট একটা সুগন্ধ বেন হাজার হাজার ভুব্বাণ থেকে, লাখ লাখ পাশিয়া মুখবিত বৃত্তা থেকে হেঁকে নিয়ে আসা হোয়েছে সেই সুগন্ধ। যেখানে ঈশাক আজিককে নিয়ে এসে পিড়িরেছিল সেটা ছিল বাদশাহের হামামের তলদেশ। অপরিষার ছোট একটা ঘরে জুপাকায়ে থসের মূল, যেমনর চানি, হুবলর, কয়ী মস্তগী, খেজার প্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি জিনিস আলিয়ে সুরভিত করা হোচ্ছিল উপরে বাদশাহের হামাম। বিকিখিকি বলছিল সেই সুগন্ধি তুকনো মূলগুলো। আজিককে সেখানে পাড় করিয়ে রেখে আরও হুঁধাপ সিঁড়ি মেয়ে গেল ঈশাক। তারপর পায়ের জোরে একটা ভারী লোহার পোয়ানো দরজার মোটা কড়া হুঁহুতে ঘরে হাটকা টানে উঠিয়ে কেলো সেটা তার পর আজিককে ডাকলো ইঁহার লাও। দিবা ভরে আজিক এগিয়ে গেল সেখানে। দরজাটা সেই বকম হুঁহুতে ঘরে থাকতে থাকতে ঈশাক বলল তাকে : দেখো নীচু হোকে যে দেখেনে মাল্লা থা।

আজিক নীচের দিকে তাকালো, ঘর খোঁয়ার বাপ হাটা আর কিছুই দেখতে পেলোনা। প্রবল উকতার হোঁওয়া পানে তাড়াতাড়ি হুঁহু সরিয়ে নিয়ে বললো কোই হুঁ তি তো নেহি দেখা।

আর দেখো খোঁজা বকর কর।

হুঁহু। একটা তুকতার লগত বেন হুমিয়ার হুঁহু ভেবে বসে হুঁহু গেল আর ওপরে একটা ভারী হাড্ডি আতরায় পোলা গেল বটায়।

বোপদানের আরীর ভূতীর আবু সাফা সাফু খানের হামাম তারার হুমিয়ার সমস্ত প্রকরের বিলাস উপকরণ দিয়ে তৈয়ারি। নানা বকরের ও নানা আকারের মার্বেল পাথর দিয়ে পড়া এই হামাম। বিশাল ঘরের চোকাটা জানালা নানা আকারের। কোনটি বিশেষ বয়নের পাখীর আকৃতির, কোনটি ফুলের মত কোনটি সিঁহের মুখের মতো। কোনটি বা মন্তনানীর আকারের ঘরের ধপধপে সালা দেয়ালের কোণে কোণে নানা ধরণের জাকিরকাটা, তার চার পাশে তেল-বা দিয়ে নানা বকরের কুলকল, লতাপাতা আঁকা। ঘরের একদিকের দেয়াল বেঁবে সাহি সাহি কতকগুলি খেত পাখরের তৈরি চোকা। তার কোনটি গুলাব, কোনটি কেতড়াগদি জলে পূর্ণ। অন্তর্গতি কোনটি গাধার চুহে, কোনটি বরক-শীতল ঠাণ্ডা জলে, কো-টি উক জলে ভর্তি। ঘরের দাকখান হুঁহু একটি ভালাবের মতো তৈরি করা হোয়েছে, তাতে ভাসছে গুলাবের পাশড়ি আর তার দাকখানে একটি কোয়ারা থেকে ক্রমাগত উচ্ছৃঙ্খল জলবারা উৎকিষ্ট হোচ্ছে। ঘরের চার কোণে অসংখ্য মিনাকরা রূপায় কুলমানিতে অচ্চর কুল। দেয়ালের জাকির কাটা বাজগলোয় ভেতর দিয়ে হুঁহুয়ে পড়ন্ত আসে। হামাম ঘরের দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে আটকানো মাছুর প্রমাণ আয়নার প্রতিফলিত হোয়ে ছোট ছোট বিশুর আকার ধারণ করে মেঝের পড়াইল। মনে হোচ্ছিল বাদশাহের বেগম বেন তার মতির হালি অভিমানে ভরে হুঁহু সায়া বরমর ছড়িয়ে কেলোহেন। সুগন্ধে ঘরটি ভরপুর হুঁহুছিল। হামাম ঘরের চারপাশে জায়গার

Amico's
GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় মৈত্রিক ব্যাথার যন্ত্রণা পাচ্ছেন- কোথায় ?

কোমরে, হাঁটুতে, কিবা কোম সন্ধিরাসে ?

শুনে বুসী হবেন—

নারীষিক, বুক বা পিঠের পীড়ায়,
বাড়ের ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাথার


এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেন্ট

(সবুজ মালিশ)
বাতবিকই নির্ভরযোগ্য।

জ্যু : বড় শিশি—২.৭৫ নং পঃ
ছোট শিশি—১.৭৫ নং পঃ
“হাউল” বস্তর

হাফপানের জন্য দিগুন—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
৬০ নং কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা-১



আমীরের অস্তিত্ব ছিন্ন থেকে নীচে তলদেশের দুপদ বাস্পকুলী
পাকিয়ে পাকিয়ে উল্লিত হচ্ছিল।

চার জন বিশাল দেহ খোঁকা মধ্যস্থলের পদ মোড়া তাঁতের চড়িয়ে
আমীরকে হামারে এনে উপস্থিত করলো। সাবধানে ভাঙাম মাটিতে
নাঁদালো। হামারের খাস নকর বোঁড়ে হলো, তার সাতারো উত্তীর্ণ
প্রৌঢ়সীমা অতি হাসল আমীর ভাঙাম থেকে নেমে ভরির কাজ
করা পুত পদী আঁটা একটি গালিচার কমঝোঝাবের তাকিয়া ট্রান
দিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন নকর তার সামনে খেত
পাখরের তৈরি একটি ছোট চৌকি এনে তার ওপর একটি কটিক
নারগিলা রাখলো। আর একজন সবৎ ভর্তি একটি সোনার
পানপাত্র সেই নারগিলার পাশে রাখলো, আর এক পাশে রাখলো
গোল রুপার পাত্রভর্তি বরফ। রেশমী শূতো আর জরির তার দিয়ে
মোড়া লম্বা নল হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ খাবিগা তামাক চোখ বুজে
সেবন করলেন আমীর—পরে মেহদি রসে রান্নানো দাড়িতে হাত
বোলাতে বোলাতে ভারী গলার আওয়াজ করলেন হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে
হামারের বাইরে এক সঙ্গে একশো কোরেল বেন গেয়ে উঠলো,
এমনি শব্দ হোলো অতি মিঠামুয়ে টুং টাং টুং টাং।

হামারের দরজা খুলে গেল—একটি নারীমুখী ভীষণপায়ে অতি
সজ্জিত ভাবে পা কেসে এগিয়ে এলো ঘরের ভিতর। স্ত্রীমুখিটির দামী
রেশমী পোষাকের উপর চিকণ মসলিনের একটা আবরণ। সেই
আবরণ বাতে খুলে না পড়ে বার, সেক্ষত গলার নীচে খানিকটা কাপড়
জড়ো করে একটা পিন দিয়ে আটকে রেখেছে, তার উপর বসানো
একটা কিরোজা রং-এর পাখর। সুন্দর বস্ত্রের আচ্ছাদন ভেদ করে দেখা
হাচ্ছিল স্ত্রীলোকটির গোলাপ ফুলের মত গায়ের রং আর নবরসের
পরিপূর্ণতা।

আমীর তার হুই চোখের ঝুঁকি দিয়ে তার সর্বাক লেহন করতে
করতে ঘোর গলার বললেন, ইবার আও তুবক। স্ত্রীলোকটি চলতে

চলতে হঠাৎ থমকে থেমে পড়েছিল—আমীরের গলার আওয়াজ শুনে
ধরধর করে একবার কঁপে উঠলো, পরে এক পা হুঁপা করে আবার
এগুতে লাগলো। চীৎকার করে আমীর আবার বলে উঠলেন, বুধকা
কাপড়া উতারা। পেছন থেকে জোরালো কার ছটি হাত স্ত্রীলোকটির
বুধের ওড়না নামিয়ে দিল। সোৎসাহে আমীর গালিচার উপর সিঁচা
হোয়ে বসলেন। হামারের চার ধারে গম্ গম্ করে উঠলো তার
চীৎকারের প্রতিধ্বনি, সাবাস। ঘরের জোহালো বাঁতটা দপ করে
নিবে গেল—এক মিনিট সব অন্ধকার—তারপর অস্লে উঠলো পাট
নীল রং-এর একটা আলো।

রাত বারোটার আমীরের গুল শের হোলো।

মানোয়ার বিবি হামারের বাইরে এলো ঈশাকের সঙ্গে। তাকে
লক্ষ্য করে মানোয়ার বললো, ঈশাক মিঞা, এবার আমার ইনামটা
দিয়ে দাও, আমি বাড়ি ফিরি।

ঈশাক অবাক হোয়ে বললো, এই দুপুররাত?

শক্তভাবে মাথা নেড়ে মানোয়ার বললো, জরুর। সেটা আমার
হাতে এসে না পৌছান পর্যন্ত এখান থেকে নড়ছি না।

বুধ নীচু করে ঈশাক খানিকক্ষণ কি ভাবলো। পরে বললো,
বেশকু তাই হবে। তুমি এখানে একটু বোসো, আমি নিয়ে আসছি।

শিউরে উঠে ঈশাকের কামিজের আঁতনটা চেপে ঘরে মানোয়ার
বললো, নেহি, নেহি, ঈশাক মিঞা, হুয়ে একেলা ছোড় কর তো
নেহি বান। আমাকে ও শাসিয়ে রেখেছে রাতের জাঁধায়ে খুন করে
মিা টুতে পুতে ফেলবে—একটা চাঁড়য়াও জানতে পারবে না।

তার কথা শেব না হোতেই হো হো করে হেসে উঠলো ঈশাক।

তারপর বুধ নীচু করে মানোয়ারের কানে কানে কি বললো—শুনে
ফুটিঙরা শ্রুয়ে মানোয়ার বিবি জবাব দিলো, বহৎ আছা কিয়া;
বরশে দেও হারামী কো অল্কে।

শুধু এই অনুরোধ

প্রতিভা রায়

শুধু এই অনুরোধ তুল না আমার।

এখন নতুন পথ সমুখে তোমার

সেখানে অনেক স্বপ্ন। অনেক পানাই

কত না বিভিন্ন হুয়ে বাজে চার ধার।

সেখানে তো ব্যথা নেই অথবা অস্তিত্ব
প্রাপ্তব্য ব্যথা নিয়ে গা'বে নাকো গান।

তবুও সে পাখে বরি মিলন-সজ্জাত

তুমি পাও আনমনে।—ফুলের উদ্ভাস

মেখে বার মনে লাগে, কোন একদিন

এমনি সবুজ ঘাসে বসে হুঁজনার

সেয়েছি অনেক গান। তবু সেই গুণ

ফুলে বেয়ো কতি নেই; কেবল আমার

নতুনসে পাশে দিয়ে এতটুকু হাস,

হাসিবে না আমি কেন তোমার লম্বা।

হুগাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য ব্রিটেনের কয়েকটি সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক কোম্পানি সংযুক্ত হয়ে **ইস্কন** নামে এক যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য প্রতিটি কোম্পানি তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বান্বিত। হুগাপুর ইস্পাত কারখানা সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় যখন সম্পূর্ণ হবে তখন সেটি পৃথিবীর যে কোন দেশের বৃহত্তম ও সর্বাধুনিক ইস্পাত কারখানার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে।

দুর্গাপুরে
কারা
কি
করছেন?

অঙ্গপ্রাতি নির্মাণ

ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড

হেড রাইটসন্ অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ

সাইমন-কার্ডগ্ লিঃ

সিওয়েলম্যান শিথ ওয়েব এন্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ

বলিয়ার স্থাপন ও গৃহ নির্মাণ

সি সিমেন্টেসন কোম্পানি লিঃ

বৈদ্যুতিক কাজ

সি ব্রিটিশ টম্বল-হুস্টন কোম্পানি লিঃ

সি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ

সি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ

মোটোশিটাম-ভাইকার্স ইলেকট্রিক্যাল এরপোর্ট কোম্পানি লিঃ

কাঠামোর জন্য ইস্পাত

ড্যান উইলিয়াম এয়ল অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ

স্ট্রীডল্যান্ড ব্রিজ অ্যান্ড এন্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিঃ

ডরম্যান লও (ব্রিজ অ্যান্ড এন্জিনিয়ারিং) লিঃ

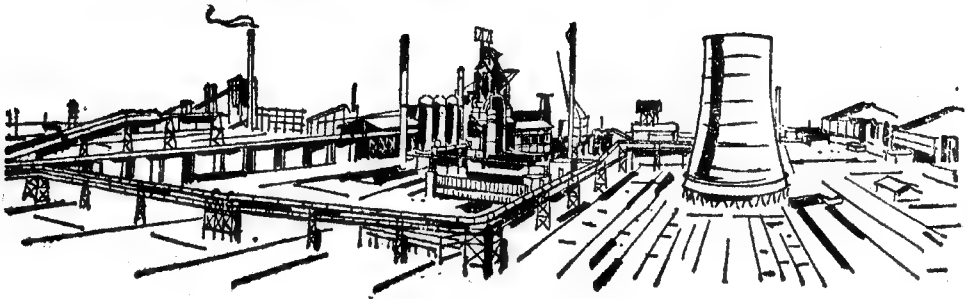
জোসেফ পার্কস অ্যান্ড সন্ লিঃ

(সিমেন্ট এডিসন সোয়ান লিঃ এবং পিরেলি জেনারেল ফেল্ড ওয়ার্কস লিঃ

যৌথ প্রতিষ্ঠানের জন্য কোম্পানি-এর কাজ করছেন।)

ইস্কন

ইন্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাকশন্স কোম্পানি লিঃ



স্বাধীনতার পটভূমি

[দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে]

দুই বছর পূর্বে মৃত মেঘের কাগজপত্র ইত্যাদির মধ্যে একখানা শিল্পকলা বড় খাম পাওয়া গেল। খামটির উপরে লেখা ছিল, এর মধ্যেকার লিখিত কাহিনী আমার মৃত্যুর পাবে বাঁচনের অথবা ডেনমার্কের কোন নৈমিত্তিক কাগজে কিংবা সরকারী কাগজে ইহা প্রকাশিত হইবে।

মৃত্যুর জানা যায়, এই লেখানী এখনও কোন কাগজেই প্রকাশিত হয়নি। লেখাটি ঠিক যেমনটি ছিল—ঠিক তেমনি ভাবেই দেওয়া হল।

আমি এই সমস্ত নীতি উপদেশ এবং আমাদের আইন আদালতের কাছে একটা চুরির অপরাধের স্বীকারোক্তি লিখতে। যে অপরাধটা আমি আমার জীবনের চল্লিশ বছর বয়সে করেছিলাম। যে ঘটনার এক বছর পরে, মহারাজা আমাকে এই পুস্তক সহরের বেধের করে গিয়েছিলেন। যেখানে কিছুদিন আগে বহু জনগণের সঙ্গে তাদের সহস্রাবৃত্তি এবং সহযোগিতার, আমার পঁচিশবছর কাল রাজকীয় কাব্য পরিচালনার জন্ত, আমার বাহ্যিকের বহু বয়স কালের সময়ে সেই কাব্যের জ্বালী উৎসব অনুষ্ঠান সম্পাদিত করিতেছি। কিন্তু আমার আত্মকর্তার এই কাহিনীটি তৎকালীন ক্যান্টনসার হেরলিয়ারের বাড়িতে, তাঁর দেওয়া ভোজসভার ঘটত। বহুদিন পূর্বে পরলোকগত ক্যান্টনসার ডেবার লেনালসিয়ার, তাঁর বাড়ীর এক ভোজসভা। পনমাত্র ব্যক্তিগণ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বহুগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেখানে।

সেই ভোজসভার এই ব্যাপারটা এখন ঘট, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুস্তকটি চেয়ারম্যান লালিয়ে, জেলার ডাক্তার হেরকলবাইন, ব্যাংক অফিসের আর আমি। আমরা একত্রে হুটই খেলছিলাম। খেলায় ঘরে বেশ উত্তেজনা এসে গিয়েছিল আর টেবিলে বেশ মত্ততা বোধ হচ্ছিল যদিও টেবিলের চার পাশের মত্ততা আরো বেশী হয়েছিল। আমরা ধারা খেলছিলাম, সকলে পানীয় হিসাবে কোভাকুই চাইছিলাম। ভেটু কেউ সারিয়েটের কোভাকু অতিচমৎকার বলে মন্তব্য প্রকাশ করছিলেন। খেলা আর পান করা অবিরত চালাই চলছিল। ব্যাংক অফিসের অতিরিক্ত পান করার জন্ত বোঁদ হয়ে পড়লেন। ক্রমশঃ তিনি এমন ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন যাকে ঠিক ভ্রমোচ্চত আর সবত বলা চলে না।

তিনি তাঁর ঘোড়ার ব্যবসারে বিখ্যাত হওয়া এবং দক্ষতা সবচেয়ে বেশী প্রকাশ করছিলেন, যে সত্তা সেই দিনই সকলে তিনি একজন বোকা প্রামা পাত্রকে হুটো বুড়ো বোড়া দিয়ে ঠকিয়েছেন। ঘোড়ার সত্যিকারের নামের চেয়ে খুব কম করেও একশ টালের ভান লাভ করেছেন। ব্যাংক আর পকেটে হাত ঢুকিয়ে ডেনলিটের বাহিন্যগণের বার করলেন আর একজন বিজয়ী ছাফির মত মোটের পুরো বাঁচলটা দেখালেন। যে ব্রহ্মাট নিয়ে তিনি এই বুড়ো পাত্রী মেতারীর ভার লাব্য করেছেন। এর পর ক্রমশঃ একটা হাতীরা হুটই ঘর করে রিসিবে আরম্ভ করলেন।

যদিও আমি বেশ বেশী করেছিলার তবুও অল্প সর্বস্বের ভুলনার আমি ঠিকই ছিলাম, এমন কি সত্যি কথা বলতে গেলে তখনও কোভাকু আমার ভালই লাগছিল। তখন পর্যন্ত আমার মাথা পরিষ্কার ছিল। আমি বা বলছিলাম বা করছিলাম সঠিক জেনেই করছিলাম। এই সময়েই পুস্তকটি হেরলিয়ারে তাঁর অল্প কাজে উঠে যান, সকলকে দেখাশোনা, পরিচর্যার ক্রটি না ঘটে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্ত তাঁকে ব্যস্ত হতে হয়। তখন আমরা একজন ডামা নিয়ে খেলাতে আরম্ভ করছিলাম।

আমি আমার চেয়ারটা টেবিল থেকে একটু সরিয়ে নিয়ে পিছিয়ে বসতেই আমার নজর পড়লো টেবিলের ডামার। কি একটা বেন পড়ে আছে সেখানে। ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখলাম সেটা একখানা পঞ্চাশ টালের নোট। সেই দুহুর্ন্তই আমি নিঃসন্দেহে ছিলাম যে ব্যাপকণ্ট ৬টা হাজারে কেলেছেন, এখন তিনি তাঁর মানিব্যাগটা বার করে খুলেছিলেন।

আমি মনে করলাম, নোটখানা কুড়িয়ে ব্যারণকে কেবল দিয়ে দেব। তাই নীচ হওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঠিক সেই দুহুর্ন্তে যে কথাগুলি পর পর আমার মনে হয়েছিল তার জন্তেই ঠিক তখনই নীচ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নোটখানা ব্যারণকে কেবল দেওয়ার কথা ভাববার পরদুহুর্ন্তেই একটা দুর্ভাগ্যবান বাসনা আমাকে পেয়ে বসলো, যে ৬টা আশ্চর্য্য করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলোও আশ্চর্য্য ভাবে আমার মনে হয়েছিল যে আমি কখনও আমার মাইনে ছাড়া এক পয়সা বেশী পাইনি। যদিও আমার মত দায়িত্ব একক যুবকের পক্ষে অতি সাধারণ ভাবে সেটা যথেষ্ট ছিল তাহলেও সেটা খুব বেশী টাকা নয়। আর একেবারে গোপা টাকা। আমার মত সরকারী চাকুরীর চাকুরীর ব্যক্তিরে যেটুকু ব্যয় করা প্রয়োজন ঠিক সেই মতই ছিল টাকাটা। আমার সমস্ত রকম লখ, চাল মটাবার জন্তে আমাকে অত্যন্ত হিসাব করে চলতে হত। তাছাড়া হাজিরবনের দক্ষণ আমার নিজস্ব কিছু ব্যয় ছিল। মোট কথা, পঞ্চাশ টালের আমার কাছে একটা বেশ কিছু টাকা ছিল। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে ঐটুকু সময়ের মধ্যে আমার ব্যাংক এই হিসাবটাও করা হয়ে গিয়েছিল যে এটা দিয়ে আমি একটা ওভারকেট করতে পারি। এই জিনিষটা আমার অতি প্রয়োজনীয় ছিল। ওভারকেটটার চিন্তাতে আমি একটু ব্যস্তও পেরেছিলাম তেমনি একই কৈশেও উঠেছিলাম, তাহলে জো চোর হতে হবে!

এ কথা ভাববার পরেও আমি তড়িৎ গতিতে আমার কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছিলাম, ৬টা আমার চাই। এই চিন্তাটা আমাকে কত উত্তেজিত করেছিল যে নোটটা সংগ্রহ করবার উপায়টা আমি বেশ ঠাণ্ডা মাথাতেই আবিষ্কার করে কেলেছিলাম। এমন কি, এত নিপুণ ভাবে পারবো জেবে একটা গোপন গর্ত অনুভব করেছিলাম।

আমি খেলায় প্রাতি অতি মনোযোগ দেওয়ার ভান করলাম। একটা নতুন সিগার বার করে তার গোড়াটা কাটলাম কিন্তু অমসৌযোগ ভবে দুমিটা কেলে দিলাম। অল্প সকলে সক্রিয় ভাবে খেলাতে এক আত্মসম্মতিক পানিয়ারে মাদকতার এক বিভোর ছিলেন যে তাঁদের কোন একজনও আমার দুমিটা ফুলে দিয়ে ভ্রমতার বাহাদুরী দেখালেন না।

বাল্যজন্ম—এই বয়সের একটা শব্দ উল্লেখ করলাম, যেন এই

বিবিক্তব বটনার জন্ত আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। আমার এম জন্তে কতই অসুবিধা হচ্ছে। এই ভাবে অবতলার সূত্র নিজেই নীচু কলসায়। পড়ে বাওয়া ছুটিটা তুলে আনতে বিবিক্ত ও অসহ্যতা হয়ে সক্ষম নিখিলায়। আগলে সমরটা নিখিলায় নোটটা হস্তগত করতে। তারপর নোটটা চাতে নিয়ে নীচু অসহ্যতা ভাঁজ করে ভূতাব মধ্যে পাবের তলার লুটিয়ে রাখতে বেশ বড় নিবেড়িলায়। নোটখানা পাবের তলার টাট করে চেপে, ট্রাউজারটা টেনে ভাল করে গোড়ালী পর্যন্ত ঢেকে ফিলায়। যাত্রা করেকটা সেকেন্ড, তার মধ্যেই কাজটা সারা হয়ে গেল ভাল ভাবেই। ছুটিটা তুলে নিয়ে আমি বেশ শান্তির নিশ্বাস ফেলে বীতলায়। সিগারেট ধরিয়ে আবার দারক টান দিয়ে, খুঁকি হয়ে বোঁরা ডেড়ে আবার খেলার প্রতিজ্ঞাতি মনোযোগী হয়ে গেলাম। বিশেষ করে ব্যারপের খেলার সমালোচনা করতে আরম্ভ করলাম।

এর পর এল সেই উৎসব-আগ্রহপূর্ণ সময়। এখন দেশ-পাণ্ডার হিসাব হবে। ব্যারপ বার টালের ডেয়েড়িলান। তিনি তাঁর সেই মানিগ্যুগটা বার করলেন। টাকা দেশের জন্ত তিনি তাঁর সব টাকাই টেবিলের উপর ঢেলে দিলেন আর হিসাব করে তুলতে লাগলেন টাকাকলো। তখনও আমি মনে মনে বলেছিলাম, এই শরতানটা লক্ষপতি, এর সামান্য কিছু কতি কবাও উচিত কাজ করাই হবে। আমি অতি অনাগ্রহ ভাবে এমিক ওমিক তাকিয়ে একটা গেলান তুলে নিয়ে এসিয়ে এসে আমার বন্ধু হের কলবাইনের ছাড়া পান করলাম। তারপর তাঁকে অতুর্বাধ তবলাম ফ্রাউ কলবাইনের সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিতে। তখনও গেলানটা আমার হুখেই থাকা হয়েছে, ব্যারপকে বলতে তুললাম হু' এটা হচ্ছে—ডাস ইট ডক ডেস টু বকলু। (Das ist doch des Teupela) শরতানের কাছে আমি পকাশ টালের পাঙ্কি না।

আমি ধীরভাবে গেলান খালি করলাম ও গেলানটা নাথিয়ে রাখলাম, তারপর টেবিলের কাছে এসে বললাম, না ব্যারপ টয়কলস নর, (শরতানের কাজ নর) হয়তো আপনি নিজেই এটা কাজটা করেছেন, তবে হ্যাঁ এটাও একটা চর্চার। অথবা কাউজিলাবের কোডাক আপনার উপর এমন ক্রিপা প্রকাশ করেছে, সেটা আমাদের উপরকার ক্রিমার ট্রিক বিশবীত। আমরা ক্রমশঃ সব জিনিষ বিগুন দেখছি। অবশেষে তেমনি ভাবেই হাতাল হওয়াতে আপনি বিগুন হয়েছেন বলে আমাদের উদ্ভট দেখছেন অবশেষে জর্জিক দেখছেন।

না ব্যারপ বলে আমার বলা কথাগুলো সকলের কাছে একটা উল্লেখের ঠাঁটা বলে মনে হয়েছিল। এমন কি, ব্যারপের নিজের কাছেও। অল্পকণ পরে তিনি যখন নোটের কাড়া থেকে ফের এক একখানা করে গুণে শেষ করলেন তখন বললেন, না এটা আর তুল নর, আমার পকাশ টালের সত্যিই খোঁরা পিয়েছে। ব্যারপ এইবার পুঙ্কর্ভী হের সিলিহকে হেরে কলসের টাকাজিলাব মগার,

আপনি আমাকে এই অসহ্যকর করন, আমার নোটগুলো আপনি একবার গুণে মির। আমি যখন আমার বাড়ী থেকে বার হই, তখন আমার আটখানা পকাশ টালেরেব নোট, একখানা পনেরো টালেরেব নোট ছিল। এখন পকাশ টালেরেব নোট নোট শত খানা বরজ।

খেলার শেষের সাধারণ ১৯৫৬-এর যথেষ্ট কাউজিলাব সিজিরে নোটের ব্যক্তিগত। কলসেন, পকাশ টালেরেব নোট সাহায্যনাই ছিল দেখা গেল। আমার বন্ধু ডাকার কলসাইন, যদি আমার মজার পর এটা কতিমী ভানার সময় পর্যন্ত ভীষিত পক্ষতন ডাকলে যে তিনি খব চিচামেটি করবেন, তা আমি বৃদ্ধে পারছি। নোটখানা গোণা শেষ করে হেবলিয়েব বললেন, সত্যিই তানী নোট সাহায্যনাই হয়েছে দেখছি। তার পর বখাযখ পক্ষীভ হার শেষ করলেন ব্যারপ, আপনি কি নিশ্চিত যে এ নোট আর একখানা বোকা খাংকি উদ্বিগ্ন ছিল?

—Ja (yes) हा काउजिलाब मगार। जीव मगार जिते डाकियर बारप बलते लागलें। আমি বহুট হাতাল হই না কেন, হর্গের ঘেরতার তিনি যে আমার ওই নোট আটখানাট ছিল, আমি বাড়ী থেকে বার চব্বার সময় ভাল করে গুণে লেখেছিলাম।

ব্যারপ এটা কথা বলার পর হু' এক ঘিনিট নীতর ভাবে কটিল, অবশেষে কাউজিলাব বললেন, ব্যারপ, আমি অসহ্য তুখিত চক্কি তবে টাকটা যখন এখানে ছিল তখন সেটা খুঁজও পাওয়া যাবে।

হের সিলিহের এটা কথায় আমার মনে একটা বিকলতা বোধ এসেছিল, তবে সেটা ব্যারপের জন্ত জ্বলিত হয়ে নর, কল অসহ্যিক কাউজিলাবের জন্ত। জীব বাড়ীতে এমন একটা ঘটনার জন্ত তিনি খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন যেন সেটা জীবির একটা জট। আমি যেন অস্ত্রত হয়ে গিয়েছিলাম, যেন সব ব্যাপারটাট আমার নিক থেকে একটা ঠাঁটানুদক ব্যাপার বলে বহিয়ে দিবে নোটটা ফেরত দিয়ে দিতে। কিন্তু কার্যকালে তা কিছুই না করে স্থির হয়ে বইলাম। কারণ টাকটা একবার পাওয়ার পর, সেটা আমি

কেনেলস
কে. এল. সিংহ এও সন্স
১৬৭ বি. বঙ্গবাজার ট্রাট কলিকাতা-১২

হাঁকছে চেয়েছিল। তাই ভয়েকটা অলু আমার জব্দা হল, হুঁসিক লরান, একদিকে একটা অগাধবোধ, অন্যদিকে পাওয়া টীকাটা হারাবার জ্বালা, হুট-এর মিলিত এক অদ্ভুত লেশন। এই কথার পর সকলের মধ্যেই একটা গুঞ্জন, সঙ্কেহ ও প্রশ্ন বেগে উঠলো। অনেকটী নানাজাবে ব্যাবথকে প্রশ্ন করতে থাকলেন—নোটটা কি পকেট থেকে অন্তর্ভাবে চাষাতে পারে না ?

আপনি কি, আসবার পথে কোনও দোকানে বাননি ? সেখানে কি আপনার অলু কোন কোটের পকেটে থাক। সম্ভব নয় ?

এই ভাবে নানা প্রশ্ন গুনতে গুনতে ও উত্তর দিতে দিতে ব্যাধন ক্রমশঃ স্থিরমস্তক হয়ে আসছিলেন এক সন্তিকারের বহুবর্ণ গলাতেই কলসেন, না, এ বকম কোন ভুল তিনি করেননি।

শেষকালে দরদী বন্ধুর মত ব্যক্তের স্তর মিশিরে, ঠাণ্ডা অথচ কড়া গলাতে আমিই বললাম, লেশন ব্যাধন, আপনার ভিনিয়ট। সম্ভব আপনি এখন এতটী নিশ্চিত তখন আমাদের মনে আপনার বন্ধু ও খেলার সঙ্গীদের ঠিক থেকে, নিজস্ব ও পৃথকভাবে বলবার কিছুই নেই আমাদের, একমাত্র নিজদের সার্চ করতে দেওয়া ভিন্ন, তাই আমি আমার পুলিশী ক্ষমতার বলে, নিজেকে সম্মত ধরে, এখন কেবল ব্যাধনের চকুরের অপেক্ষা করছি।

আমার এই কথার যে কল চরে ভেবেছিলাম ঠিক তাই হল। ব্যাধন বৃত্ততে পারলেন, কাউজিলায়ের মত সম্মানিত লোকের বাড়ীতে এই ব্যাপারটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। তখন তিনি তাঁর গম্বীরাবসুলভ ঢাল ও মধ্যাংশ দেখিয়ে বললেন, এই ব্যাপারটো মোটেই গম্বী কববার মত নয়, আর এত তুচ্ছ যে একটা বাজ্ঞে খটনা বলেই ধরা যায়। হুজুতে কালটী সব পরিভাষ্য হয়ে যাবে, টাকটা এখানে বন্ধন পেলেন না তখন বাড়ীতেই পাবেন নিশ্চয়। এখান্দা খেলার পকাশ টালের না পাওয়া গেলে তাঁর কিছুই হার আসে না।

তথ্যপি-সকলের মধ্যেই এক গোপন অস্বস্তিকর ভাব রয়েই গেল। কল কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা ভঙ্গ করে সবচেই একে একে বিপর্যাসিলেন। হলের সাগনে গিয়ে আমি এখন বাড়িলাম, তখন চের লিগিরে আমাকে কলসেন, কাল সকালে একবার আমার সঙ্গে দেখা চলে তিনি খুসী হবেন। তাক্কার কলবাইন ও আমি একত্রে বাড়িলাম। পথে চলবার সময়ে, হুজুনেই ব্যাধনের ব্যবহারের ভক্ত অমুযোগ করছিল। তিনি অন্তটা হাতাক হয়ে না পড়লে অপরের কথা বৃত্ততে পারতেন, আরো বৃত্ততেন যে তিনি যে ব্যবহার করেতেন, ভাত্তে ঝুজুসেই তাঁকে তিরস্কার করতে পারতেন। কার্যতঃ তিনি কটিকিলার ও তাঁর নিয়ন্ত্রিত বহুগপকে অপহারক বা নগদ্য চোর এটা মনে কলবার কাকন লষ্ট করেতেন।

আমি এতটী 'বুহুর্ভ' নিজেকে বেশ উৎসাহ সহকারে লাচসী রেখেছিল। সেই ভাবে কথাবার্তা বলে চলেছিল। আমার সজ্ঞন বন্ধু কলবাইন সমস্ত ঘটনাটা একটা হান্তকর ভাবে শেষ করলেন, তিনি কলসেন—আজ্ঞা! হের ফোন্টু! হারি সন্তা সন্তা! আপনি বা আমি, যে নোটখানা হারাবার কথা হচ্ছে, ওটা নিয়ে নিত্যম ভাঙলে কি একটা সঙ্কেহ করতাম না ? ওই অলু ব্যাধনের অসম্পূর্ণ উপায়ে অর্জন করা টাকা থেকে সামান্যই 'লগরা' হত, আর সেই চুটিটা একটা প্রায়সলভ প্রতিপোষ দেওয়াই হত না কি ? প্রত্যয়িত পাখী কি কলবাইন বকম আমাদের আশীর্বাদ করতেন না তাহলে

আমি বললাম, কলবাইন উপবাসকে আমাদের এই খেলার ব্যাপার থেকে দূরে রাখা থাক। আমার মতে চুটিটা সাধারণ নীচ কাল। আমি স্বীকার করি যে কেউ প্রাগের বেশে একটা খুন করতে পারে তাব মধ্যে অনেক সময় উচ্চবরের মনোবৃত্তি থাকে। সে বকম স্থল অর্থাৎ কুখার তাড়নার বা লিগিরের গোচরীয় অবস্থার চুরি করাকেও আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু কেবল মাত্র সোভের ঘাটা প্রলোভিত যে চার, সেটা অতি হীন অপরাধ। আমি এখন এই কথাগুলি বলছিলাম তখন আমার নিজের কথার স্বরের অকপটতার আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমার কলর মধ্যে নিজস্ব মতের দৃঢ়তা, আমি ভাল ভাবেই প্রকাশ করতে পেরেছিল। এই এবই সঙ্গে আমি ভেবেছিল, পকাশ টালেরের নোটটা ঠিক আছে তো, হাটবার সময়ে কোন ক্রমে বার হয়ে পড়ে যাবনি তো ?

বাজারের কাছাকাছি থেকে আমাদের পথ পৃথক হল। এবার দু জনকে হুঁকিকে বেতে হবে। কলবাইন অলু পথ ধরে বাড়ীর দিকে গেলেন। একা হওয়ার মুহূর্ত্তেই, আমি নীচ হয়ে পরীক্ষা করলাম নোটটা ঠিক ব্যাধনের কাছে না। তারপর নিশ্চিন্ত মনে সেখানে বার করে এনে পকেটের নিরাপদ স্থানে রাখলাম। এর পর বেশ কৃতিত্ব সঙ্গে শিখ দিতে দিতে বাড়ীর পথে চলতে লাগলাম। তখনও ভাবছিলাম, যে পরলা তারিখের আগে তো ওখানো ভাঙতে পারবে না। ওই সময়ে সহরের ব্যাক থেকে আমি দামী নোট ভাঙিয়েই থাকি। বাড়ীতে পৌঁছবার পর, নিজের ঘরে এসে বেশ ভাল করে অলো খেলে দিলাম, আর বোতল উৎকৃষ্ট ম্যাডারি নিয়ে বসে ভাল সিগার খংলায় আর মনে হল, ব্যাধনও হুজুতো এখন এমনি ভাবেই সিগার ধরিয়ে বসেছেন। তিনি কি মাহুর হিসাবে আমার চেয়ে ভাল, এইটাই ভাবছিলাম।

আমার মনে কোন দ্বিধা ছিল না, বরং খুব কম সময়ই আমার মন এত ভাল থাকে। টেবিলে মদের সেলাসের পাশেই বেলে রেখেছি পকাশ টালেরের নোটখানা। নোটখানা দেখতে বেশ আর্থিক সাজ্জাত্য অন্তর্ভব কমছিল। এটা দেখে এত আশ্চর্য হওয়ার কারণ এটা একেবারে বিনা কষ্টে পাওয়া, আর একটা বড় বড় পুরণ হবে এ দিয়ে, লখন করতে হওয়ার আগে, ওখানো একটা বড় খামের মধ্যে রেখে আমার কাগজপত্র রাখার হুটকেনের মধ্যে রেখে দিলাম।

পরের দিন সকালে গম্বীরাবল ছিল প্রথমে এক মায়করা লিগির বাড়ী হাওয়া। বলতে গেলে শ্রীতের এই ওভারকোটটা এখন একটা উপহার পাওয়ার মতই পাওয়া যাচ্ছে তখন, এটা মনের মত হবে না কেন ? আমি অতি উৎকৃষ্ট গরম কাপড় আর শিকের লাইনি দিয়ে তৈরী করে ডেলীভারি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে এলাম। লিগির বাড়ী থেকে সেলাম কাউজিলায়ের বাড়ী। তাঁকে তাঁর অক্লিষ্টম সেলাম। আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন তথ্যপি তাঁর মুখে হুজুনের তাপ ছিল। তিনি আমাকে 'প্রিয় মেসার' বলে সম্বোধন করলেন (Lieber Birger Meister) বোটা আমার ভবিষ্যৎ পর বলে তিনি জানতে পেরেছিলেন।

হেব লিগিরে বললেন, কাল সন্ধ্যার ওই বিজী ঘটনাটার বিষয়ে আপনার কি ধারণা ? আমাকে এর ভক্ত আপনি কি করতে বলেন, কি কথা ব্যাখ্যা বলুন তো। কাউজিলায় একটু খেয়ে বললেন একমাত্র আমার পুরানো টাকার লাইনু কিংবা কীকানো, এদের

টাই মার্কেল
(জয়পুর)
—বতীন্দ্রনাথ পাল



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির
(কামারপুকুর)
—স্বত্রত মুখোপাধ্যায়



স্বরের পিয়াসী
—বিমল মিত্র



অপত্য স্নেহ



—কুমারকান্তি রচিত

॥ শিশু-মহল ।



—জীৱন্তী শেফালিকা ঘোষ



—রাধাকান্ত বাসু



—গুচিব্রত দেব

—ইনা

—জ্যোৎস্নাকুমাৰ বসু





विद्यार्थ

হুজুরের মধ্যেই কেউ নোটখানা নিয়ে থাকবে, কারণ তা না হলে নোটখানা বাবে কোথায়? তবে কি জানেন, আমি নিজে গুনের সচিবিরের বলেই জানি, এতদিন ধরে ওরা আমার পরিবারের সেবা করে আসছে, কোন দিন বিশ্বস্ততার কোন ত্রুটি পাইনি, কিন্তু নোটখানা বিপক্ষে রয়েছে তাই, ভাবছি গুনের আর কোন অনুবিধায় মধ্যে আনতে চাইনি। কোন গুণগোল না করেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই। আমি ঠিক করেছি, ব্যারণকে একটা চিঠি লিখবো যে আড্ডা ভেঙ্গে যাওয়ার পর ওই ঘরেই নোটখানা খুঁজে পেয়েছি, আর সেখানা এই চিঠির সঙ্গেই পাঠালাম। আমার মত অবস্থায় পড়লে আপনিও কি ঠিক এই কাজ করতেন না? আমার মনে হয়, এইটাই সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি। এতে কি কেউ সন্দেহ করবে? আপনিই আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু (Mein quater Faend) মেনিগুইটের উদ্দেশ্যে, আমি আপনার পরামর্শ চাইছি।

সকলে জানে, মৃত কাউনসিলার লিলিয়ে কত ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি ধনী ছিলেন না, সংভাবে জীবন বাপন করে, স্বচ্ছল ভাবে সম্মার চালিয়ে তিনি কেবল একটা বাড়ী করতে পেরেছিলেন। সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে তিনি প্রতিবেশীদের প্রিয় ছিলেন। যাদের তিনি বড় অফিসার ছিলেন, যারা তাঁকে প্রবীণ বলে গণ্য করতেন সকলেই তাঁকে তাদের সৌজন্য বলে মনে করতেন, বন্ধু বলে ভাবতেন, তাঁর মত সজ্জন ব্যক্তি দুর্লভ।

হের লিলিয়ের প্রস্তাবটা আমাকে আহত করেছিল। যে ধনী ব্যারণের কাছে এ টাকাটা কিছুই নয়, তাকে তিনি নিয়ে সেবেন এমন অঙ্কের টাকা, যার জন্য তাঁর নিজস্ব বাজেটের অনেকটা কম করতে হবে। আমি বললাম বন্ধু চেয়ারলেন, আপনার অন্তর বোধে আপনি এই ব্যাপারটাকে খুবই গুরুতর ভাবে নিয়েছেন, তবে আমার দিক থেকে বিশ্বাস পর্যাপ্ত করিনি যে ব্যারণ আপনাকে কিছু হারিয়েছেন কি না। সে রাতে উপস্থিত প্রত্যেকেই জানেন যে, ব্যারণ মোটেই স্বিরমস্তিক ছিলেন না। আমার অনুমোদন, আপনি ঘটনাটা অন্তরিক থেকে লক্ষ্য করুন। সবল হৃদয় চেয়ারলেনকে সহজ করবার ব্যাপারে আমি তখনকার মত কৃতকার্য হয়েছিলাম। তিনি শান্ত হয়েছিলেন।

আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ব্যারণের বাড়ীতে গেলাম। আমার অনুমান ঠিকই হল, তিনি তখনও ঘুম থেকেই ওঠেননি। আমার মত ব্যারণও অবিরাহিত ছিলেন, আমি তাঁর শয়নকক্ষেই গিয়ে দেখা করলাম। আমি কালকের কথাটা তুলে বললাম, দেখুন ব্যারণ এটা নিয়ে ধরুন যদি একেবারেই হয় আপনি কি জোর করে বলতে পারবেন যে, ছোড়া কেনা-বোটার পর থেকে আর চেয়ারলেনের বাড়ীর ডিনার পর্যাপ্ত আপনি নানা স্থানে ছিলেন না, যেখানে একখানা নোট হারিয়ে যেতে পারতেন।

ব্যারণ কিন্তু তাঁর বিশ্বাসে অটল রইলেন, যে সেখানে অল্প কোথাও হারিয়ে যাবেন। তথাপি ছোট সহরের মধ্যে এই কথা বটে যাওয়া, আর অমায়িক বন্ধু চেয়ারলেনকে এক অবশিষ্ট

অবস্থায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, ব্যারণ আর আমি খুব শীঘ্রই একটা বাবাপড়ার এসেছিলাম। ব্যারণ নিজে থেকেই একটা চিঠি লিখে দিলেন হের লিলিয়েকে, যে নোটখানা চুরি গিয়েছে বলে জেবেছিলেন, সেখানা বাড়ীতে অন্য কোটের পকেটে ছিল। তাঁর আগেকার ব্যবহারের জন্য তিনি খুব দুঃখিত এবং লজ্জিত, তাঁর জন্য তিনি কমা প্রার্থনা করেছেন।

সমস্ত ঘটনাটা বেশ সাফল্য সহকারে আরম্ভ ও শেষ করতে পেরেছিলাম। ব্যারণের দরুণ পঞ্চাশ টালের দিয়ে সংগ্রহ করা ওভারকোটটা ছিল খুব দামী ও সৌখিন জিনিস। তাই ওভারকোটটা, আমার নামের ওপর যশের কাজ করেছিল অর্থাৎ আমি একজন বিস্তারী ও সৌখিন ব্যক্তি। সেই কারণে, তখনও নীচু গ্রেডের অফিসার হওয়া সত্ত্বেও মেয়র হওয়ার আগেই, আমি সুল্লারী দ্বী লাভ করতে পেরেছিলাম। ঝাঁকে নিয়ে পরে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর অতি সুখেই কাটিয়েছিলাম। আমার বিবাহিত জীবন অতি সুখের ছিল। কুড়ি বছর পরে ফুসফুসের অসুখে আমার জীবনসঙ্গিনী পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেন।

ওই ওভারকোটটা, ওটা যখন আর বাইরের পোষাক হিসাবে পরবার অবস্থায় রইল না, তখন ওটাকে আমি ডেনিস গাউন মত করে ব্যবহার করতাম। ঠাণ্ডার দিনে ওটা গায়ে দিয়ে বাইরে যাবে বসতাম। ওই কোটটা আমাকে প্রেরণা দিত, বহু ছাঁচকে চোরকে অপেক্ষাকৃত লম্বা সাঁজা দিতে। তারপরেও ওই জীর্ণ কোটটা আমার ঘরে কেবল টাঙ্কান থেকেছে। আমার প্রিয়তমা দ্বী আমার জীবনে এত সুখ উন্নতি আর ঐশ্বর্য এনেছিলেন যে আমার কোনও অভাব বোধ হয়নি বা কোন অসাধু বাসনা আমাকে কোনদিন উত্তেজিত করতে পারেনি। আমার সুখ ও ঐশ্বর্যময় বিবাহিত জীবনের স্মৃতিই আমাকে সেই ঘৃণিত চুরির লিখিত স্বীকার কাহিনীর অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, আমার মৃত্যুর পরে, যারা আমাকে অতি সামান্তও জানে তারাও এ কথা প্রচার করবে যে আমি একজন অকলঙ্ক সজ্জন অফিসার ছিলাম। কোন রকম দোষ আমাকে স্পর্শ পর্যাপ্ত করেনি। আমি নিজেও জানি, আমি সেই রকমই ছিলাম। একমাত্র আমার নিজের স্বীকৃত এই চুরি ছাড়া কোন দোষ আমার ছিল না।

কিন্তু আমার মৃত্যুর শোক সংবাদ ও বর্ণিত গুণগুণির মধ্যে, এটাও কেন থাকবে না? আমার সমস্ত প্রশংসার চেয়েও আমার সম্বন্ধে বলবার জন্য এটা কি আরো আর্গুমেন্ট হইবে না? সম্মানমূল্যবান নিয়ে যদি বিবেচনা করা যায়, তাহলে কি এটা উপদেশমূলক ভাবে বলা চলেনা? আমার এই লিখিত স্বীকার কাহিনী কি সেদিক দিকে নেওয়া চলে না?

আমি আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাঠক-পাঠিকার কাছে এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবার ভার দিলাম।

অনুবাদিকা—রেণুকা দেবী

[মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিবাস ও নির্ভরযোগ্য]

শি শি র=সা নি ধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

৭

রবিবারকে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা বসে ছোট করেছেন অন্তরা কেউ মোটেই এতটা করেনি। “অমিয় চরিত্র” ত প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন রবিবারের লেখায় কিছু নেই।

ওরা আবার এক কাউকে সহ্য করতে পারতো না। রবিবারের অন্তরের সময় রাম বেত বলে একজন একদিন বলেছে—রাম অধিকারীকে আবার কোথা থেকে জোটায়েন? আমি পেছনে বসেছিলাম, ডেকে বললাম—কি হয়েছে তাতে? তা বললে, আপনি শিখির ডাঙা দি ন্য—বলেই সরে পড়ল।

আবার ভীষ্মের প্রসঙ্গে ফিরলেন—ভীষ্ম প্রথম অভিনয় হয় ১৯২২/২৩ সালে মনোমোহনে। প্রথমে হাথা (অশ্ব) আর শিখরী করেছিল চারুশীলা—খুব ভাল করেছিল।

নরনারায়ণ আরম্ভ হয় ১৯২৩ সালের ১লা ডিসেম্বর। বুধবারে শুরু হলো শনি রবিবার অভিনয় হয়েছিল। বুধবারে আরম্ভ করার কারণ—প্রথম সপ্তাহে চারটি অভিনয় হতে পারত।

তখন বুধবার, শনিবার আর রবিবার অভিনয় হত। বুধবার আর শনিবার ম্যাটিনিতে অভিনয় হত। বৃহস্পতিবারে অভিনয়টা ত দুইয়ের পর থেকে চালু হয়েছে। ঐ দিনটার কাগড়ের লোকান-টোকান বন্ধ থাকে, তাই পূজার হয়েছিল।

নরনারায়ণের ভূমিকাটা কীরোরবাবুর মেজ ছেলে ডেকার লেখা। শুকে ঘুরিয়ে আমাকে এক হাত নিয়েছে। কীরোরবাবুর সংস্কৃত জ্ঞান খুব ছিল, আর্যগার জারগার সংস্কৃত কথাগুলো খুব সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেছেন।

শটিনবা বলে, আমি কীরোরবাবুর ওই সব ট্রাশ করি আর গুদের লেখা করি না। কিন্তু কীরোরবাবুর লেখার মধ্যে কত ভাল জিনিস আছে তা ওরা দেখে না। থিয়েটার প্রসঙ্গে—থিয়েটারের ভেপথ থাকা দরকার। মিনার্ভার আসে ছিল ৪৫ ফুট, এখন কমিয়ে দিয়েছে। অন্ততঃ ৬০ ফুট গভীরতা থাকলে তবে নাটক ভাল করা যায়।

একজন বলে—আমেরিকার লণ্ডনেতে কোন কোন টেকের গভীরতা ১০০ ফুট। বললেন—অতটা দরকার হয় না। ইলিশের জখিনাল থিয়েটার গভীরতাকে ভেপথ বোধ হয় ৭০ ফুট। তবে ১০০ ফুটের মধ্যে বোধ হয় ৪০ ফুট একটা বিভলভার (বুঝায়মান যক্ষ) রাখবে। তাহলে সামনে ৩০ ফুট, মাঝখানে ৪০ ফুট বিভলবার আর পেছনে ৩০ ফুট খুব ধারাপ হবে না। পেছনে অনেকটা জায়গা সুবিধে হ’ল, সিনারি ট্রাক করা যায়।

ধারার সময় ঠিক হল পরের দিন নরনারায়ণ পড়বেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর এসে শুরু করলেন বিজয়ার কথা। বললেন—বিজয়া “মিনট্রিস অব রাজিনা কোর্ট” থেকে নেওয়া বা ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত।

বুধবারও খুব ভাল হই। একটা জারগার শুধু একটু পোস্টার

আছে। এই যে বড় লোক, বড় বড় বাড়ি ঘর দোর—এর একটা আকর্ষণ আছে, চিরকাল থাকবে—শরৎবাবুর এই কথাটা হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বোল আনা প্রবোজ। এবার নরনারায়ণ সবচেয়ে কথা তুললেন—বইটা খুবই ভাল কিন্তু ছেলেরের জন্ত গোলমাল হয়ে গেছে। এই দেখ, আমার কাছে ওরিক্সিক্যাল লেখা রয়েছে আর এই বই—মিলিয়ে দেখে দেখানে সেখানে দু-চার লাইন চুকিয়ে দেওয়া আছে। এমন কি, চৌদ্দটা অক্ষর করার জন্তে দু’একটা অক্ষরও চুকিয়েছে। এগুলো ঠিক জিনিসের পুস্তকের কাজ। যখন দেখানে বা পেরেছে লিখিয়েছে। নিজের কথা বলতে লজ্জা করে, কিন্তু আমার থিয়েটার না থাকলে কীরোরবাবু এ বই লিখতে পারতেন না। উনি তো আরো বই লিখেছেন—আলমগীর, রত্নাবী, ভীষ্ম—কিন্তু কোন বইটাকে মেনটেন করতে পেরেছেন? এর জন্তে হুদিন ঠেকে আবদ্ধ করে রাখতে হয়েছিল।

এর পর হেনরী আরজি-এর কথার বললেন—ম্যাটিন হার্ভে আর লুই বলে বারো বছর অ্যাট্রেক্টিস থাকার কথা লিখেছেন, এর মধ্যে পেয়েছেন মাসে ২ পাউণ্ড থেকে ৫ পাউণ্ড। বারো বছর ধরে অ্যাট্রেক্টিস করে শিখত কত? বাইরে বেরোলেই সকলকে বড় বড় পাট দিতেন আর নিজে ছোট নিতেন। কখনও একদল লগুনে আর একদল বাইরে পাঠাতেন। বাইরের দলে নতুন ছেলেরের বড় বড় পাট দিয়ে পাঠাতেন।

আরজি সত্যি নাটক খুব ভাল বুঝতেন। নাটকের উন্নতির জন্তে অনেক করেছেন তিনি। তাঁকে কালার অব ইংলিশ ট্রেন্স বলা যায়।

এইবার নাটক পড়তে শুরু করলেন—প্রথম মিকের কর্ণের কথাগুলো বেন মনে হয়—you know my mind, come and do your best. এই ধরনের!

এর পর আছে বিবরণ দর্শন। আমরা প্রথম থেকেই ওটা বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম। বইতে কিছু ঠিক চুকিয়েছে।

নরনারায়ণে কক্ষগমিনী করত পদ্মা আর চারু দ্রৌপদী। দুজনেই অপরূপ অভিনয় করেছিল। যেখানে দ্রৌপদী বলছে—

সেই আমি, এই যুক্ত কেশরাশি লয়ে
সহিতেছি হে মাধব—সিতা সহিতেছি
অজিহিবহ সহস্র কশার
বজ্রালা প্রচণ্ড ধংশন—

সেখান থেকেই জমে যেত। এর পর দর্শকরা আর নিখাল কেলেতে পেরত না।

বিনয়লা তর্ক আরম্ভ করলেন—এত বেশী উপমা ব্যবহার করেছেন যে বুঝতে কষ্ট হয়।

তখন বললেন—উপমার কথা বলছি, অভিনয়ের গুণে সেগুলো চোখের সামনে দেখতে পারার মত হবে। দেখবে বেন চোখের সামনে পাঁচা গুলে হুড়িয়ে যাবে। তাই যদি না পারেন ত’ অভিনয়

কি হল? আর এতেই যদি বোঝার কষ্ট হচ্ছে, বলন্ত গুপ্তীর বেলার কি করবে?

একজন বললেন—নরনারায়ণে আপনি ত' কর্ণ করতে পারেন।

হাসলেন—আমি এখনো কর্ণ করলে হয়? কিন্তু কমবয়সী ছেলে একটি পোলে ভাল হত। এখন দম কমে গেছে। তাছাড়া বোনের সে কষ্ট পাব কোথায়? এখন তিনটে কি বড় জোর চারটে দৃষ্ট পড়ার যে কষ্ট হচ্ছে তাতে পুরো নাটক করতে পারি। পড়াতে শু আর কান নেই। তাছাড়া pouce নিচ্ছে পারছি না, তার অন্তঃ মনের মধ্যে মোচড় দেয়। একজন বললে, অপরের কি মনোভাব হয় সেটা তো বোঝান দরকার।

বিনয়দা! বললেন—আমাদের কারো ত আপনার মত দম নেই?

বললেন—তোমাদের দম নেই বলছি, তোমরা ত' অভ্যাস করনি। আমি যে ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস করেছি। এখন থাকে পেয়েছি ডেকে এনে পড়ে শুনিয়েছি। সবাই সেইজন্মে ভয় কোরত আমায়। বাইরে অবশ্য পাঠ্যবৃত্ত না, সাহস ছিল না। বাড়ীতে অনেক লোকজন ছিল, তাদের সবাইকে পড়া শুনিয়েছি। কত ছোট বয়সে জনা দেখেছিলুম, আর তারপরে জনা পড়ে সবাইকে তিনকড়ির হুয় নকল করে শুনিয়েছি।

ডাঃ অধিকারী সাধারণতঃ কিছু না কিছু বলেন, হাসাহাসি করেন। সেদিন একবারে চুপচাপ বসে। তাই হঠাৎ বললেন—কি রাম, এত বিমর্ষ কেন, শরীর ভাল ত?

তিনি বললেন—হ্যাঁ।

তখন হেসে বললেন—তাহ'লে একটু লাইট হও। সঙ্গে সঙ্গেই জুড় দিলেন—অবশ্য শরীরের দিক থেকে লাইট হতে বলছি না। ডাঃ অধিকারী সমস্ত সকলেই হেসে উঠলেন।

অপরেশবাবু কর্ণজ্বনের কথা তুললেন কে একজন। সে কথার উত্তরে বললেন—অপরেশবাবু স্ক্রীদোদবাবু অনেক পরে লিখেছেন। তাছাড়া জ্বনের তুলনা করাও উচিত নয়। সেন্সীভেরের কথা বাদ দিচ্ছি, কেননা, বন্ধ বড় হয়ে যায়। শ'র সঙ্গে সি, এইচ, মনোরর কি তুলনা হয়?

স্ক্রীদোদবাবু ড্রামাটিক সেল বড় ভাল ছিল, ঠিক জায়গা মাসিক প্যাচগুলো দিয়েছেন। নাটক পড়ার কথায় বললেন—নাটক পড়লে লাভও হয়। ডিকেন্সও ঐ ভাবে পড়ে প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন, তবে তাঁর পড়া ছিল রীতিমত অভিনয়। রবীন্দ্রনাথও রীতিমত পড়তেন। তাঁর শেষের দিকের বইগুলো পড়ছেন বিচিত্রা ভবনে। কিন্তু প্রথম দিকের গুলো কখনো প্রথম চৌধুরীর বাড়ী আর কখনও বা অন্ত অন্ত জায়গায় পড়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ—বিশেষ করে বিভাসাগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলো অশুভ!

বিনয়দা! আপত্তি করলেন—না রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মধ্যে একটা ঘোঁরাটে ভাব আছে, তাছাড়া বড় বেশী উপমা ব্যবহার করেছেন।

ওঁর কথা শুনে বললেন—বিভাসাগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলোতে বোধ হয় ঘোঁরাটে ভাব নেই। আর একবার পড় দেখোত। 'আবার সাহিত্যিক হ'ল ত আছেই—সময় দিয়ে উনি অতুলনীয়। আর উপমার কথা বলছি, উপমা না দিয়ে উনি কখনই বলতে পারতেন না।

পাঁচ মিনিট কথা বলতে না বলতে—সত্যি যেমন ঘুরে দিকে যায়, ইত্যাদি উপমা উনি সর্বদাই ব্যবহার করতেন।

ওঁর সঙ্গে তখন নতুন চেনা, বলেছিলুম (অবশ্য আবদার করে) ওদেশে যেমন Critical literary appreciation লেখা হয় তেমনি ২০০।২৫০ পাতার এক একখানা বইতে পুরোনো লেখকদের সম্বন্ধে যদি লেখেন—

তাতে বললেন—আমার বই কে পড়বে?

মবিলালকে চুপি চুপি বললুম—লেগে থাকো না।

মবিলাল বললে—খোলা লোক! লেগে থেকে কিছু হবে না।

প্রবন্ধ লেখার অতুলনীয় হলেন বসন্তমঙ্গল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট লিখে লিখেই বোধ হয় লেখাটা এত বগু হয়েছিল।

কে একজন বলে বলল—কই অল্প ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের ত হয়নি?

হাসলেন—কথাটা অবশ্য বলেছি ঠিক; ভেতরে না থাকলে আর হবে কোথা থেকে!

কথা পাঁচালেন—রবীন্দ্রভারতীতে বিজয়া করছি, সঙ্গে সব ইনস্টিটিউটের ছেলেবা। শরৎসাহিত্য উৎসবে। ওদের একজন আমার কাছে গিয়েছিল; (ওদের আমি নাম দিয়েছি শরৎশঙ্কী!)—বলতেই বললুম—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই করবো। কেন করব না? টাকার আমার বড় দরকার। কেস কড়ি মাগ তেল'তুমি কি আমার পর!

তাতে বললে—শরৎচন্দ্রের মৃত্যু উৎসবেও আপনি পরমা নবেন?

বললুম—কেন নেব না? শরৎ' কি আমার কিছু ছেড়েছেন কখনো? একবার কিছু টাকা দিতে দেয়ী হয়েছিল বলে অনেক কটুকথা বলেছিলেন।

এই সময় বিনয়দা! বললেন—আবার সেনা-পাওনা আর বোড়শী পড়লুম। নাটকে আর উপাঙ্গাসে ত অনেক তফাৎ। নাটকে অনেক নতুন নতুন কথা বলেছেন বা উপাঙ্গাসে ছিল না।

বললে—সেনা-পাওনার চেয়ে বোড়শীতে ক্রিনিয়গুলো শুঁড়িয়ে বলা আছে তা সত্যি, কিন্তু সবই ত ওতে ছিল নইলে আমি পেলুম কোথা থেকে? ওতে জমিদারী চলে যাবে একথা পরিহার লেখা আছে। জীবনানন্দর মৃত্যুর কথাটা অবশ্য আমিই বলি। বললুম—জমিদারী চলে যাবে আর জমিদার থাকবে, তা হয় না।

প্রথমে ত কিছুতেই মানবেন না, তারপর অনেক তর্ক করে অনেক বুঝিয়ে তবে মনে নেওয়াতে পারি।

বিনয়দা! আবার বললেন—বোড়শীর মনে কিন্তু একটা পরিবর্তন এসেছিল। জীবনানন্দ ওকে ধরে নিয়ে বাওরাতেই বোধ হয় পরিবর্তনটা শুরু হয়।

তখন বললেন, বোড়শীর মনে কোন পরিবর্তন হয়েছিল কি না সেটা ঠিক বোঝাননি। হৈমবর্তীকে দেখে তার মনে দুর্বলতা এসেছিল একটু, সংসার করবার সখ হয়েছিল। বিজয়াতে নরেন ছবি আঁকে, মাছ ধরে, আবার মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাজও করে। এই দেখে তোমাদের আশ্চর্য লাগছে, কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওঁর নিজের মনের ইচ্ছেটাই উনি প্রকাশ করেছেন। ওর ধারণা ছিল স্টো। করলেই উনি ভাল ছবি আঁকিয়ে বা বৈজ্ঞানিক হতে পারতেন।

বোফী নটকটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, ওই দুপনের জন্তে। আমার ঘরে বসে লিখছেন এমন সময় হুড়হুড় করে ঢুক পড়লো দুপেন। ব্যস, উনিও উঠে পড়লেন আর লিখলেন না। বললেন, না ভায়া, ওয়া গিয়ে বলে বেড়াবে, তুমি বলে বাছ আর আমি ডিক্টেশান নিচ্ছি, তা আমার সহ হবে না।

আমি কত বোঝানুম—ওতে আপনার কোন সম্মানই বাবে না। আপনি যে কি সে ত সবাই জানে।

তা কিছুতেই কোন কথা কানে নিলেন না।

ইনস্টিটিউটের কথা উঠল, বললেন—সাহাব সাহেব একবার গোলদীঘিটা বুকিয়ে ওখানে ইনস্টিটিউটের বাড়ী করে দিতে চেয়েছিলেন। গুরুদাসবাবু আর ম্যাকফার্সন সাহেব আপত্তি করতে শেষ পর্যন্ত হল না। ম্যাকফার্সন সাহেব আমাদের ডেকে বললেন—এখানেই একমাত্র তোমাদের স্বদেশী মিটিং হতে পারে, সেটা বন্ধ করবার জন্তেই বাড়ী করতে চাইছে। তোমরাও কি তাই চাও?

একটা প্রশ্ন বহুকাল ধরে আমাদের মনে উদ্ভ্ৰাজ, এই সুরোগে সেটা লিজ্ঞাসা করে বললাম—গোলদীঘিকে গোলদীঘি বলে কেন, ওটা ত চৌকো?

হেসে বললেন—গোলদীঘি ত আগে গোলই ছিল, '১২-১৩ সালে রাউট ফেলে বুকিয়ে চৌকো করে ফেলেছে। ওখানে আমরা আড্ডা দেবোঁহি। গোলদীঘির ধারে আমরা কিংকিং খেলতুম।

৬নং বাড়ীটা কে কেন বলছে—কেটবাবু। বললেন—কেটবাবু হবেন কেন, এটা ডেভিড হোয়ারের। ওপাশের বাড়ীগুলো ছিল ঘোবালদের।

ইবসনের নাটক সবছে বললেন—আজকাল যে ইবসন আর চলে না এই কথাই আমাদের দেশের লোকেরা ভুলে গেছে। ইবসন কেন শ'ও চলে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় ত্রার চার্লস মেরিয়টের লেখা পড় দেখ। একটা দল করে পুরোনো সব বই পর পর করা দরকার। কতকগুলো ছেলে যদি পেড়ুম। আগেকার দিনে ত কেমন পিখত।

কিছুদিন আগে জেমেছিলাম ২রা অক্টোবর ঐর জন্মদিন আর সেইজন্তেই ২রা এলে ঐর জন্মদিনের উৎসব করা হবে তা আমরা ক'জনে মিলে স্থির করে ফেলেছিলাম। এ ব্যাপারে প্রধান উক্তান্ত তথা উৎসাহী হ'ল লালদোহন দত্ত ও দেবকুমার বসু।

আমরা এটা বেশ ভাল করেই জানতাম যে, জানতে পারলে সমস্ত প্ল্যানটা শিশিরকুমার ভেঙে দেবেন। তাঁকে নিয়ে নাচানাচি করাটা পছন্দ করতেন না তিনি। তাই সব বন্ধাবস্ত চুপি চুপি করতে হল।

জন্মদিনের চেয়ে আগেই তাঁকে জানতে বাওয়া হল। অথচ তাঁর দেখা নেই। আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বৎসসময়ের পরেই এসে পৌঁছলেন তিনি, তবে একা, বললেন আজ ত সেবু সকাল সকালই গিয়েছিল। আমিও তৈরী হয়ে নিলাম। ব্যস, তারপর পক্ষাঘ্ন মিনিট গুর কোন ঐক্যবন্ধ নেই। বাড়ীর লোকদের বোঁক করতে পাঠানুম, তারা গাড়ী ডেকে নিয়ে এল কিন্তু তখনো সেবুর দেখা নেই। শেষ পর্যন্ত ওরা বললে আপনি চলে যান। দাঁড়ায় দেখা হলে ফুলে দেবেন। তাই চলে এলাম।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে দু-একজন বললেন, কি হ'ল সেবুর, পুষ্কিন ধরেনি ত?

হাসলেন—পুলিশে ধরবে? না, তা ধরবে না আর বললেও আজকের দিনে ছেড়ে দেবে। আজকে কার জন্মদিন জানতে? আজকের দিনে সব কিছুই অহিংস। এই দেখনা আমাদের দেশে মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয় আর আমরা অহিংস বসে তুমই দেখি। অবশ্য গান্ধীজি এমন কথা বলেন নি। নারীর ওপর অত্যাচার তিনি সহ্য করতে বলেননি। আর বাই হোক, তিনি কাংগার্ড ছিলেন না। মরে সে কথা প্রমাণ করে গেছেন।

এবার নয়নারায়ণ বইটা খুললেন। পড়া আরম্ভ করার আগে বললেন—কীরবাদবাবুর ছেলে বইটাতে ঘুরিয়ে লিখেছে, তিনি মন্ত বড় লেখক ছিলেন; কিন্তু অল্প নাটকগুলোতে লেখা তাঁর পূর্ণতা পেতে পারেনি নানা কারণে—এই বইটাতে পেয়েছে। কিন্তু তোমরা পড়ে দেখে দেখানে সেখানে কত বাজে লাইন চুকিয়েছেন। এই বাতাসে বা লেখা দেখছ—এইটাই প্রথম লেখা।

অনেক লেখক আছেন বীদের লেখা প্রথমই ভাল হয়। পরে পরিবর্তন করলে কলটা তত ভাল হয় না। নটকটা পড়তে শুরু করলেন। সন্ধির চেষ্টায় বার্ষ হয়ে কৃষ্ণ হস্তিনা থেকে ফিরে এসেছেন। ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে দ্রৌপদীর আলোচনা রত অংশটা পড়ে বললেন—এখানে দ্রৌপদী আর কৃষ্ণের মধ্যে একটু ঠাট্টা ইয়াকি হচ্ছে। পরস্পর পরস্পরের সখা আর সখী ত।

আগের দিন পড়েছিলুম, মনে আছে বোধ হয়, সন্ধির কথার দ্রৌপদী বলছে—

অগ্নিশিখা মুখে যদি
জনম আমার উত্তাপ ভিকার আমি
কোন দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর?
আমি সব।

কৌরববিনাশে নিজে যাব আমি।

এই বলে অভিমত্বায়ের নিয়ে বেরিয়ে গেছল। তারপর কৃষ্ণ হস্তিনায় সন্ধির চেষ্টা করে বার্ষ হয়ে ফিরে এসেছে।

তাই দ্রৌপদী ঠাট্টা করে বলছেন—ওরা তোমার বীথতে এসেছিল বলে শেষ পর্যন্ত বিবাত হতে হয়েছিল। এত ভয় তোমার।

কথায় কথায় সন্ধি না হওয়ায় নিজের আনন্দের কথা বললেন।

কৃষ্ণ তখন বললেন যে, ধর্মরাজের সন্ধি স্থাপনের সব চেষ্টা তোমার উচ্চ নীতিশাসে মিলিয়ে গেল।

তারপরের এক জায়গার পড়তে পড়তে বললেন—এই যে এখানে বলছে—

জাতি হবে মরে অনশনে
সলা হয় নারীর লালনা।

এই কথাগুলো বোধ হয় আজকাল সত্যি নয়। জাতিও অনশনে মরছে। নারীর লালনা ত অহরহই ঘটছে, কিন্তু কই ভগবান ত কিছু বলেন না?

দ্রৌপদী বখন পুরোনো কথা বলছেন, বলছেন কৃষ্ণ রাজসভায় তাঁর অপমানের কথা, সেই অংশটা পড়ার পর বললেন—এখানে দ্রৌপদীর কথাগুলো কেমন ধাপে ধাপে সাজানো দেখ। শেষ কথাটা দ্রৌপদী বলছে—পাণ্ডবসখা। লক্ষ্য কর—পাণ্ডবসখা এই হচ্ছে কৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয়।

সেদিন টালসে কলস্পন্দেই কাহানিনিরাতি এসেছিলেন। সেখান

তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে বললেন, ও টাসের কয়েসপণ্ডেট, ইয়েজী বোকে ত? তার পর তাঁকে বললেন—I saw some of yours actors—Pudovkin and others. Some I saw in 1952, others later on.

আবার পুরানো প্রসঙ্গে চললেন—চারুর উচ্চারণে কতকগুলো দোষ ছিল. তবে চেষ্টা করলে কি করা যায় জ্যোপদীতে তারই প্রমাণ দিয়েছিল। “হে কেশব, তুমি নাকি বিরাট হইয়াছিলে কুক সভাস্থলে,” এই কথাগুলোর প্রত্যেকটার মূল শব্দ সে ফোটাতে পেরেছিল।

শুরুকে বিশ্বাস করে যদি দু’টো নাটকও ঠিক ঠিক শুকুর অল্পসংখ্য করা যায় তাহলে ভাল অভিনেতা হওয়া যায়।

তখনকার দিনে অভিনেতাদের সকলেরই অভিনয়ে উচ্চারণের দোষ ছিল। দানীরাবুবও ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল তাঁর প্রথম ব্যক্তিগত—তারই জোরে দর্শকদের টেনে রাখতে পারতেন। জীবনের শেষ ক’বছর, মানে গিরিশবাঁবু মারা যাবার পর থেকেই তিনি আর ভাল অভিনয় করতে পারেন নি।

তখনকার দিনের অভিনেত্রীদের একটা মন্ত বড় দোষ ছিল, তারা কোন কিছু চিন্তা করত না। তারানন্দরী পড়ত ব্যক্তিক্রমবশর দলে—কিন্তু সেও কতকগুলো বাঁধা ছকের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

তারার সঙ্গে অনেকবার অভিনয় করেছি। মারা গেছে ৫০ সালে ত তাহলে ’৪৬ সাল পর্যন্ত করেছি। শেষের দিকে শুধু রিজিয়া করেছি।

রিজিয়াতে বিজ্ঞানার একটি অপদার্থ চরিত্র। আমরা কেটে ছে’ট যেমন কাঁড় করিয়েছি, তাতে তবু চলত। রিজিয়াতে অর্ধেক বাবু ঘাতক করতেন, তাঁর জন্তেই চলত। প্রতাপাদিত্যে উনি দু’টি ভূমিকা করতেন, প্রথম দিকে বিক্রমাদিত্য আর রডা। রডার গোবাক ছিল হাস্যকর। টকটকে লাল কোট আর প্যাণ্ট, তার গুপার একটা অ্যাডমিরালের টুপি। কিন্তু উনি যখন কথা বলতে আরম্ভ করতেন, তখন পোষাকের কথা মনে থাকত না কারো। এই সময় লালমোহন দত্ত এসে হাজির হল ফটোগ্রাফার নিয়ে। ফুলমালা ইত্যাদি দেওয়া হল ওঁকে, নানাঞ্জন নানা উপহার দিলেন। একটু অবাক হয়েই প্রেরণ করলেন—যাপারটা কি?

বললাম—আজ যে আপনার জন্মদিন।

বললেন—আমার জন্মদিন ত তারিখ মিলিয়ে মানি না, মানি তিথি মিলিয়ে; সবাই তাঁকে তখন জিনিষপত্র দিচ্ছে তাই বললেন—কিন্তু এসব কি?

বললেন—আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে ওরা, জানাতে দিল না।

বললেন—আচ্ছা বলছ যখন দাও। তোমরা শ্রদ্ধা করে যা দিচ্ছে তাই নেব।

একটু বেন অনমনা হয়ে পড়লেন—জন্মদিনের সঙ্গে কতকগুলো ছাপাবই ঘটনা মিলিয়ে আছে, তাই এই সব কয়েক কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। মনটা বেন কেমন হয়ে গেছে, তাই বা বলার দরকার তা বলতে পারছি না। তোমরা মনে করে নিও আমি বসেছি। এমনিতে ছবি তুলতে দেন না। সেদিন এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। প্রথমে তাঁর একক ছবি তোলা হল। তারপর

সবাইকে একসঙ্গে টেনে নিয়ে একটা গুপ ফটো তোলালেন। এবার সবাইকে মিষ্টিবুখ করানো হল।

এই সময় টাসের কয়েসপণ্ডেট প্রশ্ন করলেন যে, তিনি কখনো দেশের বাইরে গেছেন কিনা? উত্তরে বললেন—No, I have been never out of this country except once when I have been to Newyork, I stayed there for six month. সবায়ের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে—ওঁকে আবার পড়তে অজরোধ করা হল।

বললেন—না, এর পর আর পড়া হবে না। মনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। নাটক পড়া বন্ধ হয়ে গেল ত, শুরু হল নাটক সম্বন্ধে আলোচনা। বিনয়দা বললেন—নরনারায়ণের সাহিত্যিক মূল্য বাই হোক না, নাটক হিসাবে এর মূল্য literary value-র জন্তেই কমে গেছে।

বললেন—বিনয়, তুমিই প্রথম বলছ নাটকের literary value-র জন্তেই তাকে বোঝা যায় না। বোঝাই যদি না গেল তাহলে অভিনেতা আছে কি করতে। অভিনেতার সেইটাই সবচেয়ে বড় গর্ব যে সে দর্শককে নিজের সঙ্গে একাত্ম করে মেলেছে। নিজের ইচ্ছামত তাকে সে নাচাতে পারে, কাঁদাতে পারে।

আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে বললেন—আধুনিক কবিতা আমি বিশেষ পড়িনি। সত্যিই আধুনিক কবিতা বোঝা যায় না। তবে তোমার ভাল না লাগলেও জিনিষটা যে ভাল নয় একথা বলা যায় কি করে? আমার টেনিসন ভাল লাগত না, লাগত না কেন এখনও লাগে না। ঐ যে তার ইমেজারি—‘মন জমে বরফ হয়ে গেছে, চাপড়ে ভাঙছে’ এসব বেন কেমন ধরণের লাগে। কিন্তু তাই বলে টেনিসন খারাপ বলা যায় কি?

এই সময় একজন বললে—বাঙলা সাহিত্য সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছে আজকাল।

বললেন—বাঙলা সাহিত্য বলছ সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধিশালী, কোনদিকটায় দেখাও ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে কি শৈলী বা কীটন-এর কবিতার গভীরতা আছে?

এবার ইবসেন সম্বন্ধে বললেন—ইবসেনের নাটকের আর দিন নেই। আমি তাঁর প্রতিভাকে ধরু করতে চাই না, কিন্তু তবু বলব তিনি dated হয়ে গেছেন। ইবসেন নাটকবাই ছিলেন না শুধু, ছিলেন ঠেজ ম্যানেজার আর অভিনেতা। তাঁর নাটকের গঠনে ঠেজ ম্যানেজারের ছাপ পুরোপুরি দেখা যায়। কথা বলা না-বলার ভঙ্গী সব কিছুতেই নাটকের ছককাটা ভাবটা দেখা যায়। তাঁর Wild Duck খুব ভাল বই।

একজন বললে—নাটক ভাল না হলে কি অভিনেতার গুণে নাটক কাঁড়ায়?

বললেন—অভিনেতার গুণে নাটক কাঁড়ায় না? এই যে আলমগীর, ওতে নাটকীয়তা কি আছে? আসলে ত ওটা নাটকই নয়। অথচ খুব জমে গেছে, পরসীও দিয়েছে। ওই যে ভুতের ভয় আছে। দর্শকরা ঐ ভুতুড়ে ভুত দেখতে বেত। আগে ঐ ভীষণুয়ী আর আলমগীরের দৃষ্টান্ত ৩৮ মিনিটে কবছর, আজকাল কবি ১৩ মিনিটে। বোঝ বোঝ অভিনয়ের সময় চরিত্রের ভেতর নতুন কিছু

বেঁচে পোকম : আজকাল আর পাই না। গন্ত হ' বহুদে বিশেষ করে হাত ভাঙার পর থেকে কেমন যেন বুড়িয়ে গেছি।

হঠাৎই প্রাণ করলেন—ইন্সটিটিউটে বই করলে বিক্রী কেমন হয় ?

একজন বললে—হুসে লোক বোধ হয় খুব বেশী ধরে না।

বললেন—কেন, হলেন লোক ভালই ধরে। ১১০০—১১৫০

হবে—যে কোন থিয়েটারের সমান। ওখানে আর একবার বিজয়া করবার কথা হচ্ছে। মহাজাতি সদনের হলটা বেশ ভাল হয়েছে।

লোকও ধরে ২৫০০ জন। Acous খুব ভাল। আস্তে আস্তে

কথা বললেও শেব পর্যন্ত শোনা যায়। প্রেস্টন্ট করবার অবস্থা অসুবিধে হয়। কিন্তু প্রেস্টন্টর থাকার উচিত নয়। অভিনয় করার আগে অভিনেতাদের পুরো যত্নই থাকার উচিত। তাই আমি দু'মাস ধরে রিহাভ্রাল দিই। আর আজকাল দু'দিন রিহাভ্রাল দিয়ে বই নাখানো হয়। কাছেই প্রেস্টন্টারের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি ? কিন্তু প্রেস্টন্টার কি কম বিপদে ফেলে ! বার্মপুয়ে না কোথায় অভিনয় করছি, সব বলেছি—আন্ড্রোয়া মা, এতদিন কোথায় তুলে ছিলি। সেখান কাভায়ন—

বাস্, সঙ্গে সঙ্গে ফু-ক-ক আর কার্টেনসু।

মহাজাতি সদনের হল ভাল, কিন্তু ষ্টেজ সুরবিশেষ নয়। আড়ো ছোট, ডেপথও নেই। ওরা ত বাবা জানে, তাদের জিগ্যাস করবে না। বাবু, বা করেছে, ভালই করেছে। সুরভাষের পুণ্যফলেই ঘটছে ব্যাপারটি। তবে আটশ টাকা ভাড়াটা বড় বেশী।

আজকালকার অভিনয় সবচেয়ে কিছু বলতে বলার বললেন—অভিনয়ের কথা আর কি বলব বল। আজকালকার ছেলোদের সবচেয়ে কিছু বলতে লজ্জা করে। সেদিন একজন ডাক্তারকে ডাকতে বাইরে গেল, ঢুকল অন্ধরের দিক থেকে। বললুম, এটা কি হ'ল। ডাক্তার কি অন্ধরমহল থেকে ঢুকবে নাকি ?

তা বললে—তুল হয়ে গেছে।

এ রকম তুল কি হয় নাকি ?

কাজিবাবু কাল গিয়েছিলেন। ঊর ইচ্ছেতেই আবার বিজয়া অভিনয় করছি। উনি দয়ায় খুব ভাল করেন না, তবে জমে যায়। বইটার অভিনয় বা হচ্ছে, তা আর কি বলব ! তবু কিছু জমে। জমে অবশ্য নাটকের শুণে আর শরৎদার ভাবায়।

নরেন জানে বিজয়ার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়ে আছে। তার বাবা তাকে পড়িয়েছেন। কিন্তু রাসবিহারীরা অল্প রকম বুঝিয়েছে, তাই ভাবছে হয়ত মত বললেছিলেন।

বিজয়ার এদিকে রাসবিহারীকে প্রথম থেকেই ভাল লাগে না, তাড়িয়ে পর্যন্ত দিচ্ছে কিন্তু মনের কথাও বলছে না।

দয়াল প্রথম শুনে বলছে—তুমি নলিনীকে ভালবাস শুনে খুব খুশী হলাম। তার পরে বুঝতে পেরে বলছে—ও, বুঝছি।

এটা বড় স্নান করতেন—শীতলবাবু। নিজেকে নিঃশেষ করে মিলিয়ে দিতেন চরিত্রের সঙ্গে।

[ক্রমশঃ]

তাপসী-প্রতীক্ষিতা

ঐশ্বর্যশা ঘোষ

হে রামতপস্বিনি,
ঐশ্বরের লাগি আধিদীপ আলি
বসে আছ একাকিনী।
পলে পলে দিন যায়,
জ্বর-বেদিকা নিতুই ধুয়েছো
তব আঁখি-জলে হায়।
এই বুঝি আসে রাম,
এই বুঝি আসে প্রাণের ঠাকুর
নবদুর্বারল স্তাম।
কত দিন আসে যায়,
কোথায় তোমার চির-আবাস
বুঝি বা এলো না হায়।
তবু তো হওনি রান,
হে উপবাসিনি, আশায় শিখাটি
আজ্ঞো তব অমান।
অন্তরতম তরে,
নরনের জলে আলপনা আঁকি
চাহিয়া রয়েছে। ধারে।
তুমি মর্দব ধ্বনি,
ভেবেছো, এসেছে পাতকী-ভারল
তোমার সে রুবুনি ?
রক্তলবট ভরি,
নিজা বেবেছো দুয়ারের পাশে

রাতুল চরণ নরি।
বাখার প্রদীপ হয়ে,
ঐশ্বরের লাগি জলিয়াছ তুমি
মহনের ব্যথা সয়ে।
জীবন যন্যে আসে,
জরা আর ব্যাধি ঘিরে কেসে সোহে
তবু আছ রাম-আশে।
আঁখিপল্লব হতে,
বিদায় দিয়েছ নিভ্রাদেমবীবে
ঐশ্বর্য-প্রতীক্ষাতে।
শবরী এসেছে রাম,
সীতা অবেশে তোমার দুয়ারে
এলো লীলা অভিরাম।
"এসেছো কি তুমি রাম ?"
"এসেছি শবরি, করিতে আশীষ
পূবতে মনদ্যাম।"
প্রতীক্ষাই তব ধ্যান,
তাই তো অভিধি পর্ণ-কুটারে
পতিভগবান রাম।
তাপসী-প্রতীক্ষিতা,
তপস্বী তোমার চিরপ্রতীক্ষা
আমি ভটিবিত্তে।

ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ

কাজী নজরুল ইসলাম

ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর অকাল মৃত্যুতে আজকের এই সভা আহুত হয়েছে। এই সভায় ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের তিরোধানের শোক প্রকাশ করা হবে, শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আমার আশা ছিল, দেশের একজন খ্যাতিনামা জননায়ককে এই সভার সভাপতিত্ব করতে দেওয়া হবে, এবং তা করলে শোভনও হত। আমি ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের একজন দীন ভক্ত সাগরেদ। আমি নিজে, গোলাম মোস্তফা, ও আব্বাসউদ্দীন তাঁর কাছে গান শিখেছি। বাংলার হিন্দু মুসলমান ভ্রূণ গায়করা, ধারা সঙ্গীত-জগতে নাম কিলেছে, তাঁরা প্রায় সবাই ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের শিষ্য। কেউ হয়ত বলবেন : জমিরুদ্দীন ছিলেন পাঞ্জাবী, বাঙ্গলার তিনি কেউ ছিলেন না। এ উক্তি শুধু উক্তিই, এর মধ্যে যুক্তি নেই। আমি বলি, গানের পাখী উড়ে বেড়ায়, নীড় বাঁধে না। কোকিল পাহাড়ে থাকে, সে আসে বসন্তকালে, তার গান আমাদের মুগ্ধ করে। তারপর গান গাওয়া শেষ হলে আবার সে চলে যায়। সুরের আবেদন সমানভাবে সকল মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। জমিরুদ্দীন পাঞ্জাবী ছিলেন সত্য, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে। বাংলাদেশে ছোটবেলায় তিনি এসেছিলেন, বাংলাকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায়ই তিনি কথা বলতেন এবং নিজেকে তিনি বাঙ্গালী বলেই পরিচয় দিতেন এবং একমুখ গর্ব অনুভবও করতেন।

আজ সঙ্গীতলোকের একজন গুণীর শোকসভায় আমরা সমবেত হয়েছি, এটা এ দেশের পক্ষে অভিনব। শরিয়তের দোহাই দিয়ে কেউ কেউ হয়ত এই সভার সঙ্গে সহায়ত্ব দিতে দেখাতে চাইতেন না। তাঁরা হয়তো বলবেন, যে সায়া জীবন গান গেয়েই গেল, ধর্মের কাজ সে করলো কোথায়? তার জন্ম মুসলমান শোকসভা কেন করবে? তাদের কথা নিয়ে আমি বিতর্কে যোগ দিতে চাইনে। আমি শুধু বলতে চাই যে, বেহেশতের পাখী বখন গান করে তখন পৃথিবীর মূলো থেকে সে উর্দ্ধে উঠে যায়। ফকীর দরবেশ বখন সেজলা করে, তখন তার মন মাটি থেকে উর্দ্ধে উঠে যায়। এই সুরের পথ ধরেই মানুষ মুক্তির পথ পেয়েছে। হজরত ইসমাইলের পায়ের দাপে মরুভূমির বুক চিরে পানি উঠেছিল; সেই পানি মানুষের জন্ত আবে-জমজমের পানি হয়ে আত্মার শাস্তিদান করে। সুরের আশ্রিতেও মনের পানি উথলায়। সুর কখনও খারাপ হয় না। খারাপ মনের পায়ে পানি রাখলে সে পানি হয়ত দূষিত হয়, কিন্তু তাই বলে পানিকে লোব দেওয়া যায় না। পানি মানুষের জীবন বাঁচায়; আবার বজা হয়ে মানুষের ধ্বংসও আনিয়ন করে; তাই বলে পানিকে ত আমরা খারাপ বলতে পারিনে। সুরের সঙ্গে ফুলের তুলনা করা যেতে পারে। ফুল দিয়ে কোথাও কোথাও গুজা হয়। সেই ফুল নগরবিলাসিনীদের কণ্ঠেও শোভা পায়। তাই বলে ফুল খারাপ, এ কথা বলা যায় কি? শরিয়ত হয়ত গানের খারাপ দিকটাকেই খারাপ বলতে পারে। কিন্তু সুর কখনো খারাপ নয়।

এ কথা অবশ্যবীকার্য যে, মানুষের মারকতে হুনিয়ার বুকে আল্লাহ রহম নেমে আসে। সুরও আল্লাহ রহমরূপে হুনিয়ার নাজিল হয়েছে। কিন্তু সব মানুষের মূখ দিয়ে ত সুরের রহমত বের হয় না। ধীরে



মুখ দিয়ে সুর বেরোয় তাঁদের উপর আল্লাহ রহম আছে। শরিয়তের তর্ক আমি ভুলতে চাইনে। হাকিমের মৃত্যুর পর কেউ তার জানাজা পড়তে চায়নি। কিন্তু হাকিম তাঁর শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন যে, আমার বইয়ের পাতা খুলে প্রথম যে চরণ তোমাদের চোখের সামনে পড়বে, তাতেই তোমরা আমার কাম্য খুঁজে পাবে। শিষ্যরা হাকিমের মৃত্যুর পর এক অঙ্কে দিকে তাঁর বইয়ের পাতা খুলে দেখলো, লেখা রয়েছে : "আল্লাহ, আমার লাপ কেউ দাকল করবে না জানি, কিন্তু এও জানি, তুমি তোমার দরবারে আমার গ্রহণ করবে।"

মুগের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন আবশ্যক হয় এক এই প্রয়োজন মেনে নিতে হয়। এই পরিবর্তনের জন্তই মুগে মুগে মোজাক্কেদ আসেন। মানুষের পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধার দ্বার মনের ক্ষুধাও আছে; এ ক্ষুধা মেটাতে হয়। ইদের দিনে মানুষ কোথা-পোলাও কিংবা খার পেটের ক্ষুধা মিটাতে; কিন্তু আতর খোসকুও মাখে : এটা হল মনের বিলাস। গানও তেমনি মানুষের মনের ক্ষুধা মিটায়। ধারা সাহিত্যিক, কবি ও গায়ক, তাঁরা মানুষের মনের ক্ষুধা মিটান। বাইরের ক্ষুধা ধারা মেটান, আমরা তার দাম দিই। কিন্তু মনের ক্ষুধা ধারা মেটান, তাঁদের দাম আমরা দিই না। তাঁরা প্রচ্ছন্নই থেকে যান। শ্রষ্টা যে, তাঁর সৃষ্টিতেই সুখ। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সৃষ্টির সুখেই তিনি মগ্ন থাকেন।

দেশের জন্ত ধারা নির্যাতন ভোগ করে তাঁরা ফুলের মালা পায়। কিন্তু ধারা এদেরকে ফুলের মালা পাওয়ার মত করে গড়ে তুললেন, তাঁরা তো মালা পান না, তাঁরা সব সবয়েই থাকেন লোকচকুর অন্তরালে। আল্লাহ যে এক বড় শ্রষ্টা, তিনিও তাই মানুষের দেখার অতীত, কল্পনার অতীত। তিনি শ্রেষ্ঠ শ্রষ্টা, তাই তিনি সবচেয়ে বেশী গোপন।

বসন্ত বনে হিরোজা জাংগর, মনে আনন্দ-শিবরণ তোলে। দক্ষিণা বাতাস বয়ে ধাবেই। তাকে নিশা করলেও সে বয়ে বায়,

প্রকাশ করলেও বয়ে যায়। কোকিলের গানকে ধারণা বললেও কোকিল গান গাইবেই। গায়কও তাই; সে সৃষ্টির আনন্দে গান গেয়ে যায়। কারো নিন্দা-প্রশংসা সে ভর্তা।

জমিরদীন যে ধান বাংলায় বেখে গিয়েছেন, তার দাম বাংলার জনেকেই জানে না। আজ আমরা যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাচ্ছি, এতে তাঁর রূহ উপর থেকে তৃপ্তি লাভ করছে।

জমিরদীন খান সাহেব ছিলেন খান্দানী গাইয়ে। তিনি কুঁয়ী-সত্রাট। ওস্তাদ মইজুদ্দীন খানের পর, তাঁর মত কুঁয়ী-গাইয়ে আর কেউ ছিলেন না, এখন ত নাট-ই। ঞ্চন্দ, খোয়াল, টপপা, গজল, দাদরা, সব সুরেই তিনি ছিলেন সুশ্রুতি! গ্রামোফোন কোম্পানীর বেকর্ডে তিনি হাজার হাজার সুর বেখে গিয়েছেন। যে কোন সুর তিনি adopt করতে পারতেন। বহু নূতন সুর তিনি আবিষ্কার করে গিয়েছেন। ইনি লোকের যে কতটা শ্রদ্ধার পাত্র, তা বেঁচে থাকতে জানতে পারেন নি। এতদিন তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পরিনি, কাজেই আজকের সভায় তার কতকটা প্রোক্ষিত করতে পেলাম। তাঁর নামকে অক্ষয় করে রাখতে হলে ইউনিভার্সিটির সাহায্য নিয়ে একটা Classical music চেয়ার স্থাপন করা দরকার, কিংবা তাঁর নামে ইউনিভার্সিটি থেকে একটা মেডেল ঘোষণা করা দরকার। সেজ্ঞাত যে টাকা প্রয়োজন, তা একটা কমিটি গঠন করে সংগ্রহ করতে হবে। তাঁর হিন্দু-মুসলমান হাজার হাজার কৃতী ছাত্র রয়েছে। আমরা যদি এ কাজ করি, তবে, একটা কাজের মতো কাজ করা হবে। দেশ যদি স্বাধীন হয়, তবে সেদিন জমিরদীনের কবর হবে। কিন্তু আমাদের পরবর্তী যুগে আমাদের বংশধররা যেন সেদিন যেন করবার অবসর না পারবে, আমরা নির্বোধ ছিলাম, গুণীর আদর করতে জানতুম না। কেবল রাজনৈতিক নেতাদিগকে শ্রদ্ধা জানালে চলবে না, যারা ছিলে তিলে আপনাদের জন্ত নিজেদের বিলিয়ে দিল, সেই সব কবি গায়ক ও সাহিত্যিকদিগকেও সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে হবে। আপনাদের আনন্দ দানের জন্ত যিনি তিলে তিলে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেই জমিরদীন খানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা আপনাদের জন্ত একান্ত কবজ। আপনারা তাঁর শোকসভা করে তাঁর প্রতি আপনাদের কর্তব্যই করলেন। *

তুমুগীত

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক যান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন শুষ্ক হবার লগ্নেই সংবেদনশীল কবিচিতে ঠিকই ধরা পড়েছিল:

“লক্ষ্মীমেয়ে বারা ছিল

তারাই এখন চড়বে ঘোড়া, চড়বে ঘোড়া।

ঠাট ঠমকে ঢালুক চতুর্

সভা হবে ঘোড়া ঘোড়া!!”

* ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ওস্তাদ জমিরদীন খান ইতিহাস করেন। ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর শোকসভার সভাপতিত্বই কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই অভিভাব্য প্রবর্তন করেন।

আর তার কল প্রকৃতির কোলে পল্লীবাংলার সুপ্রাচীন সৃষ্টি-সম্ভার বিজড়িত সমাজের সংস্কৃতি, ‘কোন সে কালের কঠ থেকে’ উৎসবিত যে প্রকৃতিসন্তান মানব-মানবীর বিশ্ববিষয় প্রাণের স্বপ্নকল্পনার মায়াবাক্য মাথানো দৃষ্টির এ স্বন্দর ভুবনে বাঁচবার ও আবির্ভৌতিক কামনার মধুর-সুতীত ও সুস্পষ্ট আকৃতির বাঙালি প্রকাশ ব্রতগুলি ধীরে ধীরে কালগর্ভে বিলীন হয়ে বাবে তার বিবাদময় স্বীকৃতিও স্তমতে পাই:

“আর কি এরা এমন করে,

সাঁজসেঁজুতির ব্রত নেবে?

আর কি এরা আদর করে

পিঁড়ি পেতে অঙ্গ নেবে?

কপালে যা লেখা আছে,

তার ফল তো হবেই হবে।”

ব্রতগুলির প্রকৃত তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করেছেন একমাত্র শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলতে পারি জীবনশিল্পী; জগতের বৃক জীবনের মর্মমূল থেকে যে শিল্প স্বতোৎসারিত তার মর্মশীলকি করে গেছেন তিনি, “বাংলার ব্রত” গ্রন্থে তার স্বচ্ছ পরিচয় মিলবে। পূর্বনো এবং বলা কথাকেই নিজের ভাষায় প্রকাশ করা সাধারণ প্রবন্ধের ধর্ম; আমার প্রয়াস তা নয়, তাই পূর্ণাঙ্গ কথাকে রচনাকারের ভাষাতেই প্রকাশ করা যাক। “ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বাসে ঘন সবুজের আড়ালে পশ্চিমাতার মধুর কাকলি”—এর চেয়ে স্বল্প কথায় ব্রতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যায় না। আর এর মাধ্যমে “একের কামনা দেশের মধ্যে প্রোক্ষিত হয়ে একটা অমুঠান হয়ে উঠেছে।” সে অমুঠানটির স্বরূপ কি?—“প্রত্যেক স্বত্বের ফুলপাতা, আকাশ-বাতাসের সঙ্গে এই সব অশান্ত্রীয় অথচ একেবারে খাঁটি ও আশ্চর্য্য রকম সৌন্দর্য্যসে ও শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালীর সম্পূর্ণ নিজের ব্রতগুলির যে গভীর বোগ দেখা যাচ্ছে, তাতে করে এগুলিকে ধর্মামুঠান বলব, কি বড়স্বত্বের এক একটি উৎসব বলব, ঠিক করা শক্ত।” এর বাহ্যিক প্রকাশ সম্পর্কে বলেছেন, “এর মধ্যে ধর্মচরণ কতক, কতক উৎসব, কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া। মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখার গলার সুরে এবং নাট্যনৃত্য এমন নানা চেষ্টার প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা। অন্তত এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করছে দেখতে পাই।” অর্থাৎ নাচ-গান-ভাষা-হাতি-প্রকৃতিতে-মানুষে মিলেমিশে ও এক সম্পূর্ণ ও সুপ্রাচীন প্রকাশ বা সংস্কৃতি। আধুনিক প্রাকৃতিক সামগ্র্যবিহীন materialistic industrialism আর নাগরিকতার সম্পর্কে এসে এই সংস্কৃতিগুলি যে ক্রমেই লুপ্ত হয়ে বাবে, এ স্বীকারোক্তিতে ক্ষোভ ও বিবাদ থাকতে পারে কিন্তু মিথ্যা ভাষণ নেই।

কেউ কেউ ব্রতের ছড়াগুলির মধ্যে উপভাসের বীজ খুঁজে পান। ব্রতের ছড়ার ধারে আবির্ভৌতিক কামনা আর কিছু কিছু খণ্ড জীবনচিত্র মিলে থাকে বলে, তাকে উপভাসের বীজ বলা যায় না। পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশে Ballad দেখা যায় না। R. G. Moulton দেখিয়েছেন Balladই হোল সাহিত্যের সমস্ত শাখার আধিষ্ণপ বা মৌলিক বীজ। অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ব্রতের

হাফে হুজা বা কবিতা, তার সাথে স্বর নিলে গান, আলপনা থেকে হুবি, হুতা, মাটি ইত্যাদির প্রাথমিক সৃষ্টি ঘটছে। এভাবে এর মাঝে কিছুটা বিচ্ছিন্ন জীবনচিত্র পাওয়া গেলেও তাকে উপভাসের বীজ বলা চলে কি ?

বা হোক, জগতের এট বে প্রাচীনতম সংস্কৃতি তা ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। পল্লী-অঞ্চলে এখনো তার শীর্ণ ধারা ও ক্ষীণ ধ্বনি শোনা যায়, আরও পরে হয়ত একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে, তখন এই হুজাগুলি আবিষ্কার করা বা পরিচয় উদ্ঘাটন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই গড়বেতা অঞ্চল থেকে একটি তুঙ্গীত সংগ্রহ করেছি। এক বয়ীলী মহিলা ছেলেবেলায় আরও প্রাচীন। মহিলাদের কাছে যে গান শিখিয়েছিলেন তা ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন, সে মহিলা প্রায় নব্বই বছর বয়সে কিছুদিন হোল গড় হয়েছেন, তাঁর বয়স্ক-পুত্র বিদ্রোহী স্ত্রীকবির স্মৃতি থেকে বহুটুকু আহরণ করা গেছে তা তুলে দিলাম।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থে এটি ব্রত সম্পর্কে বেশ কিছুটা আলোচনা করেছেন (বাংলার ব্রত ; বৈশাখ ১৩৫৪ ; ২৭-৩১ পৃঃ)। তিনি একে বলেছেন "তোষলা ব্রত" ; আবার কোথাও বলে তু'বতুলি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়ত্রই এর প্রচলন আছে। আন্তোব ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন, মানকুমের টুঙ্গগানের সঙ্গে এর বোগ আছে, এবং সেখান থেকে এর ধারা এসে পশ্চিমবঙ্গে একপ ধারণ করেছে। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিনে গড়বেতার মেখেছি তু-গ্রামের প্রাচীন-সমাজ-স্পৃষ্ট মেয়েরা দলবেঁধে গান করতে করতে শিলাবতী নদীর তীরে জড়ো হয়েছ, নদীর জলে কত গাঁদা ফুল, মাটির সরা কাগজের খোঁচাটোপ ভেসে চলেছে। অবনীন্দ্রনাথ এই ব্রতকারিণীদের সম্পর্কে বলেছেন, শ্রীতের সকালে, শীর্ণধারা নদীতীরে, তোষলা ব্রতের দিনে, সরষে শিম এমনি নানা ফুলে সাজানো সরা ভাসিয়ে, স্রোতের জলে নেমে, সূর্যের উদয়কে এবং শস্তের উদ্গমকে কামনা করছে...মেয়েগুলি...বিশ্বচাচরের সঙ্গে সূর্যের আলোতে হলুদ আর সাগা ফুল-ফুলে-ভরা ক্ষেতের মতো জেগে ওঠবার জন্যে আনন্দে উদ্গীর।

এবার সংগৃহীত তুঙ্গীতটি নিবেদন করছি।
 ছুলা গো রাই, তোমার দৌলতে আমি হু'বুড়ি পিঠা খাই
 হু'বুড়ি ল-বুড়ি, গাঙ-সিনানে রাই,
 গাঙের জলে বাঁধি-বাঁধি, পুকুরের জল খাই।
 বাঁধ মাস বরষা, পুকুর নাই বাড়ে,
 পুকুরের টলাপাতা চলমল করে,
 মায়ের কানে সাত তাল, জেয়ের বর মাগে।
 ভাই ভবী পাটেশ্বরী
 ধান কাপাসে ঘর করি,
 এস পৌষ যেও না, জনম জনম হেঁচ না,
 যদিবা ছাড়িয়ে, পরাণে মরিয়ে,
 এক কড়া কড়ি লয়া মা, দু' কড়া কড়ি,
 তা দিয়ে মা পূজা করব সোনার পৌষরী
 পৌষরী গোলে লা, পতাকাতা খেলা
 বোবফুলের মালা,

হব তোমার দাসী, তব জলে গঙ্গি।

ভবনী কলসী ললল-ল করে

হালার বেটা বহী মারে

হাকক বহী, ততাক বিল সোনার কোঁটা কলার বিল।

এবড়া রে তোবড়া, বম ছুরারে বড়া

বমের পূজা কবে কে, সাতজেরের বুন সে,

লক্ষ্মী আসে লক্ষী বাঁধ, লক্ষ্মী নি পাভাক্তি পার

সব স্তম্ভ হুজো, মোহরতলার ভাঁজো

মোহরতলার কীরের লাডু

সেঁকা হাতে সোনার পাডু

স্বপ্ন উঠে বর সবিধা ফুলের বর্ণ

আজ ঠাকুরকে আনবো আমি আনন্দ করিয়ে

কাল ঠাকুরকে পূজবো আমি টিরা গৌরা দিয়ে,

টিরা গৌরা তুলতে গোলাম সেই লতায় লতা

শিবের সঙ্গে দেখা হোল মাথাপরা কাঁটা।

ধান এল গো ছালা ছালা, তা মাপতে, তা গুপতে,

তা তুলতে এত বেলো, বাজ মাথায় দিয়ে ফুল

ধান উড়ুল উড়ুল।

বিজ্ঞ

যত কিছু এল ছালা ছালা, তা মাপতে, তা গুপতে, বিজ্ঞ।

তা তুলতে এত বেলো, বাজ মাথায় দিয়ে ফুল,

যত কিছু উড়ুল উড়ুল।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোরাকিনের



কথা, এটা
 খুবই স্বাভা-
 বিক, কেননা
 সবাই জানেন

ডোরাকিনের

১৮-৭৫ সাল

থেকে দীর্ঘ-
 দিনের অভি-
 জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভালিকার
 জন্ত লিখুন।

ডোরাকিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এন্ট্র্যান্ড ইন্সট, কলিকাতা-১

বাই উঠলো বাই উঠলো বামুন পাড়া দিয়ে ।
 উঠ গো বামুন বাঁজ খটা বাজিয়ে ।
 বাই উঠলো বাই উঠলো যত পাড়া দিয়ে ।
 উঠ গো বত-বা বত কিছু নিয়ে ।
 চাল পোটা দুই বাঁ গো নুদন, ভাত পোটা দুই বাই ।
 কড়ির বোড়া মাথায় নিয়ে বামুন পাড়া বাই ।
 বামুন ভাই বামুন ভাই হবে আজ হে ।
 আমার সুন্দনের বিয়ে সোম মঙ্গলবারে ;
 তোমরা বত কিছু জোগাবে ভাবে ভাবে ।
 লাইবো তোর সাগরে, চুল কাঁড়ব চামরে
 পাঁচ মাঝবো ভমবে, আলো ধানের কালো চুল
 ডাঁড় ডাঁড় এওরীং কুল ॥ ইত্যাদি...

বর্তমানে আধুনিক গায়িকারা ত্রুতগীতের কিছু কিছু গাইছেন,
 ৩. তবে মধ্যে ত্রুতগীতের সেই লোকসুর থাকছে না, তাকে শৈল্পিক প্রয়াসে
 প্রা. সজ্জিত ও বাস্তবিক করে তুলছেন ।

ইউনি.

করা নয়

বোষণা ৬

আমার কথা (৬০)

শ্রীসলিল চৌধুরী

কমিটি গঠনকৃত বৎসর আগের কথা । তেজস্কুমারের উল্লান্ত কণ্ঠে সকলে
 হাজার হাজার গুনল প্রায় বাসলার তিনটি রূপও সন্নিবিষ্ট—‘পাকী চলে’,
 ‘জবে, একদল’ ও ‘গাঁয়ের বনু’ মনে গেঁথে রইল সেগুলি—গুনগুনিয়ে উঠল
 হয়, তবে কে কিছুর খোঁজ করল সকলে কে এগুলির সুরকার ? সেদিনের সেই
 বৃন্দে জানা সুরপ্রদাতা হলেন আজকের প্রখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীসলিল চৌধুরী ।
 পাচ



১৯৩১ খ্রিঃ
 ইতিহাস করেন ।
 শোকসভার সভাপতিত্বে
 প্রকাশ করেন ।

শ্রীসলিল চৌধুরী

সাদাসিধা, মাকারী গঠন ও পরিহাসপ্রিয় এই ব্যক্তিত্ব
 সহিত আলাপে জানতে পারি :—

দক্ষিণ বারাসাত (বহদ্র) গ্রামের ডাক্তার ৮জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী ও
 কোদালিয়া বোম্বাশের তনয়া শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর চার পুত্র ও
 চার কন্যার মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান আমার জন্ম হয় কলিকাতায় ১৯২৫
 সালের ডিসেম্বর মাসে । যখন আমি বহুমুখী বাকীপুর কোর্টের
 বিচারক, তখন আমার ঠাকুরদাদা ৮রামতারণ চৌধুরী তৎকালীন
 প্রবীণতম আইনজীবী ছিলেন । ১৯৩১ সালে হরিনাতি বিজ্ঞান
 থেকে প্রবেশিকা, ১৯৪১ এ বঙ্গবাসী কলেজ হইতে আই-এস সি ও
 ১৯৪৪ সালে সেখানে থেকে ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স সহ প্র্যাক্টিসেট
 হই । বাবা আসামের চা-বাগানে ডাক্তার ছিলেন—শরীর ধারাপ
 হওয়ার তথ্য পুরা এক বৎসর থাকি । বাবার ইচ্ছা ছিল
 চিকিৎসাবিজ্ঞা অধ্যয়ন করি কিন্তু তা আর হল না । বর্তমানিক
 (এম-এ) ক্লাসের ছাত্র থাকার সময় সক্রিয় রাজনীতিতে
 জড়িয়ে পড়ি । প্রথমে ছাত্র আন্দোলন পরে কিবাণ আন্দোলনে
 লিপ্ত হওয়ায় প্রায় তিন বৎসর গ্রামে গ্রামে সঙ্গঠক
 হিসাবে ঘুরি প্রায় গা-ঢাকা দিয়ে । ছাত্রাবস্থায় সাহিত্য
 চর্চার দিকে ঝুঁকি পড়ি কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লেখা শুরু
 করি কিন্তু এগুলি পড়ে শোনাতাম মা ও ভাইবোনদের ।
 কলেজে পড়ার সময় কবিতা ও ছোট গল্প কিছু কিছু প্রকাশিত হত,
 নতুন সাহিত্য ও পরিচয় । আমার লেখা ডোন্স টেবিল গল্পটি
 ১৯৪৬ সালে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় । ১৯৫৮ সালে ‘নতুন
 সাহিত্য’তে উহা পুনর্মুদ্রিত হয় ।

আমাদের বাড়ীতে গানের খুব চর্চা হত । ঠাকুরদাদা ও বাবা
 প্রায়শে থাকার জামাহাশয়ের কালকাতার বাড়ীতে আমি ছিলাম ।
 তাঁহার পুত্র ৮নিগিল চৌধুরী (ছোড়দা) মিলন পরিবন-এর অর্কেস্ট্রা
 পাটির পরিচালক ছিলেন । বাল্যকালেই তাঁর কাছে আমি পিয়ানো
 ও অন্যান্য বাজনা বাজাতে শিখি । আমার গান শেখার প্রাথমিক
 ভিত্তি ছোড়দার নিকট হয় । ছোড়দার অনুরক্ততার জন্য চার
 বৎসর পরে মামারবাড়ী হরিনাতিতে চলে আসি । সেখানে
 গানবাজনা নিবন্ধ ছিল, তার জন্য ছয় বৎসর সঙ্গীতহীন হই ।
 মধ্যে মধ্যে বাঁশের বাঁশী বাজাতাম লুকিয়ে, ক্রমশঃ বাঁশী বাজিয়ে
 হিসাবে নাম হল । মামার আর আপত্তি করেননি । বি.
 এ পড়ার সময় প্রাচ্যে জীতিমরবরণ ডটাকার্যের অর্কেস্ট্রা দলে
 বাঁশীবাদক হিসাবে যোগ দিই ।

১৩৫০ সালের বাঙ্গলা মঞ্চত্বের সময় সর্বজনমাত্রা নেত্রী
 পরলোকগতা সর্বোজ্জ্বল নাইডুর উৎসাহে ছাত্রদের একটি দল আমার
 ও বাঙ্গলা পরিভ্রমণে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে । উহাতে
 আমি সঙ্গীত লেখক, শিল্পী ও বাহক হিসাবে স্থান পাই এবং নিজেকে
 সঙ্গীতপ্রিয়গী হিসাবে আবিষ্কার করি—ইহার পূর্বে কোনদিন আমি
 সঙ্গীত সাধনা বা সঙ্গীত বরাণার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করি নাই ।

প্রথম আমি গান লিখিতে আরম্ভ করি গ্রাম-বাংলার উপযুক্ত
 সব বকম আন্দোলনের উপর । I P T A-এর মাধ্যমে লোকসঙ্গীত
 বিশেষভাবে চালু হইতে থাকে এবং আমি উহার সহিত জড়িত থাকার
 ভারতীয় সঙ্গীত সাম্রাজ্যের গভীরে প্রবেশ করি । তখন থেকে
 লোকসঙ্গীত নিয়ে চলে আমার বিরোধ—জায়ে আমার অঙ্গাঙ্গী—

উঠা আমার অঙ্গপ্রস্থ—করি অঙ্গুলন—মেধি প্রবেশ তেজ ভারতীয়
সত্যতার বিভিন্ন রূপ—যুগে পাই জাতীয় স্বাধিকার বিনিয়াদী এক্য—
কবিগুরু ভার্য 'বহর মধ্যে এক।' ১৯৫৫ সালে প্রথম ভারতীয়
কিন্ম তেলিসেশনের সন্মত হিসাবে রাশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপের অস্ত্রান্ত
দেশে ভ্রমণের সময় আমি প্রায় দুই হাজার লোকসঙ্গীতের রেকর্ড ও
লেখা সংগ্রহ করি।

মেগাকোনে আমার প্রথম গানের রেকর্ড হয় 'নবাক্ষণ রাগে
যাত্রা রে' ও পরে এচ, এম, ডিতে সুরচিত্রা মিত্রের সহিত বৈচিত্র্যসঙ্গীত
'আমাদের নানান দ্বতে নানান দলে দলানলি।' আই, এন, এ,
ট্রায়াল ও নিখিল ভারত বর্ষধর উপর আমার গাওয়া গান নিখিল
করা হয়। আমার লেখা 'সঙ্কেত' নাটকও নিখিল হয়।

সঙ্গীত আমার profession হবে—এ ধারণা কোনদিনই আমার
ছিল না। ১৯৪১ সালে একদিন অষ্টারলানী ময়মেন্টের তলার
অস্থগীত এক সভায় আমার পরিচালনার একটি গান হয়। ফিল্ম-
পরিচালক শ্রীমন্তোনা বরু উহাতে উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে
তিনি আমার ডাকিয়া জানান যে তাঁহার পরিচালনাধীন 'পরিবর্তন'
ছবিতে আমাকে সঙ্গীতকার হিসাবে বোণ দিতে হবে। আমি ত
অবাক! কিন্তু সন্তোষদা' অভয় দিলেন। দর্শকেরা ভালভাবে গ্রহণ
করেছিলেন উক্ত ছবি ও উহার গানগুলিকে। তার পর বরষাত্রী,
পাশের বাড়ী ইত্যাদি বাংলা ছবিগুলির সঙ্গীত-পরিচালক হই।
তখন থেকে পাকাপাক্যভাবে সুরকার হিসাবে থেকে বাই।

আমার বোঝাই গমনের কথা বলি। প্রাথমিক জি-পরিচালক
শ্রীবিমল রায় কলিকাতার এলেন কাছে। আমার লেখা
'বিজ্ঞাওয়াল' গল্পটি তাঁহাকে পড়ে শোনাই। বিমলদা' কেমিস্তর
মতামত দিলেন না। মনে করি লেখা ভাল হয় নাই। পনের
দিন বাদে বোঝাই থেকে বিমলদা'র টেলিগ্রাম যে, পরাতি
হিন্দীসংস্করণ তোলা হবে—সেজ্ঞ আমার বোঝাই গমন।
'বিজ্ঞাওয়াল'র চিত্ররূপ হল 'দো বিথা জমিন'—চিত্রনাট্যকার
ও সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে আমাকে থাকতে হল। এর পর
হল 'বিরাজ বউ'। তাতেও আমি রইলাম। সেই থেকে
এপধ্যস্ত বোঝাইএ তোলা অনেক ছবিতে আমাকে পুরশিষ্টী
হিসাবে কাজ করতে হয়েছে। বোঝাই আমার প্রধান কর্মস্থল
হওয়ায় সম্প্রতি সেখানে একটা নিজের বাড়ী করেছি।—পিতার
স্মৃতিচিহ্নিত—নাম 'জানকুটার'।

১৯৫২ সালে শ্রীগিরিজাভরণ ভট্টাচার্য্যর কন্ঠা ও সরকারী আর্ট
কলেজের ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা ছাত্রী শ্রীমতী জ্যোতি দেবীকে বিবাহ করি।

৩১শে জানুয়ারী ৫৭ সালে সর্বশ্রী বিমল রায়, অনিল বিশ্বাস,
কে, এ, আকাশ, লতাশ্রুঙ্গেশ্বর, মান্না দে প্রভৃতির সহায়তায়
'বোধে ইয়ুথ কয়ার' গঠন করি। কলিকাতায় সম্প্রতি কন্ঠা দেবী ও
মিজেন্সে স্থাখাজি উহা গঠন করিয়াছেন।

আমার জিজ্ঞাসার শ্রীচৌধুরী বঙ্গেন, কলিকাতায় অস্থগীত বিভিন্ন
সঙ্গীত-সম্মেলনগুলি জ্যোতাদের মনে গানের taste এনে দিতেছে।

মৌসুমী মন

উর্মিমালা চক্রবর্তী

বাখারা যতাই মিছিলে নায়ক

জীবন জুড়ে,

না হয় স্রাস্তির ঢেউ উত্তোল করুক

এ সায়র-দেহ,—

লোকমান তিলমাত্রই—

লাবণী-হ্রদের বিরম্বিরে এই সন্ধ্যায়

কান্না নায়ক খই খই।

কোন শুষ্ক-চোখে কমলার কঁায়া

জন্মেছে?—জয়ক, জন্মেছে।

স্বরোমে সেতারে আশারা কঁাহুক

কল্প বিপ্রসঙ্গে।

কোন মূগে এ কান্নার ময়া খাম্বে?

আজ বোণ-বিরোগের খতিয়ান-খাতা

না হয় রইল রুদ্ধ।

শেরেছো গোলাপ—শতল, শেত, শুধ,

সত্যক, মন্ত?—

ভবে হিসেবের খাতা ভুলে রাখো তাকে

না হয় হোলই পত।

আবাচে-মেঘ আসবে জীবনে আসবে;

কবে বৈশাখী-বায়ু চুলচুল দেহে

শিউলী-শাখার নাচবে?

তাই থাক্ না আজকে থাক্ না সময় কেনা।

নিশীথ-অন্ত নক্ত-সখী কি

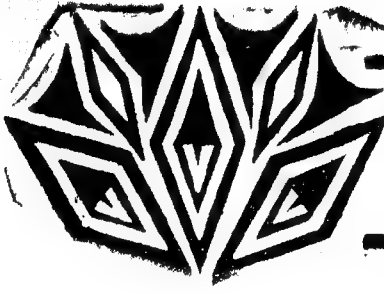
হিলহিলে চলে দোলাবে হাসুহুহেনা?

যদি বৈশাখী-মেঘ ঢেকে দেয়

এ মৌসুমী মন,

তবু অন্ধকারের বন্ধে আঁকব—আঁকবই

বিদ্যুৎ-কল্প।



সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাংস্রতিক বই

ঐতিহ্যচরিতাবৃত—গত সংস্করণ—আনিলীলা

এই আদি দৃষ্টান্ত সভ্য যে চৈতন্যদেবের কৃপাতেই বলতে গেলে বাঙলা সাহিত্যের জন্ম। একে অস্বীকার করা কোন দিকই চলে না। পৌনে পাঁচ শ' বছর আগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বিখ্যাত অশ্বার কল্পার উজ্জলতম উদাহরণ। চৈতন্যদেব প্রত্যয় বাঙালীকে আত্মনির্দেশে উৎসাহ করল। তাঁর প্রভাবে বাঙালীর প্রাণপন্থার জোয়ার এল, বাঙালী জাগল, এল নব জাগরণ, এল নব চেতনা, এল নববুগ—সেই বুগের প্রাণপ্রাতিষ্ঠাতা চৈতন্য। তাঁর বিরাট ভাবনাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য চৈতন্যভাবনী গড়ে উঠে লাগল এবং এই চৈতন্যভাবনী অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই মূলতঃ বাঙলাসাহিত্য জন্ম নিল। সাহিত্যের যে অভাব শূন্যতা, বিষয়বস্তুর অপ্রাচুর্য ছিল চৈতন্যভাবনীর দ্বারা ভরা হৃদয়ত্ব হল, সাহিত্যের জীবন্যত্ব বর্ণ সভাবনার ভরে উঠল, তার ভেতরে আকাশে মঙ্গলশব্দ বেজে উঠল, তার সিংহাসনে হুগুত্ব বাসোদ্ভাটল। সাহিত্যের তথা জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে এদের প্রভাব অনতিহ্রাস্য। বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি করল যে চৈতন্যভাবনীগুলি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতাবৃত। এর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বব্যাপিসম্মত। এর গ্রন্থমূল্য অপরিসীম। মহাপ্রভুর অনন্তসাধারণ লীলামাধুর্য পরম ভক্তি রসের সঙ্গে এতে বর্ণিত হয়েছে, বৈকর সমাজে এই গ্রন্থ চিরকাল পূজা পেরে এসেছে। চৈতন্যদেব বলতে পাঁচ শ' বছর আগেকার বাঙলা দেশের সাংস্রিক ইতিহাস—সেই ইতিহাসই স্থানলাভ করেছে এই পবিত্র গ্রন্থে। মহাপ্রভুর জীবনের পবিত্র কাহিনীগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের সৌন্দর্যে বর্ণিত নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। নরনাথ চৈতন্যদেব পাবনসে অজস্রের শ্রেষ্ঠ ভক্তি নিবেদন করে যেন গ্রন্থ রচনা শুরু করেছে। ইতিহাস, বর্ণন ও কাব্যের ত্রিবিধী সম্মত হয়েছে এই গ্রন্থে। এর সজ্জা, সরল, প্রাঞ্জল রূপগানে ক্রীতদুর্ভবন ডোচাঁও বর্ণিত কবিতার পরিচয় দিয়েছেন। ভক্তি, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই বহু প্রায়সিক তিনি সার্থক করে তুলেছেন। তাঁর রচনা মূল গ্রন্থের পবিত্রতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই গ্রন্থটি রসিক ও ভক্ত সমাজে বর্ণিত পরিমাণে আদৃত হবে এ বিশ্বাস আমাদের। রাখেতে পারি। প্রকাশক—বৈকর প্রাচীনী সমিতি, ১০-এ, ডোভার রোড। পণ্ডিতবর্গ—ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ৪৬, নর্থ সেন স্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

আমাদের শাস্ত্রনিকেন্তন

ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি এবং বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য শ্রীস্বরাজেন দাসের জীবনকাহিনী বীণের অজানা দর—তাঁরা বিশেষ ভাবেই অবহিত যে স্বরাজেনের বালাজীবন কেটেছে শাস্ত্রনিকেন্তনে তর্কাত্মক স্বরাজেনের জীবনের এমন একটা সময় শাস্ত্রনিকেন্তনে কেটেছে যে সময় শাস্ত্রনিকেন্তনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-সংস্পর্শে তিলে তিলে অধুবোধগম্য হচ্ছে। স্বরাজেনের গ্রন্থে শাস্ত্রনিকেন্তনের শিখনে ফলে আসা সেই প্রথম বুগটির অসংখ্য কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, রচনার উৎকর্ষে সেই সময় বুগটিই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে গ্রন্থের পাতায়। গ্রন্থটি প্রমাণ করল যে স্বরাজেন দাস কেবলমাত্র একজন দুরন্তর আইনজ্ঞই নন, তিনি একজন দক্ষ সাহিত্যশিল্পীও। শাস্ত্রনিকেন্তনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য কাহিনী, অসংখ্য চরিত্র স্বরাজেনের লেখনীর মাধ্যমে গ্রন্থে নতুন করে রূপ নিয়েছে। বহু প্রবণতা ও ধ্যানতামা ব্যক্তির সন্ধানও বিভিন্ন উল্লেখ গ্রন্থটিকে ক্রীসঙ্গত করে তুলেছে। শাস্ত্রনিকেন্তনের তৎকালীন আবহাওয়া, আবহাওয়া ও পরিবেশকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে স্বরাজেন বর্ণিত কৃত্তি দেখিয়েছেন। তাঁর বর্ণনাকৌশল যেমনই সরল, তেমনই চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থটি সব দিক দিয়েই তাঁর রচনাতৈলপূর্ণের পরিচয় বহন করছে। প্রকাশক—বিশ্বভারতী ৯৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর সেন। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

আমেরিকায় শিশিরকুমার

বাঙলাদেশের বঙ্গালয়ের ইতিহাসে ১৯৩০ একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছর নটগুপ্ত শিশিরকুমার সঙ্গশ্রমণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাঙলা নাটক অভিনয় করে আসেন। বহু নানাবিধ কারণে শিশিরকুমারের এই অভিনয় সর্বতোভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি, তথাপি এর ইতিহাসমূল্য অনস্বীকার্য। আজকের দিনে বেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাংস্রিক দৃষ্টের দল প্রেরিত হলে আমরা স্বভাবতই গর্ভ বোধ করে থাকি। কিন্তু বৃটিশের যুগে এই জাতীয় স্ফূর্তি আমাদের কণ্ঠগোচর হলে গর্বের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশ্ববোধও করতুম বর্ণিত পরিমাণে। সৌকর্য দিয়ে বিচার করলেও নটগুপ্ত এ অভিনয়ের ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য অস্বীকার্য। শিশিরকুমারের এই অভিনয় যেমনই ভূতপূর্ব তেমনই বাঙলা নাট্যলয়ের তথা সমগ্র দেশের গৌরববোধ

প্রাকৃত সম্ভাব্যতা বহুল। এই অভিব্যক্তি সম্প্রদায়টির সম্প্রদায়ের মধ্যে দলবী নাট্যকার প্রাধিকৃত। অভিব্যক্তি। স্বর্গত: বোগেশচন্দ্র চৌধুরীও সম্ভবত:। কলকাতা থেকে বাহা গুরু কবির প্রাকৃতবৃত্ত থেকে জন্ম সম্ভব করে কবিতা হ'বে ঐশ্বর্যে গিনী পৌত্তম পর্বত খুঁটিনাটি বিশদ বিবরণ বোগেশচন্দ্র একটি রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই রোজনামচাটি এবং "হাটিনী হার" নামক তাঁর একটি অপ্রকাশিত নাটক একত্রে গ্রন্থরূপ নিচ্ছে। বলা বাতুল্য হয়ে যে এই গ্রন্থটি লিপিবদ্ধকারের আমেরিকা অভিব্যক্তির একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তুলে ধরেছে, প্রসঙ্গতই আমেরিকারও আভ্যন্তরীণ বহির্বিব আলোচনা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কেবলমাত্র লিপিবদ্ধকারই নয়, জন্মগত সম্প্রদায়ের প্রতিটি সম্ভব বোগেশচন্দ্রের লেখনীর মাধ্যমে সমগ্র দর্শনার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছেন। গ্রন্থলেখ্যে বোগেশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী যুক্ত রয়েছে। লিপিবদ্ধকারের এবং আভ্যন্তরীণ লিপিক্রমের আমেরিকা জন্ম উপলক্ষে যে একাধিক আলোচকিত আছে—সেগুলির অন্তর্গত: একটিও যদি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হত তাহলে গ্রন্থটি আরও শোভন হয়ে উঠত। লিপিবদ্ধকারের শুধা বাঙালার নাট্যভাবগায়ক হল এই গ্রন্থ পাঠে প্রচুর আমদ পাবেন। "প্রকাশক—অক্ষয় চৌধুরী, ১এ নন্দলাল দত্ত সেন, পরিবেশক—বৃক্স হ্যাণ্ড বুক, ১৭ খরতলা স্ট্রিট, দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

নবমূল-অনূদিত ওমরথৈরাম

জগতের কাব্যসম্পাদনের সমৃদ্ধি ও পুষ্টির ইতিহাসে ধীরে ধীরে স্বাক্ষর চিত্রকালের ভক্ত অমলিন হয়ে আছে পারস্যের গুমরা-ধৈর্য্যময়ী তাঁদের অন্ততম। তাঁর কবাইয়াৎ তাঁকে অমর করে রেখেছে। এই বিশ্ব-বিখ্যাত কাব্যনির্মণটিকে বাঙালার রূপান্তরিত করেছেন মনীষী বিজ্ঞেননাথ ঠাকুর, কাজিচন্দ্র ঘোষ, চেয়েশ্বরকুমার রায়, নরেশ্বর দেব প্রভৃতি। বিজ্ঞেননাথের অনুবাদ ছাপার হরকে কখনো প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই তবে তারই কোন কোন আবৃত্ত পাঙ্ক্তি বিশেষ মাঝে মাঝে আনুষ্ঠানিক করতেন অবনীন্দ্রনাথ) বাঙলা দেশের কাব্য-ইতিহাসের একটি গোঁবরময় অধ্যায়ের স্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতার জগতে নজরুল একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব। গুমরা-ধৈর্য্যের কবাইয়াতের একটি অনুবাদ নজরুলও করেছেন। "স্বরগ থাকতে পারে, তিন-চার বছর পূর্বে এই অনুবাদটিই কিয়দংশ ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বন্ধুমাণ্ডিতে প্রকাশিত হয়েছিল। যে নিজস্বতা নজরুল প্রতিভাকে রূপ দিয়েছে তার সুস্পষ্ট ছাপ গ্রহে বিভ্রমান। নজরুলের এই অনুবাদকর বোধে রসোত্তীর্ণ, এর চন্দ্র লীলাযিত, এর তাবা-চিত্রবহল। শব্দচয়নে, ভাববিকাसे, বর্ণনকুশলতার এই গ্রন্থটিও নজরুলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তিগুলির মধ্যে গণ্য হবার যোগ্যতা রাখে। ভবরের জীবনলক্ষণের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নজরুলের অনুবাদের মধ্যে প্রতিকলিত হয়েছে। আগুন বিস্ফোটতার গুমরেও এক নতুনস্তর রূপে দিসেন নজরুল। গুমরের কবিরচিত্রের ক্ষুদ্রাতিশুক্স তার ধারাগুলির সম্যক বিকাশ ঘটেছে নজরুলের লেখনীর মধ্যে দিয়ে। এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন উত্তর সৈয়দ মুজতবা আলী। কাব্যরসিক হলেন গ্রন্থটি সমাদৃত হোক, এই কামনা। প্রকাশিকা—জোহরা খানম, ১ এন্টনিবাগান লেন। পরিবেশক—হ্যাণ্ডাউট পাবলিশিং, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। দাব—বশ টাকা বাজ।

ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ

লগ্নের আশ্বিনের ফিল্প হলেও আশ্বিনের এত পথিগিল্লি যে
যলতে গেলে তার সবকীর কোন তথ্যই প্রায় আশ্বিনের অভ্যাস
নয়। লগ্নের সবচেয়ে অসংখ্য পুস্তক ঐ অকল সবকীর আশ্বিনের
কৌতুহল বহুকাল ধরে লব করে আসছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি
লগ্নের সম্পর্কীয় হলেও গাভাভূগতিক দ্বারা লিখিত নয়, এক সম্পূর্ণ
স্বাভাবিক স্পর্শসম্বন্ধ, ব্যাখ্যিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অতীতকাল
পূর্বে এই গ্রন্থটিই বাসাবাহিক জাবে দাসিক বস্তুমতীর পাতার
প্রথম আশ্বিনপ্রকাশ করে। এখ লেখক হুগুগিল্লি সাহিত্যিকার
ঐতিহ্যিক গোষ্ঠী মতাসময়ের পুত্র ঐতিহ্যমূল গোষ্ঠী। হিমালয়
গোষ্ঠীই এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে লগ্নকে দেখেছেন যা সব
দিক দিয়ে স্বাভাবিক ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। লগ্নের ভিত্তিকার
লগ্ন তাঁর চোখে বহা পড়েছে। গ্রন্থের নামকরণই প্রমাণ করে
লেখকের দৃষ্টি কেবল গভীর থেকে গভীরে দাবিত হয়েছে। লগ্নের
সাধারণ দায়িত্ব, তাদের জীবন, তাদের ভাবধারা এ গ্রন্থে লক্ষ্যের
সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তাদের লগ্ন ভূগ, হাসি কান্ডা এবং লেখকের
হয়তী হন ও বলিষ্ঠ লেখকের সমগ্র দ্বারা উপরোক্ত শিরোনামের
এক পথম স্বপথ্য সাহিত্যের লগ্নি হয়েছে। এ গ্রন্থ কেবলদ্বারা
সাহিত্যেরসহই উৎস নয়, নানা তথ্যে পুষ্ট, লেখকের ভাষা তথ্য
রচনাশৈলী নিম্নলিখিত প্রশংসনীয়। তাঁর লেখকজীবনের ভবিষ্যৎ
সম্বন্ধে আমরা উজ্জ্বল আশা পোষণ করি। প্রকাশক—ইন্ডিয়ান
স্ট্রাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ ১৩ গান্ধী রোড। দাম—
তিন টাকা মাত্র।

গ্র্যাণ্ড হোটেল

মূলতঃ লেখিকা শ্রীমতী ডিকবিউম সাহিত্যের দরবারে বখেট খ্যাতি
আসনে মুদ্রিত। তাঁর 'গ্রাণ্ড হোটেল' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ।
এছাড়া তাঁর অসংখ্য লেখনা-প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এই
গ্রন্থে লেখিকার বক্তব্যগামী ভবিষ্যৎের পরিচয় মেলে। গ্রন্থে
চরিত্রসৃষ্টিতে ঘটনা সংস্থাপনে এবং সংলাপ রচনায় লেখিকা বখেট
শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বক্তব্যও যেমনই জোরালো তেমনিই
যুগোপযোগী। গ্রন্থটি বক্তব্যের বলিষ্ঠতার কল্যাণে ছাত্রদের দাবী
সংগঠিত পাঠ্য। এর আবরণে মাছের মনে বখেট প্রতিক্রিয়ার
সৃষ্টি করতে পারে। এই গ্রন্থটিতে বর্তমান সভ্যতার একটি জীবন্ত
বাস্তবচিত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থটিকে আধুনিক সমাজের আগামী
চিত্রের সূত্রবাহী বলে যেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকতে
পারে না। গ্রন্থটি বাঙালার অনুবাদ করেছেন মুসাহিত্যিক
শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। তাঁর অনুবাদগ্রন্থের সাহিত্যিক দাবী
অস্বল্প রেখেছে। রচনার মূল সুর কোথাও বাহত হয়নি।
ভাবা প্রাঞ্জল, রচনাশৈলী চিত্তাকর্ষক, সমগ্র অনুবাদকর্ম সর্বতোভাবে
অনুবাদের নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অনুবাদকের অনুবাদধারাও
প্রশংসনীয়। প্রকাশক গ্রন্থভবন, ১৩ গান্ধী রোড। দাম ছ'
টাকা মাত্র।

হাঘের চোখ

শিল্পের উপযোগী সাহিত্য রচনার মাধ্যমে বাংলার প্রতিভা
বিকাশ লাভ করেছে শ্রীমতী সীতা মল্লিকের তাঁদেরই একজন—এক

ভীষের মধ্যেই এক বিশেষ আগনের অধিকারিণী। ছোটদের উপযোগী অসংখ্য গ্রন্থ তাঁর তত্ববী-দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে। 'বাক্যের চোখ' তাঁর একটি সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ। তাঁর পূর্বসূর্য্যম এই গ্রন্থে ক্ষুদ্র আছে। অনেকগুলি ছোটগল্পের সংকলন এই গ্রন্থে। গল্পগুলি পাঠ করে ছোটরা যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানদরস আধাঙ্গনে লক্ষ্য হবে। গল্পগুলির আবেদন শিশু-চিত্তে রেখাপাত করতে সক্ষম হবে। শিশুদের কোমল মনে গল্পগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করার দাবী রাখে। প্রকাশক—গ্রন্থম, ২২/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট।

পরিবেশক—পত্রিকা সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড ১২-১, সিওসে স্ট্রীট। দাম দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

অজ্ঞা কোনখানে

বাঙালি দেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে সৌরীন সেন নবাগত শিল্পী। তবে তাঁর "অজ্ঞা কোনখানে" প্রকাশ করল নবাগত হলেও তাঁর আধিক্য দ্বারা সন্তোষনা ও প্রতিফলিত স্বাক্ষর বহন করে। দুইভাষা ইংরেজিও কেন্দ্র করে এর গল্পাশ গড় উঠেছে। গল্পের মধ্যে ত্রিভুজ প্রেমের এক জলসম্পর্কী আলোচনা পরিবেশিত হয়েছে। প্রেমের দ্বায়ে দুইভাষা ইংরেজিও ও পশ্চিম ভারতীয় নরনারীকে কিংবা ভাবে জানার সুযোগ মেলে। গ্রন্থের ভাষা মালিন্যমূর্ণ, লেখকের চরিত্রবিভাগ কলকাতার স্পর্শযুক্ত বর্ণনামূলক চিত্রাকর্ষক। গ্রন্থের নামকরণটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশক—বাইটাস/সিন্ডিকেট, ৮৭ বর্তমান স্ট্রীট। দাম পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

অস্তি ভাগীরথীতীরে

রবীন্দ্র কাহিনীর প্রস্তারপট ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের খ্যাতি সম্বন্ধে বিস্তৃত হলেও এ কথাও কারো অজানা নয় যে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণ উপজাতি রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর লেখনী অক্ষম নয়। আলোচ্য উপজাতি তাঁদের থেকেও একটু ব্যতিক্রম। কলকাতার প্রাচীন ইতিহাস এর পটভূমিকা। কলকাতার জন্মভূমি থেকে শুরু করে তার ক্রমবিকাশ তৎকালীন পরিবেশ-আবহাওয়া, জীবনযাত্রা, নব্যায়ন্য প্রভৃতি বিষয়ে লেখক আলোকপাত করেছেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিক আশ্রয় করে একটি পরিবারের উপান-পতনের অতি বিচিত্র কাহিনী তুলে ধরেছেন ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। উপজাতির দিক দিয়ে, সাহিত্যের দিক দিয়ে, রচনার দিক দিয়ে গ্রন্থটি সর্বতোভাবে লেখকের দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। উপজাতির পতি চিত্রাকর্ষক, ভাষা, বর্ণনা, বিব্রাস সকল দিক দিয়ে মনোমুগ্ধকর। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে এই গ্রন্থে যেখানে ইতিহাস এসেছে, সেখানে সাল-তারিখের ব্যাপার এসেছে সেখানেই লেখক অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর ভ্রমের পরিচয় দিয়েছেন। সেখানেই লেখক ত্রিভুজের খেঁচ হারিয়েছেন, এবং তার ফলেই ইতিহাস মূল্যের দিক দিয়ে বিচার করলে কলা বেতে পারে যে গ্রন্থমূল্যীও তার ফলে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ফুলগুলি বিব্রবণ করে দেখা যাক—লেখক জানিয়েছেন আলীবর্দীর মৃত্যুকালে কন্দর্পের বয়েস তিন বছর এবং সূর্যমস্তুর মৃত্যুকালে কন্দর্পের বয়েস একশ—আলীবর্দীর মৃত্যু ১৭৫৬ অবতএব কন্দর্প জন্মালেন ১৭৫৩—শিখা সূর্যমস্তুর মৃত্যু তা হলে হবে ১৭৭৪ সালে, কন্দর্পের অল্প বয়সেই বিবাহ হয়—লেখক বলেছেন (পৃ: ১১৫) যে সেই দিন উজ্জয়িনীমণ্ডলের মৃত্যু হল, ইতিহাস বলেছে যে কোন্ মারা যান

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে—তা হলে তা যদি হয় তা হলে কন্দর্প জন্মিতখন চল্লিশ পেঁয়সে গেলেন (এসিহাটিক সোসাইটিরই প্রতিক্রিয়া ১৭৮৪) গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে যে কন্দর্পওয়ালিশের মূর্ণেও সূর্যমস্তুর জীবন বিকাশমান—তা হ'লে ১৭৭৪ সালে সূর্যমস্তুর মৃত্যু কি করে হয়? কন্দর্পের চেয়েও বয়েসে ছোট কল্যা, তার কল্যা নির্মলা, লেখকের হাতে সূর্যমস্তুর মৃত্যুকালে পনেরো বছরের মেয়ে নির্মলা অথচ কন্দর্পই তখন একশ বছরের ছেলে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে কন্দর্পের চেয়ে নির্মলা যদি ছ' বছরের ছোট হয় তা হ'লে কন্দর্পের অজ্ঞতা—তার গর্ভধারণীর চেয়ে সে ক' বছরের ছোট? লেখক বলেছেন কন্দর্পের বাজবকাল বাবা বছর অর্থাৎ ১৭৮৬ সালে তার মৃত্যু—সেই সময়ে কালীও মৃত্যু, তখন তার ছেলে কানাই গুণতি তেরো বছরের ছেলে (অতএব কানাইয়ের জন্ম ১৭৭৩) তার ছেলে—ভামলাল বিভূতির সমসাময়িক কি করে হয় (যে বিভূতি কন্দর্প সত্যোত্তর চৈতন্য মাতনীর মাতি)? চোদ্দ বছর বয়েসে বাণ্যবাহিনী বিবাহ হয়, কালীর বয়েস তখন আট তাতলে দেখা যাচ্ছে বাণ্যর চেয়ে কালী ছ' বছরের ছোট, অতএব জায়গার লেখক বলেছেন—কালীর বয়েস সত্যোত্তর কন্দর্পের বয়েস তেরো, তা হ'লে কালীর চেয়ে কন্দর্প চার বছরের ছোট, কন্দর্প যদি কালীর চেয়ে চার বছরের ছোট হয় তা হলে তার মায়ের মায়ের সময় কালীর বয়েস আট হয় কি করে? নির্মলা বাণ্যবাহিনীর দৌত্বিত্রী, লেখক তাকে পৌত্রী বলে বর্ণনা করেছেন (পৃ: ২৮৮) সূর্যম সৌদামিনীর দৌত্বিত্রী তাকেও লেখক পৌত্রী বলে অভিহিত করেছেন। (পৃ: ৩০২)।

লেখকের নিম্নেরই বর্ণনামূলক যে কি রকম পরস্পর বিরোধী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণটি এইবার বিচার করে দেখা যাক—১২৮ পাতায় লেখক জানাচ্ছেন যে সূর্যমস্তুর মৃত্যুকালে কল্যা-রূপার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু চৈতন্য হয় নি আর ১১৪ পাতায় লেখকই জানাচ্ছেন যে কন্দর্পের বিয়ের খোঁজ চলছে, সূর্যমস্তুর জীবিত এবং তাঁর সব ক'টি কন্যাই বিবাহিতা—ছোট মেয়ে চৈতন্যের বিয়েও দু'বছর আগে হয়ে গেছে এবং তার একটি কল্যাও হয়েছে আবার ২২২ পাতায় দেখছি, সমাচার-দর্পণের যুগে (সমাচারদর্পণের প্রতিক্রিয়া ১৮১৮ খৃ:) চৈতন্যের বয়েস ত্রিশ বছর ছুঁই ছুঁই করছে, ঘটনাটি ১৮১৮ সালেও অর্থাৎ সমাচার দর্পণের প্রতিষ্ঠাকালেও যদি ঘটে থাকে তা হ'লে দেখা যাচ্ছে ১৭৮৮ সালের পর চৈতন্যের জন্ম। পাঠক-পাঠিকাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিই, লেখকের দেওয়া হিসাব অনুসারে সূর্যমস্তুর মৃত্যু ১৭৭৪। কন্দর্পের বিয়ের সময় দেখছি সৌদামিনী দু'বছরে মেয়ে, তা হ'লে দেখা যাচ্ছে কন্দর্পের একশ যুক্ত বাবা তেত্রিশ বছর বয়েসে বধন মৃত্যু হয় সৌদামিনীর বয়েস তখন আনুমানিক বোলা-সত্যোত্তর, আর এক জায়গায় সেই সময় তাকে আট ন' বছরের বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলে সে জন্মাচ্ছে আনুমানিক ১৭৭৮ সালে, বিভূতি তার প্রদৌত্বিত্রি—এখন যদি বিভূতির পঞ্চাশ বছর বয়েসও আমরা ধরে নিই তা হ'লে তার জন্ম ১১১০ পিতামহী-জন্মের সঙ্গে দৌত্বিত্রিপুত্রের বয়েসের ব্যবধান এখানে দ্বিগুণ হয়ে যায় নি কি? এই সমস্ত উল্লেখগুলির দিকে যদি লেখক দৃষ্টি মিতেন তা হ'লে এ গ্রন্থ এক অনবদ্য সর্বাঙ্গমূল্য গ্রন্থে পরিণত হোত, সে ধারণা আমরা নিঃসন্দেহে পোষণ করতে পারি। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্রীমাদচরণ প্লে স্ট্রীট। দাম—সাত টাকা মাত্র।



এ যুগে চিকিৎসার ব্যয়

পারিবারিক বাজেটের একটি অপরিহার্য অঙ্গ চিকিৎসার ব্যয়।

আগের দিনেও এ ছিল বটে কিন্তু আজকের দিনে এটি উল্লেখ্য অনেক বেশি। এ যুগে বিশেষ করে আমাদের দেশে এমনি ঠাঁড়িয়েছে, খাওয়া-পাওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে চিকিৎসা-ব্যয়ও একটা ধরে না রাখলে নয়। অথচ সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা খুবই কঠিন—অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রায় ঠিকভাবে হয় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেছে সব দেশেই, আমাদের ভারতেও। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চিকিৎসার ব্যয়ও বৃদ্ধি হয়েছে সেই থেকেই ধাপে ধাপে। এ যুগে চিকিৎসার অর্থ প্রচুর টাকা খরচ, ডাক্তার মানেই সাধাাতিত ফি। সীমাবদ্ধ আয় বেখানে, সেখানে বড় রকমের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ঋণ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কতক্ষণ ঠিক এ ভাবে চলতে পারে, কর জনের পক্ষে এমনটিও সম্ভবপর, সেই প্রশ্ন।

ভারত এখনও একটি দরিদ্র দেশ, জনগ্রস্ত জাতি। বোগের সাথে লড়াই দিতে দিতে এখনকার মানুষ আর পেতে উঠছে না। সহরগুলোতে জনসংখ্যার আধিক্যের দরুন আধি-বাধি আরও বেশি হয়ে চলেছে। অথচ কোন ঔষধই কম দামে মিলে না, ডাক্তার ডাকতে গেলেই চাই বেশ কিছু টাকা। বিশেষজ্ঞদের দেখাতে গেলে টাকার প্রয়োজন আরও বেশি হয়ে ঠাঁড়ায়—নিম্নমধ্যবিত্ত লোকের নিকট বার স্তবোধ গ্রহণ ক্রমশঃ মাত্র। অস্ত্রোপচারের দরকার হলেও সেই একই বিন্দু। হাসপাতালে সকলেই প্রয়োজন হওয়া মাত্র ভর্তি হবার সুবিধা পায় না, বাইরে চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের স্তবোধ নেবে, মুষ্টিমেয় লোকেরই সে সাধ্য রয়েছে।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই চিকিৎসার ব্যয় পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, এ অবস্থা ঠিক। এক মাত্র রুশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে এ প্রশ্ন হয় তো নেই, থাকলেও ততটা জটিল নয়। অপর দিকে যুক্ত ও আমেরিকার চিকিৎসার খরচ বেড়ে যাওয়ার সমস্যাটি রয়েছে বিশেষ রকম। এ সকল দেশে স্বল্প আয়বিশিষ্ট পরিবারগুলোর মধ্যে সে জন্ম অসন্তোষ রয়েছে—অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা আলোচ্য ব্যয়-ভার বহন করে উঠতে পারছেন না। ডাক্তার ও ঔষধপত্রের বিল পরিশোধ করতে গিয়ে তাঁরাও দিন দিন দাবড়ে যাচ্ছেন, এ ধরনের সংবাদও পাওয়া যায়।

চিকিৎসার ব্যয় কি হারে বেড়েছে এ যুগে বিশেষ করে পশ্চিমী দেশগুলোতে, তা পর্যালোচনা করতে গিয়ে হতবাক হতে হয়। দল পনের আয়স্কার কথামাত্র—আটালান্টার এক আলোচনে কোন

মামলার সাক্ষ্য দেন জনৈক মার্কিন ডাক্তার। তাঁর যুগ থেকে এই কথাই ব্যস্ত হয় পরিবার—চিকিৎসা ব্যবসারে নামবার পাঁচ বছর মধ্যেই বায়িক আয় তাঁর ঠাঁড়ায় ৭০ হাজার পাউণ্ড।

নিউ ইয়র্কের ম্যামরভিলের জনৈক চিকিৎসকের একটি বিলে টাকার মোটা অঙ্ক ছিলো বলে বছর তিনেক আগে ঠেঠে পড়ে গেলো। বেঞ্জামিন জোশার (জোট) নামে ছয় বছরের একটি বালককে কুয়োঁর ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু এর পরই দেখা গেলো ছেলোট জোর আক্রান্ত হয়েছে নিউমোনিয়া বোগে। চিকিৎসকের হাতে তার ডার তুলে দেওয়া হল, বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর সেবে উঠে বেঞ্জামিন। বাপ-মায়ের নিকট বিল প্রেরিত হল—এই একটি চিকিৎসার ডাক্তার চাক্ষ করেছেন সোজানুজি দেড় হাজার পাউণ্ড। মাত্রাতিরিক্ত চাক্ষ করা হয়েছে, এই ধরবার ওপর সোরগোল ওঠে স্থানীয় এলাকার সর্ব। এমনি অবস্থার উদ্ভব হয়, বার দরুন মেডিক্যাল সোসাইটি পর্যন্ত এ ব্যাপারে তদন্ত আরম্ভ করেন। সন্নিহিত চিকিৎসক বিবরণি বিশ্লেষণ করে বলেন—নিউমোনিয়ায় বধন বালকটি ভুপ্ধে, সে সময় তাকে দেখতে যেতে হয় বহু বার। এর জন্তে এক শত ঘণ্টার ওপর সময় তিনি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ঘণ্টায় ৩০ পাউণ্ডের কম ফি হতে পারে না। সে দিক থেকে বিলটি তাঁর করতে হতো তিন হাজার পাউণ্ডের। কিন্তু বেঞ্জামিনের বাপ-মায়ের অবস্থা ভাল নয়, এই বিবেচনার অর্ধেক ফি দাবী করে তিনি বিল পাঠিয়েছেন।

সমসাময়িক কালের চিকাগো সহরতলীতে সংঘটিত একটি চিকিৎসা ব্যাপার। আলোচ্য ক্ষেত্রে পারিবারিক ডাক্তার 'কল' পিছু ১৪ পাউণ্ড বিল করে পাঠিয়ে দেন রোগীর বাবার কাছে। বাবা তো বিলে দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ দেখে আশ্তন হয়ে বান। বললেন স্পষ্ট—ইহা বিলকুল ডাক্ষি হুড়া কিছু নয়। এই উক্তির কারণ দেখিয়ে তিনি বলেন, সন্নিহিত চিকিৎসক ইচ্ছা করলেই ঘণ্টায় ১৮০ পাউণ্ড কিংবা সপ্তাহে ৭২০০ পাউণ্ড পেতে পারতেন। ডাক্তারের দিক থেকে এইরূপ আয় কিংবা পসার নেহাৎ ধারাপ বলা যেতে পারে না, যদিও যে-পরিবারে বিলটি পঠানো হয়, বিল পরিশোধ করা তাঁদের ছিল সাধাাতিত।

যুগু আমেরিকা কেন, আমাদের দেশেও অনেক বাপ-মা বা পরিবার-পরিচালককে এই ধরনের শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে—তার কারণ, চিকিৎসার ব্যয় ও ডাক্তারী চাক্ষ অতিমাত্র বৃদ্ধি পাওয়া। ১৬ টাকা, ৩২ টাকা কিংবা ততোধিক 'কল' চাক্ষ

কলকাতা, এমন ভাঙাবের সুখাণ্ড আজকাল কম নয়। শুধু কলিকাতাধারাই নয়, হোমিওপ্যাথ ও কবিরাজরাও 'ভিকিট' দাবী করে থাকেন আগের তুলনায় বয়েট বেশ। কিছুদিন আগে চিকিৎসার একটি জনসংস্থা চিকিৎসা বায় ব্যাপারে গণমত বা গণবক্তব্য আহ্বান করেছিলেন। অধিকাংশ লোকই জবাবে এই বলে দিয়েছেন—এ যুগে ডাক্তারের কি বা ঔষধপত্রের খরচ বহুশ বেড়ে গেছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অপরাধ জিনিসের তুলনায় আসলোটা খাতে ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক।

হাসপাতাল বা নাসিৎ হোমগুলোতে বেড় পেতে হলেও আজকাল খরচের অন্ত নেই। 'কি বেড়' চাইলেই সব সময় পাওয়া যায় না—পাওয়া গেলেও আশুচরপ বয় বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেশ কিছু টাকা খরচ দরকার। বম্বা, ক্যান্সার, মানসিক ব্যাধি—এ সকলের চিকিৎসা-ব্যয় এতই অধিক যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তা চালানো অসম্ভব বলা যায়। আমেরিকার মতো অগ্রসর দেশেও হাসপাতালে রোগীর খরচ কিছুমাত্র কম নেই। ইলিনয়েস হাসপাতাল সংগঠনের ডিরেক্টর ডেভিড এম ফিনজারের এক উক্তি অনুসারে এই হাসপাতালে গত চল্লিশ বছরে প্রত্যয় শৈগী-পিছু গড়পড়তা ব্যয় বেড়ে গেছে পড়করা ১০৭ ভাগ। শুধু এইখানেই নয়, অপরাধের মার্কিন হাসপাতালের হিসাব পর্যালোচনার মাধ্যমেও দেখা যায় যে, শৈগী-পিছু খরচ শতকরা ১৩২ ভাগ থেকে ১৫০ ভাগ অধি বৃদ্ধি হয়েছে এর ভেতর।

কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা পরিকল্পনা মাধ্যমক নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মী ও শ্রমিকদের চিকিৎসা বায় সাধ্যমানের সরকারী ব্যবস্থা চালু আছে অনেক দেশেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও এই ব্যবস্থা অবগত করেই সম্প্রদায় করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বীমাকারীদের দ্বারা বহু সঙ্গত প্রশ্ন ও অভিযোগ তুলতে পাওয়া যায়। মোটের ওপর সাধারণ নাগরিকদের দিকে লক্ষ্য রেখে আর যারে সঠিক চিকিৎসা বাত সন্তবপর হতে পারে, সেইটি সর্বপ্রায়ে অভ্যাসভুক্ত। সরকার ও জননেতাগণ একযোগে মিলে এ বিষয়ে সত্যিকার চিন্তা-আলোচনা করলে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিলে তাড়াতাড়ি সফল পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়।

নতুন কাজ নিতে হলে

সময়ের বেঁচে থাকবার জন্য কাজ করতে হবে, এটি সত্য কথা। কিন্তু যেটি ঠিক সহজ নয়, সে হচ্ছে কে কোন কাজ করবে এবং

চাইলেই সেটি মিটিয়ে কি না। অন্তর যেমনই হোক, অন্তর এলে এখনও এই প্রশ্নটি উঠতে পারে বহু ক্ষেত্রে।

যে কাজ করতে হবে, মন যদি তাতে না বসে অর্থাৎ কবীর কাজটি যদি পছন্দসই না হলে, তবেই মুক্তি। চাকরিতে চাকরির আগেই সেজ্ঞে ভালরকম ভেবে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ বা চাকরি খুঁজে যেখানে পাওয়া গেলো, সেখানেই সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যায় শান্তি।

একথা আবারও বলতে হয়, এদেশের সমাজ-ব্যবস্থার মনের মতো কাজ খুঁজে পাওয়া কঠিন ব্যাপার। সর্বক্ষেত্রেই যোগ্যতার মাপকাঠিতে চাকরি নির্ধারিত হয় না। কাজ বা চাকরি রদবদলের তাগিদ সেই কারণেই দেখা দেয়, প্রশ্ন সেই থেকেই উঠে। যোগ্যতা কিংবা কাজের দায়িত্ব অনুযায়ী মাস মাইনা না পেলেও পোলামাল। এই থেকেও অবশ্য সলিট কর্মীর মনে চাকরি পরিবর্তনের জন্য ব্যাকুলতা আসতে পারে।

একটি কাজ ছেড়ে আর একটি কাজ নিতে হলে কতটা হুঁসিয়ার হতে হবে, এক্ষেপে সেই বিষয় পর্যালোচনা করা বাস্। প্রথমেই দেখতে হবে, নতুন যে কাজ বা চাকরি করতে যাওয়া হবে, সেইটির নিশ্চয়তা বা স্থায়িত্ব আছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা প্রয়োজন যে, কাজটিতে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা কি পরিমাণ পাওয়ার আশা আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে কাজ বা চাকরি যদি পান্টাতেই হয় অর্থাৎ নতুন কোন কাজ নিতে হলে কর্মজীবনের নূন্যতাই সেইটি খুঁজে পেতে পাওয়া চাই। খুঁকি বা লওয়ার প্রয়োজন হবে, দেহ-মনের শক্তি ও সামর্থ্য অটুট থাকতে থাকতেই সে লওয়া বাঞ্ছনীয়।

আগে থেকে মনোমত কাজ না পাওয়ার কত লোককে আজীবন দুঃখ বা আক্ষেপ করতে দেখা যায়। সেজন্যই বলতে হয়, বেইমাত্র মনে হবে, যে-কাজ বা চাকরিতে যাওয়া হলে, সেটি ভাল লাগছে না (কারণ বাই হোক), বত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটি ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। একবার বীথন শক্ত হয়ে পড়লে অমনি ছুটে যাওয়া সহজ হয় না—পছন্দসই নতুন উদ্ভবের যঁকি নেওয়ার প্রবৃত্তি ক্রমেই হ্রাস পাবার আশঙ্কা থাকে। কর্মসংস্থানে অভাব যেখানে নেই, সেই সমাজে কাজ রদবদলের জন্য এতটা ব্যস্ত না হলেও চলে, এ ঠিক। কিন্তু ভারতীয় সমাজে যেখানে বেকারী এখনও বেশ বিকটরূপে বিস্তারিত, সেখানে নতুন লাইন ধরতে হলে তৎপরতা চাই বেশিরকম। হতাশা নিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকলে প্রত্যাশিত কাজ আপনি এসে ছুটবে, এমনটি নিশ্চয়ই হওয়ার নয়।

শুভ-দিনে মাসিক বহুমতী উপহার দিন

এই অগ্রিমুখের দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা বন্ধা করা যেন এক দুর্ভাগ্য বোধ্য বহনের সম্মিল হয়ে থাকিয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা অমরিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-ব্যতিক্রম, নবজো কারও কোন কৃতকার্যতায়, আপনি 'মাসিক বহুমতী' উপহার দিতে পারেন অত্যন্ত সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বহুমতী'। এই উপহারের জন্য হৃদয় আবেশের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই পালাল। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে খুসী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যেকোন জাতকের জন্য লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বহুমতী। কলিকাতা।

স্বত্বিকার পুনরাবির্ভাব—

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বা-যুদ্ধের ভীততা বধন হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, পশ্চিমী-শক্তি শিবিরের সহিত কম্যুনিষ্ট শক্তি-শিবিরের একটা বৃথা পড়া হওয়ার দেখা দিয়াছে বিপুল সম্ভাবনা, সেই সময় শুধু পশ্চিম জার্মানীতেই নয়, নিউ ইয়র্ক হইতে মেলবোর্ন পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন সহরে স্বত্বিকার পুনরাবির্ভাবের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য উপেক্ষার বিষয় নয়। পশ্চিমী শক্তি শিবিরের চারিটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ১১শে ডিসেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর (১৯৫১) পর্যন্ত এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া রাশিয়ার সহিত শীর্ষসম্মেলনে সমবেত হওয়া সম্পর্কে একমত হওয়ার পরই স্বত্বিকার পুনরাবির্ভাব কি সূচনা করিতেছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। উল্লিখিত চারিটি পশ্চিমী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন ২১শে ডিসেম্বর শেষ হয়। উহারই তিন দিন পরে বড়দিনের প্রাক্কালে ২৫শে ডিসেম্বরের প্রারম্ভে অর্থাৎ ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যরাতি পার হওয়ার পর পশ্চিম জার্মানীর একটি ক্ষুদ্র সহর কোলনে ইহুদীদের উপাসনা মন্দির সিনাগগের দেওয়ালে স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত এবং 'হেইল হিটলার' ও 'ইহুদীরা দূর হও', এই শ্লোগান লিখিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সহরেই ক্যাসীবাঁদের অভ্যাতারে নিহত সাতজনের একটি স্মৃতিস্তম্ভের ফসক কাল বানিশদ্বারা অবলিষ্ট করা হয়। ঐ স্মৃতিস্তম্ভকে লিখিত আছে, "Here rest seven victims of the Gestapo." অর্থাৎ "এখানে গেটাপো কর্তৃক নিহত সাত ব্যক্তি অনন্ত শযায় বিশ্রাম লাভ করিতেছে।" গেটাপো অর্থাৎ (Geheime staats Polizei) জার্মানীর গুপ্ত পুলিশের অভ্যাতার কাহিনী এখনও লোকের মনে হইতে শ্রুতিয়া যায় নাই। কাজেই সে সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলা নিশ্চয়তঃ। উল্লিখিত চক্রাঘের জন্ত দায়ী দুইজন তরুণ ছাত্র ভিকারকে গ্রেফতার করিতে পুলিশের পন্থা খণ্ডিত আধিক সময় লাগে নাই। তাহারদের বয়স ২৫ বৎসর এবং নয়া ক্যাসিট ডুংসে রাইস পার্টি (Deutsche Reichspartei) তাহার সঙ্গী। ইহা হইতেই স্বত্বিকার পুনরাবির্ভাব এবং ইহুদী-বিরোধী ধর্মের উৎস কোথায় তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

প্রাক্তন ষ্টর্ম ট্রুপ্‌স্‌ এবং (Storm troops) জন কতক নায়ক দ্বারা তুংসে রাইস পার্টি (D R P) পরিচালিত হইতেছে। উহাদের ধর্ম বা শ্লোগান হিটলারের পার্টির অনুরূপ। পশ্চিম জার্মানীতে এই পার্টি গঠিত ও পরিচালিত হওয়াই শুধু সম্ভব হয় নাই, বিগত প্রাদেশিক নির্বাচনে এই নয়া ক্যাসিট পার্টির একজন সদস্য রাইনল্যান্ড Pfalz এর পার্লামেন্টেও একটি আসন দখল করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উক্ত নির্বাচনের সময় প্রাক্তন এস এস নায়ক কর্ণেল রুডল্‌স তাহার বৈচ্ছ্যকৃত নির্বাচন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বৈচ্ছ্যকৃত পশ্চিম জার্মানী পরিভ্রমণ করিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বাস করিতেছেন। পশ্চিম জার্মানীতে যে শুধু এই নয়া ক্যাসিট পার্টি গঠিত ও পরিচালিত হইতেছে তাহা নয়, ডাঃ এডেলবারের মন্ত্রিসভাতেও দুইজন প্রাক্তন নাৎসী আছেন। পশ্চিম জার্মানীর বিচার ও শাসন বিভাগে এখনও নাৎসীদের বহু সদস্য কাজ করিতেছেন। পশ্চিম জার্মানীর বিচারালয়গুলিতে এখনও এক হাজার নাৎসী বিচারপতি এবং পাবলিক প্রসিকিউটর আছেন। বিগত দশকে পশ্চিম জার্মানীর



ত্রিগোপালচন্দ্র নিয়োগী

স্থলগুলিতে যে ইতিহাস পড়ান হইয়াছে তাহার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই ইতিহাস ১৯৪১ সালে হিটলারের শাসনকালের বিবরণ ছিল ৪১ পৃষ্ঠাব্যাপী। এই ৪১ পৃষ্ঠার মধ্যে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী ইহুদী নির্ধাতনের এবং দুই পৃষ্ঠাব্যাপী ধর্মমত ধর্মের বিবরণ ছিল। রাইসের অগ্রিকাণ্ড সম্পর্কে সাড়ে পনের পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণ ছিল। কনসেন্সট্রেশন ক্যাম্প এবং হিটলার বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে একটি কথাও ছিল না। বর্তমানে অবশ্য হিটলারের শাসনকালীন বিবরণ ১৮ চঠিতে ১৯ লাইনের মধ্যেই শেষ করা হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকখানি যে পশ্চিম জার্মানীর তরুণদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

পশ্চিম জার্মানীর কোলন সহরে স্বস্তিকা চিহ্নের, নাৎসী 'হেইল হিটলার' ধ্বনি এবং ইহুদী বিরোধী ধর্মের যে প্রথম আবির্ভাব হয় তাগা সূচনা মাত্র। অন্তঃপাশ পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন অংশ কো বটেই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে উহার আবির্ভাব হয়। সিনাগগে, ইহুদীদের বাড়ীতে, দোকানে স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কনের কাজই শুধু চলিতে আরম্ভ করে নাই, চিল হোঁড়া প্রভৃতি উপাভাও আরম্ভ হয়। এখানে সে সকল বিবরণ সংক্ষেপেও উল্লেখ করিবার স্থান আমরা পাইব না। শুধু এটুকু উল্লেখ করিলেই বোধ হয় বখেই হইবে যে, পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন স্থান ছাড়াও ভিয়েনায়, মিলানে, মেলবোর্নে, নিউইয়র্কে ও লন্ডনে সিনাগগ, ইহুদীদের বাড়ীও প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত এবং ইহুদী-বিরোধী ধর্ম লিখিত হইয়াছে। এক সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নাৎসী চিহ্ন ও ধর্মের পুনরাবির্ভাব হইতে ইহা অনুমান করা কঠিন নয় যে, নাৎসীদের পুনরভ্যুত্থানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। উহার গঠনের ইতিহাস অবশ্য এখনও কিছু জানা যায় না। কিন্তু বুটেনে বর্ণবিদ্বেষজনিত হাঙ্গামা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিগ্রোছাত্রকে খেতকারদের স্কুলে ভর্তি করার ব্যাপারে হাঙ্গামা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবিদ্বেষের নীতির পরিশ্রোক্ষিতই নাৎসীদের এই নবজীবন লাভের খনি। পর্যালোচনা করা আবশ্যক। শুধু ইহুদীদের বিরুদ্ধেই নয়, অশ্বেতকার লোকদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার মূল কোথায়, তাহা নির্ভল ভাবে জানা

বাইবে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু পশ্চিম জাঙ্গাণীর গবর্ণমেন্ট মুখে নাংসীবাদের বতই নিন্দা করেন না কেন, পশ্চিম জাঙ্গাণী হইতে নাংসীবাদ নিমূল করবার জন্য দৃঢ়তার সহিত কিছুই করেন নাই, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এমন কথাও শোনা যায়, নাংসীয়া ব্যাপক ভাবে যুবকদিগকে সজাবদ্ধ করিতেছে। এই গঠনকার্য্য কত দিন ধরিয়া এবং কোন দেশে কি ভাবে চলিতেছে তাহা অনুমানের বিষয় নয়। প্রথম মহা যুদ্ধের পর জাঙ্গানীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিতে হিটলারের পুনর বৎসর লাগিয়াছিল। হিটলারের পতনের পূর্ব বৎসর পূর আবার নাংসীবাদের অভ্যাস হইয়াছে। সুতরাং বুঝা বাইতেছে, গত ১৫ বৎসর ধরিয়াই নয় নাংসীবাদের অভ্যাসের জন্য গঠনকার্য্য চলিয়া আসিতেছিল।

কোলনে বস্ত্রিক চিহ্ন অঙ্কিত করা এবং ইহুদী-বিরোধী প্রোগান লিখিবার অপরাধে যে দুই জন তরুণ ধরা পড়িয়াছে তাহারা যে রাইস পাটিং সমস্ত সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত পাটির চেয়ারম্যান হের মিনবের্গ (Herr Meinberg) বলিয়াছেন যে, বিশ্ববাসীর সম্মুখে পশ্চিম জাঙ্গানীকে অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব-জাঙ্গানী ও অন্তর্ভুক্ত দেশ হইতে কম্যুনিষ্টরা একে-একট প্রোভোকেটর পাঠাইয়া এই দুঃখ করাষ্টয়াছে। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে তাহার এই অভিযোগ শুধু ভাষ্যকরই নয়, গোড়া কম্যুনিষ্ট বিরোধীরাও উহা বিশ্বাস করিবেন না। উক্ত দুই জন তরুণকে রাইস পাটি হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। রাইস পাটির পক্ষে উহা ছাড়া আর উপায়ান্তর ছিল না। শুধু পশ্চিম জাঙ্গানীই নয়, সমস্ত বিশ্ববাসীই স্বস্তিকার এবং নাংসী ধর্ম ও ইহুদী বিরোধী ধর্মের পুনরাবির্ভাবে যদি বিচলিত হইয়া উঠে তাহা হইলে বিশ্বিত হইবার কিছুই নাই। নাংসীবাদের অগ্রস্তম একটি প্রধান ভিত্তি ইহুদী-বিরোধ। নাংসীয়া জাঙ্গানীতে ক্ষমতা দখলের পর যে ইহুদী নিধন যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা অরণ্য কথিতও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি মনে এখনও শিহরিয়া উঠে। গত দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের সময় ৬০ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হইয়াছে। সমগ্র জাঙ্গানীতে এখন মাত্র ২৮ হাজার ইহুদী বাস করিতেছে। ১৯৩৩ সালের পূর্বে কোলনে ইহুদীর সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। এখন সেখানে ইহুদীর সংখ্যা ১২ শত মাত্র। ১৯৪৫ সালে তৃতীয় রাইশের পতনের পর নাংসীবাদ ধ্বংস হইয়াছিল বলিয়া যে ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আজ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহুদী-বিরোধ এবং বর্ণ-বিরোধ দূর করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। জাতি বিরোধ নিরোধের জন্য অন্য একটা বিল ১৯৫১ সালের মার্চ মাস পশ্চিম জাঙ্গানীর পার্লামেন্ট উত্থাপন করা হয়। গত ৩রা ডিসেম্বর (১৯৫১) এই বিল সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং বিলটি প্রকৃতপক্ষে স্থগিত রাখা হয়। নাংসীবাদের পুনরাবির্ভাবের পর পশ্চিম জাঙ্গানীর গবর্ণমেন্ট বিলটি ত্যাগত্যাগি পাশ করিবার জন্য পার্লামেন্টকে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া সুবাদে প্রকাশ।

নাংসীবাদের পুনরাবির্ভাবে পশ্চিম জাঙ্গানীর সরকার বিশেষ করিয়া ডাঃ এডেনবার্গ যে বিজ্ঞত বোধ করিয়াছেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পশ্চিম জাঙ্গানীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনবার্গ প্রথমে পূর্ব জাঙ্গানীর উপরেই দোষ চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নাংসীবাদের পুনরায় অভ্যুত্থানের যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে সেগুলি পশ্চিম জাঙ্গানীর বিরুদ্ধে পূর্বজাঙ্গানীর প্রচার কার্য্য এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না, সে কথা তিনিও ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছেন। তাছাড়া পশ্চিম জাঙ্গানীর বন্ধুবর্গের মনে জাঙ্গানী বিরোধী একটা ভাব লুপ্তায়িত রহিয়াছে তাহা ডাঃ এডেনবার্গ ও যে বুঝিতে পারেন নাই তাহা নয়। নাংসীবাদের পুনরাবির্ভাবে তাহাদের মনে যে গভীর আশঙ্কা সৃষ্টি করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিমজাঙ্গানীর সমর্থক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও উহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহুদীরা যে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী ডাঃ এডেনবার্গকে তাহার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কম্যুনিষ্ট বিরোধিতাকে অবলম্বন করিয়াই হিটলার এবং নাংসীবাদের অভ্যাস হইয়াছিল। কম্যুনিজম নিরোধের অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাংসীবাদের পুনরাবির্ভাবকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিবে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। পরমাণু বোমা বিশ্ববাসীর সম্মুখে সর্বগ্রাসী ধ্বংসের আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু নাংসীবাদের পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা অপেক্ষাকৃত লোকে বেশী ভয় করে।

ভারতে ভরোশিলভ—

গত ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত দর্শনের পর বর্তমান জাম্মায়ী মাসে (১৯৬০) সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্সাল ভরোশিলভ ভারতে আগমন করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদল আসিয়াছেন। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে তিনজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই তিন জনের মধ্যে মঃ এফ আর কোজলভ রুশ মন্ত্রিপরিষদের প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান, স্ত্রীম সোভিয়েটের ডেপুটি মালাম ই এ ফুৎসেভা, এবং মঃ কুজনেটসভ রাশিয়ার প্রথম সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী। মঃ কোজলভ এবং মঃ কুজনেটসভ রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই দুইজনের কে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী তাহা একটা গবেষণার বিষয় হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং রুশ প্রেসিডেন্ট মঃ ভরোশিলভ উভয়েই পূর্ব জীবনে সৈনিক ছিলেন। মঃ ভরোশিলভ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এক রেল শ্রমিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি রাশিয়ান সোভ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলে যোগ দেন এবং বঙ্গশৈল্পিক সমর্থক হিসাবে উহার কাছে যোগ দেন। তাহার বিপ্লবী কার্য্যকলাপের জন্য জারের গবর্ণমেন্ট কয়েকবার তাহাকে নির্বাসিত করেন। কিন্তু তিনি বার বারই পলায়ন করিতে সমর্থ হন। ১৯১৫ সালে তিনি শ্রমিক ও সৈন্যদের মধ্যে কাজ করিতে থাকেন। তিনিই ইজমাইলোভস্ক সেনাবাহিনীকে বিপ্লবের পথে আনে। ১৯১৯ সালের জুন মাসে তিনি চতুর্দশ হাজার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে তিনি বিপ্লবী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা সচিব ছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মার্সাল নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের সময় তিনি সোভিয়েট সেনাবাহিনীর নেতৃত্বানীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে তিনি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের ভাইস

চোখম্যান নিযুক্ত হন। ক্যুনিট পার্টির ১১তম কংগ্রেসের পর মঃ ভেরাশিলভ রুশ ক্যুনিট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েটের সভাপতি মণ্ডলীর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং মার্কিন-শাসনভাঙ্গের প্রেসিডেন্টের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। মার্কিন-শাসনভাঙ্গের বিধান অনুসারে প্রেসিডেন্ট সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী যদিও এত ক্ষমতা মার্কণ কংগ্রেসের ক্ষমতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু রাশিয়ার শাসনভাঙ্গ অনুযায়ী রুশ-প্রেসিডেন্টের পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত দর্শনের যে রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল রুশ-প্রেসিডেন্ট ভেরাশিলভের ভারত ভ্রমণের সেরূপ কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নাই। হয়ত ইহার অস্থানিক গুরুত্বই বেশী। তথাপি তাঁহার এই ভ্রমণের রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছুই নাই তাহা বলা যায় না। তাঁহার সহিত আগত প্রতিনিধি দলের মধ্যে যে তিন জনের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের উপস্থিতি মঃ ভেরাশিলভের ভারত-ভ্রমণকে রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। রুশ প্রেসিডেন্ট মঃ ভেরাশিলভ ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ভারতে আসিয়াছেন। মঃ কোজলভ এবং মাদাম কুৎসেভা আসিয়াছেন ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া। রাশিয়ার সহিত ভারতের মৈত্রী সম্পর্কে যে বিশেষ বনিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে মঃ ভেরাশিলভের ভারত ভ্রমণ তাহার অঙ্গতম প্রধান নিদর্শন।

রুশ প্রেসিডেন্ট মঃ ভেরাশিলভগত ২০শে জানুয়ারী (১৯৬০) সপ্তমবে দিল্লীতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তিনি ১৬ দিন ধরিয়া ভারত ভ্রমণ করিবেন। তাঁহার ভারত ভ্রমণ শেষ হওয়ার পরেই রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ ইন্দোনেশিয়া বাণ্যার পথে ভারতে আসিবেন। মঃ ভেরাশিলভের ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইতে মঃ ক্রুশেভের ভারতের আগমনের উদ্দেশ্য যে স্বতন্ত্র। একথা নিসন্দেহে বলিতে পারা যায়। রাশিয়ার সাহায্যে যে সকল পরিকল্পনা ভারতে কাঁধাকরী করা হইতেছে রুশ প্রেসিডেন্ট সেগুলি পরিদর্শন করিবেন এবং রাশিয়ার সাহায্যে আরও পরিকল্পনা ভারতে কাঁধাকরী করা যায় কি না তাহার সম্ভাবনা সন্দেহও আলোচনা করা হইবে। এই দিক দিয়াও তাঁহার ভ্রমণের গুরুত্ব অনুবীক্ষ্য।

রুশ প্রধান মন্ত্রীর পুনরায় ভারত দর্শন—

রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভকে ইন্দোনেশিয়া বাণ্যার পথে ভারতে অবতরণ করার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হইতে যে আমন্ত্রণ লিপি প্রদান করা হইয়াছে তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। গত ৬ই জানুয়ারী মস্কোতে তিনি বলিয়াছেন, ভারতে বাণ্যার জন্ত তিনি যে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন, তাহা তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। তাঁহাকে এই আমন্ত্রণ জানাইবার কিছু দিন পূর্বে হইতই শোনা বাইতে ছিল যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনার জন্ত মঃ ক্রুশেভ ভারতে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার এই ইচ্ছা পূরণের জন্ত যদি তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা বিষয়ের বিষয় হইবে না। ইতিপূর্বে তিনি ইন্দোনেশিয়া

পরিদর্শনের জন্ত প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী মিঃ সোয়েকর্ণের নিবট হইতে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন এবং এই আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়া বাণ্যার পথে তিনি গুরু ভারতেই আসিবেন না, আফগানিস্তান ও ব্রহ্মদেশেও অবতরণ করিবেন। কেন্দ্রসারী মাসে তিনি এই ভ্রমণে বাহির হইবেন। এক সংবাদে প্রকাশ ১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি নয়া দিল্লীতে পৌছিবেন। অন্ততঃ চারদিন তিনি দিল্লীতে অবস্থান করিবেন বলিয়া প্রকাশ। ফেব্রুয়ারী মাসের পরে তিনি ফ্রান্স ভ্রমণে বাইবেন।

রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভের এই ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ এবং ভারতে আগমনের যে বিশেষ তাৎপর্য্য তাহা হইতে একথা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানের চীনের সহিত ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মৈত্রীসম্পর্ক যে ক্ষুদ্র হইয়াছে সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সীমান্ত লইয়া চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যেও একটা মন কষাকষি চলিতেছে। চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন লইয়া যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা আমরা ভাল করিয়াই জানি। এখন সে সম্পর্ক নতুন করিয়া আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। ইন্দোনেশিয়ার সহিত চীনের মৈত্রী যে কারণে ক্ষুদ্র হইয়াছে সে সম্পর্কে এখানে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইন্দোনেশিয়ার যে সকল চীনা বাস করিতেছে তাহাদের লইয়াই চীন-ইন্দোনেশিয়া মৈত্রী ক্ষুদ্র হইয়াছে। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ২০ লক্ষ চীনা বাস করিতেছে। ইন্দোনেশিয়ার পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা এবং আমদানী রপ্তানীর অধিকাংশই চীনাগের হাতে। ১৯৫৯ সালে প্রেসিডেন্টের ১০নং নির্দেশ দ্বারা বিদেশীদিগকে পল্লী অঞ্চলে খুচরা এবং ছোটখাটো ব্যবসা করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই নির্দেশ কাঁধাকরী হইয়াছে গত ১লা জানুয়ারী (১৯৬০) হইতে। ইহার বলে পল্লী অঞ্চলে যে সকল চীনা খুচরা ও ছোটখাটো ব্যবসা পরিচালন করে তাহারা জীবিকাহীন হওয়ার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রায় তিন লক্ষ চীনকে ভাঙ্গাঘের জীবিকা হইতে বঞ্চিত হইতে হইতেছে এবং কতকগুলি নির্দ্বারিত গচরে আসিয়া ভাঙ্গাঘিগকে বাস করিতে হইবে। অল্প সময় হইলে এই নির্দেশ যে সমস্ত এশিয়াবাসীসহী সহানুভূতি আকর্ষণ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানে অবস্থা অঙ্গরূপ ণীড়াইয়াছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার চীনারা জীবিকাহীন হইলে চীন সরকার ব'ল ক্ষুব্ধ হন তাহা হইলে বিষয়ের বিষয় হয় না। ভারতবাসী আমরাও দক্ষিণ আফ্রিকায় এক সিংহলে ভারতীয় বংশোদ্ভবের সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করা হইতেছে তাহার জন্ত কম ক্ষুব্ধ হই নাই। চীন-ভারত এবং চীন-ইন্দোনেশিয়া বিরোধের দিক হইতে মঃ ক্রুশেভের ভারত ও ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, ইহা মনে করিলে হয়ত ভুল হইবে না। তাঁহার এই ভ্রমণ হইতে তিনি চীনের নীতির বিরোধী কি না তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি হয়ত এই বিরোধ মীমাংসার জন্ত মধ্যস্থতাও করিবেন না। কিন্তু মঃ ক্রুশেভ আন্তর্জাতিক সকল বিরোধ মীমাংসার জন্ত যে চেষ্টা করিতেছেন তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার এই সফরের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা বাইতে পারে।

১৯৫৫ সালের শেষ ভাগে মঃ ক্রুশেভ আর একবার ভারতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তখন ছিলেন রুশ ক্যুনিট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল। মঃ বুলগানিন ছিলেন রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী।

মঃ ক্রুশেভ এবং মঃ বুলগানিন উভয়ে এক সঙ্গে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ক্ষুদ্রতরুর সহধর্মী লাভ করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি ভারতবাসীর মনে হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত ভ্রমণের পর তিনি ভারতে আসিতেছেন বলিয়া পশ্চিমী শাস্তি বিরোধী নীতি লইয়া তিনি ভারতে আসিতেছেন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। এশিয়ায় শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। বাপু সন্দেহনের পর এই নীতি ক্রমশঃ সূচুত হইয়াই উঠিতেছিল এবং পশ্চিমী শাস্তিবর্ণের কাছে উহা একটা ক্ষুদ্রতার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু চীন-ভারত এবং চীন-ইন্দোনেশিয়া মৈত্রী সম্পর্ক ক্ষুদ্র হওয়ার এশিয়ায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ভিত্তি ধসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। মঃ ক্রুশেভ ইউরোপে কমানিষ্ট ও অ-কমানিষ্ট দেশগুলি বাহ্যতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অমুসরণ করিয়া চলিতে পারে তাহার জন্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। এশিয়াতেও ঐ নীতিকে তিনি দৃঢ় করিতে চাহিবেন, ইহাও স্বাভাবিক। তাঁহার ভারত ও ইন্দোনেশিয়া সফর যদি এশিয়ায় সহাবস্থান নীতিকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহা হইলে ইউরোপেও সহাবস্থান নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হইবে।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা—

গত ১৪ই জানুয়ারী (১৯৬০) সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ সুরক্ষা সোভিয়েটে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট সশস্ত্র বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১২ লক্ষ সৈন্য হ্রাস করা হইবে। এই হ্রাসের পর রুশ বাহিনীতে থাকিবে ২৪ লক্ষ ২৩ হাজার সৈন্য। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫৯) মার্কিন দেশবন্ধু দপ্তর হইতে যে ঘোষণা করা হয় তাহাতে প্রকাশ, গত অক্টোবর মাসে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৩৪ জন। অবশ্য কোন রাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীতে সশস্ত্র সৈন্যের সংখ্যা কত তাহা নির্ভুল ভাবে জানিবার উপায় নাই। সে কথা সকল রাষ্ট্রই সম্বন্ধে গোপনই রাখিয়া থাকেন। বর্তমানে রাশিয়ার সৈন্য সংখ্যা কত তাহা মঃ ক্রুশেভের ঘোষণা হইতে জানা যাইতেছে এবং আরও বুঝা যাইতেছে যে, রুশ সশস্ত্র বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হইলে যে সৈন্য থাকিবে তাহা মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের সৈন্য সংখ্যা হইতে সামান্য কম। ১৯৫৭ সালে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয় দেশই সৈন্য সংখ্যা ২৫ লক্ষের মধ্যে রাখার নীতি মানিয়া লইয়াছিল। বৃটেনও সৈন্য সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষের মধ্যে রাখিতে সম্মত হইয়াছিল। বৃটেনের সৈন্য সংখ্যা ১৯৫৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ছিল ৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৩ শত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে কোন চুক্তি না হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎরাষ্ট্রবর্গে বহুদূর সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিতেছেন। ইহাতে আশঙ্ক হওয়ার কারণ আছে কি না তাহা বিবেচনা করণ। বরং মনে এইরূপ আশঙ্কা জাগিতে পারে যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনী অপেক্ষা পরমাণু অস্ত্রের উপরেই বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতে চাহিতেছেন। সৈন্য সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে পরমাণু অস্ত্র-নিরোধের জন্ত যদি কোন চুক্তি না হয় তাহা হইলে পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার সর্বগ্রাসী ধ্বংসের আশঙ্কা দূর হইবে না।

পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে কোন চুক্তি হওয়া এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। রাশিয়া একক ভাবে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করে। কিন্তু তাহার কিছু পরেই তিনটি বৃহৎ শক্তিই পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য জেনেভায় আলোচনা সাপেক্ষে ১৯৫৮ সালের ৩১শে অক্টোবর হইতে পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়। গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫৯) পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা স্থগিত রাখার মেয়াদ শেষ হইয়াছে। উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্ত কোন কথাবার্তা আর হয় নাই। সুরক্ষা সোভিয়েটে মঃ ক্রুশেভ বলিয়াছেন যে, রাশিয়ায় পরমাণু বোমা এক হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারীর কাজ এখনও চলিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, আবহিক যুদ্ধ বাধিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন অপেক্ষা পশ্চিমী দেশসমূহই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মঃ ক্রুশেভ অবশ্য ইহাও জানাইয়াছেন যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গ যদি পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করে তাহা হইলে রাশিয়াও আর পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা করিবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ঘোষণা করিয়াছে যে, পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা করা হইলে পূর্বে সে সম্বন্ধে জানিহা লেওয়া হইবে। কিন্তু ফ্রান্স সাধারণ আবহিক পরীক্ষা করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অবশ্য উহা সমর্থন করে নাই। কিন্তু ফ্রান্স সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই অভিমত গ্রহণ করিবে কিনা সন্দেহ। গত ১৮ই জানুয়ারী (১৯৬০) মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মার্কিন কংগ্রেসে ১৯৬১ সালের আর্থিক সংস্কারের জন্ত যে বাজেট প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে মোট ব্যয় ৭৯৮ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে। কাজেই বরাদ্দের শতকরা ৫৭ ভাগই নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বরাদ্দ। বঙ্গতঃ দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ১৯৫৯-৬০ সালের ব্যয় বরাদ্দ অপেক্ষা বেশী ধরা হইয়াছে। বাজেটে দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপকারী তিনটি সাবমেরিন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা 'তাসের' এক সংবাদে প্রকাশ যে, রাশিয়া গত ২০শে জানুয়ারী (১৯৬০) প্রকাশ্যে মহাসাগরের আকাশপথে পরীক্ষামূলকভাবে একটি রকেট উৎক্ষেপণ করিয়াছে।

পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কে গত বৎসর জেনেভায় যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখনও শেষ হয় নাই। এই আলোচনার ফল কি হইবে তাহা অবশ্য অসুমান করা সম্ভব নয়। তবে একমাত্র আশার আলোক দেখা যাইতেছে এই যে, আগামী শীর্ষ সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যাটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। এই সম্মেলনেই যে মীমাংসা সম্ভব হইবে সে সম্বন্ধেও আশা করা কর্তন। তবে শীর্ষ সম্মেলন শুধু একটাই হইবে না, একাধিক হইবে। উহা ঠাণ্ডামুছের তীব্রতা হ্রাসে সহায় হইবে, ইহাই একমাত্র ভরসার কথা।

ফরাসী ক্যামেরুনের স্বাধীনতা লাভ—

আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী ক্যামেরুনের স্বাধীনতা লাভ করায় আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা আর একটি বৃদ্ধি পাইল। এই দেশটির স্বাধীনতা লাভে ভারত যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করা প্রশাসনিক নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে চারিশক্তি কমিশন ফরাসী ক্যামেরুনের স্বাধীনতা লাভের তারিখটি ধার্য করে তাহাদের মধ্যে ভারত অন্যতম।

উনিংশ তশাবীৰ শেষ ভাগ হইতে প্ৰথম মহাযুদ্ধ পৰ্যন্ত ক্যামেৰুন ছিল জাৰ্মানীৰ প্ৰটেক্টৰেট দেশ। প্ৰথম মহাযুদ্ধৰ সময় বৃটিশ এবং ফ্ৰান্স এই দেশটি দখল কৰে এবং ভাগভাগি কৰিয়া লয়। ইহা ১৯১৬ সনের কথা। উহাৰ বৃহৎ অংশই অৰ্থাৎ প্ৰায় পাঁচ ভাগেৰে চাৰি ভাগই পাড়ে ফ্ৰান্সেৰ ভাগে। ভাৰ্চাই সন্ধিতে ফ্ৰান্স এই অংশটিৰ ঘাণ্ডেট লাভ কৰে। ১৯৪৬ সালে উহা ফ্ৰান্সেৰ অধীনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জৰ ট্ৰিষ্টিনিপ কমিটিৰ আওতাৰ আসে। ১৯৫১ সালেৰে প্ৰথম ভাগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জৰ সাধাৰণ পৰিষদেৰে ক্যামেৰুন সম্পৰ্কে একটি বিশেষ অধিবেশন হয় এবং তাহাতে দুইটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্ৰথমতঃ ইহা সিদ্ধান্ত কৰা হয় যে, ফ্ৰান্সী ক্যামেৰুন ১৯৬০ সালেৰে ১লা জানুৱাৰী স্বাধীনতা লাভ কৰিবে এবং দ্বিতীয়তঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জৰ আওতাৰ বৃটিশ ক্যামেৰুনে গণভোট গ্ৰহণ কৰা হইবে। বৃটিশেৰ অভিপ্ৰায় ছিল নাইজেৰিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিলে বৃটিশ ক্যামেৰুন উহাৰ সহিত যুক্ত কৰা হইবে। ফ্ৰান্সী ক্যামেৰুন স্বাধীনতা লাভ কৰিলে উহা ফ্ৰান্সী ইউনিয়নেৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকিবে, ইহাই ছিল ফ্ৰান্সেৰ মতলব। গত নবেম্বৰ মাসে (১৯৫১) উত্তৰ ক্যামেৰুনে যে গণভোট গ্ৰহণ কৰা হয় তাহাতে স্থিৰ হয়, আগামী অক্টোবৰ মাসে উহা নাইজেৰিয়াৰ সহিত যুক্ত হইবে না। উত্তৰ ক্যামেৰুনেৰে ভবিষ্যৎ নিৰ্দ্ধাৰণেৰে জ্ঞাত আকাৰ গণভোট গ্ৰহণ কৰা হইবে। এই প্ৰসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আগামী অক্টোবৰ মাসে নাইজেৰিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিবে বলিয়া স্থিৰ কৰা হইয়াছে।

ফ্ৰান্সী ক্যামেৰুনেৰে স্বাধীনতা লাভেৰে প্ৰাক্কাৰে এই দেশে যে হান্সায়া হয় তাহা উল্লেখযোগ্য। এই হান্সায়াৰ কাৰণ অল্পমান কৰা কঠিন নয়। ফ্ৰান্সী ক্যামেৰুন স্বাধীনতা লাভ কৰিয়াছে বটে, কিন্তু যে ইউনিয়ন অব শিপলস অব আফ্ৰিকা স্বাধীনতাৰ জ্ঞাত আশংকন কৰিয়াছিল ক্ষমতা তাঁহাদেৰ হাতে আসে নাই। ক্ষমতা আসিয়াছে বন্ধনশীল বুদ্ধোদ্যমেৰে হাতে। ১৯৫৮ সালেৰে জিলেশ্বৰ মাসে থানাবৰ ৰাজধানী আক্ৰমণ যে স্বৰ্গ আফ্ৰিকা সন্মেলন হয় তাহাতে এই মৰ্মে প্ৰস্তাব গৃহীত হয় যে, ক্যামেৰুন হইতে বৈদেশিক সৈন্ত অপসাৰণ কৰিয়া, সমস্ত ৰাজনৈতিক বন্দোবস্তকে মুক্তি দিয়া এবং ইউনিয়ন অব শিপলস অব আফ্ৰিকা এবং অজ্ঞাত ৰাজনৈতিক প্ৰতিষ্ঠানেৰে উপৰ নিবেদ্যজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিয়া স্বাভাবিক অবস্থা স্থাপ্তি কৰিতে হইবে এবং ক্যামেৰুনকে ঐক্যবদ্ধ কৰিবাৰ জ্ঞাত গণভোট গ্ৰহণ কৰিতে হইবে। এই প্ৰস্তাব অস্বাভাৱিক যদি কল্প কৰা হইত তাহা হইলে ফ্ৰান্সী ক্যামেৰুনেৰে স্বাধীনতা লাভেৰে প্ৰাক্কাৰে হান্সায়া স্থাপ্তি হইবাৰ কোন কাৰণ থাকিত না।

সন্ধ্যাক্ত ফ্ৰান্সী ক্যামেৰুনে আগামী মাৰ্চ মাসে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই নিৰ্বাচনেৰে গুৰুত্ব অনস্বীকাৰ্য। কাজেই এই নিৰ্বাচনেৰে পূৰ্বে স্বাভাবিক অবস্থা কিবা হইয়া আনিবাৰ জ্ঞাত আতীৰ নেতাগণকে মুক্তি দিতে হইবে। এ সম্পৰ্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জৰ বিশেষ দায়িত্ব ৰহিয়াছে বলিয়া আমবা মনে কৰি। ক্যামেৰুনেৰে দুইটি ৰংশকে পৃথক ৰাখাৰ একটা চক্ৰান্ত চলিতেছে বলিয়া আশঙ্কা কৰিবাৰ কাৰণ আছে। জাৰ্মানী, কোৰিয়া এবং ভিয়েটনামকে ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ চক্ৰান্ত বেসময়ে চেষ্টা চলিতেছে সেই সময়ে উত্তৰ ৬-বৰ্গ ক্যামেৰুনকে ঐক্যবদ্ধ হইবাৰ সুযোগ দেওৱা আবশ্যক।

আলজেৰিয়া সমস্যা :-

আলজেৰিয়াৰ সমস্যা ক্ৰমশঃ যে আকাৰ ধারণ কৰিতেছে তাহাতে উহাৰ পৰিপতি কোথায় তাহা বলা কঠিন। ফ্ৰান্সেৰ প্ৰেসিডেণ্ট জেনাৰেল জু গল আলজেৰিয়া সম্পৰ্কে অস্থানিয়ন্ত্ৰণেৰে নীতি ঘোষণা কৰিয়াছেন। তাহাতে কি আলজেৰিয়াৰ অধিবাসীয়া কি আলজিৰিয়াস্থিত ফ্ৰান্সীয়া কোন পক্ষ সন্তুষ্ট হইতে পাৰে নাই, ইহা মনে কৰিলে ভুল হইবে না। তাহাৰ আলজেৰিয়া সম্পৰ্কে আস্থানিয়ন্ত্ৰণেৰে নীতিৰ সমালোচনা কৰায় জুগল জেনাৰেল জাক মাশুকে গত ২২শে জানুৱাৰী পদচ্যুত কৰেন। জেনাৰেল মাশু ছিলেন আলজিৰিয়াস্থিত সৈন্তবাহিনীৰ অস্থায়ী অধিনায়ক। এই প্ৰসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৮ সালেৰে যে বিক্ষোভেৰে ফলে জে: জুগল ক্ষমতা লাভ কৰেন জে: মাশু ছিলেন তাহাৰ অন্যতম পৰিচালক। জে: মাশুকে পদচ্যুত কৰায় অব্যবহিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আলজেৰিয়া প্ৰবাসী ফ্ৰান্সীয়া ব্যাপক বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে এবং আলজিৰিয়াসে অব্যবহিত অবস্থা ঘোষণা কৰা হয়। আলজিৰিয়াসে যে হান্সায়া চলিতেছে তাহাতে জুগলেৰে ভবিষ্যৎ কি তাহা বলা কঠিন। ফ্ৰান্সী মন্ত্ৰিসভাও আলজেৰিয়া সমস্যা লইয়া মতভেদে গুৰুতৰ আকাৰ ধারণ কৰিয়াছে।

আলজেৰিয়া সন্তুষ্ট সমাধানৰেৰে জ্ঞাত প্ৰেসিডেণ্ট জুগল চৰম ব্যবস্থা অবলম্বনেৰে পক্ষপাতী। কিন্তু প্ৰধান মন্ত্ৰী ম: মাইকেল মেৰে এই পক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বনে অনিচ্ছুক। প্ৰে: জুগলেৰে সহিত বাঁহাৰা বনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত তাহাৰা মনে কৰেন জুগলেৰে পদচ্যুত হইবাৰ কোন সম্ভাবনা নাই। তিন বৎসৰেৰে জ্ঞাত তাহাকে একচ্ছত্ৰ ক্ষমতা দিবাৰ জ্ঞাত তিনি হয়ত ফ্ৰান্সী জনসাধাৰণেৰে নিকট আবেদন জানাইবেন। আলজেৰিয়াৰ বৰ্ত্তমানে কি অবস্থা চলিতেছে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পাৰা সম্ভব নয়। আলজেৰিয়াস্থিত ফ্ৰান্সীয়া বেমন বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিতেছে তেমনি একটা পান্টা বিক্ষোভও প্ৰদৰ্শন কৰা হইতেছে। প্ৰায় ১২ হাজাৰ মুসলমান এই পান্টা বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে। তৰুণ ইয়াৰোপীয় অধিবাসীয়া সাধাৰণ ধৰ্ম্মটে সাজা দিয়া মুসলমান দোকানগুলি বন্ধ ৰাখিবাৰ নিষেধ দিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান দোকানদাৰেৰা তাহা অমান্য কৰায় তাহাদেৰে দোকানেৰে উপৰ ইট পাটকেল নিক্ষেপ কৰা হয়। প্ৰেসিডেণ্ট জুগলেৰে আলজেৰিয়া

ডাঃ বঙ্গুর

মেমোরিকার্ডিয়েল

নারীৰ স্বাস্থ্য, শক্তি
ও পৌৰ্ণৰ্য বৰ্ধন কল্পে

প্ৰথম প্ৰেছডাক্তাৰক:

ডাঃ বঙ্গুর ল্যাবরেটৰী লিমিঃ
কলিকাতা-৯

বাণেশ্বর কথা আছে। এই অবস্থায় তিনি ঘাইবেন কিনা তাহা কিছুই জানা যায় না।

বুটিশ প্রধানমন্ত্রীর আফ্রিকা সফর—

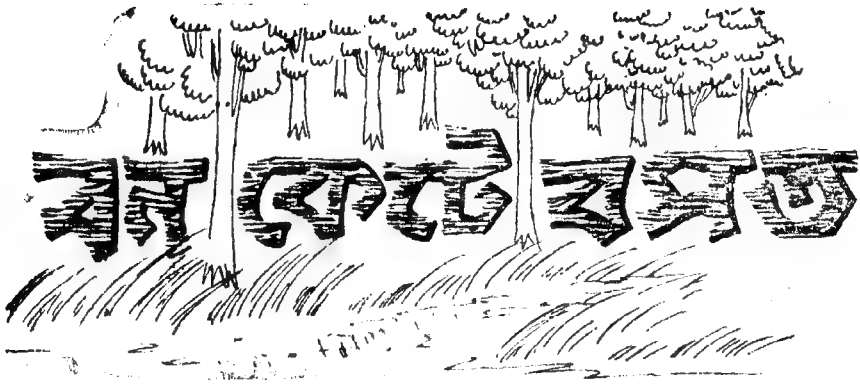
গত ৬ই জ্যুলাই (১৯৬০) বুটিশ প্রধান মন্ত্রী মি: ম্যাকমিলান এক মাসব্যাপী আফ্রিকা ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। এক মাসে তিনি আফ্রিকার বুটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত আফ্রিকার দেশগুলি পরিভ্রমণ করিবেন। ইতিপূর্বে আর কোন বুটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় আফ্রিকা ভ্রমণে বাহির হন নাই। ইহা হইতে এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আফ্রিকার বুটিশের অধীন দেশগুলির সমস্তার উপর বুটিশ গবর্নমেন্ট বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। লণ্ডন বিমানঘাট ত্যাগ করিবার সময়ে মি: ম্যাকমিলান বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই ভ্রমণ আফ্রিকার সমস্তাগুলির পটভূমিকা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সাধনা করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন। আফ্রিকার বুটিশের অধীন দেশগুলি সম্পর্কে বুটিশ সরকার একটা নতুন নীতি গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মি: ম্যাকমিলানের এই ভ্রমণে এই নীতি সার্থকভাবে প্রদর্শিত করিতে কতখানি সাহায্য করিবে সে কথা বলা কঠিন। একথা সত্য যে, বিশ শতাব্দীর বহিঃস্বার্থ স্বত্ব হওয়ার পর আফ্রিকার কয়েকটি পরাধীন দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বুটিশের অধীনস্থ পোল্ডকাট স্বাধীনতা লাভ করিয়া যানা নাম গ্রহণ করিয়াছে। নাইজেরিয়াও আগামী ১লা অক্টোবর স্বাধীনতা লাভ করিবে। কিন্তু 'ভার্ক আফ্রিকা' বা কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার বিভিন্ন পরাধীন দেশের সমস্তা যানা বা নাইজেরিয়ার মত অত সহজ নয়। ইউরোপের যে সকল যেতাজ আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলিতে বাস করিতেছেন এবং সমস্ত যক্ষম ক্ষমতা এবং সুবিধা ভোগ করিতেছেন তাহারাই এই সকল দেশের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের স্বাধীনতা লাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত বুটিশের অধীন মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশন এবং কেনিয়া। ফ্রান্সের অধীন আলজেরিয়াও এইরূপ সমস্তারই সম্মুখীন হইয়াছে। প্রকৃত সমস্তা হইতেছে এই যে, যেতাজরা তাঁহাদের স্বাধীনতাত্ত্বিক অধিকার পূর্ণ মাত্রায় অব্যাহত রাখিতে চাহিতেছেন। সেখানে তাহা সম্ভব হইতেছে না সেখানে তাঁহাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। সেই সঙ্গে চলিতেছে আফ্রিকার অধিবাসীদের উপর কঠোর অত্যাচার। মি: ম্যাকমিলান কি ভাবে এই সমস্তার সমাধান করিবেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশনের কথাই আমরা প্রথমে উল্লেখ করিব।

উত্তর বোডেশিয়া, দক্ষিণ বোডেশিয়া এবং ক্রায়াশালাণ্ডকে একত্র মিলিত করিয়া মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশন গঠন করা হইয়াছে। বুটিশ ক্রায়াশালাণ্ডকে এই ফেডারেশনে বোগদান করিতে বাধ্য করিয়াছে। ক্রায়াশালাণ্ডের অধিবাসীসংখ্যা ৩০ লক্ষ। তাহাদের শতকরা ১১.৬ জনই নিগ্রোজাতীয়। এই মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশন বৃহৎ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দক্ষিণ বোডেশিয়ার যেতাজরাই এই স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছে, তাহারাই শাসন করিতেছে এই ফেডারেশনকে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ বোডেশিয়ার প্রতি ১৪ জনে একজন যেতাজ। উত্তর

বোডেশিয়ার প্রতি ৩৯ জনে একজন যেতাজ এবং ক্রায়াশালাণ্ডে যেতাজের সংখ্যা প্রতি ২৫০ জনে একজন। দক্ষিণ বোডেশিয়ার যে বর্ণবিভেদ প্রচলিত আছে তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার অল্পরূপ। আফ্রিকার সর্বত্র কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে তাহা ক্রায়াশালাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যেও প্রভাবিত করিবে, তাহার ফেডারেশনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। বেলজিয়ম কঙ্গোতে যেমন হাঙ্গামা হইয়াছে তেমনি ক্রায়াশালাণ্ডেও হাঙ্গামা হইয়াছে। ক্রায়াশালাণ্ডের হাঙ্গামার বহু লোক নিহত হইয়াছে। এই হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য গঠিত হইয়াছিল ডেভলিন কমিশন (Devlin commission)। এই কমিশন তদন্ত করিয়া যেতাজ হত্যার ঘটনাবলির কোন সম্মান পান নাই এবং ক্রায়াশালাণ্ডের শাসন ব্যবস্থাকে পুলিশ রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশনকে আরও স্বায়ত্তশাসনাদিকার দেওয়ার জন্য গঠিত হইয়াছে মঙ্কটন কমিশন। বুটিশ প্রমিকদল এই কমিশনে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এই ধরনের কমিশনে তাঁহাদের আপত্তি করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তাঁহারা প্যারলিমেন্টারী কমিশন চাহিয়াছিলেন। মঙ্কটন কমিশনের ২৬জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র আফ্রিকান। এই পাঁচজনের মধ্যেও তিনজন তাঁহাদের আয়ের জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল। বুটিশ সরকার ডা: বান্দা প্রভৃতি বর্ণবাদীগণকে মুক্তি দিতে সম্মত হন নাই। মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশনের প্রধান মন্ত্রী তার রয় উইলেনস্ট্রির সহিত পরামর্শ করিয়াই বুটিশ সরকার এই ধরনের কমিশন গঠন করিয়াছেন, ইহা একরূপ সকলেরই জানা কথা। মি: ম্যাকমিলান আফ্রিকানদের স্বাধীনতার দাবী পূরণ করিতে পারিবেন কি ?

কেনিয়ায় 'মাই মাই' আন্দোলন দমন করিবার জন্য আপেক্ষাকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কেনিয়ায় সামরিক শাসন প্রবর্তন করা হয়, ইহা সাত বৎসর পূর্বের কথা। সাত বৎসর পরে সম্প্রতি কেনিয়া সরকার এই ভুলটী অবস্থা প্রত্যাহার করিয়াছেন। কেনিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আলোচনা আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই উহার উদ্দেশ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, গত সাত বৎসরে 'মাই মাই'দের উপর যে আক্রমণ চলিয়াছে তাহার ফলে ১০ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ নিহত হইয়াছে। মাই মাইদের আক্রমণে যেতাজ নিহত হইয়াছে মাত্র ২২ জন। কিকিযু-নেতা মি: জিম্বো কেনিয়াটাকে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। কেনিয়ায় যেতাজ অধিবাসীদের সংখ্যা মাত্র ১৩ হাজার এবং অবশিষ্ট ৫ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান। কেনিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ, যেতাজ এবং ভারতীয় ও এশিয়া প্রতিনিধিদের লইয়া গত ১৯শে জ্যুলাই (১৯৬০) লণ্ডনে যে আপোশ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহার ফল কি হইবে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। মি: ম্যাকমিলান কেনিয়ার সমস্তা কি ভাবে সমাধান করিবেন ?

মি: ম্যাকমিলান দক্ষিণ আফ্রিকাতে বাইবেন। সেখানকার সমস্তা অল্পরূপ। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যে বর্ণবিভেদের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে তিনি কোন কথা বলিতে পারিবেন কি ?



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

টোনি মাছুর চক্রবর্তী—অন্তঃপ্রাণীমত এক জেয়ার ব্যাপার।

আর প্রথম হালদাও কম ব্যক্তি নন—তিনি এক যশ্বেদী গল্প কৈলে বলছেন। নাম হল তাঁর জনাধন মুখুজে। কাজকর্মের চেষ্টায় বেঁচেছেন তিনি এবং সজের ওই লোকটি। আরও নাবালে কাঁটাভালা অঞ্চলে কারা নাকি লাট ইজারা নিয়ে বন কাটছে। এদিকে সুরিখা না হলে সেই কাঁটাভালা অবধি চলে যাবেন। লোকজন খাটানো হিসাবপত্র রাখা এই সমস্ত কাজ ভাল পাবেন তিনি। মোটের উপর, ডাঙা-অঞ্চলে আর কিছু নেই। পোকার মতন মাছুর কিলবিল করে। পোকার-জরো-জরো এ মানবেলার পড়ে থেকে বাঁচা যাবে না। বাঁচতে হলে নতুন জায়গায় বসত গড়তে হবে। যেমন এই এঁরা সব করেছেন।

গগন তিক্ত হয়ে বলে, সেও আর থাকছে কোথা ঠাকুর মশায়? মাছুরের দ্বিধার অন্ত নেই। দেদার খাবে, আবার ছেলেপুলের জন্ম রাজ্যপাট বানাবে। স্কাপা মহেশ বলে একজন ঘোরাফেরা করছে ইদানীং। বাহু বাড়িলে, কথাবার্তাও বলে বেশ খাস। সে বলে, বড়লোকের নজর লেগেছে—পোকার ধরছে, এ ঘেরির আর বাড়বাড়ন্ত হবে না। আরও নাবালে একেবারে সাগরের মুখে গিয়ে দেখ। কিন্তু গিয়ে কি হবে, সেখানেও যাবে ওরা। কত হাল্কা কবে কটা মাছুর বনের মধ্যে ক'-খানা খর বেঁধে নিয়েছি, এই এত ঘুরেও শনির দৃষ্টি।

জগজগতের চিড়ে খাওয়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কানাচে এসে একটুখানি ওদের কথাবার্তা শুনল। হাসে। চাকরলাকে চুপি চুপি বলে, আমি সামনে বাঁধিনে। খালের মধ্যে রেখে পালিয়ে এসেছিলাম। গেলে ঘরে কেলবে। পচা বলাই সবাই কালীতলায়—আমিও চললাম। বাড়িতে তোমাদের ভাল ভাল অতিথি—বিস্তার রান্নাবান্না হবে। আমিও অতিথি আজকে। রান্না হয়ে গেলে খেতে আসব।

সাতাশ

চাকরলা এসে প্রথম থেকে ডাকে : উঠুন ঠাকুর মশায়। উঠুন ঘরিয়ে চালভাল গুড়িয়ে দিয়ে এলাম। চাপিয়ে দিন এবার গিয়ে। ছুটোছুটি করে কী খে খুব প্রেত। খেতে হবে তো বটেই। কিন্তু পরোপকারে প্রথমত জায় বিড়কা। উঠুনের ধারে সৈকা-

পোড়া হয়ে তিনি বেঁধে দেবেন, অন্ত সকলে মহানন্দে বাঁধা ভাত নিয়ে বলবে—ভাতের গিয়ে দেহ যেন এলিয়ে আসে। আড়ামোড়া ভেঙে বললেন, আমার অত হাল্কা পোহাবে না। আকটিনও নেই। চিড়ে-মুড়ি যা খরে থাকে দাও। তাই চাটখানি আর খাট তুয়েক জল খেয়ে পড়ে থাকি। বাত কেটে যাবে।

নিবারণ বলে, ভাত বিনে আমার চলবে না। স্পষ্ট বলছি। আমি হাল্কা পোহাব। বাঁধিও ভাল। চল মা রান্নার জায়গা দেখিয়ে দেবে।

উত্তোগী পুত্ব—বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। চাকরলায় সঙ্গে রান্নাঘরে যেতে প্রস্তত। প্রথম খিঁচিয়ে উঠলেন : তোমার এ সাউথুরি কেন বলতো? বেঁধে খাওয়াবার লখ তো জ্বালনের ঘরে অল্প নিলে না কেন? তোমার রান্না কে খেতে যাচ্ছে? একা তুমি খাবে, আমরা সবাই চেয়ে চেয়ে দেখব—তাই বা কি রকম হবে বিবেচনা কর।

নিবারণ বলে, কি করতে পারি বলুন মশায়? আপনাদের কারও তো গরজ দেখিনে।

চক্রবর্তীর দিকে আড়চোখে চেয়ে প্রথম বলেন, সৎ জ্ঞান আদও তো রয়েছেন আমি ছাড়া।

চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমার কথা বলেন তো নাচান। দাস মশায় বিবম খাওয়ান খাইয়েছে—আমার গলায় গলায় এখম। ভাত বেড়ে আসনে সাজিয়ে দিলেও খেতে পারব না।

টোনি মাছুর চক্রবর্তী কত রকমের মজেল ভাড়িয়ে থান। বৈধ সকলের বড় গুণ, জেনে বুঝে বলে আছেন। বৈধ ঘরে চুপচাপ চেপে বলে থাকুন, গরজ দেখাবেন না, নড়াচড়া করবে না—সিঁচি পায়ের হেঁটে আপনায় কাছে হাজির হবে।

চকুর তুলে চক্রবর্তী বলেন, দাস মশায় আর যতই মশায় মিলে যা জ্ঞান-সেবাটা করল, তিন দিন আর জলগ্রহণ করতে হবে না। চাকর একটা পাশবালিশ দিতে পার তো এই মাছুরের উপর গাড়িয়ে পড়ি। চক্রবর্তী ঠাকুর থান বা না থান, শোন ভাল। শিরয়ের বালিশ না হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পাশবালিশ বিনে ঘুম হবে না।

নিবারণ রাগ করে বলে, বামনাই ট্রোলেটির মধ্যে পড়ে আমি যে মশায় ক্রিয়ার মারা পড়ি। পেটের নাকিকৃষ্টি অবধি হজম হয়ে যাচ্ছে। আমার মতন আমি চাট খুট্টে নিইগে।

শ্রমণ হালদার তড়াক করে উঠে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন : একটা মিনিট স্থিতি চাপতে পার না, তা বাইরে এত ঘোর কেনন করে ? বসে থাক তুমি, আমি থাকি।

নিবারণ না-না করে ওঠে : আপনার যে প্রাকটিক নেই। হাত টাট পুড়িয়ে ফেলবেন। রান্না ভাল হবে না। মুড়ি খেয়ে থাকবেন, তাই থাকুন না মশায়।

শ্রমণ শৈব হারিয়ে বললেন, রান্না হয়ে যাক—খেয়ে দেখে প্রাকটিক আছে কি নেই। বকর-বকর কর কেন, শুয়ে শুয়ে পা নাচাচ্ছিলে তাই নাচাও আবার।

চাকর বলেন, কোথায় কি জোগাড় করেছ, চল—

চাকরবার সঙ্গে শ্রমণ রান্নাঘরে গেলেন। খিক-খিক করে চাপা হাসি হাসে নিবারণ। চক্রবর্তী কাছে জাঁক করে বলে, জাতে ছোট হওয়ার কত সুবিধা, বুকে দেখুন চক্কোতি মশায়। আমাদের হাতে কেউ খাবে না, আমরা মজা করে সকলের হাতে খাব। কামেলা পোচাতে হল না তাই। কিন্তু আপনি যে সত্যি সত্যি শুয়ে পড়লেন, একেবারে নিরুপু রাত কাটাবেন ?

চক্রবর্তী তার কথার জবাব না দিয়ে উজকটে চাকরকে ডাকলেন, শুনে বাও তো মা একবার এদিকে ?

চাকর এসে বললেন, যুথুজ মশায় বাঁশে গেলেন তো আমায়ও এক মুঠো চাল দিয়ে দিও।

চাকরলা হেসে বলে, সে জানি। চাল আমি বেশি করে দিয়েছি।

হর ঘড়ুই বলে, হাজ্ঞেশ্বর প্রসাদ আমিও চাট্টি পাই যেন।

চাকর বলে, তুমি একলা কেন, বাড়ি স্ত্রু সবার আমরা প্রসাদ পাব। হিসেব করে চাল মেপে দিয়েছি।

বেশ, বেশ। পরম উল্লাসে নিবারণ ঘাড় দোলায় : এক বজির রান্না বাঁধিয়ে নিচ্ছ তব তো ? খাসা বাঁধেন, আমি খেয়েছি ঠর রান্না। এক দোষ, পবের উপকারে আসবে শুনে মন বিগড় যায়। আজকের রান্নাই বা কি রকমটা পীড়ায়, দেখ।

রান্নাঘরের ভিতরে শ্রমণ ওদিকে তেরিয়া হয়ে উঠেছেন : আজ এক এক পণ্ডরের গুড়ি—গোটা বাদাবন তুলে এনে রান্নাঘরে চুকিয়েছে। এই কাঠ ধরতেই তো রাতটুকু কাবার হয়ে যাবে।

ম্যানেজারের অবস্থা বুকে নিবারণের মায় হুল বোধ হয়। বলল, মাথা গরম করবেন না। রান্নায় তা হলে জুত হ'বে না। দা-কাটাির একখানা দাও দিকি ভালমানুষের মেয়ে, আমি কাঠ কুটিয়ে দিচ্ছি।

জগার কাছে শুনে পটা বলাই বাব্জীম এবং আরও দু-তিন মরদ কালীতলায় দিক থেকে এসে পড়ল। গগন আর হর ঘড়ুই তাদের সঙ্গে। গোরালের গরু বের করে কোথায় নিয়ে গেল। কামবার তকাপোশটাও ধরাখরি করে নিয়ে চলল। শ্রমণ রান্না করেন আর দেখেন। বাঁধেন তিনি সত্যিই ভাল। ভাত আর হাঁসের ডিমের তরকারি নেমে গিয়েছে, বুগের ভাল ফুটছে। আশা মরি কী সুগন্ধ ! রান্নাঘরের সামনে গগন এসে তাগিগ দেখ : আর বেশি কাজ নেই, নাথিয়ে কেগুন দেবতা।

শ্রমণ বলেন, খুব স্থিতি পেয়ে গেল ?

গগন বলে, আজ্ঞে না, স্থিতির কারণে বলছিলেন। গোলমালের ব্যাপার আছে আজ। আমাদের যখন হয় হবে, বিদেশি মানুষ আগুনরা তড়াতড়ি সেবা শেষ করে নিন। তার পরে আপনারদের পার করে বরাপোতার দিকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ বলে, বেশ তো আছি ভাই, রাতদুপুরে আবার পারাপার কেন ? একটা চট-মাছুর বা হোক কিছু দিও, তোমার ঐ আলম্বরে পড়ে থাকব। কিছু না দিতে পার, তাতেও ক্ষতি নেই। মেজের পড়ে যুব।

গগন বলে, যম হবে না এদগরে থাকলে। তবে আর বলি কেন। হর ঘড়ুই ঐ সঙ্গে বেগ দেয় : একটা রাতের তরে অতিথ এসেছেন, গণ্ডগোলে থাকার কি দরকার ? তড়াতড়ি চাট্টি খেয়ে নিয়ে গাভ পার হয়ে সরে পড়ুন।

কী একটা বড় বড় ব্যাপার আছে, মানুষগুলোর গতিক দেখে বোঝা যায়। এক দণ্ড স্থির হয়ে পীড়ায় না, চরকির মতো ঘুরছে। এই রকম আধাআধি বলে গগনও ছুটে বেকল আবার কোন দিকে।

শ্রমণ জানবার জন্য আকুলিবিকুলি করছেন। চাকরলাকে ইসারায় কাছে ডেকে বলেন, ওরা কি বলে গেল, মানে তো বুঝলাম না মা !

নিম্ন কণ্ঠে চাকর বলে, কালীতলায় পুজো হচ্ছে। নরবলি ওখানে।

সে কি গো ?

বলবেন না কাকি ! খবরদার, খবরদার ! আমার আবার মস্তবড় দোষ, পেটে কথা থাকে না। সমস্ত বলে-কয়ে অবসর হয়ে পড়ি। টের পেলে পাড়ার ওরা আমাকেই ধরে হাড়িকাঠে কেসাবে !

কিন্তু চাকর রাই হোক সেজ্ঞা কার মাথাব্যথা ? নিবারণ বলে, বলছ কি তুমি ! জলজ্যস্ত মানুষ ধরে বলি দেবে—খানা-পুলিশের ভয় করে না ?

চাকর তাকিলোর ভাবে বলে, এমন কত হয়ে থাকে। থামা তো একদিনের পথ এখান থেকে। কুমিরমারিতে এক চৌকি আছে—শুনেছি, জন দুই-তিন সিপাহি সেখানে তিনবেলা ঠেসে মাছ-ভাত খেয়ে আরাম করে নাক ডেকে ঘুমায়। ধরবে কি করে ? বলির পরে পুজোআচা হয়ে গেলেই তো ধড়-বুড় গাভের জলে ছুড়ে দেয়। টানের মুখে সে সব দূর-দূরন্তর চলে যায়, কামটে খুবলে খুবলে খেয়ে দু-শশখানা হাড় শুষ্ক অবশেষ থাকে।

শ্রমণ সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, এ যে বাবা মগের মূলক একেবারে ! চাকর বলে, বাদা মূলক। বাদায় মানুষ কাটে হাজ্জামা নেই। কাটে সব বাইরের মানুষ ধরে ধরে। বাদায় বাসিন্দা তারা নয়। কোন রকম তাদের খোজখবর হয় না। এই বত পোনেন, লাপে কাটল বাঘ-কুমিরের পেটে গেল—সবই কি তাই ? মায়ের ভোপেও যাচ্ছে কত জন। পাঁচ-সাতখানা বাঁক অন্তর এক এক মায়ের ধান—তারা কি উপোসি পড়ে থাকেন ? সমস্ত কিন্তু 'সাপ-বাঘের নামে চলে যায়।

শুনে শ্রমণ হালদার থ হয়ে গেছেন। বাদা রাজ্যের এ কেন পুজা-প্রকরণ বাইরের লোকের অজ্ঞান। বুগের ভাল কড়ইয়ে টগবগ করছে, শ্রমণ দেখেও দেখছেন না। নিবারণ বলে,

ডালে খানিকটা জল ঢেলে ঠাণ্ডা কর মশার। ধরে বাবে, খাওয়া বাবে না।

প্রথম বলেন, রাধ বাপু এখন ডাল খাওয়া। মাছের কেটে দায়ের পুজা—কী সর্বনাশ। গা-রাধা আমার মুলিয়ে আসছে। খাওয়া মাছের উঠে গেল।

চাক বলে, কিন্তু ডাল মাছের বলি হবে না কখনো। বালার দ্বারা মন করতে আসে, কালী করালী তাদেরই কবির খান। তাদেরও ডাল, মুক্তি হয়ে যায় সজে সজে।

সহসা গলা নামিয়ে নিবীহ কর্তে বলে, জামের মুখের মশার, ডারি এক শরতান কেরেবাজ আজ নাকি বাদার আসছে। প্রথম হালদার নাম—ফুলতলার কাঙালি চক্কোতির ছেলে অম্বকুল চৌধুরি—তাদের ম্যানেজার। আমাদের উদ্দেশ্য করে এই নতুন-খেরি গ্রাম করবার নানা রকম পাঁচ কষে বেড়াচ্ছে সেই লোক।

প্রথম ভাড়াভাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেন। কিন্তু চাকবালার ছাড়ে না। বলে, অমন কটকটালে লোক শুনেছি টাঁদের নিচে নেই। আমি দেখিনি মাছটাকে। আপনারা দেখেছেন?

নিবারণের দিকে তাকিয়ে প্রথম ভাড়াভাড়ি বলে ওঠেন, না না, আমারও দেখে কোথায়?

বলে, শুধুন মুখের মশার। দাদা বলে মিলেন পাঁচ হয়ে বরাপোতা চলে যেতে। আপনারা যাবেন না। কিবা গেলেনও নরবলির সমস্যা লুকিয়ে এসে চোখে দেখে যাবেন। সুবিধা হল জো ছাড়বেন কেন? আমাদের দেখতে মেয়ে না। কি করব—মেয়েমাছদের বাস্তিরে একা-দোকা বেরুতে সাহস হয় না। ঘরে কসে বলে বলির বাজনা শুনব।

প্রথম বলেন, বলি দিচ্ছে কাকে? কোথায় রেখেছে—মাছটাকে দেখেছি তুমি?

চাক একবারে কাছে এসে বলে, আপনাদের বলছি। চাউর হয়ে না যায়, খবরদার। ওরা বলা-কওয়া করছিল, চুরি করে আমি শুনে নিজেছি। ম্যানেজার প্রথম হালদারের কথা হল না—বলি দেবে সেই মাছটাকে। মিথ্যা মাফলা সাজিয়ে আমাদের দায়িক কয়েছে, জিনিষপত্রের ক্রোক করে নিতে আসছে আজকে তারা।

নিবারণ আর ধৈর্য রাখতে পারে না।

সবই তো পাচার করে দিলে। পাড়াহুস্ত মিলে করলে তাই

এতকণ ধরে। বারান্বরে আমি, কিন্তু চোখ দুটো মেলেই আছি মা-লক্ষ্মী। জিনিষের মধ্যে আছে ওই মেটে হাড়ি, ফুলে কড়ই আর হেঁড়া মাছের পোটাকরক। ক্রোক করতে এসে নৌকো-ভাড়াও জো পোষাবে না। কে এক বাজে খবর ফটল—তাই অমনি একদল দলি বওদায়িত্তে লেগেছে, আর একদল হাড়িকাঠ পুতে বসে আছে কলীভলার।

চাক বলে, ধবর বাজে নয়। দাদা নিজে দিয়ে সব থেকে জেনে এসেছে। আসছিল তারা। জা আঁকা এক কারনা হল—পাচের তিনটি গন্ধর পাকিডে আঁটকে রেখে

এসেছে। চাব পাঁচ জন বেরিরে পড়েছে, হাত-পা বেঁধে চাংবেলা করে এনে ফেলবে এম্বু।

প্রথম সাহস করে বলে ফেললেন, এ-ও তো বিবস কালীক দেখছি। সরকারি হুকুম মতে আইন মোতাবেক পরামোদন নিয়ে আসেই যদি সত্যি সত্যি, অমনি এরা বলি দিয়ে ফেলবে? লাটসাহেব যা, আদালতের চাপরাশিও তাই—সবাই ঠরা ভারত সরকারি। সরকারের বিপক্ষে যাবে—তার পরের হাজারটা কেউ একবার ভেবে দেখবে না।

চাক সহজ কর্তে বলে, হাজারটা কিসের! বললাম তো সে কথা। মানবেলা নয়, এখানকার বীতব্যাভার আলাদা। হাগল বলি দিতে দিতে তার মধ্যে এক সময় মাছটাকে টুক করে হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দেবে। বালিতে ধার দিয়ে দিয়ে মেলতুকখানা এমন করে রেখেছে, সে মাছের নিজের ঠাঁহর পায়ে না কখন ধড়মুড় আলাদা হয়ে গেছে। খালি মুতু পিটপিট করে তাকাবে। ততক্ষণে বণপাস করে মাছ-গাড়ে ছুড়ে দিয়েছে। জলের টানে পাক খেয়ে পলকের মধ্যে কোথায় চলে গেল মুতু—কোথায় যা চলে গেল ধড়! এসে পড়েছেন তো স্বচক্ষে দেখে যাবেন কেমন সে ব্যাপার।

বলে কি মেয়েটা! কী রকম সহজ ভাবে বলে বাছে। হামেশাই যেন এই সব ঘটে থাকে, মাটি কাটা কিবা মাছ মাযর মতোই অভিসাধারণ এক ব্যাপার। তবেও বা! বাদাবন এক তাকব জগৎ—প্রাণের দাম কাণেকড়িও নেই এখানে। মানবেলায় থেকে প্রাণ বাঁচাতে না গেবে মাছের প্রাণ হাতে করে পড়ে এসে এখানে। প্রাণরক্ষার শেষ চেষ্টা। টিকে থাকল তো মাছে-ভাতে জুখে বাঁচবে। এমন কি কাঙালি চক্কোতির কপাল হল মেছো-চক্কোতি নাম ঘুরিয়ে চৌধুরি খেতাবও হতে পারে কোন এক দিন। কিন্তু প্রাণ হারাতোও হয় গাদা গাদা মাছদের—জন্তু-জানোয়ারের মুখে যায়, আবার এই দেখা বাছে—সোজা-মুজ মাছদের কবলেও।

চাক বলে, ডাল সহসা দেবেন না ঠাকুর মশার? গাঁড়ান, কাল-জিরে এনে দিই। আর বিলাতি কুমড়া আছে যবে, কুমড়ো-ছে চকি খেতে চান তো এক ফালি কেটে নিয়ে আসি।

চাক উঠে কাঁহাবার দিকে দ্রুত চলে গেল কালজিরা ও কুমড়া আনতে। নিজের মধ্যে কথাবার্তার ফুসৎ এতকণে। প্রথম বলেন, শুনে তো? বিপদের উপায় কি বল।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
দ্বারা বিশুদ্ধ
মতে প্রস্তুত

বাকলা

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্বশূল, পিত্তশূল, অম্বপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, তেলুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, জমায়ে জরুরি, অম্বপিত্ত ইত্যাদি রোগ যত প্রকৃতিই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরও আশ্বস্তা সেন্স করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিহসলে মূল্য ফেরৎ। ১২ ডোজার প্রতি বোতল ৩ টাকার, একডো ৩ বোতল—৮ টা। আমা। ডা. মা. ও. সাইকিয়াট্রিক স্পেশালিষ্ট।

দি বাকলা ওষধালয়। হেড অফিস—অস্ট্রেলিয়ার (মার্ক পাবলিশার) ব্রিসবেন-১৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

নিবারণ হাই তুলে হু-বার তুড়ি দিয়ে বলে, আমি চুণোপুটি মাছ—আমার বিপর-টপন নেই। এত কথা! হল, আমার নাম একবারও করেন ম্যানেজার মশায়।

আ—বলে প্রথম টোটে আঙুল টেকালেন। বলেন, আমি হলম জনার্দন মুখো—মুখো, মুখো মশায়—তুলে বাঙ কেন? ম্যানেজার এখানে কেউ নেই।

তা নেই বটে। তবে আবার ভাবনা কিসের? ভাল নাগিরে কেনুন, পাতা করে বলে পড়া যাক।

প্রথম আঙন হয়ে বলেন, বুকেছি চাপড়াশি। ডাবছ, তুসি ভাত-ভরকারি সাপটাংবে, বলি দেবে শুধু আমাকেই। সেটা হচ্ছে না। যেতে হয় তো তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে হাড়িকাঠে মাথা দেব। তুজনে এক সঙ্গে এসেছি তো তোমার একলা ছেড়ে যাব কোন আঙলে?

নিবারণ বলে, আমার কি! বিবান-বিসবান আপনাদের মধ্যে, সরকারি মাছ আমার কোন দোষ হয়ে গেল?

সমন বয়ে বেড়াচ্ছ তুমি। তোমার জোরেই তো আসা। নইলে একা আমার সাথে কি কারও সাহায্যে হাত দিতে পারি।

যে ডিক্রিয়ারি করবে, তাইই সমন বইব আমরা। এই গগন দাঁশ কাল চৌধুরিগঞ্জের মাল কোক ককহ, গগনের আগে আগে আমি গিয়ে আপনাদের আসার উঠি।

কথাবার্তা নিম্নরূপে হিঙ্গল। তাত তুলে প্রথম খামিরে দিলেন। চুপ, চুপ! অনতিদূরে গুদরে তরকের আলোচনা। সরষতুলো খাল অবধি খুঁজতে বেরিয়েছিল, তারাই বুঝি এইবার ফিরে এল। শুধু নিষিগারে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রতি কথ্য কানে আসছে।

গাড়ি ডায়ার তুলে গরু দুটা ঠার দাঁড়িয়ে আছে। মাছ সব পড়েছে। ধরে বেঁধে নিয়ে আসব, সেটা বোধ হয় কেমন ভাবে ঠিক শেরে গেছে।

যাবে কোথা? নতুন মাছ—ওরা পথখাট জানে না। আমাদের সব নখনর্পণে। পাগি হয়ে উড় পালিতে পারে না তো। আছে কোনখানে ঘাপটি মেয়ে। সবাইকে জিজ্ঞাসা কর, নতুন মাছ এদিগরে দেখা গেছে কি না। বড়লা কোথায়?

হব যতুটিকে নিয়ে কালীতলার দিকে গেল, দেখতে পোষায়।

চল বালিতলার। বলি পালিয়েছে, খবর দিতে হবে। বেশি লোকে বেরিয়ে পড়ে খোজাখুঁজি করুক। মহাবলির সব্ব করে শেবটা চালকুমড়ায় পুতুল গড়ে রীত-রক্ষা করতে না হয়।

আর একজন বলে, কামার দেবীদ্বানে তৈরি হয়ে থাকুক। ধরে আনা মাস্তোর কপালে সিঁদুর দিয়ে মালা পরিয়ে হাড়িকাঠে চাপান দেবে।

হুড়লাড় পায়ের শব্দ। ছুটল বোধ করি ওরা কালীতলার। নিশেধ। সবাই চল গেছে তা হলে।

প্রথম আর নিবারণ দয় বন্ধ করে তনছিল। আর নয়—নিবারণ তড়াক করে লাকিরে পড়ে উঠানে। ভাগ্য ভাল, মাছবলন কেউ নেই রাত্রাঘরের এরিকটা। একটা বার পিছন তাকিয়ে দেখল না যেটা মাছ প্রথমতর অবস্থাটা কি। আপনি বাঁলে বাশের নাম। অন্ধকারে হাঁ করে কোন দিকে মিলিয়ে গেল। প্রথম তখন পাখির শব্দে পাঁচটা ঢেলেছেন সব্বার জন্ত। রইল পড় ডাল

আর ভাত—প্রাণের চেয়ে বড় কিছু নয়। বেঁচে থাকলে ঢের ঢের খাওয়া যাবে।

বাইরে এসে ভয় বেন হুমড়ি খেয়ে চেপে ধরল। যেদিকে ভাকান, মনে হচ্ছে ওই বুঝি মাছ। তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাঁধ থেকে নিচে নেমে পড়লেন। খুপসি জল আর মাঝে মাঝে জল ভেঙে চলেছেন। চৌধুরিগঞ্জের আলা কতখানি দূর—পশ্চিমে না উত্তরে, কোন রকম তার ধারণা নেই। বাচ্ছেন, বাচ্ছেন। আর নিবারণ বেন করু'র হয়ে উপে গেছে, কোন দিকে মাছঘটার চিহ্ন দেখা যায় না। সন্ধানি মাছঘণ্ডলার চোখ এড়িয়ে নিজের কোটে কোন গড়িরে পড়তে পারলে যে হয়!

আঠাশ

সকলের আমোদকুতি ছাপিয়ে গগন দাঁসের হাসি—সে হাসির তেজ ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়েছে। রাত্রাঘরে সকলে এসে জুটেছে এখন। গগন বলে, আশাপুর্বে ম্যানেজার মশায় বাঁধাবাড়া করলেন। তা' অতি নির্ভর তোরা জগা। দুটো গ্রাস অন্তত মুখে তুলতে দিলে পারতিল। বলি-টলির কথা একটু পরে তুললেই হত।

জগা বলে, বড় লোকের ম্যানেজার—কত মাছকে নিতাদিন ওরা বেগার খাটায়। আঙকে একটা বেলা পোদ ম্যানেজারকে আমরা বেগার খাটিয়ে নিলাম। রাত্রা করে দিয়ে চলে গেল। ভাল রেংগেছে কে, নাকে সুস্বাদ লাগছে। জিনিষপত্তার টানা-ইঁচড়া করতে খাটনি হয়েছে, বেসে পড় সবাই। দু-গ্রাস চার গ্রাস যেমন হয় ভাগ করে খাওয়া যাবে।

চাকরলা জগার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, পেটুক মাছঘটা খাই-খাই করছে আসা অবধি। বউদি কালীতলার পুজো/আচার জোগাচ্ছে আছে, আমার হাত ছেঁচে গিয়েছে—কী মুসকিলে যে পকেছিলাম! পেট বাজিয়ে একটা মাছ খেতে চাচ্ছে, প্পট্টা-প্পট্টা না বলা বার কেমন করে?

জগাও কথা পড়তে দেয় না : তার উপরে এই চকোত্তি মশায় এসে পড়লেন। বড়লা আহ্বান করে এনেছেন, ব্রাহ্মণ মাছ খিটের উপরে উপোসি বাঁধা যায় না। আবার বার তার হাতের রান্নাও চলবে না গুঁর। ম্যানেজার মশায় নৈক্য্য কুলীন। তিনি এসে পড়ে সুরাহা করে দিলেন। এইদিকে চলে আসুন চকোত্তি মশাই, পরিবেশনটা আপনি করুন। চাকরবার হাতের টাটানি—আমি সকলের পাতা করে দিচ্ছি। আমরা ছেঁয়াছুঁ'রির মধ্যে যাব না।

পাশাপাশি পাতা পড়ল অনেকগুলি। কত চাল দিয়েছে যে চাক—এত জনের প্রায় ভরপেট হবে। কিসের পর কোনটা ঘটেছে আগে ভাগে বেন ছকে ফেলে সাধনো। এরা দিবিয়া খাওয়ালাওয়া চালাচ্ছে—আর পাকশাক সমাধা করে দিয়ে প্রথম হালদার পশ্চিমের চৌধুরিগঞ্জের পথ না চিনে উত্তরমুখোই ছুটলেন কি না কে জানে? রতামাসা হাসিমকরা—তার মধ্যে খাওয়া বেশি এগোয় না।

এমনি সময় বিনি বউ আর নগেনশী এসে পড়ল। বামা কীবে মশাসই এক পুরুষ খানিকটা পিছনে। জাপা মহেশ। মহেশের পরনে লাল ঢেলির কাপড়; গলায় কড় ও কড়াঙ্কের মালা, জুড় জুপুট উপবীত। বামা অকসে এক ডাকে-ঢেনে তাকে সবলে।

আজকের পুরুত সে-ই। নৈবেদ্য ও পান্থ্য-কাপড় নিয়ে নিয়েছে, দক্ষিণার টাকা বাঁকি। নগেনশশীও কিছু কিছু তাই এসেছে। কত বাঁকি নগেনশশী, শুধুমাত্র মন্ডবের মাছের নয়, দায়দায়িক অনেক কাঁধের উপর। পুরুত ও বাজেনদারের হিসাব মিটিয়ে তবে আসতে হল। আরও অনেক পড়ে আছে, সমাধা হস্তে এই মাস পুরো লেগে বাবে। তার উপরে একখানা পা ইরে মতন নগেনের—বিনি-বউ ভাইয়ের হাত ধরে এতখানি পথ ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে। সেই জ্ঞান দেবি।

আলার চুকে কলরব শুনে নগেনশশী রান্নাঘরের ছাঁচতলার এসে দাঁড়াল।

কি গো, ভোজ্যে বসে গেছে যে তোমরা সকলে?

গগনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। কুর্ভিক্ষে মাছুষ। বাড়ি থেকে এই দল এসে পড়ার আগে ব্যাপারি আর মাছ-মাংসের কত দিন খাইয়েছে এটা-ওটা উপলক্ষ করে। গ্রন্থগুলো তবকারি সহ এমন আয়োজন করে নয় অথবা, সে সাধ্য তখন ছিল না। কোনদিন হয়তো শুধুই হুন-ভাত। তবু খেয়েছে অনেক মাছুষ একত্র বসে। নগেনশশী জেঁকে রসার পর আর তেমন হবার জো নেই। নিজের ঘরেই চোর যেন সে। কৈকিয়ন্তের ভাবে তাকাড়ি বলে, কী করা বাবে? ঠাকুর মশায় রান্নাবান্না করে দিয়ে গেলেন। ভাত নষ্ট হয়। তাই বললাম, তোরা বাপু এগুলো খেয়ে শেষ করে দিবে বা।

চাকরালা কিছু দৃকপাত করে না। ঠেঁশ দিয়ে বলল, পারের দোবে দেবি করে ফেললেন। নইলে আপনিও তো এই সজে বসে বেছে পারতেন।

জগন্নাথ জুড়ে দেহঃ এখন বসে পড় না কেন একটা পাখা নিয়ে। নৈকবা বায়ুনে বেঁধেছে, জাত মরবে না।

চাকু ও জগগকে একেবারে উপেক্ষা করে নগেনশশী গগনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, কোন বায়ুন ঠাকুর এসে রান্নাবান্না করে দিয়ে গেল?

কি জবাব দিল জগা, চৌধুরি বাবুদের মানোন্মার প্রথম হালদার। মাছুষ যেনই হোক, লোকটার জ্যাভায়ে খুঁত নেই।

ঘরের ভিতরে উঠে এল নগেনশশী, কিছু খেতে বসল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত খবরাখবর শুনে নেয়। শুনে হতবাক হয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

কী সর্বনাশ, কোন সাহসে এত বড় কাণ্ড করে বসলে জামাইবাবু? জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া। চৌধুরিরা লোক সোজা নয়—হাত-পা বুয়ে আবার গিয়ে কেশেঘরে উঠতে হবে, এই তোমার ভবিষ্যৎ। সে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

গগন ভালমন্ড কিছু জবাব দিল না। জগা বলে, কুমিরের বা স্বভাব তা সে কয়েকই। ঝগড়া না করে বাও না জলে কুমিরের সঙ্গে ভাব করতে। গিয়ে মজাটা বুকে এস।

নগেনশশী আগুন হয়ে বলে, মন্ডলবধান কে পাকাল বুঝতে পারছি। বাউগুলোটা তো বিদ্যে হয়েছিল। আবার কখন এসে ভর করল?

জগা বলে, তোমার বুক টনটন করে কেন? তুমি কে হে? তোমার বুক চড়াও হয়েছি নাকি?

বলল গগনই যেন—তার উপরে নগেনশশী থিচিয়ে ওঠেঃ বলে দিয়েছি না জামাইবাবু, বাড়ির উপর কেউ না আসে। কাজকর্ম

খাকলে বাইরে থেকে মিটিয়ে বাবে। তবে কি জন্ত বাজে লোক চুকে দাঙ?

এর পরেই জবাব আর বুকের নয়, হাতের। তাতে জগা শিহপাও নয়। কিন্তু হঠাৎ কী হল তার—দুঃস্বপ্ন অভিমানে সর্বদেহ অসাড় হয়ে গেল যেন। সকলে মিলে কত আশায় নতুন জালা বানাল—এই নগেনেরা কোথায় তখন? আজকে সেই লোক হুমকি দিচ্ছে জগন্নাথকে চুকে দেওয়া হয়েছে কেন? এর জবাব গগনই বা দেবার দিক। গগনকে সে বলে, কি বড়দা, বলবে না কিছু? নতুন ঘেরি শালাকে দানপত্র করে দিয়েছ বুঝি—কিছু তোমার বলবার নেই?

তারপরে জ্ঞান যায়। বাচ্ছে, দুটি ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকায়। যাঁড় নিচু করে সবাই দ্রুত খেয়ে যাচ্ছে। জগা উঠে পড়ল।

বলাই বলে, ও কি, ভাত খুয়ে ওঠ কেন?

অথের মাছ-ভাত খেয়ে খেয়ে মেনিবিড়াল হয়ে গেছিস তোরা সব। মাছুষ নেই এখানে। নয়তো পা ভেঙে লোকটা ঝোঁড়া হয়ে আছে, হাত ভেঙে দিয়ে ছুলা করে দিতিস এতক্ষণ।

আলার সীমানা ছেড়ে ভীষবেগে বেরুল। ইচ্ছে হচ্ছিল, বাবার আগে একটা খাবড়া মেয়ে বায় নগেনশশীর গালে। কিন্তু যেহি পতনের সেই গোড়ার আমল আর নেই। সবাই তাকে বাঁচিল করে দিয়ে নতুন আলার পড়ে খোঁসামুদি করে। সাঁইতলা কম হুখে ছেড়েছে সে—সাঁইতলা ছেড়ে খাজানলের চাকরি স্বীকার করে বয়ারখোলা গিয়ে উঠেছে। কিসে বাবে বয়ারখোলা এই রাতেই। গরু ছটো, শোনা গেল, গাড়ি পার করে এনেছে। গাড়ি ঘুরিয়ে তেলিসীতির পুল হয়ে বাবে এবার।

বাঁধের উপর এসেছে। নীরব জ্ঞানকার। ভাবছে, পাড়ার ভিতর পুরনো চালাঘরে দু-দুই বসে বাবে কিনা। মাছমাংসের ঘোর থাকতে ভাল নিয়ে কিরবে, তাদের সঙ্গে ছটো কথা বলে বেতে ইচ্ছে করে। জগাকে দেখে খুশি হবে নিশ্চয় তাদের কেউ কেউ। তবে তো চালাঘরে পড়ে থেকে রাতটুকু কাটিয়ে যেতে হয়। মাছের সায়ের বসল এই মূল্যে—ওরা সেই থেকে ছটো চায়টে পয়সার বুধ দেখছে। নাক সিঁটকে ভাল লোকেরা বলেন, চোরাই কাজ-কারবার বাড়িয়ে দিল সায়ের বানিয়ে। তা সাধু পথ দিন না কিছু

ধবল ও

বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল চন্দ্ররোগ, সৌন্দর্য্য ও চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য পত্রালাপ বা লাক্ষ্য করুন। সময়—সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্রাশন্যাল কিওর সেন্টার
৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

ফোন নং ৪৬-১৩৫৮

কবছা করে এই চোর বাহ-মারার খেয়ে-পরে বাতে সাধুসজ্জন হয়ে যায়।

কীভাবে এসে শীতল জলের হাওয়ায় রাগ কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন জগা এই সমস্ত ভাবছে। জঙ্গল কেটে ঘের বানালাম, কীভাবে কমেছে—কার ভয়ে একুশি খাল পান হয়ে উন্টোখুঁচো বরাবরখোলা ছুটতে? অস্বমনস্ত হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ এক সময় চোখ তাকিয়ে দেখে, এদিকে-ওদিকে জাহার মতন মানুষ। বালাবন—কত মানুষ রয়েছে কত রকমে। অপঘাতে মরলে গতি হয় না, ভুত-প্রোত হয়ে বিচরণ করে। রোমহর্ষক কত কান্ধিনী! তাদেরই একটা দল এসে পড়ল নিশিগাত্র?

একজন তার মধ্যে হাত জড়িয়ে ধরল জগার। বলাই। নগেনেশ্বর ভয়ঙ্কিতে গুয়াও সব আধ-খাওয়া করে উঠে এসেছে। বলাই বলে, যবে চল জগা।

কোন্ ঘরের কথা বলছিল?

তোমার ঘর—আমাদের সকলের সেই চালা-ঘর। ঘরের কথা মনে করিয়ে দিতে হয়—বাণ বে বাণ, কী বাণ তোমার জগা ভাই।

আপা! মহেশ এমনি সময় দ্রুত পা ফেলে তাদের মধ্যে এস। জগার আর এক হাত ধরে বলে, যবে কেন, বালায় বাওয়া থাক চল। বালায় পথ একেবারে ছেড়ে দিলে—কত দিন বাও নি বল তো জগা ভাই। মানুষের কুদৃষ্টি লেগেছে, এখানে আর যুত হবে না। নতুন জায়গা খুঁজে নাও। ভগবানের এত বড় পিরখিয়ে জায়গার অভাব কি?

পচা এসে আবার এর মধ্যে বোণ দেয়: বালায় যখন বাবে, তখন সে কথা। কিন্তু নিজের ঘর-দুয়ারে কেলে বরাবরখোলায় পড়ে থাকবে, সে কিছুতে হবে না জগা। তুমি না এসে আমরাই চল যেতাম, গিয়ে জোরজোর করে নিয়ে আসতাম।

জগা বলে, যবে থেকে তো রাতভোর একা একা মশা তাকানো? তার চেয়ে বাক্সদলের মানুষ—দ্রিবি জমিয়ে আছি সেখানে।

বলাই বলে, এবার আর একলা থাকতে হবে না। সন্ধ্যার পর চালাঘরেই এখন খেলাধুলো গান-বাজনা। মতুন আলায় আমরা কেউ যাইনে।

পচা একেবারে সোজা মানুষ, রেখে ঢেকে বলতে জানে না। বলে, বাইনে মানে কি? আলায় বাওয়া বারণ হয়ে গেছে। আলা নয়, বোলআনা গৃহস্থবাড়ি এখন। গৃহস্থবাড়ি উটকো লোক কেন ঢুকতে দেবে? নগনা খোঁড়া চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাহারা দেয়। খালের ঠিক মুখটার এক নতুন ঘর বেঁধে নিয়েছে, সেইখানে সায়েব। কেনা-বেচার সময়টা মানুষ জমে, তার পরে সে ঘর কাঁকা খাঁ-খাঁ করে।

জগার হাত ধরে নিয়ে চলল পাড়ার দিকে। বেতে বেতে বলাই বলে, এই নগনাটা বিয়ে করবে বলছে চাককে। এক বউ কোথার পড়ে আছে, ঘর করতে চায় না। বউঠাকরনের খুব দত্ত। বড়ল ভাল-মশা কিছু বলে না। আপত্তি থাকলেও বলতে সাহস পায় না।

ধমকে কাঁড়িয়ে জগদ্বাধ প্রসন্ন করে, চাক কি বলে?

মেয়েমানুষ তো। ঘরে পেড়ে পিঁড়িতে তুলে দিলে সাতপাকের সময় সে কি আর লাক দিয়ে পড়বে? অজস্র বাঁধা জায়গা—লাকিয়ে বাবেই বা কোথায়?

পচা আবার বলে, বাওয়া কিন্তু হবে না জগা। কল্লো না। কি ভাবছ?

আচ্ছা, গরুর গাড়ি তো দিয়ে আসি আগে বরাবরখোলায়—

পচা বলে, তোমার ছাড়ব না। গাড়ি-গরু আমিই কাল ঠৈলক বোড়লের বাড়ি দিয়ে আসব।

[ক্রমশ:]

মাকি

[জাপানী কবি 'নগুচি'র "The Boatman" কবিতার ভাবানুবাদ]

পথিকের জন্ত প্রতীক্ষমান রাতের কেরী মাকি হাঁকলে

: এবার নৌকা ভাসবে বিশ্বের দেশে।

: প্রাণীপ জ্বালো রাতের জল আলোকিত হোক

ভয় হচ্ছে এ লক্ষ্যকার বুঝি হাড়ে কানড় বসাবে।

: হে অতিথ, মিথ্যে আলো জ্বালা

নিঃসঙ্গ লক্ষ্যকারের চিত্তের সড়ক বেয়ে

বিশ্বের দেশে প্রথম বার পৌঁছেতে পারো।

হে অতিথ, রাত্রিকে ডরালে চলবে না

যতক্ষণ না নির্জনতার একাঙ্গ হবে

বিশ্বরপুরীর হাড়পত্রও মিলবে না।

অনুবাদক—ডক্টর সেনগুপ্ত।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

আমরা সকলেই নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলাম যে, একমাত্র আসামী গোপী বাবু ও কেঠ বাবু এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের সহিত এই হত্যাকাণ্ডীদের দলের সর্বময় নেতা খোকাবাবুর বর্তমান সম্ভাব্য বাসস্থান এবং তাহার গতিবিধি ও ভবিষ্যৎ কর্মপর্যায় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ আমাদের সরবরাহ করতে সমর্থ। এই মামলার অন্ততম আসামী গোপী বাবু আমাদের তদন্ত সম্পাদক ভুলের জগৎ ইতিমধ্যেই হাতছাড়া করে গিয়েছে। এক্ষণে আমাদের একমাত্র সম্ভল এই আসামী কেঠ বাবু। এও যদি গোপী বাবুর মত স্বীকারোক্তি না করে হেল-হাজতে-চলে যায়, তাহলে তো এই মামলার তদন্তের ব্যাপারে আমরা অগাধ জ্বলে পড়ে যাবো। এই জগৎ ঘেরপেই হোক এই আসামী কেঠ বাবু নিকট হতে একটি স্বীকারোক্তি আনায় করতে আমরা মনস্থ করলাম। এই সময় জনৈক নাগরিক আমাদের ধানায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মধ্যযুগীয় কচুয়া-খোলাই জাতীয় একটি দাওরাই এই আসামীর জন্ত ব্যবস্থা করবার জন্ত আমাদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমরা স্বসভা ভারতীয় পুলিশ বিধায় এই ব্যাপারে দৈহিক পীড়নের পক্ষপাতী ছিলাম না। আমি ঐ ভুলসোককে এই সময় বুঝিয়ে বলেছিলাম যে, দৈহিক পীড়ন এই ধরণের উৎকট অপরাধীদের উপর কখনও কার্যকরী হয়নি। এই সকল অপরাধীদের মধ্যে শেষের দিকে ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই জগৎ এদের মধ্যে কষ্টবোধ, উদ্ভাবোধ প্রভৃতি করেকটি বোধ কমে গিয়ে থাকে। এর ফলে দৈহিক পীড়ন এদের কষ্ট না দিয়ে আনন্দ দিয়ে থাকে। এইজগৎ এই শ্রেণীর আসামীর প্রতি সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। এর পর ঐ বাহিরের ভুলসোকটিকে বিদায় দিয়ে আমি দরজার সিঁপাইকে বাজার হতে সের আড়াই রসগোলা এবং তার সঙ্গে করেকটি লুচি ও কিছু তরকারী কিনে আনতে বললাম। প্রয়োজনীয় রসগোলা ও লুচি তরকারী দেখানো আনা হলে আমি অপর একজন সিঁপাইকে হুকুম করলাম, আভি লে'আও আসামী কেঠ বাবুকো। এর পর শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যস্তের স্তায় কেঠ বাবু আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে আমি আসামী কেঠ বাবুর হাতের হাতকড়ির দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে সিঁপাইকে পূর্বে পরিকল্পনা মত দুই ভৎসনার সুরে বললাম, আরে, এ ক্যা কিয়া ছায়? হাতকড়ি লাগানো কাহে? ই মাছুসী আসামী নেহি ছায়, তাই, ই আসামী বড়বরকা লেডকা ছায়। বহু বড়ী খানদানী আসামী, সমুদ্রা ছায়? এতটা মধুর ব্যবহার ধানায় এসে পুলিশের নিকট পাবে, তা খুনি আসামী কেঠ বাবুর কল্পনার বাইরে ছিল। আমার এইরূপ সদব্যবহারে তার চোখ দুটো সজল

হয়ে উঠলো। আমি এইবার বুঝতে পারলাম যে, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত দুর্বল মুহূর্তট আসামীর মধ্যে এইবার আগন্তপ্রায়। আমি তাকে সরাসরি বুনের কথা জিজ্ঞাসা না করে অতি সহানুভূতির সহিত তার পিতামাতা ও স্ত্রী-পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলাম। এর পর তার সহিত বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে তাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে রসগোলা ও তরকারীসহ করেকখানি লুচি খাইয়ে দিলাম। এই ভাবে তাকে ভরপেট খাইয়ে দেওয়ার মধ্যে আমাদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল। আমরা জানি যে খুব বেশী আহার করলে মস্তিষ্কের রক্ত উদরকে স্থপরিচালিত করবার জন্ত উদরে নেমে আসে। এর ফলে রক্তের অভাবে মস্তিষ্কের শক্তি ক্ষীণ হয়ে উঠে এবং তজ্জনিত মানুষের মনের প্রতিরোধ শক্তির হ্রাস ঘটে। এইরূপ অবস্থায় মানুষের মন বিশেষরূপে বাক প্রয়োগশীল হয়ে উঠে। এইরূপ অবস্থায় আসামী তার অন্তরের গোপনতম কথাটিও বেছায়ে বলে ফেলতে বাধ্য। আমাদের ঐ উদ্দেশ্যটিকে সাধনান গোপন করে আমি একজন নিকট আত্মীয়ের মতন কেঠ বাবুকে বললাম, তোমার যদি ইচ্ছা হয় তো পুলিশের নিকট সত্য কথা বলো, কিন্তু যদি তা না ইচ্ছা হয় তো কোনও কথা আমাদের বলো না। এর পর আমি নিজেই তাকে হাজতখরে পৌছিয়ে দিয়ে তার শয়নের জগৎ দুইখানা ভালো কবলও সেখানে আনিতে দিলাম। এর পর আমি সহকারীদের যথাযথ উপদেশ দিয়ে রাত্রিকালীন আহার সেরে ঘুমবার জগৎ উপরে চলে গেলাম।

এই রাত্রে মাত্র একটুখানি ঘুমিয়ে আমি নিয়ে নীচে নেমে এসে দেখলাম যে, কেঠা বাবু হাজতখরে তখনও পঙ্খস্ত ঘুমতে পারেনি। আমি সহানুভূতির সহিত কেঠ বাবুকে হাজত হতে বার করে অফিস ঘরে এনে একটা ভাঙা ডেক চেয়ারে শুইয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে অকারণে ডাইরী লিখলাম। তার পর আমি একটির পর একটি কথা বলে কেঠর সঙ্গে আলাপও জুড়ে দিলাম। সাংসারিক কথাবার্তার কীক-কীক আমি কেইস সংকল্প দুই-একটা কথা যে না পাড়ছিলাম, তাও নয়। অনেকেই জানান যে দিনে কেউ ভূত বিশ্বাস না করলেও রাত্রে তাগা তা করে থাকে। এর কারণ এই যে রাত্রে স্রাব্য তথা মন দুর্বল থাকে। রাত্রিকালে মানুষের মন অতীব বাক-প্রয়োগশীল বা মাজেসিভ হয়। এই কারণে রাত্রে মানুষকে যা তা বিশ্বাস করানও সম্ভব। বলা বাস্তব্য যে আমি এই বিশেষ দুর্বলতারই স্বযোগ নিতে চাইছিলাম। এ ছাড়া ডেক চেয়ারের উপর শোয়ানরও একটা কারণ ছিল। মানুষ আয়ত্ন কেনারার স্তলে তার স্রাব্যওলি এমনই শিথিল হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় মানুষ যুক্তি-তর্ক বহিত হয় এবং সাময়িক ভাবে বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলে। আমি জানতাম যে

কখন, কবে এক কোথায় আঘাত হানিতে হবে। এ কথা ও কথা পূর্ব বাক-প্রয়োগের দ্বারা আমি অতিরেই কেউ বাবুকে অভিজ্ঞ করে ফেললাম। ইতিমধ্যেই কেউ বাবু আমাকে তার একজন নিষ্ঠা আত্মীয়ের মতনই মনে করে আমাকে বিশ্বাস করতে প্ররূপ করে দিয়েছে। আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমরা চারজন অফিসার পালা করে রাত্রে ঘুমিয়ে নেবে। এক তার পূর্ব প্রত্যেকে তিন ঘণ্টা করে সারা রাত তাকে ঘুমতে না দিয়ে প্রেরের পর প্রের দ্বারা তাকে জরুরিত করে তুলবে। পরিশেষে নাচার হয়ে সে যে একটা বীকারোক্তি করবে তাতে আমাদের আর কোনও সন্দেহ ছিল না। এইরূপ অবস্থায় পড়ে মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। এর কল প্রেরণ হতে শুধু অব্যাহতি পাবার ক্ষমতা তার বীকারোক্তি করে ফেলে। যুরোপে এইরূপ ব্যবস্থাকেই বলা হয় বার্ড ডিগ্রি মেথড। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এতো ভয়ানক আঘাতের মারপাটে পাড়ার আমাদের আর কোনও প্রয়োজন হয় নেই। আমার সহিত কথোপকথনের মধ্যে কোনও এক অসহ্য বুদ্ধিতে আসামী কেউ বাবু তার অনেক গোপন কাহিনী আমাকে জানিয়ে দিলে। এমন কি, তাদের নেতাজী খোকা বাবুর বর্তমান আবাসস্থলও একটা হদিশ সে বিনা বিধার আমাকে বলে ফেললে। এর পর আমি একটুকুও কালক্ষেপ না করে নিষ্ঠা মনে আসামী কেউ বাবু এই খুন সম্পর্কে নির্যাত্ত বিবৃতিটুকু দ্রুত গতিতে টুকে নিয়েছিলাম।

‘হঠাৎ সেদিন আমাদের দলের নেতা খাঁসা ওরফে খোকা এসে জানালো ‘জানিস, একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে’। হোতাখোটা কাণ্ড আমাদের গা’সওয়া। এতে আমাদের আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। তাই ওস্তাদের একপ ব্যবহারে কোনওরূপ হদিশ না পেয়ে আমি তাকে শুধালাম ‘কিসের কাণ্ড? কেউ ধরা পড়লো নাকি?’ উত্তরে খোকা বাবু ওরফে খোকা বাবু আমাকে জানালো ‘না না তা নয়। শোন তবু বলি—কাল মলিনার ঘরে আমি বসেছিলাম। এই সময় হঠাৎ আমি দেখলাম যে দরজার বাইরে পুলিশ। এর পর উদ্ভূহ হই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘বলিস কি যে, তারপর?’ খাঁসা উত্তরে আমাকে জানালো ‘তারপর! হাঁ, বলছি শোন। মলিনাকে দরজাটা বন্ধ করতে বলে এক লাফে জানালা পালে আমি খড়া বয়ে রাস্তায় নামি এবং তারপর পিছনের স্ক পলিটার ভিতর দিয়ে সটকান দিই। আমি চলে আসবার পর মলিনা দরজা খুলে দিলে পুলিশ ভিতরে এসে কাউক না শেরে অপ্রত্যাশিত হয়ে চলে যায়। কিন্তু এ সবই হচ্ছে ঐ পাগলা বেটার কাণ্ড। সেই আমার সখ্যে পুলিশকে খবর দিয়েছে। এই পাগলা ছিল, হজুর, মলিনাস্বন্দীর শিক্ষক। মলিনাকে সে গান শিখিয়েছে! স্বয়ং মধ্যে মলিনার ঘরে এসে সে তবলাও বাজাত। বেচারী পাগলা মলিনাকে বুউব ভালো বাসতো। বতখুব আমি জানি মলিনাও অল্পরূপ ভাবে ভাক ভালোবাসতো। কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন বেটাইয়ে খাঁসা আর আমি মলিনার ঘরে আসি। আমরা পাগলাকে এই সময় মলিনার ঘরে বসে থাকতে দেখে অবাক হই। খাঁসা পাগলার দ্বাক কয় কয় হতে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, আমি শা—প্রতি মাসে

৩৫০ টাকা করে জগাবো, আর তুমি শা—তার কল ভোগ করবে। বেরো, শা—এখান থেকে। পাগলা বেরিয়ে যেতে যেতে খোকাকে বলে গিয়েছিল ‘বেটা, জেল খারিজ শুভা; কেনা জানে তোকে। গাঁড়া, সব কথা আমি খানায় জানিয়ে দিচ্ছি। হাঁ হজুর, এ সত্যি কথা। পরে আমরাও শুনেছি যে পাগলা খানায় খবর দেয় নি। সে সাহসও তার ছিল না। পুলিশ আকস্মিক ভাবে সেদিন মলিনার ঘরে হানা দিয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, আমাদের হজুর, ধারণা হয়েছিল যে পাগলাই আপনাদের ঘরে খবর পাঠিয়েছে। আমরা সকলেই পাগলার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের মনস্থ করি। আমাদের নেতা খাঁসা ওরফে খোকাবাবুর মতে মলিনার এতে কোনও দোষ ছিল না। এর কারণ এই যে মলিনা সব সময়ই মলিনা! শুভ জ্ঞানী কথা। শুভ বিশ্বাসঘাতকতা করবেই। কিন্তু পাগলা সব বিষয় জেনে শুনে পরের ভাগে ভাগ বসায় কেন? এছাড়া খাঁসার মতে পুলিশ এইজন্য খবর দেওয়াটা ছিল তার পক্ষে এক অসম্ভবীয় অপরাধ। পুলিশের দল হতে কুতরের মত এক পাড়া হতে আর এক পাড়ায় তাড়িয়ে নিয়ে আমাদের আঁঠি করে তুলবে। আমরা না পারবো বাঁতে, না পারবো জীবনটা ভোগ করবো। এ আমাদের কাছে অসহ্য। সব দিক বিবেচনা করে আমাদের জীবনের পাথর কাটা এই পাগলাকে আমরা ‘টাপ’ করাই মনস্থ করলাম।

চৌঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ সালের সন্ধ্যায় আমরা দশ জনে মিলে পাগলা ওরফে অতুলকে সোনাগাছির ভিতর পাকড়াও করি। এই সময় সে তার একজন বন্ধুর সঙ্গে পথ চলছিল। খাঁসা পাগলার গলা ধরে কাঁকানি দিয়ে চমকায় করে উঠলো, ‘জানিস আমি কে? আমি আর কেউ নয়, আমি খোকা। আমি তোমার নাক কোট দেবো। উত্তরে পাগলা সভয়ে খোকা বাবুকে বললে, ‘এবারের মত মাণ কর ভাই। আমি কখনো আর তার ওখানে বাবো না। ইতিমধ্যে ঐ পাড়ার মতিস্বর মণীন্দ্রবাবু—সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সব কথা শুনে মণীন্দ্রবাবু মধ্যস্থ হয়ে খোকাবাবুকে অস্ত্রস্বাধ করলেন, ‘বাকু, এবারকার মত ওকে যেতে দাও।’ এর পর পাগলাকে কিছুক্ষণের মত সেখানে থেকে আমরা যেত দিই। কিন্তু সে কিছু দূর চলে আসার পরই আমি খাঁসার আদেশে তাকে পুনরায় চেপে ধরি এবং গোপী বাবু দৌড়ে গিয়ে আমাদের জঙ্গ সেখানে একটা ট্যান্ডি ডেকে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে পাগলা একবার আমাদের হাত কড়ে নাকি বীণা নামে একটা স্ট্রীলেকের বাটাতে চুকে পড়তে পেরেছিল। কিন্তু আমরা তার পিছু পিছু বাঁড়া করে তাকে পুনরায় পাকড়াও করে নিয়ে এসেছিলাম। ব্যাপার দেখে পাগলার সঙ্গী বহুটী সরে পড়ছিল। গোপী বাবু তাকে চেপে ধরে বলে উঠলো, তুই আবার বাচ্চিস কোথায় যে শা—। কিন্তু খোকা এই দিনের মত তাকে বেহাই দিতে বলায় সে তাকে ছেড়ে দেয়। এর পর আমরা সকলে মিলে তার করে পাগলাকে ট্যান্ডিতে তুলি। আমাদের ট্যান্ডিখানা গরান্ধাটার একটি শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে চলছিল। এমন সময় হঠাৎ পাগলা পাড়া মাত করে চেঁচিয়ে উঠলো, ‘ওগো, ওগোরা আমাকে বাঁচাও। এরা আমাকে ঘেরেই ফেলবে।’ পাগলাকে চোঁচাতে শুনে ট্যান্ডি-ডাইভার ঐ মন্দিরের সাঁমনেই তার গাড়ীখানা ফেঁচ দিলে। সত্য পোয়াল নামে একজন ব্যক্তি ঐ সময় ঐ মন্দিরের শৈঠায় মাথা ঠুকে প্রাণায়

জানাজিল, 'ঠাকুর। বাবা তারকনাথ'। হঠাৎ আমাদের ট্যাক্সিখানা খেমে বাওয়ায় কাঁচ করে একটা আওয়াজ হয়। এই আওয়াজ শুনে সত্যাবাবু আমাদের দিকে ফিরে দেখে এবং আমাদের সেখানে এই ট্যাক্সির উপর বসে থাকতে দেখে সে ট্যাক্সির কাছে ছুটে আসে। ইতিমধ্যে হাক গোঁসাই নামে এক স্থানীয় প্রজালোকও অস্ত্রাভূত পথচারীদের সহিত সেখানে এসে ভিড় করে। এই ছুই ব্যক্তির সহিত আমাদের পূর্ব হতে পরিচয় ছিল। এদের মধ্যে গোঁসাইজী ট্যাক্সির পাদানীর উপর উঠে আমাদের ভিজ্ঞাসা করে, 'এ্যা, ব্যাপার কি? পাগলা বাবু চোঁচায় কেন?' এই পাগলাকে ওরা আমাদের তবলচি বলে জানতো। সেই জন্ত এরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ সব্বন্ধে অবহিত থাকলেও আমাদের অভিসন্ধি সব্বন্ধে কোনরূপ সংকেহ করে নি। পাগলা কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক এদের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু নাশিণ জানায় নি। তবে তার ছুই চোখ দিয়ে তখন ঠিক বরবার ধারার মত জল গড়িয়ে পড়ছিল। নিশ্চয়ই সে ট্যাক্সির উপর বসে রইলো। এই সময় মুখ দিয়ে তার একটা বা'ও বেরোয় নি। এদের এই প্রেমের উত্তর দিল খাঁদা নিজে। একটু হেসে ফেলে তারের সে জানালো, 'আপনারাও যেমন। মদটা খেয়েছি একটু নশাও হয়েছে। এখন আবার বাচ্ছি আর এক জায়গায় খেতে। এই সকলে মিলে একটু কুর্জি করতে হে হে—' এর পর কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সিখানা আমাদের নির্দেশ মত গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সিটাকে এখানে বিদেয় দিয়ে আমরা একটু মদ খালাম। পাগলাকেও এখানে আমরা একটু মদ খাওয়ালাম। শেষ পর্যন্ত পাগলাব বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে আমরা তাকে দুই একটা চড় চাপড় দিয়েই ছেড়ে দেবো। এই জন্তই বোধ হয় সে আমাদের প্রতিটি কথাই শুনে চলছিল। এর পর আমরা তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গার ধার দিয়ে অগ্রসর হই। রাত তখন আটটা বেজে গিয়েছে। তবে ঐ দিন জোঁহনার রাত্রি ছিল। ইতিমধ্যে স্নাতবে গঙ্গা পার হয়ে আমাদের এক পরিচিত পুরানো পাণী গোঁবীয়া সেখানে এসে উপস্থিত হলো। গোঁবীয়া ছিল একজন সাধারণ 'খাউ' অর্থাৎ চোরাই মালের গ্রাহক বা ক্রেতা। বড় গোছের চুবিচামারি বা খুনখারাপীর মধ্যে সে কখনও থাকেনি। এই সকল ব্যাপারকে সে ভয় করেই চলে। তাকে সেখানে দেখে থোকা তাকে বললো, 'একে আমরা এখানে এনেছি ট্যাপ করবো বলে। আসবি তুই আমাদের সঙ্গে?' ট্যাপ করার প্রকৃত অর্থ গোঁবী জানতো। সে আমাদের সব্ব নিরেছিল চোরাই মালের অপসার। খুনখারাপীকে সে বিশেষরূপে ভয় করে। আমাদের মুখে এই ট্যাপের কথা শুনে সে যেমন নিশ্শব্দ এসেছিল, তেমন নিশ্শব্দে সেখান থেকে সরে পড়লো। বিনা অনুমতিতে সরে পড়ায় খাঁদাবাবু গোঁবীর উপর ভীষণ চটে গিয়েছিল। একটা খুনের নেশা তখন তাকে শেরে বসেছে। ভীষণরূপে ক্ষেপে উঠে খাঁদা আমাদের জানালো, আচ্ছা লা—যাক তো এখান। পরে ওকেও দেখে নেবো আবার।

এর পর খাঁদা পাগলাকে আদেশ করলো, 'বা নেমে যা গঙ্গায়। শীঘ্র জান করে আয়।' আবিষ্ট ব্যক্তির ভায় পাগলা গঙ্গায় নেমে চান করে এলো। পাগলা গঙ্গার পাড়ের উপরকার বাস্তায় উঠে এসে খাঁদা তাকে জিজ্ঞেস করলো, কি রে গঙ্গাজল পান করেছিল? থোকায় এই

প্রেমের উত্তরে পাগলা তাকে জানিয়েছিল, না ভাই পান করিনি। এইবার ধমকে উঠে খাঁদা তাকে আদেশ করলো, যা শীঘ্র গঙ্গাজল পান করে আয়। খাঁদার আদেশে পাগলা পুনরায় গঙ্গার জলে নেমে অজলি ভরে গঙ্গাজল পান করে এলো। আমি শুনেছি যে পাগলা ভালরূপে স্নাত্যর জানতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সে একবারও পালাবার চেষ্টা করে নি। এর পর খাঁদার নির্দেশে আমরা তাকে নিকটের এক 'কাল ভৈরব' শিবের মন্দিরে নিয়ে আসি। খাঁদা পূর্বের মত আবার তাকে আদেশ জানালো, 'বা বেটা যা ঠাকুর নমস্কার করে আয়।' মন্দিরের ঠাকুরকে প্রণাম করে ফিরে এলে খাঁদা পাগলাকে আবার জিজ্ঞেস করলো, চরণামৃত একটু খেয়েছিলি তো? তার এই কথাব উত্তরে পাগলা তাকে জানালো, না ভাই খাইনি তো। খাঁদা আবার তাকে ধমকে উঠে বললে, এ্যা? খাস নি। যা শীঘ্র খেয়ে আয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খাঁদা মন্দিরের পুরোহিতকে বা সেখানকার অপর কাউকে তার এই আশু বিপদের সব্বন্ধে কোনও নাশিণ জানায়নি। এমন কি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষায় চেষ্টাও সে করেনি। ঠাকুরের চরণামৃত পান করে স্তবোধ বালকের মতই সে আমাদের নিকট ফিরে এসেছিল। এর পর আমরা পাগলাকে কুমারতুলির একটা স্তরার্ঘ্য ডিচ বা মেঘর গলির মধ্যে টেনে আনি। গলিটা ছিল একটি অপরিষ্কার গলির পথ। একমাত্র মেঘরবাই সেই পথে বাতায়ত করে। চারি দিক অন্ধকার—নিশ্শব্দ অন্ধকার। হঠাৎ খাঁদা আশ্চর্যের তলা থেকে হাতীর ষাঁড়ে খাঁদানো তার সখের ছুরিখানা বার করে সেটা ডান হাতে উঁচিয়ে ধরে বাহ হাতে পাগলার জামার কলারটা চেপে ধরে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বল দিকিনি পাগলা এটা কি? আসল ব্যাপারটা এতোকণে পাগলায় কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে উত্তর করলো, ওটা-ওটা ভাই ছুরি। হোয়া তো আমাকে মেরেই কেবলি। আমি কিন্তু ভাই একেবারে নির্দোষ। উত্তরে খাঁদা ভাবগভীর হয়ে তাকে বললো, ও সব কথা আর নয়। বিচার হয়ে গিয়েছে। এই বার শাস্তির জন্ত প্রস্তুত হও। তবে হাঁ, একটা কথা। তোর কোনও শেষ ইচ্ছে আছে?

হঠাৎ পাগলার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'আমি মলিনাকে একবার দেখবো।' পাগলার এই কথার আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এ্যা? পাগলা বলে কি? যে মলিনাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই মলিনাকেই সে দেখবে! হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম খাঁদার চোখ দুটো জল জল করে জলে উঠলো। চারি দিকে শুধু অন্ধকার। দেখা যায় সেখানে শুধু খাঁদার দুটা চোখ ও তার হাতের খালা চকচকে ছুরীখানা। এইরূপ অবস্থায় খাঁদা প্রায়ই হয়ে যেতো একটা নির্দয় পশুর মত। এমন কি, সেই সময় তার চোখাও বেত বসলো। এই সময় আমরা পঞ্চাঙ্গ তার ভয়ে শিউরে উঠতাম। হিংস্র পশুর মত এগিয়ে এসে খাঁদা আমাদের ভকুম করলো 'ধর তোকে ভাল করে। আমি আর গোঁবী বাবু দুই দিক থেকে এসে তার দুই হাত সজোরে চেপে ধরলাম। খাঁদা বাবুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা ছাড়া আমাদের পত্যন্তরও ছিল না। অন্ধকারের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি যে পাগলার চোখ দুটা ভেসে বুজে গিয়েছে। রেহ-বিজ্ঞান সব্বন্ধে খাঁদা বাবুর কিছু জান ছিল। তার ঘরে আমি কয়েকটি এ্যানটিবির চাটও টাডানো দেখিছি। অশ্লিষ্ট

কুসকুস প্রভৃতির অবস্থিতি তার অজানা ছিল না। হঠাৎ আঙাজ ফলো, কাচ কাচ কাঁচ। কুসপিও লক্ষ করে খাঁদা তিন তিন বার তার ছুঁখানো পাগলার বৃকের ভিতর বসিয়ে দিলে। বিনা প্রতিবাদে পাগলের দেহটা বক্ষাপুত অবস্থায় মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

বাপারটা দেখে আমরা সকলেই একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হাতার চোক পাগলা বাবু আমাদের পরিচিত ছিল। আমাদের মনের এই চক্কলতা খাঁদার চোখ এড়ায়নি। সে এই বার আমাদের সাহস দিয়ে বলে উঠলো, কি যে ভয় পেয়েছিল? এই কি আমাদের প্রথম কাজ? এতো ভয়ে কি আছে? এর পর খাঁদা দীর্ঘ স্থির মস্তিষ্কে গোপী বাবুকে আদেশ জানালো, 'বা তোর ডলিকে নিয়ে এখন তুই হাঙড়ার কিকে সবে পড়। আমিও আজ মলিনাকে নিয়ে কলকাতা ছাড়বো।

গোপী বাবু খাঁদার নির্দেশ মত ঐ স্থান থেকে চলে গেল খাঁদা আমাকে নিয়ে তার কুমুদগুলির বাড়ীতে আসে। এই সময় সামনের রকটার বসে পাড়ার দেবেন বাবু হাঙড়া খাচ্ছিল। আমাদের জামা কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে সে ঠাড়িয়ে উঠে আমাদের জিজ্ঞেস করলো, 'কি রে! তেদের জামা-কাপড় অতো রক্তা কেন? খাঁদা তার জামার আঙিনার ভিতর হতে তার দারালো ছুঁখানো বার করে ইসলাম্য তাকে চুপ করতে বললে দেবেন বাবু ভয়ে কীপতে কীপতে সেখানে চূচুচাপ বসে পড়ল। সেই স্ত্র্যাগে আমরা

দেয়ার বাটার ভিতর এসে আমাদের বক্তমাথা জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে ফেলি। এর পর খাঁদার জামার কি খেয়াল হলো, কে জানে! সে আমাকে নিয়ে পুনরায় অকুস্থলে ফিরে আসে। ওখানে যাবার সময় একটা ভোজালিও সে জোগাড় করে। ভোজালিটা দিয়ে সে পাগলার পোড়ালির শির্য দুটো কোট দেয় এবং তারপর সে পাগলার মুণ্ডাও এক বোপে বিভিন্ন করে আমাকে একটা চটের বোরা আনবার জ্ঞান আদেশ জানায়। আমি চাটর একটা খলে সজ্জ করে সেখানে ফিরে এসে দেখি যে, সেখানে থোকা নেই। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দর্শি খবরের কাগজে মোড়া পাগলার বাটা মুণ্ডা তার কৌচীর খুঁটে আড়াল করে থোকা সেখানে ফিরে আসছে। আমাকে সেখানে দেখে খাঁদা গর্কিতরে আমাকে জানালো, জানিস, ত্রাকডায় জড়িয়ে পাগলার এই মুণ্ডা মলিনাকে দেখিয়ে এলাম। আর সেই সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করে এলাম যে এর পর আর কাটক সে ভালবাসবে কি না? তার প্রিয়তমের এই কাটা মুণ্ডা দেখে বেটা একেবারে পীত ছিবকুটে সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সেই অবস্থাতেই বেটাকে সেখানে কেলে রেখে আমি চলে এসেছি।' এর পর থোকা আমার আনা সেই বোরটার মধ্যে পাগলার ঐ মুণ্ডা পুর নিয়ে গঙ্গার ঘাটে আসে। বাটের উপর দিককার একটা পৈঠার উপর খাঁদার পিতার এক বন্ধু সন্ন্যাসীবাবু একটা পোমা কুকুর নিয়ে বসেছিল। খাঁদাকে মুণ্ড সমেত বোরটা জলে ফেলাতে দেখে ভক্তলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি রে খাঁদা কি ফেলি রে জলে? কিছুমাত্র গ্লিত না হয়ে খাঁদা উত্তরে তাকে জানিয়েছিল, ও কিছু নয়। একটা মরা বেহাল।

এদিককার সব কাজ কতে করে আমরা একটা সড় গলির পথ ধরে ফিরে আসছিলাম। এমন সময় আমরা লক্ষ্য করলাম,

খাঁদার জুতা দুটো রক্তে ভিজে দিকেছে। এইজন্য খাঁদা তার জুতো দুটো একটা গর্তের মধ্যে গুঁজে দিয়ে শুধু পায়ে চলে আসে। হাঁ হজুর! জুতা দুটো এখনও সেখানে আছে। ঐ জায়গাটা এখন আপনারে আমি দেখিয়ে দিতে পারি। এর পর খাঁদার কুপাখা লেনের ঐ বাড়ীতে আমরা পুনরায় ফিরে এসে উভয়ে আর একবার আমাদের জামা-কাপড় ছাড়ি। এই ক্ষেত্রে আপনারা এখানে দুই প্রহর রক্তমাখা জামা-কাপড় দেখতে পেয়েছিলেন।

এর পর হতে খাঁদার মনের মধ্যে কি হয়েছিল কে জানে? সে আমাদের নিবেদন সত্ত্বেও সেই হত্যার স্থলে বারে বারে ফিরে যেতো। সে যাকে তাকে নিজের এই বীরত্ব সফল কল্যাণ করে গল্প করতো। বাপার স্মৃতিধে নয় বুকে আমি খাঁদাকে নিয়ে দেওঘরে চলে আসি। সেইখানে খাঁদা 'রক্তা অক কুমুদগুলি' এই নামে পরিচয় দেয় এবং এর ফলে আমাকেই সেখানে খাঁদার দেওঘর সাঙ্গতে হয়। আমরা এইখানে দান দান শুরু করি, ভিখারীদেরও সেখানে খাওরতে থাকি। দুই একদিন সেখানকার সরকারি কর্তৃচাষীদের সাক্ষ্য ভোজে নিয়ন্ত্রণ করে বাইয়েও দিই। আমাদের রাক্ষোচিত ব্যবহারে দেওঘরবাসীরা মুগ্ধ হয়ে ওঠে। এই সময় খাঁদার খেয়াল হয় তার বাবাকে—অর্থাৎ কি না মলিনাকে সে সেখানে নিয়ে আসবে। আমরা শুনেছিলাম যে আপনারা মলিনার বাটতে পাহারা বসিয়েছেন। হাঁ হজুর! আপনি ঠিকই জেনেছিলেন যে মলিনাকে না দেখে খাঁদা কিছুতেই থাকতে পারে না। মলিনাকে দেখবার জন্তে তার ওখানে তাকে আসতেই হবে। তবে আপনারা যেমন আমাদের উপর নজর রাখবার জন্তে গুপ্তচর নিয়োগ করে থাকেন, আমরাও তেমনি আপনারদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্ত বেতনভুক্ত গুপ্তচর রেখে থাকি। আমাদের নিযুক্ত গুপ্তচরেরা কলিকাতা হতে খবর দিয়েছিল যে কয়েক দিন হলো মলিনার ওখানে আপনারা পাহারা দেবার জন্ত সিপাহীদের আর পাঠাচ্ছেন না। আপনারদের এই ভাঁওতার ভুলে গিয়ে মলিনাকে বুঝিয়ে স্মৃতিয়ে দেওঘরে নিয়ে যেতে এসেই না আমি আপনারদের হাতে দগা পড়ে গেলাম। হাঁ হজুর, খাঁদার দেওঘরের আন্তান আমাকে আমি দেখিয়ে দেবো। সে এখনও সেখানে আছে এবং আমার জন্ত সেখানে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু দেখবেন হজুর, আমার এই স্বীকারোক্তির কথা যেন সে জানতে না পারে। একথা সে জানতে পারলে তার হাতে আমারও মৃত্যু নিশ্চিত। হাঁ, এই ব্যাপারে একটা জরুরী কথা আপনারদের আমি বসতে ভুলে গিয়েছি। পাগলকে হত্যা করার পরদিনই থোকা আমাকে নিয়ে তার প্রতিজ্ঞা মত সেই পলাতক গৌরীর বোঁজে শেওড়াফুলি যায় এবং সেখানে গিয়ে তাকে এবং তার বন্ধুর মারশিট করে আসে। আমি যে সত্য কথা বলছি তা সেখানে গিয়ে আপনি এই সন্ধে অনুসন্ধান করলে জানতে পারবেন। আসলে খাঁদা কাটকে কখনও ক্ষমা করে নি। আমাকেও এইজন্তে সে ক্ষমা করবে না। আপনারা দেখবেন হজুর! সে আমাকেও তার প্রতি এই বেইমানির জন্ত হত্যা করবে। আপনিও খুঁবে সাবধানে থাকবেন। দেওঘরের রাস্তার যদি একবার সে আপনাকে দেখে তো তৎক্ষণাৎ সে আপনাকে কলী করে মারবে'।

এদিককার সব কাজ কতে করে আমরা একটা সড় গলির পথ ধরে ফিরে আসছিলাম। এমন সময় আমরা লক্ষ্য করলাম, খাঁদার জুতা দুটো রক্তে ভিজে দিকেছে। এইজন্য খাঁদা

আসামী কেট্টোবাবুর এই দীর্ঘ বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে সিপিবিভ করে
আমি যদিও দিকে চেয়ে দেখলাম যে তাঁর পাঁচটা হাতের চলেছে।
ভোঁদের হাওয়া ও সেই সঙ্গে ভোঁরা আলো আসামী কেট্টোবাবুর
পার্শ্বস্পর্শ করা মাত্র কিন্তু কেট্টোবাবু সচেতন হয়ে উঠলো। খুঁট
সম্ভবতঃ কেট্টোবাবু এই সময় ভাবছিল যে সে একি করলে? আমি
শেষ বৃক্কে পারলাম যে কেট্টোবাবু অল্পশাচন্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।
সে তাঁর সন্নিহিত ক্রিয়ে পেয়ে চরমতো ভেবেছিল যে, সে নিজে তো
মরলোই—সেই সঙ্গে সে তার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপক্ষ বিধায়কত্ব করে
বসলে। এই সময় হঠাৎ শুনেলাম যে কেট্টো বাবু কেপে উঠে আমাকে
বলছে ‘আপনি আচ্ছা শরতান তো মশাই? কীকি দিয়ে সব কথা
বার করে নিলেন। যা খুশী আপনি করতে পারেন। আমি
আপনাকে আর কিছুই বলবো না।’ কিন্তু কেট্টোবাবুর বলবার আর
বিশেষ কিছু বাকী ছিল না। প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু ইতিমধ্যেই আমি
তার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। কেট্টোবাবু সেওখরের খোকার
আজ্ঞানার ঠিকানা ইতিপূর্বেই আমাকে বলে দিয়েছিল। উপরন্তু
সে নিজে হাতে তার সেইখানকার সেই বাড়িটার একটা
নমুনা আশে-পাশের পৃথবাটের পরিপ্রেক্ষিতে এক টুকরো কাগজের
উপর আমাকে একেও দিয়েছিল। কেট্টোবাবুকে আমার আর কোনও
প্রয়োজন না থাকায় তাকে এইবার আমি হাজত-ঘরে পূর্ববার জন্ত
পাহারাদার সিপাহীদের আদেশ দিয়ে সিপিবিভ বিবৃতিটি অনুবাদ
করে তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলির সত্যতা যাচাই করার
জন্ত সেইগুলি পৃথক ভাবে একটি কাগজে টুকে দিলাম। আসামী
কেট্টোবাবুর এই বিবৃতির মধ্যে এই হত্যা সম্পর্কে কয়েকজন
মূল্যবান সাক্ষীর নাম পাওয়া গিয়েছিল। এই সকল সাক্ষীদের
মধ্যে সত্য গোয়ালা, হাক্ক গোঁসাই এবং সন্ধ্যাসী ঠাকুর ছিল অন্যতম।
আমি এর পর দিনের আলো ফুটে উঠতেই বাইরে বেরিয়ে পড়ে
এই তিন জনা অতি প্রয়োজনীয় সাক্ষীদের খুঁজে বার করে থানায়
এনে হাজির করলাম। ইতিমধ্যে দুইদল বাবুও চা পান লম্পানসে
ভীষ আকিলদের নেমে এসেছেন। পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসিত
কলেও এই তিন জন সাক্ষী আসামী কেট্টোবাবুর বিবৃতির অঙ্কলই

এক একটি বিবৃতি আমাদের নিকট প্রদান করেছিল। এই নিরপেক্ষ
সাক্ষী তিনটির সাক্ষ্য হতে বৃদ্ধা গেলো যে আসামী কেট্টো
বাবু গত রাতে এই খুন সম্পর্কে আমার নিকট সত্য কথাই
বলছে। কিন্তু বহু সাধ্যসাধনা করা সত্ত্বেও কেট্টোবাবু
আমাদের সঙ্গে গিয়ে তার বিবৃতি অনুযায়ী সেই গুলি হতে
খোঁকা বাবুর পরিত্যক্ত রক্তমাখা জুতা জোড়াটি বার করে
দিতে রাজী হলো না। আমি প্রস্তাব করলাম যে আমরাই ঐ
গুলিটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে ঐ রক্তমাখা জুতা দুটি উদ্ধার করে আনবো।
কিন্তু ইনস্পেক্টার দুইদল রায় অভিমত প্রকাশ করলেন যে,
আসামী নিজে পুলিশকে অঙ্কুলে নিয়ে গিয়ে ঐ জুতা জোড়াটি
তাদের দেখিয়ে না দিলে আদালতের নিকট প্রমাণ্য হব্যরূপে
উহার কোনও মূল্য থাকবে না। এই জন্ত ইনস্পেক্টার রায়
আমাদের উপদেশ দিলেন যে, এই সম্পর্কে পুনরায় কেট্টো বাবুর
স্ববৃত্তির উদয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই
সমীচীন হবে। কিন্তু এর পর শত চেষ্টা করেও আমি তার মধ্যে
তার পূর্ণ মনোভাব আর ফিরিয়ে আনতে পারি নি। অগত্যা
এর পরের দিনেই তাকে গোপী বাবুর মত জেলভাজতে পাঠিয়ে
আমাদের দিতে হয়েছিল। এই সময় আসামী কেট্টো বাবু কোঁতে
অভিমান অতিষ্ঠ হয়ে বাবে বায়ে হাজত-ঘরের লোহার পরানের
উপর মাথা ঠুকে রক্তাক্ত করছিল। এই জন্ত তাকে আর
একদিনও পুলিশ হেপাজতিতে রাখতে আমাদের সাহস হয় নি।

একশ্রেণী আসামীদের মধ্যে সকলকেই একে একে আমরা প্রেস্তার
করতে পেরেছি। বাকি ছিল শুধু মূল হত্যাকারী ঐ মলের নেতা
খোঁকা ওরফে খোঁদা। পরিশেষে এই রাবল বধের ভারও আমাকেই
বেছার আপন স্বন্ধে তুলে নিতে হয়েছিল। এই সময় একটি
পারিবারিক দুর্ঘটনা আমাকে জীবন-মৃত্যু সবকিছু বেপরোয়া করে
তুলেছিল। এই জন্ত নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলেও আমি
উপবাসে হয়ে খোঁকার সন্ধান দেওঘরে বাক্স করার জন্তে প্রস্তুত
হয়ে পড়লাম।

[ককক]

আকাশের প্রতি

সুখাংগুনজন ঘোষ

আমিও তোমার মত রিক নিঃশ্বাসে ছিলাম।

রাটি সেই, ঘর নেই, নেই কোম মানুষের প্রীতিবন্ধন

গুণ নীল বেদনার, ভিল ভিল শুধু হতাশা

সুখ হবে গেছে সব জীকনের সোনারি আশাস।

দিবসে দুঃখের জ্বালায় আমি গুলি তোমারি মন

মরা হাত বকে মোর শতকোটি কামনার কল্ল কল্ল

নির্ধিক নিশান তবু। নিশান যেমনার থাকি সিন্ধুক

অন্ধর শিশির কিসে সিন্ধুক শুধু কবি এই কুক।

আমারও সিঁধ জুড়ে যায়ে মাঝে নেমে আসে মেঘ

সকিত ব্যথার বত পুঞ্জ পুঞ্জ বিবর্ণ আবেগ

বিষয় প্রাণ আসে, হেসে কলে আমারি কল্ল

হাতিহীন হ্রদে ঘরে পড়ে কারার কল্ল নির্ধিক।

ভূমিও আমারই মত হে আকাশ।

একদিন হয়েছিল বহু কিছু চেয়ে বর্ষাকাম

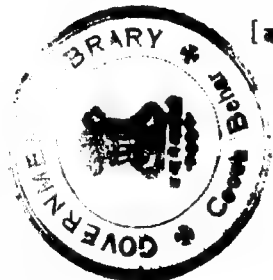
ভাই আজ সমস্ত চাওরাও উর্বে ধ্যানমোহন ভূমি নিদ্রা—

ভূতির আসন পেতে বসে আছ নির্ধিকার শিব বোণাসনে

অন্তরের পূজ্য বত লুকায়েছ পূর্ণতার হ্রদ আবরণে।

বেদনার নীলে নীলে তোমার আমারি আছ মিলেছি হৃদয়

আমিও তোমার মত রিক সুখ হয়েছি এখন।



দেশে-বদেশে

শৌখ, ১৩৬৬ (ডিসেম্বর, '৭৯ জামুয়ারী '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা শৌখ (১৭ই ডিসেম্বর): লোকসভায় দ্বিতীয় পেশকমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে বিতর্কের সূচনা—কমিশনের সুপারিশ নৈরাজ্যজনক বলিয়া বিরোধী পক্ষের অভিযোগ।

কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ পট্টি সীতারামিয়ার (৮০) হৃদযন্ত্রাণের পরলোকগমন।

২রা শৌখ (১৮ই ডিসেম্বর): ১৯৬০ সালের ১৮ জামুয়ারী হইতে ভারতীয় বান্ধ কণ্ঠচাষীদের (৭৫ হাজার) মাগুগীভাড়া বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

৩রা শৌখ (১৯শে ডিসেম্বর): দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্যকে তামিলা বোম্বাই ও গুজরাট দুইটি নতুন রাজ্য গঠন—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অমুমোদন সূচক প্রস্তাব প্রকাশ।

৪ঠা শৌখ (২০শে ডিসেম্বর): দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য কৃষি-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ অত্যাৱশ্যক—নয়াদিল্লীর আলোচনা চক্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

৫ই শৌখ (২১শে ডিসেম্বর): ২৬শে ডিসেম্বর চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ-এর সহিত বৈঠকে অসম্মতি জ্ঞাপন—চৌ-এন-লাই-এর প্রস্তাবের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

৬ই শৌখ (২২শে ডিসেম্বর): আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসাই ভারতের অভিশ্রুত—লোকসভার বিতর্কের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বোষণ।

৭ই শৌখ (২৩শে ডিসেম্বর): আকস্মিকভাবে পাক্সার বিধান সভা অধিবেশন মূলত্বীয় বাধার সরকারী প্রস্তাবের প্রতিবাদে বিরোধী সমুদায়ের বিধানসভা-কক্ষ তাগ।

৮ই শৌখ (২৪শে ডিসেম্বর): কানপুরে টেট ক্রিকেট খেলার অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের জয়লাভের গৌরব অর্জন।

বিশ্ব ভারতীয় সমাবেশের উদ্বোধন আচাধ্য শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) মন্তব্য—অসাধারণ সমাজ জাতির অগ্রগতির অন্তরায়।

৯ই শৌখ (২৫শে ডিসেম্বর): বাঙ্গালোরে তিন দিবসব্যাপী নিখিল ভারত বঙ্গবাহিনী সম্মেলনের অধিবেশন শুরু—মূল সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

১০ই শৌখ (২৬শে ডিসেম্বর): জাতীয় মধ্যমা বিকাইয়া দিয়া শান্তি সংস্থাপনে ভারত রাষ্ট্রী নয়—চীন-ভারত সম্পর্ক প্রসঙ্গে কানপুরে দেশরক্ষা সমিতি জি. ডি. কে. কুমারেনের বোষণ।

১১ই শৌখ (২৭শে ডিসেম্বর): নাগা বিদ্রোহীদের আক্রমণে ডিমাপুর ও ধারকাংটি-এর মধ্যে ট্রেন চলাচল ব্যাহত।

শিক্ষা সঙ্কট বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় নহে—বামবপুর্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উক্তি।

১২ই শৌখ (২৮শে ডিসেম্বর): গণতান্ত্রিক ও শিক্ষাভিত্তিক সমাজের উপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—জব্বলপুরে নিখিলভারত শিক্ষা সম্মেলনে অধ্যাপক নিখিলকুমার সিদ্ধান্তের (সভাপতি) ভাষণ। নয়াদিল্লীতে বিশ্ব নয়ী শিক্ষা সমিতির দশম বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর দাবী—সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী সইয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

১৩ই শৌখ (২৯শে ডিসেম্বর): রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক দুর্গাপুর্ ইম্পাত কারখানার প্রথম ব্রাষ্ট কার্ণেসের উদ্বোধন।

পরিবহন কমিশনের ধর্মঘটের ফলে বোম্বাই নগরীতে বাস ও ট্রাম চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ।

১৪ই শৌখ (৩০শে ডিসেম্বর): দার্জিলিং জেলার নানাহানে বহু তিরতীর সঙ্ঘেহজনক গতিবিধির সংবাদ।

১৫ই শৌখ (৩১শে ডিসেম্বর): নাগা তৎপরতা বৃদ্ধির দরুণ পাকিস্তানের সহস্রহিত আসামের তিনটি মহকুমা রাজ্যপাল জেনারেল এস এম শ্রীনাগেশ কর্তৃক উপদ্রুত অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত।

১৬ই শৌখ (১লা জামুয়ারী '৬০): ভারত সরকারের নিকট চীনের নতুন নোট প্রেরণ—ভারত চীন শীমান্ত সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য সরবরাহ।

১৭ই শৌখ (২রা জামুয়ারী): পশ্চিমবঙ্গে সভা-শোভাযাত্রা, সমাবেশ প্রভৃতি কার্যও নিষিদ্ধ করণের আয়োজন—বিধান সভায় পর্বতী অধিবেশনে সরকার কর্তৃক নতুন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত।

১৮ই শৌখ (৩রা জামুয়ারী): বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে শুভ ও অশুভ সম্ভাবনা—বোম্বাই-এ ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ।

১৯শে শৌখ (৪ঠা জামুয়ারী): পাক-ভারত বিভিন্ন অমীমাংসিত আর্থিক প্রসঙ্গ সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে উভয় রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের চার দিবসব্যাপী আলোচনার সম্ভাব্যজনক সমাপ্তি।

আরও দুই সহস্র শিবিরবাসী উদ্বাহক পশ্চিমবঙ্গ হইতে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণের ব্যবস্থা—কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমোহরচাঁদ খান্নার সহিত পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত।

২০শে শৌখ (৫ই জামুয়ারী): কেন্দ্রীয় প্রমসচিব শ্রীগুলজারীলাল নন্দের বোষণা—তৃতীয় পবিকল্পনার লক্ষ্য হইবে দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি।

অন্তর্দেশী নির্বাচনের জন্য কেবলে ১লা ফেব্রুয়ারী সরকারীভাবে ছুটির দিন ঘোষণা।

কাম্মীরকে কুক্ষিগত করার স্বপ্ন কখনই সফল হইবে না—চীন ও পাকিস্তানের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বন্ধী গোলাম মত্বাৱের সতর্কবাণী।

২১শে শৌখ (৬ই জামুয়ারী): মধ্য প্রদেশের দামুয়ার কয়লা খনিতে আকস্মিক প্রাণহানের ফলে ১৬ জন শ্রমিকের সলিল সমাধি।

ডালহৌসি জোয়ারের নাম 'বিধান-সংসার' করার প্রস্তাব—কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় প্রস্তাবের নোটিশ।

২২শে শৌখ (৭ই জামুয়ারী): শ্রীশ্রী সঞ্জীব বেড্ডী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার তাহার ফলে অন্ধ প্রদেশের প্রমমন্ত্রী শ্রীদামোদরম সঞ্জীৱসী রাজ্য পার্লামেন্টারী দলের নেতা (রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী) নির্বাচিত।

২৩শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী) : ইণ্ডিয়ান পাইলটস গীভের জাহাজে এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশনের বৈজ্ঞানিকদের আকস্মিক ধর্ষণ—বিশেষগামী বিমান চলাচলে বাধার সৃষ্টি।

পাক ভারত সীমান্ত বিরোধ এসেছে নয়াদিল্লীতে উত্তর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় পর্বা য় বৈঠক শুরু।

২৪শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী) : শনিবারের ছুটি ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ হাজার কর্মচারীর (কলিকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত) অর্ধ ঘণ্টা কর্তৃক বিবর্তিত।

প্রধান মন্ত্রী জিনেত্র কর্তৃক শিল্প-এর সম্মিলিত বড়পানিতে আসামের বৃহত্তম জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার উদ্বোধন।

২৫শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী) : মহাসমাবেশে প্রধান মন্ত্রী জিনেত্র কর্তৃক পাণ্ডুতে (গোহাটির সম্মিলিত) বৃহৎ জনসমাবেশের ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন।

বেলগুয়ে ইঞ্জিন নির্মাণে ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ—সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বেলগুয়ে সচিব শ্রীজগজীবন রামের ঘোষণা।

২৬শে পৌষ (১১ই জানুয়ারী) : সনালিবনগর (বাক্সার) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৫তম অধিবেশন আরম্ভ—সভাপতি শ্রী এনু সঙ্গীত হেডা।

নেফা, মণিপুর, নাগা পর্বত ও ত্রিপুরা আসামের সহিত যুক্ত হইবে না—গোহাটিতে প্রধান মন্ত্রী জিনেত্রের ঘোষণা।

ভূগোল কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় (বিজ্ঞা) কলিকাতার লীগ বিজয়ী মোহনবাগান দলের দ্বিতীয়বার তুরাও কাপ লাভ।

ভারত-পশ্চিম পাকিস্তান (পাকিস্তান) সীমান্ত সত্ত্বাস্ত সকল বিরোধের নিষ্পত্তি—দিল্লীতে উত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

২৭শে পৌষ (১২ই জানুয়ারী) : ভারত সীমান্তে চীনা আক্রমণের তীব্র নিন্দা—সনালিবনগরে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ।

২৮শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী) : কলিকাতার ট্রাম ও বাসে ভাঙা বুদ্ধির প্রতিবাদ—পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতৃবৃন্দের বোধ বিবৃতি।

২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী) : মণিপুরের গ্রামে সশস্ত্র নাগা বিদ্রোহীদের হানা—গ্রাম্য নাগা সর্দার নিহত ও অপর দুইজন আহত হওয়ার সংবাদ।

বহির্দেশীয়—

১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) : টিউনিজে প্রেসিডেন্ট হাবিব বরগুইবার সহিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

২রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর) : ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জিনেত্রের নিকট চীনা প্রধানমন্ত্রী মিং চৌ এন-লাই-এর আর এক দফা পত্র—২৬শে ডিসেম্বর চীনে বা বেঙ্গল নেত্র-চৌ বৈঠকের প্রস্তাব।

৩ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) : ২৭শে এপ্রিল প্যারিসে প্রাচ্য-প্রতীচ্য শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব—পশ্চিমী শীর্ষ বৈঠকান্তে (প্যারিস) রুশিয়ার নিকট লিপি প্রেরণ।

৭ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর) : এগারোটি দেশে 'শান্তি সফরান্ত' মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ওয়াশিংটন প্রত্যাবর্তন।

ইরাক-ইরান সীমান্তে উত্তর পক্ষের সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশ।

৯ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর) : বঙ্গবঙ্গাল প্রাচ্য-প্রতীচ্য শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্মতি।

১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর) : সোভিয়েট অভিযাত্রী দল কুমেক (দক্ষিণ মেক) উপনীত ('চাঁদ' প্রচারিত সংবাদ)।

সীমান্ত বরাবর ইরাকী সৈন্য সমাবেশের পাটী ব্যবস্থা হিসাবে ইরাক কর্তৃক সীমান্তে গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক বাহিনী মোতায়েন।

১২ই পৌষ (২৮শে ডিসেম্বর) : ১৫ মার্চ জেনেভায় নিয়ন্ত্রীকরণ কমিটির প্রথম বৈঠক—পশ্চিমী প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্মতি।

১৩ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর) : ১৬ই মে পূর্ব-পশ্চিম শীর্ষ সম্মেলন অমুঠানে রুশিয়ার নিকট পশ্চিমী ত্রিশস্তির নতুন প্রস্তাব পেশ।

১৪ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর) : পূর্ব-পশ্চিম শীর্ষ সম্মেলন অমুঠানের পশ্চিমী প্রস্তাব (১৬ই মে) সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ কর্তৃক গ্রহণ।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সিরীয় অঞ্চলের ৪ জন মন্ত্রীর পদত্যাগ।

১৬ই পৌষ (১লা জানুয়ারী, '৬০) : রুশিয়ার পক্ষে একতরফা-ভাবে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিয়া প্রতিরক্ষার জগৎ রকেট ব্যবহার করাই সঙ্গত হইবে—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

১৯শে পৌষ (৪ঠা জানুয়ারী) : পাক-ভারত সীমান্ত বিরোধ সংহতর যীমান্তার জগৎ সাহায্যে পাঁচ দিবসব্যাপী সম্মেলন আরম্ভ।

২১শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী) : সিংহল মন্ত্রিসভার আরও পাঁচজন মন্ত্রী (শ্রীলঙ্কা ক্রিডম পার্টিজন্স) পদচ্যুত।

২২শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী) : রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ কর্তৃক ইন্দোনেশিয়া বাইবার পথে ভারত সরকারের সরকারী আমন্ত্রণ গ্রহণ।

পশ্চিম বালিন পার্লামেন্টে নয়া নাংদী সংস্থা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব গৃহীত।

২৪শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী) : পাকিস্তানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উত্তোপ-পর্ব—সরকার কর্তৃক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ।

মঙ্গল গ্রহে রকেট অভিযানের জগৎ সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের প্রস্তুতি—মস্কোর ইটানবার্গ জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণাগারের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মাতিনোভের ঘোষণা।

২৫শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী) : চীন-ভারত সীমানা বিরোধ যুদ্ধে পরিণত হইবে না—তেজপুরে দেশরক্ষা সচিব শ্রীকৃষ্ণমেননের ঘোষণা।

২৭শে পৌষ (১২ই জানুয়ারী) : কেনিয়ায় সাত বৎসরব্যাপী আপৎকালীন অবস্থার অবসান।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুরেকার্ণো কর্তৃক দেশের রাজনৈতিক দলগুলি নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ।

২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী) : রুশিয়ার সৈন্যসংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ (এক কোটি ২০ লক্ষ) কমাইয়া দেওয়া হইবে—সুপ্রীম সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

দক্ষিণ পেরুতে ভূমিকম্পে ৩৮ জন নিহত ও দুই শত জন আহত হওয়ার সংবাদ।



“সেতু”—বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপার নতুন নাটক সেতুর সম্যক আলোচনা এসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় যে, এমন উচ্চতরের নাটক বঙ্গদেশে বিলম্ব। নাটকটি এক কথায় সুকলিসম্পন্ন ও ক্রটিহীন। নাট্যকার বিদ্যার ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানিয়ে তাই আলোচনা শুরু করি। কিরণ বৈদ্যের কাহিনীতে তিনি সার্থক নাট্যরূপ আরাণ্য করেছেন। নটকটির আখ্যান ভাগ আমাদের মনটাকে নাড়া দেয়। অথচ সেই চিরপুণ্যজন প্রাণার মাহুয়ের মনের দুর্কল কোণে আঘাত করে দুর্কল নাটককে জমিয়ে তোলায় বার্থ প্রচেষ্টা নেই, আবার তেমনি বাস্তবময়ী ও নতুন করবার অহেতুক মোহে নাটকটিকে আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক করে তোলা হয়নি। সর্বত্র নাটকটিই প্রধান স্থান পেয়েছে এবং তাকে পরিমিত দেবার জন্যই চার পাশের বস্তু কিছু আয়োজন।

নাটকটির প্রোতটি চরিত্র পরিপূর্ণ ও সার্থক। নায়িকা অসীমার দুই চরিত্রটি শিল্পীর হাতে অনেক বস্ত্র আঁকা। নাটকের অনেকখানি জল জুড়ে তার চরিত্রটি দীরে দীরে গড়ে উঠেছে। ছাইভারকে ছুটি মন্ব করবার আকস্মিক অনিচ্ছার তার অন্তরের গোপন চেনেয়ার যে দৃশ্য প্রকাশ ঘটেছে তা অনবদ্য, সূচ্য সাজাতে সাজাতে ক’লাইন আবৃত্তিতে তার অন্তরের উজ্জ্বল আনন্দের যে অভিব্যক্তি ঘটেছে, তা অবিস্মরীয়। কি জটিল, গভীর দুহর্মে, কি হাস্যোজ্জ্বল হাস্যক পরিবেশে—সর্বত্রই কথাপকখনগুলো প্রাথম শ্রেণীর হয়েছে। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো তো কাহিনীকারের অনবদ্য সৃষ্টির স্বাক্ষর করেই, কিন্তু কোন পার্শ্বচরিত্রও অসম্পূর্ণ নয়। এ এসঙ্গে সব আগে মনে পড়ে মাসীমার চরিত্রটি, যত্নের সাধ ধীরে ধীরে বাস্তব ‘বপদে’ পূর্ণ হতে পেল না। আর ভাবী সম্ভাবন কণের মুখ উজ্জ্বল করুক আর না করুক, সে বেন উদার স্বর, আত্মতোলা, মহান এক মাহুয় হয়, অসীমার এই মনোভাবটি নাট্যকারের একটি রসোত্তীর্ণ তুলিকাংশ।

পার্কের বৃষ্টি হৃদয়, আগাখ-অবান্তর হাড়া হাড়া বটনাগুলো নিয়েই বৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়েছে। উপরন্তু এই দৃষ্টে সুকাজির বিভাগনটি দেখিয়ে কেওয়ার মধ্যে সুপরিষ্কার স্বাক্ষর আছে।

প্রতি দুইই সেট-সেটিঙলি ভাল। বিশেষতঃ বেল-বাড়ার দুইটি পরিষ্কার অভিনয় ও সার্থক। একত ভাপন সেতের সুপরিষ্কার আলোক-সম্পাত উচ্চ প্রাথম্যের দাবী রাখে।

জন্ম নাটকটিতে করেটি দুই কটি চোখে পড়ে, যেগুলি জন্ম কোন সাধারণ নাটকে উপেক্ষা করা গেলেও এমন অনন্তসংকলন নাটকে ভাবের উপস্থিতি পীড়াদায়ক। যেমন বার বার বলা হয়েছে পুনরুৎপাদন ছিল না, কোথার এবং কেন ছিল বলাটা স্বাভাবিক ছিল। শিল্পের লাল বাড়ীর জানলার সুনন্দা সকল মর্শকের চোখে পড়েন না সামনের কোঁচে ঢাকা পড়ে বান, অথচ সহজেই তাকে সোতলার জানলার দেখানো যেত। শিল্পের চাঁৎকার স্বাভাবিক হয়নি। পর্দা টেনে চাঁৎকার বন্ধ করা কি সম্ভব? আরও আছে। শেষ দৃষ্টের ভুলটা আনন্দে—পুলক-বীতার রেজিষ্ট্রী অকস্ম থেকে প্রত্যাহারনের প্রতীক আর বরণের প্রতিক্রিয়া সেক্ষেত্রে অসীমার কালো শাড়ীটা একটু গুটিকটু নয় কি?

কিন্তু উজ্জ্বলতার অভিনয়ে এসব সামান্য ক্রটি সহজেই উপেক্ষীয় হয়েছে। কুশলী শিল্পীদের দক্ষতায় নাটকের অনেক না বলা বাণীও মুখের হয়ে উঠেছে মর্শকের অমুভূতিতে।

অসীমার চরিত্রটি একটি উঁচুতরের সাহিত্য সৃষ্টি। মাহুয়ের আকুলতা তাঁকে নায়ীর প্রেত মর্যাদা দিয়েছে। স্বয়ংবান স্বামীর দেহ, দেহের ভালবাসা আর্থিক প্রাচুর্য, সব কিছু পেয়েও তার অন্তরে যে রিক্ততা, যে ক্রন্দন প্রতিদিন তাই প্রকাশ ঘটে বার বার—অকারণে সে যোগে ওঠে, ব্যবহারটা দৃষ্টিকের জগৎ ক্রক হয়ে ওঠে। আবার যখন আসে কর্তব্যের আহ্বান, তখন তাকে আপনায় সকল বাধা ভুলে সাড়া দিতেই হয়, চোখের জল তার মুখের হাসিতে ধরা পড়ে না। এই সব কিছু মিলিয়েই সে একটি পারিপূর্ণ মানবী। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন জীমতী ভূপতি রিজ (বহরপী)। যে অভিনয় ভাবায় বর্ণনা করা চলে না। ভবতারগকে ছুটি নামমাত্র করার দৃষ্টে, অসীমার বাড়ী নিমন্ত্রণ যাওয়ার আগন্তিকে, অসীমার বাড়ীর বেননাধায়ক ঘটনার, ভাবী মাহুয়ের পূর্ণতার তিন অসাধারণ, আর শেষ দৃষ্টে শ্রুতার হাহাকারে তিনি অভুলনীয়। প্রকৃতগণকে তাঁর অভিনয় একান্ত ভাবে তাঁরই, তার কোন সজ্জা নেই। নামের পাশে ‘বহরপী’ উল্লেখ, কঠোর বাচনভাষাতে প্রতি দুহর্মে অভিব্যক্তি তিন বিশিষ্ট। প্রার্থনা করি এই বিশেষর তাঁর চিরস্থায়ী হোক।

অসীমার স্বামী তাপস রায় একদিকে প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী, সুকাজি বৈবিকুডের মালিক, আর অন্যদিকে মেহ-প্রায়ে ভরপুর একটি মাহুয়। চরিত্রটির সার্থক রূপ দিয়েছেন জীমতিভবরূপ সুখোপাধ্যায়। পুলক-বীতার প্রতি হাস্যোজ্জ্বল ব্যবহারে তিনি স্বাভাবিক, অসীমার প্রতি মেহ ও সমতাব্যের প্রকাশ তিনি অদূর! প্রাথম দৃষ্টে সীমা বলে ভাবার থেকে, নাটক সমাপ্তির দুহর্মে অসীমার কোনো-চাকুল প্রায়ে নিকন্তরে তার মাথার হাতটি রেখে পাড়িয়ে থাকা অবধি, সর্বত্র জীমতী ভূপতি রিজের উজ্জ্বল অভিনয়ের পাশে তাঁর অভিনয় যে কোথাও এতদুচ্চ স্থান হয়নি, এই-ই তাঁর কৃতিত্বের প্রেত পরিচয়।

অভিনয়ের দিক থেকে এর পরই বাড়োয়ারী কংকরের কৃতিত্বের জীমতীভবরূপ সুখোপাধ্যায়ের নাম করতে হয়। হাব-ভাবে, বাচনভাষাতে শ্রুত বাড়োয়ারীর রূপটি তিনি সাক্ষ্যের সঙ্গে কুটিলেছেন। কোকিলীয় গান, লত্মি পিয়ে আলা ঘুঘু দিয়ে পূর্ণলক হাত কথা সবচেয়ে আদ্য এবং সর্বোপরি জালিমাতির পরসায় এক অংশ দায়

কবে তিন তগবানকে খুঁজি করে রাখার মনোভাব—সব কিছু মিলিয়ে সাহিত্যে কংকরী একটি বাস্তব চিত্র সৃষ্টি।

অপরেশের ভূমিকায় মমতাজ আহমেদ সুঅভিনয় করছেন। পূর্ণকেশের ভূমিকায় তরুণকুমারের পরিবর্তে সেদিন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্বাভাবিক স্বন্দর অভিনয় মনেই রাখতে দেয় না যে তিনি প্রতিদিন এই ভূমিকায় নামেন না। অত্যন্ত ভূমিকায় শ্রীনরেশ মিত্র, শ্রীসন্তোষ সিংহ, স্নায়ু শ্রী সেন, শ্রীরজতা সেন, শ্রীইগা চক্রবর্তী, শ্রীহারতি দাস প্রভৃতি সকলেই ভাল অভিনয় করেছেন। তবে প্রধান শিল্পীদের পাশে সুরতা সেনকে একটু আড়ষ্ট লাগে।

সেতুর সাক্ষ্যের পিছনে আছে নাট্যকার পরিচালক, অজ্ঞাত কলাকুশলী ও শিল্পিয়ন—সবার আন্তরিক সহযোগিতা। এই সহযোগিতার তালিকায় বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষের নামটিও যোগ করতে হয়। সেতু মঞ্চস্থ করে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ যে উচ্চশ্রেণীর রুচিস্তান ও বসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা একেবারে নির্ভেজাল—বাবসারী মনোবৃত্তি তাতে মেলে নি মোটেই। সর্বশ্রেণীর দর্শকের মন ভোণাবার সম্ভা বাসনার প্রকাশ এতে যে কোথাও ঘটেনি তাতে (ভেতরের কথা ভাবলে) নাট্যকারের চেয়ে প্রোপাইটারের অবদান একটুও কম নয়। চটুল নৃত্য তো নয়ই এমন কি রীতার কণ্ঠও একখানি 'ডায়েরক্স' সঙ্গীত স্থান পায় নি—এটা মন্ত বড় কথা। শুনেছি শুধু বেডিও মারক্‌স শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের "আমার মন মানে না" রেকর্ডটির দুটি লাইন আর শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের কণ্ঠ "নববর্ষ" কবিতাটির কয়েক লাইন। হুঁজুতেই মনটা জ্বতুপুই হয়ে গেল বরং। তবু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রেকর্ডটা ঘরে বসেও শোনা যেতে পারে, খিত্যটি স্মরণ নয় বললে অতুক্তি হবে না। অপ্রত্যাশিত ভাবে আবৃত্তির সূচনায় তাই পুতুলখেলার সেই অননুভবীয় কঠোরের আভাস পাবার দুঃখা জেগেছিল মনে।

বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ ও কর্মিবৃন্দ শুধু ভঙ্গা চোখ না তুলিয়ে সারবস্ত্র দিয়ে মন ভরাচ্ছেন আমায়ের—তারা তাই অশ্রুই ধরাবাহাঁ।

রাজা সাজা

নিজেই লেখক নিজেই পরিচালক নিজেই অভিনেতা এক যোগে এই ত্রিবিধশক্তির পরিচয় দিলেন বিকাশ রায় তাঁর রাজা সাজা ছবিতে। গ্রাম্য শিক্ষক রজতগুহ হঠাৎ উত্তরাধিকার পূজে এক বিরাট সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে, এ সম্পর্কে পূর্বে সে কিছুই জানত না জমিদারীর ম্যানেজার তাকে খুঁজে বের করে এ বিষয়ে অবহিত করে, তারপর তার জীবনে আসছে একটি মেয়ে। নাম তার মালিনী। ম্যানেজার চক্রান্ত করে এই সুযোগে অর্থ উপার্জন করার বা সে চিরকাল ধরে কান্ড এসেছে। সহকারী ম্যানেজার ম্যানেজারের আসল রূপটি প্রকট করে তোলে রজতের সামনে—ম্যানেজারকে বরণান্ত করে রজত সঙ্গে সঙ্গে মালিনীকেও ভুল ব্যতীতে আরও করে—ম্যানেজারের নিজের দ্বার্ষিক বা পড়ার সেও মরিয়া হয়ে উঠল রজতের বিরুদ্ধে, মামলা জুড়ে রজতকে পাগল প্রমাণিত করার চেষ্টা করতে থাকে—মামলার দিন তদানীর মধ্যবর্তী বিরতিকালে মালিনীর অধুনায় রজত তখন হুৎ পুলা—পূর্বে সে চূপ করে শুধু বসেছিল, হাবি আঁকছিল

দলক পর্বত করে সি—শেবে তার বিস্মৃতি অজ্ঞানতায় করে বিচারক তাইই বশপক্ষে রায় দিলেন, পরে রাজার ধামে ট্যান্সির সামনে রজত-মালিনীর স্তম্ভলিন।

গল্পটি এলোমেলো ভাবে সাজানো হয়েছে। চিত্রমাটি লোকস্বক নয়। গল্প গতিও ছবিতে বেশ সীড়িত করেছে। দৃষ্টান্তভাবে জীবন বাপন করার পর হঠাৎ প্রাচুর্যের মধ্যে এসে পড়ার রজতের যে সব আচরণ দেখা গেল কোন শিক্ষিত ছেলের পক্ষে সেটি সম্ভবপর হর কি? হয় বলতে হবে এ জাতীয় ঘটনা অব্যবহর নয় বলতে হবে শিক্ষিত সমাজের উদ্দেশ্যে এটি একটি ব্যঙ্গ, আদালতগৃহে নিজের এই জাতীয় আচরণের যে সব হেতু রজতকে দিয়ে বিশ্লেষণ কখনো হয়েছে—সে বিশ্লেষণ মোটেই সম্ভাব্যজনক নয়। যে বাড়ীতে কারলা-কাহ্ননের বঙ্গ আঁটুনি সেখানে জমিদারকে সহকারী ম্যানেজারের দলি বলে ডাকাটাও অব্যবহিক নয় কি? বিশেষ করে যেখানে ম্যানেজার হজুর বলে সম্বোধন করছে, মালিনীর মা মিসেস ঘোষ একটি বিশেষ শ্রেণীর মহিলা। ম্যানেজারের সঙ্গেও তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা, কিন্তু এই মহিলাটির বিশ্বর বলতে গেলে দর্শক সাধারণ আগাগোড়াই অন্ধকারে থেকে গেছেন, মিসেস ঘোষ বলে তিনি বহন পরিচিতি তখন মিঃ ঘোষাটাই বা কে—বর্তমানে তিনি কোথায় এ বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়োজন ছিল।

রজতগুহের ভূমিকায় উত্তমকুমার ও ম্যানেজারের ভূমিকায় বিকাশ রায় অনবদ্য অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এঁদের পরেই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন তরুণকুমার। বঙ্গ আবির্ভাবে দর্শকচিন্তাধিকার করে গেলেন ছবি বিশ্বাস। মালিনী ও তার মায়ের ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন বধ্যাক্রমে সাক্ষিত চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রাবতী দেবী। এঁরা ছাড়া ভূমিকালিপি সম্বন্ধে ক'ছেন জীবন বসু, মিহির ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, স্তাম লাহা, রাজলক্ষী দেবী প্রভৃতি।

মারামুগ

নীহাররজন গুপ্তের মারামুগ কাহিনীটি রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছে। বলা বাহুল্য মার যে, মারামুগ কোন রহস্যকাহিনী নয়—বৃত্তান্ত মাতৃস্বপ্নের বেদনা, আর্তি ও হাহাকার পরম দক্ষতার সঙ্গে এই উপভাসে চিত্রিত হয়েছে। বর্তমানে এর ছাত্রচিত্ররূপ দিয়েছেন চিত্র বসু। অনেককাল বাদে চিত্র বসুকে আবার পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা গেল। রঙ্গমঞ্চে মারামুগের কাহিনী যে ভাবে পরিবেশিত হয়েছিল চলচ্চিত্রে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ছবিতে স্বজাত্য অধ্যাচটি সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে—কলে মাকে গল্পটি বেজাত্য জমে উঠেছিল ছবিতে গল্প সেভাবে লানা বেঁধে উঠতে পারল না। শুভ্রব সত্যিকারের চিত্রিত সঙ্ঘে আলোকপাত করতে গেলে স্বজাত্যকে বাদ দেওয়া চলে না, কেন না স্বজাত্য ও মিক—দুটি পৃথক জাতের মেরের মধ্যখানে শুভ্র চরিত্রের বধ্যাবধ বিকাশ ঘটছে। অবশ্য মাকে মিককে বড়টা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল ছবিতে মিক তার চেয়ে অনেক বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

নানাবিধ স্বাভাবিকতার মধ্যে পরিচালক ছবিতিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন, এমন কথা বলতে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

সম্বন্ধেই হচ্ছে এ ছবির আসল প্রশ্ন। ছবির শেষ দৃশ্যটির প্রতি পরিচালক চরম আবেগ প্রকাশ করেছেন এ কথা অস্বীকার করা যায় না—ও রকম স্বপ্নদম্পতী দুহর্ন্তে পারাবর্তিত উঠিয়ে দিয়ে ছবির সমস্ত গুরুত্ব হুলে কুঠাঘাট করা হয়েছে। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশে দেখানো চিত্রনাট্য সব চেয়ে দান্য। বোধে উঠে দেখানো এই রকম একটি দৃশ্য বোঝা করে ছবিটিকে ভালো করে দেখায় হয় নি কি? তবুও এটুকু অনায়াসে বলা যায় যে ছবিটির আবেদন মনে বোধাপাত করবে।

অভিনয়ে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন সুদর্শন তরুণ বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়, উভয়ের অভিনয়ই ভালো লাগবে, বিখ্যাতের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। মহেশ্বর চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে উত্তমকুমার একটি নতুন ধরণের রূপস্থলী করলেন, এই ভূমিকায় তাঁর অভিনয় অনবদ্য। ছবি বিখ্যাত ও সুনন্দা দেবীর অভিনয় যথেষ্ট গাভীপূর্ণ এবং ব্যক্তিগত। বিকাশ রায় ও সন্ধ্যাগাঙ্গী দেবীর অভিনয় যথোচিত স্তব্ধমণী ও যথেষ্ট সহজুভূতি আকর্ষণ করে। এঁরা ছাড়া অজ্ঞাত ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন তরুণকুমার, জহর রায়, জুলী চক্রবর্তী, নুগাত চট্টোপাধ্যায়, জামা লাঙ্গা, জীপতি চৌধুরী, শান্তি ভট্টাচার্য, বেবা দেবী, নিতাননী দেবী, আশা দেবী প্রভৃতি। সুরবোজনা করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কুহক

একই আধারে ভালো ও মন্দে পাশাপাশির অবস্থিতির কালে যে অস্বাভাবিক উদ্ভব হয় তাকেই অবলম্বন করে কুহকের গল্পনা গড়ে উঠেছে। সমস্ত বস্তু দেখানো থেকে এই কাহিনী জন্ম নিয়েছে। মাছের চরিত্রের ভিতরকার ভালো-মন্দ প্রবৃত্তিগুলির কোনটি কি পরিবেশে কি রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয় সেই সম্পর্কেই লেখক আলোকপাত করেছেন। একই মাছ—সে রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ ভিন্নভাবে ভালোবাসার মাধ্যমে বাসা বাঁধতে চায়—পরস্পরকেই রাজ্যের বলতা, নীচতা—কুপতা তাকে প্রাস করে ফেলে। মানবজীবনে দেব ও মানবের সংমিশ্রণে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি সেই বৈচিত্র্যকেই এখানে তুলে বরা হয়েছে।

জেলখানা থেকে পাল্লের গুরু আর নদীর ধারে গজের শব্দ। সুনন্দ এই গজের নায়ক, খুনের চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত। সেখানে ছবির দ্বায়ে অভিব্যক্তি গণেশের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা গড়ে ওঠে। হুজির পর ব'গালগল সঙ্গে মধ্যস্থলে সুনন্দ আসে গণেশের বাসায়, সেখানেই রাতে চুরি করে গণেশ বাড়ীতে টাকা বাধে, তারপর বাইরে বেরোতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যায়—সুনন্দ টাকার লোভে সেখানেই থেকে যায়, ইন্দ্র জোগাল গোতুল—বাজারদের সহচর। মরীয়া হয়ে সে টাকা বুজিয়ে বেড়ায়—তারপর সর্বশেষে সোতুলের ছুরিকাঘাতে নদীর ধারে তার পতন ও ছবির সমাপ্তি।

সুনন্দর ছুরিকাটক বাইরে থেকে মনে হয় একটি মাটির পুতুল, মাথাটা টানলে ছুরিটি বেরিয়ে আসে—সুনন্দ যেদিন জেলে ছিল ততদিন তার জিনিষপত্র হিসেবে পুতুলরূপী ছুরিটিও ধানার জমা ছিল, যখন সে ছুরি পাচ্ছে তখন পুতুলটিকে দেখে অফিসাররা বিষয় প্রকাশ করেছেন কিন্তু যখন জিনিষটি জমা পড়ল তখন তা কি কোন

অফিসারের মনে বিষয়ের উল্লেখ করে নি, বিষয়তঃ সুনন্দর মত একটি খুনে আসামীর পক্ষে সর্বদা একটি পুতুল সঙ্গে রাখার কি তাৎপর্য থাকতে পারে, তাছাড়া পুতুল সঙ্গে রাখার ব্যয়সহ তার নয়, সেক্ষেত্রে স্বভাবতঃই তো সম্ভবের উল্লেখ হয়, থানার লোকেরা চোখ বুজে সেটাকে রেখে দিলেন, পরীক্ষা করে দেখলেন না একবারও? গান তখন মোহিত হয়ে দশ টাকা একবাক্যে দিতে বাওয়া বাস্তব-সম্মত কি? জেলের কয়েদীদের একটি বিশেষ পোষাক থাকে, ডোরাকাটা পরিধেয় তাদের পরতে হয়, এ তথ্য সকলেরই সুবিদিত—ছবিতে অবজ্ঞা তা দেখা গেল না, ছবির মধ্যাংশ তো ভগ্যানক একঘেয়ে হয়ে গেছে। একবার শেষাংশ অবজ্ঞা যথেষ্ট বেগবান হয়ে উঠেছে এবং যথোচিত জমে উঠেছে।

একটি মাছের দ্বৈত ভাবটি অনবদ্য দক্ষতার সঙ্গে ছুটিয়ে তুলেছেন উত্তমকুমার, তাঁর অভিনয় এ ছবির এক সম্পদ বিশেষ। তরুণকুমার, গঙ্গাপদ বসু, তুঙ্গা চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সুনন্দা দেবীর অভিনয় চিত্রাঙ্কনায় যথার্থ। প্রেমাস্ত বসু ও জীমান দীপক অভূতপূর্ব অভিনয়-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাবেকের আবির্ভাবে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন খ্রীতি মজুমদার ও গোপাল মজুমদার। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী।

রজনীগন্ধা

আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারি নিউ গ্রান্ডারের তরুণ রায়ের পরিচালনায় ধনঞ্জয় বৈরাগীর শ্রেষ্ঠ নাটক রজনীগন্ধার উদ্বোধন হবে। ৭ই ফেব্রুয়ারি ছাড়াও এই অভিনয় উক্ত মঞ্চে নিয়মিত চলবে। নাটকে চরিত্র মোট চারটি। এই চারটি চরিত্রে রূপদান করবেন তরুণ রায় সহ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পিকলু নিয়োগী ও জীমঠী দীপাধিতা রায়। সুরবোজনা করেছেন বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী গুস্তাভ আলী আকবর খান। আলোকসম্পাত ও শব্দসজ্জার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে তাপস সেন ও খালেদ চৌধুরী। এই অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টাটির আমরা সবাই সন্মান সাফল্য কামনা করি।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

চুষনে তার এমনই বিষ। সেখানে অধরে অধরে সংযোগ মান্নেই জীবনের পরিসমাপ্তি। জীবনের পটভূমির উপর ধীরে ধীরে নেমে আসবে মৃত্যুর নীল ধ্বনি। মিলনের সম্ভাবনা মান্নেই বিচ্ছেদের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

এখন বিয়জ্ঞা ছবিটির প্রসঙ্গে কিংবে আসা যাক। আগেই বলেছি যে একটি নারীকে কেন্দ্র করে দুটি পুরুষের দেহ সনাতন বৈতন্য, যার উদাহরণ ইতিহাসের অনেকগুলো পাতাকে ভরিয়ে রেখেছে, যার নজীর মিলবে অসংখ্য কাহিনীতে, অনেকানেক ইতিবৃত্ত—যুগে যুগে, কালে কালে, সমাজে সমাজে এই বৈতন্যের সংখ্যাতীত নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিয়জ্ঞাকে কেন্দ্র করে দুটি পুরুষ লোলুপ হয়ে উঠল। দুজনেই চায় বিয়জ্ঞাকে আপন করে নেতে, তার সঙ্গে চিরকালের সম্পর্ক স্থাপন করতে, দেখের উপরে যে

আজ্ঞার অবস্থান, বিবক্তার সঙ্গে সেই আজ্ঞার স্বকন নিবিড় থেকে নিবিড়তর করতে। উভয়েরই প্রাণগঙ্গার ভীটা পড়া তীরভূমিতে জোয়ার আনল সে, উভয়েরই প্রাণের নীরব বীণার সে ধ্বনিত করে স্বকনার, উভয়েরই প্রাণের অন্তর্গত ভূমিতে সে বপন করল বসন্তের বীজ। হৃৎকেন্দ্রেই থাকে ঘিরে স্বপ্ন সৃষ্টি করতে লাগল, আনন্দ, গান, কবিতা, হাসি, বোম্বাঙ্ক, অমৃতভূতি, চন্দ্র ও লালিত্যের সমন্বয়ে সৃষ্টি একটি নিটোল স্বপ্ন, একটি মধুর স্বপ্ন, এক অভঙ্গুর স্বপ্ন। মেয়েটি বিবক্তা। আর পুরুষ দুটি? তাদের পতিচর? তাদের বিবরণ? একজন রাজ্যের রাজা, আর একজন রাজ্যের পুরোহিত, একজন সমগ্র রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর, বহুজনের ভাব বহনের ধীর দায়িত্ব, রাজ্য পরিচালন চলে ধীর অকুলি নির্দেশে অল্পজন রাজ্যের তথা প্রতিটি রাজ্যবাসীর কল্যাণ কামানায় দেবতার চরমকমলে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনে নিমগ্ন, রাষ্ট্র শাসনের গুরুদায়িত্ব একজনের উপর দৃঢ় অল্পজন রাজ্যের ধর্মাত্মশীলনের কর্ণধার বিশেষ।

বিবক্তার এই ভুবন ভোলানো রূপ আসলে যে এক পুঞ্জীভূত গরলরাশিবিধ আবরণমাত্র এ তথা অজ্ঞাতই ছিল পুঞ্জারীর (স্বয়ংস্র) কাছে। তবে সঁরা হৃৎকেন্দ্রেই যে একটি মেয়েরই স্বপ্নে বিভোর এ বিষয়ে রাজা (পুঞ্জীকাজ) কিছু অনবহিত ছিলেন না। কিন্তু হৃৎকেন্দ্রে একজনও দেহগত অধিকার তাকে করতে সমর্থ হয় নি। রাজা ও পুঞ্জারীর মধ্যে তাঁর প্রেমযুক্ত, মাঝখানে বিবক্তা—এক অপূর্ণ কান্ডিনী।

চিত্রগ্রহণের সময় একদিন কান্ডারীর মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। চিত্রায়ণের জঙ্গে সেদিন যে দৃষ্টি বাড়া হল তার সক্ষিপ্ত সাবমর্ম এই—পুঞ্জারীর এবং বিবক্তার গোপন সাক্ষাৎকার। বিবক্তা তার পতিপূর্ব নারীত্ব নিয়ে পুঞ্জারীর সামনে এসে দাঁড়ায়, তাঁর রূপের ছটা পুঞ্জারীর চোখের সামনে থেকে নিজেকে ছাড়া সমস্ত জগতকে সরিয়ে দেয় পুঞ্জারী কি দেখে সেই রূপের মধ্যে। গরলের আভাসমাত্র সে পায় না—সেই রূপের মধ্যে সে দেখে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা, আত্মনিবেদনের আকৃতি, আত্মঅঞ্জলির অটল সিদ্ধান্ত। রক্তমাংস দিয়ে গঠিত তার দেহ, পরিপূর্ণ মানবিকতার উপকরণ দিয়ে তৈরী তার মাহুধী মন। বাস্তবজগতের সঙ্গে তার দেওয়ার-নেওয়ার। সে ক্ষেত্রে বিবক্তার নারীত্বের পরিপূর্ণ আবেদনকে উপেক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব, বিবক্তার রূপের জালে সে গ্রহণ করল বন্দি, সেই রূপশিখা তার কিতরকার সুপ্ত জাগতিক কামনা বাসনা প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিল—তখন নিজেকে সন্মের নিষ্টি গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখা সত্যি সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়ল পুঞ্জারীর পক্ষে।

পারিপার্শ্বিক আবর্তন শান্ত। মাথার উপর বোহিষী মনশ্রবণ, শ্রদ্ধা, স্তব্ধ, মৌন। প্রাণদেয় অন্তর্গত স্ববিস্তৃত নির্জন কাননকূলে বিরাট নীরবতার মধ্যে হুটি প্রাণী সুখোন্মুখী দাঁড়িয়ে—পুঞ্জারী বিবাহের প্রস্তাব আনে তারপর—তারপর তার আকাঙ্ক্ষার, দাবীর, চাওয়ার মাত্রা আরও ছাড়িয়ে যায়—দীর্ঘকাল ধাঁটার মধ্যে বন্দী বিহ্বলকে হঠাৎ আকস্মিকভাবে মুক্ত

আকাশে বথে বিচরণের চাঁড়পত্র দিলে যা হতে থাকে—জুই বিবাহের প্রস্তাব জানিয়েই কীতল হয় না পুঞ্জারীর পিপাসুর মন, সে আরো চায় ‘প্রাণ ভরিয়ে তৃপ্তা’ হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাঁও...

ভাবী পত্নী হিসেবে বিবক্তার কাছে একটি চূষন দাবী করতেও সে দ্বিধা বোধ করে না। কোন সঙ্কেটই সে করে না অল্পভব, লোকলজ্জা, ভয়ভীতি তার কাজ থেকে আত্মশতহাত দূরে। বিবক্তারও অল্পর চা পুঞ্জারীকে, পুঞ্জারীকে জীবনের দোষরূপে পাওয়া তার কাছে বিদ্যাত্যাব অপরিমিত কল্পনায়ই নামাস্তর মাত্র, পুঞ্জারীর হাতে চিরকালের জাজ হাত রাখতে পাওয়া, পুঞ্জারীর বুকে চিরকালের মত মাথা হুইয়ে রাখার সৌভাগ্য অর্জন করা, পুঞ্জারীর জীবনে নিজের জীবনকে মিলিয়ে দেওয়া—আর ভাবতে পারছে না বিবক্তা এ আনন্দ সে রাখবে কোথায়—তার উপযোগী আধার কই? আনন্দে সে দিশাহারা, তারপর একরাশ কালোচিন্তা কোথা থেকে উড়ে এসে কৃকবর্ণ মেঘের মত নিমেষের মধ্যে তার সমস্ত আনন্দকে আচ্ছন্ন করে দিল, যে মন স্বপ্নকাল পূর্বে আনন্দের উদাত্ত আস্থানে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিল সেই মনই বিবর্ততার বজ্রস্রষ্ট্রেতে সঙ্কচিত হয়ে এল মনের উপর এখন কোথায় আনন্দের স্বাক্ষর? এ যে বিবাহের প্রদেপ। চোখের সামনে থেকে কোথায় সরে গেল আনন্দের স্তম্ভশব্দ চলাই পথ? এ যে হৃৎকেন্দ্রে বিদগ্ধিত চোরা গলি। বিবক্তা তো স্পষ্টই জানে যে তার একটি চূষন মাননই তার প্রিয়তমের জীবনান্ত। জীবনের পরমমত্ত প্রাণ্ডির মুহূর্তেই চিরবিচ্ছেদের নির্দাক্ষণ বেদনা সহ করতে সে পারবে না, তার থেকে এই প্রাণ্ডির পবিত্রত্ব অনাচারিত্যই থেকে যাক তার জীবনে—না পাওয়ার ব্যথা থেকে পেয়ে হারানোর ব্যথা বহুগুণ বেশী। না-না—এ হতে পারে না, এ হতে পারে না, নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে, নিজেকেই হাতে নিজেকে মুছে দিতে হবে পুঞ্জারীর মন থেকে, পুঞ্জারীর জীবন থেকে তাকে নিজেকে স্তটিয়ে নিতে হবে, সরে আসতে হবে তার জীবন



প্রতীক্ষিত চিত্র ‘উত্তরমেঘ’-এর একটি প্রণয়ময় দৃশ্য—
উত্তমকুমার ও অরিন্দ্রা চৌধুরী

যেহে। পূজারীকেই অস্তর দিয়ে ভালোবাসত বিবকতা খাঁজকে সে ভালোবাসতে পারেনি।

একটা না-না চিংকার করে বিবকতা পালিয়ে আসতে চেষ্টা করল পূজারীর কাছে থেকে। পূজারীর মধ্যে তখন পরিপূর্ণ কামপিপাসা, তার ভিতরকার তৈবিক প্রেরণাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখন, তার লুপ্তির মধ্যে দিয়ে, তার নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে, তার সংলাপের মধ্যে দিয়ে তখন কাম করে পড়ছে, বিবকতাকে সে কিছুতেই যেতে দেবে না, তাকে সে ধরে রাখবেই, ধরে রাখবে তার বাজতক্ষনে, তার উচ্চ নিঃশ্বাসে তরিয়ে দিয়ে তার অবয়ব, তার অধরাষ্ট্র একে সেবে চুষনের চিকু। তার মনের বাঁধ আজ ভেঙে গেছে, সিংহদ্বার খুলে গেছে, দুর্গকোণ হয়েছো অর্গলমুক্ত। প্রাণপণে সে আটকালে চাইছে তখন বিবকতাকে তার মনের কুণা বিবকতাকে মেটাতেই হবে এই তার দৃঢ় দাবী। উপাস্ত্রব না দেখে সাহায্যের জন্যে চেঁচিয়ে ওঠে বিবকতা। কি আশঙ্ক! স্বঃ রাজার রহস্তচক্র আবির্ভাব ঘটল প্রাণান অলিন্দে। রাজার এই আবির্ভাব আবির্ভাব উভয়কেই হতবাক করে দিল বিশ্বয়ে। রাজা আদেশ দিলেন পূজারীকে লুণ্ঠনঘরের পুর্বেই বাজঘের সীমানা অতিক্রম করে বেতে নতুবা পরিতণ্ডি আরও মর্মান্তিক রূপ ধারণ করবে।

চিত্তগ্রহণ শেষ হল। যেই না হঠাৎ আর বার কোথায়, হাসির তুফান উঠল সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে। যুগ প্রযোজক শ্রীচাচাল দাশ এবং শ্রীমতী গৌতরবাইয়ের মধ্যে পরিচালক কেদার শর্মা'র মধ্যে, প্রসিদ্ধি কলাকুশলীর মধ্যে, আমাদের শিল্পীদের মধ্যে। এই ভাস্ত্র-ভরজের অর্থ এই যে, এই অংশটির চিত্রায়ণ মাত্র একবারে সমাপ্ত হয় নি, ক্রমাগত রি-টেকএর অর্থাৎ পুনঃচিত্রগ্রহণের প্রয়োজন হচ্ছে। দৃষ্টিকে যথাগন্তব্য আভ্যন্তরিক ও কৃত্রিমতামুক্ত করে তোলায় ভক্ত পরিচালকের বারংবার রি-টেক নেওয়ার নির্দেশে স্তব্ধ এবং আমি আমরা দুজনেই রীতিমত বিব্রত ও রাস্ত বোধ করছিলাম যুগটির বিবরণ একটু আগেই লিপিবদ্ধ করেছি, স্রুতবাং পাঠক-পাঠিকাগণ সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে এই দৃষ্টের ক্রমাগত রি-টেক শিল্পী বা শিল্পীদল কি পরিমাণ বিব্রত বোধ করতে পারেন তেমনই একাধিকবার রিটেক নেওয়ার চাহিদায় আমাদেরও কম বিব্রত হতে হয় নি। খুব স্পষ্টভাবে মনে না পড়লেও যতদূর মনে পড়ে একটি সংলাপ ছিল (হিন্দীতে) বার বাঙলায় অনুবাদ হলে সায়মর শীতাবে তোমার টোটে আমার টোটে স্পর্শ করতে দাও নয় তো না আমি চাইছি জোর করে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে তা আমি কেড়ে নেব।

ক্রমাগত এই অংশটির অভিনয় আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্ত ও রাস্ত করে তুলেছিল—শেষ অবধি চূড়ান্তভাবে যুগটির চিত্রায়ণ বখন পরিচালকের অনুমোদন লাভ করল তখন আমি সত্যিই হুজির আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। দীর্ঘ পরিচয়ের পর ভূ আনন্দনার করেই আজ হইনি একটি মন্তব্যও করেছিলেন। সমস্ত পরিগ্রহ বখন সমাপ্ত, অভিনয়ে পরিচালক বখন পক্ষিত, কনীর আগের বদল আর আরও বলতে বাকী কিছু নেই—

টিক এই সময়েই মন্তব্যটি আমি করেছিলাম, কথাটি বলেছিলেন পক্ষিচালককে টেকশ বরে, বলেছিলেন “কেদার একটু বসি করলে— তাহলে চিত্রনাট্যটি বললে কেন আমাকে করে তুলল না চুষনযোগ্য?” [ক্রমঃ: +

অনুবাদক—কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে একটি অঙ্গুষ্ঠ সংস্কৃতির বন্ধন চিরকাল রয়েছে। এই সংস্কৃত সংস্কৃতমূলক। সেজন্য বিগত ডিসেম্বর মাসে দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ সহর বাঙ্গালোরের নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে যে বাংলাদেশ থেকে সংস্কৃত অভিনেতার দল তাঁদের নাট্যাভিনয়ের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করে এসেছেন, তা সর্বাধিক থেকেই অতি স্তব্ধজনক। এই সংস্কৃত নাট্যাভিনয় করেন ডাঃ যতীন্দ্রবিমল ও ডাঃ রমা চৌধুরী কর্তৃক প্রেরিত সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবাহী গবেষণাগার প্রাচ্যবাহী মন্দিরের কৃতী অধ্যাপক অধ্যাপিকা অভিনেতৃবৃন্দ। বিগত পুস্তার বন্ধে এই ৪০টি মাত্রাজে ও পণ্ডিতেরী শ্রীমদ্বিক্রান্তমে উত্তর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী বিষয়িত ভাবগভীর রসময়ুর সঙ্গীতমুখর সংস্কৃত নাটক ‘মহাপ্রভু-চরিতামসু’ ‘শক্তি-সারমসু’ ও ‘ভারত-স্বপ্নদ্বারবিন্দু’ অতি সুন্দর ভাবে অভিনয় করে সকলকে বিম্বের মুগ্ধ করেন। এবারও তাঁরা শ্রীশ্রীমা সারথামণি দেবীর পুণ্য জীবনের পূর্বাধ ও উত্তরাধ এবং শ্রীমদ্ব্যভাসপ্রভুর সাধনসঙ্গিনী মহানন্দনী বিষ্ণুপ্রিয়ায় অমিয় চরিতাবলম্বনে উত্তর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃত নাটক ‘শক্তি-সারমসু’, ‘মুক্তি-সারমসু’ ও ‘ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্’ যথাক্রমে বাঙ্গালোর নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলন, বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশন এবং পণ্ডিতেরী শ্রীশ্রীমদ্বিক্রান্তমের তত্ত্বাবধানে অতি মনোহরভাবে অভিনয় করে সকলেরই মনোহরণ করেন। এই সংস্কৃত অভিনয়গুলির আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল সুবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী হুবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবোচ্ছল প্রারম্ভিক সংস্কৃত সঙ্গীত। সেই সঙ্গে ছিলেন সংস্কৃত সঙ্গীত-নিপুণ শ্রীগৌরীকান্দার ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রত্না রায় ও নবাগত শ্রীপূর্ণন্দু রায়। তাঁদের সংস্কৃত সঙ্গীতও শ্রোতৃবর্গের প্রশংসার্নন করে।

মাত্রাজের সুপ্রসিদ্ধ রূপসজ্জাকার শ্রীযুক্ত হরিপদ চন্দ্র মহাশয় রূপসজ্জা দ্বারা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কর্ণাটক শাখাধিবেশনে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর ‘কর্ণাটক সাহিত্য ও মহীয়সী কর্ণাটক সঙ্গীত কবি’ এবং ডাঃ রমা চৌধুরীর ‘বাংলার দর্শন ও বিভিন্ন সংস্কৃতি’ ক্ষেত্রে তার প্রভাব বিবয়ক বহুতাবয় সকলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ভারত সংস্কৃতির শাখিত ধারক ও বাহক সংস্কৃত সর্বতোমুখের পুনঃজীবিত করার মহাভ্রতে বাঁরা জীবনোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের প্রচেষ্টাও সার্থক হোক।

—হিনয় চৌধুরী—

॥ মাসিক বন্ধুযতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

দলভার দরবী সিংহ কথাসিন্ধী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মানিক গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ

ইহাতে আছে দুইটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং পঁচিশটি সুনির্বাচিত গল্পসমিতি। মূল্য দুই টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ

ইহাতে আছে দুইটি সুখপাঠ্য উপন্যাস এবং বহুপ্রশংসিত চৌদ্দটি গল্প। মূল্য দুই টাকা।

প্রখ্যাত কথাসিন্ধী শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপদ গ্রন্থাবলী

—নিম্ন গ্রন্থগুলি সরিষিষ্ট—

- ১। শাস্ত, সিংহাসন, ২। প্রেম ও পুণ্ডরীক, ৩। মায়াজাল, ৪। স্তম্ভসমার মুকুট, ৫। সংশোধন, ৬। ক্ষত, ৭। প্রতিবিম্ব, ৮। জোয়ার ভাটা, ৯। নৃতন জগতে ও ১০। ভয়।

মূল্য ৮ পেজী ৩৯২ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী
মূল্য তিন টাকা।

কথা ও কাহিনীর বাহুর প্রেমেন্দ্র মিত্রের

প্রেমেন্দ্র-গ্রন্থাবলী

—গ্রন্থাবলীতে সরিষিষ্ট—

মিছিল, প্রতিশোধ, পরোপকার, একটি কড়া চৌকি, নিরুদ্দেশ, পাখাশালা, মহানগর, অরণ্যপথ দুর্গভয়, নতুন বাসা, বৃষ্টি, নির্জনবাস, ছোট গল্পে সাম্রাজ্য (প্রবন্ধ), জর্জিয়ান কবিতা (প্রবন্ধ)।

মূল্য আড়াই টাকা।

বলিষ্ঠ কথাসিন্ধী শ্রীজগদীশ গুপ্তের

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মুগুর (উপন্যাস), রাত ও বিরতি (উপন্যাস), মনোবিজ্ঞান (উপন্যাস), রোমন্থন (উপন্যাস), মিল-লোর দোলা (উপন্যাস), মন্ডা ও কুকা (উপন্যাস), তিহার জাহ্নবী (উপন্যাস), স্বাক্ষর (উপন্যাস), মনোবল্লিক ও মল্লিকা, স্মৃতি, শরৎচন্দ্রের পরিচয়।

মূল্য তিন টাকা।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের স্পষ্ট আলোখ। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নিধাতিত বাস্তবায় মুকুন্দরাম হুং ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির হুং কি করিয়া সর্বজননের হুং হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইরাছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্য-সাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

- ১। মূল কাব্য, ২। কবির জীবনী, ৩। কাব্য-পরিচিতি, ৪। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (খনি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৫। বিদ্যুত কাব্য সমালোচনা এবং ৬। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ। ডবল ক্রাউন ৮ পেজি—৩১৪ পৃঃ বোর্ড বাঁধাই।

মূল্য তিন টাকা মাত্র

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও কথাসিন্ধী—

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ

এই গ্রন্থাবলীতে নিম্ন উপন্যাসসমিতি সরিষিষ্ট

- ১। অপরিজিতা, ২। মহীয়সী, ৩। রাজকন্তা, ৪। সূচকেশের উপাখ্যান ৫। নারীর রূপ, ৬। গোখরো এবং ৭। কান্দিবানে শরৎচন্দ্র।

ডবল ক্রাউন ৮ পেজি, ৩৪০ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ

—এই ভাগে সরিষিষ্ট—

- ১। অপরিচিতি, ২। বিগ্রহ, ৩। আত্মসমর্পণ, ৪। ভাইবোন, ৫। জয়-পরাজয়, ৬। কবির মানস-প্রতিমা উবলী। সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী, মূল্য ৮ পেজী, ৩৩০ পৃষ্ঠা, সুবন্দা বাঁধাই

মূল্য তিন টাকা।

মতী সাহিত্য মন্দির :: ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২



অষ্ট্রেলিয়ার "রাবার" লাভ

ঐতিহাসিক দর্শক-সমালোচক ইডেন উল্ভান। এখানেই ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার টেস্টপার্থ্যের স্বনামিকা পড়ে। কলকাতায় যে ক্রিকেট-বক্স আরম্ভ হয়েছিলো তারও অবসান ঘটে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দল ভারতের বিরুদ্ধে "রাবার" নিয়ে স্বদেশে ফিরেছে তারা পাকিস্তান ও অষ্ট্রেলিয়া সফর মোট ১১টি খেলায় বোগদান করলেও ৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলে। পাকিস্তানে ৩টি টেস্ট ম্যাচে তারা ২টিতে জয়লাভ করে ও ১টি অমোম্যাসিত থাকায় তারা "রাবার" লাভ করে। ভারতে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ২টিতে জয়লাভ করে, ২টি অমোম্যাসিত ও ১টিতে পরাজিত হয়েও "রাবার" তাদের অস্থূল রাখতে সমর্থ হয়। বিশ্বের অল্পতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান নরমান ও'নীল ব্যাটিং-এ এবং ছাড়া বোগার এলান ডেভিডসন বোলিং-এ শীর্ষস্থান লাভ করেছেন। ও'নীল ১৫টি ইনিংস খেলে মোট ১৪১ রান করেন ও ব্যাটিং-এর গড়পড়তা দাঁড়ায় ৮৫.৫৪ রান। ডেভিডসন ৪২২ ওভার বোলিং করে ১২২টি মেডেল সমেত ৪২টি উইকেট পেয়েছেন। তাঁর বোলিং-এর গড়পড়তা দাঁড়ায় ১৮.৫১। কিন্তু দলের অধিনায়ক রিচি বেনড সর্বাধিক ৩১টি উইকেট পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। অষ্ট্রেলিয়ার ৩৮ বৎসর বয়স ফাট বোলার যে লিওওয়ার্ড ৪টি টেস্ট খেলায় ১টি উইকেট পেয়েছেন। এতে তাঁর টেস্ট খেলার মোট ২২৮টি উইকেট লাভ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এলেন বেডলার ২৩৬টি উইকেট লাভের যে রেকর্ড করেছেন, লিওওয়ার্ড তা এখনও ভাঙতে পারেননি। দেখা বাক এই সম্মান লিওওয়ার্ডের ভাগ্যে আসে কি না।

মাত্রাজের চতুর্থ টেস্টে ভারত শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করলেও কলকাতার পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলার আকর্ষণ কোন মতেই যে ক্ষুণ্ণ হয়নি, তা এখানকার ক্রীড়ামোদীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি করা গেছে। কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা এবার জেনেছেন, বা একেবারে পাওয়া যায় না—সেটা হ'লো টেস্ট খেলা দেখার একটা টিকিট। টিকিট টিকিট করে চারদিকে হাছাকার পড়ে যায়। তবে এবার টিকিট নিয়ে যে ধরনের কলেক্টারী হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত নিত্যকালে বিরল। সত্যিকারের ক্রীড়ামোদীরা একখানা টিকিটের জন্তে যখন আকাশ-পাতাল চলে বেড়িয়েছেন, ঠিক সেই সময়েই দেখা গিয়েছে—কোথাও কোথাও খুব উঁচু দরে টিকিট বিক্রয় হচ্ছে। উঁচু দর মানে উচ্চিত দুলোর চেয়েও কয়েক গুণ বেশী। কলে দেখা গেল যে, খেলার মাঠে এক বিশেষ সম্মানার নর-নারী আবিস্কৃত হয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণে—নারী দুলোর জন্তে পরোয়া করেন না। এই টিকিটগুলো কোথা থেকে বে এসো, তা কেউই বুঝতে পারেন না। লাল-নীল শাড়ীর প্রবলভাবে বাতায় শোভা

বদলে গিয়েছিলো। খেলা দেখার চেয়ে তাঁদের উল্লস বুননের মধ্যেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতে দেখা গেছে। সত্যিই তো ভারি দীর্ঘ যে পড়েছে!

কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী মাঠে দ্বিগুণ হাজার দর্শকের বসায় জায়গা—আর খেলা দেখার উৎসাহী দর্শক হলো কয়েক লক্ষ, সেখানে খেলা আরম্ভ হবার বহু আগে থেকেই লাইনে দাঁড়ান ছাড়া উপায় কি? খেলা আরম্ভ হবার কথা শনিবার আর চার টাকার দৈনিক টিকিটের লাইন পড়ে বৃহস্পতিবার। এক সত্যিই ক্রিকেটপ্রীতি না ভুলুগুণির কলকাতার ক্রীড়ামোদী?

খেলার আগে থেকে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেলেও প্রথম ইনিংসে ভারতের ব্যাটিং দেখে সকলেই হতাশ হন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ব্যাটিং-এ দৃঢ়তা দেখা যায়। চতুর্থ দিনে খেলার মোড় একেবারে ঘুরে যায়। এর জন্ত তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় জয়সিমার অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা সর্বাঙ্গ্রে উল্লেখ করতে হয়। জয়সিমা এই টেস্টে সম্পূর্ণ চতুর্থ দিন এবং বাকী চারদিনের কিছু না কিছু সময় ব্যাটিং করেছেন। টেস্ট খেলার ইতিহাসে পাঁচ দিনই ব্যাটিং করার এই কৃতিত্ব সত্যিই এক অস্বাভাবিক ব্যাপার! কেনীর ব্যাটিং-এও দৃঢ়তা দেখা যায়। চালু বোড়ে, পঙ্কজ রায়, নরী কনট্রাস্টার ও বাহু নাদকারীর নিপুণ হাতের ব্যাটিংও প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁদের নৈপুণ্যের জন্ত ভারতের পক্ষে শেষ টেস্ট খেলা অমোম্যাসিত রাখা সম্ভবপর হয়েছে।

আগন্তুক দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্দাপেকা বেশী আনন্দ দিয়েছেন অষ্ট্রেলিয়ার নূতন ব্র্যাডম্যান নন্দ্যাপ ও নীলের মন মাতানো ও চোখ জুড়ানো অনবদ্য ব্যাটিং। উইকেটের চারদিকে তাঁর চোখ মার দর্শক-মানসপটে বহুদিন অস্থিত থাকবে। অধিনায়ক রিচি বেনড ও ডেভিডসনের বোলিং সকলকে বেশ আনন্দ দেয়। বাহু হুউক, এই টেস্ট পার্থ্যের ভারতীয় ক্রিকেটের যে অভ্যুত্থান হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মোহনবাগানের পুনরায় ডুবাও কাপ লাভ

বাকলা তথা ভারতের অল্পতম দল মোহনবাগান তাহাদের পৌরবষয় ফুটবল ইতিহাসে আর একটা নূতন অধ্যায় রচনা করেছে। তাহারা দ্বিতীয়বার ডুবাও কাপ লাভ করে। দর্শক-সমালোচক দ্বিগুণে কর্ণেশন প্রেড়িয়ায়। এখানেই ১৯৫৩ সালের বিজয় মোহনবাগান—ভারতের প্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতা ডুবাও কাপ লাভের জন্ত দক্ষিণ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়—বাকলার শক্তিশালী দল মহম্মদান শোটিং-এর সঙ্গে। কি হবে আর কি হবে না—এটা নিয়েই মাঠ বেশ জমে উঠে। মোহনবাগানের সমর্থকদের বাস সাইলেন ওয়ব। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ওয়ব এখনই গোল করে

দলার দাঁট একেবারে নিভে। কিন্তু দীপু দাস ও হুটো ও ভাঙ্গালু একটা গোল করে পুনরায় মোহনবাগানের সমর্থকদের মনে আন্দোলন বজা বহিরে দেন। অপণিত দর্পক বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। মোহনবাগানের এবারকার সাক্ষ্যের পুরোভাগে ছিলেন এশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খ্রেষ্ট খেলোয়াড় জার্নেল সি। তাঁর খেলা খুবই উজ্জ্বল পর্যায়ের হয়। তাঁর খেলা দেখে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তিনি বর্তমানে ভারতের খ্রেষ্ট সেটার হাফ। মোহনবাগানের সাক্ষ্যের জন্য চুনি গোঁস্বারীর অবদান কম নয়। তাঁহার দর্পণীর 'কবীর কিক' হইতে দীপু দাস হু'টি ও ভাঙ্গালু একটি গোল করেন। দীপু দাসের খেলাতেও খুবো গল সন্ধানীর পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁর শেষ খেলাটি মিল্লার দর্পকদের হানসপটে বহু দিন অক্ষিত থাকবে। দীপু দাস লম্বা ডাইট দিয়ে হেডের সাহায্যে দর্পণীরভাবে গোল করেন।

মহামেডান সেমি-ফাইনালে কলকাতার অজ্ঞাতম শক্তিশালী দল ইষ্টবেঙ্গলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার সকলেই এই দলের সাক্ষ্য সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ফাইনালে তারা মোটেই খ্যাতি অমুখারী খেলতে পারেনি। স্বাভাবিক ভাবে খেলতে না পেয়ে মহামেডান দলকে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে খেলার কোণশল গ্রহণ করতে হয়। মাঠে মোহনবাগানের গোলের পেছনে দর্পকদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হল এবং শেষ পর্যন্ত খণ্ডখণ্ডে পরিণত হল। তবে পুলিশ অজ সময়ের মধ্যে অবস্থা আরম্ভে আনে। কলকাতার খেলার মাঠের উজ্জ্বল অঙ্গার বীজ তখন ভারতের অজ জয়গার হুড়িয়ে পড়েছে। আর এর বীজ যেন কলকাতার দলগুলোই বহন করে নিয়ে যাচ্ছে—এটাই হুগের বিষয়।

মহামেডান তৃতীয় বার রোভার্স কাপ-বিজয়ী

ভারতের ফুটবল ক্ষেত্রে বাঙ্গালার প্রথম অনস্বীকার্য। তিনটি খ্রেষ্ট প্রতিযোগিতা রোভার্স কাপ, ডুবা ও কাপ ও আই, এক এ শ্রীত সবগুলিতেই বাঙ্গালার বিশিষ্ট দলেরা ফাইনালে উন্নীত হয়। তার মধ্যে তিন প্রধান মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান দলই আছেন। রোভার্স কাপ থেকে মোহনবাগান প্রথমেই বিদায় গ্রহণ করে। ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান দল ফাইনালে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়।

সকলেরই দৃষ্টি পড়ে বোম্বাইয়ের দিকে, ইষ্টবেঙ্গল কি ছুয়াগুর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে—এটা নিয়ে মাঠ বেশ নোংরাগোল। মাঠে তিল ধারণের জায়গা নেই। উত্তর দলের সমর্থকদের সে কি উৎসাহ ও উদ্দীপনা। গত বছর মহামেডান দল ফাইনালে পরাজয় বরণ করে। এবার তারা রোভার্স কাপ লাভের জন্ত চেষ্টার কোন রকম ক্রটি করেনি। অপর দিকে ১৯৪১ সালের পর ইষ্টবেঙ্গল ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। তাদের সমর্থকরাও দলের সাক্ষ্য সম্পর্কে উদগ্রীব হয়ে আছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহামেডান দল তিন গোলে জয়লাভ করে। প্রথম দিন অবন্ত খেলাটি অস্বাভাবিক থাকে। মহামেডান দল এবার নিয়ে তৃতীয়বার এই সাক্ষ্য অর্জন করে। ১৯৪০ ও ১৯৪৬ সালে তারা রোভার্স কাপ লাভ করেছিলো। মহামেডান দলের এবারকার সাক্ষ্য স্রবার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের জন্তই সম্ভবপর হয়েছে বলা চলে। তিনি একাই তিনটি গোল করে 'হার্টি ট্রিক' সম্পাদন

করেন। ইষ্টবেঙ্গল ১৯৪১ সালে প্রথম রোভার্স কাপ লাভ করে। এবার তাদের ব্যর্থতার জন্ত দলের সমর্থকগণ বিশেষ হতাশ হয়েছেন। ইষ্টবেঙ্গল বর্তমানে ভারতের অজ্ঞাতম শক্তিশালী দল বললে বোধ হয় অজ্ঞাত হবে না। কিন্তু এবার তারা সাক্ষ্য অর্জন না করার জন্ত পুরোভাগের খেলোয়াড়দের দায়ী করা চলে। গোল করার যে সকল সুযোগ তারা নষ্ট করেছে—তা খুব কম দলের ভাগ্যে ভোটে। গোলই যখন খেলার জয়-পরাজয়ের মাপকাঠি—তখন বত উঁচু দরের খেলোয়াড়ই হোন না কেন এই বিষয়ে ব্যর্থতা প্রকাশ করলে তিনি খ্রেষ্ট আলন দায়ী করতে পারেন না।

ক্রীড়াঙ্গণতে শ্রী এম. দত্ত-বায় (বেচু বাবু) একজন দ্বন্দ্বযুদ্ধ ব্যক্তি। ফুটবল ও ক্রিকেট—উভয় আসরের তিনি নাটের গুরু। রাজনীতি করে তিনি ফুটবলকে এমন পর্যায়ের নিয়ে এসেছেন যে গত এশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিমাক্ষল লীগের জয়ন্ত সক্রিয়স্থান দখল করে। ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচনী কমিটির তিনি একজন ভাগবেল সভ্য। তাঁর রাজনীতিতে সকলেই দায়ের। ক্রিকেটকেও তিনি ভোবান্তে বসেছেন। গত ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় দলের ফলাফল আলোচনা না করাই ভাল। তবে তাঁর আমলেই ভারত বিশ্বের খ্রেষ্ট দল অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দেওয়ার—এখন বেশ খোঁস মেজাজে আছেন। লাল আমরনাথ ও দত্ত-বায় কোম্পানী এখন বেশ অল্প তবিরতে বেশ কিছুদিন চালিয়ে যাবেন বলে মনে হয়।

শ্রী এম. দত্ত-বায় কলকাতার ক্রীড়া আসরের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। তিনি মোটা মাছিনার আই, এক, এক'র বেলনভুক্ত সম্পাদক। গত হু'বছর ভারতের অজ্ঞাতম প্রাটিন ও খ্রেষ্ট ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই, এক, এ শ্রীভের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিসমাপ্তি হয়নি। গত বছর কোন রকমে ফাইনাল খেলা অজুগুটিত হ'লেও এ বছর এখনও পর্যন্ত শেষ হয়নি। সত্যিই শ্রীদত্ত-বায়ের কথুতুলসভার তাম্বিক করতে হয়। তবে একটা সুখবর শোনা যাচ্ছে। তিনি বাঙ্গাল দেশের দুটো প্রধান দল—মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে এবারকার আই, এক, এ শ্রীভের ফাইনাল নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছেন। কি ভাবে ফাইনাল খেলা করা যায়, সেই সম্পর্কে আলোচনার জন্ত আই, এক, এক'র টুর্নামেন্ট কমিটির একটা সভাও হয়ে গেছে। সভার সিদ্ধান্ত অমুখারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দলকেই বেক্সহারী মাসের শেষ সপ্তাহে ফাইনাল খেলার জন্ত প্রেরিত থাকতে বলা হয়েছে। হু'টি দলের কয়েক জন নামকরা খেলোয়াড় বর্তমানে কলকাতার বাইরে আছেন। কিন্তু বেক্সহারী মাসের শেষ সপ্তাহে সমস্ত খেলোয়াড়দের কলকাতায় হাজির করার পক্ষে কোন প্রকার অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। তবে দেখা যাক, শ্রীদত্ত-বায়ের হাত-বল। তাঁর চেষ্টার ক্রটি থাকবে না ঠিকই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হু'টো দল খেলতে রাজী হবে তো?

আরতি সাহা, প্যাটেল ও হাজারের পদ্মশ্রী লাভ

রাষ্ট্রপতি একাংশ প্রজাতন্ত্র দিবসে ৩১ জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করেছেন। তার মধ্যে চানেল দাঁতাল কুমারী আরতি সাহা, ক্রিকেট খেলোয়াড় জেমস প্যাটেল ও বিজয় হাজারে আছেন। ভারত সরকার যে ভাবে খেলোয়াড়দের সম্মানিত করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেশের অবস্থা

পূজিত ভক্তবাহন যথা রাস্তে হাওড়া গরর হইতে মাদ্রাজে আসি মাটল হয়ে হাওড়া-আমতা ঘোড়ের উপর অবস্থিত ঐ টেলিফোনিক অফিসে যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তাহা খুবই উদ্বেগজনক। অথবা প্রকাশ, প্রায় ২০ জন দুর্ভাগ্যবানকে অস্ত্রধারী হইয়া ঐ টেলিফোনিক অফিসে ঢাকা দেয় এবং অফিসের কর্মচারীদের আটক করিয়া বাধিয়া প্রায় আট হাজার টাকা হুসে বৈদ্যুতিক লাইন-সরঞ্জাম লইতে তুলিয়া লক্ষ্য দেয়। ষাঁটরা একাধার পুলিশ লরীকে আটক করিবার জন্য উহার টায়ার লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইয়াছিল। গুলী বার্ষ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দুর্ভাগ্যের মধ্যে কয়েকজন নাকি পুলিশের মত নাকী পোষাক-পর্যিত ছিল। এই ব্যাপারে প্রথমেই বাহা আমতার মনে পড়িতেছে তাহা এই যে, ঐ টেলিফোনিক অফিসে কোন সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা ছিল কি না? সশস্ত্র পাহারার যে ব্যবস্থা ছিল সবাদ হইতে তাহা বুঝা যায় না। থাকিলে অন্ততঃ দুর্ভাগ্যবানকে প্রতিরোধ করিবার একটা চেষ্টা অবশ্যই হইত। যেখানে মূল্যবান বস্তু বৈদ্যুতিক লাইন-সরঞ্জাম রাখা হয় সেখানে সশস্ত্র পাহারা নাই কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ঐ টেলিফোনিক অফিসে এই ডাকাতের ঘটনা হইতে সাধারণ গৃহস্থের অবস্থা যে কত নিরাপত্তাহীন তাহা সহজেই বুঝিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের ব্যয়ই শুধু বাড়িতেছে, সেই অশুশান্তি দেশবাসীর ধনপ্রাণ নিরাপদ হইতেছে না। ষাঁটরা পুলিশের গুলী লরী টায়ার লাগে নাট, এই ব্যাপারটি উল্লেখ্য বিষয় নয়। অন্যতম ছত্রভঙ্গ করিবার সময় পুলিশ বধন ও লরী বর্ণ করে, তখন গুলীতে কেহই হতাহত হয় নাই, এরূপ ঘটনা বড় দেখা যায় না।

—বসুমতী।

বাবাজীর যুগ

“এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে সকল প্রকার দেশ-বিদেশী উভয় আসর জমাইবে, তাহাতে আশঙ্ক হইবার কারণ নাই। কাজেই কটক হটক অথবা কালীঘাটে হটক, সনাতন বাবাজীম নব নব কলমবরে আবির্ভূত হইলে তাহাতেও বিমিত হইব না। বিমিত হই তখন বনন দেখিতে পাই এই জাতীয় অজ্ঞাতপরিচয় ছুঁইকঁড় কোনও বাবাকে বাজারে চাপু করিবার পবিত্র কর্তব্যভার কাঁধে তুলিয়া লইয়াছেন মন্ত্রী, যেহেতু প্রমুখ দায়িত্বশূন্য ব্যক্তিরা। উক্তব্যবসেপাল বাবার কীর্তিকাহিনী জনসাধারণ এখনও ভোলে নাই। এখন আবার দেখিতেছি, কালীঘাটে নটবর বাবা নামক এক ব্যক্তির আশ্রিত্যে বটিগাছ এবং এই বাবাজীর বজ্রাঘাতনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন যন্ত্রপ্রবর ঐক্যব্রহ্ম সেন মহাশয়, প্রধান অতিথির ঘূষিকা লইয়াছেন, যেহেতু ঐক্যব্রহ্মর বখোয়াপাখ্যায়। বাবাজীর

কুশার হাতের খাঁড় উপাঙ্গম বুড়ি অথবা কলিকাতা পৌরসভায় চবিহোড়ি বটিগাছ অথবা বটিগাছ কি না জানা যায় নাই। তবে দেখিতেছি, মন্ত্রী এবং মেয়রের পুটপোষকতাধীন নটবর বাবাজীর কলসাস মতিপতি সম্পর্কেই মাগাধক সন্দেহহটক প্রায় উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওড়িয়া ভাষার অধ্যাপক ঐক্যব্রহ্ম-বাস মহাশয় আমাদের পত্রিকায় একপাশি চিঠিতে উক্ত বলকীর মনোবাক্যের যে পরিচয় বিবর্তনে তাহা সত্য হইলে কিজানো করিতে হয়—খাড়ামন্ত্রী এবং মেয়র মহোদয় কী কারণে না জানিয়া তুলিয়া—এই বাবাজীর অসত্যক নিজেদের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছেন? দেশপালবা জাতীয় প্রত্যাক্ষেপে খাজায পড়িয়া মরল বিবাসী জনসাধারণের যে দুর্ভাগি হইয়া থাকে তাহার কাহিনী মন্ত্রী, মেয়র প্রভৃতি দায়িত্বশূন্য ব্যক্তিগণের সভারায় থাকিবার কথা নয়। ইত্যংও যদি এই জাতীয় বাবাজীকে লইয়া নাটনাটক করেন তাহা হইলে জনসাধারণ প্রত্যাখ্যত হইবে না কেন?”

—জানক্যাজীর।

নারীর কথা

“মাদ্রাজে অস্ত্রাতি নিষিদ্ধ ভারত মহিলা সম্মেলনের ২৯তম অধিবেশনে সভানেত্রী জীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জাতিগঠন ও সমাজ উন্নয়ন করে ভারতীয় নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে দায়িত্ব কাঁধ গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাস্তব, বুড়ি ও কর্মশক্তি ব্যাপারে নারী পুরুষের চেয়ে কিছুমাত্র নুন নন। পুরুষের হা কক্ষীয়, বোগ্য নারীসঙ্গে লজ্জ হইলে তাঁহারাও তা করিতে পারেন না, এমন কথা কেহই বলিবেন না। কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা পঁচানব্বই জন নারীর জীবনই বন্ধনশালা ও শ্রুতিকাগুড়ে, এই দুই মহলে আবদ্ধ। শিক্ষা অনেকের ভাগ্যে জোটে না, বিবাহের জোটে, তাঁহাদেরও ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশই মাত্র বাস্তবের কর্মক্ষেত্রে আসার বা জীবিকার্জনের সুযোগ পান। এই অসুখতনের অবস্থা হইতে ভারতনারীকে উদ্ধারের কাজ আগে করা দরকার। তাবশ্য বাস্তবের কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের দায়িত্ব কি ও কতটা, তা স্বরণ করাইয়া দেওয়া দরকার। গৃহস্থের বিষয়, নারীসমাজে বিবাহের নৈজীপবাচা, তাঁহারা দেশের সাধারণ নারীর জীবন কেমন ভাবে কাটে, তা সামগ্র্যই জানেন। তাই তাঁহারা স্বগোষ্ঠীর শিক্ষিতা মহিলাদেরই একমাত্র নারী জান করেন এবং যা বলেন কহেন, সে উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই। এইজন্যই সম্মেলন ঠিকই জমে, কিন্তু কাজ হয় না।”

—সুগভাষ।

পাক-ভারত মৈত্রী

“মৌলানা ভাসানী ও আবদুল গফুর খানকে নিশ্চয়ই ভারতের জাতীয়তাবাদীরা এত সহজে তুলিয়া যান নাই। আজ যদি সত্যি পাক-ভারত মৈত্রী স্থাপিত হয় তাহা হইলে কমিউনিস্টদের অপেক্ষা বেশী সুখী আর কে হইবে? কিন্তু দেখিতেছি, এখন এক ধরনের পাক-ভারত মৈত্রীর কথা বলা হইতেছে বাহা পাকিস্তান ও ভারতের জনগণের স্বার্থের বিরোধী, বাহা পাকিস্তান ও ভারতকে তাহাদের অকৃত্রিম বন্ধু সমাজতান্ত্রিক ছদ্মদ্বার বিকল্পে সাম্রাজ্যবাদী রণাঙ্গনে পরিণত করিবার পরিকল্পনা। নতুবা, পাক-ভারত সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসাকে চূড়ান্তস্বত্ব ব্যবহার করিয়া চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার চেষ্টার পরিবর্তে উহাতে প্রতিবেশী চীনের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি হিসাবে ব্যবহারের কথা উদ্ভূত হইবে কেন? পাক-ভারত সীমান্ত-বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান

জলাইয়া পণ্ডিত দেহক বধন টান-ভাবন শীমান্তবিরোধের শান্তিপূর্ণ
সীমান্তের আপা প্রকাশ করিলেন তখনই বা কেন আত্মব ধীনের
শৌভাগ্যী ভারতীয় পত্রিকাগুলি ও নেতাগণ ঠিক উঠা দূরে ইহার
উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন? এতএব, জেনারেল আত্মবের
স্বাধীনতার তির্যকতা ও সার্বভৌমত্বের শত্রুদের যে চৌপ
আসিত্যেই সে সম্পর্কে আমরা যুগ্ম এখন চাইতে সাবধান না হই,
তবে আত্মব ভবিষ্যতে অসুতাপ করিবাবিও স্বযোগ থাকিবে না।

—বাহীনতা।

জেলায় সরকারী অফিসগৃহ কোথায় হইবে

প্রাচীন আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারী বীরত্ব জেলায় বিভিন্ন সরকারী
অফিস সর্বত্র জন্ম দিলেই সুখ নির্দেশের অফিসের প্রকাশ করিয়াছে
যদিও পোলা হইতেছে। বিভিন্নভাবে জেলা সরকারী অফিস জন্ম
নির্দেশের জন্য দাঁড়ি দাঁড়ি সাত সাত টাকার মত হইয়াছে।
কংগ্রেস শাসন কামত দাঁড়ি করার পর দুইদুই হস্তীদণ্ডের মত
করিয়াছেন এক প্রত্যেক হস্তীদণ্ডের কার্যের জন্য জেলায় ও মহকুমায়
বিভিন্ন অফিস খোলা হইয়াছে। প্রচার অফিস, চাষ অফিস, বাহ
অফিস, বন অফিস, বাজার করা অফিস, মালোয়িরা অফিস হইতে শুরু
করিয়া আরও কত অফিস জেলায় হইয়াছে তাহার সবগুলির নাম করা
কষ্টকর। জমিদারী প্রকাশ আইন পাশের পর একটি একুইজিটর
অফিস, কতিপূর্ণ দান অফিস এবং সেটেলমেন্টের চার্জ অফিস প্রভৃতি
অফিসের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ময়ূরাক্ষী কানোলের
সুগৃহীত কুমির কতিপূর্ণ দান এক ভবিষ্যতে নব নব পরিকল্পনা
জন্ম যে সকল ভূমি গৃহীত হইবে তাহার কতিপূর্ণের ব্যবহার জন্ম এক
বিরাট স্থায়ী অফিসের প্রয়োজন হইয়াছে। পরিবহন বিভাগ ও
সমাজ কল্যাণ বিভাগ আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের জন্মও বিভিন্ন
অফিসের প্রয়োজন কম দেখা দেয় নাই। এতদিন শুনিলাম, সাত
বৎসর বয়স বাকস্বত জামা সত্তর বৎসর পরিধান করা যায় না এবং
একশ পয়সা হস্তাকর কিছু জেলায় সরকারী অফিস সম্পর্কে দেখা
বাইতেছে শতাধিক বৎসর পূর্বে নির্মিত জেলা কালেক্টরী অফিস
গুহনের এখানে ওখানে তার, চট বা ইটের পর্দা দিয়া ঘেরিয়া কংগ্রেস
সরকারের আমলে বহু অফিসের বিভিন্ন গুহনের স্থান হইলেও সব
অফিস ভুলাইল না, এতদ সর্বত্রের বিভিন্ন ব্যক্তির গৃহ সরকারী
বিকুইজিটর করিয়া সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু অফিস স্থাপন করা
হইল। যদিও বিকুইজিটর করা গৃহগুলির ভাড়া কম করা হইল
তথাপি দীর্ঘ বার বৎসরে শুধু বাড়ি ভাড়া বাসন বত টাকার ব্যয়
হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাতে বহু অফিসের জন্ম সরকারী নিজস্ব ভবন
নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইতে পারিত এক সহরে বাড়ি ভাড়া পাওয়ার
সমস্যাও অনেকটা হালকা হইত এক সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের হস্তরাশি
জন্ম কোন কোন অফিসের খুশখোশীনা অভ্যর্থনা কম হইত।

—বীরভূমাবাসী।

পৌষমাসেই সর্বনাশ

পৌষ পার্শ্ব শেষ করিয়া মাঘমাসের মাত্র এক সপ্তাহ অতিবাহিত
হইতেছে। গতকল্য ৭ই মাঘ বর্ধমান বাজারে সন্ধ্যা সন্ধ্যার পর ১৬
টাকার মত উঠিয়াছে, মাকারী দাঁড়ি মত মত ১৫।০ টাকার
উঠিয়াছে। গতকল্যের পর ইতিমধ্যেই ২৭।০ টাকার মত হইয়াছে।

বর্ধমান জেলা দাঁড়ি দাঁড়ি উন্নত জেলা, এখানেই বধন এই বর্ধমান
তখন পশ্চিম বাংলার বাটটি অঞ্চলের অবস্থা সত্তাইই অল্পমান করা
যায়। পশ্চিম বাংলার খাতিয়ারী শ্রীশ্রীমত সেন সেনিও হুগলী
জেলার এক জনমতের দাঁড়িভাষণে ভাবের বিনিময়, এ বৎসরের
প্রবল বজা ও অস্বাভাবিক জলপ্রাণ সত্তাই পশ্চিম বাংলার পূর্বাঞ্চ
কলম হইয়াছে। যদি তাহাটী হয় এবং ভবিষ্যতে উত্তরাঞ্চলের
সহিত এক খাতিয়ার গঠন করিয়াও কেন দাঁড়ি চাইল, ক্ষেত্রে হইতে
কলম উঠিতে না উঠিতেই এখন অগ্রিম হইল, তাহার দাঁড়ি
খাতিয়ারী কি ভাবে দিবে তাহা আমরা জানিতে পারি কি? সরকারী
মহলের সমর্থকগণ বলিতে শুরু করিয়াছেন চাষীর হাতে অর্থ ভবিষ্য
গিয়াছে, যেসকল তাহার আবে অর্থ মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য দাঁড়ি
ধরিয়া রাখিয়াছে। ইহাটী যদি সরকার তথা কংগ্রেস পক্ষ মনে করেন,
তাহা হইলে কেন তাহার মত-বিবোধী ব্যবস্থা করিতেছেন না?
আমরা বর্ধমান জেলাবাসী লক্ষ্য করিতেছি, এ বৎসরের প্রবল বর্ধনে
যদিও কোন কোন দূর অঞ্চলে ডাল ও অল্পবর্ধন ভবিষ্যৎ এখার কিছু
ধান জন্মিয়াছে বটে কিন্তু অধিকাংশ ভবিষ্যৎ ডাল ও কানোলে
বহির্ভূত অঞ্চলের জেলা ও সমস্ত ভবিষ্যৎ ধান জলের চাপে এক
ভাল্ল যৌত না পাওয়ার ভাবনাতে ভয়াবহ পাবে নাই। উপরন্তু
গাঁজ, জলাশ ও নানাবিধ পোকায় ধাতুর ফলনকে চরম করিয়া
দিয়াছে।

—দামোদর (বর্ধমান)।

নিরপেক্ষতা

মুর্শিদাবাদ জেলা উন্নয়ন পরিষদ এবং মহকুমা উন্নয়ন কমিটি
গঠন সম্পর্কে আলোচনামূলক এক বিস্তারিত সংবাদ গত মধ্য
জনমত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর বিপোর্টারের প্রকাশ
সংবাদে দাঁড়ি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে পরিষদ ও কমিটি গঠন
মিনি বা দাঁড়ি করিয়াছেন তিনি বা দাঁড়ি তাহা বুঝি একটা
নিরপেক্ষ এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী সরকার করিয়াছেন বলিয়া মনে করা
হইতে পারে না। যে কোন কারণেই হউক না কেন, কমিটি যেভাবে
গঠিত হইয়াছে তাহাতে ইহাকে উদ্ভেদ-প্রাণিত কমিটি মনে
করিলে বোধ হয় ভ্রান্ত্য হইবে না। একটি বিষয় অজ্ঞ পরিচার
হইয়া উঠিতেছে যে, গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে মৌখিক বতাই
উপদেশ বহির্ভূত হউক না কেন—কার্যক্ষেত্রে উপদেশ বর্ধকারীরা
প্রায়ই বিপরীত করিয়া থাকেন। বেতনসহ হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন
রাজিফ কমিটি পূর্ণাঙ্গ সর্বত্র একই ধরনের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ
চলিতেছে। ইতিপূর্বে গ্রাম্য রাজিফ কমিটি গঠন সম্পর্কে বহু
অভিযোগ আমাদের গল্পের ভয়া হইয়া রহিয়াছে। উন্নয়ন পরিষদ
সম্পর্কিত সংবাদটি পক্ষপাতিত্বের ইতিহাসে কয়েকটি নূতন পৃষ্ঠারূপে
সংযোজিত হইয়া রহিল মাত্র।

—জনমত (মুর্শিদাবাদ)।

শিশির-সান্নিধ্যে সম্পর্কে

[নটগুরু শিশিরকুমারের দেহান্তের পর থেকেই এই রচনাটি
ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আমরা
লক্ষ্য করেছি, রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশুল আলোড়ন
এনেছে পাঠকমহলে। বিশেষতঃ এই রচনাটি শিশির অম্মরগীর্ষের মত
বিশেষভাবে যে সম্পর্ক করেছে এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই
এই রচনায় মধ্য দিয়ে প্রাধান্যঃ মায়ূষ শিশিরকুমারের তুলন ধর
হচ্ছে। মায়ূষ শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে যে প্রতিভার, বনীয়ার।

প্রজার অভাবমীর সময় বটেছিল সেই স্বাক্ষর একটি পূর্ণপূর্ণ
অসংখ্য উপস্থাপিত করা হচ্ছে। আমরা ব্যবহারিক জীবনের
দৈনন্দিন জগতের বিভিন্ন ভিন্নে সম্পর্কে অল্পকূল-প্রতিকূল বিভিন্ন
ধরনের উক্তি করে থাকি, শিশিরকুমারের চরিত্রের মধ্যেও স্বভাবতঃই
এই অভ্যাস বিদ্যমান, কারণ সাধারণ মানুষ মানুষেরই চরিত্রে এই
অভ্যাসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। সাধারণতঃ প্রতিকূল
উক্তিগুলি বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই জেরে। কারণ তা
সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক তা যে অগ্রিম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ
থাকতে পারে না। এবং এও ঠিক যে, সেই সব উক্তিগুলি কাগজে-কলমে
লিখিত হ'লে উক্তি ব্যক্তি তথা তাঁর আত্মপরিচয় বিতাকাত্মী
বখেট কৃত ও ব্যক্তি হবেন এবং সে ক্ষেত্রে এমনভাবেই ধীরে ধীরে
ভিত্তি পরিবেশের ক্ষতি। এই ঘটনাটি প্রকাশ করে বিরাট পাণ্ডিত্যের
আধার শিশিরকুমারকে একটুট করেই আমাদের উদ্বেগ—কোন
ব্যক্তি বা সমাজসংস্কৃতিতে আঘাত করা আমাদের অজ্ঞানতা নয়।
তা সত্ত্বেও যদি উদ্বেগযুক্ত এই ঘটনার মধ্যে এমন কোন উক্তি
প্রকাশিত হয়ে গিয়ে থাকে যার ফলে কেউ ব্যক্তি হ'তে পারেন—
সে ক্ষেত্রে আমরা বেরনারোপ করছি এবং আশাস দিচ্ছি, ভবিষ্যতে
যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে আমরা দৃষ্টি
দেব।—সম্পাদক, দ্বাদশ বহুমতী]]

শোক-সংবাদ

তৎকালীন বাঙালার 'জাতীয়' জীবনের অগ্রতম প্রধান স্বর্গদায় স্বর্গতঃ
যাক! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের অন্ততম পৌত্র ও ভারতীয় রক্ত-



অমরনাথ মুখোপাধ্যায়

সালে এর জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র অমরনাথ ছাত্রজীবন
থেকেই পিতৃ-শিষ্যত্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশ ও জনসেবার আত্ম-
নিয়োগ করেন। তারেকের সত্যগ্রহ আন্দোলনে জড়িত হন এবং

জন্মের অগ্রতম প্রধান
কৃতিক স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায়ের কৃতীর পুত্র
উত্তরপাড়ার প্রখ্যাত
মুখোপাধ্যায় পরিবারের
স্বনামবন্ত, মুখোপাধ্যায়
সম্প্রদায়ের অমরনাথ
মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত
১৬ই পৌষ ৮৮ বছর
বয়সে দেহ ত্যাগ
করেছেন। বিশিষ্ট
লোকহিতব্রতী সৈয়দা
সেবক ও সাহিত্যসম্প্রদায়
একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক
হিসেবে স্বর্গতঃ
মুখোপাধ্যায় চিরকাল
স্মরণীয় থাকবেন। ১১০২

কালে কালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেওয়ানী প্রভাবতঃ প্রবুধ দেশদায়ক
খনিষ্ট সাহিত্য লাভ করেন। অমরনাথের সমগ্র জীবন দেশের ও জাতির
সামগ্রিক কল্যাণকর্মে উৎসর্গিত। অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের
সাহিত্যপ্রীতি সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন জনহিতকর কর্মে এর অদ্বা
উৎসাহও প্রবলিত। বাঙালার অসংখ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এর
কল্যাণে রূপ পেয়েছে, পুষ্ট হয়েছে, গড়ে উঠেছে। শ্রীরামপুরের
প্রথম প্রৌঢ় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, উত্তরপাড়া পৌরসভার ও ফেল
কংগ্রেসের সভাপতি, দীর্ঘ পচিশ বছরব্যাপী হুগলী জেলা বোর্ডের
সদস্য, বুটল ইন্ডিয়ান স্ট্রাংগিস্টের সভাপতি, মেবানকপুর
শরৎকৃতি সমিতির কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক
আসনসমূহ অলঙ্কৃত করে যথেষ্ট যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়ে
গেছেন। নিজে ছাত্রী-বংশোদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রীরা বিলোপ
আন্দোলনে তিনি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।
অমরনাথের তিরোধানের বিনয়গুণ, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের এক
জীবন্ত প্রতিমূর্তির অন্বেষণ হ'ল, জনসেবা তথা সমাজসেবার ক্ষেত্রে
থেকে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব বিদায় নিলেন, বাঙালীসমাজ একজন আরও
ও বলাভ ছাত্রী হারাণ। তাঁর সহধর্মিণী, দুই পুত্র শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ
ও শ্রীমোহননাথ, দুই পুত্রকন্যা এবং একটি পৌত্রী বর্তমান। তাঁর
পরলোকগমনে দ্বাদশ বহুমতী একজন প্রভুত অমরনাথের ও
জাতাকালীর অভাব বোধ করছে।

প্রশান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ইষ্টার্ন রেলওয়ের ভূতপূর্ব জেনারেল ম্যানজার এবং রেলওয়ে
বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০এ পৌষ
৫৬ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ১৯২৫ সালে পুরাতন
পূর্বভারতীয় রেলপথে যোগদান করেন ও দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর কাল
তার সঙ্গে যুক্ত থেকে নানানভাবে তার সেবা করেন। চিত্তরঞ্জন
লোকোমোটিভ ওয়ার্কস-এর প্রথম জেনারেল ম্যানজাররূপে অপারেশন
কর্মনিপুণতার পরিচয় দেন। ছাত্রজীবনেও ইনি যথেষ্ট প্রতিভা ও
যেগার পরিচয় দেন। ইনি ভারতবর্ষে দার্শনিক স্বর্গীয়
ডাঃ পি. কে (প্রসন্নকুমার) রায়ের অগ্রতম দৌহিত্র ছিলেন।
ভারতীয় বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায় ও
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন পুনর্নির্মাণ মন্ত্রী শ্রীমতী বেণুকা রায় বখাফসে
এঁর সহোদর ও সহোদরী।

রঞ্জিত রায়

প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা রঞ্জিত রায় ৩রা পৌষ মিহিলাসে
৫৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ইনি
যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, হাসির গানের গায়ক হিসেবে
এঁর খ্যাতি সমধিক বিস্তৃত। গ্রামোফোন কোম্পানী ও হিন্দুস্তান
রেকর্ড প্রতিষ্ঠানের ইনি পরিচালক ছিলেন। অসংখ্য নাটকে ও
ছাত্রাঙ্কিতে কৌতুকাভিনেতা হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে ইনি যথেষ্ট
কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং কমিশনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, 'বহুমতী বোটারী বেলিনে' প্রচারকনার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রজ্ঞা অত্যাচার

আমাদের উপর ই প্রভু ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছে। বড়লা দেশের
বৈশিষ্ট্যমান লোকের আবিষ্কার গৌরবও আপনায়। আপনায়
প্রাচুর্য পূর্ণ উদ্ভাবনী শক্তিই মাসিক বসুমতীকে এতখানি বৈশিষ্ট্য দান
করেছে এবং তাকে আজ ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাসিক পত্রিকার
পরিণত করেছে। ইতি—ভাঙ্গল সেনগুপ্ত, পাটনা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Please arrange to send your monthly Basumati for a period of one year.—Mrs. Pratima Nathan, Coimbatore, S. India.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। ১৩৬৬ সালের
কার্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাবত
করিবেন।—Sm. Sheba Ganguly, Waltair.

Annual subscription for Masik Basumati for the year Kartick, 1366 B. S. to Aswin 1367 B. S. is sent herewith.—Berhampore Girl's College.

Herewith sending advance subscription for six months upto Chaitra 1366—Sm. Niharika Roy, Delhi-7.

এই সঙ্গে ১৩৬৬ সালের কার্তিক হইতে চৈত্র মাসের মাসিক
বসুমতীর জন্ম বাৎসরিক মূল্য ৭'৫০ পাঠাইলাম—Mrs. Purnima Sarker, Jabalpur, M. P.

Herewith sending Rs. 7-50 towards the outstanding subscription which may kindly be acknowledged.—S. P. Sen, Sambalpur.

এই সঙ্গে ৭'০ টাকা পাঠাইলাম। কার্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র
সংখ্যা পাঠাইবেন।—Mira Rani Das, Cachar.

আমাদের আশিন হইতে গ্রাহকমূল্যের মেসাজ উত্তীর্ণ হইয়াছে।
আমি আবার ৬ মাসের জন্ম ৭'৫০ নয়া পরমা পাঠাইলাম।—Sm. Juthika Mitra, B. A. Cuttack.

I am remitting herewith Rs. 7-50 towards the subscription of Masik Basumati for six months from Kartick 1366—D. K. Banerjee, Sagar (M.P.)

আমাদের মাসিক বসুমতীর জন্ম আমাদের পাঠাগারের পক্ষ
হইতে আমি ৬ মাসের চাঁদা বাবদ ৭'৫০ নয়া পরমা পাঠাইলাম।
নয়া কার্তিক কার্তিক ৬৬ হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—
কলাশঙ্কর, নব চৈত্র পাঠাগার, নবগ্রাম, বর্ধমান।

I send herewith Rs. 15/- only being my annual subscription for "Masik Basumati."—Mr. A. G. Pal, Cachar.

Half yearly subscription for Masik Basumati Rs. 7-50,—Preeti Chakravorty, Pusa, (Bihar).

Herewith half yearly subscription for Basumati.—Usha Rani Dasi, Assam.

Please find subscription for six months.—Mrs. Shila Mookherjee, Kanpur.

কার্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত ৬ মাসের পত্রিকার মূল্য
বাবদ ৭'৫০ পাঠাইলাম।—Sri Chameli Devi, Jalpaiguri.

Herewith sending Rs. 7-50 as a subscription for 6 months.—Smriti Bhusan Mookherjee, Rourkela, Orissa.

We beg to remit herewith the sum of 24/- only being subscription for one year.—Vscs Gosbiblioteka, Glavpochta, Moscow, U.S.S.R.

আমাদের মাসিক বসুমতী নেতৃত্বের মেসাজ গত আশিন মাস থেকে
হইয়া গিয়াছে। পুনরায় ৬ মাসের ৭'৫০ পাঠাইলাম। গত কার্তিক
সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন—পঞ্জী সেন, বোম্বাই।

বিশেষ কারণে অকৃত্র বাঙালিতে টাকা পাঠাতে দেবী হইয়াছে।
কার্তিক মাস থেকে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন—শ্রীমতী লতিকা
বিশ্বাস, নৈহাটি, ২৪ পরগণা।

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম—
শ্রীমতী শ্রুতিকলা ভট্টাচার্য, কাছাড় (আসাম)

The sum of Rs. 15/- is remitted herewith towards my yearly subscription for the membership of monthly magazine.—Ilarani Ghose, Cherapunji, Assam.

Herewith sending Rs. 15/- as the annual subscription of Monthly Basumati.—Chirix Recreation Club, Singbhum.

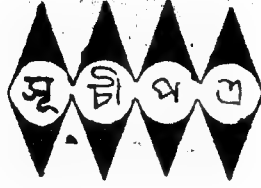
মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫ পাঠাইলাম—শ্রীকুমার
দাস, জলপাইগুড়ি।

৬ মাসের চাঁদা ৭'৫০ টাকা পাঠাইলাম। কার্তিক হইতে পরমা
সব ক'খানি পাঠাইবেন।—Mrs. Sovana Sen, Jaipur.

I am remitting herewith Rs. 7-50 for the subscription for six months from Kartick to Chaitra.—Mrs. Ava Biswas, B.A. Hazaribagh.

মাসিক বসুমতীর ১ বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম, অগ্রাহ্য
৬৬ হইতে কার্তিক ১৩৬৬ সাল পর্যন্ত চাঁদা পাঠাইলাম—
Deulbera Colliery Institute, Orissa.





বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। বিবাস ও প্রহা	—বিবেকানন্দবাণী	৫৬১
২। সত্যের অন্বেষণ ও মানব-কল্যাণ (প্রবন্ধ)	নীলরতন ধর ও সুব্রত মিত্র	৫৬৩
৩। গীতা পাঠের বীতি (আলোচনা)	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	৫৬৭
৪। রবীন্দ্র-রচনার পাঠ-চর্চা (প্রবন্ধ)	শ্রীঅবিনাশ রায়	৫৭১
৫। একটি কবিতা (কবিতা)	পদ্মা কুন্ডু	৫৭৩
৬। সূর্য্য সেন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র (বিগ্রহ-কাহিনী)	শ্রীহৃদয়ব্রজ ভট্টাচার্য্য	৫৭৪
৭। আধুনিক বঙ্গ-দর্শন (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু	৫৭৭
৮। পত্রমালা		৫৮০
৯। তাপসী-প্রতীকিতা (কবিতা)	শ্রীঅরুণা ঘোষ	৫৮৪
১০। অখণ্ড অমির শ্রীগোবিন্দ (ভাবনী)	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৫৮৫
১১। বর্ণবিষে-ববু বিভূষিকা (প্রবন্ধ)	মিহির সেন	৫৮৬
১২। আলোকচিত্র		৫৯২(ক)

বই পড়ুন • বই পড়ুন • বই দিয়ে বড়ুন

বাংলা সাহিত্যের একটি অতিপ্রয়োজনীয় সংযোজন

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রের্ত গল্প

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্যসমৃদ্ধ ভূমিকা।

প্রত্যেক বাংলা-সাহিত্যপাঠ্যসূচীর অবশ্যপাঠ্য। ৫.০০।

● অগ্ৰাণ্ড উল্লেখযোগ্য রচনা ●

উপস্থান : গল্প	উপস্থান : গল্প	উপস্থান : গল্প	বিবিধ রচনা
চারণকর বন্দ্যোপাধ্যায়	বৃজসেব বহু	প্রেমেন্দ্র মিত্র	বিবনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্মীপন্ন পাঠশালা ১.০০	সাত্তা	ড্যান্সমের মিঃমাল ২.০০	অনুভূতের উপাখ্যান ৩.০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র	মিলীপকুমার রায়	স্বত্বিকথা : আত্মগীতনী	বিবসেব বিবাস
সাম্রাজ্য চড়াই ১.০০	ভরত রোহিষে কে	মৈত্রী দেবী	কাকমজতবার পথে ২.০০
বিহারক ভট্টাচার্য	জ্যোতির বোব (ভাসর)	অংপুতে রবীন্দ্রনাথ ৩.০০	শ্রীপাহ
অজ্ঞানতার চিহ্ন ৩.০০	ভক্তহরির সংলাপ	পরিমল সোমাবনী	আজব মগরী ৩.০০
পরিমল সোমাবনী	বহুদ নয়	স্বত্বিকথিত	পতীবিলাস রায়চৌধুরী
ভুলের মেয়েরা ২.০০	আকাশ প্রাণীপ	বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা	ভাটকিতের জলকথা ৩.০০
দেবর বৈরাগী	বিভূতিভূষণ ওপ	২৫ জন লেখক-লেখিকা	
একমুঠো আকাশ ৫.০০	বীধ	যুক্তিতে যায় ব্যাখ্যা	
মহুরাই ২.০০	গীতা মনুসার	ভলে না ৩.০০	
	বাসের চোখ ২.০০		

মনোবিৎ ও মনীষী ডেল কার্গেগির	নাটক ও একাঙ্কিকা
প্রতিপত্তি ও বহু লাভ ৩.০০	অতুল ভারী। অস্তিত্বের সেনগুপ্ত।
(How to win Friends & influence People)	একমুঠো আকাশ। ধনঞ্জয় বৈরাগী।
শিক্ষিতাধীন অতুল জীবন ৫.০০	একান্ত নাটক সংকলন। অমীত চৌধুরীর ভূমিকা।
(How to Stop Worrying & Start Living)	হ'জন নাট্যকারের হ'ট পুস্তকপ্রাপ্ত একাঙ্কিকা। ৩.০০

একমাত্র পরিবেশক : পত্রিকা সিণ্ডিকেট। ১২১, লিওনে স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১০। চার জন	(বাঙালী-পরিচিতি)	১১০
১৪। পাগলা হত্যার মামলা	(বহুস্তোপত্রাস)	১১৭
১৫। ক্রিকেট খেলার অতীত ও বর্তমান	(প্রবন্ধ)	১১৮
১৬। জীবনসীতা	(প্রবন্ধ)	১০১
১৭। চন্দা তার নাম	(উপন্যাস)	১০১
১৮। বিদেশিনী	(উপন্যাস)	১১৬
১৯। কাল তুমি আসেবা	(উপন্যাস)	১২৪
২০। ভলভেরার—জীবন ও দর্শন	(জীবনী)	১৩৬
২১। একটি সনেট	(কবিতা)	১৩১
২২। বাতিঘর	(উপন্যাস)	১৪০
২৩। আনন্দ-বুদ্ধাবন	(সংস্কৃতকাব্য)	১৪৭
২৪। এরা কারা ?	(কবিতা)	১৫০
২৫। নারিদাস	(গল্প)	১৫২
২৬। হবিবুল্লাহ যেদিন	(উপন্যাস)	১৬৩
২৭। ল্যান্সপোর্ট	(কবিতা)	১৬৮
২৮। পলাশ	(কবিতা)	১৭

আঙ্কল টমস ক্যাবিনের সমগোত্রীয় সর্বকালের উপন্যাস



॥ মনোজ বসু ॥ ৫৫০ অ.প.

“গাঁয়ের সুলের নিহতে হৃৎবাবু পড়াভেন—আর ভারতী ইনষ্টিটুশনের বাড়িরের পড়ানো কান পেতে শোন গিরে। ইন্সল নয়, কারখানা একটা। মাস্টার মথ—মিথি-কারিগর। হৈ-হৈ হৈ-হৈ করে কাজ চলে।”

শিক্ষা-জগৎ ও শিক্ষক-জীবনের অশ্রু-নিষিক্ত তন্মাবহ উপাখ্যান। মহাজগৎ-আবিষ্কারের মতোই বিচিত্র। চোখের জলে লেখা, রক্তের অক্ষরে লেখা।

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥
কলকাতা-বারো



দে এণ্ড দত্ত

জ্যেষ্ঠ ও লুইজিও মার্কেট

১১৭/২-বহুবাজার স্ট্রীট-কলিকাতা-১২

বিশ্বস্ততাম
জাত্মনিকতায়
ও
মালোরমসিন্দ-
নিপুণতায়।

যুগ্মপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
২২। অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ—		
(ক) নৌঙ্গর	(গল্প) মিতা সেন	৬৭০
(খ) তৃতীয় পরিকল্পনার বাধ্যতামূলক শিক্ষা	(প্রবন্ধ) ইন্দুপ্রভা ভট্টাচার্য	৬৭২
(গ) স্বীকৃতি	(কবিতা) সাধনা মুখোপাধ্যায়	৬৭৪
(ঘ) রান্না ও কান্না	(প্রবন্ধ) শোভারানী হাসান	৬৭৫
(ঙ) হেমন্ত শেষে	(কবিতা) স্বাতি ঘোষাল	৬৭৬
(চ) প্রমাণ	(কবিতা) মাধবী সেনগুপ্ত	ঐ
(ছ) প্রত্যয়	(কবিতা) অমৃতা দেবী	ঐ
৩০। শিশির-সান্নিধ্যে	(জীবনী) রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু	৬৭৮
৩১। ছোটদের আসর—		
(ক) দিন আগত ঐ	(উপন্যাস) ধনঞ্জয় বৈরাগী	৬৮০
(খ) কালল মেয়ে	(গল্প) শাসিতরঞ্জন চক্রবর্তী	৬৮৩
(গ) ভৌতিক যুদ্ধ	(বাহুতথ্য) বাহুবল্লভ—এ, সি সরকার	৬৮৭
(ঘ) কৈ-ভোলা	(প্রবন্ধ) সুরেশচন্দ্র সাহা	৬৮৮
(ঙ) ভালবাসার জর	(রূপকথা) গুণপদ ভট্টাচার্য	৬৮৯
(চ) ছোট চাঁদ	(কবিতা) মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়	৬৯১
(ছ) ভিন চিমটি	(গল্প) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	ঐ
(জ) ক্রীটমাস্ টার	(প্রবন্ধ) জীহায়া চৌধুরী	৬৯২

শ্রী শ ন লে র স জ-প্র কা শিত বই

সুকুমার মিত্রের

১৮৫৭ ও বাংলা দেশ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সমকালীন বাংলা সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করে। লেখক সেই শতাব্দীর বিভিন্ন উপন্যাস, নাটক ও কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের মহাবিস্তৃত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উপর মহাবিদ্রোহের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার মনোস্তম্ভ বর্ণনা করেছেন। পুরু অ্যান্টিক কাগজে ছাপা। দাম : ২.৭৫

ইলিয়া এন্ডেমবুর্গের

নবম তরঙ্গ (২য় খণ্ড)

অনুবাদ : সত্য গুপ্ত

দাম : ৬.৫০

ভারত-চীন সীমান্ত সম্বন্ধে

নেহরু-চৌএন-লাই পত্রাবলী

(সীমান্ত সমস্যার উপর দুই প্রধানমন্ত্রীর পত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ পাঠের সংকলন)

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

শেভন : ১.০০

সাধারণ : ০.৭৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বক্সিং চার্জার্স স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ । ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৩২। বিজ্ঞানবর্তা		৩১৩
৩৩। আবার বসন্ত এসে	(কবিতা) জয়ন্তী সেন (বহু)	৩১৬
৩৪। আলোকচিত্র		৩১৬(ক)
৩৫। বিপ্লবের সন্ধ্যা	(কাব্য-কাহিনী) নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১৭
৩৬। মাচ-গান-বাজনা—		
(ক) কবি গীতিকার রজনী সেন প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)	শ্রীকালীপদ সাহিত্য	৭০৫
(খ) আমার কথা (শিল্পিগণিচিত্রিত)	সঞ্জীতাচার্য—শ্রীকালীপদ পাঠক	৭০৬
৩৭। সাহিত্য-পরিচয়		৭১০
৩৮। আকাশের মেঘা	(কবিতা) অধীর সুরকার	৭১২
৩৯। কেনা-কাটা	(ব্যবসা-বাণিজ্য)	৭১৩
৪০। প্রচ্ছদ পরিচিতি		৭১৪
৪১। বন ফেটে বসন্ত	(উপন্যাস) মনোজ বসু	৭১৫
৪২। দেহের কথা	(কবিতা) শ্রীবিবেকানন্দ পাণ্ডা	৭২০
৪৩। আত্মজাতিক পরিহিত	(রাজনীতি) শ্রীগোপালচন্দ্র দিয়ারী	৭২১
৪৪। খেলাধুলা		৭২৭
৪৫। রক্তপট—		
(ক) শ্রুতির টুকরা	(আত্মশ্রুতি) সাধনা বসু—অম্বুবাণ : কল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়	৭২৯
(খ) আকাশ পাতাল		৭৩০
(গ) দেবী		৭৩১
(ঘ) এক পেয়ালার কবি		৭৩২

মহাযোগী—খ্রিস্টোকেব মহাভাস্ত্রিক—সাধকগণের মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—কলির মানবের সৃষ্টির ও অলৌকিক সিদ্ধান্তের একমাত্র সুসঙ্গ
পন্থা—অসংখ্য তত্ত্বশাস্ত্র-সমূহ আলোকিত করিয়া সামান্যসর সঞ্চলনে—প্রত্যেক সত্য—সত্যলব্ধ সাধনার অগুরু সময়।

তত্ত্বশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাণীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দেব

বহু তত্ত্বসার

—সুবিদিত বঙ্গানুবাদ সহ বহু সংস্করণ—

সেবাদিগেব মহাদেব বীর শ্রীমুখে বসিয়াছেন—কলিতে একমাত্র তত্ত্বশাস্ত্র জাগ্রত—সত্য কলগ্রন্থ—জীবের সৃষ্টিদাতা অন্ত শাস্ত্র নিম্নিত—তাহার সাধনা নিম্নল। অধানে সাধনার মহাদেব পঞ্চমুখে কলিমুগে তত্ত্বশাস্ত্রের যাহায্যকীর্তন করিয়া—সংখ্যাতীত তত্ত্বশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া—সৃষ্টি ও সিদ্ধির পথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই সীমাতীত তত্ত্বসমূহ মথিত করিয়া, মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ সর্বল সহজ বোধগম্যভাবে সাধক-সম্প্রদায়ের নতি-বীজ নিহিত অমূল্য রত্ন এই বহু তত্ত্বসার আভিবন কঠোরতম সাধনার—জীবনাত্তকর পরিপ্রসঙ্গ সঙ্গ্রহ—সকল সাধনার সমাবেশ করিয়া মানবের মঙ্গলবিধান করিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্ব-তত্ত্ব ও তত্ত্ব-রহস্য—পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ? গুপ্তসাধন কাহার নাম? অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের সাধনা—ভাস্ত্রিক সাধনার শাস্ত্র তত্ত্বগণের সকল সিদ্ধিই তত্ত্বসারে সন্নিবেশিত।

সর্বল প্রাক্তন বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন বঙ্গাচারে সুশোভিত—অমূল্যনিপুণতাই সন্নিবেশিত

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষা—বহু ব্যয়ে—আত্মত্যাগিক ভাস্ত্রিক পণ্ডিত মহাশয়গণের সহায়তার কাঙ্ক্ষা হইতে পুঁথি আনাইয়া বহুমতী সাহিত্য হস্তির পরিশোধিত পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ করে। পুণ্ডা, পুরস্কার, হোম, বাগবজ, বলিদান, সাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তত্ত্বসারে কি নাই? হাইকোর্টের জ্ঞানবুদ্ধি বিচারপতি—অসংখ্য আইনগুরু-প্রণেতা উভয়ক সাহেবের অমূল্যলন—মহানীলগণ ভয়ের অম্বুবাণ প্রণয়ন ও প্রকাশকালান্বিত তত্ত্বগুরু প্রণীত শিক্তি সন্তানদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে, তাহার দোষিবেদ কি অলৌকিক সাধনার সিদ্ধি—অতীতের অমূল্য সমাবেশ—সর্বভবের সমগ্র—কৃষ্ণানন্দেব তত্ত্বসারে বস্তুত আছে, সকলেরই চিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছে। মূল্য দশ টাকা।

বহুমতী সাহিত্য মন্দির : ১৬৬, বিপিন বিহারী পান্ডুলী ট্রাট, কলিকাতা - ১২

যুগীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
(৬) অঙ্গার		৭৩২
(৮) সাম্প্রতিক চিত্র-সংবাদ		এ
৪৬। দেশ-বিদেশে (ঘটনাপত্রী)		৭৩৬
৪৭। সাময়িক প্রশ্ন—		
(ক) বক্তৃত্ত্ব সমিতির নাট ও গান		৭৩৫
(খ) চলচ্চিত্রের বিরোধিতা		এ
(গ) যুড়িহীন ভারত		এ
(ঘ) ৮ই মার্চ স্মরণে		৭৩৬
(ঙ) আয়করের ভাগ		এ
(চ) ঘর করিলেও জাত দিব কেন?		এ
(ছ) খাজনামত্ৰ		এ
(জ) ছাত্র-বিক্ষোভ		
(ঝ) প্রশংসনীয় সাংস্কৃতিক ও ব্যর্থতা		৭৩৭
(ঞ) দোকান আইন		এ
(ট) সিনেমার হাতছানি		৭৩৮
(ঠ) শিশির-সান্নিধ্যে এসে		এ
(ড) শোক-সংবাদ		এ

শ্রীরামপুরের
এস.চক্রবর্তী

স্পেশ্যাল
XX
নমস্

লক্ষ্মী এজেন্সী
৪৩/১. স্ট্রাও রোড - কলিকাতা-৭

আমেরিকার বিস্তৃত হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ

প্রতি ড্রাম ২৫ মঃ পঃ ও ৫৫ মঃ পঃ, পাইকারগণকে উচ্চ কমিশন দেওয়া হয়। আমাদের নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি ও ব্যবসায় সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। ব্যবসায় পীড়া, মায়বিক সের্কেলা, অল্পশা, অনিদ্ৰা, জ্বর, অজীর্ণ প্রভৃতি ব্যবসায়ী জটিল রোগের চিকিৎসা বিচক্ষণতার সহিত করা হয়। মস্তঃস্নায়ু রোগীদিগকে ডাকঘোষে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক ও পরিচালক—
ডাঃ কে, সি, দে এল-এম-এক, এইচ-এম-বি (পোস্ট মেডিসিট),
বৃত্তপূর্ণ হাউস ফিজিয়ান ক্যাবেল হাসপাতাল ও কলিকাতা
হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এও হাসপাতালের চিকিৎসক।
অগ্রহ করিয়া অর্ডারে সহিত কিছু অগ্রিম পাঠাইবেন।

হািমিয়াম হোমিও হল ১৮৫, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬(ঘ)

বস্ত্রশিল্পে মোহিনী মিলের অবদান অতুলনীয়!

মূল্যে, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন

১ মঃ মিল—

২ মঃ মিল—

কুষ্টিয়া, বর্ধীয়া। বেলবরিয়া, ২৪ পরগণা।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—

চক্রবর্তী, সঙ্গ এণ্ড কোং

রেজিঃ অফিস—

২৫ মঃ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

নূতন গ্রন্থ ! প্রকাশিত হইল ! ॥ যোগসাধন-বহস্য ॥

(YOGA PSYCHOLOGY)

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

ভারতীয় সাধন-বহস্ত্রের মন উদ্ঘাটন করে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পান্ডিত্য মনীষীদের সামনে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যোগ-বহস্ত্র ও সাধনা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা বর্তমানে ইংরাজীতে 'যোগ-সাইকোলজি' নামে প্রকাশিত হ'ল। ৪০০ শত পৃষ্ঠার অধিক, ডিমাই সাইজ ও সুদৃঢ় প্রচ্ছদপট-সম্বন্ধিত কাগজে বাঁধাই।

মূল্য : দশ টাকা। ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র।

VEDANTA PHILOSOPHY

ইংরেজী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছইলার হলে এই বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। তদানীন্তন অধ্যাপক হাউইসন, অধ্যাপক জোসিয়া জেমস, অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস প্রমুখ আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ অধ্যাপকের সম্মুখে কিলজাক্যাল ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাটি দেওয়া হয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইক্রোকিনেম' কর' এই বক্তৃতা আনিয়া ছাপা হ'ল। ছইলার হল, অধ্যাপক হাউইসন, জেমস, জেমস ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভোলা স্বামী অভেদানন্দের ছবি এতে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মাইক্রোকিনেম প্রিন্টের একটি কটোও এতে দেওয়া হ'ল। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ও সুদৃঢ় হলটিবদ্ধ ॥ মূল্য : তিন টাকা ॥

॥ মন ও মানুষ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ঐরামকৃষ্ণ-সঙ্কলনের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দজীর অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মজ্ঞান জ্ঞানচর্চা। তাঁর সারাজীবনের অধ্যয়ন ও মননের পটভূমিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারার আদান-প্রদানের ইতিহাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের একটি প্রধান দিক। এ' গ্রন্থে সেই ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ রয়েছে। তাছাড়া আমেরিকার ও ভারতবর্ষে স্বামী অভেদানন্দের জীবনের নানা ঘটনা এতে স্থান পেয়েছে। ধীরা ঐরামকৃষ্ণলীলা-সুচর স্বামী অভেদানন্দকে (কালী তপস্বী) জানতে চান, অথবা ধীরা উন্নিত ও বিশ শতকের মনস্তত্ত্বের এক ভারতীয় মনের অমূল্যবস্তু অধ্যাপক-আন্দোলনের উৎসাহী তাঁরা সকলেই এ' গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন।

কলকাতার বিবেকানন্দ-রকের প্রচ্ছদপট ও বহু ছবি সহজিত ডিমাই সাইজের ৪৫০ পৃষ্ঠা।

মূল্য : সাত টাকা

ঐরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ফোন : ৫৫-১৮৫৫

সেই বিখ্যাত ও বহু প্রয়োজনীয় মহাগ্রন্থ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্ বা

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

বাল্মীকি-মহর্ষি প্রণীতম্

ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের চির উজ্জ্বল মুকুটমণি; সর্বজনের অনার্যাসলভ জ্ঞানশাস্ত্র; সর্ব-সাহিত্যের সার; জ্ঞতি নামে অভিহিত এই মহারামায়ণ গ্রন্থে মানবজাতির মোক্ষলাভ অবশ্যাবধি। সর্বাপেক্ষা সহায়ক ও চিন্তাকরক এই মহাগ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ। কথোপকথনের ছলে নানা আখ্যায়িকার মাধ্যমে মোক্ষের স্বরূপ, মোক্ষলাভের উপায় বিবরণগুলি সিন্ধুতাবে বিবৃত ও বর্ণিত হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানের নীরসতার অভাবই যোগবাশিষ্ঠের চমৎকারিত্ব। যাহুকের কাম্য ও প্রার্থনা—চতুর্দশগালাভ। মোক্ষ তত্ত্বমধ্যে শ্রেষ্ঠতম। মোক্ষের পূর্ণ বিস্তারণ এই মহারামায়ণের প্রতিপাদ্য বিষয়। মূল সংস্কৃতের সঙ্গে

সহজ গদ্য অনুবাদ।

প্রথম খণ্ড : বৈরাগ্য ও মনঃকৃত্ত প্রকরণ

মূল্য সাড়ে সাত টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড : স্থিতি প্রকরণ

মূল্য সাত টাকা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রস্থাবলী

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরদের

বিশ্ব-প্রসিদ্ধ রচনার সমাবেশ

টলষ্টয়ের—কুৎসার সোনাটা

এ-নৃপেন্দ্রের অভিলাষ

গোর্কির—মাধার

মা

রেনে মারার—বাতোয়াল্লা

ভেরকরসের—কথা কও

চক্র ও চক্রান্ত

রুশ বলশেভিক বিপ্লব ও সোভিয়েট পন্থনের

মাঝামাঝি কয় বৎসরের রোমহর্ষক কাহিনী।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

বনুমতী সাহিত্য মন্দির : কলিকাতা - ১২

ভারতের আদি মহাকাব্য, আদি কবি রুত

পরশুরামের মতুম বই

বাণ্যকি রামায়ণ

চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৩.০০

সারাহাবাদ : রাজশেখর বসু ॥ ৪র্থ সংস্করণ ॥ মূল্য ৮.০০
বুদ্ধদেব বসু

আনন্দীবাসী ইত্যাদি গল্প ৩.০০

নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩.০০

কৃষ্ণকলি ২.৫০ গল্পকল্প ২.৫০

গড্ডলিকা ৩.০০ ধৃত্তরিন্মায়া ৩.০০

অন্নদাশঙ্কর রায়

কালিদাসের মেঘদূত ৬.০০

শোণপাংশু (উপন্যাস) ৪.০০

শেষ পাণ্ডুলিপি (উপন্যাস) ৩.২৫

যে-আধার আলোর অধিক (কবিতা) ২.৫০

আধুনিক বাংলা কবিতা ৬.০০

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত

কাব্য দীপালী ৭.০০

অপূর্বরতন ডাঙড়ী

মন্দিরময় ভারত (২য় খণ্ড) ৬.০০

বিদ্যুৎ চৌধুরীর উপন্যাস

বেদ্রবতী মরানদী ৩.৫০

জাপানে ৬.৫০

পথে প্রবাসে ৪.০০

রূপের দায় ৩.০০

অজিত দত্তের কাব্যগ্রন্থ

জানালা ২.০০

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ভোভার পেরিয়ে ৪.৫০

বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থ

আলেখ্য ২.৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাউজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নৃতন প্রকাশিত হইল

বিশ্ববিখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ

হাভেলক এলিসের

যৌন-মনোদর্শন

STUDIES IN THE

PSYCHOLOGY OF SEX

মহাগ্রন্থের ভারতীয় ভাষায় প্রথম অনুবাদ

অনুবাদক—ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, এল-এল-বি,

প্রথম খণ্ড (১ম ভাগ) [লঙ্কার ক্রমবিকাশ] ৭ টাকা

" (২য় ভাগ) [বয়ঃ রতি] ৭ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড (১ম ভাগ) [কামাভিবেগের বিশ্লেষণ] ৭ টাকা

" (২য় ভাগ) [প্রেম ও পীড়া] ৭ টাকা

বসুমতী সাহিত্য মন্দির : কলিকাতা - ১২

পুলকেশ দে সরকারের নৃতন উপন্যাস

অ নি রু দ্ধ

.....প্রভুলের চোখে পথের পাঁচালীর 'অপূর' জীবন
রহস্যের প্রতি মুগ্ধ বিস্ময়ের অজ্ঞান মাথানো নেই, জী-ক্রিস্তফের
সমুদ্র বিশাল জীবন জিজ্ঞাসার পূর্বাভাবও নেই। কিন্তু একটা
অস্থিরতা, জীবনের প্রতি অপরিণত কিশোরের একটা
'রিবালিউ এ্যাটিচুয়াল' উপন্যাসটিকে একটি উল্লেখযোগ্য
বৈশিষ্ট্য দান করেছে, যা' নিঃসন্দেহে মূল্যবান নয়। একজোই
অপু ও জী-ক্রিস্তফের চেয়েও প্রভুলকে আমাদের বেশী
আপনার বলে মনে হয়..... —সুগাভর

টার অন্যান্য বই :

বালির প্রাসাদ (উপন্যাস) ৪/-

লেডী রম্ (শ্লেষাত্মক গল্পগুচ্ছ) ৩/-

আচরণবাদ (মনস্তত্ত্বের একদিক) ৪/-

৩১/সি/১৫ হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা-১২

বর্ষীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক
মূল সংকলিত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনূবাদিত

মহাভারত

প্রথম খণ্ড—মূল্য ৮ টাকা
সত্বর সংগ্রহ করুন

পরমভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

শ্রীকৃষ্ণ

ভক্তির মন্ডাকিনী—প্রেমের অলকানন্দা—জ্ঞানের আকাশগঙ্গা।

—বঙ্গ-সাহিত্য এরূপ মহাগ্রন্থ দ্বিতীয় নাই—

॥ জীনারায়ণে নিবেদিত এই ভক্তিনৈবেদ্যে বর্ষপাঠে সুসজ্জিত ॥

এরূপ চিত্র-সমৃদ্ধ—রূপোভূষিত—সম্বোধন-সংস্করণ

এ পঞ্চাঙ্ক ভারতে প্রকাশিত হয় নাই।

মূল্য পনের টাকা

আর একখানি উপহার গ্রন্থ

ছত্রপতি শিবাজী

৬সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত

শে বীরবর চরনের উচ্চ শোণিত প্রদান করিয়া জননী করমুক্তির পূজা
করিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণবরণে, অনুদিন বরনীর ছত্রপতি মহাশয়
শিবাজীর উদয়-চরিত্র করমুক্তিভক্ত ও ভারতীয় বীর চরিত্র পাঠে
অনুভব মহাত্ম্যসিগের করকমলে প্রদান সহিত অর্পণ করেন অর্ধ-
শতাব্দী পূর্বে বিদ্যাবী সত্যচরণ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৩৫০ পৃষ্ঠার
বৃহৎ গ্রন্থ, কার্ডবোর্ড বঁধাই। মূল্য দুই টাকা।

বহুকাল পরে পুনরায় প্রকাশিত হইল

—রোমাঞ্চ-রহস্ত-গ্রন্থ—

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

সকল সন্যাস ধারা হাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠার প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
বখেই সমালোচনা লাভ করে। রোমাঞ্চ ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনার বইটির
আভ্যুদয় পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, জীবন-
পাথের দিক নির্দেশ। তাই প্রবন্ধনা, হলনা ও প্রেমের লীলার চাক্ষুষকর
বইটি চাক্ষুষ জুলেছে সকল সমাজেই। লোমহর্ষণ সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত
এরূপ সহস্রবারে উৎসব মত কোথাও প্রোৎসাহিত হয় নাই।
এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ
আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

বাঙ্গালার সব স্মৃতিকবিতার এই প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ,
অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু কবি
কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সর্বস্বত্ব গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বসুমতীর শ্রেষ্ঠ অবদান

শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সুনির্বাচিত এই ৭খানি গ্রন্থের মণিমাণিক্য

১। ধরত্রেতা, ২। রায়চৌধুরী, ৩। ছান্দাছবি,
৪। সতীম কাঁটা বা গঙ্গা-যমুনা, ৫। অক্লেশোদয়,
৬। ধ্বংসপথের যাত্রী এ। এবং ৭। কয়লা কুঠি।

ময়াল ৮ পেজী, ৩২৮ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ।

মূল্য দশ টাকার তিন টাকা

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

ইহাতে আছে ৫ খানি সর্বস্বত্ব ডিটেকটিভ উপন্যাস

বন্দিনী রক্ষা, মুক্ত করেদীর গুপ্তকথা, কৃতান্তের
দণ্ড, টাকের উপর টেকা, ঘরের ডেকা।

মূল্য ৩০০ টাকা

উপন্যাস-সাহিত্যের যাদুকর

অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী

বায়ুন বাগদী, রক্তের টান, পিপাসা, প্রণয় প্রতিমা,
কামিন্যের ঠাকুর (বোঝাপড়া), বন্ধন, মাতৃশপথ প্রভৃতি।

মূল্য তিন টাকা মাত্র

বসুমতী সাহিত্য মন্দির : ১৬৬, বিপিন বিহারী পান্ডুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

॥ চিরকালীন সাহিত্য-মঞ্জুষা ॥

বিচিত্র লেখক **অবধূতের বিচিত্র কাহিনী “দুই তারা” ২।।০**

সন্তোষকুমার ঘোষের
নবতম পেনাস
তেরু তোমার
মূল্য ২।।০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
আধুনিকতম উপন্যাস
তরঙ্গের পর
—পাঁচ টাকা—

বিমল করের
নবতম উপন্যাস
খোয়াই ২।।০

প্রমথনাথ বিশীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি
মনস্তাপাধ্যায় উপন্যাস

কেরী সাহেবের
মুন্সী (৫ম মুদ্রণ) ৮।।০

বাংলা সাহিত্যের
বৃহত্তম
ঐতিহাসিক
উপন্যাস

মাইকেল মধুসূদন ৪৯
নিকৃষ্ট গল্প ৫
রবীন্দ্রনাথের
ছোট গল্প ৪৯

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বহি বন্যা (২য় মুদ্রণ) ৮।।০

ছটি ২।০ প্রেরণা ২৮০ ভাড়াটে বাড়ী ৩, স্ত্রীশাস্ত্রিএম ৩.

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
মিলনান্তক ৪।।০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নবতম উপন্যাস
পরিশোধ ৪।।০

আশাপূর্ণা দেবীর
নূতনতম উপন্যাস
ছাড়পত্র ৪।।০
বলয়গ্রাস ৪৯

আন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের
নূতন বিচিত্র
উপন্যাস

সাত পাকে বাঁধা ৪।।০

রাজশেখর বসুর
চলচ্চিত্র ২।।০

কালিদাস রায়ের
সাহিত্য প্রসঙ্গ ৫

ডাঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের
আধুনিক বাংলা কাব্য ৬.

স্বপ্ননাথ ঘোষের **শ্রেষ্ঠগল্প ৫** **ছায়াসঙ্গিনী ২৮০** **জটিলতা ২৮০**

নীহারকুমার গুপ্তের
উত্তরফাল্গুনী ৬।।০
ঘুম নেই ৪।।০

নিকুপমা দেবীর
প্রত্যর্পণ ৩
অনুকর্ষ ৪

অরেন্দ্রনাথ মিত্রের
শ্রেষ্ঠগল্প ৫ **অনমিতা ৪**
চেনামহল ৫।।০ **মিল্লরাগ ৩।০**

প্রাণতোষ ঘটকের	সুরজিৎ দাশগুপ্তের	বিমল করের
রাণী বৌ ৪.০০	একই সমুদ্র ৩.৫০	অপরাজ ৩.০০
বর্ণনার ইচ্ছা হলে যে-জগৎ ছিল হৃদয় ও রহস্যময় তাকে লেখক করে তুলেছেন রোমাঞ্চ- খন, হাস্য ও কাহিনী। লেখকের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।	বিশ্বোত্তর নিশান উড়িয়ে এই নতুন ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব। এ-বইয়ের নায়ক এ-কালের লালিত ও প্রবক্তিত দৃষ্টি ও কৃষ্ণ ভাষণের মত প্রতীক।	বে-চায়ট চরিত্রের আশ্রয়ধনে এ-কাহিনীর একেকটি ভাজ খোলা হয়েছে তারা আসলে বিশ্বের কোণ হতে ব্যক্তি করেছেন মানব- অস্তিত্বের নিগূঢ় রহস্যকে।

আরও নতুন বই	অমরদাশব্রত রায়
স্বপ্নরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অরণ্যচক্র ৫	যার যেখা দেশ ৫, অজ্ঞাতবাস ৬, কলঙ্কবতী ৫, কল্যা ৩, কর্তব্য ৩, দুঃখমোচন ৫, মর্ত্যের স্বর্গ ৫, অপসারণ ৫, আধুনিকতা ২, বিমূর বই ২, উড়কি ধানের মুড়কি ২, পুতুল নিম্নে খেলা ৩, প্রত্যয় ১১০, ইশারা ১৫০, জীবনশিল্পী ১০, আন্তন নিম্নে খেলা ৩, চতুরালি (নাটক) ১১০, রত্ন ও শ্রীমতী ১৫ ও ২২ ৩১০
বিমল মিত্রের রাজপুতানী ৩১০	
স্বপ্নোৎসব চক্রবর্তীর সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত ৪	

অমৃত্যু বই	রবীন্দ্রলাল বসুর
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কল্লোল যুগ ৬, বিবাহের চেয়ে বড় ৪১০ পাথনা ২১০, যাম্য যদি থাক ৩, উর্নাত ৩১০ তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাগিনী কল্লার কাহিনী ৪, পঞ্চপুতুলী ৪, স্বর্গমর্ত ৪, মাটি ২, গোপাল হালদারের স্রোতের দীপ ৩১০, ভূমিকা ৩১০, নবগঙ্গা ৩১০ উজান গঙ্গা ৩১০, জোয়ারের বেলা ৪১০ বনফলের উদয়-অস্ত ৬, অগ্নীশ্বর ৫, নিরঞ্জন ৫, মহারানী ৩১০ ভুবন সোম ২, বিষম জর ১০, পঞ্চপর্ক ৫, নির্মোক ৫১০, কষ্টিপাথর ৩, ডানা তিন খণ্ড ১২২	তবলা বিজ্ঞান ও বাণী ২য় খণ্ড ২১০ দীপক চৌধুরীর দাগ ১ম ৫, ২য় ৪, রূপদর্শীর রত্নবাস্ত ৩৫০ গ. চ. নি. ব অথ সংসার চরিতম্ ২১০ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিসারিকা ৩

গোপালদাস মজুমদার সম্পাদিত	অমৃত্যু বই
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৫১০ সংসারী হেলেনের নজরুল ২ নবমু ঘোষের আজব নগরের কাহিনী ৮	অচ্যুত গোপালীর সংস্করণ ৫, অমরেন্দ্র ঘোষের কনকপুরের কবি ৪, কোটের মহল ৩১০, ইন্দ্র মিত্রের পঞ্চাংগ ২১০, গোপাল হালদারের জোয়ারের বেলা ৪১০ লীলাপত্মার রায়ের কোলা ৮, নীহাররঞ্জন গুপ্তের এপারে পদ্মা ওপারে পদ্মা ৫১০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্টজল ৩১০, সমরেশ বসুর পুতুলের খেলা ২১০, শান্তা দেবীর জীবনকোলা ৫, শক্তিধর রায়ের আত্মজীবনী ২১০, শৈলজানক মুখোপাধ্যায়ের আমি বড় হব ৩, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতিস্মরণ ৪১০, রানিগী ৪

অমৃত্যু বই	সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে ছোটগল্প ৮, সঞ্চারিণী ৩, ট্রফি ২, নীলদিগন্ত ৩, সজ্ঞাট ও শ্রেষ্ঠী ২১০, মহানন্দা ৪, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ বৈঠক ৩১০, বিদ্রোহী ভারী ৪১০, যোজুক ৪, অভিজ্ঞান ৬, শশীনাথ ৫, অন্তরাগ ৪১০, অমলা ৩, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাটি ঘেসা মানুষ ২১০, শুভাশুভ ৪, (নতুন সংস্করণ) পেশা ৩, চালচলন ২, সার্বজনীন ৪, সহরতলী ২	একাদশীর বিজ্ঞান ১০, এ-বছরের নরসিং প্রবন্ধপ্রাপ্ত সন্তোষকুমার ঘোষের কিন্তু গোয়ালার গলি ৩১০ ছোয়াতিরিক্ত নন্দীর প্রিয় অপ্রিয় ২১০ বিমল করের দেওয়াল ১ম ৪১০, ২য় ৬

রমাপদ চৌধুরীর লালবাজি ৫, অরণ্য আদিম ৩	নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্কল্প ৪, শুরুপক্ষ ৩	রমাপদ চৌধুরীর প্রথম প্রহর ৫	বুদ্ধদেব বসুর কালো হাওয়া ৬, বন্দীর বন্দনা ২১০
---	---	--------------------------------	--

ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২, কণ্ডওয়ালিস স্ট্রীট : কলকাতা ৬

সম্মত প্রকাশিত

• পাকা দাড়ি লাল চুল
হলুদ নীল চোখ, স্বচ্ছ
দেহ, বুদ্ধের বেশে চির
ভরণ বিশ শতকের
বিরাট বিশ্বয়, চিন্তানাগর

**ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
জর্জ বার্নার্ড শ**

একত্রে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ জীবন-কথা ॥
॥ ৮'৫০ ॥

**বুদ্ধদেব বসুর
নতুন উপস্থাপনা**

নীলজ্ঞানের খাতা

॥ ৪'০০ ॥

• সহজ আঙ্গিকে সাবলীল
ভাষায় বিষয়-বস্তুর অভিনব
নবত্ব চরিত্রগুলি আপন
মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে
উঠেছে মহৎ শিল্পীর অমৃত

বিদ্যুৎ প্র নাট্যকাব্য—জর্জ বার্নার্ড শ। সেই মহামানবের বিশ্বয়কর
জীবনেন্তিতাস, বিচ্যব-বিপ্লবগণ, তথ্য ও গবেষণাসমৃদ্ধ। জনপ্রিয়
লেখকের উপস্থাপনার কৃতিত্ব ও লিখনভঙ্গীর চারুতায় সাম্প্রতিক
কালে এক অনবদ্য সৃষ্টি—জর্জ বার্নার্ড শ।

লেখনী স্পর্শে। সাম্প্রতিক উপস্থাপনায় লেখক জীবনের যে কথা
আন্তরিক ভাবে তুলে ধরেছেন তা পাঠক-ছন্দকে অভিভূত করবে।

॥ মনোজ বসুর ॥

সোবিয়েতের দেশে দেশে

৬'০০

সোবিয়েত দেশ সম্বন্ধে অগ্ণী ভ্রমণ-কথা

মানুষ নামক জন্তু

৩'০০

সভ্যতার নানান চেহারা—সকট বুদ্ধের সমস্ত ধরে পড়ে। হিংস্র,
স্বার্থকে আশ্রয় বাঁধন রূপ। বিচার চরিত্রের অপরূপ উদ্ঘাটন।

রক্তের বদলে রক্ত

২'৫০

দাঙ্গা চলেছে লাঠির ও কলকাতায়। চেনা মানুষের অসংখ্য রূপ।
নিরঙ্কর অন্ধকারের মধ্যে সত্যদ্বন্দ্ব—মানুষ ভাল মানুষ সুন্দর।

• এক আশ্চর্য মেয়ে মনামা—
রূপেগুণে বিজয় বৃত্তিতে এমন
মেয়ে তর না—অমরার্থার সংসারে
কয়েক দিনের জন্তে এসে ভাল-
বাসিল সুবিমলকে। পরস্পরের

নারায়ণ সাহাচারের

নতুন উপস্থাপনা

মনামা

॥ ৪'০০ ॥

প্রতি অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও দুজন দুজনকে ঘাত-প্রতিঘাতে করে
জর্জরিত। লেখকের এই বিশ্লেষণমূলক উপস্থাপনা এক সম্পূর্ণ নোতুন
আঙ্গিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে—যার কাহিনী অনঙ্গ।

• সাম্প্রতিক প্রকাশনা •

কুমারেশ ঘোষের

সাগর-নগর

॥ ৩'৫০ ॥

বাণভট্টের

লালুভুলু

॥ ৬'০০ ॥

নীলকণ্ঠের

অন্ত ও প্রত্যহ

॥ ৫'০০ ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশের

রাজা ও মালিনী

॥ ৩'০০ ॥

তারানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সপ্তপদী

॥ ২'৫০ ॥

দীপান্তর (নাটক)

॥ ২'০০ ॥

হুমায়ুন কবিরের

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

॥ ৩'৫০ ॥

প্রবোধকুমার সাহাচারের

নওরঙ্গী

॥ ৩'০০ ॥

বিনয় ঘোষের

বিত্তাসাগর ও বাঙালী সমাজ

॥ ১ম খণ্ড : ৩'০০, ২য় খণ্ড : ৭'০০,

৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

বিনয়ক সাহাচারের

রবীতীর্থে

॥ ৪'০০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

মণিপন্ন

॥ ৪'০০ ॥

জয়সংকর

লোহকপাট

॥ ১ম খণ্ড : ৩'৫০ ॥

॥ ২য় খণ্ড : ৩'৫০ ॥

॥ ৩য় খণ্ড : ৫'০০ ॥

॥ অন্যান্য বই ॥

রাইকমল তারানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ২'৫০ ॥ কয়লাকুটির দেশে শৈলজ্ঞান মুখোপাধ্যায় ॥ ৩'৫০ ॥ বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা
শিববল ॥ ৬'০০ ॥ বিগত দিন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৩'৫০ ॥ অমৃতকুন্তের সন্ধ্যা কালকূট ॥ ৫'০০ ॥ বাংলা গল্প বিচিত্রা
বারাক গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৪'০০ ॥ পূর্ব-পাশ্চাত্য প্রবন্ধ ১৮'৫০ ॥ গুলুনাচের হাতকথা নাগিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৫'৫০ ॥ স্বচ্ছ
দৌলানা খাঞ্চি খান ॥ ২'৫০ ॥ স্বৈত-সঙ্গীত রঞ্জিতকুমার সেন ॥ ৪'৫০ ॥ পলাপসঙ্গ রমাপদ চৌধুরী ॥ ২'৫০ ॥ অচিন্তা
সঙ্গীত বাহুড়ী ॥ ৩'৫০ ॥ স্বাভাবিকের স্বাভাবিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ২'০০ ॥ জ্যেষ্ঠ গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৫'০০ ॥ ইংল্যান্ডের ডায়েরী
শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ ৪'০০ ॥ দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ বিগ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬'৫০ ॥ জলে ডাঙায় সৈয়দ মুক্তাব আলি ॥ ৩'৫০ ॥
পৃথিবীর ইতিহাস-কৌশল চট্টোপাধ্যায় ১৮'০০ ॥ নেপোলিয়ানের দেশে দিলীপ মালিকার ২০'০০ ॥ লালুভুলু বাণভট্ট
॥ ৩'০০ ॥ পৌষ ফাল্গুনের পালা সোমেন্দ্রনাথ রায় ৩'০০ ॥ অজ্ঞাতম হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ২০'০০ ॥ স্বচ্ছ-স্বচ্ছের ডেউ
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৪'০০ ॥ স্বচ্ছের পাখি প্রেমোত্তর আত্মা ৩'০০ ॥ অমৃত বহন অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

॥ ফাইন আর্ট এর উপস্থাপন ॥

শশধর দত্তের
স্বর্গাদপি গরীয়সী ৩, সব্যসাচার প্রত্যাবর্তন ৩,
রক্তাক্ত ধরণী ৩, দেহের কুখা ৩,
আন্তন ও মেয়ে ২.৫০
অপূর্বরূপ ভট্টাচার্যের
মৃত্যু দিনের কথা ৩, অন্তরাপ ৩, শুগ্ননীড় ২,
সত্যতার রাজপথে ৩,
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অপরাজিতা ৪, অপরচিতা ৩,
মহাজাতি সংঘ ৪,
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জীবনের জটিলতা ২, ধরাবাঁধা জীবন ১.৫০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
অনাথ আশ্রম ৩, হোমানল ১.৫০
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
বিভাবরা—৪.০০
শৈলেন মজুমদারের—ছায়ারূপ ৩,
ব্রহ্মাংশুশেখর ভট্টাচার্যের—উচ্চাকাঙ্ক্ষা ২,

আশালতা সিংহের
সহরের মোহ ২, জীবনধারা ২,
অন্তর্যামী ২.৫০, মহারাজ ৩,
বাস্তব ও কল্পনা ৩, সুরের উৎস ২,
বীরেন দাশের
আরো দূর পথ ৩, মেট্রোপলিস ২,
চাঁদ ও রাহু ২, কালপুরুষ (যন্ত্র) ২,
গোবর্তী দেবী সরস্বতীর
মুলার ধরণী ৩, সাব্বের প্রদীপ ২.৫০
চেউয়ের দোলা ৩, মাটির মায়া ২,

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের
চাকলাকর উপক্ৰাস

নতুন রাগিণী ২.৫০
সিগন্যাল (যন্ত্র)

ফাইন আর্টের ক্রাইম ও ডিটেক্টিভ, নভেল

রহস্যের মায়ারূপ ৩,	রহস্যের মায়াজাল ৩,	রহস্যের মায়াপুরী ৩,
অকৃত হত্যা ২,	হত্যাকারী কে? ২,	হত্যাকারীর সন্ধানে ২,
হত্যাকারীর কৌশল ২,	রাজমোহন (১ম) ২,	রাজমোহন (২য়) ২,

প্রকাশক—বি ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস ৬০, বিডন ষ্ট্রিট, কলিকাতা—৬

নরেন্দ্রনাথ সিংহ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৪.৫০
হরপ্রসাদ সিংহ বাংলা কাব্যে প্রাক রবীন্দ্র ৪.০০
শক্তিপদ রাধাকৃষ্ণ দিনগুলি মৌর রইল না ২.৫০
জদীমউদ্দিন ধানখেত ১.৭৫ বালুচর ১.৫০
প্রবোধ সরকার পারখাটের যাত্রী ২.৭৫
" যাবার বেলায় পিছু ডাকে ২.৫০
শিবরাম চক্রবর্তী

বাড়ী থেকে পালিয়ে ২.০০ মেয়েদের মন ২.৫০
মেয়ে ধরা জাঁদ ২.৫০ প্রেমের বিচিত্র গতি ৩.০০
কথা বলার বিপদ ১.২৫ আত্মীয়তা বজায় রাখা
সোজা নয় ১.২৫

জ্যোতির্ময় রায়

দৈনন্দিন ২.৫০ পদ্মনাভ ২.০০ তমসা ২.৫০

গৌরপ্রসাদ বসু সম্পাদিত

ডিটেক্টিভ গল্পের সম্বলন ২.৫০

হাসির গল্পের সম্বলন ২.০০

ভূতের গল্পের সম্বলন ২.৫০

প্রেমসঙ্গ মিত্রের

নতুন খবর ২.৫০ ময়দানবের জীপ ১.৫০

বাংলা ভাষায় রচিত বাস্তব পুস্তকের তালিকার জন্য লিখুন

দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম

২২/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা—৬

বিকলাঙ্গ যন্ত্রপাতি

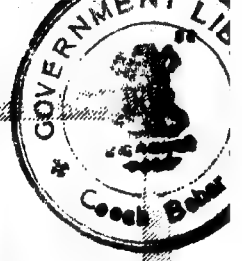


কৃত্রিম হস্ত, পদ,
কেলোপার, জ্যাকেট,
জুতা, গ্রোভেমি-
নাল বেণ্ট, হার্মি-
ট্রাশ ইত্যাদির জন্য
অভিজ্ঞ ও পারদর্শী
এবং বাজার
অপেক্ষা সুনিপুণ
প্রস্তুত প্রণালী ও
উত্তম ফিটিংস
যা বস্ত্রের বিক-
লাঙ্গের বস্ত্রের জন্য

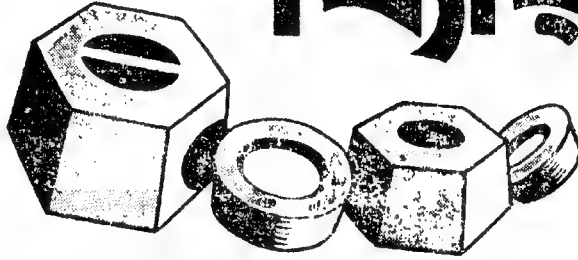
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

এম, সরকার এণ্ড কোং

৭২ নং মহাত্মা গান্ধী রোড, (হারিসন রোড) কলিকাতা



দ্বিতীয় পর্যায়



১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ও রাজ্য সমূহের কতকগুলি নির্ধারিত এলাকায় এবং নিয়ন্ত্রিত বাজারে মেট্রিক ওজন চালু করা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ পরিবর্তনের অল্প দুই বছর সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এই দুই বছর সময় ১৯৬০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর শেষ হবে। তারপর এই সব অঞ্চলে মেট্রিক ওজন ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে।

ওজন সংজ্ঞার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করা সম্পর্কে এবং সমগ্র দেশের অবশিষ্টাংশে মেট্রিক ওজনের ব্যবহার সম্প্রসারিত করা সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে। কেরালার সর্বত্র ইতিমধ্যেই মেট্রিক ওজন চালু করা হয়েছে। অন্ধ্রা প্রদেশ ও মিসৌরী মেট্রিক ওজন প্রবেশিত হবে।

মেট্রিক পদ্ধতিতে

পরিবর্তন করুন

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

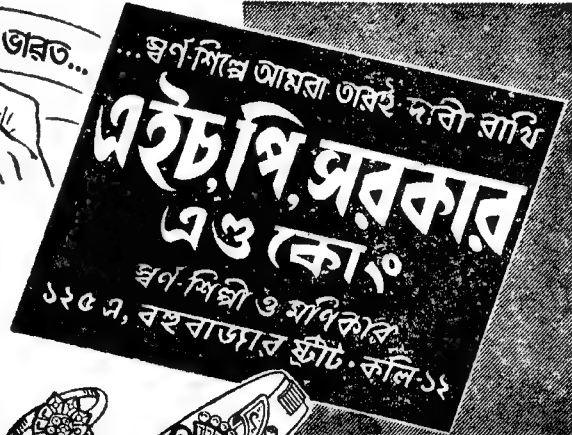


ইণ্ডিয়ান মিস্‌ গার্লস

কালঙ্ক স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা



যে গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী ভারত...



...স্বর্ণ-শিল্পে আমরা তারই দলী রাখি
**এইচ.পি. প্রবকার
এণ্ড কোং**
স্বর্ণ-শিল্পী ও মণিকার
১২৫ এ, বহুবাড়ার স্ট্রীট, কলি-১২

১৬২, বহুবাড়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গ্রাম- এইচপিএস • ফোন ৩৪-৪৮৪৮





ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਵਤੀ
੨੨ ਮਾਰਚ ੧੯੯੯

(ਕਲਾ)

ਸਾਹਿਬ
—ਸਰਸਵਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਵਤੀ

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নূতন উপন্যাস	জলপ্রপাত	১.৭৫
সত্যপ্রিয় বোয়ের নূতন উপন্যাস	গান্ধার্ব	৩.৫০
ধনঞ্জয় বৈরাগীর নূতন নাটক	রজনীগন্ধা	২.২৫



সত্ত প্রকাশিত (কার্তিক হইতে মাঘ পর্যন্ত) :

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস	রিক্শার গান ৫.০০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস	মানির ছেলে ২.৫০
দীপক চৌধুরীর নূতন উপন্যাস	নীলে সোনার বসতি ৩.৫০
'বনফুল'-এর নূতন উপন্যাস	ওরা সব পারে ২.৫০
প্রবোধকুমার সামালের নূতন উপন্যাস	ইস্পাতের ফলা ৩.৫০
শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের	লাবণ্যের এনার্টিম ৩.০০
ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের	অরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ৫.৫০
হিমালীশ গোস্বামীর	লগুনের পাড়ার পাড়ার ৩.০০
ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের	উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল ৩.০০
শ্রীখেলোয়াড়ের	ক্রিকেটের রাজকুমার ২.৫০

আমাদের পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার মতামতের কতকাংশ :

'বনফুল'-এর: জলতরঙ্গ (উপগ্রাস) ৪.০০

'বনফুল'-এর প্রতিটি উপগ্রাসই নতুন বিষয়ের ইঙ্গিত নিয়ে আসে। শুধু আঙ্গিকের প্রয়োগই নয়—তার প্রায় প্রত্যেকটি উপগ্রাসেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ণ কয়েকটি জীবন্ত চরিত্রের মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলা দেশের যে নিত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক লেখকের মধ্যে পাঁচটি উপগ্রাসিকের গুণ আছে, বনফুল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ** তাঁর ভাষাও অসাধারণ সুন্দর এবং প্রাজ্ঞ। *** আলোচ্য উপগ্রাসের কাহিনীটি কৌতুহলোদ্দীপক ** বনফুলের অন্ত্যস্ত উপগ্রাসের মতো এ উপগ্রাসটিও অত্যন্ত সুপাঠ্য। *** "

সঞ্জয় তট্টাচার্যের সৃষ্টি (উপগ্রাস) ৫.০০

... 'সৃষ্টি' উপগ্রাসটি এক্ষত্রে অশ্রিত একটি কাহিনী নয়। একটি পরিপূর্ণ চরিত্রকে খেকে দেখা। ফলে লেখক এখানে অবজ্ঞা হননি। উপগ্রাসটির সঙ্গে সহজে যার তুলনা দেওয়া যায়, তা' হলে চলন্ত রেলগাড়ির। স্থান ও কালের সীমানা বিদূর্ণ করে রেলগাড়ি এগিয়ে চলেছে, খোলা পানালয়, এরই মধ্যে ধরে রাখছে অনেক, অসংখ্য ছবি। তাই এই উপগ্রাসে এতগুলি হুম্মর 'এপিসড' দেখতে পাই। এর কোনটিই অপ্রয়োজনীয় নয়। আবার প্রত্যেকটিই নিজ মূল্যে মূল্যবান। 'মানিক-ময়না', 'পানু-শেফালী', 'পানু-তোতা' কিংবা 'দীপায়ন-হুর্ণা' এপিসডগুলি হ্রেমের এবং রামাটিক হ্রেমের অতি সুন্দর উদাহরণ। এগুলি মনে অনেককক্ষ ধরে একটি সুন্দর, ধীর আবেগের সঞ্চার করে রাখে। ভাষা-সম্পদ উপগ্রাসটির আর একটি অমূল্য বৈশিষ্ট্য। এমন বহু লিরিকাল ভাষা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু গীতধর্মিতা রক্ষা করতে গিয়ে কোথাও ভাষার জুতা এতটুকু ভেঙে পড়েনি। তাই বইটি হাতে নিয়ে আগাগোড়া শেষ না করে উঠতে ইচ্ছে হয় না, যদিও অনেক জায়গায় ভাবের গভীরতার অনন্য নমক ঝাঁড়তে হয়। এর মধ্যে অনিবার্ণভাবে এসেছে অসংখ্য ঘটনা, যেন নানা রঙের অসংখ্য ফুল। তাঁদের এক সৃষ্টির গাঁথা হয়নি। এক 'সঙ্কে' ড়ে করে এক অপূর্ণ বর্ণনাবোধ ঘটানো হয়েছে। এইখানেই অন্যান্য বাংলা উপগ্রাস থেকে 'সৃষ্টি' আলাদা। এবং এর মধ্যেই তাঁর সৌন্দর্য। "

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম : কালচার

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৬৪১



ধন-ঐশ্বর্য

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না

কিন্তু

আপনি ইচ্ছামত একটা সর্কুণ সম্পন্ন কেশতৈল
অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্বেদাচার্য্যকণ
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার
কেশতৈল নির্বাচন-সমস্তা সমাধানে সক্ষম।

ইহার কল্যাণ পরশে বাবতীর কেশরোম
নিরাময় ও মজ্জিত শীতল হয়। দীর্ঘদিন
নিরমিত ব্যবহারেই আশাহরণ
কম পাওয়া যায়।

ভেষজ বিশারদ মণেন্দ্র দাশ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

আয়ুর্বেদীয় হিমমিষ্ট সুরভিত কেশতৈল।

অন্যান্য প্রসারনী

● পামিকোকো
সুগন্ধিত নারিকেল তৈল

● হিমকল্যাণ
ক্যাক্টর অয়েল
সুগন্ধিত কেশতৈল

● ভূঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল

● যোজনগন্ধা সুরভি নির্ধ্যাস



হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ

কলিকাতা



৩৬শ বর্ষ—মাঘ, ১৩৬৬]

। স্থাপিত ১৩২২ ।

[দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা

“সংস্কৃতভাষার ‘শ্রদ্ধা’ কথাটি বুঝাইবার মত শব্দ অ’মাদের ভাষায় নাই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। ‘একাগ্রতা’ কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা কথার সমুদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় ‘একাগ্রনিষ্ঠা’ বলিলে সংস্কৃত শ্রদ্ধা কথাটির অনেকটা কাছাকাছি অর্থ হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্র মনে যে-কোন তত্ত্ব হউক না, ভাবিতে থাকিলে দেখিতে পাইবে, মনের গতি ক্রমেই একস্থের দিকে যাইতেছে বা সচ্চিদানন্দস্বরূপের অমৃতভূতির দিকে যাইতেছে। ভক্তি বা জ্ঞানশাস্ত্র উভয়েই ঐরূপ এক একটি নিষ্ঠা জীবনে আনিবার জন্ত মানুষকে বিশেষ-ভাবে উপদেশ করিয়াছে।

কঠোপনিষদের সেই মহাবাক্যটি মনে পড়িতেছে— ‘শ্রদ্ধা’ বা অদ্বৈত বিশ্বাস। নচিকেতার জীবনে শ্রদ্ধার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া বাইতে পারে।

এই ‘শ্রদ্ধা’ বা যথার্থ বিশ্বাস-তত্ত্ব প্রচার করাই আমার জীবনব্রত। আমি তোমাদিগকে আবার বলিতেছি যে, এই বিশ্বাস সমস্ত মানবজাতির জীবনের এবং সকল ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমতঃ, নিজের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হও।...সকলেরই আশা আছে, সকলেরই জন্ত মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই শীঘ্র বা বিলম্বে মায়াব বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। যদি সেই বিশ্বাস আমাদের ভিতরে আবির্ভূত হয়, তবে উহা আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাস ও অর্জুনের সময়—যে সময় আমাদের সমগ্র মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর মতবাদসমূহ প্রচারিত হইয়াছিল—আনয়ন করিবে।

জগতের যত কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সেই সকল উপনিষদের মধ্যে মনোরম কঠোপনিষদ পাঠ

করিয়াছ, তাঁহাদের সকলের অবস্থা স্বরণ আছে,—সেই রাজা এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল ভাল জিনিস দক্ষিণা না দিয়া অতি বৃদ্ধ, কার্যের অনুপযুক্ত সৌ দক্ষিণা দিতেছিলেন। ঐ উপনিষদে লিখিত আছে, সেই সময় তাঁহার পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে ঐশ্বর্য প্রবেশ করিল। এই ‘ঐশ্বর্য’ শব্দ আমি তোমাদের নিকট ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বলিব না ; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব শব্দের প্রকৃত তাৎপৰ্য বুঝা কঠিন ; এই শব্দের প্রভাব ও কার্য-কারিতা অতিশয় প্রবল। নচিকেতার হৃদয়ে ঐশ্বর্য উদয় হইবামাত্র কি ফল হইল, দেখ। ঐশ্বর্য উদয় হইবামাত্রই নচিকেতার মনে উদয় হইল, অনেকের মধ্যে প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম, আমি অধম কখনই নহি, আমিও কিছু কার্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে সমস্তার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যুতত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন, যমগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্তার মীমাংসার আর উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি যমসদনে গমন করিলেন। সেই নিভীক বালক নচিকেতা যমগৃহে তিন দিন অপেক্ষা করিলেন। তোমরা সকলেই জান, কিরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলেন।

আমাদের চাই এই ঐশ্বর্য। হুঁত্যাগ্রনামে ভারত হইতে ইহা প্রায় অন্তহিত হইয়াছে। তজ্জন্মই আমাদের এই উপস্থিত দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ—এই ঐশ্বর্য তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই ঐশ্বর্য তারতম্যই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হইবে। মদীয় আচার্যদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে বলাই হইবে, আর ইহা অতি সত্য কথা। এই ঐশ্বর্য তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্য জাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা এই ঐশ্বর্য ফলে। তাহারা তাহাদের শারীরিক বলে বিশ্বাসী। আর তোমরা যদি তোমাদের আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও, তাহা হইলে তাহার কল আরও অদ্বিত হইবে। তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের অধিগণ যাহা একবাক্যে প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত আত্মার বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই আত্মায়—বীহাকে কেহ নাশ করিতে পারে না,

অনন্ত শক্তি রহিয়াছে ; কেবল উহাকে উদ্ধৃত করিতে হইবে।—বীর হও, ঐশ্বর্যসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে।

অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্বরণ কর, তবে দেখিবে তোমরা সর্বদাই বুঝা অপরের নিকট সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু কখনও পাও নাই ; যাহা কিছু সাহায্য করিয়াছ, সবই আপনার ভিতর হইতে। তুমি নিজে পাইয়াছ, সবই আপনার ভিতর হইতে। তুমি নিজে পাইয়াছ, তাহাই ফলরূপে পাইয়াছ ; তথাপি কি আশ্চর্য, তুমি সর্বদাই অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ।—এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে ? সবই তোমার রহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি সম্রাটস্বরূপ, তুমি আবার কিসের আশা করিতেছ ?

আমি ইহা করিতে পারি বা ইহা করিতে পারি না, ইহাও কুসংস্কার। আমি সব করিতে পারি। বেদান্ত মানুষকে প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে বলেন। যেমন জগতের কোন কোন ধর্ম বলেন, যে ব্যক্তি আপনা হইতে পৃথক সত্ত্বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করে, সে নাস্তিক ; সেইরূপ বেদান্ত বলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক। তোমার আপন আত্মার মহিমায় বিশ্বাস-স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলেন।

মানুষে মানুষে প্রভেদ কেবল এই বিশ্বাসের সন্ধান ও অসন্ধান লইয়া, ইহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে। এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই সম্ভব হইবে। আমি নিজের জীবনে ইহা দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, আর যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে ; যে আপনাকে বিশ্বাস না করে, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছে, যে আপনাকে বিশ্বাস-স্থাপন না করে, সেই নাস্তিক। কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল এই ক্ষুদ্র ‘আমি’কে লইয়া নহে, কারণ বেদান্ত আবার একত্ববাদ শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ তোমরা সকলে ওত্থবরূপ।”

—স্বামী বিবেকানন্দের বাকী হইছে

সত্যের অন্বেষণ ও মানব কল্যাণ

নীলরতন ধর ও সুব্রত মিত্র

“চিরঞ্জয়েণ শাস্ত্রেণ সত্যান্তাঃ সিদ্ধিঃ সুখঃ

তত্ত্বঃ পূৰ্ণঃ অশাণ্ডঃ সত্যধর্মায় যুগে।”

হিব্রুয় পাশ্চাত্য ধারার সত্যের সুখ আনুত। হে জ্যোতির্ধর!

আমাদের সত্যদৃষ্টিভাৱের জন্ত সে আবরণ উন্মোচন কর।

ইতিহাসেব ঙ্গাচ্ছন্ন যুগে কোন সুদূর অতীতে আমাদের দেশের শাস্ত্র জ্ঞাপোবনে সত্যসন্ধানী স্বধির কঠে যে আকুল প্রাৰ্শনা ধনিত হয়েছিল, মনে হয় সেই সত্যদৃষ্টি লাভের ব্যাকুলতা ওয় একটি দেশকালের গভীরত্ব নহ, সে প্রাৰ্শনা যুগান্তিধারী। প্রতি যুগে প্রতি দেশে সত্যসন্ধানী মনুষ্য এই ব্যাকুল প্রাৰ্শনার নিজেকে উৎসর্গ করে ধস্ত হয়েছে। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে মহামনোবীর ইতিহাস সত্যসন্ধানের ইতিহাস। তাই প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও আগে সে এক অত্যাশ্চর্য ও অদ্ভুতপূর্ণ কাহিনী আমরা দেখেছি। অতুল ঐশ্বর্য, অগুণম সুখসম্পন্ন, সুন্দরী স্ত্রী, শিশু পুত্রের কোমল বাহুবল্লব—বা কিছু মানুষের কাম্য ও আকাঙ্ক্ষার ধন—সব আকর্ষণই তুচ্ছ করে, হেলার সে সবই পিছনে ফেলে রেখে ভিখারীর জর্জরবন ধারণ করে রাজার পুত্র সত্যসন্ধানের আকুল পিপাসার ঘরে ফিরছেন বনে বনে। চোখে তাঁর সত্যসন্ধানের তৃষ্ণা, একমাত্র উদ্দেশ্য সেই পরম বোধি লাভ করা, বার বার এই অধিক জীবনে মানুষ তার সকল পার্থিব ইীনতা, দৈন্ত, দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোকের পারে বেতে পায়। সাধারণ পুলিসলিন যে অসম্পন্ন জীবন, তারই দরদী আশ্রয়। এরই নাম গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের প্রাতঃহাত। সাধারণ মানুষের দুঃখশান্তির স্রত ধীর, তিনি সহজ সাধারণ ভাষাতেই সহজ মানুষের সহজসাধ্য পন্থা নির্দেশ করে গেলেন তাঁর অষ্টমার্গ পন্থা—সংচ্ছিত্তা, সদালাপ, সহপদেশ ইত্যাদি। যে বিরাট আশ্চর্য্যভাগের স্বাক্ষর তিনি ইতিহাসের পাতায় রেখে গেলেন, তারই প্রেরণার পরবর্তী যুগেও এ দেশে কত রাজা, মহারাজা পঞ্চাঙ্গ মানবকল্যাণে সর্বস্বত্যাগ করে আশ্চর্য্যসুর্গের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ইনিই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী; এই যুগই ভারতে সর্বাঙ্গিক উন্নত ও সুখসম্পন্ন।

এই সমসাময়িক কালেই নীতি ও সত্যধর্মের প্রচারক হিসাবে আমার চীনদেশে পেয়েছি কনফুসিয়াসকে।

কালের প্রবাহে আরও পাঁচশত বছর কেটে গেল। প্যালাটেইনে সাধারণ দরিদ্র ইহুদীদের মধ্যে সহজ ভাবার একটি নতুন নীতি ও ধর্মের বাণী শোনারার জন্ত দরিদ্র হুত্বেরের ঘরে আবির্ভাব হল বীত খৃষ্টের। আমাদের মতে এমন বুদ্ধিমান ও সংলোক পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনাবিহীন। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত সরল দরিদ্রের মধ্যে সত্য, নীতি ও ধর্মের বাণী গুরুত্বপূর্ণ বোঝাবার যে সহজ ও অভিনব পন্থা তাঁর ছিল, সেও অবিভীত। কিন্তু সত্যের সহজ পথ জগতে কুসুমাস্ত্রী নয়। তাঁর একনিষ্ঠ সত্যাহুসরণে আঘাত পেল ক্ষমতার আসনে আসীন ইহুদীদের বদসম্মত অধিকার। তাই যোমের সম্রাটের প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহারের অভিযোগে ক্রুদ্ধ হয়ে এদের হাতে তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে হল। সত্যসন্ধকের চরম পুরস্কারের প্রথম ইতিহাস ঘটনা কবলেন বীত। তাঁর বিচারক

ছিলেন রোমীয় শাসনকর্তা Pontine Pilate, তাঁকে এই সহজ সরল প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি নিজেই ইহুদীদের রাজা মনে করেন কিনা। একটিমাত্র উত্তরের প্রত্যাশা। বিনিময়ে হয় মুক্তা নয় মৃত্যু। কিন্তু সত্যসন্ধানী খৃষ্ট—সত্যধর্মের সাধনাই যে তাঁর স্রত। নির্ভীককণ্ঠে তাই সত্য উত্তরই তিনি দিয়েছিলেন—“আমার রাজত্ব ও আমার প্রভাব পৃথিবীর উর্দ্ধচ্যায়।” এই সত্যের কঠ বজ্রকঠিন যুক্তিতে চোপে ধরে পাটলেট ও ইহুদীরা সেদিন চরম পুরস্কারে এই কথার উত্তর দিয়েছিলেন। অশেষ যন্ত্রণায় ক্রুদ্ধবিশ্ব হয়ে মুক্তা হল বীতের। তাঁর বারজন স্রবোপা শিবা দেশে দেশে, প্যালাটেইনে, এশিয়া-মাইনর, গ্রীস, রোমে গুপ্তর অগ্নিগর্ভ সত্যের বাণী নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের ভাগ্যেও অল্পকণ পুরস্কার লাভ হল। কঠিন যন্ত্রণাদায়ক মুক্তা। সত্যাহুসরণে যে অসীম দুঃখভোগ ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন বীত ও তাঁর স্রবোপা শিবারা, সেই দৃষ্টান্তের বীজ হতেই অকুরিত হল খৃষ্টধর্মের সত্য, মৈত্রী, করুণা ও সহিষ্ণুতার বাণী। ইহুদীরা বীতের পার্থিব কঠই যোগ করতে পেরেছিলেন, এই বাণীর কঠ বোধ করা তাঁদের স্মরণ পরাহত ছিল। অগণিত ভক্তের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে নবযুগের সূচনা হল। ধর্মের জন্ত হেলার প্রাণবিসম্পন্নের এই অপূর্ণ প্রেমাণ আনল নতুন উদ্দীপনা। এরই প্রভাবে পরবর্তী যুগেও খৃষ্টধর্মাক্ষার জন্ত অগণিত প্রাণ যোমে, প্যারিসে ও অন্তর আপনাকে উৎসর্গ করে ধস্ত হল। আজো এই অসংখ্য নামগোত্রহীন ভক্তের স্মৃতিদেহের সমাধি (catacomb) ঐ সব সহরে দেখা যায়। আজ পৃথিবীর ২৮৮০ লক্ষ লোকের মধ্যে খৃষ্টধর্মাবলম্বী লোকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

মানবপ্রেমিক বুদ্ধ ও খৃষ্ট প্রবর্তিত এই কল্যাণকর সত্যধর্ম প্রচারের কলে পৃথিবীর বহু স্থানে প্রচলিত ঘৃণিত দাসপ্রথা লোপ পেতে সহায় হয়েছে। কেবলমাত্র ভাবান্বরণের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও মানুষের মানুষের অখণ্ড মৈত্রীবোধ কিংবা আসা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু পরিবর্তনশীল ইতিহাসের কাগজকে এই খৃষ্টধর্মে বহু পরিবর্তনের ধারা এসে মেশে। একদা যা ছিল সহজ মানবধর্ম, তারই শেষ পরিণাম হয় পুঞ্জিবাদী ধর্মের কেন্দ্ররূপে। পোপ মহাপুঞ্জিপালী হয়ে ওঠেন। রাজদণ্ডের উপরও তাঁর অসীম প্রভাব বিস্তৃত হয়। শুধু খৃষ্টধর্ম জগতের সর্বাধিনায়ককে তিনি তুণ্ড থাকতে পারেন না। তাঁরই অঙ্গুলি হেলেন চলে রাজ্য ভাঙাগড়ার ইতিহাস। রাজশক্তি তাঁর মুষ্টিগত। চার্চের এই অধঃপতনের কলে অনিবার্যরূপে দেখা দেয় বিদ্রোহ। বারা সমাজ বুদ্ধিজীবী বিচারশীল, তাঁদের বৈষ্য ভেঙে পড়ে। এই বিদ্রোহের পরিণাম Martin Luther কর্তৃক Protestant ধর্মের প্রতিষ্ঠা। এই লুথারই ইয়োহানেশ অধিকার যুগের অবসান করে Renaissance বা পুনরুজ্জীবনকাল প্রতিষ্ঠা করেন।

এই কালের আর এক যুগান্তকারী ঘটনা করাচী বিদ্রোহ। এর মূল ইচ্ছা ছিল সাধারণ মধ্য ও নিম্নবিত্ত নাগরিকদের উপর প্রবল পরাক্রান্ত শাসকগোষ্ঠীর নিষ্কোষ ও নিধন অত্যাচার। ক্ষমতার হাতে দুর্বলের শীড়ন। এরই

প্রতিক্রিয়ায় যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ যুগান্তকারী বিপ্লবের রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাকেই নাম করাসী বিদ্রোহ। দীর্ঘদিনের নিপেষিত বিদ্রোহী মাত্রই নৈমিত্তিক স্বাধীনতা, একতা ও আত্মশ্রমের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এই বিদ্রোহের পর নতুন সমাজ-ব্যবস্থা পড়ে উঠল প্রাচ্যের ভাষায় উপর। কেন্দ্রীয় শক্তিকে জনগণের হাতে এনে তাকে বিক্ষোভের রূপেই পথ নির্দেশ এইখানেই প্রথম সূচিত হয়। তাই সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে 'করাসী বিদ্রোহ' এক বিশেষ স্থান গ্রহণ করে আছে।

প্রায় এগার শ' বছর আগে আরব দেশেও সামান্যতমূলক ধর্মের প্রচার হয় এক এর বাণী নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ। সাম্যবাদের এই ধর্মের মূল। তাই এই মুসলিম ধর্মের লোকেরা পরস্পর সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে একতাবদ্ধ। হৃদয়ের বিশ্বাস, মুসলিম ও খৃষ্টান প্রভাবের ইতিহাস বহুক্ষণী সম্প্রদায়ের কাহিনী। বৌদ্ধধর্ম প্রভাবের ইতিহাস একরূপ নয়। এইসব ধর্মপ্রভাব মানবসমাজে সত্য, নীতি, ধর্ম ও শান্তির প্রভাব বহুল বুদ্ধি পেতেছে। পরবর্তী যুগেও আদিভাব হয়েছে বহু যুগ-মানবের—বীরা এইসব ধর্মই কিছু পরিবর্তন করে প্রচার করে গেছেন।

গুণাচারী মানুষের আদর্শ জীবনযাত্রা হতে শুরু করে বিশ-শতাব্দীর মধ্যভাগের আত্মকর্তা পৃথিবীর জীবনযাত্রা পর্যন্ত বিস্তারিত করলে বিবর্তনশীল মানবজাতির যে অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় তার মূল কথা তখন এই যে, প্রের হতে প্রেরতর পথে যাত্রা করে জগৎলাভ! সমাজের পক্ষে এই জের শুধুই আধ্যাত্মিকতা নয়, ভগ্ন ঐহিক ভোগভুক্তাও নয়। সংসারে ব্যবহারিক জীবনে ঐ ছুইয়েরই প্রয়োজন। যতদূর বলাছিলেন Men can not live upon bread alone. কিন্তু এই Breadকে বাদ দিয়েও মানুষ বাস্তবিক জীবন বাপন করতে পারে না। বুদ্ধির হাফাকার বৃদ্ধি নিয়ে ঐহিক সুখ-বঞ্চিত মানুষের পক্ষে উচ্চাধর্ম পালন করা অসম্ভব! ভারতবর্ষে অল্পকি এক কথা হয়েছে। এই অল্প গ্রহণ করে মানুষ তার লুপ্ত জীবনীশক্তি ফিরে পায়। বুদ্ধিবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে সর্বস্বত্বাঙ্গের কথা তার আত্মপ্রকাশের কথামাত্র। যে ভোগই করে নি, সে ভোগের মহিমা কতটুকু বোঝে? তাই আপামর সাধারণ মানুষের প্রথম প্রয়োজন একটি সুস্থ জাতাবিক স্থানের জীবনের মান। এই যুগের কর্মবোহী স্বামী বিবেকানন্দ এইজ, বলেছিলেন—“So long a single dog in my country remains without food, my whole religion will be to feed it.” তাই সাধারণ মানুষের জীবনের আদর্শ ভোগ ও ভোগের সমন্বয়। কিন্তু মহাপুরুষের বাণী পারমার্থিক স্রব্ধের সন্ধান দিলেও, ঐহিক জীবন সম্পদ নির্দেশ তাঁরা তেমন দিতে পারেন নাই। বিজ্ঞান ও কলিত বিজ্ঞানের চর্চার পথেই মানুষ এই সমৃদ্ধির সন্ধান পেয়েছে।

এইখানে একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে লক্ষ্যীয় ও চিন্তনীয়। মানবকণ্ঠে নিজেকে উৎসর্গ করে ধর্মতত্ত্বের জীবনে যে একান্ত সাধনা, সত্যনিষ্ঠ ও আত্মত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়, বীরা বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবার দ্বারা মানুষের হৃদয়ে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেন, সেই সব বিজ্ঞান-সেবকের জীবনেও পরহিতার্থে ধর্মতত্ত্ব

মত আত্মদান, কঠোর সহিষ্ণুতা, অব্যবসায় ও সর্বদা বিনিময়েরও একান্তভাবে সত্যাত্মসংগে থাকার আছে।

বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবরণ করলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দী হতে ১০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিজ্ঞানের ও কলিত বিজ্ঞানের প্রভুত উন্নতি হয়েছিল। গ্রীসে যখন এ্যারিস্টটল ও ডিমোক্রিটাসের অক্সুদর, তখন আমরা ভারতে পেয়েছি কণারকে ও কপিলকে। ২য় খৃষ্টাব্দে জীবক ও ৭৫০ অব্দে নাগার্জুনের নামও বিশেষ স্মরণীয়। কিন্তু তারপর মুসলমান বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত ভারত তার স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দেয়। তার স্বাধীন চিন্তাধারা লোপ পায়। কলে বিজ্ঞানসেবা, দেশের কৃষ্টি, কর্মকুশলতা লোপ পায়। কিন্তু ইয়োরাপীয় দেশসমূহে এ্যারিস্টটল প্রবৃত্তি চিন্তানায়কগণ যে বিজ্ঞানসেবার সূত্রপাত করেন, তার দ্বারা বসাবার অব্যাহত ছিল। এ্যারিস্টটলের গুরু প্রোটো সর্বপ্রথম তাঁর গ্রীক এ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বাধীন চিন্তাধারায় প্রবর্তন করেন। কিন্তু প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ ও বিবরণ করে, প্রত্যক্ষ হতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, তার প্রবর্তক এ্যারিস্টটল ও তাঁর উপযুক্ত শিষ্যরা। দূর্ভাগ্যক্রমে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের পর এই কষ্টসাধ্য ও দুঃসহ প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষণের গতি মন্থর ভাবে চলছিল। চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকের পূর্বে ইয়োরাপীয় এবং পশ্চিম-এশিয়াতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে এবং চিন্তার চর্চা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। পশ্চিম এশিয়া এবং ইজিপ্টে আরব সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া এবং ইয়োরাপীর অধিকাংশ মঙ্গোলীয় দাসনাধীন হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতের মত ইয়োরাপীয়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। এবং এই প্রভাবের একটি সুফলও পরিলক্ষিত হয়। কারণ আরবী পণ্ডিতদের সম্পর্কে আগার পর হতে ইয়োরাপীয়ে সর্বত্রই জ্ঞানভুক্তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইটালিতে সূচিত Renaissance বা পুনরুজ্জীবন যুগ হতে সারা ইয়োরাপীয়ে জ্ঞানচর্চা ছাড়িয়ে পড়ে। এই যুগে যে সকল মহামনীষী যুগান্তকারী দৃষ্টি ও কাজের সূত্রপাত করেন, তারই কলে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছে। ইয়োরাপীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ প্যারিস, অক্সফোর্ড ও বোলোনা Bolognaএর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তার চর্চা ও গবেষণা পুনঃ প্রচলিত হয়। এই প্রসঙ্গে Peter Abelaras (১০৭১—১১৪২); Albertus Magnus (১১৯০—১২৮০), Thomas Aquinas (১২২৫—১২৭৪), Dum Scotus (১২০০—১২৮০); Occam (১২৭৪—১৩৪৮), প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে Roger Baconএর নামই যুগপুরুষরূপে প্রধান। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকের আগাগোড়াই পদার্থের গবেষণামূলক প্রত্যক্ষ ও নিরীক্ষণের উপর ভিত্তি করে নব নব জ্ঞান আবিষ্কারের চর্চা অব্যাহত বৈধতে পাই। যদিও বিশেষ কোনো যুগলাবধি ও সংঘর্ষ প্রচেষ্টার কোনো পরিচয় এই ক্ষেত্রে নাই। পরে আরো চিন্তাশীল বুদ্ধিবাদীর আবির্ভাব ঘটে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির সূত্রপাত হয়। ফ্লোরেন্সের Leonardo da Vinci (১৪৫২—১৫১৯), পোল্যান্ডের কোপারনিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩), ডেনমার্কের Tycho

Brahe (১৫৪৬—১৬০১), জার্মানীয় Kepler (১৫৭১—১৬৩০), ইটালীয় গ্যালিলিও (১৫৬৪—১৬৪২), ইংল্যান্ডের Gilbert (১৫৪০—১৬০৩), এবং Newton (১৬৪২—১৭২৭) প্রকৃতির নাম বিজ্ঞানের জয়যাত্রার অক্ষর হয়ে আছে। এই সময় Francis Bacon (Lord Verulam) (১৫৬১—১৬২৫), New Atlantics রচনা করে পথ-প্রদর্শক না হলেও বিজ্ঞানের বিশেষ ধুবঙ্করূপে পরিচিত হন। এই গ্রন্থে তিনি জ্ঞানের চর্চার জন্য একটি বিজ্ঞানমন্দির পরিকল্পনা করেন। এখানে সর্বোচ্চ মানের যোগ্যতার জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইয়োরোপে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। Paracelsus, Bacon, Boyle প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার বিশেষ অগ্রসর হয়। প্রত্যেক হতে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার অভ্যাস বা শিক্ষা ইয়োরোপীয়দের ছিল বলে তারা প্রকৃতিকে জয় করতে পেরেছেন। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনেও তাঁদের এই নিষ্ঠা ও সত্যদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এরই অভাবে ৮ম শতাব্দীর পর হতে ভারতে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী মন আর অধিক অগ্রসর হতে পারে নাই।

মামুষের দুঃখদারিত্ব মোচনের জন্য প্রকৃতির অবগুণ্ঠন খুলে ধরে তাঁর প্রেমরূপ ফাল্গুনীর বে পাখে বিজ্ঞানী মামুষ চিরদিন সাধনা করতে চেয়েছে, সেই পথ আরামের কুসুমকোমল নয়। বৈধা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সচ্ছিত্তা, কঠোর শ্রম ও সত্যদৃষ্টির সহায়েই সে পাখে সিদ্ধান্তের আশা করা যেতে পারে। লোকচক্ষুর অস্তরালে নীরবে নিভৃত বনে বাগা একান্তঃ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আত্মত্যাগের পাখে সাধনা করে গেছেন, তাঁরাই দুঃখদারিত্বাঞ্জিত মামুষকে দিতে পেরেছেন যোগে সুখ, শোকে শান্তি, অভাবে, অনটনে তৃপ্তির আনন্দ। মানবকল্যাণের ইতিহাসে এইসব বিজ্ঞানসাধকের অবদান অসামান্য।

বিখ্যাত জার্মান রাসায়নিক Paracelsus বলেছিলেন—“Experimentors do not go idly about in gorgeous suits of satin, silk and phesh, with gold ring on their fingers, silver dagger at their sides, and white gloves on their hands, but, they tend patiently to their work at the fire day and night.”

অবর ফরাসী রাসায়নিক A. L. Lavoisier যিনি ফরাসী বিপ্লবের সময় গিলোটিনে প্রাণ দিয়েছিলেন, তিনি যুগ্মর কয়েকদিন আগে লিখেছিলেন—“We will close this memoir with a consoling reflection. It is not required in order to merit well of humanity and to pay tribute to one's country, that one should participate in brilliant public functions that relate to the organisation and regeneration of empires. The scientist in the seclusion of his laboratory and study, may also perform patriotic functions. He can hope, by his

labours to diminish the mass of ills that afflict the humanity and to improve its enjoyments and happiness; and should he, by the new paths which he has opened has helped to prolong the average life of man by several years or even by several days, he can then aspire to the glorious title of benefactor of humanity.”

আজ বিশ্বসভায় ইয়োরোপের বে স্থান, তার মূলে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের অবদান অবশ্য স্বীকার্য। এঁদেরই সার্থক কৃতিত্বের জন্য পাশ্চাত্যবাদিগণ ব্যবহারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অগ্রাধিকারের যোগ্য। তাঁদের কাছে বিজ্ঞানের গবেষণাগার মন্দিরতুল্য এবং বিজ্ঞানের বৌদ্ধিমূলে আত্মনিয়োগ সাধনা। এই মূর্ত্তে Palissy, Black, Scheele, Priestly, Newton, Canendist, Davy, Faraday, Pasteur, Ross, Koch, Lister প্রকৃতি বিশেষ সন্ময়ী। এঁদেরই অকান্ত একনিষ্ঠতা ও আত্মদানে ইয়োরোপে বিজ্ঞান ও কলিত বিজ্ঞানের চর্চা এত অগ্রসর। এবং ইয়োরোপবাসী এত সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তবযুখীন চিন্তাধারায়ুক্ত। প্রকৃতিকে জয় করে ব্যবহারিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করে এরা আলাদাধনের আশ্চর্য প্রদীপের সন্ধান পেয়েছেন। বার কলে মণিময় ভাণ্ডারের মত প্রকৃতির অতুল সম্পদ তাঁদের করারত। ইয়োরোপকে সুখসমৃদ্ধি সম্পন্ন করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে তাঁরা বসাতে পেরেছেন।

বাঁদের সাধনায় বর্তমান ইয়োরোপের বহুবাহিত জীবনযাত্রাপালন সম্ভব হয়েছে, সেইসব যুগপুঙ্কবকল্প বিজ্ঞানসেবকের কঠোর শ্রম ও সচ্ছিত্তা, বৈধা ও নিষ্ঠা, এবং চরম আত্মদানের বিনিময়ে সত্যাত্ম-সরণের কাহিনী, গ্যালিলিও হতে ম্যাডাম কুরী পর্যন্ত তাঁদের জীবনকথা, গমের মতই মনোরম ও আশ্চর্যকর। ব্যক্তিগত জীবনের সর্বকাম্য সুখসন্ধান, অর্থতৃষ্ণা, সবকিছুই তুচ্ছ করে পরম সত্যনিষ্ঠার পাখে অশেষ দুঃখবরণ করে এঁরা বিজ্ঞানসাধনা করে গেছেন। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সব কিছু ছেড়ে এঁরা মামুষকে দিতে চেয়েছেন সব কিছু পাবার প্রতিক্ষিত। নীরবে নিভৃত বনে একাগ্রসাধনায় এঁরা রচনা করতে চেয়েছেন সেই সোনার সিঁড়ি, বার বাপে বাপে সাধারণ মামুষ যদি এগিয়ে যায়, তবে সে দুহাত ভরে কুড়িয়ে পাবে ঐহিক শ্রী ও সম্পদলাভের অজস্র সম্ভাবনার পরশপাখর।

অসংখ্য সেবকের অসংখ্য জীবনকথায় এঁদের অসামান্য নিষ্ঠা, ত্যাগ, দুঃখবরণ ও কঠোর শ্রমস্বীকারের পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্টদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক Scheele এক ঔষধবিক্রেতার দোকানে সামান্য কাছ করে, কর্মের দারিদ্র্যের মধ্যে একাগ্রমনে জীবন সময়ের রসাতলনের গবেষণা করতেন। নিজের জীবনের চরম দুঃখ দুর্দশা হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়ে তিনি বেখে গেছেন তাঁর অমূল্য সাধনার ফলাফল।

ইংরাজ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফারাডে ধীর যুগান্তকারী প্রতিভার দানে বর্তমান বৈজ্ঞাতিক যুগের প্রবর্তন, দারিদ্র্যের কশাঘাতে কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ পর্যন্ত পান নাই। পুরান কই

বাণেশ্বর লোকের সামাজ্য বেতনে অতি সামান্য কাজে নিযুক্ত থেকে তিনি অবসর সময়ে অধ্যয়ন করতেন। তাঁর এই অপূর্ণ নিষ্ঠা লণ্ডনের Royal Institution এর Sir Humphry Davyর দৃষ্টিগোচর হইল। সেদিন তাঁর জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। কীরণ, এইই সত্যতায় তিনি গবেষণাগারে চাকুরী পেয়ে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে অসামান্য গবেষণা করার সুযোগ পান। তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য পুরস্কার তিনি লাভ করেছিলেন যখন Davyর মৃত্যুর পর তাঁকে Royal Institution এর কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা ৪০০০ টাকা মাসিক বেতনের শ্রমিককে Faradayকে তাঁদের ব্যবসারে যোগ দিতে ডেকেছিলেন। কিন্তু অর্থের প্রলোভনে সত্যসেবক সত্যাত্মস্বাক্ষরের পথ পরিত্যাগ করেন নাই।

ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সর্বজনস্বীকৃত ও সর্ববর্ণেরা স্বীকৃত হলেন Louis Pasteur লুই পাস্তুর। তিনি জলাতঙ্ক রোগের কারণের আবিষ্কারী। রোগের নিদানরূপে জীবাণুর অস্তিত্বের তিনি প্রথম ঘোষণাকারী। রোগ নির্ণয়ের দ্বারা মানুষের ক্লেশহরণের পথের সন্ধান দান করে ইনি ফ্রান্সের এক শুভ ফ্রান্সের নয়, সারা বিশ্বের সর্বমুখ্য হয়ে আছেন। ১১১৪—১১১৮ সালে যখন ফ্রান্সের চরম দুর্ভিক্ষের কাল—একদিকে সীমান্ত অবরোধ করে জার্মান জাতি বহুদূর অগ্রসর, প্যারিস সহর বোমাবিধ্বস্ত, সেই সময় Petis Parisien (ছোট প্যারিসবাসী) নামক এক সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রাণত্যাগের কাছে একটি প্রাণ নিবেদন করে উত্তর প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা এই—ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ জন কে? এই ছোট সহজ প্রার্থনা একটি অত্যন্ত উত্তর বহন করে এনেছিল—ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন দরিদ্র বিজ্ঞানবীর লুই পাস্তুর। দ্বিতীয়—Le Miserable-এর লেখক Victor Hugo-কে প্রকৃত মানবকল্যাণকারী এবং অগণিত দেশবাসীর মনে কার জন্ম অক্ষর আসন পাতা—এই উত্তর তারই দিগদর্শন।

এই পুণ্ড্রে দুই মনোবীর কথা উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশিষ্ট জৈব রাসায়নিকবিদ অধ্যাপক Emil Fischer যখন বাসিন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হন এবং অধ্যাপক W. H. Perkin (Junior) কে যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্ত আমন্ত্রণ জানান হয়, তখন তাঁরা এই সঠিকোক্তি করেছিলেন যে, তাঁদের গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করার অর্থও অবসর দিতে হবে। কোনরকম কমিটি মিটিং ইত্যাদিতে তাঁরা যোগ দিতে পারবেন না। সকলেই জানেন যে Emil Fischer Phenylhydrotine এর সাহায্যে তাঁর গবেষণায় গবেষণা করেছিলেন এবং এইই ধীরগতি বিবিক্রমের ১৯১১ সালে তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

অগণ্যবিখ্যাত মাদাম কুরীর সাধনা ও আত্মত্যাগের কাহিনী অমর হয়ে আছে। শেষ জীবনে তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল। যদিও স্যারিসের বিখ্যাত ডাক্তাররা সদাই তাঁর জন্ত সতর্ক ও উদগ্রীব থাকতেন। পরে যোকা যায় যে, যে Radium ও অক্সিজেন শক্তি দিয়ে তাঁর গবেষণা ছিল, তারই বিবিক্রমের তাঁর এই অসুস্থতা।

মাদাম কুরীর ছোট্টা কন্যা ও ভ্রাতৃত্বা Irene Curie এবং অধ্যাপক Joliot Curie ও আণবিক রশ্মির উপর গবেষণার রত

হয়ে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্য বিষয়ে কতিপ্লত হন। তাঁদের অকালমৃত্যু হয়।

১৯১৩ সালে লণ্ডনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে (University College) Sir William Ramsay অধ্যাপক পদ হতে অবসর গ্রহণ করলে এই পদে প্রথম Sir James Walkerকে আহ্বান জানান হয় কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করলে, অধ্যাপক F. G. Donnan এই পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু চাকুরী গ্রহণ করে Donnan লণ্ডনে এসে দেখলেন যে তাঁর উপর পরিচালনার নানাকর কর্তৃত্বভার দেওয়া আছে এবং বহু মিটিং-এ তাঁকে যোগ দিতে হবে। তিনি নিজের গবেষণার ব্যাখ্যা আশঙ্কা করে তাঁর নিজের পুরান পদে Liverpool এ পালিয়ে আসেন। এরপর সমস্ত কর্তব্য যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দিয়ে বিশেষ অনুবোধ ও উপবোধ করে তবেই তাঁকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

ভারতে ও প্রাচ্যে বিজ্ঞানের সেবার এতটা নিষ্ঠা, সত্যতা ও অমরীকার দেখা যায় নাই। এইজন্য তারা বিজ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনেও প্রয়োগ করতে অক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতির অসুখাশুখাগার নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিক্ষেত্র পাশ্চাত্যের মত রূপাদৃষ্টি প্রসারিত করেন নাই। বিশেষতঃ দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ বার বার বিদেশী বহিঃশক্তির আক্রমণে স্বাধীনতা হারাতে হারাতে মনে, প্রাণে, চিন্তায়, কর্মেও যেন দাঁসধ বরণ করে নিয়েছিল।

ভারতবর্ষে আধুনিককালে বিজ্ঞানের সেবার বীরা দেশমাতৃকার গৌরববৃদ্ধি করেছেন, তাঁদের মধ্যে স্রাব ভগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ও স্রাব সি, ডি, রমণ, রামমুখ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাদশীট এই রচনা করেছেন। বিখ্যাত শিল্পপতি জামসেদজী টাটার অকুণ্ঠ বাকস্বত্বায় বাণিজ্যালোচকের ভারতীয় বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান (Indian Institute of Science) প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্রাব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞানের একান্ত আরাধনার উৎসাহ দেশের যুবকযুবতীদের একত্রিত করে বিজ্ঞানচর্চার সুবিধানের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে Sheila Dhar Institute of Soil Science প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এই যে, গবেষণাগারে আবিষ্কৃত নব নব পদ্ধতির সহায়ে জমির উর্বরতাবৃদ্ধি ও খাদ্যসম্রা দ্রব করার প্রচেষ্টা করা। নিয়ম বহুক্ষণ দেশে একমুষ্টি ক্ষুধার নিশ্চিত অন্ন সংস্থান করে অগণিত ঋষ্ট দায়িত্বানার্যণের সেবা করা।

মানবজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অমর বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের একটি স্মরণীয় উক্তি উল্লেখ করে এ আলোচনার সমাপ্তি করতে চাই। তিনি মানুষের জীবনের তিনটি প্রধান স্তরে তিনটি আত্মজিজ্ঞাসা রেখে গেছেন। তিনি বলেছিলেন—প্রথম বছর বয়সে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা হওয়া উচিত এই যে, সে কতদূর মনকে প্রসারিত করে নিজেকে বিস্তৃত করতে পেরেছে। পঞ্চাশ বছর বয়সে জীবনমধ্যাহ্নে তার প্রশ্ন হওয়া উচিত—দেশের কতখানি সেবা তিনি করতে সক্ষম হয়েছেন। সত্তরবছর বয়সে জীবনের আগল সন্ধ্যায় তার এই আত্মচিন্তা আসা উচিত যে, মানবসেবার তিনি কতখানি নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছেন।

গীতা পাঠের রীতি

(আলোচনা)

শ্রীমুরেশমোহন ভট্টাচার্য



গীতা জ্ঞান সাধার্য 'মাসিক বহুমতী'তে প্রকাশিত (পৃ: ৫৬৬-৫৬৭) "গীতা পাঠের রীতি" বিষয়ক প্রবন্ধটি আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পাঠ করিতে গেলাম; কিন্তু আগ্রহ স্তিমিত এবং আনন্দ বিবাদের কপালধ্বজিত হইল। 'বিবাদ' হলেও ক্ষতি ছিল না, যদি সেটা আগে হতো এবং পরে আনন্দ দেখা দিত; কিন্তু এ আগাগোড়াই বিবাদে ভরা এবং বলতে পারা যায় কেমন যেন একটু বিবাদও :-

গল্প-উপন্যাসের কথা না হয় বাইরে দিলাম; কিন্তু ধর্মবিষয়ক কোন কিছু রচনা মাসিক বহুমতীর মত বহুল প্রচারিত একখানি পত্রিকার প্রকাশ করিবার পূর্বে লেখকের ভাষা উচিত ছিল যে, ইহা সর্বজনপাঠ্য পত্রিকা এবং এমন কি, বললে অতুক্তি হয় না যে, ইহা সর্বসাধারণেরই পত্রিকা। গল্প-উপন্যাসাদির যা ধারা এখন বর্তমান তা প্রকাশ করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে পত্রিকা-সম্পাদকের কাছে, এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও; নতুবা পত্রিকা চালানাই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। গল্প-উপন্যাসে অনেক কিছুই ভুল থাকতে পারে, অনেক কিছুই ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা ধর্মীয় নহে। কিন্তু অন্ত্যস্ত বিষয়ে বিশেষ করে শ্রীশ্রীগীতার মত একখানি ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা কালে কোন কিছু ভুল-ত্রুটি থাকলে তাহা যে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, জনসাধারণকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে—এ জ্ঞান লেখকের থাকা উচিত। তাঁর বক্তব্য যদি সম্যক পার্কৃষ্ট না হয়—তাঁর বক্তব্য যদি মধ্যপন্থ হতেই ভিন্নপন্থ অবলম্বন করে এবং তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তবে "সর্বসাধারণের জ্ঞান" তা ব্যক্ত না করে অব্যক্তই রাখা উচিত ছিল।

লেখকের প্রধান বক্তব্য ছিল 'গীতা পাঠের রীতি' সম্বন্ধে এবং রীতি-অর্থে তিনি ধরেছেন অভ্যাস; এই হিসাবে তিনি শ্রোকের পর শ্রোকে তুলে দেখিয়েছেন কেমন করে গীতা পাঠ অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু এর যে অস্ত্র আরও একটা দিক আছে সে, সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। সে কথা পরে বলছি।

গীতাপাঠ কেমন করে অভ্যাস করতে হবে, তা দেখাতে গিয়ে বৃষ্টিজ বরুণ তিনি পর পর শ্রোকে তুলেছেন—২৪৭, ৩২৭, ৫৮১, ১৩২১, ১৮৫১; পুনরায় ১৩২১-২৩, পুনরায় আরও পঞ্চাদশসংখ্য করেছেন—৬২১-৩০, ১১১৭, ১১৫ ইত্যাদি অর্থাৎ নিজের সুবিধামত শ্রোকেগুলি সাজিয়ে এইভাবে যে গীতাপাঠ করতে হয় বা বৃষ্টিতে হয়, ইহাই বোধ হয় প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি আশ্চর্যও বলেছেন "গীতা সমগ্রভাবে পাঠ করা উচিত";—অর্থাৎ? গীতা যে পাঠ করে সে কি সমগ্রভাবে পাঠ করে না? অথবা তিনি কি এই বলতে চান যে, গীতা আগে সমগ্রভাবে পাঠ করে তারপর বুঝে খাণছাড়া এই-সমগ্রভাবে পড়তে হবে।

তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য হলো—"জ্ঞান বেরূপ বেরূপ উন্নত হইবে, শিক্ষাও সেই মত হইবে।" কিন্তু ঠিক কি তাই?—জ্ঞানের চেয়ে শিক্ষা কি বড়?—সাঁতার সম্বন্ধে উন্নত ধরণের জ্ঞানলাভ করে, তারপর সাঁতারকাটা শিক্ষিত হবে।—না, জলে নেমে সাঁতারকাটা শিক্ষা করতে কংঠে তবুই না সাঁতার সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞানলাভ হবে? সজ্ঞান যেদিন ভূমিষ্ঠ হয় সেদিন থেকেই কি সে জ্ঞানলাভ করে? "অমুক" আমার মা, "অমুক" আমার বাবা—না ক্রমশ: শিক্ষালাভের পর সে বুঝতে পারে যে, "অমুক" তাঁর মা, "অমুক" তাঁর বাবা।—অবশ্য গভীরস্থায় জ্ঞানলাভ করে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মাত্র একজন মহাপুরুষ এবং সেজন্য জ্ঞানলাভ হয়েছিল বলেই তিনি ভূমিষ্ঠ হবামাত্র সূর্য্যর থেকে ছুটে পালাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা এখন বাক্য।

জ্ঞান থেকে শিক্ষা নয়—শিক্ষা থেকেই জ্ঞানলাভ হয়। জ্ঞানলাভ যার ঘটেছে তাঁর আবার শিক্ষার কি প্রয়োজন? জ্ঞান থাকে বলে?—"সংশয়"ই হলো অজ্ঞানতা, আর সংশয় থেকে মুক্ত যিনি তিনিই হলেন জ্ঞানী। স্মৃতরাং সংশয়মুক্ত ব্যক্তির জীবনে আবার শিক্ষালাভের কি প্রয়োজন?

অর্জুনের মন নানা সংশয়ে সংশয়গণ ছিল বলেই নানা প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে এবং সে-সকল প্রশ্নের স্বাধাধ উত্তর প্রদানকালে স্বয়ং ভগবান যে সব হিতবাণী শোনালেন, তাতেই অর্জুনের জ্ঞান-চক্ষুক্ষিপ্ত হইলো অর্থাৎ অর্জুনের সকল সংশয় দূরীভূত হলো।

যদিও অর্জুনের আমাদের চির-নম্র, তথাপি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অর্জুনের শিক্ষা-নীতি এমন কিছু উন্নত ধরণের ছিল না—যাতে তাঁর চির-সঙ্গী হলেন সখা শ্রীকৃষ্ণকে সম্যকরূপে অবগত হতে পারতেন। তাঁই অর্জুনের তথা লোক-শিক্ষার জন্যই শ্রীশ্রীগীতার হিতবাণীর প্রয়োজন হয়েছিল অত্যাবশ্যিক। এবং সেই শিক্ষালাভের ফলেই অর্জুনের অন্তরে অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ধীরে ধীরে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল এবং পরে এক সময়ে তাঁর সেই অজ্ঞানতা-জনিত দোষ স্বীকার করে চম্বিত এবং লজ্জিত অর্জুনের বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে:

"হেন বিধরূপ অর মধিমা অপার

প্রমাণ বা প্রীতিবলে না ভানিয়া যায়,

"হে কৃষ্ণ, বাচন সখে", বলি এত মত

সখা ভাবি তিরস্বার করিয়াছি কত।

আনন্দে অচ্যুত, হবে থাকিতে শরনে

অথবা উপবেশনে বিহার ভোক্তনে

সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে পরিহাস করি

কত অপরাধ পদে করিয়াছি হ'য়।

অচিন্ত্য যে তুমি।" আশ্চর্য্য ভাব পাশে

নিভান্ত অজ্ঞান আমি। অম্বা কর লাসে।"

(সুধাকরী গীতা, -১১-৪১৩২৭)

যাক। লেখকের তৃতীয় বক্তব্য বা আসল উদ্দেশ্য রয়েছে তৃতীয় বন্ধুর মধ্যে। কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য কতখানি সফলমণ্ডিত হয়েছে, তা 'সর্বসাধারণত' বিচার করবেন। তৃতীয় বন্ধুর মধ্যে লিখিত হয়েছে—'উপরোক্ত বাঙ্গালা ছন্দ লেখকের 'ছন্দে গীতা' হইতে উদ্ধৃত করা হইল—মূল সংস্কৃত দুই লাইনে, ছন্দে গীতায় লেখক বহুদূর সম্ভব দুই লাইনে অতি সহজ ভাষায় ও শুদ্ধ বা সঠিক অর্থে সর্বসাধারণের ভিত্তি অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।—'

চেষ্টা না করলেই ভাল করতেন! কেননা, ট্রেনের বা ট্রামেরই উল্লেখ দুই 'লাইন' আছে—মূল সংস্কৃতেরও। তাহলে পাঁড়াল কি?—ছেলেবেলায় পড়েছিলই যদি $A=B=C$ হয়, তবে $C=A$ হবে; অর্থাৎ এই কয়লাটি যদি এখানে প্রয়োগ করি, তাহলে অর্থ পাঁড়ায় এই যে: ট্রেনের দুই লাইন—ট্রামের দুই লাইন—মূল সংস্কৃতের দুই লাইন; সুতরাং মূল সংস্কৃত—ট্রেন।—

কিন্তু ঠিক কি তাই?—সর্বসাধারণ কি এতই বোকা যে ট্রেন আর সংস্কৃতকে একাকার করে ফেলবে?—

পরের কথা হলো: "অতি সহজ ভাষায় ও শুদ্ধ বা সঠিক অর্থে"—ইত্যাদি।

তার নমুনা:—

'সর্বধর্ম ছাড়ি, এক যে আমি সেই আমাকে আশ্রয় ধরি,

চিন্তা কি আর, কর্ণবন্ধন হইতে আমিই যে মুক্ত করি।"—১৮৮৬

এখন এই অনুবাদটি গড়ে রূপান্তরিত করলে কি পাঁড়ায় দেখা যাক:—(হে অর্জুন!) চিন্তা কি আর, কর্ণবন্ধন হইতে আমিই যে মুক্ত করি। (সুতরাং) সর্বধর্ম ছাড়িয়া, এক যে আমি সেই আমাকে আশ্রয় ধরিয়া...???

কি সুন্দর সরল সহজ ভাষা! কি সঠিক অর্থ! 'সর্বসাধারণের' কাছে একেবারে জলবৎ তরল!—

সমাশিকা ও অসমাশিকা নামে দুইটি ক্রিয়াপদ আছে; যে ক্রিয়ার বাক্যের সমাপ্তি ঘটে না, তাগাই অসমাশিকা ক্রিয়াপদ। এখানে 'ছাড়ি' এবং 'ধরি' দুইটিই অসমাশিকা ক্রিয়াপদ; সুতরাং এর পরেও একটা করে একই থেকে যায়, অর্থাৎ সর্বধর্ম ছাড়িয়া (কি?), আমাকে আশ্রয় ধরিয়া (কি করতে হবে?)—এ সবের কোন জবাব নেই কিন্তু; সুতরাং অনুবাদ অসম্পূর্ণ।

এ অনুবাদটির মূল সংস্কৃত হলো:

"সর্বধর্মাত্ম পরিত্যাগ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষদ্বিধ্যামি মা শুভঃ।"

এই শ্লোকের কোন কথাটির 'সঠিক' অর্থ হলো—'চিন্তা কি আর?' অথবা 'কর্ণবন্ধন'?

'চারি বা বেশী লাইনে অনুবাদ করিলে অনেক সময় অহেতুক অতিরিক্ত শব্দ আসে'—তাই যদি হয়, তবে দুই 'লাইনে' অনুবাদ করার অহেতুক অতিরিক্ত শব্দ আসিল কেন? অথবা লেখক কি ধরে নিয়েছেন যে, দুই 'লাইনে' অনুবাদ করার অহেতুক অতিরিক্ত শব্দ আসিলে তাহা মাঝারির বোধ্য হইবে?

হান-কাল-পাত্র বলে একটা কথা আছে; সে কথা মরণে ধারলে অনুবাদ করবার সময় লেখককে অকার্য 'চিন্তা কি অহং' বলে চিন্তিত হতে হতো না অথবা অকার্যে তিনি 'কর্ণবন্ধনও' ছাড়িয়া পড়তেন না।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধান্তের অব্যবহিত পূর্বেই ভার্জুন দেখলেন যে, তিনি ধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাঞ্ছনীয় তাঁর ত সকলেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধ-বান্ধব, জ্ঞাতী-কুটুম্ব; শুধু তাই নয়, এর মধ্যে শুভদেবও আছেন এবং ধর্মের সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই এমন ব্যক্তিও আছেন। এইসব দেখে শুনে তিনি শর ও শরাসন ত্যাগ করে সম্মুখে শ্রীভগবানকে বললেন—"আমি যুদ্ধ করব না; কেননা যুদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করব, হারা এই যুদ্ধ হত হবে, তাহা ত সবাই আপনাই লোক, তাদের বধ করে আমি বাস্তব চাই না। শুধু তাই নয়, এই সব আত্মীয়-স্বজন বধ হতে পাণ্ডবের বৃদ্ধি হবে মাত্র; আর হুঁ-পক্ষের যুদ্ধে বধ পুষ্ট হত হবে, ফলে কুলবধূগণ অকাল-বৈধব্যাশ্রয় পতিত হবে; তাতে কুলক্ষয় হবে। কুলক্ষয় হেতু কুলধর্ম নষ্ট হবে; ধর্ম নষ্ট হলে নারীগণ সহজেই ধর্মচ্যুতা হবে, তাতে সম্ভব বর্ণের উদয় হবে—ফলে পৃথিবী পাণে পরিপূর্ণি হবেন। তে কুরু! রাজ্যলোভে অর্য্যভিলস জ্ঞানশূন্য হয়েছে, তাই কুলনাশে দৌর দেখে না, স্বজন-বিলোপ পাণ বলে মনে করেন না;—আমরা সেই দৌর দেখে কেন এই পাণ-প্রলোভন ত্যাগ করব না। হায়! রাজ্যলোভে আমরা কি পাণই না করতে এসেছি!"—এইভাবে তিনি শোক প্রকাশ করতে লাগলেন।

শ্রীভগবান তখন নানা চিত্তোপদেশলব্ধে, ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথা শুনিয়া এবং সাহস ও অভয় দিয়ে অর্জুনের শোকগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। এক্ষেত্রে তাই শ্রীভগবান অভয়বাণী উচ্চারণ করে বললেন, "হে অর্জুন! সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমায়ই শরণ লও, আমি তোমাকে তোমার সকল পাণ থেকে মুক্তি দেব; সুতরাং তুমি আর বোদন করো না।"

রথক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমস্ত পাণ্ডব ও কৌরবগণ যখন পরস্পর ঘোবতর সংগ্রামের ভিত্ত প্রাপ্ত,—হুহুর্ক্টে বেখানে বিশ্বের বিষয়কর এক মহাপ্রলয় ঘটে যাবে; সেখানে ঈড়িয়ে অর্জুন 'কর্ণবন্ধন' থেকে মুক্তি পাণ্ডার ভাঙ্গ তহটা চিন্তিত হয়ে পড়েননি—যতটা ভীত এবং মুক্তি হতে পড়ছিলেন সমূহ পাণ্ডব ভয়ে! তাই না শ্রীভগবান অভয়বাণী দিয়ে বললেন—'অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষদ্বিধ্যামি মা শুভঃ।'

সুতরাং দেখা যাকে 'সঠিক অর্থ অনুবাদ' হয়নি। লেখকের উচিত ছিল এইরূপ একটি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ কালে পূর্ববর্তী অনুবাদকগণ কি করেছেন তা একবার দেখে নেওয়া। লেখকের তথ্য সর্বসাধারণের অগতির ভিত্তি আমি পণ্ডিত গ্রামাচার্য কবিরত্ন মহাশয় বর্জ্জ অনুদিত 'গীতা-রত্নামৃত' থেকে ঐ অংশ তুলে নিছি। তিনি প্রাপ্ত শ্লোকটির এইরূপ অনুবাদ করেছেন:

"সর্বধর্ম পরিত্যাগ করি' অমরুণ

একমাত্র আমাকেই কর হে শরণ

সর্বপাপ হতে মুক্ত করিব নিশ্চয়

শোক নাহি কর তুমি ওহে ধনঞ্জয়।"

এ ক্ষেত্রে দুই 'পটনের' পরিবর্তে চারি 'লাইনে' অনুবাদ করলেও 'অহেতুক অতিরিক্ত শব্দ' কিছুই আসেনি—যাতে মূল শ্লোকের অর্থের কিছু ব্যাঘাত ঘটতে পারে। 'অমরুণ' শব্দটি অতিরিক্ত বলে মনে হলেও বাংলায় এর ভাবার্থ আরও পরিষ্কার হয়েছে।

চার 'লাইনে' ঐ শ্লোকটির আবার কি সুন্দর অনুবাদ করেছেন

সুখানন্দ সুখাত্তর। তেন সুখায় ঈশ্বর ধরে পড়িছে তাঁর অমৃতময়ী
লেখনি থেকে। তিনি লিখেছেন:

“সর্বপাশে পরিচরিত,
কেবল আমাকে ধরি
একান্ত অন্তরে লও আমার শরণ,
সর্ব পাশে পরিচরিত
আমি কবির দান,
আর হৃৎকবির না, কৃতীর নন্দন।”

এ ক্ষেত্রে ‘একান্ত অন্তরে’, ‘আমি কবির দান’ এবং ‘আর’ কথাটি
লেখকের কাছে হৃদয় অতিবিক্ত বলেই মনে হবে; কিন্তু একটু
তলিয়ে ডুবলেই বুঝতে পারা যাবে যে, এই কথাগুলি প্রয়োগ্য করাতে
মোহিতের একাধারে অর্থ, ভাব্য এবং অনুবাদ অতি সূক্ষ্ম এবং
প্রোঙ্গল নাবার স্থান পেয়েছে।

‘মামেক শরণং’ অর্থে একমাত্র আমাকেই শরণ; কিন্তু শুধু
শরণেই কি হবে?—না, সেই শরণ হবে যা হওয়া উচিত আত্মবিকৃত্যর
পূর্ণ, তবেই না সেই শরণ লওয়া সার্থক হবে। তাই সাধক কবি
সুখাত্তর এই মূল্যবান কথাটি যোগ করে দিয়েছেন—‘একান্ত অন্তরে
লও আমার শরণ’। ‘আমি কবির দান’—এ কথাটির এখানে একটি
বিশেষ তাৎপর্য আছে। দান যে করে সে দাতা, আর তা গ্রহণ যে
করে সে গ্ৰহীতা। এই দাতা এবং গ্ৰহীতা উভয়েই পরস্পর উপযুক্ত
না হলে দান যেমন করাও যায় না, দান তেমনই লওয়াও
যায় না। একেবারে দাতা হলেন স্বয়ং ভগবান, আর
গ্রহীতা হলেন অর্জুন। কি দান করবেন—না, সর্বপাশে
পরিচরণ দান। কিন্তু ভগবান অর্জুনকে সে-দান গ্রহণ
করবার উপযুক্ত পাত্রি ভাবলেন কেন? তার কারণ ধর্মের
প্রতিষ্ঠা এবং ভূভার-চরণের জন্ত তিনি অর্জুনকে দিয়ে কাজ
করাচ্ছেন; কিন্তু গ্রহণ এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহু বাধা
বিষ এবং সম্ভাব্য বিপদের কথা বার দিলেও সমুদ্র পাশের ভয়
আছে। সেই পাশের ভয়ে কেউই এই কাজ করতে স্বীকৃত
হবেন না; এমনকি অর্জুনও হন নি। তাই অর্জুনকে অভয়
দিয়ে কাজে প্রবৃত্ত করবার জন্তে ভগবান বললেন—সর্বপাশে
মোকরিয়ামি, সকল পাশ থেকে মুক্তি দেব। কিন্তু পাশ করলে
পাণীর শান্তি বিধানই হলো বিধির বিধান—ভগবান সে বিধানের
নিয়ম ভঞ্জন করবেন কেন? তৃতীয় কথা, পাণীর যদি শান্তি
ভোগ না হয়, তাহলে ত সকলেই পাপকাণ্ডে রত থাকবে এবং
সহজেই তারা নজীর দেখিয়ে বলবে যে, অর্জুন যখন শান্তি না
পেরে পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে, তখন তাই বা পাবে না কেন?

কিন্তু আসলে তা নয়; সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।
অর্জুনের পাশেরও মোচন হবে অথচ বিধির বিধানও ভঞ্জন করা
গবে না। এবং এরই গূঢ়ার্থ নিহিত রয়েছে এই শ্লোকেরই মধ্যে
যা ভক্ত প্রোঙ্গন করেছেন এইভাবে:

‘সর্বপাশে পরিচরিত আমি কবির দান’

অর্থাৎ ভূভারহরণ তথা ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্ত যে প্রোঙ্গনসমীপ কাজ
হুমি করবে, তার জন্ত উপযুক্ত দান তোমার দেব—সর্বপাশে
পরিচরণ। সুতরাং এতবড় একটা প্রতিক্রিয়ার পর ‘আর’
শব্দ বা হৃৎকবির কোন প্রয়োজনই নেই।

মোট কথা; চারি বা ছয় ‘লাইনে’ অনুবাদ করিতে গেলে
ই একটি কথা হৃদয় বোঝা আসিতই পারে, কিন্তু মূল শ্লোকের

কথা একেবারে বঞ্জন করা কোনক্রমেই কৃতিশূন্য নয়। কি
পণ্ডিত ভ্রামাচরণ, কি সাধক কবি সুখাত্তর, কেউই ‘চিন্তা কি
আর’ অথবা ‘কণ্ঠবন্ধন’ লেখেননি; তাঁরা উভয়েই ‘সর্বপাশেপাশো’
এবং ‘মা শুচঃ’ এই মূল কথা দুটিটিরই হুবহু অনুবাদ করেছেন—
‘সর্বপাশে চতে’, ‘আর হৃৎকব বা শোক করো না’।

যাক। এইবার আসল কথার আসল যাক। ‘গীতাপাঠের
রীতি’ সত্যই কি তকম হওয়া উচিত? এর চূটো দিক আছে।
প্রথম হলো, গীতার অধ্যায়গুলি যেমন আছে ঠিক তেমনভাবেই
পড়ে যাক। অর্থাৎ প্রথম ‘অর্জুন বিবাহ যোগে’ আরম্ভ করে
‘মোক যোগে’ শেষ করা। সাধারণতঃ দেখা যায় প্রথম বিবাহ
প্রাপ্তি না হলে বৈরাগ্য আসে না; বৈরাগ্য না এলে কেউ মোক্ষের
কথা চিন্তা করে না। এই ভুলই প্রথমেই ‘অর্জুন বিবাহ যোগ’।
মাক্ষের অধ্যায়গুলি লক্ষ্যস্থল সেই মোক্ষপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার
সোপানশ্রেণী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কাজেই গীতা যেমন
খাপছাড়া ভাবে পাঠ করা কোনক্রমেই উচিত নয়, তেমনি ‘গীতা
সমগ্রভাবে পাঠ করা উচিত’ এরূপ অবাস্তব প্রোঙ্গের কথাও আলো
ওঠে না! এর পর হলো গীতাপাঠের আর একটা দিক;—যার সংক্ষেপে
লেখক একটি কথাও বলেন নি—সেটা হলো ছন্দ বজায় রেখে
গীতাপাঠ করা। অনেকেরই হৃদয় স্তব করে গীতা পাঠ করেন; সেক্ষেত্রে
যাদের কঠোর ভাল, তাঁদের গীতাপাঠ ভালই লাগে; কিন্তু কঠোর
ভাল না হলে চাজার স্তব করে পড়লেও তা মিষ্ট লাগে না। পক্ষান্তরে,
যদি ছন্দ বজায় রেখে গীতা পাঠ করা যায় তবে কঠোর ভালই
হোক অথবা মন্দই হোক উভয় ক্ষেত্রেই তা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে
আপন সৌন্দর্য-মাধুর্যে মগ্নিত হইবেই—অতিশয়শরত ত বটেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—ছন্দ কি? সে কথা বলিতে গেলে
অনেক কথাই আসে; সংক্ষেপে দু’একটা কথা বলছি।

ব্যাপক অর্থে ছন্দ—গতি-সৌন্দর্য; সঙ্গীত অর্থে—‘ভাবার
অন্তর্গত প্রবহনশীল ধ্বনি-সৌন্দর্য’ (নৃতন বাংলা অভিধান)।
সুতরাং এক্ষেত্রে সঙ্গীত অর্থই প্রযোজ্য। ছন্দ উভয়বিধ—গত এবং
পত্ত। আমরা পত্ত ছন্দেই কেবল আলোচনা করিব।

পত্ত শব্দের অর্থ পর-যুক্ত; নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ধ্বনি-প্রবাহই
পদ বা চরণ—‘লাইন’ নহে। চরণের মধ্যস্থিত বিভাগগুলির
নাম পর্ক। পত্ত পড়িবার সময় মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নেবার জন্ত
একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হয়; এই বিরাম স্থলকে বর্তি বলে।

মৌলিক রচনাই হোক অথবা অনুবাদই হোক, পত্ত বা কবিতা
লিখতে গেলে এই নিয়মগুলি মানতেই হয়। যদিও ছন্দ প্রধানতঃ
তিন প্রকার (অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরমাত্রিক বা বলবৃত্ত) তথাপি
ইহার শাখা-প্রশাখা বহু। সেইজন্য সংস্কৃত থেকে বাংলা পত্তে
অনুবাদ করতে গেলে বিশেষ একটি ছন্দ বেছে নেওয়াই ভাল।
সাধারণতঃ দেখা যায় সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের অনুবাদকালে অনেকেই
অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত পদ্যর ছন্দই ব্যবহার করেছেন যেহেতু।
দষ্টাঙ্কস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী
মহাভারত, সুধাকরী গীতা, শ্রীহরীবোধ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের
জ্ঞানবৈবর্ত পুরাণ ইত্যাদি। সুতরাং লেখকেরও এই পদ্যর ছন্দই
অবলম্বন করা উচিত ছিল,—যে ছন্দ শুধু সর্বসাধারণ নয়, সুদূর
পল্লীগ్రামের নিরক্ষর নরনারীগণের কাছেও সুপরিচিত।

কিছু লেখক যেভাবে অমুখ্য কয়েছেন (অন্ততঃ বহুশ্রুতীতে যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে) তাতে ছন্দেব সাধারণ নিয়মগুলি তিনি বহুক্ষেপে পরিহার করে গেছেন। শুধু আক্ষরিক মিল আর অক্ষরসংখ্যার সমতা বজায় রাখতে তিনি আশ্রয় চেষ্টা করেছেন। মিল বজায় রাখতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আবার উভয় চরণেরই শেষে একই কথা দুইবার ব্যবহার করেছেন; এতে পুনরুক্তি সোপও ঘটে। (যেমন ১২২ শ্লোক—আছি, আছি। ১৮৬৫ শ্লোক—আমারি, আমারি। ইত্যাদি)

এখন ছন্দ বজায় রেখে কি করে গীতা পাঠ করতে হয় তার ছ' একটা উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

১ (ক)। যুগসংস্কৃতঃ সর্গপাশ্রয় পরিত্যজ্য। মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্যং সর্গপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

এখন, যেখানে দাঁড়ি আছে সেখানে 'বতি' বৃকতে হবে, বতির দুই পাশে দু'টি পর্ষ। এই বতি মেনে পড়লে গীতাপাঠ যেমন সহজ সুন্দর হবে, অজ্ঞভাবে পড়লে তেমন কদাচিৎ হয়। যেমন :

(খ) সর্গপাশ্রয় পরিত্যজ্য। মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্যং সর্গপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

(গ) সর্গপাশ্রয় পরিত্যজ্য। মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্যং সর্গপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

(ঘ) সর্গপাশ্রয় পরিত্যজ্য। মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্যং সর্গপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

উপর উক্ত গীতাপাঠের চারটি রীতির মধ্যে (ক)টিই যে সর্বোত্তম এবং সহজগাছ বারা 'বতি'মত গীতাপাঠ করেন তাঁরা তা' সহজেই বুঝতে পারবেন। আরও দুই একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

২। গো মাং পূজতি সর্বত্র। সর্গক ময়ি পূজতি।

তত্ভাং ন প্রণয়ামি। স চ মেন প্রণয়তি। (৬-৩০)

৩। সমোহং সর্বভূতেষু। ন মে ঘোষোহস্তি ন প্রিয়ঃ।

বে ভজন্ত তু মাং ভক্ত্যা। ময়ি তে তেযু চাপাশ্রয়ঃ। (১-২১)

৪। প্রকৃতোঃ ক্রিয়মাণানি। গুণৈঃ কথ্যনি সর্বদাঃ।

অহংকারবিশৃঙ্খল। কণ্ঠাহমিত মন্ততে। (৩-২৭) ইত্যাদি।

এইবার লেখকের অমুখ্যগুলি পাঠ করা যাক :—

১। সর্ব বর্ষ ছাড়ি। এক যে আমি। সেই আমাকে আশ্রয় ধরি;
চিন্তা কি আর। কর্মবন্ধন হইতে। আমিই যে মুক্ত করি।

২। হে সর্বই আমাতে দেখে। সর্বত্র দেখে আমারে,
ছাড়ে না তিনি আমারে। আমিও ছাড়ি না তাহারে।

৩। নাহি মোর বেহ। প্রিয় বা হয়। সমভাবে সবতে আছি,
যে মোরে ভক্তিতে ভজে। সে আমাতে। ও আমি তাহাতে আছি।

৪। প্রকৃতিব তিন গুণেতেই। সর্বপ্রকার কর্ম করে,
অহংকারে বিমূঢ় হয়ে। লোক নিজে কর্তা মনে করে।

এইবার বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, প্রত্যেক শ্লোকের চরণগুলির অক্ষর সংখ্যার সমতা বজায় রাখবার আশ্রয় চেষ্টা করা হলেও, পূর্বগুলির আক্ষরিক সংখ্যার সমতা নাই—যে জন্ম বতির কাছে ধামতে গেলেই খটক। লাগবে, অর্থাৎ পাঠ করতে গেলেই বাধ বাধ ঠেকবে। সুতরাং ছন্দ বজায় রেখে ঐ অমুখ্যগুলি পাঠ করাই বাবে না; যেহেতু ছন্দেবই পতন ঘটেছে। ভাবায় কথা আর নাই বা বলার।

কিন্তু কি ভাবার লাগিতো, কি ছন্দেব মাধুর্যে, কি অনির্বচনীয় ভাব ধারায় ঐ একই শ্লোকের পদ্ধান্তবাদ সুধাকরী গীতার ছান পেয়েছে, পাঠকবর্গ তার একটু আশ্বাসন করে দেখুন :—

১। সর্ববর্ষ পরিহরি। কেবল আমাকে ধরি
একান্ত অন্তরে লও। আমার-শরণ
সর্বপাপে পরিণাম। আমিই করিব দান
আর হুঃখ করিও না। কুস্তার নগ্নন।

২। সর্বত্রই আছি আমি। আমাতে সকল
ভাগ্যান্ব যেই জন। দেখেন কেবল
তাহার অদৃষ্ট আমি। নহি কপাচন
আমার অদৃষ্ট তিনি। কতু নাহি হন।

৩। সর্বভূতে সম আমি। আছি সর্বদাই
বিষেবভাজন কিংবা। প্রিয় কেহ নাই
আমাকেই ভক্তি করে। পূজা করে বারা
তাদের অন্তরে আমি। আমাতেই তারা।

৪। প্রকৃতির গুণ এই। ইন্দ্রিয় সকল
সর্বকর্ম সম্পাদন। করিছে কেবল
অহংকারে জ্ঞানহীন। মায়াবুদ্ধ নর
আমিই কণ্ঠের কর্তা। ভাবে নিরন্তর। ইত্যাদি।

"হে সম্পাদকবৃন্দশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—
কমলাকান্তের আর সে বস নাই! আমার সে নদী বাবু নাই—
অহিংসের অনাটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না, তাহার সে মঙ্গলা
গানী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা, এখনও
একা; কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায়
আধশত। কিন্তু একায় এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি
পরিবারিলাস, কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্ম আজিও কাঁদি;
যে ফুলটি ফুটাইয়াছিল—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্ম আজিও
কাঁদি; যে জলবিধ একবার জলস্রোতে স্ফূর্ত্যমানস্রোত
দেখিয়াছিল—তাহার জন্ম আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরে
অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেখি পঢ়িয়া উঠিল
—হাইভয় মনের বাঁধনগুলো পড়ে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—

আন্তন নিবে না কেন? গুরু শুকাইয়া আসিল—এ গড়ে গড়জ
ফুটে কেন? বড় খামিয়াছে—মরিয়া তুফান কেন? ফুল
শুকাইয়াছে—এখনও গড় কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন?
মৃত কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—বন্ধ কেন? প্রাণ
গিয়াছে, পিতৃদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে, যে কমলাকান্ত
চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত,
এখন আবার তার আকির্ষের বরাদ্দ কেন? বাঁশী কাটিয়াছে, আবার
স, গ, গ, ম, কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশাস কেন? ঘর
গিয়াছে ভাই, আর কারা কেমন? তবু কাঁদি। জন্মিবার
কাঁদিয়াছিল, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।"

অমৃগত, বৃগত এবং বিগত—

ঐকমলাকান্ত চকবর্তী।

রবীন্দ্র-রচনার পাঠ-চর্চা

অম্বিনাশ রায়

রবীন্দ্র-অক্ষয়তবার্ষিকী-উৎসব সমাপ্ত। নানাদিকে নানা আয়োজন চলছে। সকলেই চান, হারী কাঙ্ক্ষণও কিছু খুঁজনা হোক। যিনি যেমন ভাবছেন, প্রস্তাবও প্রেরাস করছেন। এমন-একটি প্রস্তাব এখানে বন্ধা করা গেল। প্রস্তাবটি হচ্ছে,— বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে “রবীন্দ্র-রচনার পাঠ-চর্চা”-র প্রবর্তন। ব্যাপক ও বিশদভাবে সকলের সহযোগে তা শুরু হোক। ‘পাঠ’ মানে এখানে ‘পড়া’ নয়, ‘পাঠ-চর্চা’ মানেও ‘ট্রান্সিস্কাল’ নয়,—রচনাস্তে মানাশব্দ-প্রয়োগাদির বিচারই বিশেষ উদ্দিষ্ট বিষয়। তবে ‘ট্রান্সিস্কাল’ও এ বিষয়ে সাহায্য হতে পারে, কিন্তু সে এসল অন্তত।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পঠন-পাঠন চলছে তা ঠিকই কিন্তু কি ভাবে চলছে তাই নিয়েই কথা। কবির লেখার কেন্দ্র স্থলে মূল্যে কী ছিল, কখন কী কারণে কত রকমে বদল হল, তার মধ্যে কোন পাঠের কী তাৎপৰ্য,—সাধারণ-পাঠকমণ্ডলীতে এ নিয়ে খোঁজখবর নেই, প্রসঙ্গও ওঠে না, ওঠবার তেমন কথাও নয়, কারণ, তাদের একটা-কিছু পেলেই হয়, মোটামুটি পড়ে যেতে পারলেই হল; অনেকস্থলে হয়তো সেটুকুই হয়ে ওঠে না, রবীন্দ্রনাথের বই-একখানা হয়তো চোখেও দেখেনি অনেকে।—কিন্তু ‘পাঠ-চর্চা’, সে তো প্রতীকশেষের ক্ষেত্রে বিলাস ব’লেই চকবে। কেন না, এটি বীতিমতো সংবেদ্য বিষয়, তা বলাই বাহুল্য। তবে সাধারণ-সমাজে বাই হোক, দেশের সুদীর্ঘসমাজেও যদি এ বিষয়ে বেশি মিন আসড়তা দেখা যায়, তা গৌরবেরও নয়, ক্ষতিকর তো বটেই। প্রস্তাবিত পাঠ-চর্চার বতই বিলম্ব ঘটবে, ততই এতে অবহেলা ও জাতীয় বিভাবতার শিথিলতা বিষে সূচিত হবে, অন্তিমিকে নির্ভর-যোগ্য উপাধান ও পরিবেশসন্নিষ্ট তথ্যভিত্তিক-মণ্ডলীর সাহায্য-স্বতভত্তাও হয়তো ক্রমেই সূদূর-পর্যায় হতে থাকবে।

শিক্ষিত এবং অর্থবান মহলেই রবীন্দ্রসাহিত্যের বিস্তার বেশি, তবে ক্রমে সাধারণের মধ্যেও তার প্রচার হচ্ছে এবং এই শতবার্ষিকী উৎসবে আরো হবে, সে কথাও সত্য। এ জন্তই আবার সাবধান হবার সময় এসেছে।

এছাড়া লেখা-লেখ বিক্রী হবে, শুভসংবাদ, কিন্তু এর পরে আসে ব্যবহারের পালা, আশঙ্কার কারণ ঘটে সেইখানে।—কেবল কেনার খবরই যদি বাড়ে,—পাঠ-চর্চার দিকটা থাকে ভ্রমিত, তবে কবির “কণিকা”র সেই বহু প্রাচীন ইলিজিটাই বা শেষে সেপে যায়। অনেকস্থলেই না প্রকাশ পায়, পড়ার নামে গ্রন্থকে সেও ‘মেহাগিনি’র তাকে রেখেই আমরা কাজ সেয়েছি।

“কোন হাটে তুই বিকোতে চাসু ওরে আমার গান,
কোন দিকে তোর টানু ?

পাণ-পাখা প্রাসাদ”-পরে আছেন ভাগ্যবন্ত,

মেহাগিনির মঞ্চ ছুঁড়ি পঞ্চাঙ্গার গ্রন্থ,

সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,

অদ্বাদিত মধু বেদম বধী অনায়াত,

কৃত্য নিত্য ধূলা ঝাড়ে, বস্ত্র পুরানাজা,

ওরে আমার হৃদোন্ময়ী, সেখায় করবি বাজা ?

গান তা শুনি কর্ণমূলে মর্মরিয়া কহে—

মহে নহে নহে।”—(বধাঙ্গান)

কবির অল্পকালীন আগ্রহ এবং সক্রিয়তা চাই দেশবাসী, তার সঙ্গে অল্পবাসী অনেকে রয়েছেন সতর্কচিত্তে বিশেষ পাঠনিমিত্ত। একপাটি হলে হয় বখাৰ্খ বা হওয়া সংগত।

বই-এর মধ্যে তুল ফ্রটি থাকবে না, এমন নয়; কিন্তু, শুধরে-নেবার বিচারযুক্ত অন্তর্য ব্যবহাট প্রকৃত শ্রদ্ধার পরিচায়ক, একথাও সকলেই বলবেন। তৎসঙ্গেও তুলচুক কিছু থেকেই যদি যায়, সেক্ষেত্রে এই বস্ত্রটির পাঠচর্চার তা ধরা পড়তে পারে; তা-ছাড়া, যেটি এর প্রেক্ষাভেদ দিক,—যেটি নিগেটিভ নয় পজিটিভ—সে হচ্ছে বিভিন্ন মনীষার সাধনা যোগে পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন সংস্করণ ও পুঁথিপত্র-ছাঁকা সংগৃহীত পাঠগুলির বিচিত্র ব্যবহার-তাৎপৰ্য ও অর্থসম্পদের ঘটবে অভাবিত উৎসব,—ন’নামিক থেকে হীরকখণ্ডের মতো নানাভাবের আলোক তাতে বিচ্ছুরিত হবে।

এবিষয়ে এখানক মতটা হয়েছে, তার থেকেই ধারণা আসে, বখাচিত্ত সমবায়ের খোঁজখবর সব শুরু হলে, বক্ত-কী আরো অপূর্ণ ভাণ্ডার উন্মোচিত হতে পারে। এখন একস্থলে এটি পাঠই মন ভরিয়ে রাখে,—কিন্তু তখন দেখা বাবে, আরো কত রক্তের মেলা :—এবারে-ওধারে ছড়িয়ে আছে।—ইপেক্ষিত, কোনোটা বজিত, কোনোটা-বা অনুবধান নেপথ্যগত। কবি বর্তমান থাকতে নিজেই এক এক স্থলে বক্তবার করে কত পাঠ বদলেছেন। পাঠান্তরগুলি কালামুকমিক করে পাশাপাশি সব সাজিয়ে নিয়ে দেখলে, তখন আপনি সাধারণের সাহিত্য-কচি ও অভিজ্ঞতা প্রসারিত হবার এক সহজ স্তম্ভর উপায়ের সৃষ্টি হবে, তা অনিশ্চিত। তাঁর পরিবর্তনের সেই পথায়গুলি কত বিচার-বিবেচনা, কত গভীর শিরস্কৃতি, ও কত নিবিড় আনন্দ-বেদনার রোম ধকর সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মের রেখাময়সরণের সুযোগ দেবে। সে-সব পাঠোচ্চায়ের সঙ্গে জড়িয়ে সামনে আসবে রচনার পটভূমিকাগত কত বিচিত্র ইতিহাস। তারপরে বেরতে পারে অপ্রকাশিত আরো কত রচনা বা রচনাংশ; বজিত বা, তারও ভাগবে কত সম্ভাবনাময় মহৎ মূল্যবোধ; এবং আরো পরে চরমতো গোটের আসবে, কপিকারক কল্পাঙ্কিতর প্রকরীভার সম্প্রদায়ের কত আশ্চর্য অবদান।—এমন কি, কবির প্রাচ্যোগ নয় কেনেও অনেকস্থলেই সে-পাঠেরও উপযোগিতা এমনই মনোময় লাগবে যে, তাকে প্রকৃষ্ট বলে বাদ দিতেও আর মন উঠবে না। সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রচলিত পাঠগুলি এক-একস্থলে মূল-পাঠের আবির্ভাব দেখে নিজেদের জ্বলের খোলসটা ছেড়ে কেল আদ্যের এতদিনের পোজামিল-টানার বিড়ম্বনাকে হঠাৎ একনিমিত্তে মূর্ত করে দিয়ে, একটু-বা বক্তহাসি উপহার দিয়েই, মিলিয়ে দাবে, এবং, হয়তো কোথাও চিরদিনের অব্যক্তিকর সশব্দে

জাতিতে যেমতামোর দ্বারা থেকে পরিচালিত হয়ে চারাবিধিটি এসে ধরা দেবে পথের সৌভাগ্যের মতো। এরই সঙ্গে এক সময়ে কোনো-বাক্য-বা ইচ্ছা-করে দেবে বহুদলী-পাঠকসমূহের বেপারোয়া অভিজ্ঞান।

যেমন, মনে হবে, লক্ষটা 'পূণ্যজীবী' না 'পূণ্যজীবী'—রবীন্দ্রনাথের আধুনিক গ্রন্থ 'কালান্তর'; তার 'লড়াইয়ের মূল' রচনাটির আধুনিক সংস্করণ (১৩৫৫, পৃ ৪২) ও রচনাবলী সংস্করণ (১৩৬৫, পৃ ২৩১) দুই খণ্ডেই দেখুন,—চাপা দু'বকম; গ্রন্থ বলে 'পূণ্য', রচনাবলী ১ম ও ২য় খণ্ডেই সংস্করণটি নিয়ে যায় দুইটিকে 'পূণ্য'র দিকে। অথচ, গ্রন্থের সংস্করণ গ্রন্থও জানায় কথ্যটা—'পূণ্যজীবী'। গ্রন্থ-যন্ত্রটি পাঠ্য ছিল 'সবুজপত্র', পত্রিকারটিও সাক্ষ্য হয়ে—'পূণ্যজীবী'। তারপরে একক, প্রেক্ষাপট, পাণ্ডুলিপি—কোথায় কী আছে, কে বলবে। ভাষাটি হলে এটি,—.... গ্রন্থকার যে লড়াই, তাই লৈমিক-বসিছে লড়াই, কথিয়ে যাবে। পৃথিবীতে চিরকালই পূণ্যজীবীর 'পূণ্য' অল্পধারীর একটা স্বাভাবিক অবস্থা আছে—বৈজ্ঞানিক কণ্ঠস্বর সঠিক পথে না।

বই আজকাল কেনোটা হয় অনেক, কিন্তু কর্মস্বাস্থ সাধারণের পড়া হয় বা ক'খানা, খোঁজাখুঁজি ক'রে দেখেচেন পড়া হয় আরো কম। তারও মাঝে-মাঝে ঠেকে যেতে হলে, বা, ভুল গেলা হলে, পড়ার স্বাদ হয় নষ্ট, আখের হয় ভাট। সংশয়ের খোঁজা অস্বস্তিকর হলে ঘরে বিরক্তি, এবং তার পরে—। অল্পদের কথা বাদ নেওয়া থাক,—রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সংস্করণের বইগুলিতে সম্পাদনার ছাপ সুস্পষ্ট। স্তব্ধতা প্রতিষ্ঠিত লোকসমূহের চোখে নিশ্চিত নির্ভরে রবীন্দ্রনাথ পড়ে বাওরায় আশা করতে বাধে না। তবু এখনো এ সমস্তার আকর্ষিত অভ্যাস এ হেন ক্ষেত্রেও যে বিচিরি নয়, উদাহরণ শুধু এ জগতই।

বিদেশী সাহিত্যে এই দিক দিয়ে টেকসূচ্যাল ক্রিটিসিজম-এর ব্যাপারে, একটা দৃঢ় মান গড়ে উঠেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। সেক্ষণীয়দের প্রতি লোকের কী অমুদ্রা, অল্পশ্রী পাঠ-সংবলিত গ্রন্থবলী তার প্রমাণ। শোনা যায়, কবি হার্ডসমান তাঁর কাব্যগ্রন্থ নিজের জীবদ্দশাতে মুদ্রিত করে যেতে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, তবু এ জগতই, যে,—একটি কবির ভুলও যাতে কোথাও না থেকে যেতে পারে। যদিও সেখানে ভুলভ্রান্তি বা থাকে, তা নিয়ে পুরস্কার সাহিত্যিকমণ্ডলী ও পাণ্ডিত্যমণ্ডলী নিয়তই আছেন শোণনিবর্ত। রবীন্দ্রনাথক্ষেণীয় মহান লেখকদের লেখা সম্বন্ধে এই সতর্কতা সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এ উপলক্ষে সেই কথ্যটাই আরো শ্রাব্য হয়, বেশেও প্রাচীন-সাহিত্য নিয়ে এ ধরণের কাজ চালু না রয়েছে এমন নয়, আধুনিক বিশেষতঃ কালোত্তীর্ণ রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে তাগিদ নেই কেন, এক সর্বজননের সহযোগে এজগতই একটি 'রবীন্দ্রপাঠচর্চা' নামক সাহিত্যিক আলোচনাধারার সূত্রপাত হওয়া স্বীকৃতি কি না।

বিষয়ভারতীর চোঁয় কাজ এগোচ্ছে এও যেমন সত্য নিঃসন্দেহ, এ কাজ সকলের হোগে করবার মতো বিরাট কাজও খট। কেননা, দু'একজন নয়, বা উপরে হ'চারজন থাকলেও, বহুজনের অঙ্গসন্ধান, আলোচনা, ও বিচার-বিবেচনার চারিদিক থেকে এক

পরিপূর্ণ ও পরিচালিত করে তুললে, তবে তার সূত্রীতা আলা ক'রা যেতে পারে। সে-কাজ যে কত ব্যাপক, কত গুরুত্বপূর্ণ, সেইজগতই আরো কতবে ব্যাক থাকা সম্ভব, তার জন্ত কোনদিক দিয়ে আরো কত আয়োজন করা দরকার, গ্রন্থন-বিভাগ নিচরই তা জানেন,—জনসাধারণ এ বিষয়ে ঠিক কতখানি সচেতন, তা জানার ভাগে মিলতে স্বল্পই। কেন না, রবীন্দ্রনাথ-সম্প্রদিত তথ্য ও তত্ত্বব্যাখ্যা নিজেই এমন লেখালেখি চলছে; কিন্তু কবি যে বসোচেন, কবিকে দেখতে হবে তাঁর রচনাতেই,—কবির-মেধানো সেই প্রাথমিক পক্ষে তাঁর মূলবস্তু রচনাবলীর পাঠ্যবিভাগ-সম্প্রদিত সাধারণের যেমন কৌতুহল কোথায়? আলোচনা! তা! পূণ্যের কথা। অথচ, কবির কথার মূল্য মিলে এমিকটাই খুঁটিয়ে খবর করা কঠোর হয়ে পড়ে।

আজকাল যাটো-পেইটি বারোয়ারি পূজা হয়; সাজ-শোভাযাত্রা বাজতাতের সঙ্গসংগের কাজে ধান-মসুর-কর দিকটা একটু দেখায় বাইরে থেকে যায়। রবীন্দ্র-উৎসবের মেলায়ও বাণীর দিকটা যদি লাখব হয়ে চলে, সেটা ঠিক হবে কিনা, সমগ্র থাকতে বিচার্য। প্রতিকার-স্বরূপ 'পাঠচর্চা'র কথাটা এসলে ভেবে দেখা যেতে পারে না কি?

সে কথা সত্য, অত্যন্ত পরিশ্রম, যত্ন ও মেধা সাপেক্ষ এই কাজ। ফল তার এক-একটি আবিষ্কারের মতো, তেমনি কৌতুহলোদ্দীপক ও মূল্যবান। বীরা যেটুকু এমিক কাজ করেছে, তাঁরাই এর রহস্য জানেন; আর, তাঁরা অশেষ হস্তবাহাইও বটেন। অত্যাধি এ সাধুবাদের প্রায় পুরোভাগটাই পাবেন বিশ্বভারতী। কেন না, সকলেই জানেন, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসমন ও গ্রন্থনবিভাগ—মুস্তভাবে এ কর্মের কেন্দ্রস্থল।

অল্প সব কিছু উপাদান সংগ্রহের কর্তব্য অল্প-সব জায়গার পক্ষে প্রাথমিক পেতে পারে কিন্তু মূল রবীন্দ্ররচনার প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি ও দাবতীয় উপাদান সংগ্রহ, সংস্করণ ও সেই সঙ্গে রবীন্দ্ররচনাবলীর সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজটি বিশ্বভারতীর পক্ষে একান্ত আবশ্যিক ও প্রাথমিক কর্তব্য। আর সব উপাদান অল্প মিলতে পারে, তার জন্ত গৌরবও অনেকের অনেক কিছু প্রাণ্য থাকতে পারে, কিন্তু যে-নিমিত্ত সমগ্র বিশ্বকে একমাত্র বিশ্বভারতী তথা রবীন্দ্রসমনে চিরকাল অর্ধী হয়ে আসতে হবে, সে হচ্ছে রবীন্দ্র রচনার বহুবিধ আদি ও অকৃত্রিম নিদর্শন-সম্পদের সাক্ষ্যলাভ ও ব্যবহার। এর উপরেই নির্ভর করবে রবীন্দ্রসমনের প্রধানতম সাধকতা। আর, সে জগতই এখানে সকল কাজের আগে এ কাজটির সুব্যবস্থা হওয়া চাই বিধিমেতে, তা বলাই বাহুল্য।

বস্তুত, রবীন্দ্রসমন ও গ্রন্থনবিভাগ এ বিষয়ে পারম্পরিক পরিপূরক ব্যবস্থায় একটি বিভাগের মতোই যে অস্বাভাবিক কাজ করে যাচ্ছেন, রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়, বিশ্বভারতী-পত্রিকা, বিশ্বভারতী-নিউজ, কোয়ার্টারি ও নানা প্রদর্শনী ইত্যাদির মধ্যে সে-পরিচয়ই সকলে পেতে থাকেন। তবু, বলতে হয়, পাঠচর্চার কাজটি সম্বন্ধে হ'য়েই অনেক-কিছু করবার আছে। তার মধ্যে, দ্বারাধাতিক পাঠান্তর সংগ্রহ, বিচারপূরক তার সম্পাদনা, এবং দ্বারাধাতিকরণে সাময়িক পত্রমূর্ত্ত ও পুস্তকামালায় এই নব উদ্ধারিত পাঠ-তালিকা ও তার ব্যাখ্যা-সম্বন্ধিত গ্রন্থাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে

অন্ততঃ। এর মধ্যে সংগ্রহ, গবেষণা, পরীক্ষণ ও প্রকাশনার সবদিকই আছে এবং সেইসকলই বিষভারতীয় বিজ্ঞানভবন ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সকলেরই সক্রিয় সহযোগ একান্ত প্রয়োজন। এর মধ্যে যেখানেই হোক, গবেষণা ও নিয়মিত উপাদান সংগ্রহ ও সরবরাহের উপযোগী একটি সুব্যবস্থিত কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা হইবে প্রাথমিক কর্তব্য। জনসাধারণের মধ্যে, এই ব্যবস্থার ফলে, প্রামাণিক মূল উপাদানগুলি প্রচারিত হ'লে, তার সাহায্যে নানাতিক থেকে নানাজনের নানাভাবে কাছে-দূরে সর্বত্রই পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যার কাজ চালাবার সুযোগ ও সাহায্য স্থাপিত হবে; তখন নিশ্চয়ই এই পাঠ্যের সাহিত্যিক আন্দোলনটিও প্রসারলাভ করবে, সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' সময় সময় এই পাঠ্যের পরিচয় পাঠ্যে দায়, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় নিশ্চয়ই সেই পরিগর সামান্য; তা-তাত্ত্বিক বহুদিন ব্যবধানে সে সর্বের প্রকাশ দীর্ঘবিলম্বিত-ও যত। সাহিত্যচর্চায় একটি বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তনের পক্ষে তা যে যথেষ্ট নয়, তা হয়তো উজ্জ্বলতার ও বলবৎ; বরঞ্চ, একত্র "বিষভারতী পত্রিকা" স্থানিতাবে একটি বিভাগের প্রবর্তন প্রেরণ কিনা, বিশেষভাবেই তা বিবেচ্য। বলাবাহুল্য, দেশের পত্রিকামাঝেই এ কাজ সক্রিয় হতে পারেন ও হবেন এইরূপই সম্ভব।

এরূপ যোগাযোগ-ব্যবস্থার বিষভারতী ও লোক-সাধারণের মধ্যে রবীন্দ্র-শীলন ব্যাপকতার হলে নিখুঁত পাঠ সম্বন্ধে উদাসীনতা ও অনস্বিধাবোধ দুইই যেমন দূর হবে, সাহিত্যিক উপভোগের সুরোগও বাড়বে।—তখন চারিদিক থেকেই কবি সম্বন্ধে বহুলোকের অনুসন্ধিসা, পাঠসম্বন্ধে প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা উপহার-সমূহের স্বতঃস্ফূর্ত

সাহায্যের যোগে বিত্তম পাঠ্যবিচার করে একদিন সেকসপীরের মতোই রবীন্দ্ররচনাবলীরও উন্নততর সংস্করণ প্রকাশের কাজ এগিয়ে থাকবে এবং প্রকাশের সময়ও নিকটতর হবে। এতে প্রকাশক এবং পাঠক, বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ সকলেই যে লাভবান হবেন, তা খুবই বলা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যেখানে পাঠন-পাঠনের মান, ক্রমোন্নত হয়ে রবীন্দ্র পুঁতুর-টি আরো সমৃদ্ধ হবারই কথা। নৈমিত্তিক সাময়িক উৎসব, এই 'পাঠ্যচর্চা'ধারার প্রবর্তনক্রমে, সার্বকর্তর হয়ে চলবে নিত্যকার উৎসবে। ভারতবাসী তথা বাঙালীগণমাজের কাছে এটি যে একটি স্মরণীয় জাতীয় গাঢ়িষ, বিশেষভাবেই তা এ উপলক্ষে স্মরণীয়। রাইয়ের অন্ত কোনে কোনে থেকে একান্ত গুরু করার আগে বিষভারতী যদি যথোচিত ব্যবস্থা ও তৎপরতা সূচ্যে এর সংগঠনে অগ্রণী হন, তবে তা শোভন হয়; সকলেরই স্বাক্ষর উল্লেখ করে তা যে আনন্দজনক হবে, তা সম্বন্ধেই অন্বয়ে

অনেকদিন ধরে অপর অনেকের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগের অপেক্ষা করা গেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে এই পাঠ্যের দায়টি স্বাভাবিক সাগরে সাগরিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে ও প্রতিষ্ঠা পায়, এইজন্য জনসমাজের চৃষ্টি ও সহযোগ আকর্ষণ করা এবং সে-মর্মেই প্রজ্ঞাবোধ অবশেষে সাময়িক-পত্রাক্রান্ত করা আবশ্যিক হলে করেছে। রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষিক উৎসবের উজ্জ্বলতার বিশেষভাবেই নিবেদনটি ভেবে দেখতে বলি।

এ প্রস্তাবের উপযোগিতা বিবেচিত হলে, বিষভারতীর সহায় কড়পাকের সাধুপ্রয়াসের থেকেও যে সম্ভবপর আরো সুষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে, সে প্রত্যাশা একান্ত স্বাভাবিক।

একটি কবিতা

পদ্মা কুণ্ড

ওঁকে নায়ক করে' লিখবে একটা গল্প
অনেক দিনের সখ ও'র।
কিন্তু আমি, কইবা জানি ও'র সম্বন্ধে,
তবু জানি না-টা—
ও'র নাম 'লিরক'।
আমারই দেওয়া নাম—
আসল নাম জানিনা।
কিন্তু তবু লিখতে হবে।
দ্রোহের তাপে তপ্ত তরুণ পিয়ন সে।
কেন জানিনা চটাই সে বললে,
"লিখবে একটা গল্প আমাকে নিয়ে?"
স্বভাবের তাগিদে হেসেছিলাম আমি,
শোনালে ও,—"জানি লিখবে না—"
আমি যে পিয়ন, তোমার নায়ক তো পিয়ন হবে না।
হবে কলক-ই ডেই ব্রহ্মতো শিল্পী।"

বীকার করিনি আমি।
মিছেছিলুম কথা—"লিখবে গল্প
তোমাকে নিয়ে।" কিন্তু খেটা
নিজে জানিনা, সেটা অপরকে জানাব
কেমন করে?
কিন্তু তবু লিখতে হবে।
যদিও কথা রাখা আমার কাছে
বড়ো কথা নয়—তবু ভাল লাগে।
তাই হবে, ভালই লেগেছে ওকে
অবাক হয়েছি আমি, কেন ও অনুবোধ
এক অচেনা মেয়েকে?
তবে ও'রও কি-লেগেছে ভালো?
তবে ত' লিখবে-ই হবে গল্প
ওঁকে নায়ক করে—
না হয়, আমিই হবো ও'র 'নায়িকা'।

সুখ্য সেন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ঐতিহাসিক ভূট্টাচার্য

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে ভারতমাতার যে দুই বীর সন্তানের অবাধ অকুলনীয়া, বীরের স্বয়ংগত চেষ্টা ও আত্মত্যাগ বৃটিশ সাম্রাজ্যের দুট বনিয়াদে ফাটল ধরিয়েছিল, বাঁরা নিজের চোঁয় ভারতের লোক নিয়ে মুক্তিযোঁক গঠন করে বিশাল বৃটিশ বাহিনীর ওপর খাঁপিয়ে পড়ে এক ভারতের পূর্বাংশে সাময়িকভাবে ত্রিবিধরঞ্জিত ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, বীরের কাজ বৃটিশ জাতির মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে—এক বৃটিশকে ভারত ত্যাগে অহুঃপ্রেরিত করে, সেই দুই মহান নেতার একজন সুখ্য সেন, সারা বাংলায় 'মাষ্টারদা' নামে পরিচিত এবং অজ্ঞান বিখের সর্বত্র পরিচিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস।

শেষকে ডালবাগ, দেশের মুক্তি আনয়নের চেষ্টা করার অপরাধে প্রথমোক্ত নেতার ক্রীসি হয় ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪ সাল এবং শেষোক্ত নেতার জন্ম হয়—২৩শে জানুয়ারী ১৮৯৭ সাল। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের উক্ত দুইটি দিবসে ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ—বাঙালীরা, এই দুই মহান নেতার স্মৃতি স্মরণ করে তাঁদের অমর আত্মার প্রতি বেঙ্কাপ্রণোদিত ভক্তি-ভ্রম্মা নিবেদন করে থাকে।

এই দুই মহান নেতার কাজে অনেক স্থলে সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রথমতঃ দুইজন নেতাই বাঙালী, এবং দুইজনই জীবনের প্রথম হস্তে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ছিল বৃটিশকে বিতাড়িত করে ভারতকে বিদেশী-শাসন-মুক্ত করা। দুইজনেই কংগ্রেস-কর্মী ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে কংগ্রেস ত্যাগ করে ত্রিবিধরঞ্জে ভারতের মুক্তি আনয়নের চেষ্টা করেন।

এই দুই নেতার জীবনের শেষের দিকটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিপূর্ণ এবং তন্মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের চেষ্টা অজুতম। এই দুই বাঙালী বীরের গঠিত দেশীয় কোজের সঙ্গে বৃটিশের সেনাবাহিনীর সংগ্রাম সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া গেল।

সুখ্য সেন ছিলেন একজন স্থল-শিক্ষক, তাই তিনি মাষ্টারদা বলিয়া পরিচিত, ভারতের মুক্তির জন্য তিনি একটি বিপ্লবী-বাহিনী শাসনের অলঙ্ক্য গঠন করেন এবং ঐ বাহিনী গঠন হওয়ার পর তিনি স্বরোগে যুক্ত হন—কোন সময়ের বিভাগে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম পরিক্ষণে স্বরোগে যুক্ত হওয়ায় বিদেশী-শাসনমুক্ত করা যায়।

তখন আইন-সমাজ-আন্দোলন শুরু হয়েছে, দেশের অন্তঃস্থলে বৃটিশ-বিখের পূজাভূত, বিপ্লববাহি ধূমায়মান, ইংরেজকে আঘাত হানবার এইটি উত্তম স্বরোগে মনে করলেন সুখ্য সেন।

বিপ্লবী দলের সকলের সম্মতি নিয়ে তিনি একটি কথিতালিকা প্রস্তুত করলেন। বিপ্লবীদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে অধিকা চক্রবর্তী, নির্বাল সেন, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য—এই ছয়জনের ওপর ভার দিলেন কথিতালিকা মতে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য; এক কথায়, সর্বাধিনায়ক সুখ্য সেনের অধীনে এই ছয়জন নির্ধাচিত হলেন বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতি,

সুখ্য সেন তাঁর এই বিপ্লবী বাহিনীর নাম দিয়েছিলেন—ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী।

১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সাল, সুখ্য সেনের নির্দেশে নির্ধাচিত নায়কগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষার রইলেন। ব্যতীতার মধ্যে দিন শেষ হয়ে গেল, বীরে বীরে যাত্রী তাঁর কালোবাঁশ আঁছর করে দিল চট্টালয় বুক।

এইবার আক্রমণের পালা, লোকনাথ বল আটজন সৈনিক যোগে সজ্জিত বিপ্লবী নিয়ে আক্রমণ করলেন চাটগাঁ শহর থেকে কিছুদূরে অবস্থিত পাহাড়তলী অস্ত্রাগার, পাহাড়াওয়ালারা বাঁধা দিতে চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীর পক্ষ হতে গুলু গুলু বন্দুকের শব্দ—নিমেষের মধ্যে পাহাড়াওয়ালারা সরে পড়ে। তখন সার্কেট মেজর ফারেল গুলী করতে উদ্ভত হলেন। কিন্তু সে সময়ে বিপ্লবীদের গুলি এসে তার বুক পড়ে এক সঙ্গে সঙ্গে সে ধরাশায়ী হয়, রেলওয়ে অস্ত্রাগার লুট করলেন বিপ্লবীরা।

বীর অনন্তসিংহ ও গণেশ ঘোষ তাঁদের দল নিয়ে মোটর ভাড়া করে বেহিয়ে গেলেন এবং একই সময়ে আক্রমণ করলেন পুলিশ-অস্ত্রাগার, তখন বাত দশটা হয়নি। সাময়িক শোঁক্যক পরিহিত বিপ্লবীরা গাড়ী থেকে নেমেই গুলী চালাতে শুরু করেন, এখানে পাঁচশো পুলিশ থাকতো, অতক্ৰি আক্রমণে যে বেদিক পাললো প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলো, পুলিশ-অস্ত্রাগার বিপ্লবীদের দখলে এলো।

একই সময়ে অধিকা চক্রবর্তী তাঁর দলবল নিয়ে আক্রমণ করলেন টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, এখানেও অতক্ৰি আক্রমণে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও অপারেটর প্রভৃতি অক্ষকারে পালিয়ে যায়।

চাটগাঁতে যাতে বাইরের সেনা আনতে পারা না যায়, এই উদ্দেশ্যে ধুম ও লাংগলকোটের কাছে একদল বিপ্লবী গিয়ে রেল লাইন তুলে ফেলে।

নির্দিষ্ট কাজ শেষ করে প্রত্যেকটি দল এসে সমবেত হল পুলিশ-অস্ত্রাগারে, যন সন "বন্দেমাতরম" ও "ইন্স্কাব জিন্দাবাদ" ধ্বনির মধ্যে সেখানেই সাময়িক স্বাধীন বিপ্লবী সরকার গঠিত হল এবং সুখ্য সেন নির্ধাচিত হলেন তার সর্বাধিনায়ক।

সকাল না হতেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইউরোগীহানদের সকলকে নিয়ে জাহাজে নদীর মাঝখানে গিয়ে নেতৃত্ব ফেলে রইলেন। তিন দিন সারা চট্টগ্রামে ইংরেজদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। চট্টগ্রামের আশালত, পুলিশ-অফিস ইত্যাদির ওপর ভারতের ত্রিবিধরঞ্জিত পতাকা উড়তে থাকে। ভারতে বৃটিশ আগমনের পর এই প্রথম এবং শেষবারের জন্য চাটগাঁয়ের ওপর জাতীয় ত্রিবিধরঞ্জিত পতাকা সাময়িক ভাবে দেখা যায়।

বিপ্লবীরা আশ্রয় নিলেন সহরের নিকটবর্তী জালালবার পাহাড়ে।

২২শে এপ্রিল বিপুল গোরা সৈন্য এসে ঐ পাহাড় চারিদিক থেকে আক্রমণ করে। সুখ্য সেনের আদেশে জাবার বুক শুরু হয়। উভয় পক্ষের গুলী-বিনিময় চলল সাধারন। বিপ্লবী দলের বারো জন এই যুদ্ধে নিহত হলেন, কিন্তু তাদের তুলনায় গোরা সৈন্য নিহত ও

আহত হল অনেক বৈদ্য। জালালাবাদ পাহাড়ে মুক্তিযেয় বাঙালী যোদ্ধার যে কৌশল, যে বীরত্ব, যে দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল—অগণিত অস্ত্রশস্ত্রে অসজ্জিত ব্রিটিশ সেনার বিরুদ্ধে, তাহার তুলনা মিলে না।

রাত্রির অন্ধকারে বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড় থেকে সরে পড়ে। একটানা তিন দিন তিন রাত তাদের পেটে পড়েন খাদ্য, ঘুমে পড়েন এক কৌটা জল, কী দুঃসহ কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতিটি স্নান কেটেছে, তা বর্ণনা করার মত ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অবস্থার তীরা অদৃষ্ট হয়ে বান চারদিকে।

সূর্য্য সেন আত্মগোপন করেও মলের ছিন্ন-স্থরের বোগসাধনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এইদিকে বিপ্লবীদের ধরবার জন্ত ইংরেজরা সর্বত্র কীদ পেতেছে।

এই যে ছয়জন পলাতক বিপ্লবী গ্রাম সহরের নিকটবর্তী খোতাং মহল আক্রমণের উদ্দেশ্যে বন্দা হয়, তাদের নাম রজতকুমার, মনোজ্ঞন সেন, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত, ফকির নন্দী, বনেন্দ্র রায় ও সুবোধ চৌধুরী, কিন্তু গিয়ে দেখে সেখানে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন। আক্রমণ অসম্ভব দেখে তারা ফিরে আসা রজতের বাড়ীতে, তারা ভাত খেতে বসেছে, এমন সময় খবর পেলো পুলিশ এসেছে, বাড়ি ভাঙ পড়ে রইল, তারা গালিয়ে গেল নদীর দিকে, কিন্তু বিরাট পুলিশ-বাহিনী তাদের আক্রমণ করে এবং কালোরাপোলবাসী সমস্ত মুসলমান হল বেঁধে পুলিশের সাহায্যে এগিয়ে আসে। একদিকে বিরাট বাহিনী, অপরদিকে দুর্গাধার রজত ছয়জন বিপ্লবী—আরম্ভ হল দুইপক্ষের গুলী-বিনিময়, সুবোধ চৌধুরী ও মনোজ্ঞন নন্দী সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে ধরা পড়ে। অবশিষ্ট চারজন মুখ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

এর পর আরম্ভ হল পুলিশ আর মিলিটারীর তাণ্ডবলী। জেলার সর্বত্র অসংখ্য পুলিশ-কীড়ি এবং মিলিটারী-খাটি বসল, সর্বত্রই কিল, চড়, লাথি, লাঠি আর সঙ্গীনের খোঁচা চলল অবিচলভাবে, নরনারী নির্বিশেষে সকলের ওপর, অনন্ত নিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি ধরা না পড়া পর্যন্ত এইভাবে শাসকেরা অত্যাচার চালিয়ে যেতে মনস্থ করে।

অবশ্য চরমে উঠেছে দেখে অনন্ত নিজেই কলিকাতার পুলিশের নিকট ধরা গিলেন। লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রভৃতিও ধরা পড়লেন। এঁদের পর শাসকেরা চেষ্টা করে সূর্য্য সেন, নিমল সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারকে গ্রেপ্তার করতে।

এই সময়ে চট্টগ্রামে গোয়েন্দা পুলিশের কর্তা আসামুহুরার অত্যাচার সকলকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তাঁর নাম শুনেও জেলার সকলের, বিশেষতঃ হিন্দু নরনারীর, বুক কেঁপে উঠত, একদিন হরিপদ ভট্টাচার্য্য নামক এক চৌদ্দ বৎসরের বালক তাকে গুলী করে হত্যা করে; হত্যার অপরাধে এই বালকের উপর ইংরেজরা বর্কোচিত অত্যাচার চালায়। আসামুহুরা হত্যার পর চট্টগ্রামে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। গ্রাম ও শহরের সর্বত্র পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী মুসলমান গুণ্ডাদের নিয়ে সর্বত্র লুণ্ঠন, অত্যাচার, নারীর অমর্যাদার অভিযান চালিয়েছে। বিপ্লবীরা এই সময়ে হুপ থাকে না, সুবোধ পেনে ইংরেজদের আক্রমণ করে, হত্যা করে এবং এইভাবে প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু

বিপুল ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযেয় বিপ্লবীর পেরে উঠা সম্ভব হল না। ইংরেজদের আক্রমণ করতে গিয়ে অনেক বিপ্লবী মারাও যার। এইবার বিপ্লবী মলের নেতা সূর্য্য সেনকে ধরবার জন্ত ব্রিটিশ প্রশাসকরা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

ধলঘাটের নিকটবর্তী শৈবলার গুপ্ত আশ্রয়কেন্দ্রে সূর্য্য সেন, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, অশীল দাসগুপ্ত, মণি দত্ত, ভ্রাজেন সেন একসঙ্গে ভবিষ্যৎ বিপ্লবী পরিকল্পনার মন দিয়েছেন, ভ্রাজেন সেনের বাড়ী থেকে তাঁদের খাবার আসে। দশহাজার টাকার লোভে নেত্র সেন নামে একজন বিশ্বাসঘাতক সূর্য্য সেনের আশ্রয়কেন্দ্রের খবর দেয় ইংরেজদের নিকট।

ক্যাপ্টেন ওয়াশলী বহু পুলিশ নিয়ে নেত্র সেনের সাহায্যে বিপ্লবীদের গুপ্ত আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে ফেলে, নেতা সূর্য্য সেন আত্মহত্যার জন্ত নিজের রিডলবার খুঁজলেন, কিন্তু সেটাও তাঁর অলক্ষ্যে অপরিস্রব হয়েছিল। তিনি ধরা পড়লেন। কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী প্রভৃতি অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন।

এবার সূর্য্য সেনের স্থানে মলের সর্বাধিনায়ক হন তারকেশ্বর দস্তিদার। একদিন তিনি গুপ্তকেন্দ্রে বসে কাজ করছিলেন, এমন সময় পুলিশ ও মিলিটারী এসে তাঁদের আশ্রয়স্থল গিয়ে ফেলে। এদের সঙ্গে গুলী-বিনিময়ে দু'জন বিপ্লবী বীর নিহত হন এবং তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত বন্দা হন।

পূর্বে অনেক বিপ্লবীর যাবজ্জীবন দীপান্তর দেওয়া হয়েছিল, এবার সূর্য্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিচার আরম্ভ হয়। বিচারকের রায়ে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের কীসির হকুম হল এবং কল্পনা দত্তের হল যাবজ্জীবন দীপান্তর।

সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের কীসির দুর্ভাগ্য ব্রিটিশ জাতির চরম বর্বরতার নিদর্শন। গভীর রাতে ইংরেজপ্রহরা কারাকেন্দ্রের দরজা খুলে ঘুমন্ত নেতাদের টেনে বের করে কীসি দেওয়ার জন্তে। কীসির মক্কা পর্যন্ত প্রহরার কর্তৃপক্ষের আদেশে নির্মম প্রহর চালাতে থাকে দু'জনের ওপর। অত্যাচার এবং নির্মম প্রহর সহ্য করেও সূর্য্য সেন ধনি দিতে চাননি, 'বন্দেমাতরম', 'ইনক্বাব জিন্নাবাদ', 'একই সঙ্গে সূর্য্য সেন (মাষ্টারদা) ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে কীসির মকে এনে ঝাঁড় করানো হল, কয়েক মিনিটের মধ্যে দুই নেতার কীসি দেওয়া হল।' আগ্রত পাখানপুরীর প্রতিটি কক্ষে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠল—'বন্দেমাতরম' 'মাষ্টার দা জিন্নাবাদ'। হুশো বহর ইংরেজরা ভারতবাসীদের নিরস্ত্র করে রেখেছে, তাই তাদের ধারণা হয়েছিল ভারতবাসী আর অস্ত্রচালনা করতে পারবে না। কিন্তু সূর্য্য সেন এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রমাণ করলেন যে, স্বাধীনতার জন্তে এই দেশবাসী সশস্ত্র সংগ্রাম করতে পারে। চট্টগ্রামের ঘটনা শাসকের মনে ভয়ের সঞ্চার করে এবং শাসকেরা বুঝতে পারে যে, ভারতে তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

চট্টগ্রামের ঘটনার পর ব্রিটিশের মনে যে আতঙ্ক হয়েছিল, পরবর্তীযুগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে আত্মা-হিন্দু বাহিনীর সংগ্রাম সে আতঙ্কে আরও বাড়িয়ে দেয় এবং সমগ্র ভারত-ভাগ্যের পথ শাসকেরা খুঁজতে থাকে। এই আত্মা-হিন্দু কোজের সহস্র সংগ্রামের কাহিনী সন্দেশে নিয়ে উল্লেখ করা গেল।

১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর, জাপান অতিক্রম পাল হারবার আক্রমণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। দেখিতে দেখিতে আমেরিকা ও ব্রিটনের অনেক বাঁটি জাপানের হস্তগত হয়। তারপর সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি জাপানের দখলে আসে। বহু ভারতীয় সেনা সেই সময়ে পূর্ব-এশিয়ার ইংরেজ-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মোতায়েন ছিল, ব্রিটিশ সৈন্য মালয়, সিঙ্গাপুর এবং অবশেষে ব্রহ্মদেশ হইতে পশ্চাদগমন করায় সেখানকার ভারতীয়-সৈন্য—জাপানের হাতে বন্দি হয়। জাপানীরা ভারতীয় সৈন্যদের ক্যাপটেন মোহন সিংহের হাতে সমর্পণ করে। মোহন সিং জাপানে বাসবিহারী বোসকে এই সংবাদ দেন। বাসবিহারী বোস এই সংবাদ পেয়ে জাপানে পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয়দের হুঁড়িয়া এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় স্থির হয় যে, জাপানীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে না। ভারতীয় সৈন্যরাই ইংরেজকে বিতাড়িত করে নিজেদের দেশ মুক্ত করবে। জাপান অস্ত্র বাজী হল ভারতীয় বাহিনীকে আন্তর্জাতিক অগ্রগামী সরবরাহ করতে, এই সভা থেকেই আজাদ-হিন্দ-সংঘ গঠিত হয়।

সুভাষচন্দ্র বোস ইতিপূর্বে ভারত ত্যাগ করে অফগানিস্তান হয়ে জার্মানিতে উপস্থিত হন এবং হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন। বাসবিহারী বোস সুভাষচন্দ্রকে জাপানে আনাইলেন (২১/১১/৪৩ সাল)। তাঁহার অনুমোদনে সুভাষচন্দ্র আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বময় কর্তা হলেন। সুভাষচন্দ্র আজাদ-হিন্দ ফৌজকে নতুন মন্ত্র দিলেন—‘জয়হিন্দ’। তাদের সামরিক ধ্বনি হল ‘দিগ্ভী চলো’, তাদের পূণ হল সর্ব্বথ বিনিময়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন—লালকেলার উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ গভর্নমেন্ট নামে একটি অস্থায়ী গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র হলেন ইহার রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী এবং সমর ও পররাষ্ট্র সচিব, তাঁহার নিম্নোক্ত আজাদ-হিন্দ ফৌজ পরিচালিত হবে স্থির হল। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সংঘটন ও ভারত-অভিযানের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করতে ১৯৪৩ সাল কেটে যায়। তখন এই বাহিনীতে ৬০ হাজার সৈন্য ও ৪ লাখ অফিসার। এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সুভাষচন্দ্র আজাদ-হিন্দ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ভারতের মুক্তি পূর্ণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রেরিত হন। ১৯৪৪ সালের প্রথমদিকে আজাদ-হিন্দ সরকারের দপ্তর সিঙ্গাপুর হতে বেঙ্গলে স্থানান্তরিত হল। তারপর ঠাণ্ডা ফেব্রুয়ারী ভারতের দিকে অভিযান আরম্ভ হল। নেতাজী মাত্র ৬০ হাজার ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত বাহিনী নিয়ে ইংরেজ ও আমেরিকার মিলিত শক্তির সম্মুখীন হলেন।

এইমধ্যে ইংরেজরা মিথ্যা প্রচার শুরু করে দিয়েছে—আজাদ-হিন্দ সব জাপানের কীৎসদার। ভারতবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ নেতাজীর বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করে, অবশ্য ভারতবাসীদের মধ্যে যারা এই অপপ্রচার করেছে, পরবর্তীতে তাদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজ ব্রহ্ম-সীমান্ত পার হয়ে আসামে প্রবেশ করে। মেজর জেনারেল লী নটরহাম ইংফল অবরোধ করেন এবং স্বাধীন ভারত

কৃমিতে দ্বিগুণরুজিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।—১৫ অক্টোবর, বর্গমাইলের বেশী ভারতবাসী আজাদ-হিন্দ ফৌজের দখলে আসে, কোচিমা এবং তৎপার্বত্য আরও অনেক অঞ্চল ইংরেজদের দখল হতে মুক্ত করা হয়।

কিন্তু অস্ট্রেলার পরিত্যক্ত, এই সময় ভীষণ বর্ষা নামে। দুর্গম অরণ্য ও গিরিপথ পার হয়ে মুক্তি-ফৌজকে ভারতে আসতে হয়েছে। বর্ষার দরুন তাঁদের যোগাযোগ রক্ষা ও রসদ সরবরাহের কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক সৈনিক আমাশয়ে আক্রান্ত হয়। বাধা হয়ে অগ্রগামী দলকে পেছিয়ে আসতে হয়।

বর্ষার কোচিমা-টম্বলের পথে বহু আত্মহী সৈন্য অবস্থান হয়ে পড়ে। জাপানীরা প্রত্যাশ্রিত অসুস্থরাই আজাদ-হিন্দ-বাহিনীকে অগ্রদূত দিয়ে লাভ্য্য করল না।

ক্রমে ক্রমে ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্য ব্রহ্মদেশ অভিযান করল। এই অবস্থায় আজাদ-হিন্দ সরকারের দপ্তর বেঙ্গল হতে সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত করতে হল। সুভাষ চন্দ্র সিঙ্গাপুর বাতীর প্রান্তরে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর প্রশাসন করে একটি বাগী প্রদান করেন। প্রথম পর্যায়ে ভয়া হতে না পারায় তিনি আশা ত্যাগ করেন নাই, তিনি ভানালেন—‘আমি চিরদিন আশাবাদী, কোন অবস্থাতে পরাজয় মেনে নিব না।’

ইতিমধ্যে জার্মানরা হেরে গিয়েছে। এটিম বোমা জাপানীদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়, তারা আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে নেতাজী সিঙ্গাপুর হতে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আর একটি বাগী প্রেরণ করেন। পরদিন প্রত্যুষে বাসবিহারী বোসের সঙ্গে পরামর্শের জন্য তিনি বিমানযোগে টোকিও যাত্রা করেন। কিন্তু পথে বিমান-দুর্ঘটনায় তিনি ত্রয়ানকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে প্রেরিত হন। সেখান থেকে চারিদিকে প্রচার হল তিনি মারা গিয়েছেন। অবশ্য ভারতবাসীর মন এখনও এই কথা বিশ্বাস করতে চায় না, এখনও মধ্যে মধ্যে প্রচার হয় নেতাজী বেঁচে আছেন।

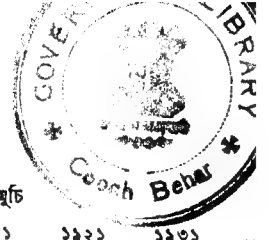
জাপানের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনা ও অফিসারদের বন্দি করে ভারতে আনে। দিল্লীর লালকেলায় তাদের বিচার শুরু হয়। ইহার প্রতিবাদে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অস্ত্র প্রাপ্ত পর্যন্ত আলোড়ন হয়; ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সেনারা বিদ্রোহ করে। ভারতবাসীর বিক্ষোভ দেখে ইংরেজরা আর অগ্রসর হতে সাহস করল না, আজাদ-হিন্দ ফৌজের অফিসারদের মুক্ত দেওয়া হল। আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারতকে মুক্ত করতে পারে নাই, কিন্তু পরোক্ষভাবে ভারতের মুক্তি অর্জনে ইহার অবদান অতুলনীয়, সিঙ্গাপুর-বিদ্রোহের পর ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ভিত্তিমূলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং গিরদ্বী সূর্য সেন, এই দুই নির্ভীক বাঙ্গালী বীর, প্রাণ ও আঘাত হানে, বাহা পরবর্তী সময়ে ব্রিটনকে ভারত ত্যাগে জব্বপ্রেরিত করে।

ভারত বর্তমানে স্বাধীন, তবে ভারতবাসীর নিকট একটি প্রশ্ন—ভারত কি নেতাজী এবং মণ্ডীরদার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করেছে—এবং পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ববঙ্গে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল হিন্দু নরনারীর দিকে দেখে কেহ কি বলতে পারেন,—এই স্বাধীনতা ভারতের জনগণের মঙ্গল আনয়ন করেছে?

আধুনিক বঙ্গদেশ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক নিম্মলকুমার বসু



মেদাস রিপোর্ট

পশ্চিমবঙ্গকে সামগ্রিকভাবে দেখলে এবং ১৯০১ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার মেদাস-রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, রায়পুরের সিংহদের অথবা শান্তিপুর সহরের ইতিহাসে যে পরিবর্তন ঘটেছে। তা সমগ্র প্রদেশেই বিস্তারিত করে দেওয়া। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, কালক্রমে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাবে কতিগ্রস্ত হয়েছে।

নীচের তালিকা থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে, চিত্রাচরিত বৃত্তি পরিবর্তনের গতি অসমান তো। বটেই, বৎ যে সমস্ত জাতি সহরে চলে গিয়ে লাভজনক বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়েছে এবং যে সমস্ত জাতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলা হারিয়ে শিল্প-শ্রমিক অথবা ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে, তাদের উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নগর ও সহরের নিকটবর্তী বায়গায় এবং বানবাহনের যোগাযোগ-বিহীন অঞ্চলে কি করে এই অবস্থা ঘটেছে, তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা করে আবিষ্কার করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

মেদাস রিপোর্ট থেকে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা' লেখকের পূর্বকার এক প্রবন্ধ থেকে নীচে দেওয়া হল :—

কুমার

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	১৯৫,৫৫৩	২৭৮,২০৬	২৮৪,৫১৪	২৮১,৬৫৪
রোজগারী লোকজন		১২,৬৫১	৭৫,৩২৬	৫৩,৫০৬
শিক্ষিতের শতকরা হার	৬.৫৪	৮.০৪	১০.১৮	১.৬৬

শতকরা কতজন আছে :

চিত্রাচরিত বৃত্তিতে	৭৫.১৬	৭০.৮০	৬১.৬১	৫৮.৮৭
কৃষিকার্যে	১৬.৬০	১০.৪০	১১.৭৬	১১.৮১
শিল্পে		৭৮.১৪	৬৪.৫০	৬৬.৬৬
উচ্চতর বৃত্তিতে		০.৮৫৭	১.২৮৮	৪.৩৫৭

কামার

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	১৭৬,৮৭৩	২০৮,৫১৫	২৫৬,৮৫৩	২৬৫,৫২৬
রোজগারী লোকজন		৮৬,১০২	৮১,৬৩৩	৮১,৭১০
শিক্ষিতের শতকরা হার	১০.৩৪	১৪.১৮	১৭.৮৮	১৪.১১

শতকরা কতজন আছে :

চিত্রাচরিত বৃত্তিতে	৪৭.৩৫	৫৭.৪৮	৩৪.১১	৪৩.৭৬
কৃষিকার্যে		১১.৩০	২৬.০২	২১.৮১
শিল্পে		৬৭.৫৩	৫২.০৪	৫৩.১১
উচ্চতর বৃত্তিতে		১.৭৪৫	১.৭৬০	৫.০২১

চামার ও হুটি

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	১৬,৩১১	৫৩৬,৩৩১	৫৬৪,৮৭১	৫৬৪,৬৮২
(শুধু চামার)				

রোজগারী লোকজন	২৩৮.০৫৮	২৪৪,১৪৫	২১৭,৩৬৬	
শিক্ষিতের শতকরা হার	৩.১১	২.১৭	৩.১১	৪.৫২
শতকরা কতজন আছে :				
চিত্রাচরিত বৃত্তিতে	২৩.২৬	৩৩.৭৭	২৩.২৪	২৪.৫১
কৃষিকার্যে	৩৩.৪৭	৩২.৩৩	২৮.৬০	৩২.৮৮
শিল্পে		৬৭.০৬	৪১.৮৪	৪৫.১৩
উচ্চতর বৃত্তিতে		০.০৫৪	০.৪৪১	১.৭৭১

বাগ্‌দী অথবা বগ্‌কট্রি

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	৭০৩,১৪৭	৮৪৭,২৫৮	৮৮৬,৮২১	৯৮৭,৩১৫
রোজগারী লোকজন	৫২২,৭৭২	৬৭১,৪৭৭	৬৬৬,৪৫৫	
শিক্ষিতের শতকরা হার	১.৫৭	১.১১	২.১৩	১.১২
শতকরা কতজন আছে :				
চিত্রাচরিত বৃত্তিতে	৭০.১৩	৭১.২৮	৪২.২৮ (৭)	৬১.৭১
কৃষিকার্যে		৭০.৪১	৬৮.৬৬	৫.০৩
শিল্পে		১০.০৫	১.২৩	৫.০৩
উচ্চতর বৃত্তিতে		০.২৪৭	০.৩৫৫	১.১৭১

গোয়াল

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	৪১৪,৬১১	৫৮৩,৭১০	৫৮২,৫৭৭	৫১১,২৮১
রোজগারী লোকজন	২৫১,৮২১	২৩১,৪২১	২১৭,৪৩৮	
শিক্ষিতের শতকরা হার	৬.৩৮	৭.৬৮	১০.৫৭	১০.১৭
শতকরা কতজন আছে :				
চিত্রাচরিত বৃত্তিতে	৪১.৪৫	৩১.৩১	২১.৩০	২৪.৭৭
কৃষিকার্যে		৪১.০০	৪২.১১	৬৭.৪১
শিল্পে		৬.৪৭	৭.৪৩	৭.২৮
উচ্চতর বৃত্তিতে		১.৬৫০	১.৮৭০	৫.৪২১

বৈজ

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	৩১,৩৫৭	৮৮,২১৮	১০২,৮৭৭	১১০,৭০১
রোজগারী লোকজন	২১,১৩৩	২৪,১১৪	২৬,৫২২	
শিক্ষিতের শতকরা হার	৪৫.৬২	৫৩.২১	৫৭.৫২	৫১.৭১
শতকরা কতজন আছে :				
চিত্রাচরিত বৃত্তিতে	৩৮.১০	২০.১১	১৫.০২	১৮.৮০
কৃষিকার্যে		৭.১৬৩	১২.৪১৮	৬.০৪

শিল্পে	২'১৩	১'২২	১'৮৫
উচ্চতর বৃত্তিতে	৪৪'৬৩	৪৬'৮১	৪১'৪০

ব্রাহ্মণ

	১১০১	১১১১	১১২১	১১৩১
জনসংখ্যা	১০,১১,৩৪৮	১১,১১,৮৬৭	১৩,৪১,৪০৫	১৪,৫৬,১৮০
মৌজাগারী লোকজন	৪০০,০৬৪	৪২৫,১৭৩	৪১৭,১৫৭	
শিক্ষিতের শতকরা হার	৩৫'৮৪	৩৯'৮৫	৪৩'১৫	৩৭'২৮
শতকরা কৃষকজন আছে :				

চিরাচরিত বৃত্তিতে	৩৩'৫৪	৩১'৭১	১৪'৫৭	১৬'৫৭
কৃষিকার্ষে	১১'৬৮৮	১৩'৬৪১	১৫'৩৮	
শিল্পে	২'১২	৩'৫৭	৪'৫০	
উচ্চতর বৃত্তিতে	৪৩'৭১২	৩৪'১৬	৩০'৭৬	

ভালিকাটি তুলনা করলে দেখা যাবে মোটের ওপর বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে দুই দিকে। কুমার, কামার অথবা চামার মুচির মত কাসিগর জাতিরা হয় ক্ষেতমজুর হয়ে গেছে, অথবা তাদের চিরাচরিত বৃত্তি হেডে শিল্পে দক্ষ-শিল্পী হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বা স্বয়ং বাঙ্গালী জাতির তুলনায় অনেক কম। ব্যঙ্গকবিত্বের (বাগ্মনি) চিরাচরিত বৃত্তি হল মাঠে চাষ করা। তারা সেটা যথেষ্ট পরিমাণে বজায় রেখেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার যথেষ্ট কম, কাষিগর জাতির জাতির মধ্যেও গড়ে যে শিক্ষিতের হার তাই রয়েছে কম। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতিরা চিরাচরিত বৃত্তির পরিবর্তন করেছে। তারা গুরু কৃষি ও শিল্পে নিবদ্ধ থাকেনি। উচ্চতর বৃত্তি যথা, চিকিৎসা, আইন ব্যবসায়, অফিসের নানাধিকার কাক, জমিদারী ও জমির উত্তরাধিকার প্রভৃতিতে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে। এদের মধ্যে শিক্ষিতের হার দেশের অন্যান্য জাতির মধ্যে গড়ে শিক্ষিতের হার অপেক্ষা বেশী।

আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, এই জাতিগুলোর শেষ অংশে যে জাতির উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে চিরাচরিত বৃত্তি বিশেষ ভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিভাবে হ্রাস পেয়েছে তা নীচে দেখান হল :

চিরাচরিত বৃত্তিতে
নিম্নক মৌজাগারী

ব্রাহ্মণ	৩৩'৫৪	২১'৭১	১৪'৫৭	১৬'৫৭
বৈজ্ঞ	৩৬'১০	২০'১১	১৫'০২	১৮'৮০

উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এখনও এখানে একই জাতির মধ্যে বিবাহের রীতি আগের মতই চালু আছে। উচ্চতর বৃত্তিতে অথবা কৃষিকার্ষে বিভিন্ন জাতির সমাবেশ ঘটলেও সেই পেশাগত ঐক্য তাদের প্রাচীন বিবাহ রীতিকে ভঙ্গ করতে পারেনি।

বাংলা দেশে কিভাবে পরিবর্তন ঘটেছে তার একটা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে অজয় নদ বীরভূম প্রদেশের সীমানা মেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দুটি জেলার সীমানা চিহ্নিত করেছে। এক সময়ে পুন্ড্র, রায়পুর ইলামবাজারের মত সমৃদ্ধ বাণিজ্যক্ষেত্রগুলো অজয় নদের তীরেই অবস্থিত ছিল। নদীগুলো তখন আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপথ হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে ইষ্ট-ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা দেশের সঙ্গে উত্তর

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সোজা বাতারাতের পথ খুলে গেল। এই রেলপথগুলো বীরভূমের উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রসারিত এবং অজয়, কোপাই, ময়ূরাক্ষী নদীগুলোকে সমকোণে অতিক্রম করেছে। এই রেলপথ অজয়নদিকে রায়পুরের কাছাকাছি একটি জারগা আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেছে।

রায়পুরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এই সংযোগস্থলে রয়েছে প্রাচীন গ্রাম বুড়া। এখন গ্রামের অবস্থা ক্রিয়াক্রান্ত। বর্তমানে অজয়ের উপরে যে রেলপুলটি আছে, তার তিন মাইল উত্তরে বোলপুর অবস্থিত।

দেশের সর্বত্র যেমন ছোট ছোট অসংখ্য গ্রাম রয়েছে, এক সময়ে এটিও সেইরকম একটি ছোট গ্রাম ছিল। এখানে একটি রেল স্টেশন হওয়ায় এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্যবসায়ীরা আসতে থাকার এর গুরুত্ব বেড়ে গেল। কিছুলোক এলো নদীতীরবর্তী সমৃদ্ধ গ্রামগুলো থেকে। ফলে ঐ গ্রামগুলো উপশ্লিষ্ট হয়ে রইল; আরও লোক এল বিহার থেকে অথবা রাজস্থানের মত দূরবর্তী প্রদেশ থেকে।

প্রথম যুদ্ধের সময় ঢালের দর বেড়ে গেল এবং বোলপুর স্থানীয় একটি ক্ষুদ্র বাজার থেকে ক্রমশ দেশের একটি বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত হল। রাতারাতি বহু ধানকল গড়ে উঠল। চাকিরকে রাস্তাঘাট ছাড়িয়ে পড়ল। গরুর গাড়ীর সংখ্যা বাড়লো এবং বোলপুর বাংলার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চাউল-ব্যবসায় কেন্দ্র হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব-আমদপূর-সাইখিরা প্রভৃতি রেল-স্টেশনগুলোও গুরুত্ব বেড়ে গেল। বোলপুরের গুরুত্ব কিন্তু সবার উপরেই রইল।

এই সহরের গত ৫০ বছরের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। জমির দর ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। রাস্তাগুলো উন্নত হল, অপরদিকে বন্দগোড়া অথবা ত্রিশূলাটির মত নিকটবর্তী গ্রামগুলোর রাস্তার পাশে গুদাম, কারখানা, দোকানপাট, বাসগৃহ ইত্যাদি গড়ে উঠতে লাগল। ক্রমে ক্রমে এলোমেলো ভাবে সব জায়গার মিউনিসিপ্যাল সহর গড়ে উঠলো। রাস্তাগুলোর সব দিকে ঘরবাড়ীর সংখ্যা বেড়ে গেল। সম্ভা, স্বল্প বায়ে মোটর পরিবহনের ব্যবস্থা হওয়ার পর থেকে রাস্তাগুলোর গুরুত্ব যেমন সব দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তার পাশে পাশে ঘরবাড়ী তৈরীর হিড়িকও বেড়ে গেল।

যে সমস্ত ব্যবসায়ী দোকানদার প্রথমে বোলপুরে এলো, তারা গোড়ায় পল্লীগ্রাম থেকে তাদের পরিবারবর্গ আনেনি। বহু দিন যেতে লাগলো, গ্রামের প্রাণন ও উৎসাহী নেতারা গ্রাম ত্যাগ করার গ্রাম-গুলোর অবনতি ঘটলো। ফলে তারা ও তাদের পরিবারবর্গও গ্রামের ভিটে থেকে সহরে এসে ভিড় জমাতে লাগল। কারণ তারা দেখল, আর কিছু না হোক, অস্বস্ত শিক্ষা আর চিকিৎসার সুবিধে গ্রামের তুলনায় এখানে সহজলভ্য। এইভাবে বাছা বাছা লোকগুলো সহরে চলে যেতে লাগলো এবং ধনী লোকেরা গ্রাম ছাড়ি-করার প্রাচীন শিল্পগুলো শ্রীহীন হতে আরম্ভ করলো। তাদের পক্ষে কলকাতার তৈরী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হল না। ফলে কারিকর শ্রেণীর লোক ক্রমবিস্তৃত সমুদ্রগুলোতে কাজের সন্ধানে গেলেন। বাকী-লকলে চামার মুচি শ্রেণীর জাতের লোকেরা যুদ্ধ কৃষিহীন ক্ষেত্রে মজুরে পরিণত হল। খুদোয় মজুরীর মূল্য কমে যেতে লাগল। এক কমে গেল যে, যেকোনো আগে আসে লক্ষ্য কলকার জাতিগত ভাগ শেত, সেক্ষেত্রে উপর-৪৭ বছর ধান পিছু ভাগচাক্ষুণ্য পুণ্ড্র

২০ বছার বয়সে ১৮ বছার গিরে পাঁড়াল। জমির মালিকের পাঁড়াল হল ২২ বছার।

বোলপুর সহরে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের নিয়মিত আনাগোনা চলতে লাগল। ধানকলে প্রচুর শ্রমিক কাজ পেতে লাগল। শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব এবং অস্থায়ী লোকজনের আসা-যাওয়া বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে মেট্রোপলিটানের সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের অবস্থা যখন এই রকম, তখন অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের সমৃদ্ধ চাবী ও ব্যবসায়ীরা সহরের উন্নতির সঙ্গে তাদের নিজস্বের স্বার্থ স্বার্থভাবে সংযুক্ত করে নিল। সহরের স্থূল এবং লাইব্রেরীর সংখ্যা বাসল, চিকিৎসা আরও সহজলভ্য হল, মিউনিসিপাল কার্যকলাপ ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হল। ফলে সহর বৃহত্তর এবং নানানভাবে উন্নততর হয়ে উঠলো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, চাউনি, ডোম, হুচি, সাঁওতাল শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোক পরোক্ষভাবে সহর-উন্নয়নের কিছুটা ফল পেলেও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই এ ব্যাপারে সব সময় অগ্রাধিকার পেতে লাগলো; ফলে নাচের স্তরের লোকেরা আগেই মতই দীন দরিদ্র এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে বাস করতে লাগলো।

লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, কারখানার মালিক, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক এবং স্থূল-মারীর প্রভৃতি নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণীর লোকেরা প্রাধান্য এলো পুরোনো সমাজের সমৃদ্ধ ভাতিগুলোর মধ্য থেকে। তথাকথিত নীচু ভাতের লোকেরা এ সুযোগ পাননি। কারণ, উঁচু ভাতের লোকেরা আগেই শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পেয়েছিল এবং সহর গড়ে ওঠার সময় গ্রাম থেকে সহরে চলে আসার আর্থিক সঙ্গতি একমাত্র তাদেরই ছিল। নতুন সহরে বৃদ্ধিগুলো গ্রামের দাবিকে বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বংশগত বিধি-বিধান মোটামুটি-এর এখানে অচল হয়ে গেল। ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়ে অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্যপূর্ণ এক নতুন সমাজ ধারার প্রবর্তন হল। সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে অসাম্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আগে 'উঁচু ভাতের' লোকদের মধ্যে চিরচলিত প্রথার যে সমস্ত সাংস্কৃতিক দায়িত্ব ছিল, তা ক্ষীণ হতে শুরু করলো।

স্বার্থের ব্যবধান

রাজনৈতিক কতৃৎস্ব ভূতের হওয়ার মধ্য দিয়ে এদেশে ইংরেজদের ব্যবসায় স্বার্থ ভূতভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এবং সেই স্বার্থের সঙ্গে সাম্রাজ্য এ দেশের মধ্যবর্তী শ্রেণী পাশ্চাত্যের দিকে মুখ করলো। ফলে গ্রাম ও সহরের স্বার্থের ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল। অষ্টাদশ শতকে শেখারকে ও উর্দুকান শতকের গোড়ার দিকে ও বাণিজ্যের মাধ্যমে যে স্থানকা সংগৃহীত হয়েছিল তা সব সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের মূলধনে রূপান্তরিত হয়নি। তার একটি মোটা অংশ জমিদারী ক্রয়ের ব্যয়িত হয়েছিল। কারণ তখন দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তিত অনিশ্চিত এবং দেশের স্বার্থের প্রতিকূল ছিল বলে লোক জমিদারীতে টাকা হারা কং নিরাপদ মনে করত।

ব্যবসায়ীরা এবং বৃষ্টিশ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের একেকটা এইভাবে যখন জমিদার হয়ে বসলো, তখন তারা তাদের সম্পদের একটা অংশ

পল্লীভবনের উন্নয়ন, মন্দির নির্মাণ, নদীতীরে স্নানের ঘাট তৈরী, ধর্মীয় উৎসব ও বিবাহ-অনুষ্ঠানে ব্যয় করতে লাগলো। ধনী দরিদ্র—নির্বিষয়ে গ্রামের প্রতিবেশীরা এই সমস্ত উৎসবে যোগ দিয়ে এক ঘরে মৈনন্দিন জীবনে কিছু পরিমাণে বৈচিত্র্য ধ্বজে পেত। ফলে তারা একেবারে স্বাভাবিক জ্ঞানতে লাগলো। সহরের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আসনের পুরুষের লোকেরা গ্রামের বাসাস্থতিকে আঁকড়ে ধরে গ্রামেই রয়ে গেল এবং সেইখানেই তাদের জীবনলালা শেষ হল। কিন্তু তাদের কল্যাণের সঙ্গে গ্রাম্যজীবনের যোগাযোগ ইতিমধ্যে ক্ষীণতর হয়ে আসার গ্রাম ও সহরের ব্যবধান বৃদ্ধি পেলে এবং এই ব্যবধান ক্রমশঃ পরিষ্কার ভাবে বেড়ে যেতে লাগলো।

সাংস্কৃতিক অসুসঙ্গতা

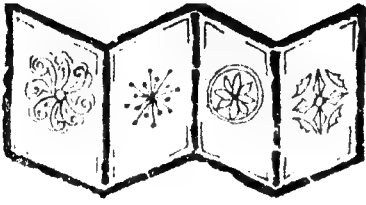
লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এদেশে ইংরেজের বাণিজ্যিক স্বার্থের লেজুড় হিন্দুরা যে দেশীয় নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠলো, তাদের উপর ইংরেজ-সংস্কৃতির প্রভাবও এসে পড়েতে আরম্ভ করলো।

শাক্তিপুরে তিলি ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রথম যুগে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ব্যবসায় ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারা এবং কলকাতার সুবর্ণ-বণিক, গন্ধবণিক, তদ্ব্যতির জাতি ও অন্যান্য জাতির ব্যবসায়ীরা সে যুগে ইংরেজ মহল্লার বড় বড় দালালের অনুকরণে ইউরোপীয় ছাঁচে বড় বড় দালাল তৈরী করেছিল।

কিন্তু বাংলা দেশে নরনারীর জীবনধারা আগে যেমন চলছিল, তেমনিই চলতে লাগলো। নারীরা পর্দার আড়ালে নিহালা জীবন যাপন করতে লাগলো, স্তন্যদান বাড়ীর ভিতরে উঠান এবং তার পাশের খোলা বারান্দাগুলো অগোচর মতই বাড়ারী সঙ্গারের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে বইল। ছাদ ছিল মেয়েদের বিকালে মুক্ত বায়ু সেবন করবার অথবা শাড়াপাড়ীদের সঙ্গে গল্প করবার বায়গা। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশ্বমেধ প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সমুদ্রিকালী হিন্দু পরিবারের বিশূল সখ্যক অতিথিকে এখানেই আশ্রয় অর্পায়ন করা হত। বাড়ীর বাইরে বৈষ্ণব আকারে একটি স্থান নির্মাণ করা হয়, বাংলায় তাকে 'বক' বলে। এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ছেলে বড়ো সবাই সেখানে ঘরীর পর ঘরী গল্প-গুজব করত, ধূমপান করত অথবা তাগপাশা খেলে সময় কাটাত।

এই ছুটি জিনিষ যথা, বাড়ীর ভিতরের প্রাঙ্গণ ও খোলা বারান্দা এবং অক্ষরযুক্তী অধিকাংশ যন্ত্রগুলো ছিল বর্তমানের ইটের তৈরী বাড়ীর বিশেষত্ব। আগে মাটি, বাঁশ ও খড়ের তৈরী বাড়িগুলোর বিশেষত্ব রক্তবস্তুর এই রকমই ছিল। ইটের তৈরী বাড়িতেই ছাদ তৈরী সম্ভব ছিল, কারণ ইতিপূর্বে যে সমস্ত মালমসলা ব্যবহৃত হত, তা দিয়ে ছাদ তৈরী সম্ভব ছিল না। আরও উল্লেখযোগ্য যে, কাঠামো মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকলেও, এই সব নতুন বাড়িতে ইউরোপীয় ছাঁচে কাককাঁ করা হত। কখনও কখনও এই কাককাঁ প্রত গুরুত্বপূর্ণ হত যে, তা বাড়ীর কাঠামোতেও পরিবর্তন আনতো। সামগ্রিকভাবে স্থাপত্যশিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব মোটামুটি একটা বহিরঙ্গের ব্যাপার ছিল, যদিও সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক ছিল না।

[ক্রমশঃ]



পত্র

মহাকবি গ্যোটের পত্র

[গ্যোটের জীবনে যে প্রেমামৃত্যুভূতি জেগেছিল তা নিয়ে একথানা বই লেখা চলে। ভূম-স্বভাব ছিলেন কবি। প্রতিবার প্রেমে পড়েছেন আর প্রতিবার জীবন-সঙ্গীর উপস্থিত হয়েছেন। মাত্র পনের বছর বয়সে প্রেম জাগে এবং জীবনের শেষ দিক অবধি সে প্রেমামৃত্যুভূতি—নারীব প্রতি আকর্ষণ—প্রবল ছিল। ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী গ্যোটের এ হচ্ছে চতুর্থ প্রণয়। তবে শার্লেট বাকের সঙ্গে তার জীবনের প্রেম তার দিক হতে এক তরফাই ছিল। কারণ শার্লেট বাক কেটনার নামক এক উচ্চ রাজবংশচর্যার বাগদত্তা ছিলেন। সুতরাং এ ব্যর্থতা ভুলে যাবার ক্ষমতা পালাবার মনস্থ করেন। তবু তাঁর জীবনে এই ব্যর্থ প্রেমের অমৃত্যুভূতি প্রকাশ পায় তাঁর লেখা 'স্বর্ষের দুঃখ' নামক উপন্যাসে। এ-বই সারা ইউরোপে চাকল্য আনে। এ বইখানির প্রতি নেপোলিয়ানের প্রচুর অনুবাদ ছিল। গ্যোটের প্রেম দাঙে বা পেত্রীকোর মত একমিষ্ট ছিল না। শার্লেট বাকের বিয়ে হয় কেটনারের সঙ্গে। কবির প্রেমসী ও প্রেমসীর ভবিষ্যৎ-স্বামীকে লিখিত কতগুলো চিঠির অমুবাদ দেওয়া হল। কবির প্রেমসীর স্বামী না বলে কেটনারকে কবির প্রতিদ্বন্দ্বী বললেই ঠিক হবে। কেটনারকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার অমুবাদও দেওয়া হল।—অমুবাদক]

প্রিয় কেটনার,

সে চলে যাবে, সে চলে যাবে, যখন এ পত্র তুমি পাবে। চিঠির সঙ্গে যা পাঠালাম, সেটা লটকে দিও। আমি পূর্ণশান্তিতে আছি। তবে যা তুমি বলেছ তাতে আমি অবাক হয়েছি। বিদায় দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু বলবার নাই। আমি এখানে অবস্থান করলে নিভেকে আর সামলাতে পারব না। এখন আমি একা। আগামীকাল চলে যাব। কী অসহ্য মাথার যন্ত্রণা।

শার্লেট বাককে এই চিঠিখানা উপরের চিঠির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমি আশা করি ফিরে আসব একদিন। কিন্তু কবে তা ভগবান জানেন। লটা, চিন্তা কর—তোমার সঙ্গে কথা বলে কী আনন্দই না! পেতাম যখন বুঝেছিলাম সেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎপার্থ। চিরদিনের জন্য না হলেও আগামীকাল আমি চলে যাব। সে চলে গেছে। কেন এক সন্তা তোমাকে আমার সঙ্গে গ্রহিত করল। যা আমি অনুভব করেছিলাম, তা বলবার সুযোগ আমার ছিল। বর্তমানে ইহলগতের কথা ভাবছি আর ভাবছি যে তোমার কয় আমি চূষন করেছি, এখন আমি একা। এখন কাঁদতেও পারি। তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, উদ্বেগ তুমি আর আমি বেন শান্তি পাই, আর নিজের স্থলয়ের মধ্যে আমরা বেন বসবাস করি। আগামীকাল বলতে চিরকালের না বোকার না। আমার ছোট ছোট বন্ধুদের বল সে চলে গেছে। এখন আর না—ইতি।

প্রিয় লটা,

আমাকে আর স্বপ্ন দেখ না—তা হলে আবার বুক আমাকে ক্রম আঁকতে হবে। লটকে আজ আমি রাতে স্বপ্নে পাওয়ার ইঙ্গিত করি। ভেবেছিলাম মনের এ-বাসনা তোমাদের দু'জনকে জানাব না। তোমার চিঠির একটা অংশ পড়ে আমি বিরক্তি বোধ করেছিলাম। লটা যে আমাকে একবারও স্বপ্নে দেখে নি, এক বৃহত্তর বোধও না। লটার স্বপ্ন ও মনের আশা হচ্ছিল আমি।

লটাকে সারা দিনরাত আমি স্বপ্ন দেখি। ভগবান জানেন সবচেয়ে জানী হয়েও আমি বোকা। এক অন্তত দেবতা কেন লটকে আর আমাকে বিচ্ছিন্ন করেন। দিনগুলো কী শুভই না ছিল। Wetzlar এ আমার দিনগুলো সুখে কাটবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। সেদিন ভগবানের কৃপায় আর ফিরে আসবে না। তারা জানে কী করে শান্তি দিতে হয়। ট্যান্টালাস তোমাকে শুভরাত জানাচ্ছি। লটার অঙ্গরাখা বিষয়ে বলছিলাম।

(এ চিঠি শুক্রবারে লিখে অসমাপ্ত রাখেন। আহাের পর শনিবারে আবার লেখেন।)

এই সময় তাকে আমি দেখতে আসতাম। এই সময়ে প্রিয়তমাকে বাড়ীতে দেখতাম। থাক চলে যাওয়ার পর আমার লেখার সময় হল। যদি তুমি দেখতে কত কষ্ট আমি। সব কিছু সহ্য ছেড়ে দিয়ে অনুভব করছি যে, গত চারমাসে কোথায় আমার জীবনের শান্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

তুমি আমাকে ভুলে গেলেও আমি ভুল করি না। তবুও মনে মনে তোমাকে আবার দেখবার বাসনা করি। যা হোক না কেন, বর্তমান পর্যন্ত মনের জোয়ের সঙ্গে বলতে পারছি যে তোমাকে ভালবাসি, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি না। তোমাকে না লিখলেই ভাল হত। শান্তিতে আমার কল্পনা থাক। তোমার অঙ্গরাখা দেখানে বলছে। ওইটাই সবচেয়ে ধারাপ। বিদায়—

প্রিয় কেটনার,

বাটারে এখনও অন্ধকার। আজ ভোরে প্রাণীপের আলোর মধ্যে বসে লিখছি তোমাকে। এ অতীতের প্রীতিপত্র স্মৃতি বহন করে আনে। দিনকে বাগত অভিনন্দন জানাব বলে ককি তৈরী করেছি এবং বর্তমান আলো আসে ততক্ষণ লিখব। চৌকিয়ার বাঁশি বাজিয়ে সময় যোষণা করে গেছে। শেষকণ্তে আমি বেগে উঠি। সে শব্দ আমাকে জানিয়ে দেয়, তোমাকে সন্ধান জানাই প্রিয় বীত। আজ

খুঁটাম। আমি এ খুঁট ভালবাসি। ঘরে একজন গান গাইছে। বাটরে যে তীব্র ঈষৎ পড়েছে ত আমাকে আনন্দিত করেছে। গতকাল কী সুন্দর দিন গিয়েছে। আজকের জন্ম আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। দিনটা ভালভাবে শুরু হয়েছে। দিনের সমাপ্তি বিষয়ে আমি আর ভাবছি না। গতকাল রাতে দুটো অঙ্গরাখা দেখে মনের বাসনা হয় তোমাকে আমি লিখব। হুঁটা প্রিয় বৃথ আমায় চোখের সামনে নাচে পড়ীর মত। ঘুম থেকে বেগে আমি লটার অঙ্গরাখার আবরণ দেখি। আমি যখন অল্প এক জায়গায় ছিলাম তখন কয়েকজন কৌক আমার বিছানার ওপর সেটা রেখেছিল। আমার ঠিক বিছানার ওপরে লটার ছবি। কি আনন্দ। এ ছবির ভক্ত অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি যেভাবে তার বিষয়ে লিখেছ তার চেয়ে বেশী আমি বলনা করি। তার বিষয়ে বলনা করা, চিন্তা করা বা অল্প কিছু বলা মানে বোকামি। চৌকিলার আবার ফিরে এসেছে। উত্তর বাতাসে সেশাঙ্গ আমার জানালার বাইরে থেকে সরাসরি ঢুকছে।

প্রিয় কেইনার,

গতকাল পল্লব মধ্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে দিন আমি কি সুন্দরভাবে কাটিয়েছি। পরের দিন অবশ্য এভাবে সময় কাটাতে পারিনি। তবে স্বর্গের ভগবানগণ ইচ্ছা করলে মন্ড্রে ভাল করতে পারে। সুন্দর সন্ধ্যাকে তারা উপহাস করেছিল। মদ আমি খাইনি। উগ্র দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকাইনি। যখন আমরা ফিরলাম তখন রাত নামলো। একটা সঙ্গীতের সুবাসল এ আমাকে স্পর্শ করায়, যখন নীচে হৃদয় থাকে এবং অক্ষর সাব দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র কীণ আলোকের দ্যুতি পশ্চিমে ছড়িয়ে থাকে। সমস্ত দেশে এ দৃশ্য অপরূপ। মনে পড়ে যৌবনে এর নীচে খেলা করতাম। সে কাজে উদীপ্ত হতাম। আমি হৃদয় অল্প দেখতাম বতস্পর্শ পর্যন্ত হৃদয় অল্প বত। নাকোর ওপরে ঝড়ের কীণ প্রায়ক্ষকারে। স্বর্গের হৃদয় আর নদীর জলে হৃদয়ের প্রতিফলন—এসব আমার অন্তরে এক বিপুলনীর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ এনে দিত। এগুলো উৎসুক বাহ প্রসারিত করে আলিঙ্গন করতাম। তারপর খাতা আর পেন্সিল দিয়ে সমস্ত নিসর্গের ছবি আঁকতাম। কেউ কেউ এ আনন্দে আমার সঙ্গে যোগ দিত। আমি বা অমৃতব করতাম সে আরও পূর্ণতর করে দিত আর আমার মধ্যে সে আনন্দনির্ভরশীলতা এনে দিত। এসব ছবিতে গতিমান করে শিশু বন্ধু কাছে পাঠিয়ে দিতাম হৃদয়মত জানবার জন্য। সে ছবিগুলো এখনও আমার ঘরের দেওয়ালে রয়েছে। আমি প্রীত এই ভেবে যে, গতকালের আমি আজ সেই রকমই আছি। আমরা সে সন্ধ্যা কী সুন্দরভাবে কাটাতাম। আর ভাবতাম, প্রকৃতি আমার ওপর অনেক কিছু দান করেছে। আর আমি নিভ্রাণ হয়ে ভাবছি যে স্বর্গের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কারণ আমাদের শিশুস্বলভ উৎসব দিয়ে খুঁটাম অমৃতান আরও মনোহর করে হয়ে উঠেছে। বাজারে শিশুদের খেলনা আর মোমবাতি দেখলাম। আর তোমার কথা ভাবলাম। পৃথ-অভ্যন্তরিত শিশুদের কথা ভেবে তোমার বাইবেল-হাতে আনন্দিত রূপ আমার চোখে ভেসে উঠল। যদি আমি তোমার সঙ্গে থাকতাম,

তা হলে আনন্দিত হতাম এই দেখে যে, হঠাত আমরা অসংখ্য মোমবাতি জ্বালাতাম। সে স্বর্গের আলোতে দীপ্ত বিচ্ছুরিত হত। প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চাবি বাজাতে বাজাতে চৌকিলার আসছে। বাসনা আলো আমার মাথা স্পর্শ করছে। খুঁটামের খুঁটা বাজছে।

ঘরের মধ্যে নিজেকে উদীপ্ত হয়ে ভাবছি। এত সুন্দর দিন এর আগে কোনদিন আসে নি। সুখী ভবির চিত্রকল্প ভেসে উঠেছে। এ আমাকে শুভ সকাল জানাচ্ছে। ঈশ্বরের বাসনার উদীপ্ত হয়ে থাকলে ছবির সাতটা ছোট ছোট মাথা নকল করা হয়েছে। আমি সেই ছোট ছোট মাথা নকল করেছি। আমি এ ছবি একে সুখী না হলেও সম্বলিত হয়েছি। আমার প্রিয় মানসীর অঙ্গরাখা সেখানে আছে। লটার অঙ্গরাখা গুঁচে আছে। আমার মেয়ে যদি থাকত তা হলে তার অঙ্গরাখার মধ্যে প্রেমপাত্র সন্ধ্যা করে রাখতাম আর সেট প্রেমপাত্রের ভিতরে আমার মেয়েকে পরম নিশ্চিন্ত ঘুমতে দিতাম। আমার বোনের হাসি আর খামে না। কারণ স্পর্শাল যৌবনে এ রকম চিঠি তার ভাবনে আদান প্রদান হয়েছিল। স্বপ্নবান যুবতীর প্রতি পূজা ভিমকে রোগগ্রস্ত করবার এ বস্তু। আমি লটার চিত্রকীটা পালটিয়েছি। প্রথমবারের চিত্রকীণ মত এটা সুন্দরও নয় এবং ভালও নয়। আশা করি এটা তবুও কাজে লাগবে। হ্যাঁ, লটার মাথার দিকে খুব সুন্দর।

দিনের আলো দ্রুত আসছে। ভাগ্য যদি ভাল হয় বিয়ে হবে আমার। মোটে তোমাকে আর এক পাতা বেশী লিখব। দিনের আলো না দেখবার ছল করব আমি।

কুকুরের মতন দেখতে সেই বুড়ো অধ্যাপক মেয়েমানুষের মত ক্রুদ্ধ হয়েছে। এ যেন সেই পুরাণের মহিলা পেনী গারিয়ে কৌস কৌস করেছে। গেয়েদার মত কোন একটা মূর্ত অধরশ করে গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করেছে। এ চিত্তিত তার নাম উল্লেখ করব না আমি। সেই বুড়ো অধ্যাপক এই চিত্তিত লটার বা তোমার নাম দেখলেই জলে উঠবে। সে বুড়ো আরও বেগে উঠবে কারণ তাকে আমি আমল দিই না। সে বুড়ো এ-রকম কাজ করে আমাদের লোভ দেখাতে চায়। আমার লেখার ওপর বুড়োর প্রবল বিতৃষ্ণা। বুড়োটা গাধার মতন। 'আমি আছি' এই বলে সে আমার বাগান বন্ধ করে আর সব কাঁটারোঁপ ও আগাছা পরিষ্কার করে।

বিদায়। দিবালোক চারিদিকে। ভগবান তোমার সহায় হোন। ভদ্রচান্নের মধ্যে আনন্দের বাণী নিয়ে দিনটা এসেছে। সুন্দর বৃহত্তরুণে আমাকে নষ্ট করতে হবে। অনেক বই-এর সমালোচনা আমাকে করতে হবে। শেষ সংখ্যা বলে সমালোচনা আরও ভাল করতে হবে।

বিদায়, আমাকে ভাল না। সকলের প্রতি ভালবাসা রইল। আমি এক অমৃত জীব। তোমাদের স্নেহ দিও—ইতি।

প্রিয় কেইনার,

তোমার পক্ষে এটা খুব স্বপ্নবানতার কাজ যখন প্রতিজ্ঞা করেও তুমি আঁটি। পাঠালে না। আমার জন্য এ কাজটা করা তোমার কাছে প্রীতিগ্রন্থ বলে হয়ত মনে হয়নি। তোমাকে আমি বৃণ

করি। কারণ শরতীন প্রলুব্ধ করেছিল আমার কাছ থেকে এ আঁটি নিতে। আমার মনে হয়, রাজার বুকটের চেয়েও এগুলো দুলব। বিদায়। তোমার পড়ার কাছে আমার কোন বাণী নাই। ইতি।

প্রিয় কেঁদেনার,

এক সপ্তাহ পূর্বেও তুমি যে আঁটি পাওনি তার জন্ত আমি দোষী নই। এই যে, আঁটিগুলো এখন এখানে। আমি আশা করি এগুলো তোমার পছন্দ হবে। আমি অবশেষে প্রীত হয়েছি। এটা হচ্ছে দ্বিতীয়টি। এক সপ্তাহ আগে এগুলো পাঠান হয়েছিল আমার কাছে। খুব বড় করে গড়তে হয়েছে। 'পুরোশাগুলোকে সরিয়ে নতুন গুলোকে গ্রহণ কর।' আমি আশা করি সব ঠিক আছে।

আমি কাদের এক শৃঙ্খলের সূচনা স্বর্ণ ও মণ্ডের সাধনা নিকটতর করক। আমি তোমারই, কিন্তু তোমাকে বা তোমার বউকে দেখবার জন্ত আমি লালসায়িত নই। ইষ্টারের ছুটিতে তার অজরাখা আমার ঘর থেকে সরিয়ে নেব। কারণ তোমাদের ষড়ের দিন দু এক দিন আগে বা পিছে ঠিক হবে। বর্তমান না লটার প্রথম সম্ভাবন হয় ততদিন আর অজরাখা বুলাব না সেখানে। কারণ তা নতুন কিছু সূচনা করবে। তারপর প্রায়শই আর ভালবাসব না। ভালবাসব তার সম্ভাবনকে। তার সুখ ও সুবিচার ভক্ত একাক করব কিন্তু তাকে কিছু আসে যায় না। আমাকে যদি তোমাদের নবজাতকের খপিতা করতে চাও তা হলে সে-শিশুর ওপর আমার আস্থা বর্তাবে। তা হলে সে শিশু মেয়েদের বিষয়ে ঠিক আমার মত অন্ত হবে, যে-মেয়েটা ঠিক তার মায়ের মতন। স্বামীর গৃহে গিয়ে শ্রমী হও। ফ্রান্সট আর তোমার সইছে না। আর তুমি আসছ না। এর জন্ত আমি শ্রমী। আর যদি তুমি এখানে আস, তাহলে আমি চলে যাব। স্থানোভারে তোমার স্বাস্থ্য শুভ হোক। বিদায়, ৪টা আঁটি আমি শীলমেতর করে রেখেছি। তোমার কথামত আমি কাজ করছি। বিদায়।—ইতি।

'প্রিয়তমা লিটা' এতদিন শার্লট বাক বলে পরিচিত ছিলেন। তাকে লিখলেন :

তোমার সুখের সঙ্গে আমার আশা মিশে থাক আঁটির মত। দীর্ঘদিন কেটে গেছে। তোমার সঙ্গে কবে আমরা মিলিত হব। তোমার হাতে আঁটি রাখব। আর তোমার চিরকালের আমি তোমাই থাকব। আমার আর কোন পরিচয় নাই। তুমি জান আমার পরিচয়।

প্রিয় লিটা,

তোমার একটা চোখ পরিচয়ের বস্ত্র প্রয়োজন হতে পারে কী না তা আমি ঠিকমত অনুমান করতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় যে, সে-অনিমিত্ত তোমার প্রয়োজন হতে পারে। এই শুকনুর্প আমি চিন্তা করে নিরুৎসাহ বলাছি। প্রিয়তমা যেত বস্ত্র পরিধান করতে ভালবাসে। বধ্যাবভাবে সূচীনিম্নের কাজ না হলে আর সে পৌষিক পরলে ঠাকুরমার মতন মনে হবে। এসময় কাশীরের সেবতা এসে মগজে কিছু

চুকিয়ে দিবে গেল। তা হলেও এ-পাষিক বৈদ্যিক টেকসই হবে। মঙ্গলনের কাপড় পাঠালাম। এর অনেক গুণ আছে। এ দিয়ে শীতবস্ত্র তৈরী হবে। দরজার কাছে সরাসরি পাড়িয়ে এক প্রহ্ন কিছু সন্মতাবে তৈরী করে নাও। সাধা ছাড়া আর কোন লাইনিং যেন না হয়। নীল ও সাদা গিছানার চাদর পাঠালাম। নতুন সজীৱ স্বামীকে পেয়ে পুরোশা বন্ধকে ভুল না, তোমার স্বামীকে ভালবাসা দিও। আমার মতন অতীতের কথা চিন্তা কর।—ইতি।

প্রিয় কেঁদেনার,

নবজাতকে আমার চুমু দিও, আর তার সঙ্গে আমার চুমু চটাকে দিও। তাকে বল, সন্তানের জননী হিসাবে তাকে আমি বলনা করতে পারি না। এ অসম্ভব ব্যাপার। প্রথম যখন আমি তার কাছ থেকে চলে আসি, সেই ঠিক রূপ এখনও আমি দেখতে পাচ্ছি। পুরোশা সম্পর্ক ছাড়া স্বামী হিসাবে তোমাকে আমি চিনি না। আর এই বলে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে, অপরের অনুভূতি দেখে বা অনুধাবন করে আমার অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। আগে তোমাদের দুজনের যেমন ভালবাসতাম, ঠিক সেই রকম আমাকে ভালবেসো।—ইতি।

প্রিয় লিটা,

ঠিক এই মুহূর্তেই আমার ঘর থেকে চলে গেছে, এ তুমি অনুমান করতে পারবে না। অনেক চেনা ও অচেনা লোককে তুমি অনুমান করতে পারবে। সেই যোজ্ঞাত্মালী কথ্য তোমার মনে পড়ে, যে তোমাকে খুব ভালবাসত। সে আর এখানে বাস করতে পারছে না। আমাদের বিচ্ছেদ শুনে সে অর্ধৈর্ষ্য হয়ে উঠেছে। আমার মা তাকে কোন একটা কাজে বহাল করে দিতে বলেছে। তোমার অজরাখা দেখে বলল—ও বাছা! তার ঠাঁত নাই; তবু তার মুখে এক অদ্ভুত বিষয়। আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্ত আমার হাত ও কোঁট সে চূষন করল আর বলল—আগে কত বড় আমি ছিলাম আর এখন কত শান্ত হয়ে গেছি! যে বৃদ্ধা আমার অনুভূতির সঙ্গে হৃদয় মেলাতে পারে তার কাছে আমার কতটা কৃতজ্ঞ থাকি উচিত। সাধুদের অস্থি আর ছেঁড়া শীতবস্ত্র যদি রক্ষা করা হয়ে থাকে এবং তার মূল্য দেওয়া হয়, তবে এই বৃদ্ধাকে আমি কেন প্রশংসা করব না? এই মহিলা তার বাহর মধ্যে যেখানে আমার করেছিল একদিন তোমাকে শিশুর মত। সেদিন তুমি এই মহিলার কাছে অনেক কিছু চেয়েছিলে। স্বর্ণের পরী তুমি। তুমিও ভিক্ষা করেছিলে লিটা। আমার কাছে কিছু না কিছু একদিন প্রকাশ করেছিলে। একটা কথা ভেবে আমার হাসি আসে। সেবুড়ী বলেছে তুমি কি ভাবে তাকে বাপাকে যেটা ছোট হাত নেড়ে! মনে হয় তোমার সন্তা আমাদের খুঁজছে। লিটা—লিটা—লিটা—আমার প্রিয় লিটা, পৃথিবীতে লিটা ছাড়া আর কিছু নাই। যেখানে লিটা নাই, সেখানে হুংবুডু আর অজা বিরাজ করছে।

গত দুই মাসে আগষ্ট তোমাকে একখানা চিঠি লিখতে শুরু

বয়েছিল। আমি। হু বহু আগে আমি তোমার পাশে এসে কত
নীচ কুচি কুচি করেছিলাম মধ্যরাত পর্যন্ত। ২৮শে আগষ্ট আমার
জন্মদিন চাপ'ও বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে শুরু হয়েছিল।
তুমি তোমার স্পর্শালু হৃদয় দিয়ে আমাকে ভালবাসার লগ্ন
করেছিলে, আর আমিও তোমাকে ভালবেসেছিলাম। তোমার
দুই স্বামী-স্ত্রী আমাকে ভালবেসেছিল। সময়ের গতি যদি
আমাদের গ্রাস করে, তা হলে আমাদের পক্ষে তা আদৌ শুভ হবে
না। তোমাকে একখানা প্রাণনার বই পাঠাচ্ছি তাড়াতাড়ি। এর
মাফত আমাদের বন্ধু ও আত্মগত্যের অতীত প্রতিশ্রুতি
আরও দৃঢ় হবে। সকাল ও সন্ধ্যায় এই বই পড়বে। আমার
জন্ম নিশ্চয়ই আগামী কাল চিন্তা করবে। আগামী কাল
আমি তোমার কাছে থাকব। এর পিছনে জৈনিক শুভাকাঙ্ক্ষী
মহিলার আশীর্বাদ আছে। চার সপ্তাহ পর দীর্ঘ প্রত্যাশিত
বৃষ্টি বরবে। বেশে থাকলে যেমন চাড়া হওয়া যায় দেয়কম
চাড়া আমি হয়েছি আর ভাবছি যে, শান্ত পল্লীর পরিবেশ আমি
অনুভব করছি। আরও কয়েকজন আমার বন্ধু এসেছিল। তোমার
অঙ্গনাখা দেখে তারা উল্লাসিত হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমার খুচরো
আলাপ হলো। যাবার সময় বন্ধুরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেল।
গতকাল ছিল নীরস ৩১শে আগষ্ট। আমার বন্ধু-বান্ধবেরা
এসেছিল। গতকাল রাতে তোমাকে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, তুমি
আমার কাছে এসে চুমু দিয়ে উদ্দীপ্ত করছ। তোমার কাছ
থেকে বহু দূরে আমি রয়েছি। কোনকালে এতদূরে ছিলাম
না। এর আগে স্বপ্নও দেখিনি। ঘুম থেকে জাগিনি। তোমার
জন্ম এখানে অঙ্গনাখা সাজিয়ে রেখেছি। আরও কয়েকজনকে
আমি তা দেব। তোমার স্বামীকে বল, সে আমাকে যেন অবগুই
কেনে। আমার কেশ ও ছাপার অঙ্কর জানাচ্ছে ধন্যবাদ।
তোমাকেও আমি ভালবাসি। তোমার অঙ্কর ছেঁয়ে চুমু দিও।
তোমার কাছে উপস্থিত হলে লিখে বা বকে তোমাকে বিরক্ত করব
না। তোমার কাছে অশরীরীর মতন উপস্থিত হব, তা হলে
আমার বিরক্ত মুখ দেখতে পাবে না। আশা করি, তোমার বাহর
মধ্যে আঁঙ্গিন অবস্থায় তোমাকে দেখতে পাব। ইতি।

প্রিয় কেটনার,

বইটা যদি তোমার কাছে পৌঁছে, তা হলে বুঝবে এই
প্রেরিত চিঠির অংশ। তাড়াতাড়িতে এ আমি ভুলে গিয়েছিলাম।
একটা বৃন্দিকড়ের আবরণে রয়েছে আমি। উৎসব শেষ হল আনন্দ
ও দুঃখের মধ্যে। অতীত ও বর্তমান দুদিকে আমাদের পরস্পরের
দিকে। আমার ভবিষ্যৎ কাঁ হবো। লোকদের নিয়ে তুমি
নিশ্চয়ই আসবে অবসর সময় অভিযোজিত করার জন্য। এ
বইটা কাউকে ধার দিও না। যে বেঁচে আছে, তাকে ভালবাস
আর যে মৃত, তাকে সন্মান কর। আমার শেষ চিঠিতে অস্পষ্ট
বিষয়ে তোমার ধারণা স্পষ্ট হবে। ইতি।

(ওই চিঠির সঙ্গে একটা জুড়ে দিয়েছিলেন, লটাকে উদ্দেশ্য করে
নীচের চিঠি)।

প্রিয় লটি,

আমার বই পড়ে তুমি বুঝে গেছো জন্ম প্রিয় এই লেখা বই

আমার। আমার কাছে এই বই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কারণ,
তা তুমি পাঠ করবে বলে শ্রবণ চুমু দিয়েছি আর তালাচাঁবি দিয়ে
রেখেছিলাম যাতে এ বই জন্ম কেউ স্পর্শ করতে না পারে।
ও লটি, এই বই কাউকে দেবো না। লাইপজিগে যখন পুস্তক-প্রদর্শনী
হবে তখন এ-বই প্রকাশিত হবে। তোমরা স্বামী-স্ত্রী নিজের
বইখানি একা একা পড়বে, এই আমি চাই। তুমি একা পড়বে,
তোমার স্বামী একা পড়বে। আর তোমরা আমাকে হুকুম
লিখবে। ইতি।

প্রিয় কেটনার,

আবার তোমাকে আমার বৃক্কের ব্যথা দূর করার জন্য চিঠি
লিখব প্রিয় কেটনার। যা হয়েছে তার জন্য আর বা প্রকাশ
পেয়েছে তার জন্য। আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার কাছ
থেকে কিছু স্নানও গ্রহণ নই। যদি ভাব তুমি নিজেকে দুঃখ
দিলে এবং যদি ভাব যে এই লেখার মধ্যে সত্যের সরল রূপ রয়েছে,
তবেই আমি লিখব।

তুমি একজন স্তম্ভন ব্যবহারকারী। আমি বলতে পারতাম
যে, তুমি দব কিছু হরণ করছ। আমি আর কিছু বলতে পারছি
না, আর আমার বলবারও কিছু নাই, কারণ ভাষায় তা ব্যক্ত
করতে পারছি না।

নীরব হয়ে আমার আশাতীত অধুত্বের কথা বলছি। আমি
কল্পনা করছি—কল্পনা কেন—বিশ্বাস করছি যে, আমাদের সম্পর্ক
আরও নিবিড় করার জন্য প্রকৃতি এই কাজ করেছে। ঠ্যা,
সত্যিই বন্ধু, ভালবাসা আমাদের সাংস্কৃতিক নিকটতর করেছে।
আমি তোমাকে ও তোমার সন্তানদের কাছে এক অন্তত যুহুর্ন্ত
চিঠির মধ্যে ব্যক্ত করছি। বা বলবার তুমি বল। তোমার কাছে
আমি ক্ষমা চাই। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। এর
আগেককার চিঠিতে তোমাকে গভীরভাবে চিন্তে পেয়েছি। সেই
রকম চেনা তুমি হয়ে থাক—লটিও সেই রকম হয়ে থাক। ঠিক সেই
রকম হোক—যা ঘটে তার জন্যই ঘটুক। তারা বলে শুভ সব কাজ
ভগবান আদেশ করে থাকেন। প্রিয় বন্ধু, এ চিঠি পড়ে যদি
স্কন্ধ হও, তা হলে স্মরণ করে ভেব যে, তোমার বন্ধু গোটে পরিবর্তিত
হলে এখন সে পূর্বের চেয়ে তোমার কাছে প্রিয়। ইতি।

কেটনার,

তোমার চিঠি পেয়েছি। এ চিঠি আমার ডেস্কের ঘরে পড়িনি।
একজন চিত্রশিল্পীর ঘরে সে চিঠি আমি পড়েছি। গতকাল আমি
তৈলচিত্র আঁকতে শুরু করেছিলাম। তোমাকে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,
ধন্যবাদ। তোমার অন্তর সজীব চিত্রকাল। আমি যদি তোমাকে
আলিঙ্গন করতে পারতাম। লটার পদতলে পড়ব এক নিমেষের
জন্য। সামান্য পড়ে কি আর জানাব। সব কিছু কালি দূর হয়ে
যাবে। তোমরা সন্দেহবান। আমি কাঁদব। তোমার বিশ্বাস
কম। হের্ভেরের সহস্র আশ পাঠ করে যদি তুমি বুঝতে পারতে।
হের্ভেরের দুঃখের মূল্যায়ন তুমি বুঝতে পারবে না।

আমি একটা নোট পাঠালাম। পড়ে কেবল পাঠিও ঠিক যেমন
অবস্থায় তুমি এ পেয়েছ। তুমি এক বন্ধুর কথা লিখেছ।
সে আমাকে অভিযোগ করেনি, ক্ষমা করেছে। ভাই, প্রিয় কেটনার।
অপেক্ষা কর, তাহলে সাহায্য পাবে। আমি হের্ভেরকে

কলব না করে এসে সে আমার জীবন রক্ষা করুক। তা হলে
অন্ধকারে তোমার চুপে অবস্থায় মতন বিলীন হবে। এক
বছরের জন্য আমি সখীৰ উত্তর-বাড়াসের মতন হব। সব কুশাশা
আর কুশাশা উড়িয়ে নিয়ে যাব। বিবোধ, হতাশা, সব কিছু দূর করে
নিজের দিকে আনন্দের পথ খুঁজে পাব। হতাশা, সন্দেহ, ইত্যর
লোকদের মধ্যে থাকে। হেরবের জীবনেও এই ঘটেছিল। তার
কথা তুমি ভেবে না। আমার কথা আর তোমার কথা ভেবে বা
তোমাকে জড়িয়ে ধরে গ্রহণ কর বুন চলেছে। তোমাকে ধন্যবাদ
জানিয়ে বলছি—এখনও আমি জীবিত আছি।

আমার থেকে উচ্চ তোমার হাত লটকে দিও। আর তাকে
জানিও ক্ষতিপূরণ হয়েছে, কারণ শ্রদ্ধা ও যুগার সঙ্গে তার নাম অসংখ্য
জনতার মুখে মুখে ঘুরছে। তারা কাউকে বেনীদিন বিপদে ফেলবে
না। তুমি যদি ভাল হও আর আমাকে গীড়ন না কর, তা হলে
তোমাকে আমি পত্র পাঠাব। তাতে দীর্ঘাশ আর চুপে হেরবের
থাকবে। তুমি যদি বিশ্বাস রাখ তাহলে ভাল হবে। আর বা
কানারুসা হবে তার কিছুই থাকবে না। এই চিঠি তোমার হৃদয়ে
ধর। আমি চুমু দিয়েছি।

কেউনা, তুমি ভেবে না যে, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করছি,
সাধনা দিচ্ছি। আমার সাধনা তোমার ও লটার শুভকামনায়
রসায়িত করছি। বিশেষে বাস্তব কান্টনীয় মত হরত তোমাকে
ভয় পাওয়াবে। লটা বিদায়, কেউনা বিদায়—আমাকে ভালবেসে
সীড়ন কর না।

অন্ত কোন লোকের কাছে এ চিঠির বাকী জানিও না। তোমাদের
হৃদয়কে উদ্বেগ করে এ চিঠি আমার লেখা। আর কারও জন্য নয়।
বিদায়—ভালবাসার ধন্যদের বিদায়। তোমার পত্নী ও ছেলের জন্য
চুমু হইল।

সন্দেহের শূন্য লোয়ার না হুসলে সব কানারুসা খেয়ে যায়।
যা বাকী ছিল তা আমি করতে পারতাম খুব তাড়াতাড়ি। তোমার
বন্ধুদের প্রতি আমার ভালবাসা হইল।

গতকাল এক বালিকা বচল—৮টা যে এত অল্পের নাম, এর
আগে আমরা জানতাম না। লেজেন বা লোলো যে নামেই তুমি
ভালবাস কিন্তু ৮টার মত উপযোগী নাম আর হবে না।

প্রেমের ও বন্ধুত্বের মধ্যে বান্ধকদের শক্তি আছে। খুব শীত,
আমি স্টেটিং খেলতে বাইবে যাব। ইতি।

তাপসী-প্রতীক্ষিতা

শ্রীঅরুণা ঘোষ

তব রাম তপস্বিনী !
শ্রী গমের লাগি আশি-দীপ জালি
বসে আছে একাকিনী ।
পলে পলে দিন যায় ।
স্বপ্ন-বৈশিষ্ট্য নিন্দাই বুয়েছে
তব আশি-জলে হারি ।
এই বুঝি আসে রাম ।
এই বুঝি আসে প্রাণের ঠাকুর
নব-বর্জিত-ভাষা ।
কতদিন আসে যার :
কোথার তোমার চির-আরাধ্য
বুঝি বা এসো না হার ।
অন্তরতম তব ।
নয়নের জলে আলপনা আঁকি
চাহিয়া বয়েছে যারে ।
তনি মর্যদা ধনি ।
ভেবেছে, এসেছে পাতকী-তারণ
তোমার সে বহুধনি ?
মঙ্গল-ঘট গরি ।
নিভা বেখেছে হৃদয়ের পাশে
হাকুন-চরণ স্মরি ।

বাধার পদোপ হয়ে ।
শ্রী গমের লাগি জলি-হাত লুপ্ত
হৃদয়ের বাধা সরে ।
জীবন ঘনিয়ে আসে ।
জরা আর বাধি ঘিরে ফেলে মেহে
তব আশি-বাম-আশি ।
আশু-শিখা তোল স্নান ।
প্রভু অশার, আশার শিখাটি
তব জলে স্নান ।
আশি পল্লব হতে ।
বিদায় দিচ্ছে নিস্তা-দবীরে
শ্রী গম প্রতীক্ষাতে ।
শবদী এসেছে রাম ।
নীতা অবেশে তোমার দুয়ারে
এল দীপা-অভিরাহ ।
এসেছে কি তুমি রাম ?
“এসেছি শবদী করিতে আশিস
পূবতে মনস্বার ।”
প্রতীক্ষাই তব ধাম ।
ভাইতো অভিব পর্বতুদীরে
পতিতপাথন রাম ।
তাপসী প্রতীক্ষিতা ।
তপস্বী তোমার চির প্রতীক্ষা
অধি ভর্তি-মিতা ।

অনন্ত অমিত
শ্রীমদ্রামায়ণ
অমিত্যুত্তমময়

রাধিকাই জয়শ্রী। জয় মানে উৎকর্ষ আর শ্রী মানে শোভা। জয়হেতু যার শ্রী, অর্থাৎ উৎকর্ষহেতু যার শোভা, সেই জয়শ্রী। দ্যুতক্রীড়া, জলফেলি, নর্মবাক্য—সর্ব কিছুতেই তার বিশেষ উৎকর্ষ। আবার সৌন্দর্যে, সৌভাগ্যে, বৈদক্ষ্যে, পাত্তিত্র্যেও সে অপরাভূতা। সুতরাং সে জয়া। আর লক্ষ্মীরই আরেক নাম শ্রী। লক্ষ্মীশব্দের সারভূতা প্রতিমাই রাধিকা। তার মানে মূলশ্রীই রাধিকা। সুতরাং রাধিকা জয়াও, শ্রীও।

লীলাস্বয়ম্বরস উপভোগ করছে। লজ্জায় কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণের পায়ের নখের অগ্রভাগের দিকে তাকিয়ে আছে অবনতমুখে। তাকিয়ে আছে পাদ-কল্পতরুপল্লবশেখরের দিকে। আর সেই পদনখশোভা দেখেই রাধিকা বিহবল। লজ্জা-শীল ধর্মকুল—সমস্ত আর্ঘ্যপথ বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণচরণে সম্যক তার আত্ম-সমর্পণ। সে সমর্পণে যে আনন্দ, তার তুলনা শুধু ঐ আনন্দই।

রাধিকাই প্রেমপরাকার্ত্তারূপিণী। তার রতি সান্ত্রতমা। চমৎকারকরশ্রী। এই রত্নির চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্যাতাপর্ষা নয়, প্রিয়ানুকূল্যাতাপর্ষা। ওর সকল উত্তম কৃষ্ণসৌখ্যার্থ।

জ্যেষ্ঠের মধ্যাহ্ন। গোচারণে গিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণকে দেখবার জন্যে রাধিকা আর তার সখীরা বেরিয়ে পড়েছে বাড়ী ছেড়ে। গোবর্ধন পাহাড়ের কাছে এসে চারদিকে তাকাতে লাগল, কোথায় কৃষ্ণ? বুঝল, কৃষ্ণ পাহাড়ের অপর দিকে অবস্থান করছে। ডাকলে কি আর শুনবে, দাঁড়াতে চোখের সামনে? দরকার কী। গোবর্ধনের চূড়ায় পিত্তের আরোহণ করি।

সেখানে উঠলেই কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হবে। কোন্ দিকে পালাবে তখন? চূড়ায় উঠলেই দেখা যাবে সর্বদিক।

সখীরা নিরস্ত করতে চাইল। কিন্তু কে শোনে কার কথা? মধ্যাহ্ন-সূর্যের উত্তাপে পাহাড়ের পা আগুন হয়ে উঠেছে, তোমার পায়ের পাতা পাতাবে কী করে? তা ছাড়া উচু নিচু টুকরো-টুকরো পাথরের কোণগুলো অসিফলার মত তীক্ষ্ণ। তোমার পায়ের পাতা রাখবে কোথায়?

কিন্তু রোজ বা অসি, তাপ বা তীক্ষ্ণতা, কোনো কিছুতে রাধিকার লক্ষ্য নেই। কৃষ্ণে অপিতচিত্ত, অনন্তচিত্ত হয়ে সে পাহাড়ে চড়েছে। চূড়াতে পৌঁছে দেখতে পেয়েছে কৃষ্ণকে। চরণতল দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, এ সবে রাধিকার অনুভূতি মেই, অনুসন্ধান নেই। কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়ার সুখেই সে নিম্পন্দ-নিমগ্ন। কোথায় বা পাথরের ধারালো কোণ, কোথায় বা সূর্যের প্রাচীর? রাধিকার মনে হচ্ছে কমলদল-আকৃত সুকোমল শয্যায় সে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণকে দেখতে যাওয়ার হৃৎকৃষ্ণকে দেখতে পাওয়ার সুখ হয়ে গিয়েছে। সূর্যকিরণ আমাকে কী করবে, আমার দেহ কোটিচন্দ্রের চেয়ে সুশীতল।

ভাদ্র মাসের চতুর্থ তিথির চাঁদ দেখলে মিথ্যে কলঙ্ক জন্মে—এইরূপ কিম্বদন্তী। এক গোপী বহু আরাধনা-উপাসনা করেও পাচ্ছে না কৃষ্ণকে। কৃষ্ণকে না পাই, কৃষ্ণ সঙ্গে মিথ্যা কলঙ্কের আনন্দটুকু অন্তত দাও। নিজের অযোগ্যতার দৈন্তে ভাদ্রের চতুর্থ তিথির চাঁদের কাছে প্রার্থনা করছে : হে চতুর্থ-নিশা-কলাক, হে কামানুরাশি-পরিবর্ধন, সেই যুবকের সঙ্গে

আমার অভিমান মিথ্যাপবাদ-বাক্যও যেন সিদ্ধ হয়।
কে সেই যুবক? আর কে! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আর
কিসের অভিমান? তিনি আমার কান্ত, আমি তাঁর
কান্তা—এই অভিমান। এই অভিমানে কৃষ্ণ-সঙ্গের
সম্ভাবনা কোথায়? নাই বা থাক কৃষ্ণ-সঙ্গের সম্ভাবনা,
কৃষ্ণ-সঙ্গের আভাস তো আছে। কৃষ্ণ আমাকে না
নিক, লোকে যে বলবে আমি কৃষ্ণকে নিয়েছি—এই
অপবাদে, এই লজ্জায়, এই হৃৎখেণ্ড আমার পরম সুখ।

হারকায় কৃষ্ণের অসুখ করেছে। এ রোগের
চিকিৎসা কী, জিজ্ঞেস করল নারদ। কৃষ্ণ বললে,
কোনো ভক্ত যদি তার পায়ের ধুলো আমার মাথায়
দেয়, ভালো হতে পারি। যে নারদ এত বড় ভক্ত,
সেও পিছু হটল। কৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী,
প্রত্যেকের কাছে গিয়ে হাত পাটল। সে কী কথা?
স্বামীকে কী করে পায়ের ধুলো দেব? তাতে
আমাদের পত্নীধর্ম নষ্ট হবে না? না, পারব না ধুলো
দিতে। নারদ তখন ব্রজে গেল। ব্রজাস্ত্রনারা চঞ্চল
হয়ে উঠল। আমাদের কৃষ্ণের অসুখ? আমরা কি
তার ভক্ত? আমাদের ধুলোতে কি কাজ হবে? তবু
আমাদের কৃষ্ণ যদি ভালো হয়, দেব আমাদের পায়ের
ধুলো! যদি পাপ হয়, অধর্ম হয়, তো আমাদের হবে।
আমাদের পাপে, আমাদের অধর্মেও যদি কৃষ্ণ সুখী
হয়, আমরা সে পাপ, সে অধর্ম করব হাসিমুখে।
জীবনে আর আমাদের ব্রত কী? সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে
সর্বভোতায়ে সুখী করাই আমাদের ব্রত।

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার কী দশা?
নয়নে ঘুম নেই। কদাচিৎ যদি ঘুম আসে, মাটিতে
শোর। শরীর ক্ষীণ মলিন হয়ে গিয়েছে। তড়ুল
গুনে গুনে হরিনামের সংখ্যা পূরণ করে। সে তড়ুল
কুটিয়ে আপো প্রভুকে নিবেদন করে, তারপর তায়
কিষ্কিন্দ্রা খায়। জীবন যে কেন রাখছে, কে বলবে!

‘প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রিতে।

কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে ॥

কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।

কৃষ্ণ চতুর্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ ॥

হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তড়ুলে করয়।

সে তড়ুল পাক করি প্রভুকে অর্পণ ॥

তাহার কিষ্কিন্দ্রা করয়ে ভক্ষণ।

কেহ না জানবে কেনে রাখয়ে জীবন’

জীবন কেন রাখছে? পতিত হুখেই পরীর তৃপ্তি,

পতির ইষ্টেই পরীর ইষ্ট, শুধু এই তত্ত্ব প্রকট করবে
বলে, প্রতিষ্ঠিত করবে বলে। তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধির
কার্যে আমি আনুকূল্যবিধায়িনী—এই প্রমাণ করব বলে।
যে প্রেমভক্তি বিতরণে তে মার স্পৃহা, আমি সেই
প্রেমভক্তিরই প্রতিমূর্তি। তোমার বিতরণ বাইরে,
আমার বিতরণ ঘরে। আমিই মূর্তিমতী ভক্তি,
তোমার স্বরূপশক্তি। তোমার সুখচিন্তা, ভক্তি চিন্তা ছাড়া
আর সমস্ত বাসনাই অশ্রুণু গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছি।

ধিয়ের পর প্রায় দু বছর কাটল নিশ্চিন্তে।
অধ্যাপনা নিয়েই মেতে আছে নিমাই। এদিকে
ভক্তিবিরোধী নানা মতবাদের প্রচার হচ্ছে নবদ্বীপে।
বাড়ছে অভক্তের দল। ‘চতুর্দিকে পায়ণ্ড বাঢ়য়ে গুরুতর।’
যেফর দেখাছে আর গাল দিচ্ছে। ভক্তের দল অনুযোগ
করছে—এ সময় উনি কিনা বিজ্ঞাচর্চায় নিবিষ্ট!

নিমাই স্থির করল এঁর আত্মপ্রকাশের সময়
এসেছে। ‘চিন্তে ইচ্ছা হইল আত্মপ্রকাশ করিতে।’
কিন্তু তার আগে একবার গয়া থেকে আসি।
পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্য শেষ করি।

প্রায় তেইশ বছর বয়স, সঙ্গ মেসো চন্দ্রশেখর
আর বহু ছাত্র-শিষ্য, নিমাই মার অনুমতি নিয়ে, সব
দেশ গ্রাম তীর্থ করে গয়ায় চলল। আশ্বিন মাস,
১৪৩০ শকাব্দ। চলতে চলতে পৌঁছল এসে ‘চির’
নদীর তীরে। সেখানে স্নানাহিক সেরে ভাগলপুর
জেলার মন্ডারে এল। যেমন মথুরায় কেশব, নীলাচলে
পুরুষোত্তম, প্রয়াগে বিন্দুমাধব, কেরলে বামুদেব,
দাক্ষিণাত্যে পদ্মনাভ, তেমনি মন্ডারে মধুসূদন।
মধুসূদনকে দর্শন করল নিমাই।

মন্ডারে নিমাইয়ের জ্বর হল। বেশ কঠিন জ্বর,
সঙ্গীরা সব ভাবনায় পড়ল। নিজের চিকিৎসা নিজে
করল নিমাই। বললে, এক ব্রাহ্মণের পাদোদক নিয়ে
এল। তা খেলেই আমি ভালো হব।

আনা হল বিশ্রপাদোদক। তা খেতেই জ্বর ছেড়ে
গেল নিমাইয়ের।

ব্রাহ্মণের মাশাখ্য দেখাবার জগ্গেই এই রজ।
না কি নিজের অসাধারণ যাত্রে বুঝতে না পারে কেউ
তারই জগ্গে এই কোশল!

তারপর দলবল নিয়ে নিমাই পুনপনে এল।
সেখানে স্নান করে পিতৃদেবের অর্চন করল। তারপর
রাজগিরি আবার স্নান সেরে গয়ায় প্রবেশ করল।

গয়াতে চুকে হুই শ্রীকর জুড়ে নমস্কার করল

তীর্থরাজকে। ভক্তি পাঢ়, গভীর ও প্রশান্ত। পিতৃকার্য করে স্নান করল ব্রহ্মকুণ্ডে। তারপর চক্রবেড়ে এসে দেখতে চলল পাদপদ্ম। দেখ দেখ ভগবানের পদচিহ্ন দেখ। যে চরণ কাশীনাথ হৃদয়ে ধরেছে, যে চরণ লক্ষ্মীর জীবন, বলির মাথায় যে চরণের আবির্ভাব, তাকে দেখ চোখ ভরে। যে চরণ তিলাৰ্ধ্যান করলে যম তার অধিকার হারায়, যে চরণে ভাগীরথীর প্রকাশ, ভক্ত নিরবধি যাকে বৃকে করে রাখে, তুমি নিতান্ত ভাগ্যবান, তাই তাকে দেখতে পেয়েছ।

নারায়ণের নাভি থেকে উৎপন্ন পদের নালে চৌদ ভুবন প্রস্ফুটিত। তার মধ্যে এক ভুবন পৃথিবী। পৃথিবীতে সপ্তসমুদ্র—লবণসমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, ছন্ধসমুদ্র ও জলসমুদ্র। দধিসমুদ্রের আরেক নাম ক্ষীরসমুদ্র বা ক্ষীরাক্তি। ক্ষীরাক্তির মধ্যে এক দ্বীপ আছে, যার নাম শ্বেতদ্বীপ। ঐ শ্বেতদ্বীপই ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা বিষ্ণুর নিজধাম। দেবতারা তাঁর দর্শন পায় না। অমুরের উৎপীড়নে পৃথিবী যখন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, তখন দেবতারা ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে গিয়ে তাঁর স্তব করে পৃথিবীর হৃদশার কথা ব্যক্ত করে। তখন বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়ে জগৎকে রক্ষা করেন, জাগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; পূর্ণতম ভগবান। তিনি যখন অবতীর্ণ হন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁর বিগ্রহের মধ্যে মিলিত হন। সমস্ত ভগবৎস্বরূপই তাঁর অংশ, তিনিই সকলের আশ্রয়।

কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্গাংশ-আশ্রয়।

সর্বঅংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥

যেই যেই-রূপ জানে সেই তাহা কহে।

সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥

কৃষ্ণের ছেলে শাশ্ব স্বয়ম্বর-সভা থেকে দুর্ঘোধনের মেয়ে লক্ষণাকে হরণ করল। কৌরবেরা তাকে বাধা দিল, পরাভূত করে হস্তিনাপুরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখল। স্বয়ং বলরাম গেল আপোষ করতে। দুর্ঘোধনকে বললে—বৃকিংশের সঙ্গে কুরুবংশের বিরোধ বাধিয়ে লাভ কি? শাশ্বকে ছেড়ে দাও। বলদত্ত দুর্ঘোধন বললে—আমার অনুগ্রহেই বৃকিংশীয়েরা বেঁচে আছে। আমিই তাদের একটি কুজরাজ্যের রাজত্ব দিয়েছি, নইলে রাজ্যসন তারা কোথায় পেত? আমারই অনুগ্রহে প্রাণ ধারণ করে আবার আমাকেই নিলজ্জের মত আদেশ করছেন?

বলরাম বললে—“কৃষ্ণকে রাজ্যসন দিয়েছ বলল গর্ব করছ? কিন্তু কৃষ্ণের রাজ্যসনে কী প্রয়োজ্য? একটা কুজ রাজ্যের সিংহাসনে তার আর কী মহিমা বাড়বে? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিরা যার চরণরেণু মাথায় ধরে কৃতকৃতার্থ; ব্রহ্মা, শিব আর আমি, এমন কি সর্বৈশ্বর্যময়ী লক্ষ্মী, যার অংশের অংশ, কলার কলা, তার কি হবে নুপাসনে?”

একদৃষ্টে নিমাই দেখতে লাগল পাদপদ্ম। দুই পদ্ম-নয়ন ভরে উঠল অশ্রুতে। প্রথম ধারা নামল অপাঙ্গ থেকে, দ্বিতীয় ধারা নামল নাকের কাছেকার কোণ থেকে। গোখের মাঝখান থেকে নামল তৃতীয় ধারা। তিনধারা মিশে গেল এক হয়ে। ত্রিবৈধী হয়ে গেল গঙ্গা অবিল্লিনা। নিমাইয়ের উপবীত ভিজল, উত্তরীয় ভিজল, বসন ভিজল।

নিমাই দেখছে কৃষ্ণকে, আর সকলে দেখছে নিমাইকে। কী সুন্দর মুখ। কী সুন্দর চোখ। কী সুন্দর অশ্রুধারা! মুখে কথা নেই, শুধু চোঁট ছুঁনি কাঁপছে। শরীর টলছে কিন্তু পড়ছে না। এ কী নতুন ভাবাবেশ! কার সাহস নেই নিমাইকে ছোঁয়; তার বাহু সহিং ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে।

দৈবযোগে সেখানে ঈশ্বরপুরী উপস্থিত। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে নিমাইয়ের এ অভিনব ভাব দেখতে লাগলেন। এ কী অমাত্যিক কাণ্ড! মেঘ দেখলে তাঁর গুরু মাধবেশ্বরের কৃষ্ণস্মৃতি হত, পড়তেন মুছিত হয়ে। এ যে দেখি সেই দশা। সত্যি নিমাইও দেখি মুছিত হয়ে পড়ছে। আর সকলে বোঝেনি—ঈশ্বরপুরীর জানা, ঈশ্বরপুরী বুঝেন। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ধরলেন নিমাইকে। নিমাই চিনতে পারল, প্রশ্রয় করতে চাইল, ঈশ্বরপুরী তাকে বৃকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রেমানন্দে একসঙ্গে কাঁদতে লাগলেন দুজনে।

নিমাই বললে—“আমার গয়াযাত্রা সফল হল। দেখলাম আপনাকে। কোনো তীর্থে আপনার সমান নয়, আপনিই পরম তীর্থ। তীর্থে পিণ্ড দিলে, যার পিণ্ড দেওয়া হচ্ছে, সে তরে যায়। কিন্তু আপনাকে দেখলে সমস্ত পিতৃপুরুষেরই বৃথি উদ্ধার হয়। সংসার-সমুদ্র থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। আমার এই দেহ আপনাকে সমর্পণ করলাম। আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত রস পান করান।”

‘পণ্ডিত, শোনো, আমি বলছি,’ ঈশ্বরপুরী বলতে লাগলেন পাঢ় করে, ‘সন্দেহ নেই, তুমি ঈশ্বর-অংশ।

যেদিন থেকে তোমাকে দেখেছি নবদ্বীপে, সেদিন থেকে তুমি আমার চিত্র আঁকা করে আছ। কিন্তু আজ যা দেখলাম, তা অপরূপ। আজ আলোর চেয়েও বেশি, আজ আনন্দ। আজ তোমাকে দেখলাম না কৃষ্ণকে দেখলাম। তোমাকে দেখেই আজ আমার কৃষ্ণ দর্শনের সুখ হচ্ছে।’

‘এ আপনার কৃপা, আমার ভাগ্য।’ বিনয় বচনে নিমাই বললে।

কম্বুতীরে গিয়ে নিমাই বালির পিণ্ড দিলে। তারপর গেল প্রেতগয়ায়। তারপর রামগয়ায়। সেখান থেকে বৃষ্টিগয়ায়। ক্রমে ক্রমে বোড়গয়ায়। সব গয়াতেই শ্রাদ্ধ করল ক্রমে ক্রমে। তারপরে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে শেষ পিণ্ড গয়াশিরে।

‘আমি আর আমার স্ববশে নেই।’ বললেন ঈশ্বরপুরী, ‘আমি এখন তোমারই অধীন। তুমি এখন যা বলবে আমি তাই করব, আমাকে তাই করতে হবে।’

সর্বস্থানে সর্বপ্রকার শ্রাদ্ধ সেরে নিমাই নিজের বাসায় ফিরে এল, আর স্বহস্তে রাঁধতে বসল। রান্না শেষ হয়েছে, এমন সময় প্রেমাবিষ্ট ঈশ্বরপুরী মুখে কৃষ্ণমাম বলতে-বলতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

‘তোমাকে চোখের আড় করে থাকি, এমন আর আমার সাধ্য নেই।’ বললেন ঈশ্বর-পুরী, ‘আর এখন তো সমীচীন সময়েই এসেছি। তোমার রান্নাও শেষ আর আমিও ক্ষুধার্ত।’

‘খুব আনন্দের কথা।’ নিমাই তৃপ্ত মুখে বললে, ‘দয়া করে তবে বসুন। আমি ভাত বাড়ি আপনার জন্যে।’

‘আমি খেলে তুমি খাবে কি?’

‘আমি পরে রান্না করে নেব।’

‘তা কি হয়?’ ঈশ্বর পুরী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

‘বরু যা রেঁধেছ, এস, দুজনে ভাগ করে খাই।’

‘ভা হয়না।’ নিমাই সব ভাত এক থালায়ই বাড়তে লাগল। গভীরভাবে বললে, ‘যদি সত্যই আপনি আমাকে চান, সমস্ত ভাত আপনাকে খেতে হবে। বিদ্ধুমাত্র সন্ধ্যা করবেন না। তিলান্তের মধ্যে আমি আবার রান্না করে নেব নিজের জন্যে।’

কৃষ্ণ-হাড়া ঈশ্বরপুরীর অস্ত্র মতি নেই। কৃষ্ণের প্রোদাদ খেতে বসে গেল পাঁচ পেড়ে। আপন হাতে

পরিবেশন করল নিমাই। পরমানন্দে খেতে লাগল ঈশ্বর।

খাইয়েও ছুটি দিলনা। চন্দন নিয়ে এসে ঈশ্বর-অঙ্গ লেপতে বসল নিমাই। ঈশ্বরের গলায় ছলিয়ে দিল ফুলের মালা। দিব্যগন্ধে আমোদ হতে লাগল ঈশ্বরের।

ঈশ্বরের বাসায় এল নিমাই। নিভুতে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, ‘আমাকে মন্ত্র দীক্ষা দিন।’

ঈশ্বর বললেন, ‘মন্ত্র বলছ কী। আমি তোমাকে আমার গ্রাণ দিয়ে দিতে পারি।’

দশাঙ্গুর-মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরকে নিমাই তখন প্রদক্ষিণ করল। বললে, ‘আমার দেহ আপনাকে অর্পণ করলাম। আমাকে এমনি শুভদৃষ্টি করুন, যাতে আমি কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে ভাসতে পারি নিরন্তর।’

‘হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।

যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে ॥’

মন্ত্র দিয়ে ঈশ্বরপুরী আলিঙ্গন করলেন নিমাইকে। দুজনেই কাঁদতে লাগলেন অঝোরে, উদ্বেল আনন্দে।

তারপরে ঈশ্বরপুরী কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানেনা।

এ কে? কাকে সে মন্ত্র দিল? জীবনে কত বড় সিদ্ধি, যিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তিনিই মন্ত্র নিলেন তাঁর কাছে। দীক্ষা-গ্রহণ-সীলার অভিনয় করলেন। দীক্ষার পর নিমাই বারে বারে গ্রাণাম করে ঈশ্বরকে। যাকে ভগবান বলে জানি, তার গ্রাণাম নিই কী করে? নিমাইয়ের থেকে দূরে সরে যাই। দূরে সরব কোথায়? নিমাই আমার হৃদয়ের মধ্যে, আমার অণুতে অণুতে। মাথবেশ্র যে বীজ পুঁতেছিলেন, নিমাই তারই ফলস্তু ফল।

পরে যখন প্রভু কুমারহট্টে এসেছেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানে, কাঁদতে লাগলেন অনর্গল। সেস্থানের যুক্তিকা তুলে বহির্বাঁসে বাঁধলেন ঝুলি করে। বললেন, এ খুলো নয়, এ সোনা। কোথায়—কোথায় আমার সেই আনন্দের আকর, সেই স্বর্ণ-ধনি।

এই অধন্য দিনান্তর আমি কাটাই কী করে? হে অনাধ-বন্ধো, করুণেক সিদ্ধো, হা হস্ত, হা হস্ত, কথং নয়ামি? কী করে কাটবে আমার দিন-রাত্রি? বলো, কি করে? ‘এই কাল না যায় কাটন।’

[ক্রমশঃ]

বণ বিদ্বেষের বিভীষিকা

মিহির সেন

১৯৫১ সালে সত্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে দৃষ্ট আদর্শ নিয়ে আমি এখন চার হিসাবে প্রথম ইংলণ্ডে বাই, তখন বর্ণবৈষম্য বর্ণবিদ্বেষ (Colour Bar and Apartheid) সম্বন্ধে আমি অবহিত ছিলাম না। ভারতবর্ষে ইংরেজ বা আমেরিকানদের সাক্ষ্য অবশ্যই আমার ঘটেছে, কিন্তু ওয়াটার্লু টেশনে পৌঁছে চারপাশের ফাকাশে ও ঈর্ষ লাল মুখগুলি আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিলো। ইংলণ্ডে পুরুষরাও যে ‘কর্সী’ হয়, এটো কথা উপলব্ধি করে আমার মধ্যে কৌতুক হয়।

কবি ও ভাবকেরা চিরকাল সুন্দরী ‘গৌরী তরুণীর’ গুণগান করে এসেছেন কিন্তু ‘গৌরবহু পুরুষের’ কথা কে করে শুনেছে? পৌরুষ ও শক্তির আধার হিসাবে চিরকাল জামবর্ণকেই কল্পনা করা হয়েছে। বাক, তখন গায়ের রং নিয়ে আমি এর চাইতে বেশী মাথা ঘামাতে রাজী ছিলাম না।

ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বর্ণবৈষম্যের নগ্নস্বরূপ আমার কাছে উদ্ঘাটিত হলো ইংরেজদেরই সৌজাত্য।

স্ন্যাট কিংবা থাকার আরগা খঁজতে গিয়ে এই বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ হয়। ভাড়া বিজ্ঞপ্তি কাগাসো কল্লর বাসগৃহগুলিতে কিংবা ‘অতিথির’ জন্ত বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এরকম গৃহস্থামিনীদের কাছে গিয়ে প্রায় প্রতিবারই আমি সমরোপযোগী মিষ্টি হাসির সাথে শুনেছি ‘বড়ই দুঃখিত, এইমাত্র উর্জি হয়ে গেছে’।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে—বহু অভিজ্ঞতার পর আমি ধীরে ধীরে বুঝেছি যে, বর্ণবিদ্বেষ—বর্ণিও এর শুরু বোধ হয় ইংলণ্ডেই, এখন শুধুমাত্র ইংরেজদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বর্ণের বিভিন্নতার জন্ত হের জ্ঞান করা এবং বিভেদ করার নীতি বহুদেশেই আছে, এবং এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণকে অবদমিত করে রাখার জন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই বৈষমানীতি অন্তঃস্বরূপ ব্যবহার হচ্ছে।

ব্রিটিশ বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই গিয়েছে, সেখানেই তারা এই ঘৃণা ও হিংসার বিষ সুরনিগূণ দক্ষতার সাথে ছড়িয়ে দিয়েছে। বর্ণবৈষম্য ইংরেজ নীতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার কথা ধরা যাক। এই বীপ—মহাদেশের লোকসংখ্যা খুবই কম। পরিসংখ্যানের তুলনা করলে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও তিনে ১০০ গুণ বড়, অথচ লোকসংখ্যা মাত্র আমাদের (পঃ বঙ্গের) এক-তৃতীয়াংশ। দেশকে উন্নত করার জন্ত যথেষ্ট লোকের একান্ত অভাব সেখানে। আমাদের দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যার কিছু অংশ সহজেই অস্ট্রেলিয়ার জনহীন অঞ্চলে পূর্বসূরিত্ব স্থাপন করতে পারে। কিন্তু তা অসম্ভব। অস্ট্রেলিয়া শুধুমাত্র শ্বেতকায়দের সরলচিত্ত বর্গ হয়ে থাকবে। গত দুটি বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যগণ অস্ট্রেলিয়ানদের সাথে জাপানী ও ইটালীয়ানদের বিরুদ্ধে পাশাপাশি যুদ্ধ করেছে—অনেকে মৃত্যুও বরণ করেছে। কিন্তু আজ অস্ট্রেলিয়া শ্বেতবর্ণ ইউরোপীয়ানদের, এমনকি

ওট জার্মান ও ইটালিয়ানদেরও প্রায় নিঃশেষের মত অমুরোধ জানাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় আগার জন্ত, বিনা ভাডায় আসা, মনোমত বসবাসের ব্যবস্থা, মোটা বেতনের চাকুরী এবং আরও বহুবিধ স্বাক্ষর্যের আশাস দিচ্ছে। ইউরোপের অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাসগুলির প্রেলোভন-জনক বিজ্ঞাপনগুলির দিকে তাকালেই এ কথা সত্যতা বোঝা যাবে। অথচ আমাদের দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, আজ ভারতবর্ষে বাস করার জায়গা নেই, যার ফলে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক হয় অল্পবয়স্ক বৈতনে কাজ করে, নয় পুরোপুরি কর্মহীন। আমাদের তরুণেরা সং জীবন বাপন করার জন্ত পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে কাজ করতে প্রস্তুত। আমাদের সহস্র সহস্র ছাত্র, ইঞ্জিনিয়ার এবং যন্ত্রবিদ-বিশারদ (Technician) যুবক রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত মেধাবী তরুণেরা আছে, যারা সুযোগ পেলে মনোভূমিতেও ফুল ফোটাতে পারে। এ যুগে ভারতবর্ষে নিঃসার ফেলার স্থানের প্রয়োজন, আর প্রয়োজন কর্মহীন যুবকদের জন্ত কাজ।

অস্ট্রেলিয়াই এ সমস্যার সমাধান করতে পারে বলেই স্বাক্ষর্য: তার কথা মনে আসে। কিন্তু আমাদের কমনওয়েলথের প্রায় স্বল্পগণ লজ্জাকর ‘শ্বেতকায় নীতি’ (White Australian Policy) পালন করে চলেছেন। এই গণতান্ত্রিক গালভরা বক্তৃতার আবাসভূমিতে জেলের আসামী, যুদ্ধের অপরাধী, এমনকি ইউরোপীয় সমাজের নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও অভিনয়িত হয়, কিন্তু সং পরিজ্ঞানী, বুদ্ধিমান ভারতবাসীর স্থান হয় না। অস্ট্রেলিয়া কি অপরাধীদের আবাস-কেন্দ্রের (Convict Settlement) ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্তই এই নীতি অবলম্বন করেছে? এটো সূত্রে এ প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অস্ট্রেলিয়াতে কাটকে পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা না করে বরং সংখ্যা বা নম্বর জিজ্ঞাসা করলে ভাল কথা হয় না। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার ব্রিটিশ বহুদিন ধরে কেবল দাগী আসামীদের পাঠাতে—তারপর বসবাস আরম্ভ হয়। তথাকথিত গণতন্ত্রের বৃহত্তম কেন্দ্র আমেরিকা, জাতি-বৈষম্যের দুর্নামের দিক থেকে, দক্ষিণ-আফ্রিকার (যাকে এদেশের নরক বলে গণ্য করা যায়) পরেই। এই স্বয়ং-নিযুক্ত পৃথিবীর ‘স্বাধীনতার রক্ত ও মুক্তিযাত্র উৎসর্গাতা’ প্রতিবছর ৬০,০০০ ইংরেজকে প্রবেশ করতে অধিকার ও বসবাস করার সুযোগ দেয়। আমাদের দেশের জনসংখ্যা ইংলণ্ড থেকে শতগুণ বেশী হলেও, ভারতের Quota বা প্রবেশাধিকার মাত্র ১৬ জনের জন্ত। আরও আজও তুলিনি আমাদের প্রতিনিধি দূত জি, এন. মেহেতাও সেখানে যে অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। শুধুমাত্র গায়ের রং-এর জন্ত নিজের পরিচয় বিবৃত করার পরও তাঁর আমেরিকার এক হোটেলের স্থান হয়নি। এইসাথে বলে রাখা উচিত যে, শ্রী মেহেতার গানের রং ‘উজ্জল গৌরবর্ণ’।

আমেরিকার অধিবাসীদের দগিত বিশাল জাতিকে, কল্যাণ-অধিত রেডইণ্ডিয়ানদের শ্বেত উপনিবেশিকরা কি ভাবে বিধাসম্বাদকতা করে বা চাকুরীর সাহায্য নিয়ে নিরপেক্ষ করে ফেলেছে, তা সকলেই

জানি, বার কলে মাত্র দুইয়ের কয়েকজন আদিবাসী এখনো পত্তর মত অবস্থায় জীবন ধারণ করছে।

এটা বৈজ্ঞানিক সত্য য, অধিকাংশ আমেরিকানের শিরায় নিগ্রো-রক্ত প্রবাহিত, কিন্তু এ কথা আরও সত্য যে, প্রত্যেকটি খেতকার আমেরিকানের হাত ও বিবেক নিগ্রোর রক্তে রঞ্জিত। সমস্ত পৃথিবী আতঙ্ক বিষয়ে লক্ষ্য করছে আমেরিকায় মানুষ মানুষের উপর কি নিষ্ঠুর বীভৎস অত্যাচার করেছে, কি নির্মম দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। আমেরিকায় দাস-প্রথার দিনগুলিকে এক ভাষণ দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। আজ আমেরিকায় ঐশ্বর্য্য এবং প্রাচুর্য্যের মূলে রয়েছে কালো ক্রীতদাসের প্রাণপাত পরিশ্রম। সহস্র সহস্র কৃষিকার লোকদের আফ্রিকার তাদের শাস্তির নীড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে পত্তর মত শুল্লিত অবস্থায় আটলান্টিক পার করে এনে কারখানার ও শস্তক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে। শেষে অপরিণীম পরিশ্রম ও অমানুষিক অত্যাচারে তারা মৃত্যুবরণ করেছে। “লংফেলো” (Longfellow) ভাষায় তারা চিরদিন নামহীন কবর থেকে আর্শনাদ করবে “আমরা সে অত্যাচারের সাক্ষী”।

মিথ্যা স্তোক ও দস্তোস্তির আবরণ ছিন্ন করে স্পৃহিতগত বৈষম্যের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আমরা বেন কখনো ভুলে না যাই যে, আমেরিকাকে লক্ষ লক্ষ কৃষিকার নাগরিক বিগতশুণের ক্রীতদাসদের থেকে মাত্র সামান্য উন্নততর অবস্থায় বাস করছে আজ ১১৫১ সালে।

সম্প্রতি আলবামার জিমি উইলসনের ঘটনাটি, বা প্রায় আন্তর্জাতিক ব্যাপার হয়ে পড়েছে, আমেরিকার নিগ্রো-জীবনের উপর কিছুটা আলোকপাত করে। আমেরিকা হচ্ছে একমাত্র দেশ—যেখানে কৃষকরা নাগরিকদের বিরুদ্ধে সামান্য চুরির অপরাধও প্রমাণিত হলে তার বৃত্তাদণ্ড দেওয়া বেতে পারে। কোনও খেতকার নাগরিককে যদিও একই অপরাধের জন্য সামান্য অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দির প্রৌচ নিগ্রো জিমি উইলসন এক খেতকার অহিলার টাকা আটকেব মতো চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়। জিমি বলে যে মিথ্যায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমেরিকার খেতকার জীবগণ বিচারের সময়—সত্যবটনা বাই হোক না কেন—কৃষকরা ব্যক্তিদের সর্বদাই দোষী সাব্যস্ত করেন। আমেরিকাকে নিগ্রোদের বিচার করতে পারেন শুধুমাত্র খেতকার প্রভুর দল, বাবা “কালো ব্যাটারের” (Niggers) শিকা দেওয়ার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। কলা নিঃস্বপ্নজন যে, আইনের দ্বারা অল্পসংখ্যক জিমি দোষী প্রমাণিত হলো এবং বৃত্তাদণ্ডে দণ্ডিত হলো। ভাঙ্গের খেলার তার পক্ষ নিলেন কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক এবং ঘটনাটি ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ বরলো। সহস্র সহস্র প্রতিবাদ আসতে লাগল; পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শিত হোল। অবশেষে কিছুটা সজ্জিত হয়ে আমেরিকার সরকার বৃত্তাদণ্ডের পরিবর্তে ব্যবহৃত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। ১১৫৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর London-এর News Chronicle-এ এই সবাদ বার হয়।

১১৫৮ সালের পরলা সেপ্টেম্বর London Daily Express-এ মুদ্রিত আমেরিকার আরেকটি বরষ পাঠকের জীতি সন্ধান কথ্যে।

কঠোরশে অস্ত্রোপচারের পর প্যারী বিশ্ববো নামে তিনি বহুশেষ খেতকার শিল্প অত্যন্ত অশ্রু হয়ে পড়ে। তাকে বীচাতে হলে প্রচুর রক্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক রেডক্রস একত্রে সহায়তা করতে পারল না, কারণ “লুইসিয়ানাতে” (Louisiana) গত জুনে গাশ হওয়া এক আইনের বলে রক্তকে “সাদা” ও “কালো” (Blood Plasma to be labelled ‘Black or White’) তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্যারীও গরীব শ্রমিক পিতার পক্ষে শত শত টাকা খরচ করে “সাদা” রক্ত কেনা ক্ষমতার বাইরে, কিন্তু একটি নিগ্রো বখন রক্তদান করতে চাইল, তার আবেদন সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হলো। এখানে বলা উচিত যে, খেতকার, নিগ্রো এবং কামাদের রক্তে কোনও প্রভেদ নাই। বখন Daily Express-এর আমেরিকা-স্বত সাংবাদিক মিসেস্ বিশ্ববোকে ফোন করে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করলেন, মিসেস্ বিশ্ববো দ্রুত প্রত্যুত্তর দিলেন—“আমার সন্তানের জন্য আমি কিছুতেই কালো আদমীর রক্ত নেণো না। বর্ণভেদ সব সময় যেনে চলা কঠোর। নিগ্রোদের রক্ত যে নিবিদ্ধ করা হয়েছে, এ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক মঙ্গলজনক হয়েছে।” তাঁর মৃত্যুপথ্যাত্রী সন্তানের শব্দার পাশে পড়েয়ে তিনি এই উক্তি করেছেন।

আমেরিকার দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর যদিও এত বিবেচনাব্যাপার অহমিকাপূর্ণ মনোভাব হয়, তবে সমাজের উন্নত শ্রেণীর অভিজাত লোকদের যে কৃষকরাবের প্রতি কি ধারণা, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

খেতকারগণ বিশেষ করে এ্যাংলো-সাক্সনের (Anglo-Saxons) কৃষকরাবের প্রতি তাদের ঘৃণা ও বৈষম্য-নীতি শুধু পৃথিবীব্যাপী কুখ্যাতি অর্জন করেছে। এদের প্রাধান্য যে দেশে বেশী, সেট দেশেই এরা আমাদের প্রতি বৈষম্যের নীতি প্রয়োগ করেন। এই এ্যাংলো-সাক্সনেরা সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেন। অল্পবিস্তর পার্শ্ব্য ছাড়া সব জায়গায় একই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি ইংলণ্ডে, কানাডায়, আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়। কেন্দ্রীয় আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র (Central African Federation) অথবা নিউজিল্যান্ডে অত্যাচারের মর্মান্তক কাহিনী সব জায়গায় এক।

একদা দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে আগত এক উচ্চপদস্থ এক অভিজাত ভারতীয় আইনজীবী আমায় এই গল্পটি বলেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, দঃ আফ্রিকায় বহু ভারতীয় বাস করেন।

একদিন বিকালে কেপটাউনের একস্থাপন্ন সহরতলীর রাজ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি অপরিদ্রক থেকে দুইজন খেতকার শ্রমিককে আসতে দেখেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজ্যের অন্তর্গত চলে বান, কারণ, দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়েকটি জায়গায় কৃষকরাবের, ইউরোপীয়দের সাথে রাজ্যের একদিকে হাঁটার অধিকার নেই। সেট ইতর লোক হুটি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করে, প্রচণ্ড প্রহার দিয়ে পথের পাশের চরমায় ফেলে দেয়; তিনি এতটুকু প্রতিবাদ করার বা প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেনি। কারণ, তাতলে তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হাত।

যাই হোক আমার বহু জীবিত থেকে পরে তাঁর কাহিনী রর্ণনা করার সুযোগ পেয়েছেন—কিন্তু সেই সহরে আর একজন নিগ্রো ব্যারিষ্টার সাদা দস্তানা পরায় অপরাধে নিহত হয়েছেন। প্রথম

শ্রমীর বাস-ষ্ট্যাণ্ড খোঁজাঙ্গের জন্ত সরঞ্জাম বসে তিনি যখন দ্বিতীয় শ্রমীর বাস-ষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিলেন, কয়েকটি খেতাজ বুঝক তাঁর নিগ্ৰহে চলে সাফা দস্তানা পরার 'অপরিসীম খুঁটায়' ক্ষেপে যায় এক সেখানটী তাঁকে প্রহার করতে করতে খুন করে ফেলে। তারপর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শুধুমাত্র সামান্য অর্থদণ্ড দিয়ে মুক্তি পায়। এ ঘটনার বিবরণ আমরা বেভার্ডের ফাদার Huddleston এর "Nought for Your Comfort" বইতে পাই।

বর্তমানে তথাকথিত গণহত্যাশ্রয় ইংরেজ মধ্য-আফ্রিকার টিনভিত্তি (Tin-rich) অঞ্চল গুলিতে লুণ্ঠ করার অভিপ্রায়ে "কেন্দ্রীয় আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র" (Central African Federation) গঠন করেছে। এবং হিটলার ও মালানের পক্ষাভ্রমণ করে দক্ষিণাশ্রয় ও নির্বিবাহী আফ্রিকানদের সভা করার চেষ্টা করছে Concentration Camp ও অত্যাচারের মাধ্যমে।

রয়টারের এক খবরে আমরা জানতে পাই কিভাবে বিপাল-নির্ধাতন-ষ্ট্যাটি (Concentration Camps) তৈরী করা হয়েছে। ব'র চারপাশে রয়েছে সুউচ্চ টাওয়ার থেকে সতর্ক মেসিনগানের পাগুর আর ১২ ফুট উঁচু বিদ্যুৎ দেওয়া কাঁটাতারের বেড়া।

এই কেন্দ্রীয় আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় হাইকমিশনারের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে, তা সহজেই প্রমাণ করে—এখানে, এই কমনওয়েলথের দেশে—কৃষ্ণকায়দের প্রতি ঘৃণাবোধ কত তীব্র।

একদিন গ্রামের মধ্য দিয়ে মোটরে যেতে যেতে ভারতীয় হাইকমিশনার ও তাঁর দ্বী একটি স্থলর হোটেলে জলপান করার জন্ত আসেন। তাঁরা ভিতরে বসতে না বসতেই একটি লালমুখো গুপ্তা-প্রকৃতির লোক তাঁদের ক্ষতভাবে ডানায় যে, সে 'কালো আদমীদের' পরিবেশন করে না। ভারতীয় হাইকমিশনার তাঁর পরিচয় দেন—এক 'আমার দ্বীরা ভরানক সেটা পেয়েছে' বলা সত্ত্বেও উক্ত লালমুখো গুপ্ত শুধু ঘৃণাচকট ইঙ্গিত করে তাঁদের বহিষ্কৃত করে দেয়।

বাদ একজন উচ্চশ্রমীর সরকারি দূত এই ব্যবহার শেষে থাকেন, তবে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত এই বহুভাষাধার দেশে সাধারণ ভারতীয় নাগরিকের কি দৃষ্টান্ত হবে, তা সহজেই অনুমেয়। আমরা ত মনে হয়, আন্তর্জাতিক নিষেধ জুয়াচুরীর মধ্যে এই কমনওয়েলথের বাণিজ্যটাই সবচেয়ে নিবৃত্ত এবং ইংরেজেরা সব চাইতে বেশী হীন-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন, যাদের ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা প্রায় ব্যাধির মত হয়ে পাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশের অনেকের ইংলণ্ড সযত্নে কালনিক ও ভুল ধারণা আছে। ম্যাগনাকার্টার মানবিক অধিকার ঘোষণাকারী 'পবিত্র' ইংলণ্ড আমাদের কাছে স্বপ্নের দেশ।

আমরা ইংরেজের ফ্রিকোট-প্রীতির কথা জানি; কিন্তু জানি না সাধারণ ইংরেজ কালো-আদমীদের কতখানি ঘৃণা করে এবং ভারতীয়রা ইংরেজদের মতে 'কালো আদমীর' পর্যায়েই পড়ে।

আমাদের মতোই হীন-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন (Inferiority Complex) অনেক 'কালোমার' আছেন, বীরা ইতিপূর্বে এবং এখনো মনে করেন ইংল্যাণ্ডে বর্ণবৈষম্য নেই বা থাকতে পারে না।

তাই গত পুজোর সময় যখন লণ্ডনে আফ্রিকান এক ভারতীয়-বিশেষী লাঞ্চ দেখাছিলো, আম'র অত্যন্ত আশঙ্ক হয়েছিলো এই ভেবে

যে, এখন অন্ততঃ এই ইংরেজ-পাগল অভ্যন্তরীণ-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কালোমারেরাগুলি সত্যকে চিনতে পারবে।

ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক শ্রমী এবং অস্বাস্থ্য সর্বল শ্রমী পরস্পরের প্রচুর বিভেদ সত্ত্বেও একটা অস্বাভাবিক সমানভাবে গোপন করে। সে অস্বাভাবিক হলো আফ্রিকান ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণার মনোভাব।

বুটিশ লেবার দলের বড় পাণ্ডা মিষ্টার টম্ ডিয়ার্স Scarborough সভায় গত বৎসর বুটিশ রক্ষণশীল দলের প্রতি কটাক্ষ করে বলেন যে, রক্ষণশীলগণ মনে করেন তাঁরা কৃষ্ণকায় হীন-জাতিগুলি—যাদের খনিজ সম্পদ ও পশ্চিম জাতির প্রকৃত উপকার সাধন করেছে, তাদের প্রত্যাখ্যান (News Chronicle. 30. 9. 58) কিন্তু বাস্তবে এ্যাটলির লেবার দল চার্লিসের টোয়ীদের থেকে কৃষ্ণকায়দের প্রতি ঘৃণা বা শোষণনীতি কিছু কম ভাবে পালন করেনি। সমাজবাদী এ্যাটলির প্রধান-মন্ত্রীর সময় বুটেন মাল্লর এবং গু: আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের উচ্ছেদার্থে বর্ণবিষমূলক তীব্র যুদ্ধ শুরু করে।

১৯৫৮ সালের ২৫শে অক্টোবর 'জন বুল' (John Bull) নামক পত্রিকার গিলবার্ট হার্ডিং (GILBERT HARDING) নামক এক বিখ্যাত সংবাদদাতা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, যা লিখিত ও উচ্চশ্রমীর ইংরেজদের ভারতীয়দের প্রতি তীব্র ঘৃণা পরিষ্কৃত করে তোলে।

বহু বছর আগে তিনি যখন ভারতীয় ক্রীকেট খেলায় দিলীপ সিংহীর সঙ্গে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে খেতে বান, পাশের একটি টেবিল থেকে কয়েকজন সুসজ্জিত অভিজাত ইংরেজ চাপা গলায় দাবী করেন 'কালো আদমীকে বার করে দাও' (Chalk the Nigger out)। আত্মকাল লণ্ডনের বাস্তায় রাস্তার বক বক অক্ষরে লেখা আছে দেখা যায় 'ইংল্যাণ্ডকে শ্বেতকায়দের লজ্জাই রাখা হোক' (Keep Britain White অর্থঃ K. B. W.)

অবস্থা এমন চরমে পৌঁছেছে যে, আত্মকাল লণ্ডনে কোন সভাগৃহে বর্ণবিষমের বিরুদ্ধে সভা ভাঙা অসম্ভব। ইংলণ্ডে আজ শুধু বর্ণবিষমীদের এবং ফ্যাসিস্টদের প্রাধান্য এবং তাদের বহুভাষা স্বাধীনতা আছে। কেন্দ্রীয় আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র থেকে পলাতক একজন আফ্রিকাবাসী লণ্ডনে বহুদলী গুলিতে গেলো দল্লা বেবেছিলো। ইংরেজরা হাইডপার্ক (Hyde Park) বস্তার আসনটিকে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্ত সাজিয়ে রেখেছে, কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, নিপীড়িত এবং অত্যাচারিত লোকদের সেখানে মুখকুটে কথা বলার অধিকার নেই। বিশেষ করে তারা যদি আবার রাগে কালো হয়।

এ বছর ২১শে মার্চ হের মুলার (Herr Mueller) পশ্চিম-জার্মানীর এক নাগা বিরোধী বোম্বা বলছেন যে, ইংল্যাণ্ডে কিছুদিন আগে ফ্যাসিস্টদের একটি গোপন সমিতি গঠিত হয়েছে। এই সমিতির নাম 'ফ্যাসিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল' (Fascist International)। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শুধু ভারতীয় এবং আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাবকে তীব্রতর করে তোলা।

১৯৫৯ সালের ২৩শে মার্চ কলিকাতার "ট্রেডইউনিয়ন" কাগজে এ খবরটি বের হয় যে, ব্রিটল-এ একটা দুইয়ের ডোহারী অবিকাল প্রদেবকে হারান, কারণ দুইয়ের বোতলগুলি মিলি করার জন্ত একজন

কালো লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। যে গৃহিণীরা দুধ নিতে অস্বীকার করেছেন, তাঁরা সবাই “সুসভ্য পশুত্বপ্রিয়” ইংরেজ জাতি-ভুক্ত।

গতমাসে লণ্ডনের একটি প্রধান রাজপথে কক্রেণ (Cochrane) নামক “জামাইকার” এক নিম্নোক্তে ছুরিকাঘাতে ইংরেজ গুণ্ডারী হত্যা করে। কক্রেণ লণ্ডনের এক হাসপাতালে কাজ করতেন। তার একমাত্র দাবী—সে কালো এবং বর্ণবিদ্বেষ-উদ্ভূত ইংরেজরা কালো লোকদিগকে জানিয়ে দিতে চায় যে, ইংল্যান্ডে তাদের ভাষণ হবে না। অথচ বৃটিশ অধিকৃত “জামাইকার” লোভী ইংরেজদের অবাধ লুণ্ঠন-নীতির জন্য সেখানে আজ অভাব ও বেকার-সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়ে পীড়িত হয়েছে। তাই বৃহৎ কক্রেণকে বিলিতে আসতে হয়েছিল চাকরীর সন্ধান।

গত মে মাসের ১৬ তারিখে গৌতম নামক এক ভারতীয় যুবক মিউল্যাণ্ড রেলওয়ের লণ্ডনস্থিত কিলবার্ণ হাটরোড ষ্টেশনে যায় অল্প দিনের মত। সেখানে সে বৃষ্টি ক্লাবের (টিকিট বিক্রয়) কাজ করতেন। হঠাৎ একজন সুসজ্জিত দীর্ঘাকৃতি ইংরেজ তার জানালার সামনে পীড়লো এবং টিকিট চাওয়ার পরিবর্তে জিজ্ঞাস্য করলো “তোমার দেশ কোথা?” “আমি ভারতীয়” গৌতম হেসেই উত্তর দেয়। বেশ, আর কথা নেই বার্তা নেই, সেই ইংরেজ আতঙ্ক করলো ভারতবর্ষকে ও ভারতীয়দের গালাগালি করতে অকথা ভাষায়। পণ্ডিত নেহরুও বাদ গেলেন না। ব্লাডি, সোয়াইন, নিগারস (ভারতীয়দের ওরা ‘নিগার’ বলে), বেরিয়ে যাও আমার দেশ থেকে, ইত্যাদি। গৌতম বখন প্রতিবাদ করে, তখন উক্ত লালমুখো দ্বিপু গুণ্ডার মত ঘরে ঢুকে আতঙ্ক করে এলোপাখাড়ি প্রহার। দুর্বল গৌতম কেন পারবে তার সাথে গায়ের জোরে? গৌতমকে টেনে ঘরের বাইরে এনে “গণতান্ত্রিক ইংরেজ ভয়লোক” লাথি, কিল, ঘুবি মেরে যায় এবং তার সাথে “ব্লাডি ইণ্ডিয়ান” “ভাটি নিগার” (Bloody Indian, Dirty Nigger) ইত্যাদি গালি দিতে থাকে। লোক জড় হয়—সবাই সাধা-চামড়া, কিন্তু এগিয়ে এসে গৌতমকে সাহায্য করা দূর থাকে, মুখ ফুটে একটি প্রতিবাদও করলো না বেউ। একটি বৃড়ি এ অভ্যাসকে সজ্ঞ না করত পেরে পুলিশকে ডাকে এবং পুলিশ বখন এসে পৌঁছায়, তখন রক্তাক্ত গৌতম বেহুঁস। এ ঘটনা দু’মাসের ওপর হলো। লণ্ডন পুলিশ কাউন্সিল এ ব্যাপারে প্রেক্ষার করেনি, কোনও তদন্ত পর্যন্ত করেনি। এখনও গৌতম হাসপাতালে শয্যাশায়ী এবং ওর দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি প্রায় বহিত। গৌতমের স্ত্রী লণ্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করা সত্ত্বেও ভারত সরকার এ ব্যাপারে কোনও অঙ্গসন্ধান করেনি নি। গৌতম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্নেসক বলেজে সন্ধ্যার সময় অধ্যয়ন করতেন।

ভারত আজ বারো বছর হলো স্বাধীন। অথচ ভারতে দাস্তিক ইংরেজদের বেরাদবী এতটুকুও কমে নাই। এই সাবে ‘দিন গ্রাউন্ডে ব্যাঙ্ক’ (Grindlay’s Bank) কেনেবাল ম্যানেকার মিঃ ব্রাউন (Brown) তার ভারতীয় কথাচারীদের হুমকি দিয়ে বুট ঠুকে বলেন,—“আমি যুদ্ধে ছিলাম, আমি জানি ভারতীয়দিগকে কি ভাবে সারোজ্য করতে হয়” (I was in the war, I know how to teach the Indians)। এই দস্তোক্তির জন্য, অল্প বেশ হলো কত বিকৃত মিটার ব্রাউন হাসপাতালের ষ্টেচারে পড়ে,

তার পরের দিনই “হোম” অভিমুখী এ্যারোপ্লেনে পলায়ন করতে পথ পেত না। এটা অবগত কথ্য, এটা গাফীর দেশ, এখানে বিদেশীর অপমানের প্রতিবাদ করা—কি ছি যৌর অস্ত্রায়। ছাপোচিত সহস্রাঙ্গি আমাদের পরম আদর্শ। কেউ যেন এ মহৎ গুণকে কাপুরুষতা বলে তুল না করেন।

লণ্ডনে একটি ভারতীয় ডাক বিভাগীয় প্রমিকের ইংরেজ স্ত্রী গ্লোরিয়ার স্বামীর করুণ অক্ষসজ্জল কাহিনী চিরদিন পাঠকজগৎ ভারাক্রান্ত করবে। ১৯৫৭ সালের ২০শে আগস্ট ইংরেজী কাগজ-গুলিতে এ খবরটির বহুল প্রচার হয়।

বাবা মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজ-দুহিতা গ্লোরিয়া এই ব্যক্তিকে বিবাহ করেন এবং তাদের মিলিত জীবন খুব সুখের ছিল। কিন্তু তাদের সন্তানের জন্মের পর থেকে প্রতিবেশীদের হিংসা ও ঘৃণা তীব্রতর হয়ে ওঠে। নানারকম বিক্রিপোক্তি ও বিঘ্নপূর্ণ দৃষ্টি তাদের জীবন অসহ্য করে তোলে। দিন দিন এ যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ভারতবর্ষ আমাদের পক্ষে এ কথা বলনা করা কঠিন, কিন্তু ইংলণ্ডে একটি শেতকারা মেয়ে যদি তথাকথিত “হীন জাতির” (Inferior Breed) পুরুষকে বিবাহ করে, তবে তাদের সন্তান নিম্নাকর্ণ ঘৃণার পাত হয়ে পীড়ায়।

২০শে আগস্ট ১৯৫৭ এর “ডেইলী মেলের” (Daily Mail) খবর অনুযায়ী তার সন্তানের এই দুঃবস্থা দেখে গ্লোরিয়ার স্বামী ভেঙ্গে পড়ে এবং সে অত্যন্ত দুঃস্থিতাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

তার গণতান্ত্রিক আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে দিনের পর দিন লাঞ্চিত হয়ে হতভানি মা চরম পথ বেছে নেয়। ২০/৭/১৯৫৭ এর নিউজ ক্রনিকলে (News Chronicle) বলা হয়েছে—গ্লোরিয়া সহরের ভূগর্ভস্থ রেল-ষ্টেশনে গিয়ে তার শিশুকে প্রাণিকর্মের একটি আসনে শুইয়ে নিজে ট্রেনের তলায় আশ্রয়িত্য করে। নির্দোষ অসহায় শিশুটি বখন করুণভাবে কাঁদছিল, তখনি এক রেহময়ী মার দেহ ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যায়।

হয়তো আজ রাতের সেই মাতৃহীনা ঘেয়েটি তার একলা শযায় চোখের জল ফেলছে, কিন্তু তার প্রতিটি অক্ষপিন্দুর সঙ্গে জায় বিচার ও তার মার মৃত্যুর প্রতিশোধের আবেদন যেশানো রয়েছে। সে তো আমাদেরই একজন—তার শিরায় তো ভারতীয় রক্তই প্রবাহিত।

এ্যাংলো-সাক্সনদের এ্যাংকো-এশিয়ান লোকদের প্রতি মমত্ব অত্যাচারের কাহিনী হিটলারের জঘন্য বর্বরতাবেও হার মানিয়ে দেয়।

হিটলার ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ইহুদীদের উপরে অত্যাচার করেছিলেন, কিন্তু এ্যাংলো-সাক্সনরা শত শত বছর ধরে আমাদের লুণ্ঠন করে অপমানিত করে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিণয়ে রেখেছিলো ও এখনও রাখছে। একথা বখনই ভাবি যে, তারা আমাদের দেশে এসে বর্ণবিদ্বেষমূলক ক্লাব খুলে ক্যান্টিনের মত আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বর্ণবিদ্বেষ চালাচ্ছে, তখন আমি চোখে অন্ধকার দেখি।

আজ এ্যাংলো-সাক্সনরা (Anglo Saxons) পৃথিবীর জনমতের সামনে পীড়িয়েছে মানুষের প্রতি জঘন্যতম অপরাধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে। আগামী দিনের ইতিহাসে তাদের হুণ্ডের কথা লেখা থাকবে। কিন্তু আজও এই লোলুপ লুণ্ঠনকারী জাতির আপন অপরাধের প্রতিকারের সময় আছে।



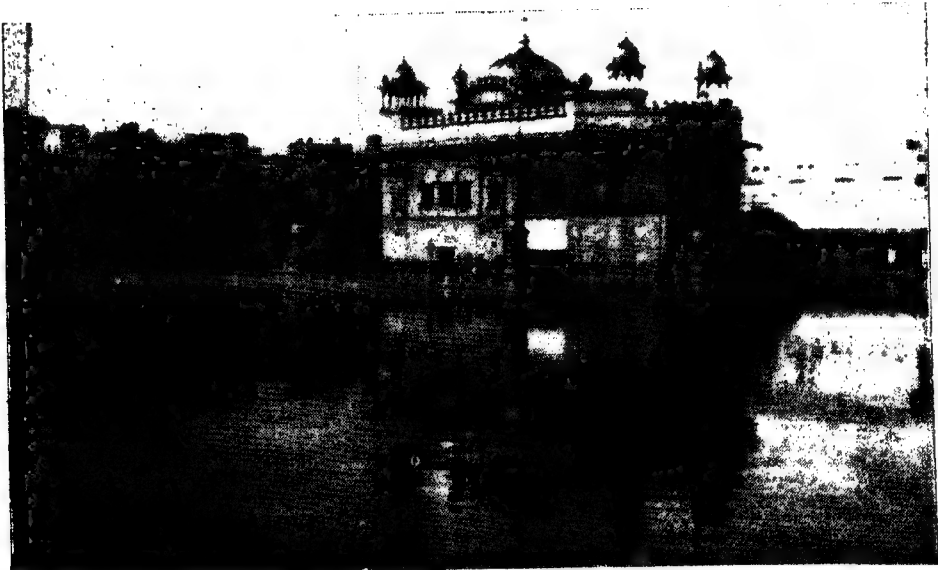
প্রতিচ্ছবি

—পরিতোষ মিত্র

॥ আলোকচিত্র ॥

জলচ্ছবি

—শান্তিকুমার গুপ্ত





মনোযোগ

— জাভেদার সিনহা



নিরাশ্রয় (ইল্যান্ড)

— অক্ষয়কুমার দে



কুমুম-কীট

—মোনা চৌধুরী

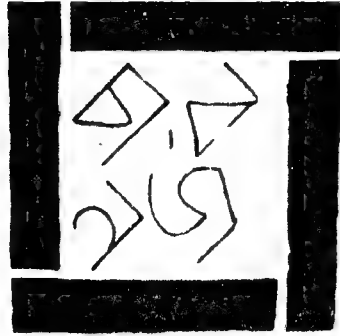
শ্রীমতী ঠাকুর

[লব্ধপ্রতিষ্ঠা নৃত্যশিল্পী ও বঙ্গবিনী চিত্রশিল্পী]

পশ্চিম-ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন
এক বিশিষ্ট স্থানাদিকারী, সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক
কাজে তৎপরতার করেণটি ব্যবসায়ী পরিবারের দান অতুলনীয়।
তন্মধ্যে হাতীসিং পরিবারের শিল্পসংগ্রহ, দ্বৈশিক্ষাপ্রসার ও সমাজহিতকর
কাৰ্য্যধারা উল্লেখযোগ্য। এই বংশের ৬পুরুষোত্তম ভাই ও তৃতীয়
সহধর্মস্বী শ্রীমতী লীলা দেবীর ছয় সন্তানের তৃতীয়া শ্রীমতী দেবী
১৯০৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর আমেদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।
ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি জীৱন্তরভাট লালভাই হলেন লীলাদেবীর
ভ্রাতা। প্রথমমন্ত্রী জীৱন্তরলাল নেহেরুর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী
কৃষ্ণা দেবীর স্বামী শ্রী রাজা হাতীসিং হলেন শ্রীমতী দেবীর অষ্টমতম
ভ্রাতা। শ্রীমতী দেবী বঙ্গ-হুহিতা নন, কিন্তু বাঙলার বধু।

শ্রীমতী দেবী আমেদাবাদ সরকারী বালিকা-বিভাগের হঠাতে
১৯১১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় সরকারী
কলেজে পড়িতে থাকেন। সেই সময় গান্ধীজী-প্রবর্তিত অসহযোগ
আন্দোলনে জড়িত থাকার তিনি সরকারী কলেজ ত্যাগ করিয়া
গান্ধীজী-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষালয়ে যোগদান করেন। তথায়
দুই বৎসর থাকার পর ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন এবং
১৯২৭ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। প্রথমে তিনি সাহিত্যের ছাত্রী
ছিলেন, পরে আচার্য্য নন্দলাল বসুর নিকট চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য ও
শাণ্ডার নিকট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ৬দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে
রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নবকুমার সিংএর কাছে নৃত্যশিক্ষা করেন।
১৯২৭ সালের শেষার্ধ্বে তিনি জার্মানী হাইয়া Froebel
Houseএ এক বৎসরে কিশোরগার্ডেন কোর্স শেষ করেন এবং
দুই বৎসর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে PEDAGOGY ও দর্শনশাস্ত্র
অধ্যয়ন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি জুথি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
ছিলেন। অশ্রুহতার জন্ত উক্ত বৎসরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন
করিয়া কিছুদিন পরে দিল্লীর মডার্ন হাইস্কুলে অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রীর
পদ গ্রহণ করেন।

বিদেশে থাকার সময় তিনি শান্তিনিকেতন ও ইহার শিক্ষাধারাকে
ভোলেন নাই। তাই জাঙ্গামীর বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্যবিদদের
প্রায়ই আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্য
পরিবেশন করিতেন। অনেকের ধারণা যে, তিনি তথায়
নৃত্যশিক্ষা করেছিলেন; কিন্তু শ্রীমতী দেবী জানান যে, ইহা সত্য
নয়। ১৯৩১ সালে তিনি পুনরায় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া
আসেন। তাঁহার নৃত্যছন্দে বিমুগ্ধ কবির উক্ত বৎসরের সেপ্টেম্বর
মাসে কলিকাতায় এক নৃত্যপ্রদর্শনের আয়োজন করেন। উহাতে
কবিগুরু 'বল্লভ' ও অস্ফটক করেণটি কবিতা আবৃত্তি করেন
আর শ্রীমতী দেবী নৃত্যের তালে তালে এগুলি রূপ দিতে
থাকেন। সেই সময় কলিকাতার দর্শক প্রথম দেখেছিলেন নৃত্যের
মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাস্তবরূপ। 'দে দৌড় দে দৌড়'
কবিতাটি শ্রীমতী দেবীর লীলায়িত ছন্দে কি অস্পৃহ হয়েছিল—
আজও দর্শকেরা তাহা তুলিতে পারেননি। ইহার পর তিনি
কলকাতা, কাতী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালার প্রভৃতি স্থানে তাঁহার নৃত্যপ্রদর্শন
করেন। সেই সময় স্থানীয় পত্রিকাগুলি তাঁহার উচ্ছসিত প্রশংসা
করে। ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় নৃত্য-প্রদর্শনের ব্যবস্থা



করেন—শ্রীমতী দেবী 'বিলার অভিশাপ' ও আরও করেণটি কবিতা
পাঠের সাথে নৃত্যছন্দে সেগুলি বিকশিত করেন। সেই সময়
ছয় মাসের জন্য তিনি কবিগুরুর সেক্রেটারীর কাজও করেন।

১৯৩৫ সালে শ্রীমতী দেবী কবি ভল্লভের কেরালা কলামগুলে
'কথাকলি' নাট শেখেন। ইহার পূর্বে তিনি মণিপুরী ও ভারত-
নাট্যময় নৃত্যে পারদর্শিনী হন। ১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি বোম্বাই,
আমেদাবাদ ও তলিকাতার নৃত্য-আসরে অবতীর্ণ হন। ১৯৩৬
দিল্লী সেমিনারে ও ১৯৫১এর Dance-Seminarএ রবীন্দ্রনাথের
নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে তাঁহার লেখা তথ্যবহুল হয়।

১৯৩৭ সালে তিনি গুরুদেবের ভ্রাতৃশ্রদ্ধা সনামধন্য
জীসোমোজনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হন। উক্ত
বৎসরে তিনি নৃত্যকলার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২ সালের
'ভারত-হাড়' আন্দোলনে লিখা থাকার তাঁহাকে লখনোতে প্রেরণ
করা হয় ও ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

যদিও তিনি চিত্রাঙ্কন শিখেছেন প্রথম জীবনে আচার্য্য নন্দলাল
বসুর নিকট, নৃত্যের প্রতি বেশী অধ্যবসায় হওয়ায় সেদিকে প্রথম
ভাগে বেশী মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। তাই স্বাবিনোদন
ভারতে তিনি এদিকে বেশী আগ্রহী হলেন—১৯৪৭ সালে রচনা



শ্রীমতী ঠাকুর

টুপিও খুলে—অজ্ঞাত, ইলোবা থেকে দুইশ চিত্রশিল্প পদ্ধতিতে মনোনিবেশ করলে—সুন্দর চিত্র যেহেতু তাঁর হাত দিয়ে—আমোলাবাদের শ্রেষ্ঠ আনন্দজী কল্যাণকী ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তাঁরই জৈনের জীবনের উপর ছবি আঁকলেন—ভূয়সী প্রশংসা পেল সেগুলি। শিল্পী শ্রীগোপেন বায় তাঁহার সজ্জিত কৈন আটের কতকগুলো চিত্র অর্জন করেছেন—সেকথা জানালেন শ্রীমতী ঠাকুর। 'রচনা' চিত্র-প্রদর্শনী কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও আমোলাবাদের উচ্চ প্রশংসিত হয়। শ্রীমতী ঠাকুর ১৯৫৭ সাল হইতে Indian Society of Oriental Art এর অবৈতনিক সম্পাদিকা এবং অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রভৃতির অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

শ্রীমতী দেবী নানাজ্ঞান সামাজিক কাজে মিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। বিশেষতঃ উদ্বাস্ত নারীদের উন্নতিকল্পে তাঁহার কার্যাবলী প্রশংসনীয়।

শ্রীনুপেন্দ্রনাথ ঘোষ

[বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রেস-ট্রাষ্ট-অফ-ইণ্ডিয়ার কলিকাতা শাখার ম্যানেজার]

সত্যতা, কর্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা থাকলে একদিন সত্যিকারের সাক্ষ্য আসবেই—এর অস্তু উদাহরণ সর্বভারতীয় সংবাদ-সংবহন প্রতিষ্ঠান প্রেস-ট্রাষ্ট-অফ-ইণ্ডিয়ার কলিকাতা শাখার ম্যানেজার নুপেন্দ্রনাথ ঘোষ। সত্যিকারের আগ্রহ নিয়ে সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশসেবা করবার তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল, তাই সরকারী চাকুরীর প্রলোভন ত্যাগ করে তিনি সাংবাদিকের জীবনই বেছে নিলেন। এর জন্তে একদিন তাঁকে দারিদ্র্য ও নানা অভাব-অভিযোগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছে ও জীবনে বহু দুঃখ কষ্টও বীকার করতে হয়েছে; কিন্তু সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবা করবার অটুট সঙ্কল্প ও আগ্রহ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। যে সময়ে শ্রী ঘোষ সাংবাদিকের জীবন বেছে নেন, সে সময় সাংবাদিকতার পথ কুসুমাকীর্ণ ছিল না; অপর পক্ষে বলা যেতে পারে কটকটাকীর্ণ দুর্গম ও ভীতি-সঙ্কুল ছিল। সামান্য ৩০ টাকা বেতনে তৎকালীন বহুমতী-সাহিত্য-মন্দির বর্জ্য প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক বহুমতীতে সাংবাদিক-বৃত্তি গ্রহণ করেন। তারপর কর্মনিষ্ঠা, সত্যতা ও অধ্যবসায়ের বলে আজ তিনি বাংলা তথা ভারতের একজন প্রেস সাংবাদিক। আজ এত বড় হয়ে এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি সগর্বে প্রকাশ করেন যে, বহুমতীতেই সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার হাতেখড়ি।

বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের বরিশাল জিলার গাভার বিখ্যাত ঘোষ-বংশিলার পরিবারে নুপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারের অন্যতম অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ শ্রী ঘোষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। শ্রী ঘোষের পিতা মল্লিকমোহন ঘোষ তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। গাভা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ১৯২২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে বরিশাল বি. এম. কলেজে আই. এ পড়েন। তারপর 'ফিণ চার্জ' কলেজ থেকে ১৯২৬ সালে বি. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে 'বিপণ দ' কলেজে আইন পড়েন। বিপণ কলেজে

(বর্তমান সুরেশচন্দ্রনাথ কলেজ) ল' ইন্টারমিডিয়েট পড়বার সময় একদিন তৎকালীন ইংরাজী 'নিউ সার্ভেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক বর্গত গ্রামস্কলর চক্রবর্তীর সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর অনুরোধেই তিনি সাংবাদিক বৃত্তি অবলম্বন করেন। নিউ সার্ভেন্টে ৪ মাস কাজ করবার পর গ্রামস্কলর বাবু ইংরাজী দৈনিক বহুমতীতে যোগদান করলেন ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি। "আমিও তাঁর সাথে চলে আসি বহুমতীতে। গ্রামস্কলর বাবুর কাছেই আমার প্রকৃতিভিৎ শিক্ষা।" বললেন নুপেন্দ্রনাথ। "এর কিছুদিন পরে গ্রামস্কলর বাবু বহুমতী ত্যাগ করলেন, কিন্তু আমি বহুমতীতেই থেকে গেলাম। এখানেই সংবাদপত্রের প্রতিটি কাজ আমি হাতে কলমে শিক্ষালাভ করি। বহুমতীর স্বাধিকারী বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। আমি সতীশবাবুর কাছে অশেষ স্বর্গী।" শ্রী ঘোষ বললেন, সাংবাদিক জীবন আমার প্রথম স্তর ১৯২৯ সালে। কংগ্রেসের মধ্যে ভূতাব্দ নলের এবং মতিলাল নেহরুর নলের মধ্যে যে বিবাদ ও কলহ ছিল, তাহার আশোষ মীমাংসার সংবাদ আমিই সর্বপ্রথম প্রকাশ করি ইংরাজী দৈনিক বহুমতীতে, এবং এই সংবাদটি প্রকাশিত হ'বার পরই কলিকাতা শাখার এসোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টারের ম্যানেজার রেক্সর শ্বোল্ড মিস্ত্র আমাকে ডেকে পাঠান ও এসোসিয়েটেড প্রেসে কার্য গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু সে সময় আমি যোগদান করিনি। তারপর ১৯২৯ সালে সতীশ বাবুর আশীর্বাদ ও অনুরোধ নিয়ে আমি এসোসিয়েটেড প্রেসে যোগ দিই। তারপর একে একে বহু ঘটনা ঘটে গেল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে গেল। ত্রিপুরী হরিপুর কংগ্রেসের কাজ উল্লেখ প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বহু কথা বললেন।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা যে কত নিবিড় ছিল এবং শ্রীঘোষের প্রতি সুভাষচন্দ্রের যে কতখানি গভীর ও অকৃত্রিম ভালবাসা ও আস্থা ছিল, তা শ্রীঘোষের সঙ্গে কথোপকথনকালে বিশেষভাবে জানা গেল। শ্রীঘোষ একটি অশ্রুতপূর্ণ ও চমকপ্রদ কাহিনী বিবৃত করলেন। তিনি জানালেন যে, সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের ঠিক পূর্বদিন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন নেতাজী তাঁকে একটি সিলবরা খাম দিয়ে বলেন যে, তিনি যদি আর মিলে না



শ্রীনুপেন্দ্রনাথ ঘোষ

আগেল বা মারা বান, তা হলে খামটি তাঁর মেজদার (স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু) হাতে দেওয়া হয়। যদি ইত্যবসরে শরৎচন্দ্রও লোকান্তরিত হন তাহলে খামটি খুলে শ্রীঘোষ যেন দেখেন তার মধ্যে কি আছে; তার পূর্বে তিনি যেন খামটি না খোলেন এবং খামটি যেন অতি-সজোপনে রাখা হয়, খামটি সোজাশুজি শরৎচন্দ্রের হাতে দিলে পুলিশ তাঁকে নিয়ে গোলমাল করতে পারে। নেতাজীর অন্তর্ধানের পর গোয়েন্দাবিভাগ এই নিয়ে শ্রীঘোষকে নানাভাবে বিব্রত করতে লাগলেন। শ্রীঘোষকে বাঁচাবার জন্তে স্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কলকাতা শাখার তৎকালীন কর্মাধ্যক্ষ স্বর্গীয় কুমুদিনী মোহন নিয়োগী তখন তাঁর ডরার থেকে খামটি বাব করে সোজা গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করেন, এ জন্তে পরবর্তীকালে শ্রীঘোষ দুঃখিত হয়ে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

দেশে স্থাধীন হলে ১৯৪১ সালে যখন প্রেস-ট্রাষ্ট-অফ-ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন আমি ও শ্রীভারতন এতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করি—জানালেন শ্রীঘোষ। এজন্তে বিভিন্ন স্বাবাদপত্রের মালিকদের নিকট যে শেয়ার বিক্রয় হয়, তার একটি বড় অংশ আমারই চোঁটায় সংগৃহীত হয়। কর্ম্মী হিসেবে প্রেস ট্রাষ্টের কর্ম্মকর্ত্তারা একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন।

লেখ্য হত্যাকাণ্ড, সার চার্লস টেগেটের উপর গুলী চালনা প্রভৃতি ঘটনায় তিনি নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে সত্য ঘটনা অনুসন্ধানের জন্তে অকুস্থলে গিয়েছেন। শ্রী ঘোষের সাংবাদিক জীবনে বহু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে, তার কয়েকটি মাত্র আমার কাছে উল্লেখ করলেন। ১৯৩৭ সাগ থেকে নূপেন বাবু দিবারাজি অফিসের কাছেই বাব করেন। তাঁর কোন সামাজিক কি অন্য কাজে হাত দিবার সময় নাই। অফিসের কাজকেই তাঁর ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জ্ঞান বলে মনে করেন এবং এজন্তে—আজও তিনি অস্বাস্থ্য ভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন। অবসর গ্রহণের পরও তিনি অর্ধবৃতনিক ভাবে সাংবাদিকতা করেন এবং সাংবাদিক হিসাবেই তিনি সূচ্য বরণ করতে চান বললেন। “সাংবাদিকতাই আমার জীবনের আদর্শ। আমি মনে করি, সত্যিকারের দেশ, জাতি ও সমাজের সেবা সাংবাদিকরাই করতে সক্ষম, এবং এই আদর্শ নিয়েই বহুদিন আমি বাঁচবো, সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশ, জাতি ও সমাজের সেবা করবো—” বললেন তিনি।

শ্রীমাত্তোষ মল্লিক

[পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার উপাধ্যক্ষ]

সুহৃৎ, সরল, নিরহঙ্কার, অমায়িক, বহু-বংশল এ মানুষটি। পৃথিবীতে একটি মাত্র কাজকে তিনি বেছে নিয়েছেন, সেটি হলো দেশ-সেবা। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার উপাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি হল-নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বিধান সভার কার্যের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীমদ্বরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করলে তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে বিধান সভার কার্যে পরিচালনা করেন কিছুদিন। এক কথায় বলা যেতে পারে, শ্রীমাত্তোষ মল্লিক অমাত্যশূন্য। আজও তিনি দেশসেবা করে চলেছেন অপ্রাণত্যাগে। বহু দিন বেঁচে থাকবেন, তত দিন



শ্রীমাত্তোষ মল্লিক

তিনি জনগণের ও দেশের সেবা করে যাবেন, এই হচ্ছে তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা।

শ্রীমল্লিকের জীবন ও আদর্শ বাড়লার তপস্বী সন্তানদের অনুপ্রেরণার বস্তু। তপস্বী সন্তানদের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক প্রকৃতি উন্নয়নের জন্তে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করে এসেছেন এবং আজও চেষ্টা করে চলেছেন।

আত্তোষ ১৯০৩ সালে বাঁকুড়া জিলার হলদকানালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম স্বর্গত পিয়ারীলাল মল্লিক। বাঁকুড়া হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বাঁকুড়া ক্রিস্টিয়ান কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯২৪ সালে বি. এ পরীক্ষার কৃতকার্ষ হয়ে ১৯২১ সালে আইন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৩০ সালে প্রবেশ করলেন কর্ম্মজীবনে। বাঁকুড়া জজ কোর্টে আইনজীবীরূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে দেশ-সেবা। কিন্তু দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্ত তিনি ছিলেন সদাই উন্মুখ। তাই ১৯৩৭ সালে সব ছেড়ে দিয়ে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়লেন এবং দেশের অগণিত নরনারীর সেবার আত্মনিয়োগ করলেন মনে-প্রাণে। তিনি বাঁকুড়া পশ্চিম সাধারণ কেন্দ্রে থেকে সর্বাধিক ভোট পেয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি পুনরায় বাঁকুড়া থেকে ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হলেন। তার পরেই তিনি ভারতের আইন প্রণয়ন পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি কংগ্রেস দলের “হট্টপ” ছিলেন ১৯৪০ সালে এবং ১৯৪২ সালে বিরোধীদের চীক হট্টপ হন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সেদিন থেকে আজ অবধি তিনি নিরলস ভাবে কার্য করে চলেছেন উপাধ্যক্ষ হিসেবে। উপাধ্যক্ষ থাকার কালীন শ্রীমল্লিক কর্ম্মক নিরাপত্তা বিলের উপর ৪৪টি ডিভিশন প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। স্বর্গত রায় বহুদিন বৈধ ছিলেন, এমন একদিনও বার নি যে দিন তিনি স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে মিলিত হন নি। বস্তুতঃ রাজনৈতিক জীবনে ঐমল্লিক বহুক্ষেত্রে কিরণ শঙ্কর অগ্রদূতেরা লাভ করেছেন। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং এক সময়ে শরৎ বসু প্রবেশিত বৃহৎ বঙ্গ আন্দোলনকে সমর্থন করেন। কেবল সমর্থনই নহে, পূর্ক-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গমন করে তিনি জনগণকে বঙ্কতা প্রসঙ্গে বৃহৎ বঙ্গ আন্দোলনকে সমর্থন করতে উপদেশ দান করেন। যে ৭ জন এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন, তার মধ্যে ঐমল্লিক ছিলেন একজন। তিনি এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের ফলে যখন মলে মলে উদ্ভাভ ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আস্তে আস্তে ভাগলো তখন তিনি পূর্ক-বঙ্গ গিয়ে যাতে তারা তাদের শিতা-পিতামহের বাস্ত ভাগ না করে, সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

পশ্চিম বাংলা বিধান সভার উপাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি এ যাবৎ যতগুলি 'স্পীকার'-সম্মেলন হয়েছে তার সবগুলিতেই যোগদান করেছেন এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

বক্তাগত জীবনে ঐমল্লিক বৈজ্ঞানিকের অনুরাগী। বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ও গণনাশাস্ত্র পড়তে তিনি উৎসাহ ও আনন্দ পান। একাধারে তিনি বহু পণ্ডিত ও সুখী সমাজের সম্পর্ক-এসেছেন তন্মধ্যে অগ্রদূতরা রাধাবিনোদ গোস্বামী, কৃষ্ণাশ্রম মল্লিক ভারতরত্ন এবং দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, কাব্য ও গণনা থেকে তিনি অগ্রদূতেরা লাভ করেন।

ঐমল্লিকের জীবনধারা হচ্ছে যাকে বলে "Plain living and high thinking"—সহজ সরল জীবনধারণ করাই হচ্ছে তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। দেশ ও জনগণের সেবার মধ্যে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করছেন তিনি এবং আজও নিরলস ভাবে কর্ম করে চলেছেন এ উদ্দেশ্য সাধনে।

ডক্টর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

[বিনীত শিক্ষাজ্ঞাত ও মধ্য শিক্ষা পর্বদের সেক্রেটারী]

শ্রীকার সাথে নিরঙ্কর ভাব—অধ্যাপনার সাথে স্নেহের সংযোগ—পরিচয়ের সাথে প্রীতির বন্ধন—জালাপের সাথে বুদ্ধিমত্তার নিরূপণ—জ্ঞানগরিমার সাথে জ্ঞানাসেবণের আগ্রহ—কর্মভীরে পূর্ণ দায়িত্ব পালন—সহকর্মীদের সাথে একান্তবোধ—আর নিজ প্রদেশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ চিন্তার আকুল—এইরূপ এক দৃষ্টিকোণে কল্পনা আগে জানিতে পারি নিবিড়ভাবে। তিনি হলেন মাধ্যমিক-শিক্ষা-সংসদের কর্মাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

বরিশাল জিলার কলকাতা হল তাঁহার বাড়ার। সেখানে তাঁহার জন্ম ১৯০২ সালের ৬ই ডিসেম্বর। শিতা পরলোকগত হরপ্রসাদবাবু বঙ্কতা টেকনিক্যাল স্কুলের সুপ্রাইন্টেন্ট ছিলেন। তাই শিতার কর্মস্থলের জিলা-বিভাগের প্রথম শ্রেণী পদাভ পড়েন। কিন্তু বয়স কম হওয়ায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারেন নি। শেষে বরিশাল জিলা-বিভাগ থেকে ১৯১৯ সালে বিভাগীয় বৃত্তিসহ উক্ত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। তথা হইতে প্রথম স্থানাসিকারী হিসাবে আই-এস-সি পাশ করিয়া ১৯২৩ সালে স্কটিশচার্চ কলেজে হইতে কিজিঙ্গ অনার্স প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান গ্রহণ করেন। অন্তরের অস্ত্র এক বৎসর পড়া বন্ধ থাকে—কিন্তু ১৯২৬ সালে Pure Physicsএ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম হিসাবে এম-এস-সি ডিগ্রীলাভ করেন। কলাকলে সম্বৃত না হইয়া ১৯২৮ সালে উক্ত বিষয়ের অস্ত্র গুপে পরীক্ষা দিয়া তিনি সন্মানে উত্তীর্ণ হন। মধ্য সময়ে করেক মাস তিনি বরিশাল বি-এম কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ডক্টর ডি, এম, বসুর তত্ত্বাবধানে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন এবং ১৯৩০ সালে ম্যালনেটজিমের উপর 'ডক্টরেট' পান। ইহার পর তিনি তথ্য অহারী লেকচারার নিযুক্ত হইয়া প্রায় তিন বৎসর থাকার পর ১৯৩৬ সালে রেজুন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পর বৎসর ভারতে কিরীয়া কলিকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে অধ্যাপক পদে বৃত্ত হন। ১৯৪১ সালে মধ্য শিক্ষা পূর্ব পণ্ডিত হইলে ঐ রায়চৌধুরী সহঃ কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে তথ্য নিযুক্ত হন। সেই সময় মাত্র তের জন সহকর্মীসহ ঐ রায়চৌধুরী তত্ত্বাবধানে সংসদের কার্যপরিচালনা বিশেষতঃ পরীক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে অমাত্রব্যবিক পরিপ্রশ্ন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৪৪ সালে তিনি উক্ত পদে সেক্রেটারী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। গত করেক বৎসরে উক্ত মাধ্যমিক ও বহুস্থলী বিভাগের পরিচালনা ও বিভাগের শিক্ষকদের জন্ত ছয় মাস intensive ট্রেনিং এর ব্যবস্থা তাঁহারই প্রচেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত মাধ্যমিক ও বহুস্থলী শিক্ষা পণ্ডিত সহজে মতামত প্রদানের সময় বর্তমানে আসে নাই বলিয়া ভাঃ রায়চৌধুরী মনে করেন।

তিনি মনে করেন যে, বাংলার ছাত্র-সমাজে মেধা, প্রতিভা, ও বুদ্ধিমত্তার অভাব নাই—টিকমত তাদের পরিচালনা করলে—বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রী আবার আমাধের মুখোচ্ছল করবে। আর সেই সক্ষে দিতে হবে শিক্ষক সম্প্রদায়কে বখাযোগ্য স্বধাধা। তিনি জানান, বাঙ্গালী জীবনের প্রতি ভরে প্রয়োজন দায়িত্ববোধ—কর্মবিরহুতা এনে দেবে অবসার, হুঃখ, কষ্ট ও নৈদর গ্রামি। কর্তব্য কর্মে আমরা যেন পশ্চাৎপদ না হই।

শেষে তিনি বলেন যে, আমাধ বাবার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁর শিক্ষাধা আমাধ পরবর্তী জীবনে খুবই কাজ দিয়াছে। আমাধ বা স্বর্গগতা শৈলবালা দেবী ছিলেন স্মৃতিহী।

॥ মাসিক বন্ধুত্ব বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচাঙ্গিত মাসিকপত্র ॥

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়ে গিয়েছে যে আমাদেরই আসামী কুকলাল প্রদত্ত 'খোকার' দেওঘরের বাসস্থাননির্দেশক' নক্সাসহ খোকাবাবুকে গ্রেপ্তার করার জন্য ঐ শহরটিতে বর্ষাশীত রওনা হয়ে যেতে হবে। এই দেওঘর শহরটি পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে অবস্থিত। এই জঙ্গ কলিকাতা শহর হতে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে সেখানে আমাদের হাওরা চলে না। এ ছাড়া পুলিশ পৌরকে প্রকৃতিতে দল বেঁধে সেখানে গেলে খোকাবাবুর মত একজন দুর্দান্ত খুনে গুলোকে গ্রেপ্তার করা অসম্ভব হবে। এর কারণ খোকাবাবুরও আমাদের মত লোকবল আছে। এই সব বেসরোয়া খুনে গুলোদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সেখানে না গলে তারা যে কোনও মুহুর্তে পাভতাড়ী গুলিয়ে ঐ শহর ছেড়ে অস্তিত্ব চলে যেতে পারে। অস্তিত্ব আমাদের সঙ্গে আমাদের সশস্ত্র সজ্জা হওয়াও বিচিত্র নয়। পরিশেষে সকল দিক বিবেচনা করে আমি ছদ্মবেশে একজন মাত্র সঙ্গি সহ দেওঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে মনস্থ করলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার সঙ্গিগণে আমার সঙ্গে ক'কে নিয়ে যাবো? আমি এমন একজনকে আমার সঙ্গিগণে রাখিলাম যে খোকাবাবুকে এক দৃষ্টিতে চিনে নিতে পারবে। এই সম্পর্কে খোকাবাবুর বাল্যবন্ধু দেবেন বাবু কিংবা হরিপদকেই আমাদের উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু যখন বাবু আমাদের সঙ্গে কিছুতেই দেওঘরে যেতে রাজী হলেন না। আমি তাকে মানবতা, লোকহিতৈষণা, দেশপ্রেম নাগরিক কর্তব্যবোধ প্রভৃতি বহুবিধ দৃষ্টান্ত সজ্জিত বাক্যবলী দ্বারা তার স্বয়ং উদ্বেলিত করতে সচেষ্ট হলাম। কিন্তু ভাবী ভোলবার নয়, তার সেই এক কথা, নূতন বিষয়ে কবেছি মশাই? আমি মারা গেলে আমার বৌকে আপনারা খেতে দিবেন?

অগত্যা তাকে পরিত্যাগ করে আমি খোকার অপার বাল্যবন্ধু হরিপদ শরণাপন্ন হলাম। বহু বাক-বিতণ্ডার পর হরিপদ বাবু ওরফে হরিপদ সরকার একটি বিশেষ সূত্রে দেওঘর পর্যন্ত আমার অনুগামী হতে সীকৃত হলো। প্রথমভা: খোকা ধরা পড়ার পর তাকে খোকাবাবুকে সনাক্ত করার জন্য ডাকা হবে। দ্বিতীয়ত: খোকা গ্রেপ্তারের পর হয় মাস পর্যন্ত তার বাটাতে পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা করা হবে। এই দুইটি সর্ত্ত আমার। আমাদের তৎকালীন উত্তর কলিকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের অনুমতিক্রমে যেন নিয়েছিলাম। বাক, একজন সনাক্তকরণকারী সঙ্গী তো পাওয়া গেল, কিন্তু এখানে ছদ্মবেশ ধারণ আমার পক্ষে কিরূপ ভাবে করা যাবে? এই সময় পুলিশ বিভাগে দাড়ী-গৌক পরা বা রঙমাথা প্রভৃতি অসাধারণ ছদ্মবেশ ধারণের রীতির প্রচলন ছিল। কিন্তু আমি স্ক্র হতেই এইরূপ ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এসেছি। আমি, ইনসপেক্টর সুনীল বাবু এবং আমার জনৈক কটোপ্রাকার বন্ধুর সাহায্যে এই বিবরে একটি নৃত্য রঙবাদের সঙ্গী হয়েছিলাম। আমার নির্দেশে আমার

কটোপ্রাকার বন্ধু নিজাই পাল এই শহরের বিবিধ পেশার নিবৃত্ত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক বেশভূষা সহ অসংখ্য আলোকচিত্র ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছিল। এই সকল কটোপ্রাকারের মধ্যে 'ব' পেশার নিবৃত্ত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, উনি পেশোয়ারী, কর্ণহর মুচি ও নাগিত, ফেরিওয়াল, ভ্রাম্যমান সাধু, তীর্থযাত্রী বাঙালী রিক্সাওয়াল, ভাটিয়া বখিক, বাঙালী জোতদার ইত্যাদি বহু ব্যক্তির স্বাভাবিক বেশভূষা ও চেহারার কটো ছিল। আমাদের পরামর্শভার্য সববেত হয়ে আর বারোটি কটো-প্রাকারবাহীর পাঁতা বেঁটে আমি একটা পেশোয়ারী ছিলু ভ্রমলোকের কটোচিত্র মনোনীত করলাম। আমার বর্ণ ও নীর্ণ দেহের সহিত সামঞ্জস্য রেখে আমরা এই কটো-চিত্র আমার ছদ্মবেশের জন্য বেছে নিয়েছিলাম। ঐ কটো-চিত্রে প্রদর্শিত ভ্রমলোকটির বেশভূষা ও হাবভাব অনুকরণ করতে আমার একটুমাত্রও সেরী হয়নি। বহুতপস্কে এইরূপ ভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে আসির সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকেই নিজে চিনতে পারছিলাম না। এর পর পর্যাপ্ত জর্থ ও একটি টোটোভরা পিঙ্কল কোমরে শুঁকে খোকার বাল্যবন্ধু হরিপদকে সঙ্গে করে আত্মীয়-বন্ধন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের উৎকর্ষা উপেক্ষা করে ও সেই সঙ্গে তাদের আত্মরিক গুণেচ্ছা শিরোবাহ্য করে আমি দেওঘর শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলার। খোকাবাবুর দলের লোকজনদেরা এমন কি তাদের নিবৃত্ত উকিলরাও যে আমাদের গতিবিধি সবচে: খানার আশে-পাশে কিংবা হাওড়া ষ্টেশনের কাছে নজর রাখে, তাতে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম। এই জঙ্গ আমরা একটি প্রাইভেট মোটরকার ভোগাড় করে মালপত্রবিহীন অবস্থায় তাতে উঠে প্রথমে নৈহাটি পর্যন্ত চলে আসি এবং তার পর পুনরায় ফিরে এসে ওয়েলিংডন ব্রিজ পার হয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে আসানসোল ষ্টেশনে এসে আমাদের বেশভূষা অনুযায়ী ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসের একটি কামরার উঠে বসি।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা ভোবের আলোয় মেহঘর সহরে এসে পৌঁছিলাম। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম প্রথমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু পরে এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করে আমরা সহরে একটি শূণ্য গৃহ ভাড়া করে সেখানে আত্মনা গাড়লাম। এর পর আর একটু মাত্রও সময় নষ্ট না করে আমি হরিপদ বাবুকে বাসায় রেখে বাটি ভাড়া করার অহিলার একেবারে খোকাবাবু বিলাসী টাউনের ভাড়া করা বাড়ির নিকট এসে দাঁড়লাম। খোকাবাবু সব নেড় হাত দুহু বজায় রেখে আমি ইতস্তত: দুরাকিরা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম একজন নতিবৃহৎ বাটার দরজার পাশে একটা নেমস্টেট দাঁড়া রয়েছে। এই নেমস্টেটটিতে লেখা ছিল—“রাজা অক কুমারহুসি।” কুমারহুসি স্থানটি যে কলিকাতার একটি নক্সা আ খেঁব হল দেওঘরবাসীদের জামা ছিল না। সত্বেত: তার উল্লেখ

কোনও এক জেলার অল্পভূক্ত হান মনে করেছিল। এই ভক্ত তাঁরা রাজত্ববহুল বাঙলাদেশে কোনও জমিদারের আবাসভূমির নারি বলে বিশ্বাস করে থাকবে। আমি চতুরতার সহিত গোপন তদন্ত দ্বারা জানতে পারলাম যে সপরিবার রাজাবাহাদুর, বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সেখানে বাস করেন। তাদের রাজোচিত ব্যবহার ও দানখানার ভিত্তি এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলেই বুঝে। এ ছাড়া ইনি কয়েকবার সহরের রাজপুত্রবন্দের নিমন্ত্রণ করে যুরোপীয় কারদার খাইয়েও দিয়েছেন। এর পর আমার আর বুঝতে বাকি থাকে নি যে আমাদের অল্পভক্ত খুনে আসামী খোকাবাবুই এখানে এসে ভোল বদলিরে 'রাজা অক কুনারটুলি' সাজে আসার ভবিষ্যৎ।

আমাদের নিজেরের জেদার করে এসে আমি ভাবছিলাম এর পর কি করা যায়। একমাত্র সশস্ত্র সিপাহী দলের সাহায্যে খোকাবাবুকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব। বিনা গুলী বিনিময়ে জীবিত অবস্থায় খোকাবাবু বে ধরা দেবেন না, 'সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। এই সময় হঠাৎ আমার একজন আত্মীয় শ্রীরীন্দ্র ব্যানার্জির কথা মনে পড়ে গেলো। ইনি এই সময় দেওঘরের ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে বহাল ছিলেন। কোর্টের নিকট তাঁর সরকারী কোয়ার্টারে তিনি সপরিবারে বসবাস করতেন। আমি মনে মনে স্থির করলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এই সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করা উচিত হবে। [ক্রমশঃ।

ক্রিকেট খেলার অতীত ও বর্তমান

ঐতিহ্যমোহন বন্ধু

ক্রিকেট খেলার সুদীর্ঘ ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়, কালান্তিকের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনবোধে তার সরঞ্জাম, খেলোয়াড়দের সাজ পোশাক এবং খেলার আইন-কানুনে অনেক রম-বদল হয়েছে। সব কথা বলার সুবিধা এই প্রবন্ধে নেই, শুধু কিছু বলতে হয়।

সরঞ্জাম : ব্যাটের চেহারা অনেকটা হকিষ্টিকের মতন এবং ষ্টাম্প দুটো ক'ল ছিল আগে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভটা করে ষ্টাম্পের প্রবর্তন হয়। ব্যাটের চেহারাও বদলার।

খেলোয়াড়ের সাজ

এখন খেলোয়াড়দের যে-সাজ দেখা যায়, বলা :—সাদা ক্রানেলের চিলি প্যাটেলুন, সাদা চিলি শার্ট, সাদা বুট-জুতা এবং ক্যাপ টুপি (অনেকটা ঘোড়সোড়ের জকিদের মতন), ১০° বছর আগে তা ছিল না। তখন ছিল উঁচু টুপি—বালতির মতন দেখতে; গুটুপি প'রে দৌড়খাপ বেশী চলত বলে মনে হয় না। গলার নেকটাই কিংবা 'বো' বাঁধা হ'ত। প্যাটেলুনটা ঝুলে না পড়ে, তার জন্ত বেল্ট বা কোমরবন্ধ ব্যবহার করা হত না, পরা হ'ত রোসেস। সাদা জুতার চল ছিল না। গোড়ার ছিল লাইন ও সাদার নক্সা করা জুজুতা। তারপর এল জাইন বুট, সর্ব শেষে এখন যা দেখতে পাওয়া যায়—সাদা বুট।

ক্যাপের ব্যবহার চালু হয়ে গিয়েছিল ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। এরপর আর খালি-টুপির ব্যবহার হয়নি।

উইকেট-কিপিং রুল্জ বা দন্ডানার চামড়া অভ্যন্তরীণ বক্স এবং প্রার অনবদীর হ'ত। ব্যাট রুল্জ এবং প্যাডের জেলন পরিবর্তন হয় নি।

খেলার কায়দা

ক্রিকেট খেলার কারদার অনেক উন্নতি হয়েছে গত একশো বছরের মধ্যে। বলা আভারহাও বোলিংয়ের বৃদ্ধি চলছে, তখন দেখা যেত যে, লেগব্রেক (legbreak) বল করার বড় সুবিধা পাওয়া যেত

(এক সেই জন্তই রোজ ছিল) অফ ব্রেকের (off, break) ভেদন ছিল না। তার কারণও হুস্পট ছিল। থ্রো (throw) না করে, বা না ছুঁড়ে—থো করা বরাবরই বে-আইনী ছিল এবং আছে—অফব্রেক বল করার তেমন সুবিধা আগারহাও বোলিং পাওয়া যেত না, এক খুব আন্তে লগ্না বল করা ছাড়া। ব্যাটিংয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বোলাররা তাঁদের বল করার বৈচিত্র্য জানতে চেষ্টা করতে লাগলেন। হাত উঁচু করে বল করলে অফব্রেক বল করার সুবিধা আছে, তাঁরা দেখতে পেলেন। এমন কি, হাত উঁচু করে (ভক্তারহাও) বেশ জোরেও অফব্রেক বল করা যায়, এটাও তাঁরা দেখলেন। দু-চার জন এই বল করা শুরুও করে গিলেন। প্রথম প্রথম আন্সারররা তা বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। পরে জনমতের চাপে প'ড়ে নতুন আইন হ'ল—ওভারহাও বল করা চালু হ'ল (১৮৬০ খৃষ্টাব্দ)।

ওভারহাও বল করা চালু হ'ল এবং যাবারি গোছের জোরে অফব্রেক বোলিংও চালু হ'ল। কিন্তু বাকে বলে জোরে (fast medium) অফব্রেক বল করা, তা তখনও কেউ দেখতে পাননি। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে এই বক্স বল ক'রে ক্রিকেট-জগৎকে চমকে দিলেন অষ্ট্রেলিয়ার এবং জগতের শ্রেষ্ঠ বোলার, এক, আর, স্পোর্থ (F. R. Spofforth)। এখানে বলে রাখা দরকার যে, স্পোর্থ ৩৬ জোরে অফব্রেক বলই দিতে পারতেন, এমন নয়। সব বক্স বল করাই তাঁর আয়ত্তে ছিল—এক 'গুগলী' (Googly) বল ছাড়া। 'গুগলী' বলের আবিষ্কার তাঁর সময়ে হয়নি।

'গুগলী' বলের আবিষ্কারক বোসানকুয়েট (Bosankuet) দক্ষিণ-আফ্রিকার গিয়া এই পদ্ধতির বল করার কায়দা সেখানকার খেলোয়াড়দের দেখান; বলে সেখানে কয়েকজন বোলার সেটা শিখে নেন এবং এত ভালো করেই শিখে নেন যে, তাঁদের বল করার উৎকর্ষ দেখে 'গুগলী' বলের মাডুফুই ইংলণ্ডে অবাক হয়ে যায়। বলা বাহুল্য বোধ হয়, অফব্রেক বা লেগব্রেক বল করার সময়ে বোলার কলটা ছাড়বার আগে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলটাকে একটা

মোচড় দেয়, আঙুল এবং কতীর সাহায্যে অক্ষরের বেলার একজন ডান-হাতে বল-করিয়ে মোচড় দেবে বাঁদিক থেকে ডান দিকে, আর লেগব্রেকের বেলার ডান-দিক থেকে বাঁ-দিকে। এই মোচড় দেওয়ার লক্ষ্য ক'রে ব্যাটসম্যান টের পায় বলটা মাটিতে প'ড়ে কোন দিক থেকে কোন দিকে যাবে। 'গুগলী' বল করা যে শিখেছে, সে কিন্তু লেগব্রেক বলের মোচড় দেখিয়ে অক্ষব্রেক বল দিতে পারে। এখন, যদি কেউ লেগব্রেক বল দিতে দিতে হঠাৎ একটা এমন বল ফেলতে পারে যেটা লেগব্রেকের চাবটি দেখিয়ে অক্ষব্রেক ক'রে যায়, তা হ'লে ব্যাটসম্যান যে বিশেষ অনুবিধায় পড়বে, এতে আর সন্দেহ কি? এই জন্যই গুগলী বল ব্যাটসম্যানের খেলার অপরিহার্য উন্নতিতে—যার দক্ষণ ক্রিকেট খেলাটা প্রায় একতরফে হ'রে এসেছিল—একটা নতুন সীমা টেনে দিলে। খেলার একটা নতুন রস এল।

খেলার মাঠ

বিগত একশো বছরে খেলার মাঠের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। পিচের (Pitch) এত উন্নতি হয়েছে যে, বোলাররা প্রায় নিরুৎসাহ হ'রে প'ড়েছেন। বৃষ্টিভেজা মাঠ ছাড়া ব্যাটসম্যানদের কিছুতেই আর বাগে আনা যায় না—এক নতুন বলে খুব জোরে সুইং (Swing) বল করা ছাড়া। কিন্তু নতুন বল কতক্ষণ আর নতুন থাকে, আর খুব জোরে বল করতে পারে এমন বোলারই বা ক'জন হয়?

পিচ (Pitch) এমনভাবে তৈরী করা হচ্ছে (গত ৬০ বছর ধ'রে) যে, বল মাটিতে প'ড়ে তার গতি আঁতুড়ে হয়ে যায়; সজোরে মাটিতে ছুঁলেও সেটা লাফায় না, হড়কেও যায় না, বাক বলে Shoot করা। এমন মাটিতে বলকে ব্রেক করানো দুঃসাধ্য। কাজেই, ব্যাটসম্যানরা আর আউট হ'তে চায় না। তবে, মজা দেখা যায় যখন বৃষ্টিভেজা মাঠে খেলা হয়, কিংবা চার-পাঁচদিন ধ'রে রোলে তকিরে পিচের ওপরটা কাটতে থাকে বা গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। একটি ভালো স্পিনবোলার তখন ঠরকম মাঠে ভেলকি খেলা দেখাতে পারে। মহামহারথীরা তখন বাট হাতে কাঁপতে কাঁপতে খেলতে যায়, আর, বাক বলে, পত্রপাঠ বিলাস!

ব্যাটিং

ক্রিকেটখেলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সমালোচক ধীরা, তাঁদের মতে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের পরে ব্যাটসম্যানদের খেলার কৌশলে এমন কিছু উন্নতি দেখা যায়নি বাকি বলা যায় ব্যাণ্ডুককারী কিংবা একেবারে নতুন। কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কার্লার দিক দিয়ে, ক্রিকেট খেলার বিশেষ ক'রে ব্যাটিং, চেহারার অনেক বদলে গেছে। এই সময়ের প্রথম দিকে ক্রিকেট-জ্ঞ ডাঃ ডব্লিউ. বি. ব্রেস ব্যাটিং করাটাকে একটা বিজ্ঞ ব'লে মেনে নিলেন, এবং এই বিজ্ঞার সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করলেন। ক্রিকেট-জগৎ অবাক বিময়ের বছরের পর বছর তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখতে লাগল। এমন হ'ল যে, ক্রিকেটখেলা মানেই ডাঃ ব্রেস পাড়িয়ে গেল। বেশির ভাগে (পিচে) আর আর মহাবীরী ৫০ রান করতে পারেন না, সেখানে ডাঃ ব্রেস বছরের পর বছর একশো-দু'শো ক'রে রান ক'রে

যেতে লাগলেন। বোলিংয়ের বাহুর জে. সি. শ'কে একবার (আরও অনেকবার) ডাঃ ব্রেসের হাতে খুবই নাকাল হ'তে হয়েছিল। খেলার পর শ'কে জিজ্ঞাসা করা হয়—'কি হে! তুমি না যেখানে ইচ্ছা ঠিক সেখানেই বল ফেলতে পার, তবে তোমার এ-হুগ'তি?' শ' বললেন 'বল আমি যেখানে ইচ্ছা ঠিক সেখানেই ফেলছি, আর ব্রেস তাঁর যেখানে ইচ্ছা ঠিক সেখানে সেটাকে পাঠিয়েছেন।'

সাক্ষ্যের ঈর্ষে উত্তেজিত ডাঃ ব্রেস তাঁর সাক্ষ্যের কারণ বিবরণ করে দেখান—ভারী ব্যাটসম্যানদের সাহায্য হবে ব'লে। প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হ'ল ব্যাটসম্যানের পক্ষে ডান পা'টা ব্যাটিং ক্রিজের ঠিক ভিতরে অনুভূতাবে রেখে থাকা। যে হারই যারা হোকনা কেন, ডান পাটা কার্যগত ছাড়বে না।

যিটার হল প্রত্যেকটা সোজা বলকে সোজা বা Straight ব্যাটে খেলতে হবে। Straight বল (যে বল কবালে Stump এ লাগবে) কখনও বাঁকা বা Cross ব্যাটে খেলবে না, ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, ১৮৯৪-৯৫ পর্যন্ত প্রায় সব ভালো ব্যাটসম্যানরাই ডাঃ ব্রেসের পদ্ধতিতেই খেলতেন, এবং তার দক্ষ প্রতীক্ষা লাভ করলেন অনেকেই। এমন সময় ইংল্যান্ডের ক্রিকেট-ময়দানে উদয় হ'ল ভারতবর্ষীয় কুমার ঈশ্বরজিৎসিংহী।

বর্জিৎসিংহী, ডান পা'টা মাটিতে অনুভূত রেখে ব্যাট করতে হবে, একথা মানলেন না। সোজা বল হ'লেই সেটাকে সোজা বা Straight ব্যাটে খেলতে হবে, একথাও তিনি মানলেন না। তিনি বললেন, ব্যাটসম্যানের কাজ হ'ল রাণ করা। সোজা বলকে বাঁকা ব্যাটে (cross bat) মেরে যদি রাণ পাওয়া যায়, তবে তাকে সেটা করতে হবে। ডান পা'টাকে নড়িয়ে যদি বলটাকে মাঝবার সুরিখা হয় ব্যাটসম্যানের, তবে তাকে তার পা'টাকে নড়াতে হবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি : ভালো বোলার, অফ-এর (off) দিকে কিন্তু, (field) সাজিয়ে, অফ-ট্রান্স জগ ক'রে বা তার একটু বাইরে যদি ভালো লেগে বজায় রেখে বল দিয়া যায়, তা হ'লে ব্যাটসম্যান রাণ তুলবে কি করে? অথচ ভাল বোলার যাক্রেই এই পদ্ধতিতে বল দেন এবং সেবেন। কাল, যদিই বা হঠাৎ লেগের একটু তারতম্য ঘটে যায় এবং ব্যাটসম্যান সেই খারাপ লেগের বলটাকে পেটার, তা হ'লেও, ওই বলটাকে ধরবার জন্য অনেকগুলো লোক অফ-এর দিকে সাজানো আছে—তারাই ওই বলটাকে ধরবার একটা সুরিখা পাবে। রাণ তাহ'লে উঠবে কি ক'রে? কখন একটা খারাপ লেগের বল পড়বে, তাহ'লে আশায় থাকতে হবে? আর তাতেই বা কি হবে? সোজা বল যদি কেবল ট্রুই ব্যাট-এ খেলতে হয়, তা হ'লে ওই অপেক্ষমান ফিল্ডারগুলোর দিকেই তো বলটা যাবে। ক'টা বল ভাঙের এন্ধিরে বাউণ্ডারীতে গিরে পুঁজি হবে? অথচ, বল বুকে, আঁরি যদি এন্ধিরে বা পেছিয়ে থেলি, তা হ'লে ওই ভালো লেগের বলগুলোকে আঁরি শর্ট-পিচ বা ওভার পিচ ক'রে নিতে পারি, অর্থাৎ পেটাবার যোগ্য বল করে দিতে পারি। তার পর, আমি যদি সোজা শর্ট পিচ বলকে (বা বেজলোকে শর্টপীচ ক'রে নেওয়া হয়, সেজলোকে) বাঁকা ব্যাটে (cross) হুক (Hook) ক'রি বা লেগের (leg)

দিকে চালিয়ে দিই, তা হ'লে আমাকে ঠেকায় কে? সে-দিকে কিন্তু ম্যান নেই, চালালেই অব্যর্থ চার বাণ; কেন চালাব না?

সুখেই শুধু বলেন নি তিনি। কাজেও ক'রে দেখাতে লাগলেন তিনি, মাঠের পর মাঠে, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বোলারদের বিক্ষিপ্ত খেলা। কখনও পিচ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে মারেন। কখনও ডান পাটা পেছিয়ে প্রায় উইকেটের কাজকাহি নিয়ে (বা পাটাও টেনে নিয়ে) বোলারের দিকে কুরে সোজা বলকে হুক করে বাউণ্ডারিতে পাঠান। বোলারের বল মাটিতে পড়বার আগেই তিনি আলাজ ক'রে কেলভেন, বলটা কোথায় পড়বে; তার পর, বল বুঝে এগুনো বা পেছনো।

বিশ্বের হস্তাক হ'রে ইংলণ্ডবাসী তাঁর খেলা দেখতে লাগলো। পুরাতন-পরীয়া মাথা নেড়ে বললেন,—এ, অসামান্য কাঁচা খেলা। ‘রঞ্জি’—(রঞ্জিংসিজীকে ইংলণ্ডবাসীরা ‘রনজি’ বলেই অভিহিত করতেন) পা দিয়ে উইকেট ঢেকে খেলছেন। বল ফন্ডালেই এল-বি-ডবলিউ (L. B. W.)। জবাবে রঞ্জিংসিজী বললেন, সোজা বল পা'এ এসে লাগলে এল-বি-ডবলিউ হব নিশ্চয়, কিন্তু বলটা ফন্ডালে তবে না পা'এ এসে লাগবে? তা হ'লে পাটা কি দোব করলে, ফন্ডানোতেই তো দোব। পা দিয়ে যদি উইকেটটাকে ঢেকে না থাকতাম তা হ'লে তো বলটা সরাসরি উইকেটেই গিয়ে লাগত—সেটাও তো ‘আউট’ হওয়াই।

ইংলণ্ডের বোলার! (এবং অধিনায়করাও) বিক্ষিপ্ত চোখে দেখলেন, এক হাকপুত ছোঁকা একটা নতুন সমস্তা নিয়ে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ কিন্তু সাক্ষ্যনো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিই বা অঙ্ক থেকে কয়েকটা ফিন্ডসম্যান লেগের দিকে নিয়ে বাওয়া হয়, তা হ'লে ওই অক্ষের কাঁকা জায়গাগুলো (যেখান থেকে ফিন্ডসম্যান লেগের দিকে সরানো হ'য়েছে) দিয়ে রঞ্জিংসিজী বল বাউণ্ডারিতে পাঠাতে থাকেন, কারণ, তাঁর নিজস্ব মারগুলো ছাড়া, তখনকার দিনে ‘শাস্ত্রী’ বলে অভিহিত সমস্ত মারই (strokes) তাঁর পুরোপুরি দখলে ছিল। বোলাররা যেমন একটা নতুন সমস্তার সম্বন্ধী হ'ল, ব্যাটিং-শৈলী তেমনই সম্বন্ধ হ'ল অচিন্তনীর ভাবে। তাই বলে একথা বলা চলে না যে, রঞ্জিংসিজী বা করে গেছেন, অল্প ক্রিকেটাররাও তার অনুকরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। অত্যন্ত দ্রুতগতি বলের বেলাতেও পেছিয়ে গিয়ে সেই বলটাকে হুক (hook) ক'রে লেগের দিকে পাঠাতে পারতেন তিনি। ইংল্যান্ড এক অস্ট্রেলিয়ার হৃৎকর্ষ জোব-বোলাররা তাঁর প্রমাণ পেয়েছেন বারে বারেই। আজ পর্যন্ত কেউই আর এরকম দেখাতে পারেননি।

জায়গা ছেড়ে, এগিয়ে গিয়ে, বলটাকে ওভার-পিচ ক'রে নিয়ে ড্রাইভ বা হিট করার কারখানা (বিশেষভাবে ডেজা এবং খারাপ উইকেটে) যদিও রঞ্জিংসিজী চমকপ্রদভাবে দেখিয়ে গেছেন, তবু, সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, এবিষয়ে আর একজন ব্যাটসম্যান অধিকতর নৈপুণ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে জার্মান অস্ট্রেলিয়ান টীমের সঙ্গে একজন তরুণ আসেন টীমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। এর আগে আরও একবার তিনি এল-বি-ডবলিউ অস্ট্রেলিয়ান টীমের সঙ্গে, কিন্তু সেবার তেমন কিছু

বিশ্বদর খেলা দেখাতে পারেন নি, ভালো খেলেছিলেন—এই পর্য্যন্তই। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জার্মানি এবং মাঠের অবস্থা একটু বেশী রকমই যেন খারাপ হাতে লাগল, বহন তখন বৃষ্টি; বোলারদের সত্যি উইকেটপ্রাপ্তির একটা মরশুম পাড়ে গেল। বল মাটিতে প'ড়ে হয় লাফান, না হয় ‘শুট’ করে (shoot), নয়তো বা এক ইঞ্চি থেকে এক ফুট ব্রেক করে—বোলারের ইচ্ছামত। জায়গার দাঁড়িয়ে খেলা অসম্ভব। সেই অবস্থায় দিনের পর দিন বিশ্বদর ভাবে খেলে গেলো উপরোক্ত তরুণটি। তাঁর নাম, ভিক্টর ট্রান্সার। ‘ক্রিজ ছেড়ে খেলা’ বিষয়ে বিশ্বদর নৈপুণ্য দেখালেন তিনি। বোলারের বল মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানে গিয়ে হাজির, তার পর ড্রাইভ করে বা হিট ক'রে কিলডম্যানের মাথার ওপর দিয়ে বাউণ্ডারিতে পাঠানো তো এক পলকের কাজ।

রঞ্জিংসিজী ব্যাটিং-সাক্ষ্যের মূল সূত্র হিসাবে বা বলে গিয়েছেন, যথা—‘বুঝ নাও বলটা কোথায় প'ড়ছে, সেখানে গিয়ে হাজির হও, তারপর পেটাও সেটাকে’, ট্রান্সার সেটাকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহাদানে ভালো করেই দেখালেন।

ক্রিকেটখেলার যে চেহারা আজকাল দেখা যায়, সেটা, ব্যাটিঙের দিক দিয়ে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যে চেহারা ছিল তার, তাই আছে—অবশ্য যেটাবুটি শৈলী হিসাবে। বোলিং-শৈলী সবকিছু বলা যায়, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের চেহারা এখনও বদলায় নি।

পৃথনির্দেশক হিসাবে যেমন নাম করা যায় (ব্যাটিঙে): ডাঃ গ্রেস, রঞ্জিংসিজী এক সি বি জাই-এর, ট্রান্সারের বোলার তা বলা চলে না। ট্রান্সার ছিলেন স্বভাব-খেলোয়াড়, তিনি রঞ্জিংসিজী ক্রিজ ছেড়ে খেলা সবকিছু যে অমূল্য উপদেশ দিয়ে গেছেন (Find out where the ball is going to pitch, go there, hit it) তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ দেখিয়ে গেছেন। বলে রাখা ভাল যে, ট্রান্সার শুধু এগিয়ে মারতেই ওস্তাদ ছিলেন, এমন নয়। সব রকম মারই তাঁর আয়ত্তে ছিল।

কাই-এর বিষয় বলতে হয়, তিনি কথায়, কাজে এবং চিত্র দিয়ে যে সব অমূল্য উপদেশ দিয়ে গেছেন ব্যাটিং সবকিছু, বিশেষ ক'রে রঞ্জিংসিজীর খেলার পদ্ধতি এবং উপদেশ সবকিছু, তা সর্বকালের জঙ্গ ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের অমূল্য সম্পদ হ'য়ে থাকবে। তাঁর চিত্র সন্নিবিষ্ট “Great cricketers, their methods at a glance” বইখানি জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যাটসম্যানদের সাক্ষ্যের কারণ (শৈলী) ব্যাখ্যা ক'রে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছে।

বর্তমানে ব্যাটিঙ-এর যে রূপ দেখা যায় (কারল এবং শৈলী), একশো বছর আগে তা ছিলনা। একশো বছর আগে থেকে আর আজ পর্যন্ত ব্যাটিঙের ক্রমবিকাশ সবকিছু, তার মূল কথাগুলো আজ কথায় বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বড় বড় ব্যাটসম্যানদের সাক্ষ্যের ইতিহাস এটা নয়। এই জন্যই জে বি হব্‌স, ডি এডম্যান, এল হাটন বা ডি কম্পটন ইত্যাদি ক্রিকেটারদের কোনও উল্লেখ এতে নাই।

জীবন-গীতা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীগোতম সেন

প্রাণীয়ারামের কাজ

এই প্রাণীয়ারাম মেহের অভ্যন্তরে কি-ভাবে কাজ করে, অর্জুন অতঃপর তাই জানতে চাইলেন।

ভগবান তার উত্তরে বললেন, প্রাণীয়ারামের সঙ্গে ঋগ-প্রাণীয়ারামের সাক্ষাৎ হয়। অবশ্য প্রাণীয়ারামের প্রকাশিত হৃদয়গত গতিতেই। এই হৃদয়গত গতি বহু হলেও সর্বত্র সক্রিয় হয়ে বহু হয়ে যায়। কিন্তু হৃদয়গত গতি বহু করেও মানুষ বেঁচে থাকে। তবে সে যে বহু গতি আছে, তার মধ্যে হৃদয়গত গতি প্রধান বলতে পারো।

ভগবান বললেন, হৃদয়গত শক্তির কাজে যেতে হলে হৃদয়গত শক্তির সাহায্য নিতে হয়। মানুষ এমন কি-রকম ক্রমশঃ হৃদয় থেকে হৃদয়গত শক্তিতে গমন করতে করতে চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছায়।

অর্জুন বললেন, আরো পরিষ্কার করে বলো।

শরীরে বহু প্রকার ক্রিয়া আছে, তার মধ্যে হৃদয়গত ক্রিয়াই অতি সহজ প্রত্যক্ষ। হৃদয়গত হলে সকল বস্তুর গতি নিয়ামক বস্তু। প্রাণীয়ারাম এই গতিককে বোঝ করে। এই গতির সঙ্গে ঋগ-প্রাণীয়ারামের অতি নিকট সাক্ষাৎ। ঋগ-প্রাণীয়ারাম যে এই গতি উপলব্ধি করতে পারেন, বহু সেই ঋগ-প্রাণীয়ারামের গতি স্পষ্ট করছে। এই বেগই উত্তোলন বস্তুর মতো বায়ুকে তেজের দিকে আকর্ষণ করে।

অর্জুন বললেন, এই হৃদয়গত চালার ক'?

চালার প্রাণ। হৃদয়গত গতি বায়ুকে আকর্ষণ করে। যে পৈশিক শক্তি হৃদয়গত সঞ্চালন করছে, তাকে বলে আমিাই প্রাণীয়ারাম। যে-শক্তি হৃদয়গত সঞ্চালন করছে, তাই প্রাণ। প্রাণীয়ারাম সেই প্রাণকেই আরও জানে। আর সেই প্রাণকে আরও জানা মানে, সেহের মধ্যে প্রাণের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকেও আরও জানা।

সত্যিই কি তা আরও জানা যায়?

মানুষ যদি পৈশিক ইচ্ছামত সঞ্চালন করতে পারে, তবে মানুষকে পারবে না কেন? সেহের সকল অংশকে প্রাণ অর্থাৎ জীবনী-শক্তি দিয়ে পূর্ণ করা যায়। অভ্যাস করলেই মানুষ তা পারে।

ভগবান বললেন, তা পারলেই তোমার শরীর বশে আসবে—তবু তোমার শরীর নয়, তুমি অপরের শরীরেও ক্রমশঃ বিস্তার করতে পারবে।

অর্জুন বিস্মিত হয়ে বললেন, তা-ও কি সম্ভব?

ভগবানের মধ্যে ভালো-মন্দ বা কিছু আছে সবই সংক্রামক। তাই ভগবান বললেন, মানুষের শরীরস্থ বস্তু একদিকে বীজ, তখন তুমি তোমার প্রভাবের দ্বারা তোমার শরীর অপরের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারো। তারের বস্তুগুলি যদি একদিকে বীজ থাকে তবে একটিকে বাক্য দিয়ে সব বস্তুগুলি বেঁচে ওঠে। কেন? সমস্তাধার ভায়া। তা যদি হয় তবে তোমার বৈদিক কল্পনও সঞ্চারিত হতে পারে অপরের মধ্যে। এই ভাবে বল সঞ্চারের দ্বারা

সঞ্চারিত হতে পারে। কারণ, এ-ও তো প্রভাব। এ-ক্রিয়া প্রভাবেরও হয়, আবার প্রভাবেরও হয়।

ভগবান বললেন, এই সঞ্চার-ক্রিয়া দূরও পাঠানো যায়।

অর্জুন বিস্মিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাইলেন।

ভগবান বললেন, দূর বলি ক'কে? দূরত্বের অর্থ যদি ক্রম-বিচ্ছেদ হয়, তবে দূরত্ব ব'লে কোনো পদার্থই নেই। কোথার আছে এমন দূরত্ব, যেখানে পরস্পর কিছুমাত্র সাক্ষাৎ বা কিছুমাত্র যোগ নেই? দূর ও তুমি—এর মধ্যে কি কোনো ক্রম-বিচ্ছেদ আছে? এক অবিস্তারিত অংশ—তুমি তার এক অংশ, দূর অপর অংশ। নগর এক দেশ ও অপর দেশে কি ক্রম-বিচ্ছেদ আছে? তা যদি না থাকে, তবে শক্তি এক স্থান থেকে অপর স্থানে যেতে পারবে না কেন?

ভগবান বললেন, সকল সাধনার লক্ষ্যই হলো একাগ্রতা। মানুষের জ্ঞান, অহং জ্ঞান। বস্তু তুমি আহার করছো—জ্ঞান পূর্বক করছো, কিন্তু বস্তু তুমি তার সারভাগ তেজের গ্রহণ করছো, তখন তা তোমার অজ্ঞাতসারেই হচ্ছে। অজ্ঞাতসারেই হলো তুমিই করছো। এই যে খাত থেকে রক্ত হচ্ছে, সেই রক্ত থেকে মেহের ডির ডির অংশ গঠিত হচ্ছে—সে-ও তোমার অজ্ঞাতসারেই হচ্ছে কিন্তু তুমিই করছো। শরীরের মধ্যে বা কিছু হচ্ছে, সে তুমিই করছো। তুমি যে করছো, এ জানা যায়। এই জানাই হলো সাধনা। তাকে জানা যায়, ইচ্ছামত চালানোও যায়। ইচ্ছামত কাজ আপনি হচ্ছে—কেউ তাকে ইচ্ছামত চালাতে পারে না, কিন্তু যোগে ইচ্ছাধীন করা যায়।

জ্ঞানের অতীত লোকে

ভগবান বললেন, মানুষের মন দুই অবস্থার থেকে কাজ করতে পারে। এক হলো জ্ঞানভূমি। যে-কাজে সব সময় জ্ঞান থাকে, আমি করছি, সেই জ্ঞানভূমি। আর যে-কাজে এই 'আমি' জ্ঞান থাকে না, তাকে অজ্ঞানভূমি বলে।

ভগবান বললেন, মন এই দুই ভূমি থেকে আরো উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করতে পারে। অর্থাৎ সে জ্ঞানের অতীত অবস্থার যেতে পারে। এই জ্ঞানাতীত ভূমি থেকে যে কাজ, সে কাজে 'অহং' থাকে না। মন তখন এই জ্ঞানভূমির অতীত প্রদেশে গমন করে—যার নাম সমাধি।

অর্জুন বললেন, এই সমাধি আর নিষ্কারণ প্রভেদ কি?

নিষ্কারণ এবং সমাধিতে মানুষ জ্ঞানের অতীত লোকে যায়। প্রভেদ এই—নিষ্কারণে সেই মানুষই কিরে আসে, কিন্তু সমাধিতে কিরে আসে আর এক নতুন মানুষ।

এই সমাধি হাড়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি যোগ-অভ্যাস করো। যোগের দ্বারা তুমিাকে জানতে হবে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তবুই তো পৈশিক

পায়ে, জগৎ জুড়ে কি লীলা চলছে। শুধু মানুষেরই নয়, প্রত্যেক প্রাণীরই জ্যোতি আছে। এ জ্যোতি সর্বদাই বিকীর্ণ হচ্ছে। সকলে তা দেখতে পার না। যোগীরা পার। পুষ্প থেকে যেমন ফুল পরমাণু নির্গত হচ্ছে। গন্ধ পাঠ তো এ কারণে। তেহনি মানুষের শরীর থেকেও সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শক্তির নিষ্কাশন হচ্ছে। তাই মানুষ যেখানেই থাক, সেখানেই এই আকাশ-তমাস্রায় পূর্ণ হচ্ছে। ঠিক এই একই নিয়মে মহাঈশ্বরও চতুর্দিক বে সমস্ত বিকীর্ণ হচ্ছে, সেই গুণ প্রভাবে মানুষ প্রভাবাধিত হচ্ছে।

মুক্তি সত্য, না বন্ধন সত্য ?

অজু'নের মনে আর এক নতুন প্রশ্ন দেখা দিলো। মুক্তি সত্য, না বন্ধন সত্য ? জগতের বা কিছু সবই তো বন্ধ। এ বন্ধন থেকে মুক্তি নেই। তবে ?

এই 'তবে'র উত্তর দিলেন ভগবান। অতি ক্ষুদ্র পদার্থ থেকে বৃহৎ পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অন্তর্গত, কেবল পুরুষ প্রকৃতির বাইরে। এই পুরুষ বা আত্মার কোনো গুণ নেই। সকল পদার্থই প্রকৃতির অন্তর্গত। সুতরাং তা চিরকালের জন্য বন্ধ।

তবে মুক্ত কে ? অজু'ন প্রশ্ন করলেন।

মুক্ত তিনিই, যিনি কার্য-কারণ সৃষ্টির অতীত। যদি তুমি বসো মুক্তভাবটি ভ্রমাত্মক, তাহলে আমি বলবো, বন্ধনভাবটিও ভ্রমাত্মক। মানুষের জ্ঞানে এই দুই ভাবই আছে। তারা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে আছে। একটি না থাকলে অপরটি থাকতে পারে না। ওদের মধ্যে একটির ভাব, আমি বন্ধ। কিন্তু মানুষের রয়েছে ইচ্ছাপ্রবৃত্তি। মানুষ সেই ইচ্ছাপ্রবৃত্তিকে যেখানে ইচ্ছা পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু বিরোধী ভাব ছুটো প্রতি পদে সামনে আসছে। যদি ছুটোর তেতরে একটি ভাব ভ্রমাত্মক হয়, তবে অপরটিও ভ্রমাত্মক। আর যদি একটি সত্য হয়, তবে অপরটিও সত্য। কারণ, উভয়েই অদ্বৈত রূপ একই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ভগবান বললেন, আসলে কিছু ঐ দুই ভাবের উত্তরটিই সত্য। বৃহৎ পর্যন্ত ধরলে মানুষ বন্ধ, কিন্তু আত্মাকে ধরলে মুক্ত। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা বা পুরুষ। যিনি কার্য-কারণ-শৃঙ্খলের বাইরে।

তাই আত্মা মুক্ত। কিন্তু তুমি ভুল করে সেই মুক্তস্বভাবকে প্রতি বৃহৎতেই বৃহৎ ও মনের সঙ্গে ফেলছো। অবশ্য তোমার ভুল তুমিই দেখতে পাচ্ছে—দেখতে পাচ্ছে, মুক্তি দেহেরও ধর্ম নয়, মন বা বুদ্ধিরও ধর্ম নয়। একমাত্র আত্মাই মুক্ত-স্বভাব, জ্ঞানস্বরূপ।

ভগবান বললেন, সমুদ্রের ব্যঙ্গ-জগত প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন। কিন্তু প্রকৃতির নিজের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, কেবল পুরুষকে মুক্ত কনাই তার কাজ।

আত্মা যে প্রকৃতি থেকে বহুতর, এই জানানোই প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য। আত্মা এখনও জানতে পারলে প্রকৃতি আর তাকে প্রেরণাভিত্তি করতে পারে না। যিনি মুক্ত, তাঁর কাছে সমুদ্র প্রকৃতিই লুপ্ত।

ভগবানের বিদ্যুতি

অজু'ন বললেন, সবই বুঝলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি না তুমি কে ? তোমার শক্তি কি ? হয়তো তুমি ভগবান কিন্তু ঘন জানতে চার না।

ভগবান বললেন, দেবতা ও মহাবীরাও আমার উৎপত্তি জানে না, কারণ আমিই তাদের আদিকারণ। আমার বিদ্যুতি ও শক্তিকে যে জানে, তার কোনো সংশয়ই থাকে না।

অজু'ন বললেন, বুঝ করে আমার সেই সংশয়। জানতে দাঁও আমাকে। যে-বিদ্যুতি দ্বারা তুমি এই তিন-ভুবন ব্যাপ্ত করে আছো—বলো তোমার সেই দিব্য-বিদ্যুতির কথা। আমাকে বলো, তুমি কে ? জানতে দাঁও তোমার শক্তি, তোমার ঐশ্বর্য।

ভগবান বললেন, তুমিই একমাত্র, যে আমার বিদ্যুতির কথা জানবে। আমি না জানালে কেউ তা জানতে পারে না। দেবেরও বাহ্যিক সেই পরম-ঐশ্বর্যের কথা একমাত্র তোমাকেই আমি বলবো।

আমি সকল প্রাণীর স্তম্ভস্থিত আত্মা। আমি সকল বস্তুর আমি। অস্ত্র মধ্য। আমিভোব মধ্যে বিষ্ণু আমি, জ্যোতির মধ্যে বলসিত সূর্য, বায়ুর মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র। আমি বেদের মধ্যে সাম, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র—ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন আমি, প্রাণীদের মধ্যে চেতনা। কল্পের মাঝে শংকর, বন্ধ ও বাঁকনের মধ্যে আমিই কুবের। আমিই কার্তিক সেনাপতির মধ্যে—জলরূপে সাগর আমি, পাখ্যরূপে হিমালয়।

গাছের মাঝে অশ্বখ হই

নলীর মাঝে জাহ্নবী,

ঋতুর মাঝে বসন্ত আর

শিল্পী মাঝে হই কবি।

আমি অগ্নিগণী কাল, সর্ববাপী ধারণকর্তাও আমি। সর্ব-হরণকারী বৃদ্ধাও আমি, উৎপত্তির কারণও আমি। আমি ভয়, আমি নিশ্চয়—আমি বসন্ত, আমি নীতি—জ্ঞানও আমি, নৌনও আমি।

‘কসমসে বৃদ্ধা আমি

জন্মসে আমি কাম,

হঠাৎ আমি ছিতি আমি

আমিই সবার পরিকাম।’

হে অজু'ন, আমার বিদ্যুতির জন্তু সেই। কি হবে জন্তু কথা জেনে ? শুধু জানো, আমার একটামাত্র অংশ দ্বারা আমি এই সমুদ্র জগত ধারণ করে আছি।

অজু'ন অভিভূত হয়ে শুনছেন। তবু সংশয়—তবু তাঁর দ্বিধা। বললেন, ভেদে হবে না—দেখাও তোমার স্বরূপ, যে রূপে তুমি জগত ব্যাপ্ত করে আছো। তোমার মহিমা প্রকাশ করো, আলোকিত করো আমার মন। সকল বস্তুর হোক অবসান। তোমার দৃষ্টি-অপোচর ঐশ্বর্য রূপ, বা সর্বকৃত্তে আছো ব্যাপ্ত হয়ে।

ভগবান বললেন, সে তো চোখে দেখা যায় না বন্ধু, দেবতাদেরও সেই সে দৃষ্টি। আমি ইচ্ছা না করলে কে সেবে সেই দিব্যদৃষ্টি ?

অজু'ন প্রাণনা করলেন, দাঁও আমাকে সেই দিব্যদৃষ্টি বা একান্ত আমারই। জগতে আর কেউ পারনি সে দৃষ্টি, জানে না তোমার কি সে রূপ। সখা তুমি, সূক্ষ্মতুমি, অজু'নের সিন্দাখী তুমি—দেখাও আমাকে তোমার সেই লোকাতীত রূপ।

বিশ্বরূপে ভগবান

ভগবান মিলেন সেই বৃষ্টি অর্জুনকে।

অর্জুনের মনে হলো, একসঙ্গে সহস্র সূর্য উদ্ভিত হলো। অর্জুন দেখলেন, সেই জ্যোতিসমুদ্রকে পরিবাপ্ত করে তাঁর সমুখে দাঁড়িয়ে আছেন এক বিরাট অনন্ত পুরুষ।

অনাখ্যাত এক দিবা চেতনায় রোমাক্ত হরে গুণে অর্জুনের দেহ-মন—সব সংসার সব তর্ক মিলিয়ে বার নিমেষে। বৃষ্টির অতীত, বিচারের অতীত—বিশ্বের মহাসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

‘পশ্চামি দেবাংস্তব দেব। দেহে

সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসম্ভাবন।

ব্রহ্মাণীশং কল্যাসনম্—

সুযোঃ সর্বাস্থবগাংস্ত দিব্যান্।’

অর্জুনের সমস্ত দেহ মন মস্তিষ্ক প্রণাম হয়ে সেই অনন্তরূপের পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

কৃতাজলিপুটে বলে গাণ্ডীবী, কোথায় কুক, কোথায় তুমি? এ কি তোমার রূপ! কোথায় তোমার আদি, কোথায় তোমার শেষ! তোমাতেই উঠছে সূর্য, তোমাতেই বাড়ে অস্ত—তোমাতেই আবর্তিত হয়ে চলেছে চরাচর জগত! তোমাকে দেখছি সৃষ্টির আদিম প্রভাতে—কল্যাসনে বসে তুমিই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, তোমাতেই রয়েছে সকল দেবতা—তোমার অনন্ত দেহের অণুতে পরমাণুতে মিশে আছে জগতের বা কিছু সব।

তোমার যুগলহরে জলছে প্রলয়ের শিখা, সেই প্রজলিত যুগলহরে পতঙ্গের মতো গিয়ে পড়ছে, ভীষণ, দ্রোণ, বৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা—কুরু এবং পাণ্ডব। ভয়াল দংষ্ট্রা-করালের অন্তরালে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাদের দেহ।

কে তুমি ভয়ংকর, ব্যাপ্ত হয়ে আছো স্বর্গ মর্ত পাতাল—হে বিরাট, হে মহান, এ কি রূপ তোমার! বার আদি নেই, যথ্য নেই, অস্ত নেই—বার শক্তি অনন্ত, অনন্ত বার বাহ, হে বিকট-পর্শন, এই ভয়াবহ রূপ তুমি সংহরণ করো—সংহরণ করে নাও তোমার এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা।

মৃত্যু নয়, অনিবার্য-গতিতে ছুটে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যু আকর্ষণে! এ কি আকর্ষণ তোমার, যে-আকর্ষণ ভরে আর্তনাদ করছে সমগ্র সৃষ্টি!

‘কে গো বিরাট, কি তোমার নাম

লহ আমার লক্ষ প্রণাম;

আদি অস্ত যথ্য কোথায়?

কে গো সর্বভূক?

রক্ষা কর রক্ষা কর

কীপছে আমার বুক।’

রক্ষা করো কুক, কিরে এসো তুমি আমার অন্তরে—কিরে এসো সখ্যরূপে, আত্মীয়রূপে। গুণো অর্জুনের চিরসখী, কোথায় তুমি? দূর করে আমার ভয়।

ভগবান অর্জুনের বুক হাত রাখলেন। বললেন, যে-সংগ্রামের মৃত দেখে তুমি ব্যথিত ও বিবৃৎ হয়েছিলে, সেই সংগ্রামের সমগ্র মূর্তি তোমাকে আমি দেখালাম।

আমিই মহাকাল, হৃৎসঙ্কটকে আমিই পরিবেশন করি মৃত্যু।

তুমি বাদের হত্যা করবে বলে ব্যথিত হয়েছিলে, স্বচক্ষে দেখলে, তারা আমার দ্বারা আগেই হত হয়ে আছে।

মৃত্যু-অগ্নি দিয়ে আমিই পরিশুদ্ধ করি পৃথিবীকে। মৃত্যুতে তোমার ব্যথিত হবার কিছু নেই—ওঠো, গাণ্ডীব ধরো।

অর্জুনের আর দ্বিধা নেই—সব সংসার গেলো বুড়ে।

‘ব্যাপ্ত হ’লে বিশ্ব ভরি’

কোথায় তোমা প্রণাম করি?

সমুখে পশ্চাতে পাশে

নমো নমো নমঃ।

হে অনাদি হে মহাকাল

বিশ্বব্যাপী গুণো ভয়াল

লক্ষ প্রণাম লও, এ দীনর

সব অপরাধ ক্ষম।’

কৃতাজলিপুটে অর্জুন বললেন, হে পুরুষোত্তম, তোমায় করুণায় আজ চিনলাম তোমাকে। বন্ধু বলে, সখা বলে তোমাকে করেছি কত অমর্খাল—আহারে, বিহারে, শয়নে, আলোশে, প্রণয়ের বেশ বা করেছি ক্রটি—হে অচ্যুত, হে দেবদেব, ক্ষমা করো আমার সেই মানবীর প্রেমের উদ্ধত অপরাধ।

সংবরণ করে নাও তোমার এই প্রজলন্ত রূপ, তোমাকে এ ভয়ংকর মূর্তিতে আমি দেখতে চাই না—দেখা দাও তোমার প্রসন্ন দিব্যমূর্তিতে—সহস্রবাহ নয়, হও চতুর্ভূজ, হও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী—এসো আনন্দময় নারায়ণরূপে এসো।

পিতার কাছে পুত্রের মতো, পতির কাছে পত্নীর মতো, সখার কাছে সখার মতো আমি সমর্পণ করলাম আমাকে তোমার কাছে।

ভগবান শান্ত হলেন, শান্ত হলেন অর্জুন।

অর্জুন বললেন, এ আমি কি দেখলাম?

ভগবান জানালেন, এ দেখার সৌভাগ্য পৃথিবীতে কার কখনো হয়নি—দেবতারাও মেধেননি আমার এই তেজোময় বিশ্বব্যাপী আদিক্রপ। তপস্তা করেও পাবে না, বজ্র করেও নয়—অনন্তা ভক্তি দিয়ে শুধু দেখা যায়, জানা যায়।

সে কি এমন ভক্তি? যে-প্রেমে তুমি আছো বাঁধা?

সেই প্রেমই ভক্তি

ভগবান বললেন, তোমার মন আমাতে যুক্ত করো, তোমার বুদ্ধি আমাতে রাখো, তাহলেই আমাকে পাবে।

‘বাহুবলঃ সর্বমিতি’ এই বোধ চাই। তিনি পিতারূপে সংসারকে পালন করছেন, মাতারূপে সবলকে বকে ধারণ করে আছেন, প্রভুরূপে নিখিল জগতকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন—ভিনি অগ্নিতে তেজ, সূর্যে দীপ্তি—তাঁর হতেই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, আবার সমস্ত জগত তাঁতেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বা কিছু হয়েছে এবং হচ্ছে, তাও তিনি। আবার বা কিছু এখনো হয়নি তাও তিনি। সূর্যে তিনি, তারার তিনি, ফুলে তিনি—সব কিছুকে ব্যোমে আছেন তিনি, একমাত্র তিনি।

এমনি করে জলে ফলে অন্তরীন্দ্রে—সর্বত্র ভগবানকে বধন অল্পতব করতে পারবে, তখন হৃদয় শুণু ভেদেই তৃপ্তিলাভ করবে না, প্রেমের ও আনন্দের আলোকশিখার তুমি জ্বলে উঠবে।

কেবল সুখের মধ্যে নয়, দুঃখের মধ্যেও বাসুদেব। সকলকার বিকলতার আলোকে জাঁঝারে—সর্বত্র তিনি। কেবল নির্মল চরিত্র সাধুর মধ্যে নয়, পতিতা এবং তব্বের মধ্যেও লুকিয়ে থেকে তিনি বলছেন, এই যে আমি, এখানে আমি।

এই অমৃত্যুত্বি মনের মধ্যে ভাগলে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষণ আনন্দ-গানে ভরে ওঠে। তখন ভয় থাকে না, উদ্বেগ থাকে না। একটি চেতনা তখন সমস্ত সম্বন্ধকে সর্বক্ষণের জন্তে পূর্ণ করে থাকে।

‘বাসুদেবঃ সর্বমিদং’ এই বোধ যখন জাগেনি, তখন অজ্ঞান পাণ্ডব ধরতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ভগবতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে—যার সঙ্গে ভগবানের কোনো সম্পর্ক নেই। বৃদ্ধ, রক্তপাত—এসব ভগবানের ইচ্ছায় কখনো হতে পারে না। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধকে ভগবান থেকে পৃথক করে দেখবার কলেই অজ্ঞানের মনে ভয় এবং কর্তব্য সংকেত সন্দেহ জেগেছিল। নতুন এক দিব্যদৃষ্টি লাভ করে অজ্ঞান তখন দেখলেন, মহাবালরূপে ধ্বংস করছেন যিনি—তিনি আর কেউ নয়, স্বয়ং ভগবান। কিন্তু ধ্বংসই তাঁর একমাত্র কাজ নয়—নব নব সৃষ্টির মধ্যেও তাঁর প্রকাশ। তিনি অসীম। অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে তিনি অহরহ প্রকাশ করছেন। অনন্ত সৃষ্টির মধ্যেও তাঁরই ইচ্ছা কাজ করছে। বা আছে তাও তিনি, বা নেই বলে মনে হচ্ছে তাও তিনি। বা ঘটেবে তাও তিনি। বা ঘটে বিলুপ্ত হয়ে যাবে তাও তিনি। স্বরণ-হ্রাসে ডুবিয়ে বিধকে নিমেষে-নিমেষে তিনিই গুচি ও নতুন করে তুলছেন। জীবন-মৃত্যুর এই অবিরাম জীবাশ্রোতের ভগ্নে যিনি সব কিছুকে মিলিয়ে সিঁদেছেন, তার মধ্যে কোনো ক্ষয় নেই—বা কিছু মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে, সব কিছুই সেখানে অক্ষুরভাবে বিবাজ করছে।

অজ্ঞান দেখলেন, মৃত্যুর বাস্বে হাসছেন অমৃতের দেবতা, জীবনের দেবতা। কালীর মধ্যে রয়েছে জগজ্জননীর সুপ্রসন্ন হাসি। বস্ত্রের মধ্যে আছে ভগবানের বীণী, দুঃখের কালো বেগের বুক থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্বর্গের আলোকছটা।

ভগবানের কাছে অজ্ঞান যে দুহুর্থে নিঃশেষে আপনাকে নিবেদন করলেন, সেই দুহুর্তে জীবনের সমস্ত কর্ম অপরাধ যত্নে রঙীন হয়ে উঠলো। কর্ণের বিপুল তার একেবারে হালকা হয়ে গেলো।

কুজ ‘আর্মিট’কে নিয়েই তো বস গোল ছিলো। ‘আর্মি’ সেই ভগবানের মধ্যে সরে গেলো, সব উদ্বেগও চলে গেলো, ভয়ও গেলো। তখন আর সকলতার জন্তে উৎকর্ষা নেই, বিকল হবে বলে হুসিহুসিও নেই। তখন যে কর্ম এবং কল তিনি ভগবানকে সমর্পণ করে বসে আছেন।

ভগবান বললেন, জানের পথ ক্রেশের পথ। জানী জগতকে অধীকার করে, আপনায় ইন্দ্রিয়ের পঞ্চগুলিকে রুদ্ধ করে। প্রকৃতির দাবীকে ক্রমাগত অধীকার করতে করতে নিজের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাকে চলতে হয়।

তাই ভগবান বলছেন, জানের পথে কঠোর তপস্যা, অবিরাম আত্মনিগ্রহ। তাকে সেখানে নিজের চেতীয়, নিজের জ্ঞানে নিজেরই ওপর একান্ত নির্ভর করে সাধনার পথে চলতে হয়। কেউ জ্ঞান সাধনা করে না।

কি হবে অত বর্ণা জেমে। বেধামে সকল কথার শেষ হয়ে গিয়েছে?

অজ্ঞানের আর প্রশ্ন নেই। তাঁর সকল প্রশ্নের অবসান হয়েছে। তিনি এখন শ্রোতা। শুদ্ধর পরতলে বাসেছেন অদ্বুগত শিবা।

ভগবান বললেন, প্রেমের পথই আসল পথ। এখানে ভগবান মানুষের একান্ত আপনায় বন। তিনি তাঁর সিংহাসনের আসন থেকে নেমে এসে মানুষের ব্যবহারে এসে পাড়িয়েছেন। একান্ত প্রিয়জনের মতো এসে পাড়িয়েছেন। বাঁকে ধরা যায় না, বোকা যায় না—যিনি অন্তান্ত দূরের, তিনি শিতা হয়ে, লম্বা হয়ে, জননী হয়ে, ছোটো হয়ে ভক্তের কাছে এসেছেন—জলে হলে কত আকার নিয়ে ধরা দিয়েছেন তিনি।

আবার ধরা দিলেও, মানুষ ধরতে পারে না। এইখানেই মানুষের বড় আঁকড়। এ অলুশোচনার অন্ত নেই। তখন মনে হয়, এত দিন ভগবানকে বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানব-প্রকৃতি থেকে বস্ত্র করে দেখেছি। দিন-রাত জুয়ার রুদ্ধ করে রেখেছি—যে আসতে চেষ্টাছে, তাকে সন্দেহ করে দূরে তাড়িয়ে দিয়েছি। বিশ্ব তার সমস্ত আনন্দ নিয়ে বাইরে খেলা করেছে—আমায় প্রাপের ওপর কোনো মাছুই বিকিরণ করেনি। তোমাকেও সেই সঙ্গে কিরিয়ে দিয়েছি।

“আছি রাজি নিবস ধীরে

হুয়ার আমার বন্ধ করে

আসতে যে চার সন্দেহে তার

তাড়াই বায়ে বায়ে।

তাইতো কারো হয় না আসা

আমার একা ঘরে

আনন্দময় তুবন তোমার

বাইরে খেলা করে।”

কিন্তু ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রেম যখন জাগে তখন সেই প্রেমের দৃষ্টিতে সে দেখে, অরূপ অসংখ্য রূপের মধ্যে দিয়ে তিনি কেবলই নিজেকে প্রকাশ করছেন—যিনি অসীম, তিনি সীমার বাহরে আপনায় স্নব বাজাচ্ছেন।

তখন সে জানে, আমাকে দিয়েই তাঁর প্রকাশ। প্রতিটি বস্তু তিনি আখ্যান করছেন আমাদের মাঝে নিজেকে লান করে। আমার চোখেই তাঁর প্রতি-প্রভাতের সূর্যোদয় সকল হচ্ছে।

তাইতো ভগবান বললেন, বস্ত্ররূপ আমিষের জজাল থাকবে ততক্ষণ তুমি তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে ভগবানকে প্রকাশ করতে পারবে না। সব না ছাড়লে তাঁকে পাওয়া যায় না। ভগবানের কাছে সব-কিছু নিঃশেষে নিবেদন করতে পারলে তবেই শান্তি পাওয়া যায়। ‘বাসুদেবঃ সর্বমিদং’ সব কিছুই বাসুদেব। বা দেখছি, বা দেখছি না—বা আছে, বা এখানে হয়নি সব কিছুই তিনি। জীবন আনন্দের, জগত আনন্দের। কারণ, জগত ও জীবনের যিনি স্বামী, জগত ও জীবনকে যিনি ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত করে আছেন—তিনি এক, অবিভীত, অসীম—তিনি আনন্দ।

তুমি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নয়, বিশ্বমানবের মধ্যে—বিশ্বমানবের অমল্য কর্মধারার মধ্যেও তিনি।

“বিশ্ব সাথে বোণে বেধার বিহায়ে
সেখানি বোণ তোমার সাথে আমায়ো।”

ভগবান বললেন, ভক্ত সেই—যার বাগ নেই, যে সকলের মিত্র—
যার মমতা নেই, অহংকার নেই—সুখে-দুখে যে সমান, যে ক্ষমাবান,
দয়াবান, সর্বদা যে সন্তুষ্ট—যে সন্মান, যে বোণবৃত্ত, যার মন চুপ, যে
আমাতে মন-বৃত্তি অর্পণ করেছে—যে স্বধ্বংস-ঈর্ষা-ভয়-উদ্বেগ
থেকে মুক্ত, যে ইচ্ছা-রহিত, উদাসীন যে—যার চিন্তা নেই, যে
সকল মাত্র ত্যাগ করেছে—যার আসক্তি নেই, যে নিশ্চিন্তভাবে
সমান, যে স্থির-চিত্ত, যে প্রভাব সঙ্গ সেবা করে, সেই আমার ভক্ত।

যে জানের দ্বারা সকল সৃষ্টির নষ্ট করেছে, যোগের দ্বারা কর্ম
সম্পূর্ণ করেছে—আত্মাকে যে পেয়েছে, সে ব্যক্তি কখনো কর্মে আবদ্ধ
হয় না।

সর্বত্র সমদর্শী বোণী সর্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন
করে। যে আমাকেই সর্বত্র দেখে এবং সকলকেই আমার মধ্যে দেখে,
আমি তাকে কখনো হারাই না—সে-ও হারায় না আমাকে।

একদে প্রতীকিত হয়ে, সর্বভূতে অব্যবহৃত—আমাকে যে ভজনা
করে, সে যেখানেই থাকুক, আর বাই করুক, সে আমার মধ্যেই বাস
করে, আমার মধ্যেই কর্ম করে।

ভগবান বললেন, জান হাড় ভক্তি হয় না। জান কি? জানা।
তোমাকে জানিবে তবে তো ভালবাসবে। না জানলে ভালবাসা হবে
কি করে? ভক্তি তো প্রেম। ভগবানে প্রেম। স্বপ্নের পরশ
মানেই ভক্তি।

অন্তঃ প্রিয়কেই তো মাছুষ বরণ করে। যে আত্মাকে ভালবাসে,
আত্মাও তাকে ভালবাসে। ভগবান তাকে সাহায্য করেন। ভগবান
বললেন, যারা আমাতে নিরন্তর আসক্ত, যারা ভালবাসে উপাসনা
করে, আমি তাদেরই।

তাই যে অজ্ঞান, আমাতে আসক্ত থাকে, তারপর কাজ করে।
এ আসক্তি পাখির বন্ধতে আসক্তির মতো নয়। এতে দোষ নেই।
ভগবানে আসক্তিই তো পূজা—ভক্তি।

পূজা সন্তোষ করা যার আবার নিষ্ঠুরও করা যায়। একে
অন্ত্রেতে গাঁথা। কেউ কাউকে ছিন্ন করতে পারে না। কর্ম
নিজেই পূজা। তবে অন্তরে ভাবনা জাগ্রত থাকা চাই। যেমন
ঠাকুরের মাথার ফুল চড়ানো। ভাববিহীন ফুল চড়ানো—পাথরের
ওপর ফুল চড়ানোর মতো। তাই সন্তোষ ও নিষ্ঠুর, কর্ম ও প্রীতি,
জান ও অজ্ঞান সবই এক রূপ। প্রথমে সন্তোষ আসে আশ্রয়, পরে
কিন্তু নিষ্ঠুর আসা চাই। নইলে পূর্ণতা লাভ হয় না। ভক্তির
দ্বারাও তাই। প্রথমে সন্তোষ থেকে উৎসাহিত হয়, মেলে নিষ্ঠুরে।
কেন জানো, বাড়ি তৈরির সময় ঠেকনা দেওয়ার মতো। পরে
সরিয়ে নিলেই হলো।

সন্তোষ উপাসকের কাছে ইন্দ্রিয়গুলো হলো সাধন-স্বরূপ।
ইন্দ্রিয়গুলো যেন ফুল—পরমাশ্রমকে নিবেদন করার জন্তেই রয়েছে।
চোখে হরির রূপ দেখে, কানে হরিকথা শোনে, জিতে হরিনাম
করে, পারে তাঁর দাস্য করে, হাতে সেবার কাজ করে—এই ভাবে
সকল ইন্দ্রিয় সে পরমেশ্বরকে অর্পণ করে।

অজ্ঞান বললেন, তবে ভক্তিই কি সব?

না। কর্ম, জান, ভক্তি—এরা তিনটি বৃত্তি। একটি

অপরটির হাত ধরে জীবকে মোক্ষের পাথে নিয়ে থাকে। একটি
না থাকলে অপর দুটি অচল। কর্ম ছাড়া জান হয় না, জান
ছাড়াও কর্ম নয়, ভক্তি নয়। আবার ভক্তি না থাকলে জান-
কর্মের পুরুষ-প্রচেষ্টা সবই মিথ্যা।

মনের ময়লা দূর করবে কে? মূল-ময়লা না হয় জানে গুড়ে
ছাই হয়। কিন্তু মূল-ময়লা? সে দূর করার শক্তি জানের
নেই। সে দূর করতে পারে একমাত্র ভক্তি। ভক্তির জল ছাড়া
সে-ময়লা ধোয়া যায় না।

আবার এই প্রেমই দেখো, বিধিয়ে উঠছে আর এক রূপে।
বেশ শুশ্রূষা বধ করেছে, সেই এবার আপন শাবকে বন্ধা
করতে প্রাণ দিচ্ছে। যে মানুষ অপরের ক্ষতি করেছে, সেই
আবার জীব-পুত্রের জন্তে সর্বদা দিচ্ছে। তবু সে প্রেম। কিন্তু
বিকৃত প্রেম।

এরা কেউ পৃথক নয়। একই প্রেমের ভিন্ন অভিযান্ত্রিকি।
যে হত্যা করেছে, সে একের প্রতি মেহবশেই করেছে। তার প্রেম
সংকীর্ণ। লক্ষ ব্যক্তিকে বাক্ত করে একের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রকৃতির মধ্যেও সেই একই প্রেমের বিকাশ। বা কিছু
দুন্দর, বা কিছু মহৎ, সবই প্রেম থেকে জন্মলাভ করেছে।

ভগবান বললেন, যেখানেই আনন্দ দেখতে পাবে, সেখানেই
বৃকবে ভগবানের অংশ রয়েছে। তিন সকলকেই আপনায় দিকে
টানছেন। তিন যে প্রেমের একমাত্র আশ্রয়।

ভগবতের সেরক ভগবান তোমার দ্বারে কাড়িয়েই আছেন। বন্ধু,
দরজা মেলে ভিতরে তিন প্রবেশ করেন না। তিন যে সেবক।
দুঃখের আলো। ঘর বন্ধ থাকলে আলো ঢোকে না। দরজা খুলে
দাও, দুঃখের তার সমস্ত আলো নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবেন। ভগবানও
তো তাই। তার কাছে সাহায্য চেয়েছো কি তিন বাহু বিভ্রান্ত
করে এগিয়ে আসবেন। তিন কোল দেবার জন্তেই তো অপেক্ষা
করে আছেন।

অজ্ঞানের সব তর্ক তত্ত্ব হয়ে গিয়েছে। যিনি ভাবায় অতীত,
যিনি বৃদ্ধির অতীত, তাঁকে আর তিন কি দিয়ে বিচার করবেন?

ভগবান বললেন, যেদর দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা, ইচ্ছার
দ্বারা আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন হয় না। একে দেখা যায়, জানা
যায়—এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে সেই, যে ভক্তির দ্বারা সর্বভূতে
আমাকেই দেখে, আমাকেই শ্রদ্ধা করে, ভজনা করে, ভালবাসে।

আমার কর্ম করো—আমাকেই জানো পরম পুরুষ বলে।
আমাকে স্বীকার করো, আমার ভক্ত হও—আসক্ত বর্ধন করে সর্ব
জীবের বন্ধু হও, তবেই আমাকে পাবে।

অজ্ঞান বললেন, তুমি বলো, আরো বলো—আমি শুনি।

ভগবান বললেন, যে পুরুষোত্তমের ভক্ত, তার স্বপ্ন ও যল
বিশ্ব-প্রসারিত। সে অহং-এর সব প্রাচীর ভেঙে ফেলেছে। বিশ্বপ্রেম
তার স্বপ্নে—সমুদ্রের মতো প্রবাহিত হচ্ছে সর্বভূতের প্রতি করুণা।

এই প্রেমই কি তবে ভক্তি?

প্রীতি যার আদি মধ্য অন্ত। ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি।

প্রেমের জন্তেই প্রেম—সেই প্রেমই নিঃস্বার্থ প্রেম। কিন্তু সে
না। এর আর বিনিময় নেই। জম করে না—ভর থাকতে প্রেম
আসে না। প্রেম তরকে বিনাশ করে।

এ ভয় কি? কেন এই ভয় হয়? পাছে জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তাই এই ভয়। এ বার্ষিকই কথা। বার্ষিক থেকেই ভয় আসে। নিজেকে বড় ছোট ও বার্ষিক করে তুলবে, ভয় সেই পরিমাণেই বাড়বে।

ভয় থাকতে প্রেম হয় না। প্রেম আর ভয় দু'টি বিপরীত-চাবাক্স। ভগবানকে ভালবাসলে আর ভয় থাকে না।

ভগবান বললেন, যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে মানুষ পৌঁছায়, তখন আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানও থাকে না, মুক্তির প্রায়ও চলে যায়।

ভক্ত যে, সে মুক্তি চায় না। বলে, মুক্তি নিয়ে আমি কি করবো? আমি যে তোমাকে চাই। দেবে যদি, লাও ভক্তি।

ভগবান বললেন, সে যে ভালবাসার উদ্যম। সে কেন মুক্তি চাইবে? সে কিছুই চায় না। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এই তো আত্মসমর্পণ। এর চেয়ে আর বড় শক্তি কি?

ভক্ত বলেন, তিনি আমি যে এক। পৃথক হলে পাবো কি করে? প্রেমের জন্তে প্রেম, এতেই আছে মুখ। এই প্রেম ছাড়া সে আর কিছু চায় না। ভালবেসে ভালবাসতে চায়। ভক্ত যে, তার আর কোনো কামনা নেই সে চায় শুধা ভক্তি।

ভগবান ভক্তি ছাড়া কিছুই নেন না—শুধু দিয়েই বান। মানুষ নেবার জন্মেই ব্যাকুল। নিতে নিতে নিজেরের সংকুচিত করে ফেলেছে। এর মূল্য কতটুকু? নেওয়ার বলে, নিজেরের নিঃস্বার্থভাবে উন্মাদ করে দেওয়াই বেদিন তাদের কাজ হবে, সেদিন কর্মের প্রকৃত রহস্ত উদ্ঘাটিত হবে।

অর্জুন তখন হয়ে গুনছেন।

ভগবান বললেন, চাই ব্যাকুলতা। বালক যেমন তার মাকে দেখবার জন্মে ব্যাকুল হয়, তেমনি ব্যাকুলতা।

ভালবাসার যে উদ্যম—তার কে না, কে বাবা, কেই বা দ্বী। সে সকল গুণ থেকে মুক্ত। মানুষ এই অবস্থার জগন্ত ভোলে।

অর্জুন বললেন, এ তো বৈরাগ্যেরই নামান্তর।

ভগবান বললেন, ভ্যাগেই তো বৈরাগ্য আসে। ভ্যাগই হলো প্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তের এ সাধন সহজে আসে। কারণ তাকে তো কিছু ছাড়তে হয় না, হিনিরে নিতেও হয় না—জোর করে কোনো কিছু থেকে নিজেকে তকাৎ করতেও হয় না। তাই ভ্যাগ তার কাছে অত সহজ।

ভক্তিতে সবকিছু লয় হয়। যেমন ক্রম-বর্ধমান আলোর কাছে অজ্ঞান আলো ক্রমশঃ নিশিত থেকে নিশিততর হতে হতে অন্তর্হিত হয়। প্রেমের কাছে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরও হয় লয়। একেই বলে পরাভক্তি। তখন তার কাছে অহুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না, লাঞ্ছেরও থাকে না প্রয়োজন। প্রতিমা, মন্দির, বেশ, জাতি সবই তার কাছে তখন নিরর্থক।

ভক্ত টানেন ভগবানকে, ভগবান টানেন ভক্তকে। নইলে ভক্তের ভগবান কেন?

অর্জুন বললেন, ভূ কি ভক্তেরই তিনি?

তিনি এতেকের। এতোক বস্ত্র মধ্যে তিনি। বস্ত্র মানুষকে আকর্ষণ করে। প্রাণহীন জড় যে, সে কি কখনো চৈতন্যবান আত্মকে টানতে পারে? ঐ জড়পরায়ণ অন্তরালে

রয়েছে তাঁরই শক্তি, তাঁরই প্রেমের খেলা। তিনি নিরত টানছেন। তিনিও টানছেন, জীবাত্মাও চেষ্টা করছে তাঁকে পাবার জন্তে। জীবনের লক্ষ্যই হলো তাঁর নিকটে যাওয়া, তাঁর সঙ্গে একীভূত হওয়া।

এই মহান আকর্ষণ ভক্তের সকল আসক্তিকে নাশ করে দেয়। সে তখন আর কিছু দেখে না—দেখে, তার ভগবান ছাড়া আর কোনো বস্তু নেই।

ভগবান বললেন, এই অবস্থা যখন ভক্তের আসে তখন তার চোখে মানুষ আর মানুষ নয়—বা সে দেখে, সবকিছুর মধ্যেই সে দেখে, তার প্রিয়তমের ছবি। জলে ভগবান, বস্ত্রে ভগবান, জীবে ভগবান, উদ্ভিদে ভগবান—বিশ্ব জুড়ে রয়েছেন তার ভগবান।

অর্জুন চতুর্দিকে চাইলেন, কিছ কি দেখবেন? সে চোখ কোথায়?

ভগবান বললেন, শ্রদ্ধার মূলই হলো ভালবাসা। শ্রদ্ধা না থাকলে ভক্তি হয় না।

কিছ ভালবাসবে কাকে? সমষ্টিকে। আগে সমষ্টিকে ভালবাসো, তবে তো ব্যক্তিকে ভালবাসতে পারবে। ঈশ্বরই সেই সমষ্টি। ঈশ্বর কে? সমগ্র জগতে যদি এক অখণ্ডরূপে চিন্তা করা যায়, তবে সেই হবে তোমার ঈশ্বর। মানুষ বতই ভগবানের দিকে এগিয়ে বেতে থাকে, ততই সে সমুদ্র বস্তকে তাঁর ভেতরে দেখতে পায়—সর্বভূতে ঈশ্বর-বর্শন তো এই। তখন মানুষ আর মানুষ নয়, প্রাণী আর প্রাণী নয়—ভগবান। তখন চুখকে সে মুখ বলে না, বেদনাকেও সে হাসিমুখে ভগবানের দান বলে গ্রহণ করে।

ভগবান বললেন, মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নেই।

তিনি সর্বভূতময়। তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড়জগত ন'ন, জগত থেকে পৃথক। কিছ জগত তাঁতেই আছে। যেমন নুড়ে আছে মণিহার, যেমন আকাশে আছে বায়ু। কোনো মানুষ তাঁর ছাড়া নয়, সকলের মধ্যেই তিনি আছেন। আমার মধ্যেও তিনি আছেন। আমাকে ভালবাসলে তাঁকেই ভালবাসলাম, তাঁকে না ভালবাসলে আমাকেও ভালবাসলাম না। তাঁকে ভালবাসলে সব মানুষকেই ভালবাসলাম। সব মানুষকে না ভালবাসলে তাঁকে ভালবাসা হলো না—আপনাকে ভালবাসা হ'লো না। অর্থাৎ সমস্ত জগত প্রীতির অন্তর্গত না হ'লে প্রীতির অন্তর্ভুক্ত থাকে না। বস্তুত্ব না বুঝবে যে, সর্বলোক আর আমাতে অভিন্ন, তত্ত্বত্ব আমার জ্ঞান হয়নি, ধর্ম হয়নি, ভক্তি হয়নি, প্রীতি হয়নি।

ভগবান বললেন, যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ প্রসিদ্ধ রয়েছে, প্রীতিতেও তেমনি জগৎ গাঁথা। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি।

অর্জুন বললেন, কিছ জানেও তো ঈশ্বর উপলব্ধি হয়?

জানা আর পাওয়া কি এক জিনিস? বাকে যেব করো, তাকেও তো জানো? কিছ তার সঙ্গে কি মিলিত হও? যেব করলে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় অল্পবালে।

কিছ মানুষ তো নিরন্তর উপাসনা করছে। ভগবানকে পাবার জন্মেই করছে।

কিছ উপাসনা তো ভক্তি নয়, প্রার্থনা। যে বা কামনা করে,



লক্ষ্মীবিলাস

তৈল

এম. এল. বসু ম্যাগ কোং প্রাইভেট লি:
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

সে তাই পারি কিছু ভগবানকে পারি না। ভগবানকে পেতে হলে চাই ভক্তি।

প্রেমের দৃষ্টিতে সমগ্র কিরা যে দেখে সে আর্ত। জানের দৃষ্টিতে যে দেখে সে জিজ্ঞাসু। আর সকলের কল্যাণ দৃষ্টিতে যে দেখে সে অর্ধার্থী।

এই তিন ভক্তই নিঃস্বামী এবং ঈশ্বরও লাভ করে। একজন করে করের দ্বারা, আর-একজন জনস্বের দ্বারা, আর অপরজন করে বুদ্ধির দ্বারা। কিন্তু যিনি পূর্ণ ভক্ত, তিনি সব কিছুতেই ভগবানের রূপ দেখেন; ভালবেসেই তার আনন্দ। পূর্ণ প্রেম। সে আশুভক ভালবাসে—আশুভকই আশুভসম্পূর্ণ করে প্রাণ দেয়। প্রেমের জন্মে প্রেম—সেই তো নিঃস্বামী প্রেম।

ভক্ত তার ভগবানকে মন্দিরবাসিতে আশ্রয় করে না—সে সকল স্থানেই ভগবানকে দেখে। তিনি নিত্য দীপ্তমান, নিত্য বর্তমান।

কিন্তু সকল ভালবাসা তো এক নয়?

ভগবান বললেন, সেইজন্মেই তো ভক্তের ভগবান। যে যেমন ভাবে ভালবাসে। কেউ সম্মানভাবে ভগবানকে ভালবাসছে, কেউ পতিরূপে দেখছে, কেউ সখারূপে, কেউ প্রভুরূপে।

ভগবান যখন সম্মান জন তখন তাঁর ঈর্ষ্য থাকে না। তিনি তখন পুত্র। তখন ভক্তি কোথায়? এই প্রেমই হলো বাৎসল্য প্রেম।

আমি তোমার লগ্ন, তুমি আমার প্রভু। এ-ও প্রেম। প্রেমের আর এক রূপ আছে যা সকলের চোরে বড়। সে প্রেম, মধুর প্রেম। এ-প্রেম, স্ত্রী-পুরুষের প্রেম। আমি স্ত্রী, তুমি স্বামী। তুমিই একমাত্র পুত্র। ভগবানকে আর পুত্র কোথায়?

প্রেমের উচ্চতম আশ্রয় মাতৃবৎ যখন পৌত্বে তখন আর জান থাকে না। জান চলে যায়। কেউ বাস্তব হয় তখন জানের ভক্ত? বুদ্ধি, উদ্ভব, নির্বাণ—এসব কথা মনেও হয় না তখন। প্রেম সজ্ঞাপন করলে গেলে কে আর বুদ্ধি চায়?

চোঁচা বাবা, প্রবাসের দ্বারা এ-প্রেম লাভ হয় না। চিত্ত শুদ্ধ হলেই আপনি আসে। আপনি মতিমার আপনি প্রকট হয়। ভালবাসা কখনো কি শিথিরে পড়িয়ে হয় না, বলে-করে করানো যায়? হায় হুদবে প্রেমের অকুর দেখা দেয়, সেই সমগ্রই বোঝে প্রেম কি বস্তু। সে এক সমস্ত স্বাভাবিক স্বত-উদ্ভূত চিত্তের অবস্থা-বিশেষ। 'সেখানে আশাস-প্রদায় বা কষ্ট কল্পনার কোনো অবকাশই নেই। কাউ এ প্রেমে কোনো ভেদ না কাগণের অপেক্ষা নেই। 'তেন ভালবাসি' এ প্রেম যেখানে অনাসক্ত সেখানে প্রেম অতলম্পর্শ। গজাব তবুও যেমন অজানা সাগর পান আপনি চলে আপনি টানে, তেমনি মনে প্রেমের চোঁচা লাগলে সে ছুটে চলে তার অ-দেখা প্রেমিকের সন্ধান। কোনো বাণী সে মানে না। চোখে দেখেনি, শুনেছে গুণ-কীর্তন। শোনা মাত্রই প্রাণে উঠলে ডেউ, ছুটলে গুণনিধির সন্ধান। এই তো নির্ভগ্ন প্রেম—যা কোনো হেতুকে অপেক্ষা করে না।

নির্ভগ্ন প্রেম সর্বভূতের কল্যাণে বস্তু। সারা বিশ্বের কল্যাণ করতে হবে—এ কথা বলা সম্ভব, করা কঠিন। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের

কল্যাণ চিন্তা বার চিন্তে, সে তা হাড়া আর কিছু করতে পারে না।

সত্ত্ব পূজা সহজ। বার যেমন শক্তি সে সেই ভাবে পূজা করে। মা-বাবার সেবা কর। শুধু দেখতে হবে, সে সেবা বেন বিশ্ব-কল্যাণের বিবাহী না হয়। যত ভেটো আকাঙ্ক্ষা সেবা করো না তেন, অপরের অধিত না হলে তা ভক্তির দরবার পৌছবেই। নইলে সে সেবা হবে আসক্তি।

নির্ভগ্ন হলো জ্ঞানময়। সত্ত্ব প্রেমময়, ভগ্নদায়ক। সত্ত্ব প্রেম আত্মতা আছে, ভক্তি আছে তার চাইতেও বেশী।

অজ্ঞানের সমাহিত অবস্থা। সকল কিছু নিবেদন করে, ভগবানকে সমুখে রেখে বসে আছেন। তাঁর আর কোনো ভাবনা নেই। যুখে প্রদগ্ন দাসি, চিত্তে পূর্ণ আনন্দ।

আনন্দই তো সব। বার আনন্দ আছে, তার সব আছে।

আমরা যে তাঁকে ডাকছি, সেটা মিথ্যা। তিনিই ডাকছেন, আর আমরা সেই দিকে ছুটি বাছি। মন দিয়ে মন টেনে নিচ্ছন তিনি। দেহ দিয়ে দেহ আকর্ষণ করছেন, আর প্রাণ দিয়ে প্রাণ আকুল করে তুলছেন।

ভগবান বললেন, এই তো প্রেম। প্রেমে 'অনন্তত্ব সত্য হয়, অসীমত্ব সীমার মাঝে হয় দেয়। চোঁচা দ্বারা প্রেম হয় না। বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা—এসব নিয়েই মাতৃবৎ ভগবান।

মাতৃবৎ বাক ভালবাসা বলে, সেটা ভালবাসা নয়—'ভা' গো।' বতকণ ভাল লাগে ততকণ মেশামেশি। তারপর মন বাক গেলে, আর সে ভাব থাকে না। ভালবাসা একবার হলে আর বার না। ভালবাসার প্রতিক্রিয়া আনন্দ। ভালবাসাই ভগবতকে ধরে রেখেছে। জীবনকেও ধরে রেখেছে এই ভালবাসা। যেমন ধরে রেখেছে মূল পাছকে।

ভগবান বললেন, এ প্রেম আমরা মৃত্যুর কাছ থেকে শিক্ষা করি। মৃত্যু ও প্রেম একই তিনি। যে প্রেমিক, সে মৃত্যুকে প্রিয়তমের মতো মনে করে, তার বুকে বাঁপিয়ে পড়তে সেই পারে।

প্রেমিক হৃৎযক আলিঙ্গন করবে, তবু প্রেম ছাড়বে না। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে তবু প্রেমকে ত্যাগ করবে না। প্রেম কি সেই জাদে। তাই তো সে হৃৎযক-কোঁচ কাঁচ হয় না, মৃত্যুকে বাঁধে বাঁধপালে।

এ সাহস সে পার কোথায়? ভগবান বললেন, স্বার্থের ভিত্তি দেহ, আর ভালবাসার ভিত্তি আত্মা। স্বার্থ মাতৃবৎ নীচে নামায়, আর ভালবাসা মাতৃবৎ উপরে তুলে ধরে।

প্রেমই ভগবান আর তিনিই প্রোলাঙ্গন। বার মধ্যে প্রেমের প্রকাশ বত অধিক সে তত বড় আর সেই প্রোলাঙ্গনের দিকে তত এগিয়ে যায়।

নিজের সর্বোত্তম আশ্রয়কে প্রিয়তমের মধ্যে দেখে আশ্রয়সম্পূর্ণ করে। তাদের কাছে ভগবতের যা কিছু সবই পুত্রবৎ, সবই পবিত্র। কুংসিত অপবিত্র কিছু নেই। এই প্রেমের সাধনাই বৈষ্ণব-বৈষ্ণব, বৈষ্ণব-উপনিষদ বা-কিছু সবেতে। এই প্রেমই মাতৃবৎ পুত্রী ও সন্ধ্যাসী। এই প্রেমের প্রেরণাতেই জগৎ চলছে। মহাপুরুষগণ এই প্রেমেরই বনীভূত দৃষ্টি।

চন্দ্রা তার নাম

॥ দারাবাহিক উপন্যাস ॥

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১৪

এলাহাবাদে কোঁজ কুখেলি। গঙ্গা-বহুনা সঙ্গমে কোঁট দখল করেছিল। লিয়াকত আলী স্থাপনা করতে চেষ্টা করেছিলেন স্বাধীন রাজত্ব। আগে ও পিছনে স্বপ্নান রচনা করতে করতে নীল এলেন সেখানে। এবার শিব সৈন্যদের কিছু পেলেন নিজের হাতে। গোরা কোঁজ ও শিব সৈন্যরা গ্রামের পর গ্রামে ঢুকে স্তব্ধ করলো নিরাশ্রিত লুণ্ঠন ও নবহত্যা। এলাহাবাদে চকের বুক এক স্তব্ধ বটগাছে ঝলতে ঝাংগলো মৃত্যুহেঁচ। সেই একই বর্ষাতার পুনরাবৃত্তি এখানেও। বিচারের শুণ্ড প্রহসন মাত্র। অফিসার চরিত্র গরমে তাঁবু ছেঁড়ে বেরোল না। কোঁজ চাঁচাতে থাকে—ত্রিশ, পঞ্চাশ, পঁচিশ।

আবার এক এক মজে এই সংখ্যার বন্দী আছে। আর অফিসার চাঁচাতে থাকেন—লটকাও। লটকাও। লটকাও।

কোনো নির্বোধ মেরে মরতে চায়। শুধন কামানে বাক্স ঠেসে, তার নলের মুখে পিছমোড় করে বেঁধে দেওয়া হয় তাক, অথবা আর বার মুখ দেখে এই শাস্তি বিধান করেন অফিসার—তাকেও একই সঙ্গে বাঁধা হয়—এক, দুই, তিন। এই পর্যন্ত বলে মজা দেখেন অফিসার। সুখানা নীল হয়ে বার বন্দীদের। ভয়ে মুখ দিয়ে লালা পড়ে। এই একবার, দুইবার, তিনবার—ক'রে তারপর হঠাতো কামান ধাপবার হুকুম দেন অফিসার। অমনই বিকট মরুদর এক আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে টুকটো টুকটো মাংসপিণ্ড হয়ে ছিদিকে ছিটকে পড়ে মানুষগুলো। এক একটা বিচ্ছিন্ন মাংসপিণ্ড—কিছু তার খেকেও তাজা গরম রক্ত করতে থাকে—ভিন্ন মস্তক আছড়ে পড়ে হয়তো এমন একজনকে গায়ে, যে হবে পরবর্তী বধ্য। শকুনির দল মহা উল্লাসে উড়তে থাকে উপরের আকাশে। এর পাবেই সূর্য হবে তাদের কাজ। শৃগালের দল দ্ব্যসহস্র হয়ে উঠেছে। এই হত্যার ক্রান্তির পর সাহেবরা বিশ্রাম করতে গেলে তারা দিনমানেন্টে বেরিয়ে আসে। প্রকাত সূর্যালোকে কাঁড়কাড়ি করে ঝোপে-বাড়ে—হদি খুঁজে পায় মাংসের টুকরা—সেই আশায়।

মানুষগুলি কি অমানুষ হয়ে গিয়েছে? তারা কি ফিরে গিয়েছে সেই আদিম যুগে? যখন শুণ্ড বেঁচে থাকবার জন্য একে অপরের কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলতো—মানবীর বৃত্ত যখন একেবারেই অশুশ্রুত ছিলো তাদের মধ্যে।

তাও ত নয়। তারপর সন্ধ্যার চোক বা দ্বিপ্রহরের অবসরেই হোক—চিঠি লিখতে বসে তারা। কাল মাতা-পিতা স্ত্রী ভাই আছে মৃত্যু ইলেক, কেউ বা কলকাতায় নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে এসেছে

তাদের। চিঠির প্রতি ছত্রে ছত্রে উৎকণ্ঠিত শ্রবণের কত ভিজাসাই না ফুটে ওঠে। কত উবেগ, কত ব্যাকুলতা। আর সেই সঙ্গে নিজস্বের 'heroic exploits' এর কথা। কি অসীম আত্মবিশ্বাস। কেউ লেখেন 'আমাদের শিখগুলো ভারী সুউজ্বল।' এদিকে ওদিকে গ্রামে ঢুকে, হঠাৎ নিগারঙলোকে তাজা করে তারা যে মজা করে। প্রত্যেকেই অফিসারের কাছে নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে চায়। গোরাগের সঙ্গে পালা দিয়ে কে কতজনকে মারতে পারে তাই নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা চলে। সত্যি বলছি প্রাণ ভয়ে ভীত নেটিভ কদমালগুলো যে কালাকালি করে দেখলে এদের ওপর শুণ্ড খেঁচাই হবে। গ্রামকে গ্রাম আগুনে জ্বলছে—বাঁশ কাটছে—ঘেয়েবা কাঁদছে, এদিকে আমরা প্রত্যেক দিন নিমূল করে চলেছি বঙ্গমাসদের। আমাদের এই বিজয়যাত্রা সম্পর্কে বার বার আমার শুণ্ড এই কথাই মনে হচ্ছে, কি অমর ইতিহাসই না বনো করছি আমরা। এই অমৃত্যু মহাউপনিবেশ আমাদের এই বিজয় গৌরব কি ইংরাজজাতির শ্রেষ্ঠত্বের জয়গাথাই ঘোষণা করছে না? নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমার। আমাদের মধ্যেও কি কিছু কিছু মানুষ নেই, তাদের ধরনীতে রক্ত এসেছে কি'ম্বরে বাবা এখানে দীর্ঘ দিন বাস করেছে আর তাদের ধাতও হয়ে এসেছে নরম। তাদের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি আমরা সামান্য মত্তবিরোধ। সুখে কিছু না বললেও মনে মনে তারা যেন কিছুটা বিরূপ। তবে সৌভাগ্য বশতঃ তেমন মানুষের সংখ্যা বেশী নয়।

নির্বিরাম এই নিরীহ নাগরিকদের হত্যা মন প্রাণ থেকে সত্যিই মনে নিতে পারছিলেন না পূর্বনো জঙ্গীরা কেউ কেউ।

বুঢ়া ম্যাকমোহন যে কত অকেজো হয়ে গিয়েছেন, এই এলাহাবাদে বসে তা অনুভব করলেন। হঠাৎ সন্তরের প্রান্তে এসে সব হিসেব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাঁর। একটা অদ্ভুত খিঁজ অবস্থা। সামান্য শিক্ষাদীক্ষা রক্তে রক্তে—ডিক্টারিয়ান বুগের পিউরিটান শিক্ষার শিক্ত মানুষ তিনি। এ হলো—

They are not to make a reply
They are not to ask the reason why
They are but to do and die—

সেই শিক্ষা। পালন করতেই জন্মায় মানুষ। কর্তব্যের মূল্য বিচার যুক্তি দিয়ে করবার কোন অধিকার নেই তাঁর।

কর্তব্য পালন করতেই এসেছেন এখানে। তবু যেন পারছেন না। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে নিজের মধ্যে চলেছে এক সংগ্রাম। ক্ষতবিক্ষত হয়ে পরাধীন হচ্ছেন বুঢ়া ম্যাকমোহন।

বুঢ়া ম্যাকমোহন—এ নাম কে গিয়েছিলো তাঁকে? গিয়েছিলো তাঁরই বেসিডেন্টের সিপাহী ও বিসাল। এ নাম তাদের অন্তরের প্রীতির পরিচায়ক। আজ ম্যাকমোহনের মনে হয়, কি ভাগ্য, যে তারা দুটি পৈত্রে গিয়েছে। অযোগ্য জেলার সেই সব কুখ্যাত, মাজপুর ছুইয়া—তারা পেনসন নিয়ে কবে চলে গিয়েছে দেশে। না হ'লে, যদি ফোর্টের সল্লয় ময়দানে তাদের সঙ্গে দেখা হতো? সেই মহাবৎ আহার—যে ভাবাবের জঙ্গলে তাঁকে সাপে কামড়ালে মুখ দিয়ে রক্ত চুষে প্রাণ বাঁচিয়েছিল তাঁর? সে রাতে ঘুম কিমিয়ে পড়ছিলেন তিনি। অথচ ঘুমালে সে হতো মরণ-ঘুম। মহাবৎ আর তেলপাল তাঁর দুই বগলের নিচে হাত দিয়ে তাঁকে সমস্ত রাত পায়চারি করিয়েছিলো তাঁর সামনে। তবু চলে পড়ছিলেন ম্যাকমোহন। মহাবৎ তখন তাঁকে ধাক্কা দিয়েছে, মেরেছে—মাথাটা খুলে পড়ছিলো—চুলের মুঠি ধরে ধরে তুলে দিয়েছে। পরদিন ভোর হতে গাছের ডাল কেটে ডুলি বানিয়ে তাঁকে নিয়ে গিয়েছে গাঁয়ে। সেখানে হাকিম চিকিৎসা করে তাঁকে বাঁচায়। পরে মচাবৎ এসে অপ্রতিভ হলে মাপ চেয়েছিলো। বলেছিলো—ছজুরকে বাঁচাতে গিয়ে কতকগুলো চড়চাপড় মারলাম। গোজাকি হয়ে গেল। মাপ করবেন ছজুর।

ম্যাকমোহন হাসতে পারেননি। তখন তিনি তরুণ। সেই সময়ই সয়ল সেই মাহুঘটার মুখ-চোখে কি বেন দেখেছিলেন—মনের ভেতরে কি বেন স্পর্শ করেছিল। এমনি আরো কতজনের কথা মনে পড়ে। কত বছরের জঙ্গলজীবন—কত তার মৃত্যু। তাঁকে যে এদের সঙ্গে দিনের পর দিন—রাতের পর রাত কাটাতে হয়েছে—মনে মনে এদের সঙ্গে তাঁর এক নিগূঢ় মিতালীর বন্ধন।

আজ যদি তারা থাকতো? এমনি করে কামানের মুখে বাঁধ—এমনি পশুর মতো অসহায়? তাদের সঙ্গে চোখে চোখ পড়লে কি হতো? তারা কি জিজ্ঞাসা করত না? বলতো না? যে সাহেব—এত বছরের সম্পর্ক এমনি করেই কেটে গিলে? আজ মৃত্যুর সময়ে মাহুঘের মতো মরতে হবে না? মারবে জঙ্গর মতো? এতই কি অপরাধ করেছি? কেন? কেন সাহেব?

কি জবাব দিতেন তিনি? অথচ তবু কি বিবেক তাঁকে শান্তি দেয়? মনে হয় তারা না হোক, এরা যে তাদেরই উত্তর পুরুষ। এই নিবিচার হত্যার ক'কে ভয় দেখানো হচ্ছে? এই জিজ্ঞাসা ও শূণ্য—কেমন করে তিনি বোঝাবেন নীলকে বা নতুন আমদানী ঐ ছোকরা জঙ্গীদের? শূণ্য আর অজ্ঞাতার যে এক দুর্লভ প্রাণীরা তুলে ধরছে শাসক ও শাসিতের মাংসখান? তুল হচ্ছে। স্পষ্ট ব্যুত্রে পারছেন তিনি, যে তুল হচ্ছে। ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের কোনদিনও মনে মনে সমঝোতা হবে না—ভারতীয় কুখ্যাতের রক্ত-মাংসে মাটিকে উর্বর করলে, তাতে শুধু তুলের কলসই কলবে, তাতে করে সাম্রাজ্য রক্ষার দিক থেকে ক্ষতিই হবে।

তিনি হিন্দুর বই পড়েছেন। তাদের মৌলভী ও পণ্ডিতদের মুখে শুনেছেন ধর্মের ব্যাখ্যা। না—বিশ্বমানবতার বড় বড় আদর্শবাদ নেই তাঁর মনে। সহজ সরল একটা বিশ্বাস বা জীবনবোধ প্রসূত তাই তাঁর মনটাকে শিখিয়েছে, যে ভালবাসা ও বিশ্বাস দ্বারা মাহুঘকে বড় সহজে জয় করা যায়, এমনটি আর কিছুতে নয়।

বুঢ়া ম্যাকমোহনকে পাণামো-রে তাঁর বাংলার সল্লয় বসন্তের শিত্তলো অবধি ভালোবেসেছে। নির্ভয়ে কাছে এসেছে। এখন এ কি হলো? পথে চলতে চলতে তাঁর চেহারা দেখলে সভয়ে কান্না বন্ধ করে মায়ের কোল থেকে শিশু চেয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে। সন্ত-বিধবা যুবতী, পতিহারা বুঢ়া, পুত্রহারা মা—তাঁর চোখের দিকে চেয়ে কি বেন খোঁজ। এলাহাবাদে পুরনো শহরের পথের দুই পাশে তাদের ভিড়। তারা নিরাশ্রয়, অনাথ—তারা কি করবে? কোথায় যাবে?

মনে মনে বঙ্গপ্রবোধ করেন ম্যাকমোহন নিরন্তর। কিন্তু কে শুনেবে তাঁর কথা? ক'কে বোঝাবেন? তবু তাঁকে বেতে হয় প্রতিদিন। সামনে ঝাড়িয়ে দেখতে হয় এই শান্তিবিধান।

ইচ্ছা ছিল, পাণামো-রে যে গাছগুলি লাগিয়েছেন—তাতে ফল ফুটলে তাই দেখবেন। মোহম শ্রীতের দেশ থেকে পাণিগুলি উড়ে এসে তাঁর বাংলার পূবে বিলের ধারে বাসা বাঁধলে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবেন। সেই শান্তিপূর্ণ অবসর জীবনে বলে বলে 'Fifty years in India' বইখানা শেষ করবেন। সেটাই হবে তাঁর সবচেয়ে সার্থক কাজ।

সব হিসেবই যে উটে গেল। ভারতকে তিনি ভালবেসেছেন? ব'দি উত্তরকালে এই সব মাহুঘের উত্তর-পুরুষ জিজ্ঞাসা করে তাঁকে? যে বুঢ়া ম্যাকমোহন, তুমি ভালবেসেছিলে ভারতকে? তাই ভারতের মনোহারা জীবনের ইতিহাস উৎসব লোকচারণ ও দেশাচারের কথা লিখেছ? তবে তোমার সে ভালবাসা এমন নিষ্ঠুর গোঁজামিলে ভরা কেন? কেন সেই তোমাকেই ১৮৫৭তে ভারতের মাহুঘ দেখলো এক নিষ্ঠুর এক অত্যাচারী জাতের সুযোগ্য সন্তান হিসেবে? সেই তুমিই কেন ঝাড়িয়ে দেখেছ কাঁপতে মাহুঘ কি বঙ্গপ্রবোধে রটপট করে মরে? কামানের মুখে ঝাড়িয়ে ভারতের জোয়ানের মুখ কেমন খুস দেখায়?

না। কোন জবাব নেই তাঁর। এরা বলছে তিনি কাপুরুষ? বা বলে বলুক তাঁর জাতিভাইরা কোনো উত্তর দেবেন না তিনি। সমস্ত হিসেব পাণ্টে গিয়েছে তাঁর। তিনি হেরে গিয়েছেন। আজকের দিনে তিনি অযোগ্য। তাঁর চেয়ে অনেক বোঙ্গা তাঁরই ভাগিনের আইট। আইটদেরই চায় আজকের শাসকরা। তিনি আজকে বাতিল।

আইট নীলব প্রিয় হয়ে উঠেছে। তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়েই হয়তো আইট বেরিরে বাঘ তার দল নিয়ে। তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়েই হয়তো বলে—বুড়োজঙ্গীদের বাতিল না করলে হবে না। তারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছে।

আইটকে এড়িয়ে চলেন তিনি।

আইটের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্ত বেন এই বস্তাক পটভূমিকারই প্রয়োজন ছিলো। বরাবরই স্বন্দর চেহারা তাঁর। বালক বয়সে ম্যাকমোহনের মনে হতো তরুণ যুগের মতোই নিষ্পাপ কান্ডি আইটের। একমাত্র বোন, বার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি—তার প্রতি সকল অপরাধ ক্ষালন করতে চাইতো তাঁর মন। তাই আইটের ওপর সকল সন্দেহ বিশেষণ আরোপ করতে চাইতেন তিনি। কিন্তু স্বন্দর ঐ যুখানার আড়ালে যে মনটা আছে, তার পরিষ্কার



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটা কত সুখী, কত সুস্থ! কারণ ওর স্নেহময়ী মা ওকে নিয়মিত অষ্টারমিক খাওয়ায়। অষ্টারমিক বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক খাদ্য। এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিক ভৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিক পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সবরকম তথ্যসম্বলিত। ডাক খণ্ডের জগৎ ৫০ নম্বর পত্রসূত্র ডাক টিকিট পাঠান—এই টিকানায়—“অষ্টারমিক”, P. O. Box No. 2257, কোলকাতা-১।

...মায়ের দুধেরই মতন

কারের শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। হৃদয় দেহগঠনের জন্তু চার পাঁচ মাস বয়স থেকেই দুধের সঙ্গে কারের খাওয়ানো প্রয়োজন। কারের পুষ্টিকর শব্দজাত খাদ্য-রাসায়নিক হওয়া—শুধু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চামচে করে খাওয়ান।



বতই পেলেন—ততই মনটা তাঁর গুটরে গেল বা খেরে খেরে।
তাঁরও পরে—চন্দন বখন পে-হাবিলদার—তখন এক কুঞ্জী
অভিজ্ঞানর ভেতর দিয়ে তাঁদের দুজনের বিচ্ছেদ ঘটলো।

ব্রাইটও সমস্ত ভীষনটা নানারকম কলহের চারায় কাটিয়েছে।
সবচেয়ে বড় হলো জয়গত পুত্র, সে যে এক গ্র্যাংলো ইংল্যান্ড পিভার
সন্তান, সে কথাটা তার সঙ্গী অফিসার ও উপরিভনরা কোনদিনও
ভোলেননি। ব্রিজহলারীকে সে বখন ঘরে আনলো তখনও বেন
বিশ্বস্ত হলেন না কেও। সে ব্রাইট—তার কাছে এর চেয়ে
বেশী আর কে কি আশা করেছে? এই বেন ছিলো সকলের
মনোভাব।

ব্রাইটদেরও ট্র্যাকেরি আছে। এ ছদ্মহায ব্রাইটরাও বড় হতে
চায়। ব্রাইটের মনে হতো, সে বেন ঠিক উপযুক্ত ক্ষেত্র পাচ্ছে না।
পেলে একবার দেখিয়ে দিতো। তার মনে হতো অদৃষ্ট
কতকগুলো বীধন যেন তাকে সতত নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে।
সীমাবদ্ধ করে রেখেছে তার গতিবিধি।

১৮৫৭ তাকে এনে দিলো সুযোগ। ব্রিজহলারীকে সোনার
রূপোর সে ভরে দিয়েছে। মূর্খ নেয়েটা মনে করে, সে বৃষ্টি ব্রাইটের
ভালোবাসার দান। তা নয়। সন্ধর করে রাখবার সে একটা
পছন্দামাত্র। টাকার দাম ব্রাইটের কাছে সবচেয়ে বেশী।

আর সুযোগও মিলেছে বটে। শূন্যতমাজের সব কিছুই কি সে
নিরে বাগছে? রূপোর শিকানী আর সোনার আতবপাস নয়—
সে শুধু সংগ্রহ করছে সোনার মোহর। সোনার ভারী রামচাঁদী
মোহর—একখানার দাম অনেক। রূপোর টাকার চেয়ে সে মোহর
নিতে সুবিধে।

তা ছাড়া নেটিট এই কালোজাতিটার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক
টেনে তাকেই বেন ছোট করা হয়েছিলো। এখন সেই পরিচয়
অস্বীকার করে নিজের প্রেষ্ঠ প্রমাণ করবার এক সুবর্ণ সুযোগ।
ব্রাইট তাই তার নিজস্ব কিছু সওয়ার নিয়ে প্রত্যাহই নতুন নতুন
এ্যাডভেঞ্চার খুঁজছে। হত্যার যে এত আনন্দ, তাতে যে অবসর
বহু কামনা বাসনাকে এমন সুস্থি দেওয়া যায়, তা ব্রাইট জানতো
না। বর্তমানে সে স্মর করেছে ‘Surprise attack.’ রাত
বিবেতে হোক, বা দিনমানে যে কোন সময়ে হোক, সে আর তার
অধারোহী হল, এগিয়ে এগিয়ে বার। খুঁজতে থাকে যদি কোন
সন্ধেহের পাত্র নজরে পড়ে। মূর্খ গ্রামবাসীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত
হয়ে আরো দূরে পালিয়ে বাবার চোঁটা করছে। বরা পড়লে অংশ
বলে—তার নির্দেশ। শুধু শ্রাণ ভয়ে পালিয়েছে। কিন্তু সে কথা
বিশ্বাস করে কোন মূর্খ? ব্রাইট তাদের সেখানেই শাস্তিবিধান
করে। যেহেতুতো শিশুদের বৃক নিয়ে চুল ছিঁড়ে মাটিতে
গড়াগড়ি দেয়—সরীর করে কেলো ক্ষতিকর। কিন্তু ব্রাইট পোকে
ডাকার না। যেহেতু সন্ধান বন্ধ করা হলো ইংরেজ জাতির
বৈশিষ্ট্য। সে সুনাম আর যেই হোক, ব্রাইট কখনো স্মর হতে দেয়
না। বখন ফিরে আসে তারা—যেহেতু আরও জনম আকাশ চিরে
তাদের অঙ্গুরণ করে। কয় জনকে খুলিয়ে দিয়ে, আর বাকি
কয় জনকে গুলী করে ব্রাইট বখন কেবো—পাশের চামড়ার খলিতে
সোনার মোহরগুলির চাপা খুন খুন শব্দ হয়। ঘোড়ার লাগাম
আলগোছে ধরে চোখ ছোট করে চেয়ে থাকে ব্রাইট। দেখে তাকে

কোনো স্বপ্নশী কবি বা শিল্পী মনে হয়। মুখে একটা আনন্দের
নির্মিলিত হাসি—স্বপ্নচাষী হুই নীল চোখ এখন মূর দেখার মতায়—
মনে হয় না যে এর সঙ্গে কয়েক মাইল পেলেন কেলো আসা সে
সর্বনাশের কৃত্তর কোল যোগাযোগ আছে।

সেদিন ব্রাইট কি খবর পায় কে জানে। রাত তিনটে থাকতে
হঠনা হর বার কানপুর বোড় হবে। কানপুর বোড়ের গুপ্ত
লালোরা গ্রাম। ছোট এ গ্রামটি এতদিন ডাকগাড়ীর ‘ট্রান্সিট হলট’
হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। লালোয়ার ভূমায় কোম্পানীর অনেক
দিনের অল্পগত প্রজা। তিনি কিছু লোক সংগ্রহ করে হলট বাংলা
আর লালোয়াকে এই সাময়িক উদ্ভত্তা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।
তাঁর নাম শাদা খাতার। তবু লালোয়া গ্রাম অভিবৃথে এ অভিবান
কেন?

ম্যাকমোহনের মনে হয় চিন্তিত হবার কারণ আছে। তিনি
বলেন—এর কলে সেই বিশ্বস্ত মাহুবগুলোর মনে অবধা অবিদ্যাসই
হুই করা হবে। সেখানকার তালুকদার ত’ টাকা দিয়ে সাহায্য
করেছেন আমাদের।

নীল এত ভাবতে চান না। তাঁর কথা হোলো—যদি সেখানে
শক্তিত হবার কোন কারণ না থাকে তবে বেলা দশটার মধ্যেই ফিরে
আসবেন ব্রাইট-রা। যে নির্দেশ তার আর শব্দ কি?

সেই রাত্তে চন্দন বহুদিন পর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিলো লালোয়ার
হলট বাংলাতে। অনেক দিন পরের ঘুম। নিজের থাকী বাগটি
জাপটে ধরে তার গুপ্ত মাথা তেখে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিলো চন্দন।
বুদ্ধ মাহুবটির মুখখানা দেখাচ্ছিলো শিশুর মতো। তেমনই নিরুদ্ভর।
ডেবাপুয়ে পৌছনো আর হুসনি চমকেন। সোভাস্ত্রি দক্ষিণে নেয়ে
আসবে পিসিতিত হয়ে নামবে আরো দক্ষিণে—ডাকগাড়ীর পথ ধরে
পৌছুবে, কানপুরে—তার পর আরো দক্ষিণের পাথে তার গ্রাম
পৌছুবে এই ছিলো তার পবিত্রনা। কিন্তু সাধাখানা ছেড়ে
আসবার আগেই খবর এসে নৈনিতালের দিক থেকে। কোম্পানী
সাফেবের সিপাহীরা কুখে গিয়েছে।

চন্দন সে কথা কানেও নেয়নি। কোম্পানীর সিপাহীরা অমন
কুখে ওঠে মাঝে-মাঝে সে কথা সে নিজেও জানে। আবার মূর্খ
সেই সব মাহুবকে কেমন করে ভ্রম করতে হয়, তাও জানে
কোম্পানী। চন্দনের জানবুদ্ধি অমুযায়ী কোম্পানীই হলো
সর্বশক্তিমান দেবতা। তার মতো ক্ষমতা বুদ্ধি ভগবানেরও নেই।
কয়টা মাহুব যে কোথা থেকে উড়ে এসে একেবারে কতকম করে
কেলেছে তাদের রক্ত—এতেই ত তাদের প্রতিপত্তি বোকা বার।
চন্দনের অভিজ্ঞতা অমুযায়ী সাহেবরা দবতা। দয়া আর শাসন
হুইই তাদের আছে। শাসন যে আছে, সে ত’ দেবতাই এক
হাতিয়ার। কঠোর না হলে মাহুবকে সে দমন করবে কি করে?
আর দয়া? এক বুঢ়াসাহেব, তার ম্যাকমোহন সাহেব তার কাছে
সকল সাহেবদের সকল অক্ষমতা ঢেকে দিয়েছে। দয়া, কল্পনা,
ভালবাসা, প্রেমমততা, বুঢ়া ম্যাকমোহনের কথা মনে হলে চিরদিন
চন্দনের অন্তর থেকে উঠবে এই ডাক—সাহেব, তুমি আমার
দা-বাপ।

দীর্ঘ দিন এই সাধাখানার নির্জন পরিবেশে বাস করেছে চন্দন।

ইদানীং সে খানিকটা বিছিন্ন হয়ে পড়েছে বর্তমানকাল থেকে। সিপাহীদের ক্রোধে যাঁগার খবরটাকে সে কাজেই বরুণ দিল না। বরুণ ম্যাকমোহান সাহেবের চিত্রিত জবাব পেয়ে পত্রবাহককে দিয়ে সে চিঠি বার বার পড়িয়ে নিল। সাহেব লিখেছেন—‘চম্পনের সাহেব একদিন লিখেছিল বটে—বাও, আপন! স্বর যেনে’ যি কা দিয়া জালাও, তৈরী হোক চম্পন, আসছে সাহেব। কিন্তু নানা কারণে তা আর সম্ভব হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে সেদিন আজও আসেনি। নাই বা হলো এবার—আবার ভবিষ্যতে হবে। চম্পন কি বলবে—সাঁর কি ক্রোধ হচ্ছে না? সেই জঙ্গলে শিকার ত’ শুধু নয়, বর্ণায় মাছ ধরবার প্রলোভনও ত’ ছিলো। শাক, চম্পনের সাহেব বুড়ো হয়েছেন বটে—তবে এত বুড়ো হননি, যে চম্পনের নিমন্ত্রণ না রেখেই মরে যাবেন।’

সাহেব লেখেন উর্দু-ভাষায়, কিন্তু নাগরী হয়ক। ছোট্টলেসেরা যেমন পণ্ডিতের কাছে লিখবার পরীক্ষা দেয়, তেমনই ধরে ধরে লেখা লাইনবাঁধা অক্ষরগুলি। চম্পন চিঠিখানা ওপর থেকে নিচে, নিচে থেকে ওপরে—নানা ভাবে স্তন্যলো। কই, তার মধ্যে ত’ কোন হাস্যময় কথা লেখেনি সাহেব? কেন লেখেনি? তবে নিশ্চয় গোলমাল বেশী নয়।

কিন্তু তার পরে তার আর সে নিশ্চিত ভাব রইলো না। বেরিলী থেকে সাহেবরা পালিয়ে এলেন। চলে গেলেন নৈনিতালের নিরাপন্ন আশ্রয়ে। বাবার পথে তাকে বলে গেলেন—বুঢ়া, ভূমিও পালাও—এখানে হাস্যাদা নেই। হতে কতক্ষণ?

তার পর কয় দিন ধরে নিশ্চিত সেই বনভূমিতে যেন রুড বয়ে গেল। আতঙ্কে গ্রামবাসীরা পংলাবার চেষ্টা করলো বনপথ ধরে এদিকে ওদিকে গিয়ে। বাঙ্গালীগণেরা পরিবাব নিয়ে পালালেন নৈনিতালে। বলে গেলেন—তোমার কাছে যা আছে নিয়ে পালো। খুব মুশ্কেল পড়ছে।

চম্পন ত’ চিন্তিত হয়ে পড়লো। সাক্ষাখানার আশাব্যাপ্ত, বাগনকোশন, সামাজ্য ওষুণপত্র, সবই তার জিম্মায়। বৃদ্ধি করে সে সব জিনিষ টেনে টেনে এনে একটা ঘরে বোতাই করলো। কয়টা অক্ষিপের টব বুলছে বাগান্দার। ম্যাকমোহান বলতেন—এগুলো বড় দামী।

একখানা জাহাজের ডেকে মরণোন্মুখ এক আহত বীরের ছবি—মকলে তাঁকে ঘিরে রয়েছে—সাহেব বলতো, এ ছবিও না কি বড় দামী। চম্পন অনেক ভেবে ভেবে বিশাল সে ভারী ছবিখানাকেও নামালো টেনে। নিয়ে বাথলো তালাবন্ধ করে। আর অতিভক্তলোব নামনে ঝাড়িয়ে পাতলা চুলগুলো টানতে লাগলো। দামী যদি হয় তো তাকে সুবাক্ত করাই উচিত। অনেক ভেবে ভেবে চম্পন সে অতিভক্তলো এ্যাকালিয়া গাছের ডালে বেঁধে দিলো। জল ছিটকে দেবার মাত্র না থাক। রাতভোর হিম পড়বে—তাতেই বেঁচে যাবে গাছগুলো।

আরো কত টুকটাকি—বাগান করবার কোশল, ধূবপী, বুড়ি—যাদিনড়োবার যন্ত্র। সব টেনে টেনে নিলো সেই ঘরে।

তার পর ঘরটা তালাবন্ধ করলো চম্পন। তাল বন্ধ করে একটা চাবি নিজের কাছে রাখলো। আর একটা চাবি শুজে রাখলো কাঠের দেওয়ালের কীকে।

নিজের জিনিষপত্র ভরে নিলো খাকী একটা ব্যাগে। আর তার সঙ্গে সাথী, ম্যাকমোহানের সেই পুরনো সার্টিফিকেট, তার কোকী-জীবনের কাগজপত্র, তার বিধবৃত্ততা সম্পর্কে ক্যান্টন কমিশনের চিঠি, এই জঙ্গলে শিকার করতে এসে তার সমাধির পরিপূর্ণ অফিসারের প্রাণসাপত্র, এই সব নিলো শুষ্কিয়ে। টাকা ভাঁমিরে জমিয়ে দুইখানা মোহর কিনেছিলো—তা-ও নিলো পেটকাপড়ে বেঁধে। জল খাবার জন্ত পেতলের ঘটি নিলো একটা। পেতলের ছোট একটা খালা আর একটা ছোট হাড়ি। সঙ্গে রইলো চকমকি। পথে এমনি ভাবে চলতে ক্রিতে সে অভ্যস্ত। এমনি করে চলতে চলতে পথের পাশে বসে আর কিছু না হোক, চেয়ে নিলে ছটো ঢাল আর এক ছটাক ঘি সবাইই মিলবে। তিনখানা পাখর পেতে কাঠকুটো ছেলে ছটো ভাত সে রাঁধা করে নিতে পারবে। আর তাই বা কেন—আধগের আটা মিললে লেট্টা বানিয়ে সৈকে নেব—আর কোনটাই যদি সুরাধে না মনে হয় তাহলে যে কোন গৃহস্থ কুবাণের বাড়ী গিয়ে পীড়াবে। আতর্ষি হয়ে সেবা নিতে নিতে পৌছিয়ে যাবে ডেংগুখ।

বাইরে টালমাটাল—বলুগা হুক হয়েছে—চম্পনের মনটা অনেক দিন বাদে গৃহমামুদের মতো কথা কইছে। কেমন যেন কিরে যেতে ইচ্ছে করছে প্রাণেশের কাছে। পুত্রবধু দুর্গার মুখের কথা স্তন্যতে ইচ্ছে করছে। সে যার আর চলে আসে। দুর্গা সেই কয় দিন কতাকম জিনিষই যে রেখে তাকে খাওয়ায়। আসবার সময়ে সঙ্গ বাড়ীর বি, আচার, পীপড় দিয়ে দেয়। মিষ্টান্ন বানিয়ে বেঁধে দেয় নতুন কাপড়ের টুকরোয়। তারপর রান্ধিয়ে পায়ের কাছে বসে নহমুখে শবুদের সব নির্দেশ শোনে—আর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে চম্পনের পায়ে।

চম্পনের অমন নাতিটা, সে-ও বেরাতি হয়ে গেল। চম্পন এবার চম্পনকে ধরে নিয়ে যাবে ঘরে। সেই মেয়েটার সঙ্গেও একটা ফরসালা করবে দরকার হলো। আসলে নিজের ঘর সসারটা বেশ বেঁধে বেঁধে দরকার। চম্পনের মনে হয়, সসারটা বেশ মুঠোর মধ্যে ধরা থাকলে, তবে যেন এই সব দিনের কাড়কাটা বুক দিয়ে রাখা যাবে।

উংরাই-এর পথ ধরে চম্পন। প্রথম দিন না হলে-ও দ্বিতীয় দিন থেকেই তার চোখে পড়ে বলুগা কি কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। বড় বড় গ্রাম, প্রায় জনস্ফুল। মামুখ জন্তে চলে গিয়েছে, তাই ঘর বন্ধ করে রেখে যেতে পারেনি। গরু, ভাগল, ভেড়া যারা নিতে পারেনি তারা ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে। আশে-পাশে ঘাসের জমাব নেই—তবু সেই মুক পশুগুলি বড় বড় চোখ তুলে শুধু মামুখ বুঁজছে—পরিচিত কেউ এলে কি না, তাই দেখছে। গ্রামের এমন অবস্থা হয়, জানে চম্পন। যখন সাক্ষ্য কোন শরভান এসে ঢোক বাঘের শরীরে—মামুখের রক্ত ছাড়া বার ভূঁপ নেই—তখন গ্রামের মামুখ কিছুতেই মুকতে পারে না সেই শানবের সঙ্গে। তারাতখন গ্রাম ছেড়ে চলে যায় অজ্ঞ গ্রামে। আর গ্রামের প্রধানরা এসে দরবার করে চম্পনের-ই কাছে। চম্পন যেন তাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে। আত্মিনায়া লিখে আনে কখনো তারা। চম্পন নিজের দর বাড়ায়। নানাবিধ অমুবিধা আর বলুক যে কি দরকম অকলো হয়ে পড়ে আছে সেই কথাই বলে বার বার। শেষ অবধি

চৌটার দাম দেয় তারা—চন্মনকে খাওয়ার, খোঁসামোদ করে। চন্মন এই সমানটুকু চায়। শিকার করাও তার খুবই ভাল লাগে। সে তারপর 'মড়ি' কেসে মাচা বেঁধে-ই হোক, বা বে কয়ে-ই হোক—সে বাথকে ধারে। ভাগ্যক্রমে বাথগুলো বুড়ো না হলে শততান আচ্ছাটার সুবিধে হয় না। তাই চন্মনকে খুব কষ্ট করতে হয় না। অবশ্য একেবারে ভালো জোয়ান বাথ, তবে পাঁচ ছয় বছর বয়স—সেও যে মাইঘরখেকো হয় না তা নয়। তেমন বাথ শিকারের অভিজ্ঞতা-ও চন্মনের আছে বই কি!

বলওয়া ভাই'লে তেমনিই কোন শরতানের রক্তচাপও হয় নেই। প্রাণপ্রকাশ করেছে এখানে। সেইজন্য এই নির্জনতা? আরো নিচে নামতে অরণ্য কম, জনপদ বেশী। সেখানে হাটের চালাঘরগুলি কীকা পড়ে আছে, থা থা করছে অঙ্গন। পরিভ্রাজ্ঞ চন্মন ইঁদারার ধারে যেতেই বিশিষ্ট একটা গন্ধ পেলো।

গন্ধটা আসছে তার পরিচিত এক ডাকরাণার থেকে। এই ডাকরাণার জাতে গাড়াওয়ালী, এবং এই পার্বত্য পথে-মাটে চলতে সুপটু। এ পথে ডাকরাণার তাই এদেরই নিযুক্ত করা হয়। চন্মন এর নাম জানে না, কিন্তু মুখ চেনে। প্রয়োজনে এ মানুষটি অনেকবার এসেছে সাক্ষাৎকার।

এখন পড়ে আছে চিং হয়ে। রোগা ছোটখাটো। শরীরটা ফুলে হয়েছে ঢোল। গলার এপাশ থেকে ওপাশ অবধি কাটা। সেখানে মাছি ভনভন করছে। কুকুর বেড়ালে বোধ হয় টেনে হিঁড়ে খেতেছে কিছুটা। ডাকবাগ আর চিঠিপত্র ছিটিয়ে পড়ে আছে।

হাম হাম। বলে সরে আসে চন্মন। ইঁদারার ধারে বসে সমস্ত পা গুলিয়ে ওঠে। বসি হয়ে যায় সব। অনেকক্ষণ বসি ধরে থাকে। তারপর জল তুলে ইঁদারার পাড়ে বসে স্নান করে। জল খায়। এবার এদিকে ওদিকে তাকায়। না। বিপদ যেন চতুর্দিকে। হাটের আঙিনা ঘোড়ার খুরে খুরে চলে কেলোছে কারা। এদিকে ওদিকে মাটির দেয়ালে গুলী ফুটো। শূন্য কাছের খোলও পড়ে আছে। কি বেন হয়ে গিয়েছে। এই মাইঘরটাকে কে মারলো? কেন মারলো?

চন্মনের মনে পড়ে পলারনপর গ্রামবাসীদের কথা। তারা বলেছে—সরকারী কাজের কোনো মাইঘর দেখলেই ওরা মারবে। তুমিও পালাও বুড়া।

এই ডাকরাণারকে কি সেইজন্যই মরতে হলো? সে সরকারের কাজ করতো বলে? এই কি তাহলে বলওয়া?

সহসা চন্মনের মনে হয়, সে খুবই বিপন্ন। কেস মনে হয়? অভিজ্ঞ শিকারীর সতর্কতার কান পাতে সে। বিপন্নতা মুখে বাতাস আসছে। কোন সন্দেহে আনছে সে বাতাস? মনে হয় পূর্বদিক থেকে বেন ক্ষীণ হলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ আসছে। এদিক ওদিকে চেয়ে চন্মন তার খসিটা কীধে বেঁধে নেয়। পরে নেয় জুতো। তারপর ঢুকে যায় জঙ্গলে। স্থানিবিড় বন। বন কোণঝাড়। মিহি একটা আন্তপচালের গন্ধ লেগে আছে বাতাসে। লম্বচূড়ের মিথুনের সময় এটা। মিথুনকামী কোন লম্বচূড়ের গায়ে যদি পা তুলে দেয় সে, মৃত্যু হবে অনিবার্য। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। একেবারে স্থির হয়ে যায় চন্মন। পাঁচের পা এঁকে পাড়িয়ে যায়। ঘোড়ার পায়ের শব্দ আসে নিকটে।

দশ-বারোজন অধারোহী। উন্নত চেহারা, গৌরবর্ণ, দেখে মনে হয় রোহিলা পাঠানই হবে। তারা নামে। ঘোড়াগুলোকে টেনে আনে। সামনে পড়ে আছে যে মৃতদেহ—সেদিকে চেয়ে নাকে কাপড় দেয়। জল তুলে নিজেরা খায়, ঘোড়াকে খাওয়ায়। তারপর নিজেরা হাটখরের বাগান্দার বসে। ঘোড়াগুলিকে চরতে দেয়। ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ঘোড়া। সওয়াররা কি কথা নিয়ে তর্ক করে। সব কথা বোঝে না চন্মন, তবে বেথিলী—কাশ্মীর—এমন কতকগুলো নাম ছিটকে ছিটকে তার কানে আসে।

তারপর ঘোড়া নিয়ে চলে যায় তারা। যে পথ দিয়ে চন্মন এসেছে, সেই পথই ধরে।

চন্মন এবার জঙ্গলের নিরাপদ রাস্তাই ধরে। হাজার হলেও এ তার জানা পথ। এখানে কোন ভয় নেই তার। জঙ্গলটা তার সঙ্গে বেইমানী করবে না। জঙ্গলে অনেক দিনের বন্ধ।

প্রবল প্রতিকূল অবস্থা চন্মনকে বার বার বাধা দেয়। কিছুতেই ডেরাপুরে পৌঁছুতে পারে না চন্মন। শেষ অবধি সে এলাহাবাদের পথ ধরে। এলাহাবাদে বুড়া ম্যাকমোহনকেও পাওয়া বাবে, এ একটা বিশিষ্ট বর বলে মনে হয় তার।

পথে বার বার কোম্পানী সাহেবের কৌজও তাকে রুখছে। সেখানে সে ফৌজীসহুট দিয়ে সাহেবের স্যাটিক্রেট আর চিঠি খুলে ধরে অস্ত্র সাহেবের সামনে। সেই চিঠিই হয়েছে তার ছাড় চিঠি। চন্মন এখন প্রথম নেমেছিলো সমতলে, তার হাঁটা ছিলো অদ্ভুত—পাহাড়ের পথে চলে অভ্যস্ত পা—সমতলে পা কেলতো সে থাকিয়ে থাকিয়ে—অদ্ভুত ভাবে।

কিন্তু এই স্বল্প সময়েই সে যা যা দেখলো, তাতে চন্মনকে একেবারে বুড়িয়ে দিলো। মর্যাদা ও বিভ্রান্তিকর সে অভিজ্ঞতার ভারে রক্ত চন্মন একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেল। অথচ ঈশ্বর জানেন, এই সেদিন অবধি মনে-প্রাণে তার কতখানি তাকুণ্য ছিলো।

চারি পাশে শুণু মৃত্যু। এই মৃত্যু শিকারীর পরিচিত মৃত্যুর মতো পরিচ্ছন্ন ও সহজ নয়। এ মৃত্যুতে ঘৃণার গন্ধ। ভয়ের আভাস। মাইঘর মাইঘরের রক্ত দেখতে এত ভালবাসে? তার জন্মকালের পরিচিত কোম্পানী সাহেব, যে সরকারকে সে দয়া ও জ্বারের অবতার বলেই জানে, এ তার কি ব্যবহার? এ যেন একটা শত মুণ্ডবিশিষ্ট দানব। শত মুখে রক্তপান করছে, এবং আরো রক্ত চেয়ে লকলক করছে ভিত। চন্মনের অন্তরাখা কুকড়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। বগাড়মিতে আনবার পর, সাহেবদের সহযোগী শিবসৈন্তের দিকে চেয়ে প্রাণগণ্ডে দণ্ডিত সিপাহীরা কি ঘৃণার সঙ্গে টিককারী দিচ্ছে। বলছে—পাজাবে তোমার মা-বোনকে পাথ বসিয়ে, তোমার বাপ-ভাইকে শূর্য্যোদের মত খুঁচিয়ে মেরেছে যে ইংরেজ, তারই সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতভাইকে মারছে? লজ্জা নেই?

পাজাবেই শিবরাও প্রধান ঘৃণার জবাব দিচ্ছে। বলছে—হা, মিল্লাতে মোগলসাহী কার্যে করলে হা। আমাদের গুজর ভবিষ্যৎগী এই ঠেতুঘরকণ আর থাকবে না।

এ ওকে ঘৃণা করছে—এত ঘৃণা কোথায় ছিল? এ কি হচ্ছে

দিন দিন? মাছুবগুলো এত অমায়ূব? চন্মনের মনে হয়, এই নরকটাই বুঝি সত্য—তার সে জঙ্গল, সাঁকাখানা, আর পরিচ্ছন্ন জীবন সে বুঝি কোথাও নেই। মনে হয়, এই ঘুণা ও আতঙ্ক ও রক্তের গন্ধ তাকে চিরন্তনের নোয়া করছে। সে আর তচিস্ত হতে পারবে না।

বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে তার মাথার। কিছু বুঝতে পারছে না চন্মন। তার শুধু মনে হচ্ছে, কোন মতে বুঢ়া সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁর পা ধরবে। বলবে—সাহেব, তুমি মা-বাপ, তোমার গোড় লাগি—তুমি আমাকে দেশে পাঠিয়ে দাও।

এলাহাবাদের উপকণ্ঠে লালোয়ার হটবাংলোতে পৌঁড়িয়ে, এলাহাবাদ এখান থেকে মাত্র ছয় মাইল জেনে সেই রাতে তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোল চন্মন। অনেক দিন বাদে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নে কোন নিহত তরুণের রক্তাক্ত দেহ, বা কীসীতে ঝুলতে ঝুলতে বস্ত্রি দেহ কোনে কবাবের গলার বোবা আর্তনাদ তাকে ভয় দেখাল না। বরঞ্চ অনেক দিন বাদে চন্মন স্বপ্নে দেখলো, সে চলছে সবুজ খাস দিয়ে—তার পাতা কীদে ধরা পড়েছে একটা ঘুঘাল। সেটাকে নিয়ে আসতে মনে হলো ঘুঘালটা বাচ্চা। তার মুখটা চেটে দিয়ে ঘুঘালটা ডেকে উঠলো। ছেড়ে দিলো তাকে চন্মন। মুখে তার হাসি ফুটে উঠল।

তখনই ভোরের আলো ফুটেছে, আর আইট পৌঁছিয়েছে সেই হলট-এ।

ঘুম ভাঙতে লাগিয়ে উঠে বখন গোহাকোঁজ দেখলো চন্মন, বুক থেকে তার পাখা ভার নেমে গেল। বেরিয়ে এলো ব্যাংলার। নেমে এলো সাহেবের কক্ষুয়ে। আর সে সাহেবকে আইট বলে বখন চিনতে পালো চন্মন, আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল ফেটে বেরলো। আইট আগে তার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে, সব ভুলে গেল সে। মনে হলো আইট ম্যাকমোহনের ভাগ্নে। নিশ্চয় তাকে বুঢ়া সাহেবই পাঠিয়েছেন। আইটের জন্ত বৃক্কের মধ্যে একটা আশ্চর্য বাৎসল্য যিস্তিত গর্ভ অল্পভব করলো সে। চোখ হাতের পিঠ দিয়ে মুছে সে এগিয়ে এল ছোট ছোট শিকারী পদক্ষেপে। সাহেব! সাহেব! আমার ছোট সাহেব! এই ছাড়া মুখে আর কোনও কথা বেরুছিল না তার।

মাছুবটার মজার আচরণ দেখছিলো সবাই মিলে। এখন, বখন মাছুবটাকে চন্মন বলে বুঝলো আইট, তখনই সে পিঙ্কল ভুললো। আইট যে পিঙ্কল ভুললো, চন্মন সেটা, দেখলো না। কারণ হলো দৃষ্টমান অনেক কিছুই তার চোখে পড়ছে না। সে যে একদিন পণ্ডে আইটকে দেখতে পেরেছে, যে আইট ম্যাকমোহনেরই ভাগ্নে—সেই আইট তাকে সাহেবের কাছে নিয়ে যাবে, আর এই সব ঘুণা ও ভয় দেখে দেখে তার ক্লিষ্ট মন প্রাণ নিয়ে সে সাহেবের পা ধরবে—ধরে বাড়ী কিরে যাবার বন্দোবস্ত করবে—এই চিন্তাগুলো ছাড়া আর নতুন কোন কিছু বোঝবার ক্ষমতা যেন তার মাথার নেই। আর নতুন কোন কিছুই সে গ্রহণ করতে পারবে না মাথার।

আইট পিঙ্কলটা যে ভুললো, তার সে ভঙ্গীর মধ্যে কোন আড়ম্বল্য ছিল না। চন্মনকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চিন্তাটা তার মাথার পরিষ্কার একটা বোধে গিয়ে পঁড়ালো। একখানা ছবি

যেন মাথার মধ্যে ছাঁপ কেটে বসে গেল। এ সেই চন্মন, বীর জন্ত তার সঙ্গে তার মামার বিরোধ—যে তার জীবনের একটা অব্যাহিত অভিজ্ঞতা এনেছিলো—সে বুঝতে তার দেহী হলো না। এইখানেই আইটের বিশেষত্ব—যে প্রয়োজনের সময়ে সে অতি দ্রুত বুঝতে পারে সব।

আইটের পিঙ্কল টিপ ভুল হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না বিশেষ করে গুলীর লক্ষ্যস্থল বখন একেবারে সামনে অত বড় একটা মাছুব। তবু আইট ঝামেলা এড়াবার জন্তেই বোধ হয় পর পর দুটো গুলী করলো।

চন্মনের চোখ থেকে সে অক্ষর ধারা শুকোবার আগেই গুলীটা লাগলো গলায়। উপুড় হয়ে দুটা হাত এগিয়ে দিয়ে তবু সে এগিয়ে এলো হুই পা। আইটের দ্বিতীয় গুলীটা পিঠের দিকে পাঁজরে লাগতে সে পড়ে গেল বটে, কিন্তু সে গুলীটা বাজে খসচই হলো বলা চলে। কেন না, চন্মন প্রথম গুলীতেই মরতো আর অমনি করেই পড়তো।

বৃক্কের ভেতরে কলজোটা কমজোরা হয়ে এসেছিলো, তাই দেহী হলো না চন্মনের। পা দুটো স্থির হয়ে গেল বখন, তখন লক্ষ্য করা গেল যে পায়ে ওপরে গোছার মাংসপেশীটা খুব অসুস্থ ও তাজা দেখতে। পাহাড়ই হেঁটে চলে ওরকম হয়েছিল।

চন্মন উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। কিছুক্ষণ আগেকার নিম্নিত চেহারাটার সঙ্গে এখনকার চেহারাও খুব সাদৃশ্য আছে। তেমনই নিশ্চিন্ত ভঙ্গী। তেমনই শিশুর মতো নিরুদ্বেগ ভাবে মাথা তেলানো। তফাতের মধ্যে, তাজা রক্ত ডানদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটির ওপর কেনা হয়ে জমে বাঁজিলো।

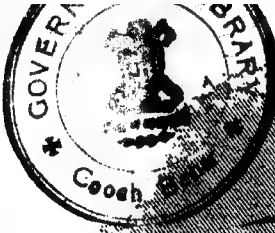
চন্মনের বাগ ও অন্তস্ত জিনিষপত্র নিয়ে আইটরা বখন বোড়ার খুঁ ফেরালো, তখন বেলো হয়েছে।

সেই পরিচিত খসিটা আর তার কাগজপত্রগুলো সামনে বিছিয়ে বিমুচ ম্যাকমোহন বসে রইলেন। যে লোকটার বিরুদ্ধে একটুকু অভিযোগ পাওয়া যায়নি, এতগুলো শত্রুর বাঁটি শেরিয়ে, নিজেরদের প্রহরীদের উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে খুদী করে যে এতদূর এসেছিলো, আর এরজন্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী যে হাসতে হাসতে কীমতে কীমতে ছুটে আসছিলো আইটের দিকে, তাকে হত্যা করার পেছনে কোন যুক্তি আছে?

তাঁর লেখা সার্টিকিটটা ছিঁড়ে গিয়েছে। তার পেছনে আঁঠা দিয়ে কাপড়ের গারে সেটা আবার সাঁটা হয়েছে। আরো কত সার্টিকিট—এই চাবিটা বুঝি সাঁকাখানার।

সেই কাগজপত্রের সামনেই মাথার টুপিটা খুলে বসে রইলেন আকবান যুদ্ধের জঙ্গী, শিশুরাি দমন করা বুঢ়া ম্যাকমোহন। মাথার চুলে আজুল চালিয়ে মাথা অঙ্গ অঙ্গ নাড়তে লাগলেন। আর হবে না। আর চলতে পারবেন না তিনি। ভেতরে কোথায় যেন কি জেঙ গেল মট করে।

একেবারে হেরে গিয়েছেন তিনি। পরাজয়ের সে কলঙ্ক কালিমা আজ তাঁকে এমন করে গ্রাস করেছে যে আর মুক্তি পাবেন না তিনি। তবে কি করবেন ম্যাকমোহন? কোথায় যাবেন? কি করবেন? প্রগটা অস্তর থেকে উঠে তাঁবুর দরজা দিয়ে অন্ধকারে ঢুকে আবার তাঁর কাছেই কিরে এল।



বিদোষিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাত

‘বিকোলীনা’র ফিরে গিয়ে আবার শুরু হল আমাদের দৈনন্দিন জীবন। সেই সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাজ্জারীতে যাউ,

দুপুরে ফিরে এসে লাঞ্চ খাউ, একটু বিশ্রাম করে বিকেলে চা খেয়ে আবার যাউ এবং সন্ধ্যাখানেক থেকে ফিরে আসি। সন্ধ্যাসেলটা মালিনের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিই কিংবা হয়ত কোনও কোনও দিন ডিনার খেয়ে দুজনে বেড়াতে বেরুই।

রবিনড্রুড গলক ক্লাবেও আগেরই মতন যাওয়া শুরু করেছি— অর্থাৎ রবিবার দিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়েই চলে যাউ, সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি যদি অবশ্য দিনটা ভাল থাকে। এ ছাড়া বুধবারের বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে যাউ যেমন আগেও যেতাম। কিন্তু এবার অতি সহজেই লক্ষ্য কবলাম, মালিনের ক্লাবে যাওয়ার আগ্রহ আর একবারেই নাই। নানান ছুতোয় ক্লাবে যাওয়াটা কাটিয়ে দিতে পারলেই সে যেন বাঁচে।

শুধু তাই নয়, এটাও লক্ষ্য করতে আমার দেবী ভাল না যে, জীবনযাত্রায় মালিনের মনের সেই আনন্দ ভরা উৎসাহ মালিন যেন এবার হারিয়ে ফেলেছে। সবই করে, কাকতাল্য স্থানিগুণ ভাবে করে যায়, আমারও সেবা যন্ত্রের ত্রুটি এতটুকু হরার উপায় নাই—তবুও কেমন যেন উদাসীন অনমনস্ক ভাব আগের সে প্রাণের সাদা যেন ঠিক পাইনা। এ নিয়ে কিছু যে ভাবিনি তা নয়। সেই লুর শেষের দিক থেকেই মালিনের মনের এই পরিবর্তনটি শুরু হয়েছে, ভেবেছিলাম সেলে ফিরে গিয়ে দৈনন্দিন জীবন শুরু হলে সব হবে কেটে কিছু কটল না তা। মনে নানা প্রশ্ন ভাগে। আমাকে কি আর তেমন ভাল লাগছে না? যে ‘লু’তে প্রথম জীবনে মালিন আমাকে নিয়ে মজাগুলি হয়ে তৃপ্ত হয়ে ছিল সেই ‘লু’তে এবার গিয়ে কি মালিন আবিষ্কার করল—আমার মধ্যে সে জিনিস আর নাই? তাই কি মালিন মুখড়ে পড়েছিল? তারপর ডাউনহুয়ে রোলাৎকে দেখে মালিন কি বুঝতে পেরেছিল যে সে জীবনে ভুল করেছে সহজ ও আনন্দময় পথটি সে হারিয়েছে তেলে জলে বিশ খায় না? এ সব কথা যদিও মনে ওঠে কিন্তু হুম-এ সব কথা মনেতে রাজী নয়। তাই নানান দিক দিয়ে মনকে

বোঝাই। কিন্তু মালিনের এই ভাবান্তরের সম্ভাবজনক কারণ কিছু খুঁজে পাইনি।

ফিরে আসার পর মাসখানেক পৃথাক্ত মালিনের বখন এই ভাবটি চলল—কটল না—তখন একদিন রাতে খাওয়াশাওয়ার পর মালিনকে সোজা প্রশ্ন কবলাম। খেয়ে-দেয়ে কক্ষ নিয়ে আমরা দুজনে লাউঞ্জে বসেছিলাম—মালিন বসেছিল আমারই কোচের হাতলের উপরে, যে রকম বসতে মালিন ভালবাসত।

ডাকলাম, লীনা।

উত্তর দিল, উঁ।

বললাম, তোমাকে একটা প্রশ্ন করব?

বলল, কি?

ডাকলাম, তোমার কি হয়েছে?

বলল, কৈ—কিছুই না তা!

বললাম, আমার কাছে লুকিও না লীনা! আমার কি চোখ নেই? আমি কি দেখতে পাই না যে তোমার সেই আগের আনন্দময় সহজ ভাবটা আর নাই। কেন হাবাল?

চুপ করে রইল। কোনও কথা বলল না। পিঠের নীচে হাত দিয়ে একটু কাছে টেনে নিলাম। বললাম লীনা! আমাকে বল, আমার কাছে কোনও আড়াল রেখ না।

হাতলের উপর থেকে নেমে এসে মুখটি ঝলঝল আমার বুকের উপরে। চুপ করেই রইল। শুধু পড়ল একটি প্রশ্নচালা দীর্ঘশ্বাস।

স্নেহে বললাম, লীনা! বলবে না?

হঠাৎ চোখ দিয়ে জল গাড়িয়ে পড়তে শুরু করল—সহজেই বুঝতে পারলাম।

আদর করে শুধালুম, লীনা! কি হয়েছে তোমার?

চাপাগলায় ধীরে ধীরে বলল, বিকে! বিকে! আমাকে ভাল বুঝ না। জীবনটা বড় নিষ্ঠুর।

হাই হোক, বতব্বর মনে পড়ে বোধ হয় মাস দেড়েক পরে মালিনের ও-ভাবটি আঙে আঙে গেল কেটে। আবার যেন ফিরে

এল সেই প্রাণটালি সহজ প্রসূত। আসারও বন-কন্যে-স্বীতে
টান তরে। মনকে বোকালাই—মেয়েদের মতই বাসে—অবশ্য
মানসিক ভাবান্তর একটু আটু-বাটু, ওটা গুদের স্বভাবতঃ।

আরও প্রায় হাস্যধাতিক কাটার পর হাসিন একদিন আমাকে
বলল, দেখ, লালকাকাদের খবর অনেক দিন পাই না—একটা খবর
নিলে হয়।

বললাম, ঠিকই ত। ক্লাবেও আর তাদের দেখি না।

হাসিন বলল, ক্লাবে যায় না—সেটা বোকা যায়।

গুণালাম, কেন?

বলল, সবাই ত সব জানে—গ্রেসের লজ্জাটা বোধ হয় এখনও
কাটেনি।

বললাম, কেন, গ্রেসের শরীর খারাপ হওয়ার রকম কর্তৃত্বালে
সমুদ্রতীরে ছিল—এই বকমই ত রং হয়েছ তুনেছি।

হাসিন যুহু হেসে বলল, লোকে সেটা জল্পতার খাতিরে মুখে
সেলে নিলেও অন্তরে মানে নি। লোক অত বোকা নয়।

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে এই কথা হল এবং সেই দিনই
সন্ধ্যাবেলা ডিনারের পরে লালকাকাকে টেলিফোন করলাম।
লালকাকাই টেলিফোন ধরলেন। গুডমুণ্ডাবাদির পর গুণালাম,
কেমন আছেন আপনারা সব? অনেক দিন আপনাদের খবর
পাই না।

লালকাকা গুণালেন, আপনারা কবে কিরে এলেন? কোন
খবর পাইনি তো?

বললাম, অনেক দিন কিরছি। তা আপনারাও তো আর
ক্লাবেও দেখতে পাই না।

লালকাকা বললেন, আমাদের খবর খুব ভাল নয়।

গুণালাম, কি হোল?

বললেন, গ্রেসের শরীর খুব খারাপ—একবারে শয্যাশায়ী।

গুণালাম, কি রকম?

বললেন, বক্তৃতা, সঙ্গে ছা চলেছে। কি জানি কি হবে।

গুণালাম, কোথায় সে—হাসপাতালে?

বললেন, না বাড়ীতেই আছেন। বাড়ীতেই সব ব্যবস্থা করেছি।

বললাম, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তা আমার স্ত্রী গিরে একদিন
টীক দেখে আসতে পারেন?

একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, আপনার স্ত্রীর বিশেষ করুণা-
তবে আপাততঃ গ্রেসের সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না।
যে, ডাক্তারকে ভিজ়াসা করব।

বললাম, তবে থাক, কিছুকিন পরেই না হয় যাবেন।

বললেন, তা আপনি একদিন যদি দয়া করে আমার সঙ্গে দেখা
করতে আসেন তো বড়ই সুখী হবো।

বললাম, নিশ্চয়ই যাব। দু-চার দিনের মধ্যেই যাব।

বললেন, বিশেষ স্বস্তি যাবে।

টেলিফোন শেষ হোল। হাসিনকে সব বললাম। একটু চুপ
করে থেকে হাসিন বলল, বেচারী গ্রেস! মন্দের প্রানিটা
ফাটিয়ে উঠতে পারল না।

গুণালাম, ও কথা বলা কেন?

বলল, আমি তো বরাবরই বলেছি গ্রেস মেয়েটাকে, কখনো

কখনো একবার বা করে কেনেছে, তার প্রানিকে নিজেই কর
হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, সে সব তো মিটে গেছে।

যুহু হেসে বলল, মেয়েদের মনে অত সহজে মিটে যায় না।

বিশেষতঃ অত বড় প্রানি।

দু-তিন দিন বাদে একদিন সন্ধ্যার পরে লালকাকাদের বাড়ী
গেলাম। লালকাকা বাড়ীতেই ছিলেন—গোতলায় বসবার করে
আমাকে নিয়ে বসলেন। লালকাকার চেহারা দেখে অবাক হলাম—
কি বিজী চেহারা হয়ে গেছে তাঁর। মুখটা বেন গেছে ভেঙ্গে। শু-
তাই নয়, মুখটা বড় মলিন ও ক্যাকাশে মনে হোল।

গুণালাম, তা আপনি ভাল আছেন তো?

বললেন, আমি ভালই আছি।

গুণালাম, মিসেস লালকাকা এখন কেমন?

বললেন, শরীট চলেছে, তবে একটু কমেই দিকে।

গুণালাম, তা হাসপাতালে রাখলে ভাল হোত না কি?

ছইন্সর গ্রামে চুপ দিয়ে বললেন, হাসপাতালে ছিলেন বেশ
কিছুদিন। বিশেষ কিছু উপকার হচ্ছিল না। তারপর নিজেই
অস্থির হয়ে উঠেন বাড়ী ফেরার জন্য। এখানে আমি সব বন্দোবস্ত
করেছি। হুবেলা ডাক্তার এসে দেখে যার এবং জম্বাড়া দিন-রাত
নার্সের ব্যবস্থার আছে।

বললাম, হ্যাঁ। মনে প্রায়শ্চিন্তাটা দরকার।

বললেন, বাড়ীতে এসে সেদিক দিয়ে উপকাঠই হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে গুণালাম, তা আপনার সঙ্গে দেখা হয়তো?
বললেন, হ্যাঁ। বোজাই দু-তিনবার দেখে আসি। তবে বেশী
কথা বলি না।

গুণালাম, কথাবার্তা বলা কি এখনও বাধ্য?

বললেন, বেশী কথা না বলাই ভাল। তবে কথা বলতে চান—

একটু চুপ করে থেকে যুহু হেসে বললেন, আমি গেলে বক্তৃতা খুসী
হয়ে ওঠেন।

বললাম, তা তো হবেনই। থাক, আশা করি শীঘ্রই সেয়ে
উঠবেন।

বললেন, ডাক্তাররা তো বলেন—এবার ভালর দিকে যাচ্ছে।

গুণালাম বক্তৃতা দিচ্ছে না ডাক্তাররা?

বললেন, হ্যাঁ—মারের মারের এখনও চলেছে।

গুণালাম, বক্তৃতা কোথা থেকে আনান?

বললেন, আমিই বক্তৃতা দিচ্ছি।

একটু অবাক হয়ে গুণালাম, আপনি?

বললেন, হ্যাঁ।

প্রত্যক্ষ বৃত্তে পারলাম, লালকাকার শরীর ভরকম হয়েছ
কেন—যুথের চেহারা কেন এত ক্যাকাশে। বললাম, কিন্তু আপনার
পক্ষে বীতিমত বক্তৃতা দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? আপনার শরীর
খারাপ হয়ে যাবে না।

বললেন, না আমার কিছু হবে না।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তা বক্তৃতা কেন কিংবা
হোত?

লালিকাকা বললেন, বাইরের রক্তের প্রতি আমার তেমন আস্থা নাই, আর তাছাড়া—খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ছেলেমানুষের মত মুহূর্তে হেসে ধীরে ধীরে বললেন, আমি নিজে রক্ত দিচ্ছি, গ্রেসের মনটা তো খুসী হবে।

তারপর কথাবার্তা অল্প দিকে গেল এবং নানা কথাবার্তার খানিকটা সমরুণ কাটল।

বিদায় নেওয়ার সময় বললাম, আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন মিসেস লালিকাকাকে দেবেন।

বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। একটু স্নহ হয়ে উঠলেই আমি টেলিফোনে খবর দেবো। মিসেস চৌধুরী দয়া করে এসে যেন একবার দেখে যান।

নিশ্চয়ই আসবেন, বলে বিদায় নিলাম।

• • • • •

বাড়ী ফিরে এসে মালিনকে সমস্ত কথা বিস্তারিত বললাম। মালিন একটু চুপ করে থেকে বলল, গ্রেসের মনের দ্রানি যদি কাটে তো সে শুধু মিষ্টার লালিকাকার ভক্তই।

বললাম, যা বলেছ, মিষ্টার লালিকাকা গ্রেসকে কি ভালই বাসেন।

বলল, শুধু ভালবাসাই নয়, গ্রেসের প্রতি বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জন্যই গ্রেস নিজের মনে জোর পাবে। আবার স্নহ হয়ে উঠবে গ্রেসের মন।

বললাম, সত্যিই, কেমন ছেলেমানুষের মত বললেন—আমাকে দেখলে বড্ড খুসী হয়ে ওঠে—তাতে নিজে কি খুসী।

মালিন বলল, এই বিশ্বাসটুকু যে মেয়েদের মনে কত বড় সম্বল—তোমরা পুরুষ, তোমরা তা ঠিক ধারণা করতে পার না।

বললাম, হয় তো তাই কিন্তু মেয়ে খাটি হলে পুরুষের মনে বিশ্বাস তো আপনাকে কেই গড়ে ওঠে।

বলল, তা হয় তো ওঠে—কিন্তু জীবনের বড়-বড়ার মধ্যে সেটাকে অটুট রাখা, সকলে সব সময় পারে না।

শুধালাম, তা কেন বলছ লীনা! জীবনে বাই খটক, মেয়ে যদি খাটি থাকে তবে পুরুষের বিশ্বাস ভাঙবে কেন?

মুহূর্তে শুধাল, গ্রেসকে কি তুমি খাটি মেয়ে বলবে?

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, তা খাটিই বলতে হবে বৈ কি। তুমিই তো বল—গ্রেস মেয়ে ভাল, জীবনে একটা ভুল করে বসেছে।

শুধালো, কিন্তু এত বড় ভুল করার পরে তার প্রতি বিশ্বাস রাখা কি সকলের পক্ষে সম্ভব হোত?

বললাম, তা অবশ্য—সেইখানে লালিকাকার বিশেষ মানতেই হবে।

বলল, তাই তো বলি—লালিকাকার এই বিশেষত্বটুকু আছে ফলেই গ্রেস হয়তো বিচে বাবে। নইলে বাঁচত না। কেন না সে লভ্যই খাটি মেয়ে।

আবার একটু হুই বৃদ্ধি এলো। বললাম, এই দিক দিয়ে গ্রেসের বগভটা তোমার চেয়ে অনেক ভাল—এ কথা ললীকার করার উপায় নেই।

বুড়-বুড়ীস রক্তক্ষণ উত্তর দিল, দ্রানি না।

কথাগাম, কেন?

বলল, তোমার আমার প্রতি ভালবাসা কি লালিকাকার গ্রেসের প্রতি ভালবাসার চেয়ে কোন অংশে কম?

বললাম, ভালবাসার কথা তো হচ্ছে না লীনা! বিশ্বাসের কথা।

বলল, ভালবাসা গভীর হলে বিশ্বাস সহজে হারায় না। খাটি ভালবাসার ফলেই যে বিশ্বাস।

শুধালাম, কিন্তু বড়-বড়ার এলে?

বলল, যে খাটির শিকড় খাটির গভীরে বাসা নিয়েছে—সে গাছ সহজে পড়ে না।

একটু চুপ করে থেকে মুহূর্তে হেসে বললাম, তা বলতে পারি না। আমার মন লালিকাকার মত অত উদার তো নয়।

একটু চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, যদি কোনদিন তা হয় তো বুঝে মাটির দোষ, পাচের নয়—বুঝবে দৈব আমার মনে, তাই তোমার বিশ্বাস হারিয়েছি। তোমাকে দোষ দেব না।

বললাম, লালিকাকার বিশ্বাস যদি আজ অটুট না থাকত—গ্রেস হয় তো সেই কথাই ভাবত।

বলল, হয় তো তাই, কিন্তু গ্রেস তাহলে বাঁচত না।

একটু চুপ করে থেকে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, বিকো! যদি কোনদিন তোমার বিশ্বাস হারায়—আমিও বাঁচবো না।

কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললাম লীনা! লীনা! আমি যে তোমার উপর কতখানি নির্ভর করি তা তো জান। তোমার প্রতি বিশ্বাস হারালে আমিও যে তলিয়ে যাব।

• • • • •

আরও প্রায় মাস দুই পরের কথা। একদিন সন্ধ্যার পরে আমরা লাউঞ্জে বসে আছি—হঠাৎ লালিকাকার টেলিফোন বাজল। ভক্ত সম্ভাবনার পর লালিকাকা শুধালেন, আপনারা ভাল আছেন ত?

বললাম, হ্যাঁ। মিসেস লালিকাকা?

বললেন, ভালই আছেন। অনেকটা স্নহ হয়ে উঠছেন। এখন আর শয্যাশায়ী নন।

বললাম, আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বললেন, গ্রেসের একান্ত ইচ্ছা—মিসেস চৌধুরী যদি একদিন তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করেন। গ্রেসের এখনও ঠিক বাইরে বাওয়ার মতন অবস্থা হয়নি।

বললাম, নিশ্চয়ই যাবেন। একদিন পাঠিয়ে দেব।

বললেন, আপনিও ত আসবেন?

বললাম, আচ্ছা—কবে যাব, টেলিফোন করে খবর দেব।

বললেন, খেঁচি ঘেরী করবেন না। গ্রেস প্রায় বোজাই মিসেস চৌধুরীর কথা বলে।

পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে টেলিফোন শেষ হল। মালিনকে বললাম। মালিন যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাল। বলল, চল শীঘ্রই একদিন বাওয়া যাক।

দিনটা শুক্রবার ছিল। ঠিক হল—পরের বুধবার বিকালটা শু আমায় ছুটা, বুধবার আর ক্রাবে যাব না, বিকেলে চা খেয়েই গঙ্গার বাড়ী বাওয়া যাবে। সোমবার টেলিফোন করে লালিকাকাকে দেখা জানিয়ে দিলার।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

— তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা



আমাদের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়।
মিষ্ণু তার পুতুলের জন্য সফলভাবে সুন্দর জামাকাপড়
যোগাড় করে। মিষ্ণু তার সিলিং জামা নেয়, ওর
মার শাকী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড়
তো আছেই। আর সব জামাকাপড় আর একটু সান-
লাইটে দিয়ে কাচা—কিন্তু কি ধপধপে ফস! আর বক
ককে রঙীন।

জামাকাপড় তোরলে আর চামরগুলোর বিকে দেখুন।
অন্ত সব কাপড় কাচতে আরই একটু সানলাইটে লেগেছে।
সানলাইটের সেরে মত প্রচুর ফেনার অনেক কাপড় কাচা
যায়, আর আছড়মায় দরকার হয়না। আপনাদের কাপড়
কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

বুঝার বিকলে বঁধাসহরে লালকাকার বাকী গিয়ে হাজির হল। লালকাকার অভ্যর্থনা করে আমাদের উপরে বসবার ব্যবস্থা নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি, গ্রেস সখানে একটি কোচের উপর বসে আছে। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। গ্রেসের দিকে চেয়ে দেখলাম—চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পূর্ণ স্বাস্থ্য ক্রমে যে কিংবদন্তি, মুখের চেহারার দেখে সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই রইল না। মালিন ও গ্রেস-এরদের বীতি অস্বাভাবিক পরস্পরকে জড়িয়ে চুমো খেল।

গ্রেস বলল। 'বললাম' বাঃ। আপনাকে আবার সুস্থ দেখে কী আনন্দই না হচ্ছে।

গ্রেস বলল, বিশেষ ধন্যবাদ। আপনারা ত চিরকালই আমার জ্ঞাতাশ্রী।

মালিনকে নিয়ে গিয়ে গ্রেস নিজের পাশে বসল। কথাবার্তা চলল। পানীর এল। লালকাকা হুইকি নিয়ে বসলেন। আমি হুইকি খাই না—আমাকে দিলেন একটি পেরী। গ্রেস ও মালিনের জন্ত চা এল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর মিঃ লালকাকা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন ত আমি একবার নীচে মোকানে বাই—একটু কাজ আছে।

গ্রেস বলল, হ্যাঁ বাও, আমি এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি।

আমি বললাম, তা আমাদেরও ত এবার উঠলে হয়। বেশীক্ষণ আপনাকে—

গ্রেস তাড়াতাড়ি বলল না—না। কত দিন পরে আপনাদের পেরেছি—আপনাদের সহজে ছাড়ছি না।

বললাম, তা আপনারা না হয় দুই বছরে কথাবার্তা বলুন—আমি একটু ঘুরে আসি।

আমার যে বিশেষ কিছু কাজ ছিল বা কোথাও বাওয়ার কথা ছিল—এমন নয়। কিন্তু মনে হল—গ্রেস হয় ত তার বর্তমান মনোভাবের দিক গিয়ে মালিনের সঙ্গে সরল ভাবে আলোচনা করতে চায়, আমি থাকলে বাধাই হবে।

বুহু হেসে গ্রেস বলল, আপনিও বসুন, আমাদের এমন কিছু গোপনীয় কথা নেই যা আপনাদের সামনে বলা চলে না।

বললাম, শুনে সুখী হল।

গ্রেস বলল, সত্যি, আপনাদের কাছে আমি যে কি কষ্ট, ভাবায় ফলে কোনও লাভ নেই। আপনাদের হৃৎ জনকেই আমি আমার একান্ত আপনায় বলে মনে করি।

বললাম, সেটা আপনাই মনের গুণ।

মালিনের কাঁধে হাত দিয়ে মালিনকে একটু বেন কাছে টেনে নিয়ে সোজা আমার দিকে চেয়ে গ্রেস বলল, ডাঃ চাইতুমু। আপনাদের জী একটি রহস্য।

মালিন কথাটা হাফা করে দিয়ে হেসে বলল, তোমার কাছ থেকে এই প্রশংসাপত্র পাওয়ার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ গ্রেস।

সে কথাই কান না দিয়ে গভীর ভাবে গ্রেস বলে বেতে লাগল, আমি ত এরকম মেয়ে দেখিনি এক অভিশপ্তের কথা বলতে পারি না, আমার বিশ্বাস, এরকম মেয়ে ইল্যান্ডে—

কথা ধামিয়ে দিয়ে মালিন বলল, হুপ হুপ। বেশী কথা না।

(আমার দিকে গ্রেসে বুহু হেসে) ঠিক অহঙ্কার বেশী বাড়লে আমি হয়ত পেরটা সামলাতে পারব না।

গ্রেস বেন নিজের মনেই বলে বেতে লাগল : সোজা কথা, মালিন আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। বাঁচিয়ে দিল আমাকে। এখন আমি ভাবি আর অবাক হই। মালিন আমার জীবনে না গিয়ে পড়লে আমি ত এ্যাসটন লজই প্রাণ দিতাম। তৈরীও ত হয়েছিল তার জন্য।

মালিন বলল, মাছুষ জীবনে ভুল করেই ভাই। ভুলটা অনেক সময় বুঝতে পারে না। ভাই বুঝিয়ে দিলে—যে বীটা মাছুষ, সে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে।

গ্রেস বলল, শুধু কি ভুল? তুমি যে আমার চোখ খুলে দিয়েছ।

মালিন বলল, সেটা তোমারই গুণ। আমার আর কতটুকুই বা শক্তি।

গ্রেস আমার বেন নিজের মনেই বলে বেতে লাগল, কি অদ্ভুত ছিল। ঠিক এক বছর ভালবাসা একেবারে বুঝতে পারিনি। জানি মালিন, আমার অন্তঃকরণ বাড়াবাড়ি উনি কিছু খেতেন না, খেতে পারতেন না, টেবিলে বসে অনেক সময় কিছু বুঝে না দিয়েই উঠে পড়তেন, আমি সবই ত খবর পেয়েছি। মাঝে মাঝে এসে আমার পাশে দাঁড়াতে—কি কাতর মনোভাব চাহনি। এ চাহনি তো আগে চিনতে পারিনি।

মালিন বলল, সেইখানেই তো জীবনের নিষ্ঠুর লীলা। তুমি তো ভবু শেষ পর্যন্ত চিনতে পেরেছ—বঁচে গেলে। অনেক সময়ে এ জীবনে চেনা আর হয়ই না—সর্বনাশ ঘটে।

মালিনের হাতখানা ধরে গ্রেস বলল, তা তুমিই তো চিনিয়েছ ভাই।

মালিন কি বেন একটা বলতে বাচ্ছিল, মালিনের মুখের কথা ধামিয়ে দিয়ে গ্রেসকে বললাম, আপনি ঠকে আর অস্ত বাড়াবেন না। ঠিক অহঙ্কার বেশী বাড়লে আমি আর হয়ত ঠকে সামলাতে পারব না।

আমার কথা শুনে মালিন ও গ্রেস দুজনেই হেসে উঠল।

গ্রেস মালিনকে বলল, কেমন? তোমার কথার পাণ্ডা জবাব পেলে ত?

মালিন বলল, আমার অহঙ্কার যদি বাড়ি আমি নিজেই নিজেকে সন্মুখাতে পারব—ঠিকে সামলাতে হবে না।

আমি বললাম, আমিও পাচ্ছি।

মালিন বুহু হেসে মাথা হুলিয়ে বলল, একেবারেই না। (গ্রেসের প্রতি) জানি ভাই, মনটা একেবারে জেল্লায় যের মতন—এই কান্না, এই হাসি।

হেসে গ্রেস বলল, তার জন্য ভাই তুমিই দায়ী। ঠকে বাড়তে দিলে না, জঁয়াল দিয়ে আড়াল করেই চিরদিন রাখলে।

মালিন বলল, ঠিক তা নয়—ঠিক কথাই যে এই। ভাই ত ঠকে সব সময় বাঁচিয়ে চলেতে হয়।

আমার দিকে চেয়ে গ্রেস বলল, আপনি সত্যিই ভাগ্যবান।

হেসে বললাম, আপনাদের কথার ত প্রতিবাদ করতে পারি না—যেনই নিলাম।

মালিনের কথাটা নিয়ে মনটা একটু অস্বস্তি হয়ে গেল।

বলা। আমার জীবনের প্রথম পর্বে তোমাকে নিষেধিতাম—
আমার মনটা একটা হালকা বেলুনের মতন, সামান্য হাওয়াতেই
আকাশে ওড়ে আবার একটু আঘাত পেতে না পেতে চূপসে
মাটিতে পড়ে যায়। মার্লিনের কথাই সেই কথাটা মনে পড়ে গেল।
কথাটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম—সত্যিই ত, এত শু মদিন ডাটমুরে
বোলাগুরু দেখে মনটা যেন কেমন চূপসে গিয়েছিল। কেন?

ইতিমধ্যে মার্লিন ও গ্রেসের কথাবার্তা চলছিল। অন্তরমনে
হওয়ার দরুন হরত কিছুটা আমার কানে যায়নি। চঠাং গ্রেসের
কথা কানে এল। গ্রেস বলছে আমি ব করেছি ভাই, জীবনের
শেষ দিন পর্যন্ত এর জন্য আমাকে প্রারম্ভিত করতে হবে।

মার্লিন বলল, ভয় পেও না। মি: লালকাঁকা নিজেই তোমার
প্রায়শ্চিত্ত সাজ করে দেবেন।

গ্রেস বলল, হয়ত ভাই। কিন্তু আমি কেমন করে ভুলব?

চঠাং গ্রেসের দৃশ্য যেন ভেঙে গেল। চূপ করে চোখে ক্রমাল
দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

মার্লিন গ্রেসকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলল, গ্রেস! ডার্লিং!
ভুলে যেও না তুমি ভাগ্যবতী, মি: লালকাঁকার প্রেমে উত্তেজনা না
ধাকলেও গভীর বিশ্রাম আছে। সেই বিশ্রামের সন্ধান যখন একবার
পেরেছ, তুমি এক দিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে—এ কথা জোর করে
বলতে পার।

বাড়ী ফিরে এসে সেই দিনই রাতে বিছানার শুয়ে মার্লিনের
সঙ্গে আমার বৈতন্য কথাবার্তা হোল—সেইটুকু বলে রাখি।

মার্লিনকে শুধালাম, আচ্ছা লীনা! সত্যিই কি আমার মনটা
হেলেনাহুয়ের মতন?

হেসে মার্লিন বলল, কথাটা মনে লেগেছে বুঝি?

বললাম, না—না। তোমার কথাটা নিয়ে ভাবছি।

একটু চূপ করে থেকে মার্লিন বলল, বিকে। অল্পতেই তুমি
অভিভূত হও এবং অল্পতেই খুশী হয়ে ওঠ—ভাই ত তুমি এত মিষ্টি।
আবার সেইখানেই তোমাকে নিয়ে আমার ভয়।

শুধালাম, ভয় কেন?

বললাম, কিছুই ত বলা যায় না—জীবনে যদি বড় কিছু ঘট
তুমি যে নিজেকে সামলাতে পারবে না।

হেসে বললাম, কেন? তুমি আছ।

বলল, আমি বত দিন আছি—তোমার পায়ে কাঁটার আঁচ
লাগতে দেব না। কিন্তু—

বললাম, আমার কিছু কি?

বলল, আমি যদি না থাকি—

বললাম, না—না লীনা!—ও কথা বলতে নেই, ও কথা ভাবতে
নেই।

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলল, জীবনকে যে মোটেই বিশ্বাস
নাই বিকে।

সত্যিই—ভবে দেখলাম, আমি মার্লিনের উপর কি বকম নির্ভর
করি। মন কোনও কারণে অভিভূত হলে মার্লিনের সহোই পাই
বিশ্রাম এবং মন কোনও কারণে উৎফুল্ল হয়ে উঠলে বতকণ মার্লিনের

শীতের দিনে-ও

ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন
আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

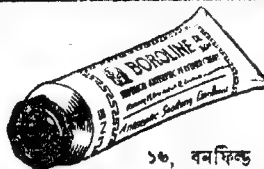
শীতের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে ত্বক-কে
সৌন্দর্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ফল
ক্রম। নিয়মিত ব্যবহারে, শুষ্ক ত্বক-যুক্ত, হ্রাসিত
বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, সস্পর্শ ও
সজীব করে তুলবে আর আপনার অন্তর্গত ত্বক-কে
সৌন্দর্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্ন
নিজেকে রূপোচ্চল করুন।



বোরোলীন

পশ্চিম প্রসাধন

পরিবেশক : জি. দত্ত এণ্ড কোং



বোরোলীনে—ল্যানোলিন আছে বলে
শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও
চৌকিটার হাত থেকে রক্ষা করে আর
ত্বক-কে শুষ্ক-ও রাখা যাবে।



১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১

মধ্যে তার সড়া না পাই, আমার মনের খেঁচা কুন্ঠিত হয় না। জীবনের প্রত্যেক কাজে এমন কি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও মালিনের সঙ্গে আমার পরামর্শ করা চাই-ই এবং মালিনের সঙ্গে একমত হলেই আমার মনটা খুশী হয়। শুধু তাই নয়, ক্রমে এমন হল, জীবনের সব ব্যাপারেই শেষ সিদ্ধান্তের ভার মালিনের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি যেন বেহাই পাই।

একটা উদাহরণ নিই। সাম্রাজ্যীতে আমার এক সেক্রেটারী ছিলেন—মিস হলওয়েল, জানই ত। তাঁর শরীর ইলানী অসুস্থ হওয়াতে তিনি কাজে ইস্তফা দিলেন। এক মাস সময় মিলেন আমাকে অল্প সেক্রেটারী খুঁজে নেওয়ায় জন্ম। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম এবং বধ্যাসময়ে অনেকগুলি দরখাস্ত এল আমার কাছে—অবশ্য সবই মেয়ে—কেন না এ সব কাজ এদেশে শৈশব ভাগ দেয়তাই। দরখাস্তর সঙ্গে ফটোও অনেকে পাঠাল—কেন না, বিজ্ঞাপনে বলে দিয়েছিলাম ফটো পাঠাবার জ্ঞ।

দেখে শুনে তার মধ্যে চারটিই মনোনিবেশ করলাম। কিন্তু এর মধ্যে কোনটিকে যে গ্রহণ করব ঠিক করতে না পেরে ভাবলাম, মালিনের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে।

বধ্যাসময়ে মালিনের সঙ্গে কথা হল। মালিনকে ফটো সমেত দরখাস্ত চারটি দিয়ে শুধালাম লীনা! বল ত, এর মধ্যে কোনটিকে নিই?

মালিন দরখাস্ত চারটি একটু দেখে নিয়ে একটি মেয়ের ফটো আমাকে দেখিয়ে বলল, বা—এ মেয়েটির মুখখানি ত বড় সুন্দর! বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু ওর কাজের অভিজ্ঞতা তেমন নাই।

একটু চূপ করে থেকে মালিন বলল, তা হোক, তোমার কাজ নিখে নিতে আর কতকণ লাগবে। অমন সুন্দর মেয়ে—চোখে বুদ্ধির সীপ্তিও রয়েছে।

হেল শুধালাম, অমন মেয়েকে সর্বক্ষণ আমার পাশে রাখতে তোমার হিসেব হবে না?

শুধাল, কেন?

বললাম, যদি আমি হাতছাড়া হয়ে যাই?

বুহু হেসে বলল, আমার বাঁধন কি এতই আলগা? আর তাছাড়া তোমাকে সন্দেহ করলেই যে তোমাকে ছোট করা হল—তাতে ত আমারই লোকসান। আমারই ত মনে লাগবে।

বললাম, লীনা। প্রেস ঠিকই বলেছে—সত্যি তোমার তুলনা নেই।

মালিন দরখাস্ত চারখানি আর একবার ভাল করে দেখে আর একটা ফটো আমাকে দেখিয়ে বলল, এ মেয়েটিও মন্দ নয়, কাজে অভিজ্ঞতাও আছে দেখছি, তবে—

আমিও মনে মনে এই মেয়েটির কথাই ভেবেছিলাম। মেয়েটি দেখতেও ভাল, কাজও মোটামুটি জানে এবং বাড়ী ম্যানচেষ্টারের কাছাকাছি প্রেষ্টন (Preston)

বললাম, আমি ত এই মেয়েটিকে রাখার কথাই ভাবছিলাম।

মেয়েটির ফটোর দিকে খানিকক্ষণ একবারে তাকিয়ে মালিন বলল, তবে মেয়েটির চোখে একটা চাপা হুইনী আছে।

ফটোটি হাতে নিয়ে কঠোর দিকে তাকিয়ে বললাম, কৈ—বেশ ত শাপ হুইনী বড় বড় চোখ।

মালিন হেসে বলল, ওটা বাইরের। বাই হোক, কাজ জানে—ওকেই রাখ।

আমার মনও সায় দিল এবং তাই ঠিক হল।

মালিন বলল, তবে পাকা করার আগে এতবার ডেকে পাঠিয়ে কথা বলে নিও।

বললাম ত তা বটেই। কালই আমার সঙ্গে এসে দেখা করার জন্ত চিঠি পাঠাব।

একটু পরে মূহু হেসে মালিন বলল, হুইনী চেহারার না হলে আমি তোমাকে রাখতে দিতাম না।

শুধালাম, কেন?

বলল, হুইনী চেহারা হলে তুমি কাজে অনুপ্রেরণা পাবে।

হেসে বললাম, ওটা যেন হিসেব কথা হল।

বলল, হিসেব কথা মোটেই নয়। কথাটা কি জান—তোমাকে সর্বদিক দিয়ে সুস্থ ও নিপুণ রাখতে হলে, তোমার বা ধোঁবাক তোমাকে সব সময়েই দিতে হবে ত?

বললাম, আমার মনেও ধোঁবাকের জন্ত সুন্দরী সেক্রেটারীর দরকার নাই। তোমাকে নিয়েই আমার মন ভরপুর।

বলল, তা ত জানি। তাই ত সুন্দরী সেক্রেটারীতে আমি ভর পাই না। বরং—

চূপ করে গেল।

শুধালাম, বরং কি—খুলে বল লীনা!

মাথা ঈষৎ নচু করে সজ্জ দৃষ্টিতে মূহু হেসে আমার দিকে চেয়ে বলল, বরং কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে তাৎক্ষণিক দিকে চাইলে আমাকেই মনে পড়বে।

আবও প্রায় বছর দুই কেটে গেল। যত দূর মনে পড়ে—এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ঘটেনি। আমাদের জীবন-প্রবাহ তার সাবলীল গতিতে অনায়াসে চলাছিল—কোনও দিকে কোনও বাধার সৃষ্টি হয়নি।

তারপর এল মেঘ। 'লু'তে মালিনের একটা কথা মনে পড়ে—ঠিকই বলেছিল—মামুষের ভাগ্যবিধাতা যে হস্তাক, জীবনে পূর্ণিপূর্ণ শান্তি তিনি সইতে পারেন না। বাই হোক, সে-সব কথা পরে বলব। ইতিমধ্যে একটি ছোট ব্যাপার বলি।

মালিনের সঙ্গে সেক্রেটারী রাখার বিষয় আলোচনা হওয়ার প্রায় বছরখানেক পরের কথা। একদিন সাম্রাজ্যীতে সকালের কাজওধুঁ সরে বেলা প্রায় ১টার সময় ফিরে এসাম বাড়ীতে—লাঞ্চ খাওয়ার জন্ত। মালিন টেবিলে লাক সাজিয়ে তৈরি হয়েছিল। গিয়ে হাতটা ধুয়ে খেতে বসলাম।

মালিন বলল, সার আর্থার এসেছিলেন।

শুধালাম, সার আর্থার?

বুহু স্বরে মালিন বলল, বোলাঙ।

মনটা যেন একটু চমকে উঠল। শুধালাম, বোলাঙ হঠাৎ?

বলল, তিনি, কি কাজে ম্যানচেষ্টার এসেছেন। এক কাক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

বললাম, তা আমার ওখানে সাম্রাজ্যীতে পাঠিয়ে দিলে না কেন? কিংবা একটা কোন করে আমাকে বর দিলেই হত?

বলল, আজ তাঁর বেশী সময় ছিল না। তাই কালকে তাঁকে লাক্কে বসেছি। তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

বেশ, বলে চুপ করে গেলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে—মনটা বিশেষ খুশী হল না। বোলাও আবার কেন? আমাদের জঁ বনে না এসেই বেন ভাল হত। পনের দিন সাংসারীতে কাজকর্ম যে একটু তাড়াতাড়ি সেবে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম—আজও মনে আছে। বোলাওর প্রতি ভরসা দেখাবার জন্য আমার আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরে যাওয়ার দরকার—সেইজন্য কি? কিংবা মালিন ও বোলাও বাড়ীতে একলা আমি নাই—ভাবতে আমার কি ঠিক ভাল লাগছিল না? তাই কি তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেবে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম? মালিনের মতন মেয়ের সঙ্গে এত দিন ঘর করার পরেও কি এ দৈব আমার মনের কাঁটেনি? বাই তোকে, ১টার অনেক আগেই বাড়ীতে ফিরে গেলাম। দেখলাম—বোলাও আসেনি, মালিন একলাই বাড়ীতে রয়েছে। মনটা কি হাঙ্কা হয়ে উঠল!

হেসে মালিনকে বললাম, কৈ, সার আর্থার আসেননি দেখছি!

বলল, না, তিনি লাক্কে থাকবেন না।

শুধুলাম, টোলফান করেছিলেন বুঝি?

বলল, না, সকালবেলা ভূঁমি চলে যাওয়ার পরেই এসেছিলেন—বিশেষ তৃপ্ত করে আমার কাছে কমা চেয়ে গেছেন—লাকের আগেই তাঁকে ম্যানসেটার ছেঁচে চলে যেতে হবে।

মনটা যে হাঙ্কা হয়েছিল—আজও মনে আছে—সে হাঙ্কা ভাবটা গেল কেটে।

বললাম, তা আসার কি দরকার ছিল—টোলফানে খবর দিলেই হত।

বলল, সেটা বোধ হয় ঠিক স্বাভাবিক ভ্রমতা।

হঁ বলে চুপ করে গেলাম।

একটু পরে বললাম, একবার আমার সঙ্গে দেখা করাটা ত উজ্জ্বলতর শিক দিয়ে প্রয়োজন বোধ করলেন না?

মালিন বলল, সেজন্য আমার কাছে বাবে বাবে তৃপ্ত প্রকাশ করে কমা চেয়ে গেছেন।

কি আর বলি। চুপ করেই গেলাম। কিন্তু সহজেই টের গেলাম—মনটা খেঁচাচ্ছে হুয়েই আছে। এবং সমস্ত দিন রইল—একথাও অস্বীকার করব না। বাবে বাবে মনে হতে লাগল—আমাকে আড়ালে রেখে মালিনের সঙ্গে দেখা করাবই গরজ তাঁর। এবং মালিনও কি তাতে খুশী?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসতে একটু দেরী হল। মালিন সহজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাইরে বোধ হয় চাঁদের আলো ছিল। জানালার সাঁগীর মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে মালিনের ঘুমন্ত মুখখানার দিকে চেয়ে মালিনের প্রতি একটা গভীর দরদে মনটা উঠল ফুলে—বেচারি! আশ্চর্য! এই দরদটুকু স্পর্শই আমার মনের মেঘ হঠাৎ গেল কেটে—মনে হল—ছিঃ ছিঃ, মালিনের মতন মেয়ে, তবুও মনের এই দৈব। শিতামহ 'স্বশান্তসার' রক্ত ত রয়েছে আমার শরীরে—এ কি তাই দায়?

বুলা! তোমার পাঠান পূজনীয় 'স্বশান্তসার' আত্মজীবনী তখনও আমার হাতে আসেনি। [ক্রমশঃ।



আনন্দ ডিঙ্গারে
ক. হোড়ের

প্রসারিত সামগ্রী



ক. হোড় ২৩ কোং • কলিকাতা-১০

হাল থুনি আলয়া

আন্তর্য যুথোপাখ্যায়

চার

চিঠি এসেছে।

মুসতান কুটিতে শিঙনের পদার্পণ একেবারে নেই বলা ঠিক হবে না। মা স এক আধবার তাকে কুটির আঙিনায় দেখা যায়। এলে সাধারণত তাকে রমণী পণ্ডিতের খোঁজ করতে দেখা যায়। ছাঁচারটে জানা ঘর আছে, বিয়ের ঠিকজি মেলানো বা দৈব সমাধানের এক আখরা খোঁজ খবর আসে তাঁর কাছে। খামে নয়, ডিন নড়া পরসা বা পাঁচ নয়। পরসার পোষ্টকার্ডই বংখট।

ছাঁচার মাস অন্তর একাধিক শিকদারের কাছেও আসে এক আংথানা পোষ্টকার্ডের চিঠি। হলে অজ্ঞত কোথায় চাকরি করে। কোথায় থাকে বা কি চাকরি করে সেটা এক শিকদার মশাই ছাড়া আর কেউ জানে না বোধহয়। তবে তাঁর একখানা চিঠি পিঙনের ভুলে এংবার নাকি রমণী পণ্ডিতের হাতেই পড়েছিল। সে-চিঠিতে প্রেরকের ঠিকানা ছিল না, শুধু তারিখ ছিল। তবে পোষ্ট অফিসের ছাপটা নাকি চোখে পড়েছিল পণ্ডিতের। সেই চিঠি কলকাতা থেকেই এসেছিল। খেয়াল না করেই পণ্ডিত চিঠিখানা পড়ে ফেলছিলেন, তিন চার লাইন মাত্র বয়ান—টানাটানির সময়, বেশি টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, তবু এবারের মত কিছু বেশি দিতে চেষ্টা করব।

মেরে কয়ক পড়ানোর খতিয়ের সময় সেই চিঠির সমাচার পণ্ডিত নিজেই সন্ধ্যাপনে বীরাপদর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন একদিন। তাঁর ধারণা, হলে সপরিবারে কলকাতাতেই থাকে, বহুদূরে একটা দিনও বড়ো বাপ-মাকে দেখতে আসে না সেই লক্ষ্যেই গোপন সেটা। তাঁর আরও ধারণা, মাসের গোড়ার দিকে এক-আধদিন ঘরে-কাচা জামা-কাপড় পরে শিকদার মশাইকে কেবল দেখা যায়—সেটা পোষ্ট অফিসে গিয়ে টাকা আনার উদ্দেশ্য নয়, হেলের বাড়ি থেকে টাকা আনার উদ্দেশ্যই। হাই হোক, এখানে প্রাণ-অর্থ-পুঁজি আর প্রৌঢ় বিবধা কত্না নিয়ে শিকদার মশাইয়ের সন্ধান। বেশ খোঁজানো ভিটেমাটি বিক্রী কিছু পুঁজি তাঁর হাতে আছে। সে-এসম অবস্থার, কখনো-সখনো পোষ্টকার্ড লেখা এক আখরা চিঠি তিনিও পান, এটা ঠিক।

লুকুনি সন্ধ্যার কাছে চিঠি লেখার নেই কেউ। তিনি শিকদার মশাইয়েরও বয়ঃকৃত। তাঁর সেন্টা পরিবারটি এখানে। বজ্রক্ষেপের আগে বজ্রবানী করতেন কোথায়, হেলেরও চাকরি

করতেন। গোলযোগের সূচনাতাই সব ছেড়েছুড়ে দ্বীপুত্র-পুত্রবধু নাতি-নাতিস সহ এই মূলতান কুটিতে টাই নিয়েছেন। দুই হেলেই প্রৌঢ় বয়সে শহরের উপকারীর এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে কর্মজীবন শুরু করেছেন। এ ছাড়া প্রাইভেট ছেলে পড়ানোর কাজও তাঁরা সেখানেই ছুটিয়ে নিয়েছেন। অতএব তাঁরা উষায় বান আর নিশায় ফেরন। ঘরে বৃদ্ধা গৃহিনী, পুত্রবধু দুটি এমন কি নাতিনিরাও প্রায় কলুষ্পন্ডা। এ পরিবারে চিঠি আসার বালাই নেই।

এ দিকের এলাকায় আর থাকল গৃহদার সন্ধ্যাপ। সেখানে শুধু সাইকেল পিঙন আসে আর দুটি খবরের কাগজ আসে। আর কেউ না বা কিছু না।

কিন্তু যে চিঠি এসেছে সেটা রমণী পণ্ডিতের নয়, একাধিক শিকদারের নয় বা আং কারো নয়। সেই চিঠি বীরাপদর। ঘর কাছে কেউ কোনদিন চিঠি আসতে দেখেনি।

পোষ্টকার্ডও লেখা চিঠি নয়, হালকা-নীল শৌখিন খাম একটা।

বীরাপদ বাড়ি ছিল না। নতুন-পুর্বনে বইএর দোকানের মালিক দে-বাংর নতুন বইএর বিজ্ঞাপন লেখার তাগিদে সকালে উঠেই বেরিয়েছিল। একখানা নয়, এব পরে আবার দু'খানা নতুন বই প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছেন ভক্তলোক, তাগিদটা তাই অবহেলা করতে পারেনি। ডাকপিঙন চিঠি দিয়ে গেছে কলকাতার লুকুনি ভট্টাচার্যের হাতে। হুকো-পার্বের পরে প্রাক-গাজোখানার স্বহস্তে। সন্ধ্যাপ উটে পাণ্টে দেখে সেটা তিনি শিকদার মশাইয়ের হাতে দিয়েছেন। এরকম একটা তবতক খাম জীবনে তিনি হাতে করেছেন কি না সন্দেহ। খামটা বাড়ির দেবার সময় রমণী পণ্ডিত সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে কোঁড়ুল মেটাতে চেষ্টা করেছেন। ওদিকে একাধিক শিকদারের নীরব বিষয়ও ভট্টাচার্য মশাইয়ের মতই।

বীরাপদর ঘর বন্ধ ছিল, ভানাল। দিয়ে বাছটা ভিতরে ফেলে দেওয়া হত। শিকদার মশাই সেটা পারলেন না। সোনারভট্টিকে ডেকে চিঠিখানা তাঁর হাতে গিলেন।—পাশের ঘরের বাবু চিঠি, এলে দিয়ে দিও।

বীরাপদর কবিত্তে একটু বেলো হয়েছিল। ভাড়াভাড়া চান সেয়ে খেতে বেহুতে বাড়িল সে। দিনের আহাং সেই পুরনো চাটলেই চলছিল। কুণ্ডারের টাকটা বীরাপদ পাবনিই সোনারভট্টিকে কেবল দিতে দিয়েছিল। সোনারভট্টি টাকা বাখেনি বা হেটোই খরচা

গন্ধে কোনো মন্তব্যও করেনি। তারপর একদিনের মধ্যে আর চোখের দেখাও হয়নি।

সোনাবউদি চিঠি নিয়ে গেল।

যেন প্রায়ই আসে এমন চিঠি, আর প্রায়ই বিয়ে-বাড়ি—কোনো কৌতূহল নেই। বিখিত নেত্রে খামের ওপর চোখ বুলিয়ে বীরশপ মুখ তুলে দেখে সোনাবউদি ততক্ষণে চোকাঠ পেরিয়ে গেছে।

হোটেলের খাওয়া শেষে ঘরেই ফিরল আবার। অর্থাৎ সেও হয়েছে বাটে। সেই রাতের পরে সত্যিই আবার চাকরি এমন অস্বস্তিকভাবে বেতে লিখে একবারও আশা করেনি। তার ঠিকানা অবশ্য বেখেছিল আর ডাইভার দিয়ে গাড় করে বাড়িও পৌঁছে দিয়েছিল। বীরশপ ভেবেছিল, সেই অস্বস্তিকতা শুধু চক্ষু-সজ্জার খাতিরে। নইলে ব্যবধান সে ভালই রচনা করে এসেছে। সমানে অসমানে করণার সম্পর্ক, বিতালী নয়। চাকরির হয়েই বাগে।

কিন্তু এ চিঠিতে না যাওয়ার দরুন অল্পবয়স্ক এবং অবিলম্বে আশা করা অল্পবয়স্ক। সত্যের আঠারো বছর আগে হট্টেলের সেই ছাত্র-জীবনের সঙ্গে মেলে। আত্মমানবদল দিনকতক দেখা গান্ধী বন্ধ করলে যেমন তাগিদ আসত। সেই তাগিদেই প্রতীক্ষাও করত তখন, আজ যাবে কোন্‌ ঘরে? ক্ষুধার যে চির দেখায়ে এসেছে তাতে শুধু অহংকার নয়, আঘাত দেবার বাসনাও ছিল, সেটা চাকরির বুকে বাকি নেই। আগের বীরশপ বদলেছে, বুকে বাকি নেই তাও। তবু ডাকাডাক কেন?

বিকেলের দিকে বারান্দায় সোনাবউদির সঙ্গে আর একবার দেখা হয়ে গেল। দুধওয়ালা টাকার সজ্জা বসেছিল, টাকা মোটাতে এসে গুকে দেখে একটু যেন স্বস্তিবোধ করল।—হিসেবটা ঠিক হল কিনা দেখুন তো—

হিসেবের ব্যাপারে সোনাবউদি কোনদিনও চট করে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এ পর্যন্ত হিসেবপত্র সব বীরশপই দেখে দিয়েছিল। এটা বোধহয় গুণ্ডার করা।

ঠিক আছে—

দুধওয়ালাকে বিদায় করে সোনাবউদি ঘরমুখে হঠাৎ ফিরে পৌঁড়াল। একটু খেয়ে আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের দিদি কি লিখলেন?

নৌল শৌখিন খাম দেখেই বীরশপ অমুমান করেছিল চিঠি কার এখন দেখছে, অমুমানটা শুধু তার একা নয়।

বেতে—

গেলেন না?

জবাব না দিয়ে বীরশপ হাসল একটু। তার আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোনাবউদি আবার বলল, জামা কাপড় কাচা নেই বুঝি?—জামা তো গায়েহুয়ে না, বুতি দিতে পারি। দেব?

হাসি করণা বিরাগ বিজ্ঞপ কোনোটা কখন কার গায়ে এসে পড়ে ঠিক নেই। নিছক ঠাট্টা না সংগতির ওপর কটাক্ষ সঠিক বোঝা গেল না। বীরশপ হেসেই জবাব দিল, গেলে এতেই হবে

সোনাবউদি নিশ্চিন্ত বেন।—খামের বাহার দেখে আমি ভাবছিলাম হবে না বোধহয়।

হাসি চেপে ঘর ঢুক গেল।

পরের ক'টা দিন বীরশপ একরকম ঘরে বসেই কাটিয়ে দিল। চাকরির চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও সেখানে ছুটে যাবার দত্ত কোনো তাগিদ যে অনুভব করেনি সেটা সত্যি। এবার সেখানে গেলে অল্পকম্পা জুটবে হয়ত। সেটা বরশান্ত হবে না। অল্পগ্রহ দেখাবার দত্ত সংগতি চাকরির আছে, এমন বাড়ি গাড়িতেই প্রায়শঃ—কিন্তু সে-সংগতি চাকরির এলো কোথেকে, কোন্‌ বিনিময়ে? ফুটপাথে বাস-ষ্টপের ধারে সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকে যে-বিনিময়ের প্রত্যাশায় তার সঙ্গে তফাৎ কতটুকু? আঠার বছর আগে যে চাকরিকে হারিয়ে শূণ্য দ্রুমে কলকাতার পথে পথে ঘুরেছে একদিন, সেই চাকরি হারিয়েই গেছে। তাই চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও সেখানে যাবার চিন্তাটা বীরশপ বাতিল করে দিতে পেরেছে।

কিন্তু একদিন চাকরির হারানোটা যেমন অমটন, আঠার বছর বাদে গ্রামোফোন-রেডিওর দোকানের সামনে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগটা যে তেমনিই এক নতুন নৃচনার ইঙ্গিত, সেটা জানত না। জানলে চিঠি পেয়েই ছুটত। আর তাহলে বিভ্রতও হত না এমন।

দুগুব গড়িয়ে সবে বিকেল উত্তর। শুয়ে শুয়ে বীরশপ একটা পুরনো বইয়ের পাতা ওলটাইছিল। আর মনে মনে ভাবছিল, বইয়ের দোকানের দে-বাবু আর শুধুর দোকানের অধিকা কবিরাজের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। আজও না গেলে দে বাবু অন্তত

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম
আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"

আপনার স্বাস্থ্য, চাপ্তি
ও সর্বস্ব রক্ষা করিতে

- কলমে প্রস্তুত
- ঈসিয়ে সঁকা
- আসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্‌ফেকশনারী
কলিকতা - ২৯

হারুণি হবেন। কামিন তার দেখা না পেয়ে সকালে কণ্ঠস্বর পাঠিয়েছিলেন।

সোনাবউদি এসে খবর দিল, আপনাকে বাইরে কে ডাকছেন দেখুন—

বীরপদ বই নামালো। খবরটা সাদাসিধে ভাবেই দিতে চেষ্টা করেছে সোনাবউদি, কিন্তু তার চোখে মুখে যেন চাপা আগ্রহ। বইয়ের লোকানের দে-বাবু আবারো লোক পাঠালেন কি না ভাবতে ভারতে বাইরে এসেই বীরপদ একবারে হতভম্ব।

কদমতলা ছাড়িয়ে অনতিদূরে আভিনার কাঁড়িয়ে চাকরির স্বকলকে মোটার গাড়িটা। পিছনের সিট-এ চাকরি বসে, পাশে আর একটি অপরিচিত মৃতি—সিগারেট টানছে। এদিকে বিষয়ে বিমূঢ় গোট্টা স্থলতান কুটির প্রায় সমস্ত বাসিন্দারা। মোটরের গা বেঁধে হী করে চেয়ে চেয়ে দেখছে গণ্ডার মেয়ে, বাচ্চা ছেলে ছোট্ট আর রমণী পণ্ডিতের ছোট্ট ছেলেমেয়ের দল। কদমতলার বেকির কাছাকাছি এসে কাঁড়িয়েছেন রমণী পণ্ডিত, তাঁর খানিকটা তাকতে শকুনি ভট্টাচার। অল্প মেয়ে-বউরা জ্ঞানীলা দরজা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। হুঁকো হাতে শিকদার মশাইও বেরিয়ে এসেছেন।

পরিস্থিতি দেখে বীরপদও হী করে কাঁড়িয়ে বইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। কি ব্যাপার!

এক লম্বা তাকে দেখে নিয়ে চাকরি বললেন, টিকানাটা ঠিকই দিয়েছিলেন তাহলে।

বীরপদ বিব্রত মুখে পিছনের দিকে ঘুরে তাকালো একবার। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষের জোড়া জোড়া চোখ এদিকেই আটকে আছে। চাকরির পাশের স্বদর্শন লোকটি কখনে মাথা এলিয়ে সিগারেট টানছে আর পুরু চশমার কঁক দিয়ে আড়ে আড়ে কিছু যেন মজা দেখছে একটা।

চাকরি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার চিঠি পেয়েছিলে?

হ্যাঁ—মানে বাব ভাবছিলাম, কিন্তু তুমি হঠাৎ। বসবে?

না, জামা পরে এসো।

বীরপদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নামলে কোথায়ই বা বসাতো? বলল, কি কাণ্ড, এই জন্তে তুমি নিজে কষ্ট করে এসেছ। তুমি যাও, আমি পরে বাব'খন—

আঃ, চাকরির মুখে সত্যিকারের বিরক্তি, সংয়ের মত বসে থাকতে পারছি না, তাড়াতাড়ি এসো।

অগত্যা জামা পরার জন্ত তাড়াতাড়িই ঘরে আসতে হল তাকে। ডেবেছিল, দরজার আড়ালে সোনাবউদিকেও দেখা:ব। দেখল না। লোহার হুকে ছুটো জামা খুলছে, ছুটোই আঁহময়লা। তাই একটা গায়ে পরে চাদরটা জড়িয়ে নিল।

মোটর চলার রাস্তা নেই। এবড়োখেবড়ো উঠোন ভেঙে গাড়ি রাস্তার পড়তে চাকরি সহজ ভাবেই বললেন, তোমার এই বাড়ির লোকেরা বুঝি মেয়েদের গাড়ি চড়তে দেখেনি কখনো?

বীরপদ সামনে বসেছিল। পিছনের আসনেই তাকে জায়গা দেবার জন্তে চাকরি পাশের দিকে বেঁধে বসতে বাচ্চিলেন। কিন্তু তার আগেই সামনের দরজা খুলে বীরপদ সরাসরি ডাইভারের পাশের আসনে গিয়ে বসেছে। কথা শুনে ঘুরে

তাকালো। হাঁসি মুখেই বলল, দেখেছে—গাড়ি চড়ে আমার কাছে আসতে দেখেনি কখনো।

চিঠি পেয়ে এলে না কেন? খুব জব—

যেন ওকে জব করার জন্তেই তাঁর এই অভিনব আবির্ভাব।

বীরপদ সামনের দিকে চোখ ফেরাল। এক নজরে চাকরির পাশের লোকটিকেও আবার দেখে নিরুদ্বে। আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বছর বক্সিশ তেত্রিশ হবে বয়েস। পরনের স্যুটটা দামী হলেও ভাঁজভাঙা আর জায়গায় জায়গায় দাগ ধরা। মাথার একরাশ ঝাকড়া চুলে বহু দিন কাঁচি পড়েনি। মুখ নাক আর চওড়া কপালের তুলনায় চোখ ছোট্ট একটু ছোট্ট বোধহয়। পুরু লেগ এবং জন্তেও ছোট্ট দেখাতে পারে।

বীরপদ মনে মনে প্রতীক্ষা করছে, ভব্যতা অনুযায়ী চাকরির এবারে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু চাকরি তা করলেন না। একটা লোককে জোরজোর করে ধরে আনা হয়েছে তাই যেন ভুলে গেলেন। তাঁর পাশের সন্ধ্যাটির উদ্দেশ্যেই এটা সেটা বলতে লাগলেন তিনি। বলা ঠিক নয়, সব কথাতেই অনুযোগের সুর। সে আবার অকিঞ্চিৎকিরে কি না, ফেরা উচিত, কাজে কর্মে একটুও মন নেই, লকলেই বলে। সকলের আর দোষ কি, খেয়াল খুঁদিত চললে বলবেই। কতবড় দাঁড়ি তার, এভাবে চললে নিচের পাল্লেসনও কঁকি দেবেই। তাছাড়া নিজের ভবিষ্যতও ভাবা দরকার, এমন সুযোগ ক'জন পায়—

তুমি খামো তো এখন, বাজে বোকা না—

সামনে থেকে বীরপদও সচকিত হয়ে উঠল একটু। এমন কি একবার হাড় না ফিরিয়েও পারল না। সেই থেকে নিরাসক্তভাবে বসে বসে সিগারেট টানটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। উপেক্ষার মত লাগছিল। তাছাড়া চাকরির এমন অল্প বয়স সন্ধ্যাটিকে সেই বক্স কোঁড়ুলও ছিল। কিন্তু এই স্পষ্ট গম্ভীর বিরক্তির ফলে একটু যেন শ্রদ্ধা হল। বীরপদ ফিরে তাকাতো চাকরি হেসে ফেললেন, ওকে লক্ষ্য করেই নিজের অসহায়তা জ্ঞাপন করলেন, দেখেচ, ও সব সময় এমনি মেজাজ দেখায় আমাকে—

মেজাজ এ দেখায় তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি সেটা চাকরির খেয়াল নেই বোধহয়। কিন্তু তাঁর উপদেশের কলেই হোক বা যে কারণেই হোক, মেজাজী মেজাজ তখনো অগ্রসরই মনে হল। প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বায় করতে করতে আবারও অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন করল, কি বাজে বক্স সেই থেকে।

বাড়ি ফিরিয়ে চেয়ে থাকা অশোভন। ডাইভারের সামনের ছোট্ট আঁশিতে চাকরিকে দেখা যায়, পাখ'বতীর একাংশও। চাকরি ঝপ করে তার হাত থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে রাস্তায় কেল দিলেন। —খোঁয়ায় খোঁয়ায় সারা গায়ে গন্ধ হয়ে গেল—আমি তো বাজেই বকি সব সময়, আমাকে দেখেই বাজে কথা শোনার জন্ত সাত তাড়াতাড়ি উঠে পালিয়ে আসতে তোকে কে দেখেছিল?

লোকটা কে না জানলেও বীরপদের কোঁড়ুল এক দকা পাঁক-হুড় হয়ে গেল। উপদেশ বা অনুযোগের অব্যবহারে চাকরি 'তুমি' করে বলছিলেন। এবারের বাসল্য-সিক্ত ব্যক্তিক্রমটা কানে আসতে ব্রহ্ম নিঃশ্বাস ফেলল। প্যাকেট আর সিগারেট ছিল না, কাশল পুত প্যাকেটটা বাইরে নিক্ষেপ করা হল ঠের শেল। আঁশিতে ওর

ইংরাজ ও
ভারতীয়গণ
সমবেত প্রচেষ্টায়
দুর্গাপুরে
এক বিরাট
ইস্পাত কারখানা
গড়ে তুলছেন



ইস্কন

ইন্ডিয়ান স্টীল ওয়ার্কস্ কন্সট্রাক্শন্স কোং লিঃ

ভেভি এবং ইউনাইটেড এন্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
কেড রাইটসন্স অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ সাইমন-ভার্ডন লিঃ
দি ওয়েলম্যান লিমিটেড এন্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ
দি সিমেন্টেন কোম্পানি লিঃ ব্রিটিশ টুন্স-ব্রস্টন কোম্পানি লিঃ
দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ
মেট্রোপলিট্যান-কার্টার ইলেকট্রিক্যাল এন্ড শিপট কোম্পানি লিঃ
স্টার উইলিয়মস্ এন্ড কোম্পানি লিঃ
স্ট্রাকচারাল স্ট্রিং অ্যান্ড এন্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিঃ
ডায়মান গুড, ব্রিঙ্ক অ্যান্ড এন্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিঃ
কোসমস পার্কস্ অ্যান্ড সন্স লিঃ ইসন্স কেবল প্রুপার্টিস (সিমেন্ট এন্ড স্ট্রল
সোয়ান লিঃ এবং দিয়েরি জেনারেল কেবল ওয়ার্কস্ লিঃ)
এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

ইঙ্গ-ভারতীয় সহযোগিতার এইরূপ দৃষ্টি দুর্গাপুরে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।
ভারতের এই নবীনতম ইস্পাত নগরীতে ভারতীয় এবং ব্রিটিশ
যন্ত্রবিদগণ নানা সমস্যা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছেন
এবং একত্রে কাজ করে দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী
বিরাট কারখানাটি গড়ে তুলছেন।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রিটেনের
কয়েকটি প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈজ্ঞানিক কোম্পানির
মৌখ-প্রতিষ্ঠান ইস্কনের উপর হস্ত আছে। এঁরা কাজের শুরু
থেকেই ভারতীয় যন্ত্রবিদ এবং দক্ষ ও সাধারণ কর্মী সকলের সঙ্গেই
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছেন।

চাকরিকেই দেখা যাচ্ছে এখন, শিশুর কিংবা ভাঙিরেও বীরপদ অঙ্কন করল, মাংসলের পাখিটা তার দিকের জানালা ধীরে ধীরে বসেছে। অর্থাৎ চাকরির কথাই পিঠে কথা বলার অভিল্যে নেই।

সেদিন রাতের অতীর্ণতার চাকরি অতিশয়োক্তি করেননি। ঘিরের আলোর তাঁর বাড়িটা ছবির মতই দেখতে। খেত পাখরের হুত স্বকণ্ঠকে লজ্জা ছোট্ট বাড়ি। হু'র দিকের ফুলবাগানে বেশির ভাগই লালচে ফুল। ফটক থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত লাল মাটির রাস্তা।

বরষা ঘরে চাকরির প্রতীকায় এক ভুললোক বসে। অবাঙালী, বোম্ব হর খাণী। তাঁকে রেখেই চাকরি তরানক খুঁশি। বলে উঠলেন, কি কান্ডের, আপনি কতকণ? আমার তো খেয়ালই ছিল না, অথচ ক'দিন ধরে শুধু আপনায় কথাই ভেবেছি।

চাকরির হুখে পরিচায় ইংরেজি শুনে বীরপদ ঘরে ঘরে অবাক একটু। ঘরে পড়ে চাকরি ঘাট্টিক পাশ করেছিলেন হটে, কিন্তু শুধু সেটুকুর বাবা এখন অত্যন্ত স্বাক্ষর-বিম্বের সম্ভব নয়। সেটা আরো বোঝা গেল আর একটু পরেই।

বোসো বীক বোসো, অমিত বোসো। নিজেরও একটা সোফার আসন দিয়ে ওই ভুললোকের সঙ্গেই আলোপে মগ্ন হলেন চাকরি। ভুললোক ফুলের সমস্ততার এবং ফুল সমস্তা সমাধানে বিশেষজ্ঞ বোঝা গেল। কারণ, রোগী যেমন করে চিকিৎসকের কাছে স্বাস্থ্য সমাচার জ্ঞাপন করে, চাকরি যেমন করেই তাঁর ফুল আর ফুল বাগানের সমাচার শোনাতে লাগলেন।—ডালিয়া তেমন বড় হচ্ছে না, আরো সর্বশেষ কাণ্ড পাতিওলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। আর দ্যাপ ড্রাগন নিয়ে হয়েছে এক জালা, শূটওলো গলা বাড়িয়ে লজ্জা হচ্ছে বলে মোটেই ভর-ভরতি দেখাচ্ছে না। প্যানজি? চমৎকার হয়েছে, দেখাছি চলুন—মিকি মাউসের মত কান উঁচু উঁচু করে আছে সব।—সঙ্গ হয়েছে তো ভালো কিন্তু সব রঙে মিলেমিলে একেবারে শিউড়ি—আলাদা আলাদা রঙের চার বোগাড় করা যায় না? পশির তো বেশ আলাদা আলাদা রঙের গেড হয়েছে।—ক্লিসেনথিমায় খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু সারাক্ষণই পোকের ভয়ে অস্থির আছি!

সেই আশঙ্কার চাকরির মেহেই স্তরাক শিহরণ একটু। বীরপদ ধী করে শুনছিল আর তাঁকে দেখছিল। বলার ধরনে সমস্তাওলো তার কাছেও সমস্তার মতই লাগছিল। কাঁটা বিনা কমল নেই আর কলঙ্ক বিনা চাঁদ নেই। কাঁটা আর কলঙ্ক না থাকলে চাকরির গতি কি হত!

মোটরের সিগারেটখোর কোট-প্যাটপরা সজাট সোফার দরীর এলিয়ে একটা রঙচঙা ইংরেজি সাপ্তাহিক খুখ ঢেকেছে। একটু আগে চাকরির হুখে নাম শুনেছে অমিত। হাবভাবে মিতাচারের লক্ষণ কমই। অসহিষ্ণু বিরক্তিতে এক-একবার চোখ থেকে সাপ্তাহিক নামাচ্ছে, দুই-এক কথা শুনেছে, এমিক-ওমিক তাকাচ্ছে—তারপর আবার খুখ ঢেকে সাপ্তাহিকের পাভা ওলটাচ্ছে।

কিন্তু চাকরি তাঁর ফুল আর ফুলবাগান নিয়ে হাবুডু। তাদের বসতে বলে ফুল-বিশেষজ্ঞটিকে নিয়ে বাগান পর্যবেক্ষণে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতের সাপ্তাহিক চটাস করে সামনের সেটার টেবিলের ওপর পড়ল। বীরপদ সচকিত। লোকটা উঠে বইতরা কাঠের আলমারির সামনে দাঁড়াল, ওঁকে ভিতরের খইতলোয় দিকে চেয়ে

রইল খানিক। স্বকণ্ঠে হবে, কারণ তার মাথা আলমারির মাথা সমান। কিন্তু একটা বইয়ের নামও পড়ল না। পাশের ছোট টেবিলে সাজানো স্বকণ্ঠকে অতিক্রম করি আর লাম্বকের খোলটা উল্টেপাল্টে দেখল একবার। আবার এসে ধূপ করে সোফার বলল। অসহিষ্ণুতাকে নয়নাভিরাম।

বাড়ি ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেছে এবার। নির্বিকার দর্শন।

আপনার নামটি কী?

আচমকা প্রশ্নটার জন্য বীরপদ প্রমত্ত ছিল না। নাম বলল।

চাক হাসি আপনায় চিহ্নি?

চাকরি বলতে বোধ হয়, কিন্তু বললে আবার এ কেমনধারা জিজ্ঞাসা। বীরপদর হৃদকিল কম নয়। বলল, অনেকটা সেই রকমই...

লোকটির হু' চোখ মিশ্রকে তার হুখের ওপর খেয়ে রইল খানিক। তারপর বলল, আমার নাম অমিত। অমিত্যাত বোঝ। আপনায় চিহ্নি আমার হাসি, মিজের হাসি নয়, অনেকটা সেই রকমই...

সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাসিতে ঘরের আসবাবপত্রগুলো পঙ্ক বেন সজাপ হয়ে উঠল। এমন কৌতুক-বরা হাড়-নড়ানো হাসি বীরপদ কমই শুনেছে। এই লোকই এমন হাসিতে পায়ে একদণ্ড আগেরও মনে হয়নি।

কিন্তু তখনো শেষ হয়নি। একটু সামলে আবার বলল, আপনি হলেন তাহলে মামা, মামো অনেকটা সেই রকমই...

সঙ্গে সঙ্গে আবার। এবারের হাসিটা আরো উচ্চগ্রামের অথচ ঞ্জিতকটু নয়। বীরপদও হাসতে চেষ্টা করছে একটু একটু। লোকটা বুদ্ধিমান তো বটেই, বেপরোয়া রসিকও। অমিত নয়, অমিত্যাত...তোজোম...হাসির তেজটা অন্ততঃ বিবম। বীরপদর খারাপ না লাগলেও তলায় তলায় অবস্থিত একটু। সত্ত পরিচিতের সঙ্গে এরকম বেআবক রসিকতা খুব স্বাভাবিক নয়।

হাসি ধামতে সচিহ্ন সাপ্তাহিকটা হাতে তুলে নিল আবার। অজ হাতে কোটের এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াতে লাগল। আপনায় কাছে সিগারেট আছে?

বীরপদ মাথা নাড়ল, নেই। কেমন মনে হল, থাকলে ভালো হত।

একেবারে চুপ। একটু আগে অমন বিবম হেসেছে কে বলবে। ফলে ঘরটা বেন গম্ভীর। বীরপদ আড় চোখে তাকালো, পড়ছেও না, ছবিও দেখছে না—শুধু চোখ হট্টাকে আটকে রেখেছে। খানিক আগের সেই প্রজন্ম অসহিষ্ণুতার আভাস।

কাগজখানা নামিয়ে ভিতরের দরজার দিকে চেয়ে হঠাৎ হাঁক পাড়ল, পার্শ্বী—

সঙ্গে সঙ্গে কাগজ হাতেই উঠে দরজা পর্বত গিরে গলার ঘর আরো চড়িয়ে দিল, পার্শ্বী।

সোফার দিকের এসে কাগজ খুলল।

আবার কোন প্রচসনের নৃচনা কে জানে। বাকে ডাকা হল বীরপদ তার কথা বেন ফুলেই গিয়েছিল এতক্ষণ। সেদিনের পরিবেশন করে খাওরানোটা ভালেনি। মেয়েটার সামনে সেদিনও নৃহ বোধ করেনি খুব। নিশ্চয়তার আবরণে চুপচাপ প্রতীক করতে লাগল।

হাতে একটা চারের ঠে নিয়ে খামিক বামে পার্শ্বীয় আর দক্ষিণ আবির্ভাব। ঠেতে হুঁপেরালা চা। মিনের আলোতেও আঁক অটটা কালো লাগছে না, পরনের শাড়িটা বেশ কস'। আজও গুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বীরাপদর মনে হল, গৃহ পুঙ্খবৃদ্ধ হলেও চাকরি নিরাপদই বটেন। জাঁটসাঁট বসনের শাসনে তমু-মধুর ভারবনত নয় একটুও, বোবনের এখিহ্রোহে যেন পার্শ্বীয়া গাভীর। প্রভাব আছে, ইশারা নেই।

ঐ বৃহৎ আগে অমিত বোবের সাহসে এসে দাঁড়াল। সে-ই কাছে ছিল। কিন্তু চারের বসলে সে ওর মুখের দিকে চেয়ে বইল—চেয়ে যে আছে তাও ঠিক খেয়াল নেই যেন।

যেটো ডাবলেশশুভ। দাঁড়িয়ে আছে পটের দৃষ্টির যত। কিরে চেয়ে আছে সে-ও, কিন্তু সে চোখে কোনো জাযা নেই। চারের ট্রো স্তম্ভাঙ্গিতের মতই আর একটু এগিয়ে বসল শুধু। এইবার ইংব বাজতার অমিত্যত বোব ঐ থেকে চারের পেয়ালা তুলে নিল।

বিত্তীয় পেয়ালাটা বীরাপদকে দিয়ে পার্শ্বী এক হাতে শূভ ট্রো বুলিয়ে ধরে দাঁড়াল। হুঁচর মুহূর্তের প্রতীক্ষা। কিন্তু গভীর মনোযোগে অমিত্যত বোব চা পানে বস। যেন শুধু এই জন্তেই একটু আগে অমন ঠাঁক ডাক করে উঠেছিল। মধুর পায়ে পার্শ্বী ভিতরে ঢলে গেল।

চূপচাপ চা পান চলল। বীরাপদ ভাবছে, চাকরি কতকণে কিরবে কে জানে।

পার্শ্বী। পার্শ্বী!

বীরাপদ চমকেই উঠেছিল এবারে। কি ব্যাণার আবার, চিনি চাই না দুধ চাই—কিন্তু চারের পেয়ালা তো খালি ওদিকে!

পার্শ্বী এলো। এবারে খালি হাতেই। তেমনি অভিযুক্তিশূভ নীরব প্রতীক্ষা।

ডাইভারকে বসো এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেবে। পেয়ালা রেখে আবার সাম্প্রতিক পত্র হাতে নিয়েছে।

ডাইভার নেই।

ও... মুখ তুলে তাকালো, সমস্তাটার সমাধান যেন নিশ্চল রমণী-মূর্তির মুখেই লেখা।

পার্শ্বী ঢলে গেল, যাবার আগে পেয়ালা ছুটো তুলে নিল। পাছে এবার আবার ওর সঙ্গেই ভ্রমলোকের আলাপের বাসনা জাগে সেই ভয়ে বীরাপদ মুখ ফিরিয়ে দূর থেকেই কাচের আলমারির বইগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগল।

পার্শ্বী।

বীরাপদ তটস্থ। সেদিন চাকরির মুখে পোনা, একজননের সঙ্গে পার্শ্বীয়ার ডাব কাটা না হাতে দেখা করতে এগনোর কথাটাই কেন জানি মনে পড়ে গেল।

এবারে যেটো কাছে এসে দাঁড়ানোর আগেই হকুম হল, সেদিন ক্যামেরাটা কেলে পেছলাম, এনে দাও।

আবার প্রত্যাবর্তন এবং একটু বাদেই ক্যামেরা হাতে আগমন। ক্যামেরাটা ছোট হলেও লম্বা বোকা বার। সামনের সেক্টর টেবিলে সেটা রেখে পার্শ্বীয়ার পুনঃস্থান। ও-মুখে তাব-বিকার নেই একটুও—বিরক্তও না, তুষ্টির না।

পার্শ্বী—।

বীরাপদ কি উঠে পালাবে এবার? বাইরে চাকরির বাণান দেখবে গিয়ে? এ কার সঙ্গে বসিয়ে রেখে গেল চাকরি তাকে। আড়চোখে তাকালো একবার, ছবি তোলার জন্তে ডাকেনি বোধহয়, কেমের মধ্যে ক্যামেরাটা সেক্টর টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে।

পার্শ্বী।

তার আগেই পার্শ্বী এসেছে। না হাতে লাটসাঁটা বা ডাব-কাটা না নয়, ভোট মোড়া একটা। অস্ত্র হাতে বোনার সরঞ্জাম। মোড়াটা খরের মধ্যেই সরঞ্জার কাছাকাছি রেখে এগিয়ে এলো। হাতে শুধু বোনার সরঞ্জামই নয়, এক প্যাকট সিগারেট আর একটা সেন্সলাইও। সে-দুটো সোফার হাতলে রেখে চূপচাপ দাঁড়িয়ে বইল একটু।

বীরাপদ মনে মনে বিম্বিত, ডাইভার তো সেই, এইই মধ্যে সিগারেট এলো কোথেকে। তাছাড়া, ডাইভার এসে থাকলেও পার্শ্বীকে বাইরে যেতে দেখা যায়নি। আর, যে সিগারেটের শূভ প্যাকেট মোটরের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে কেলে দিতে দেখেছিল সেই সিগারেটই।

এবারের আস্থানটা কেন সেটা আর বোকা গেল না। লোকটার দুহাতের মোটা মোটা আঙুলগুলি সিগারেটের প্যাকেট খোলার জংপর। সিগারেট এলো কোথা থেকে বা কি করে চোখে মুখে সে-প্রশ্নের চিহ্নও নেই। আন্তঃ-বীরে পার্শ্বী মোড়ায় গিয়ে বসল, একবার শুধু মুখ তুলে নিবিকার চোখে দুটো বীরাপদর মুখের ওপর রাখল। তারপর মাথা নিচু করে বোনায় মন দিল।

বীরাপদ আশা করছিল, ওই রমণী মুখের পালিশ করা নির্লিপ্ততার তলায় কৌতুকের ছায়া একটু দেখা যাবেই। আর, একটু সংকোচের আভাসও। খরের মধ্যে মোড়া এনে বসার একটাই অর্থ, ডাকাডাকি বন্ধ হোক—।

কিন্তু কিছুই দেখল না বীরাপদ, না কৌতুক না সংকোচ। এতবারে স্থির, অচল—পার্শ্বী। এমনটা সেই রাজিতেও দেখিনি। বোনার ওপর কাটা-ধরা আঙ্গুল কাটা নড়ছে, তাও যেন কলের মতই। অস্থির রোগীকে শাস্ত করার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন কিছু একটা ব্যবস্থা করে, খরের মধ্যে মোড়া এনে বসাতো তেমনিই একটা ব্যবস্থা যেন।

ব্যবস্থাতায় কাজও হল। ডাকাডাকি বন্ধ হল।-শান্ত একাগ্রতায় সিগারেট টানছে, ধীরে স্বল্পে সাম্প্রতিকের পাভা



ক্যালকুলাস অ্যাপলিকেশন প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ
ফোন-৩৫-৩১২৭, প্রতাপনগর: জ: সার্জিক্যাল স্ট্রিট, কলকাতা-১
গ্রাম-কলকাতা-১, ৪৫ নং প্রতাপনগর রাস্তা, কলকাতা-১।

ওলটাকে, অঙ্গল চোখে বোনা দেখেছে ধানিক, শোকার মাথা বেধে ঘরের ছাদও দেখেছে।

এই নীরব নাটক আরো কতক্ষণ চলত বলা যায় না। দু'হাত বোকাই নানা স্বকন্ঠের কুল নিয়ে ভ্রূইভাব ঘরে ঢুকিতে ছেদ পড়ল। কর্ত্তী বাগান থেকে তুলে পাঠিয়েছেন বোধহয়। কিছু না বলে ফুসসহ সে পার্শ্বতীর কাছে এসে দাঁড়াল। পার্শ্বতী ইশারায় ভেতরে যেতে বলল তাকে। তারপর মোড়টা তুলে নিয়ে সেও অঙ্গলবর্ণ করল। কর্ত্তী কিরছেন অনুমান করেই চলে গেল চব্বত।

ফলাফল দেখাব জন্য বীরাপদকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অদ্বিতীয় বোম্ব সিগারেটের শেষটুকু শেষ করে আদ্যপটে উঠল। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে শলাই আর প্যাকেট পকেটে ফেলল। তারপর কান্নাঘরাটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর যে বসে আছে, তাকে কোনরকম সম্ভাবণ জানানো প্রয়োজন বোধ করল না।

বীরাপদ এতক্ষণ বা দেখেছে সে-তুলনার এ আর তেমন বিসদৃশ লাগল না। আরো আশ্চর্য, এতক্ষণের এই কাণ্ডটা নীতিগতভাবে একবারও অশোভন মনে হয় নি তার। অথাকই ভয়েছে শুধু। লোকটার এমন অদ্ভুত আচরণ কতটা বাজিক তাও খুঁটিয়ে দেখতে চাভেনি। ওর চোখ কীকি দেবে এমন নিপুণ অভিনেতা মনে হয় না। বীরাপদ বোগ নির্ণয় করে ফেলল, সেড কেস্-বড়লোকের মজার চেড-কেস।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কোঁড়ুল একটু থেকেই গেল।

চাকরি একাট ঘরে ঢুকলেন, ফুল-গন্ধপাট বাগান থেকেই বিদায় নিয়েছেন বোধহয়। অনেকক্ষণ ঘোবাবুরির ফলে চাকরি বেশ প্রাঙ্গ। বীরাপদকে একলা বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, অমিত কোথায়, ভিতরে?

না, এই তো চলে গেলেন।

চলে গেল! সোফায় বসে পড়ে বললেন, ছেলেটাকে নিয়ে আর পায় গেল না, এখানে কি হাতের কাছে টান্নি পাবে না ট্রাম-বাস পাবে! বাকে বলছেন তার সঙ্গে যে চলে গেল তার কোনো বোগ বা পরিচয় নেই মনে হতেই বোধহয় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।—তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম, চা দিয়েছে তো না তাও দেখনি?*

দিয়েছে।

চাকরিকে এতক্ষণ একা বসিয়ে রাখার কৈফিয়তটা শেষ করে নিলেন।—কি করি বলো, ভ্রমলোক এসে গেলেন, আমারও গমিকে বাগান নিয়ে বাবেলা, এটা হয় তো ওটা হয় না—ভ্রমলোক জানেন শোনে খুব, পুণ্যর পোচা নার্দারির লোক।

পোচা নার্দারির লোকের সম্বন্ধে বীরাপদের কোনো আগ্রহ নেই, বরং অমিতাভ বোম্ব সম্বন্ধে আরো দু'চার কথা বললে শোনা যেত।

..চলো, ভিতরে গিয়ে বসি, আজও শীগুগির ছাড়া পাছ না।

বীরাপদ বলল, আজ একটু কাজ ছিল—

চাকরি উঠে দাঁড়িয়েছেন, কিরে তাকালেন।—কাজও তাহলে কিছু কবো তুমি?..কি কাজ?

এখানে এই ঘরে বসে কি কাজের কথাই বা বলতে পারে বীরাপদ—নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবর সঙ্গে

করার কাজটা নিজের কাঁছেই আর জরুরী মনে হচ্ছে না তেমন জবাব না দিয়ে হাসল একটু।

চাকরি ডাকলেন, এসো—

অঙ্গর মহলের প্রথম দুটো ঘর ছাড়িয়ে চাকরির শরন ঘর। দামী খাটে পরিপাটি শয্যা আর থল আসবাব পত্র। বেশ বড় ঘর, এক দিকের দেয়াল ঘেঁরে একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার। টেবিলে টেলিফোন, লেখার সরঞ্জাম। অল্প কোণে মস্ত ড্রেসিং টেবিল আর আলমারী একটা। যেক্ষেত্রে কুশন বসানো গোটী দুই মোড়া।

বোসো—

চাকরি মোরগোড়া থেকে চলে পেলেন এবং একটু বাসেই আঁচলে কবে তিনে দুখ দুহুতে দুহুতে কিরে এসেন। বীরাপদের মনে পড়ল, আগের দিন বলেছিলেন, বটীর বটীর জল না দিয়ে মাথা গরম হয়ে যায়।

দাঁড়িয়ে কেন, বোসো—

শয্যার ওপরেই নিজে পা গুটিয়ে বসলেন, বীরাপদ কাছের মোড়টা টেনে নিল।

তারপর, কি খবর বলো—দাঁড়াও, আগে তোমাকে খেতে দিতে বলি—

খাট থেকে নামতে বাচ্ছিলেন, বীরাপদ বাধা দিল, বোসো, আজ খাবার তাড়া নেই কিছু।

কিছু না?

না, অবেলার খেয়েছি।

সত্যি বলছ, না শেষে ক্ষদ করবে আবার?

বীরাপদ হাসতে লাগল। সে-দিনের ওভাবে খেতে চাওয়ায় শুধু যদি ক্ষদ করার ইচ্ছেটাই দেখে থাকেন, বাঁচোয়া।

চাকরি আবার পা গুটিয়ে নিয়ে খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার চিঠি পেয়েও এলে না কেন?

আসব ভাবছিলাম..

হঁ, আসলে তোমার এড়াবার মতলব ছিল। নইলে কতকাল বাসে দেখা, আমি তো ভেবেছিলাম পরদিনই আসবে।

বীরাপদ হাসিমুখেই বলে বলল, কতকাল বাসের দেখাটা সত্যিই তুমি জিইয়ে রাখতে চাইবে জানব কি করে, এবারে জানলাম।

চাকরি ধতমত খেয়ে গেলেন একটু। আত্মীয় পরিজন সকলকেই পরিভ্যাগ করেছেন, করা দরকার হয়েছে—সেই কটাক্ষ কি না বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর সহজ ভাবেই বললেন, তোমার কথাবার্তাও বললেই দেখছি, এবারে জানলে যখন আর বোধহয় পাড়ি নিয়ে হাজির হতে হবে না?

বীরাপদ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়ল। কিন্তু চাকরির তার আগেই কিছু যেন মনে পড়েছে। বললেন, আজ্ঞা তোমার ঘরের সামনে ওই যে বটটিকে দেখলাম—সেই তো বোধহয় খবর দিলে তোমাকে—কে?

বীরাপদ হাসি পেয়ে গেল। ঘেরেঘের এই এক বিচিত্র দিক। এতলোকের মধ্যে চাকরিরও শুধু সোনাবউদিকেই চোখে পড়েছে। নিজের অপোচনেই আঁঠারো বছরের ব্যবধান ঘুচতে চলছে বীরাপদের। মজা করার লোভে গভীর মুখেই জবাব দিল, সোনাবউদি।

সোনারউড়ি।
হ্যাঁ, গুপ্তার বউ।
চাকরি অবাক। তারা কারা?
চিনলে না?
আমি কি করে চিনব?
বীরপদ হেসে ফেলল, ও-বাড়ির কাকেই বা চেনো তুমি?
হাসলেন চাকরিও ১০০-তাই ততো, বাকগে তোমার খবর বলো,
ওখানেই বরাবর আছ?
হ্যাঁ।

কিছু বাড়িটার বা অবস্থা দেখলাম ও তো যখন তখন মাথার
ওপর ভেঙে পড়তে পারে।
ও-বাড়ির অনেকেই সেই সন্নিহিত অপেক্ষা করছে...কিন্তু
বাড়িটা নিলজ্জার মত শুধু আশাই দিচ্ছে।

তুমি চাকরি কেন জানি একটু খুশি হলেন মনে হল।
মুখে অবশ্য কোণ প্রকাশ করলেন, কি বিজ্ঞি কথাবার্তা তোমার।
শরাদ্দ পাটান করে বসে আবারও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরাখবর
জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। বীরপদর এটা স্বাভাবিক লাগছে না
খুব। গত আঠারো বছরের ওর ব্যক্তিগত সবকিছুই যেন জানার
আগ্রহ তাঁর। কৈন পূর্বস্ত পড়েছে, এম, এ টা পড়ল না
কেন, তার পর এ ক'বছর কি করেছে, এখন কি করছে, ইত্যাদি
ইত্যাদি। শেষের দিকে প্রায় জেরার মত লাগছিল। যেন চাকরির
জানারই প্রয়োজন এই সবকিছুই। উঠে ঘরের আলোটা জ্বলে
দিয়ে এসে বসলেন আবার।

জিনের আলো বিলারমুখি, তবু ঘরের আলো আর একটু পরে
জ্বললেও হত। বীরপদর মনে হল উনি মুখেই জেরা করছেন না,
তাঁর চোখও সজাগ। আর জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষুরসত না দিয়ে বলল,
এবারে পাত্রীর খবর বলো দেখি শুনি।

পাত্রীর খবর। চাকরি সঠিক বুঝলেন না।

বে-ভাবে জিজ্ঞাসা করছ ভাবলাম হাতে বুকি জবর পাত্রী-টাকী
কিছু আছে।

উৎকলমুখে চাকরি তদুনি জবাব দিলেন, তোমার পাত্রী তো
আমি—আর পছন্দ হয় না বুঝি? তাছাড়া, যে হতভাগা অবস্থা
দেখছি তোমার, তোমাকে ঘেরে দেবে কে?

আজ উঠি তাহলে।

চাকরি হেসে ফেললেন, না অতটা হতাশ হতে বসিনে—।
যেমে কি ভেবে নিলেন একটু, তারপর নিরপেক্ষ মন্তব্য করে বসলেন,
কিন্তু এভাবে এতগুলো বছর কাটানো পুরুষ মানুষের পক্ষে লজ্জার
কথা।

বলার মধ্যে দরদ কমই ছিল, বীরপদ উক হয়ে উঠল। যেন
এমন একটা কথা বলার যোগ্যতা উনি নিজেই অর্জন করেছেন।
বিষয়টি চোপে প্রোঙ্কর বিজ্ঞপের হয়ে বলল, তা হবে। কিন্তু বে-ভাবে
তুমি আমার খবর-বার্তা নিছ সেই থেকে, মনে হচ্ছিল লজ্জাটা হচ্ছে
করলে তুমিই দূর করে কেলতে পারো।

চাকরি সোজাসুজি খানিক ঢেয়ে রইলেন তার দিকে, তারপর
খুব স্পষ্ট করে জবাব দিলেন, পারি। তুমি রাজি আছ?

পারেন যে, সে সবকিছু লক্ষ্যের লেশমাত্র সেই বেস। সরাসরি

এমন একটা প্রস্তাবের মুখে পড়তে হবে জানলে বীরপদ বিজ্ঞপের
চোঁ মা করে খোঁটাটা হজম করেই যেত। কিন্তু যত না বিজ্ঞত
বোধ করল তার থেকে অবাকই হল বেশি। রমণী-মহিমায় রাজার
রাজ্য টলে শুনেছে, এই বা কম কি। জবাবের প্রতীকায় চাকরি
শ্রমনি চেরে আছেন ওর দিকে।

হাসিমুখে বীরপদ পরাজয়টা স্বীকার করেই নিল এক রকম,
বাক, তাহলে পারো বোকা গেল—
তুমি রাজি আছ কি না তাই বলো।

এবারে বীরপদর ছুচোখ তার মুখের ওপর ঘুরে এলো
একবার পরিহাসের আভাসমাত্র নেই, বরং ওর জবাবেরই নীরব
প্রতীক। বিষয়ের বদলে এবারে বীরপদ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ
করছে কেমন, মনে হচ্ছে, ওর ব্যক্তিগত প্রশ্নে চাকরির
এতক্ষণের এত জেরা শুধু এই প্রশ্নটার মুখোমুখি এসে ঠাঁড়ানোর
জন্তেই। রমণী-মন-পথনের এ আবার কোন ইশারা ঠিক
হয়তে পারছে না। রাজি হোক না হোক, এই বসে চাকরির
এমন জোরের উৎসটা কোথায় জানার কৌতুহল একটু ছিল। হেসে
বিস্তৃতভাবটাই প্রকাশ করল, যাবড়ে দিলে যে দেখি, উপকার না
করে ছাড়বে না?

একটু থেমে চাকরি বললেন, উপকারটা তোমার একার নাও হচ্ছে
পারে।

আর আবার কার, তোমারও?

চাকরি বিবস্ত্র হয়েও হেসে ফেললেন, বড় বাজে কথা বলো,
বা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও না?

বেশ একটা বিড়ম্বনার মধ্যেই পড়ে গেল বীরপদ। আর গলা
না বাড়িয়ে কেন জানি প্রশঙ্গটা এবারে এড়াতেই চোঁা করল সে।
হট্টলে থাকতে যে-ভাবে কথাবার্তা কইত অনেকটা সেই সুরেই বলল,
এই না হলে আর মেয়েছেলে বলে, আঠারো বছর বাদে সবে তো
হ'রনের দেখা—আঠারোটা দিন অন্তত দেখে নাও মানুষটা কোথা
থেকে কোথায় এসে ঢেকলাম!

আমার দেখা হয়েছে, সে ভাবনা তোমার—তুমি যদি বদলেই
থাকো আজকের ব্যবস্থার কাল বদলাতে কতক্ষণ?

সাক জবাব। অর্থাৎ, সেবো ঘন, বুঝব মন—কেড়ে নিতে
কতক্ষণ। কিন্তু এ নিয়ে বীরপদ আর বাক-বিনিময়ের অবকাশও
পেল না। চাকরি খাট থেকে নেমে ঠাঁড়ালেন।

পার্বতী।

এই এক নামের আহ্বান-বৈচিত্র্য আজ অনেকবারই শুনেছে।
পার্বতী দোর গোড়ায় এসে ঠাঁড়াল। রাতের আলোর হোক বা যে
জন্তেই হোক, মুখখানা অতটা ভাবলেশমূল্য পালিশ করা লাগছে
না এখন।

মামাবাবু এখানে খেয়ে বাবেন।

নির্দেশ শ্রবণ এবং প্রোধান। এর মধ্যে আর কারো কোনো
বক্তব্য নেই যেন। পার্বতী চলে বাবার পরেও বীরপদ হস্ত আপত্তি
করত বা বলত কিছু। কিন্তু সেই চোঁটার আগেই চাকরি সোজা
টেবিলে গিয়ে বসলেন। প্যাড আর কলম টেনে নিয়ে হুঁচোর
মুহুর্ত ভাবলেন কি, তারপর চিঠি লিখতে শুরু করে দিলেন

বীরপদ নির্ধাক হঠাৎ।

দাঁত মল্ল হইল।

আজও চাকরির গাড়ি করেই বীরপদ বাড়ি কিয়ছে। বুকপকেটের খাঁকি বার হই উটে-পাটে দেখেছে। এ আলোর দেখা সন্তব নয়, দেখেও নি—অস্বস্তিকর কৌতূহলে হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছে শুধু।

তেরমি নীল খাম, যেমন ডাকে এসেছিল সেদিন। অপরিচিত নাম, অপরিচিত ঠিকানা, পরিচয় ভাবে আঁটা। চাকরি খাম আঁটেন বটে, এমাখা-ওমাখা নিশ্চিন্দ। বীরপদের কৌতূহল অনেক বার ওই বন্ধ খামের ওপর থেকেই ব্যস্ত হয়ে ফিরে এসেছে।

আকাশের পরীরা একবার নাকি বড় মুশকিলে পড়েছিল। বিধাতার বরে তাদেরও বর দেবার ক্ষমতা জন্মেছিল। কিন্তু ওদিকে যে বরের যুগের বিধাতা যেতে বসেছে বেচারীরা জানত না। বর দেবার জন্তে তারা মানুষের রাজ্যে বধন-তখন এসে ঘূর্ণ-ঘূর্ণ করত আর বর দেবার কীক খুঁজত। চুপি চুপি অম্ববোধ উপদ্রোহও করত একটা বর প্রার্থনা করবার জন্তে। একেবারে করল দশা তাদের।

গল্পটা মনে পড়তে বীরপদের প্রথমে মজাই লাগছিল। এই আঁটারো বছরে চাকরিরও হয়ত কিছু দেবার ক্ষমতা জন্মেছে, কিন্তু দেবার লোক সোটেই নাকি!

চাকরি বর গছালেন?

পরী গল্পের শেষটা মনে পড়তে বীরপদ একা একাই হেসে উঠেছিল। এক পরীর তাগিদে উতাক্ত হয়ে একজন্ম মানুষ বর চেয়েই বসেছিল। চাইবার আগে পরীর মিষ্টি হুখখানি ভালো করে দেখে নিয়েছিল। শেষে বসেছিল, বর দেবে তো ঠিক? পরী বসেছিল, বর দেবার জন্মেই তো হাঁসফাল করছি—সত্যাবদ্ধ হয়ে বর দেব না, বলো কি তুমি!

তাহলে ওই ডানো দুটি আগে খোলো!

কিছু না বুঝেই পরী ডানো খুলেছিল।

এবার আমার রমণীটি হয়ে এখানেই থেকে যাও।

ভারতে মল্ল মজা লাগছিল না বীরপদের, বর গছিয়ে ফেলে চাকরি যদি বিপদই ডেকে এনে থাকেন নিজের। চিঠিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল আবারও, আঁটে-পুটে আঁটা—বরের নমুনাটা আনা গেল না।

চিঠি হাতেই থাকল :—ভাবছে। প্রথম কৌতূহল আর কৌতূহলভূতির পরে ভাবনাটা বাস্তবের দিক গড়াতে লাগল। চিঠি নিয়ে এক ভ্রমলোকের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে হবে কাল বা পরের মধ্যেই। চাকরির সেই রকমই নির্দেশ। পরন্তু হবিবার, কি হল না হল সোমবার চাকরিকে এসে খবর দিতে হবে। চিঠি হাতে নিয়েও বীরপদ একটু আগ্রহী করেছিল, বসেছিল, একেবারে অপাঙ্গে করণ করছ চাকরি, চাকরিতে অনেকবার মাথা গলিয়েছি, কোথাও মানিয়ে নেওয়া গেল না—

চাকরি থাকি মূখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিয়েছেন, সেটাই ভরসার কথা, খুব তাহলে বলানি তুমি।

বীরপদের হুঁসিখা সেগেছিল। অভিনব ব্যাপারটার আগাগোড়াই হুঁসিখা লাগছে এখনও। কার সঙ্গে দেখা করতে হবে? চাকরির না ব্যবসায়ার? বাই হোন, বড় লোক নিশ্চয়ই। কিন্তু কে চেনে

তো না। কলকাতার পরেই রমণীর ভাতারী তো একটি হুটি নয়—ভড়াছড়ি। এক একজন্মের বিস্তার অল্প ওনলে হাটফেল করার লাখিল। ক' জনকেই বা চেনে।

তবু কে ভ্রমলোক?

মুষ্টির পাটে বীরপদ একটা মূর্তি হাতড়ে বেড়ালো কিছুক্ষণ। মুখ স্পষ্ট করা পড়ছে না। বীর, গছীর অথচ হুখখানা বীর হাসি হাসি, কানের হু' পানের চুলে একটু একটু পাক করার বীর ব্যস্তিদের কাছে বীরপদের প্রায় ছেলেমানুষ মনে হত নিজেকে।

তিনিই কি?

...কিন্তু তাঁর তো নিজের পাড়িও ছিল না তখন। চাকরির পাড়িতেই ঘুরে বেড়াতে।

চিঠি নিয়ে দেখা করতে বাবে কি বাবে না সেটা পরের কথা। বোধহয় বাবেই না, চিঠিতে চাকরি ওর হয়ে সংস্থান ভিক্ষা করেছে কিনা কে জানে। একবার দেখতে পারলে হত কি লিখেছে। কিন্তু ওর তাগিদ নেই জেনেও চাকরি চেষ্টা করতে বাবে কেন। চাকরির এই ব্যাপারটাই অদ্ভুত ঠেকেছে তার কাছে। শুধু এই ব্যাপারটা নয়, আজকের গোড়া থেকে সবটাই। এব আগের দিন যে চাকরিকে দেখেছিল, এমন কি পোচা নার্সারির সেই ফুল-বিশেষজ্ঞটির সামনে সমস্তা-ভারাক্রান্ত যে চাকরিকে দেখেছিল, তার সঙ্গে এই চাকরির বেশ তফাত।

এই চাকরির ভিতরে ভিতরে যেন অনেক সমস্তা। এই চাকরি গ্রহণ করতে জানে।

বীরপদ ভাবছে, কিছু একটা জট ছাড়াবার মত করেই ভাবছে। চিঠিতে ডেকে পাঠানো সম্বন্ধে ও বারনি, পাড়ি হাঁকিয়ে চাকরি নিজেই এসে ওকে ধরে নিয়ে গেছে। অস্বাভাবিক আগ্রহে ওর এই অলস মরচে-খরা জীবনের খবরাখবরও জানতে চেয়েছে। জেনে খুব যে হুঁসিখত হয়েছে মনে হয় না। উল্টে মনে হয়েছে, ওর এই আলো-নেভানে ছোড়াভাড়া অবস্থাটাই কিছু একটা উদ্দেশ্যই অল্পকূল তার। চাকরি ব্রহ্ম করত, ভালও বাসত হয়তো—কিন্তু সেই ব্রহ্ম বা ভালবাসাও ছিল ভক্তের প্রতি করণার মতই। তার বেশি কিছু নয়। ভক্তের প্রতি মায়া একটু আধটু কার না থাকে? কিন্তু এই দেড় যুগেও সেটা আটট থাকার কথা নয়। উল্টো হওয়ার কথা এখন। চাকরির এই প্রাচুর্যের মধ্যে সে-তো মূর্তিমান ছন্দপতন। তার বিশ্বাসিকারী জীবনের এই অন্ধের ও তো কোনো সুবাসিত দর্শক নয়, বাঃ সৃষ্টির কাঁটার মতই।

চাকরিরই এড়িয়ে চলার কথা সব দিক থেকে।

তাব বদলে এই চিঠি। কি চিঠি কে জানে। উদ্দেশ্য বাই থাক, ওর দারিদ্র্যটাই কল্যাণ করে একে দেয়নি তো! দিক, বাচ্ছে কে।

কিন্তু এই এক চিঠির তাড়ম্বর পরের দিনটাও প্রায় জেবে ডেবেই কেটে গেল। এমন কি এই ভাবনার কীক দিয়ে তার প্রতি স্নলতান সৃষ্টির বাসিন্দাদের সত্তা আগ্রহ কৌতূহলও হুঁটি এড়িয়ে গেল। গত রাতে বীরপদ দু' থেকে পাড়ি ছেড়ে ঘেরনি, অজ্ঞমনস্কতার কলে পাড়িটা স্নলতান সৃষ্টির আভিনায় মধ্যেই হুঁক পড়েছিল। আজ সকালে বহুদলতার বেশির হাঁকায় আসরে ওকে নিয়ে অনেক বিস্ময়জনক জল্পনা-কল্পনা হয়ে গেছে। হাঁকো

লোকের কলে বাটব গল্গল আজ সবটাই ফুরিয়েছে। ওই চুই বুড়ার কাছে আজ রমণী পণ্ডিতের কল হয়েছ একটু। আর হাই হোক, পেশাদার দুঃস্রষ্টা তিনি। তাঁর অমায়িক দূর-দর্শনে শুননি ভট্টাচার্য আর একাদশ শিকলার কখনো জুড়টি করেছেন কখনো বা বোমাকিত হয়েছেন। কিন্তু বীরাপদ এসব কিছুই লক্ষ্য করেনি।

মধ্যাহ্নে হোটেল থেকে খেয়ে ফেরার সময়ে সোনারবউদির সঙ্গে একবার চোখোচোখি হয়েছিল। সোনারবউদি নিজের ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে মুচকি হেসে সরে গেছে। ওর ঘরে এসে সরাসরি জেরা করতে বসল বরং বীরাপদ খুশি হত। কথায় কথায় সবই বলা যেত সোনারবউদিকে। ঠাট্টা কক্ক আর বাই কক্ক, পরামর্শ ঠিক দিত।

বিক্রি আশার সময় আসাটা সোনারবউদির রীতি নয়।

চাকদার চিঠি নিয়ে নির্দেশমত কাল একবার দেখা করে আসার কথাই বীরাপদ ভাবছে এখন। না গেলে চাকদার আবারও এসে উপস্থিত হবে কিনা ঠিক কি। আর একটা কথাও আজ ভাবছে। শুধু প্রার্থণ নয়, চাকদার চলনে বসনে বেশ একটা আত্মপ্রত্যাহার মর্মান্বোধন বীরাপদ লক্ষ্য করেছে। অকারণে একটা হাতা বাপার করে বসে চাকদার নিজেকে খেলা করতে পারে সেটা আজ আর একবারও মনে হচ্ছে না।

তা'ছাড়া, না গেলে বিবেকের তাড়না। ওর নিষ্ক্রিয় পরিহার প্রবৃত্তিটাই তাহলে বড় হয়ে ওঠে। চোখে আঁড়ল দিয়ে চিঠিটা ওর এই নিশ্চেষ্ট আত্মবিকার প্রবৃত্তিটাই যেন দেখিয়ে দিচ্ছে বারবার। তুমি পেলে না? না পেতে চাইলে না? না পাও নাই পেলে কিন্তু পেতে না চাওরটা দেখেব। আশার সদর রাস্তার চলে অনেক ধোঁচট খেয়েছ? অনেক হতাশা অনেক উদ্বেগ অনেক চিন্তা আর ভুগেছ?

তবু। আশার আলো নিভিয়ে নিষ্ক্রিয়তার বিবরে গিরে চুকে চাইলে নিজের কাছেই নিজের ক্ষমা নেই।

ঠিকানা মিলিয়ে বীরাপদ যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল, চাকদার বাড়ি দেখার পর এমন একটা বাড়িতে আসছে একবারও কল্পনা করেনি। যেতণ গঠন, নীতি আছে—ছাঁদ-ছিরি নেই। খুব পূর্বনো নাও হতে পারে, কিন্তু অনেকখানি অবস্থা আর উপেক্ষা নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে বোকা বাব। এক সুগেব মধ্যও ওর বাইরের অবয়বে অজ্ঞত বং পালিশ পড়েনি।

রাস্তা ছাড়িয়ে একটা ব্লাইণ্ড লেনের মুখে বাড়িটা। সামনেই ছোট উঠানের মত খানিকটা জায়গা। সেখানে বৃটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। একটা ছোট একটা বড়। ছোটটা বগলেপা লাগা, নতুন। বড়টা গাঢ় লাল রঙের, তার চালকটি মাঝের পাটশনে মাথা রেখে বসেছে। ছোট গাড়ির চালকের আসন শূন্য।

বীরাপদ দরজার কাছে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। বাড়িতে জন-মানব আছে বলে মনে হয় না। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে জানালাগুলোও বেশিরভাগই বন্ধ। ভিতরে ঢুকেই ডাইনে বাঁয়ে ঘর, সামনের দরজার ওধারে লোভলার সিঁড়ি। আশার মধ্যে বাইরের চৌকঠা পেরিয়ে দরজার কোশে কল্লি কো কোশে পড়ল

একটা। আরো একটু অপেক্ষা করে অগত্যা বীরাপদ সেটাই চড়াও করে দেখল একবার।

একটু বাদে বাঁ দিকের ঘর থেকে মাঝবয়সী একজন লোক এসে দাঁড়াল। ঠাকুর চাকর বা সেই গোছেই কেউ হবে। শয়ান আরাম ছেড়ে উঠে আসতে হয়েছে বোধহয়, কারণ শীতে লোকটার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। এক কথার জবাবে তিন কথা বলে সত্য্য দায় সেরে ফেলতে চেষ্টা করল সে। বীরাপদ জানল, হিমাত্ত মিত্রের এই বাড়ি, কিন্তু সাহেব এখন বাস্তব—মিটি করছেন, আগের থেকে 'এপোন্টমেন' না থাকলে দেখা হওয়া শক্ত।

কিন্তু বীরাপদের বরাত ভালো, বাইরের দিকে চোখ পড়তে লোকটা অল্প সমাচার শোনাশো। গাড়ি তো দেখছি না, মিটি তাহলে হয়ে গেছে, আপনি ওপরে চলে যান—

অর্থাৎ মিটি বখন হুঁসল তখন আরো গাড়ি ছিল। বীরাপদ মোলারেম করে বলল, একবার খবর নিয়ে গিয়ে হত না।

লোকটা তার দরকার মনে করল না, কারণ, ওপরে বেরায়া আছে, তাছাড়া ছোট সাহেবও আছেন, দেখা যদি হয় ওপরে গেলেই হবে। আর কাল-বিলম্ব না করে সে বেশিক থেকে এসেছিল সেমিকেই অদৃষ্ট হয়ে গেল।

অতঃপর পায়ে পায়ে উল্ল'পথে।

দোরগোড়ার বেরায়া না দেখে বিধাবিত চরণ ঘরের মধ্যে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। আর দু'চার মুহূর্তের একটা নয়নাভরা মৃদু স্মৃতি স্মৃতি হয়ে বিস্তৃত বোধ করতে লাগল। বড় হল ঘর একটা, বেশ সাজানো-গোছানো। তার মাঝামাঝি স্তায়গার দাঁড়িয়ে বড় সড় পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে একটি মেয়ে। সামনের দিকে মুখ করে আছে বলে মুখের আনখানা দেখা যাচ্ছে। হলের ওধারে আর একটা ঘর, মাঝে মাঝে দরজার সামনে ফাইল হাতে একটি ফিটকাট তরুণ ওখান থেকেই হাতের ইশারায় মেয়েটিকে কিছু বলছে। হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে খুব সন্তুষ্ট আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার অনুরোধ। এলিক মেয়েটির মুখে বৃহৎ হাসির অভাঙ্গ। জবাবে ফোলিও ব্যাগ হুহু বা-হাত তুলে ডান হাতের আঙুলে করে বাড়ির কাঁটা ইশারা করছে সে।

শেইকণে আবির্ভাব।

খুব শুভ আবির্ভাব নয় বোধহয়।

এদিক ফিরে ছিল বলে ঘরের মানুষটিরই আগে দেখার কথা ওকে। সেই দেখল। বীরাপদ ঘরে নিল এই ছোট সাহেব। তার দুটি অঙ্গুরণ করে মেয়েটিও ঘুরে দাঁড়াল। সঞ্জন নিরীক্ষণ করল। ঘরে স্নহে এগিয়ে এলা। এই টুকুর মধ্যেই বীরাপদের মনে হল, আসাটা রমণীর ছন্দে নয় ঠিক, কিছুটা পুরুষ স্নগত মিলিপ্ত রঙের।

ক'কে চান?

ওকে নীরব দেখে নিজেই ভ্রমাসা করল।

হিমাত্ত বাবু—

এক পলক দেখে নিয়ে বলল, মিঃ মিত্র এফুনি উঠে পড়বেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ক্যাসাদ কম নয়, বাক্যে চাকদার কাছ থেকে? বলল, একটা চিঠি ছিল, তাঁকে দিতে হবে—

হাত বাড়াল, দিন।—সামান্য কথাটা বলতেও ইতস্তত করছে দেখেই চরিত্র প্রকাশের বিষয় একটু।

এই গুণগোলে পড়তে হবে জানলে ঘোরাপন চিঠির কথা বলত কি না সন্দেহ। নিচের লোকটা বলেছিল ওপরে বেরায়া আছে। সেই হাতে চিঠি সম্পন্ন অনেক সহজ হত হত। কিন্তু বেরায়া বোধহয় প্রভুর আগেই উঠেছে।

খামটা উল্টে পাণ্টে দেখে নিয়ে মেখেটি আর একবার তাকালো। ঠিকানায় নারী-অক্ষর-বিভাগ দেখে সন্তুষ্ট। তারপর চিঠি হাতে ফিরে চলে। হাফ-দরজা সংলগ্ন সুন্দরনিটি তখনো ঝাঁড়িয়ে। খামবন্ধ রমণী-বাহুর ইশারায় তার প্রতি আর একটু অবস্থানের ইঙ্গিত। পত্র-বাহিনীর এই ফিরে যাওয়াটুকুও তেমনি সবল-মার্ধ্য পুষ্ট বিলম্বিত লাগে। দেখে পুরুষের চোখ একটু সজাগ হলেও আত্মবোধ কিছুটা দুর্বল হবার মত।

চিঠিখানা সেই তরুণের হাতে দিতে সেও সেখান থেকে ঘোরাপন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা, তারপর হাফ-দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। মেয়েটি ফিরে এসে একটা সোফায় বসল, হাতের অতবড় ব্যাগটা কোলের ওপর। সোফার মাথা রেখে চোখ বুজল কি না বোঝা গেল না।

একটু বাদে সত্তবণর-ছোট সাহেবটি হাফ-দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে দূর থেকেই ঘোরাপনকে ইঙ্গিতে জানালো, সে ভিতরে গিয়ে সাফা করতে পারে। তারপর এগিয়ে এসে মেয়েটির পাশে ধুপ করে বসে পড়ল। অসহিষ্ণু অভিব্যক্তি, তাই দেখে মেয়েটির মুখে চাপা-কৌতুক।

হু'জোড়া চোখের ওপর দিয়ে বীর পায়ে ঘোরাপন হাফ-দরজার দিকে এগোলো। এদের চোখে নিজেকে কেমন অবস্থিত লাগছে বলেই ভিতরে ভিতরে অপ্রতিভ। এমন একটা ছোটো মুষ্টি তারও চোখে পড়েছে, যাদের দেখে মনে অকাবণ-বিরক্তির ছায়া পড়ে এক ধরনের। এর আগে নিজেকে সেই জাতের ভাবেনি কখনো।

ভিতরে ঢুকল। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে রিভলভি চেয়ারটা ভরাট করে বসে আছেন একজনই, ঘরে দ্বিতীয় কেউ নেই। ভানি মুখে মোটা পাইপ, আয়ত চোখে লাইব্রেরি-ক্রিম চশমা। পরনে ধামী স্কাট।

মনে মনে ঘোরাপন একেই দেখবে আশা করেছিল।

আঠার বছর বাদে দেখেও চিনতে একটুও দেরি হল না। বয়েস এখন বোধ হয় সাতাশ আটাল। চাকরির শক্ত বাড়িতে একেই দেখত মাঝে-সাজে। তেমনি গভীর অমচ হাসি হাসি মুখ। কানের হু'পাশের চুলে তখনই শাক ধরেছিল, এখন ঐ-কটা চুল আছে সবই রেশমের মত শাদা। আঠার বছর আগের দেখা সেই পুরুষোচিত রূপে বয়েসের লাগ পড়েছে, ছাপ পড়েনি।

ঘোরাপন হু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো।

রিভলভি চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে আয়ল করে বসলেন তিনি, দাঁতে পাইপ চেপে মাথা নাড়লেন একটু। সেই কীকে নীরব ঔৎসুক্যে লেখেও নিলেন তাকে। তারপর ইঙ্গিতে সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

চাকরির চিঠিটা টেবিলের ওপর থোলা পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে একবার চোখ বোলালেন। পরে চিঠি পকেটে রেখে চেয়ার ঘুরিয়ে ওর মুখোমুখি হলেন। চাকরি চাই?

চাই বলতে বাধল। আর, চাইনে বললে এলো কেন? নিষ্কণ্ডরে হাসল একটু।

চশমার ওধারে দুটো চোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে। হু'-চাপটে বাহুলী প্রশ্ন, কতদূর পড়াশুনা করেছে, চাকরির কি অভিজ্ঞতা, এখন কি করছে, ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, ঘোরাপনের কোনো জবাবই স্বত্তি নিয়োগের অঙ্গুল নয়। এরপরেই খুব সহজ ভাবেই ভারী একটা বৈখাঙ্গী প্রশ্ন করে বসলেন তিনি। বললেন, যিনি আপনাকে চিঠি দিয়েছেন, তিনি লিখেছেন আপনি খুব বিখ্যাত, আই মিন ভেরি ভেরি বিলায়েবল—রিয়েলি?

ভুল্লোকের হু'চোখ শিথিল বিস্ময়বর্ণ রত। ঘোরাপন জবাব কি দেবে!—সেটা উনিই জানে—

উনি কত দিন জানেন?

ছেলেবেলা থেকে।

তুফর মাঝে ঈবং কুকুন-বোখা পড়ল। ওর দিকে চেয়েই কিছু স্মরণ করার চেষ্টা।—ডাট মাইণ্ড, তাঁর সঙ্গে আপনার কত দিন পরে দেখা?

ঘোরাপনের অসুস্থমান টেলিফোনে এর সঙ্গে চাকরির আগেই আলোচনা হয়েছে। তাই প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝলেও বখাষ জবাব দিল, প্রায় আঠারো বছর—

দেখছেন নির্বাক করে, মুখ আরো একটু হাসি হাসি।—এ শ্রিটি লং টাইম, এতগুলো বছরে যে কোনো। লোক একেবারে বদলে যেতে পারে—কি বলেন?

বিজ্ঞের আভাস বেন। ঘোরাপনের মুখে সশয়ের চকিত ছায়া একটা। চূপ-চাপ চেয়ে রইল। তিনি আবার বললেন—বললেন না, পরামর্শ দিলেন বেন, গরম জলের কেটলির মুখে কিছুক্ষণ ধরে রাখলে খাম খোলা সহজ হয়, নেস্ট টাইম ইফ ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, টাই ভাই ওয়ে।

এমন এক অশোভন ব্যাপারে ধরা পড়েই বেন ঘোরাপনের এই অনভ্যস্ত পরিবেশে এসে পড়ার জড়তা গেল। নিজের নির্বিকার সহন্যতার আশ্রয় হতে সন্ধ্য লাগল না। সেই সঙ্গে বেশ একটু কৌতুক-বৈচিত্র্যের আশ্রয়। মনে মনে ভুল্লোকের প্রশংসাই করতে হল, এমন হতে পারে—ভাবেনি। তাঁর দিকে চেয়েই নিরাসক্ত জবাব দিল, চিঠিটা পড়ে ছিড়ে ফেলব বলে খুলেছিলাম।—আমার জ্ঞত চাকরি ভিক্ষা করা হয়েছে ভেবেছিলাম। তাতে আপত্তি ছিল।

চোরের মুখ হল না দেখেই ভুল্লোক বিশ্মিত হচ্ছিলেন, কথা শুনে বেশ অবাক।—চাকরির দরকার নেই?

ঘোরাপন হালকা জবাব দিল, দরকার আছে কি নেই এতদিনে সেই বোধটাই গেছে। আচ্ছা, নমস্কার—

সীট-ডাউন ব্রীক—

চেয়ার ছেড়ে উঠে পাঁড়ার মুখে অপ্রত্যাশিত একটা তাকাত খেরেই ঘোরাপন বসে পড়ল আবার। রিভলভি চেয়ার ঘুরিয়ে পাইপ ধানোর কীকে কীকে তাঁর বড় দৃষ্টি আরো বার কতক ওর মুখের ওপর এসে পড়ল। আগের মতই হাসি হাসি দেখাচ্ছে, লাইটায় পকেটে ফেলে বসলেন, তুমি কাল থেকে এসো—তাল বি হ্যাভ টু হ্যাভ-ইউ উইথ আল—

ইলেকট্রিক বেলএর বোতাম টিপলেন। প্যাঁক করে শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের তরুণটির প্রবেশ। পাইপের মুখ হাতে নিয়ে হিমালয় মিত্র উঠে দাঁড়ালেন। সৌভাগ্যের বীতি অস্বাভাবিক উঠে দাঁড়ানো উচিত বীরপদরও, কিন্তু সেটা খোয়াল থাকল না। সে দেখছে এখনো তেমন উন্নত বন্ধু বাস্তব ভ্রমলোকের।

বীরপদকে দেখিয়ে আগন্তকের উদ্দেশ্য বললেন, ইনি কাল থেকে আমাদের অর্গ্যানাইজেশনে আসছেন—নাম ঠিকানা লিখে নাও আর কোন কাজ স্টট করবে আলাপ করে দেখো, তার পর কাল আলোচনা করা যাবে। বীরপদকে বললেন, এ আমার ছেলে সিতাংশু মিত্র—অর্গ্যানাইজেশন চীক।

বীরপদ উঠে দাঁড়াল। নমস্কার বিনিময়।

হিমালয় মিত্র ততক্ষণে দরজার কাছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে এসেছে?

ছেলে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।

এলে বোলে! তার ভক্ত আমি যদি ধরে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি।

ফ্যাঙ্কবীতে টেলিফোন করেছিলে?

নেই সেখানে।

হাফ-দরজা ঠেলে ভ্রমলোক বেরিয়ে এলেন। অর্গ্যানাইজেশন চীক সিতাংশু মিত্র এবার তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। মুখভারে একটুও তুট্ট মনে হল না তাঁকে। বসতেও বলল না। হাবভারে বাস্তবতা। জিজ্ঞাসা করল, কি চাকরির জন্তে এসেছেন বলুন তো?

বীরপদ হাসিমুখে জবাব দিল, আপনাদের কোন চাকরির সম্বন্ধেই আমার একটুও ধারণা নেই।

ও... টেবিলের পাণ্ড টেনে নিল।—নাম ঠিকানা বলুন।

হাফ-দরজা ঠেলে এবারে ঘুরে চুকল সেই মেয়েটি। শিখিল চরণ এবং নিয়ামক মুখে ভিতরে এসে দাঁড়াল। হাতে ব্যাগটা নেই।

বীরপদ নাম ঠিকানা বলল। এর পরের আলাপ আরো অস্বস্তিকর লাগবে ভাবছে। কিন্তু আলাপ আজকের মত ওখানেই শেষ দেখে হাঁপ ফেলে বীচল। সিতাংশু মিত্র বলল, আচ্ছ! আপনি কাল তো আসছেন, কাল কথা হবে—আজ একটু ব্যস্ত আছি।

ওকে বিদায় করার ব্যস্ততার কাল কখন আসবে তাও কিছু বলল না। নিম্পাঙ্ক রমণী-দৃষ্টি টেবিলে জোড়া কাচ আবারের নিচের চাটটার ওপর।

বাস্তব নেমে বীরপদ পায়ে পায়ে হেঁটে চলল। হাসিই পাচ্ছে এখন। কি চাকরি করতে হবে বা কত হাইনে পাবে সে সম্বন্ধে খুব কৌতুহল নেই। শুধু ভাবছে ব্যাপার বদল হল না।

পাশ দিয়ে সেই টকটকে লাল বড় গাড়িটা বেরিয়ে গেল। বীরপদ সচকিত একটু। না, ভ্রমলোক একে দেখেননি, শিখনের সীটে মাথা রেখে পাইপ টানছেন। গাড়ি আড়াল হয়ে গেল।

মনে মনে বীরপদ আবারও তারিক করল ভ্রমলোকের। চোখ বটে। কি করে বুঝলেন চিঠি খোলা হয়েছে সেটা একদা বিস্ময়। কথাবার্তা টাল-টাল স্টুট, ব্যক্তি-ব্যক্তি। অস্বস্তি বৃদ্ধি হাঙ্গি হাঙ্গি। আঠার বছর আগেও প্রায় এই বকমই দেখেছিল মনে পড়ে।

বীরপদ ধমকে দাঁড়াল।

আর একটা গাড়ি। সেই মশমশে শাদা ছোট গাড়িটা। বড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। ডাইভ করছে অর্গ্যানাইজেশন চীক সিতাংশু মিত্র। পাশে সেই মেয়েটি। আশ্চর্য প্রতীতি-চেতন। পলকের দেখা বসার শিখিল ভক্তিকটক সেই বকমই মনে হল। বীরপদের আবির্ভাবে ছোট সাহেবটির বিরূপ অভিযান্ত্রিক হেতু বোঝা গেল এতক্ষণে। ও এসে বড় সাহেবকে আটকানোর ফলে এদের কিছু একটা আনন্দের ব্যবস্থা বরবাদ হতে বাসেছিল বোধহয়! ওপরের হল-ঘরে ইস্তিতে একজনকে সেই হুঁ-পাঁচ মিনিট প্রতীক্ষা করার অমুনয় এবং আর একজনের বাড়ির কাঁটা দেখানোর দৃষ্টান্ত মনে পড়ল। বীরপদ হাসতে লাগল, বিসদৃশ অভ্যর্থনার দরুন আর কোনো অভিযোগ নেই। গঙ্গা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়নি এই ঢের। কত হবে বয়েস? মেয়েটির পঁচিশ ডাব্বিশ, ছেলেটিরও আটশ উনত্রিশের বেশি নয়। কিন্তু মেয়েটার কাছে ছেলেটা একেবারে ছেলোমামুহ যেন।

কোন দিকে যাবে ভাবতে গিয়ে বীরপদের মনে হল আজই একবার চাকরির সঙ্গে দেখা করা দরকার। এখুনি। কাল বাবার কথা। চিঠি খোলার ব্যাপারটা চাকরি আর কতো মুখে শোনার আগেও নিজেই বলবে। শ্মশি স্বীকৃতিরও মর্যাদা আচ্ছ, আপাতত ওটুকুই হাতের কড়ি। আজ যাওয়াই ভালো।

দু'কম নয় চাকরির বাড়ি। দুটো বাসে মিলিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ।

গেট পেরিয়ে অজ্ঞানদের মতই দালানের দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ বীরপদের হুঁচোখ যেন এক জুঁপ লালের থাকায় বিবম একটা হেঁচট খেল। পা দুটো স্থায়ী মত আটকে গেল।

হতভম্ব! চোখ দুটো কি গেছে!

গেট থেকে বাড়ি পথভ্রম লালমাটির রাস্তা আর বাগান-ভরা লাল ফুলের সমারোহের মধ্যে সিঁড়ি-লাগ লাল নিশানটা তেমন বিচ্ছিন্ন মনোযোগে লক্ষ্য করেনি।

সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হিমালয় মিত্রের টকটকে লাল গাড়িটা।

সম্ভিত কিরতে বীরপদ ঘুরে গেটের দিকে পা চালিয়ে দিল আবার।

[ক্রমশঃ]

ডাঃ বঙ্গুর
অশোক কার্ডিয়েল
নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে
প্রথম প্রস্তুতকারক:
ডাঃ বঙ্গুর ল্যাবরেটরী লিমঃ
কলিকাতা-৯

ভলতেয়ার—জীবন ও দর্শন

উপমহ্য

১৮৪২ সালের প্যারিস Merope নাটকের মহলা চলেছে। পরিচালক স্বয়ং নাট্যকার—ভলতেয়ার। নাট্যিক কিছুতেই পরিপূর্ণ আবেশ দিয়ে তার কৃষিক অভিনয় করতে পারছে না। পরিচালক নানাভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই মনের মতো হচ্ছে না। বেচারি নাট্যিক শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়লো। না, আমি পারবো না ভেতরে একটা জাগ্রত শয়তান থাকলে তবেই এই অভিব্যক্তি সম্ভব। আনন্দে লাকিয়ে উঠলো পরিচালক এই তো, ঠিক ধরেছো কৃষি। শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাক্ষর রাখতে গেলে শয়তানের দাসত্ব করতেই হবে। প্রবর্তীকালে সমালোচক, আর লক্ষ্য অনেকই ভলতেয়ারের জীবনে এই সংজ্ঞার পরিপূর্ণ প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভলতেয়ারের দেহে শয়তান বাস! বৈধেছিল বলে গেছেন Sainte-Beuve। De Maistre এতেও ভুল না হ'য়ে বলেছেন আর তাঁর হাতে ছিল নরকের সব কিছু শক্তি।

সাদামাটা কুৎসিত চোরাচাঁদ, ব্রুথ বড় বড় কথা, অতি-চট্টল, অসত্য এমন কি সময় সময় অসং—এই সব বাছা বাছা বিশেষণ দিয়ে ভলতেয়ারের ঠিক রূপটি আঁকা যাবে না। এক কথার বলা যায় একটা বিশেষ স্থান এবং কালের বসে সে সব কিছুই একত্র সময় এই ভলতেয়ার। সবকিছুই। তবুও অনেক কথা বলা বাকী থাকে, টানা হয় না অনেক বেলা। এই ভলতেয়ারের রাইই আবার দেখা গেছে অসীম দরার প্রকাশ। যে ভলতেয়ার প্রাণ টেল দিয়েছেন, উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর সত্য সেই ভলতেয়ারই বস্তু পশুর হিংস্রতা দিয়ে আক্রমণ করেছেন লক্ষ্যকে! কলম চালিয়ে মারতেও মারা নেই, আবার কৈদে পড়লে বুকে টেনে নিতেও নেই বিধা। সাদা আর কালোর পরিমিত অথচ পরিপূর্ণ সবক'র একই আধারে বিপরীতের বিভিন্ন বিকাশ এই ভলতেয়ার!

চরিত্রের নানা দিক নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুললেও আঁকা হয় না এই বিভিন্ন প্রতিভার অস্তরের রূপটি। প্রতিভা, বিশ্বাসের প্রতিভা ভলতেয়ার। আর সেই প্রতিভার পরিচয় আছে তাঁর জীবনব্যাপী বিপুল সাহিত্যসৃষ্টিতে, এই সৃষ্টির মহাকর্মে অসংখ্য শাখা, অনেক ফুল আর অগণিত ফল। সত্যিই ফুল ফলে সমৃদ্ধ ভলতেয়ারের সাহিত্য সাধনা। ভলতেয়ার নিজের বলেছেন, যা ভাবিতা বলাই হচ্ছে আমার কাজ। ভলতেয়ারের এক একটি ভাবনা যেন নিটোল এক একটি ফুল। ভলতেয়ারের বলা যেন সেই ফুলকে কথার হায়ে গেঁথে সাহিত্যকলার গলার হুলিয়ে দেবার সূচক স্ননিপুণ প্রচেষ্টা।

ভলতেয়ার-সাহিত্যের আকর্ষণ আজ আমাদের কাছে বৈধি নেই। তার কারণ বোধ হয় আদর্শের, যে জীবনায়নের বৃদ্ধে ভলতেয়ার দীর্ঘজীবন করেছিলেন, সেই বৃদ্ধ ভলতেয়ারের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুষ্টি হ'য়েই বয়সি, আজ তার বিস্ময়জনক মৃত্যুও জেপে নেই, আমাদের জীবনের আলোপাশে।

মৃত্যু শতাব্দী এনেছে জীবনের নতুন সমস্তা, আরও নতুন সম্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে নির্ধে গেছে সেই আশ্রয়, যে আশ্রয়ে একদিন লীলা

হয়েছিল ভলতেয়ারের ব্যক্তির, দীপ্যমান হয়েছিল তাঁর সাহিত্যের স্রোত। তাছাড়াও, এই বিরাট ব্যক্তিত্বের, আকাশচুম্বী বনের অনেকখানি জুড়ে ছিলেন আলাপচারী ভলতেয়ার। যত্না মুছে গিয়ে গেছে সেই আলাপের উৎস। আছে শুধু লেখা আর সেই লেখার কীকে কীকে খুঁজে পাওয়া যায় লেখকের অন্তরায়ের জ্যোতিষ্কের পুতায়ির রেশ। এই আলোর রেখার কালের পথ বেয়ে পিছিয়ে গেলে হঠাৎ এক বিশ্বব্যমুখ মুহূর্তে সামনে এসে পড়ে সেই কড়ের মত দুর্দম, আত্মনের মত লেগিতান এক মানুষ। মানুষ কিন্তু সব বিচারে অসাধারণ সব নিরিখেই অসামান্য মানুষের ইতিহাসে বিরাটতম মানসশক্তির আধার এক মানুষ।

ভলতেয়ারের লেখাতেই লুকিয়ে আছে এই মহাশক্তির মন্ত্র। অসদ বসে থাকা মানেই আমাদের অস্তিত্বের শেষ। পৃথিবীতে এক অসদ ছাড়া আর সকলেই ভালো, এই হচ্ছে অদ্বৈত, নিরলস কর্তব্যগী ভলতেয়ারের কথা। আরও বলেছেন ভলতেয়ার, বলেছেন, বস বয়স বাড়ছে ততই বৃদ্ধি প্রতি মুহূর্তে কাজ না গেলে বাঁচা যায় না... কাজের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনের প্রকৃত আনন্দ, কাজ দিয়েই ছিঁড়ে ফেলা যায় মোহের আবরণ!

যদি আত্মহত্যা করতে না চাও তাহলে সব সময়ে কাজ নিয়ে থাকো। হয়তো আত্মহত্যার প্রতি গোপন কোনো আকর্ষণ ছিল ভলতেয়ারের, তাই তাকে এড়াবার জন্তেই গড়েছিলেন 'কাজের প্রতি এই নির্বিড় আসক্তি, ১৮৩৪ থেকে ১৭৭৮—প্রায় দীর্ঘ একটা শতাব্দী জুড়ে ছড়িয়ে আছে ইউরোপের সাহিত্যে, সমাজে সর্বত্র একটি মানুষের অগ্নিসম প্রভাব। ভিত্তির হগোর কথার বলতে গেলে বলতে হয়, ভলতেয়ারের কথা বললেই বলা হয় সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মর্মকথা। সত্যিই তাই। ইতালীতে এল নবজাগরণের সাদা, জার্মানীতে বয়ে গেল সাক্ষরের স্রোত। কিন্তু ক্রোধ? ক্রোধে এলেন ভলতেয়ার একাধারে নব জাগরণের স্বমি আর সংস্কারের হোতা। ভলতেয়ারের নেতৃত্বে এখানেই খামল না ফাল। আরো একটু এগিয়ে গেল। পার হল গণজাগরণের সুরধার পথের অনেকখানি, প্রায় অর্ধেক। অতীতকে নুচন রূপে উপস্থাপিত করলেন ভলতেয়ার। সংস্কার আর জনীতির মাধ্যম মারলেন লুথার বা ইসামুদারের চেয়ে জোরালো চাবুক। জীবনের সাধনা দিয়ে ভলতেয়ারই তৈরী করলেন সেই বাক্ষর, যে বাক্ষরে আশ্রয় দিয়ে পুরনো পৃথিবীকে উড়িয়ে দিয়েছিল মিথ্যাবাদী, রাবার্টিডানটন আর হোবসপেরার। কিন্তু সে অস্ত্র কথা, সে অনেক পরের কথা। তবু ভুললে চলবে না যে করাসী বিপ্লবের মাটি তৈরী করে বীজ বুনেছিলেন ভলতেয়ার, তারপর ফসল বেই ফলাক। লামারতিনকে উদ্বৃত্ত করে বলা যায়, সৃষ্টির সাক্ষ্য দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় ভলতেয়ারই আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ লেখক। বিধাতা তাঁকে তিরানী বছরের দীর্ঘজীবন দিয়েছিলেন কমিছু একটা বুগকে তিলে তিলে নিশেষ হয়ে যেতে সাহায্য করার জন্তে। সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি করার সময় তিনি পেয়েছিলেন এবং করের মুহূর্ত মাখার পথে কেসেছিলেন শেষ নিশ্বাস।

পারেননি, কোনো লোকই পারেননি জীবনকালে ভলতেয়ারের মত প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে। নির্বাসিত হয়েছেন তিনি, বন্দী হয়েছেন কারাগারে। রাষ্ট্র এবং ধর্ম দুই বাধা দিয়েছে তাঁকে, তাঁর একের পর এক বই হয়েছে বাজেয়াপ্ত। কিন্তু সত্যকে চেপে রাখা যায় না, মাথা যায় না তাকে গলা টিপে, রক্তের জাঁবায় ছিন্ন করে সত্যের খুঁড়ি উদ্বার হতে দেয়ি হয়নি। তখন সেই ভলতেয়ারের পায়েই লুটিয়ে পড়েছিল রাজা, মহারাজা, গোপ আর পুরোহিতের দল। তাঁর আবাতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি উঠেছিল টলমল করে। তাঁর কথা শোনার আশায় উগ্ৰুথ হয়ে ষাঁড়িয়েছিল অন্ধ্রক পৃথিবীর মানুষ। আগেও অনেক পুরে হাতস্থর সিংহের আবির্ভাব স্বপ্ন দেখেছিলেন নীটশে। ভলতেয়ারই ছিলেন এই স্বপ্নের পিছনে সত্যিকারের মানুষ হলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভলতেয়ার যুগ যুগ সঞ্চিত যত জঞ্জাল, ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছিলেন পুরাতনের ভাষ্যপ্রায় দেউল।

অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক চেতনার এক পরম সক্ষিপণে ষাঁড়িয়ে কাঁপছে ইউরোপের আত্ম। বিরাট ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে, শাসনস্থ সামন্ততন্ত্রের বহুশৃঙ্খলি ছিন্ন করে, মধ্যবিত্ত মানুষের হাতে গিয়ে পড়বার প্রেক্ষিতের মুখে। সভ্যতার এই বিরাট অগ্রগতিতে হাল, ধরলেন দুজন—ভলতেয়ার আর রুশো। ব্যক্তি-মানুষের মনে আত্মপূর্ণের স্বপ্ন রূপ পায় তাঁর চিন্তায়। ইউরোপের মানুষও তখন স্বপ্নের সন্ধানী। আইন এবং আচার—দুয়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ। সকলেই খুঁজছে মনের এই বিকোভের আগুনকে মুক্তি দেবার ভাষা। সকলেই খুঁজছে আশ্রয়—আইনের স্ফুলি থেকে প্রকৃতির শাস্ত্রীতলতায়, আচারের আবর্জনা থেকে সৃষ্টির মুক্ত-আকাশে। এই মুক্ত মানুষের এই সমষ্টির সমস্তা, ভাষা পেল ভলতেয়ার আর রুশোর লেখায়। মুক্ত আকাশের আশ্বাস নিয়ে এলেন ভলতেয়ার, প্রকৃতির শাস্ত্রীতল কোলে ফিরে যাবার পথ দেখালেন রুশো।

নতুন সম্ভাবনার ইজিতে উগ্ৰুথ হল সকলে, সাড়া মিল অনেক। বুর্জোয়া ধনীর দলও সাড়া মিল, কারণ মান রাখতে নতুন পরিবেশকে মেনে নেওয়াই ভালো। সম্মান বিচারে নতুন ভালো ভালো মিলিয়ে চলবার চেষ্টায় গোধ নেই। চললো সকলে, এগিয়ে চললো বাস্তবের লৌহকপাটের পানে। ফরাসীদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের অন্তরালে পুঞ্জীভূত হয়েছিল অনেক বিকোভ অনেক বিব। অলঙ্ঘনীয় আগুন, বিকিবিকি অলঙ্ঘন। এই আগুন প্রথম উৎক্লিষ্ট হল দুই উচ্ছ্বাস ফুল্লকের রূপ ধরে—ভলতেয়ার আর রুশো। তারপর মুক্ত হল ফরাসী বিপ্লবের অগ্ন্যুৎপাত।

বই লুই ভলতেয়ার আর রুশোর লেখা দেখে বলেছিলেন, এই দু'জন মানুষই ফরাসী দেশকে ধ্বংস করেছে। ফরাসী দেশ কঁধাটা বলে লুই বোকাতে চেয়েছিলেন তাঁর রাজবংশ। ঠিক এই ধরনের কথাই শোনা যায় নেপোলিয়নের মুখে—লেখার সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বুর্জোয়াদের আধিপত্যও নিরাস্প হতো। কামানের আবিষ্কারে সামন্ততন্ত্র নিক্তি হয়েছিল, কালি-কলমই এবার আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাকে জেঁদে চূর্ণন করে দেবে। এই কথার সূত্র ধরেই বহুগুণীয় হয়ে যোষণা করেছিলেন ভলতেয়ার, পৃথিবীতে গুণ্ডকের প্রভাপই সর্বজনীন হবে, অস্বস্তি পড়ে সেই সব দেশে হবে, যেখানে নিষিদ্ধ ভাষার প্রচলন আছে। বাসেব নেই তারা তুচ্ছ, লগণা! এই

প্রভাপের পুরোধা হয়ে এগিয়ে চললেন ভলতেয়ার। কানে ঝাঁক বাজছে মন্ত্র একটা জাত চিন্তা শুরু করলে আর তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। ফরাসী জাতকে চিন্তার মন্ত্র দীক্ষা দেবার ব্রত নিলেন ভলতেয়ার।

ভলতেয়ার—পুথো নাম ফ্রান্সের মারী আঁকএ ১৬৯৪ সালে প্যারিস সহরে জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন সহরেব একজন নামজাদা এ্যাটর্নি। মায়ের পিতৃ পরিচয়ও সামান্য অভিজাত্যের ছাপ ছিল। বাবার চাতুর্য আর অস্থির মেজাজ তিনি পুরোমাত্রায় পেয়েছিলেন। মায়ের বসিক মন আর খেয়ালী স্বভাব থেকেও তিনি বিশেষ বঞ্চিত হননি।

প্রায় সাতার হাত ফলকে তিনি পৃথিবীর মাটিতে পড়েছিলেন বলা যায়। বলা যায়, কারণ তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মা চোখ বুজলেন এবং এই কঙ্কালশার, কণ, ছোট শিশু যে চাক্ষুশ ঘটার বেশী টিকবে এমন আশা কারও ছিল না। কিন্তু সকলকে সচকিত করে শিশু শুধু টিকেই গেল না, তারপর আরো প্রায় চুবাশী বছর বেঁচে রইল। মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু দেহের উন্নতি হয়নি। কণ দেহ সাধারণের তাঁর অপর্যাপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষার পাথে বাধার সৃষ্টি করেছে।

বড় ছেলেকে নিয়ে বাবা মা দুজনে ব্যস্ত হয়েই ছিলেন—অন্যদের সেই সন্ন্যাস নেবার দিকে ঝুঁকেছিল ভলতেয়ারের দাদা। ভলতেয়ারের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছু ভাইকে নিয়ে এই সম্পত্তি এবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বাবা বলতেন যে দুটি মাকীমারা বোকা এসেছে তাঁর ছেলে হয়ে। একজন গল্প নিয়ে মাথা



ভলতেয়ার

দাখাছে আর অকজন পড় নিরে। পড় নিরে মাথা ছোট ছেলেই
দাখানি। লিখতে শিখেই সে যেতে গেল পড় বানানোর কাজে।
বিবরা বাগ তাই ছোটটি সবচেও সব আশা ছেড়ে গিলেন।
বিরক্ত হ'রে সকলকে পাঠিয়ে গিলেন গ্রামের বাড়িতে।

এরে আঁকএদ সকলের প্রিয় হ'য়ে উল। বিশেষভাবে প্রিয়
হ'ল এক ধনী বারবনিতার। বাগর চোখে বা ধরা পড়েনি, তাই
আকৃষ্ট করল বারবনিতাকে। আর সেই উচ্ছল ভবিষ্যতের পথকে
জুগম করবার জন্তেই বোধ হয় মতিলা মুড়ার সময় উঠল করে এই
কিশোরকে বই কেনবার জন্ত দিয়ে গেলেন ২০০০ টাক। বই কেনা
হ'ল এক পড়াও এগিয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলল এক পাঠীর
কাছে তর্কশাস্ত্রের শিক্ষা। তর্কশাস্ত্র দিয়ে প্রথম ধ্যাকে না করতে
সুত করল ছাত্র। ক্রমশঃ শাস্ত্র সত্য বলে আঁকড়ে থাকবার মত
কিছুই আর রইল না তার ভাতের কাছে। কিছু পরে দেখা গেল,
কৈশোর আর তাকবোর সন্ধিক্ষণে সন্মোহজর্জর, প্রেরাকুল, নাস্তিক
মন নিয়ে ঠাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ।

বাবা বললেন, কিছু একটা কাজকর্ম আবস্ত করে দাও এবার।

নিরীকার ছেলের উত্তর শোনা গেল, আবস্ত কেন? কাজ তো
করছি।

বানো? ধমকে উঠলেন বাবা।

বিশ্বনাথ বিচলিত না হয়ে ছেলে উত্তর দিলে, কেন, সাহিত্যচর্চা?
সাহিত্যচর্চা। মুখ ভেঙে চে তীব্র করে উঠলেন বাবা, তা না
হলে আর সমাজের জজাল, সংসারের বোকা হয়ে ভরাবর সুবিধে হবে
কেন? শেষ পর্যন্ত না খেতে পেয়ে মৃত্যুতে হবে, এই আর কি।

আঁকএদ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহিত্যচর্চাকেই জীবনের ব্রত বলে
গ্রহণ করল।

বাধা দেখলেন, ছেলে সাহিত্যচর্চার নামে দিনরাত আউড়ার মেতে
উঠছে। বরত অকমাকে নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে
হৈ-হুজুজ, তর্ক আর আলাপ। বেগে বেগে তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে
দিলেন কীয়ে সহরে এক আন্তর্যয়ের কাছে। বলে পাঠালেন যে
ছেলেকে বেন সব সময় ঘরে বন্ধী করে রাখা হয়। ভালো ছেলের
মত নতুন আরগায় গেল আঁকএদ। দু'-চারদিনের মধ্যেই হাসিতে
গলে আন্তর্যটিকে হাত করে সেখানেই পাতলে তার আকৃষ্টার আসর।
আটকে রাখা গেল না এই হুস্ত তরুণকে। অতএব এটা নির্বাগনের
হকুম। তরুণ বরসেই বৃষ্টি ভবিষ্যৎ ভাগ্যের আভাস পাওয়া গেল।

আভাস যে পাওয়া গেল তাতে সন্দেহ নেই। কন্নাসী দূতের
বাড়িতে থাকবার জন্ত হেগ সহরে গেল আঁকএদ। চলছিল ভালই।
হঠাৎ প্রোমে পড়ে গেল সে বিদেশী তরুণীর সঙ্গে। আলাপের সময়
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগলো। বাড়তে লাগলো চিঠির সংখ্যা
আর লেখার চৈর্য। লখা লখা চিঠি শেষ হয় ছোট ক'টি কথা দিয়ে:
সারাজীবন আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসবো।—মিন কয়েক
পরেই বাবার হকুমে বাড়ী ফিরতে হ'ল তাকে। সারাজীবন না হোক
সারাপ্রথম এক তারপরেও সন্তানকরক প্রথম প্রেমিকার কথা ভোলেনি
তরুণ আঁকএদ।

১৭১৫ সালে এতুশ বছরের বয়সে তরুণ আঁকএদকে দেখা গেল
পাণ্ডিত্যের পথে। তরুণ লুই সর্বৎ বেহে যোগদেহ। নাবালক মজুন
সম্রাটের হ'য়ে বাজা চালাচ্ছেন একজন রাজপ্রতিনিধি। প্যারিস ভ'রে

তখন বইছে জীবনোন্মাসের উচ্ছল প্রোত। সেই প্রোতে সে বহুক
গা ভাসালো। কিন্তু মিশে গেল না সকলের সঙ্গে। শ্রীজই তার
বৃদ্ধির চমক এবং বেতিসাবি জীবনযাত্রা আকৃষ্ট করল সকলকে। এই
সময়েই রাজপ্রতিনিধি খরচ বাঁচানোর জন্তে রাজকীয় আন্তর্যবলের
অর্দ্ধেক খোঁড়া বেচে গিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই সারা সহরে সকলের
মুখে শোনা গেল আঁকএদের মন্তব্য—আহা! রাজসভার অর্দ্ধেক গাঁধা
বেচে দিলে আরো কত ভালোই না হ'ত।

হাসি থেকে কাগ্না খুব দূরের পথ নয়। অন্ততঃ তাই দেখা গেল
আঁকএদের বেলায়। হাসির কথা হ'লেই তার নামে চালু তছিল।
মিথ্যা হ'লেও মাথা ঘামাননি সে। হঠাৎ রাজপ্রতিনিধিকে আক্রমণ
করে লেখা দু'টো বাক্য কবিতা তাই লেখা বলে প্রচারিত হ'ল।
বাগে আগুন হ'লেন রাজপ্রতিনিধি। আর ঠিক এই সঙ্কটময় মুহূর্তেই
একদিন রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে তার দেখা হ'ল এক পার্কে।

রাজপ্রতিনিধি তরুণ আঁকএকে লক্ষ্য ক'রে ধাওয়া হাঙ্গি
হেসে বললেন, ম'সিঃ আঁকএদ, আপনি জীবনে কোনোদিন দেখেননি
এমন জিনিষ আমি আপনাকে দেখাতে পারি।

কি বলুন তো? সরল চেসে প্রশ্ন করলে তরুণ।

বাগর জন্যে পা বাড়িয়ে রাজপ্রতিনিধি বললেন, বাস্তব
কারাগারের অন্ধকার কক্ষ।

পরের দিন ১৭১৭ সালের ১৩ই এপ্রিল বাস্তব কারাগারের
অন্ধকার কক্ষে আশ্রয় পেলে তরুণ আঁকএদ।

এই কক্ষেই আঁকএদ মরে গেল আর ভ্রম নিলেন ভুলভেয়ার।
আর ভ্রম নিল এই নতুন ছদ্মনামের লেখা তাঁর প্রথম সাহিত্যসৃষ্টি—
Henriade—দাঁব এবং চলনসই এক মহাকাব্য।

এগারো মাস বাদে মুক্তি পেলেন ভুলভেয়ার। ভুলের মাণ্ডল
হিসাবেই বোধ হয় রাজপ্রতিনিধির কাছ থেকে হ'ল মাসহাবার
বন্দোবস্ত। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখলেন ভুলভেয়ার—আমার দৈনন্দিন
উদরপুতির ব্যবস্থা করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এই সঙ্গে
সবিনয় নিবেদন যে ভবিষ্যতে আমার বন্দাসের কোনো ব্যবস্থা আপনি
না করলেই খুশী হব। ও ব্যবস্থাটা আমি নিজেই ক'রে নিতে পারবো।

অন্ধকার কারাকক্ষ থেকে তিনি সন্ধ্যা এসে দাঁড়ালেন মঞ্চের
পাশ প্রোতপের আলোয়। ১৭১৮ সালে oedipe নামে তাঁর লেখা
ট্রাজেডি মঞ্চস্থ হ'ল। একাদিক্রমে পর্যন্তাল্লিঙ্গ রাত্রি সাকল্যার সঙ্গে
অভিনয় হ'য়ে জ্ঞান ক'রে দিল প্যারিসের পূর্বকার সব রেকর্ড।
বুদ্ধ বাবা একদিন এলেন ছেলের এই কীর্তি দেখতে—ইফেটা বাবার
সময় একটু ধমকে দিয়ে বাবেল। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হলেন বুদ্ধ,
মাঝে মাঝেই বিড়-বিড় ক'রে বলতে লাগলেন, উঃ, রাফেলটা ক'রেছে
কি জ্যা।

এশংসায় পঞ্চমুখ হ'ল সারা সহর। বিখ্যাত সব কবি আর
নাট্যকারেরা এলেন অভিনয়র জ্ঞানতে, উপদেশ দিতে। তরুণ
ভুলভেয়ার কিন্তু কান গিলেন না অভিনয়র, গ্রাহ্য করলেন না কারুর
উপদেশ। অদুরাগত হৃদয়ের জন্তে তখন প্রস্তুত ছেছেন ভুলভেয়ার।
সেই হৃদয়ের পূর্ণাভাস তিনি দিয়েছেন নাটকের চরিত্র আরাগুপের মুখে:
নিজের উপর বেন আমরা বিশ্বাস রাখি, সব কিছু বেন দেখি
দিয়েদের চোখ দিয়ে, এই মন্ত্রই হবে আমাদের পথের আলো, বুকের
বল আর ঈশ্বর-আরাধনা।

অভিনয় থেকে ৪০০০ ফ্রাঁ আয় হ'ল ভলন্তেরারের। বাবার ধারণা মিথ্যা প্রমাণ ক'রে সব টাকাটা শুনিপুণ ভাবে খাটানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। ভবিষ্যতে আয় তাঁর বত বেড়েছে ততটাই বেড়েছে তাঁর টাকা খাটিয়ে লাভ করার নানা কল-ফিকির। সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে প্রচলিত নানা বৈতাস্যবিধানের মাপকাঠিতে বিচার করলে সত্যিই আশ্চর্য মনে হয় ভলন্তেরারের এই অভ্যাস। কিন্তু প্রচলিত কোন মাপকাঠিতেই বা কবে মাথা গেছে ভলন্তেরারের মত অলৌকিক প্রতিভাদের?

১৭২১ সালে এক সরকারি লটারীর সব টিকিট কিনে ফেলেন ভলন্তেরার। অনেক হিসেব ক'রে কিনেছিলেন, লাভও হ'ল বেশ মোটা টাকা। সরকার চটলে কিন্তু তাঁর চাটুকার আর অমুগ্রহভাজনরা খুশী হ'ল। খনী হবার সাথে সাথে মুক্তহস্ত হয়েছিলেন ভলন্তেরার। মধুর চার পাশে মোমাছির মত চাটুকার আর অমুগ্রহভাজন সমাগমের এই শুরু। জীবনের অপরাহুণ ভলন্তেরারের চার পাশে এদের গুঞ্জন শোনা গেছে।

কলমে শাণ দিতে দিতে টাকার অঙ্কের হিসেব রাখা সহজ নয়। কিন্তু ভলন্তেরারের কাছে এইটাই ছিল সাধারণ একটা অভ্যাসের মতো। ভালই ক'রেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর পরবর্তী নাটক Artemire সফল হ'ল না। অন্তরে খুব আঘাত পেলেন নাট্যকার। আগের নাটকের সাফল্য মনের বীণা আত্মতৃপ্তির চড়া সুরে বাঁধা হ'য়ে গিয়েছিল। একটা তার ছিঁড়ে তাই জাগল মর্মান্তিক যন্ত্রণার কম্পন। জনমতের প্রতি তবু এই যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দিল। এক দিন পথ চলতে চলতে তাঁর মনে হ'ত ছাকরা গাড়ীর বোড়াটাও তাঁর চেয়ে সুখী। কারণ মাঝের তীক্ষ্ণ বাক্যবান তার কানে যায় না।

চঃ একা আসে না। প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ হ'ল ভলন্তেরারের জীবনে। মাতাত্মক জলবস্ত্র রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। সূত্র্যব যুগ থেকে কিবে এসে ককালসার রোগ লেখক দেখলেন রাতের অন্ধকার অপসারিত হয়ে পূর্বদিকন্তে উঠছে সৌভাগ্যের সূর্য। Henriade তাঁকে শুধু বিখ্যাত করেনি, অভিজ্ঞাত সমাজে তাঁর আসন নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছে। সেই আসনে জেঁকে বসলেন তরুণ সাহিত্যিক অভিজ্ঞাত সমাজের আওতায় আর আমরে সব খুঁত নিশ্চিহ্ন হয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল সৌধীন, সচেতন, বাস্তববাদী, চমকপ্রদ আলাপচারী, সুন্দর, অসংকুত, ইউরোপীয় কালচারের পূর্ণ প্রতীক একটি মানুষ।

অভিজ্ঞাতের উচ্চ পরিবেশে, আমরের আসন দখল করে আঁট বন্ধ বসেছিলেন ভলন্তেরার। তারপরই ভাগ্যের ঢাকা ঘুরে গেল। বংশসৌর্যবের বর্ষ নেই তাঁর, নেই গালভরা সম্মানের কবচ-কুণ্ডল। শুধু প্রতিভা স্বহস করে আর থাকা চলল না অভিজ্ঞাত সমাজে। এক ভোজের আসরে একদিন বৈশ্বর শোনা গেল। প্রাণ ধুলে হাসছিলেন ভলন্তেরার, ওড়াছিলেন মক্কার মস্তাব কথার তুবড়ি। হঠাৎ হোমরা-চোমরা অভিজ্ঞাতকে মধ্যমণি একজন বেশ জোর পলার প্রদ্ব করলেন, কে হে এই ছোকরা, এমন হাউ-হাউ করে চীৎকার করছে!

চকিতে ভেসে এল ভলন্তেরারের উত্তর, আজ্ঞে এমন একজন যে নামের বোঝা বয় বেড়ায় না, বরক তার নাম আছে বলেই তাকে সম্মানের বোঝা বহিতে হয়।

মহামায়া মধ্যমণির সামনে মুখ খোলাই অভয়। এমন প্রাণখোলা কথা বলা তো প্রচণ্ড অপরাধের সামিল। অতএব গোপনে এই দুর্বিনীত তরুণের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন মহামায়া ব্যক্তিটি। রাতের অন্ধকারে ভলন্তেরারকে উত্তম মধ্যম দেবার জন্ত নিযুক্ত হল গুণ্ডার দল। গুণ্ডাদের বলে দেওয়া হল, লোকটার মাথায় আঘাত করো না, কারণ ওর মাথা থেকে ভালো কিছু বার হবার সম্ভাবনা আছে।

হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পরদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে থিয়েটারের সৌধীন আসনের সামনে গিয়ে ঠাড়ালেন ভলন্তেরার। একেবারে মধ্যমণির মুখোমুখি। স্বপ্নস্বেপ্তে আব্রহাম জানালেন মধ্যমণিকে। তাৎপর্য বাড়ী কিবে এসে বসলেন তববারিতে শাণ দিতে। মধ্যমণি কিছু স্বপ্নের ধার দিয়েও গেলেন না। সোজা ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন তাঁর আত্মীয় পুলিশের প্রধানকে। কলে ভলন্তেরারকে আবার এসে চুকতে হল কারাগারের কক্ষকক্ষে।

পরদিনই ছাড়া পেলেন ভলন্তেরার কিন্তু তরুণ হল ইংলণ্ডে নির্ধাসন। ডোভার বন্দরে এই নির্ধাসিত মানুষটিকে নামিয়ে দিয়ে কিবে গেল ফরাসী প্রহরীরা। তাদের পিছু পিছু ভলন্তেরারও ফিরলেন, প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে জ্বলতে গোপনে এসে পা রাখলেন ফরাসী উপকূল। বিজ্ঞ উদ্বেগ সিন্ধ হল না। ধরা পড়লেন ভলন্তেরার। তৃতীয়বার কারাগারে আটক হবার আগেই জাহাজে চড়ে পালিয়ে গেলেন ইংলণ্ডে। স্বর হল ১৭২৬ থেকে ১৭২৯ তিন বছর ইংলণ্ডের জীবন।

[ক্রমশঃ]

একটি সনেট

শ্রীপিনাকীনন্দন চৌধুরী

সূর্যের নীড়ের বত আলোর পাখীরা
মনের আকাশ-নীলে ভিড় ক'রে আসে।
নিভৃত স্বপ্ন-কোণে মৌন বে বাণীরা
ধ্বনি পাবে তাগানের পাখার বাতাসে।
মধুর রজনী ক্লাস্ত। আমি ক্ষণ গুণে
স্বপ্নিতের প্রলুব্ধ করি চিন্তার বোতুকে।

ও'নয়নে আলোকের পাখীরা জাগক :
সুপ্তের মৌন বাণী আলিও উৎসব।

স্বপ্নের মেঘেরা বৃষ্টি সারা রাত বুনে
সোনালী পশম ঢাকে গিম জমা বৃকে।
মনের কথারা মৌন রাতের গভীরে :
তাইতো বসিত প্রেম—স্বপ্ন নিবেদনে।
তোমার চোখের কালো-সাগরের তীরে
হয়তো সূর্যের নীড় বেধে গোপনে।

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

১৮

১৮ মাস দাঁট-দাঁট করছে। আসছে বৈশাখ নতুন বছরের স্বাক্ষর নিয়ে। কমলা সেবাসদনের উদ্দোধনের দিনও আসছে এগিয়ে। সেট বিসর জানতে সেদিন লালকুঠিতে এসেছিল সুদাম।

বাড়ী ছিলোনা অসীম। একটু ইতস্তত করে ওপরে উঠে এলো সুদাম স্মৃতির ঘর, তখন স্মৃতি সোলনায় আলোকে ভেসে, মুহূর্তে মুহূর্তে দিতে দিতে গুন গুন করে গাইছিলো একটা যুগ্মপাঠানি গান। ভীষণ সুদামকে দেখে গান থামিয়ে একটু অবাক হোঁচকে চাইলো ওর দিকে।

স্বিচ্ছ হাসির আলো আর তার সাথে একটু গোলাপি রং ছড়িয়ে পড়লো ওর হুট গালে আর ঠোঁটে।

—বাঃ! ঠাড়িয়ে কেন? বোলো। উঠে ঠাড়িয়ে বললো স্মৃতি।

খোকনের কাছে এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে ওকে একটু আদর করে বললো সুদাম—তোমার খোকন তো বেশ বড়-সড় হয়ে গেছে এই ক'টা দিনেই? আরো মিট হয়েচে দেখতে। বেশ ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ ভালোই আছে। জানো দামীদা, খোকনের সব কাজ আমি নিজে হাতে করি। কাকীমাকে বলো, আমি সব শিখে গেছি। কাকীকে বেরিয়ে শুধু আমার সঙ্গে গল্প করবার জ্ঞান।

—তাই নাকি? তা তোমার কাকির বগত ভালো বলতে হবে। নিজে হাতে সব করবে এটা বড় আশার কথা মিতা? কারণ কবিতাতে অনেক বাচ্চাদের ভার তো তোমায় নিতে হবে। হ্যাঁ যে কথা বলতে এসেছিলাম—আগামী বিশেষ বৈশাখ কমলা সেবাসদনের উদ্দোধনের দিন স্থির হয়েছে। কাকাবাবু আসছেন গুরুদেবকে নিয়ে, তাই বলতে এসেছি তুমি আর কাকা যাবেন—ছোট মামাকেও বোলবো—

—তোমার কাকাকে বোলানো দামীদা। বখা-চলো-চলো কণ্ঠে বললো স্মৃতি, কি ভয়াবহ বৈ হয়েছেন তিনি আজকাল, তা আর তোমায় কি বলবো।

—সে কি? এই তো সেদিন তুমি বলছিলে তোমাকে অনাথ আশ্রয় করতে বলছেন, উদ্বিগ্ন ভরা কণ্ঠে শুধালো সুদাম।

—হ্যাঁ বলেছিলেন যে উদ্বেগ নিয়ে, সেটাতো সিদ্ধ হলোনা তাই।

—উদ্বেগ? এর পেছনে আবার উদ্বেগ কি থাকতে পারে?

—উদ্বেগ ছাড়া যে উনি শুধু শুধুই এতটা মহৎ দেখাবেন এটা ধারণা করাই তো আমার মনে ছিলো দামীদা! ব্যাশরিটা বলছি শোনো, আলোকে নিয়ে আসবার ক'দিন পরেই ভজননাথ কি ভাবে মারা গেলো তুমি শুনেছো বোধ হয়?

—কেনই মিতা। ছোট বাবা একদিন গিয়েছিলেন, সব

জনলাম তাঁরই কাছে। বড়ই মর্মান্তিক ঘটনাটা। বাক সে কথা, এখন তোমার কথা বলো।

—হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি দামীদা। জলতরা চোখ দুটো জাঁচলে মুছে নিয়ে বললো স্মৃতি, ভজননার স্মৃতির দিন তিনেক পরেই তোমার কাকা সেদিন খুব ব্যস্তভাবে ভেতরে এসে বললেন,—লালকুঠির খুব ভালো একজন খদ্দের পাওয়া গেছে, বাড়ীখানার দায় দিচ্ছে দশ লক্ষ টাকা, তার ওপর পুরোনো কার্ণিচার বা অন্তান্ত জিনিসের জন্মেও ভালো দাম দেবে, কালই বারনা করতে চাইছে, এখনই আমাদের মতামত জানাতে হবে।

আমি তো প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওর কথা শুনে, বাড়ী বিক্রি? কেন?

উনি থেকিয়ে উঠলেন—এইতো সেদিন ঠিক করলে বাড়ী বিক্রি করে সেই টাকার অনাথ আশ্রয় করবে। এর মধ্যেই মত পাটে গেলো?

—না। আশ্রয়ের সম্বন্ধ আমার ঠিকই আছে, জবাব দিসাম আমি। তবে বাবা বত দিন আছেন, তত দিন বাড়ী বিক্রি করতে পারবো না। বাস, এই কথাতেই দপ করে অলে উঠলেন উনি, বললেন—ধড়াক্ মেয়ে তুমি। আমাকে কলা দেখিয়ে নিজের বেঙ্গলা ছেলেটাকে বাড়ীতে এনে পুরেছো। ভেবেছো! বড় চালাকি খেলিয়েছো। বড় জিত্তে গেছো। কিন্তু এটা বোঝানো যে চালাকি আর শয়তানিতে তুমি আমার কাছে ছমাসের শিশু মাত্র। ভালো চাপ তো এখনও রাখি হও আমার কথায়, এতে তোমারও ভালো আর আমিও তোমার কোমরামি নিয়ে মাথা আর দামারোনা কথা দিচ্ছি। ভাববার জন্মে তোমাকে সাত দিন সময় দিতেও রাজী আছি।

—নীচবল স্মৃতি।

—তারপর? তুমি ভেবে কিছু ঠিক করেছো? বৃহস্পতি শুধালো সুদাম।

—ভাববার অবকাশ আমি নিইনি দামীদা। জবাব তখনি দিয়ে দিয়েছি। বাড়ী আমি বিক্রি করবো না এই আমার শেষ কথা। কারণ এ তো জানা কথাই—আমাকে ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিয়ে বাড়ীখানা বিক্রি করতে পারলে টাকাগুলো ওর হাতেই যাবে। কিন্তু আমি আর কথার ছলনায় নিজের সর্বনাশ করবো না দামীদা। একবার করেছি, আর নয়, আর নয়। এর জন্মে বত লাগুনো সইতে হয় সইবো, খালি ভয় করে আমার আসলার জন্মে, প্রতিহিংসার উদ্বল হয়ে ওর কোনো ক্ষতি না করেন, এই চিন্তায় বেন আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি দামীদা!

নতুন শুক হয়ে মিতার কথাগুলো শুনছিলেন সুদাম। কথার শেষে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলো—চিন্তা শুধু মনকে বিক্ষিপ্ত করে মিতা! তার চেয়ে স্থির চিন্তে ভগবানকে শ্রবণ করো, তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। আজ চলি, অনেক কাজ এখনও বাকি আছে।

দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এলো সুদাম।

খুশ ভুলে ওর দিকে চাইলো স্মৃতি। দর দর করে ছুঁচোখের জল ঝরে পড়ছে রক্তিম হুঁট গাল বেয়ে।

—মিতা। কৌলানা লক্ষ্মী। জানি বড় বড়না পাচ্ছে তুমি। কিন্তু বিশ্বাস রাখো সেই সর্বনিরস্তার ওপর, তোমার এই মহাছব্বের লক্ষ্যের অবশ্যই কেটে যাবে মিতা!

—তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি তাই কিরে এসাম—
অনিকঙ্কণের ভাবি অস্বপ্ন করেছিলো—ম্যাসেন্ডন ম্যাসেরিয়ান
দিন সাতক হরে গেলো—বড় বড় ডাক্তার দেখছিলেন তার সঙ্গে
আমিও ছিলাম এ ক’দিন, আর করবী মাসী, কি সেবাই করেছেন
এ ক’দিন। তোমাকেও খবর দিতে বলেছিলেন আমায়—কিন্তু...
জানি তো তুমি যেতে পারবে না, মনও খারাপ হবে। তাই আমি
খবর দিইনি। হাক্ এখন বিপদের আশঙ্কা একেটে গেছে, তবে
দুর্ভাগ্য খুবই হয়ে গেছেন। সম্পূর্ণ স্বস্থ হয়ে উঠতে সময় লাগবে।

—আবার কোন মতলব নিয়ে এসেছো? কোন মন্তোর
দিয়ে ওঁর কানে?

চমকে উঠে কিরে পাঁড়ালো সুরা? সামনেই পাঁড়িরে অসীম
দুঃকামের হাত দিয়ে। চোখ দুটো ওঁর জলছে ঠিক কেউটে সাপের
চোখের মতো। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো
সুরা। বীর গলার জবাব দিলো। আপনার কাছেই এসেছিলাম।
সামনের বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় কাকাবাবু “কমলা
সেবাসনদের” উদ্বোধন হবে। কাকাবাবু আসছেন গুরুদেবকে
নিষে, তিনিই উদ্বোধন করবেন। তাই আপনাকে জানাতে
এসেছি, ঐদিন যাবার জন্তে। মিতাকেও নিয়ে যাবেন।

—কৃতার্থ হয়ে গেলাম আর কি খবর শুনে, জেচি কেটে
দুঃহাত নাচিয়ে জবাব দিলো অসীম। আমাকে কাঁচকলা

ঠেকিয়ে নিজেরা চালাচ্ছেন রাজকোপ। সেবাসন হচ্ছে।
কষ্টের পিণ্ডি হচ্ছে। তাই সেখতে যেতে হবে? আমকে কুর
এসিয়েছো—তোমাকে এই সেববার সাবধান করে দিচ্ছি রক্তাক্ত
মোটা টাকাত বাগিয়েছো, তোমার তো একাদশে বৃহস্পতি। আমকে
হরে চলাটলি তোমার না করলেও চলবে। আর তা আমি বরখা
কখনই করবো না।

অপলক দুই মেলে ওর কহরুতির পানে চেয়েছিলেন—সুরাম।
ব্রহ্মপুত্রীর কণ্ঠে এবার জবাব দিলো—আপনি যে কহরুতির
নেমে গেছেন, দেখে আমি বড় দুঃখ পাচ্ছি কাঁচকলা—আমার
দেবতুল্য বাপের সহোদর আপনি। কেমন করে সম্ভব হলো আপনার
পক্ষে এমন জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়ার? হাক্! আপনাকে
জানানো কষ্টব্য বলেই এসেছিলাম, এখন আপনি যাঁড়ালো বোঝেন
করবেন। দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সুরাম—

নব বৈশাখের প্রথম সন্ধ্যায় বিশেষ চরণে এসো—অমিতা
অনিকঙ্কণ বাড়ীতে। সঙ্গে ছিলো ওর অনিল।

খাটের ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন অনিকঙ্কণ—
পাশের চেয়ারে ছিলো সুরাম। ওরা দুজনেই চমকে উঠেছিলো
স্মৃতিতে দেখে।

—এ কি? তোমরা হঠাৎ ভূত দেখেছো নাকি? অমন স্থল
করে কেন? একটু হেসে শুভো স্মৃতি।

ও-আর-সি-এল এর

কুমারেশ

নিজের ও পেটের পীড়না

দি ওবিয়েট্যাল রিসার্চ অ্যান্ড কোমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

কৃত দেখলেও এত অবাক হবার কথা নয় মিঠা, একখানি হাত ওর দিকে প্রণবিত করে বললো অনিচ্ছা! আমরা হঠাৎ দর্শন পেলাম সেই আবার উপজাসের মৈত্রেয়বৃত্ত বন্দি হাজকতার। সেই সময়ে নাগিনীর বন্ধন খুলে, একচোখো মৈত্রেয় চোখ এড়িয়ে জাইনীর মস্তকস্থর জাল হিঁড়ে তার পর তো তোমার দর্শন পাবার কথা! এসো! এসো, কাছ এসো।

—বলোছো মিথো নয় দাশ! তোমার অসুখ শুনে অবধি সুযোগ খুঁজছি আসবার। কিন্তু জানোই তো সব। আলোকে বেধে বেরতেও ভয় করে, ওর ওপর যে কি একোশ গুঁর। গলার স্বর জাইনীর হলে এসো মিঠা,—বীর পায়ে এসে বললো অনিচ্ছা পাপে।

—তবে আজ কেন এসে মিঠা! ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললো অনিচ্ছা। এসেই যদি আলোকেও নিয়ে এসে না কেন সঙ্গে?

ভার শরীরটা আজ ভালো নেই দাশ, তাই কাকির কাছে বেধে এলাম। কাঁটটা বড় ভালো মেয়ে, ওর প্রাণ থাকতে আলোর কতি করা সম্ভব নয় কাকির পক্ষে। তাই বেধে আসতে পারলাম দাশ! আজ আজ ধনপতি ক্ষত্রিয় বাগানবাড়ীতে গেছেন, সেখানে গেলে তো হাতে কেরা সম্ভব নয়, তাই এলাম নিশ্চিন্ত মনে।

অনিল বসেছিলো সন্ধ্যার পারের চোরায়ে। সুমিতার কথার জের টেনে বললো সে—অবশ্যই কিংবদন্তি না সে আজ রাতে—বধন জুকতায় আছে তার সঙ্গে। গ্রান হাসি খেলে গেলো ভয় বাঁকা টোটে।

—আপনার নেমন্ত্রণ ছিলো না ছোট মায়া! শুধালো দাশ।

—ছিলো বৈ কি! তবে কি জানো? হঠাৎ এই সব নরকে কেমন যেন আমার বিকৃতা এসে গেছে। একদিন বাঘের সঙ্গ ছিলো পয়ল দোড়ানীর, আজ তাইবই যেন আমার জীবনের বিভীষিকা বলে মনে হয়। স্বর্গস্থল মনে হয়েছিলো যে প্রেমন্ত লীলাকে আগে, এখন মনে হয় ঠিক শুটা যেন ঢেঁকি চাকুতা আর ধানবের নারকীয় উৎসব! অবশ্য আমিও একদিন ওদেরই একজন হাতে চেয়েছিলাম বা হলেওছিলাম কিন্তু আজ আমি আর ওদের কেউ নই হুদাম। আমার জন্মকের সত্য পরিচর যে কি,—তা আমি নিজেই জানি না—আমি ভয়েও নই। আবার তোমাদেরও নই; সব হারিয়ে আজ আমি সম্পূর্ণ একা। একটা মহাপ্রভুতা যেন আমার চারিদিকে।

—ছোট মায়া! বেরনার্ত কর্তে বললো সুমিতা। আমি তো আজি, ঠিক তোমার জবাব। তবে তুমি একা কেন? গিফিমা, ছোট দাশী, আমি, আমরা সবাই যে বাড়ি তোমার। কিন্তু আমার কল—একবার তাবো? ইচ্ছা করলে এ নাগপাপ থেকে মুক্তি তুমি পেতে পারো, কিন্তু আমার মুক্তি? তবুও তোমার মত জো—আমি ভেঙে পড়িনি ছোট মায়া।

—ঠিক কথাই বলেছিলো মিঠা। একটা লজা নিষাসের সঙ্গে জবাব দিলো অনিল,—আমার হৃৎকিদের, আমার তো সবাই আছে। জ্ঞেয় তুলনার আমার এ হৃৎকিছুই নয়। তবুও ভালো আছে যে। বড় দাশার পক্ষে থাকে হতে বাচ্ছে বুকটা, সে ভালো ভোর নেই। বিবেকর নন্দন, কল জবাব, পোখরো সাগের বিবেক ভালো ভোর আছে কিছু নয় যে মিঠা। সে বিশ সাময়িক যন্ত্রণা দিয়ে তারপর

সব ভালোব নির্দোষ ঘটায়—আর এ বিবেক অনির্দোষ ভালো ইহকাল পরকাল সব কালকে ধালিয়ে দেয়।

ঘরে জলছে নীলাভ আলো। জানিনাশ পাশের গাড়ে ফুটেছে রাশি রাশি স্বর্ণটিপা। উদ্বুদ্ধ প্রশস্ত বাতান্নপথ বেয়ে আনাগোনা করছে হু-হু করা বাতাস। বুটো বুটো টিপার গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে সকলকার ব্যাখাতুর মনগুলোকে আবার উদাস করে দিয়ে গেলো সে।

ঘরের ভুক্ততা ভঙ্গ করলেন মিসেস বাহুর। অনিচ্ছাধর জন্তে এক গ্রাণ হবলিক্স নিয়ে ঘরে পা দিয়েই। বিষম-আমদ তরা কর্তে বললেন—ও মা! মিঠা কখন এলি মা? এই যে অনিলও এসেছে! কতকাল পরে যে এসেছে! তোমরা, ভারি ভালো লাগলো দেখে তোমাদের।

—সুমিতা আর অনিল উঠে গিয়ে একে একে মিসেস বাহুরকে প্রণাম করলো।

—হরলিক্সকে অনিচ্ছাধর হাতে দিয়ে, সুমিতাকে বুক জড়িয়ে ঘরে ওর গায়ে চুষন করলেন তিনি, তারপর ওর চিবুকটা ধরে মুখখানি দেখতে দেখতে কোঁড়ের সঙ্গে বললেন—সেই বিবেক সময় দেখেছিলাম, আর এই পাঁচ ছ' বছর পরে আবার দেখছি! কি বোপাই হয়ে গেছিলো মা! -কি চোরায়া—কি হয়ে গেছে। এতও ছিলো এই সোনার প্রতীমার বরাত? আ-হা-হা! বোস মা বোস, প্রাণ ভরে টানমুখখানি দেখি। সেই যে বলে, জগৎকবনে রামের সীতা। তোর কপালে তাই হালো মা!

সুমিতাকে সোকার বসিয়ে পাশে নিজে বসলেন মিসেস বাহুর।

—দাদার অসুখ শুনে অবধি মনটা যে কি খাটপ লাগছিলো মাসীমা,—তাট আজ লুকিয়ে চলে এলাম ছোট মামার সঙ্গে। আজি, বিজি, ওরা কোথায় মাসীমা? শুধালো সুমিতা।

—ওদের কথা আর বোলো না মা! নিখোঁস কলে জবাব দিলেন মিসেস বাহুর। আজি তো থাকে এলাহাবাদে, অন্তটা ঘুরে পথ সহজে আসতে পারে না, আর বিজি তো মিন-ব্রাত পাড়ে আছে মিসেস বর্ধনের কাছে, কানোদিন হাতে করে আবার কোনদিন ফেরেও না। তখন তো ব্রিনি মা, যে কি কালনাগিনী তোমাদের ঐ জলকাপূরী মাসীমাটি। নিজে মিশেছি, মেয়েদেরও দিয়েছি সেখানে। বাপ যে কি সাংঘাতিক রিজ মা, কত ছেলেরদের মাথা যে খেয়েছে রাঙ্কুসী,—বাব কাককে দেখিনি মা। বড় বেঁচে গেছে খালি তোমার ছোট মাসী। তার ছেঁড়া লাগেনি কি না তাই। আহা কি সেবাই করলো, স্বপ্নাম আর জবি, ওরা মা থাকলে আমার অনিকে কির পেতাম না মা। জাঁচলে জোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি—কিছু বুধে না নিতে বেশ চলে বাগনি মিত্ত। তোমার খাবার কথা বলে আমি বাহুরকে। অনিল, স্বপ্নাম তোমরাও খেয়ে বাবে বাবা! স্বর হেঁকে বেরিয়ে গেলেন মিসেস বাহুর।

সুমিতা উঠে গিয়ে অনিচ্ছাধর পাশে বসে ওর দাশীর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—ছোটমাসীর অনেক ভাখি। যে তোমার সেবা করতে পারছে দাশা, আমি তো কিছুই পারলাম না।

—তা এখন বেশ ভালো আছে তো ?

—হ্যাঁ, ভালোই আছি দিদি। অনেক কিছুই তো মাথুবে পায়ে না, তার জন্তে দুখ কি বোন ? যা তোমার আয়ত্তের বাইরে তার দিকে না চেয়ে এমন আরো বড় কাজ আছে তোমার জন্তে, তাই তোমাকে হরতো করতে হবে ভাই ! সুমিতার পিঠে সন্তোষ করণবশ দিয়ে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—দামীদা! তুমি আমার ওপর বড় রেগে আছো না ? বললো সুমিতা স্ত্রীমার দিকে মুখ ফিরিয়ে।

—হামি ? তোমার ওপর রেগে আছি ? এ যে একেবারে অসম্ভব কথা শোনালো মিতু ! বরং যদি বলতে সাহারা মকড়মিতে বন্ধা হয়েছে, আর মকবাসীরা আমেরিকায় গেছে বাস্তহারা হয়ে—তাহলে সেটা বরং এর চেয়ে সহজ শোনাতো।

—মুখ নিচু করে হেসে বললো মিতা—তবে কথা বলছো না যে ?

আহা ! কতদিন পরে দামীর সঙ্গে দেখা হল, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হোক, আমি তো আছিই। তারপর ? সেদিন আমার জন্তে খুব বকুনি খেতে হলো ছো ?

—তোমার জন্তে নয় দামীদা, ও জিনিষ আমার নিত্যকার বসাদ ! বতদিন না বাড়ী বিক্রি করে সব টাকা ওর হাতে তুলে দিছি, ততদিনই অত্যাচারও চলবে আমার ওপর। কিন্তু বাড়ী আমি কোনমতেই ছাড়বো না, ও বাড়ী আমার প্রাণিতামের বড় সাধের বাড়ী। ওখানে কত দান গান, উৎসব, ভোম বজ্র হয়েছে, আবার কত অভয়, অত্যাচারও হয়েছে, সব মিশিয়ে ও বাড়ী আমার বড় প্রিয়, বড় আপনান। ওটা হবে সেই শিশুতীর্থ। একটু খেমে আবার বললো সুমিতা—দামীদা, একটা কথা বড় বেশী করে কদিন ধরে আমার মনে জাগছে, সেই কথাটা তোমাকে বলবার জন্তে কদিন মনটা আমার বড় হটকট করছে।

—কি কথা মিতা ? বলো।

—স্বামীর চোখের ওপর নিজের হুটি শাড়ি উজ্জল চোখের দৃষ্টি স্থির করলো সুমিতা। তারপর গভীর সুরে বললো—দামীদা ! যে সঙ্কল্প তুমি আর আমি করেছিলাম সেদিন, সেটা সম্পন্ন করতেই হবে।

কিন্তু তার আগে বসি—যদি আমি চলে বাই ; তাহলে সে কাজের ভার আমি তোমায় আর দাদার ওপর দিলাম, তোমরা নাও সে কাজের ভার। আমার আলোর মত পরিত্যক্ত অনাথ শিশুরা যেন স্থান পায় ঐ বাড়ীতে। তাদের জন্ত বাতিঘর তোমরা করো ঐ অভিশপ্ত লালকুঠিকে। তাহলে শান্তি পাবেন আমার পূর্বপুরুষের আত্মারা। বলো দামীদা, এ কাজের ভার নিলে তো ?

সুমিতার কথার কোনো জবাব দিলো না সুদাম। জবাব দিলো অনিরুদ্ধ—এ কথার উত্তর তো তোমার জানাই আছে মিতা ! তোমার দামীদা আর দাদা, তোমার শান্তির জন্ত তোমার ছোট বড় সব ইচ্ছা প্রাণ দিয়ে পূরণ করবার জন্তে সর্বদাই প্রস্তুত। নতুন করে এর জবাব নেবার তোমার এ ব্যাকুলতা কেন মিতা ? আর তুমি থাকবে না তো মাঝে কোঁথার ?

—কি জানি দাদা ! কিছুই তো জানতে পারি না সুশ্রী ভাবে। তবে খালি মনে হয়, কে যেন ভাকছে আমার। কার ডাকে আমি ঘুম ভেঙে রাজে বার বার উঠে বসি—

—ও কিছু না, তুমি ওসব কথা ভেবোনা মিতু। ওগুলো মনের এলোমেলো চিন্তা থেকে জন্ম নেয়। বললো অনিরুদ্ধ।

সুদামের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিলো সামনের দেওয়ালে চাঁদোদা একখানি ছবির ওপর।

অসীম নীল আকাশের তলার কুলে ভরা এক উপত্যকা। তারি মাঝে পড়ে আছে কান দিকারীর গুলীখাওয়া একটি পাখি, তার বৃকের রক্তে ভিজ়ে লাল হয়ে উঠেছে পাখের মাটি। লম্বা টোঁটী ঝাঁক করে যেন কি কথা বলতে চাইছে, অন্যম ডানা ছুটি ছড়িয়ে পড়েছে দুধারে। আর ওর সঙ্গী পাখিটি একটু উঁচুতে ডানা মেলে বোধ হয় ওর চার ধারে ঘুরপাক খাচ্ছে। মুখটা মিচু করে বাড় বৈকিরে কল্প চোখে চেয়ে দেখছে তার স্বম্ব সজিনীকে। দুচোখে ওর কি দ্বন্দ্বভরী কল্প চাটনি !

ছবিটার দিকে চোখ ফেরালো সুমিতা। কি দেখছে দামীদা এমন নির্বাক হয়ে !

—উঃ ! কি নিদাশ্রয় দুঃখের ছবিটা—বাখাভরা গলায় বললো সুমিতা।

—না। এমন আর কি। তারি গলায় জবাব দিলো সুদাম, ও তো পৃথিবীর নিত্যকারের ঘটনা। হ্যাঁ। তুমি যে কাজের ভার নিতে চাইছো মিতা, আমার সমস্ত মন, প্রাণ দিয়ে আমি তা গ্রহণ করলাম। জানি না তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে কি না, কারণ আমাদের ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটে না, তবে আমার দিক দিয়ে চেষ্টার জট হবে না কেনো।

—বড় শান্তি পেলাম দামীদা ! এই কথাগুলো তোমাদের বলবার জন্তে একদিন আমার মনটা যে কি হটকট করেছে। এখনও বাকি রইলো আরেকটি কাজ, সেটি হচ্ছে আমার দানপত্র। বাবা ভো আসছেন সেবাসময় উষোণনের দিন, তখন বাবাকে জিজ্ঞেস করে সেটাও সেরে রাখতে পারলে আমার মনে আর কোন উষেণ থাকে না।

—আচ্ছা ! আচ্ছা ! সে সব হবে এখন। এখন তোমার পাকা বুলিগুলো একটু থামাও তো মিতা, উঃ ! তোমার বানপ্রস্থের কথাগুলো যে আমাকেও বানপ্রস্থে পাঠাচ্ছে। একটু হেসে সুমিতার হাতটা ধরে মুহূর্তকাল দিয়ে বললো অনিরুদ্ধ—কথা থামিয়ে দাও না একটু মাথাটা টিপে মিতু—বড় যেন ধরছে রগ হুটো !

—আচ্ছা গো দিছি ! লাজুক হাসির সঙ্গে হেঁট হয়ে ঐ ধীরে অনিরুদ্ধের চুলগুলোর ভেতর আঁচল চালনা করতে করতে বললো সুমিতা—বাবো হাস তোমার সেবা কে করবে বলতো ? এবারে একটা বৌ নিয়ে এসো দাদা ! মাসীমার তো বয়েস হয়েছে, তিনি কি আর পারেন ?

—এবারে ভাই জানতে হবে রে মিতু ! ক্রান্ত হাসির সঙ্গে বললো অনিরুদ্ধ,—কিন্তু বৌ হবার মতো মেয়ে কই ? একজন ভো বৌ হবার ওয়ে পালালো, আবার যদি তাই হয় ?

—বৌ হবার মত মেয়ে তো তোমরা খোঁজ না দাদা ! বার কথা বলছো, ও সব মেয়েরা প্রেমিকা হতে চায়, বৌ নয়। এখন ভো

জুল ভেঞ্জে জোমায়,—এবারে বুঝ লক্ষী মেয়ে একটি আনো বোঁ করে, সেখা লে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে তোমায়। তোমার ঘরই হবে তার স্বর্গ। আর তোমার আপন জন হবে তারও পরমাত্মীয়! **অনন্ত** তোমাকে ও হতে হবে তারই মত সত্যপরায়ণ, তারই মত একনিষ্ঠ, তাকেই সেখা দাদা তোমাদের বাড়ীটি হবে একেবারে সেই Home, Home, Sweet home.

—হা, হা, হা! উঠকণ্ঠে চেলে উঠলো অনিরুদ্ধ। তার পর উঠে এসে সুরিতার চিবুকটি নেড়ে দিয়ে বললো—উঃ গিন্নীপনার ঠাকুমা যে।

—বস্ত্র সতি! ভাবি খাটি কথাগুলো বলেছে তে,—বাখাভরা গলায় বললো অনিল—ও কথা মধ্য তুমি বুঝবে না, বুকেছি আমি! আমরা সত্য চর্যকি, আমাদের সঙ্গলমরী মা, ঠাকুমানের অবজ্ঞা করে নিজের ভালো মূল নিজেগাই বুঝতে চেষ্টাছি। তাই আজ আমাদের করে করে বলছে অপাক্তির আশ্রয়।

—পুঙ্খন্য তো চিরকালই লক্ষীঠাড়া, কিন্তু সেই ভয়ভাড়া হস্তভাগ্যের নিয়ে ঘর বাঁধে নারী। সেই শান্তিপূর্ণ নীড় রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি শান্তিময়ী লক্ষীপনা নারীর। পুঙ্খনের মত বীরবলী থাক না কেন, এট নীড় রচনার ক্ষেত্রে ত্যক্তা যেমন ভাগ্যী তেমনি অসহায়,—মধ্য প্রান্ত স্নান দেহ-মন নিয়ে ভাষা চার ঐ দক্ষর একটি আশ্রয়, একটি আত্মরিক্ততা তার বিশ্বস্ত সঙ্গিনীর কাছে। আগেকার দিনে এটা দুর্ভাগ্য ছিলো না ভাই, কিন্তু এই বিলাতি সভ্যতার সর্বশেষ যুগে এটা হয়েছে দুঃখং!—কালের সমস্ত মনুষ্যের এই নব্য আলোকপ্রাপ্ত যুগ, অসুত পায়নি ভাই,—পেয়েছে বিষ, শুণ্ড শিশ! আর সেই বিষ পান করছি আমরা অসুত জ্ঞান!

—মাখি জানি অনিল! পড়ার হবে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমরা, এট মর হাট পোস্টারটির ছেলে-মেয়েরা সকলেই আমরা মেকি খোলস ব্যবহার করি। মেকি রূপ দেখিয়ে চমক লাগাই সকলের মনে, আবার ঐ মেকি খোলসটারই সমালোচনা করি, মূল্য দিই। তাই আসল রূপ যে কত উজ্জ্বল, কত নির্ভরযোগ্য শাস্ত্রময় হতে পারে, তার সন্ধান আমরা কেউ করি না। হ্যাঁ করি তখনই,—বখন আকণ্ঠ বিশেষ লক্ষ্যবিন্দু হয়ে ওঠে, তখনই খুঁজি আমরা শাস্ত্রের জল কোথাও আছে কি—না। সেদিক দিয়ে তোমরা আমাদের ভাগ্যগণন বলতে পারো অনিল, মনীষিকাকে আমি, আর সহজেই মনোভাগ্য বলতে চিনতে পেরেছি। আর এই সবার মস্তকুসিত ওয়েশিস কোথায়? তার দর্শনও লাভ হয়েছে আমার। এটা আমার জীবনের দিব্যদর্শন বলতে পারো।

—Yes, quite right. তোমার ভাষ্য তোমাকে সত্যদৃষ্টি দান করেছে অনিরুদ্ধ, তাই বেঁচে গেছে তুমি। পাকে খেকেও পাক লাগেগি গায়ের, এমন হংসনীতি জ্ঞান কচিৎ কেউ লাভ করতে পারে। লতকরা নিরেনরই জনরই ভাগ্যে জোটে আমার আর মিতার মত দুর্দশ। ক্ষুৎকণ্ঠে জবাব দিলো অনিল।

—ওসব কথা থাক ছোট মায়া! বা বটে গেছে তাকে তো আর কেমনা হবে না। হ্যাঁ আপনি আসতেন তো উদ্বেগধনের দিন? তবে আমার মতে—মিহু, তোমার বোধ হয় সেদিন না আসাটাই ভালো হবে। যুহ হবে বললো সুশাস।

—কেন, কেন? অবজ্ঞা হবে ও। উত্তেজিত ভাবে জবাব দিলো অনিল,—জানো তো সুশাস, অজ্ঞার অত্যাচারকে বত নীরবে মেনে নেবে, তার জুলুমের মাত্রাটো তত বেড়ে চলবে। এর একমাত্র ওষুধ হচ্ছে যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কিবা তাকে অবহেলার উপেক্ষা করা। ঐ দুটো না হলে, বাঁচবার কোনো উপায় নেই। হ্যাঁ আমার কিছু ভাই সেদিন যাওয়া হবে না,—অনেকদিন শিকারে যাইনি, তাই আমার শিকারী গুলীরা ঠিক করেছে ঐ দিন একটু কোথাও যাওয়া হবে, সেখানে ছোটোখাটো শিকার করা হবে, যা মিলবে। আর পাণী তপ্পী মাঝরু ভাই ও ধর্মহীন-টান আমাদের মানাবে কেন? তার জন্তে আছে তুমি, অনিরুদ্ধ, কবি, মিতা তো আছেই,—হাসতে হাসতে বললো অনিল।

—তুমি ভয় পেও না দামীদা—করণ চোখ হাট তুলে বললে সুরিতা, আমি এমন কিছুই করবো না যাতে আর তোমাকে অপমানিত হতে হয়। তোমার অপমান সে যে আমার বুক পেল হয়ে বিধে আছে দামীদা, আমাকে বলতে গিয়ে সেদিন—অবরুদ্ধ বেদনার জুঁপ এসে রক্ত করে দিলো সুরিতার কণ্ঠস্বর।

—জানি আমি। মিতা! তবে আমার ওপর দিয়েই যদি সব হাদ্যমাত্রা চলতো বিন্দুমাত্র তুখে ছিলো না আমার, কিন্তু তা হতো না মিহু! তোমাকে যে সইতে হয় অনেক বেশী, আর সেইটাই হয় আমার পক্ষে গভীর বেদনাদায়ক। তাই বায়ণ করছিলাম তোমায় যেতে। তবে তুমি না গেলে মজল অম্মঠান অসম্পূর্ণ থাকবে, সেটাও দ্রবসত্য! কাকাবাবুও মনে ব্যথা পাবেন,—তোমাকে না দেখতে পেল। এর জন্তে বলছি, ভেবেচিন্তে এমন কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে, যাতে দু'দিকই বন্ধ হয়।

খুটখুট হাটছিল জুতোর শব্দে চোখ ফেরালো সুরিতা দরোজার দিকে—একটু চমকে উঠলো বিজিতা আসছে দেখ।

ঘরে ঢুকে সোফার ওপর ধপ করে বসে পড়লো বিজিতা। ভারি ক্লান্ত লাগছিলো ওকে। চোখের কোলের কালি, উগ্র প্রসাধনও ঢাকা পড়েনি। রক্ত একলোমেলো চূর্ণকুন্তল উড়ে পড়েছে মুখে,—বড্ড বেশী যেন গালটুকটো বেগে গেছে আর গলায় কঠার হাড় দুটো বেরিয়ে পড়েছে। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে বললো ওঁ—কেমন আছে দাদা? কি খাটিনিই হচ্ছে, তোমার কাছে একটু বসবার সময়-ই পাচ্ছিনে। ভাগ্যিস কবি ছিলো!

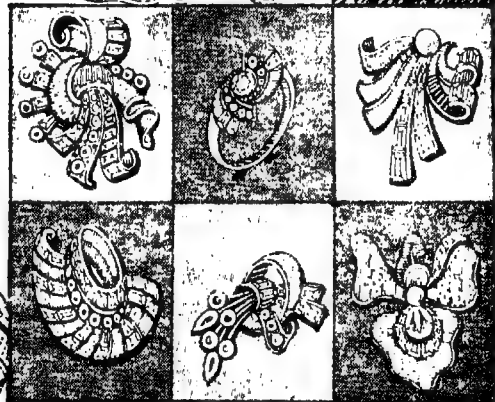
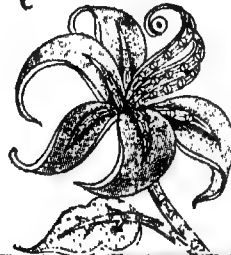
একটু হাসলো অনিরুদ্ধ। কিছু বললো না। দাদার জবাব না পেয়ে সোজা হয়ে বসলো বিজিতা। তারপর ভালো করে চোখ ফিরিয়ে দাদার পাটের দিকে চেয়ে চোখ বড় করে আছাদভরা সুরে বললো—ও মা! কবি তো নয়, ও যে মিত্র! কখন এলে ভাই? অসীম বাবুর কারাগার থেকে বেরুতে পেরেছো দেখছি?

—হ্যাঁ। অতি কষ্টে। একটু জ্ঞান হামির সঙ্গে জবাব দিলো সুরিতা। তোমাকে যে বড্ড রোগী দেখছি?—কেমন আছে?

—হ্যাঁ! তিনটে বইয়ের সঙ্গে কনট্রাক্ট রয়েছে কি না, ট্রিডিওর খাটনিতে একটু রোগীই হয়ে গেছি। তা এই ভালো, মোটা হলে ছবিতে মানায় না। অজ্ঞা দিকে ভালোই আছি! তোমার মতো, কাকুর খোঁয়াড়ে বন্ধী হতে রাজি নই বাবা! যতক্ষণ বনবে ততক্ষণ তুমি আমার, তা না হলে যে বার পাথে চলো, এই ভালো, আচ্ছা, একটা কথা এই যে, অসীম বাবু তো শুকতারাকে নিয়ে পঞ্চাশ-বার



সৌন্দর্য্য মার্ঘ্য



গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম.বি. সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭/সি/১ বহুবাজার স্ট্রিট কলিকতা-১২ গ্রাম-টিপ্পায়াকুস

ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/৫/সি প্রাসবিহারী এভিনিউ কলিকতা-২৯ ফোন-৪৬-৪৪৬৬

দোকানের পুরাতন চিহ্নানা ১২৪, ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকতা-১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন-জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ

B.B.

হাচ্ছেন ধনপতি ক্ষেত্রি বাগানে,—কত দিন বলেছি, তোমাকে জানাবার জন্তে ; মাসীমাও বললেন বার বার—মিতাকে এক দিন আনো না কেন অসীম, বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

তা তিনি তো বললেন,—তুমি নাকি কোথাও বেরুতে চাও না ? সত্যি নাকি ?

—জবাব দিলো—হুঁ—এক কথার অষ্টাদশ মহাভারত তো বলা যাবে না মিস বাবু ! যদি স্তন্যে চান তো একদিন আসুন না লালকুঠিতে। আমি শোনাবো সেই গীতাহরণের কাহিনী।

—আজ থাক ! আপনারদের খবর বলুন।

—আমাদের আর খবর কি ? হ্যাঁ, নতুন একটা খবর আছে বটে, হাস্যবাহ্য আছে। রতনলাল ক্ষেত্রি একা ফিরেছে বোম্বাই থেকে, পশ্চিমা গুকে ডাউনস্ট্রাক করে নাকি কোথাকার এক নবাবকে ধরে করেছে, তাই বেচারী একটু মনমরা হয়ে গেছে আর কি ! মাসীমা গুকে চাঙ্গা করে তোলবার ভাব নিয়েছেন, বলেছেন তিনি, এমন পশ্চিমার মত সাতটা বাঁদী তোমার এনে দেব, পরসে আছে বার, তার আবার ভাবনা কি ? ভাত ছড়ালে কাগের অভাব ? খিক খিক করে তেমে মুখে আঁচল চাপা দিলো বিজি। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো যেন একটা কাঁহালো গন্ধ।

—তুমি এখন বড় রাস্তা, বিজয় নাও বিজি। গজদীর গলার বললো অনিরুদ্ধ।

—আজকাল তুমি যেন আমাকে হু চাক দেখতে পারো না দাদা, কাছে এসেই, তাড়াতাড়ি চাও কেন বলো তো ? কি করেছে আমি তোমার ? কথাগুলো বলতে বলতে কঁদে ফেললো বিজয়। একটা বিজি, অবাকিত্তি আবহাওয়া যেন সবার মনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো।

বালিশে ভর দিয়ে জাজে জাজে উঠে বসলো অনিরুদ্ধ। শাড়ি গলার বললো বিজয়তার দিকে চেয়ে—ভুল বুঝে না বিজি। আজকাল তোমাকে দেখছি অনেক বেকী করে, কারণ একটা উগ্র আধুনিকতা, সিনেমার বিকৃত চটক বজ্র বেকী প্রকট করে তুলেছে তোমাকে সবার চোখে, আর সেইটাই হয়েছে বড় বেনাশায়ক আমার পক্ষে।

ওর কথা শেষ হল না,—পাশের ঘরে বন বন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠলো। মিসেস বাবু আসছিলেন গাভার জন্তে সকলকে ডাকতে। তিনিই ফোন ধরলেন।

মিনিট দুই বাজে তিনি এলেন ঘরে, আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে। বিজয়তা তার ভিজে ভিজে চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করলো—কে কোন করছিলো মা ? কোনো ক্রমবাহ নাকি ?

—হ্যাঁ। তবে আমাদের পক্ষে ক্রমবাহ হলেও তাঁর দিক দিয়ে মজলই বলবো, আঁহা বা কই পাচ্ছিলেন। নাতনী নয়তো, কালসাপ, সেই যে ছোবল দিয়ে গেলো, সেই অবধিই তো শয্যা নিয়েছিলেন রাজাবাহাদুর। তাঁর সেক্রেটারী কোন করছিলো, তাঁর অন্তিম অবস্থা, ডাক্তার জবাব দিয়েছেন, সেক্ষত তিনি উইল করতে চান, তাই অনিরুদ্ধকে একবার যেতে বলছেন, তাঁর বাড়িতে রেক্টার আর আরো দুই জন জন আটনি ব্যারিটার উপস্থিত আছেন। তা আমি বললাম, অনিরুদ্ধ তো এখনও বেশ দুর্বল, তবে আমি এখনি বাছি। বিজি,

তুমি এসে নিয়ে যাও, এক সাথে সবাই খাওয়া দাওয়া করো, আমি যাই একবার রাজাবাহাদুরকে দেখে আসি।

খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো অনিরুদ্ধ। ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—আমিও যাবো মা ! শরীর আমার এখন ভালোই আছে। কর্তব্যের ডাকে না যেতে পারলে, চিরদিন মনে গ্লানি থেকে যাবে যে—মিতা, স্ত্রীদাম তোমরাও চলো,—

—হ্যাঁ। আমরাও যাবো মাসীমা, ব্যথিত স্বরে জবাব দিলো স্ত্রীমিতা। দাদু বড় ভালোবাসতেন আমাকে, আঁহা তাঁর শেষ সময়ে যদি পশ্চিমা একবারও আসতো !

—ডাক্তার হিসেবে, তোমার সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে দাদা, কারণ তোমার শরীর এখনও বেশ দুর্বল। যুদ্ধকণ্ঠে বললো স্ত্রীদাম।

—না, শুধু ডাক্তার হিসেবে নয় স্ত্রীদাম, একজন Honest man হিসেবেই দরকার তোমাকে। কোটটা গান্ধে গলাতে গলাতে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—তোমার যে খাওয়া হল না মিতা। স্ত্রীদাম, অনিল তোমাদের সকলকার খাবার প্রস্তুত, খেয়ে গেলে ভালো হয় না ? বললেন মিসেস বাবু।

—না, মা ! আর এক মিনিটও দেরী করা উচিত হবে না, ওদের খাওয়াবার সময় পাবে আরো পাবে। ডাইনিরকে গাড়ী বার করতে বলো। এসো ডাক্তার, তোমার স্বন্ধে ভর দিয়ে শগুণ গতিতে চলতে শুরু করি। মিতা, তুমিও আমার আয়েকটা হাত ধরো ভাই। আর অনিল তুমি বস কেন ? এগিয়ে এসো না, সবাই মিলে আমাকে এগিয়ে দাঁও কর্তব্যের পথে। স্ত্রীদামের কীশে ভর দিয়ে মিতার একখানি হাত চেপে ধরে খাবার জন্তে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো অনিরুদ্ধ।

—ওঃ। তোমার ভাগ্য দেখে হিসেব হচ্ছে অনিরুদ্ধ। ওদের দিকে চেয়ে একটু হাসির সঙ্গে জবাব দিলো অনিল,—চলার পথে হুঁধারে যে সঙ্গী হটিকে বাগিয়েছো, আমি বলতে পারি, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও স্বর্গে যাবার পথে এমন সঙ্গী পাননি। ওদেরই শেষ পন্থায় ধরে থেকো ভ্রাতার। খাটি মাল ওরা। আর সব মেকি, বুটো।

—না ভাই, আমাকে আর টেনো না। একটু দরকার আছে, রমেন বোস-এর কাছে, মানে একটা রিভলবার নেব তার কাছ থেকে, আজ বাত দশটায় দেখা করতে বলেছে, সেক্ষত্রে ভাই এখন আমার খাবার উপায় নেই ! তোমরা এগাও, আমি বরং প্রাণভরে তোমাদের সকলকার খাবারগুলো একাই খেতে। শ্রদ্ধ করি, কি বলেন মাসীমা ?

—সে তো উত্তম কথা অনিল, খাবারগুলোরও সঙ্গতি হয় তাহলে। বিজি, একটু দেখিস না অনিলের খাওয়াটা, আঁহা চলি তাহলে।

—কাককে দেখতে হবে না মাসীমা ! আপনার এ ছেলে স্বয়ং ভীম। ত্রিভুজা রাঙ্কুসীর পতিদেবতা। ফিরে এসে দেখবেন, শুধু খাবার দাবার কেন, ইড়ি কুঁড়ি সব খেয়ে ফেলেছি। উচ্চ হান্তের সঙ্গে জবাব দিলো অনিল।

[ক্রমশঃ।

কবি কর্ণপুর-বরাচত আনন্দ-রন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অমুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৭। হাসতে হাসতে গ্রামা তখন বললেন—আমার কতকগুলি সহচরী রয়েছেন। বেজার তাঁদের বৃদ্ধি।

এখন একদিন হয়েছে কি—যেহু চরাতে বনে চলেছেন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। এগিয়ে এগিয়ে চলেছেন—পিছনে রয়েছেন সখীর দল। বেণু, বিবাণ, গুজ্জা, শিখণ্ড ইত্যাদি নানান অলঙ্কারে সকলেই সুসজ্জিত। ব্রজপুরের তোরণ ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণ, রূপ-রূপ করে বাজছে সোনার সাজ মণির সাজ। প্রাসাদের বলভীর নীচে এসেছেন, এমন সময় তাঁর এক জোড়া চোখ দেখতে পেল,—... আপনাদের এই সখীটি সেই বলভীতে পীড়িয়ে এদিকে-ওদিকে চাইছেন। বড় ভীত চাহনি। আকস্মিক সরল চাহনি। কৃষ্ণকে দেখেই কেমন যেন চক্ষুসজ্জা হল তাঁর দৃষ্টির। কিন্তু চোখ আর নড়ে না, অলস হয়ে গেল। চোখ ঘুরিয়ে নিতে নিতে আপনাদের সখীর মনে মনে গিয়ে গেল উল্লাসের ঝোঁলে। হেরে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বেই আবার দেখতে যানেন, অমনি হঠাৎ ছুটে এল শ্রীকৃষ্ণের সরল চাহনি। মাঝ পথে কেটে গেল সখীর কটাক্ষ। চরমার্দ্ধটিকে সখী উপস্কার করলেন বটে, কিন্তু ততক্ষণে অপেক্ষা না করেই কটাক্ষের পূর্বার্দ্ধটি অর্ধাৎ সেই ভাঙা বাণ বিদ্ধ হয়ে গেল কৃষ্ণের হৃদয়ে। নিয়তির নিয়োগে বিখণ্ডিত হয়েও যেন ভুঙ্ক তার পূর্বার্দ্ধ দিয়ে দংশন করল তাঁর হৃদয়। দৈবের প্রেরণা। আকস্মিক ব্যাধি তাঁকে পেড়ে ফেলল। এল উৎকর্ষ, এল বিশ্বাসের চমক। চোখের দেখারও যেন আর শেষ নেই, কেবল দেখতেই চায়।

তাঁর প্রিয় নরমহচরটিকে শ্রীকৃষ্ণ তখন বা বলেছিলেন সেগুলি আবার আমার সহচরীরা শুনেছেন শুকপক্ষীদের মুখ থেকে। খাঁচা খুলে তাঁরা পালিয়ে গিয়েছিলেন, আর আমার সখীরা গিয়েছিলেন তাঁদের খুঁজে ধরতে।

২৮। ষা শুনেছিলেন তা এই :—

প্রিয় সখা, প্রাসাদের চন্দ্রশালা আলোর আলো করে কে পীড়িয়ে ছিলেন বলতে পার ? নির্বেশ যেন বিদ্যুৎ। নন্দনবন থেকে এই চন্দ্রশালায় নিভৃত্তে কেমন করে খসে পড়ল এই ছোট কল্পলতিকটি ? ত্রিলোক সমোদ্যতের শক্তি রাখেন ইনি।

না জানি কোন মায়া দিয়ে এমন সোনার পুতুল গড়েছেন ঐশ্বর্যালোক কামদেব। পৌকুলনগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী নন তো ?

সখা, এ কী দেখলেম ? পরমকলারিৎ চিত্রকরের হাতে আঁকা আঁরি কি কোনো চিত্রলেখা দেখলেম, না, দেখলেম কোনো আকাল-সায়রের টলমল হেমহংসীর স্বপ্ন ? যেন সোনার কেরাকুল চলছে আকাশে। যেন পুশঙ্কর হাতের ইনি কুপাহীন কুপানী।

অধিতীরা যেন বিতীরা চন্দ্রলেখা, সমোদ্যের মহিমার বজ্রহী, লাক্ষ্যের নপনিকা, হাযুর্ধোর যেন সঁম্ভবোধো।

ইনি যেন ঞ্ণমদীনগুণির তেজের মঞ্জু মঞ্জরী। সোনার খাঁচার

সৌন্দর্যের পাখী। ঞ্ণে হয় আবির্ভাব, ঞ্ণে হয় তিরোভাব। সখা এ-কি আমার স্বপ্ন, না মনের ভুল, না কোনো দৈবী মায়া, বিজ্ঞাত করছে আমার মন ?

২৯। উত্তর এল :—

সখা, অত খেদ করবেন না। ইনিই বৃষভানুন্দিনী। বিধাতার এক নবীন সৃষ্টি। একেই সকলে ডাকে, সর্ব-সৌভাগ্য-সারথিকা রাখিকা নামে।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে বেরল,—

ও তাই বলা। এরই কথার আমার হুই মা সহস্রবুধ হয়ে ওঠেন। বলেন ইনিই হুইয়ে দিয়েছেন প্রসিদ্ধাসুন্দরীদের রূপের দল। ঞ্ণবতীদের গণনাও এরই চরিত্রের ব্যাখ্যান করেন তাঁরা বেশী। কিন্তু সখা, আজই এই প্রথম ইনি আমার নয়নশেখের পথিকা হয়েছেন। আঃ তাই বলা।

বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনোভাব গোপন করে অল্প কথায় চলে বান। হৃদয়ে বিকারের ঞ্ণম্ব হলও বাইরে থাকেন প্রকৃতিস্থ। যেহু নিয়ে চলে বান বনের দিকে। নাটুকে মেঘের মত নাচতে নাচতে চলে বান। কোমল নীল গায়নহারা এক জ্যোতির যেন সৃষ্টি। জামলে জামল হয়ে যায় বনতল।

ওলো সই, ওলো ললিতে, তাই বলছি, দুজনের একটি মনের একটি ইচ্ছেলতার একটাই মহাহুর জেগেছে। কাল দুটি পাতাও বেরবে, ফল ধরার সম্ভাবনাও আছে।

৩০। সব শুনে শ্রীরাধা বললেন—শ্রামা, তুই বড় মিছে বকিস। এবার ধামো সই। চন্দ্রশালায় কবে, কখন, কোনদিন, আবার আমি একলা উঠতে গেলুম ? এর পর আমাকে আর অতটা হাস্যাস্পদ করবার চেষ্টা করিসনে সই। পায়ে পড়ি, ধামো, নিল-জ্ঞতার সমুদ্রে আর ডুবিয়ে মেচো না আমাকে।

শ্রামা বললেন—খবরটি যদি এতই মিথ্যে হয়, তবে আবার নিল-জ্ঞতার সমুদ্রে ডোবার কথা ওঠে কেন ? অতএব জেনে রেখো সই, যে ভাব আপনা থেকেই জন্মায় সে ভাব চেষ্টা করলেও নিজেকে গোপন রাখতে পারো না। যাক এখন চাপলা ক্ষমা করুন সখি, আশা করি এরপর নিজের সৌভাগ্য-সম্পদে ফিরে আসবে আত্মবিশ্বাস।

৩১। এই ঘটনার রটনাটি শুভপের ধীরে ধীরে বিস্তারিত হয়ে গেল ব্রজনগরের সর্বত্র। যুধেধরীদের সঙ্গে মিলিতা হলোই তাঁদের সখীদের মধ্যে কুটত ঐ এক কথা। সবস কোনো প্রসঙ্গ উঠলে ঐ একই কথার হোতো আধিপত্য। কথার পিঠে কথার অভিযুক্ত হস্ত লাগল তাঁদের সকলের কুকাহুরাগ। এই ভাবে নিরন্তর শ্রীবৃদ্ধি পেতে লাগল পূর্ববর্গ-নাটকের পূর্ববর্গ। ফলে পাঁড়াল এই :—
পৃথিবীতে ধ্বজা ওড়ে, পদ্ম ফোট, আর তাঁরা সকলেই দেখেন আর ভাবেন,—ও সব সত্যিই শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজকমলাঙ্কিত শ্রীচরণ।

জল দেখলেই ভাবেন, ও জল তো কুকর্ভা কালিনীবি নীল জল।

জগতের সব আলো, তাঁদের মনে কুকর্ভার আলোদের জীতি-প্রীতি জাগালে। সব গন্ধই তাঁদের কাছে বয়ে নিয়ে এল ক্রীড়কেরি অঙ্গ-সৌরভ। সারা আকাশ যেন বিধোঁত হয়ে যায়—কালী চাঁদের আলোর ইশারায়!

৩২। অতএব সর্বভূতে তাঁদের সকলবি জন্মাল ক্রীড়ক-মিষ্টা। এবং ধ্যানের এক তাল তার মধ্য দিয়ে তাঁরা উপলব্ধি করলেন—নয়নে নয়নে তাঁরি জামল রূপ, বসনায় বসনায় তাঁরি অধর-রস, প্রকাশ প্রবেশে তাঁরি গুণ-শব্দ, নাশায় নাশায় তাঁরি অঙ্গ-গন্ধ এবং চর্মে চর্মে তাঁরি আনন্দ-স্পর্শ।

কুকর্ভারনের নিমেষ গুণতে গুণতে তাঁরা জানলেন সখ্যার নীতি; কুকাধারে প্রেম পরীক্ষা করতে করতে তাঁরা বুঝলেন পরিমাণের মিত্তি; গুরুজনদের থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁরা চিনলেন পৃথকতার ইতি। তাঁরা সংযোগ শিখলেন কুকর্ভারি ধ্যানের মাধ্যমে, বিভাগ শিখলেন স্বামীযজ্ঞনের বর্জনে; ‘পরম’ চিনলেন গুরুজন পরিজনদের সান্নিধ্যে; এবং অপবদ বুঝলেন ক্রীড়কেরি সমক্ষে। জীবনবিষয়ে তাঁদের এল ভাববোধ গুরুত্ব; চেতনায় এল ত্রবৎ, প্রেমে স্নেহতর। কুসংমিলন চিন্তাতেই তাঁদের যুক্ত হল বুদ্ধি, কুসঙ্গ প্রাণাশ্রিতেই তাঁরা পেলেন স্রুৎ, কুকাবিরহেই দুঃখ। তাঁদের ইচ্ছা চাইল কুসংসারীণা,

যে	...	গুরুপরিহার,
অবদ	...	কুসান্ধিসার,
ধর	...	কুসংসার,
অধর	...	কুসংসারীণা ভাব,

আর তাঁদের সাক্ষার চাইল কুসংসারায়ন। চতুর্বিংশতি গুণ এইভাবে তখন তাঁদের সকলেরই মধ্য আসন পেতে ব্যসল।

৩৩। সচরারীদের মধ্যো ব্রজলক্ষনকে নিয়ে যে ধারণার পারম্পরিক অমূল্য চলতে লাগল সেগুলিও অতি সরস। যেমন—

ভারী তো তোর ভুজের বড়াই। অমন পুরুষবতনটিকে যে মেয়ে হৃদয়ের গহনা করতে না পারলেন, সেই লো যিক তাঁর কুলশীলযোবনে, যিক তাঁর রূপগুণসম্পলে।

জীবনটাকেই বেচে দিয়েছি সখি, এখন আমার ভয়টা কিসের গুরুজনবধুবাকবে? তাঁকে পেল কাকে ভয়? না পেল, কারই ক: অভয়?

স্বামীদেবতা মারেন যদি মানন,

কুহুরা ছাড়েন যদি ছাড়ুন,

নাহুরা হাঁসন যদি হাসন,

আমি কিন্তু সেই লো নিজের করে নিয়েছি মাধবকে। কিন্তু তিনি, যে লক্ষ্য ঘুরিয়ে দেন, ধৈর্য ভাঙেন, আঘা ভীতির ভিৎ টানেন, চিন্তবৃত্তির স্বরে ডাকাতি করেন। কান দিয়ে যার নাম শোনাতোই এই, না জানি দর্শন দিয়ে তিনি কী না করতে পারেন অজ্ঞতা আঘার মত মাধবটার উপর।

৩৪। সত্যই অন্ধ ছিল না গোষ্ঠিকুলবালাদের ঔৎসুক্যের।

কালকারেলার দেহ চোবোতে বনের পথ ধরেন কালিনিধি ক্রীড়ক; তাঁদের দান কোথায়রালা মুখে বাজতে থাকে হুল্ললী; তখন তাঁর

পানে চোখের পদ্ম ছোঁড়েন এই সব অম্বরাসিনীদের দল। নয়নের চকল সৌন্দর্য বিলোতে বিলোতে আহা, যেন তাঁদের উপর কুপারি চাপতে চাপতে এগিয়ে চলে যান ক্রীড়ক। বেতে বেতে এদিকে চান, ওদিকে চান। দেখতে পান রাজপথের দুধারের অত্রযথিগুলিতে, অথবা সম্ভারযথিগুলিতে, অথবা তাঁদের স্বকীয় প্রদানের গোপরে বসে রয়েছেন গোকুলের কুলবালাদের দল। তাঁদের মন ভুলিয়ে নবীন নটের মত নাচতে নাচতে বনে চলে যান ক্রীড়ক। সামনে চলে ধেমুর দল।

এই ভাবে ভবন থেকে বনে, আবার বন থেকে ভবনে বধন ফিরে আসতেন ক্রীড়ক তখন এক উৎকর্ষার আগ্রহের আনন্দের ঢেউ খেলে যেত কুলবালাদের সম্মুখে।

কেউ কেউ হয়ত কেশ প্রসাধনে ব্যস্ত ছিলেন, খোঁপা মা বেঁধেই তাঁরা ছুটতেন। কেউ কেউ হয়ত স্নানরতা ছিলেন, আশ্চর্য, গায়ের জল না মুছেই তাঁরা ছুটতেন। মমিরেক্ষণে, একটু ঠাড়া...বসেই কেউ কেউ হয়ত আঙ্গিক চোখে অঙ্গন মেখেই ছুটতেন। ঠাড়া, আসছি...বলে এক পায়ে আলতা পরেই কেউ কেউ সিঁড়ি বেয়ে ছুটতেন ছাত্তে, বাপগুলির পাশে পাশে ফুটে উঠত ক্রীচরণের কমলচিহ্ন। কেউ কেউ হয়ত সবেমাত্র একপায়ে নুপুর বেঁধেছেন, চটাই কী যেন কি শুনলেন, বাসু আর খেয়াল নেই, এক পায়ে নুপুর নিয়েই ছুটলেন উপরে। বিশৃঙ্খলার এক শেষ। গুরুজনদের ভয়ে আবার খেমে খেমে চলতে হয়, আরো বেতলা বলতে থাকে নুপুর। আধরাগা মেখলা, পায়ের পাঁজর লুটোছে আঁচলা, ঘসড়াছে ঘসড়া, ছুটতেন...ঘূষালের নালবাধা রাজহাসীদের মত নিতান্ত বিশৃঙ্খলা হয়ে তাঁরা ছুটতেন, গোকুলের এই কুলবালা ভয়গুলোকে নাচে ফেল ছড়ছড় করে আরোহণ করতেন চন্দ্রশালার, আর সেখান আঁকা হয়ে যেত ভোরের স্থিতি-মোটা যেন কমলিনীদের ছবি।

৩৫। আবার বধন তপু হত, কুলবালাদের আঁখিগুলি তখন চুরি করে নিত যমস্ত নীলপদ্মের মাধুরী, এবং ধ্যানের মধ্য দিয়ে তারা দেখতে পেত মাধবকে—যিনি নিবাস করেন জগরে। চন্দ্রশালার জালরন্ধের ভিতর দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা এই আঁখিগুলিই দেখতে পেত ক্রীড়কে; আর কবিরের মনে পড়ে যেত শিশুরের ভিতর খঞ্জনদের উপমা।

৩৬। আর মনের সাধ মনেই ঢেকে একটি একটি করে দিন কাটাতেন গোকুলের অন্তর কুয়ারীরা। গোপজাতির সকলেই স্বভাবত: সরল পথের পথিক। তাই গোপ-পিতামাতারা সরল মনেই জানতেন, তাঁদের ঘরের মেয়েরও ক্রীড়কের বাড়ীও যার আসে সরল মনে। আর যাবে নাই বা কেন, বধন হুলোখলা থেকে আরম্ভ করে ক্রীতগবানের ভবনে তাঁরা নিত্য এসেছেন নিত্য গেছেন। ওতে দোষের কিছুই দেখতেন না তাঁরা। কিন্তু কুমারীদের হৃদয়ে জন্মাবধি নিগূঢ় ভাবে লুকিয়ে থাকে একটি ভারী পতিপ্রসঙ্গ। নিফুতে নিফাতে মহানিধির মত লোঁট ফুগু করে রাখে অন্তর, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ হয় তটস্থ উদাসীনতার। অনুরোধেরও সেই দশা হল। তাঁদের মানসধরে চড়ে চললেন একটিই মাত্র অভিলাষ...ক্রীড়কই আমাদের ভারী পতি, আর ব্যুতে বইল কালচক্র।

৩৭। তারপরে একদিন, সেদিন মণিপ্রজ্ঞার থেকে বাহির করে, নিজের শয়নগৃহে বসিয়ে শ্রীমান কেলিকুণ্ডলটিকে একটি একটি করে পাখী গুলিরেবের দানা খাওয়াচ্ছিলেন বৃন্দাভূমিনী। এমন সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি টুকবো টুকবো হয়ে যেতে লাগল কুলাভূষণের নিতৃত আশ্রয়ে। তিনি তাঁর খেলার পাখীটির দিকে চেয়ে বাগবায় বলতে লাগলেন—

ওরে পানি, কুক কও।

বার বার কুক কও কুক কও, বহুতে বহুতে এক অনির্বচনীয় পবিত্রতাকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর দৃষ্টি। উপস্থিত হল মতামুখ্য তাঁর বিশাল নিবিড়তা নিয়ে। শুকটিকে তুলিয়ে তুলিয়ে বৃন্দাভূমিনী যেন পাঠ করলেন একটি দ্বন্দ্ব শব্দ,—

দুলভভবের ভালবাসা

কী পিণ্ড লজ্জিত বৃষ্টি

স্বরবরি ভাঙে সব আশা

কুসুম-বাণীশ্রি-বৃষ্টি।

এ ঘর ছাড়িয়া দ্যেত তার

অন ঘরে জগে চলে যায়

মরি মরি তবু হাস-শোনা।

জানেনতে চেবি মধুরিকী।

৩৮। শুকপাখীটি ছিলেন পরম পশ্চিম ও বসিক। পূর্ব থেকেই তিনি সর্বস্বত্বায় পটীয়ার। শুনেতে শুনেতেই তিনি কষ্ট করে ফেললেন কথিত্যটি। কিন্তু তাহলেও পশ্চিমতাব বাবে কোথায়? আদরের পাখী, স্বাভাব্য পেয়েছেন, অতএব কুক কও কুক কও পাঠ করতে করতে শ্রীবারিতার কক-কমল থেকে ডানা মেলে তিনি উঠে পড়লেন গগনে। কিন্তু উড়ান বিষয়ে হেতুভূত অপ্রবীণ, সেটাতড় কাকে এ বাড়ীর দার খোক ও বাড়ীর ছাদে উড়ে বেড়াতে হল। ফলে তিনি এসে নামলেন গোবিন্দবাস্কর্য্যবের প্রাসাদের আলিঙ্গনে। আর তারপরেই নিজের কোমল শরটিতে একটু রক্ত চড়িয়ে গান করতে লেগে গেলেন সেই কবিতাটি—

দুলভভবের ভালবাসা—

গান শুনে যেন কান জুড়িয়ে গেল। এবং তাই 'কি আশ্চর্য কি আশ্চর্য' বলতে বলতে সবিশেষ সন্ধ্যাকৃত্তক থেকে কাছে স্বয়ং মেয়ে এসে উজ্জ্বলকুমার খি ঘর ঘন। তবু প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—

কে তুমি, কার তুমি?

তারপরে সপ্রণয় বললেন—

পানী, আবার তুমি গাও।

পটী পুনর্বার পাঠ করলেন শুক-মতামুখ্য।

৩৯। কুক বললেন, পানী, অসীম আপনায় মেধা, বিদ্যানদেরও আশনি বিভান। আপনায় কথায় দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব করছে আমার কণ। আশা করি অতীত দ্বন্দ্ব হয়ে গেছেন আপনিত।

শুক বললেন, উজ্জ্বলকুমার, আমি নিতান্তই কৃতজ্ঞ। কেন আমাকে দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব করে বুধা দ্বন্দ্বিত করছেন?

গাচ জলুবাগে ঢলুবা হয়ে পড়েছিলেন দেবী। দ্বন্দ্ব মুক্ত মধুর মধুর কুক কুক কুক নাম পাঠ দিচ্ছিলেন আমাকে। কিন্তু দ্বন্দ্ব আমাকে, অতঃপাণি, অতঃপাণি ভাত আমায়, আমায় সহস্র দ্বন্দ্ব দেবীর ককমল থেকে আমায় কিনা দ্বন্দ্ব বিচ্যুত?

৪০। নিজের তাহলে এট পক্ষীটি কোনো মহাদুর্ভাগবতীর ফলসংলগিত হবে, এই ভেবে শ্রীকুক বললেন—

পানী, থাকে চাও, থাকে বহুক্ষণ আমি না পাই, ততক্ষণ এইখানে একটু থাকো। এই বলে বাড়িয়ে দিলেন নিজের ককমল। শুকপক্ষীটিও কুকবাসনা-প্রতিপালন লালসায় নির্ভয়ে চড়ে বসলেন শ্রীকুকের ককমলে। এবং ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন কুকের হাস-প্রিয় সখা কুম্ভমাসব। বট এসেই বললেন—

শুকটি তো মহা-বিদগ্ধ দেখছি। কেলি-কৌতুকের জন্মেই যেন তৈরী। সবতনে বক্ষণীয়।

এই বলে শ্রীকোল শুককে তিনি তুষ্ট করতে বসে গেলেন দাড়িম-দানার ভোজ খাইয়ে।

৪১। এদিক বৃন্দাভূমিনী সেই সময়ে...কুলাভূষণের পরভবে একেই তাঁর কোমল তরুণারি ভজ্যান অবস্থা, তাঁর উপর হাত থেকে কোথায় যেন উড়ে চলে গেল পানী...জলুগন্ধিনী নিয়ে তাঁর অচ্যুতকে বললেন,—মধুরিকে, দ্বন্দ্বেরিকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজে দেখ ত শকের বাছাটি কোথায় গেল?

অতএব দুজনে খুঁজতে খুঁজতে শেষে মৈবৎ দেখতে পেলেন, কুম্ভমাসের গোপন-পরিচয়ে কুম্ভমাস বসন্তের মত শ্রীকুক বসে রয়েছেন চৈত্র-চৈত্রের মত তাঁর সখা কুম্ভমাসব—কেলিকুণ্ডলকে তাঁরা খাওয়াচ্ছেন। কেলিকুণ্ডলকে আনন্দে বললেন কুম্ভমাস।

কুকানিকে যখন মধুরিকা উপস্থিত হলেন কুক তখন ভাবছিলেন। ভাবনাটিও যেন আবার তাঁর মুখটিকে আরো মনোরম করে তুলেছিল। আর করবেই বা না কেন? কেলিকুণ্ডলকে দুখ থেকে শোনা দুখ কাব্যের অর্থাত্মক করে তাঁর দৃষ্টিতে জন্ম নিয়েছিল গভীর একটি বেদনা। কিন্তু সে বেদনাটি প্রকৃত্ত জানাবার মত ত্রিভুবনে লোক কোথায়? কেউ যে নেই। তাই নিজের দৃষ্টির সঙ্গেই চলেছিল তাঁর বেদনার বিচার, আর ধ্যানগৃহীতা একটি দেবী কেবল ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই বেদনার-বোঝা বিহীন মনের পথে। অতএব তাঁকে দেখাবেই তো মনোরম।

৪২। দেখে এগিয়ে এসে মধুরিকা বললেন—জয় হোক উজ্জ্বলকুমারের। হে দ্বন্দ্বাত্মক, এই শুকটি আমার দেবীর। এখন অল্পগ্রহ করে এই শুকটিকে আমার দিন। বিজ্ঞপ্তি হবে আপনার বশ: পরিমল।

৪৩। কুম্ভমাসব বললেন—এটি যে তোমার দেবীর তার প্রমাণ কি? তোমার কথা তো আর প্রমাণ হতে পারে না? যদি হয় তাহলে পাখীটিকে ডাকো, ডাক শুনে যদি তোমার হাতে চড়ে, তবেই বুঝ এটি তোমারের।

৪৪। মধুরিকা বললেন—বট, উজ্জ্বলকুমারের পদহস্তের একটু আদর পেতে কার না লোভ হয়? হাতের আদর পেলে যেখানে বাঁশের বাঁশী অচেতন হয়েও হাত ছাড়তে চায় না সেখানে সচেতন পাখী বলুন তা কেন করে পারবে? কিন্তু কুম্ভমাস, আমার দেবীটি বড় ভালবাসেন শুকপাখির গান শুণ আর চালচলন। ওটিকে না হলে তিনি এক পলকও শান্তি পাবেন না। ওটিকে দিন।

৪৫। কুম্ভমাসব। তা ঠিক বটে। নবীন শুক, তার এমন গুণ। এমন যেন কোন রমণীই না কামনা করেন?

মুখিকা। এ গুণটি তো তাঁর। তিনি কেন একেই কামনা করতে বাসেন ?

কু। তোমার দেবীটি বলি কে ?

মু। আপনার এই বসন্তটি যেমন কোনো একটি ব্রজরাজের লক্ষণ তেমনি আমার তিনিটি হলেন কোনো একটির নন্দিনী। আপনায় মত মহাশয় সাক্ষাতে তাঁর আর কী গুণ ব্যাখ্যান করব ?

৪৬। কু। বেশ তাই সই। তা আমবাঁই বা কেন এটিকে দান করতে বাব ? আমার বসন্ত তো আর চোর নয় যে চুরি করে যা গারে পড়ে এটিকে এনেছেন। আপনাদের ছলকালার অন্ত নেই, লোভেরও সীমা নেই। মিথ্যে দেখ চাপিয়ে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দৈবাৎ শরণাগত হয়েছি শুক ; যিনি শরণাগতবৎসল তিনি তাকে রক্ষা করেছেন। রক্ষা করে তিনি আবার কেমন করে বলিয়ে দিতে পারেন জানি না। ইত্যবসরে তথায় উপস্থিত হয়ে গেলেন ব্রজেশ্বরী মা বশোদা। ঈশ্বরকে সোধান করে বললেন বজ্র দেবী কবিশ বাহা ! বেলা যে পুইয়ে এসে, ভাত যে জুড়িয়ে গেল ! বজ্র অনিরম করিস। সখারা কখন চলে গেছে, একদৃশে দ্বারের বাড়া ভাত খেয়ে দ্বধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। খাবি চল। খেজুলোণ্ড চোখ বড় বড় করে, কান খাড়া করে খাড় বাঁকিয়ে ডাকছে, তোর পথ চরে বসে আছে।

৪৭। দেবী করিসেন, আর। খেয়ে ঘেরে লক্ষীটি আমার, সাখীদের নিয়ে গোঠে বা।

ব্রজেশ্বরীর কথা ধামতে না ধামতেই এগিয়ে এলেন কুসুমাসব বললেন, মা ভাৱী মজার ব্যাপার ঘটেছে একটা। এত বড় মজা আর হয়নি।

এই যে গুণপাখীটি দেখছেন, এটি সাক্ষাৎ গুণসেবের মত পূর্য দৃষ্টিমান। চন্দ্রপুত্র বুধের মত কথাশিল্পে বিদগ্ধ। গুণসেবের কেত এটি মা, কারোর চোখে পড়েনি এতদিন। অগোচরে ছিলেন বটে, কিন্তু সত্যি মা, ইনি সকলকার মন-সন্ধানী গুণচর। আবার এমিকে দয়ার বিব্রহ, মন গলাতে একটি। পদের মত এঁতে বিস্তৃতিও লেগে আছে। ভক্তিযুক্তের মত মিঠে মিঠে বুলিও ছাড়ছেন। সিদ্ধান্ত-বাগীশের মত মেথার ভীষণ দৌড়, কেবল দৌড় নয়; কঠোরও মহাতেজ। কঠটি আবার গর্ব-হরের আশ্রয়। চুই মন দেবতুল্য সাধু শাস্ত। পাহাড়ের মত স্থির। নাহুসহুস দেখতে বটে কিন্তু মন চমকিয়ে চলেন। হঠাৎ উড়তে উড়তে এসে পড়েছেন বসন্তের হাতের মধ্যে। এত কলা আর এত কৌশল এর আলোকে যে সখার আমার মন ভরে গেছে ; পক্ষীটিতে গেছে গেছে তাঁর ভালবাসা। তাই এই দেবী। দুঃখ করবেন না। আমার চেরেও সখার অধিক প্রণয়ের পাত্র হয়ে উঠেছেন শুকটি। তার উপর এই যে গোণকুমারীটিকে দেখছেন, ইনি দত্তের একটি সিঁড়ি। আমাদের ছুবছেন। বলছেন, শুকটি তাঁর দেবীর। শুধু বলা নয়, নিরেও যেতে চাইছেন। অজ্ঞাত বত সব উত্তর দিয়ে বাধা দিচ্ছেন বসন্তকে।

কুসুমাসবের কথা শুনে ব্রজেশ্বরী পাশের দিকে চাইলেন। তারপরে শব্দগ্রহে মুখরিকার গারে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—মুখরিকা, তুমি এখানে কেন ?

৪৮। ভয়ে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় প্রণতা হলেন মুখরিকা। বললেন, রাণীমা, আমি তো এমন কিছুই বলিনি। এটি আমার দেবী শ্রীরাধিকার শুক। তাঁর খেলনা। মাত্র বলেছি এটিকে না পালে তাঁর বড় কষ্ট হবে। [ক্রমশঃ]

এরা কারা ?

শ্রীমতী রত্না চৌধুরী

একখানি ভাঙ্গা ঘর,

মাটির সঙ্গে মিশে গেছে তার ভিত,

চুপুয়ের পূর্ব আর সন্ধ্যার চাঁদ

ঘরে ভরেই দেখা যায়

বুড়ির কঁটা, তাও পাওয়া যায়।

এই ঘরেই বেড়ে ওঠে ওরা ক'টি ভাই-বোন।

এইখানেই স্নহ হয় ওদের অভিশপ্ত জীবন।

বাপ মা আছে, নেই তাদের স্নেহ ভালবাসা,

ও দুটো জিনিষ ওদের কাছে অনাধারিত।

সে জন্যে নেই কোন অভিযোগ।

ওদের আছে শুধু বৃত্তকা বার নেই শেখ,

এক কঁটা ডাকার জল, তারও জন্যে আছে ক্রেশ,

সারিবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় পাড়িরে

হাস্তার কলের সামনে।

এসিয়ে বাবার চোঁটা করলে

ভুলতে হয় মোরগা পালাপালি

কান্দল, কড়াকড়, পেও বাঁধ যায় না।

তবু ওরা সুখী, অবচেতন মন ওদের

অন্ধ্রই থাকে খুদী।

দিনান্তে কুপীর মিটমিটে আলোর সামনে,

কলাই-চটা ফুটো খালার মোটা ঢালের ভাত

আর একটুখানি তরকারী শেষে,

ওদের যুখে ফুটে ওঠে এক তৃপ্তির ছবি।

যার তুলনা মেলে না,

দোতলার বিজলী বাতি ও পাখার তলায়

ডাইন: টেবিলে পোর্সিলিনের ডিশে সাজানো

চপ, কাটলেট পোলাও কালিয়ায়।

স্নাতকসেতে ভিলে মেয়ের ছেঁড়া কাঁধায় শুয়ে

ঘরের পাশের নর্মা থেকে ভেসে আসা ব্যাঙের ডাক শুনে

একটা দিনকে এরা টেলে দেয় ঘর অতীতের কোণে।

এই ভাবেই স্নহ হয় ওদের অভিশপ্ত জীবন।

হয়তো বা শেখও এইখানে,

অথবা অন্ত কোনখানে,

কিবা আর কোথায় কে জানে ?

সেকেন্সে

ধারনা নিজে

ভালভাবে জীবনযাপনের সুযোগ

মণ্ডি করবেন না ?



সেকেন্সে ধারণা ও অভ্যাসের ব্যবহার
ভালভাবে জীবন উপভোগ করার এক
সুযোগ হইবে। সুযোগের পথে সঠিক
ধারা হয়ে গাঁড়িতে পারে।

দুইতরফ, কোনো কোনো লোককে বলতে
কেনা যায়, "আমি কখনো বনস্পতি ব্যবহার করি না।
জেনেছি, বাছের পক্ষে জিনিসটা ভাল নয়।" এ হল
একবারেই সেকেন্সে সংস্কার ... কারণ সেকেন্সের
পদার্থ যে বাছের পক্ষে একান্ত অযোগ্য, বিজ্ঞান
তা প্রমাণ করেছে। উপরন্তু, বনস্পতি যে সবচেয়ে
পুষ্টিকর ও উপকারী রেহপদার্থের মধ্যে অন্যতম
বিজ্ঞান তাও প্রমাণ করেছে।

অত্যাবশ্যক ভিটামিনে সমৃদ্ধ

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায়
রাখবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্তত
পক্ষে দু' আউন্স করে রেহপদার্থ খাওয়া দরকার।
রেহপদার্থ আমাদের অস্থি খাণ্ড হজম করতে ও
তার উপকারিতা পেতে সাহায্য করে। তাছাড়া,
রোগ ও অবসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং আমাদের
হৃৎ ও স্নায়ু থাকতেও সাহায্য করে।

বনস্পতি বিশুদ্ধ উদ্ভিদ স্নেহ—চিনাবাদামের ও
তাদের তেল পরিশোধন করে বিশেষ প্রণালীতে
তৈরী। এর ভেতরে রেহপদার্থের সব গুণ ঘনীভূত
হয়ে আছে বলে বনস্পতি শুধু যে দামে হজম ও
অজ্ঞেতেই অনেক কাজ দেয় তা নয় ... আরো
স্বাস্থ্যপ্রদ করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয়
ভিটামিনও এতে মেশানো হয়। বনস্পতির প্রতিটি
আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট
সমৃদ্ধ—যা চোখের ও হৃৎকের স্বাস্থ্যরক্ষায়, শরীরের
অন্যপূরণে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে অত্যাবশ্যক।

ভাল খাদ্য আপনাকে ভাল স্বাস্থ্য উপভোগ
করতে ও ভালভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য
করে ... এবং বিশুদ্ধ, পুষ্টিকর ও দামের দিক থেকে
সুন্দর বনস্পতির কল্যাণে ভাল খাদ্য খাওয়া সহজ
হয়েছে। আপনার কি বনস্পতি ব্যবহার করতে
স্বীকৃতি উচিত নয় ?

বনস্পতি

— বাড়ীর গিল্লীর বন্ধু



স্পেন্সার স্মৃতি দণ্ড

পাঁচ বছর পরে দেখা—ওমরের সংগে। তাও ভিন্ন পরিবেশে।

কলেজের সংগে সম্পর্ক কাটিয়ে আমি এসেছিলাম বাসবপুরে পড়তে, ওমর গেল হুনিভারসিটিতে। তখন তবুও দেখা হোত। এবারে দেখা হোল হঠাৎ—ট্রফালগার ঘোঁরায়ে। আর তা পাঁচ বছর পরে। বয়স ওর বেড়েছে বলে মনে হয় না। ছিপছিপে, লম্বা চেহারা, কালো কুচকুচে দীর্ঘ চোখ আর আচ্ছন্ন বকমের বড় পাখাগুলো। এই চোখটাই ছিল ওমরের বিশেষত্ব। আমি একা ছিলাম না, সংগে ছিল আমার বোঁ, সুইস-মেয়ে লুলু। ট্রফালগার ঘোঁরাবের সামনে শাড়ী পরে ওর ছবি তোলার শখ, তাই ওকে শাড়ী পরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, ছবি তোলার শেষে ফেরার পথে ওমরের সংগে দেখা। আমার চেহারা কি পরিবর্তন হয়েছিল জানি না, লগুনে হঠাৎ অল্প ভারতীয়ের সংগে গায়ে পড়ে আলাপ করা ত তুলে গিয়েছিলো—চার বছর তখন আমার থাকি হয়ে গেছে। ওমরের দিকে কেন যে তাকিয়েছিলাম জানি না, ও ক্যান্টনাল গ্যালারীর সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে—দীপঙ্কর না?

আমি বললাম, তুমি—তুই ওমর তো?

লুলু এগিয়ে এলো। বললাম—এই আমার স্ত্রী লুলু—

বালা দিখিয়েছিল বৃষ্টি, ওমর বললে তা অত দৃষ্টি করে এই আমার স্ত্রী বলার দরকার কি? বলতে পারিল না, আমার বোঁ। কি বলেন বোঁঠান?

লুলু হাঁসার মত তাকিয়ে বইলো। হাত বাড়ি করে বোধ হয় নমস্কার বলার চেষ্টা ছিল কিন্তু হতবাক চমক খইলো।

তুই একটুও বললামনে ওমর, আমি বললাম। আর বালা শিপোইনি, শুধু ঐ কথাটা ও জানে, তবে আবার হু-চায়টে কথাও জানে। থাক আমার বোঁ-এর কথা, তোমার কথা বল।

ওমর চাইলো কাড়ান। তার পর ওর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিলো। বুললাম—ও একটা কিছু বলবে কি বলবে না জানতে। মুলমানের ভেলে। যদিও আমরা কলেজের একসঙ্গে মানুষ হয়েছি, তবু আমাদের ককরমতালের সর্বত্র ওর গতি বাধিত কি অব্যাহত—এই সংসার যখনই ওর চোখ, তখনই ও মাথার চুলে আঙুল চালান—এ আমার অভ্যাস। নম, তাই ওকে এই অবস্থায় রেখে বললাম—মা ভৈঃ।

দীপঙ্কর, আমার সংগে ঐ সরাবখানায় একটু আসবি? বড় তোটা পেয়েছে, আর ঐ সরাবখানায় বসে যাবে।

আমার কোনও আপত্তি ছিল না, লুলুবও। তিনজনে এলাম পাবে। অনেক গল্পের খবর তখন তিনজনে বেবোলায় তখন বেলা পড়ে এসেছে। ওমর আমার সিকানা আর টেলিফোন নাম্বার নিলো—আমি নিলাম ওর। আমরা বাসের ভক্ত চেয়ারিং ক্রমের দিকে ইটিতে শুরু করলাম। ওমর চললো তার উদ্দেশ্যে দিকে।

ওমরের নাম আমীর খান। আমীর থেকে কি করে ওমরে এসেছে—ঠিক মনে পড়ে না। হয়তো টুইল কলেজের নেওয়া নাম অথবা ওরই বাড়ীর। তবে নাম যেই দিয়ে থাকুক ঐ নাম ছাড়া আর অন্য কোন নামে ওকে মানাত বলে মনে হয় না।

ওমর বড় চকল। সেই চাকলা ওর এখনও আছে, লুলু কাছের জা ধরা পড়েছিল। আর ধরা পড়েছিল ওমরের চোখ। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তোমার কি ওকে পছন্দ হয়েছে? ও ছেলে হিসেবে ভালই, তবে আমি হিসেবে কি হবে জানা নেই। লুলু মুখ ভার করল অভিমানে! বললাম, মানিনি, তোমার ভারতবর্ষেই জন্মান উচিত ছিলো।

ওমর লগুনে এক বছর এসেছে। ব্যারিয়ারী পড়ছে। দেশে ওর বোঁ আছে কোলকাতায়—পার্ক সার্কাসে। বিয়ে ওর হয়েছে প্রায় দু বছর। ওর বোঁ-এর কাছে যা গল্প ভুললাম, মনে হোল সুশিক্ষিতাই। কি পাশ, জিগোস কারিনি। সিলিল সাপ্লাই-এ বোধ হয় কান্স করে। তবে চাকরী ভীষিকা হিসেবে নেহান, বর্জগতের সংগে যোগাযোগ রাখার জন্য চাকরী নেওয়া। ওমরের বাবার অনেক পয়সা—খণ্ডেরও। এদেরই ব্যাবিটারী পড়া মানুষ, তবে ওমরের কথা বলা বড় কঠিন। মন ওর ঠাঁড়তে চায় না—গতির অভাব ওকে বাধা দেয়, বিশ্রামও চায় না অন্ততঃ চাইতো না। পাঁচ বছর পরে দেখলাম, বি-এ ক্লাশের ওমর আর আভ্যন্তর ওমরের পার্থক্য নেই মৌলিক। সেই আনমনা উদ্মনা, বহুসের গাছের ওর চেহারাও অবধি ছুঁতে পারিনি। আমার নিজের দিকে তাকালে মনে হচ্ছিলো আমি ওর চেয়ে দশ বছরের বড়। মেদ জমতে শুরু হয়েছে দেহে সাতাশেই। নির্ভরতার মেদ, আত্মপ্রীতির মেদ—সংসারীর হিতৈষীতার মেদ। ওমরও তো সংসারী? ওর তো বোঁ আছে? তবু ওর চেহারা বিবাহিত জীবনের ছাপ নেই। আমার নিজের মৈথুনের গতানুগতিক ছন্দে ছাপ।

কারণও ভেনেছিলাম কিছুদিন পরে, বেশ কিছুদিনই, ভকিসের কাছে বড় বাস্তব তখন। সাতা দিন হাডভান্ডা খাটুনি—তার ওপর লুলু নেই। শাড়ী পরা প্র্যাকটিস হচ্ছিলো তখনও। সিঁড়ির কাপেটে পা বেধে পড়ে গিয়ে তিন সপ্তাহ হাসপাতালে গুয়ে আছে। বাবে বাবে বলেছিলাম—শাড়ী পরো না, শাড়ী পরো না, একে তো

আমাকেও শুক শাড়ী পরান দেখাতে করেছিল, কোমরে বড় গেবো বেঁধে, তার বর্ণনা না দেওয়াই ভাল, হয় ওর পা শাড়ীর কুলে বেঁধে যায়, নরতো উঠে আসে হাঁটু অবধি। তবু কে বেন ওকে বলেছিল যে শাড়ী পরলে নাকি ওকে অপূর্ব সূন্দর লাগে, ভারতীয় মেয়ের লাবণ্যমা আৰ স্বকীয়তা ফুটে ওঠে ওর মধ্যে। আমি বাজি ধরতে পারি যে, যে একথা বলেছিল সে নিশ্চয়ই ঠাট্টা করেছিল। তা ও কি মোহে? মেয়েমানুষ সব দেশেই সমান—মিথ্যা। স্বতন্ত্র ওদের জোলান এত সোজা। বাই হোক, লুপু বোধ হয় এবারে হাসপাতাল থেকে এসে আর শাড়ী পরার নাম করবে না। ঠিক এমন সময়ে একদিন ওমরের টেলিফোন এলো আমার অফিসে।

তোরা কেমন আছিস? আমার খোঁজও তো নিস না একটা টেলিফোন করে। ওমর বললে।

ভাল নেই, আমি বললাম। লুপু সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তিন সপ্তাহ হাসপাতালে। যাক অফিস ফেরৎ লৌড়তে হয়, তবে আজ ছুটি, আজ ওর পরিচিত কয়েকটি স্ট্রটস-মেয়ে ওকে দেখতে আসবে। আজ ওদের প্রাণভরে জাৰ্ণাল বলাব সুযোগ দিয়েছি—

বৌঠান সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে? আহা হা! কি করে পড়লো? কেমন আছে—সীতিয়াস কিছু নরতো?

কে জানে? তবে খুব খারাপ নয়। জার্নাস আমার বোধ হয় কোন পরিচিত ভারতীয় বন্ধু বলেছে ওকে, শাড়ী পরলে খুব মানায়। সেই শোনা অবধি রোজ শাড়ী-পরে আয়নার সামনে নিজেকে ঘরে ফিরে কতবার যে দেখা হোত, তার শেষ নেই। সম্প্রতি শাড়ী পরে ভারতীয় মেয়ের মত gracefully হাঁটা প্র্যাকটিস হাচ্ছিলো—বাস, সিঁড়ির কাপেটে পা বেধে পড়ল। এখন মর তুই দীপংকর কামেলা পুইয়ে।

হো তো করে ওমর হেসে উঠলো। বললাম, হাসছিস কেন? তোর খুব মজা লাগলো বুঝি? না—থরছি, তুই বলেছিস বুঝি শাড়ীর কথা।

হ্যাঁ আমিই বলেছিলাম, কিন্তু কে জানতো? রাগ করিসনি তো তুই? ওমর বললে। তারপর কিছুক্ষণ থেকে বললো দীপংকর, আজ সন্ধ্যায় তো তোর কাজ নেই, আমার সঙ্গে Lancaster gate এ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় দেখা কর, আমরা একসঙ্গে খাব আর তোকে একটা ভিনিস দেখাব।

কি দেখাবি? আমার আর দেখার বাতিক নেই।

সাকীকে কি দেখাবেন? আমি ওমর একলা থাকি কী করে, সাকী ওমরের চাই-ই, আজ তুই সাকীকে দেখাবি।

তোব সাকী তো দেশে আছে। সেলিমা এসেছে নাকি?

হুব বোকা, সেলিমা কি সাকী চ'তে পারে? ও তো আমার জ্ঞক। সাকী কি কখনো বীধনে ধরা পড়ে?

টেলিফোনে এর বেশী কথা বলার আমার ইচ্ছে ছিল না, বললাম আচ্ছা আমি আসছি, আমার কিছু এসব ভাল লাগছে না।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সময় এলাম ল্যাকাষ্টার গেটে, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড থেকে বাব হ'য়ে যে সড়ক গল-পথ আছে সেখানে বোধ ওমর দাঁড়িয়ে, ভারী সূন্দর বেশ-বাস, ওমরের চেহারাও বৈশিষ্ট্য মেন ফুটে উঠেছে।

তুই ঠিক সময়েই এসেছিস, আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে ওই স্থবিধে—বাসে এলে পনের কুড়ি মিনিট সেরী হ'লেও আশ্চর্য হতায় না, আর।

কই, তোর সাকী কোথায়? তাকে দেখতেই তো আসা—সে আসেনি?

বীবে বন্ধু বীবে, যদিও কীটাব সংগে কি সাকী চলে? তার হাওসা-কাসা সময় এড়িয়ে সময় পেরিয়ে।

তোব পাগলামী পাঁচ সাল আগে শুনেছি—তখন মানাতো, তখন আঘাব দুজনেই চান্না ছিল। কিন্তু আজ আমবা দুজনেই ফসাবী, ওমর তেল্লোভুবা আমাদের হানার না। চল কোথায় বসি, আমাশ আসাব সকাল সকাল ডিনার খাওয়া আসাম।

খানি ডিনার, তাকে তো খাবার কথা বলেছি। এই Grill-room এ আমবা খাব বলে ওমর আছিল দেখাল।

Grill-roomটা টিকিট প্রেসের লাগাও। দেখে মনে হোল—উঁচুরবেইট, লুলুব সংগে বহন কোটিসিপ চলছিল তখন, কখন-সখন একটা উঁচুরবে বেস্টোয়ারি গেছি—কিন্তু এমন ভারপার এসেছি বলে মনে হয় না। যদিও আমার এজিনিয়ারবে চাকরী আর টাকার অকটা মোনিট, তবও পরে আমার সাল-বো, তবু জীবন-মান ভারতীয় অনুপাতের সংগে সমতা বেরেছিল বেশী ইথ্যোপীশ মানেব সংগে কম। ইথ্যোপীশ জীবন-মান আর ভারতীয় মানেব সংগে পার্থক্য মৌলিক, ইথ্যোপীশ মানেব পরায় হা প্রয়োজন—ভারতীয় মান অনুসারে তা বিলাস। আমার বিয়ে তবার পরে এ ব্যাপারটা আরো ভাল করে বোকা হয়েছিল, তবু লুপু আর পাঁচজন স্ট্রটস মেয়েব মত খবচে নহ—সামলে চলতে জানতো। বিয়ের পরই তাই আর আমাদের নিত্য প্রয়োজন ছাড়া বেস্টোয়ারি আসা হো'ত না। আর এমন বেস্টোয়ারি তো নয়ই। দরজা দিবে ঢুকেই প্রথমে নজরে পড়ে এব সৌন্দর্য্য, এত গভীর আর মোলায়েম। পা বুঝি ডুব যায়! বেলোয়ারী লঠনেব ঝাড় ফুড়ে ইতি-উতি। খরিদ্বারদের তখনও আসাব সময় হয়নি। সবেমাত্র সন্ধ্যা। আমি আর ওমর একটা কোণেব টেবলে এলাম।

তোব সাকী কখন আসবে, আসবে তো না রহস্ত করছিস? তার নাম কি, বয়স কত কোন দেশীয়?

অনেক প্রশ্ন করলি দীপংকর, আবখাসের প্রশ্নও—আর তুই চটে বাসনি তো?

চটবে কেন? তোর যাবে বউ আছে, তোর অনেক ছিঁড়ট আজ পাওয়া হ'চ্ছে না, অনেক কিছু থেকে ভুটী বাস্তব, বা'দ এদেশী কোন মেয়েব সংগে মেলা-মেশা করে তার কিছুটা পাস তা'লে মজাভারত অন্তত হ'য়ে যাবে না, তবে খবচের দিকে নজর রাখতে বোলব, এত খবচ পোষায় কি করে তোব, সম্ভাব বেস্টোয়ারি বাস না কেন?

সম্ভাব বেস্টোয়ারি সাকীকে হানায় না। সাকীর পারবেশটা কি অনেকখানি নয়?

খাক তোর রহস্ত, আমার ক্ষিপে পাচ্ছে। তোব সাকীর ভর্ত তো আব অপেক্ষা করা চলে না, এর মধ্যে একটা মেয়ে এগিয়ে এসেছিল আমাদের খাবার টেবলে—ফরমায়েশ নিতে। ওমরকে দেখে সে হাসলো, বুঝলাম, ওমর পরিচতই।

ডেনীস কোথায়? ওমর মেয়েটাকে প্রশ্ন করলো, তখনলাম ডেনীস আশ্চর্য ওপর একটু বেশী জোব দিয়ে উচ্চারণ করা।

আসাব সময় তো ওর হয়ে গেছে, মেয়েটা বললে, হয়তো ডেনীস ক্রোকফ্রেম পোষাক বলল করছে।

ডেনীস যদি আসে তো তাকে পাঠিয়ে দেবে কি? আমি তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, কনসায়ের তাকেই কোরব—Please দিলি।

লিলি মিস্ট্রি চেয়ে চলে গেল। তোর মস্তিষ্কর হয়েছো বললাম। কোথায় লম্বা-শ্রী মাখান হাতের পরিবেশন, আর কোথায় ডেনীসের সান্ডিস। সে বোধ হয় স-গুচ্ছ মস্ত জোয়ান কোন পোল বা ইটালিয়ান।

না রে, ডেনীস যেতের নাম ছেলের নয়, শুনহিস না নামের উজাব আল্লাহ—বানানও আল্লাহ, ঐ দেখ ডেনীস আসছে।

কাউন্টের ঘর দিয়ে দেখলাম একটা ঘরে এগিয়ে আসছে—কালো পেরসিল লাইন পোষাকের গুণর একজন, টিউলিপবৃক্ষের মত তার গড়ন। আব কি আশ্চর্য মিল তার চেতনার ওমরের সংগে, ঐ যদি তার কালো হোত, চরতো আমারই তুল হোত ওমরের বোম ব'লে, শুধু মাথার চুলে পার্শ্বকা আর পার্শ্বকা চোখের রংএ, বীষণত্ব আঘাত চোখ, কিন্তু কি গভীর নীল—যেন মাখ-ঘরিয়া। ওমরের চোখও বীষণত্ব, তবে সে কালো, এক কলকে দেখলাম, আমার চেয়ে দেখার ইচ্ছে হোল। কিন্তু অস্ত্র দিকে তাকালাম। আমাদের টেবলের সামনে এসে ডেনীস দাঁড়াল।

আজ তো তোমার আসার কথা ছিল না ওমর হঠাৎ?—ডেনীস প্রশ্ন করলে।

আমার এক বন্ধু এসেছে সাকী! ভাবলাম—চলেই আসি। তোমার হিসেবে—আমি তো বি-হিসেবীই, এই আমার বন্ধু দীপংকর—আর এই আমার সাকী ডেনীস। ওমর আমাদের আলাপ করিয়ে দিলো, আমি কিছু বললাম না। Grill-room এর ওয়েট্রেস। না হয় রুপই আছে। তার লজ্জা এত খাপখাপো করা ওমরের সাজে না, কিন্তু ওকে কিছু বলও চলনা—এমন কাজ ওকেই সাজে, যেন্দোবাং এসে ওয়েট্রেসের সংগে আলাপ করিয়ে দেওয়া। আনিখোতার একটা সীমা আছে, লগুন লহরে হাজার বিদেশী বাছবীকে নিয়ে সময় কাটায়—কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। যেহেতু ওমরের কথা শুনে শুধু হাসলো, সেই হাসি—ওমরের মত। টোটো-চাপা, অস্বস্তি। শুধু চোখ দুটো হাসলো।

কি খাবি দীপংকর? Mixed-Grill? আর লাল সরাব সাকী, লাল-সরাব ওমর বাংলার বললে। সাকী চলে গেল, একটু পরেই কুজালি আনলো একটা ছোট্ট বেতের ঝড়িতে বাধা, ছিপি খুলে একটু আমাঘ পায়ে ঢেলে দিয়ে ডেনীস চলে গেল, খাবার আনতে। আমাঘ দু'জনে বসে রইলাম। কেমন দেখলি সাকীকে? ওমর বললে। কি আর দেখলাম, আমি বললাম, এতো জামা-কাপড় আর এপ্রণ পরা। এতে মহামত দেওয়া চলে না। ও কি তোর বাছবী নাকি?

না রে, সাকী আমার বাছবী নয়—But She gives me a good time. ওকে ধরা বড় কঠিন।

ওর কি বিশেষ বয়স-ক্রেও আছে? বিবাহিত ব'লে তো আমার মনে হয় না—বললাম।

না বয়স-ক্রেও নেই, তবে আমার কমপিশিটর আছে, তার সংগে পাল্লা দেওয়া কঠিন, মনে হয় তার অনেক পরস্যা, ডেনীস তাকে গভ আট বছর ধরে চলে।

আট বছর? আকাশ থেকে পড়লি, তোর ডেনীসের বয়স কত? আর আট বছর একটা লোকের সংগে নিরামিষ সম্পর্ক রাখা অবিধাত। তার গুণর তুই বলহিস যে লোকটার পরস্যা আছে। কেন এসব কামেলার আছিস? আমার বাপু সব ভাল লাগছে না।

নিরামিষ সম্পর্কের কথা কেন তুলহিস দীপংকর? ওর কি কোনও মানে আছে। আমি জানি শুধু, আমার আট পোরে মিনের প্রেহব ডেনীস বললে দেব, ওর সাক্ষর্বে সেলিমার কাছে শোনা—আর প্রায় তুলে বাওয়া যেঠো বীশীর স্বর এক প্রহার হয়ে বার হওগান চৌকীর বাজনা, সন্ধ্যা তারার ভাষা কুবে বায় পুখিমায় বজাতোতে। ওর ল্যাট-এখন বাত কাটাই তখন ভাবি আল্লা, কাল তুমি কেন এসে দাঁড়ও না এই মুহুর্তে। কিন্তু তারপর যেন শুনি জোয়ের আজান, বাতাস আসছে অনেক দূর থেকে, আজান আসছে 'আল্লা হো আকবর আল্লা হো আকবর, আমাজো আবুলা ইয়েলা ইয়েলা'—সেই আজানের শব্দ শেষ হয়ে বার, তারপর শুনি যেঠো বীশী আর সেই বীশীর শব্দ, সেলিমার দীর্ঘনিশ্বাস—

তোর কি মনের মাত্রা বেশী হয়ে বার! আমিও তো ললুর সংগে বিয়ের আগে বাক্তিবাস করেছি। কিন্তু এসব হেঠো বীশী, যেঠো স্বর। না মাইরী তুই রাশ টেনে ধর।

ডেনীস এর মধ্যে খাবার নিয়ে দুজনকে দিয়ে গেল। আমি এবারে আর মুখ তুলে ওর দিকে তাকালাম না, শুধু দেখলাম সবচেয়ে রাধা প্রসাদন-সেবিতা দুটি শুভ্র তাত। বস্তুনাথী।

কাল তোমার ছুটি আর আমার পার্শ্ব, মনে আছে তো সাকী! ওমর ডেনীসকে বললে।

আছে, আর আমাঘ Lotus House এ বার আমার ভাল করে মনে আছে, ডেনীস বললে। ডেনীস চলে গেল, আমি নীরবে ধোয়ে গেলাম। ওমর হঠাৎ প্রশ্ন করলো তুই হঠাৎ চূপ করে গেলি কেন? একটা কিছু বল?

তুই বলার বাইরে গেছিস ওমর, Lotus House এ নিয়ে বাছিস ওকে, তোর পরস্যার কুলোর কি করে?

চাকরী করি জানিস না। তার গুণর সস্তার ঘরে চলে এসেছি নিজের বেধে খাই, শুধু সাকীর জন্ত নয়তো খরচে কুলোয় না।

জানপাঙ্গীর মত তো কথা বলহিস, অথচ এদেশে সাতাশ বছর বয়সে তুই রোম্যান্স করতে আসিসনি তোর ঘরে বৌ আছে। তুই যেমতামুখ কি তা জানিস। তুই ওর মধ্যে কি পেয়েছিস?

জানি না দীপংকর! কিন্তু তোকে সাকী দেখাতে আনলাম ওকে তোর ভাল লাগেনি না? যেহেতু কিছু বেশ!।

এর পরে বেশী শোনার সময় ছিলোনা আমার। ডিনারের জন্ত যন্ত্রবাহ জানিয়ে দুজনে বেরিয়ে এলাম।

এর পর অনেক দিন কেটে গেছে। ওমরের কি হোল আর না হোল আমার ভাবার সময় ছিলোনা। ললু হাসপাতাল থেকে হাড়া পেয়ে বাড়ী চলে এসেছিল। আমার ওর গেরহানী আর উইক-এণ্ডে সাংসারিক কাজের চাপে আর কারুর খোঁজ নেওয়াও সম্ভব হয়নি, প্রত্যেকেরই নিজস্ব সমস্যা আছে। জ্ঞানের জন্ত আর কে বাধা থাকার। ললুই এবিনি ওমরের কথা তুলেছিল।

ছেলেটা বেশ, তবে বড় চকল, আমাদের এখানে তো অনেক দিন আসেনি, তোমার অফিসে কোন করে নাকি?

হ্যাঁ ছেলেটা বেশ। অন্ততঃ তোমাকে শাড়ী পরলে খুব সুন্দর দেখার একথা একজনও বলে, তা শাড়ী পরা প্র্যাকটিক বন্ধ হয়েছে কেন?

তোমরা বড় হিংসটে, অন্ত কেউ আমাদের সুন্দর বললে তোমাদের সহ্য হয় না, তোমার বোধ হয় জেলাসী হয়েছে ওকে আমি সুন্দর বলি বলে।

না জেলাসীর আর কারণ নেই বলে লুলুকে আমি ডেনীসের গল্প বললাম, ওমরের ঘরে বিবাহিতা স্ত্রী, অথচ ওমর এখন ডেনীসের জন্ত পাগল। সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় আর বার কোনও ভাববাৎ নেই। যদি এই সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ের া ও ডেনীসের ভালবাসা পেত তাহলে বুঝতাম এ ব্যয়ের সার্থকতা আছে, কিন্তু ডেনীসের মত মেয়েকে ভাল কেলে ধরার মত ভাল ওমরের নেই, ওমর কি ওকে ঘরণী হিসেবে চায়। এ প্রশ্নও ভেবেছি কোনও উত্তর পাইনি নিজের কাছে, সাক্ষীর পরিবেশ কি সব চেয়ে বড় কথা নয়? একথা মনে পড়ে। ডেনীসের গল্প শোনার পর লুলু বললে— আমাকে কি ডেনীসকে দেখাতে পারো?

সে বড় খরচ হবে লুলু, একটা ওয়েস্টেসকে দেখতে হাবার জন্ত এত খরচ পোষায় না।

কেন আমরা Grill room এ খাব না, Saloon এ বসে drink কোরব ও নিশ্চয়ই drink নেবার জন্ত আসবে, তাতে তো খরচ কম।

অগত্যা রাজি হলাম, এর কয়েক মাস পরেই আমরা স্ট্রীটসায়ল্যাণ্ডে, হলিডে করতে হাব বলে স্থির করেছিলাম। লুলু বাপের বাড়ীর দেশে। আমার তাঁই এমন সময়ে বাইরে গিয়ে ফ্রিক করে পরগা খরচ করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তার ওপরে তখন ওমরের আমি একটা ভিনার ধারি। ভেবেছিলাম বাড়ীতেই নেমজর করে খাওয়াব কারণ তাতে খরচ অনেক কম। তবু এক শনিবার সন্ধ্যার দিকে আবার এলাম Lancaster gate এর সেলুন বারে লুলুকে নিয়ে, একটু দেবী করেই এসেছিলাম, এক রাউণ্ড জিকের পরে এমিক ওমিক চাইলাম, ডেনীস নেই। লুলুকে বললাম— ডেনীসকে দেখছি না, তহতো আসেনি। একটা শেরী খেতেই লুলুর আবার ক্ষিধে পেল, শ্রাওউইচ নিলাম এক রাউণ্ড। দ্বিতীয়বার জিক কেনার সময় বললাম, এবারে একটা বেবী শ্রাম নি, শেরীর বললে, সম্ভা হবে। লুলু হাসলো, বললে বিয়ের আগে তুমি আমাকে শেরী খাওয়াবার জন্ত জোর করতে এখন বেবী শ্রাম। বেশ।

আমি লজ্জা পেলাম। বা নাগালের বাইরে তার জন্ত সাধ্যাতিরিক্ত আয়াস স্বাভাবিক, কোটাসপের সময় লুলুকে তাই মনে হোত। আজ ও আমার বো—আমারই। অতএব আমার দৈন্ত তুচ্ছতা, গুর কাছে আড়াল নেই, আড়াল করিও না, তবু লজ্জা পেলাম বড়। আবার শেরীই কিমলায় এবারে এ রাউণ্ড ও শেষ হোল ডেনীসের দেখা পেলাম না—কিন্তু অবাৎ হলাম আবুলকে দেখে। আবুল নওদাজ আমাদের ক্লাস এর সেরা ছেলে যুনিভারসিটির পোল্ড মেডাল পাওয়া নওদাজ। আমরা সকলেই এক সংগে বধ্যামনে

বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দি, কাশি, বুকে-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্রোয়া জমে বাচ্চার যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন



পরিবেশক :

জি, হস্ত এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১



পড়েছি। তলেক্স এসে আমি হাট সায়েন্স অব অ্যান্ড অ্যান্ডিস।
আবুল এসেছিল লগুনে P. H. D করবে Economics এ।
আমাকে দেখে খুশী হোল। লুলু কথ্য ও দেশে থাকতেই
জেনেছিল, কখন আমি যখন বিয়ে করি তখন আব পাঙ্কজের
মত লুগুনে করিনি, বাড়িতে কানিয়েই বসেছিলাম। এমন কি
আমার মা লোক মাফক লুলু তাতের সোনার কংকণ পাটিয়ে
দিয়েছিলেন, আর তা সোনা বলে লুলু কি গর্ব! লুলু সঙ্গে
আবুলের আলাপ করিয়ে দিলাম। ভবিষ্যৎ না কবে, আবুল
আমাকে ডেনীসের কথা জিজ্ঞেস করলো। নাম ওর জানা ছিল না
জব ওয়েস্ট্রেন একজন কা বলে। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম
কেন?

সেলিয়া আমার চাচার ঘরে, ওমরের সঙ্গে ওর বিয়ে হয় আমার
মোট্টেট্টেট্টে ছিল না বেরদর। কিন্তু পাছে কেউ মনে করে যে
এতে আমার স্বার্থ আছে তাই কিছু বলিনি। তুমি তো জান
নাকিতা রায় আর শিশ্রা খোসের ব্যাপার ওমরের সঙ্গে, ওমর কিনা
করেছে, ওমের সঙ্গে? এখানে এক ওয়েস্ট্রেনের জ্ঞান নাকি ওমর
পাগল, সেলিয়া সে কথা শুনেছে। এদেশী মেয়েরা সাধারণতঃ
বিবাহিত তেলের সন্ধে বিশেষ উৎসাহ নেয়, তাই সেলিয়া আমাকে
বলেছে আমি যদি মেয়েটিকে জানাতে পারি যে ওমর বিবাহিত,
তাহলে হয়তো ব্যাপারটা অল্প বকমে ঠাণ্ডাবে।

তুমি কি এই ব্যাপার জানার জ্ঞান এসেছে? কিন্তু এর
কতখানি বা তুমি করতে পারো? তোমার তো মেয়েটির নামও
জানা নেই, কি করে তুমি তাকে চিনবে? কিছু করা তো পূর্বের
কথা। আর এ বেস্তারীর খবর দিলে কে?

খবর ওমরের এক বন্ধুর কাছে পেয়েছি। এখানে ওমরকে
লেখার আশা করি সেই মেয়েটির সঙ্গে তারপর হয়তো—

মেয়েটির নাম ডেনীস তবে আঁক তাকে দেখাচেনা। তুমি যদি
কিছু করার থাকে তো করতে পারো, তবে আমার মনে হয় তাকে
বলার আগে ওমরকে বলা ভালো, ওমর হয়তো কিছু মনে করতে
পাবে, আমরা এখন চলি, আমাদের সময় নেই।

চল এসলাম দুজনে, লুলুকে সব ব্যাপার বলছিলাম পাখে, ওমরের
ব্যাপার বেশ অবধি গেছে, কি করে যে এসব খবর বটে আচ্ছা জানে,
আবার শুধু সঠিক বটেনা এত বোকা যে বলার নয়। দেশের
লোকেরের ঠিক বখিরা। যদি ওমরের চাবিত্র সন্ধে তাদের অনায়া
থাকে, যা নাকিতা আর শিশ্রার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত—তাহলে
তাদের সেলিমার সঙ্গে ওমরের বিয়ে দেবার যুক্তি কি? ওবা কি
জেনেছিল, শরমশ্রমিরের গত্যভাগত প্রাক্রিয়া ওমরের জীবনে
স্থিতি আনবে? যদি এই ওদের যুক্তি তাহলে একলা পাঠান কেন
ওমরকে বিদেশে? বক্তের স্বাধে একবার পেয়েছে তার পক্ষে কি
আবার চাওয়া আর্থোজিক?

ডেনীসকে না দেখে লুলু একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু আমার
Lancaster gate এ খাবার কথা সে বুঝে আনেনি। আমাদের
হলিতে করার দিন এসিয়ে এসেছিল। লুলু বাবে বাপের বাড়ী
জ্বিরে, আমিও স্ট্রিটারল্যাগুয়ে কয়েকটা জায়গা বেড়িয়ে শেষ
হু'সগ্যে ৭৩৭৭৭৭৭৭ থাকবে প্রোগ্রাম ছিল। আমরা এখন খবর
সন্ধান নিয়ে ব্যস্ত। আমার প্রোগ্রাম তিন দিন জেনিভা, দুদিন

বার্ণ, দুদিন লাসস—বাকি তিন দিন শ্বত্ববাড়ী জ্বিরে। আর
লুলু থাকবে এক মাস বাপের বাড়ী, আমরা দিন গুণতে লাগলাম।

জুনের তৃতীয় সপ্তাহ, জুলাই-এ আমাদের হলিডে বাবার কথা।
চঠাং এক শনিবার জানান না দিয়ে ওমর আমাদের বাড়ীতে এসে
হাজির। তখন বিকেল পাঁচটা বোধ হয় হবে, জানান না দিয়ে
কাকর বাড়ী আসা, এ দেখে সত্যতায় অভয়তা, আমরাও খুব ভাল
লাগেনি, বাড়ীটা শুভান নেই, ফুল কেনা হয়নি উটক এপ্তে।
পরের সপ্তাহে চলে যাব বলে পরস্মা বিচান হ'চ্ছিলো। অতিথি
আসবে জানলে নিশ্চয়ই ফুল কেনা হোত। তবুও মুখে হাসি টেনে
এনে বললাম আর ওমর, কিন্তু চঠাং না জানিয়ে? টেলিকোনও
তো একটা খবর দিতে পারতিন?

বলার ঘরে দুজনে বললাম, ঘর আমাদের দুটো, একটা শোবার
আর একটা বসবার, ছোট্ট কিলেনও আছে। বলার ঘরেই খাবার
টেরস পাতা, আসবাবপত্র নেতাহ সাবেকী, ওমর কিছু বললে না,
চুপচাপ বসে বইলো। লুলু এসে ওমরকে জিগ্যেস করলে, সে চা
খাবে কি না, ওমর সম্মতি জানালো।

আমরা সামান্য শনিবার হলিডে করতে বাচ্ছি স্ট্রিটারল্যাগুও।
বললাম, তুই পরের শনিবার বিকেলে এসে পাতা পোতস না।

তাঁই বৃষ্টি? তোদের অনেক দিনই খবর নেওয়া হয়নি।
বৌঠানকে তো ভালই দেখাচ্ছি। কবে ছাড়া শেল হাসপাতাল
থেকে?

লুলু এর মধ্যে চা নিয়ে এসেছিল, আমার প্রেমের উত্তর
দেবার আগেই বললে, তুমি কি সেট ভাবতীয় বন্ধুর কথা বলেছ
যাও সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল? কোথায় দেখা হয়েছে কবে,
কায় সঙ্গে? ওমর প্রশ্ন করলে।

আমার আর ওর বৈখ্যাটিক অধ্যায় সন্ধে আলোচনা করার
মোট্টেট্টেট্টে ছিল না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতাম, কিন্তু
লুলু জ্ঞান উপায় বইলো না। তাই বললাম—দেখা হয়েছিল
নওয়াঙের সঙ্গে, Lancaster gate এ saloon এ—

আচ্ছা? কিন্তু নওয়াঙ তো আমার কাছে ব্যাপারটা চেপে
গেছে, তাজ্জর!

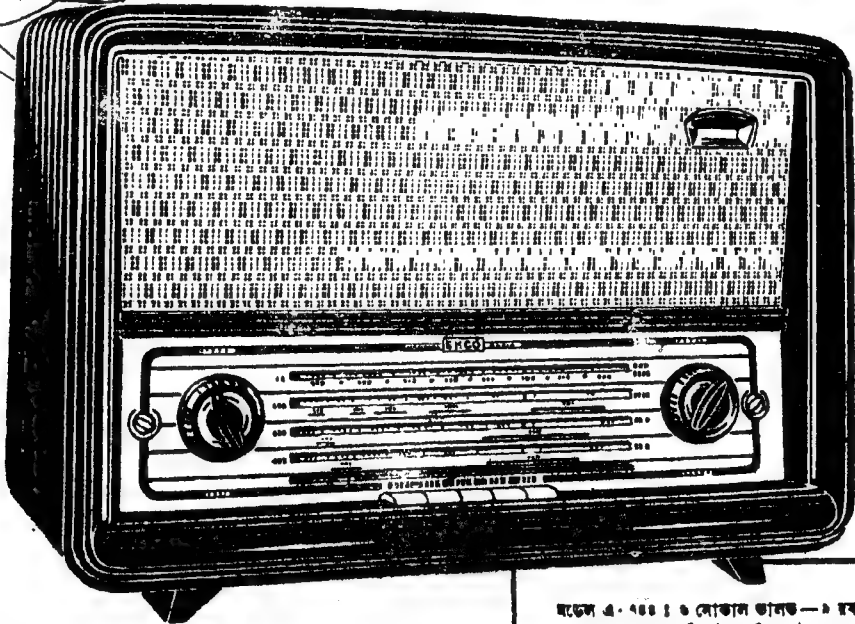
আমি কিছু বললাম না, তিন জনে চুপ করে বইলাম, একটা
বিক্রী নৈবস্তার মধ্যে আমার উচ্চতার অভাব লুলুকে বিব্রত
করেছে বললাম, লুলু আমাদের কাছে মাপ চেয়ে রান্নাঘরে চলে
গেল। তোরা কোথায় বাবি স্ট্রিটারল্যাগুও? ওমর বললে।
আমি বাব জেনিভা, লসেন, বার্ণ হয়ে জ্বিরে। লুলু স্টান বাবে
ওর বাপের বাড়ী জ্বিরে। তিন সপ্তাহ আমার দুটি।

বৌঠান কি তোর সঙ্গে কি হবে? ওমর বললে। না আপো
ঠিক ছিল ও এক মাস থাকবে, এখন শুনাছ সেটা হু'মাস। শেষ
অবধি স্টা কতদিন ঠাণ্ডাবে জান না বললাম। বৌঠানের
বাপের বাড়ীর হিজানটা দে তো, ওমর বললে, আমি অষ্ট্রিয়ার বাব
ভাবচ্ছি, বাপের পাখে না হয় দেখা করবো, টিকানা দিলাম, ওমর
ওর ডায়েরিতে তা তুলে নিল। আবুল আমার সন্ধে কিছু জিগ্যেস
করেছে তাকে নীপকর, অথবা ডেনীস সন্ধে? ওমর বললে।
যদি জিগ্যেস করেই থাকে তুই কি ভাবছিস আর পাঁচটা জায়গায়



অনবদ্য শিল্প-কৌশল...
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য...

ন্যাশনাল একো-র নতুন মডেল এ-৭৪৪



দলীত রসিকেরা ন্যাশনাল-একোর চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রচলনের পক্ষপন্থী হয়ে পারবেন না। এর অমিশ্র গভীর, কলকৌশল ও চক্চকে তেজা বৈশিষ্ট্য সন্ধান-ভিরাব, ভেমি স্রুতিমধুর ও হুস্পট এর আওতাধীন।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সত্যি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারকে যোগিয়ে শোনাতে হলুন—কোন খরচ নেই।

আমাদের অহমোচিত ন্যাশনাল-একো ডিলারের
কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : ৬ সেকেন্ডাল ভোল্ট—১ ইঞ্চি
কাছ, মসোর ফেব্রিক সমন্বিত ৪-ব্যাণ্ড ব্লক
এসি রেডিও—সাতা পৃথিবীর স্টেশন বহু।
পিরানো—কী ব্যাণ্ড সিলেকশন; যান্ত্রিক আই;
গ্রামোফোন ও একটু। শীকারের জন্ত বোমা-
বোম বাবু; টেম, বেকটারের জন্ত বিশেষ
মসোবত। এক বছরের গ্যারান্টি।

৩৮৫, নীট

দ্বিতীয় ট্যাক্স বতর



ন্যাশনাল একো রেডিওই সেরা—এগুলি

‘মসলুদাইজ’

কেন্দ্রীয় রেডিও অ্যান্ড অ্যান্ডারেলেক্স প্রাইভেট লি:

কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • দাঙ্গা • বাজার • দিল্লী • সেকেন্দরাবাদ



JWT, GRA 122

মত আমি তোকে নিয়ে পরচর্চা করবো? বললো, দীপংকর, তুই বোধ হয় আমাকে দেখে মোটেই খুশী নস। কিন্তু কারণটা বলবি কি? টেলিফোন না করে আসাটা, না ডেনীসের ব্যাপারটা। খুঁসেই বল না। বিশেষে পুরোনো বন্ধুর সংগে সাক্ষাৎ হওয়া ভাগ্যের কথা। কিন্তু এমন ব্যবহার পাওয়াও দুর্ভাগ্য! টেলিফোন না করে আসার জন্য মাগ চাইছি। আর ডেনীস? সে ব্যাপারও শেষ।

লঙ্কার অধিবাসন হলাম, আমি সত্যিই ওর সংগে ইতরের মত ব্যবহার করছিলাম। দু-হাত দিয়ে ওর হাত দুটো চেপে ধরে বললাম, ওমর বাগ করিসনে ভাই, আমার ভুল হয়েছে, মাগ কর।

ওমর ওর গল্প বলে গেল, ওর গল্প বলতেই ও গ্রসেছিল—ডেনীসের গল্প, এ গল্প ও কোথায়ও বলেনি সহানুভূতি পাবে না বলে, আমার সাল-বোঁ ভেবে বোধ হয় কিছুটা সহানুভূতি আশা করেছিল। ডেনীস ওকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, অনেক বার, ওমরের সাধ্যাতিক্ত সে এ কথা ওমরকে সোজাশুজি না বললেও প্রকাণ্ডভাবে জানিয়েছে। কিন্তু কি তুমিবার তার আকর্ষণ, ওমর বুঝতে পারে না। হাজিগা শেষ প্রতি সপ্তাহে Lancaster gate-এ Grillroom-এ, আর প্রতিটি সপ্তাহের একটি রাত সে যায় তার কাছে, একটি রাতের স্বপ্নের নেশায় ওর বাকি সাত দিন কেটে যায়, ওর প্রতিটি মুহূর্ত থাকে সেই স্মৃতির সৌরভে মগ্ন হয়ে। আবার অনাগত সন্ধ্যার প্রতীক্ষা। ডেনীস ওকে কোন দিন ভালবাসেনি, একথা ওমরের জানা আছে, ডেনীসের ভালবাসা ও কোন দিনও পাবে বলে মনে হয় না, তবু ডেনীস ওর কাছে বস্তুত্ব থাকে, তার মধ্যে কোন ঝাঁক থাকে না। ওমরকে চার দিন আগে ডেনীস একটা চিঠি পাঠায়, সেটার বর্জমা এই—

প্রিয় ওমর, আমি যোজানোর সংগে আজ হাজারকর বান্ধি, হয়তো আমাদের বিয়ে হবে। আশা করি তুমি তোমার পরীক্ষার কৃতকার্য হয়ে শীগগির দেশে ফিরবে এবং সুখী হবে, শুভেচ্ছা-সহ, ডেনীস, এই চিঠি পাঠার সংগে সংগেই ওমর ডেনীসের কর্মস্থলে আর Flat-এ কোন করে কোনও খবর পায় না, ছদ্ম ও পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, কাজে যায় না, আজ শনিবার ওর ছুটি। আমার কান্না-জ্বালা ওর হিসেবে ছিলো না, কিন্তু পথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এসে পড়ে আমার পাড়ার, তাই জানিনা না গিয়েই ও চলে আসে আমার বাড়ীতে।

যোজানো কে? বললাম, তোর কমপিউটার বলে থাকে বলেছিল সেই বৃষ্টি? নাম শুনে মনে হয় ইটালীয়ান।

হ্যাঁ ইটালীয়ানই। ঠিক ধরেছিল, ও বোধ হয় ডেনীসকে ভালবাসে। তবে ও কাব্যলিক আর বিবাহিত, ওর পক্ষে বিয়ে করা অত্যন্ত কঠিন। এ এক গোলকবঁধা।

তোর পক্ষে তো ভালই হোল, এ হাতী পোরা তোর সামর্থ্যের নয়, এখন সুবোধ ছেলে হয়ে ঘরের বউকে নিয়ে ঘর কর।

কিন্তু আমার প্রেম? তার কি হবে, ডাং আমার প্রেম কত গভীর। আমি ওর জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করলাম, কত কষ্ট করছি, কিন্তু ও তার দায় দিলো না, হয়তো ও একদিন বুঝবে।

এ তোর প্রেম—না এ তোর নিজেকে ভালবাসা? তুই

ডেনীসের জন্য বা ত্যাগ বলছিল তা কি ডেনীসের জন্য, না তোর আত্মকপ্তির জন্য? আর থাক ও কথা, যা গেছে তা মুছে থাক।

মুছেবে না দীপংকর! আমি কখনও ভালবাসিনি জীবনে, ওকেই শুধু ভালবেসেছি বলে মনে হয়, এ মোড়ার নয়।

হয়তো আমাদের আলোচনা অনেক দূর যেন। হয়তো আমি সেদিনই ওর নজরে আনতাম ওর চেহারা আর ডেনীসের চেহারার সাদৃশ্য সম্বন্ধে—কিন্তু তা আর বলা হোল না। ওমর বাকি সময় ওর ভালবাসা—আর তার গভীরতা সম্বন্ধে আমাকে বলে গেল। আমি চুপ করে শুনে গেলাম, একটু পরে তিন জনে বাইরে বেরোলাম, লগুনে—হলিডে যাবার আগে সেই শেষ দেখা।

ওমরের গল্প বোধ হয় এইখানেই শেষ হোক, আমি ভেবে দেখেছি ওর ব্যাপারটা, ওর ভালবাসা আত্মকেন্দ্রিক, এর আগে দেশে থাকতে ওর জীবনে শিপ্রা আর নশিতা বস্তুত্ব আন্দোলন এনেছিল, তাও আমার অজানা নেই। সম্পূর্ণ বিদেশী আত্মকেন্দ্রিক প্রেম। ওমরের ভালবাসা অসম্ভব রকমের স্বার্থপর, তাই শিপ্রা আর নশিতা ওর কাছ থেকে অপবাদ ছাড়া আর কিছু পায়নি। আর পাঁচজনে জেনেছিল মুসলমানের ছেলে হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছ তা নিয়ামি কখনই নয়, আমি তখন শুনতাম ওমরের প্রেমের বাখানি। অজ্ঞাত-বাণী-ওমর-ই-ইন্দ্রনীর-বেদনা—এই সব শব্দগুলো ও ব্যবহার করতো তখন আমার কাছে। ইন্দ্রনীর-বেদনা-টেননা আমি মোটেই বুঝতাম না—বুঝতাম ছেলেটা অত্যধিক বোয়ামাটিক, ও নশিতার প্রেমে হয়তো পাড়েওছিল। কিন্তু ওর প্রেম কত মৃৎ, এই জীব নিজেই কাছে নিজেকে রেগাতে গিয়ে ও সেই প্রেমের অপমৃত্যু ঘটায়। এমন আত্ম-কেন্দ্রিক প্রেম সংসারে বিরল।

লুপু কদিন আগেই জুরিকে গিয়েছিল আকাশ পথে। ওর দেখার কিছু নেই পথে, আমার দেশ দেখার ইচ্ছে, তাই আমার প্রোগ্রাম ছিল প্যারিস হয়ে জেনিভায় যাওয়া, ওমর ও বান্ধিলো অস্ট্রিয়ার, তবে তারিখ আমার জানা ছিলো না। সুইটসারল্যান্ডে ওর সংগে থাকলে আমাদের দুজনের অন্ততঃ আর্থিক সুবিধে হোক, কিন্তু ওর সংগে পথে বোঝাতে ভয় হয়, পথে ঈর্জানও বিচির নয়।

জেনিভায় লেকের ধারে একটা এলেকারসন ট্রিশ দিয়ে ফোরার সময় হঠাৎ মনে হোল, একটা ভারতীয় ছেলেকে যেন দেখলাম। তবে ঈর্জির সে অভিনিবেশ সহকারে বাঁচার রাখা এক কুচকুচে ঈড়কাককে কি মনে পাওয়াচ্ছে। একটু কাছে এসে শুনি ওমর বাংলায় ঈড়কাকের সংগে কথা বলছে আর স্ট্রাউটটাই বাগ খুলে তাকে ফ্রাংকফুটার খাওয়াচ্ছে, আর বাবা দীর্ঘ-চক্ষু, ফ্রাংকফুটার খাবি আর ঈড়কাকের পায়ে বড়, সে পরম অল্পম্যদন সহকারে সর্গ-অংগ নাড়াচ্ছে।

তুই ঈড়কাকের সংগে বাংলায় কথা বলছিল কেন ওমর? ওকি বাংলা বেরে?—বললাম, Golly। দীপংকর তুই? দীর্ঘ চক্ষু তো Good Luck। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে গেল। আর দীর্ঘ চক্ষু তো ফ্রেক ছাড়া কিছু বুঝবে না। তাই বাংলাই বললাম। থাক তোর দীর্ঘ চক্ষু। চল এঁ বেঞ্চে বসি। তুই কে এখন চলে এলি? তোর তো আরো পরে আসার কথা?

ভাল লাগছিল না লগুন দীপংকর। continent এ তো আসার

কথাই ছিল আগেই চলে এলাম। তুই কি করছিস? বোঁঠান কি জুরিকেই?

ঠা জুরিকে লুলু—আমি আজ মফোতে বাচ্ছি। তারপর লুলুর সংগে একটু এমিক সেমিক বেড়াব, তোর প্রোগ্রাম।

ওমরের প্রোগ্রাম কিছু নেই তবে ওর ভিয়েনা অবধি টিকিট কাটা বার্শে যাবে কয়েকদিন পরে, জুরিকে আবার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে জানাল। একটু পরেই আমি উঠলাম ট্রেনের সময় হয়ে এসেছিল।

সাত দিন পরে জুরিকে আমার শব্দের বাড়ীর দরজায় দেখি ওমর দাঁড়িয়ে। আর ভেতরে উঠে বললাম। তুই যে চরকি ঘুরছিস।

ঠিক বলেছিস দীপংকর, চরকি ঘুরছি, তবে এবার আমার খান বসবে, ঘাটে নোঙর ফেলবে আর নোঙর ছিঁড়বে না।

এদেশে আর নোঙর ফেল তোর কাজ নেই, এতো আ-ঘাটা, আমাকে জাখ না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে আছি। তবে তুই আবার বিদেশে এসে নতুন কিছু করলি না কি বসে হাসতে লাগলাম। হাসিস না দীপংকর please বলে ওমর আবার ওর মাথার চুলে আঙুল ঢালাতে লাগলো, বুঝলাম ও ভাবছে বলবে কি বলবে না। বললাম মা ভেঁ, একটা কথাও ওর চোখে হাসি ফুটে উঠলো, দীর্ঘ পদ্ম আয়ত চোখের সেই সুন্দর আলো আর ঠোঁট চাপা একটু হাসি, এ হাসি দেখেছি ডেনীসের টোটে, এ আলো দেখেছি তার চোখে। অকৃত সামঞ্জস্য। কি করে যে সম্ভব হয়েছে তা অবিশ্বাস্য, সাধারণ লোকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।

দীপংকর, ঐ সন্ধ্যাখানায় আসবি কি? সুইস-বীয়ারের তুলনা হয় না, দু'ভাই এ একটু গলা ভেজাব। আর শোন, বোঁঠানের সেই ইংলিশ-জার্মান ডিকসনারীটা যদি বাড়ীর থেকে নিয়ে আসিস, এনেছিস তো এদেশে ওটা?

এক এক জনের অর্পণ এমন। শুনতে হবে। শ্রোতা আবার সব সময়ে পাওয়া যায় না—তার ওপর সহায়ত্বভিত্তিসম্পন্ন শ্রোতা দুঃস্থলভ, ওমরের পক্ষে সহায়ত্বভিত্তিসম্পন্ন শ্রোতা পাওয়া কঠিন অথচ আত্মকেন্দ্রিক ওর মন শ্রোতা বোঁজ—দরদী শ্রোতা, আমাকে বোধ হয় ও দরদী মনে করে। তাই আসে আমার কাছে বার বার। বাড়ীর ভেতর থেকে লুলুও ভিন্ননারী নিয়ে দুজন এলাম পায়ে।

আবার জালে পড়েছিস বাকি আমি বললাম, তোর জজ কি পাখে ঘাটে কাঁদ পাতা আছে? না তুই ইচ্ছে করে জালে পড়িস?

দীপংকর, আমি কিছু বলব না, তুই শুনে বিচার কর, ঠা আবার কাঁদ। তবে এবারে ভাল আমার, আর জালে পড়েছে মারিয়া।

সুইস-মেয়ে ছুটিয়েছিস? বেশ করেছিস, হলিডে করতে এসে সফলই করে, তুই আর নতুন কি করলি?

দীপংকর, সুইস বীয়ারের বৈশিষ্ট্য কি বলতো? ও আমাকে হঠাৎ বললে। বীয়ারে তখনও চুয়ক দেওয়া হয়নি। কিন্তু ওর খাপছাড়া এই প্রস্নে একটু আশ্চর্য হলাম। সুইস বীয়ার কেন? বললাম তোর মত তো আমি জিক করি না আমার পক্ষে বলা কঠিন।

খুব সোজা, ও বললে। ওতে বোঁজ নেই স্নিগ্ধতা আছে, এর তিক্ততা আর মার্ধ্ব ছুটাই দৃষ্টান্ত (আমার হঠাৎ মনে পড়লো ইন্দ্রনীল-বেদনা ওর দৃষ্টান্ত শুনে) তুই সারা রাত খেয়ে বা—Hans বাক হবেন। সুইস-মেয়েও এমন।

মা মাইরী, তুই ডুবোনি বার্থ। লুলুও তো সুইস-মেয়ে, কিন্তু এসব সারা রাত—Hans বাক না হওয়া, আমি তো জানিলা, তোর ব্যাপার খুলেই বলনা, এই মারিয়া থাকে কোথায়—চালু মেয়ে নিশ্চয়ই যখন ইংরিজিতে আলাপ হোল।

চালু একেবারেই নয়, আলাপ হয়েছে বার্শে আর ও একদম ইংরেজি জানেনা বলতে গেলে। আর আমার খান? থাক বেচারী!

আবার শুনতে হোল মারিয়ার গল্প। দেশে বাসবিহারী এ্যাভিনিউএ জলযোগের পয়েন্টি খেতে খেতে শুনেছি শিশ্রু-নন্দিতার গল্প, অজ্ঞাত গুপ্তগণ, ইন্দ্রনীল-বেদনা, ট্রেকালগার স্কোয়ারের পাশে ব'সে শুনেছি, ডেনীসের ভোরের ভৈরবী, আজ আবার জুরিকের সেলুন-বারে বসে শুনতে হবে মারিয়ার গল্প। বেচারী দীপংকর। হঠাৎ আমার সেলিমার কথা মনে পড়লো, সে কি জানে? হায়রে ভারতীয় মেয়ে!

বার্শে দেখা ওমরের মারিয়ার সংগে, প্রথম দেখায় আলাপ হয়নি—ও কি যেন এক মিউসিয়ামের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। সেটা লাক্স-আওয়ার বলে মিউসিয়াম বন্ধ ছিল। মারিয়াও ছিল সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। পরনে হালকা লিনেনের স্কাট, চোখে কাল চশমা। ওমরের নজরে আসতো না যদি না দুজনই থাকতো দাঁড়িয়ে। মারিয়া যে সুইস মেয়ে ওমর তা ভাবতেই পারেনি, ও ভেবেছিল হয় এ্যামেরিকার নয় ক্যানাডার। ওর অবস্থা ভাববার কোন যুক্তি ছিলোনা। মারিয়ার রূপ অবস্থা ওকে আকর্ষণ করে, ওমরের শুধু একবার ইচ্ছে হয় মারিয়া যদি একবার তার কাশো চশমাটা খোলো। ওর চোখ যদি আকাশ-নীল হয়, সাগর নীল। উপায় ছিলো না।

আবার দেখা হোল তারপরের দিনে পার্লামেন্টের বাবের পার্কে। ওমর তখন ক্যামেরায় ছবি তুলতে ব্যস্ত। সাইজ বোঁজা হচ্ছিলো। হঠাৎ দেখা মারিয়ার সংগে—সে তখন পার্কের হাঁসগুলোকে কি খাওয়াচ্ছিল। আহা ওর চোখ দুটো যদি একবার দেখতে পাই ওমর ভাবে, তাই মরীয়া হয়ে সে আসে মারিয়ার কাছে, মারিয়াও বে ওকে বিশেষভাবে নজর করছিল তা ওর চোখ এড়ায়নি। Excuse me বলে ওমর কথা আরম্ভ করে—মেয়েটা স্বাক হয়ে ওর দিকে তাকায়। চোখের ভাষা দেখার উপায় ছিল না, কিন্তু মুখের ভাবে ওমর বোঝে যে সে ঠিক বোঝেনি। Do you speak English? ওমর বলে। NICHT জার্মানে মেয়েটা উত্তর দেয়। Not a little? ওমর তর্জনী আর বুকাবুকের অগ্রভাগ দেখায়। NICHT মেয়েটা আবার বলে। not a tiny little ওমরের তর্জনীর অংশ আবে ছোট হয়, 'লিতল' মারিয়া বলে। এই হোল ওমর আলাপের নৃত্যপাঠ। ওমর ওর ছবি তোলে—তারপর ইংলিতে বলে তোমার একটা চশমা ছাড়া ছবি নিই। চশমা খোলে মারিয়া ওমর আকুল আগ্রহে তাকায় যদি এর চোখ নীল হয়—যদি নীল হয়। হায় আলো কুচকুচে কাশো।

তবু ওরা দুজনে এক সংগে পাখে পাখে বেড়ায়, মারিয়ার হাতে Dictionary ইংরিজি জার্মান দুজনে 'তা' খুলে কথা বলে, গল্প করে হাসে। পার্লামেন্টের একটু দূরেই আর নদী—ভীমা। এর দুই তীরে অগণ্য গাছ গলাগলি করে উঠেছে, সেই সন্ধ্যায় ওমর মারিয়ার হাত ধরে বলে থাকে সেই নদীর তীরে খটীর পর খটী। রাত

যখন প্রায় দশটা তখন ওদের খেলায় হয় সময়ের, ওদের কাঁধে মারিয়ার মাথা—হয়ত ও কেঁদেছে ওদের মনে হয়। কিন্তু ও কারও কাছে না। অন্ধকার নেবে এসেছিল—ওদের ভিন্ননাটী খুলে কথা বার উপায় ছিলো না। মারিয়া গুকে বলে 'বায়েরা-ক্যাসিনো'—অর্থাৎ Casino-তে Bear খাবে চল। ওমর বলে চল। যখন ওরা আঁধার ছেড়ে আলোর আসে তখন মারিয়া বলে 'ICH BEZAHLEN' অর্থাৎ আমি দাম দেব। ওমর রাজি হয় না, শেষ অবধি রফা হয়—Spin of coin. যে জিতবে, সে দাম দেবে, ওমরের হার হয়েছিল।

ক্যাসিনো তো ওমরের বাবার সাহস হোত না—হয়তো অনেক খরচ হবে এই ছিল ওর ধারণা, মারিয়া দৃষ্টান্তে এর ভেতরে এলো। নেন কতবার সে এখানে এসেছে। ওমরের ধারণা হয়—মারিয়া নিশ্চয়ই অস্বাস্থ্য দানী। অক্টোবো বাজছিল—মারিয়া বললে এসো আমরা নাচি। ওমর নাচ জানে না—নাচা হয়নি।

বাবার এলো—তার দাম বোধ হয় অনেক। মারিয়া দাম মিলে, হঠাৎ ওমর দেখলো—মারিয়ার চোখে জল। উপায় নেই বোকার। জমা জানে না। কি বলবে ওমর? কিছু ইংগিতে কিছু ভাষা জাণেশ কিছু ইংরিজিতে ওমর বললে—মারিয়া কোয়ার টিকানা দাও কাল সকালে আমি জুঁকি হাব, সেখানে থেকে তোয়ার ছ'বজলো পাঠিয়ে দেব। মারিয়া টিকানা দেয়, ওমরের হঠাৎ খেয়াল হয় আর একদিন বার্ষে বাবার। সে মারিয়াকে আভায়ে ইংগিতে বোকাতে চায়, মারিয়া রাজি হয় না। আত্মল দিয়ে দেখায় দল ফ্রাঙ্ক আর বলে হোটেল। অর্থাৎ একদিনে হোটেল খরচ দশ ফ্রাঙ্ক। ওমর অবাক হয়, যে মেয়ে ক্যাসিনোতে এত পরশা খরচ করতে পারে সে দশ ফ্রাঙ্ক হোটেল খরচ চালাতে পারে না? শেষে রফা হয় ওরা দুপুর তিনটেয় ক্যাসিনোতে আবার দেখা করবে। তারপর দাঁত আটটার গাঠিতে মারিয়া বাবে—অলটেলএ। ওই অবধি ওর গল্প বলে ওমর খামলো। বললো, দীপংকর, দুটো পাইট নিয়ে আদী তুই, আমি একটু জিরোই।

দুটো পাইট হাতে কেবল এলাম, বললাম, বা বললি এতো হালুদী, তার পর দিন মেয়েটা কি কোরল? তুই কতদূর এগোলি? তার পর দিন মারিয়া আসেনি।

ওমর বললে, আসেনি। বিবয় খেলাম, গাবারই কথা। আমি খেলাম এখন, ওমর খেয়েছিল সেদিন।

তার পরের দিন ক্যাসিনোর বাইরেই বাগানে রামধনু-রঙা ছাতার তলায় বসে ওমর একটার পর একটা বীয়ার খেয়ে গেল, বেলা তিনটে থেকে চারটে অবধি, মারিয়ার চিহ্নও নেই। চারটে থেকে এগারোটা অবধি ওমর পথে পথে ঘোরে, মারিয়ার হোটেলও জানা নেই। মারিয়া তুমি কেন এলে না, কেন এলে না ও বাবে বাবে বলে। আমি শুধু তোমাকে বিলায় অভিনন্দন জানাতাম। শেষে সেই রাত্তই ওর হোটেলের ম্যানেজারকে দিয়ে জাণা ভাবায় মারিয়ার টিকানার চিঠি পাঠায়, যে সে আসছে অলটেল, তার একদিন পরে, শুধু দেখা করার জন্য মারিয়ার সঙ্গে—মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য।

অলটেনে আসে ওমর চিঠির কথা মত, অলটেন—নাম না জানা ছোট শহর, হুইটসারল্যাণ্ডের কোনও টুবিট কোমরিন এর নাম জানতো না—ওমর তো নয়ই। অলটেন—অলটেন, সে বাব বাব

আবুত্তি করে, কেমন এই শহর, যে শহরে তার মারিয়া বাবে? মারিয়া কি? সে কী ধরীর ছালা? বিবাহিতা? অবিবাহিতা? ওমরের কিছুই জানা নেই। কেন মারিয়া তাকে এড়িয়ে গেছে মধু বাহিনীর শ্রুতি কুরোতে না কুরোতে? বার দাখিয়া তাকে উদ্ভাস্ত করেছিল, কেন এত কাণ্ড্য তার একদিন পরেই? তার মেলামেশার মধ্যে তো এমন কিছু হয়নি যে মারিয়া তাকে এড়িয়ে বাবে একদিন পরেই। চুখন। সে তো হাত ধবাব চেয়ে কি এমন বেশী এসেছে? আর তার চুখন তো মারিয়া গ্রহণ করেছে—এতো উফতা সেই চুখনের স্বাদ। তা কি ভোলাব।

ছোট ট্রেন অলটেন। সন্ধ্যা পাঁচটার সময় ওমর নামলো অলটেনে, 'বামেল' হয়ে তখন তার অক্টোবো বাবার কথা। থাক অক্টোবো কী হবে মাটি চিনে। মাটির চেয়ে মাটির মাছই কি অনেক বড় নয়।

জনসমুদ্র নয়, ইতস্ততঃ করেকটা বাড়ী—তার মধ্যে ওমর খুঁজতে লাগলো প্রায় তুলে বাওয়া সেই যুগকে, দেখলো দূরে মারিয়া পাড়িয়ে। সেই পোষাক পরা চালকা নিলেনের জুক। চোখে চশমা নেই, দ্রুত পা চালিয়ে আমীর খান এলো, ভাড়া জাণেশে বললে মারিয়া, হু নীভ, ক্যাসিনো মানে তুমি ক্যাসিনো না, মারিয়া হাসলো কিন্তু হু চোখে তার জল। হু হাত দিয়ে সে জঙ্গী করে দেখাল সে বুঁদিয়ে পড়েছিল বেলা তিনটের সময়। তার আগের রাত্তে অত্যধিক পান করার দরুণ Hans বাক এর বুঁদ।

অলটেনে ওমর এসেছিল পাঁচ মিনিটের জন্য বিলায় নিতে। হোল না। ট্রেন থেকে বেরিয়েই সামনের সরাইখানার সে আঁড়ানি নিলো সেই রাত্তের মত, তার পর এলো মারিয়ার বাড়ী। চাবীর মেয়ে মারিয়া—ধনীর নয়। সন্ধ্যাে সন্ধ্যাে বাপ, বুড়ো ঠাকুরমা আর ঠাকুরমা। বা মারা গেছে তিন মাস আগে। বার্ষে সে সন্ধ্যাে সন্ধ্যাে সন্ধ্যাে করে গিয়েছিল। সামান্য কিছু পরশা নিয়ে। ওমরের আন্তরিকতা আর আদর তার নিজের মায় কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল—সাই সে কেঁদেছে।

প্রথম দেখায় ভালবাসা বলে একটা শব্দ ওমর জানতো, ওর মনে হোল—মারিয়া গুকে ভালবেসেছে। অলটেনে বাবার তৃতীয় দিনে মারিয়া গুকে একথা বলেও। দ্বিতীয় দিনে ট্রেনের যাকতে বসে লাগু বাজিলো, সেদিনই ওমর চলে বাজিলো, ওমর হঠাৎ দেখলো মারিয়া কাঁদছে। টেবলের সিনেন দিয়ে ও চোখ মুছলো। বাঁ বাঁ করে উঠলো ওমরের বুক। বই কেউ তো কোনদিন তার জন্য চোখের জল ফেলেনি। শিপ্রা ভয় দেখিয়েছে—নশিতা অভিশাপ দিয়েছে, সেলিমা বর ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেছে বিলাদ-লয়ে, সে কি উকাত-অজু গোপন প্রোচটা। ডেনীস জানিয়েছে ওকেছা, কিন্তু চোখের জল? হোক না সে রাজি-কালো চোখের বুজা বিন্দু—নাই বা হোল অষ্টে নীল মারিয়ার পানি—তবু সে তো কেউ দেয়নি গুকে অর্থ।

রয়েই গেল ওমর আরো দুদিন, দুদিন শুধু সে মারিয়াকে খুঁজি করে রাখলো শুধু মারিয়ার পুথ, মারিয়ার বাছকোর দিকে মনো দিলে। ওমর তুমি আমার বার্ষের দান—মারিয়া গুকে বলে। তুমি আমার—ওমর বলে, আর বলে, মারিয়া আমি London-এ তোমার কাজের ব্যবস্থা করবো, তুমি আসবে তো? আসলে

মারিয়া শুকে জড়িয়ে ধরে, গল্প শেষ করে ওমর এবার আমার দিকে তাকাল।

তোমার মারিয়া পূর্ব তো? বললাম, তো এখানে এলি যে, তোমার তো অস্ট্রিয়া বাবার কথা এখন, আর গল্প শেষ হয়েছে তো।

শেষ কিরে—বললাম না নৌঙর কেবো এখানেও বললে। অল্প বুজা মালা কুড়িয়ে পেলাম (ইয়া আদ্রা, আবার বোধ হয় ও ইজরীল বেদনা বলবে) আবার তাকি পথের ধুলোয় কেলে দেওয়া সাজে।

তোমার মতলব কি বলতো? ঘরে তোমার বউ আছে এসব কষ্ট-নষ্ট আর কতদিন করবি?

দীপকের তিন পুত্রব আগে এক তুর্কী ছিল আমার পূর্বপুত্র, তার কত বিবি ছিল জানিস? আমিও তো বুসলমানের বেটা।

কিন্তু তুই কি মারিয়াকে ভালবাসিস? আর ও কি তোকে ভালবাসে? এই প্রশ্নের জবাব দে আগে—রাখ তোমার তুর্কী-নাচন।

আমি যদি মারিয়াকে ভাল না বাসবো তো? অলটেনে রইলাম কেন? কেন ওর অন্ত্র এত পরমা খরচ করলাম, অস্ট্রিয়ার টিকিট নষ্ট করলাম—বলতে পারিস না ওর সেহের লোভে, নিছক চুন্নু খাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি, আমার ইচ্ছেও কোরত না, ভাবতাম দেখুক এ দেশের ঘরে পূব দেশের প্রেম কত গভীর। দেহসর্বশ পন্ডিষের প্রেম নয়।

খাক তুই তোমার পূব দেশ নিয়ে। বললাম। এখন ওঠ। তোমার plan কি এখন? এবারে তো London-ফিরতে হবে, তার আগে চল তোকে এখন লুলুর কাছে নিয়ে-বাই।

পাটা বরা শুক হয়েছে, হলুদ রঙের পাটা, 'অটাম' এসেছে শরৎ নয়। কাশফুলের আলপনা নেই, এসোমেলা ধূসীর মত হালকা মেঘ নেই আকাশে—পত্রবরা। শুধু বরাপাতার পান শোন লগুন। আমার মন-মেজাজ ভাল নয়। লুলুর বাচ্চা হবে, বাচ্চা হবার সুবিধে এসেছে বত কামেলাও ভক্ত। এই সেদিন বিয়ে হল, দু বছরও নয়। এর মধ্যে ছেলের বাপ হবার সাধ ঘোটেই ছিল না। হয়ে গেল।

সুইটনারল্যাণ্ড থেকে হলিডে করে ছু মাস লগুন আসা হয়ে গেছে, সামনের বছর অস্ট্রিয়ার বাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লুলু বাব সাখলো। ছানা-পোনা নিয়ে তো আর হলিডে হয় না। ক দিন আগে ভাবছিলাম ওমরের কথা। ওর অস্ট্রিয়ার সবকিছু অনেক খোঁজ খবর জানা ছিল, কিন্তু এখন আর আমার প্রয়োজন নেই তাতে।

নওয়াবের সংগে আমার সম্প্রতি দুবার দেখা হয়েছে, কিন্তু আমরা কেউ ওমর প্রসঙ্গে আলোচনা করিনি। নওয়াব বোধ হয় লগুনের আদব কায়ালা একটু শিখেছিল। আমার তো মনে হোত ওমরের মারিয়া বোধ হয় এতদিনে লগুন এসে হাজির হয়েছে, ছোট্ট হয়ত একটা কিছু করে বলে আছে। তাও ভাল। ডেনীস বাড় থেকে নামলেই হোল। আমি আর কোন করে ওর খবরও নিইনি। আর ভালও লাগে না বুঝো বরসে বালশিয়া প্রেমগাথা গুনতে। তবু এক একবার মনে হোত কোথায় ওর কীক, ও যদি তা জানতো কত ঘাটে ওর নৌকো ঘুরে মরবে? সেলিমাকেও চোখে দেখিনি। দেখলে বা জানলে হয়ত বুঝতাম, কেন ওমরের প্রেম পলাতকা? তার সাকী ডেনীস নয়, মারিয়া নয়, শিখ্রা নন্দিতা সেলিমাত নয়। ওমরের প্রেম—ওমরের সাকী। এই সাকীর শিচ্ছে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজে

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ...

শীতের দারুণ সম্পূর্ণ
শরীরের প্রয়োজনে
নিয়োগ করলেই অটুট
স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়।
ডায়াপেপসিন ব্যবহার
করলে এ বিষয়ে নিশ্চিত
হতে পারেন, কারণ
ডায়াপেপসিন খাদ্য
হজমের সাহায্য করে।

ডায়াপেপসিন



হুজো খাবার সময় নিয়মিত ছোট এক চামচ খাবেন।

ডায়াপেপসিন কখনো মজাদার ঠান্ডার দা।

ইউনিভার্সাল ড্রাগ • কলিকাতা



নিজের দ্বারা ধার প্রচেষ্টার। কি করে তা ধরা যাবে? আমার অস্থান্য যে অস্বস্তি তা প্রমাণ করার জন্যই বোধ হয় ওমরের আবার টেলিফোন এলো আমার বাড়ীতে।

দীপংকর, তোর বৌ এসেছে তো এখানে? টেলিফোনে ওর প্রথম প্রশ্ন শুনলাম। হঠাৎ ললুর কেন খোঁজ করছে বুঝলাম না। দু'মাস লগুনে এসেছি, এর মধ্যে ওমরের নিশ্চয় আমাকে দরকার ছিল না, তাই খোঁজ হয়নি, সে সম্বন্ধে কিছু বললাম না।

হ্যাঁ ললু এসেছে, কিন্তু ওকে হঠাৎ তোর দরকার পড়লো কেন? তুই কিবলি কবে, একটা খোঁজও তো নিস না বিনা দরকারে। রাগ কবিনে দীপংকর, বড় ভাড়া। কিন্তু একটুখানির জন্য কি আসতে পারি তোর কাছে? please না বলিস নি।

এর পরে না বলা চলে না। একটু পরেই ওমর এলো, বণ্ড স্ট্রের বাবুটি। কেতাহববু পোষাক। একবারে নির্বৃত্ত। এত সজগোজ করে আমাদে বাড়ীতে তাকে কখনও আসতে দেখিনি। ব্যাপার কি। তার ওপর টেলিফোনে তুই আবার ললুর খোঁজ করলি। এবার কি আবার বৌ-এর পালা? হাসতে হাসতে বললাম।

সাজগোজ? ডিনারে বাড়ি ডেনীসের সঙ্গে Lotus House এ বৌটানেক বরকার জন্ম। একটা চিঠি লিখতে হবে জাধাণে।

তোর ডেনীস আবার কবে এলো? সে না ম্যাক্সরকার গিয়েছিল ঐ বড়লোক ইটালিয়ানটার সঙ্গে। কেন সেখানে বাকি ছুত হোলনা, তাই আবার তোর কাঁধে ভর দিয়েছে। আর চিঠি দিব কাকে জাধাণে ভাবার?

মারিয়ার। আমাকে ত বিরক্ত করে মারছে মেয়েটা লগুনে আসা অবধি। প্রাত সপ্তাহে চিঠি আসছে, আধা-জাধাণ আধা-ইংরিজি। আমাকে ও কত ভালবাসে এই সব লেখা। আমি ভক্ততা করে চিঠির উত্তর দিয়েছি ইংরিজিতে। কিন্তু এবারের চিঠি পেয়ে খাবড়ে গেছি। মারিয়া ছু-তিন সপ্তাহ পরে লগুনে আসবে। তাই ওকে জাধাণে একটা চিঠি দেবার দরকার হয়েছে।

জাধাণ ভাবাই কি লিখবি বলে দে, ললু তর্জমা করে দেবে। ওমর চিঠির যা মর্মার্থ বললে তা এই—

প্রিয় মারিয়া—তোমার চিঠি পেয়েছি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানিছি সাংসারিক ব্যাপারের জন্য হঠাৎ আমি ভারতবর্ষে বাড়ি। ওমর তার চিঠির লাইনগুলো বলে গেল। আমার মনে পড়লো ডেনীসের লেখা চিঠি ওমরকে। ছোটো চিঠির স্তর হুবহু এক। দীপংকর kindly মারিয়ার চিঠিটা আমার বাড়ীতে post করিস। আমি চলি বড় ভাড়া। সাকী বোধ হয় পাড়িয়ে আছে।

তোর পাঁচ মিনিট সময় হবে কি ওমর, তাকে একটা কথা বলবো বললাম। ওমর হঠাৎ থমকে পাড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। তোর খেলা কবে শেষ হবে বলতে পারিস? ছুরিকে নতুন গল্প বলে এলি মারিয়ার, চলিডে করতে গিয়ে যদি ফুটি করে আসতিস আমার কিছুই বলার ছিল না। তুই একটা মেয়েকে নাচিয়ে এলি অথচ নিজে ঘরে মরছিস এই মরীচিকার পেছনে, ডেনীসের পেছনে, তুই জানিস ও তোর নাগালের বাইরে, তুই জানিস তোর বা আর তাতে ডেনীসের সঙ্গে তাল রেখে চলা চলে সপ্তাহে একদিন, বড় জোর দুদিন, তবু তুই ওর পিছে ঘুরে মরিস।

ওমরের মুখ বাধায় স্নান হয়ে গেল। এত রুচ কথা ওকে কোন দিন বলার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কেন জানি না আমার পক্ষে আর না বলে থাকাও চলছিল না। অবসন্ন বসন্তের মত স্নানোচ্ছল ওমর বললে দীপংকর, তুই তো জানিস, সাকী আমার কী? আমি কি বুঝি না ও আমার নাগালের বাইরে? এই দেখ না আজ সন্ধ্যার জন্য নগরাজের থেকে পাঁচ পাউণ্ড ধার করেছি।

তুই কেন ওকে ভালবাসিস আমি জানি। আমার বোধ হয় তোর তা জানা নেই। ওমর, তুই কি কখনো তোর আর ডেনীসের মুখ দেখেছিস পাশাপাশি কোন আয়নার? ওর চেহারার সঙ্গে তোর চেহারার এত সাদৃশ্য যে, আমার প্রথম দিনে ভুল হয়েছিল ডেনীস বুঝি তোর মার পেটের বোন। তুই ডেনীসকে ভালবাসিস না ওমর, ডেনীসের মধ্যে তোর নিজেকে ভালবাসিস।

ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওমরের মুখ, সে কোনও দিন ভাবতে পারেনি যে কথা, আজ যেন তা পরম সত্য হয়ে ফুটে উঠল তার সামনে। ডেনীস—তার ডেনীস তার সাকী নয়? সে নার্সিসাস। সে যাকে ভালবেসেছে সে তারই প্রতিবিম্ব। দিনের পর দিন ব্যাধার বিষ জমেছে, ওর শরীর সেই বিষে নীল হয়ে গেছে, তবু সেই বিষ গ্রহণ করে ওর প্রেম অমর হয়ে গেছে, ব্যাধার নীল সাগরে উৎকল কমল হয়ে আজ যেন প্রচণ্ড বড় হয়ে আমি তা ভেঙে দিলাম। টলতে টলতে ওমর বসে পড়ল ঘরের কোণে বাধা চেয়ারে। অসহ বেদনার যেন ফুলে উঠল তার সারা দেহ। একটু পরেই ও তা সামলে নিল।

দীপংকর, জাধাণ চিঠিটা তুই আমার ঠিকানায় post করিস। আমার আর একটা চিঠি লেখার আছে এখন হাই।

কোথায় বাড়িছ? Lotus House-এ? আমি প্রশ্ন করলাম। দূর বোকা! সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ও বললে। পয়সের উঁটা ভেঙে গেছে, পাশড়ি গেছে বরং। ডেনীস আজ আর Lotus House-এ যাবে না, যাবে সন্তার রেস্টোরাঁয়, আমাকে সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে হবে, সেলিমাকে চিঠি লিখতে হবে, সাকী চলে এসো। তোমার ওমর দিন শুগছে।

বীরের এ রক্তশ্রোত—মাতার এ অক্ষাধারা,
এর বত মূল্য সে কি ধরা ধূল্য হবে হারা?
ধামিবে না রক্তশ্রোত বাজিবে না বাণ
রাখির তপস্বী সে কি জানিবে না দিন?

—ববীন্দ্রনাথ



বিজ্ঞানভিক্ষু

Wherever [the Reader] finds that I have ventur'd at any small conjectures at the causes of things that I have observed, I beseech him to look upon them only as uncertain ghessees (=guesses), and not as unquestionable conclusions, or matters of unconfutable science.

—Micrographia : Robert Hooke

এক

গোপন আমন্ত্রণ

There was a young lady from kent,
Who said that she knew what it meant
When men took her to dine,
Gave her cocktails and wine ;
She knew what it meant—but she went.

—Anon.

স্নানি বৃদ্ধি শেষ হয়ে এল।

এক সেকেন্ড সময় লেগে যায়। আচম্ভিকা তন্ত্রা-ভাঙ্গা চোখে অজানা পরিবেশ চিনে নিতে। হাওহাই জাহাজের 'জেন্ট' এর যুদ্ধ গর্জন কানের পর্দা থেকে হ্রাসমণ্ডলীর নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সাড়া তোলে আবও এক সেকেন্ড পরে। বাইরে দেখা যায় পৃথিবীতে ধূসর আলোর আভাষ। সতের হাজার ফুট নীচে বর্ণনীয় পৃথিবী পৃথিবী কালিমায় ঢাকা। ধূসর আলোর কীপতম বিন্দু—সম্ভবতঃ উত্তর বেলওয়ার কোল টেনন হবে। আগ্রা, টুণ্ডা না 'গাজিয়াবাব'?

সহযাত্রী সকলে এখনও ঘুমুে অচেতন। 'পরশুরাম'—অধ্যাপক শিক্ষারকে দেখায় ঘুমন্ত শিশুর মতোই। পেছনে অমল বন্ধ্যার মুখ বিকৃত হয়ে গেছে—হৃদয় বা হৃদয়ের ঘোরে। কিন্তু পাখলুন এর 'ক্রীক' এখনও স্টুট!

শংকর মনে মনে হিসাব করে—বোঝ কতটা সময় ব্যয়ে যায় অমল বন্ধ্যার ভ্রাম্যাকাপড়ের ভব্যতা রক্ষা করতে।

আসাম-প্রবাসী সিন্ধী ছেলেটির—নামটা ঠিক মরমে থাকে না শংকরের—আলিমচান্দানী (?) নাসিকা গর্জন করে চলেছে 'জেন্ট' এর গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। অতৃপ্ত ঘুমের স্নানি শংকরের সর্বস্বত্বে—মেসের শব্দার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার ভায়ে শরীর-মন নত।

নিজের শব্দার যে কতো মায়া—কোন না তা মেসের তথ্যহীন শব্দা—বোঝা যায় কেবল তা থেকে বঞ্চিত চলেই।

শংকরের অভিযোগ—সরকারী উড়োজাহাজে হাল কাশনের তেলান দেওয়া গলীর পরিবর্তে ঢালা কবাসের ব্যস্ততা করা হয় না কেন?

শেছন থেকে আসে ন্যা কাশির শব্দ। মিনিট ঘরের বন্ধে তার বিরতি নেই। গোয়েন্দা তন্ত্রালোক তাহলে অ্যাকমায় কষ্ট পান। পেটের লারে ঢাকরী—কর্তার ইচ্ছায় কর। হঠাৎ সর্বাঙ্গিকভাবে জেগে ওঠে শংকরের মনে তন্ত্রালোকের মন্ত্র।

কন্সট্রোল কেবিন-এর চরভা এয়ার খুলে যায়। সরকারী পাইলট এলেন কতকটা ভাগ্যের পেয়ালা আর ধার্মিকাসক নিয়ে। ধার্মিকাসক থেকে চা ঢেলে শংকরের দিকে এগিয়ে দিয়ে তন্ত্রালোক বসেন, এই চা-টুকু খেয়ে চা-গা হয়ে নিন—পালাম এয়ারপোর্টে আমতা পৌঁছাব আর বিশ মিনিটের মধ্যে।

হৃদয়ান ভানিয়ে শংকর জিজ্ঞাসা করে তন্ত্রালোকে যে এটাও সরকারী ব্যবস্থা কি না।

মুহুরে তন্ত্রালোক বলেন, না। গ্লেনে বেচোতে চলে সর সরকারী যোগাড় করে রাখতে হয়। কখনো বা চক্রিশ ফটো তাকিয়ে নিতে হয় ডিউটিতে। আশনারের মতো সম্মানিত অতিথি পেলে স্বাস্থ্যমাত্র সেবার চেষ্টা করি।

চা-এর উৎসাহ শরীর অভ্যন্তরে সঞ্চারিত হয়ে আশা-আকাংক্ষার হৃদয়টাকে আগের চাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে। এরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উত্তর কখনো হয় নি শংকরের তেজস্বী বছরের জীবনে। ল্যাবরেটরীর দৈনন্দিন কার্যক্রমটাই ছিল এতদিন একমাত্র, বাস্তব সমতা—

বড়িতে সহর জানাচ্ছে—চারটে বেজে বজ্রিণ। দমদম থেকে পালায় আজ মাত্র দু'ঘণ্টার পথ। অভাবনীয়। পনের বছর আগেও এতটা গতিবেগ ছিল মানুষের কল্পনার বাইরে।

ভ্রমপঙ্কের চাঁদ অস্ত গেছে দমদম ছাড়াতেই। আলোপাশের অগণিত ছায়ায় জ্যোতি মান হয়ে এল। মানুষের কৃতিত্ব কতো সামান্য। দুয়ের নীহারিকাপুঞ্জ মহাশক্তির পাশে ধারমান প্রতি সেকেন্ডে বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার মাইল করে। সাড়ে চারশো মাইল সে মহাবাহুর তুলনায় কতটা অতিক্রমকর। শংকর হিসাব করে বার। এক্সপ্রেস ট্রেন এর তুলনায় কুমের গতি? এই গ্লেন এর তুলনায় একটা পি পিডের গতি? না, তার চেয়ে অনেক-অনেক মন্থ—

সহযাত্রীরা সকলেই জেগে উঠেছেন। সহকারী পাইলট ও গ্যোয়েন্স ভ্রমলোকের কী নিয়ে আলোচনা চলেছে। অস্ত সকলের গুপের দিকে শংকরের দৃষ্টি ঘুরে আসে। সকলেই নিখাক—সকলের মুখেই একটা উৎসাহের ছায়া। কী আশ্চর্য সামুদ্রিক বিভিন্ন মানুষের মনের গঠনে—অথচ কী পার্থক্য মানুষের-মানুষে! শংকর অবাক বিষয়ে ভাবে—

কনট্রোল ঘরে দরজার ওপরে অলে উঠল লাল আলোর নিয়ন্ত্রণ—বেট লাগাও সকলে—যুগপাণি নিষেধ। সহকারী পাইলট অঙ্গুলি হয়ে মান 'কন্ট্রোল' কেবিনের বন্ধ দরজার পেছনে।

কোমরবদ্ধ আঁটকাতে গিয়ে শংকর ভাবে যদি এগার ঘণ্টা 'জুটে'। আইডলওয়াইল্ড (Idlewild) বিমান ঘাটির চতুর্নটা আবার শংকরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জোট 'জুটে' গ্লেন হাট পূর্ণ করার সঙ্গে সংগেই হোসো বিস্ফোরণ—মাছনের শিখা ছিটকে গেল প্রায় দুশো গজ। ছুটি মানুষের চিরু পর্যন্ত পাওয়া গেল না। হতভাগীরা বোধ হয় টের পর্যন্ত শেল না। দৈনন্দিন দুখ ধান্যর হাত থেকে চমৎকার মুক্তি।

কানের পর্দার লাগছে এবার অস্বস্তিকর চাপ। মাথাটাও যেম একটু ঘুরে উঠল শংকরের। চোখ বন্ধ করে কয়েক মুহূর্তের অবাঞ্ছন্য শায়িত। করবার চেষ্টা করে সে—

পালায় বিমানঘাটি।

আকাশের দানব সামান্য মোড় খেয়ে শঙ্কশিষ্ট গৃহপালিত জন্তুর মতো এসে গাড়িরেছে উত্তর কোণ বেঁসে এবার নামবার পালা। গ্যোয়েন্স ভ্রমলোক বোঝা করছেন।

'রানওয়ে'র ওপর গাড়ী এসে গাড়িরেছে আছে আপনাদের গন্তব্য-স্থলে নিয়ে বাবার জন্ত। প্রথমে আপনাদের নিয়ে বাওয়া হবে আপনাদের জন্ত নির্দিষ্ট 'ব্যারাক'এ। সেখান থেকে প্রান্তরশেষের পর গাড়ী আপনাদের পৌঁছে দেবে 'কনকোর্স'এ। সময় আপনাদের হাতে বেশী থাকবে না। তাই অম্বরোধ বে কোনো কাজে প্রয়োজনান্তিরিক্ত দেবী হতে যেনেন না। মালপত্রের জন্ত আপনারা ব্যস্ত হবেন না—সে ভার আমাদের।

আর একটা সনির্ভর অম্বরোধ আছে। কনকোর্সে সংক্রান্ত ব্যাপারে কারো কাছে কোন প্রশ্ন করবেন না। করলেও প্রশ্নের উত্তর পাবার আশা করবেন না। আমাদের কাজ কেবল আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার মতোই সীমাবদ্ধ। আপনাদের

হাতে কোন অম্ববিধা ভোগ না করতে হয়, আমরা সে সবকে বখাসিধা চেষ্টা করব। সুপ্রভাত।

প্রত্যুত্তরের আবহাওয়া 'রানওয়ে'র ওপরে বিরাট কালো 'সীডান'টা ভূতে-পাওয়া বলে মনে হয়। অস্ত বজ্রিসের অম্বরোধে শংকর সবলেশে গাড়ীতে গিয়ে ওঠে। অস্তরোধের হাজি শেষের মুহূর্তে আসে আগামী শ্রুতির আমেজ। রাজধানী দুমুদ। কখনো বা হু একটা 'বাস-সরী'র দেখা মেলে পথে—নির্জন সহরতলী শব্দে সচকিত করে তারি লাল চোখ দেখিয়ে ঘন অঁধারের মধ্যে বার মিলিয়ে।

শংকর মগ্ন হয়ে বার গন্তমিনের অভিজ্ঞতার হিসাব মেলাতে...

সে যেন কতো মূগের কথা। অথচ মাত্র বিশ ঘণ্টা আগে নিত্যকারের অভ্যাসের বশে পরম নিশ্চিন্ত মনে সে ল্যাবরেটরীর দীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করছিল। ঘুর থেকেই কখন ভেসে এল তার ঘরের টেলিফোনের অশান্ত আহবান। বন্ধ ঘরের তালি খুলে শংকর কোন তুলে ধরে। এত সকালে তাকে প্রয়োজন কার?

হ্যালো, ডাঃ রায়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি?

তীক্ষ্ণ জোড়ালো বর্ধকর। শংকরের কানের পর্দা যেন কেটে যায়।

হ্যালো, আমি রায় কথা বলছি।

ডাঃ শংকরপ্রসাদ রায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনায় জন্ত আমি কি করতে পারি?

আমি ডিরেক্টর, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অফিস থেকে বলছি। দয়া করে একটু ফোনটা ধরে থাকুন। ডি-আই-বি আপনায় সঙ্গে কথা বলতে চান।

ডি-আই-বি? ডিরেক্টর, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো? তার আবার কী প্রয়োজন শংকরের সঙ্গে। শংকরের মনে জেগে ওঠে দাক্ষিণীমিত্ত বিষয়।

সুপ্রভাত ডাঃ রায়।

মোলায়েম মার্জিত কণ্ঠস্বর। শংকর গাড়া দেয়।

ডাঃ রায়, আপনায় সঙ্গে গোপনে একটু আলোচনা করতে চাই। আপনায় ঘরে আর কেউ আছেন?

বিষয়ের ওপরে বিষয়। গোপন আলোচনা। কেন?

শংকর ঘরের চার দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নেয়। ভালুকদ্বারের আজ আসতে দেবী হবে। আর দেবতাব বা বীনাফি দশটার আগে সাধারণতঃ আসে না ল্যাবরেটরীতে।

না, আর কেউ এখানে নেই।

তা হলে দরজাটা একটু বন্ধ করে দেবেন কয়েক মিনিটের জন্ত।

শংকর দরজা বন্ধ করে আবার কোন ঘরে—

এবার বলুন।

ডাঃ রায় আপনায় সঙ্গে আমার আলোচা বিষয় টেলিফোনে বলা চলে না। দয়া করে একবার আমার অফিসে আসবেন কী?

একুশি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বিষয়টা খুবই জরুরী।

শংকর একটু বিরক্ত হয়। আজ কাকের ডাড়া অনেক। চাটাজীর ঘর থেকে বড় ম্যাগনেটটা ধার করে আনা হয়েছে দু'দিনের

কড়ারে তাড়াতাড়ি কাজ শুরু না করলেই নয়। দেবতায় আর নানাকি নতুন শাকিটো গড়ে তুলেছে কাল অতিরিক্ত সময়ের পরিপ্রভে। সেটার পরীক্ষার সময় শংকরের থাকি প্রয়োজন।

কিন্তু ডি-আই-বি! গোয়েন্দা পুলিশের দণ্ডবৃদ্ধের কড়া!

অনর্থক পুলিশকে চট্টরে বা লাভ কী? এ ছাড়া কোতুলও জেগে ওঠে একটু।

কয়েক বৃহত্তর নীরবতা। তার পরে শংকর বলে, আচ্ছা। তবে আজ আমার অনেক কাজ আছে, একটু তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু।

ডি-আই-বি বলেন, অনেক ধন্যবাদ। আমি প্রতিশ্রুতি দিছি—পনেরো মিনিটের বেশী আপনার মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করব না। আর একটা কথা, আমাদের এখান থেকে আপনার জন্ত গাড়ি পাঠিয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না। আপনার ল্যাবরেটরী সামনে—নব্বয়ের একটা ছোটো ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তাকে ছকুম দেওয়া আছে আপনাকে আমার অফিসে পৌঁছে দেবার জন্ত।

নিজের নামের যে এত মহিমা চোখে না দেখলে শংকরের বিশ্বাস হত না। গেটে নিজের পরিচয় দেবা মাত্র একজন সাধারণ পোষাক পরিহিত পুলিশ কর্মচারী—ইউনিফর্মধারী সেপাই শাজী—উচ্চ নিম্ন বিভিন্ন পদস্থ কর্মচারীদের বৃহৎ ভেল করে শংকরকে সোজা বড় সাহেবের খাস কামরায় পৌঁছিয়ে দেয়।

শংকর ঘরে প্রবেশ করবারমাত্রই ডি-আই-বি চেয়ার ছেড়ে শশব্যস্তে তাকে অভ্যর্থনা জানানেন। বিষয়ে শংকরের বাকশক্তি হয় না। কী ব্যাপার? এমন ত হবার কথা নয়। একজন নগণ্য বিজ্ঞান-সাধকের এত সম্মান!

করমর্দন করে ডি-আই-বি বলেন, ডাঃ রায়, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম, এজন্ত মার্জনা করবেন। কিন্তু এ ছাড়া আমাদের কোনো উপার ছিল না সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার।

শংকরের মনে নানা রকমের সন্দেহ-চিন্তার মেঘ। সহজ হবার চেষ্টা করে সে। সাধারণ সৌজন্য প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করে কী ব্যাপার?

ডি-আই-বি বলেন, বলছি। কিন্তু তার আগে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে আপনাকে। আজ আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হবে ঘুপাকরেও সে কথা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। শংকরের বিধা বেড়েই চলে। এ কী কীম পেতে রাখলেন জয়লোক?

ডি-আই-বি শংকরের মনের অবস্থা কিছুটা বোধ হয় আন্দাজ করে বলেন, হেসে অন্তর দেন—ভুল বুঝবেন না ডাঃ রায়, কোনো সাধারণ রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে আজকের আলোচনা নয়। যদি ভেবে থাকেন যে সাত বছর আগে ছাত্রনেতা হিসাবে আপনার বিপ্লবগের আইনবিরোধী কোন কাজের জবাবদিহি করবার জন্ত আপনাকে ডাকা হয়েছে অথবা আপনার প্রতিক্রিয়া বন্ধদের সম্পর্কে কোনো তথ্য আলোচনা করবার জন্ত এই আমন্ত্রণ—তাহলে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন। সরকার সে সব নিয়ে এখন মাথা ঘামান না।

শংকর সতর্কভাবে উত্তর দেন, কিন্তু আলোচ্য বিষয়টা না কেনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া বার কেনম করে বলুন?

জয়লোক খোলা জানালাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপরে বলেন, যদি বলি আপনার প্রতিশ্রুতির ওপরে ভারতের নিরাপত্তা নির্ভর করছে?

বিষয়ের ওপর বিষয়। ভারতের নিরাপত্তা? তার সঙ্গে শংকর রায়ের প্রতিশ্রুতির কি সম্পর্ক?

শংকরের বিস্মৃত ভাবটা বেশ একটু হয়েই ফুটে ওঠে। ডি-আই-বি কিছুক্ষণ পরে আবার বলেন, জাতীয় সরকার করেকজন বৈজ্ঞানিককে গোপনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আপনার নাম আছে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। আমার ওপরে ভার পড়ছে সে আমন্ত্রণলিপি আপনাকে পৌঁছিয়ে দেবার। কিন্তু তার আগে আপনার প্রতিশ্রুতি আমার প্রয়োজন যে এই আলোচনা বা নিমন্ত্রণলিপি সফলত ব্যাপার নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করবেন না। এমন কি নিকটতম আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও নয়।

শংকরের সন্দেহ কিন্তু বার না—বরা করে একটু আতঙ্ক দেবেন কী জন্ত এই আকস্মিক গোপন আমন্ত্রণ?

ডি-আই-বি বলেন, আমি ছদ্ম্বিত কিন্তু এর বেশী কোনো খবরই আমি জানি না। এতুই ওপরেই আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শংকর সিদ্ধান্ত নেন, আচ্ছা প্রতিশ্রুতি দিলাম।

ডি-আই-বি স্বস্তির নিঃশ্বাস কেনে বলেন, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে যে ভারত সরকারের কেবল একটা গোপন প্রজেক্ট-এ আপনারদের সাহায্য চাই। এ প্রজেক্টের একটা সাংকেতিক নাম আছে—‘প্রজেক্ট-এ’। আমার ধারণা, সমগ্র ভারতে উপরওয়ালার একজন ছাড়া এ প্রজেক্টের উদ্দেশ্য বা স্বরূপ সবচেয়ে কেউই জানেন না।

শংকরের মনে আবার সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে। ভারত সরকারের গোপন প্রজেক্ট? ‘প্রজেক্ট-এ’?

এর অর্থ কী? অ্যাটম নয় ত? না, তা কী করে হবে?

হতভেদ পাকে, কিছুই বলা যায় না। তবে কি ভারত সরকারও—শংকর মন স্থির করে বলেন।

দেখুন, একটা কথা আপনাকে এখন থেকেই জানিয়ে দিছি। যদি বৃষ্ণ বা মারপাঙ্ক এ প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হয় তবে আমি তাতে যোগদান করতে অক্ষম। আমার এ অক্ষমতার জন্ত যদি শান্তিতোষ করতে হয়, আমি ভাও মাথা পেতে নেব।

ডি-আই-বি শশব্যস্তে বলেন, না, ডাঃ রায়, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমাদের এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ‘প্রজেক্ট-এ’র সঙ্গে মারপাঙ্কের কোনো সংযোগ নেই। আপনি সে সবচেয়ে নিশ্চিত হতে পারেন।

শংকরের শরীর কিন্তু দ্রুত হয় না। জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা, দেশে এক বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক থাকতে আমার মত নগণ্য বিজ্ঞান-সাধককে আপনারদের প্রয়োজন কেন?

ডি-আই-বি হেসে বলেন, দেখুন প্রয়োজনটা আমার নয়—সেটা উপরওয়ালাদের। আমরা জানাচ পুলিশ—বিজ্ঞানের সাম্রাজ্য কে

বড়ো, কে ছোটো কী করে জন্ম? দিল্লী থেকে প্রকোপ কৃষ্ণমারী একটা তালিকা আমায় কাছে পাঠিয়েছেন—আপনার নাম আছে তাতে সর্বাগ্রে। আমি পত্রবাহক মাত্র।

শংকর একটি আত্ম হই। বাক্য, অজ্ঞাত: কৃষ্ণমারী আছেন এর মধ্যে। সমাহৃতময় কৃষ্ণমারীর স্মৃতি শংকরের চোখের সামনে জেলে ওঠে। গভীর বারের পরাধীনতার গবেষণা সম্বন্ধিত শংকরের তিনটে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে একমাত্র কৃষ্ণমারীরই চেষ্টায়।

ডি-আই-বি তত্ত্বকণ টেবলের টানা চুম্বকের মধ্য থেকে একখানা সীলমোহর করা খাম বের করে শংকরের হাতে তুলে দেন।

সীলমোহর ভেঙে থাকি খুঁতেই আর একটা সীলমোহর করা খাম বেহিয়ে পড়ে। তার ভেতরে সরকারী কাগজে একটা ছোটো চিঠি।

চিঠিটা খোলার সময় শংকরের হাত ঝুঁকি পেয়ে ওঠে।

চিঠির মর্মার্থ এই—

ভারত সরকারের কোনো জরুরী কাজে কিছুদিনের জন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের পরামর্শ ও সাহায্যের প্রয়োজন। শংকরকে অজ্ঞাতমুখে করা হচ্ছে যে যদি সম্মত হন তবে ১৭ই অক্টোবর বেলা ৮টা ৩০ মিনিটে নয়া দিল্লীতে এক সোপান বৈঠকে যোগদান করতে। পত্রটা পাঠান হচ্ছে স্বাভাবিক বিভাগের মাধ্যমে—কারণ এ বৈঠক সম্বন্ধে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন। পত্রবাহকের কাছে সম্মতি জ্ঞাপন করলে তিনিই সমন্বয় নয়া দিল্লীতে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

সরকারি বিশ্বাস করেন যে শংকরের মত বৈজ্ঞানিক এ ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং বৈঠকের কথাটা সোপানে রাখবেন।

পরিশেষে নির্দেশ দেওয়া আছে, পত্রপাঠ চিঠিখানাকে লুপ্ত করে ফেলার জন্য।

শংকর চিঠিটা পড়ে নেয় আর একবার—সন্দেহের কোনো কারণ নেই—কৃষ্ণমারীর স্বাক্ষরও রয়েছে।

ডি-আই-বির টেবলের ওপরে ডেক ক্যালেন্ডারের শংকর তারিখটা দেখে নেয়। কী সর্বনাশ! আজ ১৬ই অক্টোবর। ১৭ই যে তাহলে কালই।

শংকর উত্তেজিত ভাবে চেয়ার থেকে উঠে পাড়ার। কী করা যায় এখন? হাথার চুলের মধ্যে জ্বলি চালনা করতে থাকে। এত কম সময়ের মধ্যে মনস্থির করা সম্ভব নয়? কিছুক্ষণ বাধে প্রেরণ করে—প্রেরণের উদ্দেশ্য কি আজ বিকালে দিলে চলবে? মনস্থির করতে তো কিছু সময় লাগে। এ হাড়া অনেক জরুরী কাজও হবে গেছে। দিল্লী যেতে হলে সেতুলোর একটা বকোবন্দ করার দরকার।

ডি-আই-বি বলেন, আমি অভ্যস্ত হুগুস্ত, ভাঃ রায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি নিরুপার। আজ বিকালের প্লেনে আপনারাদের উত্তর নিয়ে আমাকে দিল্লী যেতে হবে।

শংকর তবুও জিজ্ঞাসা করে, কতটা সময় আমাকে দিতে পারবেন ল্যাঃ করে বলুন। শংকর তত্ত্বকণে বেশলাই ফেলে আশ্রয় লিপির লুপ্ত করে।

ডি-আই-বি বলেন, আজ কোলা বায়টী পর্যন্ত সময় আপনারকে দিতে পারি। কোলা বায়টীর মধ্যে এই নথিতে আপনারকে কোন করবেন।

একটা স্লিপের ওপরে ত্রলোক একটা কোন-নম্বর লিখে শংকরের হাতে দেন।

কানেকশন পাবার পর কেবলমাত্র বলবেন 'প্রজেক্ট'-এ তাহলেই অপারেটর সরাসরি আমার সঙ্গে সংযোগ করে দেবে। আপনার সম্মতি পাবার পর আপনার দিল্লী যাবার সমস্ত ব্যবস্থার কথা আপনাকে জানিয়ে দেব। আমার একান্ত আশা যে জাতীয় সরকারকে আপনার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করবেন না। আচ্ছা সুশ্রুতাত!

ল্যাবরেটরীতে কিং এল শংকর বিধাপ্রস্ত মন নিয়ে। এখন কী করা উচিত? তাই তো? সহকর্মীরা সকলেই উপস্থিত হয়ে গেছে। *তালুকদার একমুখে হিগোর্টের খসড়া লিখে চলছে আর পাশের ঘরে দেবতায় আর মীনাক্ষি একটা রীলের সংযোগ করতে ব্যস্ত। শংকর নিজের চেয়ারে বসে পড়ে। নাট, একদিনের মধ্যে সব কাজ শেষ করা অসম্ভব। কিন্তু, ব্যাপারটা কী?

শংকর কৌতুহলকে দ্বিগুণ করে রাখার চেষ্টা করে। টেবলের ওপরে সকালের ডাকের চিঠিগুলোর ওপর মনোনিবেশ করে। একখানা নীল, খাম। ওপরে পরিচিত চিত্রাঙ্কন। সুমিত্রা।

আগ্রহের আতিশয্যে খামটা খুলতে গিয়ে চিঠির একটা অংশ ছিঁড়ে যায়।

সুমিত্রা এখন দিল্লীতে আছে। শংকর যদি কোনো কাজে, অথবা পথ তুলেই যদি ওদিকে যায় তবে যেন মনে করে একবার সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করে।

কোনো প্রিয় সম্বোধন নেই—উজ্জ্বল নেই। নিতান্ত মামুলি, বৈয়াক চিঠি। সুমিত্রা—

ভবী, লক্ষ্যঙ্ক সুমিত্রা। বৃদ্ধির নীতি তার মুখে, সর্বাপেক্ষা জড়িয়ে। সাদে তিন বছর আগের সেই সুমিত্রা!

মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে ফেলে শংকর। একবার ঘুরে দেখেই আস। বাক না ব্যাপারটা কী। ঘরের কোন তুলে সংযোগ করে সে।

ওখার থেকে সাড়া পেতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। যেন কয়েক বছর বলে মনে হয়। এখনও সময় আছে শংকর—এখনও সংযোগ কেটে দেওয়া চলে। ভেবে দেখ আর একবার—এখনও—

ওখার থেকে সাড়া এসে গেছে।

শংকর একবার গলটি পরিষ্কার করে নেয়, হালো 'প্রজেক্ট'-এ

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে কখন যে ছ'চোখের পাখা নিম্নীলিত হয়ে গেছে, শংকরের খেয়াল ছিল না। ঘুম ভাঙলো অমল বক্যোর থাকার, এট রায়, ওঠো ওঠো—এসে গেছি আমরা।

চোখ মেলে শংকর দেখে—ভোরের আলো ফুটে বেরিয়েছে। পাড়ীটা খেমেছে একটা লম্বা মিলিটারী ব্যারকেব সামনে। উল্লীপরা সৈন্য আর চাপরাশির দল পেছনে একটা মিলিটারী ট্রাক থেকে গুলির হালশব্দ নাড়িয়ে নিচ্ছে। সেট থেকে দেখা যায় প্রকাণ্ড একটা হলধর। তার হুশানে লম্বা বারান্দা বাস্তব সমান্তরাল ভাবে মাটি সারি দরজা জানালার পাশ দিয়ে চলে গেছে।

অভিযাত্রীর দল চলিতে প্রবেশ করে।

এক বিশালকার শিখ সাময়িক অফিসর ভবনের অভিনন্দন ও প্রীতিসম্ভাষণ জানালেন। বললেন—

দিল্লীতে থাকাকালীন আপনাদের এটাই হবে হেড কয়ার্টার ও বাসস্থান। আমার ওপরে তার দেওয়া হয়েছে আপনাদের তত্ত্বাবধান করবার। কোনো অভিযোগ বা অসুবিধার কথা আমাদের জানাতে কুঠী বোধ করবেন না।

এখানে থাকবার সময়ে কতকগুলি নিয়ম আপনাদের পালন করে চলতে অনুরোধ করছি। যদি এ সব নিয়ম রাখার কাজে আপনাদের সহযোগিতা পাই, তবে আপনাদের সহযোগিতা আমরাও সর্বতোভাবে করব।

এই নিয়মগুলির মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টকারী নিয়ম হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপার থেকে কখনও বাইরে বাবার প্রয়োজন হলে আমাদের জানিয়ে দিতে ভুলে যাবেন না।

এই হলবারই আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের প্রীতিবাণীর আয়োজন করা হয়েছে। সুপ্রভাত!

ততক্ষণে আর একজন সহকারী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বিতরণ করে চলছেন কতকগুলো সাইক্লোষ্টাইল, কচা ইন্ডাহার। শাকের চোখ বুলিয়ে দেয় কাগজগুলোর ওপরে। বাসস্থান-ডাইনিংরুম সম্পর্কিত নিয়মাবলী, 'সিকিউরিটি' সম্বন্ধে কতকগুলি মামুলি উপদেশ, দিল্লীর বিভিন্ন জায়গায় গমনাগমনের জন্য মিলিটারী-ট্রাকএর ব্যবস্থা, কতকগুলো পেটশাশ ও প্রবেশপত্র, নানা রকমের ফর্ম ইত্যাদি।

শাকরের অন্তঃস্থান্য বিব্রোহ করে ওঠে এই বিধি-নিষেধের সংখ্যা দেখে। এমনভাবে তাদের নজরবন্দী করে রাখার সার্বিকতা কী?

স্বাধীনতা লাভ হয়েছে ভারতবাসীর কতো বছর আগে! এখনও কেন যেন হয় না পুলিশ ও সৈন্যদের আপনায় লোক বলে? এখনও যেন তারা ছকুম তামিল করে চলছে কোনো বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের। ভারতবাসীর নিষ্পত্তা বন্ধা তাদের একমাত্র কর্তব্য, দেশের স্বাধুনের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে তারা এতো উদাসীন হয়ে গেল কেন?

নিজের নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করে কিন্তু শাকর খুশী না হয়ে পারে না। প্রভাত ও একখানা ঘর—একটা 'পার্টিশন' দিয়ে ছ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক পাশে রয়েছে একটা বড় 'সেক্রেটারিয়েট টেবল', বই-এর আলমারী, চারখানা বেতের চেয়ার। আর এক পাশে দুখানা আয়ত কোয়ারার পুঙ্ 'স্পী' এর গলীর আচ্ছাদন, যারে একটা নীচ টিশর। পার্টিশনের পেছনে প্রথম দখা, ডেস্ক টেবল ও ওয়র্কগেব। ঘরের পেছনে সংযুক্ত হালকাশয়ের... বাথরুম-বাথটাব শাওয়ার 'ড্রাইং-বেসিন', গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা। অফিসের জট্ট নেই। ঘরের ব্যবহার তুলনার রাজকীয় বললেও চলে।

বাসস্থানের একে পূর্ণিমাটি ব্যবস্থা আর প্রীতিবাণী তোলা-হ্রবোর প্রাচুর্য অভিযন্ত্রের আড়ট ভাবটা শিথিল করে দেয়। একমাত্র প্রফেসর শিকদারেরই কেবল মনের কাঠিট বজায় থেকে যায়। প্রীতিবাণী তাঁর ক্ষুদ্রবৃত্তি হলেও অভিযোগের শেষ নেই। জাতীয় সরকার, জাতীয় কংগ্রেস, শক্তির বাংলা কংগ্রেস, শিকদার, খাজদার, সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দপ্তর, জাতীয় পুলিশ-সৈন্যদের সংকায় কাঁধ সমাধা করে, জয়লোকের বক্তব্য আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় আলোচ্য বা সমালোচ্য বিষয়ে। বিষয়টা আর কিছুই নয়—একজন সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী বৈজ্ঞানিকের হুগুপাত। পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষের ভণ্ডামি, ছাত্রদের নষ্টামি, আধুনিক যুগ সমাজের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে মোক্ষম দৃষ্টব্য করে শিকদার আবার নীরব হয়ে বান।

ততক্ষণে 'কনকায়ল' এর জন্ত তৈরী হবার ভাগাদা এসে গেছে।

শিকদারের বাক্যম্রোত কতকটা আশ্রয়পত্রির অগ্নিপ্রাবের মতো।

দিনের পর দিন পোনা বার না জয়লোকের কাছ থেকে হী কি না ইত্যাদি অতি অপরিহার্য কথা ছাড়া আর কোনো শব্দ।

কিন্তু কোলও একটা ব্যাপারে উদ্বেজিত হলে আর রক্ষা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে অর্য্যকার। শাকরের মতো অকালপক বিজ্ঞানসাধকদের সম্বন্ধে জয়লোকের মতামত সর্বজনবিদিত, অল্পবয়সী ছেলের দল সেজ্ঞত বখাসম্বর তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে।

জীবনযুদ্ধে প্রফেসর শিকদার জয়লাভ করতে পারেননি। অথচ তাঁর প্রতিভার কথা নূতন করে আপনায়ের কিছু বলতে হবে না। ছাত্রজীবনে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের কথা কে না জানে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কৃত্যের যেকর্ড কেউ ভাঙতে সক্ষম হয়নি গত চল্লিশ বছর ধরে। শুধু দেশে কেন, ইংল্যান্ড অথবা জার্মানী—যেখানে জয়লোক পূর্ণার্ণ করেছিলেন স্বাভাবিকের উচ্চাশ্রকার জন্ত, সেখানেই ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর মশের সোঁরভ। কিংবদন্তী আছে, জার্মানী থেকে শিকদারের বিহার দেবার প্রাক্কালে মহামানব আইনষ্টাইন নাকি বলেছিলেন—ভারতীয় পারমাণবিকজ্ঞানকে এবার থেকে সন্যাস করে চলতে হবে অগতের বৈজ্ঞানিকদের। রাশারকোর্ড নাকি বলেছিলেন যে শিকদারের মস্ত বোধশক্তি একটা 'জেনারেশন'এ দু-একশাব্যের বেশী দেখা যায় না।

পেটের যন্ত্রনা কি স্নানাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
দ্বারা বিশুদ্ধ
মতে প্রস্তুত

বাকলা

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকজ্বর, তেজুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ঝাঁপা, মন্দারি, বুকজ্বালা, জ্বালা, অরুচি, স্বপ্নশিখা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাস্তবিকভাবে সেবন করলে নরজীবন লাভ করবেন। বিশ্বজুড়ে সুল্য ফেরলং। ৩২ ডোলের প্রতি কোটা ৩ টাকার, একত্র ৩ কোটা—৮।।। অত্যা। ওঃ.মঃ.৩ পাইকারী মূল্য পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-মহাবিশ্বাস (মুর্শি পাশ্চাত্য) ব্রাহ্ম-২৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

সে যুগে এতো ব্যস্তির ছড়াছড়ি ছিল না। বিজ্ঞান সাধনার উপকরণেরও না ছিল এতো প্রাচুর্য—দেশের দু-একটি গবেষণাগার ছাড়া। অতএব শেষ পর্যন্ত খোঁজখুঁজ করে পরার্থবিজ্ঞানের উদীয়মান জ্যোতিষ জীবনের পরম লক্ষ্য খোঁজলেন এক আশাসবকারী কলেজে সহকারী অধ্যাপকের কাছে নেহাত পেটের দায়েরই। নিখিল ভারত 'এডুকেশন সার্ভিস'এ শিক্ষাব্যবস্থার স্থান নিঃসন্দেহেই হয়ে যেত, যদি না থাকত তাঁর নাম পুলিশের খাতার রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরার্থবিজ্ঞানের একটা চেয়ারও তাঁর পাবার কথা। কিন্তু সেটাও হঠাৎ ফস্কে গেল সিনেট সিদ্ধিকটের দলদলিতে।

এই বছরগুলো কাটলো শিক্ষাব্যবস্থার নানা রকমের পারিবারিক স্বস্তির মধ্য দিয়ে। তাঁর দ্বিবিব্রোণ হয় বহুদিনের দুঃস্বপ্নোৎসাহে ব্যাধিতে তাঁকে নিঃশ্বাস করে দিয়ে। অগ্রজ ছিলেন এলাহাবাদের খ্যাতনামা অধ্যাপক। হঠাৎ তিনি বিকৃতরক্তিক হয়ে গেলেন। সহস্র পরিবারের জ্বর পড়ল ছোট্ট ভাইয়ের ওপরেই। বিবাহের দু বছরের মধ্যে তাঁর এক মেয়ে ঘরে ঘরে এল মাথার সিঁদুর আর হাতের লোহা দুইয়ে। একমাত্র ছেলেরও দীর্ঘদিনের জন্ত

কার্যবাসের হুকুম হয়ে গেল রাজনৈতিক বড়বড়ের মামলাতে। মাঝে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্ত তাঁকে দুবার নোটিশ দেওয়া হল; আর একবার কিছুদিনের মতো 'গাপপেণ্ড' করা হল অবাধ্যতার অপরাধে।

উমাকান্ত শিক্ষাদায়কে চিরবিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে তুললেন দাঙ্গিগাতোর এক নামজাদা ইন্সটিটিউট-এর কতৃপক্ষ কিন্তু তখন আবিষ্কারের লগ্ন গেছে বয়ে—দেশীর শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক-মণ্ডলী, কতৃপক্ষ এমন কি জনসমাজের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ কটন হয়ে দান্য বেঁধে গেছে। কারণে অকারণে ছাত্রদের গালমন্দ দিয়েই তাঁর দিন কাটে। কিন্তু এহি কাকে কাকে কটচি কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রে দেখা যায় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিভার স্কুলিং। এই ভয়াঙ্করিত অনলের কিছু প্রকাশ দেখা যায় কেবল তরুণ বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর নুতন 'খিওরি'গুলোর নির্ধম ভাবে বিনাশ করতে। বৈজ্ঞানিক মহলে তাই উমাকান্ত শিক্ষাব্যবস্থার নাম "পরন্তরাম।" একুশবার তিনি নবজাত 'খিওরি'গুলোর বিনাশ করবেন। তবেই হয়তো হবে এ দাবানলের শান্তি।

[ক্রমশঃ]

ল্যাম্পপোষ্ট

দিলীপ নাথ

অন্ধকারের কালো সত্ত্ব গাঁড় কালি ঢালা,
সুঁদীকড়ের ধাক্কায় তার পাঁজর ডেঙে চুম্বার
জ্বলিতটা তবুও তার মুকুট করে।
ল্যাম্পপোষ্ট জ্বলে।
গহম জাঁধার মুকে জড়িয়ে প্রহর আগা প্রহরীর মতো
ভর আর বড়বড়ের রণালয়ে
এক কৌটা আলোকশিখা আঘা আঘা পিটপিট চোখে
ল্যাম্পপোষ্ট জ্বলে।
রক্তসোলুপ শকুনির দল ওং পেতে থাকে চার পাশে,
কটক-আকীর্ণ পথ হানিবার ডুকায় ছটকট করে,
সরীসৃপ অন্ধকারের বিবাক কালো জিহবাগ্রে করে
আঘিম পরল বস্ত্রার গলিত সত্ত্ব
ল্যাম্পপোষ্ট জ্বলে।
এ পৃথিবীর গভীর রাত্রের অচেনার অজানায়
সারাক্ষণ অমি একটা ল্যাম্পপোষ্ট জ্বলে।
জানেনাকো কেউ তার ইতিহাস,
তার কাহিনীর বোবা সংগ্রাম,
তার দুসর চোখের তারার কলসে বাওয়া দুঃস্বপ্ন
হতাশার হলুদে একটা ফুল—ল্যাম্পপোষ্ট
ল্যাম্পপোষ্ট জ্বলে।
অন্ধকারের কালো সত্ত্ব গাঁড় কালি ঢালা,
সুঁদীকড়ের আঘাত দীর্ঘ দীর্ঘ পাঁজর ডেঙে
জ্বলিতটা তবুও তার মুকুট করে।

পলাশ

শ্রামলী রায়

পলাশ, কী আশ্রয় তুমি,
গত বছরেও দেখেছি শীতের মৌসুমী—
প্রাকৃত প্রেমের রং-এ তেমনি নিবিড়
এলে, উদার আকাশে কেলে অজস্র শিবির,
শেষে তুমি পলাতক জেনেও জীবনের দায়
থাক—সে কথা নাই বা তুললাম।

এবারেও তেমনি শীতের সকালে
ভোরের সূর্য যদি কুয়াশা সরালে
যে রোদে তীক্ষ্ণতাপ রহ,
সে রোদে তোমায় মনে পড়া বিচিত্র নয়—
আমি তাকেও দেখেছি যে পূর্ণবর্ষা
এখনও হুতোমে রাখে তোমার বাহবা,

তখন অশ্রু হলো, বধন সত্যি সত্যি
পারিনি ভাল রাখতে, বুকেই একরঙি
সাদনা নাই বৃদ্ধিতে অভিনয়ে
তখন অশ্রু হলো—লুকাতে নির্ভরে।

আর অশ্রুতাই লাল কিংক
অন্ত দরজা মেলে কিরাসেছে মুখ।

সর্দিকাশির হাত থেকে
খুব
তড়াতাড়ি
সত্যিকার আরাম দেবে



সিরোলিন

‘রডি’



ভারতের প্রতিটি
পরিবারের সর্দি
ও কাশির ওষুধ

কোন অনিষ্টকর উপাদান না থাকায় সিরোলিন আপনার পরিবারের প্রত্যেকেই নিরাপদে খেতে পারে। এতে কালি-ফটিকারী স্লেমা তরল হয়ে যায় ও গলার প্রদাহ ও বুস্‌বুসি দূর হয়—ফলে, খুব দ্রুত ও নিশ্চিত উপশম মেলে।

সর্দিকাশির

সাধারণ সর্দি থেকেই হোক কিংবা গলা ও বুকের প্রদাহযুক্ত অবস্থা থেকেই হোক, আপনার কাশির জন্য শুধু সাময়িক আরামই যথেষ্ট নয়, আরো কিছু করা দরকার—আর সিরোলিন তাই করে—এর জীবাণুনাশী শক্তি ক্ষতিকর জীবাণুগুলোকে নিমূল করে।

আদর্শ ওষুধ

শুশ্বাশ্বু ও শ্বস-সেবা সিরাপ সিরোলিন সর্দিকাশির আদর্শ ওষুধ। আপনার ঘরে সব সময় এক শিশি রাখুন।

একমাত্র পরিবেশক : ভলটাস লিমিটেড

অক্ষন ও প্রাক্ষন



নৌকার
মিতা সেন

নৌকা ভাসিয়ে দিল মাঝি। শীতলক্ষ্যার বৃকে নাচতে নাচতে
এগিয়ে চলল কোথা নৌকাটা।

জলীল মিক্রা নিজে এসে তুলে দিলে পেছে মালতীকে। বাঁধ
বাঁধ আখান দিয়ে পেতে : ভরাইও না মা, এ আমার ঢেঁনা মাঝি,
তোমারো পেরানেরই মাঝব। ঠিক পৌঁছাইয়া দিব। আর গিরাই
আবারে এটিকপা পাজ দিও কিন্তুক, বুড়া মাঝুবড়য় নইলে চিন্তা
করব।

জান হেসে মাথা নেড়েছিল মালতী। তারপর নবীর জল ছুঁয়ে
উঠে এসেছিল নৌকার।

খড়ব বাড়িতেই আবার কিংবদন্তি মালতী। বাপের বাড়িতে
এসেছিল বেড়াতে। ওরা কিছুতেই যেতে সেকেনা। অনেক
কান্নাকাটি করে অনেক কগড়া করে এসেছিল মা-বাপকে
বেখতে। তারপর ? সে একটা দুঃস্বপ্নের মত। ভাবতে গেলে
এখনও মালতীর সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। গলার তেতবটার কান্নার
পাখির আটকে থাকে। রাজ ভবন কতই হবে ? খাওয়া লাগে
সেই লক্ষ্যের বিছানার পা এলিয়ে দিয়েছে ওরা। ঘুম আসতে
সবেরা চোখের পাতার, এমন সবর ভেসে এল আকাশকাটা
চিংকায়। চমকেই বৃক হুক হুক করে উঠল ওদের, ভয়ে শরীর অবশ।
সেই গর্জন কখন : কাছে আসতে লাগল। মনে হল হাজারটা বাঁধ
আকাশ কাটিয়ে চিংকায় করে ছুটে আসছে আর প্রাণ ভরে চিংকায়
করছে আহত প্রাণীরা। দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশটা আঙনের
শিখার লাল টুকটেকে হয়ে উঠল আর ঘোঁরাব সন্কে ভয়ে গেল ব্যতাস।

বয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, তার মধ্যেই ডেকে পরল ওদের
সবর দরজা, আগুন জ্বলতে লাগল ওদের রান্নাঘরের চাল। মালতীর
চোখের সামনে ওরা ওর বাবার বৃকে ছুঁবি বসালো, ভাটটা পড়ে গেল
মাটিতে। আর যে মুহূর্তে একটা চিংকায় পশু মালতীর দিকে ছুটে
এল, সেই মুহূর্তেই মালতী একটা আঁত চিংকায় করে ছুটে পালাল।
খিড়কি দরজা দিয়ে অন্ধকার সব পথ আর পাইখানার তল দিয়ে
ছুটে লাগল মালতী, শেষে একদমরে আর না পেয়ে লুটিয়ে পড়ল
জলীল মিক্রার পায়ে, চোখের জলে পা ভিজিয়ে বলল : আপনে
আমার মা বাপ, আমারে রক্ষা করেন।

জলীল মিক্রা তুলে বসালো ওকে। বলল : ওঠ মা, আমি
মোচলমান হইতে পারি, কিন্তু পশু নই। তোমারে আমি মা
ডাকছি, আমি বাটচা থাকতে কেউ তোমার জাইন্ত ধর্ম কাইড়া
নিতো পারব না। সেই জলীল মিক্রাই আত্ম নিজে এসে নৌকার
তুলে দিল মালতীকে।

নদী ছেড়ে খাল বেয়ে নৌকা চলেছে, বৈঠা ছেড়ে লগি ধরেছে
মাঝি। দূর যোগবাগাড়ার বাঁক। বাঁক ঘুরে আর একটু এগিয়ে
গেলেই মালতীর শব্দ বাগাড়ার ঘাট, মালতী ঠিক হয়ে নিল। পুনর্জন্ম
নিবে সে আবার স্বামীর কাছে ফিরে যাচ্ছে, বার্তে সনাতনের বৃকের
একান্ত কাছে শুয়ে সে খুলে বলবে সব কথা। শুনে সনাতন নিশ্চয়ই
ভয়ে শিউরে উঠবে, তার পর হঠাৎ মালতীকে টেনে নেবে বৃকের
কাছে। মালতী চোখ বুজল।

ঘাটে এসে নৌকা ভিড়লো। লগিটা কান্নার পুতে নৌকাটা
অনেকটা উপরে তুলে দিল মাঝি। মালতী নৌকা ছেড়ে নামল
মাটিতে। তার পর এগিয়ে গেল। সবর দরজা খোঁচিয়ে উঠানে
এসে পা দিল মালতী, পা দিচ্ছেই যেন ধমকে গেল। আশ্চর্য ! একটা
ঘাবড়ও দরজা বুলল না। এগিয়ে এল না কেউ ঘাবের বটকে ডেকে
নিতো ! তবু সাতসে ভর করে লাগুয়ার এসে উঠল মালতী। তার পর
দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলো : মা, মা গো, আমি আইছি মা।

সাদা এল না। তবে কি কেউ নেই ? এখানেও কি সেই
সাম্বাটিক কাণ্ড ঘটে গেছে ? তবু নবজার হুঁ ভাতে লজ করে
মালতী আবার ডাকলো : মা, মা গো, লজা খুলুন। আমি মালতী।
তবু সাদা এল না, দরজার কান পেতে শুনল মালতী খড়মের খটখট
আওয়াজ এগিয়ে আসছে। সন্তুষ্ট হয়ে ভাড়াভাড়ি ঘোমটা টেনে
মালতী এক পাশে সরে দাঁড়াল। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো অম্বিনী
চক্রবর্তী, মালতীর শব্দ। পায়ে হাত দিয়ে প্রশ্নম করতে বাচ্ছিল
সে, হুঁ পা পিছু হটে গেলেন অম্বিনী চক্রবর্তী। বললেন : খাটিক
খাটিক, প্রশ্নমের আর দরকার নাই, ব্যাপারভা ন্পাইই জানইয়া
দিচ্ছি তোমারে।

চমকে উঠল মালতী। অম্বিনী হুঁ'বর গলাধাকারী মিলেন।
তার পর বললেন : শোন, এই বাড়ীতে তোমার কোন স্থান নাই,
তোমার সঙ্গে আমাগো আর কোন সন্ধ্য নাই। তোমার বেখানে
খুঁই যে ভাবে ইচ্ছা থাকতে পার।

মালতীর বৃকে কে যেন একটা তীর মারল। ব্যাধার শরীরটা
কৈশে উঠল, তবু কাঁপা গলার বলল : আমার অশরাব ?

গর্জন করে উঠলেন অম্বিনী চক্রবর্তী। অশরাব তোমার নয়,
অপরাধ ঈশ্বরের, বল ভোগ করছ তুমি। তোমার উপর দিয়া যে
অত্যাচার হইয়া গেছে, তার জন্ত তোমারে আমরা ভগ্ন করলাম।

মালতী কৈসে ফেলল : না, না বিশ্বাস করেন বাবা, আমি নিষ্পাপ, কেউ আমাকে ছুঁতে পৰ্ব্বাঙ্ক পারে নাই।

আবার চিন্তার করে উঠলেন অশ্বিনী চক্রবর্তী : নিষ্পাপ ? এতবড় একটা বাট চট্টা গেল। তোমার মত বড় মাইয়ার উপরে হেঁচা একত্যা অত্যাচার করল, আর তার মধ্যে তুমি অক্ষত আর নিষ্পাপ হইয়া গেল। এটী কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে কও ?

মালতী গাউ হাউ করে কৈসে ফেলল : বিশ্বাস করেন বাবা, আপনেন—

বাধা দিয়ে টেঁচিরে উঠলেন অশ্বিনী : আমি বিশ্বাস করলে কি হইব, সমাজ কি বিশ্বাস করব ? আর তোমার মত একটা কলঙ্কিনীকে লইয়া ঘর করলে এই কুলীন ব্রাহ্মণের সমাজে আমাকে একঘাইও কইরা রাখব না ?

বাবা মালতী নিঃশব্দে কীদতে লাগল, তবু শেষ 'চোঁটা করে একবার খুব ফুটে ভাঙ্গা গলায় বলল : বাবা, আপনেন দয়া করেন... আপনেন যদি চান তো আমি প্রমাণ পর্যন্ত দিতে পারি।

আবার গর্জে উঠলেন অশ্বিনী : প্রমাণ দিতে পারবা তুমি সীতার মত আশুনে ঝাঁপ দিয়া ? পারবা তুমি ? ও-সব কথা আমি শুনতে চাই না। বাও তুমি। এই আমার ভকুম।

উপড় হয়ে ফুল ফুল কীদতে লাগল মালতী। দাঁড়ায় মাটি পিছল হয়ে গেল, ঘোবের ছায়া ক্রমশ : হেলে পড়ল, তবু দরজা খুলে কেউ এল না। শেষ দেখা-পর্যন্ত করল না সনাতন। পাড়ার লোক এসে ভৌড় করতে লাগল। শেষে কীদতে কীদতে দাঁড়য়া ছেড়ে উঠানে নামল মালতী। টলতে টলতে ফিরে এল নৌকার। উপড় হয়ে পড়ল ছটয়ের তলে।

আবার নৌকা চলল। অশ্বিনের নবম বোদে ধানক্ষেত ভরে আছে। খালের বালা জাল অন্তর ডেউ তুলে নৌকা ছুটে চলছে সোজা উত্তরে। তার পর এক সময় এসে নৌকা ভিড়ল সোনাকান্ধর এলাকায়। চোখের জল মুছেই ধাবার জাতিতে পা দিল মালতী। পিছনে এক মাঝি। পথেই দেখা হ'ল মালতীর দাদা রমেন্দ্রের সঙ্গে। রমেন্দ্র মালতীকে দেখেই বেন চমকে উঠল, বলল : মালতী তুই ? তবে যে শুনেছিলাম—

হুঁহাত ঘরে মালতী কৈসে উঠল : কি, কি শুনছিল। কও, কও দাদা—

রমেন্দ্র আমতা আমতা করে। এই লোকে গুজব হুঁড়ায়— মোহনমানরা নাকি তোর উপরে—

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মালতী : না, না, সব মিথ্যা। সব মিথ্যা। তুমি বিশ্বাস কইরা দাদা। আমি নিষ্পাপ, কেউ আমাকে ছুঁতে পৰ্ব্বাঙ্ক পারে নাই। আর যদি আমি মিথ্যা কই, তবে আমার সর্কাজে বেন কুঠ—

রমেন্দ্র বলল : আঃ কান্ধিস না। শোন, বত্তরবাড়ি গেছিলি ? ভেজা জাঁচলটা দিয়ে চোখ মুছল মালতী। বলল : হ্যাঁ, ওরা কইল সীতার মত যদি পতীকা গতে পারি, তবেই ঘরে তুলব।

রমেন্দ্র চুপ করে রইল। বেন সে ভীষণ চিন্তিত।

মালতী বলল : আমাকে একটু স্থান দেন দাদা। তোমার ঘরের কুড়া লিড়ালের মত থাকব। আইঠা কুটাইয়া থাবু।

রমেন্দ্র ওকে নিয়ে এল বাড়িতে। দাঁড়ায় পাড়াল মালতী।

রমেন্দ্র গেল ঘরে ঘরোকে মালতীর কথা বলতে। একটু পরেই মালতী শুনতে গেল রমেন্দ্রের স্ত্রী ঘরের কানকাটা খিঁকার।

কি কইলা তুমি ? ওরে না মোহনমানরা চাইনা লইয়া গেছিল ?

আঃ চুপ কর না। শুভিল সব মিথ্যা কথা।

চুপ ককম কান ? তা তোমার ভত দরব কেন ? তাও যদি ঘায়ের পেটের বইন হইত।

শোন, ও কিছ কিছুদিন এইখানেই থাকব।

এবার ঘরের কঠ আরো জোরে গর্জে উঠল, কি কইলা ? মরবের আর চুলা পাইল না, আঃ মর, সংসার ভারে জালাইতে আইছে। ওরে ঘরে রাখলে তুমি আর দশকনের কথার ঠিকতে পারবা ?

আমার কথা মানতে হইব। ও এইখানেই থাকব।

বেশ থাক তুমি তোমার ঐ সতী সাক্ষী পাতন বইসেয়ে লইয়া, আমার বরাত্তে একটা দড়ি আর কলসী জুটবই।

আর শুনতে পারল না মালতী। এতক্ষণ শুনতে শুনতে সে তার পাখুলটাকে জোরে কামড়ে ঘরে সামলেছিল। আত্মল কেটে দরব করে রক্ত পড়তে লাগল। চোখের জলে ঝাপসা দেখতে লাগল সব। উঠানে পেরিয়ে বাজা দিয়ে ছুটেতে লাগল মালতী। বনে হল ঘূষারে সব বাড়ির দরজা জানালাগুলো খুলে গেছে, আর সেখান থেকে উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে সব সিঁহর-কপালে বউগুলি। হেসে হেসে আত্মল দিয়ে ঘোষারে বলছে, বেস্তা, পতিতা, কলঙ্কিনী।

মালতী ছুটেতে লাগল। ছুটেতে ছুটেতে আবার এসে উঠল নৌকার। কুঁপিরে কুঁপিরে কীদতে লাগল। মাঝি বলল, এইবার কই বাঘ ঠাইয়েন ?

মালতী চোঁচয়ে উঠল, আনি না, তোমার যেমিকে বুসী ঢালাও।

আবার নৌকা ছুটে চলল। বেলা শেষ হয়ে আসছে। খালে ঘূষার রক্ত আঁজা। ঘূবে গাছপালার কীকে একটা মসজিদের চুড়া। এককাক পাখী পাখুর আকাশের তল দিয়ে উড়ে গেল। জলে ডাঘের ছায়া পড়ল, আর সে ছায়াকে চাপা দিয়ে নৌকা চলল এগিয়ে। শেষে অন্ধকার বখন ঘন হয়ে উঠল, শুধু জোনাকীরা জ্বলতে লাগল তখন মাঝি নৌকা ভেড়ালে মাটিতে। মালতীকে বলল, এইখান এক সাধুর আশ্রম আছে। অনেক লোক থাকে। আপনেনও চোঁটা কইরা দেখেন।

নৌকা চেড়ে মাটিতে পা দিল মালতী। তারপর সফ্র অন্ধকার পথটা ঘরে এগিয়ে চলল আশ্রমের দিকে। ওখান থেকে তখন গান ভেসে আসছে। 'হুঁবলেয়ে বন্ধা কর, হুঁকনেয়ে হানো-...'

কান্না, অবসন্ন মালতী বসে পড়ল বাতাকার এক ধারে। গান শেষ হল, সন্ধ্যা প্রার্থনাও। বামীজি এগিয়ে এলেন মালতীর কাছে।

: কে তুমি ? কি চাও ?

অমনি বাঁধালা বস্তার মত মালতী লুটির পড়ল বামীজির পায়ে। তার পর কান্না জড়ানো কণ্ঠে খুলে বলল সব কথা। একটু গোপন করল না, একটুও অতিরঞ্জিত করল না। সব বলে মালতী কৈসে উঠল : বাবা, আমাকে আপনেন চরণে ঠাই দেন, আমার আর বাওরার জায়গা নাই।

বামীজি ভাবলেন কি বেন। শিখা সব উগ্রীব হয়ে রইল।

শবে তিনি বললেন : আমার ক্ষমা কর মা ! এখানে তোমার থাকতে নেবার মত জায়গা নেই। এখানে আমি তোমার রাখতে পারি না।

মালতী বলল : তবে আমি কই বাবু ?

: পথে নেমে পড়। ঈশ্বর আছেন, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে যাবে নিয়ে ফুলবেন। তবু কি মা !

মালতী আবার উঠে পড়াল। পথ, হ্যাঁ সে পথেই নামবে, সীমানে দীঘির ভালো জল অন্ধকারেও চক্‌চক্‌ করছে। গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল মালতী।

ভবেশ বললো : মহারাজ, এ কি করলেন ! একটা আশ্রয়হীন নারীকে আপনো ত্যাগীয়া মিলেন ?

স্বামীজি মুহূর্ত হাসলেন, বললেন : অনেকগুলো বিচার করে আমার কাজ করতে হয়, তা জানি ? শুকে এখানে রাখলে তোমাদের চিত্ত চক্কল হবে, চিত্তচাক্ষু্য থেকে ষটবে ত্রস্কচ্যে ব্যাধাত।

চিত্তচাক্ষু্য ? ত্রস্কচ্যে ? ভবেশের মুখে একটা অভিযুক্তি ফুটে উঠল। তারপর স্থাবরিকেনটা নামিয়ে রেখে স্বামীজিকে একটা টীকল। তারপর স্বাবরিকেনটা নামিয়ে রেখে স্বামীজিকে একটা টীকল। তারপর স্বাবরিকেনটা নামিয়ে রেখে স্বামীজিকে একটা টীকল।

অনেক হাতে লা'পাড়ার মসজিদে অনেকগুলো মোমবাতি জালান হ'ল। সেই আলোতে সামনের অন্ধকার কেটে গেল। নতুন লুজি আর টুপি পরেছে রমজান। মেহেদি পাতার হাত রাঙ্গিয়েছে। আর আবোলালীর স্বরেও বোরবার মুখ ঢেকে বসে আছে একটি মেয়ে, সেও হাত রাঙ্গিয়েছে মেহেদি পাতার। আর একটু পরেই রমজানের হাত ধরে সে এগিরে বাবে মসজিদের ভেতর। প্রার্থনা করবে জীবনের সুখ ও শান্তির জন্য। মালতীর নৌকা এতক্ষণে নৌদর করল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা

ইসলামতী ভট্টাচার্য

দুইই আনন্দ ও আশার কথা যে ভারত সরকার তৃতীয় সর্বসাধারণী পরিকল্পনার শেষের দিকে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালের শেষের দিকে ছয় থেকে এগার বছরের ছেলে-মেয়েদের বিনা যেতনে বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করছেন।

শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশের দুর্ব্যবহার কথা নতুন করে আর বলবার দরকার নেই। মুখ'তা প্রসূত অজ্ঞতা আমাদের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার জন্য অনেকাংশে দায়ী। এই সমস্ত উপলব্ধি করে মুখ'তার অভিলাষ থেকে জাতিকে মুক্ত করার প্রয়াস সত্যই প্রশংসাহ'।

এই প্রচেষ্টা কার্যকরী করার জন্য বধারীতি থসড়া প্রস্তুত করা ও নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা সমিতি কর্তৃক তা অনুমোদিত করাও হ'য়ে গেছে।

থসড়ার অবস্থা সমগ্র দেশের প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের জন্যই যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে তা বলা হয়নি। বলা হ'য়েছে কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকার ছয় থেকে এগার বছরের ছেলে-মেয়েদের বাধ্যতামূলক ভাবে অনুমোদিত বিদ্যালয়-সমূহে

যোগদান করতেই হবে। এবং যে সমস্ত পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক উক্ত বয়সের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাবেন না অথবা তাদের জন্য কোন কাজে নিযুক্ত করবেন তাদের আইনানুসারে দণ্ড দেওয়া হবে।

বর্তমানে যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে বেতে পারে না এই পরিকল্পনা অনুসারে তাদের মধ্যে দুই কোটি ছেলে-মেয়ে অন্তঃপর এই সুযোগ পাবে। আরও কোটি কোটি ছেলে-মেয়ে অবশ্য এখনকার মত এ সুযোগ পাতারা থেকে বঞ্চিতই থাকবে—কিন্তু আশা করা যায় ক্রমশঃ পরবর্তী পরিকল্পনা সমূহে এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হবে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্বন্ধেও থসড়ার সুনির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করা হ'য়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি আঙ্গুল পরিবর্তন করে বিদ্যালয়গুলিকে বুনিতাদী বিদ্যালয়ের পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হবে এবং শিশুদিগকে প্রথম থেকে নাগরিক হবার উপযুক্ত করে তোলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। তা ছাড়া সামাজিক শিক্ষা, হাতের কাজ এবং সমাজ-সেবা করার শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হবে, যাতে করে গোড়ার থেকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে গৃহ এবং সমাজের একটা যোগ থাকে।

থসড়ার আরও বলা হ'য়েছে যে বুনিতাদী বিদ্যালয়ের শিশুদের এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের তৈরী হাতের কাজ বিক্রয় করে শিশুদের টিফিনের এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের জাতীয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হবে।

উপজাত শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ স্বযোগ সুবিধা দেবারও ব্যবস্থা করা হবে এবং সর্বোপরি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের সুযোগ সুবিধা নেওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত গাফেলতি দেখা যায় সেই সমস্ত কারণগুলি অনুধাবন করবার জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গবেষণা করবার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবও করা হয়েছে।

প্রস্তাবসমূহ কার্যকরী করার জন্য অত্যন্তপূর্ণ করপ্রচেষ্টার প্রয়োজন, এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেরই শিক্ষা-দপ্তরের সেক্রেটারী বি: কে, জি, সইয়াদাতিনের সঙ্গে একমত করেন।

প্রাথমিক শিক্ষাটাকে এত দিন আমরা হঠবোর মধ্যেই বেন আনি নি। কোন রকমে জোড়াভালি দিয়ে চালিয়ে গিয়েছি মাত্র।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির গৃহ থেকে আরম্ভ করে পারিবারিক, আসবাবপত্র, পাঠ্যবিষয় ও পুস্তকাদি সর্বোপরি শিক্ষক-সকলের অবস্থা ব্যবস্থাই শোচনীয়।

কোন কোন বাড়ীর অসহায়কর পরিভ্রাতৃ একতলার দুটি একটি ঘর—কোখাও কোখাও আটচালা এমন কি খোলা জায়গা—গৃহস্থের বসতবাড়ীর একাংশ—এই রকম বিদ্যালয় ব'লে মনেই হয় না এমন সব জায়গার বেশীর ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়। পরিকল্পনা করে, উত্তোজ আয়োজন করে, কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয় আরম্ভ করেনি বেন—দুটি একটি, দুটি একটি করে ছেলে পড়তে পড়তে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ছেলে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেন এক একটা ঘাপ ওঠা হয়েছে এক তারপর কোন রকমে বিদ্যালয় আখ্যা নিয়ে 'ক'কে-স্ট'কড়ে টিকে আছে। অবাভাব, সহায়দৃষ্টির অভাব, দারিদ্র নেবার লোকের অভাবে অনেক প্রচেষ্টা অনুস্রেই বিনষ্ট হয়েছে। বিদ্যালয়দুঃ, পরিবেশ,

জানাবাবগর এই সব কার্যেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও আবাকরের পর্যায়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

শিশুর দেহের ও মনের স্বাস্থ্য যে বিজ্ঞানজ্ঞের গৃহ, পরিবেশ ও জানাবাবগরের শৌভনতা সৌন্দর্যের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে, একথা আমাদের মাথায়ই আসেনি কোনদিন। এবং শিশু বয়সের এই সব ষাটতির কল যে প্রাপ্তবয়সেও ভোগ করতে হয় সে কথাও আমরা জানি না অথবা ভাবতেও পারি না। আমাদের অধিকাংশের জ্ঞান নেই, মানুষের জীবনের একটি গাপ আরেকটি গাপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সযুক্ত। আমাদের বিশ্বাস এক গাপ শেষ হলে বৃষ্টি দেখাওয়েই তার ছেদ পড়ে গেল—পরবর্তী গাপের ওপর আগের গাপটির কোন প্রভাব প্রতিপত্তিই নেই।

প্রাথমিক বিজ্ঞানজ্ঞের শিক্ষকদের কথা এবার বলা বাহ্। স্ট্র কথার বলতে গেল বলতে হয় সাধ ক'রে কেউই এ পথ বেছে নেননি। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সমস্ত যে কাজে নেই কেউই তা নেয় না। জীবন বীড়ের বকনা করেছে, তাঁরাই গত্যন্তর না দেখে এ পথে নেমেছেন। তাই প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া বলতে বা বোঝার, তার কিছুই হয় না প্রায়। বীরা শিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁদেরই শিক্ষা নেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মন নেই, যোগ্যতা নেই—এক কথার আশ্রয়

বলে কিছু নেই, তাই দিনগত-পাণ্ডুর ছাড়া আর কি-ই বা হতে পেরেছে?

তা ছাড়া মানুষ, বিশেষ করে শিশু স্কুলের উপাসক—চেহারার, সামান্যজ্ঞার, ব্যবহারের, শালীনতার সহজাত প্রবৃত্তির বশে নিজের অভ্যাসসমূহেই সে স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়—স্কুলের বা সে তাই ভালবাসে। কিন্তু জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত দুঃখ-দৈন্ত-দুর্দশাপ্রাপ্ত মেহ-মনের সব মানুষ নিঃশেষিত শিক্ষকের মধ্যে সে কি পায়? তাই তাঁর কাছে শিক্ষা পাবে, বীকে ভালবাসবে, বীকে মেনে চলাবে, বীকে মনে মনে পূজা করবে তাঁকে অজ্ঞান ভাবে করতে পাবে শুধু—ক্রমাগত বিতৃষ্ণা জাগতে জাগতে একটা বিকৃতভাবই আস্তে আস্তে শিকড় গেড়ে বসে—এক অধিকাংশ লোকই যে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে শিক্ষকমাত্রকেই কুপা অমুদ্রা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে তার মূল কার্যই হচ্ছে ঐখানে। গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা মেনে চলা (ভয়ে নয় ভক্তিতে) ছোটবেলা থেকে এই ভাবে বাধ্যপ্রাপ্ত হয় বলেই বয়স বাড়লে আর কাউকেই শ্রদ্ধা সম্মান করবার মত মন থাকে না।

পরিকল্পনা কার্যকরী করার পূর্বে এই দিকে মন বিশেষ করে নজর রাখা হল, সেজন্য এত কথা লিখলাম। ইউরোপ আমেরিকা

মনের কথা

“এখন স্কুলের গহনা কোথায় গড়ালে?”
“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স
দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই,
মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে
ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও
দায়িত্ববোধে আমরা সবাই ধুঁসী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলার্স

সিগি মোনারে গহনা নির্মাতা ও রত্ন-কলকর
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



প্রকৃতি উন্নত দেশগুলিতে শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্যই বেশী যোগ্যতানুসারে শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হয়—আর আমাদের দেশে যাদের আর কোন গতি নেই তাদের হাতেই পড়ে এই গুরুতর কার্যের ভার। প্রাথমিক শিক্ষা বলতে আমরা বর্ণপরিচয়, একটু আখরু কাগের ঠ্যাং বাই হোক লিখতে শেখা আর সামান্য হিসেব কষতে পারার মত একটু অল্প শেখা এইটুকুই ধরে রেখেছি—শিক্ষার অর্থ যে কত ব্যাপক তা আমাদের ধারণা নেই বলেই আমাদের এই মারাত্মক ভুল।

তারপর আসে পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যবিষয়, উপকরণ ইত্যাদির কথা। বাংলাই আমাদের দেশের সাধারণ যে কোন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেছেন তাঁরাই দেখেছেন উপকরণ বলতে সেখানে কেবল একটি চাপচাপ নড়া, হাটটা কোনরকমে থাকতে হয় তাই থাকাগোছের ব্লাক্‌বোর্ড ছাড়া আর কিছুই নেই। অল্প উপকরণের কথা বলা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। পাঠ্যপুস্তকও একটি কি ছটি মলাটের ডা পাতা-ছেঁড়া, তেলধরা সেই মাকাতা কাল থেকে বা হ'লে আসছে সেই পাজির পাতায় লেখা বই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে—আর একটি ভাঙা প্লেট। এই ভাবে চলে এসেছে, আসছে-ও। পড়ানোর পদ্ধতি বলতে সেই বুঝ করা না ও বলানো গড়গড় করে—বোঝাবুঝির বাংলাই নেই। উদ্দেশ্য আদর্শের মধ্যে লিখতে পড়তে শেখা কোনরকমে।

নতুন পরিকল্পনায় এসব দিকেরই আমূল পরিবর্তন হবে, এ খুবই আশার কথা। গৃহের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগাযোগও স্থাপিত হবে। যা আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন উচ্চতর বিদ্যালয়েও নেই। কিন্তু এর জন্য গৃহ এবং সমাজের সংস্কারেরও প্রয়োজন। আমাদের অধিকাংশ গৃহ অজ্ঞতার অন্ধকূপ। বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয় গৃহে সংস্কারজ্ঞ পরিবারের শিক্ষা একেবারে জিরিয়ে নেয়।

নতুন পরিকল্পনায় প্রায় ৫০ কোটি টাকা স্ট্রাকচার জন্ম ব্যয়িত হবে। কিন্তু বয়স্ক শিক্ষার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অবশ্য বয়স্কদের আলাদা করে থেকে আবস্ত না করে সিনেমা, বক্তৃতা, প্রদর্শনী, অভিনয়, ম্যাজিকলঠন, সহজ ভাষায় লেখা মূলত পুস্তকের প্রচার, সমাজ-সেবক-সেবিকা নিয়োগ করে গৃহে গৃহে গিয়ে নানাবিধ জাতীয় বিষয় জানানোর নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্যও টাকা ব্যয় করা একান্ত দরকার।

শিশুদের হাতের কাজ বিক্রয় করে তাদের টিকিনের ব্যবস্থা করার কথাও হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে টিকিন দেওয়া যে একান্ত দরকার তা বাংলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট আছেন তাঁরাই জানেন। টিকিন খেতে পায় না বলে টিকিনের পরের ক্লাসগুলো বুধাই নেওয়া হয়—মন শরীর দুইই বেক বসে জ্বলম। ছাত্রদের শিক্ষকদেরও। তাই টিকিন ব্যবস্থা হ্রাসের জন্যই দরকার। কিন্তু অর্থকরী বিভা শেখার দিকটার বেশী বেশী দিলে বিপদের সম্ভাবনা শিশুদের অসুখের মনে। কঠিন কারিগরী যেনো বৃত্তি তাদের হাতে না পড়ে ওঠে সেদিকে কড়া নজর রাখা দরকার।

অভিভাবকগণ বিদ্যালয় বাবার বরসের ছেসেমেয়েদের বিদ্যালয়ে যেতে না দিলে অথবা অল্প কার্যে নিযুক্ত করলে দণ্ড পাবেন, এ ব্যবস্থাও করা হবে। অর্থাৎই অভিভাবকরা ছেসেমেয়েদের

বিদ্যালয়ে দিতে পারেন না এবং সেই একই কারণে তাদের কাজ করবার বয়স না হলেও কাজ করতে যেন। তাছাড়া সাধারণ লোকে এও জানে, অর্থাৎভাবে বেশী লেখাপড়া শেখানো বখান সম্ভব হবে না তখন ছোটবেলা থেকে কাজ শেখানোই যুক্তিযুক্ত। দরিদ্র দেশে যে জানাটা থাকা একান্ত প্রয়োজন সেই পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞানের অভাবের জন্যও অনেক শিশুর সংখ্যাখ্যা পিতামাতাকে তাদের প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার পক্ষে ছুনিবার বাধা হয়ে পড়ায়।

সবশেষে বলব তাঁদের কথা, বাংলা বিদ্যালয় পরিচালনা কয়েকন। অর্থাৎ ম্যানেজিং কমিটি। অধিকাংশ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সমস্তরা এবং স্কুলের সেক্রেটারীও অনেকক্ষেত্রে শিক্ষাবিদহীন। তাঁদের হাতে শিক্ষানিরূপণের ভার থাকা কোন দিক দিয়েই যুক্তিযুক্ত নয়। পরিকল্পনামুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করবার প্রয়াসের প্রথমই সরকারকে এদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য অনুরোধ করা আবশ্যিক।

স্বীকৃতি

সাধনা মুখোপাধ্যায়

কিছুই বাবে না সঙ্গে
অশ্রু-হাসির সঙ্গে,
যে মালা গেঁথেছি
যে মালা পরেছি,
প্রতিদিন এই সঙ্গে।
কিছুই বাবে না জানি যে
আকাশের আসমানী যে,
গেঁথেছিল নীল,
খুশি অনাবিল,
সাতনরী হারখানি যে।
যিরে রাখা বুক
ছোট ছোট মুখ,
কল্লার বরা মুক্ত,
নিঃশেষ হয়ে
মূল্যের কথার,
হবে অন্তর্ভুক্ত।

তাইতো চাই না রাখতে,
বিবিধ কথার
দিয়ে উপচার,
যে ছবি চেয়েছি আঁকতে।

শুধু ভরা আছে হৃদয় আশায়
লিখে রেখে বাব গানের ভাবায়,
যে দিন ছাড়িয়ে এসেছি।

তারি তীক্ষ্ণ থেকে এইটুকু বেছে
বিগত কালনে যে লগ গেছে,
তাকে কোন দিন স্বার্থবহীন
সত্যি ভালোবেসেছি।

রান্না ও কান্না শোভারানী হালদার

ভবিষ্যৎ-এর গর্ভে এমন এক বিষয়কর **আলাদীন-বুদু'-এর** অবস্থিতি অসম্ভব নয় যে-যুগ হয়ত **বড়ি-বুদু** (Tablet Age) নামেই বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। সকালে খান চা বা কফির বড়ি। সন্ধ্যা এক আউল জল। একটু বাবে বান সেয়ে এসে শিশি থেকে বার করে নিন ভাতের বড়ি—সন্ধ্যা দিন ডাল বা মাছ-মাংসের বড়ি। এক আউল জল। খাদ? হা তগবান! তবু ভরসা দিয়ে রাখি, পোটা কয়েক উৎসাহ খাতের খাদ নিয়ে জুত আপনার ভিহ্বার নিয় বা উৎসেধ পর্যন্ত ছুটে আসবে—বাসু! বৈকালীন কল বা দুধ এবং রাত্রের লুচি পোলাও'-এর জন্ত ঐ একই ধাঁচের সরকারী ব্যবস্থা। রান্নাঘর ও বাঁধুনির নিশ্চয়ই প্রয়োজন ফুরাবে—হোটেল, রেষ্টুরাঁগুলো খুলবে বড়ির রেশন-শপ। বড়ি গেলা এবং গলাবাজী করার যুগ সেটা। তখনকার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হয়ত মজুরা-সভ্যতার ইতিহাস লিখতে বসে মজবু করবেন—অগ্নি আবিষ্কারের কিছু পরে এই অর্ধ-সভ্য মজুরারা নানাবিধ গাছ ও তাত কলগুলিকে মশলা দিয়ে সিদ্ধ এবং তেল দিয়ে ভাজা করে খেতে ভালবাসতো। খুব সম্ভব, বাক্স-যুগের প্রভাব এদের ওপর বেশ কিছুকাল সক্রিয় ছিল। এরা এক একজন এক সের পাচপো চাল সিদ্ধ করে ডাল তরকারী-সহ অমারাসে আহার করতো—রন্ধন আশ্রয় এক লক্ষাধিক খাতবড়ি ওকনের সমতুল্য। মছ-মাংসের সম্পর্কে ঐ ভোজনের পরিমাণ অনেক হলে প্রায় ষোল হওয়ার সবাবও পাওয়া যায়। তাদের পেটগুলি বেশ বড়-বড় হ'ত। তাদের পেটের পীড়া সেগেই ছিল। তখনকার চিকিৎসকেরা সপ্তাহে সাতদিনই তাদের জোলাপ-বড়ি ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। সে এক ভয়াবহ ওলট-পালটের যুগ!

কিন্তু আজও এখন সে-যুগ ভবিষ্যৎ-এর গর্ভে তখন বর্তমানকে নিয়েই আমাদের চলেতে হবে এবং বর্তমান-যুগের যুগধর্মও অবশ্য পালনীয়। রান্নাঘর, রন্ধন সাহায্যী এবং উত্তম বাঁধুনিও প্রয়োজন আছে। মধ্যবিত্ত ব'রে ঠাকুর-বায়ন বেধে বাঁধার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সেখানে গৃহধর্মগাই সে-কাজ করে থাকেন এবং সেটাই তাঁদের সর্বপ্রধান কাজ এবং কর্তব্যও। কিন্তু আজকাল তাঁরা এটাকে সর্বপ্রধান কাজ বলে স্বীকার করতে নারাজ। রন্ধন কাজটার ওপর একটা মিথ্যা হীনতার আচ্ছাদন টেনে দিতে পারলেই তাঁরা বেন বেশ খুশী হন।

বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বা মন্তব্য করেন যে, অভ্যর্থিক পুরুষাণী শিক্ষা পেয়েই মেয়েদের এই প্রতিগতি হয়েছে। নরনার্থ সাখে কঠোরতার মিশ্রণে তাদের মনোভাব বিকৃত হতে চলেছে। তাঁরা আজকাল গৃহস্বামীরূপে গৃহে প্রবেশ করেন না—গৃহসরস্বতীরূপে শুধু সন্সারে শোভাময় হয়ে থাকতে চান। এবং তার কলেই নাকি রন্ধন-বিভাগ বা রন্ধন-আট সন্সার থেকে বিদায় নিতে বসেছে। উক্ত মন্তব্য কতদূর সত্য তা অবশ্য গবেষণা সাপেক্ষ। তবে এইটুকু বলা যায় যে মেয়েরা আজকাল রন্ধনকার্যে কম-উৎসাহী। এই সেদিনও মেয়েদের মনোভাব ছিল যে স্বামী, স্বভাব, শাভুড়ী প্রভৃতি ওকনদের নিজেদের হাতে মুখোচক খাবার তৈরী করে খাওয়াই এবং

পুষ্কারঘরপ তাঁদের প্রশংসামিলিত ভালবাসা একা একা আত্মসম্ব করে তাঁরাও এক অপূর্ণ পুলক ও গর্ভী অল্পভব করতেন মনে মনে। অতি সাধারণ উপাধান নিয়ে তেলমশলার কল-কৌশলের ভেতর দিয়ে কে কত সুন্দর ও সুখোচক ভোজ্যদ্রব্য তৈরী করতে পারে, তার একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সমাজে। সুখাত রন্ধনকারীর স্বর্থেই সমানও ছিল গৃহে গৃহে। তাঁদের সুন্দর আন্ধাজ জ্ঞানও উল্লেখযোগ্য। কাজের বাড়ীতে কত লোকের জন্ত কত কত জিনিষ লাগতে পারে তার জন্ত তাঁদের সমসামনে ভেঁকে আনা হতো। ভাত-ভাত থেকে কালিয়া—কোর্দা—এমন কি, নানাবিধ মিষ্টান্ন তৈরীর ব্যাপারে তাঁদের অকুত দক্ষতা ছিল। আর এখন?

অধিকাংশ আধুনিক নবগতা গৃহধর্মী তরকারী কুটেই জানেন না—মাহ কোটা তো দূরের কথা। বোল, ডালনা, বট, জবল প্রভৃতির জন্ত যে বিভিন্ন-ধরণের কুটনো কোটার প্রয়োজন তা তাঁদের কাছে একটা অবাক ঘটনা। কলে চকড়ীর আলু ঝোলে দিয়ে বা বোলের আলু চকড়ীতে ঢেলে এক অকুত তরকারী যুগান্তরকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেন। সংসারে বৃদ্ধা কেউ থাকলে তবেই রন্ধে। তাঁর ওপর কুটনো কোটার কাজটা পড়ে। কই, টাংরা, সিজি মাগুর প্রভৃতি জানল তো রক্তারক্তি সহ কান্নাকাটি এবং শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকডাকি। ঘন ঘন ওদের আগমন হতে থাকলে বাপের বাড়ীর ডাক পড়াও চোখে পড়েছে! পুটি, মৌরলা জানলে কোটার অদক্ষতার জন্ত কর্তার নজর খায়াপ বা নীচ নজর রটে রান্নাঘরে। তরকারীর দিক থেকেও বাছচিার কম নয়। পেঁপে চক্রে না, ডুমুর অখাত, মোচা গো-খাত, খোঁড় ভোটলোক খায়, কচু গলা ধরে, ওলে চন্দ্ররোগ হয়, পুইশাক টেঁড়স লালালাল বিজ্ঞ। বড় বড় ননীতাল আলু, ফুলকপি, বেগুন, কাটা-পোনা, কাটা ইলিশ ইত্যাদি নিত্য যোগাতে পারলে এঁদের কাছে উঁচু নজরের সমান মেলে।

প্রায়ই দেখা যায়, আধুনিক মহিলারা তরকারী সুবাহ করবার জন্ত এক অকুত প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হন—অর্থাৎ, প্রচুর পরিমাণে তেল যি মশলা পেরোজ রন্ধন ব্যবহার করেন। তাঁদের ধারণা, বত বেশী ঐগুলি প্রয়োগ করা যায়, তরকারী তত বেশী সুবাহ হয়। কিন্তু তাতে করে তাঁদের উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়ই না উপরন্তু অথল ও পেটের নানাবিধ পীড়ায় শেষে শুধু সিদ্ধ খাওয়ার পরামর্শ আসে ডাক্তারদের কাছ থেকে।

কোন তরকারীতে কতটা তেল থাকবে না থাকবে সেই বুঝে জল চালা রান্নায় আর একটা অজ্ঞতম দিক। কত মূল্যবান দিলে ঐ জলের সঙ্গে খাপ খেয়ে বাবে এবং তরকারীটা সুবাহ হয়ে উঠবে, সেইটাই বোধ হয় রান্নার প্রধান আর্ট। কোল কম হলে ডালনা, তুকিয়ে কেসলে চকড়ী বা বট, গারে গারে থাকলে কালিয়া এই সব হচ্ছে আধুনিকায়ের খিওরী। এখনও অনেক বৃদ্ধ মহিলারা সামান্য তেল মশলার এমন সুন্দর রান্না করেন যে খেয়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাঁরা বলেন, ঠিকমত মূল্যবান-জল দেওয়ার কায়দাটাই আসল কায়দা। ওটা নাকি তখন পড়ে হয় না। হাতে নাতে শিখতে হয়। এই প্রশংসে হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গেল। কোন ঘরে শাভুড়ী কিছু ঝোলের বেগুন কুটে নববধূকে সেগুলি ঝোলে কেসে দিয়ে আসতে বলেন। বটু বেগুনগুলি ঝোলে

দিয়ে দেখে যে তারা ভেসে রয়েছে—অন্ত তরকারীর মত ডুবে যাচ্ছে না। বধু নিজেকে সোহী মনে করে বাঁচি-বাঁচি জল কড়ায় ঢালতে শুরু করে। জল কড়া ছাপিয়ে পড়া সম্বন্ধে যখন বেগুনগুলি কিছুতেই ভোবে না, তখন বধুটি ভয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়। এমন সময় শাওড়ী সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন—এক কড়া জল, বেগুন ভাসছে, উমুন জলে প্রায় নিবে এসেছে। শাওড়ী বুঝতে পারলেন বধুর অজ্ঞতা। একটু বাগের বাড়ীর খোঁটা দিলেন বটে কিন্তু জিনিষটা বুঝিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, এই ধরনের অনেক বধুই আমাদের মধ্যেই এ যুগে নাইলনের শাড়ী পরে ফুরফুর করে ঘোরাফেরা করছেন আশেপাশে। রান্না করতে করতে তাঁরা অবশ্য কাঁদেন না। আজকাল কিন্তু অপরকে

কাঁদান হামেশাই। রান্না খেয়ে কাঁদা গেল—এ অভিযোগ গ্রাহ্য হবে বার।

এখানে বক্তব্য, কেন এমন হবে? মেয়েদিগকে বিজ্ঞাচর্চায় এত বেশী মগ্ন থাকতে হয় না। বার জন্তে তাঁরা এদিকে কিছুটা সময় না দিতে পারেন। ছেলেরা পড়াশুনাও করে এবং আরও অনেক কিছু করে। আজকাল নাচ গান বাজনা শেখার দিকে মেয়েদের আগ্রহ দেখা যায়। মধ্যবিত্ত সংসারে ওসবের খুব মূল্য আছে বলে তাদের মনে করেন না। স্রষ্টা এবং মনোহুঙ্কর পরিবেশ বজায় রাখতে হলে স্রষ্টার রান্না শেখা মেয়েদের পক্ষে একটা মস্ত বড় সুশিক্ষা এবং সংশিক্ষা। সেলাই কাঁড়াই তার পরে। মেয়েমহল এবিধে জালাদিত হওয়া উচিত।

হেমন্ত-শেষে

স্মৃতি বোঝাল

হেমন্তের ছিন্নপত্র কাঁপে খর খর
হুটা হুটা ধূলি ওড়ে তুচ্ছ আলোড়নে—
অকাজের ঠিকালীতে কি কবি কি কবি
অলস কুরাশা জমে কোঠরের মনে।

মহুর মতিব হুঁটি বুম বুম চোখে
উদ্বেগবহীন যেন চলে কি না চলে :—
হিজলের ডালে দিয়ে হঠাৎ চমক
মাছরাঙা নেমে এল হিম্বি জলে।

ছায়া ছায়া ঢেকে আসে আকাশ পৃথিবী,
নীলতরু অলস ছোঁয়া এখন গেল কি?

প্রমাণ

মাধবী সেনগুপ্ত

জীবনের প্রান্তে আজ দেখি পিছু ফেরে
বার তরে সাংগ হল জীবনের গান,
বরণ করিলে বারে আবাহনী গেয়ে
সে কী আজ উপযুক্ত দিয়েছে সম্মান?

হৃদয়ের বত সুর ছিল বত কথা,
সাংগে হলে তবু থাকে স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
যে প্রেম তাহার দান তারই কিছু আলো,
অবশেষে হৃদয়ের শূন্যতা ভরাণো।

তার প্রেম অমলিন অফুরন্ত দান,
ভরাট হৃদয় তার স্নান প্রমাণ।

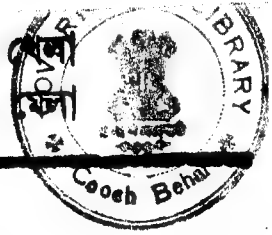
প্রত্যয়

অমৃতা দেবী

কখন যে বেলা গেল, যাদের কানাকানি
বন্ধ হল। একটি হুঁটি তারা
সন্ধ্যারান্তের বিজন অবসরে
অন্তরনে দূর আকাশের নীতি
নূপুর বাজায় : গুনছি বারে বারে।

যে কেরার তাড়া অনেক, বিবশ আমার মন
স্নান চরণ ছায়া কেসে, মেঘের পদধ্বনি
রাজি নামে আমার দিগে
আমার দিগে নামে,
হৃদয় বলে কুমি আছে : আমার যথার্থ।

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-হৃদে আজি, —হাসি খুসির ফিলা



মিষ্টি মুখের জগত জোড়া সুমিষ্ট আবেশ

মিষ্টি সুরে উঠছে বেজে

আনন্দ সন্দেশ

কোলে

লজেন্স

ও

ঢাকী

সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুট এর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

শি শি র=সানি ধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

নিজের সম্বন্ধে বললেন—গিরিশ বাবুর চেয়ে আমি বেশি দিন অভিনয় করেছি। সেই ১৯৫৬ পর্বত—৪৮ বছর। প্রথম ক'বছর ইনস্টিটিউটে, তার পর পাবলিক থেয়ে।

এখনও করতে পারি। একটা পানপীঠ দাও। বাইরে যেতে হলে একটা দল ত চাই। দু মাস অস্তর একটা নতুন বই ধরব, রিহাস্যাল দেব, ভূতনাথকে ধমকাবো।

ভূতনাথ প্রথমে 'সিন' উইস থেকে কীক করে লাগাত তারপর আন্তে আন্তে সরিয়ে নিয়ে উইংসের সঙ্গে লাগিয়ে নিত। ওর ধারণা ছিল উইংসের সঙ্গে কাগিয়ে দিলেই সব চেয়ে ভাল হয়। আবার ধমক দিলেই সরিয়ে নিত। হঠাৎ কথা বললেন, সেবুহাৎ বললেন—সেবু, তুমি যদি ভাবো ওরা আমার ক্ষোভের যেতে ডাকবে ত ভুল করবে। সাদা চামড়ার কায়ের সঙ্গে আমার ভাব নেই; ওরা কেউ আমার বন্ধু নয়।

পশ্চিমের দেশে ত আমাদের দেশের সভ্যতাকেই স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা বলতে বোঝে পশ্চিমী সভ্যতা। তবে ওদের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে রাশিয়ানদের ধারণা একটু ভাল হতে পারে, কারণ—ওদের শরীরে মুসলমান রক্ত (৭ তারার) একটু বেশী পরিমাণে আছে ত। কথায় কথায় একজন বললেন—ঠেকে গঙ্গাবতরণ দেখার প্রথম ঠায়ে। বললেন—গঙ্গাবতরণ প্রথম ঠায়ে দেখাবে কেন, প্রথম দেখার পার্শ্ব থিয়েটারে। রবি বখার ছবির মত গাটাগোটা এক মহাদেব বিরাট জটা এলিয়ে এসে পীড়াত ঠেজের মধ্যে আর উপর থেকে মাথার ওপর ছব-ছব করে জল পড়ত। জল জটা বেয়ে ঠেজের ফুটো দিয়ে নিচে চলে যেত, আর ওপর থেকে আবার জল পড়ত।

থিয়েটারের একটা বার্ড থাকলে অনেক ভাল ভাল লোককে ডেকে আনতে হয়। দু-চারজন ঐতিহাসিক (মানে বাঙ্গের মাথায় কিছু আছে), দু-চারজন অস্ত্র ধরনের পণ্ডিত লোকে। তার জন্ত তাঁদের এক কাশ চা দিতে হবে; কোনদিন ছাটা সিজাড়া, কোনদিন বা ছুটি মুড়ি—মানে কিছু খাটা করতে হবে। তাঁরা রিহাস্যাল দেখবেন, নাটক দেখবেন; ভাল লাগলে দুচার কথা বলবেন।

আজ্ঞে-বাজ্ঞে বই চৈ ১৮ করে চলে। কেন? না, মর্শকথা নেয়, তাইত। কিছু ভাল কিছু করতে গেলে মর্শক তৈরী করা চাইত। সেই অজ্ঞেই ও ঐদব পণ্ডিত আর জানী লোকদের সঙ্গে থিয়েটারের যোগ রাখা দরকার।

আমার নাটক দেখে দু-চারজন যে মন্তব্য করেননি তা নয়। অবন বাবু আমার সীতা দেখে বললেন—অবোধার সব কিছু গপধপে সাদা হওয়া উচিত বলে মনে হয় আমার।

একজন বললেন—উনি বোধ হয় রঙীন আলো বেশার কথা ভেবে বলেছিলেন।

বললেন—বল ত তাই না হয় মানলুম, কিন্তু আলো কেলত কে?

সতু যে শিখে এসেছিল, কি কাজে লাগলো? আমাদের দেশে আলোর imaginative use ত কই দেখি না? ওদের দেশে দশ ডলার তপ্তায় মাইনে নিয়ে কাজে লেগে শিখে আসা উচিত, নইলে ওরা ত দেখাবে না। আমি নিউইয়র্কে এক জায়গায় দেখলুম, ধুলো ওড়ার দৃশ্য দেখাচ্ছে, সত্যিকারের ধুলো উড়ছে বেন। বললুম—কি করে করছ দেখিয়ে দাও ত।

বললেন—I will tell you later on. কিন্তু আর বললে না।

অন্ত প্রসঙ্গে ফিরলেন—অপরেণ বাবুর কর্ণাজু নই পাশী মহাভারতের ওপর নির্ভর করে লেখা। জায়গায় জায়গায় ছবছ অল্পকরণ। ওদের যে কাহনায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখানো হত কর্ণাজু নেও এও তাই। বুধকেতুর মাথা কাটাটাও গ্রিক ওদের মত করেই দেখানো হত। এমন scene এর পর scene মিলে যায়।

কর্ণাজু নেতে আমি হুবার নেবেছি। তখন আমার টাকার খুব দরকার তাই করি। প্রত্যেকদিন তেরো'শ করে টাকা দিয়েছিল, করব না কেন? অপরেণ বাবুর খুব ইচ্ছা ছিল, আমি ঠর বইতে পাঠ করি।

একজন বললেন—ওতেও সংস্কৃতও আবৃত্তি করেছিলেন।

বললেন—হ্যাঁ, তা করেছিলুম, কিন্তু বখন বা মনে হয়েছে বলেছি। নতুন কি দিচ্ছে? আমার শম্মদনি দেখেছে কেউ? ওতে যে বৃষ্টি পড়া ছিল, তার চেয়ে ভাল বৃষ্টি পড়া দেখিয়েছে কেউ?

একজন ভাল নাট্যকার চাই—বিদেশী নাটকের সঙ্গে বার পরিচয় থাকবে না। বিদেশী নাটকের সঙ্গে পরিচয় থাকলে অল্পকরণ করে বসবে। গিরিশ বাবুর ত ভাল করেই জানা ছিল। ধর কীরোর বাবুর মত। না, ভুল করলুম, গ্রিক বলা হ'ল না। ঠরও খান কতক সেক্সপীয়রের বই পড়া ছিল, আর বেশ ভাল করেই পড়া ছিল। তখন বোধ হয় বি কোর্সেও ইংরেজী পড়তে হত।

১ই অক্টোবর বখন এলেন তখন মনে হল অসুস্থ। প্রের করাতে বললেন—শরীর ত আমার ভালই ছিল, কিন্তু সেই যে তোমরা সন্দেশ খাওয়ালে না তারপর থেকে বোজাই সন্দেশ আসতে লাগলো, আর লোভের বলে খেয়েও বসলুম। অমল পাঠিয়েছিল চকোলেট কেক, ওটা আবার আমি খেতে ভালবাসি বলে pretend করি, কাজেই চায় পাচ টুকরো খেয়ে বসে আছি। তার ফলে লিভার ফুলে পেটে ব্যাথা হয়েছে।

বলা হল, বোধ হয় হেপাটাইটিস হয়েছে আপনার।

হেসে বললেন—হেপাটাইটিস ত ছিলই। কথাটা'ত গ্রীক, লিভার বখন আছে আর তার ওপর বা অন্যান্য কারণে হয়েছে তাতে খারাপ হওয়াটা'ত আশ্চর্য কথা নয়।

আমার বখন থিয়েটার ছিল তখন বড়দিনের সময় বরাদ্দ ছিল ৪টি করে কমলালেবু আর দুটো করে কেক। তবে ভগবানের দয়ায় আর পরমা আমদানী থাকায় কখনো গুণে খেতে হয়নি,

বার বঁটা ইচ্ছে খেত। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর দাশা, অমল বললেন—তোমাদের যেন কি রকম! ভাল ভীষনাগের সঙ্গেশ কিনে এনে খেলেই ত পাবে।

আমি ভাত্তে বললুম—ক্রীসমাসের সময় কেকই ত খেতে হয়।

ক্রীসের বাবু নাটক লিখতেনও ভাল, বুঝতেনও ভাল, কিন্তু জিনিয়াই পরিবৃত থাকতেই গোলমাল হল। নর-নারায়ণে দুর্বল লেখা খুব কমই আছে। যেটুকু আছে তাও ঐ ছাপা বইয়েতেই।

নর-নারায়ণের ভূমিকায় লেখা আছে, ক্রীসোদমা নিজেই বইটা লিখেছেন। কি বলব বল, নিজের কথা বলতে লজ্জা করে। কি বগড়া ক্রীসোদমার সঙ্গে বই নিয়ে।

বললেন—আমি বই লিখে অল্প থিয়েটারে অভিনয় করতে দিতে পারি। নর-নারায়ণ লেখার সময়কার কথা বলতে পারি, কেউ যদি “রাধের” বইটা জোগাড় করতে পার। বাঁকুড়া না বীরভূম কোথাকার এক কাগজে ১৯২৩-২৪ সালে বেরিয়েছিল।

একজন বললেন—নির্মলশিব বাবুর কাগজে বেরিয়েছিল।

বললেন—তা হতে পারে। নির্মলশিব বাবু ত বুদ্ধিমান লোক ছিল।

ডাঃ অধিকারী এই সময়ে এসে ঢুকলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানলেন—এই যে রাম, এস এস। তোমার কিছু বুঝি হয়েছে দেখছি।

এবার একজন কথা তুললেন—মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নিলে চলবে কি না।

বললেন—চলবে না কেন? তবে লিজ তো পাবে না। মাড়োয়াগীর ব্যাপার ত।

বলা হল, ওখানে হিন্দী-থিয়েটার হচ্ছে।

বললেন—করাবে না কেন? এককালে ওরা খুব বাঙলা বই দেখত। আজকাল রাজনৈতিক কারণে হিন্দীর ওপর বোঁক দিয়েছে। বলা হল, হিন্দী-থিয়েটারে মাইনে বেশী দেয়। মুনলাইট থিয়েটারে সীতা দেবী দেড় হাজার টাকা মাইনে পান। বললেন—ও আর এমন কি বেশী পাচ্ছে। সীতা বধন আমার থিয়েটারে কাজ করতে এল হিন্দী-থিয়েটারে ও তখনই সত্তরোশ টাকা মাইনে পায়। আর গহ্বর—যার বস্ত্রহরণ দেখে পরে নীহারের বস্ত্রহরণ হল—পার্শী থিয়েটারে কাজ করার সময় সেকালেই সব মিলিয়ে ছ হাজার টাকা পেতো।

এবার কটা শো দেবার কথা বললেন—ইনষ্টিটিউটে নাটক করলে কি বিক্রী হবে? ঠিক করেছি, মানে একটু বাধা আছে, সেটা কেটে গেলেই চারটে অভিনয় করবো। কিন্তু কি করবো বল তো চারটে পুরোনো বই করব না নতুন বই একটা ধরব। মর্শ্চক্য বসে অভিনয় দেখলে দেখতে পাবে না কেন? এই ত রবীন্দ্র ভারতীর কুড়ি কুট ট্রেকে অভিনয় করে এলুম, সবাই ত দেখতে পেলো।

নাটক পড়তে হুকু করলেন। খানিকটা পড়ার পর বললেন—নাটকের এই অংশটা খুবই স্বন্দর। তবে পড়ে সমস্ত সৌন্দর্যটা বোঝানো যায় না, উঠে নড়ে চড়ে বলতে হয়। কিন্তু এখন ত তা পারবো না, লব পার্ট করবার দম পাবো না।

দুটটা শেব করে বললেন—কেনন timely শেব হয়েছে দেখ

দুটটা। শেব কথাগুলো না বললেও চলতো। অবশ্য এরকম ইংরেজীতেও আছে। Pinero'র বই এতেও এই রকম tune ending আছে।

ইনষ্টিটিউটের আবৃত্তির প্রাইজ না পাওয়ার জন্যে আমার দুঃখ আছে। প্রথমবার ইংরেজী, বাঙলা দুটোতেই কাঁট হয়েছিল। পরের বার ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কৃত তিনটিতেই কাঁট হুকুম। কিন্তু বিনয়বাবু বধন কাথা কাথা আবৃত্তি করবে সেই নাম পড়ছিলেন, তখন আমার নাম পড়ে বললেন—না শিশির, তুমি নয়। ইংরেজীতে কাধাবও তাই বললেন।

আমাদের সময় ইনষ্টিটিউট খুব ভয়ঙ্করটা ছিল। ১৭১৩ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ইনষ্টিটিউট সবচেয়ে ভাল চলেছিল। সে সময় আবৃত্তি প্রতিযোগিতার অনেক ভাল ভাল লোক হতেন বিচারক। শোপ পঞ্চাননও হয়েছেন। শাস্ত্রী মশায় হলে খুব বগড়া করতেন। গলার আগোজ পেছন দেখেছি কি আর সত্যেন্দ্রনাথ (ঠাকুর) খুব ভাল আবৃত্তি করতেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক ভাল। আর কি উৎসাহ, ধবর পেলেই আবৃত্তি শুনেতে আসতেন। একাধী বছর বয়েসে মারা গেলেন, তার হুবহুর আগের আবৃত্তি করতে করতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য নব্বই পেরোন নি। সেদিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী গেছেন, বোধহয় থাকে তোমরা মর্শ্চক্য বল—অষ্টাধী বছর।

প্রতাপচন্দ্র আবৃত্তি ভালই করতেন, উনি জন্ম হয়েছেন আমাদের পরে। কেশব বাবুর আবৃত্তি শুনি নি, বিনয় সেনের কাছে গল্প শুনেছি।

বিনয়বাবু আমাদের সখ্যে কতকগুলো ধারাপ ধরনের ধারপা নিয়ে এসেছিলেন। বললেন,—ঠ্যা মশায়, আপনাদের সখ্যে অমুকে অমুক কথা বললে—কথাটা মিথ্যে কথা। তাহলে ত তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

উনি বুঝলেন না যে, আমাদের মত ছেলেরা যেমন সত্যি কথা বলে, তেমনই দয়াকর হলে মিথ্যে কথা বলতেও তাদের আটকার না। তাঁকে মিথ্যে কথা বলার ক্ষমতা সন্নিহিত আছি। পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথায় কথায় বললেন—গিরীনের ধবর কি? মাঝে ত অমুখ করে হাসপাতালে ছিল। এটাজীতেই ত আছে। বাব একমিনি দেখা করতো। সত্যি গিরীন সেন বড় ভাল লোক। নয়েন সেন, এটর্নী অফিসের মালিকও। ওর অনেক টাকা বড়বাই আটকে দিলে। কিন্তু কষ্টে পড়েছি বলে ওর কাছে গিয়ে ঝড়ালে কাউকে ও কোনদিন ফেরানি। হাতে যদি একটা টাকা থাকে ত কেউ গিয়ে কেসে পড়লেই গিয়ে দেবে। অভিনেতাদের অনেককে অনেক টাকা দিয়েছে। দশ হাজার টাকা ছাওনাটে দিয়ে বহু বলে নাগিশ করলে না। তবে ভিকে দেড় লাখ টাকা দিয়েছিল, তার জন্যে নাগিশ করলে না কেন, বুঝি না। দেড় লাখ টাকা ছেড়ে দেবার মত অবস্থা ওর নয়। ওইটাই বোধ হয় ওর হুবাবি।

বিনয়বা বললেন—নরনারায়ণ আপনি অভিনয় না করলে জমবে না। বললেন—বিনয়, কথাটা তোমার ঠিক নয়। নাটক যদি বোঝে আর চোঁটা যদি থাকে যে কেউ হোক পারবে। তাহাঁড়া আমিও ত আছি, শিখিরে দিলে পারবে না কেন? আমি থিয়েটারের মত ৩০×৪০ ফুট জায়গাই দাও না দেখি।

আধুনিক ইংরেজী নাট্যকারদের কার লেখা খুব ভাল বলত ? অবশ্য সিজের কথা বাদ দাও। রবার্টসনের লেখার নতুনত্ব কই ? বেশির ভাগই তেজেজ। শ'র পরে ধারা লেখেন—ককটেল পার্টি, কনকি:ডলিয়ার্স ক্লাব লিখেছেন টি-এস-ইলিয়ট ; সেপারেট টেবলস লিখেছেন, টেবল ব্যাটগান তাছাড়া ক্রাই—এঁদের লেখার মধ্যে গুণটা কি আছে ? দ্বিবিজয়ী বা শত্ৰুঘনিও ত খুব ভাল বই, ওদের তুলনায় ত বটেই। আবি থিরেটারের জন্তেই আইরিশ নাটক ভাল হয়েছিল। গুণ জন্তে টাকা খরচ করেছিলেন মিস্ হর্নিমান। কিন্তু তার আগে অবশ্য লেডী গ্রেগরী খুব খেটেছিলেন। প্রথম প্রথম টাকা পরদাও দিয়েছিলেন তিনি।

নর-নারায়ণের লেখা বইটার অবস্থা খুবই ধারাপ। বাড়িতে এত করে বলছি, একটা কপি করতে তা আর কিছুতেই করছে না। জামো একটা কথা ছিল, কোথায় যে গেছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জামোল কথা কি জান, যে কাজ আমরা করি তার গুণর আমাদের কোন প্রভা নেই, তাই এমনিই যটে।

৮

এতদিন পর্যন্ত যে সব নাট্যকারের নাটক তিনি পড়েছিলেন তাঁরা নাট্যকার হিসাবে তাঁর অগ্রবর্তী অর্থাৎ নাটক লেখা এবং নাট্যকার হিসাবে নাম তাঁরা শিশিরকুমার অভিনয় করতে আরম্ভ করার আগেই করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি এমন একজন নাট্যকারের নাটক পড়লেন ধীর নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িত।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সীতা নাটক লেখেন হয়ে পড়ে। কারণ পূর্ব-বিস্তৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত সীতা শিশিরকুমার অভিনয় করতে পারেন নি। তাঁর বিজ্ঞানপন্থীরা কৌশলে সীতার অভিনয় স্বত্ব কিনে নেন। নাটকটির অভিনয় করার কোনরকম সমিচ্ছাই ক্ষেত্রদের ছিল না, এ শুধু নিজের নাক কেটে পরের বাত্না ভঙ্গ।

শিশিরকুমারেরও গৌ ছিল ভয়ানক। তিনি ঠিক করলেন সীতা তিনি অভিনয় করবেনই। তাই যোগেশচন্দ্রকে দিয়ে নতুন করে সীতা লেখালেন। সে নাটকের অভিনয় বেশে আলোড়ন তুলল কিন্তু বিজ্ঞানের মত হল, নাটকটির কোন গুণ নেই। তার ফলে নাটকের সুনাম হল কিন্তু নাট্যকারের সুনাম হ'ল না বিশেষ।

পরবর্তী জীবনে অনেকগুলি সামাজিক নাটক লেখেন যোগেশচন্দ্র আর কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের নাট্যরূপও দেন তিনি। এছাড়া বহু নাটকের কঠিন চরিত্রে অভিনয়ও করতেন তিনি। এইটুকুই দ্বারা জানতাম আমরা।

শিশিরকুমারের দুখেই যোগেশচন্দ্রের একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নাটকের ধবর শেলান, নাটকটি নাকি খুবই ভাল। স্বির হ'ল ১৬ই অক্টোবর এসে দ্বিবিজয়ী পড়বেন।

সেদিন বখন এসেন মনে হ'ল অত্যন্ত ক্লান্ত, সে কথা বলতে বললেন—শরীর আমার ভালই ছিল আবার দুর্বল হয়ে পড়েছি, একটু ক্লান্তি অনুভব করছি। তারপর আমাদের একজনকে বললেন—ভালো, বলতে পার ক্লান্তি দূর করার মত কোন ওষুধ আছে কিনা ? অবশ্য মদ নয় ; মদেব নেশার ক্লান্তি দূর হয় না, একটু মদেব জন্তে উপকার হয় মাত্র, তারপরই একই অবস্থা হয়ে

পাড়ায়। ঐ যে লেখক—জালডুস হাজলি—কি ওষুধের নাম করেছেন যেন ?

বলা হ'ল—মেকালিন। উৎসাহভরে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেকালিন। ও ত সিদ্ধিপাতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সিদ্ধি খেলে বোধহয় একটু ক্লান্তি দূর হয়। আফি: খেলেও হয় বোধহয়।

আমি একবার খেয়েছিলুম। whole night performance শেষ হবার আগেই শরীর আর বইছে না ; তা যোগেশনা বললেন—যদি রাগ না কর ত তোমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি। বললাম—দিন।

তা ঠিক আফি:এর বড গুলিকে তিন ভাগ করে ছুটো আমরা খেতে দিলেন। খেয়ে উপকার হয়েছিল, কিন্তু তারপরের দিন খুব ঘুমিয়েছি।

দ্বিবিজয়ী পড়তে শুরু করার আগে বললেন—দ্বিবিজয়ীর কথা হল—একজন যদি ক্রমতা পায় ত তার মনে একটা মন্ততা আসে তা সে যে অবস্থা থেকেই আসুক না কেন এবং শেষ পর্যন্ত তার ফল ভাল হয়না মোটেই।

এবার নাটকটা সম্বন্ধে বললেন—নাটকটা অভিনয় হয় ১১২৮ সালে, কিন্তু লেখা শুরু হয় ১১২১ সালে। আমি তখন মদন কোম্পানীতে চাকরী করি, ওরা একটা blood and thunder নাটক চেয়েছিল ; সেই জন্তেই লেখা নাটকটা। তিন সাড়ে তিন ঘণ্টার নাটক অথচ মোটে ৬টি দৃশ্য। এত কম দৃশ্যে নাটক এর আগে বোধহয় লেখা হয়নি। সম্বন্ধের একটা একদৃশ্যের নাটক আছে, নাম বোধহয় মুক্তিয ডাকই হবে। হরিদাস বাবু বলতেন—বৈশ্বদিনের কথা নয় : (শেষের দিকে কবছর আগে) ঐটাই আগে।

বলা হ'ল নাটকটি ১১২৬ সালের চরিশে ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয়। বললেন—তাহলে হরিদাস বাবু ঠিকই বলতেন।

আবার দ্বিবিজয়ীর প্রসঙ্গে ফিরলেন—দ্বিবিজয়ীর গল্পটা মোটামুটি ইতিহাস সম্মত। কিন্তু সাদাং আলিরা আর চিন কিলিচ খাঁ—এরা দুজনে একসঙ্গে লড়েন নি। সাদাং আলি প্রথম দুদিন যুদ্ধে জেতার পর তৃতীয়দিন সকালে বন্দী হয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সৈন্যদের হার হল। অবশ্য প্রথম দুদিন তিনি জিতেছিলেন বলা তুল, ঢেক করে রেখে দিয়েছিলেন। Irvine এর বইয়েতে সব কথাই লেখা আছে, তবে নাটকটা মাটিমার জুরাওর বইয়ের গুণর নির্ভর করেই লেখা।

সালে বেগে একটি historical character, লোকটি ছিল Idealist, আলি আকবর হচ্ছে পান্ডিত্য সম্রাট তামাসের ভাগনে। তামাসকেই বন্দী করে নাদির সম্রাট হল। তামাসের বে মেয়েকে উনি বিয়ে করেন আলি হল তাইই কাজিন। ঐ যে সর্দারদের ভাকা হত—খোয়াসানী, সিমানী, আবদাল আর অমনি তারা ঠেজে আসত। সেই সময় অন্তত: আটশ জন ঠেজে থাকত তার পর দুজন দুজন করে বেরিয়ে যেত। তাদের পোষাকগুলো বড় সূক্ষ্ম হয়েছিল খরচও হয়েছিল খুব বেশী।

দ্বিবিজয়ী করার জন্তে গুপথ খুব বেশী লাগে। দ্বিরা গোড়ানো দেখাবার জন্তে নয়, প্রথম দুস্তের জন্তে। দ্বিরা গোড়ানো দেখাতে বেশী জায়গা লাগবে কেন ? ছোট জায়গাতে মসজিদের মিনার দেখালেই চলেবে।

আমরা প্রথম দৃষ্টে ট্রেনের চার ফুট ডেপথ ছাড়াও তার পেছনে বিন ফুট একটা ঘর, চার পাখা দরজা খুলে কানাত দাপিয়ে তাঁহুর দরজা করে তার পেছনের বাঘে ফুট প্যাসেজ মায় গাছপালা শুধু দেখিয়ে দিয়েছিলুম। মোট ডেপথ প্রায় একশ ফুটের মত হয়েছিল। নিম্ন উঠলেই তাই দর্শকরা হাততালি দিত। আজকে করতে গেলে অবশ্য কোন ট্রেনে করা যাবে না করতে হবে ময়দানে।

পরে ট্রায়ে করেছি কিন্তু এখন আর ট্রায়ের ট্রেনের সে ডেপথ নেই, দেওয়াল টেওয়াল ফুলে ছোট করে দিয়েছে।

একজন বললেন—নাট্য নিকেতনে প্রবোধবাবুর থিয়েটারেও করেছিলেন দ্বিধিকারী, পেছনের প্যাসেজ পর্বত খুলে দিয়েছিলেন।

বললেন—প্রবোধের থিয়েটারে করেছিলুম? পেছনের প্যাসেজ পর্বত খুলে দিয়েছিলাম নাকি? হবে।

ভোলাদা এসেছিলেন এদিন, তিনি 'বিবাহ বোঁ' করার সময় প্রোসেনিয়াম খুলে আর বজরাটা কেমন স্পন্দনভাবে দেখানো হয়েছিল সেই কথা তুললেন। উনি বললেন—প্রোসেনিয়ামটা খুলে' দিয়ে ভালই করেছিলে ভোলা। বজরার দৃষ্টটাও খুব ভাল হয়েছিল—মাটি আর জলেব তফাৎটা স্পন্দনভাবে ফুটে উঠেছিল।

এবার বিদেশী ট্রেনের প্রসঙ্গে এসে—ওদের দেশের ট্রেনের ডেপথ খুব বেশী দেখা যায় না। ওদের সব চেয়ে বড় ট্রেন ব্রডগেজে ডেপথ ষাট থেকে সত্তর ফুট। তাব সব ট্রেনেরই ওপেনিংটা খুব চওড়া। আরে আমরা যেখানে অভিনয় করেছিলুম—অ্যাক্টরবিশট—ছোট ট্রেন তারই ওপেনিং ছিল আটশ ফুটের মত।

বলা হল—ঐরকমের ওপেনিংও ত বোধ হয় ঐ রকমই ছিল। হেসে বললেন—ঐরকমের ওপেনিং কোনদিনই আটশ ফুট ছিল না, বড় জোর চল্লিশ ফুটের মত হবে।

ভোলাদার 'শান্তি কি শান্তির' ওপর খুবই বোঁক; ও নাটকটার কথা তুলতে উনি বললেন—'শান্তি কি শান্তি' গিরিশবাবুর পের দিকের লেখা, তখন ঠিক ক্রমতা কমে গেছে, তাছাড়া সেরকলে 'কনজার্টেটিভ' ভাব বড় বেশী। নাটকটা উনিশশো দশ সালে লেখা।

অনুভূতলাল বোসের কথা উঠলে। বললেন—অনুভূতলাল বোসের নাটক সবগুলোই ভাল নয়। তবে প্রায় বিঘটি বা লিখেছেন, একেবারে হুবহু ইলেকশনে কি হবে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

এতক্ষণ চা খাওয়া হচ্ছিল, এবার আবার বই ধরলেন, বললেন—দ্বিধিকারী হল মহাশয়দেবের রাজত্বের কথা নিয়ে লেখা; আর যে একটা করেছিলুম—তখন—এ-তাইল জাহান্নার শাহের রাজত্ব নিয়ে লেখা। মাঝখানে রইল ককেশিয়ার জাহান্নারকে যে মেরেছিল, আর পরে রইল আমেদশাহ আবদালী—এই দুটো নাটক লিখলেই স্পন্দন একটা গিরিজ হয়।

কিন্তু লিখবে কে? পড়াশোনা আছে এমন যুবক নাট্যকার কই? আমি গল্প বলে দিতে পারি, চরিত্র বোঝাতে পারি কিন্তু লিখতে পারিনি। আজকালকার দিনে পড়াশোনা করবে, খাটতে পারবে এমন একজন নাট্যকার সত্যি দরকার।

নাটকের ক্ষমতা কে কি করছে? ওই তোমাদের আকাদমী

মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও
সুনিদ্রার সহায়তা করে



ভৃঙ্গল শুধু যে
কেশের পক্ষেই বিশেষ উপকারী
তাহা নহে, ইহা মস্তিষ্ক শূন্য ও
শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার সহায়তা করে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গল কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২০১

করছে। কিন্তু তারা করল কি? সবচেয়ে আনসাকসেসফুল নাট্যকারকে পাঠালে ভেলিগেট করে—বেন তার চেয়ে ভাল নাট্যকার এদেশে নেই।

আর ঐ যে তুলসিনী ভয়সহিলা তাঁকে ছড়ার কথা জিজ্ঞাসা করতেই বললেন নাটক ত আমি বিশেষ পড়িনি। তাঁর বাবাকে গুলি করে মেরেছিল সেইজন্তে এই চাকরী তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

এবার নাটক পড়তে শুরু করলেন, বললেন—তৃতীয় অঙ্কের এই দ্বিতীয় পোড়ানোর দৃশ্যটা করতে পারলে খুব ভাল হয়। নানিদের কথা শেষ হয়ে বাবার পর অনেকক্ষণ আর কোন কথা নেই। এই সময়টার বাইরে থেকে চাঁদকার, আর্দ্রনাথ, যেরে কেললে, মল্লান, ইত্যাদি শোনা যাবে আর একটা ঘোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমশঃ বেড়েই চলেবে। এই ছুটোকে ঠিকমত দেখাতে পারলে কথা না বলার জন্য খুব অনুবিধে হয় না।

তারত নারীর চরিত্রটা একটু মেলো ড্রামাটিক ত বটেই। এতক্ষণ পর্যন্ত নাটকটা ছিল এশিসভিক কিন্তু সাধারণ ভারতনারীকে এখানে এনে নাটকটাকে শিল্পিক করার চেষ্টা হয়েছে। ভালভাবে অভিনয় করতে পারলে চরিত্রটি কিন্তু ভালই লাগত। প্রথমে করেছিল ব্রজভামিনী।

অভিনয়ের শুশে চরিত্র ত ভালই কেটে। এমনকি ঐ যে গিরিশবাবুৱা বলতেন—এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল তাতেও কি খারাপ হত?

আমাদের দেশে থিয়েটার এল হঠাৎ। তার আগে পর্যন্ত যে রাজা হত তাকে সম্পূর্ণ ভাগ করে সাহেবদের পুরো অঙ্ককরণে, আমরাও করতে পারি দেখাতে তাঁরা থিয়েটার শুরু করলেন।

যাত্রারও অবস্থা বিকৃতি শুরু হয়েছিল। মতি বায় আর মধুর শাই এই বিকৃতির কারণ।

আমাদের সময় সংস্কৃত ভাল করে শেখানো হত। আমি তখনো ছুলে পড়তে চুকিনি—বয়স কত হবে আট নয়, তখন থেকেই যুদ্ধবোধ পড়তে শুরু করি। ছুলে যে ভাল সংস্কৃত পড়ানো হত তার জন্যে পোশ পকানমকে বস্ত্রবাস দিতে পারি। আমাদের পাড়ার পতিভৈরা তখন খুবই আসা বাওয়া করতেন। আমরা তখন রমানাথ কবিরাজ লেনে থাকতুম।

হরিনাথ ঘের কাছে গিয়ে বললুম—ভাই, ফ্রেন্ড শিখতে চাই, কি বইটাই পড়ব বলে দিন ত। তাতে তিনি বললেন—well youngman, it is best to have a mistress speaking the touage আমি তখন মোটে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, বয়স আর কত হবে—ওর কথা শুনে একেবারে ডেবড়ে গেলুম। অভিনয় শেখানোর কথার বললেন—সে বকম ছেলে পেলে ত শেখাই। ঝাঁড়াও আমার থিয়েটার হোক। এই ত একবকর আরম্ভ হয়েছে। এইবার এটাকে বাড়ালেই চলেবে।

আমাদের দেশে বায় বা কাজ নয় সে তাই করে। এই বাধা-কুলপ আসছেন জগদীশ বোসের শতবার্ষিকীতে বহুতা দিতে। জগদীশ বোসের উনি কি বোকেন? অবজ জগদীশ বাবুওঁর কন্ঠই ছিলেন। একবার ওঁর একটা লেকচারের টিকেট ওখানকার ছুলের

মেয়েদের মধ্যে বিলোচ্ছেন। পারালাল এক ছুলের সায়েদের মাষ্টারের জন্য টিকেট চাইতে গেছে। তাকে উনি বললেন—সে আমার লেকচার কি বুঝবে?

পারালালও মুখকোঁড় ছেলে, বললে—উনি ছুলের মাষ্টার উনি বুঝবেন না কিন্তু এই যে (মেয়েদের দেখিয়ে) বায়েদ মিচ্ছেন এরা কি বুঝবে? তখন একটু চুপ করে থেকে দুটো টিকেট দিয়ে বললেন—বাও। কিন্তু আর যেন আসেনা।

কে একজন বললেন—শিকার ছবির জন্যে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

শুনে বললেন—শিকারের দক্ষণ চারলাখ টাকা খরচ হয়েছে বলছ? আমরা ত টাকা পাইনা। টাকা ত দেওয়া উচিত সরকারের।

কে একজন বললেন—সরকারের কাছে মাথা নীচু করলেই টাকা পাওয়া যায়।

বললেন—মাথা নীচু করলেই টাকা পাওয়া যায়? তাও যদি যেত আমি একশ বার মাথা নীচু করতে রাজি ছিলাম। কিন্তু তা ত পাওয়া যায় না। সরকার ত সব কিছুই গোলমাল করে দেয়।

অজিনেতার চেহারা ভাল থাকা একটা সৌভাগ্যের পরিচায়ক। ঐ যে ভক্তলোক—কি বেন নাম—হ্যাঁ, জন ব্যারিমুর। লোকে বলত একেবারে স্বামলসেটের উপযুক্ত চেহারা। সে তুলনায় আমার একেবারে বাজে—বীটে, মোটা, চোখ ছোট ছোট তার ওপর আবার ভেতরে চোকানো। কিন্তু তাতে দমে গেলে চলবে না। ওই ঢোকা চোখকেই ফুটিয়ে তুলতে হবে।

২৩শে অক্টোবর পূজোর ঠিক পরে একাদশী না দাদশী। উনি আসতে সবাই প্রণাম করলাম, উনিও কোলাহুলি করে আশীর্বাদ করলেন, তারপর বসে বললেন—শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে, পেটে ব্যথাও রয়েছে। এবশর কি হবে তা জানি! বাইরে যেতে পারলে শরীর ভাল হত কিন্তু বাব কি করে?

পাশের বাড়ি থেকে কাল প্রণাম করতে এসেছিল, ভক্তলোকের দশটি মেয়ে! ভাব দেখি কি ভয়াবহ অবস্থা। দশটি মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, যাতে তারা রোজগার করতে পারে, ভালভাবে বাঁচতে পারে।

ওদের মাকে দেখলুম। তেরটি সন্তানের জননী কিন্তু কি অশুর্ক বাহা। দিখিছরী পড়তে শুরু করলেন—দিখিছরী হল শক্তিমত্ততার মিথাময়ী পরিণামের ছবি। শক্তিমত্ততার কল কখনই ভাল হয়না। এই সোভিয়েতেই দেখনা। লোকদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছেনা? তুসি বলতে পার আর্থিক উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু তাই কি সব। তিরিশ বছর একটা প্রচণ্ড পাঙ্কি লোক কিনা নিজের স্বমত চালিয়ে গেল। সেড় কেটি লোককে মারলে (কুরুচেভই বলেছে)।

দেশের লোকে সরকারের নামে ঠাটা বিক্রপ করেই কিন্তু ওরাত তা করেনা। আর বার দেখতে বায় তারা ভাল বলবে বলেই তৈরী হয়ে বায়। আর সবটাই ত আর ভাল নয়। এইত আমার এক পরিচিত লোক মার্কসীর ট্রাঙ্কেলসকে তিন হাজার টাকা দিয়ে পানোরো দিনের জন্য হয়ে এল। লোকানে লোকানে জিনিষপত্র সাঁজানো আছে তা তারা দেখেছে কিন্তু সেইটাই সব নয়।

সাত

বাঁধ ভেঙ্গে দাঁড়

এমনি করেই হঠাৎ বাঁধাঘাতি বন্ধপুরীর অদূর মহলের নিঃসন্ন কাছন পেল বসলে। চোদ বছরের পুরোন বাণ নিবেশের স্বপ্ন পাঁচিলগুলো জেতে চুম্বার করে এল জীবনের সাড়া। যে বাড়িতে সূর্যের আলোরও চোকবার লুকুম ছিল না। সেখানে হৈ হৈ করে চুকে পড়ল বিজ্ঞাপিতের সব ছেলেমেয়েরা। বন্ধপুরী আর সেই আগের বন্ধপুরী নেই। এ যেন বিজ্ঞাপিতেরই আরেকটা বাড়ী।

প্রথম প্রথম খেলা চলত বাড়ীর মধ্যেই পাঁচ বাইরে বেঙ্গলে পলুব শরীর ধারাপ হয়। কিন্তু দিন কতকের মধ্যেই আর পাঁচটা ছেলের মত পলুব সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। বন্ধপুরীর বাইরের বিরাট মাঠে ফুটবল খেলা শুরু হল। কিছুদিন আগেও বেখানে শুধু বরে পড়া শুকনো পাতার রাজত্ব ছিল সেখানে আজ শুধু সবুজের ইসারা। ছেলে মেয়েদের চকল প্রাণের স্পন্দন, আদিকালের পুরোন গাঁহুগুলোও যেন অনুভব করেছে, নতুন করে গজাচ্ছে সেখানে সবুজ পাতা। যে গাছে ফুল ফুটতে দেখেনি লোকে বছরের পর বছর সে গাছেও আজ ফুলের কি সমারোহ, রঙের কি কোলাহল।

ভাব বেশা পাখীর ডাকে পলুর হুম ভাঙ্গে। আনন্দে ছুটেছে ছুটেছে বেরিয়ে আসে মাঠের মধ্যে। নাম না জানা পাখীগুলোর নিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। আর ভাবে, কোথা থেকে এল এই পাখীর দল।

—দেখিস, ঠাণ্ডা না লাগে।

পলু পেছন ফিরে দেখে দাঁড় এসে দাঁড়িয়েছে তার কাছে।

পলু দোজ্জাসে বলে, না দাঁড়, ঠাণ্ডা আর লাগবে না। কিন্তু এসব কি পাখী তুমি নাম জান ?

দাঁড় পাখীগুলোর নিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে, জানতাম, ভুলে গেছি। এরাও যে আসেনি কত বছর।

—কেন দাঁড় ?

দাঁড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কি জানি।

এ ধরনের উত্তরে পলুর মন খুসী হয় না। সেদিন বেগুঁড়কে সে জিজ্ঞেস করেছিল, এখানে এতদিন পাখীরা আসেনি কেন দিদি ?

বেগুঁড় সহজ গলায় উত্তর দিয়েছিল, কেন আসবে, তুই যে ছিলি জেলখানার মধ্যে। যেখানে আনন্দ নেই, সেখানে ওরা বার না। দেখ না আজ তোদের বাড়ীর চেহারাই বদলে গেছে, আলোর,



হাওয়ার, ফুলে, পাখীর গানে কি আনন্দ। তোর মুখখানা যখন আনন্দে ঝলমল করে ওঠে ঠিক মনে হয় যেন তায়ই প্রতিচ্ছবি।

পলু বেগুঁড়ার হাতটা ধরে বলে, সত্যি দিদি জীবনে যে এত আনন্দ তা আগে কখনো বুঝতে পারিনি।

বেগুঁড় হাসে, এখনই বা কতটুকু বুঝেছ ? এবার থেকে তোমার নিজের কাজ করতে হবে।

—তার মানে।

—প্রশান্তরা কখন মাঠে ফুটবল খেলে তুমি বসে বসে দেখো, আমরা গান করি তুমি শোন। এবার থেকে তুমি নিজে খেলো, গান করো, দেখবে কালের মধ্যে গিয়ে আরও কত বেশী আনন্দ পাবে।

পলু কিন্তু ভরে ভরে বলে, আমি কি পারবো ?

—নিশ্চয়ই পারবে।

সেদিনই বিকেলবেলা প্রার্থনা গানের সময় বেগুঁড় পলুকে কাছে নিয়ে বসল। সকলের সঙ্গে পলুও গলা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু একটু পরেই যেন হাঁপিয়ে পড়ে। খেঁচে পিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়। বেগুঁড়ার আর ইচ্ছে করেই সেদিকে নজর দেয় না। নিজের মনে গান করে বার।

কেউ আর তাকে লক্ষ্য করছে না দেখে ক্রমশঃ পলু সাহস পায়। লজ্জা কাটিয়ে আস্তে আস্তে গলা মিলিয়ে গান করতে

দিন প্রাপ্ত

ধনঞ্জয় বৈরাগী

থাক। গান শেষ হয়ে গেলে বেঁকা দেখে পুলুর চোখে জলের বাঁধ। ঝাপসা চোখে তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

বেঁকা মিঠি হেসে জিজ্ঞেস করে। গান করতে ভাল লাগলে পুঁহু?

—জানি আমার প্রাণ আনন্দে ভরে গেছে। সত্যি নিজে গান শ্রী করতে পারলে এ সুখ কোন দিনই বুঝতে পারতাম না।

সেই দিন থেকে হোজ গানের সময় পুলু সকলের আগে বসে যায়, গীতা ছেড়ে গান করে। খুশিতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। দূর থেকে দাঁহ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, এক বছর গান না শোনা কান ভরষ হয়ে গান শোনে। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানায় কমলেশের দলকে, পুলুকে তারা মুহু সল করে তুলছে এ কি কম কথা?

তবে বুঝিল হয় খেলায় সময়। পুলু এখনও কুটবলের মাঠে বেগ দিতে পারে না। তার ভর করে। দু'বার বল মেরে পুলু মাঠের উপরেই বসে পড়ে। প্রশান্ত এসে হাত ধরে টাঙে, চল, পুলু বসে পড়িল কেন?

পুলু কল্প চোখে জ্ঞানীর, আমি দম পাচ্ছি না।

—নাতে আসতে পারে। ভর কিসের?

—না, না আমি পারবো না। দেখাছো না একটু পৌঁড়লেই আমি কিয়কম পড়ে বাইক।

প্রশান্ত সাহস দিয়ে বলে, অনেকদিন দৌড়ওনি বলে তুমি পড়ে যাও, একটু মনের জোর, দেখবে ঠিক খেলতে পারবে।

হয়ত প্রশান্ত জোর করে পুলুকে খেলাতে পারতো, কিন্তু ওর দাঁহ এসে বাধা দেন, পুলুর ইচ্ছে বিকছে কোন কাজ করিত না ওতে ওর শরীর ধারণ হবে।

প্রশান্ত বলবার চেষ্টা করে, পুলুতো আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে তবে আর বাধা দিচ্ছেন কেন?

বুড়ো গভীর গলায় বলে। আমি কান্নব সঙ্গে তর্ক করতে ভালবাসি না, পুলু চলে যায়।

পুলুকে নিয়ে বুড়ো বাড়ীর ভেতরে চলে যায়?

একম কিছু প্রথম প্রথমই হয়েছিল তার পরে ক্রমে সে মনের জোর পেরেছে, ছেলেরা আসবার আগেই বল নিয়ে মাঠে গিয়ে পাড়িয়েছে, খেলার সময় বতসুর সত্ত্ব মনের জোর করে বলের পেছনে ছোটাছুটি করেছে। তার জন্মে দু'একদিন বে বৌ রান্ধ হয়ে বসে পড়েনি তা নয় তবে কল্পের মধ্যে পেরেছে চরম আনন্দ। আর পাঁচটা ছেলের বড়ই সে খুশি দল। এতদিনের অস্বাভাবিক স্বাস্থ্যের গতি পেরিয়ে সে বেশির অংশে পেরেছে এই তার পরম লাভ।

যায় এই কল্পের দ্বিগের মধ্যে বঙ্গপুত্রীতে যে এতখানি পরিবর্তন হয়ে গেছে তা বহুয়ের লোকেরা কেউই বুঝতে পারেনি। দরজা জানালার বন্ধকতাই শিশুর আসানের কথা লোকেরা প্রায় এক রকম ভুলেই গিয়েছিল, কিন্তু আজ সামনের রাস্তা দিয়ে বেতে বেতে পথিক-জন বঙ্গের পিছার। বিকৃতের অতল গলায় থেকে এ আসান বেন রাস্তাঘাতি পিছার উঠেছে। ছেলে মেয়েদের কোলাহলপূর্ণ এ বিরাট বাড়ীতে বেন উৎসবের সমারোহ চলছে। সকলেই একবার করে পেটের মধ্যে দিয়ে উঁকি বুঁকি করে বুঝতে পারে না কার সোদার কাঠির পবনে এই যুগ্ম পুরী জেল উঠল, কোথা থেকে এল এই সব ছেলে মেয়ে দল।

এ বিষয় শুধু সাধারণ লোকের জন্মেই নয়, সবাশঙ্কর নিজে অবাক না হয় পারেনি। কমলেশদের বার বার জিজ্ঞেস করেছে, আমি তো বুঝতেই পারছি না বুড়ো কি করে তাদের সবাইকে নিয়ে গেল, যে লোকটী আমার সঙ্গে একদিন ভাল করে কথা পর্যাভ বলল না তার কিনা এতখানি পরিবর্তন।

কমলেশ হেসে উত্তর দেন, আমরা যে তাকে ভালবাসি।

—কাকে? পুলুকে?

—হুজনকেই। নাতি, ঠাকুরদা। তাদের ভালবাসার সম্পর্কটা যে আপনারা দেখতে পাননি। পুলুর জন্মেই তার দাঁহ বেঁচে আছে, যদি সে আপনাদের প্রতি রূঢ় হয়ে থাকে তাও এই নাতির কথা জেবেই। আমাদেরও উনি ভালবাসেন।

শব্দবাহা কি বেন ভাবছিলেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, তবে উনি চিনির কল বসাতে দিচ্ছেন কেন? দেখছি তো কোম্পানীর মালিকরা বোজই এসে সামনের মাঠে ঘোরাভুরি করছে।

কমলেশ দৃঢ় কণ্ঠ বলে, মিলও এখানে বসবে না, সামনের রবিবার ওদের লোকেরা আসছে মিহিরদাকে নিয়ে বুড়োর সঙ্গে পাকাপাকি কথা বলতে। বুড়ো আমাকে বলেছে সে সময় থাকবার জন্মে। যদি ইচ্ছে করে আপনিও আমার সঙ্গে আসতে পারেন।

সদাশঙ্কর মাথা নাড়ে না। মিহিরের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে তর্ক করতে চাই না।

রবিবার।

ইচ্ছে করেই কমলেশ আজ ছেলের দলকে পুলুর কাছে আসতে বারণ করেছে। পাছে মিহিরদাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অসুবিধা হয়। সকাল থেকেই কমলেশ আর পুলু ব্যক্তি করেছে কী ভাবে তারা কথা বলবে। কি করে যুঝিয়ে দেবে যে চিনির কল তারা বসাতে দেবে না বিভাগীঠের সামনে।

পুলু উৎসাহ দিয়ে বলে, তুমি মিথোই এত ভাবছ, দাঁহ ও আমি বিক্রি করবো না।

—উনি তোমাকে বলেছেন।

—বলেননি, তবে ওর কথার ঘরণ থেকে বুঝতে পেরেছি। তোমাকে উনি ভালোবেসেছেন, যে রকম আমাকে ভালবাসেন। তাই মনে হচ্ছে তোমার কথা উনি রাখবেন। কমলেশ জোর দিয়ে বলে, আমি বড় মুখ করে শব্দরদাকে বলেছি—তোমার দাঁহ কলওয়ালাদের জমি দেবেন না। তাইতো' ভর পাচ্ছি যদি উনি মিহিরদার কথার রাজী হয়ে যান।

কথা হয়তো আরও চলতো কিন্তু পুলুর দাঁহ এসে পড়ার তা থেমে যায়। উনি একটু হেসেই জিজ্ঞেস করেন, কৈ আমাকে বড় ছেলের দলকে দেখতে পাচ্ছি না। কমল তুমি একা কেন?

কমলেশের দলকে পুলুই কথা বলে, ওদের সব বন ধারণ।

—কেন?

—যদি তুমি চিনির কল বসতে দাও। তাহলে যে বিভাগীঠের সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে।

বুড়ো চোখ দুটো ছোট করে পুলুর দিকে তাকায়, তেঁকে বুঝি ওকালতি করতে বলেছে।

—কেউ বলেনি কিন্তু আমি বুঝতে পারছি ওদের মনের কথা।

—এখন তো আর কলওয়ালাদের বাধা দেবার উপায় নেই। আমি যে গুপ্তের কথা দিয়েছি।

কমলেশ হতাশ হয়ে পড়ে, সে কি কথা।

—আমি মিহিরকে বলেছিলাম কলোনীর বেকীর ভাগ লোকের কাছে থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে যে এটি চিনির কল বসালে তাদের কোন আপত্তি হবে না। আজ সেই কাগজ সই করিয়ে জানার কথা। তা যদি আসে আমাকে জমি ছেড়ে দিতেই হবে। কথা দিয়ে তা না বাধলে তো চলবে না।

পুলব ইচ্ছে ছিল লাহুর সঙ্গে তর্ক করে আর একবার বোঝার কিন্তু মিহির তার দলবল নিয়ে বাইরের ঘরে এসে পড়ার উনি চলে গেলেন। কমলেশরাও কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না মরজার কান পেতে শোনে।

অনেকক্ষণ ধরে মাঝুলি কথাবার্তা চলে, তারপর হঠাৎ বুড়ো জিগেস করে মিহিরবাবু কলোনীর বাসিন্দাদের অনুমতি পেয়েছেন?

মিহির সর্গরোষে হেসে বলে, না পোলে আপনাদের কাছে আসবো কেন?

—ভাদের সই নিয়ে এসেছেন?

—নিশ্চয়ই, মিহির ব্যাগ থেকে অনেকের সই দেওয়া কাগজ বার করে দেখায়।

বুড়ো ভালো করে কাগজটা দেখে নিয়ে বলে, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই, যে কোন শুভদিন দেখে আপনারা জমি রেজিস্ট্রী করে নিতে পারেন।

কমলেশের আর শোনবার ঐর্ষ্য থাকে না। মরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়, টেচিয়ে বলে, মিল বসাতে আমরা দেব না। জমি আপনারা পাবেন না।

কমলেশকে হঠাৎ এভাবে উত্তেজিত হয়ে ঢুকতে দেখে মিহির ডাক্তার চমকে ওঠে। কমলেশ তুমি এখানে?

—আমাকে দেখে অবাক হয়েছেন, না মিহিরদা? ও সব মিথ্যে সই, আমি জানি। এবার পুলুর লাহুর দিকে তাকিয়ে গম্বোরে বলে। যদি সত্যিই জানতে চান কলোনীর বাসিন্দাদের মনোর কথা কি? তাহলে সবাইকে ডেকে একটা মিটিং কলুন, তাদের বুঝের কথা আমরা শুনতে চাই। শুধু সই দেখবো কেন?

বুড়ো কমলেশের কথায় উৎসাহিত হয়, একথা মন্দ নয় মিহিরবাবু আপনারদের মাঠে সবাইকে জড়ো হতে বলুন, সামনা সামনি শোনো বাবে তাদের কাঁ বজাব।

মিহির বাধা দিয়ে বলে, মিহিমিহি এতে গণ্ডগোলার সৃষ্টি হবে। তর্কাতর্কি আর বাজে বাসোলা।

কমলেশ তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে, তবু সেইটাই উচিত মিহিরদা, বুঝিয়ে চাষের সকলের সর্বনাশ করার চেয়ে, সামনা সামনি ঝগড়া বরা চের ভালো।

—খাম তুমি আর মাঝখান থেকে ক্যাচ ক্যাচ করো না।

—সাদ্য কথা শুনলে বুঝি মনে এত কষ্ট লাগে।

মিহির ডাক্তার শাসিয়ে যায়, ঠিক আছে সেখা বাবে মিটিংএর পর, কালই আমি সবাইকে জড়ো করবো মরজানে।

মিহির বা বলে গিয়েছিল সেই মতই ব্যবস্থা করল। পরদিন শিকেলবেলা মঠে জড় হ'ল কলোনীর বাসিন্দারা। আজ সকলের

মনেই উত্তেজনা, এ মিটিংএ কোন পক্ষে বেশীর ভাগ লোক যোগ দেবে তাই জানবার জন্যে সকলেরই আগ্রহ। মাঝখানে একটা টেবিল পাঠা হয়েছে। সেখানে বসানো হয়েছে পুলুর লাহুরকে, ঠিকই যে বার দিতে হবে জমি তিনি বিক্রী করবেন কিনা চিনির কলের মালিকদের। সব চেয়ে ব্যস্ত হতে বুঝে বেড়িয়ে মিহির ডাক্তার, দেখলে মনে হয় আজকের নাকের সেই বেন নায়ক। সকলের কানেই ফিস ফিস করে কথা বলে আসছে।

সদাশঙ্কর কিছু চুপাটি করে বসে আছে আর পাঁচজন লোকের সঙ্গে। এ মিটিংএ সে বেন দর্শক মাত্র, মশিকাদিয়া এসে বার বার তাকে অনুবোধ করে শঙ্করদা আজ কিছু নিশ্চয় আপনাকে বহুভা করতে হবে।

সদাশঙ্কর মুহূর্তে হেসে মাথা নাড়ে, না আমি কিছু বলব না।

—তাহলে মিহিরদাশ কথার জবাব দেবে কে?

—যেই দিক, আমি নই।

মিটিং শুরু হয়ে গেল, বুড়ো সতর্ক কথার জানিয়ে দিল এই মিটিংএর প্রয়োজন কি, কেন সে জমি বিক্রি স্বীকৃত রেখেছে এতদিন। কলোনীর বাসিন্দাদের স্বাধীন মতামত সে জানতে চায়।

চিনির কল বসানোর স্বপক্ষে বীরা বললেন, ভীষের মধ্যে প্রধান বক্তা হল মিহির ডাক্তার। নানা রকম বুদ্ধির অবতারণা করে সে বোঝাল এখানে শিল্প গড়ে না উঠলে এ কলোনী বাঁচতে পারে না। সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে বলে, আদর্শ নিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারব না, আমাদের খেতে হবে কাজ করতে হবে, কিন্তু কাজ কোথায়, এখানে চিনির কল বসলে সকলে কাজ পাবে, বোজগার বাড়বে। মাহুঘের মত আমরা বেঁচে থাকব। এ কলোনীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই আপনারদের সকলের কথা জেবে তবেই আমি এই কাজে এগিয়েছি। এখন আপনারদের মতামত দিন।

মিহির ডাক্তার বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মধ্যে মুহূর্তে গুলন ওঠে। নিজেলের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করে, বেশ কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর বুড়ো টেচিয়ে জিজ্ঞেস করে কি, মুখ ফুটে বলুন। আপনারা এখানে কল বসাতে চান, না, না।

ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন চীৎকার করে বললে, চাই, সঙ্গে সঙ্গে অনেক কণ্ঠে তার সমর্থন শোনা গেল।

সদাশঙ্কর আর কোনদিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। তার একলা চলে যাওয়া দেখে দিকে তাকিয়ে কমলেশের বুকেটা গুর গুর করে কেঁদে ওঠে, চাপা উত্তেজনা তার চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, নিজের অজান্তে সে দাঁড়িয়ে ওঠে, বৃত্ততে পারে না কখন সে বলতে শুরু করে দিয়েছে।

—আপনারা অনেকেই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার পক্ষে কিছু বলতে বাওয়া হযত বাড়ুলতা। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছে এই ভেবে, নিজেলের দ্বাধের দিকে তাকিয়ে কি করে জুলে গেলেন সেই মাহুঘটাকে, যে আপনারদেরই জন্যে সব কিছু ত্যাগ করেছে।

কমলেশের কথা শুনে সকলেই তার মুখের দিকে তাকায়।

কমলেশ সজল কণ্ঠে বলে যায়, আমি বলছি শঙ্করদার কথা, যিনি একলা উঠে চলে গেলেন। নিজের হাতের তৈরী এই কলোনীকে বাঁধাধরা ব্যবসাদারদের হাতে চলে যেতে দেখেও একটা প্রতিবাদ

করলেন না। যিনি চিরকাল আপনাদের দিগে গেছেন প্রতিনিধান কিছু চাননি। বীর আদর্শ মানুষের মত মানুষ তৈরী করা এত সহজে তাঁকে আপনাদি ভুলে গেলেন—

নিগূণ বস্তার মত কমলেশ বহুভূমি দিয়ে বার। কোথা থেকে এত কথা তার মুখে যুগিয়ে যাচ্ছে, সে নিজেই বুঝতে পারে না, মন্ত্র যন্ত্রের মত প্রোতারা শোনে। এমনকি বুড়োর চোখ দিয়েও জলের ধারা বেবে আসে।

কমলেশ এই বলে তার কথা শেষ করে, বীরা কল কারখানা চান, তাঁরা বান না সহরে, কেউ তো তাদের বাণা দেয় নি। শঙ্করদা চেয়েছেন তাঁর এই আদর্শ বিজ্ঞাপী থেকে মানুষ তৈরী করতে। আপনাদি কি চান না, এই মানুষ তৈরীর কারখানা বেঁচে থাকুক। আপনাদি কি চাননা এখনকার ছেলেমেয়েরা বিজয় গর্বে দেশে বিদেশে এখনকার আদর্শ প্রচার করুক।

কমলেশ খেয়ে গেলে বুড়ো সোচ্ছাদে বলে ধন্য ধন্য সদাশঙ্কর, তোমার আদর্শ আজ সার্থক হয়েছে, তার প্রশংসা এই কিশোর। এখন আপনাদি বলুন এ জমি আমি মিল ওয়ালাদের দেব, কি না? সমস্বরে সকলে চিৎকার করে ওঠে, না।

মিহির ভাস্করের মুখ কালো হয়ে যায়, হিংস্র সাপের মত তার চোখ ছুটো মলে ওঠে?

সেদিকে কিন্তু কারও খেয়াল নেই। সবাই এসে কমলেশকে সাধুবাদ জানায়। মণিকামি'রা কোন কথা বলতে পারে না। তাদের চোখে জল। পুত্র হান সময় তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কমলেশের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে গম গম স্বরে বলে আমি বেন তোমার মত মানুষ হতে পারি।

(আগামী বারে সমাপ্য)

কাজল মেয়ে

শাসিতরঞ্জন চক্রবর্তী

তুমি শত খোঁজেন মলিনকং ন বুকতে—শতবার খুলেও নাকি কয়লার কালো রং মোছা যায় না। কথাটা কি সত্যি?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, পণ্ডিতেরা মাথা খুকিয়ে বলবেন, ভূমি বল কিহে হোকরা শাস্ত্রের কথা কখনও মিথো হতে পারে। কক্ষনো নয়—কক্ষনো নয়।

কিন্তু তোমরা কি বল ভাই। সত্যিই কি কয়লার কালোবরণ ঘুরে মুছে পরিষ্কার করা যায় না? বড়ই চিন্তার কথা। একদিকে গুজবের বাতী। অজ্ঞানিক বিজ্ঞানের। হাতে পাঁজি মজলবার বেন ভায়া। কোনদিকে বাই।

আমি কিন্তু তোমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি। কি করে এই ত। বেশ ধর, গুজবের কথা মানলাম জল দিয়ে শত সহস্রবার খুলেও করলা করলাই থাকে। কোন রকমকর হয় না। আবার বিজ্ঞানের কথাও ঠিক। সে বলে, খুৎ, শুভু জল দিয়ে খুতে বাব কেন? কয়লার কালো অজ্ঞে আশুন লাগিয়ে দাও। কোথায় বাবে কালোমেয়ের কালো-বরণ-রূপ। বলমলে সোনার হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠবে মেয়ে। উজ্জল কৌতুকে বলবে, হুয়ো, হুয়ো হুয়ো।

এ বেন রূপকথার রূপকুমারের ব্যাভ-বউ। ব্যাভের খোলসটা পুড়িয়ে দিতেই কেমন লাল কটুক মেয়ে বেরিয়ে এল। বিজ্ঞানও কাজলকতার কালো আবারণটি খুলে ফেলে অপূর্ণ সুন্দর রূপটিকে ধরে ফেলল।

রূপকুমার ব্যাভ বউয়ের খোলসটা পুড়িয়েছিল উজ্জনের মতো ফেলে দিয়ে। কিন্তু এই কাজলমেয়ের ছদ্মবেশ হাজার বছরে। তাকে অনেক সন্তপণে অনেক কৌশলে পোড়াতে হয়।

তোমরা হয়ত বলবে, উজ্জনে ফেলে দিলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়, অত ঝামেলায় দরকার কি?

ঠিক কথা উজ্জনে ফেলে দিলে সোনার রূপটিকে ধরতে পারি বটে। তবে কণিকের জ্ঞান। ভাল ভাতের সঙ্গে সঙ্গে উপকারটুকুও পেটের মধ্যে চলে যায়। তাতে লাভ খুব কম। অজ্ঞানকে কোক চুল্লির মধ্যে বিটুমিনাস মেয়েকে (এই বা, তোমাদের বলতে ভুলে গেছি মেয়েগুলো অবাস্য তিন জাতের লিগনাইট, বিটুমিনাস অ্যানথ্রোসাইট। লিগনাইট মেয়ে বালামী রং-এর। এর শক্তি সামর্থ্যও কম। বিটুমিনাস মেয়ে কালো। শক্তি সামর্থ্যও লিগনাইট মেয়ের চেয়ে অনেক বেশী। অ্যানথ্রোসাইট মেয়ে কালো খুব কালো। আর দেমাক কি। গর্বে মাটিতে দেন পাই পড়তে চায় না। এই জ্ঞান দেখ হিংস্রটে মেয়ের সংখ্যা অজ্ঞাত মেয়ের চাইতে কত কম। তা বাই বল আর তাই বল ক্ষমতা আছে মেয়ের।) ওঁড়ো করে জরে দাও। তারপর চুল্লির মুখ বন্ধ করে আশুন লাগিয়ে দাও। নলের মধ্যে দিয়ে যে গ্যাস বেরিয়ে আসবে তার থেকে পাওয়া বাবে অনেক উপজাত দ্রব্য। যেমন আলকাতরা, রাস্তার পিচ, বেনজিন, এমোনিয়া সালফেট, রং, গন্ধক আরও কত কি? যে অগ্নিময় কয়লাগুলো বের করে নিয়ে আসা হল তাকে বলব কোক মেয়ে। এই মেয়ের দাম আধুনিক রাজকুমারদের বাজারে ভয়ানক চড়া।

কাজল মেয়ের উপকার সন্ধে তোমাদের আর কিছু বলব না। কারণ তোমরা অনেকেই অনেক কিছু জান। আমার চেয়ে ত বটেই। মেয়ের জন্ম ত হাজার হাজার বছর আগে। কিন্তু আমাদের দেশে কাজল মেয়ে কে আবিষ্কার করল। যুগ-যুগান্তর ধরে মাটির নিচে নিশ্চিন্ত আরায়ে নিদ্রাময় ছিল কাজল মেয়ে। হঠাৎ কোন অচিরপূরের এক রাজপুত্র এসে সোনার কাঠির পরশ বুলিয়ে হুমত রাজকুমারীকে ডেকে তুলল, ওঁ রাজকুমারী আর কতকাল ঘুসবে। তোমাকে দেখবার জন্য পৃথিবী আজ পাগল।

পৃথিবী। অবাক বিশ্বের রাজকুমারের দিকে কাজল টানা দীঘল চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, পৃথিবী। সে আবার কোথায়? মধুর হাসিতে ছেয়ে গিয়েছিল রাজকুমারের মুখ। বলেছিল, রাজকুমারী, তোমার চোখে সহস্র বছরের ঘুম, অনেক কিছু জান না তুমি। চল আমার সঙ্গে চল, দেখাব কতটুকু জগৎ আলো, কত বিচিত্র রং-এর আশা আকাঙ্ক্ষার ফুলঝুরি। জীবনকে উপভোগ করবে চল।

উঠে এলো রাজকুমারী। উঠে এলো ১৭৭৪ সালে বাঙ্গালগঞ্জে বিশ্বাস অবিধানের দোলা নিয়ে। বড় বড় নৌকো দিয়ে রাজকুমারীকে নিয়ে আসা হল কলিকাতায়।

কলিকাতা। রাজকুমারী ডাঙ্গর ডাঙ্গর চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, আশ্চর্য, বিশ্বর সুন্দর।

১৮৫০ সালে ভারতবর্ষে এলো রাজকুমারীকে রাক্ষস ইঞ্জিনের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। সেদিন রাক্ষস কষ্ট হয়েছিল রাজকুমারীর। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত অভিমানেও। কিন্তু যখন দেখল ঐ বিরাট দানবটা তারই স্পর্শে হস্ হস্ করে ছুটতে শুরু করেছে তখন জানলে হাতছালি দিয়ে উঠেছিল রাজকুমারী। নিজের যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছিল একমুহুর্তে।

১৮৯৪ সালে রানীগঞ্জের সঙ্গে কবিরায় সংযুক্তি ঘটল রেলপথের দ্বারা বন্ধনে। ১৯০০ সালে গড়ে উঠল আধুনিক শিল্পের বনিয়াদ। রাজকুমারীর আদরও বেড়ে গেল অসম্ভব রকম।

যুদ্ধের হিড়িকে রাজকুমারী সম্মান পেল প্রচুর। ঐশ্বর্য্য পেল মুঠো ভরে ভরে। কিন্তু বুকাটান টান করে উঠল অব্যক্ত ব্যথার। মানুষের হিংস্র লোলুপ মুষ্টি দেখে দু'কোঁটা অঙ্গ গড়িয়ে পড়ল তার শ্রেষ্ঠ বলমল চোখ বেয়ে। কিন্তু উপায় নেই। তার বে হাত পা বাঁধা।

যুদ্ধের পর এসেছে মন্দা। মন্দার পর আবার এসেছে স্তম্ভন। রাজকুমারীকে আমরা আপনজন করে নিয়েছি। সে এখন আর রাজকুমারী নয়, আমাদের কাজল মেয়ে।

আজ বড় জয়ের কথা শুনি। আমাদের অতি আদরের কাজল মেয়ের আঁচু নাকি বেশী দিনের নয়। মাত্র আর ৮০।১০ বৎসর। কিন্তু কেন—কেন এই অভিশাপ। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমাদের বোকামির কথা মনে পড়ে।

কাজল মেয়ের প্রতি আমরা নির্দয় ব্যবহার করেছি, যথেষ্ট ভাবে তার গায়ে আঘাত করেছি। তাকে টেনে হিচড়ে তুলে এনেছি। এত অত্যাচার সে সহ করতে পারেনি। ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়েছে। যখন তুলে এনে লাভের অঙ্ক কমতে গেছি দেখি আমাদের আশা অর্ধেকের বেশী গুঁড়ো হয়ে গেছে।

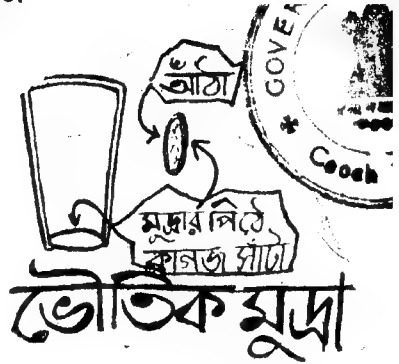
ইরেজরা আমাদের দেশের কাজল মেয়ের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য দেয়নি। যথেষ্ট ভাবে হেলাফেলা করেছে। আর সেই মাঙল দিতে হচ্ছে আমাদের।

আবার বতরু কু অক্ষত দেহ পেলাম তার থেকেও বেশী উপকার নিজে নিজে পারিনি। উপজাত দ্রব্যগুলির (আলকাতরা বা ইত্যাদি) অপমৃত্যু ঘটছে ব্যবহারের নৈজতায়।

আমাদের দেশে যে পথগুলি দিয়ে কাজল মেয়ে পাঁতাল থেকে উপরে উঠে এসেছে সেই পথগুলি এত ছোট যে বার্ষিক কৌশল ব্যবহার করা যায় না। ফলে কাজল মেয়েকে তুলে আনতে অনেক দাম দিতে হয়।

তাই আজ জাতীয় সরকার কাজল মেয়েকে রক্ষা করতে উঠে পড়ে লেগে গেছেন। নিয়ম করেছেন প্রতি বছর ১৪ নিযুত টনের বেশী কোক মেয়ে তৈরী করা যাবে না। আর কাজল মেয়েকে অতি সতর্পণে কৌশলের সঙ্গে রপাঙ্কিত করতে হবে বাস্তব করে পূর্ণ উপকার পেতে পারি কাজল মেয়ের কাছ থেকে।

ওগো কাজল মেয়ে, পাঁতালপুরীর রাজকুমারী তোমার দূর ভাঙ্গান সোনার কাঁঠি ছুঁইয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করে তোল।



যাহ্নকর এ, সি, সরকার

ফ্রান্স দেশে পাঁচ ফ্রা (Cinq Franc) মুদ্রার সাহায্যে একটি

মজার ম্যাজিক সেবার আমি দেখিয়েছিলাম ফরাসী দেশের ফরাসী সহরে আমার এক ফরাসী সম্পাদক-বন্ধুর বাড়ীতে। সম্পাদক-বন্ধুটি আমার ম্যাজিকের বিশেষ ভক্ত ছিলেন তাই তিনি ছিলেন আমারও খুব অনুরক্ত। রাতে মাঝেই তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন তাঁর সহবতলীর বাড়ীতে নৈশভোজের জন্য। প্রায় দিনই ভোজের টেবিলে পরিচয় হত নতুন নতুন খাবারের সঙ্গে আর সেই সঙ্গে পরিচিত হতাম সহরেরই কোনও না কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে। ভোজনান্তে প্রত্যেকবারই আমাকে দেখাতে হত দু'একটি বায়ুকৌশল সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে। এমনি দ্বারা একদিন ইঠাং আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম একটি খুব মজাদার খেলা। 'পাঁচ ফ্রা মুদ্রা অদ্ভুত করার খেলা। একটি পাঁচ ফ্রা মুদ্রা তুলে নিলাম ডান হাতে। বাঁ হাতে তুলে ধরলাম একটি কাগজের তৈরী গ্রাস। গ্রাসটাকে কাৎ করে ও উপড় করে ধরে দেখলাম যে তাতে কোনও কারসাজি নাই। এর পরে ডান হাতের মুদ্রাটি গ্রাসের ভেতরে রেখে মল্ল পড়লাম। কুল মন্তরে মুদ্রাটি হল উগাও। গ্রাসটাকে কাৎ করলাম, উপড় করলাম মুদ্রাটির পাতা পাওয়া গেল না। দেখে তো সবাই অবাক। সেদিন সম্পাদক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে প্রথমেই দেখা হয়েছিল সম্পাদকের ছেলের সঙ্গে। সে তখন কণ্ঠজ, বোর্ড, আঠা ইত্যাদি নিয়ে এক মডেল তৈরী করছিল। তার কোলাহল মধ্যে পেরেছিলাম ছোটো ছোটো সাইজের কাগজের গ্রাস। পকেট থেকে একটি পাঁচ ফ্রা মুদ্রা নিয়ে গ্রাসে ফেলে দিয়ে দেখলাম যে মুদ্রাটা গ্রাসের তলার একেবারে ঠাপে ঠাপে মিলে বাচ্ছে। বাস সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল আবিষ্কার। মুদ্রাটার এক পিঠে লাগালাম গঁদের আঠা আর অল্প পিঠের মাশে কেটে নিলাম একটি অংশ একটি গ্রাসের তলা থেকে। এইটি স্টেটে নিলাম মুদ্রাটির অল্প পিঠে। খেলা দেখানোর সময় মুদ্রাটিকে এমন ভাবে দর্পকদের দেখলাম যে এর কাগজ লাগানো দিকটা তারা দেখতে পেলেন না। আঠা মাখানো দিকটাই শুধু তারা দেখতে পেলেন। গ্রাসের ভেতরে মুদ্রাটা রেখে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে চাশ দেওয়াতে মুদ্রার আঠা মাখানো দিকটা স্টেটে গেল গ্রাসের তলার। কাগজ লাগানো দিকটা দর্পকের নজরে পড়াতে তারা ভাবলেন বুঝি গ্রাসের তলাই শুধু দেখছেন তারা। বড় সাইজের রূপোর টাকা দিয়ে তোমরা এ খেলা দেখাতে পারবে।



কৈ-ভোলা

সুরেশচন্দ্র সাহা

স্মৃতিকারীর ইতিহাসে সেদিন এক গুণীর্ণ দিন। সমুদ্রের
অন্তিম পর্বাণে আশাষট্‌প মাহ্‌ না পেয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া
। অপেক্ষাকৃত অল্পজলে; প্রায় বার মাইল দূরে দেখা বাছির
। বালুতামর বেলাভূমি।

প্রায় একঘণ্টা পর জাহাজে মাহ্‌ মিলল প্রচুর, প্রায় একশ'
। কাছাকাছি। সকলের আনন্দ আর উৎসাহ গেল বেড়ে।

এর কড-এণ্ড (COD-END) বা ধলের আকৃতিতে নির্মিত
মহাদুর্ভাগ্যে থাকতেই চোখে পড়ল অপরিমিত মৎস্যরাশিতে

গোলাড়ন-তাল। এক বিরাট জীব, যদিও পূর্ণদৃষ্টিতে কবল না
হওয়ার তার ঘরখানি তখনই সাধব করা গেল না। কেউ মন্তব্য

কবল গজ-কচ্ছপ, কাবও মতে পাঁচমণী ভেটকী; কেউ বা আট মণের
শঙ্করমাহ্‌ কল্পনা করে অন্তর ছোঁল এভাবে কি করে লেজটি হস্তগত

করা যায় তারই কল্পনা করাছিল মনে মনে। কিশোরী হারে চারবারে
সমস্ত মাহ্‌কে ডেকে পর তুলে আনা হোল। তৃতীয় কিশিতে

উঠল সেই বহু উৎসাহ দৃষ্টিবিশিষ্ট; ভেটকী নয়, শঙ্কর নয়, গজ-
কচ্ছপ নয়—বিপুলায়তন এক মৎস্যগজ! সাগরতলে ছোট থেকে

বড় নানা শ্রেণীর মাহ্‌ই আছে ধানের মাহ্‌র নামকরণ করেছে এক
থেকে অন্তকে সনাক্তকরণের লক্ষ্য। নিজের শ্রেণীর মধ্যে এই

মৎস্যপুলব শুধু যে রাজা নয়—একহুঁহু সম্রাট, এবং তার যথেষ্ট বিচরণ
য়ে নিজের অন্তরীণ এলকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সেবিধের আমর

নিসন্দেহ। মস্তকুলশীতে এর নাম কৈ-ভোলা। মীন-বৈজ্ঞানিকরা
বলেন সমুদ্রের নীচে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে এর বাস। জানি না

অগভীর জলে, কাণা আর বালির ভাঁজে এই অতি সৌখিন ভোলাকুল
সম্রাট কি করতেই বা এলোছিল বার মূল্য দিতে হল নিজের জীবন

দিয়ে—ছাড়পত্র ছাড়া রাজ্যসীমা লঙ্ঘন করে অপর রাজ্যের
বন্দীশিবিরে প্রাণহারাণের মত। সাত ফুট লম্বা দুই মণের

কৈ-ভোলাকে কাত করে ফেলা হোল জাহাজের ডেকে। চণ্ডাভেঙে
কম নয়, প্রায় ছ'ফুট—সৈমগের অল্পপাত মিশিয়ে বেশ বেখাপ।

সম্রাটোচিত সৌভবের পরিচয় ছিল না মৎস্যরাজের সঙ্গে। লেজের
দিকে আবার অশোভন ভাবে সঙ্গ, অবিভক্তপুচ্ছ। একটি বড়

কুইমাহ্‌র আঁশগুলি বহু বড়, এর গায়ের আঁশ তার চাইতে বেশ
ছোট; গায়ে এমনভাবে আঁটা, দেখে মনে হচ্ছিল ধনবুনটের সঙ্গ

মূল্যবোধের চাটাই। পিঠের উপরে দিককার ডানা ছাড়িয়ে বের করা;
হুঁচোল। উত্তম বর্ষাফলকের মত।

বিময়ের ঘোর কাটলে জাহাজ-কর্মীরা সকলে অভিমান্য
সচেতন হয়ে উঠল ভাগাভাগি নিয়ে। কাবও লেজটা চাই,
কাবও পোঁট, কাবও চাই হুঁড়োটা। কালিয়ার লক্ষ্য নয়,
হুড়িঘণ্টের লোভেও নয়। বাড়ীতে গিয়ে পাঁচ জনে মিলে দেখা
আর দশজনকে দেখানো এবং সেই হুঁড়ে উৎসাহ মহলে লোকপ্রিয়তা
অর্জনের তাগিদেই এই খণ্ডিত মৎস্য দেহের কাছাকাছি।
কালনেমীর লক্ষ্যভাগের মত মৎস্যরাজের লেজ মাথা পেটের বটন
পরিচালনাও হল। প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত মহলের সমর্থন।
সকলকেই নিরাশ হতে হল মৎস্যরাজকে অস্বস্তি অবস্থায় রাখানো

কলকাতার নিয়ে আসার ব্যবহার। তখন আর কি করা যায়,
মুখে আপ্যায়িতের হাসির রেখা টেনে বটন পরিচালনাকারীরাই সব

পালটিয়ে মন্তব্য করলেন—হুঁহু ছাই কেটে ফেললে এত বড় মাহ্‌টার
সৌষ্টব্য থাকে! আর একদল কর্মী তখন কৈ-ভোলা নিয়ে মেতে

উঠেছে। নির্গত জীবন মাহ্‌টার স্বাভাবিকভাবে হাঁ করা মুখে যে
পরিমাণ টান-চোড়ি-কাসা জড়ো হয়েছিল তার ওজন দশ থেকে

পনের সের। মুখের উপরে ও নীচে ছ'পাটা দাঁত কঠিনালী মুখের
পূর্ণাঙ্গ অর্ধগোলায়ভাবে সাজানো। এতোকটা পাটিতে আবার

চারটে করে সারি। আর দাঁতগুলি দেখতে অনেকটা আমদের
মাড়ির দাঁতের মত। জালে বাঁধার জন্য জাহাজে থাকে লোহার

তৈরী কাঁপা বল। হঠাৎ একজন কর্মী বোহনবাগানের মাঠে খেলার
পাঁচ নম্বর কুটবলের মত এক কাঁপা লৌহ গোলক নিয়ে অকস্মে পুরে

দিল মরা মাহ্‌টার মুখে। শেষে কৌতুকের আতিশয্যে আট ইঞ্চি
মোট রবারের পাঁচপ গলনালীতে প্রবেশ করিয়ে জল চালিয়ে দিল

পেটে। ফলে মাহ্‌টার গলাপথে বেরিয়ে এলো আঙুল-গিলে-খাওয়া
পরিপাক-হস্ত-খাবার। বড় বড় কাঁকড়া, হাঙর, শঙ্কর ইত্যাদি এক

থেকে দেড় সের ওজনের মাহ্‌ এবং মৎস্যজাতীয় জীবকুল। আর
একজন ত মাহ্‌টার পিঠে তবলা বাজাতে বাজাতে গভীর

আবহাজ সৃষ্টি করে ফেলল। অদূরবর্তী এক নীরব দর্শক
এসিয়ে এসে মাহ্‌টাকে গভীর শোক আঁকড়ে ধরে 'হায়রে বাপ,

কাল এমন সময় কোথায় ছিলিবে' বলে মরাকাতা স্তব্ব করে
মিলে।

গভীর জলে মাহ্‌ ধরার দ্বিতীয় বছরে পাওয়া গিয়েছিল এক
কৈ-ভোলা। তার পরে সকলেই উৎসাহ অপেক্ষার ছিল আরও ছ'

একটি মেলে কিনা এই দ্বন্দ্ব ভাড়া। ভগবান দাসের জালে হাঙর
ধরা পড়েছিল গলার। কিছু দিনের মধ্যেই ভগবানের জালে আটক

হয়ে গেল আরও একটি বড় হাঙর। হাঙরের ভোরে আর পল্লিকার
প্রচারে ভগবান একটি সের দিন থেকে বিখ্যাত ব্যক্তি। সমুদ্রে

আমাদের জালও রোজ ধরা পড়ে নানা আয়তনের লত লত হাঙর।
অশচ হাঙরের নাম শুনলেই লোকে এখন মুখ হাঁ করে ফল করে বলে

বসে—ভগবানের জালে ধরা হাঙরের সমান কি ভোমাদের হাঙর?
সেদিন ভায়মণ্ড হারবারের নদীতে দেখা গেল এক হাঙর, জোটারের

স্তিমিত প্রবাহের সাঙ্গে স্রোতার কেটে চলেছে। দেখে মনে হল
সাগরজলের আঁতড় ছা থেকে বেরিয়ে মামার বাড়ী বেড়াতে এসেছে

হাঙর শিশু। তবু ভগবানদের হাতে পড়লে এসেই হবে কত
নাম ডাক। প্রথম দিনের কৈ-ভোলা যেদিন কলকাতার এসেছিল

সেদিন ত রীতিমত একটা খবর। আর একটায় পর একটা বড়ই
কৈ-ভোলা আসছে লোকে ততই জিজ্ঞাস করছে—এটা কি খাবার?

অর্থাৎ সাগরে বড় মাহ্‌ যে পাওয়া যায় বেশ ভাল কথা। লেবিন,
খাওয়া বাবে ত। না, আঁশ-হওয়া অতিবৃদ্ধ ছাগমাসের মত

বসনা ভূত্বিনী। লোককে দোষ দেওয়া যায় না, উপেক্ষা করারও
উপায় নেই তাদের সমুদ্রের মৎস্যভিজতা হীন মন্তব্যকে। তবু

ভগবান দাসের মত বার বার বিখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলেও
নিশ্চিত বলা যায় আমাদের সেদিনের কৈ-ভোলা কাকার

আরওজন ওজনে আগের রেকর্ডকে সর্গোরে অতিক্রম করেছিল।
এই বিপুলদেহী বৃহৎ কৈ-ভোলা কলকাতার দর্শনীয় আকর্ষণ

স্বীকৃতি দিতেছিল। মেয়ে-পুত্রব যুবকবৃন্দ সবাই নয়ন সার্থক করেছিল মনোহর দর্শনে। বাবুবা থাকলে প্রদর্শনীর মারকতে দর্শনী আদায় হত বেশ।

ভালবাসার জয়

(মিশরের রূপকথা)

পুষ্পদল ভূচার্ধ্য

এক বে ছিলেন রাজা। তাঁর হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজকোষ ভরা ধনরত্ন। রাজ্যের সুবিচারে প্রসন্ন প্রজারা রাজাকে ভালবাসে। তবু রাজার মনে স্রব্দ নেই, রাণীর মুখে নেই হাসি, প্রজাদের মনে নেই আনন্দ।

কেন? কেন না রাজার না ভিস ছেলে, না মেয়ে। তাঁর অবর্তমানে এ রাজ্যের রাজা হবে কে?

মন্ত্রীবা পরামর্শ দিলেন, মহারাজ, মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাঠান। কখন কোন দেবতার বরে কি হয় বলা তো যায় না।

সেই দিন থেকেই রাজা আর রাণী প্রতিদিন উপবাস করে নানা দেবমন্দিরে গিয়ে সন্তান কামনার পূজা দিতে লাগলেন। দিন যায়। শেষে দেবতার বরে রাজার ঘর আর রাণীর কোল আলো করে জন্ম নিল একটি ফুটফুট স্তন্যর ছেলে। রাজামশায় নিজের হাতে মন্দিরে পূজা পাঠালেন, কোবাগার খুলে ধরলেন রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণে। তারপর দেশের বড় বড় গণংকরদের আনিয়ে রাজকুমারের ভাগ্য গণনা করতে বললেন।

গণংকারেরা এসে রাজপুত্রের হাত দেখলেন, পা দেখলেন, কপাল, ঘাড় সব দেখে স্বরের মোহেতে খড়ি দিয়ে কত কি সব আঁকলেন, তারপর নানা পাঞ্জিপুঁথি পড়ে গভীর মুখে মাথা নাড়লেন—ছেলেটি বড় হুভাগ্য।

সে কি? কেন? রাজা-রাণী শশবাক্ত হয়ে হাতজোড় করে প্রশ্ন করলেন।

কারণ তার ভাগ্যে রয়েছে অপঘাত বৃত্ত। সে হয় কুকুরের, নয় সাপের কামড়ে কিংবা কুম্ভীরের হুখে মাথা পড়বে।

রাজামশায় ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন—এই হুভাগ্যের হাত থেকে রাজকুমারকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই?

একটি মন্ত্র উপায় আছে। রাজকুমারকে যদি তাঁর জ্বরজনেরা সর্বদা সতর্ক সেবা-শুশ্রূষা ও ভালবাসায় ঘিরে রাখেন, কোন কারণে তাঁর মনে হুঃখ না দেন, তাহলে হয় তো এই কীড়া কেটেও বেতে পারে। এই হুভাগ্যটি ছাড়া রাজকুমারের ভাগ্যলিপি আর সব দিক থেকেই ভাল।

এই আশাস দিয়ে গণংকারেরা চলে গেলে রাজারান্নি মহা ভাবনার পড়লেন।

মন্ত্রীদের পরামর্শ মতন নগরের বাইরে নদীর ওপারে একটি পরিষ্কার খোলা নির্জন স্থানে চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে একটি প্রাসাদ তৈরী করিয়ে সেইখানে রাজকুমারকে তার মা আর দাস-দাসীদের সঙ্গে রেখে দেওয়া হল। রাজকুমার বাতে কখনও প্রাসাদের বাইরে না আসে সে জন্ত প্রাসাদের ফটকে সব সময়ে প্রহরীদের পাহারার ব্যবস্থা হইল। রাজামশায় প্রতিদিন রাজকুমারের পুত্র

রাজকুমারের জন্তে নানা খেলনা, খাবার ইত্যাদি নিয়ে সেই প্রাসাদে গিয়ে ছেলের সঙ্গে খেলা করতেন।

বহু দিন ছোট ছিল তত দিন রাজকুমার সেই প্রাসাদে বেশ আনন্দেই রইল। কিন্তু বয়স বাড়ার পর সে আর বাড়ীর মধ্যে কোন আনন্দ পায় না। বটীর পর বটী বাড়ীর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে নদীর পূর্বপারের নগরের দিকে চেয়ে থাকে। রাজপথ দিয়ে কত লোক, পাড়ী খোঁড়া বাওয়া-আসা করছে। দূরের রক্তভূমি পার হয়ে মাকে মাকে ব্যবসারীদের উটের দল তাদের গলার বটী বাজিয়ে সহরে প্রবেশ করছে। ছোট ছোট ছেলেরা দল বেঁধে কখন পাঠশালায় পড়তে যায়, কখন রাজপথে নানা রকম খেলা করে বেড়ায়, গান করে। এদের দেখলেই রাজকুমারের মনে হয় সে বড় একলা, তার কোন খেলার সাথী নেই। এই কাণাগারের দত্ত প্রাসাদ ছেড়ে নদীর ওপারের রাজপথে যে ছেলেরা খেলা করছে তাদের সঙ্গে খেলা করতে ইচ্ছা করে রাজকুমারের। একদিন সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল—বাবা, অজ্ঞ সবাইয়ের মতন আমিও কেন এই বাড়ীর বাইরে বেখানে ইচ্ছা যেতে পাই না?

রাজামশায় গভীর হয়ে বললেন—কারণ তুমি রাজকুমার। প্রাসাদের বাইরে গেলেই অন্নবয়সী রাজকুমারদের বিপদে পড়তে হয়।

আর একদিন রাজকুমার দেখল, নদীর ওপারে তারই বয়সী একটি ছোট ছেলে একটা কুকুরের সঙ্গে খেলা করছে। সে আসে কখনও কুকুর দেখেনি, তাই ফটকের সামনে যে প্রহরী ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করল—এ ছেলেটা কি নিয়ে খেলা করছে?

প্রহরী উত্তর দিল—ছেলেটা কুকুরের সঙ্গে খেলা করছে।

রাজকুমার ছুটে গিয়ে তার বাবাকে ডেকে এনে কুকুরটাকে দেখিয়ে বলল—বাবা, আমার তো কোন খেলার সাথী নেই। তুমি যদি আমাকে ঐ রকম একটা কুকুর এনে দাও তাহলে আমি বাড়ীর বাইরে গিয়ে খেলতে চাইব না। আমার আর একলা একলা খেলতে ভাল লাগে না।

জ্যোতিষীরা বলেছিলেন রাজকুমার যেন কোন হুঃখ না পায়। তাই রাজামশায় ভাবলেন, একটা চোট কুকুর পেলেই যদি রাজকুমার সুখী হয় তো ভালই। ঐটুকু কুকুরছানা আর তার কি কতি করবে?

রাজামশায় তখনই একজন চাকরকে নদীর ওপারে পাঠালেন। সে অনেক টাকা দিয়ে ছেলেটার কাছ থেকে কুকুরটাকে কিনে আনল। সেই দিন থেকে কুকুরটি রাজকুমারের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়াল। তারা দুজনে সব সময়ে একসঙ্গে থাকে আর নানা রকম খেলা করে।

কয়েক বছর রাজকুমারের বেশ আনন্দেই কাটল। কিন্তু বখন সে যুবক হল তখন রাজপ্রাসাদের আরামের বন্দীভবন তার অলঙ্কার হয়ে উঠল। সে চায় এই বিশালাকার বাইরে নানা জায়গা দেখতে, নানা নরনারীর সঙ্গে মেলামেলা করে অনেক বিজ্ঞা শিক্ষা করতে। সে তার বাবাকে বলল—আমি আর এই ভাবে বন্দী হয়ে থাকতে পাইব না। এবার আমাকে বাড়ীর বাইরে বাবার অনুমতি দিন আশা নি।

ছেলে বড় হয়েছে, তার বোকাবার দত্ত বয়স হয়েছে, তাই

রাজামশায় তাকে জ্যোতিষীদের গণনার কথা জানিয়ে বললেন—
ঐ সব হুঁতাপের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই তোমাকে প্রাসাদে
আগলে রেখেছি।

রাজকুমার উত্তর দিল, বাবা, এভাবে বন্দিজীবন কাটানোর চেয়ে
হুঁতাপের সঙ্গে লড়াই করে মরাও ভাল। তাপনি আমাকে বাইরে
হাবার অত্মমতি দিন।

কিন্তু রাজামশায় তাকে প্রাসাদের বাইরে যেতে দিলেন না।

কিছুদিন পরে মনের দুখে রাজকুমার অশ্রু হয়ে পড়ল। তখন
আর কোন উপায় না দেখে রাজামশায় ছেলেকে বাইরে হাবার অত্মমতি
দিলেন। রাজকুমার দেশ ভ্রমণে যেতে চাইলে তার সঙ্গে
অনেক লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাকে বেশ ভ্রমণেও পাঠালেন।
রাজধানী থেকে কিছুদূর হাবার পর রাজকুমার সঙ্গের লোকজন
সকলকে সব কিরিয়ে দিয়ে একলাই হিমশে হাড়া করল।
সঙ্গে নিল একমাত্র তার প্রিয় কুকুটিকে। পাথে যেতে
যেতে সে ধনী গরীব সব রকম পথিকদের সঙ্গেই আলাপ
পরিচয় করে তাদের কাছ থেকে নানা দেশের নানা রকম
স্বাদ্য আর কাহিনী শুনতে লাগল।

এই ভাবে যেতে যেতে রাজকুমার উত্তর দেশের রাজার রাজ্যে
এসে পৌঁছাল। এই রাজ্যের একমাত্র মেয়ে ছিল অপরূপ সুলভী।
কাজেই দেশ-বিদেশের রাজারা তাকে বিয়ে করতে চাইছিলেন।
কয়েকজন রাজা তো রাজকুমারিকে চুরি করেও নিয়ে যেতে চেষ্টা
করছিলেন। এদের হাত থেকে মেরেকে রক্ষা করবার জন্য উত্তর
দেশের রাজামশায় খুব উঁচু সাততলা একটা কেল্লা তৈরী করিয়ে
তারই সব চেয়ে উপরের তলার একটা ঘরে রাজকুমারিকে রেখে
দিয়েছিলেন। তবু নানা দেশের রাজা আর রাজপুত্রেরা ক্রমাগত
রাজকুমারিকে বিয়ে করবার অত্মমতি চেয়ে পাঠাতে লাগলেন।
এদের মধ্যে থেকে যোগ্য পাত্র বেছে নেওয়া কঠিন। তাই
রাজকুমারী বললেন—বাবা, আমি সব চেয়ে সাহসী আর বলবান
লোককেই বিয়ে করব। আপনি ঘোষণা করে যিনি, যে লোক পাঁচিল
বেয়ে সাততলার উপরে আমার এই ঘরের জানালার উঠতে পারবে,
আপনি তারই সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।

রাজামশায়ের এই ঘোষণা শুনে দলে দলে রাজপুত্র, রাজা আর
অজ্ঞাত বীরপুরুষেরা সেই সাততলার জানলার ওঠবার চেষ্টা করতে
লাগলেন। কিন্তু সেই খাড়া পাঁচিল বেয়ে ওপরে ওঠা তো সহজ
নয়? কাজেই সেই চৌর কেউ পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাল, কায়র
বা হাত-পা ভাঙল। কিন্তু কেউই সাততলার জানালার পৌঁছাতে
পারল না।

একদিন রাজকুমার এই পাথে যেতে যেতে দেখল, একটা খুব
উঁচু হুঁসের সবচেয়ে উপরতলার একটা খোলা জানালার সামনে
একজন পরমাসুলভী মেয়ে পাড়িয়ে রয়েছে। আর দলে দলে
নানা বয়সের লোক হুঁসের পাঁচিল বেয়ে উপরে ওঠবার চেষ্টা
করছে। রাজকুমার একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করে রাজকুমারীর
পশের আর রাজামশায়ের ঘোষণার কথা শুনে বলল—আমি
ঐ জানালার উঠে রাজকুমারিকে জয় করব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার লোকেরা অবাক হয়ে দেখল, একটা
বিশেষ বৃক্ষ-প্রাচীরের জল নিকাসের নালি, সন্ধ্যা কাঁপিয়ে ইত্যাদি

ঘরে তরতর করে উপরে উঠে বাচ্ছে। দেখতে দেখতেই সে সাততলার
জানালার সামনে পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী নিজের গলার
হার খুলে যুবকটিকে পরিয়ে তার হাত ঘরে জানালার ভিতর দিয়ে
হুঁসের মধ্যে তুলে নিল। এই দেখে প্রহরীরা ছুটে গিয়ে রাজামশায়কে
খবর দিল—একজন লোক হুঁস-প্রাচীর বেয়ে রাজকুমারীর জানালা
দিয়ে তার ঘরে গিয়েছে। রাজকুমারীও তাকে বরমালা পরিয়ে
দিয়েছেন।

রাজামশায় জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কে?

প্রহরীরা বলল, আমরা তাকে চিনি না। সে নিজেকে
মিশরবাসী বলে পরিচয় দিয়েছে।

রাজার আদেশে প্রহরীরা সেই সাহসী যুবককে রাজসভায় নিয়ে
এলে দীর্ঘ পথ-ভ্রমণে ক্লান্ত রাজকুমারের ছেঁড়া আর ময়লা জামা-
কাপড় দেখে রাজামশায় বললেন—যত সাহসী আর বীরই হোক না
কেন, আমি এই ভিখারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না।

রাজামশায়ের কথা শুনে দুঃখিত হয়ে রাজকুমার বখন সভার
বাইরে বাচ্ছিল সেই সময়ে খবর পেয়ে রাজকুমারী এসে বলল—বাবা,
আপনি যদি আপনার পণ রক্ষা না করেন তাহলে আমি অনাহারে
প্রাণ দেব।

রাজামশায় মেয়েকে বড় ভালবাসতেন কিন্তু একটা ভিখারীর
সঙ্গে তার বিয়ে দিলে লোকে তাঁর নিন্দা করবে ভেবে ইতস্ততঃ করতে
লাগলেন। সেই সময়ে একজন মন্ত্রী তাঁর কানে কানে বললেন—
মহারাজ, আমি ঐ ময়লা কাপড়েরা ছেলেটিকে চিনি। সে
মিশররাজের ছেলে।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজার সব আপত্তি দূর হয়ে গেল। তিনি
ঐ যুবকটির সঙ্গেই খুব ঘটা করে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন।
রাজকুমারী ছাড়া তার আর কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না, তাই তিনি
রাজকুমারকে আর দেশে কিরতে দিলেন না। তাঁর অর্ন্তেক রাজস্ব
তাকে দিয়ে ঐ সহররই এক প্রান্তে নদীর ধারে একটা বড় প্রাসাদে
মেয়ে-জামাইকে রাখলেন।

বিয়ের পর রাজকুমারের কাছে জ্যোতিষীদের গণনার কথা
শুনে রাজকুমারী ভয় পেয়ে বললেন—কুকুরের কামড়ে যুগ্মভয় বধন
রয়েছে তখন তোমার কুকুরটাকে আর কাছে রেখ না। ওটাকে হব
মেরে ফেল, না হব অস্ত্র কাখাও সরিয়ে দাও।

কিন্তু রাজকুমার সে কথা শুনলেন না। বললেন—ঐ কুকুরটি
আমার আঁঠুশাখের বন্ধু। যদি কামড়াবার হত তাহলে অনেক দিন
আগেই কামড়াত আমাকে। আমি কিছুতেই আমার এই প্রিয়
সখীকে ত্যাগ করব না।

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজকুমার বখন নদীর ধারে
বেড়াছিলেন, সেই সময়ে একটা কুমীর নদী থেকে উঠে চুপি চুপি
রাজকুমারের পেছনে এসে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল।
রাজকুমার সে কথা জানতে না পারলেও একজন পথিক কুমীরটাকে
দেখতে পেয়েছিল। সে ছিল শিকারী। জল থেকে শিকার করে
বাড়ী বাচ্ছিল, তাই তার হাতে ছিল তীর-ধনুক আর সড়কী। সে
সড়কী দিয়ে এক বা মারতেই কুমীরটা ভয় পেয়ে জলে ডুপিয়ে
পড়ল। শিকারীও রাজকুমারকে সাবধান করে দিয়ে বাড়ী চলে
গেল।

রাজকুমারী এই ঘটনার কথা শুনে এতই ভয়ে পেলেন যে, তিনি সব সময়ে রাজকুমারীর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে লাগলেন বাতে তিনি আর কোন অতীকৃত বিপদে না পড়েন। কিন্তু তবু দুর্ভাগ্যের হাত এড়ান গেল না। এক পরমের দুপুরে রাজকুমার স্বয়ং দেখতে দীপলপাটির উপর শুয়ে ঘোমটিলেন আর রাজকুমারী স্বয়ং জানালার কাছে বসে একটা চায়ে বসে তুলছিলেন। হঠাৎ দরজার কাছে একটা সর সর শব্দ শুনে রাজকুমারী চেয়ে দেখেন একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ সেই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। রাজকুমার দরজার ঠিক সামনেই শুয়ে। রাজকুমারী যদি কোন শব্দ করেন কিংবা নড়া-চড়া করেন তাহলে হয়তো ভয় পেয়ে সাপটা রাজকুমারকে কামড়ে দেবে। রাজকুমারী কি করবেন ভাবছেন, এমন সময়ে দেখলেন একজন চাকর জানালার কাছ দিয়ে যাচ্ছে। তিনি ইস্তায্য তাকে ডেকে এক বাটি দুধ এনে সাপটার কাছে রাখতে বললেন। চাকর তাড়াতাড়ি দুধ এনে ঘরের মাঝখানে রেখে সরে যেতেই সাপটা দুধের গন্ধ পেয়ে সেই বাটির কাছে গিয়ে দুধ খেতে লাগল। রাজকুমারীও সেই সুযোগে ঘরের কোণ থেকে রাজকুমারের তলোয়ারটা এনে সাপকে দু টুকরা করে কেটে ফেললেন।

এর পর কিছুদিন বেশ নিরাপদেই কাটল দেখে সকলে ভাবল, বিপদ বৃদ্ধি কেটে গিয়েছে। তাই রাজকুমার একদিন তাঁর কুকুর সঙ্গে নিয়ে আবার নদীর ধারে বেড়াতে গেলেন। কুকুরটা কিছুক্ষণ মনিবের সঙ্গে বেড়াবার পর হঠাৎ একটা হাঁসকে তাড়া করে নদীর দিকে ছুটে গেল। নদীর ধারে কাদার মধ্যে একটা কুমীর শুয়ে ছিল। কুকুরকে দেখে সে তাকে ধরবার জন্য গুটি গুটি ডাকার উঠে এল। কুমীরকে দেখেই কুকুর তার মনিবের কাছে ছুটে পালল। এইবার কুমীরের নজর পড়ল রাজকুমারের দিকে। ছোট কুকুর ছেড়ে সে রাজকুমারকেই ধরতে গেল। সোভাগ্য ক্রমে সেদিনও ঐ পাশে সেই শিকারী কাঁধাও বাচ্ছিল। সে সড়কী হাতে তেড়ে আসতেই কুমীর নদীর দিকে পালল। কিন্তু বাবার আগে কুকুরটাকে মুখে ভুলে নিয়ে গেল। এই ভাবে শ্রীর কুকুরের মৃত্যুতে রাজকুমারের শেষ দুর্ভাগ্যেরও অবসান হল।

রাজকুমার এবার রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরে গেল। রাজা রাণীও ছেলে বউকে নিয়ে স্নেহ বাস করতে লাগলেন।

ছোট চাঁদ

মজারী ছোটাপাখ্যার

আর আর ছোট চাঁদ, টিপ দিয়ে বা,
স্বয়ং অন্তল-তলে খোঁকার কাজল চোখে
এক ছুটে টিপ করে, টিপ দিয়ে বা।
হুম হুম, চুম চুম, চাঁদ আর আর,
খোঁকন সোনার খোঁকায়ের মাটির আভিনার,
মাটির হাতী, কার্টের খোঁড়া ভাড়া টিনের বাঁকী,
পা ভাড়া এক মজারী খেলাবা রাশি রাশি।
বাটী আছে, বল, ডাঙাওলি মেলাই আছে বুড়ি,
এমনি তবো সবই আছে নেইকো খেলার ছুড়ি।
আকাশ থেকে নেমে এসে খোঁকার সাথে খেলবে?
খোলাঘরের রকেট বাজী তোমার আবার ঠলেবে।

তিন চিমটি বিবনাথ চক্রবর্তী

চিমটিদিলির আসল নাম দীপালি, সীতালি, হুপালি, বিচালি বা ঐ রকমই কিছু একটা হবে কিন্তু অন্তত আমি সেটা ভুলে গেছি। আমার কাছে ৩ শুধুই চিমটিদিলি। বতস্বপ্ন আমি ওদের বাড়িতে থাকি ওর একমাত্র কাজ হল আমাকে চিমটি কেটে চলা। না, চিমটিদিলির সঙ্গে আবার বগড়া নেই। চিমটিকাটা হচ্ছে ওর ভালবাসার লক্ষণ। ও যাকে বত ভালবাসে তাকে তত বেশি চিমটি কাটে—অবশ্য বাবাকে আর মাকে বাদ দিয়ে।

ওর চিমটি কাটার জায়গা হচ্ছে হাত দুটো। তাই ওদের বাড়ি বাবার আগে আমি ছ'তুটাই কুলহাতা গেঞ্জি আর কুলসাঁট পরে নিই আর তার ওপর চাপাই কোট। যদি কোনদিন কুল করে লেগেই আর কুলহাতা গেঞ্জি গায়ে না দিয়েই ওদের বাড়িতে বাই, কিংবা এসে দেখি সারা হাতে কাশলিটে পড়ে গেছে।

অন্য উপায় কিছু নেই। যদি ওর প্রকাশ্যে কবি তাহলে ও অঙ্কুরে আটখানা। আর ওর খুঁই হওয়া মানেই বেশি করে চিমটি কাটা। আবার কোনদিন একটু গম্ভীর হয়ে থাকলে চিমটিদিলির খুঁখ ও গম্ভীর হয়ে বাবে অর্থাৎ ও রেগে বাবে। অল্প ও রেগে গেলেই—নাঃ, সে কথা চিন্তা করা যায় না।

একদিন আমার ছোট বোনের কাছ থেকে একটা গল্প শিবলুম। সেটা টাটকা টাটকা মনে থাকতেই চিমটিদিলিকে গিয়ে কালুম, আজ তোমার একটা গল্প শোনাও চিমটিদিলি।

চিমটিদিলি তখন ওর দিকিকে চিমটি কাটার কাজে ব্যস্ত ছিল। সেই জরুরী কাজটা কেলেই ছুটে এল।

বললে, কী? কী গল্প?

আমার গল্প আরম্ভ হ'ল: অতি প্রাচীন কালে চিমটিরাজ্য বলে একটা দেশ ছিল। সেই দেশের তিনজন চিমটি একবার দিবিজরে বেরিয়েছে। চিমটি, তিনজনের একজন হ'ল রাজপুত্র, নাম শ্রীরাবস্ত্র চিমটি। আরেক জন হল মন্ত্রিপুত্র—শ্রীগামচাঁদ চিমটি। তিন নম্বর কেটালপুত্র। তার আগে শ্রী নেই। সে শুধুই কাটিচিমটি। সন্ধ্যা হয়ে বাওরার তিন বন্ধু একটা হোটলে গিয়ে উঠল। রামচিমটি আর শ্রামচিমটি বাইরে গেল খাবার জোগাড় করতে। কাটিচিমটি ভেতরে রইল। আচ্ছা কে বেন ভেতরে রইল?

চিমটিদিলি মনে করিয়ে দিলে, কাটিচিমটি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা হুকায় দিয়ে উঠলুম। এবার বাচ্ছলন। যুগ্ম দেখেছ কীদ দেখনি! নিজের মুখে আমাকে চিমটি কাটতে বলেছ—এস চিমটি কাটি।

চিমটিদিলি এতটুকু বিচলিত হল না। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কোন রাসে পড়ো বিহুনা?

আমি দাবড়ে সেলুম। মাথা চুলকে বললুম, নাইন টেন হবে।

নাক ফুঁচকে চিমটিদিলি বললে, ছি! নিজের জান না কোন রাসে পড়ো? তাই তো এইরকম বুদ্ধি তোমার। ব্যাকরণ একেবারে জানো না।

ব্যাকরণ? নামটা বেন শোনা-শোনা মনে হ'ত কিন্তু কিছুতেই

মনে করত পারলুম না কোথায় গুনেছি। তবু পেয়ে বললুম, কী করে বুঝি বল তো?

আমি তোমাকে তুমি বলে ডাকি তো? চিমটি কাটতে বললে আমি তো বলব কাটো চিমটি—‘কাটচিমটি’ বলব কেন?

আমার মুখে কথাটি নেই। এতক্ষণ বেন মনে পড়ল ব্যাকরণ জিনিসটা কী।

চিমটিচিদি বললে, গল্পটা তুমি ঠিকই আরম্ভ করেছিলে তবু মাঝখানে এসে সব গুলিয়ে ফেলেছ। রাজপুত্র আর যজ্ঞপুত্রের নাম রাজচিমটি আর ভ্রাম চিমটি কিন্তু কোটালপুত্রের নামটা ঠিক হলো নি। ভেবে দেখো তো তুমি কী ভুলেছিলে?

আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম। কী ছিল কোটালপুত্রের নাম? যাজ চিমটি? বা চিমটি? কিন্তু এতসোব তো কোনোই মনে হয় না।

চিমটিচিদি জিজ্ঞাসা করলে, কী মনে পড়ল?

উঁহ, আর একটু ধাঁড়ও।

ওর নামটা এমনই যে কোনোদিন না শুনলেও মনে এসে যায়। বটে! এমন আশ্চর্য নাম। এই বলে আবার ভারতে লাগলুম।

আরো খানিক পরে চিমটিচিদি বললে, কী? মনে এল?

হতাশ হয়ে বললুম, না।

এবার ঠিক মনে আসবে। আচ্ছা বলো কোটালপুত্রের নাম কী ছিল?

ওর কথা শেষ হবার আগেই আমি হাঁ হাতে একটা ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করলুম। কে বেন সাঁড়াশি দিয়ে আমার মাংস চেপে রয়েছে। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে উঠতে চিৎকার করে উঠলুম, বাপ চিমটি!

চিমটিচিদি বিল-বিল করে হাসতে হাসতে বললে, এতক্ষণ লাগল?

ক্রীষ্টমাস ঠার ঐচ্ছা চৌধুরী

তো

মাদের মধ্যে যারা বীতর জন্মোৎসব দেখেছ, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে ‘খৃষ্টমাস ট্রী’র সবচেয়ে উপরে একটি রপালী তারা থাকে। এর কারণও হয়তো তোমরা জানো। তবু শুনে রাখো—এই বস্তুকে তারাটি দেখেই মহাশয়বীরা জানতে পেরেছিলেন—পৃথিবীতে এক মহাপুরুষের আগমন হল—তাই তারা নক্ষত্র দেখে দিক ঠিক করে বেথেলহেম যাত্রা করেছিলেন। আর সত্যিই দেখানে পৌঁছে শিশু বীতকে দেখতে পেরেছিলেন।

হু হাজার বছর আগে যে তারাটি সেই সব মহান পুরুষদের খুঁজিয়ে নির্দেশ করেছিল—সেই তারাটি নিয়েই এখন এক আশ্চর্য্য সমস্তা দেখা দিয়েছে। প্রায় উঠেছে—সে তারাটি কি সত্যিই তারা অথবা অস্ত্র কিছু খুব উজ্জ্বল কোন পদার্থ? প্রায় উঠেছে—সেটা কি নতুন কোন তারা অথবা বস্তুকে কমেট, উজ্জ্বলিত বা কোন উপগ্রহের শেষ সময়ের আলোক?

তোমাদের কি মনে হয়? তবে বিজ্ঞানীদের মতে, নতুন তারার পক্ষে অতখানি উজ্জ্বল হওয়া সম্ভব নয়। প্রায় তিন শ বছর আগে হঠাৎ একটি নতুন তারা, সাধারণ তারাদের থেকে এক শ' গুণ—হাজার গুণ বেশী আলো দিয়েছিল। কিন্তু এই বস্তু হঠাৎ আলোয় বলমলনা! তারাদের সংখ্যা নেহাৎই কম। আর প্রাচীনরা এদের সংখ্যা গুণেও রেখেছেন। কাজেই খৃষ্টমাস তারাটি নতুন তারা নয় বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এবার প্রশ্ন উঠবে—এটা কমেট কি না? বস্তুকে একটা লেজ নিয়ে একটা কমেটও তো এ সময়ে দেখা দিতে পারে। এ সময়ে একটা আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনীয় পণ্ডিতগণ হাজার হাজার বছর ধরে এই সব স্বর্গীয় বিষয়কর ঘটনার বিবরণ রেখে দিয়েছেন। তাদের সেই সব নথিপত্র খঁটো যে একটি সত্য

পাওয়া গেছে—তা হলো এই সময়ে সত্যিই একটি কমেট দেখা গিয়েছিল।

তবে বেশীর ভাগ ধর্মপ্রাণ লোকদের বিশ্বাস যে, বেথেলহেমের সেই তারাটি শুধু একটি মাত্র তারা নয়—সেই উজ্জ্বল পদার্থটি হল মঙ্গল, বুধশক্তি আর শনির একত্র সমাবেশ। অনেকেরই বিশ্বাস যে, প্রাতি আট শ' বছর পর পর এই তিনটি গ্রহ একস্থানে এসে ত্রিভুজাকৃতি রূপ ধরে। শিঙ্কনে-ফেল-আঙ্গা-বছরের মধ্যে গ্রহের গতিপথ হিসাব করতে করতে জ্যোতির্বিদগণ বের করেছেন যে, বীতর জন্মের সময় এই তিন গ্রহ একত্র হয়েছিল।

অবশ্য বীতর জন্মের সঠিক সময় এ পর্যন্তও কেউ বার করতে পারেন নি। তবুও বিশেষজ্ঞদের মতে বীতর জন্মময় খৃঃপূঃ ১১ থেকে ৪ অব্দের মধ্যেই। তালিকা থেকে প্রমাণ হয় যে, রাজা হেরডের রাজত্বকালেই বীত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখন এই রাজা হেরড খৃঃপূঃ চার অব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কাজেই এই সময়টাই বীতর জন্মের শেষ তারিখ হতে বাধ্য। আর যদি এরও আগে জন্ম থাকেন, তবে সেটা হবে খৃঃপূঃ এগার অব্দ। এর আগে বীত জন্মান নি। কিন্তু জ্যোতির্বিদগণ বলেন যে, বীত খৃঃপূঃ সাত অথবা ছয় অব্দে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। কেন না, এই সময়েই পৃথিবীর উপর-জগতে আকাশের বৃক নানা অদ্ভুত বৃত্ত দেখা গেছে। হয়তো দেবতারা তাদের প্রিয় পুত্রকে মর্ত্যের কঠিন মাটিতে নেমে বাঁওয়ার পথ দেখাছিলেন আলোকশিখা আলিয়ে রেখে। তাই তো সেই সব আশ্চর্য্য উজ্জ্বল নক্ষত্রদের তখন দেখা গেছে। কাজেই তাই বিশ্বাসী মানুষ ‘খৃষ্টমাস ট্রী’র উপরে রপালী তারা আলিয়ে রেখে সেই স্বর্গের দেবশক্তিকে আবার পৃথিবীর বৃকে ফিরে আসতে আহ্বান আহ্বান জানায়।

মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের ইতিহাস

মহাশূন্য সন্ধান ও মহাশূন্য বিজ্ঞানের পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান কি এবং কতখানি, গত এক বৎসরের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলেই তার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাবে।

১৯৫৯ সালে .লা ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৪টি কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরণ করেছে। এদের মধ্যে কয়েকটি এখনও মহাশূন্যে অবস্থান করছে এবং গোলাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। গত বৎসর ১শ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সকল উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরিত হয়েছে হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে সেইগুলিরই বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই ১৪টি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে সাক্ষ্য জর্তন করা বাতীতও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু দূর মহাশূন্যের তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্য আরও তিনটি মহাশূন্যসন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে দুটি রকেট দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর তাদের কক্ষ পরিক্রমা শেষ করেছে। তৃতীয়টি এখনও পূর্বক প্রদক্ষিণ করে চলেছে এবং মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, এর পূর্ব পরিক্রমা চলবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে।

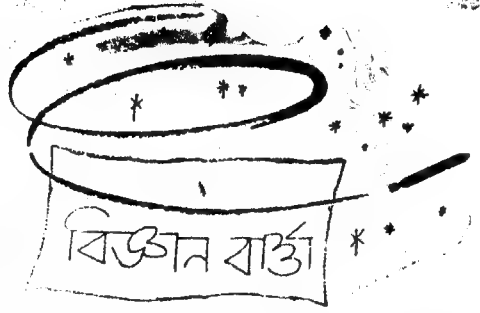
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্যের রহস্যসন্ধান এ পর্যন্ত বহুগুলি মহাশূন্যবান শূন্যে নিক্ষেপ করেছে তার মধ্যে সর্বপ্রথমটি হল "১নং এক্সপ্লোরার"। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি নিক্ষেপ হয়েছিল ১৯৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী। সর্বশেষ মার্কিন উপগ্রহটি ছোড়া হয়েছিল ১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর। এটির নাম "৮নং ডিসকভারার"।

মহাশূন্য সম্পর্কে আরও জ্ঞানলাভের জন্য এবং মানুষের মহাশূন্য বাত্রে সন্তুষ্ট করে তোলার পথ প্রস্তত করার জন্য মহাশূন্য যুগের অগ্রদূত এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির প্রত্যেকটির ওপর মাঝিণ বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট গুরুদায়িত্বের অর্পণ করেছেন। এরা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছে বিশ্বের সর্বত্র বিজ্ঞানীদের তা সরবরাহ করা হচ্ছে, যাতে তাঁদের গবেষণার কাজে সহায়তা হয়।

১নং এক্সপ্লোরার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রত্যাশিত তথ্য আবিষ্কার করেছে। যে দুটি 'ভ্যান জ্যালেন তেজস্বিকরণ বলর' বিষুবরেখার নিকট পৃথিবীকে বেঁটন করে আছে, তার একটি আবিষ্কার করেছে ১নং এক্সপ্লোরার। দ্বিতীয়টি আবিষ্কার করেছিল ৩নং পাইওনিয়ার।

১নং এক্সপ্লোরার শূন্যে প্রেরিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী। এটির জীবৎকাল তিন বৎসর থেকে পাঁচ বৎসরকালের মধ্যে হবে বলে আশা করা হয়। এর বেতারসংক্র বর্তজানে স্তব্ধ হয়ে গেছে, বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ ও অজ্ঞাত যন্ত্রাদির সাহায্যে ভূগুঠ থেকেই এখনও বহু মূল্যবান তথ্য এই উপগ্রহটির কাছ থেকে সংগ্রহ করছেন।

বেতার প্রেরকংগ্রটি বহুদিন সক্রিয় ছিল ততদিন পর্যন্ত ১নং এক্সপ্লোরার যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে মহাশূন্যে মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণের ও অতি নৃন্দ উদ্ভার পুনঃপুনঃ সংঘর্ষের বিপদ এবং এক্সপ্লোরারটি বহন উত্তম পূর্বকিরণ থেকে পৃথিবীর অতি ছায়াশীতল অংশের দিকে চলে যার তখন 'এর মধ্যে তাপমাত্রার যে পার্থক্য ঘটে সেই সন্ধ্যাত তথ্যাবলী। ১নং এক্সপ্লোরার থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ করেছে যে আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা যে পৃথিবী থেকে থাকলে বৈজ্ঞানিক



বয়সপাতিগুলি বিনা বায়র চালু থাকতে পারে, তাপমাত্রা সেই পৃথিবী থেকে বজায় রাখা সম্ভব এবং আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, অতি নৃন্দ উদ্ভার সংঘর্ষ অথবা মহাজাগতিক দুলিষণ মহাশূন্য ভ্রমণের পক্ষে স্তব্ধতার বিপজ্জনক নয়।

দূরবীক্ষণ ইত্যাদির সাহায্যে ১নং এক্সপ্লোরারের পূর্ববক্ষণ চালিয়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভূটোষক ও মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র, বিভিন্ন পৃথিবীতে আবহমণ্ডলের ঘনত্ব এবং পৃথিবীর আকৃতি ও আয়তন সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য অবগত হচ্ছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ১নং ভ্যানগার্ড মহাশূন্যে প্রেরিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি অন্ততঃ ২০০ বৎসর কক্ষপথে অবস্থান করবে। এর কারণ এর কক্ষপথ এটিকে নিয়ে গেছে বহু উল্কে—প্রায় ২৫০০ মাইল উল্কে—বেথানে আবহমণ্ডল অত্যন্ত পাতলা এবং তা অত্যন্ত জল্ল ঘর্ণন সৃষ্টি করে।

১নং ভ্যানগার্ডের উপাদানসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল এর বাটারীগুলি। উপগ্রহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট অন্ততম বেতার প্রেরকংগ্র চালু রাখার জন্য এই বাটারীগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। বাটারীগুলি সিলিকন সেল দ্বারা প্রস্তুত এই সেলগুলি সূর্যের তেজকে বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিবর্তিত করে। অতি নৃন্দ উদ্ভার সঙ্গে সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত এই সেলগুলি বহু বৎসর পর্যন্ত কাঙ্ক্ষকরী থাকবে।

১নং ভ্যানগার্ডের কক্ষপথে পরিবর্তনসমূহ পূর্ববক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, তাঁরা মহাশূন্যের অবস্থা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য লাভ করেছেন। ৪৭০ মাইল উল্কে বাতাসের ঘনত্ব সম্পর্কে তথ্যাদি লাভ করা গিয়েছে। ইতঃপূর্বে আর কোন কৃত্রিম উপগ্রহ ১১০ মাইলের উল্কে বায়ুস্তরের কোন তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করতে পারেনি।

পৃথিবী গোলাকার, তবে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে কিঞ্চিৎ চাপা বলে চিরচরিত হতে ধারণা রয়েছে ১নং ভ্যানগার্ডের সাহায্যে জানা গেছে যে তা তুল, পৃথিবীর আকৃতি ভাসপাতি জাতীয় কন্ডের অনুরূপ।

তৃতীয় সকল উপগ্রহটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ২৬শে মার্চ। এর নাম ৩নং এক্সপ্লোরার, এটি প্রায় তিন মাসকাল কক্ষপথে অবস্থান করেছিল। ঐ সময়ের শেষে কক্ষপথের নিম্নাংশ অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ১০০ মাইল উল্কে আবহমণ্ডল দিয়ে বাতায় সময় বায়ু সংঘর্ষজাত উত্তাপ এই উপগ্রহটি ধ্বংস হয়। এর কক্ষপথের সর্বাধিক উচ্চতা ছিল প্রায় ১,৭৪০ মাইল।

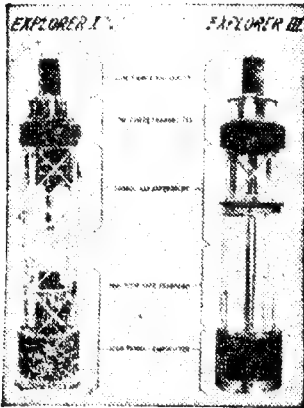
মহাজাগতিক বিকিরণ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করাই



আমেরিকা মহাশূন্যচাষী পাইওনিয়ার-৪
উৎক্ষেপণ করছে



চারটি সৌরকক্ষ পাউল হরীলসহ
এক্সপ্লোরার-৬কে দেখা যাচ্ছে



দুইখানি এক্সপ্লোরার—১নং ও ২নং
এক্সপ্লোরার-এর আভ্যন্তরীণ ব্যাপাতি

৩নং এক্সপ্লোরারের সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল এবং এদিক থেকে এ সাক্ষ্যলাভ করেছে। যে সকল তথ্য এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে তা থেকে 'ভান অ্যালেন তেজ বিকিরণ বলয়' সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বিশেষভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে।

পরবর্তী উপগ্রহ ৪নং এক্সপ্লোরার মহাশূন্যে নিক্ষেপ হয়েছিল ১৯৬৮ সালের ২৬শে জুলাই। মহাকাশগতিক বিকিরণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য লাভ করাই এই কৃত্রিম উপগ্রহের লক্ষ্য ছিল। ১নং এক্সপ্লোরার ও ৩নং এক্সপ্লোরারের সাহায্যে তেজ বিকিরণ সংক্রান্ত যে তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছিল তার আরও সূক্ষ্ম পরিমাপ সম্ভব হয়েছে ৪নং এক্সপ্লোরারে সম্বিষ্ট দুটি গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে। ১৫মাস বাবৎ কক্ষপথ পরিকল্পণের পর এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ১৯৬৯ সালের ২২শে অক্টোবর কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতঃপর দুটি মহাশূন্যচাষী রকেট মহাকাশে প্রেরণ করে। এদের অন্যতম ১নং পাইওনিয়ার নিক্ষেপ হয়েছিল ১৯৬৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর।

১নং পাইওনিয়ার প্রায় ৭১,০০০ মাইল উর্ধ্বে উঠেছিল, ৩নং পাইওনিয়ার উঠেছিল ৬৬,০০০ মাইল উর্ধ্বে। ১নং পাইওনিয়ার পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে নতুন তথ্য সরবরাহ করেছে, মহাশূন্যে সূক্ষ্ম উদ্ভাবনার ঘনত্ব সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেছে। ৩নং পাইওনিয়ার পৃথিবী বেটনকারী দ্বিতীয় ভান অ্যালেন তেজ বিকিরণ বলয় আবিষ্কার করেছে।

আইওয়া ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জেমস এ. ভান অ্যালেনের নামানুসারে 'ভান অ্যালেন তেজ বিকিরণ বলয়'ের নামকরণ করা হয়েছে। ডাঃ ভান অ্যালেন ৩নং পাইওনিয়ারের তথ্য সংগ্রহে সাক্ষ্যের কথা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন :

১। পৃথিবী বেটনকারী তেজ বিকিরণ অঞ্চল ভেদ করে বলয়ের গঠন ও বিস্তৃতি নির্ধারণ, ২। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে দুটি স্পষ্ট বিকিরণ বলয় আবিষ্কার, ৩। পৃথিবী থেকে দূরে মহাশূন্যে মহাকাশগতিক রশ্মির তীব্রতা পরিমাপ, এবং ৪। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র কতদূর পর্যন্ত কার্যকরী থাকে সে সম্পর্কে নতুন জ্ঞান লাভ।

মহাশূন্যে প্রেরিত পরবর্তী মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের নাম 'অ্যাটলাস সবাক উপগ্রহ'। ১৯৬৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর এটি মহাকাশে বাত্মা করে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার বড়দিন উপলক্ষ্যে বিশ্ববাসীকে যে শান্তি শুভেচ্ছার বাণী তুলিয়েছিলেন তা টেপ রেকর্ডিং করে এই উপগ্রহ মারকত পৃথিবীতে প্রচার করা হয়েছিল। এই সর্বপ্রথম মহাশূন্য থেকে মানুষের কণ্ঠ শোনা গেল। উপগ্রহটি ১৯৬৯ সালের ২১শে জানুয়ারী পর্যন্ত কক্ষপথে অবস্থান করেছিল।

মহাকাশবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, সবাক অ্যাটলাস সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটি নতুন দিক উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এক পর্বায়ে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ভূপৃষ্ঠ থেকে একই সঙ্গে ৭টি বিভিন্ন সংবাদ গ্রহণ করে ও তা 'টেপ রেকর্ডিং' যন্ত্রে লিপিবদ্ধ করে রাখে, এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্র পর্বারকমে তা পৃথিবীতে প্রেরণ করে।

এর পর এল ‘২নং ডানিয়ার্ভ’। ১৯৫১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এটি মহাকাশে উঠল। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ১০০ বৎসর বা তার চেয়েও বেশি দিন কক্ষপথে বিচলিত করবে বলে আশা করা যায়, তবে এর বেতারপ্রেরক যন্ত্রগুলি বহু পূর্বেই জ্বল হয়ে গেছে। এটি বেতারপ্রেরক যন্ত্র ২৭ দিন বাতং, অপরটি ২০দিন বাতং বহু তথ্য প্রেরণ করার পর বন্ধ হয়েছে।

নতুন ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ ‘১নং ডিসকভার’ মহাশূভে প্রেরিত হল ১৯৫১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী। ১,৩০০ পাউণ্ড ওজনের এই উপগ্রহটি চৌম্বকৃতি। এই উপগ্রহটিই সর্বপ্রথম উত্তর ও দক্ষিণমেরু অঞ্চল অতিক্রম করে যায়। এর কক্ষপথ ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত।

পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহযোগে মানুষকে মহাশূভে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই ১নং ডিসকভারের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। পাঁচ দিন কক্ষপথে অবস্থানের পর ১৯৫১ সালের এই মার্চ এটি সমুদ্রে পতিত হয়।

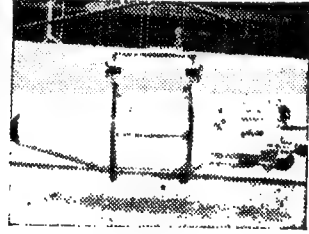
এর পর মহাপ্রভাসকানী রকেট ওনং পাইওনিয়ার ১৯৫১ সালের ৩রা মার্চ পৃথিবী থেকে মহাপ্রভাস অভিযানে প্রাণিত হয়। বর্টার ২৫,০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে এটি সর্বপ্রদক্ষিণকারী কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছায়। বিজ্ঞানীদের মতে এ লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বক প্রদক্ষিণ করবে।

ডিসকভার প্রেরণের দ্বিতীয় উপগ্রহটি হল ২নং ডিসকভার, এই উপগ্রহটি ১৯৫১ সালের ১৩ই এপ্রিল উত্তর-দক্ষিণ মেরু কক্ষপথে উপনীত হয়। ১৩ দিন পরে এটি কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়।

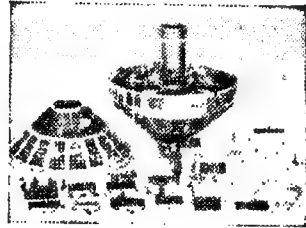
১৯৫১ সালের ৭ই আগষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ‘প্যাডস্ হাইল উপগ্রহ’ ৬ষ্ঠ এক্সপ্লোরার মহাশূভে প্রেরণ করে। এই উপগ্রহের দেহসংলগ্ন চারটি প্যাডল বা পাখানা বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সৌরকোষ দিয়ে গড়ে উঠেছে। উপগ্রহটিতে ১৫টি বড় রকমের বৈজ্ঞানিক তথ্য পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সন্নিবিষ্ট রয়েছে। ভ্যান অ্যালেন তেজবিকিরণ বলয়, পৃথিবীর মেঘাবরণ, মহাপ্রভাস উদ্ভাষণা, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং অয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গের আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে আরও অধিক তথ্য লাভের উপযোগী করেই এই যন্ত্রপাতিগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে।

৬ষ্ঠ এক্সপ্লোরার উর্শে মহাকাশে যে ভাবে পৌঁছেছিল পূর্ববর্তী কোন কৃত্রিম উপগ্রহের পক্ষে সে পর্বস্ত পৌঁছান সম্ভব হয়নি। এই উপগ্রহটি সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে ভ্রমণে রয়েছে পৃথিবীর একটি টেলিভিশন চিত্র এক মহাপ্রভাস তেজবিকিরণ সম্পর্কে আরও নতুন তথ্য। পৃথিবীর চিত্র গৃহীত হয়েছিল ১৭,০০০ মাইল উচ্চ থেকে এবং তাতে উত্তর মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের বৃহৎ অংশের ওপর মেঘাবরণ লক্ষ্য করা গেছে।

মহাপ্রভাস তেজবিকিরণ সক্রান্ত গবেষণার ৬ষ্ঠ এক্সপ্লোরার বিজ্ঞানীদের যে তথ্য সরবরাহ করেছে তাতে একপ ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক বিবরণের উর্শে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে উল্লেখ্যসম্পন্ন প্রোটনের তেজবিকিরণ বলয় বা এবাং



এখানে দেখা যাচ্ছে সর্কারনিক মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ ‘ডিসকভার’। কালিকোণিয়ার ভাণ্ডেনবার্গ বিমানবাহিনী ঘাঁটি থেকে বিমানবাহিনীর লোকেরা একে উৎক্ষেপণ করে।



একটি কৃত্রিম উপগ্রহের কতক বিচ্ছিন্ন অংশ দেখা যাচ্ছে। ফ্লোরিডার কেক ক্যানিভেরাল থেকে জুনো-২ শূন্য বান কর্তৃক এগুলি উৎক্ষিপ্ত হয়।

অনাবিষ্কৃত ছিল। এই বলয়টি পৃথিবীর ১,২০০ মাইল উর্শে রয়েছে এবং বলয়টির ঘনত্ব ৩০০ মাইল। এই নতুন বলয়টি পূর্বাভাসিত ভান অ্যালেন বলয়ের অংশ নয়।

১৯৫১ সালে আগষ্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডিসকভার প্রেরণের আরও ছটি কৃত্রিম উপগ্রহ শূন্যে উৎক্ষেপণ করে—‘পঞ্চম ডিসকভার’ ১৩ই আগষ্ট ও ৬ষ্ঠ ডিসকভার ১১শে আগষ্ট তারিখে। এই উপগ্রহগুলির মোচাকৃতি অপ্রভাসের মধ্যে ছিল দ্রুতগতিমাপক যন্ত্র। কারিগরিবিজ্ঞান বর্তমানে যে ভাবে উপনীত হয়েছে তাতে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে প্রেরণ করে বিচ্ছিন্নতার সাহায্যে তার যন্ত্রসম্বিত মোচাকৃতি অপ্রভাসটিকে বিচ্যুত করে দেওয়া এবং সমুদ্রে পতিত হওয়ার পর পরীক্ষার জন্য ঐ অপ্রভাসটিকে উদ্ধার করা সম্ভব কি না নির্ধারণ করাই এই উপগ্রহগুলির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আগামী দিনে টেলিভিশন ক্যামেরা প্রভৃতি মহাপ্রভাসে প্রেরণ ও পুনরায় তা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পথ প্রস্তুত করার জন্যই এই পরীক্ষা করা হয়। বিশ্ব হৃদ্যাগা বশতঃ এদের অপ্রভাসগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। তবুবাতে এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা করা হবে। পঞ্চম ডিসকভার ১৯৫১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি



কোরিডায় কেক ক্যানাভেরাল ঘাঁটি থেকে
থার-এবল-৩ রকেট আপন নাসিকাগে
এক্সপ্লোরার-৬কে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং ৬৪ ডিসকভারার কক্ষচ্যুত হয় ২০শে
অক্টোবর।

এর পর ১৮ই সেপ্টেম্বর মহাশূন্যে উপিত হয় '৩য় ভ্যানগার্ড'।

এর জীবকাল ৩০ থেকে ৪০ বৎসরকাল হবে বলে আশা করা হয়।
অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতি এর মধ্যে রয়েছে। মহাশূন্যের
অবস্থা সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য এ সরবরাহ করবে বলে বিজ্ঞানীরা
আশা করেন। চৌম্বকবল সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও অন্ধকারেই
রয়েছেন। চৌম্বকবল কি কারণে? আবহাওয়ার মত চৌম্বক-
বল সম্পর্কেও কি পূর্বাভাব দেওয়া সম্ভব? এ নিবারণের উপায়
কী? বিজ্ঞানীরা আশা করেছেন ৩য় ভ্যানগার্ড এই সকল প্রশ্নের
উত্তর দেবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতঃপর ১৯৫১ সালের ১৩ই অক্টোবর ৭ম
এক্সপ্লোরার মহাশূন্যে প্রেরণ করে। প্রায় ২০ বৎসরকাল এটি
কক্ষপথে থাকবে বলে আশা করা যায়। মহাশূন্যে শক্তিশালী
মহাজাগতিক রশ্মি ও সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত এক্স রশ্মি ও
অভিব্যক্তি রশ্মি প্রভৃতি নানা ধরনের বিকিরণ পরিমাপ করার
উপযোগী যন্ত্রপাতি এই কৃত্রিম উপগ্রহটির মধ্যে রয়েছে।
এই যন্ত্রপাতিগুলি সর্বসময়ে ৭টি পরীক্ষাকার্য চালাচ্ছে। এর
মধ্যে চারটি পরীক্ষা হল মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণ সংক্রান্ত,
একটি পরীক্ষা উদ্ভাষণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং অবশিষ্ট
দুটি হল কৃত্রিম উপগ্রহের আভ্যন্তরীণ ও বাইরের তাপের
পরিমাপ এবং মহাশূন্যের পরিবেশে অরক্ষিত সৌরকোষের
প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত পরীক্ষা। পৃথিবী কতখানি প্রাণশক্তি সূর্য থেকে
লাভ করছে এবং কতখানি শক্তি মহাশূন্যে ফিরিয়ে দিচ্ছে তা নিরূপণ
করাই তেজবিকিরণ পরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১৫টি কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে শেষ দুটি উপগ্রহ ৭ম ডিসকভারার
ও ৮ম ডিসকভারার মহাশূন্যে প্রেরিত হয় যথাক্রমে ৭ই ও ২০শে
নভেম্বর।

আবার বসন্ত এল

জয়ন্তী সেন (বসু)

আবার বসন্ত এল নতুন আশার বাণী লয়ে
এল কি নতুন দিন, সূর্য্য তায় প্রসন্ন নয়ন
মেলে মিল নীলাবরে, বসন্তেরে দেখি
সোনালী রশ্মিতে তার মেঘেদের অপূর্ণ বয়ন।

কল-কারখানা ঘোঁরা, হেঁধা জন্তু-বাস্ত মানুষেরা
দশটা-পাঁচটা সার দলে দলে কেহাগীর ভীড়ে
শান্তি নেই, নেই যেন জীবনের বলিষ্ঠ ব্যঙ্গনা
তবু ক্লান্তি, লগ্নয়েরে কটন বন্ধনে রাখে ঘিরে।

তবুও বসন্ত আসে, ইট-কাঠে ভরা কলকাতা
তবুও কোকিল ডাকে, সবুজেরা তবু যেন হাসে
দীপ্তি হীন, ভূপ্তি হীন মল্লতীর্থ এই তো পৃথিবী
তবুও জড়তা ভেঙ্গে বসন্ত আবার ফিরে আসে।

ভাল ছেলে
—মুদ্রিত ত্রিপাঠ

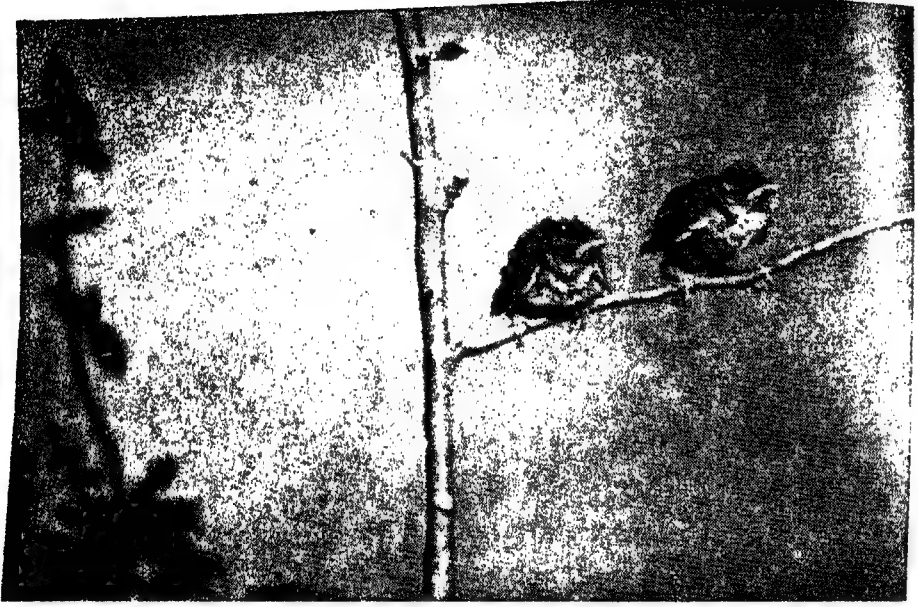


[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম থাম ও
ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]



চলমান দোকান
—নীপক খোর





অবাক পৃথিবী ।

—বিশ্বরূপ সিং

বিশ্রাম

—শেখারী চট্টোপাধ্যায়





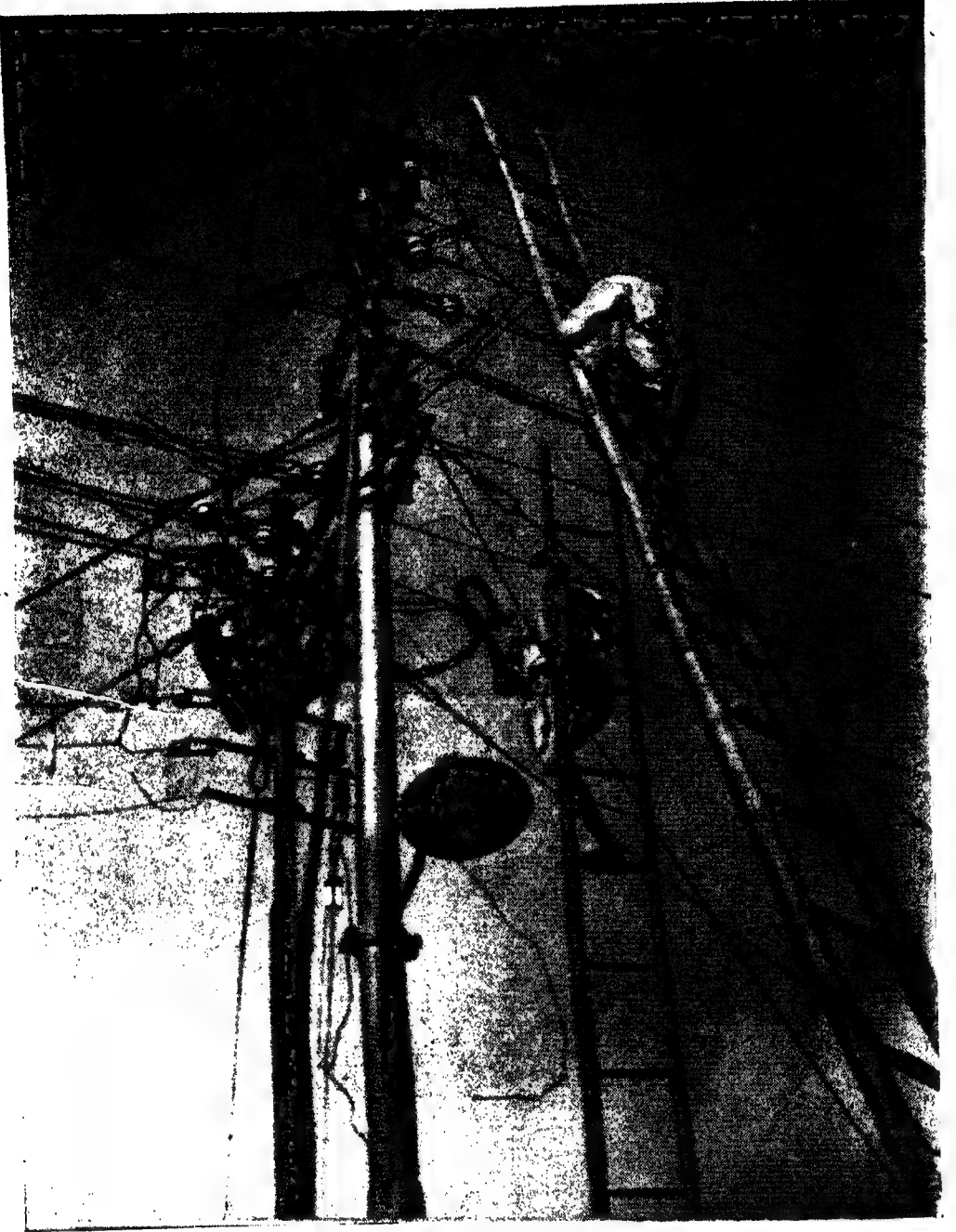
ভাই-বোন

—ই ডিও বীণা

সাক্ষসজ্জা

—প্রবন্ধ মিত্র





अमजोबी

—क्यावकाङ्गि दाऊद

বিপ্লবের সঙ্কাতে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচাশ বছরীণ ভারত কথা আপাততঃ বর্ণিত বেধে আমাকে একটা গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করতে হচ্ছে। গত সংখ্যায় আমি অধিকাংশ বিবরণ লিখেছি,—সেটা আমার স্মৃতিশক্তি দেখা বিবরণ। মাসিক বসন্তমতীর যে-পাঠকেরা আমার লিখিত বিবরণটা পড়বেন,—তাদের একথাটাও জানা থাকা প্রয়োজন যে,—বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ডাক্তার বাহুবোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত বিবরণ পুস্তক "বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি"তে—অধিকার আদ্বৈতত্বা সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে,—সেটা আমার বিবরণ থেকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের—একটা পৃথক গল্প। সুতরাং আমার অবস্থা সত্যাপন—কারণ আমি সাহায্য লোক—নেতা নই।

কিন্তু যেহেতু আমি আমার বিবরণ বাতিল করতে প্রস্তুত নই, অতএব বত পাগই লোক—আমাকে বাহুবোপাল বিবরণ বিশ্লেষণ করতেই হবে।—সব বিধা-সন্দেহ তাগ করি' যুক্তি ও সাক্ষ্যপ্রমাণের কঠিনপাথরের সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে হবে। কারণ বিষয়টা তুচ্ছ নয়।

প্রথমে বাহুবোপাল প্রস্তুত বিবরণটা উদ্ধৃত করা যাক। তিনি লিখেছেন (বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি—৫১৩-১৪ পৃষ্ঠা)—

"আমি ১৯২৬ সালে আলিপুরে বসলি হয়ে আসি—...আলিপুরে রাজবন্দী মহলের একটা দুর্গম দুঃপাথর রটে গিয়েছিল। আমাদের নতুন করে পুনর্মিলন-গঠনের কাজ চলছিল—বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি সংগঠন—'জহাঙ্গীরনামা সমিতি' ও 'যুগান্তর'—এক হয়ে বাচ্ছিল। পুস্তক সংকলন-চরিত্র বাহু, তাদের এড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা কড়ার স্থান আলিপুর জেলেই করে নিতে হয় (১)। আমার চিরপ্রিয় বন্ধু নরেন্দ্র সেন : তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম—...দ্বিগুণ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী একতরফা বাহু বাঁধা লোকদের নিয়ে বসবাস করবেন। আমি থাকবো দোতলায় বেগের দোকান খুলে পাঁচ রকম ভাল মদ মশলা নিয়ে (২)। একজন বাঁ (হিন্দু) আমাদের সঙ্গে দোতলায় থাকতো (৩)।...তার সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কিছুই আমি জানতাম না। জেনেছিলাম সে বিক্রোহী সংসদের লোক। বিক্রোহী সংসদে চাটগাঁয়ের কয়েকটি লোকও ছিল। এদের পরামর্শের মধ্যে সেমন মিল ছিল না—মন-ভার-ভার অবস্থা ছিল—...বার সঙ্গে অল্প দলের কেউ বিশেষ পৌছার্য রাখতো না। ওটা ছিল কলারিলি ব্যাণার। আমি তাকে আদর করে একটা নামে ডাকতাম। সে তাতে জারি খুশি

হত। হায়রে, রেহ-বুদ্ধি!...আমার জেলখানার কর্মী বলেন—আমার জেলখানা সর্বদা সর্বত্র প্রেরী বৈধিত। আমি কোথায় কি হচ্ছে জানি না। অথচ মোয়েলা বিভাগ থেকে আমার জানার কবে কি ঘটছে। আপনি সর্বক থাকবেন (৪) আমি প্রশ্ন করলাম আমার সর্বক করার অর্থ কি? আমি তো জেলী রাজনীতি করি না। তিনি বলেন—বৈধী প্রশ্ন করা নিষেধক। তাঁর সন্দেহ, জেল থেকে মোয়েলা বিভাগে যাবার দায় (৫)।

"আমার শরীরে একটা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে অস্ত্র আমাকে শত্ননাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে কলকাতার ডীপ হিন্দু-মোজের লাক্ষী স্ত্রক হয়। পুলিশ লাক্ষী থামাতে ব্যস্ত ছিল। আমার জেলখানার কিরিয়ে অনার পাছারা পাওয়া না যাওয়ার আমাকে অমর্যক কিছু বেশিদিন হাসপাতালে থাকতে হয় (৬)।

"এই মধ্যে বাঁ সাহেব একদিন হাসপাতালে এসে উপস্থিত। বলল, তার ভাই হাসপাতালে অস্ত্র রাখী ছিল। তাকে সে দেখতে আসে (৭)। সেই সুবিধার আমার সঙ্গে দেখা করে মো (৮)। খেদ করে বলে, তাকে কেউ ভালবাসে না (৯)। আমি কেন জেলে ফিরে যাচ্ছি না? কতদিনে যাব? কবে যাব? ইত্যাদি—(১০)। বেশ ব্যস্তে পারলাম, তার দ্বন্দ্ব বড়ই, তাকে অনেক ভাল কথা বললাম। সে সমরমত বিহার নিলা। দুঃখিত (১১)। সেদিনের বিহার বড় ব্যাধাচারক (১২)। সে আমার পায়ের খুলা নেবে—আমি দেব না। এটা আমি বহুকাল করে পল্লব করে আসছি। সে আমার সঙ্গে সমরমত বস্ত্রাভি আরম্ভ করে দিল। পায়ের পাঠার হাত নিতে না পায়লেও হাঁটর নীচে ছুঁয়ে সেই হাত মাথায় লাগিয়ে চলে গেল (১৩)।

"তার পর গেছে একদিন। আমি সুবাস পেলাম, বাঁ পায়ে আগুন লাগিয়ে আদ্বৈতত্বা করেছে। যেদিন সে শত্ননাথ হাসপাতালে আসে, ঐদিন রাতে সে নিজের গারে আগুন লাগিয়ে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। তা সামলে রাখা হয়। পুলিশের তরফ থেকে ধুম করে অহুসন্ধান চলে (১৪)। সে আদ্বৈতত্বা সত্যই কি করেছিল? অথবা অস্ত্র কেউ বা কাহা তাকে ঐ পাত্রে হত্যা করেছিল? (১৫)।...আমি হাসপাতাল থেকে জেলে প্রত্যাবর্তন করলে চিঠি আমার দেওয়া হয় (১৬)। তাতে

সে বহু অপকর্মের স্বীকারোক্তি করে বাই (১৭)। জেল থেকে সে গোয়েন্দা বিভাগকে খবর সরবরাহ করতো। সময়সমত এই চিঠি গৈনিক কয়েদার কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয়। চিঠিখানি জেলের শর্ত সতর্কতা এড়িয়ে গোপন পথে দূর বোসের কাছে পাঠানো হয়।

সেখা বাচ্চে, অজিত মৈত্র নামক একজন ডেটিনিউয়ের অস্তিত্বই যেন বাহাদুর অজ্ঞাত ছিল, বা অধিকার আত্মহত্যার ব্যাপার সম্পর্কে অজিত মৈত্র নামক কোন ডেটিনিউয়ের কোন সম্পর্কের কথা বাহাদুর জানতেন না। অথচ অধিকার যে চিঠি কয়েদারের ছাপা হয়েছিল, সেটা যে অধিকারের হস্ত লিখিত, এটা দেখাবার জন্য চিঠিটার যে কটোটাট কপিই ছাপা হয়েছিল, তাতে “ভাই অজিত” বলে হস্তাক্ষর করেছে চিঠিটা স্পষ্ট হয়েছিল। সে চিঠিটা যে বাহাদুরকেই দেওয়া হয়, এবং তাঁর ব্যবস্থাতেই কয়েদারের পাঠানো হয়, তা তিনি নিজেই বলেছেন। সুতরাং অজিতের নামটা বাহাদুর ভালো করেই জানতেন।

অজিত চিঠিটা চেয়েছিল,—কিন্তু তাকে সেটা দেওয়া হয়নি এই কথা বলে’ যে, এখন নয়, পরে নিও, আমাদের কাছেই থাক। It is your property, তুমি পাবে। তারপর সেটা কয়েদারের পাঠানো হয়।

অজিতের কাছে আমার বাতায়ত আছে শুনে কিছুদিন আগে অমর ঘোষ আমাকে বলেছিলেন,—তাকে একদিন আমার এখানে নিয়ে আসতে পার না? অজিতের সমঝোতা বলে সেটা হয়নি। অর্থাৎ অমর বাবুর এখনও অজিতের ওপর একটু টান আছে, বার স্ত্রপাত ঐ অধিকার প্রভাব থেকে তাকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টার মধ্যে। সেই তাঁর অজিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সেই অজিত বাহাদুর গল্পে বোমাশূন্য পানোব হয়ে গেছে। একি শুই বিস্ময়? বাহাদুর গল্পের ১৭টা জারগার আমি নব্বই গিয়েছি, কারণ ওর সবক’টিই তুল। আর বেড় পৃষ্ঠার গল্পে যদি ১৭টি তুলেব একটি ছন্দর মালা গাঁথা হয়, তা হলে রঙাবতই মনে হয়, তুল নয়—সন্ধান গল্প রচনা।

কথাটা বড় দুঃসাহসের কথা। কিন্তু এর চেয়ে দুঃসাহসের কথাও আছে! এমন বেপরোয়া ভাবে এই গল্প রচিত হয়েছে যে, রচয়িতার হ’ল নেই যে, অনেক কথা শুধু পরাম্পরবিরোধী নয় অনেক কথা অসম্ভব—কোন প্রকারেই সম্ভব হতে পারে না। এমন বেপরোয়া হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, বিপ্লবাস্কোলাল সম্পর্ক তাঁর মত একজন নেতার গল্পের কেউ যে কোনদিন প্রতিবাদ করবে, একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি—বিশেষত ত্রিশ বছর জেলের এক “স্পাই” সজোক্ত গল্পের।

কিন্তু আমার গল্প শুধু অজিত মৈত্রই সমর্থন করেন, এমন নয়, বরং অমর ঘোষও সমর্থন করেন,—বিনি বাহাদুর সঙ্গে পরামর্শ করেছে অজিতকে অধিকার প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

একদা বাহাদুর গল্পের বিবরণ করা থাক :—

(১) অমূলীন-যুগান্তরের মিলনের ক্ষেত্রে কথা কওয়ার স্থান লাগি “আলিপুর জেলেই করে নিতে হয়।” শুনে হাসি পায়। আলিপুরে সে সময় অমূলীনের একটামাত্র নেতা ছিলেন নয়েন সেন

এবং যুগান্তরেরও একটি হাত নেতা ছিলেন বাহাদুর। মিলনের কথাবার্তার প্রবেশ হয়েছিল ২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে, এবং কথাবার্তা অনেকখানিই এগিয়েছিল। কারণ সেখানে দুই দলের অনেকগুলি নেতা অনেকদিন একত্র ছিলেন—যুগান্তরের বাহাদুর, মনোহরজননা (গুপ্ত), তুণ্ডপতিলা, ময়েশনা (চৌধুরী) যুগান্তরেরই জাতি বিশিনদার দলের গিরীন্দা (ব্যানার্জি) এবং অমূলীন (মুখার্জি)—আর অমূলীনের প্রভুল গাঙ্গুলী, ববী সেন, অমৃত সরকার এবং সত্যীশ পাকড়ানী। যুগান্তরের নেতা উপেন ব্যানার্জি, অমর চ্যাটার্জি এবং প্রভুল ঘোষ, ২৬ সালের প্রথম ভাগেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং দুই ‘দলে’ কথাবার্তার মতন কোন কাণ্ড ঘটানোর কোন Scope ই ছিলনা। মাঝে মাঝে নয়েন বাবু বাহাদুর একসঙ্গে বেড়াতেন এবং কথাবার্তা চলছে ভেবে আমরা ঠিকের সঙ্গে যেতুম না—এই পর্যন্ত।

মিলনের কথাবার্তার প্রথমভাগ মেদিনীপুর জেলে, এবং final amalgamation এর ক্ষেত্রে সকল দলের নেতাদের তিন দিনবাগী গুপ্ত সন্মেলন ২৮ সালে আমাবই হয়ে হয়—সে কথা বাতায়তের আসবে আর মাঝখানে ২৬ সালে আলিপুর জেলে বাহাদুর এবং নয়েন সেনের আলাপন।

(২) “দ্বির হল, রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী একতলার বাছাবাছা লোক নিয়ে বসবাস করবেন। আমি থাকবো দোতলার বেণের দোকান খুলে পাঁচ বকম ভাল ও মন্দ মশলা নিয়ে।”

“বাছাবাছা লোক” মানে অমূলীন ও যুগান্তরের বাছাবাছা নিশ্চয়—যেমন বরুন নৃপেন মজুমদার, বিরণ দে, প্রভৃতি। আর “বেশ মশলা” যেমন বরুন, অমর ঘোষ, মনোমোহন ভট্টাচার্য, অমূল মুখার্জি প্রভৃতি। হাস্যো না কাঁদবো, ভেবে পাই না। ২৩ সালে রেগুলেশন থির প্রথম ব্যাচে যুগান্তরের লাদারাই অন্তত ডজনখানেক, এবং তাঁরা যে প্রথমে দোতলাটাই দখল করেছিলেন—ফিরল ইয়ার্ড থেকে উপেনদা প্রভৃতি কিংবে এসে যে দোতলাতেই উঠেছিলেন, সেই থেকে ২৮ সাল পর্যন্ত দোতলাটা ছিল প্রধানত যুগান্তরদেরই একচেটিয়া এবং নেতাদের একচেটিয়া। অজ্ঞানল বা বড়তি পড়তি, এবং ছুনিয়ার মতই ব্যবহার একতলার থাকতো। এ ব্যবহার ব্যতিক্রম করা অসং হিটলার এলও পারতো না।

(৩) “একজন ধী (হিন্দু) আমাদের সঙ্গে দোতলার থাকতো।” হায় বেতুল! সে যে গায়ে আঙুন লাগিয়েছিল নোচের ঘরে এক তলার। “পাঁচ মিশেলী” দেখাবার জন্য তাকে দোতলার আনা যে একটা দুপুরে ডাকাতি। আর অধিকা নামটা উচ্চারণে এমন সর্বাঙ্গিক আপত্তিটা কি ‘ঘরি মাহ, না ছুই পানি’র একটা উৎকট দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু? কিছু ঢাকা দেওয়ার পরেই অধিকা নামটা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে।

(৪) “জেলখানার কর্তা বলেন গোয়েন্দা বিভাগ থেকে জারার জানায় (জেলে) কবে কোথায় কি ঘটছে—আপনি সতর্ক থাকুন।” কোনো স্পাই যদি জেল থেকে গোয়েন্দা বিভাগকে গুপ্ত খবর দেয়, তখন সেটা জেল কর্তৃপক্ষকে জানাবে স্বয়ং গোয়েন্দা বিভাগ, কেন বাহাদুর? আপনাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য? তপস্বী।

অধিকার চিঠির মত চিঠি এখন বিপ্লবীরা কয়েদারের ঘোঁড়ানে পাঠায়, তখনই গোয়েন্দা বিভাগের প্রবেশন হয় জেল কর্তৃপক্ষকে

গাফিলতী করার দ্বারা বন্ধক দেওয়ার। আমি জেলের মধ্যে
‘কোথার কি ঘটছে’ সবই বিপ্লবীবাণ্ড এবং স্পাইয়ের একা?।

(৫) “আমি তো রাজনীতি করি না। তাঁর সন্দেহ, জেল থেকে গোলন্দাজ বিভাগে খবর দায়।” কথাটা কি “আমি তো কলা খাইনি” ধরণের হল না? spy theory খাড়া করার জন্য এতটা বাহুল্য কি নিশ্চয়োক্ত নয়?

(৬) “অস্ত্রাণচারণের প্রয়োজনে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ দালা খামাতে ব্যস্ত ছিল। আমার জেলখানার কিরিরে আনার পাহারা পাওয়া না যাওয়ার আমাকে অনর্থক কিছু বেশিদিন হাসপাতালে থাকতে হয়।” সমস্ত পুলিশ এতদিন ধরে এত ব্যস্ত ছিল দালা খামারার জন্য যে, escort-এর অভাবে বেশ কিছুদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হল, কারণ তাঁকে জেলে কিরিরে আনতে একটা প্রকাণ্ডবাহিনী সরকার, ব্যাপারটা কি এই?

(৭,৮) “এই মধ্যে ঝাঁ সাহেব একদিন হাসপাতালে উপস্থিত। তার ভাই—রোগী ছিল। তাকে সে দেখতে আসে। সেই সুবিধার আমার সঙ্গে দেখা করে নেন।”—অর্থাৎ সে স্পাই ছিল বলেই তাকে জল সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, এবং escort-এরও অভাব হয়নি—তার জন্যে ২১ জন পুলিশই বঁধেই কিনা!

(৯,১০) “খেদ করে বলে, তাকে কেউ ভালবাসে না। আমি কেন জেলে কিরে বাচ্চি না—ইত্যাদি।”—Spy এর মুখে এমন কথা! আর দুজনের পাহারা-পুলিস নিশ্চয়ই সরে গিয়েছিল, কারণ তাদের সামনে ভালবাসাবাসিটা কি ভাল কথা?

(১১,১২) “বেশ বুঝতে পারলাম, তার ক্ষমতা বড়ই ক্ষুধাতুর। তাকে অনেক ভাল কথা বললাম।—সেদিনের বিদায় বড় ব্যাধনায়ক।—অর্থাৎ Spyটা বাহুদার বিরুদ্ধে কাতর, এবং বাহুদাও তাকে বড় ভালবাসতেন। বাহুদা যদি সেদিন জেলে ফিরে যেতেন, হয়ত অধিকা আত্মহত্যা করতো না। অর্থাৎ অধিকার স্নেহ-বৃত্তি বিরহ কাতর দুঃস্বপ্ন তাঁর প্রতি একটা আশঙ্ক ছিল বলেই সম্ভবত তার আত্মদগ্ধি এসেছিল, এবং তার আত্মহত্যার প্রাক্কালে বাহুদার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অনাবিল স্নেহের। অজিতের ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জানা ঘুরে থাক, অধিকার আত্মহত্যার সম্বন্ধে বাহুদার সৌজন্যবোধ বিস্ময়কর দৃষ্টি ছিল না। তিনি সে ঘটনার কিছুদিন আগে থেকে কিছু দিন পর পর্যন্ত জেলেই ছিলেন না।—কিন্তু অধিকার চিঠিটা বাহুদার নামে না হয়ে অজিতের নামে হওয়া কি উচিত হয়েছে?

(১৩) “সে আমার পায়ের ধূলা নেবে,—আমি লোব না। এটা আমি বহুদিন ধরে পালন করে আসছি। সে আমার সঙ্গে পঙ্কর মত খন্ডাখন্ড আরম্ভ করে” দিল।—“পায়ের ধূলা দিতে চায় না। অনেকেই—কিন্তু কেউ সেটা পালনও করে না, এবং তা নিয়ে ‘গভীরতা’ও করে না। কিন্তু ভাল মানুষ সাজার এতখানি প্রয়োজনেও হয়ত কারো কখনও হয় না।

(১৪) “পুলিশের তরফ থেকে ধুম করে আত্মসন্ধান চলে।”—ধুম করে আত্মসন্ধান চলে না। কেন চলবে? ফটিন দায়িক সকলের Statement নেওয়ার জন্যে পরদিন সকালে Lowman ও কুপেন গাট্‌য়ে এসেছিলেন—দাঁচের ধরে যশে সকলের সামনেই সকলকে বিজ্ঞাপন করিয়েছিলেন,—অজিতও সেখানে গিয়েছিল,—কুপেন

মাগুয়েন্টাম

পচমনিবারক স্নিগ্ধ
নিম্ন মলম

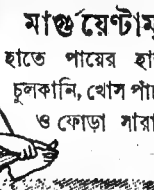
মাগুয়েন্টাম

কেটে গেলে, ছুড়ে
গেলে, বললে গেলে
ও পুড়ে গেলে
আরোগ্য করে।



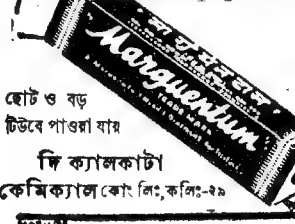
মাগুয়েন্টাম

হাতে পায়ের হাতা,
চুলকানি, খোস পাঁচড়া
ও কোড়া সারায়।



মাগুয়েন্টাম

ব্রণ,মেচেরা, ছুলি ও
অজান্ত চর্মরোগ
দূর করে।



ছোট ও বড়
টিউবে পাওয়া যায়

কি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল কোং লিমিটেড, কলিকতা-২৯

চাইবে তাকে কিছু বেতাল। প্রায় করতে সে চিৎকার করে তাঁকে
হায়েত খিয়েছিল,—সকলে ঘরে ফেরতে সে জুতো ছুঁড়েছিল, বাস!
অনুগ্রহান এই পর্যন্ত। তার শেষ ফল, অজিতের মশোর জেলে বন্দী।
বন্দীর জেলটা ছিল শান্তির হারণ—নানা অসুবিধা এবং ম্যালেরিয়ার
জাড়া।

পায়েই চকিরেখের ইয়ার্ডে হঠিনারায়ণ চন্দ এবং বীরেন বানার্জি
টিসেন,—তারা আমার গল্প সমর্থন করেন এবং বলেন তাঁরা কোন
‘দুঃস্বপ্নে অনুগ্রহান’ টের পাননি।

(১৫) ‘সে আশুভত্যা মতাই কি করেছিল? অথবা অত
তোটা কাব্য তাকে ঐ ভাবে হত্যা করেছিল?’—সে বন্ধন ন্যাই,
জীবন আশুভতার চেয়ে হতাই বেশী মনুষ্য-পুলিশের অনুগ্রহানের
দুঃ এই সম্বন্ধেই। সীতের ঘরেই যদি কাণ্ডটা বটে থাকে, হায়ে,
জালা বন্ধ অথবা মধ্য, তাহলে সীতের ঘরেও কেউই হত্যা। কিন্তু
যে মনের ব্যাঘাতিক কবল চাপা গিয়ে আঙন মিথিয়েছিলেন বলে
সকলের কাছেই বসেছিলেন, তাঁর ওপর পর্যন্ত পুলিশের কোন সন্দেহ
ছিল বলে কখনও কেউ কিছু পোনেননি। জেবাত হয়নি। ‘খুম’
বটে।

(১৬, ১৭) ‘আমি হাসপাতাল থেকে জেলে প্রত্যাবর্তন করলে
চিঠি আমাকে দেওয়া হয়। তাত সে বহু অপকর্মের স্বীকারোক্তি
করে বায়’—বীকুড়া জেলে গণেশ ঘোষের পলায়ন চেষ্টার সময়
অধিকা সেখানে ছিল—কোন অপকর্ম করেনি। আলিপুরে
করেন বাসে এমন কিছু বৈপ্লবিক বড়বড় হয়নি, যা নিয়ে অপকর্ম
‘বহু’ হতে পারে। বাইরে করেক বছর ধরে বোমা-কলক, ধুমোখনির
সঙ্গে সক্রিয় ছিল,—‘বহু অপকর্মের স্বীকারোক্তি’ হতে পারে সেই
বাইরের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে। বাহুরার গল্পের মধ্যে তার একটাও
উল্লেখ নেই।

কিন্তু তার বাইরের সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কোন অপকর্মের কথা
বলে না। অজিত মৈত্র বলে না। অতুল রায় বলেন, অধিকা যদি
ন্যাই হত, আমাদের রাজবন্দী হতে হ’ত না—যানি টানতে হ’ত।
নর্থবেল খুশান্তর পার্টির একমল কর্মী নীলফমারীতে এক বৈঠক
করে অধিকাকে ন্যাই বলে প্রচার করা হয়েছে বলে দৃংখ প্রকাশ
করে এবং অধিকার স্মৃতির প্রতি প্রদর্শন দিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ
করেছিল। তার মধ্যে জুনিয়ার লীডার কাসী বাকচিও (কাসাদা)
ছিলেন। তিনি দাগদের বিশ্বস্ত অম্বচর,—বহুরারও বিশ্বস্ত,—এবং
সম্প্রতি সে কথা সমর্থন করেছেন।

অতুলদারও তাকে ন্যাই বলেননি। শুধু তা নয়, তিনি তা
বলতে পারেন না। কারণ শান্তি চক্রবর্তীকে চরম দণ্ড দেওয়ার
সিদ্ধান্ত যে সভার স্থির হয়েছিল, সে সভা হয় নিমন্তলা শ্রাণনিবাটে
হায়ে এক সে সভার অতুলদারও উপস্থিত ছিলেন, এবং অজিত এবং
অধিকাও উপস্থিত ছিল।

বহুরার আগে অধিকা যে অতুলদারকে ডেকে পাঠিয়েছিল,
অজিতকে ডাকেনি, তার ব্যাখ্যা, অজিতেরও ধারণা অতুলদার কাছ
থেকে অজিতের মনোভাব সম্বন্ধে কিছু শুনে, তারপর হয়ত তাঁকে
বিস্তারিত অজিতকে ডেকে পাঠাতো। কিন্তু তার শেষ ইচ্ছাটুকুও পূর্ণ
হল না।

অধিকা ন্যাই হলে অজিত এবং অতুলদার শান্তির ব্যাপারে

ভিত্তি পড়তেনই, আরো করেক জনও বেহাই পেতো না।
অতুলদার তো, অজিত না। অজিতের তো অজানা নয়।
এই অজিত মৈত্র বাহুরার সঙ্গে একবারে out of picture।

সত্য মিথ্যা বিচারের ভার শান্তিকরের হাতে কেন্দ্র গিয়ে আমি এ
প্রসঙ্গ এই বলে শেষ করতে চাই যে, সে সময়ে যে ব্যাপারটা আমার
শুধু বিবরণ মাত্র জেনেছিল, আজ ৬০ বছরের ব্যবধানে ঠাঁড়িয়ে সে
ব্যাপারটার কথা ভেবে, বিশেষত বাহুরার বই পড়ে আমার শুধু এই
কথাটাই মনে হচ্ছে বিপ্লবান্বেষীদের এবং বিপ্লবীদের চিত্রের এই অজাত
চিকটা চিরকাল যেদের সোজের অজাত থাকলে বিপ্লবান্বেষীদের
সিঁখত ইতিহাস হবে একটা জুয়াচুরীর নামান্তর।

এখন অন্তরীণ বাহুরার কথা বিবেচনা করা যাক। প্রভাস
লিডারায় এসে আমার পাবনা বাহুরার কথা শুনেই গাড়ীর সম্বন্ধ জেনে
নিয়ে, ‘আমহি’ বলে চলে গেল, আমার escort watcher হুজুর হাফ
হেতে বাচলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে প্রভাস আবার ফিরে এল,
গাড়ীতে ওঠার সময় হয়েছে বলে ওদের সঙ্গে মালপত্র নিয়ে আমার
গাড়ীতে কুলে চিত্তে চললো। আমি গাড়ীতে উঠে বসলে প্রভাস
প্রাটিকরমে গাড়ীতে কথা কইতে লাগলো। তারপর গাড়ী হাড়তেই
সে টুপ করে গাড়ীতে উঠে পড়লো। ওরা ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে
থাকলো। প্রভাস বললে রাণাঘাট পর্যন্ত টিকিট কিনে এনেছি।

তারপর চললো গল্প। প্রভাস বি পি সি সি এবং কর্মসংঘের
কাণ্ডকারখানার কথা বললে। শাসমলের সঙ্গে আমাদের বি পি সি সি
ক্যাঁপচারের লড়াই, দপ্তর নিয়ে সরে পড়া, জবর দখল, গুপ্তার
আমদানী, বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে কেমন করে শাসমলের গুপ্তারা
ওদের আটকে ফেলেছিল, কেমন করে ওরা জানালা টপকে পাগিয়েছিল
ইত্যাদি। তখন কংগ্রেস অফিস ছিল ১১৬ নং বৌবাজার স্ট্রীট
নাড়াজালের রাজা দেবেন্দ্রলাল ঝাঁর বাড়ীতে। কর্মসংঘের অফিস
এবং মেস ছিল কলেজ স্কোয়ার ও মিরাঁপুর স্ট্রীটের কোণায়।

আমি অধিকার আত্মহত্যা এবং অনন্তহার প্রমোদরঞ্জনের কিসির
গল্প বললুম। প্রমাণ হয়ে গেল, বিপ্লবটা বাইরের থেকে জেলের
ভিতরেই চলছে অনেক বেশী জোরে। কংগ্রেস ও ক্যাঁপচার নিয়ে
দলাদলিটা খাঁটি অহিংস না হলেও নিরামিষ তো বটে। সরকার
শুধু মজাই দেখে।

রাণাঘাটে প্রভাস নেমে গেল। আমি পাবনার পৌছালুম
রাতে। পুলিশ সাহেবের অফিসে গিয়ে তললুম, তিনি শিকারে
গেছেন। আই বি অফিসার আমাকে ডি এস পির অফিস ঘুরিয়ে
পুলিশ ক্লাবে রেখে এলেন। তার পরদিন সেখানে খাওয়া লাওয়া
করে চললুম সিরাজগঞ্জ সাবডিভিশনে জামতৈল রেলস্টেশন হয়ে
কামারখন্দ থানার। সৌভাগ্যক্রমে কামারখন্দের দারোগা সৈনিক
কাধোপলকে সিরাজগঞ্জে এসেছিলেন। আমাকে তাঁর সঙ্গে
ভিড়িয়ে দেওয়া হল, পুত্ররা ভাল escortই পেয়ে গেলুম।

অন্ধকার রাতে প্রায় ১০টার সময় স্টেশনে নামলুম। আইল
টাক পথ ধরে যেতে হবে। গরুর গাড়ীও নেই, একটা কুলিও নেই।
একা হলে বিপদে পড়তুম। দারোগা সাহেব (মুসলমান, বহল
বেশী নয়) রেলের কুলি জোগাড় করলেন। এক প্রৌক্তিক
আমিকেন নিয়ে পথ দেখিয়ে চললো।

দারোগা সাহেব কোন ব্যবস্থা আছে কি না, ডিভান্স কতখান
দারোগা সাহেব বললেন, নেই, এক হওবাও শক্ত, এখানে খেতেই
কিছু খাবার খেয়ে বা মিয়ে যেতে হবে। একটা খাবারের
লোকানো শুধুমাত্র টিমটির করে আলো জ্বলছে এই ট্রেবটা আসার
কলপোকেট। যেখান থেকে কিছু টিপিসম্পন্ন কিলে নিলুম।

আধবর্কটিক বেটে ধানার উঠলুম, এবং তারপর সেলুম
“আমার হয়ে।” তেলোবোর্ডের বাজার একদিকে ধানার টিনের বর
তার তার বিশদীভ মিকেই আমার জন্তে নতুন বর তৈরী হয়েছে।
হাতা থেকে এক জুটটাক উঠে খানিকটা জ্বরির ওপর একখানা
কড় নতুন টিনের তাল বর কিছু সোটা আমার বর নয়, সেটা
হাবোজ রেজিষ্টার অফিস—কাজী সাহেবই এই জমিটার জালিক।
অফিসের খানিকটা পিছিয়ে এক পাশে আর একখানা বর টিনের
মোটাল লম্বার বেড়া এককুটী লেডকুটী জামালা নতুন তৈরী হলে
আমার জন্তে। ঘরের মধ্যে আর বাইরের জমি এক level।
সে “মতেও পিটে চৌরস করা হয়নি। তার মধ্যে এক পাশে একটা
ঘাটা, আর একপাশে এক তক্তপোষ বিবাহ করছেন। সমস্ত কাণ্ডটা
লেখ, “এই ঘরে আমার থাকতে হবে?” বলে আমি তক্তপোষ
বসে পড়লুম।

দারোগা সাহেব একটা অপ্রতিভভাবে বললেন,—সব ঠিক
হয়ে বাবে, ভাববেন না—মৌলবী সাহেবের সঙ্গে আমার কথা
আছে আপনাব প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্তে। এখানে
এমন একটা শিক্ষিত জ্ঞানলোক নেই—বার সঙ্গে চট্টো কথা কই।
তাই ডেটিনিউ রাখার বন্দোবস্তের order বখন এসে, তখন কাজী
সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলুম। তিনিও মাসে ১০টা করে টাকা
ডাড়া পাঠান, আর আপনিও থাকবেন আমার কাছেই।

কাজেই বিছানা পেতে শোয়ারি জোগাড় করলুম। এক কলনী
খাবার জল একটা বালতি ও মগ এবং একটা হারিকেন থানা
থেকে দিয়ে গেল। আর সব জিনিস সকালে দেওয়া হবে।

গোবরার সঙ্গে শুভ মেষে ঘুঁটে দিলে কেমন হয়, যদি করনা
করতে পারেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, কেমন সন্দেশ খেলুম।
একটুখানি খাবার চট্টো করে জল খেয়ে শুয়ে পড়লুম। দারোগা
সাহেব বললেন, সকালে সবজিনিসই পাবেন, কাছেই হাটপোলা
আছে। শুনে রাগ হতে লাগলো, কিন্তু এই নতুন অবস্থার
সঙ্গেই তো নিজেকে ঝাপ ঝাঁপে নিতে হবে। দারোগা সাহেব
চলে গেলে চিপাং হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে রাত্তি হয়ে
ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে উঠে একটু সার্ভে করতে বেরিয়ে দেখলুম, বেশিকৈ যত
দূর দৃষ্টি বার, লোকবসতির চিহ্ন নেই। আমার ঘরটা মৌলবী সাহেবের
ভিটের এক পাশে। তার ঠিক পাশে পুণানো কারখানা। এখন
সেখানে কবর দেওয়া হয় না—কিন্তু কবরই কতকগুলো সেখানে
আছে,—এক আমার জানালা দিয়ে থুতু ফেসলে সেই কবরস্থানেই
পড়ে। তারপর খানিকটা চাষের জমি, তারপর একটা ছোট গুনো
খাল,—তারপর একটু দূরে হাটখোলা। খালটা হচ্ছে বৈজ্ঞ-জামাইল
এক কামারখান গ্রামের মাঝের সীমানা। মৌলবী সাহেবের ভিটের
আর হুঁচরখানা ছোট ছোট একদো ডালা-পড়া চালার আছে।
ভিটের অপর পাশেও খানিক চাষের জমি, তারপর নতুন কবরস্থান,

তারপর আবার চাষের জমি, তারপর পুশান। মৌলবী সাহেব
অন্ত গ্রামের বাড়ী থেকে রোজ সাইকেলে আসা-যাওয়া করেন।

হাটখোলা থেকে খালপার হয়ে, থানা এবং মৌলবী সাহেবের
ভিটের মাঝখান দিয়ে, কবরস্থান ও পুশানের পাশ দিয়ে জেলা
বোর্ডের সড়ক চলে গেছে। তারই সমান্তরাল আমার বাসার পিছির
দিয়ে চলে গেছে একটা ছোট গুনো নদী, এবং তার ওপারে নিম্ন
বিদ্যুত চাষের জমি। বর্ষাকালে সে জমি ভূবে সমুদ্র হয়ে যায়,—নদীর
সঙ্গে একাকার হয়ে আমাদের ভিটের কানায় কানায় জল হয়, পাশের
খালেও নৌকা ঘাসে। আমার ঘরের সামনে নদীর ঢালুতে চাষের
বীশ পুঁতে তার ওপর একটা বাঁশের ফ্রেম বেঁধে আমার উঠোন থেকে
চট্টো বীশ পেতে দিয়ে পারখানা বানানো হয়েছে এবং তার বেকা
দেওয়া হয়েছে পাঁকাটি বা পাটখড়ির। দরখা করা হয়েছে একটা
দরখা জুলিয়ে দিয়ে। বাজারও জার তৈরি চ, তবে চাটটা ঠিক
আছে।

কামারখান গ্রামটা খুব ছোট—থানা হাজা একপ্রান্তে রয়েছে
বর মুসলমান কবরস্থান বাস আছে মার। প্রকৃত পক্ষে গ্রামটা বর
জামাইল গ্রামেরই একটা অংশ মার—জামাইল গ্রাম মুসলমানের
বাস নেই, আর কামারখান গ্রামে হিন্দুর বাস নেই। একজন বাজালী
জয়ানার, একজন হিন্দুস্থানী কনাইবল, এবং এক নতুন আমদানী
ডেটিনিউ আমি, এই তিনটি প্রাণী মাত্র হিন্দু।

আমার সরকারী অন্তরীণ আদেশপত্রে শুধু বাসার চৌহদ্দী লেখা

নোনা ৩৪-৩৯৩০

পি, পি, আড্য

জুয়েলার

১২৫-বি. বহুবাজার স্ট্রীট-কলিকাতা-১২

আছে, এবং থানার যোগ হাজিরা দেওয়া হাড়া এই চৌহদ্দীর বাইরে বাওয়া নিষেধ। অর্থাৎ Orderটার মধ্যে একটা ক্লস ছিল, বার কলে আমি দিনরাত ঘরে আটক থাকতে বাধ্য।

সুতরাং আমি একটা দরখাস্ত করলুম। যেদিনীপুর জেলে একবছর থেকে আমি দরখাস্ত লেখা বশু করেছিলুম। সকলের সকল রকমের দরখাস্ত draft করতেন বাতুল—একথানা মোটা exercise book—এক আমি সেগুলোর fair copy লিখে বিক্রয়। কলে দরখাস্ত লেখা বশু হয়ে গিয়েছিল। আমি লিখলুম—আমার দরখাস্ত জানা আছে, Internment Orderএ হুটো চৌহদ্দী দেওয়া থাকে—একটা বিশেষ বেলায় তত—সাধারণত একটা গ্রামের চৌহদ্দী—যেখানে আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি, —আমি একটা চৌহদ্দী হাটের জন্ত বাসার চৌহদ্দী—যেটা আমি সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ভাগ্য করতে পারি না। সুতরাং আমার Internment Orderএ শুধু বাসার চৌহদ্দী দেওয়াটা তোমাদের ক্লস হয়েছে—তার জন্ত কে দায়ী, সে কথা ছেড়ে দিয়ে পরপাঠ Orderটা সংশোধন করে পাঠাও—না হলে আমার নির্জন কারাবাসে থাকতে হচ্ছে।

দারোগা সাহেব বললেন,—আমি কি এসব জ্ঞান মশাই? একটা চৌহদ্দী চেয়েছে, আমি বাসার চৌহদ্দী লিখে দিয়েছি! বাই হোক, দরখাস্তের কলে দিনের চৌহদ্দীর বন্দোবস্ত হল জামাউল গ্রামের আরেক নিয়ে কিন্তু Orderটা সংশোধন হয়ে আসতে প্রায় এক মাস কেটে গেল। আমি সুযোগ বুঝে দিন রাত ঘরে বসে Bertrand Russellএর Roads to freedom বইখানা বাংলায় অনুবাদ করে ফেললুম। পরে Brailsfordএর Russian Worders' Republic বইখানাও ঐখানেই বাংলা করেছিলাম।

দরখাস্তের লেখাটা ভাল,—attitude ভাল,—সরকারী Order যেনে দিনরাত ঘরেই থাকি এবং লেখাপড়া করি—বেশ একটা propaganda হয়ে গেল পুলিশ সাহেবের অফিসে, লোকটা ভাল লোক, এবং গণ্ডিত।

সিরাঙ্গগঞ্জের সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রার প্রাণনাথ সেন non-official visitor, একদিন আমার ঘরে এসে বসে পরিচয় দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি দারোগা সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন কি? —তিনি বললেন, তাঁর কাছে যাওয়ার আমার কোন দরকার নেই—আমি আপনার সঙ্গে privately দেখা করতে পারি। আমি বললুম, আমার ওপর সরকারী আদেশ, আমি বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না, ঘরও receive করতে পারি না। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি দেখিয়ে বললেন, এই দেখুন তিনি আমাকে non-official visitor appoint করে বলছেন, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনার অভাব-অভিযোগ জেনে তাঁকে জানাবো। আমিও আমার Internment Order বার করে তাঁকে দেখিয়ে বললুম,—আমার অনেক অভাব-অভিযোগ আছে—কিন্তু এই দেখুন আমি বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। তারপর ধানিক গুপ্তাধিকার করে হার যেনে কিরে গিয়ে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখলেন—detenue আমার সঙ্গে কোন কথা বলতে রাজি নয়, কারণ আমি বাইরের লোক।

কল হল এই যে, সেখানে আমার একটা propaganda হল,

detenue অফিসে অফিসে Govt. order মেসে চলে। ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সাহেবকে লিখলেন, পুলিশ সাহেব আমাকে লিখলেন, অল্প অল্প non-official visitor—তাঁদের সঙ্গে আমি privately কথা বলতেও পারি, ঘরও তাঁদের receive করতে পারি।

আমি পাবনার হাওয়ার আগে সেখানে এচও সাক্ষাদায়িক দালা হয়ে গেছে—তার কলে হুসলমান পুলিশ সাহেব বকলী হয়ে গেছেন, এবং তাঁর কলে এসেছেন মোহনবাগান দ্বারের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় 'কাহু'—(J. Roy)।

এমিকে ঘরের অবস্থা সবচেয়ে আমি প্রভাসের কাছে একটা বিস্তারিত চিঠি লিখলুম—অভিযোগের সূত্রে নয়—একটা হজাধার প্রভাসের গল্পের মতন করে। সেটা পাশ হয়ে গেল এবং সেটা পেয়ে প্রভাস তার খোরালো ইংরাজী অনুবাদ করে প্রকাশ করে দিলে ফরোয়ার্ড কাগজে, এমন ভাবে যে, আমার চিঠির খবর বলে বোঝা না যায়।

পরের দিন দারোগা সাহেবের কাছে খবর পেলুম, ফরোয়ার্ডে আমার ঘরের এক বিতর্কিত বর্ণনা বেরিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক মোটর বাইকে এক তরুণ সাহেব একটা মাসের কিতে নিয়ে ছড়মুড় করে এক চোটে আমার ঘরে এসে উঠলেন। দারোগা সাহেব ছুটে এসে পড়লেন। সাহেব তখন গভীরভাবে মাগজোপ করতে শুরু করে দিয়েছেন। দারোগা সাহেব নিশ্চেষ্ট সাহায্য করতে লাগলেন। মাগজোপ বেশ হয় ফরোয়ার্ডের বিবরণের সঙ্গে মিললো। দারোগা সাহেব কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করলেন,—বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথা আছে, detenue-এর প্রয়োজন মতন সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে—আমি detenue বাবুকে সে কথা বলেছি।

সাহেব কিছু উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন—আমার সঙ্গে একটাও কথা না বলেই। শুনলুম উনি সিরাঙ্গগঞ্জের S. D. P. O.—অর্থাৎ সিরাঙ্গগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত অ্যান্টিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট—নাম বোধ হয় Minister.

মৌলবী সাহেব এলেন—সব শুনলেন—দারোগা সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ হল। পরদিনই কাজ শুরু হয়ে গেল। ঘরের মেঝে ইটকি ছয়েক উঁচু করা হল, বাইরে রোয়াক হল—নিকিরে দেওয়া হল—রোয়াকের ওপর চাল হল—পায়খানা নতুন করে তৈরী হল—ঘরের জানালা বড় করার ব্যবস্থা হল।

একজন কবাইতুওয়াও—ঠাকুর-চাকর তো দরকার—প্রথমে টিক করা হল এক মালি-চৌকিদারকে, জামাউল গ্রামে থাকে। ধারার কাছে যে চৌকিদারের বাস, তাকে দারোগা-জামাউলের বেগার খাটতে হয় সর্বদাই—তার জন্তে রোজ সকালে তাকে থানার আসতে হয়। চৌকিদারদের হাইনে তখন ৬ থেকে ১ টাকা। অল্প কাজ না করলে চলে না কিন্তু এ বেতোরীর অল্প কিছু করার উপায় নেই। সে বেন বরতে গেল।

একদিন সে বাঁহাছে, এমন সময় এক কনষ্টেবল এসে হাজির—জামাউল বাবু যোড়া খুঁজে আনতে হবে—এখনি। আমি এক ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলুম। চৌকিদার সম্মত হয়ে উঠলো। কিছুদিন বললে, আমি আর কাজ করতে পারবো না। তখন দারোগা সাহেব

হলী হয়েছেন—এক সেকেন্ডে বৃদ্ধ মুসলমান দারোগা এসেছে—বৃদ্ধ, গাভী, ভীত।

চৌকিদারকে বললুম, জমাদারবাবু শাসিয়ে দিয়েছে—এই তো? সে কিছুতেই তা বলে না—বলে, আমার অসুবিধা হয়। সুতরাং একটা লড়াই লাগলো চাকর নিয়ে। জামঠেল গ্রামে এক বুড়ো কামার ছিল গরীব এবং বেকার। তাকে বলা হল—সে রাজী কিছ কামারগিরী রাজী নয়, বলে ওখানে যেতে হবে তো? কিন্তু উনি তো মালির হাতের ভাত খেয়েছেন কাজেই ওখানে খাওয়ার চলেই না।

ঐ গ্রামের এক ছুতোর বড় জানালা বসাতে এসেছিল—তাকে চাকরের সমস্তার কথা বললুম। সে ডেবচিটছে কামার বুড়োর কথা বললে। আমি বললুম তার কাছে লোক গিয়েছিল, সে রাজী কিছ আমি মালির হাতে ভাত খেয়েছি বলে কামারগিরীর আপত্তি। তখন ছুতোর—বুধ টিপে হাসতে লাগলো। আমি বলি, হাস কেন? সে বলতে চায় না। শেষে হাসতে হাসতে বললে—গ্রামে কামার-গিরীর মালি বদনাম আছে।

চৌকিদারী হাজিরার দিন এক বুড়ো হিন্দুস্থানী চৌকিদারকে ডেকে দারোগা সাহেব বললেন, তোর ছেলে তো কিছু করে না, ভাত রাঁধতে পারে? সে বললে, পারবো না কান হুজুর কিন্তু উনি কি পলসো হবে? দারোগা সাহেব আমাকে বললেন, ও কিছু জাতে হুচি—আপনার চলবে? আমি বললুম, খুব চলবে। তাই ঠিক হল।

পরের দিন এক ১৪১৬ বছরের ছোকরা এসে কাজ কর্ম করলো, রাঁধলো, আমাকে খাওয়ালো, বাসন মেলে, উছন নিকিয়ে, ঘেঁষে বলে কিনা আমি বাতী চললুম ভাত খেয়ে আসবো। আমি বললুম, তোর তো এখানে খাওয়ার কথা। সে বলে, না—মা বাবশ করে দিয়েছে। আপনি তো কিরিস্তান।

অবাক কাণ্ড! আমি বললুম, কে বলেছে আমি কিরিস্তান? সে বলে আপনি যে সব-জাতের হাতে ভাত খান। বলে সে চলেই গেল।

দারোগা সাহেবকে বললুম তিনি অস্ত্র লোকের সন্ধান করবেন বললেন কিন্তু লোক মেলে না। মালি-হুচির হাতে ভাত খেয়ে এক দফা গোল পাঁকিয়েছি। তার ওপর মুসলমান বেখে আরো গোল পাঁকিবার ভরসা হল না। জামঠেল গ্রামের হিন্দু একটু খাতির করে, তারও শেষে বিপত্তি বাবে?

সুতরাং পাখনার S. P. রাহে এক ঘোরালায় দরখাস্ত লিখলুম আগাগোড়া ইতিহাস মার জমাদার বাবুর ঘোড়ার গল্প পর্বত। কলে করেক দিন পরেই জমাদার বাবুর বংশীর হুকুম এসে হাজির। আমার কাছেও খবর এল S. P. বরং কামারখন্দে আসছেন।

কয়েক দিন পরে একদিন সকালে খানার “হাতা”র প্রেকাণ্ডে বটগাছের তলার ছায়ার আমার ঘরের প্রায় সামনে এক টেবিল ও দু’খানা চেয়ার পড়েছে একখানা নতুন টেবলকথও পড়েছে আর দারোগা সাহেব full uniform-এর ষাড়া-চুড়ো পরে অপেক্ষা করছেন। বুড়ো হাছব, অনেককণ ঝড়িয়ে, ঘুরে-কিরে অপেক্ষা করার পর হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন—S. P. এসে হাজির গাইকেলে।

দারোগা সাহেব খটস করে সেলাম দিলেন। S. P. চেয়ারে বসেই হুকুম করলেন—ডাকুন detenue বাবুকে। আমি গিয়ে বসতে বসতেই দারোগা সাহেবের বাগা থেকে একগালা গরম লুচি, আলুর দম, হালুয়া আর একটা প্রেট-ভরা ল্যাড়া আম হাড়ানো, টুকরো করা। আমি একটু অশ্রুভিত হতে না হতেই S. P. বললেন—হাত লাগান, এক প্রেটেই চলুক। আমরা খাই আর কথাবার্তা চালাই—আর দারোগা বাবু ঠায় attention হয়ে ষাড়া—এই show জেলা-বোর্ডের বাস্তবায়ন ধায়ে। সুতরাং বাস্তবায়ন হুকিকে একটু একটু তকাক্তে দেখতে দেখতে হুটি রেট ভিড় জমে গেল।

খাওয়া এবং কথাবার্তা শেষ হলে S. P. দারোগা বাবুকে কড়াভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—চাকর পাওয়া যায় না কেন? দারোগা বাবু সটান বললেন, একটা লোকের সন্ধান পেয়েছি—তাহ—আজই তাকে ডাকিয়ে আনবো। S. P. বললেন, কাল থেকেই চাকর চাই, অস্ত্র কোন কথা শুনবো না। আমাকে বললেন, বধন বা কিছু অসুবিধে হবে, আমার কাছে লিখবেন,—একটা খামে ভবে আঠা দিয়ে এঁটে “confidential” লিখে দারোগার কাছে দেবেন। আমি বললুম, তাহলে তো উনি নিশ্চয় চিঠি খুলে দেখবেন, এবং চিঠি চোপে দেবেন। S. P. বললেন, Let him do it—তারপর আমি তার ব্যবস্থা করবো।

S. P. চলে গেলেন। অনেক দূরের অনেক পথ-চলতি লোক কাণ্ডটা দেখে গেল। দারোগা সাহেব একটু চুপে গেলেন। পরদিনই

নীর৷

তাল ও খেজুরের হুমিষ্ট রস

প্রতি বোতল—১২ নং পঃ।

খেজুর সিরাপ

২ পাউণ্ড বোতল

প্রতি বোতল—১-৫০ নং পঃ

সর্বত্র পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তালগুড় শিম্পী

সমবায় মহাসংঘ লিঃ

৪, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা—২৬

ফোন :—৪৬-১২২৪।

❁ কমিশনে এজেন্সী দেওয়া হয়।

একজন চাকর এসে কিছু সে দু'বেলা এসে শুধু বেঁধে খাটয়ে যায় মাত্র। সব অসুবিধা বুজলো না। কিছু গায়ে গায়ে খবর পৌঁছে গেল, বদেলীবাবু দারোগায় চেয়ে বড় অফিসার।

২৪ দিন পরেই এক ঘোরাণা লগ্না দরখাস্ত লিখলুম S. P. র কাছে। তারপর সেটাকে খামে ভরে আঠা দিয়ে এঁটে "confidential" লিখে 'খানায়' মুন্সী সাহেবের (literate constable) কাছে দিয়ে এলুম। তিনি বাঙ্গালী মুসলমান, আধাবয়স, আমি আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলাম। বলে এলুম, দারোগা সাহেব নিশ্চর চিঠিটা খুলে দেখবেন এবং চেষ্টা দেখবেন। আপনি শুধু খবরটা আমাকে দেবেন,—আমি এ নিয়ে লেখালিখি কিছুই করবো না। আমি চাই, চিঠিটা চেষ্টা দিয়ে দারোগা সাহেব একটু জেরে ভয়ে থাকবেন, এবং আমার পিছনে লাগবেন না। মুন্সী সাহেব কথটা বুজলেন এবং দিন দুই পরে বললেন, আপনায় আলাপ ঠিকই হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

নওসের নামে এক জোয়ান ছিল গ্রামের pound keeper কিছু রোগাগারও করতো, এবং সব সময়েই ফিটাবা শুদ্ধ থাকতো, জরজবে করে তেল খেঁচ টেরি কেটে কোট চড়িয়ে খানায় আসতো এবং আমার কাছেও আসতো। সে এক হারমোনিয়াম কিনেছিল, যদিও না পারতো বাজাতে, না পারতো গান গাইতে। আমি গান গাইতে পারি তখন এক দিন হারমোনিয়াম এনে হাজির—গান শুনবে। গান শুনিবে দিলুম, শুনে বলল, ওটা আপনায় কাছেই থাক। তারপর রোগ বিকেলে ঘরের সামনে বাস্তার ধারে মাহুর পেতে বসে গান গাই, নওসের আসে, আরো ২৪ জন এসে জোটে বুড়ো হাজি সাহেবরা পর্যন্ত। দারোগা সাহেব দেখেন, মনে মনে গজবান, কিছু বলতে পারেন না।

একদিন নওসের এসে একগাল হেসে বলল, বাবু, দারোগা সাহেব আপনাকে ভাবি ভর করে। আজ আমাকে বলে কি, তোর সাত বছর জেল হবে, তুই বদেলীবাবুকে হারমোনি দিয়েই তো গানের ঘটা করেছিল। জানিস? ওরা ডাকাত। তা আমি বলি কি, তাহলে বাই, এতুনি হারমোনি নিয়ে আসি। দারোগাবাবু বলে কি, না না, এখন বাগনি, তাহলে বুকে পায়বে, আমি বলেছি, কাল আনিস। বলে নওসের হাসলো। আমি বললুম বেশ, কাল তোর হারমোনি নিয়ে বাস, গানতো অনেক হল।

বুড়ো হাজি সাহেবদের সঙ্গেও আলাপ জমেছে, এবং কথায় কথায় তাদের বুঝিয়ে নিয়েছি আল্লা হচ্ছে জমিদারের দালাল, আর 'মোল্লা'রা সাব দালাল। কথটা সহনীয় এবং গ্রহণীয় করার জন্তে হরিকেও সঙ্গে রাখি—আমাদের হরিণ তাই—জমিদারদের দালাল আর শুক পুতরা সাব দালাল। হিন্দু মুসলমান চাষারা এককটা হল কি জমিদাররা তাদের ঠকাতে পারে? কিন্তু এককটা হওয়ার লক্ষণ দেখলেই একদিক থেকে মোল্লা, আর একদিক থেকে শুক-পুতরা ধর্মের দোহাই দিয়ে, আল্লা হরিণ দোহাই দিয়ে ভেদ ঘটায়, দাঙ্গা বাধায়, চাষারাই মরে, জমিদার মোল্লা পুতরাবের গায়ে

হাত লাগে না। তখন হাজি সাহেবদেরও বলতে হয়, তা, বাবু বলছেন, কথগুলোতো ঠিকই। চাষাদের বুঝি বে বলনের মতন, তাই মারও খায় বলনের মতন। ওরা বৈদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, সেইদিকেই যায়।

তখন সিরাজগঞ্জের এক প্রধান মুসলমান নেতা ছিলেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। উমেদালী সরকার নামক এক ছুঁদে জোতদার খানায় আসতেন। তিনি বলতেন,—ও, বৌ সিরাজী! বেন পারস্ত থেকে এসেছেন। ওর চোদ্দ পুত্র সিরাজগঞ্জের—বৌ সিরাজগঞ্জী। কথটা অবশ্য সহজবোধ্যই।

সিরাজীর একটা বিশেষ অপরাধ ছিল এই যে, তিনি বলতেন, শ্রম নেওয়া যে হারাম, মুসলমানদের এই ধর্মীয় কুসংস্কার একটা সাংঘাতিক নিষিদ্ধতা। হিন্দুরা মহাজনী কারবার করে, সব মুসলমানই তাদের কাছে মোটা মুদে বর্জ করে। শ্রম নেওয়া যদি হারাম হয়, তাহলে নেওয়াটাও হারাম। তবু তারা হিন্দু মহাজনদের পেট ভরায়। মুসলমানদেরও মহাজনী করা উচিত। এ কথাটাও অবশ্য সহজবোধ্যই।

বাই হোক, চাকর আমার টিকলো না। অগত্যা মুন্সী সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলুম। তিনি আমাদের "ভিটের" একটা পড়ো ঘরে বেঁধে বসতেন। বন্দোবস্ত হল, আমি মাছ—কিছু কই-মাগুর মাছ এবং মাঝে মাঝে দুবরী, হাট থেকে কিনে দোব, তিনি রাঁধবেন তাঁর ঘরে, আর আমি আমার ঘরে ট্রেতে দুজনকার ভাত রাঁধবো, তার পরে দুজনে এক সঙ্গে খেয়ে বাসন বুয়ে ফেলবো। তিনি অবশ্য আমাকে বাসন ধুতে সিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন হঠাৎ এক চাকর ছুটে গেল নোয়াখালীর এক জোয়ান, নাম লক্ষণ। বাড়ীতে "বাইয়েরা ক্যারলই খ্যাচর খ্যাচর করে" বলে চাকরী করত বেরিয়েছে, অনেক জায়গায় কাজ করে শেষে জামটেল গ্রামে এসেছিল। জাতে কারু, বেশ পরিচ্ছন্ন স্বভাব।

তখন আমি গড়গড়ায় তামাক খাওয়া ধবেছি। লক্ষণ সর্বদা কান খাড়া করে রাখে, গড়গড়ার আওয়াজ বন্ধ হলেই নতুন কাজ চড়িয়ে দিয়ে যায়। অবশ্য কবে পাটানোর সময় প্রত্যেকবারই বেশ হুঁচর টান মেয়ে ভাল করে বরিয়ে তারপর নিয়ে আসে। মনে হল, এই ধোয়ার বাঁধনেই টিকে বাবে। কিছু দিন বেশ চললো। তাবপর হঠাৎ একদিন বেহালুম উধাও। মাইনের টাকার আদ্যজ মতন টাকা আগে নিয়েছিল, তাছাড়া বাবার সময় একটা কুটোও নিয়ে বায়নি, সব সাক্ষিয়ে শুদ্ধিয়ে রেখে গেছে। বুঝলুম, এমন করেই ও অনেক জায়গায় কাজ করে এসেছে। বলতো, "আমার হস্তল জাপ জাখোনের ইচ্ছা।" অদ্বুত স্বভাব।

২৭ সাল শেষ হয়ে আসছে। বোধ হয় সেপ্টেম্বরের শেষে, হঠাৎ একদিন release order এসে গেল। চাটিবাটি শুদ্ধিয়ে কলকাতায় রওনা হলুম। [ক্রমশঃ]

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বন্ধুঘড়ার উল্লেখ করবেন]

কবি গীতিকার রজনী সেন প্রসঙ্গে

পাঁচবা জেলার অন্তর্গত ডানাবাড়ী নামক স্থানে কবি রজনী সেন জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি কবিতা ও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। সঙ্গীতপ্রতিভা তাঁকে অমর করে রেখেছে। তিনি কবিতা ও সঙ্গীত রচনা-নৈপুণ্যে এতটাই সিদ্ধান্ত ছিলেন যে, অতি অল্প আয়াদেই তিনি উৎকৃষ্ট কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন। বি.এল পরীক্ষা পাশ করে তিনি বাঙালী কোর্টে ওকালতি করতে থাকেন। এই সময় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর রচিত গান লোকের মনে বিশেষ প্রেরণা দান করতে সমর্থ হয়েছিল। স্বদেশী সঙ্গীত 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' কবি রজনী সেনেরই রচনা। ইনি বাণী, কলাগী, আনন্দময়ী, সত্যবন্ধুসম, অমৃত, বিজ্ঞান ও অন্তর প্রভৃতি সাতখানি কবিতা ও সঙ্গীত পুস্তক রচনা করেছিলেন। বাংলা ১৩১৭ সালে ইনি ব্রাহ্মণ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘ আট মাস কাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগভোগের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর রচিত বাণী ও কলাগী নামক পুস্তক দু'খানি সেই সময় বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর 'অমৃত' নামক পুস্তকে মোট ৪৮টি ছোট ছোট কবিতা স্থান পেয়েছে। এগুলি বালক-বালিকাদের শিক্ষাগ্রন্থ করে রচিত হয়েছে।

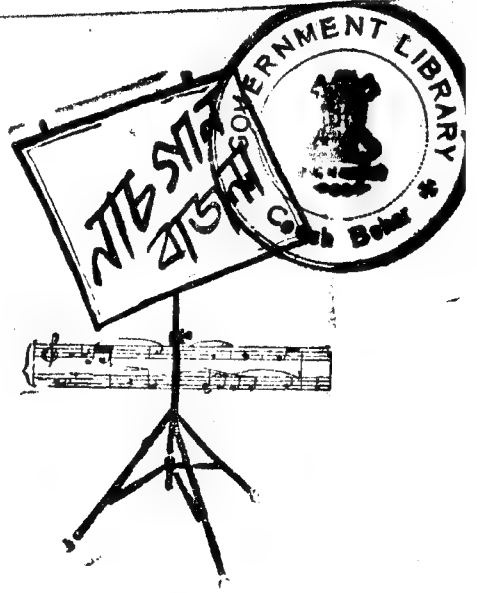
কবি নিজেকে বলেছেন, এই কবিতাগুলির ভাব কিছু সুপরিচিত সংস্কৃত নীতি শ্লোক ও বাংলা ইংরাজী গল্প হ'তে গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি তুলনাচাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা এবং এগুলির কিছু কিছু আত্মকাল পাঠ্যপুস্তকেও স্থান পেয়েছে। এগুলি শিক্ষামূলক উপদেশ শিশুদের সহজেই দাগ কেটে বসে।

কুহুচেতা মানুষ সামান্য বিজ্ঞা লাভ করে গর্ব করে। কিন্তু বিজ্ঞার পাঠ্যমাণ অবিক হলে অজ্ঞতার কয়েত থাকে, সকলই তখন 'বিজ্ঞা ভজ্যতি বিনয়'। মানুষ তখন বৃত্ততে পাবে নিখিলের তুলনার তার জ্ঞান কত অল্প। কিন্তু এই জ্ঞানের অজ্ঞতার অজ্ঞত্বিত অনন্ত জ্ঞানের বিশালতার উপলব্ধি না হলে জাগে না। কারণ নিউটনের জ্ঞার বিজ্ঞ ব্যক্তিও তখন ক'রে বলেছিলেন, 'সমুদ্রে জ্ঞানের সমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে, আমি তাহার তীরে ঝাঁড়াইয়া শুধু মুড়ি বুড়াইতেছি।' তাই তিনি তাঁর কবিতার ইহা স্মরণ ভাবে প্রকাশ করেছেন।

'বিজ্ঞ দার্শনিক এক আইল নগরে
ছুটিল নগরবাসী জ্ঞান লাভ তারে;
সুন্দর গভীর বৃত্তি শান্ত বরশন
হেরি সব ভক্তিকরে বহিল চরণ।
সবে কহে 'তুমি জানী অতিশয়,
হু'-একটি তত্ত্বকথা কহ মহাশয়।'
দার্শনিক বলে, 'কেন বল জানী?
কিছু যে জানি না আমি এই মাত্র জানি।'

দল করা যে বুধা সেট কথোপকথন দ্বারা সুন্দর ভাবে
বাহান হয়েছে তাঁর এই কুহু কবিতার।—

'নর কহে, 'ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে;
সিরকাল প'ড়ে র'লি চরণের নীচে।'
ধূলিকণা কহে, 'তাই কেন কর তুণা?
তোমার বেদের আমি পরিণাম কি না



তাঁর আট একটি কবিতার শিক্ষাগ্রন্থ বিষয় সুনিনপুণ ভাবে
বর্ণনা করেছেন তিনি মাত্র চারটি ছন্দে।

'যেব বলে 'সিদ্ধ তব জন্ম বিফল
শিপাসার হিতে নার এক বিন্দু জল।'
সিদ্ধ কহে 'পিতৃনিষ্ঠা কর কোন বুধে?
তুমিও অপের হবে পড়িলে এ বুকে।'

এই কবিতার দুটি পাকীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বাহীনতার
সুখ যে কি, তা বোঝান হয়েছে।

'বাবু পাখীরে ডাকি বলিছে চড়াই,
'কু'ড়ে যবে থেকে কর শিল্পের বড়াই।
আমি থাকি মহাপ্রবে অটালিকা' পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও বোম বৃষ্টি বড়াই।'
বাবু চানিয়া কহে 'সকল কি তার?
কষ্ট পাই তব থাকি নিজের বাসায়;
পাখা হোক তবু ভাই, পরের ও বাসা;
নিজে চাতে গড়া মের কাঁচা ঘর বাসা।'

একে অপকে হিংসা করে, একে অপরের নীচ মনে করে;
এই মনোভাব মানব সমাজের প্রকৃতি। এই সমস্ত অজ্ঞতির
লক্ষণ। অতুণ মানুষের মনোবিকারই আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তু

(হিংসার ফল)

'পাখির আকাশে উড়ে সেখিয়া হিংসার
পিশীলিকা বিহাতার কাছে পাখা চায়;
বিহাতা মিলেন পাখা দেখে তার ফল,
জাণ্ডে পুড়িয়া মরে পিশীলিকা দল।'

'মানবের গীতি শুনি হিংসা উপজিল,
মশক, বিধির কাছে অকণ্ট মণিল,
গীতশক্তি দিল বিধি; দেখো তার ফল,
মরকাবাতে মরে মশক সকল।'

বা সাধারণত, লোক ভাই করতে পারে। অস্ত্রের সাধারণত নয় বলে পরিহাস করবার কিছুই নাই। এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন কবি তাঁর এই কবিতায়।—

(উচ্চ নীচ)

“উড়িয়া যথেষ্ট দেশে চিল কহে ডাকি,
কি কর চাতক ভায়া, ধূলি মাঝে থাকি ?
কোথায় উঠেছি চেয়ে দেখো একবার,
এখানে আসিতে পার ? সাধা কি তোমার ?
চাতক কহিলে, ‘তবু নীচে দৃষ্টি তব ;
সলা ভাব, কার কিবা ছোঁ মারিয়া লব।
মেঘ-বারি সিলি অঙ্গ জল নাহি খাই,
তাই, আমি নীচে থেকে উঠব যথেষ্ট চাই।”

সত্যতার সন্ধাতে যে জাতীয়তাবাদ এই সময় জন্মগ্রহণ করে সেই স্বাধীনতাবোধের পরিপূর্ণতায় জন্ম প্রয়োজন জন্মভূমির প্রেত প্রচার করায়। দেশমাতৃকার পরাবীণতা দূরীকরণে একদিকে যেমন দেশের জনসাধারণকে উদাত্ত আহ্বান জানান হয়েছিল, বক্তৃতা দিয়ে তেমনই অনুপ্রাণিত করার প্রয়োজন হয়েছিল দেশের লোককে গণতান্ত্রিক রূপের মূল্য বোঝাবার জাতীয় সংগীত দিয়ে। এই সংগীতের মূল্য তখনকার দিনে বড় কম ছিল না। তাই তিনি দেশবাসীর মনে স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে দেশমাতৃকার মহিমায় গৌরবোজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপন করেছিলেন জন্মভূমির গান দিয়ে। তাঁর রচিত সংগীতের বর্ণবিভাস ও ছন্দোবদ্ধতা অনবদ্য।

“জয় জয় জন্মভূমি, জননি,
দাঁড় স্বপ্নাশ্রয় শোণিত ধমনী ;
কণ্ঠে গীতিজিহ্বা, জ্বলিত অবনত
হৃদ, লুহ, এই সুবিপুল ধ্বনি।”

“সর্ব শৈলজিত, হিমগির্জা-পুঞ্জ
মধুর গীতি চিব সুখরিত কুল
সাধল-বিহ্বল-বীর্ষ্য-বিশিষ্ট,
সংকীর্ণ পরিণত জ্ঞান-ধনি।”

“জননী বুল্য তব কে মর জগতে ?
কোটি কণ্ঠ কহ ‘জয় মা বরমে।’
দীর্ঘ বন্ধ হতে তপ্ত বন্ধ ভুলি
সেই পথে। তব ধ্বজ গবি।”

নিরসিদ্ধি গানে কবি বাংলা দেশের ভৌগোলিক সংস্থাকে কার্যে রূপান্তর করে এবং ইন্দ্রে গৌণে একে মসৃণ করেছেন। রচনা-নৈপুণ্য ও বর্ণনার কুশলতার সংগীতটি কবির একটি প্রেত সৃষ্টি মধ্যে পরিণত হয়েছে।

(বঙ্গমাতা)

“নমো নমো নমো জননি, বঙ্গ।
উত্তরে ঐ অজ্ঞেয়ী
অতুল, বিপুল গিরি অলঙ্কার।
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
চূষে চরণতল নিরবধি।

মধ্যে পূত জাহ্নবী জল
মৌত ভ্রামকেত্র সজ।
বনে বনে ছুটে কুল পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক কমল,
অমৃতবারি সিক্তে কোটি
তটিনী মত্ত, ধর তরঙ্গ ;
কোটি কুঞ্জে মধুপুঞ্জ
নব কিশলয় পুঞ্জ পুঞ্জ
ফল-ভর-নত শাখিবৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ।”

ভারতবাসীর বিভ্রান্ত দৃষ্টি যশোরের প্রতি ঝাঁকুট করে কবি ভারতবর্ষের পূরণ ও সাহিত্য হ'তে স্বেচ্ছাবোধক উপকরণ সংগ্রহ ক'রে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের এক গৌরবোজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছেন চোখের সামনে।

“সেখা আমি কি গাহিব গান।
যেখা গভীর ওষ্ঠারে সায় স্বহারা,
কাশিত দূর বিমান।
যেখা সুর সপ্তকে বীষিয়া বীণা,
বাণী শুভ্র কমলাসীমা
যোধি তটিনী জলপ্রবাহ
তুলিত মোহন তান।

যেখা—বুলাবন কেলিকুলে
হুতলী রবে পুঞ্জ-পুঞ্জ
পুলকে শিহরি হুটিত কুসুম,
হরুনা যেত উজান।

আর কি ভারতে আছে সে স্বয়ং
আর কি আছে সে মোহন ময়
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,

আর কি আছে সে প্রাণ ?” (বাণী)

দেশাত্মবোধ প্রকৃত মহাবাহুর অজীকৃত। বাবাবর হাতের জীবনে এল দ্বিতীয় সংকল্প, জন্মস্থান নিরূপিত হল, জেপে উঠল হাতের মনে দেশাত্মবোধের স্পন্দ। তাই রচিত হল দেশাত্মবোধক সংগীত, জন-জাগরণের প্রেরণা দিয়ে। হাতের বীতরঙ্গ হয়ে উঠল, বিশেষী শাসনে ; তাই বিশেষী পণ্য বর্জনের সংকল্প দেশ গ্রহণ করল এবং যশোরজাত ব্রহ্মের প্রেতবোধ জাগিয়ে তুললেন কবি তাঁর কাব্যে, তাঁর সংগীতে।

“মায়ের মেতরা মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন ছাধিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধা নাই।
মোটা সূতোর সঙ্গে মায়ের
জপার রেহ নেপতে পাই ;

এমনি পাব্যাপ, তাই কেসে এ
পরের সোবে ভিকা চাই।" ইত্যাদি—
(বাণী)

মত্ত বাসনার মোহ হুজির সুর ধনিত হয়েছ কবির এই গানে।
সর্বত্র বিরাজমান পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট তাই তাঁর করুণ
বাঁহুত, তাই তাঁর বিশ্ব-বিপদহস্তার নিকট করুণ আবেদন মঙ্গলের
ভঙ্গ।—

"তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্মে মুছিয়ে;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে বাঁক মোর
মোহ-কালিমা মুছিয়ে।
লক্ষ্য শূন্য লক্ষ্য বাসনা
ছুটিছে পতীর আঁধারে,
জানি না করব তুবে বাবে কোন্
জুল পরল-পাখারে।
প্রভু, বিশ্ববিপদহস্তা,
তুমি দাঁড়াও রুবিয়া পাহা,
ভব, প্রীচরণ-তলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা মুছিয়ে।
আহ অনল-অনিলে চির নভোানীলে,
তুখর-গলিলে, গহনে,
বিটপি-লতার জলসের গায়
শশি-তারকার তপনে।"
ইত্যাদি—

জগতের হৃৎ ও বিশ্বর্ষের মেখে তিনি সন্দেহাকুল হ'লেও নির্ভরতার
তার যে অবিচলিত বিশ্বাস তারই সুর ধনিত হয়েছ তাঁর সঙ্গীতে :—

"কেন ব্যক্তি হব চরণে
আমি কত আশা ক'রে বসে আছি, পাব
জীবনে না হয় মরণে।
আহা, তাই যদি না হবে গো;
পাতকী-ভারণ তরিতে, তাপিত
আত্মরে তুলে না লবে গো;
হয়ে পথের ধলার অন্ধ,
আমি দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে ব'সে পায় করবলে পাঙ্গী
কেন ডাকে নীল-শরণে?
আমি ভনেছি, হে কুয়াহরি,
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অবৃত্ত,
তুহিত যে চাহে বারি।
তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
বার কেহ-নাই, তুমি আছ তার;
এ কি, সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে প্রভু মরণে।"

পতীর ভাবব্যঞ্জক এই গানে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার সব কাজই
মনোমুগ্ধের ইচ্ছিত সম্পূর্ণ।—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া হৃৎ
তোমারি দেওয়া বুক, তোমারি অহুতব।
তোমারি হু' নয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হাহা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া
তোমারি শক্তি আকুল পথ চাওয়া
তোমারি নিরঞ্জে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সাধনা, শীতল সৌরভ।" ইত্যাদি—

কবির এই সঙ্গীতে ধনিত হয়েছ শেষ মহাবাতার সুর। তিনি
গেয়েছেন :—

"কবে এ ভূবিত মরু ছাড়িয়া বাইব
তোমারি রসাল নন্দনে,
কবে তাপিত এ চিত্ত করিব শীতল
তোমারি করুণা চন্দনে।
কবে তোমাকে হ'বে বাব, আমার আমি হারা,
তোমারি নাম নিষ্ঠে নয়নে বহে ধারা,
এ সেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক-স্পন্দনে।
কবে ভবের সুখ-দুঃখ চরণে দলিয়া,
হাতা করিব গো, জীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, স্তম্ভ গলিবে না,
কাহারা আকুল ক্রন্দনে।"

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে **ডোয়ার্কিনের**



কথা, এটা
খুবই স্বাভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮-৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভালিকার
জন্ত লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এসপ্ল্যান্ডেড ইস্ট, কলিকাতা-১

সিরিয়াজবজ্ঞা আনন্দময়ী সৌরীর পিতৃগৃহে আগমন, বসন্তবাসী
প্রভ্যাগমন প্রভৃতি বিষয়ে কবির কতকগুলি কবিতা তাঁর আনন্দময়ী
নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। ইহার আভ্যন্তর আগমনী ও
ও শেষাংশ বিজয়ার নানা ঐতিহাসিক সংগীতে সন্নিবিষ্ট।

সৌরীর আগমন-গাহ

(প্রতিবাসিনীর উক্তি)

"গা তোলা, গা তোলা, গিরিরাণি !

এনেছি মা, শুভবাণী,

দেখে এলাম পথে, তোর ঈশানী।

রূপে কানন আলো করে

ছেলে দুটি কোলে ধরে

কিশোরী কেশরী পুরে

তোটি চন্দ্র নিলি, পা ছুবানি।" ইত্যাদি

(সৌরীর নগরে প্রবেশ)

"কে দেখেছি ছুটি আর,

আজ গিরিতরুন আনন্দের স্তবজে ভেসে যায়।

ঐ বা এল, মা এল" বলে

কেমন বাহুর কোলাহলে

উঠি পড়ি করে সবাই আগে দেখতে চায়।" ইত্যাদি

তিন দিন সৌরীর মতে অবতানের পর নবমী নিশির সন্ধ্যায়
কর্ণা কবি সুনিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন,—

"নবমী-নিশায় নগর নীরব,

আনন্দ-সমীত ধোমে গেছে সব।

একটি পতাকা উড় না আকাশে,

বাজে না মঙ্গল শব্দ।

কঠোর কর্তব্য পালন নিবত

নবমী নিশিখ কি বিবাদ ব্রত,

ক্রিষ্ট মলিন, অবসর কত।

সুগভীর কি কলহ।" ইত্যাদি—

রসগন্ধ রচনাতেও যে তিনি সিদ্ধান্ত ছিলেন, তার
নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর নিরুত্তর, তিনকড়ি শব্দা ও জেনে
হাখো প্রভৃতি কবিতায়। এই সকল কবিতায় রসবাচনিক
সংবাদনের এবং সমাজ সংস্কারের অনেক ইঙ্গিত আছে।

(নিরুত্তর)

"জাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিক

দেখাও সে উপাধি নিলে,

কটা কেনর জবাব দিবে।

ধরা কেন কেন পানে, ছোট বড় সবকে টানে,

বোটা হেঁজা ফলটি কেন সে,

দেয় না বেতে অল্প দিকে ?

তিনি কেন মিঠি লাগে, চাতক কেন বুলি মাগে ;

চকোর চায় চন্দ্রমাকে,

কমল কেন চায় বলিকে ?" ইত্যাদি—

(তিনকড়ি শব্দা)

"(আমি) বাহা বলি, সবি বহুতা,

বাহা লিখি মহাকাব্য ;

(আর) স্মৃতি তত্ত্ব অপ্রাপ্তি

দর্শন, বাহা ভাবব।

(আমি) বা খাই সেইটি বাত ;

আর বা বাজাই সেটা বাত ;

আমি যদি বলি এইটে উত্তর

বেইখানে সেটা যাগ্য।

আমি করি আর হিত ইচ্ছে,

তারে পৃথিবী শুদ্ধ দিচ্ছে

(দেখো) কক্ষণে তার বংশ হবে না

ঘরে বসে ধারে শাপবো।" ইত্যাদি

তাঁর আর একটি ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা :—

(জেনে হাখো)

"মাঘবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পূর্বে পাঁচ হাত লম্বা ;

সামু সেই যে পনের টাকার নিয়ে, দেখার রক্ত।

দায়িক বটে সেই, যে দিন-রাত কোঁটা তিলক কাটে ;

ভক্ত সেই যে আজম্বাকাল চৈতন্য নাহি ছাটে।

সেই মহাশয় সংগোপনে যে ঘন্টা আগটা টানে ;

নিষ্ঠাবান যে কুর্কুট হাঙ্গের মধুর আবাদ জানে।

বসিক সেই, আর বাট বহুরে আছে পক্ষম পক্ষ ;

সেই কাজের লোক, চরিত্র খটা হঁকো আর উপলক্ষ্য।"

বয়স প্রধানে তিনি তাঁর ভাবের আভ্যন্তর করেছেন। সমাজ,
সংস্কারের পক্ষে ওগুলি অতি মূল্যবান অবদান।

(বয়ের দর)

"কতদূরে বিস্তৃত হয়েছ বিলম্ব ;

তাই যুগি সংক্ষেপে কাছাকাছি সমাপন।

নগরে চাই তিনটি হাজার

তাতেই আমার গিন্নী বেজার,

বলেন এবার বয়ের বাজার কঙ্গা কি রকম !

(কিছ) তোমার কাছে চক্কুলজ্ঞা লাগে যে বিষয়।

গিন্নি বলেন, 'বাউটি' স্ট্রেট রূপলাবণ্যে ওঠে ফুটে,

একশ ভরি হলোই হবে একটি সেট উত্তর,

যেন অলঙ্কার দেখে, নিজে করে না লোকে,

দিও বেনারসী, বোখাই, কর্দ কিছু হাল লবাই,

তা, তোমার মেয়ে তোমার জামাই

তোমার আকিকর।

আমার কি চাই ? আল বামে কাল দুই হ'ল নয়ন।"

ইত্যাদি—

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাঘবের রচিত্রও অনেক পরিবর্তন
হয়েছে। এখন আর এই সব ভাবসমৃদ্ধ সঙ্গীত গাইবার রীতি
নেই। লঘু ও চটল সিনেমার পানে আজ আকাশ-বাতাস মুগ্ধিত।
সুতরাং প্রাচীন কবির কাব্য চর্চায় ও সঙ্গীতে কাহারও মনো
এই প্রতিভাবান কবিকে স্বাধীন করার এবং তাঁর কাব্য আলোচনা

করার দায়িত্ব বাধীন সেপের নাগরিকের। তাঁর, কবিবর জন্ম ও
মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে কবিকে শ্রদ্ধাভীরব করে রাখা এতোক
প্রাণীকর্তব্য।
—শ্রীকালীপদ লাজিড়ী

আমার কথা (৬১)

সঙ্গীতাত্মক শ্রীকালীপদ পাঠক

গ্রামের ছেলে—বংশের বাবাছাচারী নিজেই গান গায়—কিন্তু
স্বাচ্ছন্দ্যের উত্তাপী বরাবর—কৈশোরে—এল কলিকাতায়—

গান শেখার সুযোগ হল না প্রথমে—তবে ব্যায়ামাঙ্গুলীন কতার
সুবিধা হল—হঠাৎ বোলাবোলা বটে সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করার—
সেটা গ্রহণ করেন নিবিশেষ ভাবে—আর তার জন্য বাজনা দেশ শেল এক
মার্গ সঙ্গীতসাধকরূপে আজকের বয়সস্থ শিল্পী শ্রীকালীপদ পাঠক
মহাশয়কে। ডাকনামেই পরিচিতি তাঁর কিন্তু অজানার অন্তরে
থিয়েছেন শ্রীমোহিনীমোহন পাঠক।

মজবুত দেহ, কোমল মন আর হিলখোলা হাসির ভিতর থেকে
জানতে পারি সঙ্গীতাত্মক—

১৩০১ সালের কানুন মাসে আরামবাগ ময়কুমার (জাহানাবাদ
পরগণা) থানাকুল থানাদর্গত হাফেজি গ্রামের ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের
শিক্ষক শ্রীকালীপদ পাঠক ও ৮শিবিলা দেবীর সাত পুত্রের মধ্যে
তৃতীয় আমি স্বর্গে জন্মাই। পাঠশালা ও গ্রামের মধ্য-ইংরাজী
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখি। ষড় ঠকল হিম্মত আর প্রথম থেকে
খোশালা ও ব্যায়ামের দিকে ধ্রুব মন দিই—সেই ভক্ত পড়াশুনার
বেশীদূর বাইনি।

আমার ঠাকুরশালা ৮রামলাল পাঠক ভাল বুদ্ধি বাজাতেন।
তাঁর অজ্ঞাত ভাবেই গান-বাজনা করতেন। ময়মুন্ডল দেশীর বাজার
সভাপায়ক ৮বহুনাথ রায় সম্পর্কে আমার ঠাকুরশালা হতেন। তাঁর
ছই ভাইপো ৮আলু রায় ও সুবীর রায় কলিকাতার সঙ্গীতমহলে
পরিচিতি ছিলেন।

গ্রামে বাজা গুনতাম—গান নকল করতাম—খিয়েটোরে
অঙ্গপ্রস্থককারী হিলাম—পাঠশালার গান করার জন্য গুরুমশায়ের
কাছে যার খেয়েছি কিন্তু গান গাওয়া নিয়মিত চলত। দাদা
হামিনীশেখর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর কলিকাতায় চাকুরী
নেন। কিছুদিন বাবে সপরিবারে বাবা হাওড়া কলকাতার চলে
আসেন। আমার বয়স তখন ১৬ বৎসর। আমি শিবপুর ব্যাটার
সমিতির সভ্য হয়ে পড়ি। নিয়মিত স্বাচ্ছন্দ্য করতুম সেখানে—
কাছেই প্রখ্যাত অঙ্গপ্রস্থক পরলোকগত নিকুঞ্জবিহারী নন্দর বাড়ী।
এতাই গান শেখাতেন তিনি অনেক ছেলেকে—আমি ঘুরে পাড়িয়ে
তাঁর গান গুনতুম আর নকল করে নিতাম। একদিন তিনি আমার
গলায় তাঁর গান শুনে অসন্তুষ্ট হন ও নিষেধ করেন। আমার তখন
ধ্রুব রোঁক গান শেখার—তাঁর কথা প্রায় অগ্রাহ্য করি—তজ্জ্বল আমি
অপমানিত হই। মনে বড় কোভ হল—একদিন বড়বাজার দত্ত
মহাশয়কে ধরে হারী জানাই আমার তাঁর সঙ্গীত-শিখ্য করার জন্য।
বহু অসম্মতির পর তিনি রাজী হন। এক বৃহস্পতিবার সকালে
ভটিসিঙ্গ ঘরে তাঁর গৃহে তাঁকে গুরু-বন্দনা জানাই। খোশা ও প্রদ
পাল তিনি আমার শেখার আশ্রয়কভাবে ও বিনা বন্দনোতে। ৮মতিলাল
চট্টোপাধ্যায় ও বহুজন বীর শিখ ৮কলীপদর সুখাপাধ্যায়ের নিকট

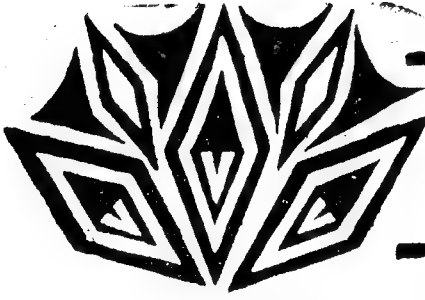
উপা শিখি। সেই সময় আমি কলিকাতায় কয়েকজন শিল্পীর সহিত
পরিচিত হই। কালী নন্দরল, মলিনীকান্ত সঙ্কর, অধ্যাপক
জুজিট মুখার্জী, অমিননাথ সান্নাল ও আমি প্রতি রবিবার মিলিত
হতুম গানের উল্লাস—বুক কোম্পানীর বহুবিধকাগজের অধিন শিল্পী
লেনের গৃহে।

ডাঃ রবীন্দ্র মিত্র ছিলেন আমাদের প্রধান উৎসাহদাতা এর
পর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ও পরেশ ভট্টাচার্যের সহিত ধ্রুবই
ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯২৭ সাল থেকে আমি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের
সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। হিজ মাস্টার ভয়েস ও সেনোলা কোম্পানীতে
আমার পাওয়া ভাস্কর্যসঙ্গীত ও টপ পা গানের বের্ড আছে। আমি
নিধুবাবু লেখা ৮৫টি গান জানি। ভক্তকালী নিবাসী ৮রাম নন্দর
লেখা গান আমি বেড়িওতে গিয়ে থাকি। আমার দুটি ছাত্র
শ্রীগোপালচন্দ্র চাট্টাঙ্গ ও শ্রীচৌধুরী মালের তত্ত্বাবধানে
বলে আমার হাশপা। ১৯৩১ সালে আমার স্ত্রী চণ্ডীবালা দেবী
পরলোক গমন করেন। আমি নিঃসন্তান।

বহুদিন আগে দুহারি সঙ্গীত-সম্মেলনে আমি একবার কর্তব্য
হিসাবে যাই। এক কর্তব্যকর্তাকে হঠাৎ অজ্ঞাতোৎপন্ন আমি
গান গাইতে দেওয়ার জন্য। তিনি রাজী হলেন। ভারতবিশ্বায়
কয়েকজন গায়কের গান গাওয়া শেষ হল বহুদিন ভোয়ে। সেই
ভক্তলোককে আবার মনে কয়ইয়া দিতে আমি গাইবার সুযোগ
পাই। একটি গান বরি, কল ভালা-আমর আবার ভক্তি হল
ধানিকটা। কর্তব্যকর্তার সন্তুষ্ট হলেন। এর পর থেকে আমি
তথাকার নিয়মিত শিল্পী হই।



সঙ্গীতাত্মক শ্রীকালীপদ পাঠক



সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

হাজার বছরের প্রেমের কবিতা

জীবনের পূর্ণতা প্রেমে। আর এই প্রেমের মধ্যেই মানুষ বুঝে পেরেছে জীবনের মানে, প্রেমকে কেন্দ্র করে মানুষ অনন্তকাল ধরে জীবনের গভীর থেকে গভীরে অবগাহন করে আসছে। কালের প্রভাবে প্রেমের হয়ে থাকে রূপান্তর। সময়ের ব্যবধানে প্রেমও তার রূপ বদলায়, তার প্রকাশভঙ্গিমাও হয় পরিবর্তন—সমকালীন কাব্যে তাইই ছাড়া পড়ে। এ কথাও স্পষ্ট সত্য যে প্রেমের কাছে পৃথিবীর কাব্য সম্পদ যে কি পরিমাণ সীমী তার তুলনা নেই, কেন না প্রেমকে ঘিরেই অগতের কাব্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। খৃষ্টপূর্ব বোধগম্যতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অগতের বিভিন্ন ভাষায় যে সকল প্রেমের কবিতা রচিত হয়েছে, তাদের বলাচুড়ান সমূহের একটি সার্থক সঙ্কলন সম্পাদনা করেছেন কবি অবন্তী সাত্তাল। ২১শ্রনাথ, দত্তোজ্জনাথ, মজুমদার ইসলাম, বতীজ্জনাথ সেনগুপ্ত, কালিদাস চট্ট, হোমেন্দ্রকুমার গায়, বিমলজ্যে ঘোষ, অমলীকুমার দে, কানাই সান্না, ফিউ দে, হরপ্রসাদ মিত্র, শুভাব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিসের অল্পবাদ রচনা গ্রন্থকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে। সম্পাদনার ক্ষেত্রে অবন্তী সাত্তাল যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিতা এবার সঙ্কলিত হয়ে গ্রন্থটির মাধ্যমে বেশ এক আন্তর্জাতিক মহামিলানের পবিত্র মন্ত্রপাঠ করছে। কবিতার দৃষ্টিকোণ থেকে সারা পৃথিবী যেন এখানে এক হয়ে গেছে একত্রে সারা অগতের বহুধা কবিসের কাব্যসৃষ্টির রসাবাসিনে তার সমস্ত বাধা যেন অপসৃত হয়ে গেছে। গ্রন্থটি বঙালার কাব্যভাণ্ডারে একটি স্থানবান সংযোজন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রকাশক নতুন সাহিত্য ভবন, ৩ শতাব্দী পণ্ডিত স্ট্রীট কলিকাতা-২০। দাম আট টাকা মাত্র।

মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার

বঙালী কাল ও নাট্যসাহিত্যের নবজাগরণের ইতিহাসে মধুসূদন একটি চিরউজ্জ্বল স্বাক্ষর। মধুসূদনের কল্যাণে বঙালাদের কাব্য ও নাট্যসাহিত্যে প্রথম দৃষ্টির রসাবাসে সমর্থ হল। তাঁর অবদানের পরিমাণ ইতিহাসকে বিষয়ে বিদ্যুৎ করে দিয়েছে। কবিতার ও নাটকের ক্ষেত্রে তিনি অনেক কিছুই অবদান করলেন, যে বিষয়ের নবজাগ দিলেন। তাঁর কালজয়ী কাব্য ও নাট্যসৃষ্টিকে কল্প করে উপবোধআলোচনা গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। গ্রন্থটি শরৎচন্দ্র

মারক বক্তৃতামালার প্রথম প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ও খ্যাতনামা প্রবন্ধকার শ্রীমদেবচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের বক্তৃতার গ্রন্থরূপ। কবি ও নাট্যকার হিসেবে মধুসূদন স্বতন্ত্র সুবোধচন্দ্রের একটি বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থটিকে রূপ দিয়েছে। সুবোধচন্দ্রের আলোচনা শুধু বিদ্যুতিতেই পূর্ণ নয়, সারবত্তার দিক দিয়েও বিশিষ্ট। তা ছাড়াও আলোচনা প্রাঞ্জল, তথ্যসমৃদ্ধ এবং অধ্যাপক সেনগুপ্তের প্রকৃত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। সুধী ও ছাত্র উভয় সমাজই গ্রন্থটি যথেষ্ট সমাদর অর্জন করবে এ বিশ্বাস আমাদের রাশি। প্রকাশক এ, মুখার্জী ব্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বক্সিং চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক

(প্রথম খণ্ড)

পরলোকগত সাহিত্যিকার সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মাতুল। বয়সে অবত বিছু ছোট—বহুর চারেকের, স্ততরাং সমসাময়িক বক্তৃতে বাধা নেই—বাল্য ও কৈশোরকাল এরা একত্রেই অতিবাহিত করেছেন—শরৎচন্দ্রের জীবনের বাল্য ও কৈশোরপর্বে ঘটে যাওয়া এমন বহু ঘটনা আছে যার তাৎপর্য অসীম এবং পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যে যাদের প্রভাব বিস্তার হয়েছে বহুল পরিমাণে—এই ঘটনাগুলি অতের পক্ষে জানা সম্ভব নয়—কেবলমাত্র ধারা সেই সব ঘটনার সাক্ষী বা ধারা শরৎচন্দ্রের বনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছেন প্রধানতঃ তাঁদেরই পক্ষেই তা সম্ভব। সুরেন্দ্রনাথ সেই সব ঘটনাগুলির প্রতিই আলোকপাত করেছেন। অসংখ্য কৌতূহলোদ্দীপক এবং চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশে গ্রন্থটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আর সেই সব ঘটনার আলোর শরৎচন্দ্র যেন এই নতুন মূর্তিতে এখান ঘরা দিয়েছেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের, তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির, শরৎচন্দ্র—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—বিদ্যুতিভূষণ ভট্ট—নিরুপমা দেবী প্রমুখ সাহিত্যরথীদের জীবনের প্রভুতি পর্বের একটি নিখুঁত আলোচ্য অঙ্কনে যথোচিত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে—সুরেন্দ্রনাথের লেখনী। গ্রন্থটি বখাযোগ্য সমাদর লাভ করুক এই কামনা করি। প্রকাশক—পূর্ণচন্দ্র প্রকাশনী, ৩২-ই ল্যান্ডডাউন রোড। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

মুক্তাধার

উজ্জ্বলতার বহন আশি। তাঁকে ঘিরে বিষয়ের মেরু-সীমা-পরিমীমা নেই। কোন কেশ-বিশেষের, আভি-বিশেষের

হস্ত-বিশেষের তিনি বিষয় মন, বিষয় তিনি মনএ বিষয়।
নাম তাঁর হেলেন কেলার। উত্তর মিস্ কেলার।। মূল দৃষ্টিশক্তি
না থাকে সবেও মূল দৃষ্টিশক্তির দ্বারা জীবনের পূর্ণতার পথের যে
সন্ধান তিনি জন্মের গভীরতার দ্বারা পেয়েছেন, তাইই ব্যাখ্যা
তিনি করেছেন বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে। সেই বাক্যাংশগুলি
একত্রে সংকলিত হয়ে গ্রন্থরূপ নিয়েছে। মিস্ কেলারের সেই বিখ্যাত
গ্রন্থটির নাম "দি ওপেন ডোর"। পক্ষেত্রিয়ার কয়েকটি ইল্লির তাঁর
চেতনামীনি সত্যিই বিশ্ব চেয়েনই তাঁর উপলব্ধির ও অনুভূতির
গভীরতাও অবগতির এবং তাঁর সাহায্যেই তিনি অমৃত সত্যের সন্ধান
পেয়েছেন—সেই সত্যই তাঁর বাক্যাংশগুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে
উঠেছে। জীবনকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে হেলেন কেলার
বিচার করেছেন। গ্রন্থটি বাঙালার অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত
কথাসিদ্ধী শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। অচিন্ত্যকুমার অনুবাদকরে
যথেষ্ট নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন, তাঁর অনবদ্য ভাষা-সম্পদ অনুবাদ
প্রচেষ্টাকে সার্থকতার রূপ দিয়েছে। তাঁর অনুবাদ যথেষ্ট
সাধুসাধের দাবী রাখে। প্রকাশক—পার্ল পাবলিকেশনস্
প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ ওয়াটার্লু ম্যানসনস, ১৭০ পাক্ট রোড,
বোম্বাই ১। পরিবেশক ইন্ডিয়া বুক হাউস, ১ লিগলে স্ট্রীট।
দাম—পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

মাকির ছেলে

শুধু সাহিত্যশিল্পী হিসেবে নয়, সাহিত্যপ্রস্তুতি হিসেবে ইতিহাস
বাঁধা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, স্বর্গীয় মাসিক বহুমতীপাঠ্যর
উঁচেরই একজন। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অসামান্য। জ্ঞানর মাহুসের
তিনিই প্রতিষ্ঠা করলেন সাহিত্য-জগতে। তারাই তাঁরই কল্যাণে
সাহিত্যের পাঠ্যে স্থান পেল, সাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা
হল। সাহিত্যপ্রস্তুতি হিসেবে যে বৈশিষ্ট্যের তিনি অধিকারী ছিলেন
আলোচ্য উপভাসে সে বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন সুপরিষ্কৃত। লেখনীর বলিষ্ঠতা
আর জন্মের গভীরতা, হৃদয়ের সমন্বয়ে এক অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি
হয়েছে। হাসি-কান্নার ভরা কয়েকটি মাহুসকে কেন্দ্র করে, ভাসের
সম্মান, চিন্তাধারা, ভালোবাসাকে নিয়ে একটি সুন্দর নিটোল গল্প
পরিবেশিত হয়েছে। এতে কোনপ্রকার হলনা, কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা
বিলুপ্ত। ছাড়াপাত করে না, উপভাসটি আনন্দিকতার আলোর
উজ্জ্বল। লেখক আজ আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেতনী থেকে অনেক
দূরে, স্তব্ধতা পার্থিব নিলাজতিকে আজ আর তাঁকে স্পর্শ করতেও
পারবে না। তাঁর আত্মার উদ্দেশে প্রার্থা নিবেদন করি। প্রকাশক
—ইন্ডিয়ান ম্যাসোগ্রাফিও পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড,
১০ পাক্ট রোড। দাম—২ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

স্মরণচিহ্ন

অতীত শব্দটির সঙ্গে অনেক কয়ে "মৃত" বিশেষণটি যুক্ত হয়ে
থাকে—কিন্তু তা বর্ণার্থ নয়, অতীত স্মৃতিচরিত্র। যৌবনের যুগের
উপর দাঁড়িয়ে বাণ্য ও কৈশোরের দিকে পিছন ফিরে তাকালে
তখনকার ঘট ঘটনা ঘটনাবলি এক নতুন রূপ নিয়ে চোখের
গায়েনে জেসে ওঠে, এই সব ঘটনাবলি জীবনকে শুধু স্পর্শ করেই
কান্না হয় না, জীবনে এনে দেয় মূর্ত্যে মূর্ত্যে বৈচিত্র্য, বায় কলে
জীবন এত বিভিন্ন। শিল্পকালে এমন অনেক ঘটনার সন্মুখীন

আমরা হই যাদের দ্বারিষ কপতালের কিন্ত প্রভাব চিরকালের।
জীবন যেন একটি দীর্ঘ পথ, যবেসমুদ্রী এক একটি পথিক যেন
তাঁর যুগের উপর পা ফেলে চলছে আমাদের চেতনা যেন তাঁর
নীচের দ্রষ্টা। এই পটভূমিকে ভিত্তি করেই আলোচ্য উপভাসটি
রচিত। উপভাসটির রচয়িতা বাঙালার বঙ্গবী সাহিত্যকার
স্ববীরজেন মুখোপাধ্যায়। অতীত—স্মরণ যে এক অপার মানস,
এক পুলক রোমাঞ্চ, এক গভীর তৃপ্তি এই সত্যটি উপভাসটির
মধ্যে বাহ্যিকের ব্যক্ত হয়েছে। উপভাসটি প্রাণস্পর্শী, জন্মবর্ণী
এবং পরম সুখপাঠ্য। স্ববীরজেনের লেখনীর তীক্ষ্ণতা, বলিষ্ঠতা ও
শক্তির ছাপ উপভাসের পাতার পাতার পাওয়া যায়। চরিত্রগুলি
সুসজ্জিত এবং সুসুপারিত। সংলাপ যৌক্তিক ও সুনিপুণ। লেখকের
অনুভূতিময় জন্মের সমস্ত স্মৃতিতা যেন তিনি উজ্জ্বল করে তুলে
দিয়েছেন এই উপভাসটির মধ্যে। পটভূমির দ্বিধে উপভাসটি যথেষ্ট
বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরযুক্ত। গ্রন্থটিকে শুধু বৈশিষ্ট্যবান বললেই সম্পূর্ণ-
রূপে বলা হয় না, গ্রন্থটিতে নতুনদের স্পর্শও যথেষ্ট এবং এই
নতুনদের পরীক্ষার লেখক সুগরিবের উত্তীর্ণ হয়েছেন বলা যায়।
লেখককে আমরা অভিনন্দন জানাই। প্রকাশক—ডি. এম.
লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

রাজমহল

মাসিক বহুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে শ্রীমতী নীলিমা
দাশগুপ্ত অপরিচিতা নন। অজকালপূর্বে তাঁর ইন্দ্রাণীর প্রেম স্বীকৃত
উপভাসটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে।
"রাজমহল" তাঁর আর একটি উপভাস। এই উপভাসটি লেখিকার
দক্ষতার, প্রতিভার ও শক্তির স্বাধিকার স্বাক্ষর নিয়ে আনন্দপ্রকাশ
করেছে। একটি অভিজাত বর্ষিক রাজপরিবারের বিপরীতের
রোমাঞ্চকর কাহিনী যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে এই গ্রন্থের মাধ্যমে তুলে
ধরা হয়েছে। তিন পুরুষের কাহিনী এর মধ্যে স্থান লাভ করেছে।
রচনার প্রসঙ্গগুণে উপভাসটি পাঠকের প্রাণস্পর্শ করতে সক্ষম হবে।
প্রতিটি চরিত্র স্বাধিকার বিকশিত, আবেতনী বা পরিবেশও সুচিহ্নিত,
আনন্দকিশোর ও হরিপ্রিয়ার জীবনের পরিণতিও জন্মবর্ণশী।
ললিতকিশোরের চরিত্রসুষ্ঠিতে নীলিমা দাশগুপ্ত অসাধারণ প্রতিভার
পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—এস. ব্যানার্জী হ্যাণ্ড কোম্পানী,
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। দাম—২ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

মাহুস কি করে গুণতে শিখল

গণনার সঙ্গে পরিচয় নেই এমন মাহুস খুঁজে পাওয়া যায়।
গণিতের দুইহু জটিল তথ্যটির সঙ্গে দক্ষ গণিতজ্ঞ ছাড়া অন্যের পরিচয়
নেই, একথা সত্য—তবে তার প্রাথমিক অধ্যয়নগুলির অর্থ
গণনার সঙ্গে পরিচয় নেই, এ ধরনের মাহুস খুঁজে পাওয়া যায় না।
এই সংখ্যাবিজ্ঞান আজ এক বিরাট রূপ নিয়েছে, তার জয়যাত্রা আজ
ব্যাপক, তার আবেদনও আজ অপরিহার্য কিন্তু স্মরণ অতীতে
সুপ্রাচীনকালে প্রায় হাজার তিনেক বছর আগে পৃথিবীতে এই গণন
বিভাগ জন্ম হল কেমন করে, কার দ্বারা, কিভাবে—সেও এর
চমকপ্রদ ইতিহাস। সেই ইতিহাস রচনা করেছেন প. ম. বেরমান
মূল রূপ থেকে বাঙালার ডা। অনুবাদ করেছেন বিনয় মজুমদার।
কিছু সহযোগে ইতিহাসটি বোঝানো হয়েছে। আলোচনা জন্ম

সাহসপতী, ইতিহাস বর্ণনার প্রকৃত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি পাঠ্য তবলে সন্ধ্যাশাস্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা যায়। সন্ধ্যাশাস্ত্রের বিরাট, চমকপ্রদ ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব সর্বতোভাবে বিদূষিত হবে। সন্ধ্যাশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থটি বহুবিধ জ্ঞান ও বিভিন্ন তথ্যের আকর। প্রকাশক—গ্র্যান্ডনাল বুক এক্সেলি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বক্সিং চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম বোর্ড বাঁধাই—এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র এবং কাগজে বাঁধাই—পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে

বাঙলা দেশের গা বেঁধেই বলতে গেলে লেপচাদের বাসস্থান—মুতরাং তাহা যে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী, এ বিষয়ে কিম্বদন্তি হওয়ায় কোন কাবলি থাকতে পারে না। অথচ এদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বললেই চলে, ভারতবর্ষে অসংখ্য জাতি ও উপজাতি। ভারতবর্ষের এই বৈশিষ্ট্যই তাকে অনেকখানি মতিমমরী করে তুলেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে লেপচাদের একটি পরিপূর্ণ ইতিহাস। এই নাস্তিবৎ গ্রন্থে তাদের সাহিত্য—শিল্প—রাজনীতি—অর্থনীতি—সমাজ—চিন্তাধারায় বিস্তৃত ইতিহাস পরিবেশন করা হয়েছে। অজ্ঞাত জাতির মত লেপচাদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। নীহারবরুণ চক্রবর্তীর এই গ্রন্থটি সেই কৌতূহল বহুল পরিমাণে নিবরণ করবে। শ্রীচক্রবর্তী নিঃসন্দেহে একটি অভিনবকল্প-যোগ্য কাল করেছেন। এই ইতিহাস রচনার তাঁকে যথেষ্ট জ্ঞান স্বীকার করতে হয়েছে এবং সেই সঙ্গে অনেকখানি শক্তি ও আত্মবিক্রমের পরিচয় দিতে হয়েছে। এই গ্রন্থটি লেপচাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাব দূর করবে। গ্রন্থটি লেখক নিজেই প্রকাশ করেছেন। প্রান্তিকান (১) হোমশিখা প্রকাশনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কলকাতা (২) বুক হাউস, কলকাতা এবং (৩) বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বক্সিং চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—দু' টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র।

ডোডার পেরিয়ে

ঐক্যবন্ধন চট্টোপাধ্যায় কবি হিসেবে এসিদ্ধি লাভ করলেও অসংখ্য গ্রন্থ কবিতাগ্রন্থ নয়, এটি একটি ভ্রমণকাহিনী।

ইয়োরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করাকালীন যে অভিজ্ঞতা লেখক অর্জন করেছেন সেই অভিজ্ঞতাকেই লেখনীর মাধ্যমে এখানে তুলে দিতেছেন। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ বেড়াতে লেখকের সামনে ধরা দিয়েছে তারই প্রতিচ্ছবি গ্রন্থের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। লেখকের লেখনীর বলিষ্ঠতার তাঁর রচনা প্রাণ পেয়েছে। ভ্রমণপটী যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, তাহার মধ্যেও প্রাঞ্জলতার স্পষ্ট পাতনা যায়। মনকে আকৃষ্ট করার শক্তি এই গ্রন্থটির আছে। কয়েকটি আলোকচিত্র গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছে। প্রকাশক এম সি, সরকার ও সন্ধ্যা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বক্সিং চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম চা' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

সর্প সম্বন্ধীয় : (১) সাপের খবর ও (২) সাপের কথা

সাপ। দুটি গ্রন্থ অল্প—কিন্তু তাই দংশন মানেই জীবনাড়, তার কথা উদ্ভূত হওয়ার অর্থই জীবনের উপর বনিকাপতনের সম্বন্ধ। সর্প দংশিত মানুষের গায়ে হয়ে বাবে নীলাত বস্ত্রের হাত থেকে পরিত্রাণ না পেয়ে তাকে ঢলে পড়তে হবে মৃত্যুর কোলে। সর্পসেই হচ্ছে বিশ্বের আধার আর এই সর্প শব্দের সঙ্গে বসতে গেলে মিশে আছে আবহমানকালব্যাপী মানুষের ভয়, আতঙ্ক ও উৎকর্ষ। কিন্তু এরও ইতিহাস আছে, আছে পরিচিত, আছে নানা তথ্যবহুল বিশদ বিবরণ। ১৩৬৪ সালের দৈনিক বস্তুমতীর শাহসীয়া সংখ্যায় ঐশ্বরীতাবাক্যর চন্দ্রের সাপের সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমানে তাঁরই রচিত সর্প সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে (সাপের খবর)। যেতীযোক্ত গ্রন্থটি ঐক্যবন্ধন যোবের লেখনীভাজ এবং ভারত সরকার গ্রন্থটিকে একটি পুস্তকায় ধারা সম্মানিত করেছেন। উক্ত গ্রন্থই সর্প সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে ভরপুর, সুবর্ণিত এবং বিবরণ বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়। লেখকবর সর্প সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা করেছেন গ্রন্থ দুটির সাহসবাহী তার প্রমাণ। প্রথমটির প্রকাশক এ. হুজারী ব্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বক্সিং চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র। দ্বিতীয়টির প্রকাশক ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বক্সিং চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম এক টাকা পঁচিশ নয়াপয়সা মাত্র।

আকাশের নেশা

অধীর সরকার

বুড়ির হৃদয়ে দেখেছি বাতাস বুঝ
দুটি কালো চোখে আঁধারের অনাহার,
জ্বলন্ত জড়ানো একান্ত উৎসব
কাছে পেতে চাওয়া অতীতের কোনো মায়ী—
হস্ততো এ সব আমি নেই তার জন্তে।
পানি হল মন, উরাও আকাশ পারে,
অন্তঃস্থিত মানসকূলে তার
কুটেছে বকুল অজস্র সম্মানে
পাংগল করেছে গোপন সুরভিতার—
পানি হল মন উরাও তাহার জন্তে।

অথচ সে পাখি স্নান করেছে ডামা;
আকাশ কোথাও আছে নাকি? বুঝি নেই;
গোপন গন্ধ ভরাতে গিলেছে কান
সুরভি তাহার হবে পেতে গোপনেই।
স্নান পাখির আঁতি কিসের জন্তে?
ওবে তুই পাখি, উড়ে ব' উড়ে দু'বে
অতি কাছে তার গলবে অন্ধকার;
স্নান ডানার পতীর রক্ত জুড়ে
আকাশের নেশা হরণে হরণে—
অহত ভূমির হবে পেতে তার জন্তে।



ভাগ্য গঠন—কয়েকটি সূত্র

যদি হবার স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষেরই থাকতে পারে। কিন্তু নিচুক আত্মজ্ঞান নিয়ে গৃহকোণে বসে থাকলেই বড় হওয়া যায় না। জীবনে বড় হতে হলে সফল যেমন থাকবে, তেমনই থাকতেই হবে সাধনা। উদ্ভাসী পুস্তকের ওপরই কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হয়। বড় পেতে চলে প্রয়োজনীয় সূত্র চাই-ই।

আদল রূপ হচ্ছে—ভাগ্য গঠনের জন্য ব্যাকুলতা যদি জাগ্রত, তা হলে কয়েকটি সূত্র নিয়ম বা সূত্র মেনে চলতেই হবে। জীবনে ধীরে সফলকাম হয়েছেন, প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে, পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যু-নীতিগুণা অঙ্গুসরণ না করে এগোতে পারেন নি তারা। সত্যনিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস—এ কয়টি অপরিহার্য মূলধন নিয়েই চলতে হয়েছে তাঁদের বরাবর।

ব্যাঙ্গ সম্ভব লেখাপড়া হয়ে গেলেই আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় চাকরি করা কি ব্যবসা-বাণিজ্য করা, সে যেমনি হোক। ব্যবসা-বাণিজ্য জীবনে বড় হবার বহুদূর সুযোগ হতে পারে, চাকরিতে সাধারণতঃ ততখানি হওয়া কঠিন। তবু চাকরির দিকেই গড়পড়তা মানুষের বৌদ্ধ থাকে বেশি আর এর কয়েকটি বিশেষ কারণও রয়েছে। যেমন, ব্যবসা করতে গেলেই কিছু না কিছু মূলধন চাই, চাকরির ক্ষেত্রে যেটির প্রায় প্রয়োজন হয় না। অপর দিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে বেলায় যে ঝুঁকি লওয়ার প্রশ্ন থাকে, চাকরিতে নিশ্চয়ই ঠিক সেই পরিমাণে ঝুঁকি নেই।

জীবন-সংগঠন কি ভাবে হতে পারে, কেমন করে ভাগ্যবান হওয়া যায়, এই নিয়ে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ পর্যালোচনা করেছেন প্রচুর। বেশ ভেবে-চিন্তে তাঁরা কতকগুলো মৌল নিয়ম বা সূত্র নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই নির্দেশ সমূহের সূচনা। আলোচ্য সূত্র বা নির্দেশগুলো হব্দ অঙ্গুসরণ করে চলা কঠিন ব্যাপার, সন্দেহ নেই।

অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, ভাগ্যগতির পথ প্রশস্ত করতে চাইলে সকলের আগেই যে মৌল নীতিটি পালন করা আবশ্যিক, সে হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। বিনা পরিকল্পনার কোন কিছু করতে গেলেই বিফল মনোবল হওয়ার বেশিরকম আশঙ্কা থাকে। আবার কোন ব্যাপারে নামতে হলে, সে ব্যবসার খুঁটিনাটি সম্পর্কে আপোনা থেকে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন।

যে লাইনে বোগ্যতা প্রদর্শনের সম্ভাবনা থাকবে না, তেমন কোন কোন লাইন বেছে নেওয়াও প্রের নহে। মোটের ওপর আর্থিক

পুঁজি বা-ই থাকুক, সঞ্জিষ্ট কাজ সম্পর্কে চাই পর্যাপ্ত জ্ঞান বা হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা।

বিশেষজ্ঞ মহলের তাই দাবী—জীবনে সফলতা লাভের গোপন চাবিকাঠিটি হচ্ছে প্রস্তুতি। যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে ঠিক সময়টি বেছে নিয়ে কাজে নামলে উত্তম সফলতা বার্থ হবার নয়। আরও একটি নীতি বা সূত্র রাখা হয়েছে সামনে, যাতে বলা হয়েছে—নতুন পথ হয়ে এগোতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার টিকে থাকবার জট্টাই বিশেষ প্রদর্শনের এই দাবী। নতুন কিছু নিয়ে হাজারি হতে পারলেই দেখা যাবে সমাসরি প্রতিযোগিতা হচ্ছে না। প্রস্তুত প্রস্তুতবে সমাসরি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে না হতে হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তবেই উত্তম নামতে বাওয়া সমীচীন। বাণিজ্য-পণ্যের স্বাতন্ত্র্য অথচ উপযোগিতা যদি ঠিক ঠিক থাকে, তা হলে চালু করার ভক্ত এ প্রচার-কার্যেরও তেমন প্রয়োজন পড়ে না। সে পণ্য আপনীর বাজার আপনি খুঁটি করে নিতে পারে, ভাগ্যলক্ষীকেও টেনে আনতে পারে সাথে সাথে।

ব্যবসারে নামবার জট্টে টাকা কোথায় পাওয়া যাবে, এই প্রশ্নটি সুনতে পাওয়া যায় অনেক স্থলেই। অবশ্য এ ঠিক, শুধু সংগঠন হলেই হবে না, পরিকল্পনার রূপ দিতে হলে আবশ্যিক পুঁজি বা মূলধনও চাই। অল্প উপায়ে মূলধনের ব্যবস্থা না হলে নিজেকেই কোন জীবিকা থেকে অর্থ সংকর করতে হবে কিছু কিছু করে। এতেও যদি অভীষ্ট পুঁজি সংগৃহীত হবে বলে বিশ্বাস না হলে, বিকল্প কোন কাজ বা পেশা মেখে নিতে হবে পাশাপাশি। যাক্ কিছু পরিমাণ অর্থ বঞ্জন জমা হয়ে যাবে, তখনই হবে নেওয়া চলবে কিছু মূলধন হলে। এই অল্প পরিমিত অর্থই কি ভাবে বাড়ানো যায়, কোন পন্থায় ব্যবসা করে বিত্তগত তিনগুণ ঘরে আনা চলে, এটিই হবে পরবর্তী ভাবনা। সামান্য আরম্ভ থেকে অসামান্য হয়ে বাড়িয়েছে, এমন সূত্রান্তের অভাব নেই এ দেশেও, বিলেতে তো নয়ই। তলিয়ে দেখলে সব বায়পাতেই সাকল্যের একটি সাধারণ সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। আবাকও বলতে হয়, সেটি হচ্ছে প্রস্তুতি ও উত্তম, সংগঠন ও স্বনির্দিষ্ট। এই সূত্র মেনে কাজ করলে সত্যি দেখা যাবে, 'মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রা'—এ প্রবাদটি ভাঙ্গার্যবহন।

নতির নেশা

আজকের দিনে এমন দেশ প্রায় বিরল, যেখানে নতির (নস্ত) ব্যবহার চলতি নেই। বাংলা তথা ভারতে এ ব্যাপকতা লাভ করেছে

পূর্বের চেয়ে বড় বেশি। এক টিপ নস্তি পেলেই খুশি হয়, অসংখ্য লোক এ যুগে চোখে পড়ে, যেমন এদেশে, অল্প দেশেও।

নস্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে ঠিক কতকাল আগে, জোর করে চহুতা বলা চলে না। ইতিহাস পণ্যাদ্যোচনায় এইমাত্র দেখা যায়, আমেরিকার সিনে আমবা যেভাবে নস্তি ব্যবহার করি, মধ্য আমেরিকার আন্তেকুয়াও ঠিক তেমনি নস্তি ব্যবহার করত। শুকনো তামাক-পাতা শুড়ো করে নিজেদের নস্তি নিজেরাই তৈরী করে নিতো তারা—যেমন এখনও অনেক জায়গায় হয়। ১৪২৪ সালে কলম্বাস যখন দ্বিতীয়বার ভারতের (আমেরিকা) উদ্দেশ্যে জাহাজ ভাঙ্গান, সে সময় একজন ইতালীয় মঠবাসী ছিলেন তাঁর সঙ্গে। এই ইতালীয় লোকটির লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়—ওয়েট ইণ্ডিজের অধিবাসীদের ভেতর তামাক পাতার শুড়ো নাগিনকার ছিন্নপথে টানবার অর্থাৎ নস্তি ব্যবহারের অভ্যাস ইনি লক্ষ্য করেছেন অভিজ্ঞতাকালে।

ইতিহাসপাঠে এও জানা যায় যে, সর্বপ্রথম নস্তি আমেরিকানী হয় স্পেন এবং তারপর পর্তুগালে। ১৫৬০ সালে লিসবনস্থ করাসী রাষ্ট্রদূত মাথা ধরায় গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে নস্তির ব্যবহার করে যেন কাথারিনে দ্য মেডিসিক। রাণী গুরুত্বপূর্ণ করেছেন বলে প্রচার হতেই নস্তির ব্যবহার সে দেশে দেখতে দেখতে চালু হয়ে যায়। ই ল্যাণ্ডে কিন্তু গোড়ার দিকে নস্তি ছিল খনিকশ্রেণীর একটা বিলাস জীব্যবিশেষ। ঐ দেশে তামাকের ব্যবহার প্রবর্তন হওয়ার পরও প্রায় দুই শতকাল অবধি নস্তি এমনি আটকে পড়ে থাকে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যেই। তারপর ১৬৬৫ সালে যখন দেশব্যাপী মহামড়ক দেখা দেয়, তখনই মাত্র নস্তির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। ১৭০২ সাল নাগাদ অর্থাৎ রাণী আবার ঐশ্বর্যকালে সকল শ্রেণীর লোককেই নস্তি টানতে দেখা যায়।

নস্তি বারান নিয়ে অভ্যস্ত, তাদের একটি বিরাট আংশের দাবী—নস্তি ব্যবহার করলে চং করে ঠাণ্ডা লাগতে পারে না, ইনফ্লুয়েন্সা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এক টিপ নস্তিই শরীরকে ঝিমিয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম—মানসিক শক্তিও এতে বৃদ্ধি পায় (সাময়িক ভাবে হলো) অনেক। শুধু তাই-ই নয়, এই শ্রেণীর নস্তি-সেবীরা এরপও অভিভূত প্রচার করে থাকেন, পাইপ, সিগার বা সিগারেট খাওয়ার চেয়ে নস্তি টানার অভ্যাস ভাল। কারণ এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না কখনও, দৈনন্দিন খরচও পড়ে কম। এক কোটা নস্তিতে বহু সময় কাটরে দেওয়া যায় মনোর আনন্দে।

আর এক শ্রেণীর লোকও অবশ্য সমাজে দেখা যায়, যারা নস্তি ব্যবহারটা খুব ভালোই চোখে দেখতে বাজী নয়। কিন্তু এইজন্য যে নস্তি কম ব্যবহৃত হচ্ছে, এমনটি বলা চলে না আমো। বরং কি বক্তা, কি ভক্তার, কি শিক্ষক, কি আইনজীবী, কি শাসনাতী, কি কারাবন্দী, কি শ্রমিক—সব শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই নস্তিপ্রীতি বাড়ছে। বহু পরীক্ষারূপেও নস্তি সম্বল করে অবিরাম পড়ন্তো চালিয়ে যেতে দেখা যায়। শুধু পুরুষরাই নয়, নারীগণও নস্তি ব্যবহার করে থাকেন এবং সংখ্যা উভয়দিকে বেড়ে চলেছে।

নস্তিকে কেন্দ্র করে বড় বড় রকম শিল্প গড়ে উঠেছে অনেক দেখেই। ভারতের মাদ্রাজ অঞ্চলেই নস্তি তৈরীর কারখানা তুলনায় বেশি—যেখান থেকে অপরাপর রাজ্যে প্রচুর নস্তি সরবরাহ হয়ে আসে। নস্তি কাটতি বুদ্ধির সাথে সাথে নস্তির কোটাও রকমারী তৈরী হচ্ছে। বড় বড় মহল ভাঙতির ঠাঁতেও এখন কি সোনারপার কোটাও ব্যবহৃত হয়। আজকাল কারখানার বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে বৈ নস্তি তৈরী হয়, তাতে ছাত ছোঁরানো হয় না। নস্তির একটি বিশেষ বস্তু, আছে—যা দেখলেই চিনতে পারা যায়। অনেক ক্ষেত্রে নস্তিতে ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করা হয় বাত করে জিনিসটি আরও লেভনীয় হয়ে ওঠে।

অনেক গণ-বস্তুকে লুপথ করে বলতে শোনা গেছে—নস্তি খুবই ভালো জিনিস। এ নিয়মিত ব্যবহারের এই সুফল তাঁরা পেয়েছেন—তাঁদের গলার স্বচিট (যা তাঁদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মূলধন) পরিষ্কার থাকে এবং জোরদার হয়। গুয়াশিটনের সেনেটে বাবার প্রবেশ দুখে দুটি প্রকাণ্ড সবুজ রঙের পাতা বসানো আছে। এইগুলো সর সময় মনোমাতানো নস্তিতে ভর্তি রাখা হয়। দার্শনিক সেনেট সমস্তগণ সভাকক্ষে যেতে আসতে ওখান থেকে নস্তি নিয়ে থাকেন, এইজন্য অবশ্য কোন মূল্য দিতে হয় না তাঁদের।

সব লোকই যে নস্তি ব্যবহার করবে কিংবা সকলের কাছেই যে এটি হবে একান্ত প্রিয়, এমন কথা নেই। তবে বিশ্বের সর্বত্র সিগার, সিগারেট, বিড়ি—এ সকলের পাশে থেকেও এর সমাদর বাড়ছে দিন দিন, এ ঠিক। এমনটি হওয়ার প্রধান কারণই হলো, নস্তি ক্ষতিগ্রহক নয়, উৎসাহ সঞ্চারক। অবসাদ দূর করে অল্প সময়ের মধ্যে হলোও কর্মের প্রেরণা এনে দিতে পার এ সক্ষম, দাবীটি একবারে উড়িয়ে দেবার নয়।

... এমসের প্রচলনপটী ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের একখানি লিপ্যাক্ষিপিত আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রখানি নেতাজী বিমার্চ ইনষ্টিটিউটের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

উনত্রিংশ

রাত তো অনেক। তা বলে কেউ শুয়ে পড়ছে না।

এমন রাত্রি কতদিন আসে নি। এত জনে আজ এক সঙ্গে। চালাধরে জমিয়ে বসা গেল অনেক দিন পরে। না, ঘরের চারগা কতটুকু—উঠান জুড়ে বসা থাক। মায়ের পুলা উপলক্ষে সীতলার মাছ-মাঁরাবা কেউ জালে বেরোর নি। না হর কাল উপোশই বাবে। কালকর তো বারোমাস আছে, মায়ের নামে একটা দিনের এই ছুটি।

জমেছে খুব। ভগ্নদ্বাধ এসে পড়ল কোথা থেকে, নতুন-ঘেরি পতনের মূলে যে মাহুঘটা। ঘেরি বানিয়ে আলা বেঁধে সায়েব চালু করে জনসলে জনালয় বানিয়ে দিয়ে একদিন সরে পড়ল। আর আছে মহেশ, কালী কয়ালীর পুজোর যে এসেছে। এই এক মজা। কাপা বাঙালির কোথায় বসবাস, কেউ জানে না। অস্ত্র সময় বৃষ্টি সে অন্তরীক জন্ম হরে থাকে, মায়ের নামে ঢাক কাটি পড়লে অমনি বৃষ্টি সে মৃতি ধরে উকর হয়। রাধাধাকো বেখানই পুজো হোক, মহেশ হাজির। জন্মলের অঙ্গিনাঙ্গি তার নখদর্পণে। বাঘ-ভুদীর পোষ-মানা গজ-ছাগলের মতো। অস্ত্র বা দেখতে পায় না, তার নজরে সে সব এড়ায় না। এই যেমন, কথাবার্তা হচ্ছে তো উঠানের উপর বলে—কথার মধ্যে চোখ পাকিয়ে হঠাৎ মহেশ আকাশ বুধো তাকিয়ে পড়ে : এইও—কীড়িয়ে কি দেখিছ? পালা, পালা। গা লিরিরির কর কাপা মহেশের কথা শুনে। তার কাণ্ডকারখানা দেখে।

ঠিক ময়রখানে মহেশ। তার পাশে জগা। মহেশ আজ জগাকে নিয়ে পড়েছে। বোকা বোকা শুকনো কাঠ আগিয়ে দিয়েছে। ঐত কটে গিয়ে গুম হচ্ছে আগুন। আলো হচ্ছে। বাতাসের বাপটা আসে এক একবার। রাত্রির পাখী হুহুহু করে উড়ে যায় মাথার উপর দিয়ে। কাপা মহেশ কথা বলে আর বলখল করে হাসে। সীতলার মেয়েপুত্র ঘিরে বসেছে।

কত সব জাজব ধবর। কাপা মহেশ বখনই আসে, এই সব চনকে পাওয়া যায়। শোনবার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে থাকে। জানাশোনার এই দেশভূমি বাহুবল্লব নয়। অসম্মা অম্মা। কালজন্মে কলাছি বেখানে মাহুঘের পা পড়ে। পা কলে এই মহেশ আর তারই মজন বন-বিপটা ভবন বাঙালি। পা কেলবার আগে পুলা মিলে এক

ডবিষাতের জন্য মানসিক করে বনের ঠাকুরকে ভুট্ট করে বেতে হয়। হরেক বকমের শত্রু—নজর মেলে বাঘের দেখা যায়, বাঘ-সাপ-ভুদীর। অস্ত্রের শুধু অস্ত্রের ভরসার গেলে হবে না। চোখ রয়েছে সামনে, পিছনে দুটো চোখ নেই তোমার, পিছন দিয়ে এসে কি করবে? চোখ খেবেই বা কি। কোন হেঁতালকোণ কিবা গিলেভতার চোখের মধ্যে গাছপালার রক্তের সঙ্গে গায়ের রক্ত মিলিয়ে খাপটি মেরে আছে—চোখ থেকেও ভূমি যে বনকানা বনে গিয়েছে। অস্ত্র থাকে থাকুক, কিন্তু আসল হল মস্ত। ভাল গুণীন আগে আগে পথ দেখাবে—মস্ত ঘরের ডেকে কথা বলে।

আর শত্রু আছে—বারা বাতাস হয়ে থাকে, গুণীনের বীজ চোখ শুধু ঠাঁহর গায় তালের। কুটো-বানো জিন-পরা। জনালয়ের অভ্যাচার এড়িয়ে নিঃশব্দ আরামে থাকে তারা। এককালে মাহুঘ হয়তো ছিল—মরে বাবার পর মাহুঘের সবচেয়ে শুধা আর অবিশ্বাসের অস্ত্র নেই। মাহুঘ কিছুতে চুকতে দিতে চায় না জনসলে।

জগা এর মধ্যে সহসা মস্তব্য করে গুটে : বেঁচে থেকে আমাদেরও ঠিক তাই। মাহুঘ বড় পাঞ্জি। তাড়িয়ে তাড়িয়ে কোথায় এই এনে তুলেছে। তাড়া করছে এখানেও।

চোখ তুলে কাপা মহেশ তাকায় একবার তার দিকে। গল্প কথাপূর্ব চলছে : নতুন বারা জনসলে ঢোকে, সকল রকম শত্রুতা সাংঘ তাদেয় সঙ্গে। ঝড়-ভূকান তুলে নৌকা বানচাল করে। বাঘ-সাপ-ভুদীর সেলিয়ে দেয়। নিজেই পত্ন-মৃতি ধরে আসে কখনো বা। অথবা রূপসী মোহিনী হয়ে কোন জলাভূমিতে তুলিয়ে নিয়ে বাড় মটকায়। অথবা সোজাশ্রমি উড়িয়ে নিয়ে দুর্গমতন জঙ্গলে একলা ছেড়ে দেয়। বড় দয়া হল তো মানবোদার ভিতর আঁধার উড়িয়ে রেখে আসে।

মহেশ বলে, আমার সহায় বর তোমরা। বড়লোকের বিদ-নজর লেসেছে, এ জায়গার মজা নেই। কোনদিন আর সুখ পাবে না। দক্ষিণের নতুন নতুন বাগায় নিয়ে বার তোমাঘের। বা বনবিবি আর বাবা দক্ষিণগায়ের আজায় জীবজন্তু আমার কুকুমের দাস : কথা না মানলে মাটি আগুন করে দেব—গাছ-খাল কাঁপিয়ে দোঁড়ে পালাতে দিলে পাবে না। কামরূপ-কামিন্যের আজায় দানো-পরা মাজ করে চলে, আকাশের বায়ু নয়তো আগুন করে দেব। শুধু কাণ্ডারী হয়ে

লোকে ভবসিদ্ধি পায় হয়, গহিন বনের কাণ্ডারী হলান আমার ককির-
বাউলে। চল আমার সঙ্গে। কান গাড়া পায় হয়ে গিয়ে কেশভাড়া—
দরিয়া সেখান থেকে পূর্বে বেলার পথও নয়।

সেই কেশভাড়ার তেপান্তর জুড়ে সালা বালি চিকচিক করছে।
আর কাশবন। মিঠাজল দূর-দূরন্তর থেকে বয়ে আনতে হবে না—
গুপ্তহান আছে কাশবনের ভিতরে, সন্ধান জানে শুধুমাত্র মহেশ।
বালি সরিয়ে গর্ত করে চূপচাপ বোসো গিয়ে—কাকের চোখের
মতো নির্বল জল এসে জমবে। অঁকলা ভরে খেয়ে দেখ,
কী মিষ্টি! জলে বেন বাতাসা ভেজানো।

তনতে তনতে সকলে সোমনা হয়ে ওঠে। সাঁইতলা সন্ধ্যা
আর ভাল লাগে না। এক জায়গার অনেক দিন হয়ে
গেছে। তা ছাড়া প্রবল শত্রু চৌধুরিরা নানা রকম প্যাঁচ
করছে। এতদিন নিষ্কোষ করছিল, এবারে সরসের আদালত অবধি
ধাওয়া করছে। আদালতের চাপরাশি এসে পড়েছিল, এর পিছনে
আরও কত কি আসবে কে জানে। কিন্তু সকলের চেয়ে অসহ
নগেনশশীর হাতকরি। নতুন-আলা এখন হয়ে গেছে গৃহস্থবাড়ি।
জলল হাসিল করে গতবে খেটে হারা একদিন আলা বেঁধেছিল,
বাইরের বাজ্রে মাছব তারা। গৃহস্থবাড়ি ঢোকবার তাদের এজিয়ার
নেই। তাদের বাওয়া-আসা খাল-বাঘের সায়ের অবধি—মাছ
নামিয়ে দিয়ে টাকাপরসা মিটিয়ে নিয়ে চলে এসে। বাস। কাজকর্ম
ব্যাপার বানিজ্য ছাড়া অস্ত্র সম্পর্ক নেই। তামাকটা এখনো বুকতে
খেতে দেয় বটে, তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে একদিন। বোঁড়া নগনাটা
এমনভাবে চোখ ঘোরায়, ইচ্ছাও করে না বিনি কাজে সেখানে দৃ-
শ্য বসে থাকতে।

বলাই বলল, যেতে তো মন লয় শুধী। কিন্তু এ জায়গায় বড়লা
ছিল। হিসাবি মাছব, লিখতে পড়তে জানে, হাতে-পাটে হুঁচার
পরদা নিয়ে এসেছিল। তাইতে ঘোর পত্তন হল। আমাদের সখল
কুসো-কুসো—শুধু ক'টা মাছব গিয়ে নতুন জায়গায় কি করব?

মহেশ বলে, অখই দরিয়ার তলা থেকে দেবতা ডাড়া বের করে
বিরেছেন, মরগল পরসা লাগছে কিলে সেখানে? ডিঙি জোপাড় করে
নাও। চাল-শুন নাও। আর পুজোর ব্যবস্থা লাগে সেইগুলো নিয়ে
নাও মিলবিল করে। এইটে হল আসল, পূজা অঙ্গে খুঁত না থাকে।
নৌকো কাছি কর গিয়ে চরের পাশে। শুণী বাবে পথ দেখিয়ে,
মরল জোয়ানেরা তার পিছন বয়ে। পা ফেলে ফেলে জায়গাজমির
কথল নিচ্ছে। পায়ে হেঁটে যে বকদূর বেড়িয়ে এল, জরি ততখানি
ভাল। লেখাজোখা দলিলপত্র নেই। এসব জমিব মালিক মাছব
লয়, মালিক হলেন দেবতা। তাঁর সঙ্গে লেখাজোখা লাগে না,
খরচ-খরচার ব্যাপার নেই।

জগা জেদ ধরল: হবে না ঠাকুর। আগে ওদের তাড়াব—
তাড়িয়ে দিয়ে তার পরে বেধান বেতে হয় বাব।

জোয়ানার আলোয় নিভুতি আলা দেখা যায় দূরে। সেদিকে
সেদিকে জগা আঁতুল দেখায়: বড় জারেশ করে দৃষ্টিছে। কোন
মূলুক থেকে বাঁশ জুটিয়ে এনে জললেব পোল-গরান কেটে স্বর বেঁধে
দিয়েছি—যক্সা লুঠছে বাইরের উটকো মাছব এসে এখন। ওদের
তাড়াব।

মহেশ বলে, তাড়িয়ে কি লাভ হবে, একের জায়গায় অস্ত্র

দলজন এসে পড়বে। রাজা হয়ে পেল, কলের গাড়ি এসে বাছে
মাছবের গাড়ি লেগে যাবে এবার। আমার মুখ আর হইল না
কোথাও।

এ সমস্ত পরের ভাবনা, একুশি তো আর হচ্ছে না। আপাতত
বিস্তর আনল। মস্তবড় রণজয় হয়েছে, ম্যানোজার প্রথম আর
চাপরাশি নিবারণ রাঁখা-তাত কেসে ছাট পালাতে দিশা পায় না।
বড়বস্ত্রের ভিতরে যেমন জগন্নাথ তেমনি গগন দাঁস। এক মেয়েলোক
হয়ে চাকবাগাও রয়েছে। আর সকলের বড় আনন্দ, বোঁড়া নগনার
তাড়া খেয়ে বলাই পটা আবার এখন বোলজানা পাড়ার মাছব
হয়েছে। বলাই ঢোল বের করে নিয়ে এল ঢালার ভিতর থেকে।
জগা কোলের উপর টেনে নিয়ে হুঁতিনটে যা দিয়ে বলে, বেশ তো
আছে। দিবি আওতাজ আছে।

বলাই বলে, বাজাই যে আমার।

বাজাবি তো বটেই। নতুন-আলার বোল বাজাতিস—বাজনার
বড় ওস্তাদ তুই যে এখন।

জগার মাথার ভিতর বৃষ্টি খেলে যায় একটা। বলে, আলার
ওরা বড় মজা করে দৃষ্টিছে। সে হচ্ছে না।

জগা মা মহেশ সন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। জানে এসে—কিছুই অসম্ভব
নয় বালা অকলের হটকো ছোঁড়াদের পক্ষে।

কি করবি? চানা দিয়ে পড়বি নাকি আলায়?

জগা হাসতে হাসতে বলে, অস্ত্রায় অর্ধে আমার নেই। বোল-
আনা ধরকাজ। একটা জায়গায় শিকড় পেড়ে বসে কি হবে—
ঘুরে ঘুরে গানবাজনা। নগরকীর্তন।

পটা বলে, ঢোল বাজিয়ে কিসের আবার কীর্তন!

ঢোলে বৃষ্টি খেলোর বোল তোলা যায় না? শুভিষ। ঢোলে
আরও জোয়ানায় হয়। এতগুলো জোয়ান ময়দের গলা—মিনমিনে
খোল তার সঙ্গে মানায় না।

মহেশ চালাঘরে ঢুকে পেল। বাঁধের পথে ঘেরিয়ে পড়ল এরা
সব—

নগরবাসী আর তোর

সকীর্তনের সময় বয়ে বাব।

নেচে নেচে বাছ তুলে

হরি বলে ছুটে আয়।

আঠার-বিশ জন মাছব—আঠার রকম স্তর তাদের গলায়।
ঢোলপাড় লেগে গেছে। কালীভাটা আগে পরিক্রমা করে এলো।
নতুন-আলার সামনে বাঁধের উপর এসে পড়ে। নড়তে চায় না
আর এখন থেকে। বাঁধের উপর পাশাপাশি দুটো কেওড়াগাছের
নিচে পুরো আসর বসিয়ে নিয়েছে।

গান গায় আর উঁকিঝুঁকি দেয় জগা।

বলাই বলে, পাড়ানুজ আমবা জেগে, ওদের তো নড়াচড়া নেই।

মেখে আসব জগা ভিতরে গিয়ে?

জগা বলে, দেখবি আর কোন ছাই? এর পরেও দৃষ্টিছে
পারে সে হারা ময়ে গেছে তারাই।

বলছে তবু বোলজানা ভরসা করতে পারে না। গানে আরও
জোর দিয়ে দিল। প্রত্যাশা, নগেনশশী মেজাজ হারিয়ে বহি
উঠানে একবার বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু চিন্তাকারে পলার নলি ছিঁড়ে বাবার দাখিল, বাজাতে বাজাতে আঙুল টনটন করছে—না বাম না গঙ্গা, তিলেক শব্দসাদা নেই ওপক থেকে। হতাশ হয়ে বলাই বলে, ঘরে চল জগা ভাই। কানে হিপি এঁটে ওয়া পড়ে আছে। পারবি নে। আমরাই মিছে হয়গন হছি।

পচা বুলে, তগনা-খোড়া বুলতে পেরেছে, এত মানুষ আমরা পিছু হঠব না। এক কথা বলতে এলে উলটে বিশ কথা শুনিবে দেব। মরে গেলেও সে বেঙ্গবে না।

জগা বলে, তার উপরে আজকে আর এক উপসর্গ টোনি চক্কোত্তি। কিন্তু ওয়া কিছু না বলুক, চাকরবার কি হল? গলার তোড়ে জঙ্গলের বড়-শিরাল লেজ তুলে দৌড় দেয়, সে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে আছে কেমন করে?

বলাই হেসে বলে, আমি বলতে পারি চাকরবালা কেন চুপচাপ। কেন রে?

বলাই বলে, নগেনশশী জন্ম হচ্ছে, তাতে বজ্র স্রুখ চাকরবার। খোড়াটাকে ছুঁচকে দেখতে পারে না। নিজের কষ্ট হলেও হুকানে আঙুল চুকিয়ে ঝাঁত-ঝুখ চেপে পড়ে আছে কোনরকমে।

জগা উল্লাস ভরে বলে, সত্যি? লাগাও তব, জোর লাগাও—কিন্তু কতক্ষণ? পোহাতি তারা উঠে গেছে। একতরফা লাড়ায়ে মজাও পাওয়া যায় না। পাতার কিরে এল অবশেষে। দাওয়ার, বরের মধ্যে, উঠানের উপর—বে যেখানে পাবল পড়িয়ে পড়েছে।

চক্কোত্তি মশার আর নগেনশশী দুই পাটোয়ারি ব্যক্তি। পরিচয় অল্প সময়ের বটে, কিন্তু একে অন্তের গুণ বুঝেছেন। ভাব হয়ে গেছে দু-জনার। আলাখরে পাশাপাশি শুয়েছেন। একটুখানি ঘুমের আবল এসেছিল, গানের তোড়ে সে কোঁক অন্যকক্ষণ কেটে গেছে।

নগেন বলে, এক ছিলিম হবে নাকি চক্কোত্তি মশার? কলকে ধরাব?

চুপ! বলে চক্কোত্তি খামিয়ে গিলেন। কিসকিস করে বলেন, কথা বলবে না, মোটে নড়াচড়া নয়, পেয়ে বসবে। বেড়ায় চোখ দিয়ে দেখছে হয়তো কেউ। যেমন আছে বুঝিয়ে পড়ে থাক অমনি। আর ভাবো।

রাত কেটে গিয়ে অবশেষে গান-বাজনা থামল। আলো হয়ে গেছে চারিদিক। বাতের পথে কেউ নেই। চক্কোত্তি তখন উঠে বললেন : ভ্রাম্যকের কথা বলছিলে না? হোক এইবারে।

হালকা গেরোকাঠের করলা করা থাকে। টোমর খেলে ধরানো যায়। নগেনশশী ভাম্যক সেজে কয়েক টান টেনে ভাল করে ধরিয়ে দিল। জ্বালপের হুঁকা নেই, বালা অকলে দরকার পড়ে না। নলচের মাথা থেকে কলকে নামিয়ে ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতটা চিত্তরে নিচের দিকে ধরে চক্কোত্তির দিকে সম্মুখভরে এগিয়ে দিয়ে বলে, উজ্জ্বল করুন।

চক্কোত্তি চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ ধরে টানলেন। ঠাঁক চিতে মুখ দিয়ে খোঁরা ঝেঁকছে। সঙ্গসা চোখ তাকিয়ে বলেন, কেমন বুঝলে? ঠিকমতো অর্থ না বুঝে নগেনশশী বলে, আজ্ঞে!

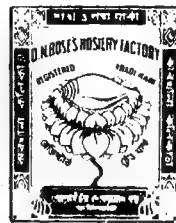
দাস মশার আমার বললেন, শব্দই শিকনে লেগেছে। শব্দই কিসে নিশাত হর তার বৃত্তি-পরামর্শের জন্ত টেনেটেনে নিয়ে এসেন। তা ভালই হল, সব শব্দের স্বরকে দেখে গেলাম। রাত দুপুরে এক শব্দই দেখেছি, ভোরবারে আবার এই ভিন্ন দল দেখলাম। বেশি প্রবল করা দেখে এইবারে ভেবে।

নগেনশশী বিনয় দেখিয়ে বলে, আপনি বলুন, শুনি।

চক্কোত্তি বলেন, চৌধুরি বাবুরা ঘেরিয়ার, দাস মশায়ও তাই। বড় আর ছোট, এই হল ভাব। চিল বড় পাখি তা বলে চুড়ই কি আর পাখি হল না? সামনাসামনি বসে দু-পক্ষের কতকটা বুঝসম্বন্ধ হতে পারে। অন্তত চোঁটা করে দেখা যায়। কিন্তু হাঘরের দল পথে ঝাঁড়িয়ে গুলগোল করে যায়, তাদের সঙ্গে মুখ পৌঁকাতি কিসের বে? আমি বাপু দাস মশায়ের ব্যাভারের মর্ষ বুঝলাম না।

পুলকিত নগেনশশী বাড় নেড়ে বলে, দেখুন ভাই। ইদিকপানে ওদের আসা বন্ধ করে দিয়েছি, তাই নিয়ে জামাই বাবু মন ভুমরে বেঙনি। বুঝিয়ে বলুন আপনি তাঁকে। আর প্রতিকার কোন পথে, সেটাও বলে দিন।

চক্কোত্তি হেসে উঠে বলেন, নতুন আর কি, সনাতন পথ। সময়ের-পথ। ঐ একটা পথ আজন্ম চিনে বসে আছি। পাঁচ-সাত নম্বর মামলা হুঁকে লাগে। পরলা নম্বরে কোজনারি—কাঁচা-খেসো দেবতা থাকে বলে। আইন মোতাবেক ওই চল, আর



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
‘শঙ্খাও মদ্য’

মার্ক গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—ব্রিটেন ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৯৯৫

আইনের বাইরে বা কথার এদিক থেকে চলুক। খানার ভাল করে তথির করে এসে। কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে সবগুলোকে বাতে টেনে নিয়ে যায়।

নগেনশশী বলে, সবগুলোকে লাগবে না। পালের পোশা ঐ জগদীশকে নিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বেটা ছিল না এখানে, কাল এসে পড়েছে। খালের মধ্যে গরুর গাড়িতে গুঁদের আটকে রেখে চক্রান্ত করতে এলো এখানে। বাধে কাঁড়িয়ে অমন হটগোশ করা জগা না থাকলে কেউ সাহস করত না।

চক্রান্তি লুকে নিয়ে বলেন, খবরে এসে গেছে তো, বেড়ে হয়েছে। বাঁটা দেওয়া হবে না, বুঝলে? খেয়েদেয়ে কৃষিকার্তি করে বেড়াক অমনি। কোন-কিছু টের না পায়। আর দেখ, তোমাদের উপর বুকি বেখে কাজ নেই। তোমাদের কি সুবাদ? চৌধুরি বাগুদের নামিয়ে দিতে হবে। ম্যানেজার টং হয়ে রয়েছে, নতুন কিছু করতে হবে না, খালি এখন বাতাস নিয়ে বাওয়া। দেখাতে হবে, তোমরাও চৌধুরিদের সঙ্গে। কালকের ব্যাপারের মধ্যে তোমরা ছিলে না। বাউলগুলো করেছে।

বলতে বলতে চিন্তাবিহ্ন হয়ে চক্রান্তি একটু থামলেন। বলেন, তবে কিনা দাস মশায়ের বোনটোও জড়িয়ে পড়েছে। প্রথম ম্যানেজারকে ভয়ভীত দেখাল সেই।

নগেনশশী আশ্বস্ত হয়ে বলে, তাকে টেনেছে ঐ জগাই। আচ্ছ! রকম জগ করতে ওটাকে। বান্না-করা মুখের ভাত কেসে তরলোক ছুটে বেরলেন। সাপে কাটল না গাড়ে-খালে ভেসে গেলেন কে জানে।

সহস্রে চক্রান্তি ষাড নাড়েন : কিছু না, কিছু না। ও হাছব হবে না—প্রজ্ঞাদ। নামটা শোনা ছিল, কাল পরিচয় হল। নাম ভাড়ির কত খেল খেলতে নাগল। চৌধুরিগঞ্জে সেলে ধবরবাহ পাওয়া যাবে বাবে তো চলো। আমি যেতে রাজি আছি।

টোনি হাছব, মামলা-মোকদ্দমা বাগাতে জুড়ি নেই। এই হল পেশা। গুণগোল হু-পকে বত জমে আসবে, তত মজা লুটবেন।

বলেন, দাস মশায়কেও নিয়ে চলো। খোদ মালিক তো বটে—তোমার আমার চরে তার কথার দাম বেশি। জেবে দেখছি, কালকের কাজটা ভালই হয়েছে মোটের উপর। ঠিক মতো খেলাতে পারলে ম্যানেজার আর জগদীশে লেগে যাবে। সেই যে বলে, থাকে বাঘ মারতে শত্ৰু পাঠানো। বাঘ মরে ভাল, শত্ৰুও মরে আরও ভাল।

উৎসাহে নড়েচড়ে চক্রান্তি উঠে পাড়ালেন : কি হে, দাস মশায় হয় থেকে ওঠেনি এখানে? বোঁক নাও।

কামরার ভিতরে গগন শোয়। অনেকশ লে উঠাচ্ছে, ডোবার বাটে গুঁড়ির উপর বসে বাবলার ডাল ভেঙে পানতন করছে। নগেনশশী বলে, ঠী যে জামাইবাবু। জিজ্ঞাসা করে আসি।

বেকুতেসিমে দেখে বেকার ওখানে হাছব—চাকর। বাঁটা হাতে বে কাঁড়িয়ে আছে।

এখানে কি?

চাকর। কর কর করে ওঠে, তামাক-টামাক বাইরে গিয়ে

খেলেই তো হয়। একখানি বেলা হল, বাঁটা-পাট হয় আর কখন?

না, রাজি নয় গগন। চৌধুরিগঞ্জে সে কিছুতে যাবে না। হাছাবের ঘরতে এসে কাল পেরে ওঠে নি, গোড়ে পালাতে মিশা পায় না। কিছু ছাড়বে না ওরা, আবার আসবে। মামলা-মোকদ্দমার নাস্তানাবুদ করে শোধ তুলবে। বতদুর্নাধ্য লঞ্চে যাবে গগন। নিতান্ত না পেরে ওঠে তো বাত তুলবে এ জায়গা থেকে। পালা পেরে বাতীর দলের মাস্তব যেমন এক গ্রাম ছেড়ে বিদায় হয়। রং মেখে আবার ভিন্ন গাঁয়ের ভালি আসবে গিয়ে নামে। হুনিয়ার মধ্যে ভাগা খুঁজে নিতে একদিন খালি হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, হুনিয়া একেবারে শেষ হয়ে বাজে না এই সাঁতলতার করালীর কূলে এসে। আবার বেরুবে। তা বলে কাল রাত্রে এত সব কাণ্ড হল, সকালবেলা চোখ মুছতে মুছতে শত্রুর পায়ে দণ্ডবৎ হয়ে পড়তে পারবে না।

নগেনশশী নানা রকমে বোকবার চেষ্টা করে : কেশে গেলে কেন জামাইবাবু? ব্রাহ্মণমাস্তব অভিধ হয়ে হাত পুড়িয়ে রাঁধাবাদ্য করলেন। রাঁধা-ভাত তোমরা কেড়ে নিলে তাঁর মুখের সামনে থেকে। ঠী, কেড়ে নেওয়া ছাড়া আবার কি। মামলা-মোকদ্দমা চুলোর বাকগে। কিন্তু মনের কষ্টে ব্রাহ্মণ শাপশাপাশাপ্ত করে গেলেন, তার একটা প্রতিবিধান চাই তো! গিয়ে পড়ে ছুটো মিষ্টিকথা বলে বুসমঞ্চ করা।

গগনের এমন খভাবটা নরম, কিন্তু গৌ ধরল তো একেবারে ভিন্ন মাস্তব। গাড়ালের গৌ আর মরদের গৌ—একবার যে পথ নিয়েছে, কারও ক্ষমতা নেই ভিন্ন দিকে বুরিয়ে দেবার। হার বলে ঘর ছেড়ে এসে এত হুঃখকষ্ট পেয়েছে কিন্তু বাড়ি ফিরে যাবার কথা মনে কখনো ওঠেনি। বাবেও না আর—সেইটুকু গগন বখন তখন বলে থাকে।

নগেনশশী তখন ভিন্ন দিক দিয়ে তাতিয়ে তুলছে : শত্রু-শত্রু করছ—চৌধুরিগঞ্জের শত্রুর কাছে দণ্ডবৎ হবে না। চৌধুরিরা তবু বতই হোক টাকার মাস্তব—ভরলোক। মত সব চ্যাচড়া শত্রু সে তোমার ঘরের দুয়ারে। সুবিধা পেলেই বৃকে বসে দাড়ি উপড়াবে। তাদের ঠাণ্ডা করা হল বেশি জরুরি।

গগন বোকা নয়। বুঝে ফেলেছে নগেন কি বলছে। ভ্রাক সেজে তবু প্রশ্ন করে, ঘরের দুয়ারে কাদের কথা বলছ তুমি—ঠী?

ডোর অবধি কীতন পেরে যারা আমাদের গজারাজ্য করে গেল। ঘরের সামনে বাঁধের উপর এসে হানা দিল—একা-দোকা নয়, পাড়ার ছুটেপুটে এস। কাল ঢোল পিটকে, এর পরে লাঠি-পেটা করবে। টোনি ঠাকুর বলে দিলেন, ভয় এদেরই কাছে, এদের কি করে সামলাবে তাই ভাবো।

গগন এক কথার উড়িয়ে দেয় : আমাদের ভয়টাই নেই। তোমার ওরা দেখতে পারে না। আর চাককে দিয়ে কবাব মতলব করছে তো বিয়ে খাওয়া সেজে হু-জনে বিয়ের হও দিক। তোমার বোন থাকতে চায় তো রেখে বাও তাকে। আসে আমার যেমন ছিলার, ঠিক আবার তেমনই হয়ে থাকবে।

রাগ ও বিরক্তির ভাব গিয়ে নগেনশশীর মুখ খুলিতে উজ্জল হল : বেশ, তাই। জোপাড়বস্ত্র করে দিয়ে দাঁও বিরে। তুমি বোনাই আছ, আমিও তোমার বোনাই হয়ে ঘরের মানুষ বেশে ঘরে চলে যাই। পেটের শোড়ার তোমার মতন জঙ্গলে আসি নি তো। বাপ-সাহার নৌলতে তিন পুরুষ এখনো উঠানে পা না দিয়ে ঘরে বসে খেয়েপরে বেতে পারব।

গগন বাবে না তো, নগেনশশী ও চক্কোত্তি চললেন। হুঁটো মানুষ রাত্রিবেলা আচনা পথে ছুটে বেরল, অজ্ঞ কিছু না হোক তাদের খবরাখবর নিয়ে আসা কর্তব্য। খবর ঐ চৌধুরিগঞ্জে না হলে তো চল যাবেন ফুলতলা অবধি। ও-তরফের সামনে গিরে দোবজপরাধ বেড়ে কসতে হবে একেবারে : আমর নেই ওসব বজ্জাতির মধ্যে, আমরা কিছু জ্ঞানি নে।

ম্যানেজার ও চাপরাশি পৌঁছেছেন তাঁরা চৌধুরিগঞ্জের আলাদ। অনেক কষ্ট পেয়ে, অনেক অপথ-বিপথ ঘুরে। নিবারণ জোরবেলা হাডের ডিক্রিতে বগুনা হয়ে গেছে। আছেন প্রথম ম্যানেজার। আহেশি মানুষ, অত ধকল কাটায় উঠতে পারেন নি। রাত্রিবেলা নিবনু উপোষ গেছে, যড়ও ছিল না ঘর। মেছো বাজ্যে, দরকার মতন চাটটুকুও পাওয়া যায় না। সব কিছু আগে থাকতে বোগাড় করে রাখতে হয়। কালোসোনা গেছে চিড়ে-ঝুড়ির চোঁয়ার—গেছে তো গেছেই, দেখ কোথাও বস গিলতে বসে গেল তিন। মেছোঘেবির এই ভুলভালকে বিখাস নেই। প্রথম ম্যানেজার শুয়ে ছিলেন। নগেনশশীকে আগে দেখেন নি, চক্কোত্তিকে দেখে চিনলেন। গর্জন করে উঠলেন উঠে বসে : সতালবেলা কোন মতলবে আবার? কালীতলার বলি মিতে নিয়ে বা'জল। আইন তো জানা আছে মশায়ের—ক'বছর জেলের বানি ঘোরাতে হবে সেইটে ভাল করে ওদের বুঝিয়ে দিন গে।

টোনি চক্কোত্তি বলেন, শুণু আপনি হলেও তো ভাল ছিল ম্যানেজার মশায়। আদালতের চাপরাশিও সরকারি কাজে বাধ্যতাক্ষম। সরকারি লোকের উপর জুলুম, খুনখারাবির চেষ্টা। শ্রাঙ্ক কদ্ব অবধি গড়াতে পারে, উটকো লোকে কিছু কি তলিয়ে দেখে?

নগেনশশী স্তম্ভিত। কী মানুষ চক্কোত্তি। ঠাণ্ডা করতে এসে আরও বে বেশি করে ত্যাগিয়ে দিচ্ছে। প্রথম ম্যানেজার ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, কে কাউকে ছাড়ব না, সবস্বত্বে জড়িয়ে কোঁদখারি হচ্ছে। নামধার্য জোগাড়ের জন্ত থেকে গেলাম আজকের দিনটা।

উঁহ, উঁহ—সবেগে ঘাড় নেড়ে ধুটেন চক্কোত্তি : পাকা লোক হয়ে কাঁচা কাজ করে বসবেন না। তবে তো জুত পেয়ে বাবে। গগন দাস বতই হোক ঘেরিয়ার মানুষ। শাঁস আছে, ছাঁগচড়া কাজে দে বাবে না। এ সব করে বেড়ার উড়ো মানুষ বারা। বলে দিল মুখে মুখে ফুঙ্কুড়ি কথা কতকগুলো, বাতাসে উড়ে চলে গেল। সে কথার দায়বদ্ধি নিতে বাবে না। এবারে কাঁদবার পাওয়া গেল তো দলটা ধরে সবুতিত শিক্ষা দিয়ে দিন। আপনাদের বৈয়কিক বিরোধের মীমাংসা হতে তারপরে দেখবেন হু-মণ্ডের বেশি লাগবে না।

আলম মানুষগাঁচ নগেনশশী এককনে বুকে পাগছে। চক্কোত্তিকে

মনে মনে তারিক করে। চক্কোত্তি আবার বলেন, পুরো দল নিয়ে পড়তে হবে না। পালের গোলা একটা আছে, তার নাম জগন্নাথ। ওটাকে কাটকে পুবে দিন, দেখবেন সব ঠাণ্ডা।

কিছু প্রথমও গভীর জলের মাছ,—এক কথায় মেনে নেনেন, সে মানুষ নন। ঘাড় নেড়ে বললেন, ও বললে শুনি নে মশায়। খুঁটোর জোরে মেজা লড়ে। গগন দাস প্রকান্তে না হোক তলে তলে ছিল। ওই যে ছুঁড়িতা—গগন দাসের বোনই তো—হেসে হেসে পড়িয়ে পড়ছিল আমরা বখন বেরিয়ে আসি। স্বকর্ণে শুনে এসেছি।

চক্কোত্তি বলেন, কচকে ছুঁড়ি—কোন একটা মজা শেলেই হাসে। ও হাসি বর্জবোর মধ্যে নাকি? ইনি নগেনশশী, গগনের সখী—মেয়েটাকে দোষপক্ষে বিয়ে করে নিয়ে যাবেন। ডাডারাজ্যে নিয়ে তুলে গেসেলে ছুড়ে দেবেন। আর কখনো এ মুখে হতে হবে না।

প্রথম কঠিন হয়ে বলেন, ওসব বুঝি নে আমি। বাছাবাছির কী দরকার! সবস্বত্বে জড়িয়ে দেব। নির্দোষী হলে আদালতে প্রমাণ দিয়ে ছাড়িয়ে আসবে।

কথা এমনি পীড়াবে, চক্কোত্তিরও আশঙ্কাজে ছিল সটা। নগেনের দিকে তিনি চোখ ঈসার্য কখন : ম্যানেজার বাবু বুঝতে 'পানচ্ছে' না। বুঝিয়ে দাঁও নগেন বাবু।

নগেনশশীর কোমরে গাঁজিয়া বাঁধা। চক্কোত্তির পরামর্শ নিয়ে এসেছে। গাঁজিয়া খুলে টাকাপয়সা বের করে। ইতিমধ্যে কালোসোনা ফিরেছে কোথা থেকে হুড়ি সংগ্রহ করে। লেনদেনের ব্যাপার দেখল একটুখানি পীড়িয়ে। তামাক আনল, পান সেজে

Amico's
GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় দৈহিক ব্যথার হ্রাস পাচ্ছেন- কোথায়?

কোমরে, হাঁটুতে, কিংবা কোন সন্ধিহানে?

তবে খুশী হবেন—

পারীক্ষিক, হুক বা পিঠের পীড়নার,
ঘাড়ের ইত্যাদি ব্যবহার্য ব্যথার

এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেন্ট

(সবুজ মালিশ)
ব্যস্তদৈহিক নির্ভরযোগ্য।

মূল্য : বড় শিশি—২.৭৫ নং পঃ
ছোট শিশি—১.৭৫ নং পঃ
“মাসল” বস্তুর

বন্দোবস্তের জন্য লিখুন—

আমিন গ্রুপ ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
৮০ নং কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা-১



এনে দিল। কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ। বাওরার সময় প্রথম এগিরে বাঁধ অবধি দিয়ে এলেন। নগেনকে বলেন, পাটোরারি হাটুয় চক্কান্তি মশায়। এঁর ভক্তে তোমাদের রক্তে হয়ে গেল। তোমার বোনটিকে বোলো সে কথা। আমরা ঘেরিয়ার, তোমরা ঘেরিয়ার—আমাদের উত্তর তরফের শত্রু ভগল্লাথ। ঐ শত্রু নিকেশ করি আগে। চোর-ছাঁচোড় চেলাচাঞ্চুলে ফুঁরে উড়ে বাবে তারপরে। বুঝিয়ে বোলো সমস্ত দাসমশায়কে।

চৌধুরিগণ থেকে কিয়ে এসে গগনকে মাঝে বাসিয়ে ফলাও করে এই সব কথা হচ্ছে। বড় শত্রু এইবারে মিত্র হয়ে মাথায় মাথায় এক হয়ে লাগছে। নতুন-ঘেরির আর বিপদ নেই।

নজর পড়ল, চাকুবালা ঘৃণ হয়ে শুকছে। নগেনশশী বলে ওঠে, বোনের জন্মেই তুমি জাহাঙ্গীরে বাবে জামাইবাঁবু। মান-পশার নষ্ট হবে। ম্যানেজার আর চাপড়ানিকে কালাতলার বলি দেবার কথা চাকু বলেছিল, কোমরে দড়ি বেঁধে সকলের আগে ওকেই ধানার টানত। খরচপত্র করে বিজ্ঞর কঠে আমরা টেকিয়ে এলাম। সামাল কর এধনো বোনকে, বালা থেকে সরিয়ে লাও। আমরা সেই কথা দিয়ে এসেছি। বাঘেলার নয়তো পার থাকবে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো চক্কান্তি মশায়ের কাছে শোন।

চাকু চলে গেল। বেরিয়ে পড়ল পাড়ার দিকে। সারা রাত্রি ছল্লোড়ের পর নিশ্চয় সব মজা করে ঘুম দিচ্ছে। চৌধুরি-আলা আর নতুন-আলায় মিলে গলা কাটবার মেলতুকে শান দিচ্ছে, নির্বোধ গৌরারগুলো কিছু জানে না।

ফাণা মহেশ গুণ্ডয়ার জেগে। লক্ষ্য কলকের গাঁজা সেক্রে এক-মনে ছুড়ি ধরাচ্ছে। বাড়ি তুলে চাকুবালাকে দেখে বলে, হুণুরের

সেবা তোমাদের ওখানে দিদি। বালাখনে আর জীকরে ভাত-কোড়া নেই। তোমাদের হৈসেলের ভাত খাব। হাদাগুলোই হাত পুড়িয়ে রাগা করতে যায়।

চাকুবালা এদিক-ওদিক উঁকি দিচ্ছে বাল, সে লোকটা কোথায় গেল ঠাকুব মশায়? সেই যে নাটের গুরু—হুশমন দুটোকে গল্প গ্যাড়তে তুলে নিয়ে আসছিল।

ভগল্লাথ? গাড়ি কেবল দিতে চলে গেল। বাজারদলে আমার পাতে জুটে যায়—বলাই আর পচা পাহারাদার হয়ে গেছে। ওরা টেনেটান নিয়ে আসবে।

কবে আসবে?

আমি তো রয়ে গেলাম ওদের জন্তে। বলে করে ছাড়ান করে আসবে তো—আজকে পেরে উঠবে না। কাল নয় তো পরন্ত। বয়ান-খোলায় আর হবে না, এখানে থাকবে।

চাকু দূর হয়ে বলে, এখানেও থাকবে না। সেই কথা বলতে এসেছিলাম। ওকে শেলায় না, তোমায় বলে যাচ্ছি। নতুন বাহার কথা বলছিলে, সেইখানে নিয়ে তোলাগে। আমার দালা এখন ঘেরিয়ার, আগের মতন আর হবে না। হাজারায় পড়ে বাবে, ধরে নিরে কাটকে পুবেবে। বলে দিও তাদের।

মহেশ বড় খুশ: আছি তো সেই জন্তে। নেহাৎ একবার দেখিয়ে আনব নতুন জায়গাটা। হাটুয়ের নজর খাটো কেন জানিনে। দুবের দিকে দেখতে পায় না। শিরথিয়ে টাইয়ের অভাব নেই, হাল্লামাহজুতের তবে কী দরকার! ওরা না যায় তো ভিন্ন এলাকার মানুষ দেখতে হবে। সেবা কিন্তু এই ক'দিন তোমাদের ওখানে। জগলব মানুষের গৃহস্থ-বাড়ি খাওয়া—এমন খাওয়া খেয়ে নেব, মাসাবধি তার ঢেকুর উঠবে। [ক্রমশঃ]

দেহের কথা

শ্রীবিবেকানন্দ পাল

[শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ১৪শ অধ্যায় অবলম্বনে]

মাগের মনোব কণিক তুলে আসেই বুঝি কুলজার,

মাগের বুক কাটা হয়েই হয় যে চির আশঙ্কার।

ভাবেই নাকো পাগল করা চর্যার সে দৈতের কুখা,

শিয়ার শুধু গরলধারা, নয় সে কত পবন স্তম্ভ।

আবার জানি, কমা চেয়েই, পায় যে নারী পুণ্ডরাক,

কুলের মাঝে আসেই নেমে বংশ তিলক অলঙ্কার।

কতপ সে ঋষির জায়া, লক্ষকল্পা নামটি দিতি,
লঙ্কাকালে কামার্তি, যে হলেন অতি, নয় বা বীতি।

ছিলেন ঋষি বজ্রশালার, মরুচিত বিজু-ধ্যানে,
অমুচিত এই আবেগনেই, শেলেন ব্যথা বড়ই প্রাণে;

“যিক তুমারের নিলাজ নারী, অবুর কেন পাগলপারা?

পুণ্ডরকে শাঙ হও, সামনে দেখে পূজ্য ধারা।”

বিজ্ঞ বাহারি ঠাঁই বাঙ্গী নারীর কানে বুঝাই বাজে;

সিরাতিই অমোঘ বিধান চরম কুঁড়ি সকল হাজে

কপের মাঝে বুঝলে নারী, কর্ণফল নয় ক’সোজা,

বংশধারায় বইতে হবে হয়তো বুঝি পাপের বোকা।

“আমায় ক্ষম, দেবতা সবে, এই মিনতি সবার করি,

আমার দোষে দণ্ড দিতে পারবে নাক’ পুজোপরি।”

“বামার সাথে দেবতা হলো, অনিহির যে করলে আর

তারই ফলে হবেই হবে, পুত্র দু’টি কুলজার;

বিশ্বমাঝে করবে তার্য অকথ্য যে অন্তাচার,

বধতে তাদের অবতীর্ণ হবেন হরি পুনবার।”

বামীর কথা শুনেই দিতি, বললে, “তোমার অপার কুণা,

ব্রহ্মপাপ মুক্ত তাগের হারবে হরি; ভাগ্য কিবা।”

“অমুতাপের পুণ্য তব, হবেই জেনো এক যে নাস্তি,

ভিনটি ভুবন মাঝেই বার ব্যাপ্ত হবে বশের ভাস্তি।

পুণ্য ভাষায়, মুছেই যাবে জগৎ হতে বহুতক পাপ,

লক্ষ কথা হয়গ করে দিশাধ দিল্লয় কতক তাপ।”

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬০) ফ্রান্স সাহারা স্বাধীনতা দাবীতে তার প্রথম আনুষ্ঠানিক বোমার বিক্ষোভ ঘটাইয়াছে। সাহারা স্বাধীনতা দাবীতে এই বিক্ষোভ ঘটান হইয়াছে তাহা বোর্গোয়ান জারজিয়াস হইতে ৭৫০ মাইল এবং কাসাবান্স হইতে ৬২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। একটি তিন শত ফুট উচ্চ ইম্পাতের স্তম্ভের উপর হইতে জি, এম, টি সকাল ছয়টায় (ভারতীয় ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম বেলো সাড়ে এগারটা) এই বিক্ষোভ ঘটান হয়। গত নভেম্বর (১৯৫৯) মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ সাহারায় পরমাণু পরীক্ষা স্থগিত রাখিবার জন্য ফ্রান্সকে অনুরোধ করিয়াছিল। ফ্রান্স এই অনুরোধে কর্ণপাত করে নাই। এই প্রস্তাব সম্পর্কে বুটেন, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহাতেই ফ্রান্স এই অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সাহস পাইয়াছে। তাছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অনুরোধ নিজের পছন্দ মত না হইলে কোন রাষ্ট্রই সেই অনুরোধ রক্ষা করে না, ইহা নূতন কথা কিছুই নয়। পশ্চিম-আফ্রিকায় কয়েকটি রাষ্ট্র পরমাণু বোমার পরীক্ষার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। ফ্রান্স এই প্রতিবাদ গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবে ইহা আশা করা হইয়াছিল। ফ্রান্স নিজের পরমাণুবোমা বিক্ষোভ ঘটাইবার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না, প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তির আসন লাভ করিয়াছে কি না, পরমাণুশক্তি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকই মনে জাগিতে পারে। পরমাণুবোমার বিক্ষোভ ঘটাইয়া ফ্রান্স যে উদ্দেশ্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে প্রতিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে তাহাতে তাহার এই উদ্দেশ্য যে কিছু পরিমাণে সূর্য হইয়াছে ইহা মনে করিলে হয়ত ভুল হইবে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬০) সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, it was only natural that first Britain and then France had developed a nuclear device in the circumstance of life existing today অর্থাৎ বর্তমানে যে অবস্থা চলিতেছে তাহাতে প্রথমে ব্রিটেন এবং তারপর ফ্রান্স পরমাণু বোমা উদ্ভাবন করিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে তিনি এই আশাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ এমন একটা চুক্তিতে পৌঁছিতে পারিবেন যাহাতে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র এই ধরনের অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় অর্থব্যয় করিতে না চায়। তাহার এই আশা পূর্ণ হইলে স্তম্ভের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহারার বিক্ষোভ ইহাট প্রমাণিত করিয়াছে যে, পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র সবেছে দুজনের বহুত আজ আর কিছুই নাই।

আজ ফ্রান্স পরমাণু বোমা নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। লাল চীনও পরমাণু বোমা নির্মাণ করিতে সমর্থ হইবে। জাপান এবং অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রও যে পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে পারিবে না, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহাতে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসকারী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ না হইয়া একটা দীর্ঘযাত্রী অচল অবস্থা হইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষামূলক বিক্ষোভ বহুই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, বায়ুমণ্ডলী তত্ত্বই হইতে থাকিবে এবং পৃথিবীর বর্তমান অধিবাসীদিগকে না হইলেও তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে অতিভাবহ কল ভোগ করিতে হইবে। বিশ্ববাসীকে এক



ত্রিগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পরমাণু শক্তিবর্গকে একথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক প্রয়োজন। সেদৃ বৎসর হইতে চলিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং বুটেন পরীক্ষামূলক বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য আলোচনা চালাইতেছে। সাহারায় একটি পরমাণু বোমার বিক্ষোভ ঘটাইয়া ফ্রান্স হয়ত এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে চায়। বর্তমানে যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতে ফ্রান্সকেও যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে বি না সে-সময়ে কিছুই এখনও জানিতে পারা যায় নাই। হয়ত ফ্রান্সকে আমন্ত্রণ করা নাও হইতে পারে। ফ্রান্স যদি আমন্ত্রিত না হয় এবং বৃহৎ পরমাণু শক্তিবর্গ পরীক্ষামূলক বিক্ষোভ বন্ধ রাখা সম্পর্কে একটা চুক্তিতে উপনীত হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ফ্রান্স সেই চুক্তি মানিবে কি? সাহারায় পরমাণু বোমা বিক্ষোভ ফ্রান্সের প্রথম ও শেষ পরীক্ষামূলক বিক্ষোভ, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে ফ্রান্সের একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনা হতে ১৯৬৫ সালের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হইবে না। কিন্তু আগামী দুই মাসের মধ্যে ফ্রান্স সাহারায় আরও একটি চোট পরমাণু বোমার বিক্ষোভ ঘটাইবে এবং তাহার প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিক্ষোভ হয়ত ১৯৬১ সালের মধ্যে প্রকাশ্য মহাসাগরে ঘটান হইবে। ফ্রান্স আশা করে, ১৯৬৫ সালের মধ্যে বৎসরে একশতটি হাইড্রোজেন বোমা সে তৈয়ার করিতে পারিবে। ইহার অর্থ প্রতি চারিদিনে একটি হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার হইবে। সেই সঙ্গে পরমাণু বোমা বহু দূর জগলে বহন করিয়া লইয়া রাইবার উপবোয়ী জেট বোমার এবং মিসাইল—৪ নির্মাণকার্য ১৯৬৩ সালে পূর্ণ মাত্রা লাভ করিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট জা গেলের নেতৃত্বে ফ্রান্স পৃথিবীর অন্ততম পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হইবার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। সাহারায় বিক্ষোভ তাহারই প্রথম ফল। সাহারার আশে-পাশে আফ্রিকায় যে সকল স্বাধীন রাষ্ট্র আছে তাহারা, ফ্রান্সের এই বিক্ষোভের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে। বানিন্স করালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি আটক করা হইয়াছে, অব্যবহৃত বিক্ষোভের ফল কিরণ হয় তাহা না জানা পর্যন্ত। মরক্কো সরকার প্যারী হইতে তাহাদের রাষ্ট্রদূত বিদায়ী আনিয়াছেন।

এশিয়ার বাঙালিও এই বিক্ষোভের ফলে যে বিচলিত হইয়াছে সে কথা সন্নিহিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী ভেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ডও স্বীকার করিয়াছেন। এই বিক্ষোভের ফল ভারতে কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলিতেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহলাল নেহরু লোকসভায় বলিয়াছেন, সাধারণ ফ্রান্সের পরমাণু বোমা বিক্ষোভের ফলে যেটুকু হেজেন্সিতা বাড়িয়াছে তাগাতে ভারতের আশঙ্কার কারণ নাই। চতুর্থ নাট, কিন্তু পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিক্ষোভ যদি চলিতে থাকে তবে উগ্রর পরিশ্রম পুঙ্খানুপুঙ্খে বিশ্ববাসীর মধ্যে যে সঙ্কোচ করা হইবে, উহাই প্রধান উদ্বেগের বিষয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু ফ্রান্স এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির দ্বারাও বিক্ষোভে যোগেই বিচলিত নয়। পৃথিবীর তিনটি বৃহৎ শক্তির চারো বতনিন পরমাণু অস্ত্র থাকিবে তত দিন ফ্রান্স পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের বিরত হইবে না, ইহাই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্যগলের স্বপ্ন। ১৯৫৮ সালে শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পরই তিনি পরমাণু বোমা তৈয়ার করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেও বৎসরের চতুর্থ এই পরমাণু বোমা তৈয়ার করা হইয়াছে। পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের জন্য ফ্রান্স ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াও ১৯৫৫ সালের মধ্যে সে পরমাণু অস্ত্রে মাণিং-বুদ্ধির বা রাশিয়ার সবকক্ষ হইতে পারিবে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

পরমাপু বোমার প্রথম অধিকারী হাইড্রাক্ট মার্কিং-যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়া পরমাপু বোমার নির্মাণ কবিত্তে সমর্থ না হওয়ায় মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রেই ছিল পরমাপু বোমার সবচেঁট্টা অধিকারী। বয়ালিংজম নিরোবেধে অল্প মার্কিং পরবর্ত্তীকৃতিকৈ মার্কিং-যুক্তরাষ্ট্রব পরমাপু বোমার একচেঁট্টা অধিকারেব উপরেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে বিশ্ববাসী সর্বপ্রথম জানিতে পারিল যে, রাশিয়াও পরমাপু বোমার বিকোষণ ঘটাইয়াছে। ইহার পর ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে আমেরা জানিতে পারি, মার্কিং-যুক্তরাষ্ট্র পরমাপু বোমা অপেক্ষাও বহুগুণ শক্তিশালী "সুপার" বোমা তৈয়ার করিতেছে। মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রব হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণের কাজ চলার সংবাদ যখন প্রকাশিত সেই সময় হইও প্রকাশিত হইয়াছিল যে, রাশিয়াও হাইড্রোজেন বোমার উৎকান্তিক বিত্তরী জানে। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিং-যুক্তরাষ্ট্র এনিওটোক অটকে (Eniwetok Atok) সর্বপ্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিকোষণ ঘটায়। কিন্তু উহারবিধে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্বে প্রকাশ করা হয় নাই। অতঃপর ১৯৪৪ সালের ১লা মার্চ প্রোশা মহাসাগরের মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষামূলক ভাবে হাইড্রোজেন বোমার বিকোষণ ঘটায়। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৩ সালের ১-ই আগষ্ট তদানীন্তন সোভিয়েট এশানমন্ত্রী ম্যাসলেনকোভ সর্বোচ্চ সোভিয়েটের যুক্ত অবিশেষণে ঘোষণা করেন যে, হাইড্রোজেন বোমাও আর মার্কিং-যুক্তরাষ্ট্রে একচেঁট্টা নহে। ইহার চারদিন পরেই রাশিয়া হাইড্রোজেন বোমার বিকোষণ ঘটাইবার পূর্বে মার্কিং-যুক্তরাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমার কোন বিকোষণ ঘটাইয়াছে কিনা এই প্রশ্ন অব্যাহত। পরমাপু শক্তিতে রাশিয়া বহু না মার্কিং-যুক্তরাষ্ট্র বহু তাহা

বলা সম্ভব নয়। পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার সংখ্যা দিক দিয়া মাঝিণ-যুক্তরাষ্ট্রে হয়ত রাশিয়া অপেক্ষা অধিক দৃষ্টিশালী। তিচ্ছ লুণ্ঠারার কেশপাশে নির্দোষ এবং মহাকাশের গবেষণায় ব্যাপারে রাশিয়া যে মাঝিণ-যুক্তরাষ্ট্রে হারুড়ায়। গিয়াছে। এবাং বলা বাস্তব্য মাত্র। রাশিয়ার কেশপাশগুলির অতিক্রমের ভার বইনের ক্ষমতা আছে। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের কটোগ্রাফ লইতে লম্বাং হওয়ার বুঝা বাইতেছে, এই সকল কেশপাশে নিয়ন্ত্রিত পরিবার ব্যাপারে রাশিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। আর মাঝিণ-যুক্তরাষ্ট্রেও প্রায় উঠিয়াছে যে, রাশিয়া যুক্ত চুড়ান্ত ভয়-পরাভব উদ্ভাবনের উপযোগী সামরিক শক্তি অজ্ঞানের কাছাকাছি রাশিয়া পৌঁছিয়াছে কিনা। অর্থাৎ রাশিয়া এমন সামরিক শক্তি অর্জন করিতে চাহিয়াছে কি না, যে, প্রাচ্য আক্রমণের ক্ষত সহ করিয়া সে আক্রমণ চালাইতে পার।

মার্কিন ষ্টেটসক বিমান বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল পাণ্ড্যর বলিয়াছেন যে, "সোভিয়েট ইউনিয়ন ত্রিশ মিনিটের মধ্যে আমাদের সমগ্র পরমাণবিক আধাস্তর সামর্যকে ধ্বংস প্রেতি আক্রমণের (retaliatory) শক্তিকে ধ্বংস করিতে সক্ষম"। রাশিয়া এক মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরমাণবিক শক্তির এই যে ব্যবধান তাহা "missile gap" বলিয়া অভিহিত। উটাক একন বলা হয় "deterrent gap." এ সম্পর্কে প্রধান আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। কিন্তু মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৩ সালের মধ্যে এই ব্যবধান বিলুপ্ত করিতে পারিবে কি না, এট প্রশ্নও উঠিয়াছে। ইহা বিবেচনা করিলে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ফ্রান্স মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার সমকক্ষ হইতে পারিবে ইহা জালা করা সম্ভব নয়। তবে সাধারণ বিবেচনা 'নাটো'তে যে ফ্রান্সের মধ্যদা বৃদ্ধি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ଜୈନ-ବ୍ରହ୍ମ ମୌସାମ୍ଭୁ ଚୁକ୍ତି—

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে যে সময় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে, সেই সময় চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে উত্তর দেশের সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি চুক্তি এবং দশ বৎসরের জন্য একটি ঐক্যী ও অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার তাৎপৰ্য্য এবং চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের উপর উহার প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। চীনের প্রধান মন্ত্রী যে: চো-এন লাইয়ের আমন্ত্রণে ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল নি উইন গত ২৪শে জানুয়ারী (১৯৬৫) শাকিংয়ে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় উল্লিখিত চুক্তি দুইটি স্বাক্ষরিত হয়। গত ২৮শে জানুয়ারী (১৯৬৫) একটি বৌধ উদ্ভাধারে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় কিন্তু ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী বেন্‌সেন পৌছিবার পর উক্ত চুক্তির বিষয় এক সঙ্গে শিকিং ও বেঙ্গলে প্রকাশ করা হয়। চীন ব্রহ্মদেশে সীমান্ত বিরোধটাও অবত নতন নয়। ১৯৫৪ সাল হইতে এই বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই। এই বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে চীনের প্রধান মন্ত্রী ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রীকে শিকিংয়ে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য চীনের প্রধান মন্ত্রী শিকিংয়ে যা য়েছেন

জালাচাঁর জন্ত ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নিকটেও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ বেগম গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। চীন-ব্রহ্মদেশ সীমান্ত বিরোধ যে সেরকম গুরুতর নয়, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। চীন-ব্রহ্মদেশ সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্ত যে-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাকেই তাহার কল কি হইবে, এখনই তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়।

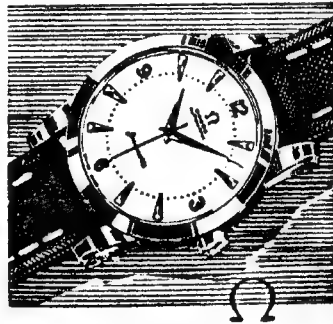
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে দুইটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। একটি ৭শ বৎসরের জন্ত মৈত্রী ও অনাক্রমণ চুক্তি আর একটি সীমান্ত সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্ত। নয়াচীন সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠান গত ৩১শে জানুয়ারী (১৯৬০) নিক্তি হইতে প্রচাৰিত বিশপোর্টে এই চুক্তি দুইটির বিপর্যয় বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। সীমান্ত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উভয় দেশের সমান সখ্যক প্রতিনিধি লইয়া একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হইবে এবং এই কমিটি উভার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্ত একটি চুক্তির খসড়া তৈয়ারি করিবেন, সীমান্ত অঞ্চল ভ্রমণ করিবেন এবং সীমান্ত চিহ্নিত করার জন্ত লোক নিযুক্ত করিবেন। কি ভাবে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা হইবে তাহার নীতিও চুক্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিম পাণ্ডুলুং এবং কাংকাং অঞ্চল ব্যতীত মোচাকুতি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হইতে চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের পশ্চিমমুখক শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র অচিহ্নিত সীমান্ত অঞ্চলকে প্রচলিত সীমারেখা অনুসারে চিহ্নিত করা হইবে। অর্থাৎ একদিকে উত্তর দিকের মোচাকুতি উচ্চ শৃঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া টাইপিং, শোয়েসি, হু এবং টুং নদীর জলরেখা বরাবর এবং অপর দিকে মাইহা নদীর জলরেখা ধরিয়া চিঙ্গাম ও নকুমকাংয়ের মধ্যে মাইহা ও তুলংয়ের সম্মিলন বরাবর এবং উত্তর পূর্ব একদিকে তুলং ও ভাংলু নদীর মধ্যবর্তী জলরেখা এবং অপরদিকে চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের পশ্চিমের শেষ সীমা পর্যন্ত তুলং ব্যতীত হইবারতী নদীর উত্তান অঞ্চলের সমস্ত উপনদী বরাবর সমগ্র সীমান্ত প্রচলিত সীমারেখা অনুযায়ী চিহ্নিত করা হইবে। ব্রহ্মদেশ তিম, পাণ্ডুলুং ও কাংকাং অঞ্চল চীনকে ফিরাইয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। উক্ত অঞ্চলের কতখানি ভূভাগ চীনকে দেওয়া হইবে তাহা যুক্ত কমিটি নির্ধারণ করিবেন এবং তদনুযায়ী সীমারেখা চিহ্নিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। চীন সরকারও ত্রিভুজাকৃতি মেংখাও অঞ্চলটি ব্রহ্মদেশকে দিয়া দিবেন এবং উহার বিনিময়ে ব্রহ্মদেশ পানছাং ও পানলাও উপজাতীয়দের কতকটা অঞ্চল চীনকে প্রদান করিবেন।

চুক্তিতে সীমান্ত চিহ্নিত করিবার যে নীতি স্বীকৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, চীন সরকার ম্যাকমোহন লাইনের ব্রহ্মদেশের সচিব সস্বস্ত্র শেষ অংশ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং সীমান্তরেখা নির্ধারণের জন্ত 'গুয়াটারশেড' নীতিও মানিয়া লইয়াছেন। দুইটি: এই নীতি সর্বত্র বলিবার কিছুই নাই। ১৯৪১ সালে ইসেলিন কমিশন (Iselin Commission) যে সীমান্তরেখা নির্ধারণ করিয়াছিলেন তাহাও অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের স্থানীয় বসিন্তে কাজ করিবার পূর্বতন অবিকারও চীন ছাড়িয়া দিয়াছে। ব্রহ্মদেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রাঙাঙ্গে এই চুক্তি

সম্পাদিত হওয়ার একটা তাৎপর্য্য যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্যান্টনিসের অল্পকাল দেশত্যাগ ইন্টেনসিটিভে ব্রহ্ম নির্বাচনে বাহ্যতে কিছু সুবিধা করিতে পারে সেইজন্য সাধারণ নির্বাচনের প্রাঙাঙ্গে এই চুক্তি করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু নির্বাচনে এক-এক-পি-এক-এলের উল্লব অংশট সখাগণিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। নি উইন মিশন যে উদ্দেশ্য লইয়া ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য কতকটা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই আপাতত মনে হইতেছে।

ব্রহ্মদেশে সাধারণ নির্বাচন—

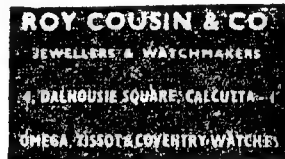
ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি যে সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেল, তাহাতে উ হু দেশের নিরঙ্কুশ সখাগণিষ্ঠতা লাভে উ হু জনপ্রিয়তা বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। ক্যান্টন বিরোধী গণস্বাধীনতা লীগ ১৯৫৮ সালে বিপ্লবিতরু হইয়াছে। উত্তর উ হু সমর্থকগণ (clean faction of the A. F. P. F. L) পুনরায় চারি বৎসরের জন্ত পুনরায় ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হইলেন। ক্যান্টন বিরোধী গণ-স্বাধীনতা লীগের যে অংশ stable faction নামে অভিহিত হইবার নেতা উ বা শোয়ে। উ বা শোয়ের সমর্থক ললি নির্বাচনে বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই, ইগা লক্ষ্য করিবার বিষয়। উ হু দুইবার ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে আউল সান ও তাহার মন্ত্রিসভার সমস্তগণ নিহত হওয়ার পর তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। তাহার চলক পুসংহত করিবার জন্ত তিনি প্রধান মন্ত্রি একবার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার প্রধান মন্ত্রি



• • OMEGA

Automatic SEAMASTER

Steel case Rs. 520/-



জাগরণ করেন ১৯৫৮ সালে জুলাইর মাসে। দেশের অবস্থা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রীর ভাগ্য করিয়া জেনারেল নিউইনের হাতে শাসন কমতা তুলিয়া দিয়াছিলেন। উ বা শোয়েও এক সময় জঙ্গলজঙ্গের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

উ হুস রুল একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় কমান্ডি জঙ্গলজঙ্গের সমর্থন লাভের জন্য উ হুস আর উদ্ভাবিত থাকিতে হইবে না। তিনি জঙ্গলজঙ্গ বোদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই নীতি তিনি কাগজবাহী করিবেন কি না কিবা ক্ষিপ্রভাবে করিবেন তাহা অন্তত বর্ধমানবাবা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবেন। তাঁহার অর্থনৈতিক নীতি কি হইবে বিদেশী ব্যবসায়ীগণ আশঙ্কাপূর্ণ চিত্তে তাহা লক্ষ্য করিবেন।

কেনিয়ায় শাসন-সংস্কার—

কেনিয়ায় শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া লণ্ডনে যে সম্মেলন হইতেছিল গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। সম্মেলনে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে মোটের উপর একটা মতৈক্য হইয়াছে। কিন্তু কুমিসক্রান্ত রক্ষাকবচ সম্পর্কে কোন মতৈক্য সম্ভব হয় নাই। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ ম্যাকলয়েড প্রতিনিধিদের দ্বারা অধিবেশনে এইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, কুমিসক্রান্ত রক্ষাকবচ সম্পর্কে কোন মতৈক্য সম্ভব না হওয়ায় মন্ত্রিসভার নিকট স্থগাধিগ করিবার সময় এসম্পর্কে তিনি তাঁহার প্রস্তাব পেশ করিবেন। যদিও মোটামুটি ভাবে কেনিয়ায় শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে মতৈক্য হইয়াছে তথাপি কেনিয়ায় অর্থেকার আবিধানীরা এই মতৈক্যের ফলে কতটুকু স্বাভাবিক অধিকার পাইল তাহাই প্রধান বিবেচনার বিষয়। তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গ যে সবল অধিকার পাইবার আশায় এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন প্রথমে সেগুলির কথাই উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁহাদের দাবী ছিল দারিদ্রবিল গবর্নমেন্ট, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, এই বৎসরই এক সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী গঠন, একজন আফ্রিকান প্রধান মন্ত্রী হইবেন এবং আইন-সভার বিশেষ আগুন সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিলোপ। তাঁহাদের এই দাবীগুলির একটিও পূরণ করা হয় নাই। বৃটিশ সরকারের নিকট এইটুকু আশা মাত্র তাঁহারা পাইয়াছেন যে, কেনিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়াই বৃটিশসরকারের অভিপ্রায়। এইরূপ আশা বৃটিশসরকার ইতিপূর্বে কেনিয়াকে আর কখনও দেন নাই ইহা অসঙ্গত। কিন্তু এই আশা যে কবে কার্যে পরিণত করা হইবে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। কেনিয়ায় যে সকল এশিয়াবাসী এবং আরব আছেন তাঁহারা অবশ্য আফ্রিকানদের হাতেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য ব্রত করিতে যাকী আছেন। কিন্তু কেনিয়াবাসীরা স্বাধীনতা লাভের প্রধান অন্তরায় যে বৈতনিকগণ এ কথা অনবীক্য।

মিঃ ব্রুন্ডেন এবং তাঁহার সালটারিসিয়ল নিউকেনিয়া পার্টি (multi-racial New Kenya Party) এক নির্বাচক মণ্ডলীর তালিকা হওয়ার সম্ভাবনা মানিয়া লইয়াছেন। কেনিয়ায় আইন-সভায় আফ্রিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও তাঁহানিগকে মানিয়া লইতে হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও এইরূপ প্রস্তাব তাঁহারা প্রথমে অব্যোধ্য বলিয়াই মনে করিতেন। পুণ ক্যাপটেন ব্রিগ্‌স

এবং তাঁহার দলের ইউরোপীয়গণ মনে করেন যে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। একথা হয়ত সত্য যে, তাঁহারা ঠিক বাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পান নাই, কিন্তু কেনিয়ায় আফ্রিকানগণ প্রকৃতপক্ষে কিছুই পান নাই, তাঁহাদের কোন দাবীই পূরণ করা হয় নাই। শাসন পরিচালনক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের প্রাধান্যই থাকিয়া গেল। তবে কেনিয়াকে আর একটি দক্ষিণ আফ্রিকার পরিণত করিবার যে অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল তাহা পূরণ হওয়ার পথে কতকটা অন্তরায় দৃষ্টি হইয়াছে।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ ম্যাকলয়েড কেনিয়ায় শাসন সংস্কার সম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ আমরা জামিতে পারি নাই। বড়তুক জামিতে পারা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, কোমিয়া আইনসভা নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই নির্বাচন হইবে আংশিকভাবে একটি সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকা, আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ নির্বাচকমণ্ডলী এবং আংশিকভাবে ভাগিগত সংখ্যালঘুদের জন্য সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকার ভিত্তিতে। গবর্নরের মন্ত্রিসভা বারজন মন্ত্রী লইয়া গঠিত হইবে। তদ্ব্যতীত বর্তমান মন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠতায় হইতে গ্রহণ করা হইবে। আফ্রিকান মন্ত্রীর সংখ্যাই যে বেশী হইবে ইহা মনে করিবার নাই। প্রধান মন্ত্রীও আফ্রিকান হইতে পারিবেন না। বর্তমানে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে যে নির্বাচক তালিকা রহিয়াছে তাহা বিলোপ করা হয় নাই। তবে নির্বাচন অধিকারের পরিধি আরও বিস্তৃত করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে একই নির্বাচক তালিকা গঠিত হওয়ার একটা আশা সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যে ভাবে আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অন্তঃস্ব জটিল। এই জটিলতার অভিজ্ঞতা বৃটিশ শাসনের আমলে আমরাও সঞ্চয় করিয়াছি। নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়াই কেনিয়ায় আইনসভা গঠিত হইবে? প্রতিনিধির সংখ্যা হইবে ৬৫ জন। এই ৬৫ জনের মধ্যে ১২ জন হইবেন স্বাভাবিক সদস্য বা national members. বাকীরা বিশেষভাবে নির্বাচিত হইবেন তাঁহাদের এই নুতন নামকরণ করা হইয়াছে। আইনসভা তাঁহানিগকে নির্বাচন করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে চারি জন আফ্রিকান, চারি জন এশীয় এবং চারি জন ইউরোপীয়। অবশিষ্ট ৫০ জন সাধারণ নির্বাচন তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন। বাকীরা নিজদের ভাবার পাড়িতে বা লিখিতে পারবেন, বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছে, কোন চাকুরী করিয়াছেন বা বার্ষিক আয় ৭৫ পাউণ্ড তাঁহারা ভোট দিতে পারিবেন। সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ হিসাবে ৫০টি আসনের মধ্যে ২০টি আসন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংরক্ষিত থাকিবে। এই ২০টি আসনের ১০টি ইউরোপীয়দের, ৮টি এশীয়দের জন্য এবং দুইটি আরবদের জন্য। গবর্নরের সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবে। মন্ত্রিসভা ৪ জন সিভিল সার্ভেন্ট, ৪ জন আফ্রিকান, ৩ জন ইউরোপীয় এবং একজন এশীয় লইয়া গঠিত হইবে। কিন্তু কোন আফ্রিকান প্রধান মন্ত্রী হইতে পারিবেন না। তবে একজন আরব উপদেষ্টা থাকিতে পারেন।

কেনিয়ায় আফ্রিকানরা যে এই ধরনের শাসন সংস্কারে সম্মত হইবেন না তাহা অস্বাভাবিক করা কঠিন নয়। আফ্রিকানদের প্রতিনিধি

দাঁ মরোয়াকে যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে চাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে তিনি একজন চরমপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইলেও আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে তিনি নবমপন্থী বলিয়া গণ্য। তিনি লুওগ (Luao) উপজাতির লোক। বিদ্রোহের পর কিকিউদের বিপদ হইতে এই উপজাতি কিছু সুবিধা করিয়া লইয়াছে। মাউ মাউ আন্দোলনের প্রতি মিং মরোয়ার কোন সহায়তই কোন সময়েই ছিল না। মাউ মাউ আন্দোলনের প্রতি সহায়তের জন্যই মিং জোমো কেনিয়াই হতভিত্র হন। কেনিয়ার যে শাসন সংস্থার প্রবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা আফ্রিকানরা তাহাতে সন্দেহ হইতেন না। কেনিয়ার খেতকারদের হাইল্যান্ড (White Highland) গাটের হওয়ার আশঙ্কা দূর হয় নাই।

মঃ ক্রুশেভের সফর—

রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং আফগানিস্তান ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিবিয়া গিয়াছেন। বর্তমান মার্চ মাসেই (১৯৬০) তিনি প্রেসিডেন্ট জ গলের সঙ্গে আলোচনার জন্য ফ্রান্সে বাটবেন। চতুঃশক্তির শীর্ষ সম্মেলন হইবে আগামী মে মাসে। মঃ ক্রুশেভের এশিয়ার কতকটি দেশ ভ্রমণের তাৎপর্য্য সন্দেহ আলোচনা করিবার পূর্বে তাঁহার ভ্রমণের কথা মোটামুটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি গত ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬০) ভারতের রাজধানী দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহার সঙ্গে বাহারা আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ক্রুশ পুরষাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ গ্রোমিকো, সংস্কৃতি মন্ত্রী মঃ মিখাইলভ, বিদেশের সহিত সংস্কৃতি স্থাপন সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান মঃ কুলকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই তিনি ভারতীয় পালারামেন্টের উভয় সভার সভার সমস্তদের নিকট বক্তৃতা দেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী মঃ ক্রুশেভ এক পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে প্রথম দফা আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় রামলালা মহাশয়ে মঃ ক্রুশেভকে শৌরসম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঐ দিনই ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে দুইটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। একটি চুক্তি ভারতকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান সম্পর্কে এবং অপর চুক্তি সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্কে। মঃ ক্রুশেভ বিশ্ব-কুসুমোৎসব পরিদর্শন করেন। ভারত-সোভিয়েট যে অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় তদনুসারে ভারত রাশিয়ার নিকট হইতে ১৮০ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য পাইবে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী মঃ ক্রুশেভ সুরাটগড়ের রাষ্ট্রীয় খামার পরিদর্শন করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অবসরিত অফসে একটি রাষ্ট্রীয় খামার গড়িয়া তুলিবার জন্য ১৯৫৬ সালে রাশিয়া-ভারত সরকারের বহু বকম কুযায়স্থপাতি উপহার দেয়। এই সকল যন্ত্রপাতি হারা রাজস্থানের সুরাটগড়ে ৪৮ বর্গ মাইল ব্যাপী অল্পকালের ভূমিতে রাষ্ট্রীয় খামার স্থাপন করা হয়। সুরাটগড় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি নেহরুজীর সহিত আর এক দফা আলোচনা করেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি ভিলাই ইম্পাং কারখানা পরিদর্শন করেন। ১৯৫৫ সালে সোভিয়েট সাহায্যে এই কারখানা স্থাপিত হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতার পৌঁছেন এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুনযাত্রা করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুন হইতে তিনি ইন্দোনেশিয়ার গমন করেন।

ইন্দোনেশিয়া হইতে কিরিবার পথে ১লা মার্চ (১৯৬০) মঃ

ক্রুশেভ পুনরায় কলিকাতা আগমন করেন। তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য পণ্ডিত নেহরুও কলিকাতায় আসেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় ব্রহ্মদেশের নেতা উল্লেখ কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় ঐদিন অপরায়ু তাঁহাকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় ক্রুশেভ ও নেহরুজী নিভৃত আলোচনা করেন। বহুটুকু জানা যায় উক্ত এই আলোচনার বোগদান করেন নাই। ২রা মার্চ মঃ ক্রুশেভ কলিকাতা হইতে কার্গিলে পৌঁছেন। কার্গিল হইতে তিনি ৫ই মার্চ রাঙ্কো প্রত্যাবর্তন করেন। রাঙ্কো পৌঁছিবীর অব্যবহিত পরেই সেদিন ট্রেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারতে প্রধানমন্ত্রী জীনেহরুর সহিত তাঁহার গুরু ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে ইহাও কয়েক রাশিয়ার ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়তর হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ক্রোচোব অধিবাসীরা এখন বৃত্তিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের জীবন-রাজ্যের মান উন্নত করিবার ব্যাপারে রাশিয়ার তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদীরা বাহাই বলুন না কেন, অল্পগ্রন্থ ও পুঙ্কের বিদেশী-পদানত দেশগুলিতে উন্নতির যথোচিত রোধ করা বাইবে না।

ক্রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ এশিয়ার চারটি দেশ ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং আফগানিস্তান সফরের তাৎপর্য্য এবং উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। ইহা নিছক শুভেচ্ছা মিশন তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। গত ডিসেম্বর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের এগারটি দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি পরিভ্রমণ করিতেছেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী আফ্রিকার ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি গত জানুয়ারী মাসে (১৯৬০) পরিভ্রমণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রনায়কদের এই সকল সফরকে নিছক শুভেচ্ছামিশন মনে করিলে ভুল করা হইবে। পশ্চিমীশিবিব এবং সোভিয়েটশিবিবের মধ্যে আদর্শগত একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। পশ্চিমীশিবিব চাহিতেছে সামরিক জোট গঠন করিয়া কমান্ডমন্ডকে নিরোধ করিবার জন্য। ফলে উভয় শিবিরের মধ্যে অন্তঃসঙ্কার তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে। ইহার জন্য সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বৎসর দশ হাজার কোটি ডলার ব্যয় হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া কমান্ডমন্ডের ঐচ্ছিকতা প্রমাণ করিতে চায়, অল্প বলে নয়, 'প্রতিযোগিতা মূলক সহাবস্থান' দায়। ইহার জন্য বিশ্বশান্তি তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মঃ ক্রুশেভ এশিয়ার যে চারটি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গেলেন, তাহার কোন সামরিক জোটে যোগদান করে নাই। এই দেশগুলির জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য বিশ্বশান্তি একান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই মঃ ক্রুশেভ এই চারটি দেশ ভ্রমণ করিয়া বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রী করণের বাণী প্রচার করিয়াছেন। কারণ বিশ্বের জনমতকে উপেক্ষা করিবার শক্তি কাহারও নাই বলিয়াই তিনি মনে করেন। প্রতিযোগিতা-মূলক ধ্বংসের আয়োজন অপেক্ষা প্রতিযোগিতামূলক 'সহাবস্থানই রাশিয়ার কাম্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তাঁহার এই সফর, বিশেষ করিয়া আসন্ন শীর্ষ-সম্মেলনের প্রাক্কালে। ইন্দোনেশিয়ার মঃ ক্রুশেভ স্বীকার করিয়াছেন, এশিয়ার প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের

শ্রী-গণেশের নাম পাঠ করা উচিত। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইকোনোমিস্টরা প্রেসিডেন্ট সোকেবর্ন-ই এ প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপন করিয়াছিলেন। মঃ ক্রুশেভ কয়ানিজমের প্রচলনসাধন হিসাবে এই সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। প্রতিকোমিউনিস্টিক সহযোগিতা নীতি গ্রহণ হইলে কমুনিস্ট দেশগুলি শুধু কয়ানিজম দেশের সহযোগিতা পাইবে না, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিরও সাহায্য পাইবে। কয়ানিজমের সহিত ধনতান্ত্রিক চর্চাধর্মের অবস্থা প্রতিকোমিউনিস্ট। এই প্রতিকোমিউনিস্ট যদি কয়ানিজমের প্রেরণ প্রত্যাশা হয় তবে তাহার অগ্রগতি রোধ হইতে পারে। বাটবে না। আবার ধনতান্ত্রিক প্রেরণ প্রত্যাশা হইলে উহার আত্মসাৎ আরও বর্ধিত হইবে। বিশ্ববাসীর পক্ষে এইরূপ প্রতিকোমিউনিস্টার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপেরা হার অল্পমত দেশগুলিকে সাহায্য দিয়া তাহাদের উন্নতি ক্রমতঃ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। অল্প উহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠিত করিয়াছে। বন্ধুত্ব: পশ্চিমী পশ্চিমীদিগের বর্তমানে প্রতিকোমিউনিস্টিক ধর্মের নীতি অসম্মত। প্রতিকোমিউনিস্টিক সহযোগিতার নীতি বিবেচনা করিতে হইবে।

ভারত, ব্রহ্মদেশ ও ইকোনোমিস্টরা সাধারণ চীনের যে বিরোধ দৃষ্টি হইয়াছে তাহার সীমান্সা করিবার অভিপ্রায় মঃ ক্রুশেভের এই সঙ্কেতের মধ্যে কতখানি নিহিত রহিয়াছে তাহা সম্পর্কে বুঝা যাউতে পারে না। চীন ও ব্রহ্ম দেশের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারত-চীন সীমান্তবিরোধের উত্তরাংশ হ্রাস পাইয়াছে কিনা লক্ষণ দেখা যাউতে পারে না। মঃ ক্রুশেভের সহিত নেহরুর আলাপের চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ যে বিশেষ স্থান গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গত ১২ই ফেব্রুয়ারী মঃ ক্রুশেভের সহিত আলাপের কয়েক ঘণ্টা পরেই নেহরুর রাজ্যসভায় যোগদান করেন যে, বর্তমান অবস্থায় চীনের সঙ্গে কোনরূপ আলাপনা করিয়া লাভ হইবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইহার পূর্বেই গত ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬০) চীনের প্রধান মন্ত্রীর নিকট দিল্লীতে এক বৈঠকের প্রস্তাব করিয়া এক পত্র দেন। উক্ত পত্রের নকল গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। পার্লামেন্টের বিমানবন্দর হইতে বাতায় প্রাক্কালে জনৈক সাংবাদিক চীন-ভারত বিরোধ সম্পর্কে মঃ ক্রুশেভের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি ১১৫১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ৫ম বর্ষক প্রচারিত একটি বিবৃতির কথা উল্লেখ করেন। উহাতে দুইটি মন্ত্রি দেশের মধ্যে বিরোধ দৃষ্টি হওয়ার সোভিয়েট সরকার দৃষ্টে প্রকাশ করেন। ইহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই বলেন নাই। কিন্তু বেল্লু বাতায় প্রাক্কালে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গল বিমানবাণীতে মঃ ক্রুশেভ সাংবাদিকগণকে বলেন যে, ভারত এবং চীন এই দুই সম্ভব দেশ অতি

বীহীন তাহাদের মতনির্বোধ মিটিয়া কেবলমাত্র পারিবে এবং তাহাদের সৌহার্দ্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। তাহার এই উক্তির কয়েক দিন পরেই চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই বর্ষক নেহরুর কায়দার গ্রন্থের কথা আশা জানিতে পারি। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি নেহরুর কায়দার গ্রন্থের কথা জানাইয়াছেন। তবে তিনি মার্চ মাসে আসিবেন না, আসিবেন এপ্রিল মাসে। আশ্রয় গ্রহণের পক্ষে তিনি বসিয়াছেন যে, "আমাদের দুই দেশের মাঝখানে যে বৃক্ষের জমিয়াছে, তাহা আমাদের মিলিত চেষ্টার দ্বারা হইবে বলিয়া আমি বিশেষ ভাবে আশা করি।" তিনি কি ভাবে এই সীমান্ত বিরোধের সীমান্সা করিতে সম্মত হন তাহার উপরেই তাহার এই আশার সাক্ষ্য নির্ভর করিতেছে।

মঃ ক্রুশেভ তাহার এই জমণের সময় একাধিক বার বলিয়াছেন যে, উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন যে নানাভাবেই অভিযুক্ত করিতেছে সে কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মঃ ক্রুশেভ পশ্চিম ইউরোপের (নিউগিন) কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহার উপর ইকোনোমিস্টরা দাবী মানিয়া লইয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়া এবং ইকোনোমিস্টরা মধ্যে সহযোগিতা নিবিড়তর করার জন্য অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সহযোগিতার একটি এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার একটি চুক্তি ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। রাশিয়া ইকোনোমিস্টরাকে ২৫ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছে। মঃ ক্রুশেভ আফগানিস্তানে ছিলেন তিন দিন। তাহার সম্মানার্থ আফগান প্রধান মন্ত্রী ২৩ মার্চ যে ভোজ প্রদান করেন তাহাতে বহুতা প্রসঙ্গে তিনি পাক-আফগান বিরোধে আফগানিস্তানকে সমর্থন করেন এবং বলেন যে, যে সকল দেশ সম্প্রতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে সেই সকল দেশের কোন কোন মহলের আচরণ ও প্রাক্তন শাসক গোষ্ঠীর আচরণের মধ্যে খুব বৈধি পার্থক্য নাই। এই সকল মহল অপরের অধিকারের প্রতি প্রত্যাশা করেন না। তাহারা কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমর্থন করিয়া থাকেন। মঃ ক্রুশেভের এই বহুতা প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বৃটিশরা যে পাক-আফগান সীমান্ত রেখা চানিয়াছে আফগানিস্তান তাহা স্বীকার করে না আবার পাকিস্তানী বৈতরে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবাধীন হওয়ার অভিযোগ করা হইয়া থাকে। ৪ঠা মার্চ মঃ ক্রুশেভ যোগদান করিয়াছেন যে, আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে সোভিয়েট রাশিয়া সাহায্য করিবে।

—৫ই মার্চ, ১৯৬০।

[মাসিক বন্ধুত্বতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য]



দিল্লীতে জাতীয় ক্রীড়াধুলা

দিল্লীর জাশনাল টেডিয়াম। এখানেই গার্ভাধিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ১৯৬০ সালের জাতীয় ক্রীড়াধুলায় উপর বনিকা পড়ে। আগষ্ট মাসে রোমে বিশ্ব অলিম্পিকের যে আসর বসবে তার ভঙ্গ জাতীয় মল গঠন করা হবে বলে এবারকার জাতীয় প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। বার শত প্রতিযোগী নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অল্পাধানে যোগদান করতে আসেন। দৌড়কাপ ছাড়াও কুস্তি, ভারোত্তোলন এবং ভলিবল প্রতিযোগিতাও আয়োজন হয়। কর্পোরেশন টেডিয়াম, বিমান-বাহিনীর স্টেডিয়াম, সড়কারগঞ্জ ও পাড়াগুজার রেলওয়ে টেডিয়ামে কতকগুলি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে। জাশনাল টেডিয়াম থেকে তিন মাইল দূরে হালকাটোরা গার্ডেনসে "গ্রেমস ফিল্ড" অর্থাৎ প্রতিযোগীদের থাকার ব্যবস্থা হয়। এখানে ব্যাড, তার ও ডারথর, ক্যান্টিন, রেডিও ও টেলিভিশন সেট, সিনেমা, চিকিৎসার ব্যবস্থা কোনটাই অভাব থাকে না। এখানে গড়ে ওঠে এক নতুন সহর। নানা রঙের ফুল আব বিজলী বাতির বলকানিতে বাগানের পোতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

সার্বভৌম স্পোর্টস বোর্ডে লি বোর্ডের বর্তমান অধ্যক্ষ সর্বাঙ্গসম্মত করার ভঙ্গ চেষ্টার কোন কটী করেন নি। দিল্লীর ৩৪৫ মাইল দূরে ছালাধুবার যোগমায়া মন্দিরের চিরজন লক্ষা থেকে অলিম্পিকের মশাল পাঁচ শত লোকের হাতে হাতে দিল্লীতে আনা হয়। উদ্‌ঘাটনের সময় শেষ বাহক ঐ মশাল নিয়ে জাশনাল টেডিয়ামে যুক্তি আবার পূতাগি প্রাধিকার করেন। উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়াধুলায় উদ্‌ঘাটন করেন। ১১ বার তোপধ্বনি করার পর বাকি থাকে পায়রা উড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্রীড়াধুলাকে উপলক্ষ করে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী জৈরহরলাল নেহরু, শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে. এল. মুখার্জী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির স্তব্ধতা বাধী পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি বাগীতে বলেছেন—“দেহ সুস্থ ও সবল রাখা ছাড়াও খেলার মাঠে খেলাধুলা কল্যাণমূলক কার্য হিসাবে খুবই বাহিনীর। সেই কারণে আমি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনে সামরিক বাহিনীর আগ্রহ উত্তরাত্তর বৃদ্ধি পাওয়া আনন্দিত।” প্রধান মন্ত্রী জৈরহরলাল নেহরু বাগীতে বলেছেন—“ভারতে খেলাধুলা কল্যাণমূলক কার্য হিসাবে উৎসাহ বৃদ্ধি পাটভেদে মেধা আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমি ইহাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কারণ, যেহেতু সুস্থ রাখা ছাড়াও ইহা তরুণ-তরুণীর মানসিক উৎসাহ প্রদান করে। শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ মুখার্জী বাগীতে বলেছেন—“এ লেবে খেলাধুলায় উন্নয়নে জনসাধারণকে আগ্রহবিশীল করিয়া তুলিবার জন্য এক ইহাকে অধিক গুরুত্ব দিবার উদ্দেশ্যে ভারত

সরকার খেলাধুলায় উন্নয়নের ভঙ্গ বহুই সাহায্য সিদ্ধান্তে। জাতীয় ক্রীড়াধুলায় এ বাপাতে বহুই সাহায্য করিবে।”

শুধু প্রাথমিক স্পোর্টসে এবার নতুন রেকর্ড ভারত ২৬টি। কিশোরদের দীর্ঘ ৯ মিনিটে চার জন আগের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। হাটবার মিটার দৌড় ও শোলভেটে তিন জন করে এথলীট নতুন রেকর্ড করেছেন। এমন ভাবে কোন বিষয়ে দু'জন, কোন বিষয়ে তিন জন অথবা চার জনও আগের রেকর্ড ভাঙতে বস্তুত্ব করেন নি। এ থেকে কি মনে করতে হবে যে ভারতে প্রাথমিকের মান উন্নত হয়েছে? কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা করলে চক্কর মাথা হেঁট হয়ে যায়। ভারত একটি বিরাট দেশ। বিশ্বের সবখানে ভারতের এত প্রতিপত্তি। কিন্তু এ-দেশে দেশেও একমাত্র মিলখা সিং ছাড়া আর কোন এথলীট বের করা যায়নি—একে অলিম্পিকের পুরস্কারে বেলা চলে। প্রাথমিকের উন্নতি করতে চলে—চাই সাধনা আর সাজ চাই হীতিমতো চক্কর। এই দুটাই ভারতের অভাব। তবে সামরিক বাহিনীর কিছুটা সাধনা আছে বলেই তারা এ বিষয়ে অগ্রগী। এবারও সামরিক বাহিনীর প্রতিযোগীরা সর্বাঙ্গিক সাহায্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে ভারতের স্বাধীন এথলীট মিলখা সিং-এর নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হবে। তিনি এবার ভারতের প্রাথমিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করার সৌরবে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় ও এশীয় রেকর্ড স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু মিলখা সিং ১০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড করলেও সেটা রেকর্ডরূপে অল্পমোহিত হয় নি। কারণ, পবনদেব এ বিষয়ে বাধ সাধলেন। শত মিটার দৌড়ের সময় বাতাসের গতিবেগ সেকেন্ডে শিউ ৮টি মিটারের বেশী ছিল। বাই হোক, এবারের স্বীকৃতি না পেলেও তিনি যে রেকর্ড করেন—এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর পূর্বে কোন ভারতীয় এথলীট এভাবে ছয় পাল্লার তিনটা দৌড়ে সাক্ষ্য অর্জন করতে পারেন নি।

বেশ তোড়জোড় করেই বাঙ্গালা থেকে এক বিরাট মল দিল্লীতে হাজির হয়েছিলো। এখানকার প্রতিযোগীদের সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা না করাই ভালো। তবু ভালো—সবে ৭ন নীলমণি—শঙ্কর নাগ। কিশোরদের বিভাগে উচ্চ ৯ মিনিটে প্রথম স্থান লাভ করে বাঙ্গালার যুগ রেখেছেন। তিনি এ বিষয়ে রেকর্ড করারও কৃতিত্ব অর্জন করেন। সাবাস শঙ্কর নাগ!

পাঁচজন এথলীটের যোগ্যতা লাভ

অলিম্পিক ক্রীড়ার ষষ্ঠ স্থানার্থিকারী মান অল্পসামান্যে নির্দিষ্ট ক্রীড়ামানের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার ভারতীয় এমচার প্রাথমিক

কীড়াঙ্গণতে বাঙ্গালার অবস্থা কোন পর্যায়ে এসে পড়েছে তা নিয়ে আলোচনা করতে সভ্যই চম্ভা হয়। এবার বাঙ্গালাকে রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। তার বিহারের নিকট ২ উইকেটে পরাজিত হয়। রঞ্জী প্রতিযোগিতার খেলায় বাঙ্গালার বিরুদ্ধে বিহারের এই প্রথম সাফল্য। দীর্ঘ ২২ বছরের মধ্যে বিহার দল ইতিপূর্বে কোন বারই বাঙ্গালাকে পরাজিত করতে পারে নি। বাঙ্গালার এই পরাজয়ে দুটা কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একদিকে বাঙ্গালার ক্রিকেটের অবনতি আর একদিকে বিহারের অগ্রগতি। বিহার এই সাক্ষ্যের জন্য সভ্যই কৃতজ্ঞের দাবী করতে পারে। বাঙ্গালার এই দুঃস্বপ্না হলেও এখনকার ক্রিকেটের কণ্ঠকর্তাদের হুমের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না নিশ্চই ?

স্মৃতির টুকরো

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সাধনা বসু

মা এলেন বহুতে। আমাদের কাছেই উঠলেন, ওরলিতে।
পঙ্কর-পার্শ্বী এক বিষকন্ডার বে আশাতীত সাফল্য অর্জনের
সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল তার জন্তে—এ কথা স্পষ্ট সত্য যে,
এর পরোক্ষ ভাবে দায়ী যিনি তিনি আমার মা ছাড়া কেউই নন।
নৃত্য-সম্প্রদায়ের ভ্রমণের এবং ছবি-স্টুডিং-এর অকল্পনীয় পরিশ্রমের
মধ্যে বহন আমার দিনগুলি কেটে যাচ্ছে সেই সময় মা যদি ব্যক্তিগত
ভাবে আমার দেখাশুনোর ভার না নিতেন তা হ'লে আমার স্বাস্থ্য
যে কি রূপ নিত, বোধ করি তা বিধাতা ছাড়া আর কারুর পক্ষেই
জানা সম্ভব নয়। আমি তখন একসঙ্গে তিনখানি ছবিতে
অভিনয় করে চলছি। একযোগে তার চিত্রায়ণ চলছে—দিনে এবং
রাত্রে সকল সময়ই স্টুডিং চলছে।

বেড়ানো, বেকর্ড বাতানো, খেলা দেখা, ছবি দেখা,
বেড়ানো, গল্প করার মধ্যে দিয়ে নয়—সেই সময়গুলো আমার
একভাবে কেটে যাচ্ছে টুন্ডিগুর আওতায়। রূপসজ্জার আর
অল্পস্র আলোর উত্তাপে দেহ তখন তাপদগ্ধ—তখন শুধু মিনিটার, টেক,
কাট, ও-কে, সাউণ্ড, ক্যামেরা ট্রিকিং, প্যানিং, পাক আপ।

কাজের চাপ চকিগণ ঘটার মধ্যে অনেকগুলো ঘণ্টা কেড়ে
নিরেছিল বটে কিন্তু সবগুলো পায়ে নি, করের বন্ধে আমরা
নিজেদের আহুতি দিয়ে থাকি আর সেই আহুতি দেওয়াটা
আমাদের ধর্ম কিন্তু বিধাতাও কর্মজগতকে গোলকধাঁসায় পরিণত
করেন নি—সেই সঙ্গে অজববিধক আনন্দের সন্ধানও তিনিই
দিয়েছেন, করের দুর্গম, কষ্টেরময় পথই কেবলমাত্র মানুষের
সামনে খোলা নেই—আনন্দের উন্মুক্ত সবণিও মানুষের সামনে
পরিষ্করমান, কর্মই জীবন—তবে জীবনের সব কিছু নয়, কোন
“একটি”র মধ্যে নিববদ্ধির ভাবে নিজেকে সমাহিত রাখা সাধারণ
মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—তাহলে সে যন্ত্রে পরিণত হবে—সম্ভব
সংস্কারের পক্ষে। বৈচিত্র্যের তাৎপর্যও তো মানুষের জীবনে
উপেক্ষীয় নয়, আমরা কাজও কবেছি, পরিশ্রম কবেছি চূড়ান্ত,
অবচেদা করে ধর্ম থেকে বিচ্যুত নয়—আবার তাইই কীকে কীকে
বখনই অবসরের বিন্দুমাত্র আভাস পেয়েছি তখনই ত্যাগ মর্ষালা দিতে
বারেকের তরেও করিনি কার্পণ্য প্রতীপ। করের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি
জীবনের আনন্দকে, অবসর বখনই এসেছে তখনই অল্প পথ থেকে
তাকে আহরণের চেষ্টার যেতে উঠেছি—তখন সেই আনন্দের অন্তর
মাগরে অবগাহন করে প্রাণ্ডি দূর করেছি। ব্রিঙ্ক চক্রিমার
কিরণোদ্ভাসিত সাগরাত্তিমুখী আলিকে তখনই বসেছে বরের আলর,
সামনে সীমাহীন সমুদ্র, কখনও শাদ, মৌন, স্থির, কখনও উজ্জ্বল,
তরঙ্গসঙ্কুল, বেগবান। কুন্ডললাল সাগরগলের সেই লজ্জিতকণ্ঠ,
যোতিলালের সহজ পরিহাসপ্রস্রবতা, সুবোমের গান এবং নিজেকে
ধরা দেওয়ার সেই কমলীয়তা, বুলবুলের শ্রবণ-ধৈর্য, তিমিরবরণের
ভাইপো অমিয়কান্তির এবং স্টোড ভাটী শিখরশোভনের স্বাক্ষর
সেতার ও তবলা প্রভৃতির মধ্যে ঘিরেই বরণ করে নিয়েছি সেই
স্বাবস্থিত অবসরকে। সেই মানুষ-মণ্ডিত আবার পরম উজ্জ্বলমণ্ডিত
জীবনের অবিসরণীয় সেই বর্ণবিচিত্র দিনগুলি কি সত্যিই হারিয়ে
গেল?



বস্ত্রিত মুভিটোনের সঙ্গে আমার চুক্তি বলতে গেলে তখন শেষ
হয়ে আসছে এবং আমিও তখন মনে মনে কলকাতা ফেরবার সঙ্কল্প
করছি—যদিও বোম্বাইতেও আমার বন্ধুবান্ধবের অপ্ৰাচুর্য ছিল না,
বোম্বাইতেও আমার বক্তৃতাথাক বন্ধু-বান্ধবী ছিলেন। আমার নিজস্ব
জগত ছাড়াও সমাজের অন্যান্য শাখার বন্ধু-বান্ধবের স্তোত্রময়
ঘটেছে আমাদের বোম্বাইয়ের বাসগৃহে। ছবির ও নৃত্যজগতের
বিশিষ্ট বীরা স্ত্রীরা তো বটেই অন্যান্য জগতের সুখরূপে বীরা স্বীকৃত
স্ত্রীরা সার্বগণ্যও আমরা পেয়েছি বহুটি পরিমাণে। স্মরণীয় যদিও
বোম্বাইতে আমাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাকেত্রিক দৈর্ঘ্য মোটেই ছিল
না তবও ঠিক অনুবাসী বলতে বা বোঝায়, আমার সেই বিশেষ
অনুবাসীর দল বর্তাবর্তী কলকাতাতেই ছিলেন।

১৯৪২ থেকে শুরু করে ১৯৪৩-এর শেষ অবধি এইটুকু সময়ের
মধ্যে আমি অজস্র অর্থ উপার্জন করতে পারতুম, কত টাকা যে
আমার জমায়েতের উঠতে পারত তার সীমা-লংঘা নেই—অন্যান্য
অভিনয়শিল্পীদের সেই স্বাধীনতা ছিল—তারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন—
কোন কিছু চুক্তিতে তারা বদ্ধ ছিলেন না কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ
আমি সেই সময় বক্তৃত মুভিটোনের সঙ্গে তাদের নির্ধারিত বা নিজস্ব
শিল্পীত্বসেবে চুক্তিবদ্ধা ছিলুম—অর্থাৎ অল্প প্রয়োজনীয় কাজ করার
স্বাধীনতা তখন আমার ছিল না—অন্ততঃ সেই চুক্তি বতকণ না
শেষ হচ্ছে—এর ফলে অনেক সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে
গেছে। কসলতঃ অন্যান্য শিল্পীরা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে
সমর্থ হয়েছিলেন আমার উপার্জন তার চার ভাগের এক ভাগও
হতে পারল না।

১৯৪৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পুরস্কারপত্র মনুজজয়ের
মহাশয়ী কবিশিল্পী সত্যক দেবীর টেলিগ্রামে যে বহুহুর্ন্তে বাবার
দেহাঙ্গুরের সর্বদা পেলুম—সেই সঙ্গেই আমার জীবনব্যায়
নিয়মতন্ত্রতার আবির্ভাব ঘটল—টেলিগ্রামের কয়েকটি শব্দ সবলিত
বাক্যাংশ আমার জীবনে সৃষ্টি করল বেনারস ভ্রমণের কত।
বাবা যে অন্তঃপ্রাণে এ সংবাদ আমায় কাছে সম্পূর্ণ অসিঁটির ছিল।
তিনি স্বাভাবিক, শুধু সেই ধারণা আমার বতকণ ছিল তার পর-
বহুহুর্ন্তে একেবারে আচমকা। তার বহু সংবাদ—তার বাজা সহজেই
অহমের, শুধু তাই নয়, বোম্বাইতে আমার কাছে এসে থাকার কথাও

তার ছিল—দিন পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয়েছিল। তথা ডিসেম্বর কথা ছিল তার বোম্বাই আসার—তিনি এলেন না, এল তাঁর সূত্ৰা-সংবাদ। সেই ডিসেম্বর পৃথিবীর কাছ থেকে তিনি চিরাবসার গ্রহণ করেছেন। বাবার আত্মে যেয়ে আমি। তাঁর জীবনের আশ্রমতম মুহূর্তটিতে তাঁর সঙ্গে শেষবারের মতন পার্থিব সাক্ষাৎ আমার হল না—এ মুহূর্ত কি ভোলবার? পিতৃব্যবয়োগের এই বেদনা সুদীর্ঘ কালব্যাপী আমার চিত্তে স্থায়ীভাবে করেছিল, অবশ্য সময়ের এই সুদীর্ঘতার কারণ আমার নিজেরও জানা নেই, আমার মনের গভীরে গভীরে এই শোকের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, শোকজন অব্যাহতবিকতা আমার আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আমার মন থেকে জীবনের সৌন্দর্যের সকল আবেগন মুছে গেল একেবারে। মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে, আসেকার সেই জীবন বেগে আংশিকভাবেও ফিরে পেতে, সৃষ্টিধর্মী করার মত মনকে কোন কল্পনার বিস্তার হয়ে থাকার মত একাত্মতা, দৃঢ়তা ও শক্তি আবার আয়ত্তে আনতে আমাকে দীর্ঘ সময় হয়েছিল ব্যয় করতে।

আমার দাশা অনীলচন্দ্র সেন এলেন বহুতে, উইলেন আমাদের কাছেই। আমাদের নৃত্য-সম্প্রদায়ের পরিভ্রমণে দাদাও আমাদের সঙ্গে নিলেন।

দিন এগিয়ে চলে। কোথা দিয়ে যে এক-একটি দিন আসে এবং যায় তা ভাবাও যায় না—সময়ের এই নিরবচ্ছিন্ন গাতির মধ্যেই জগতের বৈচিত্র্য।

বীরে বীরে আবার কাজের জালে জড়িয়ে পড়লুম। আবার সেই কর্মজীবন, আর কর্মের মধ্যে দিয়ে জীবনধর্মের সাধনা। আমি যোগ বিগুন জয়ন্ত শিকচাঁদ লিমিটেডে। উর্ধ্বীণ ভূমিকায় আমার অবতীর্ণ হতে হল। ভূমিকালিপিও যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল। তখনকার দিনে “রামরাজ্য” খ্যাত জনপ্রিয় তারকাগায় সম্প্রতি পরলোকগত প্রেম আদিত্য এবং শোভনা সমর্থও এর ভূমিকালিপিকে সঞ্চ করেছিলেন। ঠিক এই সময়ে আমি কিছুকালের জন্তে তাম্রমহল হোটেলে বাস করছি। তারপরই উঠে গেলুম গ্রীষ্ম চৌটেলে। তাম্রমহল এক গ্রীষ্ম এই ছুটি হোটেলেই পরিচালনায় রত ছিল একই কর্তৃপক্ষের উপরে।

ছবিতে অভিনয়ের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছি কিছু চিত্রগ্রহণ তখন হচ্ছে না। এ-হেন সময়ে প্রযোজকেরা একাদিন আমার জানালেন যে তাঁদের চিত্রগ্রহণ শুরু করতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে—অর্থাৎ সেই দিনটির এবং চিত্রগ্রহণ শুরু হওয়ার দিনটির মধ্যে এমন অনেকগুলো দিন পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি তাঁরা কাজে লাগাতে পারছেন না—অতএব আমি ইচ্ছে করলে সেই দিনগুলি যেভাবে ইচ্ছে সঞ্চাবহার করতে পারি—এই মধ্যবর্তী সময়টুকু আমার নিজস্ব ইচ্ছামত সঞ্চাবহার করতে তাঁদের তরফ থেকে কোন বাধা থাকছে না।

আবার সাক্ষাৎ মিলল আমাদের জনপ্রিয় হরেনদাস—সম্প্রদায় হজেনরূপে পুনরায় আমাদের মধ্যে পাওয়া গেল। হরেনদাস এবার অভিনয় জানালেন আমাদের নৃত্য-সম্প্রদায়সহ এবাব মধ্যভারত পরিভ্রমণ করা হোক।

যে সময়ের ঘটনাটি বিবৃত করছি সেই সময়টি হচ্ছে—১৯৪৪ খ্রিঃ।

[ক্রমশঃ]

অনুবাদ—কল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ পাতাল

সর্বতোভাবে বার্ষ এই বাঙালি ছবিটি গোড়া থেকেই বিভাতির সৃষ্টি করে এসেছে বাঙালির দর্শকসমাজে তার নামকরণকে কেন্দ্র করে। ছবিটির বিভাজিত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকেই ভেবেছিলেন যে প্রখ্যাত কথালিঙ্গী প্রাণতোষ ঘটকের অবিসংখ্য সাহিত্যসৃষ্টি “আকাশ পাতাল” চিত্রায়িত হচ্ছে। ছবির গল্পাংশও যখন প্রচারিত হল তখন অবশ্য এ তুল্য ভাঙতে বিলম্ব হয় নি দর্শকসাধারণের। একটি বিখ্যাত এবং বহুলপ্রচারিত উপন্যাসের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করা যে শিল্পচর্চাসম্মত নয় বা নীতি-বিরুদ্ধ, আশা করি এ বিষয়ে কেউই দ্বিগত হবেন না।

শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষই এর গল্পের প্রধান উপজীব্য। মালিকপুত্রের সঙ্গে শ্রমিককন্যার প্রণয়, শিতাপুত্র সন্দর্ভ, শিতাব পরাজয়, শ্রমিকদের জয়—অতি মামুলী বৈশিষ্ট্যবাহীন গল্প যেমনই দুর্বল তার চিত্রনাট্য, ততোধিক অসার তার পরিচালনা। ছবিটির মধ্যে চোখাবাণীনা যে কতরকম হতে পারে তারই একটা দৃষ্টান্ত দেখে গেলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। বস্তী সঞ্চদে পরিচালকের সাধারণ জ্ঞানের যে নিতান্ত অভাব ছবিটি সে কথাও বিশেষভাবে প্রমাণ করে, বস্তীর মেয়েদের যেভাবে এখানে কল্পনিত করা হয়েছে (বস্তীর গৃহসজ্জা, প্রকোষ্ঠের আভ্যন্তর তার অঙ্গসজ্জা, মেয়েদের মার্জিত ও বুদ্ধিসূক্ত সজ্জা প্রকৃতি) আসলের সঙ্গে সেই রূপায়ন বিন্দুমাত্রও মেলে না। আসলের সঙ্গে তার ব্যবধানটাই আকাশ পাতাল। নেত্রীর মেয়েটিকে মারবার জন্তে ম্যানেজার যে লোকটিকে নিযুক্ত করলেন অর্থ দিয়ে সেই লোকটি শেষ পর্যন্ত যখন মেয়েটিকে তার মায়ের কোলেই ফিরিয়ে দিল, ম্যানেজারের দিক থেকে তখন কি কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, লোকটিকে কি তিনি তখন তার চুক্তিভঙ্গের জন্তে অভিনন্দন জানালেন? পতাকা হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা পৃথিবীতে নতুন নয়—আমাদের দেশেও বহুবার শোভাযাত্রা বেরিয়েছে পতাকা হাতে নিয়ে—জননায়করা বেরিয়েছেন, দেশসেবকেরা বেরিয়েছেন পরাধীনতার বিরুদ্ধে, শোষণের বিপক্ষে, বিদেশী অত্যাচারের প্রতিবাদে। মদের দোকান তোলার জন্তে তাঁরা পতাকা হাতে নিয়ে বেরিয়েছেন এ রকম কোন তথ্য আমাদের অবশিষ্ট। মদের দোকান তুলতে গেলে কোন দেশসেবী শ্রীহরের শেষ সম্পর্ক পতাকা হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা করে বেরোতে হয়, এ বিষয়ও আমাদের ইতিপূর্বে জানা ছিল না।

হুঁ-পুঁটা চলা এই ছবিটির প্রযোজনার সঙ্গে আছেন এ-ভি-এম। ভারতের বিখ্যাত চিত্র প্রযোজনা এ-ভি-এম এবং জীবন্তী অল্পকর্তা মুখোপাধ্যায় যুগ্মভাবে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের একটি বিশিষ্ট আসন কাজ এ, ভি, এম-এর অধিকারভুক্ত, হাল্দিয়া এক বাঙালির এই বোধ প্রচেষ্টা চরিত্রাঙ্কনে সফল হতে পারল না, এই ছবিটি সম্পূর্ণ হতে এবং শেষে মুক্তিলাভ করাল দেখা গেল যে মাস্টারীমহলে প্রভাত মুখোপাধ্যায় লেখের মুখটি পুড়িয়ে দিলেন। বাঙালী চিত্রশিল্পীদের চিত্রবোধ এবং বাঙালী পরিচালকদের চিত্রসৃষ্টির দক্ষতা সঞ্চদে মাস্টার্সের চিত্রভঙ্গত এবার থেকে প্রতিকূল ও নৈরাশ্রজনক মনোভাব স্বভাবসত্ত্বই পোষণ করে থাকবেন এবং তাতে আদর্শ হবারও কিছু

বিশ্বাস এবং আন্তরিকতাকে নিয়েও এই বাড়ালী পরিচালকটি ছিন্মিনি খেললেন। এর ফলে ভবিষ্যতে সত্যিকারের শক্তিশালী চিত্রশ্রীসমূহের মাহাজ থেকে যেটুকু সহযোগিতা পাবার আশা ছিল তা থেকেও তাঁরা স্বভাবতঃই বঞ্চিত হবেন। প্রভাতবাবু এই ভাবে বাংলার সমগ্র চিত্রশিল্পের যে কত বড় সর্বনাশ করলেন তার তুলনা মেলা ভার।

তবে অক্ষুণ্ণ হুণোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ ও দিলীপ রায়ের অভিনয় এবং জ্যোতির্ষর রায়ের সংলাপ এই অসার ছবিটিকে অনেকখানি পুষ্ট করেছে। পাহাড়ী সন্তান, তরুণকুমার, জহর বাহ, রসরাজ চক্রবর্তী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্পেন পাঠক, তপতী ঘোষ, মণিকা গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, পাণপা বসুঠাকুর, গীতা সিং, তাপসী রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, অচলা সহদেব প্রভৃতি শিল্পীগণ বিভিন্ন ভূমিকার রূপ দিয়েছেন। দুটো কথা বলবার জন্তে চন্দ্রাবতী দেবীর মত একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীকে নামানোর তাৎপর্য বোঝা গেল না, দুর্গা খোঁটার বাড়লা উচ্চারণ বিতর্ক নয়, তা সত্ত্বেও তাঁকে নামানোর অর্থও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, ঐ ভূমিকায় অভিনয় করার মত বাড়লাদেশে কি অভিনেত্রী ছিল না?

দেবী

ভাড়াহবির বাজারে এবার সজ্জিত বায়ের দেখা পাওয়া গেল প্রভাতকুমার হুণোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে, প্রভাতকুমারের স্বীকৃতি থেকেই জানা যাচ্ছে যে প্রায় বাট বছর পূর্ণ লেখা এই গল্পটির বিষয়বস্তু নাকি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ কাহিনী মূল কাঠামোটি মাত্র বলেছিলেন, তার অন্তর্গত সব কিছুই অর্থাৎ চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ প্রভাতকুমারের সৃষ্টি।

অগ্নীর প্রভাতকুমার হুণোপাধ্যায় মহাশয় বাড়লা সাহিত্যের বিষয়। বাড়লা ছোট গল্পকে তিনি বেতাবে ভ্রীসম্পন্ন করে পেছেন তা মুক্ত-বিশ্বের সৃষ্টি করে। সার্থকনামা স্ট্রীকুলের একজন বৈশিষ্ট্যবান প্রতিনিধি। তিনি যে অনবদ্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিভার এবং স্বাভাবিক সম্পর্কে তাঁর যে-সব ছোট গল্প অমর হয়ে আছে, “দেবী” গল্পটির মধ্যে তাদের কোন সম্পর্কই পাওয়া যায় না। দেবীর মধ্যে প্রভাতকুমারের কুললতা, নিপুণতা, দক্ষতার (যা তাঁর অন্তর্গত রচনাগুলিকে অমর করেছে) ছাড়া পড়ে না বিশৃঙ্খল।

একটি কিশোরী বধূ এর নারিকা, স্বস্তর যন্ত্রে জানলেন সেই সাক্ষাৎ ‘দেবী’। দেবীজ্ঞানে চলল তার উপাসনা, গুজার্চনা এই দেবীকে সেবে বিপর্দয়ের সৃষ্টি করল, বধুর জীবন হারিয়ে হারে উঠল, স্বামীর সঙ্গে সে পালিয়ে বাঁচতে চাইল, সঙ্গে সঙ্গে তার ভয়ও হল—সত্যি যদি সে দেবী হয় তা হ’লে তার স্বামীর অকল্যাণ হবে—ভয়েরই অর হল শেষে পালানো নিয়েও সে পালিয়ে এল,

একটিকে আরোপিত দেবীত্বের নিউনতার মুক্তিগিপায় মন অন্তরিকে সকলের অন্ধ ধারণাকে অস্বীকার করার অক্ষমতা এবং প্রায় অন্তর্ভুক্তি আরোপিত দেবীকে মেনে নেওয়া—এই দোটারায় ধ্বংস হবে গেল সাজানো একটি সংসার, একটি শিশুর জীবন, একটি যুবকের ভবিষ্যৎ, একটি কিশোরীর সর্বস্ব।

গল্পটি যখন লেখা হয় তখনকার সমাজজীবনে নিশ্চয়ই এর আবেদন ছিল—বিশেষতঃ আজকের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তখনকার সমাজব্যবস্থার ছিল আকাশ পাতাল প্রভেদ, তখনকার তুলনার আজ কুসংস্কার অনেক কমে গেছে—তখনকার কুসংস্কার দূরীকরণের জন্তে বা তার কুল বোঝানোর জন্তে এজাতীয় গল্প রচনার প্রয়োজন ছিল (বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বলছি) আজ বাট বছর বাদে চিত্রায়ণের জন্তে এই গল্প নির্বাচনে অন্ততঃ বুদ্ধির কোন পরিচর মেলে না, তাও যদি প্রভাতকুমারের অন্তর্গত গল্পগুলির সঙ্গে তুলনায় হোত তাহলেও ব্যর্থত্ব গল্পগুলোর দিক দিয়ে এর আবেদন উপেক্ষণীয় নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরিকল্পনায় অবশ্য পরিচালক সাধুবাসের দাবী রাখেন। তা ছাড়া একটু অসুধাবন করলেই দেখা যাবে কুসংস্কার ও মোহের অন্ধতাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে এক সম্বন্ধাত্মক ইঙ্গিত খুব প্রচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বৃদ্ধ গৃহস্থানী নিষ্ঠাবান সাধিক পুরুষ, আজীবন ধর্মাত্মকলনে তিনি করেছেন জীবিতবাহিত, ঠাকুর দালানের নাটমঞ্চেরোতিনি খড়ম পরে আসছেন, নাটমঞ্চের শেষ সীমায় এসে তিনি পাহুকা ত্যাগ করেছেন—তাঁর মত নিষ্ঠাবানের পক্ষে এ সম্ভব নয়—অত সাধারণ লোকও দালানের প্রান্তদেশে পাহুকা ত্যাগ করে থাকেন বা থাকে, আমরা হিন্দু দেব-দেবীমূর্তি চরণপদ্ম থেকে কলনা করি, চরণ থেকে আমরা প্রভাত্যাকে চিত্রা করি, প্রভাত্যার চরণোৎপল থেকে আমাদের বৃষ্টি উপরে ওঠে, এখানে দেখলুম দেবীর মুখের উপর স্কোজ আপ, পরে ক্যামেরা পিছিয়ে গেল এবং দেবীর প্রভাত্যার সম্পূর্ণচিত্রটি আমাদের



জনতা শিকচাস' পরিবেশিত গঙ্গার একটি দৃষ্ট রমা গাঙ্গুলী ও সীতা দেবী

ক্রোধের সময়ে তেলে উঠল অর্থাৎ দেবীপ্রতিমা পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখানো হয় নি, দেখানো হল মাথা থেকে পা পর্যন্ত, যা বিষয় নয়। বৃদ্ধ গৃহস্থামীর সংস্কৃতির মস্তাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ককাত্যুয়ার উৎকট চাকরার সমস্ত পারবেশটির গাভীরে মূলে কুটীরাঘাত করল। গানভাল স্থগিত।

অভিনয়ে শিল্পীরা যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, শিল্পীদের সম্মিলিত অভিনয় চারিত্রিক অনেকখানি প্রাণ দিয়েছে। ছবি বিশ্বাস, পৌষিক চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু বুধোপাধ্যায়, কঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শর্মিষ্ঠা ঠাকুর প্রভৃতি প্রধানাংশ দেখা দিয়েছেন। আর আবির্ভাবে যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন কালী সরকার ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।

এক পেয়লা কফি

"এক মুঠো আকাশ" এর মাধ্যমে পেশাদারী রকমকে তরুণ হায়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ। এক মুঠো আকাশ এর পর নাট্যকার পরিচালক ও শিল্পরূপে তাঁর দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ ঘটল রঙমুঙেট্ট এক পেয়লা কফিকে কেন্দ্র করে। বাড়লার নাট্যজগতে তরুণ রায় যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন এক যে নতুনত্বের সন্ধান তিনি দিয়েছেন তার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি এক পেয়লা কফির মধ্যেও ঘরা পড়েছে।

এক চিত্র-সঙ্গীতায়ের সভাবল্য এর পাত্র-পাত্রী, পরিচালকের আকর্ষক এবং রঙমুঙেট্টক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। এ ধরনের অপরাধমূলক কাহিনীর কৌতুহলই হচ্ছে মূল সম্পদ যে কাহিনীতে কৌতুহল বস্তু ভীত কাহিন্য তত সার্থক, সেদিক দিয়ে এক পেয়লা কফি সার্থকতার স্পর্শ ভরপুর। কাহিনী হিসেবে তো বটেই, নাটক হিসেবেও এক পেয়লা কফি তরুণ হায়ের শক্তিমানতার পরিচায়ক। ঘটনার সংস্থাপন কৃশলতায় এবং বিভাগের প্রাচলতায় নাটকটি জমে উঠেছে। কাহিনীও কৌতুহলোদ্দীপক হওয়ার নাটকের মধ্যে এক খাসকরুণর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নাটকের গতিবেগের কল্যাণে নাট্যরস যথেষ্ট বনীকৃত হয়ে উঠেছে।

সচরাচর অপরাধীকে যে রীতিতে ধরা হয়—এখানে তরুণ রায় সে রীতি অহম্বণ করেন নি, নাটকের শেষ দৃশ্বে অপরাধী বধন প্রকট হয়ে পড়ল—সেই আশেও নাট্যকার যথেষ্ট অভিনব দেখিয়েছেন। এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা ছিল বাস্তব অপরাধী নিজের অপরাধ স্বীকার করল, অপরাধী যে কে বুদ্ধিমান দর্শকের তা আগে থাকতে অহমান করতে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু যে পরিবেশে অপরাধী নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে বাধ্য হল—তার সূত্র নির্ণয় করা আগে থাকতে অনেক বুদ্ধিমান দর্শকের পক্ষেও সম্ভব নয়, নাটকের সেইখানই আসল কৌতুহল এবং এ ক্ষেত্রে নাট্যশ্রষ্টা সম্পূর্ণ সফলতাই অর্জন করেছেন। সেটির বিশদ বর্ণনা আমরা যেব না—তার কারণ আপনারা ঝাঁগ নাটকটি এখনও দেখেন হি. তাঁদের কাছে মূল কৌতুহলটি তা হলে আগে থাকতেই তেজে সেগরা হবে।

তরুণ হায়ের এতে মাত্র প্রথম অঙ্কেই আবির্ভাব, আর আবির্ভাবে তরুণ রায় আপন দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন, এর পরেই উল্লেখ্য কবর হরিদন বুধোপাধ্যায়, গুহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়ের নাম।

করব সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন মজুমদারের নাম। এরা ছাড়া ভূমিকা-লিপিকে আছেন বিশ্বজিত চট্টোপাধ্যায়, সমরকুমার, পিকল মনোয়ী কেতকী মন্ত, কবিতা রায় এবং শ্রীমতী নীশাধিতা রায় প্রভৃতি।

অজ্ঞান

মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটারের বিজয়বন্ধু—অজ্ঞান একটি যুগোপযোগী বলিষ্ঠ ও হৃদয়স্পর্শী নাটক। কয়লাখনির শ্রমিকদের নিয়ে এর গল্প। মালিকদের অতিরিক্ত অর্থগুণ্ডার শ্রমিকদের মধ্যে কত জীবন যে অকালে নষ্ট হয়ে যায় তার তুলনা নেই, মালিকের লোভের বা লাভের আশুনে অনেক শ্রমিকের জীবন বলি দিতে হয় (মালিকদের কাছে সে সব প্রাণের কোন মূল্য নেই) অথচ তার কোন বিচার নেই, তার কোন প্রতিবিধান নেই, তার কোন প্রতিজ্ঞা নেই—এই পটভূমিকার নাটকের আখ্যান ভাগ গড়ে উঠেছে। নাটকের রচয়িতা ও পরিচালক উৎপল দত্ত। এ ছাড়া অভিনয়শাশেও তিনি দেখা দিয়েছেন। স্তব দিয়েছেন বরিশদ্বর। লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী।

বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অত্যন্ত সমন্বয়যোগী সাহাবান এবং বক্তব্য সম্বন্ধিত নাটক। বাড়লা নাটকের আবার রূপান্তর শুরু হয়েছে, কালের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী বাড়লা নাটক আবার পরিবর্তনের সমুখীন হচ্ছে, বাড়লা নাটকে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে পরিচালনরীতির দিক দিয়ে বাড়লা নাটক আজ কৃত্রিমতা কাটিয়ে উঠে ক্রমেই উন্নততর পথে পল্লার্ণণ করছে। অজ্ঞান প্রমুখ নাটকই আমাদের এই উজ্জ্বল সত্যতা প্রমাণ করবে এবং আমরা আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে এই ব্যাপকতার ও নতুনত্বের অভিমুখে বাড়লা নাটকের অগ্রগমন আশার ব্যর্থতাই বহন করে আনে। কলাকৌশলের দিক দিয়ে এবং মঞ্চ পরিকল্পনার দিক দিয়ে অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য অপরূপ, সেদিক দিয়ে যে বৈশিষ্ট্যের এক সে স্বজনীপ্রতিভার পরিচয় এঁবা মিলে বাড়লার রকমকে তার তুলনা মেলে না। রকমকে যেভাবে খনির দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা যেমনট ভগ্নপূর্ণ তেমনট বিষময়কর, একটি মঞ্চের উপর বিভিন্ন বস্তুপাতি সহযোগে একটি শিল্পকল গড়ে তোলা যথেষ্ট শক্তিরই পরিচায়ক। শেবাংশে মাত্র আলোক-রেখার সাহায্যে তাপস সেন যেভাবে জলপ্রাণের দৃশ্য দেখিয়েছেন তা অভাবনীয়, উত্তমপূর্ণ আলোকনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ ধরনের দক্ষতার পরিচয় দর্শকরা বোধ হয় পান নি, আমরা মুগ্ধকণ্ঠে আলোকশিল্পীকে তাঁর এই বিষময়কর নৈপুণ্যের জন্য বৃত্তকৃত অভিনন্দন জানাই। তাঁর এই অনবদ্য সৃষ্টি দর্শকসাধারণের মুগ্ধের কথা কেড়ে নেয়।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রাণপূর্ণ অভিনয় করেছেন; প্রত্যেকেই প্রশংসার দাবী রাখেন তাঁদেরই মধ্যে উৎপল দত্ত, তরুণ মিত্র, রবি ঘোষ, শ্রামল সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল রায়, নাট্যকার উমানাথ ভট্টাচার্য, শোভা সেন, সুমিতা লালগুপ্ত, নীলিমা দাস, মারা চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক চিত্রসংবাদ

আকাশ পাতাল এবং দেবী ছাড়া শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে আরও বেসর চাড়াছবি প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের মধ্যে উত্তম শ্রীপ্রয়া অভিনীত উত্তরমেঘ, পৌরালপ্রদা বহর তার এক দুই বেচারার নাম উল্লেখযোগ্য।

মাঘ, ১৩৬৬ (জাম্বুয়ারী-ফেব্রুয়ারী '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা মাঘ (১৭ই জাম্বুয়ারী) : 'দেশংকার তুচ্ছ হইলেও ভারত কোন সাময়িক জোট বেগ দিবে না'—সদাশিবনগরে কংগ্রেস-বিরূপ-নির্বাক্তনী সমিতির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২রা মাঘ (১৬ই জাম্বুয়ারী) : 'আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনের আহ্বান'—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৫তম অধিবেশনে (সদাশিবনগর) সভাপতি শ্রীনীরম সঙ্গীত রেড্ডীর ভাষণ।

এয়ার-ইন্ডিয়া ইকোয় ক্রাশনেল কর্পোরেশন ও ইণ্ডিয়ান পাইলট গিভের মধ্যে মীমাংসা আলোচনার এয়ার-ইণ্ডিয়া ইকোয় ক্রাশনেলের পাইলটদের নয় নিবসবাণী স্বর্ঘ্যট প্রস্তাহিত।

৩রা মাঘ (১৭ই জাম্বুয়ারী) : '৪৬৪ পার্টি নেতা শ্রী সি বাজা গোপালাচারী কর্তৃক মন্ত্রী ও পদস্থ অতিসাহসের বিরুদ্ধে জানীত অভিযোগ উল্লেখ্য জন্ত ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব সমর্থন।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জাম্বুয়ারী) : সারনাথে লালট লামায় (বিরহ) সতিত সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের চার বক্তাবাণী আলোচনা।

৫ই মাঘ (১৭শে জাম্বুয়ারী) : ট্রায়ের ডাড বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ও সহবতলীতে সরকারী ও বেসরকারী বাসের ডাডাও বন্ধিত।

৬ই মাঘ (২০শে জাম্বুয়ারী) : ভারতে ১৬ দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় সঙ্গ উদ্দেশ্যে রূপ রাষ্ট্রপতি মার্শাল ভরোশিলভ, রূপ সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ কোজলভ ও সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি নেত্রী মায়ায় কৃৎসবোর দলী শাগমন।

৭ই মাঘ (২১শে জাম্বুয়ারী) : 'পরীক্ষার বিপুল সংখ্যক ছাত্রের বার্থতা শিক্ষার মানের অবনতির পরিচায়ক'—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের উক্তি।

৮ই মাঘ (২২শে জাম্বুয়ারী) : তৃতীয় পরিকল্পনায় (পঞ্চবার্ষিক) কৃষ শিল্পের সর্বোচ্চ উন্নয়নকল্পে ২৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ—দিল্লীতে কৃষ শিল্পবোর্ডের দুই নিবসবাণী বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব।

৯ই মাঘ (২৩শে জাম্বুয়ারী) : ভারতের সর্বত্র এক বিশেষভাবে কলিকাতা ও সহবতলীতে সাড়বরে নেতাজী স্মৃতিচক্রের ৬৪তম জন্ম-জয়ন্তী পালন।

১০ই মাঘ (২৪শে জাম্বুয়ারী) : স্বাভী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রুশিয়া ও ভারত একযোগে সংগ্রাম করিবে—দিল্লীতে নাগরিক স্বর্ঘ্যনায় উক্তয়ে রূপ রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভের ঘোষণা।

নেপাল ও ভারতের বন্ধুত্ব অক্ষর ও অক্ষর—দিল্লীতে নেপালী প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরালার উক্তি।

১১ই মাঘ (২৫শে জাম্বুয়ারী) : প্রজাতন্ত্র দিবসে ৩১ জন বিশিষ্ট ভারতীয়ের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ—কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাঈশ ও ডাঃ আর, এন চৌধুরী 'পদ্মভূষণে' সম্মানিত এবং চ্যানেল সাঁতাক কুমারী জামতি সাহা, ক্রিকেট খেলোয়াড় জেমস প্যাটেল ও বিজয় হাজারের পদ্মশ্রী লাভ।

১২ই মাঘ (২৬শে জাম্বুয়ারী) : রাজধানী দিল্লী ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সমারোহ সহকারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের দশম বাবিকী উপবাপিত।

© দেশে-বিদেশে ©

১৪শে মার্চ প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী কৈরালার মধ্যে উভয় দেশের স্বাক্ষর সম্পর্কে দুই বক্তাবাণী আলোচনা।

১৩ই মাঘ (২৭শে জাম্বুয়ারী) : কোয়েম্বাটুরে কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা-সচিব শ্রী ডি, কে, কৃষ্ণমেননের ঘোষণা—আবশ্যক হইলে সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হইবে।

১৪ই মাঘ (২৮শে জাম্বুয়ারী) : ভারত ও নেপালের স্বাক্ষর বনিষ্টভাবে জড়িত—দীর্ঘ বৈঠকান্তে নেহরু-কৈরাল (সারিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের প্রধানমন্ত্রী) বৃদ্ধ ইচ্ছাহারে ঘোষণা।

অধিকৃত উপলক্ষে এলাহাবাদের জিবেশী সঙ্গমে ২০ লক্ষাধিক নরনারীর পূর্ণাহার।

১৫ই মাঘ (২৯শে জাম্বুয়ারী) : কলিকাতার বাজার হইতে চিনি উৎপাদ—১১০০ টি ভাষা মূল্যের লোকানে চিনি দেওয়া সম্বন্ধে সর্ঘজ চানির জন্য গণাকার।

পাশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শান্তি সম্মেলনে (কলিকাতা) শারী ভারত শান্তি সংসদের সভাপতি পণ্ডিত গুল্লুরালার উক্তি—সহ-বিলুপ্তিই সহ-অবাস্থ্যাতর একমাত্র বিকল্প।

১৬ই মাঘ (৩০শে জাম্বুয়ারী) : জাতিক সম্মিলিতভাবে ভারতের অখণ্ড ও স্বাধীনতার প্রতি চ্যালেঞ্জ করিতে হইবে—শরীদ দিবস উপলক্ষে দিল্লীর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দাবী।

বিখ্যাত গান্ধীবাদী অর্থনীতিবিদ ডাঃ জে, সি, কুমারস্বামী মাক্সিমেল ও হাসপাতালে পরলোক গমন।

১৭ই মাঘ (৩১শে জাম্বুয়ারী) : 'ভারত ও চীনের মধ্যে কোনক্রমেই বৃদ্ধ হইবে না'—ভারত সরকারে চণ্ডীগড়ে সাংবাদিক-বৈঠকে নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি, পি, কৈরালার উক্তি।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) : বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে কেরল রাজ্যের অন্তর্গতী সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন—কংগ্রেস, পি, এস, পি, মসলের লীগ জোট ও কম্যুনিষ্ট পার্টি মধ্যে ভীত প্রাত্যাহন্ত্য।

সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি মার্শাল ক্লিমেন্ট ভরোশিলভের ভারত সফরের শেষ পথায়্যে সঙ্গবলে কলিকাতা মহানগরীতে শুভাগমন।

১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী) : কেরলের অন্তর্গতী নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী বৃদ্ধফ্রণ্টে (কংগ্রেস-পি, এস, পি, ও মসলের লীগ গঠিত) জয়লাভ।

২০ই ফেব্রুয়ারী (কলিকাতা) সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভ, রূপ সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ কোজলভ ও সোভিয়েট নেত্রী মায়ায় কৃৎসবোর নাগরিক সমর্থন।

২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী) : কেরলে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য কংগ্রেস, লীগ ও পি-এস-পি বৃদ্ধফ্রণ্টের তৎপরতা—পঞ্চকাল মধ্যেই নতুন মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-আয়োজন।

২১শে মাঘ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ১০১২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হইয়াছে—কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য সচিব শ্রী এস, কে, পাতিলের ঘোষণা।

কেরলের অন্তর্গতী কালের নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল প্রকাশিত—১২৬টি আসনের মধ্যে বৃদ্ধফ্রণ্ট ১৪টি (কংগ্রেস—৬৩,

পি-এস-পি—২০, মসলেম লীগ—১১), কমিউনিষ্ট পার্টি—২৬, কমিউনিস্টসমিতি স্বতন্ত্র—৩, 'লাব-এস-পি—১, কণাটিক সমিতি—১ ও নিদলীয় স্বতন্ত্র—১টি।

২২শে মার্চ (৪ই ফেব্রুয়ারী): মণিপুরের খারসোম অঞ্চলে আনাম বাউকেল বাহিনী উপর নাগা বিদ্রোহীদের আক্রমণ—সংঘর্ষে হুইজেন সিপাচী ও তিনজন বিদ্রোহী নিহত।

২৩শে মার্চ (৬ই ফেব্রুয়ারী): অকল সমর্পণের সপক্ষে আলোচনা চালাইতে ভাবত কখনই প্রস্তুত নয়—চীনের প্রতি কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী সচিব জি. কে. কুন্সমেনমের সতর্কবাণী।

কাম্বোজের মুখ্যমন্ত্রী বকী গোলাম মরুমেরের স্পষ্ট দাবী—লাভোকে উপর চীনা আক্রমণ প্রত্যাহার করিতে হইবে।

২৪শে মার্চ (৭ই ফেব্রুয়ারী):—প্রাচীনায় স্বর্ণ রূপান্তরিত—মরাদিল্লাতে বিশ্ববিমেলায় ভারতীয় পরমাণুবিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব প্রদর্শন।

২৫শে মার্চ (৮ই ফেব্রুয়ারী): 'চীনভারত সীমান্ত সম্পর্কে চীনের একতরফা সিদ্ধান্ত ভাবত মান্যবহ না'—পার্লমেন্টের বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের উদ্বোধনী ভাষণ।

২৬শে মার্চ (৯ই ফেব্রুয়ারী): কলকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেসনেতা শ্রীঅতুল ঘোষের বিরূপ মন্তব্যে শোণিত্যয় কংগ্রেস ও বিহারী সদস্যদের মধ্যে তুহুল বাক-বিতণ্ডা।

জেনারেল ও শোণিত্যয় ডাক্তারী নৃতন কংগ্রেস গঠনের প্রস্তাব—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আবঙ্গক বিল প্রণয়নের সিদ্ধান্ত।

২৭শে মার্চ (১০ই ফেব্রুয়ারী): পশ্চিম সঙ্গ সভা ও শোণিত্যয় নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরোধিতা—নবগঠিত পঞ্চতাত্ত্বিক ট্রেন্ড ইউনিয়ন কমিটির প্রতিরোধ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত।

২৮শে মার্চ (১১ই ফেব্রুয়ারী): ভাবতে 'শান্তি ও শুভেচ্ছা সন্ধ' উদ্দেশ্যে রূপ প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের দিল্লী উপস্থিতি। নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী লীনেহরু ও রূপ রাষ্ট্র-প্রধানের জরুরী আলোচনা শুরু।

২৯শে মার্চ (১২ই ফেব্রুয়ারী): বর্তমান অবস্থায় চীনের সহিত আলোচনার কান ভিত্তি নাই—রাজ্যসভায় বিতর্কের ভবাবে প্রধান-মন্ত্রী লীনেহরু ঘোষণা।

রূপ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লীনেহরুর উপস্থিতিতে নয়াদিল্লীতে ভারত-সোভিয়েট অর্থনৈতিক সাহায্য চুক্তি ও সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ভারত-সোভিয়েট সম্পর্ক-বিষয়ে দিল্লীতে লীনেহরু ও মঃ ক্রুশ্চেভের মধ্যে তিন ঘণ্টাবাসী গাথন আলোচনা।

৩০শে মার্চ (১৩ই ফেব্রুয়ারী): ছুটি ড্রাস ও শনিবারে পূর্বা কালের আদেশের প্রত্যক্ষদে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কথ্যচর্চাদের কলম-বরাদ্দ প্রদত্ত।

বহির্দেশীয়—

১লা মার্চ (১৪ই জানুয়ারী): কাশ্মীর সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার নবকারী প্রস্তাবটি মুসলিম সোভিয়েট কর্তৃক অমুদ্যোগ।

২রা মার্চ (১৭ই জানুয়ারী): হোয়াইট হাউসের প্রস্তাবিত সর্বদে প্রকাশ—মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ১০ই ইইতে ১১শে জুন কশ্মীর সন্ধ করিবেন।

৪ঠা মার্চ (১৫ই জানুয়ারী): মার্কিন-বাজেটের অর্ধেকের বেশী অর্থ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ—প্রোসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার কর্তৃক কংগ্রেসে নতুন বাজেট উপস্থাপন।

৭ই মার্চ (২১শে জানুয়ারী): পাক-ভারত বোধ প্রতিরক্ষার লীনেহরুর (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) নিরপেক্ষ নীতি বাহত হইবে না—চাকার পাক প্রেসিডেন্ট আব্দুল খানের ঘোষণা।

৮ই মার্চ (২২শে জানুয়ারী): অবৈজ্ঞানিক ফিট্টের (আফ্রিকা) কলম্বাথানব চাদ ধসিয়া পড়ায় মর্যাদা পরিবর্তিত—খানগর্ভে প্রায় ৫ লাখ শ্রমিক আটক।

১১ই মার্চ (২৫শে জানুয়ারী): দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিণতিতে আলজিরিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষিত—সমগ্র ফ্রান্সে জনসভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ।

১২ই মার্চ (২৬শে জানুয়ারী): সর্বপ্রকার বুদ্ধ বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে—অসলোর ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ঘোষণা।

চীন ও ভারতের জনগণের মধ্যে নিবিড় মৈত্রী কামনা—পিকিং-এ ভারতীয় দূতাবাসের অধ্যক্ষ (ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বাহিনী) চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন্ লাই-এর ঘোষণা।

১৪ই মার্চ (২৮শে জানুয়ারী): লীনেহরুর জনসভায় পাক প্রেসিডেন্ট আব্দুল খানের সমস্ত উক্তি—কাম্বোজের নিশ্চয়ই আমাদের ইইবে—আমরা ইহার জ্ঞান ভিক্ষা করিতে বাটব না।

১৭ই মার্চ (৩১শে জানুয়ারী): চীন-রুস মৈত্রী ও আনুক্রমণ চুক্তি এবং সীমানা নিদারণ চুক্তি সম্পাদিত—পিকিং-এ ব্রুসের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নে উটন ও চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন্ লাই কর্তৃক চুক্তিদের স্বাক্ষর দান।

১৮ই মার্চ (১লা ফেব্রুয়ারী): সম্মিলিত আবহ-প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি সমস্ত বাহিনীর প্রতি আরব প্রজাতন্ত্র প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ—সীমান্তে ইস্রায়েলী ও সিরীয় সৈন্যদের সংঘর্ষের জের।

২০শে মার্চ (২রা ফেব্রুয়ারী): সোভিয়েট ইউনিয়ন আগবিক বোমা নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত—কটিমাগুতে সংঘর্ষনার উত্তরে রূপ রাষ্ট্রপতি ভেরাশিলভের ঘোষণা।

আলজিরিয়ায় বিদ্রোহ মমেনের জ্ঞান করানী সেনেটে গৃহীত বিল অনুসারে প্রেসিডেন্ট জু গলের বিশেষ ক্ষমতা লাভ।

২৩শে মার্চ (৬ই ফেব্রুয়ারী): ব্রুসে সাধারণ নির্বাচনের অমুদ্যোগ সম্পন্ন।

২৬শে মার্চ (৯ই ফেব্রুয়ারী): ব্রুসের সাধারণ নির্বাচনে উ দর দলের (ক্যাসিবিরাধী গণ-স্বাধীনতা লীগের) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ লাভ।

২৮শে মার্চ (১১ই ফেব্রুয়ারী): সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কোন নিবন্ধীকরণ চুক্তি সফল করিতে হইলে চীনকে ও তাহার মধ্যে অনিতে হইবে—গুয়াংজোনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ঘোষণা।

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণায় জ্ঞান প্রস্তাবিত—কারবো-এ আরব লীগ পরিষদের গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্ত।

৩০শে মার্চ (১৩ই ফেব্রুয়ারী): সাহায্য ফ্রান্সের প্রথম আগবিক বিক্ষোভ—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ।

বঙ্গভাষা সমিতির নাট ও গান

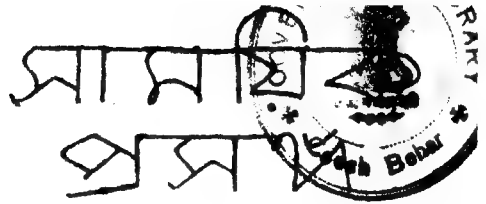
“পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গভাষা সমিতি সরকারী প্রতিষ্ঠান নহে—আধা

সরকারী; কারণ প্রধান-সচিব তাহার সভাপতি এবং সরকারের দপ্তরখানার তাহার অধিবেশন (রবিবারেও) হয়। গত রবিবারের দপ্তরখানার “রোচিঙা”র তাহার যে আধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত—সমিতি পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গবিকৃত স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিগ্ৰাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিবে। কেন্দ্রী সরকার সভাপতি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে এই কাজের জন্য ৬ লক্ষ টাকা দিবে বলিয়াছেন। সমিতি কেন্দ্রী সরকারের স্থান রাখিয়া সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা দিয়াই নিরস্ত হইল। নানা সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গবিকৃত ভিলাসমূহের আওতাধীন যে সব ক্রটির বিষয় প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, লোকের খাণ্ডের ও বাসের আবশ্যক ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। ইন্দ্রপের উপকণ্ঠের দেখা যায়, করুণ অখপাল অখগুলিকে প্রভুত পরিমাণে মর্দন ও মাজ্জন করিত, কিন্তু খাত্তল্য দানে কাপণ্য করিত। সেউজ্ঞ অখগণ অখপালদিগকে বলিয়াছিল—এত মর্দন ও মাজ্জন না দিয়া আমাদিগকে আধক খাটতে দিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থায় সেই উপকণ্ঠের বিষয় মনে পড়া স্বাভাবিক। তবে কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে যদি ৬ লক্ষ টাকা আদায় হয় তবে—সে বখানার্ড—লজ্জা বাদ গুচে আসে। তবে যাহা আসে তাহাট ভাল। বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হইলেও প্রাথমিক শিক্ষা কি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে? তাহা যদি না হয়, তবে গৃহগুলি কি কাজে ব্যবহৃত হইবে? দেখা যাউতেছে, নেতাজীর পরিকল্পিত “মহাভাতি সমন” দেশের জন্য ভাগ্যবতীকারকারীদিগের প্রতিকৃতি সমুখে রাখিয়া হইতেছে—নাট ও গান।”

—দৈনিক বনুমতী।

চলচ্চিত্রের বিরোধিতা

“জঙ্গল চলচ্চিত্র-বিরোধী সমিতি নামে যে সমষ্টি স্থাপিত হইয়াছে তাহার অভ্যর্থনা সম্পর্ক আশায়ে কিছু বলিবার নাই। তবে শাস্তিপূর্ণ থাকারানের যে সংকল্প কর্মসূচী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার দু-একটি ধারা সম্পর্কে কিংবা বন্ধনা আছে। সমিতি ‘ম্যাটিনী শ্বা’ অর্থাৎ বৈকালিক প্রদর্শনী প্রকল্পের বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। ইচ্ছা হইতে পারে যে তাহা হইবে। তাহা ছাড়া সমস্তের বৈবাহিক কর্মসূচী এক নয়, হাব বধন কবস্থিত সে তখনই ছবি দেখে, বৈকালিক প্রদর্শনীতে যে কেবল অগ্রাধিকার প্রদর্শনী ভিত্তি করে এমন নয়। বিশেষ করিয়া গৃহীয়া ত বীতিমত মনে ভারী হইয়াই আসে। সেদর প্রথায় আরও কড়াড়ি প্রবর্তন করার যে পরামর্শ সমিতি দিয়াছেন তাহা বিবেচনা-যোগ্য। তবে সরাসরীক কেবল চলচ্চিত্রের সঙ্গে ছাড়াইয়া দেবিলেই চলিবে না, শিল্পের বাণকতব পইন্ডিয়েন্তে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে। যে প্রশ্ন আজ চলচ্চিত্রকে উপলক্ষ করিয়া উঠিতেছে তাহা নানা সময়ে সঙ্গত, চিত্র নাটক এক সঠিক-কথাওকে আলোচিত করিতেছে। আবার উগাও ঠিক সঠিকতা এক চলচ্চিত্রের আবেশন এক জাতীয়ও নহে। জাপার অন্ধের বর্ণনার যাহা আভাসে থাকে দৃশ্যপটে তাহাট অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হইয়া যনকে দোলা দেয়। কিশোর চিত্রের উপর “হবর কমিকসে”র



অকলাপকর প্রভাবের কথা আমরা জানি। বিলাতী “বক ন রোল” সঙ্গীত প্রতিক্রিয়া এখনও মিলায় নাই। চলচ্চিত্র সম্ভারের প্রসঙ্গ এই পর্ষায় পড়ে। তবে সেই সঙ্গে দেশ ও কালভেদে ক্ষতিও যে বদলায় এই কথাটাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বিদেশী এবং দেশী ছবিকে একই গল্পকাঠি দিয়া মাণিতে গেলে চলিবে না। বিশেষের আচার-আচরণ আমাদের দেশের চেয়ে একবারে আলাদা। স্ত্রীতবাং বিদেশী চিত্রে যে দৃশ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সচনীয় টেকে, দেশী ছবিতে তাহাট দৃষ্টিকটু হইয়া পড়ায়। চলচ্চিত্র-নির্ধালাদেরও অন্তত এই বাস্তব অবস্থাটা মনে রাখা কর্তব্য। স্ক্রীন কী অঙ্গীকর্ষ বা কী, এই তত্ত্বগত আলোচনায় না গিয়াও এই কাণ্ট্রকু করা যাউতে পারে। তাহা ছাড়া মূল প্রশ্নটির কোন মমাসাও বৃষ্টি নাই? বহুকাল ধরিয়াই রসিক মহলে ইচ্ছা লটয়া লগেবল জবাব চলিতেছে, চূড়ান্ত বার মেল নাই। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি এই কথাটাট খাকে যে, আটের ক্ষেত্রে বহুটা শুধ সন্দেহ-অসুন্দারবই নহে, ইহার সহিত সত্য ও শিবেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অসুন্দারকে অকারণে আসরে নামাইলেই সে অঙ্গীকর্ষ হইয়া ওঠে; অপোত্তনের অবতারণা শিল্পী যদি করেনও তবে তাঁহার বিশষ্ট একটী লক্ষ্য থাকে চাই। এই লক্ষ্য অবশ্যই শিব বা কলাগুণ, এবং শিল্পসৃষ্টির ভিত্তি যে সত্য বস্তু হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

যদিহীন ভারত

“প্রতি মাসে পাঁচ চাকার বর্ষ (বৃত্ত) নির্মিত হইতে পারে এইরূপ একটি জাপানী ছবির কাহিনীর প্রথম চার্লান জুন মাসে ভারতে প্রেরিত হইবে, চৌকিখতে এক প্রতিদ্বন্দ্বী ইচ্ছা বোঝা করিয়াছেন। ডট জন ভারতীয় সিন্দারী এই মাসেই জাপান হাটাজুতন, ইচ্ছাও তাঁহারই বোধগাতকী জানা গিয়াছে। জাপানী ছবি, সাইকেল, কাচ, চীনামাটির বাসন ইত্যাদি ভাঙাও বহু মনোচাকী ক্রমে জাপান একখানে ভারতের বাণীর জাঁকিয়ে বসিয়াছিল। লায় কয়, টেঁকসই ও দেখিতে শুদ্ধর বলিয়া উচ্চা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। এখন শিল্প বাসিন্দা সকলেই বাসিন্দা হইয়ায় চেষ্টা করিতেছে, স্ত্রীতবাং বিদেশী ক্রমের আমদানীও বিশেষ ভাবে নিরুদ্ধিত। ভারত সরকারের সর্গভরাটাই এই কাহিনী প্রতিক্রিয়া ও পরিচালিত হইবে। অপেক্ষাকৃত অনেক কম মূল্যের জুতাই এদেশে জাপানী ভিনিসের আদর ছিল। কিন্তু সেই কাহিনীটাই এদেশে প্রতিক্রিয়া হইয়াই যাবে ওপানকার নিমিত্ত ছবির লায় হাটাজু অত্যন্ত হইয়া না পাড়ে, সেদিকে নিশ্চয় লক্ষ্য রাখা হইবে ত? এ যুগের বস্তা-মিনিট দনা সব কালই বস্তুত প্রবেশন। কিন্তু যদি তৈরীবা বাসনা না হইত—কি যেমন আমদানী নিরুদ্ধ হইতাহে, তাহাতে সাধারণ লোকের পাশে যদি কেনা চ্যুশো। স্ত্রীতবাং জু মূল্যে যদি পাওয়া গেলেই এই ব্যবহার সার্বকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।”

—সুপ্তার।

৮ই মার্চ স্মরণে

"বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে শিল্পী, সাহিত্যিক, মানবশ্রেমিক, রাষ্ট্রনেতা ও রাজনীতিবিদগণ এই কথা উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছেন যে, সমাজের আর্দ্রে অঙ্গ পঙ্ক হইয়া থাকিলে তাহার চলনশক্তি বাহিত হইয়া বাইবেই—মাতৃভাষাতিক হীনাবস্থায় রাখার অপরাধে সমগ্র সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকাংশ নারী পুরুষের সমর্থনাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তখন সেই শক্তির আলোকে আমাদের চোখের সামনেও একথা ভাব্য হইয়া উঠিয়াছে যে নারী পুরুষের সম্পত্তি নয়, দেবীও নয়, তাহাদের বরতন্ত পুঙ্খনিপঞ্জে পোড়াকাঠও নয়—তাঁহারা মানুষ, তাহাদের নিজস্ব সত্তা আছে, সমাজ গঠনের মহাযজ্ঞে পুরুষের সমান অবদান আছে, নতুন সমাজস্থিতির কাজে সমান ভূমিকা আছে। কিন্তু কোন পথে? কি ভাবেই বা মুক্ত জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া হইবে? কাগাসাই বা আলোকবস্তিতে তাতে পথ দেখাইবে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নূন প্রত্যয়ের পথ দেখাইয়াছিল বলিয়াই আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিশ্বের একটি স্ববীণা দিন। শুধু আইনগত অধিকার, শুধু মৌলিক ও আর্থগত অধিকার, শুধু চেতনাব্য উদ্রেক ও বিরোধের লক্ষন যে—শুধু মুক্তিসংগ্রামের ভূমিকা মাত্র। নারীর সামাজিক মুক্তি সমগ্র সমাজের লাস্যমোচনের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে সমগ্র লোভিত মানুষের মহান মুক্তির বাস্তব সংগ্রামের পথে বিশ্বনারী আলোকনে নূন্য প্রবন্ধাবী মেয়েরা যেদিন সমবেত কণ্ঠে সমানোভিকারের ধ্বনি তুলিয়াছিলেন—সেই স্ববীণা দিন ৮ই মার্চ। আজ সেই দিনটিইই স্বর্ণ জয়ন্তী।"

—স্বাধীনতা।

আয়করের ভাগ

"বাঙ্গলা দেশে অধিক আয়করের মোটা ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার কাড়িয়া নিতেছেন এবং উহা সিংগর, উদ্ভাও প্রদেশ প্রভৃতিকে দান করাতেছেন, উভার সিংগর লামরা বহুদিন আশ্রয় লইয়াছেন। বঙ্গীয় বিধান পরিষদে লামরাংশ সাধারণ এ বিষয়ে নতুন আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার নিজের জন্ত বাঙ্গালার নিকট হইতে আয়করের আগ নিতে পারেন কিন্তু অঙ্গ প্রদেশকে দান করা করিবার জন্য উহা কাড়িয়া নিতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা দেওয়ার দায়িত্ব প্রদেশসমূহের আছে, কিন্তু এক প্রদেশের সম্পদ অপরকে ধরবারি করিবার অধিকার কোন প্রদেশের নাই, এক প্রদেশের সম্পদ কাড়িয়া নেওয়ার ক্ষমতা সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয় নাই। সাধারণ মহাশয় যিব্যক্তি বিচারের জন্ত কেন্দ্রীয় কোর্টে পার্মিটিতে বসিয়াছেন। ডাঃ রায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ভাল করিবেন।" —যুগব্যাপী (কলিকাতা)

ঘর করিলেও জাত দিব কেন?

"স্বদেশস্বপ্নের এক উপজাতির উপনামিকা নারী বৎসব ধবিয়া ঘর করিলেও জাত ছেদ নাই। যে সব বাস্তুদাতা বাস্তুদাতা যোগল বাস্তুদাতার অঙ্গাঙ্গি হইয়াছিলেন, তাঁহারা চারোমুখী শক্তিতে নিত্য বহুনার দান ও শিবপূজা করিতেন। আমাদের কংগ্রেস নেতারা ঠিক এই বকবের সাক্ষী। মুসলিম লীগের সহিত কেবল বুদ্ধবুদ্ধ

করিতে পারেন, মুসলমান ভোটগুলি পাইবার জন্য তাহাদের পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের সক্তি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন—নেতাব, নেতাব। অহম্মাদের সেকুলারিজম খানিক মুসলমানের দুর্গা পোষার যত। মুসলমানের চাই, কারণ, তাহাদের নথর নথর ভোটগুলি একসাথে আসে। তজ্জ্ব লীগের চরণসেবাতোও আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের মন্ত্রিসভায় নিলে নিজেদের ভাগে কম পড়িয়া বাইতে পারে।"

—হিন্দুবাণী (বাঁকুড়া)

খাতসমস্যা

"এ বৎসর প্রাকৃতিক দুর্ভাগ্যের ফলে বীরভূম জেলার প্রায় সর্বত্রই ধানের কলন মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও কৃষি ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হইয়াছে। খাত উৎপাদনে উৎকৃষ্ট বীরভূম আজ প্রকৃতির কান্ডাজ ডায়ের দানের ঘাটতি অকসেস পরিণত। ইহার উপর সরকার অবিরোধকের নিম্নমত লইয়া বাকী খাজনা, ঋণ ও অতিবিক্র কানেল কর আদায়ের হামলায় দ্বারা ধান ওঠার প্রথম যন্তমেই আড়তদার ও মিল মালিকের নিকট চানীকে খাত বিক্রয়ে বাধ্য করিয়াছেন। বক্তার্ত্ত মাধুঘের ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার তাহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কোনটিই কাঙ্ক্ষণী করেন নাই। চাহীর ধানের মোটা অংশটা মুনাফা শিকারীদের কবলাগত হওয়ার পর হইতেই ধান চালের দরের অব্যাহত উর্দ্ধগতি সাধারণ মানুষের মনে এক ভয়াবহ সন্ত্রাস হতাশার করাল ছায়া বনাইয়া আনিতেছে। গ্রামাঞ্চলে খাটনির অভাব প্রতিদিনের তাজ্রতর হইয়া উঠিতেছে। কৃষি মজুর ও নিম্নবিত্ত গৃহস্থের গৃহে গৃহে অর্দ্ধাহারের সর্বনাশা দুর্দিন ক্রমশই ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে। খাতসমস্যার বাজারের নিয়ন্ত্রণ কংগ্রেসী সরকার তাহাদের প্রত্ন মুনকাবাজ প্রণয়ন করলে তুলিয়া দিয়া প্রকৃতিবির পরাকটীর পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণ মানুষ ক্রমশ: বিশেষতঃ হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপর এ বৎসরের দুর্দশার কথা বিমুত হইয়া জেলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উদার ভাবে সিরেমা ও সার্কাসের অনুমতি পত্র বিতরণ করিয়া চাহীর ঘরের শেষ ধাতুকণাও মুনাফা শিকারীদের গুণামজাত করিবার স্ববন্দোবস্ত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে অবৈধ লেনদেনের একটা স্বাধী কারবার চলিতেছে বলিয়া জননর প্রায় প্রকাজেই বিনা প্রতিবাদে আলোচিত হইতেছে।"

—বীরভূম।

ছাত্রবিক্ষোভ

"গোটা ভারতেই ছাত্রবিক্ষোভ প্রচণ্ড ভাবে চলিতেছে। শুধু বিক্ষোভ হইলে আশঙ্কার কারণ ঘটিত না। ইহার সহিত লুণ্ঠ, গৃহদাহ, গুণ্ডারী প্রভৃতি জড়িত। প্রথমে আলিগড়, বারাণসী, তারপর এলাহাবাদ, বাজালোর, সর্বশেষে লক্ষ্ণৌ, তারপর কোমার ঘটিবে বলা যায় না। শিক্ষাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলার মুসেই বখন এই গলদ, তখন দেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অন্ধকারময় ও লঙ্ঘাজনক। আমাদের ভাগ্যে সত্যই কি একনারকবের বিভূষণা আছে? এই সমস্ত সমাজ-বিরোধী ঘটনাগুলির মূল কারণ অসংখ্য। সারা দেশব্যাপী দুই ব্যাধির ইহা উপসর্গ মাত্র। এই মহাব্যাধির নিদান কি? গভীর অন্ধসন্ধান করিলে অনেক কিছুকেই ইহার

নিদান বলিয়া ধরা যায়। শুধু মানুষ ইহায হেতু নয়, পরিবেশও ইহায উৎপত্তিস্থল বলিয়া বিবেচিত হইবে। ছাত্রদের এই সমস্ত ধর্ম কার্যের স্তম্ভ একমাত্র মারী নয়। সরকার, রাজনৈতিক দল, বিভাগের পরিচালকমণ্ডলী অভিভাবকগণ ও শিক্ষকগণ কেহই দায়িত্ব গ্রহণে পারিবেন না। এই সমস্ত দুর্য্যবের দণ্ড ছাত্রদের প্রাণ্য হইলেও তাহারা যি এই সমস্ত কার্যের হেতু, ইহা চিত্তাশীল ব্যক্তির স্বীকার করিবেন না। যুবকেরা সাধারণতঃ অপরিণতবুদ্ধি। তাহাদিগকে লইয়া রাজনৈতিক দলগুলি যদি দাবাখেলার গুটির মত ব্যবহার করে, তবে সে দোষ কি তাহাদের নয়? নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগের প্রচলন যুবকগণের নৈতিক অধোগতির কারণ। ছাত্রদের নিকট আদর্শবাদের বালাই নাই। কোন বকমে পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়াই তাহাদের জীবনের কাম্য। ক্রমবর্ধমান বেকারী ও দ্বন্দ্ববাজনক অর্থনৈতিক অবস্থার বিতীর্ষিকার তাহারা জীবন সম্বন্ধে উদ্বেগহীন। কাজেই ভবিষ্যের মত তাহারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবনাশূন্য। দ্রুত শিল্পীকরণের ফলে চলিত মূল্যমানের লোপ অথচ তাহার স্থলে কোন নতুন মূল্যমানের প্রকাশ না হওয়ায় নীতিবোধ অল্পবল। এই সমস্ত কারণ ও অন্তান্ত প্রভাবের ফলে ছাত্রসমাজ যে বিক্ষুব্ধ হইবে, তাহা স্বাভাবিক নয় কি? তার পর আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থাও এক জটিল সম্বন্ধের মধ্যে। এই সমস্ত অবস্থার চাপে আমাদের ছাত্রসমাজ দুর্নীতির পথে হতদ্রব অগ্রসর হইয়াছে। জাতির বাত্মনাথ ইহা একট বড় দুঃসম্পদ। ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? —জনমত।

প্রদর্শনীর সার্থকতা ও ব্যর্থতা

“বারাসাত মহকুমা কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য ও পশুপক্ষী প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে বারাসাত সহরে কেন্দ্রগারী মাসের শেষ তিনটি দিনে ঘেরপ উৎসাহ আলোড়ন পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। আমাদের গত সপ্তাহের সংখ্যায় প্রদর্শনীর একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাম্যকালে প্রচণ্ডের অল্পতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হইতেছে প্রদর্শনী, যেখানে হাতে-কলমে কাজ করিয়া চিত্র, পুতুলের সাহায্যে অনেক নীরস প্রচার সরল হইয়া উঠে। যন্ত্র বা মডেল বাহা সাধারণতঃ পুস্তিকা, বক্তৃতা বা মারক গ্রামবাসীকে বুঝাইয়া দেওয়া খুবই কঠিন, প্রদর্শনীতে তাহা অনায়াসে হাতের কাজে দেখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়। বারাসাত মহকুমার কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে অনেকগুলি জিনিস ছিল বাহা গ্রামের কৃষক ও সহরের মধ্যবিত্ত দর্শকগণের বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি জিনিস ছিল না বাহার অভাবে প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া গ্রাম গঠনের সহায়ক প্রেরণা সহজে প্রচার করা যাইত। এই প্রদর্শনীতে আমরা সবচেয়ে বেশী যত্নের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, মহিলাদের স্তম্ভ বিশেষ ব্যবস্থার অভাবে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টি মহিলাদের বিশেষ লক্ষ্যের কারণ হইলেও তাহারা অত্যন্ত সংকোচ ও লজ্জার সহিত পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক, একেই গ্রামের মহিলাদের সংস্কার অভ্যাস প্রবল এবং পুরুষ পরিবেষ্টিত প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে তাহাদের স্বাভাবিক কোমল লক্ষ্য ও লোকনিষ্ঠার ভয়ে এক বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। যদি মহিলাদের স্তম্ভ বিশেষ দিন নির্দিষ্ট থাকিত এবং পুরুষদের

প্রবেশাধিকার না ঘটে, তবে গ্রাম্য মহিলাদের পক্ষে দীর্ঘ সময় ধরিয়া প্রদর্শনী প্রদর্শক পরিদর্শনের সুযোগ হইয়া উঠে।”

—বারাসাত বার্তা।

দোকান আইন

“কিছু দিন আগেও দেখিয়াছি, কিছু সংখ্যক দোকানদার সপ্তাহে ছেড় দিন দোকান বন্ধ রাখিত। দোকান কর্মচারী আইন তাহারা মানিয়া চলিত। কিন্তু একশ্রেণীর ব্যবসাদারের প্রচলিত আইনকে বৃদ্ধান্ত্র দেখাইবার প্রবণতা সেই সঙ্গে অপরাপর দোকান বন্ধ থাকার সুযোগে অধিক মুনাফা লুণ্ঠিবার চাঞ্চালা। এই আইনটির প্রয়োগকে প্রায় সম্পূর্ণ বানচাল করিয়া দিয়াছে। এখানে আমরা বর্ধমান

মাসিক বঙ্গমতীর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

- ১। প্রকাশের স্থান—বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির।
- ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
- ২। প্রকাশের সময়—প্রতি মাসে।
- ৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম ও ঠিকানা—
শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় নাগরিক। গ্রাম—
মেড়িয়া। পোঃ—আকনা। জেলা—হুগলী।
- ৪। সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা—পূর্ণতোষ
ঘটক। ভারতীয় নাগরিক। ১১১, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা—৯।
- ৫। যেট মূলধনের শতকরা এক ভাগের অধিকের
অধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা—শ্রীমতী দীপ্তি দেবী।
বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। শ্রীমতী ভজি দেবী। ১৪১, ইন্দ্র
বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। শ্রীমতী আরতি দেবী।
১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯। কুমারী পূর্ণতি
দেবী। বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী
গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। কুমারী উৎপলা দেবী।
বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।
- আমি শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা
করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও
বিশ্বাসসম্মত।

স্বাক্ষর

শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

তারিখ

১-৩-১৯৫৯।

জেলার কথাই বলিতেছি। মাসিকের লোভের সঙ্গে কর্মচারীর প্রাণা ছুটি অস্বীকারের এমন দৃষ্টান্ত কৃত্রিম দেখা যাইবে না। কয়েক দিন পূর্বে কলিকাতার শেকান কর্মচারীরা সভা-সমিতি এবং বিধান সভা অভিযান দ্বারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছে। দোকান কর্মচারী আইনের সংশোধন দাবী করিয়াছে। সরকারও সংশোধনী বিল আনিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আইনের কথা না বলাই ভাল। আইন উপেক্ষা করার হিড়িক আসিয়াছে। সুতরাং আইনের কড়াকড়িতে কোনো ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। জনগণ তথা ক্রেতাসাধারণ যদি আগাইয়া আসেন, তাহা হইলে কিছু সুরাহা হইতে পারে। যে সরকারী কর্মচারী এই আইন বখাও প্রয়োগ হইতেছে কিনা দেখিবার চক্কর আসেন (জেলায় একজন)। তাহার একর পক্ষে সম্ভব নয়। বন্ধের দিন সেই দোকান খোলা থাকিলে কোনো দ্রব্য সেই দোকান হইতে না ক্রয় করা এই মনোভাব যদি ক্রেতা সাধারণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কিছু সুফল দেখা দিতে পারে। আর একটা বিষয় আছে—তাহা হইতেছে আইনগত। দোকান বন্ধ রাখার নিয়ম অঙ্গল হিসাবে করা উচিত। একটি সহরকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া দোকান বন্ধ রাখার দিন নির্ধারিত করা। ইহাতে আইন ভঙ্গকারীদের চিহ্নিত করা সহজ হইবে। আশা করিতেছি, আমাদের সুপারিশ ক্রেতা ও সরকার বিবেচনা করিবেন।

—বর্ধমানবাণী।

সিনেমার হাতছানি

“দেখিয়া চক্ষু সার্বক হইল। বেলা বিপ্রহর, ষাণ্ডয়া-দাওয়া সারিয়া বাহির হইয়াছি—সুতরাং তাদ্রা ছিল না। চাহিয়া রহিলাম। এক বালক—বয়স বোধকরি ১৩:১৭ বৎসর হইবে। সম্মুখের এক প্রোডের নিকটে আঙুন চাহিয়া হইয়া আপন সিগারেটের মুখাঙ্গিরাল। প্রোটেক সে ‘লাগা’ বহিয়া সংখ্যান করিয়াছিল। বালক তখনও টোট পাকাইয়া উঠিতে পারে নাই, তাই ‘লাগা’ বলিলেন—‘নূতন শিখেছ বুড়ি?’ বালক ঘাড় নাড়িল। লগা লাইন। সব বকমের মায়াব আছে, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ‘উদ্ভাস্ত-প্রেম’ লিখিয়াছিলেন—এখানে আসিলে সকলে সমান হয়।’ এখানে অর্থঃ শ্রাশানে। তাঁহার মন তখন ভাল ছিল না। সত্ত্বী মরিয়াছেন—সুতরাং দৃষ্টি মেঘাচ্ছন্ন ছিল। নহিলে দেখিতেন—শ্রাশানে সকলে সমান হয় না, কাহাকেও চন্দনকাঠে পোড়ান হয়, কাহাকেও আমকাঠে, কাহাকেও বা গাণায়। কাহারও অঙ্গে সিন্ডের কাপড়, কাহারও মিলের ধুতি—কেউবা মেহের কেন্দ্রস্থলে একটা না-খাঙ্কিলেন-নয় গোছের টুকরা লইয়া চিতায় চাপে। শ্রাশানে সাম্য নাই। সাম্য আছে এই লাইনে। সকলেরই মূল্য হয় ছয় আনা, না হয় দশ আনা। ইহার কতক্ষণ ধরিয়া লাইন লগাইয়াছে? এক বার বছরের বালককে প্রশ্ন করিলাম। ছেলোট বলিল—১২টা হইতে। ৩টার সময় ছবি আবৃত্ত। দেখিয়া বুঝিলাম, আজকাল দেশের নেতারা ছাত্রসমাজে পুঙ্খসার অভাব ঘটাইয়া বলিয়া যে আওয়াজ তুলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা।”

—পূণ্যভূমি (ভারকেশব)।

শিশির সান্নিধ্যে এসঙ্গে

[মাসিক বঙ্গমতীর বিগত আধিন (১৩০৬) সংখ্যায় প্রকাশিত শিশির সান্নিধ্যে রচনাটিতে স্বর্গত নাট্যকার অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাট্টা মহাশয়ের কিছু অপ্রীতিকর ও অব্যক্তি উক্তি প্রকাশিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত দুঃখ এবং বেদনামুগ্ধ করিতেছি। এইরূপ ভিত্তিহীন উক্তি প্রকাশিত হওয়ায় অপবেশচন্দ্রের আত্মজনবর্গ ও অনুসারীগণ মনঃস্বস্ত হইয়াছেন। আমরা এই লজ্জাকর পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি বাগাতে না হয় ভবিষ্যতে তৎপ্রতি সর্বশেষ দৃষ্টি রাখিব।

—সম্পাদক, মাসিক বঙ্গমতী।

শোক-সংবাদ

বাঙালার সর্বজনপ্রিয় প্রবীণ কথাসিদ্ধী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩ই মার্চ ৭১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। অস্বাস্থ্যকর নিরহঙ্কারিতার ও শোচনীয়বোধের মূর্ত প্রতীক উপেন্দ্রনাথ ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায়-পরিবারের সন্তান এবং অপরাধে সাহিত্যশিল্পী শরণচন্দ্রের তিনি সম্পর্কে মাতুল। প্রথম জীবনে ইনি আইন-ব্যাসায়ী ছিলেন, পরবর্তীকালে সর্বতোভাবে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। উপেন্দ্রনাথ সম্পাদিত বিচিত্রা বাঙ্গলাদেশের সাময়িক পত্রগুলোর গৌরব। অভিনেতা এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়ক হিসাবে তিনি অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। (বিশেষতঃ গায়ক হিসাবে), সাধারণতঃ গজলখক হিসাবে সাধারণ্যে পরিচিত হলেও কবি হিসাবেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অল্পতম সহকারী সভাপতির আসন উপেন্দ্রনাথ অকৃত করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগদ্বাণী স্বর্ণপদক দ্বারা একে সম্মান নিবেদন করেছেন। উপেন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে শশীনাথ, রাজপথ, অভিজ্ঞান, অমূল্যক, দিবঙ্গল, একই বৃন্তে, বিগত দিন, শেষ বৈঠক, স্মৃতিস্মৃতি, শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙালার সমাজজীবন থেকে একটি সর্বজনপ্রিয় পুরুষের স্থান শূন্য হ’ল।

বিখ্যাত চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ গনপতি পাঁজা ১২ই মার্চ ৬৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। গত সেপ্টেম্বরে পরলোকগত প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গনপতি পাঁজা এ’র অগ্রজ ছিলেন। ইনি ১৯৫২ সাল পর্যন্ত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের চর্মরোগ বিভাগের প্রধানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে ইনি দেশশাস্ত্রী প্রভুত সুনাম এবং খ্যাতি অর্জন করেন।

বিশ্ববিখ্যাত সম্ভবপরিব রবীন্দ্র চাটোপাধ্যায় ১ই মার্চ এলাহাবাদে ৬০ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯৩২ সালে ইনি দীর্ঘস্থায়ী সীতারের আত্মজীবনিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। সম্ভবপরিব হিসাবে জগতের দরবারে ইনি বাঙালার ও বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হিসেবেও জগতের সীতারফলে ইনি বহুবার প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হতে সক্ষম হন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৩৬ নং বঙ্গবাজারী পাবলিশারী ট্রাষ্ট, “বঙ্গমতী রোটারী থিয়েটার” সভাপতি ও প্রকাশিত।



ঘটায়।

মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যায় 'চাবন্ধন' এর মধ্যে আমাকে স্থান দিয়েছেন। সেজন্য ধন্যবাদ। কয়েকটি মাসিকের প্রামাণ্য এবং কিছু তথ্যগত ভুল সন্ধ্যা করা গেল। (১) প্রথম 'প্যারাগ্রাফ' এ লাইনগুলো উল্টো-পাল্টা হয়ে যাওয়ায় কোনো অর্থবোধ হয় না। (২) বি. সি. এন্ড ফেল করলাম কবে বুঝতে পারছি না। কথাটি বেশ হয় ছিল—'দিলেন' কিংবা 'দেন'। কম্পোজিটর মশাটি করেছিলেন 'ফেল'। বেশ হয় ভাবলেন, জেলখানার লোক যখন, নিশ্চয়ই পাশ করতে পারেনি। (৩) Last but one প্যারাগ্রাফে বর্তমানে কথাটি যদি রাখতে চান, তাহলে তিন বছর আগেকার তথ্যগুলো বদলানো দরকার। অর্থাৎ বর্তমানে আমি বহরমপুর নয় তথ্যগুলো বদলানো দরকার। অর্থাৎ বর্তমানে আমি বহরমপুর নয় আলিপুর সেক্টর জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তামসী ও লৌহকপাট (৩য়) বন্ধাক্রমে মাসিক বসুমতী ও 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হচ্ছে না, অনেকদিন আগেই বই-জাকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে, এবং 'তামসীর ঘর' মুদ্রণ ও লৌহকপাট তৃতীয় পর্বের চতুর্থ মুদ্রণ শেষ হতে চলেছে। আমার এ চিঠিখানা প্রকাশ করতে বাকি না। যে ভুলগুলোর উল্লেখ করলাম, আগামী সংখ্যায় তার সংশোধনের ব্যবস্থা করলে বাধিত হবে।—শ্রীচাকচক্ষু চক্রান্ত (জরাসন্ধ) ২ বেকার বোড, কলিকাতা—২৭

ঋণীদের রচনাকাল ও বৈদিক আর্থের আদিনিবাস

মাসিক বসুমতীর বেশ কয়েকটি সংখ্যা থেকেই জীহ্ম সমাজদার ও শ্রীশানন্দ ব্রহ্মচারীর 'বৌদ্ধ ও পঞ্চলীল' প্রবন্ধের বিষয় থেকে অস্পষ্ট আনুমানিক করেও কিছু বিষয়ের উপর বিতর্ক চলে। তার ভিতর ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব এবং বৈদিক আর্থের আদি-নিবাস সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠে এবং তা নিয়ে বাণাস্থ্যবাদ চলে। বলা বাহুল্য, শ্রীশানন্দ বাবুর মতে ঋণদের রচনাকাল খৃঃপূঃ ৫০০—১৫০০ মধ্যে এবং বৈদিক আর্থের আদিনিবাস ভারতবর্ষের বাহিরে। অস্পষ্ট অনেক ঐতিহাসিকের মতের সঙ্গে এ মতের পার্থক্য নেই। অধিক সংখ্যক জনসাধারণের কাছে বা ইতিহাসের ছাত্রের কাছে এ মতই গ্রাহ্য হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এবং চিন্তাশীল লোকের সঙ্গে এবিষয় নিয়ে অনেক বাণাস্থ্যবাদ এবং চিন্তাশীল লোকের সঙ্গে এবিষয় নিয়ে অনেক বাণাস্থ্যবাদ হয়েছে। তাই প্রচলিত মতবাদও পাণ্ডে যেতে পারে—যদি তার বিশেষ কিছু বুদ্ধি থাকে। আর যখনকার বুদ্ধি যদি নিত্যকাল হ্রাস থাকে তবে তা চিরদিন অজ্ঞান বলে পরিগণিত হয় না। কাজেই যে ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত মতের কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন বলেই মনে করি। এ ক্ষেত্রে শ্রীহেমবাবুর স্বপক্ষে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। বিশেষভাবে গভীর আশ্রয় প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের

জন্মকাল প্রবন্ধে। সেখানে তিনি শ্রুষ্টিভাবেরই উল্লেখ করেছেন শিলালিপি, ভগ্নমূর্তি এবং লিপিমালায় দ্বারা ঐতিহাসিক সঠিককাল নির্ণীত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ গীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর 'উপনিষদ' নামক আলোচনা গ্রন্থেও এ সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনিও প্রত্নতাত্ত্বিক মতকে পরিহৃত্যগ করেছেন। আর তাহাড়া প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে অস্পষ্ট অস্পষ্ট প্রমাণের আবর্তন। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ও সাক্ষ্যে সম্ভব নয়—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে। কেননা এখানে গ্রন্থ প্রকাশ হতে অনেক পরে। পূর্বে মুদ্রণকারে থাকিত। সেই জন্য বৈদ-উপনিষদকে প্রাচীন বলা হয়ে থাকে। তাতে লিখবার সময়ে তৎকালীন ভাষার ছাপ অবশ্যই থাকবে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের দ্বারা রচনা বা স্মৃতির কাল অনেক পূর্বে। তাই ভাষাতত্ত্ব দ্বারা অসম্ভবতঃ আমাদের প্রাচীন গ্রন্থের কাল নির্ণয় সম্ভব নয়। তারপর 'বৈদিক রচনাকাল' এবং 'বৈদিক আর্থের আদিনিবাস বাহিরে' ছিল—এ দুইয়ের ঐতিহাসিক তথ্য প্রথমে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রচার করেন। তাঁদের প্রভাব আমাদের অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যেও এসেছে। তাঁরা যে নিরপেক্ষ ভাবে লিখেছেন, তা সর্বশেষ মানা যায় না। কারণ তাঁদের অনেক সমস্ত মতোক্তি পরবর্তীকালে প্রমাণের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁরা চিরদিনই হিন্দুসভ্যতাকে সন্ধিস্ত এবং খাটো করে দেখানোর যথেষ্ট অপপ্রয়াস করে

মধ্যে তাঁদের ভাবশিখা নেহাৎ কম নয়। তাই দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এক একজন এক এক কথা বলেছেন। বেউ বলেন, আর্থের আদিনিবাস মোসোপোটামিয়া অঞ্চল, আরও কেউ বলেন বাসিন্দার ভদ্রাব অববাহিকার কবেলী অঞ্চল, আরও কাহারও মতে হাঙ্গেরীয় অঞ্চল। তার পিছনে ঐতিহাসিক যুক্তি খুবই কম। এর পিছনে এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভিন্ন বিস্তার নেই। কাজেই এই দুইটি বিষয়ের উপর বর্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে কিছুটা আলোচনা করব। কেননা আনুমানিক সিদ্ধান্তের চেয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত অধিক যুক্তিযুক্ত।

প্রথমতঃ দ্বারা যাক ঋণদের রচনাকাল। পূর্বে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ভাষাতত্ত্ব এবং প্রত্নতত্ত্ব দ্বারা এর কাল সঠিক নির্ণয় সম্ভব নহে। এ ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজন অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত। যেমন ভাবে হেমবাবু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়কাল সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। লোকমাত্র তিলক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Orion এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সে ১৭শে এবং ১৮শে সামান্য একটু আলোকপাত করা সঙ্গত বলে মনে করি। আকাশমার্গে ১২টি রাশি এবং ভাঙে ২৭ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগের নাম নক্ষত্র

অয়নচলন (Precession of the equinoxes) দ্বারা জানা যায় বিয়ুণ (vernal equinox) একস্থলে স্থির থাকে না। উগা বৎসরে ৫০ বিকলা সরে যায় এবং ২৫৮৬ বৎসরে ৩৬০ ঘূরে আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসে। বিয়ুণ এখন মীনরাশিই উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে আছে। ২০০০ বৎসর পূর্বে যেনে ছিল, ৪০০০ বৎসর পূর্বে উহা বুধে ছিল। বিয়ুণ যে নক্ষত্রে থাকে, সেই নক্ষত্রে বাসস্তিক ক্রান্তিপাত (vernal equinox) ঘটা হয়। এই অয়নচলন দ্বারা বৈদিক যুগের কাল নির্ণয় করা যায়। তিলক মহারাজ তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদের কয়েকটি ঋকের রচনাকালে পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসস্তিক ক্রান্তিপাত সংঘটিত হাত। সে হেতু বাসস্তিক ক্রান্তিপাত হয় উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে এবং উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র থেকে পুনর্বসুর দূরত্ব ৮ নক্ষত্রেরও অধিক। এখন এক এক নক্ষত্র $২৩\frac{১}{২}^\circ \times ৬০ \times ৬০ = ৮৪০০$ বিকলা। অতএব ৮ নক্ষত্রের দূরত্ব ৫৮৪০০০ বিকলা। বৎসরে বিয়ুণ যখন ৫০ বিকলা অতিক্রম করে তখন ৩৮৪০০০ বিকলা অতিক্রম করিতে ৭৬৮০ বৎসর প্রয়োজন। অর্থাৎ খৃঃপূঃ প্রায় ৫০০০ বৎসর। কাজেই এক্ষেত্রে ঋগ্বেদের সময় খৃঃপূঃ ২৫০০-১৫০০ ধরা মোটেই সঙ্গত নয়।

ভারতের বৈদিক আর্থার আদিনিবাস সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক। এক্ষেত্রে লোকমুখে তিলক গবেষণার দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন যে বৈদিক আর্থারের বাসস্থান উত্তর কুরুতে। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Arctic Home in the Vedic Arya গ্রন্থে এমত প্রকাশ করেছেন। বর্তমান Paleontologist-গণ বলেন, উত্তর কুরু (North pole) স্থির নহে। তিলক মহারাজ দেবের যে সময় নির্ণয় করেছেন, সে সময় এবং তার পিছনে বৈদিক সভ্যতা গড়ে উঠতে যে সময় লেগেছিল সে সময়ের সমষ্টিকালের সময় উত্তরকুরু বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ সমগ্র হিমালয় অঞ্চল (Trans Himalayan), তিব্বত ইত্যাদি অঞ্চল জুড়ে ছিল। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রামায়ণের সভ্যতার কাল মহাভারতের সভ্যতার কাল অপেক্ষা প্রাচীন অনুমান করা অসংগত নয়। (প্রসংগত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে মহাভারতের সভ্যতা প্রাচীন, কেন না, আর্থ্যাগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিক থেকে ভারত প্রবেশ করে এবং যেখানে যেখানে বসতি স্থাপন করে সেখানে সেখানে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ক্রমশঃ তারা পূর্বদিকে অগ্রসর হয় এবং রামায়ণের সভ্যতা অধোয্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। এই ভাবে তাঁরা প্রমাণ করেন—মহাভারতের সভ্যতা রামায়ণের সভ্যতা থেকে প্রাচীনতর। বলা বাহুল্য, তাঁদের এ মতের অসাহিত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে ঐক্য গণনা অনুযায়ী প্রমাণিত হয় বৈদিক আর্থারের আদিনিবাস প্রাচীন ভারতবর্ষ। বাহির থেকে যে সমস্ত আর্থ্যা এসেছে তারা বৈদিক আর্থ নয়। ভারতীয় আর্থারের সঙ্গে বহির্ভারতীয় আর্থারের যোগাযোগ অনেক পরে হয়। তার প্রমাণ তৎকালীন সাহিত্যে মিলবে। কিন্তু বৈদিক সভ্যতা এত প্রাচীন যে তখন বহির্ভারতে কোন সভ্যতা ছিল বলে মনে হয় না। থাকলেও যোগাযোগ ছিল না, তার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্য। কাজেই বৈদিক আর্থারের আদি নিবাস বহির্ভারতে এ তথ্য জ্ঞেয় করে বলা উচিত নয় বলেই মনে করি।—

শ্রী অনীলকুমার আচার্য্য, ৬৫২, বিজয়গড়, কলিকাতা-৩২।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Sending Rs. 10-50 as subscription for Monthly Basumati—R. P. Saksena, Gomia. Dt. Hazaribagh.

মাঘ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত টাকা পাঠালাম—Sovona Rahut, Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর ১৩৬৬ সালের মাঘ হইতে ১৩৬৭ সালের আষাঢ় পর্যন্ত ৬ মাসের চাঁদা বাবদ ৭১০ টাকা পাঠাইলাম।—বেণু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণা।

Subscription for one year from Agrahayan 1366. Kindly arrange to send the magazines from that month.—Dr. D. N. Chakravorty, Silchar, Assam.

The sum of Rs. 15/- is remitted towards the annual subscription of monthly Basumati from Poush Sankhya—Promode Library, Darjeeling.

আমাদের কার্তিক সংখ্যা হইতে বসুমতী পাঠাইবেন—Durgabati Boys Library, Sahabad.

আমার চাঁদা বাবদ ১৫৭ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইলে বাধিত হইব।—শ্রীমতী প্রভাবতী পাহাড়ী, Midnapur.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক মূল্য ৭১০ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া কার্তিক হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী সেবা দেবী চক্রবর্তী—Deona (U. P.)

আমার বার্ষিক চাঁদা ১৫৭ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিতভাবে পত্রিকা পাঠাইলে বাধিত হইব।—গীতা ভৌমিক, জলপাইগুড়ি।

Herby I am sending Rs 15/- as the yearly subscription of Masik Basumati for the new year—Sm. Debi Banerjee, Jodhpur.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ৭৫০ নং পঃ পাঠাইলাম। দয়া করিয়া মাঘ মাসের পত্রিকা হইতে পাঠাইয়া দিবেন।—Gouri Ghoshal, Jamshedpur.

I am remitting herewith my subscription towards monthly Basumati for the period from Poush to Jyaistha—Leela Ghosh, Jabbalpur.

১৫৭ টাকা পাঠাইলাম। ১৩৬৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে ১৩৬৭ সালের কার্তিক পর্যন্ত নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—শ্রীমতী কমলা মিত্র, বোম্বাই।

Remitting herewith Rs. 7-50 on account of half yearly subscription to Monthly Basumati for Kartik to Chaitra 1366 B. S. in advance—Berhampur Girls Mahakali Pathsala, Dt. Murshidabad.

Sending herewith Rs. 7-50 for Masik Basmati as half-yearly subscription—Sulekha Roy, Bombay.

Sending herewith yearly subscription Rs. 15/-—Shanta Ganguly, Hazaribagh.



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। জাতি-বিভাগ	—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী	১৩৭
২। প্রাচীন-পরিচয়		১৩৮
৩। বনভঙ্গ আন্দোলন	(প্রবন্ধ)	১৩৯
৪। রাইনের মাঝিরা রিডের ছুটি কবিতা	অম্বাবান : কমলেশ চক্রবর্তী	১৪১
৫। স্মৃতি-বৈচিত্র্য	(প্রবন্ধ)	১৪২
৬। তুলসী কেন বনগীয়া ?	(কাহিনী)	১৪৬
৭। শ্রুতির কথা	(প্রবন্ধ)	১৪৮
৮। ঐক্য চরিত্রের একটি দিক	(আলোচনা)	১৪৯
৯। বিদ্যার প্রার্থনা	(কবিতা)	১৫০
১০। পত্রগুচ্ছ	অম্বাবান : ভ্রামাণাল সেনগুপ্ত	১৫১
১১। এলেই হল	(কবিতা)	১৫৫
১২। অখণ্ড অমিয়-শ্রীপোষাক	(জীবনী)	১৫৬
১৩। বন কেটে বসত	(উপন্যাস)	১৬১
১৪। মা মণি বিদ্যার	(কবিতা)	১৬৬
১৫। চার জন	(বাঙালী-পরিচিতি)	১৬৭

নববর্ষে বাছাইকরা বিদেশী গ্রন্থ পরিবেশনের

● আকর্ষণীয় আয়োজন ●

চার খণ্ডে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকজন বিদেশী লেখকের বাগোথানি বিভিন্ন বিষয়ক রচনা-সঙ্কলন সকলকার সাধারণত মূল্যে পরিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। তিনখানি সুখপাঠ্য মনস্তত্ত্বমূলক ও আদর্শগম্য উপন্যাস, তিনজন শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের নির্বাচিত গল্প, তিনজন মনীষীর তিনখানি চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধের বই এবং তিনখানি বিভিন্ন বিষয়ের কিশোরপাঠ্য রচনা। গ্রন্থগুলি কৃতী লেখকদের কঠোর নিপুণতার সহিত অনূদিত ও সম্পাদিত এবং সমালোচকগণ কঠোর উচ্চপ্রশংসিত। ব্যক্তিগত ও সাধারণ পাঠ্যগার এবং ছাত্র-কলেজ-সাইজেরীর পক্ষে অপরিহার্য। বোর্ড বাঁধাই। সুচারু রঙীন প্রচ্ছদ। উপহারের উপযোগী শোভন সঙ্কলন।

উপন্যাস - সঙ্কলন

লেখক	অনুবাদক	মূল্য
জন হাইনস	জোসাফিন ওয়েল	সিকেন সেন
॥ তিনখানি অসাধারণ উপন্যাস একত্রে ॥ এই খণ্ডের মূল্য ২'৫০ মাত্র ॥		

গল্প - সঙ্কলন

নির্বাচিত গল্প ও হেনরি	নির্বাচিত গল্প এডগার অ্যালান পো	নির্বাচিত গল্প ভাথানিয়েল হর্স
॥ মোট একশটি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প একত্রে ॥ এই খণ্ডের মূল্য ২'০০ ॥		

প্রবন্ধ - সঙ্কলন

নির্বাচিত প্রবন্ধ	অনুবাদক	মূল্য
আর ডব্লিউ এমাসন	ডেভিড থোরো	জন কন্টর ডালস
॥ তিনখানি বিপুলারতন মননীয় প্রবন্ধ-গ্রন্থ ॥ এই খণ্ডের মূল্য ২'৫০ মাত্র ॥		

কিশোর - পাঠ্য সঙ্কলন

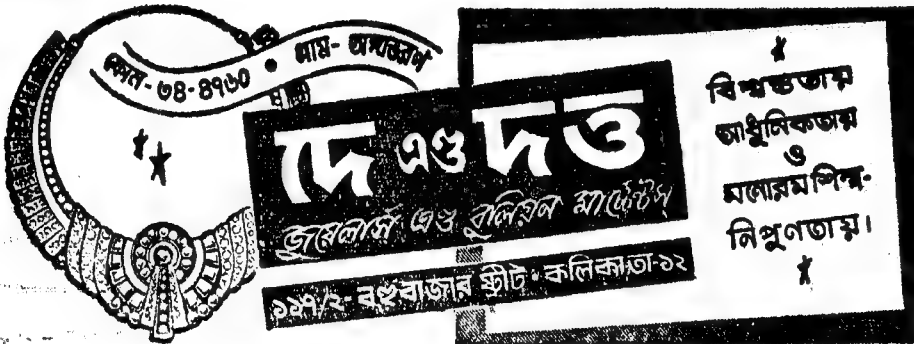
টিম লাইন্স	এব লিঙ্কন	কলঙ্কালের লক্ষ্যবাহী
(কাহিনী)	(জীবনী)	(জনন)
মার্ক টোয়েন	ফার্মিং বর্ষ	আর্থার শেরি
॥ ছোট বড় সবর পক্ষেই সুপাঠ্য সঙ্কলন ॥ এই খণ্ডের মূল্য ২'০০ মাত্র ॥		

নির্দিষ্ট সংখ্যক বই এই বিশেষ ব্যবস্থার পরিবেশন করা সম্ভব হবে। অতএব অবিলম্বে আপনার অর্ডার পাঠান। ডি পি-তে অর্ডার দিলে অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠানো আবশ্যক। পত্র লিখলে বিস্তারিত বিবরণ-সুস্থ পুস্তিকা পাঠানো হয়।

একমাত্র পরিবেশক : পত্রিকা সিণ্ডিকেট। ১২১, লিওনে স্ট্রিট, কলিকাতা-১৬।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১৬। আঙ্গোকাচিহ্ন—		১৬৮(৬)
১৭। ভাসবাসার গান	(কবিতা)	১৭১
১৮। শিশির-সান্ত্বনো	(জীবনী)	১৭২
১৯। চম্পা তার নাম	(উপক্ৰাস)	১৭৮
২০। হার	(কবিতা)	১৮০
২১। বিদেশিনী	(উপক্ৰাস)	১৮৪
২২। প্রত্যয়	(কবিতা)	১৮৭
২৩। হবিবুল্লাহ যেমিন	(উপক্ৰাস)	১৮৮
২৪। ভাস্করের—জীবন ও দর্শন	(জীবনী)	১৯৭
২৫। বাতিঘর	(উপক্ৰাস)	১৯২
২৬। কাল ভূমি আলোয়	(উপক্ৰাস)	১৯৩
২৭। রাতের আঁহে হাজার আঁধি	(অনুবাদ-কবিতা)	১৯২
২৮। আনন্দ-বৃন্দাবন	(সংস্কৃতকাব্য)	১৯৪
২৯। একটি বেদনাদায়ক কাহিনী	(বিদেশী-গল্প)	১৯৮
৩০। ছোঁওয়া	(কবিতা)	১৯৯
৩১। অজল ও প্রোজল—		
(ক) হামিলাবাছু বেগম	(গল্প)	১৯৪
(খ) হেনা-পাওনা	(গল্প)	১৯৬
(গ) অসমাপ্ত	(গল্প)	১৯৭



মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। গুরু বিনা কেহ কোন মনস্তত্ত্বের অধিকারী হয় না। গুরু তাই আমাদের দেশে নবম ও প্রথম।
 সুকোমল ও স্বাধীন গুরুত্ব লক্ষণ, মাহাত্ম্য সাধারণ মানুষের কাছে প্রচলিত। শিক্ষা ও নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞান, নীতি, পুরুষের
 প্রভুত্ব শাস্ত্রীয় অঙ্গুষ্ঠানে গুরুত্ব নির্দেশ অনন্যকারী বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের চির-ঐতিহ্যের সাহিত্য-সেবার এই মহাপ্রবাহের প্রকাশ।

বাঙলা ও বাঙালীর ধর্মপাথের পথ-নির্দেশক।

* ত্রিভুজ রূপশাস্ত্র *

বর্গত উপক্ৰান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বিবিধ তত্ত্ব ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের ও কর্তব্যাকর্তব্যাদি, নীতিপ্রণালী, গুরুপূজা, তত্ত্ব ও পুরুষের প্রভুত্বের সঙ্গ্রহ।

মূল্য মাত্র দেড় টাকা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির : ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

গুণাপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৩২। সমাধি	(কবিতা) বন্দনা ভট্টাচার্য	৮৪০
৩৩। শিশু	(কবিতা) জয়া সরকার	৮৪১
৩৪। অবলার গান	(কবিতা) অন্নপূর্ণা মৈত্র	৮৪২
৩৫। নতুন বীপ	(কবিতা) শ্রীমতী প্রভা দত্ত	৮৪৩
৩৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব	(কবিতা) পুষ্প দেবী	৮৪৪
৩৭। জানালা	(কবিতা) রমা ভট্টাচার্য	৮৪৫
৩৮। বন-সংহাৎসব	(কবিতা) শ্রীমতী সুপ্রীতা মিত্র	৮৪৬
৩৯। আজকের এই সূর্য্য ঝল	(কবিতা) শ্রীজিৎলা বুধোপাধ্যায়	৮৪৭
৪০। প্রের	(কবিতা) মায়ী বুধোপাধ্যায়	৮৪৮
৪১। তৃষ্ণা	(কবিতা) কদম্বা শিলাই	৮৪৯
৪২। বিলম্বিত লয়	(কবিতা) দীপ্তি সেনগুপ্তা	৮৫০
৪৩। বিজ্ঞানবার্তা	(প্রবন্ধ) অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু	৮৫১
৪৪। আধুনিক বঙ্গদেশ	(কবিতা) কৃতী সোম	৮৫২
৪৫। স্বত্বস্বঃ জিজ্ঞাসা		
৪৬। ছোটদের আলস—		
(ক) দিন আগত এই	(উপস্থাপন) বনজয় বৈরাগী	৮৫৩
(খ) কি করে স্পষ্ট ছবি তুলতে হয়	(প্রবন্ধ) রথীন রায়	৮৫৪
(গ) ম্যাগিক ম্যাচ	(বাহুতথ্য) বাতুলকর—এ, সি সরকার	৮৫৫

লাইব্রেরীতে রাখার মত কয়েকটি বই

- বিশ্ব-সাহিত্যের অঙ্কবাচ -

ম্যাকশিম গর্কি :	৪.০০	মিখাইল শলোখফ :	ধীর প্রবাহিনী ডান	১.০০
নিকোলাই অস্ট্রোভস্কি :	৬.৫০		সাগরে মিলান্ন ডান	৬.০০
ইলিরা এরেনবুর্গ :	৪.৫০		(১ম খণ্ড)	৫.৫০
১ম খণ্ড :	৬.০০	আলেকজান্ডার দুপরিন :	রত্নবল্লভ	৩.৫০
২য় খণ্ড :		লিওনিদ শলোভিয়েভ :	বুখারার বীর কাহিনী	৩.৫০

লোক-বিজ্ঞানের বই

ইলিন ও সেগাল :	৩.৫০	টাদে অভিযান	৩.০০
মানুষ কি করে বড় হল	১.৬২	ব. ন. বেরমান :	
ডি. আই. প্রমত্ত :		মানুষ কি করে গুণতে শিখল	১.০০ ও ০.৭৫
এফ. আই. চেতনত :		এ. কাবালভ : মানবদেহের গঠন ও	
জান্ননোক্ষিক্সারের কথা	১.৫০	ক্রিয়াকলাপ	৭.০০

বাংলা-সাহিত্যের কয়েকটি বই

গল্প সংগ্রহ :		কবিতা : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় :	ক'টি কবিতা	
নবী ভৌমিক :	চৈতন্যদাস	ও একলব্য	২.০০	
অক্ষয় চৌধুরী :	সীমানা	উপস্থাপন : অমরেন্দ্র বোষ :	চরকাশেম	৩.৭৫
প্রবন্ধ ও আলোচনা :	প্রহুয়ার মিত্র : ১৮৫৭ ও বাংলা দেশ			২.৭৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চৌধুরী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ । ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

চূড়ীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
(ক) ক্রীতদাস প্রথা	(প্রবন্ধ) শ্রীভাগবতলাস বসু	৮৫৮
(ঙ) বা ও বৃত্ত	(গল্প) হাল ক্রিষ্টিয়ান আণ্ডেরশন— অনুবাদ : হানবেন বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬০
৪৭। বিপ্লবের সন্ধান	(বিপ্লব-কাহিনী) নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬৪
৪৮। আলোকচিত্র—		৮৬৪(ক)
৪৯। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো	(সংগ্রহ)	৮৭০
৫০। বর্ণালী	(উপভাস) সুলেখা দাশগুপ্তা	৮৭২
৫১। লাচ-গাল-বাজলা—		
(ক) শূর ও বস্ত্র	(প্রবন্ধ) শ্রীমীরা মিত্র	৮৭৮
(খ) রেকর্ড পরিচয়		৮৮০
(গ) আমার কথা	(শিল্প পরিচিতি) শ্রীমতী কমলা বসু	৮৮১
৫২। চৈতালি ধূপ	(কবিতা) শ্রীঅবিনাশ সাহা	৮৮১
৫৩। আত্মজাতিক পরিচিতি	(স্বাক্ষরিত) শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োদী	৮৮২
৫৪। অনেক সন্ধ্যার কথা	(কবিতা) রশ্মি বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৮৭
৫৫। খেলাধুলা—		৮৮৮
৫৬। কেনাকাটা—		৮৯০
৫৭। পাগলা হত্যার মামলা	(বহুস্তোপকাস) ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল	৮৯২
৫৮। একটি সন্ধ্যা হাসি	সত্যোজ চক্রবর্তী	৮৯৫
৫৯। শরৎচন্দ্রের এক সন্ধ্যার স্মৃতি	অজিতকুমার সেন	৮৯৬
৬০। সাহিত্য পরিচয়—		৮৯৮
৬১। রঙ্গপট—		
(ক) স্মৃতির টুকরা	(আত্মস্মৃতি) সাধনা বসু—অনুবাদ : কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায়	৯০২
(খ) বিশ্বরঙ্গ		৯০৪
(গ) ছুই বেচারি		৯০৫
(ঘ) রঙ্গপট প্রসঙ্গে		৯০৬
৬২। নাজিম হিকমে	(অনুবাদ-কবিতা) মেলিয়ারাকোড—অনুবাদ : কমলেশ চক্রবর্তী	৯০৭
৬৩। দেশ-বিশ্বদেশ	(ঘটনাপঞ্জী)	৯০৮

বহুকাল পরে পুনরায় প্রকাশিত হইল

—রোমাঞ্চ-রহস্য-গ্রন্থ—

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্ত নদীর ধারা মাসিক বহুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক সমাদর লাভ করে। রোমাঞ্চ ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনার বইটির আভ্যুপাধ পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, জীবন-পথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবন্ধনা, ছন্দনা ও প্রেমের লীলার চাক্ষু্যকর এই চাক্ষু্য কুলেহে সকল সমাজেই। সোমহর্ষ সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

বহুমতী সাহিত্য মন্দির : ১৬৬ নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

আর একখানি উপহার গ্রন্থ

চতুর্পতি শিবাজী

১৮শতাব্দীর শাস্ত্রী প্রবীণ

যে বীরবর দ্বন্দ্বের উচ্চ শোণিত প্রদান করিয়া জননী অমৃত্যুর পূজা করিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণবরণে, অনুদিন শরীর চতুর্পতি মহাবীর শিবাজীর উদার-চরিত্র অমৃত্যুভিত্তক ও ভারতীয় বীর চরিত্র পার্শ্ব অমৃত্যু মহাত্ম্যাদিগের করকমলে প্রচার সহিত অর্পণ করেন অর্জুনশতাব্দী পূর্বে বিদ্যার সত্যচরণ। ডকল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা ৩৫ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ, কার্ডবোর্ড বাঁধাই। মূল্য ছুই টাকা।

সূচীপত্র

সামগ্রিক প্রসঙ্গ—

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
(ক) আমদানী নীতি		১০৮
(খ) ভারতীয় বিমানবাহিনী		ঐ
(গ) শিল্পের প্রসার		ঐ
(ঘ) ইহার কাহালা		ঐ
(ঙ) বিক্রয়কর		১১০
(চ) টেলিফোন চার্জ		ঐ
(ছ) রাজ্যের ব্যবস্থা		ঐ
(জ) চিনির হাটাকার		ঐ
(ঝ) স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মতৎপরতা		১১১
(ঞ) আমের হুজিৎ		ঐ
(ট) আর কত দিন আছে বাকী ?		ঐ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
(১) ডাকঘরের ডাকটিকেট নাই		১১২
(২) ইঞ্জনের অভ্যাস		ঐ
(৩) অনাহারীর পারণ		ঐ
(৪) চিনি রহস্য		ঐ
(৫) চাউলের বাজার		ঐ
(৬) খাদ্য খাননা		ঐ
(৭) পরীক্ষা বিভাগ		১১৪
(৮) নৈতিক মাপ		ঐ
(৯) শিক্ষা ও শিক্ষক		ঐ
(১০) বইয়ের ব্যবসা		ঐ
(১১) শোক-সংবাদ		ঐ



লক্ষ্মী এডেন্সী

৪৩/৯. ফ্র্যাঙ্ক রোড • কলিকাতা-৭

আমেরিকার বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ

প্রতি সপ্তাহ ২২ অংক ৩ ও ২৫ অংক ৩, পাইকারপকে উক্ত কমিশন দেওয়া হয়। আমেরিকার সিকিট চিকিৎসা সনাক্ত পুস্তকাদি ও বাবতীয় সরঞ্জাম দ্রুত মূল্যে পাইকারী ও খুদা বিক্রয় হয়। বাবতীয় পিড়া, দারবিক পৌরসা, অকুশ, অমিরা, অর, অকীর্ণ প্রভৃতি বাবতীয় ঔষধি রোগের চিকিৎসা বিতরণকার সহিত করা হয়। অকুশল রোগীদিগকে ডাকঘরে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক ও পরিচালক—
ডাঃ কে, সি, বে এল-এম-এম, এইচ-এম-বি (পোড মেডেলিট),
ইন্টার্ন হাউস কিজিনিয়াস আবেল হাসপাতাল ও কলিকাতা
হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এও হাসপাতালের চিকিৎসক।
অনুবৃত্ত করিয়া অর্ডারের সহিত কিছু অগ্রিম পাঠাইবেন।

হোমিওপ্যাথিক হোমিও হাউস ১০৫, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭(৭)

বস্ত্রশিল্পে

মোহিনী
মিলের

অবদান অতুলনীয় !

মূল্যে, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন

১ নং মিল—

২ নং মিল—

কুষ্টিয়া, নদীয়া : বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা

ম্যানেজিং এজেন্টস্—

চক্রবর্তী, সঙ্গ এণ্ড কোং

রেজিঃ অফিস—

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা



ইঞ্জিয়ান মিল গার্মেন্টস

কালজা ফ্লো মার্কেট • কলিকাতা

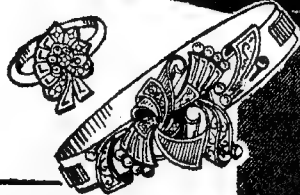


মি গৌরবময় প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকারী ভারত...



...স্বর্ণশিল্পে আমরা তরুণ দলী রাখি
এইচ.বি. প্রবকার
এন্ড কোং

স্বর্ণ-শিল্পী ও প্রবকার
১২৫এ, বহুবাড়ার ফ্লো • কলি-১২



১৬২, বহুবাড়ার ফ্লো • কলিকাতা-১২

গ্রাম- এইচবিএস • ফোন ৩৩-৪৮৪৮





ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ
 ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର
 (ବିହାରୀୟାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ)

(ସେପାରି)

ସେପାରି

ହଜୁରୀ ରାଜପୁତ ଡିଜି
 —ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ

সরগীয় ৭ই * অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি
আমাদের বই শেষে ও দ্বিবে সমান ভাণ্ড

৭ই চৈত্রের বই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সসেনিরা (ব্যোমকেশের কাহিনী) ৩.০০
শান্তিদেব বোষের গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য (সচিত্র) ৩.০০



সম্প্রতি প্রকাশিত (কার্তিক হইতে কাল্জন)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপস্থাস	রিক্শার গান	৫.০০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপস্থাস	মাঝির ছেলে	২.৫০
দীপক চৌধুরীর নূতন উপস্থাস	নীলে সোনায় বসতি	৩.৫০
'বনফুল'-এর নূতন উপস্থাস	ওরা সব পারে	২.৫০
প্রবোধকুমার সান্ত্বালের নূতন উপস্থাস	ইম্পাতের ফলা	৩.৫০
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নূতন উপস্থাস	জলপ্রপাত	২.৭৫
সত্যপ্রিয় ঘোষের নূতন উপস্থাস	গান্ধর্ব	৩.৫০
শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের	লাবণ্যের এনাটমি	৩.০০
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের	ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রমুন্দর	৫.৫০
হিমালীশ পোদ্দামীর	লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়	৩.০০
ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের	উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল	৩.০০
'জীবেলোয়াড়'-এর	জিকিটের রাজকুমার	২.৫০
ধনঞ্জয় বৈরাগীর নূতন নাটক	রজনীগন্ধা	২.২৫

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোট টি দে র বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাকুতির পুঁথি ৩.০০ : টাইবুড়োর পুঁথি ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প ৩.০০ : অধিতীর
ঘনাদা ২.৭৫ ॥ বিমল মিত্রের টক-কাল-মিষ্টি ২.০০ ॥ রবীন্দ্রনাথ মিত্রের মাল্লাবাঁশী ১.৫০ ॥ বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের তালনবমী ২.৫০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের হেসে যাও ২.০০ ॥ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
রূপকথার কাঁপি ২.২৫ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ ২.০০ ॥ প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
কাদম্বরীর কথা ২.২৫ ॥ লীলা গঙ্গুন্যায়ের হলদে পাখীর পালাক ২.০০ : গুপির গুপ্ত-খাতা ২.০০ ॥ 'বনফুল'-এর
করবী ১.৭৫ ॥ বুদ্ধদেব বসুর রাজা থেকে কান্না ১.২৫ ॥ স্বপনবুড়োর মজার গল্প ১.৫০ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর বর্মার
মাঝা ২.২৫ ॥ গিরীন্দ্রশেখর বসুর লাল কালো ৩.০০ ॥ প্রশান্ত চৌধুরী ও জয়ন্ত চৌধুরীর ছুট ('জন্মতিথি' কথাচিত্রের
গ্রন্থরূপ) ২.২৫ ॥ হাসির গল্পের সংকলন—শুধু হাসির গল্প ৫.০০ ॥ পদ্মপতি ভট্টাচার্যের সুদূর দেশের
রূপকথা ২.০০ ॥ সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথা ৩.২৫ ॥ জয়ন্ত চৌধুরীর হাওয়া
বদল ৩.০০ ॥ অ-ক-ব-র খামখেয়ালী ছড়া ১.৫০ ॥ অনাথনাথ বসুর ছোটদের ককাবতী ১.০০ ॥

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম : কালচার

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৬৪১



ধন-ঐশ্বর্য

যাশা চাওয়া যায়
তাশা পাওয়া যায়না

কিন্তু

আপনি ইচ্ছাবশত একটি সর্বজন সম্পন্ন কেশভৈল
অন্বেষণে পাইতে পারেন। আয়ুর্বেদচার্য্যস্বয়ং
কর্তৃক উক্ত প্রস্তুত 'হিমকল্যাণ'ই আপনায়
কেশভৈল নির্বাচন-সমতা সমাধায়ে সক্ষম।

ইহার কল্যাণ পরনে যাবতীয় কেশরোগ
নিবারণ ও যত্ন লীভল হয়। বীৰ্যবিত্ত
নিরবিত্ত ব্যবহারেই আশাহত
কম পাওয়া যায়।

কেশের বিশেষ গুণে দ্বারা শাশ্বত

হিমকল্যাণ

আয়ুর্বেদীয় হিমস্রিত সুরভিত কেশভৈল।

ঐশ্বর্য্য সমাধি

● পামিকোকো
সুগন্ধিত নারিকেল তৈল

● হিমকল্যাণ
ক্যাশটর অয়েল
সুগন্ধিত কেশভৈল

● ভূঙ্গামলা মহোপকারী কেশভৈল

● যোজনগন্ধা সুরভি নিখাস



হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা



৩৮ বর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৬৬

। স্থাপিত ১৩২৯ ।

। দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

জাতি-বিভাগ

আমি সব জাতিকে একাকার করিতে বলি না। জাতিবিভাগ খুব ভাল। এই জাতি-বিভাগ-প্রণালীই আমরা অনুসরণ করিতে চাই। জাতি-বিভাগ যথার্থ কি, তাহা লম্কে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই, যেখানে জাতি নাই। ভারতে আমরা জাতি-বিভাগের মধ্য দিয়া উহার অতীত অবস্থায় গিয়া থাকি। জাতি-বিভাগ ঐ মূল সূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতের এই জাতিবিভাগ-প্রণালীর উদ্দেশ্য হইতেছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ, তবে দেখিবে এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হইয়াছেও। আরও অনেক হইবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হইবে।—কাহাকেও নামাইতে হইবে না—সকলকে উঠাইতে হইবে।—ইউরোপ ও আমেরিকার জাতি-বিভাগের চেয়ে ভারতের জাতি-বিভাগ অনেক ভাল।—ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল হবে দেখিয়াছে? ইহা সর্বদাই গতিশীল।

আধুনিক জাতিভেদ ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক; উহাতে সঙ্গীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডী কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

প্রাচীন জাতিবিভাগে অতি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা ছিল—বর্তমান জাতিভেদের মধ্যে যেটুকু ভাল দেখিতে পাইতেছেন, তাহা সেই প্রাচীন জাতিবিভাগ হইতেই আসিয়াছে। বুদ্ধ জাতি-বিভাগকে উহার প্রাচীন মৌলিক আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারত বার বার যখনই জাগিয়াছে, তখনই জাতিভেদ ভাঙ্গিবার প্রবল চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এই কার্য চিরকাল আশা দিগকেই করিতে হইবে—আমাদিগকেই প্রাচীন ভারতের পরিণতি ও ক্রমবিকাশ-কল্পে নতুন ভারত গঠন করিতে হইবে। যে কোন বৈদেশিক ভাব ঐ কার্যে সাহায্য করে তাহা যেখানেই পাওয়া যাউক না কেন, লইয়া আপনার করিয়া লইতে হইবে। অপরে কখন আমাদের হইয়া ঐ কাৰ্য্য

করিতে পারিবে না। সকল উন্নতিই ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের ভিতর হইতে হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের প্রাচীন শ্রুতিকারেও জাতিভেদ-লোপকারী ছিলেন, তবে আধুনিকদিগের স্থায় নহে। তাঁহারা জাতিভেদরহিত্য অর্থে এই বুঝিতেন না যে, শহরের সব লোক মিলিয়া একত্র মত্ত-মাংস খাউক; অথবা যত আহাশ্রয় ও পাগল মিলিয়া যখন যেখানে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক, আর দেশটাকে একটা পাগলাগারদে পরিণত করুক, অথবা তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন না যে, বিধবাগণের পতির সংখ্যাসূচক কোন জাতির উন্নতির পরিমাণ করিতে হইবে। একরূপ করিয়াই অভ্যুদয়শালী হইয়াছে, এমন জাতি ত আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই।

জাতিভেদ বৈদান্তিক ধর্মের বিরোধী। জাতিভেদ একটি সামাজিক প্রথা, আর আমাদের বড় বড় আচার্য্যেরা উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সম্প্রদায়ই জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু যতই এইরূপ প্রচার করিয়াছেন, ততই জাতিভেদের নিগড় আরো দৃঢ়তর হইয়াছে। জাতিভেদ রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। উহা বংশপরম্পরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (Trade guild)। কোনরূপ উপদেশ অপেক্ষা ইউরোপের সহিত বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জাতিভেদ বেশী ভাঙ্গিয়াছে।

বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পুরোহিতগণ যাহাই বলুন, জাতি একটি সামাজিক বিধানমাত্র, এক্ষণে ফটিকের মত এক নির্দিষ্ট বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগণনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি

লোকের নিজের সামাজিক স্বত্ববুদ্ধি জাগরিত করা যায়।

উপনিষদের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের সকল বড় বড় আচার্য্যেরাই জাতিভেদের বেড়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন; অবশ্য মূল জাতিবিভাগকে নহে। তাঁহারা উহার বিকৃত ও অবনত ভাবটাকেই ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন

উচ্চবর্ণকে নিম্ন করিয়া, আহাশ্রয়-বিহীন যথেষ্ট-চারিতা অবলম্বন করিয়া, ক্রিষ্ণ ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ-সমস্তার মীমাংসা হইবে না; পরন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্মের নির্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়—তবেই এই জাতিভেদ-সমস্তার মীমাংসা হইবে।

জাতিভেদ-সমস্তার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে—সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্তার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণের সকল জাতিই ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইবেন। সুতরাং ভারতের জাতিভেদ-সমস্তার মীমাংসা একরূপ দাঁড়াইতেছে—উচ্চবর্ণগুলিকে হীনভর করিতে হইবে না—ব্রাহ্মণজাতির লোপসাধন করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মহামুখের চরম আদর্শ।...এই ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও সিদ্ধপুরুষের প্রয়োজন—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের লোপ হইলে চলিবে না...উচ্চতর বর্ণকে নীচু করিয়া এ সমস্তার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে। ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্যপ্রণালী। একাদিকে ব্রাহ্মণ, অপরদিকে চণ্ডাল, আর চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণহে উন্নয়ন।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

...এ সমস্ত প্রচেষ্টা...

এই সংখ্যার প্রেক্ষে যবদীপের একটি প্রস্তাবমূলক উদ্যোগ
কপতাল চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্র
গুলিবিস্তারী চক্ৰবর্তী গৃহীত।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি এসে বৃহত্তে পাবলেন যে, বাঙালীর স্বজাতিপ্রিয়তা, স্বদেশোদ্ধারগুরুত্বই বেড়ে চলেছে। 'কাজেই বাঙলা দেশকে যদি দুর্বল করে রাখা না যায়, তবে বাঙালীর রাজনৈতিক পূর্ণগণে যে এক টুকরো কালো মেঘ দেখা দিয়েছে, তা অল্প ভবিষ্যতে সারা ভারতের আকাশ ছেঁয়ে ফেলবে এবং ভারত শোষণের লালসা ত্যাগ করে ইংরেজদের দেশে ফিরে যেতে হবে, তাই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালাকে দুইভাগে ভাগ করবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আত্ম হইল দেশবরেণ্য সুরেন্দ্রনাথ ও মনোহী বিনিনন্দ পালের নেতৃত্বে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালার রাজনীতিকদের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন সকল শ্রেণীর মধ্যে যে একা সৃষ্টি হয়েছিল, তেমন আর কোনদিন হয়নি। বঙ্গ ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলনের টেট সহর হতে নীচে ধরে বাঙ্গালার প্রতিটি পল্লীতে বিস্তার লাভ করে "Divide and rule" নীতির ধ্বংসাত্মকী সাত সমুদ্র তেবো নদীর পার ধেকে আগত অব্যক্তি ইংরেজ ১৯০৫ সালে এই প্রদেশকে দ্বিভাগিত করে। বর্তমান ও'লেসিডেনী বিভাগ নিয়ে হল পশ্চিম বাঙ্গালা এবং ঢাকা, বাঙ্গাসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ নিয়ে হল পূর্ব বাঙ্গালা।

শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অগ্রগামী বাঙালী জাতি এই কৃত্রিম বিভাগকে মানতে রাজী হল না। এই অন্ধারের প্রতিবাদে শুরু হল দেশবাণী বিদেপী বঙ্কন, বিদেশ হতে প্রেরিত অসংখ্য প্রয়োজনীয় জিনিস বর্জন করে বাঙ্গালীরা চেষ্টা করে স্বাবলম্বী হতে এবং বিদেশী বসিকের শোষণ বন্ধ করতে।

ইংরেজরা বাঙ্গালীদের আন্দোলন চমন করার জন্য আবজ্ঞ করে নির্দম উৎপীড়ন এবং বর্ধরাজ্যতির ভ্রায় অত্যাচার। অত্যাচার বতই বাড়তে থাকে, আন্দোলনের জোরও সভাবে বাড়তে থাকে, বাঙ্গালার তরুণ মুক্তি-যুতেরা গোপনে সম্ভব হতে থাকে অত্যাচারী বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে।

তদানীন্তন কবি ও লেখকগণ বৃটিশ জাতির অবিচারের বিরুদ্ধে কলর ধারণ করেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, এই পূর্ব-পশ্চিম, স্থাপিণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অংশের ভ্রায়, একই পুণ্ডান বন্ধ প্রাত সমস্ত বঙ্গদেশের শিয়ার উপশিয়ার প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে, জননীর বাম ও দক্ষিণ স্তনের ভ্রায় চিরদিন বাঙ্গালীর সম্মানকে পালন করিয়াছে।

• জাতির উদ্দেশ্যে অতুল্য বঙ্গ লিখলেন :—

গুণা জোর করে নেয় নিক না,

বঙ্গ বলিদান।

আমরা বব অস্বস্ত, এক অঙ্গ

মনের সঙ্গে মিলিয়ে প্রাণ

আমরা জাত বাঙ্গালী, প্রেম বাঙ্গালী,

ভাবছিস তোর মন ভাঙ্গালী,

তা নয়, আলিয়ে আশুন করলি দ্বিগুণ,

বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ গাইলেন :—

বঙ্গ আমার, জননী আমার

পাত্রী আমার, আমার দেশ।

কেন গো মা তোর শুক বদন,

কেন গো মা তোর রক্ত বেশ।

কেন গো মা তোর ধূলার আসন,

কেন গো মা তোর মলিন বেশ।

সপ্ত কোটি সম্মান বার ডাকে উচ্চ আমার দেশ।

কিসের হুং-। কিসের দৈন্ত, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,

সপ্তকোটি মিলিত কর্তে ডাকে যখন "আমার দেশ"।

একদা বাহার বিজয় সেনানী, ভেলায় করিল লজ্জা জয়,

একদা বাহার অর্ধবশোক্ত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,

সম্মান বার কিকর, চীন, জাপানে গঠিল উপনিবেশ,

তার কিনা এই ধূলার আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ ?

যদিও মা তোর দিবা আলোক,

যেবে আছে আঁজি জাঁঘার ঘোর,

কেটে বারে মেঘ, নবীন গরিমা,

ভাতিবে আবার ললাটে তোর,

আমরা ঘূচাব মা তোর কালিমা,

মাত্রয় আমরা, নহি তো যেব।

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

লেখকের উদ্দেশ্য প্রবন্ধে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনলবধী

বক্তৃতায়, কয়েকখানি জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় প্রচারের ফলে বিপ্লবের আগুন অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে বাঙ্গালার সর্বত্র।

বাঙ্গালার অন্ধচ্ছের দিনটিকে বাঙ্গালীরা শোকের দিন বলে গ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গের মিলনেব চিরুধরুণ রবীন্দ্রনাথ "বাখী" বন্ধনের প্রস্তাব করেন এবং রামেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন অরুনের, শোকের চিরুধরুণ বাঙ্গালীরা বাঙ্গালার অন্ধচ্ছের দিনে অঙ্গুল প্রহণ করত না, থাকত সকল খালি পারে, বন্ধ থাকত শোকনিশাট, হাটবাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য গাড়ীঘোড়া সব। সকাল হতে সকলে "বন্ধ মাতংমু" গাইতে গাইতে বাজায় ঘরে, রবীন্দ্রনাথের বাখী বন্ধনের গানটি স্মরণিত কর্তে গেয়ে একে অস্ত্রের হাতে বাখী বেঁধে দিত—

বাঙলার মাটি বাঙলার জল

বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল

পুণ্য চউক

পুণ্য হউক

পুণ্য চউক

চে ভগবান।

১৪ জাভান হিন্দু বাহিনীর আসাম সীমানার সক্রিয়, বৃষ্টিপঞ্জাতির
 মনে ভয়ের সঞ্চার করে এবং তাই বৃষ্টিতে পায়ে যে অসুস্থ ভবিষ্যতে
 তাদের ভারত ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু যদি ভারতবাসী হিন্দু
 মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করা না যায়, তবে ভবিষ্যতে
 কোন দিন তাদের ভারতে আসার সুযোগ হবে না, তাই ইংরেজরা
 বাঙ্গালা ভাগ করার পূর্বের অর্থাৎ ১৯০০ সালের প্রথমভাগে চিন্-
 মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার চক্র যে অভিনয় করেছিল,
 যে অভিনয় আবার আরম্ভ করে, তাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে
 হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে আবার বিচ্ছেদের অনল জ্বলে ওঠে এবং
 উল্লেখ্য সর্বাধিক সহ্যের মুষ্টি ধারণ করে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট
 তারিখে, সুযোগ বুঝে ইংরেজরা ভারতকে শণ্ডিত করে এবং
 ভারতের মধ্যবর্তী বাঙ্গালা প্রদেশকেও দুই ভাগে বিভক্ত করে।
 এক ভাগ ভারতের সঙ্গে এবং অপর ভাগ (পূর্ববঙ্গ)
 নবগঠিত পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, ভারত বিভাগের
 ফলে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হল বাঙ্গালী জাতীয় এবং বাঙ্গালী
 প্রদেশের।

পূর্ব বাঙ্গালা ভারতের বুকের ভিতর এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মত কোন মুসলমান রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাই ভারতের নিরাপত্তার জন্য, বাঙ্গালী জাতির মঙ্গলের জন্য, ভারতের অধীনে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

তাই বর্তমান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যুগের নেতা সুব্রহ্মনাথ, মহীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত দেশশ্রেমিক মহাপুরুষের প্রয়োজন, বাঁহারা বর্তমান অজ্ঞার বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করবেন, বাঁহারা হিন্দু মুসলমানদের বন্ধিয়ে দিবেন যে ধর্মমত বিভিন্ন হলেও বাঙালী হিন্দু মুসলমান একজাত, বাঙালার বাহিরে তাদের পরিচয় দিতে হয়

বাঙালী বলে, ব্রিটিশের চক্রান্তে এক কয়েকজন ধনীকে দেশের উন্নয়নিত
দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে বাঙালার শতক হা ১১ জন লোক তাদের
সর্বনাশ ডেকে এনেছে। দেশ বিভাগের পর বাঙালীদের সামাজিক
জীবনে বেগম জাহাভাব, বস্তাভাব, দারিদ্র্য দেখা দিয়েছে, দেশ বিভাগের
পূর্বে সেরূপ ছিল না। দেশ বিভাগের পরিশিষ্ট ব্রহ্মণ একই দেশে
দুই সরকার গঠিত হওয়ার শাসনতান্ত্রিক ব্যয় বেড়েছে শিক্ষণ, তার
উপর কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে বাঙালার সমস্যার সমাধানকল্পে,
দুই দেশের দুই সীমানার বিরাট সীমান্ত বাহিনী রাখার জঙ্ক এবং
সৈরুপ আরও অন্তর্ভুক্ত কারণে, সে বিরাট ব্যয় প্রয়োজন হবে না। দুই
বঙ্গ পুনরায় মিলিত হয়ে এক প্রদেশ গঠিত হ'ল এক যে অর্থ দুই
বঙ্গ মিলনের ফলে রক্ষা পাবে, তা জাতীয় কল্যাণের জঙ্ক
ব্যক্তি হলে বাঙালীজাতির নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য দূর হবে, বাঙালী-
প্রদেশ শিক্ষা-দীক্ষার উন্নত হবে, বাঙালার হিন্দু-মুসলমানদের
সামাজিক জীবনে পুঙ্খ-শান্তি ফিরে আসবে, বাঙালারদের অভিশপ্ত-
জীবনের অবসান ঘটবে এক হুভিক-পীড়িত বাঙালী আবার সোনার
বাংলায় পরিণত হবে।

উপসাহায়ে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানদের নিকট একান্ত অমুযোগ্য যে তাঁরা একবার চিন্তা করে দেখুন, বঙ্গ-বিভাগের ফলে তাদের কত বকম দুর্গতির সন্মুখীন হতে হয়েছে, তাদের সামাজিক জীবনে কত বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এই সমস্ত বিবেচনা করে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে যে ভাবে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানরা মিলিত হয়ে দুই বঙ্গ মিলনের জন্ত চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত চেষ্টার সফল ফলগ্রহীতেন, সে ভাবে সকল সমস্যার সমাধানের জন্ত আবার বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানদের দুই বঙ্গ মিলনের জন্ত চেষ্টা কর প্রয়োজন কিনা ?

রাইনের মারিয়া। রিল্কে'র দুটি কাব্য

আগমন

গোলাপের অস্তরে, প্রিয়তম, তোমার শয্যা বেছানো। তুমি, যদিও,

আমি (বেচারি সান্তার সুগন্ধের বিপক্ষ শ্রোতে)

মনে হুসু হারিয়ে গেছি। এখন, জীবনের নির্দিষ্ট পথে

হারা (বহিঃস্থিত পরিমাপের অন্তীত) তিন দ্বাৰ তিন মাসের জীবন্ত,

আমিও তলাই ভেতবে, প্রকৃত সস্তা হবো। এক মুহুর্তে,

চল্লি সত্ৰৰ বংশৰ পূৰ্বে সে নতুন স্থানে আমৰা উভয়ে

কী উপস্থিত, যেমন দ্রুত মিলন ঘটেছে,

সহসা : অখোদ্যুতি তোমার সঙ্গে,

আমি অন্য নেবো তোমার উক্ক দৃষ্টিতে ।

আকিলেজা গির্জায় পিয়েত।

.....এবং আমি দীর্ঘ হয়েছিলে.

কেবল, অতিদীৰ্ঘ বেদনাৰ মতো,

সীমা চাভিয়ে মিনার উচ্চ

আমার প্রথম কথ্যভাব। এক প্রবল তুমি শাসিত

ভাড়াভাঙি আমার গর্ভে, আল আমি অক্ষয়

তোমার জন্য দিতে ।

অনুবাদক—কমলেশ চক্রবর্তী

সৃষ্টি-বৈচিত্র্য

ঐনায়গ ডক

অপ্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপ অবধারণে সহায় অনুমান, কিন্তু
তাঁহার জ্ঞান প্রয়োজন তরুণ লক্ষণাবিত অপূর একটি বস্তুর
প্রত্যক্ষজ্ঞান, যদ্বারা উত্তর কল্পনা করা যাউতে পারে; নতুবা
উহা অবিজ্ঞাতই থাকিয়া থাকিবে। সৃষ্টির পূর্বাবস্থাও তরুণ অব্যক্ত
এবং অবিজ্ঞের যেহেতু উত্তর লক্ষণ প্রতিপাদনের যোগ্য কিছুই
নাই। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

“আদিদিনং তমোভূতমপ্রত্যক্ষলক্ষণম।

অপ্রত্যক্ষমবিজ্ঞেয়ং প্রাপ্তশ্রমিব সর্বতঃ।” ১১৫

বস্তুতঃ “তমোভূত” বা “শূন্যময়” বলিলে যে অবস্থা অভিযুক্ত
হয় না; কেন না, উল্লেখও বদ্যকার বা আকাশের অন্তিম সূচিত
হয়; কিন্তু তদবস্থায় উত্তর ছিল না; কিছুই ছিল না,—সে ভাব
অব্যক্ত।

“ততঃ স্বয়মুভূতগবানবাস্তো বায়ুয়গ্নিম্।

মহাভূতাদিগবতোঃ প্রাণুয়গ্নৌ তমোহুয়ঃ।” ১১৬

ইহাট সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথা। উপনিষদে কথিত হইয়াছে—
“এক, বহু হইতে ঈশ্বা কালেন, তাহাতেই এই বিশ্বসংসার
অকস্মাৎ প্রকটিত হইল।” অব্যক্ত হঠাৎ ব্যক্ত হইলেন কেন,
অথবা ইচ্ছামাত্র এই বিঘটিত, বৈচিত্র্যময় বিশ্বচরাচর প্রকটিত
হইল কিপ্রকৃ—বিজ্ঞানের যুগে এরূপ প্রশ্ন অব্যক্ত উঠিবে, কিন্তু ইহার
সম্ভাবজনক উত্তর মনে নাই। বেদে-পুরাণে নাই; পুঙ্খানুপুঙ্খ
বিজ্ঞানই কি এ বিষয়ে নিঃসংশয়িত সত্য প্রতিপাদনে সমর্থ?
সুতরাং সে বস্তু-উদ্ঘাটনের চেষ্টা বুধা—ইহা অবিজ্ঞের এবং
অপ্রত্যক্ষ।

যাহা হউক, সেই ঈশ্বাদি সৃষ্টি পর্বটা ধরিলেই হউক, সৃষ্টির
ধারাবাহিকতা রক্ষার মূলতঃ মনুকথিত রীতিটি বিধান :—

“ধিবা কৃষাঙ্কনো দেহমর্দনং পুরুষোহভবৎ।

অর্জুন নারী তত্ৰাস্য স বিবাজমস্বয়ং প্রভুঃ।” ১১৭

অর্থাৎ প্রভা প্রথমেই স্বয়ং পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে ধিবা বিভক্ত
হইয়া মৈথুনিক বা sexual পদ্ধতিতে ইহার বে সূচনা করিলেন,
অতঃপাি স্বজন-বাপায়ে সেই নিয়মই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।
এই প্রক্রিয়ার এক অংশে বীজ, অপূর অংশে কেন্দ্র, আর মধ্যে
নিয়োজিত এক ছনিবার শক্তি তত্ত্বয়ের সংযোগ-সাধনে। তাহা
হইতেই নব নব প্রভব এবং বংশপরম্পরায় সৃষ্টিপ্রবাহের অগ্রগতি।
জীবজগতে কি অমাহুজ, কি অণুজ উভয়বিধ প্রাণীই যে মিলনোভূত
অর্থাৎ গুরু-শোণিতসৃষ্টি ইহা তো প্রত্যক্ষদৃষ্ট, কিন্তু জড়জগতে
ওরবাণিও যে এই নিয়মাবলী উল্লাই সমধিক বিস্ময়কর। যে
পরমাভূত কৌশলে বিশ্বনিয়ন্ত্রা সৃষ্টিরকার সূত্ৰসাধ্য কার্যকে
সূক্ষ্ম ও সাবলীল করিযাছেন, তাঁহার তত্ত্বনিয়ন্ত্রণে মানব-বুদ্ধি
একেই অসমর্থ, তত্ত্বপরি আবৃত প্রত্যক্ষসম্পর্কে তথা বলিবার
অধিকারও এরূপ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ডাক্তারী গ্রন্থের sexology
বাত্ত) “একান্তই সীমাবদ্ধ।” সুতরাং অনেক স্থলে বিশদ বর্ণনার
অভাব ঘটিবে; সুবি পাঠকবর্গ তজ্জন কমা করাবেন।

মানবী জন্ম ঈশ্বাট মৌল ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলিতে রাজি

ছিলেন না? যেহেতু, সর্বশক্তিমানের আর কৌশলের প্রয়োজন
হয় না; কিন্তু বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সর্বজন কৌশলজ্ঞান বিহীন।
বস্তুতঃ তাঁহার কণা অসীকার করিবার উপায় নাই। নিত্যদৃষ্ট
ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধিতে আমরা অভ্যস্ত নহি, নতুবা একটি
ক্ষুদ্রতম কীটেরও জন্ম যে কত বৈচিত্র্য পূর্ণ, তাহা বুঝিবার চেষ্টা
করিতাম। পাশ্চাত্যের স্বাভাব্য বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের আন্ত-
কিমৌর, স্বাভাচ্য বিরাট Laboratory সমূহে বহু প্রয়াসে বাহা সম্ভাবিত
করিতে পারেন নাই, জীবোৎপাদনরূপ সেই সূক্ষ্মকর কার্য যিনি হস্তি-
অখাদি বৃহৎ প্রাণী দ্বারা থাক, চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র জীবাত্ম-
তত্ত্বাধিক ক্ষুদ্র রসায়নগারে অবলীলাক্রমে সম্পাদিত করিতেছেন,
তাঁহার মত কৌশলী কে আছে? কি বিচিত্র বিধানে এই রসায়নগারে
রস-বস্তুাদি বাতু নিচয় শাক প্রাণু হইয়া অংশেবে নব জীবোৎপত্তিই
কারণ ভূত হইতেছে, আবার কিরূপে উগা হুই বিপত্তীত ধর্ম পদার্থ
পরিণত হইয়া পুরুষে শুক্র ও নারীতে আন্তকরণে উপচিহ্ন হইতেছে,
তাহা চিন্তা করিলে সত্যই প্রতীত হয় যে, বিশ্ব-নিয়ন্ত্রা শক্তি সহ্যে
নয় পরন্তু কৌশলেই তাঁহোদ্ধার করিতেছেন। নতুবা প্রজ্ঞান-
ক্রিয়াকে তিনি অনন্ত নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের মিলনাবলী না
করিয়া স্বতঃসিদ্ধই করিতেন। কিন্তু কাছ্য কারণ নিয়ম নিয়ম
জ্ঞানসম্পন্ন মানবের চিন্তাশক্তি ও চিত্তের বুদ্ধিক্রম স্তব্ধ করিয়া দিবার
মত স অসাধারণও তাঁহার কাছ্য যদি না থাকিত, তবে এই সৃষ্টি-
বৈচিত্র্য প্রসঙ্গের অবতারণাও অর্থহীন হইত। তথাপি সেই
অসাধারণটাই কেন সৃষ্টির বুধ্য অর্থাৎ মূলনীতি হইল না, তৎসম্বন্ধে
বলা যাউতে পারে যে, তাহা হইলে সংসার নাট্যালীলা একবারে
রসলেশশূন্য হইয়া দাঁড়াইত, স্বজনানুজ জীবের চরম কাম্য, উত্তাতে
তাহাঙ্গা ব্যক্ত হইত। সিস্কায় সক্রিয় হেতু ধিবা-বিভাজিত স্ত্রী
ও পুরুষের একাধি অপরাধের জন্ম স্বতই আকুল। উহাদের
অনির্বচনীয় মিলনানুকোপলক্ষেই তাই সৃষ্টির সম্ভাব্যতা।

“সম্ভাব্যতা” বলিবার তাৎপর্য এই যে, জীবোৎপত্তির কারণভূত
হইলেও মৈথুনিক ক্রিয়া মাত্রই কলোপধায়ক নহে; বিশেষতঃ জরায়ুজ
প্রাণী-সমূহের ক্ষেত্রে। কারণ, জরায়ুতে গুরু-শোণিত-সম্প্রাপ্তি আবার
ঘটনাবলী। আলো জীবের প্রজ্ঞান-শক্তি কাল-নিয়ন্ত্রিত। সাধাঃপতঃ
বোবনই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত হইলেও বৈচিত্র্যময় নারী-জীবনে উহা
আবার স্বত্বপ্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন জীবের স্বত্বপ্রবৃত্তির
নিয়মও আবার বিভিন্ন রূপ—কাহারও স্বরাধিত, কাহারও বা
বিলম্বিত। মানবী পক্ষে উহার প্রথমোক্ত সম্ভাবনা একাধশ বর্ষে
“দশমে কন্তাকালঃ তদুর্দ্ধে তু বন্তঃকলা”—মহু।। তদনন্তর প্রতি
২৮ দিন পরে উহার পুনরাবৃত্তি এবং সাধারণতঃ ৪০ বৎসরাবধি উহার
প্রভাব। প্রত্যেক পর্যায়ের স্বত্বপ্রবৃত্তির প্রথম দিবস হইতে বোদ্ধশ
দ্বিস পর্যন্ত গর্ভ গ্রহণের অধিকার কাল, তদন্তে নিখল। পটুগিগের
পক্ষে আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে স্বত্বপ্রবৃত্তির নিয়ম প্রত্যেক শ্রেণীর
ভিন্নরূপ। তবে প্রায়শঃ বৃহৎ জীবের উগা বিলম্বিত এবং ক্ষুদ্র জীবের
স্বরাধিত, দৃষ্ট হয়। গর্ভধারণ কাল সম্পর্কেও অনেক ক্ষেত্রে এই
নিয়ম।

জগৎ প্রাণীগিগের স্বত্বপ্রবৃত্তির নিয়ম শ্রেণীগত ভাবে কেবল
ভিন্ন নহে—বিচিত্র। পক্ষিকুলে হাম, পাংগত ও ইজুট ব্যাত্ত
অজ্ঞাত পক্ষিগিগের বৎসরে নির্দিষ্ট সময় একবার মাত্র স্বত্ব হইয়া
থাক। মন্ত, ভেক প্রভৃতি জলচর প্রাণীগিগেরও প্রায়শঃ এই

নিয়ম এবং ইহা প্রেমীগণ অর্থাৎ একই সময়ে উচ্ছ্রাসের সবার কারণেই সমানভাবে বহিষ্কৃত থাকে। তৎকালে পুং-সঙ্গের খটিলেই উচ্ছ্রাসের গর্ভধারণ হয়, কিন্তু এ একবারের মত। পক্ষান্তরে একটি মলিকবাণী ব্যবহৃত পুং-সঙ্গের সাধারণতঃ জন্ত প্রজননশক্তি সংগ্রহ করিতে পারে।

মন্ত্র প্রভৃতি এককালে যে অপরিমেয় ভিন্ন প্রেমের করে, তাহা দেখিয়া চমকিত হয়। পরন্তু বর্ষার নানাজাতি কীট-পতঙ্গ, শরতে নীলজল কীটের বাচ্চা এবং হেমন্তে দেওয়ালী পোকা প্রভৃতির বর্ষা বিস্তৃতি কি বিস্ময়কর! আবার উচ্ছ্রাসের আবির্ভাবও কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। বৎসরের অন্তর সময়ে ইহাদের কোনও অস্তিত্বই দৃষ্ট হয় না। বর্ষা পরিসর জীবনের কতিপয় মিসর মাত্র জন্মকর্ত্তা করিয়া চরম সময় ইহার কি অপরিমিত উপায়ে ভাবী কালের জন্ত ভবিষ্য সন্তানগণের জন্মলাভের ব্যবস্থা করিয়া যায়, তাহা পরম রহস্যবৃত। তথাপি বিশ্বের দরবারে ইহারও সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়—জীবগুণোপাধীর তুলনায়।

অণুজ প্রাণীদিগের অপর অভিধা—‘বিজ্ঞ’। অর্থাৎ একবার মাতৃকর্ত্তর হইতে এবং আরও একবার ডিম্বভেদপূর্বক জন্ম হয় বলিয়া বিজ্ঞ আখ্যা দেওয়া হয়। এই ডিম্ব হইতে বাচ্চা জন্মাইবার প্রক্রিয়া দ্বি-ত্রি জীবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। পক্ষিমাতা সমুদ্র ত্যাগিয়া (চাপ) ডিম ফুটাইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্র-ভেকাদি জলমধ্যে ডিম প্রসব করিয়াই নিশ্চিন্ত; জলে ভাসিতে ভাসিতে এমন কি, মাতৃসান্নিধ্য হইতে শত শত মাইল দূরে গিয়া নিরাপদ হইয়াই যেন ডিম্ব হইতে সন্তানের নিষ্করণ! কারণ, মন্ত্রমাতা স্বীয় ডিম্বের পালন অংশকা গেলনেই সমধিক বৃত্তবর্তী। তবে এ বিষয়ে নাগমাতাই আশ্চর্যজননীয়। পক্ষান্তরে কর্কটমাতার অপত্যস্নেহের পরাকাষ্ঠা দর্শন বিস্তৃত হইতে হয়,—কাকার বালির অল্পরূপ ইহাদের স্নেহে, পৃষ্ঠদেশের আবরণ (খোলা) হইতে কিঞ্চিৎ কোমলতর যে নাস্তিক্য সম্পূর্ণ আছে, তাহারই মধ্যে প্রাপ্ত ডিম্ব ধারণ করিয়া, বাচ্চা হইবার পর, ঐ অস্বাভাবিক স্বীয় জীবনরসে পৃষ্ঠ করিয়া, সন্তানকল্যাণে নিঃশেষে আত্মদান করিয়াই জীবন-লীলা শেষ করে। এরূপ মাতৃ-মতিমার দৃষ্টান্ত ভগতে বিরল।

জলচর কুম্ভীরাদি জলাশয়ের তটভাগে গর্ভ ধনন করিয়া তন্মধ্যে ডিম্ব প্রসব করে এক উচ্ছ্রাস প্রাপ্তি লক্ষ্য রাখে; ডিম্ব ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলেই জলে লইয়া যায়। কুকলাসেবাও শুক মাটিতে গর্ভ খুঁড়িয়া ডিম পাড়িয়া উহাতে মাটি চাপা দেয়। শাবকেরা বধাকালে স্বয়ং যত্নিকা জেলে করিয়া বাহির হয়। বটপদ অর্থাৎ মধুমক্ষিকা, বোক্তা, ভীমফল প্রভৃতি স্বীয় লাল-নির্মিত কোষমধ্যে ডিম্ব প্রসব করে। উচ্ছ্রাসের ডিম্ব ফুটিয়া প্রথমে কীড়াকারে, তৎপরে সর্পাকারে সন্তান বাহির হইয়া আসে। মধুমক্ষিকার চক্রনির্মাণ কেবল মধুসংগ্রহের জন্ত নহে, সন্তান উৎপাদনই উচ্ছ্রাস বুঝা উদ্দেশ্য। উর্নান্ড ভিত্তিগত্রে অথবা বৃক যত্নে ডিম পাড়িয়া তৎপরে ঐরূপ লাল-তন্তুর পূর্ণ আন্তরন রচনা করে এবং তাহাকে বেঁধন করিয়া বসিয়া তাল দিয়া ডিম ফুটাইয়া থাকে। কুমারিয়া পোকা ও কাচপোকা মাটির দর নিখান করিয়া তন্মধ্যে ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটিবার পর কীড়াকারে শাবকের বাহিরে বোগান স্বরূপ ছোট ছোট

কীটপতঙ্গ বহিয়া আনিয়া উচ্ছ্রাস ভিতর স্থাপিত করিয়া মন্ত্রপ্রলেপ দ্বারা সেই ঘরের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। অতঃপর বিমাতা ভবিষ্য শাবক সর্পাকারসম্পন্ন হইয়া আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হয়।

ডিম্ব জীবনকালপূর্ণ উচ্ছ্রাস অত্যন্তবহু পদার্থে জীবের আভাষ থাকিলেও জীবনের আভাষ কিছুমাত্র থাকে না। কতিপয় ক্ষেত্রে মাতৃদত্ত প্রাণের তাপে উহাতে ‘প্রাণপ্রাণেতা’ হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহারও অভাব কেবল স্বভাববলেই অর্থাৎ কালানুক্রমেই পরিণত প্রাপ্ত হইয়া উচ্ছ্রাস জীবরূপে প্রকটিত হয়। একটি হিসের ডিম ও একটি মুরগির ডিম যুগপৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পুষ্টিপুষ্টি কল্পনামানে পদার্থে সম্পূর্ণ আন্তঃপ্রতিপন্ন হইয়াও সেই একই রূপ উপাদান হইতে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির বিবিধ জীব বিকসেপ উৎপন্ন হয়, তাহার মীমাংসা কে করিবে? সকল সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মিসরনেও রূপপক্ষে ক্রমিকূলের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হয়, কে বলিবে?

জীবোৎপত্তির জ্ঞান উদ্ভিদের উৎপত্তিকারণও যে মৈথুনিক অর্থাৎ যিগা-বিভাজিত দ্বী ও পুরুষের মিলন-সাপেক্ষ, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে; বস্তুতঃ উহা বীজ ও ক্ষেত্রের যোগ-সম্পাদনরূপ কৃষিসাধ্য স্থল ব্যাপার নহে, প্রকৃত দ্বী-পুরুষের মিলন-বচিৎ শুক্রশোণিত সম্প্রাপ্তির অনুরূপ নিগূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য। যেতদু, বীজই উদ্ভিদ-জন্মের মূচনা, ক্ষেত্রে উহা অকুরিত এবং বর্ধিত হয় মাত্র;—অণুজ প্রাণীদিগের অণুর সঞ্চিত ইহা তুলনীয়। ডিম্বের মধ্যে যেমন প্রজনন ব্যাপার সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, কাল উগাকে কলিত করে মাত্র, বীজের মধ্যেও তেমনি সম্পূর্ণতা থাকে উদ্ভিদের—অনুকূল পরিবেশ উহাকে প্রকটিত করে মাত্র। নারিকেল ও তালের বীজ হইতে অকুরোদয়ে এমন কি, ক্ষেত্রেরও স্থাপনোপকৃতি নাই, শূন্যময়ী বালিরা বাবিলেও নিরবিবাদে অকুরিত হইয়া থাকে, অবশ্য কৃষক পরিগতি লাভের কথা স্বতন্ত্র। কুম্ভাণ্ড (চালকুম্ভা) ও কাঁচালের ভিতর বীজ স্বভাবমূলপত্র বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যতঃ উদ্ভিদের প্রজনন কার্য বীজ মধ্যেই সম্পূর্ণ এবং বীজ বৃক্ষোৎপত্তির নিরানন্ডত স্বয়ংসম্পূর্ণ পদার্থ ইহাও সংশ্যাতীত। তাহা হইলে বীজের সঞ্চিত ক্ষেত্রের সংযোজন গোপ ব্যাপার, সৃষ্টির মুখ্য সাধন বীজের উৎপত্তিতেই প্রকৃষ্ট হইয়াছে, ব্যক্তি হইবে। কখন, কোথায় কি প্রকারে তাহা ঘটিল?

প্রজনন ব্যাপারে কি জীব, কি উদ্ভিদ উভয় এ প্রশ্নের প্রকট উপায়ন পুং, ইহারই পথে তাঁচার জন্ম লীলার জয়যাত্রা। দ্বীজাতের বহুপ্রবৃত্তির ক্ষেত্রে যেমন ইহার গোপন উদ্বিগ্ন, উদ্ভিদেরও অল্প সমাগমে তেমনি ইহার প্রকাশ উদগমন। তথাপি জীব হইতে উদ্ভিদে ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, নারীর জরায়ুস্থলে বিকশিত সেই পুংসের মধ্যে কেবলমাত্র আন্তর্ব্যপণ, কিন্তু উদ্ভিদের শাখার উদগত এই পুংসে একাধারে শুক্রশোণিত উভর শুণ্ঠি বিজয়ান। প্রত্যেক পুংসের অন্তঃস্থ গর্ভকেশর ও পরাগকেশর পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট এবং পরাগরেণু গর্ভকেশরে প্রবেশনই পুংসের গর্ভাবধান; তাহাতেই ফলোৎপত্তি আর ফলের ভিতরই উদ্ভিদের নিরানন্ডত বীজের জন্ম। কিন্তু বিশ্বের বিবর, ঐরূপ বিবিধ কেশর একান্তে সন্নিবিষ্ট থাকিবারও, উচ্ছ্রাস মাতৃবহর ভ্রাতা ভগিনীরই জ্ঞান অবস্থিত—একই পুংসের

পর্যাপ্ত কদাপি ঐ ফুলের গর্ভকেশরে অঙ্কাক্ষিপ্ত হয় না। তৎকাল প্রতীক্য অঙ্ক ফুলেরই অল্পরূপ অপার ফুলের। কিন্তু গতিশক্তিচীন পাত পাতীর সেই আকুল প্রতীকার কল কি, উদ্ভিত মিলনের সজ্জাবনা কোথায়?

বস্তুতঃ ইহাও সম্ভাবিত হয় কৌশলী শ্রষ্টার চাতুর্যপ্রভাবে। কাব্যশাস্ত্র ফুলবালা রসনতী নারিকা এবং ভূরাজ্য শ্রবসিক নাগরঙ্গুণে পরিকল্পিত। ইহাদের বিরহ ও মিলনের অপূর্ণ কাহিনী প্রেয়সকুল মানব সমাজের উপজীব্য স্বরূপ হইয়া বহিয়াছে। কাব্যের কণি বঙ্গনা মাত্র হইলেও কথাটা আদৌ ভিত্তিচীন নহে,— সৃষ্টির মূলনীতি উচার অঙ্কনিহিত। নারিকার রূপ যৌবন ফুলের সৌন্দর্য্য, সুরতি, পরিমল—আকর্ষণ প্রবল; কিন্তু যেহেতু নায়ক ভূরাজ্য, সেই হেতু রাজাদিগের দ্বার তিনি 'সকলপ্রণয়ী'। এক ফুলে তাঁর মন ভরে না, বারেকমাত্র মধুপান চরিত্রাই উড়িয়া গিয়া বসেন অঙ্ক ফুলে,—উচা হইতেই হয় বিশ্বশিতার উদ্ভক্ত সিঁচি। সকলই দেখিয়া থাকিবেন,—ফুলের অভ্যন্তরস্থ গর্ভকেশরই অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্য এবং সুসত্তর; উচা উপরে দিকে প্রসারিত, আর গুল-কেশরগুলি কুল ও মধুক্ষেপে অবলিপ্ত শ্রাব। এই জ্ঞাত একই ফুলের পরাগবোঁ উচার গর্ভকেশরে পতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু ভ্রমর যখন পুষ্পপুটে প্রবেশি হইয়া চলিয়া যায় মধুক্ষয় বিধ করতঃ মধুপানে প্রমত্ত হয়, তখন তাহার লোমস্পর্শকলিতে ঐ সকল পরাগবোঁ সঞ্চিত হইয়া যায়। তদনন্তর অঙ্ক ফুলে বসিমাত্র গর্ভকেশরই উচ্চ প্রসারিত থাকা প্রযুক্ত উহারই উপর তাহার পদসংলগ্ন পরাগবোঁ পতিত ও রন্ধুপে অঙ্কপ্রবেশি হইয়া যায়। এইরূপে যুগ্মজীবনের সাহায্যে মৈথুনিক প্রক্রিয়ার জড়-উদ্ভিদের বংশরক্ষা হইতেছে।

তবে উহাই যদি উদ্ভিদের বংশরক্ষার একমাত্র উপায় হইত, তাহা হইলে অনেক বৃক্ষলতার বংশলোপ বহুপুর্বেই ঘটিত; কারণ অনেক প্রকার উদ্ভিদের আসে কল প্রযুক্তি নাই, আবার কতকগুলি এমনও আছে, বাহ্যেরে ফল হয়, কিন্তু উহা বীজশূন্য একশ ক্ষেত্রে শ্রষ্টা মূল, কল, শাখা, পত্রব, এমন কি পত্র মধ্যেও উহারে বংশ রক্ষার উপায়ভূত স্তম্ভনশক্তি নিহিত রাখিয়াছেন। কোথায়ও আবার বিধি, বা ততোধিক ব্যবহাও বিস্তার। টগর, জবা, সোলাপ প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষে ফল হয় না; কিন্তু শাখা হইতে উহারের নব নববৃক্ষের উৎপত্তি হয়। গাঁদা ও কুক্কলির বীজ ও শাখা দুইই কার্যকরী। পটোল ও বিধ বা তেলাকুচার মূল, বকী ও বীজ তিনই বংশবিস্তারের সমর্থ। বাঁশ, হিজল, কলা প্রভৃতির বংশধারা মূলগত,—মূল হইতে ইহাদের নতুন নতুন চারা বাহির হয়। তথাপি কদাচিৎ বীশের কলোৎপত্তি হইতে দেখা যায় এবং গাছ সপুষ্ট সেই বীজ হইতেও বংশের বংশরক্ষা হইয়া থাকে। বীশ একপ্রকার বৃক্ষ তৃণ ব্যতীত আর কিছুই নহে; স্তম্ভরায় কল পাকিলেই ঘরিয়া যায়। তখন ঐ সকল বীজ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা বাহির হয়—উচা ককি হইতেও ক্ষুদ্রতর। কিন্তু ক্রমবিবর্তন নীতি অনুসারে উচারের মূলস্থায়িত্ব কয়েকটি বংশ পর্ধ্যায় উচা আবার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। বীশ নানা জাতীয় আছে, তন্মধ্যে বেউড় বা 'কাটা বীশ' এই অভিনবলীলা প্রত্যক্ষভূত হইয়া থাকে। ইহারেই এরূপ এক একটি পর্যায় আরম্ভ ও সমাপ্ত হইতে প্রায় ৩০ বৎসর লাগে। বীজ গর্ভ

কলারও বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হয়; কিন্তু এরূপ অতি ক্ষুদ্র হইলে হেতু বহু বৎসরে কল প্রাপ্তির প্রতীক্ষার কে থাকিবে তাহাও আবার বিচিন্তা।

ওল, কচু, আলু প্রভৃতির বংশবিস্তৃতি কল হইতে। ইক্ষুর প্রতি গ্রন্থিতেই প্রজননশক্তি বিস্তারিত। আয়ুর্কৌলজ অমৃত বা গুল্ল লতার যে কোনও ক্ষুদ্রতম অংশ খীর বংশলক্ষ্য সক্ষম। অমৃত নাম ইহার সার্থক,—শতজিহ্বা হইলেও ইহার ভীমান্ত হয় না। এমন কি, তদবস্থায় ভূমি সম্পর্ক বিয়ুক্ত করিয়া উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে স্থাপিত করিলেও উচা বাঁচিয়া থাকিবে এবং তথা হইতেই মূল বিস্তার দ্বারা ভূমি হইতে রস আকর্ষণ পূর্বক বংশ বিস্তার কারবে। আবার হিমসাগর বা পাথরকূটির কার্য্য ততোধিক বিষময়কর। এই গাছের পাতা মাটিতে পড়িলেই উচার বালার তুল্য চক্রাশ্রিত প্রান্ত ভাগের অসংখ্য গ্রন্থি হইতে রক্তবীজের উৎপত্তির ভ্রায় অগণিত বৃক্ষ ভ্রম পরিগ্রহ করে।

বীজোৎপন্ন হইলেও উদ্ভিদগণের ভিতর বট, অশ্বখ ও উড়ুদ্রারির চরিত্র অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। ফুল না হইয়াই ফল হইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের পুংসুত্রবাচক আখ্যা—বনম্পতি। কলোৎপত্তির সহিত পুংসুত্র শাখা-বিধানের ইহা ব্যতিক্রম ইহাকে শ্রষ্টার অঙ্কনবর্ণক সৃষ্টিজীলার অল্পতম নিদর্শন বলা বাইতে পারিত, কিন্তু আধুনিক উদ্ভিদতত্ত্ব-বিদগণ ঐ সকল বৃক্ষের কলচই মধ্যে পুংসুত্র আরোপ করিতেছেন। অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় উহার পুংসুত্র; তখন প্রকোমল দলরাজির পরিবর্তে মূল আরম্ভ মধ্যে উহার যে কিঞ্চিৎ থাকে, তাহাই ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া কলের আকারে পাকিয়া দাঁটি হইয়া উঠে। এই সিদ্ধান্ত যদি মানিয়া লওয়া হয়, তবে ভাল ও খন্ডরাদির কলোৎপত্তির তাহার কি ব্যাখ্যা করিবেন? কিন্তু সে কথা রাখিয়া বনম্পতিগণের অত্যন্ত জন্ম বুভাভূই অগ্রে কথনীয়। সাধারণতঃ বীজের ধর্ম্ম—সরস ভূমিতে পড়িলে জাচেই অঙ্কুরিত হইবে; কিন্তু এই বনম্পতিগণের বীজ সে প্রকৃতির নহে,—আত্মবিক প্রজননশক্তি ইহাদের নাই; নতুবা স্তম্ভক কলের রাশি রাশি বীজ বৃক্ষতলে বর্ধমে মিথিয়া মাটি হইয়া যায়, কদাপি অঙ্কুরোৎপন্ন হয় না কেন? আর পশ্চিমবীয়ে উচ্চ সৌখনিগণের উহারের উৎপাদিকা শক্তির পরাকর্ষ্য প্রেরণিতহর কিরণে? বাস্তবে কি, সৃষ্টি বৈচিত্র্যেরই ইহা অল্পতম নিদর্শন। যেহেতু, জীবজন্তুহীলে (ফলের সহিত) বীজের উৎপাদিকাশক্তি জটরাগ্নিতে নষ্ট হইয়াই কখন, কিন্তু বনম্পতির বীজ জীবের পাকায়ের পাকপ্রাপ্ত হইয়াই উৎপাদিকা শক্তি লাভ করে।

লাউ, কুমড়া, বিলা, লশা, তরবুজ প্রভৃতি লতা ফসলে বৈচিত্র্য ফলসনাপ পুংসুত্রগম্য; কিন্তু প্রথমতঃ উচারের কতকগুলি নিঃস্র-পুষ্প না হইয়া একেবারেই এরূপ ফলস্র পুষ্প হইতে দেখা যায় না। ইহা হইতে অন্তর্ধান করা বাটতে পারে যে, ঐ সকল পুষ্প পরাগ বোঁ লতাঘেঁষে সঞ্চারিত হইবার কলেই লতার এরূপ ফলসনাপ পুষ্প প্রসবের সামর্থ্য জন্মে। লতা ব্যতীত জ্ঞত কোন উদ্ভিদে ইহা দৃষ্ট হয় না; কেবল কাউষবৃক্ষের প্রকৃতিতে ইহার সৌসদৃশ্য বিস্তারিত।

নারিকেলের বৈচিত্র্য ইতিহাস প্রোদ্ব। অত্যন্ত সন্নিহিত বস্তুকে নাকি আমরা ভাল করিয়া দেখ না; তাই নারিকেলের মর্যাদা বোধে আমরা এত উলানী কিছু দূরগত গুণগ্রাহী। বাবর শাহ ইহাকে সপ্তরক্ষণে চিনিয়াছিলেন। এ হেন নারিকেলের

ফুল ও ফল একই কীভাবে হয়; কিন্তু ফুল হইতে ফলের উৎপত্তি নহে—বস্তুভাবে।

অন্তঃশর তালের কথা। ফলোৎপত্তির সাধারণ নিয়ম প্রমাণিত করিতে কেহ যদি তালের বৃদ্ধিতে পুষ্পের আয়োজন করেন, তবে অন্যকোচ বলা বাইতে পারে—তাহার ভালজান নাই। বস্তুতঃ উদ্ভূতবীর্যর ভ্রাব ইহার ফল প্রথমাধিকার ও শূণ্যগর্ভ নহে এবং তদাধো গর্ভপরাগ রেণু অস্তিত্ব করনারও কোন সম্ভাব্যতাই বিস্তারিত নাই। তথাপি শ্রষ্টার বিভিন্ন বিধানে সন্ম-রজঃ-তমঃ গুণত্রয়ের তিন জাতি সমেত তালের বিরাট প্রকাশ, এতদুই অনবীকার্য।

খর্ব্ববেগ তালের মত স্বতোস্তব গুণই বিস্তারিত। তথাপি এই দ্রুতই পুষ্প প্রকারান্তরে হইয়া থাকে। কিন্তু পুষ্পের সহিত ফলের কোনও রূপ সাক্ষাৎসদৃশ একেবারেই নাই। যে বৃক্ষে ফুল হয়, সে বৃক্ষে কোনওকালেই ফল হয় না এবং যে বৃক্ষে ফলোৎপত্তি হয়, তাহাতে কোনদিন ফুল হয় না। তবে একের পুষ্প প্রযুক্তিই যদি অপরের ফলপ্রসবের কারণ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা হইলে বাক্সালার সেই প্রবাদবাক্য সত্যই এক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে;—

মা না বিরালো, বিরালো মানী,
কাল খেয়ে মরে পাড়া প্রতিবাসী।

উদ্ভিদের কার্যপথ্যালোচনা করিলে ইহাদেরও ইচ্ছাকৃতিক কথা বসতই মনোমধ্যে উদ্ভিত হয়। মনুষ্য, পশু পক্ষী ভীত পতঙ্গাদির ভ্রাব ইহারাও যে নিরন্তর বংশবিস্তারের জন্য ব্যস্ত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও ইহাদের আচরণে পাওয়া যায়। আগন্তার বাহিরে, দূরে—আবও নুতরে গোষ্ঠিবৃদ্ধির চেষ্টা ইহাদের কতই না প্রবল! তজ্জগৎ বীজের দূরপ্রাপ্তি ইহাদের কতই না কৌশল! ফলের বাদিষ্টতা, ফলের সৌভাগ্য, পত্রের সৌন্দর্য্য যেন সকলই সেই উদ্বেগ-সিদ্ধির উপায়রূপে আকর্ষণ সৃষ্টি,—দূরে নীত হইবার প্রয়োজনে। বাহ্যদের তাড়ন কোনও আকর্ষণ নাই, তাহাদের চাতুর্য্যই স্বল। কাহারও ফলে কাঁটা, কাহারও চটচটে আঠা, উদ্বেগ—জীব-শরীরে বা চলমান পদার্থে সলগ্ন হইয়া দূরে গিয়া বংশ-বিস্তার। অপমার্গ, চোরপাটো ডো চলেন একেবারে নরবাহনে। কাহারও ফলে তুলা ভগা,—বাহুভরে ভৎসলগ্ন বীজ ‘প্যারাসুটে’ চড়িয়া নুতরে বাজা করিবে। আবার ‘বীদরা’ (পরগাছা) ও ‘আলোকলতা’র কৃত্তিব্য আরও চমৎকার। ইহারা বহু লাক্ষাইয়া পড়েন গিয়া দূরবর্তী শিকারের ঘাড়ে। তবে তজ্জগৎ সুবোণ প্রতীকার থাকিতে হয়,—যখন প্রবল বাটিকার পানিশকুল বিলম্ব হইতে থাকে, তখনই ইহাদের দূর-দূরান্তে গিয়া ‘কলনা’ দ্বাপনের মনুষ্য—বড়ের কাঁধে চড়িয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে চলে ইহাদের বিলম্ব-অভিধান। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা—যেখানেই পতিত হইবে, সেইখানেই পরবাণহারি দ্রুতর ভ্রাব উহার বৃক্ষ হইতে রস শোষণ করতঃ আন্তঃপুষ্টি ও বংশবিস্তার করিবে। আলোকলতার এই শক্তি এমনই প্রচণ্ড যে, বিস্তৃতি পরিমিত স্বর্ণভক্ত সলুণ উহার কোনও হিরাংশ গাছের উপর গিয়া পতিত হইলেই অচিরে বীর প্রৌঢ়ভাগ দ্বারা বৃক্ষের শাখা বা পল্লবের কণ্ঠবৈঠনপূর্ব্বক রস-শোষণকরতঃ দ্রুত সুবৃদ্ধি হইবে এবং ক্রম ক্রমে সেই বৃক্ষের উপবিস্তার সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া উহাকে দূর্য্য-কিরণ সম্পূর্ণে বঞ্চিত ও বৃত্তপ্রায় করিয়া ফেলিবে। কিন্তু ইহা

হইতেও হিংস্র—জীবকুল শিকারী উদ্ভিদ আছে—‘কলসী-গাছ’। লজ্জাবতী লতার ভ্রাব তাহাদের স্পর্শশক্তি এমনই প্রখর যে, কোনও ক্ষুদ্র জীব তাহার পত্রপুটে আসিবারাত্র তাহাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে এবং বতকণ পর্য্যন্ত উহার পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, ততকণ আর সেই কলসীতুল্যপুট বাবুত করিবে না।

আনারসেও বৈচিত্র্য অল্প নহে। উদ্ভিদের ফলপ্রসবের সাধারণ রীতি ইহাতে কিছুমাত্র নাই। গলগণ্ডের ভ্রাব বৃক্ষকাণ্ডে ইহার উৎপত্তি এবং তাহাতে বীজ সমেত সুরসাল ফলের সমস্ত সম্পদ সম্ভব করিয়া বৃক্ষের পুনরায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি, আর শিরশ্বেদের পরও সেই দ্বিগ্ন শির হইতেই নবজীবনের সূচনা—আর কোথায়ও দেখা যায় না।

উদ্ভিদ যে কেবল ফুলেই হয়, তাহা নহে; জলরম্যেও বহুবিশ আছে এবং তাহাদের বংশধারাও বহুবিশ বিভিন্ন প্রণালীতে প্রবাহিত হইতেছে। প্রথমতঃ শৈবাল,—ইহারা বৃক্ষননশীল। আত্ম যুক্তিকায়, এমন কি সুউচ্চ সৌধশিখরে যে শেওলা জন্মে, বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে, নিঃসন্দেহে প্রতীত হইবে যে উহা অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, কিন্তু উহাদের উৎপত্তি সূত্রের স্বভাবধর্ম্মই হইয়াছে। পৃথিবীর পক্ষোদ্ধার না করিলে গলিত পঙ্ক হইতে পানিও ঐরূপে জন্মিতে দেখা যায়। শিউলী, ময়রা গাঁজ ও দাম জাতীয় জলজ উদ্ভিদের সামান্তমাত্র অংশও কোনওরূপে আসিয়া পড়িলে পরিষ্কৃত পৃথিবীও অচিরে উহার সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সরোবরের শোভা নয়নানন্দকর ইন্দীবরের বংশবিস্তার পদ্ধতি এমনই চমকপ্রদ যে, জলাশয়ের মালিকের চক্ষে উহা স্বর্ণপুস্প রূপে প্রতীভাত হইতে অতি অল্প সময়ই লাগে। মূল, বকী ও বীজ জিবিধ উপায়েই কুলদের কুলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুমুদিনী এ বিষয়ে বিশেষ সযত। ইহার লতা-বিস্তারের বলাই নাই, মূলদেশের ‘গণ্ড’ হইতে পর্য্যায়ক্রমে গত্র ও পুষ্প উদ্গত হইয়া, গভীর বা অগভীর বাহাই হউক, জলের উপরে ভাসিবার মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াই কাষ্ঠ থাকে। লজ্জাশীল কুলবালার ভ্রাব কুলগুলি নিশাকালেই বিকসিত হইয়া শোভা বিস্তার করে আর দিবালোক প্রকাশিত হইতে দেখিলেই সুখাবগুণীন টানিয়া দেয়। পুষ্প হইতে যে ফল জন্মে, তাহার বীজে প্রজনন-শক্তি থাকে, কিন্তু খাজাঘেরী মানবের দোরাছোই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। জলজ উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে বংশ বিস্তারে কচুরিগানার খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

বলা বাহুল্য যে, উদ্ভিদজগৎ সর্বতোভাবে ঋতুচক্রে নিয়ন্ত্রিত। ওষধিজাতীয় উদ্ভিদ সমূহ ঋতু-অনুসারেই জন্মে, ফুল-ফল প্রসব করে এবং বধাসময়ে মরিয়া যায়। তজ্জ-লতা সকলও ঋতু-অনুসারেই পত্র-পরিহার, নব কিশলয় ও পুষ্পপ্রসব এবং ফলধারণ করে। কতকগুলি বৃক্ষের ফল প্রযুক্তি নিরবচ্ছিন্ন চলিতে দেখা যায়, আবার অনেকের এমনও আছে, বাহানের ফল বৎসরে একবার মাত্র ফলে, কিন্তু সবৎসরব্যাপী স্থায়িয হেতু কোন সময়ই উহাদের অভাব বোধ করিতে হয় না। বেল ও আভ্রাতক প্রভৃতি সেই জাতীয়। আভ্রাতক বা আমড়ার পুরাতন ফল নূতনের সহিত একই সঙ্গে দায়ের কোলে শোভা বহন করে; তাই বৃত্তবৎস জননী সমস্ত ইহার জাতি নিজ সম্বানের পলার বাধিয়া দেন।

সৃষ্টির আনন্দকুলে সকল স্রষ্টা-কিছু-না-কিছু দান আছে; কিন্তু এ বিষয়ে বর্ষার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। এই বর্ষা ঋতুতে ফুল-ফল-অন্তরীক্ষে এককালে সৃষ্টির সমারোহ লাগিয়া যায়। কত অভিনব উদ্ভিদ, কত বিচিত্র কীট-পতঙ্গ-প্রজাপতি যে এই সময়ে প্রোৎসাহিত হয়, তাহার ইংতা নাই। বর্ষার আর এক অনন্তস্থলত দান—ছত্রক। গলিত তৃণ-কাষ্ঠাদিতে অথবা কুমিলেদ পূর্বক ছত্রের আকৃতি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা ধরণের এই পদার্থগুলি এ সময়ে বহুতর আশুপ্রকাশ করে। চলিত কথায় ইহাকে ‘ব্যাঙের ছাতা’ বলে। কখনো সত্য হইলে প্রকৃতি মাতার ইচ্ছা বোরস্তর পক্ষপাত বলিতে হয়। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সন্ধি হইবার কোন আশঙ্কাই বাহাদুর নাই, তাহাদের জন্য তাহার এই ছাতা বিস্তরণের দরাজ বন্দোবস্ত; আর আমরা মাথায়ের চতুর্ভুজ মূল্য দিয়াও ছাতা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া সন্ধি-কাসিতে ভুগিয়া মরি।

সৃষ্টি প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত বাহা পরিবর্তন হইয়াছে, বৈচিত্র্য কিছু থাকিলেও ভঙ্গসমূহে কার্য্য-কারণ সবদ বিজ্ঞান। কিন্তু এইবার

বাহা বলিতে উদ্ভত হইতেছি, তাহা একেবারেই কার্য্য-কারণের বহির্ভূত। আকাশের সর্বানুসৃত-সন্তায় বাহা বা আত্মাখন এবং পৃথামণ্ডল হইতে আগত পার্থিব বায়ুস্তরে বিচরণশীল জীবাণু-ধর্মী জীবরূপে আত্মপ্রকটনে বাগা বিধাসী, তাহাদেরও নিকট উপহাসাশ্রম হইবার ভয়ে বলিতে সাহস হয় না যে, সেড ফুট দীর্ঘায়ত; দেহধারী কোনও জীবের সৃষ্টি নিঃসংশয় শূন্যমার্গে সম্ভব হইতে পারে। তথাপি যদি খোঁষ-মজাজে ও বহাল-তবিরহে, প্রেকাঙ্গ দিবালোক, নিম্পাদন মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া, অকস্মৎ শূন্য হইতে তালমলং বস্তৃপিশের পতন ও তাহা হইতে প্ৰত্যেক সর্পের ইবন্তত; পলায়ন-ব্যাপার দীন লেখকের একাধিক বার বচকে প্রত্যেক করিবার সৌভাগ্য না হইত, তবে কদাপি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গ অবতারণা হইত না। তবে ভরসা আছে—হয় ত কোনও বয়ীরা পৃষ্ঠক “হেল-সাপের” এই অত্যুদ্ভূত জন্মকথা সম্বন্ধ করিবেন।

তুলসী কেন বরণীয়া?

শ্রীযুক্তকিশোর চট্টোপাধ্যায়

আজ হতে হাজার হাজার বছর আগে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তুলসী জন্ম নিলেন এক রাজার ঘরে। তাবপর কত যুগ কত বর্ষ চলে গেছে, তবু নারায়ণপ্রিয়া তুলসী আজও ভারতভূমিতে বরণীয়া ও চির আদিত্যী হয়ে মানুষের মনের মাঝে মেহের ও শ্রদ্ধার আঁচল পেতে প্রতি ঘরে বৃক্ষরূপে বিরাজিতা আছেন। এখনও প্রতি সন্ধ্যায় গোষ্ঠী লগ্নে কুলবধূগণ আর কুলের মত ছোট ছোট শিশুরা শ্রদ্ধা ও প্রীতির মাঝে ছোলে দেয় সন্ধ্যার প্রদীপ তাঁর চরণকমলে। নত মস্তকে ভক্তি ভরে অর্ঘ্য দেয় তুলসীর শরণে। পুণিমার জ্যোৎস্নার রজনীতে লুমধুর সঙ্গীতের মাঝে কবিতালি দিয়ে করে চরণ-বন্দনা।

ভগবৎভক্তগণ আজও শ্রদ্ধাভরে বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীকে আগলে নিজ নিজ বকে ধারণ করেন। কেমন করে সেই পরমাত্মপবিত্র তুলসী অখিল বিশ্বের নাথ শ্রীহরির বকে মালা ও বিষ্ণুপ্রিয়া হলেন সে এক অজীত কালের পূণ্য কাহিনী।

রাজার দুলালী ওৎসবী তুলসী বাসো সকল খেলা ফেল ছুটে যেতেন শ্রীবিষ্ণুদেবের আর কচি বচি হাত ভরা ফুল এনে অঞ্জলি দিতেন শ্রীকৃষ্ণারপদ্মে। নানা ফুলের মালা গাঁখে পরিয়ে দিতেন বিশ্বনাথের কণ্ঠে। ঘুমের মধ্যা-দেখত পেলেন কমলাপতির চিব-প্রসঙ্গ প্রেমময় মূর্তি। আনন্দে ভরে উঠতো তাঁর শিশুমন। স্বপ্নের দেবতা হাসি ভরা মুখ নিয়ে মিলিয়ে যেতেন আকাশের বৃক্।

পূর্ণকর যুগ যেত ভেঙ্গে। জলভরা নদয়ে বার্থ হয়ে ফিরে আসতেন জাযার বিষ্ণুমন্দিরে। এমনি করেই তুলসী প্রচার অর্ঘ্য

দেয় ভগবানের রাজ্য চরণে। যৌবনে তুলসী সবার অনেকে ছায়েই অনন্ত প্রেম নিয়ে যান দেবতার মন্দিরে, আর বেষে আসে শ্রদ্ধা ও প্রীতি কমলাপতির শ্রীচরণে। তবু পাষণ দেবতা বলে না কথা তাঁর সাথে, তাই ব্যাভাড়া অন্তরে তরঙ্গ মাঝে ফিরে আসেন আপন ঘরে। তাঁতের অন্ধকারে আবার যান এগিয়ে হৃদয়ের একান্ত আশা নিয়ে, আবার আসেন ফিরে বার্থ হয়ে নীরব ভক্তের মাঝে।

পিতা তাঁর মনের কথা জেনে বিবাহের করেন আয়োজন। নানা দেশ হতে আসে বহু রাজকুমার বিচিত্র বেষে, আর লুলয় গাজে। তুলসী আসেন মাশ নিয়ে বিস্ত্র দেখতে পান ন তাঁর অন্তরের স্বামী ভগবান বিষ্ণুকে। পদ্মনয়ন জলে যায় ভরে, বেদনার মার্গে শূন্য হৃদয়ে যান ফিরে।

সংসা বিচিত্র সন্ধ্যায় আসে অপরূপ সাজে হৃদ্যবসী লক্ষ্মীচূড়। লক্ষ্মীচূড়ের তেজোভীর্ণ ঔষধময় মূর্তি দেখে বাসগণ হন শিংশিত। তুলসীর পিতা ভয়ের মাঝে কপেন সাবর সম্ভারণ। পিতার আদেশে তুলসী এগিয়ে যান মালা নিয়ে কবকম্পন মাঝে। বেদনার ভ্রু হয় ভরে পদ্মনয়নে। নৈবেদ্য বেষে তুলসী লক্ষ্মীচূড়ের গলায় পরিয়ে দিলেন মালা। রাজগণ ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসেন মুঞ্চ কবতে। প্রবল পরাক্রান্ত লক্ষ্মীচূড় সকলকে করে পরাজিত। তুলসীর লগ্নাটে বর্ষের খ্যাতি আছে লেখা, তাই সবার অন্তরের ঠাঁকু ময়ানুনি নারদ এলেন এগিয়ে, আর হাঙ্গিন্তা মুখে বিদায়ের কালে আকীর্য্য করে বললেন, কল্যাণধরী তুলসী, বিবাহের ইচ্ছার এই মিলন পট্টে, তাঁকে হালিভা মুখে বরণ করে নিও। তুলে যেও না নৈবেদ্য হর্ষার গতির কথা। সুখি থাকে তাও সেই অখিলবিশ্বের নাথ শ্রীহরি

হুড়িয়ে আছেন সবার অন্তরে এক আভ্যন্তর। লড়া কবে মাদ্রাসের অন্তরে বামীকে, তার লাক্ষেই খুঁজে পাবে একদিন তোমার স্তোমগিক।

বিবিধ নিয়মে যে এসেছে তোমার ভাবন-পথের পরে, আদর করে নিও তাতে আপন হৃদয়-মাঝে। বামীকে অন্তরে প্রেমের ও প্রহর প্রাণীপ হোসে গ্রহণ না করলে, তোমার পতিভক্তাধর্মের মর্যাদা হবে হানি, আর তার সাথে তোমার অন্তরের নির্মল জ্যোতি হবে স্তান। কোন দিন হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে প্রকাশ হবে না কমলাপতির চিরপ্রাপ্ত প্রেমময় মুখকমল। প্রেমরূপে আছেন বসে সবার হৃদয়ে জগতের স্বামী, তাই সোহাগের ব্যক্তি খেলে এগিয়ে যেও বামীর পাশে, তার মাঝে খুঁজে পাবে তোমার অন্তরের স্বামী।

মহামুনি নারদের কথায় তুলসীর স্বরয়ে জানের ও প্রেমের প্রাণীপ-শিখা ওঠে জলে। সেবেত পান সবার হৃদয়ে আপন প্রেমের ঠাকুরকে। হাদিমুখে বিহার নিয়ে চলে যায় বামীর ঘরে। গুণবতী তুলসীর জুগে আর পবিত্র জ্যোতিতে শম্ভুচূড় করে তাকে আগ্রের বাণী। নির্ধার করে সন্মতী তুলসীর প্রাসাদ বেখানে, তুলসী গোপনে প্রতিদিন স্বামীর মঙ্গলের জন্ত করেন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা, আর পবিত্র হোম।

বিষ্ণুবিবেচী শম্ভুচূড় দেখতে পায় তুলসীর একান্ত আরাধনা, কোথায় নিষ্কপ করে শ্রীমূর্তি। তুলসীর নয়নে আসে জল, তুলে আনেন শ্রীমূর্তি, চোখের জলে আঁচল দিবে প্রেমের মাঝে হুড়িয়ে নেন শ্রীধর। তবু স্বামী যুদ্ধে গেলে তুলসী প্রাণের ঠাকুরকে সাক্ষার নানা কুসে, আর তাঁর মঙ্গলের জন্ত উপবাসী থেকে লক্ষ লক্ষ মহাপ্রসন্ন করেন জপ। সত্যের পুণ্য ও ভক্তিতে বিষ্ণুভক্ত হয় সঙ্গারিত স্বামীর অঙ্গে। শম্ভুচূড় হয় আরও হৃদয়, হৃদীর পতিতে এগিয়ে যায় দেবলোকে। সর্বত্র জয়ের মালা পরে শম্ভুচূড় কিংবে আসে আপন প্রাসাদ। হাদিমুখে হুখে তুলসী এগিয়ে এসে পরিচয় নেন হোমের জয়টিকা স্বামীর ললাটে। সত্যী তুলসীর বিষ্ণুভক্ত শম্ভুচূড় হয় চিরজ্যোতি। তবু সে জানে না, তার আসল শক্তির উৎস কোথায়, তাই অংগারে এগিয়ে যায় সর্বত্র ভীষণ কল্যাণমুহুর্তে।

দেবতারা হন ভীত, স্বরণ করেন বিপদভঞ্জন মহামুনি শ্রীহরিকে। সেই সময় গোলাকবিহারী শ্রীহরি এই পৃথিবীর বৃক জয় নিয়ে ব্রজে ব্রজহলাসরূপে অপরূপে ঐশ্বর্যময় লীলা করছেন। ব্রজের তুলসী শ্রীকৃষ্ণ ও বলভক্ত গুহ্য সাক্ষীপতির আশ্রমে শিক্ষা সাপান করে ভক্তি ভরে গিতে চাহিলেন গুহ্যমন্ধি। হুনি সাক্ষীপতি অঙ্গজলে বলভক্ত নিজ পুত্রের ককণ কাছিনী। হৃদয় শম্ভুচূড় করেছি বন্দী হুনির পুরক। বাহ্যিকভক্ত শ্রীগোবিন্দের চোখের সামনে ভেসে এলো দেবতার অন্তরের ডাক, আর আপন গুহ্য বেনাময় ভীষনের কথা। চক্ষু হলো তাঁর স্বরয়। একমিকে ভক্তের ব্যাকুল আহ্বান, অঙ্গ-মিকে প্রিয়া তুলসীর প্রেমময় ভালবাসা তাঁকে নিয়ে এলো শম্ভুচূড়ের কাছে। হুনিপুত্র উদ্ধার ও প্রিয়া তুলসীকে ছবর বরণের মানসে শেষে এগিয়ে এসেন শম্ভুনিদান করে শম্ভুচূড়ের ঘায়ে। শ্রীকৃষ্ণের তৃণনিদান শুনে বলদশী অগ্রর হৃদয়ে টকায় গিয়ে এগিয়ে এলো মহাপ্রাণে। মহাপ্রসাদ তুলসী স্বামীর অঙ্গলয়ের কথা চিন্তা করে পরিচয় মিলেন পবিত্র হোমের জয়টিকা। হৃদয় মহামায়ারী শম্ভুচূড় প্রকাশবেশে নানা অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেন কৃষ্ণকলারকে।

শ্রীকৃষ্ণ বিধা অন্তর হেনে বার্ষ করে অন্তরের আক্রমণ। নানা বিধা আন্তর বনবনায় লক্ষে দেবতারা হন শক্তি। মেঘের কোলে ভেসে আসেন ভগবান শঙ্কর আর হুনি-কবিগণ, তত্ব হয়ে দেখেন প্রত্যক্ষর যুদ্ধ। পুণ্যবতী সত্যী তুলসী উপবাসী থেকে লক্ষ লক্ষ মহাপ্রসন্ন করেন জপ স্বামীর মঙ্গলের জন্ত। সত্যী কৃষ্ণের সঙ্গারিত হয় অন্তরের সারা অঙ্গে, তাই সে চর আরো দুঃখ। শ্রীধর হস্তে দ্বিভিত্ত অস্ত্র সব বার্ষ দেখে। স্বামীর মাঝে জাত হস্তে শম্ভুচূড়ের হৃদয় শক্তির কাব্য। তাঁর হৃদয়কমলে ভেসে এসে প্রেমময়ী তুলসীর স্মৃতি। কমলাপতির সন্মানন ভরে গেল প্রেমাজ্ঞেত। ব্যাক্ত হন প্রিয়া তুলসীর কথা ভেবে। হস্তরাম স্বরণ করে চন্দ্র মাঘরক ছাত্রের দমন ও শম্ভুচূড়ের পরিব্রাজের জন্তই কীর ধরায় নরনাগররূপে অবতীর্ণের কথা।

ভগবান শ্রীগোবিন্দ ভক্তিমতী তুলসীকে দর্শন ও তাঁকে আপনায় হতে আপনায় করবার জন্ত পুনরায় যুদ্ধবাত্রা করলেন। বলভক্ত বলে মিলেন কোশল ভিনয়ের কথা। শ্রীকৃষ্ণ শম্ভুচূড়ের শুনে শম্ভুচূড় আবার এগিয়ে এলো বিভিন্ন রবে ও নানা বিধা অন্ত্র নিয়ে। ভগবান কৃষ্ণ যুদ্ধের মাঝে নিজ দৈবী মায়ার প্রকাশ হলেন দুই মুহুর্তে। এক রূপে দুঃখের অন্তরে সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করেন, আর শম্ভুচূড়ের মুখমাকে দেখা মিলেন প্রিয়া তুলসীকে। তুলসী আনন্দে এগিয়ে এলেন ভয়মাল্য নিয়ে হৃদয়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তুলসী বেই মাত্র মহাপ্রসন্ন জপ ত্যাগ করেন, বিষ্ণুভক্ত হয় অজ্ঞাত স্বামীর অঙ্গ থেকে। সেই অবসরে কৃষ্ণ করেন নিগন হৃদয় মায়ারী শম্ভুচূড়কে।

তুলসীর অন্তরের জ্যোতি হার নিবে, মিকে মিকে অমঙ্গলের চিহ্ন দর্শন করে চিত্ত হয় ব্যাকুল। ধ্যানের মাঝে ভেসে এলো স্বামীর ভীষনের বেনাময় ককণ ছবি। কোথায় দূর নিষ্কপ করেন ভয়মাল্য, আর নানা আভরণ। হৃদয়সত্যী তুলসীর অঙ্গ পাবকসম মুক্তি দেখে নারায়ণ হন ভীত। নয়নের বহির মাঝে জিলাক হয় কম্পিত। শ্রীগোবিন্দ প্রেমময় নারায়ণমুহুর্তে প্রকাশ করেন তুলসীর কাছে। হস্তমোহানীর্ঘী দেবী দুর্গা শক্তি রূপে প্রকাশ হলেন তুলসীর হৃদয়-মাঝে। তুলসী হন শক্তি। জলন্তরা নয়নে নারায়ণকে বলেন—প্রভু জগৎকাল হতে তোমার শ্রীঃপ ছাড়া এ দাসী আর কিছু জানে না। তার কল কি এই নিষ্ঠুর বৈধব্য?

বাঁধাকান্ত শ্রীমাধব আপন রূপে প্রকাশ হয়ে যুদ্ধ হেসে বলেন—বাণী হতে তুমি আমার অন্তরের প্রিয়া। দৈবের প্রভাবে হয় তোমার মিলন শম্ভুচূড়ের সঙ্গে। তোমারই পুণ্য আমার হস্তে নিধন হয়ে সে হায়ে অমরলোক বৈকুণ্ঠমায়ে। পাবে চিরমুক্তি। আর আজ হতে তুমি হবে আমার অন্তরের প্রিয়া। জগত মাঝে চিরপুজিতা হবে বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসী নামে।

প্রেম ভরে ভক্তগণ দেবে তোমার সন্মার প্রাণীপ। আর মালা করে কণ্ঠে তোমার করবে ধারণ। ব্রজভক্ত বৃষ্ণরূপে থেকে সকলের পাপ হরণ করবে।

তাই আজও মাঘ প্রতি পুণ্য কাজে প্রভা ও প্রীতির মাঝে প্রাণীপ খেলে করে বরণ, আর নানা কুসের মাঝে সাজিয়ে বৃষ্ণরূপী তুলসীকে বন্দনা করে বাল—

ও বৃষ্ণরূপে তুলসীদেবী প্রিয়াটর বেশভূষা।

বিষ্ণুভক্তপ্রিয়াটর সত্যবটের নমো নমঃ ॥

শীতের কথা

কাননবিহারী দে

ভারতবর্ষের আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করার সময় এসে গেল। মাত্র আর কয়েক সপ্তাহ পরেই কাগজে দেখা যাবে, গত ৬-৭ বছরের এত গরম পড়ে নাই,—ইত্যাদি ইত্যাদি। পৃথিবীর অল্প প্রান্তে বার্ষিক যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য আবহাওয়ার আর একটা দিক নিয়ে খবরের কাগজ ও রেডিও যে অবিরাম আলোচনা চালিয়েছেন, সেটা খবর হিসাবে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কি না সন্দেহ। তবে শীতের যেত-শুভ্র ব্রহ্মকণা তুষারপাত এখনও পূর্যোগমে চলেছে—এর জন্তে বা কিছু অন্ত্রবিধা ও দুর্গতি সেটিই সাধারণের কাছে সব চাইতে বড় কথা। গত ১৭ বছরের মধ্যে নাকি মার্চ মাসের অর্ধেক দিন পেঙ্গলেও এত ঠাণ্ডা আর তুষারপাত হয়নি।

গত বুধবার, ১ই মার্চ-এর পর এই এক সপ্তাহের ভিতরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩০ জনের প্রাণহানি হয়েছে তুষারের ঝড়ে। নর্থ ক্যারোলাইনা রাষ্ট্রের বহু জনপদ বরফে ঢাকা পড়ে বার, রাস্তাঘাট বন্ধ হওয়ার বোগাবোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অবশেষে পৌর প্রতিষ্ঠান, সেনাবিভাগ ও বিমান বহরের প্রচেষ্টায় জনপদের বাসিন্দাদের খাত সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

১৫ই মার্চ মধ্যরাত্রি হইতে আইওয়া, ইলিনয়, উইসকনসিন, ইন্ডিয়ানা ও মিশিগান প্রভৃতি রাষ্ট্র পুনরায় তুষারপাত শুরু হয়েছে। ১৬ই মার্চ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এই তুষারপাত চলবে, এইরূপ পূর্বাভাস। ইতিমধ্যে চিকাগোতে প্রায় ৬৮ ইঞ্চি তুষারপাত হ'য়ে গেছে। মিশিগান লেকের ধারে মিলওকি সহরে প্রায় ১৪ ইঞ্চি তুষারপাতের সন্ধান। ১৬ই মার্চ সকালে চিকাগোর রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত ধারাপ ছিল। তবে বিকালের দিকে তাগমাত্রা কয়েক ঘণ্টা ২৩-৩৩° ফা° থাকার রাস্তাঘাটগুলি সন্ধ্যার দিকে কিছুটা পরিষ্কার করা সম্ভব হয়। আজ চিকাগোর দুইটি বিরাট বিমানঘাটি মিডওয়ে আর ও'হার একেবারে চূপচাপ, কোনও বিমান উঠা বা নামা বন্ধ।

দপ্তরের হিসাব মত, আগামী চারদিনের মধ্যে বসন্ত ঋতু শুরু হয়ে বাওয়ার কথা। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রহারী মাসের জমা বরফ—না পলে রাস্তার ধারে জুপাকার হ'য়ে থাকার সবাই আকাশের দিকে তাকালে আর সাজসজ্জাহীন শীর্ণ গাছগুলোর দিকেও মাঝে মাঝে তাকালে। একটু গরম পড়বে, যোগ উঠবে। রাস্তার ধারে জমা বরফগুলো পলে নালার ভেতরে যাবে—তার একটা কলকল শব্দ হবে। জড়ি গাছগুলোর ডালে ডালে পাতা ও ফুঁড়ি দেখা যাবে। মাঝে মাঝে হুঁটো-একটা রবিন পাখী ডেকে উঠবে। এই হ'ল বসন্ত ঋতুর আগমন সন্বাদ। যেখানে একটু মাটি বেরিয়ে আছে সেখানে ঘাসের সবুজ দেখা দেখা পেতে এখনও সেরী আছে। ঘাসেরা নাকি উদ্ভিদ জগতের মধ্যে সব চাইতে সৌখিন। ঠিক বোগামত আবহাওয়ার প্রতিজ্ঞাতি না পেলে ওরা মাথা তোলে না। ছোট মাথা তুলতে না তুলতে বুড়িয়ে গিলে হয়ত আর ওঠাই হ'বে না। তার চাইতে বয়ে সরে ওঠাই ভাল। আমাদের মত সাধারণ মানুষের, ঘাসের দৃষ্টান্ত মেনে চলাই ভাল নয় কি?

এই শীত আর বসন্তের মাঝামাঝি সময়টার ভেতরে কয়েকটা জিনিষ লক্ষ্য করার মত। প্রথম সর্দি-কাশির বৃহৎ জাম্বা-জুতো আলগা করে ছ'পুরের একটু পরমে, বাস। তার পর চল চেন রিয়ার্সন। বাড়ীতে একজন ক্যাচ করলে আর রক্ষা নেই। বাড়ী শুদ্ধ, তার পর ট্রায়ে, বাসে, হাটে বাজারে, ইন্ডুল, কলেজে, অফিসে আর আর সর্বত্র একটোটা সবার ওপর দিয়ে হ'য়ে যাবে। মাত্র ছ'-একজন রেহাই পাবে—যারা জানে সর্দিকাশির আক্রমণ থেকে দূরে থাকার কয়েকটা বাঁধাধরা নিয়ম।

শীতের দিনে সাধারণ পুরুষেরা ভেতরে গরম লম্বা আঙুর ওয়ার, গরম স্ট্রট আর তার ওপরে গুভারকোট পরে। সার্টের গলাটা তো টাই দিয়ে একেবারে এঁটে বাঁধা থাকে। স্ট্রটের আর গুভার কোটের মাঝখান দিয়ে স্কাফ'থান (আমরা বাকে মাফলার বা কমকটার বলি) কাঁধ থেকে ঝোলে, গলাটা আরও একদফা ঢাকা দেবার ব্যবস্থা। গরম মোজা তো চাই-ই। অনেকে আবার হুঁজোড়া মোজা পরেন। বুদ্ধিমানের জর সর্বত্র। তুষারপাত শুরু হ'লে চাই গুভারত বা গাম্বুট। প্যাণ্টের তলাটা মুড়ু, তার ভেতরে চুকিয়ে ঝাও। নতুবা বরফ চুক মোজা ভিজিয়ে দিলে হাসপাতালে যেতে হবে। মানাই প্রাণান্ত। খরচে—সেবার নয়। বত একটু একটু গরম পড়বে তত ভারী গুভার কোটের বদলে হাফা টপ কোট তার পর শুণু পশমের স্ট্রট—এই ভাবে কমতে কমতে দেখা যাবে জুলাই মাসে এ্যাসিট্রেটের (সিডের মত জিনিষ) হাফা পোষাক পরে জলের ধারে।

মহিলাদের ছবিটা শীতবস্ত্রের দিক দিয়ে ঠিক অল্পরূপ নয়। কারণ আমাদের খুসীরা—দেশের সর্বত্র মহিলা মহল-এর ঠিক স্বজাতীয় বলা যায় না। পাঁচাতো মা, ঠাকুমা সবাই খুসী-শ্রেণীভুক্ত, অন্তত পোষাকে, কেবল বয়সে তফাৎ। অতএব সামাজিক সজ-পোষাকে শীতের দিনে মেয়েদের কণ্ঠের সীমা নেই। সৌখিন জুতোর ওপর বট পরা চলে না ও পরা যায় না। হাঁটু পর্যন্ত পা খালি। বড়ের দিনে কনকনে হাওয়ার, বাসের জন্তে ৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হ'লেই ম্য'রের জাত পাঁচাতো সভ্যতাকে গালি দিতে কুণ্ঠিত হ'ন না। তবে সামাজিক সভা, সমিতি বা রপ্তরের কাজ ছাড়া মেয়েদের প্যাণ্টের মত পোষাকও চল আছে। তা ছাড়া আজ-কাল হাঁটুর ওপর পর্যন্ত মোজা পরার নতুন ক্যানন হওয়ার কিছুটা রেহাই। এখানে বলা ভাল, পুরুষের কেবল মাথার টুপি ছাড়া কান ঢাকা দেওয়ার প্রথা নেই—বলিও ইয়ার মাপ বা কানের পুঁটলি ব্যবহার মাঝে মাঝে দেখা যায়। মেয়েদের কিন্তু কান মাথা ছাড়া দ্বিগুণে ঢেকে চলার প্রথাই বেশী। শীত কমার সঙ্গে সঙ্গে ম্য'রেরাও ভারী পোষাক ছেড়ে ক্রমে হাফা পরতে শুরু করেন। প্রায়ের মাঝামাঝি পোষাকের পরিমাপ এক কমে যায় যে বজ্রাত্যব, দরিদ্রা না ক্যানন এই ভিনটের মধ্যে কোনটা ঠিক গুলিয়ে যায়। তবে জলের কিনারার 'পোষাকে' সব চাইতে বেশ বাবীনতা। উপকরণে আরও ছ'-একটা কথা সন্ধান করে নেওয়া ভাল।

বাঁদের অপেক্ষাকৃত অবস্থা ভাল, তাঁরা শীতের একশেষের মত হাত থেকে বেহাই পাবার জন্যে একবার দক্ষিণের দিকে ঘোরিডা রাষ্ট্রের হারামি বা টেক্সাস রাষ্ট্রে কোথাও ঘুরে আসেন। বিমানের ভাড়া এদেশে সস্তাই বলা চলে। এই সব জায়গাগুলিতে শীতকালেও তাপমাত্রা ৫০—৭০° ফা থাকে। ভ্রমণকারীদের জন্যেই এই সব জায়গাগুলিতে হোটেলের ব্যবসাই প্রধান। আমাদের অবস্থা হিটা উল্টো, আমরা প্রায়ে বাই দাঙ্গিঙ্গি বা উটি (অনেক বন্ধুর মতে দাঙ্গিঙ্গি নাকি বন্ধি, সেকেন্সে।)।

বাড়ীর ছাদে ছাদে জমা বরফ আস্তে আস্তে গলে পড়তে শুরু করবে। দিনে তাপমাত্রা ৩০।৩৫° ফা থেকে বাত্রে নামবে ২০° ফার কাছাকাছি। সেই গলা বরফের ধারগুলি ইতিমধ্যে জমে বাবে। সকালে দেখা বাবে ছাদ থেকে ঝুলছে জমে বাওয়া জলের ধারা দেখতে সাগা মোমের মত, ওপরটা চওড়া, ঝলছে শিলিং থেকে—নাম আইসিকলস।

বরফ গলে রাস্তাঘাট শিথল ও স্নাতকস্নাতে হয়ে থাকে, প্রায়ই রাস্তার ধারে মেটা গাড়ীগুলি আটকে গিয়ে বিকৃত হয়। কান পাতলেই শুনতে পারে চাকা ঘোরার সাই সাই শব্দ, গাড়ী কিন্তু

নড়ছে না। যদি একমাত্র চালক গাড়ীতে থাকে তবে দুর্ভাগ্যের একশেষ। ভাগ্যক্রমে পথচারী দ্বারা করে ঠেলে ঠেলে তুলে দিলে রাস্তা—নতুন উজ্জার করার জন্যে ট্রাক ডাক তার একশি ২-৪ ডলার। সন্ধ্যার বরফ গলে জল হয়ে জমে থাকে রাস্তার ধারে। গাড়ী দাঁড় করিয়ে গিয়ে দিবি সারারাত বিজ্ঞানি করলে, সকালে এসে দেখলে সেই জল আর তরল নেই, জমে পাথর হয়ে আছে, আর তোমার গাড়ীর টায়ারগুলোকে জাঁকড়ে আছে শক্ত করে। ভাগ্য ভাল হলে একই শাবল দিয়ে কুশিয়ে বেরিয়ে যেতে পার নতুবা পথচারী বা ক্ষয় গাড়ীর চালক একটু ঠেলে দিলে। প্রায়ই দুর্গতির একশেষ। ট্রাককে ডাক—পরশা নষ্ট লাগে। বরফের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে টায়ার আছে, কিন্তু এই সব অবস্থায় তার কমতাত সীমাবদ্ধ।

ছোটবেলার গরুর গাড়ীর ঢাকা আটকে গেলে কাঁধ দিয়ে ঠেলে তুলতে দেখেছি, অবস্থা কাহিনীও আছে ‘পুট ইওর সোন্ডার, টু দি হুইল’। বিজ্ঞানের যুগে হয়ত গরুর শিরোনাম পাটাতে হবে—‘পোর ইওর ডলার আন্ডার দি হুইল’ (Pour your dollar under the wheel) বললে খুব খারাপ শোনাবে না।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের একটি দিক

শ্রীগৌর দাস ও শ্রীবিখনাথ নাথ

সমস্ত বৈষ্ণব কাব্য, অষ্টাদশ পুণ্য, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভূড়িয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্তমান অর্থাৎ যেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াই ঐ সমস্ত প্রবাহনীর রচিত। তাই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সম্পূর্ণ অংশ লইয়া আলোচনা করা এখানে সম্ভব নহে। যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীপ্রেমের বহুহরণ করিয়া সমাজবিগড়িত কাজ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই আবার হস্তিনাপুরের রাজসভায় দ্রৌপদীর বহুহরণ কালে তাঁহার লজ্জা নিবারণার্থে বৃন্দাবন করিয়াছিলেন—এইরূপ একই ব্যক্তির পক্ষে কিরূপে পরস্পর-বিরাধী কাজ সম্ভব হইল তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বৈষ্ণব কাব্য পড়িয়া বসন্তুর জানা যায় বৃন্দাবনের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদিনী ছিলেন। তিনি তাঁহাদের যে বহুহরণ করিয়াছিলেন একথাও শাস্ত্রাভিমুখী সত্য। কিন্তু নারীদের বহুহরণ যে কত অপরাধমূলক কাজ তাহা সকলেই অবগত আছেন। এ যুগে যদি শ্রীকৃষ্ণ কোন নারীর বহুহরণ করিতেন কিংবা ঐরূপ করিবার চেষ্টাও করিতেন তাহা হইলে উত্তমরূপে উত্তম-মধ্যম প্রহত হইতেন এবং পুলিশ কর্তৃক যে পাঁকড়াও হইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে কি সেকালের সমাজে ঐরূপ অপরাধমূলক কার্যের সমর্থন ছিল? কিন্তু মোটেই তাহা নহে। কেননা, বধনই কাল্পনিক দৃষ্টিতে ‘বহুহরণ’ বলিতে নারীদের যে অসম্মানসূচক ‘বহুহরণ’ বলিয়া আমাদের ভ্রম হয় তখনই আমরা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের নিম্নাবলি করিতে প্রসঙ্গের হই। আমাদের সকল শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই সেই ‘একম অমিত্যয়ম্ পুরুষোত্তম ভগবান্’ বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতএব বহু ভগবানের দ্বারা ঐ কাজ সমাধা হইতে পারে না।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদিনী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বর্ধিত ভালবাসিতেন। এই ভালবাসা সাধারণ মানবীয় ভালবাসা বলিতে বাহা বুঝায় তাহা নহে। ইহা ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম। এই প্রেম মাছুষের মধ্যে তখনই সম্পূর্ণরূপে উজ্জ্বলিত হয় যখন মাছুষ বাহ্যিক সকল প্রকার লজ্জা, হুশা, ভয় ত্যাগ করিয়া একান্তই একান্তভাবে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ভূগিয়া তদগতপ্রাণ হয় অর্থাৎ বধন মাছুষ প্রকলাভ করেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত ভালবাসা সত্ত্বেও হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে লজ্জা-ভয় ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বহুহরণ করিয়াছিলেন। কলে দেখা গিয়াছিল, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সন্নিপে নিবারণণ অবস্থায় লজ্জা বশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়, গোপীগণ তখনও সম্পূর্ণরূপে লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে প্রেম নিবেদন করিতে পারেন নাই অর্থাৎ গোপীগণের একান্তবোধে জন্মায় নাই। তথাপি এই প্রসঙ্গে একজন নারীর কথা উল্লেখ করা বাইতে পারে, যিনি আপনাদি লজ্জা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আত্মনিবেদন করিতে পারিয়াছিলেন।

একদা বিদ্বদ-গৃহে বিদ্বদের অল্পপছিত কালে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন এবং বিদ্বদকে আহ্বান করেন। সে সময় বিদ্বদপত্নী গৃহে বিবসনা অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। পূর্বাভাস্য হইতে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের শুনিয়া সেই সরলা রমণী প্রেমের গভীরতা বশতঃ বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সেইরূপই বিবসনা অবস্থায় তাঁহার সমুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কিরূপে আত্মনিবেদন করিতে করিবেন তাহা তাবিরা বন্ধি ব্যাকুল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই রমণীর

এইরূপ গভীর উৎকর্ষ। যেখান নিম্ন অঙ্গ হইতে একবস্ত্র বস্ত্র তাঁহার পরিধানের নিমিত্ত তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে বিদূর স্বয়ং গৃহে উপস্থিত হইলে স্বীয় পত্নীর এইরূপ অশোভন আচরণে কিং-কর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তাহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন ঐক্য বিদূরকে তাহার পত্নীর ঐশ্বরিক প্রেমের গভীরতার স্বার্থ বুঝাইয়া দিয়া তাহার পত্নীকে নির্দোষ বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিলেন এবং ইহাতে বিদূর তাহার পত্নীর পরম সৌভাগ্য মর্শনে আত্মীয় বিমূঢ় হইলেন। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রকার লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করিতে হয়, মহাত্ম্যরতে বর্ণিত তথ্যকথিত 'বহুহরণ' এষ্ট শিক্ষাই দিতেছে। সুতরাং সকল শাস্ত্রে ঐক্যচরিত্রের আভ্যন্তরীণ সত্যতা যে রূপকল্পে বর্ণনা করা হইয়াছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ ঐক্যচরিত্র ব্যক্তি করিতে কেন রূপকের সাহায্য গ্রহণ করিলেন সে কথা এই প্রবন্ধের উপসংহারে কিছু আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে জ্যোতিষীর বহুহরণ প্রসঙ্গে আসা যাক।

অর্জুন ছিলেন অবিভীষী বীর। তিনি ক্রপণ-গৃহের বয়স্ক-সভার লক্ষ্যভেদ করিয়া জ্যোতিষীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ পত্নীলাভ অর্জুনের এক অধ্যাত্ম শক্তিলাভের প্রচ্ছন্ন পরিচয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, নাতীই পুরুষের শক্তি। যখন কোন ব্যক্তি অধ্যাত্ম শক্তিতে পারদর্শী ওক দ্বারা আদিষ্ট হইয়া আত্মার উন্নতি-মূলক কার্যে লক্ষ্যভেদ করিতে পারেন তখন তিনি এক অক্লান্ত অধ্যাত্ম শক্তি লাভ করেন। এই শক্তিলাভ করার পরেও যাহার কার্যে ক্রোধ প্রকৃতি বিশৃঙ্খলের দ্বারা নিখ্যাতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সেই হেতু অর্জুনপত্নী জ্যোতিষীকেও হৃদ্যাসন নির্ধাতন করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে হৃদ্যাসনের পরিচয় সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞানসিদ্ধি দাখিয়া যায়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, হৃদ্যাসন অর্থে যাহাকে শাসন করা যায় না অর্থাৎ সেই রিপু

শ্রেষ্ঠ কাম। হৃদ্য চরম অধ্যাত্মশক্তি লাভ করিতে না পারিলে এই প্রবলতম কামরিপুকে শাসন করিতে পারে না। সুতরাং অর্জুনপত্নী জ্যোতিষী যে হৃদ্যাসন বর্জিত নিখ্যাতিত হইয়াও ঐক্য কর সহায়তার রক্ষা পাইয়াছিলেন, ইহার অর্থ এই যে, অর্জুন নামক ব্যক্তির অধ্যাত্মশক্তি কামরিপু দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাঁহারই অন্তর্নিহিত পরমাত্মা অর্থাৎ ঐক্যকর্তৃক সেই শক্তি রক্ষা পাইয়াছিল। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, ঐক্য, অর্জুন, জ্যোতিষী, হৃদ্যাসন প্রত্যেকেই এক একটি রূপক চরিত্র। আমাদের শাস্ত্রকারগণ রূপকের আশ্রয় লইয়া অধ্যাত্মবস্তুর নিগূঢ় স্বার্থ সকল শাস্ত্রের মধ্যে পরিবেশন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই সকল চরিত্রে ঐতিহাসিক সত্যতা অল্পসন্ধান করিতে গেলে আমরা বিশেষ কিছুই পাইব না এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে হারাষ্টাই। তুল পক্ষে অল্পের মত অল্পগমন করিব।

এতাবৎ আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, পূর্ব-কথিত ঐক্যকর্তৃক গোপীগণের বহুহরণ ও জ্যোতিষীকে লজ্জা নিবারণার্থে বস্ত্রদান আপাতঃদৃষ্টিতে পরম্পর-বিরোধী কার্য মনে হইলে উভয়ই এক উদ্দেশ্যমূলক। এই কার্যাবলীর মধ্য দিয়া বহুহরণ ঐক্যকর্তৃক মানবের মুক্তিমানেয় উদ্দেশ্য দিয়াছেন।

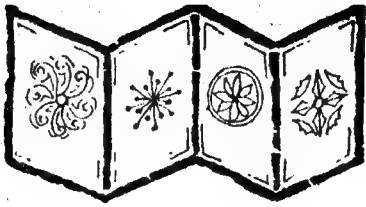
উপসংহারে শাস্ত্রে কেন রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করা যাক। আমাদের সকল শাস্ত্রেই অধ্যাত্মবাদের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতেকে। এষ্ট কঠিন বিষয়ও সকলের পক্ষে সমাজ গ্রহণযোগ্য নাহে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ রূপকের সাহায্যে উহাকে সহজ গ্রহণীয় করিয়াছেন। এইরূপ হালকা বসের মধ্য দিয়া পরিবেশন উহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। জোর করিয়া বলিলে অত্যাচার করা হইবে না। যে পৃথিবীর সকল মর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা একমাত্র ভাওতীয় মর্শনশাস্ত্রই অধ্যাত্মবাদের এইরূপ নিগূঢ় ভাবের পরিচ্ছন্ন প্রকাশে সকলকাম হইয়াছে।

বিদায় প্রার্থনা

বন্ধে আসী মিয়া

হয়েছে সময় এত দিনে
এইবার বেতে হবে চলি।
ভাক মোরে অরণ্য পর্বত
হারি-খন ভামল প্রান্তর,
সুবিলাল বটতরু মেলি শতবাহ
বারবার করিছে ইশারা—
বাবো হোখা চলি।
নাই সেখা জনতার স্কন্ধ কোলাহল
হানাহানি স্বার্থ-শব্দনিয়।
হোখার প্রথর বোঁজ—জীবন-সঙ্গায়
বিকৃত তদুন্নয়ন
জানি বিবশ—
পারি নাকো আর।
জননী বহুদয়া, করা কহো বোঝে
আজ আমি যাঁচি আশ্রয়।

এত দিনে হয়েছে সময়।
পাঁচুর হয়েছে নভ—প্রদোষ এখন
এইবার বেতে হবে
ভামল বনানী ঢাকা
তরুহার-ভুলে।
বানপ্রস্থ দিন মোর এসেছে জীবনে,
কদিনীর বিবহালা দৃষ্টিতে নিঃশব্দ—
দিনে দিনে ক্লেশ হলো মন।
ক্লান্ত আমি পরাজিত—
এইবার মুক্তি চাহি
তোমাদের সবারই কাছে।
চলে বাবো অরণ্য-গহনে
বাঁধিব একটি নীড়—রহিব সেখায়
কিবিব না আর।
সময় হয়েছে এত দিনে, চলিছ এয়ার।



পত্র



মহাকবি গ্যেটের প্রেমপত্র

[পত্র দ্বারা সংখ্যায় এই লেখকের অন্তিম গ্যেটের পত্রাবলী আপনারা পড়েছেন। সে পত্রগুলি কবির প্রেমিকা ও প্রেমিকার স্বামীর কাছে লিখিত। আলোচ্য পত্রাবলীতে যে-সকল প্রকাশিত হল, সেগুলো প্রেমপত্র। তবে শার্লট বাকের যত এ প্রেম একতরফা ছিল না। কেটনারের মত এ প্রেমিকার স্বামী কৃষ্ণ ও ক্ষুণ্ণবিশ্বাস ছিলেন না। গ্যেটের নিজের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, শ্রীমতী ক্রাইস্ট ভূমি জ্বায়েন কবির পূর্ব প্রেমস্বামীর মাতার এবং ভগিনীদের স্থান অবিকার করেছিলেন। শ্রীমতী জ্বায়েন ছিলেন সাত সন্তানের জননী। ভাইমার রাজসভায় শ্রীযুক্ত জ্বায়েন অস্বাভাবিক বাকবিত্তি করেছিলেন। গ্যেটে অপেক্ষা শ্রীমতী জ্বায়েন আট বছরের বড় ছিলেন। শ্রীমতী জ্বায়েন লিখিত কোন পত্রই পাওয়া যায় না। শ্রীমতীর সঙ্গে গ্যেটের চুক্তি ছিল, শ্রীমতী বর্ষক গ্যেটকে লিখিত পত্র নষ্ট করে দিতে হবে। প্রেমিক কবি তাঁর সর্ব সম্পাদন নিষ্ঠা সহকারে করেছিলেন। শ্রীমতী জ্বায়েনকে গ্যেটে সমগ্র তুচ্ছতম ঘটনাগুলো লিখে পাঠাতেন হরত একটুকরো কাগজের মধ্যে। প্রায় দশ বছরব্যাপী এক উচ্চ অমুরাগ শ্রীমতীর সঙ্গে গ্যেটের বর্তমান ছিল। জ্বায়েন অল্পদিন সিংহাসন ছিলেন। ক্রমিক সংখ্যা অমুরাগী গ্যেটের এটি পঞ্চম প্রণয়। চতুর্থ প্রণয়ের পাত্রী শার্লট বাকের কাছ থেকে প্রেরিত হলে গ্যেটে লিখির প্রেম পড়েন। লিখিত কবিকে ভালবেসেছিল। প্রতিবন্ধক ঝগড়াল আত্মীয়জন। ভাইমার রাজসভায় শেষে গ্যেটে চলে যান। শ্রীমতী জ্বায়েন জ্বাড়া আরও দুই বার কবিকে উদ্ভাস্ত করেছিল। একত্রে তিন রমণী কবির জীবনে আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রথম জন শ্রীমতী জ্বায়েন, দ্বিতীয় জন অভিনেত্রী কারাগা শোবটার—ইনি অভিনয়ে ও কয়েকটি ভাষার ব্যাপ্তিস্থান করেছিলেন। তৃতীয় জন হলেন মার্চেসা শ্রাবকণি। অভিনেত্রী কারাগা শোবটারের সঙ্গে কবি স্বরচিত নাটক ইকিতনীতে এক আবগমর ভূমিকার সাক্ষ্যের সহিত অভিনয় করেন। শ্রীমতী জ্বায়েন এই মেলায়মাশে দেখে ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। মার্চেসা শ্রাবকণিকে কবি উপেক্ষা আর অনীহা দিয়ে জড়িয়েছিলেন; তাব সে-প্রেম কবির নাতিখাল উঠেছিল। শ্রীমতী জ্বায়েন দ্বিতীয় হয়ে তাঁর বখান তাঁর অন্তরিতে গ্যেটে ইটালীতে চলে যান, এই অবৈধ প্রণয় ছিন্ন করবার জন্য ইটালী ভ্রমণান্তে ক্রিশ্চিয়ান তুলপিয়ারের সহিত গ্যেটের অবৈধ সম্পর্ক দেখে শ্রীমতী জ্বায়েন আরও মরায়া হয়ে ওঠেন। শেষে সম্পর্ক ছেঁদ পড়ে। ক্রিশ্চিয়ান তুলপিয়ার অতি নগণ্য যত্নের বন্দী ছিলেন। গ্যেটে প্রথমে এই তথ্যলোক পরিচরিকার কাজে নিযুক্ত এবং অবশেষে বিবাহ করেন।—সম্পাদক]

কোন নিয়তির চরণায় জড়িয়ে পড়েছি এত কাছাকাছি।
আমাকে কেনেছ তুমি একটু দৃষ্টে। বা তুমি কেনেছ তা কেউ
জানে নি বা কেউ জানতে পারে নি। তুমিই আমাকে পরিচালিত
করতে পার। অস্বস্থ বন্ধপ্রবাহে তুমিই সাহায্য আমার। তোমার
বাঁহায়ে আমার শান্তি।

শ্রীমতী জ্বায়েনকে লিখিত গ্যেটের পত্রাংশ।

আমরা কোন ভাষে বোধ হয় স্বামী দ্বী দ্বিগাম। তা না হলে
আমরা জীবনে এরমণীর কী গুণ সার্থকতা থাকতে পারে।

ভাষ্যাত্মক লিখিত শ্রীমতী জ্বায়েন বিষয়ে গ্যেটের পত্রাংশ।

এ মহিলা আমার জীবন থেকে জ্বায়েন আবরণ দূর করে দেয়।

ল্যাটটরকে লিখিত শ্রীমতী জ্বায়েন বিষয়ে গ্যেটের পত্রাংশ।

গ্যেটে কর্তৃক শ্রীমতী জ্বায়েনকে লিখিত

মার্চ ১৭৭৬

কুয়াশার আর ত্বায়ে তোমার জন্ত ফুল তুলি। আমার প্রেম
যে কীরকম বড় আর শৈত্যে পরিব্যাপ্ত। আজ আমি আসতে
পারি। আমার মনে শান্তি আছে। আমি বেশ ভাল আছি।

আমার মনে হয় আসেগের চেয়ে আমি তোমাকে ভালবাসি।
আর এর তাৎপর্য আমি নতুনভাবে অধ্যয়ন করি। ইতি

২৪ মার্চ ১৭৭৭

যে আমার মানসী, আমার বিলাস জানাই। আমি বুকতে
পারছি যে প্রেম হল মাটিতে শত ইড়ানোর মত অলক্ষ্যে কেনে
ওঠে বুকলিত হয় তারপর বিকশিত হয়। এ সব বন্ধকে বেশ
ভগবান আরও আশীর্বাদ জানান। ইতি

২২শে জুলাই

পাহাড়ের অন্তরিক্ত আমি ছবি আঁকছিলাম। আর ভাল
লাগছে না। আমার ঘর থেকে দেখাই ভাল। এখানে বিজ্ঞানের
জন্ত কিছুদিন থাকতে চাই। প্রিয়তম, কত ছবি আমি এখান
থেকে আঁকেছি। তবু স্পষ্ট বৃত্তে পারছি, জীবনে শিল্পী হতে
পারব না। প্রেম আমাকে সব কিছু দেয়। যেখানে প্রেম নাই
সে স্থানটি আমার কাছে আগাছার স্থান বলে মনে হয়। আর
এ সব আগাছা শত নয়। বর্ণাঢ্য ছবি আমি আঁকতে পারি না।
তবে নিখুঁত নিরাবরণ ছবি আমি সহজে আঁকতে পারি বেশ
মনোহরভাবে। পত্রের মনে বর্ষা নামছে। তুমি যদি এখানে

তাহলে ছবি ত হার। সব কিছু চলে যেত বর্ণনার বাইরে।
এখানে আসবার পর অনেক ছবি আঁকেছি। ছবিগুলো নগণ্য।
চোখ দিয়ে, হাত দিয়ে পরখ করলেও তা অল্পের সাড়া দেয় না।
তাই আর দেখবার কিছু নাই। যে কেউ কবি হোক, শিল্পী
হোক বা মানুষ হোক নিজেকে সন্তুষ্ট করা এক চিরন্তন সত্য।
প্রয়োজন, ভালবাসা, কতগুলো বস্তুকে অবলম্বন করে কোন কিছু
ঘরে থাকা, কোন জিনিষকে সব দিক থেকে দেখা এবং তাদের সঙ্গে
এক। অনুভব করা এক চিরন্তন সত্য বিদায়। খাড়া পর্বত আর
পাইনের বনের দিকে আমি তাকাব। এখনও বাদল বরষে।

ইতি

3rd May 1777

শুভ সকাল! গতকাল কেমন ছিল। ভূত আমার জন্ত
একটা ওয়ালেট বানাল। তারপর নীল রঙ-এর পোষাক পড়ে বাইরে
বার হলম। প্রথমে বেশ শুকনো আবহাওয়া ছিল, তারপর ঝড়
বালদের মধ্যে বেশ বহুলগতিতে চললাম। দেহাতে বুম আমি
পছন্দ ছবি না। তোমার ঘামি যদি গৃহে থাকেন তা হলে বল
নতুন ঘোড়াকে বাগ মানাতে আমি চেষ্টা করব অবশ্য তিনি যদি
বল্গা লাগিয়ে আমার কাছে ঘোড়া পাঠিয়ে দেন। সম্ভবতঃ তিনি
তার রূপ আমার মধ্যে দেখবেন। প্রিয়তম, মধ্যাহ্ন ভোজে হয় ত
তোমার কাছে আমি যেতে পারি। তোমাকে আগামী কাল
ফুলের শুভক দেব বলে এক সপ্তাহব্যাপী আমি ফুল বাছাই
করেছি। ইতি—

12 June 1777

ঘরের বাইরে বাগানে তুমি বখন আমাকে ছেড়ে গেলে তখন
আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কিছু ঐশ্বর্য আছে। কর্তব্য
পালনের কিছু আছে। আমার জন্ত সব তুচ্ছ বাসনা, বিস্মিত ভাব
প্রেরণাত চাপসা বিস্মিত আকারে প্রকাশ পেয়ে তোমার জীবন
বৃত্তিই আমার প্রেম করে যায়। বার কলে আমার বরুপকে আমি
চাপিয়ে নিয়ে বাই, কিন্তু বখনই তুমি দূরে থাক তখন সব কিছুই
আমার ঘুলিসাং হয় পড়ে। বেলভিডিয়ায় আজ সকালে গিয়ে
রাঁহ খবে সেখানেই খেয়েছিলাম। সেখানে আমার এক পরিচিতের
তনয় উপস্থিত ছিল। রাজা খাসা হয়েছিল লিখে চলছি। হাতে
আঠা লেগেছে। গাছ-গাছালির পরিচর্যা আমি করছি। ঝড়-
পড়তি সব ঠিক করে দেব। চিকিৎসার জন্ত গাছগুলি বহুদিন থেকে
বেন কাঁচছে। গাছগুলির বৃদ্ধি আমি দেব। কবি আর প্রেমিক
হালী পড়তে পারে না। কারণ হল, কবির প্রেমিক আর না হয়
প্রেমিকের কবি। বিদায় প্রিয়তম। তুমি সর্বদা আমার হও
কারণ আমি যে তোমার। আমার জীবনের ঐশ্বর্য, বিদায়। ইতি—

13 Sept. 1777

প্রিয়তম, ওয়াটবোর্গে এসেই ঈশ্বরের স্তোত্র করেছি—বিনি নানা
দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে থেকে আমাকে তুলে ঐশ্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত
করেছেন উদ্ধারনে। ভিউকের প্রস্তাবে আমি এখানে চলে এসেছি।
হানীর লোকের সঙ্গে আমার করণীয় কিছু নাই। এই সব জোক
হয় সত্য ভাল। তবু তারা আমার কাছে নাই। তাদের মধ্যে
অনেকে তবে যে তারা আমাকে ভালবাসে। এটা অবশ্য সত্য নয়।

প্রিয়তম, এই রাতে গৃহে তুমি আসীন হয়ে আছ এই কথাটা ভাবছি।
তুমি জ্যোৎস্নাপ্রাণিত রাতে আশ্রনের ধারে শীতে বসে আছ এই
কথাটাই আমি বলনা করছি। এখানকার শীত শু স্যাংসোতে
আবহাওয়ার মধ্যে বাগান ছেড়ে আমাকে থাকতে হবে। দূরে। সেই
বাইরের দৃশ্য যদি তোমাকে আজ দেখাতে পারতাম। এই নয়নাভিরাম
দৃশ্য দেখার জন্ত কোন কিছু খরচ নাই। শুধু আসন ছেড়ে উঠে
দাঁড়িয়ে দেখলেই হল। কত প্রশস্ত উপত্যকা, প্রান্তরের স্তর, বন,
অরণ্যানী, বালিরাড়ী প্রভৃতি চন্নিমার কোমল কিশল উদ্ভাসিত।
পর্বতের দুর্গপ্রাকার ছাড়া আর সব আঁধারে ছেয়ে গেছে। এমন কি
পর্বতের সাহস্রশে অন্ধকার। শুধু পাহাড়ের চূড়াগুলি চন্নিমার
আলোর রাজ্য হয়ে উঠেছে। নিয়ে জল বিভাজিকা আর উপত্যকা।
প্রকৃতির এর পরই ষরলিয়া বনভূমি, প্রিয়তম কী মধুর এ
আনন্দ। যদিও এ আনন্দ থেকে আমি কিছু পাইনি। মনে হচ্ছে
কতকাল বাঁধা পড়েছিলাম। আজ আমি হাত মেলে মুক্ত হচ্ছি।
ধন্বাদের স্পর্শ এসেছে। তৃকর্পণ আমি জলপান করে মনোরম
প্রভৃতি আকর্ষণ ও বসন্তের প্রতি আমি তাকাচ্ছি। একটা ছোট
কোণ খুব একটা ছোট কোণ আমি বেছে নেব। দার্শনিক প্রকৃতি
এখানে উৎসাহিত। তারপর সেই ছোট কোণ। আঃ। এসব
কিছু বর্ণনা দিতে নাই, লিখতে নাই। এই অবসরে তোমাকে
আবার জানাই যে আমি বেঁচে আছি। সত্যিই তোমাকে ভালবাসি।
তা হলে আমি যে কত সুখী হব। আমার এই নিঃসঙ্গতাকে সন্তান
দেবার জন্ত নিশ্চয়ই অল্প একটি পক্ষে মন দিয়ে তুমি আনন্দ পাছ বা
আমাকে তুমি নিশ্চয়ই লিখছ।

ইতি—

14 Sept 1777

একটা চিন্তা জেগেছে আমার মনে। আঁকা হচ্ছে আমার কাছে
খেলনার মত—যে খেলনা একটা শিশুর মুখে গুঁজে দেওয়া
হয়েছে শান্ত করবার জন্ত। এই স্থানটি খুব মনোরম। এত
মনোরম স্থান এর পূর্বে আমার জানা ছিল না। দুস্তের শিখরের
একটা শান্ত উল্লেখ আছে। যে সব অতিথি এখানে আসে
তারা মোহিত হয়ে পড়ে। তোমাকে চিঠি লেখার জন্ত কত
পত্রই না নষ্ট করলাম। কী বুঝা প্রচেষ্টা প্রাচীন শিল্পীদের
কথা ভাবলাম, বারা ধনসাবণের ওপর মহাকালের মত বসে
সব কিছু নীহারেখাকে রেখাঙ্কিত করেছে, মানুষের নর আবরণকে
প্রকৃতির মধ্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। মহাকালের গোপন পথবাক্স
আর তার প্রয়োজনীয়তা মানুষ ও শিল্পীর কাছে কি তা বোধ
হয় ঈশ্বর জানেন। আমাদের মধ্যেই যে ঈশ্বর, একথা আমি বেশ
ভালভাবে জানি। তবে কী ভাবে তা আমি প্রকাশ করব। দাঁত
সাড়ে এগারটা। শহর থেকে আমি এখানে ছোট এসেছি। মনোরম
রাত। চন্দ্রালোকিত রাতে দুর্গে উঠতে কী শিহরণ যে লাগে। বখন
ভিউক এখানে এসেছিলেন তাঁকে এক কথা বলেছিলাম, আমাদের
জীবনে কী এক অদ্ভুত পরিবেশ এসেছে। এক মাস আগে এখানে
থাকবার কথা বলে অস্বাভাবিক হতাম। এখন সব স্বাভাবিক বলে মনে
হয়। এটা গৃহের মত মনে হচ্ছে; পাখীর কাছে যেমন নীচ
মনে হয়।

আমার কাছে কতগুলো দুঃখ সজীব গাছ এসে পৌঁছেছে।
সেগুলো চেঁচী এবং নানান ধরনের গাছ। বখন যে এগুলো তোমার

পূর্নগৃহে পৌঁছাবে। সবচেয়ে চারপাশগুলো পুঁতবে এক বেশ সবচেয়ে রাখবে। চারপাশে বেশ শক্ত কাঁটাগাছের বেড় দিও, তা না হলে ধরপোশ সব নষ্ট করে দেবে।

গতকাল তোমার কাছ থেকে কিংবে এসে আমার মধ্যে একটা চিন্তা পেয়ে বসছে। সে চিন্তার প্রথম কথা হল আমি কী তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসি বা তোমার যে সাঁজুবা চাই। লোকের চেয়ে থাকে দর্পণের কাছ থেকে। আমি বুঝতে পারছি সত্যিই তোমাকে আমি দর্পণের মত ভালবাসি; তার প্রতিফলন থেকে আমার সমস্ত সত্যকে স্পন্দিতভাবে প্রতিকলিত হতে দেখি।

তারপর ভাবছিলাম, আমার ভাগ্যজালকে কী ভাবে মাটির সঙ্গে রোপণ করা হল। গাছের সজীবতাই বা কী ভাবে এল। তবু এই সজীবতা না থাকলে গাছ যে মরে যায়। তবু কয়েক বছরের জন্ত জন্তের মত সে গাছগুলো ঝাড়িয়ে থাকে, কয়েক বছরের জন্ত। বিদায়! হঠাৎ গত বছরের ৭ই নবেম্বরের একটা দেওয়ালপত্রী দেখলাম। পড়লাম, যে ঈশ্বর, মানুষ কে, যার প্রতি তুমি এত করুণাময়। ইতি

12th May 1779.

সত্যি কথা বলছি, তোমার কাছ ছেড়ে দূরে আমি থাকতে পারি না। আমি একটা ছোট কাঠের টুকরো। একই স্থানে আছি, আর বার বার টেউ আমাকে ঘুরে দিচ্ছে। প্রবাহিত হওয়ার জন্ত জলের আর প্রয়োজন নাই। তোমার জন্ত কতগুলি কল ও ফুল পাচ্ছি। আমার কথা চিন্তা কর। ইতি

7. 9. 80

হার্জ পর্বত থেকে লিখছি। দিনটা উজ্জল ও স্বচ্ছ। রাত্রে অল্প বাতাস বইছিলো। আজকের আবহাওয়া ভাল যাবে। বাতায় পূর্বে তোমাকে শুভ সকাল জানাই—ইতি।

আমার কাছে তোমার প্রেম প্রভাবীতার মতন, সম্ভাটার মতন। একতারা সূর্য্য অন্তরালে বাবার আগে ওঠে অজুটি সূর্য্য অল্প অল্প জাগবার আগে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কী এ হল প্রবর্তা—যে তারা কখনও ওঠে না। এ শুধু আমাদের মাথার ওপরে নির্যাবরণ মালা গেঁথে চলেছে। প্রার্থনা করি, জীবনের পথে ঈশ্বর যেন এ তারারটিকে মনোনিপুণ না করেন। বসন্তের প্রথম বর্ষা আমাদের কর্ণশূচী হরত নষ্ট করে দিতে পারে। তবে তা গাছগুলোকে সজীব করবে এবং অল্পদিনের মধ্যে জাম সমারোহ আমরা দেখতে পাব। একসঙ্গে এত মনোরম বসন্ত এর পূর্বে উপভোগ করি নি। এ বছর শরতে যেন রূপান্তরিত না হয়। বিদায় আমার প্রিয়তম! ইতি

28. 4. 1781

আজকের এই আবহাওয়া তোমাকে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে আর মনে হচ্ছে যে তোমার অন্তর আমার কাছে এসে আনন্দে পূর্ণ দলে বিকশিত হতে চাইছে। আমার বল প্রিয়, কেমন বুঝ হয়েছে তোমার? আজ বিকেলে আসবে ত? তোমার সঙ্গে কে আসবে? বিদায়। তুমি আমার অনন্ত সুখের উৎস। ইতি—

19-12-81

তোমাকে একখানা জমপকান্দী পাঠালাম। কাহিনীর সূত্র্য অংশ পর্য্যন্ত পড়েছি। জীবনের গর্তনদ্বিত্তে এসে এভাবে সূত্র্য

বরণই মহৎসের কাজ। যে মানুষ ঈশ্বর সে নিজের জন্ত বা অপরের জন্ত বাঁচতে পারে না। বিদায়। তোমার কাছেই আমি আছি। তোমার মহন্ত আর প্রেম হল সেই বায়ু বা আমি খাসপ্রাণে গ্রহণ করি। ইতি—

14-2-82

আমাকে একটা কথা শোনাও জটা। তোমার প্রেমে আমি বুঝি যে আমি পথে প্রান্তরে বা তাঁবুতেও যদি বসবাস করি তবে মনে হবে যে আমি শুষ্ক ভিত্তিক গৃহে বসবাস করছি এবং সেইখানে নিরাপদে মরতে পারব এবং সেখানে জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য রেখে যেতে পারব। বেলা দশটার ঠিক পূর্ব হুহুর্ন্তে তোমার কাছে গিয়ে বিদায় নেব, তোমাকে দেখতে বাব। তোমার কাছে এখন বিদায় বলতে পারি না, কারণ তোমার কাছ থেকে সরে আমি এখনও অস্ত্র কোথাও বাই নি। ইতি—

কতগুলো টুকরো প্রকাশ :—

রজনী আর প্রভাত বেখানে একাকার হয়ে আছে সেই তোমার কাছে আমি অনতিবিলম্বে পৌঁছাব। তোমার জীবনের নিশ্চরতা আমার জীবনে স্বপ্ন জাগিয়েছে—নতুন ও পুরোনো জিনিষের কত নানা সংমিশ্রণ, কিন্তু তুমি আমার চিরকালের নতুন হস্তন। ইতি—

আজকের সকাল থেকে তুমি আমার কাছ হাড়া। জীবন, মৃত্যু, সাহিত্য গঠন, সরকারী কাজ প্রভৃতি তোমার কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তুমি বরক এই আমি চাই। তা হলে শীতের স্মৃতি আর তোমার করুণার কাহিনী ভেঙ্গে ওঠে। বিদায়! আমি তোমার জীবনের স্বপ্ন। আমার হৃদয়ে একটু ব্যথা দূর কর। আগামীকালে চা-পর্ব্ব আহবান করে মজলিস জমাব। ইতি—

অভিনেত্রী করোণা স্রমধুর হয়ে গান গাইছিলো। সে স্রব অত্যন্ত সুস্রাব্য। কিন্তু আমার চিন্তা তখন তোমাকে কেন্দ্র করে ঘুরছিল। গানো মানুষের কণ্ঠস্বর না থাকা যেমন অস্বাভাবিক সেই রকম আমার জীবনে তোমার অভিব্যক্তি না থাকা অস্বাভাবিক। আগামী কাল আমরা দুজনে আর একটা দিন বাড়িয়ে নেব। তুমি যদি অস্ত্র কোথাও বাও তা হলে আমি বাঁধাতে থাকব। সহস্রবার বিদায় বাচ্চনী। ইতি—

17-6-84

আমার চিঠি পড়ে বুঝবে আমি কত একা। আহা! আর কোর্টে আমি করি না। হু—একটা লোক আসছে আর বাচ্ছে—এই আমি দেখছি। পৃথিবীর স্রব্দর স্থানে তোমাকে আমি উদ্ভাসিত দেখতে চাই। তোমাকে ভাল না বেসে থাকতে পারি না। এতে আমার ভাল হয়। তোমাকে চোখে দেখলে আরও খুশী হব। তোমার সাবুজ বিবরে আমি সচেতন। তুমি যেখানে থাক সেখানে আমি উপস্থিত থাকি। তোমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত নারীকে আমি পরিমাপ করি। তোমার মধ্যে সবকে আমি দেখতে পাই। তোমার প্রেমে আমি নির্ভারণ করি আগামী দিনের পরিমাপকে। তবে তা এই ভেবে নয় যে পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ তোমার মধ্যে আমার কোন কিছু অপরিচিত হয়ে থাকবে। বলতে গেলে তোমার প্রেমে সব কিছু পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রকে সহজে বুঝি। তাদের

পরিকল্পনা, কাজ, আনন্দের অমুভবন করি। তাদের বা আছে সে বিষয়ে অসন্তোষ জানাই না। তবে তুলনা করে একটা আনন্দ পাই। আমি যে ভোলায় বহু ঐশ্বর্য পেয়েছি।

বাড়ীর কাজেও যেমন তোমাকে অমুভব করি সেই অমুভব তুমিও কর, বস্তু-বিষয়ে আমিও অজ্ঞ থাকি। কারণ বস্তুর স্বরূপ আমরা জানি না, আর বস্তুর দিকে নজরও দিই না। বস্তুর রহস্য আমরা বুঝতে পারি 'বস্তু বস্তুর স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারি। আমরা সময়েত তত্তে চাই। নিজব্যক্তি সব কিছু সু-সম্মত করে সব কিছু শৃঙ্খলায় এনে এবং সেগুলি স্বার্থাধীনে নিয়ে আসে সরলীকরণ মারফত। ইতি

1.9.86.

কালস'বাদ হতে বিলার, এক ভদ্রমহিলা তোমাকে হয়ত এই চিঠিটা দেবে। সে ভদ্রমহিলা তোমাকে বা বলবে সে বিষয়ে তোমাকে আমি আর কিছু বলত না। সহজভাবে তোমাকে বলছি আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি যখন অজ্ঞত চলে গিয়েছিলে তখন আমি ব্যথা পেয়েছিলাম। তোমার আনন্দের প্রতিশ্রুতি আমাকে আবার উজ্জীবিত করেছিল। নীরবে আমাকে অনেক কিছু সইতে হয়েছে। আমার সব চেয়ে সেরা বাসনা ছিল যে আমাদের সম্পর্ক পুনরায় স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং অত কোন শক্তি তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যে কোন সূত্রে আমি আর তোমার কাছে থাকব না। যে দেশে অর্থাৎ যে বিশেষে আমি থাকি সেখানে নীরবে জীবন কাটা। আমাকে ভালবেস। আমার সব কিছুই তোমার। আশা করি অনতিবিলম্বে আমি তোমাকে লিখব। আবার। ইতি—

আজকের সকালে সব কিছু আলাদা বলে মনে হচ্ছে। বাইরে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখি এক তুষারের আশ্রয়ণ। এটা ক্রুদ্ধের মত মনে হল। ঝাড়াই পাঁহাড় হ্রদের পাড় থেকে উঠেছে মনে হল। এ লুপ্ত সমন্বিত ছবি আমি এঁকেছি। ছবিটা যদি নষ্ট না করি তা হলে তুমি দেখতে পাবে। গতকাল আমি চমকিয়ে উঠেছিলাম। দিনপঞ্জীতে আঁকার কথা ছিল। তোমাকে যে ক'খানা ছবি পাঠিয়েছি তাছাড়া আর কিছু আঁকি নি। বিলার। তুমি আমার কথা ভাবছ—এ আমি জানি, তা না হলে তোমার কথা আমি অহরহ ভাবতাম না। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। এ আমি অমুভব করি, কারণ তুমি যে আমাকে ভালবাস। ইতি—

তোমার চিঠির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে সে চিঠি বহু দিক থেকে আঘাত দিয়েছে। উত্তর দিতে আমি ইতস্তত করেছিলাম, কারণ এ সব ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হওয়া শক্ত এবং আঘাত না দিয়েও থাকা যায় না।

ইটালী থেকে কিরে এসে বুকেছি, প্রমাণ পেয়েছি যে, তোমাকে আমি কত ভালবাসি এবং আরও বুকেছি তোমার প্রতি, তোমার সম্ভাবনার প্রতি আমার দারিদ্র কতখানি। ডিউক যদি এখানে থাকেন তা হলে আমাকে এখানে থাকতে হবে.....তোমার সম্ভাবনা ও তুমি হাড়া পৃথিবীতে অত কোন বস্তু আমার কাছে ছিল না। ইটালীতে আমি যা কেলে এসেছি তা পুনরায় বলবার আগে। ইচ্ছা জানায় নাই। এ বিষয়ে আমার আস্থা যে কতখানি তা

তুমি বহুদলভ মনোভাব দিয়ে দেখনি। আমি যখন পৌঁছাই তোমার মনের অবস্থা সে-সময় ছিল অদৃষ্ট ধরনের। আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমি খুব ব্যথা পেয়েছিলাম—যে ভাবে তুমি এবং আরও বহুজন অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। একটা শূন্য আসন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অস্বাভাবিক বস্তুদের খাতিরের আমি সেখানে ছিলাম, কারণ এ সব বস্তুদের জন্তও ত আমি কিরে এসেছি। তবু সে সময় বার বার কড়া কথা শুনেছিলাম। যুবলীম সকলকার সহযোগিতা হারিয়েছে; সে স্থান হয়ত পরিত্যাগ করতাম সেখানে, হয়ত এর পূর্বের এক সম্পর্কের সূত্র। তোমাকে আঘাত দিয়েছি।

এ সম্পর্কটা কী? এতে কার ক্ষতি হয়? সেই হতভাগিনী নারীর প্রতি আমার যে মনোভাব তার দাবী করেই বা কে? কতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেছি?

ক্রিটজকে ২ প্রশ্ন কর, শ্রীমতী হার্ডারকে প্রশ্ন কর, যে আমাকে জানে এমন যে কোন লোককে প্রশ্ন কর তা হলে বুঝতে পারবে তা হলে বুঝতে পারবে বস্তুদের প্রতি কী আমার কম সহানুভূতি, কম ভাবসংকরণ, কম তৎপরতা প্রদর্শন করি? আর যদি তা না হয়, আমি জানি না তাদের সঙ্গে, আমার সমাজের সঙ্গে কী ভাবে আমি জড়িয়ে আছি। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের যদি ছেদ পড়ে তা হলে সেটা রহস্য হয়ে পড়াবে। তুমি যে আমার কাছে শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং অন্তর্যময় ছিলে। সর্বশ্রম উদ্যোগ হয়ে ভাবি জীবনের প্রত্যেক স্তরে সে ভাব বর্তমান। আর ভাবি জীবনের প্রতি স্তরে তুমি যে আমার সঙ্গে কথা বলতে।

তবু আজ আমি বলতে বাধ্য, যে ব্যবহার আজ পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে করেছ তা সইতে আমি আর রাজী নই। আমি যখন কথা বোঝী বলতাম তখন তুমি আমার মুখ চেপে রাখতে। যখন সব কিছু ব্যাখ্যা করতাম তখন তুমি উদ্ভাসিক বলে আমার বিপক্ষে অভিযোগ এনেছ। বস্তুদের হয়ে কোন কাজ করতে গেলে আরাগসহীনতা ও অবহেলার অভিযোগ তুমি আমার এনেছ। আমার প্রত্যেক বইটার তুমি তীব্র সমালোচনা মারফৎ এবং আমার হাবভাবের সমালোচনা করে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলে। যখন আমাকে এমন ঘৃণা পরিণত করেছ তখন আর আস্থা আর সজীবতা থাকে কী?

আমি আরও লিখতে পারতাম কিন্তু বর্তমানে তোমার মানসিক অবস্থা বা, তা ভেবে ভয়ে এর বোঝী লিখতে সাহস করলাম না। এইজন্য যে, এই পর তোমাকে শাস্ত করার পরিবর্তে উত্তেজিত করবে আর তাতে তুমি অপমানিত হবে। বলন্ত হুঃ হয়, তোমার ককি পান বিষয়ে যে ব্যবস্থা করেছিলাম তা তুমি জান না উপরন্তু এমন বস্তু আহা করছ যা তোমার শরীরকে বিষিয়ে তুলছে। এ থেকে মনে হয় যে এগুলি এমন কিছু না তোমার কাছে বা থেকে মানসিক অবসাদ হতে তুমি মুক্তি পাবে। তুমি বেহাগত দিক

১। ক্রিস্টিয়ান ডুগিপিয়ার।

২। জারেনের সম্ভাবনা, গোটে এর শিক্ষার ভার নিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন, একবার গোটে শ্রীমতীকে লিখেছিলেন, ক্রিটজকে যখন চুপু খাই তখন তার মধ্যে তোমার অন্তরঙ্গতা দেখি।

থেকে এমন একটা জিনিষ নিয়েছে যা তোমার জৈব ক্রান্তিকর প্রকৃতিকে বাখার শোবাক জোগাবে।

কিছুদিন আগেও ক্ষতিগুলো তুমি বুঝেছিলে। আমার প্রতি তোমার ভালবাসা ছিল বলে এগুলোকে তুমি এড়িয়ে গিয়েছিলে। ফলে তোমার উপকারও হয়েছিল। তোমার ব্যক্তিগত ও স্বাস্থ্য শুভ হোক। এখন আমি আশা ছাড়িনি এই ভেবে যে সত্যিই তুমি আমার কাছে থেকে বিদায় নেবে, আমি যেমন আছি সেই ভাবে তুমি আমাকে দেখবে। বিদায়। ক্রিটজ ভাল আছে। সে প্রায়ই আসে। ছোট যুবরাজ বেশ ক্ষুধিত বেঁচে আছে। ইতি—

তোমাকে লিখিত আগেকার পত্রে প্রত্যেকটি ছত্রে ছত্রে কী বেননা জেগেছে জান? সেটা সবচেয়ে অসম্মানজনক, কারণ সে চিঠি তোমাকে পড়তে হয়েছে আর আমাকে লিখতে হয়েছে। তবুও আমার আমি কথা বলছি আর আমি আশা করি যে আমরা দুজনে আর কথা না বলে থাকব না। অল্প কোন কিছু মধ্য নিজেই না রেখে তোমার মাঝে আত্মসম্পূর্ণ যে কত আনন্দের তা এর আগে আমি বুঝতে পারি নি। এ আমি খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করেছি আর তাতে তুমি বাগা দিয়েছ। এখন আমি অল্প মাহুয়। আগেকার চেয়ে আমার পরিবর্তনও সহকার।

বর্তমানের অবস্থার জন্য কোন বোঝাপড়া আমি করি না। তার সঙ্গে আমি খাপ খাইয়ে নিয়েছি। তা আমি সক্ষম করে রাখব যদিও বর্তমান আবহাওয়া আমার শরীরকে বিবাক করে তুলেছে। আশঙ্ক্য করছি অসহ্য হয়ে পড়ব—তা হলে সেটা আমার পক্ষে ভাল হয়। শীত গ্রীষ্ম আমাদের সম্ভাবনাকে, নিষ্ঠাকে বৈশিষ্ট্য করে দেয়। অসহ্যের কাছে এসে যদি অল্পকে কেউ নামাঙ্কিত

করে তখন কেউ কেউ সেই অবস্থার হৃদয় বুঝে থাকে, তবে এর জন্য শক্তির প্রয়োজন—তলিয়ে গেলে হবে না। কারণ এর জন্য আনন্দ ও কর্মসংপরতার প্রয়োজন। শুধু পরিতর্কনা খাড়া করে নিজেকে মুক্ত ভাষা উচিত নয়। তবে পূর্বেই বাদ এই অপ্রীতিকর সম্পর্ক অত্যন্ত নিকটবর্তনের সঙ্গে ঘটে তবে কোথায় যে ঘূর্ণতে হবে তা কেউ বলতে পারবে না। তোমার এবং আমার ভালোর জন্য এ কথা আমি বলছি। তোমাকে আর জানাই যে এ অবস্থার তোমাকে 'বাখা' দিতে আমার নিজের লাগে। নিজেকে ক্ষমার জন্য আমি কিছুই বলব না। তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, তুমি আমাকে সাহায্য কর এই জন্য যে, তোমার এবং আমার সম্পর্ক যেন ঘৃণ্য না হয়ে ওঠে; উপরন্তু যেমন আছে ঠিক শুধুনটাই যেন থাকে।

তোমার আস্থা আমার মধ্যে সঞ্চারিত কর। সব কিছু স্বাভাবিক ভাবে বিচার কর। তোমাকে সহজ সরলভাবে আমাকে বোঝাতে দাও। তা হলে আশা করতে পারব যে তোমার কাছে সব কিছু স্বচ্ছ ও সত্য হয়ে উঠবে। তুমি আমার মাকে দেখেছ, তাকে পূর্ণ চুপ্তিও দিয়েছ। প্রতিদিনে আমাকে উদ্দীপ্ত হতে দাও।

বিঃ দ্রঃ—শেষ দুখানা পত্রের অন্তঃসন্ধ্যা থেকে এ কথা যোঝা যায়—খ্রীমতী জার্মেনের সঙ্গে প্যাটের সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসছে। স্যোটের Pagan প্রেম খ্রীমতী জার্মেনের অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইটালী প্রবাস-জীবনে আর তিন নারীর সঙ্গে কবি ভূম্বের মত ব্যবহার করেছিলেন।

অনুবাদ : শ্রীমান্দাস সেনগুপ্ত

এলেই হল

বান্দুদের গুপ্ত

এলেই হ'ল। ঘর সাজানো আছে শীতের মত
সাঁড়শকহীন। ঝোটন পাঁয়তালি এখনো নাচে;
ডেউ তোলে। কথা হয়ে উড়ে যায় নীচুবিনত
মেঘের দিকে।

ভাকি ঢালুতা। নদীর কাছে
ছিপছিপে হাওরার নৌকা কালকুলকে দ্বুতি
করে রাখে। আর মিহি বালুয়ারু চিক চিক
করে হাসে, কেবল হাসে! ভাকিরে থাকে অলীক
আকাশে।

এলেই হ'ল। দেখা অদেখার প্রীতি
হৃদয় বৃত্তিতে জল চুষ দেয়। ভীক হয়ে ভাবে
এই যে দিন আছ এই যে রাত দুর্গের মত
মাখা উচিয়ে নগর সাকার, সাকার গ্রাম। শত
ইচ্ছাকে বেলে ধরে আলোর আঙনে তার :
চলতে চলতে চোখের চাহনি ছুড়িয়ে বহুবার,
কোথায় যাবে—এরা একদিন কোথায় যাবে?

দেবত্ব দেহিয়
শ্রীমদ্রামায়ণ
অস্তুত্বময় দেবত্ব

‘দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেম-পরকাশ।’ যে পরম পণ্ডীর ছিল সে এখন পরম বিহ্বল হয়ে পড়ল। ছাড়ল কথাফুটি, ছাড়ল দেহচেষ্টা। কখনো উর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকে, কখনো বা ধ্যাননিশ্চল চোখে, শূন্য পানে। কখনো বা বিরলে বসে কাঁদে। কার সঙ্গে বা কথা বলে অগত। কী হল আমাদের নিমাইয়ের? সঙ্গীরা দিশেহারার মত পরস্পরের মুখচাওয়াচাওয়ি করে। নিজেরাও কিছু বোঝে না, নিমাইকে জিগেস করলেও কিছু বলে না।

আমি কি জানি আমার কী হয়েছে! রাধিকাই বা কী জানত।

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে, না গুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধ্যাননে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহায়ে, রাজা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা ॥
আউলাইয়া বেণী, চুলের গাঁথনৌ, দেখয়ে থসায় চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে, কি কহে ছ হাত তুলি ॥
এক দিঠি করি ময়ূর-ময়ূরী-কণ্ঠ করে নিরঞ্জন।
চণ্ডীদাস কয়—নব পরিচয় কালিয়া বন্ধুর সনে ॥

কৃষ্ণের সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়েছে। ‘কৃষ্ণগঙ্গ-লুন্ধ রাধা।’ কৃষ্ণের সঙ্গে আটটি পদ্ম। অজ নলিনাটক। কি কি? নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, পদদ্বয়, নাভি আর মুখ। কি দিয়ে চর্চিত করেছেন? মৃগমদ আর কপূর, বরচন্দন আর অঙ্কুর দিয়ে। পদ্মগন্ধের সঙ্গে মিশে গিয়েছে অঙ্গানুলেপের গন্ধ। বায়ুর ভরজ নয়, শুধু অঙ্গগন্ধের ভরজ। সেই ভরজ শুধু আমার জাগ্রৎস্বপ্নকেই বিস্তার করছে। স সে বদনমোহন: সখি জনোভি নাসাম্প্ৰহাম।

গুরুদত্ত মন্ত্র অণু করছে, হঠাৎ নিমাই ডুকরে কেঁদে উঠল: ‘কৃষ্ণ রে, বাপ রে, তুমি কোথায়? তুমি কোন দিকে পালালে?’ বলতে বলতে মাটিতে মুহিত হয়ে পড়ল। শিষ্যদের গুঞ্জনায় মুহুরী যদি বা ভাঙল, ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে আবার কাঁদতে লাগল: ‘কৃষ্ণ, বাপ, আমার জীবন-জীহরি, তুমি আমার প্রাণ চুরি করে কোথায় অন্তর্হিত হলে?’

কে সাধুনা দেবে নিমাইকে? যে স্তোকবাক্য বলতে আসে সে নিজেই কেঁদে আকুল। নিমাইয়ের কান্নায় তাদেরও কান্না।

কৃষ্ণ যদি ব্রজে না আসে এ নিশ্চিত যে আমি তাকে পাব না, সেও পাবে না আমাকে। তবে এত কষ্ট স্বীকার করে এ দেহ রেখে লাভ কী? ললিতাকে বলছে রাধিকা: এ দেহ আমি ছেড়ে দেব। আমার মৃত্যুর পর এ দেহ ধরে রাখতে তোমরা কোনো চেষ্টা করো না। এ দেহ পচে যাক, গলে যাক, পুড়ে যাক, মিশিয়ে যাক মাটির সঙ্গে। ক্রিতি, অণু, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে লয় হয়ে যাক। এই পঞ্চভূতই তো আমার প্রাণবল্লভের ব্যবহারের বস্তু। তার ব্যবহারের বস্তুর সঙ্গে এ দেহ মিশে গেলেই তো আমি কৃতার্থ। সখি, এ দেহ দিয়ে তো তার সেবার সৌভাগ্য হল না। দেহাবশেষ দিয়েও যদি তার একটু সেবা করতে পারি। তার সেবা ছাড়া এ জীবনের সার্থকতা কী!

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি। কিবা তার বল।

অপিতে অপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥

কে বলে তুমি পাগল? তোমার চিন্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়েছে। কৃষ্ণনামের মজাই এই যে, এই নাম

জপবে তার প্রাণই কৃষ্ণপ্রেমের পাখার হয়ে উঠবে।
প্রেমের তরঙ্গে সে তখন হাসবে কঁাদবে নাচবে ধুলোয়
গড়াগড়ি দেবে।

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব।

যেই জপে—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।

আমাদের নয়নপথে আবির্ভূত হও। গোপীরা
কৃষ্ণের জন্তে কঁাদছে। হে সন্তোষমতি, হে অভীষ্টদ,
আমরা তোমার বিনাবেতনের কিস্করী, তাই বলে কি
সুশ্রুত কমলনয়নের আঘাতে তুমি আমাদের বধ করবে ?
তুমি আমাদের বিষ, সর্প, রাক্ষস, বাত্যা, দাবানল—
সকল প্রকার ভয় থেকে রক্ষা করেছ, তবে এখন কেন
তুমি উদাসীন ? ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্ব পালনের জন্তে
তোমার জন্ম। তুমি গোপিকামৃত নও, তুমি অখিল-
দেহীর অন্তরের সাথী। অতএব আমরা যখন তোমার
ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা পূরণ করো। আমাদের ভজনা
করো, আমাদের দেখাও তোমার শ্রীমুখ। তোমার যে
পাদপদ্ম ব্রহ্মভদ্রদেহীর পাগনাশন, লক্ষ্মীর সাধনের তীর্থ,
যা দিয়ে তুমি গোচারণে যেতে, যা কালীয়ার ফণার
উপর হস্ত করেছিলে, তা এখন আমাদের কুচতুর্টের
উপর অর্পণ করে আমাদের অনঙ্গবেদনা অপহরণ
করো। তোমার কথাবৃত্ত আমাদের বিহ্বল করেছে।
তুমি এস, তোমার অধরসুখায় আমাদের পুনর্জীবিত
করো। তোমার কথাই তো তপ্তজনের জীবনপ্রদ,
অবগম্যত্রেই মঙ্গলসাধক, সমস্ত কামকর্মনিবারক।
যারাই তোমার কীর্তক তারাই বহুদাতা।

নিমাই সঙ্গের লোকদের বললে, 'তোমরা বাড়ি
ফিরে যাও।'

'আর তুমি ?'

'আমি আর ফিরব না। আমি মথুরায় চললাম।'

'মথুরায় ?'

'হ্যাঁ, মাকে বোলো আমি কৃষ্ণ পেতে মথুরায়
চলেছি। আর প্রবেশ করব না সংসারে।'

সকলে 'মিলে ঠেকাল নিমাইকে। বোঝাতে
বসল।

রাত্রে, সবাই যখন ঘুমিয়েছে, প্রেমের আবেশে
ঝেরিয়ে পড়ল নিমাই। কৃষ্ণ রে, বাপ রে, কোথায়
গেলে পাখ তোমাকে, কোন পথে, কোন অরণ্যে ?
তোমাকে ছাড়া আমার রাত অন্ধকার, দিনও অন্ধকার।

কিছু দূর যেতে দৈববাণী শুনল নিমাই। এখন
বাড়ি ফিরে যাও, কাল পূর্ণ হলে বাবে মথুরায়।

কথোদ্রু যাইতে শুনেন দিব্যবাণী।

এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি।

যাইবার কাল আছে যাইবা তখনে।

নবদ্বীপে নিজগৃহে চলহ এখনে।

আকাশবাণী শুনে গৌরহরি ফিরে চলল নবদ্বীপ।

পৌষমাসের শেষে বাড়ি পৌঁছল।

নিমাই ফিরেছে। শচী ছুটে এল বাইরে,
বিষ্ণুপ্রিয়া দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। মার
পাছুখানি ধরে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল নিমাই, আর
চক্ষুর স্নিগ্ধ প্রসাদটি রাখল প্রিয়ার নয়ন ছুটিতে।

কিন্তু এ নিমাই কী হয়ে গিয়েছে। এ যেন
আরেক মানুষ। বিজ্ঞার সেই ঐক্যতা নেই, নেই বা
প্রাধাত্যবোধ। মৃত জগৎ সংসারকে উপেক্ষা করবার
জন্তে মুখে যে একটি বিজ্ঞপের রেখা ছিল সেটিও
অন্তহিত হয়েছে। নিমাই এখন নম্রতা-বশুভার
প্রতিমূর্তি। মুখখানি বৃষ্টি বা একটু স্নান, ছুটি
চোখ করুণায় স্নান করা। সকলের চেয়ে তুচ্ছ,
সকলের চেয়ে দীন এমনি এক আতি তার শরীরে।
অশ্রুমনস্ক, না, দূরমনস্ক। যে অনর্গল কথা কইত,
কথা কইতে ভালোবাসত, সে এখন শুদ্ধতার সঙ্গেই
কথা কইতে উন্মুখ। কেন যে চোখে জল আসছে
কে জানে! এ কি তার হৃৎথের অক্ষ না আনন্দের
অশ্রু, তাই বা কে বলবে ?

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অমুরাগ।

কৃষ্ণ বিম্ব অশ্রু তার নাহি রহে রাগ।

কৃষ্ণের প্রীতি উদ্দেশ্যেই যে সেবাবাসনা তার নামই
অমুরাগ বা প্রেম। যদি সেবা না থাকে তা হলে
সদ্বন্ধও থাকে না। আর সদ্বন্ধ না থাকলে প্রেম
কোথায় ? আলোকহীন সূর্য যেমন নিরর্থক তেমনি
সেবাবাসনাহীন সদ্বন্ধজ্ঞানও নিরর্থক। প্রেম যদি
জাগে সঙ্গে-সঙ্গে সেবা করবার সাধও জাগবে। আর
কৃষ্ণপ্রেম যদি জাগে তাহলে কৃষ্ণসেবার সাধ ছাড়া আর
কিছুতেই মন আসক্ত হবে না, আকৃষ্ট হবে না।

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল

যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল

সেই প্রেমা অমৃতের সিদ্ধ।

নির্মল সে অমুরাগে

না লুকায় অন্তদাগে

শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।

সাদা কাপড়ে কালির ছোট দাগটিও হরা পড়ে।

তেমনি সুনির্মল কৃষ্ণপ্রেমে যদি সুখবাসনার লেশ থাকে
তা হলে তাও হরা পড়বে। তা পড়ুক। আশার

কথা এই, কৃষ্ণপ্রেম গঙ্গাজল। গঙ্গাজলে তো কত
কদম কত আবর্জনা, তবু তা সংসারমোচক। তেমনি
কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে সুখবাসনা থাকলেও তা অম্লরূপ
সংসারভারক। কিন্তু গঙ্গাজল যদি আবিল হয় তবে
তা সুস্বাদু হয় না, তেমনি কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে যদি
বিষয়মালিন্য মেশে তবে তাও বিষাদ লাগে। সুস্বাদু
লাগুক আর না লাগুক, কৃষ্ণপ্রেমই পুরুষার্থ।
পরমপ্রয়োজন।

‘গোবিন্দ জীতলানন্দ করুন প্রসাদ।’ নিমাইকে
গুরুজনেরা আশীর্বাদ করছে। তবু নিমাইয়ের কান্নার
বিরাম হচ্ছে না কেন?

‘শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ আর মুরারি গুপ্ত
—তিন বন্ধুর কাছে তীর্থকথা বলছে নিমাই।

‘বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখলাম। পয়ায় এসে ঐখানে
কৃষ্ণ পা রেখেছিল, ঐখানেই ধুয়েছিল পা। ঐ
পা-ধোয়া জলই তো গঙ্গা। সেই গঙ্গাই শিব
মাথায় ধরেছে।’ বলতে-বলতে খেমে পড়ল নিমাই।
চক্ষু নিনিমেষ হয়ে গেল। মহাশ্বাস ছেড়ে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ
বলে কাঁদতে লাগল। টলে পড়ে গেল মাটিতে।

এ কী অবস্থা! তিন বন্ধু স্তম্ভিত হয়ে রইল।
পরে শুক্রবায় মন দিল। কী বলে কাকে বোঝাব!
কী হুঃখ যে সামান্য দিই। কৃষ্ণকে কি দেখছে, না,
দেখতে পাচ্ছে না বলে কাঁদছে? যারই জন্তে কাঁদুক,
মাহুঘের চোখে এত অশ্রু থাকতে পারে এ কবে কে
দেখেছে? এরই নাম বুঝি প্রেমগঙ্গা?

সুবিশাল তনু কত বলবান হয়ে উঠেছে, কী সূঠাম
সুন্দর! সর্বকলেবর এখন পুলকপরিপূর। থরথর করে
কাঁপছে কখনো। কখনো বা স্বেদ বরছে। কখনো
বিরণ হয়ে যাচ্ছে। কখনো কথা বলছে গদগদ ভাবে।
কখনো বা ইন্দ্রিয়ের ত্রিন্ময় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু
লব মিলে আনন্দচমৎকার।

কৃষ্ণভাবে চিন্ত আক্রান্ত হলেই চিন্তকে সত্ত্ব বলে।
এই সত্ত্ব থেকে যে ভাব জাগে তাই সাত্বিক ভাব।
সাত্বিক ভাব আট রকম। সন্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ,
কম্প, বৈকর্য, অশ্রু আর মুচ্ছা। এই সাত্বিক ভাবের
প্রকাশ এখন নিমাইয়ে।

প্রেমের স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে পায়।

উন্নত হইয়া নাচে—ইতি-উতি ধায় ॥

স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাদ গদগদ বৈকর্য।

উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈন্ত ॥

এই ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।

কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥

‘সেই নিমাই কী হয়ে গেল দেখছ?’ বললে
সদাশিব।

‘কে জানত সেই বিদ্বান ‘এমন ভক্তিম্যান হবে?’
মুরারি বললে।

‘কিন্তু আসল ব্যাপার কী?’ শ্রীমান পণ্ডিত তট
বা তল কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। নিমাই কি কৃষ্ণকে
দেখছে, না, দেখছে না? দেখছে না বলে যদি কাঁদছে
তবে আনন্দে এমন মাতোয়ারা কেন? আর দেখছে
বলে যদি তার পুলকরোমাঞ্চ, তবে এমন কাঁদছে কেন
অবোরে!’

বন্ধুদের সেবায় কিছুটা শান্ত হল নিমাই। বললে,
‘কাল তোমরা তিন জন শুক্রাবর ব্রহ্মচারীর বাড়ি যাবে।
সেখানে নিভুতে বসে তোমাদের কাছে আমার হুঃখের
কথা নিবেদন করব। ‘মোর হুঃখ নিবেদিত নিভুতে
বসিয়া।’

‘মা, ওঠ, ওঠ—’ শচীর রুদ্ধ ঘরের দরজায় করাঘাত
করছে বিষ্ণুপ্রিয়া।

‘কি, কী হয়েছে?’ ধড়মড় করে উঠে বসল শচী।

‘দেখ এসে উনি কেমন করছেন।’

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে শচী দেখল, শয্যায় বসে
নিমাই কাঁদছে, অবুঝের মত কাঁদছে। বউয়ের দিকে
তাকাল শচী। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া কী এর ব্যাখ্যা
দেবে? বড়ে পড়া পাখীর মত চেয়ে রইল অবোলা
চোখে।

ছেলের মাথায় হাত রাখল শচী। বললে, ‘নিমাই,
কাঁদছিস কেন?’

প্রশ্ন নিমাইয়ের কানেও ঢুকল না।

‘কেন কাঁদছিস বাপ, কী হয়েছে?’

কে কার কথা শোনে।

‘তোর কিসের হুঃখ? আর যদি হুঃখ থেকেই
থাকে, আমি তোর মা, সেই কথা তুই আমাকে বলবি
না তো কাকে বলবি?’

নিমাইয়ের কান্না আরো বেড়ে চলল।

‘নিমাই, বাপ’, গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে লাগল
শচী। বললে, ‘অন্তে উতলা হলে তুই—তাকে শান্ত
করিস, এখন তুই-ই যদি উতলা হোস তোকে কে
শান্ত করবে? আমার এত গভীর নিমাই পণ্ডিত সে
কেন পাগল হল, বিহ্বল হল?’ শচীও কাঁদতে লাগল।

মায়ের কারা বুঝি শুনেতে পেল নিমাই। বললে, 'মা, আমি কাঁদছি দেখে তুমি কেঁদো না। আমি স্বপ্নে বনমালী কৃষ্ণকে দেখলাম। সেই কালিন্দী-পুলিনপ্রাঙ্গণ প্রণয়ী কৃষ্ণ। যার বাঁশির স্বরে শুধু স্বাবর সজীব হয়ে ওঠে সেই বিপুল বিলোচন কমনীয় কিশোর, অখিললক্ষ্মীচিহ্নহারী মুগ্ধমুতি। মা এমন রূপ আর দেখিনি, এমন বাঁশি আর শুনিনি। কিন্তু জানো, দেখা দিয়েই যে কোটি মদন-বিমোহন পালিয়ে গেছে। কৃষ্ণকে সকলে কল্লতরুর চেয়েও উদার বলে। কল্লতরু বিনা প্রার্থনায় কাউকে কিছু দেয় না। বাঙালিতিরিক্ত দান কল্লতরুর নিয়ম নয়। কিন্তু কৃষ্ণ, মা, না চাইলেও দান করে। না চাইতেই স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু মিলিয়ে গেল। আবার কৃষ্ণ দেখা দেবে সেই আশায় তৃষ্ণাতুর চোখে তাকিয়ে আছি। যমুনা বা জাহ্নবীর স্রোতের বিরাম আছে, আমার এই সত্যক নয়নে চেয়ে থাকার বিরাম নেই।'

সারা রাত বসে মা আর স্ত্রী শুনেতে লাগল কৃষ্ণকথা।

ভোরবেলা শ্রীবাসের বাড়ি ফুল তুলতে এসেছে শ্রীমান। শুধু শ্রীমান নয়, গদাধর, গোপীনাথ, আরো অনেকে। শ্রীমানের মুখখানি হাসি-হাসি।

'বড় যে হাসি দেখছি। কী ব্যাপার?' জিগগেস করল শ্রীবাস।

'তা, কারণ ছাড়া কি কার্য হয়?'

'সত্যি? বলো না কী কারণ?' আগ্রহে এগিয়ে এল শ্রীবাস।

'সে এক অদ্ভুত কথা। নিমাই পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছে।'

'বলো কী?'

'গয়া থেকে ফিরেছে জেনে বিকেলে গিয়েছিলাম কুশল সম্ভাষণ করতে।' বলতে লাগল শ্রীমান। 'গিয়ে দেখি উদ্ধত নিমাই আর নেই, এ এক বিনম্র নিমাই। বৈরাগ্যে—ওদাস্তে অপরূপ। আমাদের কাছে ভীর্ণের কথা বলতে লাগল। পাদপদ্মভীর্ণের নাম নেওয়ামায়ে বিরাট বিপ্লব এল নিমাইয়ে। সর্ব-অঙ্গে মহাকম্প-পুলক উপস্থিত হল। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে কাঁদতে-কাঁদতে মুগ্ধিত হয়ে পড়ল মাটিতে। ভাই, এত কালো মানুষে কাঁদতে পারে তা আমার জানা ছিল না। দেখিনি কখনো শুনিনি কখনো।'

যে-অশ্রু দেখিল আমি তাহান নয়নে।

তাহানে মহুসাবুদ্ধি নাহি তার মনে ॥

'এর মত শুভসংবাদ আর কী আছে?' বললে শ্রীবাস, 'নিমাই যদি বৈষ্ণব হয় তা হলে আর পায় কে আমাদের? বিদ্বেরীদের তবে দেখে নেব এবার।'

'শোনো। নিমাই আমাকে আর সদাশিবকে আর মুরারিকে গুন্ডাঘরের বাড়ি যেতে বলেছে। সেখানে নাকি আমাদের বলবে সে আরো দুঃখের কথা।' শ্রীমান হরাসিত হল। 'ফুল তুলেই সেখানে যাচ্ছি।'

শ্রীবাসের উঠানে কুন্দফুলের ঝাড়। গদাধরও ফুল তুলছিল। যতই ফুল তোলে ততই শাখায় আবার ফুল আসে। ফুল তুলে পাছকে কেউ রিক্ত-শূন্য করতে পারে না। 'যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে। অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্বক্ষণ ধরে।' কিন্তু গদাধর যে নিজেই নিষ্পুষ্প, নির্গন্ধ। কই তাকে তো নিমাই নিমগ্ন করল না, গুন্ডাঘরের বাড়িতে উপস্থিত থাকতে বলল না। সে কি নিমাইয়ের অন্তরঙ্গ হবার অধিকারী নয়? নিমাইয়ের দুঃখের কথা সেও কি একটু শুনেতে পায় না? তবে নিশ্চয়ই তার হৃদয়ে ভক্তি নেই, নেই নামগন্ধ। সে তাই প্রত্যাখ্যানের যোগ্য।

তবে ভক্তি কী?

গর্গাচার্য বললে, কথাদিব্যমুরাগঃ। অর্থ, ভগবানের কথা-ইত্যাদিতে অমুরাগ। অগ্নিরা বললে, সানুরাগরূপা।

অমুরাগ কী?

আসক্তির নাম অমুরাগ। যেমন শিশুর মাতৃসুগ্ধে, কামুকের কামিনীতে, গৃধুর অর্থে, তৃষ্ণার্তের জলে, ক্ষুধিতের অঙ্গে অজ্ঞানীর দেহে, কুলটার উপপত্তিতে আকর্ষণ তেমনি ভগবানের প্রতি একান্ত আকর্ষণের নাম অমুরাগ। আর সেই অমুরাগই ভক্তি।

ইন্দ্রিয় নির্মল করে প্রিয়তমের যে সেবা তার নামই ভক্তি। ইন্দ্রিয়কে নির্মল করব কী করে? সর্বত্র ভগবানকে দেখে, সকল শব্দে ভগবানকে শুনে, সকলরূপে ভগবানের আবাদনে, নিখিলগন্ধে তাঁর জ্ঞান নিয়ে, সমস্ত স্পর্শে তাঁর স্পর্শ অনুভব করে। সেই অনুভবেই নির্মল হওয়া।

এ তো খুব কঠিন শোনাচ্ছে। এমন লোক আছে নাকি পৃথিবীতে?

ছলভ হলোও আছে। চন্দন ছন্দাপ্য কিন্তু পাওয়া যায়। ভক্তিদেবীর কাছে কেউ বঞ্চিত হয় না।

আর কিছু না পারো তুমি শুধু শ্রবণ-কীর্তন করো।
শ্রবণের চেয়ে অবশ্য কীর্তন শ্রেষ্ঠ। শ্রবণে শুধু কান
পরিভূত হয়, কীর্তনে রসনাও পরিভূত হবে।

প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্তন।

কৃষ্ণপ্রেম সেবাকলের পরম সাধন।

শ্রবণকীর্তন হতে হয় কৃষ্ণপ্রেরমা।

সেই পরমপুরুষার্থ, পুরুষার্থে সীমা।

কিন্তু নাম করতে হলেও তো শ্রদ্ধা চাই। না,
নাম শ্রদ্ধারও অপেক্ষা করে না। সংশয় সত্ত্বেও নাম
করো শুকতাতেও ভয় কোরো না। ডাকতে ডাকতেই
ভক্তি আসবে। প্রবল নামশক্তির দ্বারাই ভক্তি
শৃঙ্খলিত।

তা হলে আর ভয় নেই পদাধরের। সেও তবে
যাধে গুরুদ্বারের বাড়িতে। না হয় লুকিয়ে থাকবে।

শ্রীবাস হুঙ্কার দিয়ে উঠল : 'কৃষ্ণ আমাদের
বৈষ্ণব পরিবার বৃদ্ধি করুন।' 'গোত্র বাড়উক কৃষ্ণ
আমা সভাকার।'

গুরুদ্বারের ঘরে সমবেত হয়েছে তিন বন্ধু।

ঐ আসছে নিমাই।

দীর্ঘকায় পরাক্রান্ত পুরুষ কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে
খলিত হয়ে পড়ছে। বাহ্যদৃষ্টির প্রকাশ মাত্র নেই।
অজস্র ধারায় অশ্রু পড়ছে গড়িয়ে।

এ কী, সর্বক্ষণই আবেশ। সর্বক্ষণই অশ্রুস্রাব।

'আমার কৃষ্ণ কোন দিকে গেল? তাকে
পেয়েছিলাম, দেখেছিলাম, কিন্তু সে পালিয়ে গেল।
কেন পালিয়ে গেল? কোন দেশে গেল?'

টলতে টলতে একটা স্তম্ভ ধরল নিমাই। ভেঙে
পড়ল স্তম্ভ।

জলসিঞ্জন অর্ধ বাহুজ্ঞান ফিরে এল নিমাইয়ের।
সে এবার আরেকজনের কাছা গুনছে। জিগপেস করল,
'ঘরের মধ্যে কে কাঁদে?'

গুরুদ্বার বললে, 'তোমার পদাধর।'

'পদাধরকে ডাকো।'

পদাধর বেরিয়ে এল।

নিমাই বললে, পদাধর, তুমিই ধন্য। শিশুকাল
থেকে তুমি আমার সঙ্গে ছায়ার মত বেড়াচ্ছ, কিন্তু
ছায়াই সার্থক, দেহী নয়। শিশুকাল থেকেই তুমি
কৃষ্ণে দৃঢ়মতি, কিন্তু আমার জীবন বৃথা-রসে কেটে
গেল। অমূল্য নিধি পেয়েও আবার হারালাম। তোমরা
সব বল, আমার কৃষ্ণ কোথায়।'

ক্ষণে পড়াচ্ছে ক্ষণে উঠছে। ছুই চোখ প্রেমজলের
প্রাবনে মেলতে পারছে না। নিমাইকে দেখে আর
সকলেও কাঁদছে। হরি-হরি ধ্বনি তুলছে। ঈশ্বরপুরীর
সঙ্গ থেকেই এই কৃষ্ণপ্রকাশ। বলছে কেউ-কেউ।
'পর্য্যাপ্ত ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল। সেই হতে নিমাই
আমার পাগল হইল।' কৃষ্ণরহস্যের উদ্ভেদ হল
এতদিনে, বলছে আবার কেউ-কেউ। নিমাই একটু
সুস্থ হোক, পাণ্ডুরদের মুণ্ড ছিঁড়ে নেব এবার, কেউ
কেউ আবার আফালন করলে।

'আমার দুঃখের খণ্ডন করো সকলে। মন্দগোপের
নন্দনকে এনে দাও।' মাটিতে চুল লুটিয়ে দিয়ে
কাঁদছে নিমাই।

সারা দিন চলে গেল, স্নানাহার নেই নিমাইয়ের।
সন্ধ্যায় টলতে-টলতে ফিরে চলল বাড়ি। শচী তার
ভার নিলে।

স্নানাহারের পর আবার বেরিয়ে পড়েছে নিমাই।
এবার তার ছাত্রেরা তাকে ঘিরে ধরল। মনে পড়ল,
হ্যাঁ, সে তো টোলে পড়াতে এসব ছাত্রদের। আর কি
তবে সে পড়াবে না এদের? আর কি কিছু পড়াবার
নেই?

গুরু গঙ্গাদাসের কথা মনে পড়ে গেল। সটান
চলে গেল পণ্ডিতের বাড়ি। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল
গুরুকে।

'তোমার জীবন সার্থক, পিতৃকুল মাতৃকুল দুই
কুলই মোচন করলে। এবার তবে আবার অধ্যাপনা
শুরু করো।' বললে গঙ্গাদাস।

'আর কেউ পড়ালে হয় না?'

'তোমার পড়ুয়ারা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে
জানে না। তোমার যাবার পর থেকে ওরা পুঁথিতে
ডোর দিয়ে বসে আছে। পড়তে হলে তোমার কাছেই
পড়বে, আর কার কাছে নয়।'

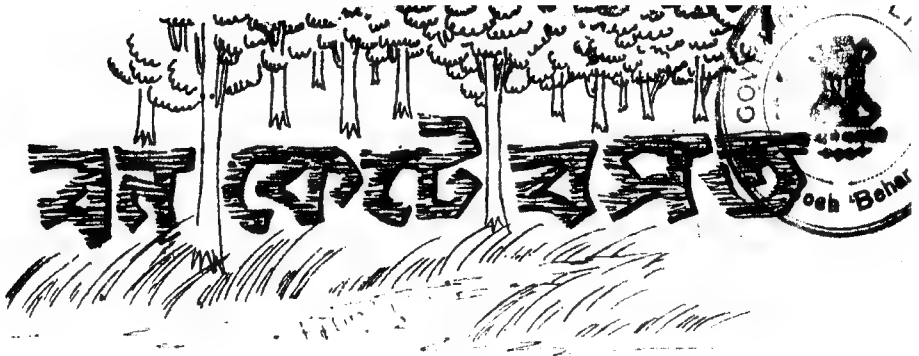
'আমি আর কী পড়াব?'

সেখান থেকে মুকুন্দসঙ্গরের বাড়ি গেল। মেয়েরা
উলু দিয়ে উঠল, শঙ্খধ্বনি করল। চণ্ডীমণ্ডপে টোল
ছিল নিমাইয়ের, সেখানে গিয়ে বসল। মুকুন্দ এসে
প্রণাম করল, নিমাই তাকে বাহুবন্ধনে বেঁধে কাঁদতে
লাগল।

হা নাথ রমণ শ্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ।

দাস্তান্তে কুণায়া মে সখে দর্শয় সরিধিমু॥

[ক্রমশঃ]



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

ত্রিশ

জুগায়া গেছে তো গেছে। দুটো দিন দুটো বাড়ি কাটল। কিরবার নাম নেই। মহেশ ঠাকুরকে যেনে গেছে ভাণের চালাঘরে। ঘরবাড়ি পাহারার আছে ঠাকুর। পাহারার মানুষই বটে। গাঁজা টানে, আর মানুষ পেনে বনের গল জুড়ে দেয়। মানুষ না থাকলে পড়ে পড়ে ঘুমায়।

রাধেশ্যাম জুটেছে ক্যাপা ঠাকুরের সঙ্গে। গাঁজার গন্ধ তাকে টেনে নিয়ে তুলেছে। কিন্তু এমন মানুষটার সঙ্গে মউজ করে ভালমন্ড দুটো কথা বলবে তার ফরসত কই? সুমুখ-আঁধারি রাত বলে সকাল সকাল এখন জালে বেতেছে হচ্ছে। কড়া ব্যবস্থা অন্নদাসীর। সন্ধ্যা হতে না হতে বা-হোক দুটো খাইয়ে জালপাছ কাঁধে দিয়ে বাঁধের উপর তুলে দেবে। ঠিক ঠিক এগিয়ে বাচ্ছে, কিবা পাড়ামুখো কিয়ল-পরধ করবার জন্ত নিজেও পিছু পিছু সঙ্গে যায়। বউ বটে একখানা। ঘুঘুটি অন্ধকারে এক সময় ফিরে আসে একলা মেয়েমানুষ—ডর লাগে না। সত্যিই বউ ফিরে গেছে অনেকক্ষণ—রাধেশ্যাম তবু কিছু ভরসা করতে পারে না। কোন হেঁতাল-ঝোপের আড়ালে ঠাঁড়িয়ে আছে কে জানে? পন্ডি-দেবতার একটু বেচাল দেখলে কাঁক করে অমনি টুটি চোপে ধরবে : ভবে রে হাড়-ফুটো, এই তোমার জালে বাওয়া।

মহেশের মতো ভবিজন পাড়ার মধ্যে বর্তমান, তা সবেও রাধেশ্যাম বউয়ের জন্যে সারা রাত ভেড়িতে ভেড়িতে জাল বেয়ে বেড়াল। ব্যাপার-বাণিজ্যও নিশ্চয় হয়নি—টাকা পুরে তার উপরে আরও তিন আনা। অন্নদাসী শের রাতে উঠে বখারিতি সায়েবে চেপে বসেছে। ডাক শেষ হয়ে গিয়ে ব্যাপারির ষোড়ার মাছ পড়তে না পড়তে দামের টাকা-পরসাদালা হেঁ। মেয়ে নিয়ে জাঁচলে বেঁধে সে কয়দারি করে চলল। রাধেশ্যাম হী করে দেখছে। বিড়ি খাওয়ার জন্তেও দুটো পথনা হাতে দিয়ে গেল না।

একটা রাত গেল তো এই রকমে। আলা থেকে সোজা সে মহেশের কাছে চলে গেল। কিন্তু গিয়ে হবে কি। সারা রাত জুতের খাটনি খেতে খেতে ভেঙে আসছে, ভাল করে দুটো কথা বলার ভাগত নেই এখন বাহুবটার সঙ্গে। হুলতে হুলতে গুরে পড়ে শেখটা। সড়ার মতো কুন্দায়। পরের রাতে বেরতে আর মন চায় না। মহেশ

ঠাকুর ভাগ্যবশে আজকের দিনও বেরে গেছে। তবু হায় রে, বউয়ের তাড়ায় জাল বাড়ে রওনা হতে হয়। এখানে ওখানে বৃণ-বৃণ করে জালও কেলে পাঁচ-দশ কেপ। শ্রীত ধরে আসে, দেখে কাঁপুনি লাগে। এই কাঁপুনির প্রতিবেদক আছে মহেশের কাছে। তার বড় কলকয়ে। মরীয়া হয়ে এক সময় রাধেশ্যাম বাঁধ ধরে আবার ফিরে চলল। ভাবি তো বউ—বউ-টুট সে গ্রাঙ্ক করে না।

আলো নেই, অন্ধকার চালাঘরের ভিতর কলকের মাথা বলে জলে উঠছে। ছায়াঘৃতির মতো ক্যাপা মহেশ ও দু-তিনটি লোক গোল হয়ে বসে। রাধেশ্যামও গিয়ে একপাশে ঠাই নিল।

শ্রীতে মায়া বাই ঠাকুরমশায়, প্রসাদ দাও।

ভেবেছিল দুটো তিনটে টান টেনেই আবার বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু গা এলিয়ে দিচ্ছে। এ বেশার একবার বসে পড়লে হঠাৎ আর ওঠা যায় না। চলছে। মহেশ আগে বেশ কথাবার্তা বলছিল। কিন্তু কলকে ঘুরে ঘুরে বতবার হাতে আসে, দম দিয়ে ততই সে কিম হয়ে বাচ্ছে। রাধেশ্যাম ভাবছে, ক-খানা ঘরের পরেই তার ঘর। অন্নদাসী ঘুমিয়ে গেছে এতক্ষণে। রাধেশ্যাম জল কাঁপিয়ে মাছ মেয়ে বেড়াচ্ছে, অবলা নারী শুকনো-খটখটে ঘরে ঘুম দিচ্ছে মজা করে। জোর থাকতে উঠে আলার গিরে চেপে বসবে মাহের পরসাকড়ি জাঁচলে বাঁধবার জন্ত। জাঁচল কেন রে বউ দু-মুখো খলি সেলাই করে নিয়ে বাস কাল। সেয়েহেই বা পরসাকড়ি রেখেছিস, তাই কাল বের করতে হবে। নথতো পেটে কিল মেয়ে পড়ে থাকা সকলের। বাচ্চাটা অবধি।

এরনি নানা রকম ভাবতে ভাবতে, বিশেষ ঐ বাচ্চার কথা মনে ভেবেই, রাধেশ্যাম আবার জাল কাঁধে বেরিয়ে পড়ল। টান উঠে গেছে, জুত হুবে না আর। বাঁধে উঠলেই ভেড়ির বত পাহারাদার ঘুর পেছে, জুত হুবে দেলবে। ঘিরে ধরবার চেষ্টা করবে নানান দিক থেকে। তার ভিতরে এক-আধ কেপ দেওয়া যায় যদি বড় জোর। মাহ-মহারের মেবতা বুড়ে হালদার—তিনি ইচ্ছা করলে কী না হতে পারে! উঠানের উপর কানকো হেঁটে মাহ আসছে, কত এমন দেখা যায়। সবই বুড়ে হালদারের মবলি।

কিন্তু হল না আজ কিছুই। বউ কায়-কায় করে, কাক ঘরের চালে কাক পড়তে দেবে না। পাড়ার লোকের অপাতি। বাচ্চাটা ট্যা-ট্যা করে ঢেঁগাবে।

অন্নদাসী বলে, বাগনি মোটে জ্বলে। গেলে নিদেনপক্ষে দুটো ফুটোচিড়ি জ্বলে বেধে আগন্ত না?

বাইনি, তবে জাল ভিত্তি কি করে?

খানাপ্রদেব জলে জাল ভিত্তিরে আনা যায়। গাঁজায় দম মেয়ে পড়েছিল পাগলা ঠাকুরের ওখানে।

এমন কথা উঠবে অনুমান করে রাখেতাম সত্যক হয়ে এসেছে। ফুলফুল করে এক মুঠো তুলসী পাতা চিবিয়েছে। বউয়ের নাকের কাছে মুখ নিয়ে যায় একবারে। বলে, দেখে—গন্ধ শুঁকে দেখ হাসি।

ঠেলা দিয়ে অন্নদাসী মুখ ফিরিয়ে দিল। জোরাটা বেশি হয়ে গেল রাগের বলে। রাখেতাম চেঁচিয়ে ওঠে, অ্যাঁ, মাংলি তুই আমার? পতির গায়ে হাত তুললি? পতি হল দেবতা, কাঁচাখেলো দেবতা—হাত তোর কুড়ি কুড়ি হয়ে খণ্ডে পড়বে।

এক সেংতাটি শুধুমাত্র মুখে শাপশাপান্ত করেই নিরন্তর হয়ে যাবার পাত্র নয়। হাতও চলে। অন্নদাসী বধাসম্মত প্রতিরোধ করে কুক ছেড়ে শেখটা কাঁদে। জেলে উঠে বাজাটাও চোটেছে। এমিককার মশে তক্ত দিয়ে রাখেতাম দু-হাতে বাজা তুলে নেয়। নাচিয়ে এমিক-ওমিক ঘুরে বেড়িয়ে শান্ত করে। কিন্তু পেটের ক্ষিধে ভুলে অবোধ শিশু নাচানোয় কতক্ষণ শান্ত হয়ে থাকবে? একটা উপায় এখন—আধুলিটা সিকিটা হাওলাত চাইতে হবে গগন দাসের কাছে। সায়েরে মাছের দাম থেকে পরে কেটে নেবে।

গণগোলে দেরি করে ফেলল, সায়ের ভেঙে গেছে। গগন এখন আলায় কিংবদন্তি। রাখেতাম আলায় সীমানার মধ্যে ঢোকে না। খোশারুদি করতে এসেছে, বগড়াবাটি নয়। ডোবার ধারে কাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকে, একটা কথা বলব, ইদিক পানে এসো বড়দা।

চূপ করে যায় হঠাৎ। নির্বাক ভালমাসুখ হয়ে কাঁড়ায়। ধবধবে কর্ণা জামা-কাপড় পরে নগেনশশী বেরিয়ে আসছে। নগেনের আগে আগে সেই মাছবাটা—চক্কোভি মশার।

নগেনশশী রাখেতামের দিকে দ্রুত চলে যায়: মতলব কি হে? বড়দার কাছে কোন দরকার?

রাখেতাম কাতর হয়ে বলে, জ্বলে কিছু হয়নি। চার-পাঁচ আনার পরমা না হলে তো বাজাটা মুখ উপোষ কর মরে।

নগেন বলে, সেটা ভাল। কাজ করবে, বেজুত হলে এসে হাত পাঁজবে। নয়তো আমরা সব আছি কি করতে? কিন্তু বলে দিচ্ছি। জগার ঐ শরতানি-রাহাজানির মধ্যে কক্ষণো যাবে না। গেলে মরবে। পাখে কাঁড়িয়ে সারাবাস্তির হুলা করল তুমি তার মধ্যে ছিলে নাকি রাখে?

না ছোট বাবু। আমি কেন থাকতে বাব! হ্যাঁচড়া কাজে আমি নেই। তিনটে মুখের ভাত জোগাতে আমার বলে বস্ত্র জল হয়ে যাবার জোগাড়—

সেদিনের পানের দলে রাখেতাম ছিল তো বটেই, কিন্তু সন্ধ্যার সে খাড়া নাড়। নগেনশশীও এক কথায় মেনে নিল। শত্রু সংখ্যাবত কম হয় ভাল। বলে, এই বাড়ি পিণ্ডি চটকাতে ওদের। চক্কোভি মশার সহায়। সদয়ে বাড়ি, ফুলতলা আগে হয়ে যাব। চৌধুরির আলা আর সাইতলার নতুন আলা এক হয়ে গেছে। ফিরে এসেই লক্ষ্যকাণ্ড।

কয়েক পা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার বলে, সময়ে দিও পাড়ার সকলকে। নগেনশশী বাবু খোদ বেরিয়ে পড়ল। এম্পায়-এম্পায় করে তবে ফিরব। সায়েরে আজ বলে দিচ্ছি সকলকে। তুমি এই দেখে বাচ্ছ—তোমার মুখে আর একবার সবাই শুনে নিক।

খালের ধারে ভর কাঁড়ের পানসি বাঁধা। এ ছেন শৌখিন বস্ত্র বাদ্যানে হামেশা আসে না, উত্তর অকল থেকে ছুটিয়ে আনতে হয়। দু-জনে সেই নৌকায় উঠছে। আরও লোক আছে ছুটির খোপে। রাখেতাম উঁকিঝুকি দিয়ে দেখে—কে মাছবাটা? মাছবাটা এসেই আহ্বান করে: এসো গো। লাঠি ধরে খুব সামাল হয়ে ওঠে, বোঁড়া মাছবা পা পিছলে না পড়। উঁঠে আনুন চক্কোভি মশার।

রাখেতামের মোটেই ভাল ঠেকে না। বা বলেছে—কাণ্ড ঘটাবে একখানা সন্তাই। পানসি কি ফুলতলার চৌধুরি বাবুদের—প্রমথ ম্যানেজার কাছে পানসিতে, ক'দিন আগে সকলে মিলে থাকে নাজানাবুদ করল? ঐ কাজটা জগা বড় অজ্ঞান করেছে—কেউতেপাণ খাঁটা দিয়ে রাখা।

পানসি চলে যাবার পরে গগন আলা থেকে বেরুল। বেরিয়ে বেড়ার ধারে এল। রাখেতামকে এতমাত্র যেন চোখে দেখতে পেল। কোমল স্বরে বলে, কে, রাখে? পর-অপরের মতো বাইয়ে কাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসো।

অপস্বয়মান নৌকার দিকে চেয়ে রাখেতাম কক্ষণ পরে বলে, আগে তো বধন তখন চলে যেতাম ভিতরে। বলতে হত না। এখন বাওয়া যায় না।

গগন বাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ, কুকুর গুবেছি। পুনি নি, এমন এসে ছুটেছে। মাছবা দেখলে খেউ-খেউ করে। কিছু বগতে গেলে আমরা অবধি তেড়ে আসে।

রাখেতাম বলে, এই মাস্তর চলে গেল—সেই জন্তে বলতে পারলে দাদা। কিন্তু আর একটি আছে—

আলাধরের দিকে সত্যের দৃষ্টিক্ষেপ করে বলে, নিজের বোন বলে বাদ দিচ্ছ, ওটিও কম যায় না।

গগন ভারি ভরষার কথা বলে, তাড়াব। কোনটাকে থাকতে দেব না। চেষ্টা করছি এক সঙ্গে তাড়াব ছুটোকে—বিয়ে দিয়ে সরিয়ে দেব। এখন বুঝি নগনটা ওই লোভে ওদের শিছু পিছু ধাওয়া করে এলো। বড় ভাই আমি মত না দিলে বিরোধওরা হবে না, চেপে বসে থেকে তাই বত অঘটন ঘটাবে।

শালা বড় ভর দেখিয়ে গেল। শুনে তো গা কাঁপে। বলতে বলতে রাখেতাম ফিক করে হেসে ফেলল। বলে, তোমার শালা সেই সুবাদে পাড়াহুজ আমাদের সকলের শালা।

গগন বলে, মিথ্যে ভর দেখানো নয়। আমে-দুখে মিলে বাড়ি, লাঠি তোর! এখন তল। চৌধুরি ঘেরদার আর গগন ঘেরদার দুই এখন এক হয়ে গেছে—পাড়ার মধ্যে তোমরা কারা হে বাপু? বাতবিরেতে ঘেরিতে জাল বাওয়া চলবে না, সায়েরে চুরির মাছ বেচাকেনা হবে না। বত পুণোনি নিরমকাহন বাড়িল। ঘেরির আইন আর সরকারি আইন এক বকম—চুরি করে জাল বাইলে ফাটকে নিয়ে পুণবে।

রাখেভ্যায় সত্তরে বলে, বিয়ের শিপসিয় মত দিয়ে লাও বড়না।
বলিয়ে রেখো না। বিরোধোড়া চুকিয়ে আপন-বালাই বিয়ের হয়ে
যাক।

বরারখোলায় পুরো দুটো দিন কাটিয়ে জগারী কিরল। চুকিয়ে-
চুকিয়ে আসা সহজ নয়। ছাড়তে কি চায়। বাত্রার দলটা
এখন অসময়ে কিমিয়ে আছে বটে, কিন্তু কটা মাস গিয়ে আবার তো
পৌষমাস। উঠোন-ভরা ধানের পালা, দলও চালা হবে সেই সঙ্গে।
কিবেক তখন কোথায় খুঁজে বেড়াবে?

নূদন কপাল চাপড়ায়। খানিকটা মন্ডরা, খানিকটা সত্যি
সত্যি। বলে, ইস রে! অর হোক বিকার হোক, খুঁকতে খুঁকতে
কেন আমি গাড়ি নিয়ে গেলাম না! কাটে গিয়েই জগা-বার মন
বিগড়ে গেল।

জগা বলে, কোট আমার কোনটা দেখলি তোর? দুনিয়ার
উপর জন্মে পা দুখানা শক্ত হতে যে কটা বছর লেগেছিল। তারপর
থেকে খালি কোট বসলে চলছে। নামতে নামতে নাবাংলে নেমে
যাচ্ছি। বেশি কদরে দুনিয়ার খুঁড়ে। যেখানে গিয়ে বিনি
গন্তগোলে আরেস করে থাকে বার।

চলে বাহু বধন একদিন চাটি শাক-ভাত খেয়ে বাও জগা।
এ-বাড়ি খায়, ও-বাড়ি খায়। শীতকালে আসছে তো ঠিক? কথা
দিয়ে বাও। হ্যাঁ, জগার কথার কানাকড়িও দাম আছে নাকি?

বলাই বলে, সবাই তোকে ভালবাসে জগা। যেখানে বাস,
মাছুবজন দু-বিনের ভিতর মাতিয়ে তুলিস।

জগা বলে, ভালবাসা নয় না আমার মোটে। মন ছটকট করে,
লোহার শিকলির মতন লাগে।

অবশেষে বরনা হয়ে পড়ল তিনজনে। বলাই পচা আর জগা।
সকলের হাত ছাড়িয়ে বেরুতে দেখি হল অনেক। পঞ্চ কতটুকুই
বা! গাছ-খালে আগে শতক বাক ঘুরতে হত, তখন দূর-দূরন্তর
মনে হত। সড়ক বানিয়ে বাকচুর ঘিরে করে দিয়েছে। বাস্তাব্যট
বানিয়ে দুনিয়া কত ছোট করে ফেলেছে মানুষ। সাঁইতলা সকাল
সকাল পৌছানোর দরকার—পাড়ার মানুষ ডেকেডেকে আসার
বসতে হবে। সেদিনের মতো তুলল গান-বাজনা। আর কিছুতে
না পারা যায় গান গেয়েই জন্ম করবে খোঁড়া নগনাকে। পা চালিয়ে
চলে। দেরি হলে সবাই জালে বেরিয়ে বাবে, মানুষ পাওয়া
বাবে না।

সাঁইতলা এসে পড়ল, প্রহর রাতও হয়নি তখন। পাড়া
শিঙাতি। মানুষ অকারণে কেরোসিন গোড়ায় না। কিন্তু বুকের
উপরে তো খাজনা-ট্যাক্স বসায় ন, কথা বলতে এক পরমা খরচা
নেই—তবে কেন চুপচাপ এমন ঘারা? পাখপাখালি জীব-
জানোয়ার সকলের ডাক আছে। কিন্তু সাঁইতলার পাড়া ভরতি
এক গাধা মানুষ বেন ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। দুটো রাত্রি ছিল না।
সবলজ্ঞ তার মধ্যে মরে-হলে গেল নাকি?

বলাই বলে, কেই পক্ষ গেয়ে সকাল সকাল জালে বেরিয়ে গেছে।
জগা বলে, বেরুবে মরদ মানুষ। মাগিগুলো কি করে?
কাঁকর সেয়ে নিয়ে নিচেরপক্ষে একটু বগড়াবাটি তো করবে।
কী হল। বন না বসত, কিন্তু বোখা বায় না।

উঠানে এসে গাঁজার গন্ধ নাক পায়। ভাত খানিক সোরাহি।
পাড়ার মানুষ থাকুক না থাকুক, তাদের চালাঘরে আছে। জন্মকালে
কুতের মতো বসে আছে ক্যাপা মহেশ। মাওয়ার খুঁটি ঠেশ দিয়ে
ঝিম হয়ে একলাটি বসে। অবস্থা কী গাড়িয়েছে, বুঝে দেখে তবে।
গাঁজা এক। একা খাবার বস্তু নয়। অথচ এমন পাড়ার ভিতর থেকে
একজন কেউ বেরিয়ে এলো না। গন্ধ পাচ্ছে—মানুষের মন ঠিক
আনচান, তবু কি জন্মে কোন লোক এসে পড়ছে না।

মহেশও ঠিক এই কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। বোমার মতো কেটে
পড়ে বেরিয়ে পড় ভরে শালারা, মাথা কুটতি। এ জায়গায়
শনির নজর লেগেছে। বাবুভয়েরা গাওয়া করেছে—আর সুখ
হবে না। পালা, নয়তো মারা পড়বি একেবারে।

বৃত্তান্ত এর পরে সবিস্তারে শোনা গেল। রায়েস্তামকে ওই
শাসানি দিল, পাড়ার প্রতিজনকে হবে ঘরে জমনি বলে দিয়েছে।
চৌকি বসে বাছে নাকি চৌধুরিগঞ্জে, পুলিশ মোতায়েন হবে।
রাত্রিবেলা ঘেরির খোল ভাল ফেলে মাছ মারা যা, সিং কেটে ঘরে
চুকে মাল পাচার করাও ঠিক সেই বস্তু। চুরি। চুরির আটনে
বিচার হবে এবার থেকে, শুধুমাত্র ভাল কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে
না। হাতে হাতকড়ি পরিয়ে টানতে টানতে খানায় নিয়ে যাবে।

পচা ব্যাঙুল হয়ে প্রঙ্গ করে, চলবে কি করে তবে মানুষের?
থাবে কি?

মহেশ বলে, সে কথাও হয়েছিল। নগেন বাবু বলল, বাস্তাব্যট
হচ্ছে, মাটি কাটবে। মাখার দাম পায়ে ফেল বোজগার করে খেতে
হবে। অসংবৃতি চলবে না। শোন কথা! ওরাই বেন খাটনি
খেতে বোজগার করে খায়।

পচা বলে, মাটি কাটুক, ভাল কথা। কিন্তু একদিন তো রাস্তা
বাঁধ শেষ হয়ে যাবে। তখন?

মহেশ বলে, তখন মরবে। সময় থাকতে তাই তো পালাতে
বলি। কানে নিছিস নে শালারা।

চালাঘরে চুকে বলাই টেমি জালে। বরাহখোলা থেকে চাল
নিয়ে এসেছে—তাই কিছু তাদাতাড়ি কুটিয়ে নেওয়া। পচাকে
ডাকছে, উঠুন বরা পচা। ক্ষিধের পেটের মধ্যে বাপান্ত করছে—

জগা বলে, বাওয়া হোক শোওয়া কিন্তু হবে না। তাই বুঝে
চাল নিবি। কুঁচকি-কঠা গিলে হাসকাস করবি, ঘুবি ঘেরে ভুঁড়ি
কঁাসাব তাহলে। সারা রাত জেগে গানবাজনা। ঢোল
বাজাব আমি, আর গাইব তিনজনে মিলে। দল ভেঙে দিল
তো বয়ে গেছে—আমাদের তিনটে মানুষের প্রতাপ দেখিয়ে দেব
আজ ওদের।

বলাই চাল বুকে গেছে বাঁধের নরানজুলিতে। পচা উঠুন
ঘরান্নে। ক্যাপা মহেশ উঠে এসে উঠনের আগুনে কলকের ছড়ি
ঘরিয়ে নিয়ে গেল। আর জগাই বা সময়ের অপব্যয় করবে কেন—
ততক্ষণ ঢোলক নামিয়ে নিয়ে বসলে তো হয়।

বেড়ায় ঢোলক টাঙানো থাকে—কী আন্দাজ, ঢোলক তো নেই।
গেল কোথায়? টেমি নিয়ে এসে উঠনের দার থেকে, বেড়ার
চতুর্দিকে টেমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে : নেই তো। ঢোলক বলে নয়
—দড়ির উপর কাঁধা টাঙানো থাকে, তাও গেছে। দুটো দিন
ছিল না, মহেশকে পাহারাদার রেখে গিয়েছিল। ক্যাপা ঠাকুর

পাঁজা খেয়ে সৌম্য-ভালানাথ হয়ে পড়েছিল, সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে সেই সময়।

জগন্নাথ পরম হরে মস্তককে বলে, তোমার জিন্মায় সব ছিল। ঠাকুর-দেবের মধ্যে কে এসেছিল ?

বড়-কলঙ্কের প্রবল এক টান দিয়ে চোখ পিটপিট করে মহেশ বলে, কে আসবে ? চাকরবালা এসেছিল বৃষ্টি ক'বার। মেয়েটা বজ্র ভাল। আমার সেবা হত কিনা আলায়—ডাকতে আসত।

ডাকবে তো বাইরে পীড়িয়ে। কোন সাহসে ঘরে ঢোকে ? কুকুল তো ঠাণ্ডে লাঠি মেয়ে খোঁড়া করে দিল না কেন ?

মহেশ জ্বলজ্বল করে বলে, এসে মন্দির কি করল তুমি ? ময়লা দেখতে পাবে না মেয়েটা। কাঁটা নিয়ে কোমরে আঁচল বেঁধে লেগে বেত। গৌর-মাটি গুলে ঘরের মেঝে লেপত। বেড়ার নিচে ফুটো। বলে, মাটিতে পড়ে থাকে মানুষগুলো। ফুটো দিয়ে করে সাপখোঁপ ঢুকে পড়বে। মাটি লেগে ফুটো বন্ধিয়েছে। ঘর কেমন স্বকরক তরতর করছে, সিঁদুরটুকু পড়লে তুলে নেওয়া যায়। বজ্র দোষ হল মেয়েটার—কেমন ?

কিছু নয়ম হয়ে জগা বলে, আমাদের কাঁথা কোথায় রেখে গেল ?

আর বোলো না। বা মশা হয়েছিল কাঁথার। কঁটা আঙুলে মেড়েমেড়ে মেয়েটা তো ঘেসে খুন। বলে বাহা যাবে শুধী ন ঠাকুর, তা তোমাদের বন্ধু লাগবে না। জন্ম-জানোয়ার দেখলে কাঁথা ছুঁড়ে দিও, কাঁথার গন্ধে পালাতে মিলে পাবে না। নানো-কুটোর জন্তেও তোমার ধুনোবাণ সর্ববাণের দরকার নেই। নিয়ে গেল কাঁথা বাঁ-হাতে বুলিয়ে। স্বপ্নে কেটে দেবে কাঁচতে গিয়ে মৃত্যো মৃত্যো হয়ে যায় তো গৌর-মাটি দেবার ভাতা করবে। নয়তো কেবল দিয়ে যাবে বলেছে।

আর ঢোলক ?

মহেশ হি-হি করে হাসতে লাগল : মেয়েটা আবার কুর্ভিলাজ খুব। ঘর লেগে হাত ধুয়ে এসে ঢোলকটা গলায় বুলিয়ে ডুম-ডুম করে বাজাতে লাগল। আর ঠিক তোমার মতন গলা করে ডেউতে ডেউতে গান গায়। হাসতে হাসতে পেটে খিল ঘরে বাবায় জোপাড়।

গেল কোথায় ঢোলক ? সে-ও কার কাঁচতে নিয়ে গেল নাকি ?

মহেশ বলে, ভুল করে বোঝ হই গলায় বুলিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

জগা আঙন হয়ে বলে, চলে গেছে তার মানে ? ঢোলক কি লক্ষ চেনহার যে গলায় পয়ে তারপরে আর খুলতে মনে নেই ? ঢোলকি পেরেছে ?

বলাইকে জগা ঠিক দিয়ে ডাকল।

বড় তো ব্যাখ্যা করিস চাকরবালার। ওটা হল চর। গানে সেবিন খুব অনুরিখা লেগেছে। আমরা ছিলাম না—খোঁড়া নগনা সেই কীকে ভয় দেখিয়ে ছমকি দিয়ে মল ভাঙিয়েছে। আর মেয়েমানুষ চর পাঠিয়ে ঢোলক হয়ে নিয়ে গেছে। তিনটে মানুষ খালি গলায় টেঁচির কারনা করা যাবে না।

পচা আর বলাইর হাত ধরে জগন্নাথ হিড়হিড় করে টানে :

চল—

বলাই বলে, কোথায় রে ?

আলায়। ঘরের জিনিষপত্রর টেনে নিয়ে গেল, ডেবেছে কি ভয়া ?

মনে মনে রাগ বড়ই থাক, বলাই ঠিক সামান্যামনি পড়তে চায় না। বলে, ভাত চাপিয়েছি, ধরে যাবে।

গোড়া ভাত খাব আজকে। চল—

বলাইর দিক জগা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে : মেয়েটাকে ভয় করিস, স্পষ্টা-স্পষ্টি তাই বল না কেন। কাছা দিবিদে আর, তুই বুঝলি ? মাথায় ঘোমটা টেনে বেড়াবি এবার থেকে।

মহেশ এর মধ্যে কথা বলে ওঠে : যেতে হবে না। তোমরা এসে গেছ, কাঁথা এবারে নিজে থেকে এসে দিয়ে যাবে। মেয়েটা বজ্র ভাল গো, সাধ্য পথে কারও কষ্ট হতে দেবে না।

আর ঢোলক ?

জা জানি নে। ঢোলক অবিশ্বাস না দিতেও পারে। ঢোলক হাতে পেলে তো কান কালাপালা করবে তোমরা। সেটা বোঝে।

জগা আঙন হয়ে বলে, দেবে না, ইয়ারকি পেরেছে ? নতুন করে ছেয়ে আনলাম কুলতলা বাজার থেকে। করকরে টাকা বাজিয়ে দিবে। দেখে আসি, কেমন দেবে না—ঘাড়ের কঁটা মাথা নিয়ে আছে !

টেনে নিয়ে চলল দু-জনকে। রোখের মাথার আজকে আর সীমানার বাইরে নয়—একবারে আলা-ঘরের ছাঁচতলার গিয়ে হাজার ছাড় : বড়না—

ঘরের ভিতর কথাবার্তা হচ্ছিল, ডাক শুনে চুপচাপ হয়ে গেল।

জগা বলে, কানে ভুলো ভরে রেখেছ বড়না, গুনতে পাছ না ? বেরিয়ে এসো বলছি। নয় তো ঘরে ঢুকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসব।

এইবার দাঁড়য়ার শ্রোত্রে গগন বাসকে দেখা গেল : ঠেচাস কি জন্মে ? হল কি জোয়ের ?

অন্ধকারে গগন বাসের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গলায় ঘরে বোকা যায়, ভয় পেয়ে গেছে খুব। বলে, কি বলবি বল। বাসিস কেন ?

তোমার বোনটাকে শাসন কর বড়না।

গগন অসহায়ের ভাবে বলে, কি করল আবার ? না, পারার জো নেই ওদের নিয়ে। দিবিয়া শান্তিতে ছিলাম। জুটেপুটে এসে এই নানান ঝগড়া।

জগা বলে, আমরা ছিলাম না। সেই কীকে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মালপত্রের পাচার করেছে।

চাকরবালা বৃষ্টি পিছনে এসে পীড়িয়ে ছিল। সে স্বাক্ষর দিয়ে ওঠে : মাল আর পত্রের—কচু আর বেচু।

জগা বলে, ভালর ভয়ে বলছি, আপসে দিয়ে দিক সমস্ত। নয়তো কুককেছোর হবে।

চাকরবালা দ্রুত ভিতরে চলে গেল। পরক্ষণ কাঁথা এল দু-হাতে মেলে ধরে। কেচে কন্স করতে গিয়ে পুরানো কাঁথা কঁসে দিয়েছে। হেঁড়া কাঁথা দেখিয়ে হেসে কেটে পড়ে।

দেখ দাদা, চেয়ে দেখ। ঘর থেকে কত দামি শাল-দোশালা নিয়ে এসেছি, সেই জন্মে মালমুখি এসে পড়ল। মালুম নয় ওরা, মালুমের এর উপরে শুভে পাবে না।

জগা আশুন হয়ে বলে, আশাদের ঘরের ভিতর আমরা বেরন খুলি লোব, অত্ন লোকে কি অত্ন মোড়লি করতে বায় বড়ল? দিয়ে দিক একুশি।

চাকুবালা বলে, সেলাই করে তারপরে দিয়ে আসব। এ কাঁথার গাওয়ার চেরে মাটিতে শোওয়া অনেক ভাল।

মাধুর গুটানো ছিল ঘোরের পাশে, চাকুবালা ছুঁড়ে দিল। বলে, মাধুরে শুয়ে আজকের রাতটা কাটুক। কাঁথা দেব কাল।

জগা জেন ধরে : না একুশি। পরের মাধুরে পা মুছি আমরা।

সত্যি সত্যি পা মুছে পারের ঘায়ে মাধুরটা চাকুর দিকে ছুঁড়ে দেয়।

আর গগন ওদিকে কাতর হয়ে বলছে, ওরে চাকু, দিয়ে দে ওদের জিনিষ। ঝিছে বগড়া করিসনে।

চাকু কানেও নেয় না। জগার রাগ দেখে হাসে আরও মিটিমিটি। জগা বলে, ঢোলক কি জন্তে আনা হয়েছে, জিক্সাসা কত তো বড়ল। ঢোলক মরলা নয়, ছেঁড়াও নয়।

চাকু বলে, ছিঁড়ে দেব সেই জন্তে নিয়ে এসেছি। ঢাব-ঢাব করে বেয়ক্কা পিটিয়ে কানে তাল ধরিয়ে দেয়। তবু যদি বাজাতে জানত।

জগা টেচিয়ে ওঠে : ছিঁড়ে দেবে, জুলুম। তাই বেন দিয়ে দেখে। হাত মুচড়ে ভেঙে দেব না?

চাকু বলে, মুচড়ে ভাঙতে আসবে, তার আপসেই যে হাতকড়া পড়ে যাচ্ছে। তার কি উপায়—সেই ভাবনা ভাব গিয়ে এখন।

বলাই হাত ধরে টানে : চল রে জগা। ভাত ধরে ওদিকে।

জগা বলে, ভয় পেয়ে গেলি?

বলাই ঢোক গিলে বলে, না, ভয় কিসের? কিন্তু এরা লোক খায়াপ, বলা যায় না কিছু।

পচা এগিয়ে এসে আর এক হাত চেপে ধরল। কিসকিস করে বলে, গৌরাত্মি করিসনে জগা, চলে আর। ছিল নগনা-খোঁড়া, তার উপরে আবার টোনি চক্কোভি ভর করেছে। গতক নুবিসের নয় মোটেই।

হ'জনে ছ' হাত ধরে একরকম টেনেই নিয়ে চলল জগাকে।

মহেশ শোনে সমস্ত কথা, আর হা-তা করে হাসে : চল, বেয়িয়ে পড়ি। বদর বদর জকার দিয়ে কাছি খুলে দে নায়ের। তবুতর করে নেমে চলুক। হিলি কিলি আর মোলা—ঘোর জলদের ভিন দেবতা। রামকলী দেবতা ওঁরা। রক্তে মাধুর তোদের তাড়া করেছে, মাধুরের রাজবে ঠাই হবে না। রামের রাজবে চল বাই। তাদের দয়া হবে, সেখানে ঠাই মিলবে।

সে রাখে গান-বাজনা হল না। ভালই হল। ক্যাপা মহেশ হুমোয় না। ঘোর বাদ্যর গল্প করে, আর গীতা খায় ক্ষণে ক্ষণে। এরা তিন জনে প্রসাদ পায়।

শোন, জল হল জীবন। জলে জলময় বাদ্যবনের চতুর্দিক—সে জল ডাকে, বোদের আলোর বিকসিক করে পাত মেলে যে জল খেতে আসে। কিলিক বের সে জলে বাজিলে। অন্তহীন আকাশের নিচে কুলহীন সেই জলের উপরে ভীতু মাধুর আর্দ্রতা করে : ঠাকুর, হুনিরা-কোঁড়া তোমার দরিদ্র। কত ছোট আমাদের নৌকো।

ভাড়া এনে দাঁও কাছাকাছি—ভাড়ার জীব, নক্ত মাটির উপর পা রেখে বসে পাই। কুকার ছাতি কাটে, তবু এত জলের একটি কৌটা মুখে তোলবার উপায় নেই। উৎকট নোন্তা। সেই সময় কেউ যদি বলে এক খটি সোনার মোহর নিবি না এক কেয়ো জল—জল চাইবে মাধুর। মিঠা জল—বার বিহনে কঠাগত হয় জীবন।

সেই জীবন অকুহল রয়েছে কেশেভাড়ার চরে। মাটির নিচে লুকানো। আমি সন্ধান পেয়েছি। বালি খুঁড়ে খেয়েও এসেছি অজলি ভরে। নিজে গিয়ে লেখে এসে তবে বলছি।

আমি প্রথম নই। সকলের আগে গিয়েছিল শশী গৌরলা। তার মুখে শুনে সমস্ত হরিস নিয়ে তবে আমি বাই। সরকার থেকে লাট বন্দোবস্ত নিয়েছিল শশী। সিকি পরসী সেলামি লাগেনি, খাজনাও নয় প্রথম আট বছর। আট বছর অন্তে দু-আনা নিরিখে নামেমাত্র খাজনা। এমনি চলবে। বোলআদা হাসিল হয়ে গেলে পুরো খাজনার কথা তখন বিবেচনা। কী দিনকাল ছিল—জমি-জিরোড ডেকে ডেকে দিয়েছে, নেবার লোক পাওয়া যায় না। সাহস করতে না লোকে। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান ছিল, ইচ্ছেও হত না লোকের। ভাত-কাপড় পুড়ে-অলে বারিনি তো এখনকার মতো।

গাঙে-খালে ডাকাতি করে শশী পরসী করেছিল। বরস হয়ে গিয়ে এক টাকাপরসী জমিরে পাণবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে, পুলিশ তবু ত্যক্ত-বিরক্ত করে। মোটা তত্তা শুণে যেতে হয়, নয়তো গুল ধায়র মামলার জুড়ে দেবে, নাজেহাল করবে নানা রকমে। ডাকাতির আমলে কাঁচা পরসী হাতে আসত, দিতে আটকাত না। এখন পুঁজি ভেঙে ভেঙে দিতে গারে বড় লাগে। শশী তাই ছেসেদের নিয়ে বাদ্যর চলে গেল। নিরিবিবি সেখানে সংসার পাতবে। চোঁটাও করল অনেক রকমে। পেয়ে উঠল না। তিন তিনটে জোয়ান ছেলে বাঘের মুখে দিয়ে টাকাকড়ি সমস্ত খুঁয়ে শশী আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। উপযুক্ত গুণীন সঙ্গে না নিয়ে তার এই দশা। ভবসিদ্ধুর কাণ্ডারী হলেন গুরু-মুশি, বনের কাণ্ডারী ককির-গুণীন। আমার পিছন ধরে শশী বেতে চাচ্ছে আর একবার। বনের টান কাটেনি—ও নেশা কারও কোন দিন কাটে না।

বাওয়ার মতি হয়েছে অবশেষে ওদের। টিকতে না পারলে তো কিরে আসবে। কিবা আর বেখানে হয় চলে যাবে। হুনিয়া থেকে এত দিনে সবল বা ছুটি-রছে, সেটা ভার-বোকা কিছু নয়। এদের এই মস্ত সুবিধা, নড়তে-চড়তে হাল্কাই নেই। বাদ্যবনে বারিনি কত কাল! অরণ্যের অকিসন্ধিতে সাপের মতো বৃকে হাঁটা, বানরের মতো ডালের ডগায় চড়ে বসা আবার কখনো বাঘের মতো চক্কোর দিয়ে খোরা। মনে পড়ে গিয়ে বৃকের মধ্যে আনান করে।

পচা বলে, নৌকোর কি হবে?

পচার বেকুবি কথা শুনে বলাই হি-হি করে-হাসে : ছুতোয় ডেকে নৌকোর বারনা দে। নয়তো আর কোথায় পামি? বলি, হাটবারে কুমিরখারি গিয়ে খাটে তাকানি কখনো? নৌকোর নৌকোর এখন জল দেখা যায় না। বনে বাবে, তাই নৌকোর ভাবনা করছে।

মহেশ ব্যক্তি দেখে আপত্তি করে ওঠে : হুমকি কোরো না বরদার ! অনিষ্ট হবে। আশাহুখে বাহু, কেউ লাশহুতি না দেয়। হুঃখ পেয়ে নিশাসটাও জোরে না ফেলে বেন কেউ।

শব্দী সোয়ালার কথা উঠল আবার। শব্দীর পাণ্ডিত্য পরস। জোগাড়ি দেই করণে। পাঃ-বাল আর পহিন জল এক সঙ্গে বেন আঃজোহেত লাগল ভাঙাত শব্দীর সঙ্গে। সন্ধ্যা অবধি লোক বাটিয়ে মাটি কেসে বাঁধ বাঁধল—সকালবেলা দেখা হার মাটি বুয়ে সাক হয়ে গেছে, বাঁধের নিশানা পাওয়া যায় না। কুড়াল মেয়ে বে পাছটা কাটে, সাভটা না বেতে গোড়া দিয়ে পাঃ-সাভথানা ওজ বেরোর। কেটে কেটে শেখ হয় না। কেশে গিয়ে শব্দী আরও টাকা চালে; জনমজুং হুনা তেহুনা নিয়ে আসে। হল না, সর্ব্ব গেল। ফুঃরি না শেষে মাটি-কাটার দল শেখটা একদিন বিয়র মার মারল শব্দীকে। মার খেয়ে শব্দী পালাল। নির্বংশ নিরন্ন হয়ে ছোঁড়া ভাকড়া পরে এখন ঘুরে বেড়ায়।

জগা বলে, সন্ধ্যাে নৌকো ভাড়া কবর আমরা। জগন্নাথকে সবাই ডেনে। ভাচার টাঙ্গা আগাম দিয়ে দেব।

চিহ্নিত সেই কেওড়াগাছটার ভাণ্ডারের কিছু অবশিষ্ট আছে। জোর সেইখানে জগার।

মহেশ ঠাকুর বলে, কুমিরমারি চল তবে একদিন। নৌকো ঠিক করা যাবে। বাহার নেমেই তো পুজোআচা, তার কেনাকাটা আছে। খোঁজাফিও সঙ্গে নিতে হবে।

বগাই পঃমোংগাহে বলে, ফর্দ কবে ফেল ঠাকুর।

মহেশ বলে, লেখাজোখার হার বাড়ি নে। ফর্দ বুখে বুখে। ফর্দ আমায় মনে রাখা। কত বার কত লোক নিয়ে গেলাম।

জগা বলে, পরন্ত হটিবার আছে। পরন্তদিন চল তবে। সাইতলা আর কিরব না। ঐ পথে অবনি লা ভাগার।

গোশন ছিল ব্যাশারটা। জলল কেটে খেটেখুটে বসতি গড়ে ফুলে এফ কথার এমনি ছেড়ে চলে বাওয়া লজ্জার ব্যাশাও বটে। নগেনশনী নেই, শরতানি পাচ কবছে কোনখানে গিয়ে। কিছু চাকুরালা আছে। টের পেলে মেয়েটা হাসাহাসি কববে : নেড়ি কুতুরের মতন লেজ তুলে পালার কেমন দেখ। সেইজন্য রা কাড়ে নি ওয়া হুঃখ।

তবু কি ভাবে জেনে ফেলেছে বায়েস্তামটা। বেড়ায় আড়ি পেতে শুনে গেছে নাকি ?

শেখরাজি। তারা ষিঃমিক করছে ওপারে বনের মাথায়। বালে ভাঁটার টান। জল নামছে কোনদিকে অবিশ্রান্ত কলকল আওহাজে। এমিক ওমিক তাকিয়ে চারজনে বাঁধের উপর এসে উঠল।

বাঁধের নিচে গর্জন গাছের পাশ থেকে রায়েস্তাম কথা বলে ওঠে, আমি বাব—

তুমি বাবে কোথা ?

তোমরা বেখানে বাহু। ক্ষাপা ঠাকুর বেখানে নিয়ে যায়।

তোমার বউ-বাজা ?

বউয়ের ভয়েই তো বাছি—

বাঁধের উপর সকলের মাখখানে চলে এল। হাতে খেপলাঞ্জাল। বলে, বাহু আজও হল না। গালি দিয়ে ভুত ভাগাবে বউ। মরে গিয়ে আসা ছুড়াব, সেই মতলব হয়েছিল। বউ বলে আমি মরলে সেও সঙ্গে সঙ্গে মরবে। মরে গিয়ে পেত্নী হয়ে শিছু নেবে। তা ভেবে দেখলাম, এই ভাল। রাতে রাতে সরে পড়ি রে বাবা, বউ টের পাবে না। বোসো, জালগাছ দাঁওয়ায় রেখে আসি। মাগি ঘুঃছে এখন।

[ক্রমশঃ]

মা-মণি বিদায়

[দালভাতোর কোয়ার্সিমালোর চিঠি : 'আমার মাকে' এর মূল-ভাব গ্রহণ করিয়া নিজস্ব-ভঙ্গীতে রচিত]

গণেশ বন্ধু

শ্রীতের কুয়াশা জাগে, মনে পড়ে যায় সেই ভোরেব নীলিয়া,
তোমারো চোখের পাতা ভিক্তিছিল মানবিক চোখের ভলে
দেখেছিলাম অজস্রিক সে জাঁখি তোমার মা গো পৃথিবীর তলে ;
আজ আর কেঁতো নাকো কবির জননী তুমি, রেহের প্রতিমা।

মনে পড়ে অবুঃব বনানীর পাশ দিয়ে ট্রেনের গতি
একরাশ ঘোঁরা ছেড়ে হইসেল দিতে দিতে অজানার পথে
হৃদয় উয়ার্ড থেকে বাদাম-আপেল হুঁতো ভগা এই রথ ;
কবিরের জন্তে আমি তুলে বাই পৃথিবীর সব লাভ-কতি।

করলার বুড়ি নিয়ে ট্রেন যেতো ইমেরাই নদী-মোহানার
অসংখ্য ম্যাগপাই, সহস্র নুন আর ইউক্যালিপটাস ;
তোমারই দান এই ওষ্ঠের শাবিত হাসি একরাশ
হুঃখ আর কান্নার প্রশস্ত হাত থেকে বে হাসি বাঁচার।

মনেতে বাসনা জগে ধর্ম্মবাদ দিই আমি তোমারে গো আজ
তবুও চোখের কোণ আছে। দেখি জল তবু করে টলমল
তাদেরও চোখের কোল কিসের প্রতীকার করে হলহল,
জানি আমি কে সে বীর, কোন্ সে অতিথি জানি, স্বকৃত্যর সাক্ষ।

বুকু ছুয়াবে বুঝি, তাই আজ বলে বাই মা-মণি বিদায়
চলে বাই পাখনার ভয় করি আমি সেই হৃৎ নীলিমার !

জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

[প্রবীণ দেশবন্দী ও বিপ্লবী]

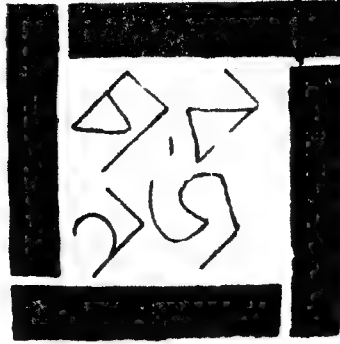
মুনে-প্রাণে একজন বিপ্লববাদী ও নিঃস্বার্থ দেশসেবী এই মানুষটি। বলতে কি, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র জীবনটাই জাতির কল্যাণভ্রমে উৎসর্গীকৃত। ভারতে বৈপ্লবিক জগৎব্যপী ছড়িয়ে দিতে বাংলার প্রচাসের অস্ত্র নেই, তিনি তাঁদেরই অস্ত্রতম প্রাণ। বুদ্ধি-সংগ্রামের অংশীদার হতে বেয়ে কী অপরিমিত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে—অথচ মেরুদণ্ড তাঁর এখন অবধি বেশ সোজা, বিপ্লবের পথ-রেখা ধরে চলার আজও তিনি একজন দুঃসাহসী সেনানী।

ঢাকার বিক্রমপুরের পঞ্চদশ গ্রামে জীবনলাল জন্মগ্রহণ করেন বিগত শতাব্দীর শেষ শতকের গোড়ার। বাঙালী মহাবিশ্ব পরিবারের আর মশ জন ছেলের ক্ষেত্রে যেমন হয়, বা হতো তেমনি সাধারণ ভাবে গড়ে উঠতে থাকে তাঁর জীবন। কিন্তু সামনে ছিল একটি প্রোজ্জ্বল আদর্শ—দেশমাতৃকার নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ।

চাত্রজীবন তখনও অতিক্রান্ত হয় নি জীবনলালের—দেশ ছুড়ে চলেছে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন। ইত্যবসরে পুলিস দাস ঢাকার অল্পশীলন সমিতি সংগঠন করে ফেলেছেন—পূর্ববঙ্গে এসে গেছে একটা প্রাণের জোয়ার। জীবনলাল এই মুহূর্তে গুরুকোণে বসে থাকতে চাইলেন না। অপরিত বয়সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যান তিনি—উদ্বেগ, ঢাকার ঘরে অল্পশীলন সমিতিতে যোগ দেন। এই ভেতর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন তিনি সক্রিয় ভাবে। তাঁর বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কর্মজীবনের সূচনা বলতে পারা যায় এইখানেই।

লক্ষ্যপথে ক্রমেই এগিয়ে যাবার জন্তে চকল হয়ে ওঠে জীবনলালের বিপ্লবী মন। ইতোমধ্যে কলকাতায় এসে যান তিনি এবং আসার পরই তখনকার বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর'-এর সাথে সক্রিয় যোগাযোগ ঘটে যায় তাঁর। ওদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের অবকাশে জাতিগণ থেকে অস্ত্র সাহায্য নিয়ে এসেছে সশস্ত্র আত্মরক্ষার যে গোশন আয়োজন হয়, এর সাথে ঘটে জীবনলালের নিবিড় সংযোগ। এই সময় যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), এম্ এন্ রায়, বাবুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসভাজন ও নির্ভরযোগ্য কর্মী ছিলেন তিনি। কোন কারণে বড়বড়টি কাস হয়ে পড়লে পুলিশী অগ্যাচাবের তাণ্ডব চলতে থাকে দেশের সর্বত্র। অনেক নেতা ও কর্মী কাগাবরণ করেন তখন—কতক সংখ্যক বিপ্লবী কাজ করে চলেন গা ঢাকা দিয়ে। সংগঠনকে ('যুগান্তর') বাঁচিয়ে রাখাই ছিল সে মুহূর্তের বড় সমস্যা। এই দুঃস্থ দায়িত্ব পালন করেন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, কুন্তল চক্রবর্তী—এঁদের সাথে নিজের প্রাণ জীবনলাল আর সেটি আত্মগোপন অবস্থার থেকে। ইংরেজ সরকারের পুলিশী লাহুনা থেকে বিপ্লবী কর্মীদের বাঁচাবার চেষ্টায় সেদিনে বীর অগ্রণী ছিলেন, জীবনলাল তাঁদেরও অস্ত্রতম। এর জন্তে অসংখ্য অপর্যায়ী নির্যাতন ও নিপীড়ন বুক পেতে সইতে হয়েছে অস্ত্রভয়ের সাথে তাঁকেও।

রাজনৈতিক মহলে 'জীবনলাল' বলে পরিচিত এই নিরহঙ্কার ও চিন্তাশীল মানুষটি কতবার যে জেলের বাঁচায় আটক পড়েছেন,



বলবার নয়। সূচনা থেকেই তিনি আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন—বিপ্লবের আদর্শে তাঁর প্রবল অমুরাপ ব্যক্ত হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। এমন কি, ইংরেজের গায়দখানার বেবেও আপন নীতি ও আদর্শের জন্তে সংগ্রাম দিতে তিনি পিছুপা হন নি। অনশন ও অস্ত্রাভ ব্যবস্থা মাহকত জুলুম ও নির্যাতনের জোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি আটক জীবনেও। এইই নিমিত্ত দেখা গেছে—লোম্যানের মতো কিছু গোঁষো অফিসারও কাঁচা গত্তী পেমিয়ে এসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তাঁকে।

ইত্যবসরে ১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। স্বাধীনতা এ পথে না এলেও বিপ্লবের জন্তে প্রয়োজনীয় গণ-জাগরণের পক্ষে এ পরম সহায়ক হবে, এই প্রত্যয় নিয়ে 'যুগান্তর' দলের নেতারা কংগ্রেসের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। সংগ্রামী জীবনলালও স্বভাবতঃই থাকালেন আন্দোলনের তত্ত্বভাগ। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকেও ভবিষ্যতের তত্ত্ব সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচার ও গুপ্ত সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন তাঁরা পাশাপাশি। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই সময় জীবনলালকে ('জীবনলাল') ঘিরে একটা তরুণ বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে থাকে, শুষ্ক বাংলায় নহ—বাংলার বাইরেও। 'যুগান্তর' দলের অস্ত্রতম প্রাণী কর্মকেন্দ্র 'সত্যাক্ষর' (দৌলতপুর) সাথে তিনি নিবিড়ভাবে



জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

যুক্ত ছিলেন। অপরদিকে কল্যাণকর ভাষনাল কুলেরও (টোকা) তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতি দেখে দেশবন্ধু বধন স্বাক্ষর পাঠির আদর্শ নিয়ে কংগ্রেসকে নতুন করে গঠন করতে ততী হন, সে সময় বুগান্ডার দল ও এর বিপ্লবী কর্মীরা এসে হাত মিলান তাঁর সাথে। এই ব্যাপারেও একটি প্রধান সক্রিয় নেতৃত্ব ছিল গঠনপট্ট জীবনলালের। স্বভাবচন্দ্রের (নেতাজী) সাথে এ সময়ই তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ আবদ্ধ হন। পার্টির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বহু আলোচনা ও পরামর্শ হয়েছিল উভয়ের ভেতর। সেমিনে। জীবনলালের গুণের স্বভাবচন্দ্রের কী অসীম শ্রদ্ধা ছিল, নানাশূদ্রে দেখতে পাওয়া গেছে সেটি।

এম্ এন্‌ রায় মারকত কম্যুনিষ্ট ভাবধারা ও আন্দোলন ভারতের বিপ্লবী মহলে তখন আলোড়ন আনতে শুরু করেছে। জীবনলালও প্রথম দফাতেই কম্যুনিজমের আদর্শ ও কর্মনীতির সাথে নিজেকে ভালরকম পরিচিত করে তোলেন। দেখতে দেখতে এসেছে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্ভাত্তা হয়ে পড়েন তিনি। সে যুগে স্বভাবচন্দ্রের মধ্যে বর্তমান কম্যুনিষ্ট নেতা মুজফফর আহমেদ ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও স্ত্রস্থ।

১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৮ সাল—পাঁচটি বছরই কারাজীবন বাপন করেন জীবনলাল আর এবার স্রুদ্র ব্রহ্মদেশে। অগ্নিযুগের এই বিপুল সেনানী কিন্তু এইখানেই দমে গেলেন না। বরং মনে এই দাবীটি রাখলেন তিনি—আগে চলতেই হবে, ঠিক পথ মিলবেই এক সময়। কেন না, সর্বোপরি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—‘পথই পথ দেখায়’।

ব্রাহ্মের জেল থেকে মুক্তি পাবার পরই কলকাতার ঐতিহাসিক কংগ্রেসে (১৯২৮) যোগদান করেন জীবনলাল। তারপর ১৯৩০ সাল—কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশময় চলেছে আইন অমান্ত আন্দোলন। এতদুচ্চ বিধা না করে জীবনলালও যোগিয়ে পড়েন এই গণ-আন্দোলনে। এই সময়ই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব ভার পড়ে তাঁর ওপর। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে ১৯৩৮ সাল অবধি আটক জীবন বাপন করতে হয় তাঁকে। এই আটটি বছর কাটে তাঁর কখনও বস্ত্রার জেলে, কখনও হিজলী জেলে, আর বেশির ভাগ সময় মাদ্রাজের কয়েকটি জেলে। তাঁর সময়োচিত সন্ধান ও নির্দেশ পেয়ে মাদ্রাজে সেদিনে একটি বেশ বড় রকম বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

এবারে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর জীবনলাল আরও অনেকের সাথে কংগ্রেসের গুণের আস্থা হারিয়ে কেনেন। রামগড় কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের আপোষ-রক। মারকত কমতা আদায়ের প্রস্তাব গৃহীত হলে এই সংগ্রামী যাদুঘটির মন স্বভাবতই বিকৃত হয়ে ওঠে। তারপর তিনি একাই নন, এম্, এন্‌, রায় প্রমুখ বহু নেতা ও দেশকর্মী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন। দেশে কি ভাবে শক্ত ভিত্তিতে বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তোলা যায়, তখন তাঁদের সামনে এই জুড়ী প্রস্তাব দেখা দেয়। নীতি ও কর্মসূচীর অমিল হওয়ার জীবনলাল কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিতে পারলেন না। এম্, এন্‌ রায়ের সংগঠিত রাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতেও যুক্ত থাকা তাঁর পক্ষে কঠিন হলো। পরিশেষে বাক্ত সখ্যক বিশ্বস্ত

কর্মী নিয়ে ১৯৪৩ সালে গড়ে তোলেন নিজে একটি নতুন সংগঠন—রায় নামকরণ করা হয় ডেমোক্র্যাটিক জ্যানগার্ড। আদর্শ অনুযায়ী এই মার্কসবাদী সংগঠনটিকে জোরদার করে তুলতে সেই থেকেই চলেছে জীবনলালের ব্রত ও প্রয়াস।

এ দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও এই মুক্তিগোষ্ঠার অবদান সামান্য নয়। খাত আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, উদ্বাস্ত আন্দোলন, ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলন, শান্তি আন্দোলন—প্রতিটি গণ-আন্দোলনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। ডেমোক্র্যাটিক জ্যানগার্ডের মুখপত্র ‘গণ-বিপ্লব’ের পরিচালনার দায়িত্ব আজও তাঁরই ওপর জড় আছে। মত ও পথের বিভিন্নতা থাকলেও জীবনলাল দল নির্বিশেষে সকল বিপ্লবী ও দেশকর্মীর প্রত্যাভাষন। এর প্রধান কারণই বোধ হয়—আজ জীবনলাল একজন ব্যক্তি-বিশেষ মাত্র নয়, নিজেই একটি আদর্শ।

আচার্য শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথের কর্মময় জীবনের ইরক জন্মভূমি হল ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি এন্ট্রাল পরীক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন এবং এ সময় থেকে তিনি সমাজসেবা শিক্ষা প্রচার দেশে আর্থিক উন্নয়ন কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমগ্র নোয়াখালী জেলা শিক্ষায় কতদূর পশ্চাৎপদ ছিল, তা বুঝতে অনুপ্রাণিত নেই। কারণ শ্রীরাধাগোবিন্দের পূর্ববর্তী এম এ পাশ ব্যক্তি মাত্র দুজন ছিলেন।

অসাধারণ মেধাযী ছাত্র হলেও সেকালে এন্ট্রাল পরীক্ষা পাশ করতেই তাঁর বয়স হয়েছিল ২১ বৎসর। এর প্রধান কারণ—কঠোর দায়িত্ব আর শিক্ষার সুযোগের অভাব। নোয়াখালী দালাল বাজারের বিত্তোৎসাহী রায় পরিবারের সাহায্য সহযোগিতা না পেলে কিশোর রাধাগোবিন্দের বিত্তোজ্জন হরতো গ্রাম্য পাঠশালায়ই সীমাবদ্ধ হ’ত। তমসাবৃত্ত বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলোকে স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আর লাভ নেই। তাঁর জন্মভিটা এখন পাকিস্তানে অবহেলিত; কিন্তু তাঁর জন্মতারিখ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩রা বৈশাখী বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিবস।

বিভাগীয়শীল ও বিভাবিতরণকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলে শিক্ষার অনগ্রসর নোয়াখালী ত্রিপুরাবাসীদের সেবার সুযোগের জন্য কলিকাতার সেন্ট পল্‌স কলেজে এবং চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপকের পদ প্রত্যাখ্যান করে কুমিল্লাকেই কর্মক্ষেত্রে নির্বাচন করেন। স্মরণীয় ১৩ বৎসর কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ পদের গুরুভার অধ্যাপিতর সহিত বহনের পর ১৯৪৩ সনে অবসর গ্রহণের পর নোয়াখালী-চৌরহানীতে কলেজ স্থাপনা এবং পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক রক্তমোক্ষের পর থেকে তিনি হারিতভাবে কলকাতার অবস্থান করে খীর মহৎকাজে লিপ্ত আছেন।

স্মরণীয় ৮টি বৎসর নিরলস একান্ত সাধনা ছাড়া তিনি সর্বত্র বৈক্য শাস্ত্র ও সাহিত্যসিদ্ধি মহন করে পরমার্থ বিজ্ঞা আহরণ করেছেন।

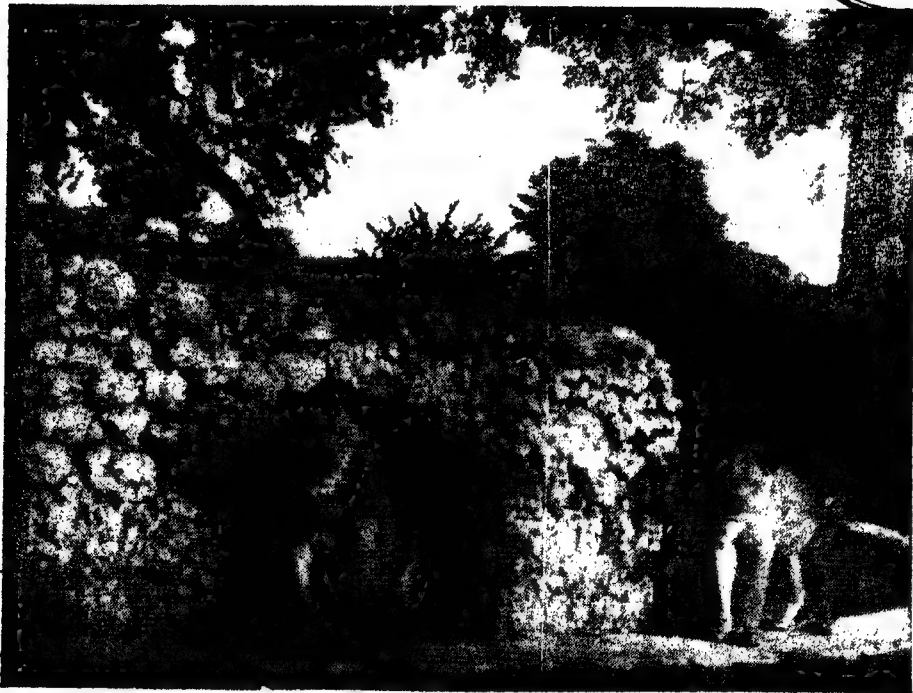
কর্মমূল জীবনের প্রারম্ভ থেকে তিনি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, আনন্দবাজার পত্রিকাকে বহু জানপর্গ ও মুদ্রিত্তিত্ত প্রবন্ধ দ্বারা

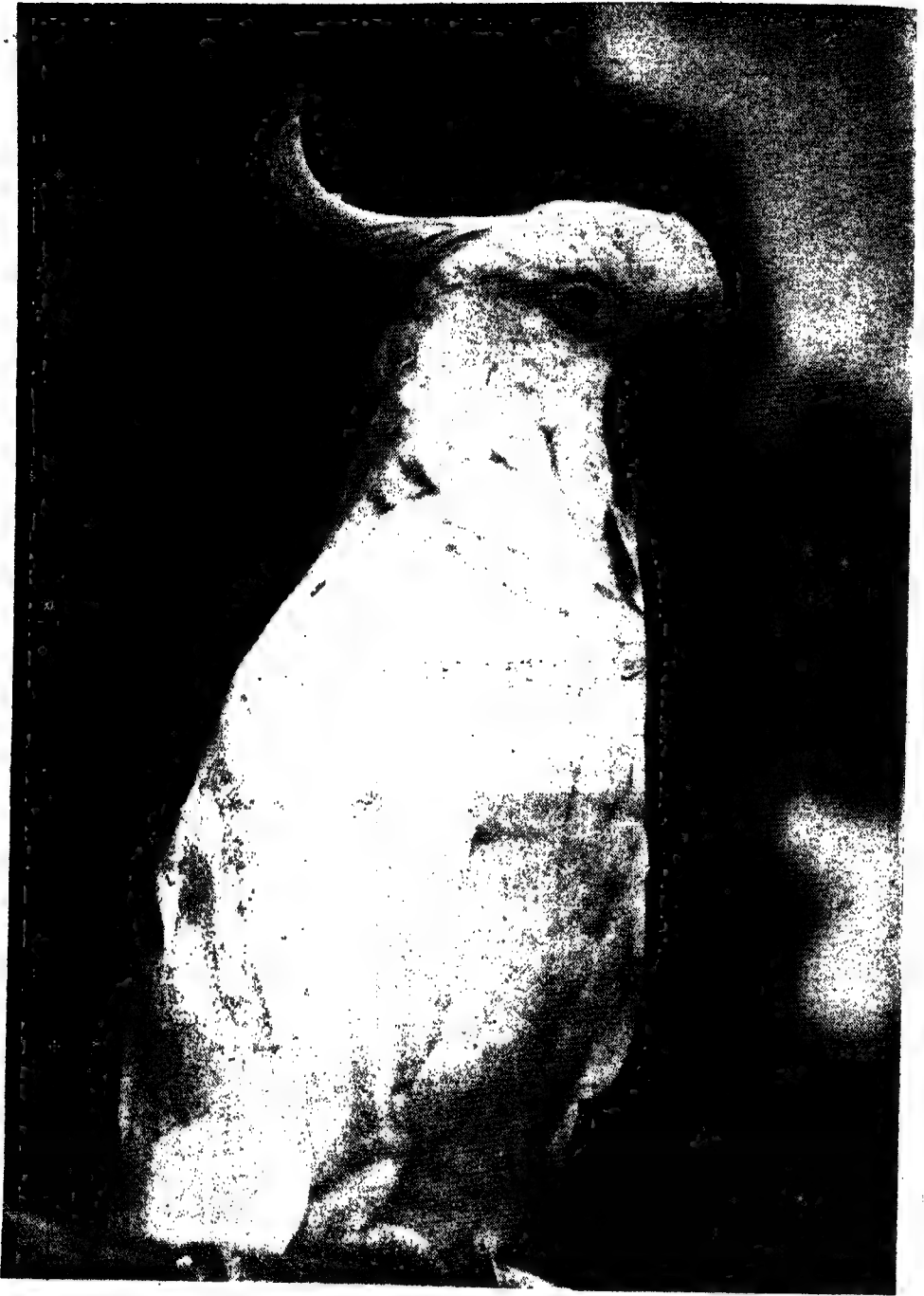


ସୂକ୍ତି

॥ ଆ ଲୋ କ ଚି ଡ୍ର ॥

ବନ୍ଦୀ





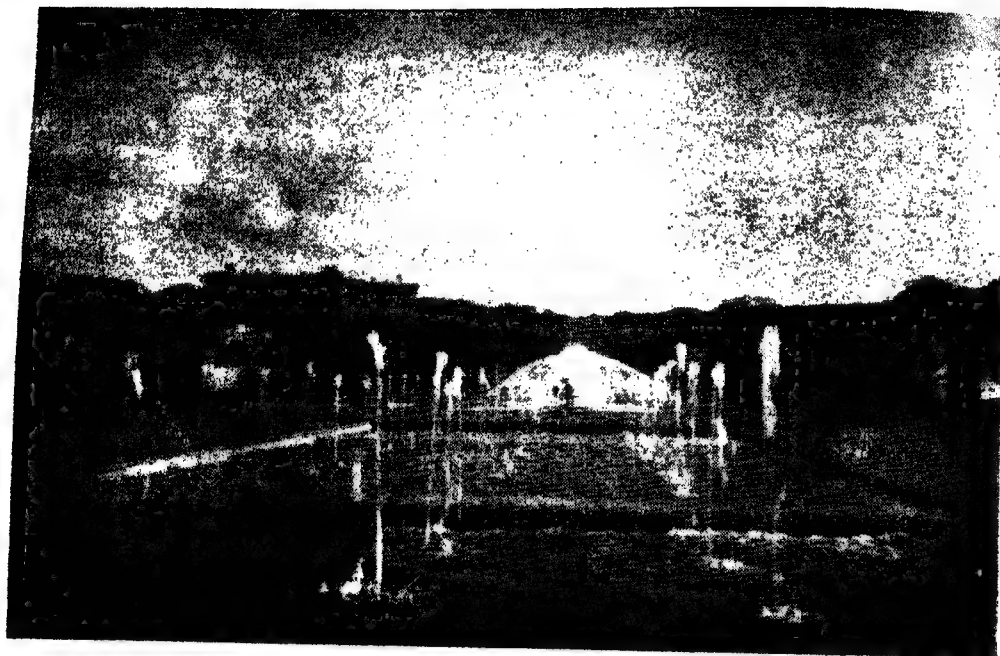
পোষাপাখী

—কবীর হুশোয়ার



নাচের পোষাক

—বিশ্ব চক্রবর্তী



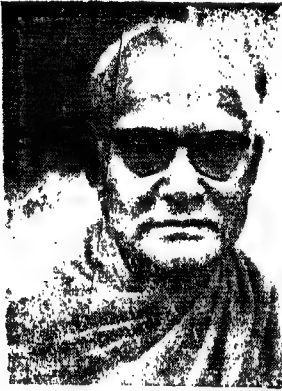
কোমারা

—সুপ্রভ বাগচী

কসলের প্রকৃতি

—নিমাইরতন গুপ্ত





শ্রীযাথগোবিন্দ নাথ

সমুদ্র করেন। বিভাগসময়ের তত্ত্বপ বিদ্যার্থীদের জন্য তিনি পাটীগণিত প্রণয়ন করেন এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য তৎকৃত বীজগণিত জ্যামিতি সলিড জিওমেট্রী কবিক সেক্সন প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃক প্রমুখ্যায়িত হয়।

কুমিল্লা নোয়াখালীর ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতিগঠন মূলক প্রতিষ্ঠান সংস্থা সর্বদ্যই তাঁর স্বস্তনী প্রতিভার নিদর্শন। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক প্রভৃতির গঠন কাজে তাঁর প্রচেষ্টা বাঙ্গালীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যতদূর দান।

শ্রীযাথগোবিন্দের কর্মধারা উত্তর কালে তলীয় জীবন সাধনার অন্তঃসলিলা ফল্গুবারার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্বজনের জন্য ভক্তিবস ভাগীরথী ধারার স্বই করল। ভাগবত-প্রমত্ত ব্রহ্মাণ্ডে নিজে আত্মদান করে নিবৃত্ত হন নি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গোয়াল, সমাল, সাধনা, প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বজনের জন্য সে অমৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গৌর কৃপাতরসিনী চাঁড়া তলীয় ভাগবত নিষ্ঠার অপর্য্য আলোব্য। স্বয়ংক্রমের পরম মহত্ব শ্রী যথাগোবিন্দ-জীবন আত্মসমাহিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রাহুত্বলনে প্রজ্ঞার নবতম বিকাশ হচ্ছে। অসীতিবর্ষে এ জ্ঞানভাগসের শ্রী হৃদ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মহাগ্রন্থ লিখনে নিয়োজিত। তিন হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এ বিশাল গ্রন্থখানি শুধুমাত্র লিখন কার্যে যে প্রমসহিষ্ণুতা আর গভীর শাস্ত্রজ্ঞান আবতক তার জন্য সর্বস্বত্বের সুধীমণ্ডলী প্রদা নিবেদন করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে।

বঙ্গভারতীয় জাতীয় আন্তরিক আরাধনার প্রতি সন্ধান দেখিয়েছিলেন, প্রাচ্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযাথগোবিন্দ নাথকে "সত্যোজিনী ব্রহ্ম সুবর্ণ পদ্মক" দ্বারা। এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দ্বারা এ বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানভাগসকে বোগা সন্মান প্রদর্শন করেছেন। "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন" তাঁর জীবন-সন্ধান সাহিত্য সাধনার নবতম অর্ঘ্য।

গুরুত্ব জনগণের প্রদা নিবেদনের অভিযুক্তি ডি.লিট, পদবিভার্চা, বিভাগাচলতি, ভক্তিসিদ্ধান্তভাষ্য, ভাগবতভূষণ প্রভৃতি প্রণয়িত উপাধিতে।

আমরা এ জ্ঞানবৃত্ত সচল সরল অমায়িক বিনয়ী আদর্শ বাঙ্গালী বয়সে/ ব্যক্তিকে আন্তরিক প্রদা নিবেদন করি।

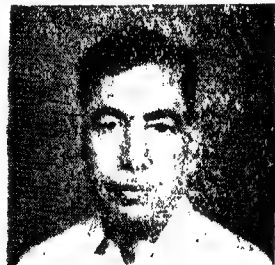
শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

[প্রবীণ সাংবাদিক]

দেশ ও দেশকে পরিচালনা করেন রাজনৈতিক নেতারা, কিন্তু দেশ ও দেশ-এর অভাব-অভিযোগ, সুবিধা-অসুবিধা এবং দুঃখ-কষ্ট জনসমাজকে তুলে ধরেন নীরব সাংবাদিকেরা। শুধু তাই নয়—এই সবে প্রত্যেকের পক্ষা উপস্থিত করেন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদের সুলেখনীয় মাধ্যমে। দৈনিক "যুগান্তর"-এর যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহিত আলোচনার সময় সবাদ-পত্রসেবীদের কর্তব্যনিষ্ঠার কথা আমার বার বার মনে আসে।

১১০০ সালের ৩১শে আগষ্ট শ্রী দাশগুপ্ত বরিশাল জিলার মাহিলাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইগার পৈতৃক বাসস্থান হল মশোহর জিলার মাগুরা মহর। বাবা ওকফবু দাশগুপ্ত বরিশালে জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে বসন্ত স্থাপন করেন। একমাত্র পুত্র বিজয়ভূষণ বাবাকে হারান মাত্র তিন বৎসর বয়সে—আর যা ওকফোদারমন্ডারী দেবী সন্তানকে মাত্র বয়সে হারেন তাঁহার দায়িত্ব নেন বহুস্তে। গ্রামের বিভাগসে চাকরিতে পঞ্চাশ পড়িয়া তিনি ১৯১৬ সালে শোলক-বাটাভোড় বেঙ্গলার হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে আই-এ ও বি-এ পাশ করেন। ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পড়ার সময় অর্থাৎ ১৯২১ সালের শেষভাগে জিলা কংগ্রেস সম্পাদকের কার্যভার লইয়া তাঁহাকে বরিশালে কিরিতে হয়। বালাকাল হইতে রাজনীতিতে অতিষ্ঠ থাকায় তিনি বিশিষ্ট নেতাদের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। তিনি ১৯২১ সালের অসমবোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং দুই বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি ১৯২৪ সালে বরিশাল মহরে "জুহাদয়" নামে একটি মুক্তগণার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহারই সম্পাদনায় ১৯২৬ সালে তথা হইতে "বরিশাল" সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে ব্রহ্মমোহন

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পুরলোকগত জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা নে উদ্ধাতে বোগদান করিয়া চারি বৎসর শিক্ষকতা করেন। অল্প দিকে সাংবাদিক শ্রীসলিল্য প্রতিষ্ঠিত ক্রী-প্রেস-এর বরিশাল জিলায় সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। সেই সময় তৎপ্রেরিত কলকাতা-পোলাবালা তালীচালনা ও অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট সংবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার পর এসোসিয়েটেড প্রেস তাঁহাকে আয়ত্ত্ব কানায়।



শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কিন্তু জাতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ছাড়াই অধিক মানিবার বিশেষ প্রতিষ্ঠানে যোগদান জাতীয়তাবাদী বিজয়ভূষণকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তৎকাল এ. পি. র. কালকাতা শাখার তৎকালীন কর্মকর্তা জিলাশান্তের দৃঢ় মনোভাবের ভূমি প্রশংসা করিয়া গন্ত্ৰ দেন।

একবার বরিশাল পরিভ্রমণে আসিয়া সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) জিলাশান্তের সহিত কলিকাতার সাংবাদিকতা কথার কথা আলোচনা করেন। ইহার পর ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্রের কলিকাতা হইতে ভারতবর্ষীয় জিলাশান্ত 'দৈনিক বঙ্গবতী'তে সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। তিন বৎসর পরে ১৯৩২ সালে তিনি 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকার আসিয়া বেড় বৎসর তথ্য থাকেন। ইহার পর সাপ্তাহিক 'নবদুর্জিত'ে বেড় বৎসর সম্পাদকরূপে কার্য করিয়া ৬৪বিদ্যাস মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক কেশরী'তে চলিয়া আসেন।

১৯৩৮ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জিলাশান্ত 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগদান করিয়া বর্তমানে উহার যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে কার্য করিতেছেন।

নলীয়া জেলার দাঙ্গাপুর গ্রামের ৬৭নম্বর বাহের কস্তা শ্রীমতী প্রবীলা দেবীকে জিলাশান্ত বিবাহ করিয়াছেন।

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ সরকারের কমনওয়েলথ রিসোসাল ডিপার্টমেন্টের আমন্ত্রণে জিলাশান্ত ইংল্যান্ড পরিভ্রমণ করেন এবং বাতারাভের পথে ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ও ইটালী পরিদর্শন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ ও নবীন সাংবাদিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগের প্রয়োজনের কথা জিলাশান্ত উল্লেখ করেন।

নবদুর্জিত স্বাধীনতাকে দুর্ভিক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে আর ভারতবর্ষকে প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে জগৎ-মাঝে থাকিতে হইলে— কামানের সমাজ, সংসার ও দেশ পরিচালনার সুখলতাবোধের পরিচয় দিতে হইবে— আর প্রয়োজন একাগ্রতা, কামিনীতা, সাহসবৃত্তি ও মানবতাবোধ। আসার সময় জিলাশান্ত এই কথাগুলি আমার অন্তরের গভীরে স্পর্শ করে।

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

[বিখ্যাত চা শিল্পপতি]

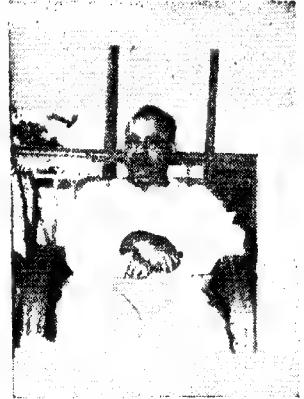
উত্তরবঙ্গের চা-শিল্প বাঙ্গালী মানুষেরই গৌরবের বস্তু।

১৭৮০ বৎসর পূর্বে দেশী চা-শিল্পের (বাঙ্গালী পরিচালিত) পল্লভ হয়। ইহার পূর্বে চা-শিল্পে ইউরোপীয়ানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল।

বৃষ্টিমের যে কয়জন বাঙ্গালী অসম প্রতিযোগিতার ক্ষমতা এবং নানা প্রকার সরকারী বেসরকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে বুদ্ধি করিয়া হিন্দু শাখা সুলল অস্বাভাবিক তরায়ের জগলে চা-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন জলপাইগুড়ি শহরের তৎকালীন লক্ষপ্রতিষ্ঠা উকিল বোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন। জলপাইগুড়ি শহরে অবস্থিত ভারতীয় চা-কর সমিতির প্রধান কর্মপরিচালক ডবল বোগেশ মেমোরিয়াল হল তাঁহার নামাঙ্কিত হইয়া আছে।

এই বিখ্যাত চা-শিল্পপতিরই অন্ততম সন্তান শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যুগ্মদায়। তিনি কলেক্ট হইতে বাহির হইয়াই চা-শিল্প

সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নিজেই নিয়োজিত করেন। এবং পিতার সহযোগিতায় ১৯২৭ হইতে ১৯৩০ এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই অল্পাধি চৌরাস্তা দ্বারা মালভাটি, সোলাঘিনী, কাদ'ঘনী, বিভূষণগর, এবং লক্ষীকান্ত এই পাঁচটি নতুন চা-বাগানের পল্লভ করেন। তিনি তখন বয়সে তরুণ মাত্র। এই পাঁচটি বাগান এখন সম্মিলিত ভাবে প্রায় বার লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন করিতেছে। ১৯৩৬ সাল হইতেই তিনি ভারতীয় চা-কর সমিতির (Indian Tea planters Association) সঙ্গে যুক্ত হন। এবং ইহার সম্পাদক, সহকারী সভাপতি এবং সভাপতিরূপে কার্য করিয়া নানা ভাবে চা-শিল্পের সম্প্রসারণে সহায়তা করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি কেন্দ্রীয় চা সংস্থা Central Tea Board) কর্তৃক মনোনীত হইয়া লণ্ডনস্থ আন্তর্জাতিক চা-শিল্প সম্প্রসারণ সভায় (International Tea Market Expansion Board) যোগদান করেন। কিন্তু ভারতীয় চা-শিল্পের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষিত না হওয়ার দৃশ্য ভারত সরকার এই আন্তর্জাতিক চা সমিতির



শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

সম্মতি সম্পূর্ণ ছিল করেন এবং স্বাধীন ভাবে ভারতীয় চা-সমিতি (Tea Board of India) বলিয়া একটি নতুন সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ ১৯৫৪ সনে ভারত সরকার কর্তৃক এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যরূপে মনোনীত হন। এই সনের মধ্য ভাগেই তিনি ভারত সরকার কর্তৃক আমেরিকা পরিদর্শনকারী ভারতীয় চা প্রতিনিধি মণ্ডলীর সভা নিযুক্ত হইয়া সমগ্র আমেরিকা এবং কানাডা পরিভ্রমণ করেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Tea council-র অন্ততম পরিচালক বলিয়া মনোনীত হন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় চা সমিতির সভাপতিরূপে বৃত্ত হন। তিনি ইতিপূর্বে ইহার সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইউরোপীয়ানদের দ্বারা পরিচালিত দুইটি বিরাট চা-বাগান অতি অল্প সময়ের মধ্যে অংশীদারদের নিকট হইতে ২১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া ক্রয় করেন। এই দুইটি সত্ত্বাক্রীত চা-বাগান শ্রীবোধের স্বপ্ন পূরণের জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই উৎকৃষ্ট চা-বাগান হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি তিনি আরও দুইটি চা-বাগান ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের স্বপ্ন— ইউরোপীয়ানদের দ্বারা পরিচালিত চা-বাগানগুলি ক্রমাগত ক্রমাগত বাঙ্গালী পরিচালিত চা বাগানে পরিণত করা এবং উত্তরবঙ্গে সমগ্র চা-শিল্পে বাঙ্গালীর স্থলভন নিয়োগ ও বাঙ্গালীর প্রাধান্য বিস্তার করা। এখনও পূর্ণ স্থলভন নিয়োগের ক্ষেত্রে, এর

কি সংখ্যার দিক হইতেও জলপাইগুড়ি দাঁড়িয়া অকলে চা শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একক প্রাধান্য লাভ দূরে থাকুক, সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভও হয় নাই। তাঁহার জীবনের স্বপ্ন সফল হইক।

শ্রীযুক্ত ঘোষ কেবলমাত্র বিশিষ্ট চা-শিল্পপতি এবং চা বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়াই সর্বভারতে খ্যাতি ও বিশিষ্ট পদ লাভ করেন নাই; তাঁহার অসংখ্য কর্মশক্তি নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি সম্প্রতি Reserve Bank-এর director নিযুক্ত হইয়াছেন। জলপাইগুড়ি শহরের তিনি কেবল বহু প্রতিষ্ঠানের সচিব ভূক্ত নহেন, তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতাও বটে। বলিতে গেলে তিনি জলপাইগুড়ির Polytechnic Institute-র গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত এই শিশু প্রতিষ্ঠানটি শ্রীযুক্ত ঘোষের পরচালনার বহুমুখী সম্প্রদায়ের পথে। শ্রীযুক্ত ঘোষ চেষ্টা করিতেছেন—বাহাতে এই বিদ্যালয়টি বিভিন্ন শাখা সম্বলিত ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তিনি এই শহরের আনন্দচন্দ্র কলেজ, প্রেমেন্দ্রের বালিকা মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত আছেন এবং এই প্রতিষ্ঠান দুইটির স্তম্ভ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি আরেকটি বিরাট কার্যে হাত দিয়াছেন। তাহা প্রায় সফলতার পথে। যদি তাঁহার এই নবতম উদ্ভট তাহার পরিচালনা অনুযায়ী পরিপূর্ণতা লাভ করে, তাহা হইলে ইহা কেবলমাত্র তাঁহার কর্মপ্রতিভার একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া যাইবে না, ইহা জাতির ধনসম্পদ

বৃদ্ধি করিবে এবং জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত সহস্র সহস্র ছিন্নমূল পরিবারের উদ্ভবশীল যুবকদের একটি বিরাট কর্মসংস্থান ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহার পরিকল্পিত North 'Bengal Sugar Mill' বাতালার প্রধান মন্ত্রীর আশীষপূত হইয়া এবং বঙ্গীয় সরকার প্রায় এক কোটি টাকার মূলধন এই শিল্পে নিয়োগ করিবেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষ কেবলমাত্র দুর্লভ কর্মভাবেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নাই, শহরের খেলাধুলা ক্ষেত্রেও তিনি একজন বিশিষ্ট উৎসাহদাতা। তাঁহার পিতার নামের সঙ্গে জড়িত Jogesh Chandra Memorial Sports Association প্রতি বৎসর জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়াবিদগণকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়া উৎসাহিত করিয়া থাকেন এবং ইহার বাৎসরিক অনুষ্ঠান উত্তরবঙ্গে একটি বিশিষ্ট চিত্তাকর্ষক বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ সাংসারিক জীবনে সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরিতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা শহরবাসী যাত্রেরই গৌরবের বস্তু। তিনি সম্প্রতি ৫০ বৎসরে পলাপণ করিয়াছেন। আমবা এই স্মৃতিভাবী, সবারচিত্ত, ভগবন্তের কর্মীপুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করি। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরবঙ্গের শিক্ষা ও বারিষ্য ক্ষেত্র দিকে দিকে সম্প্রসারিত হইয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক।

ভালবাসার গান

[জাপানী কবি 'নগুচী'র Love song কবিতার অনুবাদ]

হাতে হাত।

কাঁধে কাঁধ মিশেছে।

শ্রীবাৎসব আর অগের অধর।

আঃ দুটি বক্ষেব উদ্দাম স্পৃহাং হাতাল,—

হার পৃথিবী বাতের সামিল আর জীবন ফুরোর

প্রেমের কি মকর অবসাদ—

প্রেম সরিৎ কখনো স্থপিল কখনো তস্তিত,

মক রাস্তা কুমুদ কখনো শ্রীড়ায় উজ্জল কখনো বা রান,

প্রণয় মৌনো ভাস্কর না কিংবা অন্তলে ডুবক,

দেবতা অথবা 'মার'কে দেহ সমর্পণ কর,

দৈব দুটি সন্তা নিয়ে ইচ্ছে যতো খেলুক।

কাঁধে কাঁধ মিশেছে,

কপোলে কপোল আর অগের অধর,

দুটি স্তনস্পন্দন জানকে উজ্জল,—

ভালোবাসার কি নিবিড় অবসাদ।

পৃথিবী হারাৎ জীবন ফুরোক

তুমি অন্ধকারের বন্দনা পাইবো ॥

—অনুবাদক—চণ্ডী সেনগুপ্ত

শিশির=সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

দ্বিধিকারী প্রথম লেখা হয় উনিশ শো একুশে। আমি তখন মদন কোশ্মানীতে চাকরী করি। লেখাটা পড়ে ওদের পছন্দ হল না, ওরা আমার আলমগীর করতে দিলে। সেই first draft এরই সংকৃত রূপ দ্বিধিকারী। যোগেশদার আগে মম্বথ এক কৃত্তে হুজুর তাক লিখেছে বটে, কিন্তু ওটা ঠিক নাটক নয়—আর ওখানে হুজুর বলবার দরকারই হয় না। এখানে কিন্তু ডেলিবারেটলি সিন কমানো হয়েছে।

দ্বিধিকারীর প্রকৃত সমালোচনাই হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সেই যে বলেছিলেন—সীতা নাটকই নয়, সেই থেকে যোগেশদার নাটক কেউ গ্রহণই করলে না। শুধু যোগেশদার লেখা বলে দ্বিধিকারীর কেউ সমালোচনাই করলে না। এক বুকি হেমেন্দ্র সমালোচনা করেছিল, বলেছিল—শিশিরকুমার ভাল অভিনয় করেছেন। কৃত্ত ভাল হয়েছিল কিন্তু নাটকটি তেমন সুবিধার নয়।

আমরা আগের দিন তৃতীয় অঙ্ক পর্বত পড়েছিলাম—বেথানে ভারতনারী বৃক্সের রক্ত দিয়ে নাগরিক অভিলাষ দিয়ে গেল। তার পরেই নাদির ভারতবর্ষ ছেড়ে ইরানে কিংল।

চতুর্থ অঙ্ক দেখা যাচ্ছে নাদির তার ছেলে রেজাকুলিকে সন্দেহ করছে। সিরাঞ্জী সিতাবাকে বোঝাচ্ছে যে, খ্রিস্টান সাধুর কাছে গেলে তিনি হয়ত নাদিরের মতিগতি বদলাতে পারেন। এর পর নাদির এসে সে কথাটা তাকে বলে দেবে।

রহমেনের চরিত্রটা অনেকটা মহাভারত গান্ধীর মত। অহিংসা বলেই চাঁৎকার। তিনি সীতা সত্য বিশ্বাস করতেন কিনা জানি না; কিন্তু প্রায়ই বলতে হয়েছে আমি ভুল করেছি, মত ভুল করেছি—হিমালয়ান ব্রাহ্মণ।

ইংরেজরা কি ভেবেছিল, কোনদিন এসে তাদের ছেড়ে যেতে হবে? অবশ্য আঠোরা শ' পঁচাত্তি সাল নাগাদ একটু একটু ভাবনা আসতে আরম্ভ করেছে, তাই রাওইয়ার্ড কিপলিঃ বলেছে—Lest we forget.

বিনয়লা বোলেন—আবার জিগ্যাস করলেন—বালোঁ ত কবি, তাকে নাট্যকার বলে কেন?

বললেন—বলবে না। ওই ত প্রথম নাটকের আঙ্গুলকায় রূপ দিল। Tamburlane, Dr. Faustus, Jew of Malta—সব ক'খানাই ত ভাল নাটক। ওর Edward II ত ঐতিহাসিক নাটকের সূত্রপাত করল। সেক্সপীরার Richard II ত ওখ থেকেই চুরি।

আবার প্রশ্ন হল—সেক্সপীরাকে কবি বলে কেন?

বললেন—কবি ত বলবেই, তবে কবি নাট্যকারই বলে। থেকে থেকে নাটকের কাব্যগুণ কবিতার চরমে উঠে যায়।

সেক্সপীরার পড়াতেন প্যাসিভাল সাহেব। কর্কস পলা কিন্তু পড়ানোর তলী ছিল অশূর্ল। আমি ত জ্ঞান ছেলে ছিলাম না, শুধু

পড়ে আসতুম। যারা ক্লাস পালান, কোন দিন পড়ে-চড়ে আসে না, তারা পর্বত যেমন একটা আকর্ষণ বোধ করত।

প্যাসিভাল সাহেবের মতো ঘোষ সাহেবও (M. Ghosh) পড়ানোতে একটা আকর্ষণ এনে দিতে পারতেন। কিন্তু নোট নিয়ে পড়াতেন না বলে এ বছরের পড়ানো, আগের বছরের পড়ানোর থেকে অনেক তফাৎ হ'ত। নোট না নিয়ে পড়ালে অমন অবস্থা হয়।

বিনয়লা বললেন—নোট না নিয়ে পড়ালে গুরুত্ব হয়। পড়ানোর সময় যেমন হুজুর থাকে interpretationও তেমন হয়।

বললেন—কথাটা ঠিকই বলেছে বিনয়। হুজুর যেমন থাকে interpretationও সেই রকম হয়। এই নোট নিয়ে না পড়ানোর কথা আমাদেরও বলেছে। ছাত্ররা এসে বলত—আপনি কোনও নোট কলা করেন না, আপনার পড়া ধরতে পারি না। আমাদের ত পাশ করতে হবে। তারা কিন্তু ঠিক বলতো না। আসল কথা হ'ল, একটু ঘুরিয়ে বললে তারা আর বুঝতে পারত না।

প্যাসিভাল সাহেব শুধু যে ভাল পড়াতেন তাই নয়, পড়ানো করার কার্যদণ্ড ভাল জানতেন। তবে ক্লাসে কথা বললে চটে যেতেন। চটে যেতেন বলটা বোধ হয় ঠিক বলা হল না; খুব-চোখ লাল হয়ে যেত, বলতেন—Talking in the class is not only an insult to the professor, it is an insult to the class. বলেই আবার পড়াতে শুরু করতেন।

প্রকুর বাবু তাঁর সব বই পেরেছিলেন। বইতে সালা কাগজ লাগিয়ে, এপাশে ওপাশে চারপাশে ছোট ছোট করে বখন বা মনে হয়েছে, লিখে রাখতেন।

অনেকে বলে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক লেখা সহজ। আমার ত মনে হয় নাটক লেখাটী শক্ত। অবশ্য পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের একটা তৈরী কাঠামো পাওয়া যায়, কিন্তু interpretation দেবার বা চরিত্র গড়বার স্বাধীনতা ত থাকেই। ভাল সামাজিক নাটক লেখা ত খুবই শক্ত।

এর পর কি বই পড়বেন জানতে চাওয়াতে, অনেকেই বললেন—রক্তকবীর পড়ুন। বললেন—না ওটা এখন থাক। তখন আবার বলা হল—যোড়শী। বললেন—হ্যাঁ ওটা পড়া যেতে পারে। নাটকটা নষ্ট করে দিলে নুপেন চাটুজে। অবশ্য ওওই বা গোষ কি।

একজন নাটকটা শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা কি না জানতে চাওয়ার বললেন—না ও নাটক শিবরামের লেখা নয়। আসল ব্যাপার হল, দেনাপাওনার নাট্যরূপ দেবার অধিকার শরৎলা শিবরামকে লিখে দিয়েছিলেন। সে চারটে সিনে বইটা লিখে আনল। কিন্তু চারটে সিনে কি নাটক গাঁড়ায়? পরে শরৎদাকে ওর জন্তে একশ টাকা দিতে হয়েছিল। আমি আসল কথা বলিনি, তাহলে হয়তো শরৎদাকে বিপন্ন হতে হত।

বিনয়লা বললেন—উপভাসে আছে, জীবনানন্দ একজন অভ্যাতারী জমিদার ছিল।

বললেন—জীবনানন্দকে অভ্যাতারী জমিদার বলছে, কিন্তু সে ত অভ্যাতার for অভ্যাতার's sake করত না। তার দরকার টাকার আর টাকা পেলেই সে খুশী। কিন্তু টাকা চাইলেও তার ওপর তার দয়া হয় না। দেখা যায় একটা সোনার ঘড়ির ওপর সে হাই কেলেছে, বিছানার একটা দানী শাল পেতে রেখেছে, একটা ভাল চাদরে হাত মুছেছে।

ওর একমাত্র আকর্ষণ ছিল অলকার ওপর। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক করে খুঁজিও ছিল তাকে। তাই বোড়ীকে দেখে চমকে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মায়াও তার চলে গেল। আর তারপরে ত বাঁচার আর কোন মোহ রইল না তার।

বিনয়ণ আবার বললেন—জীবানন্দের ত্যাগী রূপটা আপনার কল্পনা।

বললেন—না, না, জীবানন্দের এই ত্যাগী রূপটা আমার কল্পনা নয়, উপক্ৰাসে এর আভাস ছিল, নয়ত আমি পেলাম কোথা থেকে? এবার সাধারণ আলোচনা শুরু হ'ল। বীরা হাজির ছিলেন তাঁদের প্রায় কেউই দিবিজয়ী অভিনয় দেখেন নি। ঠেকে অল্পবোধ করা হ'ল দিবিজয়ী একবার অভিনয় করতে,—বললেন, আজকাল আমার আর এই সব কম বয়সী চরিত্র করতে ভাল লাগে না। তাছাড়া নানির করতে বোধ হয় মগু পাবো না।

কে একজন বললেন—নতুন বই করতে গেলে একটা নতুন দলও দরকার।

বললেন—হ্যাঁ, নতুন একটা দল ত করা দরকার। দেখ চেষ্টা করে যদি কিছু করতে পার।

চান করে টাকা তোলার কথা উঠল, তাতে উনি বললেন—টাকা পরসা তুললে আমাদের দেশে হিসেব দেয় না। এই ধারণা আমার অনেক দিনের। আমরা কেডারেশন হলে মিটিং করে নল বোসের বাড়ি গেলুম। তা সে সময়ে কত টাকা উঠেছিল কেউ জানে না।

নল বাবু আমার চেয়ে অনেক বড়। ঠাঁর বয়স প্রায় ৮০ হল। অবন বাবু ছিলেন রবি বাবুর চেয়ে বছর দশকের ছোট।

হামিনী বাককে যোগেশ্বর অনেক সাহায্য করেছেন। আমাদের থিয়েটারও কত কাল Decor করেছে। নবনট্যমন্দিরে ত করেছেই—এমন কি ঐক্যমে পর্যন্ত "সরমার" সম্মুখের বৃত্ত করেছিল। অল্প খুব ভাল করে নি। হামিনী হয়ত আজকাল পুরানো দিনের কথা ভোলবার চেষ্টা করছে।

বাড়ি ফিরতে পাড়ীতে উঠলেন। সেখানে আজকালকার থিয়েটার সবকিছু কথা হল। বললেন—উঁকা দেখতে এসেছিলুম একবার, দেখি সব এমনিতেই হাততালি দিচ্ছে। বড় বাস্তার ওপর থিয়েটার হলে বড় অসুবিধা হয়। কর্ণওয়ালিসে সীতা করার সময়, ভাল একটা জায়গায় বড় বড় করে ট্রাম চলে গেল। ঐক্যমের মত জায়গায় ত খুবই ভাল হয়। পনেরো বছর ছিলুম ওখানে।

দিবিজয়ী কবে শেষ হয়েছিল জানতে চাওয়ার বললেন—উনিশশো ত্রেক্সি হুবারের জন্তে শেষ অভিনয় হয় দিবিজয়ী। ওতে সিন্ডারার করেছিল রাগ।

বলা হল—বিনি কীর্তন গান করেন।

বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে কীর্তন গায়। আমার ওখানে চানকে হারায় করতো। শিখের ছিল আমারই ওখানে।

ঠেকে আবার অল্পবোধ করা হল—একবার অন্ততঃ দিবিজয়ী কখন।

বললেন—দিবিজয়ী কবতে বোধ হয় কন পাবেনা। অন্ততঃ চরিত্রকে তৈরী করানো, বজ্র খাটনি পড়বে। তাছাড়া excitement আছে ত।

হঠাৎ এমনি এমনিই বললেন—তারানন্দবের রাইকমল পড়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন—বইটা আমার বেশ ভাল লাগল, ওটা তুমি থিয়েটারে করতে পার। কথাটা তারানন্দরকে আমিই বলি। ও বেশ ভাল লোক।

৯

আজকের দিনে বাঙলা রঙ্গমঞ্চ তথা চিত্রঙ্গনের অধমতারণ, অগতির গতি শরৎচন্দ্রকে, শিশিরকুমারের চেষ্টাতেই জনসাধারণ নাট্যকার হিসাবে চিনতে পারে। শরৎচন্দ্রের বোড়ী নাটক জীবানন্দরূপী শিশিরকুমারের অভিনয় নৈপুণ্যই ভাষার হয়ে থাকবে চিরকাল।

তিরিশে অক্টোবর সেই বোড়ী পড়বার জন্ত এলেন। আগের সপ্তাহের চেয়ে শরীরটাও ভাল মনে হল, নিজেও বললেন—শরীরটা কদিন পরে একটু ভাল। তবে ফুলাটা এখনও কমেনি। ডাক্তার এসেছিল, কারণটা বলতে পারলেন না।

রাজনীতির কথা তুললেন—গান্ধিজী বাঙ্গালীদের একেবারে দেখতে পারতেন না। তার সবচেয়ে বড় প্রেমশ বঙলা দেশে কোয়ালিশন হতে না দেওয়া। বললেন—কোয়ালিশন করা পাশ। অর্ধচ সেদিন শরৎ বোসের সঙ্গে কল্লল হকের কোয়ালিশন হতে দিলে বঙলা দেশে মুসলিম লীগের নামগন্ধ পর্যন্ত থাকত না। বঙলা দেশে মুসলিম লীগের সৃষ্টি হল একটি আলিসনে—পশ্চিম আর পূর্বের মিলনের জন্তে জিয়া আর কল্লল চাচার আলিসন ঘটানোর ফলেই মুসলিম লীগের জন্ম হল। কল্লল চাটাকে তখন লেখাপড়া জানা লোকেরা খুবই খাতির করত; তাদেরই বিশেষ অল্পবোধে কল্লল চাচা শেষ পর্যন্ত জিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন।

পাকিস্তান ইসলামের পৌরবের জন্তে ততটা হয়নি বটাই হয়েছে হিন্দুবিষয়ের জন্তে। মুসলমানদের দিয়ে কিছু হবে তা আমি আগে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কিছু হলেও হতে পারে। এই যে ইঞ্জিনের নাসের—ওকে দেখেই মনে হচ্ছে কিছু হতে পারে। ওর দেশে ত কিছুই পাওয়া যায় না তুলো ছাড়া—Longstaple Cotton না? সেই তুলো বখন কিনবে না বললে, তখন তার উত্তর দিলে আরও কেডারেশন করে। প্যান আরবের কল্পনা বোধ হয় প্যান ইসলামেরও আগেকার! প্রথম মহামুন্দের আগেই হবে হতে।

এই সময় বরিশ-পাটায় নাকের ডাঃ স্টিভাগো নিয়ে তুলল আলোচনা চলছে। তাই জানতে চাইলেন—ডাঃ স্টিভাগো কেমন বই হয়েছে? কোলকাতায় পাওয়া বাচ্ছে? শুনছি নাকি টলটলের মত ভাল লেখা হয়েছে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

একজন বললেন—বইটাতে কিছু উটোপাটো কথা আছে বলে ওর দেশে কেউ পছন্দ করেনি;

বললেন—ওই ত ভয়ের দোষ, একটু এমিক ওমিক হতে দেবে না। তাছাড়া বজ্র মিছে কথা বলে। (এখানে আবার কল্লল সেই ত কেউ, তাহলে তারা আবার চটে যাবে।) হামিনীর মতো একটা blood thirsty ভাব আছে। এই দেখ না বলল—

কোথায় গেল সে? উলান বাটোরে তিন মাস তার ধবর পাওয়া
বাচ্ছে না।

বলা হল—সে মলোটোক। হুলগানিন ট্রেট ব্যাকের গভর্ণর
হয়েছেন?

এবার বোড়স্কী নাটক ধরলেন—বোড়স্কী নাটকটা incomplete
হয়ে গেল, complete করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একটা
দুর্ঘটনার জন্তে হল না। এখন বা আছে তাতে অভিনেতাদের
চোঁতেই ঝাঁড়ায়।

বইয়ের সূক্ততেই এই যে detailed directions এটা সব
কিছু বেঁধে দেয়। এতে অভিনেতাদের করবার কিছু থাকে না।
আগে কিছু এমন ছিল না। ঐ যে second Mrs. Tanerod
লিখেছে পিনেবো নাটকে—মানে যে ইংরেজী নাটকেবশ একটা
আলোড়িন স্টুই কবল তার সময়েও এত বেশী থাকত না।
এটা ইংলেন্ডের সময় থেকেই সূক্ত বলা যায়, আর সবচেয়ে
বেশী বলেছেন শ'।

জীবনন্দের যে কোনও কিছুই ওপরিই লেভ নেই তা বেশ
বোকা যায়। বিছানায় একটা দামী শাল পাতা, সোনার যজ্ঞি,
ছাইলানি, হাত মুড়ছে ঢাকাই চামলা।

এই যে বিব দেওয়ার কথা এইটাই বার বার বলেছেন উপভাসে।
আমরা অবজ্ঞা ওটা বাদ দিই। চোখ বুজ ভুবু খাওয়ার কথাটাও
টিক রাখিনি। বোড়স্কী এসে মুখে ঢেলে দিত, জীবনন্দের মুখের
ওপর আলো পড়ত, আর তাতেই তার মুখের আঁচিল দেখতে পেয়ে
বোড়স্কী চিনতে পারত।

জাবগার ভায়গার এমন তুল ডাইরেকশন দেওয়া আছে যে
হাতকর। অবজ্ঞা সবটাই শব্দটার দোষ নয়।

আজকাল নাটকের উপাদান আমাদেরই আপোপাশে ছড়িয়ে
আছে। নেটওলা শুধিরে লিবলেই হবে, তবে কোন নারায়ণ
টারারণ দিয়ে কিছু চলে না।

ভারকরা বললেন—নটুক রামনারায়ণও কি ঐ দলে পড়েন?

বাস্তবাবে বললেন—না, না, সে বামনাবারদের কথা বলেছেন।
তিনি নমস্ত লাক ছিলেন। তাঁর নাটক সত্যিকারের ভাল নাটক।
'কুলীনকুলসর্ষব' নাটকটা কাটাকাটি করছিলেন কিন্তু ও আর এখন
প্রকাশ কর না, তাহলে আবার অল্প কেউ ব্যবহার করে ফেলবে।

বোড়স্কীর কথোতেই এলেন আবার—বোড়স্কীর সময় থেকেই
শব্দটার সঙ্গে বিরোধ বাধলো। নূপেন না জেনে আমার কতটা
ক্ষতি করেছে? না, ও বোঝ হয় জানেও কিছুটা।

আমি তাঁর কথাগুলো এতটু ভাবনাগের মত করে বলেছি বলে,
উনি বললেন (আমাকে অবজ্ঞা সরাসরি বলেননি)—আমার কথা
কুত্বের মুখে দিলেও ভয়ে বার আর শিখির সেগুলো বললার।

তাতে আমি বললুম—কই দাদা জমেনি ত। পল্লীসমাজ বগড়া
করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গির ঠাঁর থিয়েটারকে দিলেন
কিন্তু চলল না। তখন আবার আমার কাছে এসে দিয়ে বললেন—
হা ভাল বোক কর।

আমি বললাম—এখন একটা হাঁচি করে ফেলছেন, আর কি
ক্ষম বলুন।

পানিভাসে যেতে হলে কোন ঠেখানে নামতে হয় কেন—

হুলগাহিয়া, একবার হুলগাহিয়ার বাসেন, হাওড়া ট্রেনে নামি
দিতে গেছি। তা আমার বললেন—তুমি চল।

গাড়ী ছেড়ে দিয়ে সজে চললুম। যেতে যেতে দেখি খালি একটা
খার্ডবাস কমপাটমেটে আমার দুই বন্ধু বসে, বললুম—শব্দে বেল
ভাল সজী পাওয়া গেছে, চলুন এটাতেই ওঠা বাক, বেশ গল্প করতে
করতে বাওয়া যাবে।

উঠলেন, কিন্তু তারপরেই গাড়ী ছাড়ার মুখে মুখে বললেন—
না ভায়া, আমি ওদিকেই বাই। বল সেকণ্ডে ক্লাসে গিয়ে উঠলেন।

আমি বললুম—আচ্ছা, ট্রেনে পৌছে আপনার সঙ্গে দেখা কর,
এখন এখানেই থাকি।

শব্দে তার মনোগত ধারণা ছিল সব ঘেয়েই সত্যী সাবিত্রী। তাই
তাঁর সব নারীচরিত্রই সত্যী এমনকি সাবিত্রী পর্যন্ত। শব্দে তার সঙ্গে
আমার বিরোধের আর একটি কারণ—বহুস্মরণে। আমি তখন
কুস্তাক্ষের উইল বিহার্সাল দিছি, চঠাই একদিন শব্দে এসে
হাজির। দেখে টেখে বললেন—এই সব 15th rates বইগুলো
কেন কর বুঝতে পারি না।

তাতে আমি বললুম—দাদা, আপনি আর এর চেয়ে ভাল
লিখলেন কোথায়? আজও ত আপনি সেই রোহিণী আর হীরার
চরিত্রেরই অম্লকরণ করছেন। ভদের চেয়ে ভাল একটা চরিত্রও কি
জঁকতে পেরেছেন? শুনে রাগ করে চলে গেলেন, আর সেই থেকেই
বিরোধের শুরু।

রবীন্দ্রনাথও চল্লিশ সালের আগে চোখের বাতির ভূমিকায়
লিখেছিলেন—আজকের দিনের অবস্থায় বহুস্মরণের রোহিণী বা করত
তাই বিনোদিনী আর কুস্তাক্ষের উইল চোখের বাতি। চল্লিশ সালের
পর সেটা উড়িয়ে দিয়ে উপদেশ পূর্ণ ভূমিকা ছুড়ে দেন।

রবি বাবু উপভাস এমন কিছু ভাল কেমননি এক গোঁরা ছাড়া।
গোবাকো বিশ্বমানবতা ইত্যাদি চুকিয়ে দিলেন। লজ্জিতা চরিত্রটি
বেশ ভাল কিন্তু সুরচরিতার প্রেমের অপূর্ব বেগ। চতুরঙ্গও ভাল
উপভাস।

বিনোদী বললেন—কিন্তু ওতে দামিনী যে ভাবে বেড়ে গেল তাতে
উপভাসের structure ধুসে পড়ে।

বললেন—জীবনে এমন হয়।

নাটকও উনি খুব ভাল লেখেননি, তবে লিখতে পারতেন। কিন্তু
হকের সঙ্গে ত মেশেননি। না সেটাও ঠিক নয়, মেশবার চেষ্টা
করেছিলেন। সময় দত্তর সময় তাঁর থিয়েটারে প্রাইই আসতেন।
তা ছাড়া ওঁদের বাড়িতেই তাঁরা অভিনয় করেছেন। কিন্তু উনি
ছিলেন স্পর্শকাতর, তাই মিলতে পারেননি।

আমাদের বিশেষ্যী কি বলছে না বলছে তাঁর ওপর খুব লড়া
আছে। সেদিন জীমনি এসেছিল, আমার বললে—রানিয়ারনা
আমাদের অভিনয় দেখে কি সব ঘেন বলে গিয়েছিল, আপনার কাছে
কি লেখা আছে নাকি?

রবীন্দ্রনাথেরও এক সময় এই রকম ধারণা ছিল। তারপর
কেমব্রিজের History of literature-এ তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত
বয়োল—তখন উনি অত্যন্ত মর্যাদিত হলেন। তারপর থেকেই
বিশেষ্যীদের মন্তব্যের উল্লি কোন আর মূল্য দেননি।

রবিবাবু সবচেয়ে ওপরে অস্তরকম ধারণা ছিল। আমেরিকায়

খন গেছেন—কিতাব সেন বলেছেন—ওষ লক্ষা ঝড়ি আর flowery robes দেখে লোকের ধারণা হয়েছে উনি বোধ হয় prophet. উনি নিজেও ভাবতেন, উনি একজন prophet.

রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা বলছি। ঠর কবিতার Lyrical quality তুলনা হয় না, বিশেষ করে শেষ সাতটি বই—যোগেশ্বর ইত্যাদি। তবে মাইকেলের ব্রতাল্পনা কাব্যে এই Lyrical qualityর পূরণপাত হয়। অবশ্য তখন তাঁর দেখায় বৈচিত্র্য খুব বেশী ছিল না।

বলাইল, অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শৌভনিকের অভিনয়ে বলেছেন যে, থিয়েটারে লেখাপড়া জানা কেউ অভিনয় করতে আসেন।

শুন হাসলেন—অহীন্দ্র বলেছে নৃষি? তা না হয় বললে। তারপর বাসকতা করে বললেন—অহীন্দ্র বলবে না কেন? তোমরা ও নাম দিয়েছ নটসূর্য। এখন নটসূর্য বলেছেন—আমি কর প্রণয়ন করছি, তোমরা ধারণ কর।

মাইকেলের নাটক অপূর্ণ রচনা। কৃষ্ণকুমারীর মত নাটক ত দেখি না। ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ও খুব ভাল গ্রহণ। দীনবন্ধুর ‘সম্ভব একাদশী’ এবেরই কি বলে সভ্যতার উল্টা দিক। দীনবন্ধু বলত চেয়েছিলেন, সভ্যতা তোমরা পাওনি, তাই ‘সম্ভব একাদশী’। দীনবন্ধুর সম্ভব একাদশীও নিমটাদের চরিত্র কেউ কেউ বলে মাইকেল, কিছু মোটেই তা নয়। তাছাড়া নিমটাদের চরিত্রে ত পাগপ কিছু নেই, বরং বেশ ভাল ভাল কথাই বলেছে। নিমটাদ মদ খেতো আর খেতো বলেই কিছু করতে পারত না। মৈনাকের মত—ছুটি পক্ষ দ্বিগুণ তার পারে না উড়তে।

তখনকার দিনে কাগজে লেখা বহোলে আর কেউ অবিশ্বাস করত না। মুদির দোকানে বলত—বঙ্গবাসীতে বেরিয়েছে। তখন মুদির দোকানে খুব বঙ্গবাসী পড়ত। মাইনর পড়া একজন পড়ত আর বাকীরা বসে শুনত। তখন মুদির ছেলেরা মাইনর পড়ত, আমি চাষ বছর মত মাইনর খুঁবে পড়েছি, আমাদের সঙ্গে অনেক সেকরার ছেলে, মুদির ছেলে পড়ত। তখন মাইনর পাশ করলেই খার্ড ক্লাসে ওঠা যেত। তবে ঐ সব ছেলেরা বড় একটা পাশ দিত না। দু’তিন বছর পড়ে মোটামুটি শিখে নিয়ে ছেড়ে দিত।

একজন বললেন—খাতা লিখতে শিখেই ছেড়ে দিত আর কি।

বললেন—খ্যা, খাতা লিখতে ত শিখতই। মাইনর খুলে দু বছর পড়লে শুভকরী একেবারে তৈরী হয়ে যেত। তখনকার দিনে খুলে লেখাপড়া খুব ভাল করেই শেখান হত। আমি ত কোন ভাল খুলে পড়িনি, বঙ্গবাসীতে পড়েছি। সেখানে আমাদের এক মাটির ছিলেন, নাম বরদাচাঁদ—এম, এ নয় শুধু বি, এ পাশ কিন্তু ইংরেজী পাড়াহীন না তার তুলনা হয় না। সেকেন্ড ক্লাসে আমাদের কম্পোজিশন পড়াতেন, এক একটা কম্পোজিশনে বেশ খানিকটা সেক্সীয়র পড়িয়ে দিতেন। দ্বীপ্ত বোঝাতে একটার পর একটা পড়ে শোনাতেন।

অবশ্য তখন একটা সুবিধে ছিল। ক্লাসে আমাদের ছেলে ছিলুম মোটে আটত্রিশ জন। কলেজে অবশ্য আমাদের সময়েও ছেলে বেশী হত—ধর কাট ইয়াবে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমরা ছিলুম একশ উনিশ জন।

ওদের দেখে বাওয়া উচিত বুঝে টুয়ে দেখবার জ্ঞে। তাছাড়া দলবল নিয়ে বুঝে আসা উচিত।

পাড়ীতে কোয়ার সময় কথা হল, গিরিশবাৰু সীজে বললেন—গিরিশবাৰুর উপযুক্ত নাম দেওয়া হয়নি। ঠর কতকগুলো বই সত্যি ভাল যেমন শ্রীবৎস-চিন্তা—পড়লে মনে হয় আজকের কথা লিখেছেন। তবে দোষও কতকগুলো ছিল। কিছু কিছু বই একেবারে খারাপ লিখেছেন। অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। থিয়েটারে অভিনয় করতে হবে অথচ বই নেই। তাছাড়া সাধারণ চরিত্রের জটিল গুণের বস্তু বেশী জোর দিয়েছেন। অথচ উনি ইচ্ছা করলে চরিত্রদের জটিল ইচ্ছা করতে পারতেন। থিয়েটারের জ্ঞে হাজার হাজার টাকা দিয়েছেন অথচ থিয়েটারের গুণের কথাটা মায়া পড়েন। ছেলেকে বলেছিলেন—কখনো থিয়েটারের মাসিক হোসেন।

রাশিয়ায় যা যত্নে তা তিরকাল থাকবে না। কুকচেত কি ভাবে যে সবাইকে দাবিয়ে রাখবে? ওদের একটা blood thirsty ভাব চিরকালের। কিছুটা তাহার রক্তের বোগ আছে বলেই মনে হয়।

৬ই নভেম্বর যখন এলেন শরীফটা আবার খাণাপ হল, বললেনও—শরীফটা কয়দিন খেতেই খাণাপ যাচ্ছে। নিজেই আবার বললেন—সেদিন দেখেছিলুম কাগজে, মিসেস সামথিং অ্যালেন ত মিলিয়ন ডলার দিয়েছে আমেরিকান ব্যাপেটার থিয়েটারকে (তিন মিলিয়ন ডলার মানে আমাদের দেশের দেড় কোটি টাকা)। থিয়েটারকে কি পরিমাণ ভালবাসে বোঝ; আর টাকাও কি পরিমাণ আছে ভেবে দেখ।

একজন বললেন—ওদের সব চেয়ে নামকরা মিলিওনয়ার বোধ হয় বকফেলার।

বললেন—বকফেলার তো মিলিওনয়ার নন, বিলিওনয়ার। ঠর কত টাকা নিজেই জানেন না। বকফেলারের কাছে যেই যেত তাকেই একডাইস করে দিতেন। না নিলে আবার তাঁকে অপমান করা হত। আমরা যখন নিউইয়র্কে বাই ১৯২১-৩০ সালে, তখন slump, কাগজে খবর বেরোল যে তিনি এখন slump বলে একডাইনের জায়গায় ৫ সেট করে দিচ্ছেন। (এখানে বোধ হয় উনি একটু ভুল করেছেন, কারণ ১ ডাইস—৫ সেট। হয়ত নিকেল বলতে ডাইস বলেছেন।

এই সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, বললেন—ও, আপনি? আপনাত ভ বেশ কম বয়স বলে মনে হচ্ছে? চল্লিশ হবে?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে জানালেন, না। বললেন—হবে না। তাহলে ত বেশ বয়স।

ভদ্রলোক বললেন—আপনাকে ১৯৪৩ সালে ‘স্টাশচিট’ কলেজে নিয়ে গিয়েছিলাম।

বললেন—তা হবে।

ভদ্রলোক আবার বললেন—আপনি বলেছিলেন, নাটক লেখার অপরাধে একদিন এই কলেজের কেমিস্ট্রী প্রফেসর তাড়ানো হয়েছিল।

বললেন—বলেছিলাম? তাও হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথাগুলো বলছিলেন তাকে খুব অবশ্যের বোগ ছিল না। এবার আপনা থেকেই পুরোনো কলেজ-জীবনের স্মৃতিস্বপ্ন বলতে শুরু করলেন। কায়রো মানে ক্যামেরন আর মাই

হানে ম্যাকলীন! এরা আরম্ভের সময়েই আসে। এই অভিনবরা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েটরা কোলকাতা ইউনিভার্সিটির মানে আন্তর্জাতিক সমরকার বি, এর চেয়ে কোন অংশ ভাল নয় বরং নিম্নের।

মাকু বহন প্রথম আসে আমরা তখন কোর্স ইমানে—আমাদের ১০.১২ জনের Tutorial নিতে এল। আমাদের সঙ্গে শ্রীকুমার, সুকুমার, শহীদ সুরাবর্দি পড়ে। তাছাড়া আমিও ছিলাম। তা প্রথম দিন ক্লাসে এসে বললে—তোমরা কি পড়তে চাও?

তা বলা হল, আমরা অনার্স মোটে তিনখানা সেক্সগীয়ারের নাটক পড়ি, সেগুলো বাদ দিয়ে অন্য কোন একটা সেক্সগীয়ারের বই পড়ো। কি একটা খুব পরিচিত বইয়ের নাম করা হল—তাতে বললে, দেখ ও বইটা আমি পড়িনি।

তখন বলা হল—‘এস-টেস’ করাও। তাতে বললে—My English composition is not very good.

এদিকে খুব সরল ছিল। তা ক’দিন পরেই ওকে Ist year এ পড়তে দেওয়া হল—আর অন্য প্রেক্ষাসাধেরা বলে দিলে ও রকম করে সব কথা খুলে বোলো না। তা কিছুদিন পরে দেখলে সুরাবা হচ্ছে না, তখন কাঁধ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

কামরাঙা ওর চেয়েও খারাপ পড়ত। একজন একবার ওর পড়ানো লিখে নিয়ে গিয়ে ল্যাং সাহেবকে বলেছিল—দেখ কি ভুল পড়ায়। ওর কাছে আবার পড়ব কি? আর সেই শেষ পর্যন্ত হল প্রিন্সিপ্যাল। কাউকে বলতে শুনেছি—ও নাকি খুব ভাল পড়ত। কি পড়ত? Economics।

মাকু মাহবুব খুব সরল ছিল আর থিয়েটারের ওপর ওর বোঁকও ছিল। সেক্সগীয়ারের যে কটি নাটক ও অভিনয় করেছিল সে কটি খুব ভাল জানত। নরেশের সঙ্গে অভিনয় করেছিল—নরেশ সাইলক আর ও অ্যাস্টোরিয়ো।

এভিনবরা বা এবারডীন ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েটরা যে কিছু নিশত না একথা ওয়ান সাহেব মুককটে বোকার করতেন, বলতেন তোমরা কি ভাব তোমাদের পেগাতে এসেছি আমরা? ইংরেজী তোমাদের যেমন আমাদেরও তেমনি বিদেশী ভাষা।

এই সময় আর এক ভুললোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, জিগোস করলেন কার ভাই বললেন? পকানন দাস?

ভুললোক বললেন, পকানন দাস মুখাঙ্গির ভাই।

বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পকানন দাস মুখাঙ্গির কথাই বলছি। ইকনমিকসে অনার্স ছিল।

ভুললোক বললেন—চেনেন তাঁকে?

উত্তর দিলেন—চিনি বৈ কি। ওর ভাই পান্নালাল ত ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পকাননের মত ওরকম ভাল ছেলে আমি খুব কমই দেখেছি। পান্নালাল আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট ছিল। ও শুধু আমার বন্ধুই ছিল না ছিল ভায়ের মত। ১১১২ থেকে ১১৩৮ পর্যন্ত এমন রাত খুব কমই আছে যেদিন আমরা একসঙ্গে থাকি। বাড়িতে লোকজন কেউ না থাকলে আমি ওদের বাড়িতে যেতুম আর বেশী ভাস দিন রাত্তিরে ও আমার বাড়িতে যেত। রাত্তিরে দুজন বেরিয়ে কিংবদন্ত রাত বারটার আগে কোনদিন নয়—তখন বি, এ পাশ করেছিল, তারপর বাড়িতে এসেছি জানান দিয়ে আমরা আবার ঘেরাভূম।

আমি তখন বাহুড়বাসিন সেকেন্ড সেনে থাকি। ওখান থেকে বেরিয়ে সাকুলার রোডে পড়ে গ্রীয়ার পার্ক—সেখান থেকে তখন পুলিশের তাড়া খেতে হত না—তারপর গ্রীয়ার ওয়ার ঘরে চারটে নাগাদ এসে শুতুম। এই সময় নানা রকম আলোচনা করতুম আমরা যখন পলিটিকস থেকে শুরু করে, নাটক মার সাহিত্য পর্যন্ত। নাটকের কি ভাবে উন্নতি করা যায় এ নিয়ে অনেক কথা বলত সে। বিজ্ঞানের ওপরও বোঁক ছিল তার। বোধ হয় অনেকদিন আগে আমাদের বলেছিল, হাউই এর মত কোন বস্তুর সাহায্যে আমরা চাঁদে পৌঁছতে পারবো।

বুদ্ধি ওর খুবই বেশী ছিল; কিন্তু কেমন একটা বৈরাগ্যের জন্তে কিছু হল না ওর। মাইনর পরীক্ষায়ও হল ফার্স্ট আর আমি ওর ন’জনের নীচে টেনশ। একটা জে ও হল ফার্স্ট না কোর্স আর আমি শুধু পাশ করলুম। ফার্স্ট জাটসে ও বোধ হয় আরো টিচুতে, না বোধ হয় সিম্বল, তারপর বি, এস, সিনে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স কিন্তু এম, এমসিতে কোনরকমে পাশ করলে। তাও ওর মাইনর মশার চন্দ্রভূষণ বাবু বললেন, ও ফেল করল only chemist in the batch ফেল করার। শুনে ওকে পাশ করায়।

ওর ছিল কেমিস্ট্রী অনার্স। একটা কোর্সে either/or ছিল, তার একটা অংশ ছিল এডভান্সড যে কেউ চোঁটাই করেনি। সেটা বোধ হয় প্র্যাকটিকাল। এক্সপেরিমেন্ট ও আন্তর্জাতিক ডালই, প্রোফেসর, ডিমনস্ট্রেটর সবাই সাহস দিচ্ছে। হঠাৎ মাঝপথে কি হল সিগারেট বাড়তে গিয়ে যন্ত্রপাতি ভেঙে চুরে সব ততনহ। ও পরীক্ষার আগে বড্ড নার্ভাস হয়ে যেত। একবার দুটোর সময় পেপার আরম্ভ ও গোলদাঁঘিতে সিগারেট থাকে আর ছড়ি হাতে পাঁচটারি করছে। পনের মিনিট হয়ে গেছে এমন সময় কে একজন দেখতে পেয়ে বলছে—পান্না আজ পরীক্ষা না?

তখন ব্যস্তমস্ত হয়ে বলছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ্ঞে পরীক্ষা। ভেবে পাচ্ছিলুম না কি কাজ আছে। চল হাই।

ওর এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে কোন বিষয়ের তর্ক করতে পারত।

এবার বোড়শী পড়তে শুরু করলেন। প্রথমে বললেন—বোড়শীর দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দুটো বোঁক আর খুব ভাল লেখা কিন্তু কেমন যেন দরকচা ঘেরে গেছে।

বোড়শী-জীবানন্দের কথোপকথনের অংশটা পড়ে বললেন—জীবানন্দ এখানে বলতে চাইছে তুমি আমার স্বামী বলে স্বীকার কর কি না?

এর পরের দুখ নিখিল জীবানন্দ আমার পর যে সব কথা বলছে সে সব বললেন—নিখিলের কথাগুলো অস্বাভাবিক নয়। এখানে সে একবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে—caught with the Jampot in hand. বোড়শীর এটা deliberate। নিখিলকে ধরে এনেছে জীবানন্দকেও ডেকে পাঠিয়েছে। অবশ্য জীবানন্দ এসে পড়ায় নিখিলের অস্বস্তিকর অবস্থা হয়ই আর অভিনয়ে সেই অস্বস্তিকর অবস্থাই ত দুটোর তুলতে হবে। এখানটা একটু খাপছাড়া লাগে, কিন্তু কি করা বল। এই দুটো সিনের আগে ছোট একটা সিন যদি লিখে দিতেন তাহলেই হৈমর কি লেখে বোড়শীর লোভ হয়েছিল সেটা বোঝা যেত। [কম্বোঃ।



ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ

ତେଲ



ଏମ୍. ଏଲ୍. ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା କୋ. ପ୍ରାଏଭେଟ୍ ଲି:
ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ ହାଉସ୍, କଲିକତା-୨

চন্দ্রা তার নাম

॥ পারাবাহিক উপন্যাস ॥

মহাশেতা ভট্টাচার্য

১৫

ব্রাহ্মণের গুলীগুলো শরীরে নিয়ে চন্দ্রন সেখানেই পড়ে রইলো ধুনভোর। সন্ধ্যার দিকে তাকে পা ধরে টেনে নিয়ে পাশের পানীর ওকনো পাতার ওপর ফেল দিলো ডোমরা। এ সময় পরসা বা, তারাই কামাচ্ছে। পরসা দিয়েও প্রয়োজন মতো ডোম বা ভালী মিলছে না। এমনকি করে চন্দ্রনের জীবনটা ফুরিয়ে গেল। জীবনটা চন্দ্রন এমনিই কাটায়নি। দীর্ঘ দিন ধরে সে সাহেবদের সর্বশক্তিতে বিশ্বাস করেছিলো। কুমায়ূনের কোন একটি বনাঞ্চলকে নিজের শরীরের মতো ক'রে খুঁটিনাটি জেনেছিলো। তার শরীরে ক'টা কাটাছেঁড়ার দাগ আছে, কোথায় তিল আছে, কোথায় শিরাগুলো দাঁড়ির মতো উঠে আছে, এ-ও যেমন সে জানতো; তার সেই বনটার কোথায় খুঁড়িপথ, কোথায় নতুন চারা উঠছে, কোথায় নদীর বাঁকে আজিকের বুড়োময়ালটা পাথরের কোলে জলে গা ভেজাতে আসে, সে বছরকার বাঘানীর আসন্নকৃত্য ফলে জন্মিয়েছিলো যে ব্যাঘ্রশাবক—এ বছর বালকের মতো কোঁতুহলী বলললে চোখ নিয়ে মা-র কাছ ছাড়া হয়ে সে কোথায় দাঁড়িয়ে খরগোস ও সজাকর ত্রস্ত গতিবিধি দেখে—এ সবই ছিলো তার জানা। তার সাধাবানির গাছগুলোকে সে ভালবাসতো, আর নতুন পাতার সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়ি এলে পরে তার বালকের মতো আনন্দ হতো। সে প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ দিন একসঙ্গে বাস করে, প্রকৃতির সে জীবনসীমা থেকে তার মধ্যেও অনেকটা প্রকাশিত, বৈশ্ব এবং বাঁচবার আনন্দ সে গ্রহণ করেছিলো।

দেখা গেল সে সব জ্ঞান প্রাপ্ত হতে গেল। সে সব তার এ সময়ে কোন কাজেই আসলো না। এমন কি, সারা জীবন সে আশ্রয়স্থানকে যে এত বড় ঠাই দিয়ে এসেছে, কোন সময়েই অশোভন বা অসমানজনক কোনো আচরণ সে করেনি—যুঁহাটা ঠিক তেমন ভাবে এলো না। যুঁহা, সে ত' জীবনের চক্রের এক অবস্ফাবী পরিণতি। যুঁহাকেও অন্ধের করে তোলা হয় নানা রকম জাগতিক রীতিনীতি দিয়ে। রামনাম, লাল কাপড়, পুরের হাতের আগুন এবং পুরোহিতের মন্তোচারণ এই সব নিয়ে তবে যুঁহা হইল বালীন হয় চিত্তাক্রম। চন্দ্রনের যুঁহাটা সৈদিক থেকেও সম্পূর্ণ পরিণতি পেল না। যুঁহাটা এলো বিজ্ঞানাবে, সুর কেটে, যে মাহুয়টার মধ্যে জীবনত্বা বৃদ্ধ বয়সেও ছিলো প্রবল—তার ওপরে অতর্কিত এক বৈদ্যদের ছুরির মতো।

পাতাগুলো তার পকেট করলো, সাদারাত, সাদারিন ধরে এই বা। চন্দ্রনের যেটা বিজ্ঞানাবে চিহ্ন হয়ে পড়েছিলো—পাতাগুলো

বন্ধুর মতো শেরাল ও শকুনের চোখ থেকে কিছুদিনের মতো ঢেকে রাখলো তাকে।

চন্দ্রনের যুঁহার কথা চন্দ্রন জানে নি। সে কিরছিলো কানপুরের দিকে। কানপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে জাতসকের বিজয়ী সেনানী, এবং নীল-চলছেন এলাহাবাদ ছেড়ে কানপুরে। এ সময়ে কানপুরে যাওয়া মানি যুঁহাবরণ করা। কানী, গুলী অথবা কামানের গোলা ডেকে আনা।

তবু চন্দ্রন কিরছিলো। বাইরের সমস্ত ঘটনা ছাপিয়ে তার মনের ভেতর তখন একটা অদ্ভুত তাগিদ। কিরতে তাকে হবে-ই। যেমন ক'রে হোক যেতে হবে কানপুরে। চন্দ্রাকে সে ধবর পাঠিয়েছে—চন্দ্রা তার জন্তে অপেক্ষা করবে।

মনের ভেতরের এই দুর্দগ তাগিদ—চন্দ্রার জন্ত তার এই আকৃতি এখন চন্দ্রনের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সন্তার চেয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছে। চন্দ্রা, যে ছিলো চন্দ্রনের স্বপ্নের মধ্যে, যুঁহার ধরা—সে যে তার স্বপ্ন, মন, তার পৃথিবী সব ছাড়িয়ে এমন ক'রে বড় হয়ে উঠবে, তা বুকি জানতো না চন্দ্রন।

বেনারস ছেড়ে এলাহাবাদের পথ ধরে উজ্জ্বলে আসতে থও থও বৃদ্ধ হয়েছো ধার বার। বাদের সঙ্গে বেরিয়েছিলো চন্দ্রন, তারা কে কোথায় চলে গেল! এই যে লড়াই করলো, এই বনে একশো সাল বাদে, ইংরেজদের হারিয়ে তাদের রাজ্য কায়েম হবে—এই বিশ্বাসেই সে-ও গুরেছিলো হাতিয়ার। মাহুয় মাহুয়কে মেয়ে এত আনন্দ পাবে, এত রক্তপাতের প্রয়োজন হবে—স্বার এমন করে পরাজয় আনবে—তা সে আগে জানে নি।

যুঁহার এমন সর্গগ্রাসী রূপ সে আগে দেখেনি। গত ছয় মাসে যুঁহা তার নিত্যসঙ্গী ছিলো। যুঁহা যে এমন ভয়ঙ্কর অথচ ভয়হর, এমন নিষ্ঠুর, অথচ এমন নির্মল—যে যুঁহাতে এত ভয়, সেই যুঁহাকে সে নিত্য দেখলো—বৃকের কাছে, হুই চোখ জুড়ে, প্রাণমন ভরে

এই যুঁহা-ই তার চোখ খুলে দিয়েছে। বারা নিজেরা মরতে ভয় পায়, তারাই বুকি অপরকে মেয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ পায়। তবু কি ইংরেজদের কথাই মনে পড়ে তার? তার বদশীলদের, সে দেখেনি? দেখেনি যে তারই দেশের মাহুয়, যেমনভুক্ত কিছু পদলেহী মাহুয়—ইংরেজদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে সমান আনন্দে কেত থেকে গা থেকে মাহুয় ভাড়িয়ে এলো কানী দিয়েছে? কানী দিয়েছে—স্বার কিবাণের প্রাণ হাজার শিকড়ে বাঁধা, সে প্রাণ বেতে চারদিন সহবে। কতকণ ধরে গাহের তালে অসহায়ভাবে হুহুকে ফুটে, চোখ কান

থেকে রক্ত কেটে বেরিয়ে তবে মরেছে এক একটা মানুষ। সে বৃত্ত দেখে নিচে দাঁড়িয়ে ভাল ও আকিম খেয়ে আনন্দ করছে অজ্ঞার।

কিবাণ এমন অতর্কিত ও নির্ভর মৃত্যু বোঝে না। কিবাণ প্রাণ সৃজন করে। মাটির সঙ্গে কিবাণের সম্পর্ক নারী ও পুরুষের মতো। যে আনন্দে কিবাণ তার সন্ধিনীর ভেঁরে জীবনের বীজ সঞ্চার করে—সেই আনন্দেই সে মাটির অন্ধকার ভেঁরে গোপিত করে প্রাণের বীজ। মাটিকে সে কলবতী করে আর তার ও মাটির যে ভালোবাসাবাসি চলে এক একটি ফসলের মোহনয় ধরে। কেত থেকে শস্ত কেটে নিয়ে চলে যায় কিবাণ, রক্ত ও হতপ্রী ভূমি পড়ে থাকে। কিন্তু মাটি তখন তার ঐ অর্জনগ কালাদেহ, দরিদ্র প্রেমিকের ওপর কষ্ট হয় না। অভিমান করে না। সে জানে, এর পরে বর্ষেরে ঋতুতে তারও ঋতু সঞ্চার হবে আর ঐ কিবাণ-ই ফিরে এসে গভীর প্রেমে আবার তাকে কলবতী করবে। রক্ততার অভিমান নিয়ে কিবাণের দিকে চেয়ে থাকে শুণু পতিত অনাবাদী জমি। কিবাণকে ভয়ষ না হোক, শুণু কর্ণের মালিকানাটুকুও কেউ সেরনি বলে যে জমিকে বন্ধ্যা থাকতে হয়। কিবাণ আদর্শ প্রেমিকও বটে। কেন না জমির শেষ মালিক সে নয় মালিক কোনো ভূম্যধিকারী—যে শুণু শতশতাব্দের লোভে জমি চায়; শুণু পুরাকায়নার পত্নী চাইবার মতোই অবিবেচক তার সে মালিকানার অধিকার।

কিবাণ অনেক প্রাণ সৃজন করে এবং অভিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে, সেই ফসলের অকাল মৃত্যুতে সে বিরোধবাধা অনুভব করে। গাছের সন্ধ্যা ও মৃত্যু যেমন স্বাভাবিক, নিশ্চয় এবং তার মধ্যে যেমন জীবনের অন্ত সূচিত হয় না নতুন প্রাণের আগামী সজীবনাই বোঝা যায়—বিষাণের নিজের জীবনেও সে সেই স্বাভাবিক মৃত্যুই কামনা করে। যে মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে আসে। যে মৃত্যু দ্বারা সে অবশুণ্ড হয়ে যায় না—বরঞ্চ চিত্তাভঙ্গে গ্রামের পরিচিত নদীর লগ্নের সঙ্গে মিলে, নিজের পুত্র ও পৌত্রের স্মৃতিতে মিলে সে জীবনের সীমিত বাণ্য অতিক্রম করে চিরন্তন হয়ে বেঁচে থাকে।

সে মৃত্যু শাস্ত, বন্ধুর মতো, সেবতার মতো আশ্রয়দাতা, এবং জননীর মতো ক্ষমাশীল।

সে মৃত্যু পেল না কিবাণ। চন্দনও সেই মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত, এবং সেই মৃত্যুই সেও কামনা করেছিলো।

এখানে সে যে মৃত্যু দেখলো, তা জীবনের অবগ্রস্তারী পরিণতি নয়। কিবাণ জীবনশিষ্ঠী, তাই সে অমন সবড়ে পরম আগরে নিখুঁত ও নিটোল ভাবে প্রাণ সৃজন ও মৃত্যুকে গ্রহণ, দুই-ই করতে পারে।

এই সব মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীত। তারা আশাপাতলাভের আশায় অস্থির। তারা পৃথিবীতে নিজের প্রতীক্স করতে চায়, ভালোবেসে নয়, ক্রমা দিয়ে নয় জোর করে বলপ্রয়োগে।

ইংরেজ অফিসার-ও সেনানীকে চন্দন দেখেছে—হাত-পা বাঁধা বন্দী কিবাণ, যে সজ্ঞাজাত কোনো শিঙর মতোই অসহায় তখন, সেও যদি কীসার দক্ষিতে গলা ঢোকাতে দেয়ী করেছে—অফিসার ও সেনারা কি রকম হটকট করে, গালাগালি দিয়ে শূন্য চাবুক আফালন করেছে।

কীসী দিচ্ছে অসহায় বালক ও কিশোর ও বৃদ্ধদের—সেখানে মদপানিত হবার কোন মানাই হয় না। তবু, তারা যে এক সহজে

প্রাণহরণ করতে পারে, তা জানে, ইংরেজ অফিসারকে সে চোখ মুখ লাল করে উল্লসিত হতে দেখেছে—যা মদ-মত্ততারই নানান্তর মাত্র।

প্রাণহরণে এই আনন্দ কেন? না, ঐ যে অসহায় শরীরগুলো ওগুলো ব্রিটিশের শ্রেষ্ঠেষ্টই জয়ধ্বজ। ব্রিটিশ যে কত বক, পরাবীন দেশের মাহুষের প্রাণহরণে কি যে ভগবৎসত্ত অধিকার তাদের, এ যেন তারই প্রমাণ।

চন্দনের মনে হয়েছে, এই খোঁজরা জোর করে, এই ভাবে তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। আর এই খেতেই মনে হয় কোথাও তারা দুর্বল। কোথাও তাদের ভিত্তি একান্ত দুর্বল। কেন না, যে প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ এবং সত্যিই যে শক্তিশালী তার কি এমন এক রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করে তবে নিজেকে জাহির করতে হয়? চন্দনের মনে হয় ব্রিজমুলারীর কথা। ব্রাইট তাকে শরীবে মনে নিত্যা ধ্বংস করে নিজের প্রতি আসক্ত ও আবদ্ধ করতে চেয়েছে। পেয়েছে কি? ব্রিজমুলারীর শরীরটা নিত্যা লাঞ্চিত হয়েছে কিন্তু তার বাইরেও যে মনটা?

চন্দন জানে ব্রাইট কোনদিনও সে মনের নাগাল পায়নি। সে মনটা ব্রিজমুলারী দিয়েছে ডাক্তারসাহেবকে। ভবানীশঙ্কর ভট্টর, তাই সে প্রেমের মর্যাদা দিতে পারেননি। তাই বলে ব্রিজমুলারী ছোট বা মিথ্যা হয়ে গেল না।

আজকে ইংরেজরা চন্দনের দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বলপূর্ণী কোনো লুণ্ঠক বিদেশীর মতোই ধ্বংস কলঙ্কিত করে নিজের অধিকার জাহির করতে চাইছে।

পারবে না। পারবে না। সে কথা এক বছর আগেকার মন নিয়ে চন্দন বুঝতে পারতো না।

কিন্তু মৃত্যুর নিত্যা সাহচর্য তাকে অনেক শিখিয়েছে। চন্দন জেনেছে যে মৃত্যুটা কোন সত্যই নয়। তার চেয়ে সে অনেক সত্য। চন্দ্রার প্রেম অনেক সত্য।

আজ, কানপুরে মৃত্যু নিত্যা অপেক্ষমান জেনেও যে সে চলেছে, তার কারণ ঐ চন্দ্রা। চন্দ্রা তাকে টানছে।

চন্দ্রা টানছে, চন্দ্রা আর শুণু চন্দ্রা নেই আর চন্দনের কাছে। ডেরাপুরের মাটি, গ্রাম, সে বটগাছ, তার সে সাদামাটা শান্তিকামী বাবা প্রতাপ, মুখ ও মদগবিতা বা দুর্গা—এদের সে দীর্ঘদিন ভুলে ছিলো। কিন্তু এরাই তার জীবনের জল, মাটি, আকাশ, উত্তাপ ও বর্ষা। এদের উপাধানেই তার দেহ মন তৈরী। দীর্ঘদিন চন্দন তাদের ভুলে ছিলো। কিন্তু এখন, এই মহান অভ্যুত্থান যখন অঙ্গম কোনো প্রাচীন যুগপতি হাতীর মতো মুখ ধুড়ে পড়েছে—এখন তারা তাকে টানছে। তারা সবাই এক হয়ে গিয়েছে চন্দ্রার মধ্যে।

চন্দ্রা তাকে টানছে তাদের সকলের হয়ে। চন্দন জানে সামনে বিশদ, পিছনে শত্রু-সৈন্য, এবং নিরাপদে যদি বাঁচতে চায়, তবে যমুনা পেরিয়ে কান্নাতে গিয়ে নানাসাহেবের যে নতুন বাঁটি হচ্ছে সেখানে বোগদেওরা-ই সমীচীন। দ্বারা বুদ্ধিমান, দ্বারা ভক্তিতে চায়, তারা তাই করছে। কেননা, দ্বাবানলের গতি-এখন মহ্যভারতের মুখে ধাবমান। সেখানে, বলতে গেলে ইংরেজ শাসনের কোন অস্তিত্বই নেই।

চন্দন সে সব কথা ভাবতে পারছে না তার দেহটার রক্ত,

হাস, শিখা, উপশিখা, চোখের দেখবার ক্ষমতা, হকের অল্পভবের শক্তি, প্রবণের শোনিবার ক্ষমতা—এই সব কিছু ভরে হৃদয়ে গিয়েছে চন্দ্রা।

চন্দ্রা তাকে নিরন্তর চানছে। চন্দ্রার মধ্যে দিয়ে ডেরাপুরে মাটি, পাছ, বদীর ভিত্তি বাতাস, সেই রটগাছের নিচে জল জল ছল ছল দ্বারী জমিটুকু—সব কিছু তাকে সমানে ডাকছে আর চানছে। চন্দ্রার মধ্যে দিয়ে তার বাবার বেধাক্ষিত মুখখানা, আর মা-র চুই প্রসারিত হাত তাকে ডাকছে।

কেন চন্দ্রা নিজেকে না বুকে এমন করে ঘাটে ঘাটে ঠোঁড়ের খেয়ে বেড়িয়েছে? সে কি চায়, তা বুঝতে এত ঘেরী হলে কেন? কেন সে নিজের পরিচয় এমন করে ফুলে ছিলো? কি চায়, আর কি সে পাবে, জীবন তার জন্ত কি পাওনা মেনে রেখেছে তাই বুঝতে এমন কথ্য এতগুলো দিন কেটে গেল?

এমনি করেই হয়তো জীবন থেকে শিক্ষা মেলে। এমনি করে, সেখানেই সত্যের খুন্সী মাড়িয়ে মাড়িয়ে, লড়াই করে শরীর কন্ত-বিকৃত করে, হাজারটা মৃত্যুর স্বাদ নিজের ক্লাস্ত রক্তে নির্যত অল্পভব জা করলে চন্দ্রা কোনদিনও জানতো না, যে সে কি চেয়েছিলো।

আজ চন্দ্রা জানছে, যে সে শুধু এইটুকুই চেয়েছিল—চন্দ্রার হাত ধরে ডেরাপুরে ফিরে যাবে—সেইখানে, তার গ্রামের মাটির তার গ্রামের বাতাস ও জলের ও আকাশের স্নেহ পরিবেশে সে চন্দ্রাকে ভালোবাসবে। চন্দ্রা এবং তার সে প্রেমের ফলের উত্তরপুরুষ লুই হবে। তার চন্দ্রা জননী হবে। তার সন্তানকে ধারণ করে চন্দ্রার শরীরটা যখন ক্ষীণ হয়ে যাবে—তখনও চন্দ্রাকে তার অল্পভব লাগবে না। বরঞ্চ তখনই বোধ হয় চন্দ্রাকে সুকরতম লাগবে। তার জন্ম ক্ষেতে খাবার বয়ে নিয়ে—গাছের ছায়ার বসে চন্দ্রা তার সন্তানকে হুধ দেবে। আর তা-ই দেখতে দেখতে চন্দ্রা, জীবনের সঙ্গে তার নতুন নতুন গ্রন্থির বন্ধন অল্পভব করবে।

এই সে চেয়েছে। এই সে চায়। আর কিছু চায় না। আজ চন্দ্রা চন্দ্রার জন্তে সেই প্রেম অল্পভব করে, যা সে কোন দিন-ও করেনি।

তার গ্রামকে সে কোনদিন এত ভালবাসেনি। তার পিতা-মাতাকে সে কোনদিন এত ভালবাসেনি। চন্দ্রাকে সে কোন দিন এত ভালবাসেনি।

তার আর চন্দ্রার ভাগ্য সেই কবে, স্বদূর কোন্ শৈশবে লাল-চেলীতে গ্রন্থি বেঁধেছিল। চন্দ্রা বুঝতে পারেনি।

এগিয়ে আসে কানপুর। পথে এবার ছোট ছোট ইংরেজ পক্ষের প্রহরা দলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। চন্দ্রা প্রায় বিনা অহুত্বিত্তে যুদ্ধ করে ও হত্যা করে। তার সঙ্গীদ মরতে মরতে কমে এসেছে। এখন আছে তারা সাত জন। হিন্দু ও মুসলিম। তার সঙ্গীরা তার এই যুগ্ম সাহসের প্রশংসা করে। চন্দ্রা ধুম্যরিত রাইফেল বাতাসে ঠাণ্ডা করে, আর রক্তমাখা তরবারি খাসে মুছে দেয়। কোন কথা বলে না। বলে না যে, এটা সাহস নয়। ভয়ের বোধ নেই, সাহসের কথা ওঠে না।

কানপুরের উপকণ্ঠে গগনানপুরের কাছাকাছি এসে চন্দ্রা ও তার সঙ্গীরা কোন শব্দের এক আমবাগানে বিশ্রাম করে। বিশ্রাম

কনিকের। এখন সিদ্ধান্ত দেবার প্রয়োজন। ভগবান ও অর্জুন, গুলহুহাদ, সিরাজ ও বিদুশ—তারা এখন-ও সজ্জা আছে, তাদের ঘোড়া-ও তাজা আছে। তাদের হয়ে সিরাজ বলে—আমরা যখন পেরিয়ে কাছীর পথ ধরব। চিরধারী বাই, বা বালা যাই—কানপুরের পথে যাব না।

দয়্যারাম এদের চেয়ে বয়সে তরুণ। তাকে প্রায় কিশোর বলা চলে। পথে, গত পুরাতন লড়াই-এর পর তার বা পাখানা গিয়েছে। পা-টা রক্তমাংসের একটা জড়পুটিলীর মতো। একপার্শ্বে মূলছিলো। কাল থেকে তাতে পচ ধরেছে। ওপরের উকটা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। দয়্যারামের অব-ও হয়েছে। সে আর চন্দ্রা থেকে যায়।

দয়্যারামকে মাটিতে গুয়ে পড়তে সাহায্য করে চন্দ্রা।

সঙ্গীরা এবার পাঁচ মাস বাদে ছাড়াছাড়ি হয়। তারা চন্দ্রা ও দয়্যারামকে আলিঙ্গন করে বিদায় নেয়।

দয়্যারাম চন্দ্রাকে শুকনো গলার বলে—একটা ডাল ভেজে দাও।

গাছের একটা ডাল ভেজে দেয় চন্দ্রা। দয়্যারাম সেটা কামড়ে ধরে থাকে। কাছে-পিঠে জল নেই। ডালটা কামড়ে সে বহুবার অর্ন্তনাদগুলো চেপে চেপে দেয়। বেশী বজ্রা হলে পরে মুখ ভেঙে দেয় মাটিতে। চন্দ্রাকে বলে—যদি দেখে কিরিকীরা আসছে, তবে চন্দ্রা ভাই তুমি গুলী করে আমাকে রক্ষা করে দেবে। কথা দাঁও।

চন্দ্রা বলে, দেব।

রাত বাড়তে থাকে। মশা ভন্ ভন্ করে। দয়্যারামের বজ্রা বাড়ে। একবার সে মুখ ফিরিয়ে বলে—মাটিতে কান পেতে আছি। মনে হয় ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাচ্ছি অনেক দূরে। তুমি বরাবর চলে যাও। এখন গেলে বাঁচতে পারবে।

চন্দ্রা বলে—আমি যাব না। আমি কানপুরে যাব।

দয়্যারাম বলে—না, ভুল শুনেছি। সব চূপচাপ।

চন্দ্রা গড়িয়ে পড়ে পাশে। বলে—রাত তিন প্রহরে উঠে আমরা বেরিয়ে যাব। তুমি যদি কিছু শোদ—তবে আমাকে ডেকে।

দয়্যারাম বাড় নাড়ে। চন্দ্রার তস্ত্রা আসে।

রাত তিন প্রহর পেরিয়ে বাবার আগেই এসে পড়ে ত্রিসেভিয়ার ইভানুসের প্রহরাদল। রাতটা যখন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বাড়ছিলো—তখনই মাটিতে মুখ ভেঙে মরতে থাকে দয়্যারাম। শেষ চেষ্টার বারুদের গুঁড়ো মাথা পটিটা থেকে কেসে দিয়ে সে ছোঁরা দিয়ে বাঁধন কাটাতে চেয়েছিল। হাতে বশ ছিলো না। ছোঁয়ার খোঁচা লেগে উকতে একটা বিজ্রি গর্ত হয়। সে গর্ত থেকে প্রথমে কালো রক্ত ও পুঁজ, তার পরে লাল রক্ত ছিটকে ছিটকে বেরোয়। অল্পত আর্য্য বোধ করে দয়্যারাম। রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও বেরোতে থাকে। মরতে যে তার কত ভালো লাগছে, এই কথা পাছে বলে উঠে চেঁচিয়ে আর শব্দ সৈন্তদলকে জানান দিয়ে দেয়, এই ভয়ে দয়্যারাম মুখের গহবরে বতটা আঁটে—ততটা খুন্সী আর হাস কামড়ে দেয়। চন্দ্রার ঘুম ভাঙে না।

ভগবানপুরের ক্যাম্পে ইভানুস সকালবেলা কোর্টমার্শালে বসে।

যুদ্ধের কয়টা মাসে, ইভানুস-এরও আত্মোপলব্ধি হয়েছে। সেই যুগ্মদর্শী, ভাবপ্রবণ ইভানুস—যাকে বুক বয়সেও বয়সজ্ঞির এক তরুণ

হালে বোধ হতো। কিশোর বেতস গাছ যেমন রোদ ও জল ও বাতাস সবটুকুই পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করবার জন্য কচি কচি পাঁতাগুলি মেলে থাকে—ইভাজলও একদিন এই মহাদেশের সবটুকু জানবার জন্য, বৃষ্ণার জন্য—তার অল্পকৃতিগুলিকে মেলে রাখতো। ভারতের সব কিছুই তার মনে হতো রক্তস্রব, স্রবন। চম্পাকে তার মনে হয়েছিলো এই প্রাচ্যের উদ্ভূত বসন্তের মতোই কোনো মদিরবোঁবনা প্রেমিকা। এমন কি চম্পার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, তাকেও সে কত রোমাঞ্চ দিয়ে ব্যস্তিয়েছিলো। তার মনে হয়েছিল অজ্ঞাত খেতাজ জমিদারী, ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করে, তাতে প্রেরণা থাকে অনুপ্রাণিত। চম্পা ও তার সম্পর্ক তার চেয়ে জমেত স্রবন। চম্পা তাকে সত্যিই ভালোবাসে। বিদেশী পরিভ্রাজক এবং Indian nautchgirl এর যে আরব উপক্ৰাসমূহী প্রণয়ের কথা পড়া যায় তাকে চম্পার প্রেম সেই গোত্রেরই কিছু। এমন কি, সে এ কথাও ভেবেছিলো—“O, Lotus eyed maiden” ধরনের কোনো প্রেম সিক্ত উদাত্তস্রবের কবিতা লিখবে।

এখন ইভাজের সে কথা মনে পড়লে ভাসি পায়। মনে হয়, তখন অবশি তার, নিজেই পরিচয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিলো না। তাই তার ধ্যানধারণাগুলো ছিলো ঐ রকম স্বপ্নাংশী এবং দুর্বল চিত্ত। ঠ্যা—সে ভ’ ওঁরল চিন্তেই পরিচয়।

এই কয় মাসের সভ্যতায় সে ভালো করেই ভেবেছে সে-ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক বংশাঙ্গী প্রতিভা। এই উপলব্ধি তার এসেছে, ব্রিটিশের সর্বশক্তিমানতার পরিচয় পেয়ে। কত সহজে তার মন কয়েকটি অর্থনৈতিক মামুলিগুলোর স্বাধীন হবার অভ্যর্থনা। কি ক্ষমতা তাদের—যে অনায়াসে হাজার হাজার মানুষকে তার হত্যা করে চলেছে।

মানুষকে এমন সহজে, আইনের নামে, ধর্মের নামে, ব্রিটিশ দীপপুঞ্জের অধিকার বজায় রাখবার নামে যে হত্যা করা চলে—এই থেকে ইভাজের মনে স্বাভাবিকবোধ এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ভ্রান্ত হয়েচে।

চম্পার কথা এখনও মনে হয় তার। তবে সেই স্মরণিত ভীক প্রেমের চোখে নয়। মনে পড়তে, চম্পার উন্নত স্তন এবং দেহটার কথাই মনে চর।

নিরন্তর রক্তপাত দেখতে দেখতে তার রক্তও কুণা জেগেছে। সে চম্পাকে এখন পেনে তাকে যে পরিপূর্ণ ভাবে আশ্বাসন করবে—সেই কথাটাই মনে হয়। মনে চর সে যুগ, তাই দিনের পর দিন চম্পার সঙ্গে কথা বলে আর চাত ধরে, আর বড়জোর তার আতরগন্ধী চুলের গন্ধ ভাঁকে কাটিয়েচে।

কাদী রোডের ধারে ভগবানপুর গ্রাম বর্তমানে ঈংরেজ বাঁটি। সেখানে নিরন্তর কোর্টমার্শাল ও কীসী চলেছে। তবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বড় তাড়াতাড়ি। কেন না, কীসী দেবার মতো মানুষ আর বড় বেশী মিলেছে না।

চম্পাকে গেয়ে তাই উল্লসিত হয়ে ওঠে সবাই।

চম্পার ঘর ভাঙলো যখন, তখন দেবী হয়ে গিয়েছে সত্যিই—তবু চম্পন একেবারে আত্মসমর্পণ করেনি। সকালের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার খুরের শব্দ এবং টিংকারে ঘুম ভাঙলো তার। প্রথমেই মনে হলো দয়ারামের কথা। দেখলো অনেকখানি কালো ও লাল রক্ত মাটিতে কেলে দয়ারাম শরীরের এমন একটা কোণ স্পষ্ট করে

কুঁকড়ে পড়ে আছে, যে সে কেন সৈনিকের কর্তব্য করেনি—সে প্রায় তাকে জিজ্ঞাসা করা অব্যবহর। দয়ারামের হাত ও পিঠের ওপর দিয়ে তখনই শিঁপড়ে উঠেছে। আর যুক্তার আত্মা না পেনে শিঁপড়ে হাঁটে না কাকের শরীরে।

চম্পনের হাইফেল গুলী ছিলো। বহু কত-বিকৃত হাতখানার জোয় ছিলো। আর, ইংরেজরা এ কথা ভাবেনি, যে একটা লোক উঠে ছয়টা সওয়ারের বিরুদ্ধে হাইফেল তুলবে। হঠাৎ এসে ধরলে পরে ভারতীয়রা খানিকটা অসহায় হয়ে পড়ে এই তারা জানে।

চম্পন তখনই বোধ করলো, জীবনের সঙ্গে তার যে গ্রন্থি বঁধা ছিলো, সে গ্রন্থি বেন কেটেছিলো কেউ। তখনই সে যুক্তার পারলো।

তার নিশানাও কম স্থির নয় আর পাঁজা দেবার এমন কিছু ছিলো না—সামনের ঘোড়াসওয়ারটি বেশ তাগড়া তাজা—গলার উত্তি দেখা যায়—বোঝা যায় কোনো মানোদায়ী গোরা হবে। চম্পনের গুলীতে বিজাতীয় উত্তি করে সে দুটোকা খড়ের পুতুলের মতো টুপ করে পড়ে গেল পাশে।

দিব্য লাগলো চম্পনের। পাশের জনকেও সে গুলী ছুঁড়লো, কিন্তু প্রথম সৈয়দটির ঘোড়াটা এগিয়ে এসে তাকে কেলে দিলো। ভড়কে গিয়েছিলো আর কি। আর চম্পনের হাত থেকে তখনই হাইফেলটা ছিটকে পড়লো।

চম্পনকে ইভাজ আগেও দেখেছে। চেনা মুখ দেখে আনন্দে ও সাফল্যে সে হাসতে লাগলো। কতকগুলো প্রাণ এক অসীল রসিকতা করলো। জবাব দিলো না চম্পন।

হুঁজন ডোম তাড়াতাড়ি করে দড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে পাকের ডালে লটকাছিলো। চম্পন দেখলো দড়িটা চক চক করছে। সম্ভবত ওরা ঘোম ঘবে পাশিণ করে কীসির দড়ি।

তারপর, একটা মিনিটকে খণ্ড খণ্ড করে প্রতি পল অল্পপলকে এক একটা অনন্ত সময় করে নিয়ে চম্পন তীক্ষ্ণ ও একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে নিলো পৃথিবীটাকে। কপালের চামড়া ঘোড়ার খুরে কুলে নেমেছে। হাত শিথলোকা করে বঁধা।

চম্পন দেখলো সকালের আলোতে সামনে কানপুরের পথে আমগাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। তার ওপরে শিবমন্দিরের পিতলের ত্রিশূল চক্চক করছে। দেখলো পশ্চিম-দক্ষিণে যমুনার জল বাসির ক্যালো নীল দেখাচ্ছে। তার ওপারে আর কিছু দেখা যায় না। বাড়টা ঘুরিয়ে দেখলো আমগাছটার ডালের ওপরে একটা কাঠবিড়ালী মুখে কি নিয়ে উঠে যাচ্ছে। চম্পন জানলো, ও খাত সক্ষম করছে। তারপর দেখলো তার পায়ের নিচে ঘাসগুলো সবুজ। হুই পা চুকে নাগরা ছটো খুলে ফেললো সে। খালি পা ঘাসে রেখে মাটি ও পৃথিবীর স্পর্শ নিলো সে, এই হলো তার এক পৃথিবীর মধ্যে অস্তিত্ব আদান-প্রদান। মনটা বিহ্বল হলো না। কেন না, ঐ খণ্ডিত যুহুর্ন্তের মধ্যে যে অনন্তর আশ্বাস পেলো চম্পন তার মধ্যেই চম্পা ছিলো। বস্ত্রত চম্পা এক তার গ্রাম, তার মাটি, ঘাস, সেই খটগাছ, সেই আকাল ভরে টিয়াপাখির ঝাঁক নেমে আসা মরুভূমি সন্ধ্যা, সেই কালো মেঘের তলার চম্পার হাত ধরে ছুটে চলা শৈশব, তার মার সাক্ষিণ্যে এসে পরে বি ও হুই এর পরিচিত গন্ধ, তার বাবার চোখের নিচের পরিচিত জন্ম দাগ, তার দাদা চম্পনের হাসিভরা চোখ, আর

আবার চম্পা, আরো অনেক ক'রে চম্পা, শুধু চম্পা—মৈশবের বেণী খোলানো চম্পা, প্রথম বৌবনের বটগাছের তলার কাঁড়িয়ে থাকা একাকিনী চম্পা, বিদায়ের দিনের বকলয় চম্পা। চম্পা, চম্পা এবং চম্পা এবং আরো অনেক চম্পা তার মধ্যে সেই সময় ঘিলে গেল।

ভগবানপুরের ঠিক বাইরে, ছাউনীতে তখন চম্পা বসেছিলো।

তখনো ইভান্স বা হ্যান্ডগেরল, বা ট্রিফেন্সন জানেনি, যে তাদের বিবর্ত হাবিলদার লক্ষণ সিং প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শিবিরের লোক। বস্ত্র, লক্ষণ চৌধুরি নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে লক্ষ্য হয়েছিলো। তারও পরে—গ্রামে গ্রামে লক্ষ্যহীনক লোকদের মাঝের লিট নিয়ে সে ঘুরেছে—এক বছরনকে পূর্বেরে খবর দিয়ে পলাতে সাহায্য করেছে। এ কাজে নিত্য বৃত্ত্যর সঙ্গে খেলা করছে সে, তা জেনেও লক্ষণ খেমে যারনি। ১৮৫৭-তে এ ধরনের নির্বোধ সাহস দেখাবার মানুষ কিছু ছিলো। আগষ্ট মাসে তার সহকারী যখন তাকে ধরিয়ে গিলো, তখন তার কানী হলো, আর তখন জানা গেল, লক্ষণের তৎপরতার অন্ততঃ দুই হাজার মানুষের প্রাণ বেঁচেছে। গ্রামকে গ্রাম ভাঙিয়ে এনে কানী দেওয়া যেখানে নিত্য চলেছে—সেখানে লক্ষণের চেষ্টার অন্ততঃ পনেরোটা গ্রামে পূর্বেরে খবর গিয়েছে আর পৃথক পালিয়ে বেঁচেছে।

লক্ষণই চম্পাকে খবর দেয়। চম্পানের সে ঘনিষ্ঠ পরিচিত মানুষ—আর ইভান্সের রক্ষিতা নামে পরিচিতা চম্পার প্রকৃত পরিচয় তখন কানপুরের মানুষ ভালো করেই জানে।

চম্পা আসছে খবর পেয়ে চম্পা অগ্রসর হয়। কিন্তু পদে পদে বাধা—এক ইংরেজের বেটনী। ইভান্সের কথা বলে, চেষ্টা ক'রে ক'রে এগোতে এগোতে সে পদে পদে বাধা পেয়েছে। ভগবানপুরে যদি বা পৌছলো—গ্রামে ঢুকতে পেল না। ছাউনীতে তাকে আটকে বেললো সবাই। সাহেব কোটমাথালে আছে—এক এখনই ফিরবে—একটা মানুষকে লটকাতে আর কি লাগবে—অন্ত সাহেব হ'লে পরে তাঁর থেকে বন্ধীর সংখ্যা শুনে—লটকাও! লটকাও! এই বলে কাজ সেয়ে দিতে। বাকিটুকু জেগে-জাগেও ইংরেজ সিপাহীরা করতো। ইভান্স সে দরের মানুষ নয়। সে বিচার করবে—অর্ডার দেবে—তবে কানী দেবে। মানুষটা না মরা পৰন্ত পকেট যদি ধরে কাঁড়িয়ে থাকবে।

চম্পা বসে থাকে। আসবার সময়ে কিছুটা এসেছে বয়েল পাড়ীতে—কিছুটা এসেছে হেঁটে। নাগরা দুটো ধুলোর ডরা। চুলেও ধুলো।

দুটো হাত কোলে ক'রে সে বসেছিলো—। মনে তার অনেক চিন্তা। আজ রাতের মধ্যেই এখান থেকে ক্যাম্প তুলে ইভান্সের বিশেষ চলে বাবে বিতুর। বিতুরে পোশাবার প্রাসাদ ধ্বংস করতে। এই বিশেষও প্রয়োজন হবে মেজর ট্রিফেন্সনের।

ইভান্স এলো ছপুৰ নাগরা। এসে চম্পাকে দেখে তার মনে হলো এটা-ই খুব আভাবিক—এক এই সে চেয়েছিলো। চম্পা কি বললো না বললো ভালো ক'রে শুনলো না সে—নোংরা হাতে-ই গ্রেট তুলে মাংস খেলো—জাতি খেলো নির্জলা—আর তাকিয়ে তাকিয়ে চম্পার বুক, চম্পার শরীর ভালো করে

দেখতে লাগলো। ইভান্সের সেই চোখ দেখেই চম্পা বুঝতে পারলো এখন কি হবে না হবে—আর এ-ও বুঝলো, সে এতদিন ধরে প্রেমের বে অভিনয় করেছে—তার দামটুকু কড়ার গণ্ডার না নিয়ে ছাড়বে না ইভান্স।

ইভান্স তারপর শিখ সিপাহিকে হুকুম দিলো, কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। এঁটো গ্রেট ও বোতল ঢোকির নিচে ঠেলে দিয়ে সে উঠে এলো। পদাটো ফেলে দিলো। তারপর হাত বাড়িয়ে টেনে আনলো চম্পাকে।

চম্পা শুধু এই বুঝলো না। যে তার ওপরে অমন পক্ষ এবং পণ্ড হয়ে, তার জামা ছিঁড়ে তাকে জাঁচড়ে-কাঁচড়ে কত-বিকৃত করবার কি প্রয়োজন ছিলো ইভান্সের। কেননা, চাইলে-ও সে প্রতিবোধ করতে পারতো না।

তার পরে এক সময় বিকল হলো। ক্যাম্প তোলবার সময় হলে-ও ইভান্স-কে ডেকে বিরক্ত করতে সাহস ছিলো না কার। ইভান্স নিজের-ই উঠে এলো। চম্পার জামাকাপড়গুলো তার গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাইরে এসে কাঁড়ালো।

তারপর ভেতরে এসে বসে লালচোখে দেখলো চম্পা কি রকম কষ্ট করে টেনে টেনে জামাটা পরছে—চামরাটা দিয়ে গা ঢাকবার চেষ্টা করছে—কুমাল ভিজিয়ে রক্তাক্ত ঠোট, গাঙ্গ সব মুছতে চেষ্টা করছে।

ইভান্স দুটো-চারটে অঙ্গলয় কথা বললো। একবার বললো—এবার তোমার একটা বাচ্চা আশা করতে পার।

চম্পা জবাব দিল না। তার দিকে চাইলো না। ইভান্স তারপর বললো—সেই ছোঁড়াটাকে আজকে লটকালাম—সেই যে তোমার সঙ্গে ঘোরাকেরা করতো।

চম্পা এবার তাকালো। বললো—কখন?

—আজ-ই সকালে। বেশ মরলো। বিশেষ খায়েল করলো না।

চম্পা ধুলো ঝেড়ে নাগরা পরলো। ইভান্স বললো—এবার আমার সঙ্গে বাবে?

—হাব। তোমার খোঁজে-ই ত এসেছিলাম।

—কখন?

—তুমি বাও। আমি সিপাহীদের সঙ্গে বাব।

—আচ্ছা।

ক্যাম্প উঠিয়ে নিঃশেষে সকলে চলে না বাঁধা অবস্থি চম্পা সেখানেই বসে রইলো। ক্যাম্প রইলো বারো জন শিখ পাহারাদার। তাদের সম্পর্কে চম্পা নিশ্চয় ছিলো। কেন না, সে জানে, সন্ধ্যা বনালো ঝড়তি-পড়তি কুড়ি জন ভারতীয় আসবে ভগবানপুরে। বহুনা শেরিয়ে কাড়ী বাবে। সে-ও বাবে—এই ঠিক আছে। আর সে বিশ জন এই বারো জনের মহড়া ঠিক-ই নিতে পারবে।

ভারতীয় বিশ জন এসে সেই মনের নেশার মাতাল বারো জনকে খায়েল করতে বেশী সময় নিলো না। তারপর তারা চম্পার খোঁজে গেল।

তারাই চম্পাকে দড়ি কেটে নামালো। চম্পা বললো—একটা গোর খুঁড়ে দাও।

তখন গোর খেঁড়িবার সময় দাঁড়। তবু চম্পার কথা তারা
কেন্দ্রে পায়ে না আর অগভীর একটা কবর তারা খুঁড়লো।

চন্দনকে সেখানে শোয়াবার পরেও চম্পা উঠলো না। বসে
রইলো। তারা বললো—এবার চলো। হাতায়াতি নাকো
শয়রে চলে যাবার কথা না?

চম্পা বললো—তোমরা বাও। আমি যাব না।

—তার মানে?

চম্পা অবৈধ না হয়ে বুঝিয়ে বললো—চন্দন একলা আছে।
আমি যাব না। আজ আমি বিঠরে যাব।

তারা কিছু বুঝলো, কিছু বুঝলো না। মনে হলো চম্পা বোধ
হয় প্রকৃতিই নেই—কেন না ছেঁড়া জামার কঁকে বুক ঢাকবার
চেষ্টা করছে না। একদিক খোলা। আবার চোখ দেখে বা কথা
শুনে অপ্রকৃতিই মনে হলো না। তবে তাদেরও সময় ছিলো না।
তারা চলে গেল। আঁধারে গা মিশিরে, ছায়া ছায়া হয়ে।

চম্পা চন্দনের গলা থেকে কাঁসটা কাটলো। ওড়নী দিয়ে মুখটা,
চোখের কোলটা মুছলো। হাতে দড়ির দাগটা ঘসে ঘসে মেলাবার
চেষ্টা করলো। পা থেকে ধুলো মুছলো। তার পর বসে রইলো
পাশে।

সে রাতে দুটো শেরাল এসেছিলো, তাদের তাকালো। একবার
বিরক্ত হয়ে-ই বললো—আমি ঐ ছাউনীতে বসেছিলাম, ডাকতে
পারোনি?

কিন্তু চন্দনের উপস্থিত বুদ্ধির ওপর কোনকালেই তার ভয়সা
ছিল না। তাই আর কিছু শুধাল না।

পরদিন সকাল হতে মনে হলো, এত রোদ পড়ে চন্দনের কষ্ট
হচ্ছে। চম্পার বুকের মধ্যে কুমালে বাঁধা ডেরাপুরের মাটি ছিলো
একমুঠো। সেই মাটিটা সে সবচেয়ে প্রথমে ছড়ালো চন্দনের ওপর।
তার ওপর কবর খোঁড়া মাটি চাপা দিলো। তার ওপর আরো কিছু
ডালপালা এনে ফেললো। তার পর আবার সে সেইখানে বসলো।
ওপর দিয়ে চম্পাকে বুয়ে বৃষ্টি নামলো। চম্পা বসে রইলো।

রাতে তীব্র বাতাসে শীত করতে লাগলো। মেঘমুক্ত আকাশ
চেয়ে রইলো নিঃশব্দ দিকে। চম্পা বসে রইলো।

তার পরদিন সকাল থেকে রোদ উঠে পুড়িয়ে দিলো চম্পাকে
চম্পা বসে রইলো।

সেই দিনটা যখন শেষ হলো, তখন চম্পা উঠলো।

ইভান্স বাবে বিঠরে। বিঠরের পথ ধরলো চম্পা।

[ক্রমশঃ।

হার

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়

এবার তুমি হার মেনেছ কবি,

জীবনভরা মানস-পটে

হারিয়ে যাওয়া বালুর তটে

মিলিয়ে গেছে তোমার আঁকা ছবি

এবার তুমি হার মেনেছ কবি!

আজকে কোমল তুলির টানে

ধরছে না ঝংঝংক প্রাণে

জোয়ার যেথা বইতো সেদিন

বারেক পরশ পেলে,

মনের পটে আজকে শুধু

তপ্ত বালু করছে ধু ধু

চাইলে কেবল হুঁ হাত ভরে

ব্যথার দহন মেলে।

হাসিনুখে গ্রহণ কোরো সকল প্রতিদানে

হৃদয় যদি হয় গো ক্ষত

ওষ্ঠাধরে সাধ্যমত

কত কোরো তোমার কবির-বানে;

নতুন পটে আবার তুমি

সোহাগভরে লও গো চুমি

ভ্রামল বেশে সাজিয়ে তোল তোমার প্রিয় ছবি

পরাজয়ের সকল কালো

হুচ্চিরে মেখে বিজয়-আলো

জলাট-পরে পুণ্ড্রহারী আঁকবে তিলক-যদি।

বিদ্যাসিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

আট

আমার নতুন সেক্রেটারীর একটা বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার দরকার। মেয়েটির বয়স বছর সাতাশ আটাত্ত—নাম মিস ভায়লেট মিলবার্ণ। দেখতে সুন্দরী—সে কথা অস্বীকার করা চলে না। ফটো দেখে বা মনে হইতছিল, আসলে তার চেয়ে দেখতে ভাল। একহারি লম্বা গড়নের সামগ্র্যে বোবনের সহজ প্রকাশ সুন্দর। একটু লম্বা ধরণের মুখে ছোটো সোনালী বড় বড় চোখ—বাইরের অভিব্যক্তিতে শান্ত ও গভীর কিন্তু তার মধ্য দিয়ে চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। একমাথা সোনালী চুল, খুব পরিপাটি করে যে আঁচড়ান তা নয়, একটু বেন এলোমেলো খোঁকা-খোঁকা গুচ্ছে খাড়া পথ্যন্ত নেমে এসেছে—মুখের সঙ্গে বেন সহজে মানায়। কথাবার্তা খুব কম বলে কিন্তু বতকণ আমি সাক্ষারীতে থাকি কক্ষের তৎপরতার সদাই চকল—এক মুহূর্ত বেন বিজ্ঞান নিতে রাজী নয়।

সত্যিই মেয়েটির কর্ণের নিপুণতায় মুগ্ধ না হয়ে উঠার নাই। মিস্ হলওয়েল ও কাজে ভাল ছিলেন, তার কাজে বিশেষ কোন ক্রটি কোনও দিনই আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু এ মেয়েটির কাজের ধরনই আলাদা। কাজকে শুধু সুসম্পন্ন করা নয়, কাজটিকে আপনা থেকে সহজ করে তোলাই আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল এই মেয়েটির। আমি ত বেলা ১০টা আলাল সাক্ষারীতে বাই—মেয়েটি সাক্ষারীতে বোগ দেওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিয়ম করে দিল রোগীদের সাড়ে নটার মধ্যে সাক্ষারীতে এসে হাজির হতে হবে। তার পর আমি সাক্ষারীতে বাওয়ার আগেই কিংবা আমার রোগী দেখার কঁকে কঁকে প্রত্যেক রোগীর সঙ্গে কথা বলে তাদের রোগের বৃত্তান্ত আলাদা আলাদা কাগজে লিখে নিতে লাগল এবং প্রত্যেক রোগীকে আমার ঘরে পাঠাবার আগে তার রোগের বৃত্তান্তের কাগজখানি গভীরভাবে এসে আমার টেবিলে আমার সামনে বসে ঘেঁষে—বা পড়ে রোগীটিকে দেখার কাজ আমার অনেক সহজ হয়ে গেল এবং সময়ও লাগতে লাগল অনেক কম। শুধু তাই নয়, আমার মধ্যে প্রত্যেক জরুরী খবরটা দিয়ে এমন গুছিয়ে লিখত যে আমি অবাক হয়ে অনেক সময় জেবেছি—মেয়েটি কি ডাক্তারী জানে।

ফলে, সাক্ষারীতে আমার কাজের সময় অনেক কমে গেল। মিস্ হলওয়েলের সময় সকাল বেলা আমি প্রায় তিন ঘণ্টার কমে রোগী দেখা শেষ করতে পারতাম না কিন্তু এখন দু'ঘণ্টা যেতে না যেতেই আমার রোগী দেখা শেষ হয়ে যায়।

একদিন মেয়েটিকে বললাম, ভায়লেট। তুমি কি ডাক্তারী জান নাকি ?

বে সময়ের কথা বলছি—মেয়েটি কাজ ছাড়া আমার ঘরে ঢুকত না এবং কাজ সেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যেত—বুধা সময় একটুও বেন আমার ঘরে থাকতে পারত।

চলে বাচ্ছিল—আমার প্রশ্ন শুনে চমকে ঝাঁড়িয়ে গেল। সেই গভীর চোখ তুলে চাইল আমার দিকে। কিন্তু ঠোঁটের কোণে মুহূর্তের জন্য যে একটু বৃহু হাসি খেলে গিয়েছিল—সেটুকু লক্ষ্য করেছিলাম।

শুধাল, কেন ?

বললাম, তুমি এমন সুন্দর নোট লেখ কি করে ? ডাক্তারীর নিক দিয়ে যেটুকু জানা দরকার কিছুই ত বাধা যায় না ?

বলল, আমি ত অল্প ডাক্তারদের কাছে কাজ করেছি। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি কাজে বোগ দেওয়ার দু'-তিন মাসের মধ্যে ক্রমে লক্ষ্য করলাম আমার রোগীর সংখ্যা বেন বেড়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু নতুন রোগী এসে আমার তালিকার বোগ দিতে লাগল এবং তার প্রধান কারণ যে এই মেয়েটি, সেটা বুঝতে আমার সেরা হল না। বুঝলাম, মেয়েটির রোগীদের সঙ্গে ব্যবহারে শুধু যে মাদুর্য্যই প্রকাশ পায় তা নয়, একটা দরদে তাদের আস্থা জর করারও ক্ষমতা ছিল মেয়েটির। ফলে আমার ঘন মেয়েটির উপর ক্রমেই ধুনীতে ভরে উঠতে লাগল।

দু'-তিন মাসের মধ্যেই ক্রমে আমার ঘরে হল—মেয়েটি বেন আমাকে একটু এড়িয়ে চলে। কাজের কথা ছাড়া অল্প কোনও কথা আমার সঙ্গে বলে না এবং কাজের প্রয়োজন ছাড়া আমার লামনে আসেও না। জিনিষটা একটু বেন অস্বাভাবিক বলে মনে

হল এং ক্রমে মেয়েটিকে আরও একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে জানার ইচ্ছা হল মনে। এতদিন কাজ করছে—ব্যবহার সহজ হচ্ছে না কেন?

এতদিন সকালের কাজ সেবে বেরিয়ে বাচ্ছি—তখন বেলা ১২টা হবে। মেয়েটি সদর-দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, যেমন যোজাই থাকে। আমাকে মাথা নীচু করে বিদায় সম্ভাষণ জানাঙ্গর জ্ঞত। মেয়েটির সামনে এসে আমি দাঁড়ালুম।

শুধালুম, ডায়লেট! তোমার এখানে থাকতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ত?

মেয়েটি মিস হলওয়েলের মতন সার্জারী সলয় স্ট্যাটেই থাকত।

বলল, না সার! ধন্যবাদ!

বললাম, তুমি ত কিছু আমাকে বল না। যদি কোনও দিক দিয়ে কোনও অসুবিধা হয় ত আমাকে জানাতে দ্বিধা কর না।

বলল, অনেক ধন্যবাদ।

বললাম, সুবিধা মত মেড পেয়েছ। না নিজেই সব কর?

বলল, একজন মেড রেখেছি—এক বেলা আসে।

বললাম, শুনে খুসী হলুম।

তারপর একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে আর কি বলা যায় ভাবছি এমন সময় মেয়েটি বলল, আশা করি আমার দ্বারা আপনার কাজের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

বললাম না-না। স্বন্দর কাজ কর তুমি।

তারপর একটু হেসে বললাম, শুধু তোমার ইচ্ছাভাবিক লজ্জাই একটু বেশী—ব্যবহারে সহজ হতে পারছে না।

এইবার টোন্টের হাসি পরিষ্কার ফুটে উঠল। বলল, আমি চোঁকা করব!

এই কথাবার্তার দু-একদিনের মধ্যেই সকালে যোগী দেখবে, মাঝামাঝি এক কীকে এক পেয়লা গরম চা নিয়ে ঢুকল আমার ঘরে।

বলল, আপনার জন্ত এক পেয়লা চা এনেছি—খাবেন কি?

চা দেখেই মনটা খুলী হয়ে উঠল। হেসে বললাম, নিশ্চয়। অনেক ধন্যবাদ।

চায়ের পেয়লা আমার টেবিলে বসিয়ে শুধালে, চিনি দুধ ঠিক হয়েছে? আমি ত আন্দাজে করে আনলাম।

এক চুমুক দিয়ে বললাম, ঠিক হয়েছে। আচ্ছা ডায়লেট! আমি এ সময় এক পেয়লা চা পেলে খুসীই হয়—তুমি জানলে কি করে?

এবার টোন্টে নয়, চোখের মধ্যে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।

বলল, সেটুকু বুঝতে পারি।

শুধালুম, কি করে?

একটু চুপ করে থেকে বলল, কাজের মধ্যে এক কীকে এক



ও-আর-সি-এল এর

কুমারেশ

লিডার ও স্ট্রেঞ্জার



দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

পেয়লা চা খেয়ে নিলে কাজে আরও মন লাগে আর তাড়াহুড়া—
চূপ করে গেল।

গুণালাম, কি ?

বলল, আপনি চা খেতে ভালবাসেন—আমি জানি।

গুণালাম, কি করে ?

বুহু হেসে বলল, আমার কাছে যে যেড কাজ করে তার নাম
মিস খুঁট। সে এককালে আপনারদের বাড়ী কাজ করত। সে গল্প
করে।

একটু অধিক হলে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। মেয়েটি
খবর রাখে ত !

এই হল সূচনা, এর পর থেকে বোজাই কাজের মাঝামাঝি এক
পেয়লা চা নিয়ে আসত আমার ঘরে এবং আমিও চা পেয়ে বোজাই
খুশী হয়ে উঠতাম। এক দু'-চার দিনের মধ্যেই শুধু একবারই নয়,
আমার কাজ শেষ হলে আর একবার ট্রেতে চা সাজিয়ে ঘরে নিয়ে
আসতে শুরু করল এবং প্রথমে বুধে একটু আধটু আপত্তি জানালেও
আসলে যে আমি খুশীই হতাম—সেটুকু বুঝতে মেয়েটির দেরী হয়নি।
এক ক্রমে আমারই আমন্ত্রণে একটি পেয়ালার পরিবর্তে দুটি পেয়লা
সাজান এই কাজের শেষে আমার ঘরে নিয়ে আসত এবং মিনিট
পনের কুড়ি এমন কি এক একদিন আধ ঘণ্টাও চা খেতে খেতে মেয়েটির
সঙ্গে কথাবার্তা হত এবং যদিও মেয়েটি কথা কম বলত তবুও তার
সঙ্গে কথা বলে বেশ একটা আনন্দ পাওয়া যেত সে সময়।
তার প্রধান কারণ মেয়েটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলোকে যে
বিষয়ই কথাবার্তা হোক না কেন সবই কেমন যেন উজ্জল
হয়ে উঠত।

সে সময় বয়সের ভাগ্য কথাবার্তাই হত রোগীদের নিয়ে। এক
ক্রমে লক্ষ্য করলাম, যদিও মেয়েটি ডাক্তারী জানত না তবুও কার রোগ
কতটা গুরুত্বপূর্ণ এমন কি কার রোগে আর নিষ্কৃতি নাই ঠিক বুঝতে
পারত এবং সে বিষয় নিজের মতকে সুশীল আমাকে জানিয়ে দিতে
কোনও দ্বিধা ছিল না। শুধু তাই নয়, রোগীদের নিয়ে আলোচনা
একজেরই এটুকু আমার লক্ষ্য এতদিন যে মেয়েটি মনুষ্য চরিত্র খুব ভাল
বোঝে এবং দেখিক দিয়ে তার মতামতের উপর ক্রমে আমার একটা
আস্থা গড়ে উঠল।

একটা ছোট উদাহরণ দি। একদিন একটি রোগিনী এল তার
স্বামীকে নিয়ে, শারীরিক যন্ত্রণার অভিযুক্তিতে বড়ই কাতর, কাজের
পেয়ে 'চা' খেতে খেতে আলোচনার ভায়লেট বলল, সার, আমার ত
মনে হয় ওর রোগ কিছুই নয়। ও স্বামীর কাছে নিজের দর
বাড়াচ্ছে।

রোগ বে কিছু নয়, সেটা মেয়েটিকে পরীক্ষা করে আগেই আমার
মনে হয়েছিল। তবে স্বামীর কাছে দর বাড়াবার দিকটা আমি
জানিনি।

গুণালাম, মেয়েদের ত হিষ্টিরিয়া বলে একটা জিনিষ আছে। স্বামীর
কাছে দর বাড়ানো একথা মনে করছ কেন ?

সন্দেহে বলল, স্বামীর ব্যবহারে।

গুণালাম, কি রকম ?

বুহু হেসে বলল, আমি লক্ষ্য করছি স্বামীর কাছে ওর আর তেমন

মূল্য নেই—একে এড়িয়ে চলতেই চায়। তাই মেয়েটি রোগের আশ্রয়
নিরেখে, নিজের মূল্য যদি একটু বাড়ে।

ভায়লেটের এই ধরনের কথাবার্তার ভায়লেটের মনুষ্য চরিত্রের
এতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রমাণ না করে পারিনি।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একদিন ভায়লেট কথার কথার আমাকে
বলল, একটা দিক দিয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করি।

গুণালাম, কেন ?

বলল, আপনার দ্বার সজে দেখা করে, প্রজ্ঞা নিবেদন আজ পর্যন্ত
করিনি।

হেসে বললাম, বেশ ত যেও।

বলল, তিনি পছন্দ করবেন কি না এই ভেবে এতদিন চূপ করে
ছিলাম।

বললাম, না না। তিনি খুশীই হবেন।

বলল, মিস খুঁটের কাছে তাঁর এত প্রশংসা শুনেছি—তাকে বড়
দেখতে ইচ্ছে করে।

বললাম, আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে কথা বলে কবে বাবে আমি কালই
তোমাকে জানাব।

বাড়ীতে এসে মালিনের সঙ্গে কথা বললাম।

মালিন বলল, বেশ ত। পয়ত্ত দিন ত বুধবার—পরন্ত বিকেলে
চা খেতে আসতে বল।

বললাম, বুধবার বিকেলে ক্লাবে বাওয়াটা মাটি করবে ? দিনগুলি
এমন সুন্দর চলছে।

তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্য্যের আলোতে বকরকে দিনগুলি প্রায়ই
পাওয়া যাইছিল—যেটা এসেছে খুব কমই পাওয়া যায়। ক্লাবে
গিয়ে গলক খেলায় ত আমার দারুণ নেশা। তাই বুধবার বিকেলটা
খেলা বন্ধ করতে আমার মন একবারেই সায় দেয়নি।

মালিন বলল, বেশ ত। তুমি ক্লাবে যেও—আমি বাড়ীতে
থাকব। বুধবার ছাড়া আর বলবেই বা কবে—অল্পদিনে ত তোমার
সাক্ষ্যারীতে কাজ। আর সবিবারও ত সমস্ত দিনই ক্লাবে কাটাতে
চাও।

বললাম, তা বটে।

শেষ পর্যন্ত বুধবারই ঠিক হল। ইতিমধ্যে অবস্ত ভায়লেটের
বিষয় মালিনকে অনেক কথা বলেছিলাম—কোনও কথাই বোধহয়
বাদ দি নাই। সাক্ষ্যারীতে চা খাওয়ার গল্প শুনে মালিন বুহু হেসে
বলেছিল, হা—মেয়েটি আসতে তোমার সাক্ষ্যারীও আনন্দঘর
হয়ে উঠল।

বুধবার ক্লাব থেকে ফিরে আসতে রাত প্রায় ১১টা বাজল।
বুলা। রাত ১১টা শুনে চমকে উঠল না। মনে আছে ত—এসে
গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা হতে হতে ১০টা বাজে। তাই ১১টা মানে সন্ধ্যা
একটু পরেই, ভিনার বধাসময়ে অবস্ত ক্লাবেই খেয়ে নিয়েছিলাম,
ক্লাবে সব বন্দোবস্তই আছে জানই ত।

মালিন আমার জন্য কিছু সাপার অর্থাৎ জ্যাম ত্রানডুইচ চা
ইত্যাদি রেখে দিয়েছিল। এসে সাপার খেতে খেতে মালিনকে
জিজ্ঞাসা করলাম, ভায়লেট এসেছিল ?



মার্লিন বলল, হাঁ।

গুথালাম, কেমন লাগল ভারলেটকে?

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, মেয়েটিকে ঠিক বোকা পেল না।

গুথালাম, কেন?

বলল, সহজে নিজেকে ধরা দেওয়ার মেয়ে ও নয়—অসম্ভব চালাক!

বললাম, তা ত বটেই, এবং চারিদিকে লক্ষ্যও খুব।

মার্লিন বলল, প্রথমে এসেই তোমার উজ্জ্বল প্রশংসা করে আলোপ শুরু করল। বোধ হয় ভাবল—আমি সহজেই খুসী হয়ে উঠব।

গুথালাম, আমার প্রশংসা কোন দিক দিয়ে?

বুহু হেসে মার্লিন বলল, ঝপের দিক দিয়ে নয়—অন্ত সোজা নয় মেয়েটি। ডাক্তার হিসেবে।

বললাম, ওঃ।

মার্লিন বলল, সে ত অল্প অল্প ডাক্তারদের কাছে কাজ করেছে—এমন বিচ্ছিন্ন ডাক্তার সে না কি আজ পর্যন্ত দেখিনি।

হেসে বললাম, রোগীদের কাছেও বোধ হয় ঐ ধরনের কথা বলে—তাই রোগীর সংখ্যা একটু একটু বাড়ছে।

মার্লিন বলল, বোধ হয়। মেয়েটি জানে—কাকে কি ভাবে হাত করতে হয়।

গুথালাম, তোমাকে হাত করে ফেলেছে না কি?

চোখে হাসি মাখিয়ে মার্লিন বলল, আমাকে হাত করা ত ওর উদ্দেশ্য নয়—তোমাকে।

গুথালাম, তাই কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

বলল, হ্যাঁ। এতদিন লক্ষ্য করে মেয়েটি এটুকু বুঝেছে—আমাকে খুশী করতে পারলে তুমি খুশী হবে।

হেসে গুথালাম, তা আমাকে হাত করে ওর লাভটা কি? আমি ত অবিরাহিত নই?

বলল, প্রথমতঃ ওটা ওর স্বভাব। দ্বিতীয়তঃ মনিষক হাতে থাকলে ত সুবিধাই হয়।

বললাম, তোমার দেখছি মেয়েটি সবচেয়ে ধারণা ভাল হয়নি।

একটু ভেবে বলল, তা ঠিক নয়। অন্ততঃ কাজের, সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। তা হলেই তোমার হল।

বললাম, নিঃসন্দেহ। এরকম পরিপাটি কাজ এর আগে কোনও সেক্রেটারীর কাছে থেকে পাইনি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু বেশী দিন টিকবে বলে মনে হয় না।

গুথালাম, কেন?

বলল, কেমন বেন মনে হয়—ওর জীবনে সবই লীলা। অল্প লীলার স্বযোগ ত তোমার কাছে নাই। শুধু কাজের লীলা নিয়ে টিকে থাকবে বলে মনে হয় না।

পরের দিন সকালবেলা কাজ শেষ করে চা খেতে খেতে ভারলেট বলল, আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।

গুথালাম, কেন?

বলল, কি সুন্দরী মোহিনী তুমি আপনি পুরেছেন—এরকম খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে।

ভারলেটের কথা শুনে মনটা শুধু খুসী নয়, একটা গর্বে ভরে উঠল। সত্যিই ত—এত ত চারিদিকে দেখি, মার্লিনের মতন এমন তুমি ত কারও দেখি না।

বললাম, তা বটে—মার্লিনকে শেরে আমার জীবন সার্থক হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে মেয়েটি বলল, শুধু তাই নয়, এরকম বুদ্ধিমত্তাও আমি খুব কম দেখেছি।

হেসে বললাম, তা সত্যি। আমি ত জীবনে সব ব্যাপারেই মার্লিনের উপর নির্ভর করে চলি।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, তা নির্ভরতা বহন করার শক্তিও আছে তার।

হেসে গুথালাম, ভারলেট! তুমি একদিন মার্লিনকে দেখেই এতটা চিনলে কি করে?

টোটে বুহু হাসি খেলে গেল।

বলল, আমিও ত এদেশের মেয়ে—তাই এদেশের মেয়ে দেখলে সহজেই চিনতে পারি। [ক্রমশঃ।

প্রত্যয়

মাধবী সেনগুপ্ত

তবু সেই ফুল আজ ফুটেবেই,
কায়ার জলে যদি হয় হোক সিন্ত;
ধু-ধু বিকেলের সন্ধ্যার সাগর ছবি
হবেই যত্ন, হোক না নিঃস্ব-বিস্ত।

যদি মুছে যায় স্মরণীয় স্মরণি
কড় যদি ভাঙে টলোমলো এই ঘর,
যদি কেলে আসি তরুণ পথের রেখা—
আজির বেবে স্মরণের প্রান্তর।

শ্রুতি যদি হয় তবুই তমসাময়,
উপহার যদি শ্রীবিষ্ণু পারিজাত,
পূর্ণ্য যদি বা হৃদয়ে বেগনা জানে
তবু জানি হাতে আছে যে তোমার হাত।

নিবে যদি যায় জীবনের উত্তাপ
যদি থেকে যায় অক্ষুট কথা বচো,
সলজ্জ বধুর মত নম্র সেই ফুল
স্নদরে স্নদর দিয়ে কোঁটীতে হবে তো।



বিজ্ঞানভিক্ষু

দুই

"...Emergencies produce astonishing progress and concentrations of effort, as has often been demonstrated, can move mountains."

C. H. Greenwalt

The Fickle Fashions of Science."

শ্রীকর রায় স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে 'রিসেপশন হাল'-এর হাসের দিকে। দশ মিনিটের মধ্যেই সে সিদ্ধান্ত করে ফেলল—কোন দিক থেকে চূণকামের কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল, কোন দিকে গিয়ে তার শেষ হয়েছে—আর কত টাকা লাভ করেছে 'কন্ট্রাস্ট'র এই কাজে।

বাড়ীটা নতুন। চূণকামও করা হয়েছে হালেই। বৃক্শের দাগ ও বৃক্শের অংশবিশেষও জায়গা। জায়গায় রয়ে গেছে। সবটা মিলিয়ে যুগের নৈতিক অবনতির স্বাক্ষর। পায়ের নীচে মোলায়েম কার্পেটটা বহুমূল্য—কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু তার এখানে ওখানে ফুলনী হয়ে গেছে অসমান। কন্ট্রাস্টের, কার্পেটনির্মাণের আর 'কারনিচার' নির্মাণের ব্যবসায় ভিন্ন হলেও সকলেরই মূলনীতি এক। মাল যদি হলে কেলে দিও না—জাতীয় সরকারকে তা চড়া দামেই গহ্বরে দেওয়া হবে।

দেওহাল-ঘড়িতে সময় জানাচ্ছে—আটটা বেজে বক্রিম মিনিট। এখনও সরকারের ডাক পড়ল না কনকারেন্সের ঘরে। কী একটা অজুহাতে গোয়েন্দা পুলিশ তাকে ছাড়পত্র দিচ্ছে না ওপরে বাবার। সহকারীদের সমবেত চেষ্টাতেও কোনও ফল পাওয়া যায় নি। পাল্লাবী শাস্ত্রীর দল বলছে, আডার নেহি হায়।

শ্রীকর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—বাঁচা গেল। এই অজুহাতে যদি যুক্তি মেলে। এখান থেকে সোজা স্মিত্রার ওখানে হাজিরা দেওয়া বাবে ৬ ওর চিঠি পাবার বাইশ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীকর ওকে চমকে দেবে। শ্রীকর উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

একি শ্রীকর? এখনও ভেতরে বাওনি কেন? তোমার লজ্জা যে সকলে অপেক্ষা করছেন!

যাকে চমকে দেবার মতভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল শ্রীকর,

তারই অপ্রত্যাশিত বর্ণনায় শ্রীকর হতবাক হয়। স্মিত্রা এখানে জুটল কেমন করে?

এই যে স্মিত্রা! তুমি এখানে? কী করে এলে? কী ব্যাপার বলো তো? বলতে পার, আমাকে এরা কেন ওপরে যেতে দিচ্ছে না? একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে শ্রীকর।

সে কি কথা? আচ্ছা বোসো তুমি, আমি দেখছি।

স্মিত্রা বন্ধীর দলের সাথে হাত-মুখ নেড়ে তর্ক জুড়ে দেয়। তাদের মুখপাত্র ভদ্রলোক কিন্তু ঘাড় নেড়েই চলেছেন। কিছুক্ষণ বুধা চেষ্টা করে হতাশার ভঙ্গী দেখিয়ে স্মিত্রা সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেই স্মিত্রা! সাড়ে তিন বছরেও এতোটুকু পরিবর্তন হয় নি তার! হাত নাড়ার ভঙ্গিতে কেমন রয়ে গেছে তালপাতার উজ্জ্বলতা। কেমন করে শ্রীকরের মনে তা জাগিয়ে তোলে হারানো বসন্তদিনের জন্ত একটা অহেতুক বাঁধতাবোধ...

সিঁড়ির বাঁকে এবার দেখা গেল স্মিত্রার পাশে প্রেক্ষার কৃষ্ণস্বামীকে। বন্ধীদের সাথে তবের আশ মাঝে মাঝে শ্রীকরের কানে ভেসে আসে। হারিনেতা...বামপন্থী...কৃষ্ণস্বামীর কথা...এঁকে না হলে প্রজেক্ট চলবে না বন্ধীদের গুজব আপত্তি—আপনারাই সিকিউরিটির ছাড়পত্র চেয়েছেন এখন আপনারাই সে ব্যবস্থার লংঘন করতে চান?

শেখ পর্শ্বত কৃষ্ণস্বামী সমুদ্র দায়িত্ব নিজের ওপরে তুলে নিলেন। বন্ধীর দল ইসারায় শ্রীকরকে জানায় যে তার পথ খোলা হয়ে গেছে। শ্রীকর স্তম্ভিত না হয়ে পারেন না। আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে তার চাকরী—ভারত সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে তার দিল্লীতে আসা—অথচ তারই প্রবেশাধিকার নিয়ে এতো হাংগামা?

কৃষ্ণস্বামী স্তব্ধকণ্ঠে বলেন, ডাঃ রায়, আমি খুবই লজ্জিত যে আপনাকে এই অপ্রবিধাটুকু সূচ করতে হয়েছে। দোষ এদের খুব বেশী নেই—আদেশ দিয়েছি খুব কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবার জন্ত। কিন্তু আমি ব্যপ্তও ভাবতে পারিনি যে এই অজুহাতে এরা মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণ সন্মানিত অতিথিদেরও আটকে রাখবে। দয়াকরে মনে কিছু করবেন না।

শ্রীকর সাধারণ সৌজন্য প্রকাশ করে।



শ্রীমতী ওয়াহেদা রেহমান
ভবনবের "চান্ডলি কা টান" ছবিতে

রূপ যেন তার রূপ কথারই রাজকন্যার যতো...



LT8.42-X52 BG

রূপে রূপে অপরূপ! যেন রূপকথার,
রূপবতী রাজকন্যা! ... এত রূপ, এত
লাবণ্য সে-ওতো গুর নিজেরই চোঁটায়।
রূপসী চিত্রতারকা ওয়াহেদা রেহমান জানেন,
সৌন্দর্যের গোপন কথা হলো স্বকের
কুহুমদম কোমলতা। 'তাইতো আমি
তোজই লাল্য ব্যবহার করি। এর সুরের
মতো ফেনার সতিই স্বক মোলায়েম
আর লাবণ্যময়ী হয়' ওয়াহেদা বলেন।
আপনার হৃদয়তাও বাড়িয়ে তুলুন —
নিয়মিত লাল্য ব্যবহার করে।



চিত্রতারকার সৌন্দর্য-সাবান
বিশুদ্ধ, শুভ্র, লাল্য

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী।

সুমিত্রা বন্ধু, এবার চল, তোমার জন্ত সকলে অপেক্ষা করে রয়েছেন।

লম্বা কবিতার অতিক্রম করে ওয়া প্রবেশ করে কনকাবেল ক্রম-এর মধ্যে।

অর্ধ চন্দ্রাকারে চার সারিতে চেয়ার সাজানো। পেছনে একটু উঁচু ডেস্ক-এর ওপরে একটা মূর্তি প্রজেক্টর। সামনের আসনগুলো থেকে পনেরো-বিশ হাত দূরে খাড়া করা রয়েছে চলচ্চিত্রের পর্দা। সে পর্দার পাশেই একটা ছোটো টেবল-এর ওপর সাদা কাপড়ে ঢাকা কোনো বস্তু।

ঘরের চার পাশে শব্দের দৃষ্টি ঘুরে আসে।

সহযাত্রীদের বাদ দিয়ে জনা দু-তিন চেনা-জানা বৈজ্ঞানিকদের সে আবিষ্কার করে। এ ছাড়া লক্ষ্য করল যে, কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিকদের নিয়েই সভা ডাকা হয়নি। তারতসরকারের ক্যাবিনেটের দু-চার জন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীও উপস্থিত রয়েছেন সভায়। তা ছাড়া সেনা বিভাগ নৌ-বিভাগ ও বিমান বিভাগের ইন্টেলিজেন্সারী 'জেনারেল', 'ব্রিগেডিয়ার', 'জ্যাড, মিরাল', 'এক্সকমান্ড', 'চীফ-অফ-ষ্টাফ' ও অনেক কেউ বিষ্ট ব্যক্তিদের সমবেত সন্ধ্যায় সভা স্থল গর গর করছে। কুকুখামী সুমিত্রাকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সভার মাঝখানে। অসহায় ভাবে কিছুক্ষণ ঝাঁড়িয়ে থেকে শেষ সারিতে একটা আসন খুঁজে নেয়, শব্দ করে।

সভার কাজ ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে।

মাননীয় অতিথিগণ ও বৈজ্ঞানিকদের স্বাগতটি সন্ধ্যায়ের পালা শেষ করে কুকুখামী বললেন, এ সভার সম্পর্কে 'সিকিউরিটি'র কড়া ব্যবস্থার আপনারা নিশ্চয়ই সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। অনেকে হয়ত মনে মনে বিরক্তির পোশাক করছেন। সে জন্ত সভাই আপনাদের ধোঁহ দেওয়া চলে না।

আমরা কারো সংগে বৃদ্ধে লিপ্ত নই। উপরন্তু জাতীয় সরকারের প্রধান বৈদেশিক নীতি জগতের সর্বত্র বৃদ্ধ প্রচেষ্টার বাধা দেওয়া। এমন কি প্রতিবেশী দু-একটি রাষ্ট্রের সংগে নানা ব্যাপারে সম্পূর্ণ সখ্যতার অভাব থাকলেও সহযোগিতার কোনও তাগিদ এখনও আসেনি। তবে নিরাপত্তারক্ষার এই জটিল ব্যবস্থা কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আপনাদের সকলের কাছে চাই এই প্রতিজ্ঞা যে; যে প্রয়োজনে আপনাদের আহ্বান করা হয়েছে সেটা এ সভার বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করবেন না, এমন কি নিকটতর আত্মীয়স্বজনের কাছেও নয়।

সরকারের তরফ থেকে অবশ্য এ আশাস অবশ্যই আপনাদের দেওয়া যায় যে যদি আপনাদের মধ্যে কেউ কোনো কারণে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে সক্ষম না হন, সরকার সে জন্ত কোনো বাধা তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন না। আপনাদের আশাস দেওয়া হয়েছে আর একটা ব্যাপারে, বৃদ্ধ বা মারাত্মক সংগে আজকের সভায় কোনও সংযোগ নেই।

এ ছাড়া যদি কারো মনে সন্দেহ জেগে ওঠে যে এই সম্মেলনের অধিষ্ঠাতা একটা 'সার্বৈতিক ইন্টেলিজেন্স কোর'-এর পত্তন করবার চেষ্টা চলছে—আমরা সে সন্দেহেরও নিরসন করে দিতে চাই।

কিন্তু সকলকেই এই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে আজকের আলোচ্য বিষয়ের পোশাক দরকার হলে জীবনপণ করেও আমরা রক্ষা করব।

কেউ যদি সে প্রতিজ্ঞা নিতে মনস্থির করতে না পারেন, তিনি দ্বিগ্ন করে এখনই সেটা আমাকে জ্ঞাপন করুন।

কুকুখামী কিছুক্ষণের জন্ত নীরবে অপেক্ষা করলেন।

বৈজ্ঞানিক মহলে সামান্য একটু চাকল্য। তার পর ঘরে নিখর নীরবতা।

কুকুখামী আবার আরম্ভ করেন।

আপনাদের নীরবতা আমি সম্মতি বলে গ্রহণ করলাম। আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমার যে কতটা গর্বের, তা বলে বোঝাতে পারব না। এ বারে তাহলে কাজের কথাই আসা যাক।

আজ থেকে ঠিক দু মাস আগে দিল্লীতে আমাদের পদাধ-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে বৃহৎকতর মতো উদয় হল এক তরুণের। নিজের পরিচয় সে দেয় 'অ্যামেচার ফিজিসিস্ট' সৌখীন পদাধ-বিজ্ঞানী বলে। 'রিসেশনসিস্ট' এর কাছে তার দাবী ছিল 'ডিরেক্টর' এর সংগে তার দেখা করার একটা বন্দোবস্ত করে দিতেই হবে। দেখা করার কারণ—সে নাকি এক অত্যন্ত চর্চা এবং অতৃতপূর্ব যুগ আবিষ্কার করেছে।

তরুণের নাম হবিবুল্লা খান। খুব সম্ভবতঃ আপনাদের মধ্যে কেউই এর নাম শোনেন নি। শোনার কথাও নয়। ক্রান্তনাল রেজিষ্টারে আমরাও হবিবুল্লা খান নামের কোনো পদাধবিজ্ঞানীকে আবিষ্কার করতে পারিনি। কিন্তু এই ধরনের ছেলেরদের দেখা নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে অনেকেই পেয়েছেন। নিজেরদের সম্বন্ধে এদের ধারণা আকাশম্পর্শী এবং এরা আশাও করে যে জগতের সকলেই এদের প্রতিভা বিনা বাধ্যবৃত্তে স্বীকার করে নেবে।

এই ধরনের 'আত্মসম্মতির' ও লম্বা-চওড়া কথার ছেলোট উপস্থিত হৃৎকজন কর্মচারীর বিরাগভাজন হয়ে পড়ল। 'ডিরেক্টর' ছাড়া আর কারো সংগেই সে কথা বলতে নাভাজ। শেষে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে হয় তাকে পুলিশে দেওয়া, না হয় 'ডিরেক্টর' এর সংগে তার দেখা করার ব্যবস্থা করানো ছাড়া গতাস্তর রইল না।

—আমি সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম 'ডিরেক্টর'-এর ঘরে একটা কাজের জন্ত। কতকটা আমারই অনুরোধে ডিরেক্টর ছেলোটিকে ডাকলেন আমাদের সামনে। হবিবুল্লার বক্তব্যটা ছিল বেশ চমকপ্রদ! সে নাকি একটা 'অ্যাণ্টিগ্রাভিটি মেশিন'—মহাকর্ষের বিপরীত শক্তি সৃষ্টি করার একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে!

শব্দের অন্তস্তল থেকে একটা বিপুল হাসির ধাক্কা চলে উঠলো। এমন কি রাশভারী প্রক্সের শিক্ষারয়ে ঠোট দুটিও বেঁকে গেলো কীণ হাস্যবেধার। আন্তে আন্তে হাসির শব্দে ঘবটা ভরে উঠলো। পরস্পরের মধ্যে অর্ধপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেলো বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে। শব্দের চেয়ে দেখলো যে সভাগুলো একমাত্র সুমিত্রাই অবচলিত। তার মুখেই কেবল একটা অস্বাভাবিক গাড়ীরে ছায়া।

শব্দের ভাবে, মনস্তাত্ত্বিকদের মনের নাগাল পাওয়াই ভার! কুকুখামী একটু থেমে আবার শুরু করেছেন—দেখতে পাচ্ছি আপনারা সকলেই কৌতুক উপভোগ করছেন। আমিও সেদিন হাস্য-সম্বরণ করতে পারিনি। ভাবতে শুরু করলাম—এখন এ আপদটাকে বিদার করা যার কী করে?

জারি চেষ্টা করলাম, কোন বৈজ্ঞানিক পুত্র তার এই মোক্ষম জবিদ্ধারের ভিত্তি সে সম্বন্ধে আলোচনাটা টেনে নিয়ে আসবে। কিন্তু হবিবুল্লা পূরম উদ্ভক্তের সঙ্গে অস্বীকার করে বলল 'থিয়োরি' সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। শুধু তাই নয়, সে দাবী করে বলল যে তাকে ওই ল্যাবরেটরিতে গৌপনে কাজ করার অমুমতি ও সুবিধা দেওয়া হোক। তার মেশিনের ক্ষমতা ও গুণাগুণ সম্বন্ধে সে কতকগুলো পরীক্ষা করতে চায়। এবাখানা আলোচনা ঘরই তাকে ছেড়ে দিতে হবে, সমস্ত দরকারী যন্ত্রপাতি তাকে ভোগাড় করে দিতে হবে—সে পরীক্ষার জন্য। সমস্ত পরীক্ষা সম্বোধনজনক ভাবে সমাপ্ত হলে তবেই সে আমাদের সঙ্গে 'জ্যাস্টিগ্রাভিটি থিয়োরি' নিয়ে আলোচনা করতে রাজী আছে।

দেশ বা বিশেষ এমন কোনও গবেষণাগার আছে বলে আমার জানা নেই, বার কতৃপক্ষ ওই যুগ্মের অসংগত ও অদ্ভুত প্রস্তাবে রাজী হতেন। বলা বাহুল্য, আমরাও তার দাবী মেনে নিতে পারলাম না। তাই নিয়ে এমন ঘটনার সৃষ্টি করল হবিবুল্লা, যে তাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বাবার নির্দেশ দিলাম আমরা।

হবিবুল্লা আমাদের শাসিয়ে গেল যে একদিন আমাদেরই বেড়ে হবে, পায়ে ধরে তাকে কিরিয়ে আনবার জন্য।

তার সে আশ্বাসন যে ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে, সেদিন তা কল্পনাও করতে পারি নি।

কৃষ্ণধার্মীর শেষ মন্তব্যের তাৎপর্য গ্রহণ করতে চেষ্টা করে শংকর। মনের মধ্যে জেগে ওঠে এক অজানা অস্বস্তি। লক্ষ্য করল যে বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই নড়ে চড়ে বসলেন।

হবিবুল্লার কথা ফলে যেতে আমার কয়েক মিনিটের বেশী সময় লাগে নি। দৌভাগ্যক্রমে ডিরেক্টরের রিপোর্টনিউ-এর কাইল-এ তার নাম, ধাম, ঠিকানা, পেশা, ইত্যাদি জমা হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী অল্পসময় পরে এটাই আমাদের হয়েছিল প্রধান সহায়।

এ কাহিনীর পরবর্তী ও শেষ অধ্যায়ের সূত্র ও শেষ মাত্র আটোরা দিন আগে। শবরের কাগজে বিশেষ করে বারাদি দিল্লীর সংবাদপত্রগুলো পড়েন—আপনারা হয়তো দেখে থাকতে পারেন ঐদিন টিমারপুরে একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। অগ্নিকাণ্ডের পরের দিনই টেলিকোনে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের সম্পাদকের কাছ থেকে এক লক্ষ্যী তলব আসে। তিনি আমাকে বললেন যে টিমারপুরের অগ্নিকাণ্ডের ছবি উঠেছে নিউজ রীল-এর জন্য। সে ছবিতে একটা অত্যন্তদূর্ঘ ঘটনা ধরা পড়েছে। সে ঘটনার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব কিনা?

কৌতূহলের বশে তাঁর অফিসে গিয়ে জুটলাম সেদিন বিকালেই। সেখানে কী অভিজ্ঞতা হল সেটা আপনারা জানাবার জন্য কিম্বদাঁটী সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বলা বাহুল্য, এ ছবি প্রকাশিত হয় নি। নেগেটিভ ও একমাত্র কপি এখন রয়েছে দেশরক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে।

জানালার পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করা হল। পিছন থেকে পাওয়া গেল প্রজেক্টরের দৃশ্য।

পর্দার প্রথম চিত্রে প্রকাশ হল—একটা তিনতলা বাড়ীতে আগুন লেগেছে। প্রাকৃত বিবালোক। একতলার কয়েকটি ঘোকান প্রায় পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে। একটা বড়ো সাইনবোর্ড

হলসে, দুমড়ে পড়ে গেছে পথ জুড়ে। মোতালার জানালার কাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের লেলিহান শিখা আর তিন তলার সমস্ত কোবর দিয়ে ঘোঁরাই কাশো কুণ্ডলী উঠে বাছে মহাকাশে।

দমকল এখনো এসে পৌঁছায় নি। বিপরীত দিকের দূতপাথে আগ্রর নিয়ন্ত্রে হতভাগ্য বাসিন্দার দল। বিজ্ঞানা-সাহাব, চৌকি-চোর-টেবল, বাজ-ভোরগ, রাষ্ট্রাধরের বাসন, ভূপীকৃত কাপড়-জামা চতুর্দিকে ছড়াকার হয়ে রয়েছে। সকলে হত্যাধাসে অগ্নিকাণ্ড দেখছে। কয়েকজন কেবল ভয়েজন্মে এখানে-সেখানে দু-এক বালতি জল কেলে আগুন নেবাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে।

এর পরের দৃশ্য তোলা হয়েছে বাড়ীটার পাশ থেকে। আগুনের শিখা এদিকে দেখা দেয়নি—কিন্তু ঘোঁরাই জালে সমস্ত দূতপট অশ্লীল করে তুলেছে।

এর পরে একটা 'ক্লোজ আপ'—তিন তলার একটা খোলা জানালার। হঠাৎ ঘোঁরাই কুশাশর মধ্যে দেখা গেল এক জঙ্গ-মহিলাকে। জানালার ধারে ঠাঁড়িয়ে তিনি পাগলিনীর মত টিংকার করে চলেছেন—কোলে তাঁর এক শিশু। শিশু প্রাণপণে জাঁকড়ে ধরেছে মারীকে।

সহস্র দেখা গেল—একজন যুবক চক্ষুর নিম্নে এক লাক্রে ওই তিন তলার জানালার ওপরে লাফিয়ে উঠল অবলীলাক্রমে। তার পর ঘোঁরাইর অন্তর্বালে দূতপট আবার ঢেকে গেল। হঠাৎ বিক্ষোভের মত আগুনের লেলিহান শিখা প্রাস করল সমস্ত পটভূমিকা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস পড়ল এই দিকের সমগ্র দেওয়ালটা।

পরের দৃশ্য দেখানো হলো তিনটা দমকল থেকে জলের ধারা অবিরাম পড়ছে ওই ভয়ভূঁপের মধ্যে। ঘোঁরাই কুণ্ডলী আর বাশ মিলে আকাশ আচ্ছন্ন করে তুলেছে। আগুনের শিখা হয়ে এসেছে আরস্তাবান।

সর্বশেষে দেখা গেল একটা অর্ধদগ্ধ দৃশ্যদেহের অংক—ভয়ভূঁপ থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে। পিঠের ওপরে রয়েছে একটা সাঁচা চ্যাপ্টা বাজের মত কোনো বস্তু।

কিন্তু প্রদর্শনার শেষ হল।

কৃষ্ণধার্মী ঘোষণা করলেন—যে শেষ অংশটুকু আবার দেখানো হবে সো-মেশানে।

পর্দার ছবির পুনঃপ্রকাশ হলে দেখা যায় বলিষ্ঠকায় এক যুবকে। পিঠের ওপরে একটা চ্যাপ্টা বাজ চামড়ার 'ট্র্যাপ' দিয়ে বাঁধা। পরনে তার ট্রাইজার ও রঙীন স্পোর্টস শার্ট। মাথার চুল খুব খাটো করে ছাঁটা। চোখে একটা অদ্ভুত উজ্জ্বল দৃষ্টি। কোমরবন্ধে অশ্লীল ভাবে দেখা যায়, কতকগুলো রেডিওর knob এর মত বোতাম। এক হাত দিয়ে বুঝা তার একটিকে ঘোরাচ্ছে আর এক হাত রয়েছে উল্লস বাহু হয়ে। মাটি থেকে দশ ফুট ওপরে ঠাঁড়িয়ে আছে যুবক—শূন্য। বীরে বীরে সে ওপরে উঠে গেল—তারপর মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেলো জানালার দিকে। হঠাৎ ঘোঁরাই মেঘে দূতপট হয়ে গেল আচ্ছন্ন।

হবিবুল্লাকে দেখে শংকরের দৃষ্টিপটে জেগে ওঠে এক রকম মনোবিকারের কথা—'প্যারলয়েড'। স্মৃতিজ্ঞা একদিন তাকে বৃত্তি দিয়েছিল 'প্যারা জইয়ার' লক্ষণগুলো। ধী, অলঙ্করণসহি মিলে

বাচ্ছে তো। লোকের হির করে সভার শেষে সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করবে এ সম্বন্ধে।

কুম্ভারামী আবার আরম্ভ করেছেন—হবিবুল্লার মৃতদেহ উদ্ধার করা গেলেও ওই নারী ও শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করা যায়নি। অবশ্য সমস্ত তত্ত্বাবধান এখনও সরানো সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু সকলেরই ধারণা যে, তারাও জীবিত নেই।

আপনারা সকলেই দেখলেন যে হবিবুল্লা, আর্টিস্ট্রাভিটির সন্ধান পেয়েছিল। কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর কাহিনী হলে অবিশ্বাস করবার কারণ ছিল। কিন্তু বিশ্বাসের কথা হচ্ছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছে সকলের চোখের সম্মুখীন। একমাত্র কামেয়ারা চোখেই সেটা পড়েছে ধরা। এখন কামেয়ারা সাক্ষ্য অবিশ্বাস করবেন কী করে?

সামনের টেবল থেকে শেখবল্লের আচ্ছাদন করিয়ে কুম্ভারামী বললেন, এই হচ্ছে মামুন্নের তৈরী প্রথম আর্টিস্ট্রাভিটি মেশিনের ধ্বংসাবশেষ। আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন যে, একটা ভাঙা, ছিন্নভিন্ন, বলাসানো, আলুমিনিয়ামের বহিরাবরণ ছাড়া সে-যন্ত্রের কিছুই অবশিষ্ট নেই। আপনাদের প্রত্যেককে এই যন্ত্রটিকে পরীক্ষা করবার সুযোগ দেওয়া হবে। আপনাদের পরীক্ষা শেষ হলে আমরা রসায়নাগারে যন্ত্রটিকে পাঠাব তার মূল উপাদান নির্ণয় করবার জন্য।

স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মীদের অসাধারণ কর্তৃত্বপূর্ণতার মনে এই কর্মদিনেই হবিবুল্লার অতীত জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। শ্রীমতী সুমিত্রা দেশপাণ্ডে সেগুলো একসঙ্গে প্রণীত করে হবিবুল্লার জীবন কাহিনী গড়ে তুলেছেন। অল্পসন্ধান এখনও চলেছে—নূতন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হলে অবিলম্বেই আপনাদের তা জানানো হবে।

কিন্তু হবিবুল্লার সম্বন্ধে অনেক কথা জানলেও আমরা বহু চেষ্টাও এই আবিষ্কারে মূল উৎসের সন্ধান পাইনি। আমরা আশা—আপনাদের তীক্ষ্ণতর বিশ্লেষণ ক্ষমতা সে সম্বন্ধে কিছু আলোকসম্পাত করবে।

হবিবুল্লা সংক্রান্ত তলস্তে আর একটা দুঃসংবাদ আমরা পেয়েছি। হবিবুল্লার একমাত্র সঙ্গী ছিল তার এক আত্মীয়—সলিমুদ্দিন। হবিবুল্লার মৃত্যুর পর সলিমুদ্দিনকে পাওয়া যাচ্ছে না। আর তার সঙ্গে নির্ধোজ হয়েছে হবিবুল্লার সমস্ত নেটেই আর ডায়েরী তার ল্যাবরেটরী থেকে। আমরা বিশ্বস্তহৃদে খবর পেয়েছি যে হবিবুল্লা ডায়েরী রাখত—আর অল্পমান করে নিযেছি যে সে পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে কোনো না কোন জায়গায় লিপিবদ্ধ করে রাখত। সমস্ত ল্যাবরেটরীখানা তল্লাসী করে পাওয়া গেছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কড়কগুলো কাগজের টুকরা। এগুলোতে পাওয়া যায় হয় কোনো ইন্ডোব্রেশনের অংশ, না হয় কোনো অজ্ঞাত পরীক্ষার ফলাফল অথবা data। আর্টিস্ট্রাভিটির পরিপ্রেক্ষিতে সে সমস্ত কাগজের টুকরোর কোনো অর্থ হয় না অন্ততঃ আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো অর্থ করে নিতে পারিনি।

স্বরাষ্ট্র বিভাগের গোয়েন্দাদের দ্বারা সলিমুদ্দিন আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে পাণ্ডুরী বাগ্টে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁদের ধারণার ভিত্তি হচ্ছে এই যে সলিমুদ্দিনের মতো কোনো একজনকে হবিবুল্লা মৃত্যুর চারদিন পরে পালায় এরায়পোর্ট-এ দেখা যায়। যুবকের 'পাসপোর্ট'-এ রাখা ছিল সামান্য খান এবং যেই নামেই কয়েকজন পক্ষ, টিকিটও

কেনা ছিল। যুবক করাচী হয়ে লণ্ডনগামী এক উড়োজাহাজে যাত্রা করে। 'বুকিং ক্লাক'-এর ঘটনাটা স্মরণে ছিল, কারণ সামান্য খানের সঙ্গে ছিল প্রচুর মালপত্র—বাড়তি মাওল নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটিও হয় তার সঙ্গে।

শুধু তাই নয়, বৈদেশিক 'ইন্টেলিজেন্স' শাখার কর্মীদের কাছে থেকে খবর পাওয়া গেছে যে পাণ্ডুরী বাগ্টে সামরিক নেতাদের সংগে তরেকজান বৈজ্ঞানিকদের এক গোপন বৈঠক হয়ে গেছে—এক সম্মেলন আগে। অবশ্য এ বৈঠক আজকাল ওদেশে মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। কিন্তু হবিবুল্লার আবিষ্কারের পটভূমিকার এরকম বৈঠকের সংবাদে আমরা আশংকিত না হয়ে পারি না। গোয়েন্দাবিভাগের দ্বারা যদি সত্য হয় তবে, ভারতের ইতিহাসে মহা দুর্দিন আগতপ্রায়।

বলা বাহুল্য, কোনো যুগ্মত্ব দেশের পক্ষে হবিবুল্লার আবিষ্কার ভয়াবহ মারপাড়ে পরিণত করতে কিছুই দেয়ী হবে না।

এ আপনারা এখন সকলে অবহিত হলেন, কেন এই আকস্মিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে—আর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই চরম পদ্ধতির প্রয়োজন কেন। উপস্থিত বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীকে সাবধান করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য যে তাঁদের জীবন সংশয় হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সামান্য অন্তর্বিধা হলেও এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাঁদের সর্বতোভাবে মনে চলটিয়া বাধনীয়।

আজকের এই সভায়লে যারা উপস্থিত আছেন তাঁরা ছাড়া হবিবুল্লার আবিষ্কারের স্বরূপ বাইরের আর কেউ জেনেছে কিনা—আমাদের পক্ষে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। হবিবুল্লার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল টিমারপুতুর ওই ভয়ঙ্কর বাড়ীর কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে। কিন্তু তাঁরা কেউই এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন নি। লক্ষ্য করে থাকলেও তাঁরা মিথ্যা কথা বলেছেন কিনা আমাদের তাও জানা নেই। তারা ছাড়া হবিবুল্লা তার যন্ত্রের স্বরূপ আর কারো কাছে উদ্ঘাটিত করেছিল কি না—আজ আমাদের সে সম্বন্ধে অল্পসন্ধান করবার মতো কোনো সূত্র নেই।

সমবেত বৈজ্ঞানিকদের কাছে আমরা আশা করি, যে তাঁদের সহায়তা আমরা পাব ওই ভাঙা যন্ত্রটার পুনর্গঠনের কাজে। এ কাজে সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ ও দেশরক্ষা বিভাগ সম্পূর্ণ সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। এই প্রজেক্টের ব্যয় নির্বাহ করে সরকার ব্র্যাক চেক দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রজেক্ট এ বা প্রজেক্ট-আর্টিস্ট্রাভিটির সঞ্চিত বৈজ্ঞানিকদের দেওয়া হবে সর্বোচ্চ হারে বেতন। বাসস্থান, আহাারাদি যানবাহন ও প্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিকদের চিকিৎসার ব্যয় সরকারই বহন করবেন।

এ ছাড়া বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি, উপকরণ আমদানী করার প্রয়োজন হলে দেশরক্ষা বিভাগ বিশেষ মালবাহী উড়ো জাহাজের ব্যবস্থা করবেন। শুষ্ক ও বাষ্পীভবন বিভাগের ছাড়াপত্র 'এক্সচেঞ্জ পাসপোর্ট', 'লাইসেন্স' ইত্যাদির চরিত্র ছাড়া মধ্য ব্যবস্থা করা যাবে। দেশরক্ষা বিভাগের যে কোনও 'অর্ডারলি ক্যান্ট্রী' বা জাতীয় সরকার পরিচালিত যে কোনো কারখানা বা গবেষণাগার সর্বদা প্রস্তুত থাকবে আমাদের যন্ত্রপাতি বা গাউনসহ প্রস্তুত করবার জন্য। রেলওয়ে আমাদের মাল সর্ববাহ্য করবে অল্প কাজ স্থগিত রেখে। সমস্ত ব্যাপারেই সর্বোচ্চ 'প্রায়শ্চিত্ত' দেওয়া হবে 'প্রজেক্ট'-এর জন্য।

আমার নিজের তরফ থেকে বলতে পারি যে এই পরিকল্পনার সাংগঠনিক সহায়তা করা আজ থেকে আমার প্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করলাম। দিব্যরাত্রি যে কোনও সময়ে আমার দ্বার খোলা থাকবে আপনাদের জন্য।

সর্বাত্মকরূপে আপনাদের সাহায্য বায়না করি।

কৃষ্ণবাহিনীর অভিভাবক শেখ হল এখানেই। সভাগুলো শুরু হল বৃহৎ গুপ্তন। কৃষ্ণবাহিনী সুরিয়ার সংগে বৃহৎ ঘরে কী নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। শংকর লক্ষ্য করে, সুরিয়ার প্রবল আপত্তি কৃষ্ণবাহিনীর কোনও এক প্রস্তাবে। কিন্তু কৃষ্ণবাহিনী নাছোড়বান্দা—সুরিয়ার হাত ধরে সভার হাফে টেনে নিয়ে আসেন তিনি। তার পরে আবার ঘোষণা করেন—

যে কোনো ‘প্রজেক্ট’ চালাতে গেলে একটা সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন। আমাদের সৌভাগ্য যে একজন বৈজ্ঞানিক সম্পাদিকার সাহায্য আমরা এত দিন পেয়ে এসেছি। ডাঃ সুরিয়ার দেশপাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ‘প্রজেক্ট-আপটিভিটি’র অস্থায়ী সম্পাদিকার কাজ করে এসেছেন। বহুঃ একদিনেই যে আমরা সভার অধিবেশন করতে সক্ষম হয়েছি, তার জন্য সর্বপ্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে শ্রীমতী দেশপাণ্ডের। আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, একেই আপনারা স্থায়ী সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করতে আহ্বান করুন।

সুরিয়ার প্রবল আপত্তি জানায়—বলে, এত বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকদের সমাবেশে ‘১২’ মতো নগণ্যকে সম্পাদিকার পদে বসাল করলে ‘প্রজেক্ট-এর’ ক্ষতি ছাড়া উপকার কিছু হবে না। কিন্তু তার ওজর-আপত্তি ভূবে দায় অভাগতদের সমবেত করতালিতে।

শংকর ব্যাশারটা বেশ উপভোগ করে। লক্ষ্য করে যে এই ঘটনার ঘরের গুমোট আবহাওয়াটা কোথায় মিলিয়ে গেছে। অজ্ঞাতদের মিশ্রমুখের স্তম্ভিতবোধে সুরিয়ার মুখ হয়ে উঠেছে আরক্ত। শংকর ভাবে—হৃদয়-মুখের জয় সর্বত্র।

কলগুপ্তন ধামধার পর কৃষ্ণবাহিনী ঘোষণা করলেন—এবার আমাদের সম্পাদিকা আলোচনা করবেন ‘প্রজেক্ট-এর’ সংগঠন সম্পর্কে।

সুরিয়ার কিছুক্ষণ চুপ করে ঝাড়িয়ে থাকে সভার মাঝখানে। তার মুখের অরণ্যতা তখনও মিলিয়ে যায়নি। শংকরের দিকে মিনিতি ও হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে। তারপর আরম্ভ করে—

এ জানী-জগীর্জনসমাবেশে সম্পাদিকা হিসাবে আপনারা আমাকেই মনোনীত করেছেন। এ মনোনয়নে বোধ্যাতার কোনও বিচার আপনারা করেন নি। তাই আমার প্রগল্ভতা মার্জনা করবেন।

কণ্ঠস্বর বৃহৎ। কিন্তু তা শোনা যায় বিরাট ‘কনফারেন্স’-এর হৃদয়তম কোণ থেকে। পরিভার বাক্যবিস্তার অন্যায়সে বয়ে চলেছে নির্বচিনীর মতো। শংকর হৃদয়বিশ্ময়ে ভাবে, সাড়ে তিন বছর আগের সেই ভীষণ মেয়েটির মধ্যে এ ক্ষয়তা লুকিয়ে ছিল কোথায়।

আমার যদি কোনও দায় থাকে তবে সেটা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

মনোবিজ্ঞানের সংগে হবিবুল্লাহ এই আবিষ্কারের কোনো লাপাত্ত স্বযোগ বের করতে গেলে অনেক পমিয়ার করতে হবে।

ভবুও কণ্ঠস্বরের আশা—হবিবুল্লাহ ‘চিন্তাবাদী’ কোন হৃদয় প্রণালী বেয়ে এত বড়ো আবিষ্কারের পথে উত্তীর্ণ হয়েছিল, মনোবিজ্ঞান হয়তো সে সম্বন্ধে কিছু আলোকসম্পাত করবে।

আপনাদের কাজ যেমন ওই ভাড়া যন্ত্রটাকে গড়ে তোলা, আমার কাজ তেমন অধুনা পঞ্চভূতে বিলীন হবিবুল্লাহ সৃষ্টিটাকে আপনাদের হানসপটে ফুটিয়ে তোলা। কতটা সক্ষম হবে সে কাজে জানি না, কিন্তু আপনাদের আশীর্ব্বাদে ও সহায়তায় হয়তো বা ইতস্ততঃ ছড়ানো হবিবুল্লাহ জীবনের কতকগুলো ছোটো-বড়ো ঘটনার একটা অর্থপূর্ণ সমাবেশ করা সম্ভব হতে পারে।

আপনাদের আশাতরুণ হবে, এই আশংকার আগে থাকতেই আপনাদের জানানো দরকার যে এই সন্নিবেশে পাবেন না নিগুণ শিল্পীর দক্ষতা। অপটু হাতে গড়া মাটির তালকে যদি সম্পূর্ণ প্রতিমা বলে আপনাদের সামনে তুলে বরি, তবে দয়া করে শিল্পীর অক্ষমতাকে মার্জনা করবেন। কিন্তু চেষ্টা আমাদের সকলকে করতে হবে বখাশাধা।

এক কথায়, আমরা এমন অবস্থায় এসে ঝাড়িয়েছি যে, এ কাজে সাফল্যলাভ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আশাবাহিনী হয়তো বলবেন যে আমাদের এতটা আশংকার বা নিরাপত্তা স্বাক্ষর এতটা কঠোর ব্যবহার কোনও সত্যিকারের ভিত্তি নেই। সলিডকিন হয়তো বা এ দেশের কোথাও রয়ে গেছে। তার অন্তর্ধান আর

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



প্রতি প্যাকেট
২৪ টি
স্লট ব্রড আকারের

- কলমে প্রস্তুত
- ফ্রিজে সেকা
- হোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সর্বত্র রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কনফেকশনারী
কলিকতা - ২২

লব্ধিদ্বারা স্যাবরেটরীর কাগজপত্রের অল্পত্ব হবার হয়তো বা একটা সফল ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আমি তাঁদের স্বরণ করিয়ে দিতে চাই, বিজ্ঞান সাধনার ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াসমূহের কথাটা। অ্যাটম বোমা আর নিউক্লীয়র মারপাত প্রায় একই সময়ে একাধিক দেশে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কাজেই, যে আবিষ্কার একজন ভারতীয় তত্ত্ব সত্ত্ব করেছিলেন, সে আবিষ্কার আর একজন মার্কিন, রুশীয় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে—এমন কি একজন চৈনিক, বর্মীয় বা পাকিস্তানী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভবপর হবে না কেন?

আজ বৃগ্গাকারী আবিষ্কারের জন্ম প্রয়োজন বিরাট সমবেত চেষ্টা, বিশাল পরিকল্পনা—আর সম্ভব হলে বিশাল অর্থব্যয়। উদাহরণস্বরূপ আবার ওই অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা অথবা স্পুটনিক, লুনিক, পাইলটেরীয়ার বা এক্সপ্লোরার রকেট—এর কথা হতে পারে। পশ্চিমদেশে আজ বিরাট প্রজেক্টগুলোতে সমবেত চেষ্টার সাফল্য অল্পপ্রাপ্তি হয়ে সাধারণ দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন পেশার লোকেরা আজ সমবেত চেষ্টা বা “সাইবারনেটিক্” (cybernetic) পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছেন।

পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যার সমাধানের জন্য যেমন বিভিন্নধর্মী ‘সার্কিট’-এর একত্র সমাবেশ করে সাইবারলেটিক্‌স্ গড়ে তোলা হয়েছে বৃহত্তর জগতেও তেমনি বিভিন্ন ধরনের চিন্তাপ্রণালীর একত্র সরিয়েশে অনেক দুঃস্থ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ইলেক্ট্রনিক্‌স্-এর পরিবর্তে সমাবেশ করা হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে জটিলতম সার্কিট—মানুষের মস্তিষ্ক। এমন কি আমাদের দেশেও সাইবারলেটিক্‌ পদ্ধতি কিছু পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। উদাহরণ—আমাদের পরিকল্পনা কমিশন।

কোনো সমস্যার ওপরে বিভিন্ন পেশার বিশেষজ্ঞদের সমবেত চিন্তায় অদ্ভুত ফল পাওয়া গেছে। দেখা যায় পদার্থবিজ্ঞানের দুঃস্থ সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন প্রাণিতত্ত্ববিদ, রসায়নের নতুন আবিষ্কার সম্ভব করছেন ভূতত্ত্ববিদ : ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে বিপ্লব এনে দিচ্ছে নগর্যা স্থলশিকড়িয়ার প্রেষণ। এটা ‘স্পেশালাইজেশন’-এর ধূ—আজকের বিশেষজ্ঞের চিন্তাধারা গড়ে ওঠে একটা নির্দিষ্ট সার্কিট প্রণালী বেয়ে। তাই পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র পদার্থবিজ্ঞান প্রচলিত ধারাতেই সমস্ত হুঁকি রাখেন সীমাবদ্ধ। অর্থনীতির ছাত্রও সমগ্র জগতটায় পরিমাপ করে চলেন অর্থনীতির চেনা মানদণ্ডটা দিয়ে। সহসা দেখা গেল, পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত সমাধানে অর্থনীতির মাপকাঠিটা কাজে লেগে গেল—তার ফলে সম্ভব হয়ে গেল এক কল্পনাভীত আবিষ্কার।

তাই আজ এ সভায় আহ্বান করা হয়েছে কয়েকজন বিভিন্ন বিষয়ের সেরা ছাত্রদের। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে অনেক স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক এখানে অল্পপস্থিত। বড়ো বড়ো গবেষণাস্থার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব বীদের ওপরে তত্ত্ব, অনিশ্চি-কালের জন্য তাঁদের ‘এ প্রজেক্ট’ আটকে রাখলে দেশের বিজ্ঞান-সাধনার শৃংখলা, বজায় রাখা কঠিন হবে। তাই আমন্ত্রণলিপি তাঁদের কাছে পাঠানো হয়নি। বীদের স্বকীয় উদ্ভাবনীশক্তির কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি, তেমন বিজ্ঞানসাধকদের বাদ দিতে হয়েছে—তাঁরা প্রতিষ্ঠার চরম শিখরে থাকলেও। জিন্নাভাবল্যী জন্ম বৈজ্ঞানিকদের সম্পর্কে চরম অসহিষ্কার অধ্যাতি দোলা যায়

আরো কয়েকজন প্রবীণ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের। এঁদের নাম তালিকাভুক্ত করা হলে ‘প্রজেক্ট-এ’ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববৃত্তের রূপগড়ি হয়ে দাঁড়াত।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আজ দেশের সত্যকারের প্রথম জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলতে দুইমুঠে কয়েকজন ছাড়া আর কারো সন্ধান মেলে না। তাই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে যেটাটি উদীয়মান দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্য থেকে। বস্তুতঃ এই দুই জ্যেষ্ঠ মধ্য সীমারেখা কোথাও দেখা যায় না। এঁদের কৃতিত্বের ইতিহাস সঙ্গ্রহ করা হয়েছে জাতীয় বেজিষ্ঠার থেকে। দেশে বা বিদেশে গবেষণার কাজে বঁারা স্বকীয় উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—একাধিক বিষয়ে বীদের দেখা গেছে মনের প্রসার, তাঁদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে বারো জনকে।

এই বারো সাংখ্যার ওপরেও সীমারেখা টানা হয় নি। আপনারা যদি প্রয়োজন অনুভব করেন কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো বৈজ্ঞানিকের সহায়তার, তবে সে বৈজ্ঞানিককে আমন্ত্রণ করে যে কোনো সময়ে দলবদ্ধি করার অন্তর্বিধি হবে না।

এবার পরাম্পরের সংশে পরাম্পরের পরিচয় করিয়ে দেবার পালা।

প্রফেসর শিকদারের কথা নুতন করে আপনাদের না বললেও চলবে। মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র, চুম্বকের বিভিন্ন রূপ আর পরমাণুর গঠন সবচেয়ে প্রফেসর শিকদারের দান জগত অনেক দিনই স্বীকার করে নিয়েছে।

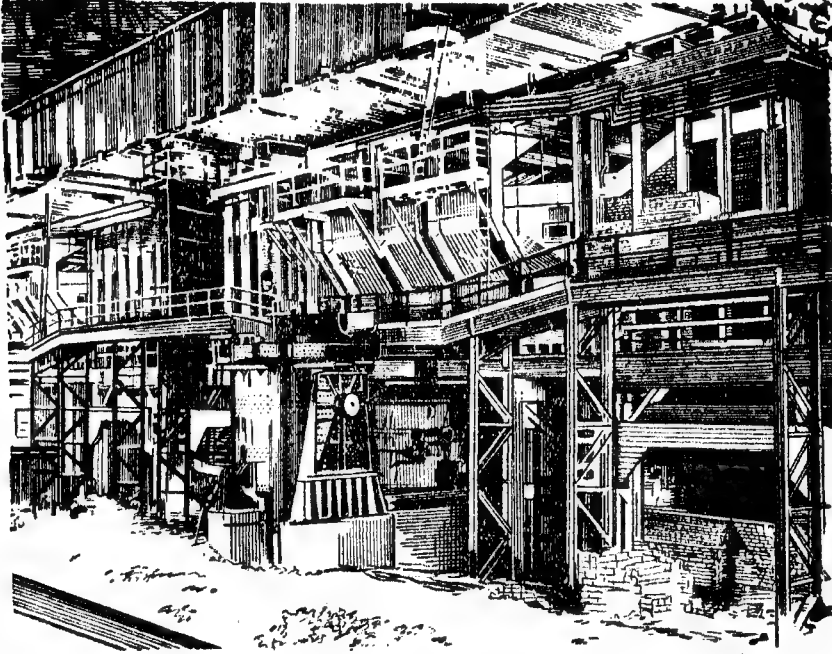
প্রফেসর গোপালাচাট্টা—রসায়নের অন্ততম সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। ছাত্রজীবনে আর স্বাতন্ত্র্যকান্তর জীবনে ইলেক্ট্রোকেমিস্ট্রি সবচেয়ে আমাদের প্রফেসর গোপালাচাট্টা নুতন গবেষণার দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন। অক্সিডেশন-রিডাকশন সর্বচেয়ে তাঁর বৃগ্গাকারী থিয়োরির কথা নুতন করে প্রচার না করলেও চলবে। পরবর্তী জীবনে এই প্রবীণ অধ্যাপক নিয়োগ করেছেন অধ্যাপনায়—আজ তাঁর ছাত্রেরাও বশবী হয়ে উঠছেন সাম্প্রতিক বিজ্ঞানসাধনার।

ডাঃ শঙ্করপ্রসাদ রায়। আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের উদীয়মান জ্যোতিষ। ইলেক্ট্রন কিয়দংশ নিয়ে ডাঃ রায়ের গবেষণা শুরু হয় আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে—অনেকটা মহামানব আইনষ্টাইনের ছত্রছায়ায়। পরে ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-তে সাইবারলেটিক্‌স্ সক্রান্ত এক দুঃস্থ সমস্যার সমাধান করে বিখ্যাত হন। বিলাতে ক্যাডেগুলি স্যাবরেটরিতে স্প্রুইং ডাইনামিক্‌স্ সক্রান্ত একটা নুতন থিয়োরি আবিষ্কার করেন। দেশে ফিরে এঁর গবেষণা চলছে—আইনষ্টাইনের ইউনিকোডেড কীড থিয়োরির একটা প্রমাণ বার করার উদ্দেশ্যে।

শংকরের কর্ণবুল আয়ত্ত্ব হয়ে ওঠে সূর্যমিত্রার এই বিশদ প্রশংসায়। প্রখ্যাত পাণ্ডিত্যে উঠে কোনোরকমে সভাসদদের অভিভাষণ জানিয়ে আনাড়ির মতো ধপ করে বসে পড়ে।

ডাঃ কালেশ্বর রাও। গণিতশাস্ত্রের সব্যসাতী বললেও চলে। লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ রাও গবেষণা করেন ‘রিসোলিউট কৌরাটাই ডাইনামিক্‌স্’ সর্বচেয়ে। আলোক-তত্ত্বেরে অভিব্যক্তি কপ ধরা পড়ে গেছে ডাঃ রাও-এর এক ইকোয়েশন। শুধু তাই নয়,

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা



মিল মেসিঙ্গ শপ

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে

এই তো সেদিনের কথা— প্রথমে জরিপ, তারপর পরিকল্পনা তারপর আসল কাজ শুরু হল..... আর আজই তার ফল দেখা দিয়েছে।

দুর্গাপুরে ভারতের নবীনতম ইস্পাত কারখানা, যেটি ইস্কন নির্মাণ করছে, আজ হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেডের

অধীনে উৎপাদন আরম্ভ করে দিয়েছে।

একদিকে এক নতুন প্লাস্ট ফার্মেসে লোহা তৈরি হচ্ছে অন্য দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ কার্য এগিয়ে চলেছে। এই পর্যায়ের কাজ শেষ হলেই ইস্পাত তৈরি শুরু হবে।

ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কমস্ট্রাক্শন্স কোম্পানি লিমিটেড

ভেভি এবং ইউনাইটেড এন্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড হেভ রাইটস্ অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ সাইমন-কার্ডশ্ লিঃ বি গুডেনহাফেন স্মিথ গুডেন এন্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ মি সিমেন্টস কোম্পানি লিঃ ব্রিটিশ টয়ল-কটন কোম্পানি লিঃ মি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ মি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড মেট্রোপলিটান-কাইবার্গ ইলেকট্রিক্যাল এক্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ তার ইন্ডিয়ান রাফ অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ স্টীলগ্যাংড ব্রিজ অ্যান্ড এন্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিঃ ডবলবার স্কে, গ্রিড অ্যান্ড এন্জিনিয়ারিং লিঃ বোস্কে পার্কস্ অ্যান্ড সন্ লিঃ ইস্কন কেম্বল গ্রুপ (সিমেণ্ট এডভান্স মোরান লিঃ এবং পিরেনি জেথারেল কেম্বল ওয়ার্কস্ লিঃ)

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবার রত

কিছু দিন অল্প 'খিয়ারি' অর্ক ইন্সপেক্টর 'ডেবিরেলস্' শীর্ষক এক প্রবন্ধ ইনি গণিতজ্ঞদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তোলেন।

ডাঃ আলিমচন্দ্রানী ফলিত পদার্থবিজ্ঞানের পি-এইচ-ডি। 'অপারেশনস্ রিসার্চ' সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। মাস্কের সংগে ভটিং যন্ত্রপাতির যে কী সম্পূর্ণ অটোমেশন ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদনযন্ত্র আজ কারখানা পরিচালনার বা মাস্কের সমাজবিধানেও যে কী পরিবর্তন এনে দিচ্ছে ডাঃ আলিমচন্দ্রানী করেছেন এ সম্বন্ধে এক অসাধারণ বিশ্লেষণ-সাধ্য ও পদার্থবিজ্ঞানের সহায়তায়। ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞানের এক অপরূপ মিলনক্ষেত্রের উন্মোচন হয়েছে এঁদেরই গবেষণার ফলে।

ডাঃ দত্তগুপ্ত—ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। নতুন ধরণের এক ট্রান্সিস্টর আবিষ্কার করে এসেছেন জাপানে। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে বিদ্যুৎ শক্ত হয়েছে কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, রেডিও ইলেক্ট্রনিক্স এবং রাজ্যে। রেডিও টেলিগ্রাফ—এমন-কি মেসারি কিঞ্জি-এ ও ডাঃ দত্তগুপ্তের ট্রান্সিস্টর ব্যবহার করা হচ্ছে।

ডাঃ অমল বানার্জি—আসলে ডাঃ বানার্জি হচ্ছেন চিহ্নংসক। গ্রাসগোতে ইতি বহুদিন কাটিয়েছেন ত্রেন কিঞ্জিওলজি নিয়ে গবেষণার। কতকগুলো মডেল ইলেক্ট্রনিকস্ এর সার্কিট উনি উদ্ভাবন করেছিলেন। এগুলোর সাহায্যে মাস্কের মস্তিষ্কের অনেক ক্রিয়ার স্বরূপ ধরা পড়ে গেছে। বানার্জি সার্কিটের আজ সমাদর অগতে সর্বত্র—মস্তিষ্কবিদ্যারঙ্গের মধ্যে। কেবলমাত্র কিঞ্জিওলজি নয়, পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক্স ওপরেও ডাঃ বানার্জির দখল অসাধারণ।

ডাঃ সুরাহমনিয়ন। জাণ্ডাবীর ম্যাক্স প্রাংক ইনস্টিটিউটে ইনি গবেষণা শুরু করেন প্রথমে উদ্ভিদশাস্ত্র নিয়ে। স্থাব্রলোকের সহায়তায় উদ্ভিদ কী করে বাতাস থেকে অংগার সঞ্চার করে বেড়ে ওঠে—এই কোটোপিয়েনিস সম্বন্ধে ইনি কৌতুকী হয়ে পড়লেন। আলোক-তরঙ্গিকার শক্তি আর বাসায়নিক জৈব শক্তি কী ভাবে একটা থেকে আর একটার রূপান্তরিত হচ্ছে এ সম্বন্ধে কয়েক বছর আগে কয়েকটি অসাধারণ প্রবন্ধ লেখেন ডাঃ সুরাহমনিয়ন। এই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে ইনি প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন উদ্ভিদ-বীজাণু, আর জীবজন্তুর মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের সাহুস্তের কথা। এই আবিষ্কারের জন্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ছাড়াও ডাঃ সুরাহমনিয়নকে নতুন করে লিখতে হয়েছিল থারমোডাইনামিস ও 'ভয়েজ 'মেকানিক্স'। ডাঃ ছাড়া অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে।

মিঃ জন হচ্ছেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সুইজারল্যান্ডে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন কোনো প্রসিদ্ধ মেশিনটুল তৈরী করার কারখানায়। এরই কীকে কীকে 'ট্রিবিটি অর্ক মেটাল ট্রাকচারস্'—ধাতুনির্মিত স্থল কাঠামোর স্থায়িত্ব—শীর্ষক বারাবাহিক প্রবন্ধের মধ্যে—অনেক নতুন 'লাইডিয়া' দিয়েছেন দেশ বিদেশের ইঞ্জিনিয়ারদের। মিঃ জনের গবেষণার ফল আজ কাজে লাগছে

রকেট ও মিসাইল নির্মাণে। এ সমস্ত প্রবন্ধ পাওয়া যায় 'কটন-বিজ্ঞান' তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয়।

ডাঃ কৌল আসছেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কৃষি বিভাগের অধ্যাপক ইনি। উদ্ভূত বিহারের বজ্র নিবারণের জন্য এক নতুন পরিবহন ইনি জাতীয় সরকারকে দিয়েছেন। একটা ছোটো জাহাজ নিয়ে ডাঃ কৌলের পরিকল্পনা অমুখ্যায়ী পরীক্ষা করে অসাধারণ সাফল্য লাভ করা গেছে। শুধু তাই নয়, 'লাইব্রেরী সার্ভেস' বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে ইনি বহু গবেষণা করেছেন। ঘরে বাইরে তাই ডাঃ কৌলের প্রসিদ্ধি শুধু কৃষি বিজ্ঞানেই নয়—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেও ভারতের একজন দিকপাল বলে তাঁর খ্যাতি প্রচার লাভ করেছে।

আর এসেছেন স্বামী সচ্চিদানন্দ—আহমেদাবাদ যোগাশ্রম থেকে। এই বৈজ্ঞানিকদের আসরে স্বামী সচ্চিদানন্দের নাম শুনে আপনারা হয়তো বিম্বিত হবেন। আসলে স্বামীজি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে 'বায়োকেমিস্ট্রি'তে এম, এস, সি আর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োফিজিক্স-এ পি, এইচ, ডি। যোগের কিঞ্জিওলজি সম্বন্ধে গবেষণা করে ইনি মাস্কের শরীর সম্বন্ধে অনেক বিষয়কর তথ্য প্রুথী সমাজে প্রচার করেছেন। সামান্য উপকরণে অতি সূক্ষ্ম বিষয়কর বস্তু গড়ে তোলার কাজে, স্বামীজীর প্রেতিভা অস্বীকার্য।

সবশেষে বলতে হয় নিজের কথা। আমি সুরমিত্রা দেশপাণ্ডে, মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী। শিশু-মনস্তত্ত্ব আর মনোবিজ্ঞানে 'সাইবারনেটিক্স' পদ্ধতির প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু কিছু অঙ্গের অসমাপ্ত কাজ আমার আছে। কিন্তু সে কাজ এতই নগণ্য যে এই মহাজ্ঞানীদের সভায় তার কথা উত্থাপন করলে হৃদয়পতন ঘটবে। গুণ, অভিজ্ঞতা ও বয়সের দিক থেকে এই প্রজেক্টের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র অযোগ্য। হচ্ছি আমি।

বয়সের প্রস্তুতা বধন উত্থাপন করছি—তখন আর একটা কথাও বলতে হয়। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, যে প্রফেসর শিকদার, প্রফেসর গোপালাচাঁরী ও স্বামীজিকে বাদ দিলে আমাদের সকলের বয়স সাতাশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। সাতাশের বিশ্লেষণে যদি বিশ্বাস করা যায়, বেশীর ভাগ বিজ্ঞান সাধকের জীবনে এই চতুর্দশ বৎসরই হচ্ছে সবচেয়ে কলহান সময়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা যায় অনেক।

আমরা ছাড়া প্রফেসর কৃষ্ণস্বামীকেও এ 'প্রজেক্ট'র একজন কর্মী বলেও আমরা ধরে নিতে পারি। আহা! নিজে পরিত্যাগ কয়েছেন তিনি আমাদের এ সংমেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য।

বস্তুতঃ আজকের এই সম্মেলন যে পণ্ডিত হয়েছ তার জন্য প্রধান কৃতিত্ব তাঁরই আর কারো নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণাধারায়ে পূজীভূত অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ আর কমপক্ষে ত্রিশটি সরকারী ও বেসরকারী কমিটি বীর ওপরে নির্ভর করে বসে আছে। তিনিই যে কী করে মাত্র বায়োমিদের মধ্যেই এ সভার আয়োজন করে তুললেন ভাবতেই বিম্বর লাগে। সমবেত সভ্যদের তরফ থেকে প্রঃ কৃষ্ণস্বামীকে তাই অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। [ক্রমশঃ]

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বন্ধুসভার উল্লেখ করবেন]

ভলতেয়ার—জীবন ও দর্শন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

উপমহা

লগুন—ইংরাজদের সম্পর্কে চিঠি

লগুন গুহিরে বাঁসে ভলতেয়ারের প্রথম কাজ হল ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করা। নতুন ভাষার ব্যাকরণ অবস্তা তাঁর বিশেষ বিরক্তিগ্রস্ত কারণ হল। কিন্তু তাকে দেখা আটকাল না। এক বছরের মধ্যে তিনি শুধু ইংরেজী ভাষাই শিখলেন না, ইংরেজী সাহিত্যের সব শ্রেষ্ঠ সম্পদ পড়ে ফেললেন। এরই সঙ্গে ইংলণ্ডের সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হবারও একটা সুযোগ জুটে গেল। চর্চা বলিভ্রোক ভলতেয়ারকে একে একে সেই সময়ের সেরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডিন অইকট থেকে আরম্ভ করে কনগ্রীভ, পোপ, অ্যাড্রিনন সকলের সঙ্গে আলাপ হ'ল ভলতেয়ারের।

সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপে চরমকৃত হলেন করাসী লেখক। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন এই সাহিত্যিকদের কলমের স্বাধীনতা দেখে। শুধু সাহিত্যিক কেন, আশ্চর্য হলেন ইংরাজ জাতের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনের ধারা দেখে। ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে সামান্য একটা সরু চ্যানেলের ব্যবধান কিন্তু কি বিরাট ব্যবধান দুই জাতির জীবনদর্শন, জীবনোপলব্ধিতে। ইংলণ্ডে এরা ধরকে নতুন রূপ দিয়েছে, এক রাজাকে ক্রীসিতে খ্রীস্টে সিংহাসনে বসিয়েছে অস্ত্র এক রাজাকে, গড়ে তুলেছে নিজস্বের পার্লামেন্ট। যে পার্লামেন্ট ইউরোপের যে কোনো শাসনকর্তার চেয়ে শক্তিশালী। সারা ইংলণ্ড ঘুরেও একটা বাড়িদের কারাগার দেখতে পেলেন না ভলতেয়ার। অনেক ঘুরলেন কিন্তু পেলেন না সেই সব অকর্মণ্য খেতাবধারী আর রাজকীয় করুণাপূর্ণ অত্যাচারী রাজপুরুষের দল যাদের গোপন চিঠির জোরে একজন নির্দেশ সাধারণ মানুষকে জেলে আটকে থেকে আরম্ভ করে বিদেশে নির্বাসন পর্যন্ত দেওয়া যায়। ইংলণ্ড দেখে, সেই দেশের মানুষ দেখে, শাসন ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হলেন ভলতেয়ার। আর যে পরিমাণে মুগ্ধ হলেন সেই পরিমাণে সারা অস্ত্রর জুড়ে অহুভব করলেন তিক্ততা—নিজের দেশ আর তার আভিজাত্যের অত্যাচার সবচেয়ে তিক্ততা।

কি শাসন ব্যবস্থা। কি বিরাট মানসিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রভুতি চলেছে সারা ইংলণ্ড জুড়ে। বেকনের নাম তখনো ভাসছে দেশের আকাশে বাতাসে। বেকন নির্দেশিত জীবন-জিজ্ঞাসার নতুন পথে এগিয়ে চলেছে দেশ এই চলার পথে পাথের 'হবসের' বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ, 'লকব' মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, 'কলিনস', 'টিম্বল' ইত্যাদির গির্জার প্রচলিত গোঁড়ামি অগ্রাহ্য করে নতুন ঈশ্বর জিজ্ঞাসা।

নিউটনের যুগ্ম হল। সমাবিপ্রোক্ত উপস্থিত ভলতেয়ার বিম্বিত হয়ে দেখলেন, লোকান্তরিত মহামানবের আশ্চর্য প্রতি সমগ্র জাতির নীরব প্রভা নিবেদন। কিরে এসে লিখলেন এই লেখক এক পণ্ডিতসভার ভুলদায় সেই শিথলগত প্রায় নিরে ভর

হচ্ছে—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে—সিভার, আলেকজান্ডার, তৈমুরলঙ্গ না ফ্রোমওয়েল। একজন বললেন—এদের কেউ নয়, নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ হচ্ছেন আইজাক নিউটন। আমার ওই একই মত। বিনি সত্যের শক্তিতে আমাদের অন্তর জয় করেছেন তাঁরই পায়ে তুলে দেব আমাদের প্রভাব অর্থ; তাঁদের পায়ে নয় ধীরে পাশবিক শক্তি দিয়ে আমাদের বেঁধেছেন দাসত্বের শৃঙ্খল। এর পর নিউটনের লেখার মাঝে ঘুরে গেলেন ভলতেয়ার, ফ্রান্সে কিরে গিয়ে এই মনোবীর মত সেখানে প্রচার করবেন বলে।

ইংলণ্ডের সোনার ফলস, তার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান অবিস্মৃত ক্ষমতার সঙ্গে দুহাতে কুড়োলেন ভলতেয়ার। তারপর তাকে করাসী সংস্কৃতির আগুন পুড়িয়ে, নিজের প্রতিভার রসে সিক্ত ক'রে নতুন রসায়ন প্রস্তুত করলেন করাসী পাঠকদের জন্যে। Letters on the English এর পাণ্ডুলিপি গোপনে পাঠিয়ে দিলেন ফ্রান্সে বন্ধুদের কাছে। গোপনে পাঠালেন কারণ কারাগারের নুতি তখনো মন থেকে মুছে যায়নি। প্রত্যেক চিঠিতে অনেক প্রশংসা আছে ইংরাজদের আর তুলনার আছে করাসী সমাজের প্রতি বাজ, শাসনের বিরুদ্ধে কশাঘাত। তাই রাজপুরুষদের ঘোষাশু এড়িয়ে চলাই ঠিক করলেন ভলতেয়ার। প্রত্যেক চিঠিতে আরো কিছু ছিল, ছিল মধ্যবিত্তদের প্রতি আশ্বাস; যাতে ইংলণ্ডের মত করাসী মধ্যবিত্তরাও কিরে পেতে পারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে তাদের প্রকৃত স্থান। ভলতেয়ারে হয়তো অতো ভেবে লেখেননি, কিন্তু ইতিহাস বলছে যে এই চিঠিগুলোর মধ্যেই লুকিয়েছিল করাসী বিপ্লবের প্রথম বীজ।

রোমান্সের রঙীন আসর

করাসী রাজপ্রতিনিধি অবস্ত অত শত জানতেন না। তাই ১৭২৯ সালে তিনি ভলতেয়ারকে স্বদেশে কিরে আসবার অহুমতি দিলেন। প্যারিসে পা দিয়েই ভলতেয়ার ভাসলেন বিলাসের ফ্রোতে আর সঙ্গে সঙ্গে অবাসিত ধারার তাঁর কলম থেকে ক'রে পড়তে লাগল জীবনানন্দ্যর রঙে রঙীন নানা সুবের হাসি। উড়ে চলে গেল দীর্ঘ পাঁচ বছর আর তারপরই আবার তাঁর জীবনে আর একটি এবাদের সভ্যতা প্রমাণিত হ'ল। হাসির পায়ে পায়ে এল কারার দিন।

হঠাৎ এক চুষ্ট প্রকাশক লেখকের অহুমতি না নিয়েই Letters on the English ছাপিয়ে ছেড়ে দিলে বাজারে। ভলতেয়ারের জীবনে আবার ঘনিয়ে এল মেঘ। প্যারিসের পার্লামেন্ট এই নোভরা ধর্মঘোষী, নীতিবিসংহিত, এবং রাষ্ট্রবিরোধী বই বাজেরাপ্ত ক'রে খোলা রাজপথে সকলের সমনে পুড়িয়ে দেবার হুকুম দিলে। কিন্তু এখানেই থামল না রাজঘোষের রথ। ভলতেয়ার স্তন্যদৈনে সে রথ এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে, তাকে তুলে আবার বাড়িদের কারাগারে নিয়ে যাবে ব'লে। কালের গতিতে জীবনদর্শন তখন অনেক পক্ক হ'য়েছে ভলতেয়ারের। তাই এবার তিনি ক: পলায়তি এবাদ

বাক্যের অঙ্গসমূহ করতেন। পালসেন, তবে আর একা নয়।
প্রকৃত রসিকের মতো পালসেন অন্তরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে।

সঙ্গিনী Marquise du chatelet'র বয়স তখন আটপাঁচ;
আর ভলভেরার চল্লিশ পার হয়েছেন। প্রতিভার প্রতিপ্রতিভার
আকর্ষণের কাছে কিন্তু তুচ্ছ হ'ল বয়সের ব্যবধান। অনন্তা এক
নারী ভলভেরারের এই প্রিয়বান্ধবী অল্পশ্রুত তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তির
সংবাদ ভবনট হুড়িয়ে পড়েছে দেশের স্ত্রীসমাজে। শুধু তাই নয়,
নিউটনের Principia'র সঠিক অনুবাদ করেছেন তিনি এবং স্বয়ং
ভলভেরারকে হারিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ওপর রচনা লিখে লাভ করেছেন
করাসী আকাদেমীর পুরস্কার। এমন সর্বজনপ্রিয়তা নারীর স্বামী ছেড়ে
অন্তরে জীবনে জড়িয়ে যাওয়ার কথা ভাবলে বিশ্বের অস্ত
থাকে না। কিন্তু ভলভেরার বেথানে নায়ক সেখানে বৃষ্টি বিম্বিত
হবার কিছুই নেই। প্রিয়বান্ধবীট বলেছেন—সর্ববিষয়ে এমন
স্বপ্নের পূরক; সাধা ক্রান্তের সবচেয়ে মূল্যবান অলঙ্কার। বোকা
স্বামী ছেড়ে তাই হয়তো তিনি গলায় শোলসেন এই মূল্যবান
মালা। অথবা প্রতিভার বিকাশে কিছুই বৃষ্টি বাধা নয়, প্রেমের
পথে সব সম্ভারই বৃষ্টি তুচ্ছ।

প্রিয়বান্ধবীকে প্রেমে প্রস্থার ভরিয়ে দিলেন ভলভেরার। হুড়
হয়ে বললেন সত্যিই মহৎ একটি অন্তর, আর একমাত্র অপরাধ মনে
হয় নারী হয়ে জন্মানো। শুধু যুগুই হলেন না, এই প্রিয়বান্ধবীকে
আর অসাধ্য পরিশ্রমিতাকে কেন্দ্র করে পাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে
ভিল ভিল করে গড়লেন নারীর এক নিজস্ব রূপ, সেলেন পূরক আর
নারীর মানসিক সমস্যাভাবতার ধারণা। লিখলেন ভলভেরার, পূরককে
বশে রাখবার জন্যই ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করেছেন। সমাজ-বিজ্ঞানের
পাড়ার পাতায় এই উক্তিই সত্যতা ছড়িয়ে আছে।

Cireyতে প্রিয়বান্ধবীর ভিলায় আশ্রয় নিলেন ভলভেরার।
প্যারিসের রাজনৈতিক কোলাহল থেকে দূরে এক শান্ত নির্জন
আশ্রয়। মাদামের স্বামী তখন অস্ত্র-কোথার যুদ্ধে ব্যস্ত। কলে দুজনের
মিলনে কোনো বাধা হইল না। সমাজ? তৎকালীন করাসী সমাজে ধনী
বুদ্ধের তরুণী দ্বারা হু একজন প্রেমিক নিয়ে মাথামাখি করতেনই।
সুবিধাবাদী সমাজ চোখ বুজে থাকতো, কারণ ধনসম্পদ দিয়ে যে
তরুণী নারীর মন জয়না এ সম্ভাব্য অস্বীকার করবার সাহস কারুরই
ছিল না। অভিজাত মহিলাদের খাঁচায় এমন দু-একটা বাঁধতি
পূরক সব সময়েই বশ করার জন্যে থাকতো। খুব কিছু বাড়াবাড়ি
না হলে সমাজে বারণ করতো না। জীব সেই পূরক পরিচিত এক
প্রতিভা হলে ভো কথাই নেই। সমাজ তখন সমস্তের বাহবা দিত।

কিন্তু সমাজের বাহবা কান দেবার সময় ছিল না ভলভেরার
বা তাঁর বান্ধবীর। এমন কি বহুবান্ধবদের আপায়ন বা পরিচর্যার
সময় ছিল না দুজনের। সারাদিন গভীর গবেষণার মস্ত থাকতেন
এই প্রতিভাবান পূরক আর অসামান্য নারী। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে
নানা পরীক্ষার জন্য মূল্যবান এক গবেষণাগার তৈরী করিয়েছিলেন
ভলভেরার। জ্বরের পর বছর নতুন নতুন আবিষ্কার আর
আলোচন্য নিয়ে প্রতিবাসিতা চলল এই দুই নর-নারীর মধ্যে।
ইতিমধ্যে অভিজাত ও স্ত্রী সমাজের আসর স্থানান্তরিত হল
প্যারিস থেকে Cireyতে। প্রকৃত বৈদ্য আচারের পর ভলভেরার
আর তাঁর বান্ধবী এসে বোগ দিলেন অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে।

কোনোদিন সাধারণ একটু অভিন্নর হস্ত, কোনোদিন বা ভলভেরার
পড়ে শোনাতেন তাঁর লেখা গল্প। কখনো কখনো নাটকের
কোনো চরিত্র অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন নাট্যকার স্বয়ং।
আশ্রয়ের মধ্যমণি হয়ে নিজে হেসে, অপারকে হাসিয়ে সময় কাটতে
দিতেন ভলভেরার।

১৭৩৭ সালের জুলাই মাসে ফ্রেডরিক দি গ্রেটকে চিঠি লিখেছিলেন
এই ভলভেরার, কখনো কখনো বোকা সাজার মধ্যেও মাধুর্য আছে।
যে সব দার্শনিক হেসে মনের ভার হালকা করতে পারে না, তারা
সত্যিই করুণার পাত্র। আমার মনে হয় যে গান্ধীও একটা সাংঘাতিক
গোপ। এই ভলভেরারকে লক্ষ্য করেই রাশিয়ার ক্যাথলিক বলেছেন,
আনন্দের পূর্ণ পবিত্র প্রতীক।

Cirey-র এই নিভৃত নিকেতনে আনন্দোচ্ছল ভলভেরারের
কলস থেকে উৎসারিত হল রোমান্সের ধারা। বহু সাহিত্যিক যুগের
মত একে একে করে পড়ল Zadig, Candide, Micromegas,
L'Ingenn, Le Monde Comme il va। এই রসধারার
মধ্যে প্রতিভাত হ'ল সাহিত্যিক ভলভেরার, রাসিক ভলভেরার, ভাবুক
ভলভেরারের পূর্ণ রূপ। দার্শনিক ভলভেরারও যে কোথাও উঁকি
দেননি এমন নয়। এই বইগুলোকে উপভোগ্য, বললে ভুল হবে,
আবার ঠিক ছোট গল্পও নয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রূপায়িত
হয়েছে লেখকের চিন্তাধারা, নায়ক একটি বিশেষ ভাবের, আদর্শের
প্রতীক, আর ভিলেন চরিত্রে ছায়া পড়েছে প্রচলিত সংস্কারের।
সব মিলিয়ে প্রত্যেকটি লেখা যেন এক একটি নিটোল নির্মল,
দ্যুতিময় মুক্তা।

এই রকম মুক্তা, ছোট একটি মুক্তা L'Ingenn। এক
বিশেষী ঘুরতে ঘুরতে করাসী দেশে এসে পড়েছে। প্রথম গোলমাল
বাধাশো তাকে খুঁটনোয় দীক্ষিত করা নিয়ে। সেটা কোনোক্রমে
মিটল বটে কিন্তু বিশেষী তাতেই ধামবে না। শাস্ত্রময়ত স্বীকারোক্তি
শেষ করে সে স্বামী জানালে সে বাজককেও তার কাছে স্বীকারোক্তি
করতে হবে। শাস্ত্রেই লেখা আছে, পরস্পরের মধ্যে স্বীকারোক্তি
করিবে। নাছোড়বান্দা এই বিশেষীর পাজীর বাজক বেচারির প্রশ্ন
বায় আর কি! বিশেষী শেষে প্রেমে পড়ল এক তরুণীর। কিন্তু
শাস্ত্রের নানা বাধায়, পুরোহিত, সাক্ষী, আইন ব্যবসায়ী ইত্যাদি
একাধিক বিয়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যক্তির নানা প্রয়োচনায়,
বেচারির বিয়েই কেঁসে হাবার ষোগাড়। সে তখন শাস্ত্রের বাধা না
গরিয়ে নিলে খুঁটনোয় ভাগ করার ভয় দেখাল। শেষ পর্যন্ত বিশেষীও
হ'ল। এইভাবে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে গড়ে উঠেছে ভলভেরারের
গল্প। সাধা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে হুস্ম একটি শ্রোতাব্দ মত্ত করে
গেছে খুঁটনোয় মূল মস্তের সঙ্গে তথাকথিত আচার-আড়ম্বর জর্জরিত
বাজক-প্রচারিত ধর্মের বৈষম্য। এই বৈষম্যের বিষকে, সংস্কারের
জলালকে ছুর করাই ছিল ভলভেরারের লক্ষ্য। ছোট সরল একটি
কাহিনীর মাধ্যমে সেই লক্ষ্যের পথে হ'ল তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।

Micromegas-এর কাহিনীতে ডিনু ব্রাইফটের প্রভাব আছে
ঠিকই; কিন্তু কল্পনার বিস্তারে ভলভেরার তাঁর আদর্শকে বহুদূর
অতিক্রম করেছেন। নায়ক লুডক নক্ষত্রের অধিবাসী।
৫০০,০০০ হাজার হুট লবা এই বায়ুবাট এসেছে পৃথিবীতে
নেমে। পথে সন্ধ্যা জুটল শনিগ্রহের এক বাসিন্দা। সন্ধ্যা

বোঝারি সারা বাস্তব অভিব্যক্তি করতে করতে এসেছে তার উচ্চতা মাত্র কয়েক হাজার ফিট বলে, তার মাত্র ৭২ টা ইন্ডিয় আছে আর তাদের পরমাণু মাত্র ১৫,০০০ বৎসর বলে। ১৫০০০ বৎসর পরমাণু মানে জন্মাবার পবনগেই মৃত্যু; ফলে কিছুই তারা শিখতে পারে না আর কোনো কাজেই লাগতে পারে না তাদের কণহারা অভিজ্ঞতা। অনন্ত কালসমূহে এমন ঘটনের মত ছোট, এক গ্রহের অধিবাসী হয়ে, ১৫,০০০ বৎসরের সামান্য পরমাণু পেয়ে বোঝারি দুঃখের শেষ নেই। ৫০,০০০ হাজার ফুট লম্বা সজীকে দেখে সে দুঃখ আবার উল্লে উঠেছে বেন। এমন সময় ভূমধ্য-সাগরের গুণব দিয়ে চলতে চলতে চোখে পড়ল একটা জাহাজ। নায়ক টুক করে জাহাজটা তুলে বসালে তার বুড়ো আঙ্গুলের ডগায়। ছোট্ট একটা ছায়াপোকার মত দুলতে লাগল জাহাজটা। তারপর স্তম্ভ হ'ল জাহাজের ভয়াবহ বারীদেবর সঙ্গে অল্প গ্রহের এই আগন্তুকদের কথাবার্তা। নাবিক, যাজক, দার্শনিক সকলেই কথোপকথনে অল্প গ্রহণ করেছে আর এই মধুবর্ষা সন্ধ্যাপের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়েছে ভলতেয়ারের তীক্ষ্ণ শ্বেব আর তীব্র ব্যঙ্গ।

তারপরই Zadig। Candide আরো পয়ের রচনা। শ্রেষ্ঠতার Candide এর পরই Zadig। নায়কের নামেই কাহিনীর নাম। দার্শনিক তত্ত্ব Zadig এর বর্ণনায় ভলতেয়ার বলেছেন মানুষের পক্ষে হতখানি সম্ভব Zadig ঠিক ততখানি বিজ্ঞ-- বর্ণনাপ্রস্তুে তার জ্ঞান অসাধারণ বলা যায় অর্থাৎ সে খুব সামান্য জানে অথবা কিছুই জানে না। এট Zadig পড়ল Semirar প্রেমে। ডাক্তারদের হাত থেকে সেমিরা কে বাঁচাতে গিয়ে সে বাম চক্ষুতে আঘাত পেল। ইজিপ্ট থেকে এলেন এক বিখ্যাত চিকিৎসক। দেখে শুনে বললেন চোখ আর সারবে না। চিকিৎসক সাক্ষাৎ ধ্বংসবি, অন্ধ হবার দিনক্ষণ পর্যন্ত বলে দিলেন। ধ্বংসবির কথা কিন্তু মিথ্যা হ'ল। দুদিন বাতাই যা সেবে গিয়ে চোখের দৃষ্টি ফিরে গেল Zadig। চিকিৎসক বেগে একেই যা সেবে বাওয়া যে অভায় হয়েছে তাই প্রমাণ করবার জন্যে একখানা বই লিখে কেললেন। Zadig সে বই পাঠা উল্টেও দেখলেন না।

ইতিমধ্যে Zadig এর অন্ধ হবার সম্ভাবনা শুনেই সেমিরা অন্ধ একজনকে বিয়ে ক'রে কেলছে। বিরক্ত হয়ে Zadig তখন এক গ্রাম্য চাষার ঘেরেকে বিয়ে করে বসল। বিয়ে তো হল কিন্তু স্ত্রী যে তাকে ভালবাসে তার প্রমাণ কি? এক বছর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল, সে মরার ভাগ করে পড়ে থাকবে আর সেই অবসরে বন্ধু গিয়ে জীকে জানাবে বিবাহের প্রস্তাব। পরিকল্পনা ঠিক ঠিক রূপায়িত হ'ল। ফলও যা হবার ঠিক তাই হ'ল। অর্থাৎ স্ত্রী প্রথমে বন্ধুকে দুব দুব ক'রে তাড়িয়ে দেবার ভাগ দেখিয়ে তারপর স্তম্ভভ্রষ্ট ক'রে একটু সলজ্জ হেসে প্রস্তাবে রাজী হ'লেন। এ-হেন ব্যাপারে মরা মানুষ জেগে উঠত। স্তম্ভরাজ জীবন্ত Zadig শুধু ককিন থেকে লাফিয়ে বাইরেই এল না, সোজা চ'লে গেল গভীর অরণ্যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য আর সরলতার আশ্রয়ে।

কিছুদিন পর বন থেকে বিজ্ঞ হয়ে ফিরে এল Zadig। রাজা তাকে অস্বাভাব্য আসন দিলেন। তার প্রশাসন আর তার বিচারের ফলে রাজ্যে শ্রুত-স্বত্ববির বান ডাকলো। কিন্তু এখানে

আবার দুর্ধোগ বনিয়ে এল Zadig এর জীবনে। দ্বাগী ভালোবেসে কেললেন তাকে। ফলে রাজা প্রথম বিব্রত হলেন, তারপর তাকে এবং রাণীকে বিব খাইয়ে মারবার এক মড়ক কাদলেন। রাণী জানতে পেয়ে পালাবার পরামর্শ দিলেন তাঁর প্রিয়তমকে। প্রেদের চেয়ে প্রাণ বড় প্রমাণ ক'রে Zadig আবার আশ্রয় নিলে অরণ্যের নির্জন অন্ধকারে।

বনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল Zadig। তার এই সময়কার জীবনবর্ণন বর্ণনা করেছেন ভলতেয়ার। পৃথিবীটা তার মনে হ'ল একটুকরো মাটির ঢেলার মত আর মানুষগুলো বেন একদল শোকার মত। সেই ঢেলা ব্যোপে পরস্পরের সঙ্গে মাঝামাঝি কামড়াকামড়ি করছে। প্রত্যেকেই চোটা কড়াচ্ছে অস্ত্রকে গ্রাস করবার। জীবন ও জগতের এই রূপ দেখার পর, নিজের দুঃখ নিয়ে মাথা বামাবার আর বিন্দুমাত্র স্পৃহা হইল না। কি-ই বা তার মত একটা কীটাত্মকীর আশ্রয় আর কতটুকুই বা এই পৃথিবী। ভাবতে ভাবতে অনন্তে লীন হ'ল তার অন্তর, গভীর ধ্যানাবস্থায় তার প্রত্যক্ষ হ'ল এই বিরাট বিশ্বের নুশুখল সৃষ্টিরহস্য। কিন্তু ধ্যান ভাঙ্গার পর-...-কঠাৎ মনে হ'ল তার অন্তে কেঁদে কেঁদে রাণী না প্রাণত্যাগ করেন! অমনি বিরাট বিশ্ব মিলিয়ে গেল। মাটির পৃথিবীতে এসে কাঁড়াল সামান্য এক মানুষ।

আবার বন ছেড়ে লোকালয়ের পথ ধরল সে। পথে দেখে এক নারীর গুপার অভ্যাচার করছে একজন পুরুষ। এগিয়ে গিয়ে সে অভ্যাচারীকে আঘাত করল। আঘাতের প্রচণ্ডতার প্রাণ হারালো পুরুষটি। বীরের মত বুক ফুলিয়ে সে চাইল নারীর পানে। প্রত্যুত্তরে কিন্তু নারী ক্রোধে অগ্নে উঠে তাকে অজস্র অভিশাপ দিলে। তার অপরাধ, আঘাত দিয়ে সে বাকে হত্যা করেছে সেই পুরুষটিই ছিল নারীর মনের মানুষ। নারীচরিত্রের বিচিত্র রহস্যে বিম্বিত হ'য়ে আবার পথ ধরল সে।

পথে বন্দী হ'ল Zadig। বাধ্য হ'য়ে ক্রীতদাসের কাজ নিতে হ'ল তাকে। প্রত্যুৎকে একদিন সামনে পেয়ে কিছু তথ্যকথা শুনিতে দিল, প্রভু খুসী হ'য়ে তাকে নিজের উপদেষ্টা ক'রে নিলেন। এই সময় স্থানীয় এক রাজা একজন সং মন্ত্রী খুঁজছিলেন। Zadig-এর গুণব তার পড়ল একজন সং উপযুক্ত লোক বাছাই ক'রে দেবার। বাছাই করার জন্যে একটা মজার পরীক্ষার ব্যবস্থা করল সে। নাচঘরে বাঘার পথে টেবিলে নানা হীরা-অহরৎ সাজিয়ে রাখা হ'ল। প্রত্যেক প্রার্থীকে একা সেই পথ দিয়ে বাঘার সুরোগ দেওয়া হ'ল। একে একে প্রত্যেক প্রার্থী নাচঘরে জমায়েত হবার পর ঘোষণা করা হ'ল—সবচেয়ে বখশ্ম বায় নাচ হবে, তাকেই দেওয়া হবে মন্ত্রীর পদ। দর্শক রাজা স্বয়ং এবং তার পাশে Zadig। সেই নাচের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভলতেয়ার লিখেছেন, প্রত্যেকটি ব্যক্তি নাচল সম্পূর্ণ অনিচ্ছার সঙ্গে, আশ্চর্য রকম জড়সড় হয়ে। কাকর মাথা বুলে পড়েছে, কাকর পিঠ কুঁজো, কেউ হাত দিয়ে পাশের পকেট সাফল্যে ব্যস্ত।

এই ভাবে একটির পর একটি হাতশীপ্ত কিন্তু ব্যঙ্গ-রিক্সের হোঁয়ার মাঝে মাঝে তিক্ত বটনা সাজিয়ে এগিয়ে গেছে ভলতেয়ারের পদ। কল্পনা করা যায় যে ভলতেয়ারের বুকে এই গল্প শুনাতে ভলতে হেসে লুট্টে পড়েছিল প্রোতার দল। প্রচুর চিনি মাখিয়ে ছোট

হোট হুইনাইসেন্স বড় পরিবেশন করেছিলেন ডলভেরার। সেদিন সেই সামান্য তিক্ততার স্বাদও কি পেরেছিল উন্নীত জ্ঞাতার দল ?

ফ্রেডরিক ও ডলভেরার

দেশে বিদেশে তখন অসংখ্য ডক্ত ডলভেরারের। সকলের Cireyতে এসে লেখকের সমালোচকের স্তবোৎসাহ বা ভবিষ্যৎ ছিল না ? তারা আসতে পারত না তারা চিঠি লিখত। ১৭৩৬ সালে যুবরাজ ফ্রেডরিক প্রথম চিঠি লেখেন ডলভেরারকে। চিঠির ছাত্র ছাত্র ছাত্রো ছিল তরুণ একটি অন্তরের স্বাধীনতা ও বিশ্বাস। ডলভেরার তখনো তাঁর অবিশ্বাস্য একখানি বইও লেখেননি। তবুও ফ্রেডরিক ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে তাঁকে সম্বোধন করে বোঝাতে চাইল যে স্বদেশের সীমাবদ্ধা অতিক্রম করে তখনই ছড়িয়ে পড়েছে এই ক্যাসী লেখকের প্রতিভার দীপ্তি। ফ্রেডরিকের চিঠির মধ্যে একটি মাত্রিত প্রগতিশীল মনের পরিচয় পেয়ে খুশী হয়েছিলেন ডলভেরার। মানুষের জীবনে দারিদ্র্যের, সংস্কারের অন্ধকার দূর হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক নতুন স্বচ্ছল, সবার জীবনের আলো—এই ছিল ডলভেরারের স্বপ্ন। ফ্রেডরিক সিংহাসনে বসলে এই স্বপ্ন রূপায়িত হবার সম্ভাবনার আনন্দে নেচে উঠেছিল তাঁর অন্তর। ফ্রেডরিকের কাছ থেকে এক খণ্ড Anti-Machiavel উপহার পেলেন ডলভেরার। বই পড়তে পড়তে তরুণ যুবরাজের যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা, শাস্তির কামনা দেখে বার বার চোখ জলে ভরে গেল এই প্রৌঢ় মানবচিহ্নবীর। কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না। কয়েক মাস পরে সিংহাসনে বসে এই ফ্রেডরিকই যুদ্ধ ঘোষণা করল সাইলেশিয়ায় বিজ্ঞে। ইউরোপে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের আগুন আবার উঠল জ্বলে।

১৭১৫ সালে বান্ধবীকে নিয়ে ডলভেরার ফিরে গেলেন প্যারিসে, ইচ্ছা, ক্যাসী আকাদেমীর সভাপদের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা দিতা। বান্ধবীর প্রেরণা ছিল এই ইচ্ছার আড়ালে। একটা কিছু নিয়ে যেতে ওঠা ডলভেরারের স্বভাব। আর মাতালে জ্ঞান থাকতো না স্তম্ভ-অস্তায় সশঙ্কে। এবারও এর ব্যতিক্রম হ'ল না। অনেক ভেবেচিন্তে এক ধর্মরাজের জমিদার অবতীর্ণ হ'লেন ডলভেরার, ছ'চারজন নামজাদা বাজকের অস্ত্র প্রশংসা শুরু করলেন এবং প্রাণথলে মিথ্যে কথা বললেন ও লিখলেন। অর্থাৎ নির্বাচন-যুদ্ধ বা করা উচিত তাই করলেন ডলভেরার। কিন্তু তবুও প্রথম বছর তার হ'ল। পরের বছর অবস্থা নির্বাচিত হ'লেন এবং স্বপ্ননা সভায় যে ভাষণ দিলেন তা আজও ক্যাসী সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে।

স্বপ্নের ধাতা যেন কোন এক বাণুচরে হারিয়ে গিয়েছিল। বান্ধবীও লক্ষ্য করেছিলেন এই পরিবর্তন। নতুন পরিবেশ, নবীন প্রেরণার আশায় ডলভেরারকে নিয়ে গিয়েছিলেন প্যারিসে। বার্ষ হ'ল না তাঁর সেই আশা। প্যারিসে সেই হারানো ধারা আবার খুঁজে পেল পথ। একটার পর একটা নাটক বার হ'রে এল ডলভেরারের কলম থেকে। জীবনভোর অসংখ্য নাটক লিখেছেন ডলভেরার—আঠারো বছরে শুরু করে তিরিশ বছরে শেষ হয়েছে এই বসবাস। সব নাটকই সফল হয়েছে এমন নয়। ১৭০০ সালে Brutus আর ১৭০২ সালে Eriphyle নিরাশ করলো সকলকে। কতরা নাটক লেখা বন্ধ

করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কাকার পরামর্শ শোনবার লোক নয় ডলভেরার। সেই বছরেই তাঁর সবচেয়ে সফল নাটক Zaire লিখে তাক লাগিয়ে দিলেন সকলকে। এর পর ১৭৪১ সালে বার হ'ল Mahomet, ১৭৪৩ সালে Merope, ১৭৪৮ সালে Semiramis এবং ১৭৬০ সালে Tanoride। ক্যাসী নাট্যসাহিত্যের ডালি ট্রাজেডি আর কমেডি দিয়ে পূর্ণ করে দিলেন ডলভেরার।

এবারে জীবনেও তাঁর ঘনিরে এল ট্রাজেডি এবং কমেডি। দীর্ঘ পনেরো বছর পর বান্ধবীকে আর ভাল লাগছিল না ডলভেরারের। ক্রমশঃ দু'জনের মাঝে সামাজিকতম কলহও বন্ধ হ'রে গেল। এর ফল ফলতেও দেবী হ'ল না। ১৭৪৮ সালে মাদাম তরুণ এক মাকু'ইসের প্রেমে পড়লেন। খবরটা কানে যেতেই দু'জর ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন বরুন্স সিংহ। কিন্তু ওই পর্বন্তই। বয়সের দোষগুলোই বা যাবে কোথায়। মাকু'ইস এসে কমা চাইবেই স্নেহে গ'লে গেলেন তিনি। উদাস চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখলেন স্ত্রীর দিগন্তে। বেলাশেষের রান আলোর রেশ তখনো জড়িয়ে আছে মেঘের পায়ে গায়ে। তাঁরও অন্তঃস্রাবের সময় হ'রে এল অনেক আলো ছড়িয়েছে তাঁর ভাবের প্রতিভা; এবার নবাকর্ণের প্রতীকই শ্রেষ্ঠ পথ। চ'লে গেল মাকু'ইস। কাগজ টেনে নিয়ে লিখলেন ডলভেরার, এই নারীর স্বরূপ বটে! আমি একজনকে সরিয়ে বান্ধবীর অন্তরের সিংহাসন দখল করেছিলাম। আজ মাকু'ইস আমাকে সরিয়ে অধিকার করেছে সেই সিংহাসন। প্রকৃতির এই নিয়ম—প্রত্যেককেই অন্তের ভাঙ্গা স্থান দেবে দিয়ে যেতে হয়। এই নিয়মেই চলছে আমাদের পৃথিবী। ভাবের আভিলম্ব্য অথবা নিজ পুরুষ ব'লেই শুধু নারীকে উদেগ ব'রেই বাঁচত হল এই দার্শনিক হা-হুতাশ।

১৭৪১ সালে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মৃত্যু হল বান্ধবীর। স্বামী এবং মাকু'ইস দু'জনের সঙ্গই মৃতদেহের পাশে দেখা হ'ল ডলভেরারের। এক ঈশ্বর ছাড়া কেউই জানলো না সব চেয়ে বেশি ক্ষতি কার হ'ল, কে হারালো সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ।

বান্ধবীর মৃত্যুতে সব কেমন শূন্য মনে হ'ল ডলভেরারের। Siecle de Louis xiv রচনার মন দিলেন। কিন্তু কিছুতেই বাধ না মনের ভার। এমন সময় Potsdam থেকে এল ফ্রেডরিকের আমন্ত্রণ, সঙ্গে বাহ্যবর ৩০০০ ফ্রাঁ। ১৭৫০ সালে বার্লিনের পথে যাত্রা করলেন ডলভেরার।

বার্লিনে হাবার অনেক আগে চিঠি লিখেছিলেন ডলভেরার আমি চাই তিন বা চারজন প্রতিভাবান পণ্ডিতের সঙ্গে থাকতে। আমাদের মধ্যে ঈর্ষা লেশমাত্র থাকবে না, শুধু থাকবে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। একান্তে আমরা ক'জন থাকবো, নিজের নিজের বিষয় চর্চা করবো, পরস্পরের মধ্যে আলোচনা চালাবো আরো উন্নত কিছু স্বপ্নের আশায়। করে যে আমার জীবনে এই ছোট স্বপ্ন জীবনের আবর্তিত হবে। বার্লিনে বাস্তবে রূপায়িত হল ডলভেরারের স্বপ্ন। স্বপ্নীয় জীবনের আশ্রয় পেলেন তিনি।

বার্লিনে রাজকীয় ক'কজরকের গভী এডিয়ে চললেন ডলভেরার। ফ্রেডরিকের সঙ্গে তিনি মিলিত হলেন রাজ্যের ভৌতিক টেবিলে। কবি ও দার্শনিক হবার বাসনায় তখন উৎফুল্ল

ফ্রেডরিকের মন। তাই এই ভোক্তাসভার ডাক্তারেন ভলন্তেরার এক সামান্য ক'জন বাহা বাহা সাহিত্যিককে। ভোক্তার শেষে গীর্জার বয়ে চলতো আলোচনার শ্রোত। কি স্বচ্ছ নির্মল সেই শ্রোত। কি তীব্র তার গতিবর্ণ। আলোচনা চলতো ফরাসী ভাষায়। কারণ ভলন্তেরার অনেক চেষ্টা কবেও জার্মান ভাষা আত্মক করতে পারেননি। এই আলোচনা কেউ লিখে রাখার স্বার্থে গার্মিন, এ বিশ্ব সাহিত্যের হুঁতরাণ। লিখে রাখলে একাধিক বিষয়ে সমৃদ্ধ হয় বিশ্বসাহিত্য। এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে ভলন্তেরার লিখিতেন ফ্রেডরিক এক চাতকে আঘাত আর অল্প হাত দিয়ে আরও করে—চামি অবগত কিছুতেই বিরক্ত হটনা পকাশ বন্ধ তরঙ্গসকল সমুদ্র ভাঙত চাঙ্গিয়ে, আমি এবার খুঁজে পেয়েছি নিরাপদ বন্দর। এখানে সব! এন্টিকিভ তাই কাছ আমায় মিলেছে এক রাজার যোগসভা। দাঁশনিকের আলোচনা-আলোচনা, আর অল্পসী বন্ধুর শাহসভা...।

কবি ও দার্শনিক ভলন্তেরারের এত সুখ বৃষ্টি সটীলো মা, হিসেবী, বাস্তববাদী ভলন্তেরারের। হঠাৎ সেই বছরের মতেখর মাস ভলন্তেরার স্যাক্সন বাণ্ড টাঙ্কা খাটাবার এক পবিত্রনা হুঁকে ফেললেন। এই ধবধবে টাঙ্কা বাটানায় ফ্রেডরিকের যে কড়া নিষেধাজ্ঞা আছে তা তাঁর মনেই বইলো মা। কালক্রমে যন্ত্রের দাম চড়লো, বেশ ক'পরমা লাভ হ'ল ভলন্তেরারের। কিন্তু বিপদ বাধালো তাঁর পথায়। কথটা পৌঁছে গেল ফ্রেডরিকের কানে। রাগে কেটে পড়ে জানিয়ে গিলেন ফ্রেডরিক আর হয়তো এক বছর আমায় প্রয়োজন হবে ভলন্তেরারকে। লেবুর রসটুকু পান ক'রে, জিন্ডেনি ফেল দেওয়াই উচিত। রাজসভারের স্যাক্সন বখানিরমে পৌঁছে গেল ভলন্তেরারের কানে। রাতের ভোজ্য তাবপার ঠিকই চললো কিন্তু ছিবড়ের ভুত ঘাড় চেপে মুখ বন্ধ হ'বে গেল ভলন্তেরারের। এই সময় লিখলেন ভলন্তেরার রাতে ঘুমিয়েও ছিবড়ের স্বপ্ন দেখি...পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়তে পড়তে বাতাসের নবম ছোঁয়ার হুড়ু তরে যে ব্যক্তি বলেছিলেন সত্যিই আবারও, অবশ্য যদি এই পতন অনন্তকাল স্থায়ী হয়—তার ভুল্য মহাপুরুষ আমি নই।

ইতিমধ্যে দেশের মাটিতে ফিরে যাবার জন্য মাসে মাসে ব্যাকুল হচ্ছিলেন ভলন্তেরার। দেশ ছেড়ে বেশি দিন থাকতে পারেন না ফ্রান্সের লোক, ভলন্তেরারও পারছিলেন না। মনে মনে তাই তিনি ফ্রেডরিকের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। চায়ের পেয়ালার তুফানের মতো সামান্য এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিচ্ছেদ ঘনিয়ে এলো। নানা দেশ থেকে পণ্ডিত-মনোবী এনে নবরত্ন সভা সাজিয়েছিলেন ফ্রেডরিক; উদ্দেশ্য ছিল জার্মান জনগণকে নব-জাগরণের আভাস দেওয়া। ফরাসী দেশ থেকে এসেছিলেন প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ Manpertuis। এই গণিতজ্ঞকে কেন্দ্র করেই ভলন্তেরার আর ফ্রেডরিকের মধ্যে সুর হ'ল বন্ধ। জার্মানীর একজন প্রায় অখ্যাত গণিতজ্ঞ Koenig এর সঙ্গে Manpertuis এর চলছিল তর্ক, বিষয় ছিল নিউটনের একটা সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা। ফ্রেডরিক নিয়েছিলেন Manpertuis এর পক্ষ। অদম্য ভলন্তেরার হিতাহিত বিবেচনা না করে গিলেন Koenig এর পক্ষ। এই সময় এক বাস্তবী শ্রীমতী জেনিদের কাছে চিঠিতে লিখলেন, অত্যন্ত হুঁতরাণে বিষয় হচ্ছে

যে আমি একজন লেখক এবং আমাকে রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়তে হয়েছে। আমার হাতে রাজস্ব নেই, আছে শুধু একটি কলম। ফ্রেডরিকও ঠিক একই সময় তাঁর বোনের কাছে চিঠি লিখলেন ভলন্তেরারকে অল্প গালাগাল দিয়ে। কিন্তু শুধু চিঠি লিখে থেমে থাকবার মানুষ ভলন্তেরার নন। Manpertuis কে লক্ষ্য করে লিখলেন তাঁর Diatribe of Dr. Akakin বিখ্যাত গণিতজ্ঞের বিরুদ্ধে ছাড়লেন মর্মভেদী বিক্রম-বাণ। লেখা ফ্রেডরিককেও পড়ে শোনানো হ'ল। সারারাত হাসলেন ফ্রেডরিক এবং সকালে উঠে ভলন্তেরারকে লেখাটা প্রকাশ না করার জন্য জানালেন অজুযোজ্য। ভলন্তেরার কিছু না বলে চূপ করে বইলেন। তাছাড়া গভীরতরও ছিল না কারণ অতীতকে তখন ছাপার কাজ শুরু হ'বে পেছে। বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজসভারের আঁচ পেলেন ভলন্তেরার। অপেক্ষা না করেই পলায়িত নীতি অনুসরণ করলেন।

ফ্যাক্সফোর্টে বরা পড়লেন ভলন্তেরার। ফ্রেডরিকের রাজ্য-সীমার বাইরে হ'লেও বেশ কিছুদিন আটকে থাকতে হল দেখানে। রাজস্বহীনরা ভীকে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে আসেন। এসেছিল ফ্রেডরিকের লেখা কবিতা Palladium-এর পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করতে। ভ্রমসমাজের কল্লো লেখা নয় এমন এক কল্পিত কবিতার পাণ্ডুলিপি ভলন্তেরারের সঙ্গে চলে যাওয়ায় বিপদ বৃদ্ধি হলেন রাজ্য ফ্রেডরিক। ভলন্তেরারও পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দিয়ে অসম্মত বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন।

দীর্ঘপথ বেয়ে ফরাসীদেশের সীমান্তে এসে দাঁড়ালেন ভলন্তেরার। স্বদেশের মাটিতে পা দেন এমন এবার, হঠাৎ বিনামেয়ে বজ্রাঘাত হ'ল। অভ্যর্থনার বদলে এল অচিরে স্বদেশ থেকে নির্বাসনের আদেশ। উদ্ভ্রান্ত ভলন্তেরার প্রথমটা কি করবেন ভেবে গেলেন না। একবার ভাবলেন সোভা চলে যাবেন আমেরিকায়। তারপর ক্রমশঃ শান্ত হ'য়ে জেনিভার প্রান্তে একটি কুটির কিনে চলে আসলেন শান্তির নীড়। অন্ত্যালে যাবার আগে আর একবার রাতিয়ে দিয়ে গেলেন মানুষের মনের আকাশ। সুর হল তাঁর শ্রেষ্ঠতম এবং মহত্তম সৃষ্টির বৃণ।

[ক্রমশঃ।

ডাঃ বসুর
মেমোরি কার্ডিয়েল
নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে
প্রথম প্রস্তুতকারক:
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯

নাতিশর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

—মিতা দিদি, একটু কাছে সরে এসো ভাই। কীণ স্বরে ডাকলেন রাজাবাহাদুর। তাঁর কন্ঠাস্বর হাতখানি কৈশে কৈশে উঠছিলো বাহুবন্ধনে প্রব্রজনতে পাবার জন্য। হুঁ চোখে ঝপেছে তাঁর নির্দোষমুখ প্রলীপের অস্বাভাবিক দীপ্তিশিখা।

—নাহু! এই যে আমি আপনার পাশেই বসে আছি। কারাভরা গলায় বললো সুমিতা। কিছু বললেন আমার?

ওর নিকটে কিংবা সতৃষ্ণুই মেলে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বাও—না, আর কিছু নয়। কাজ আমার শেষ হয়েছে দিদি। তার পর একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে খেঁষে খেঁষে বলতে লাগলেন—সব কথা আমি শুনেছি দিদি ডাঃ স্ত্রীর কাছে। তোমাকে বাবার আগে একবার দেখবার জন্যে প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়েছিলো, আর এই সম্প্রতিগুলো কার হাতে দিয়ে বাবো, কে দেবে, সে তার? বড় ভাবনা ছি—লো। শুধু কেরোহিলার রক্তকে আর অমিকতক—ঐ! গলাটা বড় শুকিয়ে উঠেছে—নাও ততো, দিদি একটু... একটু ঠাণ্ডা জল... না, মা, আর কিছু নয়, সিঁটাই, তুমি নয় ব্রজ একাকীউজ মি—

সুমিতা কাঁড় কাপে একটু ঠাণ্ডা জল কল্‌পিত হাতে একটু একটু করে ঢেলে দিলো রাজা বাও-এর মুখে। হুঁ চোখ ছাপিয়ে ওর সেমেছে অক্ষরব্রতা।

—আপনি আর কথা বলবেন না। রাজাবাহাদুর, একটু বিলম্ব নিব এবার। অহরোধ করলেন ডাঃ স্ত্রী।

—না, না। অস্থির ভাবে মাথা নাড়লেন তিনি—বলতে দাও, বলতে দাও। হ্যাঁ, জানো দিদিভাই, ঐ দুটো সংলোককে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষোচ্ছলার তার ডগল। তোমাকে আর ঐ দেবতার মতো—ঐ একরাস আলোর মতো ছেলে—সুদামকে আজ যে ভগবান... আমার হৃদয়খবার পাশে এনে দেবেন, ভাবতে পারিনি ভাই। তোমরা আমাকে মহা হু-ক-তি দিয়েছো। আমার এই অভিশপ্ত সম্পদ হৃদয়ের সেবার খরচ করে দিও। আজ ব্রজাম দিদি, ঈশ্বর বা করেন, সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য। পশুপাখিদি, যদি না যেতো, এ সম্প্রতি জনকল্যায়ের জন্য উৎসর্গ করতে আমি পারতাম না। উঃ, বড় ভেটো! আ—বে—ক—টু জ—ল। হ্যাঁ করলেন তিনি। সুমিতা কাঁড় কাপ নিতেই ইসারায হুদামকে বললেন রাজা বাও—তার মুখে জল দিতে।

রাজা বাওকে এবারে জল পান করলো সুদাম।

—আঃ! সংসদ যে এত মধুর, এত শান্তিদায়ক তা এর আগে এরর করে বুঝিনি ভাই। তোমাদের হাতে, মানে, ঐ এককাকিউটিত যোড়েই হাঁতে বসলো আমার সব কিছু। হাসপাতাল, সেবাসদন, বা হুঁ কোথো ভাই।

—আপনি যে তার দিলেন আমাদের ওপর রাজাবাহাদুর,

আমাদের সমস্ত শক্তি, ও ইচ্ছা বাবা আপনার আদেশ আমরা পালন করবো, আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন—বললো হুদাম। অবনত হয়ে হুঁ হাত বাড় করে।

—আশীর্বাদ? হ্যাঁ, প্রাণভরে আমার সকল শুভটীকা, সব আশীর্বাদ, আমি নিজেই উজাড় করে তোমাদের নিলাম ভাই। অস্থি-চতুসার কাগজের মত শালা বংএর হাতখানি তাঁর কৈশে কৈশে পুড়ে উঠে ধপ্প করে পড়ে গেলো বিছানার ওপর। অস্বাভাবিক অলম্বলে চোখ দুটি তাঁর হঠাৎ জলে ভরে এলো।

—জানো, মিতা দিদি! জানো ভাই? কীণ স্বরে ডাকলেন তিনি।

—নাহু, এই যে আমি, আপনার পাশেই—বলুন, কি বলবেন?

—বলছি ভাই। একটা কথা নিশ্বাস ফেলে বললেন তিনি—তোমার পিতামহ ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলো আমার সকল ব্যাপারেই কম্পিটিশন। মানে, তার সঙ্গেই পালা দিয়ে সুখ পেতাম। ঘোড়া, গাড়ি, বাইজী, আর—সুন্দরী নারী, পোষাক, আশাক, সব কিছুতেই সে আমার কাছে হারবে না, আমিও তাকে হারাতেই, এই নিয়ে, আমরা হুঁশক বহু টাকা, উড়িয়েছি। তার মাথার ওপর, গায়েই ছিলেন, আর আমি হিলাম বাখানি। সেক্ষেত্রে, আমরাই জিত হতো বৈশ্বর ভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু সব কেন্দ্রেচার দেখে, আজ হিসেব মেলাবার সময় দেখি, আমি শেচনীয ভাবে পরাজিত হয়েছি তার কাছে। সেমনাথের মত সাধু পুত্র, সুমিতার মত পৌত্রী তার বংশ উজ্জ্বল করে আছে। আর আমার? একমাত্র ছেলে, ক্যান্সারে মরছে। তার তিলে তিলে হৃদয়ধ্বংস দেখছি আমি। তারই মেয়েকে বৃকে করে মানুষ করলাম, ভর মা কি করেছিলো জানো? স্বামীর ক্যান্সারে দেখে, ছোঁচাচ লাগবার ভয়ে পালিয়েছিলো আমারই ভাগ্যের সঙ্গে। তারপর এককাল পরে, তাইই মেয়ে আবার পালালো। আমার বুকটা ভেঙে গুড়ো করে দিয়ে, সেও পালালো? হ্যাঁ! ওরা পালাবেই They are birds of passage।

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নীরব হলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বাও। হুঁচোখের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য যেন বীরে বীরে স্তিমিত হয়ে এলো। চোখের দুটি কোণ বেয়ে নেমে এলো কীণ দুটি জলধারা।

—হ্যাঁ, মা! মহা-অবধার এ একটি সূত্র বীজ হাজি। এর যে প্রয়োজন ছিলো তোমার কাছে আসবার। বলছিলেন গোপীদাস মহারাজ, আলোককে কোলে নিয়ে।

—কি বলছেন? বুঝতে যে পারছি না। আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন? ব্যাকুল স্বরে শুভালো সুমিতা।

—সময় হলই বুঝতে আপনাই পারবে মা। বহুগভীর স্বরে বললেন সন্ন্যাসী—তোমার অন্তরে রয়েছে যে অনন্ত সুখা, একদিন এই সূত্র খট ছানিয়ে তা ছড়িয়ে পড়বে অনন্তবহি উদ্ভাস, লুপ্ত সহস্র ভাষিত আত্মা শান্তি পাবে তাতে। সেই বিরাট উৎস এ সূত্র খটে বহু থাকবে না মা।

চমকে উঠলো সুমিতা। সমস্ত অঙ্গে তার বেন কীটা দিয়ে উঠলো। বুকটা কৈশে উঠলো থর থর করে। ব্যাকুল বাহু এসারিক



একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায় তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শরর সী তার পরিবার করা ধবধবে সাদা সাটটা দেখে দাঃখ থুসী। আর শুধু কি একটা সাট দেখুন না জামাকাপড়, বিছারাত, চাদর আর তোরালের সুপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্যকরী ও অকুরন্ত ফেনা কাপড়কে পরিপাটি করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারে না। আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন বা কেন...আজই!



সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জল করে

আনন্দ উহলে পড়া বন্ধ থেকে শেষে কোত রয়ে পড়লো
বিদ্যায়।

জাতীয় রক্ত, অনিচ্ছা, ও অত্যন্ত বক্তারা, সকলেই সংক্ষেপে কিছু কিছু বললেন। সবার শেষে প্রধান সভাপতির উদ্দেশে প্রজ্ঞা নিবেদন করে বিনীত কণ্ঠে জানালো, স্বর্গীয় রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ষাট-এর বিরাট দানের কথা। এবং তাঁর মহান পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দেবার জন্যে চাইলো সকলকার সহায়তা ও শুভেচ্ছা।

ও কাল—এখন স্থগিত থাকবে প্রদান, গভীর স্বরে বললেন ওরফে। এখনও সময় হয়নি, সামান্য বিলম্ব আছে ওর। তবে মহেন্দ্রপ্রতাপের আত্মা পায় শান্তি লাভ করেছে, তোমাদের মত কণ্ঠবাহীদের হাতে তাঁর অভিলেখ বনভাঙাটির জায় অর্পণ করে। তাঁর শেষ ইচ্ছা ও সংবাসনা অবশ্যই সিদ্ধ হবে।

এবারে স্মৃতিভার শির্ষে হাত বুজিয়ে বললেন ওরফে—তুমি খুব ভালো ভজন গাইতে পারো ভনেছি। দেখি একটা পোনোও তো যা।

—অনেক দিন যে গান গাইনি, ওরফে। হুঁ নিচু কয়লো স্মৃতি।

—নামকীর্ণ করার ভজ্ঞে অজ্ঞাসের প্রারোজন নেই জননি। শিত হাতের সঙ্গে ভবায় দিলেন ওরফে।

—আমার একটি ছোট বক্তব্য আছে। গানের আগে সেটুকু আমার বলতে দিন ওরফে। উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভাবে বললো অনিচ্ছ।

—বেশ, বলে যাও। আগ্রহ করলেন ওরফে।

বললো অনিচ্ছ—বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ বালুচরের নাম আপনায়ী অনেকেই জানেন?

জুটোখে বক্তার দিকে চাইলো স্মৃতি। ওর দিকে চেয়ে হুঁ হেসে বললো অনিচ্ছ—সেই কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা, ‘ইছামতী’ তাঁর বইয়ের লভ্যায় গ্রহণ করেন নি। বইখানির পঞ্চম সংস্করণ এখন চলছে এবং তার মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা আমার কাছে জমা আছে। ‘ইছামতী’ আমাকে আদেশ করেছিলেন, টাকাটা কোনো সংকাজে ব্যয় করতে—সেইজন্য আজ আপনাদের অনুমতি পেলে টাকাটা আমি ‘কমলাসংবাসন’কে উৎসর্গ করতে চাই।

আবার তুলল করতালি দ্বারা প্রস্তাবটি পূরীত হল। সঙ্গে সঙ্গে হুঁ গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেলো।

—‘ইছামতী’টি কে? ওর আসল নাম কি? মিটি মিটি হাসি ঠোঁটের ভাঁজে চেপে অনিচ্ছ এসে বললো স্মৃতির পাশে। ওর ধরধর করে কীপা একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো,—একা গাইতে পারছো না বৃকি? বেশ তো আমি আর কবি আছি তো। কি গাইবে বলো, জানা থাকলে বোগ দেবো।

ওরা তিন জনে মিলে গাইলো—

ওহে ভজনবল্লভ, ওহে সাধন তুলভ,

আমি কিছুই নাহিকে। কব,

দীর্ঘ স্বরে আঁকিয়া লইব

প্রেমস্বরিত তব।

অনুর্ভাব আর সুরের ধ্বনিতে পদ পদ করতে লাগলো প্রস্তুত কক্ষটি। ভগবৎপ্রেমিকের আত্মনিবেদনের ব্যাকুল আকৃতি, সুর-বৃন্দার হায়ে কেঁদে কেঁদে কিবছিলো।

দ্বাদশ হয়ে বসেছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁর হৃদিত সের থেকে ধরে পড়ছে প্রেমাপ্রকাশ।

সোমনাথের ছিব দুটি নিম্নে ছিলো তাঁর ভ্রমণী কমলায় ছবিখানির ওপর। তাঁর চিত্রখিনি মায়ের মুখখানি যেন আজ শান্ত জোভিতে ফলফল করছে। ছবিব তলার পাথরের কলকে খোঁদাই করা হয়েছে তাঁর জন্ম, ও মৃত্যু-তারিখ, ও তার তলার রয়েছে কমলা সেবাসঙ্গের প্রতিষ্ঠার দিনটি লেখা, উনিশ শো পঞ্চাশ সাল, বিশ বৈশাখ।

মায়ের কোল থেকে আলোককুমারকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে স্তন্য গিরে বসেছিলো স্মৃতিভার পাশ।

আজ খোঁদনবাহুক মনোব মত করে সাজিয়েছে স্মৃতিভা। ভ্রম-শালা কিংখাপ স্যাটিনের ব্রুক-এব সঙ্গে মনিয়ের পরিবেশে নিজের চোটিফলায় গরম। বপধন লালা ছুটি নদ্য হাতে ঘোটা ঘোটা হীরেব বালা ফলফল করছে। গলার দামী ব্রুকায় শেলি, আর কপালের ওপর সোনারী তুলগুলো জড়ো করে, তাতে বৈবে দিয়েছে একটি ছোট্ট হীরেব তাগ।

বিত্তের হয়ে ওর দিকে চেয়ে আজ স্তন্য। আর ওর দিকে চেয়ে মাকে মাঝে ভাসছে আলোক, স্নেহে হাতখানি নেড়ে, অনুর্ভাবার কত কি বলে যাচ্ছে।

হাতখড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালো অনিচ্ছ। নিচু গলার বললো স্তন্যমকে,—সাতটা বাজলো, এবারে আমি চল স্তন্য। হাত দশটার ট্রেন যদিও, তবুও গোছগাছ এখনও কিছু বাকি আছে।

আসতে পারবো না বলেও আজ আসতে চলেছে ওকে, কাবণ অসীম ভিত্তে পত্তব মত আক্রমণ করতে এসেছিলো স্মৃতিভাককে। যখন সে চিত্তাকর করে বলছিলো—কখনই নয়। লালা, স্তন্যমটায় কুণ্ডলি আর সত্যি সত্যি রানজত তেখেতে বাবার জন্তে প্রাণটি যে একবারে খাবি লাঞ্ছ দেখতি। হবে না,—তা হবে না। আমাকে অবতলা করে পা বাড়িয়েছো কি—গর্জনের বাশটা হঠাৎ টেনে ধরলো অসীম। হু দরজার হুহাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনিচ্ছ।

—কি, খন করবে না কি? বলে যাও, থামলে কেন? জুটোখে আগুন জ্বালিয়ে বললো অনিচ্ছ।

—খন? ভোঃ। গোলাগুলি আমাদের মুখেই চলে, তার জন্তে দরকার পড়ে না কামান-বন্দুক। ও সব পেশা তোমাদের জন্তে।

পায়চারী করতে করতে বাড় বৈকিয়ে তুল নাচিয়ে জবাব দিলো অসীম।

—You are right, মিষ্টার হালদায়। তবে এটা ঠিক যে, বীরপুরুষের হাতের বন্দুক কামানের গোলাগুলির চেয়ে, ঐ কাপুরুষের দাঁতের গুলি, আরো মারাত্মক আরো বিধাত। বীরপুরুষের গুলিতে মাহুত একবার মরে, কিন্তু কাপুরুষের গুলিতে আছে, নিত্যকার মরণঞ্জনা।

—তাই নাকি? হা! হা! হা! হা! প্রচণ্ড হাসিকে কেটে পড়লো অসীম।

—যিক! কুট একটু চাঁ করে তৈরী করে দে। ট্রেন তো আমার সেই বাত মনটার, হাট কতবার ঘুরে আসি তোর খোকনকে কোলে নিয়ে। জীবনবর একটু তোস সজালা অনিল—পুণ্যস্থানে বাতরা নেইবা কপালে আছে বহন, তখন ঠিকার কে?

তোম্ব কোতুঙ্গ জাগিয়ে ঠাণ্ডা গলার কুংখালো অদয়, কোথায় থাকে, হাত কখনো?

—এই পোশাক-পোশাক নিয়ে একটু খেলা করবে। মানে দিকাবে, জব্বতীবা পাভাড়ে, সঙ্গলবলে। সেই গিয়েছিলাম যতর আটক আগে, তালার যেন তেমন ছিলে পাভেছিলাম, তাই আমার যেহাজের ধারটাকে একটু শাণিয়ে নেবার বাসনা আর কি।

—গা! গা! তালার হাসে এসব জালা। তা মা ভাল জীবনটা বহু একজনের লাগ। আর তুমি তো থাকো, হাসপাতাল দেখাবে, মিস্তাক-নিয়ে বাও হবে,—আমার একটু বিশেষ লক্ষ্যেই দেখতে চাই কি না।

আন্তর্য্য কোচল গলার স্বরটা জমীমর, মিতার কানে কেমন যেন জড়স গেলো। যেন বাধের কাঠি হরিণের বহ।

গাভীতে আসতে আসতে একটা কোলে সজেট বালুছিলো অনিল—কলকটা ভাটার দিনে দিনে ভাবি করল তার উঠে। জব্বা অদয়কে আক্রমণ করা যেন আমার একটা bad habit এ বীড়িয়েছে। না, না, এ বড় অন্তর, নিজেকে সশোধন করতেই হবে।

—এব দিকে তোম্ব তুলে চাইলো একবার সুমিতা। কোনো জবাব দিলো না।

সেবাসময়ে গাভ, এট প্রথম সে পাবর ভক্তি করে, প্রণাম করে পায়ে ধুলো নিয়েছিলো, কতবার আর সোমনারথর।

—কি? হঠাৎ যেন একটা বড় পরিবর্তন ভেগেছে তোমার ভেতর, মনে হচ্ছে? হে-ককণা ভরা দুই তাঁর, ওর সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে বলেছিলেন সোমনাথ।

—পরিবর্তন? তা হতেও পারে। তবে কি যে হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না জামাই বাব। বাধা-ভালো-ভালো কাঠি কনাব নিয়েছিলো সে—একদিন বা বড় ভালো লেগেছিলো, আজ সে-সব যেন বিস বসে মনে হচ্ছে। তাই মনে হয়, মাকে আর কবিকে নিয়ে দিনকতক আপনার সঙ্গে যাবো।

জবাব দেমনি সোমনাথ। উদাস দুই তাঁর তখন লুপ্ত "গগনে, কি যেন অবেশণ করছে। সন্ধ্যায় গোপীলাল তাঁর জন্তুভেঁদে, সাগনোজ্জ্বল দুই প্রাণের আগাতে কি যেন পাঠ করলেন অনিলের লগাটিনিতে।

ভাবগল্লীর কাঠি বললেন—ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ছাড়া শান্তিসাধন আর বিতীয় পথ নেই বৎস! ওর কোটি বিজুবিভ মুখর দিকে চাইলো অনিল। যেন অনন্ত শান্তি ও ককণা করে পড়েছে ওর দুটি চোখ থেকে। বৃন্দর লগপানি আলটার ওপর যেন ব্রিঙ্ক-লীলস প্রলেপ কেঁ লগিয়ে দিলো।

হেঁট করে সন্ধ্যায় পায়ে মাথা হেঁয়ালো অনিল। ওর মাথায় শিষ্ট বীর বীর হাত বুলিয়ে মৃত কাঠি উদ্ধারণ করতে লাগলেন ওরবে ও শান্তি! ও শান্তি! ও শান্তি!

আলোকের ভালায়ব কোল থেকে তুলে নিয়ে আসব করে চুমো খেলো অনিল। তারপর ওকে মাটিয়ে নিয়ে গেলো মায়ের কাছে।

নিচু গলার বললো মাকে—এবারে আমি বাড়ি যা। কিবে এসে,—তোমাকে নিয়ে বাবো গুরু মহারাজের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করতে, কি বলা?

—বাধি দ্বারা? সেই ভালো। মনটা যেন আগুনে বসলে গেছে,—মায়ের-বাটার বেহিতে পড়বো ওঁব সঙ্গে এবার।

উঠে পড়লেন দ্বারা ভেঁদে। অনিলের চাত করে গোট পর্যন্ত গেলেন ওর সঙ্গে। চোখ যুক্ততে যুক্ততে ভাবি গলার বললেন—কবী করিসনে বাবা। অত লুপথে বাধি,—সঙ্গে খাবার-লাবার নিয়োচিস তো? সব গোড়-গাড় ঠিকমত চারতে তো? আতা হাতা যে—আগে বহন গেছিস কোথাও, সাত দিন আগে থেকে যে আমি তোর জিনিষ গোড়াতে লুক করেছি।

চোখে আঁচল চাপা বিবে কোপাতে লাগলেন তিনি।

—মা! মা গো। অনিল জড়িয়ে ধরলো মাকে। ওকে বুকে টেনে মিলান তিনি।

মার বুকে বুপ লুটিয়ে আসবারে কীদলো অনিল। এমন করে ভীনে আর কখনও কীদলি সে। কি এক অশ্রু বহুগা-যেন বুকের কলকোটা যুক্ততে দিলিলো, আজ সারা দিনটা ধরে। এতকণে বুকাটা অনেকটা চাক্ক বোণ চাক্ক।

—ইস। অনেক দেবী হয়ে গেলো মা। তুমি ভেঙো না। লালকুঠিতে আর কিবো না, কুচবিভার থেকে শোভা তোমার বাছ ফিরে বাবো। দিন সাতেক থাকবো সেখানে। মায়ের পায়ে ধুলো নিয়ে মাথায় নিয়ে গোট দিয়ে চকল পায়ে বেবিয়ে গেলো অনিল। বহুকণ ওকে দেখা গেলো সতরু নয়না সেই দিকে চেয়ে বইলেন মায়া দেবী। বহু বহু করে চোখের জলের ধারায় গাল ছুটো ওঁব ভেসে বাড়িলো।

বাড়ীতে পৌঁছে দেখলো অনিল, বাড়ি আটটা বেজে গেছে। ভেবেছিলো, তার বাবার সময় 'অন্ততঃ' শুকতারা বাড়ী তিরে আসবে। কিন্তু কৈ? শু: কি স্বয়মহীনা! অজমনা হয়ে কোনোবকমে চাকরের সাচায়ে অসমাপ্ত গোছগাছ শেষ করলো সে। বাবো বাবো মনে কীটার মত বিচ্ছেদ আজ সকালের ব্যাপারটা।

—একটু শুছিয়ে লাও না গো! ওসব আমার আভাস নেই তো। আগে বহন বাইরে গেছি মা-ই সব ঠিক করে গিছেন কিনা। আর দেখো। কিছু খাবার দাবারও সঙ্গে দিও। আমার আবার ট্রেনে উঠলে বড় কিয়ে পার। হাসতে হাসতে শুকতারার হাতটা চেপে ধ'ব বলেছিলো অনিল, তোমাকে এক করে সাগলায়, কিছুতেই তো গেলে না আমার সঙ্গে। সন্তা বলছি, যদি যেতে তুমি, ণ্ড-বু, ভালো লাগতো তোমার। তার আচাবও।

—ও মা! আজই তোমার বাবার দিন? তা ভাল মনে করিতে দিতে কি হয়েছিলো? হাতপানা কটকা মেবে চাতিয়ে নিয়ে কাঁকেব সঙ্গে জবাব দিলো শুকতারা। জানোই তো আমার বাবার সময় নেই। তোমার না হয় দিন কুরবোকে ভবিষ বাছাবে, আমার তো আর তা নয়। ডেট দিতে না পেয়ে নিভা তো অকার কিবিয়ে দিছি। তবে আজ অবত হুটই নেই, জা

হলে ওসব গৌড়াছাঁহ কববার মতো সমঝ তো নেই। স্বতনলাল রে একটা জমকালো পাটি দিচ্ছে আজ বাগানে। এই ন'টার ব্রেংকাট, একটার লাক। সারাদিনই চলবে। দেবী কতি কি হবে বলা? ডিসি'প্রনটা মানতে হবে তো। দুদিন আগে মনে করিয়ে দিলেও কিছুটা করতে পারতাম। বাকুগে ছোট লালকে নিয়ে ঝটুকু সেরে নিও।

নিখুঁত প্রসাধনে নিজেকে মনোমোহিনী রূপে সজ্জিত করে স্বতনলালে পাঠানো বটুকু করে বেরিয়ে গিয়েছিলো শুকতার।

একটা বোবা চিংকার ঘোঁয়ার কুণ্ডলার মতো পাক খেয়ে উঠে এসেছিলো গুব গুলার কাছে। শুকতারার বাসগৃহ কথা আর প্রেমের অবশেষের বিবাক্ত ভীষের তীব্র ফলাফলো অন্তরটাকে কত-বিন্দু করে দিয়েছে গুব। বাড়ির দুপাশের মোটা মোটা শিরার যুক্তের শিরশিরাপি। মাথায় নপ নপ করে ঝলছে বেন একথাবরা আগুন। হাত দুটা বেন নিশ্বাস করে উঠেছিলো, শিকারী বাঘের খাবার মতো।

দেই খালার খানিকটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলো, বিকেলে মুমিতার সঙ্গে দেখা করতে ওপরে গিয়ে অসীমের ওপর।

এখন মন গুব প্রায় শান্ত হয়ে গেছে। তাই একটা কোমল বাসনা ম'ম গুব উঁকি দাঁকি মারছিলো, চরতো সে সজ্জার মতোই বিরে আগবে। বাবার যুহুটটি তার একটু অকৃত্যগ রঞ্জিত করে দেবে।

—ইস। পোনে ন'টা বে। হাতখড়ির দিকে চেয়ে সচকিত হয়ে উঠলো অনিল। ছোট লালকে পাঠালো ট্যান্ডি ডাকতে। খাবার বাবু। তখন কিছু। কিসে পাচ্ছে খব। বাক, টেনে কিছু খেয়ে নিলেই হবে। একদাশ জল ঢুক ঢুক করে খেয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ট্যান্ডিতে উঠে পড়লো অনিল।

ট্রেনে গিয়ে মালপত্র নামিয়ে কুলির মাথার চাপিয়ে, ট্যান্ডি ভাড়া দেবার সময় মানিবাগটি খুলে অবাক হলো অনিল। খুচরো পয়সা টাকা মিলিয়ে সাত আট টাকার বেশী হবে না। তবে? নোটের তাড়াতী কোথায় গেলো? এ কি? ট্রেনের টিকিট? তারওতো পান্ডা নেই। মানিবাগে?...

অস্থিরভাবে হাতের মুঠোর চুল টেনে ধরে ভাবতে চেষ্টা করলো অনিল।

ওঃ। তাইতো। ঠিক ঠিক। ছোট লালকে বলেছিলো, স্টকেশ আর বোডটা ট্যান্ডিতে তুলে দিতে। সে তাই দিয়েছিলো। আর ছোট হাতবাগটোতে টাকা, ট্রেনের টিকিট আরও দু চারটে দরকারী জিনিষ ভরে, সেটা যথেষ্টলো ডেসি টেবিলের ওপর, নিজের হাতে নেবে বলে ১০০-কিছু মনটা বে কি হয়েছে, উঃ আর পারা যায় না। কুলির সঙ্গে হাতে হাতে ট্রেনের ভেতরে যেতেই ছুটে এসো বমেন বোস, আরো কয়েকজন বছর সঙ্গে।

—বারে? আচ্ছা কুঁড়ে লোক তো। এতকণে যদি বা এগেছো এমন হাঁট হাঁট পা পা, করছো কেন? ট্রেন যে ভাড়বার সময় হয়ে এসে। ভীষণ ব্যস্তভাবে গুব হাতখানা ধরে কাকি দিয়ে বললো বমেন বোস।

—বার কেন? হাসলো অনিল। আসল মাল কেনে এগেছি। টাকা, ট্রেনের টিকিট সব। এখন সময় তো আর নেই

যে ট্যান্ডি করে গিয়ে নিয়ে আসবে। বাক পে—তোমরা একটা উপকার করো আমার ভাই;—আমার মালগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এগো তোমরা; আমি পরের ট্রেনে যাব। এগুলো সাময়িক আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই আগে ওয়াই বাক, আমি শুধু সেই ব্যাগটিকে প্রেমলী মতো বুকে জড়িয়ে নিয়ে যাব।

—শান্ত্যে। মন তোমার থাকে কোথায় হে? একসঙ্গে চৈ চৈ করে কতকাল পরে যদি বা বাবার সময় মিললো,—তা এমন করে নষ্ট করে দিলে? ঠিক আছে, তোমার কামেলাগুলোকে আমরাই নিছি। ঠিক পরের ট্রেনটা কটার ছাড়বে, তেনে বাও। এবারে বেন আবার ব্যাগটিকে তুলে দিয়ে, নিজে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে না। কিছু অসম্ভব নয় তোমার পক্ষে সেখানি।

সকলের মিলিত কণ্ঠের হাসিতে ট্রেনের কামরা বেন কেঁপে উঠলো।

—আরো কিছুক্ষণ বসলো গুবের সঙ্গে অনিল। তার পর সেনে এলো। ট্রেন ছেড়ে দিলো—কমাল উড়িয়ে গুবের বিদায় সন্ধ্যা জানাতে গিয়ে চঠাং হাত ফড়ে কমালটা ফংকিয়ে উড়ে গিয়ে চলন্ত গাড়ির তলায় পড়ে গেলো।

একবার কতৃণ চোখে চাইলো, তার পলাতক। কমালটির উদ্দেশ, তার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে চললো সে।

কমালটা শিখেছিলো ওকে শুকতার,—একটি মনোদম সন্ধ্যা। তাই ওটাকে হারিয়ে মনটা খাবার হয়ে গেছে গুব।



বিখ্যাত
'শঙ্খ ও গদ্য'

মার্কা গেম্বী
ব্যবহার করুন

রেকর্ডিং ট্রেডমার্ক

ডি, এন, বসুর
হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২৯৯৫

এতক কিসের আভন বেনে ঝপেছে পেটের ভেতর। ঠেগনে কিছু ভেবে নেবে কি মা একটু ঝড়িয়ে জাবলো অনিল। মোগলাই গল্প ভেসে আসছে বেঙে গাটা খেকে। নাঃ। থাক—তাড়াহাড়ি বাড়ি বাওয়া দবকার, অতঃশো টাকা বাইরে পড়ে আছে। ব্যাগটা নিয়ে এসে কোথাও খেয়ে নিলেই হবে।

—হাত দশটা বেজে গেছে। বালিগজের বনেদি পথটা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

ট্যান্ডিটা বাইরে ছেড়ে দিয়ে পেট দিয়ে পায়ে হেটে টুকলো অনিল। হরতো মিটা এখনও ফেরেনি, তাই পেট এখনও খোলাই আছে। পানের বেগেতে বসে দরওয়ান নাক ডাকাচ্ছে।

দুখ থেকেই নখের পড়লো গুর, শোবার ঘরে ঝলছে দুখ নীল আলোটা। মনটা যেন আনন্দে ছলছলিয়ে উঠলো—তারা তাকলে কিবেছে ভালোই হয়েচে, ব্যাগটা ফেল দিয়ে। গুরু একটু আলস করে, মনটাকে সুস্থ করে নিয়ে যাবে এবার।

টি. টি শব্দ করে পানের পাতের ঘন পাতার আভাস থেকে কেঁচে উঠলো কোন ঘুমড়া পানী। আর খটখট করে মাথার ওপর দিয়ে উড় গেলো একটা কালপেঁচা, কর্কশ বব তার তীরের ফসার মতো বিঁধলো ঘন রাতের অশুভ নীরবতার বৃকে।

পূর্ণিমার চাঁদের গুণের জমেছে খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ। চাঁদের আলোর উজ্জ্বল পড়া হাসিটুকু এখন আর নেই। রান বিহার আলোর লগা লগা ছায়া ফেল খমখেমে গাছগুলো ঝাড়িয়ে যেন দার্শনিকের কেসেহ। কেমন যেন অশুভ লাগলো গুর। এমন মুহুর মত নীরবতা কৈ আগে তো কখনও নিজের আসেনি গুর? পান্ডিম দিগন্তে সপিল বেথার বিহায়ে খেলো গেলো, কার বাঁকা হাসির মতো। খমখেমে স্তম্ভতা স্বভেদে পূর্ণি রক্ষণ। হু হু করে যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে কালো কালো মেঘগুলো। আকাশের নিকে চাইতে চাইতে, চকল পায়ে ঘরের নিকে এগিয়ে চললো অনিল।

কমলা সেবাসদন থেকে সোমনাথের সঙ্গে সুরামের বাড়ীতে গিয়েছিলো সুরমিতা। সুরামের মা কিছুতেই ছাড়েননি গুরু।

—এত রাত না ঘেবে বাবি? তাই কি হয়? তোরা কিছু ভয় নেই, দাদী গিয়ে পৌছে গিয়ে আসবে তোকে। বলেছিলেন তিনি। সোমনাথ, আর গুরুদেব রইলেন সুরামের বাড়ী। দু-একদিন থেকে ঠগা চলে যাবেন। মারা দেবী চোখের জলে ভেসে সোমনাথের ছুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—এবার আমার একটা গতি করে দাও বাবা। প্রাণটা যে জলে পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে; গুরুদেবের পায়ে আমার একটু ছানি করে দাও।

গুরুদেব শান্ত হাসি দিয়ে বলেছিলেন—দুঃখ ব্রহ্মা ভোগই যে শান্তিপথের প্রথম প্রবেশদ্বার মা! আত্মতুষ্টি হবে গুর দ্বারাই; তাবপরে আনন্দমার্গে বাবার অধিকার পাওয়া যায়।

গুরুদেবের হুটি পা জড়িয়ে ধরে মাথা বেঁধে বলেছিলেন তিনি, এ চরণ আর ছাড়ছি না বাবা। অনিল কিরে এলে, দুজনেই লজ্জা নেব আশনির, দর্য করে আশ্রয় দিতেই হবে।

—আমাদের ইচ্ছার কিছু হয় না, গুর ইচ্ছা থাকলে সবই হতে পারে। গভীর ঘরে জ্বাং দিয়েছিলেন সুরমী।

—বাবার সময় সোমনাথকে বললো সুরমিতা—আপনাকে আমার কিছু বলবার আছে বাবা, আজ তো হলো না বলা, কাল বাবার আসবো।

—আচ্ছা মা। তাই এসো। গুর মাথার হাত বুলিয়ে বললেন সোমনাথ। আলোক ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সুরমিতার কোল থেকে গুরু নিজের কোল নিলেন গুরুদেব। তাবপরে অশুভঘরে কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করে গুর মাথার, গায়ে, সর্বদিকে হাত বুলিয়ে দিয়ে—গুরু সুরমিতার কোলে কিবিয়ে দিলেন।

সুরমিতাকে সঙ্গে নিয়ে খোকনকে কোল করে সুরমা ট্যান্ডিতে উঠলো।

গাড়ীতে বসে বসে বললো সুরমিতা—বাড়ীর ভেতরে গাড়ী নিয়ে যেও না দাদীমা। হাত দশটা বেজে গেছে, জানতো সবই। বাবা চুলচুলিয়ে উঠলো গুর কঠবরে।

—জানি মিথু। তোমাকে গেটের সামনে নামিয়ে দিয়ে, এই ট্যান্ডিতেই আমি কিরে আসবো। জ্বাং দিলো সুরমা।

গুর একখানি হাত নিজের দুটি হাতের মুঠোর নিষিদ্ধ করে জড়িয়ে ধরলো সুরমিতা,—জলে ডুবে যাওয়া মানুষ যেমন করে জড়িয়ে ধরে, বাঁচবার একটু অবলম্বন হাতের কাছ পেলে।

—জানো দাদীমা! কোমল রক্ত গুরু বললো সে—আজ বুঝতে পারলাম, সঙ্গতে শুধু দুঃখই নেই, আনন্দও আছে। কতকগুলো ছুকুটা পথেই শুধু সে আসে না, সে আসে নব নব রূপের ভেতর দিয়ে। যখন দুঃখের বড়-বাটা আসে জীবনে, চাবিকিকে দেখি শুধু কি ভীষণ অন্ধকার। তখন মনে হয় না এর পরেও আলো আছে; তাই মনে হয়েছিলো, আমি ফুরিয়ে গেছি। যে জীবনে শুধু তুল, শুধু হতাশা তীব্র মানি, আর মুহুর ব্রহ্মা, ছাড়া আর কিছু ছিলো না, সেই জীবনেই যেন আসছে জ্বাং আলো, আশা, আনন্দ। আমি যেন কোন নতুন জীবনের স্পর্শ অনুভব করছি, মনে-প্রাণে। তাই মনে হয় দাদীমা জীবনের এই তুল, বিপদায়, বেদনা, কোনটাই বোধ হয় অর্থহীন নয় আমাদের পক্ষে।

—তোমার সত্য দর্শন, অজ্ঞাত মিটা। জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা আমাদের শ্রেণিবদ্ধ ভাবেই সাজানো আছে; আমরা শুধু চলেছি তার ভিতর দিয়ে। পূর্বে পরিকল্পিত বন্ধনে যদি আবদ্ধ হতাম আমি, তাহলে, হরতো নিজের উন্নতি, বশ কর্বা আর ভোগের দিকেই আমার মনটা নিবিষ্ট থাকতো মিথু। কুহ সঙ্গারের গণ্ডিটাকেই পরমার্থ বলে মেনে নিতাম, শুধু সেইটুকুই আমার বলে জানতাম,—কিছু জ্ঞান তো আমার কাছে, আমার পরিচয় ঠিক তো তা নয়। আজ মনে হয় বিশ্বের সকলেই যেন আমার পরম আত্মীয়। মহাপ্রাণের যন্ত্রে এই কুহ জীবনের কণাটিকে উৎসর্গ করার নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকুলতা অনুভব করি আমার সারা মনে প্রাণে। তোমার দিক থেকেও ঠিক ঐ একই কথা বলা বার মিটা। যে মহাপ্রাণের পরম পেয়েছ জীবনে তুমি, তা শুধু তোমার জীবনের ঐ দুঃসময় বিপর্যয়ের জটই সম্ভব হয়েছে। আবেগ ভরা কণ্ঠে জ্বাং দিলো সুরমা।

—আমার কথা কবো দাদীমা! একটু পায়ের ধূলো লাও আমার, তোমার আশীর্বাদে, যদি আমার মহাপ্রাণের কিছু মাত্র কর হয়! আমি যেন তোমার আদর্শে চলতে পারি গো। ব্যাকুল হয়ে সুরমিতা গেলো সুরামের পায়ে হাত দিতে—

হাল ছুনি আলিয়া

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৫

উত্তমেন হি সিগাঙ্জি কার্ধানি ন মনোবৈধঃ।

ন সি স্পৃহত্ব সংহত প্রবিশজ্জ যুৎ যুগাঃ—

রমণী পণ্ডিতের উক্তি। সিংহও ঘুমিয়ে থাকলে তার যুৎ হরিণ গিয়ে ঢোকে না। নিশ্চেষ্ট ভাবনায় কোন সমস্যাওই বা সুরাহা হয়—চোঁটা থাকা চাই। চোঁটাই আসল। উত্তমই আসল।

বীরাপদর প্রেমের একটু বাস্তবতা অনুভব করে অন্তরঙ্গ স্ত্রীস্বখ্যায়ীর মত রমণী পণ্ডিত বলেছিলেন কথাগুলো। মজা-পুরুষের দ্বার দিয়ে বীরাপদ একটু পা চালিয়েই শটকাট করছিল। তাড়া ছিল। পল্লবাত্মনে শৌছানোর আগে গোটেল খেয়ে নিতে হবে। এখানে একমুঠি বিরাহ করছেন জানলে সোজা পথ ধরত। প্রোঙ্ক-বচন শিরোবার্ত করেই পাশ কাটিয়েছে। কিন্তু মনে মনে অবাক একটু, চোঁটার কি দেখলেন এরা। বিগত ক'টা দিন ধরে শুকে ঘিরে স্তলতান জুটতে একটা বহুতর বুননি চলছে, আজ এই একজনের সঙ্গে ঘোষোচোখি হেঁটেই বীরাপদ তার আঁচাস পেল। চিঠি আসা, চাকরির পাড়ি আসা, চাকরির আসা—এতগুলো আশার ধাক্কায় আলোড়ন একটু হবারই কথা। কিন্তু তা' বলে সিংহে আগতে চলছে জ্বলন্ত সেটা টের পেলেন কি করে? গর এক-কটা দিনের ভাল-চলনে চোঁটার লক্ষ্যই বা কি ছিল।

চোঁটার প্রথম কল, হোটেল থেকে অভ্যস্ত ক্রিতে হল। অবিস-টাইমের জিডের সঙ্গে এককাল পরিচয় ছিল না। নিয়মিত বেলা-পেয়ে আগন্তুক সে। এ-মুহুর্তে দেখে চমুহির। তাড়া না থাকলে বলে দেখার মত। ভোজন-পূর্বে এমন তাড়া আর দেখেনি। টেবিলে থালা কল্যাণে ঠাই নেই। প্রত্যেকের পিছনে পিছনে পরের ব্যাচে ধীরে বসবেন তাঁরা অসহিষ্ণু প্রতীকার ধাঁড়িয়ে। এক একজনের পিছনে হুঁজন করবে। তাড়াহুড়া চেঁচামেচিতে পরিবেশন-রত কর্মচারীরা হিমসিম।

প্রত্যাবর্তন। ভাতের আশার থাকলে কম করে আরো এক বটা।

চোঁটার দ্বিতীয় কল, নির্দিষ্ট বাড়ির নির্দিষ্ট হল-ঘরে এসে দেখে—'জনমানব-শূন্য। আবহা! অন্ধকার, জানালাগুলো পূর্ণ তখনো খোলা হয়নি। হাক-বরকার ও-ধারে উকি দিলে দেখে সেখানেও কেউ নেই। নির্দিষ্ট ওপাশে নিচের জলার মতই এক সারি ঘর। বীরাপদর অনুমান এ বাড়ির ওটাই অন্ধরমহল।

কাজেই সেদিকেও বেশি উবিখুঁকি দেখে। হুইটিন কোষ বহন না। হল-ঘরেই ফিরে এলো আবার। নিজেই ভ্রমো জানালা খুলে দিয়ে আর একটা আলো জ্বলে বসল। একটা থমকানো শূন্যতা কিছুটা হাবা হল বেন।

বীরাপদ বসে আছে। বসেই আছে।

ডুডুডে নেমস্তন্নর বসিকতার মত লাগছে। সেতুজ্ঞে এসে দেখে হানাবাড়ি। এব মগে নিচের তলায় ঘুরে এসেছে একবার, সাচলে ভর করে অন্ধরমহলের কড়া নেড়েছে বারকতক, তার পর আবার এসে বসেছে।

প্রায় খটাপানেক বাদে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ধীর প্রবেশ তিনিও অপরিচিত। ছেঁড়া জুতা, মজিন হুতি, কালছে কোট চড়ানো একজন প্রোচ। বীরাপদর প্রতীকার কারণ তুনে একটু বিম্মিত—এখানে দেখা করতে বসেছেন?

কোণায় দেখা করতে হবে নির্দেশ না থাকায় বীরাপদর দ্বারদ্বা এখানেই। মাথা নাড়ল বটে কিন্তু প্রায় তুনে নিজেই খটকা লাগছে একটু।

বসন তাহলে। জ্বলন্তের নিলি'ন্ত যুৎ একটুখানি বিরাহ ছায়া পড়ল কিনা ঠিক ঠাণ্ডে হল না। হাক দরজার কাছাকাছি হল-এর এক কোণে টাইপ রাইটারের দিকে এগোলেন। চোঁটারে কাঁধে কোট খুলিয়ে টাইপ রাইটারের চাকনা খুলে বসলেন তিমি।

বসে বসে বীরাপদর কিছুনি এসে গিয়েছিল। বড় দেহাল-ঘড়ির কাঁটা আরো হু'পাক হুয়েছে। টাইপের অতি-বহু খট-খটও এবার বোঁহর খেমেই গেল। হু'বটায় পুরো এক পাতাও টাইপ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। চোঁটার ছেঁড়ে জ্বলন্ত কাছ এলেন, পরে তারেই জিজ্ঞাসা করলেন, কই কেউ এলেন না তো?

বীরাপদর মনে হল তাঁর নিলি'ন্ত যুৎসে সেই ছায়াটা সরে গেছে। 'নকীব প্রতীকা দেখে পান-খাওয়া টোঁটার কোণে উটে হাসির আভাসের মত। অর্থাৎ, কেউ এসে সেটাই বিষয়ের কারণ হত।

কেউ খোঁজ করলে বলে দেবেন টিকিনে সেহি।

খোঁজ কেউ করবেন না সে সবকিছু নিশ্চিত হয়ত, আর টিকিন থেকে ফিরবেন না উনি তাও নিশ্চিত বোঁহর। কারণ, কোটটা আবার পায়ের উঠেছে আর টাইপরাইটারের ওপরেও চাকনা পড়েছে।

হল-ঘরে একা আবার। এককণ ভাবছিল, হুপুয়ের ধাবার

দূর হলে সাহেবদের আবির্ভাব ঘটবে। এখন সে সম্ভাবনাও দেখছে না। বীরপদ উঠে পড়বে কি না ঠিক করার আগেই আর এক দৃষ্টির আবির্ভাব। কালকের সেই পরিচারক গোছের লোকটি, ঘরের ভাড়ার বেতাকে ওপরে চলে পাঠিয়েছিল। এসেই কৈকিয়ন্তের ঘরে বলল, টাইপবাবু বলে গেলেন আপনি সেই সকাল থেকে বসে আছেন, কলিং-বেল টেপেননি, আমি কি করে জানব বলুন—

যেন তার জন্তেই বীরপদ এতক্ষণ ঘরে অপেক্ষা করছে আর সে সেটা জানে না বলে অস্থতপ্ত। কথাবার্তার আজ আর লোকটাকে তখন বাকবিশুদ্ধ মনে হল না বীরপদের, মাঝে মাঝে একটা আঁখটা প্রস্র করে সলগ্ন এবং অসলগ্ন অনেকখানি তথ্য আহরণ করা গেল। যেমন, 'সকালোর' বাড়িতে তো কাউকে দেখা করতে বলা হয় না, বীরপদকে বড় সাহেব ফ্যাঙ্কটীতেই যেত বলেছেন বোধহয়—না, সাহেবদের বাড়িতে খাবার পাট নেই, দু'বেলাই সকলে বাইরে খান—মাঝে মাঝে ডাল-চুড়ি-সুজোর বোপ খেতে ইচ্ছে গেলে ভাগ্যবান আগে থাকতে ঢকে খবর দেন, ওই তখন সব ব্যবস্থা করে রাখে, কিছু ভাগ্যবান কাছে সবকিছু করার বাতায়তরী নিতে চেষ্টা করে কেয়ার-টেক বাবু—হুঁটাকা বাজার করে দশ টাকা লিখে রাখে, বড়সাহেবের তো আর কেয়ার-টেক বাবুর লেখা উল্টে দেখার সময় নেই, মাসকাবারে টাকা ফেলে দিয়েই খালাস। কিন্তু এই মানকে খুঁটা হলো বোঝে সব, কুঁকো মুখ বৃদ্ধ থাকে, জলে নিবাস করে তো আর কুঁকোর সঙ্গে বগড়া করা চলে না।

খেই হারিয়ে মানকের পুঞ্জীভূত কোত্তের খুঁটাই আলগা হয়ে

গেল। কে ভাগ্যবান বা কে কেয়ার-টেক বাবু বীরপদের বোৎসাহ হল না।

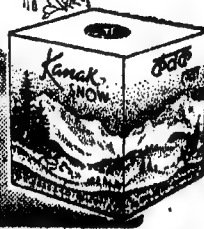
—সাহেবরা কেমন কখন? একত্রে বাবে সেই বাড়িতে। কেউ এখন কেউ ত্যাগন। শুধু ভাগ্যবান মাঝে মাঝে ই'দক-সিদ্ধি চলে যান। সাহেবরা দু'জন রোভই কেমন, কখন কড়া নড়ে উঠবে বা গাড়ির লক শোনা বাবে সেই পিত্তোশে কান খাড়া করে এই মানুষকেই ঠায় জেগে বসে থাকতে হয়—কেয়ার-টেক বাবুর তখন 'কুন্তকয়ের' নিদ্রা, আর সকালোর উঠেই সাহেবদের কাছে এমন 'দু'স্ত' দেখাবেন যেন মার রাত অবার তিনিই জেগে বসেছিলেন।

—ফ্যাঙ্কটীতে গেলে কার সঙ্গে দেখা হতে পারে? সকলের সঙ্গেই—বড়সাহেব ছোটসাহেব ভাগ্যবান মেম ডাক্তার—মেম ডাক্তারকে অবিশ্তি 'বিকেলোর' ওয়ুধর দোকানেও পাওয়া বাবে, তেনার সঙ্গে দেখা হলে তিনিও সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন—ব্যবস্থাপত্রের তার তো সব মেম ডাক্তারেরই হাতে। সঙ্গে সঙ্গে কি মনে হতে যোগাতে দুখের কোটরাগত চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠেছে একটু। গলায় স্বর নামিয়ে বলেছে, টাইপ বাবু বললেন আপনার চাকুরি হয়েছে এখানে, আপনি তো এখন ঘরের লোক, বলতে দোষ কি—সুযোগ সুবিধে হলে মেম ডাক্তারকে একটু বলে দিয়ে লেবেন কারখানার বরি চাপরাশির কাজটা তান, বাড়ির কাজ করই 'কতে' পাব—আমি নিজেই একবার সাহসে 'নিউ' করে মেম ডাক্তারকে বলেছিলাম, তা তিনি তুলেই গেছেন বোধহয়—এতকাল কাজ করছি এতু না হলে আর



আনন্দ উৎসবে
ক, হোডের

প্রসারিত সামগ্রী



ক. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১০

জানা কি বলুন—এখানে কেয়ারটেক বাবুটিতো সরল স্বভাবের বৃদ্ধ পাঁচ বছর আগেই আসেন, যখন তেনারই খাস-তালুকের প্রজা আমি।

নবী গতি সহজে, মানিকের সব কথা বিবরণ কেয়ারটেক বাবুতে এসে। মুকুটের ঘর দেখে বীরপদর হাসি চাপা পড়তে লাগল। সকল ব্যবস্থা-পত্রের কঠোর মেয়াদান্তরটি কে অমূল্য কমাচ্ছে। সেই মেয়েটিই হবে। আর কেয়ারটেক বাবু কেয়ারটেকের বাবু হবেন। তবু এবারে জিজ্ঞাসা করল, কেয়ারটেক বাবুটি কে?

—কেয়ারটেক বাবু বুঝলেন না? ইঞ্জিনিয়ার বলে—নিজেই নিজের নাম দিয়েছে, আসলে ও হল বাতায় সরকার, বুঝলেন? গিরিয়ারের বাপের দেশের লোক কি না তাই গো বারো—গিরিয়ার চোখ বুজতে এখন তো সন্ধ্যা ভাবেন নিজেকে, ছুঁতে সব কীক করে দিলে, ইন্দিকে আমি সোঁরা থেকে জল গড়াতে গেলেও সন্ধ্যার সন্ধ্যার ইঁদুর ঘরা বেড়ালের চোখ করে তাকাবে—যেন বাসুক ডেকে টাকা সরাচ্ছে। কাউকে তো বলা বাবে না কিছু, কথাটি কওয়াই দায়, এক ভায়েবাবুকে বলা যায়—তিনি লোক ভালো। কিন্তু তেনাকেও আগের ভাগেই হাত করে বসে আছে, বাপের পিসার মত দরদ দেখায়। তবু তেনাকে বললে শুনেবেন, ডেকে ধমক ধমকও করবেন—কিছু তারপর? ভায়েবাবু তো সন্ধ্যাক্ষণ নিজের তালে থাকেন, নিজের তালে যোবেন—কেয়ারটেক বাবু তখন আমার কলজে ছিঁড়ে কালিমা বানিয়ে থাকে।

বীরপদর হাসিও পাচ্ছে, হুঃখও হচ্ছে। যেম সে-ই ওকে ভায়েবাবুর কাছে কেয়ারটেক বাবুর বিকল্পে নাশিলের পরামর্শটা দিয়েছিল। ভায়েবাবুটি কে বীরপদ এখনো জানেন না। কিন্তু জীও করতে পারছে। সেই কোকটাই হবে—সেই অমিতাভ ঘোষ মানিকের ঘুমে ভায়েবাবুর স্বভাব আর আচরণের আভাসে সেই রকমই মনে হয়। শুধু তাই নয়, গতকাল তিমন্ত মিত্র ছেলেকে হার সঙ্গে দেখা হলে ঘড়ি ধরে তাঁর দুঃখটা অশেফা করার কথা জানাতে বলে দিয়েছিলেন, বীরপদর এখন ধারণা সেও ওই একই লোকের প্রসঙ্গে।

মানিকের হাবভাব হঠাৎ বদলাতে দেখে বীরপদ ফিরে তাকালো। আঘমল্লা বুতির ওপর ফটকটা শালা গেঞ্জি গায়ে বে লোকটা সামনে এসে পিঁড়াল, তাকে দেখা মাত্র বীরপদ বুঝল, ইনিই কেয়ারটেক বাবু। মানিকের মতই লম্বা, রাগা—কর্প। ঘুমে ভায়েবাবু চোপ। অনাবৃত বাহু দুটিতে বেন আগাগোড়া ভায়েবাবু ছিটের কাজ করা। মাথা-জোড়া তেল-চকচকে টাকের ওপর গোটাছুক মাত্র কাঁচা-পাকা চুল মাথার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনো। এক-নজর তাকে দেখে নিয়ে গম্ভীর প্রশ্ন করল, টাইপ বাবু বলে গেছেন আপনি নাকি সাহেবদের জন্ত তিন ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করতেন?

সম্ভাব্য অপরাধীকে যেভাবে জেরা করা হয়, অনেকটা সেই পুর। তার আপাদ-বস্ত্র একবার চোখ বুজিয়ে বীরপদ জবাব দিল, তার বেশিই হবে—

মানিক।

বিভীরা ব্যক্তিটির দিকে ঘুরে হাতে-মোটে এবারে আসামিই প্রণয়ন করা হল যেম। কিন্তু বীরপদ লক্ষ্য করল, ওই এক ডাক

শুনতেই মানিকের এতকণের মিথিই ঘুমে কক্ষ ছাপ পড়ে গেছে একটা। অভিযোগ স্বাভাবিক সচেতন মন বলেই ঘুমে দ্বিধা উদ্ভূত প্রতীক্স এবং জবাবের প্রস্তাভ।

কেয়ারটেক বাবুর কাঁধালো অমূল্যসনে মানিকের অপরাধ বোঝা গেল।—নতুন কাজে লাগতে এসে ভুললোক তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছেন আর তুই কোথায় বেতে হবে কি করতে হবে বলে মিসনি, আমাকেও ডাকিসনি। কোম্পানীর এই তিন ঘণ্টার লোকসান কে দেবে? আর উনি যদি সাহেবদের সে-কথা বলেন, আমার ঘুমে থাকবে কোথায়?

বীরপদ তাকাল। এমিকে মানিকেরও সমান ওজনের জবাব, বাবু তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছেন আমি কি শুনে জানব? উনি কি বেল টিপেছিলেন—জিগেস করুন তো!

ও—কেউ এলে ঘণ্টা বাজিয়ে শাঁখ বাজিয়ে তোমাকে জানাতে হবে আর তা না হলে পালকে শুয়ে পড়ের ওপর পা তুলে সারাক্ষণ তুমি চুরির মতলব ভাঁজবে, কেমন? আশুক আজ সাহেবরা, দুই দুই করে না ভাড়াই তো কি বললাম—

সাহেবদের নামে মানিকের পুর বদলালো একটু কিন্তু গলা নামলো না। বীরপদকেই একটা জালজামান অত্যাচারের সাক্ষি মানল সে।—দেখলেন? যা নয় তাই বললে, দেখলেন? আজ আমার কি লোব বলুন তো, এতবড় বাড়ি, ভাড়াটি গললে টের পাওয়া যায় না, আপনি তো মামুদ—তাও বেল টিপেননি—

ফের টকটকিয়ে কথা?

একটা ধায়ডের মতই ঠাস করে কানে লাগল। মানিকের ঘুমে বন্ধ। রাগে গজগজ করলেও আর ঘুমে খলতে ভরসা গেল না। কেয়ারটেক বাবু এবারে দুই চোখে বীরপদকে ওজন করে মিল একটু।—আপনি কোথায় কাজে লেগেছেন, ওম্বের লোকসানে না ক্যান্টরীতে?

বীরপদ ভাবছে, কাজে লাগার কথাটা টাইপ-বাবুকে না বলাই ভালো ছিল। জবাব দিল, দেখা বাক—

লোকটি চিন্তাশীল।—আপনি না-হয় ওম্বের লোকসানেই চলে যান এখন, বিকেলে মিস সরকার সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেবেন।

বীরপদ উঠে পিঁড়াল, হাসল একটু।—আজ আর কোথাও না, সাহেবরা এলে বলে দেবেন।

কেয়ারটেক বাবু বিলম্ব বিমিত, আজ কোথাও না হামে আজ কাজে জরেন করবেন না? কাজ শেষে কাজে লাগার আগ্রহ নেই এ আর দেখিনি বোধহয়। একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনি থাকেন কোথায়?

বিসিকতার লোভ এবারে কিছুতে আর সংবরণ করা গেল না। মানিকের সঙ্গে আগে আলোচনের মক্কাই হোক বা তার প্রতি কেয়ারটেক বাবুর অবিচারের বিবাস্ত শুনেই হোক, বীরপদর সহায়ভূতি আপাতত আসের জনের প্রতি। তার পর ওর সামনেই যে-ভাবে দায়িত্বানী দিয়ে থাকালো লোকটাকে তাতেও টানটা দুর্বলের দিকেই হওয়াটা স্বাভাবিক। কেয়ারটেক বাবুর দিকে চেয়ে দেবেই জবাব দিল, এখন পর্যন্ত থাকার ঠিক নেই কিছু, ঘুম সস্তর—এবারেই থাকব—

সঙ্গে সঙ্গে বুকের চকিত রূপান্তর। ওষু কেয়ার-টেক বাবু নয়, হানকেও কোন্ তুলে কালকাল করে চেয়ে রইল। তার পর নিজেরে মধ্যেই দৃষ্টি বিনিময়। শালা অর্ধ, এ আবার কি হানেশার কথা!

হাসি চেপে বীরপদ দরজার দিকে এগোলো। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রমণী পণ্ডিতের কথাটাই মনে পড়ে গেল। সিংহও বুঝিয়ে থাকলে নিজে থেকে হরিণ গিয়ে তার বুখে ঢোকে না—চেঁচা থাকে চাই। ভাবব সিলে হত, শনির দৃষ্টি সামনে পড়লে চেঁচাতেও কিছু হয় না, পোড়া শোলমাহুও পালায়—

কিন্তু বীরপদর কিছু যেন লোকসান হয়নি, এককণের প্রতীক্ষার স্পত্তিও তেমন টের পাচ্ছে না আর। ওই লোক দুটাই অনেকটা পুথিয়ে গিয়েছে। জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানের এই আল-বাঁধা ক্ষেত্রে কত রকম জীবনের চার তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে।

বাবু! বাবু!

বীরপদ ট্রামের অপেক্ষার পাঁড়িয়েছিল, ব্যস্ত-সমস্ত ডাক শুনে দূর পাঁড়াল।

তাকেই ডাকা হচ্ছে। ডাকছে মান্কে।

হস্তদণ্ড হস্ত কাহ্নে এসে বড়গড় একটা দম নিয়ে উদ্ভাসিত বুখে জানালো, এন্টুনি কিরতে হবে, ফাষ্টিবী থেকে ছোট সাহেবের টেলিকোন এসেছে।

ইচ্ছে খুব ছিল না, তবু কিরতেই হল। কিন্তু বাড়ি পূর্বত যেতে হল না। গার জামা চড়িয়ে আর ব্যাখিসের জুতোর পা গলিয়ে কেয়ার-টেক বাবু নিতে নেমে এসেছে। গভীর বুখে সুবাদ ছিল, তারেবাবুর খোঁজে ফাষ্টিবী থেকে ছোট-সাহেবের টেলিকোন এসেছিল। কেয়ার-টেক বাবু বীরপদর কথা জানাতে তার ওপর ইচ্ছা হয়েছিল ওকে সঙ্গে করে ওষুধের দোকানে পৌঁছে গিয়ে আসতে। অতএব—

বীরপদ আপত্তি করল না।

মধ্য কলকাতার সাহেব পাড়ায় মস্ত ওষুধের দোকান। বাস্তায় দশ-বিশ গজ দূরে দূরে যেমন দেখে তেমন নয়। চোখে পড়ার মতই। পোটা একটা দালানের সমস্ত নিচের ভলটা দোকানের দখলে। এম্বাখা-ওম্বাখা কাউন্টারে কম করে পনের বিশজন কর্মচারী পাঁড়িতে পারে। মাঝে মাঝে গ্রাসকেশ্-এ ওষু সাঝানো। কাউন্টারের এধারে আগাগোড়া শোহানোএল্ সেপ কাচ দরজার আলমারি। চার আন্ত লও ঝাঁক নেই ভিতরে, ওষুে ঠাসা। ভিতরের একদিকে 'ডিসপেনসিং' রুম—মিক্চার পাউডার ইত্যাদি তৈরি হয় সেখানে। অস্ত্রমিক ডাক্তারের চেম্বার। চেম্বারের সামনে পোষ্টাকতক লেখনি বেক পাতা কয়েকটা মোম-পালিশ চেম্বারও।

হুপুরে একবড় দোকানটার বিমস্ত অবস্থা। এমিক-ওমিক হু-চার জন খন্দের মাত্র। কর্মচারীও এসময়ে পাঁচ সাতজনের বেশি দেখল না। ডাক্তারের চেম্বার শূন্য। দূরে আর এক কোণে 'ডকে ডকে' আবা-কাঠ আর আবা কাচ-বেরা কাশ-চেম্বার।

হালকাখানের বিলিতি কারবার লোকান।

বীরপদকে সঙ্গে করে এনে প্রথমেই হ্যান্ডেলার বাবুর খোঁজ করল কেয়ার-টেক বাবু। চারটেয় আগে হ্যান্ডেলার বাবু ডিউটিতে আসেন না শুনে নিজের পছন্দ-মত বাইশ-চমিশ বছরের একটি

চটপটে হোঁকারকে ডেকে তার হাতে বেল সঁপেই দিয়ে গেল বীরপদকে। বলে গেল, সাহেবদের নিজের লোক তাই নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে—হ্যান্ডেলার এলে যেন তাকে বলা হয়, আর ভালো করে কাজকর্ম দেখানো হয়।

ছেলেটি সর্বোত্তম সাহেবদের নিজের লোকের আপামরমুখক চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়ল।

কর্তব্য শেষ। কেয়ার-টেক বাবুর প্রস্থান। বীরপদর ধারণা, সে-ও মিত্র-বাড়িতে আস্তানা নিতে পারে সেই আশঙ্কাতেই তার এই অন্তরঙ্গ সতর্কতা।

সত্তপরিচিত ছেলেটি দমিক আর তার রসনাও একটু বুখার। অন্তত সংভব নয় খুব। বীরপদকে নিয়ে কোণের বেঁকিতে বসল। নাম জেনে নিল, নিজের নাম বলল। রমেন, রমেন হালদার। ছ'বছর ধরে এই দোকানে কাজ করছে। বীরপদ আগে কোন্ দোকানে কাজ করত, ডিসপেনসিং শিখবে না কাউন্টারে পাঁড়াবে? কোনো কিছুইই অভিজ্ঞতা নেই জেনে অবাক একটু। এত লোক থাকতে আর একজন লোক ঢোকানো দরকার হল কেন? ও, সাহেবদের নিজের লোক তাই। মনে মনে হাসছে, কেমন নিজের লোক তা এই সামান্য কাজে ঢোকা দেবেই বুখে নিয়েছে।

চমৎকার দোকান? এ তর্রাটে বাঙালীর একবড় দোকান আর কই। এখন তো দোকান ঝাঁক, দেখবেন বিকলে আর সন্ধ্যার পর। সকালেও জিড থাকে কিছু, বিকলের মত অস্ত নয়। সন্ধ্যার পর তো এক-বুড়ি লোক কাউন্টারে পাঁড়িয়েও রিমসিয় খায়। আর ঠেলে রোগীও আসে তখন, সে-সময় আবার উত্তর মিসু সরকারের চেম্বার-আওয়ার্স তো—।

পলকের কৌতুকাভাস বীরপদর চোখ এড়ালো না। দোকানে সবসময় চারজন ডাক্তার বসেন। সকাল আটটা থেকে লশটা একজন, লশটা থেকে বায়েটা আর একজন। তারপর বিকলে চারটা থেকে ছ'টা একজন, শেষে ছ'টা থেকে আটটা মিস সরকার। প্রথম তিন ডাক্তারই বিশেষত কেরত, তবু মিস সরকারেরই রোগী বা রোগিনী বেশী। মন্তব্য, হবেই তো, রাতের নিকটেই সব রোগের জোর বাড়ে, দুবলেন না?

বীরপদ দ্বলল। মাত্র বাইশ তেইশ হবে বয়েস। পেকেছে ভালো।

মিস সরকার—কোম্পানীর কেউ, না শুধু ডাক্তার?

বাবু, এইটুকু থেকেই রমেন হালদার আরো ভালো করে বুখে নিয়েছে কেমন আপনজন সাহেবদের। নিশ্চিন্তে বুখ আলগা কল্পা যেতে পারে আরো একটু। বলল, আপনি কি রকম আপনায় লোক দাদা সাহেবদের—মিস সরকারকে চেনেন না। উনিই তো দণ্ডবুণ্ডের মালিক আমাদের। কোম্পানীর মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার, দোকানের ডাক্তার আর সুপারভাইজার, নাসি হোমের অর্কে মালিক। সকলে ঠিক পছন্দ করেন না, আমাদের কিন্তু বেশ লাগে দাদা—

ওদিকটা একবার দেখে নিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল।

ছেলেটা কান্নিল হলেও বীরপদর মন লাগছে না। হাসি-খুসিটা প্রাণবন্ত। নাসি হোম প্রসঙ্গে জানা গেল কোম্পানীর মজ

ভট্টার কোনো সন্দেহ নেই। ওর হালিক মিস সরকার আর ছোট সাহেব। ইকোয়াল পার্টনারস। মস্ত মস্ত ঘরের স্টাট, একটা মিস সরকারের বেড-রুম, দু'ঘর চারটে বেড, আর একটা ঘরে বামবাকি বা কিছু। মাস গেলে তিন ন' পঁচাত্তর টাকা ভাড়া—মেডিক্যাল অ্যাডভাইসারের ক্রী-কোয়ার্টার প্রাপ্য বলে ভাড়াটা কোম্পানী থেকেই দেওয়া হয়। আর, সেখানে আলমারি বোঝাই মেসব দরকারী পেটেট ওয়ুথ-টুথ থাকে তাও কোম্পানী থেকেই নাসি-কোমএর ডেড-এ অমনি যায়, দাম দিতে হয় না। খুব লাভের ব্যবসা লাগ, বুঝলেন?

আবার কি-হি হাসি।

ঘড়ির কাঁটা ঘরে ঠিক চারটের মানেজার হাজির। ব্রেট-খাটো, মোটোসোটা—রাধার কাঁচাপাকা একরাশ বাকড়া চুল। বসে পঞ্চাশের কম নয়। তাঁকে দেখেই রমেন হালদার চট করে উঠে এক দিকে ডেকে নিয়ে মিসকিন করে বলল কি। বীরাপদর কথাই হবে। কথার কঁকে ছেলেটাকে হাসতেও দেখা গেল। সাহেবের আপন জন জানানোর কৃতি হরত।

মানেজার ঘুরে পাড়িয়ে সেখান থেকেই গুরু দেখলেন একবার। সিম্পহ দুট্ট। প্রায় তাকিয়েই মতট। বিজ্ঞাপন সেখার প্রত্যাশার এসে অধিকা কবিবাজ বা নকুন-পুরনো বইয়ের লোকানের হালিক দে-বাবু যে চোখে তাকান অনেকটা সেই রকম। তাঁদের থেকেও নিঃসঙ্গ।

উঠে পাড়িয়ে বীরাপদ হুঁচাত জুড়ে নমস্কার জানালো। জবাবে তিনি বাকড়া চুলের মাথাটা একটু নাড়লেন শুধু। ভাকলেনও না বা কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না। ওর কাজের গুণাবলী বা কেতামতি রমেন হালদারই জানিয়ে দিয়েছে সম্ভবত। প্রথম নির্বাক কর্পনেই লোকটিকে রাগতারা কড়া মেজাজের মনে হল বীরাপদর।

ধানিক বাদে এক কঁকে রমেনই কাছে এলো আবার—মানেজারকে বললাম আপনায় কথা, ওর মেজাজ অমনি একটু ইয়ে ভো—বলছিলেন, কাজ জানে না ক'র জানে না হট করে আবার এক জনকে যাড়ে চাপানো কেন! আপনি কিছু ভাববেন না, আমি আপনাকে হুমিনেই শিখিয়ে দেব, কোন্ আলমারির কোন্ তাকে কোন্ বকমের ওয়ুথ থাকে এই ভো—

বিকল থেকে লোকানের চেহারা অন্তরকম। কর্মচারীরা একে একে এসে গেল। খন্দেরে ভিড়ও বাড়তে লাগল। পাইকিরি আর খুচরা দু-রকমের বিক্রী, ভিড় হবারই কথা। রমেন হালদার বাড়িরে বলেনি, সন্ধ্যার দিকে মিশেছারা অবস্থাই বটে। কর্মচারীদের বাস্তবিক তৎপরতা সঙ্গেও খন্দেরে তড়ায় তাদেরও ভাড়া বাড়ছে। ওটা আনো সেটা আনো, ওটা বার করে সেটা বার করে, ওটা দেখাও সেটা দেখাও—কে কোনটা আনছে, বার করছে, দেখাচ্ছে, বীরাপদ হাসি পেয়ে উঠছে না। এরাই মধ্যে একটু কঁকা হলে কাউটারের কাছে এসে পাঁড়ানো সে, আবার ভিড় বাড়লে বাইরের দিকে সরে আসছে, বা জায়গা থাকলে বেকিতে বসেই।

হুঁচা নাসাদ কুটপাখের ওপারে পাড়ি পাঁড়ান একটা। কোম্পানীর পাড়ি, টেপান-ওয়ানস পোহেব। জইভায় শব্দবতে মনে পিছনের দরজা খুলে দিল।

বে নামল, মনে মনে বীরাপদ তাকেই আশা করছিল হরত।... ভট্টার মিস লাংগ সরকার।

গোটা নামটা কেউ বলেনি তাকে। ভক্তারের চেহারার গায়ে আটোণ্ড: মিছিমিয়ানদের নামের বোর্ড থেকে দেখেছে। চারটে থেকে ছটার ভক্তার একটু আগে বিদায় নিয়ে গেছেন।

আগের দিনের দেখা তেমনই শিখিল চরণে লোকানো চুকল। পিছনে সেই চক্ক-বাগ হাতে ডাইভার। প্রতীকারত রোগীদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খন্দেরের পাশ কাটিয়ে ভিতরে চুকে গেল। ও-দিক দিয়ে অর্থাৎ লোকানের অন্ধর মহল দিয়ে চেহারে ঢোকায় আর একটা দরজা আছে। রোগীদের দেখার সময় বীরাপদর সঙ্গেও একবার চোখাচোখি হয়েছে, কারণ সে ওদিকটাতেই পাড়িয়েছিল। আলাদা করে কিছু খেয়াল করেছে বলে মনে হল না।

ভিতরে যেতে যেতে যে-কজন কর্মচারীর বুঝোমুখি হয়েছে, সকলকেই ভোড়-ভাত কপালে ঠেকাতে দেখা গেছে। রমেন হালদার ওদিক থেকে এসিয়ে এসে সামান্যসামনি হয়েছে এক তৎপর অভিযান জনপন করেছে। এমন কি এতক্ষণের হাক-ডাক আদেশ নির্দেশে ব্যস্ত মানেজার এই প্রথম বুঝে একটু হাসি টেনে একটা হাত কপালে তুললো, তাঁর অভ হাতে ওয়ুথের প্যাকেট।

একটু বাদে এদিকের দরজা ঠেলে রোগীদের সম্মুখীন হতে দেখা গেল তাকে। পারে ঢোলা শালা এগুন, হাত কছুরের ওপর গোটানো, গলার হাবের মত টেখোসকোপ কুলছে। দেখে বীরাপদও রোগী হবার বাসনা। বেকিটার ঠাসাঠাসি লোক। একটা বেকে শুধু মেরেছেলো। চেয়ারক'টাও খালি নয়। এসেই বোহার হাতে গ্রিপ দিতে হয়, সেই গ্রিপ অল্পবারী পর পর ডাক পড়ে। হায়া আগের পরিচিত রোগী অথবা হায়া শুধু রিপোর্ট করতে এসেছে—একে একে তাদের সঙ্গে সেখানে পাড়িয়েই কথা বলল। অল্পখের খবর নিল, প্রেসকুপশান দেখল তারপর নির্দেশ দিয়ে বিদায় করল। ওয়ুথ বসলানো হরকার বলে কাউকে বা বসতে বলল। তারপর গ্রিপ অল্পবারী একজন একজন করে নিজেই ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। আগের ভক্তারের সঙ্গে রোগী দেখার তারতম্য লক্ষ্য করল বীরাপদ। আগের ভক্তারটিকে একবারও চেহারে ছেড়ে উঠে আসতে দেখেনি। লাংগ সরকার পরবেক্ষণ শেষ করে প্রত্যেকটি রোগীর সঙ্গে বেরিয়ে আসছে আর পরের জনকে ডেকে নিচ্ছে।

বীরাপদর আর কেনা-বেচার দিকে ফিরে বাওয়া হয়ে উঠল না। সেই এক জায়গাই পাড়িয়ে আছে। বেকির খাল জায়গা নকুন রোগী বা রোগিনীর আবির্ভাবে ভরে উঠতে সময় লাগছে না। সকলে গ্রিপ পাঠাচ্ছে তাও নয়। মনে মনে বীরাপদ হিম্মতে মিরর বুদ্ধির তারিক করেছে এরাই মধ্যে। এমন সবল আকর্ষণ মনোর দরপ বাহাদুরী প্রাপ্য বটে। মহিলার গলার ঘরটি পর্বত চেহারার সঙ্গে মানায়। মেরেদের তুলনার মিটোল ভরাট কর্তব্য। চোখ বুজে ওনলে মনে হবে অল্পবয়সী মেলের যিষ্ট গলা। মতবার বেজছে, বীরাপদ নিরীকণ করে দেখছে। নাহাও মানায়। লাক্য। নাহী-বুলত চলছে লাংগের চিহ্নমাত্র সেই বসেই উই মার বেশি মানায়। বা আছে সেইটুকু উপলব্ধি করার মত, দেখার

নয়। রত দুই কপা নয়, কপা কবার চোঁও নেই। চুল
টেনে বাঁধা, কলে ও-বিক থেকেও কিছুটা লাগা চুবি। চোখের
দুটি গভীর অথচ নিঃস্বোচ, কিছুটা বা নিপিন্ড। চোঁটের কীকে
একটু আঁচু হাদির আভাস কমণীর বটে, কিন্তু তেমন অস্তরক নয়
বলেই অনমনীয় মনে হয় আরো বেশি। এক ধরনের জোহালা
শ্রীতার আড়ালে নারী-মাদুর্ষ প্রচ্ছন্ন বাধার মধ্যেই লাগা নাম
সার্থক মনে হল বীরাপদর।

পুত্র-বর চোখ অলঙ্কারে বহুই উকিঝুঁকি দিক, অমন মেয়ে সামনা-
সামনি হলে নিজেকে বোঁসর ভাণা লজ।

লাবণ্য সরকার সেটুকুও জানে যেন।

বেঁকি আর চেঁচার প্রায় ঝাঁক। এমিক-ওমিক হুই-একজন
মনে ভখনো। শেষের বে সোঁকটিক ঢেকে নিয়ে গেছে তাকে দেখতে
সময় লাগল একটু। ইতিমধ্যে আরো জনাকিতক নতুন আগন্তুক
বেঁকি লখন করেছে। এবই মধ্যে হু' জোড়া বোধ হয় হামি জী।
আগেও হু'-চার জনকে সন্তুক আসতে দেখেছে। হামিটি বোঁগী কি
জীটি বোঁগিনী বীরাপদ অনেক কেহেই ঠাওর করে উঠতে পারেনি।
এই নতুন লক্ষ্যতাদের দিকে চেয়েও মনে মনে বোধহয় সেই
গবেষণাতেই মগ্ন ছিল।

রজা টেনে সাবর্ণ সরকার বেঁকিত আবার নতুন আগন্তুক দেখে
ছোট একটা নিখোঁস কেলল। তার পনে বীরাপদর দিকেই চোখ
পেল তার। কে তেমন খোঁসল কলেনি, অনেকরূপ ধরে দাঁড়িয়ে
আছে চুপচাপ, শু-সেটুকুই লক্ষ্য করেছিল। যে ক'জন প্রতীকারত

তাদের সকলের আগে এসেছে ভেবেই ভাকল, এবারে আপনি
আগুন।

সমস্ত দিনের উপোদী মুখে অসুস্থতার ছাপ পড়াও বিচ্ছিন্ন নয়।
বীরাপদ বতটা সস্তর কোথায় দিকে আর বাটবের দিকে মুখ করে
দেখাল ঠেস গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। খতমত খেয়ে নিজের অগোচরেই
হুই-এক পা এগিয়ে এসে। আহ্বানকারিণী চেঁচাবের দিকে এগোতে
গিয়েও হুঁধের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। হুই ভুঁকর মাঝে কুকুন
বেখা। কিছু মরনের চোঁ। আপনি...আচ্ছা, আগুন।

ভিতরে ঢুকে গেল। অগত্যা বেঁকি ক'টার পাশ কাটিয়ে
বীরাপদও।

একটা ছোট টেবিলের এমিকে হুটো চেঁচাব, উটো দিকে
ডাক্তারের নিজের। টেবিলের ওপর প্রেসকপশানশাড আর সেই
বড় কোলিও ব্যাগটা। দেহালের গায়ে হাত দেড়েক চওড়া বোঁট
পরীকার ধপধপ বেত।

নিজের চেঁচাবটা টেনে বসল লাবণ্য সরকার। ওকে বসতে বলল
না। কাছে এসে না দাঁড়ানো পর্বত সরাসরি চেঁচাবটল। কুল
হচ্ছে কি না সেই লক্ষ্যর।—আপনাকে...আপনিই কাল খিটর
খিটর গাড়ি গেটলেন না?

বীরাপদ মাথা নাড়ল, গিয়েছিল।

আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?

সিতাভবাবু এখানে আসতে বলেছেন গুনলাম...

গতকাল হিমাণ্ডাবাবু বলে খোঁক করতে লাগবা সরকার হুই



'নিম'এর তুলনা নেই

২০০০ বছর ধরিয়া ইহার উপকারী গুণগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত

দাঁত স্ফূট করে মাটিও
সুস্থ রাখে

নিম টুথ পেস্ট

ইহা নিমের সক্রিয় ও উপকারী গুণ
এবং আধুনিক টুথ পেস্টগুলিতে ব্যবহৃত
ঔষধাদি সমন্বিত একমাত্র টুথ পেস্ট



পত্র লিখিলে নিমের উপকারিতা
স্বকীয় পুস্তিকা পাঠান হয়।

..... মি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা-২২

MT-186, NP-3

এক পলক চোরে থেকে বাহুক মিঃ মিত্র করে নিয়ে জবাব দিয়েছিল
বীরাপদর মনে আছে। আজও বুকের ওপর ঠাণ্ডা ছই চোখ একবার
খুলিয়ে নিয়ে খুব সাশাসিবে ভাবে বলল, তিনি সমস্ত বিজ্ঞানের
জ্যোতিষজ্ঞান চাক—সকলে ছোট সাহেব বলে। তা আপনি সেই
থেকে ওখানে কাড়িয়ে কি করছেন, কাজ-কর্ম দেখেছেন নিন—
ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

বীরাপদ বাড়ি বাড়ার আগেই টেলিফোন বোতাম টিপল। বেয়ারা
হাজির।

ম্যানেজারবাবু—

পরক্ষণে ভিতরের দরজা ঠেলে ম্যানেজারের আবির্ভাব। হোণী
জাফার কল লাকবা সরকার চেয়ার ঠেলে উঠে কাড়তে কাড়তে
বলল, ইনি ওদিকে কাড়িয়ে কেন, কি কাজ দেখিয়ে-টেঁপিয়ে দিন—
বান এঁর সঙ্গে।

দেখের নির্দেশ বীরাপদর উদ্দেশ্যে। গুরুগম্ভীর ম্যানেজারের
সঙ্গে বিহ্বল দৃষ্টি বিনিময়। তাঁকে অসুস্থ করে ভিতরের দরজার
এবারে আসতেই বিরক্তি চাপতে পারলেন না ডক্টরলোক।—ওদিকে
ঐ করে দেখার কি ছিল, এদিকে বান—চূপচাপ দেখুন কি হচ্ছে না
হচ্ছে। এই তাড়াতাড়ির সময় কাজ দেখান বললেই দেখানো যায়
না, কাজ শিখার জন্যে পুণ্ডর নিবিবিলিতে এসে দেখতে হবে—
পঞ্চমক কনতে করতে আবার একমিলক চাল পেলেন তিনি।

বাণীধর-পন্থিক লেখ বীরাপদর চানিত পাচ্ছে। ভিতরের দরজা
দিয়ে দেখিয়ে আসার রক্তন কাউটারের কর্মচারীদের সঙ্গে মিশে গেছে
সেও। কেনা-বিক্রয় চিকিত্সক কয়েনি জ্ঞানো। হাজির হংসবতার
কর্মচারীরা ওটটুকু পরিসরের মধ্যেই একে অজ্ঞের পাশ কাড়িয়ে
আলমারির কাগজ-বক্সা ঠেলে ঠেলে ওখুঁদে বার করছে—মিলি, বোতল,
প্যাকেট, ট্যাবলেট। এ-মাথা ও-মাথা তাক-ঠাসা আলমারির মধ্যে
কোথায় কোন্ খুঁটাটি বসটি রয়েছে তাও বেন সকলের নথদর্পণে।
বীরাপদ ওখুঁদে জ্ঞানক কনতে, এভাবে ওখুঁদে বার করতও দেখতে—
কিন্তু কাজটা যে এমন চর্যেণ বকয়ের চক্কর একবারও ভাবেনি।
হালদার আশাস দিয়েছিল ছ' দিনেই শিখিয়ে দেবে, “হু” বহুরেও
ওর দায় হবে কি না সন্দেহ।

আজ্ঞা, আপনি ও-দিকে সরে পীড়ান না, কাজের সময়—

সচকিত হয়ে বীরাপদ তিন চাব ভাত সবে পীড়াল, প্যাসেজ
জুড়ে আড়া-বাড়ি কাড়িয়েছিল বলে বিরক্তিতা তাইট উদ্দেশ্যে। খানিক
বাদে আলমারি খুলতে বাধা পেয়ে আর একজন বলল, “সবে পীড়ান।
বীরাপদ আবার ছ’-চাব পা সরেছে। একজন খানসর ওর খুঁদেখুঁদে
কাড়িয়ে প্রেসকরণান এগিয়ে দিতে বিহ্বল মুখে হাত বাড়িয়েছে, সেই
সঙ্গে কর্মকর্তা বাস্তবতা হাত বাড়িয়েছে পানের কর্মচারীটিও। হাতে
হাতে কলিমান। অকুট বিরক্তি, আপনি এটা নিয়ে কিছু বুঝবেন
এখন ? সফল ওদিকে—

বীরাপদ আবারও সরেতে।

আজ কুটার মধ্যে এমনি বার কতক তাড়া খেতে সবচেয়ে সবচেয়ে
বীরাপদ একেবারে দরজার কাছটিকে এসে গেছে। তার পাশেই
তখন বেলোকাটি কাড়িয়ে সে বহি সবচেয়ে বলে, চাক-দরজা ঠেলে
বীরাপদকে এর পর দোকানের বাইরে এসে পীড়তে হয়।

ক্লান্ত অপেক্ষা না দেখে বীরাপদ বাইরেই চলে এলো।

কাঁকা বাস্তব পা চালিয়ে দিয়ে বস্তির নিকোস কেলল। কিছুই
করতে হয়নি তবু বেশ একটা ধকল পেল বেন। চাকরি পূর্বে
এখানেই ইতি, আর এ-খুঁদে হচ্ছে না। শান্তি। বিবেকের
তাড়নায় ভুগতে হবে না আর।

কিন্তু পরদিন এ-নিশ্চিন্ততা পুণ্ডর ও-খার পূর্বে গড়ালো না।
ওখুঁদের লোকানের কাউটারে কাড়িয়ে ওখুঁদে বিক্রী করার চাকরি দেবার
কাজে চাকরির এমন আগ্রহ—সেবকম কিছুতে মনে হচ্ছে না।
হিম্যাং মিত্রকে লেখা চিঠির স্বর, চিঠির ভাষা মনে আছে।
লিখেছিলেন, নিষিদ্ধার দায়ব জেওরা যেতে পারে। সেটা এই
দায়ব ? তাহাড়া চিঠি খোলা হয়েছে ধরে কেনেও হিম্যাং মিত্র কে-
ব্যবহার করেছেন আর যে-কথা বলেছেন তাতে কাউটারে কাড়িয়ে
ওখুঁদে বিক্রির কাজটা ঠিক প্রত্যাশিত নয়।

নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের মাসিক দে-বাবুর সঙ্গে দেখা
করবে বলে বেরিয়েও বাস্তব বললে বীরাপদ মধ্য কলকাতার সেই
ওখুঁদের দোকানে এসেই ঢুকল।

আগের দিনের মতই পুণ্ডর নিবিবিলি পরিবেশ। আজও সেই
ছোকরা অখাং রমেন হালদারই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো।—গালা
কাল পালানো কখন ? ম্যানেজারকে না বলে করে ও-ভাবে বার।
ম্যানেজার চটে লাল, কাজা মাহুদ তো—আজ শোনাবে খন। তা-
হাড়া সকলেও তো এলেন না, ডিউটির টাইমও ঠিক হল না।

তা সত্ত্বেও মুখে কোনোদরকম উৎকর্ষার আভাস না দেখে একটু
বোধহয় বিস্মিত হল সে। পরামর্শ দিল, বাই-বলুক, মুখ শুকিয়ে
বলবেন, নতুন মাহুদ ভুল হয়ে গেছে—

একটু বেশি তড়বড় করলেও ছেলেটাকে গতকালই ভালো
লেগেছিল বীরাপদর। এই নীরস কর্মকর্তার মধ্যও প্রাণবন্ত।
অজ্ঞের কান কাঁড়িয়ে কোণের বেঁকিতে বসে বীরাপদ বলল, ম্যানেজারের
কাজে জাবনা নেই, ফাউরীটা কোথায় বলে দেখি তাই ?

প্রশ্নটা শুনে হালদারকে আসন পরিগ্রহ করতে হল। সেখানে
যা-যেন ?

মাথা নাড়ল।

সাহেবদের সঙ্গে দেখা করবেন ?

ছ’চোখ গোল হতে দেখে বীরাপদ চেসেই ফেলল।

চেলেটাও হাসল।—আমাদের কাছে ওঁরা আবার ভগবানের
মতই কি না... আসনি এখানে কাজ করবেন না ?

দেখা হাফু—

ফাউরীর হাসি দিয়ে রমেন আবারও সপ্নের প্রকাশ করল,
কিন্তু আপনি ভিতরে ঢুকবেন কি করে, দরজার তো বন্দুকওয়ালা
পাহারা—এনকোয়ারি ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করতে হবে, সে সন্ধ্যা
হলে সাহেবদের টেলিফোন করবে, কতুম্ব হলো তবে যেতে হবে।

এত গুণগোল জানত না, বীরাপদ হয়ে গেল একটা।

পরক্ষণে রমেনই আবার একটা সচক পথ বাস্তব দিল। জানালো,
তিনটের সময় গাড়ি বাবে ফাউরী থেকে মাল আনতে, ভাইভারকে
বলে দিলে লোকানের কর্মচারী ‘হসসে’ সেই গাড়িতেই বীরাপদ
বিনা বাধার ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। সচক পথ দেখিয়ে দেবার
কলে ভটও পেল একটু, কিন্তু সাহেবরা যেসে যাবেন না তো ?
আমি খসড়া বলবেন না-বেন-

বীরাণব হেসে অস্তর দিল তাকে, তার কোনো ভয় নেই।
তিনটে বাজতে দাঁড়াখানেক দেখি তখনো। ম্যানেজার
জামার আগেই সরে পড়তে পারবে সোটা মদ নয়।

রমেন হালদার গভীর মুখেই বলে যেতে লাগল, দেখুন, যদি
অন্ত কিছু গেরে বান, এখানে আমাদের বা মাইনে—ত'বস্তর ধরে
আছি, পাচ্ছি মাত্র একশ পঁচিশ—চলে আন্তকালকার দিনে ?
ম্যানেজারই পায় মাত্র সাড়ে তিনশ' সেই গোড়া থেকে আছে,
আমাদের আর কত হবে। অল্প কিছু টাকা হাতে গেলে নিজেই
একটা লোকান খুঁতাম, আঁট-বাঁট সব জেনে গেছি, টাকাই নেই
কি হবে—।

সমস্তার কথা ভুলে কি মনে পড়তে চপল কোঁতুলে তুচ্ছ
উৎসুক হয়ে উঠল তার। উত্তর মিস সরকার কাল আপনাকে
ঘরে ডেকে কি বললেন ?

বিশেষ কিছু না।

সংক্ষিপ্ত জবাব মনঃপুত হল না বোধহয়। একটু অপেক্ষা
করে বলল, কিন্তু তাঁকে ডিঙিয়ে আপনি সাঁচেরঘের সঙ্গে দেখা
করবেন—সাহেবরা তো আবার তাঁর কথাকেই ওঠেন বসেন, বিশেষ
করে ছোট সাঁচের—এখানকার বা কিছু সবই মিস সরকারের হাতে।

বীরাণব নিরস্তর। এটুকু দুর্ভাবনার কথা মনে মনে নিজেও
উপলব্ধি ক'ছে হয়ত। কিন্তু সত্যিই চিন্তিত নয় তা বলে,
বেটুকু নাড়াচাড়া করে দেখছে, খেলার ছলেই দেখছে। এককালের

নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে কিরে বেতে মনের একটা দিক সব-সময়েই
প্রস্তুত।

—কিন্তু বাই বলুন জাদা—অস্তরজ জনের কাছে মনের
কথা ব্যক্ত করার জন্মেই যেন আরো কাছে যুঁকে রমেন
হালদার গলা ধাতো করে বলল, মিস সরকারকে আপনার
ভালো লাগেনি ? যতক্ষণ থাকেন উনি আমার কিছু বেশ লাগে,
অমন জোরালো মেরেফেলে কম দেখেছি, আর তেমনি চালাক
—মাইনে বাড়িয়ে নেবার জন্য একটু ইয়ে করতে গিরে আবার
বা অবস্থা শুনেলে আপনি হেসে মরবেন—

হেসে মরার বাসনা না থাকলেও বীরাণব শোনার প্রক্কর
আগ্রহটুকু অকৃত্রিম! মিস সরকারকে তারও ভালো লেগেছে কি
না জিজ্ঞাসা করতে নিজের অন্তস্তলে হঠাৎই যেন এক কলক
আলোকপাত হয়েছিল। বীরাণবর বা স্বভাব, মিত্র বাড়িতে
গতকাল ওই রকম প্রতীকার পর 'কেন্দ্র-টেক' বাবুর সঙ্গে তার
দুযুগের লোকান পর্যন্তই আসার কথা নয়। আসার পিছনে নিজের
অগোচরের একটুখনি আকর্ষণ ছিল, যানকের মুখে মেম-ডাক্তারের
কথা শুনে রমণীটিকে আর একবার দেখার বাসনা হয়েছিল বইক।
সেই বাড়িতে অল্প একটু দেখার ঝাঁকে তার নিলিপ্ত বলিষ্ঠতাটুকু
এক ধরনের কোঁতুল যুগিয়েছে। তাই মনে হয়েছে, ভালো করে
দেখা হয়নি, ভালো করে দেখতে পারলে কিছু যেন আবিষ্কারের
সম্ভাবনা। ধপধপে শালা মোটরে তার পাশে সিতাও মিত্রকে

অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতিষার্ঘব, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লণ্ডন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত কলিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কাশীর বারাগনী পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারী সভাপতি।
ইনি দেখিবারাম মামবজারনের কৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোজী
বিচার ও প্রস্তুত এবং অন্ত ও দৃষ্ট প্রহাতির প্রতিকারকল্পে শাস্তি-পন্থারাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়ায় ও প্রত্যেক কলপ্রদ
কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন
রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা,
আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষীলগ ঠাহার অলৌকিক
দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রাশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও কাটালগ বিনামূল্যে পাঠবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে বাছারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিন্দু হাইনেস মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস মাননীয় বটমাস্তা মহারাজী ত্রিপুরা স্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি
মাননীয় ভারত সম্রাটমহাশয়ের কে-টি, সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর ভারত সম্রাটমহাশয়ের কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের
প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি. কে. রায়, বম্বী গভর্ণমেন্টের মহারাজাবাহাদুর শ্রীঅসমের রাজকর্ত, কেউনগড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব
মিঃ এল. এম. রায়, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল ভারত কল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে. রূচপল।

প্রত্যেক কলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য কবচ

ধর্মকর্ম কবচ—ধারণে ক্ষমতাসহ প্রভুত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (ভরোক্ত)। সাধারণ—৭১৮/০, শক্তিশালী
বুধ—২২১৮/০, মহাশক্তিশালী ও সম্বর কলারক—১২২১৮/০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্যের কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর
অবশ্য ধারণ কবচ)। লক্ষ্যভূমি কবচ—সমরশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষার দৃষ্টি ২১১/০, বুধ—৩৮১৮/০। মোহিনী (বলীকরণ) কবচ—
ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুংস্ব বশীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১১১/০, বুধ—৩৮১৮/০, মহাশক্তিশালী ৩৮১৮/০। বঙ্গলাক্ষ্মী কবচ—
ধারণে অভিলষিত কর্মোত্তি, উপরিষ্ট মনিক কল সন্ততি ও সর্বপ্রকার মায়মায় জয়লাভ এবং প্রবল শক্তিশালী ২৮/০, বুধ শক্তিশালী—৩৮১৮/০,
মহাশক্তিশালী—১১৮১/০ (আমাদের এই কবচ ধারণে জগদ্বাল সম্রাটী জয়ী হইয়াছেন)।

(হাণ্ডিভা ১০০ বঃ) অল ইণ্ডিয়া এণ্টোলজিক্যাল এণ্ড এণ্টোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ব), বরকলা স্ট্রিট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশ পথ ডয়েলসলী স্ট্রিট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০৫৫।

সম্বর—বৈকাল ৪টা হইতে ৫টা। ব্রাহ্ম অফিস ১০৫, প্রে স্ট্রিট, "বল্লভ বিদ্যাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৬৮৫। সম্বর প্রাতে ১টা হইতে ১১টা।

একখানি নিষ্কণ্ড নিখার পাশে ঢল পতনের মত মনে হয়েছিল বীরাপদর। বখন ধূনি গ্রাস করতে পারে, শুধু তেমন তাড়া নেই যেন—।

লোকানের অমন কাজের খন্ডের মধ্যে মস্তিষ্কার আকর্ষণীয় বায়ুগতি কর্ম-রথের বলগা-ধরা সারথিনীর মত। ত্রুটি নেই অথচ এক ত্রুটিতে সব ওলট-পালট হতে পারে সেই গোছের অদ্ভুত। বীরাপদ তমস্র হয়েই দেখছিল, সমস্ত দিনের অনাধারের ক্লেশও ভুলে গিয়েছিল। পলকে সময় কাটছিল। তমস্রতার ছেদ পড়েছিল ডেকেই ডেকে বসতে, শুধু তাই নয়, হকচকিয়েও গিয়েছিল একটু। কাঁটটারেই সেই বরফের অভিজ্ঞতার কলো আর দোকানমুখো হবার কথা নয় বীরাপদর। নানান সম্ভাবনা বিলম্বণ করে তবেই এসেছে বটে। কিন্তু কোথায় অলস? একটু তাগিদও ছিল। রমেনের কথার ধরা পড়ল। ভালো লাগার আকর্ষণে না-হোক, এক ধরনের লোভনীর মনসিজ রেখাবিহির আকর্ষণ যেন ছিল। ওই ধরনের মেয়ের প্রতিকূলতা করতে পারার মতই পুরুষোচিত লোভের হাতছানি একটু। তুলনায় কাল নিজেই বড় বেশি তুচ্ছ মনে হয়েছিল বলেই পুরুষ-চিত্তের সহজাত উদযুতিনি আজও তাকে দোকানের দিকে টেনেছে বোঝার। দেখাই থাক না কি হয়, ওম্বু বিক্রি করতে তো আর বাচ্ছে না।

মাইনে বাড়ির নেবার উদ্দেশ্যে লাথবা সরকারের সঙ্গে একটু ইয়ে করতে গিয়ে কি হাল হয়েছিল, মনের আনন্দে রমেন সেই কাঁদর লাখা-প্রাখা বিস্তার করে বসেছে। অনেক দিন পায়তাদা করে সামনে সামনে ঘুর ঘুর করেছে, মিস সরকার এলেই ভিতরের দরজার কাছটিতে কাজ নিয়েছে সে, বেদারাই ইনজেকশানের স্প্রিং দিয়ে এলেই প্রত্যেক বার নিজে গিয়ে ইনজেকশানের ওম্বু সাপ্লাই করেছে, বেদারাই হাত দিয়ে পাঠায়নি। মিকন্ডারের প্রেসকৃপশানও নিজে নিয়ে এসেছে। মিস সরকার ইনজেকশানও দেন সব থেকে বেশি, মিকন্ডারের প্রেসকৃপশানও করেন সব থেকে বেশি। ইনজেকশান দেবার ওম্বু হ' টাকা করে পান—কম্পাউণ্ডার ইনজেকশান করলে এক টাকাতাই হয়, কিন্তু রোগীর সামনেই বখন ইনজেকশান চেয়ে পাঠান রোগী তো আর বলতে পারে না এক টাকা বাঁচানোর জন্তে কম্পাউণ্ডারের হাতে ইনজেকশান নেবে। ওদিকে মিকন্ডারের প্রেসকৃপশানেও টাকার চায় আনা লাভ। কম চল নাকি। হ' শ' টাকা মাইনে পান আরো কোন্ না চায় পাচশ' এই করে হয়? রোগীদের কাছে ওনারই তো কদর বেশি, এই রোগজগতের ওপর নাসি হোমের রোগজগার—ভাবুন একবার। তা বাই গোক, মাইনে যদি কিছু বাড়ে আর নাসি হোমেও যদি একটু কিছু পাট টাইম কাজ-টাজ ছোট্টেই আপায় রমেন হালদার অনেক দিন বলতে গেলে ওনার পারের জুতোর সঙ্গে মিশে থাকতে চেষ্টা করেছিল। তার পর সুযোগ-সুবিধে ঘুরে একদিন—আর বখন একটুও রোগী নেই বাইরে, দুর্গা-গণেশ শ্রবণ করে ভিতরে এসে দিদি বলেই ডেকে বসেছিল বর্ণ করে। যতখানি সম্ভব করণ করেই দিদি ডেকেছিল, নিজের দিদি হলে ওটুকুতেই রেখে চকু হুলহুল করে ওঠার কথা—

তার পর? তার পর সে যা হল—রমেনের মুখ আয়সি। দিদি ডাক শুনেই এমন ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন যে মনে হচ্ছিল তার

সমস্ত মুখে যেন দু টুকরো বরফ বোলানো হচ্ছে। সে একেবারে বোবার মতই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু বাদে মিস সরকার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি বলবে?

রমেনের মনে হয়েছিল চোখের থেকেও গলায় স্বর আরো ঠাণ্ডা, একেবারে হাড়ে গিয়ে লাগার মত। যা বলবে বলে এসেছিল ততক্ষণে সব ভুল হয়ে গেছে। যা মুখে এসেছে তাই বলে বসেছে। বলেছে, আজ একটু আগে বাড়ি বাওয়া দরকার ছিল।

রমেনের ধারণা, এতখানির পর এর থেকে অনেক বড় কিছু নিবেদন আশা করেছিলেন মিস সরকারও। আর দিদি ডাক না তুলে জবাব দেবার জন্তেও তৈরি ছিলেন। ওর আরজি শুনে ঠাণ্ডা ভাবটা কমলো একটু। রাত প্রায় নটা বাজে তখন, তা ছাড়া ছুটি কেউ কখনো গুর কাছে চাইতে আসেন না, একদিন-দু'দিন পর্যন্ত ছুটি ম্যানেজারই মঞ্জুর করে থাকেন। কিন্তু রমেন তো আর অতসব ভেবে বলেনি, যা হোক কিছু বলে ঘর থেকে পালাবার জন্তেই বলেছে। কিন্তু কি বিজাটেই না পড়তে হল ডেকে ওটুকু থেকে—পাঁক করে টেবিলের বোতাম টিপে বসলেন মিস সরকার, ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, এর বোধ হয় একটু আগে ছুটি দরকার, দেখুন।

বাস, বাইরে এসে ম্যানেজার হাঁ করে খানিক চেয়ে রইলেন ওর দিকে, কারণ, তিনি তো জানেনই যে ওর ডিউটি শেষ হয়েছে প্রায় খটাখানেক আগে—ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারত।

তারপর এই মারেন তো সেই মারেন।

ফলিটা রমেন হালদার মল বাতলে দেখনি। বিনা বাধায় সংসারি একেবারে ক্যান্টিনের এলাকায় মধ্যে ঢুক পড়া গেল। কোম্পানীর গাড়ি দেখে গট-ম্যান গোটা কটক খুলে দিল। বন্ধ হাতে যেখানে পাহারাওয়াল বসে, সেখান দিয়ে পাশাপাশি ছুঁজনও ঢুকতে বা রক্ততে পারে না।

কিন্তু এভাবে ভিতরে ঢুকই বীরাপদ যেন আরো বেশি কাপরে পড়ে গেল। কোথায় কেন্দ্রিক বাবে কিছুই হসিস গেল না। বিস্তৃত যেখানে এলাকার মধ্যে তিন চারটে ছোট-বড় দালান। দালান বলতে বিশাল এক-একটা গুদোম-খোর মত। শুধু মাঝখানের বড় দালানটা তিন-তলা। অল্পমানে বীরাপদ সেদিকেই এগোলে।

তালকানার মত নিচের বড় বড় ঘরগুলোতে এক চক্কর ঘুরে নিল। কোনো ঘরে সারি সারি মেসিনের মধ্য দিয়ে টুপটুপ করে অবিরাম ট্যাবলেট বৃষ্টি হচ্ছে। কোনো ঘরে মেসিনে করে-গোটা দশেক বিশাল বিশাল ডেকাট যোরাণো হচ্ছে—সব ক'টার মধ্যেই নানা আকারের ট্যাবলেট। একজন লোক ডেকাটের মধ্যে এক-এক রকম রঙের মত কি ঢেলে দিচ্ছে। ট্যাবলেট রঙ-করার ব্যাপার বোধহয়। আর একটা ঘরে ইলেকট্রিক ফিট-করা গোটাচক্কর মত মস্ত আলমারি। এক একবার খোলা হচ্ছে, বন্ধ করা হচ্ছে। প্রত্যেক তাকে হাতল-জলা বড় বড় ট্রেতে গুঁড়ো ওম্বু তাকানো হচ্ছে।

কর্মরত এ-পরিবেশটা বীরাপদর ওম্বুর দোকানের থেকে অনেক ভালো লাগল। নিচে না ঘুরে ওপরে উঠে এলো। সেখানও ঘরে ঘরে ছোট ছোট বস্ত্রপাতি সাজ-সজ্জা—বস্ত্রের ধারণা, ওম্বু

বিপ্লবের কাজ চলছে এখানে। খৌজ নিয়ে জানা গেল হিম্মত মিত্র আজ আসেন নি, আর সিতাং মিত্র কট্টোঁস হয়ে।

কট্টোঁস-কমের খোঁজে এমিক-ওমিক বিচরণের ফলে একটা প্যাম্পের মুখে বার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা, সে মেডিক্যাল অ্যাক্সিডেন্টের লাভণ্য সরকার। একটা প্যাম্পেট পড়তে পড়তে এমিকেই আসছিল। বীরপদ পাশ কাটিয়ে গেলে লক্ষ্যও করত না হয়ত। কিন্তু বীরপদ কাঁড়িয়ে পড়ল আর চেয়ে রইল।

কাছাকাছি এসে প্যাম্পেট সবিয়ে মুখ তুলল লাভণ্য সরকার। নিজের অগোচরেই বীরপদর যুক্ত-কর কপালে স্পর্শ করল। ওমিকে প্যাম্পেট-ধরা হাতখানা সামান্যই নড়ল। আপনি এখানে যে?

বীরপদ একবার ভাবল বলে, এমনি ফাঁকী দেবতে এসেছে। বলে ফেললে পরে নিজের গুপ্তেই রেগে যেত। জবাব দিল, সিতাং বাবু—হোট সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করব বলে এসেছিলাম।

নামের তুলটা হয়ত ঠুঁছে করই করল আর গুথরে নিল। লাভণ্য সরকার বলল, তিনি ব্যস্ত আছেন, আপনাব কি দরকার?

...আমাব দরকার ঠিক নয়, খামল একটু, আমাকে তাঁর দরকার আঁকে কি না জেনে নিতে এসেছিলাম।

জবাবে বা দাঙাবিক তাই হল। হুই চকু ওর মুখের ওপর প্রায়িত হল। কিন্তু বীরপদরই বরাংক্রমে সম্ভবত আর বাকবিনিময়ের অবকাশ থাকল না। ফিটফাট সাহেবী পোষাক-পর্য হুটি লোক হস্ত-সজ্জ হরে লাভণ্য সরকারকে চড়াও করে ফেলল। এক জনের হাতে খোলা মেডিক্যাল জার্নাল একটা, আর একজনের হাতে বই। মুখে কিছু একটা আবিষ্কারের ব্যগ্র আনন্দ। বই আর জার্নাল খুলে কোনো সমতা-সংক্রান্ত তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার।

লাভণ্য সরকার নিঃস্বস্ত দৃষ্টিতে চোখ বোলাল-একবার, তার পর বলল, চলুন দেখছি—

এক পা এগিয়েও বীরপদর দিকে কিং-তাকালো।—মিঃ মিত্র ওপরে।

হু' পাশের হুই ডয়লোকের সঙ্গে সামনের দিকে এগোলো। বীরপদ চেয়ে আছে। ভক্তসমাবেশে অচপল-চরণে দেবীর প্রস্থান।

সিতাং মিত্রের সঙ্গে দেখা করার আর তেমন তাগিদ নেই। দেখাটা হিম্মত মিত্রের সঙ্গে হওয়ারই বাঞ্ছনীয় ছিল। পায় পায় উপরে উঠল তবু। সামনের এ-মাথা ও-মাথা বিশাল হল-ঘরের দরজার সামনেই পাঁড়িয়ে গেল। এখানকার কর্মরত দৃষ্টা নয়নাভিরাম। হল ভরতি ভিন সারিতে নানা বয়সের প্রায় একশ লোক ডিসিটিলড ওয়াটারে আমপুল মুছে। প্রত্যেকের সামনে কম-কিট করা একটা করে বেলিন। কলের হু' দিয়ে রেখার মত তাঁদের নামে জল পড়ছে। এক-একটা আমপুল ধোয়া হতে ভিন সেকেন্ডও লাগছে না। তার পর জ্বালের মত গর্ত-করা কাঠের ঘাকে উপড় করে বাধা হচ্ছে সেগুলো। গোটা হলঘরটাই সেই উপড় করা আমপুল-এ ধকধক করছে। প্রয়োজন তুলে বীরপদ জই দেখতে লাগল।

হলের ও বাধার দরজার সর্বার্ধ সিতাং মিত্রের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে আমপুল-ধোয়া কর্মীদের বাড়তি নিষিদ্ধাটুই উপলব্ধি

করা গেল। সিতাং মিত্র হু' পাশ জনা-পাঁচেক অসুগত দৃষ্টি, হাত নেড়ে তাদের উদ্দেশ্যে কি বলতে বলতে এমিকে এগিয়ে আসছে। এ দরজার দরোয়ান শশব্যস্তে টুল হেঁড়ে বুকটান করে পাঁড়ালো।

এক নজরে মালিক চেনা বার।

এমিকের দরজার কাছে পাঁড়িয়ে হুই এক কথার পর অসুসরণরত পার্শ্বদলের মধ্যে হু'জনের দ্ব্যস্ত প্রত্যাবর্তন। তার পর বীরপদর সঙ্গে চোখাচোখি।

চৌকাঠ পেরিয়ে সিতাং মিত্র এগিয়ে এলো। অস্ত্র ভিন জন ভব্যতার দানে সেখানেই পাঁড়িয়ে।

আপনি...ও আপনি। ছোট সাহেবের মনে পড়ছে, আপনাকে তো কাল ওয়ুধের দোকানে যেতে বলেছিলাম—বাননি?

বীরপদ বাড় নাড়ল, গিয়েছিল।

কথাবার্তা হয়নি বুঝি কিছু, আমারও মনে ছিল না। আজ আপনি সেখানেই বান, আমি বলে দেবখন।

বীরপদর মুখে বিস্তৃত হাসির আভাস একটু। সেখানে কাউটারে পাঁড়িয়ে ওয়ুধ বিক্রি করব?

কাভটা নগ্ন অথবা ওর যোগ্য নয়, সেই অর্থে বলতে চায়নি, ওর দ্বারা ও-কাজ সম্ভব নয় সেইটুকুই ব্যক্ত করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আগের অর্থেই পাঁড়াল। আর তাতে সুকলই হল বোধহয়। ছোট সাহেবের মনে পড়ল, কারো কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসার

নীরা

তাল ও খেজুরের সুমিষ্ট রস

প্রতি বোতল—১২ নং পঃ।

খেজুর সিরাপ

২ পাউণ্ড বোতল

প্রতি বোতল—১-৫০ নং পঃ

সর্বত্র পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তালগুড় শিল্পী

সমবায় মহাসংঘ লিঃ

৪, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা—২৬

ফোন :—৪৬-১৯২৪।

✱ কমিশনে এজেন্সী দেওয়া হয়।

ফলে বাবা বাস্তুতা সম্বন্ধে লোকটির সঙ্গে দেখা করেছেন, তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, কোন কাজে স্টট করবে ভারতে বলেছেন, আর পরদিন এই প্রসঙ্গে তার আলোচনা করার ইচ্ছেও ছিল।

আজ্ঞা, আপনি ঘরে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

বেয়ারার প্রতি প্রাক্তন ঘরে নিয়ে বসবার ইচ্ছা। সপার্নি আর একমিকে চলল গেল সিতাং মিত্র। বাস্তু, কোনো কারণে একটু চিন্তিতও যেন।

তিন তলার বেয়ারা দোতলার কট্টাল কামের দরজায় মোতায়েন বেয়ারার তেপাডতে গুকে ছেড়ে দিয়ে গেল।

অপাগোড়া কাপেট বিছানো মন্ত ঘর। ছুঁকির দেয়ালের কাছে কাচ-বসানো বড় বড় দুটো সেক্রেটারিয়েট টেবিল। সামনে ছুঁখানা করে শৌখিন ভিজিটারস চেয়ার। মাঝামাঝি জানালার নিক খেঁষ টেনোগ্রাকারের ছোট টেবিল। একজন মাঝবয়সী মেম সাহেব টাইপে মগ্ন। দামী মেসিন সজ্জবত, টাইপের দকটা খট খট করে কানে লাগছে না, টুক টুক যুহ শব্দ। বড় টোবলের একটাতে লাবণ্য সরকার সামনের কতগুলো ছড়ানো কাগজপত্র থেকে লিখছে কি।

ঘরে দুকেই বা দিকে এক প্রস্থ দামী সোফা-সেট। বেয়ারা বীরাপদকে সেখানে এনে বসালো। লাবণ্য সরকার মুখ তুলল একবার। টেনোগ্রাকারও।

দ্বিতীয় শূন্য টোবলটা নিঃসঙ্গে ছোট সাহেবের। পাশের দেয়ালে মন্ত চাঁট একটা, তাতে খুবসম্ভব কারখানার সমস্ত বিভাগেরই মজা জাঁক। ডপালের দেয়ালে একটা বার্ডের গায়ে কোন বিভাগে কত কর্মচারী উপস্থিত সেদিন, তার তালিকা। বিভাগের নামগুলো ছায়া হরণের, উপস্থিতির সংখ্যা খড়ি দিয়ে লেখা।

বীরাপদ আড়চোখে দেখছে এক-একবার। সোজা হুজি চেয়ে থাকলেও কারো কোনো বিবস্তির কারণ হত না—মহিশার নিরুদ্বেগ কাজের পতিতে একটুও ছেদ পড়ত না। সেটুকু উপলব্ধি করেও বীরাপদ চুপ করে দেখতে লাগল। খুব যে একাগ্র মনোযোগে কাজ করছে তা নয়, বরং শুধু হাতের কাজ সেয়ে রাখছে যেন।

বাইরে কয়েক জোড়া পারের শব্দ। প্রথমে ছোট সাহেবের প্রবেশ, পরে অম্ববর্তীদের। লাবণ্য সরকার এবারে মুখ তুলে তাকালো।

আজ তো হলই না, কালও হবার কোনো লক্ষণ দেখছি না।—প্রজ্ঞার কোন্ডে তার উদ্দেশ্যে খবরটা বলতে বলতে সিতাং মিত্র নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

হাওয়ার কলমের খুঁটা আটকাতে আটকাতে লাবণ্য সরকার উঠে এসে তার সামনের চেয়ারটাতে বসল। অস্ত আগন্তুকরা তাদের ঘিরে ধাড়িয়ে। বীরাপদের দিকে চোখ নেই কারো। তাদের বাকবিনিময় থেকে সমস্তা কিছু কিছু জাঁক করা যাচ্ছে। নতুন বয়লার চালানো যাচ্ছে না, কারণ চীক কোমিটের হুকুম নেই। অথচ পুরনো বয়লারের ওপর সুরকারী নোটিসের দিন এগিয়ে আসছে। আগন্তুকরা সম্ভবত ওই ক্রাজেরই কর্মচারী, ছোট সাহেবের মন রেখে তারা বয়লার চালানোর সুবিধের কথাও বলছে, আবার চীক কোমিটের বিরাগভাজন হবার সত্যবনাভেই হয়ত অন্তবিধের কথাও বলছে।

লাবণ্য সরকার সামনের বোড়টার দিকে ইঙ্গিত করল, লোকজন

তো, সবই উপস্থিত, তাহলে এমন কি অন্তবিধে হবে। আপনি তো সঙ্গেই একবার পরিভার আলোচনা করে নিন না, খেয়াল-খুশিমত হবে না বললে চলেবে কেন?

প্রস্তাবের জবাবে খট করে টেলিফোন তুলে কানে লাগালো সিতাং মিত্র।—সি, সি। সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর যুহ শোনালো।—একবার আসবে? কথা ছিল...

টেলিফোন নামালো। মাথা নাড়ল একটু, অর্থাৎ আসছে। ইঙ্গিতে অস্ত সকলকে বিদায় দিল। বীরাপদের ধারণা, এ কয়েকসার মধ্যে তারা থাকতেও চায় না। সিতাং মিত্র খাড়া ফিরিয়ে কর্মচারীদের উপস্থিতি-তালিকার বোর্ডটা দেখছে। আর সেই সঙ্গে নিজেকে একটু প্রস্তুত করে নিচ্ছে হয়ত। সমস্তার ভারে বীরাপদের কথা মনেও নেই বোধহয়। অস্ত-প্রান্তের সোফার কারণে নির্বাক মূর্তির মত পা-ডুবিবে বসে আছে সে।

লাবণ্য সরকার নড়ে চড়ে বসলো। পদমর্দনার ঠাণ্ডা অভিব্যক্তির এই প্রথম ব্যতিক্রম একটু।—বীরাপদের চোখের তুল না দেখার তুল? অভ্যস্ত উপাসীনতার বদলে রমণী-মুখে চকিত কমনীয়তার আভাস... দেখার তুল না চোখের তুল?

এবারে বে-আনুযেব চকল আবির্ভাব তাকে দেখে বীরাপদ ভিতরে ভিতরে চালা হয়ে উঠল। অমিতাভ বোবাই বটে। একমাথা খাঁকড়া চুল, পাটভাড়া দাগ-ধরা দামী সুট, ঠোঁটে সিগারেট।...

কি রে, কি খবর...

ছোট সাহেবের মুখে সহজতা বজায় রাখার আয়াস।—বোসো, বাস্তু ছিলে নাকি?

না। অমিতাভ বোব হুঁজনকেই দেখল একবার। শূন্য চেয়ারটার একখানা পা তুলে দিল চোরারের কাঁধ ঘরে খুঁকে ঝাঁড়াল।—কি ব্যাপার—বয়লার?

হ্যাঁ, আজ তো চললই না, কালও চলবে না?

না। সাদাসাংটা জবাব।

লাবণ্য সরকার অতদিকে মুখ ফেরালো। ছোট সাহেবের কণ্ঠস্বর ঊষং অসহিষ্ণু।—কিন্তু না চললে এমিকে সামলাবে কি করে, তাছাড়া বাবা বার বার বলে দিয়েছেন—

সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। বচন শুনে নিজের উপস্থিতির দক্ষন বীরাপদ নিজেরই অস্বস্তি একটু।—মামাকে গিয়ে বল মিটি করে আর বক্তৃতা করে বেড়াইলে সব কাজ হয়ে বাবে, আর কিছু দরকার নেই—

হুই এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সিতাং মিত্র বোঁচাটা হজম করে নিল, তার পর উফ জবাব দিল সেও।—কোমার তো ছুঁদিন ঘরে পাত্তা নেই, সেদিনও বাড়িতে বাবা বহুক্ষণ অপেক্ষা করলেন—মিটি করা ছেড়ে তাহলে তোমার পিছুনেই বুঝতে বলি।

পায়ে করে চেয়ারটা একটু ঠেলে দিয়ে অমিতাভ বোব সোজা হয়ে ঝাঁড়াল। মুখের সিগারেটটা আদমপটে তুলল।—আবার বা বলার আমি পনের দিন আগেই লিখে জানিয়েছি। বয়লার চালাবে কে, তুই না আমি না ইনি?

ছোট সাহেব দৃঢ় অথচ যুহ জবাব দিল, বাবা চালাবার তাড়াই চালাবে, তুমি আপত্তি করছ কেন?

চেয়ারটা ঠেলে নিয়ে এবারে অমিতাভ বোব দলল ধুপ করে।

বেশ, কারা চালাবে ডাকো তাদের, বুঝে নিই কি করে চালাবে। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ছোট সাহেবের সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল।

কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যে সিতাও মিত্রর কাউকে ডাকার অভ্যাস দেখা গেল না। তার বক্তব্য, পুথনো বয়লারের লোক দিয়ে নতুন বয়লার আপাতত চালু করা হোক, পুরনোটা তো বন্ধই হয়ে যাচ্ছে, পরে একসঙ্গে দুটোই বখান চলবে, তখন দেখে শুনে জনাকতক পটু কারিগর নিয়ে আসা যাবে। সমর্থনের আশাতেই বোধ করি নির্বাক রমণীমুখের দিকে তাকালো সে। কিছু বুঝে না বুঝে মেম-টাইপিষ্টেরও হাত চলেছে না।

সামনের বোর্ডের ওপর চোখ রেখে লাভ্যা সরকার এই প্রথম মন্থন করল, ফুল ট্রেখ তৈরি আপাতত আমানোর আঁচেই, ওখানকার রিকার্ড ছাও ক'জনও পাচ্ছি, তাদের পুরনো বয়লারে লাগিয়ে সেখানকার ব্লকও ছাও...

বাস বাস বাস। অমিতাভ ঘোষ যেন কাপরে পড়ে থামিয়ে দিল তাকে। হাতা বিক্রপের ঘুরে বলে উঠল, এতক্ষণ অমন গভীর হয়ে বসেছিলে খুব ভালো লাগছিল, ভাট ওহাও ওয়াটারফুল। তবল অভিব্যক্তির ব্যস্তায় ধীরাপদস্থক লোকের মধ্যে সন্তপণে মড়েচড়ে বসল একটু। মেম টাইপিষ্টের মুখেও কৌতূকের আভাস। ছোট সাহেব গভীর।

আর লাভ্যা সরকারের গোটা মুখখানাই আরক্ত।—কেন, হবে না কেন?

ঈষদ্রক চ্যালেঞ্জ সোজানুজি চীক কমিটির উদ্দেশে। জবাব না দিয়ে হাসিমুখে সে ফিরে দুই এক পলক চেয়ে রইল শুধু। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে পীড়াল আবার। সিতাও মিত্রকে বলল, তোমরা চোঁটা করে খেতে পারো, আমি কোনো দাবিও নেব না। লাভ্যা সরকারের দিকে ঘুরে পীড়াল, মুখখানি তেমনি লম্বু কৌতূকে ভরা।—কুঁচি বললে এখানে সব হবে, এতবিধি ইজ পসিবল—

সরকার দিকে ছুঁপা বাড়িয়েও থমকে পীড়াল। ধীরাপদ সবট আদর এবার, তাকে দেখেই খেমেছে। চিনেছেও।

মামা—মানে অনেকটা সেই রকম যে! আপনি এখানে বসে, কি ব্যাপার? উৎফুল্ল মুখে কাছে এগিয়ে এলো।

এই পরিবেশে এভাবে আক্রান্ত হবার ফলে নাড়িহাল অবস্থা। উঠে বসিও বা পীড়ানো গেল, সহজ আলাপের চোঁটা ব্যর্থ। জবাবে, হার জতে বসে ধীরাপদ, তার দিকেই শুধু তাকালো একদম। ওদিকে এমন এক অপ্রত্যাশিত আপ্যায়নে লাভ্যা সরকার আর সিতাও মিত্রও বিমম্বিত। ওর অবাকিত উপস্থিতি এতকাল লক্ষ্য করেনি বলে বিরক্তও। ছোট সাহেবের মুখে মলিন-ম্লান পাঠাই।—আপনি সন্ধ্যার পর মোকানে এসে এঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেবেন।

নির্দেশ জানিয়ে গটগট করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এঁর সঙ্গে অর্থাৎ লাভ্যা সরকারের সঙ্গে।

অপগূর্ধের বিড়ম্বনার সাক্ষি হিসেবে ধীরাপদর অবস্থান মহিলাটির চোখে আরো বেশি মর্শালাহানিকর বোধহয়। চীক কমিটির বিক্রপের স্তরই তখন পর্যন্ত সামলে উঠতে পারনি। ধীরাপদই কপাল মন্দ। যে-ভাঁবি ঘুরে তাকালো ওর দিকে, মনে হল, ছোট সাহেবের হয়ে কথা বলার পরোয়ানা পেয়ে ঠাণ্ডা চোখে কিছু একটা কৈকিয়তই তলব করে বসবে এবার।

কিন্তু কিছুই বলল না। যে-টুকু বুঝিয়ে দেবার পরেই ভালো করে বুঝিয়ে দেবে, তাড়া নেই যেন। উঠে নিজের জায়গার গিয়ে হাতের কলমটা টেবিলের ওপর রাখল। ধানিক আগের লেখা কাগজটা তুলে নিয়ে সেটার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে সেও সরজার দিকে এগিয়ে গেল।

অমিতাভ ঘোষ আধাআধি ঘুরে পীড়িয়ে উৎসুক নেত্র একে একে ছ'জনের ছুটি প্রশ্নান-পর্ব নিরীক্ষণ করল। তারপর ধীরাপদর ওপরই চড়াও হল আবার।—কি ব্যাপার বলুন তো, এঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

ধীরাপদ এতক্ষণে হালকা বোধ করছে একটু। মাথা নাড়ল, অর্থাৎ, সেই রকমই বাসনা ছিল বটে।

কেন?

প্রশ্নটা কানে নীরস শোনালো। জবাব শোনার আগেই সরজার দিকে পা-ও বাড়িয়েছে।

আর বলেন কেন, চাকরির পান্নার পড়ে ছ'দিন ধরেই তো ঘুরছি। তাকে অল্পসরণ করে ধীরাপদও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। একদিনের স্বপ্ন আলাপের এই একজনকেই কিছুটা কছেই লোক মনে হয়েছিল।

চাকরির নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক্তিকের মতই কাঁচ হল বুঝি। আবারও বিস্ময় আর আগ্রহ। চাকরমাসি পাঠিয়েছে আপনাকে? কেন? চাকরি?

কি জানি কেন, ঘরে বেঁধে পাঠিয়েছেন এই পর্যন্ত।

সিঁড়ির মুখে এসে পীড়িয়েছিল দুজনেই। অমিতাভ ঘোষ ফিরে এবারে ভালো করে নিরীক্ষণ করল তাকে। সঞ্চার ঘুমির আভাস।—চলুন নিচে চলুন। হাত বাড়িয়ে ধীরাপদর কাঁধ বেঁটন করে নিচে নামতে লাগল।—আপনি তাহলে চাকরির সেই বিশ্রেজেনটেটিড। তাই বলুন—কি আশ্চর্য!

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন। যে কোন রকমের পেটের বেদনা দ্রিদিদের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
ছাত্রা বিশুদ্ধ
সময়ে প্রস্তুত

আরও গাছ: রেজি: নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, তেজুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ঝাঁপা, মন্দারি, বুকজ্বালা, জ্বালা, অরুচি, শূলপনিত্রা ইত্যাদি রোগ যত প্রবলই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু প্রতিকূলা করে মারা হতাত হয়েছেন, তাঁরাও আশ্চর্য্য সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বজোে সুখ্য ফেরত। ৩২ ডোলাল প্রাণি কোটা ৩০ টাকা, একমাত্র ৩ কোটা—৮।।। আশা। ডা. মা. এ. পাইকগাঙ্গী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস: শ্রীশ্রীশ্রী (দুর্গা পাকিস্তান) ড্রাক-১৪৪, মহাশ্রী গাঙ্গী কোটা. কলকাতা-৭

বীরাপদর মনে হল আশ্চর্য বলেই এত খুশি, আর, হঠাৎ এই অস্বাভাবিকতাও চাকরির কারণে। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি কিছুই বুঝল না। শুকে সঙ্গে করে মুলবাপান পেরিয়ে সামনের মস্ত একতলা দালানের দিকে পা চালিয়ে অমিতাভ ঘোষ উৎকল কণ্ঠে বলে উঠল, তুমি তা আপনি এদের কাছে যুবছেন কেন, আমার সঙ্গে দেখা করুন।

বীরাপদ বুঝে নিল মায়াটি কে। মানকের বুথে শোনা ভায়ে বাবুর সমাচারও মনে আছে।—সেখা করেছিলাম... চাকরি তাঁর কাছেই চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি পরে কথা বলবেন বলেছিলেন, কিন্তু দুদিনের মধ্যে তাঁর তো দেখাই পাওয়া গেল না।

সেখা পাওয়া শক্ত। হাসতে লাগল, নামের টান বড় সাজাতিক টান যে। পকেট হাততাকে লাগল, সিগারেট আছে? থাক... আমার টেবিলেই আছে বোধহয়। তাহলে আপনার আর ভাবনাটা কিসের এখন?

ভাবনা নয়, এঁদের মেজাজ গতকাল ঠিক সন্নিহিত লাগছে না... অমিতাভ ঘোষ হা-হা শব্দে হেসে উঠল একপ্রহা। এ-মাথা ও-মাথা শেষ দেওয়া এক মস্ত ক্যাটকী-ঘরের মধ্যে ঢুক পড়েছে তারা। তত্ত্ব শুমেট বাতাস। লোকজন গলদঘর হয়ে কাজ করছে। ইলেকট্রিক প্লেট বসানো সারি সারি চৌবাচ্চার মধ্যে কি সব ফুটছে, লোহার ফ্রেমে খুঁছে মিটার-বসানো মস্ত মস্ত ডাম—বোঝে হয় তকোনো হচ্ছে কিছু, অগ্নির কাচ-ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তিতে বিশাল বিশাল জাঁতার মত বৃহৎ কি আর তাল তাল কি একটা কঠিন শালা পদার্থ পিষে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—সেই তকতকে গুঁড়ো সারি সারি ভ্যাটের মধ্যে বয়দার তুপের মত দেখাচ্ছে। চারদিকে গৌ-গৌ শৌ-শৌ একটানা যান্ত্রিক শব্দ। ভিতরে ঢুকেই বা-দিকে অল্প একটু ঘেরানো জায়গায় চীক কেমিটের টেবিল-চেয়ার।

—বহুন। নিজেও বসল, তারপর তাকিল্যের নুরে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত মনে চূপ-চাপ বসে থাকুন, বীর কাছ থেকে আসছেন, এঁদের মেজাজের ধার ধারতে হবে না আপনাকে—আমার সঙ্গে দেখা হলে আমি কথা বলব এখন।

ভাটচিতে সিগারেট ধরালো একটা।

বীরাপদর আবারও মনে হল, সে চাকরির লোক, চাকরির কাছ

থেকে আসছে—আপন জনের মত লোকটির এই এঁদের অস্বাভাবিকতা শুনেই জ্বলে, আর কোনো হেতু নেই। বীরাপদর ভালো লাগছে বটে, সেই সঙ্গে বুকের অগম্য কিছু হাতড়েও বেড়াচ্ছে। চাকরি কাউকে পাঠাতে পারে এ কি জানত নাকি। বোধহয় জানত, নইলে, চাকরির প্রপোজেনটেট বলাবে কেন ওকে? চাকরির লোক বলেই ওর জোটা খেন ঠুনেকা নয় একটুও। অথচ যে বলছে, নিজে সে চাকরিকে পরোয়া কতখানি করে তা বীরাপদ নিজের চোখেই দেখেছে সেদিন, নিজের কানেই শুনেছে। অবশ্য, পরোয়া বাটকেই করে বলে মনে হয় না। জোট সাহেবের ঘরে বং বড় সাহেবের উদ্দেশ্যেই তার নিঃশব্দ ব্যালোজি শুনে এলো শানিক আগে। তবু বীরাপদর খাপছাড়া লাগছে কেমন। বহটা জেনেছে বহটা দেখেছে আর বহটা শুনেছে—সব যেন ঠিক ঠিক জুড়ে উঠতে পারছে না।

চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে অমিতাভ ঘোষ পরম আয়েসে সিগারেট টানছে। গোটা কতক লম্বা টানে সিগারেট অর্ধেক।

কিন্তু বেশকিছু নয়, একটু বাদেই বিশ্রীত রোবে খুশির আরোহ ধান ধান। অগ্নির মিটার বসানো ড্রামগুলোর ওদিক থেকে একজন অল্পবয়সী কর্মচারী কাছে এসে ভিজাস করল, আধ-বটা মিটার দেখা হয়েছে আর হীট দেওয়া দরকার আছে কিনা।

চেয়ারের কাঁধে তেমনি মাথা রেখেই চীক 'কেমিট' আগন্তকের হুখের ওপর অলস দুই নিক্ষেপ করল একটা।—তুমি নতুন এলে এখানে?

অবাবে কর্মচারীটির নিবেদন, গত দুদিন চীক কেমিটের অল্পপস্থিতিতে মিস সরকার কাজ দেখেছেন, পরতাল্লি মিনিটের বসলে তিনি আধ বটা মিটার দেখতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

যান্ত্রিক পরিবেশের সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ যেন বাজ পড়ল একটা।

গেট আউট।

চীক কেমিটের গোটা মুখ রক্তবর্ণ। চেয়ার ছেড়ে উঠে পাড়িয়েছে। হারমুখি চিংকার, সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর প্রচণ্ড চাপড়।

লোকটা সজায়ে পাশিরে বাঁচল। কাছে, দূরে সকলেই কিরে কিরে তাকাচ্ছে।

বীরাপদ হতভম্ব।

[ক্রমাগত]

রাতের আছে হাজার আঁখি

[F. W. Bourdillon এর The night has a thousand eyes এর বাংলার অনুবাদ]

রাতের আছে হাজার আঁখি

দিবসের শুধু এক,

তবুও বহুখা আঁখিরাই সে যে

রবি হবে হবে নাক'।

মনের আছে হাজার আঁখি

হৃদয়ের শুধু এক,

তবুও জীবন, জীবন-হারা সে

প্রেম হবে হবে নাক'।

অনুবাদিকা—শ্রীমতী অমলি ভট্টাচার্য্য

সর্দিকাশির হাত থেকে
খুব
তাড়াতাড়ি
সত্যিকার আরাম দেবে



সিরোলিন

‘রডি’



ভারতের প্রতিটি
পরিবারের সর্দি
ও কাশির ওষুধ

কোন অনিষ্টকর উপাদান না থাকায় সিরোলিন আপনার
পরিবারের প্রত্যেকেই নিরাপদে খেতে পারে। এতে কাশি-
হুটিকারী স্নেহ তরল হয়ে যায় ও গলার প্রদাহ ও খুসখুসি
দূর হয়—কলে, খুব দ্রুত ও নিশ্চিত উপশম মেলে।

সর্দিকাশির

সাধারণ সর্দি থেকেই হোক কিংবা গলা ও বুকের প্রদাহযুক্ত
অবস্থা থেকেই হোক, আপনার কাশির জন্ম শুধু সাময়িক
আরামই ঘটেই নয়, আসে কিছু করা দরকার—আর
সিরোলিন তাই করে—এর জীবাণুনাশী শক্তি কঠিনকর
জীবাণুগুলোকে নিমূল করে।

আদর্শ ওষুধ

স্বাস্থ্য ও স্ব-সেবা সিরাপ সিরোলিন সর্দিকাশির
আদর্শ ওষুধ। আপনার ঘরে সব সময় এক শিলি
রাখুন।

একমাত্র পরিবেশক : ভলটাস লিমিটেড

কবি কণ্ঠপুর-বিরচিত আনন্দ-রন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অম্ববাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৪১। ব্রজেশ্বরী তাঁকে নিতৃত্তে ভ্রেক নিয়ে বললেন, মধুরিকা, তুমি এখন বাড়ী যাও। আমার বাহা ধেম্ব নিয়ে গোট গেলো, আমিই তোমার দেবীর কাছে শুকটিকে পাঠিয়ে দেব।

বন্দোবন্দ।

প্রণামান্তে প্রস্থান করলেন মধুরিকা।

ব্রজেশ্বরী তখন পুরের পদ্মহাটখানি নিজের স্তূতির মধ্যে নিয়ে বললেন—

চল যে বাহা চল।

তারপর ছেলেকে উঠিয়ে কুমুদাসবকে বললেন—

আর দেখ কুমুদাসব, নিজে তুমি শুকটিকে সাবলানে রাখবে।

আর সোনার বাটিতে করে খি-ভাত খাওয়াবে। তেমন ?

কিন্তু তর সইল না! শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলে উঠলেন—

না মা আমিই নিজে গুকে খাওয়াব। এই বলে সীতাসুক নিজের করকমলে আটকিয়ে রেখে দিলেন শুকটিকে।

কিন্তু বার বার তাঁর মনের মধ্যে ভেগে উঠতে লাগল শুকের মুখে শোনা সেই কবিতাটি। কবিতায় একটি উত্তর রচনা করেও কেলেন। শুককে তুলিয়ে কুমুদাসবকে কাছে টেনে নেপথ্যে বললেন—

সখে, আর আমার মন উঠছে না, বয়স্কদের নিয়ে বলে বেতে, ধেম্ব চর্যতে। সুখ নেই ছোট্ট হুঁসুটিতে বাজছে। শুকাতকের মুখে যে কবিতাটি তনলুম সেটি বোধ হয় হবে বা কোনো দয়িতালাপ। একটি গাঢ় অম্বদাগ খিতয়ে রয়েছে কবিতার।

৫০। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ জননার চরণচিহ্নের উপর নিজের চরণ-কমল দুটিকে আধান করতে করতে পৌঁছে গেলেন ভবনে, যেখানে তাঁতে হুতে হল পা, বসতে হল ভোকনের অসনে, খেতে হল, তার পর নিজের সামনে রাখা সোনার বাটি থেকে অতি গগন্ধী দুতাক্ত খাওয়া নিয়ে একটু একটু করে নিজের হাতে খাওয়াতে হল শ্রীকলিঙ্গকটিকে।

৫১। তারপর আচমনান্তে পূর্ব পূর্ব দিনের মতই বধন আবার ধেম্ব নিয়ে গোট্রে বেতে প্রস্থত হলেন তিনি, কখন আদর করে মাকে বললেন—মা, আর কারো উপর ভার দিও না বেন, নিজেই তুমি শুকটিকে দেখো।

ধেম্ব পালন করতে বিপিন মধ্যে চলে গেলেন লীলাকিশোর। আর, এক মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না শ্রীকৃষ্ণ জননী; বাত্মী-হুহিতাকে ডাকলেন এবং তাঁর হাত দিয়ে রাখার শুকটিকে পাঠিয়ে দিলেন রাখার গৃহে।

শুকপাখীটিকে হাতে বসিয়ে সহসা বাত্মী-হুহিতাকে আসতে দেখে, ভামলা ও সখীদের নিয়ে পাড়িয়ে উঠলেন ব্রজমুকিশোরা।

আমর আমর বলে সবতমান আহবান জানিয়ে নিজের অর্ধদানে তাকে বসিয়ে স-প্রণয় ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন পরে বললেন—

কুশলে আছেন তো মহীধরী ব্রজেশ্বরী ?

আপনিও কো ভাল আছেন ? বাত্মীকতা বললেন—

আগনাদের চরণপ্রসবে ভালই আছি। কিন্তু আপনার এই শুকটি যে এত তাড়াতাড়ি এত আনন্দ বিতরণ করতে পারলেন তা জানা ছিল না। কুমার তো আনন্দে দিশেহারা। গুঁর ঐ মন্দর ডাক শুনে কুমারের কণ্ঠ ছুটি বাকে বলে উৎপুলকিত। কী তাঁর আনন্দের ঘনঘটা। চক্ষুধারীদের বেন ত্রিতাপ খণ্ডালেন। তারপর যেই তিনি খেদুচারণে চলে গেলেন বিপিনে, ব্রজেশ্বরীও বুঝলেন এটিকে না'শেলে আপনারও অন্ত থাকবে না দুঃখের। তিলেক দেবীও হবে অসহ। তাই আপনার উপর ভেঙে পড়ল তাঁর মদা আর তারপরেই আর কুশলে, কুশলে মাত্র বিলম্ব না করে সমধ্যান। আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই পক্ষীর শুকটিকে।

৫২। ভামা বলে উঠলেন—সুবলেন অমন কথা বলবেন না। এই গোটুলে গোপকুলে গোপনীর বা আগোপনীর বা কিছু রত্ন রয়েছে, যা কিছু ভুবনের কুহক হয়ে রয়েছে সবই তো আমাদের ব্রজযজ্ঞনন্দনের। নন্দনকাননের বিহঙ্গজ্যেষ্ঠের চেয়েও সৌভাগ্যবান এই শুক, যেতু শ্রীভগবান তাকে হাতে তুলে নিয়েছেন। অতএব তাঁরই খেলায় উপকরণ হওয়া উচিত এই শুকটির। তাবলে, এখনি এটিকে কেবল পাঠানো অম্বচিত হবে। আপনি এখন আমর। খেদুপালন করে বধন বন থেকে ঘরে কিরবেন কুমার তখন ব্রজেশ্বরীর সামনে লালতা। গয়ে এটিকে তাঁর হাতে দিলেই, মানাবে ভালো।

৫৩। শ্রীবাধা বললেন—

শুকর ঐটে বা কিছু আমার ভামা বললেন, তার সবই মন্দর। তা আপনি এখন আমর। আমা কার ব্রজেশ্বরীর চরণে পৌঁছিয়ে দেবেন আমাদের প্রণাম।

৫৪। বাত্মীকতা বিষয় নিলেন। তারপর নবীন কৃষ্ণাঙ্কুরাগের ঐধর্ষ সুখ অম্বভব করতে করতে বুঝতাম-মন্দিরী সমুখবর্তী বিহঙ্গোত্তমকে সেই বলেছেন—

ধন্য তুমি ধন্য; হুল্লভের স্পর্শ সুখ লাভ করে তুমি আজ সৌভাগ্যবান হয়েছ। তাই বলে আমার হাতে আসতে ভর কোরা না কিন্তু। তোমাকে ছুঁলে আমারও যে কল্যাণ হবে, ধ্ব। কি হল এখন বল। এবং এই পর্যন্ত বলে শ্রীবাধা যেহান শুকটিকে তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে অমান শ্রীকলিঙ্গক বলে উঠলেন—

আমার কবিতাও তাঁর কণ্ঠপথে প্রবেশ করল আর অলঙ্কারে জাতর হয়ে গেল তাঁর মদর। পরিজনদের মধ্যে ঘোরাসেবা করতে

লাগলেন বটে কিন্তু মনে হল কিশোর কবিরকে কেন নিরস্তর শীর্ণ করে দিচ্ছে গোপন গভীর একটি ক্ষত।

৫৫। এবং সখাকে লক্ষ্য করে জনান্তিকে তিনি বললেন—... কুমুদাস, আর মনে উঠছে না বনে যেতে খেঁজ চ্যাতো। সুখ নেই ছোট বুলাটিকে বাজিয়ে। শুকান্তমের বুখে সে কবিতাটি শুনলুম সেটি বোধ হয় হবে বা কোনো দয়িতালাপ। একটি গাঢ় অমৃতাগ বিস্তারে রয়েছে কবিতায়।

৫৬। শ্রামা বললেন—বাফ আর আমাকে হাত্পাশ হতে হবে না। এখন বুঝলেন তো আমার কথাটি ঠিক। আমাকে দয়া করে আপনাদের অভিনন্দন করা উচিত। দয়িতালাপ ঐ পদটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তোমাকেই সই প্রেমময়ী বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

৫৭। শ্রীধারা বললেন—বৌদ্ধধর্মের পাঠার মত তোমার উদ্বিগ্ন হলে হবে কি সই, শ্রামের কথার বাঁধনি বোঝাবার বোধশক্তি তোমার নেই। তাঁর পরিহাস-কর্মটি এখনও তুমি ধরতে পারনি। এটি কর্ণধার, বগীতপুস্তক নয়। তৎপুস্তকটি সত্যিই চলন্ত। সম্ভাবনার যা বাইরে তাই বা ভেবে আমাকে কেন হান্ধা করার তোমার এই চেষ্টা? সে মামুষটি তো বললে—পরম অদ্বৈত। তাঁর দশা আমায় মত একটি মনভাগ্য সোঁকের দ্বন্দ্ব কেনম করেই বা তুমি চাপাচ্ছ যদি বল, অমুমান করছ তাই বা কেনম করেই হয়। তার হেতু কই? হার কপাল, আমার সমান হয়েও অসমাপ্ত উপরোধটাকে তুমিই তাহলে সমাপ্ত করছ? ঠাট্টাচ্ছলে নিজের মোটাছ কৌতুক?

৫৮। শ্রামা বললেন—চারমিক না ভেবেই যা নর তা বলছ সই। পোকুলে কে না জানে মধুরিকা তোমার অমৃতচরী। সেইই এখন বলছে, আমার দেবীর এই শুক তখন দেবীটি যে তুমিই সে কি আর বুঝতে বাকি থাকে শ্রামের। অসম তোমার ভাবনার সই। এইখানেই জে শেব। এর পরে কি আর কথা কাটাকাটি চলতে পারে? বিশ্বাস নিল বিবাদ।

৫৯। তার পরে একদিন ব্রজধামে অতিথি হয়ে এল গুণবানের জয়তিথি। মহোৎসবের প্রারম্ভে রাজপুরীতে ঢা ঢা করে বেজে উঠল ভেরী। পটদের সে কী পুষ্ট লাগল! মর্দনের সে কী গুষ্ঠ পটুতা। হস্তভিত্তির দম্ব দম্ব দ্বন্দ্বের মধ্যে মধ্যে চমৎকার-কারী সুরে বেজে উঠল বাঁধরী। নানান ধ্বনিতে বোধিত হল উৎসব। আনন্দের পাখে এসে মিললেন বোবেরা, মিললেন বোবজয়ারা। এবং সেই সঙ্গে আনন্দময় পরমানন্দ ঘনিয়ে সহস্রচরণে ফুলুপু বেজে উঠল নৃপের বোল, সহস্র হস্তে গুরু গুরু করে বেজে উঠল মৃদঙ্গের বোল।

মস্তোচ্চারণ করতে করতে দ্বিজশ্রেষ্ঠরা এলেন। মস্তপুত সলিলে পূর্ণ হয়ে উঠল সহস্র শিল্প বিঘটিত ফটিকের ঘটগুলি। সহস্রধারায় আরম্ভ হয়ে গেল আকৃতি শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কার-লক্ষ্মীবিধান অভিষেক মঙ্গল।

তারপরে শ্রীকৃষ্ণকে সবতনে পরানো হল নব্য দিবা ও গীতবরণ কোশেদ্বয় ও উত্তরীয়। মণি মণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিবেশে বেন সহস্রা জলে উঠল মহোৎসবের মহৌল্লাস। মঙ্গল মণিবন্ধে পরানো হল মণি-বলয়, তার উপরে শোভা পেল পরিচিত হলুদডোরে বাঁধা

নবদরীদ্র। গোরাচোনা দিয়ে এখন তাঁর ললাটে আঁকা হল উজ্জলরত একটি তিলক তখন তার বিশেষ কমনীয়তার আকৃষ্ট হয়ে আনন্দিত আবেগের একটি বিশাল বেগ সৃষ্টি করে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন শ্রীশোভা। দরায় ও আমোদে বিচলিত হয়ে কুমুদাস দ্বিগুণে পুত্রকে করলেন আশীর্বাদ। বধাবিহিত সম্মান পুত্রদের আমন্ত্রিতা ব্রজপুরীর পুরস্কার তারপরে এলেন। শ্রীকৃষ্ণের করলেন গীতোজ্জ্বলা আরতি। কৌতুকভরে হৌতুক করতে লেগে গেলেন সকলে। অনন্তরশ পায়স পিষ্টক ও মোদকাদির নৈবেদ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঘটালেন সৌহিত্য।

ব্রজেশ্বরীর সখীদের ও ব্রজধামের শিষ্য জনদের যিনি প্রেমধাম তিনি এখন তাগুণ সেবা করলেন তখন পুনর্বার অমৃষ্টিত হল আরত্নিক। ততপরে এখন তিনি দিব্যাসনে আরোহণ করলেন তখন মনে হল আরও বেন রত্নতেজে জ্বলে উঠল উৎসব-জ্যোতিঃ।

স্নেহের তারল্যে ও উৎসবের সিদ্ধি-কামনার বন্ধুদের নিমন্ত্রিত করেছিলেন ব্রজরাজ মহিষী। নিমন্ত্রিতা হয়ে এসেছিলেন ব্রজধামের পুরস্কারী, তাঁদের বধুরা, তাঁদের কুমারী কন্ডারা। ব্রজরাজেরও নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিলেন ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠেরা, সন্ন্যাস, উপনন্দ আদি আভীরেরা। তাঁদের বন্ধুদের নিয়ে বন্ধনে ব্যাপ্তা হয়ে পড়েছিলেন নিখিল গুণারোহিনী শ্রীমোহিনী দেবী। কত প্রকারের যে বন্ধন হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। নানাবিধ উপকরণ। ভোজের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হতেই পুনর্বার পোড় করানো হল দ্রী-পুস্তকদের প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে যে যেখানে আছে তাকে ডেকে আনতে। সকলেই এলেন। গোপেরা ও গোপাঙ্গনারা তারপর বধাক্রমে আশীর্বাদ করলেন পরমসুখ্যার লীলাকুমারকে। আনন্দিত উৎকর্ষীরা তাঁরা নিজদের কণ্ঠ থেকে ধুলে নিয়ে কুমারকণ্ঠে পরিবে দিতে লাগলেন মণিহার। প্রত্যেকেই করলেন শ্রীকৃষ্ণের পূজা।

৬০। তারপরে একের পর এক এলেন স্বামীস্বারা। এক তারপর তাঁদের পদাঙ্ক অমৃতরশ করে এলেন নবানুপ্রাণিনীদের দল। পাশাধি পর্যন্ত বহু মূল্য অন্তরী বস্ত্রে তাঁদের লজ্জা আবৃত। পূর্ব-রাগের বিরহানিমা লেগে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নতুন গুণনার অতিপূর্ণ বহুজাল ভেদ করে বেন বলকে বলকে ফুটে বেরিয়ে আসছিল সেহবিভা। শ্রীকৃষ্ণকে দেখেই, যদিও তাঁদের নীলপদ্মের মত সূক্ষ্ম নয়নগুলি চানাবগুণের ঝিনুকিনে অঞ্চলের মত ছলল হয়ে উঠতে চাইল, এবং যদিও সেগুলি নিষ্ঠুর হতে চাইল ক্ষিপ্র উদীয়মান স্বরয়ের চাপল্যাখ্য সঙ্গারী ভাবের মাহিমায়, তবুও সেই ক্ষণে তারা ভাবগোপন করতে বাধ্য হল নির্দিকার অকুটিল দেখাল তাঁদের নয়ন-সম্ম। এবং কৌতুক দেবার সময়টিতে, ধর অমৃতাগ সঙ্কেও অমৃতধর হয়েই রৈল তাঁদের হাতের বলয়গুলি। সেখানে বীরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ধরেও ধরতে পারলেন না নবানুপ্রাণিনীদের এই ভাবগোপনতা। বারমুত্তাধুই-বশতঃ তাঁরাও ভাবছিলেন—পরম মহানিধির মত পাওয়া গেছে এই ব্রজভটিকে, তাঁরাও ভাবছিলেন—আমিও আবার ঐ সোভাগ্য ফুলমঞ্জরীর।

৬১। তারপরে জননীদের পায়ে পায়ে এলেন কুমারী কন্ডারের দল। তাঁদের মনের ফুলগুলির যদিও পতিভাবনায় নিষ্ঠুর স্থাবানিত থাকাই স্বাভাবিক এবং সেই ছেন মনের মহোৎসব সমান শ্রীকৃষ্ণকে যদিও তাঁরা দিনের পর দিন প্রতিদিন দেখেছেন, তবুও আজ তাঁদের

কেন হল তাঁদের নয়ন বেন এই সৌন্দর্য গৃহেরে প্রবেশ করে, দেখবার মত এই প্রথম সুখের মুহূর্ত। তাঁরা বসে হঠাৎ গেলেন বস্ত্রাধিকা হয়ে পেলেন।

৩২। নবীন গোবিন্দ-কুলললনাদের যখন এই তেন অবস্থা সমান সমবয়সীরা, সমান আকার বিকাসের সবিশেষ সঙ্গাপনতা, লক্ষ্যের শিক্তির এক সনান অবস্থা, তখন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিস্তীর্ণ হয়ে উঠল জগৎ। এতদিন ধীরে ক্রমে তিনি ছিলেন হঠাৎ তাকে দেখে তাঁর শ্রীতি ভালবাসার ভিত্তিতে হয়ে উঠল তাঁর মন। অধীর হয়ে তিনি ব্রজরাজকুমারের পাশ ছেড়ে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন শ্রীধারার চরণ কমলে।

তুই ঠাঁর, তুই বাঃ এই কথাটি জনেরে এবং আদরের বাহুল্য কলিয়ে বসন তাঁকে সরিয়ে দিতে লাগল শ্রীধারার কন্দনবতী একপানি হস্তভঙ্গি, তখন শ্রীকৃষ্ণেরও নয়ন ভোমরা অকস্মাৎ দেখতে পেল, একপাখি নতুন কোটা পদ্মকুলের মালার মত যুগভানুস্মিতীকে। হ্যাঁ, তিনিই তো। দৃষ্টি হল অদৃষ্টি মধুর। মন আলগা করে দিল চোখের বাসকে।

৩৩। পদ্মধ্বজাদের মধ্যে নিজের পত্রটিকে দেখতে দেখতে মুচকি হাসির মধুরস বেন আপ্রাণ হয়ে গেল ব্রজধামীর মুখ। অংশে যে তিনি পুত্রের নিকট থেকে নিজে ডেকে তুলে নিয়ে এসেন কমলধ্বজীদের, যথাযথ বাসিয়ে দিলেন ভোজন স্থানে।

৩৪। ইত্যবসরে ব্রজরাজ শ্রীমৎ তাঁর মণিমণ্ডিত আলিঙ্গন নিরুপম গন্ধমালাদি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন নৈটিকী গাভীরের এবং ভক্তগণি গভীর কার্ঠর সইতোভ্রম আলিঙ্গন উপবেশন করিয়ে চরণ দুইয়ে দিলেন ব্রাক্ষণ শ্রেষ্ঠদের। এবং বেহেতু স্বর্ণপাত্র পাত্রসাৎ করতে হলে ব্রাক্ষণ শ্রেষ্ঠগাই উপযুক্ত পাত্র, সেইহেতু ব্রজরাজ তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন পান ভোজন আচমনাদির কনকপাত্রগুলির অর্থদান করে। সমাগতা হয়ে আলিঙ্গন এলেন সমস্ত উপনন্দের অ্যোতসরী ভাষায় এবং শ্রীমোহিনী। তাঁদের পরিবেশন-তৎপরতায় ব্রাক্ষণ ভোজন সমাপ্ত হয়ে গেলে ব্রজরাজ তাঁদের সকলকে উপহার দিলেন মালাচন্দন তাম্বুল ও বস্ত্রালঙ্কার। তারপরে স্বয়ং বসে গড়লের আগনে। সঙ্গে বসলেন লোকনয়ন তাপ সঙ্গরূপ শ্রীস্বর্ধন বলরাম, শান্তিপ্রিয় বৃন্দেরা, ব্রজতরুণেরা এবং শিশুগোপেরা।

এরূপে শ্রীমোহিনী পরিবেশন করছেন ও ব্রজরাজ সাজপাক নিয়ে ভোজন করছেন, আর তাঁকে মন্থন মরকতভবনে ততক্ষণে শ্রীমদাদ্য কাপড় ঢাকা পাড় পাঠিয়েছেন, পাড়তে বাসিয়েছেন সর্বপ্রধানা শ্রীধারাকে, আর তাঁর চুপাশ বসিয়ে দিচ্ছেন অসামান্য মাতাদের বৃন্দের কুমারীদের।

প্রত্যেকের পাতে পরিবেশনাদি করতে করতে নিজেই তিনি বেন ভাসতে লাগলেন স্বপ্নমুদ্রে। মুচকি হাসির অন্তর ছড়িয়ে 'না গো মেয়েরা এখানে লজ্জা করতে নেই' বলতে বলতে তিনি প্রত্যেকেরই খাইয়ে দিলেন তৃপ্তভরে। তার পরে প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন একখানি করে অমল বসন, মণিময় অলঙ্কার, মালাহুলেপন শিশুর তাম্বুল। ভোজনপর্ব সমাপ্ত হয়ে গেলে ব্রজধামীর সকল প্রাণম করলেন সৌভাগ্যবতী শিরোমণি ভগবতী শ্রীকৃষ্ণজননীকে। লৌকিক বীতি অনুসারে ব্রজধামীও তখন সকলকে আলিঙ্গন দান করে ঘরে কোথার ব্যবস্থা করে দিলেন প্রত্যেকের।

৩৫। মহোৎসবের বোগদান করেছিলেন আপামর জনসাধারণ। অতিমোদন অবশিষ্ট ভোজ্যদ্রব্যগুলিকে তাঁদের মধ্যে নিয়মিত ভাবে বিভাগ করে দিলেন ব্রজরাজ। নটনটী বাজকের চারণ মগেধাধির মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে তিনি বণ্টন করে দিলেন পারিতোষিক। তা সত্ত্বেও ব্রজধামীকে পূনবার মৌত্তে হল তাঁদের চাহিদা।

শান্ত হল মহোৎসব। কিন্তু শান্তি কোথায় যা বশোদার মনে? তাঁর মন কেবল বলতে লাগল—নিত্য যদি এমন হয় তবেই তো সুখ। ভাবতে ভাবতে অন্ধকাল নয়ামীরও হৃদয়খানি অমৃত করল উৎসব শেষের পরম মুখে।

৩৬। তার পরের দিন। ধেনুপালনে বসে গেছেন নন্দকুমার। সহচরদের সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ তিনি প্রকাশ করে বসলেন ফুলের গেক্সা নিয়ে তাঁর বিচিত্র খেলা।

ফুল তুলেছেন সাধারী। বিলাসরসের উপযোগী রাশি রাশি ফুল। ফুল তো নয়, বেন চন্দ্রবেবের মাংসপিণ্ড। অতি সুলভ কন্দকুমার। অমনি শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় করে বসলেন হাজারে হাজারে কন্দকন্দক। তারপরেই লোকলুকি আর চৌড়াছড়ির সে কী আমোদ আনন্দ। ফুলের গেক্সাগুলো আকাশে উঠে বাত, আর মনে হয় ঐ বৃষ্টি গুহা কৃষ্টির দিগ্বিদ্যে ছালোককুমারীদের রমণীয় মনের লাভ্য। ফুলের গেক্সাগুলো বৈকি ছুটে চলে যায় আকাশপথে, আর মনে হয় মিথুনের কানে কানে বৃষ্টি ঐ গুহা পরিবেশে দিচ্ছে কর্ণপূব। কন্দকন্দক নিয়ে খেলাতে খেলাতে অবিশ্রাম ছুটে থাকেন নন্দকুমার খেলার গর্ভে ফুল ফুলে গুটে বুক।

৩৭। আগর কখনও ছুটেতে ছুটেতে রাঙা চোখের কোণ কুঁচকিয়ে পৃথালোককে তিনি ঘেমে বান। চৌদিগের বাকের চমু ভাঙা ভাঙা ফুলগুলি তাদের নড়তে থাকে, উড়তে থাকে। আর তাদের মধ্যে কোঁতুকী কুমার কিস্তি হঠাৎ বেন বিজয় গর্ভেই ঘেমে বান। আর সেই স্বর্ণটিতে তাঁকে দেখায় বেন ছবিটি। উপর থেকে নীচে নামছে ফুলের গোলা; যুগ তুলে সেটিকে ধরতে যাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ বা হাতে আবহাষা মোহন পাগ ডান হাতে ঢাকছেন পৃথ।

৩৮। কেন যে এই খেলার প্রকাশ কে জানে? ছুরবগাই বীত চরিত্র তিনি আবার তারপর তখন খেলাতে থাকেন ফুল দিয়ে বিলাসী খেলা। শরতের ভয়া চাঁদের মত অমিত্যয় ভরে যায় তাঁর মুখ, মুক্তার বালর দোলায় বিন্দু বিন্দু যক্ষ। তরুণ তরুর মূল ঘেঁষে হঠাৎ তিনি বসে পড়েন। লম্বমান লম্বাপন্ন দিয়ে তাঁকে বাতাস করতে থাকে কোন সখা, নিজের বস্ত্রাকল বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে শুইয়ে দেন, কেউ কেউ বা ধীরে ধীরে পা টিপে দেন তাঁর।

৩৯। এই ভাবে দিন কেটে যায় কন্দকন্দক নিয়ে খেলায়। এই বকম করেই তো পথম দরিতেরা অবিলম্বে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলেন, সকল রসের আবাদ পান, আর পালন করতে থাকেন তাঁর নৈটিকী গাভীরের দল।

৪০। তার পরের দিন। সেদিনও কুতূহলী নয়ন মেলে ছালোকচরী দেবতার চোখেছিলেন মর্ত্যের পানে, জুড়োছিলেন নয়নের জালা; কুক বলরামকে মাঝখানে নিয়ে খেলছিলেন

সহচররা; আনন্দে চরছিল খেদুর পাল; হৃদিত্ত হলেও বৃদ্ধাবনের
বত তরুণতা, বত যুগ, বত পানী, বত জ্বর সকলের সৌভাগ্যই
দান। বলরামের বয়স... এই কথাটি ছল করে সকলকে বোঝাচ্ছিলেন
কুফ ভগবান; সহচররা শুনেছিলেন, হাসছিলেন, খেলছিলেন;
সেদিনও ছশুরের কড়া বোকে খেয়ে উঠে বনে বনে বিহারে ভেঙে
ছায়াবন তরুণে জড়াজড়ি করে গুরে পড়েছিলেন ছ'
ভাই; হাসাহাসির ফুল ছড়িয়ে সখার অভিনয় করছিলেন প্রায়
উপর্য।

১১। এমন সময় সহসা তাঁর কবিক বিপ্রদ ছেড়ে লাক্ষ্মিরে
উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ। এবং আশ্চর্য্য, সমগ্রমে ও সপ্রণয়ে টিপে দিতে
লাগলেন অগ্রজের চরণ-কমল। কৃষ্ণের করম্পর্শে কোথায় যেন
মিলিয়ে গেল বলরামের ক্লান্তি। তার পরে মধ্যাহ্নের তপনতাপ
অগ্রাহ্য করে শ্রীকৃষ্ণ দৌড়লেন কাননে। সঙ্গে ছুটলেন সহচররা।
শ্রীকৃষ্ণের হেলাখেলার হুজোড়ে নিমেষে যেন নিশাত হয়ে গেল
ভাদেরও চরম শ্রম। খেদুরের পিছনে পিছনে কুতূহলী হয়ে
ছুটলেন বলরাম।

১২। সহজপ্রণয়মার্ধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ বখন কণে কণে আনন্দে
আনন্দহারা হয়ে জীবলরামের সঙ্গে সকল খেলা খেল চলেছেন তখন
সখাদের মনে হতে লাগল তিনিই যেন ক্রীড়াশিল্পনৈপুণ্যের মধুরিমা,
সখানধারীদের গণনার তিনি যেন মূর্ত্ত। কণ্ঠে মধুপ্রসাদ বইয়ে
তাই তাঁরা বলে উঠলেন—

বলি ও রাম, বল ও কৃষ্ণ, প্রতাপের তো দেখছি অস্ত নেই।
অঙ্গের প্রভা উড়িয়ে খুব তো দ্ব্যবরতেন অন্ধকার। কিন্তু এদিকে
যে আপনাদের সখাদের উদরে বরণা উপস্থিত হয়েছে অক্ষয়
বৃদ্ধকার। সৌরা টপকেছে। ঐ দেখুন জাতীয়, দ্ব্য থেকে নয়
নিকট থেকেই গিরিপক কলের গছনিমগ্ন অসদায় নাসিকার
নিকটে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তালবন। ছিঁড়তে হবে না, নাড়ালেই
ঝরিয়ে দেবেন তাল। সেগুলিকে সংগ্রহ করে আমাদের আপ্যায়ন
করা কি আপনাদের কর্তব্য নয় উভয়ের?

১৩। সখাদের লোভ বেধে তাঁদের ঔৎসুক্য মেটাতে তালবনের
দিকে তখনই ছুটে চলল চারখানি জীবরণ। কে জানত... এই
তালবনে পাহারার বসে আছেন 'খেদুর'-দৈত্য।

হু ভাই বখন তালবনের নিকটে এলেন তখন তাঁদের চোখে
নাচছে আনন্দ। শোভার লোভ বাড়ি, লোভে লোল হয় চোখ,
আর চোখ তখন চেঁচিয়ে উঠে বলে কল চাই।

১৪। আগুন-রক্তের পাকা পাকা ফল। তখনও থসেনি।
কাঁদি-কাঁদি কল মূল হয়ে গেছে তাল গাছের কাঁধ। ঠাস কাঁদি।
বেগল আনন্দ, গেল কল্যাণ।

ছক বাঁকিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখতে লাগলেন সেই তালীকৃষ্ণ... মেঘের
মত মেঘুর, কলছে, কিন্তু নাগালের বাইরে। মনমাতানো পৌঁছ।
কিন্তু হাঠুং কেমন করে উপভোগ করবে সেই সৌরভ যদি চরাচর
গুরু পবনদের নিজেই দয়া করে অমন সটট ধনিতে তালপল্লব
চকিত করে হরণ করে নেন ফলগন্ধ? দেখতে দেখতে সখাদের
চাঁকার ভেসে এল—

কেলো কেলো, পাড়ো পাড়ো। বড় বড় টিল উড়ল।
বপর্শণ করে মাটিতে পড়তে লাগল তাল।

তালপড়ার আওয়াজ শুনে তালকৃষ্ণ থেকে পথের মাঝখানে
বেগিয়ে এলেন খেদুর-দৈত্য। প্রকাণ্ড গর্দভের মত আকৃতি।
মহাবলবান। খুঁপার মত তাঁর চারপায়ের খুর। খুরের আঘাতে
কেটে যেতে লাগল মাটি স্ফটি হয়ে গেল ধুলোর জাঁক। শিহনের
দুপা ছুঁড়ে কাঁপিয়ে তুললেন পৃথিবীর প্রাণ। কী তাঁর নাগার
উজ্জ্বল সূর্য্যংগর্ভন। যেন তল্লিত হয়ে গেলেন ছালোকের নির্জেরা,
যেন জর্জরীভূত হয়ে গেল পর্জন্ত-খোব।

খোবালকদের অবজ্ঞা করে খেদুরদৈত্য সোজা ছুটে এলেন
বলরাম ও কৃষ্ণের অভিমুখে। হত্যা বাদনা অলছে চোখে।

১৫। অগ্রিমুখী পতকের মত পিছনের পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে
কাঁপিয়ে এলেন অম্বর। নড়লেন না বলরাম। অবহেলায়...
বামকরের অগ্রভাগ দিয়ে তিনি ঘরে কেললেন তাঁর দুপায়ের স্ফটি
গোছ। আকাশে দুপাক ঝািয়ে গাধার দেহটাকে ছুঁড়ে ফারলেন
সমুত্তাল তালকৃষ্ণের কাণ্ডে। দেহটা দিয়েই এক পলকে
সরিয়ে দিলেন তালগাছের সমস্ত ফল। পিবে নিশ্রাণ হয়ে গেল
খেদুর।

১৬। ছুটে এলেন দৈত্যের অম্বরচরের দল। তাদেরও
অজ্ঞায়াসেই শেষ করে দিলেন হুভাই।

১৭। বদীর্ণ তালকলের নিবিড় নিপাতে পড়িল হয়ে গেল
কৃষ্ণপ্রাণ। অপক ফলগুলিকে বেছে নিয়ে সকলে তখন কল্লুক
ক্রীড়ায় মত্তে উঠলেন। রক্তচেল্লা প্রাণকে কেউ ভক্ষণ করলেন
না কল।

১৮। যদিও তালকলের অবাদ না পেয়ে অতৃপ্ত রৈল
কৃষ্ণবান্ধবের রসনা, তবুও কলের গন্ধ বাঙ্কবে ফুলে ফুলে উঠতে
লাগল তাঁদের বজুর নাসাপট। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ একত্রিত করলেন
খেদুরগণী এবং তাঁর অতলস্পর্শ মধুরিমা ছড়াতে ছড়াতে
জীবলরামের সঙ্গে বেলা পাড়ে আসছে দেখে পা বাড়ালেন অঙ্গের
পথে। সৌন্দর্য্যে গেল পৃথিবীর হৃৎশোকা। বৃদ্ধাবনের জ্যোতির্পর
যেন নত হয়ে গেল পৃথিবীর হৃৎশোকা। বৃদ্ধাবনের জ্যোতির্পর
প্রত্যেকটি তরুণতাকে আত্মনন্দন করতে করতে মহাহ্রদ্য
মহাহ্রদ্য নন্দকুমার সখা চললেন অঙ্গের অভিমুখে। যিনি আঁকি
তাতেও ফুটে উঠল প্রকৃতভাব। অল্পম অধরে মধুরে বেছে উঠল
মুরলী। মানস গঙ্গার বাতালে উড়তে লাগল গোখরের ক্ষুদ্র বেণু;
আর সেই বেণুর আনন্দ বারবার চূষন করতে লাগল তাঁর
অলকাবলী, চূষন করতে লাগল তাঁর স্রোচ উফার।

প্রিয়জনদের নগ্নে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্বটিকে প্রতিফলিত
করতে করতে মুরলীর কলধনিতে ব্রজনগরের নাগরীদের গরবভা
বনের মাদিকখানি ভুলিয়ে হরণ করতে করতে, শ্রীকৃষ্ণ ধরে বীরে
প্রবেশ করলেন নিজের ভবনে। বলভঁতলে আরোহণ করে তাঁকে
অনিমেঘ নয়নে দেখতে লাগলেন বসিকারা আর নহনপাল্লর পত্রপুটে
পান করতে লাগলেন সৌন্দর্য্যামধুরীর মধু।

১৯। পুত্রটিটক কিংবদন্তে দেখে ছুটে এলেন জীবনদা, ছুটে
এলেন জীবো হবী। তারপর প্রথমত অঙ্গমর্জ্জনের স্থান পান
ভোজনের পর স্নেহে পালকে হয়ে পড়লেন জীবাম এবং দামোদর।

ইতি পূর্ণাঙ্গপরভাঙ্গো নাম অষ্টমঃ স্তবকঃ।

[ক্রমশঃ।

একটি বেদনাদায়ক কাহিনী

(আইরিশ গল্প)

জেমস জয়েস্

মিঃ

জেমস ডাকি চ্যাপেলস্‌জিড বাস করতেন। তার কারণ তিনি যে শহরের আবাসী ছিলেন তার থেকে বহু দূরে সম্ভব তিনি বাস করতে চাইতেন এবং ডাবলিনের অস্ত্রাস্ত্র উপবর্ত্তকে তাঁর মনে হত সাধারণ, আধুনিক এবং কৃত্রিম বলে। তিনি একটা পুরনো বিষ্ণু বাড়িতে বাস করতেন এবং বাড়ির জানালা থেকে তিনি দেখতে পেতেন অব্যবহৃত মদ চোলাটির কাগজখানাটি কিংবা আরও দূরে দেখতে পেতেন সেই অগভীর নদীটি যার উপরে ডাবলিন শহর অবস্থিত। কাপেটে অনাবৃত তাঁর ঘরের উঁচু দেয়ালগুলিতে কোন ছবি টাঙানো ছিল না। সে ঘরের প্রতিটি আসবাব কিনেছিলেম তিনি নিজে: বাংলা রঙের একটা লোহার ঘাটি, লোহার একটা গুয়ানি-ষ্টাণ্ড, চারটা বেডের চেয়ার, একটা আলনা, একটা কয়লা বাখার পাত্র, ইঁদ্রি করবার বস্ত্রপাতি এবং ডবল-ডেক্স বুক একটা চতুর্ভুজ টেবিল। দেয়ালের গায়ে সাদা কাঠ দিয়ে তৈরি করা একটা বুকসেসও ছিল। বিছানাটা ঢাকা ছিল সাদা চাদরে এবং চাদরের দিকে ছিল লাল ও কালো রঙের একটা বয়ল। গুয়ানি-ষ্টাণ্ডের উপরে একটা ছোট হাত-আয়না ঝুলানো ছিল এবং ঘিনের বেলা সাদা আয়রণে ঢাকা একটা বাতি মাত্র ঘরের শোভা বৃদ্ধি করত। সাদা কাঠের তাকে বইগুলি নীচু থেকে উপরে আকার অনুসারে সাজানো ছিল। সব চেয়ে নীচু তাকটার একপ্রান্তে ছিল গুয়ানি-ষ্টাণ্ডের গ্রন্থাবলী এবং সব চেয়ে উঁচু তাকের একপ্রান্তে নোটবকের কাগজের কভারে সেলাই করা এক খণ্ড 'মেমুন্স্‌ ক্যাটেকিজম্‌' ছিল। ডেক্সের উপরে সব সময় লেখার উপকরণ থাকত। ডেক্সের মধ্যে ছিল হপ্টম্যানের 'মাইকেল ক্র্যামারের' অনুবাদের পাণ্ডুলিপি; তার অধিব্যয়ক নির্দেশাবলী লেখা ছিল লাল কালিতে। এ ছাড়া পিতলের পিন দিয়ে আটকানো এক গোছা কাগজও ছিল ডেক্সের মধ্যে। এই সব কাগজে মাঝে মাঝে বিশেষ করে ব্যঙ্গাত্মক মুহুর্তে এক একটা বাক্য লেখা হত। কাগজ গোছার প্রথমটিতে 'বাইল বন্স'র বিজ্ঞাপনের একটা শব্দোন্মোচন (আঠা) দিয়ে এঁটে রাখা হয়েছিল। ডেক্সের আবরণ খুললেই একটা মুহুর্ত এসে নাকে লাগত—নতুন দেবদাক কাঠের পেন্সিল কিংবা আঠার বাতলের গন্ধ। মাঝে মাঝে তুলে ফেলে-রাখা খুব বেশি পাকা আপেলের গন্ধও পাওয়া যেত।

দৈহিক কিংবা মানসিক কিছুমাত্র পরিচর্যক যে কোন জিনিসই মিঃ ডাকি সূয়ার চোখে দেখতেন। মধ্য যুগের ডাক্তাররা তাঁকে নিশ্চয়ই শনির মাথায় বলতেন। তাঁর মুখে ছিল তাঁর গোটা জীবনের কাহিনীর ছাঁপ এবং সে মুখের রঙ ছিল ডাবলিনের পথের মত বাগানী। তাঁর লম্বা এবং কিছু পরিমাণে বড় মাথার ছিল শুকনো কালো চুল এবং তাঁর মুখে যে গাঁক ছিল তাতে তাঁর অবিনয়ী মুখটা ঢাক পড়ত না। তাঁর গালের হাড়ের দৃশ্যও খুঁটাকে কঠিন বলে মনে হত; কিন্তু তাঁর চোখে কোন কাঠিন্যের পরিচয় ছিল না। বাগানী রঙের চোখের পাতার নীচ থেকে তিনি চোখ দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাতেন এবং মনে হত যে

তিনি অস্ত্রের মধ্যে গুলি আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে অগ্রাহ্যিত এবং তা না পেয়ে তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই হতাশ। তিনি যেন তাঁর নিজের দেহটা থেকেও কিছু দূরে বাস করতেন এবং নিজের কার্যকলাকেও দেখছেন সালফেট চোখে। একটা ক্ষুদ্র আত্মজীবনীমূলক অভ্যাসও তাঁর ছিল। এই অভ্যাসের বলবতী হয়ে তিনি কখনও কখনও মনে মনে নিজের সবকিছু বাক্য গঠন করতেন—সে বাক্যের বর্তী হত তৃতীয় পুরুষের এবং কিয়দা হত অতীত কালের। তিনি কখনও ভিত্তারীদের ভিক্ষা দিতেন না এবং মোটা হাজেলের লাঠি নিয়ে দৃঢ়পদে হেঁটে বেড়াতেন।

তিনি বহু বৎসর ধরে ব্যালট স্ট্রীটের একটা বেসরকারী ব্যাঙ্ক ক্যাশিয়ারের কাজ করছিলেন। প্রাতিদিন সকালে তিনি চ্যাপেলস্‌জিড থেকে ট্রামে করে অফিসে যেতেন। দুই বেলো তিনি ড্যান বাথের হোটেল লাফ, এক বোতল বিয়ার ও বেশ কয়েকটি আয়ারল্যান্ড বিস্কুট খেতেন। বিকেল চারটায় তাঁর ছুটি হত। তিনি জার্জ স্ট্রীট একটা হোটলে নৈশ ভোজন শেষ করতেন। এই হোটলে তিনি ডাবলিনের গির্নিট করা খুব সমাজের হাত থেকে নিরাপদ বোধ করতেন এবং এখের খাবারের উপরও তাঁর আস্থা ছিল। তাঁর সম্মুখগুলি কাটত হয় গৃহকর্তার শিশুমানের সম্মুখে নয়তো শহরের উপকণ্ঠে বেড়িয়ে। মেজাজটর সন্ধ্যা তিনি ভালবাসেন বলে মাঝে মাঝে তাঁকে অপেরা বা কনসার্টও দেখা যেত। তাঁর জীবনে এগুলি ছিল একমাত্র আনন্দ।

তাঁর সঙ্গী ছিল না, বন্ধু ছিল না, গির্জাও ছিল না, ধর্মবিশ্বাসও ছিল না। অস্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখেই তিনি তাঁর অধ্যাত্ম জীবন বাপান করতেন, বড়দিনে যেতেন কুটুম্বদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে এবং তারা কেউ মারা গেলে তাদের মৃতদেহের শিঁচু শিঁচু তিনি সমাধি স্থানে যেতেন। তিনি প্রাচীন মধ্যযুগের খ্যাতিতে এই ছুটি সামাজিক কতব্য করলেও আমাদের সামাজিক জীবনের নিয়মক অস্ত্র কোন রীতি নীতি মানতেন না। তিনি একথা ভাবতও নিজেই অল্পমাত্র স্মৃতিতে যে সেরকম অবস্থার গড়লে তিনি ব্যাঙ্ক লুট করবেন কিন্তু সে অবস্থার সৃষ্টি কখনও হয়নি বলে তাঁর জীবন সমান ভাবেই গড়িয়ে চলেছিল—তার মধ্যে কোন উদ্বেগনা ছিল না।

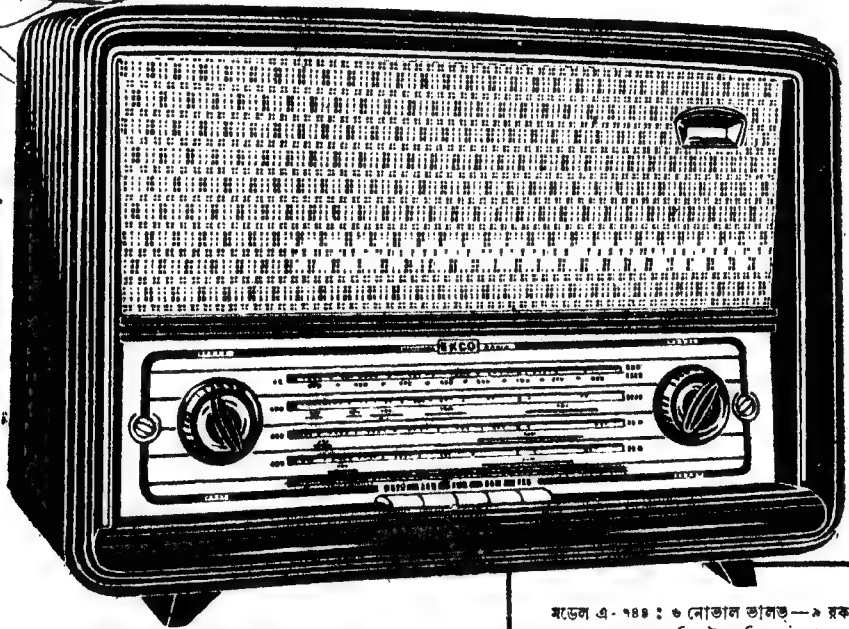
এক সন্ধ্যায় রোটাটার তিনি নিজেকে দুটি মহিলার পাশে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। সেই হলে অর্ধ সাংখ্যক দর্শক ও নীরবতার ফলে মনে হচ্ছিল যে আসার তেমন জায়গা না। তাঁর পাশে উপবিষ্টা মহিলাটি প্রায় শূন্য প্রেক্ষাগৃহটি দুই একবার দেখে বললেন: এটা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে আজ রাত্তি দর্শকের সন্ধ্যা এত কম। শূন্য প্রেক্ষাগৃহে পান পাওয়া এক স্তম্ভনীয় ব্যাপার।

তিনি মহিলার এই মন্তব্যকে কথা বলার আমন্ত্রণ বলে গ্রহণ করলেন। তিনি বিমিত হয়ে দেখলেন যে মহিলাটি আদ্যে বিব্রত বোধ করেন না। কথা বলতে বলতে তিনি মহিলাটিকে স্থায়ীভাবে নিজের স্মৃতিতে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। বখন তিনি স্মরণলেন যে মহিলাটির পাশে উপবিষ্টা তরুণীটি তাঁর বক্তা তখন তিনি বিচার করে দেখলেন যে মহিলাটির বয়ে তাঁর চেয়ে দুই এক বছরের কম হবে। তাঁর মুখ এক সময় স্তম্ভন ছিল এবং এখনও সে মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাঁপ আছে। ডিবাক্তান্তর মুহুর্তে অবরুদ্ধ বৈশিষ্ট্য প্রকট। চোখদুটি ছিল



অনবদ্য শিল্প-কৌশল...
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য...

ন্যাশনাল একো-র নতুন মডেল এ-৭৪৪



সঙ্গীত-সরিকেরা ক্লাশনাল-একোর চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হয়ে পারবেন না। এর অনিন্দ্য গড়ন, কলাকৌশল ও চক্চকে চেহারা যেমন নমুন্য-ভিরায, তেমনি প্রতিমধুর ও সুস্পষ্ট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সত্যি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি ক্লাশনাল-একো ডিলারকে বাজিয়ে শোনাতে বলুন—কোন খরচ নেই।

আমাদের অনুমোদিত ক্লাশনাল-একো ডিলারের
কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : ৬ বোতাল ভালভ—৯ রকম
কাজ, মনোরম কেবিনেট সজ্জিত ৪-বাণ্ড যুক্ত
এসি রেডিও—সারা পৃথিবীর স্টেশন ধরা যায়।
পিচানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন; ব্যাজিক আই;
গ্রাফোফোন ও একক্ট। স্পীকারের জুস্ত বোগা-
বোগ বাব্বা; টেপ রেকর্ডারের জুস্ত বিশেষ
বন্দোবস্ত। এক বছরের গ্যারান্টি।

৩৮৫, নীট

স্থানীয় টায়ার স্বতন্ত্র



ন্যাশনাল একো রেডিওই সেরা—এগুলি



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যান্ডারেসকো আইভেট লি:

কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • বাজাজ • বাল্লাভের • দিল্লী • সেকেশবরবাদ



পতীর নীল ও ছিন্ন। সে চোখের দৃষ্টির পূরণ হত উদ্ভূত ভাবিতো কি? পরে কপীলিনকার তাগারদ্বারা ইচ্ছাকৃত মুহুর্তে এক মুহুর্তের জন্যে বোকা যেত যে চোখের অধিকারিনী খুব বেশ শরৎকালে। তারারদ্বারা আবার দ্রুত আত্মপ্রকাশ করত, আবার বুদ্ধিবৃত্তির অধীনে হারিয়ে যেত এই অর্ধ নিম্নোক্ত প্রকৃতি এবং মহিলা পরিপূর্ণ আকৃতির বন্ধন আবেশকারী আত্মপ্রকাশ জ্যোৎস্না এই উদ্ভূত আরও বেশি করে ফুটে উঠত।

আবার কয়েক সপ্তাহ পরে আলগসকোট টেরেসে একটা কনসার্টে ছলনের দেখা হল। মহিলাটির কন্ঠার মনোযোগ যখন অল্পত নিবৃত্ত তখন তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেন মহিলাটির সঙ্গে। তিনি ছ একবার স্বামীর কথা উল্লেখ করলেন বটে, কিন্তু সে উল্লেখের মধ্যে সাবধানতার কথা ইচ্ছাকৃত ছিল না। তাঁর নাম শ্রীমতী নিনিকো। তাঁর স্বামীর প্রাপ্তবয়স্ক পিতা এসেছিলেন সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর স্বামী হলেন ডাবলিন ও হল্যান্ডের মধ্যে স্ফাটলকারী একটি বাণিজ্য জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং তাঁদের সন্তান সাত একটা।

ঘটনাচক্রে তৃতীয়বার মহিলাটির সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি সাহস করে উভয়ের নিভৃত একত্রিত হবার একটা প্রস্তাব করলেন। সেই নিভৃত মিলনে মহিলা এসেছিলেন। এইভাবে বহু নিভৃত মিলনের পূরণ হত। তাঁরা প্রায়ই সন্ধ্যার একত্রিত হতেন এবং সর্বাপেক্ষা নির্জন এলাকা বেছে নিয়ে উভয়ে একত্রে বেড়াতেন। এই ধরনের লুকাচুরিতে মিঃ ডাকির কিছু আপত্তি ছিল এবং মহিলাটি ব্যতীত তাঁকে তাঁর গৃহে আবদ্ধ রাখেন, সে বিষয়ে তিনি তাঁকে বাধ্য করলেন। ক্যাপ্টেন নিনিকো ভাবলেন যে মিঃ ডাকি বোধ হয় তাঁর কন্ঠার পানিপান্য তাই তিনিও তাঁর আলগা সম্বন্ধ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর দ্বীপে নিজের আনন্দের মত থেকে এমনভাবে নির্বাসিত করেছিলেন যে তাঁর দ্বীপে সন্ধ্যার একত্রিত হবার কোন আশ্রয় থাকতে পারে একথা তিনি ভাবতে পারতেন না। স্বামী প্রায়ই বাড়ি থাকতেন না এবং যেহেতু সঙ্গীতশিল্পী নিজে বেরিয়ে যেত বলে মিঃ ডাকি মহিলার সঙ্গীতশিল্পের অনেক সুযোগ পেতেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে কেউ পূর্বে এ ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন নি এবং তাঁরা এর মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন নি। বীরে বীরে মিঃ ডাকির সমস্ত চিন্তা জড়িয়ে গেল মহিলাটির সঙ্গে। তিনি মহিলাকে বই ধার দিতেন, তাঁর সঙ্গে ভাব বিনিময় করতেন এবং নিজের বুদ্ধিবাদের অংশও তাঁকে দেখার চেষ্টা করতেন। মহিলাটি সব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

কখনও কখনও মিঃ ডাকির মতবাদ বর্ণনার বিনিময়ে মহিলাটি নিজের জীবনের কোন কোন ঘটনা বলতেন। প্রায় মাসের মতই উভয়ে নিয়ে মহিলাটি তাঁকে তাঁর প্রকৃতি পূর্ণাঙ্গী খুলে ধরার উপদেশ দিতেন। মিঃ ডাকি তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি কিছুকাল অগ্নিশিখা সমাজতন্ত্র দলকে সাহায্য করেছিলেন; তৈলশীপে প্রয়োজনীয় ছাত্রের একটি কুঠরীতে জন কৃত্তি প্রমিকের মধ্যে তাঁর নিজেকে খুবই বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে মনে হত। যখন সে দল তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং প্রত্যেক উপদলই তার স্বতন্ত্র নেতার অধীনে আলগা-আলগা ছাত্রের কুঠরীতে মিলিত হতে

লাগল তখন তিনি দল ছেড়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন যে প্রমিক খুবই ভয়ে ভয়ে আলগা। করত এবং নিজের বেতনের প্রাপ্ত তারার সঙ্গে প্রায়ই দেখাত তাও ছিল অস্বাভাবিক। তাঁর ধারণা তারার ছিল কড়া রকমের বাস্তববাদী এবং তা দয় সাধারণ নয় এরূপ অবস্থানের কনসার্ট কাঁচকালে যে বাধ্যবাধিতা আসে তা তারার ঘৃণা করত। তিনি মহিলাকে বললেন যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ডাবলিন কোন সামাজিক বিপ্লব হবার সম্ভাবনা নেই।

তিনি তাঁর চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করেন না কেন একথা মহিলা জানতে চাইলেন। তিনি সমগ্রায় যুগার সঙ্গে জানতে চাইলেন লিখে কি হবে। যারা বাট থেকে পানশরীর রক্ষা করে চিন্তা করতে পারে না সেই কবিতাবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে? যে যুগান্তের মধ্যবর্তী জৈবী নিজের নীতিবোধ পুষ্টির হাতে ও নিজের শিল্পকলা শিল্পোক্তাদের হাতে সমর্পণ করে আলগা তাদের সমালোচনার সম্মুখীন হবে?

তিনি প্রায়ই ডাবলিনের বাইরে মহিলার কুঠরীতে যেতেন এবং তাঁরা দুজন নিভৃত বহু সন্ধ্যা কাটাতেন। ধীরে ধীরে তাঁদের চিন্তা যখন পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল তখন তাঁরা কাঁধে কাঁধে নিয়েও আলগা-আলগা পুস্তক করলেন। সে মহিলার সান্নিধ্য ছিল বিশেষ চারার চার ধারে উচ্চ বৃত্তিকার মত। অনেক দিন তিনি ব্যক্তি না আলিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে দিতেন উভয়ের চার ধারে। তাঁদের দুটি সন্তা একত্রিত হত অন্ধকার কক্ষ, নিজের বিচ্ছিন্নতা ও উভয়ের কাশে বাজা সঙ্গীতের মাধ্যমে। এই মিলন মিঃ ডাকিকে উত্তেজিত করত, তাঁর চরিত্রের কর্তৃক বিকটা নষ্ট করে দিত এবং তাঁর মনোজগতে আসত আবেগের শিরশ্রা। সময় সময় তিনি নিজের পলার স্বর নিয়েই শুনতেন। তিনি ভাবতেন যে মহিলার চোখে তিনি দেখত পথের উঠে পড়ার এবং তিনি বহু বেশি করে তাঁর সঙ্গিনীর আবেগাক চারত্রে নিজের দিকে টানতে লাগলেন ততই তিনি শুনতে লাগলেন নিজের অল্পত নৈর্বাণিক পলার স্বর—যে বয়ে তিনি বোঝতে চাইতেন আত্মার দৃষ্টিকোণ নির্জনতার কথা। সে স্বর কলত, আমরা নিজের বিলিয়ে দিতে পারি না—আমরা আমাদের নিজেরই। এই সব আলোচনার পরিসরান্তি ঘটছিল যে রাতে সে রাতে শ্রীমতী নিনিকো অস্বাভাবিক উত্তেজনার সকল লক্ষণই প্রকাশ করেছিলেন এবং সাধারণে তাঁর হাত ধরে নিজের পাল ধরেছিলেন।

মিঃ ডাকি খুবই বিমত হয়েছিলেন। তাঁর আলোচনার বিষয়ে অর্থ মহিলা করেছিলেন তাতে তাঁর মোহত্ব হয়েছিল। তিনি সপ্তাহকাল আর মহিলার সঙ্গে দেখা করতে চান নি। পরে তিনি তাঁকে দেখা করার জন্যে অল্পবয়স্ক জানিয়ে ‘চিঠি’ লিখেছিলেন। তাঁদের শেষ দেখা নিজের বিপরীত স্বাক্ষরোক্তির প্রভাবে ভাঙা হোক—এ তিনি চান নি বলে তাঁদের দেখার ব্যবস্থা হয়েছিল পার্ক-গেটের কাছে ছোট একটি ককের দোকানে। সপ্তাহটি ছিল শরৎকাল—রাতিমত ঠাণ্ডা কিন্তু তবু তাঁরা পার্ক তিন ঘণ্টা কাল এমক ওদিক এক সঙ্গে বোড়িয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ে ছিন্ন করলেন যে আর তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। মিঃ ডাকি বললেন যে প্রতি মিলনেরই পরিসমাপ্তি ঘটে যেমন। পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা নীরবে এগিয়ে

গেলেন ট্রামের দিকে কিন্তু এখানে শ্রীমতী সিনিকো এমন দুর্ঘটনাক্রম কাপতে শুরু করলেন যে, তিনি আবার মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন এই ভয়ে মিঃ ডাকি তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এর কয়েকদিন পর মিঃ ডাকি পার্শ্বল যোগে নিজের বইগুলি কেয়ং গেলেন।

তার পর চার বাসর চলে গেল। মিঃ ডাকি তাঁর পূর্ববর্তী সমতাপূর্ণ জীবন দ্বারা কিয়ৎ প্রভাবিত হলেন। তাঁর শরীরকে তাঁর দুঃখলাব্ধ মনের দুঃস্বপ্ন ছাপা ছিল। নীচের ঘরে তাঁর পানব জায়গায় কয়েকটি নতুন বয়লিশির আবির্ভাব হয়েছিল আর তাঁর বই-এর তাকে দেখা দিয়েছিল নীচের দু'খণ্ড বই—'হাস্ স্পেল জারাত্ত্বা' ও 'দি গেস সারেন্দ'। তাঁর ডেহের মধ্যে যে কাগজগুচ্ছ ছিল তাতে আর তিনি লিখতেন না। শ্রীমতী সিনিকোর সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাতের মাস দুই পরে লেখা তাঁর একটি বাক্যের বয়ান ছিল এই রকম: পুরুষের সঙ্গে পুত্রবধূর প্রেম অসম্ভব কেননা তাদের মধ্যে রতিক্রীড়া সম্ভব নয়, আর পুত্রবধূর নারীর মধ্যে বন্ধুত্ব সম্ভব নয় কারণ তাদের মধ্যে রতিক্রীড়া হবেই। মহিলার সঙ্গে দেখা হবে ভয়ে তিনি কনসার্টে যেতেন না। ইত্যংসরে তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন এবং ব্যাকের ছোট আশীনার অবসর নিয়েছিলেন। তিনি কিন্তু রোভই সকালে ট্রামে করে শহরে যেতেন এবং প্রতিনিয়ত জর্জস্ট্রীটে সন্ধ্যা নৈশাহার শেষ করে, সন্ধ্যা পত্রিকা পড়ে সন্ধ্যায় শহর থেকে হেঁটে গৃহে ফিরতেন।

একদিন সন্ধ্যায় মুখে একটুকরো মাংস ও কপি পুতে পুতে তিনি

থমে গেলেন। তিনি যে সন্ধ্যা পত্রিকাটি পড়ছিলেন তার এক সংবাদে এসে তাঁর চোখ স্থিরনিবদ্ধ হয়ে গেল। তিনি খাবার গ্রাস প্লেটে রেখে মনোযোগের সঙ্গে সংবাদটি পড়তে লাগলেন। তার পর এক গ্রাস জল খেয়ে, খাবারের প্লেটটা একদিকে সরিয়ে রেখে দুই কুই-এর মধ্যে কাগজখানা দুই ভাঁজ করে নিজের সামনে রেখে সেই সংবাদটি বার বার মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগলেন। কপির তরকারি থেকে একটা সাদা চর্বির মত জিনিস বেরিয়ে তাঁর খাবারের প্লেটে জমা হল। তাঁর খাবার ঠিক মত রান্না করা হয়েছিল কিনা জানার জন্যে হোটেলের পরিবেশিকা মেয়েটি এসিয়ে এল। তাঁর খাবারে যে কোন দোষ ছিল না একথা জানিয়ে তিনি অভিকষ্টে কয়েক গ্রাস গিললেন। তার পর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নববধূর সন্ধ্যায় মাটিতে নিয়মিত হাজির। মোটা লাঠিটা হুঁকে তিনি দ্রুত গতিতে হেঁটে চললেন। তাঁর ওড়ার কোঠের পাশের পকেট থেকে উঁকি মারছিল ধূসর রঙের 'মেল' কাগজটি। পার্কগেট থেকে চ্যাপেললিড পর্যন্ত রাস্তাটি নির্জন—সেখানে তিনি চলার গতি কমিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের লাঠিটি কম জোরে মাটিতে পড়তে লাগল এবং তাঁর নাক থেকে দীর্ঘশ্বাসের মত যে অনিয়মিত নিঃশ্বাস বেরুচ্ছিল তা শীতের হাওয়ায় উড়ছিল জমে। বাড়ি পৌঁছে তিনি তৎক্ষণাৎ উপরে বসবার ঘরে চলে গেলেন এক পকেট থেকে কাগজটা বের করে জানালার কাছে পড়তে আলোতে আবার সেই সংবাদটা পড়লেন। তিনি সেটা জোরে পড়লেন না—তবে

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ..



বাড়ের সারাংশ সম্পূর্ণ শরীরের
প্রয়োজন নিয়োগ করলেই
অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়।
ডায়া-পেপ সিন ব্যবহার করলে
এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন,
কারণ ডায়া-পেপ সিন খাচ্চ
হজমের সাহায্য করে।

ডায়াপেপসিন

ইউনিয়ন ড্রাগ কলিকাতা

দুবেলা খাবার সময়
নিয়মিত ছোট এক
চামচ খাবেন।
ডায়া-পেপসিন
কখনো অভ্যাসে
পাঁড়ায় না।



হাজকেরা প্রার্থনা পড়ার সময় যেমন করেন তেমনি টোট নেড়ে নেড়ে তিনি সেটি পড়তেন। সংবাদটি ছিল নিম্নোক্তরূপ :

সিডনি প্যারেডে মহিলার মৃত্যু—

একটি বেরনাদারক কাহিনী—

আজ সন্ধ্যা অব ডাবলিন হাসপাতালে ডেপুটি করোনার (মিঃ লেভারেরটের অধুপস্থিতিতে) গত কাল সন্ধ্যায় সিডনি প্যারেড ঠেগনে নিহত ৪৪ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতী এমিলি সিনিকোর মৃতদেহের ময়না তদন্ত করেন। সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে মহিলা রেললাইন পার হবার সময় বাত দশটার কিংসটাইন থেকে আসা বীরগতির ট্রেনের এঞ্জিনের গাড়ায় পড়ে বান এবং তার ফলে মাথায় ও দেহের দক্ষিণ ভাগে আঘাত পান। এই আঘাতের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। এঞ্জিনের ড্রাইভার জেমস লেনন তার সাক্ষ্য বলে যে সে পনের বৎসর বাবত রেল কোম্পানীতে চাকুরী করছে। গার্ডের হুইসল শুনে সে ট্রেন চালু করেছিল ও তার দু-এক সেকেন্ড পরে উক্ত ট্রেনকার শুনে ট্রেন থামিয়ে দিয়েছিল। ট্রেনটা চলেছিল বীরগতিতে।

রেলের কুলি শি ডান বলে, যে ট্রেনটা-বখন ছাড়ছিল তখন সে একটি নারীকে ট্রেন লাইন পার হবার চেষ্টা করতে দেখেছিল। সে ট্রেনকার করতে করতে তার দিকে ছুটে গিয়েছিল কিন্তু সে তার কাছে পৌঁছানোর আগেই সে নারী এঞ্জিনের গাড়ায় মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

জনৈক জুরি : তুমি মহিলাকে পড়ে যেতে দেখেছিলে ?

সাক্ষী, আন্তঃ হ।

পুলিশ সার্জেট ক্রলি তার সাক্ষ্য বলে যে সে ট্রেনে পৌঁছে য়তাকে প্রাটিকের প্রায় ময়ার মত শোরানো অবস্থায় দেখেছিল অ্যাথল্যান না আসা পর্যন্ত দেহটি রক্ষার জন্তে সে য়তাকে ওয়েলিঃ রুম নিয়ে বাবার বাবস্থা করেছিল।

৫৭ নম্বর কনষ্টেবল এই সাক্ষ্য সমর্থন করে। সিটি অব ডাবলিন হাসপাতালের সহকারী হাউস সার্জেন ডাঃ হালপিন তাঁর সাক্ষ্য বলেন যে য়তার নীচের দুটি পাঁজর ভেঙে গিয়েছিল এবং তাঁর দক্ষিণ কঁধেও গুরুতর আঘাত লেগেছিল। পড়ে বাবার ফলে মাথার দক্ষিণাংশেও আঘাত লেগেছিল। স্বাভাবিক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে আঘাত যথেষ্ট ছিল না। তবে তাঁর মতে একেজ্রে মৃত্যু ঘটছিল আকস্মিক ভাবে ও হার্টের কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার।

রেল কোম্পানীর তরফে মিঃ এইচ. বি. চ্যাটারসন্ ফিনলে দুর্ঘটনার জন্তে গভীর অস্বস্তাপ প্রকাশ করেন। সেতুর উপর দিয়ে ছাড়া লোকদের রেল লাইন পার হওয়া বন্ধ করার জন্তে কোম্পানী সম্বন্ধতাত্ত্বিক সব ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছে। প্রতি ট্রেনে নেটিল টাক্সিবে দেওয়া হয়েছে এবং লেভেল ক্রসিঙুলিতে গেট বসিয়েও দেওয়া হয়েছে। য়তার গভীর রাতে রেল লাইন পার হয়ে প্রাটিকরম থেকে প্রাটিকরমে বাবার অভ্যাস ছিল এবং আলোয় দুর্ঘটনার বিবরণ দেখে বোঝা যায় যে তাঁর রেল কোম্পানীর কর্মচারীদের এ ব্যাপারে কোন দোষ ছিল না।

য়তার স্বামী সিডনি প্যারেডের লিওভলের ক্যান্টেন সিনিকোও সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন যে মৃত্যু ছিলেন তাঁর স্ত্রী। দুর্ঘটনার সময় তিনি ডাবলিনে ছিলেন—তিনি সেইদিন সকালেই রটারডাম

থেকে ফিরেছিলেন। তাঁদের বিবাহিত জীবন ছিল বাইশ বৎসরের এবং বৎসর দুই আগে পর্যন্ত তাঁদের বিবাহিত জীবন ছিল সুখের। বৎসর দুই আগে থেকে তাঁর স্ত্রী কিছুটা অমিতাচারিণী হয়ে উঠেছিলেন।

কুমারী মেরি সিনিকো বলেন যে সম্প্রতি তাঁর মা মদ কেনার জন্তে প্রায়ই রাজ্জে বাইরে যেতেন। সে এ নিয়ে মার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করত ও তাঁকে একটা সন্ডের সদস্তা হতেও সে রাজী করিয়েছিল। দুর্ঘটনার ঘটনা খানেক পর পর্যন্ত সে বাড়িতে ছিল না।

জুরি ডাক্তারী সাক্ষ্যমুসারেই তার দেন এবং লেননকে দোষযুক্ত বলে ঘোষণা করেন। ডেপুটি করোনার ঘটনাটিকে অত্যন্ত বেরনাদারক বলে স্বর্ণনা করেন ও ক্যান্টেন সিনিকো ও তাঁর মেয়ের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নিবারণের জন্তে তিনি রেল কোম্পানীকে আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্তে অস্বস্তাপ জানান এ দুর্ঘটনার কারণ কোন দোষ ছিল না বলে প্রতিপন্ন হয়।

মিঃ ডাকি কাগজ থেকে চোখ উঠিয়ে জানালার মধ্য দিয়ে তাকালেন বাইরের সন্ধ্যাকালীন নিরানন্দ দৃশ্যপটের দিকে। শুধু মদ চোলাইর কারখানার পাশে নদীটি শান্ত হয়ে পড়েছিল এবং লুকান রোডে কোন কোন বাড়িতে কখনও-কখনও আলো দেখা যাচ্ছিল। কি হুঃধের পরিণতি। তাঁর মৃত্যুর সব কাহিনী তাঁর কাছে স্মৃত্যব্রহ্মক মনে হল এবং তিনি এই নারীর কাছে তাঁর পথিক গোপন কথা বলেছিলেন বলে তাঁর নিজের উপরও ঘৃণা হতে লাগল। চুল চেয়া বিশ্লেষণ, সহানুভূতির কাঁকা কথাগুলি, অতি সাধারণ মৃত্যুর একটি বিবরণকে অসাধারণ প্রতিপন্ন করার জন্তে রিপোর্টার কর্তৃক প্রযুক্ত সমস্ত নির্বাচিত কথাগুলি তাঁর পাকস্থলীকে আক্রমণ করল। সে তো নিজেকে ছোট করে দিলই, সে বেন তাঁকেও ছোট করে দিল। তিনি দেখতে পেলেন তার পাশের জঙ্গলপূর্ণ পথ—কষ্টদায়ক ও দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ। তাঁর আত্মার সন্নিহী। যে সব খুঁড়িয়ে চলা হতভাগাদের তিনি দেখেছেন মদের দোকানীর কাছে পান্ড ও বাতল পূর্ণ করতে নিয়ে যেতে তাদের কথা তাঁর মনে পড়ল। ভ্রায়ণরায়ণ দ্বৈধ, কি হুঃধের পরিণতি। স্পষ্টই সে বেঁচে থাকার পক্ষে অস্বস্তাপ হয়ে উঠেছিল। তার জীবনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না বলেই সে অভ্যাসের দাস হয়ে উঠেছিল, এদের মত মানুষের ধ্বংসাবশেষের উপরই সম্ভ্রান্ত পড়ে গঠে। কিন্তু সে এত নীচে নেমে গেল তাই বলে। তবে কি তিনি এতদিন তার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার কবরী হয়েই চলেছিলেন! সেদিন রাজ্জে তার ভাবাবেগ সম্ভ্রান্ত আচরণের কথা তাঁর মনে পড়ল এবং তিনি এর আগে যা করেন নি তেমনই কঠিন ব্যাখ্যা করলেন তার সেদিনের আচরণের। তিনি যে পথ নিয়েছিলেন সে পথের সমর্থন পেতে তাঁর আর কোন অস্বস্তি ছিল না।

আলো কমে যাওয়ার তাঁর মৃত্যু বিচরণ করে ফিরতে লাগল; তাঁর মনে হল তাঁর হাতে যেন সেই মহিলার স্পর্শ। প্রথম পাকস্থলীতে যে আঘাত লেগেছিল সে আঘাত এখন লাগল তাঁর মায়ুতে। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর চুপি ও গুতারকোট পরে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। দরজার গোড়াতাই সাক্ষ্য হল ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে, সে ঠাণ্ডা বাতাস বেন কোটের হাতার ভিতর দিয়ে

সেই প্রবেশ করল। তিনি চ্যাপেলিং ও ব্রিজে একটা মন্দের দোকানে এসে একটা গরম পাক আনার হুকুম দিলেন।

মালিক বিনীত ভাবে তাঁর হুকুম তামিল করলো কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলার সাহস শেল না। দোকানে পাঁচ ছয়জন শ্রমিক বসে জটলা করছিল। তারা কাউন্টি কিলডেয়ারের কোন ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্য সবুজ আলোচনা করছিল। তারা মাঝে মাঝে তাদের বড় বড় মন্দের পায়ে চুমুক দিচ্ছিল, ধূমপান করছিল, মেঝেতে খুঁচু ফেলছিল এবং তাদের ভারি বুটের ধূলাবালিও ছড়াত্তছিল। মিঃ ডাকি নিজের টুলে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিন্তু তিনি তাদের দেখতেও পাচ্ছিলেন না, তাদের কথাও শুনছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তারা উঠে গেল এবং মিঃ ডাকি আবার একটা পাক চাইলেন। তিনি বহুক্ষণ ধরে সেটি পান করলেন। দোকানটা নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছিল। মালিক কাউন্টারে বসে হাই তুলতে তুলতে 'স্টেরাড' পড়ছিল মাঝে মাঝে বাইরের নির্জন রাস্তায় এক আধটা ট্রাম স্রুতগতিতে চলে যাবার শব্দ আসছিল ভেসে।

তিনি সেখানে বসে ভাবতে লাগলেন মহিলার সঙ্গে তাঁর সংযোগের কথা আর তাঁর মনে ভেসে উঠতে লাগল তাঁর ছুটি মূর্তি; সেই সঙ্গে তাঁর এ অল্পভূক্তিও হল যে সে মহিলা মৃত্যু, তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে সে আজ মৃত্যু মাঝে পৰ্ব্ববসিত। তাঁর যেন কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। এতদূর অবস্থায় তিনি তার সঙ্গে প্রবন্ধনমূলক মিলনাত্মক নাটকের অভিনয়ও করতে পারতেন না কিংবা তাকে নিয়ে খোলাখুলি বসবাসও করতে পারতেন না। তাঁর কাছে যা সবচেয়ে ভাল মনে হয়েছিল তিনি তাই করেছিলেন। এতে তাঁর দোষ কোথায়? এখন সে চলে যাবার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে রাতের পর রাত একা ওই ঘরে কাটিয়ে তার জীবন নিশ্চয়ই নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তিনি মনে না বাওয়া পৰ্ব্বন্ত, তাঁর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে মৃত্যু মাঝে না ঠাঁড়ানো পৰ্ব্বন্ত তাঁর জীবনও নিঃসঙ্গ।

রাত ন'টার পর তিনি মন্দের লোকান থেকে উঠে গেলেন। সে রাতটা ছিল ঠাণ্ডা ও বিষন্ন। তিনি প্রথম গেট দিয়ে পার্কে চুকলেন ও বড় বড় গাছগুলির নীচে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। চার বৎসর পূর্বে যে ঠাণ্ডা গলিপথগুলিতে তাঁরা দুজন একসঙ্গে হেঁটে বেড়িয়েছিল, সেই পথে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অন্ধকারে মনে হতে লাগল সে যেন তাঁর খুব কাছে। কোন কোন বৃহত্তে মনে হতে লাগল তার গলার স্বর যেন তাঁর কানে এসে বাজছে, তার হাতের

স্পর্শ তিনি পাচ্ছেন নিজের হাতে। তিনি কান খাঁড়া করে শোনার জন্যে ঠাঁড়ালেন। তিনি কেন তাকে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত থেকে বঞ্চিত করেছিলেন? কেন তিনি তাকে হৃত্যবশ্ত দিয়েছিলেন? তিনি অল্পভব করলেন যে তাঁর নৈতিক প্রকৃতি যেন ভেঙে চুকুরো চুকুরো হয়ে যাচ্ছে।

ম্যাগাজিন হিলের চূড়ায় পৌঁছে তিনি থামলেন এবং নদীপাশে তাকালেন ডাবলিনের দিকে; নীতের রাত শহরের ব্যতিতুলি লাল হয়ে অলছিল আর আতিথ্যের আহ্বান জানাচ্ছিল। তিনি চালু সমুদ্রযাত্রা পথে তাকিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে পার্কের দেয়ালের ছায়ায় শুয়ে থাকা নরনারীর মূর্তি দেখতে পেলেন। এই ধরণের কার্যক ও লুকাচুরিকরা ভালবাসার বৃত্তে তাঁর হৃদয় হত্যাশায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর জীবনের নীতিবোধ তাঁকে লেশন করতে লাগল। তিনি অল্পভব করলেন যে জীবনের ভোজে তিনি অপাত্তেয় হয়ে গেছেন। একটা মানবী তাঁকে ভালবাসতো বলে মনে হলো তিনি তাঁকে জীবন ও স্বথ থেকে বঞ্চিত করেছেন—তাকে তিনি দিয়েছেন লজ্জা ও কলঙ্কের বৃত্ত্যবশ্ত। তিনি বুঝলেন যে নীচে যে জীবগুলি দেয়ালের কাছে শুয়েছিল তারা চাইছিল যে তিনি পৃথিবী থেকে বিতারন নেন। কেউ তাঁকে চায় না—জীবনের ভোজ থেকে তিনি নির্বাসিত। তিনি দুই ফেরালেন ডাবলিনের দিক প্রবহমানা ধূসর চকচকে নদীটির দিকে। নদীর ওদিকে তিনি দেখতে পেলেন যে কিস্ত্রিভ্রম শৈলন থেকে একটা মালগাড়ি অগ্নিবরী মাথাওয়ালা একটা পোকায় মত অন্ধকারে একত্রে যেভাবে কাঠ স্টেট একে বেকে চলেছে। সেটি ধীরে ধীরে দুই পাখের বাইরে চলে গেল কিন্তু তিনি তবু তাঁর মাথার মধ্যে শুনতে পেলেন এঞ্জিনের কণ্ঠস্বর, ধসধসান যেন সেই মহিলার নামটি বারবার উচ্চারণ করে চলেছে।

তিনি যে পথে এসেছিলেন সেইপথেই ফিরে চললেন—তাঁর কানে বাজতে লাগল এঞ্জিনের শব্দের হুম। মৃত্যির বৃত্ত্যবশ্ত সবুজ তাঁর মনে সংশয় জাগল। তিনি একটা গাছের নীচে ঠাঁড়িয়ে সেই ছন্দের ধনিকে লুপ্ত হয়ে যাবার সুযোগ দিলেন। তিনি সেই অন্ধকারে সেই মহিলার অস্তিত্বও অল্পভব করতে পারলেন না, তার গলার স্বরও তাঁর কানে বাজল না। তিনি শোচনীয় ভাবে কয়েক মিনিট প্রতীক্ষা করলেন। তিনি কিছুই শুনতে পেলেন না—রাতটা ছিল পরিপূর্ণরকমে নিস্তব্ধ। তিনি আবার শুনতে চেষ্টা করলেন—আবার সেই পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। তিনি বুঝলেন যে তিনি সম্পূর্ণ একা।
অমুবাদক—গোপাল ভোমিক

ছোঁওয়া

অজলা হালদার

ছুঁয়েই করবে জয়? স্পর্শও কাতর
হয়, যদি সেই ছোঁয়া গুঁঠব বেশে
বরষের মত থাকে কিছুক্ষণ জমে।

কিন্তু এ যে স্পর্শ নয়—স্পৃহা ভরসায়।

ছুঁয়েই করতে হয়, স্পর্শটুকু যদি
আরো ঘন হত—ওই জীবনের মত,
অবাস্তা তিথি আজ। অস্ত এক ব্রত
নিয়মে এ প্রবাহিত—বেগবতী নদী।

ছুঁয়েই করবে জয়, তমিলা বখন
আলোকের স্পর্শ পেয়ে স্বচ্ছ হয়ে যাবে,
চখন চুঁইয়ে হবে প্রাপ্তির আবেগ।

কেউ গেলে আকাঁধার গাঁতময় মেঘ
হিমালয় বাধা দিয়ে অনেক করাবে
যে বাধি সত্যই ছোঁয় পৃথিবীর মন।



হামিদাবাদু বেগম শিখানী ঘোষ

একদল বাকী সিদ্ধনদ পার হয়ে এগিয়ে চলেছে সোজা পশ্চিমে। পক্ষ নদীর পলিপাড় সমতল ভূমি পিছনে ফেলে রেখে চলতি ক্রমশঃ পার হয়ে চলেছে দুর্গম পার্বত্য পথ। কখনও পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করার পর তাদের বাকীপথের সমুখে এসে পড়েছে সুবিবৃত মরুভূমি। তাও পিছনে ফেলে রেখে বাকীদলটি এগিয়ে চলেছে শুধু পশ্চিম তেতে আরও পশ্চিমে।

এই বাকীদলের মধ্যে রয়েছে কিছু শত্রুপালিক সেনা আর কয়েকটি উট। মোগল সম্রাট হুমায়ুন শের খাঁর নিকট পরাজিত হয়ে রাতের নিশ্চলতার পাজাব প্রদেশে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন আফগানিস্তানের পথে। তাঁর অভিপ্রায় সীমান্ত প্রদেশের কোথাও অবস্থান করে তিনি শক্তি সঞ্চয় করে নেবেন শুধু ভাবে। পরে সুবিধে বুঝে আক্রমণ চালিয়ে পাঠান-রাজকে পরাজিত করে তিনি অধিকার করে নেবেন সিদ্ধ প্রদেশ।

এই উটগুলির ওপর বসে রয়েছেন হুমায়ুন বামশার জননী, জায়া ও ভগ্নিনীগণ। তাঁদের প্রত্যেকের মুখেই পড়েছে আতঙ্কের চার। আপাতত কোথাও আশ্রয় না পেলে তাঁদের পক্ষে এই ভাবে উটের শিঁটে বসে থাকারটা হবে উর্ধ্বে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। এই বাকীদলটি পরিচালিত হচ্ছে হুমায়ুনের কান্ট জাতা মির্জা হামিদাবাদুর নির্দেশে। সে এর কি, বাবদ্য করছে কে জানে। শেখ পর্যন্ত কি কান্দাহারে বাগাইট ঠিক করলো!

হুমায়ুন ডেক পাঠালেন তাঁর ভ্রাতাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন অন্ধদের মূখ্য ভদ্রহি কুমি না কি এখন এই বাকীদলকে কান্দাহারে

নিরে চলেছে? কিন্তু অত দূর এভাবে অগ্রসর হলে মেয়েদের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছে?

—দেখেছি দাদা। উত্তর দিল হিন্দোল—কান্দাহারে বাবার মন্তলব আমার থাকলেও আপাততঃ আমি স্থির করোঁ শিবির স্থাপন করবো পটিনগরে। সেখানে থাকেন আমার গুরু মীর বাবা দোস্ত। তাঁর রূপায় আমাদের কোন অসুবিধেই হবে না।

সিদ্ধনদের কুড়ি মাইল পশ্চাতে পটিনগর অবস্থিত। হিন্দোল সেখানেই স্থাপন করলেন শিবির।

হুমায়ুন বামশা অনেকখানি আশঙ্কু হলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিচক্ষণতা দেখে। অল্পঃপরিমাণের দীর্ঘ পথ চলার কষ্ট তবু কিছুটা উপশম হবে এখানে। তিনি এগিয়ে গেলেন মেয়েদের শিবিরের দিকে।

হুমায়ুন-বামশা সেখানে যেতেই একদল অজানা অচেনা মেয়েকেলে উঠে পাড়িয়ে কুণিল জানালো সম্রাটকে।

আবাক হয়ে গেলেন হুমায়ুন। এরা কারা?

এগিয়ে এলেন হুমায়ুনের মাতা মিলতব বেগম। তিনি বললেন ওরা এসেছে হিন্দুস্থানের সম্রাটকে অভিনন্দন জানাতে।

বিস্মিত হয়ে হুমায়ুন বললেন সম্রাট? কে হিন্দুস্থানের সম্রাট?

মিলতব বেগম হেসে বললেন—তুই বাহা তুই। তোকৈই ওরা জানাতে এসেছে অভিনন্দন।

হুমায়ুন বললেন—মোটটী আমি এখন হিন্দুস্থানের সম্রাট নই। এখন আমি পথের ভিখারী। কিসের জন্তে আমি নিতে বাব ওদের অভিনন্দন।

জিজ্ঞাসের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে বলে উঠলো—অভিনন্দন নেবেন এই কারণে যে কিছুদিনের মধ্যেই আপনি হিন্দুস্থান জয় করে পুনরায় বধন তার সিংহাসনে বসবেন তখন আমাদের মন্ত অভাগিনীরা আপনাকে পাবে কোথায়? তা চাড়া কাবুল এখনও বীর অধীন তাঁকে তো পথের ভিখারী বলা চলে না।

হুমায়ুন চেয়ে দেখলেন মেয়েটির মুখের পানে ভারী মিলি তো ওর কঠিন।

তখনও হাসছে ঐ কিশোরীর চোখ মুখ। হুমায়ুন-বামশা আর সামলাতে পারলেন না কৌতুহল। তিনি মিলতব বেগমকে জিজ্ঞেস করেন—ঐ মেয়েটি কে মা?

মিলতব বেগম মুখ হেসে বললেন—ওটি মীর বাবা দোস্তের মেয়ে হামিদাবাদু। বড় চমৎকার মেয়েটি। এর আগে হিন্দোলার মুখে ওর কথা শুনেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি মেয়েটি তার চেয়েও সুন্দর। মেয়েটিকে দেখে সত্যিই বড় মুগ্ধ হয়ে গেলেন হুমায়ুন। যদিও তাঁর বরংক্রম তেত্রিশ পার হয়ে গেছে এবং তাঁর সন্তর্ভরণও রয়েছে পাঁচ জন, তবু নিজের রাশ টান ধরে রাখতে পারেন না হুমায়ুন। ঐ চোখ বহুরের কিশোরীটিকে পাবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁর অন্তর।

দিন দুয়েক যেতেই রনে হল ঐ হামিদাবাদুকে না গেলে দরুন্দি হয়ে উঠবে তাঁর জীবন।

সোদন তিনি গেলেন তাঁর মাতার কক্ষে। তখন সেখানে রয়েছে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিন্দোল। হুমায়ুন একটু ইতস্ততঃ করে সরাসরি মাকে কথাটা বলে দিলেন—দেখো মা আমি দোস্তের মেয়ে হামিদাবাদুকে রূপে বড় মুগ্ধ হয়ে গেছি, তা আমার অভিপ্রায় তোমরা আমার সাথে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা কর।

তার কথা শুনে বিম্বিষ্ঠ হয়ে হিন্দোল বলে—সে কি, এখানে এখন আমাদের শক্তি সঞ্চয় করার সুসবাবা পুনরুদ্ধার করছে হবে। এখন তাঁই নানীর প্রোথ পক্ষের চলাব কেন?

তমাসুন বললেন—দশ কক্ষের কথা তুমি পাবে চিন্তা করলেও কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু হামিদাকে না পেলে এখন আমার পক্ষে বেঁচে থাকার অসম্ভব।

অসম্ভব বিবাক্ত হয়ে হিন্দোল বলে—না তা ভুলেই পারবে না। কারণ মীর বাবা দোস্ত আমার গুরু। আর তাঁর যেসকল আমি দেখি নিজের বোনের মত। কাজেই এ অবস্থায় তার সাথে আপনার বিয়ে হতেই পারে না।

তমাসুন তাঁর ভাই-এর কথায় ক্রোধে উদ্ভ্রান্ত হয়ে বললেন—মা তোমারও কি এ মত?

দিলদর বেগম এর কি উত্তর দেবেন ভেবে পান না। আর তাঁকে নিরুত্তর থাকতে দেখে তমাসুন সেই স্থান পরিত্যাগ করে চলে যান আপন শিবিরে।

পূর্বেক ঐভাবে চলে যেতে দেখে কিছুটা অমরুতলা জেগে ওঠে দিলদর বেগমের অন্তরে। তিনি তাকে এই মার্স একটা পত্র লিখলেন—বাজা, তুমি হামিদাবাদকে যে বিবাহ করতে চাও তাতে আমাদের কাবও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু মেয়ের মা যে এখন হামিদার বিয়ে দিলে রাজী নন, কাজেই আমরা কি করতে পারি বল?

সেই পত্রের উত্তরে হুমায়ুন জানালেন—মেয়ে মাসুর মন্তামন্ত কি তা পার শোনালেই ভাল হবে, উপস্থিত মোঘলির সাথে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা হলেই তিনি সন্তুষ্ট হন।

শগভা হামিদাবাদ স্থি। কারণ আগামীকাল একটি সভা আহ্বান করে হামিদাকে এনে তাকে এতে রাজী করালেই ঠিক হবে। কাজেই লোকজন ডেকে জানিয়ে দিলেন সভার কথা এবং একটি দাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, সেখানে হামিদাবাদকে খবর দিয়ে আসে এখানে আসার জন্য।

ঘরের মধ্যে একাকিনী বসে আনন্দান করছে হামিদাবাদ। কই হিন্দোল তো এখনও এল না! ও এলে বড় মজা হয়। এই সময় বাড়ীতে কেউ নেই। সে এলে হামিদা তার গলা জড়িয়ে ধরে বলবে—এবার আর তোমাকে ছাড়বো না, দেখি কেমন করে পালানো!

কিন্তু এখনও তো এল না! আসবে না না কি! না না, ঐ যে আসছে পা টিপে টিপে।

তাকে দেখে হামিদা বলে—ওগো এসো এসো আর উঁকি মেয়ে দেখতে হবে না, এখন বাড়ীতে এই কিশোরীটি ছাড়া আর কেউই নেই।

হিন্দোল বলে—তবে তো এই কিশোরীটিকে এবার অনাদাসেই নিয়ে পালানো পারি।

হামিদা বলে—তা পারলে বখেই খুশী হতাম।

হিন্দোল বলে—খার অন্ত খুশী হয়ে আর কাজ নেই। একটা কথা তোমাকে বলে বাই। আমার দাদা তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন। এ থেকে পরিত্রাণ হইত তুমি পারবে না। কাজেই প্রস্তুত থেকো।

হিন্দোলের কথা শুনে তখনই মেঘাবৃত হয়ে বার হামিদাবাদে প্রথমগল। সে বিম্বিষ্ঠ হয়ে বলে—কি! কি বলল! তোমার দাদা হুমায়ুন আমাকে বিয়ে করতে চান? তাঁর মত একজন আধবুড়ো লোকের সাথে আমার বিয়ে বাড়ীর লোকেরা দেবেন কেন! আর আমায় বা রাজী হব কেন!

হিন্দোল বলে—তোমার বাড়ীর লোকেরা এতে নিশ্চয়ই রাজী হবেন এবং তোমাকেও এই বিয়ে করতে বাধ্য হতে হবে।

—কথন না। আমি তোমাকে ছাড়া—

তার কথার মাঝখানেই হিন্দোল ইসারা করে বলে—চুপ তোমার ঘরে কে যেন আসছে। আচ্ছা আমি পালানো পেছনের দরজা দিয়ে।

হিন্দোল চলে যাওয়ার পরই সেই ঘরে প্রবেশ করে দিলদর বেগমের দাসী। সে বললে—কাল সম্রাটের শিবিরে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে, তা সেখানে আমার বাবার সঙ্গে বেগম সাহেবা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

হামিদাবাদ বলে—তোমার বেগম সাহেবাকে বলো আমি যেতে পারবো না। কারণ সম্রাটকে বা সম্মান দেখানোর তা আমি সেইদিনই দেখিয়েছি কাজেই সেখানে আমার যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

দাসী এই কথা শুনে ফিরে বার তার বেগম সাহেবার কাছে। দিলদর তা শুনে পড়লেন মহাশুভাবনা। তিনি ডেকে পাঠালেন সুভান কুলিকে। তাকে বললেন—যাও হিন্দোলকে বলগে যে যেন ঐ কথা হামিদাকে বলে আসে। কারণ তার কথা মেয়েটি কখনই অবহেলা করবে না।

এতে হিন্দোল রাজী হল না একেবারেই। কাজেই দিলদর বেগম সুভান কুলিকে বললেন—যাও তুমি নিজে গিয়ে তাকে একথা বলে এসো।

সুভান কুলি একথা গিয়ে হামিদা বামুকে বললে সে জবাব দিল—রাজ দর্শন একবারই আইন সম্রাট দ্বিতীয়বার নিষেধ। কাজেই সে কখনই যেতে পারবে না আগামী দিনের সভার।

অগত্যা দিলদর বেগম নিজে হামিদার কাছে এসে বললেন—দেখো মা, আমার ইচ্ছে তুমি হুমায়ুনের দ্বী হও। সেই কারণেই তোমাকে কাল বেতে বলাছিলাম।

হামিদাবাদ বলে—এখন আমার পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব নয়।

দিলদর বেগম বললেন—দেখো মা, মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছো তখন বিয়ে তো একদিন করতেই হবে। তা একজন বাদশাহের বেগম হতে পারাটা কি ভাগ্যের কথা নয়?

তার কথা শুনে কুপিয়ে ওঠে হামিদাবাদ বলে—সব বুঝলাম। কিন্তু আমি এমন একজনকে বিয়ে করবো যার অন্তঃ কণ্ড পর্যন্ত আমার মাথা বার কোমর পর্যন্ত নিশ্চয় নয়।

দিলদর বেগম বললেন—হুয়া মা তোমার আর হুমায়ুনের বয়সের পার্থক্য অনেক বেশী। কিন্তু তোমাকে না পেলে যে সে ছিন্ন থাকতে পারছে না। সেইজন্যেই আমার এত করে বলা। বা হৈম, তুমি তোমার মন স্থির করে এ কথাটা ভেবে গ্রাহ্যো। পরে আমি আর একবার আসবো এখন। বলে চলে গেলেন দিলদর বেগম।

সেদিন হামিদাবাদ তার পিতা মীর বাবা দোস্তকে নিয়ে বলে—

শিখা হুমায়ুন বাগশা আমার পাণিগ্রহণ করতে চান, কিন্তু তাকে আমার একদৃষ্ট ইচ্ছা নেই। কাজেই এ জিনিষ বাতে না হর সেই মত আপনি নিবেশ করে দিন।

দীর বাবা দোস্ত, মেয়ের বুকের পানে তাকিয়ে বলেন—আমরা নিবেশ করবার কে মা। এ বিবাহ যে স্বয়ং বিধাতার অভিমানে। শীঘ্রই দেশে আবির্ভাব হবেন এক মহাপুরুষ। সেই কারণেই তোকে হতে হবে হুমায়ুনের পত্নী।

শিখার কথা ঠিক বুঝতে পারে না হামিলাবাহু। তার কেমন বেন ভয় হয়। সে নিশ্চয় চালা যায় আপন করে। নানি রকম দুশ্চিন্তা বৃত্তে থাকে তার মাথায়। হুমায়ুন বাগশাকে আপন স্বামীরূপে বলনা করতে তার বিশ্রী বোধ হয়। এমিকে হিন্দোলার কথা মনে পড়লে তার চোখ কেটে নেমে আসে জল।

এই ভাবে নানান চিন্তার মধ্যে গিয়ে এক সময় ঘুম আসে তার চোখ। হঠাৎ স্বপ্নের ঘোরে মনে হল একটি ছোট শিশু এগিয়ে আসছে তার সামনে। তার মাথায় বলছে উজ্জল জ্যোতি। তামাম হিন্দুস্থানের লোক কুণিণ জানাচ্ছে ছোলেটকে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় হামিলাবাহুর। কে, কে এ শিশুটি! এ কি তবে সেই মহাপুরুষ। তিনি কি জয়গ্রহণ করবেন তাঁর পুরুরূপে? বহুক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে হামিলাবাহু। সে ছুটে গিয়ে সব কথা বলে তার শিখাকে।

দীর দোস্ত কথা শুনে বলেন—এর পর আর হুমায়ুনকে বিবাহ না করবার আর কোন উপায় নেই মা। কারণ তুমি তাঁর সহধর্মিণী হলে তবেই সেই মহাপুরুষ জয়গ্রহণ করবেন তোমার গর্ভে। কাজেই একে তুমি মত করে ফেলো।

হামিলাবাহুর তখন কাঁপছে সারা অঙ্গ। সে কণ্ঠিত ওঠে বলে—আমি এই বিবাহে মত্ত দিলাম।

এমন সময় দিল্লির বেগম পুনরায় এলেন তার হত্যামত জানতে। হামিলাবাহু তখন তাঁর পায়ে মাথা রেখে বলে—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিবাহ করতে আর আমার অমত নেই মা।

দিল্লির বেগম তখন তাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে। তিনি বুঝতে পারেন এই মেয়েটির পুণ্যই পুত্রহীন হুমায়ুনের অন্তরের আশা পূর্ণ হবে।

দেনা-পাওনা

শিপ্রা দত্ত

জাসীম ক্লাভি নিয়ে সীমা কলেজ হতে ফিরে দরজার তাল খুলে রুদ্ধকক্ষের বাতায়নগুলি খুলে দিচ্ছিল। বাতায়ন পথে ভেসে আসছিল পাশের বিয়েবাড়ীর শানাই-এর শব্দ। অন্তরনন্দ ভাবে কিছুকণ সে জানালার পাশে ঝাঁড়িয়ে রইল। তার মনের কোণে ছড়াছড়ি করে চলেছিল অতীতের স্মৃতির মালা। ক্লাভি খাতি যেহেতু সে এগিয়ে দিল জানালার পাশের ইজিচেয়ারের ওপরে।

•(1) The Humayun-Nama of Gulbadan Begam—Mrs. Beveridge.

(2) Journal of the Royal Asiatic Society, Oct. 1898, art. Bayazid biyat, H. Beveridge. 16.

(3) Ain-i-akbari—Blochmann.

সীমাদের ছোট পরিবার ছিল,—মা বাবা ও তিন বোন সীমা, শিখা ও সিন্ধা। বাবা সরকারী অফিসার। তাই স্বাক্ষরের মধ্যে তাদের তিন কেটে বাচ্ছিল। বাড়ীর প্রথম সন্তান সীমা—অতি আদরে মানুষ হচ্ছিল। পড়ার জন্ত ছিল তার গৃহ শিক্ষক জাহাড়া গান সেলাই ও অন্যান্য জগৎ আরও তিনজন শিক্ষিকা, আজকের মত দেশের আর্থিক সমস্যা তখন দেশে ছিল না—তাই গৃহ শিক্ষক নিহুস্তির জন্ত দুশ্চিন্তার বেধা দেখা দিত না অভিজাতবর্গের অবসরে। একটির পর একটি পরীক্ষার পত্নী সীমা উত্তীর্ণ হয়েছিল যেমন করে স্বপ্নে পড়ে দিনপঞ্জী হতে একটির পর একটি দিনের পাতা। সুখের মধ্যে চড়ে সোঁতাগোর রাশ টেনে সীমার অনঙ্গ বুকের মিনগুলি ছুটে চলেছিল। সীমার মায় কোল পূর্ণ করে এলো আরও দুটি বোন ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ একটি ভাই।

কলেজে চুকেই সহপাঠী তপনের সঙ্গে হল সীমার বন্ধু। ঘনীর একমাত্র পুত্র। তপন সীমার ঘনিষ্ঠতা বেয়ে ঝাঁড়াল নিবিড় বন্ধুত্ব। ঘরে বাইরে সবাই জেনে নিল একই শূভ্রে বাঁধা পড়বে একদিন এই দুই তরুণ তরুণী। মহাবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে চুকলো তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কত রজনী আশার জাল বুনেতো ছুজনায়। শিখাও দ্বিধির মত ভগ্নেরে উঠছিল এক এক করে পাঠ্যক্রমের সব সিঁড়ির। কিন্তু সিন্ধা কেবল হোট খেয়েই এগিয়ে চলেছে।

বর্ধার ধারা বর্ধনের মত বখন সীমা তপনের জীবনে বয়ে চলেছিল আনন্দের উদ্ভাসমত। তখন হঠাৎ খবর এল সীমার শিখা অন্তঃস্বায় হারা গেছেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সীমার সব কল্পনার গতি পথ বেন প্রতিহত হল বিশাল পাথরে বাধা পেয়ে। শ্বেহপ্রবণ দ্বিধির মন কেঁপে উঠল ছোট ছোট ভাই বোনদের জন্ত। তপনকে ডেকে বললো—তপন হিসাবে ভুল হয়ে গেল। তুমি আরও এগিয়ে যাও। আমি কর্তব্য শেষ করেই তোমাকে ধরে ফেলবো। তপন সাহসের প্রলেপ বুগিয়ে দিয়েছিল সীমার দৃঢ় বিদ্যমত। আশার দেউটি বেগে একটু আলোকিত করতে চেষ্টা করেছিল তার কৃষ্ণ অনাগত অন্ধকার ভবিষ্যতের। হয়ত বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে হেসেছিলেন বাগকের খুঁটা দেখে।

পাঠ্যক্রম শেষ করে সীমা চুকলো কর্মজীবনে। কৃত্তকের সঙ্গে শেখ পরীক্ষাটা পাশ করেছিল বলে—চাকরীর বাজারে আর তাকে কিউ দিতে হরনি। যে উৎসাহ উদ্ভাসমত নিয়ে সে চাকরীতে চুকছিল—পারিবারিক কুণা মিটাতে স্বপ্নে তার সবই নিভে গেল। অন্তঃস্বায়ের সঙ্করের হাল একেবারেই শূন্য ছিল। জীবনবীয়াও মাত্র করেক হাজার ছিল আর ছিল প্রভিডেন্ট ক্যান্ডের টাকা। বিরাট কলারের অভাব মিটাতে বেয়ে তাতেও পড়েছিল হাত। সিন্ধার মত সীলা, শিবানীও কেমন বেন বীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছিল জীবন পরীক্ষার গতিগুলির দিকে। ফুটা পায়ে জল ঢালার মত—অতি দ্রুত অন্তঃস্বায়ের সঙ্কত শেখ সঙ্কল শেখ হয়ে গেল। তখন শুরু হল সীমার বৈধ্য পরীক্ষা। কলেজে অধ্যাপনার পর সে নিল কয়েকটি টিউশনি। সংসারের ব্যয় সংকোপ করার জন্ত গৃহহালীর অনেক খরচ কমিয়ে দিল। সীমার আশা ছিল তার মত পড়াশুনা শেষ করে শিখাও সংসারের হাল ধরে তাকে সাহায্য করবে কিন্তু ঘটলো উল্টো।

শিখা এম, এ পাশ করে সীমাকে এসে জানালো সহপাঠি রক্ততের জীবন সজিনী সে হতে চায় না। যদিও তপনের মত ছাপিয়ে যায়নি রক্ততের ধন—তবু নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে অভাবের অশান্তি দেখা দেবার মত অবস্থা রক্ততদের নয়। পরীক্ষা দিয়েই পুলিশের পোয়েন্ট বিভাগে একটা স্থান জুটিয়ে নিয়েছিল রক্তত। তাই সীমার বা তার মার আর আপত্তি করার কিছু থাকে না। তবু সীমার মা বলেছিলেন—শিখুর বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি নাই বা হলো। তুই আর কতকাল সংসারের হাল বইবি। তুই বরং এবার শিখুর উপর দায়িত্ব দিয়ে তোর সংসার গড়ে নে।

স্নান হান্তে সীমা উত্তর দিয়েছিল—সবার পক্ষে সব সম্ভব নয় মা। শিখা এতবড় সংসারের দায়িত্ব নিতে পারবে না। সবাইকে আর বন্ধ কারাগারে বন্ধ করে রেখে না। তা ছাড়া অনেক আশা নিয়ে রক্তত পরীক্ষার ফল বের হবার আগেই চাকরী নিয়েছে—ওদের নীড় বাঁধতে দাও।

শিখা স্বার্থপরের মতই শিখির উপর গাধার বোকা চাপিয়ে চলে গেল। মাধ্যাকর্ষণের মত সীমার রূপ, স্বাস্থ্য সবই নিয়গামী ছিল। ওমিকে ধন'র জ্বাল তপনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে বাচ্ছিল। সীমার সংসারের অপূর্ণতাকে সে পারপূর্ণ করে দিতে চেয়েছিল তার

প্রাচুর্যের ভরোশ দিয়ে। সীমার অতীত আভিজাত্যের অহমিকা মাথা নোয়াতে চায়নি এই দানের সামনে। সীমার মা-ও ব্যথিত হয়েছিলেন তপনের প্রস্তাবে। কিন্তু সীমার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেনি তার মা। সীমাকে যে তাড়াতাড়ি তার সংসার হতে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন—তা তখন নিজের অন্ধ স্বার্থের জন্য এ কথা ভুলে গেলেন। শিখা গেল—আরও চারটি ভাই বোনের দায়িত্ব বইতে হবে সীমাকে। কোন ব্যাপারেই শ্রদ্ধা, ঈলা বা শিবানী সীমার মনে আশার আলো জ্বালাতে পারে নি। বিজ্ঞা, ধন—হুইএর অভাবে বোনদের পাত্রহ করার হুশিয়ার সীমা পাগলের মত কপ্সাগরে ডুব দিল। নিজের অভিজ্ঞের কথা সে বেন ভুলে গেল, টাকার সংখ্যা বাড়তে হবে। তাই অমোহাশ্রি নানানভাবে অর্থোপার্জনের জন্য সে নিজেকে নিরোক্ত করে। লতার মত যে কয়জন প্রাণী তাকে অভিযোজিত—তার। হতবাক হয়ে দেখছিল তার ক্ষুদ্রকমতা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য। বহু কষ্টে এক এক করে যখন শ্রদ্ধা, ঈলায় গতি সে করল। তখন আবার এসে পাঁড়াল তপন।

কিন্তু আজকের তপনের চোখে কয় বছর আগের দেখা—সীমার জন্য সেই মোহজাল বিস্তার করে নেই। সীমার রূপ লাভ্যা হারিয়ে গেছে—নিষ্ঠুর সংসারের কর্তব্যের দ্বারে। আদরে প্রাপ্তপালিত

মনের কথা

“এমন সুন্দর গঁহনা কোথায় গড়ালে?”
“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলাস
দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই,
মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে
ঠিক সময়। এঁদের রুচিকান, সততা ও
দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুশী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলাস

শ্রীমতি মোনোর গহনা নির্মাতা ও রত্ন-ভরসারী
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-২২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



সীমার অপরবে আজ কুটী উঠেছে প্রাতি, ক্রান্তির রেখা, চোখের কোলে কে যেন কালির রেখা বুলিয়ে দিয়েছে। সীমার উচ্ছল বোনের সৌন্দর্য তপনের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল—আজ আর তা নেই। এ যেন ঝড়ে তেলে শুকনো এক খণ্ড বুদ্ধশাখা। তপন ভালবেসেছিল সীমাকে নয়—সীমার সৌন্দর্যকে তাই সীমার যুগে যুগে হস্তশিল্প প্রতি আর তার কোন আকর্ষণ ছিল না।

সীমা জেনেছিল তপনের মোহমুগ্ধ মন হতে তার আসন খসে পড়ছে। সেখানে আসন পেতেছে যেনী তলালী সম্মিমা। সব দিক দিয়ে হুঁতুর্গা যখন ব্যুহ রচনা করে সীমাকে ঘিরে বেঁধেছিল—সেই দুর্বোধ্য যুহুর্গে এসে তপন জানালো একমাসের মধ্যে সীমা যদি তাকে বিয়ে করে—এ সংসারের সব দারিদ্র ভাগ্য করে চলে আসে—তবে তপনের গৃহে তার স্থান সন্ধান হবে। সঙ্গে সঙ্গে মড়ার উপর খাঁড়ার বাড়ি দিয়ে এটাও সে জানিয়ে দিল—সীমা বিশ্বের পর চাকরী করতে পারবে না এবং জামাই এর সাহায্য নিতে সীমার মা যখন অপমান বোধ করেন—তখন সেও আর অপমানিত করবে না তারী শান্তড়াকে।

তার পরের অধ্যায়ের মধ্যে নতুন কিছু নেই। তপন তার প্রতিজ্ঞা পালন করেছে। সীমার সাধের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। বহু বছরের ঈর্ষান্বিত বাসনা আর পূর্ণ হল না। মা ও ছোট ভাই বোন এর দারিদ্র্য পালন করতে যেয়ে—অপরিপূর্ণ থেকে গেল তার জীবন। জীবন সায়াহ্নে সব কর্তব্য শেষ করে যখন সে নিজের দিকে ফিরে চাইবার সময় পেল—সেখানো সবার জন্ম ছিল সে। কিন্তু তার জন্ম নেই কেউ। ভাই বোনেরা সব আপন আপন ঘরে গেছে। ভাইও পড়াশুনা শেষ করে বিদেশে চাকরী নিয়ে গেছে। ভাইএর খাবার অজুবিধা হবে—ভাই যে মা এতদিন সীমাকে মুক্তি দেন নি—তিনি খেলেম ভাইয়ের সংসারে। পড়ে রইল সীমা একা। একা অনন্ত অবসর। ঠিকা কি এসে কাজ করে দিয়ে যায়। সীমা নিজেই ভাতে ভাত কোনরকমে ফুটিয়ে নেন, অথবা বাইরের রেইংব্রেট হ'তে খেয়ে আসে।

একদিন সে সীমা ছিল ছাত্রমহলের সবার প্রিয়। সবার মধ্যে যে ছিল চাকল্যের কারণ, যাকে পাওয়ার ভক্ত—সবার মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়েছিল। যে যুদ্ধে জয়ী হয়ে তপন আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল। সেই সীমা আজ জীবনের পড়ন্ত বেলায় নৈরাত্তের ডালি নিয়েই কেবল জীবনের স্থিতি মন্বন করে চলেছে। কর্তব্যের অতিরিক্ত কিছুই ছুটলো না—তার অশ্রুতে গ্রেহ, প্রেম, ভালবাসা—সব কিছু হ'তেই সে আজ দিল্প—সরসহারা। তাই শানাইএর যে সুর একদিন তার কাছে মধুর শোনাতে—আজ যেন আর্দ্রানদের মত তার অস্বপ্ন মনে তা গাড়া দিচ্ছে।

অসমাপ্ত

শ্রীলীলা বসু

দাঁজিলি-এর আকাংক্ষা পাহাড়ী পথ ঘরে চলেছি আমি আর মন্দির। নীচের পথ ঘরে যখন উঠছি আমরা ওপরের পথে চোখে পড়তে আসের পথিকদের। ঐ ওপরে আমাদেরও পৌঁছতে হবে ভাবতেই আশ্চর্য হয়ে বাছি আমরা, কলকাতার ছেলেরা। বিশপিত এই পথ ঘরে, মাটি হংএর সাপ যেন উঠে বাছে ওপরে

একে বেকে। পাটনের সারি, নীলাকাশের মাঝ নিজেদের ঘেম বিলিয়ে দিয়েছে। মেঘেরা কবচ ওলা, পাভাড় চূড়ার সাথে। টিপ টিপ করে বৃষ্টিও হয়ে গেল। ঘোঁরাব মতো ভলে ভরা কুয়াশাগুলো বাগদা করে দাচ্ছে আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টিকে। আমাদের চুলগুলোর ওপরে যেন তাদের লোভ। কুয়াশার জলে চুলের ওপর মালার মতো ঝরে পড়ছে।

একঝলক কুয়াশা ভেদ করে উঠছি, আমি আর মন্দির। সাহিত্যিক আর শিল্পী। মনটা আমাদের বাঁধা রয়েছে সৌন্দর্যের দুয়ারায়। সৌন্দর্যপিপাসু আমরা স্মৃতির উপাসক আমরা। দূরে দেখা যাচ্ছে তব্রতীর মন্দির 'গুদুনা'। লাল, হলদে কাপড়ের টুকরোগুলো বহু হাওয়ার দূরত্বে বিস্তার হয়ে গেছে, মন্বন্তর হয়ে গেছে, প্রকৃতির এই নিখুঁত সৌন্দর্যে দূরে দেখা যাচ্ছে সালা বরফের পাহাড় কাকুনজুয়া, শুভ্র। শুভ্র। শুভ্র। সালা রং সুরচিতার, পবিত্রতার নিদর্শন। সূর্যের শুভ্র আলোক যেন আরও শুভ্র, আরও স্মরণ করে তুলেছে, শুভ্রা কাকুনজুয়াকে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য যখন আকর্ষণ পান করছিলাম, মন্দিরের কথার চমক ডাকল। বলল, মন্দির দেখো দেখো পল্লব ঐ ওপরে ছুটোছুটি করতে একটি পাহাড়ী মরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি সত্যিই তো খুব দূরে নয়—কাছেই একটা প্রজাপতি ধরবার জন্যে ছুটোছুটি করছে স্মৃতির এক যুবতী। পরনে তার জিব্রাতায় পোষাক পেছন দিক থেকে দেখলার, লম্বা দুটো বাদামী বেগী বুলে, স্মৃতির পিঠ বেরে। তার কাঁকে লাগানো রয়েছে, নাথ না জ না এক গুচ্ছ হলদে পাহাড়ী কুল আমাদের পাঠের পক্ষে মেয়েটি ফিরে তাকাল। হাসল স্মরণ প্রাণম'তানো অপ্রতিভ হাসি। এক স্মরণ মন্দির হতে পাবে। গালাগাি রং, লাল টুকটুক করছে পাতলা ঠাণ্ডা দুটো। গাল দুটো যেন আপেল ফল। বৃষ্টির তীপ্তি রয়েছে ছোট চোখ দুটিতে। চকল হস্তিনীর মতো ছুটে প্রজাপতি ধরবার তার কি প্রচেষ্টা। বহুস পনের-বোল হবে। মন্দির আর আমাদের দেখে লজ্জা জড়সড় হল না—স্মৃতির পাহাড়ী যুবতী। হাসল মন্দির হাস। কতাদনের পরিচয় মাখানো সবল চকল দৃষ্টি।

দূর থেকে ভেসে এলো ছোট ছেলের গলার ডাক, ইডেন, ইডেন। তার পর তুর্য্যো এক ভাষায় াক যেন বলল ছেলেটি। মেয়েটি তখনই প্রজাপতিটাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলল সামনের কুটিয়া মন্দিরটার দিকে।

আমাদের মুখে কথা ছিল না। হ'জনে হতবাক হয়ে এগিয়ে চলছিলাম। কথা বললে পাছে সমস্যাটা নষ্ট হয়ে যায় খপ্প ভেঙ্গে যায় এই জ্বরে হ'জনেই নিকাক হয়ে এগিয়ে চলেছিলাম, পাহাড়ী পথ ঘরে।

ছেলেটির গলার স্বর অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখা—দূরে টাড়িয়ে রয়েছে এক সারি মাটির ঘর। সেগুলোর চিনের চাল। এই চাল ঘরে উঠে গেছে, সেই নাম না জানা জংলা কুলের গুচ্ছ। ঘরে ঘরে আলোর মতো সাজান রয়েছে, সেগুলো। ঘরের ভেতরে আসে দৃষ্টি আকর্ষণ করল বকবকে বাসনগুলো। তব্রতায়দের বিলাসিতার নমুনা।

মন্দির তখনও ভক্ত হয়ে তাকিয়েছিল হস্তিনীর ছুটে বাওয়া পথ

পান। ছোদিশার সময় পড়ে গিয়েছিল তার চুল থেকে, সেই ফুলগন্ধ। তিব্বতী তরীবা লামার চুলের মিষ্টি গন্ধে ফুলগন্ধোৎপন্ন করুণ হয়ে গেছে। পাচাত্তমী মেয়েদের সাথী বে সে। তাদেরই মতো স্বভাবের হয়ে গেছে ঐ জলী ফুলগন্ধ। বিলাসিনী আধুনিকদের সুগন্ধি কল্যাণ ক্যামেলিয়া ব্র্যাকশিয়ার হয়ে তাদের স্থান নেই য।

আমরা ভুলেটি কাছ গ্রগবে রাত পশ্চিম বাংলা ভাষার সে বসে টেন, রামন বাংলায় বাবু না? আমি বাঙালী বাবুদের খুব পছন্দ করি আমি অনেকদিন কলকাতার ফিল্ম কি না? পাচাত্তমী এক সাক্ষাৎ তিব্বতী ছেলের মুখে বাংলা ভাষা শুনে আমার হৃদয়ে খুশি হয়ে উঠল। এগিয়ে গিয়ে বললাম এটাই কি তোমাদের বাড়ি? উত্তরে মাথা নাড়ল সে। মন্মথ রু ছেলেটির। মাথা ভরা কৌতুহলে বাংলায় চুল। মেয়েটির মতোই চোখ চুষে ছোট ছোট। কিন্তু, হাতের জাল আর বুড়ীপু। মন্মথর জিজ্ঞাস করল ঐ মেয়েটি কি হয় তোমার? সে কি বলতে গিয়ে হঠাৎ হাততালি দিয়ে তার নিজের ভাষার কি যেন বলে উঠল। তার দৃষ্টি অল্পমরণ করে চেয়ে দেখি, বিরাট আলখাল্লার মতো লাল বস্ত্রের পোষাক পরা। মুগ্ধিক মস্তক। বিরাট চেহারার এক তিব্বতী লামার হাত ধরে টানতে টানতে আনছে—মন্মথের বোড়ী। লজ্জাবাদ্য বাংলায় ঘরের বোড়ী নয়। খোলা পাহাড়ের বুকে মন্মথ, পাহাড় ক্রম উঠেন।

ভুলেটি ওরা বাংলা ভাষার বলল, ঐ দেখো আমার বাবা আর দিদি আসছে।

কালকুণ্ডলার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল কাপালিকার কথা।

তারপর সে আরও বলে গেল—তোমরা আমাদের মন্দির দেখতে এসেছো? আমি বাঙালীদের বজ্র ভালোবাস। ইউন ও বাঙালীদের গান শুনে খুব ভালবাসে। এক changer আসে দাজ্জিলিং-এ, কিন্তু খুব কম লোকই আসে আমাদের মন্দির দেখতে। তুংহুং বস্ত্রী সহ থেকে অনেকটা বুঝে কি না তাই। যে হু' একজন এসেছে—তারে সঙ্গে আমার খুব ভাল হয়ে গেছে।

আমরা অল্পমরণ হয়ে শুভকল্যে ছেলেটির কথা। আমাদের চোখ পড়েছিল—ঐ আঁকাবাকা পথে, যেখান থেকে আসছিল ইউন তার বাবার হাত ধরে।

লামাজী এসে আঁকা হিন্দী আঁকা বাংলায় বললেন, তোমরা আমার মন্দির দেখতে এসেছ? চল দেখিয়ে আনি। আমরা হেসে তাকে অনুসরণ করলাম। ইউন কিন্তু লাকতে লাকতে লাকতে তাদের ঘরের মধ্যে ঢুক গেল। আমাদের উৎসাহও যেন নিমেষে নিমেষ হয়ে গেল শেষে

বহি নিমেষের কালিনী

লামাজী এগার বয়ে চললেন। সেই শ্রাবণের ইতিহাস। সারি সারি ট্রান্সপলেন্ট। বিরাট বুদ্ধমূর্তি লামাজী বললেন, মূর্তিটা নাকি হাজার বছরের পুরান। কাপল্যবস্ত্রের নাকি পাড়রা গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তিব্বতীয় শিল্প, বুদ্ধলম্ব না বিশেষ গুরুত্ব। লামাজীর সে কি উৎসাহ! অর্গল বকে চললেন। সব দেখা হল, আমি বললাম, চল মন্দির এবার কি। অনেক পথ সামনে হবে।

লামাজী চট করে হাত চেপে ধরলেন আমার। বললেন জা হয় নাকি। এতটা বেলা হয়ে গেছে। অদ্ভুত অতিথি কিরে যাবে। নিংপা তা হলে আমার ওপর খুব রোগে যাবে। তোমরা অতিথিরা, যদি না হাও আমার ঘরে, তবে রসম, ইউনও খুব দুঃখ পাবে।

আমরা যেন আবার প্রেরণা পেলাম। আমরা ফিল্মের মতো ঘরের দিকে। হার চাল বেয়ে খোঁকা খোঁকা জলী ফুলগন্ধা রয়েছে, আর ভেতরে রান্ধছে, জলী লামাজী-কন্ডা ইউন!

আমরা যখন সেখানে ফিল্মায়, তখনও রসম সেখানে বসে। হাতে তার টংগোতে লেখা ক্রিকেট স্পোর্টস একথানা বই। নানা ছবি দিয়ে খেলাটাকে লেখানায় ব্যবস্থা রয়েছে এতে।

আমাদের লালনে বসতে দিয়ে লামাজী ঘরের ভেতর চলে গেলেন। সম্ভবতঃ নিংপাকে খবর দিতে। আমার চোখ কিছু খুঁজে ফিরছিল, আপেলের মতো লাল গালের অধিকারিণী মন্মথী ইউন কে।

‘রসমের’ হাত থেকে বইটা নিয়ে মন্মথর জিজ্ঞাস করল, কি তুমি ক্রিকেট খেলা খুব ভালবাস? রসম বলল বারে, ভালো লাগবে না? এর মতো খেলা আছে? ক্রিকেট খেলাকে যে খেলার মধ্যে ‘রাজার খেলা’ বলা হয়েছে, এ শুধু costly বলেই নয়, এই খেলা ‘সত্যিই’ রাজ্য। আচ্ছা, গত Test match এ তোমরা কলকাতায় ছিল? শুভ, মানকড়। উঃ কি খেলা। শুভের বোলিং কি অদ্ভুত না? আচ্ছা পি তার তো তোমাদেরই মতো বাঙালী। কি ভালো খেলেন তিনি তোমরা খেল? আমরা অবাক বিস্ময়ে দশ এগারো বছরের ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বইলাম। দাজ্জিলিং-এর একটা বস্ত্রী ছেলের মুখ থেকে এ সব কথা যেন পাকাম মনে হ’ল। মন্মথর অল্প দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, মুখে বিরাক্ত ভরা। শিল্পী যন—খেলা-ধূলা পছন্দ ও করে না তেমন।

ইতিহাসে লামাজী কিরে এতেন, সঙ্গে এক তিব্বতীয় মহিলা। ইউন, রসমের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য রয়েছে অনেকখান। লজ্জা মন্মথর চেহারা। পরনে তিব্বতীয় পোষাক। লামাজী ভালোপ করিয়ে দিলেন। নিংপা নমস্কার জানাল, তাদের দেবীর ভকীমায়। তার পেছনে ইউন। হাতে তার দুটো পাড়। সে পাড় দুটা নামিয়ে রেখে, মায়ের মতো করে নমস্কার জানিয়ে রসমের পাশে এসে বসল। চোখে-মুখে তার হাসির রহস্যলানি। অবাক বিস্ময়ে আমাদের দেখছে সে।

আমরা নিম্পলক ভাবে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। অপ্রতিভ চান্নীতে ভর ছিল না আমাদের। তার রূপ পান করছি দেখে—সে চিত্রকার করে বলে উঠবে না, অলভ্য কোথাকার, ভ্রমহিলাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় জানেন না। এ তো কলকাতার পথ নয়। এ যে দাজ্জিলিং-এর পাহাড়ের বাঁকে একটুকরো জলী বস্ত্রীয় গল্প।

পাড় দুটা হাতে নিয়ে হু’জনেই চমকে উঠলাম, মন দিয়ে তারা অতিথির সম্মান করে, এ কথা গল্পেই পড়েছিলাম। বিল্লী গন্ধ, অথচ এ প্ররণ না করলে তাদের অপমান। মুখ বিকৃত করে খেলার, এক চোক করে। এরপর নিংপা এনে দিল টিউড ভণ্ড

আমরা কোন মতে সেগুলো গলাধকরণ করলাম। তারপর এল এক ধপের নুপুড়ি, খানি পাইয়ের হুধ জমিয়ে তা তৈরী। নাম বললে ছুরপি। বেশ লাগল সেটা।

এরপর এ দেশের নাচ গানের কথা উঠল। নিংপা খুব ভালো গান জানে। সে আর একদিন শোনাবে, বলা চিল।

খাওয়া শেষে বিলার নিলাম তাদের কাছ থেকে। রসমের কাছে আসতেই আবার সে খেলার কথা পাড়ল। আমি বললাম তুমি নিজেও খেল তো? একদিন এখানে এসে তোমার সঙ্গে ক্রিকেট খেলব—আর তোমার দিদির ঐ ইন্ডেনের গান শুনব।

এই কথাতে হঠাৎ যেন কি হল। হাসি খুশি ভরা লামাজী, নিংপা, ইন্ডেন, রসমের মুখ যেন কেমন হয়ে গেল? সারাদিনের বলমলানি খুশালোকের পর, সন্ধ্যা নামলে পৃথিবীর চেচায়া যেমন হঠাৎ—এ যেন তাইই নিদর্শন। ধর্মধমে এক বিলি আঁবহাওয়ার সৃষ্টি হল।

রসম শুকতা ভেঙ্গে রান মুখে বলল, আমি খেলব কেমন করে? আমি যে হাঁটতেই পারি না। ভাতার বাবু ওয়ুধ দিচ্ছেন। বলেছেন শীগগিরি সেবে বাব। জন্ম থেকেই আমার পাঁচের দোষ কি না তাই সারতে দেবী হচ্ছে। এত খেলতে ইচ্ছে করে—কিন্তু খেলতে

পারি না। আমার পা যদি ঠিক থাকত, তবে দেখতে মানকড়, শুকপেকেও হারিয়ে দিতাম বোলিং এ। জান, দিদির ভাতারের ওয়ুধও খুব ভালো। দিদি হাসলে আগে কোন শব্দই বার হত না আভকাল একটু একটু আঙুরাজ আসে। আর ক'দিন পরেই দেখবে দিদি কথা বলতে পারছে। দিদি এত গান ভালবাসে কিন্তু বেচারী করতে পারে না। কবে যে আমরা ভালো হব।

চমকে উঠেছিলাম আমরা দু'জনে। একসঙ্গেই নতুন পড়েছিল দেওয়ালে হেলান দেওয়া ক্রাচ দুটো। আর মনে পড়ে গিয়েছিল—মুন্দরী ইন্ডেন তো একটাও কথা বলে নি। সে শক্তি থেকে ভগবান ওকে বঞ্চিত করলেন কেন একে? এত রূপ দিলে যদি তবে তাই দিলে না কেন, নিষ্ঠুর দেবতা? চোখে পড়েছিল, মুন্দরী ইন্ডেনের মিষ্টি লাল ঠোঁট দুখানি। সে দুটো নড়ে নড়ে উঠেছে, নতুন কিছু বলবার জন্তে নতুন গান গাইবার জন্তে।

নিংপা অজ্ঞানিক চেয়ে রয়েছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল লামাজীর বুক থেকে।

চোখের জল মুছে, মন ভাব করে কিরে এসেছিলাম সেদিন আমরা সাহিত্যিক আর শিল্পী দু'জনে। অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল আমাদের পথের গান। আমাদের আনন্দ অভিধান।

সমাপ্তি

কন্দনা ভট্টাচার্য্য

নীরব হয়েছে পৃথিবী এখানে
শেষ হয়ে গেছে চলা
যেমে গেছে সব কল কলতান
ফুরিয়েছে কথা বলা।
কত বেদনার ভরা আঁখিজল
জমে আছে হৃদয় হার
কত স্মৃতি আছে বিজড়িত এই
সাথী হারা আঁতনার।
কত গান এসে যেমে গেল হেথা
কত হাসি হল স্নান
কত বিরহের অলঙ্কার শিখা
হোল হেথা অবসান।

শিশু

জয়া সরকার

আমার নয়ন রাগি আঁধার ঘরের আলো।
সবাই ভানে পরান দিয়ে বেসেছি তোমায় ভালো।
অতীত বাধা সব ভুলেছি প্রথম দেখার ফণে।
হারিয়ে গেছি বখন তুমি এসেছো আমার মনে।
তোমার গালে গাল্ বুলিয়ে বললে মনের কথা।
মুখ সাগরে বেড়াই ভেসে জুড়ায় সকল বাধা।
বিকল বেলা দু'জন মিলে বকুল তলায় বসে।
চুপটি ক'রে খেলব খেলা দেখুক না কেউ এসে।
তুহলে রবি অতল জলে মেলায় আঁধার পাখা।
ভয় পেয়ো না কুসুম মায়া দেবেন তখন দেখা।
তুমি কেবল লুকিয়ে থেকে মাভার বাঁধন দিয়ে।
স্বপ্ন মাকে পরাণ হ'য়ে প্রীতির পরশ নিয়ে।

অবেলার গান

অন্নপূর্ণা মৈত্র

তোমার অবাধ মন স্বপ্ন বোনে রাতের কপর্দে
দুরারত চোখে তাই করনায় ছায়াছবি দোলে।
গল্পের নারিকা নও, শুধু এক শিল্পীর মডেল,
রূপ আর রঙ দিয়ে ভরেছিলে মনের ইজেল?
জীবনের পটভূমি আজ তবু ককশ জিজ্ঞাসা।
অতীত প্রেমের লিপি বুঁজে কবি দ্রবস্ত্র অথবা।
প্রাগৈতিহাসিক প্রেম আজ শুধু কংকালের তুল
হুছে বাক সে অধ্যায়। জীবনের ব্যর্থতার রূপ
ওখানে নিশ্চিহ্ন হোক; শেষ হোক হারানোর গান।
নিজেকে অধম দিই বা পেলায় সে তোমার গান।

নতুন দ্বীপ

শ্রীমতী প্রভা দত্ত

আমার জাহাজ ভাসে বিক্ষুব্ধ এ সাগরের বুকে :
এগিয়ে চলেছে বুঝি কোন এক নিরুদ্দেশ পথে,
যেখানে জীবন আছে মিহিলের নেই অবকাশ
বড় বেধা খেমে গেছে অজানা সে সাগর-সৈকতে ।
আমি শুধু ভেসে বাই মনে হয় অবাধ জীবন,
অবাধ অবাধ লাগে ছায়া ছায়া মেঘের পাহাড় :
নীল চোখ হরিণীর স্বপ্নভরা উদাস আকাশ—
মনে হয় কোন দীপ আমি বুঝি কবি আবিষ্কার ।
হয়ত সে দীপে আছে জীবনের অল্পস্র সম্পদ,
হয়ত সেখানে আছে অক্ষরস্ত বসন্ত-বাতাস
হয়ত সেখানে শুধু পরীদের ঘুম-ভাঙ্গা পান
নীল তলে স্বান সাঝে ডানা মেলে উদাস আকাশ ।
আমার জাহাজ চলে পায় হয় অনেক সাগর ;
সে সাগরে ঢেউ নেই সেখানেই হাজারের ভেড়,
মহাশূন্যকার দেশ তার বুঝি হয়নি কিনারা
হয়ত সেখান শুধু ভেড় করে নক্ষত্রের নীড় ।
আমার জাহাজ চলে কোন এক নিরুদ্দেশ পথে :
যেখানে ভেসেছে দীপ বেধা আছে আখেরে মিহিল—
যেখানে অনেক শব্দ আছে জানি প্রাচুর্যের স্বাদ
শহুরীর ভেড় নেই আছে শুধু গাঙ-পাখি-চিল ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

পুষ্প দেবী

সহজ সবল পুত পবিত্র তুমি মমতার ছবি
তোমার উদয়ে নিমেষে মিলাল বিধা শংসর সবি
তত্ত্ব মন্ত্র সবি নিলে মেনে
বুকে নিলে ভাবে শিব বুকে ভেসে
ভাঙ্গনিত কিছু গড়ে গেলে শুধু মিলনের মহারণ
হেরি সে বিরাট মিলন ক্ষেত্র স্থবি স্তম্ভিত চুপ ।

হৃদয় দেহে সবল উদার শক্তিতে ভরা প্রাণ ।
শক্তি মাঘের শক্তি লভিয়া গেয়ে গেলে তাঁর গান,
ভালোবাসা দিয়ে করে নিলে জয়,
নিরমল মন চির নির্ভর—
অহঙ্কারেরে করি পদানত উন্নত করি শির ।
লোভ কাম পাশ ভেরাগী আপনি তুমি অবিচল স্থির ।

কাম ও কামিনী তোমার মস্ত্রে মেনে নিল পরাজয়
কাম হল শুধু যাবের কামনা কামিনী মাতৃমর
সংসার বলি জগজ্জয়ে নিলে
গাহ'ছা ছবি নিজের এক মিলে
জীবের পালনে জনক রূপেতে জগত পিতার সম
উদিলে আপনি দীপ্ত সূর্য্য উজ্জ্বল মনোরম

উদার বিশাল পিতার রূপেতে জননীর মায়ী মাথা
দয়াল ঠাকুর হে করুণা যন তব মুখখানি আঁকা
সবাকার ভরে চির আশ্রয়

পেল পাণী ভাগী সাধুনাযর
মমতা কোমল হৃদয় কমল তুমি আনন্দময়
অবৃত কণ্ঠে উঠে তাই ধনি শ্রীরামকৃষ্ণ জয় ।
অবতার কিনা আমি ত বুঝি না তুমি পূর্ণভায়র
পূর্ণরূপেতে জগতে আগিয়া গাহিলে প্রেমের জয়
লালসা বিলাস সরমে লুকার
সহজ ভক্তি পরাণ রাজার
আপনার মাঝে দেবের প্রকাশ দেখিল বিশ্বময়
স্বদেশে বিদেশে সবাই প্রশমি গাহিল তোমার জয় ।

সবারে মানিয়া সহজ পথেতে চলেছিলে লীলা ভরে
শুধু ভোগভোগ দূরেতে ভেরাগী সবারে আপন করে
শুদ্ধ মনের নিছাম চাওয়া
আপনার মাঝে দেবতারে পাওয়া
দেবতারে পাওয়া সবাকার মাঝে আপনার ঘন করে
তাঁহার দরশে তাঁহার পরশে উঠেছে পুলকে ভরে ।

সে যে কী পুলক সে কী আনন্দ দেখিল বিশ্ব জন
জীবে ভাব শিব সহজ মস্ত্রে মোহিত সবার মন
শব্দ মিত্র সবে পদানত
বিস্ময় ভরে হল স্তম্ভিত
শিশুর মতন সহজ ভাবার জটিল তত্ত্ব বস্ত
মীমাংসা তাঁর নিমেষে করিলে সহজ জলের মত

সবাকার দুখ রোগ পাশ তাপ নিলে আপনার দেহে
জগজ্জয়ের পিতা হইরাছ তাই অপার করুণা মেহে
কঠিন রোগের যন্ত্রণা সহি
সে কী তপস্তা তুবানলে হহি
পাণী ভাগী ভরে নিলে অবহেলে শুধু অতুলন মেহে
সংসার ভব ওগো সন্ন্যাসী সারাটি বিশ্ব গেছে

জানাল

রমা ভট্টাচার্য্য

সাঁতসেঁতে জমিতে ঘুটঘুটে অন্ধকার বাড়ী,
কুয়াশাগভীর মাঠ, পাতাছাড়া গাছের সারি,
বেধনার বিবাক্ত নিশাস, সঙ্কীর্ণ মন আর,
বিধে ছড়িয়ে-পরা শাস্তিহীন ভাষ্টির বিকার
—আর ঘুটঘুটে অন্ধকার ।

রাত ভোর হোল । সূর্য্যের রেখা বসন্তের সাথে
এগিয়ে এলো । দিন-পাখী-মন নাচে গায় ভাকে
—কোন রৌদ্রব্রত জানালার পথে ।

বন মহোৎসব

ঐশ্বর্য্যমীমতা মিত্র

নিভা নিভা কতই মালী, গাছ পুঁতে
কলার কল রোঁজে জলে ভিজে, তেতে।
কোটার কত বংএর গোলাপ, বই, বেলা,
সাজায় কত সুগন্ধিময় ফুলের ডালা
কতই রক্ত করবীর ওই ঝাড় দোলে।
দক্ষিণ মালিক পরশ বুলায় লাল ফুলে।
রাজা উজীর গাছ পুঁতে হয় মহোৎসব
চারি দিকে উঠবে তখন কতই কলরব।
মাটির কলস, বং দিয়ে হয় তার আঁকা
মহিলারা নানান সাজে বায় দেখা।
মহোৎসবে উঠছে তো সব মেতে
ক্ষুধার আঁলা মিটেবে কাহার এতে?
সবজন কোটার-বারা-ফুল
সুগন্ধি অন্ন জনের, তাদের ভাগে হল।
সকল মুখে অন্ন বারি ধরে
তাদের তরুই কুশ অনাহারে।
বাঘের দানে পুষ্ট করে কার
তাদের পানে ফিরেও নাহি চায়।
দেশের ক্ষুধার ফসল কলার বারি,
তাদের গৃহই রইলো অন্নহারা।

আজকের এই সূর্য্য স্বপ্ন

ঐশ্বর্য্যমীমতা মিত্র

আজকের এই সূর্য্য স্বপ্ন
হবে কি সার্থক কোন কালের স্বাক্ষরে।
নবম নদীর মেহে
ছোট ছোট জাহাজের আনাগোনা
নতুন কালের বন্দরে।
গাংচিল ডানা মেলে ছোটো,
আবার মুক্তোর মেলা নদীর নতুন বন্দরে।
এও কি স্বপ্ন আমার—
জীবনের সোনালী স্বপ্ন।
শালের প্রান্তর থেকে
জীবনের বসিষ্ঠ চেতনার আনাগোনা
খেতজোড়া ঝালের বুকতে।
সোনালী ফসল জোড়া—
দিগন্ত চূষিত জীবন,
এ তো আজকের নয়,
আগামী কালের কোন এক সূর্য্য-বর্ণন।
হবে কি সার্থক.....
গ্রহের কীপন লাগা.....
কোন এক সৌরপ্রহর জাগ
নতুন দিনের বন্দরে।

প্রশ্ন

মায়ার মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণশঙ্কর কালো চুলে ছাঁওয়া আকাশ
তোমার চুলেতে ছায়া কেলে;
বোবা মুহূর্তের অশরীরী পদক্ষেপে
মনে হয় তোমার আনাচে-কানাচে কারা ঘোরে।
অন্ধর সজীব এক মনকে পাই কোথা বল?
এ রাতি তমসা কি আনবে না সকালের আলো?
দুশ্চিন্তায় যুক্তা নেই, আকাঙ্ক্ষার শেষও কি আছে?
চেরে না পাওয়ার অর্থ জীবনের অভিধানে খুঁজি বসে বসে।
পার্শ্ব কামনা ভেজা শিশিরে স্রবাত নয় মন,
জীবনের রক্ত মাঠে স্তব্ধ হয় কলস কলার আবেদন।
পৃথিবী কি মুষ্টিমান বিবরণতা?
হৃদয়ের রক্ত ঘারে এ প্রেমের সাড়া মেলে কই?
তোমাকে রাত্রির মত মনে হয় নিঃসঙ্গ স্তব্ধ,
মৌনস্তর হিমে জমা কঠিন জিজ্ঞাসা!!
নিশ্চিন্ত পাওয়ার তাই ছেদ টানে হাবাবার ভয়,
মৃত্যুহীন, প্রেমহীন তোমার সত্তার কি নেই কোনো পরিচয়?

তুষা

কদম্বা পিল্লাই

সাগরের সীমা আছে।
সীমা আছে আকাশেরও—স্বপ্ন দিগন্তে।
গুণ্ডু বার সীমা নাই—
সীমাহীন অসীম সে তুষা।
নদীর উদ্দাম স্রোত শ্রান্ত সাগরেতে।
কর্ণার যুগ্ম-গান শান্ত সমতলে।
গুণ্ডু পিপাসার শান্তি

আর কামনার কান্দি নাই।

বিলম্বিত লয়

দীপ্তি সেনগুপ্তা

শোনো আজ বাতাসেরা কোন কথা বলে বার
নীল নক্ষত্রের ঐ হাজারো বুটির মত উজ্জ্বল আকাশ।
বাতাসের প্রাণে আজ শিশিরের শব্দ গান গায়
বাসন্তী রাজলে মনে লাল সবুজের এক রঙিন জাতি।
মনে পাড়ে এখন কান্তন দিনে কুমারী ছিলেম আমি
টিপ-টিপ পা ক্লেমে মনের আকাশে ঢেউ তুলে
কাঁঠাল-চাঁপার ঐ স্রবতি বাতানো এই তুমি
আগনিকো। জিগুলের বেগুনী রঙের ফুল
অনেক খুঁশির ভাষা। মাঠে, ঘাসে, কলসীর দামে
কান্তনের কত আয়োজন। মরালের গতির আবেগে
মনের জানলার গুণ্ডু স্বপ্নের আবেগ নামে।
রাজকুমারের স্বপ্ন চিহ্ন বাধে সেদিনের মেঘে মেঘে।
সেই তুমি এসে আজ বসন্তের শেষে।
বৈশাখী কাল। হবে আকাশেতে মেঘে।

পুরনো অন্ধ-সংস্কার নিষে

আপনার
উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ
নষ্ট করছেন কি ?



এমন অনেক লোক আছেন যারা কোন সুযোগই হাতছাড়া করেন না মনে ক'রে নিজেদের আধুনিক ব'লে গর্ব বোধ করেন। কিন্তু আসলে তাঁরাই অন্ধ-সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে নিজেদের সুযোগ নষ্ট করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাসার জন্তে স্নেহজাতীয় জিনিসের কথাই ধরুন। অনেকেই বলেন “বনস্পতি দিয়ে রাঁধা খাবার আমি কখনো খাই না। এটা একটা কৃত্রিম স্নেহ। কাজেই প্রাকৃতিক স্নেহপদার্থের মত ভাল হতেই পারে না।” অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র তৈরী করতে মানুষের অসাধারণ যত্ন ছাড়া এর ভেতর কৃত্রিম ব'লে কিছুই নেই।

আগাগোড়া কঠোর নিয়ন্ত্রণ

বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী একটি বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ। কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে

পরিচালিত আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়। এই বিশুদ্ধ স্নেহপদার্থ সহজেই হজম হয় ও সবরকম রাসার পক্ষেই উৎকৃষ্ট—কারণ বনস্পতি দিয়ে রাঁধা খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয় না। বনস্পতি কেনার ও ব্যবহারে খরচ কম... কারণ এর প্রতিটি আউন্সই খাঁটি ও পুষ্টিকর।

ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বাঁচার জন্তে

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অসুস্থতঃ ছ' আউন্স স্নেহজাতীয় পদার্থ খাওয়া দরকার। বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্য বনস্পতি অল্প খরচে আপনাকে এই সুযোগ দিচ্ছে। ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্তে বনস্পতির ব্যবহার শুরু করা আপনার উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিল্লীর বন্ধু

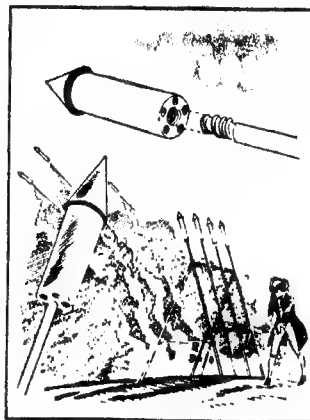
দ্রি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত



মহানুষ্ঠ—গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যুর
বেড়াবে, মহানুষ্ঠ জর করবে—মহানুষ্ঠের
কতকালের স্বপ্ন। আজ সে স্বপ্ন ক্রান্ত সকল
হতে চলেছে। কত উপকার হতে পারে
এর কলে মহানুষ্ঠের। যেমন, আবহাওয়া
জারজে এসে গেলেই বাণিজ্য ও কৃষির পক্ষে
সুবিধা হবে। স্থিতিজ্ঞতা যেতার ও
টেলিভিশন যোগাযোগও হবে তখন একটি
সহজসাধ্য ব্যাপার।

ইতিহাস—মহানুষ্ঠ সম্পর্কে মানুষের
মনে আগ্রহ রয়েছে বরাবর। গ্রীক পণ্ডিত
টলেমি বিত্তীয় শতকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানে
গবেষণা চালান। এই ব্রহ্মে তাঁকে সহায়তা
করেন চীন, আরব প্রভৃতি দেশীয় কয়েকজন
গবেষক। এদিকে ১৬১০ সালে টেলিস্কোপ
বা দূরবীণ আবিষ্কার করলেন গ্যালিলিও।
গ্রহ নক্ষত্রাদি বিষয়ে প্রচুর প্রথম তথ্য
জবাব মিললো এইখানেই।

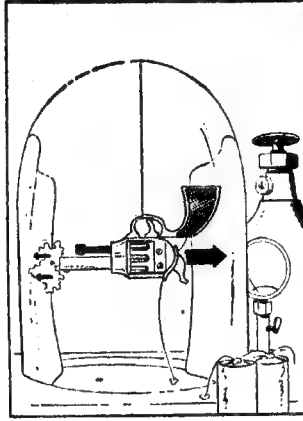
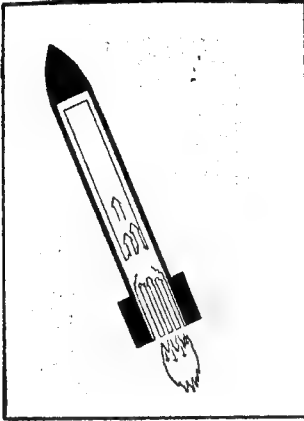
অধুনাবর্ত—বিত্তীয় শতকের কথা—মহানুষ্ঠে
অভিযানের স্বপ্ন দেখছেন গ্রীক দার্শনিক
লুকিয়ান। এর পর ১৮ শত বছর কেটে গেছে
হাজার হই বিংশ শতকের অধুনাবর্ত। লুকিয়ানের
সেদিনকার স্বপ্ন আর ঠিক স্বপ্ন হয়েই
নেই। আজ রকেট উঠেছে পৃথিবীর সীমানা
ছাড়িয়ে—গ্রহান্তরে পাড়ি জরাতে মানুষের
চলেছে প্রগতি। কত বৈজ্ঞানিক তথ্য
জানতে পারা যাচ্ছে এর সহায়তায়।



রকেট—মহানুষ্ঠের চাবিকাঠি আজকের
এই রকেট, কিন্তু মানুষের কাছে এ ঠিক
একটি নতুন আবিষ্কার নয়। ইতিহাসের
পাতায়ই দেখা যায়—চীনারা ১২৩২ সালের
উৎসব-অনুষ্ঠানে রকেট ব্যবহার করছে। তবে
প্রথম যুগের রকেটগুলোর গতিবেগ ছিল
নিম্নতম সামান্য—গতিপথও ছিল অনিশ্চিত।
দিশেহারা অবস্থার কয়েক শত কুটের বেশি
কেতে পারতো না সেদিনের রকেট।

অগ্রগতি—রকেট এশিরদশ আবিষ্কৃত
হলেও ব্যাপকতা লাভ করে এ ইউরোপে।
অষ্টাদশ শতকে ত্রায় উইলিয়াম কংগ্রিভ
(ইংরেজ) এর এমনি উন্নতিসাধন করলেন,
যাতে করে এক মাইলেরও বেশি দূর রকেট
প্রেরণ সম্ভব হলো। সে যুগের রকেটগুলোতে
ব্যবহৃত হতো নিম্নেট আলানী (সাধারণতঃ
বাকস)। কিন্তু এ ব্যবস্থাবীনে অসুবিধা
কট অনেক, পরীক্ষার দেখতে পাওয়া গেছে।

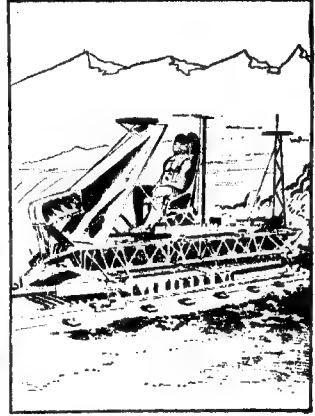
গডার্ড—উনবিংশ শতকের গোড়ার
দিকে ডাঃ রবার্ট এইচ গডার্ড (হার্শিং) তরল
ফালানী দিয়ে রকেট চালানোর পরীক্ষা-
নিরীক্ষা শুরু করেন। রকেট চালনা ও
মহানুষ্ঠ অভিযাত্রা ব্যাপারে চিন্তাধারায়
আত্মল পরিবর্তন করে মিলেন তিনি।
রবার্ট গডার্ড ছিলেন একজন কলেজের
অধ্যাপক। প্রচুর সময় ও অর্থ তিনি ব্যয়
করেছেন এই অমূল্য গবেষণায়।



চালনা—ডাঃ গডার্ড যে পুখানুপুখ পুরীক্ষা চালিয়ে যান, এর মাধ্যমে একটি নতুন জিনিস প্রমাণিত হয়। সেদিন অবধি ধারণা ছিল রকেট থেকেই বেরিয়ে আসা গ্যাস বায়ুকে ধাক্কা দেয় আর এরই ফলে রকেটের গতিবেগ আসে। কিন্তু বিজ্ঞানী গডার্ড দেখিয়ে দেন যে, রকেটের ভেতরকার অল্প গ্যাসের চাপেই এটি চালিত হয়। এই দাবীর স্বীকৃতি কিন্তু মিলেনি বহু বছর।

বায়ুশুল—গডার্ড এও অবজ্ঞা বিধান করতেন যে, স্বাভাবিক বায়ুসম্বিত স্থানে রকেটের যতটা গতিবেগ হবে, তুলনায় তা অনেক বেশি হবে মহাকাশে—যেখানে বায়ুশুলের অন্তর্ভুক্ত নেই কিংবা বায়ুশুল কী। তিনি বায়ুশুল কাঁচের জারে রক্ষিত একটি পিস্তল থেকে কাঁকা কার্তুজ ছুড়ে তাঁর মতবাদটি যে সত্য, সেইটির প্রমাণ তুলে ধরেন সকলের সমক্ষে।

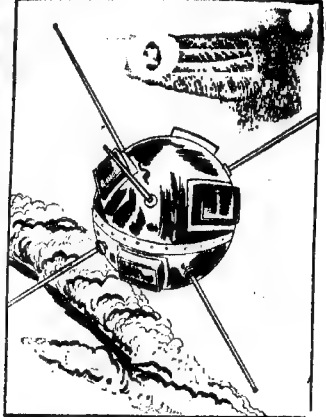
তরল জ্বালানী—১৯২৬ সালে গডার্ড তরল জ্বালানীর সাহায্যে রকেট চালনার প্রথম পরীক্ষা চালান। তাঁর উৎকৃষ্ট রকেট তখন শূন্যপথে মাত্র ১৮৪ ফুট পর্যন্ত যেতে পারলো। কিন্তু গডার্ড বুঝে নেন যে, তরল জ্বালানী ও গ্যাসোলিন মিশিয়ে তিনি যে জ্বালানী তৈরী করেছেন, তা পরীক্ষার টিকেছে। আধুনিক রকেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটিও গডার্ডেরই একটি আবিষ্কার।



প্রাণরক্ষক—মহাশূন্য বিজ্ঞান অভিযানে সাম্প্রতিক অভাবনীয় সাক্ষ্য রকেটের অগ্রগতির গোড়াকার ধাপগুলোর কথা তেমন বলা হয় না কিংবা উপেক্ষা করা হয়। অথচ খুব দরকার বিপর জাহাজের উদ্ধারসাধনে—হুগুত মাছুবের প্রাণরক্ষার রকেট কাজে এসেছে বহু বার। রকেটচালিত ভোপলানি মারকত জল ও হুলে সঙ্কটদানের কাজে চলে দীর্ঘদিন।

জেটো—রকেট-শক্তির আর একটি কাব্যকরী অবদান 'জেটো' (জেট সাহায্যে 'টেক অফ' বা উড্ডয়ন)। এই ব্যবস্থার বেশিরকম বোঝাই করা বিমানগুলোতে ছোটখাটো রকেট জুড়ে দেওয়া হয়। এর লক্ষ্য—অনেকটা সহজে উক্ত বিমানসমূহকে শূন্যপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অবতরণের সুবিধে নেই, এমন সব স্থানে জরুরী অবস্থার সাহায্য প্রেরণে এ বিশেষ সহায়ক।

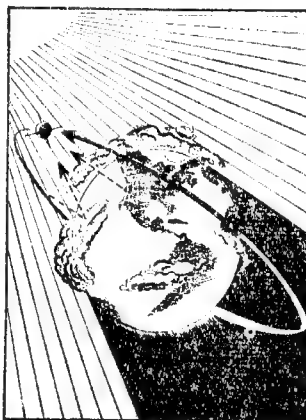
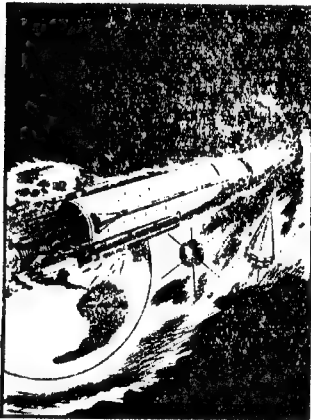
এক্সিলারেশন গ্রেড—রকেটের অপরাধকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে 'এক্সিলারেশন গ্রেড'-এ—বা দ্রুতগতিসম্পন্ন এরোনাটিক ও প্রত্যাশিত মহাকাশ অভিযানে বড় বড় পরীক্ষার সুযোগ করে দেয়। খুব অল্প সময়ে পৃষ্ঠতলটির ওপর দিয়ে তাক চলাচলেও রকেট কয় কাজে লাগতে পারে না। বিশ্বের নানা দেশে নানা উৎসবে জাই-রকেটের ব্যবহার চলতি আছে এখনও।



মার্কিন কর্মসূচী—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষটি অল্পব্যয়ী রকেট সম্পর্কে গবেষণা চালায়। যন্ত্রবৈজ্ঞানিক কল্যাণের লক্ষ্য থেকে তারা যে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে, সারা বিশ্বকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়। এই বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীসমূহ নিম্নে নামকরা বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন ডাঃ জেমস এ. ক্যান এলেন, ডাঃ উইলিয়াম এইচ পিকারিং ও ডাঃ ওয়ার্ণার ভন ব্রাউন।

বহুপর্যায় রকেট—১৯৪৬ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তথ্যটি আবিষ্কার করে যে, মহাশূন্যে অভিযান চালনার জন্য একাধিক পর্যায়বিশিষ্ট রকেট চাই। ১৯৪৯ সালে প্রথম বহু পর্যায়ের রকেট ছোঁড়া হলে সেটি ২৫০ মাইলেরও বেশি পথ ছাড়িয়ে যায়। আজকের দিনে মহাকাশে উপগ্রহাদি উৎক্ষেপণের জন্য যে রকেটসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলো চার বা ততোধিক পর্যায়বিশিষ্ট।

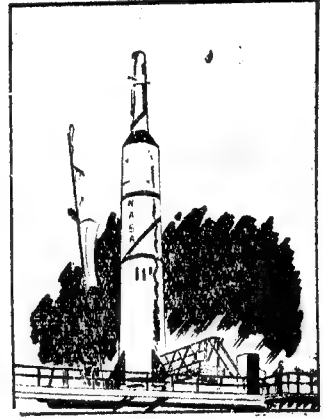
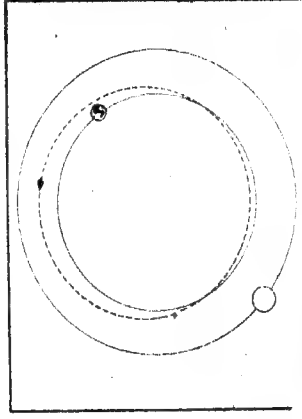
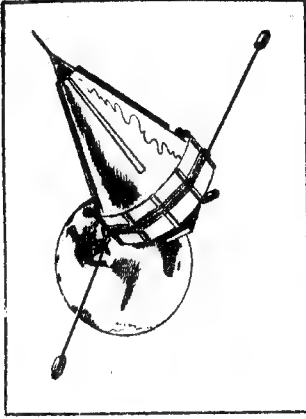
ভূ-পদার্থ বৎসর—বহু পর্যায়ের রকেটের সাহায্যেই ১৯৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি ('শিও টাম') পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ রকেট স্থাপন করে। আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বছরের গবেষণায় জাতিসমূহের সাথে সহযোগিতার রূপ হিসাবেই এই কাজটি করা হয়। এই বছর বিশ্বের ৬৬টি দেশ ১৮ মাস ধরে পৃথিবী, সাগর, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি সম্পর্কে পর্য্যালোচনা চালায়।



এ্যাটলাস—প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও কয়েকটি 'টাম'কে কক্ষ পৌঁছে দেয়। এই ধরনের একটি 'টাম' বা কৃত্রিম উপগ্রহই এ্যাটলাস। ৩৬০ ডিগ্রি এইটর সাড়ে চার টন। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বড়দিনের শুভেচ্ছা বাণী ছড়িয়ে দেয় এ বিধে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এতে করে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

ভ্যানগার্ড-২—এর পরই উৎক্ষেপণ করা হয় ভ্যানগার্ড-২। বিশেষজ্ঞরা দাবী করেন যে, আবহ-বিকার ক্ষেত্রে এইটি নিয়ে আসতে পেরেছে একটি নতুন যুগ। এর মারকত ভূমণ্ডলের আবহাওয়ার পূর্বাভাস বিজ্ঞাপিত করা সহজতর হবে—এও তাঁদের বিশ্বাস। এই উপায়েই মেঘমণ্ডলে আর পৃথিবীর উপরিভাগে সূর্যের প্রতিকলন সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারা যাবে।

আবহাওয়া—বিজ্ঞানীদের একটি দাবী—আবহাওয়ার পূর্বাভাস যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা উন্নততর করা (শতকরা ১০ ভাগ) সম্ভব হলেও বিশ্বের বাণিজ্য ও কৃষির উপকার হবে অনেকখানি। কেউ কেউ এও বলছেন যে, এরূপ আবহাওয়ার বাহুরের পক্ষে আরও অল্পকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে না। এখন যেখানে কলন হচ্ছে না, সেখানেও শত জন্মাবে, এ নিশ্চয়তা তখন মেলাবে।



সৌর উপগ্রহ—মহাশূন্যচারী দুটি রকেট ৬৫ হাজার মাইলেরও অধিক উর্ধ্বে প্রেরণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাকল্যের সঙ্গে পাইওনিয়ার-৪ (কৃত্রিম সৌর উপগ্রহ) উৎক্ষেপণ করে। আপন কক্ষে পৌঁছবার পূর্বে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি পথ অতিক্রম করে বায় তিন লক্ষ মাইল। ৪০৬,৬২০ মাইল উর্দ্ধাকাশ থেকেও মাছের তৈরী এই উপগ্রহের বেতার সংকেত শ্রুত হয়।

কক্ষপথ—মহাশূন্য অভিযানে পাইওনিয়ার-৪ বিজয়ী হয়েছে। এক্ষণে ১১,৭৪৪,০০০ মাইল হতে ১০৫,৮২১,০০০ মাইল দূরে থেকে প্রতি ৩১২ দিনে সূর্যকে এ প্রদক্ষিণ করে চলবে আবহমানকাল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে মুক্ত হবার জন্য এই উপগ্রহটিকে গতিবেগ নিতে হয় ঘণ্টায় ২৪,৮১১ মাইল, প্রেসমত: এ-ও উল্লেখ করা যেতে পারে।

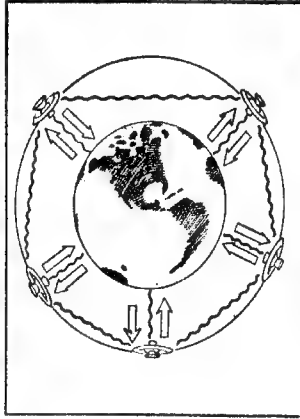
মহাকাশ দপ্তর—রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত কণ্ঠস্বরাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় বিমান ও মহাশূন্য বিভাগের (একটি অসামরিক সংস্থা) হাতে অর্পণ করেছে। শান্তিপূর্ণ পন্থায় রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের উন্নয়ন ব্যবস্থা তদারক করছেন এই প্রতিষ্ঠানটি। মানুষের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে গমনাগমনের দিনটিকে দ্বারাবিহীন করার জল্পনাই আজ মার্কিন বিজ্ঞানীদের দুরন্ত প্রয়াস।



সমস্তাবলী—মানুষ বহন মহাকাশে ঘুরে বেড়াবে, তখন তার সামনে হাজির হবে রকমারী সমস্তা। মার্কিন ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানীরা এখনই তাই সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করছেন। বাতাস, ঝড়, জল, এসব বাঁচবার উপাদান কিভাবে সঙ্গে দেওয়া যায়, আর অভিমাত্র তাপ, ঠাণ্ডা ও বিকিরণের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় কি, এ বিষয়ে পরীক্ষা চলছে অনেক।

আকর্ষণ—মাধ্যাকর্ষণ না থাকার মরুণও মহাশূন্যে মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সেই স্তরে তার ওজন থাকবে না, তখন সে ভাসতে থাকবে, তার খাবার জিনিসও সে সময় দেখা যাবে শূন্যে ভাসমান। নলের মারকত সেটি তখন মুখে টেনে নেবার ব্যবস্থা থাকা চাই। সেখানে বেহেতু চাপ থাকবে না, বিশেষ ধরনের পোষাক না থাকলে শরীর খান খান হয়ে বাওয়াও বিচিত্র নয়।

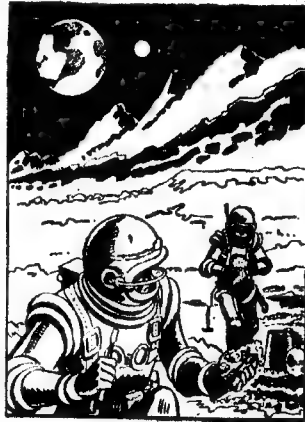
চন্দ্রলোক—চন্দ্রলোকে পৌঁছলে মানুষ দেখবে সেখানকার আকর্ষণশক্তি খুবই কম—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের এক বর্ষ্ঠাংশ মাত্র। এ অবস্থানে ৩০ ফুট উঁচু অবধি লাফানো সম্ভবপর হবে। সেখানে বাতাস বা জল মানুষ পাবে না—বায়ুস্তরের অভাবে শব্দও শ্রুত হবে না। তাপমাত্রা রাত্রিতে শূন্য ডিগ্রীর নীচে ২৫০ ডিগ্রী বা ততোধিক আর দিনে শূন্য ডিগ্রীর নীচে ২০০ ডিগ্রী বা ততোধিক হবে।



শূন্য বাঁটি—বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই বিশ্বাস যে, গ্রহাঙ্করে পাড়ি দিতে হলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্যে বাঁটি (প্ল্যাটফর্ম) স্থাপন করাই নিত্যকৃত্তি মুক্তিপনত ব্যবস্থা। ভূপৃষ্ঠ থেকে বকেটবোলে প্রেরিত হয়ে শূন্যচারী বান ও বাঁটির আশগুলো এক জায়গায় মিলবে। বায়ুমণ্ডল কিংবা মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা অবস্থায় এই ধরনের বাঁটি থেকে শূন্যবান-সমূহ উড্ডয়নের শক্তি খুঁজে পাবে প্রচুর।

অত্যাশ্রয় স্থবিধা—শূন্যচারী বানগুলোর উড্ডয়নের স্বযোগ করে দেওয়া ছাড়াও শূন্য-বাঁটিসমূহ আরও অনেক কাজে লাগতে পারে। এই মঞ্চগুলো থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে উন্নত ধরনের পর্য্যালোচনা চালানো যায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের নকল গবেষণা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা, সেখানে থাকছে না। আবহাওয়া, বেতার ও টেলিভিশন বাঁটি হিসাবেও এগুলোর ব্যবহার চলতে পারে।

শূন্যচারী বান—মহাকাশে যেহেতু আকর্ষণ ও বায়ুমণ্ডল নেই, কোন প্রতিরোধও নেই। আর সে-সব নেই বলেই মহাশূন্যচারী কোন বানের জন্য ক্রীমলাইনিং-এর প্রয়োজন হবে না। বায়ুমণ্ডল সমন্বিত গ্রহে (যেমন পৃথিবী) অবতরণের জন্য ছোটখাট 'ক্রীমলাইনিং' করা বান সঙ্গে থাকতে পারে। তবে এইরূপ অবস্থায়ীনে গতিবেগ সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা না থাকলে চলবে না।



পতিবেগ—গ্রহ থেকে গ্রহাঙ্করগামী বানের গতিবেগ হতে হবে ঘণ্টার অন্তত: ২৪.৩৮ মাইল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ও বায়ুমণ্ডলের প্রতিক্রিয়ায় অতিক্রম করার জন্যই এইটি চাই। এর পরই দেখা যাবে ঐ শূন্যবানের পতিবেগ কীভাবে হতে পারে ঘণ্টার চার থেকে পাঁচ হাজার মাইল। এই হারে চলে যেতে ৫০ সেকেন্ড, মজলে যেতে ২১০ দিন আর শুরুগ্রহে যেতে ২১৫ দিন সময় লাগবে।

কল্যাণ—বহু বিজ্ঞানীর ধারণা যে, মঙ্গল ও অত্যাশ্রয় গ্রহে আদিম জীবনের পরিচয় মিলতে পারে। কারো কারো বিশ্বাস, বৃদ্ধি আছে, এমন প্রাণীর সন্ধানও সেখানে পাওয়া অসম্ভব নয়। তবে ইলেকট্রনিক রবটের সহায়তায় অন্য গ্রহে আবিষ্কারের প্রথম প্রয়াস চলতে পারে। এই বাস্তবিক ব্যবস্থার সুবিধা—তাপ, আবহাওয়া, বিকীর্ণ ইত্যাদিতে এর কোন ক্ষতি হবে না।

গ্রহ-পরিবাহন—স্বর্গকে কেন্দ্র করে যে গ্রহ-পরিবাহনটি রয়েছে, তাতে আছে—বৃহৎ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। বিজ্ঞানীমহলের ধারণা—শুক্র খুব সম্ভব একটি 'মিত্র' গ্রহ আর মঙ্গলগ্রহে বৃদ্ধিমান জীব বসবাস করতে পারে। একমাত্র শক্তির পাশেই শূন্যবানের এই নতুন বিষয়কর যুগে মানবজাতির কল্যাণ সম্ভব নয়।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবুয় সাবান দিয়ে স্নান করেন



যে পরিবারে ছেলেবুড়ো নবাই সবসময় হাসিখুসী সে পরিবার লভাই সুখী। কিন্তু বাহা ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুসী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলা বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লার থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবুয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাক করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রতিদিন লাইফবুয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লাজনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা স্বপ্নেরে করে তোলে।



আধুনিক বঙ্গদেশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

বিজিতি স্থাপত্যশিল্পের অঙ্করণে করিহিরান শুভ নিমিত্ত হত। জানালা, ভেনিসিয়ান খড়খড়ি, খিলান, মিশ্র শুভ

পবিত্র ধর্মের গীর্জা থেকে নকল করে বারান্দা, ঘর, ঠাকুরদালান নামে অভিহিত পূজার্নন প্রভৃতি নির্মাণ করা হত। সেগুলোর ব্যবহারে যথেষ্ট বুদ্ধি অথবা উপযুক্ত শিল্পচেতনা দেখা যায়নি। ইউরোপীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা যনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল কেবল তাদের ঘর-বাড়ীর কাককাঁধে এই বাহ্যিক পাশ্চাত্য শিল্পের প্রয়োগ দেখা যেত।

কলকাতার পুরানো মহল্লার যেখানে আগে ধনীরা বাস করতো সেইখানেই সাধারণতঃ এই ধরনের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। এইভাবে চাঁপুর রোড, হুগাচাঁটা, নিমতলা, পাথুরিয়াঘাটা অথবা তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে অর্থাৎ হুগলী নদীর কাছে অথবা এর পূর্বদিকস্থ অঞ্চলে পাশ্চাত্য স্থাপত্যশিল্পের এবং কাককাঁধের প্রচুর নির্দর্শন রয়েছে। সহরের এই অংশটি উত্তরোত্তর বিকশিত হওয়ার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার এখানকার আদি বাসিন্দারা অত্যন্ত চলে বেতে বাধ্য হয়েছেন এবং পাশ্চাত্য শিল্পের যুগের অঙ্করণে নির্মিত এই স্থতিসৌন্দর্যে এখন বাজার, গুদাম, বস্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। এই অঞ্চলেই এক সময়ে ধনীরা তাদের নবলব্ধ নাগরিক পৌরব নিয়ে বসবাস করতেন।

হিন্দুসমাজের অবস্থা

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বাংলার হিন্দুসমাজের দিকে পেরুন ক্রির তাকালে এক বেদনাশায়ক চিত্র দেখতে পাই। নানারকম সামাজিক পাশে জীবন তালগোল পাকিয়ে গেছে। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত; প্রকৃত ধর্মীয় উৎসবের পরিবর্তে তখন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য এবং জাঁকালো পূজাপদ্ধতি দেখা দিয়েছে। নারীজাতি পরাধীন। উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে বিধবাবিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ। পুরুষদের মধ্যে নৈতিক ক্রটিবিচ্যুতি উপেক্ষিত। পবিত্রতা তখন জীবনের আদর্শরূপে সাধনার বস্তু ছিল না, বাহ্যিক পবিত্রতা রক্ষার দিকেই অধিকতর যৌক দেখা দিয়েছিল।

তখন সতীশাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, মাঝে মাঝে সতী হবার জন্ত বলপ্রয়োগ করা হত বটে, তবে এইভাবে যেহুয় আত্মবলিনানের দৃষ্টান্তও কিছু কম ছিল না। জাপানের হারিকিরি প্রথার মত এ রকম আত্মবলিনানের প্রকৃত সম্মান ছিল। মনে হয় যেন হিন্দুসমাজ তার এই মহান অথচ সম্পূর্ণ বিপথচালিত বীরত্ববাহিনীর ওপর হিন্দুসমাজের পবিত্রতার অরক্ষণা উড়ে তুলে দরার দারিহীন কর্পণ করে সেই পতাকা উজ্জীন রাখার চেষ্টা করেছিল। একদিকে নারীরা জাঙনে পুড়ে মরতে, অপর দিকে অবশিষ্ট সমাজ কুপ্ৰথা ও অবনতির পাশপক্ষে রিসম্মিত হয়ে প্রতিটি দ্বাদ্ধের জীবন সবদিক থেকে ধাক্কাধাক্কি করে তুলতে, জীবনের

বোকা ও প্রলোভন থেকে ধর্মের পথে বাওয়াই একমাত্র মুক্তির উপায় ছিল।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নৈতিক দৈন্ত এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গপতন সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে তেমন কোন বিস্তারিত ভাব দেখা যায়নি। মাঝে মাঝে দুর্বল প্রতিবাদধ্বনি উঠেছে, কিন্তু সমগ্র ভাবে মানুষ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপোষ করেছে। এবং অসম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াকেই মেনে নিয়েছে। অপর দিকে আর এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা দিয়েছে সংস্কারবাদ ও ব্যর্থতাবোধ। সমাজ সংস্কারের স্বহ্ম প্রচেষ্টা কোন সম্ভব আত্মনিয়োগে যৌক দেখা যায়নি। কয়েক শতাব্দী ব্যব্য রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে যেমন উত্তম উত্তোগের অভাব বিরাজ করছিল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সেই উত্তম উত্তোগের অভাব দেখা গিয়েছিল। বৃষ্টান যিশনারীদের ক্রিয়াকলাপ বাংলাকে যে নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করলে ভাতোই তার নিম্নাভঙ্গের সূচনা করলে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঐরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশন স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মিশন সমাচারদর্পণ নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাতে হিন্দুসমাজ ও ধর্মের উপর তীব্র আক্রমণ করা হয়। রাজা রামমোহন রায় এর উপযুক্ত জবাব পাঠান; কিন্তু তা ছাপা না হওয়ার তিনি আনিক্যাল ম্যাগাজিন নামে দ্বিভাষাবাহী নিজস্ব একটি সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। সেটি অবজ্ঞিত সাংখ্যার বেশী ছাপা হয়নি।

ইতিমধ্যে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য নামে একজন গোড়া ব্রাহ্মণ বেঙ্গল গেজেট (৭ জুন ১৮১৮) নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ছাপলেন। গঙ্গাকিশোর বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র বই প্রকাশ করলেন, সেটি হল, ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র লিখিত ভক্তিমূলক কাব্য অন্নদামঙ্গল। তিনি গোড়া হিন্দুধর্মের বই, যেমন গঙ্গাভক্তিভঙ্গিনী ও লক্ষ্মীচরিত প্রকাশ করলেন।

কিছুকাল পরে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে হিন্দুসমাজের আরও শক্তিশালী একজন নেতা সদ্বাদকৌমুদী (ডিসেম্বর, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) নামে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সদ্বাদচরিত্রিকা নামে নিজস্ব একটি ছাপাবানা ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। ভবানীচরণ যেমন হিন্দু রক্ষার আগ্রহী ছিলেন, তেমনি নিজের সমাজ সংস্কারও উৎসাহী ছিলেন। তিনি নববাবুবিলাস (১৮২৩) ও অপর ২টি বিরূপাঙ্কক গ্রন্থের লেখক, এই বইগুলিতে তৎকালীন কলকাতার ধর্মোন্নয়ন মধ্যে প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে এই বইগুলো এবং ঐরামপুর মিশনের উইলিয়াম ফেরী সম্পাদিত একটি বাংলা কথোপকথনের বই, সম্ভবত তা তাঁর শিক্ষক ব্রহ্মচর্য তর্কালঙ্কার কর্তৃক লিখিত, বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম বই। এতে সহজ ও চমুটি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

খুটানী আক্রমণ

মিশনারী সংবাদপত্রগুলো এখন গৌড়া সমাজ ও ধর্মের উপর আক্রমণ শুরু করলো, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সংবাদপত্র ও সভামঞ্চ থেকে এই আক্রমণ শুরু হল। কিন্তু একটা মহার ব্যাপার লক্ষ্য করবার যে, বাংলার মুসলমান সমাজকে কোনরকমে স্পর্শ করা হল না। খুটানী ধর্মের সঙ্গে ইসলামের অনেক বিষয়ে মিল আছে বলে বোধ হয় এরকম হয়েছিল। কিন্তু এই মৌনভাবের আনন্দিক কারণ বোধ হয় এই যে, ভারতে নামমাত্র শাসক শক্তি তখনও ছিল মুসলিম এবং কয়েকজন মুসলমান নবাব বাংলা দেশ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা বিদূরিত করে মিশনারী কার্যকলাপে তাদের তীব্র আপত্তি জানালেন, কেন না পৃষ্ঠপোষক শক্তির সঙ্গে মিশনারীদের কার্যকলাপের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ ছিল।

ব্যাপটি মিশনারীদের চোখে ইসলাম হিন্দুধর্ম অপেক্ষা কম ঘৃণ্য ছিল না; তবুও হিন্দুদের কুসংস্কার, তাদের পুতুলপূজা, জাতিভেদ ও অন্ত্যস্ত সামাজিক অন্ত্যায়ের তীব্র সমালোচনা করা হত। এই অধঃপতনের বুকে মিশনারীদের পক্ষে দরিদ্র ও সমাজে উপেক্ষিত জাতিদের এবং ভ্রান্ত্যাপ সমাজের মিথ্যা ও আত্মত্যাগ কঠোরতায় নিগূহীতা নারীজাতিক সাহায্য করা সম্ভব ছিল। মিশনারীদের সমালোচনার মধ্যে অনেক সত্য ছিল; এবং বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিরা এই অধঃপতন চ্যালেঞ্জ করলে হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে উদ্ভূত সমাজ সংস্কারকা সহজেই তা স্বীকার করতেন। একজন খুটানীর পক্ষে বিদেশী সংস্কৃতি সম্পর্কে বাস্তব বস্তাবাদী

বর্ণনা করা সহজ ছিল, কারণ নিজের দোর খোঁজা অপেক্ষা অপরের গোর খুঁজে বের করা সব সময় সহজ।

বাই হোক, এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে মিশনারীদের দৃষ্টিভঙ্গী বতথ্যনি সত্যব বলে তাঁরা দাবী করতেন তা থেকে কম বাস্তব ছিল। ঘৃণা জাতির লোকদের আশ্রয় স্থান হিসেবে আকাশী দ্বারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল, এর ফলে তারা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করত এবং খুটানী ধর্ম ও ইউরোপীয় সভ্যতাকে আদর্শ বলে মনে করত। এর দ্বারা এই সমস্ত মিশনারী হিন্দু সভ্যতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করতে না পারলেও তারা অন্তত স্বদেশ অপেক্ষা এখানে আরও উন্নত ও খাঁটি খুটানী জীবন বাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডে দিল্লিপ্রবের প্রথম যুগ চলছিল। লোভ ও ঘৃণাকার সামাজিক অল্পমোদনের মধ্য দিয়ে এবং এক ধরনের ব্যক্তিগত স্বাভাবিক অধিক মূল্য নির্ধারণের দ্বারা মানুষের জীবনে যে নিষ্ঠুরতা ও নোংরাগি জমা হয়েছিল তা রাজনৈতিক পরাবীনতার পর শুক আচার-অভ্যুত্থানে সীমাবদ্ধ হিন্দুধর্ম অপেক্ষা কার্যত কম খুটানী আদর্শবিরোধী ছিল না। যে চিন্তাধারা উপনিষদ, অর্ধ ও কাম্যাত্ম রচনা করেছিল, তা এই শুক আচার-অভ্যুত্থানসর্ব হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক ছিল এবং এমন কি পরবর্তীকালে শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য ও কবীরের নামে যে ধর্ম সংস্কার হয়েছিল তারও স্পষ্ট বিরোধী ছিল।

বাই হোক, খুটানী মিশনারীদের বিরুদ্ধ প্রচারণার ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে

সেপার্টন জুড়ে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

দেবযানী

ফেস্ পাউডার
ট্যালকম্ পাউডার
স্নো, কুমকুম
হেয়ার ভয়েল
নেল্ পলিশ

ডি, জে, প্রোডাক্টস • কলিকাতা-১

ইংরেজ শাসন বাংলা দেশে এসেছিল শান্তি সংস্থাপকরূপে এবং খৃষ্টাব্দ ছিল সেই নতুন শাসকের ধর্ম। সমাজের উপাত্তবর্তী শাসক সমাজবাদের সঙ্গে নিজেকে ভুক্তি করে সমাজের উপাত্তে জীবন দিয়ে তার। ক্রমনিম্নমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে, এই ধারণা থেকে এই মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল যে খৃষ্টাব্দ উত্তরবর্তী বাস্তব এবং ইউরোপীয় জীবনযাত্রা পদ্ধতি গ্রহণ অগ্রগতির সাক্ষ্য। ধর্মাত্মকরণের তার মিশনারীদের উপর ছিল, এবং জ্ঞানকরণ অবিভবের দূর ছিল অথবা বৈজ্ঞানিক ভাবে নিরপেক্ষ ছিল।

কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে ইহা খৃষ্টান মুসলিম শাসকের মনোভাবের সাক্ষ্য দিয়েছিল। কেন না, যে সময় বলপূর্বক অধ্যয়ন ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতায় প্রসারিত নিয়ে ধর্মাত্মক করা হত, এই ধারণা থেকেই এ মিশনারীদের পরামর্শ এক হয়ে পড়েছিল।

এই প্রসঙ্গে এখানে ইংরেজরা যে, একমাত্র "অগ্রগতি" প্রকৌশলীয় যন্ত্রে এই খৃষ্টাব্দে নীতিগতভাবে কত সীমাবদ্ধ ছিল, অপব্যবহারে অধিকতর উচ্চতরীকরণে মিশনারীদের কাঙ্ক্ষণে খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করেনি। তবে কলকাতার বাল্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) অথবা মাইটলস যন্ত্রকর্মী রজেন্স (১৮২৪-১৮৭৩) খৃষ্টাব্দ গ্রহণ একটা স্বাভাবিক মাত্র এবং গ্রহণ ঘটনা আর যেটুকু না হওয়ার বাংলায় শিক্ষিত সেন্সমাজের ওপর ধর্ম হিসাবে খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব খুব অল্পই ছিল, ইহা প্রমাণিত হয়।

পূর্বের মতই খৃষ্টাব্দে নবদীক্ষিতরা হিন্দুধর্মের ক্রৌঞ্চলোব অত্যন্ত প্রবলভাবে মিশ্র করে। কিন্তু তথাপি সমাজের একটা বৃহত্তম অংশ ছিল, যাঁরা মনে করতেন যে হিন্দুধর্ম একটা অম্পত্তিত ও কবিভূক্ত পদ্ধতি আরও পরিষ্কার হয়নি। জরানীচরণ ও অন্যান্য কয়েকজন নেতা প্রাচীন জ্ঞান সাহিত্যিকতা সম্পর্কে পুনরায় আগ্রহ সৃষ্টি করে হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জনসাধারণকে প্রবল জড়তা থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রচেষ্টা করতেন। জ্ঞানসাধারণকে প্রবল জড়তা থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রচেষ্টা করতেন। জ্ঞানসাধারণকে প্রবল জড়তা থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রচেষ্টা করতেন।

লক্ষ্যের বিষয় যে, এই বাপারে প্রথম যৌন প্রচেষ্টা নেতৃত্ব করেছিলেন এমন 'এক ব্যক্তি' তিনি তাঁর শৈশবের শিক্ষাকীরনে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের প্রাচীন গুণগুলির দ্বারা অবিভক্ত হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন তাঁর একাধারে সংস্কৃত ও আরবি ভাষার একজন প্রেমপুত্র ছিলেন। বহুতর বোঁড়া হিন্দুধর্মের স্তোকে একজন বড় মৌলবী বলে অভিহিত করা হত। যেমতান 'এক মাই লাইফ এন্ড টাইমস', বিপিনচন্দ্র পাল ১৯৩২, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৩৭। তিনি ইংল্যান্ডে পুণর্জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর জীবন কবানী বিপ্লবের ধার্মিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এক জীবনে গ্রহণ সমগ্র জীবন ছিল। তাকে সর্ববিধে 'আধুনিক' বলে গণ্য করা যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন তাঁর কলকাতার আসনে এবং খৃষ্টান মিশনারীদের বন্যার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের সমাজের গোবর্তনীয় বিরুদ্ধেও সঙ্গ্রাম করেছিলেন, যদিও এর কল তাকে বহু ভিক্ত

আগেই বলেছি যে, রাজা রামমোহন ইসলাম ও ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রবল ভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের এক নতুন ভাষা রচনা করতেন যা যে ধর্মের আত্মগণ থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন তা থেকে আদৌ নিভৃত ছিল না। হিন্দুধর্মকে বর্জন করে নতুন, একমাত্র হিন্দুধর্মের মাধ্যমেই হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল। এই বিষয়ে রামমোহনই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি সমাজের ভিতর থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নতুন ধর্মাত্মের প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং তার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তা হচ্ছে ইসলামের আলাহাবাদী একত্ববাদ এবং আধুনিক ইউরোপের গণিত মুক্তিবাদ। রামমোহন এই ভাবে বীজ বপন ও সেচিয়ে একটি নতুন সংস্কারে লালন করলেও তাঁর উদ্ভাবনিকারী দেহেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৮-১৮৮৫) সত্যদিন সে আলোকনকে ভারতীয় কৃষ্ণ পুনর্জাগরণের ভারী আলোকনে পরিণত করতে না পেরেছিলেন সত্যদিন সেই অন্ধুর মতীরে পরিণত হতে পারেন। রামমোহনের মত দেহেন্দ্রনাথ ও ইসলামীয় কৃষ্ণ দ্বারা প্রবল ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। (আত্মজীবনী, ২২৫ দেহেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০১: পৃ: ১২৭-১৪৬) কিন্তু রামমোহন আরবীয় সূত্র থেকে একত্ববাদের আদর্শ পেয়েছিলেন, আর দেহেন্দ্রনাথ তাঁর আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সত্যদিন ও মরমী কবিগণের কাছ থেকে। এতে তাঁর উপনিষদের ধর্মতত্ত্ব বৃদ্ধতার সঙ্গে প্রেম ও ভক্তি মিশ্রিত হয়েছিল।

দেহেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, যেমন করে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টা তাঁর মহাদাকে আগ্রহ করেছিল এবং যেমন করে তিনি সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। (আত্মজীবনী, ২২৫ দেহেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ৩৮-১) এখানে বলা দরকার যে, হিন্দী হস্তক্ষেপ থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করা বাস্তব বাধাকল্প দেব ও ভবানীচরণ বাল্যোপাধ্যায় সচ পৌড়া হিন্দু সমাজের কয়েকজন নেতা ১৮৩০ সালে ধর্মভা নামে একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন। ঐতিহ্যগত দেহেন্দ্রনাথ তত্ত্বাবোধিনী সভা ও তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা (১৮৩১) স্থাপন করলেন, পত্রিকা প্রাগৈতিহ্য মতভাবে যুগপন্ন হয়ে উঠলো। উপরোক্ত ঘটনার পর আমরা জানতে পারি, উত্তর পাশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হাতে তিরোহিত হয় তৎকাল ধর্মভায়া সনস্করা দেহেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন।

বাংলার নৈতিক ও চিন্তাভাবের পুনর্জন্মে তত্ত্বাবোধিনী সভা ও তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের ভিত্তি নির্মিত ছিল। এই পত্রিকাটি বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করতো, খৃষ্টান মিশনারীদের আন্তঃধর্ম সমূহের জীবন দিত, এবং আত্মত্যাগাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করলেও তা (পত্রিকা) জনগণকে তাদের সভ্যতা সম্পর্কে গর্ববোধ করতে শিখিয়েছিল এবং একটা সত্যপূর্ণ গর্ববোধের দ্বারা পশ্চিমের বা কিছু প্রেম অবদান তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

ধর্মনিরপেক্ষ প্রভাব

লক্ষ্যের বিষয় যে, রাজা রামমোহন ও সমাজের ধর্ম সংস্কারের কল খৃষ্টান



আট
দাল আঙন

বিভাগের আকাশে যে দুর্বারের কালো মেঘ জমা হয়েছিল তা কেটে গেল। সেই দিন মিটিং-এর পর মিহির ডাক্তার তার ডেরা তুলল এই-কলোনী থেকে। সেই সঙ্গে ছুঁ-চারজন তার অঙ্ক ভক্তও। তবে কোথায় চলে গেল তারা বলল না কাউকে। অনেকে জাবল কলকাতায় ফিরে গেছে। যেখানেই থাক তাদের কথা আর ভাবতে চায় না কেউ।

কমলেশ এখন এ কলোনীর দূরে নায়ক। বাইরে থেকে লোক এসে তাকে দেখতে চায়। বিভাগের ছেলেরা সব সময় তার সঙ্গে পরামর্শ করে। কমলেশ নিজে কিছু এসবে লজ্জা পায়। ছেলেরা বলে, তোমার কাছে মত চাইছিল কেন? শঙ্করদার কাছে যা।

ওরা বলে, শঙ্করদার কাছে তো বাবই, তবে তার আগে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া ভালো। কি ভাবে শঙ্করদাকে বলা উচিত তুমিই ঠিক বলে দিতে পারবে।

কমলেশের খাতির বেড়ে বাঙারায়, সবচেয়ে বেশী খুসি হয়েছে প্রশান্ত আর বেণুকা। তাদের আনন্দের আর সীমা নেই। বেণুকা বলে, আমি বাড়িয়ে বলছি না কমল, ইদানিং শঙ্করদার ব্যাখ্যানের খুব দেখলে সত্যিই বড় কষ্ট হত, মনে হত নিজের হাতে তৈরী এই কলোনী যে ছেড়ে চলে যেতে হবে, তা তিনি মনে মনে স্থিরই

করে ফেলেছিলেন। আমি জো দেখেছি, যদিকাঁদিরা তাকে কত সাধনা দিত, উনি শুধু হাসতেন, বড় কল্ল হাসি, বলতেন, তোমরা আমাকে কি মনে কর, একবারে ছেলেমানুষ কিছু বুঝতে পারি নি। মিহির যে এ বকম একটা কাণ্ড করে থসবে তা বুঝতে পারি নি। তবু কাজ করতে হবে, এখানে না হয় অস্ত্র কোথাও গিরে লাগতে হবে। তোমাদের সঙ্গে গেলে ভালো, না পাই একাই কাজ করবো।

বেণুকার কথা শুনে প্রশান্তর চোখে জল এসে পড়েছিল। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে, এখন শঙ্করদাকে দেখলে বড় আনন্দ হয়। ঠিক আগের মত সেই লগালগমর মাল্লব। কী মন দিয়ে কাজ করছেন। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করে, ঠর সঙ্গে তোর কি কথা হয় রে কমল?

কমলেশ খুব আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মনেই যেন বলে যায়। আশ্চর্য্য লোক শঙ্করদা, অনেকেই শুধু তার বাইরেটা দেখেছে, ভেতরটা দেখবার সুযোগ পায়নি। সেদিন মিটিং-এর পর লবাই যখন আমাকে নিয়ে তৈ-তৈ করতে, একসময় সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে আমি পালিয়ে বাট শঙ্করদার সঙ্গে দেখা করার জন্তে। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে কোথাও তাকে পাই না। শেষে দেখি, লাটব্রেরীতে একলা বসে খুব মন দিয়ে বই পড়ছেন। গীতা। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রণাম করলাম। শঙ্করদা সঙ্গেহে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, ভগবান তোমার মজল করুন।

কমলেশ চোখের জল সামলাবার জন্তে কিছুকণ থেমে যায়। নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে, কী আশ্চর্য্যক আশীর্বাদ! আমার মন-প্রাণ ভরে গেল। বললেন, চোরের বস। বসলাম।

একদৃষ্টে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে থেমে বললেন, আজকের মিটিং-এ বক্তৃতা করে তুমি এখানকার ছাত্রদের মান বন্ধা করেছো, শিক্ষকদের মর্যাদা বাড়িয়েছো। তবে কয়েকটি কথা সব সময় মরণ রেখো। সত্যের পথে চলেবে। যে কাজই কর, মন-প্রাণ দিয়ে করবে। লোকের কাছ থেকে বাতাবা পেলেও ভেবো না, কাজ তুমি করছো। মনে রেখ তুমি উপলব্ধ মাত্র। ঠাকুর নিজেই কাজ করেন, তোমাকে সামনে রেখে। এ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাঁর রূপা পাওয়ার। যখন যেখানে যে অবস্থায় থাক। স্বামীজির কথা মনে গেঁথে রাখবে—

বহুরূপে সমুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিত ঈশ্বর,

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

কমলেশ জোরে জোরে নিশ্বাস ফেল বলে, আমি সত্যিই তোমাদের বোঝাতে পারবো না, শঙ্করদার এই কটি কথা আমাকে

দিন আশ্রিত ঐ

কতখানি বলে দিয়েছে। আজ কাল ঠাকুরের কাছে শুধু এই প্রার্থনাই করি, শঙ্করদার উপদেশমত যেন চলতে পারি, যেন বাহুরে মত মালুম হয়। বেশ আর দশের কাছে যেন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিই।

গুণ কমলেশ নয়, বিভাগ্রামের সকলেই আজ ঐ আশ্রমে অল্পপ্রাণিত হয়ে উঠেছে। হাসিমুখে তারা কত বৈধী কাজ করছে। বারো এতদিন বাধা দিয়েছে তারা যে আর কেউ নেই। সে-সব কাজ এতদিন শঙ্কর চালা করত পারেন নি। এখন তাই শুরু হয়েছে। কাছাকাছি গ্রামগুলোর উন্নতি কি ভাবে করা সম্ভব তা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা-সভা বসে। গাঁয়ের হাতকররা আসে, তাদের সুবিধা অনুবিধার কথা জানায়, সেই মত কার্যপ্রণালী তৈরী হয়।

ছুটির দিনে সর্দারদর ছেলের দল নিয়ে বেরিয়ে যায়। পরাম্পরের কোন পুত্রে বৃষ্টি পানো পড়েছে, সাক্ষ্য করা হয়নি। আশ্রম থেকে তিনটে গাঁ পেরে পরাম্পর—প্রায় সাত মাইলের দূরত্ব। ছেলের দল এগিয়ে চলেছে সেখানকার সংস্কার করতে।

পাশের গাঁয়ে এক সাবেকী জমিদারবাড়ী। সেখানে আজ ব্রাহ্মণ ভোজন। জমিদারের মা মারা গেছেন, তাইই জ্ঞান ধুমধাম করে স্বর্গে বাবার ব্যবস্থা। জমিদারবাড়ীর সকলেই থাকেন কলকাতার, সেখানে ব্যবসা আছে।

শঙ্কর! যেতে যেতে বলেন, উঃ, কি বিলী পয়সা নষ্ট!

কমলেশ সায় দিয়ে বলে, সত্যিই তাই, কি দরকার ব্রাহ্মণ ভোজনের, তার চাইতে, গরীব দুঃখীদের খাওয়ালে ভালো হয়।

—সেটাও পয়সা নষ্ট। একদিন ভালো-মন্দ খাইয়ে কি লাভ। তার চেয়ে যে টাকা এই ভোজনপর্বের মধ্যে দিয়ে অপচয় হচ্ছে তা দিয়ে যদি গাঁয়ে একটা টিউবওয়েল বসানো হয় তাতে সাধারণের কত সুবিধা, তিন পুঙ্খ ধরে সেখানকার জল খেতে পারে। এরা টাকা খরচ করে সাধারণের ভালোর দিকটা ভেবেও দেখে না।

ছেলের দল এসে পড়ে পরাম্পর। বেশ বর্ষিকু গ্রাম। সহজেই চোখে পড়ে এখানকার সরল গতিময় জীবন।

গাঁয়ের হাতকররা এসে হাজির হয় শঙ্করদার কাছে, সবাই তাকে ভালোবাসে।

শঙ্কর! হেসে জিজ্ঞেস করে, কি দীর্ঘ গুড়ো, তোমাদের উদ্ভব দিকের পুত্রে পানো পড়েছে অথচ সেটা সাক্ষ্য করনি, এই থেকেই যে রোগ জন্মায়।

বৃদ্ধ দীননাথ লজ্জিত হয়ে উত্তর দেয়, কি কথব বল, রোজই তো হোঁড়াগুলোকে বলি ওটাকে সাক্ষ্য করে ফেলতে, করি করি করেও ওরা করে না।

সবাই পুত্রে দিক এগিয়ে চলে, মাঝখানে পথ ভীষণ ধারাল। কাঁচা রাস্তা, জলে আর গরুর গাড়ীর ঢাকার ডেজ চূবে নষ্ট হয়ে রয়েছে, অথচ এইটাই গাঁয়ের প্রধান রাস্তা।

—এ পথটা সারান হয় না কেন? গাঁয়ের ঘেরে-পুঙ্খ সকলেরই তো অনুরোধ হয়।

—সে তো জানিই, অথচ হোঁড়াগুলো—

দীননাথ চুপ করে যায়।

শঙ্কর! ছেলের বসেন, আর এক দল এ রাস্তার কাঁচের হাত দে আর এক দল পুত্রে পানোটা সাক্ষ্য কর।

কথা শেষ করে, জামা খুলে কাঁচের লেগে বান শঙ্কর! সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দলও হাত লাগায়। বৈধীকণ কাজ করতে হয় না, গাঁয়ের লোকেরা ছুটে আসে, সবাই কাজ করে ও দণ্ডী করেকের মধ্যেই ভাঙা রাস্তা হয় কঠিন, শঙ্কর পানোপুত্রে হয় পবিত্র নিখিল।

কাজ সেরে তারা ফেরে, কমলেশ প্রশ্ন না করে পারে না।

—শঙ্কর! এত অল্পসময়ে যদি কাজগুলো করা যায় তবে না করে এত অনুবিধার মধ্যে থাকে কেন?

—সেইখানেই ওদের কুঁড়েমী। চলছে চলুক ভাব নিয়ে ওরা বেঁচে থাকতে চায়। দেশের কাজ করতে হাল আগে এইগুলো দূর করা দরকার। বৈধী নয় শুধু একটু প্রেয়ণ দেওয়া। বহুতা দিয়ে কাগজে নাম ছাপিয়ে দেশের সেবা হয় না। এদের মাঝখানে থেকে একসঙ্গে কাজ করে শিক্ষা দিতে হবে।

কথা বলতে বলতে তারা আশ্রমের দিক এগিয়ে চলে। ছেলের চোখ-মুখ আনন্দে ভরে ওঠে। সত্যিই তারা করছে দেশের সেবা, যাদের সেবা।

পুলু এখন এই বিভাগ্রামের ছাত্র। আর পাঁচটা ছেলের মত ক্লাশে বসে পড়াশুনো করে, আশ্রমের কাজে কাজ করে। কমলেশের সঙ্গে গ্রামোন্নয়নের কাজে ও এগিয়ে যায়।

পুলুকে এ খুলে এনে উর্জিত করেন তাঁর দাদু স্বয়ং। এ-ও সেই মিটিং-এর পরের দিনের ঘটনা। এত দিন সর্দারদরের সঙ্গে তার মোটেই ঐতিহ্য সম্পর্ক ছিল না। সেদিন কিন্তু নিজেরী নান্তির হাত ধরে এসে দাঁড়ালেন, সর্দারদরের টেবিলের সামনে।

টাকে দেখে সর্দারদর বিস্মিত না হয়ে পারেনি। সম্মান দেখিয়ে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, আপনি?

বিনা ভূমিকার যত্ন হেসে বুদ্ধ বলেন, আমার নাতিটিকে তোমার হাতে দিতে এলাম।

—এ ত বড় আনন্দের কথা।

বুড়ো পুলুর কাঁধে হাত রেখে ব্রহ্মভদ্রা গলায় বলেন, এ আমার অজ্ঞের বন্ধু, একমাত্র বংশধর। এতদিন ভেবেছিলাম চারদিকে বেড়া দিয়ে চারপাছকে বাঁচিয়ে রাখব কিন্তু দেখলাম ও শুকিয়ে যাচ্ছে, তাই দিয়ে গেলাম তোমার এই কুল বাগানে। জানি তুমি যত্ন নেবে।

সর্দারদর পুলুকে নিজের কাছে টেনে নেয়, আমার বংশাধার আমি করব।

—দেখ ও যেন কমলেশের মত হতে পারে।

আর কোন কথা না বলে পুলুকে সর্দারদরের জিম্মায় রেখে বুড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আবার ফিরে আসে।

—যে জমি নিয়ে তোমার সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল মানে যেখানে চিনির কল বসবার কথা—যদি তোমার দরকার থাকে খুলে দিচ্ছি।

সর্দারদর সাগ্রহে বলে, তাহলে আমাদের বড় উপকার হয়। বহু গ্রামবাসীদের জন্যে আমরা শিক্ষাকেন্দ্র শুরু করতে চাই। ঐ জায়গাটার কথা আমি মনে মনে ভেবেও রেখেছিলাম, মাঝখানে সব গোলমাল হয়ে গেল, তাই আর করা হয়নি।

—বেশ তো, ঐ জমিতেই কর।

সর্দারদর কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, দাম কত দিতে হবে?

কৃত মান হাশে, সে পথে চলিবে। কিন্তু তা এখন কব।

সেই বিঘাট জমিতে বড় বড় টিনের চাপ উঠেছে, তাড়াকাদি পাঁচটা গ্রামের একে লোক আসে এখানে পড়বার জন্য। এমন কি ষাট বছরে বৃদ্ধারাও পেছিয়ে নেই, তারাও আসে, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নতুন জীবনের আশা পোষণ করে। এঁদের পড়বার জন্য নতুন শিক্ষকও এসেছে বারা বহুসংখ্যক শিক্ষা দিতে পারে, এ বিষয়ে আশঙ্কা।

এখানে স্থান বসতিও ভাগটি বাক্যে, সারাদিনের কাজ-কর্ম-সেয়ে ব্যক্তিগত কৰ্ম্মাণে লেখাপড়া করতে। কি তাদের উৎসাহ।

কমলেশ লক্ষ্য করে দেখেছে শিক্ষাক্ষেত্রের ছুটি পর্ব তাকিয়েলা স্বপ্ন বহু হুতাশ। এখানে থেকে যাবার বা, সঙ্গীতের দ্বারা থেকে তাদের চলে যাওয়া পাখার মতো তাকিয়ে থাকে। স্বপ্নভাণ্ড সে চোখের দৃষ্টি: কমলেশ কাছে গিয়ে দাঁড়ালে শব্দে তার কীয়ে গুণের নিশ্চয় হাত রেখে তেমনি দুবের নকে তাকিয়ে গাঢ় হয়ে আনুভূতি করে—

এই সব যুগ মান, যুগ যুগে দিতে হবে জাণ,

এই সব যুগ বৃদ্ধ কামনা তুলিসে তবে আশা।

যেদিন এসেছে শিশু থেকে বৃদ্ধ সশরী পায়ে জামানের আসে। দেশে, সব যুগ কষ্ট কষ্টে বাবে। আমরা মাতৃভূমিকে বুঝতে পারব, প্রকৃত সম্ভাবনামাত্র আমরা সীমিত হবে।

কমলেশ মনে মনে প্রোক্তা করে, সারাদিনের সে শব্দবাহার আনন্দকে অনুসরণ করে বাবে।

এলা বৈশাখ। পাঁচ বছর আগে এই দিনে এই কলোনিয় পত্তন করেছিল সঙ্গীত। পুণ্ড-হুতের মধ্যে দিয়ে এই ক'বছর কেটে গেছে। উদ্ভাতও হয়েছে অনেক; বিশেষ করে মিহির ভাস্কর্যের মতো হয়ে গিয়ে পালিয়ে যাওয়ার আবার লাঞ্ছিত করে এসেছে সকলের মনে, কালের উত্তম আসে বৈশি, তাই ঘটা করে এ বছর পালন করা হচ্ছে এলা বৈশাখের পূর্ণাতিথি।

ছাত্রদের অভ্যাসকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে এ উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। সেই সঙ্গে আসছে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তি। সকলকে দেখানো হবে, এই পাঁচ বছরে কি কাজ করেছে। সঙ্গীতের বিজ্ঞান। কীকা মাস্টার গুণের প্রশংসনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে, দেখানো থাকবে ছেলেরদের হাতে-আঁকা ছবি। সেলাই করা এমন্ত্রণার, আবার কলকাতার মডেল। ছাত্রেরা অভিনয় করবে ঐতিহাসিক ছোট একটি নাটক। তারও রিহাসাল চলছে রাতভর। কমলেশ ও প্রশান্ত দুজনেই অভিনয় করছে এ নাটকে। এমন কি, পল্লী বাদ বাঁশ। সেও বুঝি একবার মঞ্চে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করা বলায় আছে।

আজ উৎসব। সারাদিন সকলেই ব্যস্ত—আশ্রমকে সাজানো হয়েছে খুব সুন্দর করে। সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বস্ত্র বিতরণের পালা। দুই গী থেকে সকল এসেছে, তারা আজ উৎসবে যোগ দিয়ে, অভিনয় দেখে কাল বাড়ী ফিরবে।

কমলেশের বাবা-মাও এসেছেন, মিমমিত্রদের সঙ্গে। ঘুরে ঘুরে সমস্ত আশ্রমটা দেখে, খুশি হয়ে বলেন এ তোমার কি কাণ্ড করেছে যে করণ? সেই ছোট আশ্রম আজ কত বড় হয়েছে। সত্যিই তোমার শব্দবাহার, বাহাদুরী আছে।

কমলেশের সপর্কে বলে, শব্দবাহার আরও কত বড় মান আছে,

এমনও সে সব হয়ে উঠে। —

এমনও বুঝি মেয়েদের ছোটলতাই হয়?

বেগুলা উত্তর দেয়, না। তাহলে বাইরে থেকে মেয়ে এখানে নেওয়া হয় না।

কমলেশের মা হাসতে চানতে বলেন, কমলেশ যে দেখছি অনেক উন্নতি হয়েছে, শুনিছ বড়তা করছে, কাজ করছে, বাড়ীতে তো কাটি ভেলে কুটো করলে না।

বেগুলা তাড়াতাড়ি বলে শুধু তাই, আমাদের কি দিদি বলে মানে, কত গভীর গভীর উপদেশ দেয়। আজ দেখবেন কি বকম খিয়েটার করবে।

—সে কি যে, ভুট্টা খিয়েটারও কর্তব্য?

কমলেশ হেসে বলে, তুমি সব মাটি করে দিলে বেগুলাদি, কোথায় ভাবছলাম বাবা-মাকে একটা সাবপ্রাইজ দেবো।

সত্যিই কিছু সাবপ্রাইজ দেওয়া খেল না। যিকোন থেকে লোক ভ্রমতে শুরু করে, খিয়েটারমন্ডের সামনে। মিমমিত্রদের দল আর চাবুকিকে ছাড়িয়ে হয়েছে আশ্রমের চারিদিক। অভিনয়ের আগে বড়তা করল সঙ্গীতের, গভীর পাঁচ বছরের বিজ্ঞানময় আগ্রহের বিরোধী শেখ করল অভ্যাগতদের সামনে। তাগীর কলোনিয় বাসিন্দাদের শব্দ থেকে এক যুগের ভাষা দেবার কথা ছিল কিন্তু তাও বলা হল না। সব মাত্র মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় চিংকার উঠল, আগুন, আগুন! কয়েকজন ছুটে এসে বলে, সর্বনাশ হয়েছে, হুলালের ঘর আগুন লেগেছে। উদ্ভবনায় তাদের গলা কাপছে।

সকলে চমকে ওঠে, সে কি?

লীগ'গির চলুন। এখনি আগুন ধামাতে না পারলে সারা কলোনি পুড়ে যাবে।

অমৃতানোর সেইখানেই শেষ। সঙ্গীতের সঙ্গে সকলে ছুটে যায় আগুন নেগাবার জন্যে।

কি বিচিত্র দৃশ্য, আগুনের লেলিহান শিখা, লালের তুচ্ছ খেলা। শুধু হুলালের ঘর নয়, আরো দু-চারটে বাড়ীতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা অনেকেরই নেই। প্রথমটা কমলেশের মত অনেকেরই নিকর হয়ে চেয়ে থাকে আগুনের প্রচণ্ডতার দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই বেন কমলেশ তার সন্নিহিত করে পায়। অস্ত্র ছেলের সঙ্গে মিলে আগ্রাণ চৌ করে সে আগুন নেবাবার। সেই বিশাল অগ্নিকান্ডের মধ্যে থেকে তারা আন্তে আন্তে বাব করে আনছে জিম্মিশব্দগুলো। নির্ভয়ে, নিশ্চয় বালতির পর বালতি জল এনে ছুঁতে—বিষমহীন কাজ।

আগুন ক্রমশ: নিবে আসে, সব জিনিষট প্রায় বাব করে আনা হয়েছে কিন্তু বাইরে থেকে বোকা বাড়িল না, উত্তর দিকের আগুণোড়া ঘর থেকে চলতে চলতে ছাত্রমুষ্টির মত কে বেন বেরিয়ে আসে, তার কোলে একটি শিশুপুত্র। এই হৈ-হৈ হাঙ্গামার মধ্যে সেই শিশুর কথা। প্রথমে কান্না কান্না বাঁশি, সঙ্গীতের ছুটে গিয়ে দেখে, ভয় নেই সে বেঁচে আছে। কিন্তু সে লোকটি বাস্তবিক বাব করে এনেছিল, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, বসে পড়ে মাটির ওপরে। সকলে এখন তার দিকে তাকিয়ে দেখে, কেনই বাব না,

জাণে হাত-মুখ যিহীভাবে পুড়ে গেছে, তার শুকনো রক্ত
জাড়াডাঙি কোলে করে নিয়ে আসা হ'ল, ভিসপেলারীর মধ্যে।

আলোর সবাই তার চোখের দেখে চমকে উঠল, এ আর কেউ নয়,
পুলু দাছ। সেই বন্ধু বড়ো। সশাস্ত্রের হিংস্র হয়ে পড়ে। আপনি
এর মধ্যে গেলেন কেন? বুকের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, অন্ধত্ব
এককনকেও তো বীচাতে পেরেছি। আমার জীবনের আর কি দাম,
আজ না চর কাল একদিন তো যেতেই হ'ত, থাকে বন্ধা করেছি সে
হয়ত শোমাদের অনেক কাজে লাগবে।

সকলের চোখে জল ভরে আসে। কিন্তু বুকের চোখে কোন
জল নেই। উজ্জ্বল আনন্দের হাসিতে ভরা মুখ। আমার মৃত্যুর
পর তোমরা আমার বাড়ীর তিন তল বন্ধ ঘরটা খুলে। আমার
উইল স্থানে বেখে গেছি।

পুলু দাছ মাথা গেলেন। যে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল তা
শেষ হ'ল বিবাদের মধ্যে সংকার সেরে পুলুক নিয়ে সশাস্ত্রের গেল
সেই একপুণ্যর মধ্যে, খুলল সেটি তিন তলার নিবিচ্ছিন্ন ঘর। ঘর বড় নয়
কিন্তু স্বন্দর করে সাজানো। চারদিকের দেওয়ালে নেতাদের বড় বড়
ছবি। মাস্তানের চোখের, দেবাজের মধ্যে রয়েছে বুড়ার শেষ
উইল। তার তারহ সজ্জা দেখা একখানা চিঠি।
সেহের পুলু,

তুমি যখন এ চিঠি পড়বে, তখন আমি থাকব না। আগন্ত
ঘরে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ এ তোমার বাবার ঘর। যে তার দেশ ও
দেশের জন্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। পাছে তুমি এ স্মৃতি
চলে চাও, সেই ভয়েই এত দিন তোমাকে আগলে বেপেছিলাম, এখন
বুকের পেতে আমার ভাল। এত দিন ধরে বুকের মত ব সম্প্রদ
আমি জামেরে রেখেছিলাম তোমার ভোগের জন্তে তা উইল করে
বিকিয়ে দিলাম দেশের লোকের জন্তে। তুলে দিলাম তোমাদের
শস্ত্রদার হাতে। তোমার বাবার ভাগ ও আগনের ছবি তুমি
ঊঁচাই মধ্যে দেখতে পাবে। আশীর্বাদ করি মস্তেবের মত
মায়া হও। ইতি তোমার দাছ।

শেষ

কি করে স্পষ্ট ছবি তুলতে হয়

রথীন রায়

ভাল আলোকচিত্র মাত্রই সাধারণতঃ স্পষ্ট চরিত্র দরকার

কিন্তু কতকগুলি সাধারণ তুলের ফলে অনেক সুন্দর সুন্দর
আলোকচিত্রও অস্পষ্ট হইয়া যায় এবং আলোকচিত্র হিসাবে তখন
তার আর কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু একটু সতর্ক হইতেই এইসব
ভুল এড়ানো সম্ভব। আসুন তবে দেখা যাক এইসব ভুলের প্রকৃতি
কি এবং এইগুলি কি ভাবে এড়ানো সম্ভব।

(১) ভাল কোকাস করা—ক্যামেরার লেন্স হইতে বিবর্তনের
দৃশ্যের উপর লেন্স হইতে কিম্বার দৃশ্য নির্ভরশীল। একের
পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তন অবশ্য কর্তব্য এবং ইচ্ছাকেই কোকাস
করা বলা হইয়া থাকে। এই কোকাস করার পদ্ধতি বিভিন্ন
ক্যামেরার বিভিন্ন প্রকারের। এই কোকাস করা ঠিক না হইলে
ছবি অস্পষ্ট হইতে বাধ্য। সুতরাং প্রথমেই ঠিকমত কোকাস
করা সতর্ক হইতে হইবে। বহু ক্যামেরাগুলির কোকাস

রপতঃ অসীম দূরত্ব বীধা থাকে। এই ক্যামেরাগুলি সাধারণতঃ
ফিটের (৩') বাইরের যে কোন বিবর্তনের আলোকচিত্র
ভাবে তুলতে সক্ষম। অবশ্য খুব মিকট হইতে আলোকচিত্র
তে হইলে অতিরিক্ত ক্লক-আপ লেন্সের সাহায্য লইতে হইবে।
(২) দ্রুত 'শাটার স্পিড' (slow shutter speed) ছবি
বার সময় ক্যামেরা নড়া—কিন্তু আলোর ছবি তুলতে হইলে
'শাটার স্পিড' বধা—১ সে: ১ সে: ১ সে: ১ সে: বা আরো
সময়ব্যাপী একপোজারে ছবি তুলতে হয়। তখন ক্যামেরা
লে ছবি অস্পষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে
যেহাটি কোন সতর্ক কিছু বধা—ট্রিবিং, চেয়ার বা ক্যামেরার



ছবির তারতম্য

তিন পায়া ট্যাণ্ড ইত্যাদির উপর টিকিটের বসাইরা লগুই দরকার। মোটকথা ক্যামেরা বাহাতে না গড়ে সেই বিষয়ে সতর্ক হইবে।

(৩) লক্ষ 'শাটার স্পীড' গতিশীল বিষয়বস্তুর ছবি তোলা— গতিশীল বিষয়বস্তুর ছবি সাধারণতঃ দ্রুত 'শাটার স্পীড' বখা— ১০০ থেকে ১০০০ সে: হট্টম সে: ইত্যাদিতে তুলিতে হয়। এই সব ক্ষেত্রে লক্ষ 'শাটার স্পীড' ব্যবহার করিলে ছবি অস্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই 'শাটার স্পীড', নির্ভর করে (ক) ক্যামেরা হইতে বিষয়বস্তুর দূরত্ব (খ) বিষয়বস্তুর গতিবেগ ও (গ) ক্যামেরা হইতে বিষয়বস্তুর গতির দিক প্রভৃতির উপর। গতিশীল বিষয়বস্তুর ক্যামেরার বস্ত্র নিকটে হইবে 'শাটার স্পীড' তত দ্রুত প্রয়োজন হইবে। গতিবেগ কম বেশীর জন্য 'শাটার স্পীড'ও কমবেশী করিতে হইবে। বিষয়বস্তুর গতির দিক যদি ক্যামেরার আড়াআড়ি (Parallel) হয় তবে অপেক্ষাকৃত দ্রুত 'শাটার স্পীড' প্রয়োজন হয়। গতির দিক যদি ক্যামেরাভিমুখী বা ক্যামেরার বিপরীতমুখী হয় বা ক্যামেরা হইতে ৪৫° কোণ করিয়া হয় তবে অপেক্ষাকৃত লক্ষ 'শাটার স্পীড'ও ছবি তোলা সম্ভব হইবে।

(৪) অপরিকার লেন্স—লেন্সই ফিল্মের গারে বিষয়বস্তুর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে। অপরিকার কাচের মধ্য দিয়া যেমন স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না, তেমনি অপরিকার লেন্সের সাহায্যেও স্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব নয়। সুতরাং স্পষ্ট ছবি তুলিতে হইলে সর্বদা ক্যামেরার লেন্সটি পরিকার রাখিতে হইবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি মনে রাখিলে ছবি অস্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা দূরীভূত হইবে। এবং ভাল আলোকচিত্র আরো ভাল দেখাইবে।



যাহ্‌কর এ, সি, সরকার

'ম্যাট্রিক ম্যাচ' খেলাটা যে কত মজার তা বলে বোঝানো যাবে না। যে কোনও জায়গায় এ খেলা দেখিলে অনু্য অর্জন করা যায়। এমন কি জাহাজ—বিমানে বসেও বঝার এই খেলাটা দেখিয়েছি বিশেষ সাক্ষ্যের সঙ্গে।

যাহ্‌করের হাতে আছে একটি ম্যাচ বক্স। বাঁকুনি দিয়ে তিনি দেখাছেন যে বাজটা কাঠিতে সম্পূর্ণ ভর্তি। আওরাজ ওদে দর্শকেরাও নিশ্চিত হলেন।

এইবার যাহ্‌কর তার মন্ত্র পড়লেন—

...ম্যাচ বক্সের ভূতকে ভাক
করতে কাঠি চিচি কাঁক
লাগ লাগ লাগ ভেঙী লাগ
ভাঙমতী করবে বাগ--

মন্ত্র পড়ে যাহ্‌কর তাঁর হাতের ম্যাচ তুলে দিলেন দর্শকের

হাতে। তাঁরা খুলে দেখলেন বাজ কাঁকা একটি কাঠিও নেই তাঁর মধ্যে।

এর পরে ম্যাচ বক্স আবার তুলে দেখা হল যাহ্‌করের হাতে। তিনি মন্ত্র পড়লেন—

...লাগ লাগ লাগ ভেঙী লাগ
কাঠিতে ম্যাচ ভরে বাক
দেখে সবাই লালক তাক--

মন্ত্র পড়ে যাহ্‌কর বাঁকুনি দিলেন। ম্যাচ বক্সটিতে আওরাজ হল। সবাই বুঝলেন ম্যাচ বক্সে কাঠি কিংবে এসেছে।

কেনন করে এ খেলা সম্ভব তাই শোন। এ খেলা দেখাতে হলো আগে থেকেই একটি কাঠিভর্তি বেশলাই সেখটি পিন দিয়ে লাগিয়ে রাখতে হয় কোর্টের বা দিক্‌কার আঁতনের ভেতরে সকলের অজান্তে। এখন বাঁ হাতে খালি ম্যাচ নিয়ে বাঁকুনি দিলে লুকনো ম্যাচ বক্সে বাঁকুনি লাগবে আর তা বেজে উঠবে। দর্শকেরা ভাববেন যুঁহি খালি ম্যাচ বক্সের ভেতরেই কাঠি এসে গেছে বাহুমন্ত্রে।

কীর্তদাস প্রথা

কীর্তদাস বরাট

অতীতের কথা। কিন্তু তা' বলে গত কাল-পরগুর কথা নয়।

মুদ্র অতীতের অর্থাৎ বৈদিক যুগের তথ্য। মনুষ্য সমাজে দাসপ্রথা সেই প্রাচীন যুগ থেকে চালু হয়ে আসছে।

অনুনা আমাদের মধ্যে অনেকেই ঘরে চাকর আছে। আবার চাকরাণীও আছে। তারা দাসমাইনার গোলাম। বেতনভোগী কর্মচারীর শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে এই শ্রেণীর গৃহভৃত্য নিহৃত্ত হত কি না জানি না। হয়ত বা হত। তবে সেই সময়ে আর এক শ্রেণীর দাসেরও আমরা পরিচয় পাই। তারা কীর্তদাস।

প্রাচীন যুগের কথা। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি জন্তু জানোয়ারের মত মানুষেরও যেচো কেনা চলত সে যুগে। মানুষ মানুষকে কিনত আর বেচত। বার ক্রিনত তারা ঐ কেনা মানুষকে ঘরে নিয়ে গিয়ে কাজ করাত। দাসরূপে তারা গণ্য হত। সেজন্তে এদের নাম ছিল কীর্তদাস।

পূরাতন পুঁহি, প্রহু, হস্তলিপি, প্রত্নতত্ত্বক ইত্যাদি দর্শন ও অধ্যয়নারি পর ঐতিহাসিকগণ আমাদের কাছে পুরাকালের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও বিচার-ব্যবহার একটা সঠিক তথ্য জাহির করেছেন। তাঁদের মতে সে যুগে মনুষ্য সমাজে অজান্তে প্রথার মত দাসপ্রথাও প্রচলন ছিল। দাসদমুতিতেও আমরা পনের প্রকার দাসের রূপ দেখতে পাই। বখা:—

"গৃহজাততথ্য কীর্তো লভো জারাজপাগতঃ।

অরকাল ভূতন্তব দাহিতঃ স্বামিনা চমঃ॥

দক্ষিতে মহতশ্রমবি বৃদ্ধে প্রাপ্তো পশে দ্বিতঃ।

তবাহমিত্যুপাগতঃ প্ররজ্যাবাসিতঃ কৃতঃ।

বিক্রোতা চাক্রনঃ দাজে দাসাঃ পঞ্চমশা বৃত্তাঃ॥"

দাসপ্রথা অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত সকলে যে প্রবর্তিত ছিল সে লক্ষ্যে বহু প্রমাণ আছে।

স্বতন্ত্ৰ আৰ্হিগণ কৃষ্ণকায় অনাৰ্যসকলক বৃত্ত পূৰ্ণ কৰে বন্দী কৰে। তাৰপৰি তাৰেদৰে বন্দী অবস্থায় যেনে এনে অনেক সময় দাস পৰিণত কৰে।

সূত্ৰ শব্দৰ অভিধানিক অৰ্থ দাস। পূৰ্বকালে সূত্ৰসকলক মনে এই ধাৰণাই বহুমান ছিল যে তারা সেবক। সূত্ৰৰাৰ ব-ইছাৰ তারা *Florence Nightangle* এৰ মত সেবাবৰ্গে দীক্ষিত হয়ে অত্যন্ত শ্ৰেষ্ঠবৰ্গৰ ব্যক্তিবৰ্গৰ সেবা কৰত। কলে আশ্রম, কল্লিৰ ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিবৰ্গৰ কাৰে সূত্ৰৰা আপনা আপনি কৃত্ত হয়ে পড়েছিল। আৰ এ সময় উক্ত বৰ্গৰ ব্যক্তিবৰ্গ এতু কৃত্তোৰ নকৰে তাৰে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিল।

দাসত্বৰ পাত্ৰৰ আমৰা দেখতে পাই যে পূৰ্ববৰ্ণনৰ দাস হৰিশ্চন্দ্ৰ আপন কৰ্ত্তব্যবশতঃ স্বয়ং বিক্ৰীত হয়ে এক চণ্ডালৰ দাস হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী শৈব্যা দেবীকেও তিনি এক ব্রাহ্মণৰ কাৰে বিক্রয় করেছিলেন। সূত্ৰৰাৰ এৰ থেকে প্রমাণিত হয় যে সূত্ৰৰ অতীতে অৰ্থাৎ পৌৰাণিক যুগেও ক্ৰীতদাসত্ব প্রথা চালু ছিল। নিয়ে যে দলিলখানি প্রকাশ কৰছি, তা ১১১৫ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখে লেখা। দাসত্ব প্রথাৰ বিস্তৃতিৰ আট একটি উদ্ধৃত প্রমাণ। দলিলখানি এইৰূপ :—

“ইহাদি আন্তৰিক পত্ৰমিহঃ

শ্ৰীকৃষ্ণনাথ ভাৰতবৰ্ষ ওলদে গদাধৰ সিদ্ধান্ত,

সাঁ চাকৰী, পরগণে বাকৰোড়া সূচৰিতে—

নিশান সহি

শ্ৰীকৃষ্ণমালা দাসী

শ্ৰীমতী কৃষ্ণমালা ওমৰ ২১ সাতাইশ বৰিষ, বসন্তায় জওজে রামকৃষ্ণ তৈ, সাকিন—শিল্পালাকাঠি, পরগণে আজীমপুর। অস্ত্ৰ লিখনঃ আগো আজী মহাকঠ পালিত ধোঁৰাক পোঁৰাক আজিজ হইয়া মায়াজী এক আমাৰ কজা শ্ৰীমতী মহামায়া ওমৰ, সাত বৰিষ, বসন্তায়, এহাৰও অন্নবস্ত্ৰ দিয়া পরিশোধন কৰিতে না পাৰি এৰ কেহ আমাৰ ঘৰ অন্নবস্ত্ৰ দিয়া পৰাৰি কৰে এমত না রাহে। অস্ত্ৰ আপন ব্যক্তিৰ কবতে সজ্জায়ে আক্ৰেবহাল তবিয়ে সেইছাপুৰ্ণক আমি ও আমাৰ কজা বহাৰ আপনাৰ স্থানে মনলগ তিন রূপাইয়া পুরো ওজন মহামাসী চলন সহী দত্তবদন্ত পাইয়া আন্তৰিক লইলাম। আপনে জিয়া লওয়া ধোঁৰাক পোঁৰাক দিয়া মূলত ১০ সত্ৰী বৰিষ দাসী অৰ্ধ, কৰ্ণ, দান, বিকীৰিকারী হইয়া কৰাইতে বহ। যদি এই বুদ্ধত বৈৰ্দ্দে আচাৰ হইতে চাহি তবে ১০ সোয়া মণ হলদি সিধা দিয়া আচাৰ হইব। এই কৰায়ে আন্তৰিক লইলাম। ইতি। সন ১১১৫ এগাৰ শত পচানবৈ সাল, তারিখ ১৪ চৈন্দৰী মাহে অগ্রহায়ণ।”

এই দলিলপাঠে আমৰা তৎকালীন দেশৰ অবস্থা, বীতিনীতি, ভাৰা ও লিখনপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক পরিচয় পোৱে থাকি। তা’ ছাড়া সেকালেৰে দাসত্বৰ আৰ্হি অবস্থা ও নানাবিধ বিষয় সবচেয়ে আমাৰ মনে পৰিপূৰ্ণ জ্ঞান কৰে।

এই সূত্ৰ আৰ একটি দলিল প্রকাশ কৰছি। এই দলিলপাঠে জানা যায় যে, কৃষ্ণমালাৰ এক ভাস্কৰ ছিল। তাৰ নাম ছিল দাসৰাম তৈ। কৃষ্ণমালাৰ আন্তৰিকৰ সময় ওৰ ভাস্কৰও জীবি

ছিল এৰ তাৰও এই আন্তৰিকৰে সম্ভতি ছিল। সেই দলিলখানি নীচে প্রকাশ কৰলাম।

“শ্ৰীকৃষ্ণমালা।

শ্ৰীকৃষ্ণনাথ ভাৰতবৰ্ষ, সাকিন চাকৰি, সূচৰিতে—

শ্ৰীৰামদাস দাস, সাকিন বটোৰোড়া, পরগণে বাকৰোড়া

অস্ত্ৰ লিখনঃ আগো—

নিশান সহি—

শ্ৰীৰামদাস দাস।

শ্ৰীমতী কৃষ্ণমালা জওজে রামকৃষ্ণ তৈ সাকিন শিল্পালাকাঠি, পরগণে আজীমপুর এৰ ওচাৰ কজা শ্ৰীমতী মহামায়া,—এই দুইজন সেইছাপুৰ্ণক আপনাৰ স্থানে আগো বিক্ৰী হইল। এহাৰ দুব দুইজনকে আমি আনিয়া দিলাম। এহাৰ ভাস্কৰ শ্ৰীৰামদাস তৈ ইসলী কৰেন। দুই তৰা আমি দিলাম। এহাৰ নাম কওলায় লিখাইয়া দিব। যদি না লিখাইয়া দিতে পাৰি তবে এইজন্তে কিছু খেসারত আপনাৰ হয়ে তাহাৰ নিসা আমি কৰিব। ইতি। সন ১১১৫ তেতিখ ১৪ চৈন্দ অগ্রহায়ণ।”

১৮৩০ খৃষ্টাব্দৰ দশবিধৰ পূৰ্বে দাসত্ব প্রথাৰ প্রচলন আমাৰে দেখে ছিল। ইংৰাজ রাজত্বৰ আমলে দশবিধ আইনেৰে ৩৭৭ ধাৰা অনুসারে এই প্রথা লুপ্ত হয়।

“Whoever imports, exports, removes, buys, sells or disposes of any person as a slave or excepts, receives or detains against his will, any person as a slave, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.”

এই আইনেৰে কৰ্ত্তব্যতাৰ দাসত্ব প্রথাৰ উচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু তা’ হলেও পৃথিবীৰ অপরাধৰ দেশ থেকে ক্ৰীতদাস প্রথা এখনও বিলুপ্ত হয় নি।

হ’ এক বছৰ পূৰ্বে ক্ৰীতদাস নিবারণী সমিতিৰ কাইয়ো অধিবেশনে মধ্যপ্রাচ্যেৰ ক্ৰীতদাস প্রথাৰ বিস্তৃতি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সমিতিৰ কৰ্ত্তব্যকৰণ জানিয়েছেন যে এখনও আৰবেৰ সৈয়দ রাজবংশৰ আৰতাবীনে ৭৫০,০০০ সহস্ৰাধিক ক্ৰীতদাস প্রতিপালিত হচ্ছে। সমিতিৰ বিবরণীতে এ সংবাদও জানা গেছে যে বৰ্ত্তমান ক্ৰীতদাস প্রথাটি বিশেষ ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ। বনবান মজ্জী তীৰ্থযাত্রীয়া যাত্রার পূৰ্বে গৃহে প্রতিপালিত কৃত্তাসেৰ আৰবেৰ ক্ৰীতদাস বিক্ৰয়কে বিক্ৰী কৰে চলে যান। ক্ৰীতদাস ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ সৰ্ব বৃহৎ কেন্দ্র মজ্জীৰ অন্তৰ্গত সুয়েইণ্ডে।

রাজা সৈয়দেৰ পুত্ৰদ্বাৰ প্রদানের বৈশিষ্ট্য ছিল। আমাৰা যেমন আমাৰেৰ কোন বন্ধু-বান্ধব, ব্ৰেহ্মাঙ্গ কোন ব্যক্তি বা কোন উচ্চাঙ্গ পুৰুষকে পুৰুষত্ব কৰতে বন-সম্পদ বা টাকা কড়ি প্রদান কৰি, রাজা সৈয়দ তা কৰতেন না। তিনি একশ কেহে ক্ৰীতদাস উপঢৌকন পাঠাতেন। ক্ৰীতদাস সমিতিৰ সদস্যসকলে অত্যধিক দারিদ্রতা তেজু মধ্যপ্রাচ্যে ক্ৰীতদাস প্রথা বিলম্ব। অনেক কেহে দেখা পেছে যে অল্পত প্রেয়ীৰ লোকেরা জীবন মূখে লাভ হয়ে

জীবনের খাঁড়-প্রাণিখাঁড় ও অমিষ্টরস! হতে যেটাই পাবার ক্ষেত্রও
বেজায় ক্রীতদাস্য গ্রহণ করে। তাবত মতাসাপরী উপকূল
অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে ক্রীতদাস্য গ্রাণা এখনও বিদ্যমান।

ক্রীতদাসের ক্রম-দস্য সময় বিশেষে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। তবে
সাধারণতঃ একটি শিল্প কন্ডার দায় একটি বহিষ্ঠ বোড়া বা কপুঠ
উট অপেক্ষা অনেক কম। অথবা বিংশ শতাব্দীতে ভদ্র অপেক্ষা
হাইব অল্প বুলো বিক্রীত হজ্জে এ সম্বন্ধে ভুবি বিশ্বকরই নয়—
পরিচালেশে বিবয়।

মা ও মৃত্যু

হাল খ্রিস্টীয়ান আওরুশান

মা! বসে আয়েম হেলের দুখের দিকে তাকিয়। হেলের অস্থখ
কয়েক, এখন অস্থখা বড়ো ধায়াপ, দুখ তার জাফাল হার
পেতে, বেন যকটীন, বীবে-বীবে নিবেশ পড়ত। মা হেলের দুখের দিকে
নিশ্চলক তাকিয়ে চুপ করে বসে আয়েম লালো, পুত, নরম বিজানার
পাশে। শীতের দিন, বাইরে শী-শে' ব'য়ে চলেছে উজুরে
হাওয়া, সব পড়তে সেই কখন থেকে, লাল সব বহক, নিরেট
খোতবর্গ ঠান্ডা কেবল।

কে একজন বাইরে দুয়ারের কড়া ধরে নাড়িলে। মা আয়ে-
আয়ে হজ্জা খুলে গিলেম, এক বুড়ো লোক বীবে ঘরে এসে ঢুকলো
মোটা কালো কাপড়ে তার সমস্ত শরীর ঢাকা, উক কালো কাপড়,
শরীরকে বেশ গরম রাখে। বাইরে সব ভূবারে ঢাকা, পাঁজরায়-ভুরি-
চালানো ভনকনে ঠাণ্ডা চাওয়া বইতে বাইরে।

বুড়ো লোকটা ঠাণ্ডার ঠকটিকিয়ে কাঁপলো একটু; চুল্লি-আলানো
ঘরে এসে সে বেন বাইরের শীতলতাকে এখন হুহুর্থে ঝেড়ে
ফেলতে পারছে না। অল্প একটুকুরে ভক্ত শান্ত হলো শিল্পটির
জগদা-বাক্যনো শরীর, আর মা উঠলে একটা বাটিতে খানিকটে
বিহার গরম করতে গিলেম বুড়ো লোকটার জন্ত। আয়ে-আয়ে
বসলো বুড়োটি, হুহুভাবে লোলা দিতে লাগলো শিশুর সোলনা ধরে।
মা বললেন বুড়োর একপাশে এক পুরোনো চেয়ারে, পীড়িত শিশুর
নরম হাত ধরে বুড়োর দিকে তাকিয়ে বইলেন।

আমার ছেলে বাঁচবে তো? কী মনে হয় তোমার? একটু
পরে আয়ে, কিপকিশিয়ে জিগোস করলেন মা, আমার সোনাকে ঈধর
কখনো আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না।

কিন্তু বুড়ো লোকটা স্বস্তম্ব ভাবে বাড় নাড়িলে, সে বাড় নাড়ার
মানে 'হ্যাঁ-ও হতে পাখে, না-ও হতে পাখে : বুড়ো আসলে হজ্জ
হুত্ব। তার দিকে চেয়ে থাকতে পারলেন না মা, আপনা থেকেই
নত হয়ে এলো তাঁর চোখ, তাঁর হৃ-চাখ দিয়ে গাল বেয়ে অক্ষর
পড়লো। মাথার ভেতরটা তারি হ'রে উঠলো ক্রমশ, তিন দিন তিন
রাত অবিশ্রাম তিনি শিশুর পাশে জেগে ব'সে, একবারো চোখ
বোজেন নি, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন একটু, কয়েক হুহুর্তর জন্ত বুকে
এলো তাঁর হৃ-চাখ। তারপর হঠাৎ তিনি চমকে জেগে উঠলেন
ঠাণ্ডার কৈশে।

ৎকি! একি হলো? বুতের মতো অস্থক গলায় জিগোস
করলেন মা, চারদিকে তাকালেন হতাশ ভাবে। সেই বুড়ো লোকটা
চলে গেছে, আর তাঁর ছোটো শিশুও নেই, বুড়ো তাকে নিয়ে

গেছে তার সঙ্গে। ঘরের কাছে এক পুরোনো খড়ি টিকটিয়ে
বাজছিলো একজন, হঠাৎ এবার সমস্ত ঘর জুড়ে কি তার নেমে এসে,
খড়িটা খেমে গেলো।

মা আর একহুহুর্থেও ঘরে থাকলেন না, কাঁধে-কাঁধে ঘর ছেড়ে
ছুটে বেরিয়ে এলেন পাখে।

বাইরে পথ-বাট কঠিন বরকে ঢাকা; ভূবারের উপর এক মারী
ব'সে, কালো লম্বা তার কেশ; সে বললে, হুত্ব তোমার ঘরে এসেছিলে
আমি দেখলুম, সে তোমার ছেলেকে নিয়ে ছুটে চলে গেলো; বড়ো
জন্ত তার গতি, বাতাসের চেয়েও তাতাত্তি হার সে, আর সে যা
নিয়ে হার তা আর কখনো ফিরিয়ে আনে না।

মা বললেন, আমার কেবল বলে হাও কোন দিকে সে গেলো।
কোন পাখে সে গেলো-বলো আমাকে, আমি তাকে খুঁজে বেঁ
করবো।

কালো কাপড়পরা সেই মারী বললে, আমি জানি তার পথ;
কিন্তু সেই পথের ঠিকানা তোমাকে দিতে পারি কেবল এক সপ্তে,
তা বলবার আগে আমাকে তোমার গান গেয়ে শোনাতে হবে,
তুমি তোমার শিশুকে যে-সব গান গেয়ে শুনিবেছো। আমি গান
ভালোবাসি, সেই গানগুলি আমাকে শোনানো; তোমার-গাওয়া গান
এর আগে আমি শুনকি, কেননা আমি হজ্জি ব্যক্তি; আমি দেখছি
তোমার হুচোখে ভল বরোবরো করছে, এখন তুমি তোমার ছেলেকে
গান গেয়ে শোনাচ্ছিলে।

শোনানো তোমাকে আমি গান শোনাবো, সব গান তোমার
গেয়ে শোনানো—অবীর গলায় মা বললেন, কিন্তু এখন আমার
দেবি ক'রে গিয়া না, হুত্বকে যে এগিয়ে গিয়ে ছুটে ধরতে হবে,
আমার শিশুকে চাই।

ব্যক্তি কিন্তু স্বত্ব, কোনো কথা বললো না, বোবার মতো বসে
রইলো। মা তখন বাথার হাত হুচড়ে কাঁপলেন আর গাইলেন
আর কাঁপলেন—অনেক গান, তার চেয়ে বেশি চোখের ভল। তখন
ব্যক্তি বললে, তান দিক ঘরে বেরো, ঐ অক্ষর পাইন বনে, হুত্ব
ঐ পাখে তোমার শিশুকে নিয়ে চলে গেলো, দেখলুম।

গভীর বনেক ভিতর এক চৌমাথা; মা বুঝতে পারলেন না,
কোন পাখে তিনি বাবেন। পাখের পাশে এক কালো কাঁটার
ঝোপ, শীতে তার সব পাঁতা করে পড়েছে, শুকনো জলে ভূবার
জমে খুলছে।

মা তাকে জিগোস করলেন, তুমি কি দেখেছো, হুত্ব কোনদিকে
আমার শিশুকে নিয়ে গেলো?

হ্যাঁ, আমি দেখছি, ঝোপটি উত্তর দিলে, কিন্তু বতকণ না তুমি
আমার তোমার বুকের তাপ দিয়ে আমাকে উক করছো, ততকণ
কিছুতেই তোমাকে বলবো না সেই পথের ঠিকানা; আমি ঠাণ্ডার
জমে মরে গেলুম, বৃষ্টি বরক হয়ে জমে বাবো একবারে।

মা সেই কালোকাঁটার ঝোপকে তাঁর বুকে ভড়িয়ে ধরলেন,
নিবিড় ভাবে জড়ালেন, বেন সে ঝোপ বেশ গরম হয়ে ওঠে, তাঁর
দেহের মাংসে কাঁটা সব ফুটে গেলো, বড়ো বড়ো কাঁটার তক্ত হয়ে
পড়তে লাগলো। কিন্তু হাযের উক, তপ্ত, কোয়ল বুকের স্পর্শে
কালোকাঁটা পাছের মাথার মাথায় নড়ন পাতা, সবত পাতা গভিরে
উঠলো। ঠাণ্ডা, ভনকনে, অক্ষরায় শীতের রাতের কাঁটা গান

জন্মে উঠলো ! সন্ধান হাবিরে মায়ের বুক এয়নি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কলোনিটার বোশ তখন বলে দিলে কোন পথে থাকে যেতে হবে মৃত্যুর সন্ধান।

যেতে যেতে যা এক বিশাল বড়ো ফুলের সামনে এসে পৌঁছলেন ; ফুলে কোনো জাভাজ নেই, নোঁকো নেই, পেরোবার কিছু নেই। ঠাঁওয়ার কঠিন হয়ে জমেও বারনি ফুটটা, যে তিনি পায়ে হেঁটে পার হয়ে যেতে পারবেন। আবার সাঁতরে পেরোবার উপায়ও নেই। তখন তিনি ভীয়ে চলে বসে ফুলের জল খেতে শুরু করলেন ; অবশেষে একটা ফুলের জল লক্ষ চুষকেও শেষ করা একতরনের পক্ষে অসম্ভব, এক সে কথা ভাবাও পাগলাম্যে ; কিন্তু পোকে আকুল হয়ে যা ভাবছিলেন, হয়তো দেবতার অমূল্যায় কোনো আলৌকিক ঘটনা ঘটে যাবে।

ভাখো, তুমি আমার জল খেয়ে শেষ করতে পারবে না কখনো, বললে তাঁকে হুদ, তার চেয়ে শোনো। মুক্কা জোগাড় করে জমিরে রাখলে বড়ো ভালোবাসি আমি, আর তোমার চোখের মতো এমন বহু চোখ আমি আর দেখিনি। তুমি যদি কঁদে কঁদে তোমার চোখগুটিকে খসিয়ে আমাকে দিয়ে বাও, তাহলে আমি তোমাকে এই হুদ পার করে মৃত্যুর সব্ব্ব দেশে নিয়ে যাবো, সেখানে বিপুল বড়ো এক বাগানে মৃত্যু বাস করে, সেখানে সে গাছ লাগায়, ফুলের চাষ করে, প্রতিটি ফুল, প্রতিটি গাছ হচ্ছে এক একটি মানুষের জীবন।

ফিসফিসিরে মা বললেন, আমার ছেলেকে হিরে পারবার জন্ত আমি সব দিতে পারি। হুদের ভীয়ে একলা বসে যা কীংকটে লাগলেন ; কীংকটে কীংকটে তাঁর চোখ দুটি হুদের গভীর জলে ঝপে পড়ে গেলো। পড়েই তারা দুটি সুন্দর মুক্তার আকার নিয়ে নিলে। তখন হুদ তাঁকে এপার থেকে তুলে নিয়ে অজপারে পৌঁছে দিলে, সে-পারে বিশাল বড়ো এক অপরূপ বাড়ি, মাইলের পর মাইল লম্বা, সেটা কি গহ্বর, না অরণ্যময় পাঠাড়া, না তৈরি বাড়ি তা বোঝবার ক্ষে নেই। আর সন্ধান হারানোর শোকে অন্ধ যা তো কিছুই দেখতে পেলেন না, কঁদে কঁদে তাঁর চোখ ঝপে পড়ে গেছে।

খনখনে গলার তিনি কেবল শুধোলেন, যে মৃত্যু আমার ছেলেকে নিয়ে চলে গেলো, তাকে আমি কোথায় পাবো ?

ধরখুরে এক বৃদ্ধি বললে, মৃত্যু তো এখানে এখানে এসে পৌঁছোয়নি, তুমি কী করে এলে ? কে তোমার সাহায্য করলো ?

এই বৃদ্ধি মৃত্যুর বাগানে পাহারা দেয়, তার সব চুল গেছে শালি হ'য়ে গেছে।

দেবতা আমাকে সাহায্য করেছেন, হাড, কোমল গলার মা উত্তর দিলেন, দেবতার কল্পনার তো শেষ নেই। তুমিও আমার কল্পনা করবে আমাকে ; কোনখানে—কোনখানে আমি আমার শিক্তকে পাবো ?

বৃদ্ধি উত্তর দিলে, আমি তো ভা ভানিনে। আমি তো বলতে পারিগে না, কোনখানে তুমি তোমার ছেলেকে পাবে। আর তুমি তো চোখে দেখতে পাছোনা। আজ রাতে অনেক গাছ অনেক ফুল জ্বজ্বিয়ে ঝ'বে পড়েছে ; মৃত্যু এসে ঈগণির তাদের আবার নতুন জন্মদায় পুঁতবে। তুমি তো জানো, প্রত্যেক মানুষের একটি করে জীবনের গাছ বা জীবনের ফুল আছে, সেই গাছ বা ফুলেই জীবন জন্মে থাকে। আর সব গাছপালার মতোই তারা

দেখতে, কেবল তাকাতের মধ্যে এই যে, মানুষের জীবনের গাছগুলির জ্বপিত আছে, তা স্পষ্টিত হয়। হ্যাঁ, ছোটো ছেলেমেয়েদের গাছগুলির বৃদ্ধি বৃদ্ধি করে বাড়ে। হয় তো তুমি তোমার ছেলের জ্বপিতের বৃদ্ধিকানি আঙুলে ভুলে যুহতে পারবে। হ্যাঁ, তার আগে বলো আমাকে তুমি কী দেবে। তবে তো তোমাকে খুলে বলবো সব কথা।

আমার তো আর কিছু দেবার নেই। ছিলো সাতবাজার ঘর এক ঘনি, তাকেও তো মৃত্যু নিয়ে এসেছে। তোমার জন্ত আমি যেখানে বসে যেতে পারি।

মৃদ্ধি বললে, মা তোমাকে কোন্‌দোখানে যেতে হবে মা, কিন্তু তুমি তো তোমার ঐ লম্বা কালো চুল আমাকে দিতে পারো। তোমার চুল কী সুন্দর। আমার ভারি ভালো লাগছে দেখতে। তুমি আমার শালি চুল নিয়ে তোমার ঐ লম্বা কালো চুল আমাকে দাও।

এই তুমি চাছো ? আমার চুল 'কুপি' তোমার দিয়ে দিছি। এই ব'লে মা তাঁর সুন্দর কালো চুল বৃত্তিকে দিয়ে দিলেন, তার বরলে পেলেন তার শালি চুল, বরোফের মতো শালি।

তখন বৃদ্ধি তাঁকে নিয়ে গিয়ে ঢুকলো মৃত্যুর বিশাল-বড়ো বাগানে। সেখানে কতো রকমের গাছ, কতো রকমের ফুল—বটগাছ, নারিকেল গাছ, দেবদারু, সরল গাছ, বৃকালিপোলের রূপোলি শবীর, চন্দ্রমল্লিকা, হাসমুহানা, বৃহদ্রথী—কতো সব আশ্চর্য গাছপালা। প্রতি গাছের, প্রতিটি ফুলের নাম আছে : পৃথিবীতে বতো মানুষ রয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্ত একটি করে গাছ, কেউ রয়েছে চীনদেশে, কেউ-বা গ্রীনল্যান্ডে, কেউ দিনেমার দেশে রয়েছে, কেউ ইংল্যান্ডে—প্রত্যেকের প্রাণ তার নিজের-নিজের গাছে।

সন্ধান হারাবার শোকে অসীম হ'য়ে মা ভাভার-হাভার গাছের মধ্যে নিজের গাছটি খুঁজতে লাগলেন ; প্রত্যেকটি গাছের জ্বপিতের বৃদ্ধিকানি শুনে সেই অন্তর্নিহিত গাছের মধ্যে থেকে নিজের ছেলের গাছটি চিনে বের করলেন। একটি ছোটো কুহুম ফুলের উপর ঘুরে প'ড়ে তিনি বললেন, এট-বে এট-বে আমার ছেলের বৃকের বৃদ্ধিকানি। বোগজীর্ণ বিবর্ণ ফুলটির উপর ঝুঁকে প'ড়ে তিনি তাকে ধরতে হাছিলেন, এমন সময়ে বৃদ্ধি তাঁকে বাধা দিলে।

হুঁয়ো না, স্পর্শ ক'তো না ঐ-ফুল। বাধা দিয়ে বললে বৃদ্ধি, তুমি এইখানে ঠাঁড়িয়ে থাকো, তারপর মৃত্যু যখন আসবে—সে এই এলো ব'লে, আসবার সময় চলেছে তাব—মৃত্যু এসে ঐ ফুলের গাছ ছিঁড়ে উপড়ে ফেলতে চাইবে, তুমি তখন তাকে বাধা দিয়ো। তুমি বোলো, মৃত্যু যদি তোমার ছেলের ফুলের গাছ উপড়ে ফেলে তাহ'লে তুমিও আর সব গাছ টেনে তুলে লুণ্ঠিত করবে, তাহ'লে সে তুমি পেয়ে যাবে। তাকে যে প্রত্যেকটি গাছের জিসব দিতে হয় ; দেবতার আদেশ না পেলে সে একটি গাছও উপড়ে ফেলতে পারে না।

আচমকা এক দমকা তুহিন হাওয়া এলো ; অন্ধ যা অজ্ঞত্ব করলেন, মৃত্যু আসছে।

মৃত্যু শুধালে, তুমি এখানে কী করে এলে ? আমার চেরেও তাড়াভাড়া কী করে এখানে এসেতে পারলে ?

নেতিয়ে হাওয়া গলার মা উত্তর দিলেন, আমি-যে মা। তারপর মৃত্যু সেই ছোটো সুন্দর ফুলটির দিকে তার লম্বা হাত

বাড়িতেই যা তার হাত জোরে চোপ ধরলেন প্রাণপণ শক্তিতে; তাঁর বুক ভরে ফুলতুলে, এই বুঝি মৃত্যুর স্পর্শ কোনো পাতার গিরে লাগে, এই বুকে মৃত্যুর নিখেন গিরে পড়ে ফুলের লাবণ্য। মৃত্যু তাঁর হাতের নিখেন ফেললে, সে নিখেনের স্পর্শ তুহিন হাওয়ার চেয়েও ঠাণ্ডা; মায়ের হাত অবশ, শক্তিশীন হয়ে গেলো।

মৃত্যু বললে, তুমি আমার ইচ্ছে বিরুদ্ধে কিছু করতে পরবে না।

কিছু দেবতা? দেবতার দয়া তো পারবে।

হ্যাঁ, দেবতা বা বলেন, আমি তাই করি, আমি তাঁর হুকুম তামিল করি কেবল। আমি তাঁর বাগানের মালি; আমার কাজ হচ্ছে তাঁর হুকুম অনুযায়ী তাঁর এই সব গাছ ফুল এখান থেকে তুলে দিয়ে বর্ষের বিরাট বড়ো বাগানে নতুন করে রোপণ করা। সে অজানা দেশ। সেখানে সব গাছ ফুল কেমন বাড়বে, তা আমি জানিনে, সে কথা কিছু বলতেও পারিনে।

হা বললেন, আমার ছেলেকে তুমি কিরিয়ে দাও। কান্নার আবেগে তাঁর সমস্ত শরীর খবখবিয়ে কাঁপতে লাগলো। তারপর হঠাৎ তিনি ছটি স্কন্ধর ফুল তাঁর হাতে ধরে মৃত্যুকে বললেন, তোমার সব ফুল আমি ছিঁড়ে ফেলে দেবো, জাখো, আমার শিশুর শোকে দ্বন্দ্ব ভেঙে গেলো।

মৃত্যু বলে উঠলো, স্পর্শ কোরো না, ওদের স্পর্শ কোরো না।

তুমি বলছো, তুমি ভয়ানক অসুখী, আর তবু তুমি পৃথিবীর অস্ত্র আরেক মাকে অসুখী করতে চাও?

আরেকজন মাকে? হা অবাক হয়ে ফুলগুলি থেকে হাত গিরিয়ে নিলেন।

এই নাও তোমার চোখ,—মায়ের হাতে তাঁর চোখ ছটি তুলে নিলে মৃত্যু, হৃদের জল থেকে আমি চোখ ছটি তুলে আনলুম; কী স্বকরক করছিলো। এ যে তোমার চোখ তা ভাবিনি। তোমার চোখ নিয়ে পায়—আঙ্গুর চেরে চোখ ছটি আরো নির্মল, আরো উজ্জ্বল হয়েছে, তারপর ঐ গভীর ক্রোধের মধ্যে ভালো করে তাকিয়ে জাখো। তুমি যে ফুল ছটি তুলতে চাইছিলে তাদের নাম তোমার বলছি। তুমি দেখতে পাও তুমি ফুল ছিঁড়ে কী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে বাচ্ছিলে।

গভীর ক্রোধের ভিতর হা তাকিয়ে দেখলেন। তিনি দেখতে পেলেন একটি মাছের জীবনের দৃশ্য। তার প্রাণ আনন্দে ভরা, সে পৃথিবীর কল্যাণ করছে, বেশিকে সে বাচ্ছে সেমিকেই সে ছড়চ্ছে আনন্দ আর সুখ। দেখে মায়ের মন সুখে ভরে গেলো। তারপর আরেকজনকে দেখলেন, তার জীবন দ্বন্দ্বের ভরা। দারিদ্র্য, ব্যর্থতা, বেদনা।

মৃত্যু বললে, হুটই দেবতার ইচ্ছে।

হা ভিজেন করলেন, কোন ফুলটি হুখী জীবনের আর কোন ফুলটি আনন্দের রক্ত ছোপানো?

তা আমি তোমাকে বলতে পারবো না, বললে মৃত্যু তাঁকে, তবে তোমার এইটুকু বলছি, ওর মধ্যে একটি ফুল তোমার শিশুর—একটি ছবি হচ্ছে, তোমার শিশু যদি না হয়ে পৃথিবীতে বাঁচে, তার জীবন্য জীবনের ভাগ্যকলের ছবি—

শিশুরে হা ভরে চেঁচিয়ে উঠলেন। কোন জীবন আমার ছেলের, বলো, আমার বলো। না, ঐ নিষ্পাপ শিশুকে তুমি হুজি দাও, সব দ্বন্দ্ব বসুধা ব্যর্থতা থেকে তাকে রেহাই দাও। তাকে নিয়ে বাও তুমি দেবতার বাগানে। আমার সব অশ্রু তুলে নাও, আমার সব প্রার্থনা; তুমি তাকে নিয়ে বাও।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে, মৃত্যু বললে, তুমি কি তোমার শিশুকে কিরিয়ে চাও না? নিয়ে বাবো তাকে অজানা রাজ্যে।

বেদনার একবার কঁপে হা তাঁর হুহাত মুড়ে নতজান্ন হয়ে বলেন, তারপর তিনি প্রার্থনা করলেন দেবতার দয়া। ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছে বিরুদ্ধে আমি যা চাই আমি বা প্রার্থনা করি সে প্রার্থনা তুমি শুনোনা; তোমারই ইচ্ছে হচ্ছে সকল কল্যাণের উৎস। আমার ইচ্ছে আমার বাসনার প্রার্থনা তুমি শুনো না, কখনো শুনো না।

তাঁর মাথা বুক নত হয়ে পড়লো। তাঁর শিশুকে নিয়ে মৃত্যু চলে গেলো অজানা দেশে।

অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিস্ট্রী ডাকে	—	২৪
বাৎসরিক "	—	১২
প্রতি সংখ্যা "	—	২

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	—	১৫
" বাৎসরিক সডাক	—	৭.৫০

ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১.২৫

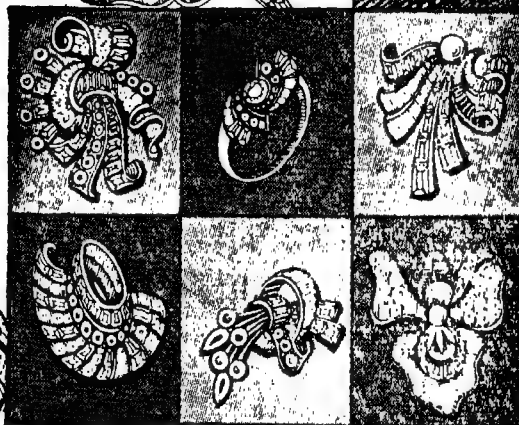
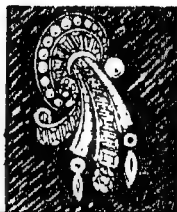
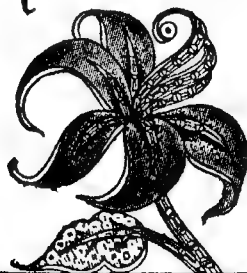
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিস্ট্রী ডাকে	—	১.৭৫
পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)		

বার্ষিক সডাক রেজিস্ট্রী খরচ সহ	—	২১
বাৎসরিক " " "	—	১০.৫০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	—	১.৭৫

মাসিক বসুমতা কিছুন ● মাসিক বসুমতা পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বসুন ●



জৈদ্যো মাদ্রিং



গিনি লাল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

এম.বি.সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ট্রাষ্ট কলিকতা-১২ গ্রাম-পিলিগ্রামে
ড্রাক-হালি গণ্ড-২০০/মি মাসবিহারী এড্ভিউ কলিকতা-২২ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
স্বাক্ষর পুরাতন টিওলা ১২৪, ১২৪/১, বহুবাজার ট্রাষ্ট, কলিকতা-১২
কেন্দ্রীয় হবিবার খোলা থাকে
ড্রাক-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- ৯ সিটি-২৪৪৮৭

B.B.

বিলম্বের সন্ধানে

| পূর্ব-প্রকাশিতের পর |

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭ সালের শেষের কয়েকটা মাস অনেকগুলো বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল, বিশেষত আমার পক্ষে বড়। ভেলখানা বা গ্রামের কতকটা নিবালা পবিত্রেশ্বর মাধা থেকে বাইরেরকার বিচিত্র ভড়-হাল্লামার মধ্যে এসে পড়লে যা স্বাভাবিক,—খুঁটিনাটি সব কথাও মনে নেই, আশ ঘটনাগুলোর সময়ের পারস্পরিক সব সময়ে মনে থাকে না। তাই কয়েকটা বড় ঘটনার কথাই কতকটা বিচ্ছিন্ন ভাবে বললো।

আমি যেদিন কলকাতায় আসি, সেই দিনই মেঘর বতীক্ষ্মোচন সেনগুপ্ত স্বাক্ষর পাটির ক্ষতপূর্ব সেক্রেটারী সত্তা মুক্ত রাজবন্দী সত্যেন্দ্র মিত্রকে কর্পোরেশনে At Home গেলেন। আমি ৭১ নং মির্জাপুর স্ট্রীটের কংগ্রেসকর্মী সংঘের বাড়ীতে প্রথমে উঠে লট-বহর রেখেই চললুম “Forward” অফিসে উপেনদার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি ২৬ সালে মুক্ত হয়ে “করোয়ার্ডে” বোগ দিয়েছিলেন—তখন ম্যানোজি ভিবেটের মরণ বয়স।

সেখানে মনোমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গেও দেখা হল। তিনিও কিছু দিন আগে মুক্ত হয়েছিলেন। আমাকে দেখে দ্রুতনে কিছু আশ্চর্যিত করেই কানে কানে পরামর্শ করে ফোনে মেঘরের সঙ্গে কথা করে আমাকে নিয়ে চললেন কর্পোরেশনের At Home সভায়। সেখানে বাগদার পর বর্ষাশান্ত বক্তৃতাদায় হল, এবং সত্যেনদার সঙ্গে আমাকেও সভার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে মেঘর দুজনার গলার দুহুড়া বড় বড় মোটা বেলকুলের “গোড়” মালা পরিয়ে দিয়ে স্বর্ধনা করলেন। আমি সত্যেনদার প্রকাণ্ড ভুড়িতে হাত বুলালে অভিনন্দন করলুম—তিনি সলজ্জ হাস্য মুখে আমার বাহু দুটোতে একটু অঙটপুনী দিলেন।

কিছু সারা কলকাতার বড় বড় লোক, কাউন্সিলার প্রভৃতিও সভায় হঠাৎ প্রোমোশন পেয়ে একটু হুচকিরে গিয়েছিলুম। ব্যাবিষ্টার নুরেন হালদার (বাসন্তী দেবীর ভাতা) সেটা কাটিয়ে গিলেন, “হালো” বলে মোক্ষম রকমের হাত-খাকানি (সেক্‌হাণ্ড) দিয়ে। তাঁর সঙ্গে আলোপ বিশেষ ছিল না,—তিনি নেতা, আমি কর্মী—বি, পি, সি, সির মিটিয়ে দেখা সাক্ষাৎ হ’ত। মনে হল, তিনি তাঁর বন্ধু বাবুদেবের বুঝিয়ে গিলেন,—এই দেখে একজন বিদ্রোহী নেতা—তোমরা হয়ত চেননা, কিন্তু আমার সঙ্গে খাতির আছে। তিনি বললেন, আমাদের বাড়ী একদিন বেণু। আমি বিদ্রীত ভাবে হাসিমুখে বললুম, হাবো। পরে আরো অনেকবার

দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, এবং তিনি বললেন, কৈ আমাদের বাড়ী এসে না? আমি বরাবরই বলেছি বাসো, কিন্তু বাগদা কোনদিন ঘটে ওঠেনি।

প্রোক্সের নিম্ন সংস্কারের স্ত্রী, জার্মাণ মহিলা, এসে আলোপ করলেন, এবং চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানে অবশ্য না গিয়ে পারিনি।

প্রভাস তখন কর্মীগণের mess manager করতে করতে mismanage করে উধাও হয়েছেন, তার কোন পাত্তা নেই। উপরন্তু তার আর একটা বরনামও বটে গেছে, সে নাকি আই বির কাছে থবর দিত। মনটা ধারাপ হয়ে গেল। বরনাম বিবাস করতে পাবলুম না। অথচ হঠাৎ অদ্ভুত হওয়া তো ভাল কথা নয়!

বরনামের বাড়ীতে তখনই গেলুম না, কারণ ভাগীর অবস্থা খুব ধারাপ হয়ে পড়ায় জামাই তাকে নিয়ে পুথী চলে গিয়েছিল জানকুম, কিন্তু তারপর তাদের খবর বা চিঠিপত্র পাটনি।

দেবার মামলার তথির করতো প্রভাস, উকীলের নামটা শুনেছিলুম—বোধহয় সুবীন্দ্র মুখার্জি, পদ্মপুত্রে থাকেন, টিকানা জানি না। খুঁজে যেতে ২৪ দিন দেবী হল। তিনি জুখ করতে লাগলেন, ২১ দিন আগেই তারিখ ছিল, প্রভাসও কিছুদিন বায়নি, আমার হুজির খবরটা স্বর্ধনার পরের দিন করোয়ার্ডে খটা করে ছাপা হয়েছিল, আমার পবিত্র ছিল প্রায় এক কলম জুড়ে। মহাজনের উকীল বাগ মানেনি, জজ এক পাটি ডিগ্রী দিয়ে দিয়েছেন। ল্যাঠা চুকে গেল ভেবে স্বস্তিবোধ করলুম।

পরে অমরনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি ডিগ্রীর কথা শুনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে মহাজনের বাড়ী গেলেন (কাশীপুরের বামন দাস মুখোপাধ্যায়ের কুড়পুত্র)। তিনি কুশল প্রদর্শন মিজ্ঞাসা করার পর অমরনা আমার কথা কুলে প্রস্তাব করলেন, ওভাবে বাড়ীটা নিয়ে নেওয়ারটা তো ভাল দেখায় না, ওকে আর কিছু টাকা দিন, বাতে ও কিছু হোজগার করে খেতে পারবে, ও বাড়ী বিক্রীর দলিল লিখে দিক। মহাজন বললেন, এসব বিষয়ে আমি কিছুই করি না, ম্যানোজারই যা ভাল বোকে, করে। ম্যানোজার অবশ্য প্রেক্ষা থাকিয়েই গিলেন।

সারাদা দিল্লীতে বড়লদার কাছে চলে গিয়েছিল, আমার হুজির খবর পেয়েই চলে এল। দোদর পেয়ে ভরসা হল, কারণ সে আমার সঙ্গে আহায়ম পবিত্র যেতেও রাজি। চিন্তামণি দাসের লেনে একখানা ছোট ঘর ভাড়া করলুম ১২টাকা ভাড়ায়। কলকাতা স্ট্রীটে বর এক

সলের ঠোঁট মেঝামেঝের দোকান অনেক কালের—তাদেরই বাড়ীর বাইরের একখানা ছোট ঘর।

কিছু অর্থের সংস্থান হয়েছিল ঘটনা চক্রে, এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে। কামারখন্দে থাকার সময় চাকরের অসুবিধাটা হয়েছিল শাপে-বর। প্রতি মাসেই করেকটা করে টাকা বাচতো। জামাইভল গ্রামের এক বড় জোতদার বাধাগোবিন্দ সাহার ভাতুশূত্র অখিল সাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, টাকা ক'টা তাঁর কাছে জমা রাখতুম। মুক্তির পর তাঁদের শোভাবাজারের পাটের আড়তে এসে তিনি আমাকে জমানো টাকাটা দিয়ে রান। সেই আমার প্রাথমিক সংস্থান। উদ্বলোক শিক্ষিত, সং, চমৎকার লোক।

কিছুদিন চিন্তামণি দাসের সেনে থেকে অসুবিধা হ'তে কলকাতা রে'তে এক "ব্রাহ্মণ মেগ" নামক বোড়িরে এক ঘর নিলুম,—এক গুলিসত্তো কিনে দুজনে পৈতে বানিয়ে পরলুম! পৈতে না দেখালে সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু এখনই কিছু বেজগারের ব্যবস্থা না করলে চলে না। ক'টা মাত্র টাকা, কয়েক দিনেই কুরিয়ে গেল। নিলামে বাতায়াত শ্রমক করে দিয়েছিলুম, এবং বন্ধ বান্দবদের কাছে ঘুরে তাদের কাছ থেকে এক আধটা জিনিসের জরুরি সংগ্রহ করে, কিনে দিয়ে ২৫ টাকা পেতুম। তাতেই খরচ চলতো কারয়েশে।

ঘর সন্সারের ২৪টে অপরিহার্য জিনিসের সন্ধানে বরানগরের বাড়ীতে গেলুম। বাড়ীর সামনে এক স্বর্ণকারের কাছে জামাই বাড়ীর চাবি দিয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে খবর শেলুম ভারী মাথা গেছে। আর এক লাঠাও চুকতো।

'২১ সালে বখন ডেকোরেশনের ব্যবসা তুলে দিয়েছিলুম, তখন প্রোসেনশানের লাইট তৈরী চলছিল। লড়াইয়ের পরের চড়া দামে বহু লোহার পাটপ কিনেছিলুম, এবং সেগুলো বাণ্ডিল বাঁধা অবস্থায় বাড়ীতে পড়েছিল। দেখলুম, মরচে ঘরে এক একটা খাবা হয়ে গেছে। সেগুলো নিয়ে ঝগড়া বাড়ানোর চেয়ে ভুলে বাঙরাই ভাল মনে করলুম।

বাড়ী থেকে সংগ্রহ করলুম একখানা বড় তক্তপোষ, একটা বেঞ্চ, একটা আলনা, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা অ্যাসিটিলিন গ্যাসের দেওয়ালগিরি আলো,—আর ছাদে ওঠার একটা কাঠের সিঁড়ি আর ১২ ফুট লম্বা একখানা সাইনবোর্ড (দোকানের)। জামাই বা নিয়ে যেতে পারেনি তাই পড়েছিল। আমি ঐ জিনিসগুলো নেওয়ার পর আর বা কিছু পড়ে থাকলো, সেগুলো স্বর্ণকার মলাটকে দিলুম। বললুম, যদি পারেন, আমাকে করেকটা টাকা দিয়ে দেবেন। তিনি সন্ত সন্ত পনেরোটা টাকা দিয়ে বললেন, পরে আর বা পারি দেখ। আমি তার পরে আর হাইনি। অর্থাৎ আমার বাকি অস্থায়ী সম্পত্তি থেকে শেলুম পনেরো টাকা।

পূর্ব দাশের এক লেকটরাষ্ট কালীপ্রসাদ ব্যাখ্যাতিকে সাইনবোর্ডখানা বেচে কিছু শেলুম। তিনিও তখন অন্তরীণ থেকে ফুট হয়ে এসে কালীঘাট ট্রাম ডিপোর পাশে এক motor engineering works খুলেছেন—মেঝামতী কাজের দোকান। সিঁড়িটা বেচেও কিছু শেলুম।

আমার বি, পি, সি, সি-র আগেকার মেঝারশিপ তখনো আছে। ২৪ গুরুত্বপূর্ণ কাজের কমিটির অফিসের কর্মীরা আমার সখ্যর্নায় এক

আয়োজন করলেন। বখাশাপ বক্তৃতা ও মাল্যদান হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব বাহ্যামতী ডাক্তার অমলাধন মুখার্জিও সে সভায় ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের ঘরের লোক।

তখন বি, পি, সি, সি-র Acting-President ছিলেন অখিল দত্ত। কেন, তা মনে নেই। সম্ভবত সেনগুপ্ত বয়েতে মমতাজ বেগমের মামলায় বেগমের সমর্থনে মামলা করতে গিয়েছিলেন।

মমতাজ এক বিখ্যাত সুরক্ষারী—ইন্সপেক্টরের মহারাজার রক্ষিতাংশে প্রোসাদে প্রায় বন্ধিনীর অবস্থার ছিলেন, এবং একজন লোকের সহায়তায় তার সঙ্গে বয়েতে পালিয়ে এসেছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই সে লোকটা এক গুপ্ত আততায়ীর হাতে খুন হয়, এবং মমতাজকে আবার অপহরণের চেষ্টা বার্থ হয়। মমতাজের পক্ষে এবং খুনের বড়বয়স মহারাজাকে জড়িত করে যে মামলা হয়, বোধ হয় ২৫ সালের গোড়ায়—সে মামলা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনবর হাতে দেওয়ার জন্ত কলকাতায় লোক আসে, এবং তিনি নিজে না নিয়ে সে মামলার সেনগুপ্তকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেন।

তখন স্ত্রীভাব বাবু ভাগ্যলী বা বাগীকেতে স্বাস্থ্য-নিবাসে আছেন। রোজ বিকালে টেম্পোরচারি বাড়ি, বোগা হয়ে গেছেন—suspected T. B.—তাকে মুক্ত করার চেষ্টা চলছে। এক বেসরকারী মেডিক্যাল বোর্ড তাঁকে পরীক্ষা করে টি বি সন্দেশই প্রকাশ করলেন। বোধ হয় তার মধ্যে ডক্টর বিধান রায়ও ছিলেন। সরকার এত দিন মানছিল না, এবার এক সরকারী মেডিক্যাল বোর্ড দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে suspected T. B. বলেই মুক্তি দিলেন।

তাঁর মুক্তির কয়েক দিন আগে বি, পি, সি, সি-র সভায় শ্রীঅমরকুমার ঘোষের এক প্রস্তাব গৃহীত হল,—বাতে স্ত্রীভাব বাবুকে বি, পি, সি, সি-র প্রেসিডেন্ট করা হল। স্ত্রীভাব বাবু এলেন। সর্বত্র তাঁর সখ্যর্নায় হল। বীরে বীরে তাঁর স্বাস্থ্যও ভাল হয়ে উঠলো।

'২৭ সালের শেষেই বোধ হয়, বিলাত থেকে পাশী এম, পি, বিলাতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সাপুরুজী সাকলাতওয়ালার ভারতে এবং কলকাতায় এসে আলবাট হলে এক বক্তৃতায় যুবকদের পরামর্শ দিলেন, তেঝারা সর্বত্র Young Communist League সংগঠন কর। তখনও কমিউনিষ্ট পার্টি নামের কোন প্রকাশিত সংগঠন ছিল না—কমিউনিষ্ট কর্মীরা workers party, peasants party প্রভৃতি ধরণের নামের আড়ালে থেকে কাজ করে। বক্তৃত কমিউনিজম কথাটাই তখনও চালু হয়নি, তার বদলে চলতো বলশেভিকম কথাটা, কারণ আমাদের দেশের রহস্যবের একচেটিয়া স্ববাসনগপতে কমিউনিষ্টদের বা পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচার বলশেভিক নায়েই চালানো হত।

কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠিত হয়ে ওঠার লক্ষ্য দেখামাত্রই সে প্রচেষ্টার অঙ্কুরে বিনাশের অজট সরকার বাহাদুর '২৪ সালে কানপুর "বলশেভিক" বড়বয়স মামলা করেছিলেন,—যার এক নম্বর আগামী ছিলেন এম, এন, রায়। তিনি তখন কমিউনিষ্ট—যেহাওয়ার ভূতীয় আন্তর্জাতিকের সভাপতিমণ্ডলীর ১১জন সদস্যের অন্তর্ভুক্ত—সমগ্র প্রাচ্যে ভূখণ্ডে কমিউনিজম প্রচারের এবং পার্টি সংগঠনের ভায়প্রাপ্ত সদস্য।

বাই হোক, '২৭ সালে শাকলাতওয়ালার পরামর্শ অনুসারে ২৪

হানি-হানীর তরুণ কৃষক কর্মীরা Young Communist League গড়ায় চেষ্টা করেছিল। ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জে এমনি এক সংগঠন হয়েছিল। তাদেরই প্রচারণার বলে '২১ সালে কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে, এবং ঢাকা থেকে মোজা-বোলবীরা সেখানে গিয়ে সটাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণত করে। এ বিবস্ত্রের বিশদ বিবরণ বহাসময়ে দেওয়া বাবে।

এদিকে সুভাষাবাবুকে বি, পি, সি-র গদীতে বসানোর পর তাঁকে কর্পোরেশনের গদীতেও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা শুরু হল। জেলে বাঙারীর আগে তিনি ছিলেন কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং তাঁর অধীনে কার্ট ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার জে, সি, সুধাকর্ষী "চীফ" হয়েছিলেন। তাঁকে কংগ্রেস-নেতারা অস্বস্তি করলেন, সুভাষাবাবুকে জায়গা ছেড়ে দিতে। তিনি বললেন, অন্য কারো কাছ থেকে ছাড়বো না,—সুভাষ বাবু অস্বস্তি করলে ছাড়বো। সুভাষ বাবুর সে অস্বস্তি করতে সচেষ্ট বাঙালো। সুভাষ সুধাকর্ষী চীফ থেকে গেলেন,—এবং সুভাষ বাবুকে মেয়রের গদীতে বসাবার তোড়জোড় শুরু হল, সামনের কর্পোরেশন-নির্বাচনের কথা নিয়ে।

ওদিকে আমার ভাগ্যে বেচারী তখনও বাহ্যিক জিতেন কুশারীর সত্যাক্রমে পড়ে আছে। তাকে নিয়ে এলুম। কিন্তু থরচালালোও দুই—আর পড়াশুনার ব্যবস্থাও প্রায় অসম্ভব। আমার কাছে থাকলে পড়াশুনা হবে না ভেবে তাকে নিয়ে গেলুম তার জ্যাঠামশায়ের কাছে। তিনি retired Govt. Pensioner—বাগিগঞ্জে ছিলেন রোডে সপরিবারে বাস করতেন। বাড়িতে লেখাপড়ার আঁকোঁড়া চমৎকার। তাঁর ছেলেরা সকলেই শিক্ষিত, কেউ এম এ, কেউ এম এস সি, কেউ কলেজে বা স্কুলে পড়ে। আমি তাঁকে বললুম, আমার কাছে থেকে ওর পড়াশুনার ব্যবস্থা কতি হয়েছে, আর কতি করা উচিত নয় বলে আপনার কাছে এসেছি। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে গ্রহণ করলেন। ভাগ্যের একটা ফিল্প হল বলে আর একটু হস্তির নিবাস কেললুম। তার লেখাপড়া সেখানেই আমার শুরু হল।

আমার বাড়ীর হামলা revive করার জন্য কোন কোন বন্ধু পরামর্শ দিচ্ছিলেন—বাড়ীটা বিক্রি করার সুযোগ পেলে নেনা শোধ করেও কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাগারই সংস্থান নেই—হামলার টাকা কোথায় পাব? বড়ট চুকে গেছে জালই হয়েছে। হাত দুটো আর পেট একসঙ্গেই আছে। টায়ে টায়ে দিন গুজরাণ করতে পারলেই হল। দাদারা মুক্ত হয়ে আসছেন। দুই মলে জোট বাঁধতে পারলে একটা বিরাট শক্তির সৃষ্টি হবে। পারম্পরিক প্রয়োজেরিতে শক্তি কয় হবে না,—অবিপ্রবী নেতাদের বিপ্লববিরোধী কর্মসূচীর লড়াইয়ে দুই বিপ্লবীমল দুপক্ষে থেকে পরাম্পরের বিরোধিতাকেই তাদের কর্মসূচীর প্রধান বাধা করে ব্যবধান হয়ে ধাবেনা। নতুন নিষ্কর্ম কর্মসূচী আসবে,—তার জন্য তৈরী থাকাই; দরকার।

স্বাধীনতা, রাসেল এবং ব্রেসলফোর্ডের কাছে চিঠি লিখে অস্বস্তি চাইলুম, তাঁদের বইয়ের বাংলা অস্বস্তি প্রকাশের জন্যে। রাসেল উত্তরে লিখলেন, তোমার চিঠি আমার প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে

দিলুম, তাদের সঙ্গে বলাবল্য কর। প্রকাশক আমাকে জানালেন, যদি অবিলম্বে পাঁচ পাউণ্ড পাঠাতে পার, অস্বস্তি পাবে; নতী করলে পাঁচ পাউণ্ডে চলবে না।

তখন দিন-কাল এমনি ছিল। কিন্তু আমার দিন-কালও এমন ছিল যে, পাঁচ পাউণ্ডের যতন টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব। ওটার আশা ছেড়েই দিলুম।

ব্রেসলফোর্ড লিখলেন, আমি তো তোমার পরিচয় জানিনা, যদি একটা আমার চেনা লোকের সুপারিশ পাঠাতে পার,—যদি জে, সি, বোসের সুপারিশ সংগ্রহ করে পাঠাতে পার,—তাহলে আমি অস্বস্তি দিতে পারি।

বুকলুম, আমার প্রথম চিঠিতে একটু ঘোরাশো করে পরিচয়টা দিলে হয়তো কাজ হয়ে যেত। কিন্তু একে আনড়ী, তাতে নিজের সবচেয়ে ভাল কথা বলার অভ্যাস কোন কালেই নেই, কাজেই সেটা হয়নি। বাই হোক, জগদীশ বহুর সুপারিশ সংগ্রহের জন্য বোস ইনস্টিটিউটে গিয়ে গোপাল বাবুর (ভট্টাচার্য) সঙ্গে দেখা করলুম, এবং শুনলুম, কয়েকদিন আগেই তিনি "ফরেন ট্রে" বেরিয়ে গেছেন। সুভাষ সে বইটা সবচেয়ে আশা ছেড়ে দিলুম।

গোপাল বাবু তখন টালার নদী গৌসাইয়ের বাড়ী থেকে গৌরীবেড়ের খালগারের কাছে এক গলিতে বাড়ী ভাড়া করেছেন। তাঁর সঙ্গে সেখানেও গেলুম, এবং অবশ্য থেকে এলুম। তাঁর বাড়ীতে গেলেই খেয়ে আসা শেষ পর্যন্ত বেওয়ারজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বার "বকেল" করে বেড়ায় তাদের যে খাঁড়খানিগার কোন টিক-টিকানা নেই, এটা মায়েরা এবং বউয়েরা ধরেই নিয়েছিলেন, এবং তলহুসারে, গেলেই প্রথমেই বলতেন, ভাত খেয়ে বাবে।

বোস ইনস্টিটিউটে গোপাল বাবুর টিকিনের সময় হাস-ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন,—আমাকে বলেছিলেন, বেশি আসবেন, টিকিনের সময় আসবেন। সুভাষ মায়ের মাঝে সেখানে গিয়ে তাঁদের টিকিনের ভাগ খেয়ে আসতুম। এমনি করে ওখানকার কয়েকজন রিসার্চ কলারের সঙ্গে আলাপ জমেছিল, এবং পরে তার কল কলেছিল সুব্রহ্মণ্যারী। সে কথাও পরে আসবে।

একদিন গিয়ে দেখি, নড়িয়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার নিবারণ দাশগুপ্ত এসেছেন। গোপালবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, এবং দুজনকে এক চেয়ারে বসিয়ে কটী তুললেন।

তখন সভাপতির দিন, নতুন কারবার হোটেল হয়েছে পাইস হোটেল—হ'পয়সার রাহের হোল ভাত খাওয়া হয়ে যায়। তাই কোন মতে চলে যেত। কিন্তু আর কিছু, কয়েকটা টাকা, রোজগার না করতে পারলে হুত হচ্ছে না। সুব্রহ্মণ্য মজুমদারকে একদিন বললুম, আপনার "আনন্দবাজারে" আমাকে এমন একটা চাকরী দিতে পারেন, যাতে রোজ খটী দুই খেতে মাসে ১৫২০ টাকা পাওয়া যায়? তিনি বললেন, না—বাটনি ৩৪ কড়ী আর মাইনে গোটা ত্রিশ টাকা, যদি চান, হতে পারে। তখন হাজারে ডিসেম্বরে কংগ্রেস আসল।

সুভাষ বাড়ী হলুম এবং ৩০ টাকা মাইনের সাব এডিটরী চাকরী নিলুম। বতীন ভট্টাচার্যও তখন (সিনিয়র) সাব এডিটরী ছিলেন। সে টিক কংগ্রেসের আগেই। হবদম টেলিগ্রাফ, খবর

জানিয়ে এবং আমারাও হরময় অনুবাদ করে চলেছি, এইভাবে কংগ্রেসের কয়েক দিন একটু বেশী রাত পর্যন্তই থাকি। এইভাবে তার পর হল জ্বর।

মাস্ত্রাজ কংগ্রেসে তরুণ স্বাধীনতাবাদী ও বিপ্লবীদের চোঁটায় এক প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছিল—কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। এটা হল এক প্রস্তাবের আকারে—creed পরিবর্তন হল না। মহাত্মা তখন বল ইণ্ডিয়া প্লিনারী অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে যুদ্ধর উৎপাদন চালাচ্ছেন, কংগ্রেসের নেতৃত্ব স্বরাজ পার্টির হাতে ছেড়ে দিয়ে। মাস্ত্রাজের কাণ্ড দেখে তিনি আর চূপ করে থাকতে পারলেন না, ফিরে এসে আবার কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ করলেন।

আমার প্রথম জ্বর, গুঠ-নামে, কিছু ছাড়ে না। পাশের ঘরে এক ভক্ত ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের সিক্সথ ইয়ার ইন্ডেন্ট। তিনি ক'দিন দেখে, জ্বর নামার মুখে কুইনাইন খাওয়ালেন। আবার জ্বর গুঠ-নামা এক আবার কুইনাইন—এমনি করে অনেক কুইনাইনও খাওয়া হল, জ্বরও চললো।

তখন আমাদের "ব্রাকশ মেসে" ইলেকট্রিক ছিল না,—যে ঘরে জলতো হারিকেন। জ্বর অবস্থায় একদিন আমি "গোথেলস স্পীচ" বইখানা পড়ছি। কুয়ে টাইপে ছাপা প্রকাশ্য বই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তখনও পড়ছি। চোখের ওপর একটু অভ্যস্তার হচ্ছে। সাবলা বাঁধ করলে, পড়া বন্ধ করলুম।

সেই দিন শেষ রাত্রে মাথার যন্ত্রণার ঘুম ভেঙ্গে গেল, মাথার পিছন দিকটাকে বেন কেউ ছুঁতে গিয়ে খোঁচাচ্ছে। আমার আঁতর্নাকে আর সকলের ঘুম ভাঙলো। পাশের ঘরের ডাক্তারও এল। হারিকেন জ্বলে আমার মুখের কাছে ধরলো। আমি শুধু জ্বলের একটা আভাস বুঝতে পারছি, আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সম্পূর্ণ অন্ধ।

কাণ্ড দেখে সারদার সঙ্গে ডাক্তারও ঘাবড়ে গেল এবং তখনই মেডিক্যাল কলেজ ছুটলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরলো এক মোটার নিয়ে। তখন সকাল হয়েছে। আমাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে ওয়া হুজনে চললো হাসপাতালে। তখন বেশী ওয়ার্ডে সিট খালি ছিল না,—ইউরোলজার ওয়ার্ডে একটা মাত্র সিট খালি ছিল। "ডাক্তারের" তবিরে আমাকে সেখানেই ভর্তি করে নেওয়া হল। খানিক পরেই এলেন কর্নেল কোপিঞ্জার (আই পেসিয়ালিটি ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট) এবং কয়েক জন ডাক্তার ও ইন্ডেন্ট। কোপিঞ্জার চোখ পরীক্ষা করে বললেন, অ্যাকিউট গ্রুকোমা, সাডন্ অ্যাটাক, ডেরি রেটার—জঃ, আমার একুণি কাটতে ইচ্ছে করছে।

তার পর চললো লেকচার আর চোখ দুটোকে টিপে, পাতা টেনে তুলে দেখানো। সকলেই এক একবার চোখ দুটোকে টোপাটিপ করলেন। আমি তখন দেখছি শুধু সতকগুলো মাছের অবয়ব মাত্র নড়াচড়া করছে—সবই খোলা। প্রাণটার মধ্যে চলছে একটা হাট্কার—একি হল।

পরীক্ষার জন্তে সেদিন সন্ধ্যা নেওয়া হল, পরদিন প্রস্তাবও নেওয়া হল; তৃতীয় দিনে হল অপারেশন। সেদিন "টেনশন" কমেছে, কলেজের মাছের চিনতে পারছি, একটু ভরসা হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যায় চোখ কঠিন—জ্বরও হচ্ছে।

হুজির পরেও আমার ওপর একটা Restriction order ছিল, যেখানেই থাকি, J. B. D. I. G. বা জেলার S. P.-র অফিস

টিকানা জানাতে হবে, কলকাতার বাস করতে করতে বাইরে যেতে হলে D. I. G.-র কাছে খবর দিতে যেতে হবে, ইত্যাদি। বেদিল হাসপাতালে গেছি, তার পরের দিনই সে অর্ডারটা Cancel করার notice serve করার জন্তে একজন S. B. Inspector বাসায় গিয়েছিলেন, সেখান থেকে হাসপাতালে এসেছেন notice serve করতে। স্ততরা জানাজানি হয়ে গেল যে, আমি আটক হিশুম। মেম নার্সরা ঠা করে আমার হুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে does he make bombs? আকসার বৃহৎ হেসে চূপ করে থাকেন।

অপারেশন টেবিলে যখন চোখের সামনে ছুরি ধার কোপিঞ্জার বলছেন look straight, তখন উঠে পালতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু বোমাওয়াল হয়ে কেমন করে পালাই? কাজেই লজ্জার আড়ষ্ট হয়ে থাকলুম। দুটো eyeballই ইলেকশন দিয়ে রেডি করেছিল কাটার জন্তে, কিন্তু ঐ চোখটা কাটতে যখন টেম পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ডান চোখটা কাটতে হিশুম না।

কোপিঞ্জার বললেন, তুমি রাজী না হলে আমি কাটতে পারি না, কিন্তু না কাটলে আবার আক্রমণের ভয় থেকে যাবে, এবং আক্রমণ হলে আবার দুটো চোখই কাটতে হবে। আমি বললুম, ভা হুজ হোক।

বেশী কথার সময় নেই—তার দুখটা ডিউটির মধ্যে তিনি ৪০টা যোগীয় চোখ কাটলেন, গ্রুকোমা, হানি প্রভৃতি, কারো একটা, কারো বা দুটো চোখ, যেন আলু-পটল কাটছে—এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

প্রথম দিনই সারদা অল্পকালকে খবর দিয়েছিল—তিনিও কিছুদিন আগে অন্তরীণ থেকে ফিরে এসেছেন—তিনি দেখতে এসে, খাওয়া লাগার অবস্থা ভাল নয় দেখে বলাবল্য করে গিয়েছিলেন, এবং রোগ দুপুর বেলা বাড়ী থেকে লুচি, তরকারী, মাছ প্রভৃতি খালা সাজিয়ে নিয়ে নিজে হাসপাতালে এসে খাইয়ে যেতেন। তাঁর ভালবাসা আমি ভুলতে পারি না।

বাই হোক, তৃতীয় দিনে ব্যাপেক্স খুলে দেখে all right বলে, আবার বেঁচে ছেঁদে দিলে এবং আট দিন পরে ব্যাপেক্স খুলে ছেঁদে দিলে। লেখাপড়া আপাতত একেবারে নিষিদ্ধ হল। স্ততরা ব্যবসা ছাড়া আর কোন পথ রইলো না। নিলেয়ের উপরই চলে পড়লুম।

২৬ সালে হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্বের পর অতীত বস্তুর প্রতিষ্ঠিত সিমলা ব্যারাম সমিতি জাঁকিয়ে উঠলো—হিন্দু ছেলেরদের শরীরচর্চা, লাঠিখেলা প্রভৃতি জোর চললো। মাড়োরা বড় লোকেরা পৃষ্ঠপোষক হলেন, অমর বস্তুর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হল।

২৭ সালের শেষে কলকাতার কংগ্রেস অফিসে (বৌবাজার স্ট্রীট) ইউনিট বনকারেল হল,—অস্ত্রান্ত হানেও ইউনিট বনকারেল চলতে লাগলো। তখন মহম্মদ আলী, সৌকর আলী প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা বিগড়ে গেছেন এবং মুসলমানদের দাবী নিয়েই ইউনিট বনকারেলে লড়ছেন। কলকাতার মোহাম্মদী প্রভৃতি কাগজে মুসলমানদের দাবীর মধ্যে মক্কেল চাকরীর শতকরা ৮০টা তাদের জন্য রিজার্ভ রাখার দাবী উঠেছে। উপনয়না ঠাটা করে বলেন, মন্দির-মসজিদ ভাঙাও এই অনুরোধে করা চাই—শতকরা ৮০টা মন্দির এবং ২০টা মসজিদ। তিনি কংগ্রেস কর্মী সবে বোম্ব দিচ্ছিলেন

এক ঐ সময়েই তাঁর হিন্দু মহাসভার সংগে ঘনিষ্ঠ বোগাযোগ হয়। অমরনাথ (চ্যাটার্জি) সবতোভাবে তাঁর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি হয়েছিলেন কর্মী গণের প্রেসিডেন্ট।

'২৭ সালের শেষে বা '২৮ সালের প্রথমে, ঠিক মনে নেই,—শেষবন্ধ পার্কে হিন্দু মহাগভার অল-ইণ্ডিয়া সম্মেলন হল,—মূল লক্ষ্য, ইউনিট কনফারেন্সের বিরুদ্ধে হিন্দুদের একত্রীতা করা। সেই কনফারেন্সে বীর সভাপতির নেতৃত্বে প্রস্তাব হল, এটা হিন্দু দেশ, মুসলমানরা যদি এদেশে থাকতে চায়, তাহলে তাদের হিন্দুদের কাছে রাখা হেঁট করেই থাকতে হবে। এইভাবে সেই কনফারেন্সেই "ইন্ডিয়ান থিওরি" বা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভগ্নমত প্রচলিত। দাঙ্গার পর হিন্দুদের মন এতখানি বিঘিয়ে উঠেছিল যে "প্রবাসী" ও "ইডলি" পত্রিকার হিন্দু মহাসভার পুর হয়েছিল।

আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়—সাম্প্রদায়িকতার আকারে বিপ্লব-বিরোধী দক্ষিণ সর্বভাই প্রবল হয়ে উঠেছে। দানারা ফিরলে final amalgamation হলে আগার একটা শক্তিশালী বিপ্লবীল আসরে নামবে, এই আশায় দিন ভনছি।

ম্যাক্জি লারালের নিলামের সকলের সঙ্গেই আলাপ-খাতির ছিল বলে মাল কেনার সময় টাকা ভিপজিট দিতে হতনা—তাকে একটা হস্তা সময় পেতুম, এবং কেনা-মাল বিক্রী করে ডেলিভারী আনতুম। তখন highest bidderএ অনেক ভাল মাল বিক্রী হত—কিনলে বাথট কেমা বায়, এবং বিক্রী করে দু'দশ টাকা লাভও পাওয়া যায়। কিন্তু সব কেনা মাল ডেলিভারী নেওয়ার আগে বিক্রী করতে না পারলে, বাকি মালগুলো এমন রাখার জগেয়া দরকার। তা নেই বলে সম্ভাব্য পেলেও যথেষ্ট মাল কিনতে পারি না। সুতরাং যেমন করেই হোক, একটা দোকান না কহতে পারলে আর চলছে না,—এটা বেশ বুলুঘ, এবং অল্প ভাড়ার খর খুঁজে বেড়াতে শুরু করলুম।

শান্তিপূর্বের শশী ঝাঁর (মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, বিনি সেবেন দের সঙ্গে কয়েক বছর আগে মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান) ছোট ভাই নীলোদ ঝাঁর সঙ্গে আসাপ ছিল, তিনি ছিলেন সম্ভাব্য মিত্রের দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একদিন তাঁর সঙ্গে অ্যালবার্ট-বিল্ডিংয়ের শিফিন দিয়ে বেতে বেতে দোকান খবর কথা হচ্ছিল। হঠাৎ ভাষা চরণ মে স্ট্রিটের কোনায় অ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের ছুটো দরজায় তাল বন্ধ দেখে নীলোদ ঠাটা করে বললে, এই ঘরটা নিয়ে ফেলুন। আমি বললুম, ঠাটা করছেন—বেশ, এই ঘরই নোব।

হু দরজা ওদালা বড় ঘর,—কিছুদিন আগে সে ঘরে খন্দর প্রদর্শনী হয়েছিল। ভাড়া মাসিক ১০০ টাকা। তখন আমার পকেটের সবল মাত্র গোটা পঞ্চাশেক টাকা। সেক্রেটারী সত্যানন্দ বহু বিরহমুগ্ধের লোক,—পঞ্চাশের বতীন দস্তুর সঙ্গে (বুলাগঞ্জ জামাভাল ফুলের ভূতপূর্ব হেড মাস্টার) আসাপ আছে। প্রবেশ মজুমদারের কাছ থেকে ৫০টা টাকা খর করলুম এবং বতীন দস্তুরকে সঙ্গে নিয়ে সত্যানন্দ বাড়ির বাড়ী গিয়ে আগাম একমাসের ভাড়া ১০০ টাকার জমা দিয়ে পকেট খালি করে ঘরের চাবি নিয়ে এলুম।

সাহা! অর্থাৎ হরে আমার কাণ্ড দেখছিল। আমার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস,—সেই বিশ্বাসের কোরেই সে আমার পিছন পিছন বিপ্লবের পথে চলার জন্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল। তাকে আমার

প্রান বললুম,—একটু দৌঁধে গুনে মাল কিনবো, মিস্ত্রীর খরচ এক পরসাপ করবো না; আমি ছুতোর মিস্ত্রী, তুমি পালিস মিস্ত্রী, দুজনেই দুজনের কাজে সাহায্য করবো, আমি বাইরে ঘুরবো, তুমি থাকবে দোকানে, এখানেই বেঁধে থাকবো, বত সন্ধ্যাপে পান্না হায়। সে বুললো, সাহ মিলো, "ড্রাক্স মেন" ছেড়ে ঘরের জিনিস কটা নিয়ে দোকানে উঠলুম।

ভাতে-ভাত একদিন রেঁধে দুদিন খাই, দ্বিতীয় দিনে ফুলুরী কিনে গুঁড়িয়ে তেলঘুন মেখে নিই। ক্রমে এক এক দিন তৃতীয় দিনেও জল দেওয়া ভাত থাকে, ভাতগুলো আগ-পটা ভাজাভাজা, জলটা নাল-হুড়গড়ে। সেগুলোকে টাটকা জলে ছু-তিনবার ধুয়ে নিয়ে তেল-ঘুন দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে ফুলুরী দিয়ে খাই।

হাতড়ে হাতড়ে দুজনে মিস্ত্রীর কাজ করি। নিজেমে মালকেমা বাড়লো, বিক্রীও বেড়লো, ২১টা করে মাল দোকানেও জমতে শুরু করলো। ৭৮ মাসের মধ্যেই দোকানও ভরে উঠলো, বিক্রী হাজার টাকার পৌছলো, দোকান পাড়িয়ে গেল রীতিমত Self supporting হয়ে। দুজন্যর আনন্দ হল, নিজেদের ওপর ভরসা ও বিশ্বাস বাড়লো। এতদিনে '২৮ সালের মাঝামাঝি এসে পড়েছি।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটা নতুন কাণ্ডের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ১৯২০ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড এক পাশ স্বরাজ দেওয়ার সময় ঘোষণা করেছিল, ১০ বছর অন্তর অন্তর নতুন নতুন এক এক পাশ স্বরাজ দেওয়া হবে। সুতরাং ৩০ সালে পরবর্তী শাসন সংস্কারের কথা। তারই ব্যবস্থা করার জন্তে ব্রিটিশ সরকার '২৭ সালে এক রয়েল কমিশন তৈরী করলেন—Simon Commission. তাঁরা ভারতে এলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি, সম্প্রদায়, নেতা প্রভৃতির মতামত এবং অন্তর্জাত প্রয়োজনীয় বিবরণের আলোচনা ও বিবেচনা করে, '৩০ সালের শাসন সংস্কারের মূলনীতি নির্ধারণ করে কাঠামো বেঁধে দেবেন। কংগ্রেস সে কমিশন বয়কট করলো কারণ তার মধ্যে একজনও ভারতীয় সম্ভব ছিল না।

এই রকম এক কমিশন '২২ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট শাসন সংস্কারের জন্ত তৈরী হয়েছিল, বোম্বাইর Milner Commission মিশর-বাসীরা তাকে এমন সর্বাঙ্গিক ভাবে বয়কট করেছিল যে, তাঁরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট গিয়ে কারো তব্বকের কোন কথা সুনতে পারিনি। তাঁরা যেখানেই যায়, বাঁধ কাছেই বাঁধ, সকলেই তাদের প্রেরণের উত্তরে বলে, Go to Zoglu! তখন জগলুল পাশা মিশরীদের নেতা।

ভারতে '২০ সালে মন্টেগুওর কাছে সকল দল এবং লোকই দরখাস্ত করেছিল, সাক্ষ্য দিয়েছিল—কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগও বৃহৎ মেমোরিয়াল দিয়েছিল। '২৭ সালে সাইমন কমিশনের কাছেও কংগ্রেস ও লীগ ছাড়া আর সকলেই দরখাস্ত ও সাক্ষ্য দিয়েছিল। আর কংগ্রেস তাদের বয়কট করেও, এক কমিটি তৈরী করেছিল, Nehru Committee, আপাতী শাসন-সংস্কারে কি রকম ব্যবস্থা হলে কংগ্রেস ও ভারত সম্ভব হবে, সে সবকিছু বিস্তারিত ভাবে রিপোর্ট দেওয়ার জন্ত। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সে কমিটির সভাপতি—আর সভ্যদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ বয়স্ক ছিলেন সোয়ামেব কোয়েলি আর হুতাই বহু।

'২৮ সালের পোড়ার সে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল, অবশ্য প্রাথমিক সাইমন কমিশনকেই দাবী জমাদানোর জন্ত, যে দাবীর ফল

কথা ডেমিনিয়ন ট্যাটাস। স্বাক্ষরকারীদের অন্তর্ভুক্ত্য বস্তু। বোকা গেল, কংগ্রেসের creed যে স্বাধীনতা, তার প্রকৃত অর্থ ডেমিনিয়ন ট্যাটাস এবং সেটা বিপ্লবীমানসদেরও অস্বীকার্য। তা না হলে হয়ত স্বাভাব্য বাবু একটা note of dissent দিয়ে বসতেন।

এমিকে জহরলাল নেহেরু '২৭ সালের শেষেই ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন এবং বিলাতের বামপন্থী শ্রমিকনেতা ফেনার প্রকণ্ডে বক্তৃক সংগঠিত League against Imperialism এর সদস্য হয়ে, এবং সোভিয়েত রুশিয়া সফর করে ফিরে এসে একটু বেসুরো কথা বলতে শুরু করেছেন,—Independence এবং Socialism.

বোধহয় '২৮ সালের গোড়ার দিকেই মনোব্রজনা (গুপ্ত) হতু হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর গুপের একটা নিবেদ্যজ্ঞাপ্ত জারি হয়েছিল যে, তিনি কলকাতা হাওড়া এবং ২৪ পরগণা জেলার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। সেজন্য তিনি হুগলী বিভাগমন্ডিরে এসে বাস করছিলেন। গান্ধীবাদী নগেন মুখোপাধ্যায় এবং গৌরহরি সৌম তখন হুগলী বিভাগমন্ডিরের নেতা, এবং তাঁদের সঙ্গে মনোব্রজনা দার খুব খাতিয় জমেছিল কংগ্রেসের কাজের মধ্য দিয়েই। আমি এবং আরো আমাকে কলকাতা থেকে তাঁর কাছে যেতুম।

এমনি একদিন সন্ধ্যার পর হুগলী বিভাগমন্ডিরের দরজা থেকে ইমামদারার পাশের রাস্তা দিয়ে গলার বাট পঞ্চদ্ব দৃষ্টি পাইচাঁরী করতে করতে তাঁর সঙ্গে নানা কথা হল। আমি স্বাভাব্য বাবুর মতিগতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করলুম। তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, সব ঠিক আছে। আমি শেষ পর্যন্ত বললুম, বোঝাতে এলে তর্ক করবো—তার চেয়ে হুকুম জারি করুন, স্বাভাব্য বাবুর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে পারবো না, আমি নিরস্ত হব। তিনি বললেন, বেশ, তাইই তো।

সোকান পাড়িয়ে গেছে বলে আমার হৃঃসাহসও বেড়ে গেছে। আলবার্ট বিজি-এর তেতলায় কোটো আর্টিষ্ট সিঙ্হের ঘরের পাশে একটা আয়তভারটাইজিং এজেন্সীর অফিস ছিল, সেটা উঠে গেল সেখা ৩৫ টাকা ভাড়ার সে ঘরও নিলুম। অজুহাত গুণাম করবো, কিন্তু বাস্তবে সেটা হল গোপন কথা-বার্তার জায়গা, এবং তার সঙ্গে অবশ্য কিছু মালও থাকে, এবং রাষ্ট্রা খাতিয়ও সেখানেই ব্যবস্থা হল।

ক্রমে দাদারা সকলে ফিরে এলেন। হাঙ্গুদাকে রীচিতে extern করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেখানে বাঙারার আগে কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় থাকার অল্পমতি পেয়েছিলেন। সেই সুযোগে সকল বিপ্লবী দলের amalgamation এর জন্যে নেতৃ সম্মেলনের ব্যবস্থা হল গোপনে, এবং আমার ঐ ঘরে। আলবার্ট বিজি-এর পাশের গলিতে একটা দরজা এবং সিঁড়ি ছিল। আমি গলির মুখে পাঁড়ালুম, এবং নেতারা একে একে আসতে লাগলেন এবং আমি তাঁদের ঐ দিক দিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতে লাগলুম।

পর পর তিন দিন ঘরে ঐ ভাবে সম্মেলন চললো এবং মিলন হয়ে গেল। অমূল্যলনের তরফে প্রভুল গাঙ্গুলী, রবী সেন প্রভৃতি, যুগান্তরের বাহু'না, মনোব্রজনা ভূপতি'না প্রভৃতি, যুগান্তর দলের সহযোগী বিপ্লবদার দলের বিপ্লব'না, গিরীন্দ্র'না প্রভৃতি, পূর্ণ দলের দলের পূর্ণ দার এবং আরো ২১ জন, এমনি করে প্রায় জন হুড়ি নেতা সকল বিধর বিশদভাবে আলোচনা করে সকল অবস্থাস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কমে' সর্ববাদী সম্মত মিলন হয়ে গেল। আমি অবশ্য বরাবরই

বাইয়ের পার্জ, escort এবং হুকুম বরাবর থাকলুম। ভরসা হল, আনন্দ হল, একটা নতুন যুগের সূচনা হল।

এই অ্যামেলগামেশনের মধ্যে উপেন'না এবং অমরনাথকে বাব দেওয়া হয়েছিল, কারণ প্রথমত, তাঁরা সেনভাস্তের সমর্থকদের চাই, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরা ছিলেন হিন্দু মহাসভা-বৈধা। তা ছাড়া উপেনদাকে তো যুগান্তরের দাদারা আগে থেকেই খবচের খাতিয় লিখেছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে অমরনাথও। অ্যামেলগামেশনের মধ্যে অমূল্যলনের দাবী ছিল, কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না, কারণ অবনী মুখাঞ্জি ও নলিনীগুপ্তকে দলে নিয়ে তাদের মায়কং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁদের কিছু আক্কেল হয়ে গিয়েছিল। অহেতুকী, স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত আর্মি কমিউনিজম-বিরোধিতা ঐ দুই political adventurer এর পায়ের পড়ে আরো উৎকট হয়ে উঠেছিল। যুগান্তর ও সার্লিট দাদারাও অনায়াসে এবং মনে প্রাণে সে দাবী মেনে নিতে পেরেছিলেন তাঁদের কমিউনিজম-বিরোধী বৈপ্লবিক আদর্শের কল্যাণেই। মুরেশ দাস এই সময় কর্মীসংঘ ছেড়ে দাদাদের মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন।

জীবন তখনও টি বিব আক্রমণের সঙ্গেই সরকারী ব্যবস্থার আলমোড়ায় রয়েছে। হঠাৎ একদিন কাগজে খবর দেখা গেল, তার কানের সঙ্গে বক্তৃ পড়ছে, জ্বর চলেছে, অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ। দাদাদের ততক্ষ থেকে একজন লোক পাঠানোর ব্যবস্থা হল, এবং মনোমোহন ভট্টাচার্য আমাকে বাস্তবায়নের খবচের টাকা এনে দিলেন, আমি গেলুম আলমোড়ায়। গিয়ে দেখলুম, অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ বটে, কিন্তু আমরা বসটা আশঙ্কা করেছিলুম ততটা নয়। মা এবং বাবল (ছোট ডাই প্রয়ুজ চ্যাটার্জি) সঙ্গে আছে। ভয়ের কিছু নেই।

সেই প্রথম শুনলুম, পাইডী ভাস্তার জ্বর হলে ডাক্তার খেতে নিষেধ করে, বলে, খিচড়ী খাইয়ে। আর সেখানে দেখলুম প্রভাসকে—সে বারায় ছিল, কাগজে জীবনের খবর পড়ে' সেখান থেকে দেখতে এসেছে।

তার কাছে শুনলুম, আমাদের হুজীগঞ্জের এক সহকর্মী তার মাতবরী position দেখে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বশত তার নামে নানা অকথা-কুকথা প্রচার করে' তার এমন অবস্থা করেছিল যে, কর্মী-সংঘের সন্ত্রাস ছেড়ে তাকে পালাতে হয়েছিল, এবং দেশত্যাগের জজাই সে বারায় গিয়েছিল।

আমি বললুম, আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে চল, সোকান নিয়ে থাকবে, কারো সঙ্গে মিশবে না, আমার কাছে কিছুদিন চূপ করে থাকলে ও সব কথা আপনি die out করবে। তাই ঠিক হল, আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরলুম।

তারপর একদিন হুজীগঞ্জের সেই বহুটির সঙ্গে একান্ত বসে' প্রভাসের কথা পাড়লুম। যে সব ঘটনা নিয়ে তিনি বিসফেছিলেন, সেগুলো শুনে আমি তার ব্যাখ্যা করলুম, এবং বললুম, এ ব্যাখ্যা কি অসম্ভব? তিনি একটু ভেবে বললেন, এরকমও হতে পারে, আমি এভাবে ভাবিনি। বাই হোক, প্রভাস সোকান্দেই থাকলো, এবং আন্তে আন্তে তার গুপের লোকের আস্থা ফিরে এল।

ওদিকে জহরলাল ইউরোপ থেকে আসার পর এলাহাবাদে' এক নতুন সংগঠন আদ্যত করলেন—Independence League,

তখন ভট্টর কানাই গাঙ্গুলী সেখানে ছিলেন, জহরলাল তাঁর ওপর তাঁর মিলেন, বাঙালির Independence League-এর শাখা সংগঠনের, এক পতিনি কলকাতার এসে দাদাদের কাছে জহরলালী প্রভাব করলেন। তিনিও সোসিয়ালিজমের কথাই বলতেন।

দাদারা সুভাষ বাবুকে 'অল-ইণ্ডিয়া' ক্ষেত্রে বাংলার বিপ্লবীদের প্রতিনিধিত্বের খাড়া করার প্রান নিয়ে কাজ করছিলেন। সুভাষা জহরলালের নেতৃত্বে সুভাষ বাবু কাজ করতেন এ তো হাতে পারে না। কলে দেখা গেল, কলকাতার এক নতুন স্বাধীন সংগঠন হল Independence for India League, Bengal. কিরণশঙ্কর রায়কে করা হল সেক্রেটারী। কানাই বাবু সরে পড়লেন।

'২৭ সালে চীনে কমিউনিষ্টরা এক বিদ্রোহী সরকার গঠন করে কয়েকটি, এক কুরিয়ামটা সেনাপতি চিয়াং কাইশেক সে বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে সাংহাই সহরে হাজার হাজার বিপ্লবী ভবিপ্লবী শ্রমিককে হত্যা করেছিল। এম এন রায় তখন চীনে উপস্থিত ছিলেন, এবং

অসময়ে বিপ্লব ও তার ব্যর্থতার জন্তে দায়ী করে কমিউনিষ্ট থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তিনি বলেন, এ সবেয় ভ্রম দায়ী বোরোভিন, যিনি কমিউনিষ্টের পক্ষ থেকে বহুকাল ধরে সেখানে কাজ করছিলেন।

এ Controversy-র কথা এখানে অবান্তর। শুধু এই কথাটুকু বলা দরকার যে, ভারতের কমিউনিষ্টরাও অতঃপর তাঁকে বর্জন করলেন, কিছু বদনাম রটতে লাগলেন, এবং শেষ পর্যন্ত ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে বসেও তার নামটা সম্পূর্ণ Black out করলেন।

'২৮ সালে ভগৎ সিং প্রমুখ কয়েকজন তরুণ এক 'নওজোয়ান ভারত সভা' সংগঠন করেন—বৈপ্লবিক সংগঠন, যার মধ্যে বোমা বন্দুক এবং সোসিয়ালিজমের আদর্শ দুইই ছিল। জেলে বন্দীরা দেশের ইতিহাস বিস্তৃত অনুশন এবং ৬৩ দিন ধরে তিলে তিলে সভান ঘূর্ত্যাবরণও এই সময়েই। [ক্রমশঃ]

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো

১৯৫৭ সালের ২১শে অক্টোবর এলগিন বোর্ডের 'নেতাজী-তত্ত্বন'-এ আভাঙ্গ-হিন্দু এমবুলেন্স সার্ভিসের সমাজ-শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের উত্তোপে রিসার্চ ব্যুরো কার্যারম্ভ হয়। ব্যুরোর উদ্দেশ্য হল :—(১) নেতাজীর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে বাঙালীর বিবরণ সংগ্রহ, (২) সংগৃহীত বিবরণের উপর সুসংযুক্তভাবে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গবেষণা, (৩) নেতাজী-তত্ত্বনে নেতাজী archiles গড়িয়া উপযুক্তভাবে এইগুলি সংরক্ষণ, (৪) নেতাজীর বিভিন্ন লেখা ও আত্মবিশ্বাস ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা, (৫) নেতাজীর সম্পূর্ণ ও উপযুক্ত জীবনী প্রকাশের প্রয়োজনীয় পটভূমিকা।

কার্যকরী ভাবে ব্যুরোর সহিত ঘনিষ্ঠতা বন্ধা ও ইহাকে সুপরিচালনার জন্ত বিশিষ্ট জননেতা, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক ও নেতাজীর সহযোগী সহকর্মীদের প্রায়শঃ আমন্ত্রণ জানান হয়। ব্যুরোর উপদেষ্টা বোর্ডের মধ্যে আছেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সত্যরঞ্জন বসু, অতীন্দ্রনাথ রায়, জ্যোতিব্রতেন জোয়ারদাশ, হরবিষ্ণু কামাখ, লীলা দাস ও শশীকমলেশ্বর সান্যাল। ইহাতে বোণদানের জন্ত আরও অনেকের সহিত পরামর্শ চলিতেছে।

রিসার্চ ব্যুরোর বিভাগ কয়টি এইরূপ :—(ক) অভিধান, (খ) বাছাই ও সম্পাদনা, (গ) ফটোলাবরেটরী (প্রধানতঃ মাইক্রোকিন্ডি কাজের জন্ত), (ঘ) আর্কাইভস, (ঙ) নেতাজী প্রদর্শন, (চ) প্রকাশনা, ইনকরমেশন, লেকচার কোরাম ও প্রদর্শনী বিভাগ। অনেক চিঠিপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল ইত্যাদি রিসার্চ ব্যুরো মাইক্রোকিন্ডি করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। নেতাজী ভারতে ও বিদেশে যে সমস্ত ভ্রম্য ব্যবহার করেছেন, সেগুলি সংগ্রহ করার জন্ত বিশেষভাবে উত্তোপ আহ্বোজন চলিতেছে। সংগৃহীত অনির্বচনীয় নেতাজী-তত্ত্বনে চিত্রস্বারী করে রাখার ব্যবস্থাও ইহাতেই।

নেতাজীর জীবনী সক্রান্ত বিষয়বস্তু সংগ্রহে নিম্নলিখিত ধারা গ্রহণ কর্তৃক হইয়াছে :—(১) ১৮৯৭ সালের (অর্থাৎ নেতাজীর জন্মপ্রদেশের কলকাতা) পূর্বের ২৫ বৎসরে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, (২) জাহাঙ্গীর পারিবারিক ইতিহাস, জন্ম ও শৈশবকাল, (৩) দাদা

ও বোঁদনকাল (১৯০২-২০), (৪) জাতীয়কর্মে উত্তোপী (১৯২০-২৬), (৫) ব্যবসায়িক নেতৃত্ব (১৯২৬-৩০), (৬) জাতীয় রাজনীতিতে প্রথমকাল (১৯৩০-৩৩), (৭) বিশেষ প্রথম রাজনৈতিক দোঁতা (১৯৩৩-৩৬), (৮) জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ (১৯৩৭-৪০), (৯) ভারতবর্ষ হইতে মহান নির্গমন (১৯৪১) ও (১০) ইউরোপ ও এশিয়ার আন্দোলন-হিন্দু আন্দোলনের প্রসার (১৯৪২-৪৫)।

চিঠিপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে রিসার্চ ব্যুরো যে নীতি অনুসরণ করেছেন, তাহা খুবই সুন্দর হয়েছে এবং দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের কাছে লাঞ্ছাও পাওয়া গিয়াছে। এর ফলে ব্যুরোর হাতে এসে পড়েছে বহু ছবি ও দলিল। মাইক্রোকিন্ডি করে সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। নেতাজীসম্পর্কে বেশী ও বিশেষী লেখকদের প্রায় শতাধিক বই এদের গ্রন্থাগারে আছে। এ ছাড়া ব্যুরোর প্রাচীন ও সাম্প্রতিক খবরের কাগজের কাঁজি-এর সংগ্রহটিও বেশ ভাল। যে গাড়ী করে অম্বর্ষানের সময় নেতাজী কলিকাতা থেকে গোমো পর্যন্ত গিয়াছিলেন, সে গাড়ীটি নেতাজী-তত্ত্বনে কাচের আবরণে ঠেঁকা হিসাবে রাখা আছে। তাঁর নিজের লেখা ও বক্তৃতার সংগ্রহটি খুবই ভাল হয়েছে—রিসার্চ ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে। ১৪ই আগস্ট ১৯৪৫ সালে নেতাজীর নিজের হাতে সই করা একখানা 'হতুমনিয়া' ব্যুরোর হাতে এসেছে। অনেক এই সমস্ত সংগ্রহ নিজেদের পড়া ও গবেষণার জন্ত ব্যবহার করে থাকেন।

একটি চিত্রস্বারী মিউজিয়াম প্রথমে মুম্বাইকার খুলিয়া ক্রমশঃ উহার পরিসর বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করছেন রিসার্চ ব্যুরো।

রিসার্চ ব্যুরোর কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মীদের উত্তম, অধ্যবসায় ও সততার সজ্জিত দেশবাসীর আন্তরিক তৎপরতা মিলিত হলে ইহা এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে বেশী বিলম্ব হবে না। ব্যুরোর আর্থিক সক্তি উন্নয়নযোগ্য নয়—কিন্তু স্বতঃপ্রসঙ্গিত হয়ে দেশবাসী নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সহিত অনেক বেশী সহযোগিতা করুন—ইহাই কাম্য।

পরিবর্তন

পটল বাবুর মেস। অনেকই সেখানে থাকে। আমি থাকি, বিজয় থাকে, ভোলাও থাকে। আমার এক ঘরেই থাকি। বিজয় ভোলা চাকরী করে। আমি বেকার। বেকার আমি তিন বছর। টিউশনিতে পেট চলে। সন্ধ্যা সকাল চক্রবর্তী বাবুর ফেলেমেয়েদের পড়াই। গোটা চল্লিশেক টাকা মাসে হাতে আসে। ওরই ভেতর থাকা, খাওয়া, কাপড় চোপড়, পান, চা সবকিছু। কষ্ট করেই চলেতে হয়। সকালে চায়ের নেশা। শুধু এক কাপ চা। দোকানটা একটু দূরে। জুবনেশ্বর মটর ঠাণ্ডাটার কাছে। মেস থেকে, কিছুটা পথ হাঁটেতে হয়।

সোজাই হাঁটেতে হয়। একটা মোড়। জোরাস্তার মিতালি। কোনের বটগাছটার তলার পাড়িয়ে সরকারী পুলিশ ট্রাফিক কন্ট্রোল করে। তারপর বাঁ দিকে ঘুরতে হয়। ঘুরতেই দোকানটা, তেমন বড় নয়, আবার একবারে ছোটো নয়। চালু চায়ের দোকান। তবে সাইনবোর্ড নেই। ভাঙ্গাভুজি, মিষ্টি, জলখাবার সবই পাওয়া যায়। বরাবরই এখানে আমি এক কাপ চায়ের খদ্দের। এর ওপরে এগুবার সাখি আমার নেই। আর ভাগ্যি জোরে এগুনে বড় জোর একটা চালু সিগাড়া নয়ত জিলিপি পর্যন্ত। তবে বোজাই যাই।

পর্যায় জুটলে—কোন কোন দিন বিকেলের দিকেও এক একবার চুমারি। দোকানের মালিক রঘুনাথ সরকার। বাঙালী। মহাজন টাইপের লোক। বোজা সকালে তাঁর সাদর অভ্যর্থনা। আরে আশ্বন, আশ্বন, আপনাদেরই দোকান। ওরে টোপা, বাবুর জন্ত এক কাপ চা নিয়ে আর—টোপাও হাঁক ছাড়ে, ‘এক চানু...’

ঐ চালু চায়ের খদ্দের সোজা মিনিট পাঁচেক ইলেকট্রিক পাখার ঠাণ্ডা হাওয়া যায়। সেই সাথে বোজাকার ইংরিজি কাগজটতেও চোখ বুলায়। কাগজের অস্ত্র খবরে আবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। শুধু সিসুয়েশন ‘ড্যাকটে’র কলমটাই দেখি। বোজাই দেখি। এ কলমের প্রতিটি লাইন মন দিয়ে পড়ি। খালি চাকরীর খবর খুঁটাই টুকে রাখি। তারপর মেসে কিংবদন্তি পিটশন চুঁকি, ঐ পর্যন্তই। বিজ্ঞাপনলাভার দর্য করেও কোনদিন খবর সেন না। তবু পরিকা দেখি, চাকরী খালির খবর পড়ি। বোজাই পিটশন চুঁকি, দিনগুলো কোনমতে কেটে চলে ১০০

বছর থাকেই হয়ে গেছে, একটা চাকরী পেয়েছি। তা-ও কিন্তু ঐ দোকানটার পরিকারই সোজা, কেহানীর চাকরী। ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট আপিসে নশটা পাঁচটা কলম পেশার কাজ। মন্দ নয়। মাইনে একশো পাঁচ টাকা। এখনও পটল বাবুর মেসেই থাকি, তবে চায়ের দোকানটাতে আর হাওয়া হয়না, চালু চা সিগাড়ার বাদও প্রায় ফুলতে বসেছি ১০০-বেকার জীবনের রোজনারমাটো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। বোজাকার সেই এক কাপ চা, সরকার মশাইয়ের চায়ের লোকানটা, টোপার হাঁক-ভাক্ সবই বেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো।

পুরোনো দিনের শ্বুভিসব, ভুলবার নয়, ভুলতে আমি চাইও না। বোঝবার সকালে গোলাম লোকানটার। বটলো পেরিয়ে মোড় ঘুরতেই দোকানটা দেখা যাচ্ছে। সরকার মশাই কাশে বসে আছেন। আমার দেখতে পেয়েই একেবারে ছুটে এলেন, আদর করে ভেতরে নিয়ে বসালেন। মনে হলো পুরোনো ব্রাহ্মণটিকে পেয়ে তিনি খুশী হয়েছেন। কাপড়-

চোপড়ের চোরা দেখেই অবশ্য আশ্চর্য করেছিলেন বাঁধকাপ কিছু একটা করছি ১০০-আগের মতো আজও ছকুম হলো, ‘ওরে টোপা, বাবুর জন্ত এক কাপ চা, দুটো সিগাড়া, চালু নয়, স্পেশাল। গরম জলপি।’

স্পেশাল? বোধগম্য হলো না, হঠাৎ বেন একটা পরিবর্তন মনে হচ্ছে, জীবনভোর চালু চা সিগাড়া খেয়েছি। আজকে হঠাৎ স্পেশাল কথাটা শুনে একটু অবাক হলাম ১০০-স্পেশাল চা সিগাড়া এলো, সত্যিই স্পেশাল! অপূর্ব চা। সিগাড়া দুটোও বেশ বড় সাইজের। খেতে চমৎকার লাগছে, চালু জীবনে প্রথম স্পেশালের আবাদ। আগেও কয়েকবার সিগাড়া এ দোকানে খেয়েছি, তবে স্পেশাল নয়। জিজ্ঞেস করে জানলাম স্পেশাল সিগাড়া ‘ডালডা’র ভাঙ্গা। ‘সরকার মশাই তা’হলে ‘ডালডা’র ভক্ত’। কথাটা মুখ থেকে লুফে নিয়ে সরকার মশাই শুরু করলেন—‘ভক্ত কি মশাই, সাধক বলুন। নিজেইতো দেখেছেন ‘ডালডা’র ভাঙ্গাতে সিগাড়ার বাদ কি চমৎকার হয়েছে।’

কথা পেলে আর বাবে কোথায়, সরকার মশাইয়ের চিরাচরিত স্বভাব। ‘আমার বাড়ীর সব রান্নাই ‘ডালডা’তে হয়। আর শুধুর তুলনায় দামেও খুব সস্তা কিনা’—এক নজর বগুটার দিকে তাকিয়ে নেন রঘুনাথ সরকার। ‘এমন জিনিষ আর চয় না।’ সরকার মশাই বোধ হয় খামবেন না। বাধা দিলাম না। ছুটির দিন। তেমন তড়া নেই। তবু এবার ফেরা দরকার। নইলে হয়ত চানের আবার জল পাবো না। ‘সব সময় সিগাড়া টিনে। গুলো মরলা ভেজালের ভয় নেই। তারপর এর প্রতি আউন্সে কোম্পানীর লোকেরা ৭০০ ইন্টার জাশনাল ইন্টিনিট ডিটামিন ‘এ’ এবং ৫৬ ইন্টার জাশনাল ইন্টিনিট ডিটামিন ‘ডি’ জুড়ে দেয়।’ এবার কিন্তু কথার মাঝে কথা বলতে হলো। ‘ডালডা’তো আমি খারাপ বলিনি সরকার মশাই।

সরকার মশাই মুহুর্তের জন্ত থমকে গেলেন। ‘ওহো, তা’হলে আপ-নিও ‘ডালডা’র ভক্ত বলুন, একা আমার বাড়ি চাপাচ্ছেন কেন।’ হোঃ হোঃ হাঃ অটহাসিতে ফেটে পড়লেন রঘুনাথ সরকার। ভাবখানা একে-বারে বেন যুকু জিতে এলেন। আমাকেও হাসতে হলো, সরকার মশাই এখনও তবে আমার অবস্থা বুঝতে পারেননি। মেসের হাল হকীকৎ তাঁর জানা নেই। পাঁচুর রাঁধা ডালের কথা মনে হলে, চোখ দুটো হলহলিয়ে ওঠে। শুধু এক বাটি জল, ডালও নয়। গামছা দিয়ে ছেঁকলেও হয়ত ডালের দানা পর্যন্ত পাওয়া বাবে না ১০০-যাকগে সে কথা। পাঁচুর ও শেষ নয়। দোষ আমাদের ভাগ্যের। চোখের ওপর কত পরিবর্তন দেখছি। পথ-খাট, ঘর-দোর, লোকজন সবই পাণ্টাচ্ছে। সরকার মশাইয়ের দোকানটারও পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের এই এক ঘেঁষে জীবনটাতে কি পরিবর্তন আসবে না? এ প্রশ্নের জবাব মোশা ভার ১০০

স্পেশাল চা সিগাড়ার দাম চুকিয়ে মেসের পথ ধরলাম। বীরে বীরে দোকানটা বটগাছের আড়ালে চলে যাচ্ছে। মোড় ঘুরলাম, এবার সোজা পথ। একটু পরেই পৌঁছে বাবো, মাথার আজ নানা চিন্তা উঁকি মারছে—মাথার আজি। একদিন এ মেস জীবনেও পরিবর্তন আসবে, হয়ত আমাদের মেসের খাবারও ‘ডালডা’তেই রান্না হবে ১০০

অদমাগু ডাইরী। আজ এখানেই শেষ করি—



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

[লেখিকার অসুস্থতা বশতঃ গত বৎসর মাস 'বর্ণালী'

প্রকাশিত হয় নাই।—স]

উপকাগটি কিছুদিন বন্ধ ছিল, তাই ফের শুরু করবার আগে
পূর্ব স্মৃতি একটু ঘরিয়ে দিয়ে নিচ্ছি—

রক্তের দেওয়া টাকা জয়ার মার ভাঙে তুলে দিয়ে মজু
নিরুদ্বেগ মনে বইপত্র গুড়িয়ে পড়ার মন দিয়েছিল। যে
মেয়ে জানে তাকে কাজ করতে হবে—অনেক কাজ, যে মেয়ে
জানেন তাকে বড় ভতে হবে—অনেক বড়, যে মেয়ে মুখের
ওপর দিয়ে বয়ে বাওয়া বাতাসকে কানে কানে বলে যেতে
শোনেন 'ভগ্না মেয়ে এগিয়ে চলো' সে মেয়ে আর যে কাজেই কীক
হাথুক আর কীকি দিক, পড়ার ব্যাপারে কীক রাখে না কীক দেয়
হা। জয়ারের দিকে একটু নিশ্চিত হতে গেলেই বিকিণ্ড মনটাকে
মজু গুটিয়ে নিয়ে এসে নিষিদ্ধ কবেছিল বই-এর পাতায়। কিন্তু ওর
গ্রন্থাগারটাই বোধ হয় এমন চলছিল যে তারা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে
বেড়াচ্ছিল। জয়ার আত্মহত্যা করতে বাবার খবর পেয়ে ফের দৌড়োতে
হলো ওকে বইপত্র কেনে। কিন্তু কেবল দৌড়োলেই ছোট্ট ছুটি,
ছুটি ছুটি উপর দিয়েই ব্যাপারটা যদি মিটত তবুও ভালো
ছিল। জয়ার প্রাপ্টবুদ্ধি শুধু বিশব সীমা পার করে জানতে
বন্দন ওর অমন নিশ্চিত্যের টাকা কটা এক সন্ধ্যার হাসপাতালের
হাওয়ার হাওয়া হয়ে উড়ে গেল তখন এতদিনে সত্যি চোখে
অন্ধকার দেখল মজু। এখন কি করে কি করবে সে? কোথা
থেকে সে একদিকে জয়ার হাসপাতালের ওষুধ পথের বোগান
দেবে, অন্যদিকে জয়ারের বাড়ীর প্রতিদিনের অন্ন সাহায্যের
ব্যবস্থা করে চলেবে। না, বাঁচবার উপায় নেই—আগে বা দর
বাঁচবার উপায় ছিল না আজও তাদের বাঁচবার উপায় হয়নি।
হুই, বাঁচেনি—নীল, তাকে বাঁচাতে পারেনি। জয়া, জয়, জয়ার
মাও বাঁচবে না—সেও তাদের বাঁচাতে পারবে না। সে পাগল—স
পাগল—সে উদ্ভ্রাণ, তাই এ দুঃসাহস তার হয়েছিল।

ও পালতো। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়ে মৌরীর গিলে
কোঠার দরজা সুঁটে নিন্ত। কাজ সাধ্য ছিল সেখান থেকে ওকে
টেনেও কের করে জানতে পারে। ও জানতো না জয়ার চিকিৎসা
হচ্ছে কিনা—অন্যাহারী ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসে
জয়ার বা ওর পারের শব্দের অল্প পল-বও শুণছেন কিনা। ও
জানতো না ওর বাকী যেনে আলা ওষুধের বিল নিয়ে সমতা

কি করল আর ওকে। কি ভাবলো ও জানতো না জয়া
হাসপাতাল থেকে রক্তশূন্য রোগী দুর্বল পায়ে বাইরে বেরিয়ে
এসে ওকে খুঁজত কিনা। ওকে না দেখে ওর ফাকাসে মুখের
মালা টোটো দুটো খরখর করে কঁপে উঠত কিনা। যদি
ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে সে গ্রাস ওর গলা দিয়ে নামতে না
চাইতো, যদি তা উগরে ফেলে দিতে হতো তবু না—তবু সে খয়ের
দরজা খুলত না, কিছু জানত না। কিংবা হয়ত ওর কানে এগিয়ে
চলার বাণী বয়ে আনা বাতাসকে ওর রক্ত দরজার কাছে ঠাঁড়িয়ে
পড়তে দেখে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে নিন্ত। তারপর অঁচল দিয়ে
কপালের খেদবিলু মুছত। কি যে সে করত আর কি যে সে করত
না কে জানে, যদি না 'রক্ত আছে' এই একটা কথা ওর ভেতর মনে
অন্তঃসলিলা নদীর মতো বইতে না থাকত।

অবশি শুধু যে ঐ সেদিনের টাকা দেওয়ার রক্তই রক্তের উপর
এটা ভরসা ও মনে মনে পোষণ করছিল তা নয়। রক্তের বহু
বিদেশিনী বান্ধবী আছে। তারা যদি কেউ বালা শিখতে চায় এক
রক্ত, তাকে তেমন একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেয় তবে তার অশেষ
উপকার হয় শুনে রক্ত বলেছিল, সে নিশ্চয়ই দেখবে। তার বই
যোজ় নিতে মজু, এর মধ্যে আরো কয়েক দিন আসা বাওয়া
করেছে রক্তের কাছে। আর এই বাওয়া আসার ভেতর দিয়ে
মজুটি সব্বন্ধে ওর মনে যে ধারণা গড়ে উঠেছে সেটা স্মরণও
বটে, প্রীতিপূর্ণও বটে। লোকটি বুদ্ধিতে ব্যবহারে আন্তরিকতার
উজ্জল। এর কাছে এসে বসে সময় ভালো কাটানো যায়। এর
সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। বিনা দ্বিধায় এসে হাজির
হওয়া যায় প্রয়োজনে—একটি মানুষকে বন্ধ বলে গ্রহণ করার ভয়
আর কী চাই? বিশ্বাস?

হী, বিশ্বাস বলে একটা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু আছে বৈ কী। প্রেমে
প্রীতিতে ভালোবাসায়, কাজে কথায় আন্তরিকতার বা মজুযায়ে
কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল—একজনকে যে চোখোচোখি
দেখছি, যে ভাবে চলছি তার রে ব্যবহারটুকু আমাকে তার কাছে
বার বার ব্রিয়র ফিরিয়ে এনে হাজির করে দিচ্ছে সেটুকুর
ওপরও নির্ভর থাকা চাই বৈ কী। কিন্তু বিশ্বাসের প্রতি
কোন অবিশ্বাসই এখন পর্যন্ত ওর মনে গড়ে ওঠেনি। এ বয়সটাই
হলো মজুদের বিশ্বাসের বিশ্বাসের বাতাস বইতে দেখার। মৌরী ওকে
রক্ত সব্বন্ধে বতই অবহিত করুক, মজু রক্তকে স্মরণ হিসাবে গ্রহণ
করে নিয়েছিল।

আর রক্তের মজুকে ভাল লাগার বোধ হয় কোন সীমা ছিল না।
মজু যেন তার কাছে এক অপরিচিত বিষয়। মজু এলে কোর করে
থরে রাখত সে তাকে। আর কথার পর কথা তুলে শুনত কেবল
মজুর কথা। কোন কথা আজ আর বাঁকী নেই মজুর বা রক্তের
শোনা না হয়ে গেছে। ছোড়না বড়ল। বৌনি থেকে মৌরী স্মরণ
নীল কেউ আজ অপরিচিত নয় রক্তের কাছে—অপরিচিত
নয় জয়া, জয়, জয়ার মা। ছোড়নার বিয়ে ভালার কাহিনী
শুন গেছে সে চুপচাপ সিগারেট খেতে খেতে। সমস্তার রূপের
কথা শুনে চোখ দুটো কুঁচকে ছোট করে একটু মুখটেপা হালি
হেসে বলেছে, আচ্ছ। মৌরী স্মরণের গল্প শুনতে শুনতে
সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার কি মনে হয় ডাক্তার আর
আসবে না? তোমার তাই মনে হয়। দিদির মুখা স্মরণের

বিঃ—তা সে বুঝবে কি করে, ভাববে কি করে? কতটুকু বোঝ
তুমি ন? আমি বলছি, দেখো ডাক্তার ঠিক একদিন এসে
উপস্থিত হবে। আচ্ছা, আমার কথা তোমার দিকি বলেছ?
—বলেছ। কি বলেন তিনি আমার বিষয়ে?

হেসে উঠেছিল মজ।

—এমন করে হেসে উঠলে যে?

—এমনি।

—ওঃ, লোকটি আমবেই পছন্দ করেন নি বুঝি? তা গল্প যা
জনলাই তাতে আমাকে তার পছন্দ হবার কথাও নয়। তুমি যে
আমার এখানে আস এ কথা তিনি জানেন?

—না, জানেন না।

—জানলে আসতে দিতেন না?

—বাধা দিতেন।

—তোমার দিকি তো তোমার ভীষণ প্রিয়?

—ভীষণ।

—তবে—তবে তার কথা শোন না কেন?

—বতই প্রিয় হোক আর বতই ভালবাসা থাক একজনের
সব কথা আর একজনের কিছুতেই সব শুনে চলেতে পারে না বলে।

—তবে তুমি তোমার দিকির অব্যাহত হয়েই এখানে আস?

—কিছুটা—

—আই আম লাকি।

নীলের কথা শুনে শুনে কোঁককে কোঁকুলে আর ঠুংরুকে
বকবক করে ওঠে রক্তের ঢোখ—নীল ধনীর লেখা লিখে দেয়।
কাজটা সে এত খুশী মনে করছে যে বেগে ছুঁতে হয় মজুর। নিজের
লেখা অপরের নামে দেওয়া—কোভের কথা নয়? কিন্তু নীল
বলে, ঈশাতপ নিরস্ত্রিত ঘরে বসে মূল্যবান সিগারেট টানতে
টানতে, মূল্যবান কাপে চা খেতে খেতে নিজেকে তার মনে হয়
সহ্য। অপরের চিন্তা নিয়ে চিন্তা করতে লিখতে পীড়াদায়ক
মনে হয় না তার? মজুর জানতে চাইলে জবাব দেয়, তার
চাইতেও অনেক বেশী পীড়াদায়ক চিন্তা মনে হয় তার বসে বসে
পেটের চিন্তা করা। নীল বলে, নির্বোধ ঘ্যানঘেনে প্রিয়জনের
অবস্থা হাবীর মতো নাকি তার একঘেয়ে ঘ্যানঘেনানি। তাকে
ঠাণ্ডা না করে উপায় কি অস্ত কোন কাজে মন দেয়—

চিবুকে হাত বুলাতে বুলাতে মজুর কথার মাঝখানে হঠাৎ
বলে ওঠে রক্ত—ভেরী ঠুং রাইডেল।

নিভাত অপ্রাসঙ্গিক অবস্থায়িত কথা ধরে উঠতে পারল না
মজুর। রক্তের ককশ করে তোলো বুকের দিকে তাকিয়ে বলল—
রাইডেল—হানে?

—রাইডেল মানে প্রতিদ্বন্দ্বী।

—এখানে কথাটা কোথা থেকে এলো?

—জুু কথা কেন আসবে। বাড়িও আছে। তোমার
কথার ভেতর গিয়ে থাক দেখতে পাচ্ছি আমি তারই কথা বলছি—
কোরাইট এ পায়সোনাগিটি।

—তাই বলুন, পায়সোনাগিটি। রাইডেল বলছেন কেন।

—তা আমি কি কল্পনা বল। তিনি আমার কাছে যে রূপে
দেখা দিলেন।

ইউর কথা, তার চার পয়সার বাজিট মিলানোর পর তখন
একত নীয়ে। জয়ার কাহিনী শুনেছে মজুর সাধনের
প কুর তিন চার হাতের ভেতর পায়চারি করতে করতে। মজুর
এ খোজের ব্যাপারটা এতদিন রক্তের বোধগম্যতার বাহিরে
ছিল। ওদের বাড়ীর অবস্থা সে জানে। বতীনবাবু মজুর উপাধানে
নির্ভর নন। এতদিনে মজুর টাকার প্রয়োজনের রহস্য উদ্ঘাটিত
হলো রক্তের কাছে। আছে আছে জিজ্ঞাসা করলো সে—
আমি তোমার জন্ত কি করতে পারি?

বত মন দিয়েই শুনে থাক, প্রোতা কোন গল্পের ভেতর প্রবেশ
করছে আর কোন গল্পের বাহিরে ঝাঁড়িয়ে আছে, গল্পকারের পক্ষে তা
বুঝতে কষ্ট হয় না। চুটর কথা বত জবাব বেদনা নিয়েই মজুর বলুক,
রক্তত গভীরভাবে শুনে শুনে বলেছে বলে—জয়ার কাহিনী তার
অন্তর স্পর্শ করছে ঠিক যেমন একটা সার্বিক উপভাস আমাদের
অন্তরাত্মতিকে নাড়া দিয়ে বার ঠিক তেমনি—এ বুঝিল মজুর। কিন্তু
সেজন্ত রক্তের প্রতি ধারণার মান তার নেমে এলো না। কারণ
রক্তকে সে বা চিনেছিল সে চেনার কোন আঘাত এতে পড়ল না।
রক্তের ‘আমি তোমার জন্ত কি করতে পারি?’ জিজ্ঞাসার জবাবে
বলল সে—আপনার বিদেশী বান্ধবীদের সঙ্গে একটু বোগামোগ
করিয়ে দিতে পারেন।

—আর কি করতে পারি বল?

—আর কি করতে পারেন! সব কথা তো আপনার দিকে
তাকিয়েই খেমে রয়েছে। না করতে পারেন কি আপনারা।

—আমার করার কথা বলছিলে। আমি তাই একবারেই জন্ত
জগতের মাছুর। তোমার করার আমি কি কাজে আসতে পারি
তাই বল।

—বলুক চালাতে জানেন?

একটুও বিপদ হলো না রক্ত মজুর প্রেরে। জবাব দিল—না।

—লড়াই করতে পারেন?

—উঁহু।

—তাও না। একটু ঘেন ভাবল মজুর। তার পর, আচ্ছা
আমুন পাঞ্জা কবে দেখা থাক গায়ের জোরটা আপনার কেমন।
সামনের টেবিলটার ওপর কতই বেখে পাঞ্জা লড়ার ভরিতে হাত
বাড়িয়ে দিল সে রক্তের দিকে। রক্ত হাত মিলালে এক চাপে
তার হাতটা টেবিলে নামিয়ে ফেল বলল—ভাবছেন বুঝি ইচ্ছে করে
হায়সেন?

—নয়?

—কখনো নয়। হাব—হার ইচ্ছে করে বাহুর তখনই হার
বখন ঠিক জানে হার অনিবার্য।

হেসে উঠল রক্ত। বললো, আর কোন কারণে হার স্বীকার
করে না?

উঁহু। কিন্তু আপনি কি করে আমার কাজে আসবেন বলুন।
মাছুরের কাজে আসে হয় গায়ের জোর নয় টাকার জোর তো?

—অপর জোরটা পরীক্ষা করে দেখো।

—টাকার?

—হী।

—সেটার পরীক্ষা সেওয়াও আমার মনে পড়ে।

—বলো কি! সেটাই পরীক্ষা দেওয়াও তোমার হয়ে গেছে।
কবে হলো? পুরীকার বোকাটো কি?

—ভালো নয়।

—ভালো নয়! এবার কার কাছে হারলাম গো?

হেসে কেলল মল্ল। বললো—হেরেছেন আমার কাছেই।
হয় কি এক চেহারা হয়। কোথাও হয় শারীরিক শক্তির কোথাও হয়
মানসিক শক্তির। ভাবছেন তো, মেরেটা বলে কি। এই সেদিন
সব সন্ত সাধা চেক সহ করে বিলাম। একগোছা টাকা বিলাম আরও
দেওয়ার প্রস্তাব বাড়িয়ে ঘরে বসে আছি—তা ছাড়াও কত দেওয়া
দিতে আপন চোখে মেরেটা দেখছে—সেই মেরে আমাকে এমন কথা
বলে। কিন্তু আপনিই বলুন, এগুলো কি কোন শক্ত দেওয়া না
শক্তির দেওয়া? টাকার পরিমাণের তুলনায় এমন কিছু অক্ষের
দ্বারা দান সবাই করতে পারে। আমি পাঁচ পানি—কেউ পারে
কণ, আপনি না হয় পানয়ে হাজার। কিন্তু পানয়ে দিতে সব?

—রক্তত হুখ খুলতে বাবার আসেই মাথা ধোলাতে দোলাতে বলল
উঁহ, পানয়ে না। হাঁ নেও, হাঁ নেও করতে করতে সরে পড়ুন।

—সরে পড়ি—

সরে পড়ুন না তো কি। মনে নেই সেই সাধা চেক দেওয়ার
দিনের কথা? বললাম, বা খুদী অস্ত্র বসাবো? বললেন, বস।
বললাম, তারপর যে আর আমাকে দেখে দিন ভালো বাওয়ার
কথা আপনার হুখে আসবে না। বললেন, আসবে। তুমি
বোঝ এসো। বললাম, এমন একটা করে চেক বোঝ দেবেন?
বললেন, বোঝো। তারপর যে দিন পারাবো না, তুমি খাওয়ার
আমার। কিন্তু বোঝ বললাম, তবে অনর্থক নিত্যদিন চেক কাটার
ছাড়া মাটা বেখে লাভ কি? একবারেই দিয়ে দিন না সব। আজ
থেকে আপনার কিছু নয়—সব আমার। শুনে এমন ঘাবড়ানোই
দামড়ে পেলেন—এ যে বললাম, হাঁ নেও, হাঁ নেও করতে করতে
তাড়াতাড়ি দেবোকে থেকে কিছু নোট এনে ব্যাগে ভরে দিয়ে বিদায়
করলেন আমাকে—

হাট, হাট করে সমস্ত ঘর ভরে তুলে হেসে উঠেছিল রক্তত—জীবণ
বাঁকে গিয়েছিলাম বুঝি।

কথার বার্তার ঠোঁড়কে পরিহাসে এমন একটা মধুর এং
পরিচ্ছন্ন সন্দর্ভ মল্লর সঙ্গে রক্ততের গড়ে উঠেছিল যে, হাসপাতাল
থেকে বেরিয়ে এই রাতের বিনা ছিয়ার চলে এসেছিল মল্ল রক্ততের
এখানে—বলিও এর আগে কখন সে এখানে রাতের আসেনি, এসেছে
কলেজে বাবার হুখে। যে সময়টার রক্ততের কাছে অভ্যাগতের ভিড়
থাকেনা। এক তার দরকার লটকানো থাকে 'ভোট ডিসটার্ব' কার্ড।
তবু তখন যে কেউ কেউ না এসেছে বা হু'একজন মহিলাকে
আসতে বসতে মল্ল না দেখেছে তা নয়। কিন্তু সেই আসা বাওয়া
বলার কখনো এমন কিছু দেখেনি বাতে যন বিরূপ করে ভোলে;
কড়ি কুণ্ডিত হয়। তাই কোম জানান না দিয়ে রক্ততের ঘরে এসে
প্রবেশ করতে তার মনে কোন প্রায় জাগেনি—না, এমন একটা
অবস্থার সামনা সামনি হবার জন্য কিছুমাত্রও প্রস্তুত ছিলনা সে।

তা সন্মানে মল্লর কটা ব্যাপার সামলাবার জন্য প্রস্তুত হবার
সময় পায় বা প্রস্তুত হয়ে ঘটনার বুধোদগি হয়। কটা ঘটনা
আগে থাকতে সজ্জ্ব দিতে দিতে আসে। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের

মতো ঘটনার পায় তো কোন কটা বাবা থাকেনা। সে ভক্ত কিছু
নয়। জীবনে আকস্মিকতার যেমন শেষ নেই তেমনি তা সামলাতে
মল্লর শিখে কলেজে। এই অবস্থায় একমাত্র করণীয় বা ছিল
মল্লর পক্ষে সেটাই করছিল সে অর্থাৎ যেমন অজ্ঞাতে প্রবেশ
করেছিল তেমনি অজ্ঞাতে বেরিয়ে বাচ্ছিল ঘর ছেড়ে। কিন্তু মল্ল
যখন দেখল—যে রক্তত যেমন ছিল তেমনি থেকে শুধু বুখটাকে
একটু ঘুরিয়েছিল আগছককে দেখবার জন্য, ওকে দেখামাত্র সেই
রক্ততের নিবিড় বাহুবন্ধন বুখটাকে বিকল হয়ে খলে পড়ল মেরেটার
শরীর থেকে তখন চলে বাওয়ার উত্তম মল্ল হঠাৎ যেন রক্ততের এই
দুর্বলতার ভিত্তের উপর পাড়িয়ে পড়ল শক্ত হয়ে।

পরম মেহের পাড়াকে নিজের বেতাল দেখে কেলতে দেখলে
শুক্লবাসী দুঃসহ লজ্জার মরে বেতে বেতে যে ভাবে উল্টো তিরস্কারে
তিরস্কৃত করে ওঠে, ঠিক তেমনি ভাবে ওকে তখন বলে উঠল রক্তত—
আঃ মল্ল, তুমি এখন এসেছে কেন এখানে! তুমি বাও! তখন
মেরেটা টান করে জবাব দিল মল্ল—না।

লাল টকটকে বুখটা আরো লাল হয়ে উঠল রক্ততের—তুমি বাবে
না বলছ?

মল্ল তাই বলছে। হাঁ, মল্লচরিত্রের সব চাইতে বড় দুর্বল
দিকই বোধ হয় এটা, সে যদি একবার অপরের দুর্বলতার দিকটা
টের পেয়ে যায় তবে পুরো মূল্য পেয়েও সম্মতি হতে পারে না—
অনেক বেশী নিয়ে ফেলে।

হুইকির বোতল, সোভার বোতল পড়ে রয়েছে। টেবিলে টেবিলে
ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে খালি খালি গুয়াইন গ্রাস। প্লেটে প্লেটে
পড়ে রয়েছে ভাজাভুজির ভুজাবশিষ্ট। ছাই দান উপচে পড়ে ছাই
আর পোড়া সিগারেট নোংরা করে তুলেছে কাপেট। কোণের দিকে
কেসের ভেতর আনকোরা বোতলগুলোর সোনালী রাস্তা মোড়া মাথা
আছে সারি সারি উঠু হয়ে। কোঁচের ওপর পড়ে আছে গোটা কয়
নেটের স্বাক্ষর। উজ্জ্বল স্বরটার উপর চোখ বুলিয়ে আনতে আনতে
মল্লর হুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে
টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল সে—বসবো।

এক সঙ্গে পা কেল চলার মতো মল্লর দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রক্ততের
রক্তাভ চোখ ছটোঙা অস্থিরভাবে ঘুরে এলো স্বরটার ভেতর—খালি
বোতল, ভরা বোতল, গ্রাস, প্লেট, মেরেদের ফেলে বাওয়া স্বাক্ষর
বিছানার ওপর আধশোয়া মেরে—সাধা জবির নাইলনের শাড়ীটা
তার দেহের উপর নিয়ন আলোর বিকস্মিক করছে যেন একটুকরো
রূপালী রোদের মতো। আর দেখা যাচ্ছে ঠিক যেন নগ্ন দেহের
উপর রোদের চারের টাকা একটা পড়ে থাকা নিরাবরণ দেহ—
ছটকট করে উঠল রক্তত—প্রিজ মল্ল, প্রিজ—আমি অমনর করছি,
ওঠ লক্ষ্মীটি।

শরীরটাকে আরো ছেড়ে দিয়ে বসতে বসতে শক্ত গলার জবাব
দিল মল্ল—আমার কিছু কথা আছে।

—না, এখন আমার কাছে তোমার কোন দরকার থাকতে
পারে না—কিন্তু দরকার থাকতে পারে না মল্ল। গাড়ী কলে দিচ্ছি,
পৌছে দিয়ে আসবে তোমায়—ওঠ। হঠাৎ যেনই মাথার নেশাটাকে
কোক-কেলে ঘূর্ণ কর্ত্তে আদেশ করল রক্তত।

কিন্তু আশ্চর্য্য বস্তু একটু হাসির উদ্ভবের পরেই করলো মল্ল তাড়ি।

অসহ্য ভাবে কের তাকালো মজু মেরেটির দিকে। ঠিক তেরনি আশ শোয়াভাবে শুয়ে আছে সে। তার এক হাতে সিগারেট। পাশে নিচু সাইড টেবিলের ওপর ওরাইন-ব্লাস। তখনো সে নিম্নলিখিত চোখে সিগারেটে টান দিয়ে ওপর দিকে ঘোঁরা ছাড়ছে, কখনো মাথাটা ঈষৎ উচু করে ধ্রুণ তুলে নিয়ে তাতে টোট ছোঁয়াচ্ছে। কোন ভাবান্তর ঘটেনি তার। ঘরে সে ছাড়া যে কেউ আছে তাও জানে না সে। একা শুয়ে অলস সময় কাটাচ্ছে সে।

কিন্তু সেটা যে সত্য নয় বোঝা গেল এবার। রক্তের অসহ্য দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিছানার ওপর উঠে বসল সে। প্রথমে টেবিলের ওপর থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে ছইকিটুকু এক সঙ্গে চুক করে ঢেলে দিল গলায়। তারপর গ্লাসটা টেবিলের ওপর ঠক করে রেখে দিয়ে নেমে পীড়ালো খাট থেকে একটু সময় স্থির হয়ে পীড়িয়ে থেকে টলমলে শরীরটাকে নিল বাতাস করে। শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে পড়ে যেমন কাপেটির ওপর লুটোচ্ছিল তেমনি ভাবে সেটাকে লুটোচ্চে লুটোচ্চেই আসছিল মো রক্তের কাছে কিন্তু নিতান্তই স্থলিত আঁচল পায় পায় বিরক্ত করছিল বলেই হৃদয় তারপর সেটাকে কাঁধের ওপর তুলে দিল। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল—নাচের টিকিটটার একটু সন্ধ্যাবহার করে আসতে বাচ্ছি রক্ত—কিন্তু কথাটা শুনে এমন সন্তুষ্টভাবে এগিয়ে এসে তার বাহু চেপে ধরে ওর বাওরায় বাঁধা দিল রক্ত যে

অবাক হয়ে গেল মেরেটি। রক্তের আজকের ব্যবহার প্রথম অবধিই হুঁধোধ্য ঠেকছিল তার কাছে। সেটা আরো একমাত্র বাড়ল। সে ভেবেছিল, উঠে গিয়ে রক্তকে কিছু সাহায্য করতে পারে এবং রক্তের অসহ্য দৃষ্টি তার কাছে এ কথাটাই বলতে চাচ্ছে—আর উচিত তো সেটাই। রক্তের এই আতঙ্কিত বাঁধার কোন অর্থ বুঝে উঠতে পারল না সে। বলল—বড্ড বেশী খেয়েছ তুমি রক্ত। কিন্তু আতঙ্কিত হবার কারণ ছিল রক্তের।

মাথার জ্ঞান বুদ্ধি বোধ তার তলিয়ে গেছে মনের তলায়। সর্বদেহে বইছে তার ঘনিষ্ঠ নারী সঙ্গের উত্তেজনা; এ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই তৃপ্ত হাতাল মন নিয়ে সাহস নেই রক্তের মজুর সাহচর্যে বসে থাকে। কারণ রক্ত জানে, শিল্প যেমন আত্মন নিয়ে খেলতে ভয় পায় না আত্মনকে সে চেনে না বলেই মজুর অনেক খেলা, অনেক সাহস সেই জাতীয়। মেরেটিকে হাত ধরে কোঁচে বসিয়ে দিয়ে পকেট থেকে ক্রমাল বার করে ঘাম চট্টতে মুখটা মুহূর্তে মুহূর্তে রক্ত বললো—তুমি বোস।

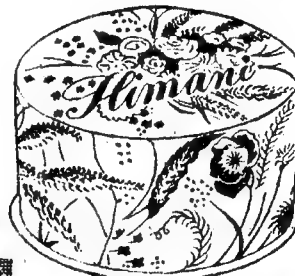
কিন্তু রক্ত হাত ছেড়ে দিতেই কের উঠে পীড়ালো মেরেটি। বললো—ডাট বি সিগি। আমি তো পালিয়ে সাচ্ছিনে। শুনে না ওরা যে বলে গেল—নাইট ইজ ষ্টিল ইয়াং—বলে বরকর করে হেসে উঠল সে। তারপর বেহের প্রতিটি জন্মের সফলতন আঁহানে যেন রক্তের শরীরময় সাগর তাত্তব তোলার টেউ খেলিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

হিমালো

বিউটি পাউডার

রূপের জোলুস বাড়ায়

বহু আবরণের মত মুখশ্রীকে আবহাওয়ার দাক্ষতা ও বরলার হাত থেকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ফ্রন্ট 'শেড'-এ পাওয়া যায়।



হিমালো প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা-২

হুই হাতে চুলগুলো ছুঁতে করে ধরে কিছুকাল একই ভাবে ঠাঁড়িয়ে রইল রক্ত। তারপর কোঁচে বসে মাথাটা কোঁচের পেছন দিকে কেসে ঢোখ বন্ধ করল।

মজু টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখা ওর ব্যাগটা কেব কেলের ওপর টেনে নিয়ে তার ওপর খতনী চেপে বসে বলল—আচ্ছা। ইরাং না হলে আপনাদের কিছ ভালো লাগে না না? কেন মথারাতটা কম লুন্ডর নাকি—আর শেব রাতটা তো রমণীয়। শেব রাত যখন যুগ্মবর্ণের মতো লাল টুকটুকে ভোরের টুকরোটুককে বর্ণ করে তুলে রাজাপাট ছেড়ে নিজেকে নিয়ে আঙে আঙে মিলিয়ে থাকে, দেখেননি তো তার সেই উদার বিদায়।

রক্ত যেমন ছিল তেমনি থেকে ক্রান্ত গলার বলল—তুমি কি বলবে বল।

কিন্তু কি বলবে মজু। সে কি কথা বলার জ্ঞাত এসেছিল। সে এসেছিল বিশ্রামের জ্ঞাত। এসেছিল আর্থিক প্রয়োজনের নিশ্চিন্ততার জ্ঞাত। আর এটার জ্ঞাত না এলেও পেটের ভেতর এমন একটা ছুঁপাছু জাগছিল যে, আসা মাত্র রক্ত যে খাবার ডিনটা এগিয়ে দেয় সেটারও দরকার ছিল। কি সব কথা সে ভুলেই গেছে এখন।

সত্যি এই এক আশ্চর্য বস্ত্র মন্ত্রণের মন। সে যে কখন কি করে, কেন করে তার কিছুই প্রায় সে নিজেই বোঝে না। মজুও কিছু বুঝে নয়, ভেবে নয়, কি করছে—কেন করছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র চৈতন্য থেকে নয়, শুধু করে যেতে লাগল—কারণ অন্য কিছু সে করতে পারল না। নেশার ঝোঁকে চলার চাইতে কম জোরালো নয়—ঝোঁকের নেশার চলা।

রক্তের তুমি কি বলবে বল সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে বাঞ্ছা বলে মজু ওর পৃষ্ঠকাটা বেড়ে ফেলল যে, যেন এসে পর্বত হু হুবার নবীনা বাস্ত্রি ভক্তি শুনেছে বলেই কাপতু কাটা বলে ফেলেছে। কিন্তু এবারও ওর যে জ্ঞাত আসা সেই জ্ঞাতই কথা উত্থাপন করছে। কেলের ব্যাগটা কেব টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে মজু বললো—আচ্ছা, আজকাল নাকি কোনে কোনে সব কিছু হয়—হয়?

জ্বায়ে রক্ত শুধু বলল—বল।

—হয় কিনা তাই বলুন না।

—সব না হোক অনেক কিছু হয়। তুমি কি করতে চাও বল।

মাথা বেঁকে উঠল মজু—আপনি মাথাটা অমনি করে পেছনে কেসে রাখলে, আমি কি দেহালের সঙ্গে কথা বলব।

মাথা তুলে বলল রক্ত। বলল—বল, কোনে কোনে তুমি কি করতে চাও।

—একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে চাই—আজই—একুনি।

মজু কথা শুনে এবার যেন রক্তের মনের নেশা ছুটে গেল। বলল—কার বিয়ের?

—আমার।

—তোমার। নিনিমেব দৃষ্টিতে মজু য় দিকের রক্ত কলসো—পাত্র আমি তো?

—অবশ্যই—কিন্তু খাবড়াবেন না। আপনাকে আমি হোটেল ছেড়ে গৃহস্থালী হতে বলব না। পানীয় ছেড়ে জলপান করতে বলব না। বৈষ্ণবের জীবন ছেড়ে নীলম একধরো জীবনে টেনে নিয়ে

যাবো না। প্রতিদিন মিনে রাতে সন্ধ্যার একই হুখ বেবে কাটাতে হবে এমন শীড়ালারক শাণ্ডি কখনোই আপনাকে ভোঁপ করাবো না—এমন কি আপনার সময়কে আনন্দময় করতে যে বাস্তবীরা আসেন তাদের মর্দা। মূল্যের ব্যবস্থা পর্বত আমি ঠিক রাখব। জীবন আপনার যেমন ছিল ঠিক তেমনই থাকবে।

—তোমার পাটটা তবে হবে কি?

—আমার পাট? জীবনে একটা যেন রোল অবজি আমি করবো—তবে সেটা এটা নয়। এ ক্ষেত্রে আমার রোলটা হবে একটা সাইড রোল—

—যেমন?

—যেমন—একটু খেমে মজু বলল, যেমন আপনার অর্থ সম্পদের কিছুটাও রাতে সদায়ে ব্যয় তার ভদারক করব আমি। আপনার টাকাগুলোর প্রতি আমার বড় লোভ—ঘরের চারদিকে আবার একবার চোখ বুন্ডিয়ে আনতে আনতে বলল—দেখুন না, সমস্ত ঘর ময় কেবল টাকা উড়ছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে বুক আগলে পড়ে থাকি।

বহুকণ ধরেই রক্তের জিত গলা তাকিয়ে আসছিল। কিন্তু তবু ওয়েটারকে ডেকে ডিক চাইল না সে। একটা গ্রাসে কিছুটা জল পড়েছিল, করেক টুকরো বংক চামচে দিয়ে তুলে তার ভেতরই কেসে দিয়ে গ্রাস হাতে উঠে পিড়ালো সে। তারপর কার্পেটের উপর তার অভ্যস্ত হাটাগিটি করতে করতে গ্রাসের ঠাণ্ডা জলে জিত গলা তেজাতে লাগল।

মজু কতটুকু সময় রক্তের পায়চারি করা আর জল খাওয়া দেখল চুপ করে। তার পর বলল—আমার প্রস্তাবটা কিছু বিবেচনা করে দেখবেন না?

রক্ত কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে এসেছিল। হেসে ফেলল সে। বলল—তবে বিয়ের আয়োজন করি কি বল?

হীপ ছাড়ার মতো একটা নিশ্বাস ফেলল মজু—যাক বাঁচলেন। আজ আপনি কেবল আমার অপমান করে চলেছিলেন। ঐ মেয়েটির কাছে অপমান করেছেন কেবল—চলে যাও, চলে যাও, বলে। এখন করছিলেন বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে। অবজি এখন ঘরে কেউ ছিল না কিন্তু অপমানটা তো ছিলই। কিন্তু এই প্রস্তাবটা কিন্তু আপনিই আগে করেছিলেন—রক্তকে কথাটা শুনে ওর সামনে জিন্সার চোখ ঠাঁড়িয়ে পড়তে দেখে বলল—কেন আপনার মনে নেই, দিদির বিয়ে ডেকে যাওয়ার সুবাদ সে রাতে দিতে এসে, আপনি আমার বিয়ে ডেকে গেছে ভেবে কি বলেছিলেন? বলেছিলেন—থ্যাংস লয় বয়ে গেল, বর এসো না। সবার অলক্ষ্যে সভা ছেড়ে বেরিয়ে এসো কভা বেনারসির গুড়নার বুখ ঢেকে। তারপর তরিংশার পথ পার হয়ে তার চন্দনে কুমকুমে সাজানো বুখ আর কাজলটানা চোখ ছুটি তুলে পিড়ালো এসে আপনার হুখের দিকে তাকিয়ে, মনে নেই?

মনের মধ্যে মোহ ধরে আসছিল রক্তের। কিন্তু মোহ হঠাৎ করার জ্ঞাত মজু কোন কথাই বলছে না। মোহ টিকতে বিবে কেন মজু? তার কথার বেশ টেনে বলে ছেতে লাগল—যখন আজকের রাতটাই সে রাত। কিন্তু চোখে কাজল টালার আর চন্দন কুমকুমে অলোজিন করার আজ কভার অলস

নেলি। তবে কিছু আসে জানলে সে একটি ভাল লাল টিপ পরে আসতে পারতো—জ্যা তার হুই অঙ্গলি ভরে সে আয়োজন করে রেখেছিল। এমন কি, শাড়িটা বাসিয়ে জানাও অসম্ভব হতো না। বুঝতে পারছেন না তো? না আপনাকে বলা হয়নি, বলার অবসরই বা পেলাম কোথায়? জ্যা আজ আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

জ্যাকে ধরে উঠতে পারল রক্তত কিন্তু এক টুকরো বরকের উপর হাতুড়ির খা মারলে যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে তা চারদিকে ছিটকে পড়ে রক্তের মোহটুকুও তেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছিটকে পড়ল আত্মহত্যা লক্ষটার আঘাতে। হু চোখ বড় করে তুলে জিজ্ঞাসা করল সে, জ্যা কে?

হু টোট দৃঢ়বদ্ধ হলো মজ্জ্ব। মজ্জ্ব টোটের এই দৃঢ় ভাঁজের সঙ্গে জয়ার গল্প বলে চলার সময়কার টোটের ভাঁজের কোথায় হয়ত মিল ছিল—জয়ার সব কথা মনে পড়ে গেল রক্তের।

হাতের গ্রাসটা একটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে কোচে বসে মজ্জ্ব দিকে বৃকে পড়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—তারপর?

—তারপর একটু হাসল মজ্জ্ব। গায়ের শাড়ি গুছোতে গুছোতে বলল—তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে বাওয়া হল, বন্ধ দেওয়া হল। সেলাইন দেওয়া হল, আরো কত কি করা হলো। তারপর? তারপর হাসপাতালে তাকে কিছু ভালো দেখে শ্রান্ত মজ্জ্ব সোজা আপনার কাছে চলে এলো। আপনি তাকে কিছুতেই বসতে দিতে না চাইলেও জোর করে সে বলল আর এখন সে বাবার জন্য উঠছে। টেবিলের উপর থেকে ব্যাগটা তুলে তার কিতোটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিতে দিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আর তারপর? হয়তো জ্যা বাঁচবে—হয়তো বাঁচবে না। সেদিন আপনি বলেছিলেন আপনারা হলেন নাকি একবারে অন্য জগতের মানুষের। সত্যি তাই। আর আপনারাও মতো অন্য জগতের মানুষদের হাতেই আজ সব অর্থ সব শক্তি। তাই এ জগতের মানুষদের হৃদয়ের ও শেষ নেই—স্বপ্নেরও শেষ নেই। আচ্ছা নমস্কার—আপনার লজিনীকে উঠিয়ে দিয়েছি—আপনি বসে বসে হুইডির বদলে জল খাচ্ছেন, আপনারাও রাত আর পণ্ড করবো না আমি। আশা করি যে সময়টা জোর করে বসে পণ্ড করে সেলাম সে সময়টুকুর জন্য বিশেষ কতি হবে না। আবারও আপনার এই স্বর্গীয় আসর একুশি গুলজার হয়ে উঠতে পারবে।

রক্তত জয়ার আত্মহত্যার কাহিনী শোনবার জন্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে যে ভাবে বৃকে বসেছিল ঠিক সেই ভাবেই বসে রইল অন্যদিকে।

মজ্জ্ব দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—আপনার লজিনীর নাচ ভালো সেপে সেলে ক্রিয়তে হয়তো তার কিছু দেয়ী হয়ে যেতে পারে। যদি বলেন, আর কাউকে আমি পাঠিয়ে দিয়ে, যেতে পারি। সেদিন জ্যাকে না চিনলেও আজ আমি একটু চোঁটা করলেই গুয়ের চিনতে পারব।


কতকাল যে রক্তত কোঁচের পিঠে মাথা রেখে চোখ বুজে বসেছিল কে জানে। লল-বল কিংব আসতে উঠে বসল সে। ওরোটার এসে পিঠট পড়ল অতুল খোঁজল টেমে টেমে তুলে গ্রাসে হুইডি জেল জেল

সবার হাতে ধরে দিতে লাগল। মেয়েটি এসে গ্রাস হাতে রক্ততের কোঁচের হাতায় বসে তার গলায় হাত রেখে আঁকারের তলিতে টেঁটি কুলিয়ে তুলে বলল—মেথো রক্তত, খল খল বোঁস না বেন আমি আর রক্ত খাবো না—চা খাবো। বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল সে।

এক বছর ধরে চুকে বসতে বসতে বলল, বুঝলে রক্তত, আসার সময় নীচে একটা ভিড় রেখে ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য একটু উঁকি দিয়েছিলাম। দেখলাম, তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসে যে মেয়েটি সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আর এক পাঞ্জাবী ডাইভার সবাইকে উদ্দেশ্য করে উগ্র কণ্ঠে বলছে, মেয়েটি নাকি তাকে আজ সমস্ত দিন হাসপাতালে আটকে রেখেছে। তারপর বলেছে, গ্যাংও এসে টাকা দেবে। আর একজন এখানে বাসিয়ে রেখে এখন বলছে, বাড়ী চলো। সেখানে টাকা দেবো। তার ভাড়া উঠে গেছে ত্রিশ টাকার উপর। সে ধাবে না। তাকে এখনি টাকা বিট্টির দিতে হবে। কিন্তু বুঝলে রক্তত, আশ্চর্য্য ঘের। এতগুলো চোখের উপর বীর শান্ত পার এগিয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলো এক পুলিশ। তাকে দিয়ে নব্বয় টোকাল। তারপর গাড়ীতে উঠে বসে বলল—চলো। তার সেই চলা আর তার সেই দৃঢ় কণ্ঠে 'চলো' বলা সে যেমন বিশ্বাকর তেমন প্রশংসনীয়। যেতে হলো ডাইভারকে, তবে তার বাওয়াটা হয়তো মেয়েটির জন্য নয় পুলিশের ভয়ে কিন্তু আমি বুড়ে হয়ে গেছি তার সাহস দেখে।

রক্তত উঠে কতকগুলো র হুইডি গলায় ঢেলে বিকৃত মুখটা কমালা দিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে কেঁর গিয়ে নীরবে কোঁচে বসল। [ক্রমশঃ]

JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1



সুর ও বস্তু

সুরের জন্ম হোল কবে, কোথায় তার প্রথম বিকাশ? এ নিয়ে তর্কাতর্কির আড় শেষ নেই। নানা জ্ঞানীর নানা মত, কারো কারো অমুমান, বস্তুই সুর তথা সঙ্গীতের স্রষ্টা, বস্তুই তার তত্ত্বকে তত্ত্বিতে জাগিয়ে তুলেছিলো যে সুর তার ধ্বনি প্রকল্পিত করেছে হৃদয়ের হৃদয়তন্ত্রী। আর তারই প্রতিনিধি কুটে উঠেছে মানব, কণ্ঠে। কণ্ঠসঙ্গীতের জন্মবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাই পাশ্চাত্য মনীষী বোনেশু নিছাত্ত করলেন বস্তু-সঙ্গীতের জন্মের পরই কণ্ঠসঙ্গীত পেরেছে তার রূপ। ক্রাউয়েট আবার উন্টো মতের পোষক। তিনি বলেন—বস্তু-সঙ্গীত শুধু কণ্ঠসঙ্গীতের পুরাঙ্গুণ্যময়ী নয়, তার বয়সও নিতান্ত অল্প—বড়জোর ২০০ বছরের কিছু বেশী হবে। কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক ধারাকে অহুসরণ করলে দেখা যাবে, দুটি দৃষ্টান্তের কোনটিকেই মেনে নেওয়া যায় না। 'বস্তু' মাহুষের এক পুণরিকল্পিত সৃষ্টি, শিল্পের একটি উৎকর্ষ। বস্তুবজ্ঞাত এমন কোন বস্তুই 'সঙ্গীত' আনবার আভাও পাইনি যাতে ভিন্ন ভিন্ন স্বরধর্মের সমাবেশ আছে বা থেকে অনায়াসে বিভিন্ন স্বরের উৎপত্তি হতে পারে। বস্তু সুর ও স্বর অমুবারী গড়ে তুলতে হয়, যাতে তা থেকে স্বর ও সুরের সৃষ্টি হতে পারে। এই গড়ে তোলাই শিল্প। শিল্প হৃদয়ের কল্পনার বহির্বিকাশ মাত্র। প্রতিটি শিল্পের গোড়ার কথা প্রয়োজনীয়তাবোধ, তা থেকেই হৃদয় নিজের সুবিধামুবারী করেছে কল্পনা আরাপ্রণ চৌর্য তারই রূপ দিয়েছে কোন উপাদানকে অবলম্বন করে। হয়তো কোন সৌন্দর্য—কোন সূত্র উপাদানটির বোধ্যতার আভাস দেয়। হৃদয় তার আদিম প্রয়োজন মেটাতে প্রকৃতির দানে তাই থেকে সুবিধা মত গড়তে শেখে, যার ফলে জন্ম নেয় শিল্প। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আবার ঐ গড়ে তোলার জন্ত প্রয়োজন 'কান' এর সুর বা স্বর না শুনেলে স্বরের সজ্জা আসা সম্ভবপর নয়, যাতে সে বস্তুমুবারী মিলিরে গড়তে পারবে বস্তু। তাই মনে হয়, হৃদয় সঙ্গীতকে চিনেছে প্রকৃতির দ্বারা, তাকে

পেরেছে আঁপন স্বরে আর তাকেই আঁপির চেরেছে নিজের কল্পনা মধ্যে বা থেকে হয়েছে বস্তুর উদ্ভব।

সত্যতার আলোক বজ্রিত হানে আজও অনেক জাতির সঙ্গীত পাওয়া যায় বস্দের মাঝে গান আছে, কিন্তু বাজনার কোন আভিভ নেই। অথচ এমন কোন জাতির কথা শোনা যায় না যারা গান গায় না কিন্তু বাজনা বাজায়। কাজেই বস্তু-সঙ্গীত কণ্ঠ-সঙ্গীতের পরবর্তীকালীন সৃষ্টি, এ মতবাদটিকে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। কিন্তু তাই বলে তার বয়স যে মোটে ২০০ বছর এ কথা মোটেই স্বীকার করা চলে না। তার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেই বোধ হয় মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পা তাদের জীর্ণ বক্ষে ধারণ করে আছে আজও নানাপ্রকার বস্তুর নিদর্শন, বস্দের বয়সের সীমা ৫০০০ বছরেরও মধ্যে নির্ধারণ করা যায় না কিছুতেই। বৈদিকযুগের বস্তুমুহুর্তানে নাচ ও গান একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করতো আর তাদের সঙ্গে সাহচর্য্য কোরতো বাজনা। বস্দের বয়স নিয়ে তর্কাতর্কির শেষ না হলেও তা ৩৫০০ বছরের কম নয় একথা সবাই মানেন। সুতরাং অতি প্রাচীন কালেও যে আমাদের দেশে বস্তু বা বাজনার প্রচলন ছিলো তা প্রমাণ করার জন্ত খুব বেশী কষ্ট করতে হয় না। সংস্কৃতে বাজনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—“বসতি ইতি অমুগচ্ছতি বা,” অর্থাৎ বাহা প্রতিধ্বনি করে।

সেই ধারামুবারী আজও তাই বাজনাকে বলা হয় 'সঙ্গত' (সম + গত), বা একই সাথে ও সমভাবে গমন করে।

বস্তু "সম গচ্ছতি বা সহ গচ্ছতি ইতি সঙ্গত।"

দেখা যায়, বৈদিক ভারত বাজনার শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়েছে 'সঙ্গত'-এর ক্ষেত্রেই। নাচ, গান ও বাজনা তিনের সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ ছিলো তখনকার সঙ্গীত। "ঋক যজুকে অবলম্বন করে তিন স্বরের প্রয়োগে গঠিত হোত সামিকযুগের প্রাথমিক সঙ্গীত। পরে সেই সঙ্গীতই পরিপুষ্টি লাভ করে সাত স্বরের বিচিত্র সমাবেশে। সামগানের আসল উপাদান ছিলো ঋক বা বাক্য—তাদের অবলম্বন করেই পরে সুর-সংযোগ করা হোত এবং বস্তুমুহুর্তানে প্রাধান্য লাভ কোরত ঐ বাক্যগুলিই, সুর নয়। তাই বলতে হয়, প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ছিলো বাক্য বা কথার, সুরের সৃষ্টি হয় পরে। আর বস্তুসঙ্গীতের অবলম্বন কেবল মাত্র সুর, সুতরাং তার সৃষ্টি পরবর্তীকালে হওয়াই স্বাভাবিক। আবার সামিক যুগের তিন স্বরের ব্যবহার থেকে এমন অমুমান করাও বিচিত্র নয় যে, তখন মাত্র তিন স্বরেরই প্রচলন ছিলো। মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বনিসংলগ্ন হতে যে বস্তুগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিতে নাকি সাত স্বরের সংস্থাপন আছে। ষ্টুয়ার্ট পিগগোট (Stuart Piggot)-এর অভিমতে আধুনিক স্বরগ্রাম অমুবারী গঠিত তারা ১১ এদিক থেকে দেখলে মহেঞ্জোদাড়োর সাংস্কৃতিকে বৈদিকযুগের সত্যতা বললে তুল হয় না।

বস্তু ও বৈদিকযুগ—বৈদিক কালের নির্ধারণ নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মত বিরোধের সমাপ্তি আজও ঘটেনি। কেহ কেহ মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পা হতে প্রাপ্ত কতকগুলি ঈলমোহরের সাথে

১১. Stuart Piggot mentioned as having seven tones or notes were constructed according to the heptatonic seat.—Prehistoric India, p270.

বৈদিক ঈশ্বরোহনের এবং কতকগুলি মূর্তির সাথে বৈদিক দেবদেবী—
যক্ষা, হুর্গা, নটরাজ, শিব প্রভৃতির মূর্তির সাথে শাস্ত্রগুলি লক্ষ্য করে
বলেছেন—মহোৎসবগুলো সভ্যতা প্রাথমিক তে নয়, বরং তা
ঋকবৈদিক সভ্যতার আলোকে সমুজ্জ্বল ছিলো। অতএব বৈদিক
যুগের সীমা নির্ধারণ করতে হলে তা অন্ততঃ পক্ষে ৬০০ বছর
আগে করতে হয়। সাধারণ চলিত মতবাদকে অনুসরণ করলেও
একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে, এই মতবাদের ভিত্তি অতি
যুক্তিসঙ্গত।

ডাঃ বাণাকৃষ্ণনও এই ধরনের কয়েকজনের মতবাদের আলোচনা
করে বলেছেন যে, বেদের সময় খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ শতক ছিঁর করলে
তাকে অত্যন্ত প্রাচীনত্ব দানের দাব্যেরোধ হতে যুক্তি পাওয়া বাবে
নিশ্চয়। ঋকবেদ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনত্বের দাবী রাখে
সর্বাপেক্ষা অধিক। এই ঋকবেদ-সাহিত্যের আমরা কতকগুলি
নাম পাই যাদের আচার্য সাধারণ তাঁর ভাষা বাঙ্গলা বলেই ব্যাখ্যা
করেছেন। কাজেই আমাদের বাঙ্গলার প্রাচীন সাংস্করণের বয়স খুব
কম করে ধরলেও ৩৫০০ বছরের কম হতে পারে না কিছুতেই।

ঋগবেদ-সাহিত্যের উদ্ভূত শব্দের পাখার শব্দের সঙ্গে কর্করির
শব্দের সাংস্কৃত উল্লেখ আছে। কর্করিকে সাধারণ 'বাতবিশেষ' বলে
ব্যাখ্যা করছেন। ২ আবার 'কোব্রী' শব্দটিকেও পাই যাকে সাধারণ
বলেছেন 'বীণা-বিশেষ'। ৩ ব্রাহ্মণ সাহিত্য আরও কতকগুলি
বৈদিক যন্ত্রের খবর দেয়। ডাঃ কাল্যাণ্ড তাঁর 'পঞ্চবিশ ব্রাহ্মণ এ ৪
—কর্করির, অলাবু, বরু, কশিশির্ষনি, ঐসিকি অপবাতলিকা, বীণা',
কাল্পি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন অর্ধ বৈদিক যন্ত্র বলে। ৫ তিনি
গোদায়নযন্ত্র হতে প্রাপ্ত 'অবাতি', 'শিচ্ছোলা' এবং 'কর্করির'ও
উল্লেখ তিনি করেছেন। ঐ নামগুলি আবার সাধারণ যন্ত্রেও
পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবি ঐ যন্ত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত
ইতিহাসসিদ্ধ বলেই মনেছেন। তাঁর মতে, 'শিচ্ছোলা' আর
'পেচ্ছোরা' একই যন্ত্র এবং উহুবা কাঠে তৈরি বলে তাকেই আবার
'উহুখরী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ৬ বিবাহসম্বন্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে
অধ্যাপক কিঞ্চও বলেছেন যে বিবাহের পর সখ্যারা নৃত্য করিতেন
এবং সে নাচের সঙ্গে থাকতো বেণু ও বীণা সংযোগে যন্ত্র সঙ্গীত।
(সাধারণ, ১১১১৫৬ পঞ্চবিশ ব্রাহ্মণে যজ্ঞসম্বন্ধের বিবরণে আছে
—বেদীর পশ্চাতে যজ্ঞমানদের নারীরা বসতেন, তাদের প্রত্যেকের
হাতে থাকতো একটি করে 'কাণ্ডবীণা' ও একটি করে 'শিচ্ছোরা'।
তারা প্রথমে কাণ্ডবীণা ও পরে শিচ্ছোরাকে বাজাতেন। ডাঃ কাল্যাণ্ড
এই কাণ্ডবীণাকে বাঁশের বাঁশী ও শিচ্ছোরাকে 'সিটার'—বিশেষ
বলেছেন। শিচ্ছোরা 'কোন' এর (জওয়ার) সাহায্যে বাজানো
হোত। এই যন্ত্রগুলির উল্লেখ ব্রাহ্মণ (১১২৬—৮) ও লিটটাইন

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে 'শততন্ত্রী'—বীণার যন্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়।
তাতে বলা হয়েছে—সেটি কাঠের তৈরী এবং লাল মৃৎপাত্রের চামড়ার
আবৃত হোত। চামড়ার লোমশ দিকটাই বাইরের দিকে থাকতো।
বীণাটার শিচ্ছনের দিকে দশটি ছিদ্র থাকতো এবং প্রতিটি
ছিদ্রে ২০টি করে তার আটকান হোত। তারগুলি তৈরী করা
হোত মূছা বা দুর্বাযাস হ'তে। এক উপপাত্রীর (বাঁশের
টুকরো বিশেষ) সাহায্যে তারগুলিতে আঘাত করে শততন্ত্রী বীণা
(৪২/৫—৫) প্রভৃতিতেও পাওয়া যায়। এ ছাড়াও পঞ্চবিশ ও
ব্রাহ্মণো হোত। এই 'শততন্ত্রী'বীণার বর্ণনাও বিশেষতঃ এবং
ব্রাহ্মণের পদ্ধতি থেকে হাওঁর কথা মনে আসে। ডাঃ সৌরেন্দ্রমোহন
ঠাকুর ও আরো অনেকের অভিমত যে, এই শততন্ত্রী-বীণাই পরে
কাত্যায়নী-বীণা বলে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু কবে বা কোন
সময় এবং কে যে এই নৃত্তন নামকরণ করেছেন তার কোন
ব্যাখ্যা আমরা পাইনি। পরবর্তীকালের সঙ্গীতগ্রন্থে আমরা এই
সব বৈদিক যন্ত্রের মধ্যে 'অলাবু' কবকরিকা, 'অবাতি', 'অপবাতলিকা'
প্রভৃতির নাম বা ঐ সমূহ নাম পেলেও 'শিচ্ছোরা' বা 'কাণ্ডলীণা'র
কোন উল্লেখ পাইনি। অথচ শিচ্ছোরার বর্ণনা থেকে তাকে
একটি এসিদ্ধ যন্ত্রের মধ্যমা যে দেওয়া হোত তা বেশ বোকা যায়।

শিক্ষা-যুগের সুরযন্ত্র

নারীশিক্ষায় (২য়-শতাব্দী) বীণা ও বেণু'র কথা থাকলেও
'দায়বী' ও 'গাত্রবীণা' ছাড়া আর কোন বীণার নামোল্লেখ এতে

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে **ডোরাকিনের**



কথা, এটা
খুবই স্বাভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোরাকিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দার্ব-
দিনের অতি-
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার
অন্ত লিখুন।

ডোরাকিন এণ্ড সন প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এলগ্যান্ড ইন্সট, কলিকাতা - ১

২। ঋগবেদ সাহিত্য—২।৪০.৩

৩। ঐ—২।৩৪.১০

৪। ডাঃ কাল্যাণ্ড : 'পঞ্চবিশ ব্রাহ্মণ' (ইংরেজী সং), পৃ: ৮৬

৫। 'দিকোরাটাসি' জার্নাল অফ অর্কিটোরিক্যাল সোসাইটি,

জুলাই ১৯২৫, পৃ: ২০

৬। অধ্যাপক কিঞ্চ : 'সায়কট, ভীমা' (১৯২৪), পৃ: ২৬ (খ)

অধ্যাপক ব্যাকডোনেল : 'সায়কট, সিটারকার', পৃ: ৩৪৭

পাওয়া যায় না। এমন কি এদের নাম কখনো হাড়া আর কোন বর্ণনা নাই দেয়া। বলা "বীরবী গাজবীরা বীণে গান জাতিয়"। এছাড়া বীণা বা অন্ত কোন বস্তুরও আর স্পষ্টতর বর্ণনা নাই। শিকার নেই এবং অশরণ শিকারও সামান্য কয়েকটি বস্তুরই নাম পাওয়া যায় মাত্র। এ থেকে মনে হয়, শিকার্যুগে বস্তুর বস্তুই বর্ণনা হয়তো দেওয়া হোত কিন্তু তখন তার প্রচলন কিছুটা কমে গিয়েছিল।

মহাকাব্যের যুগে বহুসভা

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বলা রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতিতে আমরা নানা বস্তুর নাম পাই। প্রভাতে জাগরণী সন্ধিতে প্রধান অংশ ছিলো বহুসভার। তা ছাড়া বিভিন্ন অঙ্গুষ্ঠানে রাজ্যাভিষেক, বিবাহ, রাজসভার ও শবাহুগমনে থাকতো বহু ও সঙ্গীতের আয়োজন। কঠিনপীতের সঙ্গে বস্তুর সাহচর্য তখন একরকম অপরিহার্য ছিলো। রাজারূপে অঙ্গরূপে নৃত্যের সঙ্গে বস্তুর হোত বীণা। রামায়ণে বাজনাৎক বলা হয়েছে "আতোত" এবং বিচিত্র প্রকৃতির বাজনা তখন প্রচলিত ছিলো বলেই জানা যায় (সুন্দরকাণ্ড ১০।৪২)। বীণার সঙ্গে লবকুল গান করতো বলেও বর্ণিত হয়েছে। নংটি তাৎপর্য "বিপক"—বীণার উদাহরণ রামায়ণে পাওয়া যায় (সুন্দরকাণ্ড ১০।৪০—৪১)। তত্ত্বী ও লয় বলে বীণার উল্লেখও আছে (অব্যোধ্যাকাণ্ড ১৮।১২)। এ ছাড়া বহুসভারই বহুসভা (বহুসভা ৫০.২৬), বহুসভা (অব্যোধ্যাকাণ্ড ৩১।৪১), ভেরী (অ: কা: ৫০।৬০), পদব (বু: কা: ৫০.৮), দপা (বু: কা: ২২৪।২২২৫), শব্দ, তুর্ধ্য, বেণু, বংশ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। মহাভারত ও হরিবংশেও তত, বন, গুহির, আনন্দ, ভেরী-এবং বন নাম বলা, বীণা, বেণু, তত্ত্বী, বহুসভা, হৃদয়, বহুসভা, নন্দ, পটল প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

কালিদাসও তাঁর গ্রন্থে বহুসভার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মেঘদূতে বীণা ও বহুসভার প্রাঞ্জল বর্ণনা পাই।

নৃত্য, গীত বাজ কথাকুল বোধজাতকে প্রায়ই পাওয়া যায়। শোভাভারত বর্ণনার বাজনার উল্লেখ আছে। ভেরী বাজিয়ে উৎসবের কাল বোধনা করা হোত। শুভিল জাতকে "সপ্তহস্ত" বীণার বর্ণনা আছে ও তাতে যে ভাবে বীণা বাজানোর কথা বলা হয়েছে তা থেকে সে যুগের বেশ উন্নত পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। শুভিল জাতকটি পড়লেই, গান বা নাচের সহযোগী হিসাবে নয়, স্বতন্ত্র ভাবে বীণার মাধ্যমে যে কত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সাধনার রীতি প্রচলিত ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বীণা, তুর্ধ্য প্রভৃতির নাম অনাচরণ-জাতক, ভেরী বাদক-জাতক বীণা, হুল-জাতক, চূর প্রাণোত্তন-জাতক, শৌনিক-জাতক, বিদুর পণ্ডিত জাতক, কুলজাতক, প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

—ঈশ্বর মিত্র

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।]

রেকর্ড-পরিচয়

স্মৃতি যে সকল নতুন রেকর্ড সাধারণে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদেরই একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ও বিবরণী আমাদের পাঠক-পাঠিকার আগ্রহের জন্য এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

যে রেকর্ডগুলি হিজ মাস্টার্স ভয়েসের দ্বারা গৃহীত হয়েছে, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

এন ৮২৮৫৩—প্রখ্যাত গায়িকা ঈশ্বরী হুচিরা মিত্রের দ্বারা গৃহীত কণ্ঠ কবিতার রবীন্দ্রনাথের দুটি অনবদ্য গান।

এন ৮২৮৫৪—ঈশ্বরী হুচিরা মিত্রের কণ্ঠে দুটি আকর্ষণীয় আধুনিক গান।

এন ৮২৮৫৫—এতে দু'খানি হাড়া ধরনের মার্গনজীত শোনা যাবে। গান দুটি গেরেছেন শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এন ৮২৮৫৬—সাবলীলতা, লালিত্য ও মধুরের দিক দিয়ে বিচার করলে অতুলপ্রসাদের গানগুলির তুলনা হয় না। অতুলপ্রসাদের অসাধারণ গানগুলির মধ্যে থেকে দু'খানি গান এই রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে। সত্যানার প্রতিক্রিয়াপূর্ণ নবীন শিল্পী জ্যোতি সেন গান দু'খানি গেরেছেন।

এন ১১০০২।১১০০৩—"বস্তুর মতে আগমন" নামক কথাচিত্রের গানগুলি এই রেকর্ডগুলির মাধ্যমে জনতে পাবেন। গানগুলি গেরেছেন এ, কানন, নির্মালা মিত্র, সত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আলপনা মুখোপাধ্যায়।

এন ১১০০৪—"মর্যাদাপূর্ণ" ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই ছবিতে তাঁর নিজের পাওয়া দু'খানি 'হিট' গান এই রেকর্ডে জনতে পাবেন।

এন ১১০০৫—"প্রবেশ নিবেশ" ছায়াছবির দু'খানি গানও এই রেকর্ডে ধরে রাখা হয়েছে। গান দু'খানি প্রতীমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাওয়া।

যে রেকর্ডগুলি কলকাতার দ্বারা গৃহীত হয়েছে, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

জি-ই ২৪১৭৮—বাঙালীমাত্রকেই আকুল করে তোলে অবিস্মরণীয় কবি রজনীকান্ত সেনের অতুলনীয় গানগুলি। বাঙালী-জগৎ এদের আবেদন চিরকালীন। এই রেকর্ডে তাঁর দু'খানি গান গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে একটির নাম "কবে তুঁতি এ মর"—প্রতিভাময়ী শিল্পী ঈশ্বরী পূর্ববী মুখোপাধ্যায় তাঁর দরদ, লালিত্য ও গভীরতা সমন্বিত যুগজীবী কণ্ঠে গান দু'খানি গেরেছেন।

জি-ই ২৪১৭৯—দুটি মনোহরতর আধুনিক গান এই রেকর্ডে জনতে পাবেন জনপ্রিয় শিল্পী যিৎনে মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে।

জি-ই ২৪১৮০—এই রেকর্ডে দু'খানি অপূর্ণ সুরসমন্বিত গান জনতে পাবেন। গেরেছেন ঈশ্বরী প্রতীমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বরী প্রতীমা যে একজন শক্তিময়ী কণ্ঠশিল্পী এবং বাংলার একজন সার্থকনাত্রী সুরসাহিকা—এই রেকর্ডে ধরে রাখা তাঁর পাওয়া গান দু'খানি সেই কথাটাই প্রমাণ করে।

জি-ই ৩০৪০৪—"অবাক পৃথিবী" ছায়াচিত্রে পাওয়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্দ্যানের দু'খানি গান এই রেকর্ডের মাধ্যমে জনতে পাবেন। গান দু'খানি সত্যিই যথেষ্ট হৃদয়স্পর্ক।

জি-ই ৩০৪০৩।৩০৪০৪—"হাসপাতাল" ছবিতে পাওয়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সত্য মুখোপাধ্যায়ের গানগুলি এই রেকর্ডগুলির মাধ্যমে জনতে পাওয়া যাবে।

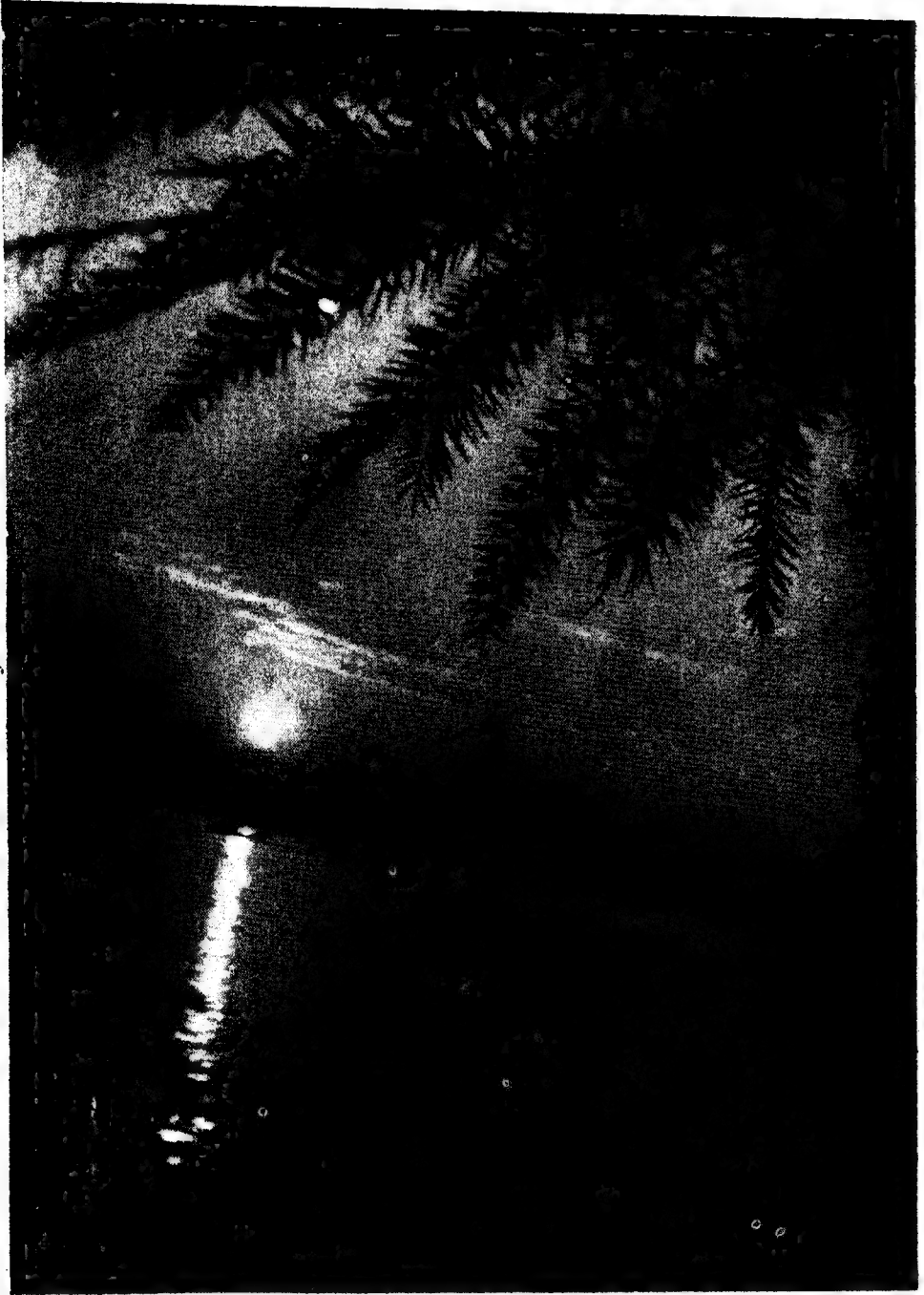


মহানিষ্ক্রমণ

(দেওয়ান-চিত্র, সারনাথ)

—মহাভের চট্টোপাধ্যায় গৃহীত





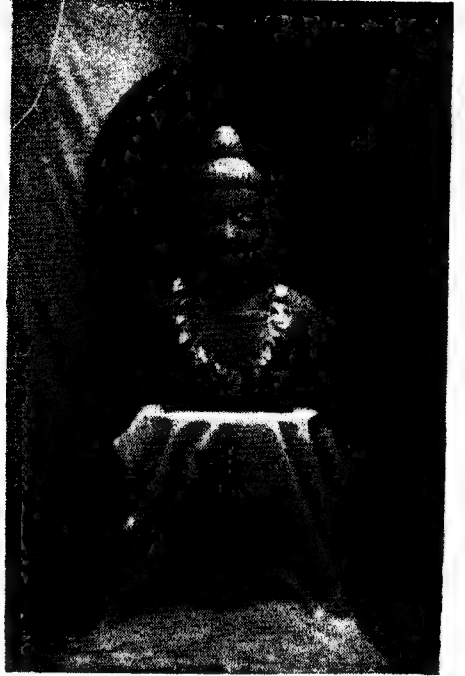
বাঁকা-চোখে

—বিমল হোস



বিশ্রাম

—দীপক ঘোষ



বুদ্ধমূর্তি

—বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় নিমিত্ত ও গৃহীত



নিঃকনে

—হীরেন আচার্য

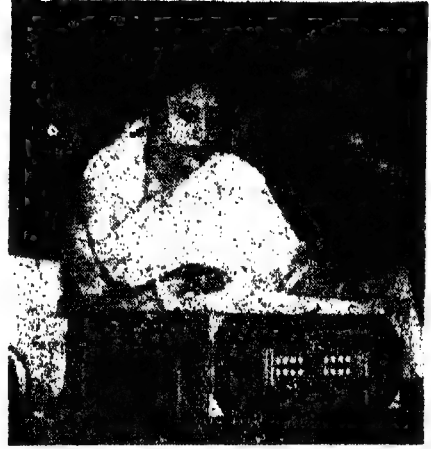
আমার কথা (৬২)

শ্রীমতী কমলা বসু

যে অল্পসংখ্যক শিল্পী গুরুদেব রচিত সঙ্গীতসম্ভারকে অন্তরের সহিত এখনও সাধনা করে চলেছেন—রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ব্যবসায়িককৃত না করে তাঁতার প্রকৃত প্রচার ও প্রসারের জন্য যত্ন প্রচারবিমুখ হয়ে আপ্রাণ চেষ্টা আত্মনে—তাঁদের মধ্যে স্বরভারী ও শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্তা শ্রীমতী কমলা বসু অন্যতম।

বার্ষিক বিনয়ের সহিত শ্রীমতী বসু বলেন—১৯২৪ সালের ১৪ই জুলাই আমি নারায়ণগঞ্জে জন্মাই। পারিবারিক স্থান হল করিমপুর কিন্তু কুচবিড়ারে বহুপূর্ব হতে সকলে থাকিতেন। আমার বাবা শ্রীপ্রমথনাথ সেন উত্তরপ্রদেশের নানা জায়গায় বিভিন্ন সার্জেন হিসাবে কাজ করে জৌনপুর থেকে অবসর নেন। আমার মাতুলদের ঢাকা বিষ্ণুপুর—দাশমহাশয় ছিলেন ভারতের ডাক-তার বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব পোষ্টমাস্টার জেনারেল ব্রজেন্দ্রকুমার সেন। মা হলেন শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। বাবার বঙ্গী-চাকুরী হওয়ার আমি উত্তরপ্রদেশের নানা স্থানে ঘুরছি। তেলেরসে স্থানীয় স্কুলে পড়ার সময় হিন্দী ভাষা শিখি। মধ্যে বাবাগঙ্গী থিওসোফিক্যাল (Theosophical) স্কুলে ভর্তি হই ও উত্তর হোষ্টলে থাকি। পরে কলিকাতা ব্রাহ্ম বাসিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়িয়া শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসি ও তথায় চইতে ১৯৪০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হই। এর পর তথাকার সঙ্গীত-ভবনে তিন বৎসর ছাত্রী হিসাবে থাকিয়া ১৯৪৬ সালে বিখ্যাততী ডিল্লোয়া পাঠ। এছাড়া উক্ত বৎসরের Tagore's Hymn পুস্তকের আমাকে সেওয়া হয়।

উত্তরপ্রদেশে থাকার সময় আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখেছিলাম। ছয় বৎসর বয়স থেকে গান আরম্ভ করি। আমাদের বাড়ীতে গানের চর্চা ছিল। আমার দাদা প্রসাদকুমার সেন আমার গান শোনার প্রথম থেকে খুব উৎসাহী ছিলেন। তাঁর কথা আমি কখনও ভুলিব না। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে দাদা মারা যান। তিনি ডাক্তার কে, এম, হারের অন্ততম জামাতা ছিলেন। একমাত্র পুত্রকে চিরকালের জন্য হারিয়ে বাবা না নিদারুণ আঘাত পান আর আমরা তিন ভগিনী শুধু বড় ভাইকে হারাইনি—সেইসঙ্গে বয়স্কদের জন্য হারিয়েছি দাদার অপরিণীত প্রভাব। বিশিষ্ট অভিনয়শিল্পী



শ্রীমতী কমলা বসু

শ্রীমতীর শাস্ত্রগীর আমার ছোট বয়সে আমার ২০টি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখান। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল যে আমরা শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করি ও গানবাজনা শিখি। উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে ব্রাহ্ম বাসিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আমার কলিকাতা ভাল লাগে নাই। তাই শান্তিনিকেতনে চলে যাই বাপ মার ব্যবস্থামত। সঙ্গীতভবনে প্রবৃত্ত শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের নিকট আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখ হয়। শান্তিনিকেতন থেকে কিয়ে আমি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষালয় 'দক্ষিণী'তে এক বৎসর শিক্ষিকা হিসাবে থাকি। শরীর ধারণের জন্য আমি 'দক্ষিণী' ছাড়ি। পরে ব্যক্তিগত ভাবে আমি কয়েকজন ছাত্রীকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখাই। বর্তমানে আমি 'গীত-বিতান'এর সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। ভারত কোম্পানী হইতে আমার প্রথম প্রামোদ্যোন রেকর্ড 'পূর্ণিমা'র মাস্তা ও 'আমার এ পথ' ব্যক্তি হয়। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে থেকে প্রথম গান করি। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৯৪৮ সাল হইতে আমি তথাকার নিয়মিত শিল্পী রইয়াছি।

১৯৪৭ সালে মহম্মদসিংহের (সন্তোষ পাট জাণী) শ্রীশৈলজেনারায়ণ বসুর সহিত আমার বিবাহ হয়। সঙ্গীতভবনের হোষ্টলে শ্রীমতী সূচিঞ্জা মিত্র, নৃত্যশিল্পী সেবা মিত্র ও আমি একত্রে থাকার পরাম্পরের প্রীতি নিবিড় ভাবে আমরা পরিচিতি হই।

চৈতালি ছপুর

অবিনাশ সাহা

তাপদগ্ধ হৃদয় ছপুর
দিকে দিকে বৃত্ত্য-পরোয়ানা
পৃথিবীর নাভিভাঙ্গ সে কি
লনবেদ্য বোমাবাজী করে।

শাখার শাখার দাপাদাপি—
কলানল ঢলে

বৃত্ত হতে থলে থলে পড়ে ফুল—কোটা ফুল
বাধের শায়কে।

তবুও তো যেতে হবে পথ
অনন্ত বিস্তৃত পথ—দিগন্ত নিলয়
হ্রদ নড়ে খেত কপোত
জস করে শান্তির পাখায়।



ত্রিগোপালচন্দ্র নিয়োগী

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন—

দুই বৎসর পূর্বে পু-বাং জেনেরার গত ১৫ই মার্চ (১৯৬০) হইতে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রিসভাগুলি এই সম্মেলন হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরে এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধিত জাতিগত বর্ধক অনুমোদিত হয়। এই দশটি রাষ্ট্রের পাঁচটি রাষ্ট্র পশ্চিমী শক্তি-শিবিরের এবং পাঁচটি রাষ্ট্র সোভিয়েট শক্তি-শিবিরের। পশ্চিমী শক্তি-শিবিরের এই পাঁচটি রাষ্ট্র কানাডা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন। সোভিয়েট শক্তি-শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্র বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, রুমিনিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন। দশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে সে সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে জেনেরার যে আশংকা এটি সম্মেলন চলিতেছে সে সম্পর্কে একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং সোভিয়েট রাশিয়া এই তিনটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে উক্ত সম্মেলন চলিতেছে। ১৯৫৮ সালের ৩১শে অক্টোবর এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত এই সম্মেলনের অগ্রগতি বিশেষ কিছুই হয় নাই। অধিবেশন দুই মাস বন্ধ থাকার পর গত ২৭শে অক্টোবর (১৯৫৯) পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৯শে ডিসেম্বর হইতে অধিবেশন স্থগিত থাকিয়া গত ১২ই জানুয়ারী হইতে পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করা সফল সম্মেলনের অগ্রগতি সন্দেহ পরে আমরা আলোচনা করিব।

গত ১৫ই মার্চ যে নিরস্ত্রীকরণ সঙ্কট আরম্ভ হইয়াছে তাহার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী এবং বহুশক্তি-শক্তিগোষ্ঠী এই উভয়পক্ষের সমসাম্যক রাষ্ট্রের যোগদান। ১৯৫৭ সালে লণ্ডনে যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হয় তাহাতে যোগ দেন ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং সোভিয়েট রাশিয়া। এই সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া যায়। অতঃপর এই সম্মেলনে পশ্চিম ও পূর্ব শিবিরের প্রতিনিধিদের যোগদানের ঘটনা এই প্রথম। যে সম্পূর্ণ নূতন পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা এই সম্মেলনের

একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সম্মেলনের প্রথম দিনে প্রথম বক্তা ব্রিটেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ওরবসলী পোঁর এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতের কথা বলিয়াছেন যে, It is beginning in an atmosphere more favourable to success than at any time since the end of war. অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তীকালের যে কোন সময় অপেক্ষা সাফল্যের পক্ষে অধিকতর অনুকূল পরিবেশের মধ্যে এই সম্মেলন আরম্ভ হইতেছে। তাহার এই উক্তি যে খুবই ঠিক এ সম্বন্ধে সত্যতা থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এবং কি উহার পরে সাফল্য সম্পর্কে অধিকতর আশা লইয়া নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হয় নাই। উভয় শক্তি-শিবিরই আজ নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে যেরূপ আগ্রহীল হইয়া উঠিয়াছে, ইতিপূর্বে এইরূপ আগ্রহ আর দেখা যায় নাই। সোভিয়েট রাশিয়া সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করিয়াছে। পশ্চিমী শক্তি-বর্গও আজ আগাপ আলোচনার পথে আন্তর্জাতিক বিরোধ সীমাসীমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পৃথিবীতে আজ যে শান্তি দেখা বাইতেছে তাহা আসলে বড়ই পূর্ববর্তী শান্তি অবস্থার মতই, সকলের মনেই এই আশঙ্কা দৃষ্টি হইয়াছে। অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ আন্তর্জাতিক বর্তমান শান্তি অবস্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্ববাসী আজ ব্যাপক ধ্বংস এবং হুমুসী শান্তি সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উভয় শক্তি-শিবিরই আজ ব্যাপক ধ্বংস এড়াইতে চায়। উভয় শক্তি-শিবিরই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অস্ত্রগুস্ত্র হ্রাসের কোন ব্যর্থতা যদি করিতে পারা না যায় তাহা হইলে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা আরও ব্যাপকভাবে চলিতে থাকিবে, বিশ্ব-সংগ্রামের রথের অগ্রগতি চলিতে থাকিবে অনিবার্যভাবে।

আলোচ্য নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য পশ্চিমী শক্তি-বর্গের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব। ১৯৫৭ সালের লণ্ডন-সম্মেলনে তাহার যে প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছিলেন তাহার সহিত এই প্রস্তাবের পার্থক্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। পশ্চিমী শক্তি-শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্র যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন তাহা তাহাদের রচিত সম্মিলিত পরিকল্পনা বা প্রস্তাব হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রস্তাব হইতে মনে হয়, তাহার। বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে সাফল্যলাভ করিতে হইলে নিজেদের জেব বোল-আনাই বন্ধ রাখিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। কি রূপে অস্ত্রহ্রাসের সমস্যাটির সমাধান করিতে পারা যায় তাহার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহিত এতটা মঠক্য হওয়া প্রয়োজন। এ 'কথা' অস্বস্তি সৃষ্টি করে, উদ্বেগ সঞ্চে উভয় শিবিরই একমত। কিন্তু এই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে হইলে পথে যে সকল বাধাবিধি আছে অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে তাহার সম্মান পাওয়া গিয়াছে। ১৯৫৭ সালের পরিকল্পনা বা প্রস্তাবটি ছিল কুণীতিবিশিষ্টের ভাবার প্যাকজ বা অগুপ্ত পরিকল্পনা অর্থাৎ ঐ পরিকল্পনা বোল-আনাই প্রণয়ন করিতে হইবে না হয় বোল-আনাই বন্ধন করিতে হইবে। আলোচ্য সম্মেলনে পশ্চিমী পাঁচটি রাষ্ট্র যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন তাহা পূর্বাপুর্বি প্রণয়ন করিতে হইবে এমন কোন বাধাবাহকতা নাই। এই পরিকল্পনার যে কোন দিক বা অঙ্গ লইয়া আলোচনা চলিতে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারিবে। যে-সকল বিষয়ে মঠক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না সে-সকল বিষয় লইয়া পরে আলোচনা হইতে পারিবে।

সাধারণভাবে ইহাই পশ্চিমী পাঁচটি রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ সেল্টেন লয়েড নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই ভিত্তিতে পশ্চিমী শক্তিশ্রমিকের প্রস্তাব রচিত হইয়াছে। অংশ পাঁচ পশ্চিমী রাষ্ট্রই বাহ্যতে একমত হইয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে সেইজন্য উহাকে পরিবর্তিত এবং সংশোধিত করিতে হইয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্ম প্রথমে ওয়াশিংটনে এবং পরে প্যারীতে আলোচনা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে পেশ করা হইবে সে সম্পর্কে ক্রান্তির সহিত একটা মতানৈক্য ঘটিয়াছিল। ‘কিশনেবল্’ বা বিভাজনবোধ্য পদার্থের উত্থাপন নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ক্রান্তি আশ্রিত করে। তাহার যুক্ত এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও রাশিয়ার হাতে যথেষ্ট পারমাণে কিশনেবল্ পদার্থ আছে। এইগুলি দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস করা বাইতে পারে এবং এই রাষ্ট্র কয়টি ছাড়া আর কেহই পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হইতে পারিবে না। ফলে ক্রান্তি উক্ত তিনটি রাষ্ট্রের সম্মরণসা পাইবে না এবং আণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রত্যাশার ক্রান্তিকে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ক্রান্তি আণবিক বোম্বাক বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতির নিরস্ত্রীকরণ, কিন্তু মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ তাহা চাহেন না। কারণ এ ব্যাপারে রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সমকক্ষ হইতে চায়। বাহা ইউর, শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারের একটা মোমাংসা হইয়াছে এবং পাঁচটি পশ্চিমী রাষ্ট্র একটি যৌথ পরিকল্পনা রচনা এবং উহা নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক পেশ করিতে পারিয়াছেন। এই পরিকল্পনা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। ১৯৫৭ সালের পরিকল্পনার সহিত উহার আর একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, উহার সহিত রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির সর্ব সূত্রিয়া দেওয়া হয় নাই। ১৯৫৭ সালের পরিকল্পনার ঐক্য সর্ব ছিল।

তিনটি স্তরবিশিষ্ট পশ্চিমী পঞ্চ রাষ্ট্রের প্রস্তাবের প্রথম স্তর প্রস্তাবিতব্য। একটি আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সন্থা গঠন করিয়া হইবে উহার প্রারম্ভ। উহার প্রকৃত কাজ কি হইবে এবং সাম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহিত উহার সম্পর্ক কি হইবে তাহা আলোচনা দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথমেই একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হইবে না এবং পৃথিবীর সর্বত্র উহার শাখা প্রাধিকার স্থাপিত হইবে না। গঠিত হইবে একটি সদর কার্যালয় বাহ্যতে অতি ক্রান্তি উহা কাজ আরম্ভ করিতে পারে। সম্মেলনে বোগদানকারী পশ্চিমী রাষ্ট্রের সৈন্তবাহিনীর সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার সৈন্তবাহিনী ২৫ লক্ষের বেশী হইবে না। অস্ত্র তাহাষ্ট্রের অবস্থা অনুযায়ী সৈন্তসংখ্যা নির্ধারিত হইবে। প্রতিষ্ঠিত অস্ত্রস্ত্র কি পরিমাণ আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সন্থার হাতে অর্পণ করা হইবে সে-সবকেও একটা চুক্তি হইবে। দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ বিক হইতে উল্লেখযোগ্য সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতিনির্বাহণ লইয়া একটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। তৃতীয় বা শেষ স্তরে নিরস্ত্রীকরণ, স্বাধীন এক শাস্তিগুণ বিধ পঠনের জন্ম ব্যবস্থা গ্রহণ

করা হইবে। পশ্চিমী পঞ্চ রাষ্ট্রের পরিকল্পনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল মহাশূন্য সাক্ষাত কার্যকলাপ এবং ক্ষেপণাস্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ। প্রস্তাবিত সকল প্রকার মহাশূন্য বান ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণ সম্পর্ক আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সন্থাক পর্বদাধিকার দিতে হইবে। মহাশূন্য ষাঁট নিষ্পত্তিও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ এই সকল ষাঁট মহাশূন্য বানের অবতরণ ক্ষেত্র হিসাবে অথবা ব্যাপক হত্যাভাণ্ডে প্রাতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। স্মৃত্যং দেখা বাইতেছে, এই পরিকল্পনার ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণের খবরাখবর দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মহাশূন্যের অবতরণক্ষেত্র পর্যন্ত মহাশূন্য সাক্ষাত সকল বিষয়ের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ব্যাপক ধ্বংসকারী আণবিক রাসায়নিক এবং জীবাণু সাক্ষাত সকল প্রকার অস্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার এবং অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণ হ্রাসের উদ্দেশ্যে মনুষ্য জগতের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের প্রথম দিনে মার্কিন প্রতিনিধিগণের প্রধান মিঃ ক্রেডোরিক এম এটন তাঁহার সফ্তভার বলেন যে, বর্তমানে যে সৈন্তবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র আছে তাহা ক্রমশঃ হ্রাস করিতে হইবে এবং কোন রাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার ক্ষমতা যে পর্যন্ত না বিলুপ্ত হয় সে পর্যন্ত যথাযোগ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থারূপে এই হ্রাসের কার্য চলবে। তিনি আরও বক্তব্যছেন যে, While we are engaged here and until, hopefully the agreements which we shall set down are implemented, my country will continue to maintain the strength necessary to assure its security and to meet its commitments to the world. তাঁহার এই উক্তি সারমর্ম এই যে, বর্তমান তাঁহার আলোচনা চালাইতে থাকিবেন এবং বর্তমান না আশাহত পক্ষে কার্যকরী করা হয় তাঁহার বেশ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার নিরাপত্তার জন্ম প্রয়োজনীয় শক্তি বজায় রাখিবে এবং পৃথিবীর অন্তর্গত দেশকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহা পালন করিবে। বৈঠকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ বোরিস পশ্চিমী পঞ্চাশকের প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন যে, তাঁহার দেশ সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চান তাহাতে সাধারণ বা পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলি নাই। নিরস্ত্রীকরণ সমস্ত সমাধানের জন্ম যে মনোভাব উহাতে আছে তাহা কার্যকরী সমাধানের পক্ষে সঙ্কেহাতীত নহে। মিঃ ক্রেডোরিক গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সাম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে নিরস্ত্রীকরণের যে সোভিয়েট পরিচয়না উত্থাপন করিয়াছিলেন মিঃ বোরিস উহা আলোচনার জন্ম আহ্বান জানাইয়াছেন। সাধারণ পরিষদ যে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ অনুমোদন করেন সে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বিভাগিতভাবে বিবেচনার জন্ম উক্ত প্রস্তাবই সাধারণ পরিষদ কামটির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ঘোড়ের উপর অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। জেনেভার যে পরমাণু বোম্বার পরীক্ষামূলক বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করার জন্ম ত্রিশকের একটি সম্মেলন চলিতেছে সে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্মেলন ১৯৫৮ সালের ৩১শে অক্টোবর হইতে চলিলেও আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

কিছু হয় নাই। সম্প্রতি গত ১৯শে মার্চের (১৯৬০) সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ-মার্কিন-রুশ যুক্ত আণবিক গবেষণার জন্ত যে প্রস্তাব দিইয়াছে একটি সম্মেলনে রাশিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছে। রাশিয়ার সশুটি হইল এই যে, গবেষণা কার্য চলিতে থাকি অবস্থার কোন পক্ষই নিরস্ত্রমানের কোন প্রকার পরীক্ষা চালাইবে না বলিয়া সম্মত হইতে হইবে। সহজে ধরা পড়ে এমন পরীক্ষা বন্ধ রাখার একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্ত রাশিয়া একটি প্রস্তাব করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট রকমের ভূগর্ভস্থ পরীক্ষা বন্ধ রাখার যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহা সহ ভূগর্ভস্থ সমস্ত পরীক্ষা বন্ধ রাখার জন্ত একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব রাশিয়া করিয়াছে। কম গুরুত্বপূর্ণ হটক আর অধিক গুরুত্বপূর্ণ হটক, আর সর্বপ্রকার পরীক্ষা বন্ধ রাখাই রাশিয়ার অভিপ্রায়। পরীক্ষামূলক বিস্তারণ বন্ধ রাখা সংক্রান্ত ঐচ্ছিক যেখানে যৌল দ্বারা ধরিয়া চালাতেছে নিয়ন্ত্রীকরণ বৈঠক সেখানে এক বৎসরে শেষ হওয়ার আশা করা কঠিন। নিয়ন্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান খুব দ্রুত এবং চাকল্যকর রূপে হইবে এই প্রত্যাশা কেহই করেন না। উত্তর পাকিস্টান গভীর আগ্রহ থাকিলেও বৈষ্যের সহিত দীর্ঘ দিন আলোচনা চালাইতে হইবে। আগামী মে মাসে প্যারীতে শীর্ষ সন্মেলন হইবে। উহাতে নিয়ন্ত্রীকরণ প্রসঙ্গই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। আন্তর্জাতিক পটভূমিকা এখন পর্যন্ত সব দিকেই অস্বস্তিকর বলিয়াই মনে হয়।

সিংহলে সাধারণ নির্বাচন—

গত ১১শে মার্চ (১৯৬০) সিংহলে যে সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেল তাহাতে শ্রীভাডুলী সেনানায়কের ইউনাইটেড ফ্রন্ট পার্টি ৫০টি আসন দখল করিয়া বৃহত্তম দলে পরিণত হইয়াছে এবং সিনেনানায়ক প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। সিংহলের প্রতিনিধি পরিষদ ১৫৭টি আসন লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে ১৫১টি আসন নির্বাচনমূলক। অবশিষ্ট ছয়টি আসনের জন্ত সমস্ত মনোনয়ন করেন সরকার। নির্বাচনমূলক ১৫১টির মধ্যে ইউনাইটেড ফ্রন্ট পার্টি ৫০টি আসন দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। পরলোকগত প্রধান মন্ত্রীর শ্রীলঙ্কাফ্রন্ট পার্টি দখল করিয়াছে ৪৩টি আসন। ইউনাইটেড ফ্রন্ট পার্টি বৃহত্তম দল হইয়াও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে না পারায় কি ভাবে প্রতিনিধি পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করিবে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নূতন সরকার যে ছয়জন সমস্ত মনোনয়ন করিয়াছেন তাহাদিগকে লইয়া সরকারী দলের সংখ্যা ঠাঁড়াইয়ে মাত্র ৫৬ জন। সুতরাং আরও ২৩ জন সন্ত্রস্তের সমর্থন না পাইলে মন্ত্রিসভার পক্ষে কাজ চালাইবার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতার থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সিংহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিজয়ানক দমনায়ক এবং তাহার মন্ত্রিসভার চারি জন সন্ত্রস্ত নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন এবং পরাজিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি তাঁহার ও তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। শ্রীদমনায়ক যে লক্ষ্যপ্রজাতন্ত্রবাদী পক্ষ দল গঠন করিয়াছিলেন সেই দলের মাত্র ৪জন প্রার্থী নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। এই চারি জন সন্ত্রস্ত ইউনাইটেড ফ্রন্ট পার্টির

সমর্থন করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাহা হইলেও স্থায়ী সরকার গঠন করিতে হইলে সিনেনানায়কের দলের আরও অন্ততঃ ১১ জন সন্ত্রস্তের সমর্থন দরকার। ইউনাইটেড ফ্রন্ট পার্টি আশা করেন যে, ছোটখাটো দক্ষিণপন্থীদের এবং কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র সন্ত্রস্তের সমর্থন তাঁহারা পাইবেন।

সিংহলের এই নির্বাচন উপলক্ষে যে প্রচার কার্য চলিয়াছিল তাহাতে নাগরিক অধিকার বিহীন লক্ষ্যবিশিষ্ট ভারতীয়দের সম্পর্কে কোন বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস দেখা যায় নাই। প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর সিনেনানায়ক সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন, “I propose to, as early as possible, try and implement the Nehru-Kotelawala agreement which was arrived at some time back.” অর্থাৎ সিংহল ভারতীয় বংশোদ্ভবদের সম্পর্কে যে নেহরু-কোটেলওয়ালা চুক্তি হইয়াছে তাহা তিনি যথাসম্ভব সত্য কার্যকরী করিতে চেষ্টা করিবেন। আগামী মে মাসে তিনি বহন কমনওয়েলথ সন্মেলনে যোগদান করিতে লণ্ডনে যাইবেন সেই সময় অথবা এরোজনে হইলে তাহারও পূর্বে এই বিষয়টি সম্পর্কে তিনি নেহরুজীর সাহিত আলোচনা করিবেন। তাঁহার এই আশ্বাস বাকী সত্ত্বেও আমরা ভয়সা করিবার মত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সিংহলের স্বাধীনতা লাভের পর এ পর্যন্ত তিনটি সরকার গঠিত হইয়াছে এবং পাঁচ জন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীভাডুলী সেনানায়কও একজন ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি পিতার মৃত্যুর পর প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন সরকার বা প্রধান মন্ত্রী-ই ভারতীয় বংশোদ্ভবদের সমস্তার কোন সমাধান করিতে পারেন নাই। এবার চতুর্থ গণরমেন্ট গঠিত হইল এবং শ্রীভাডুলী সেনানায়ক হইলেন ৬ষ্ঠ প্রধান মন্ত্রী। তিনি যে সহজে এবং শীঘ্র এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। তবে তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইবে না, এইটুকু আশা করাও বর্তমান কঠিন।

সিংহলের এই নির্বাচনের ফলাফল হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, সিংহলবাসীরা দক্ষিণপন্থার দিকেই ঝুঁকিয়াছেন। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে ইউনাইটেড ফ্রন্ট পার্টি মাত্র ৮টি আসন পাইয়াছিল। মার্কসবাদী পরিচালিত মহাজন এক সাথ শেরাহুয়ানলটি পাইয়াছিল ৫১টি আসন। এবার এই দলটি মাত্র ১০টি আসন পাইয়াছে। লক্ষ্য সমাজপার্টি চা, রবার প্রভৃতির বাগান, ব্যাক, বীমা কোম্পানী এবং আমদানী রপ্তানী ব্যবসায় সমস্তই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু শ্রীভাডুলী সেনানায়ক হিতাবস্থা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী। শ্রীভাডুলী সেনানায়ক বলিয়াছেন যে, তিনি চা, রবার প্রভৃতির বাগান রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার বিরোধিতা করিবেন। বহু বেতাক ব্যবসায়ী এখনও এই সকলের মালিক। কলম্বো বঙ্কর এবং পরিবহন ব্যবস্থা বঙ্করনায়কের সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিয়াছেন। এইগুলির কোন পরিবর্তন তিনি করিবেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে জনসাধারণ তাহাকে সমর্থন করার ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে তাহারা মার্কসিষ্ট দলগুলির বিরোধী। তাঁহার এই অনুমানের দৃষ্টে অনেক গুলন আছে বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। ৬জন মনোনীত সন্ত্রস্ত, ৪জন

সহ্য প্রজাবাহুবাবী পক্ষের সমস্ত এবং ৫জন ব্যক্তি সমস্তের সমর্থন পাউলোও তাঁহার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না। নিম্নলিখিত তামিল ভাষাভাষীদের প্রতিষ্ঠান কেডাভেল পার্টিগত ২২শে মার্চ এক ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, পার্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন চুক্তি না হইলে তাঁহারা ইউনাইটেড নেশনাল পার্টির গণবর্গস্টকে সমর্থন করিবেন না। এই পার্টির ১৫জন সমস্তের সমর্থন ব্যতীত ইউনাইটেড নেশনাল পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব হইবে না। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে শ্রীসেনানায়ক নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করিবেন। আগামী ৩০শে মার্চ স্পীকার নির্বাচনের প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশন হইবে এবং তখনই আনুষ্ঠানিক ভাবে কাজ করিতে হইবে। ইউনাইটেড নেশনাল পার্টি যদি জোট জয়লাভ করিতে না পারেন তাহা হইলে কি হইবে? বিভিন্ন যেকোনো পার্টি হিসাবে পরলোকগত বন্দরনায়কের শ্রীলঙ্কা ক্রিয়ম পার্টি মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহুত হইতে পারে। উহার একমাত্র বিকল্প পুনরায় সাধারণ নির্বাচন। শ্রীলঙ্কা ক্রিয়ম পার্টি যদি দ্বারী সরকার গঠন করিতে না পারে, তাহা হইলে আবার সাধারণ নির্বাচন অনিবার্য হইয়া উঠিবে। আগামীদিকে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা—

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬০) গভীর রাত্রে মরক্কোর আগাদীর সহরে যে-প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছে তাহা যেমন ভয়াবহ তেমনি ধর্মহাসিক। এই ভূমিকম্প কোয়েটার ভূমিকম্পের কথাই সর্বপ্রথম স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯৩৫ সালে কোয়েটার ভূমিকম্প গভীররাত্রে ঘটয়াছিল। আগাদীর ভূমিকম্প হয় দুনিয়ার সময় ২৩-৩১ মিনিটের সময়। ভূমিকম্পের কালে আগাদীর সহরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ক্রাউনপ্রিন্স মোলা হাসান সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন, ভূমিকম্পের কালে নিহতের সংখ্যা দশ হাজার হইতে বার হাজার হইবে। আহতের সংখ্যা দুই হাজারের বেশী হইবে না। চল্লিশ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। ইতিপূর্বে মরক্কোতে এইরূপ ভূমিকম্প আর হয় নাই। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী পূর্বাংশেরাজ্য এই সহরটি বিশেষী পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। বহু বিশেষী পর্যটক এই সময় আগাদীরে ছিলেন। তন্মধ্যে সেলিন পুরস্কার প্রাপ্ত দুইজন উপস্থাসিক মিঃ আর্থার লুণ্ডভিট অন্ততম। আগাদীরের শোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। সমুদ্রতীর হইতে মাত্র কয়েক গজ দূরে অবস্থিত বিলাসবহুল আগাদা হোটেলটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। বণিক সভাভবন, ডাকঘর, পুলিশ হেড কোয়ার্টার, বিখ্যাত অনাথ আশ্রম প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্পের সময় এই সহরের বিলাসবহুল হোটেলগুলি বিশেষী পর্যটকদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

বিধ্বস্ত, যুতের সহয় আগাদীরকে বৃলভকার দ্বারা সমভূমি করিয়া ফেলা হইতেছে। আবার নতুন করিয়া এখানে সহর গড়িয়া উঠিবে, আবার নতুন রূপে আগাদীর সহর জনকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যাপক বিধ্বংসী ভূমিকম্পের দর্শনাত্মিক দৃষ্টি চিরকাল অরাম হইয়া থাকিবে। সিসবনের ভূমিকম্পের সহর মরক্কোর কেনে আরও একবার প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল। ভূমিকম্প, আরব্রগিরির অগ্ন্যংগাও, ট্যামেডো প্রভৃতি

এমন আকর্ষক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে আঘাত হানে যে দায়িত্ব আশ্রয় করা যায় আর সময় পায় না। উহাদের আঘাত অনেক সময় এত প্রচণ্ড হয় উহা হইতে আশ্রয় করাও অসম্ভব। ভূতাত্ত্বিক যুগে এই ধরনের বহু বিপদায়ক হইয়াছে বাহ্যিক কালে পৃথিবী বর্তমান রূপ পাইয়াছে। মানুষের ধারণা কালের মধ্যে এইরূপ ধ্বংসলীলা যত কম হয় নাই। বিবহিরসের অগ্ন্যংগাতে পশ্চিমায়ী ও হারকিউলানিয়ান সহর দুইটি বিধ্বস্ত হওয়ার কাহিনী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ১৭৫৫ সালে ১লা নভেম্বরের ভূমিকম্পে সিসবন সহরটি সমভূমি হইয়া যায়। নিহতের সংখ্যা পাঁড়াইয়াছিল ১০ হাজার হইতে ২০ হাজারের মধ্যে। ভূমিকম্পের কালে সর্বাধিক লোক নিহত হয় ১৫৫৬ সালের আনুয়ারী মাসে চীনের সেন্সি অঞ্চলে। নিহতের সংখ্যা পাঁড়াইয়াছিল ৮ লক্ষ ৩০ হাজার। আর কোন ভূমিকম্পে এত লোক নিহত হওয়ার কথা জানা যায় না। নিহতের সংখ্যাকার্যকরিক হইতে উহার পরেই ১৭৩৭ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতার ভূমিকম্পের কথা উল্লেখযোগ্য। এই ভূমিকম্পে তিন লক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল বাঙ্গালা প্রদেশ। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের কান্সুতে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে নিহতের সংখ্যা পাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর জাপানের টোকিওতে ভূমিকম্পের কালে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার লোক নিহত হয়। ভায়েতে যে সকল প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছে তন্মধ্যে ১৭৩৭ সালের কলিকাতার ভূমিকম্প এবং ১৯৩৫ সালের কোয়েটার (বর্তমানে পাকিস্তান) ভূমিকম্পের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কোয়েটার ভূমিকম্পে ৫০ হাজার লোক নিহত হইয়াছে। আসামে ১৯৫৩ সালে যে ভূমিকম্প হয় তাহার কথা বোধ হয় সকলেরই মনে আছে। এই ভূমিকম্পে দেড় হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অনেক মনে করেন, নিহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। আসামে আরও একবার প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল ১৮৯৭ সালে। এই ভূমিকম্পেও দেড় হাজারের অধিক লোক নিহত হয়। ১৯৫৫ সালে বাঙ্গালার ভূমিকম্প এবং ১৯৩৪ সালের বিহারের ভূমিকম্পের কথাও আমাদের মনে না পড়িয়া পাবে না। সমস্ত ভূমিকম্পের কথা এখানে উল্লেখ করার স্থান আমরা পাইব না। গত দশ বৎসরের মধ্যে যে সকল প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছে তন্মধ্যে ১৯৫৩ সালে আসামে তুরফের ভূমিকম্প, ১৯৫৬ সালের জুন মাসে আকগানহানের ভূমিকম্প এবং ১৯৫৭ সালের জুলাই ও ডিসেম্বর মাসে ইরানের ভূমিকম্প এবং ১৯৫৭ সালের বহির্জঙ্গোলাহার ভূমিকম্পের কথা উল্লেখযোগ্য। তুরফের উক্ত ভূমিকম্পে বার শত লোক নিহত হয়। ইরানের দুই ভূমিকম্পে প্রায় তিন হাজার লোক নিহত হইয়াছে। বহির্জঙ্গোলাহার ভূমিকম্পে নিহত হইয়াছে বার শত। ১৯৫৮ সালের আনুয়ারী মাসে শেখতে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে ১২৮ জন নিহত হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রচুত উন্নতি সত্ত্বেও ভূমিকম্প কবে কোথায় হইবে পূর্বে তাহা জানিতে পারার উপায় আজও উদ্ভাবিত হয় নাই। ভবিষ্যতে হইবে কি না তাহা বলাও সম্ভব নয়। ভূমিকম্প নিরোধন করার কথা বিজ্ঞানে বোধ হয় এখনও কল্পনাও করিতে পারে না। ভূমিকম্পে মৃত্যু হইবে না একদা গৃহ নির্মাণ করা আজও সম্ভব হয় নাই। ভূমিকম্প কেন হয়, বিজ্ঞান তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার

সহ; কিন্তু এই তত্ত্ব পূর্বাবধি কি না সত্যই বিজ্ঞানীরা বলিতে পারেন।
কিন্তু আগামীসের কৃত্রিম সম্পর্কে অব্যাপক জি, ডি বার্লি
এক-আন-এস বলিয়াছেন, সাধারণ কণাসী পঞ্চাশ বোমা বিস্ফোরণের
সহিত উহার কিছুটা সম্পর্ক থাকিতে পারে, এই সম্ভাবনা তিনি
উড়াইয়া দিতে পারেন না।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় নরমেষ যজ্ঞ—

দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপটাউন ও জোহেন্সবার্গের কুফাল
অঞ্চলগুলির আফ্রিকানরা পরিচরণ বা পান আইনের বিরুদ্ধে
গত ২১শে মার্চ (১৯৩০) বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা
সরকারের বেতাল বাহিনী বেশবোরা গুলিবর্ষণ করিয়া যে হত্যাকাণ্ডের
আয়োজন করে তাহা জাতিসংঘের দ্বারা হত্যাকাণ্ডের কথাই
আমনিগকে স্বরণ করাইয়া দিতেছে। এই বিক্ষোভ দমনের
জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা যেন
এক যুদ্ধের আয়োজন। শোভাযাত্রার দ্বারা উপরে বিমানের
হুড়া দেওয়া হইতছিল। তার পর চলে হাইকেল ও ট্রেনগানের
গুলিবর্ষণ। তবু তাই নয়, সাঁকোরা গাড়ীও ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং
উহা হইতে কয়েক কয়েক বুলেট বর্ষণ করা হইয়াছে। নিরস্ত
জনতাকে হত্যা করিবার জন্য যেন যুদ্ধের আয়োজন করা হইয়াছিল
জেনারেল বটনারের অবস্থাও হইয়াছিল যুদ্ধক্ষেত্রের মতই। হত্যাহত
অসংখ্য শিশুর দেহ ঘটনাগুলি সমাকর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। কত
সেই হত্যাহত হইয়াছিল? সরকার পক্ষ হইতে সেখান পর্যন্ত
স্বীকার করা হইয়াছে যে, ৭২ জন আফ্রিকান নিহত হইয়াছে এবং
আরও হইয়াছে ১৭৮ জন আফ্রিকান। কিন্তু এ সংখ্যা যদি
আরও বেশী হয় তাহা হইলেও আমরা বিশ্বাসিত হইব না। জটিল
পুলিশ কমান্ডার বলিয়াছেন—“কতগুলি মারিয়াছি জানি না।” আরও
কোনো মারা হয় নাই বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার আইন সভার অনেক
সদস্য কোত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান
আফ্রিকা ভ্রমণের সময় দক্ষিণ-আফ্রিকার পার্লামেন্টকে খুব মৌলোয়েয়
ভাবে জানাইয়াছিলেন যে, সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। এই
হত্যাকাণ্ড যেন উহারই প্রকৃতি।

দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের বর্ণবিষয়ের নীতির কথা আমরা
জানি। যথাস্থা পাকড়াই যে উহার বিরুদ্ধে সত্যাপ্রহ
করিয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিক কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে।
কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার বেতালদের কুফাল-বিষয়ে প্রবল হইতে
প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকানদের বসবাসের জন্য বস্ত্র
অল্প নিষিদ্ধ হইয়াছে। শিক্ষার পথ পীড়িত বিবাহভাঙ্গারও
প্রবণ করিয়াছে বর্ণবিষয়ে। এইখানেই সব শেষ হয় নাই।
আফ্রিকানদিগকে নিজেদের মেয়েই সব সময়ই পরিচরণ করিয়া
বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। পুলিশ মোবতে চাহিলেই উহা
সেখানেই হইবে। প্রতি মাসে উহাতে পুলিশের একটা সই লইতে
হইবে। পরিচরণ সঙ্গ না থাকিলে জেল ও কারাখানা হইবে।
এই আইনের প্রত্যবাদে প্যান আফ্রিকান-কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক
আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে। এই আন্দোলনের মূলধারা হইল
পরিচরণ সঙ্গ না লইয়া থানার হাজির হওয়া এবং প্রেক্ষতার স্বরণ
করা। বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছিল এই আন্দোলনকে উপলক্ষ

করিয়া। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত ২০শে
মার্চ (১৯৩০) লোকসভার বলিয়াছেন, “দক্ষিণ-আফ্রিকার
আফ্রিকানদের ব্যাপক হত্যা এমন একটি ঘটনা যাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠা
পরিবর্তন করিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই ঘটনার শেষ
এইখানেই নয়; ইহা ভবিষ্যতে আরও সংঘর্ষের সূচনা করিতেছে।
আফ্রিকার জনসাধারণ এই ধরনের ব্যাপার সহ্য করিবে না এবং
তাহাদের পিছনে থাকিবে এশিয়ার প্রতি মানুষের সহানুভূতি।”
তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু আসন্ন কমনওয়েলথ
সম্মেলনে এই হত্যাকাণ্ডের দায়ক দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রীর
সহিত কর্মমর্দন করিতে এবং এক সঙ্গে বসিতে অস্বীকার
করিয়া তিনি কি এই সহানুভূতিক বাস্তব রূপ দিবেন? থানার
প্রধান মন্ত্রীও কমনওয়েলথ সম্মেলনে বোগদান করিবেন। তিনি
কি দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীর সহিত কর্মমর্দন করিতে এবং
এক সঙ্গে বসিতে অস্বীকৃত হইবেন।

কেনিয়ায় এশীয়রা আক্রান্ত—

গত ১৬ই মার্চের এক সংবাদে প্রকাশ, কেনিয়ায় পালা ছুরিকা
লইয়া একমল আফ্রিকান তিন বার এশীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছে।
কেনিয়ায় এশীয়দের উপর আফ্রিকানদের আক্রমণ এই নূতন নয়।
কিন্তু সম্প্রতি বিশেষ করিয়া লগুনে কেনিয়ায় শাসন সঙ্ঘার সম্পর্কে
সম্মেলন শেষ হওয়ার পর এই আক্রমণ বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে
হইতেছে। মাউ মাউ আন্দোলন দমনের জন্য কেনিয়ায় যে সাত
বৎসরব্যাপী সামরিক শাসন প্রবর্তিত ছিল সেই সাত বৎসরে মোট
২৬ জন এশীয় আফ্রিকানদের হাতে নিহত হইয়াছে। কিন্তু গত
পাঁচ মাসে আফ্রিকানদের হাতে নিহত হইয়াছে ৫ জন এশীয়।
গত ১৫ই মার্চ (১৯৩০) নৈরবি সহরের এক হাজার এশীয় কর্তৃক
আক্রান্ত এক দরখান কেনিয়ায় গবর্নর তার প্যাট্রিক মেনিসনের
নিকট পেশ করা হইয়াছে। এই দরখান এশীয়দিগকে বন্ধার
জন্য অধিকতর পুলিশ সাহায্য দেওয়ার আবেদন জানাইয়া বলা
হইয়াছে যে, একমল দারিদ্র্যহীন লোক এশীয়দিগকে ভয়প্রদর্শন
করিতেছে এবং তাহাদিগকে বিভাঙিত করিতে চাহিতেছে। লগুন
সম্মেলনে কেনিয়ায় এশীয়গণ তাহাদের ভাগ্য আফ্রিকানদের হাতেই
ছাড়িয়া দিয়াছে। ভ্রম সম্পর্কে কোন স্বাক্ষরিত তাহার দাবী
করে নাই। তবু এই আক্রমণের হেতু কি, সে-সঙ্গে প্রকৃত সত্য
নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেনিয়ায়
আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং দেশেরা দৃষ্টান্তের মন্ত্রী মিঃ এটলী
ফোয়ান এবং পুলিশ কমিশনারের যে উক্ত ‘ইউ’ আফ্রিকান ঐতিহ্য
পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এশীয়দের
উপর যে আক্রমণ চলিতেছে তাহার কোন সাম্প্রতিক তাৎপর্য
আছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু কেনিয়ায়
এশীয়দের অবস্থা একদিক ইটোয়ালী এবং আর একদিকে
আফ্রিকানদের চাপে পড়িয়া সেহুইচের মত হইয়াছে মনে করিলে
বোধ হয় কুল হইবে না।

কেনিয়ায় ইটোয়ালীরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, এশীয়রা
প্রকৃত কেনিয়াবাসীদের আত্মীয় আন্দোলন স্বপ্ন করিয়া এবং
মোগল স্বপ্ন করিয়া ইটোয়ালীদিগকে এবং উপনিবেশিক

সরকারকে। এই ধরণের উক্তি যে এশীয়দের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার
একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এশীয়দের উপর আফ্রিকানরা
যদি ক্রুদ্ধ হন, তাহাবিশিষ্টকে বাহ্যতে অবিশ্বাস করে সেই উদ্দেশ্যেই
এইরূপ প্রচার করা হইতেছে, ইহা মনে করিলে যথেষ্ট দুঃখ হইবে
না। এই ধরণের উক্তিই এশীয়দের উপর আক্রমণ চালাইতে
আফ্রিকানদিগকে প্ররোচিত করিয়াছে ইহা মনে করিলে তুল হইবে
কি? কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করার পর জোমো কেনিগাটা
বস্তুহে বন্দী আছেন। তাঁহাকে যদি এই বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তি
দেওয়া হয় তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টায় এশীয়দের উপর এই আক্রমণ
বন্ধ হইতে পারে এবং এশীয়দের সম্পর্কে মিথ্যা ধারণাও দূর হইতে
পারে।

চৌ এন লাইয়ের ভারতে আগমন—

সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য গত জাহুরাবী (১৯৬০) মাসের
শেষভাগে চীন ও ভ্রমদেশের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর গত
২৮শে মার্চ (১৯৬০) চীন-নেপাল সীমান্ত সম্পর্কে মিঃ চৌ এন লাই
এবং নেপালের প্রধান মন্ত্রী জী বি পি কৈরলার মধ্যে এক চুক্তি
সম্পাদিত হইয়াছে। তাহাড়া নেপালকে চীনের অর্থ নৈতিক
সাহায্য দান সম্পর্কেও একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। চীনের
প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া নেপালের প্রধান মন্ত্রী গত ১১ই
মার্চ দুই সপ্তাহের জন্য চীনে গিয়াছিলেন। ভ্রমদেশ ও নেপাল এই
দুইটি দেশের সহিত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া চীনের প্রধান

মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই ১১শে এপ্রিল নয় দিল্লীতে আসিতেছেন।
তিনি ভারতে এক সপ্তাহ অবস্থান করিবেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী
কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধের, মীমাংসার জন্য
আলাপ-আলোচনা করিতে তিনি দিল্লীতে আসিতেছেন। চীন-
ভ্রমদেশ বা চীন-নেপাল সীমান্ত বিরোধের মত চীন-ভারত সীমান্ত
বিরোধ মীমাংসা সম্বন্ধে ব্যাপার নয়। চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত
লঙ্ঘনের কলে ভারতের জনস্বত্ব অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, চীন-ভারত
মৈত্রী সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নেহরু-চৌ আলোচনার আগে সীমান্ত
বিরোধের যদি মীমাংসা হয় তাহা হইলে স্তব্ধের বিষয় হইবে
সন্দেহ নাই।

চীনের প্রধান মন্ত্রীর ভারতে আগমন উপলক্ষে সর্বত্র আনন্দ
প্রজ্ঞাপনের প্রেসিডেন্ট নাসেরের ভারত ভ্রমণের কথাও উল্লেখ করা
প্রয়োজন। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার
পূর্বেই তাঁহার ভারত সফর আরম্ভ হইবে। তিনি ২৩শে মার্চ
ভারতে আসিয়া পৌঁছিবেন। ৩১শে মার্চ তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টে
বক্তৃতা দিবেন। ভারতের রাজধানীতে তিনি তিন দিন থাকিয়া
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত আলাপ আলোচনা
করবেন। দিল্লী পৌরসভা হইতে তাঁহাকে সন্মান করা হইবে।
প্রেসিডেন্ট নাসের ১০ই এপ্রিল বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে
বক্তৃতা করিবেন এবং সম্মেলনের পর বিমানযোগে করাচী বাজি
করিবেন।

২৪শে মার্চ, ১৯৬০

অনেক সন্ধ্যার কথা

রণেশ মুখোপাধ্যায়

সাঁঝের আকাশে শিশু-তারকার ঘুম চলে,
বাহুতের ডানা ঢেকে দিয়ে যায় শেষ আলো;
খবরদারীতে হঠাৎ ঘুমের চোখ জলে;
গাছের পরেছে জোনাকির জামা জমকালো।

মাঝখানে চাঁদ বসেছে আসর জাঁকিয়ে,
ঝড়-ঝির-ঝির বাতাসে কতো না গানের সুর;
এমনই আবেশ মাথানে আকাশে ডাকিয়ে;
মনে হলো আজ, তুমি চলে গেছো কতো দূর।

সেদিনও এমনই তারাতারা সেই সন্ধ্যাতে,
তেবেতি, তুমি না থাকলে সবই তো অন্ধকার;
বোঁপার জড়ানো কিশোরী রজনীগন্ধাতে
মেখেছি তোমার প্রাণ-প্রত্যয় কণ্ঠহার।

আজও তো সে চাঁদ হামাগুড়ি দেয় আকাশে,
তুঁটচাপা-ঘন গন্ধে আতুল আজও রব;
চুড়ি-তুঁন্দু-তুঁন্দু বেলেয়ারাবী সুর বাতাসে;
আজও সেদিনের অনেক গোপন কথা কর।

তোমার হৃদয়ে এতো ভালবাসা মেখেছি;
আজ সেই প্রেম নিয়ে হৃদয়ে মেখেছি।



বোম্বাই দলের একাদশ বার "রঞ্জী ট্রফি" লাভ

বোম্বাই দলের পৌরবর্মর ক্রিকেট ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় রচনা হয়েছে। তাহার একাদশ বার ভারতের প্রথম ক্রিকেট প্রতিযোগিতা "রঞ্জী ট্রফি" লাভের কৃতিত্ব অর্জন করে। এই প্রতিযোগিতার ২৬ বছরের ইতিহাসে আর কোন দলের গকে এই স্থান লাভ সম্ভবপর হয় নি।

বোম্বাইয়ের ত্র্যাবর্ণ ট্রেভিটাম। এখানেই বোম্বাই দল এবারকার কাইতালে মহীশূর দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবতীর্ণ হয়। খেলার আকর্ষণ কম ছিল না। হার্টে চর্পক-সমাগমও বেশ হয়। বোম্বাই দলের শক্তির সঙ্গে সক্ষেই সুপর্যাপ্ত। তাদের সাহস্য একরূপ নিশ্চিত। এই মনে করে বোধ হয় চন্দ্রকমের মধ্যে উৎসাহ ও উৎসাহীনা কিছুটা দেখা যায়। বোম্বাই দল এই খেলায় এক ইনিংস ও ২২ রানে মহীশূর দলকে পরাজিত করে। তাদের এবারকার সাক্ষ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবার কোন দলই তাদের বেশ হিতে পায়নি। মহীশূর দল কাইতালে পরাজিত হলেও এই দলের তুচ্ছ ও উল্লীহমান খেলোয়াড়রা—শক্তিশালী বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে প্রশংসার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উভয় ইনিংসেই মহীশূর দল দুটো রান সবে রাণ তোলার চেষ্টা করে। তবে বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংসে নিজেদের কিংবিশিষ্ট বিপর্যয়ের সঙ্গে তাদের যে ক্ষতি হয়—তা জলের-সাক্ষ্যের পথে অন্তরায় হয়ে পড়ায়।

মহীশূর "কলো-অন্যের" পর ইনিংসে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করে। কিন্তু প্রবল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ২২ রানের জ্ঞতা তারা সফল হতে পারেন নি।

বোম্বাই দলের এবারকার সাক্ষ্যের জ্ঞতা হাড়িকার ও রানটানের অবদান সবচেয়ে বেশী। তাঁরা প্রাক্রমে ১৪৫ রান ও ১০৬ রান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। বোলিং-এ গোলাম গার্ড উভয় ইনিংসে ১৩৫ রানের বিনিময়ে ১টি উইকেট পান। মহীশূর দলের প্রব্রাহ্মনিয়ম বিতীর ইনিংস ১০৬ রান করার পৌরব অর্জন করেন। তাঁর ব্যাটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। তাঁদের বোলিং-এ নীপক দাম্পত্য সাক্ষ্য অর্জন করেন। তিনি ৭৭ রানে ৪টি উইকেট পান।

রাণ সংখ্যা

বোম্বাই—১ম ইনিংস ৫০৪ (হাড়িকার ১৪৫ রানটান ১০৬, উল্লীহ ৬৬; নীপক দাম্পত্য ৭৭ রানে ৪ উইকেট)।

মহীশূর—১ম ইনিংস ২২১ (বিব্রাথ ৫১, কুম্ভুতি ৪৮, নাজারেন ৪১; গোলাম গার্ড ৬৬ রানে ৫ উইকেট)।

মহীশূর—২য় ইনিংস ২৬১ (প্রব্রাহ্মনিয়ম ১০৬, রানজক ৪১; গোলাম গার্ড ৬৬ রানে ৪ উইকেট)।

আই এক এ'র সম্পাদক জিএম দত্তরায়ের আন্তঃপ্রাণ

এবারকার আই, এক, এ'র সম্পাদক জিএম দত্তরায়ের বার্ষিক বিবরণী আলোচনা কালে কয়েকজন সমস্ত কয়েকটি যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক বলেছেন যে, আই, এক এ'র অধীনে সকল ডিভিসন ফুটবল খেলাতেই বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। কোন দল পরেটের জ্ঞতা কোন দলের কাছে কৃপা ভিক্ষা করেনি। লীগে উঠা-নামা দৃষ্টিত রাখার জ্ঞতা লীগের খেলা শুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল ভাবে শেষ করা সম্ভবপর হয়েছে। সম্পাদকের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কয়েকজন সমস্ত জোরালো ভাবার সমালোচনা করেন। একজন সমস্ত বলেছেন যে, লীগে উঠা-নামার ব্যবস্থা বন্ধ রাখার ক্ষেত্রে খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আকর্ষণ একেবারে কমে গেছে। শুধু ক্রীড়া নয়, লীগে উঠা-নামা বন্ধ থাকার জ্ঞতা খেলার মানেরও অবনতি হয়েছে। প্রত্যয় নিজের কর্তব্য সম্পাদনের জ্ঞতা সম্পাদক জি দত্তরায়ের আন্তঃপ্রাণের কোন কারণ নেই। তিনি আরও সমালোচনা করেছেন যে, আই, এক, এ'র নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে পরাম্পর-বিশেষী নিয়ন্ত্রণী আন্তঃ পর্বত সংশোধন করা হয় নি। কলকাতার ট্রেভিটাম পটনের পথেও আই, এক, এ অনেক ক্ষেত্রে অন্তরায় ঘটবে। ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার রাজ্যলার সাক্ষ্য সম্পর্কে যে কলকাতা করে বিবরণী তৈরী হয়েছে—তার সমালোচনা করে অপর একজন সমস্ত বলেছেন যে, এ বিষয়ে রাজ্যলার পৌরব কোনমতেই বাড়েনি। ১৯৫৮ সালে পাঁচ জন এবং ১৯৫৯ সালে ছয় জন স্থানীয় খেলোয়াড় রাজ্যলা দলে স্থান পান। এ থেকে ভালভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে আই, এক, এ'র ফুটবলের উন্নতির বিষয়ে কোন স্থায়ী পরিকল্পনা নেই। তাঁরা আন্তঃ পর্বত তুচ্ছ ও উল্লীহমান খেলোয়াড়দের শিক্ষার কোন চেষ্টা করেন নি।

আই, এক, এ-র আন্তঃপ্রাণের হিসাব পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মোট ব্যয়ের প্রায় তিন ভাগই ব্যয় হয় কর্তব্যবিশেষ বেতন, দুখুলা ভাতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাণ্ড ব্যয়। এই ব্যয় যে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে তার আবার অর্ধেকই ব্যয় হয়েছে, আই, এক, এ-র বেতনভুক্ত সম্পাদক জি দত্তরায়ের পুত্রকে। সম্পাদকের মূল বেতন মাসিক বারো শত টাকা। তাছাড়া অন্তঃ ভাতা তো আছেই। আই, এক, এ-র আন্তঃপ্রাণের পঞ্চাশ ভাগ আসছে চারিটি ব্যয় থেকে। চারিটি ব্যয় টাকা থেকে মোটা মাইনের সম্পাদক পোষা উচিত কি না তা আই, এক, এ-র পরিচালকমণ্ডলীই বলতে পারেন। মোটা মাইনের সম্পাদক জি দত্তরায়ের কার্যকরতার নিয়ন্ত্রণমণ্ডল কয়েকটা উল্লেখ্য চিন্তাই ভালভাবে উপলব্ধি করা যাবে। (ক) ১৯৫২ সালে আই, এক, এ বিন্ট কাইতাল বানটাল। (খ) ১৯৫৩ সালে লীগ ও প্রিন্ট ফুটবল বানটাল। (গ) ১৯৫৭

সালে ডিসেম্বর মাসে শীত কাইতাল। (৬) ১৯৫৮ সালে জানুয়ারী মাসে শীত কাইতাল। (৭) ১৯৫৯ সালে শীত কাইতাল বানচাল। লাবাস জীবনভরায়।

ইংলণ্ড দলের “রাবার” লাভ

পোর্ট অফ স্পেন (তিনিশাস) অসুস্থিত পক্ষম ও শেষ টেষ্ট খেলা অসমাপিত ভাবে শেষ হওয়ায় ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ সর্বপ্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে “রাবার” লাভের কৃতিত্ব অর্জন করে। ১৯২১-৩০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হানীয় দল ও ইংলণ্ডের মধ্যে টেষ্ট খেলা শুরু হয়। কিন্তু এর আগে ইংলণ্ড দলকে জয়লাভ করতে দেখা যায়নি। এবারে দুই দলের মধ্যে পাঁচটি টেষ্টের মধ্যে চারটি অসমাপিত থাকে। ইংলণ্ড দ্বিতীয় টেষ্টে জয়লাভ করে।

রাণ সংখ্যা

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ৩১০ (কাউডে ১১৯, ডেন্জটায় ৭৬, ব্যারিটন ৬৯, জিম পার্কস ৪০; রামাধীন ৭৩ রাশে ৪ উইকেট ও সোবাস ৭৫ রাশে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—১ম ইনিংস (৮ উই: ডি:) ৩৩৮ (সোবাস ১২, হাট নট আউট ৭২ ও ওয়ালকট ৫০)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস (৭ উই: ডি:) ৩৫০ (জিম পার্কস নট আউট ১০১, স্মিথ ১৬, পুলাস ৫৪, ডেন্জটায় ৪৭; সোবাস ৮৪ রাশে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—২য় ইনিংস (৫ উই:) ২০১ (ফ্রাঙ্ক ওয়েল ৬১, সোবাস নট আউট ৪১, হাট ৩৬, কানহাই ৩৪; ইনিংওয়ার্থ ৫৩ রাশে ২ উইকেট)।

আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলার জন্য আহ্বান

সম্প্রতি রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার রক্ত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হয়। খেলায় বোম্বাই ও অবশিষ্ট দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলাটি অসমাপিত ভাবে শেষ হয়। তবে প্রথম ইনিংসে অগ্রগমনের ফলে বোম্বাই দল ইরানী কাপ লাভ করে। এই খেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সম্মেলনে সভায় বক্তৃতা প্রদান নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি পাতিয়ালা মহারাজা ভারতে ক্রিকেট খেলার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখে আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। পাতিয়ালা মহারাজা বলেছেন যে, ভারতীয় ক্রিকেটের সাক্ষ্য সংগঠকদের চোঁর উপর ততটা নির্ভর করে না—বতী খেলোয়াড়দের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। তিনি আরও বলেছেন যে, ক্রিকেট খেলোয়াড়রা আক্রমণাত্মক ডব্লী খেলার মিকে মনোনিবেশ না করলে ক্রিকেট খেলার দর্শকদের আগ্রহ সোপ পায়ে। তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর পিতা পরলোকগত পাতিয়ালা মহারাজা ভূপেন্দ্র সিং ভারতে ক্রিকেট খেলার বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য “রঞ্জী ট্রফি” দান করেছিলেন।

“আমাদের সঙ্গীতও রাজসভা সম্রাটসভায় পোষ্যপুত্রের মত আমরে বাড়িতেছিল। সে সব সভা পেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই সঙ্গীতের সেই বস্ত্র আবরণ, সেই স্টপপুট পেছে। কিন্তু গ্রাম্য সঙ্গীত, বাউলের গান, এ সবের মার নাই। কেননা, ইহারা যে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। জামল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড় শিকার টকিতে পারে না।”

—বাবুনাথ ঠাকুর

কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য কোন মতেই সফল হয়নি। পাতিয়ালা মহারাজার মন্তব্যটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ক্রিকেট কটেজ বোর্ডের পরিচালনার ব্যর্থতার জন্য বর্তমানে “রঞ্জী ট্রফি” খেলার আকর্ষণ একেবারেই বিলুপ্ত হতে চলেছে। “রঞ্জী ট্রফি” খেলার আকর্ষণ একদিন টেষ্ট খেলার সমতুল্য ছিল বললে বোধ হয় অত্যন্ত হবে না। বর্তমানে এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সকলেই আশঙ্কা বোধ করছেন।

প্রেমজিৎলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

সম্প্রতি বেঙ্গল লন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের ডাবলসের সেমি-ফাইনালে জয়দীপ মুখার্জীর ভূটিতে খেলার সময় “খেলার প্রাক্শনে” অশোভন আচরণ, আশ্পারারের নির্দেশ অবমাননা এবং খেলা চলার সময় আশ্পারারকে লাঞ্চিত করার জন্য বেঙ্গল লন টেনিস এসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতি ভারতের তিন নম্বর ও ডেভিস কাপ খেলোয়াড় প্রেমজিৎ লালের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে, নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনকে অবহিত করার এক চাক্ষু্যের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ প্রেমজিৎলাল ডেভিস কাপের খেলায় ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছিলেন। তবে শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে মাঝে মাঝে সরে দাঁড়িয়েছেন। নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশন কিয়দপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ইহা দেখিবার বিষয়। তবে ভারতের লন টেনিস খেলার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একজন আশ্পারার খেলোয়াড় দ্বারা লাঞ্চিত হয়েছেন। খেলার প্রাক্শনে এইরূপ অ-খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

“বাম্পার বল” বন্ধ হওয়া দরকার

কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ও ভারতীয় ক্রিকেট কটেজ বোর্ডের ভূতপূর্ব সভাপতি ডাঃ পি. সুরেন্দ্রনাথ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, “বাম্পার বল” বেওয়ার্থ প্রথা বন্ধ না হলে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি আশা করেন যে এবছর ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সঙ্গে পরামর্শ করে এম, সি, সি এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

তিনি বলেন যে, একপক্ষ “বাম্পার” মিলে অপরপক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য “বাম্পার” মিতে থাকেন। সম্প্রতি ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলায় অনেকে ইহার ফলে আহত হয়েছেন। এই ধরনের বোলিং-এর ফলে ব্যাটসম্যানরা মারিয়া খেলতে-পায়েন না। এতে ভাল না হয়ে ক্রিকেটের ক্ষতি হয়। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বিবৃতি সভাই বিবেচনার বিষয়। আশা করা যায় এবারকার ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।



কাজ—কে কোনটি করবে ?

আজকের দুনিয়ার বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে, কিন্তু সবাই সব কাজ করতে সক্ষম হতে পারে না। কে কোন কাজের ঠিক উপযোগী, সে-টি খুঁজে পাওয়া চাই। ঠিক মানুষটি ঠিক ব্যবসায় পড়ে গেলে কাজ ভাল হবে, সহজে হবে। এমনটি বেখানে হলো না, সেখানেই কাজের গলদ পড়িয়ে যায়, হাজির হয় অসন্তোষ বা বিপৃথগতা।

এ-ও দেখা যায় অবস্থি—যোগ্য লোক ঠিক ব্যবসায় পড়েও ঠিকে থাকতে চাইছে না। এর শিড়নে একাধিক কারণ থাকতে পারে, তবে সাধারণ কারণ যেটা জানা যায়—চাকরি ক্ষেত্রে উপযুক্ত মর্যাদা বা মাইনে না পাওয়া। ক্রমাগত কয়েক বছর কাজ করা হরতো হরত পেলো এবং পরও বিকল্প কাজ চাইলে এ কারণটির কথাই মনে আসে প্রথম।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অসন্তোষ দেখা দেয়, প্রধানত: এই কারণে—যে কাজটি যার পক্ষে প্রায়ঃ, সে-টি না পাওয়া। উন্নতির নিশ্চিত ভাসিয়ে যেখানে চাকরি রদবদল করা হয়, সেখানে অবশ্য থাকা চলে না। চাকরি পাট্টের নিয়েও যদি অবস্থান্তর না ঘটে, প্রত্যাশিত কাজটি যদি না মিলে, তা হলেই দুঃখের হয়ে পড়ায়। তাই প্রায়ঃকম বুঝতে পারা চাই আগেরভাগে, কার পক্ষে কোন মাইনে বা ওয়া ঠিক—কে কোন কাজটির সত্যি হবে উপযোগী।

শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ-তরুণীদের সামনে এ প্রশ্নটি হাজির হয়। প্রশ্নের সমাধান তাদের দ্বারা সব সময় হয়ে ওঠে না। এ কারণেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করা অনেক নিরাপদ। বিভিন্ন কাজের ভেতর কে কোনটি করবে অর্থাৎ কোন কাজ কার পক্ষে সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর, নিজস্বের ব্যবস্থা চাই-ই আর সে-টি বহুদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি।

পশ্চিমী দেশগুলোতে বিশেষভাবে আমেরিকায় এ জিনিস নিয়ে আলোচনা গবেষণা হয়ে চলেছে অনেক। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার কাজের বোধ্যতা বিচার ও পরামর্শদানের জন্য একটি কেন্দ্রই রয়েছে। এর ভেতর প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন, এমন অর্ধ-লক্ষাধিক নর-নারীর সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে এখান থেকেই। নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে কর্ম-জীবনে বহু ব্যক্তি মনের প্রশান্তি পেয়েছেন, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন ব ব কেন্দ্রে।

আমেরিকা পরীক্ষা-কেন্দ্রে লিপিবদ্ধ একটি বিবরণ—যুব বেশি দিনের ব্যাপার নয়, ২৫ বছর বয়সের একটি যুবক আসে এখানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাবে বলে। যুবকটি সেলসম্যান হিসেবে

কাজ করে চলেছে কয়েক বছর—কিন্তু তাতে তার কিছুই হচ্ছে না। পেশাগত পরীক্ষা, ব্যক্তিগত ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা কয়েক দফা চালানো হয় এবং বেলায়। তারপর কেন্দ্রের সঙ্গে সম্মিলিত পরামর্শদাতাগণ এই সুপারিশ করলেন যে, যুবকটির পড়া উচিত একটি টিং।

যেমনি বুদ্ধি পাওয়া, অমনি যুবকের উত্তম শুরু হয়ে যায় নতুন খাতে। একটি নৈশ বিভাগে যেতে সে ঠিক ভর্তি হলো। অল্পদিন বাদেই আগের কাজটি সে ছেড়ে দেয়—ছেড়ে দিয়ে গ্রহণ করে একদম একটি নতুন লাইন। উক্ত পরীক্ষা-কেন্দ্রকে সে লিখে জানায়—সুখের বিষয়, একাউন্টিং পড়তে বলার আমার চোখ খুলে গেছে। এক্ষণে আমি একটি বীমা কোম্পানীর কন্ট্রোলার বিভাগে কাজ করছি। তিন বছরেরও কম সময় মধ্যে মাইনে বেড়েছে এখানে আমার চার দফা।

উক্ত মার্কিন কেন্দ্রটির বিবরণ থেকে সংগৃহীত আর একটি ঘটনা—বছর কয়েক হলো একটি অত্যন্ত লাভুক ও ভীক ছেলের মা-বাবা এসে হাজির হন এখানে। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার দেখতে পাওয়া যায়, এর সামর্থ্য রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু অনেক লোকের সাথে মিশে কাজ করতে তাকে রাজী করানো কঠিন। বাপ-মা তো ভেবেই পান না—সত্যি কি করা বাবে ছেলেকে নিয়ে এর পর? আরও পরীক্ষা চালানো হলো, দেওয়া হল ব্যবস্থাপত্র—সমাজসেবামূলক কাজের দিকেই টেনে নিতে হবে তাকে ধীরে ধীরে। আশ্চর্য, স্কুল বেশ ফলসো এক্ষেত্রেও শেষ অবধি।

আমেরিকার মতো রাষ্ট্রসমূহে বোধ্যতার পরিমাণে কাজ বেছে নেওয়া কঠিন বলা যেতে পারে। কেন না, সেখানে প্রায় ৪০ হাজার রকমের কাজ রয়েছে—মার্কিন শ্রম বিভাগের প্রকাশিত পেশাগত অভিধানেই এই তালিকাটি পাওয়া যায়। 'এ অবস্থায় অনভিজ্ঞ তরুণ-তরুণীর পক্ষে ভাল-মন্দ বখাও বাছাই করে নিয়ে কাজে ঢোকা একদম অসম্ভব। বহু-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে এমন সব ধরনের কাজ সৃষ্টি হচ্ছে—যার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় নেই কারও। এ সকল সমস্তার দক্ষণই দরকার পড়ছে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সূচিভিত্তিক নির্দেশ।

নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় বোধ্যতা নির্ধারণ কেন্দ্রটির অত্যন্তম পরিচালক ডক্টর ওয়ালেস গবেষণার সম্ভাব্য অঙ্গসারে মাসুকের চাকরি-জীবনটাও একটা বড় ব্যবসারের মতো। আপন দক্ষতা ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ যে পেরে গেলো, এমন একজনের কথাই ধরা যাক। বছরে গড়পড়তা ৫,৫০০ পাউণ্ড রোজনার

করলে এবং ৪৫ বছর (২০ থেকে ৬৫) কাজ করা হয়েছে, ধরে নিলে এই লোকের মোট আয়ের পরিমাণ পাঁড়াবে ২,৪৭,৫০০ পাউণ্ড। আবার একই লোক ঠিক জায়গাটিতে গড়লো না ধরে নিলে অবস্থা কি পাঁড়ায়, পাশাপাশি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। লোকটিকে স্বভাবতই অপছন্দসই নিয়তম কোন কাজে বছরের পর বছর কাটাতে হয়, এ অমনি অসুস্থের—বছরে গড়পড়তা রোগস্বরূপ তার ৪,৫০০ পাউণ্ড এই ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে লোকটির নীট ক্ষতি বেয়ে পাঁড়াবে ৪৫,০০০ পাউণ্ড সারা জীবনে।

একশ্রেণী অন্ততঃ এ দেশে বা হয়—কে কোন কাজ করবে, কোথায় কার চাকরি হবে শেষ অবধি, সে-টি অনেকটা ঘটনাচক্র মাত্র। বেশির ভাগ কর্মপ্রার্থীর বলাতে আগে থেকে কিছু বলা চলে না—ঠিক কোন জায়গাটিতে কে যেয়ে বসবে। ফলে অনেক স্থলেই স্থল করতে হয় নৈরাশ্র ও ব্যর্থতা, দেখা দেয় ক্রমে অভিশ্রু ও অসন্তোষ। সতর্ক হওয়ার বেশি রকম প্রয়োজন রয়েছে সেজন্যই—আগে থেকে ভেবেচিন্তে কাজের লাইনটি তাই বেছে না করে নিলে নয়।

মাত্রা রেখে খাওয়া

স্বস্থভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবার জন্যেই খাওয়া—এটি সহজ কথা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যতটুকু খেতে হবে। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির তাগিদ মেটাতে ঠিক সময় খাওয়াটি চাই, আর চাই মাত্রা রেখে খাওয়া অর্থাৎ পরিমিত আহার। অতিভোজনে মেরুদণ্ড হতে পারে, হৃৎপিট কেঁপে উঠতে পারে; কিন্তু এটি বর্থাৎ স্বাস্থ্যের লক্ষণ কিনা, সে সন্দেহ থেকে যায়।

শরীর-বিজ্ঞানী বা স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা তাই দাবী রেখেছেন—মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ার চেয়ে একটু কম খাওয়াই বরং ভালো। অতিভোজনে পাকস্থলীর ওপর স্বভাবতই বেশি চাপ পড়ে। ফলে তুচ্ছসহ্য সহজে হজম হতে চায় না আর এ হজম না হওয়ার অর্থই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। শরীর-বিজ্ঞানীদের মতে বতটুকু খাওয়ায় হজম হয়, তাই- পরিমিত খাওয়া। পরিমিত ও সুস্থ খাওয়াই হজমের নিয়মটি উপেক্ষা করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

ভোজনবিলাসীদের প্রায় সব সময়ের একটি চিন্তা—কি করে ঠেঁমে উদরটি ভর্তি করা যায়। এরূপ করতে যেয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেরু বা চর্বি তাদের শরীরে দেখা দেয় কিন্তু শরীর চালানার ক্ষমতাটি ক্রমেই হ্রাস পেয়ে আসে। সমস্যাটি শুধু এদেশেই নয়, অন্তর্দেশেও রয়েছে এবং মাত্রা কোথাও প্রায় কম নহে। বহুলোক (সাধারণতঃ ওপরতলাকার) এই প্রায় নিয়ে বিভ্রান্ত—

অপ্রয়োজনীয় যেকোনো কাজে বায়, কোন পথ ধরে শরীরের অতিরিক্ত ওজন হ্রাস করতে পারে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়েছে এই প্রশ্নের দিকে নজর রেখে সেগুলোর ব্যবহার্যও চলছে অবশিষ্ট হয়নি। কিন্তু স্বাস্থ্যবিদ্যেই অতিমত—এ ব্যাপারে ভাবী কল পেতে হলে সকলের আগে মাত্রা রেখে খাওয়ার নীতি অনুসরণ না করলে চলতে পারে না।

মার্কিন যুক্তরাজ্যের ক্ষীণকায় লোকের সংখ্যা নাকি আশ্চর্যকাল বেশ বেড়েছে (২৫ লক্ষের ওপর)। ফলে আলোচ্য প্রশ্নটি নিয়ে সেখানকার বিভিন্ন মহল অনেক মাথা ঘামাচ্ছেন বলেও জানা যায়। ভারতের মতো অনগ্রসর দেশগুলোতে অবশিষ্ট প্রশ্নটি ততটা ব্যাপক নয় কিংবা প্রশ্ন মূলতঃ উদ্ভেদে ঘরপের। এ সকল স্থানে সাধারণ মানুষের মাত্রাখাওয়াত খাওয়ার সংস্কার নেই, চর্বি বা ওজন কমানার প্রশ্নটি তাদের কাছে অবাস্তব বলা যায়। তবু অতিরিক্ত মেরুদণ্ড ও দৈহিক ওজনবিশিষ্ট নরনারীদের ব্যাপার নিয়ে কিছুটা ভাববার নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে এখানেও।

মাত্রাতিরিক্ত খেলেই যে শরীর ক্ষীণ হতে, সব সময় বা সম্বন্ধেই অবশিষ্ট একথা খাটে না। এ-ও দেখা যায়, তেমন কিছু না খেয়েও শরীরে মাংস হচ্ছে—পেটে চর্বি বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। এ ধরনের অবস্থা যেখানে, সেখানেই কোন ব্যাধি হয়েছে ধরে লওয়া যায় সহজেই আর তখন চিকিৎসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দেখা যাবে, খাওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ সে অবস্থাতেও রাখবার দাবী থাকছে। বাড়তি মেরু বা ওজন হবার পথবোধের আর একটি উপায় নিয়মিত কায়িক শ্রম করা। অপর দিকে চর্বিপ্রধান খাদ্য বতদূর সম্ভব বর্জন করাই হবে এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত।

প্রয়োজনের চেয়ে সবসময়ই বেশি খেলে, দামী দামী জিনিসে পেট বোকাই করলে, মেরু বা চর্বি বাড়তে পারে এ বুঝা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এত লোক মাত্রা ছাড়িয়ে খায় বা খেতে চায় কেন? বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—পেটের ক্ষিদে ছাড়া চোখের ক্ষিদেও আছে, যেয়েও বেন খাওয়া হলো না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, এই ভাবটাই আধিক্য। জিভের ওপর নিয়ন্ত্রণ যেখানে থাকে না, সেখানেই প্রায় মাত্রা-অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে পড়বার কারণ ঘটে। গৌড়াতেই বলতে চাওয়া হ'ল—অত্যধিক খাওয়া যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ, তেমনই প্রয়োজনের চেয়ে কম মাত্রায় আহারও হানিকর। অমনি কম খেয়ে খেয়ে রোগটি হয়ে বেতে হবে—দাবী বর্থাৎ অর্থোজিক। আবার পরিমাপহীন খাওয়ার পরিণতিতে শরীরে অধা মেরু ও চর্বি বাড়ানোটাও অসঙ্গত। মনে রাখা চাই—এই দুই ধরনের অবস্থাটি ব্যাধির সমতুল্য, উভয়ই স্বাভাবিকভাবান্তর।

ডঃ কার্তিক বসু

টার্কোমোডা

অল্প, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায়

নানাল

ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা-১

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন বোষাল

আমি দেখবার অস্থির আশন মনে পথ চলছিলাম। একবার মনে হলো আমাদের ভাড়া করা বাড়ীটাতে ফিরে যাই। বহুক্ষণ ঘুরা-ফিরা করবার জন্য একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। থোকা বাবুর বাগানবন্ধু হতেও অবির হয়ে আমার জন্য আমাদের ভাড়া করা বাড়ীটাতে বসে অপেক্ষা করছে। তবু আমার মনে হলো যে আমার পক্ষে স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া উচিত হবে। আমি বীর পদবিক্ষেপে থানার পথ ধরে থানায় এসে উপস্থিত হলাম। থানার অফিসার ইনচার্জ সুরেশ বাবু ছিলেন একজন বাঙালী অফিসার। আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে তিনি বললেন 'আরে মহাশয়! আপনি এসে পৌঁছেন? কাল থেকে তুমিই যে কোলকাতা থেকে একজন পুলিশ অফিসার এখানে তলন্তে এসেছেন। কিন্তু কোথায় যে তিনি এসে উঠেছেন তা এতো চোটা করেও খুঁজে বার করতে পারলাম না। দেওঘর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের এই বোকা-খুন্সির বহরে আমি লজ্জিত হয়ে উঠলাম। আমাদের খুঁজতে তিনি কুমারটুলির রাজার কাছে জান নি তো? তা'হাড়া এই শহরে আমাদের আগমনের বাড়ী তিনি এতো স্নিহ জানলেনই বা কি করে?

হঠাৎ আমার চিন্তার ধারা বিচ্ছিন্ন করে সুরেশ বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তা পাওয়া দাওয়া করছেন কোথায়? কাল রাত্রি থেকে আপনি আহনই বা কোথায়? আজ থেকে আমার কোয়ার্টারে থেকে এইখানেই খাওয়া দাওয়া করবেন। আপনাকে খুঁজে বার করবার আগেই আমাদের বাইরেকার ঘরটার আপনার জন্য একটা খাটরায় বিছানা-পত্র ঠিক করে রেখেছি।

দেওঘর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের এই অতিথিবাংসল্য ও আগ্রহাতিশয্যে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ছিলাম। আমার কোলকাতা পুলিশের লোক। বাহির হতে কোন অফিসার এলে নিজের মধ্যে তাকে মেঠো পুলিশ বলে নিজের মধ্যে বহু ঠাটা-বিক্রপও করেছি। এমন কি, আমাদের কেউ তাদের অপেক্ষাকৃত বেশেও পাশ কাটিয়ে আশিসযবে চলে এসেছে। কিন্তু আমরা কোনও কার্যব্যাপসে শহরের বাহিরের কোনও থানার এসে উপস্থিত হলে তারা সাধারণত তাঁদের অভিমুখিত হান-বাহন বোগে পুলিশ তলন্তকার্থে আমাদের সাহায্য তো তাঁরা করেছেনই; অবিকল আমাদের জন্য তাঁরা যখনই পরিষ্কার মহাশয় সহ হুত্বকেননিত শযা ও হাংস দৃষ্টি মিষ্টার হুত্ব সমভিব্যাহারে পক্ষব্যক্তন সহ অতি চিকণ অস্ত্রেরও ব্যবহার করে নিরেন্ধেন। বক্তব্যপক্ষে একজন সাময়িক দ্বী ব্যতীত জাহ্নবী আদরের প্রতিটি উপকরণই তাঁরা আমাদের জন্য সরবরাহ করতে কৃতা বোধ করেন নি। আমরা তৎকালে রাজ নিজেরই একজন হুসজ পুলিশ মনে করতাম। তা বেন আজ আমার ধারণার

বাইরে। অথচ তাদের কাছে সমস্ত পুলিশেরই ছিল সমান আদর। একজন পুলিশ সাহেব ও একজন নিরস্তর পদের কনেষ্টবল অতিথি হিসেবে তাঁদের কাছে সমান ভাবেই আদর পেরে এসেছেন। একবার তাঁদের কাছে গিয়ে বললেই হলো যে আমি পুলিশ বিভাগের একজন লোক হিসাবে আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী। কি রাজস্ব, কি বোকাই, কি মহারাজ, কি বিহার—তারতের প্রতিটি প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের পুলিশের মধ্যে আমি দেখেছি অতিথিসেবা ও ভাত্যবাংসল্যরূপ সেই একই ভারতীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য। অন্তর্গত মাদ্রাজ বোকাই ও কলিকাতার মেট্রোপলিটন পুলিশদের মধ্যে আমি দেখেছি—যুবোপীর সভ্যতার শুণ্ড নির্ম্ম একটা বার্ষিক অভিব্যক্তি। কলিকাতা পুলিশের একজন অফিসার বিধায় লজ্জিত হয়ে উঠে আমি ডাবলায়, কাল ইনি কোলকাতায় এসে ক্রামপুত্রর থানার এসে হইতো আমি জিজ্ঞাসাও করবো না যে ইনি কোথায় থাকবেন ও আহ্বানদি করবেন। বরং নির্ম্মিকার চিত্ত আমি দেখবো ও উপভোগ করবো যে তিনি থানা হতে বার করে গিয়ে ট্রামের হস্তার ওপারে জনতার ভীড়ের মধ্যে বেয়াপুয় মিলিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা তাঁদের থানায় গেলে তাঁদের গৃহিণীর পর্যন্ত অতিথিসেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অনেকেই বহুতে পরিবেশন করে আমাদের শাইরেও দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তাঁদের ওপরে নিয়ে যাবো বা তাঁদের জন্য এতো বেলাতে রাজ্যধরে চুকতে হবে—গৃহিণীদের নিকট তা কল্পনারও বাইরে ছিল।

এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের এইরূপ অমায়িক ব্যবহার সত্ত্বেও আমি কিন্তু তাঁকে পুরাপুরি বিশ্বাস করে সকল ব্যক্তি তাকে এখনি জানিয়ে দেওয়া সমীচীন মনে করলাম না। এই সময় শুণ্ড তাঁকে এইটুকু আমি বললাম যে কুমারটুলির একজন খুনে শুণ্ডার খোঁজে আমরা এখানে এসেছি। তাঁর কাছে এ-ও শুনলাম যে, ঠেপনে গালা পোষাকে পাহারারত একজন সিপাহী গার্টকর্মে আমার ও হরিপদর মধ্যে করেকটা কথাবার্তার আদান-প্রদান দূর হতে শুনে বুকে নিয়েছিল যে আমরা কোলকাতা পুলিশ থেকে এখানে একটা-দায়লার তলন্তের জন্য এসেছি। আমাদের পুলিশ বলে নিশ্চিতরূপে বুরতে পারার জন্য সে আর আমাদের অসহন করেনি। উল্লতন অফিসারের কাছে প্রায়ই করেকটি উপদেশবানী শুনতাম, যথা—'বাহার হতে ক্র করে কিন্তু সেখানে নিজের জিনিস মিক্রর করো না। লোকের কথা শুনে বেও কিন্তু নিজে বেশী কথা কও না। পথ চলো নিঃশব্দে ও আলো পানের লোকেরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখো,' ইত্যাদি।

আজ সম্যক ভাবে উপলব্ধি করলাম, এ হুত্ববান উপদেশগুলি অফিসার অফিসার পালন না করলে জীবন পর্যন্ত কলর হতে পারে। শুণ্ডবান আমাদের প্রতি সবার যে এই

দিন আমাদের এই সব কথাবার্তা শোকা বাবুর কোনও উত্তরও
 তুলে নি। পুলিশওই জনৈক কনেষ্টবলের মত তা ক'গোরে
 হয়েছিল। সকল কথা শুনে ভারপ্রাপ্ত অফিসার সুরেশ বাবু
 বললেন, আচ্ছা, এখানে তো কুমারটুলির রাজাবাহাদুর এসে
 কিছুদিন আছেন। তাঁর লোকজনদের নিকটে গোপনে তাঁর
 সবচেয়ে খোঁজ নিলে হয় না? তবে রাজাবাহাদুরটা অতি পাঞ্জী ও
 অহংকারী। দারোগাদের একেবারে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। ওর
 মেলামেশা শুধু বড়োদের সঙ্গে। আমরা যেন হাঙ্গুই নই। এমন
 কি তাঁর পেটে দুই দিন পাছার ব্যবস্থাও আমাদের কর্তৃপক্ষের
 আদেশে করতে হয়েছিল। আইনে একবার গেলে দেখে নিতাম
 তাঁকে। আমি তাঁকে সাব্বান দিয়ে শুধু এইটুকু জানালাম যে
 কোলকাতায় তাঁর বিকল্পে করেকটা মামলা আছে। শীঘ্রই তিনি
 চারটে প্রেস্টারী গুয়ারেট পাবেন। সেই সময় দেওবরদাসীর কাছে
 বেইজ্ঞত হয়ে তাঁর এই সব দুর্ব্যবহারের জন্ত উচিত শাস্তি তো এমনিই
 পাবেন। কাল থেকে তাঁর গুথানে এসে আমরা আতিথ্য গ্রহণ
 করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিলে তবে তিনি আমাদের বিদায় দিতে
 রাজী হলেন। এ ছাড়া তিনি এক ব্যক্তিকে আমাদের খবরদারী
 করবার জন্ত আমাদের সঙ্গে পাঠাবার জন্ত জিদও করেছিলেন।
 এর পর তিনি একটা টাঙ্গা পাড়ী ডেকে আমাদের তাতে তুলে দিয়ে
 গাড়োয়ানকে তার প্রাণ্য (৭) ভাড়াটা নিজেই চুকিয়ে দিলেন।

আমার নির্দেশমত টাঙ্গা গাড়ীখানা আমাদের ভাড়া করা
 বাসাবাড়ীর দিকে ছুটে চলছিল। ঠিক এই সময় আমার
 মনে পড়লো আমাদের জনৈক আন্তর্য ভ্রমলোক শ্রীযুক্ত
 বানার্জির কথা। তিনি এই সময় দেওবর কোর্টের একজন
 ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদে বহাল ছিলেন। তিনি দেওবর
 সাবডিভিশনের সেকেন্ড অফিসার বিহার পদব্র্যাদায় ঠিক এস-ডি-ও
 সাহেবের নীচে। তাঁর কথা মনে পড়ামাত্র আমি টাঙ্গাচালককে
 'হাকিম লোককে। বাঙ্গলো'র দিকে তার গাড়ীখানি চালাবার জন্ত
 নির্দেশ দিলাম। আমাদের ইনকরমার হরিপদ সরকার এদিকে
 আমাদের বাসাবাড়ীতে আমার জন্ত আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা
 করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের আন্তর্য কর্তৃপক্ষ সত্ত্বেও আমাদের
 এই কর্মতার অসীম আন্তর্য বহুটির সচিব পদামর্শ করবার
 আমি বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছিলাম।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বানার্জির বাটতে এসে বখন আমি পৌঁছিলাম
 তখন সকাল দশটা বেজে গিয়েছে। আমাকে দেখে আমাদের রবিদা
 ওরফে রবীন্দ্র বানার্জি বিশেষ উৎকর্ষ হয়ে বলে উঠলেন, আরে
 তুমি হঠাৎ এখানে? এই সময় তিনি আদালতে হাবার জন্ত পোষাক
 পরে বার হয়ে বাচ্ছিলেন। আমার নিকট হতে সকল সমাচার
 অবগত হয়ে তিনি বললেন বাপ রে বাপ! এ তো সাজাতিক
 কাণ্ড! বেটা জ্বালাকেও একবার নিমন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু আমি
 তার গুথানে বাই নি। আচ্ছা। তুমি এখানে আমার এখানে
 জানাহার করে নাও। আমি আদালতে গিয়ে মণ্টা দুই 'দাঁড়ে' বসে
 ফিরে আসবো আধুন। এখানকার হেডকোয়ার্টারস হচ্ছে দুমকা
 সহর। দুমকা থেকে আর্দ্রাভ কোর্স নিয়ে আসা উচিত হবে।
 বিনা যুদ্ধে খোঁকা বাবু বখন ধরা দেবে না তখন এইরূপ ব্যবস্থা করাই
 ভালো হবে। আমি ফিরে এসে এস-ডি-ও সাহেবকে বলে দুমকার

লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমারও ইচ্ছা ছিল যে, স্মি
 ডিনটার সময় খোঁকা বাবুর বাটটা অন্তর্কিতে সমস্ত শাস্ত্রী বারা ঘেঁরাও
 করে কেলে সজোরে বুটসহ পদাধাতে দরজা ভেঙ্গে করে ঢুকে ঢাকে
 প্রেস্টার করা। এইরূপ অবস্থায় গুলী-বিনিময় হলেও আমাদের
 মধ্যে দুই তিনজনদের বেশী হতাহত হবার সম্ভাবনা কম ছিল।

আমি রবীন্দ্র বাবুর উপদেশই শিরোधार্য করে তাঁর
 জন্ত অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে করলাম। ইতিমধ্যে আমি
 আমার গুলীডরা পিছলটি কোমরের পেটা হতে খুলে কেলে
 শ্রীমতী বানার্জির নিকট জমা দিয়ে ব্রান করে নিয়েছি।
 রবীন্দ্রবাবুর একজন আর্দ্রাঙ্গীর মধ্যবৎ আমাদের ইনকরমার
 হরিপদ বাবুর নিকট আমার এখানে অবস্থান ও কারণ সত্ত্বে
 লিখে একটি গোপন পত্রও পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ব্রানের
 কার্য শেষ হলেও রবীন্দ্র বাবু ওরফে রবিদার সঙ্গে আমার একজনে
 আহার করার কথা। এদিকে তাঁর ফিরে আসতে আরও সেক
 ঘটকাল বাকি। তাই কিছু জলযোগ করে ঘৃতি পাঞ্জাবী
 পরে আদালতের আপো-পাশের রম্য স্থানটি ঘুরে ফিরে একবার
 দেখে আসবার জন্তে আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। আমি এর পর
 যুদ্ধ পদসঞ্চারে ইতস্ততঃ বুঝ কিরা করতে বড়োজতার উঠে কিছুটা
 দূর অগ্রসর হয়েছি। এই সময় হঠাৎ আমার নজর পড়লো
 সমুখের একটা ডাইনিং রুমিঙ মোকামের দিকে। সমুখের বা
 দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীরটা যেন সজোরে ছুটে উঠলো।
 আমার দেহের প্রতিটি শিরার শিরার যেন ইলেকট্রিকের শক

Amico's GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় দৈহিক ব্যথার যন্ত্রণা পাচ্ছেন- কোথায়?
 কোমরে, হাঁটুতে, কিংবা কোন সন্ধিহাসে?
 তবে বুদী হবেন—
 গাঠীমিক, বুক বা পিঠের পীড়নায়,
 বাতের ইত্যাদি হাবতীর ব্যথায়

এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেন্ট


(সহজ মালিশ)
 ব্যস্তবিকি নির্ভরযোগ্য।

মূল্য: বড় বটল—২.৭৫ নং পঃ
 ছোট বটল—১.৭৫ নং পঃ
 "হাওল" বস্ত্র

বাস্যপাত্রের জন্য দ্রব্য—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ

৮০ নং কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা-১



এবাহিত হচ্ছিল। আমি শিউরে উঠে জেরে দেখলাম এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে খোঁক খোঁক বাবু ভরবে খোঁক শুভা আমার সমুখে এসে বুখোবুখি হয়ে পাড়িয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে তার ডান হাতখানি তার ডান পকেটের মধ্যে কখনো সে সঁদিয়েও দিয়েছে। অজান্তেই আমিও আমার ডান হাতখানি তখন আমার পাখারীর ডান পকেটটাতে ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার সেই ডান হাতখানি পকেট হতে টোটাভরা পিঁপ্‌লসহ বার করে নেওয়া আর সম্ভব হলো না। হার, আমার নিত্যপ্রয়োজনীয় গুলীভরা পিঁপ্‌লটি এখান কোথায়? সেটি যে আমি বুদ্ধির দোষে সোঁতাগ করে আমার দ্রাব্যভাষার নিকট পছিত রেখে এসেছি। দোষী ব্যক্তিদের অমুখিত বিলাসী টাউন ছেড়ে খোঁকাবাবু যে এই অফিস কোয়ার্টারসের কোনও রাস্তার অন্তর্কিতে এসে পড়বে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। এইরূপ এক নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ারে পাড়িয়ে আমার উদ্ভতন কর্তৃপক্ষের করকট উপদেশবাণী থেকে থেকে আমার মনে পড়ছিল। আগেরাজ্ঞ কখনো হাতছাড়া করে না। একবার যদি তা হাতে ওরো তো তা বেন হাতেই থাকে। অজ্ঞাধার কখন আগেরাজ্ঞ আগপেই গ্রহণ করে না। ইহার অসতর্ক হেপাজতী শুধু পনের বিশদ ডেকে আনে না। সময় বিশেষে ইহা নিজেরও বিশদের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু খোঁকাবাবু কি আমার মত এই একই ভুল করেছে? নিশ্চয়ই সে তা করে নি। না হলে সে তার পকেটে অমন করে হাত পুরলে কেন? আমি আসামী কেঁটার মুখে ভুনেছিলাম যে খোঁকা কাউকে ক্ষমা করে না। কাউকে শত্রু বলে সন্দেহ করলেও তাকে তৎক্ষণাৎ গুলী করে মেরে ফেলে। তা ছাড়া গুলী ভরা পিঁপ্‌ল ও তৎসহ একখানি ধারালো ছুরি ছাড়া কখনও পথ চলে না। সে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলছিল যে খোঁকা আমাকে সেতবরের কোনও পথে দেখতে গেলে তখন সে আমাকে গুলী করে মেরে ফেলবে। এর আগে কয়েক বার আমি মৃত্যুর বুখোবুখি হয়ে পাড়িয়েছি। কিন্তু এর পূর্বে এমন অসহায় ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর বুখে আমাকে কখনও পাঁড়িতে হয় নি।

এই সময় হঠাৎ দুই পা গিড়িয়ে গিয়ে আমাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো, আশা করি পকানন বাবু, যে আপনায় কাছে একটা ভালো হাতিয়ার আছে। কিন্তু আপনায় কাছে যেমন একটা আছে তেমনি আমার কাছেও একটা আছে। এমন ভাবে দুজনেই এক সঙ্গে না মরে একটা কাব করা বাক। আপনিও সরে পড়ুন এবং আমিও সরে পড়ি। দুজনেই ব্যাপারটা চেপে ফেলবো আশুন। কেউ আমাদের এখানে দুজনকে একত্রে এখনও দেখে নি। এতে দুজনার কারখরিই কোনও বদনামের সম্ভাবনা নেই।

খোঁকা বাবু বুখে এইরূপ এক নতিবাচক বাক্য শুনে আমার মনে হলো যে তার কাছে বোধ হয় কোনও পিঁপ্‌ল বা ছুরিকা নেই। তা 'তার কাছে থাকলে নিশ্চয়ই সে এতোকণে আমাকে গুলী করে মেরে ফেলতো। এইবার আমি একটু সাহস সঞ্চয় করে খোঁকাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলাম, ওসব বাজে কথা থাক। এখান তুমি একটু মাত্র নড়ো, তো আমি তোমাকে গুলী করে মেরে ফেলবো। আমার নিকট হতে এইরূপ একটা উজ্জর পেতে পারে তা বোধ হয় খোঁকা বাবুর কল্পনার বাইরে ছিল। সে পাঁচ-বুখি বিচিরে

আমার দিকে একবার হিংস পত্তন মত তাকিয়ে দেখলো। তার পর তান হাত তেমনি করেই পকেটে রেখে বাম হাতটা বুট করে উপরে উঠিয়ে বললো, তা হলে আমাকে আর দোষ দেখেন না। আপনি মৃত্যুর জন্তে প্রস্তুত হন। তবে তার আগে আর একবার ভেবে দেখতে পারেন।

খোঁকার এই শেষ কথায় আমি ভীত-জঙ্ঘ মনে দুই পাশে একবার চেয়ে দেখলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আশে-পাশে একটি মাত্রও পথচারী আমার বৃষ্টিপোচের হলো না। সাহায্যের জঙ্ঘ চিৎকার করে ডাকবো, এমন একটি লোককেও নিকটে আমি দেখতে পেলাম না—বাকি সাহায্যের জঙ্ঘ ডাকতে পারা বার।

আরও মিনিট দুই এমনি ভাবে আমার বুখোবুখি হয়ে পাড়িয়ে থাকার পরও খোঁকা কিন্তু আমাকে আক্রমণ করলো না। আমার সন্দেহ হলো যে আমার মত তার কাছেও কোনও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নেই। এর পর আমি আর একটু মাত্রও দেবী না করে ছুটে গিয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ বস্তাধস্তির পর সে আমাকে একরকম ছুড়েই ডেনের মধ্যে ফেলে দিলে। কিন্তু আমি এই সময় মর্যাদা হয়ে উঠেছিলাম। আমি সজোরে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে তাকে সেখানে ফেলে দিলাম। হঠাৎ এই সময় সেখানে একজন সিপাহীসহ পুলিশের জমাদারকে দেখা গেল। এদের একজন অপর জনকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো, আরে এ কা ভৈল। রাজাবাবুকে শিটল হো। সৌভাগ্যক্রমে এদের অপর ব্যক্তি আমাকে ধানার বড়বাবুর সঙ্গে কথা কইতে দেখেছিল। অজ্ঞাধার তারা হয়তো রাজাবাবুকে রাস্তার মধ্যে প্রেতার করার জঙ্ঘ আমাকেই প্রেতার করে নিয়ে যেতো। গোলমাল বুখে সে এক দৌড়ে কোর্টে গিয়ে কোর্ট ইনসপেক্টরকে খবর দিতে গেলো। ইতিমধ্যে সেখানে খোঁক বড়বাবু সুরেশ বাবু একজন জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন। এস-ডিও সাহেবের কাছ হতে খবর পেয়ে তিনি ববীন্দ্রবাবুর কোয়ার্টারে আমাকে খোঁজ করতে আসছিলেন। এই সময় আমি বস্তাধস্তির মধ্যে প্রায় নিভেজ হয়ে পড়েছিলাম। ভবু রক্ষে যে খোঁকা বাবু ছুরি ও গুলী চালাতে অভ্যস্ত থাকলেও আমাদের মত রিক্তহস্ত মাহুয়ের সঙ্গে বস্তাধস্তিতে অভ্যস্ত ছিল না। ধানার বড়বাবু সুরেশ বাবুর প্রকৃত বিষয়টি বুখে নিতে একটুমাত্রও দেবী হয় নি। সুরেশ বাবুর নির্দেশে জমাদার দিলোয়ার ধানও পূর্ব হতে সেখানে উপস্থিত কনষ্টেবলটি একত্রে খোঁকা বাবুকে ঘিরে ফেলে তাকে জড়িয়ে ধরলো। ইতিমধ্যে অদূরে আদালত গৃহ হতেও বহু ব্যক্তি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এর পর বা আশা করেছিলাম তাই দেখা গেল। দেহ তল্লাসী করে খোঁকা বাবুর নিকট আমরা একটা পেনসিলকাটা ছুরিও পেলাম না।

খোঁকা বাবু সিংহ-বিক্রমে গর্জে উঠে একবার বলে উঠলো, জমাবাবু বৈজ্ঞানিক। হাক, একটি নবহতার পাপ থেকে তা হলে আমি রেহাই পেলাম। খোঁকা বাবু আমাকে কনগ্রাটুলেট করে খুশীমনেই জানালো যে তার অপরাধী ভীতনে সে এই প্রাণের নিরঙ্ঘ হয়ে রাজপথে বার হয়েছে। সে আমার দিকে এগিয়ে এসে জানালো, আরে পকানন বাবু! সকালে বাড়ী দিয়ে সবমাত্র ছুরিটা ও গুলীভরা পিঁপ্‌লটা পেঁচার কাপড় হতে বুখে নিয়ে সেগুলো ট্রাকে বন্ধ করে চান করতে বাবো ভাবছি এমন সময় কালাপাহাড়

এসে বললো যে যোগা আমার কাণ্ড তখনও দিয়ে যায় নি। বোটা প্রতিজ্ঞাতি দিয়েও প্রতিজ্ঞাতি বাধে নি। তাই খামকা আমার রাগ হয়ে গেলো। রেগে মেগে টাক্সী করে এই ডাইনিঙ রুমিনাঙ দোকানটাতে এসে দেখি সেটা বন্ধ। একবার কোর্ট গিয়ে একজন বন্ধু উকিলের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। এই জন্ত চূড়ান্ত ক্রমে ওই টাক্সির ভাড়া চুকিয়ে সেটাকেও ছেড়ে দিয়েছিলাম। তা'না হলে আমাদের মাইনে করা টাক্সি ড্রাইভার নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করার জন্ত ছুটে আসতো। এতোগুলি ঘটনার যোগাযোগ আপনার পক্ষে গিয়েছে বলে আপনি এবারের মত বেঁচে গেলেন। আপনার ওপর বাবা বৈতন্যনাথের বোধ হয় দয়া আছে। অবশ্য ভগবান বলে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি যদি থাকেন তবে—

রাস্তার উপর ঝাঁড়িয়ে থোকার কাছ হতে এতো তথ্য কথা জনতে আমরা স্বভাবতঃই রাজী ছিলাম না। কিন্তু সুরেশ বাবু আমার উপদেশ মত থানা থেকে একটা হাতকড়া ও একটা মাটা বশি আনতে পাঠিয়েছিলেন। এর কারণ এই যে, কটকান মেয়ে এতোগুলো ব্যক্তির হাত এড়িয়ে পালাবার মত ক্ষমতা থোকা বাবু ছিল। দ্রব্যাকয়টি থানা থেকে এসে পড়া মাত্র আমরা থোকার হাতে হাতকড়া পরিয়ে ও কোমরে আটপৃষ্ঠে দড়ি জড়িয়ে তার মত বীরের মর্যাদা রাখতে কুঠী বোধ করিনি। এর পর বীরে দীর্ঘে আমরা তাকে নিয়ে থানায় এসে দেখি যে সশস্ত্র শাস্ত্রীসহ সহ S. D. O. সাহেব, রবীন্দ্র বাবু, ডি. এস. পি, বসিকুদ্দিন খান সাহেব প্রভৃতি থানায় এসে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মধুপুর থানার অফিসার ইনচার্জ এস ব্যানার্জিকেও দেখলাম। বাবিনতার পর ইনি এ আই জি হয়েছিলেন।

থোকা বাবু চারি দিকে এববার চেয়ে দেখে আমাদের বললো, পকানন বাবু, ভুল করছেন আপনি। আমি হচ্ছি ডুপ্লিকেট থানা। আমরাই নাম হচ্ছে সুরোধার। আসল থানাকে ধরেও কোলকাতায় তাকে আপনারা ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। থোকা বাবুর কথায় চমকে উঠে আমি তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। তারপর তার ক্রুর দৃষ্টির প্রতি চোখ রেখে আমি উত্তর করলাম, আচ্ছা, এখুনিই তা প্রমাণ হবে। তোমার বন্ধু হরিপদও আমার সঙ্গে এসেছে। হরিপদকে আনবার জন্ত আমি থানায় এসেই একজন জমাদারকে পাঠিয়েছিলাম। আমার কথা শেষ হতে না হতে হরিপদ সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে উঠলো, আরে, এই তো থানা—থানা—তাহলে থানা ধরা পড়লো, এঁা! থানা বজ্রমুষ্টি তুলে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতে অপারগ হয়ে চোখ দুটো ছোট করে বলে উঠলো, পকানন বাবু তার কর্তব্য করছে। কিন্তু তাকে

আমি বুঝা করি। তাকে আমি আগে সরাবো, সকলে মিলে হরিপদ বন্ধুকে তার চোখের আড়ালে সরিয়ে দিয়ে আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় থোকাকে নিয়ে একটা লরীবোসে D. S. P. সাহেবের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশের একটা দল সহ আমরা থোকার বিলাসী টাউনের বাটীতে এসে তখুনি কদরকজন স্থানীয় সাক্ষীর সম্মুখে বাটার খানাতল্লাসী শুরু করেছিলাম। থানার বান্ধু খুলে তার মধ্যে আমরা প্রথমেই পেলাম তামা কাঠের ভর্তি একটি শিশু। এই শিশুটি দুই বৎসর পূর্বে কুমুরটুলির একটি জমাদার বাড়ী হতে সেখানকার তামা ভেঙ্গে চুরি করা হয়েছিল। এর পর ঐ বাস্তব ভিত্তর হতে হাতীর দাঁত দিয়ে বাট বাঁধানো থোকা বাবুর সোঁখিন সুরধার ছুরিখানা বেরিয়ে পড়লো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে তখনও পর্যন্ত ছুরির রেড়ে শুকনা রক্তের ছাপ লাগা ছিল। এছাড়া ঐ বান্ধু হতে সন্তোষে হাজার টাকা ও এগারোটি হীরার জলদার পাওয়া গেল। থোকার এইখানকার বাটা হতে আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রদর্শনী দ্রব্য (Exhibit) পাওয়া গিয়েছিল। এইগুলি ছিল থোকার পরিবার বস্তাদি। এদের প্রত্যেকটির কোণে কোণে লাল সুরতীর দ্বারা S অক্ষরটি উৎকীর্ণ করা ছিল। এইরূপভাবে S অক্ষর যুক্ত বহু রক্তমাখা বস্তাদি ইতিপূর্বে আমরা থোকার কুপানান্থ লেনের বাড়ীতেও পেয়েছিলাম। এই থেকে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছিলাম যে S অক্ষরযুক্ত রক্তমাখা কাপড়গুলির অধিকারী থোকাবাবুই ছিলেন।

এতে মহা উৎসুক হয়ে আমরা থোকা বাবুকে নিয়ে দেওঘর থানায় কিরলাম, কিন্তু থোকা বাবুর অস্বাভাবিক ভূত্যা কালাপাহাড়কে কোথায়ও আর পাওয়া গেলো না। তবে স্থানীয় এক পানবিক্রেতা আমাদের জানালো যে এইদিনই সে থোকার আদেশে মধুপুরে একটা কাজে গিয়েছে। সেখানে সে দিন চার পাঁচ থাকবে। এর পর থোকাকে নিয়ে আমাদের অপর এক সমস্তা হলো। আমরা তাকে থানার হাজতে রাখা একটুমাত্রও নিরাপদ মনে করি নি। এইজন্য S. D. O. সাহেবের বিশেষ আদেশে তাকে আমরা স্থানীয় জেলখানায় পাঠিয়ে দিলাম। এই সময় ঠিক হলো যে তার বিবৃতি নেবার জন্ত আমি পরদিন প্রত্যুষে থোকার সঙ্গে এই জেলখানায় এসে দেখা করবো। S. D. O. সাহেব এইজন্য একটি বিশেষ হুকুমনামাও আমার সুরিধের জন্ত লিখে রাখলেন।

এইদিন কোনও রকমে একটু আহার করে হরিপদকে সাধনা দিতে দিতে আমি থানার বড়বাবুর কোয়ার্টারের একটি ঘরে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন নিশ্চিন্ত ও নিরুবেগ ঘুমের আনন্দ আমি বহুদিন পাই নি। কিন্তু কে জানতো যে বিপদ তখনও আমাদের শেষ হয়নি!

[ক্রমঃ।

একটি সম্ভাব্য হাসি

সন্তোষ চক্রবর্তী

- ঐ বুঝি হাসলো সে, অলসুড়ি বেজে ওঠে হাতে, বিকেল সমুদ্র হল ঝিরঝির শাখার হাওয়ার।
আমি তার দেবতাও হতে পারি। সময়ের সাথে পথ চলা কী মধুর; কী বক্ষণা নিবিড় পাওয়ার।

যেতে যেতে চমকানো। কিরে দেখি। বলকে বলকে ঐ বুঝি হাসিতেছে, আকাশ যে আরও নীল হলো।
আমি তার দেবতাই। না হলে সে দীর অপলকে এমন আপন মনে তাকাতো না লাজে হলোহলো।

আমাকে চকল করা তার ব্রত। পোনো, ঐ হাসে, তখন পোঁদুসি কিংবা ভোর হয়, পাখীরা বাতাসে।

শরৎচন্দ্রের এক সন্ধ্যার স্মৃতি

শ্রীঅজিতকুমার সেন

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবনিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি বহু স্মৃতি মনোহী ও সুবিজ্ঞ সমালোচকই সমিভাবে তাঁর রচনার ও জীবন-কথার আলোচনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তাঁর সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য পরিবেশনের দাবী অথবা স্পর্শও আমি রাখি না। তবে, বহু বৎসর পূর্বে অনাড়ম্বর এক রাত্ৰায়া সন্ধ্যা-বৈঠকে শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে তাঁর লেখা সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক এক ভাষণ শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই কথাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বলিব।

১৯২৩ কি ১৯২৪—বোধ হয় ১৯২৪ই হইবে। কলেজে পড়ি ও মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের (বর্তমানে কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট) ওয়াই-এম-সি-এ ইন্ডেন্টস্ হোটেলে থাকি। তারই কতৃৎস্থানীয়দের আমন্ত্রণে সেই সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র আমাদের ছাত্রাবাসে আসেন। অমুঠানে আমার নিজের মাদুলী একটি ভূমিকা ছিল,—উদ্বোধন-সংগীতের। আমাকে বর্তমানে ঝাঁপা চেনেন—তাঁরা এ সংবাদে হকচকিয়া উঠিবেন নিঃসন্দেহ। শরৎচন্দ্র নিজে যে সংগীতজ্ঞ ও সুররসিক, তাহা আমরা জানি গাম। সুরতরঙ্গ গাহিয়াছিলামও ভয়ে ভয়ে এবং সসঙ্কোচে। গানের শেষে তাঁর মুখাবয়বের রেখা-চিহ্নে কোন বৈলক্ষ্য্য না দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি যে,—আনান্ডীয় অক্ষম সে সংগীত-প্রচেষ্টা। তিনি তাঁর সহজাত খেলোয়াড়-মূলভ মনেই গ্রহণ করিয়াছেন।

এরপর তিনি তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। হৃৎথেব বিষয়, তার কোন অমূল্যখনই রাখা হয় নাই। স্মরণ হয় মূল বক্তব্য ছিল—তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসের ধারা। প্রসঙ্গক্রমে কিছুটা ক্ষুদ্র ভাবেই যেন এই স্মৃতি তিনি শরৎ-সাহিত্যের তথাকথিত দুর্নীতিমূলক বিতর্কের উল্লেখ করেন বাংলা সাহিত্যের আসরে সেদিন এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় খেউও উত্তোয়ের পালা উদ্র হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব হইতেই রবীন্দ্র-পন্থা ও ষিঙ্কেজ-পন্থীর বিরোধ ক্ষিপিত হইয়া আসিলেও, সাহিত্যে দুর্নীতির ধূরা তখন অব্যাহত, বিশেষতঃ কবিত্ত্বক রবীন্দ্রনাথের 'স্বল্পশত্রু'-যুগীয় গদ্য উপভাঙ্গ অবলম্বনে। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি নারী-চরিত্রসমূহ তাতে শুধু যে নূতন করিয়া ইন্ধন জোড়াইয়াছিল এমন নয়, তাঁর বইগুলি এই সময়ে সনাতন-পন্থী বিশিষ্ট এক সমালোচকগোষ্ঠীর ভীমকলের চাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াই যেন তাঁদের চকিত, ক্ষুব্ধ, প্রতিক্রিয়া-পরায়ণ ও দণ্ডে-নবধর-সংকুল করিয়া তোলে। লেখার ব্যক্তিগত আক্রমণও সেদিন কার্পণ্য হয় নাই। অতীতকি ইবসেন, বাগার্ড শ'-এর বইও তখন শুষ্ক সমালোচনা হাতে হাতে ফিরিতেছে, এক প্রথম যুগোপীয় মহাসমরোত্তর কালের ভাব-বৈকল্যের বিপ্লবান ধারা এসেছেও ক্রম-প্রসারমান।

সেই ডায়ারিডালের বাজারে আমাদের সন্ধ্যা আসরে যে সত্যটির প্রতি শরৎচন্দ্র পাঠক-সম্প্রদায়কে অবহিত হইতে বলেন—আমার মনে তা অনপনের এক বেথাপাত করে। তাকে শরৎচন্দ্রের—সাহিত্য-জীবনের উপর অভিনব এক আলোক সম্পাতও বলা যায়, বিশেষ করিয়া আজিকার এদিনে যখন এমনও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, শরৎ সাহিত্যের উপর সহজিয়া ধর্মী সাহিত্যের ছাপ আঁটিয়া কোন কোন সমালোচক তাকে "Ism" (ইজম্) বা মতবাদ মূলক সাহিত্যের কোঠায় ফেলিতে চাহিতেছেন। স্বয়ং শরৎচন্দ্রের সেদিনকার নিজের কথা,—কথাশিল্পী চণ্ডি সৃষ্টি করেন, অন্তর্নিহিত সৃজনের প্রেরণায় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ও প্রত্যয়ের আলোকে। মানুষের প্রকৃতি,—তার ভালো ও মন্দ,—তথাকথিত সুর ও কু, অর্থাৎ নীতিবোধ এবং তার চিন্তের প্রবণতা বা যৌক,—এক কথায় তার গোটা ব্যক্তিত্ব, এ সবই গড়িয়া ওঠে তারআপ্ত ও লব্ধ সংস্কার সমসাময়িক ঘটনা সংঘাত, এবং অমূল্য অথবা প্রতিকূল পারিবারিক, সমাজগত ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ প্রমুখ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নানা অপরিসংখ্য কারণের সমন্বয়ে। বিভিন্ন ছাঁচে গঠিত এ সব নয়নারীর চরিত্র-বৈচিত্র্যই শিল্পের ও সাহিত্যের উপজীব্য। তাদের নিবিড় ও প্রত্যাক সম্পর্কে চিত্ত যে গভীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তথা অন্তঃবেগের সঞ্চার হয়—সংবেদনশীল মনে তাহাই বহিয়া আনে প্রকাশবেদনা, প্রেরণা-সম্পাদন ও সিংহাস। শক্তিমান কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী ভাষায়, চিত্রে ও ভাষ্যে সেই অমূল্যভূতিসমূহই অস্তরের দরদ ও সহায়ভূতি দিয়া মূর্ত ও বাস্তব করিতে প্রয়াস পান। এঁদের ভূমিকা স্রষ্টার ও স্রষ্টার, ভোক্তার ঠিক নয়;—এক এই কারণেই এবাধিধ ধারণা ভ্রান্ত ও অশুদ্ধের যে, স্মৃতি কোন চরিত্র-বিশেষের প্রতি এঁদের কোন পক্ষপাতিত্ব অথবা তার সম্পর্কে এঁদের কোন অজ্ঞান বা একান্ত বোধ রহিয়া গিয়াছে। ভাষান্তরে সকল রঙে রঙীন হইয়াও এঁরা দলীয় মনোবৃত্তির অতীত এক ভূমিতে সংগত। সুরতরঙ্গ রসতত্ত্ব বিচারে নীতির আলোচনা একান্তরূপে অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও, এরূপ মনে করিবার কোন হেতুই নাই যে—যরমী সাহিত্য-স্রষ্টা তাঁর রূপায়িত কোন-না-কোন নয়নারীর চরিত্র নৈতিক অথবা সামাজিক আদর্শরূপে খাড়া করিবার অপচেষ্টায় উন্মুখ ও উৎকণ্ঠ। বরং এমন বলা লে যে, এসব চরিত্র দিব্যাহুগিনের জীবনের এক একটি Type বা প্রতীক এবং এই কারণেই এঁদের আবেদন পার্থক্য ও শাশ্বত। উচ্চসের সাহিত্য যে প্রচলিত অর্থে প্রচারমূলক ঠিক নয়, রস পরিবেশনই যে তার মূল উদ্দেশ্য, স্মৃতি সমাজে অবিসংবাদিত রূপে একথাই বা আজও কোথায় বাঁকুতি পাইল?

মাসিক বসুমতীর প্রচার ও প্রসার বাওলা দেশের বিস্তার!!

মিষ্টি স্নরের নাচের তালে মিষ্টি ঘুথের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



অপ্রসিদ্ধ কোলে

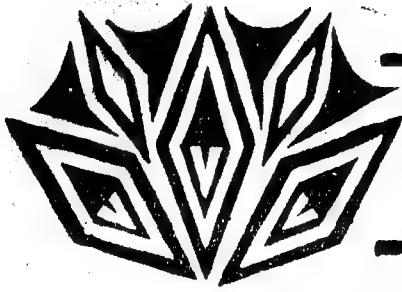


বিস্কুটের

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০



সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

বাঙলা গ্রন্থ বঙ্গীকরণ

প্রাচীন সাহিত্যেবী শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সাহিত্যজগতে বিশেষ প্রভাব অধিকারী। বর্তমানে গ্রন্থাগারের পরিচালন পদ্ধতির উন্নতিকল্পে উপরোক্ত গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছেন। শিকোনামা থেকেই অনুমান করা যায় যে গ্রন্থটি গ্রন্থের বঙ্গীকরণ সম্পর্কিত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রন্থের বঙ্গীকরণের বিষয়ে সকলেই আশা করি সুবিধিত। একই বিষয়ক গ্রন্থাদি একত্রে সম্বন্ধিত না থাকলে গ্রন্থ সেনসেনের ব্যাপারে গ্রন্থাগারের কর্মীকে বিশেষ অগ্রবিষার সমুদীন হুঁতে হয় এই অগ্রবিষা দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই এই পদ্ধতির জন্ম, কিন্তু তাতে ভারতীয় বিবরণি বর্ণোচিত সন্নিবেশিত না থাকায় এই পদ্ধতিটিকে এ দেশীয় গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রভাতকুমার এই দীর্ঘায়তন গ্রন্থটির জন্ম দিলেন, প্রভাতকুমারের এই অসাধারণ কীর্তি গ্রন্থাগার জগতের বিরাট অভাব দূর করল ও এক বিরাট সমস্যার সমাধানও করল সেই সঙ্গেই। গ্রন্থাগারিকের দল এই গ্রন্থটি থেকে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হবেন এবং স্বভাবতই আশা করা যাবে যে দেশের গ্রন্থাগারগুলিও এর কলে অনুযায়িত ক্রমশঃই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। সে দিক বিচার করলে বলা যায় যে প্রভাতকুমারই সেই উন্নতির, পথের সন্ধান দিলেন। এই গ্রন্থটি প্রণয়নে এই পরিণত বয়সে তাঁকে যে পরিমাণ শ্রম বরণ করতে হয়েছে এবং যে অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে হয়েছে তার তুলনা নেই। এই গ্রন্থটির জন্ম, এ কথা বলাই বাহুল্য যে দেশের গ্রন্থাগার জগত প্রভাতকুমারের কাছে ধনী হয়ে উঠল। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১ ভাদ্রাচরণ-দে ফ্রীট দাম—দশ টাকা দাম।

শ্রী চৈতন্যদেব

সুদূর অতীতের অভিমুখে শিখন করে তাকালে দেখা যায় যে বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব অনতিক্রম্য। বাঙলা সাহিত্যের আজ যে বিরাট পীড়ন রয়েছে তার অনুশোধন হয়েছিল চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে, সেই থেকে আজ পর্যন্ত চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে, অনুশোধ জীবনীকারের দ্বারা, আলাদা গ্রন্থটি মহাপ্রভুর জীবনী সম্পর্কিত একটি সাম্প্রতিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি রচয়িতা স্বামী সারসেদানন্দেব অথবা দক্ষতার একটি উৎকৃষ্ট ব্যাকর। মহাপ্রভুর পুত্র পবিত্র জীবনী আলোচনায় ও বিশ্লেষণে স্বামী সারসেদানন্দেব এভাবে যেমনই কথোক্তি, প্রভা এবং অকস্মিক তেমনই প্রভূত

পবেষণা ও শ্রমের পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন গ্রন্থটির মাধ্যমে। বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর দেহান্তরে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে। চৈতন্যদেবের জীবনীকে কেন্দ্র করে লেখক সে যুগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক একটি নিখুঁত আলোচনা পরিবেশন করেছেন। এই সব দিকগুলিকে কেন্দ্র করে গ্রন্থটি অসীম তাৎপর্ষ্যে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখকের রচনা যথেষ্ট প্রাণশ্পর্শী, সরস ও মনোমুগ্ধকর। গ্রন্থের অনঙ্গসজ্জাও মনোরম। প্রকাশক—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, শিলা, "পরিবেশক—মডেল পাথলিগি হাউস। ২-এ ভাদ্রাচরণ দে ফ্রীট। দাম আট টাকা দাম।

অতীতের স্মৃতি

যুগভ্রাতা রামকৃষ্ণের পুণ্যানামযুক্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্রকীর্তি রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে ধারা দেশের ও জাতির সর্বত্র কল্যাণকর আত্মনিয়োগ করে অমরত্ব অর্জন করেছেন স্বামী বিরজানন্দ তাঁদেরই একজন এবং এক বিশেষ জনও। বছর দলে ক পূর্বেও তিনিও আমাদের মধ্যেই প্রকট ছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বাধ্যক্ষরূপে তাঁর পুণ্যকীর্তি এবং ঠাকুর ও স্বামীজীর পবিত্র ভাবাদর্শ অনুসরণ করে মানব কল্যাণকর্যে তাঁর আত্মনিয়োগ তাঁকে অমরত্বের আশ্রমে সমাসীন করেছে। গ্রন্থটি তাঁরই জীবনী গ্রন্থ, গ্রন্থটিতে বিরজানন্দের ব্যাপ্ত পরিচয়, গার্হস্থ্য জীবন, জীবনের ভাবাভাব, রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদান এবং পরবর্তী সাধক জীবন সম্পর্কে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্যবহুল বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটির সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে, এই গ্রন্থে বিরজানন্দের জীবনকে কেন্দ্র করেই রামকৃষ্ণ মিশনের একটি আত্মপুর্বিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, এমন কি মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন বহু ঘটনা কাহিনী বা ব্যক্তি সম্বন্ধীয় বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। ঠাকুরের, মায়ের, স্বামীজীর, নিবেদিতার এবং ঠাকুরের অন্ত্যস্তান মানসপুত্রদের এবং আশ্রমের অন্ত্যস্ত স্বামীজীদের বিবরণ বহু তথ্য ইতিহাস ঘটনা এখানে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে গ্রন্থটিকে অনায়াসে এক প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া যায়। গ্রন্থটি রচনার স্বামী প্রদানন্দ যথেষ্ট শক্তির ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, পোঃ বেগুড় মঠ, হাওড়া, পরিবেশক মডেল পাথলিগি হাউস, ২-এ ভাদ্রাচরণ দে ফ্রীট। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চদশ পয়সা দাম।

জর্জ বার্নার্ড শ'

'মাসিক বহুমতী'র পাঠক-পাঠিকার কাছে তবানী মুখোপাধ্যায় অপরিচিত নন। বিশেষ সাহিত্যের বহু মূল্যবান রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে তাঁর মূল্যবান রচনার সঙ্গে। আলোচ্য গ্রন্থটিও 'মাসিক বহুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বার্নার্ড শ' এর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কীয় এবাং বহু রচনা প্রকাশিত হলেও বাংলায় ঠিক এখন পর্যন্ত একখানি প্রামাণ্য পূর্ণ বইয়ের অভাব ছিল; বর্তমান বইটি সে অভাব অনেকাংশে দূর করবে।—বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ভাণ্ডারে এটি যে একটি মূল্যবান সংযোজন একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।—বইটির ভূমিকার লেখক বলেছেন যে 'শ' এর সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠককে আগ্রহী করে তুললেই এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখকের এই আশার সঙ্গে একমত হয়ে আমরা গ্রন্থটির সাক্ষ্য কামনা করি।—প্রচ্ছদ সুকৃতিপূর্ণ, ছাপা ও বঁধাই ভাল।—প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, দাম—আট টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা মাত্র।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র

গল্প ও উপভাস রচনার বর্তমান লেখকেরা যত উৎসাহী সাহিত্যের অজান্তে দিক তাঁদের ঠিক ততখানি আড়ষ্ট করে না, এক সেতুই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য এখনও খুব 'সমুদ্র হয়ে ওঠেনি। বিখ্যাত সাংবাদিক স্রুতমার মিত্র রচিত 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র' প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কয়েকটি প্রবন্ধ লেখক উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের জাতীয় বিদ্রোহ কাহিনীগুলিকে পরিবেশন করেছেন।—প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত, কালানুক্রমে এগুলি সাজান হওয়াতে পাঠকের পক্ষে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সহজ।—অল্পসঙ্কীর্ণ পাঠক বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করবেন।—প্রকাশক—এডারেল বুক হাউস, এ-১২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কিট, দাম—তিন টাকা মাত্র।

সোনার আলপনা

বাঙলা দেশের পাঠক মহলে স্রুতমার প্রবন্ধকার রূপে ঐতিহ্যবাহীন বঙ্গোপাধ্যায় আজ বর্ষে প্রসিদ্ধির অধিকারী। আলোচ্য গ্রন্থটি পৃথিবীর যুগপ্রসিদ্ধ সাহিত্যবিদ্যার জীবন ও তাঁদের সাহিত্য সম্বন্ধীয় তাঁর (লেখকের) কয়েকটি রচনার সমষ্টি। এই রচনাগুলিকে বহুমতী পাঠক পাঠিকাগণ বহুমতীর পাতার ইতঃপূর্বে দেখেছেন। পৃথিবীর দিকপাল সাহিত্যপ্রসিদ্ধির জীবনী এবং তাঁদের বিখ্যাত সাহিত্য সৃষ্টিগুলির সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থটিকে রূপ দিয়েছে। বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন সাহিত্যিকের দ্বারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাহিত্য সম্পদ কেমনভাবে রূপ নিয়েছে এক সেই নব নব রূপান্তরনের মধ্যে দিয়ে কেমন করে সেই সাহিত্য পূর্বভার অভিব্যক্তি এগিয়ে গেছে সে বিষয়ে এক অল্পশয় আলোচ্য চিত্রবর্ণন বঙ্গোপাধ্যায় এখানে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠক পাঠিকা ভগতের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি সমূহের আখ্যান ভাগগুলির সঙ্গে অনায়াসে পরিচিত হতে পারবেন। গ্রন্থটিকে সব চেয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছে লেখকের কাব্যময় ভাষা। গ্রন্থের নামকরণটি বর্ষে প্রাণশ্পর্শী কেবল মাত্র সাহিত্যকারদের জীবনী ও গ্রন্থাদির আলোচনাই লেখকের মূল্য উদ্দেশ্য নয়, প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে লেখক একটি নিত্য সত্যের দিকেই সর্বদা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে শত শত শতাব্দী, ভাষা, বিয় প্রভৃতিকে তার সৃষ্টির সাধনা থেকে কখনো বিচ্যুত করতে পারে না। মহৎ সৃষ্টিকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তার প্রকাশ ঘটবেই। গ্রন্থখানি বাঙালীর সাহিত্য ভাণ্ডারে ঐশ্বর্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করল এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রকাশক—এডারেল বুক হাউস, এ-১২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কিট, দাম—আট টাকা মাত্র।

বাস্তব-বিজ্ঞান

জিনারায়ণ সাত্তাল বাস্তব-বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ভাষায় 'বাস্তব-বিজ্ঞান' পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে বিশেষজ্ঞ ও জনসাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়েছেন এবং বাংলা ভাষায় এরূপ একটি প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনা করবার গৌরব অর্জন করেছেন। অবশ্য আলোচ্য পুস্তকে তত্ত্ব নির্ধারণ পদ্ধতি বা নির্ধারণ কৌশল সম্বন্ধেই আলোচনা সীমিত হয়েছে। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু (২)—বাস্তব বিজ্ঞানের নজর, বিনিয়োগ, ইটের গাঁথনি, ট্রি-ইনফোর্সড কংক্রিট, বাড়ীর প্রাচীর প্রভৃতি। লেখকের প্রথম ও উত্তম প্রণয়ন। প্রকাশক—ভারতী বুক স্টল, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, দাম দশ টাকা মাত্র।

ভাগনের নিঃশ্বাস

বাঙলা কবিতা এবং ছোট গল্পের ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবদান পরিমার অল্প নেই। শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি বাহুবল। বাঙলা শিশু সাহিত্যে তাঁর দ্বারা বহুল পরিমাণে পুষ্ট হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর ছোট ছোট ছোট উপযোগী বড় গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে (ভাগনের নিঃশ্বাস ও পিঁপড়ে পুণ্য) গ্রন্থটি স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্ব ভরপুর, লেখনীর দক্ষতার কল্যাণে প্রাণবন্ত, পটভূমির বৈশিষ্ট্য উজ্জল। দ্বিতীয় গল্পটির পটভূমির বৈশিষ্ট্য পাঠককে হতবাক করে দেয়। ছোট বড় নিবিশেষেই আমরা দৃঢ় ভাবে বোধগম্য করতে পারি গল্পটি অবশ্য পঠিতব্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র যে অল্পবয়স্ক কল্পনাশক্তির অধীশ্বর তাই প্রমাণ মিলবে পিঁপড়ে পুণ্যে—পিঁপড়ের মাটির তলা থেকে পৃথিবীকে দুর্বল করেছে, হাজার হাজার বছরের সাধনায় তারা সফল হল, সমস্ত পৃথিবীকে তারা তখন ধ্বংস করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করল। এরকম একটি অভিনব চমকপ্রদ গল্প শিশুসাহিত্যের ঐতিহ্য বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। প্রেমেন্দ্র মিত্র সন্ধানী, স্রষ্টা, চিন্তাশীল—তাঁর চরিত্রের এই তিনটি দিক গল্প 'চ'টির মধ্যে বিশেষ ভাবে হারপাত করেছে। গ্রন্থটি আশান চমৎকারিত্বের স্রোত ছোটদের স্রব অনায়াসে গ্রহণ করতে পারবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রকাশক—গ্রন্থ, ২২১ কণ্ডওয়ার্লিশ স্ট্রীট, পরিবেশক শ্রীকান্ত সিংহকেট প্রাইভেট লিমিটেড। ১২১, লিওনে স্ট্রীট। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

মিতে-মিতিন

সাহিত্যে বলিষ্ঠ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তক হিসাবে শৈলজ্ঞানন্দের নাম সন্মান্য নয়, একদা সমগ্র সুবীক্ষণক্ষম আলোড়িত করে তুলেছিল তাঁর কবিতাকৃতিকে কেন্দ্র করে। অনবদ্য রচনা সমূহ খনি-সমুদ্রের জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের কাহিনীই তাঁর কবিতাকৃষ্টি সংক্রান্ত গল্পগুলির বিষয়বস্তু; বর্তমান সংকলনটিতে ছানি পেয়েছে তারই কবিতা। “মিতে-মিতিন” বারোটি ছোট গল্পের এক সংকলন, একমাত্র ‘কে তুমি’ ব্যতীত প্রত্যেকটিই দীর্ঘতাল খনি-প্রমিদের বিচিত্র জীবনযাত্রার সার্থক রূপায়ণ। শৈলজ্ঞানন্দেব অনিন্দ্য কথকতা, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, কাহিনীগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে; প্রতিটি গল্পই উপভোগ্য এবং পাঠকমনকে বশীভূত করে তোলার ক্ষমতা রাখে। ‘কে তুমি’ গল্পটির উপাদান একটু অল্প ধরণের, অশরীরী রহস্যের ছায়া আছে। এই গল্পটিতে, কুশলী লেখকের লেখনীর স্পর্শে তা হয়ে উঠেছে রসময়ুর। ইন্দ্র হুগার অঙ্কিত প্রচ্ছদটি অতি মনোহর। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ ভ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, দাম তিন টাকা মাত্র।

বাহু বাহু, পদে পদে

অচিন্ত্যকুমারের নৃতনমত গল্প-সংগ্রহ। ‘অচিন্ত্যকুমার’ এই নামটিই আজ পাঠকমনকে কৌতুহলী করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট, অপূরণ লিখনশৈলীর মাধ্যমে যুগোপযোগী বিষয়বস্তুকে পরিবেশন করেছেন তিনি এই গল্পগুলিতে, কলে প্রত্যেকটি গল্পই হয়ে উঠেছে মিটোল, রসোত্তীর্ণ, মোট সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে এবং তাল প্রত্যেকটিই সুখপাঠ্য। বইটির নামের মধ্যেই তার সার্থক পরিচয়, রসপিপাসু পাঠক পড়ে তৃপ্ত হবেন এ কথা বহুক্ষেপেই বলা যায়। প্রথম একটি মনোহর গল্প সংগ্রহ উপহার দেওয়ার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ ভ্রামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম দু’ টাকা পঁচাত্তর নয় পয়সা মাত্র।

মাছুষ গড়ার কারিগর

বর্তমানকালে বাঙলা কথাশিল্পীদের মধ্যে একটি বিশেষ ও সম্মানজনক আসন মনোজ বহুর অধিকারভুক্ত। গল্প, উপন্যাস, কবিতা নাটক, ভ্রমণকাহিনী রচনার সকল ক্ষেত্রেই ইনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষকতার চেয়ে যন্ত্রণার পেশা আর নেই, অসংখ্য বাছুরকে ‘মাছুষ’ এর পর্বায়ে উপনীত করেন এই শিক্ষকবুল, মাছুষের হুগু যান, ধারণা, চিন্তা, চেতনাকে এঁরাই জাগরণের ঘোষে নিয়ে আসেন। মাছুষকে তার জীবনের বোধনলগ্নে এঁরাই জীবন সম্পর্কে পাঠ দেন শিক্ষকবুল সারা জাতির নমস্ত তাঁদের অবদানের তুলনা নেই, তাঁদের কাছে ধর্মের শেষ নেই। এই শিক্ষককে কেন্দ্র করেই আলোচ্য উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে, একটিকে ‘সুন্দর প্রাণস্পর্শী পটভূমিকা অঙ্গদিক-মনোজ বহুর শক্তিশালী লেখনী ছুয়ের সম্মিশ্রণে মাছুষ গড়ার কারিগর নামে এক অনাদার্য সাহিত্যস্রষ্টা সত্ত্ববশ হয়েছিল। উপন্যাসটি দ্বন্দ্ববর্জী,

গতিমুখর, বলিষ্ঠ আবেদন সম্পন্ন। বর্ণনার, ব্যঙ্গনার, বিভ্রাসে দক্ষ সাহিত্যশিল্পী সর্বজনস্বীকৃত আপন প্রতিভার যথোপযুক্ত পরিচয়ই দিয়েছেন। সমগ্র উপন্যাসটি বেশ লেখকের আত্মরিক্ততার, দয়নের, গহাভূতীর একটি মিত্র প্রতিচ্ছবি বহন করেছে। এই উপন্যাসটি পাঠক পাঠিকার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হবে এ বিশ্বাস আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে পোষণ করি। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম পাঁচ টাকা পঁচাত্তর নয় পয়সা মাত্র।

আলোচ্যদর্শন

স্বলেখক হিসেবে সুশীল রায় যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী। কবি হিসেবেও তাঁর দক্ষতার অপ্রাচুর্য নেই। আলোচ্য গ্রন্থটি কিন্তু তাঁর কোন গল্প উপন্যাস বা কাব্যগ্রন্থ নয় গ্রন্থটি তাঁর এক অভিনবনবোধ্য প্রচেষ্টার স্বাক্ষর, তাঁর লেখক জীবনের এক বিময়কর কীর্তি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে সাহিত্যিক সুশীল রায়ের এক নতুন পরিচয় পাওয়া গেল মেঘদূতের অভিনব ভাষ্যকাররূপে। মেঘদূত সম্পর্কে আজ পর্যন্ত অসংখ্য আলোচনা হয়েছে তার অনুবাদ, তার টীকা, তার ব্যাখ্যা গ্রন্থটির জন্য নেই, সুশীল রায়ের ভাষ্য ভিন্নতর ধারা অবলম্বন করেছে। মেঘদূতের মর্মসুল তিনি এখানে উদ্ঘাটিত করেছেন। কালিদাসের মেঘদূতকে সুশীল রায় যে অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার স্বরূপে স্বরূপ মিলিয়েছেন, তার গোপন রহস্যের দ্বার উন্মোচন করেছেন সেই সব বিষয়গুলিই অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে লেখক তাঁর গ্রন্থে লিখিবদ্ধ করেছেন। মেঘদূতও সুশীল রায়ের মর্মচক্ষুর সামনে নতুন রূপে যে ধরা দিয়েছে—লেখকের ভাষাই তার বাধ্যবাধী প্রমাণ করে। মেঘদূতের মর্মকথা সম্পর্কে সুশীল রায় এক নতুন চিন্তাব্যবহার উদ্বোধন করছেন। লেখকের ভাষা, বর্ণনা ও ব্যাখ্যা যেমনই হলেমোর তেমনই সরস তেমনই প্রোঙ্গল। গ্রন্থের ভূমিকা ও কথাবল রচনা করেছেন যথাক্রমে ডক্টর শ্রীমতীকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যসর। গ্রন্থটি প্রমাণ করল সুশীল রায় কেবলমাত্র নিপুণ সাহিত্যিক এবং দক্ষ কবিই নন—ভারতের বিশ্ববিস্তৃত মহাকাব্যের একজন সার্থক ভাষ্যকারও। প্রকাশক—রতন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিহার রোড। দাম—আড়াই টাকা মাত্র।

সান্নিধ্যে

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি স্মৃতিচিহ্ন। লেখক চিন্তামণি কর। খাতনামা শিল্পী এবং কলকাতার সরকারী চাক ও কাল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ চিন্তামণি করের নাম শিল্পরসিক সমাজে সুপরিচিত। সাহিত্যের আসরে তাঁর এই প্রথম প্রবেশকে সান্নিধ্যে স্বাগত জানাই। বিশেষে ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতার কল এই স্মৃতিচিহ্ন। বহুদল সাক্ষীরা ভাষার লেখক ছোট ছোট স্মৃতির চূকরোগুলিকে পরিবেশন করেছেন। শিল্পজীবন সম্পর্কিত অনেক জ্ঞান তথ্যের সন্ধান এতে আছে। বিশেষে কথার আকর্ষণ

মারে মারে শীড়ানোর ঠেক। তা ছাড়া বইট নিঃসন্দেহে
নুৰপাঠ। শিল্পমাসিক বিষয় পাঠককে এই দৃষ্টিভঙ্গি আনতে
বলেই আমরা আশা করি। শিল্পলেখকের স্বহস্ত অঙ্কিত প্রচ্ছদটি
নুপাঠন। ছাপা বাঁধাই ভাল। প্রকাশক ত্রিবেণী প্রকাশন,
২ ভাষাচরণ দে স্ট্রীট। দাম চার টাকা মাত্র।

সাত পাকে বাঁধা

বাঙলার সাহিত্য জগতের শক্তিশালী শিল্পীদের মধ্যে আন্তোভ্য
মুখোপাধ্যায় অন্যতম এবং ইনি এমন একজন শিল্পী যিনি নিঃসন্দেহে
বিশ্বের উল্লেখের অধিকারী। বহুমানসী পাঠক পাঠিকারা কিছুকাল
পূর্বে তাঁর “সেলিমচিশির কবর” নামে ছোট গল্পটি পড়বার সুযোগ
পেয়েছিলেন, বর্তমানে সেই গল্পটিই “সাত পাকে বাঁধা” নামে
উপন্যাসে পরিণত হয়ে প্রকাশলাভ করেছে। জীবনের হাসি-কান্না-
আনন্দ-বেদনা-মিলন-বিচ্ছেদ প্রত্যেকটির স্বরূপ বর্ণে নৈপুণ্যের
সঙ্গে লেখক এখানে চিত্রিত করেছেন। বাত প্রতিবাস্তবের
জীবনের এক মর্মস্পর্শী আলোচ্য তিনি অপরিমিত কৃতিত্বের সঙ্গে
পরিবেশিত করেছেন। জীবনকে তিনি নানা কেন্দ্রে থেকে প্রত্যক্ষ
করেছেন—তার চিরু তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যেই বিস্তারিত। এক
বিচিত্র গতির মধ্যে দিয়ে লেখক কাহিনীকে পরিণতির নিকে এগিয়ে
নিরে গেছেন। লেখকের স্বরূপ আন্তরিকতার, মমতার ও স্নেহের
পরিপূর্ণ। তাঁর এই সমগ্র গল্পটি উপন্যাসটিকে একটি “সার্থক উপন্যাসে”
পরিণত হতে সহায়তা করেছে। প্রচ্ছদকে এক মুগোপমোগী
আবেদনের বাহক বলা যায়। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ।
১০ ভাষাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—সাতো চার টাকা মাত্র।

একটি নীড়ের আশা

প্রখ্যাত উপন্যাসিক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস
“একটি নীড়ের আশা”। আজকের সমাজে কোন এক সঠিক নীতিতে
কেন্দ্রীভূত হতে পারছে না, তারই নিখুঁত বিশ্লেষণাত্মক প্রকাশ
দেখা যায় এ উপন্যাসে। ব্যবহারিক দিক থেকে আজ প্রেমও
যেন বাস্তব সংঘাতে কঠোর ভাবসম্পন্ন হয়ে পড়েছে। অলকা
মিত্র চরিত্রে এ প্রেমটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চরিত্র চিত্রণের ও
স্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশের মাধ্যমে গভীর ভাব প্রকাশ করতে
লেখকের দক্ষতা সাহিত্যে স্বীকৃত। সমাজ সংঘাতে যে প্রেমের
বাহ্যিক রূপ বদলার, এ উপন্যাসে তা দেখা যায়। প্রকাশক : ক্লাসিক
প্রেস। ৩১-এ ভাষাচরণ দে স্ট্রীট। দাম-তিন টাকা মাত্র।

পাখির পৃথিবী

পাখি সম্বন্ধে আমাদের কোঁকুল কতখানি, এ সম্বন্ধে গবেষণা
ও তথ্য সংগ্রহ ঠিক কতখানি কম। ইতঃপূর্বে যুক্তিমের কতিপয়
লেখক এ সম্বন্ধে বহুতরু আলোকপাত করেছেন, তা অপরিণত বললেও
চলে। আশা ও আশঙ্কের কথা সাংবাদিক জীবিতানা মুখোপাধ্যায়

স্বপ্ন লগুন বসে এ সম্বন্ধে বহুতরু গবেষণা করতে পেয়েছেন,
তার কয়েকটি তথ্যপূর্ণ অঙ্কচ্ছেদে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে
বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। বিজ্ঞান বিষয়ক
পুস্তক হয়েও ভাষা কাব্যময়। ছাপা স্বরূপে ও পরিষ্কার।
প্রচ্ছদপট সুন্দর। প্রকাশক : বলাকা প্রকাশনী। ২৭-সি
আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-১ দাম—ছটাকা পঁচিশ নম্বর পরমা মাত্র।

চেনা-অচেনা

শ্রীমতী মারা বহু সাহিত্যের জগতে নবাগতা হলেও অপরিচিতা
নন, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পের মাধ্যমে ইতঃপূর্বে তাঁর
আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর কয়েকটি গল্পেরই সমষ্টি।
মোট ষোলটি গল্প এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বইটি সুখপাঠ্য,
স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল, গল্পগুলির মধ্যে কোথাও জড়তা বা হলনা বা
কৃত্রিমতার আভাস নেই। গল্পগুলি বলিষ্ঠ বক্তব্যে ভরপুর, লেখিকার
বহু অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক এবং কুশলতার স্পষ্ট স্বাক্ষর। কাহিনী
বিশ্লেষণে পরিবেশ ও চরিত্র সঙ্গতিতে, সংলাপ সংযোজনায়, লেখিকা
বর্ণে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীকালীকান্ত
ঘোষ দৃষ্টিভঙ্গি এই গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি
করেছেন। প্রকাশক—সাহিত্য সন্দেশ, এ-১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট।
দাম—তিন টাকা মাত্র।





স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

ভয়ঙ্করের বিবাহ তখন বেছে উঠেছে। আকাশে বাতাসে ছেয়ে গেছে হিংসার বিধবাণ। চতুর্দিকে তখন হুড়ার ঝাঁপ। আতঙ্কিত পরিষ্কৃত উপর হুঁসেগের কালো মেঘ ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। বিশ্ব ভুড়ে তখন মরণের মহোৎসব লেগে গেছে। সারা দেশের তখন ছরছড়া অবস্থা, মানুষ সব দিক দিয়ে তখন বিশপ, অট্টোপানের মত রাজ্যের উবেগ তার অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছে। এক সর্বেই ধ্বংসের অভিযুখে 'মানবসমাজ যেন শনৈঃ শনৈঃ গতিতে এগিয়ে চলেছে। মানুষ তখন হাসতে তুলে ভেঙে, গানের সুর মেলাতে পারছে না, কবিতার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না ছন্দ। তার জীবনে তখন স্থিতি নেই, নেই স্থিতিবদ্ধতা, নেই প্রশান্তি। প্রাণের ভয়ে সমস্ত মারামোহ কাটিয়ে মানুষ তখন বস্ত্র পশুর মত ব্যাকুল হয়ে দিক থেকে দিকান্তরে দ্রুপতের হাত ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটুখানি নিরাশদ আশ্রয়। বার তলায় অন্ততঃ প্রাণটা বাঁচানো বাবে।

কোথায় সেই ঘননীল, মেঘমেহুর, তারা ভরা আকাশ সে আকাশ আজ হানাহানির কুকবর্ণের উত্তরায়ে আবৃত। যে আকাশ কেবল আলো দিত, বৃষ্টি দিত, বার নীলাভার, বার যৌন মেঘের মিহিলের আকর্ষণে মানুষ নিজেকে হারিয়ে যেত, যেখানে পাখিরা আশ্রয় মনে নিষ্কিরণ গতিতে উড়ে বেড়ানোর মধ্যে কোন বাধার সম্মুখীন হোত না, সে আকাশের এক মর্যদ্বার অবস্থা। আকাশ, বাতাস মাটি আজ ধ্বংস, ভয়ানক, শঙ্কাসঙ্কল।

সারা জনতের হ্রাসপিত লক্ষ্য করে ধ্বংসদেবতা তাঁর অমোঘ অস্ত্রগুলি পরম নিমুণতার সঙ্গেই একে একে প্রয়োগ করে চলেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তলোলা তখন চরমে উঠেছে।

যুদ্ধ হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল হুভিককে ধ্বংসকরে সে একলাই অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ধ্বংসদেবতার হাত থেকে সে একলাই পুরস্কার গ্রহণ করবে? না না এতটা আত্মকেন্দ্রিক সে নয়, একটা স্মৃতিস্তম্ভ বিবেচনাবোধ তার অন্ততঃ আছে, তা ছাড়া এ খেলা একলা খেলতে তো ঠিকানোও লাগে না, এই সব ভেবেই

সে ভাব দিল হুভিককে সেও বোধ দিক তার কয়েক সেও তার সঙ্গে এ খেলার অংশ গ্রহণ করুক, সেও হুভিকের বাহুবলের প্রতি উদ্দেশ্য করে এক একটি তাঁর শর নিক্ষেপ করুক, অজিত সৌন্দর্য হুভিকে ভাগ্যে হোক, একসঙ্গে দুজনে পারিতোষিক গ্রহণ করুক। হুভিকও সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল যুদ্ধের ডাকে, হুভিক প্রবোধ বাসকের মত সে এগিয়ে এল, ক্রমে সেও দেখা দিল রক্তমাখ। তারপর শুরু হল সে খেলা, সে আরও অভিনব খেলা। যুদ্ধের তাকানোর মাত্রই আশ্রয় খুঁজে বেরিয়েছে এইবার একটুখানি চালের জন্তে সে প্রতিটি হুভিকে কড়াঘাত করেছে, বাসের তরুণশই অবস্থা, তার পরম্পরের ব্যাঘাত পরম্পরে চোখের জল কেসেছে বাসের অবস্থা তরুণ নয় তারা জন্মত মনোবৃত্তির পশ্চিম স্বপ্ন কুখ্যতির কুসুরের মত নয়না থেকে তাকিয়ে দিয়েছে। ডাউটবিনে তখন সে কি সামাজিক ভীড়, কুসুরও তার খাতি খুঁজছে, মানুষও তার খাতি খুঁজছে, সামান্য ভাতের কানের উপর অসহায় জননীকে কি লোলুপতা এক চুইক ক্যান খেলের ওটা ছুঁখিনীর অঙ্গলনিবি, তার শিবরাত্রির সলতে তার বাহুর বংশামান্ড ক্ষুরবৃত্তিও তো হয়ে, এক টুকো ক্যান পর্যন্ত খোঁচাতে না পারার কলস্বরূপ জননীকে দেখতে হরহে ভিখারীর অবস্থার তার একমাত্র আশা-ভরসা-সাধনা—তার সমস্তান পৃথিবীর বুকে তার শেব নিঃশ্বাসটি উপহার দিয়ে গেল, পৃথিবী তাকে কিছু দিল না—দিল না তাকে একটুকো অন্ন, পরিধানের জন্তে একখণ্ড বস্ত্র, প্রাণের আনন্দের প্রলেপ কিছু সে তার উল্লাসতা স্বার্থাভিত্তিই প্রদর্শন করল—তার বা দেবার পৃথিবীকে সেটুকু দিতেও কার্পণ্যবোধ করল না, পৃথিবীকে সে দিয়ে গেল তার পার্থিব জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাসটি। যে বাড়ীতে এই ঘটনা ঘটে গেল পাশের বাড়ীতেই কোন ধর্মীর দুলাল জীওট্টে স্পর্শ করলেন না—তার সৈনিকার দৈনিক খাতি পোয়াটিক দুধ, রুটি, মাখন, দামী কল, ডিম, বাস্তার মাটিতে কেলে বেওয়া হল—কুসুরে চোট খেল সেই খাতি, তবু মানুষ তা পেল না। দারবান, লন, পোট্টিকো পেরিয়ে সর্বহারা জননীর বেদনার কান্নার শব্দ সেখানে পৌছতে পারে না।

সেনার বাঙলার এই অবস্থা। কত কু-দুরাত্তব পশিক কু থেকে সেনালী ধানের রেখা দেখতে পেয়েই আশ্রয়মানে বলাবলি করত এ নিশ্চয়ই বাঙলাদেশ, হতেই হবে নয়তো এত ধান পৃথিবীর আর কোন্ দেশে আছে? এই সব ধান যখন চাবীরা সভাইতে তুলত তাদের গৃহে আনন্দের সাদা পড়ে বেত—সে দিন সত্যি সত্যিই স্বপ্ন হয়ে গেল—দেশে অপচয় করেও ধান নষ্ট করা যেত না, সারা বিশ্বেই জয়ে বেত বাঙলা দেশের পাঠানো গাভ সন্দেহ, বাস্তবজ্ঞানী হুটো হুটো আশীর্বাদে সৈনিক ভামল বাঙলা দেশ পূর্ণ ছিল কাশীর কাশীর—বাঙালীর তখন মনের কথা—“চিরকল্যাণমরী, তুমি বস্ত্র, দেশ-বিশলে বিতরিছ অন্ন।”

হুভিকের দানবীর লীলার বাঙলা দেশ তখন বিধাবিভক্ত।

কলকাল পূর্বের ব্যক্ত করেছি এই সময়ের অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে হরেন্দ্রনাথ কাহ থেকে স্বাভাবিক গ্রন্থের একটি প্রস্তাব এসেছে। “কুখা”কে কেন্দ্র করে নৃত্যসমূহ রচনা করা গেল। কুখার চেয়ে সে সময়ে সমরোপযোগী পটভূমি আর কি থাকতে পারে, বাস্তবের পারিপার্শ্বিক আবেশী বা পরিষ্কৃতিরই সম্যক প্রতিফলন ঘটে তার ক্ষুধার মধ্যে দিতে। তখন বা দেশের অবস্থা, মানুষের কান্না বা অন্ন,

সর্বস্বার্থের আর্তনাদের বা রূপ, সমস্তার বা চেহারা—সে ক্ষেত্রে সমরোপযোগী পটভূমি বলতে কুখ্যাত হাড়া আর কিছুই মনে পড়ল না, আর কিছু মনে করার ছিলও না। “Divine Source” নাম দিয়েও আর একটি নৃত্যসমষ্টি পরিকল্পিত ও রূপায়িত হল, নামকরণ অল্পবয়সেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এর আবেশন অর্থহীন।

ভূখ (কুখ) এবং ডিভাইন সোর্স স্বতন্ত্র জনসমাজের ভেতরে উঠল, লক্ষ্যচিহ্ন (বিশেষ করে বিশ্ববস্তুর জন্তে) গভীর ভাবে স্পর্শ করতে এরা সমর্থ হল, জনতার-মল, বিপুলভাবে সাড়া দিল এর আবেশনে সমস্ত শহর এর জয়গানে ভরে উঠল। বৃহৎ বিস্তৃত জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া গেল আশাতিরিক্ত।

দিল্লীতে এই নৃত্য-সমষ্টি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল যে শেষে আমাদের পরিকল্পিত গৌরালিয়ার ভ্রমণের তারিখ তার বেগে পিছিয়ে গিয়ে দিল্লীতে অহুষ্ঠান হারও কিছুকাল চালাতে হল। গৌরালিয়ারে যাওয়ার সমস্ত কিছুই তো আমাদের আগে থাকতেই ঠিক ছিল তারিখ প্রকৃতি সব কিছু, সেই অহুষ্ঠান আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থাদিও বহারাতিই হয়েছিল কিন্তু শেষে দিল্লীর জনগণের দাবীতে সব কিছু পরিবর্তন করতে হল।

গৌরালিয়ারে আমরা বিপুল ভাবে সমর্থিত হলাম। মহারাজা ও মহারানী প্রথম সমাজের আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের সদাশ্রিতা, বিনয়নয়িতা ও অতিথিবাৎসল্য ভোলবার নয়। মহারানীর পরিচিতি আর একটু বিশদ করি। সাওগারের রাণা কুঞ্জ শমসের জন্তেই ইনি নিকট আত্মীয়। কলকাতার লোহার সাকুলার বোম্বার্ডার গণেশ ম্যানসনে মহারানী এক সময়ে থাকতেন। এই গণেশ ম্যানসনে মাও থাকতেন। স্বভাবতই একই গৃহের বাসিন্দা হওয়াতে এরা পরস্পর পরস্পরের অত্যন্ত কাছ এসে পড়েন। হুজুনেই হুজুনের ব্যবহারে বৃহৎ হন এবং পরস্পর পরস্পরের গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন। আমার প্রথম ছায়াছবি আলিবারা বখন শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে সাধারণের প্রদর্শনের জন্তে প্রথম মুক্তিলাভ করল মহারানী তখন মাকে তাঁদের সঙ্গে ঐ ছবি দেখতে যাওয়ার জন্তে তো রীতিমত পেড়াপেড়ি শুরু করলেন, সে এক লক্ষ্যের আবদার সে আবদার সাড়া না দিয়ে থাকা যায় না শেষে মহারাজকুমারী তো রীতিমত আমার অহুষ্ঠানী হয়ে উঠলেন—পরবর্তীকালে গৌরালিয়ারের মহারানী হিসেবে বখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন তাঁর মুখ থেকেই শুনলাম—যে আমার প্রত্যেকটি ছবি তিনি দেখেন একটিও বার নেন নি এমন কি একথাও জানাতে তিনি ভোঁলেন নি যে আমার কোন কোন ছবি তিনি দুবার এমন কি তিন বারও দেখেছেন। তাঁদের বাড়ীতে—যে বাড়ীর নাম ‘সমুদ্র মহল’—এক পাটিতে এমন কথা প্রসঙ্গে গল্পের ছলে আমি বলেছিলাম যে আমি আমার নৃত্য পরিভ্রমণে বেড়ছি সমস্তদ্বারে এবং দিল্লী এবং অজান্তে অকল হলে আমরা এবারের গন্তব্যস্থল। আর বার কোথায়, যেই না বল। একেবারে স্পষ্ট অহুষ্ঠান দিল্লী ও অজান্তে ভারগাঁব সঙ্গে আপনাদের গন্তব্য স্থলের তালিকার গৌরালিয়ারকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সে কি আশ্চর্য, সে কি আশ্চর্যিকতা, সে কি বিতর্কহীন।

দু বছর এর মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে অর্থাৎ একটি একটি করে সাফল্য ডিভিটি দিন। আমার বাড়লা বেশ। আমার মাতৃ-

ভূমি, আমার জন্মভূমি আমার পুণ্যভূমি পিতামহের লীলাভূমি। কিরে আসার পরই শুরু হল আমার নৃত্য প্রদর্শন বেশ কিছুকাল পরে বাড়লার বৃকে আমার আমার নৃত্য প্রদর্শন। অব্যক্ত জানিবে মনটা ভরে উঠল।

ছায়া প্রেক্ষাগৃহে আমার নৃত্য শুরু হল, বীর্ঘকাল পরে আমার দেশবাসী আমাকে সরেই বরণ করে নিতে বিলুপ্ত কার্পণ্য প্রদর্শন করেনি আমার অহুষ্ঠান সম্পর্কে ঠিক আগের মতই তাদের মনোভাব অক্ষুণ্ণ। আমাদের বাড়লা ভাই বোনদের তাঁদের মূল্যবান সহযোগিতা দ্বারা আগের মতই আমার যত্ন করলেন। এরা আমার সব চেয়ে গুণাকারী সব চেয়ে আপনজন সব চেয়ে প্রিয় প্রিয়তর।

খাঁকার করছি নিজের মুখে ব্যক্ত করাটা সীমীত হবে না তবুও এই ঘটনা আমার জীবনের প্রথম সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলেই বলবার প্রয়োজনটাকেও পাশে সরিয়ে রাখতে পারছি না। তা ছাড়া এর মধ্যে আপনাদের বেগও যে রয়েছে অনেকখানি। ছায়াতে বখন অহুষ্ঠান করছি কর্তৃপক্ষের একদিন জানালেন যে আমার অহুষ্ঠান না কি ইতিহাস তুলি করেছে—কি বকম—না—এর পূর্বে তাঁদের প্রত্যেকটি অহুষ্ঠানে বা প্রদর্শনীর বা প্রেষ্ঠ রেকর্ড আমার অহুষ্ঠান তাকেও অতিক্রম করে গেছে।

এইবার আপনাদের বিস্তারিত করে দেব। ঠাা বিস্তারিতই করে দেব। এমন একটি তথ্য পরিবেশন করব যাতে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন—অবশ্য একথা আপনারা কতদূর বিশ্বাস করবেন জ্ঞ আমার জানা নেই—এতাবৎ তো দেখা গেছে যে ঈশ্বরের কৃপায় আমার অহুষ্ঠান জনপ্রিয়তার ভেতরে উঠেছে, লক্ষ সাধারণ প্রথম সমাজের বরণ করে নিয়েছে এই অহুষ্ঠানগুলিকে দিকে দিকে লাড়ো পড়ে গেছে এই অহুষ্ঠানের, শুধু বাড়লা দেশে নয়—ভারতের বিভিন্ন স্থানেও একই প্রতিক্রিয়া বাড়লায় ও বাড়লায় বাইরে সাংবাদিকের হল আমাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। গৌরালিয়ারে যাওয়ার দিন পিছোতে হয়েছে দিল্লীর জনপ্রিয়তার দাবীতে। ‘ছায়া’র কর্তৃপক্ষও জানিয়েছেন যে আমার অহুষ্ঠান তাঁদের আগেকার প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর ও অহুষ্ঠানের প্রেষ্ঠ রেকর্ডকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে, জনগণের এই বিপুল সমর্থন বিধাতার অশেষ আশীর্বাদের নামান্তর ছাড়া তো কিছুই নয়, এদের প্রীতি, সন্তোষিতা ভক্ত কামনার মধ্যে দিয়েই প্রথম কাল্পনিকের আশীষ ধাতার স্রোত হওয়ার নোঙর্য জীবনে মিলেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও হীনতা সত্ত্বেও আমাদের আবার প্রত্যেকটি অহুষ্ঠানে গুনতে হয়েছে যে প্রদর্শনীর এই ব্যাপক জয়যাত্রা সত্ত্বেও লাভের ঘর কাঁকানি থেকে যাচ্ছে—লাভ কিছু হচ্ছে না—অবাক হলেন তো? কিন্তু এবও কারণ আছে—হেতু আছে বৈ কি এই লাভ না হওয়ার পিছনে, এই লাভের শূন্যতা অস্বস্তিক নয়। আমার অহুষ্ঠানের খরচও যে ছিল বিরাট, মাত্রাতিরিক্ত, অত্যধিক। আমার সম্প্রদায় পরিচালনা ছিল উচ্চতর মানের, সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়খণ্ড ছিল বিপুল, তার উপর প্রত্যেকের পারিশ্রমিক ছিল বখেষ্ট উচ্চ আদরে—এই দিকগুলি ভেবে দেখলেই দেখা যাবে যে লাভ না হওয়াটা অস্বস্তিক নয়, আয়ের অল্প ব্যয়ে চলে যেত, জমার ঘরে আর জমত না। কিছুই। এই ব্যয়বাহুল্য সত্ত্বেও জমার ঘর পূর্ণ করা সম্ভবপর ছিল না। জলপ্রোতের মত টাকা এসেছে, চলেও গেছে জলপ্রোতের মতই—একদিক দিয়ে

এসেছে, আর এক দিক দিয়ে গেছে, আমার অজুঠান টাকা পেয়েওয়ে যেমনই। দিয়েওছে তেমনই।

অতএব, অগভ্যতাই, বেমনাহত চিত্তে ছবির জগতেই আমাকে বিরে বেতে হল, তাও বাস্তবদেশে থেকে নয়, পা বাড়তে হ'ল বোঝাইয়ের অভিযুগে। [ক্রমশঃ।]

অনুবাদ—কল্যাণাক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বরূপা

গত মঙ্গলবার ২৪শ কাছান সন্ধ্যায় বিশ্বরূপার "সেতু" নাটকের শততম রজনীর দায়ক উৎসব ও ভগবান শ্রীশ্রীমন্মথের ১২৫তম আবির্ভাব দিবস ও নটগুরু গিরিশচন্দ্রের জন্মোৎসব দ্বারী যুক্তানন্দের সভাপতিত্বে উৎসাহিত হয়। প্রধান অতিথির আদান গ্রহণ করেন ভারীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুরস্কার প্রদান করেন শ্রীমতী বি. কে. দত্ত। এতদুপলক্ষে বিশ্বরূপা গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পী ও কর্মীদের স্বর্ণ অলঙ্কার, মেডেল, আংটি, কাউন্টেন পেন, টি-সেট প্রভৃতি উপহার বিতরণ করা হয়। বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে শ্রীমসবিহারী সরকার অভ্যাগত ও দর্শকবৃন্দকে স্বাগত সস্তাবণ জ্ঞাপন করেন ও বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে আঙ্গিকের উন্নততর আলোক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ব্যাপক ব্যাবহার বঙ্গ-রঙ্গমন্ডলের ভবিষ্যতের পক্ষে শুভকল্যায়ক হ'বে কি না সে প্রশ্ন বাংলার নাট্যমৌরী সুধীশ্রুদকে বিবেচনা ক'রে দেখতে অনুরোধ করেন। ভারীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বারী যুক্তানন্দ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। ব্রহ্মচারী নীরোদবরণ রামকৃষ্ণ জ্যোতি পাঠ করেন। শ্রীশ্রীমন্মথের উদ্দেশ্যে বে জিলাঙ্গী ভোগ দেওয়া হয় সেই প্রসঙ্গ দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

হুই বোচার

চতুই ভাতির উদ্দেশ্যে একটি বাগানে জড়ো হয়েছে সবাক্বরী মিলি—দ্বারী কিশোরী চট্টোয়ার একমাত্র মেয়ে। বাগানের কাছের দিক দিয়ে শিল্পী অলোক ও তার বন্ধু চক্কেলর বাস। মিলির ও তার এক



দীপক বসু পরিচালিত "ইন্দ্রকুমার"র একটি দৃশ্যে অসিতবরণ ও

অরুণতী মুখোপাধ্যায়

বাঁকবীর সঙ্গে দৈবক্রমে পরিচয় হয়ে যায় অলোক ও চক্কেল। অলোক মিলিকে না জানিয়ে তার একখানি ছবি এঁকে কেসে বাঁকবীর বিক্রী করতে দেয়, জানতে পেয়ে মিলি বেগে গিয়ে অলোকের কাছে আসে তার আচরণ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দাবী করতে কিন্তু এই আসা থেকেই মিলির মনের পরিবর্তন শুরু নিজের অজান্তেই অলোককে ছন্দ দিয়ে কেসে মিলি, কিশোরীমোহন ধনী অনিমেষের সঙ্গে চান মেয়ের বিয়ে দিতে। অবশেষে মানাবিধ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রেমেরই জয় হল। অলোকের হাতেই হাত রাখল মিলি।

মূলতঃ বে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে গল্পের বিস্তার এবং বাক্য কেন্দ্র করে ছবিতে হস্তান্তরের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বে ঘটনার মধ্যে দিয়ে মূল কাহিনী রূপ পেয়েছে সেটি হচ্ছে কিশোরীমোহন এক কথায়ই অলোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান নি—তিনি একটি সঠিক সৃষ্টি করলেন তাঁর সঠিক মত অলোককে তিনি এক লক্ষ টাকা দিলেন ও বললেন যে এই টাকা কোন প্রকার দায়িত্ব না করে পক্ষাশ্ব দিনের মধ্যে খরচ করতে হবে—এক তা করতেই হবে নচেৎ মিলিকে বিয়ে করার সম্বন্ধ অলোককে ত্যাগ করতে হবে। অলোক আর চক্কেল দুজনে মিলিয়া হয়ে খরচ করতে লাগল। কেনাকাটার পর ব্যবসায় চালতে লাগল লোকসান কামনার একটি সচিব নিযুক্ত হল টাকাগুলি লোকসান করিয়ে দেওয়ার জন্যে সঠিক হল commission on loss কিছুতেই শেষ পর্যন্ত লোকসান আর হয় না কেবলই লাভ হয় বতদিন যায় এরাও মিলিয়া হয়ে ওঠে কিন্তু পাবে না—শেষে শেষ দিনটিতে কিশোরীমোহনও নাটকীয় ভাবে বোষণা করলেন you have passed in every subject আসলে কাহিনীর এই অংশ অবাস্তব নয় কি? হাসির গল্পে অবাস্তবতা বসে বসে করা বাবে রসসৃষ্টি ততই সার্থক হবে, হাসির গল্প মানেই অবাস্তবতার দুর্ভাগ্য নয় হাসির গল্পের পটভূমি যিনি বসে বাঁচবে করে তুলবেন তাঁর রচনা তত সার্থক হবে উঠবে। যদি কেউ স্রাটায়ারের প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করেন তার উত্তরে আমরা বলব যে স্রাটায়ার আর হিউয়ার কখনোই এক জিনিষ নয়। একটি লোক হঠাৎ হু'হাতে দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য টাকা খরচ করেছে, আরকর বিভাগের কানে কি সে সংবাদ পৌঁছেছে না বিশেষ করে যেখানে থাকারো ক্রমশঃই লাভ হচ্ছে, লোকসানও নয়। এমন কোন লোক যুঁজে পাওয়া যায় না, এক লাখ টাকাকে কেন্দ্র করে ঐ রকম অজুত ধরণের একটা সঠিক করতে পারেন। সেইমুহুর্তের পরেই বানরমূর্তি দেখানো কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়, বীলককে দিয়ে টাইটেল দেখানোর মধ্যে চিত্রনির্ণাতার কল্পনাশক্তির অপ্রাধিকার্যই চিহ্ন মেলে। ছবির প্রথমার্শে ছলাছপি এত বেশী দেখানো হয়েছে যার কলে প্রথম থেকেই দর্শকচিত্তে রীতিমত বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

অভিনয়ে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন অম্বপকুমার। তিনি বাস্তবতার একজন সত্যিকারের সার্বকালীন, এ ছবিতে তাঁর অভিনয়ের তুলনা নেই। কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর দাস প্রভৃতি নিজেদের চরিত্রগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই সৃষ্টি করে তুলেছেন। প্রধান দুটি নারী চরিত্রে অবতীর্ণা হয়েছেন বাসবী নন্দী ও সন্ধ্যা দাস। রাজলক্ষ্মী দেবীর শেষের দিকের অভিনয় প্রাণকে পতীরভাবে

সম্পন্ন করে। এঁরা ছাড়া ছবিতে তুলসী চক্রবর্তী, নবমীপ চাকদার, পণ্ডিত কুতু, শৈলেন মুখোপাধ্যায় বসবাস চক্রবর্তী প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকার দেখা দিয়েছেন। স্বত্বাংশে করেছেন ভূপেন হাজারিকা। কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন দিলীপকুমার বসু।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

শ্রীচৈতন্যের পূণ্যজীবন অবলম্বন করে এতাবৎ অনেক ছবিছবি নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে শ্রীবিমল বায়ু যে ছবিটির নির্মাণকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, সেই ছবিটিও চৈতন্যসেবের জীবনীকে কেন্দ্র করে। ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছে নদের নিমাই। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিধাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, নীতীপ মুখোপাধ্যায়, জহর বায়, শোভা সেন, সবিতা বসু প্রভৃতি শিল্পীগণ। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে “কুখা”র ব্যাপক জয়যাত্রা সমগ্র রঙ্গমণ্ডলের পৌরব। “কুখা” পেশাবারী রঙ্গালয়ে সর্বাধিক অভিনীত নাটক—এই তার বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে বিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই মঞ্চসকল নাটকটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন। স্বরাজ্যনার ভার নিয়েছেন নটিকতা ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন বসন্ত চৌধুরী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, বিধায়ক

ভট্টাচার্য (কাহিনীকার ও সংলাপলেখক), সুনন্দা দেবী, সাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয়শিল্পীরা দল। “কুখা”র সর্বপ্রধান আকর্ষণের কারণ যে—এই চবিতে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করছেন নিশিরোত্তর বাঙালীর তথ্য ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র। সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু “চেনাখুঁ” কাহিনীটির চিত্রায়ণ পরিচালিত হচ্ছে স্বর্ষিক ঘটকের দ্বারা। রূপায়ণে আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিজয় ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন বাবু, হিমু ভাটওয়াল, সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, গীতা ঘোষ, আরতি দাস প্রভৃতি। গায়ী সীমিত “এখনও দিন আসতে পারে” কাহিনীটির চিত্ররূপ গ্রহীত হচ্ছে সুন্দরায়ের পরিচালনায়। এতে অভিনয় করছেন বলে গানের নাম শোনা যাচ্ছে জাঁদের মধ্যে ছবি বিধাস, বিপিন গুপ্ত, বিবজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জহর বায়, তুলসী চক্রবর্তী, মাসিক পদ্ম এবং বঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী গ্রামনী দেবীর লেখা “পটে আঁকা ছবি”টিকে চিত্ররূপ দিচ্ছেন কলাকুশলী গোষ্ঠী। কমল মিত্র, অসিতবরণ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মিশির ভট্টাচার্য, চন্দ্রা দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সন্ধ্যা বায়, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, সাধনা বায়চৌধুরী প্রভৃতি শিল্পীদের অভিনয় এই প্রসঙ্গে রূপালী-পদায় দেখতে পাওয়া যাবে।

নাজিম হিকুমেং

ইয়ারোলাভ মেলিয়াকোভ ১৯১০তে—উক্রেইন-এ জন্ম।

এক বছর নয়, কিং,

দশ বছর ধরে তাদের বার্ষ উড়ানে

আমার বাচ্চা ছিল তোমাকে দেখব, হিকুমেং!

তোমার জীবনে আমি বেঁচেছিলেম সেই সব মুহূর্তে

বখন তোমার কবিতা তর্জমা করেছি

এক তোমারি চোখে আমি দেখেছিলেম, হিকুমেং,

তোমার বোঁবনের প্রতিফলিত দেখে।

ও, সেই ব্যক্তিই, আমি,

সমস্ত বিশ্ববাসী, আমায়,

তোমার সংগীত এবং প্রেমের আপন সাহসে

দূরের অর্ধ শেটিকার মত জেলখানায় দেওয়াল ভেদ করে

তাকিরেছিলাম তোমার প্রতি বুদ্ধতা নিয়ে।

আর এখানে হাজাতে

মন্ডো। সরাইখানার

তুনোহিলেম তোমার মৌনী ঘর :

আমার সম্মুখে, দৃঢ় এবং চওড়া কাঁধ

অবশেষে ছিনিয়ে নিল জেলের দেওয়াল

সেখানে দাঁড়িয়েছিল আমাদের এই প্রহর একজন কমিউনিষ্ট,

আমাদের কর্মীদের, একজন আমাদের গায়কদের :

পর্বা ব্র

আর সহজ নীতি

লাল বোঁচা-বোঁচা নোঁক বা কবীরদের মন :

তোমার চোখে

যেমন নীল গগনে

এক প্রৌণ্ড বিশ্ব এবং বৃক্ষ বন :

ওহে, কে পারে এই মুহূর্তকে ছুঁতে ছিব নিশ্চিতে ?

মন্ডো তোমার আধিকার এক মহৎ বিজয়।

তুমি আমাদের অল্প এক এখানে আমাদেরই মধ্যে আছো

তুমি সংস্কার সংগীত পেয়েছিলে—

মন্ডো তোমার সংগীতে আজ মন।

অনুবাদ : কমলেশ চক্রবর্তী

© দেশে-বিদেশে ©

ফাল্গুন, ১৩৬৬ (ফেব্রুয়ারী-মার্চ, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী): চীন-ভারত প্রের সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে দিল্লিতে প্রধান মন্ত্রী জিনেহুয়ান সহিত রুশ প্রধান মন্ত্রী ম: নিকিতা ক্রুশ্চেভের নিবিড় আলোচনা।

২রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী): কলিকাতা মহানগরীতে শান্তির দূত ম: ক্রুশ্চেভ বিপুল ভাবে সম্বিহিত।

চীনা প্রধান মন্ত্রী মি: চৌ-এন্-লাই-কে দিল্লী আগমনের জন্য প্রধান মন্ত্রী জিনেহুয়ান আমন্ত্রণ জ্ঞাপন।

৩রা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী): নয়াদিল্লী হইতে নেহরু-ক্রুশ্চেভ দুই ইন্টার প্রচার-দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠার সহ-অবস্থানের নীতিতে নেতৃত্বের পূর্ণ আস্থা বিস্তারিত।

৪ঠা ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী): ভারতীয় রেল সচিব জিগমজীবন রায় কর্তৃক পার্লামেন্টে ১৯৬০-৬১ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ—বাজেটে ১৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা উৎস্বৃত।

বেঙ্গলে শ্রমের প্রধান মন্ত্রী ভেনাবেল নেউইনের সহিত সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ম: নিকিতা ক্রুশ্চেভের বৈঠক।

৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী): ভিসাই-এ ধর্মঘটা ইম্পাত জমিদারদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ, বেত্রাচালনা ও কাঁদনে গ্যাস প্রয়োগ।

৬ই ফাল্গুন (১৯শে ফেব্রুয়ারী): খাজুরত্রে মূল্য হ্রাস পাইতেছে বলিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি সচিব জি এস. কে. পাতিসের দাবী—দিল্লীতে পার্লামেন্টে খাজুরত্রে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে ভাষণ।

৭ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী): চীনের চ্যাংজেং সমুচিত জঘাং দিবার জন্য ভারত সরকারের প্রতি হ'সিগারী—মহাভাতি সন্দেন (কলিকাতা) চীনা আক্রমণ প্রতিবোধ সম্মেলনে আচার্য্য জে. বি কৃপালনী (প্রজা-সমাজতন্ত্রী) প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা।

রাষ্ট্র এলিজাবেথের (ইংল্যান্ড) পুর সজ্ঞান হওয়ার রাষ্ট্রপতি ড: রাভেন্সপ্রান ও প্রধানমন্ত্রী জিনেহুয়ান শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ।

৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী): কেরলে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে জিগমজীবন বৈঠকে কংগ্রেস, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ও মসলেম লীগের মতামত প্রস্তিষ্ঠা।

৯ই ফাল্গুন (২২শে ফেব্রুয়ারী): কেরলে জিগমজীবন খাদ্য শিল্পাই'র (প্রজা সমাজতন্ত্রী নেতা) নেতৃত্বে কংগ্রেস পি-এস-পি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ—সাত মাস ব্যাপী রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান।

কংগ্রেস প্রার্থী জীবিত কর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার নির্বাচিত।

১০ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী): দালাই লামাং হীরা, জহরং বোকাই বৃহৎ বাজার দিকিই হইতে কলিকাতার আনয়ন—লোকসভার (মুম্বাই) প্রধান মন্ত্রী জিনেহুয়ান বোকা।

১১ই ফাল্গুন (২৪শে ফেব্রুয়ারী): বোকাই রাজ্য বিভাগ সফল বিভিন্ন বিবরে সম্ভাব্যজনক বীমাংসা—নয়াদিল্লীতে বোকাই-এব

বুখামতী জিগমজীবন সহিত বৈঠকান্তে বরাট সচিব পণ্ডিত পণ্ডের বোকা।

১২ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুয়ারী): পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে রাজ্য ৭ লাখে এক কোটি টাকা ব্যয়িত—বুখামতী ডা: বিধানসভায় ৩য় কর্তৃক অর্থমন্ত্রীরাপ রাজ্য বিধান সভায় বাজেট-পেশ।

১৩ই ফাল্গুন (২৬শে ফেব্রুয়ারী): কলিকাতা কর্পোরেশনের বিক্রেত হুন্সীভিত্তিক প্রতিবোধ—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিল আলোচনা কালে তীব্র সমালোচনা।

১৪ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অমুসৃত কর্মনীতিটি রাজ্যের জনগণের চুখ-দুর্দশার জন্য দায়ী—রাজ্য বিধান সভায় রাজ্যপালর ভাষণের উপর বিতর্ক শুরু।

১৫ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী): চীনা প্রধান মন্ত্রী মি: চৌ-এন্ লাই কর্তৃক চীন ভারত সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে দিল্লীতে আলোচনা-বৈঠকের জন্য জিনেহুয়ান সর্বশেষে আমন্ত্রণ প্রদান।

১৬ই ফাল্গুন (২৯শে ফেব্রুয়ারী): ভারতের ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে ৮০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রিত্ব জিগমজীবন বোকাই কর্তৃক লোকসভায় বাজেট পেশ।

এপ্রিল মাসে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এব সহিত বৈঠকে ভারত সরকার সম্মত—পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রী নেহরুর নিবৃতি।

১৭ই ফাল্গুন (১মা মার্চ) সাময়িক পন্যক্রম সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিষদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র—কলিকাতার রত্নী ট্রেডিংয়ে প্রদত্ত নাগরিক সর্বাধিকার উত্তরে রুশ প্রধানমন্ত্রী ম: ক্রুশ্চেভের বোকা।

রাজভবনে (কলিকাতা) জিনেহু ও ম: ক্রুশ্চেভের নিবৃতি বৈঠক—শ্রমের জনপ্রিয় নেতা উ হুং সহিতও পরে উভয় রাষ্ট্র-নাগরিকের আলোচনা।

১৮ই ফাল্গুন (২রা মার্চ): জিনেহুয়ান কংগ্রেসী সরকারকে সতর্ক করার জন্যই এখানে বিরোধী দলের একান্তভাবে প্রয়োজন—ওয়ার্ল্ডওয়ারের জনসভায় ভাষণ প্রদান জি সি বাকাগোপালাচাচারী (স্বতন্ত্র দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতা) বোকা।

সকলান্তে ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে কলিকাতার সাংবাদিকদের নিকট ক্রুশ্চেভের মন্তব্য—ভারত ও রুশিয়া দুই দেশই শান্তির পথে অগ্রসর হইতেছে।

১৯শে ফাল্গুন (৩রা মার্চ): ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড দাবী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বাজেট বিতর্ককালে কয়েকজন কংগ্রেসী সদস্য কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা।

২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ): জীবন বীমা কর্পোরেশনের বিক্রেত জনসাধারণের অর্থ লইয়া ছিন্মিনি খেলার চাকল্যকর অভিযোগ—রাজ্যসভায় সরকার পক্ষের লক্ষ্য করিয়া বিরোধী সম্প্রদায়ের আক্রমণ।

২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ): বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে অনিশ্চিত কালের জন্য ট্রেডিংকর্মীদের সারা ভারতব্যাপী ধর্মঘট।

২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ): ত্রিমেডিয়ার জ্ঞান সিং-এর নেতৃত্বাধীনে জয়নগর (ভারত-নেপাল) সীমান্ত হইতে প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের যাত্রা।

ভিক্রান্তে জনগণ চীনায়ের বিক্রেত সেলি। বৃহৎ ও নিম্নজাত প্রতিবোধ চালাইতেছে—মুম্বাইতে দালাই লামাং বিবৃতি।

২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ) : কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দুর্গাপুরে বিভিন্ন কৌশলী স্থাপনের প্রস্তাব অগ্রহণ—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানেন্দ্র দাশের ঘোষণা।

২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ) : 'চীনের সহিত আলোচনা করি—সর কথাকবি নহে'—হাফিজাবাদে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিকা মন্ত্রী শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেননের ঘোষণা।

২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ) : দণ্ডকারণ্য ব্যাপারে পশ্চিম সরকারের প্রতী কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের চরম উপেক্ষা—রাষ্ট্র বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানেন্দ্র দাশের অসন্তোষ প্রকাশ।

২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ) : বোম্বাই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রেম ভগবান দাস আত্মজাকে হত্যার অপরাধে কমান্ডার কে. এম. নানাবতী (৩৭) ব্যবসায়িক কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

চীন-ভারত বিবেচ্য প্রশ্নে ২০শে এপ্রিল নাগাম চৌ এন্ড লাইট-এব (চীনা প্রধান মন্ত্রী) সহিত বৈঠকের প্রস্তাব—চৌ-এর নিকট শ্রীনেত্রকর নিকট লিপি প্রেরণ।

২৭শে ফাল্গুন (১১ মার্চ) : ষ্টেট ব্যাঙ্ক সহ সকল ব্যাঙ্কের বিবেচ্য নিষ্পত্তির ক্ষমতা জাতীয় ট্রাস্টবোর্ড গঠন-লোক সভায় কেন্দ্রীয় প্রমসচিব শ্রী গুণজান্নালাল নন্দের ঘোষণা।

বোম্বাই বাক্য বিভাগক্রমে ১লা মে নূতন মহাশক্তি ও গুজরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠা—লোক সভায় স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত পঙ্কজ ইন্ডিত।

২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ) : বিখ্যাত বীরেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সংকল্প আচার্য্য ক্ষিত্রমোহন সেন শাস্ত্রীর (৮০) জীৱনচরিত্ত নির্মাণ।

২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ) : রাজা সুবোধ মল্লিক দ্বারা (কলিকাতা) গৃহীত বঙ্গ ভাষাভাষী মহা সম্মেলনের দাবী—পশ্চিম বঙ্গের সম্মিলিত বঙ্গ ভাষাভাষী অঙ্গগণলি পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ) : শাসনতন্ত্র সংশোধন ছাড়া বেকসভা হস্তান্তর সম্ভব নহে—নেহরু-ছন চুক্তি প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের বার।

বাহ্যদেশীয়—

১লা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী) : নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা (মৌলিক গণতন্ত্র) অগ্রগামী কিন্তু মার্শাল আদর্শ ধান পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

৩রা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) : ১৯৬০-৬১ সালে বুর্জোয়া দেশবন্ধা বাজেট ১১ কোটি ৫৭ লক্ষ টালি-বুর্জোয়া পাইবে বলিয়া সরকারী ঘোষণা।

৪ই ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) : রাওয়ালপিণ্ডিতে (নূতন পাকিস্তান) পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্টরূপে কিন্তু মার্শাল আদর্শ ধানের লগ্ন প্রথম।

৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী) : 'সাম্রাজ্যবাদের শেষ দিক' বুদ্ধিমা তেলুন—ইকোনাশিয়ায় ১২ দিন সম্মেলনে রূপ প্রদান যাত্রী কুশলভের আহ্বান।

৭ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী) : বাঙ্গাল চুক্তির স্থলগত

'সেটোর' (মধ্য চুক্তি সংস্থা) শক্তি বৃদ্ধির জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষর, তুরস্ক ও পাকিস্তান নেতাদের তত্ত্বাবধায়।

৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী) : বুটেন উত্তর বোর্ডিংর রাজধানী জেনেলটনে ভারতের ভূতপূর্ব ডাইসের পুত্রী লেডী মার্টিন ব্যাটেনের সম্মত অবস্থায় জীবনাবধান।

১০ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী) : জেনেলটন ত্রিশকি আঞ্চলিক সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আঞ্চলিক বিক্ষোভের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ সাক্ষাৎ সোভিয়েট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

১২ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুয়ারী) : বেসামরিকীকৃত অঞ্চল হইতে অবিলম্বে ইস্ত্রায়েলী সৈন্য হটাইবার দাবী—সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘ মার্কস চরমপত্র প্রেরণ।

১৫ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী) : রুশিয়া কর্তৃক ইকোনাশিয়ায় ২৫ কোটি ডলার ঋণদানের প্রস্তাব—রূশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সফরকালে স্বরূপের বোগের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর।

১৭ই ফাল্গুন (১লা মার্চ) : ময়াক্কোর আগাধির বন্ধের ভূমিকম্পের ফলে বহু সহস্র নব-নারী ও শিশু হতাহত—সমগ্র সহস্র ধ্বংসস্থল পরিগতি।

বুটেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরোধিতা কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকান-পণ্য বর্জন আন্দোলন শুরু।

১৯শে ফাল্গুন (৩রা মার্চ) : পাক-আফগান বিরোধে আফগানিস্তানের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থন জাপন—কবুলে আফগান প্রধান মন্ত্রী প্রিজ দাউদের আরোহিত ভোক্তার মঃ কুশলভের বক্তৃতা।

২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ) : চীনা বন্ধের গোলা-বাক্স বোম্বাই করাসী জাহাজে ('লাকরী') বিক্ষোভ—প্রায় ৭৫ জন নিহত ও শতধিক আহত।

২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ) : চীন সরকারের আওতায় চীন সরকারের উদ্দেশ্যে নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি. প. কৈরালার সালবলে পিকিং যাত্রা।

২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ) : কার্যেরা হইতে সরকারী ভাবে ঘোষণা—২৮শে মার্চ সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের ভারত সফরে আসিবেন।

২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ) : বোধ নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা সম্পর্ক পশ্চিমী শক্তিবর্গের মতৈক্য—প্যারিসে 'নাটো' অঙ্গী সংস্থা স্থাপনাের উক্তি।

২৭শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ) : পাইওনিয়ার-৫ নামক প্রথম মার্কিন কৃত্রিম গ্রহ (পৃথ্বী পরিভ্রমকারী) সাকল্যের সহিত কক্ষপথে স্থাপিত—কেপ ক্যান্যাবেল হইতে সরকারী ভাবে ঘোষণা।

২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ) : পশ্চিম পাকিস্তানের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী মিঃ মুজাফর আলি কাজিলবাস ও তৎকালীন মন্ত্রী মিঃ হাসান মাহমুদকে পশ্চিম পাকিস্তান ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচারার্থ তলব।

৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ) : স্বাভাবিক কারণে পূর্ব তাত্ত্বিক পরিবর্তন করিয়া সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ কুশলভ কর্তৃক ২৩শে মার্চ ক্রাজ সফরে যাত্রার নূতন তাত্ত্বিক স্থিরীকরণ।

সম্মানস্বামীদের তৎপরতার দক্ষ আফ্রিকান প্রেসিডেন্ট আর্টুরো ক্রাস্তিগ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক অঙ্গী অবস্থা' ঘোষণা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমদানী নীতি

“এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর (১৯৬০) পর্যন্ত যে আমদানী নীতি গত ৩১শে মার্চ ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে আমদানী নীতির কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হয় নাই। কতকগুলি পণ্য আমদানীর পরিমাণ বদ্ধিত করা হইলেও কঠোরভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি অব্যাহতই রাখা হইয়াছে। অত্যাবশ্যক শিল্পের কাঁচা মাল ও যন্ত্রাংশের জন্য অবিকল্পিত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা যেমন বরাদ্দ করা হইয়াছে তেমনই এই বৃদ্ধি সহিত তাল রাখিয়া বহু সাধ্যক শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানীর কোটার পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। অবশ্য যে সকল শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সম্প্রতি ভারতে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানীর কোটাই হ্রাস করা হইয়াছে। সাধারণ মানুষের দিক হইতে এই আমদানী নীতিতে একটি বিধের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাহাদের ব্যবহার্য কয়েকটি পণ্যের আমদানীর কোটা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই খড়ির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দুই বৎসর পূর্বে খড়ির আমদানী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। গত ছয় মাসে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের খড়ি আমদানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আগামী ছয় মাসে ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের খড়ি আমদানী করার বরাদ্দ করা হইয়াছে। তবে সোনার খড়ি বা ১৫০০ টাকার বেশী দামের খড়ি আমদানী করা বাইবে না। সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য আর যে সকল দ্রব্যের আমদানী বৃদ্ধির বরাদ্দ করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত পিত্তলের জন্য দুইজাত পাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জঙ্গ-নিয়ন্ত্রণের সবলতম আমদানী বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতে জনসংখ্যা বাহ্যতে হ্রাস পায় তাহাই যে উহার উদ্বেগ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু জঙ্গনিয়ন্ত্রণের ত্র্যাব্যতির আমদানী বৃদ্ধির কলে নৈতিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা উপকার বিধের নহে।”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

ভারতীয় বিমানবাহিনী

“ভারতীয় বিমানবাহিনীর বার্ষিক দিবসের উদ্‌যাপন নিশ্চয়ই শুধু একটি সমরবিজ্ঞানীয় কর্মজীবনের বার্ষিক উৎসব নহে। ইহা বিমানবাহিনীর কথ্য কৃতিত্ব উল্লিখিত এবং বহু সৌরভের কীর্তির সহিত জনসমাজের ধারণা ও আগ্রহের সংযোগ আরও অঙ্গবদ্ধ করিবার উৎসব। বাহিনীর সৈনিক দেশ ও জাতির প্রতি তাহার কর্তব্যের পরিচয় অকীকার স্বরণ করিয়া সৈনিকতার অস্ত্রে আরও নিষ্ঠাশীল হইবে, এবং জনসমাজ উপলব্ধি করিবে যে, এই বাহিনীকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী দৃঢ় এবং বোমা করিবার জন্য তাহারও প্রস্তুতি আছে। বর্তমান বৎসরে বিমানবাহিনীর বার্ষিক দিবসের অঙ্গুষ্ঠান কর্মসূচী হিসাবেও একটি নতুন ভঙ্গব লইয়া দেখা দিয়াছে। যখন কর্তৃত্ব হইতেছে, তখনই উত্তর সীমান্তের মর্যাদা পাল

বাহিনীর আদর্শে বহু হইয়াছে। এবারি ধর্ম্মাঃউহার বাকীতে বলিয়াছেন, বিপার কাটে নাই। বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ বলিয়াছেন আমাদিগকে এখন বিশেষ সতর্কতার সহিত সাক্ষ্যমির সীমান্ত রক্ষা করিতে হইবে। ভারতীয় বিমানবাহিনী তাহার সাত্তাৎ বৎসরের জীবনে সাময়িক বোগ্যভার বহু কীর্তি প্রদর্শন করিয়াছে। উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তার মর্যাদা রক্ষার ভারতীয় বৈমানিক সৈনিক পুনরায় তাহার শৌর্ষ ও কৃতিত্বের এক দুর্লভ পরীক্ষা স্বীকার করিতে অগ্রসর হইয়াছে। দেশবাসীর ভক্তে সৈনিকের জীবনের প্রেরণা; সে প্রেরণার দ্বারা এবং মহত্ব স্বীকার করিয়াও বলিতে হইতেছে, অধ্যক্ষ এয়ার-মার্শাল মুখার্জী তাহার প্রচেষ্টিত বাকীতে বাহা বলিয়াছেন, আত্মতুষ্টি হইয়া থাকিলে চলিবে না। বিমান পরিচালনার কাজে আমাদের এখনও অনেক কিছু শিখিতে হইবে। দেশের সরকার, জনসমাজ এবং বিমানবাহিনীর সম্মিলিত আগ্রহে উৎসাহে ও সহযোগিতায় বিমানবাহিনীকে আধুনিকতম যন্ত্রাণকরণে সজ্জিত করিবার সংকল্পটিই বার্ষিক অঙ্গুষ্ঠানের প্রায় সংকল্পে পরিণত হউক। যুগসমাজের পক্ষেও বৈমানিক শিক্ষার বিশেষভাবে উৎসাহিত হইবার প্রয়োজন আছে। এই বৎসর বিমানবাহিনী-দিবস বোম্বাইয়ে পালিত হইতেছে। প্রত্যেক বৎসর দিল্লিতে দিবস উদ্‌যাপন করিবার রীতি পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া প্রচলনদ্বী সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমবাও দাবি করি, আগামী বৎসর বেন কলিকাতাতে বিমানবাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হইবে। বাহিনীর জনসমাজের অন্তরঙ্গতার সংযোগ প্রসাধিত করিতে হইলে বার্ষিক অঙ্গুষ্ঠানকে শুধু দিল্লিতে কেন্দ্রীভূত না করাই উচিত।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

শিল্পের প্রসার

“এই রাজ্যে শিল্পের প্রসার করিতে হইলে এসব বাধাবির এড়াইয়া বাইতে হইবে। অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে দ্রুত শিল্প প্রসারের জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়াই সরকারের নীতি। নিত্যব্যবহার্য নানারকম ভোগ্য ও টেকসই জিনিষ তৈয়ারীর ছোট-মাঝারি শিল্প অল্প সময়ে গড়িয়া উঠে অল্প মূলধন লাগে ও বেশী লোক নিয়োগ হয়। এই কারণে এ ধরনের শিল্পই বিদিল্ল রাজ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। অতএব নিত্যব্যবহার্য নানারকম জিনিষ তৈয়ারীর জন্য পশ্চিম বাঙ্গালার নতুন কারখানা স্থাপনের সুযোগ নিতান্তই নগণ্য। তবে কতগুলি ব্যাপারে পশ্চিম বাঙ্গালার বিশেষ সুযোগ আছে। এখানে পর্যাপ্তসাধ্যক ত্রুক্ষ ও অস্বিক্রিত কারিগর পাওয়া যায়। ইহাদের কর্মক্ষমতার উপর তিতি করিয়া ব্যক্তিগত দক্ষতা-সম্পেক যন্ত্রপাতি, কলকবজা ইত্যাদি তৈয়ারীর শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রকৃত সম্ভাবনা রহিয়াছে। নদীবহুল ও সমুদ্রতীরবর্তী এই রাজ্যে নৌবান নির্মাণ ও সেবায়মতী কারখানার তবিত্যৎ বিশেষ উজ্জল। ধনি অঞ্চলে করলা হইতে নানারকম উপজাত উৎপাদনের অঙ্গপ্র সুযোগ বিভবমান। এই সব নতুন নতুন পথে শিল্পের পুনর্বিভাস করিলে পশ্চিম বাঙ্গালার তবিত্যৎ উজ্জল। কিন্তু অন্ধের মত পূর্ব হইতে হুক-বাঁধা পথে শিল্প-প্রসারের চেষ্টা করিলে ব্যর্থতা অবজ্ঞাবী।”

—মুদ্রাস্তর।

ইহার কাহারো ?

“মেহিনীপুর জেলায় কেশপুর থানার আনন্দপুর গ্রামে বিজ্ঞানুগা পাঠ্য নামে একটি মূলমানসোজী আছে। কমিউনিস্ট এবং, এল, এ



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটি কত সুখী, কত সন্তুষ্ট। কারণ ওর স্নেহময়ী মা ওকে নিয়মিত অষ্টারমিল্ক খাওয়ান। অষ্টারমিল্ক বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত খাদ্য। এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিল্ক তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সবরকম তথ্যসম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নম্বর পরসার ডাক টিকিট পাঠান—এই টিকানায়—“অষ্টারমিল্ক”, P. O. Box No. 2257, কোলকাতা-১।

...মায়ের দুধেরই মতন

জ্যারেল শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। দুধ দেহগঠনের জন্য চার পাঁচ মাস বয়স থেকেই দুধের সঙ্গে জ্যারেল খাওয়ানও প্রয়োজন। জ্যারেল পুষ্টিকর শব্দজাত খাদ্য-রাসায়নিক দ্রব্য—ওষুধ আর চিনি মিশিয়ে, শিশুকে চামচে করে খাওয়ান।

OS. 2-X52-C. BG.



শ্রীসরোজ রায় এই পার্টির অস্তিত্ব সম্পর্কে চারি বৎসর পূর্বেও একবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গত বুধবার বিধান সভায় শ্রীরায় জানান যে, এই হিজাবারা মনের কিছু লোক অসাম্প্রদায়িক মূলবলানদের ১২টি ঘর লুণ্ঠ করে এবং মজলিস ঘর পুড়াইয়া দেয়। কয়েকজনকে মারি মারিও করা হয়। কেশপুর থানার দায়োগী কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহাও জানা যায়, উক্ত দায়োগীকে হঠাৎ বন্দী করার স্থানীয় অধিবাসীরা বিস্কৃত। এই অতি সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজেদের ভিতরে ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি করিবে। এই অঞ্চলের আবহাওয়া বিবাহীরা তুলিতেছে ইহাদের আসল স্বার্থ কি তাহা জানা দরকার। কাহাদের নির্দেশে ইহারা এই আত্মঘাতী পথ ধরিতেছে তাহাও খোঁজ করা দরকার। শ্রীসরোজ রায় পুলিশমন্ত্রীর নিকট সমগ্র ঘটনাটি জানাইয়াছেন। আমরা আশা করি, পুলিশমন্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া জনসাধারণকে আসল ঘটনা কি তাহা জানাইয়া দিবেন।

—স্বাধীনতা।

ক্রিয়াকর্ম

ডাঃ রায় অধাস দিয়াছেন দশটি জিনিসের উপর হইতে বিতর্ককর প্রস্তাব দিতে হইবে। তার মনে কোন দশটি জিনিস আছে জানি না। তার মধ্যে সাহা-বীজ-দুল, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং মিষ্টান্ন আছে ইহা আশা করা কি অসম্ভব হইবে? কলসমুখি আন্দোলনের সঙ্গে প্রথমটির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, পাছ ও বীজের উপর কর বহু আগেই প্রস্তাবিত হওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়টি দরিদ্রের চিকিৎসার প্রণালী উপকরণ। উহার উপর বিতর্ককর ঘোরতর অজ্ঞার। তৃতীয়টির উপরও কর প্রস্তাবিত হওয়া উচিত এই কারণে যে, বর্তমানে উহাই দেশে খাঁটি প্রোটিন খাদ্যের প্রণালী উপকরণ। সেদিন এক সভার ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তিত্বছিলেন—আমাদের চেলেচা এখন খাঁটি দুধ জানে না। অস্ট্রেলিয়ার একপ্রকার যেতবর্ণ তরল পণ্য 'ভাউ' হইয়া আমাদের দেশে আসে, উহা জলে গুলিয়া লইলে দুধ হয়—ইহাই তাহার জ্ঞান। আমাদের এখানে বানবাহনের অনুবিধায় দুধ বেশীদূর চালান দেওয়া যায় না বলিয়া উহা ছানার রূপান্তরিত হয় এবং মিষ্টান্নরূপে বিক্রয় হয়। একমিকে প্রোটিন খাদ্যবুদ্ধির কথা বলিব, আবার সেইসঙ্গে কর চাপাইয়া উহা বন্ধ করিয়া দিব—ইহা ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রের কর্তব্যবোধ নহে।

—যুগবাণী (কলিকাতা)

টেলিফোন চার্জ

“টেলিফোন চার্জ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সরকারী সিদ্ধান্তটি অস্বস্তিকর। নতুন ব্যবস্থার মধ্যবিত্তের উপর চাপ পড়িবে সবচেয়ে বেশি। পোটা বছরে যে কতটা কলট হউক না কেন, মাসে ২০ টাকা হারে আগাম ২০০ টাকা এগ্রিল মাসেই জমা দিতে হইবে। সাধারণতঃ অনেক মধ্যবিত্তই মোটামুটি ‘রিসিডিং পারামিটার’ কোন রাখেন; মাসে রিসিডিং বেতসহ ১৫১৬ টাকা চার্জ গুঠে। এখন প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক, সবসঙ্গেই প্রতি বছর আগাম ২৪০ টাকা কোন চার্জ দিতে হইবে। ইহাতে ব্যসা প্রতিক্রিয়াগুলির খুব বেশী অতি হইবে না। নিম্নতম স্খায়া কোন বন্দন তাহাদের প্রয়োজন হইবেই এক ব্যক্তি কলার বেট বন্দন ১৫ নয়া পরসাই বলক থাকিবে তখন

তখন কোন অনুবিধা নাই। বৎসর মাস অন্তর বিল মিটাইবার ব্যবস্থা হওয়ার তাহাদের কিছুটা সুবিধাই হইবে। টেলিফোনের মাধ্যমে আর বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকিলে সঙ্গত এই মধ্যবিত্ত-মারা ব্যবস্থা না করিয়াও অতি সহজেই তাহা করিতে পারিতেন। একটা নিম্নতম স্খায়া বাধিগা দিয়া বাড়তি কলার বেট বাড়ানো বাহিত। তাহাতে কালতু টেলিফোন কল কিছুটা কমার সম্ভাবনা থাকিত, আর পরসাইও বোঝা হইত। কতটা ভাবি পকেট হইতেই চলিয়া আসিত। একসঙ্গে আগাম ২৪০ টাকা জমা দিতে হওয়ার অনেক মধ্যবিত্ত ডাক্তার উকিলও পকেট আর কোন বাধা সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ বড় বড় শহরে টেলিফোন ইহারের একান্ত প্রয়োজন।”

—বর্তমান (কলিকাতা)।

রাস্তার দুর্ঘটনা

“কাঁচি তমলুক রাস্তার কাঁচি সহরের মুখে এক মাইল বেশ আজ প্রায় মাসাধিককাল পূর্বে সংস্কার করা হইয়াছে। কিন্তু রাস্তার পার্শ্বস্থিত হিট বোলা ও কাকের বাগি আদি ভূপীকৃত হইয়া থাকায় সাধারণের বাতায়তে বিষয় কষ্ট হইতেছে। সহরের মুখে এই পথটি সংস্কার হইলেও উহার পার্শ্বস্থিত অবাধা দোলা ভূপীকরণের অব্যবস্থার বিষয়ই মনে পড়ে। মুখোমুখি বন্দন বাতায়বাহী মোটর বাসগুলি কিবা রিক্সাগুলি অতিক্রম করে তখন এক সড়ক অবস্থার উদ্ভব হয়, যে কোন মুহুর্তে এ পথে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। অবিলম্বেই উহার সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িবে কি? দ্বিতীয়তঃ রাস্তার এই অংশটি সর্বাঙ্গিক সংস্কার। বাতায়টি উভয় পার্শ্ব মাটি দিয়া বাধান প্রয়োজন। বর্তমান নহানজুলীতে জলস্রুত হইয়াছে, এ অবস্থায় মাটির কাজ করার এখন প্রকৃত সময়। এ বিষয়েও কর্তৃপক্ষ অবহিত হইবেন আশা করি। —নীহার (কাঁচি)

চিনির হাশংকার

“যদি বর্তমান হারে চিনির উৎপাদন ও ব্যবহার চলিতে থাকে তবে ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন চিনি সঞ্চিত হইবে। গত বৎসর এই একই চিনি সংকলের পরিমাণ ছিল মাত্র এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন। সুতরাং অনুবর্তনীয়তে চিনির দুর্ভোগাত্মক সম্বন্ধে কোনটী ভীতির কারণ থাকিতে পারে না। সমিতির পক্ষ হইতে এই সম্বন্ধে এক ভাববর্তী প্রণয়নমূলক ও প্রকৌশলী খাণ্ড ও কৃষি মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঃ বঙ্গে চিনি সরবরাহ ও বিতরণ সম্পর্কে রাজসরকারকে পরামর্শ দানের জন্য একটি উপকণ্ঠী কমিটি গঠন করিয়াছেন ও এই কমিটিতে সভাপতিরূপে আমাদের এই জেলায় অধিবাসী পাঃ বঙ্গ সরকারে খাণ্ড উপমন্ত্রী শ্রীচাক্রা মহাপ্রসাদ মহাপ্রসাদ ও আরো কয়েকজন সভ্য বক্তিত্ব করেন। বাহাতে প্রতি ইউনিয়নে সম্বন্ধরূপে চিনি পাওয়া যায় তাগণ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য অন্তর্ভুক্ত চিনি ব্যবসায়ী সমিতির আবেদন অনুযায়ী চিনির উপর সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার সুপারিশ করিবার জন্য ইহারিককে অনুপ্রেরণা জানাই।”

—প্রদীপ (মেদিনীপুর)।

স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তৃত্বপন্নতা

“দুর্নীগ্রামে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে দলীল কয়েক বৎসর পূর্বে নগদ টাকা ও ভূমি রেভিনিউ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মিত হইতেছে না এ প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকে রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগ জানান যে তাঁহাদের দপ্তরে ভূমি রেভিনিউ কোনও দলিল নাই। ব্লক এলেকাভুক্ত হওয়া মাত্র বাহাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মিত হইতে পারে তাহার উক্ত উক্ত রেভিনিউ দলিলের টাকা ভূমির চালানের নকলসহ হোঁজা ম্যাপে উক্ত ভূমির অবস্থানের অঙ্কলিপি স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রেরিত হইয়া প্রের্যজন। ইহাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের বর্তমৎপরতার যে প্রমাণ মিলিল তাহা মোটেই গৌরবজনক নহে।” —বীরভূম (বামপুথহাট)।

আমের ভূভিক্ষ

“মালদহে প্রচুর পরিমাণ আশ্রয় মুকুল দেখিয়া “পূর্বাভাষে” গীতায়া আশ্বাসিত হইয়াছিলেন—তাঁহারা সহ সকলে হকাস হইয়াছেন। গভীরাহর ভাবায় গাছে পাছে “ডাণ্টো খাডো” ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছে না? পর পর কয়েক বৎসর আশ্রয় উপাদক ব্যবস্থাসীরা শোচনীয়ভাবে মার খাইতেছেন এবং সহস্র সহস্র কৃষি ও মধ্যবিত্ত পরিবার এবং মজুরদের বর্ষ সন্ধান দুইই হইয়া উঠিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সঙ্কটকে বাড়াইতেছে। আশ্রয় মালদহের বিরাট এক অংশের অন্ততঃ দুই মাসের খাদ্য। আশ্রয় না হইলে মালদহবাসী সে খাদ্য হইতেও বঞ্চিত হইবে। কলাই ও চৈতালীর ব্যর্থতা, আশ্রয় শোচনীয় অবস্থা, প্রায় ও বর্ষাকালের মালদহের গ্রামবাসীর আর্থিক অবস্থা কল্প হইবে। এই শোচনীয় অবস্থায় যেভাবে উপাদকরা বাহ্যিক মার খাইতেছে—তাঁহাতে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের স্তম্ভ এবং আশ্রয় মুকুলি ফলপ্রসূ করিতে এতদসম্পর্কে সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সমবেতভাবে গভীর পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। এতদসম্পর্কে ভেলা সমাহর্তা, মালদহ ম্যাকো মার্কেটস্ এ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেতেছি।” —উদয়ন (মালদহ)।

আর কত দিন আছে বাকী?

আসানসোল শিল্পকেন্দ্রগুলির আশে পাশে যে সব কলোনী বা গ্রাম আছে, সেগুলিতে চুরি ডাকাতি ও নানাবিধ অসামাজিক অপরাধের ঘটনা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। যেমন বাড়িয়াছে জি. টি রোডের বানবাহন দুর্ঘটনার সংখ্যা। জি. টি. রোডের এই অকসটির উপর নানাবিধ মোটরবানের বাতায়ন ক্রমাগত বৃদ্ধ বর্ষে দুর্ঘটনাও বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা সাধারণ বুদ্ধি, কিন্তু তদন্ত করিলে ইহাই দেখা যাইবে যে বেগবোয়া গতিতে অতিরিক্ত বোকাই গাড়ী, এবং যত অবস্থার গাড়ী বালাইবার ভক্তই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এ পর্যন্ত প্রতিবিধান করার উপযুক্ত কোনও ব্যবস্থা স্থানীয় পুলিশের নাই। গাড়ীর গতি নির্দিষ্ট রাখিতে বাধ্য করা পুলিশের সাধ্যায়ত্ত নয়। অতএব বহুবৎসর হাবং যে অব্যবহার্য ফলে বহু ব্যক্তি নিহত, আহত ও কতিপয় হইতেছে তাহা অব্যাহত আছে। ইহার পর চুরি ডাকাতি ও গুণ্ডামী প্রভৃতি—হুগলি ও এইমিকের ব্যাপন ও কলিয়ারী মৎস্য অবশ্যে এইসব ঘটনা আরই ঘটতেছে।

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক-গ্রাহিকার প্রতি নিবেদন

বাঙলা ও বাঙালীর প্রিয়তমা মাসিক বসুমতীর ১৯৬৭ বর্ষাক্ষয় বৈশাখে ৩১শ বর্ষে পূর্ণাপণে আমাদের দেশের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক বিশেষ ও আনন্দের অধার রচনা হবে। মাসিক বসুমতীর অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকা সমগ্র বাঙলা তথা ভারতবর্ষ তথা সর্ববিশ্বে ছড়িয়ে আছেন—বাঁদের কারও কারও আশ্রয়পরিচয় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন মাসিক বসুমতীর শেষ পৃষ্ঠার—আমাদের নূতন ও পুরাতন গ্রাহক তালিকায়। হয়তো আপনারদের লক্ষ্যে ধরা পড়েছে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, দূরপ্রাচ্য ও মহাপ্রাচ্যেও মাসিক বসুমতীর গ্রাহক-গ্রাহিকা আছেন।

বাঙলা দেশের সর্বজনপ্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীর মূল্য এবং মূল্যমান পত্রিকার পাঠক পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকা বিচার করেন। মাসিক বসুমতীর আগামী বর্ষের নুচুতে বা বা থাকবে তা আর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না, আমরা নিশ্চিত বলতে পারি। আগামী বৈশাখে মাসিক বসুমতীর বর্ধমান মূল্য। আমাদের অনেক কালের পুরাণে গ্রাহক গ্রাহিকাগণ তাঁদের দেশ চালা পাঠিয়ে বাহিত করুন। চিঠিতে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করতে ভুলবেন না। নমস্কারান্তে ইতি—

কলিকাতা-১২

কদ্যাক
মাসিক বসুমতী

মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজি: ডাকে.....২৪

বাণ্যাসিক " "১২

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজি: ডাকে

(ভারতীয় মুদ্রায়).....২

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে

গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ

মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা

উল্লেখ করবেন।

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক ১৫

বাণ্যাসিক সডাক১১

প্রতি সংখ্যা ১।

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে.....১৫

(পাকিস্তানে)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ.....২১

বাণ্যাসিক " "১০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "১৫

দুসৈন্যিক ডাকাতের ঘটনা এমনভাবেই ঘটতেছে যে পুলিশের সবকে অপরাধীদের কোনও শব্দা জ্ঞান একদম বোধ হয় না। শুভরূপে সাধারণ লোক নিরাপত্তার আশা না রাখিয়া কেবলমাত্র ভাগ্যের উপরই নির্ভর করিয়া আছে। —আসানসোল হিঠেরী।

ডাকঘরে ডাকটিকেট নাই।

“মোহনপুর, ২৩শে মার্চ—হানীর ডাকঘরে প্রায়ই ডাকটিকেট, পোষ্টকার্ড, এনভেলোপ, বেডিয়া ট্রাম্প পাওয়া যায় না বলিয়া জনসাধারণকে বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বেডিয়া ট্রাম্পের অভাবে অনেক সময় হানীর সরকারী কর্মচারীগণকে বিলম্বে বেতন গ্রহণ করিতে হয়। স্ববাদ লইয়া জানা যায় যে, ডাক পোষ্ট অফিসে ৫০ টাকার বেশী ডাকটিকেট রাখার বিধান নাই। ইহার ফলে প্রায়শই কোন না কোন প্রকারের টিকেট, বেডিনিউ টিকেট অথবা পোষ্টকার্ড ডাকঘরে সমুদ্র থাকে না। —সেবক (আগরতলা)।

ইঁদুরের অত্যাচার

“আমাদের সরকার খাদ্যভাব সমস্তার জন্য পরিবার পরিকল্পনা, এক কথায় বাক্যে বলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন! আর ইঁদুরের জন্ম নিয়ন্ত্রণে ভারত সরকার এখনও মন নিতে পারেননি। এককোড়ো মানুষ খুব বেশী হলে বড় জোর সারা জীবনে এক ডজন মানুষের জন্ম নিতে পাবে আর সেক্ষেত্রে এককোড়ো ইঁদুর বড় কতকম কম ২৫-টি ইঁদুরের জন্ম দিয়ে থাকে। মানুষের খাদ্যের ration ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ তারা কেলিমে হড়িমে খাওয়া দাওয়া থাকে প্রয়োজনের চেয়ে কম খেতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইঁদুর বত না খায় তার চেয়ে নষ্ট করে বেশী। ভারতে এইরূপে ইঁদুরে কেলি হড়িমে বড় কত শত উন্নয়ন নষ্ট করে জানেন? মাত্র ৬০ কোটি ২০ লক্ষ মন।” জি, টি, বোড (আসানসোল)।

অনাহারীর পারণ

“বাক অনাহারী সমাজের ‘হিল্ল’ হলো। কুদার্ত মানুষের ক্ষুধাশক্তি ব্যাপার নয়,—কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারের ভাতা ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু করদাতার করে কেবল কাউন্সিলারদের কর্পোরেশনই একমাত্র কাম্য নয়, তুরসা করি অনাহারীদের মিউনিসিপ্যালিটি ও অধুনাতন পঞ্চায়েতগুলিও কলকাতা কর্পোরেশনের এই উজ্জল ও রসাল দুটো অনুরণণ করে বিদেশী শাসনকালের অবশিষ্ট কুপ্রথাটির বিলোপ সাধন করবেন। গৌরী সেন ত’ জেন থেকে চতুই-এ পরিণত হয়েছে,—এর পর আরওলা। তা’ হোক, স্বয়ং শাসন বিভাগে রসপিপাসনের একমাত্র রস ছিল ‘উপরি’। উপরিভাগের একটা কিছু থাকার দরকার বৈ কি! তবে কেবল এখানে নয় সর্বত্রই আসল ‘উপরিভাগটা’ কিন্তু তলদেশে। অবশ্য আমাদের শোনা কথা। —আমরা মানুষ (কালী)।

চিনি রহস্ত

“মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের জন্য নিয়ন্ত্রিত দরে চিনি পাইবার যে পারমিটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ওনা বাইতেছে তাহাদের অনেকেরই ষ ষ চিনির কোটা ভুলিতে শব্দবোধ করিতেছে। শব্দার কাবণ আর কিছুই না—ইনকাম ট্যাক্স। অর্থাৎ যে পোকানের চিনির মাসিক খরচ হয়ত ১০ থেকে ২ মন সে ব্যক্তি হয়ত মাসিক চার পাঁচ মণের পারমিট করাইয়াছে, কিন্তু কোটা ভুলিবার সময়

পারমিটে প্রাপ্ত সমস্ত পরিমাণ না ভুলিয়া স্বাভাবিক প্রয়োজনমতই মাল উঠাইতেছে, (অবশ্য তাহাকে সচি করিতে হইতেছে নিশ্চয়ই সমগ্র পারমিটের ভলুট) অনেকের আবার প্রাপ্ত কোটার সমগ্র মাল ভুলিবার মত অর্ধসজ্জিতও নাই, বাহার ফলে একটা বিপুল পরিমাণ চিনি কোলাবাজারে পাচার হইতেছে। খোঁসা বাজার হইতে মোটা দানার চিনি বাহা সপ্তাহখানেক পূর্বে ১১০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছিল তাহা আজ পা চাক দিয়াছে, এবং মিহিধানার চিনি ১৫০ আনা সে দরে বিক্রয় হইতেছে। নিয়ন্ত্রণের ফলে চিনির দর ত কমিল না উঠে। বাড়িয়াই চলিয়াছে। —মালক (নিয়াহতপুর)।

চাউলের বাজার

“গুজ বঙ্গবন্ধু সরকার যখন চাউলের দাম নির্ধারণ করেন তখন দেখা গিয়াছিল যে বাজার বড় বড় ব্যবসায়ী পঞ্চাঙ্গ সংবাদপত্রে মোটা মোটা বিজ্ঞাপন দিয়া সরকারের নীতির ব্যর্থতার ইঙ্গিত প্রকাশে দিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে সরকারের নীতি ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহা হইতে পরিচায় উপলব্ধি করা যায় খাদ্যমন্ত্রের উপর সরকার হইতে ব্যবসায়ীদের দখল বেশী। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ইংরাজ সরকারকে নত করিতে বেরূপ আলোড়ন দীর্ঘদিন চলিয়াছিল—১৯৫১ সালে খাদ্যদ্রব্য দ্বারা নিয়ন্ত্রণ অভিনবাল ঘায়েল করিতে রাজ্যের চাউল ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত স্বপ্ন মত সফল হইয়া উঠিয়াছে। ১৯০৫ সালে ছিল ইংরাজ—১৯৫১ সালে স্বদেশীয় কর্তৃক সরকারী দপ্তরে উঠিয়াছে। প্রভেদ এখানেই এবং জনসাধারণের ভয় এখানেই। ইহা বোধ কার, রাজ্যের একটা শত পঞ্চাঙ্গ জানে যে রাষ্ট্রের বিকল্প চলিলে তাহাকে জেলখানায় বাইতে হয়—খাদ্যের দাবী করিয়া আন্দোলন করিলে জেল বাইতে হয় কিন্তু এই দেশের কুদার্ত মানুষের মুখে আর লইয়া চক্রান্ত ২৫মত্রে লিপ্ত থাকিলে স্বয়ং মামুদার আশীর্বাদ কুড়িয়া পাবে যায়। আমরা সময় থাকিতে রাজ্যের নেতা ও বিধান সভার সদস্যগণকে জানাইয়া দিতেছি যে কালবিলম্ব না করিয়া চাউল ব্যবসায়ী মহাজনদের প্রতি সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করুন এবং খাদ্যমন্ত্র ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে চাউলের বাজার ভবিষ্যতে যে পথ ধরিতে চলিয়াছে তাহাতে কোটি কোটি কুদার্ত মানুষের চিংকার দেশ গঠনের দৃষ্ট পথিকল্পনার মধ্যে ভাস্কর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে। অতএব হঁসিয়া। —বাসাস্ত বাস্তা (বাসাস্ত)।

খান্না খান্না

“পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিক করেন যে—ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে সত্য সত্যই—কে কে সরকারী ডোল পাইবার অধিকারী। দেখা গিয়াছে এমন লোকেরও ডোল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যিনি সুভাষাখ্য। খান্না সাহেবের ক্ষমতা রহিয়াছে। আজও তিনি ক্ষমতা অঙ্গীন রহিয়াছেন। খান্না সাহেব যদি সত্য সত্যই বাঙালী দরদী হইতেন তবে—বাঙালী দণ্ডকারণে বাইতে ভয় পাইত না এতদিনে হিরমূল উষ্মজনের বিচুটা পুনর্বাসন সম্ভব হইত। খান্না সাহেব কখনও বলেন আমি মনে প্রাণে—বাঙালী, আমার কখনও বলেন আমি বাঙালী নই বলিয়াই বাঙালীরা আমার পিছনে লাগিয়াছে। —জনবত (জলপাইগুড়ি)।

পরীক্ষা বিভ্রাট

“কিছুদিন পূর্বে যামবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রেটার এবং কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র মন্তব্য করেন যে, ছাত্রগণের মধ্যে বিশ্বখ্যার জ্ঞান আসলে দারী শাসন-কর্তৃপক্ষ। তাঁহাদের নীতির জগুই সর্বগ্রাসী ধাবানলের ত্রায় ছাত্রগণের মধ্যে বিশ্বখ্যার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং করিতেছে। এইরূপ সত্যভাষণ বাহারা করেন তাঁহারা সরকারের চক্ষুশূল। কিন্তু একথা আমরা জানাইয়া দিতেছি—ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, পণ্ডিত মুখেরা নিজ স্বার্থ নিকির জ্ঞান যে আগুন ছালায়, নিজেরাই একদিন সেই আগুন পুড়িয়া মরে। ভারতবর্ষের প্রচুর ক্ষতি এই সকল নেতা করিয়াছেন যুবজন্তিকে তাঁহারা কলঙ্কিত দুর্বল এবং দেশগর্বনের অল্পপযুক্ত করিয়াছেন। ইহার ফল আগামী কালের মহা-ভারতের ভিত্তি রচিত হইতেছে না, বিলুপ্তি বা পরাধীনতার পথ প্রশস্ত হইতেছে? পরীক্ষা বিভ্রাট বার বার খটিতে থাকিলে জাতীয় শৃঙ্খলা জাতীয় জাতিও একদিন পরিণত হইবে।” —মেদিনীপুর হইতে যী।

নৈতিক মান

“কর জরুরি ক্ষেপে পরিকল্পনার নামে ত্র্যয়ের মূল্য দিনের পর দিন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। করের বরাদ্দ বাহারা করেন তাহারা ত্র্যয়ের এই অগ্রিমূল্য স্বীকার করেন না। মূল্য বৃদ্ধি তাহাদের আঘাত করে না। ইহা আঘাত হানে দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের সাধারণ জীবন ব্যাধার উপর। এ আমলে ত্র্যয়ের মূল্য কমিতে পারে না। দিনের পর দিন ইহা বাড়িয়াই চলিবে। ইহার উপর আছে ভেজাল। এমন কোন খাতবস্ত নাই বাহাতে ভেজালের কারবার চলে না অর্থাৎ বাহা ভেজাল মুক্ত। দেশের দায়িত্বশীল মন্ত্রীর পক্ষে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ইহা স্বীকার করেন এবং চরিত্র ও নৈতিক মানের উল্লেখ করেন। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে এই দেশের সাধারণ মানুষের চরিত্র ও নৈতিক মান নিকৃষ্ট নয়। যে সব স্তরে আজ চরিত্র ও নৈতিক মানের উন্নয়ন দেশ ও মানুষ আশা করে সেমিকে তাকাইলে হতাশ হইতে হয়। ইহাও আজ দেশবাসীর চরম দুঃখ কষ্টের অন্ততম কারণ? আজ দেশের উচ্চ স্তরে দুর্নীতি বেড়াইতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে এই দেশে দুর্নীতির এই পঙ্কিল স্রোত কে রোধ করিবে এক কিভাবে রোধ করিবে?”

—ত্রিশ্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

শিক্ষা ও শিক্ষক

“বর্তমান দুর্ঘ্যুলাতার বাজারে মাসিক ৫২।।০ ও ৬৩।।০ বেতনের শিক্ষকদের পক্ষে এমনিতেই ভরসা নেই বাঁচিয়া থাকা কঠিন। এই বেতন ও নিয়মিত মেলে না। সর্কোপরি আছে বখন তখন দুর্বৃত্তী হানে বল্লী কিংবা কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইলে ছাটাইএর ব্যবস্থা। এই ভাবে শিক্ষার সর্বনিম্ন ভিত্তি রাখিয়া ধীহারা জাতিকে গড়িয়া তুলিবেন তাঁহাদের নিজস্বের জীবনেরই কোন ভিত্তি নাই। অবহেলিত শিক্ষক সমাজ, অবৈজ্ঞানিক ও দুর্বিবহ পাঠ্যক্রম,

পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি ও সরকারী ঊনসীন্ত সব মিলিয়া দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে মন্দ্র ও ভুলিল করিয়া তুলিয়াছে; কলে সংবিধানের নির্দেশিত মণ বংসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করিবার ব্যবস্থা ফলবতী হয় নাই। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিক্ষা জগতে বরাদ্দ ত্র্যয়ের যে সংবাদ বাহির হইয়াছে তাহাতে এই নীতি অল্পসরদের সরকারী দৃষ্টভঙ্গী অবিচল রাখিয়াছে বোঝা যায়।”

—মুর্শিদাবাদ বার্তা।

পরের ধনে পৌদারী

“শাসনতন্ত্র সংশোধন না করিয়া ভারতের কোন অংশ অল্প রাষ্ট্রকে দান-ধরবাত করিবার অধিকার প্রধান মন্ত্রী বা লোকসভার বে নাই, বেকবাড়ী সম্পর্কে সম্প্রতি মহামাত্র স্বপ্রিয় কোর্টের রায়ে ভাড়াই ধ্বনিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল কুচবিহারের ছিটমহল, মুর্শিদাবাদ ও আসামের যে সকল অংশ পাকিস্তানকে বে-আইনীভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহা উদ্ধারের কি কোন ব্যবস্থা হইবে? শাসনতন্ত্র সংশোধনের সাহায্যে বেকবাড়ী বাহাতে পাকিস্তানকে দেওয়া না হয়, তাহার জ্ঞান পশ্চিম-বাংলার পক্ষ হইতে সম্ভবত্বভাবে আওরাজ তোলাই প্রয়োজন।” —সংবাদ (হগলী)।

শোক-সংবাদ

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

বাঙলার তথা ভারতের প্রাণী মনোবী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য দেশবিশ্রুত সুবীর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় ২৮ ফাল্গুন বর্ষমান লহরে ৮০ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ১৮৮০ সালের ২রা ডিসেম্বর ভারতের পূণ্যভূমি, শিক্ষা দীক্ষার সংস্কারের মহাপীঠ বারাণসীতে ক্ষিতিমোহনের জন্ম। পনেরো বছর বয়সে ইনি সন্তপত্তী সাধকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও তারই কলম্বরপ উত্তর জীবনে সন্তপাদ সন্তক্স ক্ষিতিমোহনের নির্ভরযোগ্য অতুলনীয় পাণ্ডিত্য সারা ভারতের সুখী সমাজ কঙ্ক স্বীকৃত হয়। আজকের দিনে আমাদের মধ্যে বাড়িল সমাজ সন্তক্স যে সন্তেনতা এসেছে তারও মূলে আজেন ক্ষিতিমোহন। বারাণসীতে সে সব সময় সংখ্যাতীত দিকপাল পণ্ডিত-বৃন্দের সমাবেশ ছিল তাঁদের ঘনিষ্ঠ সারিখে ক্ষিতিমোহন আপন জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। ১৯০৮ সালে ইনি শাস্তিনিকেতনে যোগদান করেন এবং আশ্রমের গঠন কর্মে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহকর্মী রূপে পরিগণিত হন। ১৯২৪ সালে ইনি কবিগুরুর সঙ্গে চীন, বর্মা, পেনাং, মালয় ও সিঙ্গাপুর ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে ‘দেশকোত্তর’ (ডি লিট) উপাধির দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে কিছুকালের জন্তে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে ইনি মাসীন ছিলেন। ক্ষিতিমোহন একজন স্নেহলব্ধ ও ছিলেন, অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ জায় লেখনীজাত। তাঁর তিরোধানে ভারতের সংস্কৃতির জগত থেকে একজন দিকপালের অভাব ঘটল।

সংবাদ—প্রশ্নোত্তর ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রট, “বঙ্গবন্ধু” রোটারী বেসিনে” জিভারকম্বা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ব্রহ্মত ও প্রকাশিত



নিখুঁত কাজ

AR-BEN



আধুনিক চেহারা ও আধুনিক গড়নের উবা ডি-লুম্ব ফ্যান দীর্ঘদিন ধরে নিৰ্ব্বাচীত কাজ দেবে। ডি-লুম্ব মডেলের সুদৃশ্য চেহারা আধুনিক গৃহসজ্জার সঙ্গে চমৎকার মানাবে।

• বেকড এনামেল ফিনিশ—দীর্ঘদিন চক্চকে থাকে • ডাব্ল বল-বেয়ারিং লাগানো ব'লে নিঃশব্দে ঘোরে আর কাজও দেয় অনেকদিন • অল্প বিদ্যুৎখরচে অনেক বেশী হাওয়া হয় • ৬০", ৫৬", ৪৮" ও ৩৬" মাপে এ. সি.-তে পাওয়া যায়

এই সমস্ত আকর্ষণীয় গুণের জন্মই সারা পৃথিবীর ৪০ টিরও বেশী দেশের লোক আজকাল উবা ফ্যান কিনছেন।

আজই আপনার স্থানীয়
উবা বিক্রেতার সঙ্গে
দেখা করুন।

উবা

বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্যান

অম এঞ্জিনিয়ারিং ও অর্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৩৫



ক্রীষ্টমাস ট্রী

হিন্দুদের ঘোড়ার মত খ্রীষ্টমাস ইউরোপের একটি জাঁকজমক পূর্ণ উৎসব। বীণের ভাঙের দিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিবছর এই উৎসবে প্রতিটি খ্রীষ্টান পরম্পরের মধ্যে সুখ ও শুভেচ্ছার আদান প্রদান করে থাকে। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বৎসর আগে পৃথিবীতে ঈশ্বরের পুত্র মহান বীণ জন্মগ্রহণ করে। ঈশ্বরের পুত্রের মত প্রতিটি মানুষই বিরাট শক্তির আধকারী যদি তাহার মধ্যে থাকে একটি মহৎ অঙ্কুরণ।

প্রচলিত ক্রীষ্টমাস ট্রী, অর্থাৎ উৎসবের বৃক্ষটি আপার রাইনের এক অংশ হইতে, উৎপত্তি লাভ করে এবং ১৭০৮ সালে প্রথম বর্ণিত হয়। একটি প্রচলিত তথ্য বৃক্ষটির সহিত গুপ্তপ্রস্তোভাবে জড়িত। রূপকে উল্লিখিত আছে যে, শীতের এক সন্ধ্যায় বালক বীণ একটি কাঠুরিয়ার জীর্ণ কুটারের দরজায় আঘাত করিতে থাকে। কাঠুরীর দম্পত্তি দোর খুলে দেখে এক অপূর্ণ বালক শৈতানীড়িত অবস্থায় ঝাড়িয়ে আছে—ফুপাও মলিন বসনে। তারা আশ্চর্য বালকটিকে সর্বপ্রকার বস্তু খাওয়া ও উষ্ণ বিছানা দিয়া নিজের করিয়া লইল। প্রত্যুষে বালকটি শব্দাত্যাস করিয়া কানুন শোভায় ভাসে। তাহার পরিসর দিল—আর একটি 'কার' বৃক্ষ হইতে একটা শাখা ভাঙিয়া কাঠুরীর দম্পত্যকে উপহার দিল—হাজির আশ্রয়কূলের ধন্যবাদ হিসাবে। বালকটি মহান ইচ্ছা প্রকাশ করিল যে—এই বৃক্ষশাখাটি নতুন নতুন আচুসার পল্লব বিস্তার করিয়া তাহাদের প্রতিবছর কল্যাণ সুখ ও সমৃদ্ধি বিতরণ করিবে। তাহার বালক বীণের কথা শুনিয়া—বৃক্ষশাখাটি গৃহের কানিচেই বোষণ করিল। বৃক্ষটি বহানময়ে বহু পল্লবিত-শাখা বিস্তার করিয়া কল্যাণ হইল, তাহা হইতে তাহার কালে প্রচুর শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিল।

ইউরোপে নানা জাতীয় 'কার' বৃক্ষ আছে। তাহাদের মধ্যে উপকারী প্রধান হইল—

সিলভার কার—*Abies alba* Mill

বাল সাম কার—*Abies balsamea* (L) Mill

হোয়াইট কার—*Abies concolor* Lindl. & Gord

এলপাইন কার—*Abies lasiocarpa* (Hook) Nutt.

রেড কার—*Abies magnifica* A. Murr.

নোবল কার—*Abies procera* Rehd. ইত্যাদি।

এবিসু (কার) . চিহ্নিত বৃক্ষ, লতা পিরামিডের মত চেহারা।

ইহার নানাপ্রকার উপকার আছে। মিল ও শিল্পপ্রদান হানে ইহাদের চাহিদা অনেক। ইহার কাঠ খুব হালকা নয় ও মৃদু।

বাল সাম কার নিম্নোক্ত ইহার উপকারিতা অত্যন্ত বেশী। বালসাম কার হইতে এক প্রকার আঠা কাঁচ শিল্পের প্রয়োজনে বহুল ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে এবিসের একটি বৃক্ষ পাওয়া যায়। ইহার নাম হিমালয়ান কার (*Abies spectabilis*—A. webbiana)—হিমালয় পর্বতমালায় মধ্যে ও দক্ষিণ ভাগে ছাড়া। প্রায় সকল অংশেই পাওয়া যায়।

মুইজারল্যান্ডে আর একটি চির হরিৎ বৃক্ষ 'ইউ' (*Taxus*) পরবর্তী কালে পবিত্র হইয়া গঠে। সত্য যে একটি সবুজ বৃক্ষকে বেছে নেওয়া হয় শুধু উৎসবটির সবুজ সফলতা ও প্রাণবন্তের প্রতীক হিসাবে। এই উদ্বিগ্ন শব্দকে আরও থেকে 'কার' অথবা 'প্পু' (*picca*) বৃক্ষকে বখাখ বেছে নেওয়া হয়েছে ক্রীষ্ট মাস ট্রী হিসাবে। ধার্মিক বৃক্ষানের অজ্ঞাবহি বহু পরিশ্রমে সুবর্ণরূপ কথার গাছটিকে পরিপূর্ণভাবে আলোক ও নানাপ্রকার তেলতায় সজ্জিত করে। বড়দিনের সময় বহু সমারোহ তাহার নিজেদের মধ্যে শান্তি ও বিনীততার আদান প্রদান করে—সমৃদ্ধির রূপক এই পবিত্র বৃক্ষটিকে কেন্দ্র করে। ইহাই প্রচলিত ইউরোপীয় সভ্যতার 'ক্রীষ্ট মাস ট্রী'—শ্রী চৈতন্যরঞ্জন দাস, ৩ নং, জ্যোতিষ রায় রোড, কালকাতা—৩৩।

পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়, আপনার মাসিক বসুমতী ৩৮শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা মাস ১৯৬৬ সনের একটি প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত পুণ্য সেন ও নেতাজী রক্তবিক্ষেপ ২০ নং প্যারাগ্রাফে এই মের জায়গায় ৬ই মে হইবে, "রক্তকুমার" জায়গায় রক্তকুমার সেন হইবে। কালোপোশাল এর ভাংগার "কালোপোশাল" হইবে পুণ্য সেনকে খণ্ডের জন্ত "দশ হাজার" নয় "১৫ হাজার" টাকা পুরস্কার বোঝা করে "শেরলা নয়" "গৈরলা" পুণ্য সেনের ভিলবার অপসারিত হয় না, পিছন হইতে একটি গুণ্য সৈন্ত তাঁকে ধরে ফেলে, ছদ্ম বাবু যদি এসবই আপনাদের কাছে কিছু জানিতে চান তবে তাঁকে জানাবেন, মনোরঞ্জন সেনের ছোট ভাইয়ের কাছে লিখতে। ও নিয়মিতকাল পত্রালাপ করবার জন্ত। ইতি—চৈতন্যরঞ্জন সেন ১নং মধুপুর বানি (ক) রোড, বেলগারিয়া ২৪-পরগণা।

মহাশয়, আপনার পত্রিকার (২য় সংখ্যা) ৬য় প্রবন্ধ "কায়দার বচনাকাল ও বৈদিক আর্থের আদানবাস" পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

জানাই। এই চিঠিটি লেখার প্রায় তিন কতকগুলি মাসের মধ্যে প্রকাশ উল্লেখ করা। কেননা আমার প্রবন্ধের মূল বিষয়ের সঙ্গে উহার কিছু পরিমাণ রয়েছে। যেমন 'খ' পৃষ্ঠার প্রথম দিকের লাইনটি 'উহা বৎসরে ৫০ বিকলা সরে যায় এবং ২৫৮৬ বৎসরে ৩৬০° ঘুরে আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসে। এই লাইনটির ২৫৮৬র স্থলে ২৫৮৬৮ হবে (যদিও গণিতীয় হিসাবে আরও কিছু বেশী হয় ২৫৯২০)। আবার এখন এক এক নক্ষত্র $২৫৮৬০ \times ৬০ = ৮৪০০$ এই ৮৪০০র স্থলে ৮৮০০০ হবে। হিসাবের ভুল—ভুল বোকাবুকের কারণ হয়ে পড়তে পারে। সেই জন্যই এই প্রচেষ্টা। আর অত্যন্ত আকর্ষক ভুলগুলির উল্লেখ নিম্নয়োজন। শুধু একটি ভুল আমার নিজের, সেটি লোকমাত্র ভিলকের গ্রন্থের নাম লিখেছিল। 'Arctic home in the vedas।' অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। শুভেচ্ছান্তে—সুনীলকুমার আচার্য্য, ৬/৫২ বিজয়গড়, কলিকাতা-৩২।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Please accept subscription for the 1st. six months for your monthly in 1367 B.S.—Ava Rani Devi, Kanpur.

মাসিক বসুমতীর আগ্রহী ছয় মাসের চাঁদা (ফাল্গুন হইতে আশ্বিন পর্যন্ত) পাঠাইলাম।—শ্রীমতী কণক দে, কটক।

Please send me your monthly magazine Basumati from Agrahayan to Baisakh. Sending my subscription herewith.—Krishna Dutta, West Dinajpur.

ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। মাঘ সংখ্যা হইতে গ্রাহক-প্রেরিত করিলে অশেষ খুসী হইব।—শ্রীমতি। নন্দরায়, আসাম।

আমার ছয় মাসের চাঁদা ৭'৫০ নয়া পরমা পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।—Anjali Basak, New Delhi.

ছয় মাসের চাঁদা ৭।।০ টাকা পাঠাইলাম। ১৩৬৬ সালের মাঘ হইতে ১৩৬৭ সালের আষাঢ় মাস পর্যন্ত। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।—লাবণ্যপ্রভা দে, দিল্লী।

Herewith sending Rs. 7.50 for the copies of 'Masik Basumati' for coming six months.—R. N. Talukdar, Jalpaiguri.

আগামী বৈশাখ মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত মাসিক বসুমতীর জন্য ৭।।০ পাঠাইলাম।—Mrs. Amita Sanyal, Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। পত্রিকার আরও উন্নতি কামনা করি।—Mrs. Rama Dutt, New Delhi.

আগামী ছয় মাসের চাঁদা (মাঘ হইতে আশ্বিন) পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন।—ইন্দিরা শ্বাহদলী, Shahdol (M. P.)

Herewith please find Rs. 7.50 being the subscription towards Monthly Basumati for a further period of six months.—Mrs. Purnima Chakravorty, Mokokchung, N.H.T.A.

আগামী ছয় মাসের (মাঘ হইতে আষাঢ়) জন্য আমার গ্রাহিকা চাঁদা ৭ টাকা ৫০ নয়া পরমা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী চন্দ, Dhenkanol.

Remitting Rs. 7.50 for enrolling me a member. Please continue to send me the copies of your Magazine from Kartick to Chaitra 1366 B.S.—Kalpana Das, Barkakana, Hazaribagh.

Sending herewith the subscription for another six months from the month of Chaitra.—Mrs. Namita Choudhury, Bangkok, Thailand.

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দুর্বিষহ বোকা বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, ঐতিহ্য, জ্ঞেয় আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারণ উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারণ শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বার্ষিকীতে, নয়তো কারণ কোন কৃতকার্যতায়, আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে সারা বছর বঁচে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্য স্মৃতি আবারও ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে খুশী হবেন, সম্ভ্রান্তি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যে-কোন জাতবোয়র জন্য লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। হিন্দু বৈশিষ্ট্য	—স্বামী বিবেকানন্দ	১১৩
২। সেলিন ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিসীলী জেলী	(প্রবন্ধ) ম্যাকসিম গোর্কি	১১৫
৩। অর্ধেক আকাশ জুড়ে	(কবিতা) শান্তিকুমার ঘোষ	১১৭
৪। জ্ঞানাসেবণে	(রম্য রচনা) ডিকেন্স—অনুব: মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৮
৫। অখণ্ড অবিয় ত্রীপোরাজ	(জীবনী) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১২১
৬। কৃষ্ণচূড়া	(কবিতা) দিলীপকুমার বসু	১২৬
৭। সে	(কবিতা) নটিকেন্দ্র ভট্টাচার্য	১২৬
৮। শিশির-সান্নিধ্যে	(জীবনী) রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু	১২৭
৯। বঙ্গসংস্কৃতি ও চিত্রকলা	(প্রবন্ধ) অশোক ভট্টাচার্য	১৩৩
১০। চার জন	(বাঙালী-পরিচিতি)	১৩৪
১১। আলোকচিত্র—		১৩৬(ক)
১২। দেশলাই কাঠি	(কবিতা) বৈজ্ঞানিক দাস	১৩৮
১৩। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার সন্ন্যাসী ও কবির সম্প্রদায়	(প্রবন্ধ) স্তম্বরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৩৯
১৪। আত্মিকার গভীর অবশেষ	(বাস্তবতা) ডি. আর সরকার	১৪০
১৫। বর্ণালী	(উপক্ৰাস) সুলেখা দাশগুপ্তা	১৪২

বই পড়ুন • বই পড়ুন • বই দিয়ে বলুন

মৎপুতে স্ববীজ্যনাথ মৈত্রী দেবী ॥ ৬.০০ ॥ স্বত্বচিহ্ন পরিমল পোষামী ॥ ৬.০০ ॥	প্রতিপত্তি ও বহুলাভ হুসিন্দাহীন নতুন জীবন ডেল কার্ণেগি ॥ ৪.৫০ ॥ ৫.৫০ ॥	বুদ্ধিতে আর ব্যাখ্যা চলে না পশ্চিমবঙ্গ লেখকলেখিকা ॥ ৩.০০ ॥ আজব নগরী জিগাছ ॥ ৩.০০ ॥
জ্যেষ্ঠ গল্প চাক্রাচর বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্যবান সংযোজন ॥ ৫.০০ ॥	প্রেমের গল্প প্রতিভা বহু মনোহারী সংকলন ॥ ৪.০০ ॥	অনিবারিত গল্প সরনীকান্ত দাস ২৪টি বিখ্যাত গল্প ॥ ৫.০০ ॥
ডালবালার ইতিকথা শিবরাম চক্রবর্তী রসের রকমারী ॥ ২.৫০ ॥	অনুভূতির উপাখ্যাম বিষনাথ চট্টোপাধ্যায় পুরাণের বিচিত্র কথা ॥ ৩.৫০ ॥	তারাপীঠের একতারা চিত্তরঞ্জন দেব নতুনতর রম্যকাহিনী ॥ ৩.৭৫ ॥
উপন্যাস ভরত রোষিবে কে দিলীপকুমার রায় ॥ ৬.০০ ॥ একদ্ব্যর্থী আকাশ মধুরাই ধনঞ্জয় বৈরাগী ॥ ৫.০০ ॥ ২.৫০ ॥ অজানিতার চিঠি বিহারক ভট্টাচার্য ॥ ৩.০০ ॥	উপন্যাস লাড়া বৃন্দাবন বসু ॥ ৩.০০ ॥ বীর বিত্তভিষণ গুপ্ত ॥ ৩.৫০ ॥ লক্ষীপন পাঠশালা তারাপীঠের বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১.৫০ ॥ হুলের মেয়েরা পরিমল পোষামী ॥ ২.০০ ॥	গল্প সামনে উড়াই প্রমোদ মিত্র ॥ ১.৫০ ॥ বাতের চোখ লীলা মজুমদার ॥ ২.৫০ ॥ ভজহরির সংসার ভাস্কর ॥ ৩.০০ ॥ আকাশ প্রদীপ হৃদয় কান্ত ॥ ৩.৫০ ॥
কাকনজংঘার পথে বিহারক বৈরাগী ॥ ২.৫০ ॥	এক দ্ব্যর্থী আকাশ (নাটক) ধনঞ্জয় বৈরাগী ॥ ২.০০ ॥	নতুন তারা (একটি সংকলন) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ ৩.২৫ ॥
ভাপনের নিঃশ্বাস প্রমোদ মিত্র ॥ ২.৫০ ॥	একটি নাটক সংকলন অরুণ চৌধুরীর ভূমিকা সহৃদয় ছাঁজন নাট্যকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত হাট একাত্তিক ॥ ৩.০০ ॥	

একমাত্র পরিবেশক : পত্রিকা সিন্ডিকেট : ১২১, লিওনে ট্রিট, কলিকাতা ১৬

মুদ্রাপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১৬। বিপ্লবের সন্ধান	(বিপ্লব-কাহিনী)	নারায়ণ কল্যাণাধ্যায় ১৪৫
১৭। ঐশ্বরিকালয়ের উন্নয়ন	(প্রবন্ধ)	উপমহা ১৫০
১৮। চন্দ্রা তার নবম	(উপজ্ঞাস)	মহাশেতা ভট্টাচার্য ১৫৪
১৯। বিদেশিনী	(উপজ্ঞাস)	নীরদব্রজ দাশগুপ্ত ১৬০
২০। বাতিঘর	(উপজ্ঞাস)	বারি বেবী ১৬৪
২১। শিশু	(কবিতা)	তারা দত্ত ১৭৬
২২। এতটুকুন	(কবিতা)	জসীম উদ্দীন ১৭৬
২৩। কাল ভূমি আলোয়	(উপজ্ঞাস)	আত্তোব নৃমোপাধ্যায় ১৭৭
২৪। আনন্দ-যুদ্ধাবন	(সংস্কৃতকাব্য)	কবি কর্ণপুর : অম্বাবান—শ্রীএবোবেলুনাথ ঠাকুর ১৮৬
২৫। হরিব্রজার মেশিন	(উপজ্ঞাস)	বিজ্ঞানভিক্ষু ১৮৯
২৬। অপরিচিতাৎকে	(কবিতা)	এডগার এলেন পো : অম্বাবান—প্রফুল্লকুমার দত্ত ১৯৫
২৭। ভলভেরার—জীবন ও মর্শন	(প্রবন্ধ)	উপমহা ১৯৬
২৮। জয়কাল	(কবিতা)	আশীষকুমার দাস ১০০২
২৯। পত্রগুচ্ছ		১০০৩
৩০। কবর-সজ্জিত	(কবিতা)	ট্রিভেনসন : অম্বাবান—শৈলেনকুমার দত্ত ১০১১
৩১। সত্ত ববী	(জীবনী)	হামিনীকান্ত সোম ১০১২
৩২। আধুনিক বঙ্গদেশ	(প্রবন্ধ)	নির্মলকুমার বসু ১০১৮
৩৩। নোনা গা	(গল্প)	শক্তিপদ রায়গুপ্ত ১০২২

বস্ত্রশিল্পে মোহিনী মিলের

অবদান অতুলনীয় !

মূল্যে, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন

১ নং মিল—

২ নং মিল—

কুষ্টিয়া, বরীয়া । বেলবরীয়া, ২৪ পরগণা

ম্যানেজিং এজেন্টস—

চক্রবর্তী, সঙ্গ এণ্ড কোং

মেসি: অফিস—

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা




**শ্রীরামপুরের
এস.চক্রবর্তী**

**XX
ব্র্যান্ড**

লক্ষ্মী এড্‌ভান্সী

৪৩/৯, ফ্র্যাণ্ড রোড - বালিঘাটা-৭

আমেরিকার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ও

বাইওকেমিক ঔষধ

প্রতি ড্রাম ২২ মঃ পঃ ও ২৫ মঃ পঃ, পাইকার্যপক্ষে উচ্চ কমিশন দেওয়া হয়। আমাদের নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি ও ব্যবহার্য সরঞ্জাম মূল্যে মূল্যে পাইকারী ও পুত্রা বিক্রয় হয়। ব্যবহার্য পিচ, প্রায়বিক চৌকলা, অম্বা, অনিরা, অর, অর্জী প্রভৃতি ব্যবহার্য জটিল রোগের চিকিৎসা বিচক্ষণতার সহিত করা হয়। সফলতম রোগীকিন্দকে ডাকঘোমে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক ও পরিচালক—ডাঃ কে, সি, বে এম-এম-এম, এইচ-এম-বি (সোভি মেডেলিট), কুতপূর্ণ হাউস ফিলিসিয়ান্স ক্যাম্বেল হাসপাতাল ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এও হাসপাতালের চিকিৎসক। অসুস্থ করিয়া অর্জারের সহিত কিছু অগ্রিম পাঠাইবেন।

জামিয়ারাম হোমিও হল ১০৫, মিলেকান্দ রোড, কলিকাতা-৬(৭)

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
৩৪। জলছবি	(কবিতা) মলয়শংকর দাশগুপ্ত	১০২৯
৩৫। ডেখ বেলঙরে	(গল্প) অমিত দাস	১০৩০
৩৬। পেরেক	(রম্য রচনা) মিহিরকুমার কাকিলাল	১০৩৪
৩৭। একটি নাংসী মেয়ের ডায়েরী	মেহিরা বিহারনোন্দ : ভূবাব—মিলকুমার ঘোষ	১০৩৭
৩৮। হামলেট	(কবিতা) বরিশ পাট্টারনেক : জুবাব—পৃথ্বীশ সরকার	১০৪০
৩৯। সিদ্ধার্থ-সঙ্গীত	(কবিতা) পৌতম বুদ্ধ	১০৪০
৪০। অজান ও প্রাণ—		
(ক) মানবদরলী রবীন্দ্রনাথ	(প্রবন্ধ) অপর্ণা সরকার	১০৪১
(খ) মেয়েবাই দারী	(প্রবন্ধ) মহামারা দেবী	১০৪২
(গ) পাহাড় পেতে পর	(কবিতা) জামলী রায়	১০৪৪
(ঘ) খাঁজানা বেগম	(গল্প) শিবানী ঘোষ	১০৪৪
(ঙ) রামধনু আঁকে রঙ	(গল্প) মীনাকী দালাল	১০৪৮(ক)
৪১। আলোকচিত্র—		
৪২। জীৱামুকুন্দদেব	(কবিতা) পুষ্প দেবী	১০৪৯
৪৩। বন কেটে বসন্ত	(উপন্যাস) মনোজ বসু	১০৫০
৪৪। ছোটদের আসর—		
(ক) চডক উৎসব	(প্রবন্ধ) সুরীন্দ্রকুমার মণ্ডল	১০৫৬
(খ) লামেবিরয়া	(গল্প) ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০৫৭

= ন্যাশনালের কয়েকটি বই =

গল্প-সংগ্রহ :	প্রবন্ধ ও ইতিহাস :	
নবী ভৌমিক :	চৈত্রাদর্শ	৪'০০
অরুণ চৌধুরী :	সীমানা	১'৭৫
উপন্যাস :		
অমরেন্দ্র ঘোষ :	চরকাশেষ	৩'৭৫
	কবিতা : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : ক'টি কবিতা ও একলব্য	২'০০
	স্বকুমার মিত্র : ১৮৫৭ ও বাংলা দেশ	২'৭৫
	রেবতী বর্মণ : সমাজ ও সভ্যতার	
	ক্রমবিকাশ	৩'৫০
	নীরেন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্যবীক্ষা	৩'০০

কবি-পক্ষ

* ২২শে বৈশাখ (৫ই মে) থেকে ৩ই জ্যৈষ্ঠ (১১শে মে) কবি-পক্ষ। প্রগতি সাহিত্যের ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে এই পক্ষে সকল খুচরা ক্রেতাকে আমাদের প্রকাশিত বাবতীয় বই ও আমাদের এজেন্সিপ্রাপ্ত (মন্ডো, শিকিং, ফ্রান্সিয়া, সেভেন সীল সিবিজ ও দিল্লির শি-শি-এইচ কর্তৃক প্রকাশিত) বাবতীয় বই-এর দামের উপর ১২½% কমিশন দেওয়া হবে।

নতুন বের হল :

হেমাজ বিশ্বাসের

WITNESSING CHINA WITH EYES

চীন সন্ধানে নানা কুংসার জবাব প্রসঙ্গে সেখানকার সমাজ ও মানুষের পরিচয় দিয়েছেন লেখক তাঁর আড়াই বৎসরব্যাপী চীনে অবস্থিতির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।
দাম : ০'৭৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বাক্স চার্টার্ড স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ । ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

যুগীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	
৬ (গ) দেশী বং	(ঐবন্ধ)	ইন্দুবিকাশ দাস	১০৫৭
(ঘ) ছড়া	(কবিতা)	মুস্তাফা নাশাদ	১০৫৮
(ঙ) মহাকবি গোটের বাল্যকাল	(জীবনী)	জামাদান সেনগুপ্ত	১০৫৯
৪৫। মনস্বয়	(কবিতা)	শৈলেনকুমার দত্ত	১০৬০
৪৬। কীটদের কবিতা থেকে	(কবিতা)	রমেশচন্দ্র রায়	১০৬০
৪৭। বিজ্ঞানবার্তা			১০৬১
৪৮। কানপুরে হামকুক্ষ মিশন	(ঐবন্ধ)	গুণকুমার পাল	১০৬২
৪৯। কেনা-কাটা			১০৬২
৫০। একজন মহৎ শ্রমীর মহাপ্রয়াণে	(কবিতা)	তারক সেন	১০৬৭
৫১। সাহিত্য-পরিচয়			১০৬৮
৫২। লাচ-গান-বাজনা—			
(ক) পূব ও পশ্চিম		মীরা মিত্র	১০৭১
(খ) রেকর্ড পরিচয়			১০৭৩
(গ) আমার কথা	(আত্ম-পরিচিতি)	নীলিমা সেন	১০৭৪
৫৩। স্বয়ংবরা	(কবিতা)	শতভিষা	১০৭৫
৫৪। দেশ-বিদেশে			১০৭৬
৫৫। আন্তর্জাতিক পরিব্রিতি	(রাজনীতি)	ঐগোপালচন্দ্র নিয়োগী	১০৭৮
৫৬। খেলাধুলা			১০৮৪
৫৭। প্রকৃতি-পরিচিতি			১০৮৫
৫৮। পাণ্ডা হত্যার মামলা	(বহুস্তোপত্রাস)	পঞ্চানন বোহাল	১০৮৬
৫৯। প্রত্যাশা	(কবিতা)	কমলা দেবী	১০৮৮
৬০। বঙ্গপট—			
(ক) ক্রমিক পর্বায়ে ১৩৬৬ সালের বাংলা ছবি			১০৮৯
(খ) বোকাবাবুর প্রত্যাঘর্ষন			১০৯১
(গ) হাট বাড়ালেই বন্ধু			১০৯২
(ঘ) বঙ্গপট এসকে			১০৯২



দে এণ্ড দত্ত

জার্নালিস্ট এণ্ড বুকবাইন্ডার্স

১১৭/২-বঙ্গবাজার স্ট্রীট-কলিকাতা-৩২

বিশ্বস্ততা
আধুনিকতায়
ও
মজারমশিন-
নিপুণতায়।

মুদ্রাপত্র

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
৬১। একটি সনেট	(কবিতা) অম্বাণা মুখোপাধ্যায়	১০৯২
৬২। সাময়িক প্রসঙ্গ—		
(ক) কিল চুরি		১০৯৩
(খ) মৎস্যপ্রীতি		৯
(গ) ইহাও সত্য		৯
(ঘ) বন্ধ দুখে		৯
(ঙ) ঘৃণ ও প্রতিকার		১০৯৪
(চ) কৃষিভিত্তিক পরিকল্পনা		৯
(ছ) হাসপাতাল প্রসঙ্গে		৯
(জ) জাতির প্রসঙ্গে কংগ্রেস		৯
(ঝ) স্বতীয় ব্লক		১০৯৬
(ঞ) শোক-সংবাদ		১০৯৬

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের সাদুদর্শন ও সংপ্রসঙ্গ (১ম খণ্ড)

মূল্য—৫.০০

ভারতবিশ্রুত মহাপণ্ডিত ও সাধকের দৃষ্টিতে সারাজীবন ধরে ধরা পড়েছে যে সম
অলৌকিক জীবন ও তত্ত্ব, এ গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে সহজ সাবলীল ভাষায় ও ভঙ্গীতে।

সরিংশেশ্বর মজুমদারের

পার্ক মূল্য ৪.৫০

প্রতিভাধর সমাজ-সচেতন লেখকের এ উপজ্ঞান বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সংযোজন।

লিখিতবারের চিঠি : --ভাষায়, বর্ণনাকৌশলে ও ঘটনা বিব্রাসে লেখক শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন। উপজ্ঞানের গল্প
ডিটেকটিভ, উপজ্ঞানের মত চমকপ্রদ হইয়াও মানবজীবনের উলার ও মহৎ আদর্শকেই জগৎকৃত করিয়াছে। স্বপ্ন অনুভূতি ও মননশীলতার
ইহা নিছক রোমাঞ্চ কাহিনী হয় নাই; শিল্পশক্তি হইয়াছে।

শঙ্করনাথ রায়ের

ভারতের সাধক (৫ম খণ্ড) মূল্য ৬.৫০

- যোগী, তান্ত্রিক, বৈদান্তিক ও মরনীয়া সাধকদের আনানাগিক জীবনীগ্রন্থ। নিগূঢ় তথ্য ও তত্ত্ব ভরপুর।
প্রত্যেকটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ।
- বিশিষ্ট পত্রিকা ও বিদগ্ধ সনালোচকদের অতিনন্দনীয় এই মহান গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের এক অক্ষয় সম্পদ।
- পাঠাগার, ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ ও প্রিয়জনকে দেবার পক্ষে অপরিহার্য।

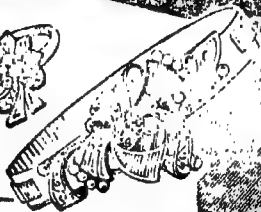
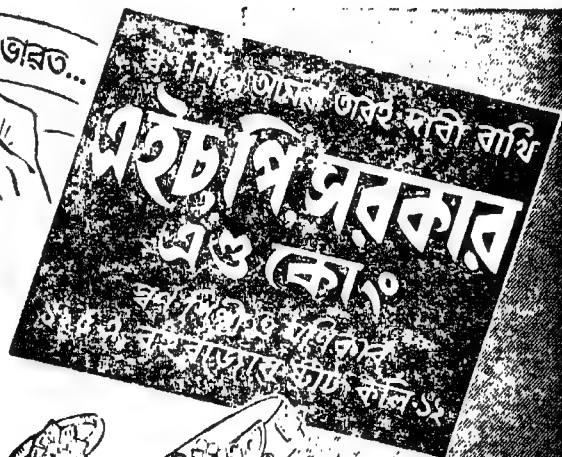
প্রাচী পাবলিকেশন্স : ২/২ সেবকবৈষ্ণব ষ্ট্রিট, কলিকাতা—২৯

ফোন : ৪৬-২৯৬৫



ଶୈଳିଆନ ମିଳ୍ଟ ଷ୍ଟୋର

କାଲଙ୍ଗ ଛୋଟେ ମାର୍କିଟେ • କଲିକାତା



୧୬୧, ବଡ଼ବାଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରୀଟ • କଲିକାତା-୧୧

ଫୋନ୍ - ଏସ୍ଟିଏମ୍ • ଫୋନ୍ ୭୫-୫୮୫୮

অগস্ট ৭ই • অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রহাভ্যাস
আমাদের বই পেয়ে ও দিলে সমান ভূমি

৭ই বৈশাখের বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের (পরাশর বর্মার কাহিনী)

পরশর ২-৭৫

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস এক ছিল কন্যা ৬-৫০

ত্রিদিব চৌধুরীর সালনা জার্নালের জেলে উনিশ মাস ১০



সম্প্রতি প্রকাশিত :

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস	মাঝির ছেলে	২-৫০
দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস	নীলে সোনায় বসতি	৩-৫০
'বনফুল'-এর নতুন উপন্যাস	ওরা সব পারে	২-৫০
প্রবোধকুমার সাহাচার নতুন উপন্যাস	ইস্পাতের ফলা	৩-৫০
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নতুন উপন্যাস	জলপ্রপাত	২-৭৫
সত্যপ্রিয় ঘোষের নতুন উপন্যাস	গান্ধর্ব	৩-৫০
শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের	লাবণ্যের এনাটমি	৩-০০
বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের	ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর	৫-৫০
হিমালীশ গোস্বামীর	লগুনের পাড়ায় পাড়ায়	৩-০০
ধনঞ্জয় বৈরাগীর নতুন নাটক	রজনীগন্ধা	২-২৫
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ব্যোমকেশের কাহিনী)	সমেমিরা	৩-০০
শান্তিদেব ঘোষের (সচিত্র গ্রন্থ)	গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য	৩-০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

১৯৫৯-৬০-এর আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

ক ল ক ত া র ক া ছে ই ৬-০০

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হইল

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভিমতের কতকাংশ :

অমৃত চৌধুরীর হাওয়া বদল ৩-০০ ॥“গ্রাম্য পরিবেশে দুটি কিশোর রুদয়ের ভাব-ভাবনা! আনন্দ-ভালবাসা, বেদনা ইত্যাদির কথা বর্তমান কাহিনীতে পরিস্ফুট হয়েছে। বাবলু আর ভুলুর কাহিনী ইতোপূর্বে ধারাবাহিকভাবে বেতারে পড়ে শোনানো হয়েছিল। হোট ভুলুর বুদ্ধা ঠাকুরমাকে নিয়েও যে আর-এক জগৎ আছে—সেই পরিবেশ রচনাটি বড় আন্তরিক হয়েছে।.....ঘরোয়া পরিবেশ রচনার কৃতিত্ব লেখকের থাকায় কাহিনীটি সুখপাঠ্য হয়েছে এবং ছোটদের ভাল লাগবে। —দেশ

‘বনফুল’-এর ওরা সব পারে ২-৫০ ৪“এই কাহিনীতে ‘বনফুল’ এমন একটা রহস্যের জাল বুনেছেন যা আগাগোড়া কৌতুহলোদ্দীপক এবং রোমাঞ্চকর। সেই আশ্চর্য ও অলৌকিক কোণল যারা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে তাদের মধ্যে মহাসিনী, অজয় ও শুভিতার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। —সুগন্ধর

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম : কালচার

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৬৪১



ঐন-এ-শুর্য়া

যাশা চাওয়া যায়
তাশা পাওয়া যায়না

কিন্তু

আপনি ইচ্ছামত একটি সর্বজন সম্পন্ন কেশভৈল
অনাগলে পাইতে পারেন। আনুর্কোচাচ্যক
কর্জক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনায়
কেশভৈল নির্বাচন-সমস্ত সমাধানে সক্ষম।
ইহার কল্যাণ পরশে বাবতীর কেশমোহ
নিরাসন ও মস্তক শীতল হয়। বীর্ষমি
মিহমিত ব্যবহারেই আশাহত
কম পায়রা যায়।

ভেদে বিনোদিত মণ্ডল মাথ শাখীর

হিমকল্যাণ

আনুর্কোচী হিমকল্যাণ সুরভিত কেশভৈল।

অন্যান্য প্রসারিনী

● পামিকোকো

সুরভিত নারিকেল তৈল

● হিমকল্যাণ

ক্যাকর ওয়েল

সুরভিত কেশভৈল

● ভূসামলা মহোপকারী কেশভৈল

● যোজনগম্বা সুরভি নির্ধ্যাস



হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা



৩৮৭ বর্ষ—চৈত্র, ১৩৬৬]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[দ্বিতীয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

হিন্দুর বৈশিষ্ট্য

হিন্দুদিগের একটি বিশেষত্ব এই যে, উহারা যে কোন তত্ত্বের আলোচনা করুক না কেন, অথচ উহার ভিত্তর ছইতে যতদূর সম্ভব একটি সাধারণ ভাবের অনুসন্ধান করে, উহার মধ্যে যাহা কিছু বিশেষ আছে তাহা পারে মীমাংসার জন্ত রাখিয়া দেয়। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে—“কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ?” (যু: উঃ, ১।৩) —এমন কি বস্তু আছে, যাহা জানিলে সমুদয় জানা যায় ? এইরূপ, আমাদের যত শাস্ত্র আছে, যত দর্শন আছে, সমুদয় কেবল যে বস্তুকে জানিলে সমুদয়ই জানা যায়, সেই বস্তুকে নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত।

ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্যাপ্তি লইয়াই কাস্ত নহেন, তাঁহারা ব্যাপ্তির দিকে ক্রিপ্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং তৎপরেই ব্যাপ্তি বা বিশেষ ভাবগুলি যে সকল সামান্য ভাবের অন্তর্গত, তাহাদের অধেষণে প্রবৃত্ত হন। সর্বভূতের মধ্যে এই সামান্য ভাবের অধেষণই ভারতীয়

দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য। যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা যায়, সেই সমষ্টিভূত, এক, নিরপেক্ষ, সর্বভূতের মধ্যগত সামান্যভাবরূপ পুরুষকে জানাই জ্ঞানীর লক্ষ্য ; যাহাকে ভালবাসিলে এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ভালবাসা জন্মে, ভক্ত সেই সর্বগত পুরুষপ্রধানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে চাহেন ; যোগী আবার সেই সকলের মূলীভূত শক্তিকে জয় করিতে চাহেন—যাহাকে জয় করিলে সমুদয় জগৎকে জয় করা যায়। ভারতবাসীর মনের গতির ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি তত্ত্বতত্ত্ব, কি দর্শন—সর্ব বিভাগেই উহা চিরকালই এই বছর মধ্যে এক সর্বগত এই অপূর্ব অনুসন্ধান ব্যস্ত।

দার্শনিক বিষয়ে জগতের কোন জাতিই হিন্দুদের পথপ্রদর্শক হইতে পারিবে না।

প্রাচীন হিন্দুরা অদ্বিত পণ্ডিত ছিলেন—যেন জীবন্ত বিশ্বকোষ। তাঁহারা বলিতেন—

“পুস্তকহা তু যা বিজ্ঞা পরহস্তগতঃ ধনঃ ।

কার্যকালে সমুৎপাদে ন সা বিজ্ঞা ন তদ্বনম্ ॥”

(চাণক্যনীতি)

অর্থাৎ বিজ্ঞা যদি পুথিগত হয়, আর ধন যদি পরের হাতে থাকে, কার্যকালে উপস্থিত হইলে সে বিজ্ঞাও বিজ্ঞা নয়, সে ধনও ধন নয় ।

আধ্যাত্মিক-সাধনসম্পন্ন ও মহাত্ম্যগী ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ... আদর্শ ব্রাহ্মণ তাহাই যাহাতে সাংসারিকতা একবারেই নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান... হিন্দুজাতির ইহাই আদর্শ । ...আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সত্যযুগে এই একমাত্র ব্রাহ্মণজাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই—প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরিয়া সত্যযুগ অভ্যুদয়ের সূচনা হইতেছে ।

আমাদের দেশেও যে ছই-একটা বলবান জাতি আছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কত বয়সে বিবাহ করে। গোরখা, পাঞ্জাবী, জাঠ, আফ্রিদি প্রভৃতি পার্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর। তারপর শাস্ত্র পড়িয়া দেখ, ৩০, ২৫, ২০—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বিবাহের বয়স ।

তোমরা সকলে জান, সন্ন্যাস-আশ্রমই হিন্দুজীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকে সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। যে না করে সে হিন্দু নহে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রের অমান্যকারী। সংসারের সুখ সমুদয় ভোগ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষভাগে সংসারত্যাগ করিতে হইবে। যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে সংসার অসার, তখন তোমাকে সংসারত্যাগ করিতে হইবে। আমরা জানি—ইহাই হিন্দুর আদর্শ ।

তোমরা এই আদর্শ কখনও বিস্মৃত হইও না যে, হিন্দুর লক্ষ্য এই সংসারের বাইরে যাওয়া—শুধু এই জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নয়, স্বর্গকেও ত্যাগ করিতে হইবে—মলকে ত্যাগ করিতে হইবে শুধু তাহা নয়, ভালকেও ত্যাগ করিতে হইবে—এই সকলের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে ।

তোমরা হিন্দু আর তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস যে, দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না। সময়ে সময়ে যুবকগণ আসিয়া আমার নিকট নাস্তিকতার কথা কহিয়া থাকে। আমি বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু কখন নাস্তিক হইতে পারে। পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া সে মনে করিতে পারে, আমি জড়বাদী হইলাম, কিন্তু সে ছই দিনের জন্ত, উহা তোমাদের মজ্জাগত নহে, তোমাদের ধাতে যাহা নাই তাহা তোমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পার না, উহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব চেষ্টা। এইরূপ করিবার চেষ্টা করিও না। আমি বাল্যাবস্থায় একবার এরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতে কৃতকার্য হই নাই—উহা যে হইবার নয় ।

হিন্দু যে কোন দেশের যে কোন সাধু-মহাত্মার পূজা করিতে পারে। আমরা কার্যতঃ দেখিতে পাই, আমরা অনেক সময় খৃষ্টানদের চার্চে ও মুসলমানদের মসজিদে গিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। ইহা ভালই বলিতে হইবে। কেন আমরা এরূপ উপাসনা না করিব? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ধর্ম সার্বভৌম। উহা এত উদার, এত প্রশস্ত যে, উহা সর্বপ্রকার আদর্শকেই সাদরে গ্রহণ করিতে পারে ।

জগতে যত জাতি আছে, তন্মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা অধিক পরধর্মসহিষ্ণু। হিন্দু গভীর ধর্মভাবাপন্ন বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী তাহার উপর সে অত্যাচার করিবে। কিন্তু দেখুন, জৈনেরা ত ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রাম্যক বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন হিন্দুই জৈনের উপর অত্যাচার করে নাই। ভারতে মুসলমানেরাই প্রথমে পরধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল ।

এখানে, কেবল এখানেই লোকে তাহাদের ধর্মের ঘোরতর বিবেচনাসম্পন্ন অপর ধর্মাবলম্বীর জন্তও মন্দির গির্জাদি নির্মাণ করিয়া দেয়। জগৎকে আমাদের নিকট এই পরধর্মে ছেৎরাহিত্যরূপ মহাশিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে ।

হিন্দুসন্তান কখন মাকে টাকা ধার দেয় না, মার সন্তানের উপর সর্ববিধ অধিকার আছে, সন্তানেরও মার উপর তাই ।

আমাদের জাতির পক্ষে এখন আবশ্যক কম তৎপরতা ও বৈজ্ঞানিক (তত্ত্বাবিকারোপযোগী) প্রতিভা ।

—বাসী বিবেকানন্দের বারী হইকে ।

লেলিন ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী

ম্যাক্সিম গোর্কি

১৯১৮ সালে যখন লেলিনকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়, তার আগে পূর্বত লেলিনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয়নি; এমন কি, দূর থেকেও আমি তাঁকে দেখিনি। আহত অবস্থায় তাঁকে যখন আমি দেখতে পেলাম, তখন তিনি হাতখানা বিশেষ মাড়াচাড়া করতে পারছেন না, ঘাড়টাও কেরাতে পারছেন না। গুলীটা তাঁর ঘাড়ের লেগেছিল। এই ঘটনাটা সত্যকে আমি ক্রোধ আর ঘৃণা প্রকাশ করলাম। লেলিন, কিন্তু এমনভাবে ব্যাপারটাকে চুকিয়ে দিলেন যেন এর সম্পর্কে বহুবার নিজের মত দেওয়ার পরে স্নান বোধ করছেন। তিনি শুধু বললেন, "এটা তো লড়াই। কিছু করার নেই। সকলেই তার নিজের উপলব্ধি অনুসারে লড়াই করে থাকে।"

যুব সৌহৃদ-সমিহাঙ্কর মনোভাব নিয়েই আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, আলোচনা-আলোচনা করলাম। কিন্তু আমার দিকে যখন তিনি তাকাছিলেন, তখন ইলিচের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টির মধ্যে স্পষ্টতই একটা করুণার ভাব অনুভব করছিলাম। আমি যে বিপথ-চালিত হয়েছিলাম, সেইজন্মেই যেন এই করুণা।

কয়েক মিনিট বাদে তিনি বেশ একটু আবেগের সঙ্গেই বললেন, "যদি আমাদের পক্ষে নয় তবুও আমাদের বিরুদ্ধে। জীবনকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটছে, সেই সব ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে উদাসীন বা নিরপেক্ষ লোকও আছে—এটা নেহাৎই অলোক কল্পনা মাত্র। যদি বা স্বীকার করি যে, একদা এই ধরণের লোকের অস্তিত্ব ছিল হয়তো, তাহলেও এ ধরণের লোকের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই, থাকতেও পারে না। এরা কান্নার পক্ষেই কোন কাজের নয়। এদের শেষ লোকটিকে পর্যন্ত বাস্তবতার দুর্গাবর্তে জড়িয়ে পড়তে হবে—যে-বাস্তবতা দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। আপনার কি মনে হচ্ছে যে, আমি জীবনকে বড়ো বেশি সরল করে দিচ্ছি? এই সরলীকরণের ফলে সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে বাবার আশংকা দেখা দিচ্ছে? অ্যাঁ?" "আর প্রশ্ন করার পরেই তাঁর সেই একটু ব্যঙ্গের স্তর মেশানো নিজস্ব ভঙ্গিতে হাঁ, হাঁ...বলা।

বলতে বলতে তাঁর দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। আরেকটু নিচু গলায় তিনি বলে চললেন, "...রাশিয়ার সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের সামনে আমাদের সহজ কিছু-একটা ভুলে ধরতে হবে, এমন একটা কিছু রাখতে হবে যেটাকে তারা ধরতে চুঁতে পারবে। সাম্যবাদ আর আমাদের এই সোভিয়েতগুলো * সহজ ব্যাপার। প্রমিষ্টদের আর বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত একটা ইউনিয়নের কথা বলছেন? বেশ

তো, সে তো ভালোই। বুদ্ধিজীবীদের সে কথা বলুন। তারা আশ্রয় আমাদের কাছে। আপনার মতে, তারা বর্খাস তাদের পক্ষে। তাহলে আর এতো ভাবনা কিসের? অবশ্যই তাদের আমাদের কাছে আসতে বলুন। আমরাই হচ্ছে সেই সব লোক যারা জনসাধারণকে তাদের নিজেদের পক্ষে ঠাঁড় করিয়ে দেবার মতো বিরাট কাজের ভার নিয়েছি, জীবন সম্পর্কে বিশ্বের সামনে সত্য কথাটি ঘোষণা করার দায়িত্ব নিয়েছি—আমরাই জনসাধারণের সামনে মানবজীবনের সোজা পথটি নির্দেশ করছি—যে-পথ দামদ ভিক্ষাবৃত্তি অপমান থেকে মুক্তির লক্ষ্যে নিয়ে যায়।" তারপরে হেসে বললেন, "সেই জন্মেই আমি বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে একটি বুলেট পেয়েছি।" তাঁর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়াজ কোভ বা বিয়ক্তি ছিল না।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে যেটুকু উত্তাপ ছিল, সেটা যখন মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এল, তখন জুলামির ইলিচ একটু বিয়ক্তি বিয়ক্তির সুরে বললেন, "বুদ্ধিজীবীদের যে আমাদের লক্ষ্য—এ সম্পর্কে আমার কোন ঝগড়া আছে বলে কি আপসি মনে করেন?"



লেলিন

* সোভিয়েত—অর্থাৎ সত্য; জনসাধারণের মধ্যে থেকে তাদের নিজেদের নির্গঠিত প্রতিদ্বন্দ্বিত্বের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আর্থনৈতিক-সহজ।

কিন্তু দেখুন, ওদের মনোভাবটাই কি বহুশ শত্রুতাপূর্ণ, ঠিক কোন মুহুর্তে যে কোনটা প্রয়োজন সেটা তারা কতো কম বোঝে। এবং ওরা এটাও দেখতে পায় না যে, আমাদের ছাড়া ওরা কতোটা শক্তহীন, জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে ওরা কতো অপারগ। আমরা যদি একটু বেশি মাত্রায় কালা পাহাড় হয়ে পড়ি, তাহলে দেখতে ওরাই পোব।”

লেনিনের সঙ্গে আমার বহনই দেখা হত, প্রায় প্রত্যেকবারই আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতাম। তাঁর মূখ্যের কথা শুনে অবশ্য মনে হত যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তাঁর মনোভাবটা মোটের ওপর অবিশ্বাসে ভরা, আর শত্রুতাপূর্ণ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভুলসিমির ইলিচ বিপ্লবের কালে বুদ্ধিজীবীদের মানসিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা আর গুরুত্বের সঠিক মূল্যায়নই করতেন। এ বিষয়ে তিনি একমত হতেন যে, সামাজিক বিকাশের স্বাভাবিক গতি বহন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন বুদ্ধিজীবীদের প্রাঙ্গসর ডেউনা আর মানসিক শক্তির আকস্মিক আত্মবিকশণই হল বিপ্লবের মূল কথা।

একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। ভুলসিমির ইলিচের সঙ্গে বিজ্ঞান-পরিবহনের তিন সন্তানের কথাবার্তা হচ্ছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। কথা হচ্ছিল শিটাস বার্গের উন্নততম একটি বিজ্ঞান-সম্বন্ধকে নতুন করে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। এঁরা তিনজন চলে বাবার পর লেনিন সন্তোষের সঙ্গে বললেন—“এই তো বেশ হল। এঁরা বুদ্ধিমান লোক। এঁদের কাছে সবই সহজ, সবই একটা নিম্নমের ছকে বাঁধা। এঁদের সঙ্গে কথা বলে আপনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারবেন এঁরা কি চান। এঁদের সঙ্গে কাজে নেমে সুখ আছে। বিশেষভাবে আমার ভালো লাগল—কে।” লেনিন রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজনের নাম করলেন। এমন কি একদিন পরে আমাকে টেলিফোনে বললেন, “স—কে জিজ্ঞেস করবেন তো তিনি আমাদের সঙ্গে বোগ গিয়ে কাজে নাহতে রাজি আছেন কিনা।” স—বখন এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, তখন তিনি আন্তরিক খুশি হলেন। হাতে হাতে যবে হাসিমুখে কৌতুক করে বললেন, “একে একে আমরা সমস্ত রাশিয়ান আর ইওরোপীয় আকিমিডিসদের আমাদের পক্ষে টেনে আনব। তারপরে পৃথিবী ঢাক আর না ঢাক, তাকে বললে যেতেই হবে।”

বিপ্লবের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আর বিপ্লবী জীবনের মধ্যে বেসব নির্মমতা, নির্ভৃততা আছে, আমি লেনিনকে প্রায়ই সে সম্পর্কে বলতাম। বিশ্ববিখ্যাত ক্রোভের সঙ্গে তিনি আমাকে পাশ্চাৎ জিজ্ঞেস করতেন, “কি চান আপনারা? এমন ভরসার আর অভূতপূর্ব রকমের হিংস্র এক সঙ্গ্রামে কি হয়ারারা বজায় রাখা সম্ভব? কোমল হৃদয়ে উপরততা বোধানোর মতো অবকাশ কোথায় আছে কি? গোটা ইউরোপ আমাদের বিরুদ্ধে অবরোধ স্থাপি করেছে, ইওরোপীয় অমিক শ্রেণীর সাহায্য বাতে আমরা না পাই তার জন্মে সব রকমের বাধা স্থাপি করা হয়েছে, উন্নত জ্ঞানের মতো প্রতিবিপ্লব আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্মে এগিয়ে আসছে চারিদিক থেকে। একেবারে আমরা কি করতে পারি? আমরা বা করছি তা কি ভাবসগত নয়? আমাদের কি সঙ্গ্রাম চালিয়ে শত্রুকে প্রতিহত

করাই সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য নয়? না, মাপ করবেন, আমরা একমল নির্বোধ লোক নই। আমরা জানি, আমরা বা চাই তা শুধু আমাদের নিজস্বের চেষ্টাতেই পেতে পারি। এ সম্বন্ধে যদি সম্বেদীভূত প্রচার আমরা না থাকত তাহলে আমি কী এই জায়গায় বসতাম বলে মনে করেন?

একবার খুব উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কের মুখে ইলিচ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—লড়াইয়ের সময়ে কোন ব্যক্তি মারা উচিত আর কোনটা বাড়াতি হয়ে পড়ল—সেটা বিচার করবেন আপনি কোন মানদণ্ডে? এই সহজ প্রশ্নটার জবাবে আমাকে শুধু কবির করতে হল। তাছাড়া আর কিছু জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

খুব বন বন আমি লেনিনের কাছে গিয়ে হাজির হতাম নানা ধরণের অনুরোধ জানাবার জন্মে। এবং এও অল্পভব করতাম যে, বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে আমি যে এতো মাথা ঘামাচ্ছি, এর জন্মে লেনিন বেন আমাকে বেশ একটু করুণার চোখেই দেখতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, “মতো সব বাজে লোকের জন্মে আপনি অবস্থা শক্তিকর করেছেন বলে আপনার মনে হয় না?” কিন্তু আমি বা করা উচিত বলে মনে করতাম তাই করে যেতাম। অমিক শ্রেণীর শত্রু কারা সেটা বিনি খুব ভালো জানতেন, তিনি বখন ক্রোভের সঙ্গে আমার দিকে আড়চোখে তাকাতেন তখন আমি নমে যেতাম না। একটা খুব প্রবল ভক্তি করে মাথা নেড়ে তিনি বলতেন, আমাদের কষেভসের চোখে, অমিকদের চোখে, আপনি কিছু নিজেকে অসম্মানিত করছেন। আমিও বলতাম যে, অমিকরা, কষেভরা, বখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তারা এমন সব লোকের জীবনকে তার স্বাধীনতাকে বঙ্গসাম্রাজ্যই মূল্য দিয়ে থাকে, তাদের জীবন মনোরা আর কর্মের স্বাধীনতা সমাজের পক্ষে মূল্যবান। এবং, আমার মতো, এই ধরণের অতিরিক্ত রকমের—এমন কি মাঝে মাঝে কাণ্ডজ্ঞানহীন—নিষ্ঠুরতার ফলে বিপ্লব যে তার স্বকটিন আর উচ্চ আদর্শটি থেকেই মাঝে মাঝে বিচ্যুত হয়, শুধু তাই নয়; এবং জন্মে বহু সং আর সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় লোক বিপ্লবে বোগদান করতে শিষ্ট-পা হন।

একথা শুনে ভুলসিমির ইলিচ সশব্দের সঙ্গে “হ” “হ” বলে মাথা নাড়তেন আর এমন সব উদাহরণ উল্লেখ করতেন যেখানে বুদ্ধিজীবীরা অমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। একবার বলেছিলেন—“বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে গিয়ে বোগ ঘের ভুল ভুলতা আর কাপুরুষতা থেকেই নয়; নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার বশেও তারা এরকম করে থাকে। পাছে তারা একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে, পাছে বাস্তবের মুখোমুখি তাদের প্রিয় থিওরিসি জাঙ্ক বলে প্রমাণিত হয়, সেই ভয়েও তারা অমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু এ জন্মে আমরা ভয় পাই না। আমাদের কাছে কোন থিওরি বা প্রকল্প একেবারে পুত পবিত্র অলঙ্কারী ধর্মব্রতের মতো নয়। থিওরিকে আমরা কাজে লাগাই হাতিয়ার হিসেবে।”

কিন্তু ইলিচ কোনদিন আমার কোন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। সব সময়ে যে এই সব

অল্পবয়সেই হস্তি তার কারণ তাঁর নিক থেকে প্রত্যাখ্যান নয়, সেটা হয়েছে এমন কোন একটা ব্যবহার দোষে—যেদূর দোষ তখনকার সভ্যগণিত প্রমিত-রাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। কিংবা হয়তো এ ক্ষেত্রে হতে পারে যে কোথাও কেউ একজন বিবেকের মনোভাব থেকে একটি মুদ্রাবান্ধু জীবন বাঁচানোর ব্যাপারে কিংবা কাকুর অভ্যাস শাস্তির বোঝা হালকা করার ব্যাপারে অনিচ্ছা দেখিয়েছে। ইচ্ছাকৃত কতি করার দু-চারটি উদাহরণও যে না ছিল তা নয়। শত্রুপক্ষও তো যেমন দৃষ্ট তেমনি নির্মম। প্রতিশোধমূলক আর বিবেকের মনোভাবটাও তেমনি প্রায়ই নিষ্ক্রিয়তার শক্তির মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত কার্যকরী হয়ে থাকে। আর, এরকম ক্ষুদ্রমাত্রা লোক তো আছেই যাদের অসুস্থ মনে প্রতিবেশীর স্বত্বাধিকারনা দেখে অস্বস্তিগ্রস্ত করার এক বিকৃত কামনা গোপন রয়েছে।

লেনিন কিন্তু যাদের তাঁর শত্রুপক্ষের লোক বলে মনে করতেন, তাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। এটা লক্ষ্য করে আমি বহুরার বিমিত হয়েছি। তিনি শুধু যে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করতেন, তা নয়; তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল।

উদাহরণ হিসেবে, সমর-বিভাগের একজন জেনারেলের কথা বলতে পারি। তিনি ছিলেন সেই সঙ্গে একজন প্রতিভাবান রসায়ন-বিজ্ঞানী। তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আমার বিবরণ খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার পর লেনিন বলেন, “হঁ। হঁ। তাহলে আপনি মনে করছেন যে ওর অজ্ঞাতই ওর ছেলেরা জীবনোত্তরিতে বণ্ডল পিড়ল লুকিয়ে রেখেছিল? বেশ একটু রোমাঞ্চিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। তা, আমাদের কিন্তু দ্রুত উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে ব্যাপাচাটা ছেড়ে দিতে হবে গুজেরিকিন্‌স্কি-র হাতে।” সত্য ঘটনাটা আবিষ্কার করার সিকে তাঁর একটা তীক্ষ্ণ স্বভাব-অনুভূতি আছে। দিনকতক বাদেই তিনি আমাকে পোজোগ্রাদে টেলিকোনে ডাকলেন। বললেন, “আপনার এই জেনারেল মশাইকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি—বোধহয় এর মধ্যেই তিনি

ছাড়া পেরে গেছেন। এখন তিনি কি করতে চান?—তাঁর যদি কিছু দরকার পড়ে তো আমাকে বললেন।”

একটা মাসের জীবন বাঁচাতে পেরে ডলারিমির ইলিচ যে আনন্দ বোধ করতেন, সেটা তাঁর গল্পের স্বরে আমি খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করলাম। কিন্তু সেই মনোভাবটা তিনি গোপন করতে চান বলে হালকা বিক্রপের চটে কথা বললেন। আরও দিন কতক বাদে তিনি আমার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আচ্ছা, আপনার সেই জেনারেলের খবর কি? সব ঠিক হয়ে গেছে তো?”

বিপ্লবের সময়ের জানা আবেগকে চাপা দিতে হয়। কদের ভেতরে নানা আবেগের তরলকে কি ভাবে চাপা দিতে হয় সেটা লেনিন খুব ভালো ভাবেই জানতেন। তাছাড়া, নিজের নিকে তাঁর যেমন বিশেষ মনোযোগ ছিল না, তেমনি নিজের কথাও তিনি অন্তর্কে খুব কমই বলতেন।

কিন্তু একবার তাঁকে দেখেছিলাম—নিঃসন্দেহভাবে সারোব সহরে * একজন শিশুর মধ্যে। এই শিশুরে আরও করতে করতে তিনি বললেন, “আমাদের চেয়ে ঘের বেঁটা দুই হবে এদের জীবন। আমাদের যে নিদারুণ দুঃখ-বজ্রপাত মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, এদের আর সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে না। এদের জীবনকে এই নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা থাকবে না।” তারপরে ঘুরে পালিয়ে গেলেও যেখানে আমাদের করেটা হুঁড়ে ঘর বোম্বুরে উজ্জল হয়ে উঠেছে সেই দিকে তাকিয়ে ডলারিমির ইলিচ বললেন, “তাঁর কথা আমি হিসেব করিনি। আমার বা কহেছি বা ইতিহাসের নিক দিয়ে বিষয়কর রকমের তৎপর্যপূর্ণ। আমাদের জীবনের ভাগিদেই এই নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন ছিল। এ নিষ্ঠুরতা যে অবশ্যকারী ছিল, তা ভবিষ্যতে লোকে বুঝবে, একে তারা কমা করবে। এ সবই তারা উপলব্ধি করবে—সব কিছু।”

গভীর মেঘের সঙ্গে মিলে এই শিশুরে গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন এই কথাগুলি।

(—ম্যাক্সিম গোর্কির “লেনিনের দৃষ্টিকথা” থেকে।)

তৎকালীন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা।

* বর্তমান নাম “গোর্কি।”

অর্দেক আকাশ জুড়ে

শান্তিকুমার বসু

অর্দেক আকাশ জুড়ে মহানগরীর আভা

প্রস্তুত উজ্জল ময়:

হবে কি সময় আর এক পাত্র ঘর

বলে আলোতে খাওয়ার।

এখনি অপোরা শুরু:

মলকুমি হয়ে বাবে নক্ষত্র-সঙ্গার।

সোনালি আলোর বুকে মলসীর

এর কণ্ঠে অব্যাহ সঙ্গীত।

শব্দের অবিক বেগ—বৃত্তের ভিতরে বাজা:

সংল জোরশ হাতে

যে টার বাজবী কীণ দ্রাব্য স্পন্দন।

ক্রমিক নিটোল শ্রুতি

লব্ধ কায়নার তার—অনির্বেরে বিমলতা

মাথায় খুলিতে আঁটা অস্বকার হেরেইস সমুদ্র জাগ

জ্ঞানাবেশ

(চালস ডিকেন্সের মি: পিকউইক ট্রাভেলস)

(বিভাট্টা এবং জ্ঞানাবেশে ব্যাপ্ত থাকার উদ্দেশ্যে লণ্ডনের পিকউইক সমিতির স্থাপনা। মিটার পিকউইক এবং তাঁর বন্ধু মিটার বুদ্ধব্রাস, মিটার টুপম্যান এবং মিটার উইকল এরা চারজন পিকউইক সমিতির সভ্য। জ্ঞানাবেশে এরা দক্ষিণ ইংলণ্ডে গিয়ে প্রথম কোয়ার্টে ঘেরিয়ে ছিলেন।)

অতিশয় দাতাশ পৃষ্ঠাকের তেরই মেরে সকালে সবে মাত্র ওঠা পূর্বা আলােকপাত শুরু করেছে, এমন সময় মিটার ত্রাম্বেল পিকউইক বিতীর পূর্বের দাড়া নিম্নাঙ্কে গাড়োখান কোরে তাঁর পুরসককের জামালা খুলে নীচের পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত কোরলেন। নীচে গসওয়েল স্ট্রীট, ডাইনে বায়ে বতরু দৃষ্টি চলে গুপ গসওয়েল স্ট্রীট তিনি দেখতে পেলেন, আর গসওয়েল স্ট্রীটের বিপরীত দিকটা তিনি দেখতে পেলেন রাস্তার অপর পায়ে।

"বে সকল দার্শনিকেরা তাঁদের সমুখ বা দেখতে পান, তাই সেবেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বড় সংকীর্ণ। তাঁরা অপর দিকে লক্ষ্যবিত সন্তোষ ভব্যার্হসন্ধান ব্যাপ্ত হাতে পারেন না।" মিটার পিকউইক ভাবতে লাগলেন। "আমিও যেমন গসওয়েল স্ট্রীটের চতুর্দশর্বে বে সকল স্থান আছে তাদের অল্পস্থানে বহির্গত না হোঁরে চিরকাল ধরে গসওয়েল স্ট্রীট দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে পায়তাই।" এবং এই কথা মনে উদয় হওয়া মাত্রই মিটার পিকউইক নিজেকে এক প্রথ পোষাকের মধ্যে এবং অপর পোষাকগুলিকে বাস্তব মধ্যে বন্দী কোরতে শুরু কোরলেন।

মহাপুরুষদের সাজসজ্জার ব্যাপারে বিশেষ বস্তু নিতে বড় একটা লেখা বার না। সেই অজই মিটার পিকউইকের কোর কর্ম সমাধা, পোষাক পরিধান এবং কচি পান খুব স্নিহই লম্পার হোল আর এক ঘটায় হযোই মিটার পিকউইক হাতে পোর্টম্যান্টো, গ্রেটকোটের পকেটে টেলিফোন আর উল্লম্বযোগ্য বা কিছু দেখবেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য ওয়েষ্ট কোর্টের পকেটে নোট বই নিয়ে সেন্ট মার্টিন-লে গ্র্যান্ডের টিকা গাড়ী আড়ার উপস্থিত হোলেন।

গাড়ী চাই—মিটার পিকউইক নির্ভিকার ভাবে গাড়ী ভলব কোরলেন।

এই যে তাঁর গাড়ী এসেছে,—উত্তর এক দমিব জাতিস এক অভিন্ন সংস্কারের কাছ থেকে। লোকটির পরিধানে ধনের কাপড় দিয়ে তৈরী কোট এবং এগ্রন। তার গলার খোলান সমাধালেখা একটা শিতলের চাক্তি দেখে মনে হয় বেন কোন দুস্তাশ্য জিনিসের সংগ্রহশালার তাকে চিহ্নিত কোঁরে রাখা হোয়েছে। লোকটি পানীয় জল সরবরাহ কারক। এইটাই প্রথম গাড়ী তাঁর। প্রথম গাড়ীর দালিক নিকটবর্তী সরাইখানায় বোসে তার পাইপে প্রথম অগ্নি সংযোগ কোরেছিল। মিটার পিকউইকের প্রয়োজনে গাড়ী জানীত হোলো তাঁকে এক তাঁর পোর্টম্যান্টোটাকে গাড়ীর মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হোল।

"গোস্টেন ক্রল চল"—মিটার পিকউইক আদেশ দিলেন।

গাড়ী চলতে শুরু কোরলে চালক তার বন্ধু জলসরবরাহকারীকে উদ্দেশ্য কোরে বিরক্তিতরে বোলল—"ছোট হেলের ভাড়া টমি"—(অর্থ—মাত্র একশিলিং পাওয়া বাবে এতে।)

মিটার পিকউইক ভাড়ার জন্য জামালা কোরে রাখা শিলিংটি দিয়ে তাঁর নাক চুলকাতে চুলকাতে চালককে জিজ্ঞাসা কোরলেন—"তোমার বোড়ার বয়স কত বন্ধু?"

"বিরামিধ",—পাশে উপবিষ্ট মিটার পিকউইকের প্রতি একনজর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উত্তর দিল চালক।

"কি বোলছ।"—বিস্ময়চক উক্তি কোরলেন মিটার পিকউইক, তাঁর নোট বইটির ওপর হাত রেখে। চালক তার কথার পুনরাবৃত্তি করে। মিটার পিকউইক কঠোর দৃষ্টিতে লোকটির মুখের দিকে তাকান, কিন্তু তাঁর মুখাবয়বে কোন বৈলক্ষ্য লেখা যায় না। অন্তরাত্ম তিনি কালক্ষেপ না কোরে কথাটি তাঁর নোট বই-এ লিপিবদ্ধ করেন। তারপর আরও নতুন তথ্যাদ্ধসন্ধান প্রবৃত্ত হোয়ে মিটার পিকউইক তাকে জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা তুমি কতক্ষণ একে একটানা গাড়ীতে জুতে রাখ?"

"হু'তিন সপ্তাহ ধরে"—উত্তর দেয় লোকটি।

"সপ্তাহ"—অবাক হোয়ে জিজ্ঞাসা করেন মিটার পিকউইক। তাঁর নোট বইটা আবার খুলে বার।

"পেন্টনউইলে ওর আশ্রয়ল। কিন্তু ও দুর্বল বোলো আমার ওকে আড়াবে খুব কমই নিয়ে বাই"—নিরুতাপ কণ্ঠে অবাক দেয় চালক।

মিটার পিকউইক বুঝতে না পেরে ওর কথারই পুনরাবৃত্তি করেন—"দুর্বল বোলো।"

ওকে গাড়ী থেকে বার কোরে নিলেই ও গড়ে বার, কিন্তু বখন গাড়ীতে জোতা থাকে তখন আমার ওকে খুব টেনে ধরে রাখি, ভাঙে ওর আর গড়ে বাবার ভয় থাকে না। তাছাড়া গাড়ীতে একজোড়া বেশ বড় মূল্যবান চাক। লাগান আছে, সেইজন্য ও বখনই টোলতে থাকে চাকাতলো ও গর শিঙনে গড়াতে শুরু করে, কলে ওরও না। দুটে গতান্তর থাকে না।

মিটার পিকউইক প্রতিটি কথাই তাঁর নোটবুকে লিখে নিচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য—কটকর অবস্থার সঙ্গে বোঝা নিজেকে কিতাবে খাপ খাইয়ে দেয়, তার একটা বিশেষ উদাহরণ হিসাবে এ ঘটনার কথা তাঁর সমিতির সভ্যদের কাছে পেশ করা। লেখা প্রায় শেষ হোয়েছে, এমন সময় তাঁর পোর্টম্যান্টো এসে উপস্থিত হোলেন। চালক গাড়ী থেকে নামার পর মিটার

পিকউইক অবরোধে কোরলেন। সেখানে মিষ্টার টুপম্যান, মিষ্টার ব্রডগ্রাস এবং মিষ্টার উইঙ্কল অধীর আগ্রহে তাঁদের খাতনামা দেখতে সন্ধান জানাবার জন্য তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন।

(মিষ্টার পিকউইক এবং তাঁর সঙ্গীরা অতঃপর শকটারোহণে রচেষ্টার সহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং সেখানে পৌঁছে 'বুল' সহাই অবস্থান করেন।)

রণাঙ্গনে

পরদিন প্রাতে রচেষ্টার এবং তার নিকটবর্তী সহরগুলির অধিবাসীরা যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে শয্যাভাগ করল। সেদিন ঐ স্থানে এক চমকপ্রদ দৃশ্য অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। স্তেন-চমু প্রধান সেনাপতি এবং ডজন সেনাবাহিনীর যুদ্ধাভিনয় পরিদর্শন করবেন। সেইজন্য অস্থায়ী দুর্গ নির্মিত হয়েছিল, যেগুলি সেনাবাহিনী অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে আক্রমণ এবং অধিকার করবে। একটা মাইন ফাটার ব্যবস্থাও ছিল সেখানে।

মিষ্টার পিকউইক সেনাবাহিনীর একজন উৎসাহী প্রশংসক। তাঁর কাছে এর থেকে আনন্দদায়ক বিষয় আর কিছু নেই এবং তাঁর প্রতিটি সঙ্গীরই 'অদ্ভুত মানসিক অবস্থার এ দৃশ্য অপেক্ষা ভালো লাগার বিষয়ও আর কিছু হতে পারে না। স্তুরগাং তাঁরা বখাশীর প্রভু হোয়ে যুদ্ধক্ষেত্র দিকে পদক্ষেপে যাত্রা করলেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অংশ থেকে দলে দলে লোক সেখানে সমবেত হোতে আরম্ভ করেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এবং আয়োজন দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, যথেষ্ট জাঁকজমক সহকারেই যুদ্ধের অভিনয় হবে। দর্শকেরা যাতে ব্যাঙ্গদানে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য শাস্ত্রী মোতামেন করা হয়েছে। জন্মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান পাঠানো হচ্ছে কুড়োয়া। সার্কেটরা বগলে রাখান বই নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরেটা ঘুরেটা করছে। সাময়িক পোষাক পরিহিত কর্ণেল বুলডার অল্পশব্দে আত্মরোধ করে একস্থান থেকে আর একস্থানে ভীড়ের মধ্য দিয়েই তাঁর অধ্যয়ন করছেন এবং মাঝে মাঝে ফিরা কায়দেই এমন কর্কশ শব্দে চিৎকার করে উঠছেন যে, উপস্থিত দর্শকেরাও ভাবতে ভয় পেরে চমকে উঠছেন। অকিসাররাও এদিক ওদিক পৌঁড়ানোড়ি করে কখনও কর্ণেল বুলডারের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, কখনও সার্কেটদের আদেশ দিচ্ছেন আবার কখনও অন্তরালে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের পোষাক পরিচ্ছন্ন এবং অলঙ্কারে বেশ সেনাবাহিনীর লোকের চোখেও এমন একটা বিষয়ের দৃষ্টি ফুটে উঠছে যা থেকে এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

মিষ্টার পিকউইক তাঁর তিন সঙ্গীসহ ভীড়ের সমুখ সারিতেই অবস্থান করে অনুষ্ঠান দ্রুতর জন্য বৈধব্যসহকারে প্রতীক্ষা করছেন। ভীড় ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং যাতে তাঁরা স্থানচ্যুত না হন তার জন্য পরবর্তী হুঁশধা ধরে তাঁদের যথেষ্ট পরিলক্ষ্য করতে হয়েছিল। অনেকখানি বনই এর জন্য ফলে রাখতে হয়েছিল তাঁদের। এক সময় মিষ্টার পিকউইক পিছনের ভীড়ের দাক্ষার সাহায্য করে গল্প দু'বে হটকে পড়লেন। যে গতিতে তিনি

পড়লেন তা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও গাভীকীর সঙ্গে বিশেষ মাত্রার অন্তর্ভুক্তি হতে। আর এক সময় তিনি পিছনে সরে হাবার জন্য অগ্রসর হোলেন এবং অগ্রসর হোতে তিনি বখাখতাতে পালন করেন তার জন্য পায়ে এবং বুক বন্ধের কুঁদোর স্পর্শভুক্তিও লাভ হোয়েছিল তিনি। অতঃপর কয়েকজন জরুলোক তাঁদের এমন ভাবে পাশে দিকে ঠেলেতে আরম্ভ করলেন যে, মিষ্টার ব্রডগ্রাস কোথায় তাঁদের ঠেলে নিয়ে বাওয়া হচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হোলেন। মিষ্টার উইঙ্কল 'বুকের অভিনয়' দেখাটা যুগ্য কাজ বিবেচনা করে তাঁর মত প্রকাশ করার কয়েকজন দর্শক দ্রুত চোদে তাঁর টুপিটা চোখের উপর নামিয়ে দিলেন এবং তাঁর মাথাটা পকেটস্থ করার দাবী জানালেন। এই সব বাস্তব কারণ এবং এছাড়াও মিষ্টার টুপম্যানের অল্পপন্থিত (তিনি চঠং অদ্ভুত হয়েছেন।) অবস্থাকে 'অত্যন্ত অস্বস্তিকর' করে তুলল। অন্ততঃ আনন্দদায়ক বা উপভোগ্য করেনি।

অবশেষে ভীড়ের মধ্যে বহুকণ্ঠের গুঞ্জন উঠলে বোঝা গেল যে তাঁদের প্রতীক্ষা সার্থক হতে চলেছে। সকল চকুই নিবন্ধ হোল চূর্ণের নিজস্বমণ্ডারের দিকে। কয়েক মুহূর্ত সাগ্রহ প্রতীক্ষার পর হাওয়ার পতপত, 'কারে ওড়া হটন পতাকা এবং সুর্য্যকিরণ উজ্জল অন্তরীক্ষা অগ্ন্যগামী সেনাদল স্পষ্ট হোয়ে উঠল। দলে দলে যোদ্ধার সমবেত হোল প্রাঙ্গণে। সেনাবাহিনীর কুচকণ্ঠের শব্দ হোল। প্রধান সেনাপতি, কর্ণেল বুলডার এবং আর কয়েকজন অধিদায় সমভিব্যাহারে সারিবদ্ধ কৌজের সমবেত এসে পৌঁড়ালেন। রণরামায়া বাজতে লাগল। ঘোটকগুলি পিছনের হুঁপাতে ভয় নিয়ে পিড়িয়ে ছেঁড়ার কোরল এবং কখনও সমুখে এসিয়ে এনে কখনও পিড়িয়ে গিয়ে লেজ আকোলিত কোরতে শুরু কোরল। কুড়োর বেউবেউ, ভীড়ের মধ্য থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকার এবং সৈন্যদলের পরস্পর জারগাটকে বেশ কোলাহলদ্রুতর করে তুলল। হতভূত দৃষ্টি চলে—তু লাক কোর্ডা আর সামা পাখজামার সমবেত বোঝা বাজিল।

মিষ্টার পিকউইক নিজেকে পড়নের হাত থেকে এবং ঘেড়ার পারের আঘাত থেকে বাচাবার জন্য এমন ভাবে ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি পূর্ববর্তিত দৃশ্য হাড়া অন্য কিছু দেখার অবসর পাননি এবং তিনি দৃঢ়ভাবে নিজের পারের ওপর পিঁড়িতে সমর্থ হোলেন তখন তাঁর আনন্দ আর উৎসাহের অবশিষ্ট রইল না।

মিষ্টার উইঙ্কলকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—“এর থেকে দ্রুতর আনন্দদায়ক আর কি হোতে পারে?”

মিষ্টার উইঙ্কল প্রায় পনের মিনিট হাবং একটি বর্ণাঙ্কিত ব্যক্তির তার নিজের পারের উপর সহ কোরে পিঁড়িয়ে ছিলেন। মিষ্টার পিকউইকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বোললেন—“কিছু না।”

এমন স্বন্দর দৃশ্য দেখে মিষ্টার ব্রডগ্রাসের হৃদয়ে কবিরের উদয় হোয়ে শুধু প্রকাশের পথ খুঁজছিল। তিনি বোললেন—“বি অপরূপ মহান দৃশ্য! শাস্তিকামী নাগরিকদের সমুখে পিঁড়িয়ে বীরাবাহিনী ওদের মুখে যুদ্ধকালীন মৃগসতা নেই, চোখে প্রাঞ্জিলা পরায়ণতার দৃষ্টি নেই—কেমন শান্ত শব্দে যুদ্ধভাব আর মুখি দীপ্ত চোখে মানবতার আবেদন।”

মিটার গড়গ্রাসের কবির ভাল লাগল মিটার শিকউইকের
কিছু তাঁর কথার প্রতিধ্বনি তিনি কোঁরতে পারলেন না।
কারণ, বোম্বারের চোখের দৃষ্টি তাঁর কাছে বৃদ্ধি-বীণ বোলে মনে
হোঁল না। উপরন্তু “সমুখে দৃষ্টি” আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই
সকল বোম্বারই ভাবসেশহীন চেঁখের দৃষ্টি সমুখে নিবদ্ধ হোঁল
এবং উপস্থিত লক্ষ্যেরা হাজার জোড়া দ্বির নিবদ্ধ চোখে মানবতার
আবেদন অথবা বুদ্ধির বীণি কিছুই দেখতে পেলেন না।

মিটার শিকউইক চহুদিকে দৃষ্টিপাত কোঁরে বোললেন,
“আমরা এখন বেশ সুন্দর ভায়গার ঠাঁড়িয়েছি।” তাঁদের কাছাকাছি
তীক বেশ পাতলা হোঁয়ে গিয়েছে এবং টেলোঠেলিও আর
নেই।

“চমৎকার।”—মিটার গড়গ্রাস এবং মিটার উইকল হুঁতনেই
জবাব দিলেন।

মিটার শিকউইক তাঁর চশমা ঠিকমতো সন্নিবেশ কোঁরতে
কোঁরতে জিজ্ঞাসা কোঁরলেন—“ওরা কি করছে এখন।”

মিটার উইকল-এর রং পরিবর্তিত হোঁল, মানে ক্যাকাসে হোঁয়ে
গেলেন তিনি। “আ...আমার মনে হয় ওরা এবার কারার
কোঁরবে।”

মিটার শিকউইক ভাড়াভাড়ি বোললেন—“ননসেন।”

“আ...আ...আমার মনে হয় ওরা সত্যিই কারার কোঁরছে”—বেশ
জীতি-বিহীন কণ্ঠে বোললেন মিটার গড়গ্রাস।

“অসম্ভব”—মিটার শিকউইকের কণ্ঠ হুঁতে উদ্ধারিত হওয়ার
সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমুখে দুটি সেনাবাহিনীর রাইফেলের মূখ
তাঁদের দিকে কিবল। সব কটি রাইফেলের লক্ষ্য একই এবং
তা হুঁছে শিকউইক সমগ্রাণ। সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেলগুলি হোঁতে
কীকা আওরাক করা হোল। সে আওরাকে পৃথিবীর কেন্দ্রে
পর্যন্ত ঝেঁপে উঠল। এই বরফ এক অবস্থিকর অবস্থার মধ্যে তাঁরা
শিকর্ষব্যবিস্ট হোঁয়ে ঠাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় তাঁদের পিছন
দিকেও আর একটি নতুন সেনাবাহিনী বৃহত্তম ভলীতে আবিস্কৃত
হোল। মিটার শিকউইক কিন্তু এতও তাঁর মহৎ ব্যক্তিসুলভ বৈধা
ও সবম হারান নি। তিনি মিটার উইকলএর হাত ধরে নিজেকে
স্বাধাধনে এবং আর একদিকে মিটার গড়গ্রাসকে রেখে তাঁদের
দরশন স্বাধতে অস্বরোধ কোঁরলেন যে, একমাত্র কান্দে ভালো সেপে
হাওরা ছাড়া কারাখি থেকে আর কোন বিপদ আসল্য করার কোন
বেছু নেই।

মিটার উইকল বোললেন—“কিন্তু থকন যদি কেউ কুল কোঁরে
সত্যি ভলী ডরে থাকে তা।” ডরে বিবর্ণ তাঁর মুখ। “আমি
এইমাত্র কান্দে পাখ দিয়ে সাঁ কোঁরে কি একটা চলে বাবার মতো
ভলনাম।”

মিটার গড়গ্রাস বোললেন, “আমাদের পক্ষে এখন উপুড় হোঁয়ে
ডরে পড়াই সব ডরে নিরাশ।”

“না, না ভায় আর স্বরকার নেই, সেব হোঁয়ে গিয়েছে সব”—
মিটার শিকউইক বোললেন, হয়ত তাঁর চোঁট ঝেঁপে উঠছিল
আর গালের রক্তভা ছিল না কিন্তু তাঁর বামনভলীতে ডরে লেগ
ছার ছিল না।

মিটার শিকউইকের কথাই ঠিক, কারাখি বদ্ধ হোঁয়েছিল।

তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হওয়ার ভিত্তি তিনি নিজেকে স্বত্বাধ জ্ঞাপন
কোঁরতে বাঙ্ছিলেন কিন্তু সময় পেলেন না ভায়। কারণ ইতি-
মধ্যে নতুন আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুটি বাহিনীর বেয়নেট
উত্তম কোঁরে বেখানে মিটার শিকউইক এবং তাঁর বন্ধুরা অবস্থান
কোঁরছিলেন সেই দিকে দ্বারিত হোল।

মাছুষে মরণশীল। তাছাড়া মাছুষের সাহসেরও একটা মীমা
আছে। বাহাদুর সৈন্তদলের প্রতি মিটার শিকউইক চশমার
ভিতর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কোঁরলেন এবং পরকণ্ঠেই—না, পালালেন
এ কথা আমরা বোলব না কারণ প্রথমত, কণ্ঠটা অপমানজনক,
দ্বিতীয়ত মিটার শিকউইকের আকৃতিও ঐক্য ক্রিয়ার উপযুক্ত নয়।
তিনি বখাসম্ভব ক্রতগতিতে সরে গেলেন।

পিছন দিকের সৈন্তেরা সারিবদ্ধ ভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ
করার জন্য প্রস্তুত হোঁয়ে অপেক্ষা কোঁরছিল এবং সমুখের সেনাদল
আক্রমণ করার জন্য ক্রতগতিতে এগিয়ে আসছিল, কলে মিটার
শিকউইক এবং তাঁর সঙ্গিগণ দুটি বৃহত্তম সেনাবাহিনীর মধ্যে
কিংকর্ষব্য বিধূত হোঁয়ে ঠাঁড়িয়েছিলেন।

আক্রমণোত্তম সৈন্তদলের অকিসার চিৎকার কোঁরে উঠলেন—
“হোঁই।”

অপেক্ষমান বাহিনীর অকিসার ধমক দিলেন—“হুঁ, বাও।”
উত্তেজিত শিকউইকেরা বোললেন—“বাব কোঁথার।”

হোঁই-হোঁই—হোঁই, ছাড়া আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না।
ঘাবড়ে গিয়ে চুপ কোঁরে ঠাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিই বা কোঁরতে
পারেন তাঁরা? বুদ্ধবর্জের মধ্যেই কি হোঁয়ে বার। একটা বাচ্চা—
উচ্ছল হাসির লক্ষ্য—পরকণ্ঠে প্রায় পাঁচশ গজ দূরে সেনাবাহিনীর
অবস্থান।

মিটার গড়গ্রাস এবং মিটার উইকল হুঁতনেই বখেঁড় কিপ্রভা
সহকারে লাকতে বাধ্য হোঁয়েছিলেন। অতঃপর হাটিতে বোসে
পড়ে তাঁর হলুদ রঙের ক্যামো নাকের লাল রক্ত মুখে ফেলতে
ফেলতে মিটার উইকল প্রথম যে জিনিস দেখলেন তা হুঁছে তাঁদের
ব্রাহ্মের নেতার মাথার টুপিটি বিভিন্ন গতিতে গড়িয়ে বাচ্ছে আর
তিনি তাই ধরবার জন্য তাঁর ভানী দেহ নিয়ে ছুটছেন।

মাছুষের জীবনে ঐক্য মূর্ত্তে খুব কমই আসে বখন তাকে
নিজের টুপির পিছনে গৌড়বার মতো লাহুনা লছ কোঁরে সকলের
কুপায় পাত্র হোঁতে হয়। হাওরার উড়ে বাওরা টুপি ধার জন্ত
বখেঁড় ঠাণ্ডা-মণ্ডিক এবং বিচারবুদ্ধি থাকায় প্রয়োজন। অতি
ক্রতগতিতে দৌড়লে হুমড়ি খেয়ে টুপির উপর পড়ার সম্ভাবনা, কলে
টুপি পনতলে পিষ্ট হবার ভয় থাকে। আবার ওর সঙ্গে ভাল রেখে
না ছুটলে নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। সাবধানতার সঙ্গে
অগ্রসর হোঁয়ে ঠিক মূর্ত্তে ওকে পাকড়াও কোঁরে মাথার চাপিয়ে
সেওয়াই সমীচীন।

বীরে বীরে বাতাস বইছিল। মিটার শিকউইকের টুপিটিও
হাওরার গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে বাঙ্ছিল। এই বরফ আরও এগিয়ে
বেত, অন্ততঃ তাই ডেবে মিটার শিকউইক প্রায় হাল ছেড়ে দেবার
উপক্রম কোঁরলেন।

অস্বাভাবিক—স্বপ্নপ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্ত অক্ষয়
শ্রীমদ্রাম



অক্ষয়কান্ত হোম

২১

উষাকালে পঙ্গবান করে নিমাই টোলে গিয়ে বসল। পড়ুয়ারা আসতে লাগল একে-একে। হাতে পুঁথি আছে সকলের কিন্তু ডোর দিয়ে বাঁধা। যার-যার আসনে বসল স্থির হয়ে।

ডোর খোলো এইবার।

কোনোদিন এমন হয়নি, পড়ুয়ারা ডোর খোলবার আগে হরি-হরি বলে উঠল। হরিশ্বনির সঙ্গে-সঙ্গেই খুলে গেল ডোর। হরিশ্বনিই কি সমস্ত বন্ধন মোচনের কুমিকা?

হরিশ্বনি শুনে নিমাই আনন্দে আবেগে বিভোর হয়ে গেল। বললে, 'সর্বকালে হরিনামই সত্য। সুত্র বৃষ্টি টীকা সমস্তই হরিনাম। হরি ছাড়া শাস্ত্র নেই শব্দ নেই অর্থ নেই ব্যাখ্যা নেই। আবার বলো। আবার শুনি।'

হরি শব্দের নানা অর্থ, ছুটি মুখ্যতম। এক, 'সর্ব অমঙ্গল হরে'; আর 'প্রেমে হরে মন।' যিনি হরণ করেন তিনিই হরি। কী হরণ করেন? সমস্ত অমঙ্গলের যা কারণ সেই মায়াবন্ধন হরণ করেন। আর হরণ করেন আসক্তি যা মনের সঙ্গে ওতপ্রোত। শুধু নিয়েই যান না, দিয়েও যান। আসক্তি নিয়ে দিয়ে যান কৃষ্ণপ্রেম।

কৃষ্ণ তাই চৌরাগ্রগণ্য। ব্রজের নবনীতচোর, গোপীদের ছুকুলচোর, রাধিকার হৃদয়চোর, নবাবুদের স্ত্রীমলকাস্তিচোর। আর আমাদের বহুজন্মান্বিত পাপচোর, যমবন্ধপাশচোর।

মাধুর্য চাতুর্যের সম্পদ কৃষ্ণের মুখপঙ্কজ সততই আমার হৃৎ-সরোবরে বিরাজ করুক। এ পঙ্কের মকরন্দ

কোথায়? মুরলীধ্বনিই এ পঙ্কের মকরন্দ। কৃষ্ণের কপোল ছুটি মুকুরায়মান ইন্দ্রনীলমণি। চোখ দুটি ভাবোদগারে ও স্রমদে ঈষৎ মুকুলিত। তার সেই মধুরিমার কণিকাও কি আমার বাক্যে প্রকাশ পাবে? তবু আমার সেই বাস্তবজীবিত মদনমধুরমুখ শ্রাম-সুন্দরের জয় হোক।

'কৃষ্ণ যার রতি-মতি নেই, সর্বশাস্ত্র পড়েও তার দারিদ্র্য যাবেনা।' আপন মনে বলতে লাগল নিমাই, 'কিন্তু দুর্গত অধমও যদি কৃষ্ণনাম নেয় তার কৃষ্ণধামে গতি হয়। কৃষ্ণের ভজন নেই অথচ শাস্ত্রব্যাখ্যা করে, সে ভারবাহী গর্দভ ছাড়া আর কী! কৃষ্ণপদে ভক্তি—এই শাস্ত্রমর্ম' যে পড়াবে, তার নিজের জীবনে তা বিশদ করতে হবে। স্তবরা, আর কিছু নয়, কৃষ্ণপাদপদ্মন ভজন করো।'

'পুতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান।

হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্তর্ধান ॥

অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন।

কোন সুখে ছাড়ে লোক তাহার কীর্তন ॥'

ঘোরা খেচরী কামচারিণী পুতনা নন্দগৃহে মৃচ্ছা।

ঘুরতে ঘুরতে শয্যার উপরে বালককে দেখতে পেল।

সে বালক যে অসাধুদের অন্তর্কারক, ভ্রাম্যচ্ছাদিত পাবকের মত স্বীয় অসীম তেজ প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে, জানত না পুতনা। স্তবরা তার ভয়ও হলনা।

চৌচরাখা ভগবান হরি বুঝল এ ভামিনী-কামিনী নয় এ রাক্ষসী, বালঘাতিনী। চোখ বুজে রইল। নির্বোধ যেমন রজুবোধে নিজিত কালসর্পকে তুলে নেয়, তেমনি পুতনা নিজ কালস্বরূপ কৃষ্ণকে অসহায় শিশুজ্ঞানে কোলে তুলে নিল। কোষনিহিত অসির মত পুতনার

অন্তর তীক্ষ্ণ বটে কিন্তু তার বাহ্যভঙ্গি ঠিক মায়ের মত। যশোদা আর রোহিণী তাই বারণ করতে পারল না। শিশুকে কোলে নিয়ে পুতনা তার চুর্জয় বিষপূরিত স্তন তার মুখে দিল। শিশু ছই হাতে সেই স্তন ধরে সবলে গীড়ন করতে লাগল, ক্রুদ্ধ রসনায় স্তনচুষ্টের সঙ্গে পান করতে লাগল রাক্ষসীর প্রাণশক্তি। মুঞ্চ, মুঞ্চ, অলং—ছাড়া ছাড়া আর নয়, আর্তনাদ করতে লাগল পুতনা। মর্মভেদী যন্ত্রণায় নয়ন বিবৃত করে হস্তপদ বিকম্প করতে করতে নিজরূপ ধারণ করলে। আকাশপথে উড়ে যেতে চাইল কিন্তু সাধ্য কি অযুত মহন্তী সেই শিশুর ভার সে সহ্য করে। কেশ, চরণ ও বাহু বিস্তৃত করে কংসের গোষ্ঠে গিয়ে পড়ল, ছয় ক্রোশ ব্যাপী সমস্ত গাছ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। কৃষ্ণ কোথায়? ছয় দিনের শিশু, কৃষ্ণ নির্ভয়ে সেই রাক্ষসীর বুকের উপর খেলা করছে।

ক্রীড়ারত শিশুকে উদ্ধার করে আনল গোপীরা। প্রচলিত বিধি অনুসারে শিশুর রক্ষাবিধান করল। চক্রধারী মুরারি তোমার সামনে, গদাধারী হরি তোমার পশ্চাতে, ধনুধারী রঘুশূদন আর অসিধারী অজ্ঞ তোমার ছই ভূজপার্শ্বে অবস্থিত হোক। জীবীকেশ তোমার ইন্ড্রিয়, নারায়ণ প্রাণ, শ্বেতদ্বীপপতি চিত্ত, যোগেশ্বর মন, পুশ্চিনন্দন বুদ্ধি আর পরম ভগবান তোমার আত্মা রক্ষা করুন। তুমি যখন খেলবে তখন গোবিন্দ, যখন শুয়ে থাকবে তখন মাধব, যখন চলবে তখন বিষ্ণু, যখন বসবে তখন শ্রীপতি আর যখন খাবে তখন সমুদায় গ্রহের ভয়োৎপাদক যজ্ঞভূক তোমাকে রক্ষা করুন। বক্ষ-রক্ষ-শিশাচ-বিনায়ক, কোটরা-রেবতী-জ্যোতী ডাকিনী সকলে নষ্ট হোক, নষ্ট হোক সকল ব্যাধি আর উৎপাত, উদ্ভাদ আর অপস্মার।

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে স্তম্ভপান করতে লাগল।

গোপগণ কুঠার দিয়ে পুতনার বিশাল কলেবর খণ্ড খণ্ড করে কাঠে বেটন করে দাহ করল। চিতাধুম থেকে উঠল অগুরুসৌরভ। কৃষ্ণকে স্তম্ভদান করেছিল বলে ও তার লোকবন্দিত পদস্পর্শ লাভ করেছিল বলে পুতনার সমস্ত পাপ দূরীভূত হল আর সে লাভ করল জননীর পতি, বৈকুণ্ঠপতি।

আর অঘাসুর?

গোপাল-বয়স্কদের সঙ্গে খেলা করছে কৃষ্ণ। বে ভগবান হরি বিবজ্ঞানের পক্ষে অপ্রকাশ পরম মুখ,

ভক্তজনের পক্ষে নিগূঢ় আত্মপ্রসাদ আর মায়ামূঢ়ের পক্ষে সামান্ত নরবালক, সে পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্যসঞ্চয়ী গোপ-বালকদের সঙ্গে বিহার করছে। প্রতিবিম্বকে উপহাস করছে আর আক্রোশ করছে প্রতিধ্বনিকে। কেউ গুঞ্জন করছে ভূঙ্গের সঙ্গে, কূজন করছে কোকিলের সঙ্গে, কেউ বা উড়ন্ত পাখীর ছায়ার সঙ্গে ছুটছে। কেউ নাচছে ময়ূরের সঙ্গে, কেউ বা গাছে উঠে বানরের সঙ্গে শাখা থেকে শাখান্তরে লাফ দিচ্ছে।

তাদের সুখক্রীড়ায় অসহিষ্ণু হয়ে সেখানে অঘাসুর এসে উপস্থিত হল। পুতনা আর বকের ছোট ভাই এই অঘ, কংস তাকে পাঠিয়েছে কৃষ্ণ নিধনে। দাঁড়াও, এই শিশু আমার ভাতা-ভগ্নীকে বধ করেছে। সন্দেহ কি এ শিশুই তাদের তিলোদক, একে বিনষ্ট করব সদলে। চুম্বিত অঘ অজগর দেহ ধারণ করল, আর গুহার মত মুখব্যাদান করে শুয়ে পড়ল পথের উপর। তার নিম্ন ওষ্ঠ পৃথিবী ও উত্তর ওষ্ঠ মেঘ ছুঁয়ে রইল। ছই স্কন্ধ দুই দরীর মত বিস্তীর্ণ, একেকটি দাঁত একেকটি গিরিশৃঙ্গ, মুখবিবর ঘোর অন্ধকার, জিহবা যেন অন্তহীন সরগি, নিশ্বাস সাক্ষাৎ বজ্রা, চক্ষু দাবান্লির মত ধরস্পর্শ। হাসতে হাসতে করতালি দিয়ে গোপবালকেরা অঘাসুরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করল। অসুর তক্ষুনি ওদের গলাধঃকরণ করল না, কৃষ্ণের প্রবেশ প্রতীক্ষা করতে লাগল। নিখিল লোকের অভয়দাতা অশেষদর্শী কৃষ্ণ তার প্রার্থনা পূর্ণ করল, চুকল তার মুখ-গহবরে। মৃত্যুর জঠরাগ্নির মধ্যে বয়স্কদের সে তৃণীভূত হতে দেবে না আর খল অসুরকেও নষ্ট করবে। সর্পের গলদেশে কৃষ্ণ নিষেকে অতিবেগে বহিত বিফারিত করল। অসুরের কণ্ঠ নিরুদ্ধ হল, ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে প্রাণ বেরিয়ে গেল মুহূর্তে। বয়স্কেরা জাগ পেয়ে বেরিয়ে এল। মহৎ জ্যোতিতে উজ্জ্বল হল দশ দিক।

অসাধু ব্যক্তি কিছুতেই ভগবানের সমানরূপতা লাভ করতে পারে না, কিন্তু অঘাসুর শুধু তাঁর অঙ্গ-স্পর্শহেতু পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সমানরূপতা প্রাপ্ত হল। যার শুধু প্রতিকৃতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে ভক্ত ভাগবতী পতি পায়, সেই ভগবান স্বয়ং যদি অসুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে সে অসুর মুক্ত হবে না কেন?

নিমাই শুধু কৃষ্ণকথাই বলে চলেছে, আর পদ্মসারী শুনে চলেছে একমনে।

হঠাৎ বাহুজ্ঞান ফিরে এল নিমাইয়ের, লজ্জায় অধোমুখ হয়ে রইল। এ সে কী বলছিল? তার না পড়ানোর কথা? এ সে কী পড়াল?

‘এ আমি তোমাদের কাছে কোন্ সূত্র ব্যাখ্যা করলাম?’ নিজের জিগপেস করল অপ্রস্তুতের মত।

‘কিছুই বললাম না।’ বললে পড়ুয়ারা। ‘শুধু বললেন যা কিছু শব্দ সবই কৃষ্ণনাম।’

‘তা হলে এখন পুঁথি বাঁধো। চলো গঙ্গা স্নানে যাই।’ নিমাই উঠে পড়ল। ‘আজ মঙ্গলাচরণ হল, কাল পাঠারম্ভ হবে।’

বাড়ি ফিরে এলে মা জিগপেস করল, ‘আজ টোলে কী পড়ালে?’

নিমাই বললে, ‘শুধু এক কথা। এক বিজ্ঞা। তার নাম কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণবিজ্ঞা।’

‘মায়ে বোলে, আজি বাপ। কি পুঁথি পঢ়িলা?’

কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা?’

প্রভু বোলে, আজি পঢ়িলাও কৃষ্ণনাম।

সত্য কৃষ্ণ চরণ-কমল-গুণধাম॥’

মায়ের সঙ্গেও কৃষ্ণকথা বলতে লাগল নিমাই। কপিল যেমন বলেছিল তার মা দেবহৃতিকে।

বিন্দু সরোবরের তীরে দেবহুতি পুত্ররূপে অবতীর্ণ ভগবান কপিলের কাছে গিয়ে বললে,—‘হে ভূমন, আমি ইন্দ্রিয়াভিলাষে মোহাক্ষ। আমার সম্মোহ দূর করে দাও। তুমি অজ্ঞানের চক্ষু, আমাকে পথ দেখাও।’

কপিল বললে—‘হে অপাপে, চিন্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। চিন্ত বিষয়ে আসক্ত হলে বন্ধের আর পরমাখ্যাত্তে আসক্ত হলে মুক্তির কারণ হয়। মা, যোগীদের ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধির একমাত্র পথ ভক্তি। ভক্তি ছাড়া মঙ্গলময় পথ আর দ্বিতীয় নেই। কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে সাধুসঙ্গ একান্ত দরকার। যে আসক্তি আত্মার অক্ষয়শাস্বরূপ তা সাধু পুরুষে বিহিত হলে নিরাবরণ মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হয়ে যায়।’

কিন্তু সাধু কে? জিগপেস করল দেবহুতি।

যে তিতিক্ষু, দয়ালু, সর্বদেহীর স্নেহদ, শাস্ত্র ও অজ্ঞাতশত্রু, সেই সাধু। সে সর্বদা সদাচারভূষিত সর্ব-সঙ্গ বিবজ্জিত। সে অপ্রগল্ভ হয়ে আমার পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্তন করে। ‘দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ।’ দেবতারা স্বার্থাধেবী কিন্তু সাধুর ঈশ্বর ছাড়া অদ্বিষ্ট নেই। তাই ভগবৎ কৃপাও ‘সাধুবাহনা’—সাধুর

কৃপাকে বাহন করেই মানুষের কাছে এসে থাকে। সাধু সমাগমে আবার বীৰ্যপ্রকাশক জ্বলন্ত রসায়ন কথা ওঠে আর সে কথাতেই জীবিত জ্ঞান জন্মে। জ্ঞান হতে রুচি আসে আর রুচি থেকে ভক্তি। ‘আর ভক্তি জাগলেই ইন্দ্রিয়-শুধ-সাধে বিরতি ঘটে।’

দেবহুতি বললে, আমি অল্পবুদ্ধি নারী, আমাকে সরলভাবে বুঝিয়ে দাও।

মা, ভগবান হরির প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাই অনিমিত্তা ভক্তি আর তা মুক্তির চেয়েও গরীয়সী। যদি ভক্তি জাগে তা হলে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতাও কাম্য নয়। ভক্ত কী করে? আমার প্রসন্ন বরদরূপ দর্শন করে, আমার সঙ্গে ইচ্ছামত কথা বলে। মা, ভক্তিই জীবের নিঃশ্রেয়সের উপায়। আমার প্রতি ভক্তের মনোগতি সাগরাতীর্থমুখিনী গঙ্গাধারার মত অচ্ছিন্নপ্রবাহ। সে সালোক্য সাযুজ্য সাক্ষ্য সামীপ্য কিছু চায় না, পেলেও নেয় না কোনোদিন। সে চায় শুধু আমাকে সেবা করতে—অথও অনন্তকাল ধরে সেবা করতে। যেহেতু আমি সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ, ভক্ত বহু সম্মানসহ সকল প্রাণীকেই প্রণাম করে মনে মনে। ‘মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেৎ বহু মানয়ন।’ সব ভূতে ব্রহ্মদর্শনই অহেতুকী অব্যবহিতা ভক্তির চরম পরিণাম।

জননী দেবহুতির মোহাবরণ দূরীভূত হল। ভগবানের স্তব করে বললে—‘তোমার নাম যার জিহ্বাগ্রে থাকে, সে চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ; যারা তোমার নাম উচ্চারণ করে, তারাই যথার্থ তপস্বী হোম আর তীর্থস্নান করেছে, তারাই যথার্থ সদাচারী ও সার্থক বেদাধ্যায়ী।’

পরদিন সকালে আবার টোলে চলল নিমাই। মনে মনে স্থির করল আজ ঠিক-ঠিক পড়াব, মন বিচ্যুত হতে দেব না, বিভ্রান্ত হতে দেব না। পণ্ডিত, থাকব পণ্ডিতের মত।

কিন্তু পড়াতে বসেই আবার লুপ্ত হল বাহুজ্ঞান। বৈষ্ণব আবেশে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। ‘যে প্রভু আছিল ভোলা মহা বিজ্ঞারসে। এবে কৃষ্ণ বিহু আর কিছু নাহি বাসে।’

‘তারপর?’ প্রশ্ন করল পড়ুয়া।

‘কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। তার পরেও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।’ নিমাইয়ের চুচোখে খারা নামল। ‘পঢ়াইতে বৈসে গিয়া জিগপেস-রায়। কৃষ্ণ বিহু কিছু আর না আইসে জিহ্বায়।’

‘বর্ণ সিদ্ধ কোন্ সংজ্ঞায়?’ জিগগেস করল আরেক ছাত্র।

‘সর্ব বর্ণে একমাত্র নারায়ণই সিদ্ধ।’ নিমাই বললে।

‘কিস্তি বর্ণ সিদ্ধ হল কী করে?’

‘শুধু কৃষ্ণ দৃষ্টিপাতের কৃপায়।’

একজন ছাত্র বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে, ‘সমুচিত ব্যাখ্যা করুন।’

‘সব ক্ষণ কৃষ্ণ স্মরণই একমাত্র ব্যাখ্যা।’

ছাত্র বললে, ‘এ সব বায়ু ব্যাধি ছাড়া কিছু নয়।’

‘এ কৃষ্ণ ব্যাধি।’ হাসল নিমাই। ‘এখন তবে এ পর্যন্ত থাক। বিকেলে আবার একত্র হব। ইতিমধ্যে বিরলে বসে পুঁথি পড়ে তৈরি হই গে।’

ছাত্রের মধ্যে কেউ কেউ গঙ্গাদাসের বাড়ি গেল নালিশ করতে, নিজেদের হৃদশায় কথা বলতে। এখন কী করা যায়। গয়া থেকে এসে অবশি পড়ানোতে অরমন নেই অধ্যাপকের, সর্বক্ষণ কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ করেন। কৃষ্ণ ছাড়া শব্দও নেই, ব্যাখ্যাও নেই। যা কিছু সূত্র তার সিদ্ধান্ত কৃষ্ণ। যা কিছু সিদ্ধান্ত তার সূত্র কৃষ্ণ। এরকম ভাবে চললে আমাদের পড়া হবে কী করে! আপনি যদি ঠুঁকে একটু বলে দেন।

‘আমরা বাড়ি ঘর ছেড়ে কত দূর দেশে বিভাজন করতে এসেছি, কৃষ্ণকথা শুনে আসিনি।’ ছাত্রেরা কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠল—‘আমাদের অধ্যাপকের এ কী হল! একে আপনি সংযত করুন। আদেশ করুন যেন ঠিকমত পড়ায় আমাদের।’

গঙ্গাদাস বিজ্ঞপ্ত করে উঠল, ‘পণ্ডিত হয়ে শাস্ত্র ছেড়ে কৃষ্ণ ধরেছে? যাও, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। আমি নিমাইকে বলে দেব, ভালো করে পড়ায় যেন ঠিক ঠিক।’

বিকলে ছাত্রেরা এসে খবর দিল, গঙ্গাদাস ডেকেছে পণ্ডিতকে। তখন নিমাই ছাত্রদের নিয়ে গুরুগৃহে এসে উপস্থিত হল।

‘বিভালাভ হোক।’ আশীর্বাদ করল গঙ্গাদাস।

বিনয় ভঞ্জিতে বসল নিমাই।

গঙ্গাদাস বললে, ‘কত বড় ভাগ্য তুমি অধ্যাপক হয়েছ। তুমি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, নীলাধর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। তোমার বাপ আর মাতামহ দুইই প্রকাণ্ড পণ্ডিত। তুমি তাদের নাম ডোবাবে? সমস্ত গোড়ে

তোমার বশ পরিব্যাপ্ত, তোমার ব্যাকরণের টিপ্পনীর কত আদর আজ সমাজে, তুমি ডোবাবে তোমার নিজের নাম?’

আমি কী করেছি। শিশুর মত সারল্যে নীরবে তাকিয়ে রইল নিমাই।

‘তুমি নাকি হরিভজা হয়ে যাচ্ছ? সর্বকথাই নাকি তোমার কৃষ্ণ-উত্তর।’ গঙ্গাদাস প্রায় তিরস্কার করে উঠল: ‘এ সব পাগলামি ছাড়ে। সমীচীন পাঠ দাও, ব্যতিরিক্ত অর্থ করো কোন সাহসে? তুমি না পণ্ডিত, অতএব তাৎপর্যে তুমি পর্যাপ্ত থাকবে। সীমা লঙ্ঘন করার তোমার অধিকার কোথায়? তোমার ছাত্রেরা তোমাকে ছাড়া আর কারুর কাছে পড়বে না, অথচ তুমি রীতিমত পড়াছ না ওদের। তুমি আমার মাথা খাও, ওদের ক্ষোভ নিরসন করো।’

নিমাই লজ্জিত হয়ে করজোড়ে মার্জনা চাইল। বললে, ‘আপনার ভয় নেই, আপনার চরণ প্রসাদে আমি যথার্থ পাঠ দেব। আমার সূত্র-ব্যাখ্যা খণ্ডন করতে পারে এমন কাউকে দেখিনা নবদ্বীপে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার পাঠে বিন্দুমাত্র ভুল হবেনা। কার সাধ্য নেই দোষ ধরে।’

গঙ্গাদাস খুশি হয়ে আশীর্বাদ করল। গুরুকে প্রণাম করে শিষ্য নিজস্ব হস্ত লিখল নিমাই। এগিয়ে গিয়ে দেখল রত্নগর্ভ আচার্যের দ্বারের শাস্ত্রালাপের সভা বসেছে। যোগপট্ট হাঁদে কাপড় বেঁধে একপাশে বসল নিমাই, শিষ্যরাও বসল। চার দশ রাত হয়েছে, তবু বাড়ির কথা কার মনে এল না।

কৃষ্ণ দর্শনের বর্ণনা করছে আচার্য:

শ্রীমৎ হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ

খাতু প্রবালনটবৈশমহুত্রতাসে।

বিশ্বস্তহস্তমিতরেণ ধূনানমজ্জ

কর্ণোৎপলালকপোলমুখাজহাসম ॥

তার বর্ণ শ্রীমৎ, পরিধানে পীতবাস, ‘অজ্ঞে বনমালা ও ময়ূরপুচ্ছ, খাতু ও প্রবালে তার বেশ রচিত বলে নটের মত শোভমান। অমুচরের কাঁধে এক হাত রেখে আরেক হাতে একটি নীলাকমল ঘোরাচ্ছে। তার কর্ণযুগলে উৎপল, কপোলযুগলে কুন্তল আর মুখপঙ্কজে স্নমধুর হাসি বিলসিত।

কৃষ্ণ-রূপবর্ণনার এই শ্লোক শুনেই নিমাই মুছিত হয়ে পড়ল।

ছাত্রেরা বিশ্বয়বিপাক চোখে তাকিয়ে রইল।

এমন ভাব তো কোনোদিন দেখিনি। শুধু কথাই শুনেছে, এ কী তার উচ্চারণ!

ছাত্রেরা নিমাইয়ের সেবা করতে লাগল। বাহজ্ঞান ফিরে পেয়েও নিমাই শান্ত হলনা, কঁাদতে লাগল আকুল হয়ে। মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। ধূলা কাদা করে ফেলল চোখের জলে।

সভায় যারা ছিল তারা সবাই হতবাক। রাস্তায় চলতি পথিক দাঁড়িয়ে পড়ে, কেউ কেউ বা প্রণাম করে সেই ভাববিগ্রহকে।

‘শ্লোক বলো। আবার বলো।’ লুটিয়ে লুটিয়ে বলতে লাগল নিমাই।

রত্নগর্ভ আবার সেই শ্লোক পড়ল। ‘শ্রাম্য হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ।’ উঠে বসবার চেষ্টা করছিল নিমাই কিন্তু পড়ে গেল মাটিতে।

‘শ্লোক বলো।’

এ কী অবশক্ষা!

রত্নগর্ভ আবার পড়ল।

‘বলো, বলো—’ শ্লোক কথাটা আর বলতে পারছেননা, বিহ্বলকণ্ঠে নিমাই শুধু বলো-বলো করতে লাগল।

রত্নগর্ভ তৃতীয়বার পড়ল।

নিমাই টলতে-টলতে উঠে আলিঙ্গন করল রত্নগর্ভকে।

মুহূর্তে এ কী হল রত্নগর্ভের? নিমাইয়ের পা ধরে কঁাদতে লাগল অবোরে। কঁাদে আর শ্লোক আওড়ায়। আর নিমাই ততই ছুঁকার ছাড়ে: বোলো, বোলো। আর যত শোনে ততই ধূলায় লুপ্তিত হয়।

যেখানে নিমাই সেখানে গদাধর। গদাধর আর সইতে পারছে না নিমাইয়ের আতি, বাণবিক্র বিহঙ্গের কাতরতা। রত্নগর্ভকে বললে,—তুমি থামো। তুমি না থামলে নিমাইকে পারব না শুষ্ট করতে।

রত্নগর্ভ থামল।

‘বলো, বলো—’ অনুনয় করল নিমাই।

রত্নগর্ভ আর পড়ল না।

আস্তে আস্তে বাহজ্ঞান ফিরে গেল নিমাই। আস্তে আস্তে উঠে বসল। সোনার অঙ্গ ধূলিধূসর, প্রথম লক্ষ্য করল নিজেকে, তারপর বিশ্বয়নিশ্চল জনতাকে। লজ্জিত মুখে বললে, ‘এ আমি কী চাঞ্চল্য করলাম!’

‘চলো গঙ্গাস্নানে যাই।’ গদাধর নিমাইয়ের হাত ধরল।

‘চলো।’ উঠে পড়ল নিমাই।

পরদিন আবার টোলে এসে বসেছে। ছাত্রদের বলছে, ‘একটি গোপন কথা তোমাদের বলি। এ কথা অশ্রুত অকথ্য। তোমরা আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়, তাই এ কথা শোনবার যোগ্য শুধু তোমরাই। শোনো। তোমাদের কী পড়াব, সব সময় দেখি এক কৃষ্ণবর্ণ শিশু আমার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। তাকে দেখব, না শুনব, আমি উদভ্রান্ত হয়ে পড়ি। রূপমাদুর্ঘ্য না বেণুমাদুর্ঘ্য—আমি কোন্ লীলা-কলৌল-বারিষিতে স্নান করি বলো।’

‘কৃষ্ণবর্ণ শিশু?’ সকলে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল উৎসুক হয়ে।

শ্রাব্য শ্রাব্য সুনামশ্রুতি-

সমিভ-পরব্রহ্মবংশী-প্রসূত।

দর্শং দর্শং ত্রিলোক-বর

তরুণ কলা-কেলি-লাবণ্য সারম্ ॥

‘সবে দেখোঁ তাই, সেই বোলোঁ সর্বধায়।

কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায় ॥

যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম।

সকল ভুবন দেখোঁ—পৌবিন্দের ধাম ॥

কৃষ্ণ বিম্ব আর বাক্য না ফুরে আমার।

সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনায় ॥’

‘তাই আমার কাছে তোমাদের পড়া বিভ্রম্না মাত্র।’ বললে নিমাই, ‘তোমরা অশ্রু গুরু দেখ। আমি অনুমতি দিচ্ছি, যার কাছে তোমাদের ইচ্ছে তার কাছে গিয়ে পড়ো, আমাকে নিষ্কৃতি দাও।’ অশ্রু-উদ্বেল চোখে নিমাই নিজের পুণ্ড্রিতেই ডোর দিল।

‘আমরা আর কার কাছে পড়ব? তোমাতে ছেড়ে আর কার কাছে যাব—আমাদের আর কে আছে?’ সমস্তের কঁাদতে লাগল পড়ুয়ারা। ‘কী হবে আর আমাদের পড়ে? তোমার কাছে যা পড়লাম যা পেলাম তাই আমাদের বিস্তার।’ কান্নার রোল উঠল চারদিকে।

নিমাই প্রত্যেককে ডেকে আলিঙ্গন করতে লাগল। বললে, ‘আমি আশীর্বাদ করি, যদি আমি একদিনও কৃষ্ণ ভজন করে থাকি তবে তোমাদের জীবনের

অভিলাষ সিদ্ধ হোক। কৃষ্ণ-কৃপায় বিচার ফুটি হোক তোমাদের হৃদয়ে। আর বিচার কী? কৃষ্ণ-ভক্তি কৃষ্ণ-বিলাসই তো বিচার। তোমরা নিরবধি কৃষ্ণ-নাম শোন, তোমাদের বদন কৃষ্ণ-নামে মুখর হোক। এস, সবাই মিলে কৃষ্ণ কীর্তন করি।’

শিবারা কান্দতে লাগল, বললে, ‘কৃষ্ণ কীর্তন কেমন আমাদের শিখিয়ে দিন।’

নিমাই হাতে তালি দিয়ে গাইতে লাগল : ‘হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ। আরো বলো, গোপাল গোবিন্দ রাম ঐশ্বর্যদুন্দন।’

হাতের তালি দিতে লাগল, গাইতে লাগল মুগ্ধকণ্ঠে।

কৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ উঠল চারদিকে।

কৃষ্ণচূড়া

ঐদিলীপকুমার বসু

বৈশাখের হৃদয়ে হৃৎ করে ছুটে যাওয়া
উত্তপ্ত হৃদয় বাতাসের ঠোঁটে,
মনে হয় বুঝি চুবনের স্বার ভেসে আছে।
কলসানো বোনের নিষ্ঠুর, নিবিড় আলিঙ্গনে,
প্রেমোদ্রেক আঁচুর মনের
কামনার বহিষ্কার। বুঝি তৃপ্তির সকল নিযুক্তি বাচে।
তাই দেখি, কক্ষ প্রান্তরের বুকে, ঘেঁঠোপথের ধারে,
পার্ক অথবা ময়দানের কোল ঘেঁসে,
পৃথিবীর লজ্জাক্ষণ আভা লাগে কৃষ্ণচূড়া শাখে।
রাগ-অলুপাসে ভরা কাপের পরাগ নিয়ে,
নবোন্মী বধুর মত সে যেন কপ্তন বকে
চন্দ্রকাস্তুরি দিয়ে তার সারা অঙ্গে মাখে।
জীর্ণ-শিখ, শোকাচ্ছন্ন করে পরা শবাকীর্ণ প্রকৃতির,
কোকিলের বিদ্র-বিদ্র মন কাঁপানো শব্দ,
প্রাণের উচ্ছ্বাস ঢেউ, মনের তটোতে এসে বাজে।
কচি বাস, কচি পাতা ফুল আর কলের সন্ধ্যা,
বৌবনের ইসারা নিয়ে মরা নদী কাঁখে,
পলাশ-কিন্তক জাঁখি মেলে, প্রেমন্ত বসন্তরাজ সাজে।
পূর্বনো জজ্ঞাল বত কিছু, অভ্যন্তরে সঁপে দিয়ে
হে বৈশাখ নতুন জয়গানে ভরে তোলে,
পূর্ণ কর নীলাকাশ, অকরাণ ব্যাভাস বারবার।
তারই দৃশ্য হয়ে সলজ্জ বস্ত্রিত তুলিকা নিয়ে
নানা বর্ণে, নানা রঙে আকাশকে তুমি রাঙিয়েছ।
ওগো কৃষ্ণচূড়া!—তাই, তোমায় নমস্কার।

কৌতুক দেখতে লোকে ভিড় করে এল কিন্তু সবাই
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। কৌতুক কোথায়, এ
যে ভক্তি আর ভাবের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। কেউ
নাচছে, কেউ ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে, নিজ নাম রসে
আবিষ্ট হয়ে কীর্তননাথ বারে বারে আহাড় খেয়ে
পড়ছে।

নয়ন সফল করছে সকলে। বলছে, ‘জগতে এমন
ভক্তি আছে তা কে জানত। হেন উকতের যদি
হেন ভক্তি হয়, না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা ওবা কিবা
নয়।’

এই মহাপ্রভুর প্রকাশের সূচনা। নবদীপে এই
প্রথম নামকীর্তনের উদয়।

(ক্রমশঃ)

সে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বাতের সিঁড়ি বেয়ে সেই যে চলে গেল
আর সে কিরল না। তবু সে জ্যোত্স্নার
মন্দির হোমে গাঁথা অবাক কলকাতা
এখনো মনে পড়ে : ব্যথার বালু কড়ে—
সোনালী মুখখানি কাচের জানালায়
অগাধ ক্রমে জাঁকা।—বাসের বাতিঘর
কখন ডুবে গেল বাতের প্রলয়ের প্রস্তন পারাবারে।
হারিয়ে গেল সব—বখন হুড়ে গেল হাওয়ার চাহাকায়ে।

বাতীভরা সেই বাসের আলোটিরে
রক্তে মাথা বেন দীর্ঘ স্বপ্নের।
এখনো দেখি তারে—এখনো নাড়িচাড়ি
বোবা এ সন্ধ্যার সিঁদু-তীরে তারে।

আমার দিন-রাত—ময়ুর বরসাত—নিউলি-আখিন
আহা কি রিমরিম—আমার মধুমাস,
হৃদয় মেখে ঢাকা। অবোধ এ আকাশ
গুহরে মরে আহা! কেবল মাথা কোটে:

নৃত্যের জানালায় তবু সে মুখখানি
সোনালী অবয়ব নিখুঁত হয়ে ওঠে
এখনো কেন জানি নিবিড় হয়ে কোটে।
“এবার চলি তবে,”—ঠোঁটের পরবে
সেই যে গান-গান কথার কবিতাটি আমার মনে পড়ে।
বীটার যিহে নীল অন্তল আলোছায়া মনের সরোবরে
একটি টলোমলো করুণ পদ্মের হাসিটি ফুটে ওঠে।

শিশির=সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

বাঙলা দেশে দুজন সত্যিকারের নাট্যকার হতে পারতেন—

রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ মিশতে পারলেন না বলে হলেন না, আর শরৎচন্দ্র হলেন না চোঁটা করলেন না বলে। ঠেকে কতবার বলেছি—লেখার ভাষার অভিনয় করা যায় না বলেই কথা বললি, আপনাকে অজ্ঞাত করে নয়।

তা কথাটা উনি বুঝলেন না। ঠর লেখার মধ্যে ঐটাই লোভ হয়ে ঠাঁড়ায়। তবে ঠর লেখার ছিল রিয়েলিজম। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে কেবলই তত্ত্ব আর উপমা—অবশ্য সাধারণ ভাবে কথাও তিনি অমনি করেই বলতেন।

এই সময় বিনয়না বললেন—শরৎচন্দ্রের নাটকে নায়ক-নায়িকারা একই ধরনের, তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের বড় অভাব।

বললেন—শরৎচন্দ্রের নাটকের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব আছে, এ কথাটা কিছুটা সত্যি। রবীন্দ্রনাথের নাটকে হাটুরে লোকের কথা, মেয়েরা বাঁছে তাদের কথা, এমন কি ভালপার কথা পর্যন্ত উনি স্থলর তুলেছেন; কিন্তু ভয়লোকের কথায় এলেই উনি বৈচিত্র্যই সে বহি বল, একটি মাত্র লোকের লেখাতেই বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাঁর নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশবাবুর লেখাতেই নায়িকা বা নায়কের চরিত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায়।

এবার চা এল, বই বন্ধ করে চা খেতে খেতে অজ গল্প জুড়লেন—আমাদের থিয়েটার ঠিক মত বাড়তে পেলো না। প্রথম দিকে নাটক ছিল বাজা-বেঁধা, অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু হঠাৎই সেটা একেবারে পশ্চিমীদের নকল হয়ে গেল। গুরুত্ব থিয়েটারও ত আমাদের শ্রাটানকালে ছিল, থিয়েটারের উন্নতি করতে হলে বাজার সঙ্গে মিল খাটরে অভিনয় করানো দরকার; তবে তার জগেই ত পরীক্ষা করা চাই। বাজার নোকা বেরোনোটা আমার ঠিক ভাল লাগে না—হয় ঘুর থেকে ঢুক আসা, নয়ত আসরের এক পাশে বসে থেকে টুপ করে উঠে পড়া। আপানে এর জগে টানেসেই ভেতর দিয়ে আসার ব্যবস্থা আছে। আপানে অবশ্য হয় খুব বড় এরিয়া নিয়ে; চান্নের কিন্তু আমাদের মত ছোট।

পুরোপো ড্যালকাউসি ইনষ্টিটিউট বেটা এখন ভেঙে ফেলা হয়েছ—এতে বেশ স্থলর একটা এপ্রোঞ্জ ছিল। ওখানে আমি প্রথম অভিনয় করি ১৯১৩ সালের শেষ দিকে। একটা বই ঠিক করে অভিনয় করার ব্যবস্থা হ'ল। ও হলের ভাড়া ছিল ১০০ টাকা। প্রকল্পক দেখ ঐ টাকাটা দিয়েছিল। প্রকল্পর অভিনয়ের দিকে একটু বোঁকা ছিল। ওয়ারয় ফুও না কি ফুওর জগে চ্যামিটি হিসেবে অভিনয় করা হ'ল—১৭০০, উঠেছিল। প্রকল্প বলল ১৭০০ দেওয়া যায় না; সে আরো ৮০০ দিয়ে ২৫০০ করে কণ্ডে জমা দিলে।

সেই আমার বাইরের লোকের সামনে প্রথম অভিনয়। তাদের মধ্যে জনেকেই ছিল winter visitor, তারা আমার অভিনয়ের

উজ্জ্বল প্রশংসা করেছিল; কিন্তু ও প্রশংসার খুব বেশী দ্ব্য দেওয়া যায় না।

থিয়েটার আর্টস কাগজটা আমাকে পাঠায়। ওদের কাগজের চক্ষিণ বছর হয়ে এডিটার ছিলেন—কি যেন নাম ভ্রম মহিলায়—এখানে আসেন। আমি তখন ভারতুম্বারের বটর্ট (জীবন রত্ন) করছি। অভিনয় দেখে এসে আমার গ্রীণ কমে বললেন—Mr. Bhaduri, you are one of the greatest actors of the world. আমার চৌবাট বছর বয়েস, এর মধ্যে এমন অভিনয় খুব কমই দেখেছি। আমার এখন হংকং, চীন যেতে হবে; ফিরে এসে ফোমার সব নাটকের অভিনয় দেখব।" তিনিই পাঠান।

কে একজন বললে—ডেম সিবিল বর্ণডাইক বোধ হয়।

বললেন—না, ডেম সিবিল বর্ণডাইক নয়। সিবিল বর্ণডাইক ত ব্রিটিশ। উনি আমাকে সামনা সামনি খুব প্রশংসা করলেন। নেমজ্বর করে খাওয়ালেন; কিন্তু দেশ গিয়ে লিখলেন "Calcutta is a place where the most modern theatre flourishes side by side with the mediaeval type."

ওরা আমাদের প্রশংসা কোনদিনই করতে পারেনি; আজকাল ত আরো পারবে না, কেন না এখন ওদের থিয়েটার খুব নীচু জয়ের।

একজন প্রশ্ন করলেন—কটিনেন্টাল থিয়েটার দেখেছেন কিছু?

বললেন—না, কটিনেন্টাল থিয়েটার দেখিনি। তাছাড়া কনালী ভাণ্ড ত জানিনা, তবে শুনেছি ওদের নাটক খুব ভাল জাতের হয়। ভাণ্ড না জানলে বস গ্রহণে অনুবিধে হয় বটে, কিন্তু এমনও কেউ কেউ থাকেন, যিনি ভাণ্ড না জানলেও বস ঠিক ঠিক করতে পারেন। আমেরিকার এক বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক আমাকে অভিনয় দেখে নিউইয়র্ক সনে লিখলেন—The love of Rama and Sita will continue for ever and ever অর্থাৎ বিরহ বাদের প্রেমকে জান করতে পারবেন।

হুবহু বই-এতে যে কথাগুলি আছে তারই তুলনায়।

আমেরিকানরা থিয়েটার বিশেষ বোকে না। দেখনা, ওরা একটাও ভাল নাটক লিখতে পারলে না। কিন্তু ওদের চোঁটা আছে খুব, একটা চরিত্র তিনজন অভিনয় করলে তিন বকর interpretation দেবে, যানে তার বেরকর মনে হয়েছ। কতটা ভাবে বুঝে দেখ।

তাছাড়া, তারা অভিনয়ের ইতিহাস খুব মত করে লিখে রাখতে চোঁটা করে। আমাদের দেশে ইতিহাসই নেই। গিরিশবাবুরের নাম হারিয়ে হটল খালি হবিবাবুর নাম। কাগজে সত্যিকারের সমালোচনা ত আর বেরোয় না! সমালোচকরা অজ্ঞ মেয়ে লর্পক তৈরী করে, নাটকের উন্নতির পথ দেখায়। আমাদের দেশে সে সব কোথায়?

আমরাও পাব্লিসিটি বুঝতুম না, আজকালকার ছেলেরা ওসব খুব বোকে। আমি প্রথমে ওকথা বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু এখন দেখছি পাব্লিসিটিরও দরকার আছে।

চাএর পালা শেষ হয়ে গেল। আবার 'বোড়ী' পড়তে শুরু করলেন, বললেন—শিয়ামশি বা জনার্দন কমিক রিভিউ 'সেবার

জন্মে সৃষ্টি হয়নি। ওগুলো সত্যি চরিত্র—ওরকম অনেক দেখা যায়। তাছাড়া ভিত্তিও হলোই যে হাসাবে না এমন কোন কথা নেই। তবে ওরা কোন সময়েই দর্শকদের সিমপ্যাথি পায়না, বরং শেষ দৃষ্টি নিরোমণি বখন বলে—সর্বনাশ, ও আমাদের সর্বনাশ করবে। দর্শকরা তখন হাসে, বলতে চায়—কেমন মজাটা টের পাও।

শিবোমণি বোগেশনা খুবই ভাল করেছিলেন, কতকগুলো চরিত্র ত ঠিক মত আর কেউই করতে পারে না।

যোড়শীতে শেষ পর্বন্ত বলা হচ্ছে—জমিয়ার থাকবেনা, শোবক থাকবেনা, থাকবে শুধু ঐ চাবীর দল।

হঠাৎ পড়া খামিরে বললেন—আজ এই পর্বন্ত থাক। এবার পর করা যাক।

রাজনীতিকদের সবচেয়ে আলোচনা শুরু করলেন—রাজনীতিকদের মধ্যে বিপিন পালের মত এমন বাগ্মী দেখিনি। আজও যেন স্তনতে পাচ্ছি—‘রক্তাক্ত রণক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে স্বরাজের রথ ঘর ঘর লাফে চলিয়া যাইবে।’

বিপিন বাবু মোটেই সাহসী লোক ছিলেন না, আর সে কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। ফেডারেশন হলের মাঠে মিটিং-এ ঠকে বখন টাকার তোড়া দেওয়া হয়, উনি তখন নিজেই ধলিয়েছিলেন, ঘরের ভেতর থেকে বখন দেখেছি বাইরে ব্রীজের ওপর দিয়ে চলেছে ট্রামগাড়ী আর তার মধ্যে বসে আমারই দেশের ভাইবোন—ভাদের হয়েছে খোলা আকাশ আর প্রচুর আলো হঠাৎ! আর আমার ছোট ঘর, আকাশ পর্বন্ত ছোট হয়ে গেছে, তখন ভেবেছি, দিই লিখে, বা ওরা চায় লিখে দিই।

রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী Consistent ছিলেন উনি। আর কি ঠাট্টা আলামারী বক্তৃতা। আমি পান্ডুর মাঠ, ফেডারেশন হলের মাঠ ইত্যাদি জায়গায় ঠাট্টা বক্তৃতা শুনেছি।

রবীন্দ্রনাথ করতে পারতেন অনেক কিছু, কিন্তু করলেন কই? কবিতার, গানে, গল্পে উনি অনেক কিছু দিয়েছেন মানি, কিন্তু নাটক বা উপভাসে কি দিলেন? নাটকও লিখেছেন মোটে দুটো।

একজন বললেন—উপভাসের দ্বারকে বহুমুখ নতুন পথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বললেন—উপভাসের দ্বারা বহুমুখ নতুন পথে নিয়ে গেলেন বলছি, কিন্তু তার আগে কি উপভাস ছিল? ছিল ত গল্প। নতুন বলতে বা বোঝায় তা কোথায় ছিল? অবশ্য দশকুমার চরিত্রে অনেক গল্পের গল্পের কাহিনি আছে। একজনকে ত বলেছিলুম যে, সিনেমা করতে চাও ত দশকুমার চরিত্র কর।

রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের প্রেতিভার সমাদর করেননি। উনি আর জ্যোতিবাবু হুই ভাই মিলে খুঁত ধরতে বসলেন। প্রথম নিকের লেখার ত যথেষ্ট নিদে আছেই। সেগুলো লক্ষ্য করা উচিত বললেও পরে আবার ঠাট্টা কবিতার ছন্দে কি দোষ, তাকে কি ভাবে লেখা চলত তাও লিখেছেন।

একমাত্র কিছুটা সমালোচনা লিখেছেন বহুমুখের, তাও যেভাবে লেখা উচিত ছিল, সেভাবে মোটেই লেখেননি। অথচ লিখতে উনি পারতেন।

একজন বললেন—বিভাগসাগরের সবচেয়ে ভাল লিখেছেন উনি।

বললেন—বিভাগসাগর সবচেয়ে কি লিখেছেন জানি না, তবে হয়। ঐ একটা চরিত্র, ঠকে নিয়ে বিরাট একটা নাটক লেখা যায়। বিরাট বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য—ঠক সাংগিতিকটে বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে রসময় লাহার সই আছে ওতেই সব কিছুই বিশদ বর্ণনা আছে। উনি বেদান্ত, শ্রুতি, ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, জায়, সব কিছু জানতেন। অথচ দেখে ঐ বকম পণ্ডিতকে গর্জন ইয়াংএর মত বাচ্চা সিভিলিয়ান অপমান করতে পারে। উনি বখন টাকার ছাড়লেন, তখন ঠকে রাখার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু উনি থাকলেন না। তবে তিন মাস সময় চেয়েছিলেন, বলেছিলেন—অনেকগুলো স্থল খুঁজে, অনেক টাকা খরচ হয়েছে, তার সমস্ত দায়ভার আমার বাড়ী পড়ে যাবে।

তার পরের দিন ফ্রেডারিক হ্যালিডে সাহেব formal জবাব পাঠালেন—When you have resigned, it is no longer necessary for you to continue.

মাছুষটার কেমন সাহস ছিল দেখ। বীর বাপ আট টাকা খোলা টাকা, বা চব্বিশ টাকার ২২শী কখনো মাইনে পাননি, ঠারই ছেলে অকৃতোভয়ে খণ করে চলেছেন। বিবাস আছে, বই লিখে সব টাকা শোধ করে দেবেন। আর দিয়েও ত ছিলেন। বই বা লিখলেন তাও সব বিভাগসাগর-পাঠা অর্থাৎ যাতে শিক্ষা বিভাগ হয় তার জন্তে। উনি যা উপক্রমশিকা লিখেছিলেন, সঙ্কট ব্যাকরণ শেখার তার চেয়ে ভাল বই আর হয় না। অথচ আজ সেকেণ্ডারি বোর্ড সে বই পছন্দ করেন না, ভাল নয় বলে। বিধবা বিবাহ দেবার আন্দোলন চালালেন একলা, তাও ইমোসানের ওপর নয়, শ্রুতির সাহায্যে।

বাড়িতে যে কেন ঠক সঙ্গে গোলযোগ হ'ল তা কিন্তু জানা যায় না। বাপ মা ছাড়া ভাইদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, কিন্তু কেন? নারায়ণ বিভাগসাগর বলছেন—কলহই হল। কিন্তু কেন?

একজন সুপ্রচিতিত থিয়েটার-মালিকের নাম করে বললেন—সে আজ এসেছিল। বলছিল অল্প ছুটো হলের তুলনায় বিক্রী কম হচ্ছে, তবে লোকসান হবে না। কোন রকমে খরচ চলেও কিছু লাভ থাকবে। একশ রাত পার হলে আবার একটা বাড়ি খেয়ে ভাল করে চলাতে পারে।

তাকে আমি বললুম—বাবা, পরসার ত তোমার অভাব নেই, আর পরসার তোমাদের থিয়েটারের দৌলতে। তা থিয়েটারের যাতে উন্নতি হয় সে কাজ ত তোমার করা উচিত।

তাতে বললে—বলুন, কি করতে হবে?

বললুম—কিছু লেখা-পড়া জানা লোক নাওনা কেন? মাইনে ত খুব খারাপ নাওনা, বাট টাকার ত আজকাল কি-এ পাশ পাওয়া যায়।

তাতে বললে—সে হবে না।

রবীন্দ্রনাথ নাকি শারদোৎসব আর কি একটা বই করেছিলেন শান্তিনিকেতনে—রবী বাবু লিখেছেন, যা নাকি খুব ভাল হয়েছিল। রবিবাবুর প্রোডাকসনের মধ্যেও ভাল হয়েছিল ডাকঘর সিখলিক স্টেট-এর জন্তে, আর তাদের দেশ—অপেরা। এমনি নাটকে উনি স্বীকার করেছেন আমাদের প্রোডাকসনই ভাল হয়েছে। উনি আমার ওপরেই ভাব দিয়েছিলেন, অথচ ঠক অফিসিয়াল বারোগ্রাফিকে লেখা হচ্ছে, উনি নাকি অস্বীকার করে বই

লিখেছিলেন। কেন বইটা লিখেছিলেন? উনি মণিলালকে চিঠি লিখেছেন—আমি বাইরে বাছি, বাতে গোলমাল না হয় ত'ই শিরিরে ওপর প্রয়োগের ভার দিয়ে বাছি।

সে চিঠি নাচবের ছাপা হয়েছিল। অথচ বলছে অক্সফোর্ডে লেখা হয়েছে। ও ত এক চিরকুমার-সভাতেই নেবেছিল। ঐ বইটাও কিন্তু উনি আমাকেই লিখে দিয়েছিলেন। তার প্রথম অভিনয়ের কাটা বইএ কাগজ মেরে রবিবার হাতে লেখা কাবেকশন, এতকাল আমার কাছেই ছিল, এখন এই নতুন বাড়ি বসলাতে গিয়ে হারিয়ে গেল। তপতীর কাটা কাগজ মেরে কাবেকশন করা বইটা এখনও আছে।

একজন বললেন—এসব কথাই উত্তর দেন না কেন?

জান হাসলেন—উত্তর দিও হবে বলে ত কোন দিন ভাবিনি।

চিরকুমার সভাটার বিয়েটারে অভিনীত হবারও একটা কাহিনী আছে। বইটা পাবার পর আমি অল্প বই অভিনয় করছি, সেই সময় প্রবোধচন্দ্র গিয়ে ঠেকে বললে—এই ত শিরিবাবু একদিন বেখে দিয়েছেন, এখন আবার অল্প বই করছেন। উনি করবেন না। কান পাতলা লোক ছিলেন ত, তখন ঠেকে দিয়ে গিয়ে।

সাজাহান নাটকের কথা উঠল, বললেন—সাজাহানে ঐ যে দুজ্ঞে পাগল হয়ে বলাচ্ছ, তুমি বজা, আমি তড়িংশিখা, সব ঝালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিই। তারপরই আছে—দুই লাক, দেব লাক। আগের দুজ্ঞা কেউ করে না, অথচ ঐ দুজ্ঞা না করলে সাজাহানের পাগল হওয়ার কারণটা বোঝা যায় না।

বিনয়রা বললেন—আপনার মত সবাই ত বুঝে অভিনয় করেন না, আর করতেনও না।

মাথা নাড়লেন—না না, ঠিকি বলছ। আমার আগে কেউ বুঝে অভিনয় করবে না কেন! ও কথাটা ত ঠিক নয়। তোমরা ত আর কেউ গিরিবাবুর অভিনয় দেখনি। ওরা ত চরিত্র বুঝেই অভিনয় করতেন।

গাড়ীতে বেতে বেতে বললেন—টি. বির কল ত চোখের সামনেই দেখলুম, বাদের টাকা পরয়া আছে, তারা যে কেন চিকিৎসা করে না, চাপা দিতে চায়, বুঝি না। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক কোটিপতি। ছেলের অসুখের কথা চোপে রাখলেন, তারপর শেষ পর্যন্ত লসনে গিয়ে চিকিৎসা করে সারল। হয়ত আগে গেলে বেশী ভাল হ'ত।

১৩ই নভেম্বর এসেন, সেদিনকার প্রথম কথা হ'ল—আজকাল ফিউরিয়া সীল কেউ পড়ে। কত তাড়াতাড়ি ডেটেড হয়ে গেল দেখ। অথচ আমাদের সময় খুব পড়ত।

নানী জনের মদ খাওয়ার কথা হলে বললেন—মদ অস্ত্রশেলের লোকেরাও খায় কিন্তু এতটা মাতাল হয় না। আর মদে জ্ঞানলোপ হতে গেলে অস্ত্রও বহুর দশেক খেতে হয়।

এবার নিউইয়র্কের একটু স্মৃতি বললেন—নিউইয়র্কে দেখেছি একই চেনা হলেই ফ্লাট করে।

ডিসেম্বরে নাট্যাংসবের কথা পাকা করতে বিনয়রা' আগের দিম ওর বাসায় গিয়েছিলেন, সেই কথাই বললেন—বিনয় কাল আমার ওখানে গিয়েছিল।

বলা হ'ল—আমরা জানি, বাবার আগে আমাদের সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছিল।

আমাদের একজনকে বললেন—বিকেল পাঁচটার সময় তুমি এখানে ছিলে? ডাক্তার মানুষ বিকেল পাঁচটার সময় এখানে বসে কি করছিলে? কণী বুকি ডাকেনা এখনো?

বলা হ'ল—না, তবে আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে ডাকবে নিশ্চয়। তাছাড়া হাসপাতালে কাজ করি, প্রাইভেট প্রাক্টিস করা চলেন।

হাসলেন—ঘন ঘন ডাকে এইত আশা করি। হাসপাতালে কাজ করা অবশ্য ভাল, কোন হাসপাতালে কাজ কর?

হাসপাতালের নাম শুনে বললেন—বাং, বেশ ভাল জায়গা ত! জানানো হ'ল—কিন্তু জি-আই-পিদের বড় উৎপাত, বড় অস্বস্তি করে।

হাসলেন—ও উৎপাত এখন সর্বত্র। আগে এটা ছিল না। যখন থেকে রাশ আলগা হতে আরম্ভ করেছে, তখন থেকেই এরকম চলেছে। আমি যখন হাসপাতালে—in the thirties তখনই দেখেছি—আমার কাছে অনেক আসত, খাবার ফলটল দিয়ে বেত, তাতেই curious হয়ে সিষ্টার আমাকে জিগ্যাস করেছিল—তুমি কে? কি কাজ কর?

বললুম—তুমি যা ভাবছ তা নয়। I am an actor by profession, তাই অত লোক আসে।

—ভি. আই. পি কথাটার পুরো হ'ল Very Important Person.

একজন বললে—কথাটা আমেরিকানরা চালু করেছে।

বললেন—আমেরিকানরা চালু করবে কেন? তবে ওদের কথাই প্রথম অক্ষর নিয়ে abbreviation করার ওপর একটা হোঁক আছে। ওদের সোলজারকে বলে G. I., G. I. মানে General Issue। আমিহতে সব কিছুই জেনারেল ইস্যু, তাই সোলজারও জেনারেল ইস্যু। বৃটিশ আমিহতেও সোলজারকে বলা হয় টমি অ্যাটকিনস! ওদের রেডকোটও বলা হয়। জি-আই বলার আগে আমেরিকানদেরও কি একটা বলা হ'ত বলে পড়ছে না।

এবার পড়ব, কিন্তু বিনয় কি রায় এখনো আসেনি ত। মাতুলর গোছের কেউ না থাকলে কার কাছে পড়ব?

বলতে বলতেই বিনয়রা চুকলেন, তখন আবার বললেন—রায় এখনো এলোনা, আবার এসেই এক গালা বাজে বকতে শুরু করবে।

বই পড়তে শুরু করার ঠিক আগেই বললেন—আগের দিন আমরা ওয় অক্স ১ম দুগ্ন শুরু করেছিলুম, কিন্তু শেষ করিনি; কাজেই প্রথম থেকেই আরম্ভ করা বাক।

পড়তে শুরু করলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে জীবানন্দের সঙ্গে পথিকের কথা বলার অশ্রুটা পড়ে বললেন—এই যে পথিকের সঙ্গে কথা বলতেই সে 'বাবু' বললে জীবানন্দ ভাবছে, বললে জয়ীবার বাবু। 'কাল আসব' বলার মানে কিছু টাকা দেব।

যখন তাকে বললে—চল, তুমিকে গিয়ে একটু নাখ-গান শুনিবে। তখন সে তার গায়ের হোঁক লগ্ন টানতে বার, এবিধ

দিয়ে ছেঁড়া, ওদিক দিয়ে ছেঁড়া বেরিয়ে পড়ে! জীবানন্দ তখন নিজের গায়ের শাল খুলে তাকে পরিয়ে দেয়।

যে লোকটা দাবী চান্নের হাত ঘোছে, শাল পেতে শোর, তার কাছে একাজ করা মোটেই আশ্চর্য কথা নয়।

পশ্চিম শেতল খুব ভাল করেছিল, গানটাও ওরই জোগাড় করা।

এক জারগার নির্দেশ আছে ‘সভয়ে’, সেখানটা পড়ে বললেন— এই দেখেছ, এখানটা সভয়ে নয়, ঠাটা করছে। এটা শরৎদার লোব নয়, এরকম লিখে রাখা মানে আয়েচার পার্টির সর্বনাশ করা। ভারত ‘বন্ধু’ তৈরীকৃত’ করবে।

—মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে জীবানন্দ, অস্ত্রা সে কথা এখনও জানেনা। এবার জীবানন্দের সলাপ পড়ে বললেন,—বাস হেরে গেল বোড়ী, একেবারে complete defeat।

—জীবানন্দ সারারাত না ঘুমিয়ে যন্ত্রণার ছটফট করেছে। সকালবেলা পেট চেপে শুয়ে আছে। ইঁা, বলতে ভুলে গেছি, আগের দিন রাতে বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে যায়, ওকে কোনরকমে ধরে এনে, শুয়ে দেওয়া হয়েছে। এইসব গোলমালে ঘুম হয়নি।

পড়া শেষ করে বললেন—বইটা আরো ভাল করে করা যেত কিছু মাঝের তৃতীয় পক্ষের জন্তে আর হ’লনা। শেষের দিকটা অনেক বলছেন। মানে যেখানে যেখানে আমার সাজেশান মত লিখেছিলেন, সেখানে সেখানে নির্মমভাবে মুছে ফেলবার চেষ্টা করেছেন। এ একধরনের ছেসেমায্য। অথচ উনি লিখলে লিখতে পারতেন, কিন্তু এ যে লোকেরা বোকা, তুমি এমন লিখিয়ে আর কে এক ভেড়ের ভেড়ে শিশির ভাবুড়ির কথা লিখবে। তা সে কথাত শুধু শরৎদাকেই বলেনি, কীরোদনাকেও এ একই কথা বলেছে।

বোড়ী আমি পছন্দ করে নিয়েছিলুম। উনি আমার দিয়েছিলেন ‘পল্লীসমাজ’। ওটা আগে ঠার থিয়েটারকে দিয়েছিলেন। তা প্রথম দিনেই (বই) হার খেল, দু’তিন দিন পরে গোলমাল হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। তখন একহাতে খাতা আর একহাতে ছাতা নিয়ে এসে হাজির হলেন। (কথাটা আমার নয় স্মরণ)। এসে বললেন—শিশির, এটা তুমি নাও। আমি টাকা পরস্যা চাইনা, কেটেছুটে বা খুসী কর, শুধু দেখিয়ে দাও বইটা জমে।

সুখা বলেছিল—বনমালী পাড়ুই বলে যে ফুল মাষ্টারের চরিত্রটি আছে, ওকে হোরেশিয়ো করে দিল। Ramesh is an inexplicable character। ওকে বোঝাবার জন্তে বনমালী পাড়ুইকে ব্যবহার করুন। আপনার ভাষার শুধু খুব বেশী আর শিশির বলতেও পারে ভাল, বেশ চলে যাবে।

তাইতেই ত চটে গিয়েছিলেন।

শেতল পাল বখন যে চরিত্রই করেছে, তাই ভাল করেছে। ওর ভেতর একটা কিছু ছিল। বেদেশনাও ত খুব ভাল অভিনয় করেছেন। উনি ছিলেন সত্যিকারের character Actor—a character of unusual brilliance.

বিজয়া খুব সুইট বই, চার্লস গার্ডিংয়ের লেখা বইএর মত— বিশেষ কিছু পদার্থ নেই, তবে হিউম্যান এলিমেন্ট আছে, আর হিউম্যান এলিমেন্ট থাকলেই জমে যাবে।

প্রভা বিজয়া বড় ভাল করেছিল। অবশ্য কোন্ বইটাই হাও ভাল পাঠ করেন? গিরিরাস পাট্টাই হোক আর হাসির পাট্টাই হোক, বড় পাট্টাই হোক আর খুব ছোট পাট্টাই হোক, সবভাবেই সে ভাল অভিনয় করেছে। তার সব চেয়ে বড় অপরাধ সে বাড়লা দেশে জন্মেছিল।

বাঙলা নাটকের আর মঞ্চের একটা সত্যিকারের ইতিহাস লেখা হ’ল না। সবাই জানল নাটক বা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। গিরিশ বাবু’র বাদ গেলেনই, রবীন্দ্রনাথের তপতীও নাটক নয়, নাটক হয়েছিল পাঠি অফিস (ডাক ঘর)। আমার নিজের জন্তে কিছু মনে হয় না, দুঃখ হয় গিরিশবাবুর জন্তে।

বাঙলা নাটক সবচেয়ে আগের কথাটা লিখেছে মুলুক রাজ আনন্দ। মুলুক রাজ একখানাও বাঙলা নাটক কখনো দেখেনি, অথচ কেমন মতামত লিখে বসল। আর আশ্চর্য কথা, তার একটা প্রতিবাদ পূর্বস্র কেউ করলেন না।

একজন প্রশ্ন করলে, আপনি যে এতগুলো নাটক করেছেন, তার মধ্যে কোনটা আপনার পছন্দ বেশী?

বললেন—সব কটাই পছন্দ, নয় ত করব কেন? কোন বিশেষ চরিত্র সব চেয়ে ভাল লাগে বলতে পারব না, বখন বোটা করি তখন সেটাকেই সব চেয়ে ভাল লাগে।

রবীন্দ্রনাথ বড় স্পর্শ-কাতর ছিলেন। টমসনের ব্যাপারটা নিয়ে কি কলেঙ্কারী ব্যাপার ঘটালেন। নিজেই উত্তর লিখলেন।

বিনয়দা’ বললেন,—না, ওটা নীহার বারের লেখা।

বললেন,—নীহার বার লিখেছিল? কি জানি! আমি কিন্তু লেখার সময়েও দেখেছিলুম, বখন পড়েন তখনও শুনি। আমার জিগ্যেস করতে গেলেন, আমি পালিয়ে বেড়াতে লাগলুম। শেষ পূর্বস্র ধরে নিয়ে গেল। আমি শুনে বললুম—ওটা আমার মতে না ছাপালেই ভাল।

ওর ভাল লাগল না, আমার ওপর রাগ হয়ে গেল।

রাত হয়ে গেছে, এবার উঠলেন। গাড়ীতে বসে বসে বললেন—আচ্ছা, আজকাল আর জগদ্ধাত্রী গুলো হয় না? ওগুলো করাতো শক্ত, গৃহস্থের পক্ষেও, পুরোহিতদের পক্ষে ত বটেই। সব কিছু দুর্গাপূজার মত অথচ করতে হবে একদিনে। আজকাল সংস্কৃত মন্ত্রকে বাড়লা করা দরকার, আর কিছু হোক আর নাই হোক, তাতে লোকে অন্ততঃ বুঝতে পারবে।

১০

ইতিমধ্যে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে, ডিসেম্বর মাসের ১১ই থেকে ১৪ই পর্যন্ত ইউনিটার্সিট ইনস্টিটিউট হলে নাট্যাংশব হবে। এও ঠিক হয়েছে নব্য বাঙলা নাট্য পরিষদের নিজস্ব প্রচেষ্টা হিসেবে পরে ‘মালিনী’ মঞ্চস্থ করা হবে আর সেই জন্তে আপাততঃ সোমবার সোমবার তার মহলা চলবে। পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন এবার থেকে হবে শুক্রবার; আর সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে দরকারমত নাট্যাংশবের নাটকগুলোর মহলা চলবে।

১৪ই নভেম্বর এ নিয়ে আলোচনা করতে এলেন। প্রথমেই বললেন—আলমস্ট্রী ত করা দরকার। আলমস্ট্রীর প্রথম করি

১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর। তারপর ১৯২২ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৩৫তম বাবিকী পর্যন্ত কবি আমার বাড়িতে। ১৯২৬ সালেও কেমন একটা যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল যাতে ১০ না ১১ তারিখে করেছিলুম। খালি বাব বায় ১৯২৭ সালে। সেবারও হয়েছিল ২৩শে ডিসেম্বর—সেটা অনেক পরে। ১০।১১ তারিখ হলেই সবচেয়ে ভাল হয়। প্রথম দিন চুটার কথা বলব আর কি।

আলমগীরের পোষাক-টোষাক সব সময়েই ভাল ছিল। রাখালদাকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছিলুম—সে অব্ধ ১৯২৪ সালে। কিন্তু মদন কৌশলানীর সময়েও বেশ ভাল ছিল পোষাক। রাজেন সেন সেই সময় কতকগুলো ছবি চুসেছিল।

একজন বললে—বিশ্বরূপার ত ছবি আছে আপনায়!

বললেন—সেটা হাফবাই ত! ওটা ত কাগজ থেকে তৈরী করা। মণিলালের নাচবার ছাপানো হয়েছিল; সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে। ছবিটা অ্যালায়েড থিয়েটারের পেছনে বাগিয়ে তোলা।

রাজেন বাবুর কাছেই ছবির কাটাচগুলো ছিল। উনি ১৯৪২ সাল নাগাদ আমায় বিতে চেয়েছিলেন। তাতে আমি বলি—কোথায় রাখব ওসব।

তিনি ত মারা গেছেন, সে সব কাটাচ আছে কিনা কে জানে?

আলমগীর করতে কি আমার কম কষ্ট পেতে হয়েছে? যে বা আবার করেছে সব স্তন্যতে হয়েছে। ঐ ঘোব বলে একজন তব্বর থা করেছিল, সে বললে—ঘর ফাটিয়ে ডাকলাম। ইত্যাদি কথা না থাকলে পাঠই করব না।

কুসুমকে নিয়েও কি কম হাস্যামা? সে আমায় এসে বললে—ম্যানেজার বাবু (তখন সবাই আমার ম্যানেজার বাবু বলত), দেখুন, আমি হুপুবে বেলায় আসব।

আমি বললুম—সে কি, কেন?

বললে—না, মানে, ছোট ছোট মেয়েরা দেখবে আপনি আমায় শোখাচ্ছেন, সে আমার লজ্জা করবে। অব্ধ শোখা আমার দরকার, কেননা এরকম ত আমরা শিখিনি। তাই বলছিলাম কি, হুপুবে বখন কেউ থাকবেনা, তখন এসে শিখে নেব।

আমি বললুম—তা না হয় নেবে, কিন্তু কথাটা কি চাপা থাকবে?

তাতে বললে—আপনি রাজী থাকলেই হ'ল, বাকীটা আমি ব্যবস্থা করে নেব।

কি আর করি, তাতেই রাজী হতে হ'ল।

ডাঃ অধিকারী বললেন—কুসুমের শেষ দিকের অভিনয় আমার ভাল লাগেনি।

বললেন—কুসুমের শেষদিকের অভিনয় তোমার ভাল লাগেনি বলছি, কিন্তু ও ত তিরকাল একই রকম অভিনয় করেছে। তবে তখন সকলেই ওই রকম অভিনয় করত তাই বোঝা যায়নি। ওর চেয়ে তারামুন্দরীর ব্যক্তি ছিল বৌ আর অভিনয় বৃকতও বৌ। কুসুম কিন্তু নাচত খুব ভাল। শেষের দিকে দেখেছি ঐ অতবড়

শরীরটা নাড়ছে কিন্তু পা'কেলার আওরাজ হচ্ছে না মোটে। চাককে বললুম—দেখ, তোমরা দেখে শোখো।

তা সে বললে—কুসুমদি' আমাদের চেয়ে ভাল নাচে।

আমি বললুম—নাচো তোমরাও ভাল কিন্তু কুসুমের কমতা আছে, ওই অতবড় শরীরটা ফেলছে অথচ পায়ের কোন আওরাজ নেই।

আলমগীর করার সময় প্রথম দিকে একদিন খুব গোলমাল হয়েছিল। এদিকে ত খুব বিক্রী হচ্ছে, তার ওপর লেডিজ সিনে'র কোন নম্বর নেই, বত পেরেছে বিক্রী করেছে। বসবার বা জায়গা ছিল সব ভর্তি হয়ে গিয়ে, বন্ধ পর্যন্ত ভর্তি করে বসে আছে তারা। কালীবাবু, জ্যোতিষবাবু খুব ভুলটোছুটি করছে, এদিকে বন্ধ কিনেছে যে সব বড়লোকেরা তারাও এসে হাজির—মহাবিশ্ব। মেয়ে'র বলতে যেতেই তারা ধমকে উঠল। একজন বলল—জায়গা বখন নেই টিকিট বেচেছে কেন? যেখানে জায়গা পেরেছি সেখানেই বসেছি। ওঠাবে কেমন করে দেখি? বৌ' কথা বললে এক চড় মারব।

বীরঙ্গনা তখনও ছিল এদেশে! সেদিন থিয়েটার আরম্ভ করতে এক স্টা দেয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কি করে মিটমাট হয়েছিল জানি না।

রাজসিংহ করতেন ললিতবাবু। প্রথমে অব্ধ করেছিলেন প্রবোধ ঘোষ। পাঠ খুব মন্দ করেননি, তবে স্বরটা ত ছিলই।

একটি বিশেষ চরিত্রের নাম করে বললেন—এটা করত 'অনুক'। চেহারাটা খুবই সুন্দর ছিল আর পাটও ভাল করেছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু নেশাবোর হয়ে গেল। অব্ধ মোব খুব নেই। নজরবদা চেহারা দেখে একটি মেয়ের ভাল লাগল। ও তার খম্মরে পড়ে গেল। বাপ-মাকে ছেড়ে উয়ার কাছেই এসে রইল। তারপর তাকে ছেড়ে একজন, তারপর আর একজন, এমন করে সব মেয়ের পাঞ্জায় পড়ে শেষ পর্যন্ত মরফিয়া ধরল।

আমি একবার ওর নেশার ফল দেখেছিলুম। তখন আমরা লক্ষ্যে গেছি! অভিনয়ের আগে দেখি একেবারে হটকট করছে, চোখের দুটি কেমন বোলা-বোলা; ঘাড় লটকে পড়েছে! ভর পেরে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হ'ল। এদিকেও খবর নেওয়া হ'ল—একজন অভিনেতা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন; উনি একটু সুস্থ হলে, না হয় বলল! একজনকে তৈরী করেই নাটক আরম্ভ করা হবে।

ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে গেছে, ওকে দেখে-টেখে বললে—কোন ভয় নেই, এখনই ঠিক হয়ে উঠবে। ফুঁড়েও দিলে। বাস, পনেরো মিনিটের ভেতর অঙ্গ মামু'ব।

ফেরবার সময় লক্ষ্যে গেলেন ওকে নিজে ইনজেকশন নিতে দেখলুম। কিছুক্ষণ হটকট করে ঘুবে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত চন্দুলজ্জা ত্যাগ করে সিরিজ বার করে পায়ের বাগিয়ে দিলে। দেখলুম, ওঘুটা ভরবার সময় থেকেই চেহারা বদলে গেল।

শেষদিকে ও বড় লোককে ঠাকাত।

ডাঃ অধিকারী বললেন—আমাকেও একবার ঠকিয়েছিল।

বলেন—তোমার মোটে একবার ঠিকইছিল। হাম, তাহলে ত তুমি ভাগ্যবান।

আলমগীর প্রসঙ্গ এতেন আবার—যখন মননে আমি আলমগীর করছি, তখন আমার কনট্রাষ্ট শেষ হতে আর মাসচারেক বাকী। অত্যা তখন বুড়োকে বুঝিয়েছে আমার নাম হলে অপুখিষে হবে, তাই ঝপাক করে আলমগীর বন্ধ করে দিলে। আলমগীরের পরে হ'ল আলিবাবা।

প্রশ্ন করা হ'ল আলিবাবার আপনি কি পাট করেছিলেন?

বলেন—আলিবাবার আমার কোন পাট ছিল না। তারপর হ'ল রত্নাবার।

আমি ছাড়বার পর নির্বলম্বে নিয়ে ওরা প্রতাপাদিত্য পুসল: বললে—আর কাউকে দরকার নেই, একলাই চালিয়ে দেবে। খুঁলেই ভীষণ মার খেল, তিন দিনের দিন বন্ধ হয়ে গেল। নির্বলম্বে মোটে তিরিশ টাকা মাইনে পেত।

তখন ত আমনিই ছিল। একসময়ে দানীবাবুও পেরতেন তিরিশ টাকা করে। তবে দানীবাবুর কোনদিনই খুব পশুশাশিটি ছিল না।

সেবুলা পুজোর সময় রাজস্থান বেড়িয়ে এসেছে, তাকে দেখে বললেন—এই যে বড় সেবু, কবে এসে? কতদূর ঘুরে এসে?

সেবুলা ফিরিঙ্গি দাখিল করলে—জয়পুর, উদয়পুর, চিতোর, অম্বর, আরবীর ইত্যাদি।

তখন বললেন—আজমীর ঘুরে এসে, তিলাকুটি, পাগলকুটি কেছে—শেঠ নেমিচাঁদের?

আমিও একবার ওখানে গিয়েছিলুম—এক আত্মীয়ের সুবাহে। খুব খাতিব বন্ধ করেছিল। সে অনেক কাল আগেকার কথা, আমি তখন কৈশোর-বৌবনের সঙ্কল্পে।

জয়পুরে ত অনেক বাঙালী ছিল। লোকে বলত—সংসার বাবুর বাসা, সুখবোনের বাসা আর রেসিডেন্সীর কোঠা।

কে একজন বললে—জয়পুরের মহারাণীও ত বাঙালী।

একটু বেন আদর্শ হলেন, প্রশ্ন করলেন—জয়পুরের মহারাণী বাঙালী?

সে উত্তর দিলে—হ্যাঁ, কোচবিহারের মেয়ে।

বলেন—ও, কোচবিহারের মেয়ে। কোচরা ত বাঙালীই নয় তবে তিনশো বছর আগে জোর করে ওরা বাঙালী হয়েছিল। আজকে কি আর চাইলেই তিনশো বছরের ইতিহাস তুলে বাবে? আজ্ঞা বল ত, বাঙালদেশের আবার সেদিন কবে আসবে, যেদিন জাড়াহাও বীকার করবে আমরাও বাঙালী হছি।

সেদিন আসবেই, তার বেশী দেরীও নেই।

একটু সময় চুপ করে বসে রইলেন, তারপর একেবারে অস্ত প্রসঙ্গ তুললেন—দানীবাবুর অভিনয়ের মধ্যে ছিল অপূর্ণ গলা, অমন গলা দেখা যায়না। তবে গিরিশবাবুর অভিনয়ের কাছে কিছুই নয়। গিরিশবাবুর অভিনয় প্রথম দেখি দম্বজ্ঞে—ওনি

সেজেছিলান দম্ব। এখনও মনে আছে—সবুজ রঙের সিঁড়ের লম্বাহাতা জামা পরনে। দানীবাবু হয়েছিলেন শিব। ওঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ গলার—কোথা বাই, কোথায় পালাই: হিলাম সন্ন্যাসী, হয়েছি সংসারী ইত্যাদি বললেন।

গিরিশবাবুর কিছু তুলনা হয়না। পরে একবার কমবাইও নাইটে জাতি দেখেছিলুম—পুরজন: দানীবাবু, নিরঞ্জন—অম্বর দত্ত আর বঙ্গলাল—গিরিশবাবু। সে অভিনয় দেখে মনে হয়েছিল—Girish Babu first and every body else nowhere।

দানীবাবু কিছু খুব বেশী পপুলার ছিলেন না, ওঁর নামে কোনদিনই খুব একটা লোক আসত না। সৈনিক দিয়ে অম্বর দত্ত ছিলেন হাজার গুল পপুলার। দানীবাবু প্রথম নাম করতে শুরু করেন ১৯০৭ সালে অর্ধেন্দুবাবু মারা যাবার পর। গিরিশবাবু তখন আর বড় একটা নায়েনই না; না বলেও প্রকৃততে বোগেশ আর বক্তাদানে বঙ্গশায়র। চন্দ্রশেখরে প্রথম দু-তিন দিন চন্দ্রশেখর করেছিলেন, তাও খুব কীকি দিতেন। শেষপর্যন্ত করতেন সুন্দরীর স্বামী—বরজামাই। পাটে ত কিছু নেই—নাচুস-হুহুস গোলগাল চেহারার হালুঘাটী কৌচানো কাপড়টি পরে এসে চুকতেন তারপর বাড় নেড়ে বলতেন—আজ্ঞে, আজ্ঞে কে শুনতে পাবে।

সুন্দরী যখন হাঁটু গেড়ে বসে গান ধরত, বলতেন—চুপ চুপ কে দেখতে পাবে।

ভূমিকার কিছু নেই কিন্তু কি অপূর্ণ অভিনয়। চরিত্রটা জীবন্ত হয়ে উঠত।

তবে বড় কীকি দিতেন। শেখানোর ব্যাপারেও তাই। ছুবার বললেন ত, ভাগ্য ভাল। তারপরেই বলতেন—বেশ বলেছিল বাবা। বেশ বলেছিল। তোর বয়েসে আমি ওরকম পারতুম না। এখন এগিয়ে গিয়ে চোঁচিয়ে বল।

আমিও বলি ওঁর নকলে।

দানীবাবুর বতদিন গলা ছিল ততদিনই নাম, তারপর আর কেউ মনে রাখল না। অভিনেতার গলা গেলে আর কিছুই থাকে না। যখন বুঝবে ওপরে হু অস্টেড (উঠছে না) আর নীচে এক অস্টেড নাবছে না (গলা) তখন তার অভিনয় ছেড়ে দেওয়া উচিত।

সিনেমা হবার পরেই অভিনেতার পয়সা পেলে। কুস্তমই বলেছিল—একদিন কাজ করবার জন্তে পঞ্চাল টাকা, তা বাপু করব না কেন বল?

এবার বললেন রবীন্দ্রনাথের কথা—রবীন্দ্রনাথের নাটক বলতে ত দুখানা—তপতী তার মালিনী। গোড়ায় গলদ শুধু কথা দিয়ে সাজানো, তবে কথা ঠা আছে খুবই সুন্দর। অথচ লোকে জানে রবীন্দ্রবাবু ভাল বই হ'ল ডাকঘর, তাসের বেশ; কিন্তু ওগুলো কি ঠিক নাটক হ'ল। ওঁর কোন বই-ই গাঁড়ানি, এমনকি তপতীও নয়।

[ক্রমশ:]

॥ মাসিক বঙ্গবতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাঙ্গিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

বঙ্গসংস্কৃতি ও চিত্রকলা

অশোক ভট্টাচার্য

বঙ্গসংস্কৃতি সম্বন্ধে তার বিপুলভার, উদ্বেগে এবং নিয়মানুযায়িতার কলকাতার বিভিন্ন বাৎসরিক অক্টোবর মাসের প্রথম আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কতৃপক্ষ তাঁদের সাধারণ্যবায়ী বাঙালী সংস্কৃতির সকল ধারাকে এক পক্ষকালিক সমন্বয়্যাপী এই সম্মেলনে তুলে ধরেন এবং নাগরিক বাঙালীকে প্রায় তুলে বাওরা প্রাণী সঙ্গীতাদির সম্পর্ক দান করেন। উদ্ভোক্তাদের এট প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রাণী অর্জন করেছে। এবারে একটি চিত্র প্রদর্শনীকে সম্মেলনের নতুন সংযোজন হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সংস্কৃতির অজ্ঞাত ধারার আলোচনার পাশাপাশি একদিন চিত্রকলা সম্পর্কিত আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই আলোচনার বর্তমান চিত্রকলা সম্পর্কে কয়েকজন ব্যক্তিনামা শিল্পী আপন আপন মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। আলোচনার ধারা মূলতঃ দুই ভাগে ছিল বিভক্ত। এক ভাগ শিল্পী আধুনিক চিত্রকলার নামে যে অচেতন জাতীয় শিল্প ঐতিহ্য-বিরোধী শিল্পচর্চা চলছে, তার বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করেন। অপর ভাগ শিল্পী বর্তমান বিশ্বচিত্রার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পে অবনতিরূপ প্রবর্তিত ধারা থেকে মুক্তি চেয়েছেন এবং আধুনিক চিত্রকলার হিসাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। শিল্পীদের আলোচনা সর্বদাই নৈর্ব্যক্তিক ছিল না এবং তর্ক কোনো কোনো সময়ে প্রায় বিতণ্ডার স্তরে পৌঁছেছিল। তবু এ প্রসঙ্গে একটি কথা না বলে পারা যায় না যে, আলোচনার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক শিল্পীই কিছুমাত্র তৈরী হয়ে এসেছিলেন। অথচ তাঁদের মুখনিঃসৃত বাণী শোনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট এবং বাইরে বহুজনই হয়েছিলেন সমবেত। আধুনিক চিত্রকলার প্রচার ও প্রসারের জন্য বক্তাদের অনেকেই অনেক উপায় উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের সামনে উপস্থিত জনতার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে উৎসাহ সঞ্চার করতে তুলে গেলেন।

আলোচনার দেখা গেল প্রত্যেক শিল্পীই আজিকার সম্পর্কে অত্যন্ত ভাবিত, জাতীয় না বিজাতীয় কোন ধারার এদেশের চিত্রকলার হবে অগ্রগতি—সে বিষয়ে সকলেই চিন্তাবিত। কিন্তু সমাজ-জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক, মানবজীবনের সাংস্কৃতিক উন্নতিতে তার বিশেষ কোন ভূমিকা কিংবা বঙ্গজীবনের প্রতি শিল্পীর মনোভাব, এ জাতীয় কোনো আলোচনার সূত্রপাত গুণ্য করেননি। এমন কি, বিষয় ও আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক বৈ সম্পর্ক—সে বিষয়েও কোনো আলোকপাত বিশেষ কেউ করেননি। অথচ হয় তো এ সব আলোচনাতেই দর্শক বা শ্রোতার চিন্তিত হবার সুযোগ পোতেন।

বঙ্গ সংস্কৃতির উদ্ভোক্তারা স্থির করেছেন প্রতি বছর তাঁদের সম্মেলনের অংশ হিসাবে একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন। এই সংবাদ অনেক তরুণ শিল্পীর মনেই উৎসাহ সঞ্চার করবে। কেননা, একাডেমির বাইরে কোনো জনপ্রিয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থার অভাব প্রতিদিনই অনুভূত হয়েছে। এ বছর প্রথম বছর। তাই

আয়োজনে জটিল থাকার সম্ভাব্য নয়। তবু যাতে আগামী বছরেও একই ক্রটির সমুদায় হতে না হয়, তাই উদ্ভোক্তাদের অল্পবোধ—তাঁরা যেন একটি প্রেক্ষাপট যথেষ্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। নচেৎ বড় ছবি দেখার ব্যবধান পাওয়া যায় না। তা ছাড়া রচনার মাধ্যমে বিচারে ছবিগুলি আলাদা করে সাজালে দর্শকের প্রতি এবং ছবির প্রতিও সুবিচার করা হবে। তা না হলে চক্কা তেল রঙের পাশে শাদা জল বা প্রায়ই অসহায় বোধ করে।

প্রদর্শনীতে প্রাধান্য তৈলচিত্রের। সাধারণতঃ এ বিভাগে বাঙালী শিল্পীরা অগুট হলেও একাধিক শিল্পী তাঁদের রচনার মোটামুটি নকশা দেখিয়েছেন। বিষয় নির্বাচনে এবং বস্তুসংস্থানে (Composition) তাঁদের অনেকেই চিত্রাচারিত ধারাকে পরিহার করেছেন। কিন্তু রঙের ব্যবহারে তাঁদের নৈপুণ্য অনেকাংশেই খণ্ডিত। কালো রচনার রঙের আধিক্য লক্ষিত হয়েছে, আবার কালো ছবি দেখে যেন হয়েছে যেন ইংলণ্ডে জাঁকা ছবি, সবই ঘোঁরাটে অথবা অস্বচ্ছ।

আলোচনার বিভাগে সব থেকে ভালো লেগেছে অল্প কয়র তৈলচিত্র জানালা (১৩)। আলোর উজ্জ্বল্যের বিভিন্ন মাত্রাভেদে সৃষ্ট এই ছবির শান্ত পরিবেশ মনোরম। এতে শিল্পীর সর্বস্ব পরিচুত, তবে বিদেশী ছবি মনে লাগে। শিল্পীর অজ্ঞাত ছবিও উল্লেখযোগ্য। সোমনাথ হোড়ের কয়েকটি ছবির মধ্যে সব থেকে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিত্র বিভাগ (১২৫) ছবিটি। কয়েকটি নিঃস্ব মাছুষের সমাবেশে এর বস্তু সংস্থাপন। নীল রঙের প্রাধান্য তাদের পাণ্ডুরতা ও প্রাণহীনতাকে কান্ডার শীতলতার পৌঁছে দেয়। প্রাথমিক প্রথম এই দেশের মাছুষ বলে চিনতে তাদের মুখ তাই তুল হয়। ঠিক অপর প্রান্তে শিল্পী অক্ষতী রায় চৌধুরী। তার 'চুপন' (৮) ছবিটি চোখে পড়ে বলিষ্ঠ বস্তু সংস্থাপন ও চক্কা রঙের জোড়। তিনি যদি রঙ ব্যবহারে একটু সযত্ন হন তবে ছবির রস প্রকাশে সুবিধা হয়, ছবিতে চোখ রাখা যায়। এ ছাড়া মুহাম্মদ চক্রবর্তীর 'প্রাণ সন্ধ্যা' (৮২), জামলী ঘোষের 'প্রতিকৃতি' (৭৩), আমিতা ঘোষালের 'গণাধার নগর' (৪) ও কল্যাণ কব্জর বর্ষা (৩৪) ভালো লেগেছে।

জলরঙে রচিত রজন সরকারের 'কলতলা' (৭৭) ও 'নদীর ধারে' (৭৮) ছবি দুটি উৎকৃষ্ট। রঙের স্মৃতি ব্যবহারে ও রেখার সঙ্গে তার সঙ্গতি সাধনে তিনি সার্থক হয়েছেন। বিশিষ্ট শিল্পী পূর্ণ হালোই-এর ছবি কটির মধ্যে দু-একটি একাডেমিক এবং দুইই প্রদর্শিত হয়েছে। না দেখা ছবি 'মানভাড়া' (৪৩) দেখে হন বড়বস্তই শিল্পীর প্রতি অনুগত হয়, খুঁই হন শিল্পীর ঐতিহ্যবাহী ধারার রচিত শান্ত পরিবেশ দেখে। গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু-একটি ছবি এবং সুভাষ দে-র জাঁক 'বিশ্রাম' (১৩১) অজ্ঞাত জলরঙের ছবির মধ্যে বিশিষ্ট।

প্রখ্যাত শিল্পী বঙ্গীর আদিনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাতটি ছবি ছিল প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ।



ডে: জেনারেল ডি, এন, চক্রবর্তী

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ও স্বর্গীয়]

বঙ্গালী একজন কেবল একদিন প্রাথমিক লাভ করেছিল।

কি রাজনীতিতে, কি সামাজিকক্ষেত্রে, কি সাহিত্যে, কি কাব্যে, কি বিজ্ঞানে, কি সাহসিকতায়—সকল ক্ষেত্রেই বঙ্গালী জাতি ছিল সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু সাময়িক ভাবে ও ঘটনা-পরম্পরার জন্য বঙ্গালী জাতির সে সুদিন অন্তর্মিত হলেও বঙ্গালী জাতির সে সুনাম বিলুপ্ত হয় নি। আজও বঙ্গালীর মধ্যে এমন লোক বেষ্টিত পাওয়া যায় যার তুলনা হয় না। এমনি একজন মানুষ হলেন ডে: জেনারেল ডি, এন, চক্রবর্তী। তাঁর কর্মনিষ্ঠা, সততা, এক অশ্রবসায় বঙ্গালী জাতির অমুপ্রেরণার স্থল। বঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নিজের কর্মরততার আজ তিনি সমগ্র দেশতে সুশ্রীতি। ভারত সরকারের প্রতিনিধি পদেও তিনি সশ্রদ্ধে অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অমুপ্রাণে ডে: জেনারেল



ডে: ডি, এন, চক্রবর্তী (স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর)

চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ভার গ্রহণ করেছেন এবং এ উচ্চতার আজও তিনি বহন করে চলেছেন অক্লান্ত ভাবে। জেনারেল চক্রবর্তী ইতোমধ্যেই স্বাস্থ্য পণ্ডরের প্রভূত উন্নতি বিধান করেছেন। সাধু, কর্মনিষ্ঠ এবং অক্লান্ত কর্মী হিসেবে তিনি জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মত একজন নিয়মস্বত্ব পোষক পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী তথা সরকার বহু হয়েছেন, একথা অনস্বীকার্য।

জেনারেল চক্রবর্তীর পৈত্রিক বাসভূমি পূর্ববঙ্গের ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত পঞ্চসার গ্রাম। তাঁর পিতা বিশপবিহারী চক্রবর্তী ডিগ্রি লাভের পর উত্তর প্রদেশে কলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে যান এবং সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তর প্রদেশই ইঞ্জিনিয়ারিং এর কর্ম গ্রহণ করেন এবং সে থেকেই এ বঙ্গালী পরিবারটি উত্তর প্রদেশের অধিবাসী হন। বিশপবিহারীর ছয় পুত্র ও এক কন্যা। তন্মধ্যে ডে: চক্রবর্তী তৃতীয়। তাঁর সমগ্র জাতাই উচ্চ পথে অধিষ্ঠিত।

১৮৯৮ সালে উত্তর প্রদেশের হায় বেরীতে ডে: জে: চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেনারস, এলাহাবাদ এবং লাক্ষ্মীতে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২২ সালে লক্ণৌ থেকে মেডিকেল ডিগ্রি লাভ করে ১৯২৪ সালে ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে পদ গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সশস্ত্র বাহিনীতে দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন প্রথম-জীবনে তাঁকে রাজকীয় বিমান কন্ডরের কার্যে যার লেভা হয় এবং এ কার্যেই তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, ইরান ও অজান্ত স্থানে অতিবাহিত করতে হয়। তাঁকে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্তে বিলাতে প্রেরণ করা হয়। তিনি বিলাতে চিকিৎসা বিষয়ে মাত্রাকান্তর শিক্ষালাভ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে জেনারেল চক্রবর্তী সর্দিগামী ও তাহার কারণ এবং চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ক গবেষণার প্রবৃত্ত হন। সে সময় উহাতে বহু সাধ্যক সৈন্য বিশেষতঃ বৃষ্টি সেনাঙ্গণ যত্নবরণ করত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ডে: চক্রবর্তীর গবেষণার ফলে বহু সেনার জীবনরক্ষা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হয় এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর জেনারেল চক্রবর্তী ভারত থেকে প্রথম সেনাবাহিনীতে মধ্য-প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রা করেন। তিনি মিশর, সিরিয়ার মস্কামি, সুদান, এরিট্রিয়া আবেসেনিয়ার গমন করেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেন। তিনি এই সকল দেশের ভাষা শিক্ষা করে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং এই সকল দেশের অধিবাসীদের বহু উপকার সাধন করেন। অবশ্য সেনাবাহিনীর লোকেরাও তাঁর কাছে বসেই সাহায্য পায়। তিনি সেনাবাহিনীরও উন্নতি বিধান করেন। এরিট্রিয়ার কেবেরের নুডে অগ্রগামী দলের নেতৃত্ব করেন ডে: চক্রবর্তী। এ কার্যের কৃতিত্বের নিদর্শন হিসেবে তাঁকে “অর্ডার অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার” এ ভূষিত করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনিই সর্ব প্রথম এই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি মিশরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন সৈন্যদের রেডক্রস কিংবা অন্য কোন সুখ সুবিধার ব্যবস্থা নাই। তিনিই মধ্য প্রাচ্যে সর্ব প্রথম ‘রেডক্রস’ সন্থা গড়ে তোলেন। কারণেতে তিনি এ সময়ে নিয়মিত বেতনও ভাষণ দিতেন এবং এঁতে সৈন্যদের মধ্যে সাহস, উৎসাহ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। কারণ এ সময়ে যির

বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে একটা হতাশার ভাব দেখা দিয়েছিল। একজনই তিনি নিয়মিত বেতার ভাষণের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪২ সালে মধ্য প্রাচ্যের অবস্থার উন্নতি হয়, এবং জে. চক্রবর্তী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সীমান্তে যুদ্ধের জন্ত সৈন্যদের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্র সংগঠন করেন। তিনি সেকেন্দ্রাবাদে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৪৩ সালে লক্ষ্যেতে ১৫ সহস্র সৈন্যের শিক্ষার অধিকর্তা নিযুক্ত হন। এ কার্যের জন্তে তাঁকে 'কর্ণেল' পদে উন্নীত করা হয়। তারপর মেডিকেল অফিসারদের শিক্ষা-কেন্দ্র সংগঠনের জন্তে তাঁকে পুনরায় বদলি করা হলো, এখানেই সশস্ত্র বাহিনীর কলেজ স্থাপিত হয় এবং সেনাবাহিনীর মেডিকেল অফিসারদের স্বাতন্ত্র্যের শিক্ষা-কেন্দ্র হিসেবে এখনও উল্লেখ্যমান আছে।

১৯৪৬ সালে যুদ্ধের অবসান হলে সেনাবাহিনীর কর্মীদেরকে অবসর গ্রহণের সমস্তা প্রবল ভাবে দেখা দেয়। এজন্তে পুন্যর একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হলো এবং জে. চক্রবর্তীকে ভার দেওয়া হলো কি প্রকারে অতিরিক্ত সৈন্য ও অফিসারদের অবসর প্রদান করা সম্ভব। কেন না, শান্তির সময় যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন হয় না। তিনি এই গুরু দায়িত্ব পূর্ণ কাজ কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করেন, এবং "এরপর কিছুকাল বোম্বাইতে মেডিকেল সার্জিসের সহকারী ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেন। প্রথম জীবনে রাজকীয় বিমান বহরের গুরুত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সাক্ষ্য মণ্ডিত কাজ করার জন্ত বিমান বহরের মেডিকেল সার্জিসের ডিরেক্টর করা হলো তাঁকে। নয়াদিল্লীতে তাঁর সদর কার্যালয় স্থাপিত হলো এবং তাঁকে বিমান বহরের গুপ্ত ক্যাপটেন পদ দেওয়া হলো। ১৯৫০ সালে জে. চক্রবর্তীকে প্রেয়ার কামোদ্ভার করা হয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর মেডিকেল সার্জিসের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হয়। এর পরেই পর পর কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত হতে হয়। ১৯৫১ সালে ওয়েস্টার্ন কমান্ডের ডেপুটি ডিরেক্টর, ১৯৫২ সালে মেডিকেল সার্জিস (সেনাবাহিনী) এর ডিরেক্টর এবং ১৯৫৩ সালে সেনাবাহিনীর মেডিকেল সার্জিসের ডিরেক্টর জেনারেলের গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন পশ্চিম বঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট তাঁকে তাঁদের কাজের জন্তে প্রদানের অমুরোধ করেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অমুরোধে ভারত সরকার তাঁকে ডিরেক্টর জেনারেলের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অব্যাহতি দেন।

জে. জেনারেল চক্রবর্তীর মত কর্মদক্ষ কর্মচারী অতি বিরল। তিনি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও শুণী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদালাপী, অমায়িক, বন্ধু-বৎসল, স্নায়বশীল। তাঁর অপূর্ণ কর্ম-নিষ্ঠা ও লক্ষ্যতা, সাহস, ভারতীয় জনগণের অমুরোধের বস্তু। এ বস্তুতে তিনি যেভাবে কর্তব্যকার্য সম্পাদন করেন, তা অফিসারদের অমুকরণীয়। তিনি একটি মিনিটও অপব্যবহার করেন না। তাঁর কর্মদক্ষতার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাহ্য-কণ্ঠের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এরই মধ্যে। এই অস্বাভাবিক মানুষটি দীর্ঘজীবন লাভ করে দেশের ও জাতির সেবা করুন; এ প্রার্থনাই আমরা শ্রীকৃষ্ণবানের নিকট জানাই।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

[কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের পালিত (রসায়ন) অধ্যাপক]

“ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের বৃত্ত্য আম'কে খুবই আকৃষ্ট করেছে

—শুধু আমার সেজ দাদা বলে নয়—তিনি ছিলেন আমার বড়বাবের শুভাকাঙ্ক্ষী, সুস্থ ও পথ প্রদর্শক। আমার ছাত্র জীবনের ভিত্তি তাঁহারই হাতে পড়া—উল্লেখ্য হইবে তাঁহারই পরিচালনায়—ছোটখাট, সরলমনা ও মাজিত কচিসম্পন্ন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ আমার জানালেন তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়ে।

হুগলী জেলার ঐতারকেশবের কাছে স্বগ্রাম ঘরগোহালে ১৯০০ সালের এপ্রিল মাসে ভূপেন্দ্রনাথ জন্মান। এগার বৎসর বয়সে বাপ' ওরামচন্দ্র ঘোষকে হারান। মা ওরনোরমা দেবী ছিলেন প্রতাপ নগরের দুহিতা। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ—তাই অল্প দিন দাদার আন্তরিক শ্রেহ-ভালবাসা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেজ দাদা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও ভারতমাতার অন্ততম সুসজ্জন পরলোকগত ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের প্রচুর প্রভাব পড়েছে ভূপেন্দ্রনাথের জীবনাদর্শে।

ছেলে বয়স থেকে তিনি বাড়ীতে পড়াশুনা করেছেন আর বাবার সঙ্গে ঘুরতে হয়েছে বিহারের স্থানে স্থানে। একবার তাঁহার আত্মীয়-জ্ঞাতাদের পাটনা সহরের গৃহে বেড়াইতে যান এবং তাঁহার ভূপেন্দ্রনাথকে স্থানীয় রাজা রামমোহন রায় সেমিনারী স্কুলের ম্যাট্রিক ক্লাসে ভর্তি করান। সেই সময় তথাকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। ১৯১৭ সালে তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি পান—কিন্তু সেই বৎসরই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হইয়ায় উল্লেখ্য হইতে বঞ্চিত হন। আই, এস, সি পাশ করিয়া অন্তঃস্থতার তত্ত্ব এক বৎসর পড়া বন্ধ থাকে। কিন্তু ১৯২২ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কেমিস্ট্রী অনার্স সহ প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রথম হন রায় পরিবহন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সিভিলিয়ান শ্রীবতীন্দ্রনাথ তালুকদার। ১৯২৪ সালে তিনি এম, এস, সিনে



ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রথম প্রেমী প্রেম হল। অধ্যাপক হিসাবে তিনি পেতেছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডক্টর পি. সি. মিত্র, ডক্টর জে. এন. মুখার্জি প্রভৃতিকে। ইহার পর এক বৎসর বহু ইন্সটিটিউটে তার কর্মদীপন প্রভুর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন। ১৯২৬ সালে ডকটরস বৃত্তি পাইয়া তিনি নভেম্বরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে যোগ দিয়া অধ্যাপক এক, জি. ডোহনের অধীনে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯২৯ এর মে মাসে তিনি "Roll of Electrokinetic behaviour of Colloids" নামে প্রবন্ধ দাখিল করিয়া 'ডক্টরেট' লাভ করেন। ইহার পর ছয় মাস গবেষণার ময় থাকেন। পরে যুরোপ ঘুরিয়া ১৯৩০ সালে ডক্টর যোব স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র যোব তাঁতাকে এক্সিক্যালচারাল কেমিস্ট্রী পড়ার জন্য রথারফোর্ড-এ যোগদান করিতে নির্দেশ দেন—কিন্তু শরীর ধারণ হওয়ার তিনি নিবৃত্ত হন।

১৯৩২ সালে তিনি কসৌলী ম্যালেবিয়া সার্ভেতে রিসার্চ কেমিস্ট হিসাবে যোগ দিয়া দুই বৎসর থাকেন। ১৯৩৪ সালে তিনি তার পি. সি. রায় রিসার্চ কেলো রুপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। পর বৎসর তিনি Physical কেমিস্ট্রীর লেকচারার নিবৃত্ত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি "রীডার" হন ও ১৯৫০ সালে তার তারকনাথ পরীক্ষিত অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

তার গবেষণার বিবরণ হল :—

"Separation of Toxin & Enzyme from Snake Venom", "Chemistry of Antigen & Antybody Reaction", "Collides".

ডক্টর যোব ভারতীয় কেমিক্যাল সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহঃ সভাপতি হইয়াছেন ও ১৯৪৪ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের নির্বাচিত হন।

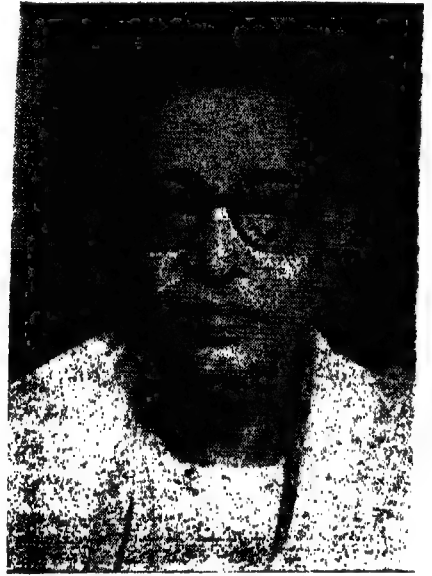
১৯৩১ সালে তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সত্যলোকানন্দ্রিত ডক্টর নরেন্দ্রমোহন জন্তের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার সহধর্মিণী হলেন দেবি ব্রাবোর্ণ কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপিকা ডক্টর শ্রীমতী সত্যী যোব। শ্রীমতী যোবের কনিষ্ঠা ভগ্নী হলেন ডক্টর নবরোণাল দাসের সহধর্মিণী অকশশিলী শ্রীমতী উষা দাস।

কথায় কথায় ডক্টর যোব বলেন—রাজনীতিতে কোন সময় যোগ দিই নাই, কিন্তু ১৯০০, কলেজ স্ট্রিট্‌য় যেসবাতীতে বিপ্লবী নেতাদের খুবই আনাপোনা ছিল এবং আমি তাঁদের বেশ ভাল করেই চেনেছিলাম। উক্ত মেসেব পরিচালক ছিলেন ডাঃ নীলরতন বর। আর সেখানে থাকতেন ডক্টর জ্ঞান মুখার্জি, ডক্টর জ্ঞান যোব, ডক্টর নীলরতন বর। খুবই আসতেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীমতীস্বনাথ বর—আর প্রায়ই দেখা যেত "বাঘা বতীন" প্রভৃৎ বিপ্লবী নেতাদের। পরবর্তী কালের ভারতীয় বৈজ্ঞানিক দিব্যালয়ের সঙ্গে থাকার সুযোগ হইত আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তোলার সাহায্য করেছে।

শ্রীবক্তিমাস্ত্রে কর

[পশ্চিমবঙ্গ-বিধানসভার অধ্যক্ষ]

সত্যতা, কর্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থাকলে মানুষ বড় না হ'য়ে বার না। এরই বলস্বত্ব দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গ-বিধানসভার বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীবক্তিমাস্ত্রে কর। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং নিজের অধ্যবসায়ের বলে তিনি আজ পশ্চিমবঙ্গ-বিধান-

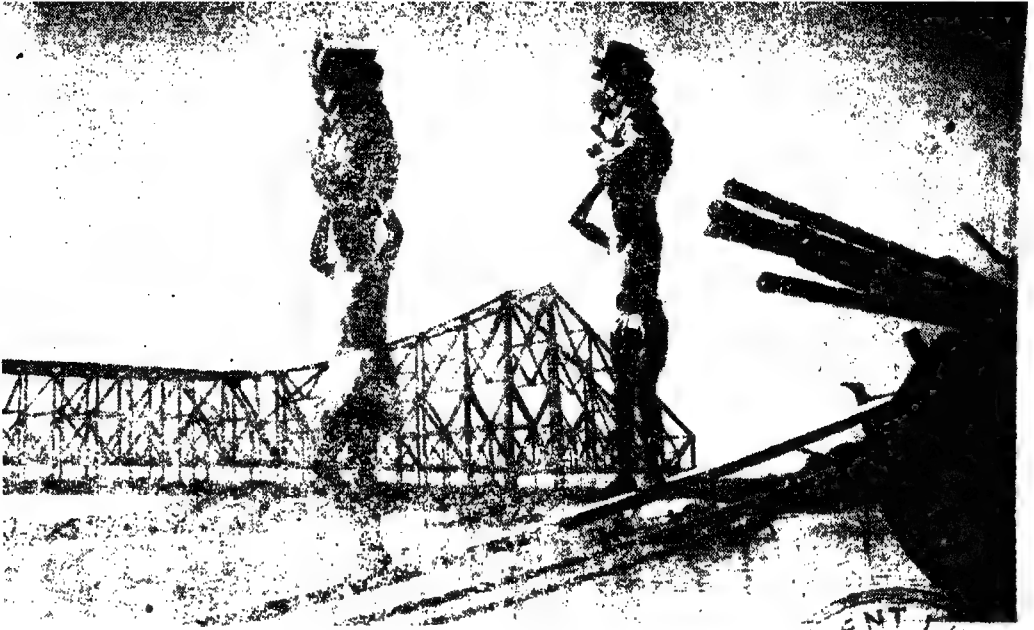


শ্রীবক্তিমাস্ত্রে কর (পাঃ বঃ বিধানসভার অধ্যক্ষ)

সভার অধ্যক্ষ। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আহ্বানে তিনি এম.এ ও ল' পরীক্ষা না দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি বিপ্লবী নেতা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের সাংস্পর্শে আসেন এবং তৎকালী বিদ্যামন্দিরে যোগদান করে দেশসেবার আত্মনিয়োগ করেন। শ্রী কর পশ্চিমবঙ্গের খাজমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সাংস্পর্শে এসে আত্মসম্মানের বড় ডোহল খানি প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি কংগ্রেসের সমর্থক এবং একজন সক্রিয় সদস্য। চিদিনই তিনি দেশের কাজ করতে ভালবাসেন এবং এখন পর্যন্ত নানা ভাবে দেশের সামাজিক, শিল্পনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে সক্রিয় ভাবে যোগদান করে দেশ ও জাতির অগ্রগতির সাহায্য করছেন। জাতি ও দেশসেবাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এখনও অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চলেছেন।

১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হাওড়ার লক্ষণ দাস লেনে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রী কর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় অমৃতলাল কর ছিলেন হাওড়া ষ্টেশনের চীফ ক্লার্ক। ১৯১২ সালে প্রথম রেল বর্ষব্যবসার সময় তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন।

শ্রী করের প্রথম শিক্ষালাভ হাওড়া এম.ই. (বর্তমান হাওড়া টাউন) হতে। কিছুকাল ঐ স্থানে শিক্ষালভের পর তাঁহার পিতা কাসিম বাজারে বসি হইয়া যান। শ্রী করও চলে যান তাঁর পিতার সঙ্গে এবং খাগড়া এস, এম.এস, ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হন। কিছুকাল ঐ স্থানে শিক্ষালভের পর শ্রী কর হাওড়ার চলে আসেন এবং আই, আর, বেলজিয়াম ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হন। ১৯১৫ সালে উক্ত বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার



ইষ্টকনগরী কলকাতা

॥ আ নো ক চি ড় ॥

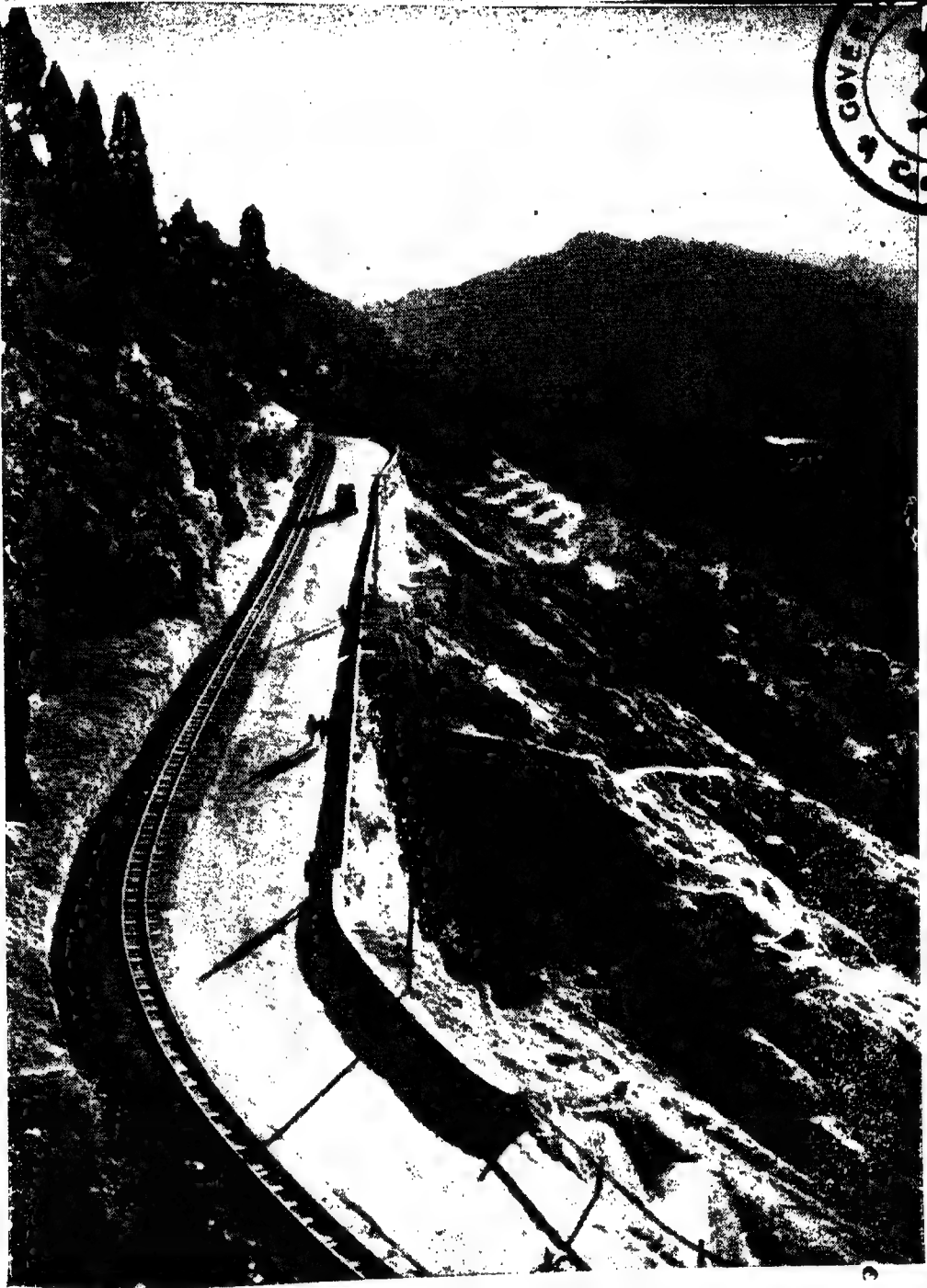
কিমাক্ষ্যম্।





নাগিকা স্মৃতিরা (অরলিপি চিত্রে)

—হেমেন খিল



সীমান্তের পথে

—স্বকীয় পাল

উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯১৭ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বিভাগীয় কলেজে প্রবেশ করেন। ১৯১৯ সালে বি-এ পরীক্ষায় কৃষ্ণাখ্যাতা লাভের পর উত্তীর্ণ হলেন এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও ল' স্নাতক। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দফতর আরম্ভ হলো অসহযোগ আন্দোলন। ছাত্রেরা সারি সারি প্রবেশদ্বারে শয়ন করে থাকে। পরীক্ষার্থীদের এই সকল অসহযোগী ছাত্রদের পদচলিত করে পরীক্ষা দিতে হয়। শ্রী কর এ অসহযোগী ভাবে পরীক্ষা দেওয়া অপেক্ষা পরীক্ষা না দেওয়াই স্থির করলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন। তারপর প্রায় দুই বৎসর তিনি নানা ভাবে দেশের সেবা করেন। ঘরের কষ্টের সংবাদ পেয়ে তিনি হাওড়ায় ফিরে আসেন এবং ১৯২৩ সালে নন কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে এম-এ ও ল' পরীক্ষা দেন এবং সম্মানে উত্তীর্ণ হন।

এর পরেই শ্রী করের কর্মজীবন শুরু হলো। ১৯২৪ সালে তিনি প্রথম আলিপুর জজকোর্টে যোগদান করেন এবং পরে হাওড়া কোর্টে আসেন।

সে সময় থেকে তিনি হাওড়া কোর্টেই জাইম হাবসাস করেছেন। ফৌজদারী মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন।

শ্রী কর ইলওয়েল আন্দোলনের সময় থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে তিনি হাওড়া পৌরসভায় কমিশনার নির্বাচিত হন এবং ২০ বৎসর (১৯৫০) পর্যন্ত তিনি পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি হাওড়ার পাবলিক প্রেসকিউটর নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে হাওড়া পশ্চিম কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসেবে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে শ্রী কর এ একই কেন্দ্র থেকে পুনরায় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে হাওড়ার জনসাধারণের সেবা করে আসছেন।

শ্রী কর বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তন্মধ্যে হাওড়া গার্লস স্কুল, হাওড়া গার্লস কলেজ, হাওড়া টাউন স্কুল, হাওড়া জিলা কংগ্রেস, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, হাওড়া জিলা ইকাস' কংগ্রেস, হাওড়া সমাজসেবা সমিতি, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রী কর ১৯২২ সালে 'প্রখ্যাত সর্বাধিকারী পরিবারের নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর কন্যা মঞ্জরী ললিতা দেবীর সহিত পরিণয়গ্রহে আবদ্ধ হন। নগেনবাবু ছিলেন তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর পঞ্চম ভ্রাতা। শ্রী করের তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা।

শ্রী কর গত কয়েকদশ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

শ্রী অমূল্যচন্দ্র দত্ত

[বিশিষ্ট হোটেল-পরিচালক]

বহির্বিশ্বে বহু বাদ্দালী শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, আইনজীবী অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে সুপরিচিত। কিন্তু আগ্রা নিবাসী শ্রী অমূল্যচন্দ্র দত্ত হলেন এক ব্যতিক্রম। আগ্রা

মধ্য ও দিল্লীর 'আগ্রা হোটেল'-এর স্বাধিকারী ও সর্বব্যবসায়ী হিসেবে শ্রী দত্ত সাহা ভারতে বহুজনবিস্তৃত।

অগ্নী নন্দগোপাল দত্ত তদীয় সহযোগী অধিকারীদের লইয়া গুগ্রাম বড়িশা (২৪ পরগণা) হইতে একশত বর্ষ পূর্বে উত্তর প্রদেশের জেলবিভাগে কথ্য লইয়া আসেন ও পরে তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হন। ইহার তৃতীয় পুত্র অমূল্যচন্দ্র ১৮৮৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মাতুলাল সাহাভায়ানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতুল কালীঘাটের স্বর্গত নন্দলাল মিত্র সেই সময় সেখানকার জেলা-শাসকের দপ্তরে চেড ক্লাক ছিলেন। মিত্র মহাশয়ের সখ্যী ছিলেন মীরটের প্রথম বাদ্দালী আইনজীবী কালীপদ বসু আর কোর্ট জামাতা ছিলেন ডেপুটি জাজ সাহা নিবাসী ও সচিবাত্মক কৈলাসচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম বন্ধু, পরলোকগত নারায়ণচন্দ্র বসু (বোগজা)। শ্রী দত্তর বাল্য ও কৈশোর মাতুলের নিকট অতিবাহিত হয়।

আট বৎসর বয়সে তিনি মোহাম্মদান চার্চ মিশন স্কুলে ভর্তি হন ও এখানকার বৎসর বয়সে লক্ষ্মীর Queen's Anglo-Bengali School এ প্রবেশ করিয়া আঠার বৎসরে তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পূর্বে তিনি পিতৃহারা হন। লক্ষ্মীর কাল্পি কলেজে পড়িবার সময় অর্থাভাবে তিনি চাকুরীর চেষ্টা করেন। খেলা-ধূলা ও কুস্তিতে পারদর্শী হওয়ায় ১৯০৩ সালে তিনি ইউ, পির পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করেন। এক বৎসর পরে তিনি সাধারণ বিভাগ হইতে রেলওয়ে পুলিশে বদলী হন। তখন তিনি প্রদেশের বহু জায়গায় হাফাতা করিতেন। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি রাজাজীব পদে উন্নীত হন। কিন্তু এক হাজার টাকার জমানত সংগ্রহে খুব অসুবিধা দেখা দেয়। সেই সময় লক্ষ্মীর সুরেন্দ্রনাথ বসু বিনা বিধায় উক্ত অর্থ দিয়া তাঁতাকে সাহায্য করেন। সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও শ্রীদত্ত রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক কাজে নিজেকে জড়িত করেন। উত্তর প্রদেশের বিশিষ্ট আইনজীবী, লক্ষ্মীর প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান ও পরে হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীগোকর্ণনাথ মিশ্রের সহকর্মীরূপে দীপ্ত হই বৎসর নানাজগৎ সামাজিক কক্ষে লিপ্ত থাকেন। তখন প্রাকঃস্বর্ণীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কালী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাথে অর্থসংগ্ৰহে উদ্যোগী হন। গোকর্ণনাথের নিকট অমূল্যচন্দ্রের কথা শুনিয়া মালব্যজী শেষোক্তকে আহ্বান জানান। শ্রী দত্ত সঙ্গে সঙ্গে বিনা বেতনে দুই বৎসরের ছুটি লইয়া পণ্ডিত মদন মোহনের সহকারী হইয়া এই মহান প্রচেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেন। এই সময় তিনি স্বর্ণলতা, সোভিনি নাইডু ও ভারতবাবো অজ্ঞাত নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। দেশের কাজে জাতীয়তাবাদী নেতাদের সহিত অমূল্যচন্দ্রের এত নিকট-সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বৈদেশী সরকার তাঁহার সততা ও কর্মনিষ্ঠার জন্য কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা দেন নাই।

১৯২১ সালে তিনি আগ্রার বদলী হইয়া আসেন এবং ১৯৩০ সালে স্বৈচ্ছায় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পশ্চাতে একটি ঘটনা আছে। ১৯২৯ সালে দেশজোড়া আন্দোলন শুরু হয়েছে। আগ্রা শহরে দুইটি বাদ্দালী তৎপর হইত হন।

অমূল্যচন্দ্র সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীয়ের পক্ষে জামিন হইয়া তাঁহাদের স্বর্গহে লইয়া আসেন। বর্জ্জনক এই ব্যাপারে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করেন। ইহার উত্তরে শ্রী দত্ত পরত্যাগ পত্র পেশ করিয়া লিখেন, “আমার কর্তৃত্বান্বিতায় যদি আপনাদের কিছুমাত্র অবিধাঙ্গ আসিয়া থাকে, তবে আমার আর এই কাজে থাকা উচিত নয়।” তৎকালীয় হলেন কুমারী শান্তি দাস (বর্তমানে শ্রীমতী শান্তি কবীর) ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র।

ইহার পর আরম্ভ হয় এক নতুন কর্মধারা। এর সূচনা হয়েছিল কয়েক বৎসর পূর্বেই। চাকুরী ছাড়ার পর ইহার পূর্ণ রূপদানে তৎপর হলেন অমূল্যচন্দ্র। ১৯২৬ সালে বৃন্দাবন ধামে কুম্ভমেলা বসেছে। বাংলা দেশের বহু বাত্রী তথায় সমবেত হয়েছেন। সেখান থেকে কেবীর গাথে সকলেই আগ্রার হাজির হন পৃথিবীর অশ্রুতম আশ্চর্য্য দর্শনীয় মন্দির-প্রাসাদ ‘জামমহল’ ও অশ্রুত ঐতিহাসিক-স্থাপত্য কীর্তিগুলি দেখিতে। স্থানীয় কালোবাড়ীর ক্ষুদ্র পরিসরে বাঙ্গালীর স্থান সংকুলান হয়নি— বিশেষতঃ মহিলাদের। কত অসুবিধা ও কত বিপদ যে হইতে পারে, পুলিশ কর্মচারী অমূল্যচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করেন। এনে দিল তাঁর মনে এক প্রেরণা—হির করলেন স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের—পল্লন করলেন ১৯২৬ সালে ‘আগ্রা হোটেল’-এর। যুখা উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালীর নিকরিতা, স্বল্প খরচে অবস্থান আর স্বমধুর ব্যবহার।

১৯৩০ সালে অবসর গ্রহণের পর অমূল্যচন্দ্র একান্তভাবে নিজেকে সমর্পণ করলেন ইহার শিখনে—ক্রমশঃ গড়ে তুললেন মধ্য ও দিল্লীতে ইহার শাখা—বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী তাঁহার কর্মমিপুণতায় ভরসী প্রকাশ্যে করলেন। আজও তাঁহার পরিচালিত ঐতিহাসিকের মধ্যাঙ্গা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দেশ ও বিদেশের বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি এখানে অবস্থান করিয়া সমুদ্র হইয়াছেন। “আগ্রা হোটেল” আজ বৃহৎ কর্মশালায় রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও অমূল্যচন্দ্র ও তাঁহার পুত্রদের অনাড়ম্বর, অমায়িক ও সরল ব্যবহার মনে রেখাপাত করে। শ্রী দত্তর প্রেরণাতেই উত্তর-ভারতে বাঙ্গালী পরিচালিত কয়েকটি বিশিষ্ট হোটেল গড়িয়া উঠিয়াছে।

ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত অমূল্যচন্দ্র ভারতবর্ষের অধিকাংশ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এককাল বহির্বঙ্গে বাস করিয়াও তিনি বাংলার ও বাঙ্গালীর কথা গভীর ভাবে চিন্তা করেন। উত্তর প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে তিনি তথাকার সমস্তা সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত আছেন।

১৯০৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর আগ্রার বিশিষ্ট বাসিন্দা ও সরকারী কর্মচারী ওড়ুবনেশ্বর ঘোষের তনয় শ্রীমতী মুণালিনীর সহিত শ্রী দত্ত পরিণয় হুত্রে আবদ্ধ হন। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে শ্রীমতী দত্ত পরলোকগমন করেন।

বাঙ্গালী উত্তরোত্তর ব্যবসারে লিপ্ত হোক—ইহাই শ্রী দত্তর ঐকান্তিক ইচ্ছা।

দেশলাই কাঠি

শ্রীবৈজ্ঞান্য দাস

এক টুকরো দেশলাই কাঠি
পাখিকলনের কেউ ফেল গেল
পাখের মাঝখানেই।
ঝিরঝিরে হাওয়ার তার নিভু নিভু ফুসকিটা
নতুন জীবন পেচো আর একবার।

কত জনে দেখেও দেখলোনা যেন—
চলে গেল পাখ দিয়ে,
কেউ আবার মনে করলো :
নিভিরে কি সেব এটা ?
দরকার কি মিছে জলবার ?
থাকগে, জলুক, পুড়ুক...
আমারই বা কি এত মাথাব্যথা ?

কেউ বা ভাবলো :
এই বেলা চুপিচুপি এটা দিয়ে
আগুন লাগিয়ে দি আবহুলের ঘরে

এঁ বাঃ, কে যেন আসছে—
তবে সরে দাঁড়াই।

সরে গেল।

আর একজনে কাঠিটাকে দেখে
ভাবলো অনেক...
বললো সে সবাইকে ডেকে :

এক কাজ করি এসো ভাই সব
চলো কিছু কাঠিটুকো দেখে শুনে নিরে আসি আগে
তারপরে এই কাঠির ফুলকি দিখে ঘরিরে সেগুলো
হাড়কাঁপা শীতের সন্ধ্যায়
সকলেই এসে বসে আগুন পোহাই।

সব শেষে সেই নিল তুলে কাঠিটাকে। আর...
অলঙ্ঘন ফুজিগটা মুচকি হেসে হেসে বুঝি
দেখেতে লাগলো বজা।
আর দেখলো মাঝবেকে।
সমস্ত...পৃথিবী জুড়ে

মুক্তিযুদ্ধে বাংলার সম্মানসা ও ফাকর সম্প্রদায়

ঐতিহাসিক জন সত্যচর্চা

১৭৬০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ জাতি বাংলার এক সম্প্রদায়ের লোকের সমগ্র বিপ্লবের কালে বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। উক্ত বিপ্লবীরা কি ধরণের লোক, একটানা ৪০ বৎসরের ওপর— তাঁরা কিভাবে সংগ্রাম করেছিলেন সামরিক শিক্ষার উন্নত শিক্ষাদানী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে এবং কিভাবে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা ভুলে বিস্মিত হতে হয়।

উক্ত বিপ্লবী সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল হিন্দুদের সম্মানসা এবং মুসলমানদের ফকিরদের নিয়ে। সম্মানসা ও ফকিররা সর্বভাষী এবং লোকালয়ের কোন ব্যাপারের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না—তা সামাজিক ব্যাপারই হোক বা রাজনৈতিক ব্যাপারই হোক, তাঁদের কাজ ঈশ্বরের সাধনা, ফলমূল আহাৰ এবং লোকালয়ের বাহিরে বসবাস, যেখানে থাকলে ক্ষুদ্র আর্থপরিভা, লোভ, মায়ার, মোহ মাদ্রয়ের মনকে লিপ্ত করতে পারে না।

কিন্তু ইংরেজ শাসনের কালে বাক্সলী জাতির দুঃখ-দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে চলেছে দেখে ঐ সর্বভাষী সম্মানসা ও ফকিররা স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরা মনে করলেন যে, দেশ ও দেশের কল্যাণে উদাসীন থাকলে ঈশ্বরের প্রেরিত উপাসনা হয় না, কারণ মানুষ ভগবানের অংশ এবং দুঃখ-দারিদ্র্যক্রিষ্ট, অত্যাচারের অবিচারে লজ্জিত জনসাধারণের সেবা করলে ঈশ্বর সুখী হন। আর তাঁরা দেখলেন যে, ইংরেজরা বিধর্মী এবং দেশের মঙ্গলের জন্য তাদের তাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। তাই সম্মানসা স্বেচ্ছক হলেন ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে এবং মুসলমান ফকিররা স্বেচ্ছক হলেন মজমুদার নেতৃত্বে। সম্মানসা ও ফকিররা একযোগে একই আদর্শ নিয়ে অত্যাচারী বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

পূর্বপরিচয়না অমূল্যে হিন্দু সম্মানসারী নানা জায়গা হতে এসে মিলিত হতেন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এক একটা বিশেষ ধর্ম-অনুষ্ঠান উপলক্ষে। পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ঢাকা জেলার লাললব্ধে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান উপলক্ষে সম্মানসারী সমবেত হতেন এবং কিভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়, কিভাবে জনগণের মঙ্গল আনয়ন করা যায়, এইরূপ বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা-আলোচনা করতেন। বিশেষ তিথিতে এবং বিশেষ দিনে প্রতি বছর গজাবান বা সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে অথবা বখাবাত্রার সময়ে—হিন্দুদের পবিত্র-তীর্থ পুরীতে গিয়ে তাঁরা মিলিত হতেন এবং ভাবী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতেন, দেশের লোকেরা তাদের ভালবাসতো এবং তাদের কাজের সমর্থন করতো।

মুসলমান ফকিরেরাও পাণ্ডুর দরগাহ, মালদহের আদিনি দরগাহ, গায়ে পাঁহাড়ের শাহ কামালের দরগাহ নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হতেন এবং পরামর্শ করতেন কিভাবে দেশকে ইংরেজদের করল হতে মুক্ত করা যায়।

সম্মানসা ও ফকিররা বুঝতে পারলেন যে, সংগ্রাম ছাড়া অব্যক্তি ইংরেজদের হাত হতে দেশের মুক্তি আনয়ন সম্ভব নয়। তাই তাঁরা বীরে বীরে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে আরম্ভ করলেন।

তাঁরা অস্ত্র-সংগ্রহ ও অস্ত্রশিক্ষার মন দিলেন। সুলতানের মধ্যে তাঁরা হয়ে উঠলেন ভাল লাঠি খেলোয়াড়, তাঁকেই স্বর্গী, তীর-বন্দর সন্ধান করে উঠল অব্যক্তি। ইংরেজ সৈনিকদের বন্দুক তাঁরা কেড়ে নিতেন শুধু—লাঠি চালিয়ে। কি কৌশলে লাঠি চালিয়ে—বন্দুককেও ব্যর্থ করে দেওয়া যায়, তা এমুগে আমরা বলনোও বসন্তে পারি না। বন্দুক ছুড়তে ও তরোয়াল চালাতে তাঁরা হয়ে উঠলেন খুবই পারদর্শী। বোড়-সওয়ারদের মত বোড়ার শিঠে চড়ে অঙ্গলমঙ্গল মধ্যে তাঁরা অনেকদূরে চলে যেতেন এবং সব জায়গায় বোগাবোণ রক্ষা করতেন।

দেশ ও দেশের হিতকামী এই সাধক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিল দেশের অগণিত লালিত, শোহিত, বঞ্চিত কৃষক, মজুর প্রভৃতি। এই বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের লোকজনদের ইংরেজরা বলতো ডাকাত, ইংরেজদের অত্যাচারে, অবিচারে, শোষণে যারা বাধ্য দিত, তাদের ডাকাত বলা শাসকের খুবই স্বাভাবিক, আসলে তাঁরাই ছিল তখনকার স্বদেশপ্রেমিক।

দেশের ও দেশের মঙ্গলের জন্য একদল সর্বভাষী সম্মানসা ও ফকির মিলিত হয়ে একটা বিশাল ও শত্রুত রাজশক্তির বিরুদ্ধে বৎসরের পর বৎসর যুদ্ধ চালিয়ে গেছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না।

সম্মানসারী বিভিন্ন জেলার কোলা স্থাপন করেন এবং ঐ সমস্ত কোলা হতে চালাতে থাকেন খণ্ড খণ্ড অভিযান। ঐভাবে ইংরেজকে বিব্রত করে—অনেক জায়গায় তাঁরা অনেক অত্যাচারের, অবিচারের প্রতিরোধ করেছেন। উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, পূর্ববঙ্গের মহম্মদসিংহ, ঢাকা ও বরিশাল এবং তখনকার পশ্চিমবঙ্গের বশোহরে ছিল তাঁদের কার্যকলাপের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

সম্মানসারীদের সঙ্গে ইংরেজদের বেলী যুদ্ধ হয়েছে উত্তরবঙ্গে। কুচবিহারের মহারাজের পক্ষে সম্মানসারী যে সংগ্রাম করেছিলেন, তাতে ইংরেজদের পরাজয় ঘটে এবং ইংরেজ সেনাপতি মরিসনকে সন্মিলিত পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। ঐ ঘটনার দু'বছর পরেই জলপাইগুড়ি জেলার এক যুদ্ধে মাইল সাহেব সম্মানসারীদের হাতে মারা যান। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কিং সাহেব বিশাল ইংরেজবাহিনী নিয়ে রংপুরে সম্মানসারীদের অক্রমণ করতে যান। কিন্তু তিনিও সম্মানসারীদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও সন্মিলিত নিহত হন। কিং সাহেবের মৃত্যুর পর ক্যাপটেন টমাস সম্মানসারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে দলবলসহ নিহত হন। এবার ইংরেজ সেনাবাহিনী মেজর ভগলাস ও ক্যাপটেন এডওয়ার্ডের নেতৃত্বে সম্মানসারীদের অক্রমণ করতে অগ্রসর হন। দুই পক্ষে প্রবল যুদ্ধ হল, সম্মানসারীদের যুদ্ধ জয় হয় এবং উক্ত সেনাপতিদের সন্মিলিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর ইংরেজের সঙ্গে সম্মানসারীদের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে—এবং অদ্রোশান্ত বনীবান অশিক্ষিত ইংরেজ সেনারা প্রতিটি যুদ্ধে সম্মানসারীদের হাতে পরাজয় বরণ করে।

মুসলমান ফকিররাও ব্রটিশের বিরুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বাথারগঞ্জ আক্রমণ করেন এবং কোম্পানীর চাণার ফ্যাক্টরী দখল করেন, বেগাতক দেখে ইংরেজরা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। এর কয়েক বছর পর ফেলমান সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজরা ফকিরদের আক্রমণ করে, ফকিররা ঐ মুহূর্তে অদম্য সাহসের পরিচয় দেয়।

ঐ সময়ে সন্ন্যাসীরা রামপুর-বাওয়ালিয়ায় ফ্যাক্টরী দখল করেন। যেটন সাহেব দলহলসহ সন্ন্যাসীদের হাতে বন্দী ও নিহত হন।

সন্ন্যাসী ও ফকিররা মিলিতভাবে চেষ্টা করেছেন কোম্পানীর অত্যাচার ও অবিচার বন্ধ করতে এবং প্রাণপণ শক্তিতে তাঁরা আঘাত হেনেছেন ব্রটিশ শক্তির ক্রিতিস্থলে। শেষ সাফল্য লাভহোক বা না হোক, আন্তরিক প্রয়াসের যে নাম, তাহা সাফল্যের নামের চেয়ে কম নয়।

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন বাঙ্গালীই প্রথম করে। মুক্তি কামনার হৃদবতার মাধ্যমে সে এনেছে বিপ্লবী চিন্তায় চর্যায় গতি, সে গতি বৌদন-জলন্তরঙ্গের মত ভয়ঙ্কর। সে কোন বিশপকে ভয় করে না, বিপ্লকে প্রাঙ্ক করে না, মৃত্যুকেও পরোয়া

হবে না, কালমার স্বাভাবিক প্রাণের আবেগে সে পাষণ্ড ভেদ করে তুটি করে উল্লস প্রোতপথ। এই বলিষ্ঠ স্বাধীনতার প্রাণময় প্রয়াস বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ব্রটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ইহাই ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব।

সর্বভাগী সন্ন্যাসী ও ফকিররা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিটি খণ্ড-মুহূর্তে জরী হওয়া সত্ত্বেও ব্রটিশকে তাহত থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেনি, কারণ তাঁদের বিপ্লব বাংলার বাইরে বিস্তার লাভ করেনি, ইংরেজ সেনাবাহিনী ছিল সংখ্যায় যিশুল, অশিক্ষিত এবং অস্ত্রবলে বলহীন, তাদের তুলনায় বিপ্লবী সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সংখ্যা খুবই কম এবং তাদের (সন্ন্যাসী ও ফকিরদের) অস্ত্রশস্ত্রও ইংরেজদের অস্ত্রের মত উন্নত ধরণের ছিল না এবং সামর্থ্যের অভাবে তাঁরা ইংরেজদের যুগপৎ সহ জায়গা হতে আক্রমণ করতে পারেন নি। তবে তাঁরা মিলিতভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে একটানা ৪০ বৎসরের ওপর সংগ্রাম চালিয়ে দেশবাসীদের শিখিয়ে গিয়েছেন যে, অত্যাচারী বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে চাই মনোবল, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টা এবং সশস্ত্র আন্দোলন।

আফ্রিকার গভীর অরণ্যে

মারাত্মক-রাক-ম্যাজিক

ডি, আর, সরকার

আজ আপনাদের নিকট যে আলৌকিক কাহিনী এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিব, তাহা আমার এক পশ্চিম-ইউরোপীয় বন্ধুর নিকট হইতে শোনা। তিনি ও তাঁহার পত্নী, তাঁহাদের আফ্রিকার জঙ্গলে ভ্রমণ কালে আইভরী কোষ্টের নিকট ইফাউব নামক এক পল্লিতে এই আলৌকিক দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কাহিনীটি যদিও ভয়াবহ কিন্তু সত্য। যে সময় সেখানকার বাসিন্দারা তাহাদের বাৎসরিক ফসল সংগ্রহ করিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করে, সেই সময় প্রতি বৎসরই একদল ম্যাজিক ক্রীড়া-প্রদর্শক সেই ভ্রমণে গ্রামের লোকদের কাছ হইতে কিছু উপার্জনের আশায় এই লোমহর্ষক ক্রীড়া দেখাইতে আসে।

গ্রামের লোকেরা যেখানে সবলে সমবেত হয়, ঠিক সেই স্থানে সুযোগ বুঝিয়া খেলুয়াড় খেলা শুরু করে। তাহাদের দলে থাকে কতকগুলি স্বাধাবতী বালিকা, ভূমভূমী প্রভৃতি বাস্তব, বাস্তবক ও নানা রকম খেলার উপকরণ। এরগুলির পোষাক সামান্য কৌশল, তাহাড়া খেলা দেখাইবার জন্য তাহারা কিছু টুকরা-করা কাপড়ের ফালী ব্যবহার প্রায় কোমরে পরে। ইহা খেলার জন্য তৈয়ারী হয়।

খেলার আরম্ভে শুরু হয় কয়েক মিনিট ধরিয়া একটানা বাজনা। দুই জন বলিষ্ঠ লোক চাংটি বালিকা সমেত খেলার প্রাঙ্গণে প্রথমে আসে। এই বালিকাদের বয়স চার হইতে

ছয় বৎসরের মধ্যে। বলিষ্ঠ গঠন পুরুষ দুটি লাল ভেলভেট দেওরা টুপী পরে, টুপীর ধারে ধারে কড়ির ঝালর গাথা এবং তাহাদের কোপিন হালুদ রংয়ের কাপড়ের—ঝরা-কিহক ও ছোট ছোট পিতলের ঘণ্টার দ্বারা আবর্ষণীয়। তাহাদের ঘন কৃকবর্ণ গাঞ্জের চতুর্দিকে সাধা রংএর চিত্র জাঁকা ও পায়ের গুটি থেকে নিচু অবধি থাকে মোজার মত বিচিত্র অঙ্কণ। সব সময়ই বাহা এক ভয়াবহ ও কৌতুহলপ্রদ দৃশ্য।

এইবার খেলা হয় শুরু। প্রথমেই বালিকাদের সমুদয় গায়ে এক প্রকার মালিশ লেপন করা হয়, বাহাতে ছুরির আঘাতে তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়।

সর্দার খেলুয়েটি একটি গরুর শিংএর ভিতর হইতে একপ্রকার গাঁচ তুল পদার্থ নিজের হাতের তালুতে ঢেলে মেরেগুলির গায়ে আর একবার মালিশ করে—বিশেষ করে তাদের কপালে, বুক ও পেটের উপর, সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার মন্ত্র উচ্চারণ করে। আমার বন্ধুর পাশে দণ্ডায়মান একটি ফরাসী জানা বালক তাহাকে বলে যে, ইহাতে মেরেটির গায়ে ছুরির আঘাতে কোনরকম ব্যর্থ হইবে না।

এই সব অভূত দৃশ্যের অবতারণায় আমার বন্ধু-পত্নী ভয় পাইয়া তাঁহার স্বামীর নিকট বলে—চল, এখান থেকে সরে পড়ি কিন্তু প্রবল বাজনার শব্দে সবার কথাবার্তা চাপা পড়ে। ভূমভূমীর বাজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তারপর হঠাৎ একেবারে

থেকে যায়। পুরুষ দুটি মেয়ে চারটিকে বেশ লজ্জা করে যার এবং লোকালুকী গুরু করে। যেন হয় যেন চারটি মহা-আকৃতি বল লইয়া খেলা চাইতেছে এবং দর্শকদের—বৈঠকীয় বড় করবার জন্য তাহাদের লোকালুকী আয়তন বৃদ্ধি করে। মেয়েগুলির মধ্যে হয় বা বেহনার এমন কোন চিহ্ন দেখা যায় না, যাঁহাতে অনুমান করা যায় ভাবিরা যত কি জীবিত। এক এক সময় যেন হয় যেন চারটি আবলুস কাঠের বড় বল লইয়া খেলা চাইতেছে, এক দ্রুত তাহাদের গতি। কিছু কিছু দর্শক জানায় যে তাহাদের Hypnotise করা হয়েছে। কোন কীবাণু মাছের দ্বারা ইহা সম্ভবপর, কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন।

হঠাৎ বাজনা থামে এবং মনোমলিক, কাছ থাড়ের তৈরী হাড়ের ছুড়ে লেওয়া হয়। কিছু সময়ের মধ্যে তাহা হাত-পা ছড়ায় যেন হয় যেন একটা সাপের বাণ্ডিল এবং জল সময়ের মধ্যে তাহারা উঠে এবং এমন স্তম্ভ সর্প নৃত্য করিতে থাকে যাহা সত্যি অপূর্ণ এবং যে কোন পেশাদার শিক্ষিত নৃত্য-শিল্পীকেও চক্কা এনে দেয়। তাহাদের নৃত্য যখন শেষ হয় যেন হয় যেন একটি বৃহৎ বজ্রপঙ্ক্ত পাক খুলিয়া মেয়েগুলির হাত, পা, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ একটি একটি করিয়া পৃথক হইয়া গেল।

কিন্তু এই সব খেলাগুলি হচ্ছে প্রকৃত খেলা—যা এখন দেখান হবে তার সূচনা মাত্র। পুরুষ খেলুড়েরা—এইবার বিংশ আবার প্রবেশন হলেন, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে বৃহৎ এবং লম্বা তাকুতির শাণিত ছুরিকা ঠিক কনাই থানার মাংস কাটার ভোজালী যন্ত্র। এইবার একটি বালিকা সাধারণত আর্চ হবার ভঙ্গি ত্যাগে পা রাখিয়া পেছনে শরীর দুইয়ে তাত দুটি মাটিতে ঠেকাল। আবার শুরু হল টমটম বাজ এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। যেন হয় যেন বাজকারেরা পাগল হয়ে গেছে। দলপতি পুরুষ খেলুড়ে একটি বৃহৎ কাঠের হাতুড়ী তাদের বাড়ির ভিতর থেকে টেনে বার করে, সজোরে মেয়েটির পেটে ছুরিকা বিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু অচুত বাপার যে, মেয়েটা কিছুমাত্র আভাব মিলেনা যে তার পেটের ভিতর একটি বৃহৎ ছুরিকা বিদ্ধ করা হল। সূর্য্যো আলোকে স্পষ্ট দেখা গেল—আঘাত এত জোরে হল যে আঘাতকারীর হাতের পেশী ফুলে উঠলো ও ছুরীর বাটের ওপর হাতুড়ীর আঙুল্য বাজনা বাজা সন্তোষ শোনা গেল। এই নিশাঙ্কণ আঘাত পর পর চারটি বালিকার উপর সমান করা হল এবং দর্শক-গণকে আহ্বান করে দেখান হল যে সত্যি ছুরিকা কোন রকম নকল নয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য বাপার হল তাদের পেটের উপর এক বিন্দু রক্তের চিহ্ন নাই। এবং মেয়েগুলির কোন রকম পরিবর্তন হল না। এইবার নতুন উত্তরে বাজনা ও খেলুড়ের উৎসাহ দেখা গেল।

বাত্তারেরা আবার বাজনা বন্ধ করল এবং খেলুড়েরা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিল, তাদের নতুন হুঃসাহসিক অভিযানের জন্য। কিছুক্ষণ পরে একটি ছোট বালিকা দৌড়ে একটি বস্ত্রান পুরুষ খেলোয়াড়ের কাছে গেল। দর্শকগণ গজ পাঁচ ছয় আরও তফাতে দাঁড়াল এবং নতুন খেলার স্তম্ভ সাগ্রহ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করতে লাগলো। চকিতের মধ্যে মেয়েটিকে একটি পুরুষ খেলোয়াড় কাঁধে তুলে নিল এক ধারে এবং অন্ধদিকে আর একজন দুইটি বৃহৎ ছুরিকা সোজা করে,

ফলার স্তম্ভ উপর দিকে করে। যে সব দর্শক এই খেলাটি আদৌ দেখবার স্বযোগ পোষণে তাহা একপ্রকার এমন লজ্জা উত্তারণ করল যাঁহাতে বোঝা যায় আর সব দর্শকদের মধ্যে যেন ভীতি সূচনা দেখা গেল, কারণ তাহা জানতো এবার যা দেখান হবে তা যত্নের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমার বন্ধুটি বলল যে অনেকে দাঁত দিয়ে নিচুকার ঠোঁট কামড়ে ধরে হইল কিন্তু তাহাদের চক্ষু হইল খেলোয়াড়ের মধ্যে নিবদ্ধ। দুঃ দুঃ শব্দে আবার বাজে ডুমডুমি। এই দৃষ্টের তুলনা করা যায় কোন সাবকাস্ মকে, যখন জামার একটি বিশেষ অরতারণার, প্রথমে একপ্রকার দ্রুত বাত ধরান করে ও হঠাৎ খেয়ে যায় এবং সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে একটি স্তম্ভ খেলার মধ্যে।

তারপর হিহাৎ গতিতে ঐ পুরুষ খেলোয়াড়টি—মেয়েটিকে জোরে ছুড়ে দিল সেই দণ্ডায়মান ছুরির উপর। গেল গেল শব্দে দর্শকদের



খুব জোরে সে মেয়েটির পেটে শাণিত ছুরী বিদ্ধ করিল
এক বৃহৎ হাতুড়ীর দ্বারা।

মধ্যে অনেকে তাদের চোখ বুলিয়ে ফেলল, কিন্তু হুভর্ত্তের মধ্যে আর একটি পুরুষ দৌড়ে ছুরির ঠিক এক ইঞ্চি উপর থেকে মেয়েটিকে লুক নিল। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে তখনও অনেকে নিশ্চিত হতে পারেনি যে মেয়েটি মৃত্যু না ভীষিত। এই দুঃ বার বার দেখান হল, পর পর অনেক বার। বারা দুর্কল চিত্ত তাহা দেখান থেকে পালিয়ে গেল। একটি আদিবাসী যে বহুদিন আবাদিনে বাস করে—সে আমার বন্ধুকে বললে যে, মহাশয় প্রতিবৎসর এই রকম খেলোয়াড়েরা এই স্থানে মারাত্মক ব্রাক ম্যাজিক দেখাতে আসে এবং একটি ছোট বালিকা এই খেলার মধ্যে নিষেধের জীবন বিসর্জন দেয়। ছুরির দ্বারা বিদ্ধ হয়ে।

(প্রত্যক্ষদর্শীর কাহিনী অবলম্বনে)



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

সেই যে মঞ্জু রক্তের দিক থেকে মুখ কিরিয়ে নেবে এলো তো একেবারেই এলো।

কিন্তু মঞ্জু এতোটা আহত হবার কি ছিল—সে তো জানতো রক্ত মম ধার? সে তো জানতো রক্তের সে খাওয়ার কোন পরিমাণ বোধ নেই? সে জানতো শুধু দেশী বাকবী নয়। বিদেশিনী বাকবীরও অভাব নেই রক্তের?

হী, সবই জানতো সে। কিন্তু মাসুকের কোন জানাই তার আপন-জানার বাহিরে এক পাও বাড়তে পারে না। তাই মঞ্জুর ধারণার রক্তের সব বন্ধুর চেহারাই এসে থেমেছিল গুর সঙ্গেই রক্তের বন্ধুর চেহারার। আর তা ছাড়াও জানা এবং শোনার সঙ্গে চোখে দেখার তফাৎ অনেক। কান যে কথা অনায়াসে অগ্রাহ করে—চোখ তা দেখে থমকে দাঁড়ায়।

জানার আর চোখে দেখার ভেতর আসমান-অমিন তফাৎ যদি না হতো তবে আজকের মাসুয় এমন স্তম্ভমনে ঘরে বসে খেতে-মুমোতে পারতো না—কখনই পারতো না—পাগল হয়ে উঠতো তারা। মাসুয় জানে না কোন কথাটা? বাঙালীন মাসুয়গুলোর মাথা গুঁষবার আশ্রয়টুকু থেকে গুরু করে খাওয়া, পরা, শিক্ষা স্বাস্থ্য—বাংলায় ব্যাপার নিয়ে এক ‘সেবা’ শব্দের দুর্গে বসে, এক ‘সেবা’ শব্দের নামাবলী গার জড়িয়ে যে, আমেরী আর অর্থলোভী খেলা বধেজ্ঞাচারে বর্তমান রাজনৈতিক পুঙ্খবরা খেলে চলেছেন,—চোখের আড়ালটাই তো তাদের একমাত্র বাচোরা। নইলে চোখের ওপর একটা সামান্য চোরকেও চুরি করতে দেখলে তাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে না তারা? অপকর্মকারীদের ওপর বাঁপিয়ে পড়ে না তারা?

—জানার যা সরে বাওয়া যায়, দেখার তার আদ্যেকও সর না—মঞ্জুর তাকায়ের গুটিভাতাও যে দেখার রক্তের এ জিনিষ গ্রহণ করতে পারবে না। আর আন্দর্ভা কি।

নেবে এসে শেষ শক্তিটুকু দিয়ে মঞ্জু পুলিশ ডাকল, গাড়ীর নম্বর নিল এবং ড্রাইভারকে গুকে বাড়ী পৌঁছে দিতে বাধ্য করল। তার পর গাড়ী চললে গরিতে মাথা রেখে একরকম শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। ক্রুদ্ধ পাঞ্জাবী ড্রাইভার এমন গতিতে গাড়ীটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চললো যে, যদি না পুলিশের কাছে গাড়ীর নম্বর থাকতো আর দুর্ঘটনা ঘটলে গুর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী এবং ড্রাইভারের বিনাশ এক সঙ্গেই ঘটবে—এই না হতো, তবে মঞ্জুর পক্ষে এভাবে চোখ বুজে থাকা

সম্ভব হতো না। ঘরে ঘরে বা হু একবার ক্রোধ ফুলল সে তা শুধু পথ বলে দিতে।

বাড়ী গিয়ে দিদি আর বৌদিকে আজ জরার সব কথা বলবে প্রথম বাস্তব মঞ্জু মনে মনে তাই স্থির করে ফেলল কিন্তু পর মুহূর্তেই মত পরিবর্তন করলো সে। কি লাভ হবে বলে? কিছু কিছু না। যদিও বৌদির হাতে টাকা আছে। বাবা মার কাছ থেকে সে নিয়মিত মাসোহারা পায়। প্রথম জন্মদাবসে সে হাত করবেও কিছু কিন্তু তার সেই আগ্রহ মন্দীভূত হয়ে আসতে সময় লাগবে না। তাই তার কাছে দান হিসাবে নেওয়ার চাইতে ধার হিসাবে নেওয়ারই সুবিধা বেশী। আর মৌরী? তার সামর্থ্য জো ওরই মতো। সে হয় ত স্তম্ভিত হয়ে বাবে—বিরক্ত হয়ে উঠবে মঞ্জু একটা গোটা সন্সার টেনে চলার হুঃসাহস দেখে। না, দরকার নেই। আজকের ট্যান্ডি ভাড়াটা সে এক বছর ধার চাইছে বলেই বৌদির কাছ থেকে নেবে।

দিদি বৌদি বাড়ী নেই। অল্পদিন হলে সমস্তদিন বাদে রাতে কিরে এতে আরাম বোধ করতো সে। কিন্তু আজ শরীর ছেড়ে এলো মঞ্জু। টাকা—টাকা কোথায় পাবে সে। নির্জন বাড়ী। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে। তার মানী পিসিমার বাড়ী নেই? থাকলে কি তিনি এমন বুধা ঘরে ঘরে বাতি জ্বলতে দিতেন। শুধু রান্না ঘর থেকে জোর খুঁজি নাড়ার শব্দের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে রান্নুর গান—মঞ্জুরই দেখানো সেই গান, ‘হরদম লাগাতা বাডু, তবি এছা হাল—হি: হি:, এতটা জ্ঞানল—’

গিয়ে রান্না ঘরের দরজার উকি দিল মঞ্জু—রান্নু কেউ বাড়ী নেই রে? গলা দিয়ে যেন স্বর বেরুতে চায় না মঞ্জু।

হাতের খুঁজি উপর দিকে তুলে ছানটা দেখিয়ে বাস্তু বলল—আছে ছাদে।

—কে দিদি বৌদি?

—না পিসিমা। আরো যেন কি বলতে বাচ্ছিল রান্নু—হয়ত মঞ্জুর দেবী করে ফেরা বা খাওয়ার কথা, কিন্তু ততক্ষণে মঞ্জু ছাদের দিকে ছুটেছে। যে পিসিমার কাছ থেকে টাকা নেবার কথা এতক্ষণ তার একবারও মনে হয়নি—বাপারটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায় বলেই মনে হয়নি, এখন সেই পিসিমা আছেন শুনেই যেন সে হাতে স্বর্ণ পেলে। ড্রাইভারের রুদ্ধ হাতের হর্শের শব্দ কানে নিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে উপস্থিত হলো ছাদে। ব্যস্তমস্ত ভাবে পিসিমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—শিগগির পিসিমা—শিগগির—গোটা চল্লিশেক টাকা ধার দেও তো আমায়। আমার এক বছর ভীষণ দরকার। কালই কিরিয়ে দেবে সে তোমার টাকা।

মঞ্জু যুগ্মের রেখার রেখার এমন কিছু ছিল পিসিমার মুখ দিয়েও টাকা না দেওয়ার কথাটা বেরুতে পারল না। যদিও কালই কিরিয়ে দেবার কথাটা তিনি আদর্শেই বিশ্বাস করলেন না—তবু জন্মের মালা খসিতে ভরে উঠে পড়ালেন। নীচে এসে টাকা বের করে দিতে দিতে একটা সংপরাশ্রম দেওয়ার মতো চোখের ইঙ্গিত করে চাপা কণ্ঠে বললেন—গোটা হুড়ি দে। চল্লিশ চাইলেই চল্লিশ দিদি কেন—বল মাসের শেষ হাতে নেই—

অর্ধেক মঞ্জু বলে উঠল—নাওনা। বলছি তো কাল দিয়ে দেবে। তেমন দরকার না হলে তোমার কাছে চাইতাম না কি—

‘তোমার কাছে চাইতাম না কি’ কথাটার স্কন্ধ হলেন পিসিমা। মুখ গোঁমরা করে টাকা বের করে দিলেন তিনি। টাকা হাতে নিয়ে

এতক্ষণে বস্তির নিঃশব্দ ফেলে ছুটল মজু নীচে। জমার চিত্তাঘর চাইতেও বেশী বিশদে কেলেছিল এই ট্যান্ডি ভাড়ার চিত্তাঘর। এবার টাকা না পেলে সে যে কি করতো! শিউরে উঠল মজু। না, ডাইভারের দোষ কিছু নেই। আজ তার উপর জুলুমই চলিয়েছে মজু। বিগড়ে তো বাবেই সে। বকসিশ শুধু টাকা ডাইভারের হাতে তুলে দিয়ে সত্যি সত্যি দুঃখ প্রকাশ করলো মজু। বললো, তার কাছে কিছুই ছিল না বলে বাধ্য হয়েই তাকে জোর করে বাড়ী পৌঁছে দিতে বাধ্য করেছে সে—সদারজী যেন কিছু মনে না করে। তার কাছে টাকা থাকলে সে নিশ্চয়ই সদারজীর সমস্ত দিনের ক্ষতি পূরণ করে দিত। তারপর বাওয়ার সময় গেল যে সদারজীকে নমস্কার জানিয়ে।

বসিও ত্রুহ দৃষ্টিতে রূঢ় হাতেই মজুব হাত থেকে একরকম টাকাকটা টেনে নিয়ে গুপতে গুরু করেছিল সদারজী—কিন্তু মজুব কথা শুনে খেমে গেল তার হাত। আর তারপর সমস্ত ক্ষতি পথটা মজুব শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্লিষ্ট—ছোট মুখটা বারবার তার চোখের ওপর ভেসে উঠতে লাগল আর বারবারই সে সমস্ত মাথাটা নাড়তে নাড়তে মনে মনে নিজের ব্যবহারে নিশ্চয় করত লাগল এই বলে যে, এই ছয়-সাত ঘণ্টার এদের পরস্পরের কথাবার্তার ভেতর দিয়ে আর কিছু না বুঝে এটা তো সে নিশ্চয়ই বুঝেছিল যে, আত্মহত্যা করতে বাওয়া মেয়েটি এর বন্ধু ছাড়া আর কিছুই নয়। একে রাস্তার উপর অপমান করাটা তার ঠিক কাজ হয় নাই—না হয়, কাল এসে ভাড়া নিয়ে যেত সে।

কিন্তু-মজু কি তারপর এবার সত্যি গিয়ে মৌরীর চিলে কোয়ারি দরজা বন্ধ করলো?

মা। সময় যেমন কাক জন্ম বসে থাকে না, কোন কাজও তেমন কাক জন্ম ঠেকে থাকে না। হয়তো একজনের সাহায্যে যে কাজ বত সহজে, বত অনায়াসে হতো তা হয় না—দেবী হয়, বিলম্ব ঘটে কিন্তু ঠেকে থাকে না—কাকের জন্ম কেউ খেমে যায় না। মজুও খেমে গেল না রক্তের জন্ম। পরের দিন মমতাকে সে যে সময় দিয়ে এসেছিল হাসপাতালে উপস্থিত হবার, ঠিক সেই দশটার সময় গিয়ে হাজির হলো সে হাসপাতালের দরজায়। আর সেখানেই দেখা হলো নীলের সঙ্গে। সে ভালো হঠাৎ কিন্তু হঠাৎ নয়, নীল ওরই জন্ম অপেক্ষা করছিল। আপন চিন্তায় চলছিল মজু—নেমে পড়ল নীলের ডাকে—আরে থামুন, থামুন। একেবারে লোজা চুকে বাবেন না। আমি আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি যে। ঠিক তেমনি একটা ফাইল হাতে এগিয়ে এলো নীল ওর কাছে।

—আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন এখানে। আপনি জানলেন কি করে আমি এখানে আসবো?

—কেন, জ্ঞাপনি কি ভুলে গেলেন নাকি মমতা আমার নারী—

না, মমতা যে নীলের বোন একথা মজু ভুলে যায়নি ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্য একবারও মনে পড়েনি তার সে কথা। হয়তো আর্থিক অসুবিধার ব্যাপারে নীলকে মনে পড়ার কথা নয় বলেই তার কথা ওর মনে হয়নি। কিন্তু মনে না পড়লেও তারি খুসী হয়ে উঠল ওর মনে হয়নি। কিন্তু মনে না পড়লেও তারি খুসী হয়ে উঠল মজু নীলকে দেখে। একেবারে হাসপাতালের গেটের মুখে দাঁড়িয়ে

পড়েছিল মজু—হুপা সর রেগিঃ ধারে গিয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'তাই তো! তা কালকে যে অবস্থার মধ্যে ছিলাম—মনে পড়বার কথাও নয় কিছু।' তা মমতার সঙ্গে দেখা হবারে এসে ছুটি মনলে কালকের ঘটনা।

নীলের হাতে তেমনি এক মন্ত কাইল বই। ডান হাত থেকে সেটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে রেগিঃ ধরে দাঁড়ালো সে। বললো, হাঁ। মমতা আমার জিজ্ঞাসা করছিল মেয়েটি আপনার কেউ হয় কি না। কিন্তু আমিও তো সে কথা জানিনে। কে মেয়েটি? আমার বোন মনে হচ্ছে এদের কথার একটা আভাস আমার একদিন জ্ঞাপনি দিয়েছিলেন—তাই কি?

হাঁ, নীল তার সেই ধনী ব্যবসায়ী ভ্রমলোকটির গাড়ীতে ওকে জরানের বাড়ীর দরজায় বসিন না নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন নীলকে মজু বলেছিল, এদের কথা আর একদিন সে নীলকে বলবে। এখন পর্যন্ত সে নিজের ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। নীলের জিজ্ঞাসার জবাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো মজু—হাঁ, বলেছিলাম।

—চলুন তবে কোথাও বসে ব্যাপারটা শুনি। মেয়েটি ভালো আছে। তাকে মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে—ওদিকে হুশিয়ার কোন কারণ নেই।

কিন্তু মমতার সঙ্গে একবার দেখা করতে ওর ভেতরে যেতেই হবে। গিসিমার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সন্ধান বাড়ীর কাক জানতে বাকী নেই। সকালে উঠেই আবার ফের বৌদির কাছে ধার চাওয়া তাই মজুব পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্রাড ব্যাকের টাকা ও নিয়ে আসতে পারেনি—মমতাকে সেটা একটু জানিয়ে আসতে হবেই। নইলে সে ভাববে কি ওকে। বলল—দাঁড়ান, আমি আসছি একটু মমতার সঙ্গে দেখা করে। বলেই গলার ট্রেসিং কোশ বোলান একদল ক্লাস ফেরৎ ছাত্রের ভেতর দিয়ে, হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা লাল ক্রসচিহ্নিত মস্ত মস্ত গোটো দু'তিন এম্বুলেন্সের পাশ দিয়ে মজু হন হন করে ঢকে গেল ভেতরে।

নীলের নয়া ধরনে সিগারেটের পুরোটা শেষ হতে হতেই কিসে এলো মজু। বলল—চলুন।

ছজনে নেমে এলো রাস্তায়। কলকাতার ভিড়ের আজকাল আর ভারী পাতলা নেই। লেগেই আছে ভিড়। নইলে এখনও অফিস কাছারীর সময় হয়নি, এখনই রাস্তা ফুটপাথ ভর্তি গিজগিজ করছে। লোকজনের পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে মজু বললো, আপনার বোনকে না পেলে জরাকে—মানে মেয়েটিকে বাঁচাতেই পারতাম না। কি ব্যবস্থা হাসপাতালের দেখুন, ইঞ্জেলি ওয়ার্ডের কেস, এক ঘণ্টার ওপর পড়ে রয়েছে ইমার্জেন্সি বরদার টেবিলের ওপর—কোথায় বা ডাক্তার, কোথায় বা নার্স—কোথায় বা কি। কি যে করবো বুঝেই উঠতে পারছিলাম না—কিছু করতেও পারতাম না যদি মমতাকে না পেতাম। বোচারী, মাত্র তার ডিউটি শেষ করে কোয়ার্টারে গিয়েছিল। কিন্তু আমার কোন পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছে।

একটা চায়ের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে নীল জিজ্ঞাসা করল—এটার চুকবোন?

—চলুন।

বসে চারের জড়ার দিগে নীল জানতে চাইল ঘটনা। বললো, এখার বলুন তুমি মেয়েটি কে—কেন সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল?

ঠিক রক্তে কাছের একদিন বেলাবে জরার কথা সে বলেছিল ঠিক তেমনি ভাবে তার কথা আজ মজু নীলের কাছে বলল। শুধু এর ভেতর থেকে যেটা কেটে বাদ দিল তা হলো রক্তের প্রসঙ্গ। বাগ দিত না, নীলের কথা যেমন রক্তের কাছে বলেছিল, তেমনি করেই বলত মজু নীলের কাছেও রক্তের কথা। যদি আর একদিন আগেও এই গল্প সে নীলের কাছে করতে বসতো তবে তার ভেতর রক্ত বড় আসন পেতো।

নির্বিষ্ট মনে শুধু তখন গেল নীল। তারপর মজু খামলে একটু সময় চুপ করে থেকে বলল—কলেক্স আছে তো?

—আছে। তবে বাথো না।

—কেন, টাকার খোঁজে বেরবেন?

—উপায় কি।

—কোথাও গেলে টাকা পাবেনই এমন নিশ্চয় জায়গা আছে?

—না।

—তবে চলুন আমার সঙ্গে। ব'লে বেল বাড়িয়ে ব্যকে ডাকল নীল।

—কোথায় যাবো আপনার সঙ্গে? টাকার খোঁজে?

নীল হেসে বললো, না, খুঁজে বেরাবার মতো টাকা অসুসন্ধানের অত ঠিকানা। আমার জানা নেই। চলুন স্থাননেলে যাওয়া যাক। পূজার মনস্ত্রম, চলছে—কালও কয়েকজন এসেছিল লেখা চাইতে। লেখা গেলে টাকা হাতে শুভে দিয়ে তারা লেখা নিয়ে যাবে। চলুন লাটব্রের তে—বই পড়ার খেটে কিছু বিষয় বস্তু বের করা যাক। অন্তত এর খড়, গর মাথা, তার হাত পা জোড়া দিয়ে কিছু প্রথম শ্রেণীর নিবন্ধ তো নিশ্চয়ই তৈরী করে ফেলা যাবে। আর যদি জব চার্জক খেঁটে, পুরোনো কবর খুঁড়ে কিছু গল্প বের করে ফেলতে পারি তো কথাই নেই। বড়দের জন্ত বিলিতি ভুতের গল্প লিখে ফেলব দেখবেন ডজনখানেক।

ডজন না হলেও দিন দশেকের ভেতর গোটা সাতেক লেখা তৈরী করে ফেলল—নীল। মজুকে প্রশংসার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখে বলল—জনতা প্রডাকশন গাড়ী মেশিন, চৌত ইত্যাদির মতো এ হলো জনতা প্রডাকশন লেখা।

—না, না বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, চমৎকার হয়েছে লেখাগুলো।

—ভালো না হলে সম্পাদক নেবেন কেন, পাঠকই বা পড়বে কেন।

—তবে বলাছেন যে, জনতা প্রডাকশন।

এ কথাব জবাব দিল না নীল। বললো, কথটা হচ্ছে কি জানেন, অর্থাভাব একেবারে প্রকটালুতে এসে না ঠেকলে এসব লিখতে ইচ্ছে করে না। বড় সময় নষ্ট হয়—আমার আসল কাজ একেবারে বন্ধ থাকে।

মজু জানে না নীলের আসল কাজটা কি। সে বলে না। জিজ্ঞাসা করলে হাসে। তবে মজু এটুকু জানে তার ধ্যান, জ্ঞান, লখনার বিষয় একটা কিছু আছে। বার ভেতর মন হয়ে থাকে

সে সব চাইতে বেশী সময়। অন্ত লেখা লেখে সে অসুপায় হয়ে। কখনো নিজের জন্ত, কখনো অপরের জন্ত। এখন যেমন মজুকে কিছু সাহায্য করা যায় কিনা—তার জন্ত লিখছে। নীলকে—সাহায্য করতে গিয়ে এই জ্ঞানানেল লাটব্রের বেন মজু মনে নেপা ধরিয়ে দিল। কলেক্স বন্ধ হয়ে গেছে। নীলের প্রোডাকশন থাক আর নাই থাক ও নীলের সঙ্গে সঙ্গে বই নিয়ে বসে। তারপর নীলের কাজ হয়ে গেলে এক সঙ্গে ফেরে। চারটার সময় জন্তকে দেখতে যায়। ছটার সময় ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেলে বেরিয়ে এসে কখনো কিছুক্ষণ কোন পার্কে বসে নীলের সঙ্গে—কখনো বা বাড়ী চলে আসে। এই হলো ওর বর্তমানের রোজ নামচা।

মৌরী দিন কয় অত্যন্ত রাগের সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে রইল মজুব দিক থেকে। না বলল কথা, না জিজ্ঞাসা করল কিছু। তারপর আর পারলো না। রোজকার মতো সেই বেলো নয়টায় প্রস্তুত হয়ে মজুকে বেরতে দেখে কঠিন গলায় ডাক দিল মৌরী—মজু।

যেমে পড়ল মজু। একটু মুখ টিপে হেসে মৌরীর দিকে ফিরে জবাব দিল মজু—আজো।

বিয়স্তিতে তুচ্ছ চকচকালো মৌরী। মজুব ইচ্ছাকি ধেন অসুতা ঠেকল তার কাছে। একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, তুমি ঠিক করেছিল এখার পরীক্ষা দিবনে, এই তো?

—কেবল মনগড়া কথা নিয়ে মনগড়া ভাবনা ভাববি আর মন খারাপ করে শুন্ম হয়ে থাকবি। কেন পরীক্ষা দেবো না? আমার প্রতিদিন—প্রতি ঘটায় পড়া এগুচ্ছে—জানিস!

—এই বিশ দিনের ভেতর ত্রিশ মিনিট একত্রে তুমি বই নিয়ে বসিসনি—আর বাকে বলে উঠায় বেরুচ্ছিস, নিশায় ফিরছিস—স্তোর পড়া এগুচ্ছে কি করে?

—এই সেদিন তো পরীক্ষা দিলি। লাটব্রের কাজ বলে একটা বস্তু আছে তো? তোর ধারণাই নেই সে কাজ আমার কতটা এগিয়ে গেছে—গাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে খাতাগুলো এনে।

এমনি সময় মজু দেখতে পেলো বাবান্দার ঠাড়ির দূর থেকে রায় প্রাণপণে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। কি ব্যাপার? মৌরীকে 'গাঁড়া আসছি' বলে বাইরে বেরিয়ে এলো মজু। রায় মৌরীর ঘরের কাছ থেকে আরো কয়েক পা দূরে সরে গিয়ে বসবার ঘরটা হাত দিয়ে দেখিয়ে চাপা গলায় বলল—দিমিমাশি, জামাইবাবু।

—জামাইবাবু! জামাইবাবু আবার কে এলো তোর?

তাড়াতাড়ি নিজের মুখে আব্দুল চাপা দিয়ে মজুকে আস্তে কথা বলতে ইসারা করল রায়। তারপর তেমনি চাপা করে বললো—দেখেই যান না।

রায়ের কান্ডর আসার সংবাদ নিয়ে এমন চাপাচাপির অর্ধ ঘরে উঠতে না পেরে গিয়ে বসবার ঘরের পর্দা সরিয়ে ডাক দিল মজু।

ঘরের মধ্যখানে ঠাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি ক্রমাল দিয়ে মুখ মুছছিল, তাকে দেখে মজু হেন ব্যক্তিও প্রথম দাঁড়ায় পর্দা ছেড়ে দিয়ে—পালিয়ে আসতে বাচ্ছিল। কিন্তু লোকটি দেখে ফেলল তাকে। বাধা হয়েই একমুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকতে হলো মজুকে। কিন্তু—কি করবে, কি বলবে বেন বুঝে উঠতে না পেরে বোকা বোকা মুখে বলে উঠল—আরে, কি ভাগ্য আমাদের! বহন—বহন।

[ক্রন্দন।

বিপ্লবের সঙ্কল্প

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮ সালে রাজবন্দীদের মুক্তির পর সর্বদনার একটা হিড়িক লেগে গিয়েছিল, পাইকারীভাবে। ব্যাপারটা হয়ে উঠেছিল একটা অ্যাট-গভর্ণমেন্ট ডিমনস্ট্রেশনের মতন—সরকার বাদের বিনা বিচারে বন্দী করে, দেশের লোক তাদের শ্রদ্ধা করে, সভা থেকে এটাই ঘোষণা করা হত। সব রাজবন্দীই ছিল কংগ্রেস-কর্মী, এবং খাঁটি-বন্দর-শোভিত,—সুতরাং প্রদর্শনীটা হত ভালই,—এক বিভিন্ন দানের কংগ্রেস কমিটীই ছিল উজ্জ্বল।

এমনি এক সর্বদনার ব্যবস্থা হয়েছিল হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে। তখন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট। তাঁকে ব্যবহারিক রাজনীতিতে নামাবার চেষ্টা শুরু হয়েছিল এই হাওড়া জেলা কংগ্রেস থেকেই। অবশ্য কংগ্রেসের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি শেষ পর্যন্ত ইতস্ততা দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে,—আর বাগাই স্বরাজ চাক, হাওড়ার লোক যে স্বরাজ চায়না, এটা তিনি বুঝেছেন!

যাইহোক, দুই বড় বিপ্লবী দলের মিলনের পর পরামর্শ হয়েছিল সন্তোষ মিত্রকে কোণঠাসা করতে হবে,—যাতে সে আবার ২২ সালের মতন “কুটকাট” শুরু করে পুলিশকে আবার ধর-পাকড়ের সুযোগ না দিতে পারে। দাদারা বলতেন, বিপিনদা এক প্রোঃ জ্যোতির ঘোষ গোপনে তাকে সমর্থন করেন,—বস্তুতঃ তাঁদের প্রভাব তার ওপরে ছিল,—কিন্তু তাঁরা দাদাদের কাছে সেকথা স্বীকার করতেন না,—বিশেষত বিপিনদা বলতেন, সে আমাকেও মানে না। প্রকৃত কথা মনে হয় এই যে, সে ২২ সালে তাঁদের যেমন মানতো, জেল থেকে বেরোবার পর অবস্থাটা ঠিক তেমন ছিল না। তখন তার একটা নিজস্ব দল গড়ে উঠেছিল, এবং সে বিপিনদাকেও চ্যালেঞ্জ করতো—নিজেকে একটা পৃথক বিপ্লবী দলের নেতা মনে করতো।

তাহাড়া সে সোসিয়ালিজমের কথাও বলতে শুরু করেছিল, এবং সে কিরুর “দাষ্টার মশাই” (প্রোঃ জ্যোতির ঘোষ) নাকি ছিলেন তার ঠিক। এ ব্যাপারটা দাদাদের এবং বিপিনদার ভারি ঝগড়া—সুতরাং তাকে কোণঠাসা করা চাইই।

দ্বিতীয় জেলে ২৪ সালে লর্ড লিটন সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন,—এক কথাবার্তার মধ্যে সন্তোষ নাকি রড়াই করে বলেছিল,—হ্যাঁ খুন-ভাণ্ডারিত তো করেছিই। এই

ব্যাপারটা থেকে দাদারা বলতে শুরু করেছিলেন যে, সন্তোষ লিটনের কাছে সব-কিছু বলে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশের লোকের কাছে এই কথাটা প্রচারের প্রয়োজন, অথচ তার কোন সুযোগ পাওয়া বাচ্ছিল না। সে সুযোগ এল, হাওড়ার রাজবন্দী সর্বদনার উপলক্ষে।

হাওড়ার আয়োজনটা হয়েছিল বুহদাকাবে—প্রকাণ্ড প্যাণ্ডাল—প্রকাণ্ড সভা, এবং শেষে রাজবন্দীদের কুরি-ভোজের ব্যবস্থা। দাদারা পিছনে থেকে শরৎ চট্টোপাধ্যায় এবং সুভাষ বাবুর হাতে তামুক খাওয়ার প্র্যান আটলেন।—প্রথমে নিমন্ত্রণ পত্র বিলির ব্যবস্থার মধ্যে সন্তোষ মিত্রের দলকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হল, বিপিনদার দল,—গিরীন বান্যাজি, অম্বকুল মুখার্জি প্রভৃতি বিপক্ষে গেলেন। ওদিকে হাওড়ার বিপিনদা এবং সন্তোষ মিত্রের দলের ছেলেরা গোপনে একগাধা নিমন্ত্রণ পত্র—শরৎ বাবুর সই করা পত্র—সন্তোষ মিত্রের হাতে পৌঁছে দিলে। দেখা গেল, প্যাণ্ডালের সত্যার সমলবলে সন্তোষ মিত্র উপস্থিত।

তখন সুভাষ বাবুকে দিয়ে শরৎ বাবুকে চাপ দেওয়া হল, সভার তাঁর বক্তৃতা তার মধ্যে সন্তোষ মিত্রের বিরুদ্ধে বলতে হবে। শরৎ বাবু পড়লেন মহা কাঁপারে,—এক শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা মধ্যে বললেন,—হুজুরের বিষয়, উপস্থিত রাজবন্দীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাদের সরকারের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ আছে, বাবা পুলিশের কাছে গোপন রিপোর্ট দেয়—ইত্যাদি

একটা বিতর্কিত অবস্থা। সন্তোষের নাম করে কিছু বলা হয়নি বলে সে চুপ করেই থাকলো। কিন্তু সভার পরে কুরিভোজের ব্যবস্থাটা মাঠে মারা বাওয়ার জোগাড়।—পাছে সন্তোষের সঙ্গে বসে খেতে হয়, সে ভক্তে দাদারা ভোজ বরকট করে চলে এলেন—যাতে কাণ্ডটা এবং প্রকাণ্ডটা আরো বোরালো হয়। বিপিনদার দল থেকে গেল, যাতে ব্যাপারটা অত উৎকট না হয়। আমি গোপনে ভূপতিদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম,—ব্যাপারটা কি?—আপনারা সন্তোষ মিত্রকে সভাটাই স্পাই মনে করেন,—না, এটা তাকে কোণঠাসা করার প্র্যান? তিনিও গোপনেই বলেছিলেন, কোণঠাসা করার প্র্যান।

এরপর বিপিনদার দল সন্তোষ মিত্রের জন্তে এক বিশেষ সর্বদনার আয়োজন করেছিলেন যথা কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে।

আমি সারাক্ষণ সেখানে পাহারেকারি। সন্তোষ মিত্র এই সুযোগে নিজেকে আরো খোঁজাখোঁজ করে নিলে, এবং বিপিনদাস বিরুদ্ধেও বা ভাষ্যের দৃষ্টি করলে। ফলে বিপিনদাস এবং পিন্নীনা আবার জামাইদের দাম্পত্যের মধ্যে ভিড়ে গেলেন। অজুতলা কিন্তু সন্তোষ মিত্রের বিরুদ্ধে কোন কলসেন না। সুভাষ-সেনগুপ্ত লড়াইয়ে সন্তোষ মিত্র এবং অজুতলা সেনগুপ্তের সমর্থনে ঝাঁপড়েন।

পরবর্তীকালে—১৯৩০ সালে—হিন্দী বন্দী নিবাসে সন্তোষ মিত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হলে সুভাষদাস দ্বারা সন্তোষ মিত্রের বাড়িতে গিয়ে তার বাবার কাছে গুপ্ত প্রকাশ করেছিলেন এবং হাওড়ার ব্যাপারে ভুল করেছিলেন বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। দামারী অবন্ত একরকম কাণ্ড করেননি।

ঢাকার তখন ঐসংঘ তরুণদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন বৃদ্ধি পেল, এবং তাদের সঙ্গে অজুতলা পার্টির সংগ্রামও চলছিল,—অজুতলা পার্টি বাবীসংঘ নাম দিয়ে ঐসংঘের পান্ডা এক তরুণসংঘ গঠন করেছিল। ফলে ঐসংঘের সঙ্গে যুগান্ত পার্টির সহযোগিতাও চলছিল। ঐসংঘের চারজন নেতা—অনিল রায়, সত্য গুপ্ত (‘সেজর’), ভূপেন বসুজিত এবং মঞ্জী নারায়ণ রায়—আর মহিলা বিভাগের নেত্রী লীলা নাপ (‘হার’), যুগান্ত পার্টির তরক থেকে জীবন (চ্যাটার্জি) তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো,—এক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল মঞ্জী বাবু সঙ্গে। ঢাকার জীবনের আড়ার তাঁর সঙ্গে আহারও আলাপ হয়েছিল।

এই সময় ঢাকায় এক খুব সম্মেলন হয়,—ঐসংঘ ছিল তার উদ্ভোক্তাদের মধ্যে। বাবীসংঘের তরক থেকে যুগান্ত এক হারামি বাহাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কিন্তু সেটা বেশী দূর গড়াতে পারেনি। কাপপুর বলশেভিক বড়ব্রহ্ম মামলায় দণ্ডিত ও সজ্জেল-প্রতাপিত মোজাকর আহম্মদ বোম্ব হর প্রধান অতিথি ছিলেন। অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল, পলার আগুয়াজ ততোধিক ক্ষীণ। আমিও নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। কমিউনিষ্ট পার্টি বা তার মার্ক্স তখনও চালু হয়নি। মোজাকর প্রভুত তখনও বলশেভিক আদর্শে অজুপ্রাণিত কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের নেতা বলেই পরিচিত। আর কংগ্রেসী ও বেসরকারী কাগজে পড়ে তখনও সরকার বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে এই নীতির মোহাই দিয়ে ‘কমিউনিষ্টদের’ সমর্থনে লেখা হত যে, শুদ্ধ মতবাদের জন্তে কাজকে কারাদণ্ড দেওয়া অত্যাচার। কার্যত কোন বে-আইনী কাজতো তারা করেনি। ঢাকার খুব সম্মেলনে মোজাকর আহম্মদের নিমন্ত্রণের কারণ এই।

তখন একটা অল-ইণ্ডিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠনের সাহায্য করার জন্তে বিলাতী কমিউনিষ্ট ক্লিপ সূত্রটি এবং হাটলন, আর অস্ট্রেলিয়ার কমিউনিষ্ট নেতা ব্রাডলে ভারতে আসেন এবং মোজাকর তাকে প্রভুতির সঙ্গে প্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কাজ করতে থাকেন। মাত্রাক কংগ্রেসের পর থেকেই প্রমিক আন্দোলন আবার জোরদার হতে থাকে। ২৮ সালে বড় বড় ধর্মঘটের হিড়িক লেগে যায়। বছের গিরগি কাপ্পর (লালবাগা) ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা (বহুশ্রমিক প্রমিক) ৭০ হাজারে ওঠে। বছের বহুশ্রমিক প্রমিকদের এক বিরাট ধর্মঘট হয় মাস হারী হয়। সাধারণতঃ ধর্মঘটে সর্বমুঠো ৩ কোটি ২০ লক্ষের

ওপর ‘বোজ’ ধর্মঘটে কাজ বড় থাকে। সোসিয়ালিজম কথাটাও ক্রমে জনপ্রিয় হতে থাকে। তরুণদের মনে কংগ্রেসী অকংগ্রেসী নির্বিশেষে কমিউনিষ্টদের কথাগুলোই সবচেয়ে বেশী সাড়া দেয়। কারণ তার মূলে আছে বিপ্লবের কথা, এবং সাইমন কমিশন বরকটের আন্দোলনেও তারা সাহিল আছে।

এই সাইমন কমিশন লাহোরে গেলে যে বিরাট বিক্ষোভ মিছিলে কুপণতাকা প্রদর্শিত হয়,—পুলিস তার ওপর প্রচণ্ড লাঠি চার্জ করে মিছিল ভেঙে দেয়। সে মিছিলের নেতৃত্ব করছিলেন লীলা লালপত রায়—সামনের সারিতে থেকে। তাঁর পাঁজরে এক লাঠির গুতো মেয়ে পুলিশ তাঁকে জখম করে, এবং সেই আঘাতেই তিনি হাসপাতালে মারা যান। এবার কিছুদিন পরে সন্তোষ নামক একজন পুলিশ সাহেব বিপ্লবী নজোহানদের গুলিতে নিহত হয়।

এদিকে বাংলার দুই বিপ্লবীদের মিলনের পর মনোরঞ্জন দা’ (জুগ) ঢাকার গেলেন এবং অজুতলাদের নেতা প্রভুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে যুগান্তর দলের লোকদের আলাপ করিয়ে গেলেন। প্রভুলবাবুরও তাঁর দলের লোকদের মনোরঞ্জনদাস’ সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু পরে গোপনে শোনা গেল, প্রভুলবাবু সে বিষয়ে কিছু কারচুপি করেছেন। তখন মনে হল, ওদের সঙ্গে মিলনে বড় কঠিন ব্যাপার, কিন্তু যুগ কুটে সে কথা কেউ বললে না।

বাহুদার অবর্তমানে কলকাতার বাজারে যুগান্তের নেতৃত্ব করতেন ‘সুরেনদা’ (বোম্ব), হরিদা (চক্রবর্তী), মনোরঞ্জনদা, ভূপতি দা’ প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে সুরেনদার প্রতিপত্তি বীরে বীরে বেড়ে উঠছিল। একদিকে তিনিই সুভাষবাবু সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ,—আর একদিকে নলিনী সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে টাকাকড়ি সবচেয়ে তাঁর অবস্থা সহজ, আর ‘বিগ ফাইন্ডার’ (শরণ বসু, বিধান রায়, তুলসী গৌসাই, নির্মলচন্দ্র, নলিনী সরকার) সঙ্গেও তিনিই যুগান্তর দলের পক্ষ থেকে সলাপারমর্শ করেন। এই রাজনৈতিক কুট-কৌশলের ক্ষেত্রে ক্রমে তাঁর প্রাধান্য সবচেয়ে মনে নিয়েছিল। বাহুদার সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রাখতেন। এই অবস্থার ২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস সামনে এসে পড়লো। তার সংগঠনের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই সম্মিলিত বিপ্লবীদলই প্রধান করী। তার তোড়জোড় শুরু হল।

পার্ক সার্কাসের নতুন ময়দানে কংগ্রেস হবে। তার কাছেই প্রধান সড়কের ওপর কালীবাগানের (মন্ত্রী) বাড়ী—সে বাড়ীতে নতুন শোভা অধিস হয়েছিল। বড় বড় বাড়ী ওখানে অনেক তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। আমার মনে হল, যদি ঐ পাড়ায় কানিচারের লোকান এখন করা যায়, পরে খুব ভাল চলেবে। হুঁরে মেখে এলুম, ঐ বাড়ীটার রাখানের কটকের একদিকটা জুড়ে শোভা অধিস, আর একটা দিক জুড়ে এক প্রকাণ্ড ঘর খালি রয়েছে। ঘরটার সামনে ছ’টা দরজা ১২×৫ ফুট করে—আর ভেতরের মেঝের আরতন প্রায় দেড় কাঠার মতই। পরবর্তীকালে ঘরটাতে ঘোঁটার গাড়ীর পো-কম হতেছিল।

কালীবাবুর দাদা ছিলেন বিপিনদাস’ মেলা এবং অজুতলাদাস’ বড়। অজুতলাকে সঙ্গে করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বন্দোবস্ত

করে এলুম—ভাড়া সস্তা, ৬০ টাকা মাত্র। এই ঘরে ভালো করে দোকান সাজাতে পারলে বিনা খরচে খুব ভাল আড়ভারটাইজকেট হয়ে বাবে—কারণ কয়েকটা দিন ঘরে সাঁরা সহর ও বাইরের কার কংগ্রেস স্বাক্ষরের এই ঘরের সুখ দিয়েই কংগ্রেসে স্বাক্ষর করতে হবে।

নিজের একটা পার্শ্বাঙ্গাল লাইব্রেরী গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল। নীলামে বইয়ের লটও কিনতুম, এবং ২৪ খানা করে বাছা বই রেখে বাকি বই বিক্রয় চেষ্টা করতুম। এমনি করে লোকনে প্রচুর বই জমে গিয়েছিল। ঠাকুর পুতপক্ষীও কিনতে শুরু করেছিলুম। একবার প্রকাশিত একটা বইয়ের লট নীলামে বিক্রী হয়েছিল—সব মিলিটারী বই—ইস্রক ও নাজিবুদ্দিনের দল সেটা কিনেছিল (কলেজ ছোয়ারে; পুরোষা বইয়ের বড় দোকানদার) —আমি তা থেকে বেছে বেছে মিলিটারী শিক্ষার অনেক বই কিনেছিলুম। এমনি করে 'ছোট' বড় বড় ডেসেনটাইজ বোকাই হয়ে গিয়েছিল—তেতলার ঘরে সেগুলো রাখতুম। কংগ্রেসের ডলারিটার সংগঠনে যখন দাঁড়ায় নামলেন,—অহুশীলনের রবী সেন একদিন এসে সেগুলো নিয়ে গেলেন। বললুম,—কিছু টাকা দেবেন, একেবারে কীকি দেবেন না। তিনি ২৫টা টাকা দিয়েছিলেন। চোখের "রাতিবাস" লাভের মতন। কিছু কাজ হল জেবে খুসী হলুম।

একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ, একটা বেশ বড় কুমীর, একটা হুম্যান, একটা প্রকাণ্ড বীভার, একটা হরিণের মাথাসমেত ডাল-পালাওলাল সিং—মাটিতে ঝাড়া করলে সিংয়ের ডগায় হাত পৌঁছাতো না—একটা বাঘের মাথা প্রকাণ্ড ধারার মত,—এইসব ঠাকুর জন্তু জানোয়ার, একটা বার্ড অফ প্যারাডাইজ প্রভৃতি সংগ্রহ করেছিলুম। কংগ্রেসের আগেই দোকান সাজিয়ে কেলেছিলুম। আলবাট বিল্ডিংয়ের ঘরে প্রথমে কাশিচার তুলে দিয়ে এক প্রকাণ্ড পুরোষা বইয়ের দোকান সাজিয়েছিলুম। পরে ছোট্ট চালানো সম্বর নয় দেখে সেটাও পার্শ্বাঙ্গীসে তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম এবং কংগ্রেসের সময় বেশ কিছু বই বিক্রীও হয়ে গিয়েছিল।

এইবার আসল কংগ্রেসের কথা। কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি হতিলাল নেহেরু। সেনও ছিলেন স্বরাজ্যহলের নেতা এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য, সুতরাং তিনি হলেন অত্যাধিকারিক চম্বারম্যান—অল ইণ্ডিয়া লীগারদের কাছে বাংলা-কংগ্রেসের দলানলির প্রতিনিধি তো ভালো কথা নয়। অত্যাধিকারিক সমিতির সম্পাদক ডাঃ বিধান রায়। একত্রিংশনের সেক্রেটারী মলিনীরজন সরকার। ডলারিটার বাহিনী সংগঠনের ভার দাদারের হাতে। তার সংগঠন আদর্শ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার ময়দানে ময়দানে মিলিটারী প্যারেড শিক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল।—হাজার হাজার ছেলে—বিদ্রোহীদের রিক্রুজিংয়ের টার্গেট। যেসে ডলারিটার বাহিনীও সংগঠিত হয়েছিল—বোধ হয় লতিকার বন্ধ হয়েছিল সেটা।

ডলারিটার বাহিনীর চীফ—G. C. O. (General Officer Commanding) কাকে করা হবে, তা নিয়ে এক ঝগড়া বাধলো। সুভাষ বাবুই নেতাদের মধ্যে বেকার ছিলেন—চীফ হলে নয় দিক দিয়েই মাদার। দাদারও চীফ করার কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু পূর্ণ দাপের দল থেকে প্রস্তাব করা হল,

G. O. C. করা হোক পূর্ণ দাপকে। সুতরাং স্বাক্ষরিত অহুশীলনের তরফ থেকে পাঠা প্রস্তাব হল প্রভুল পাঞ্জুরী নাম। সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিকের দল বললে,—সুভেন—যেহ নয় কেন? হঠাৎ প্রায় অচল অবস্থা। শেষ পর্যন্ত,—"সুভাষী বমকে দেওয়া যায়, তো সতীকে দেওয়া যায় না"—এই প্রতি অহুশীলনে সুভাষ বাবুকেই করা হল G. O. C.

পূর্ণ দাপ, হরি চক্রবর্তী প্রভৃতি হলেন লেকট্রাট,—রবী সেন হলেন G. O. C.র অর্ডার অফিসার। বিপিনদার দল কোথাও নেই,—ভীরা দ্রুত। অ্যামেলগামেশনের এই অবস্থা আমরাত যেমন লক্ষ্য করছিলুম,—সুভাষবাবুও অবশ্যই লক্ষ্য করছিলেন। সুভাষের কংগ্রেসের বিভিন্ন বিভাগে কর্মী বটনের ব্যবস্থা। প্রভুল পাঞ্জুরীকে করা হয়েছিল "হিন্দুস্থানী সেবাসলে" বাংলার বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি। বিরাট একত্রিংশনে সুভেনদার দলবলই কর্মী। কিসের কমিটিতে সুভেন দাপ এবং টালিটলের অমর যোয (যোদ্ধার)। পার্শ্বাঙ্গীস ময়দানের পিছনে "নেট" নামক একটা বাড়ী ছিল,—সেখানে হয়েছিল কিসের ট্রো। সেখানে বসানো হল ময়মনসিকের আনন্দ মজুমদারকে, সুভেনদার লোক। পূর্ণদাপের দল সেটা জোর করে দখল করতে গিয়েছিল, এবং লড়াই খামাবার জন্তে আপোষে ভাঙেও সেখানে জায়গা দেওয়া হয়েছিল।

অহুশীলনের নেতারা কেপে গেল—বটে! এই তোমাদের অ্যামেলগামেশন?—সেখানে টু-পাইস আছে, সেখানেই বুগান্ডার,—আর বড় সব শুকনো আঘাটার অহুশীলন। অ্যামেলগামেশন ভেঙ্গে চূবদার হয়ে গেল।

টু-পাইস ছিল অবশ্যই। এতবড় একটা কংগ্রেসের মধ্যে বিদ্রোহী কর্মীদল কিনরাত কুতের মতন খাটবে, আর পাটির কিছু অর্থের সংস্থান হবে না,—এই বা কেমন কথা। একদিন রাতে একত্রিংশনের টিকিট বিক্রীর পর হঠাৎ সংস্থা আলো নিভে গেল, বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারে হুড়োহুড়ির পর আলো জ্বললো—এবং দেখা গেল, একটা ক্যান্স ভর্তি বাস উঠাও হয়ে গেছে। মনোমোহন ভট্টাচার্য একত্রিংশন কমিটিতে ছিলেন—পরে তাঁর কাছে কথাটা শুনেছিলুম। "নেট" বাড়ীটার পিছনের দরজা দিয়ে দাল বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে এসে আবার সামনের দরজা দিয়ে হুকতো, এবং এইভাবে একই দাল দুবার জমা হত,—এ গল্পও শুনেছি। এক মালের দুবার বিল হয়েছে, এবং অত্যাধিকারিক সমিতির অফিসে সেটা বরা পড়েছে,—হুজান জুনিয়ার দাদা সেজ্ঞ তাদা খেয়েছেন, এ গল্পও শুনেছি। শুনেছি অহুশীলনের লোকের কাছে নয়, আমাদেরই পাটির লোকের কাছে।

অ্যামেলগামেশন ভেঙ্গে গেল দেখে মনটা খিচড়ে গেল। আমি বলতে শুরু করেছিলুম—এক ফুড়ি শিয়াল যদি তিন দিন ধরে খুঁজি করে কিছু ছির করতো,—তাহলে সেই "শিয়ালের খুঁজিও" এই অ্যামেলগামেশনের চেয়ে বেশী দিন টিকতো। কলকাতা ২১।৩০ সালের সুভাষ-সেনও লড়াইয়ের অহুশীলন গিয়ে ভিড়েছিল সেনওদের শিবিরে। নো-চেয়ারদের খাঁটা মর্শ্বকালকাটা কংগ্রেসে সুভাষ মজুমদারের সঙ্গে বনিষ্ঠভাবে জড়িত অমর বন্ধু বুগান্ডার দলের লোক হয়েও সেনওদের শিবিরে ছিলেন। আর ছিলেন অমরদা (দ্রাটার্জি) কংগ্রেস কর্মী সবেষ প্রেসিডেন্ট।

হাজি ও মুর সংগঠনের নেতারা—শৈলেন দাস, শতীন মিত্র, প্রমোদ বোমাল, হাওড়ার কুক চ্যাটার্জি প্রভৃতি পাকিস্তানী নো-কোয়ার্টার ছিলেন সেনগুপ্তের শিবিরে। বোটের ওপর, সে লড়াইয়ে সুভাষ বাবুর নিকে-বিগকাইভের সঙ্গে যুগ্মভাবে দল,—এবং সেনগুপ্তের বিতর্ক থাকি সব দেখাঙ্গী পাঁচশিল্পী দল ও ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল।

বাই হোক,—আবার কংগ্রেসের কথায় ফির আসা বাক। ভলান্টিয়ারদের ক্যাম্প হয়েছিল একাধিক। জৈনেশ্বর অগ্রতম নেতা সত্য ভক্ত হয়েছিলেন একজন সৈন্য। তিনি কঠোর সামরিক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বাছা বাছা ছেলের বিপ্লবের যন্ত্র দিয়ে নিজের এক বিপ্লবী দল খাড়া করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ছোট্ট পরবর্তী কালের বি, জি, দল, বারা মেদিনীপুরের পর পর তিনজন ম্যাক্সিট্রেক খুন করেছিল বলে শোনা গিয়েছিল। ভলান্টিয়ার ক্যাম্পের মধ্যেই অপর কোন ভলান্টিয়ার গ্রুপের সঙ্গে কি এক বিবাদ উপলক্ষে মেজর সত্য গুপ্ত তাঁর বাহিনীকে মিলিটারী কারদায় পরিচালিত করে ঐ প্রতিপক্ষ ভলান্টিয়ার গ্রুপকে মার দিয়ে এসেছিলেন। তারপরে সুভাষবাবু কোর্ট-মার্শাল বিচার করে তাঁকে একদিনের জজ করেন করেন। খাটা মিলিটারী গো। সুভাষবাবু রীতিমত গভীরভাবে সেনাপতির ভূমিকায় ভাসি দিচ্ছিলেন।

আবার কোকানে হয়েছিল জীবনের দলের আত্মা। বধে থেকে গিরিণি কামগর ইউনিয়নের নেতা বিরাজকর (পরে মথুর মের হয়েছিলেন) জীবনের (চ্যাটার্জি) অতিথিরূপে আমার কোকানেই উঠেছিলেন এবং বাস করেছিলেন। জীবনের সম্পর্কে আমিও হয়েছিলুম তাঁর নারানধা। এই সব কারণেই গোয়েন্দা বিভাগ কলকাতা, আমার ব্যবসায়ী হচ্ছে ক্যাম্পোয়েজ।

২৮ সালেই সুভাষবাবু এক জ্বরলাগকে করা হয়েছিল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী। কংগ্রেসের সাবজেক্ট কমিটিতে সুভাষবাবু এক ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজ্ঞাব দাখিল করেছিলেন। মহাত্মা তাঁকে বোঝালেন,—তুমি নেহেরু-রিপোর্ট সই করে ডেমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের দাবীর পক্ষে মত দিয়েছ,—এখন ব্রিটিশ সরকারকে একটু সময় না দিয়েই ইন্ডিপেন্ডেন্সের দাবী কি শোভা পায়? অন্তত ২১ সালটা তাদের বিবেচনার জন্ত সময় দাও,—তারপর যদি তারা ডেমিনিয়ন-ষ্ট্যাটাস দিতে রাজী না হয়, তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে মিলে ইন্ডিপেন্ডেন্সওয়াল হয়ে বাবো। সুভাষবাবু নিরস্ত হলেন।

বিপিনদা বলেছিলেন, তিনি কংগ্রেসের একান্ত অবিশ্বাসে ইন্ডিপেন্ডেন্সের প্রস্তাব তুলবেন। দাদাদা তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন।

প্রকাশ অবিশ্বাসের সময় হঠাৎ একটা হুড়োহুড়ি লেগে গেল,—হাজার বিশেক (কারো কারো মতে ৫০ হাজার) শ্রমিক মিছিল করে রোগান দিতে দিতে কংগ্রেসে আসছে। কর্তারা G.O.Cকে নির্দেশ দিলেন, ওদের রুখতে হবে। তিনি ভলান্টিয়ার বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, শ্রমিকদের রুখতে হবে। কিছু কিছু ভলান্টিয়ার সে আদেশ না মেনে সরে পড়লো। এমন একটা গ্রুপের মধ্যে ভক্ত কবি বিমল বোম্ব ছিলেন।

দেখেতে দেখতে বক্তার প্রবাহের মত শ্রমিক জনতা কংগ্রেস ক্যাম্প ছাপিয়ে এসে প্যাণ্ডালে ঢুকে পড়লো—তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব

হলনা—বাধা দিতে গেলে দক্ষবদ্ধ হয়ে যেত। তারা প্যাণ্ডাল দখল করে' দুখটা ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পর কংগ্রেসের—কর্তারা তাদের দাবী-পত্র গ্রহণ করলেন এবং সেগুলো বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারা জরুজা বাজিরে বেরিয়ে গেল। ভলান্টিয়ারদের একচেটিয়া কংগ্রেসে আবার ছোটলোকের হোঁচট লাগলো।

বাই হোক, কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব—পাকিস্তানী মতিলাল রচিত প্রস্তাব হল, ২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যদি ব্রিটিশ সরকার ভারতকে ডেমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দেয়, তাহলে আবার অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে এবং আইন অমান্য শুরু করা হবে খালি বন্ধ করে'।

স্বাধীনতাপন্থীদের (সুভাষ-জহর) তরফ থেকে সংশোধনী প্রস্তাব হল,—২১ সালের শেষে ডেমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস না পেলে কংগ্রেস সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কার্যক্রম গ্রহণ করবে। জোঁটাছুঁতে সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে হল ১৭৩ ভোট, আর মূল প্রস্তাবের পক্ষে ১৩৫ ভোট। মূল প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

একদিকে বিপ্লবী নওজোয়ানদল, আর একদিকে জজী শ্রমিক—এই দুর্ভোগ দেখে টি প্ল্যান্টস' অ্যাসোসিয়েশনের গৌরব সভাপতি বার্ষিক সাধারণ সভার বক্তৃতায় বলেছিলেন,—একমাত্র ভরসা 'গ্যাণ্ডি'।

বক্তা 'গ্যাণ্ডি' মহারাজও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন এবং কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন 'দুর্ভোগ' ঠেকিয়ে রাখার জন্তে। ২১ সালের বোম্বাইর এপ্রিল মাসে,—বড়লটি আরউইনের সঙ্গে দেখা করে স্বাধীনতাবাদীদের ও জরীশ্রমিকদের প্ল্যান বানচাল করার ব্যবস্থা করার জন্তে মহাত্মা পাকী 'Dear friend' বলে এক প্রকাশ চিঠি লেখেন, এবং তাঁর তখনকার এক নতুন ভক্ত রেমিভান্ড রেনডস নামক ভগ্ন ইংরেজের হাত দিয়ে সে চিঠি আরউইনের কাছে পৌঁছে গেল।

পরবর্তীকালে মহাত্মার কাণ্ডকারখানা দেখে ভক্তি চটে বাঙালার কলে ছোকরা দেশে কিরে বার এবং রেনডস নিউজ নামক এক সাময়িকপত্র প্রকাশ করে মহাত্মার সমালোচনা লিখতে থাকে। বর্তমানে রেনডস নিউজ বিলাতের এক সুপ্রতিষ্ঠিত বামপন্থী পত্রিকা।

সরকার বাহাদুরও দুর্ভোগ লক্ষ্য করে কোমর বাঁধছিলেন। এখন তাঁরাও আতঙ্ক হানার জন্তে এক Public safety bill তৈরী করে 'Communist activities' নমন করার ব্যবস্থা করলেন। তখন স্বরাজ পার্টির নেতা বিঠলভাই বাসেরভাই প্যাটেল (সদর প্যাটেলের দাদা) কেন্দ্রীয়-ব্যবস্থাপক সভার স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন, এবং স্বয়ং বড়লটির স্বাক্ষরিত ঐ Bill ব্যবস্থাপক সভার উপস্থাপিত করার জন্ত প্রেরিত হলে তিনি তাঁর আইনানুগ ক্ষমতার বলে সে বিল উপস্থাপিত করার অনুমতি দেননি। এই অবতন নিয়ে সারাদেশে একটা উগ্র-উত্তেজনার ঝড় বয়ে যায়। অবশ্য বড়লটির বিশেষ পক্ষতা বলে আইনটা চালু করা হয়, এবং ঐ আইনে বাছা বাছা শ্রমিক নেতাদের প্রেস্তার করা হতে থাকে, এবং তাঁদের নিয়ে মারামিতি এক বছর মাথলা খাড়া করা হয়। আসামীদের মধ্যে বিশেষী কমিউনিষ্ট হাটিলেন প্রভৃতিও ছিলেন, এবং অ-কমিউনিষ্ট কিশোরী বোম্বও ছিলেন। মামলার কিশোরী বোম্ব খালি পেয়েছিলেন,

কিন্তু তার আসেই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। আর ফিলিপ জ্যাক্ট মুক্ত হয়ে সবে পাড়ে ছিলেন, বোধ হয় মামলা শেষ হওয়ার আগেই। তাঁর নামে ৪৭৭ বদমায়েম রটছিল।

বাই হোক, কংগ্রেসের ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাল ইন্টিপেণ্ডেন্সের লড়াই বাইরে, বাংলাদেশ—সেনগুপ্ত-সুভাষ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিরাট আকার ধারণ করলো। সবথীত প্রেস থেকে তখন “স্বাধীনতা” নামক সাপ্তাহিক কাগজ বেরিয়েছে। তাতে একবার লেখা হল, —আসলে সেনগুপ্ত-সুভাষ লড়াইটা হচ্ছে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের সঙ্গে স্বাধীনতাবাদী কংগ্রেসের লড়াই—সেনগুপ্ত কংগ্রেস ওয়ার্ল্ডিং কমিটির লোক, সুভাষ হাইকমান্ডের ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের পক্ষপাতী,—দ্বার তার মানেই—ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের বন্ধু; আর সুভাষ বাবু ইন্টিপেণ্ডেন্সের প্রতীক, সুভাষ ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের এবং চলন্ত ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের শত্রু।

সে সময়ে বাংলাদেশের লোক কয়েকটা বছর ধরে বলেছে এবং জ্ঞানছে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস এক ইন্টিপেণ্ডেন্স এক নয়—ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস মানে ব্রাউন ব্রোক্রেসী, অর্থাৎ কালো লাট সাম্রাজ্য মাত্র,—আমরা তা চাই না, বাঁটা ইন্টিপেণ্ডেন্স চাই—ব্রিটিশ সম্পর্ক বর্জিত স্বাধীনতা।

এই ধর্যের ওপর আমাদের দ্বারা সুভাষ বাবুকে বুঝিয়ে রাজী করে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে লড়াইটা সম্ভারিত করে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ষ্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনে নামলেন। কলে আগেকার এ বি এস এ এবং এ বি ওয়াই এর মধ্যে ভাগন ধরলো,—এ বি এবং বি পি-র লড়াইয়ে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে লড়াই চললো। এ বি হল সেনগুপ্তের সমর্থক, এক বি পি-সুভাষ বাবু। এই লড়াইয়ে চটিগার একটা ছেলে খুনও হল—নাথ বোধ হুদ সুখেনু—বি পি। আহত হয়ে কলকাতার ক্যামেল হাসপাতালে মারা যার, এক আমরা প্রোসেশন করে সংখ্যা করি।

ব্যাপারটা এখন ছেলে নিয়ে টানাটানি, এবং সুরেনদা এখন নেতা, তখন যুগান্তর পাটির ছেলে বাগাবার মতক। বলে অমূল্যনের সেনগুপ্তের ক্যাম্পে ভিড়ে গিয়ে ছেলে বাগানোর চেষ্টা করতে হল। পরবর্তী কালে এ বি-র নেতা শৈলেন রায় যে ডেটিনিউ হয়েছিলেন, তার মূল কারণ এইখানে। আর শরৎ বহু বিপি সংগঠনে টাকা দিতেন, এক সেই কারণেই তিনিও পরে রাজবন্দী হয়েছিলেন।

এই সময়ে বালীর কাছে ডানকুনি টেনে এক রায়ে এক বিরাট ট্রেন-দুর্ঘটনা হয়। ফরয়ার্ড কাগজে তার বিবরণে বলা হয়,—যত লোক মারা গেছে বলে বেল কত পক্ষ বলেছে, আসলে লোক মারা গেছে,—প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে,—তার চেয়ে অনেক বেশী; বেল কত পক্ষ হুতমেহুলো গোপনে সরিয়ে কেলেছে।

কয়েক মাসের বিচ্ছেদে ই, আই, আর লাখ টাকার দাবী করে ষড়যন্ত্রে মামলা করে। মামলার সময়ে বংশাজ প্রত্যক্ষ দর্শীদের সমস্ত পাওয়া গেল না। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী সংগ্রহের চেষ্টা হল দাদাদের মাধ্যমে। সত্যদা (চক্রবর্তী-খলনা) আমাকে বললেন, কোলিয়ারী এলাকা পূর্বদে ট্রেনে ট্রেনে ঘুর দেখতে হবে, সাক্ষী পাওয়া যায় কি না। আমি সারদাকে ভিড়িয়ে দিলুম।

সারদা কয়েক দিন ধরে ঘুরে ফিরে এল—মামলার সাক্ষী দিতে কেউ চায় না।

সুভাষ মামলার ই, আই, আর লাখ টাকার ডিক্রী শেষে গেল, এবং প্রেস ক্রোক করার জন্য কোর্টের লোক নিয়ে পরিদর্শনার লোক গেল। ফরয়ার্ড অফিসের গেটে তখন পাহারার বসে গেছে নলিনী বঙ্গন সরকার ও তুলসী গোস্বাইয়ের লোক। তারা বললে, প্রেস আমাদের সম্পত্তি, ফরয়ার্ড কাগজের সঙ্গে ছাপার কনট্রাই ছাড়া প্রেসের আর কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই প্রেস ক্রোক করা গেল না। পরদিন দেখা গেল, সেই প্রেস থেকে “লিবার্টি” নামে কাগজ বেরিয়েছে—ফরয়ার্ড উঠে গেছে। উপেনদার “আত্মবলি” সাপ্তাহিক পত্রিকা—ফরয়ার্ড কোম্পানি নিয়েছিল। সেটা হল “নবশক্তি”।

সুভাষবাবুর রাজনৈতিক বিকাশের পথে সে সময়টা ছিল একটা সন্ধিহীন। সুভাষবাবুর ভক্তরা যেমন মনে করেন, তিনি যেন একটা ready made পাক্সা নেতাকী হয়েই জন্মেছিলেন,—সেটা ভক্তিমাগের অপসিদ্ধান্ত মাত্র। তিনিও যে মাছুষ, এক মাছুষের জীবনের সকল স্বাভাবিক নিয়মই যে তাঁর পক্ষে প্রযোজ্য, এটা ভুলে গেলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হয়। দেশের কি জটিল অবস্থার মধ্যে, রাজনীতির কি জটিল আবর্তের মধ্যে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বাভ-প্রতিদ্বাভে তিলে তিলে তাঁর বিপ্লবী চেতনার কার্যকরী রূপ গড়ে উঠেছে, সে ইতিহাস একটা রাস্তা-কটকিত রহস্তোপস্তাসের মতন। একদিকে নির্ভেজাল গান্ধীভক্তি ও কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বস্ততা,—আর একদিকে তাঁর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধ এবং সমগ্র বৈপ্লবিক আদর্শ তাঁর চরিত্রে তখন একটা স্ব-বিরোধী কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তার উপাচরণে পরিণত করেছিল। জাশালিম, ফ্যাসিজম, সোশিয়ালিজম ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে গিয়ে “ফ্যাসিজম কাম সোশিয়ালিজম” হয়ে উঠছিল তাঁর বক্তৃতার ধারা। কংগ্রেসের সভায় জাশালিম, শ্রমিকদের সভায় সোশিয়ালিজম এবং ছাত্র-যুব সভায় ফ্যাসিজম তিনি একসঙ্গে বলতে শুরু করেছিলেন।

একবার ফরয়ার্ডের প্রেসকর্মচারীরা ষ্ট্রাইক করে বসেছিল। সুভাষবাবু তখন জেমসগঞ্জে শ্রমিকদের সভায় সোশিয়ালিস্টিক বক্তৃতা করছিলেন,—এদিকে তাঁর ডেপুটি মেজদা শরৎ বহু ফরয়ার্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ধর্মঘটীদের সঙ্গে কনসাল্টা না করে নতুন কর্মী রিক্রুট করেছিলেন এবং এইভাবে ধর্মঘট ভেঙ্গে গিয়েছিল। সুভাষবাবু সরাসরি দাবী নন, অথচ এই ছিল তাঁর “যবের অবস্থা”।

বিপ্লবী দলগুলোর আমোদগাম্যমন্ডনের আগে অমূল্যন ও যুগান্তরের নেতাদের সঙ্গে তাঁর জ্বলন্ত ঋত্তির জমেছিল,—এক কলকাতা কংগ্রেসের আগে পূর্বদে হুইলের দুই দালা,—সুরেন বোধ এবং রবী সেন রোজ সকালে তার বাড়ী গিয়ে বসাতেন। কংগ্রেসের পর সেটা “হুদিক থেকে তোমাদের” রূপ নিয়েছিল। তিনি সবই বুঝতেন, এবং G.O.C-র মতন গভীর চালে কথা কইতেন Yes, no, very well ধরনে। স্বভাবত গভীর প্রকৃতিটা তাঁর এই সময়ে চূড়ান্ত গভীর হয়েছিল—বোধহয় এই যুগটাকে কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি।

কমণ:

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন উপাচার্য)

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) বাতে সৃষ্টি, রূপ ও সংহতভাবে হতে পারে, এ নিম্নের ব্যবস্থার জন্ত রেজিস্ট্রার বিভাগ, পরীক্ষা কন্ট্রোলার বিভাগ ও কলেজসমূহের ইনস্পেক্টর বিভাগ—এ সকল একত্র করে দেওয়া হয়েছে। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া, টাকা-পয়সা রিফাউ দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে বিলম্ব সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা বাতে ক্রমে কমে যায়, এই ব্যবস্থার অন্ততম লক্ষ্য এ-ও। আমি এখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসি, বলতে গেলে এই ধরনের অভিযোগ আর ছিলই না।

২। পরীক্ষার ফল কীস হয়ে পড়া—কার্য্যভ্য: এইটি তিরোহিত হয়েছে। কলাকল প্রকাশের আগে নম্বর জানবার সুযোগ নেই এখন।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয়ার বিভাগটি পুনর্গঠন করা হয়। একজন আর্থিক সময়ের ইঞ্জিনীয়ারের স্থলে সর্ব সময়ের ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হয়েছেন। আগেকার ইঞ্জিনীয়ার বাসে চার শত টাকা করে পেতেন, এ ছাড়া পেতেন নিজের পরীক্ষিত বিল ও এন্ট্রিয়েটের ওপর শতকরা হারে কতক টাকা। ইঞ্জিনীয়ারের কাজ বেখানে এন্ট্রিয়েট কিংবা বিল কমানো, সে অবস্থায় এ ব্যাপারে তাঁকে শতকরা হারে কিছু দেওয়াটাই হাতকর বলে আমার মনে হয়। যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তাতে করে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-ভাণ্ডার কিছু অর্থ বেচে গেছে।

৪। গুণগত দিক বিবেচনাক্রমে গিওন ছাড়া আর সব কর্মী নিয়োগ চলতে থাকে। নিয়োগ ব্যাপারে বাইরের লোক দ্বারা টেট পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়।

৫। বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসটি রেনে সাজানো হয়। এমন ব্যবস্থা করা হয়, যাতে এই প্রেসে বাইরের কাজ চলতে পারে এবং এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুটা স্বাধীন আসে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করে প্রেসের ফ্রিকাল্প পুখারিগুপ্ত তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। এই কমিটিতে অন্ততনের তত্তর থাকেন সরকারী প্রেসের একজন বিশেষজ্ঞ ও ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসের একজন বিশেষজ্ঞ।

৬। লেকচারার ও প্রফেসরদের (সর্বসময়ের ও আর্থিক সময়ের) বেতনের প্রেত স্থির করে দেওয়া হয় এবং লেকচারারদের একইরূপে দেখা হতে থাকে।

৭। ইনক্রিমেন্ট (বেতন-বৃদ্ধি) পাওয়ার সময় হলোই ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয় এবং এ কারো অস্থায়ের ওপর নির্ভর করে থাকে না।

৮। সহকারী লেকচারারের পদ বিলোপ হয়ে যায় এবং আগে এই পদগুলিতে দীরা ছিলেন, তাঁদের লেকচারারের প্রেত দেওয়া হয়। এর কলে খরচ কিছুটা বেড়ে যায়; কিন্তু এতে লেকচারারদের অবিকতার সম্ভবী কারণ ঘটে। শিক্ষাদান যেন আরও ভাল করে হতে পারে, সেইজন্যই এ ধরনের পরিবর্তন যেনে দেওয়া হয়।

৯। পরীক্ষক নিয়োগ ব্যাপারটি খুব নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং অপরের দাবী এড়িয়ে কোন নিয়োগ প্রায় হয় নি।

১০। বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের সেরামভী অনেক আগেই হওয়া প্রয়োজন ছিল। কয়েকজন কর্মচারী বন্দ্যোপাধ্যায় কুপনেন, আমি লিখেতে পেলাম। বিষয়টি নিয়ে আমি তখন পর্যালোচনা

করে চলি। দুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানমন্ত্রী বার যেন চিকিৎসক হিসাবে এসে নিজে সব ব্যাপারটা দেখেন, সেভাবে তাঁকে আশ্রয় জানাই। তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীরা যে যে ঘরে কাজ করেন, সেগুলিতে আলো হাওয়া খেলবার একটা নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আমার আমলে যেমনটি ছিল, সেই থেকে এই বরঙলি কত ভাল হয়েছে, যে কেহ আজ দেখতে পারেন। বিজ্ঞান কলেজের সেরামভী এক আলো হাওয়ার নতুন ব্যবস্থাটি প্রবর্তনের জন্ত সরকার আমাদের একটি ধন যেনে—অল্প কিস্তিতে সে টাকা পরিশোধের কথা থাকে। সরকার প্রবর্তন ধনের পরিমাণ হচ্ছে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর এ ৩০ বছরে পরিশোধ্য। সম্পূর্ণ আমার প্রচেষ্টার এইটি হয়। বিজ্ঞান কলেজের রূপকার ডাঃ সেরামভী সাহা আমার সাথে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতেন এবং বলতেন যে, গত ২০ বছর ধরে এই কলেজের কোন সেরামভী হয় নি। নিকট ভবিষ্যতেও সেরামভী যদি না করা হলো, তা হলে কলেজটি বাবে। বন্দ্যাকান্ত কর্মীদেব দ্বী ও মাদেয়া দ্বী কিংবা পুরের বোগ চিকিৎসার জন্ত অর্থ সাহায্য চেরে সিন্ডিকেটের নিকট ছুটি তিনটি আবেদন প্রেরণ করেন। এটি একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার বলে মনে হয়। আমি নিজে নীচুতলার অফিসে খেলার এবং দেখতে পেলাম যে, কর্মচারীরা অন্তত লম্বাছাটকর অবস্থায় কাজ করতেন। একটি ঘরে বড় বড় কাপড়ের বাউল রাখা ছিল—যা থেকে খুবই খারাপ গন্ধ বের হতে থাকে। এই ঘরে কোন আলো হাওয়া খেলার ব্যবস্থা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে দুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি বিষয়টি রাখলাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ১০ হাজার টাকা (সহজ কিস্তিতে পরিশোধ্য) ধন যেন এবং এই বরঙলিতে আলো হাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। এ সম্পর্কে কারো কৌতুহল থাকলে বেয়ে দেখে আসতে পারেন।

১১। বার্কলীট দেওয়ার নতুন ব্যবস্থা পত্তন করা হয়। এর কলে এই বীড়ার যে, পূর্বে বেখানে ফলাকল প্রকাশিত হলে পর তিন চার সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হতো, সেখানে আমার আমলে কল প্রকাশের এক সপ্তাহের তেজরই বার্কলীট পাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১২। পূর্বের চেয়ে অনেক ভাড়াভাড়া ছাত্রদের অভিযোগগুলি যেন, বেতন দেওয়া, কোন পত্র উত্তর পাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ছুটি দেওয়া হয়।

১৩। সেনেট কিংবা কিংবা সিন্ডিকেটের কোন বিশেষ সমস্রকই বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা উত্তর কার্যপরিচালনা ব্যাপারে প্রস্তাব বিভাবের সুযোগ দেওয়া হয় না।

১৪। প্রেস বার্ক দেওয়া বড় করে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগুলিতে অত্যধিক কলের হার হবার কারণ তদন্তের জন্ত ১৯৫২ সালে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। অধ্যক্ষগণের সহায়ত সংগ্রহ করা হয়। এবং কারণগুলি সন্নিহিত আকারে সুত্রিত ও প্রকাশিত হয়। কলের শতকরা হার কমাবার দাবীতে কলেজ সমূহে টিউটরিয়াল রূপ প্রবর্তনের একটি প্রস্তাব করা হয়। আমার আমলেই বিশ্ববিদ্যালয় টিউটরিয়াল রূপের ব্যবস্থা করবার নির্দেশ যেন দেওয়া হয় (কিন্তু প্রায় কোন মহল থেকে আপত্তি উঠেছিল)।

১৫। সুরেন্দ্রনাথ, গিটি, বিভাগগর ও বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজগুলি ভালভাবে বড়ত চলিত হতে পারে, তার জন্ত ১৯৫২ সালে আমি শক্তি বক সরকারের নিকট থেকে প্রায় দেড় লক্ষ

টাকা দান আদায় করি। সংযুক্ত এই অর্থ শিক্ষাক্ষেত্রের নির্দেশ অনুসারে বন্টন করে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে চ্যালেঞ্জারের (আচার্য) সাথে আমি আলোচনা করি। শিক্ষাদানের মান উন্নত করা হবে এবং কলেজগুলিতে সীমাবদ্ধ সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করা হবে— এই সঙ্কেত সরকারের নিকট আরও সাহায্য আদায় করে দেবার প্রতিকল্প আমি নিই।

১৬। পোট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের হোষ্টেল (ছাত্রাবাস) ছিল দুইটি—একটি হোষ্টেল ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে (এমন নামকরা ব্যয়গা নয়) এবং অপরটি হুরলীধর সেন সেনে। দুইটি নতুন হোষ্টেলের ব্যবস্থা করা হয়। এর জন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দশ-বারো হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তৃপ্তি ছিল যে, ছাত্ররা থাকবার ভালো ব্যয়গা পেয়েছে আসের তুলনায়।

১৭। ভারত সরকার আমার আরসের পূর্বেই পোট গ্রাজুয়েট হোষ্টেল নির্মাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ২,৪০,০০০ টাকা সাহায্য প্রদান করেন। কিন্তু কাজ কিছুই করা হয়নি। আমার সময়ে বাণিজ্য সচিবালার রোডে পালিত ট্রাষ্ট ল্যান্ডে একখণ্ড জমি সংগ্রহ করা হয় এবং ৮০ থেকে ১০০ জন ছাত্রের থাকবার সংস্থান হতে পারে, সে ভাবে একটি হোষ্টেল তৈরী হয়।

১৮। ছাত্রদের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃকচারীদের হাজিরা ব্যাপারে কড়া কড়ি করা হয় এবং অপরাহ্ন ৫টার আগে তাঁদের অফিস ছেড়ে যেতে দেওয়া হত না। কারণ, ছাত্রদের অভিভাবকরা অপরাহ্ন ৫টার পর আমার সাথে দেখা করতে আসতেন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অভাবে কোন নির্দেশ দেওয়া যেতো না। সেজন্তেই কর্তৃকচারীদের অপরাহ্ন ৫টা অবধি অফিসে থাকতে অহুরোধ জানানো হয়। কর্তৃকচারীরা সেভাবেই কাজ করে চলেন।

১৯। ছাত্রদের পরীক্ষার কি বাতে বেড়ে না যায়, সে লক্ষ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরও অর্থ আদায় করে আনতে ছাত্রদের সহিত আমি শিক্ষাসচিবের কাছে যাই। ছাত্ররা যখন আমার সাথে দেখা করে বললে, বেজিন্টেন কি বাড়িয়ে ২ টাকা থেকে ৫ টাকা এবং আর একটি কি ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা করা হলে তাদের পড়াশুনো চালিয়ে বাওরার অগ্রবিধা হবে, তখনই কি বৃদ্ধির প্রস্তাবটি বন্ধ রাখা হয়।

২০। জি.সি. সি. বিশ্বাসের আমলে শিল্প ট্রাইব্যুনাল যে রোয়েন্সার দেন, পূর্বে তা পুরোপুরি কার্যকরী করা হয়নি। শিশুকক্ষের সামনে নতুন দাবীপত্র পেশ হলেও আমার সময়েই রোয়েন্সারটি সম্পূর্ণ কার্যকরী করা হয়।

২১। আমার প্রচেষ্টায় অন্তত দুইজন হাদ্যাকারী ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

২২। ১৯৫০ সালে আমি যখন উপাচার্য (ডাইন-চ্যালেঞ্জার) হলান, সে সময় তার বি.এল.মিত্র তদন্ত কমিটির রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের কার্যসূচী প্রস্তুত হয়। আমার পূর্ববর্তী উপাচার্য জি.সি.সি. বিশ্বাসের আমলে এই তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু আইন সচিব নিযুক্ত হলে এই পদ ছেড়ে বাওরার সদয় জীবন আমার হাতে উক্ত রিপোর্টের অসমাপ্ত হুজির প্রথম খণ্ড এবং বিত্তীয় ও তৃতীয় খণ্ডের পাঠ্যনির্ণি দিয়ে বাস। কমিটির

রিপোর্ট প্রকাশ হলেই বলে চাহিদিক থেকে অভিযোগ উঠতে থাকে। আমি তখন চ্যালেঞ্জার (আচার্য) ডাঃ কে.এন. কটিজর সাথে দেখা করি এবং বিষয়টি তাঁর কাছে বলে এই অহুরোধ জানাই যে, তাঁর নিজের প্রেসে উক্ত রিপোর্টের কিছুটা মুদ্রণে তিনি যেন আমার সাহায্য করেন। তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করে ৬-১১-১৯৫০ তারিখ মধ্যে পেশ করা হয়। অর্থাৎ আমার উপাচার্য হবার তিন মাসের ভেতরই এই কাজটি হয়ে যায়। অনেকের কাছ থেকেই এরূপ হুমকী আসে যে, রিপোর্টটি প্রকাশ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মানবানিহন মামলা দায়ের করা হবে। চ্যালেঞ্জার ডাঃ কটিজর এই এই কমিটি নিয়োগ করেছিলেন এবং নিজেও তিনি একজন রক্ত আইনবিদ। তিনি আমার পরামর্শ দেন যে, রিপোর্টটি ‘পৌনরী’ এই চিহ্ন দিয়ে সেনেটের সভ্যদের ভেতর বিলিয়ে দেওয়া হোক। সে মতে ১৯৫১ সালে রিপোর্টটি সেনেট সভ্যদের বিলিয়ে দেওয়া হয়। সেনেট সভ্যসমূহ এই নিয়ে বা ইচ্ছা করতে পারতেন। সেরূপ সমীচীন মনে হলে রিপোর্ট প্রকাশ করতেও তাঁদের বাধা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টটি প্রকাশ বন্ধ করে রেখেছেন, এই অভিযোগের মধ্যে এতটুকু সত্য ছিল না।

২৩। এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস পরীক্ষাগুলিতে বাঙালী ছেলেদের অধিক সংখ্যায় কেল হাঙ্ক দেখেই আমি তৎকালীন জন শিক্ষা ডিরেক্টর ও অধ্যাপক জি.হরিশাস ডট্টাচার্য এবং শিক্ষাক্ষেত্র খাতনামা আরও কয়েকজন ওজলোকের সাথে পরামর্শ করি এবং একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিই। আর্দেক ধরত বহন করার জন্য আমি বাংলা সরকারকে অহুরোধ করি এবং তাতে তাঁরা রাজীও হন। আই-সি এন্ড ছাত্রদের যেমন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেভাবে বাঙালী ছেলেদের ট্রেনিং দেবার জন্য সাময়িকভাবে ইংল্যান্ড থেকে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে আনা আমার ইচ্ছা ছিল। আমি চেয়েছিলার যে, কতকাল পর আমাদের নিজের লোকেরাই এই কাজ করতে পারবেন এবং ছাত্রদের আই-সি এন্ড পরীক্ষার লাইন ধরে ট্রেনিং দিতে সক্ষম হবেন।

২৪। হোষ্টেলের (ছাত্রাবাস) ছাত্রদের যেন আরও ভালো চাল দেওয়া হয়, খাজ সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের সাথে আমি সেভাবে ব্যবস্থা করি।

২৫। প্রথম বিরোধিতা সত্ত্বেও ও বিভিন্ন কলেজের পরিচালনা সংস্থাবলির (গভর্নিং বডি) জন্য একটি ধরনের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা করি এবং একটি আধুর্নিক ব্যতিক্রম সহ ঐটি তৈরী করতে কিছু পরিমাণে সফলকামও হই। স্বজন-পোষণ ও দুর্নীতির অবসান ঘটাবার লক্ষ্য নিয়েই এই কাজটি করা হয়।

২৬। যখনই কোন ছাত্র এইভাবে অভিযোগ করে যে, সে ঠিক নম্বর পায় নি কিংবা তার উত্তরপত্র ঠিকভাবে পরীক্ষিত হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে সে সন্নিহান, তখনই আমি একটি কমিটি নিয়োগ করি এবং নিজে উপস্থিত থেকে খাতা ভালরকম দেখা হয়েছে কিনা, নতুন করে পরীক্ষা করিয়ে নিই।

২৭। পরীক্ষাসমূহের ব্যাপারে আমি নিয়ন্ত্রিত প্রস্তাব করছি রাধিঃ (ক) কলেজের অধ্যক্ষদের সুপারিশক্রমে ছেলেদের কলাকল প্রকাশ করতে হবে। কলেজগুলিতে সাপ্তাহিক, পাদিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ও বাৎসরিক পরীক্ষা হওয়া চাই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। তবে

(খ) যদি কোন পরীক্ষা হতেই হয় আর আমাদের ছাত্রেরা নিয়ম-কাছনে নির্ধারিত পাশ মার্ক না পায়, সেক্ষেত্রে আমি প্রস্তাব করি : (১) পাশ মার্ক কমিয়ে দেওয়া চলতে পারে ; (২) পাঠ্য-তালিকা (সিলেবাস) কমানো যেতে পারে ; (৩) পঠিতব্য বিষয় কম করা চলতে পারে এবং (৪) প্রশ্নগুলি এমনভাবে করতে হবে যাতে ছাত্রেরা ভাববার, লিখবার এবং লিখে পড়ে দেখবার সময় পায়। এ ছাড়া প্রশ্ন সহজ ও সোজা হুজি ধরনের হতে হবে এবং পরীক্ষাসমূহ ও একতম নির্দিষ্ট মান অল্পপাঠিক হওয়া চাই। আমি এও বলি যে, একটি মাত্র পাঠ-শ্রুতি (সিলেবাস) করে দেওয়া, পাঠ্য বিষয়ের প্রকাণ্ড তালিকা করা ও পাশ নম্বরের শত করা হার বেশি করে রাখা এবং তার-পর প্রেস নম্বর (কখন কখন ১৫২০ নম্বর পর্যন্ত) দিয়ে ছাত্রকে পাশ করানো হলো বলে যোগা করা জনসাধারণের সাথে প্রতারণা মাত্র।

২৮। উত্তরপত্রগুলি যেন সঠিকভাবে দেখা হয়, সেজন্য আমি পরীক্ষকের অসুবিধা জানাই। এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব দেখাতে আমি নিবেদন করি। কোন ছাত্র এক ছই নম্বর আরও বেশি পেতে পারে কি না সন্দেহ হলে পরীক্ষক যেন সম্পূর্ণ খাতাটি আবার দেখেন, সেই দাবী রাখা হয়। পরীক্ষককে দেখতে হবে, এই বিশেষ পত্রটিতে হলে পাশ হবার যোগ্য কি না এবং যদি যোগ্য বিবেচিত হয়, তা হলে তাকে পাশ করাতে হবে। পরীক্ষকরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁরা শিক্ষক—ছাত্রদের সম্পর্ক এবং তাদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে সিন্ডিকেটের যে কোন সদস্যের চেয়ে তাঁরাই অনেক বেশি ওয়ারকিবহাল। এই পরীক্ষকদের আমরা বিশ্বাস না করে পারি না।

২৯। কলেজগুলির অধ্যাপকদের প্রতি আমি নির্দেশ রাখি যে, যতই তাঁরা স্নদক হোন, ছাত্রগণের সাহায্যের জন্য নির্দিষ্ট সময় তাঁদের কাজ করতে হবে। কোন ক্রমেই কোন অধ্যাপকের তিনি যতই লক্ষ হোন) পক্ষে বিলম্বে আসা এবং ক্লাশ থেকে আগে বেরিয়ে বাওয়া চলবে না।

৩০। যে বুদ্ধিে ছাত্ররা অভিযোগ করে যে, পাঠ-শ্রুতি (সিলেবাস) শেষ হতে পারে, এমন ভাবে পর্যাপ্ত সখ্যক লেকচার দেওয়া হয়নি। তখনই আমি সেই ছাত্রদের জন্য বিশেষ লেকচার দেবার বিশেষ রকম ব্যবস্থা করি।

৩১। আমার আমলের আগে একজন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রদূত কাজ করার পরই কার্য্যতঃ পুরো বেতনে (পড়ার জন্য ছুটি) ইংল্যান্ড যাবার সুযোগ পান বলে আমি জানতে পারি। আমি এই ব্যবস্থা বিলোপ করে দিই এবং এই নির্দেশ জারী করি যে, কোন অধ্যাপককেই নির্দিষ্ট কয়েক বছর কাজ না হলে এই রূপ ছুটি (পড়ার জন্য) মঞ্জুর করা হবে না। শুধু তাই নয়, এইরূপ ছুটি মঞ্জুরীর পূর্বে বিভাগীয় প্রধানের নিকট থেকে এই জাতীয় সুপারিশ চাই যে, সন্নিহিত অধ্যাপকের অসুস্থতায় কালে লেকচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে অতিরিক্ত আর্থিক দায় মিটিবার প্রয়োজন হবে না।

৩২। বিজ্ঞান কলেজে কোন কাউন্সিল ছিল না—কলে এই কাঁড়ার যে, বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রদের এসে মাইনে দিতে হতো বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারা অভিযোগ করে এবং বিষয়টি ক্রমাগত কয়েক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনাগত অবস্থায় পড়ে থাকে। বইমাত্র ব্যাপারটা আমি জানতে পারলাম, তিন দিনের ভেতরই বিজ্ঞান কলেজে একটি কাউন্সিল খোলার ব্যবস্থা করে বেশি।

৩৩। ছাত্র এবং কর্মচারীদের ভেতর আমি নিয়মাবলীভিত্তি এনে দিই। ছাত্রদের ব্যাপারে কর্মচারীরা যাতে সঙ্গে সঙ্গে কাজটা শেষ করেন, সেজন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

৩৪। পরীক্ষার ফল বত তাকাতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করা হয়। স্বজন-পোষণ বা আত্মীয়-তোষণ যাতে না চলতে পারে, সেজন্য উত্তরপত্রগুলি একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩৫। যখনই আমি কোন কার্য্য ব্যবস্থা অবলম্বন করি, সিন্ডিকেটের সমস্তগণ—বীরা অভিজ্ঞ ও আমার চেয়েও অনেক বেশি জ্ঞানেন, কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষাবিৎ হিসাবে তাদের প্রভুত খ্যাতি আছে, তাঁদের সকলেরই আমি পরামর্শ নিই। যথোচিত চিন্তা—আলোচনা করা হলে পর ভবেই সেই কার্য্য-ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। কয়েমী স্বার্থের ওপর আমি হয় তো আঘাত দিয়ে থাকব, কিন্তু সেটা কখনই একনায়কত্বধর্মী হয় নি।

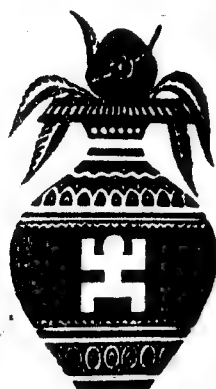
৩৬। ছাত্রীরা তাদের হোস্টেল সম্পর্কে, বাথ-রুম সম্পর্কে আমার নিকট অভিযোগ করে। তাদের অভিযোগগুলি সম্পর্কে দেখানো করার জন্যে আমি ব্যবস্থা করি। প্রকৃত প্রস্তাবে আমি দিন তিনেক মধ্যে একটি বাথরুম করে দিই এবং এতে ছাত্রীদের যথেষ্ট সুবিধা হয়।

৩৭। আমি বলব যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন রাই, খুব অসুবিধার মুখে পড়ি। ১৯৫৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার সময় আমাকে যে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়, সে সময় একজন পূর্বকৃতম উপাচার্য্য তাঁর ভাষণে বলেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন জলিতেছিল' এবং আমি সে অবস্থা আরও ভালি।

৩৮। ততকাল পর্যন্ত ও পূর্বকার বিতরণ বন্ধ ছিল। অনতি-বিলম্বে সেগুলি বিতরণের জন্য কার্য্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

৩৯। স্তমভঙ্গ কার্য্য-সম্পাদন পদ্ধতি চালু করার ব্যাপারে আমি তৎপর হই এবং প্রত্যেকটি ব্যাপার ঠিকভাবে দেখা শোনা হোক, এই চাই। এ করতে যেয়ে আমাকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। অবশ্য সন্ধ্যার বিনিই করতে যাবেন, তাঁকেই কিছুটা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে আমি কি করেছি না করেছি, সে বিষয়ে আমার বিবেক পরিষ্কার।

৪০। কনট্রোলার বিভাগটি সারা বিত্তি-এ ছড়িয়ে ছিল এক বিভিন্ন কাজের মধ্যে কোন সহতি ছিল না। তদারকিতে তখন অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতো এবং ছাত্ররা বারা কনট্রোলার বিভাগের কাছে পরামর্শ নিতে আসতো, তাদের এতু ভয় করতে প্রচুর মর্জ্য্য ভোগ করতে হতো। আমি নিজের অনেক সময় বিভাগীয় কাজ কর্তৃ দেখতে যেয়ে দেখছি কর্মচারীরা অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর কাজ করছেন। কনট্রোলার বিভাগকে একটি বাগদার নেবার জন্যে বিত্তি এ স্থান ছিল না। সেনেটের সভাগুলি যে হলে হয়, তাঁর উচ্চতা বেশ বেশি ছিল। আমি প্রস্তাব করলাম যে, সেখানে নতুন তলা তৈরী করে কনট্রোলার বিভাগটিকে স্থান দেওয়া হোক। এই কাঁড়ার যে, সবত্র কনট্রোলার বিভাগটি এক বাগদার এসে-বার আসে এতে তদারকীর সুবিধা হয়, ছাত্রদের সুবিধা হয় এবং আরও অস্ত্রাধরনের সুবিধা হয়। অর্থাৎ সেনেট সভা বৈঠক হয়, সেখানে যে আর একটি তলা বসেই হয়েছে, কারো চোখেই পড়ে না।



ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ

ତେଲ



ଏମ. ଏଲ. ବନ୍ଧୁ ଛାତ୍ର କୋ. ପ୍ରାୟେଜେ ଲି:
ନବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାଉଟ, ବଳିବାଡ଼ା-୨

চন্দ্রা তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১৬

এক সর্বনাশা আতঙ্কের প্রেতছায়া তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিলো বুড়া ম্যাকমোহনকে।

নীলের সঙ্গে কানপুর অভিমুখে চলেছেন ম্যাকমোহন। এ হলো বাইরের ঘটনা। তিনি চলেছেন। পথে রাত হলে ক্যাম্প পড়ছে। সকালে ক্যাম্প উঠছে এবং চলেছে বিজয়ী সৈন্তের অগ্রগতি। এই অগ্রগতির চিহ্ন কোনো পাথরের ওপর কালো অক্ষরে ঘোদিত থাকছে না। চিহ্ন থাকছে দুই পাশের ভরাডুস্ত গ্রাম ও শস্যক্ষেত্রে। চিহ্ন থাকছে দুই পাশে গাছের ডালের মৃতদেহগুলিতে।

সৈন্তদের পায়ে পায়ে কদম। ঘোড়ার খুরে খুরে ধূলা। রাতে ক্যাম্পে ধুনি জ্বলে। সৈন্ত এবং অফিসাররা শুধু হত্যা এবং প্রতিশোধের কথাই বলে। পাঞ্জাবে কুপারের কৃতিত্বের কথা বলে। কানপুরে যে তার কি করবে—কি নতুন রক্তাক্ত অধ্যায় ফুটি করে অন্য সব জায়গার কীর্তি/কাহিনী ডুবিয়ে দেবে—সেই কথা বলে। নিরস্তর হত্যা ও জিৎসি, আরো হত্যা এবং আরো জিৎসি—এই ছাড়া কথা নেই তাদের। মহান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—বার শুভ আশ্বাসনা পৃথিবীতে ভারতের মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন সব উপনিবেশে উপনিবেশে স্তম্ভ ভাবে প্রোথিত—তার ভিত্তিতে যা দিয়েছে এই সব মামুল। তারা স্বাধীনতা চেয়েছে। তারা চরম অপরাধে অপরাধী। অতএব তাদের শাস্তি দিতে হবে।

হত্যা ছাড়া তারা আর কোনো কথা খুঁজে পায় না। তারা কথা বলে—আর ম্যাকমোহন উঠে বান সেখান থেকে।

ছোকরার হাসে। ম্যাকমোহন উঠে গেলেই তারা ম্যাকমোহনকে নিয়ে ঠাটা জোড়ে। দেখা যাচ্ছে আকগান যুদ্ধের সময়কার এই সব বুড়োজ্ঞানী এসময়ে একেবারে বরবাদ হয়ে গিয়েছে। তাদের মনে হয়, তারা ভারতে এসে টাটকা টাটকা এদের কত কৃতিত্বের কথাই না শুনেছে। মনে হয় সে সব আশ্বাসিত্য, আশ্বাসনা। সে সময় যুদ্ধ বহিঃর কৃতিত্বের সঙ্গে লাড়ে থাকে, তবে এই যুদ্ধের সময়ে এখন মেয়েমানুষের প্রশ্ন আর পায়চারি কলজের প্রমাণ মিছে কেন? বন্দীদের শাস্তিবিধান দেখতে চোখ বুঁজে আস। যুদ্ধের কথা শুনে উঠে যায় সামনে থেকে। সর্বনাশা নিজের মনে আছে—একলা বুরছে—নয় তো কপালে হাত দিয়ে ফুরকুয়ে শাশা চুলগুলো ঘুর্তা করে ধর দিনরাত কি বেন ভাবছে, কি ভাবছে? কোনো মসিক অফিসার হাসতে হাসতে বলে—বিবেক ঠেকে লগাচ্ছে। নইলে দেখাল না? সেদিন বিন্দুকীতে চারটে ছেলেকে কাঁদা দেওয়া

নিয়ে কি বললো? বললো এ সব আচরণ unchristian হচ্ছে?

হাস্তকর সে ঘটনার কথা মনে পড়তে সবাই হাসলো। মজার ব্যাপারই হয়েছিলো। এলাহাবাদে থাকতেই নীল শিখসিপাহীরেব একটু লাইসেন্স দিয়েছিলেন। শুধু গ্রাম জালাবে আর দিন থেকে রাত নেটিজনের তাড়িয়ে তাড়িয়ে আনবে? শিখ সিপাহীরা মদ খেয়ে তারই মধ্যে একটু কৃতি করতো। ওরা স্বভাবতই ভারী কৃতিবান্ধ।

বিন্দুকীতে সে চারটে ছেলে—কাঁদী চবে জেনে-ই তাদের হয়ে গিয়েছিলো। মাথা ঘোরাছিল এমিক থেকে ওমিক—বিড়বিড় করে কি বলছিল আর যে সামনে আসছে তাকে-ই গোড়লাগি, বাবা গোড় লাগি—বলে পা ধবতে বাচ্ছিল। শিখ সিপাহীরা তাদের নিয়েই মজা করতে লাগলো। বেয়নেট বাগিয়ে ভাড়া করলো তাদের। আর তারা ছুটতে শুরু করলো। এমিক থেকে ওমিক ছুটে আবার কীমতে কীমতে ওমিক থেকে এমিকে ছুটে আসে। ছুটে ছুটে মুখে ফেনা উঠে—কীদে কেটে সে আহুত কাণ্ড! কাঁদী হবার সময় বখন হলো, তখন ত' একজন খাড় নেতায় পড়লো। অজ্ঞান অবস্থাতেই চড়াতে হলো তাকে।

সেই কথা গল্প করতে করতে ছোকরা জ্ঞানীরা হাসতে লাগলো।

কথা এবং চিন্তা কি কোনো অদৃষ্ট হুল দিয়ে চলাফেরা করে মন হতে মনে? নিজের তীব্রত, দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে বুড়া ম্যাকমোহনও, কি আশ্চর্য, সেই চারটে ছেলের কথাই ভাবছিলেন। তাদের মুখ-ই মনে পড়ছিল তাঁর। মনে পড়ছিলো শিখ সিপাহীদের সে বর্করকৌতুক তাদের মুখগুলো ভাবলেশহীন নির্বোধ জয়ের মুখোশ জাঁটা—কাঁদছে, চোখ দিয়ে জল আর মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে—সে চৈতন্য তাদের নেই।

মনে পড়েছিলো কয় জন ছোকরা ভদ্রী তাদের দেখে কি ঠাটা জুড়েছিলো। আর শিখগুলো বখন বুঝল যে সাহেবদের তারা আনন্দ দিতে পেরেছে—তখন তারাও উল্লাসে আরো বর্কর হাচ্ছিলো। ম্যাকমোহন এই আচরণের নিন্দা করতে গিয়ে নিজেই অপমান হন। কন্যাগুণ অফিসার সে বর্কর আচরণের মধ্যে কোনো কিছুই নিন্দনীয় খুঁজে পেলেন না।

এখন সেই চারটে ছেলের মুখ তাঁর মনের ভেতর বেন তাঁর লিক কিয়ে চাইলো। মুখ থেকে কান্না বা ভয়ের অভিব্যক্তি মুছে গিয়েছে।

তারা কি বলছে। তারা তাঁকেই অভিযোগ করছে—তুমি এই অপমান দেখলে কি করে ?

ম্যাকমোহন বিড়বিড় করে বলেন—আমাকে কমা কর।

বলেই চমকে ওঠেন। কাক বললেন ? কেউ কোথাও নেই তো ?

সত্যিই কি কেউ নেই ? এখন রাত হয়েছে—সবাই বিশ্রামে গিয়েছে। ম্যাকমোহন তাঁবুর বাইরে এসে পঁড়াল। ধূনির আগুনের বাইরে—ঐ যে দেখতে ভুল হয় না—কালো কালো ছায়া-শরীর গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করছে।

ছায়া নয়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্ধকারটা চোখে তরল হলে ঠিকই ঠাঁহর করা যায়, যে সামনে বারো বসে আছে, তারিও মানুষ। চুল ঝুলে পড়েছে মুখের দুই পাশে, ছিন্নবিছিন্ন কাপড়ের গুপের কেউ-বা শিশুকে চেপে আছে—কেউ বুদ্ধা, কেউ যুবতী, কেউ বা বালিকা। তবে এ তারতম্য শুধু চোখে দেখে বোঝার। অজ্ঞাথায় নারীকে কোন অস্তিত্বই তাদের মধ্যে নেই। সকলেরই কক্ষকেশ, জীর্ণ বসন—চোখে তাদের অপেক্ষমান জঙ্ঘর মতো একাত্ম দৃষ্টি।

ম্যাকমোহন ওদের জানেন। ওরা অর্থী ওদের মতো মেয়েরা, মেদিন মানুষ ছিলো, মেদিন ওদের স্বামী ছিলো, পুত্র ছিলো, পিতা ছিল, ভাই ছিল—ঘর-ও গৃহস্থী ছিল।

বর্তমানে কিছু নেই। গ্রামের পর গ্রামে একজন পুরুষ মানুষও নেই। গ্রামের অস্তিত্ব নেই—ঘরদোর সব ঝুলে গিয়েছে।

এই মহাঅশ্বাসনে তাই এই সব মেয়েদের আশানচরিতা শৃগাল ও নেকড়েদের মতো ক্যাম্পে অসুসরণ করা ছাড়া উপায় নেই।

যে কোন দেশে যে কোন যুদ্ধের পরে এমনি করেই শত সহস্র ধুমাবতী সৃষ্ট হয়। তারা তখন বিজয়ী সেনাদলকে অসুসরণ করে চলে—আর কিছু দরকার থাকে না।

উত্তর-পশ্চিমের অবাধ্যা জেলার এই সব মেয়েরা তাই ক্যাম্পে অসুসরণ করে চলেছে। এদের কণ্ঠে কোন শব্দ নেই—এদের শিশুরা কাঁদে না—দিনমানে কোন বোপেচাড়ে দগ্ধ-বসতিতে লুকিয়ে থাকে ! কখনো ঘরপোড়া ছাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাই উড়িয়ে খাণ্ডবস্তুর সন্ধান করে। কখনো সেই ছাই-এর পাশে মাথার হাত দিয়ে পাখর হয়ে বসে থাকে।

আর ক্যাম্পকে অসুসরণ করে। রাত্তিরে আঁধার নামলে একমাত্র সেই আঁধারে তারা বরোয়া অসুভব করে—আর এগোতে থাকে আঁধারে আঁধারে। ক্যাম্পের আশে-পাশে গুঁড়ি মেরে বসে চেরে থাকে। বাচ্চা ও বালিকাদের দেখে কখনো সখনো কেউ খাবার ছুঁড়ে দেয়, কেউ দেয় না। খাবার ছুঁড়ে দিলেই যে তারা তুলে নেয়, তা নৈয়। তারা শুধু চেরে থাকে। চেরে দেখে এরা তাঁবু খাটাচ্ছে, রসুই বানাচ্ছে, হাসিটাটা করছে—আরো কি করছে না করছে—দুই চোখ মেলে, পলক না বেলে নিনিমেমে দেখে তারা। দেশী সিপাহীরা ইতিমধ্যেই তাদের ভয় পেতে শুরু করেছে। ভয় পাচ্ছে—তাদের মনে হচ্ছে ওরা ভাইনী—মনে হচ্ছে ওদের চোখে ও নিঃশব্দে অভিসম্পাত আছে। দেশী সিপাহীরা তাই রাত খনালে তাঁবুর পেছন দিকে যেতোর না।

খেতজরা ভয় পায় না। ইতিহাসের সে শৈশবে, যখন তারা এদেশে আসেনি, ভূখণ্ডসাপরের অভিব্যবহীন ভূখণ্ডে তারা

ভ্রাম্যমানের জীবন বাণন করতো, তখন—তার পরে ঠাই না পেয়ে দল বেঁধে ছড়িয়ে পড়ে হিন্দুকুশের পথে—সার্ববাহু দল যেরে এই ভ্রাম্যসভ্যতার মহাশেষে যখন এসেছিলো, তখন—কুলা জোপদীর মতো বহু মালিক দ্বারা ধরিভা আফ্রিকাতেও যখন মিশনাবীদের সামনে এগিয়ে পেছনে বন্ধু কামান নিয়ে গিয়েছিলো, তখন—যুগে যুগে বারো বারী ও যুদ্ধেত আফিমের বীজ ও কাবানের গোল নিয়ে চীনদেশে যখন গিয়েছিলো, তখন—যুগে যুগে বাবে বাবে তারা এমনি করেই অপয়ের দেশকে আশান করছে—আশান বচন। কবতে কবতে এগিয়ে গিয়েছে—এবং সেই আশানের ডুম ও অহি অসুসরণ করে এমনি করে সব আশানচরিতা অসুসরণ করেছে।

এ তাদের পরিচিত। তাদের রক্তকণিকা এসব কথা জানে। তারা না হয়, আজকের ১৮৫৭-তে জমী গোদা—ভাদের রক্তকণিকা ত' কয় সহস্র বছরের বর্ষরতার উত্তরাধিকার বহন করে। তারা তাই জানে যে এমন হবে। এখন তারা বার বার করবে—আর বায়বার-ই বর্ণের গরিমা এবং ব্রিটিশ ঘোপগুজের শ্রেষ্ঠাধিকারের নজীর দেখিয়ে নিজেদের-ই নিজেরা 'অর ভর' বলে ডেট দেবে।

নীল, বা ব্রাইট, বা পাজোবের কুপার, বা দিল্লীর নিকলসন, বা লঙ্কো-এর তপননের ঘুম বা আহাঁরে অভিক্রটি বা কোনো আহাঁমের বদমাশত ঘটে না।

ম্যাকমোহন শুধু বুঝতে পারেন, যে তিনি পারছেন না। তিনি চেরে গেছেন। এই যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, যে তিনি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য রক্ষার্থে এই হত্যা ও হননলীলার অপারগ।

ম্যাকমোহন চোখ তাকিয়ে, বড়ো-জরকে তীব্র করে ঐ নেকড়েদের মতো অপেক্ষমান আশানচরিতাদের দেখেন। তিনি জানেন, ওরা একটা কথা কইবে না—ওদের শিশুরা কাঁদবে না, ওদের কণ্ঠ থেকে একটা শব্দ-ও উচ্চারিও ত-বনা—ওরা শুধু চেরে থাকবে। ওদের সমস্ত দেহমনের অস্তিত্ব এখন কেন্দ্রীভূত দুই চোখের মণিতে—ঝোলা, সিটয়ে পড়া, ভটপাকানো চুলের নিচ থেকে দুই চোখ নিয়ে তারা শুধু দেখবে—দেখবে এই নতুন মানবদের বাসের জুড়ি তারা কখনো দেখেনি—না মহাভারতের যুগে মহাঅশ্বাসনের সময়ে—না দাদির বা তৈমুর, বা অজ্ঞ বিদেশীদের আক্রমণের কালে। ইংরাজ সঙ্কলকে টেকা দিয়েছে। এরা তাই দেখবে এই সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণগরিবার গরিমান বিজ্ঞাতাদের।

ম্যাকমোহনের বুক যন্ত্রণার মোচড় খায়। তিনি এগিয়ে যান। বলেন—কমা করো। কমা করো আমাকে—আমাকে শান্ত দাও—আমাকে কমা করো, আমার জাতকে কমা করো—

সঙ্গে সঙ্গে শ্রেতহারা মতোই সেই চোখগুলো পিছিয়ে যায়। পিছিয়ে পিছিয়ে পাঁচ আঁধারে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে।

ম্যাকমোহন জানেন, যে তারা আবার আসবে—এগিয়ে আসবে—এগিয়ে এসে আবার চেরে থাকবে।

কত শত-সহস্র যুগ। সবগুলো যুগ এমন করে মনে গাঁথা থাকে কেন ? নিজের মনটা তাই এমন ভারী হয়েছে, ভরে গিয়েছে, চানচান হয়ে গিয়েছে, যে ম্যাকমোহনের মনে কয় বুকটা কখন বুদ্ধি ছুঁইখানা হয়ে ভেঙে যাবে। তিনি আর সহ করতে পারছেন না।

তার কানের প্রথম গোড়াপতন থেকে কত ভাবতীর টিপাই,

সত্তার, গ্রামের মানুষ, শহরের হিন্দু মুসলিম সন্তান—কতজনের সঙ্গে ছদ্মবেশে সন্ধ্যা হাশিত হয়েছিল? সকলের মুখ মনে পড়ে। এক একটা রাত হয়, আর ম্যাকমোহনের বুক জেড়ে মানুষগুলো বেবিয়ে এসে মিছিল বেঁধে তাঁর চারি পাশে ধাঁড়ায়। তারা কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন করে না। শুধু চেয়ে থাকে। এই সব মেয়েদের মতোই চেয়ে থাকে, বারি আর মেয়ে নেই—কভা, পত্নী, জননী নারীদের সব সজ্জা পেরিয়ে বারি মানুষ ও অমায়ুষের একটা অদ্ভুত নীমারেখার পৌছিয়ে গিয়েছে।

এরা তাদের মতো চেয়ে থাকে। কেন? কেন এরা একটা কথা-ও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে না? কেন তারা বলে না, যে সাহেব, বুড়া সাহেব, এ তুমি কি করলে? তুমি নামনে ধাঁড়িয়ে এ কি দেখলে? আর তুমি যে আমাদের সঙ্গে সকল দুঃখকষ্ট ভাগ করে নিচ্ছে, ভালবেসেছে, আমাদের ভাবার কথা বলেছে, বৌজীকাছনে আমাদের শান্তি হলে আজি লিখে লিখে লড়েছে, আমাদের সঙ্গে হামলীলা দেখে সিঁধির সবং খেয়েছে, আমাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে মোহর আশীর্বাদ দিয়ে থানা খেয়ে এসেছে—তুমি শেষ অবধি ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছ? সাহেব, তুমি এ কি করলে?

তারা সে প্রশ্ন করে না। বুড়া ম্যাকমোহন মাঝে মাঝে এই নীরবতার অতিষ্ঠ হয়ে বখনই বলে ওঠেন—কি বলতে চাও, বলো!

তখনই তারা সরে যায়। আর তাদের দেখেন না। জানেন, যে ওরা তাঁর নিরন্তর চিন্তার ফলে সৃষ্ট কতকগুলো ছায়াসরীর।

তখনই এ-ও জানেন, যে ধূনির আগুন কমেছে—আর বাইরের সেই সূর্যগুলো ওঁড়ি মেয়ে বেয়ে এগিয়ে এসেছে—তারা ছায়া নয়। তারা সত্যি।

এতজনকে দেখেন তিনি, শুধু চমকনকে দেখেন না। চমকন—যে তাঁর অদ্ভুতের সঙ্গী—থাকে তিনি বলেছিলেন—বাব একদিন তোমার বাড়ী। সময় হলে বাব। বাও, আপনা ঘর মে' যি কা দিয়া হালাও

সেই চমকন একদিনও আসে না।

এমনি করে চলতে চলতে ক'দিন বামে একদিন এমন রাত-ও আসে যে রাত ভোর হলে-ই কানপুর। মানে নীল তার সকল কীর্ষি জান করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে সেখানে। কানপুরে বিবিধের ইংরেজ নারী ও শিশুদের হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক সব কাহিনী সে রাতে মদের সঙ্গে চাটের মতোই পরিবেশন করা হয়। নিজেকে খেপিয়ে খেপিয়ে চড়া ভাবে বেধে রাখে সাহেব-রা। আজকের রাতটা এমন যে আজ রাত্তি অল্পগত ও বিধ্বস্ত দেশী লিপাহীদেরও তারা কথায় কথায় গালি পাড়ে। জন তুলে, জাত তুলে। অর্থাৎ আজকের রাত পোহালে যে ভোর হবে তার জন্য এই সব গোলাম সেনাদের ও অপমান করবার প্রয়োজন আছে।

আজকের রাতটা ম্যাকমোহনকে কলিজার কামড়ে ধরে। কলিজা, যেখান দিয়ে রক্ত চলাচল হচ্ছে, এবং বার থেকে সমস্ত শরীর প্রাণ পাচ্ছে, ঠিক সেইখানটার চুক বসে কামড়ে ধরে আজকের রাতটা। ম্যাকমোহন সে ধাঁড় ছাড়তে পারেন না।

আজ রাতে চমকন এসে ধাঁড়ায়। সজ্জা কুশাম্বনের সাধনা থেকে এলো, কীষে শিকারের থলি, হাতে মাছ ধরা জাল।

ম্যাকমোহন তাকে দেখে আশ্চর্য হন। চমকন তাঁকে ইসারা করে। বলে—বাইরে চা। এখানে কথা বলে সুখ নেই।

ম্যাকমোহন ওঠেন। তিনি-ও কম সতর্ক নন। নিজের রিভলভার নিতে ভোলেন না। রিভলভার নিয়ে উঠে খুব নিশ্চয় বেবিয়ে যান। চমকন তাড়াতাড়ি হাঁটে। ম্যাকমোহন দেখেন, যে পাগড়ে চড়াই উৎরাই করে করে তার পদক্ষেপগুলি কেমন বীকারা, অদ্ভুত অদ্ভুত হয়েছে। ম্যাকমোহনের এবড়ো খেবড়ো চরা জমির ওপর দিয়ে চলতে অস্বাভাবিক হয়—কিন্তু চমকন চলে তাড়াতাড়ি। ষানিকপুর এসে বখন ম্যাকমোহন দেখেন, সে কাম্প অনেক দূরে গেলে এসেছেন, এখন আর কথা বলতে আপত্তি হওয়া উচিত নয় চমকনের। এই কথা মনে করে বখন ফিরে তাকান অমনিই দেখেন চমকন নেই। চমকন নেই? সামনে হাত বাড়ান। হাতটা হাওয়া কেটে ঘুর আসে।

চুই পা কাঁক করে ধাঁড়ান ম্যাকমোহন। তাঁকে নিশি জেকেছে। নিশিই এসেছিলো চমকন হয়ে। চমকনের রূপ ধরে তাঁকে পথের নিশানা দেখিয়ে গেল। বড় চমকন, তাকে বিশ্বাস করে করে সে এলাহাবাদ আসছিল পথে অতর্কিতে ব্রাইটের গুলিতে মরে যাওয়া চমকন—সেই চমকন দেখা গেল বৃত্তার পথেও তাঁকে ভোলেনি।

আকাশের দিকে তাকান ম্যাকমোহন। এ তো সেই সব তারা ঠিক রয়েছে। প্রথম যেদিন কার্গো জাহাজ চড়ে ভারতে এসেছিলেন, বোম্বাই-এর বন্দরের আকাশ থেকে প্রথম রক্তনীতে যে সব তারারা তাঁকে অভিনন্দন করেছিল তারা ঠিক তেমনিই জ্বলছে। বাতাসও ত' তেমনিই বড়ুর মতো জুড়িয়ে গিছে কপাল, চোখ-মুখ। আর এ মাটি। ভারতবর্ষের মাটি। যে সব মানুষকে কীসীকারে মুলিয়েছেন তারা, তাদের হাতে চরা এ ধূল পাটকিলে রঙের ঢেলা ও গুঁড়োমাটি—ম্যাকমোহন জানেন, মুখ ওঁজলে এ মাটি থেকে সেই পরিচিত প্রিয় গন্ধই পাবেন।

তবে আর এই রাতটাকে টেনে নিয়ে একটা রক্তমাংসের আর্দ্রনাশে বর্ষর সকালে পৌছে দেবার দরকার কি?

চিবুকের নিচে রিভলভারের ঠাণ্ডা নলটা চেপে ধরে গুলী করেন ম্যাকমোহন। তারপর মুখ খুবড়ে পড়ে যান মাটিতে।

এমনি করে শেষ হয়ে যান ম্যাকমোহন। ১৮৫৭র দিন-কাল তাঁর জীবনবৃত্তি এবং জীবনব্যয়ের পক্ষে বড় বেশী সমস্তাসম্মূল হয়ে উঠেছিল। নিবিচার বরহত্যা, এক রাষ্ট্র ও রাজত্বের নামে এই হননলীলা তিনি কিছুতেই মনে-প্রাণে মেশাতে পারছিলেন না। ম্যাকমোহনের কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন জড়িয়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। তার উত্তরের কিনারা তিনি করতে পারেননি। তিনি প্রশ্নবস্ত: এক সর্বপ্রথম একজন রাষ্ট্র ইংরেজ। একজন রাষ্ট্র ক্রিষ্টিয়ান। কিন্তু তারও আগে, সর্বপ্রথমে ধর্মগত ডুমিঠ হয়ে প্রশ্ন কি তিনি মানুষ নন? তিনি প্রশ্নে মানুষ, দ্বিতীয়ত ইংরেজ? না প্রশ্নে এক চিবুকের ইংরেজ?

এই নির্বোধ প্রশ্ন তাঁর মনে হয়েছিলো। উত্তর পাননি।

বুড়া ম্যাকমোহন, তাঁর কোলের দেওয়া ভালবাসার নাম। সেই বুড়া ম্যাকমোহন, নিজের জীবনের সকল কর্তব্যকে বিশ্বাস করেছেন। তিনি অনেক কিছু করতে চেয়েছেন। তিনি পাপামোদের বাসোতো

ধাকবেন—তিনি অনেক কাজ করবেন, যার বড় প্রয়োজন এদেশে। তাঁর আদর্শ ছিলেন কর্ণেল স্ট্রীমান প্রমুখ ভারতপ্রেমী বৃদ্ধ ইংরেজরা। তিনি তাঁদের আদর্শে, খাঁটি ক্রিষ্টিয়ানের মতো ভারতকে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবনবোধ তাঁকে এই শিখিয়েছিল যে, এই দেশকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে, ভালোবাসা দিয়ে, কমা দিয়ে, সেবা দিয়ে তবে এদেশে বৃটিশ শাসনকে সার্থক করা যাবে। কেন না নিজের দেশকে ম্যাকমোহন সত্যিই ভালোবেসেছিলেন। জায়গারায়ণ ইংরেজ জাতি কোন ভুল বা অজ্ঞার করতে পারে না—এই ছিলো তাঁর বিশ্বাস।

দেখা গেল, ১৮৫৭তে তাঁর মতো ধ্যানধারণাসম্পন্ন ইংরেজের কোন প্রয়োজনই নেই। তিনি একেবারে বরবাদ। আত্মকের দিন কে কে ভ্যরতে যে ইংরেজ প্রয়োজন হবে, সে ঐ নীল, ব্রাইট, হডসন, নিকলসন ও কুপার। তাঁর মতো ভারতীয় ভাষা শেখা, আচার-ব্যবহার শেখা, এদেশের প্রতি প্রত্যাশী, ভালবাসা ও স্নেহভরা স্বপ্ন, বোদে পোড়া, জলে ভেজা তামাটে মুখ ইংরেজের আর কোন প্রয়োজন হবে না।

এরা যা বোঝে, তিনি তা বোঝেন না। যদি সময় পেতেন, তবে ম্যাকমোহন অনেক কাজ করতেন, যার কোন জাগতিক প্রয়োজন নেই। টানা টানা অক্ষর, হাঁসের পালকের কলমে—‘Fifty Years in India’ বইখানা তিনি লিখে শেষ করতেন। তাতে এদেশের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসার কথা লিপিবদ্ধ থাকতো। সময় পেলে কুমায়ূনের বনাঞ্চল সে সাফাখানায় গিয়ে তিনি গাছের প্রথম কুসুমসঞ্চার দেখতেন। মৌসুম পাখীরা এসে কেমন করে বাসা বাঁধে, কেমন করে সঙ্গিনীর সঙ্গে প্রণয় করে—কেমন করে বাচ্চাকে উড়তে শেখায় তাই দেখতেন। সময় পেলে চম্বনের সঙ্গে তাঁর গাঁয়ে যেতেন। চম্বন তার ডেরাপুর গ্রামের নদীর ধারে একটি বটগাছের কথা প্রায়ই বলতেন—তিনি সেই বটগাছটা দেখতেন। গাছ, ফুল, পাখী, এ সব তাঁকে চিরদিনই আকৃষ্ট করেছে। সময় পেলে গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের চিবুক তুলে ধরে, তাদের কাশো চোখের অতল সরোবর দেখতেন। ভারতের শিশুদের চোখের চাহনি তাঁর চিরদিন আশ্চর্য্য লেগেছে।

সে সব কিছু হলো না। ম্যাকমোহনের কুমুদে সাধা চুলগুলো রাতের বাতাসে উড়তে লাগলো। তাঁর মুখটা মাটিতে গৌজা। তাই আকাশ দেখতে পেলো না তবে রঙে ভেজা সে মাটি, কৌটার মত অন্ধ চোখে অল্পভব করেও ছুঁয়ে ঠিকই জানলো, যে তার বুকে গৌজা ম্যাকমোহনের সে মুখটা যীরে যীরে প্রশান্ত হয়ে আসছে। শরীরটার নান্দু ঢিলে হয়ে আস্তে আস্তে আরাম পাচ্ছেন ম্যাকমোহন।

ডেরাপুরের সে বটগাছও ভালো ভালো বৃদ্ধসহ বুলবার হুগলি জানলো।

ম্যাক্সওয়েলের বাহিনী আসবার খবর পেয়ে গ্রামের মানুষ পালিয়ে গিয়েছিলো। তবে সকলেই কিছুই আর বুদ্ধিমান নয়। কিছু কিছু মানুষ থাকে সোঁরায এবং নির্বোধ, তারা কোনমতেই কোন বুদ্ধিই ভুলতে চায় না। চম্বনের ছেলে, চম্বনের বাপ প্রতাপকে যেমন বোঝাতো পারল না কেউ। সে গ্রাম হেঁড়ে গেল না। কলসো,

আমার গম সব পৌলার ভরতে হবে মানুষ না পাই। আমি আর বোঁ মিলে তুলবো।

গ্রামের বয়স্ক মানুষরা বললো—প্রতাপ, তোমার এত বুদ্ধি আর এত কথাটা বোঝ না, যে তোমাকে যদি জানে যেবে রাখে তা হলে গম দিয়ে কি হবে?

—জানো মারবে কেন?

প্রতাপ সবজাতীর মতো হাসতে লাগল। বললো—

আমার বাড়ীতে পেটি খুলে দেখিয়ে দেব সাহেবকে—বাবার কাছে সাহেবদের সার্টফিকেট আমার ছেলে চম্বনের নামে সাহেবের সার্টফিকেট সব আছে। সাহেবরা ত ম' বাপ, তারা ঠিকই বুঝবে।

অল্প কারও ঘরে তেমন প্রাণ বাঁচাবার কোন সাক্ষী প্রদান ছিল না। তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। গল্প-বাতুরের দড়ি কেটে দিয়ে গেল। তারা স্বচ্ছন্দভাবে চলে থাকে। ঘরদোয়ের জন্তে ভালো না। প্রতাপের মতো বিশ্বাস নিয়ে আত্মা যে কতজন বসেছিলো গ্রামে তারা সবাই গ্রামের মানুষের এ আচরণ দেখে দুঃখে মাথা নাড়ে।

প্রতাপ কোনদিনও বাপের মতো একতরফে বা ছেলের মতো বেপারোয়া নয়। সে কলকৌশলে কাজ আশায় করতে বিশ্বাসী। বিক্রয়ী ইংরেজ বাহিনী আসছে জেনে সে শি, দ্বধ, মধু, কলা ও শাক-সব জীব ভালো সাজিয়ে সান্দ্য করতে যার মাখার পোষাকী পাগড়ী বেঁধে।

তাই দেখেই সন্দেহ হয় ব্রাইটের। প্রতাপের কাছে তাইই মামা ম্যাকমোহনের চম্বনের সম্পর্কে চিঠি দেখে সে সন্দেহ এবার বনীভূত হয়। তার আর বুঝতে বাকি থাকে না, যে এ একটা পুরোদস্তুর Rebel village, সেট চম্বনেরই ছেলে প্রতাপ—এক এমই সহযোগিতার ফলে গ্রামের অল্প মানুষগুলি পাশিয়েছে। এই সব কথা তাঁর মনে দ্রুত বাসা বাঁধতে থাকে। তার পর প্রতাপকে বলে—তোমার মতো এই বকম বিশ্বাস আর কতজন আছে, ডেকে নিয়ে এস।

বেশী কেউ ছিলো না। গ্রামের বৃদ্ধো মৌলভী আর বুড়ী কৌশল্যার বাড়ি। এই গ্রামে এক—এই অকলে এক সময় জরী-কাজের খ্যাতি ছিল। এ গ্রামের শেষ কারিগর শামাদের কাছে ছেলোটো জরী-কাজ শিখছিলো। পনেরো বোল বছরের ছেলে—বৃদ্ধ কাজ আর ছোটখাটো জিনিষ তৈরীতে তার নিপুণতার কথা সবাই জানে। শামাদ তাই ছেলোটাকে জরীকাজে তালিম দিয়েছিল। এমনও বলেছিল—আগ্রাতে গিয়ে যদি তার চাচেরা ভাইয়ের কাছে আমাদের পরিচয়পত্র নিয়ে হাজির হয় ছেলোটো তার চাচেরাজাই তবে তাকে নিজের কারবারে শিক্ষানবিশ করে নিতে পারে। সেই ছেলোটো যারিনি। দুর্গার কাছে খাওয়া লাওয়া করছিল—আর নিজের ছেলোটাকে ঘরছাড়া করে থেকে অল্প বয়সের এই ছেলোটোর ওপর দুর্গার কেন এমন মাতা পড়েছিল। এক দিন ছেলোটো এইখানেই প্রতাপের সঙ্গে কাজে সাহায্য করেছে। দুর্গার কাছে কাছে থেকেছে। আর দুর্গা তাকে অনেকবার বলেছে যে চম্বন কিংবদন্তি আসবে—চম্বাকে নিয়ে আসবে—আর তখন এই ভাল ঘরখানা ছেলে-বোকে ছেড়ে দিয়ে দুর্গা গুটিকের ঘরে থাকে। ছেলোটাকে তখনও নিরাস্রর হস্তে হবে না। আগ্রা বাবার জন্তে যে টাকা দরকার, তা সেই দেবে।

রাজ সন্দর্শনে ডাক পড়েছে। মৌলভী পরিভার সাধা পোষাক পরে আসে। ছেলেটা আসে প্রতাপের সঙ্গে। আর কেউ নেই কেনে এবার ব্রাইট উঠে আসে। একজন বৃদ্ধ, বালক ও একজন প্রৌঢ়কে ধরতে ছয় জন গোরাই বখেই হয়।

সেই বটগাছটাই বেশ উপযোগী বলে মনে হয়। সঙ্গে দড়ি ছিল না। একজন গিয়ে প্রতাপেরই বাড়ী থেকে দড়ি নিয়ে আসে। প্রতাপ চিরদিন ভীক ও গা-পোষা ছিল। তার বাপ তার মধ্যে পৌরুষের অভাব দেখে কত লজ্জিত হয়েছেন। ছেলেও লজ্জা পেয়েছে বাপের জন্তে। আর সে যে মরদের মতো মরন নর—তা নিয়ে দুর্গাই কি কম কথা শুনিরয়েছে তাকে?

বৃত্তার সামনে এসে প্রতাপের সে ভয়-এক দুর্বলতা কোথায় চলে যায়। যেই জানে, যে কি হবে এখন—প্রতাপ সাধা থেকে পাগড়ী খুলে ফেলে পা থেকে জুতো খুলে ফেলে—গলায় সৈবীনাথের প্রাণদী কবচ ছিল, সেটা আর কিরকাদেবর হোঁরায় কলঙ্কিত করে না—ছুড়ে ফেলে দেয় নদীর জলে। পায়ের কাছে অবধি জল উঠে এসেছে। জাঁজলা ভরে জল তুলে খেয়ে নেয়, মাথায় গায়ে ছিটিয়ে দেয়। মৌলভীকে বলে—এমন জানলে চন্দনের মার হাতের চুড়ি নিয়ে ভেঙে দিয়ে আসতাম।

তার শুণু চিন্তা হয়, দুর্গা দেখতে পাচ্ছে কি না, বাড়ী থেকে।

ভায়শব সে বোকে, এখন এ চিন্তা করেও তার লাভ নেই। কুরে মনটাকে বেঁধে ফেলে।

প্রতাপ এমন নির্ভীক ভাবে, এমন অবহেলে মরে—তা দেখতে কেউ থাকে না এই যা—নাইলে, সে ভয়হীন ভাবে বৃত্তাবরণ দেখলে পরে তার পিতা চন্দন গোরব অমুভব করতো—তার ছেলে চন্দন দেখলে অভিভূত হতো—আর তার কতই দুর্গা তা দেখলে পরে স্বীকার করতো, যে হ্যাঁ, সারাজীবন তোমার মধ্যে যে পৌরুষ খুঁজছি আমি তবু পাইনি সেই পৌরুষ চূড়ান্তভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেলে তুমি। আমি দেখে থুতু হলাম।

গ্রাম লুটে, বয়াল গাড়ীতে অন্ত্র খাঁতসস্তার তুলে নিয়ে চলে যায় ব্রাইটের ব্রিগেড। সকালের আলো পড়ে বড় স্নন্দর দেখায় ব্রাইটকে। গ্রীক-ভান্ডারের হাতে ক্ষোদিত সূর্যসেবতা এ্যাপোলো বেন খেলাচ্ছিলে এই বোম্বার সাঙ্ক নিয়ে চলেছেন। ব্রাইটের সোনালী চুল, ও অল্প কৃত্রিম দাড়ি গৌকের ওপর আলো চকচক করে। দুটি চোখ বেন স্বপ্নদর্শী, সে চোখ অনেক সোনার স্বপ্ন দেখে।

প্রতাপ, মৌলভী ও কৌশল্যার নাতি—তিনজন তিনটে ভালো নিকশূ হার বোলে। তারাও একদিন জীবিত ছিলো—যে বার মতো ভাবে জীবন থেকে জীবনের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই সত্যবনে সে সব শিক্ষা কোন কাজেই লাগলো না। প্রতাপ ভালো গৃহস্থ ছিলো। চাঁবাস আর জমিতে তার প্রাণ ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, গ্রামের বৃড়া বাতবরসার-ও গুল, কড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি কসলের ভালোমন্দ, এ সব বিষয়ে প্রতাপ যে ভাদের থেকে অনেক বেশী বোকে, অনেক বেশী জানে—সে কথা স্বীকার করতো। মাটি দেখে বুঠো বেঁধে প্রতাপ বলতো,—এবার মাটি কি রকম রসাল হয়েছে। এবার অড়হব আর ছোলা তুলে শেষ করতে পারবে না। সেখান মাটির চেহারা?

নিজের ক্ষেতীকিষাণদের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করতে করতে

বাতাস ভাঁকে সে বুঠির সস্তাবনা অমুভব করতো। বলতো—বুঠি এসে পড়বে কালকে নাপাদ। হাত চালিয়ে কাজ করো তোমরা।

মাটিতে পা রেখে, হাতের বুঠোর বীজের গড়নি তল্লভব করে, সেই বীজ মাটিতে পুঁতে নালা কেটে ভাল সেঁচে সেঁচে, সেই বীজকে গাছে পরিণত করে—প্রতাপ ডেবানুরের ক্ষেত ও ফসল ও জল-বাতাসকে মনে-প্রাণে পুঁথির মতো পড়ে নিয়েছিলো।

মৌলভীর শুণু কোরাণ-ই মুগ্ধ ছিলো না, সে সবসময় গ্রামের ছেলেদের কারসী পড়াতে শিখিয়েছে—সে নানা বকম ধর্মীয় উপাখ্যান জানতো। অনেক পীর, ককির ও দরবেশের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা—হাজিপুরের সে মুক্শেদ পীরের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা—বহু বাবলা বেগমের কাহিনী “লয়লামজহু” এবং সোবাবরুস্তমের কিসসা এ সব সে জানতো। তাছাড়া সে জানতো কিছু হাকিমী দাঁওরাই—নতুন প্রযুক্তিরের শরীর তাড়াতাড়ি ভালো করতে হলে কি খেতে হয়—গরমের কালে ছোটদের চোখে গরম বাতাস লেগে খালা করলে এবং জল কাটলে কি মলম দিতে হয়—তাও সে জানতো। গল্প কাহিনী বলবার মতো একটা কণ্ঠ লাভ্য তার ছিলো। তার গলায় গল্প কাহিনী শুনতে লোকের খুব ভালো লাগত। কেননা তার উচ্চারণ ছিলো বিবৃদ্ধ এবং গল্প বলতো সে প্রাণ দিয়ে। মাহুতী শান্তিপ্রিয় এবং গ্রামের সকলে যেমন তাকে ভালোবাসতো, সেও গ্রামের সকলকে ভালোবাসতো। তার কপে দুই চারজন শতবর্ষজীবী পিতৃপুত্র ছিলেন। সেও শতবর্ষ বাঁচবার আশা রাখতো, এবং বয়স সত্তর পেরুতই সে মাস ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধচারীর জীবন অবলম্বন করেছিলেন।

কৌশল্যার নাতির বয়স ছিলো কম। তার আঙুলে ছিলো প্রথম প্রণয়সক্ত কিশোরীর মতোই ভীক কোমলতা। সেই আঙুল দিয়ে কপোর ছুঁতে ভনী পরিয়ে কালা ডেলভেটের ওপর—সে অতি স্নন্দর, অতি নিখুঁত ভাবে গোলাপগুচ্ছ কোটাতে পারতো। আরো স্নন্দর স্নন্দর নজ্জা জাহির করবার ইচ্ছা তার মনে ছিল এবং সে আশা রাখতো, যদি সুযোগ পায় এবং টাকা-পয়সা হয় তার, তবে পরীর কারিগর হয়ে শুণু খন্দেরের টাকার ফরমায়েসী জিনিষ না বানিয়ে সে নিজের জঙ্গে একটা তাজমহল বানাবে। সকল জরীর কারিগরই শেষ অবধি একটা জরীর তাজমহল বানাতে চায়। সেও বানাবে। তবে জরীর কাজে যে টাকা দরকার, তার তা নেই। সে আশা রাখতো, একদিন তার সে টাকা হবে।

এরা এই সব জানতো। কিন্তু এই সব জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা এ সময় কোন কাজেই লাগলো না। এই সব অনেক পরিচর, এ সময় কোন কাজেই লাগলো না। হাজারটা খুঁচুরে পরিচরের ভেতর থেকে একটা পরিচরই ছেঁকে তুলে নিলো ইয়েজরা—যে তার ভায়তীর। অজ কোন পরিচরের প্রয়োজন নেই।

প্রথমে তাগড়া-তাজা, তার পর আঙু আঙু দুর্গক ছড়িয়ে গলে-পড়ে—তার সেই বটগাছের ডালে অনেক দিন ধরে কলে রইলো।

দুর্গার মাথার দোব হয়েছিলো। দেশ-ঘর ছেড়ে, কোঁজের পেছন পেছন এসে সে কানপুরের বাজারের রাস্তার ঘর বানালো। ঘিন-রাস্তা বিকিড় করে বকতো আর আঁচলে খুলে নিয়ে বাসি-পুত্রের জঙ্গে

ধাবার নিয়ে কেতে যেতো—বাতাদের গায়ে হাত বুলিয়ে শতবের পা
টিপে তাকে দেশে থাকবার অজুর্গোষ করে চোখের জল লেগেতো—আর
চন্দন আর চুশা, ছেলে-বোয়ের বিয়ের বাজনা নিয়ে মুখে বাজিয়ে
ধুলা দিয়ে কুলের জলের চড়া দিয়ে দিয়ে ছেলে-বো ঘরে তুলতো।

এ রকম অনেক হয়েছিলো। বেনারস, এলাহাবাদ, কন্তপুর,
কানপুর, লক্ষৌ, দিল্লী, মীরাট—এই সব শহর, শহর ঘিরে যে বর্ষিক
গ্রাম—সে সব জায়গায় এই রকম উদ্ভাস জ্বলোকদের অভাব ছিল
না। তারা সংখ্যায় অনেক। অনেক হাজার হবে। তারা সকলেই
পাগল, তবে নজর করলে দেখা যেত একই ‘method in
madness’ তাদের মধ্যে। তারা সকলেই হাত বুলিয়ে পান গেরে
কচি ছেলে ঘুম পাড়ায়, বিকৃত অলভসী করে সন্ধ্যাবেলা ছাগল গরু
তাড়িয়ে গায়ে আনে—খুলা ও জঙ্গাল দিয়ে বারিগুরুকে ধাবার
পৌছাতে বার কেতে—আর রাজ্যের চৌমাথায় বসে বান্নাবান্না, ঘর
সংসারের কাজ করে—নেড়ী ও খেঁকি কুকুরকে দেখলে ঘোমটা টেনে
—এ কি, তুমি কখন এলে? বলে সগঞ্জে মাথা ঘুরিয়ে নেয়।

এই এক ধরনের পাগলামি তাদের সকলের মধ্যেই ছিলো।
তাদের মধ্যেই দুর্গাও হারিয়ে যায়।

যে স্মৃতিতে ব্রাইটের জীবনটা দুনিয়ার সঙ্গে বাঁধা ছিল, সে
স্মৃতিটাও চটক করে কেটে গেল।

কানপুরে এসে ব্রাইট মুখে মুখে খবর পায়, যে ব্রিজহুলারী তাকে
খুঁজছে। আর সেটা তার কাছে খুবই বাতাবিক বলে বোধ হয়।
কেন না ব্রিজহুলারী তাকেই খুঁজবে—এখন নয়, চিরদিন-ই—এটা-ই
বাতাবিক। লড়াই-এর স্বর থেকে ব্রাইট কম টাকা হস্তগত করেন।
এবং সে সবার বন্ধপাবেক্ষণের জন্ত—নানাকারণেই তার ব্রিজহুলারীকে
শ্রোতামন। আরো কি, এই কয় মাসে ব্রাইট ভালো করেই বুঝেছে,
যে ব্রিজহুলারী বাতাবিত অজ্ঞ নারীতে তার কুটি হবে না। এমন কি,
ব্রাইটের এমন সন্দেহ-ও হচ্ছে, সে বৃষ্টি বা ব্রিজহুলারীকে ভালবাসে।
এ-ও যদি ভালবাসা না হয়, তা অজ্ঞ কাকে ভালবাসা বলে ব্রাইট
জানেন না।

শেষ মগনলালের এক বাগানবাড়ী কানপুরের উপকণ্ঠে—সে
বাড়ীতেও মগনলালের গুপ্ত তোযাখানা আছে—এরকম শুনে
চুকেছিলো ব্রাইট। সে বাড়ীতে আসবাবপত্র এবং অস্ত্রাস্ত্র তৈজস বা
ছিলো, তা মহামূল্য। ঘর থেকে ঘরে ঘুরছিলো পোরার।

চূড়ান্ত সে গোলমালের মধ্যে-ই। একটা পালক ঠেলে কেলে
মোঝতে কোটার করে রাখা এক লোহার পেট ঠিকই আবিষ্কার করলো
ব্রাইট। টাকা নেই—কিছু সোনার আভরণও গোলাপ পাশ
আছে। তাই বা মন্দ কি। ব্রাইটের মুখ এক আশ্চর্য
আত্মপরিতৃপ্তির হাসিতে ভরে গেল। এ বিষয়ে, অর্থাৎ একটা
বড় বাড়ীর ঠিক কোথায় লোহার পেট থাকবে—সে বিষয়ে তার
একটা আশ্চর্য বোধ জন্মেছে।

—নিচু হয়ে ব্রাইট পেটির ওপর উপুড় হয়ে পড়লো, আর উপুড়
হতে হতেই সামনে দেখলো ব্রিজহুলারীকে। ওদিকে বৃষ্টি পোষাগুলো

আঁতাবলে আঁতন দিয়েছে। দরজা দিয়ে হাসরোখকারী বোঁয়ীর
কুণ্ডলী ঢোকে। নাক-মুখ জ্বালা করে—সেখতে কষ্ট হয়, তবু
ব্রিজহুলারীকে সে ঠিকই চেনে।

ব্রাইট মুখ তোলে—কি বলতে ও চার আর তাতেই সুবিধা
হয় ব্রিজহুলারীর। এই মামুষটাকে খুঁজে খুঁজে সে অনেক দিন
পরে কিরেছে। এখন তাকে পেয়েছে। সুবিধেজনক ভাবেই
পেয়েছে। ওড়ি মেঝে উপুড় হয়ে আছে ব্রাইট—আর মুখটা
উঁচু করেছে বলে, গলাটা বেশ দেখা যাচ্ছে। ব্রিজহুলারী তাক
করে গুলী ছোঁড়ে গলায়। রিভলভারে কটা গুলী ছিল কে জানে!
আধাগর্জন আধা চীৎকার করে ব্রাইট গড়ির পড়তে না পড়তেই
সে বাকি গুলীগুলোও ছুঁড়তে থাকে।

সৈন্তরা ততক্ষণ পালেশ কুটি চড়াও করেছে। ব্রিজহুলারী
রিভলভারটা ফেল দিয়ে ব্রাইটের দেহটা টপকে দরজার কাছে
এসে ভবানীশঙ্করের ওপরে আছড়ে পড়ে।

দীর্ঘ চর্য মাস বাসে দেখা। তবু আশ্চর্য হন না ভবানীশঙ্কর।
তাকে জড়িয়ে ধরেন।

ব্রিজহুলারী নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। বলে—ব্রাইটকে আমি
মেয়েছি।

ভবানীশঙ্কর তাকে টেনে আনেন। তাঁর বকের কাছে মুখ
রেখে ফিস ফিস করে ব্রিজহুলারী বলে—এখন আমার কেউ নেই।
কিছু নেই। এখন তুমি আমাকে নিতে পারবে না?

—পারব।

—জায় কখনো ঘুরে ঠেলে দেবে না?

—না।

সে কুটি জ্বলতে থাকে—সে কুটির ছাঁট ও আঙুন উড়তে থাকে।
এই আশান মাড়িয়ে ভবানীশঙ্কর ও ব্রিজহুলারী গলায় দিয়ে নৌকার
ওঠেন। এলাহাবাদ বা বেনারস, বা অস্ত্র কোথাও, যেখানে হয় ঘর
বাঁধবেন তাঁরা।

এই আশানকে উপেক্ষা করে, নিজেলের প্রেম দিয়ে, জীবনত্যা
দিয়ে আবার নতুন এক ইতিহাসের গোড়াপত্তন করবার দুঃসাহসী
সহস্র নেন ভবানীশঙ্কর ও ব্রিজহুলারী। তাঁদের এ প্রেম ইতিহাসের
কোথাও লেখা থাকবে না—এবং তাঁরা যে নতুন এক ইতিহাস
রচনা করছেন তাঁ-ও তাঁরা জানেন না। তবে অনেক
মৃত্যু, এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে এইটেকে মনে হয়
পরম লাভ।

নৌকোটা তাঁদের নিয়ে তেলে চলে। আজ প্রায় নিলক্ষ হয়েই
ব্রিজহুলারী ভবানীশঙ্করের বুক জড়িয়ে থাকে। এতটুকু বিচ্ছেদ-ও
সহ হয় না আজ।

যাকি কিছু মনে করে না। মনে করবার দিনকাল এ সত্যজন
নয়। এখন চারিপাশ শুধু মৃত্যু, তাই এতটুকু জীবনের আশাস
যেখানে, সেখানে এমনি করেই দুজনে দুজনকে ধরতে হবে—তা মনে
মাকি বোঝে।

সত্যজন সকলকেই জানী করেছে।

[ক্রমশঃ]

॥ মাসিক বসুমতা বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

বিদ্যাসিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরজ্ঞন দাশগুপ্ত

দেখতে দেখতে আরও বোধ হয় বছরখানেক কাটল এবং ক্রমে ভায়লেটের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব সহজ হয়ে পড়াল।

অর্থাৎ কাজের শেষে রোজই সকালবেলা 'চা' খেতে খেতে দু'জনার কথাবার্তা চলত অনেকক্ষণ—এবং ভায়লেটের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে একটা আনন্দ ছিল, সে কথা আগেই বলেছি। প্রত্যেক কথায় এমন সাড়া পাওয়া যেত তার মধ্যে যে অনেক সময় অবাক হয়ে ভেঁজেছি—মেয়েটির কি বুদ্ধির সীমা-পরিমীমা নাই! তাই অনেক বিষয় তার সঙ্গে আলোচনা করেছি সে সময়, অবশ্য বেশীর ভাগই আমার ডাক্তারীর ব্যবসার দিক দিয়ে।

এক দিন কথায় কথায় ভায়লেট বলল, আপনার ডাক্তারীতে যে রকম বুদ্ধি, আমার ত মনে হয় আপনার ম্যানচেষ্টারের মতন কোনও বড় সহরে একটা প্র্যাকটিস্ কিনে সেখানে বাওয়া উচিত। সেখানে সহজেই আপনার ব্যবসা খুব বড় হয়ে উঠবে এবং ক্রমে আপনি ইংল্যান্ড-বিখ্যাত লোক হয়ে উঠতে পারবেন। হাজার হলেও সেল ত ছোট সহর, কতটুকুই বা এর চাহিদা।

তুখালাম, তা এখানকার কি হবে?

বলল, হয় এটা বেচে দিন, না হয় একজন এসিস্ট্যান্ট বসিয়ে দিন।

বললাম, এখানে বাড়ীঘর করে গুছিয়ে বসেছি—

বলল, তা ম্যানচেষ্টার যদি যান—এখানে না হয় প্রত্যেক শনি রবিবার আসবেন। চাই কি, সপ্তাহে আরও একদিন এসে এখানকার প্র্যাকটিস্‌টা তদারক করে যেতে পারেন।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, দেখি ভেবে,—মালিনকেও বলি।

বলল, তিনি নিশ্চয়ই কথাটার সমর্থন করবেন। খামীর উন্নতিতে সত্যিকারের জী কি কখনও বাধা দেয়?

* * * *

মালিনকে সেই দিনই কথাটা বললাম। মালিন কথাটা শুনে একটু চুপ করে থেকে কেমন যেন একটু উদাসীন ভাবে বলল, আবার—ম্যানচেষ্টারে গিয়ে কি হবে। কি হবে আর বেশী টাকা রোজগার করে।

বললাম, শুধু টাকা ত নয় লীনা! ভায়লেট বলে—ম্যানচেষ্টার গেলে আমি একদিন ইংল্যান্ড-বিখ্যাত লোক হতে পারব।

একটু চুপ করে থেকে মালিন বলল, মনের শান্তিটাই ত সব চেয়ে বড় কথা।

সত্য কথা বলতে গেলে, মালিনের এই উদাসীন ধরণটা আমার কেমন ভাল লাগল না। জীবনে আমার উন্নতির দিক দিয়ে কি উৎসাহ আগ্রহই না ভায়লেটের মধ্যে পাই,—আর মালিনের মধ্যে।

শুধু এ ব্যাপারেই নয়। ইদানিং এই মাস দু-তিন থেকে মালিনের মধ্যে আবার একটা ভাবান্তর সূত্র হয়েছে—সেটা লু থেকে ফিরে আসবার পরে কিছুদিন লক্ষ্য করেছিলাম। জীবনের কর্তব্য সবই করে যাচ্ছে কিন্তু কোন কাজেই যেন কোনও উৎসাহ নাই, আনন্দ নাই। এবং টোন্টের সেই মধুর হাসিটি ঠোঁট থেকে যেন মিলিয়ে গেছে। মালিনের গভীর চোখ দুটি স্বভাবতই একটু বিষণ্ণ, জানই ত—

—তা যেন বিষণ্ণতায় আরও গভীর হয়েছে। একমাত্র বলতে লজ্জা করব না—প্রাণ ঢেলে বখন আমার বুকে আশ্রয় নেয় তখনই প্রাণের ক্লাস্তি ও বিষাদ আমার বুক ঢেলে দিয়ে যেন একটু বাঁচে।

কেন এমন হল,—নানা দিক দিয়ে মালিনকে অনেক প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাই নি। কখনও বা রাগ করেছি একটু আখুঁত কখনও বা অভিমান করেছি। আবার কখনও বা মধুর আদরে মালিনকে প্রোৎসাহ করে তোলার চেষ্টা করেছি—কিন্তু তাতে করে দৃষ্টিকের জন্ত একটু কল পেলোও আসলে মালিনের মনের বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারিনি।

অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত মনকে বুঝিয়েছি—কারণ কিছুই নাই, এটা একরকম মানসিক ব্যাধিই বলতে হবে। সেবারেই মনস্তন কিছুদিন গেলে আপনা থেকে বাবে কেটে। এ সময়টা মালিনের উপর আমার রাগ বা অভিমান করা উচিত নয়।

বাই হোক, কলে মালিনের সঙ্গে কথাবার্তার সেই সহজ আনন্দ ক্রমে যেন হারিয়ে গেল। তাই কি, সাক্ষারীতে ভায়লেটের সঙ্গে কথাবার্তার দিকটা ক্রমে উঠতে লাগল জমে। আজ জীবনের অপরাধে ঝাঁড়িয়ে এ কথাটা ভাবতেও যে আমার লজ্জা হয়।

এই সময় একদিন কথায় কথায় ভায়লেটকে তুখালাম, ভায়লেট!

কিছু ভাল লাগে না, জীবনে কোনও উৎসাহ নেই—মনের এ রকম একটা অবস্থা মাঝে মাঝে কেন হয় জানি ?

ভায়লেট বলল, জানি বৈ কি। দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞান দেখছি। ক্রমে ঐ থেকে melancholia হতে পারে।

ভায়লেটের কথাটা ভাল লাগল না। বললাম, না না, সেটা ত একটা সাংঘাতিক মানসিক ব্যাধি। এ মনের একটা সাময়িক ভাবান্তর—ক্রমে কেটে যায়।

ভায়লেট শুধাল, সে রকম বোগী কি আমাদের কাছে কেউ এসেছে ?

বললাম, না—এমনি কথাটা মনে হল।

ভায়লেট একবার চোখ তুলে দোজা চাইল আমার দিকে। ভায়লেটের এ চাহনি এর পূর্বে দেখিনি। চোখের গভীরে একটা চাপা হাসির উজ্জ্বল আলো আমার চোখের মধ্য দিয়ে আমার অন্তরতম অন্তর বিদ্যুৎ করে সমস্ত যেন নিল দেখে, আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

একটু চুপ করে থেকে মাথা নীচু করে ভায়লেট বলল, যে কারণে হয়, সেই কারণটা কেটে গেলে মনের এ ভাবটাও যায় কেটে।

বললাম, কোনও কারণ নাও থাকতে পারে—বিনা কারণেও হয়।

ভায়লেট বলল, আপনি অবশ্য আমার চেয়ে বেশী জানেন। কিন্তু আমি বা জানি বা দেখেছি—কারণ একটা থাকেই।

বললাম, না। অনেক সময় কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভায়লেট বলল, আপাতত দৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। দেখানো বাইরের কোনও কারণ থাকে না কিন্তু অন্তরে খুঁজলে কারণ পাওয়া যায়ই।

বললাম, তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বলল, যে জীবনধারণ চলে তার মাধ্যমে আনন্দ হারালেই ঐ রকম হয়। কিন্তু সে আনন্দ হারাবার কারণটি অনেক সময় অন্তরেই ঘটে।

শুধালাম, কি রকম ?

একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো—এই ধরন—কোন মেয়ে প্রাণ তেল ভালবাসে স্বামীকে বিয়ে করেছে। কিছু দিন পরে হঠাৎ বুঝতে পারলে সে স্বামীকে আর ভালবেসে না, স্বামীই মধ্যে আর কোনও আনন্দ নেই। ছেলে মেয়েও হয়নি যে তাদের অবলম্বন করে আনন্দ পাবে। তখন তার ঐ অবস্থা হতে পারে।

যনটা চমকে উঠল। ভায়লেট কি মালিনকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলল ? ভায়লেট কি বুঝতে পেরেছে মালিনকে নিয়েই আমার কথা। মাথা নীচু করে কথাগুলি বলতে বলতে হু একবার মাথাটি হেলিয়ে ঈষৎ উঁচু করে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছিল—আমার ভাল লাগেনি।

তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম, থাকে ও সব বুঝা আলোচনা করে লাভ কি। যদি কখনও কোনও কেস আসে তখন দেখা যাবে। কিন্তু—

শুধাল, কি ?

হিমালী

বিউটি পাউডার

রূপের জোলুস বাড়ায়

যজ্ঞ আবরণের মত মুখশীকে আবহাওয়ার রক্ষতা ও যত্নের!
হস্ত থেকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ফ্রম 'শেড'-এ পাওয়া যায়।



হিমালী আইডেট লিঃ কলিকাতা-২

বললাম, তুমি এত জামলে কি করে ?
 দুহু হেসে বলল, আমি যে ভুলভোগী !
 শুধালাম, কি রকম ?
 বলল, আজ থাক, আর একদিন বলব।

বাড়ী কিংবদন্তি যেতে সহজেই বুঝতে পারলাম—মনটা ধারণা
 হয়ে আছে। ভায়লেটের কথার মধ্যে কি বিষ ছিল ? ক্ষুদ্র
 ইনজেকশনে কি সেই বিষ ঢেলে দিয়েছিল আমার মনে ? মালিনের
 আশ্রয় প্রতি ভালবাসা আর নাই—এ কথার ইঙ্গিতও যে আমি সইতে
 পারি না। হাই হোক, বিষের ক্রিয়ায় মনটা প্রায় আট-দশ বটা ভাঙি
 হয়েছিল আজও মনে আছে।

মন কিছুতেই মানতে রাজী হয়নি—মালিন আমার প্রতি
 ভালবাসা হারিয়েছে—কথাটা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু
 ভায়লেটের একটা কথা মনে লেগেছিল মানসিক পরিবর্তনের একটা
 কারণ থাকেই। সেই দিক দিয়ে ভেবে ভেবে কোনও সম্ভাব্যজনক
 জবাব না পেয়ে মনটা ক্লান্ত হয়ে উঠল।

রাত্রে বিছানার শুয়ে মালিনকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে
 শুধালাম, লীনা ! তোমার কি হয়েছে আমাকে বলতেই হবে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, কিছু না।

বললাম, কথাটা চাপা দিও না লীনা ! কেন তোমার মন
 দিন রাত এত ধারণা যেন কোনও আনন্দ নাই ? আমার কি
 চোখ নেই, আমি কি লক্ষ্য করি না ?

একটু চুপ করে থেকে বলল, জীবনে ত ষাট প্রতিশ্রুতি আছেই
 কেটে যাবে। তুমি ভেব না।

শুধালাম, কিসের আশাতে তোমার এমন হল—সেইটেই ত
 জানতে চাই।

চুপ করে বইল। কোনও কথা বলল না।

আবার বললাম, লীনা ! লীনা ! বল আমাকে। তোমার এই
 মানসিক ভাবান্তরে আমি যে কি রকম অশান্তি পাচ্ছি তুমি জান না।
 বেচারা বিকো আমার। এই ক'টা কথা বলে আমাকে অন্তরের
 মধ্যে টেনে নিয়ে আকুল ভাবে উঠল কেঁদে। কান্নার বেশ একটু রোধ
 হলো ভাঙা গলায় বলল, বিকো ! বিকো ! তুমিই যে আমার একান্ত
 আশ্রয় তাই আমাকে ভুল বুঝ না আমার প্রতি বিশ্বাস হারিও না
 এই অহুরোখটি তোমার কাছে হইল।

এই বলে যেন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম আমার বুকে সমস্ত প্রাণধনা
 ঢেলে দিয়ে এগিয়ে পড়ল। মালিনের প্রাণের স্পর্শে কি বাহু ছিল
 জানি না, সহজেই মনের ভার গেল কেটে—আর যেন কোনও প্রশ্ন
 নাই কোনও সীমাসার প্রয়োজন নাই।

সন্দেশে বললাম, লীনা ! তোমারও মনটা ক্লান্ত, তুমি
 এখন ঘুমাও।

মেখে সুখী হলাম—পরের দিন থেকে মালিনের ভাবের যেন
 একটু পরিবর্তন শুরু হল। সেই চৌকির মধুর হাসিটি মাঝে মাঝে
 আবার এল কিংবদন্তি। শুধু চোখের সেই গভীর বিষণ্ণতাটি কাটল না।
 মনকে বোঝালাম ক্রমে বাবে কেটে।

শুধু তাই নয়, নিজেই একদিন বলল, এই রবিবার তোমার সঙ্গে

রাবে বাব বিকো। ইলানিং মালিন রাবে বাওয়া বন্ধ করেছিল।

অজুর্বেশ করলে বলল, আমার ভাল লাগছে না—তুমি বাও
 লক্ষীটি।

হাই হোক, এই ভাবে দিনগুলো কাটতে লাগল এবং ভায়লেটের
 সঙ্গে ও প্রসঙ্গে আর কোনও আলোচনা করিনি। একদিন ভায়লেট
 আমাকে বলল, কাল হু জুন নতুন রোগী আপনার কাছে আসবে—
 আমাদের ভালিকার যোগ দিয়েছে।

বললাম, বেশ ত।

বলল, স্বামিনী-জী। জ্যোটি আমার বিশেষ বন্ধু।

শুধালাম, থাকে কোথায় ?

বলল, ক্রকলীনে।

শুধালাম, তা তোমার সঙ্গে বন্ধু হল কি করে ?

বলল, জ্যোটি আমার বাপের বাড়ীর দেশের মেয়ে। ববাবরই
 আমার সঙ্গে যোগ আছে।

শুধালাম, রোগী কে ? স্বামী না জ্যী ?

বলল, স্বামী। একটি পায়ে থেকে থেকে অসহ্য যন্ত্রণা হয় ক্রমে
 যেন অবশ হয়ে আসে।

শুধালাম, বরষ কত ?

বলল, বরষ বেশী নয়—এখনও চল্লিশের নীচে।

পরের দিন স্বাস্থ্যময়ে ভায়লেটের বন্ধুরা এল। ভায়লেট যখন
 তাদের আমার ঘরে নিয়ে এল দেখে অবাক হলাম, স্বামীটি চাইনীজ
 যদিও মেয়েটি ইংরেজ। মেয়েটিকে দেখেই ভাল লাগল—কি সুন্দর
 শাড়ি কমণীয় চেহারা। কথাবার্তা শুনেও মুগ্ধ হলাম—কি মিষ্টি
 কথাবার্তা, কি মধুর ধরণ। ছোট খাট মাছুষটি কিন্তু সর্ব্ব অঙ্গে
 একটি সামঞ্জস্যের ছন্দে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। বরষ এই
 ভায়লেটদেরই বয়সী হবে কিংবা কিছু ছোটও হতে পারে।

আরও লক্ষ্য করলাম—মেয়েটি যেন সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে
 স্বামীকেই জড়িয়ে আছে। স্বামীকে ঘরে আমার ঘরে নিয়ে এল—
 তার মধ্যে শুধু স্বামী নয় একটা প্রাণ ঢালা দরদ সহজেই চোখে পড়ে।
 স্বামীটি যন্ত্রণার কাতরোক্তি করলে মেয়েটির চোখে যেন জল আসে,
 সাহায্যে পারে না। নাম শুনলাম—মিঃ ও মিসেস প্যান।

বিশেষ বন্ধু করে স্বামীটিকে দেখলাম এবং তারপর শুধু পত্রের
 ব্যবস্থা হলে তারা চলে গেল। বাওয়ার সময়ে মেয়েটি একবার আকুল
 ভাবে আমার দিকে চেয়ে শুধাল সারবে ত ?

বললাম, আমি ত খুই আশা করি। বেশী দিন লাগবে না।
 গোটী তিন-চার ইনজেকশন গিতে হবে।

রোগীরা সব বিলায় নিলে, স্বাস্থ্যময়ে চা থেকে থেকে ভায়লেটের
 সঙ্গে আলোচনা শুরু হল।

বললাম, ভায়লেট ! তোমার বন্ধুটি ত তুমি চমৎকার মেয়ে—
 আমার খুব ভাল লেগেছে।

বললাম, হ্যাঁ—সকলেরই ওকে ভাল লাগে।

বললাম, স্বামীকে কি ভালই বাসে।

চৌকির কোণে যেন একটা হাসি খেলে গেল।

তারপর বলল, হ্যাঁ। তা বাসে।

বললাম, তুমি যেন প্রাণ দিয়ে আমার কথাটার সমর্থন করতে
 পারছ না ভায়লেট !

বলল, স্বামীকেও ভালবাসে, অস্ত্র লোককেও ভালবাসে।

অবাক হয়ে শুধালাম, তোমার কথার মানে ?

বলল, ওর একটি প্রেমিক আছে।

শুধালাম, কি রকম ?

বলল, লেখতে ত ভাল তাই কুমারী অবস্থায় ওর অনেক প্রেমিক চুটেছিল। হঠাৎ এই চীনটিকে বিয়ে করে বলল। প্রেমিকরা সবাই অবগু বিদায় নিলে—একটি ওকে ছাড়ল না। সেই এখনও আছে।

হেসে বললাম, ও—তাকে কিছুতেই বিদায় করতে পারছে না বুঝি ?

মুখ হেসে বলল, পারছে না—না। এখন তাকে বিদায় করতে চায়ও না।

বললাম, কিন্তু—

মুখ হেসে বলল, স্বামীকে যে ভাবে যত্ন করে, তাই মনে করছেন ওটা সম্ভব নয়। আপনি আমাদের দেশের মেয়েচরিত্র কিছুই বোঝেন না।

শুধালাম, তুমি বলছ—স্বামীর প্রতি ভালবাসা থাকে সত্ত্বেও অস্ত্র প্রেমিক থাকে সম্ভব ?

বলল, ভালবাসার ত সব সময় একরূপ নয়। সেবা যত্নের মধ্য দিয়ে তার একটা দরদের রূপ প্রকাশ পায় বটে—কিন্তু অস্ত্ররূপও ত আছে।

ভীকুদুষ্টিতে ভায়লেটের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ভায়লেট। তুমি মেয়েদের এত হীন মনে কর—

বলল, যা হউ, যা স্বাভাবিক—তাই বলছি।

একটু ভিত্ত স্বরে বললাম, তোমার দুষ্টিভঙ্গী বিকৃত হয়েছে—তোমাদের দেশে বিবাহিত মেয়েদের অস্ত্র প্রেমিক থাকা স্বাভাবিক বলতে চাও ?

একটু বেন জোবের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ—অবশ্য ত্রী যদি সুলক্ষী হয়। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে—সুলক্ষী ত্রী অশান্তির বাহন।

ভায়লেটের সঙ্গে কথার ফলে সমস্ত দিন মনটা ভিত্ত হয়ে রইল। মনে মনে ঠিক করে নিলাম না, ভায়লেটের সঙ্গে এ সব আলোচনা আর করব না। ওর জীবনে কি ঘটেছে জানি না কিন্তু জীবনের প্রতি ওর দুষ্টিভঙ্গী সহজ ও স্পষ্ট নয় তাই সে সম্পর্কে না বাওয়াই ভাল। মন অবধা বিকৃত হয়।

বাড়ী ফিরে মার্লিনকে কথাগুলি বলার জন্য মন ব্যগ্র হল—মার্লিনের সঙ্গে এ নিয়ে একটা আলোচনা করা দরকার। কিন্তু হুপুর বেলো কথাটা হলনা—কেন ঠিক মনে নাই। হয়ত মার্লিন হুপুর বেলোটা গালাগিক কোন কাজে বিশেষ ব্যস্ত ছিল। বিকলে চা খেতে খেতে সময় বেশী পাওয়া যায় না। তাই হয়ত ভেবেছিলাম

বাড়ীে থাওয়া দাঁওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে কথাগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু তাও হলনা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিশেষ কোনও রোগী ছিলনা—মাত্র দুজন। তাই সার্জারীতে বাওয়ার মিনিট কুড়ি-পঁচিশ-এর মধ্যেই রোগী দেখা শেষ হল। অস্ত্রদিন হলে ভায়লেটের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে বাড়ী ফিরতাম কিন্তু সেদিন আর ভায়লেটের সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছে হলনা কেননা মনটা তখনও একটু ভিত্ত ছিল এবং ঠিকই ত করেছি যে ভায়লেটের সঙ্গে আর ও সব আলোচনা করবনা। তাই সার্জারীতে বাওয়ার বস্তুখানেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরে এলাম।

বহুদূর মনে পড়ে তখন অক্টোবর মাস, সন্ধ্যা হতে দেবী হয়না। সার্জারী থেকে স্বপ্ন কিংবদন্তি আসছি সন্ধ্যা ঘনিরে প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ফিরে আসতে আসতে আকাশে একখানি চাঁকও দেখতে পেলাম। মিনটা পরিষ্কার ছিল—ফিরে আসতে আসতে কনকনে ঠাণ্ডার গুভারকোটের গলা ভুলে দিয়ে বেন একটু বাঁচলাম। এইখানেই বলে রাখি সাধারণতঃ সার্জারী বাওয়া আসা আমি হেটেই করি—গাড়ীতে নয়।

ক্রমে গুভ হল লেনে ঢুকে বাড়ীর কটকের কাছে এগিয়ে এলাম। কটকে ঢুকতে বাছি একি। একটি ভক্তলোক গুভারকোট গলা পর্যন্ত ঢাকা, মাথার চুলী, আমার বাড়ীর সমর দরজা খুলে বেরিয়ে এল এবং আমার কটকের দিকে হুঁপা এগিয়েই, আমাকে লেখতে গেরে আবার ফিরে দ্রুতপদে অস্ত্র কটক দিয়ে গেল বেরিয়ে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে মুখখানা একবার মাত্র কপিকের জন্য দেখতে পেয়েছিলাম—বোলাওই ত বটে। শিখন থেকে চলে বাওয়ার ভলীতেও বোলাও বলই মনে হল।

আমি জানি—এ সময় বাড়ীতে মার্লিন ছাড়া অস্ত্র কেউ নাই। মেড সন্ধ্যাবেলা এসে কাজকর্ম শেষে দিয়ে হুপুরে চলে যায়—সন্ধ্যাবেলা থাকে না। বোলাও, আমি চলে গেলে এই রকম চুপি চুপি মার্লিনের সঙ্গে এসে দেখা করে। বৃকের মধ্যে বেন ভূমিকম্প শুরু হল।

সমর-দরজা খুলে বাড়ীতে ঢুকলাম। মার্লিন একটু দূরে সিঁড়ির দিকেই পাড়িয়েছিল। শুধাল, আজ এত শীঘ্র কাজ হয়ে গেল ?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে শুধালাম সাহ আর্থার বোলাও এসেছিলেন ?

বিম্বিত দুষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, কই না।

গম্ভীরভাবে বললাম আমি তাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে বেতে দেখলাম।

মাথা নীচু করে একটু বেন চুপ করে রইল। তারপর গম্ভীর ভাবে বলল, ভুল দেখেছ।

আর কথা বলার প্রবৃত্তি হল না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ভায়লেটের কথা—সুলক্ষী ত্রী অশান্তির বাহন। [ক্রমশঃ]

“তোমরা এক্ষণে যে শিক্ষালাভ করিতেছ, তাহার ফলকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু উচ্চর আবার ফলকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে, ভগ্নভাগ উহাতে ভূবিয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ শিক্ষার মাহুব প্রস্তুত হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিকভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষার অথবা অস্ত্র যে কোন শিক্ষার এইরূপ সব ভাস্কিয়া-চুরিয়া যায়, তাহা বৃত্ত্য অপেক্ষাও ভয়ানক।” —স্বামী বিবেকানন্দ।

বাতিঘর

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

গেটের সামনে সুমিতাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলো
সুখিম। যুদ্ধ থোকনকে বুক জড়িয়ে ধরে পাড়ি বরাবর

কাঁচাকাঁচি বধন এসেছে সুমিতা, তখন তার কানে এলো শুকতারার
আকাশ কাটানো চিকার—বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছে ?

ছুটে ওদের ঘরের ভেতরানো মরোজা ঠেলে ঘরে ঢুক পড়লো
সুমিতা, আর ঠিক সেই মুহূর্তে অনিলের পিঙ্কলের গুলী ছিটকে
এসে বিদ্ধ হলো থোকনের পিঠে।

একটু কোমল কাতবাণ, আর হাত পায়ের বিচূনির পর
হির হয়ে গেলো তুলতুলে নরম মাংসপিণ্ডটা সুমিতার বুক
ওপর। থোকনের ভাঙ্গা হস্তের ধারা, কান্নিকি দিয়ে নেমে এসে
জাসিয়ে গিলে সুমিতার হৃদি হাত। টপ টপ করে পড়িয়ে
পড়ে রক্তের গিলে মালা মার্কেল পাথরের মেকেটাকে।
চিকার করে উঠলো মিতা—মামীনা! আমার আলো যে
নিবে গেলো মামীনা—

বিছানার চিৎ হয়ে পড়ে আছে অসীম হালধার।
রক্তের টেউ খেলছে বিছানার। শুকতারার ? না না সে
মরেনি, সে পালিয়েছে। তার বদলে জীবন দিয়েছে সুমিতার
আলোককুমার।

উরাদের মত ছুটে এলো সুমিতার কাছে অনিল—মিতা,
মিতু ? কোথা থেকে এলি তুই এখানে ? কেন এলি ? কেন
এলি ? ওরে—একি সর্বনাশ হলো যে মিতু ? সেই সর্বনাশ
একি সর্বনাশ করে গেলো আমার। তাকে মারতে গিয়ে এ কাকে
মারলাম। পাগোলের মত বিভ্রলবর তুলে নিজের বুক
ওপর কাঁচা করলো অনিল। কিন্তু হার গুলী ফুরিয়েছে। সজোরে
নিজের মাথায় বা মেঝে তিলাবারটা মাটিতে ছুড়ে কেলে দিয়ে,
আলোর বসন্ত দেহটা সুমিতার কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে গেলো
অনিল।

কিন্তু পারলোনা। এক অমানুষিক শক্তিবলে, বাহুভারে
ওকে বুক জড়িয়ে ধরে ধর ধর করে কাঁপছে সুমিতা। রক্তের টেউ
খেলছে ওর সর্বাঙ্গ বেয়ে।

—হোট মায়া ? হোট মায়া ? হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অকুট ঘরে
ডাকলো সুমিতা—হোট মায়া ? হোট মায়া ?

—না। না। আমি তোমার মায়া নই যে, হুহাতে চুল
ছিঁড়তে ছিঁড়তে কেঁবে উঠলো অনিল,—আমি রাক্ষস তোর
ছেলেকে ঘরে কেলেকি, আমি ধুন, আমি শরতান, আমি ডাকাত।
ভয়ান্ত দুষ্ট মেলে ঘরের চারিদিকে চাইছে সুমিতা। রণ রণ
করে পড়ছে ওর দীর্ঘ ঘন আঁখি পল্লবগুলো। ধর ধর করে কাঁপছে
সর্বাঙ্গ। টেনে টেনে নিখোশ নিয়ে অকুট ঘরে আবার ডাকলো

সুমিতা—হোট মায়া ! হোট মায়া ! ঐ ঐ দেখো, কারা সব
হাসছে—ঐ দেখো, কারা—কারা সব কাঁদছে—ঐ দেখো কত
বন্ধু-তো ! হোট মায়া ! হোট মায়া ! আমার আলো কত
বন্ধু দিয়েছে আর নয়, আর নয়,—এবারে ধাঁ-মা-ও ধাঁ-মা-ও হোট
মায়া—ওকে ? ভীষণ জোরে কাঁকানি দিয়ে কেঁপে উঠলো সুমিতার
সর্বাঙ্গ। অতি কষ্টে টেনে টেনে চাইলো একটু শ্বাস নিতে।
যুদ্ধাপথবাত্রী যেমন করে অস্ত্রিম শ্বাস টানতে থাকে। বাইরে গেটে
তখন চলেছে ভীষণ গোলমাল। চারিদিকের বাড়ীগুলোর জানলা
খুলে গেছে, লোকের ভাড় সেখানে। বহলোকের পায়ের শব্দ এগিয়ে
আসছে ঘরের দিকে।

অনিল হুহাতে জড়িয়ে ধরলো সুমিতাকে। তখন খুলে গেছে
ওর স্মৃদ্ধ বাহুবলন। ওর কোল থেকে কেড়ে নিলো অনিল
আলোককে।

বড় বড় চোখ দুটোতে সুমিতার আর পলক পড়ছে না। হির
বিফারিত দৃষ্টি ওর আঁচকে গেছে কোন্ অলঙ্কার দ্বন্দ্ব মাঝে।

—কে ? ওকে ? বাবা ? না বাবার মত ওকে ? বুধে
ঠোটে কত বন্ধু ওর ? চোখে কত জল ? কাঁদছে ? ও কেন
কাঁদছে ? কত বন্ধু ! কত কাঁদা। ইঃ ! কৈ—কৈ তুমি—
মা-মীদ-অ-আ। মর্মান্তিক আর্ন্তনাদের সজ-সজ, বুজ গেলো
ওর উদ্ভোজ দৃষ্টিমাগা চোখ দুটা। হাত দুটো অসহায় ভাবে
কি যেন জাঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করলো—তারপর সশব্দে দেহটা ওর
লুটিয়ে পড়লো বসন্ত মোক্ষর ওপর। আলোককে বুক ধরে
হোঁহো করে উদ্গারের মতো ছেসে উঠে বললো অনিল
—তুইও বাচ্চিস মিতু ? বা ! বা ! তোর থোকনের কাছে
বা। আমিও বাচ্চি—তোর পেছনে। ওরে, পায়ের পিঙ্কল
ভি—না, তাইও বিদ্যাস্বাতকতা করলো আমার সঙ্গে—বিন্দু—
কাঁসির দড়িটা আমাকে কাঁকি দেবে না রে—ওটা আমার কাছ থেকে
ছিনিয়ে নেব কে দেখি এবার ?

পরিশিষ্ট

পরদিন সকালে সবাদপত্রের হকারদের চিকার বমুকে পাঁড়ালো
মহানগরীর চলমান জনতা।

কলিকালের কংসমায়া, অভিনেতার অভিনব কীর্তি, সম্পত্তির
লোভে ভোড়া খুন। হ হ করে কাটতে লাগলো কাগজগুলো।
করক ঘটীর মধ্যেই মুখরোচক ধবংহ আওনের হকার মতো ছড়িয়ে
পড়লো চারিদিকে। পাথ পাটে, বেড়োয়া, বন্ধ-জ্ঞান, মূল কলজ,
অকিস আগলত সর্বত্রই লোকের মুখে মুখে গুজবিত হতে লাগলো
লালকুটির হত্যাকাহিনীটি। আমরাও পড়েছিলাম ঐ চাকলাকর
ঘটনাটি। সঙ্কিত বিবরণ এই যে, গতকাল রাত্রি প্রায় পৌনে
এগারোটার সময় প্রখ্যাত চিত্রতরকার শুকতারার সেন (চ্যাটার্জি)
ভয়ান্তভাবে ছুটে এসে ওস্ত বাগিগঞ্জ ব্যাবিষ্টার মিলমাধব দত্তের
বাড়ীতে আশ্রয় নেন এবং কাতবভাবে বলেন যে, ঐক্স ধানীর ধবর
কেওনা হোক, অদুর্ভেদী তাঁর বাড়ীতে ভীষণ খুন হয়েছে। ব্যাবিষ্টার,
মাঠেবের কোন শেয়ে শুধুমাত্র স্থানীয় পুলিশ বাহিনী এসে ওস্ত
বাগিগঞ্জের লালকুঠি নামক প্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং তাঁর দেখেন
যে, বাড়ীর একটি কক্ষে পাটে বসন্ত পথার ওপর ঐ বাড়ীর দালিক
অসীম হালধারের বৃত্তসেহ পড়ে আছে এক তাঁর স্ত্রী সুমিতা দেবী

অচৈতন্য অবস্থায় ঐ কক্ষের রক্তাশ্রুত মেঝেতে পড়েছিলেন আর সেইখানে ঝাঁড়ের একটি বৃক্ষশাখা মৃতশিশুকে বৃক্ জড়িয়ে ধরে উদ্গারের মতো হা হা করে হাসছেন একজন যুবক।

যুবকটি পুলিশের কাছে নিজেকে হত্যাকাণ্ডী বলে আত্মসমর্পণ করে। জানা যায়, ঐ হত্যাকাণ্ডী একজন অভিনেতা, নাম অনিল চ্যাটার্জি। তিনি শুকতারায় সেন-এর স্বামী ও স্মৃতিতা দেবীর মামা হন। শবর পেরে স্মৃতিতা দেবীর পিতা সোমনাথ ত্রিবেদী ও মৃত অসীম হালদারের ড্রাফ্টার ডাঃ সুর্য্যাম হালদার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং স্মৃতিতা দেবীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। মৃতদেহ দুটি মর্গে চালান দেওয়া হয়েছে।

অভিনেত্রী শুকতারায় সেন পুলিশের কাছে বলেন যে সম্প্রতিয় জন্মই অসীম হালদার এবং তাঁর পালিতপুত্রকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁকেও অনিল চ্যাটার্জি গুলী করেছিলেন, কিন্তু সে গুলীট লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে উন প্রাণ নির পালাতে পেরেছেন। এখন তিনি অসুস্থ, সমস্ত হত্যারহস্য তিনি অসুস্থ হবার পর জানাবেন।

এ ঘটনার পর প্রায় দেড় মাস গত হয়েছে। লালকুঠি হত্যাকাণ্ডের সরকারী তদন্তের কাজ শেষ হবার পর বিচারের দিন ঘাণী হয়েছে। বিচারের দিন অসংখ্য কোতুল্লী মাথব এসে ভিড় জমিয়েছে আলিপুর দারজাকোর্টের সামনে, আর পথের দুধারে। এই পথে আসবে স্বামীর প্রধান সাক্ষী জনচিন্তাহাবী শুকতারায় সেন (চ্যাটার্জি)।

বয়সময়ে জঙ্গলাহের আসন গ্রহণ করলেন। ন'জন জুবি পঠন করে বিচারকাণ্ডা শুরু করা হল। কাঠগড়ার ঝাড়িয়ে আসামী অনিল চ্যাটার্জি। ছ'কিট উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা। টকটকে কপা গায়ের রং, তেমনি নিখুঁত যুগ্মী। একমুখ গৌকনাড়ি, এই ভেড় মাসের মতোই রংগে হ'পাশের চুল শাণা ছোপ ধরেছে, চোখের কোলে জঃমছে গভীর বনজাপের কালমা।

বড় বড় উলস করা দুটি চোখে বিবাহতর্য গাভীরে মানছায় ছাড়া ঐ চোখে-মুখে কুঠা বা ভয়ের লেশমাত্রও নেই।

সাক্ষীর আগমনে উপাধি সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী অভিনেত্রী শুকতারায় সেন। পরনে তাঁর লালশাড়ি দুধগরদে শাড়ী। কৌকড়ানো ককচুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়ানো, কতকগুলো স্পঃএর মতো কপা তুলে আছে কপাল বিধে। সৌখিন অগ্রভাগে আর কপালে বলছে এনোন্টা ফি।

মাথায় শরঃঘোটা, বেন মুষ্টিমতী বিবাহপ্রতিমা।

সরকার পক্ষের স্বাক্ষর ব্যাট্টার নীলমাধব দত্ত মর্গশাণী ভাষায় লালকুঠি হত্যারহস্যের কপাট জনগণের সামনে উদ্ঘাটিত করলেন। তার দ্যাক্ষ্য অববণ এই—মহারাণা বগীঃ রামনাথ ত্রিবেদীর একমাত্র স্পঃত্র সোমনাথ ত্রিবেদী লালকুঠি নামে প্রাঃদায় মালিক ছিলেন। সোমনাথের অকালে দ্রাঃদায় হওয়াতে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি তাঁর একমাত্র স্বামিবৎসর্য কতা স্মৃতিতা ত্রিবেদীকে তার বিধিমা মহামায়া চ্যাটার্জির তত্ত্বাবধানে রেখে, গুরুর সঙ্গে তাঁর পণ্যটন চলে যান। তখন থেকে স্মৃতিতার বিধিমা, তাঁর

একমাত্র পুত্র অনিল চ্যাটার্জি ও কতা করবীকে নিয়ে লালকুঠিতে বসবাস করতে থাকেন এবং সম্প্রতিয় আর ভোগ লবল করতে থাকেন। বছর আটক পর বিখ্যাত ট্রিবেডোর অসীম হালদারের সঙ্গে স্মৃতিতার বিবাহ হয়। বিবাহের পর অসীম হালদার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে লালকুঠিতে বাস করবার অভিপ্রায় জানালে স্মৃতিতার বিধিমা তাঁর কতাকে নিয়ে রাগতচিন্তে লালকুঠি পরিত্যাগ করে চলে যান। এই সময় অনিল চ্যাটার্জির সঙ্গে, অভিনেত্রী শুকতারায় সেনের বিবাহ হয়। লালকুঠির একতলার এক অংশে শুকতারাকে নিয়ে অনিল চ্যাটার্জি বসবাস করতে থাকেন। নিজেকেই সুখভোগে বাধা পড়ার লজ্জা অনিল চ্যাটার্জি আর তাঁর স্বামীর মনে অসীমের প্রতি প্রেবল বিধেব সঞ্চারিত হতে থাকে, এবং তখন থেকেই এঁদের প্রেবল চিন্তা হল কেমন করে ঐ পথের কাঁটাকে সরানো যায়।

শুকতারায় কিছু এই জঘন্য ব্যাপারে মোটেই সমর্থন ছিলো না, বরং সে অনিলকে তিরস্কার করতো। তার এই হীনতার লজ্জা সুযোগ খুঁজছিলো, ওদের সব ব্যাপারটা জানিয়ে সাবধান করে দেবার লজ্জা, কিন্তু সম্প্রতি বোধ হয় অনিলের মনে শুকতারায় প্রতি সন্দেহ দেখা দিয়েছিলো, তাই সে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি পাহারা দিতো তাঁর দিকে। অসীমের সঙ্গে দেখা করা একেবারে নিষেধ ছিলো অনিলের। বিয়ের বছর পাঁচেক পর অসীম ও স্মৃতিতা একটি শিশুকে পালিতপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে, কারণ ওদের কোনো সন্তানাদি হয় নি। এই ব্যাপারে অনিল আবারো কিছু হয়ে ওঠে, সে প্রায়ই বলতো, একটা কাঁটা ছিলো আবার দুটো হলো। ঐ দুটোকে সবাতো না পারলে ওদের হারানো। সুখের দিন কিরে আসবে না। ঘটনার দিন স্মৃতিতার বাবা সোমনাথ ত্রিবেদীর প্রতিক্রিত হাসপাতাল কমলা সেবাসদনের উল্লেখন ছিলো। স্মৃতিতা সেখানে গিয়েছিলো তার খোকাকে নিয়ে। অসীমের শরীর অসুস্থতার লজ্জা সে বারনি। অনিল জানালো শুকতারাকে যে, সে তার বন্ধুদের সঙ্গে রাজি নটীর ট্রোঃ বাচ্ছে শিকার করতে। বয়সময়ে অনিল চলে গেলে,—আর শুকতারায় স্থির করলো, এই সুযোগে অসীমকে সাবধান করে দেবে। সে অসীমকে নিজের ঘরে ভেঙে এনে বধন সব কথা তাকে বলছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে চোখের মতো নিঃশব্দ পায়ে অনিল বাড়িতে এসে ঘরের জানালার পাশে ঝাঁড়িয়ে সব শোনে, এবং রাগে কিন্তু হয়ে জানালা দিয়ে প্রেবল অসীমকে গুলী করে হত্যা করে। তার পর গুলী করে শুকতারাকে, সে গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে চিন্তার করে শুকতারায় বরজা দিয়ে বধন পালাতে চেষ্টা করে ঠিক সেই সময় ওর চিন্তার ভনে খোকাকে নিয়ে স্মৃতিতা ঘরে প্রবেশ করে। স্মৃতিতা তখনই কিরছিলো কমলা সেবাসদন থেকে। স্মৃতিতাকে দেখেই অনিল তার কোলের বৃক্ষ শিশুকে গুলী করে। এই ভয়াবহ কাণ্ডে স্মৃতিতা জান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। শুকতারায় ভয়াবহভাবে বাস্তা দিয়ে ছুটে গিয়ে ব্যাট্টার নীলমাধব দত্তের কাছে আশ্রয়-ভিক্ষা করেন। ব্যাট্টার সাচেরেব কোন পেরে স্থানীয় পুলিশ বাহিনী লালকুঠিতে হানা দিয়ে হত্যাকাণ্ডী অনিল চ্যাটার্জিকে গ্রেপ্তার করেন।

সরকার পক্ষের ব্যাট্টার সমস্ত ঘটনা শেষ করবারপর লজ্জা সাহেব আসামীকে প্রেব করলেন—আপনার কিছুতে যে অভিযোগ

আনা হয়েছে তা আপনি গুনলেন, এখন আমার প্রথম প্রশ্ন—আপনি অপরাধী না নিরপরাধ ?

—“ইয়ের ওনার”—আমি অপরাধী বা নিরপরাধ কোনটাই নই ; তবে আমি বহুত্রে এই দুজনকেই হত্যা করেছি । উন্নত মস্তকে জবাব দিলো অনিল ।

এবারে সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী শুকতারার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল । সে সজল চোখে এই ব্যাবিষ্টারের কথাই পুনরাবৃত্তি করে গেলো ।

আসামী পক্ষে দাঁড়িয়েছেন তরুণ ব্যাবিষ্টার অনিরুদ্ধ বাসু । তিনি বললেন—

—“ইয়ের ওনার” যদিও আসামী স্বীকার করছেন যে তিনি হত্যাকাণ্ডী ; তথাপি এই হত্যাকাণ্ডে যে একটা সাময়িক উত্তেজনা বলন্ত সৃষ্টি হয়েছে সেটা আমি প্রমাণ করবো ।

তিনি জজসাহেবের অক্লান্ত নিয়ে প্রধান সাক্ষীকে জেরা শুরু করলেন ।

—আচ্ছা, আপনি কি আসামী অনিল চ্যাটার্জির সত্যিকারের স্ত্রী ?

—সে-কথা কাকুর অজানা নয় । বৃহ্মধর কণ্ঠে জবাব দিলো শুকতারার ।

—মানে আমি বলতে চাইছি যে, মৃত অসীম হালদারের সঙ্গে আপনার অর্ধবৎ সম্পর্কটা তো বহুকালের পুরোনো ব্যাপার এবং তা সর্বজনবিদিত । তাই জিজ্ঞাসা করছি যে, সেই মোহ কাটিয়ে, আপনি কি অনিল চ্যাটার্জির সত্যি স্ত্রী হতে পেরেছিলেন ?

—আপনার উক্তি যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি মিথ্যা । আমাদের ঘামি-স্ত্রী সম্পর্ক মধুর ছিলো, সন্তোষে জবাব দিলো শুকতারার ।

—আচ্ছা, আপনার ঘামি অনিল চ্যাটার্জি কি সন্দেহ করতেন যে অসীম হালদারের সঙ্গে আপনার প্রণয়বর্জিত সম্পর্কটা বরাবর অটুটই আছে ? এবং সেই কারণেই তিনি আপনার দুজনও ওপংই বিরূপ ছিলেন ?

—কখনই না । তা যদি হতো, তাহলে এই পাঁচ বছর তিনি আমার সঙ্গে একত্রে জীবন বাপন করতেন না ।

—হ্যাঁ । আপনার সঙ্গে জীবন বাপন করাটা তার একটা মস্ত বড় মোহ ছিলো বটে । কারণ তিনি আপনাকে সত্যি ভালোবাসতেন ? সেজন্য আকর্ষণ বিব পান করেও তিনি আপনার সঙ্গে ত্যাগ করেননি । আচ্ছা শুকতারার মেবি, ঐ ঘটনার দিন আপনি বখন অসীম হালদারকে ঘরে ডেকে এনেছিলেন, তখন কি শুধু সাংবাদ্য করবার অভিপ্রায়েই ডেকেছিলেন ? না তা নয় । আপনার খাটের পাশের টেবিলে দুটি মদের পেলান ও বোতল ছিলো, মানে এই যে আপনারা এক সাথে মত্তপান করে বিছানার বখন আপত্তিকর অবস্থায় দৃষ্টি করছিলেন, ঠিক সেই সময় অনিল চ্যাটার্জি বাড়ী ফিরে আসেন, কারণ ট্রেনে গিয়ে বখন তিনি জানতে পারলেন যে মনের তুলে ছোট হাওগাংগটি ঘরের টেবিলে কেন্দ্রে পেছেন এবং তার মধ্যে তাঁর ট্রেনের টিকিট আর সব টাকা আছে । তখন তিনি তাঁর মালপত্র বন্ধুদের সঙ্গে রওনা করে দিয়ে, পূর্বের ট্রেনেই নিজের বাচ্চের তাঁদের জানিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন । এ ঘটনা জানা পেছে বাঁরা ওর সঙ্গে বাচ্চলেন

তাঁদের কাছ থেকে । তাঁরা সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন । বাড়ী এসে অনিল চ্যাটার্জি আপনারদের ঐ অবস্থার জালালা দিয়ে দেখতে পান, এবং ক্রোধে আত্মহারা হয়ে আপনারদের দুজনকেই পর পর গুলী করেন । আপনি চিৎকার করে বখন দরজা দিয়ে পালালেন, সেই মুহূর্তে স্ত্রীমিতা ঘরে ঢুকতেই, আপনার উদ্দেশ্যে ছোড়া গুলীটা এসে স্ত্রীমিতার খোকার শিঠে বিদ্ধ হলো । এই হচ্ছে আসল এবং ঠাট্টা সত্য ঘটনা । এখন বলুন, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলুন—হত্যাকাণ্ডের মূলসত্য তথ্য এই কি না ?

আদালতগুহ লোক নির্দাক হয়ে চেয়েছিলো শুকতারার দিকে । জুরিও রুদ্ধবাসে অপেক্ষা করছেন ওর জবাব শোনবার জন্য ।

বাড় বৈকিয়ে উদ্ভত ভঙ্গিতে দাঁড়ালো শুকতারার সেন, বেন ট্রেজে দাঁড়িয়েছে জাভ-অভিনেত্রী কোনো সিরিয়স ডুবিকার, অভিনয়-চাতুর্ঘ্য দেখাবার জন্য ।

—“ইয়ের ওনার” এই কল্পিত কাহিনীটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বা সত্য তা আমি আগেই বলেছি ।

আমার ঘামি মাঝে মাঝে ঘরে বসে ডিক্ট করতেন এবং তাঁর প্রিয় চাকর ছোট্টালকে প্রণাম দিতেন । ঘটনার দিন বেকুবের আগের, ঐ চাকরের সঙ্গে বসে ডিক্ট করেছিলেন, সেজন্য টেবিলে ঐ দুটি গ্রাশ ও বোতল ছিলো । ছোট্টাল হাজির আছে, সত্য মিথ্যা তাই কাছেই জানা যাবে ।

ছোট্টালের তলব হলো এবং তার জবানে শুকতারার কথাই সত্য প্রমাণিত হলো ।

নিঃসন্দেহভাবে, কাণ্ডগড়ার দাঁড়িয়ে ওদের বাঁদাছুঁবার গুনছিলো অনিল । বেন তার সামনে এক বহুমুখের নাটকের অভিনয় হচ্ছে ; আর সে তার একজন দর্শক মাত্র ।

একটু দূরে জমাট পাথরের মতো বসেছিলো করবী । প্রাণটা তার হাহাকার করে কেঁদে বলছিলো—তুমি কি নির্ধর ছোড়না ? একবার তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যে কি আশ্রয় চেষ্টা করেছি, কিছুতেই কেন তোমার সম্মতি পেলাম না গো ? কাকুর মিনতি ভরা ওর চোখ দুটির ওপর দুটি পড়লো অনিলের—আহা কি হয়ে গেছে কবিটা ? কিছ মিভা কৈ—সে তো আসেনি ? সে কি তবে নেই ? তার খোঁকন ? আলোককুমার ? কৈ সেই কুলের মতো সুখখানা ?—ওহো—বড় বহুশার দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো অনিল ।

আরো কিছুকণ সাক্ষীদের তীব্র প্রশ্রবণে জর্জরিত করলেন ব্যাবিষ্টার বাসু ।

সেদিনকার মত আদালতের কাজ শেষ হল ।

বিচারের দ্বিতীয় দিন,—আজকের জনশ্রোত আরো বিপুল । রাজ্যের দুধারে অসংখ্য মানুষের চাপাচাপি—ভিড়ের জন্য পোলিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে । বধ্যাশয়ের আদালতের কাজ শুরু হল ।

জজসাহেব আসামী অনিল চ্যাটার্জিকে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, অসীম হালদারের, পালিতপুত্র আলোককুমারকে কি আপনি হাইড্রার গুলী করে হত্যা করেছিলেন ? না অবস্থায় গুলীটা লেগে গিয়েছিলো ?

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায় তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা



না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শব্দর সীতার
পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সাটটা দেখে
দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সাট দেখুন
না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোরা-
লের রূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জল
এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে!
সানলাইটের কার্যকরী ও অক্লান্ত ফেনা
কাপড়কে পরিপাটি করে পরিষ্কার এবং
কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারে না।
আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না
কেন...আজই!



সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জল করে

B. 267-XS2 BQ

বিশ্ববাস লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

মহামাত্র বিচারপতি। কমা করবেন, বৃহৎসিহর সঙ্গে বললো অনিল—আপনার প্রেরণিতে একটু ভুল থেকে বাচ্ছে। আলোককুমার অসীম হালদারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ নয়—তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ ও পালন করেছিলেন স্মৃতিভা দেবী।

—ও। একই কথা। জবাব মিলেন বিচারপতি।

“—ইরোর ওম্বর”। বিচলিত ভাবে গাঁড়িয়ে বললেন ব্যাটিন্সর বাবু, না একই কথা হতে পারে না। কারণ রাস্তার ভাটবিন্স থেকে হেলোটিকে কুড়িয়ে এনে যখন স্মৃতিভা দেবী ওকে পুত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন, তখন ঐ অসীম হালদারের কাছ থেকে ওকে অমাহুবি অত্যাচার সহ করতে হয়েছিলো, কিন্তু সেই হেলোটি আর তার মা স্মৃতিভা এই আসামী অনিল চ্যাটার্জির প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আজ দুর্ভাগ্য বশতঃ স্মৃতিভা দেবী অত্যন্ত অসুস্থ ও স্বাভাবিক জ্ঞানহারী, সেজন্য তাঁর জবাবীতে যে অকটী প্রমাণ পাওয়া যেতো, যাতে এই হত্যারহস্তের মূল সত্যতথ্যটি প্রকাশিত হতো, সেই মূল্যবান জ্ঞান থেকে আজ আসামী বঞ্চিত হলেও, স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারা ই বিচার করা যায় যে, তাঁর পুত্রকে তাঁর ব্রহ্মহত্যার মামার পক্ষে বইছাড় হত্যা করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। এটা একটা অ্যাকুসিডেন্ট মাত্র। আশা করি শুকতার দেবি, এই সত্যটুকু স্বীকার করবেন।

শুকতার পূর্বদ্বান্নেই ছিলো। পরনে তার আজ কালো হলমলের খান। চুল আজ আরো কক! চোখের তেলে বিবাদের কালি। নিরাক্ষর চুখভাবে বেন ভাবাক্রান্ত এক বিবাদ-প্রতিমা।

জুরিরাও সমবেত দর্শকগুণীর মত সেই বিবাদিনীকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে ছিলেন। সমবেদনার বোধ হর তাঁদের চিন্তায়রও টলমল করছিলো।

শুকতার কাছই দর্শকদের মাঝে বসেছিলেন মাসীমা। পরনে তাঁর গরমের খান, খেতচকনের কেঁটা কপালে, হাতে জপের মালা।

ব্যাটিন্সর বাবুর বাক্যবাহে স্তম্ভভাবে ডাঠ গাঁড়ালো শুকতার। তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় বিবাহ ঢেসে বললো—ইরোর ওম্বর! আমি জানি একটু মিথ্যার আশ্রয় নিলে আসামীর অপরাধের গুরুত্ব কিছুটা হালকা হতে পারে; কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমি আসেও বলেছি এক এখনও বলছি, আসামী বিষয়ের লোভেই অসীম হালদার ও আলোককুমারকে হত্যা করেছে। তবে সেদিন রাগের মাথায় ওদের গুলী করেছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য তা ছিলো না,—উদ্দেশ্য ছিলো পোপনে বিধ দিয়ে হত্যা করার এক তার জন্ত আমার সাহায্য চেয়েছিলেন, সেমিক দিয়ে বার্ষ হয়ে আলোকের আদ্যকে টাকার লোভ দেখিয়ে যে বিব তার হাতে দিয়েছিলেন, ওদের খাতে মেশাবার জন্ত, সোঁট এখনও তার কাছই আছে। তার আদ্যটি অত্যন্ত ভালো, তাই সে এসে আমাকে সব কথা বলে দেয়। সে এখানে উপস্থিত আছে, তাকে ডাকলেই সব জানতে পারবেন। আজ শুণু সত্যের খাতিরেই আমাকে সে সব কথা বলতে হচ্ছে—এর জন্যে——। কদার আবেগে শুকতার কণ্ঠ কঁদে হয়ে গেলো। সে চকস পক্ষে মাসীমার কাছে গিয়ে তাঁর বুক বুখ লুকোলো। মাসীমা হুহুতে ওকে জড়িয়ে ধরে নিজের কাছে বসালেন।

নিপুণ অভিযন্তার এই ব্যাখ্যান বৃষ্টি আর তার চোখের জলে ভেজা মধুর কণ্ঠের প্রাণশর্পী অভিনয় সিনেমার পর্যায় মতোই সকলকার মন জয় করতে সক্ষম হলো। তার অভিনয়-চাতুর্যের সম্বোধন বাণে জুরিরাও সম্বোধিত হয়ে পড়লেন।

নেপালী আদ্যক চাঞ্চির করানো হলো এবং তার সাঁকোও নেওয়া হলো। সে কম্পিতগততে তার ওড়নার আঁড়াল থেকে একটি ছোট্ট নীল কাচের শিশি বার করে দিয়ে জানালো—এই বিব মামাবাবু (জামামা) তাকে দিয়ে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে বলেছিলো, ছোট্ট খোকাবাবু আর তার বাবার খাবারে দিতে কিন্তু সে তা পারেনি, তাই মামামার কাছে এটা কেবং দিয়ে কেঁদে বলেছিলো সে আর এ বাড়ীতে কাম করবে না। সে চলেই যেতো, খালি খোকাবাবুর মামার বেতে পারেনি। খোকাবাবুর মাকে একথা বলতে পারেনি, কারণ তাঁর মাখার ব্যায়রাম ছিলো, ঐ ভয়ানক কথা শুনেলি যদি কিছু খারাপ হয় তাই।

সাক্ষীকে কণ্ঠের ভাবায় ব্যাটিন্সর বাবু জেরা শুরু করতেই বাধা পড়লো আসামীর কণ্ঠস্বরে।

মহামাত্র বিচারপতি, এবারে আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে চাই। বহুগতীর কণ্ঠ বললো আসামী অনিল চ্যাটার্জি।

—বলুন, আমি শুনেতে প্রস্তুত। বললেন জজসাহেব।

—হ্যাঁ, বলছি শুভন। এই বুধ বাক্যবৃদ্ধ দর্শা করে এবার বন্ধ করুন। আমি স্বীকার করছি, সাক্ষী শুকতারী দেবীর কথার প্রত্যেকটি অক্ষর সত্য। অকস্মাৎ তিছুই ঘটনি, আমি সম্পত্তির ভুলই অসীম হালদার ও আলোককুমারকে বইছাড়, বহুস্তে হত্যা করেছি।

বিচারককে বেন সহসা বহুগতন হলো। চমকে উঠলো দর্শকবৃন্দ। স্তম্ভিত, হতবাক হয়ে সকলে চাইলো আসামীর দিকে। ধব-ধব করে কেঁপে উঠলো শুকতারার সর্বাস্থ। সে ভয়ানক-চোখে চাইলো অনিলের মুখের দিকে।

বিজয়ী বীরের মতো উন্নত মস্তকে গাঁড়িয়েছিলো আসামী অনিল চ্যাটার্জি। অপূর্ণ হাসিতে দৃষ্ট ওব ছুটি চোখ রাখলো শুকতারার চোখের ওপর। সে হাসির দীপ্তি বৃষ্টি সইতে পারলো না শুকতার। সভয়ে চোখ বৃদ্ধ মাসীমার কাঁপে মাথাটা এদিয়ে দিলো।

আপনার এই স্বীকারোক্তির কল কি হতে পারে, সে দাবী আছ আপনাব? শ্রুগতীর কণ্ঠ প্রশ্ন করলেন বিচারপতি।

—অবশ্যই। সত্যের কণ্ঠ জবাব দিল আসামী। পুনী আসামীর উপযুক্ত দণ্ডই আশা করবো।

কপালের ঘাম মুছে বসে পড়লেন ব্যাটিন্সর বাবু। কয়েক মিনিট নতমস্তকে চিন্তা করবার পর জজসাহেব চার্জ শুরু করলেন। সরকার ও আসামী পক্ষের সকল তথ্য তিনি জুরিদের কাছে দীর্ঘ সময় ধরে নিপুণ ভাবে বিবেচন করলেন।

তার পর জুরিরা উঠে গেলেন নিজেদের অভিমত স্থির করবার জন্ত।

কিছুক্ষণ পরে জুরিরা ফিরে এসে নিজেদের আসন গ্রহণ করলেন—এবং তাঁদের মুখপাঞ্জ জানালেন তাঁদের সম্মিলিত অভিমত।

সকলকার সঙ্গে একমত হয়ে বিচারপতি আসামী অনিল চ্যাটার্জির বৃত্ত্যদণ্ডের আদেশ ঘোষণা করলেন। আসামীকে প্রাণ করা হলো,—

তিনি কি হাইকোর্টে আপীল করবেন? বা গভর্ণরের কাছে প্রাশ-
ভিকা করবেন?

—বজ্রবান জানিয়ে আসামী জবাব দিলো না।— কিছুই তিনি
করবেন না।

আজ থেকে এক মাস আসামীর জীবনের মেয়াদ ধার্য হলো।

কারার ভেতর পড়েছিলো করবী অনিলের কোলো মুখ গুঁজে,
ওর মাথার মেহতরে হাত বুলিয়ে বললো অনিল—এত ভেত্রে
পড়লে চলবে কেন দিদি? সব তো বুঝি তুই? মিতার জীবনের
আলোকে নিবিঘ্নে গিয়ে মিছের কী বসেও আলো আলিয়ে রাখার
বাসনা আমার ছিলো না যে, এ আমার মৃত্যুদণ্ড নয়, এই
অভিলুপ্ত জীবন থেকে মহাহুজির ছাড়পত্র। একটা কথা শুধু
জানতে বাসনা, মিতু কি বেঁচে আছে?

—আরে। তবে সে না থাকার মধ্যে, বললো অনিলুদ।
আগে থেকেই তো দায়বিক দুর্কলতা ছিলো, তার ওপর সেদিন
মাথার ভীষণ চোট লেগেছিলো। প্রথমে কমলা সেবাসননে রেখেই
টিকিৎসা চালাছিলো, আর আর অস্ত্রাভ উপসর্গগুলো কিছুটা কমলো,
কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞান আর কিয় এসো না। কান্নকে চিনতে পারেনা,
বা কথা বলে না। ডাক্তারদের নির্দেশ মতো একে এখন পুরীতে
সমুদ্রের ধারে রাখা হয়েছে।

সুদাম তার মা আর কাকাবাবু সঙ্গে আছেন, আছা ও সব কথা

এখন থাক—আমি বলতে এসেছি যে এমন করে আত্মহত্যা করার
সার্থকতা কি? হাইকোর্টে আমরা আপীল করতে চাই তুমি মাঝপথে
অমন বাগড়া না দিলে, সব দিক্ বক্ষা হতো, মৃত্যুদণ্ড তো বুঝেই কথা,
তোমার কোনো গুণই হতো না, মিথ্যে সাক্ষ্যের মাধ্যমটাকে উড়িয়ে
দেওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই শক্ত কাজ ছিলো না; বাক্য—এখনও পথ
আছে,—

—আমি জানি,—আমি সব জানি অনিলুদ, কিন্তু বাচতে যে
আমি চাই না,—অসীমকে খুন করে বিন্দুহীন অদ্বৈতগুণ নই আমি,
আক্ষেপ হইলো ঐ পরতানীটাকে পৃথিবী থেকে সরতে পারলাম না
আরো বহু জীবন বিবহর করার জন্তে ও বেঁচে রইলো, আর ওর
বললে জীবন দিলো মিতার খোঁকা? বুঝবে না, তোমরা বুঝবে না ভাই,
কি আগুন দিন-রাত আমার হৃদয়ে জ্বলছে, কি তার ভাল। মিতার
যদি কোনো দিন জান করে, বোলো তাকে তার হতভাগা মামাকে
যেন সে ক্ষমা করে। বোলো তাকে যে বস্ত্রা দিয়েছি, তার ডেরে
লক্ষণ বেঁধে বাতনা তার মামা ভোগ করে গেছে। ও।
তার খোঁকা মরলো আমারই হাতে, এই ছিলো আমার অদ্বৈতগুণ।
আর সব জেনেওনো তোমরা আমাকে আবার বাঁচতে বলছো?

তুমি হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো ফুলে ফুলে কাদতে লাগিলো
অনিল।

—ছোড়ো! শুধু নিজের কথাই ভাবছো? মা বে তোমার
জন্তে পাগলের মতো বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে।
দিনরাত মাথা খুঁড়ে ঠাকুরের কাছে জীবন-ভিক্ষে চাইছেন তোমার।

সেদারিন জুয়েল একটি ঐক্য জ্যোতিষ্ক

সেদারিন

মেস্ পাউডার
ট্যালকম্ পাউডার
স্নো, কুমকুম
হেয়ার অয়েল
নেল পলিশ

ডি, জে, প্রোডাক্টস * কলিকাতা-১

উপর কথা একবার ভাবো হেঁচকা। কীভাবে কীভাবে বললো করবী।

—আমি তো তাঁর চিরকালের হস্তভাগা সন্তানি ভাই। কখনও তো স্বথশক্তি দিইনি তাঁকে। তুই তাঁকে দেখিস দিদি। তবে আজ বড় গুণে হুঁসেদিনের কথা ভেবে, বখন মা তাকে একজন ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে আশ্রয় চেষ্টা করছেন আমি তখন তাঁকে বিক্রয়ই করেছি, কোনদিন তাঁর সহায়তা করিনি যে। আজ মনে হচ্ছে তখন যদি চেষ্টা করে তোর একটা ভালো বিয়ে দিতে পারতাম; তাহলে আজ তোদের পাশে কেউ একজন থাকতো।

বুড়াপুথবাড়ীর কাতর মুখের দিকে একবার ছির দৃষ্টি মেলে চাইলো অনিরুদ্ধ—তারপর চোখ ফেরালো, করবীর চোখের জলে ভেসে যাওয়া মুখের দিকে। একটু ইতস্ততঃ করে মুহূর্তের বললো সে তার কি আমার গুণ দিতে পারেনা অনিল? আমি প্রার্থনা করছি করবীকে—চিরদিন গুণের পাশে আমি থাকবো।

পরশর করে কৈশে উঠলো করবীর সর্বাঙ্গ। এই মর্মযাতী বস্ত্রাঘ গুণের আবার হুল্লভ আনন্দের একি অত্যাচার?

বিস্মৃত দৃষ্টি মেলে একবার চেয়ে দেখলো করবী তার অসীম সৌভাগ্যবাতার দিকে, তারপর মুখ নিচু করলো।

চমক লেগেছিলো অনিরুদ্ধেরও মনে, তাই সে নির্বাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত গুণ মুখের দিকে চেয়ে ভাবলো, পরিহাস নয়তো? না, না, এ পবিত্রমুখ কোনো ছলনাকারীর হতে পারে না।

—ভগবান আছেন। এই জীবনে আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম অনিরুদ্ধ, যে তিনি শ্রম করণাময়। ব্যাকুলতায় বলতে বলতে, হুহাত বোঁড় করে অনিল প্রণাম জানালো সেই মঙ্গলময়ের উদ্দেশে। তারপর করবীর হাতখানা তুলে গুণ হাতে গিয়ে বললো,—তুমি সত্যি দেবতা অনিরুদ্ধ, তোমরা আছে। বলে আজো সত্য বহু, এগুলোর অস্তিত্ব জগতে রয়েছে ভাই। কি যে শাস্তি তুমি আমার দিলে, আর আমার কোনো হুং নেই। বাবার সন্থর যে এমন শাস্তি নিয়ে বেতে পারে, কোনো এক মিক দিয়ে সে বহাজপান।

করবীর হাতখানা চেপে ধরে বললো অনিল—জামাই বাবুর মস্তের কল, আজ তোর কলসো রে দিদি। সাধুবাক্য, সাধুসঙ্গ যে এত মধুর, বড়—দেবীতে বুঝলাম।

—মাথা নিচু করে অনিলকে প্রণাম করতে গিয়ে—আবার কান্নার ভেত্রে পড়লো গুণ পায়ের গুণর করবী।

—জেল-অফিসার এসে পাঁড়ালেন,—সময় শেষ হয়েছে জামাবার জন্য।

—মিত্র। লক্ষীটি দাবিক আমার, সেই কখন থেকে বসে আছি যে, একবার হাঁ করে, একটু খাও। কিভিঃ কাপটি টেবিলে নামিয়ে রেখে যখন দেবী স্মৃতির মাথাটি অঙ্গ কাঁকিয়ে ওকে বারবার খাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বুখা চেষ্টা। গুণ কোনো কথাই যে ওনতে পাচ্ছে স্মৃতি, এমন কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না।

চোখ ছোটো গুণ খোলাই ছিলো, তবে সে চোখে কোনো দৃষ্টি

ছিলো না। আপন মনে বিচক্ষিত করে কি সব বকছিলো। কী তরুলতাটি আরো কাঁপ হয়ে যেদ বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে।

একটু দূরে চেয়ারে বসেছিলো সুরাম, হাতে রয়েছে একখানি সন্ধানপত্র। হার মেনে বসুমা দেবী তাঁকে বললেন—তুই একবার দেখ দামী। সকাল থেকে এক চামচ যে পেটে কিছু গেলেনা। কাগজখানা নামিয়ে রেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে এলো সুরাম। স্মৃতির পাশে বসে চামচে করে, কৌশলে তার মুখে একটু একটু করে সুপ ঢেলে দিয়ে গুণে খাওয়াতে লাগলো।

খবরের কাগজটি হাতে নিয়ে লালকুটির হত্যার ব্যয়টি গড়ে চমকে উঠলেন যখন দেবী। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে বেড়িয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বারান্দার কবলের আসনে বসেছিলেন সোমনাথ। দৃষ্টি তাঁর নিবন্ধ সামনে দিগন্তপ্রসারী সমুদ্রের প্রতি। যখন দেবী কাগজখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট তাঁরদে লাগলেন।

আমি দেখছি মা। গভীর স্বরে বললেন সোমনাথ—নিরন্তর বিধান রচন করবার শক্তি কারুর নেই। তবে ভাবছি একবার কলকাতার যাবো, গুণ মাকে আর করবীকে সঙ্গে নিয়ে কিবো।

—আমিও আপনার সঙ্গে যাবো ঠাকুরপো। একবার জন্মের শোধ বাছাকে দেখবো। উঃ, কি করে এই নিরাক্রম মুখ সইবেন গুণ মা। বললেন যখন দেবী।

যাবেন বৈকি। সুরাম থাকবে মিত্রর কাছে, আর নাস্ত তো রয়েছে, অন্তরবিষ হবে না। জবাব দিলেন সোমনাথ।

হঠাৎ গুরুসেবকে নিঃশব্দে সামনে দণ্ডায়মান দেখে একটু চমকে, উঠে পাড়ালেন সোমনাথ। তাঁকে প্রণাম করে আসন এগিয়ে দিলেন যখন দেবী।

কিছু দূরেই আশ্রম। সোপানদাস মহারাজ কয়েক দিন ওখানে বাস করছেন। সোমনাথ আছেন এ বাড়ীতে স্মৃতির কাছে।

ওদের দুজনকে নীরব দেখে যখন দেবী উঠে গেলেন সেখান থেকে।

—আমাকে হঠাৎ দেখে বিষয় বোধ করছে। বৎস। প্রাশান্ত হস্তের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন গুরুসেব সোমনাথকে।

—না গুরুজী। আমি জানতাম আপনি আসবেন। হ্যাঁ। তোমার মনের চাকল্য আমাকে আকর্ষণ করেছে। এখন বলো হঠাৎ কোন সন্ধ্যর তোমার সাধনপথে বিঘ্ন ঘটছে?

—নতদূরনে নীরব রইলেন সোমনাথ।

গুণ দিকে উজ্জল দৃষ্টিপাত করে, মুহূর্তে বললেন গুরুসেব,—আচ্ছা এখন থাক ওকথা। এখন যে প্রয়োজনে এসেছি তাই বলি। আগামী পরন্তু আশ্রমে মরনারায়ণ সেবার মনস্ক করেছি। আশ্রমে কিছু সাধুদের একটিমাত্র মাটির কলসী আছে। সেজন্য পানীয় জলের জন্য বড় কয়েকটি পাত্রেয় দরকার।

—চোখ তুলে গুণ দিকে চেয়ে বললেন সোমনাথ—আজই জন্ম, সে ব্যবস্থা করে রাখবো। কয়েকটি মাটির বড় জালা আমসেই হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ। হবে। তবে ঐ চার-পাঁচশো লোকের জন্মের প্রয়োজন মিটে গেলে পর পাত্রগুলো, কি হবে? ততসোতে কি



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোল শিশুটি কত সুখী, কত সুস্থ। কারণ ওর স্নেহময়ী মা ওকে নিয়মিত অষ্টারমিল্ক খাওয়ান। অষ্টারমিল্ক বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত খাদ্য। এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিল্ক তৈরী করা হয়েছে।

বিশ্বাস্য-অষ্টারমিল্ক পুষ্টি (ইংল্যান্ডে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সবরকম তথ্যসম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নম্বর পয়সার ডাক-টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়—“অষ্টারমিল্ক”, P. O. Box No. 2257, কোলকাতা-১।

...মায়ের দুধেরই মতন

কারেন্স শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেন। দুধ দেহগঠনের জন্য চার পাঁচ মাস বয়স থেকেই দুধের সঙ্গে কারেন্স খাওয়ানো প্রয়োজন। কারেন্স পুষ্টিকর শব্দজাত খাদ্য-বান্ধা করতে হয়না—শুধু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চামচে করে খাওয়ান।



জীবনের জল বাধা হবে? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সোমনাথের দিকে
দেখে ওখানে গুরুদেব।

—না গুরুদেব। কারণ, ওতে যে অনেক জল ঘরে। অত
জল ব্যবহার ও হবে না, আর কয়েক দিন রেখে দিলে ওতে গোঁকা
হয়ে যেতে পারে। ওগুলো শুষ্কই থাকবে।

—ও। তা হলে বুঝতে পারছো যে, হয় পাত্রগুলোকে বহু
জোড়ের পিপাসা যেটোতে হবে, নয় পূজা থাকতে হবে। দু-চার জনের
জল ওরা স্ট্রই হয়নি, যেমন ছোট পাত্রগুলো হয়েছে।

চমকে উঠলেন সোমনাথ। গুরুদেবের জ্যোতিঃবিদ্যুত চোখ
দুটির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকবার পর পত্রীর প্রত্যাহার মাথাটি
উত্থাপন করে এলো তাঁর চরণে। ব্যাকুলতায় বললেন তিনি—কহা
জ্ঞান। আবার বোধ অভ্যাসতার জ্যোতিঃ কহা কখন গুরুদেব।

ওকে পত্রীর ঘেঁষে তুলে ধরে বললেন সন্ন্যাসী—জ্যোতিঃ তোমার
কোথায় বাবা? মহামায়ায় খেলা বিভা-অবিভার খেলার আদর। যে
কুহু হুটি মাত্র। অবিভার আকর্ষণে সাধকের মন বন্ধন, সেইহেতু
বা সন্ধিলোক কুমিত্য হয়ে সাময়িক ভাবে নেমে আসে নিরুদ্ভূতমতে,
তখন সে অহংসাগরের অর্থ, দুঃখ, রূপ, উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে
বিজ্ঞাত হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধনার রক্ত বাহ্যিক কামের বাঁধা, সে ওতে
তলিয়ে যাবে না, কিছুক্ষণ পরেই আবার বিস্তার আকর্ষণে এই সাধন-
বন্ধুর সাহায্যে সে ফিরে যাবেই স্বস্থানে।

স্মৃতির জীবনের এই শোচনীয় পরিমাণ-দর্শনে তোমার মনে যে
সাময়িক বিভ্রান্তির তরঙ্গ দেখা দিয়েছিলো, সেটা এই অহংতত্ত্বের
খেলা আর কি। নিজেকেই সকল কণ্ঠের কর্তৃত্বাঙ্গান করলেই কণ্ঠের
অর্থ-দুঃখের তরঙ্গ হাবুডুবু খেতে হবে।

এখন বুঝছো যে তোমার মনে যে সংশয় জেগেছিলো যে—
কুমি সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন না করলে স্মৃতির জীবনে এই বিপর্যয়
ঘটতো না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, স্মৃতি ও স্নানামরুপী এই দুটি
পাত্র কুহু মাটির কলস নয়। কুহু কার্যের জল ওরা স্ট্রই হয়নি বা
কুহু গুপ্তিতে ওরা আবদ্ধ থাকতে পারে না। ওরা স্ট্রই হয়েছে
বহু অর্ন্তস্থিত আত্মার জল। ওদের জীবন উৎসপীত বিষের
জনকল্যাণে। সেজন্ত সাধারণ সঙ্গী পরিবেশে ওরা যেমানান।
বেধানকার প্রয়োজন একটি সাধারণ কুহু পাত্রের সেই পরিবেশে, ওরা
হবে অর্থহীন, সেজন্ত শুষ্কই থাকবে।

পূর্বাধিকার করলেই এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাবে, যেসব মহাজীবন
যারা বিশ্বকল্যাণ সাধিত হয়েছে, তারা সাধারণ নিয়মে সংসার-জীবন
ধারণ করেনি। নিজের আত্মীয়-পরিজনবৈধিত যে কুহু সংসার
সেখানে ছিলো তারা যেমানান অল্পপুঙ্খ। তারপর সমষ্টি ছেড়ে
যখন ব্যক্তিগত প্রসারিত হল তাদের পরিবেশ তখনই স্বরূপে, স্বস্থানে,
হল তাদের প্রতিষ্ঠা; হলো মহাজীবনের উদ্বোধন। আজ স্নানায় ও
মিতার জীবনে বা দেখছো এটা হচ্ছে ওদের মহাজীবনের প্রসঙ্গি
মাত্র। জন্মকাল থেকে যে জন্মের বীজ অকুরিত হয়েছিলো
ওদের মনে, লোকচক্ষে সাধারণ নিয়মে তা বার্ষ বলেই মনে হয়।
কিন্তু সত্যি তা বার্ষ নয়। ওদের কুহু প্রেম একদিন রূপায়িত
হবে অহং মহাপ্রেম। ওরা সেই বিজ্ঞ অনন্ত চিদানন্দ-সাগরের
তরঙ্গরূপে বিশ্বজীবার আলোক উপলব্ধি করবে।

মিতার জীবনে অসীমের অনবিকার প্রবেশ, তারপর

নিগাঞ্জন মনস্তাপ, সেই বৈশিষ্ট্যের সাথে আর কাদের স্নেহলীলা,
তারপর তার তিরোভাব, এর কোনটাই অর্থহীন নয়। এগুলো
ওদের কুহু হতে বৃহৎ, অসং হতে সং, অকর্তার হতে আলোক
অমিত্য হতে নিত্য জীবনের বিবর্তন মাত্র। এই কুহু শিঙাট এসে,
ওর নারীজনদের যে মৃদু বৃত্তিগুলোকে জাগরিত করে গেছে,
সে থাকলে মাতৃঘের এই অমৃত নিরীক্ষণী শুধু তাকেই ঘিরে থাকতো,
কিন্তু তা এর হবার নয়, একদিন এই কুহু নিরীক্ষণী মহানরীতে
রূপান্তরিত হয়ে বহু পরিত্যক্ত, অনাথ শিশুর জীবনে অমৃত দান
করবে। বিশ্বশিতা, বিশ্বমাতা, বিশ্ববন্ধু হতে বাধা আসে
তারা কি কাজের লৌকিক দ্রাঘা-শিতা, বহু হতে পারে? বিষের
সমগ্র প্রাণীর সঙ্গেই যে তারা একত্ব হয়ে যায়।

এখন বুঝছো, তোমার উন্নত মার্গে গমন, মিতা স্নানায়
জীবনের বিপর্যয়, সব কিছুই মাঝেই রয়েছে সেই মহাজীবনের
মহান উদ্বেগ।

বহু-বহু করে অবিরল, ধারার আমলাকণ হয়ে পড়ছিলো,
সোমনাথের ছুটি গণ্ড বেয়ে। আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বললেন—
গুরুদেব সত্যি এই সংশয়ট কীটার মতো জেগেছিলো আমার সাধন-
পথে। তাকে উপেক্ষা করে চলেছি এতদিন, কিন্তু মাঝে মাঝে
তার অন্তিম আমাকে যন্ত্রণাও দিয়েছে। আজ আপনার অপার
বক্তব্য আমি কণ্টকমুক্ত হলুম।

গুরুদেব প্রণাম করে আবার বললেন তিনি, অনিল আর
তার মাকে আশীর্বাদ করুন গুরুজী, তাদের জীবনে বহু সঙ্কট
উপস্থিত।

গভীর স্নেহভরে সোমনাথের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ
জানিয়ে বললেন তিনি। সাধনপথকে শাণিত ক্রুরের সঙ্গে তুলনা
করেছেন বোগী-ধরিয়া। এখানে গমন সহজসাধ্য নয় বাবা। বাবে
বারেই আসবে নানা শস্যন, কঠোর রূপ ধারণ করে, ভয় পেও না,
অমৃতপথবাদী তোমার অবিভার হলনা অনায়াসে অতিক্রম করে
যেতে পারবে।

আর অনিল, আর তার মায়ের এই সঙ্কটকালকে ওদের জীবনের
শ্রেষ্ঠ মুহূর্তই বলা যায়। আত্মা তো অবিনাশী সে কথা জানো,
তবে তার সদৃশ কণ্ঠের কল তো তাকে ভোগ করতেই হবে। ওদের
অসং কণ্ঠের স্তূপীকৃত জগাল অহংতাপ ও দুঃখের আগুনে নষ্ট হয়ে
যাবে। এর পর ওরা শুধু জীবনের অবিকারী হয়ে উন্নত মার্গে অগ্রসর
হতে পারবে। কর্তব্যের দায়িত্ব ওদের জীবনের এই মহাসম্মিলনে
সেখানে তোমার উপস্থিতির প্রয়োজন বাবা।

—ঠা গুরুজী। আমিও সেই কথাই ভেবেছি।

—আজ্ঞা এবারে এসো, মিতুমার কাছে একবার বাই।

স্মৃতির শয্যাপাশে বসেছিলো স্নানায়, ওদের আসতে দেখে উঠে
গিয়ে প্রণাম করলো।

ওর মাথায় হাত রেখে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন গুরুদেব—
কলীকে কেমন দেখছো ডাক্তার। সারিয়ে তোমার আশা
যাখো?

—আপনাদের আশীর্বাদই আমার তরঙ্গ। বৃহৎমহে জনন
দিলো স্নানায়—বাতাবিক জ্ঞান তো এখনও ফিরলো না, খাতির

করানোও আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই মনে হয়, কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আনালে বোধ হয় ভালো হয়।

—তোমার বখান তাই মনে হয়েছে, সোমনাথ তো কলকাতার রাহেই—সেই রকম ব্যবস্থা না হয় করা বাবে। একটু হাসির সঙ্গে বললেন গুরুদেব।

—তার প্রয়োজন হবে না সুদাম, গাঢ় হয়ে বললেন সোমনাথ, গুরুদেবের পরামর্শ ওর সর্বোচ্চ দাঁড়, এই একমাত্র মহোঁষি ওর।

গুরুদেব বললেন সুমিতার লম্বা পাশে।

সুদাম তাঁর পরামর্শ নিতে অগ্রসর হলে ইস্তাফা তিনি হারণ করলেন। তারপর সুমিতার মাথার আর সর্বোচ্চ হস্তচালনা করতে লাগলেন। সম্বন্ধে সোমনাথ সুদাম, দুটি মীলাত জ্যোতিষিণী গুরুদেবের হুচোখ থেকে নির্গত হয়ে বেন সুমিতার সর্বোচ্চ সঞ্চাষিত হচ্ছে। মিতার আধখোলা নিম্পত্ত দুটি চোখে আর শুক ফাঁকালে ঠোঁটে বেন প্রাণের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। হাতখানি শূন্যে তুলে সে বেন ক'কে অব্যবহৃত করছো ধন-ধর করে কীপড়ে হাতখানি, কিন্তু পড়ে যাচ্ছে না। উঠে পাড়ালেন গুরুদেব। নিম্ন হাসির সঙ্গে বললেন ওর হাতখানি ধরো সুদাম।

গভীর সমতার সঙ্গে সুদাম হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই থপ করে হাতখানি ওর হাতের ওপর পড়ে গেলো, আর অসুস্থ কাতরোক্তি করে চোখ বুজলো সুমিতা। মাথাটা একপাশে তলে পড়লো। মহাব্যস্ত হয়ে ওর হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করতে গেলো সুদাম।

ছির হয়ে ওর পাশে থাকো ডাক্তার, আর কিছু করতে চরেনা। গুরুদেবের আলৌকিক কণ্ঠের বাণী শুনে মন্ত্রমুগ্ধর মতো সুমিতার পাশে নিশ্চল হয়ে বসে রইলো সুদাম।

দক্ষিণেখের মা ভবতাবিরীর মন্দির। সামনের নাটমন্দিরের চাতালে সর্বোচ্চ একখানি শালা চাগর হুড়ি দিয়ে মড়ার মত পড়েছিলেন মারা দেবী। সারা চামচটা মাছিতে বেন ঢেকে গেছে।

অনড় অচল হয়ে তিনি কেঁদে কেঁদে ডাকছেন মহা বিশমতাবিরীকে পূত্রের প্রাণভিক্ষা চাইছেন।

—মা, মা গো। একবার উঠে বসো মা!

করবীর আঁকুল ডাকে হুখের চাগর সরালেন তিনি। চারিপাশে অত লোক দাঁড়িয়ে কারা? আন্তে আন্তে মেঝের ভর দিয়ে উঠে বসলেন মারা দেবী।

করবীর পাশে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলো অনিরুদ্ধ আর মিসেস বাবু। যত্ননা দেবী আর সোমনাথ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন।

বাবা সোমনাথ। তুচ্ছের কেঁদে উঠলেন তিনি, 'তোমরা এসেছো কেন বাবা? আমার অনিল আমার খোকা, সে কৈ বাবা? তাকে কোথায় রেখে এসেছো বাবা?

এগিয়ে এসে সোমনাথ বসলেন ওর পাশে। তারপর বীরকণ্ঠে বললেন—তার শেষ সময় উপস্থিত, আর করেক দিন থাকবে সে পৃথিবীতে। আপনি চলুন তাকে আশীর্বাদ করবেন।

বুক চাপড়ে হাঁহাকার করে উঠলেন তিনি—এ কি খবর শোনালে গো। ওরে আমার সোনার বাছা, শেষে ডাইনীতে খেলো তোকে রে। আমার কোলে কিরে আর বাবা, আমি বুক চিরে লুকিয়ে রাখবো তোকে।

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে চেয়ে দেখছিলেন মিসেস বাবু—

মিতার সেই বিবিয়া? কোথায় সেই বিস্মিতি কাসান-দুহস্ত, পর্কিতা দাড়িকা নারী? লম্বাচঙা অত বড় দেহটা বেন তকিরে এতটুকু হয়ে গেছে। হোট করে কাটা চুলগুলো বেন ক' মাসের রপ্তা শবের মতো শালা হয়ে গেছে। দিনরাত কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো কীত যন্ত্রবর্ণ। পাখরের মোকোতে অবিরাম মাথা ধোঁড়ার অত কণাল কুলে, চাপ চাপ রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। পরনে একখানি আধঘরলা মোটা ধানকাপড়। ওর পাশে বসলেন মিসেস বাবু— তারপর ওর হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন,—আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আনাতে এসেছি মিরি।

—আমার কাছে? হা, হা, হা, করে হেসে উঠলেন মারা দেবী—সর্বহার্য তিথ্যাবিরীকে কি পরিহাস করছো মিরি।

—না, না, এটা কি পরিহাসের সময় তাই? আমি এসেছি কবিক-চাইতে আপনার কাছে। বললেন মিসেস বাবু।

—কবি? কে কবি? আমার করবীর কথা বলছো?

এবারে ওর পায়ের কাছে এসে বসলো অনিরুদ্ধ—বিনীতভাবে বললো—হ্যাঁ, মা। আপনার করবীকেই চাইছি, আমি আমার জীবনসঙ্গিনীরূপে, এসো কবি, মাকে প্রণাম করো। ওরা দু'জনে এক সঙ্গে মারা দেবীকে প্রণাম করলো।

—এ কি, এ কি? এ কি সত্যি, না স্বপ্ন? আমার এই রূপহীনা মেয়েকে তুমি গ্রহণ করলে বাবা? আমার বহুকালের

নীরৱ

তাল ও খেজুরের সুমিষ্ট রস

প্রতি বোতল—১২ নং পঃ।

খেজুর সিরাপ

২ পাউণ্ড বোতল

প্রতি বোতল—১-৫০ নং পঃ

সর্বত্র পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তালগুড় শিম্পী

সমবায় মহাসংঘ লিঃ

৪, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা—২৬

ফোন :—৪৬-১৯২৪।

✱ কমিশনে এজেন্সী দেওয়া হয়।

আলমস্বপ্নে এটি হলো? বাবা বাবা আলম, একবার আর যে, সেয়ে ক বাবা ভোর হতভাগী মায়ের বড় সাথ আজ পূর্ণ হলো যে।
এক বৃকট তো আমার কেটে যাচ্ছে না? এত বড় হুংস আর আর এতখানি আলমের ভায়ে বৃকট আমার ভেঙে ওড়ে হরে পেলো না তো? ভুলো তোমরা কেউ একটা লোহার ভাঙা দিয়ে এই পাখির বৃকট ভেঙে দাও না গো। করবী আর অনিরুদ্ধকে হুঁহাতে বৃকের মধ্যে জড়িয়ে ধার হাট্কার করে কঁদে উঠলেন তিনি।

—নিজেকে সংবরণ করুন। বজগভীর ঘরে বললেন সোমনাথ, প্রাণ বিলোড় তার কর্তব্যলগ্নে আপনি এখন করতে পারবেন না। ওত তার মল্লও কিছু হবে না। এর চেয়ে নিজের অশান্ত চিত্তকে ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করুন, আর তাঁর কাছে পুত্রের আত্মার সন্মতি কামনা করুন। এ ছাড়া আর বিতীর পথ নেই।

বড় বড় চোখ মেলে সোমনাথের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মাদা দেবী—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—নিয়ে চলো বাবা, আমার কোথায় নিয়ে যাবে। কি করলে, কি বললে আমার খোকর ভালো হবে আমার বলে দাও।

—আমুন। ঠর হাতখানি ধরে, বীর পরক্ষেপে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন সোমনাথ। মহামায়ার সামনে গিয়ে নিজে বসলেন, মাদা-দেবীকেও পাশে বসালেন। তারপর অল্পকণ্ঠে ঠর কানে মেন কি বললেন।

হুঁহাত অল্লিবদ্ধ করে চোখ বুজলেন বৃদ্ধা। ধ্যানস্থ হয়ে ঠরা হুঁহাতে বসে রইলেন মা ভবতারণীর সামনে।

পাশেই দাঁড়িয়েছিলো করবী। দর-দর করে চোখের জলে গাল দুটো ভেসে যাচ্ছিলো তার। একটু দূরে মিসেস বাবু ও বমুনা দেবী বসে জগন্মাতার কাছে বৃদ্ধার জন্তে শান্তি প্রার্থনা করতে লাগলেন। আর অনিরুদ্ধ অস্থির ভাবে মন্দিরের চাতালে পাইচারী করতে লাগলো। মনটা তার নিরাশ্রয় আক্ষেপে হার হার করছিলো। প্রতি মুহূর্তে যে অনিশ্চয়ের জীবনের সেরা কুসুরে আলছে। এমন নির্বোধ মানুষ কি এই পৃথিবীতে আর আছে? যে খেজুর কাঁসির দড়িতে গলা বাড়িয়ে দেয়?

হাইকোর্ট, স্ট্রীমকোর্ট করবার যে কত কি ছিলো। হায়, ঐ নির্বোধটার জন্তে যে কিছুই হলো না। অশান্তচিত্তে নিজের চুল হুঁহাতে টানতে লাগলো ব্যারিষ্টার অনিরুদ্ধ বাবু।

আজ সকাল থেকেই শ্রুত হয়েছে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা। প্রমত্ত বড়ের হা, হা, কয় অটহাসির সঙ্গে বিশেষ সাগরের অশান্ত কলরবন। কিন্তু পবন যেন আজ সিঁদুকতার বৃক জাগিয়েছে প্রমত্ত আলোড়ন, তাই সে লক্ষ লক্ষ বাহ জুলে, আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করতে চাইছে মহাকাশকে আর তার নাগাল না পেয়ে নিফল বেদনার ভায়ে আছড়ে ভেঙে পড়ছে বেলাকুমির ওপর। জনহীন সাগরতট। বহুঘরের ভেতরে ভেসে আসছে বড়ের হতভাগীর আর সাগরের আবুল কল্লনবনি।

বড়ের দাপটে সন্ধ্যার আগেই পৃথিবীময় বিজলীপ্রবাহ কাজে লবায় গিয়েছে।

সুস্থিতার ঘরে ষোড়শটি আলোয় বর্ণ প্রচেষ্টার বিরত হয়ে

পড়িয়ে হুঁহা। বড়বার সে বাতি আলো, জালানার কোন কীক ঘিরে দয়াকাবানাস এসে হুঁ ঘিরে নিভিয়ে দেয় বাতিটা।

প্রকৃতি আজ বত অশান্ত ঠিক তার বিপরীত শান্ত হয়ে গেছে সুমিতা। বহুদিনের অশান্ত ভাবটা যেন আজ তাকে হুঁকি ঘিরে চলে গেছে, তাই সেই সকাল দশটা থেকে সে শান্ত হয়ে বসেছে। বহুকাল কোনো সন্ধ্যাপর অসুস্থ প্রিয়জনের পাশে নিরাশ্রয় উৎকর্ষার সঙ্গে দিন-রাত সংগ্রাম করবার পর, গুপ্তবাক্যনিবীর চোখে যেমন নামে নিস্তার অতলসমুদ্র, তেমনি সুমের জোয়ার বৃষ্টি এসেছে, ওর হায়-ভক্তিতে, নিবহারা হুঁটি চোখে। কি এক অস্থিরতা ওকে কি নিরাশ্রয় কই? ঘিরেছে এই ক'মাস রোগশয্যায়। সুম যেন ওর চোখ ছেড়ে নিরুদ্ধেণ বাক্য করেছিলো, আজ বৃষ্টি সে কিরবে। তার ঘেঁষে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে ওর বিভ্রান্ত মনে।

বার বার শক্তিত হয়ে ওকে পরীক্ষা করেছে সুমাম কিন্তু না, জয়ের কোনে। কারণ নেই, তবুও সকাল দশটা থেকে এই রাত ন'টা পর্যন্ত কিছুই তো খাওয়ারো হয়নি ওকে, কিন্তু সুম ভাবিয়ে খাওয়ারোও ওর মন রাজি হলো, তাই একটু দূরে চেয়ারে সে বসে বসে ওর সুম ভাঙার জন্ত প্রতীক্ষা করছে সারাটা দিন। নাসটি আজ সকাল থেকে প্রবল জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ছে। তাকে বমুনা দেবীর ঘরে শুইয়ে তার ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে, নিজেই সারাক্ষণ আছে সুমিতার কাছে। রাত ন'টা বাজলো। বড়ের গতি মধুর হয়ে আসছে, আকাশ ভেঙে এখন নেমেছে প্রবল বর্ষণ। আশ্রম থেকে ওর খাবার দিয়ে গিয়েছিলো, পাশের ঘরে ঢাকা আছে। অতিকষ্টে একটি বাতি জ্বলে আড়াল দিয়ে সুমিতার ঘরে রেখে, আরেকটি বাতি জালিয়ে, নিজের খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিলো সুমাম। কিরে এসে দেখলো মিতার ঘরের বাতি নিভে গেছে।

—হঠাৎ মনে পড়লো ওর নিচের ঘরের আলমারীতে আছে তো সেই আলোটা, যে বাতিমানটা মিটা ওর জন্মদিনে একবার উপহার দিয়েছিলো। একটি সোনা রূপোর কারুকার্য করা ডাগন মৃতি, তার মাথার ওপর সবুজ রং এর বেলোয়ারী কাঁচের একটি চিনালঠন ফিট করা ছিলো। মৃতিটির গায়ে মাছের জাঁলের মত খাঁজ কাটা, আর প্রত্যেক খাঁজে বাজে, হীরে, যুক্তো, চুপি, পান্না, প্রবাল, নীলা আর পদ্মরাগ মণি, মানিয়ে এমন করে বসানো যে, মাথার ওপর আলোটা জ্বলেই, ডাগনের মৃতিটা থেকে রামধনু রং-এর আলো ঠিকের পড়ে। ওর চোখ-হুটেতে রক্তবর্ণ দুটি মহামূল্য চুপি বসানো। এটি একজন চিনাসওয়ারর বিকি করেছিলো কুমার ইন্দ্রনাথ জিবেমিকে। তখনকার দিনে, পৌখিন এবং শিল্পের সমকলার হিসেবে, কুমার ইন্দ্রনাথের খুব নামভাক ছিলো, তাই দেশ-বিদেশ থেকে আগন্ত বণিকরা বালায় মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধান নিয়ে জানতে পারতো এদেশে প্রকৃত ক্রেতা কে আছে? এই অপরূপ সুন্দর বাতিমানটি একবার সোমনাথের আসেশে, সুমিতা ওর জন্মদিনে ওকে দিয়েছিলো। পূর্বাতে আসবার সময় এই প্রিয় দ্রব্যটি কাজে লাগতে পারে ভেবে সুমাম এটিকে সঙ্গে এনেছিলো। তারপর সেটা আলমারীতে তোলাই ছিলো।

হ্যাঁ বাতিমানটা যে আজ বড় দরকার। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে, ষোড়শটি জালিয়ে, আলমারী খুললো সে।



লাইফবয় যেখানে

স্বাস্থ্যও সেখানে !

আঃ ! লাইফবয়ে গান করে কি আরাম ! আর গানের পর শরীরটা কত স্বস্তির লাগে !
 আরে বাইরে ধুলা ময়লা কার না লাগে — লাইফবয়ের কার্যকারী ফেনা সব ধুলা
 ময়লা রোগ বীজাণু ঘরে পেতে বাতায় মল করে । আর থেকে আপনার
 পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে গান করুন ।

সেই বুট বুট কালো সজ্জ। ও কি ভীষণ কালো কালো
পাহাড়ের মত চেউলো। ওরা যেন বিরাটকার নৈত্যের দল,
চারি দিক থেকে হা, হা, করে ছুটে আসছে স্মিতাক প্রাস কদমার
জন্ত। কাজল মাথা আকাশের ফাটা বৃকে লক্ লক্ করে জলছে
যেন, প্রাণের আঁধার।

ওর দেহটা নিয়ে নৈত্যগুলো লোফালুকি খেলছে, উঃ, কি ব্যথা
প্রতি বহুর্ভে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, ওর।

—আর যে পারি না। কে আছে? বাঁচাও বাঁচাও আমাকে,
আমাকে বাঁচাও গো।

—দুয়ের বোরে গুন্ডের গুন্ডের কেঁদে উঠলো স্মিতা। ঐ, ঐতো
সেই বাতিঘরটা। সেখানকার সেই উজ্জল আলোকভক্তটা পাঠ দেখতে
পাচ্ছে স্মিতা। হঠাৎ একটা বিশাল চেউ ওকে এক ধাক্কায় ছুঁড়ে
কেলে দিলো বাতিঘরটার ওপর।

—আঃ এসেছি। এতদিন পরে এসেছি বাতিঘরে, মহা বিশ্বয়
ভরে দেখলো স্মিতা। সেই উজ্জল আলোকভক্তটি তো স্তম্ভ নর, ও ব
একজন মানুষ। 'আর তার হাতেই জলছে সেই মহা উজ্জল
আলোটা।

—ও কে? দামীনা? তুমি? তুমি আলো নিয়ে কাঁড়িয়ে আছে
এখানে? আমার দেখতে পাচ্ছে দামীনা?

সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো সে, দামীনা, দামীনা
আ-আ।

টানা লঠনটি ছালিয়ে নিয়ে স্রবাস ঘরের বাইরে পা দিয়েই,
চমকে উঠলো।

কে? কে ডাকছে তাকে? এদিক ওদিক আলোটি বুঝিয়ে দেখলে
দা কেউ নেই মনের ভুল। বাতাসের শব্দ।

আবার তেমে এলো সেই ডাক—দামীনা। দামীনা,
আ—

—কে? কে ডাকছে ওকে, অমম করে? মিতা। মিতা ডাকছে।
একি সত্য? প্রায় আড়াই মাস হতে উলসে, তার কণ্ঠ থেকে শুধু
অনুট, অর্থহীন বহুপায়ের প্রলাপোক্তি ছাড়া বাতাবিক কথা
একটিও শোনা যায়নি তো। ও কণ্ঠ বুঝি চিরতরে নীরব হয়ে
গেছে।

আবার আবার তেমে এলো সেই ডাক।

—দামীনা, দামীনা আ-আ।

—না। না তুল নয়, ভ্রান্তি নয়। মিতাই ডাকছে। তবে কি
জলছে তার বাতাবিক জ্ঞানের আলো মনে? কেটে গেছে ওর মনের
বিশুদ্ধির ভিমির অন্ধকার? প্রথম বড়ের গজ্ঞান, সাগরের
কলরোল, বৃষ্টির জলতরঙ্গ, সকল শব্দকে ছাপিয়ে ঐ যে তেমে
আসছে তার চির-পরিচিত কণ্ঠের ডাক—দামীনা দামীনা
আ,—আ।

—এই যে, এই যে আমি মিতা। তুমি নেই! বাচ্ছি। বা-ই,
বা-ই, মিতা, মিতা-আ।

উচ্চকণ্ঠে সারা দিতে দিতে, সেই মহা উজ্জল পারা বঃ এর
আলোক বিচ্ছুরিত, রক্ত রচিত দীপাবারটি হাতে ধরে, ক্রত পদক্ষেপে
স্বাকুল চিত্তে, সিঁড়ির ধাপ ধেরে উল্লে'গমন করতে লাগলো, ডাক্তার
স্রবাস হালদার।

সমাপ্ত

শিশু

তারি ধর

নিখার অকুল ঘন জাঁধার বিদারি
যেলিল তরুণ জাঁধি উবার আলোকে,
ছিন্ন কন্যা পরে হস্ত পদ নাড়ি
চৌদিকে চাইছে কেবল বিশ্বয় পূলকে।

অন্ধকার হাতগর্ভ, সীমিত বন্ধন,
আলোক প্রবেশিতে সেখা পায় না'ক পথ—
মুক্তি লাগি বন্ধ মাঝে স্তম্ভিত ক্রন্দন
ডাকি আনে অবশেষে বাহিরের রথ।

পূর্ণাচল দেয় দেখা অরুণের রেখা,
ভিমির পলাইয়া যায় সোপানে সোপানে,
বিশ্বমাঝে নৃতনের নাম হয় লেখা,
শিরোপরে আশীর্বাদ করে যে তপনে।

বিশাল উত্তাল নদী এ বিশ্ব ভুবনে
পাড়ি ধরে এই শিশু বর্ধিকো বোঁধনে।

এতটুকুন

জসীম উদ্দীন

আছে আমার আকাশ-ভরা কে তাহারে বাতে?
এতটুকুন চাই যে আমার ছোট্ট বুকের মাঝে।

আছে সাগর অগং জোড়া কূল কে তাহার পার,
এতটুকুন সাগর চাহি বিহ্বল মতির ছায়।

মেঘ ভরিয়া বৃষ্টি ধরে কেবা সে-ধোঁজ করে,
আমার চাতক পাখী কাদে একটি কোঁটার তরে।

আছে কথার সরিং সাগর কথাযুতের নদী
একটি কথার লাগি পরাণ কাদে নিরবধি।

রাত্রি ভরি লক্ষ তারা হাসছে লরে চাঁদে
একটি মাটির প্রাণী লাগি পরাণ আমার কাদে।

মনী ভরা ভূবার বারি তৃষ্ণা নাহি বার,
গৃহকোণের মাটির কলস প্রাণ ছুড়ানি আর।

আকাশ ভরা সিঁহুরে রেখ আকাশে না ধরে,
একটি কোটা শিখার সিঁহু পরাণ ছুড়ায় তরে।



আজতোর মুখোপাধ্যায়

৬

স্বিকারিতঃ পুরুষ ভাগ্য, স্ত্রীলোকের চরিত্র আর
পুরুষের ভাগ্য...

মামুষ কোন ছাঁর, দেবতাদেরও বোধের অগম্য নাকি।

বচনটি জানা ছিল। তা' বলে ভাগ্যের সিঁড়ি বাতারাতি উদ্বুদ্ধি
হতে পারে কোনোদিন এমন আশা বীরপদর ছিল না। আর,
রমণী চরিত্র প্রসঙ্গে উক্তিটা একমাত্র সোনাইউদির বেলান্তেই প্রযোজ্য
বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু চাকরির বাড়ি এলে প্রোজ্ঞ বচনের
নিগূঢ় ইঙ্গিত অনেকটাই প্রসারিত মনে হল। নিজের ভাগ্যের
ওপরকার পুরু পরদাটা একদফা নড়ে চড়ে উঠল। চাকরির মধ্যেও
জটিল নারী রীতির বৈচিত্র্য দেখল একটু। শুধু চাকরি নয়,
বীরপদর মনে হল, ওই পাছাড়ী মেয়ে পার্বতীরও ভিতরে ভিতরে
অনাবৃত রহস্যের বৃহদী চলেছে কিছু।

বাইরের ঘরে উকিরূপে কি দিয়ে বীরপদ কাউকে দেখতে পায়নি।
মালী ওকে দেখে খবর দিয়েছে তারপর করে এসে ভিতরে যেতে
বলেছে।

—এসো, তোমার আবার বাইরে থেকে খবর পাঠানোর
দরকার কি, সোজা চলে এসেই পারো।

দোর গোড়ার এসে দাঁড়ানোর আগেই চাকরির আহ্বান।
বীরপদ বুঝল না, সেই এসেছে চাকরি জানল কি করে। মালীর
নাম বলতে পারার কথা নয়। বাইরে স্নাওল জোড়া খুলে তাঁর
ঘুরে ঢুকতেই বেশ একটু সন্ধ্যা পড়ে গেল। তকতকে মেঝের
বসে চাকরি একটা মোটা চিকনি হাতে পার্বতীর কেশ বিভ্রাস্তে মগ্ন।
তাঁর কোলের ওপর কালো কিত্তে। ধনধনে ফঙ্গা এক হাতে
পার্বতীর চুলের গোছা টেনে ধরা, অঙ্গ হাতে বেশ জোরেই চিকনি
চালিয়ে চুলের জট ছাড়াচ্ছেন। বীরপদর মনে হল পার্বত্য
রমণীট শক্ত হাতে রশ্মিনী।

বোসো—। কেন ও আসবে জানাই ছিল। চাকরি পার্বতীর
চুলের গোছা আরো একটু টেনে ধরলেন। তাঁর আবার লজ্জার
কি হল, বোস ঠিক হয়ে, মাথা মনতো আঙ্গ একখানা জঙ্গল!

• বীরপদ আগের দিনের মতই অন্ধুরে একটা মোড়ার বসেছে।
জঙ্গল-কেন্দ্রিনীর মুখে লজ্জার আভাস কিছু চোখে পড়ল না।
শায়নের দিকে একটু বঁকে আছে হস্ত, অথবা কঁকিতে চাইছে,
চাকরির বেশাকর্ষণে সেটা সন্তব হচ্ছে না। এটুকু ছাড়া মুখভাবে

আর কোনো তাৎপর্য নেই। ওর লজ্জার লক্ষণ চাকরিতে ভালো
জানেন। তাঁর অগোচরে বীরপদ মেয়েটার দিকে দুই একবার
চোখ না চালিয়ে পারল না। পাখরের মূর্তির মত নিশ্চল
বসে আছে—সামান্য ব্যতিক্রমে তাঁর বসনের বাধা ভেঙে ছুঁ
তরঙ্গ উপড়ে ওঠার সম্ভাবনা। পরিচালিকার প্রীতি কর্তার এই
বাংসল্যটুকুও মিষ্ট।

এরই মধ্যে ছাড়া পেল, কোথা থেকে আসছে? দ্রুত হাত
চলেছে চাকরির।

ফাট্টী থেকে।

চাকরি উৎসুক নেত্রে তাকালেন, অমিতের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

বীরপদ মাথা নেড়ে জানালো, হয়েছে।

এলো না কেন, আজ আসবে ভেবেছিলেন, টেলিফোনে বলেওছিল
আসবে, তোমার সঙ্গে আলোপ আলোপ হয়েছিল ভালোমত?

আজই হল। বীরপদর দুচোখ পার্বতীর মুখের ওপর আটকালো
কেন নিজেও ভানে না। অন্তস্তলের হসিক মনটির অহুভুতির কারিগরি
আরো বিচিত্র। একজনের আসার সম্ভাবনার সঙ্গে চাকরির এই
বাংসল্যের একটা যোগ উকিরূপে কি দেখে কেন, তাই বা কে জানে।

চটপট চুল বাঁধা শেষ করে চাকরি বেন বুজি দিলেন মেয়েটাকে।
কি আছে মামাবাবুকে তাড়াতাড়া এনে দে, খেটেখুটে এসেছে—

খেটে আহুক আর না আহুক বীরপদর খিদে পেয়েছে।
পার্বতীর প্রস্থান। চাকরি উঠে ভিক্ষে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে
মুছতে তাকালেন ওর দিকে। বীরপদর চোখ তখনো দোরগোড়া
থেকে ফেরেনি, আপন মনে হাসছিল একটু একটু। চাকরির চোখে
চোখ পড়তে কৈকিয়তের সুরে বলল, মনিব ভালো পেয়েছে—

তোয়ালে বেখে চাকরি খাটে বসলেন। তুমি কেমন মনিব পেলে
গুনি—সেদিন এসেও ওভাবে চলে গেলে কেন, পার্বতী বলছিল—

বীরপদ অপ্রস্তুত। তাঁর সেদিনের আসাটা কেউ টের পেয়েছে
একবারও ভাবেনি। কিন্তু তাহলেও এ প্রসঙ্গ চাকরির অন্তত
উপাশন করার কথা নয়। এসেও ওভাবে কিরে গেল কেন সেটা
তাঁর থেকে ভালো আর কে জানে।

ওকে খুল বিভ্রমনার মধ্যে ফেলে কোতুক উপভোগ করাটাই
চাকরির উদ্দেশ্য বলে মনে হল না। চাকরি বেন বলতে চান, লাল
পাড়ি বেখে তুমি পালিয়েছে, কিন্তু পালানোর কেনো দরকার ছিল না।
সন্ধ্যাচের বাপাচারটা গোড়া থেকেই কাটিয়ে দিতে চান হয়ত।

জবাব এড়িয়ে বলল, তোমার পার্বতী পাহারাদারও কড়া দেখি।
খুব। এ নিয়ে আর বাঁচাখাচি করলেন না চাকরি। ওর
চিঠি খোলার খবরটা হিম্মত মির বলে গেছেন কি না তাও
বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল বলে, কাজ করছ?

কি কাজ?

ও-না, সে আমি কি জানি! কাজে লাগে কিনা?

বীরাপদ মাথা নাড়ল। তারপর হেসে বলল, শুধু তুমি কেন,
কেউ জানে না—

চাকরি অস্বাভাবিক। এই যে বললে ক্যান্ট্রী থেকে আসছে?

গেছলাম একবার। হালকা করেই বলল, তুমি এভাবে আমার
মত একটা লোককে ওদের মধ্যে ঢেলেটুলে ঢাকাতো চাইছ কেন,
ও থাকগে—

ভালো লাগছে না? চাকরি হঠাৎ বিমর্ষ একটু। বিরক্তও।
ভীর কিছু একটা প্লান বেন বয়বাদ হতে চলেছে।—এখনও তো
কাজই শুরু করেনি, এরই মধ্যে একথা কেন?

কাজের জন্তে নয়, ঠাণ্ডা ঠিক—

ঠাণ্ডা কারা?

বীরাপদ আর কিছু বলে উঠতে পারল না। অভিযোগ করতে
চায়নি, অভিযোগ করার নেইও কিছু। ও বাওরামাত্র সকলে
সাধারণে অভ্যর্থনায় গ্রহণ করবে এমন প্রত্যাশাও ছিল না। এই
দুদিন যোরা-ঘুরি করে নিজেকে একেবারে বাইরের লোক আর বাড়তি
লোক মনে হয়েছে বলেই কথাটা তুলেছিল।

কিন্তু চাকরি আসল দিলেন না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই দুটো
দিনের খবর শুনলেন। তারপর একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন,
কাজে না ঢুকেই পালাতে চাইছ। এক নম্বরের কুঁড়ে তুমি—দুটো
দিন সবুজ করো সব ঠিক হয়ে যাবে, ঠাণ্ডা সত্যিই এখন ব্যস্ত খুব।

একটু খেমে আবার বললেন, আর একটা কথা, ওখানে কাজ
করতে গেছ বলে নিজেকে কারো অসুগ্রহের পাঠ্য ভাবার দরকার
নেই, তুমি তো বেতে চাওনি, আমিই তোমাকে জোর করে
পাঠিয়েছি।

ভীর জোর করে পাঠানোর জোরটা কোথার সঠিক না জানলেও
বীরাপদ আবারও মনে হল, জোরালো বকমের জোর কোথাও
আছেই। সেটা শুধুই কোনো এক পুরুষের ওপর কোনো এক রমণীর
জোর নয়। ব্যক্তিগত প্রভাব নয় কারো ওপর, ওই পোটা ব্যবসার-
প্রতিষ্ঠানটির ওপরই কিছু একটা বার্ষিক প্রভাব আছে ভীর। ওর
চাকরির ব্যাপার নিয়ে তা না হলে এমন অ-রক্ষীহীন মাথা ধাবাতেন
না তিনি, অত আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। চাকরির লোক বলেই
ওর জোরটা যেহীনকো নয় সে-রকম একটা প্যাট আভাস বিকেলে
অমিতাভ বোঝে দিয়েছিল। বলেছিল, বাঁর কাছ থেকে এসেছে—
কারো বেজাজের বাঁর ধাততে হবে না।

বীরাপদের আরো কাছে এসে আবেগ ভালো করে, আরো
নিরীক্শণ করে দেখতে ইচ্ছে করছিল চাকরিকে। দেখছিল কি না
কে জানে। হেসে বলল, অর্থাৎ, পার্বতীর মত আমারও আসল
মনিবাচি এখানে ডুবিই?

চাকরিও হাসলেন। প্রায় স্বীকারই করে নিলেন বেন।
হাসির সুরে সুরে বৈবরিক পাড়ীবিটু গেল। বললেন, আসে তো

এই মনিবের টানে টানেই পাশ ছেড়ে নড়তে না, এখন বয়েস হয়ে
গেছে, আর তেমন পছন্দ হবে না বোধহয়।

আঠের বছর বাদে দেখা হওয়া সত্ত্বেও সেদিন চাকরির বয়েসটা
বীরাপদর চোখে পড়েনি। আজও পড়ল না।—কারো কি পড়েছে?
সেদিনও হিসেব করে বলেছিলেন চুয়াল্লিশ। বাই বলুন, বীরাপদর
এখনো মনে হয়, চাকরির সব বয়েস ওই লালচে চুল আর লাল রঙের
মধ্যে হারিয়ে গেছে। কিরে ঠাট্টা করতে বাচ্ছিল, পছন্দ এখনো কম
নয়, কিন্তু মনিবের কাছে সেটা অগ্রস্ব।

বলা হল না। বাঁবার হাতে পার্বতী ঘরে ঢুকেছে।

বীরাপদ আড়চোখে খাবারের থালাটা দেখল। এক খাবার কেউ
আসবে বলে তৈরি করা হয়েছিল বোধহয়। কে করেছে পার্বতী
না চাকরি? কি দেখাও হয়েছে চাকরি লক্ষ্য করলেন না, অত কিছু
ভাবছিলেন তিনি। পার্বতী চলে যেতে সর্কোড়কে তাকালেন তার
দিকে।—তার পর, ওখানে যেম ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ পরিচয়
হল?

যেম ডাক্তার! কার মুখে শুনেছিল? মনে পড়ল, হিম্মত
মিয়ার বক্তির মানুষকে বলতে শুনেছিল।—মানুষের সঙ্গে চাকরির
যোগাযোগ আছে তাহলে। হঠাৎ এ প্রসঙ্গ আশা করেনি বীরাপদ।
আরো কিছু শোনার আশায় নিরন্তর।

হী করে চেয়ে আছে কি, লাভাব্য সরকারকে দেখোইনি এ পর্যন্ত?
তুমি সত্যিই ওখানে চাকরি করবে কি করে তাহলে।

ও। বীরাপদও হাসল এবারে, আমি নগণ্য ব্যক্তি ভীর কাছে।
চাকরি উৎসুক মুখে সাং দিলেন, তা সত্যি—দেখো চৌচরি
করে একটু-আধটু গণ্য হতে পারো কি না, সেই তো বলতে গেলে
কতটা ওখানকার।

আমারও? বীরাপদ বাবড়ই গেছে বেন।

চাকরির খুশির মাত্রা বাড়ল আরো। তুমি না চাইলে তোমার
নাও হতে পারে। কেন, পছন্দ নয়?

তেমনি নিরীহমুখে বীরাপদ পাণ্টা প্রায় করল, পছন্দ হলোও
চাকরিটা থাকবে বলছ?

চাকরি চোখ পাঁকালেন, বেড়ালের মত মুখ করে থাকো, কথার
তো কম নয় দেখি। পর-হুহুতে উজ্জ্বল হাসি।—তাও থাকবে,
চেষ্টা করে দেখতে পারো।

প্রথম দিন এ-বাড়ি এসে পার্বতীর বাড়ি-পার্শ্ব এসে চাকরিতে
এমনি হাসতে দেখে বীরাপদর মনে হয়েছিল, অত হাসলে চাকরিকে
ভালো দেখায় না। আজও তেমনি মনে হল। চাকরির অত
হাসি খুব সহজ মনে হয় না। এত হাসি অজান্তেই কিছু সোপান
প্রতিক্রিয়ার দোষের বেন।

এই দিনও বীরাপদ ছাড়া গেয়েছে অনেক রাত। কথার
কথার এত রাত হয়েছে সেও খেয়াল করেনি। সন্ধ্যার ওই
জলবোপের পর রাতের আহারের তাগিদ ছিল না। তবু না বাইরে
ছাড়েনি চাকরি। বলেছেন, এত রাত কে আর তোমার জন্তে খাবার
সাজিয়ে বসে আছে? হজ্ঞ-সংসারও প্রকাশ করেছেন, না কি আছে
কেউ?

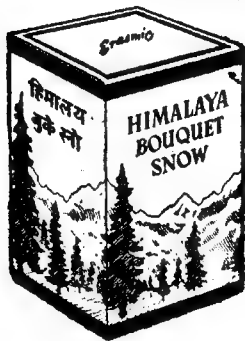
কেরার সময় অজান্তে বাঘের নতই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন।

—চাকরি অনেক গরম করেছেন আজ। এই দিনের গরম বেশ

আপনার রূপ লাভন্য আপনারই হাতে !

মুণ্ডীক অকারণ রোদে—খুলেই কালো বা নই হতে
 কেন কেন? চেহারার লাভণ্যতা রক্ষার ভার হিমালয় বুক স্নো ওপরই
 ছেড়ে দিন—তারপর দেখুন চেহারার চমক ! একটু শানি হিমালয়
 বুক স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি ধীরে ধীরে আবার কেমন
 ফিরে আসছে ! ক্লান্ত শুক শুক সজীব হয়ে উঠছে !
 হিমালয় বুক স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ বা দাগ পড়তে
 দেবে না । নিজের চেহারার দেখুন...লাভণ্যতা এনে ধরেছে...!

হিমালয় বুক স্নো !



নিষিদ্ধ আগ্রহে শুনেছে বীরাশপ। যাদের সঙ্গে ওর নতুন যোগাযোগ, কথা বেশির ভাগ তাদের নিয়েই। বলার উদ্দেশ্য নিয়ে বলা নয় চাকরির, এক একটা হালকা নুচনা থেকে গভীরতর বিস্তার।

—ওই ছোঁড়াই তো হট করে এনে বসিয়েছিল মেয়েটাকে, কারো কথা তো শোনে না কোনোদিন, কারো কাছে জিজ্ঞাসাও করে না কিছু—নিজে বা ভালো বুঝবে তাই করবে।

ছোঁড়া বলতে অমিতাভ ঘোষ, আর মেয়েটা লাবণ্য সরকার।

শু নিয়ে এসেছে। এনে ভেবেছে, ভারী দামী একটা আবিষ্কারই করে কেলেছে। ১০০-খামি একদিন ঠাটা করে বলেছিলাম, সব কিছুকে জুতো নেই জানিস তো? শুনে সে কি রাগ ছেলের। বা নয় তাই বলে বলল আমায়, সবাই না কি তা' বলে আমার মতও নয়। খুব হেসেছিলেন চাকরি, সেই হাসি আবারও প্রাঞ্জল মনে হয়নি বীরাশপের, খুব ভালো লাগেনি। হাসি ধামতে বলেছেন, আসলে ওই বয়েস আর ওই শাশা নয়ম মন—চটক দেখে মাথা ঘুরে গেছিল, বুঝলে না?

চাকরির কথা সত্যি হলে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লাবণ্য সরকারের যোগাযোগ বেশ রোমাঞ্চিকই বটে। ১০০-যোগসূত্রে 'সপ্তাহের খবর'। পরীক্ষার খাতার সাইজের ছোট আট পাতার কাগজ একটা। সপ্তাহে সপ্তাহে বেরোয়, ফেলে দিলে ঠোঙার কাজেও লাগে না, এমনি চেহারা-পত্র তার। কিন্তু নিয়মিত পড়ুক না পড়ুক, সেই কাগজের নাম জানে আধা-শিক্ষিতজনেরাও। চাকরির মুখে নাম শোনার আগেও বীরাশপও জানত। এখনো জানে। সপ্তাহের খবরে খবরের মত খবর থাকে এক-একটা। চমকপ্রদ চটকদার খবর সব। কাগজখানা অনেক সময়েই ওপরের মহলের ভীতি, অস্বস্তি বা চমুসজ্ঞার কারণ। আর সব সময়েই নিচের মহলের রোমাঞ্চ আর বিশ্বাসের খোঁরাক। সাধারণ লোক প্রয়োজনীয় একটা বাঁটার মতই মনে করে কাগজটাকে। রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি আর হোমরাচোমরা অনেক ব্যক্তিনীতির অনেক অন্তর্লক্ষণ জ্ঞানল বোঁটের এনে ফলাও করে তুণীকৃত করা হয় ওখানে। 'সপ্তাহের খবর'এর খবরের ভিত্তিতে প্রাদেশিক এমন কি কেন্দ্রীয় আইন সভারও প্রতিপক্ষদের ছল-কোটানো জেরায় অনেক সময় নাজেহাল সরকারী পক্ষ। এই ধরনের খবর যদিও উপেক্ষার গহবরেই বিলীন হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তবু এতেই সাময়িক প্রভাব বড় কম নয়। শিকার ধরা তাঁরা অন্তত এই সাময়িক আলোড়নটুকুতে বেশ পৃথুগ্ধ বোধ করেন। অন্ধকারের জীব হঠাৎ আলোর বা খেলো যেমন পোলামেনে বিজ্ঞানার মধ্যে পড়ে যায়, অনেকটা তেমন।

বহুদত্তার ভোল বদলানোর মত এ পর্যন্ত অনেকবারেই নাম বদলাতে হয়েছে কাগজখানার। শুধু নামই বদলেছে, ভোল বদলায়নি। অনেকবার কোর্টকাচারী করতে হয়েছে, ছোটখাট খেদারতও দিতে হয়েছে একাধিকবার, গুলন্দণ্ড বা গুল খেদারতের সমুদ্রবিন হতে হয়েছে। কিন্তু নাম? নামে কি আসে যায়? গোলাপ ফুল নাম-চাপা পড়ে কখনো! ভিন্ন নামে আর ভিন্ন নামের সম্পাদনার রাতারতি সেই গোলাপই ফুটেছে আবার। অন্ধকারের কোঁতুল, এ-বাঁজারে কাগজ চালানোর খরচ পোষায় কোথেকে? পাঁচ নয়। পরসার ছাপার খরচও তো ওঠার কথা নয়।

বিজ্ঞানের অভিমত, খরচের খানি ভয় থাকে তারাই টানে—আটপাতার কাগজে এক-একবার চারপাড়া বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে না? আর মাগে ঠেকলে সব সময়ে যে চোখে পড়ার বিজ্ঞাপনই দেবে সকলে, তারই বা কি মানে?

বহুর কতক হল 'সপ্তাহের খবর' নাম-ভুগুণে লেছে কাগজখানা। যে-নামে বা যে-নামের সম্পাদনায়ই চলুক, এর আলম মালিক আর সম্পাদকের নামটিও বলতে গেলে সর্বসাধারণের পরিচিত। ভিন্ন বিভূতি সরকার। কীর্তিমান পুস্তক।

এই বিভূতি সরকার লাবণ্য সরকারের দাদা। অনেক বড় দাদা, বহুর পঞ্চভাঙ্গিস বয়েস।

এখান থেকে লাবণ্য-প্রসঙ্গ শুরু চাকরির।—গেল বস্তার বিনে পরসার কোম্পানীর বাস বাস ওষুধ পাঠানো হয়েছিলো অন্তরহ বন্যার্তদের জন্যে। অনেক জায়গায় মহামারী লেগেছিল। ওষুধ সাহায্য করে প্রতিষ্ঠান নাম কিনেছিল বেশ। কাগজে কাগজে সাহায্যের খবর বেরিয়েছিল, প্রশংসা বেরিয়েছিল।

কিন্তু 'সপ্তাহের খবর'এর এক ফলাও খবরে সব প্রশংসা কালি। দুর্গত অঞ্চলের ডাক্তারদের বিবেচনার সাহায্য প্রাপ্ত ওষুধের নাকি মান খারাপ বলে প্রকাশ। যে-ওষুধ অব্যাহতি কাল হওয়ার কথা, সেই ওষুধও আশাশ্রম ফল দেখা যাচ্ছে না। সপ্তাহের খবরে বড় বড় হরণে ছাপা হয়েছে, "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ!" তার নিচে আসল সবাদ আর সম্পাদকীয় সংশয় টীকা-টিপ্পনী মন্তব্য।

অমিতাভ ঘোষ তার দিন কতক আগে বিলতে থেকে টেনিং নিয়ে চাকি কমিটি হয়ে বসেছে। সব ক'টা কাগজের সঙ্গে প্রচারের যোগাযোগ তখন সেই রাশত, বিজ্ঞাপনও সেই পাঠাতে। দুর্গতদের সাহায্যের জন্যে কোন্ লটের কি ওষুধ পাঠানো হয়েছে, ভালো করে জানেও না। এদিকে ফ্যাটরী তছনছ ওলট-পালট করল, অসহিষ্ণু সঙ্গেই কত চলনসই ওষুধও নষ্ট করল ঠিক নেই—অজ্ঞানিক কাগজের বুধ-চাপা দেবার দায়ও তারই।

বিভূতি সরকার সবিনয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কিন্তু পরের সপ্তাহেই ফলাও আক্রমণ আবার। প্রচারের সোভে অপচিত ওষুধ দান করার নৃশংসতা, নরম-গরম কটু-কাটব্য, উঁচু মহলের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান-প্রধানের, অর্থাৎ হিমাত্ত মিত্রের অন্তরহ যোগাযোগ প্রসঙ্গে বাস-বিজ্ঞপ, ইত্যাদি।

অমিতাভ ঘোষ আর বেত কি না সন্দেহ, কিন্তু হিমাত্ত মিত্রই আবার তাকে পাঠিয়েছেন। সরকারী হলে একসঙ্গে ছ-মাসের বিজ্ঞাপনও 'বুক' করে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবারও বিভূতি সরকার অমায়িক ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জনসাধারণ যে তত্ত্ব দাবী করে সম্পাদকীয় লেখার জন্য চাপ দিচ্ছে তাঁকে, সে-কথাও বলেছেন। মামার কথা ভেবেই অমিতাভ ঘোষ ঠাণ্ডা মেজাজে বসেছিল। বাই হোক, বাঙালী প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবারে সহযোগিতার আশা এক আশাস দিয়ে লাশামাটা একটা ব্যক্তিগত সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন বিভূতি সরকার। ঠাণ্ডা বোনটি সেবারে ওড়ার পাশ করেছে, ভালো যোগাযোগ কিছু হয়ে উঠছে না—সেই বোন এখন দাদাকে ধরেছে ওদের কোম্পানীতে কিছু সুবিধে হয় কিনা। বোনকে ভেবে তখনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

বাস, চাকরি হেসে উঠছিলেন, ছেলে ওইখানেই কাঁত। বি-এসসি পাস ডাক্তার শুনে আরো খুশি—শিথিরে-পড়িয়ে নিলে কেমিস্ট্রির কাজেও সাহায্য করতে পারবে ওকে। সটান গাড়িতে তুলে একেবারে মামার কাছে এনে হাজির।

চাকরি আরো মজার কথা বলেছেন। বলেছেন, তার পর কটা মাস সেকি আনন্দ আর উৎসাহ। ওকে পেয়ে লাড়টা যেন শেষ পর্যন্ত ওদেরই হল। বিভূতি সরকার বোনের হিল্লো করে দিয়েই চুপ হয়ে গেছেন নাকি? অমন পাণ্ডাই নয়, নিজের স্বার্থের কাছে বোনটান কিছু নয়—অন্তটা খোলাখুলি না হলেও মাঝে-মাঝে খোঁচা দিতে ছাড়ত না—তাই নিয়ে এক একদিন অমিতের সামনেই বোনের সঙ্গে ভাইয়ের বগড়া।

এদিকে মাসির কাছে অর্থাৎ চাকরির কাছে লাভণ্য সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অমিতাভ ঘোষ। সঙ্গে করে নিয়েও এসেছে অনেক দিন। আই, এসসি পাস করেই লাভণ্যর নাকি ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছে ছিল, পরমার অভাবে পারেনি—সকল-বিকল মেয়ে পড়িয়ে তো নিজের পড়া চালাতো। বি, এসসি পাস করার পর অস্বাভাব্য ভরিশপতি ডাক্তারী পড়বার খরচ চালাতে রাজি হন। ভরিশপতির মন্ত মুখীর দোকান, মোটা বোজগার মাসে। তাঁর এত উদারতার পিছনে আদল লক্ষ্যটিও অমিতাভ ঘোষ বার করে নিতে পেরেছিল লাভণ্যর কাছ থেকে। ভরিশপতিটি বিপরীক, পাঁচ ছ'টি ছেলেপুলে। ভরিশপতির আশা বৃষ্ণেও লাভণ্য তাঁর সাহায্য গ্রহণ না করে পারেনি। স্বর্ণ পরিশোধের জন্তে তাঁকে যদি বিয়ে করতে হয় তাও করবে, তবু নিজের পায়ে ঠাঁড়াবে সে—ডাক্তার হবে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এর সঙ্গে অল্প কোনো কিছুই অপস দেই তার।

চাকরি ঠাটা করেছিলেন, খুব প্রতিষ্ঠা হোক, কিন্তু মেসেটার এতসব ঘরোয়া খবরে তাঁর এত মাথা ব্যথা কেন?

তাতেও রাগ, মেয়েটা নাকি মেয়েদের ভালো চিনতে পারে না, একটা মেয়ের অমন মনের জোর দেখে ছেলে তখন হুজু। সব মেয়ে এমন হলে এই বেশটাই নাকি অভাবকম হত। চাকরির হাসি।

গল্পের মাঝে এইখানে বীরাপদ ছলপাতন ঘটিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, উনি ভরিশপতিবই বিয়ে করবেন তাহলে?

চাকরির হাসিভরা ছুই চোখ ওর মুখের ওপর আটকে ছিল খানিকক্ষণ। তারপর মন্তব্য করেছেন, তুমি একটি নীরট।

চাকরির মতে অমিতাভ ঠিকই বলেছিল, প্রতিষ্ঠালাভের ব্যাপারে লাভণ্য সরকারের আর কোনো কিছুই আপস নেই। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কাকে ধরতে হবে, কাকে ছাড়তে হবে, কোন পথে চলতে হবে, কি ভাবে চলতে হবে সেটা ভালো করে বুঝে নিতে তাঁর নাকি হ'মাসও লাগেনি। প্রতিষ্ঠার সিঁড়ি ধরে এখনো তাই চড়চড়িয়ে উঠেই চলেছে।

.. কীকা রাত্তার ঘুম চোখে ডাইভার খুশিমত স্পীড চড়িয়েছে। বীরাপদর খেয়াল নেই। ভাবছে। চাকরির অমন নিটোল হাসি কৌতুক উদ্দীপনার কীক কীক ও তখন কোন্ কাটল খুঁজছিল? প্রতিষ্ঠার সিঁড়ির খোঁজে কাকে ছেড়ে কাকে ধরতে হবে লাভণ্য সরকার হ'মাস না বেতে বুঝে নিয়েছে—সেটাই খবর? না খবর

আর কিছু? তার ছাড়াটা খবর না অল্প কাউকে ধরাটা? এভাবে ঠেকোলে চাকরি ওক এর মধ্যে ঢোকাতে চান কেন?

ব্যবসায়ের নাড়ি নক্ষত্র খবরই বা রাখেন কেন এত?—বীরাপদ ভাবছে, কথা উঠলেই চাকরি নিজের বয়সের কথা বলেন কেন? বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, নিশ্চিন্ত দিন ব্যাপনের টাকাও বোহেম্য আছে—তবু কষ্টার কষ্টার চোখে মুখে জল দিতে হয় কেন চাকরির?

চাকরি ওকে পাহারার বসালেন? নড়েচড়ে বীরাপদ সোজা হয়ে বসল। লাভণ্য সরকার সিঁড়ি ধরে উঠছে, না সিঁড়ি দখল করেছে?

স্বভাব অস্বাভাবী এবারে এই প্রগলভ বিদ্রোহে গা ভাসানোর কথা বীরাপদর। কিন্তু কোনো কৌতুক প্রহসন দেখে আসার পর শিথিল অবকাশে অলক্ষ্যে পড়ারতর আবেশনটুকু যেমন ভিতর থেকে ঠেলে সামনে এসে ঠাঁড়ায়, তেমনি সকলকে ঠেলেচুলা ওর মনের মুখোমুখি যে এসে ঠাঁড়াল সে অমিতাভ ঘোষ। পরিহাস-তরল অনর্গল কথা-বার্তার মধ্যে নিজের জগোচরে চাকরি এই একজনকে কেমন করে ভারী কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

—আমার কোনো কথা শোনে নাকি! আমাকে মাহুব বলেই গণ্য করে না ছেলে, বা মুখে আসে তাই বলে।

অমিতাভ ঘোষ প্রসঙ্গে নিরুপায় অভিযোগ চাকরির। কিন্তু চাকরির মুখে খেদ দেখেনি বীরাপদ, তৃপ্তি দেখেছে। বা যেমন দুঃস্বপ্ন অব্যবহালে নিয়ে নাচার, তেমনি। নিভৃত প্রশংসার তুলি। বীরাপদর ভালো লেগেছিল, মিলি লেগেছিল।

ভয়ানক রাগ সকলের ওপর? এরই মধ্যে কি করে ব্যালেন তুমি? চাকরির আলাপের বিস্তারও আর হয় শোনার নি—ওই রকমই মেজাজ হয়েছে আজকাল। রাগ সব থেকে ওর মামার ওপরেই বেশি, অথচ হু'বছর বয়স খেবেই তাঁর কাছে মাহুব, কি ভালই না বাসত মামাকে—এখনো বাসে, অথচ ধারণা, মামা ভিতরে ভিতরে ওকে আর একটুও চায় না।

সত্যি নাকি? বীরাপদ সাগ্রহে বিবৃতিটুকু জ্বিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল।

সত্যি নয় শুনেছে। এম, এসসি অমন ভালো পাস করতে হিম্মন্ত মিত্রই আগ্রহ করে তাকে বিশেষ থেকে ট্রেনিং দিয়ে এনেছেন, ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্টিনে অতবড় কাজে বসিয়ে দিয়েছেন, আর গোটা ব্যবসায়ের হু'আনার অংশও অমিতাভ ঘোষের নামেই লেখা-পড়া করা আছে।

শেষের খবরটা অবাক হবার মতই। সেই সুউন্নত পুরুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জাগার মত। এতখানি ভাগনে বাৎসল্য দুর্লভ। তাহলে এমন হয় কেমন করে? বীরাপদ কোন্ এক হনুন্তবগত গল্পে পড়েছিল, খুব অল্প বয়সে মা-বাপ হারানো বৈহবিক্ত ছেলে মেয়ের অনেক বয়সের জটিল অনুভূতি-বিপদ্য দেখা দেয় নাকি। ডিকিংসকরা বাকে বলেন ইমোশনাল ক্রাইসিস। চাকরির কথা থেকে সেই গোছেবই কিছু মনে হল।

মামাতো ভাইটি চার-পাঁচ বছরের ছোট, সে আসার পর থেকে নিজের সঙ্গে তার অনেক তকাত দেখেছে অমিতাভ ঘোষ। বে তকাত দেখলে এক শিশুর প্রতি আর এক শিশুর মনে তবু বিফনেই পুঁই হতে থাকে, সেই তকাত। তকাতটা দেখিয়েছেন অমিতের মামী,

নিভাতের মা । বাইরে থেকে সেই ডাকাতেই সে অভ্যস্ত হয়েছিল, বড় হয়েছিল । কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার প্রতিক্রিয়া ছিলই । চাকরির সেই বকসই বিবাস । নইলে একজন আর একজনকে এখনো বরদাশ্ত করতে পারেনা কেন । সেই বদ-এগারো বছর বয়সে ছেলেরা প্রথম আসে চাকরির কাছে, তার পর থেকে একবার আসতে গেলে আর সন্তোষ বেতে চাইতে না—টেনে-হি চড়ে নিয়ে বেতে হত ।

হিমাত মিত্র নিজের ছেলেকে কোনো দিন নিয়ে এসেছেন কি না চাকরি উল্লেখও করেননি । চাকরির কথা শুনে শুনে মনে মনে বীজপল ছোট একটা হিসেবে মগ্ন হয়েছিল । অমিতাভ ঘোষের বদল এখন বড় জোর তেলিঙ্গ, আর চাকরির চুয়াগিল । এগারো বছরের ছোট । ছেলেরা বদ-এগারোবয়সের সময় চাকরির একুশ-বাইশ । অমিতাভ ঘোষের মাসি-প্রাণ্ডিটা তাহলে চাকরির খবরবাড়িতে, তাঁর বানী বেতে থাকতে ।

অমিতাভ ঘোষ মা না পাক, জানাবি মা মাকে পেয়ে বাবা পেয়েছিল । সেই পাওয়ার অনেককাল পর্যন্ত কোনো সংশয় ছিল না । কখন এম, এসসি পড়ে তখনো না । কিন্তু সেই সংশয় বেথা দিতেই বসত লকট । সেই সময় মামা চোখ বুজেছেন । হিমাত মিত্র তখন প্রকৃতই বা-হারা ছেলের মতো বেশি খুঁকছিলেন । অস্বাভাবিক নয়, ছেলে তখনো ইকুলের গভী পেরোয়নি । মামাত ভাইয়ের প্রতি এম-এসসি পড়া ভাঙ্গার প্রবন্ধ বিবেচনের আভাস পেয়ে অনেক সময় ভাবকে ক্রক শাসনও করেছেন তিনি ।

—সেই থেকেই ছেলে একেবারে অন্তরকম—আর কি যে এক অন্তরকম বর্ণিত বসল তার পর, ভাবতেও পারে কাঁটা দেয় ।

চাকরি সত্যি শিউরে উঠেছিলেন ।—সেই বকসই আজ পর্যন্ত সেল না ওয় ।

নিজের অগোচরে সেই বোগ-সকটের দৃষ্টা বীজপল কল্পনা করছিল । মনের উপাদান দিয়ে ভাবতে গেলে মধ্যস্থিতকই বটে । বোগ-বদলার থেকেও মানসিক বাস্তবতার দৃষ্টকটানি বেশি ছেলেরা । অন্তরকম হাসপাতালে এনে কেনা হয়েছ সেটাই এক মধ্যস্থিতকই বিষয় । হাসপাতাল নয়, অনেক ব্যয়সাপেক্ষ নামকরা নার্সিং হোম । আরামের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, বড় বড় ডাক্তারের আনাগোনা । কিন্তু বিপ-বাইশ বছরের ছেলেরা চোখে সেটাই হাসপাতাল । আর কখনো কোনো হাসপাতালের অভ্যন্তরে পা দেয়নি । যে ব্যবস্থা রোগীমাত্রেরই প্রায় ঈর্ষার বজ্র, ওর চোখে তাই তখন নির্বাচক নিরাক্ষর বোগ-ব্যয়মাত্র । মামা পাঠিয়েছে তাকে এখানে, মামা পাঠালো ! বতক-জান ততক-জান প্রতীক । মামা আসে না কেন ? মামা কই ?

হিমাত মিত্রের বিশেষ হাজার দিন আসন্ন । অনেক আসেই সকল ব্যক্তি নুসন্দার । শেষ সময়ে বাওয়া বজ্র করলে সব সিকের সব আরোহন পত্ত । চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে তার বরদাশ্ত বোধ করেননি । এতক-নার্সিং হোমে থেকেই অনেকটা নিশ্চিন্ত তিনি ।

কিন্তু ছেলেরা মনের দিকটা চাকরি উপলব্ধি করেছিলেন । নিশ্চিন্ত চোখের চকিত দৃষ্টি কার জন্ত প্রতীকাত্মক হয়েছিলেন ।—আসবেন—কাল যাবে পর্যন্ত বেরবেন, ব্যস্ত তো থু, কীক পেনেই আসবেন ।

আবাস দিয়ে চাকরি নিয়েই শক্তিক । মামা বেরোচ্ছে কোথাও তা যে ওর মনেও ছিল না, দুই চোখের বেননা ভরা বিশ্বাসে সেটুকু শ্রুতি । অবশ্য বোকানোর সঙ্গে আবাসও ।—কতদিন আগে থাকতেই তো বেকনের সব ঠিক ঠিক, দুই তুলে গেলি এখন কি না গেলে চলে । তাছাড়া তোর কি এমন হয়েছ, আমি তো আছি—কিন্তু হঠাৎ সেই উজ্জ্বল উদ্ভেদনা দেখে চাকরির জ্ঞান একেবারে ।—সবুজ হলে মামা বেতে পারত ? তাকে হাসপাতালে পেওয়া হত ?

হিমাত মিত্র পরদিন ভাগ্যকে দেখতে এসেছিলেন, আর বাবার দিনও । কিন্তু তিনি একাই দেখেছেন, ও কিরকম তাকায় । সকলেরই ধারণা যোগে বেহুস । কিন্তু তিনি বর থেকে বেকবার সঙ্গে সঙ্গে রোগী অন্তরকম চোখ মেলে চাকরির দিকে তাকিয়েছে । বিশ্বাস আর কাউকেও করা চলে কি না তাই দেখতে চেয়ে চেয়ে । তার পর ছোট শিশুর মত দুই হাতে চাকরিকে জঁকড়ে ধরেছে । তারপর সত্যিই বেহুস ।

বদ-মাত্রের চানটানি পোটা একটা মাস । পালা করে হয় চাকরি নয় পার্শ্বী বসে সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত । চোখ মেলে দুজনের অভ্যন্তরকে না দেখলে বিবদ বিপদ—অব আর অব, খই কোটা অব—তাই থেকে বেনিনজাইটিস না কি—বলেছে ডাক্তারটা । তারা হিমসিম, চাকরি দুর্ভাবনার অস্থির, পার্শ্বী পাখর । শেষে অব নামল । মাথার সেই মারাত্মক ব্যামোও ছাড়ল, অচ-ছেলোটা আর সেই ছেলেই নয় বেন । সব সময় অসহিষ্ণু সন্দেহ একটা । অস্বস্তিক কিনা কুয়ে কুয়ে শুভ সেই ভাবনা আর সেই সন্দেহ । ভালো হবার পর তিন মাস চাকরির কাছেই ছিল—কিরে এসে হিমাত মিত্র চোঁকা করেও ওকে নিতে পারেননি । দিন রাতের বেশির ভাগ তখনো হয় চাকরিকে নয়তো পার্শ্বীতাকে কাছে বসে থাকতে হত । এক ভাক সামনে এসে না পাঁড়ালে তার জের সামলাতে তিন বকী । চাকরি জানেন, ভিতরে ভিতরে সেই বোগই পুড়ে এখনো—মামার প্রতি অবিবাস । স্মৃতি দিয়ে বোকামোও ভিতরে ভিতরে প্রতিকূল আবেগ একটা । কখন কোন কারণে যে ওতে নাড়া পড়ে বোকা যায় । ওই থেকেই বত পগুগোল, ওই থেকেই অমন মেজাজ ।

অমিতাভ ঘোষের জন্ত চাকরির বেরাহা দৃষ্টিকটাক্ষ বীজপল উপলব্ধি করেছে । ওকে বেরোচ্ছে, ভালো করে আলাপসলাপ করতে, ভালো করে শিপতে । অন্তরকম হবার রাষ্ট্রও বাস্তবে দিয়েছেন ।—একবার বদি ওর ধারণা হয় তুমি ভালবাসো ওকে, তুমি আপনজন—বেথবে তোমার জন্তে ও না করতে পারে এমন কাজ নেই । ব্যবহারে টের পাবে না, বদ-টপ্টো বেথবে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেনা হয়ে থাকবে ।

বীজপল মনে হল চাকরি সেই কেমাই কিনেছেন । আপনজন হয়ে উঠতে থু বেন পেতে হবে না পোটা সোকাটর আর বিকলের আচরণ থেকে আশা করা বেতে পারে । সেটুকু চাকরির কল্যাণেই । সেটুকু হবার তাও চাকরির কল্যাণেই হবে । নৈশ, নিরিবিলিতে আর একটা দৃষ্টক মনে পড়ছে বীজপল । চাকরির দুই-কমে সেদিন পার্শ্বীতর উদ্ভেদে অমিতাভ ঘোষের সেই পাঁচ দল হীক ভাক—বেথবে চোখের নাপালে বদশীটির অবস্থানে বদশীর নিবৃদ্ধি ।

চাকরির কাহিনী বিস্তার থেকে অমিত বোমের জীবনে পার্বতীর
আবির্ভাবের একটুখানি হিম্নি মিলেছে।
অমিতাভ বোমকে চাকরি একাই কিনেছেন ?

গাড়ীতে নীলানি লাগতে বীরশপন কুকু বাইরের দিকে
তাকালো। আর একটু এগোলেই সুলতান কুঠির একডোঁধবড়ো
এলাকায় ঢুক পড়বে। তাড়াতাড়ি পাড়ি ধামিরে সেখানেই নেমে
পড়ল। আগের বারের অন্তমনস্কতার পাড়ি নিয়ে ঢুক পড়ার
কগটা সেদিন রমণীপণ্ডিতের চোখেখুঁচে উঠলে উঠতে দেখেছে।

সুলতান কুঠিতে অনেকক্ষণ ঘুম নেমেছে। পায়ে পায়ে শুকনো
পাতার সারাংশ লম্বাও মড়মড়িয়ে ঠাট। বাতাসে এরই মধ্যে ঘন
কিঁকির ডাক। আলো বলতে দুই একটা জোনাকীর দম্পনানি।
পা ছুটো অভয় বললেই হোটেল খেতে হয় না। বীরশপন নিজে
ঘরের সামনে এসে পীড়াল। বারান্দাটা অন্ধকার। কতদিন
জেরেছে ছোট টর্চ কিনবে একটা। কেনা হয়নি। পকেটে একটা
দিয়ালশাই রাখলেও হয়। দিনের বেলায় তাও মনে থাকে না।
চাকির খোঁজে পকেটে হাত ঢুকিয়ে লক্ষ্য করল, ঘরে রমণী পণ্ডিতের
কোণ-ঘর ছুটোর একটা ঘরে আলো জ্বলছে তখনো। কারো
ভবিষ্যতের ছক তৈরি করছেন, নয়তো বিয়ের কুঠি মেলাচ্ছেন।
কিন্তু রাত জেগে ঘরে আলো জ্বলে কাজ করতে হয়, পণ্ডিতের এত
কাজের চাপ কবে থেকে হল।

তবু হাতটাই পকেটে বিচরণ করছে, চাবি উঠল না। এ
পকেটে...না এ পকেটেও নেই। বুক পকেটেও নেই। অজানা
ক্যাসান...চাবি? বন্ধ-দরজার আঙঠার তালো জো দিকি কুলছে।
দরজাটা ঠেলে দেখল একবার। না, তালো বন্ধ। চাবিটা আবার
কোথার কেলস তাহলে?

শান্তব বিভ্রম। অসহায় মৃতিতে বীরশপন দাঁড়িয়ে রইল
চুপচাপ। তালোটা ভাঙবে? ভাঙবেই বা কি দিবে। এই হাতে
আর এই অন্ধকারে ঠকঠকিয়ে তালো ভাঙতে গেলে লাঠিসোটা নিয়ে
দৌড়ে আসবে সব। এতল্লাটে চোরের উপস্থানে ঘরের মধ্যেও গৃহস্থ
সচেতন। আবার তালো না ভাঙলে ঘরে ঢুকবেই বা কি কবে। সারা
রাত ঠায় দাঁড়িয়ে কাটাতে হয় তাহলে, নয়তো কবরতলার বেঞ্চি
ভরসা। শীতের রাতে সে-ভরসাও মারাত্মক।

সচবিত হয়ে বীরশপন কিলে তাকালো।

পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দ। কুণি হাতে সোনাবউদি।
সামনে এসে চাবিটা এগিয়ে দিল। ও-চাবি যেন তার কাছেই
থাকে।

অবাক হলোও ঘাম দিয়ে ছর ছাড়ল।—এটা আপনি পেলেন কি
করে?

তালার সঙ্গে লাগানো ছিল।

বীরশপন অপ্রস্তুত। এতটাই অন্তমনস্ক ছিল নাকি। এ-বন্ধ
সংক্ষিপ্ত ভাব বা নীরবতা থেকে সোনাবউদির মেজাজ কিছুটা ঝাঁট
করা যায়। তালো খুলে সেটা একটা আঙঠায় আটকে কিলে তাকালো।

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ...

খাওয়ার সারাংশ সম্পূর্ণ
শরীরের প্রয়োজনে
নিয়োগ করলেই অটুট
স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়।
ডায়া-পেপ্সিন ব্যবহার
করলে এ বিষয়ে নিশ্চিত
হতে পারেন, কারণ
ডায়া-পেপ্সিন খাওয়া
হজমের সাহায্য করে।

ডায়াপেপ্সিন



দুকেলা খাবার সময় নিয়মিত ছোট এক চামচ খাবেন।
ডায়া-পেপ্সিন কখনো জন্ডাসে পীড়ায় না।

ইউনিয়ন ড্রাগ • কলিকাতা



সোনাবউদির চোখে মুখে বুঝে চিল্ল নেই। জেগেই ছিল বোঝা যায়।
ভাসতে চেষ্টা করলেও ধীরাপদর মুখে অপরাধীর ভাব একটু।
বাঁচা গেল, এমন মুশকিলেই পড়েছিলাম, ভাবছিলাম কি করি—

সোনাবউদি চুপচাপ চেয়ে আছে।

আপনি ঘুমোননি এখনো ?

বরে চুকে আটনাটা ছালবেন না সারা রাত এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকব ?

ধীরাপদ শশব্যস্তে ঘরে চুকে গেল। কোণ থেকে হারিকেনটা দাঁধিখালে নিয়ে এল। বাগানের নিচ থেকে দিয়াললাই। সোনা-
বউদি দরজার বাইরে থেকেই কুপিটা একটু এদিকে বাড়িয়ে ধরেছে।
ইশাপদ বলছে পারত আলোর আর দরকার নেই। কিন্তু বলতে
ইচ্ছে করল না। ভরসাও পেল না বোধহয়। চাবি-ভুলের এই
বিড়খনাটাও খারাপ লাগছে না খুব। এমন কি, হারিকেনটাও ইচ্ছে
করলে হয়ত আর একটু ভাড়াভাড়ি ধরাতে পারত।

অগ্নি সন্ধ্যোগ করে চিহ্নিটা ঠিক করে বসাতে বসাতে কিছু একটা
কথা বলার জন্তেই জিজ্ঞাসা করল, গুল্লার নাইট ডিউটি বুঝি ?

জবাব না পেয়ে ফিরে তাকালো। তারপর জবাব পেল।

হলে সুবিধে হয় ? নিরুত্তাপ পাঠা প্রায় সোনাবউদির।

নিজেরই হাতের ঠেলা লেগে হারিকেনটা নড়ে উঠল। ফলে
সোনাবউদির মুখভাব বদলালো একটু। মনের মত টিল্লবী কেটে বা
ধৌচা দিয়ে কাউকে জ্বা করতে পারলে এর থেকে অনেক রুচ
নিম্প্রহতাও তরল হতে দেখা গেছে।

বাড়ি কিরিয়ে গিঠের কাছের দরজার আড়ালটা একবার দেখে
নিরে সোনাবউদি হাতের কুপি নিবিয়ে দিল। তারপর ঈর্ষ
বিক্ষেপের সুরে নিজে থেকেই বলল, মনের অবস্থা তো চাবির ভুল
দেখেই বোঝা যাচ্ছে, চোখেরও হয়ে এসেছে নাকি, বিটলে গণ্ডকারের
ঘরে আলো দেখেননি ?

ধীরাপদ অবাক, গুল্লা ওর ওখানে নাকি ?

খোলা দরজার মায়ে সোনাবউদি ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।—ভর
করছে ?

জায়া আর ভয়টা কি, কিন্তু এত রাতে গুল্লার ওখানে কী ?

সবই। নিম্প্রহ জবাব।—মাইনে বাড়লে কি হবে, প্রফ
রিটার প্রফ রিটারই—এবারে সাব-এডিটর হবেন। বরাতের
যেমন জোর শুনছি, কালে এডিটর হয়ে বসারও বিচ্ছিন্ন নয়।
—ওখানে বরাতের জট ছাড়ানো হচ্ছে, বরাতে থাকলে কি না
হয় ?

খাবার জন্ত দরজা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সোনাবউদি।
নিরীক্ষণ করে দেখল একটু।—আপনারাও তো দেখি একই ব্যাপার,
সাত মণ তেল পুড়ছে, রাধা নাচবে তো শেষ পর্যন্ত ? দাঁদার গলা
ধরে ওই গণ্ডকারের কাছেই না হয় বান একবার—

সোনাবউদি চল খাবার পরেও ধীরাপদ অনেকগুলো বসে কাটালো।
শেষের এই ঠেসটুকু প্রাপ্য বটে। কিন্তু রাধা যে তার বেলার সন্ত্য
সন্ত্য নাচতে চলেছে সেটা আর বলা হল না। বললে 'বেশ হত।
সমস্ত দিনটাই ভালো কালি আল, সেই গোছের তৃপ্তি একটু।
পুরুষের ওপর সোনাবউদির শেষের এই বীজপ্রদ ভাবটুকু সন্ত্য হলে
এত ভালো লাগত না। চাকদি ঠাটা করেছিলেন, এত রাতে কে
আর ওর জন্তে খাবার সাজিয়ে বসে আছে। খাবার না হোক,
এত রাতে এই চাবি নিয়ে বসে থাকটাও কম নয়। অন্তত কম
লাগছে না ধীরাপদর।

কি এক বিপরীত ইশারায় ভাবনার লাগাম টেনে ধরতে চাইল।
একটা চকিত অস্থি মনের তলার ঠেলে দিয়ে ধীরাপদ উঠে দরজা
বন্ধ করে আলো নিবিয়ে বিছানায় এসে বসল। অনতিদ্রুত
ইজিতটা অর্গলবদ্ধ হল না তবু, অন্ধকারে ডুলল না।

—চাকদি বলেছিলেন একটুখানি স্নেহ দিয়ে অমিতাভ ঘোষকে
কিনে রাখা যায়। চাকদির এই উপলব্ধির কথা অমিতাভ ঘোষ
জানলে কেমন লাগত ? প্রার্থীর পক্ষে এটুকু জানা নিজের দেউলে
মৃতিটা চেয়ে চেয়ে দেখার মতই।

—অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে কোথায় যেন ওর বড় রকমের মিল
একটা।

মনে মনে ধীরাপদর সেটাই জ্বীকারের চেষ্টা।—চাবিটা যে
পেত সে-ই রেখে দিত, সেই দিয়ে যেত।

[ক্রমশঃ।

মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিস্ট্রী ডাকে	—	২৪
বাৎসরিক "	—	১২
প্রতি সংখ্যা "	—	২

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	—	১৫
" বাৎসরিক সডাক	—	৭৫০

ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১-২৫

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিস্ট্রী ডাকে — ১-৭৫

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক রেজিস্ট্রী খরচ সহ — ২১

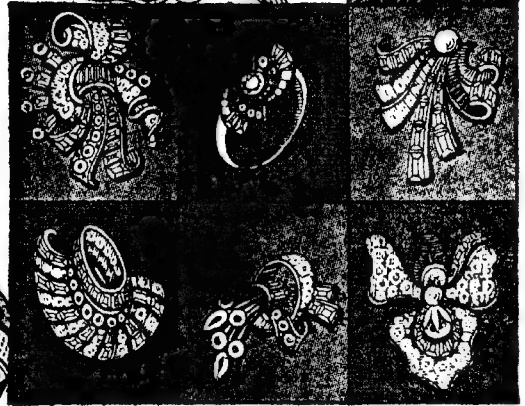
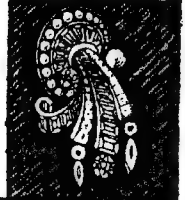
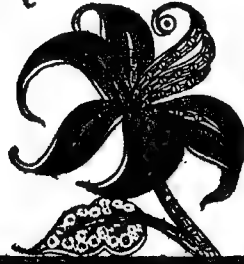
বাৎসরিক " " " — ১০৫০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " — ১-৭৫

মাসিক বসুমতী কিছুন ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিসতে আর পড়তে বসুন ●



সৌন্দর্য্য মার্ঘ্য



গিনি ল্যান্ড জুয়েলারী স্টেশালিষ্ট

এম.বি.সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৩১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/২ স্বতন্ত্র টাই কলিকতা-১২ গ্রাম-পুলিয়াইল
গ্রাফ-বালি গজ-২০০/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকতা-১২ ফোন-৪৬-৪৪৬৬
মোক্তার পুরাতন চিত্রনা ১২৪, ১২৪/২, স্বতন্ত্র টাই, কলিকতা-১২
কেবলমাত্র বিবাহ খেলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮৫

কবি কণপূর-বরাচত আনন্দ-বন্দাবন

৭ [পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—ঐশ্বর্যবোধেশ্বরনাথ ঠাকুর

নবম স্তবক

১। একদা জীবরাম নেই সঙ্গে, নৈমিত্তিকী গাভীগুলিকে
সমুখে নিয়ে গোচারণে যেন বেরিয়েছেন বনমালী, ঘুরে বেড়াচ্ছেন
কাননে, এমন সময়ে ছুটে গেল এক আশ্চর্য ব্যাপার অকস্মাৎ।

কক্কতনের মহাসর্প “কালির” নাগ গরুড়ের ভয়ে ভীত হয়ে
লুকিয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় আবিষ্কার করলেন বহুনার অচ্ছন্ন।
তিনি এসেন—ঐমতী বহুনা দেবীর অচিকিৎসা দ্রোহের মত;
কালারিক্কদের ত্রিলোক সাহাবিনী শক্তির নিক্ষেপ-পীঠের মত;
ভয়ানক রসের উৎপত্তি ভূমির মত, অনির্বোধিত সাহাবাকারী
স্বহৃদের মত দুঃস্থার।

২। জলের মধ্যে ডুবে রইলেন বটেই কালির কিন্তু তাঁর বিবের
বৈশাখ তপ্ত হয়ে গেল আকাশ। হৃদের কুল ছেড়ে আকাশে উঠে
পড়ল পাখীর স্বাক্ষর। ভয় হয়ে বাবার ভয়ে যেন শুভ হয়ে গেল
জলের উপরকার বাতাস। এবং আশ্চর্য, বসের ভগিনী হয়েও বহুনা
দেবী এই অতুলনীরটিকে উত্তরমধ্যে বহন করতে লাগলেন—মহালাই
শিল্পজন্মের মত।

কালিরের নিম্নাঙ্গের প্রচণ্ড রসনে উত্তাল হয়ে উঠল বহুনার
জল, ডেউয়ের মাথার মাথার ভেসে বেড়াতে লাগল ফুটন্ত সোনালি
রক্তের অতি ভীত বিব। কী তার আলা। চক্চক্ করতে লাগল
বিব, সহস্রভঙ্গের যেমন রাঙে চক্চক্ করে লবণকান্তি বাতুরাণ।
রক্তিত পিতের মত বহুনার ভাসতে লাগল বিব।

৩। জলরাশিকে আচ্ছাদিত করে ধ্বংসের মত কৈশে কুলে
জলের উপরে এক ঘুরে বেড়াতে লাগল সেই বিব-নিম্নাঙ্গ যে মনে
হল “জলকূলে বহিমান ধূমাং” এই অসং-অনুমানটিকও বুঝি সং
অনুমানরূপে প্রমাণিত করতে চাইছে বিবনিম্নাঙ্গ। জলতলের
বিবের আলায় একমাত্র কালির-পরিবার ভিন্ন অল্প সমস্ত জলজন্মের
পক্ষে সমতা হয়ে দাঁড়াল শুভ বাস। তারা আর্দ্র হয়ে উঠল প্রবল
জলে।

৪। মহানলকুণ্ডের মত মহাহ্রদ। সেখানে বাস করা কি
সহজ কথা। এ যেন প্রাণিজগতের এক সন্ন, প্রলয়দিনের
কালপূর্ববর্তে যেন নাজিহ্নদ।

মহাহ্রদের তটপ্রান্তে তৃষ্ণার্ত হয়ে গাভীরা এল, গোপেরা এসেন।
তাঁরা কেমন করেই বা জানিয়ে হ্রদের জলে কালিরের প্রবেশ-বার্তা?
তাঁরা পান করলেন জল।

গাভী এক গোপেরের দেহ অপ্রাকৃত হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁদের
উষ্মের শব্দনের অসহ্যতা সত্ত্বেও অবিনাশি হয়েও তাঁরা সকলেই
নিম্নে ঢলে পড়লেন বিপদগ্রস্তের মত। যোগ হয় ঐক্যের ইচ্ছা-
শক্তিই এত কারণ।

৫। কাণ্ড দেখে ব্যাখার ভয়ে উঠল সহস্রদমনের মন। তাই
তিনি অবিলম্বে তাঁর অন্তরঙ্গসান্নিধ্য কবলনরনের একটি
কটাক্ষপাতের বদান্ততায় সজীবিত করে তুললেন সকলকে। জীবিত
হয়েই সকলে এ ঠাঁর দিকে চাইতে লাগলেন। সকলেরি চোখে
বিস্ময়ের চাহনি। তারপরে তাঁদের হাসিতে বকল অমিয়া, তাঁরা
কোলাহুলি করলেন প্রচণ্ড, শেলেন পর্ষত প্রমাণ স্তম্ভ। কলাবলি
করলেন—

৬। বহুনার জল পান করে অমিয়া ভো ময়েই গিয়েছিল।
ইনিই-ভো আমাদের বাঁচিয়েছেন এচিরে। আসেও একদিন এমনিই
ঘটেছিল যেদিন পাণ অম্বাসুরের শেট থেকে নিম্নাঙ্গ আমাদের
উদ্ধার করেছিলেন ইনিই। আমাদের সখাটি দেখছি বৃত্তসজীবনী
একটি পদার্থবিশেষ।

বলতে বলতে সম্প্রদায়নরেন তাঁরা ঐক্যের দিকে চেয়ে রইলেন।

৭। ঐক্যের নিজের নামের সঙ্গে বহুনার কুলা নামের মিল
রয়েছে। তাই ঐক্যের স্থির করলেন—কক্কতনের কালিরনাগকে ঘুর
করে দিয়ে তিনি হৃদয় শোধন করবেন যিতার।

তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল একটি বিপুল কবচকর। এত উন্নত
যে মনে হয় বুঝি আকাশের স্বপ্ন চুবনের লালসায় তুলী হয়ে উঠেছে
কম্ম। আর আশ্চর্য, চতুর্দিকে এত বিবের আলা সত্ত্বেও একটিও
পাতার তার কোথাও রক্ত বলায়নি। অপরূপ কবচকরটিতে সঘর
আরোহণ করলেন অঙ্গমা-মহিমা ঐক্য। অহির মানভঙ্গ তাঁর
উদ্দেশ্য।

আরোহণ করেই তিনি শুধিয়ে কেলেলেন নিজের কুকিত
অলকাবলী। মাথার উর্ধ্বপট্টটি বাতে না থুলে যায় বাহু-বার তাই
করতল দিয়ে সেটিকে উন্নত করে রাখলেন। যেন সৌন্দর্য বাঁধল
মাথারূপে।

তারপরে মহাপরা ক্রমবৃদ্ধিরূপে ঐক্য নিজের দেহে যেন পর্বতের
সমস্ত হৈহু। তার বহন করতে করতে লুরিয়ে কাপড় বাঁধলেন কোমরে।
বরসে কিশোর হলে হবে কি, বসতে বৃত্ত ভারের শোষণতা থাকলেই না
হবে কি, তাঁর সেই বিপুল পরিভিন্ন মাথারূপে মহিমার আঘাতে যেন স্থির
হয়ে গেল জাগতিক অল্প সমস্ত কিছুই পরিমা।

তারপরে তিনি কালিরের মানমর্দনের অভিজ্ঞা, হর্ষের উৎকর্ষে
এক উৎকর্ষিত চিত্তে নিজের অচ্ছন্নদের দিকে বারেক নিক্ষেপ
করলেন দৃষ্টি।

ভয় কোবোনা। যা ভয়। যেখানেই নিয়ে এইখানেই তোমরা
থাকো। এখানে থাকলে প্রভাক্ষর হবে না তোমাদের—এই বলতে
বলতে হস্তে শুভ্রাঙ্কিত হয়ে গেল তাঁর অর্ধর, তাহে নিষ্কণ্ণ হয়ে গেল
তাঁর বৃদ্ধি।

সেই বিশাল হ্রদ বিবম বিবের তীরাতিতীরা মহানলে টপক
করে ফুটে যায় জল, বার বিপুল আলায় আকাশ থেকে জলে
পড়ছে পাখীদের দেহভঙ্গো, তাঁর থেকে জলে পড়ছে দুগ্ধের দেহভঙ্গো,
সেই মহাহ্রদটিকে কবচকর শিখর বেশ থেকে দেখে, ঐক্যের মনে
হল সামান্য একধমক শৈবাল ভ্রামল পথল। তারপরেই সহসা তিনি
কাঁপ দিলেন জলে; ঘুরে উড়তে উড়তে সাহাবাঙ্গ পাখী যেমন করে
হেঁঁমের কাঁপিয়ে পড়ে জলে মাছ ধরতে নির্ভরে। কী অলীক
পরাধর, কী অপরূপ আক্রমণের কোশল, কী প্রচণ্ড সেই পতিবৎ।

নিশাচরের আবরণে বিহ্বল হয়ে বিপদ লাগিয়ে

বয়সের ডেউ, ছড়িয়ে পড়ল বর্ষমান বহু জন্মায়; কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল গরল-কীট জলরাশি; এবং হৃদয় ডেউগুলির কুলভাঙা আঘাতে ত্রস্ত হয়ে তার ছেড়ে দূরে পালাতে লাগল গাভীর দল, রাখাল বালকদের দল। সুখ হয়ে উঠল স্নগভীর মহাহ্রদ।

পাতালের উন্নয়ন দায়বের বাসনা নিয়েই ঐক্য বেন ডুব মালেন হ্রদে। সেই নিমজ্জনে বেন স্পষ্ট কৈপে উঠল সঙ্গ-পরিবারের মজ্জা। ডুব দিয়েই মণ্ডলাকারে হুই বাহুর আঘাতে ঐক্য আলোড়িত করলেন সেই জল। হ্রদের মাথায় ভেসে উঠল গরলের শিখা।

“কে এস, কোন্ অজানা...কে দোলায় হ্রদের জল, এত জীবন চেউ ডাঙছে কে?”

বিষয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন কালির নাগ। তারপরেই কবীন্দ্র দেখতে পেলেন...বেন এক তেজোহরণ মণীন্দ্রকে।

৮। তমালবরণ ঐক্যকে দেখে, সেই নিরাতক দর্পহরণ পবন-মনোহরকে দেখে, তাহিল্য ভরে উঠল কালিরনাগের তাতিক মন। ছোঁ: ছোঁ: মাধুর্যের প্রকাশে ইনি যে দেখছি হার মানিতে চাইছেন কম্পকণ্ড। শোভার সার পরাধীকে দেখতে দেখতে প্রবৃত্ত হয়ে উঠল তাঁর পিত-প্রকাশ। রোয়ে পঙ্কব হয়ে উঠল হ্রদয়। কৈপে ফুলে উঠল কণ। তারপরে, কালীরক-সুপ্রভিশরীর ঐক্যক:ক সহস্রা বেষ্টন করে ফেললেন কালির নাগ।

আবৃত্ত-ঐশ্বর্য ঐভগবান কিঞ্চ প্রকাশ করলেন না প্রাগলভ্য।

৯। এই অব-মখনকে, কৈশোরোৎসব পুষ্ট এই জ্যোতির্ময় সূর্যটিক, হঠাৎ কালিরের মনে হল বেন তিনি বৃহৎ হয়েছেন, মহা-বিশ্বার লাভ করছেন। অতএব গর্বেচ্ছত নাগ তখন আর বিলম্ব না করেই নিবিড় ভাবে তাঁকে পূর্ণ বেষ্টন করে ফেললেন, নিজের প্রকাণ্ড ভোগ-কাণ্ডের আবর্তনের মধ্যে। কবেও, কিঞ্চ কেমন বেন অল্পভব করলেন অপর্ণ্যাপ্তি।

১০। নির্মল ইচ্ছাশক্তির আয়ুর্কল্যেই ঐভগবান লীলাভরে বরণ করে নিলেন সর্গের বন্ধন চন্দনতরুর মত। হ্রদের লেশমাত্রও তাঁর উল্লিঙ্গ হল না কোত।

এবার আমার আমার এই বন্ধের আভার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে নব্য কোষত; মনে মনে এই আলোচনা করতে করতে ঐভগবান কালিকী-সলিলে মগ্ন হয়ে বিলম্ব করতে লাগলেন ততক্ষণ, বতকণে না অনন্তকাম অনন্তমৈবত হয়ে নিখিল ব্রজবাসী যেরে আসেন, তাঁদের প্রেম বাড়ে বৈধ্য বাড়ে, অনায়াস হয় অল্পরাগ, আতঙ্ক পিড়ন হয়ে যায় চোখ, আঙ অরিষ্ট কল্পনায় উন্মুক্ত হয় হ্রদয়, এবং সর্ব শেষে নয়ন সার্থক করে তাঁরা অবলোকন করেন কবীন্দ্রের কণামণ্ডলে ঐক্যের লোকোত্তর ভাণ্ডব।

১১। হ্রদের তটপ্রান্তে যে সব ক্ষেত্র হল ছিল, গোপবালকেরা ছিলেন, প্রাণেশ ঐক্যকর এই উত্থান বিলম্বে তাঁরা বেন তরে কষ্ট তটস্থ হয়ে শিখিল জীবন হয়ে পড়লেন। আকাশের গীর্ধাপণ বিষ্মত হলেন কেশবদ্বন্দ্ব বর সংঘম। বাণাহতের মত বাধার আভুর হয়ে হাছাকার ধনি ফুলে নয়নজলে ভাসাতে লাগলেন সুখশয়। নোড়ে যে আসবেন তাও তাঁরা পারলেন না। কি বেন করে, কিশোর বেন শোকে, মাধার হাত দিয়ে তাঁরা এক রাখাল বালকেরা মুক্তকণ্ঠে চীৎকার দিয়ে উঠলেন—

হা কষ্ট, হা কষ্ট, হার হার, আরবা মরলাব, আরবা মরলাব। নিরালোক হয়ে গেল তাঁদের লোক। বতকণে মুছা! গেলেন ততক্ষণে ব্রজনগরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাণলিক বিকার বইয়ে দিয়েছে বিষমহুত্বের বাতাস।

১২। শব্দেব দিকে বৃষ্ণ ফুলে অন্তত চীৎকার করে উঠেছে সুগলয়ের দল। গুলির কম্পন লাগে নু ধীরের অঙ্গে সেই বেন দিগন্তনাগও মহিষ-সুন্দর মত রান হয়ে গেছেন বিবের ঘোঁরাই। অহোমণির মধ্যে এসেছে নির্মহোমণির বিভ্রম। পবনের সে কি ধরন্তর স্পর্শন। ভূকম্পের সে কি প্রচণ্ড হৃৎকর। বামনয়নাদের স্পন্দিত—হয়েছে—অবাম নয়নাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পৃকবদের ঘটেছে বৈপরীত্য। অনির্ধর্যের উত্তপের বাধার ভেঙে পড়েছে ত্রীপুত্রব সকলেরই প্রাণ।

১৩। সর্বর এই বিরুদ্ধভাবের অবতারণা দেখে ঘোবোদেরও হ্রদয় পঙ্কিল হয়ে উঠল মহাতঙ্ক-পঙ্কে। একি ঘোর ছায়া নামল পৃথিবীতে। ঘোবাধিরাজ ঐনন্দেও মন বুলে—প্রশর বাটে। যে কৃষ্ণের প্রভাব অমৃত্যব ও ভাব এতদিন তাঁরা স্পাতীভভাবে অমৃত্যব করেছেন আজ আর তাঁর ভাব কিছুই বেন অমৃত্যব করতে পারলেন না। কৃষ্ণের অস্ত্রে আশঙ্কার অস্থির হয়ে উঠল তাঁদের মন।

১৪। নীতিমস্তেব বলে উঠলেন—

দেখেছো? কাণ্ড, বলরামের বৃদ্ধহৃদ্য আছে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে একলা এই বনে বাওয়া কেন বাপু আমাদের দুলালের? চতুর্দিকে ঘোর শত্রু, নানান উপদ্রব। কত আর সামলাই বলুন। আনাড়ী কতকগুলি শিশু আর পশুদের নিয়ে একলাই আছে। শিব শিব, আমাদের মরণ আর কি। কী কষ্টটাই না পাচ্ছে? আমাদের নিশাপ দুলাল।

১৫। যেমন ছিলেন তেমনি, কাজকর্ম ফেলে রেখে সকলেই দৌড়লেন। এক বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে সকলেই দৌড়লেন। বিকল হলোই বেড়ে বার লোকের আগুন। যে পথে কৃষ্ণ পেছেন সেই পথ ধরে কুলবৃন্দের ও পুরুষীদের সঙ্গে নিয়ে ব্রজেশ্বরী ছুটলেন। বালবৃদ্ধ তরুণ আভীরদের এবং সর্বত্র বলরামকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজেশ্বরী ছুটলেন। ত্রিভুবন-বিলম্ব লক্ষণ ঐভগবানের চরণকলচিচ্ছায়সরণ করে কাড়রচ্ছিত, মনের চেয়েও বেন অগ্রে সকলে উপস্থিত হয়ে গেলেন মহাহ্রদের তটদেশে। নিভাত অশান্তির মতই ব্রজবাসীর শূন্য ঘরগুলি, ছাবর ও অবর বলেই, গাঁড়িয়ে হইল শোকাচ্ছয় হয়ে।

১৬। তাঁরা এসে দেখলেন, রাখালবালকেরা কীদছে, প্রচণ্ড শোকের ভারে তারা আভুর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে, তাদের প্রাণের বহু নৈই। প্রর না করেই তাঁরা প্রাণে প্রাণে অল্পভব করলেন কী হতে পারে তাদের অকথিত উত্তর। বুঝতে পারলেন: তাঁদের ঐক্য ডুব দিয়েছেন বিহ্বলে। এবং এই বাধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনে হল তাঁরাও বেন ডুবছেন—বিবের হ্রদে।

পাদাঙ্গ থেকে শিরোভাগ পর্যন্ত তাঁদের হাউ হাউ করে ফলে উঠল বিবানলের রক্ত প্রত্যাশে। আলার বিভাবিকার বেন হাই হয়ে গেল হ্রদয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সকলে। হ্রদের প্রান্তদেশে আকীর্ণ করে লুটিয়ে পড়লেন নারীকল—কড়ের পূর্ণিতে উপড়ে বাতাস।

গভীরে বসে। পুরুষেরা কীপতে কীপতে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে ছিন্নমূল বেন তরুর দল।

পিছুবৎসল পুরুষেরা নীরে ডাকতে ডাকতে ব্রজাধীশ কেঁদে উঠলেন—

ভরে কুই এ কী দুঃসাহসের কাজ করে বসলি? কান্নার কণ্ঠ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ, মুক্তি হরে পড়ে গেলেন, ধরনীতে।

হে ব্রজজনপ্রিয়, হে বৎস, চেয়ে দেখ, তুমি এত কাছে থাকতেও ব্রজবাসীরা আজ বরহে—

বলতে বলতে অমূল্যী আভীরেরা ব্রজাধীশের চতুর্দিকে মুক্তি হয়ে পড়ে গেলেন।

ব্রজগোপীরা বাগা ব্রজবাসীর হৃৎখে হৃৎখিনি মুখে মুখিনি, তাঁরা চীৎকার দিয়ে উঠলেন। মা, কীদন্তে লাগলেন, কুরী পাখীর মত তাঁর কান্না। লোককণ্ঠিতাকী বংশাঙ্গকে ঘিরে গোপীরা বিলাপ করে উঠলেন সুরুশ।

হোট হোট কুমারীরা এবং তাঁরা--বীদের চোখে এই সবে অজান পরিবেশের নবীনের মোহ বীনের মনোমাল্যকে এই সবে সৌরভ ছুটেছে প্রথম অহুরাগের--তাঁরাও বিনোদিনী মুক্তির সাধনায় শিথিল-ভঙ্গ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। বিলাপ করবার অবসর তাঁরা আর পেলেন না।

১৭। কিন্তু ঈশ্বরের আকারে আকারিত বীদের মন তাঁদের কি কখনও লভ হয়? প্রাণের হয় না। সে জীবন যে অপ্রাকৃত, বিপুল যে তার স্বৈরীর বিস্তার। ভাই মানবদেহের নিঃসহায় অবলুপ্তনে হিরলভাক্রমময়ী হয়ে গেলেন ধরনী; ককণবিলাসের শব্দগুণে গুণময় হয়ে উঠলেন গগন; অক্ষর প্রবাহে নির্ঝরময় হয়ে গেল হৃদভট, এবং বিহ্বলভরে শোকময় হয়ে গেল সমর।

এখন সময়, কৃপাকল্পভাব-ভাবনার কুতূহলী হয়ে তাকিলাভরে বলে উঠলেন হলধারী বলরাম—

১৮। ভাত, মনটাকে অতিমাত্রায় তাতিয়ে দেওয়াই শোকের ধর্ম। অতিশোকের উত্তাপে নিজের দেহটিকে অঙ্গাবরণ করা,-- কাজের কথা নয়। আমার ধারণা কুকই কিং অঙ্গকরণ করছেন কালিকে।

১৯। আর মা, এর পর এখন আপনার বিলাপের প্রয়োজন নেই। আমার কথা শুনুন, বৈধী স্বরুন।

এবং হে পৌরজনগণ, নুতন বিপদের আবিষ্কার মূলে মহাসম্ভাপ কুড়িয়ে নেওয়ার কোনো অর্থই হয় না।

২০। আমার এই অমূল্যটির শোঁষে মহিমা নিঃসন্দেহে আপনারা জানেন না। হ্যাঁ, আমিই কেবল জানি। এ মহিমা আনন্দ বাঢ়ায়। এই শোঁষের জন্ম হয়েছে অহঙ্কারের প্রেরিত্য থেকে। এব খবর আমিই কেবল রাখি। দেবপ্রেরিত্যের এক কণিকা জানে এই এই মহিমার।

২১। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, ঈশ্বক পুরুষকুজর। তাঁর পারে নাগরাজ কালিরের পরাভব,—একটা ইংবকার-বিশেষ।

সিরিরাজকে কি টলাতে পারে বাতাস? সূর্যকে কি জ্বাল করতে পারে অন্ধকার? মহানলকে কি নেবাত্তে পারে নলবন? যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব আমার এ মকরকুণ্ডলধারী ভাইরায় পকে একটা হুতলীপাকানো কুন্তলমেই ভরে ভীত হওয়া। সম্ভাব্য পূর্ব

করে দিন হ্রদর থেকে। দেখবেন, নিজের শোঁষে জলাঞ্জলি না দিয়ে এবং নাপাধমটিকে যুক্তপ্রাণ করে এখনি সমুদ্রান করছেন আমার অখণ্ড প্রতাপ ভাইরা। এই আমার অভিমত, নিঃসন্দেহে।

২২। চরমবল ভগবান ঈশ্বররামের ভাবন শেষ হতে না হতেই যেন কার অতি মহান লোকোত্তর অল্পভাবে মাদ্যবিসোধিত হয়ে গেল সুরলোক এবং অসুরলোক। এবং সেইক্ষেপে জনক-জননী ও ও পরিজনদের নীরব শোকের কাতরতা অহুমান করেই যেন ক্রমবর্ধমান বিপুলবিক্রমে, অধরে বৃহৎশির পেলবতা, সমুদ্রান করলেন ভক্তজনসুখাকর ঈশ্বক। ভবনও তাঁকে তাঁর কুতলিত বিরাট আবেষ্টনীর মধ্যে নির্ধর ভাবে স্থিত করে বেবেছেন, বিরাট কালিয়নাগ। সুধের উদর বিলীর্ণ করে ঈশ্বক বেরিয়ে আসতে লাগলেন, যেন এক তিমিরভঙ্গ-কাণ্ড গত চন্দ্রবার চির।

২৩। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ...বোঝবার বৈবতসভার বেজে উঠল শব্দ; হু হু হু...অন্যদে বেজে উঠল হুপ্তি; ভোঁ ভোঁ...গভীর ভাঙারে গঞ্জে উঠল ভেরী। নাদ পরিমার গীর্বাণদের কান বুধি কেটে যায়।

২৪। সেই নাদ নিয়ে এল দিগন্তবিস্তার প্রমোদনা। আর সঙ্গে সঙ্গে কী সৌভাগ্য, মহাসৌভাগ্যশালী ব্রজরাজাদি সকলেই, বিপন্নদের জীবন পাণ্ডরায় মত, হঠাৎ কিং পেলেন তাঁদের প্রাণ। প্রমোদ যেন হঠাৎ হাত ধরে তাঁদের শীড় করিয়ে দিল মাটি থেকে উঠিয়ে। বলতেই হবে এ সৌভাগ্য ব্রজাধীশ অজিনমনযোগ্য।

তাঁরা দেখতে পেলেন কালির নাগকে। শ্বশার্ণিত 'ভীষক' লোহের বত তাঁর প্রত্যেকটি কৃষ্ণকরাল কণা থেকে কন্কন করে ছুটে বেরিয়ে আসছে গরলের কেনা। যেন একটা প্রচণ্ড মহাভয়ের সুধের বিবর থেকে বলক বলক বেরিয়ে আসছে অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ। একশ মাথার তাঁর একশ মণি। মণির রক্তিগ্রাস যেন টেনে নাহিয়ে আনতে চার আকাশখানাকে। কণার সুখগুলো যেন গগণগে লোহার কড়া, চোখগুলো যেন অগ্নিকণা, লক লক করছে হ'শো জিহ্বা।

কালিয়নাগকে দেখেই ভরে তুলিয়ে কালো হয়ে গেল তাঁদের আনন্দের নবাহুর। বিরাট অসম্ভাব্যে ভরে উঠল হ্রদর। জীবনের আশ্বাস দিয়েছিলেন ঈশ্বররাম কিন্তু কেমন যেন বিশ্বাস হল না তাঁর কথায়। ভগ্ন নিখোঁস কেলতে কেলতে নিজেবাই যেন হরণ করতে লাগলেন নিজের বৈধী। প্রমোদাবস্থায় উপস্থিত হয়ে যে মুহূর্তে তাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছেন, অনবধাটিকে অবলম্বন করতে ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁরা হঠাৎ শোক-সম্ভরণ ঈশ্বরবর্ষের সুখে কী যেন এক ভনতে পেলেন সয়স বাণী, এবং ততঃপরেই তাঁদের বাণীতীন করে দিয়ে তাঁদের নয়নসমুখে প্রসুট হতে উঠলেন পথম শ্রীভী-প্রতীক ঈশ্বররাম ঈশ্বক।

কালিদায় রসতরঙ্গ থেকে ভুলভয়ের উৎসবের পেশল পেশণতা থেকে, রক্তভীর তিমি শিথিল করে নিয়েছেন নিজেকে।

কণার মত কন্কন করে মূলে উঠেছে তাঁর মন। পাখীর মত আনন্দে লাক দিয়ে তিনি চড়ে বসেছেন কণীর কণারগুলো।

একশ কণার একশ মণি, কিরণের সমুদ্রতে আলোর আলো হয়ে গেছে মহাভক্তের কীকানন। [অবসান]



কিছানভিসু

ভিল

আকাশ-কুসুম

"Alice laughed. 'There's no use trying', she said, one 'can't believe impossible things.

I dare say you haven't had much practice, said the White Queen. 'When I was your age, I always did it for half-an-hour a day. Why, sometimes, I've believed as many as six impossible things before breakfast.'"

—Alice Through the Looking Glass
Lewis Carroll.

অজ্ঞানচাকরের পর 'ক্লোরোফ'এর ঘোর কাটিয়ে বোগিব চেহারা কিরে পাওয়া একটা কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা। বাইরে বেরিয়ে এসে শংকরের মনে হল—তার মস্তিষ্কের মধ্যেও এমনই কোনো প্রক্রিয়া চলেছে। ধরবোই নয়াবিল্লীর বড়ো বড়ো সৌধের সারি যেন পটে আঁকা—অবাস্তব। চোখ বন্ধ করলেই দেখা যায়, এক তরুণের মূর্তি—যেঁয়ার কুয়াশার বাপুস। নিষ্ঠে একটা চ্যাপটা বাস্তব নিয়ে হবিবুল্লাহ কমাগতই শূন্যে উঠে যেঁয়ার বিলিয়ে থাকে।

খোয়াল হল হঠাৎ—আলম বস্ত্রটাই যে তার দেখা হয়ে ওঠেনি। স্বপ্নচালিতের মধ্যে কখন যে সে রাজপথে নেমে পড়েছে, শংকর জেবেই পার না। তাই তো। আবার কিরে বাবে কিনা—শংকর পথে ঠাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

এই যে শংকর—তোমারই খোঁজ করছিলাম। পালাচ্ছিলে কোথায়?

স্মৃতি কিরে আসতে শংকর দেখে সুমিত্রাকে। চট করে কোনো জবাব মনে আসে না, ভাই স্মিতবুধে সে ঠাঁড়িয়ে থাকে।

সুমিত্রাকেই আবার কথা শুরু করতে হয়, ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মূর্তিটা দেখলে সভ্যই ভয় করে আবার। যদি চট করে শাপমতি দিয়ে বস।

শংকর এবারে একটু লজ্জা পায়। না সুমিত্রা, রাজিটা কেটেছে না ঘুমিয়ে, মাথাটাও হঠাৎ ধরে উঠলো ওই সভ্যদের বহু ভদ্রেট আকর্ষণকারী। ভাই একটু 'বাইরে আসতে হলো।

আর তা হাত্তা তোমাকে তো দেখলাম একেই-এ'র মহিয়সরী কল্পারূপে। হঠাৎ বনিষ্ঠতা করাটা সাহসে কুলোল না।

সুমিত্রা এর জবাব দিতে ছাড়ে না।

ও, তোমার পৌরুষে আশ্চর্য পড়ল বুঝি? হায় হায়, হায়, শেষে শংকর রায়েরও এই দশা।

শংকর বলে কেসে—পৌরুষের অহংকার নয়—ভয়। এখন ভয় হচ্ছে সুমিত্রা দেশপাণ্ডে-সম্পাদকিকে। তারপর মনোবিজ্ঞানী সুমিত্রা দেশপাণ্ডেকে আর সর্বোপরি সুন্দরী মনোবিজ্ঞানী সুমিত্রা দেশপাণ্ডেকে মাথা ধরেছে বলেও নিস্তার নেই—এবার হয়তো তার বিরোধিতাও শুরুতে হবে।

সুমিত্রায় অন্তরালে কোথায়ইবেন আশ্চর্য লাগে কিন্তু স্মিতবুধেই সে বলে, সাড়ে তিন বছর বাবে দেখা—আর এখন থেকেই তুমি বগড়া করতে শুরু করলে। থাক এখন তর্ক শুরু করলে রাজ্যের লোক জরে বাবে। কটা বাজলো খোয়াল আছে? ব্যারাকে কিরবে না?

শংকরও লজ্জিত হয়, কী কথা বলতে গিয়ে কী কথা এসে পড়ল। হি হি কথাগুলো এমন করে বলার তো কোনো প্রয়োজনই ছিল না। প্রসঙ্গের পরিবর্তনে সেও ঠাঁক ছেড়ে বাঁচে।

তাইতো সে কথা মনেই ছিল না। জা বাহনের ব্যবস্থা কি হবে।

সুমিত্রা বলে, বা রে, এরি মধ্যে তুলে পেছ। তুমি এখন সরকারের সম্মানিত অতিথি; সব সময়েই মিলিটারি গাড়ী প্রভৃতির মধ্যে তোমার হুকুম তামিল করবার জন্ত, এখন কেবল হুকুম দেবার অভ্যাসটাই বন্ধ করতে হবে।

অবশ্য এখনকার মত হাতুলের গাড়ীটা আমার সঙ্গেই আছে—আপত্তি না থাকলে চলো না সেটারই সন্ধ্যাবহার করা থাক।

ছোটো গাড়ীটা মন্থর গতিতে চলেছে। অনেকক্ষণ চূপ করে থেকে শংকর জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা সুমিত্রা, তোমাকে এরা পাকড়াও করলে কী করে?

সুমিত্রা বলে, সে অনেক কথা। পরে একদিন বিশদ করে বলা বাবে। এখন থালিগেটের মধ্যালা রাখবার জন্ত ক্ষণেকের উত্তরটাই দিতে হয়। নতুন ধরনের শিক্ষাপ্রণালীর আদ্যময় একটা 'কীম' (Scheme) কোনো কর্মজীবির নকশে পড়ে যায়।

দিল্লিতে একটা ছোটোখাটো শিকলারে তার পরীক্ষা চলছে। সেই উপলক্ষেই দিল্লিতে আজ বাস। এতদিন মাতুলের অন্নই খসে করছিল। কিন্তু আজ থেকে তোমাদের ব্যারাক গিরে ভেরা বাঁধতে হবে।

আমার স্বামী, কিছুটা কার্যকরী হয়েছে—সেই ক্ষুদ্রই প্রবেশবন্ধ কক্ষস্থানীর সঙ্গে আসাপ। এখন তাঁর অগাধ বিশ্বাস আমার ওপরে। আর তা ছাড়া—সুখিত্রা বৃদ্ধ হেসে বোণ করে, মেয়ে হয়ে কক্ষস্থানীর কিছুটা সুবিধা আছে সে খবর রাখা তো? শংকর কংশন করবার সুযোগ পেলে ছাড়বে না—তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। সুখিত্রা বলে, কিছুই দেখতে পচ্ছো না। কক্ষস্থানী চান হবিবুল্লার অতীতকে আবার মনুনে করে গড়ে তুলতে এই আবিষ্কারের পটভূমিকায়। তাঁর ধারণা আমি হরতো অক্ষম হবো সে কাজে।

শংকর গভীর হয়ে বসে, বলে—জানো সুখিত্রা, তোমাদের এ প্রজেক্ট সফল হবার/কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের জানা বিজ্ঞানে এমন কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না যা নিয়ে হবিবুল্লার রক্তটাকে বোঝানো যেতে পারে, পুনর্গঠন তো হুয়ের কথা।

সামনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, নতুন জল নিকাশনের নালী বসানো হবে রাস্তার এক ধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত। সুখিত্রা পাড়ীটা পেছিয়ে নেয়, তারপর বাঁ দিকের অন্ধ এক রাস্তা ধরে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, তোমার এ কথার মানে কী?

শংকর বলে, এর মানে? মানে হচ্ছে এই যে হবিবুল্লার ক্ষয় যদি সত্য হয়, তবে তোমার পাড়ীটার মতো আমাদেরও পেছনের 'স্মিয়ার' লাগিয়ে অতীতে ফিরে যেতে হবে। কে জানে কতো দূর! পশ্চিম বছর? পকাশ বছর? না পঁচিশো বছর? অমূল্যমান করতে হবে কোথায় বিজ্ঞানের জয়যাত্রা রাজপথ ছেড়ে গিরে মেঠো পথে সেমে পড়ল।

আমি শুধু ভাবছি কী জানো? দুনিয়াতে এতো বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক থাকতে হবিবুল্লার মতো একটা চাঞ্চা 'প্যারানয়েড' ই বা সেটা উপলব্ধি করেছিল কেমন করে?

সুখিত্রাও গভীর হয়ে বলে, শংকর, হবিবুল্লাকে এতটা কুহজ্ঞান কারো না। আমার অজুরোধ তার সবচেয়ে কোনো রকম বার দেবার আগে তার জীবনকাহিনীটা পড়ে নিও, আর তার ল্যাবরেটরী ও লাইব্রেরী ভালো করে ঘুরে দেখো। দেখবে, অত্যন্ত পরম্পর-বিরোধী উপাধানের সমন্বয়ে হবিবুল্লার মগজটা গড়ে উঠেছিল। একদিকে যেমন পদার্থবিজ্ঞান, স্নিগ্ধ আর ইলেক্ট্রনিক্সে ছিল তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অন্যদিকে আবার পাত্তজলদর্শন, হঠাৎ, সাংখ্যিক বিজ্ঞান, লেজিটেশন, ডাকিনীতন্ত্র সব কিছুই জট পাকিয়েছিল তার মনের মধ্যে।

শংকর হেসে কেসে, সম্ভবত: ইউরোপের ডাইনিবুড়ীদের মতো হবিবুল্লাও প্রথম আকাশবাণী শ্রুত হয়েছিল বাঁটার চড়ে।

সুখিত্রা কিন্তু এ পরিহাসে সার দেয় না। বলে—হাসির কথা নয় শংকর। ইউরোপের সর মেসেই ডাইনিবুড়ের সবচেয়ে এতো মজার গল্প চলতি আছে কেন বলতে পারো? এ সব গল্পের দৃষ্টই বা' হোসো কেমন করে? ইউরোপ কেন, আমাদের

দেশের প্রতি গ্রামে গ্রামেই হয়তো গুনতে পাবে মাহুকের নৃত্যে বিচরণ করার কাহিনী। মহারাষ্ট্রে কোনো কোনো বৃদ্ধ ঠাকুরমা বলবেন এ সমস্ত ব্যাপার তাঁদের চাকু্য দেখা আছে। বাংলা উপকথার মায়াটি অজুবাগেও ছেলেবেলার পড়েছি ওই একই ধরণের কাহিনী।

রেল বসবার আগে বাংলার সাগে মহারাষ্ট্রের প্রায় সবোগই ছিল না বলতে পার। তা হলে একই রকমের কাহিনী সামান্য রং বকলিয়ে ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে গেল কী করে?

শংকর বলে, এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নয়। এ সমস্ত গল্পের মূলে আছে মাহুকের উর্বর কল্পনা। নিজের সবচেয়ে মাহুকের বেদিন থেকে সচেতন হল, সে দিন থেকে অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান জানোয়ারদের সে কল্পনাই করেছে। কিন্তু হার মেনে গেছে পাখীর কাছে। মগজের শক্তি থাকলেই তো আর রাতারাতি জানা গজানো যায় না—সম্ভবত: ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে তা সম্ভব হয়নি। পাখীর মতো আকাশে উড়বার ব্যর্থ কল্পনাই ছিল তার সম্বল। যেমন ধর, যখন ছোটো ছিলাম তখন পক্ষিরাজের গল্পটাই ছিল সবচেয়ে প্রিয়। ঠাকুরমা অন্য গল্প বললেও একে যোজাই একবার করে বলতে হত পক্ষিরাজের গল্পটা।

কিন্তু এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো অতো সহজ নয়।

মাথা ধরার উপশর হলেও শংকরের মাথার বোকাটা নামতে চায় না। হুপরে বিশ্বাস নেবার বুধা চেষ্টা করে সে। কিকো তন্ত্রায় ষোর বারের বারে কেটে বার। চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রতি বারই ষোর কক্ষ ঘোরার কুণ্ডলীর মধ্যে হবিবুল্লা অদৃশ্য হয়ে বাচ্ছে মহাপুত্রে। হুয়ের বুধা চেষ্টা ত্যাগ কোরে শংকর উঠে পড়ে। মাথাটা পেতে দেয় বাথকমে ঠাণ্ডা জলের ধারার নীচে। তারপর বসে বায় চিঠিপত্র লিখতে। কণ্ঠপক্ষের কাছে ছুটির দরখাস্ত, সহকারীদের কাছে উপদেশ কোলকাতার অসমাপ্ত কাজ সবচেয়ে, দু-একজন বন্ধুর কাছে চিঠি।

অপর্যাপ্ত বেলায় তেরছা আসো ঘরে পড়ল পক্ষিরাজের জানালার ঘরে।

সন্ধ্যাকোলা 'হল' ঘরে প্রথম জটলা বসে গেছে—টেবলের ওপরে হবিবুল্লার ডাঙা রক্তটাকে কেজ করে। রক্তটা এখনই ছুড়ছে, স্বলসে গিয়েছে যে তার থেকে কোনো সমাধানের আশা করাই বুধা। জিনিবটা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু বহিরাবরণটুকু ছাড়া ভেতরের স্বপ্নাভিত্তির চিহ্নসমূহ অবশিষ্ট নেই। এখানে ওখানে দেখা বাচ্ছে ইলেক্ট্রিক তারের ধ্বংসাবশেষ। ভালো করে নাড়া দিলে বেরিয়ে পড়ে অগ্ন্যবের কবিকা, আর ছোটো ছোটো কীচের টুকরো। অগ্ন্যবের হবার প্রাচীর আর জৈব পদার্থের ঢাফ পদ্ধ এখনও মিলিয়ে বায়নি রক্তটার থেকে। সবটা মিলিয়ে রক্তটার বহিরাবরণটা দেখতে একটা রেভিওর চাসিস (chaasis)-এর মতো—কিন্তু সাধারণ কোনো বেতার যন্ত্রের সঙ্গে পার্থক্য তার অনেক।

শংকর ভাবে, ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে যদি কোনো রকম রক্তটাকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্র।

চোখ বন্ধ করে যন্ত্রটির ওপরে হাত বুলোর সে।

এক মুহূর্তের বিভ্রম—তারপর সহসা শব্দরের সংবিত ক্রিয় আস! হি হি, এ কী উদ্ভাসের মতো কাজ করছে সে। ‘আড়চোখে সকলের দিকে চেয়ে দেখে—তার এ ছেলেমানুষী কারো নজরে পড়ে গেছে কি না। না, তর্কের নেশার সকলেই বাহ্যজানমুগ্ধ। প্রকেশের নিকটায় আয়াম কেদারায় হেলান দিয়ে একটা মোটা চুঁকট ভরীভূত করছেন—শূন্য দৃষ্টি তাঁর নিবন্ধ ‘সোলি’ এর দিকে। ‘সুমিত্রার চোখেই শুধু একটু কৌতুকের আভাষ। শব্দর জানল, যে একমাত্র ‘সুমিত্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই বরা পড়ে গেছে তার এই আশ্চর্যবিভ্রম।

শব্দর ভাবে—তার এই দ্বন্দ্বিক ছেলেমানুষীর মধ্যে সত্য কি কিছুই নেই? বৈজ্ঞানিকের দল বিশ্বাস করেন না ‘অ্যাটিগ্রাভিটি’র অস্তিত্বে—তাই তাঁদের মধ্যে কারোই ‘অ্যাটিগ্রাভিটি’ সম্ভব করবার চেষ্টা পৃথক নেই। হবিবুদ্দা বিশ্বাস করেছেন—সে অসম্ভবও সম্ভব। তার কলেই এই বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছিল।

তবে কি—বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুবর্ষ?

প্রবল তর্ক চলেছে তখন সহকর্মীদের মধ্যে এই যন্ত্রটা সম্বন্ধে। একদলের মত হচ্ছে—যন্ত্রটা ইলেকট্রনিক্স সংক্রান্ত। এই দলটাই ভারী। আর একদলের কোনো নির্দিষ্ট মতামত নেই—অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সব যুক্তি খণ্ডন করবার চেষ্টা। কেবল ছুটি প্রাগীই নীরব—আয়াম কেদারায় শরান প্রকেশের শিকদার—আর কিছু দূরে বসে ‘সুমিত্রা।

শব্দর ভালো করেই জানে ‘সুমিত্রার এই চুপ করে থাকার অর্থ। এই নীরবতার অন্তরালে চলছে বিশ্লেষণ—কে কতটা ‘অ্যাগ্রেসিভ,’

ছেলেবেলার কোন ‘অ্যাম্প্রেশন’ এর বলে কার মধ্যে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কার যান্ত্রিক বহিবৃত্তি—কার বা অন্তর্বৃত্তি। ‘সুমিত্রার চিন্তার ধারাটা ধরে পাড়ে’ এর কপালের কৃপনে। হবিবুদ্দার যন্ত্রটা সম্ভব কি অসম্ভব—এ নিয়ে নিশ্চয় কোনো দ্বন্দ্ব নেই ওর মনে।

এ দ্বয়ের মধ্যে ‘সুমিত্রাই বোধ হয় একমাত্র দ্ব্যর্থী বার কোনো সন্দেহ নেই ‘অ্যাটিগ্রাভিটি’র অস্তিত্বে।

‘সুমিত্রার এ প্রশান্ত নিলিপ্ততা শব্দরের সহ হয় না। নিজের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে সে ‘সুমিত্রার পাশে গিয়ে বসে মন্তব্য করে—পদার্থবিজ্ঞান চর্চা না করার একটা মতো সুবিধা আছে, ‘সুমিত্রা। মায়বকে বৃন্দী হুবে রেখেছেন মা ধর্মিতা মহাকর্মের শক্ত গরাদের মধ্যে। পদার্থবিজ্ঞানীর মাথা কয়েকবার ঝুঁকে গেছে সেই গরাদের লোহার তাই সে বেড়ার স্বল্পটা ভালো করেই জানে। বাসের সে গরাদের সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, তারাই কেবল ভাবতে পারে এ গভী ভেদ করে বেরিয়ে পড়াটা এমন কিছু অসাধ্য সাধন নয়। মনোবিজ্ঞানীদের কাছে বোধ হয় সবই সম্ভব সেই জন্ত।

‘সুমিত্রা প্রস্তুতই ছিল, মুহূর্তেই বলে, বুখাই আমাদের ছিত্রাধরণ করে বেড়াচ্ছ, শব্দর। আমাদের অবোধ, অজ্ঞান বলে যদি দ্বন্দ্বিক আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাও ত্যাত আমার আপত্তি নেই। আমি শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই টেবলের ওপরে ওই যন্ত্রটার কথা। ওটা কবি কল্পনা নয়, অবচেতন মনের হৃৎস্পন্দও নয়। ওটা ইট কাঁচ পাথরের মতোই বাস্তব। এখন তোমার পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে ওটার স্বল্পটা আমার বুঝিয়ে দাও তো।



জীবাণুনাশক নিমন্তল থেকে তৈরী, সুগন্ধি মার্গো সাপো কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সাপোর প্রচুর নরম স্কেনা রোমকুপের গভীরে প্রবেশ করে ত্বকের স্ফরকর্ম মালিন্য দূর করে। প্রজ্জ্বলিত প্রত্যেক ধাপেই উৎকর্ষের জন্ত বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিষ্কার ও প্রদূর থাকবেন।

পরিবারের
সকলের পক্ষেই
ভালো



মার্গো সাপো

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

বি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২৩

CHC-15 BEN

কৃষ্ণাচারী বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন নৈশ জোনের সময়। আহাঃ! পূর্বের পূর্ব তিনি জানতে চাইলেন সকলের মতামত হবিবুল্লার মেশিন সম্পর্কে। দেখা গেল, প্রথমে কোনও মতামত প্রকাশ করতে সকলেই বিধি আপত্তি।

কৃষ্ণাচারী অন্তর দেবার জন্য বসন্ত, এটা আদালত নয় বা বিজ্ঞান সম্মেলনও নয় যে কোনও মতামত প্রকাশ করতে আমাদের গুরু করতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের নিত্যকর্মের আড্ডা, মনের লাগাম একবার ছেড়েই দিন না কেন? আপনাদের আদালত বা থিয়েটারের নিষ্ঠুরতা প্রমাণ করবার জন্য কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাড়বারও প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ ওই বসন্তকে দিয়ে আমাদের মনে চলছে যে সব বুনা জন্মনা কল্পনা বতই অবিশ্বাস্য অসম্ভব মনে হোক না কেন পরস্পরকে লেগলো জানালো হয়তো বা তার মধ্যে কোনো সূত্র মিলে যেতে পারে।

—কী বলেন আপনারা?

দেখা গেল জন্মনা কল্পনার ব্যাপারে দস্তগুপ্তের সাহসই সবচেয়ে বেশী। তিনি প্রথমেই বুধ ধুলেন, বললেন যে তাঁর ধারণার বসন্ত একটা নতুন ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার ইলেক্ট্রন বা বিদ্যুৎকণাকে কাজে লাগাত মহাকাশের বিপরীত শক্তি তৈরী করতে কতকগুলো ট্রান্সিস্টরের সহায়তায়। তবে এই ট্রান্সিস্টরগুলো চালু করবার শক্তি যে কোথা থেকে আসতো সে সবচেয়ে তাঁর কোনো ধারণাই নেই।

দস্তগুপ্ত পরে সুরাহামনিয়ন বললেন, যে তাঁর মতে বসন্ত ছিল একটা অভিন্ন সোলার ব্যাটরী (Solar battery)। রবিরশ্মির তেজ কোনো অজ্ঞাত উপায় বসন্তা কাজে লাগত মাধ্যাকর্ষণের বিপক্ষতা করতে।

দস্তগুপ্ত আর সুরাহামনিয়ন স্রোতের বন্ধ লক্‌সেটটা খুলে দিলেন। তারপর শুরু হয়ে গেল নানা রকমের উদ্ভট জল্পনা কল্পনা। দেখা গেল কল্পনামাশ্রিত কারোই কম নয়। কেউ বললেন বসন্তা একটা কুয়ে সাইক্লোট্রন-চুম্বকশক্তির সাহায্যে পরমাণুর বা বিদ্যুৎকণার শক্তি ও গতি বহুগুণ বাড়িয়ে ছোঁয়ার একটা উপায়। কেউ বা বললেন কস্মিক পার্টিকুলের অধিকশক্তি আহরণ করা যেত হবিবুল্লার মেশিনে।

অমল বন্দ্যোপাধ্যায় মতে একটা নতুন তরংগ সৃষ্টি করাটাই বসন্তার মূল কাজ ছিল, সে তরংগ মাধ্যাকর্ষণ—তরংগের বিপক্ষতা করতে। পলিটিক্স রম্মি বিপরীত পদার্থ বা অ্যান্টিম্যাটার সৃষ্টি হত বাসন্তার থেকে, ফটিকের মতো সে শক্তি পরমাণুগুলোর পরস্পরের দৃষ্ণ বজায় রাখে, তেমনি ধারা কোন অজ্ঞাত শক্তিকে পৌষ মানিয়েছিল হবিবুল্লা—এই ধরনের কতো রকম কথাই উঠল।

শংকরের লক্‌সেটের মনে ধরল রাও-এর মতব্য, আইনস্টাইনের মতে প্রাক্টিসেশনের মূলে আছে কোন পরার্থের কাছাকাছি Space—warp এর সৃষ্টি মহাপ্রকৃতি হুসড়ে বৈক বাওয়ার কলই মহাকর্ষ। হবিবুল্লার বসন্ত ছিল একটা কোন সর্বল ব্যবস্থা—মহাপ্রকৃতি আর সোজা করে কেসবার।

প্রফেসর শিকদার আহাঃ! পূর্বের পূর্ব আবার আরাম কোয়ার্ড আশ্রয় নিয়েছেন। পয়স নিশিগ্ণতার সঙ্গেই চুপট থেকে ঘোঁরা নিচাপন করে চলেছেন—যেমন যথেষ্ট যে ফুঁকন করে চলেছে

সেদিকে কর্পণাত না করেই। কোন মন্তব্যই শোনা যায় নি এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে।

কৃষ্ণাচারী এবার শিকদারকে নিয়ে পড়লেন। আপনায় মতামত তো জানা গেল না, প্রফেসর শিকদার?

একরাত ঘোঁরা ছেড়ে শিকদার বলেন, দেশের বৈজ্ঞানিকদের একটা গুণের তুলনা পাওয়া ভার। সেটা হচ্ছে আকাশকুসুমের চাব। এদের সকলের বৈজ্ঞানিক না হয়ে রূপকথার লেখক হওয়া উচিত ছিল। তা হলে বোধ হয় ভারতীয় শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ হত।

এবার বসন্তার কথা।

আমার মতে, ওটা একটা ভাড়া আলুমিনিয়ামের বাস ভাড়া আর কিছুই নয়। অন্ততঃ আমার চালসে ধরা চোখ ওর মধ্যে আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারে নি। আপনাদের রংগার কবিকল্পনার যোগ দিতে পারলাম না বলে মার্জনা করবেন।

হবিবুল্লার সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটু বিরাট কীকী রয়েছে গেছে। মানে, কতকটা ভেতরী খেলার মতো। মফের ওপরে পাড়িয়ে বাহুর ধলির ভেতর থেকে বের করে চলেছেন কবুতর না হয় ধরগোস একটার পর একটা করে। বাহুর ধলির কারিকুরি অনেক সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রাণসৃষ্টি সম্ভব তো আর তাঁর নেই। আসল ব্যাপারটা বটেই দর্শকদের চক্ষুর অন্তরালেই। প্রত্যেক রোমহর্ষক, অসম্ভব বাহুর খেলার পেছনে রয়েছে কৌশল। প্রত্যেক ম্যাগিকের মূলে আছে সহজ আর সরল ব্যাখ্যা।

কিছু অ্যান্টিপ্রাডিক্ট? অসম্ভব।

শিকদারের কথার অবজার সুরটা শংকরের মর্মে নিয়ে কোথায় আঘাত করে। ভর্তুকি করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় সে।

প্রফেসর শিকদার, কাল পর্যন্তও আমি আপনায় হতেই পারি দিতাম। কেউ যদি আমার বলতো, ও হে, আজ একজন বাহুরকে উড়তে দেখলাম আকাশে, তাহলে তার কথা আমিও উড়িয়েই দিতাম। বলতাম আমাদের প্রত্যক্ষদর্শীর মতিজ্ঞান হয়েছে, না হয় বাহুর কৌশলে সে হয়েছে নাভানাব্দ। কিন্তু প্রাণ একেই ওটা এই যে, ক্যামেরার নিষ্ঠুর চোখকে হবিবুল্লা কীকী দিল কেমন করে?

শিকদার শংকরের যুক্তি মেনে নিয়ে বলেন, সেই সমস্তাই তো সমাধানের চোঁটা করছি এতক্ষণ ধরে। হবিবুল্লার বাসন্তা বিশ্লেষণের আশার বুখাই সময় না করছেন আপনারা। তবে সে আপনাদের অভিজ্ঞতি। দেখুন, কতকগুলো পায়রা বেরিয়ে আসে বাসন্তার থেকে।

নিজের বিসিকতার অটহাত করে ওঠেন শিকদার।

খামোড়িও কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, এবার বললেন—

একদিক থেকে দেখতে গেলে হয়তো প্রফেসর শিকদার সত্য কথাই বলেছেন। আপনারা বোধ হয় ভেবে দেখেননি এ কথাটা। যে বাসন্তা হয়তো 'অ্যান্টিপ্রাডিক্ট'র ক্ষেত্রে একবারেই গৌণ। আসল ব্যাপারটা সম্ভব করেছিল হবিবুল্লা যোগশক্তির সাহায্যে। আমাদের দেশে অনেক নকীর আছে এ রকম 'লেভিটেশন'-এর অনেক বিশ্বাসযোগ্য লোকের লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে। আমরা অবশ্য নিজের পৌত্তাল্য হাবনি-এরকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করার। তবে বোধ-পদ্ধতিতে অনেক দুসম্মত পারীক্ষিক পরিবর্তন যে অন্যায় সে সম্ভব করা

বার এ আমি নিজের অভিজ্ঞতার দেখছি। যেমন ধরুন—ইচ্ছাবৃত্ত
জংশন বাঁড়ানো বা কমানো, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আর ধমণিতে রক্ত
চলাচলের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ, শরীরের তাপ কমিয়ে ফেলা। আমাদের
আগ্রহে অনেক যোগীকে পরীক্ষা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।
হয়তো মাধ্যাকর্ষণকে জয় করবার শক্তি মানুষের মধ্যেই অস্বাভাবিক
রয়ে গেছে। হবিবুল্লাহ সন্ধান পেয়েছিল সে গুপ্তশক্তির উৎসের।

শংকর প্রায় তোলে, তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করে নেওয়া
গেল আপনার কথাটা, কিন্তু ও বাস্তবতার তাহলে প্রয়োজন কী ছিল?

হামীজি বলেন, আমি সে কথাতেই আসছিলাম। শিশু যখন
প্রথম দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে দেখে তার দরকার একটা
অবলম্বনের। যন্ত্রটার প্রয়োজন হয়েছিল একটা অবলম্বন হিসাবেই।
ধরুন, মোটর গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য চাই 'স্টীয়ারিং হুইল',
'গিয়ার', 'ব্রেক', 'অ্যাক্সিলারেটর'। কিন্তু গাড়ীটাকে চালু রাখবার
আসল ব্যবস্থার সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক নেই—সেটা আসছে ইঞ্জিন
থেকে।

—মনে করুন, যন্ত্রটা হচ্ছে একটা ছোটোখাটো 'রেডার'।
খুবই অসম্ভব মনে হচ্ছে কি?

শংকর চিন্তা করে দেখে—হামীজির বৃষ্টি চট করে এড়িয়ে
যাওয়াও চলে না।

প্রফেসর শিকদার বলে শুটেন, তাই যদি হয়, তবে এ প্রজেক্টে
বৈজ্ঞানিকদের ডেকে আনবার সার্থকতা কী? আপনার যোগাশ্রম

থেকে সকলকে এখানে নিয়ে আসুন, দরকার হচ্ছে ভৌতাসিরি
আশ্রম থেকে সাধুদের পাকড়াও করে দলবৃদ্ধি করুন। এর ওপরে
'সাইবারনেটিক' পদ্ধতির মান রাখবার জরুরি না হয় বাস্তব থেকে
ডেঙ্কিওয়ালা আর গাঁ থেকে ভুতের ওঙ্কাদের ধরে নিয়ে আসুন।
তাহলেই তো কার্যসিদ্ধি হবে।

হামীজির সৌম্য মুখ রান হয়ে যায় এই অপ্রত্যাশিত স্নেহে।

কৃষ্ণস্বামী এবার হামীজির গুরু নেবার চেষ্টা করেন—

প্রফেসর শিকদার, বৈজ্ঞানিকের কাজ হচ্ছে সমস্ত থিয়োরি—
বত অসম্ভবই মনে হোক না কেন, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা। যদি
অধিকাংশ যোগশক্তিই হবিবুল্লাহর আবিষ্কারে মূলে থেকে থাকে, তবে
তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতে হবে তো। হেসে
উড়িয়ে দিলেই ত চলবে না।

ভেবে দেখুন, আদিমকালের গুহাবাসী মানুষের কী নিদারুণ ভয়ই
না ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগে অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, ভূমিকম্প, বজ্র-
বাত্যা, বিদ্যুৎ বা বজ্রনির্ঘোষ সব কিছুই ছিল তার বুদ্ধির বাইরে।
তার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে এসবের কোনোটারই স্মৃষ্টি ব্যাখ্যা মিলত
না। তাই এগুলোকে সে ধরে নিত দেবতা বা অপদেবতার প্রকাশ
বলে।

নৈসর্গিক ব্যাপারের কারণ নির্ণয় করতে মানুষের লেগেছে হাজার
হাজার বছর। এখন দেবতা বা অপদেবতারের ঠেলে পেওয়া চলেছে
দর্শন বা ধর্মশাস্ত্রের মেঘের আড়ালে। তাঁরা এখন আর বণক্ষেত্রে

ও.আর.সি-এল এর

কুমারেশ্বরী

লিডার ও স্টেটেরী পীতু

দি ওবিয়েক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

অবতীর্ণ হয়ে পলা বা তুরায়াল ঘুরিয়ে নিজ হাতে সহায় করেন না, বড়ো বড়ো কোম্পানীর ‘একজিকিউটিভ’দের মত ‘সুইচ’ অথবা ‘কলিং বেল’ টিপেই বিস্ফোরণাদি চালান। আত্মকন্দের সংগে স্বগড়া বাঁচাবার জন্য আমাদের বলতে হয় যে দেবতাদের আজ পদোন্নতি হয়েছে।

আজকের মানুষ যদি নিঃসন্দেহে যেনে নিত যে তড়িৎ ভগ্নবানের দুর্বোধ্য নীলা সে সবকে বিজ্ঞানের কোনও কর্তব্য নেই তাহলে মাথার ওপরে ওই বিজ্ঞানীবাতিগুলোর অস্তিত্ব থাকতো না।

আজকে আপনি অ্যাণ্টিনাগুলির বা বোগশক্তির অস্তিত্ব উড়িয়ে দিতে চাইছেন। মনে করুন নিউটনের যুগে কোনো বৈজ্ঞানিককে যদি বলা হত যে রেডিও টেলিভিশন সম্ভব তাহলে সে বৈজ্ঞানিকের প্রতিক্রিয়া কেমন হত? কল্পনা করেছেন কোনোদিন?

শংকর এতক্ষণ চুপ করে এঁদের মন্তব্য শুনে বাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ তার মনে উদয় হল এক ভয়াবহ সন্দেহের। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল—

আপাততঃ স্থগিত রাখা যাক বোগশক্তি, আণবিক, আত্মশক্তির কথা। তা নিয়ে তর্ক সুরু করলে রাত কাবার হয়ে বাবে। শুধু সে জন্য নয় আর একটা কারণে আপনার বক্তব্যে বাধা দিলাম সেজন্য দয়া করে ক্ষমা করবেন, প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী। একটা বিপদের কথা আমার মরণে এসেছে। সেটা আপনারদের সর্বাপেক্ষে জানানোর প্রকার।

যে নেওয়া যাক যে মাধ্যাকর্ষণের সংগে লড়াই করবার সমস্ত উপকরণটাই মজুত ছিল ওই বাজটার মধ্যে। এ কথাটা আপনারা ভেবে দেখেছেন কি না জানি না যে মহাকর্ষ মানুষ একমুখ দিয়ে বিজয় করেছে পাঁচটা শক্তি লাগিয়ে, যেমন স্পাটনিক অথবা লুনিক। কিন্তু অতটুকু বাজের মধ্যে ধরানো যায় এমন কোনো শক্তি আমাদের জানা আছে কি?

এ প্রশ্নের একটা ভয়াবহ উত্তর এইমাত্র আমার মনে এসেছে। আমি পরমাণুশক্তির কথাটা ভাবছি।

ভেবে দেখুন, হবিবুল্লা জানালা দিয়ে টিশারপুরের বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করার সংগে সংগেই একটা বিস্ফোরণ হল। আকাশের ছবিগুলোর লক্ষ্য করে থাকবেন—বাড়ীর ওচলটীতে কিন্তু আগুনের কোনও চিহ্ন ছিল না। হবিবুল্লা প্রবেশ করল আর তার পরের মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়লো অগ্নিশিখা। হঠাৎ আসে পড়ল সমগ্র দেওয়ালটা।

আমার অল্পমান যদি সত্য হয় তবে বজ্রটাতে ছিল একটা উগ্র ধরণের রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ। সম্ভবতঃ এখানো পর্বত পরমাণু রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে বজ্রটা থেকে। কে জানে, আমরা এর মধ্যে কতটা পরমাণুশক্তি সেবন করছি। হয়তো বা আমাদের সকলের মৃত্যুও হতে পারে এ অনবধানতার জন্য।

যত্নের মধ্যে বিস্ফোরণ হলেও এর চেয়েও তত্ত্বিত হত না কেউ। সবথেকে বেড়ে উঠল অসুট আর্কাদ বৈজ্ঞানিকদের কণ থেকে।

কৃষ্ণস্বামী দ্বিপ্রহাত বজ্রটিকে তুলে নিয়ে বারান্দার ধর করে দিলেন। ক্রিয়ে এসে বললেন—তাই তো। এ কথাটা আমাদের একেবারেই মরণ ছিল না। এ অনবধানতার জন্য একমাত্র দায়িত্ব আমারই। জ্ঞানী এখনই পাঠাচ্ছি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য।

কৃষ্ণস্বামী আবার ব্রহ্মপদে বেরিয়ে বাল ঘর থেকে।

নীরবতা ভগ্ন করে স্মিত্রা—শংকর, তাই যদি হয়, তবে হবিবুল্লা ওটকে পিঠে নিয়ে বেড়াতো কী করে?

শংকর বলে, আমরা এমন কোন প্রমাণ পাই নি যে হবিবুল্লা ওটাকে সর্বক্ষণ পিঠে বেঁধে ঘুরে বেড়াতো। হবিবুল্লার সময় ওই বজ্রটা ব্যবহার করা হাড়া তার কোন উপায় ছিল না।

আর একটা কথা, হবিবুল্লা সরকারী পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে চেয়েছিল বজ্রটির পরীক্ষা করতে। সেটা কিসের জন্য? আমার মনে হয়, তার সম্মত ছিল যে তার বজ্রটার মধ্যে কোথাও ভয়ের কারণ হয়ে গেছে।

স্বামীর আদেশে ইতিমধ্যে বজ্রটাকে ভরা হয়েছে একটা লোহার তোরঙ্গের মধ্যে। সম্ভবপক্ষে সেটা ট্রাক তুলে দেওয়া হচ্ছে একটা বিস্ফাট মিলিটারি ট্রাক-এর পেছনের দিকে। ঘরের টেলিফোন তুলে দেশরক্ষা বিভাগের ল্যাবরেটরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন কৃষ্ণস্বামী—তারপর ঘোষণা করেন যে আঘাতের মধ্যেই জানা যাবে জাঃ রায়ের সম্ভব সত্য কিনা।

সকলের কথার সব রকমের তর্কের উৎস হঠাৎ শুকিয়ে গেছে। অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়চারি শুরু হয়েছে। প্রফেসর নিকদার আরায কেদারায় উঠে বসেছেন—উঁচু হাতের চুচুটটা গেছে নিভে।

শংকর চেয়ে দেখে বিভিন্ন মানুষের মুখে মৃত্যু ভয়ের বিচিত্র বিকাশ। কারো মুখে ফুটে উঠেছে চরম হতাশা। কারো উত্তেজনা কারো বা রাগ। স্মিত্রাই কেবল এর মধ্যে অবচলিত। নীরবে শংকরের পাশে এসে সে পড়ায়। শংকর মনে মনে স্মিত্রার প্রশংসা না করে পারে না।

অমল বন্দ্যোপাধ্যায় নানা রকমের প্রতিবেদক ঠগদের কথা বলে চলেছে—বি, এ, এল; ই, ডি, টি, এ; অনিন ট্রাইকার্সনিক অ্যালিড, আয়ন একসচেজ রেজিন।

নিজের মনে কোনো প্রতিজ্ঞার অভাব লক্ষ্য করে শংকর বিম্বিত হয়। হয়তো বা মৃত্যু ভরে তার স্নানমণ্ডলী অসাড় হয়ে গেছে তাই এই চরম বিপর্যাস তুলতে পারছে না তার চেতনায়। এত বড় জীবন-মৃত্যুর চমকপ্রদ নাটকের সেই যেন একমাত্র দর্শক।

কৃষ্ণস্বামী সামান্য বিচলিত হলেও বৈধ হারান নি, সকলকে আশ্বাস দেবার বশাসাধ্য চেষ্টা করেন। সভাস্থলে শৃংখলা কিয়দে আনবার জন্য বলেন—আপনারা বিচলিত হবেন না, ভেবে দেখুন এমন কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ ওই বাজটার মধ্যে, থাকলে এতদিনে আমার মৃত্যু হতই উচিত ছিল। আপনারদের সংগে ওই বাজটার সম্পর্ক তো কেবল মত্রে দু ঘণ্টার। আপনারা দিল্লীতে আসবার দু সপ্তাহ আগে থাকতে ঐ বজ্রটাকে নিয়ে আমরা সর্বক্ষণ নাড়াচাড়া করছি।

আর তা হাড়া ‘তখন জোরালো পরমাণুশক্তি যদি থেকেই থাকে ওই বাজটার মধ্যে তবে হয়তো মৃত্যুকে এড়াবার কোনও পথই নেই আমাদের। সেজন্য বুঝা চিন্তা করেই বা কী লাভ? মরতে তো একদিন হবেই।

কৃষ্ণস্বামীর কথার শংকর বিহ্বলতা কেটে গেলেও পরিপূর্ণ

আশাসও কেউ পায় না। উৎসেগের ছায়াটা রয়েই যায় প্রায় সকলের ঘুখে।

কুতুখামী বলে যায় আপাততঃ কিছুকনের জন্ত যেডিও অ্যাণ্ডিভিটির কথাটা তুলতে চেষ্টা করুন এটাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। বখন এখনও বেঁচে আছি তখন সব চেয়ে জরুরী কথাটা হচ্ছে যে ভবিষ্যতের কার্যক্রমের একটি পরিকল্পনা করতে হবে। কিন্তু পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হলে চাই নিশ্চিই কোনো 'আইডিয়া'।

আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগদান করার আগে নিজেরদের মধ্যে আমরা প্রচুর আলোচনা করেছি হবিবুল্লার বন্ধ সম্বন্ধে। আমাদের মনেও যে দু-একটা বহনবীর উদ্ভব হয়নি—এমন কথা বলছি না। কিন্তু কার্যক্রমের কোনো সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারিনি। কিন্তু মাত্র এক ঘটনার সমবেত চেষ্টায় আমরা পেলাম নানা রকমের মত—কতো রকমের 'আইডিয়া'। কে বলতে পারে ভাগ্য করে অহুসন্ধান করলে আজকের এই নিতান্ত খরোয়া আলোপ-আলোচনা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে—প্রফেসর শিকদার বাকি বলেন "আকাশ-কুসুমের চাব"—অ্যাণ্ডিভিটিটির মূল স্বরূপ আবিষ্কার করা হবে কি না?

এক ঘটনা আগে একটা কার্যক্রমের কথা চিন্তা করাই অসম্ভব ছিল। কিন্তু এখন আমাদের সামনে রয়েছে বহু সম্ভাবনা—তার মধ্যে কোন কোনটার হয়তো বৈজ্ঞানিক অহুসন্ধানও সম্ভব। কার্যক্রম আরো সীমাবদ্ধ করে ফেলাটাও কিছুই অসম্ভব নয়। হবিবুল্লার জীবনী এক কপি করে আপনারদের বিতরণ করা হয়েছে। কাগ বিকালে আপনারদের হবিবুল্লার বাড়ী ও ল্যাবরেটরী পরিদর্শন করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন একটা বিষয়ে—আজকের 'আইডিয়া'গুলোর মধ্যে কোনগুলো দিয়ে অগ্রসর হওয়া হবিবুল্লার পক্ষে সম্ভবপর হতো।

কাজ আরম্ভ করতে হলে আপনারদের প্রথমেই প্রয়োজন একটা ল্যাবরেটরী। হবিবুল্লার বিরাট গবেষণাগার সৌভাগ্যক্রমে আমাদেরই তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সরকার ছেড়ে দিচ্ছেন সে ল্যাবরেটরীর সম্পূর্ণ ভার আপনারদেরই ওপরে—'প্রজেক্ট-এ'র কাজের জন্ত। যে গবেষণাগার থেকে প্রথম অ্যাণ্ডিভিটিটি মেশিনে আবিষ্কৃত হয়েছিল, দ্বিতীয়বার সে আবিষ্কার সম্ভব করবার সাধনার সে গবেষণাগারের চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত স্থান আর কোথাও পাওয়া যাবে কি? এ ছাড়া সরকার হলে নিজের যে কোনো গবেষণাগার আমাদের ব্যবহার করতে পারবে।

ভেবে দেখুন, অক্টোবর কী পরিহাস! হবিবুল্লার চেয়েছিল মাত্র

একখানা ঘর আর কতকগুলো সাধারণ উপকরণ। আজ তারই কাজের পুনরাবৃত্তি করবার জন্ত হয়তো বা নিফল আরোজনাই—স্বল্প হয়েচে বিরাট পরিকল্পনা। সেদিন যদি তার কথার কর্ণপাত করতাম!

বাই হোক, বুঝা আকশোস করও লাভ নেই। এবারে সমিতি গঠন করতে হয়—দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্বন্ধে ভাবে পরিচালনা করবার জন্ত। কমিটির নামে বীরা ভদ্র পান, তাঁদের আশাস দেবার জন্ত বলা যায় যে, এটা নিতান্ত খরোয়া ব্যাপার। আপনারদের মধ্যে কেউ যদি স্বতন্ত্রভাবে কোনো একটা পুঙ্খ ধরে কাজ করতে চান—তাঁর কাজে কোনো রকম ভাবেই বাধা দেওয়া হবে না। কিন্তু সে-কাজের কলাকলটাও সঙ্গকে জানাতে হবে নিয়ম মতো।

মেধা গেল, সকলেই একবারো সম্মতি প্রকাশ করলেন কুতুখামীর প্রস্তাবে। ছিব হোলো যে, সমিতির মেয়াদ আপাততঃ রাখা হবে চার মাস—তার পরে পুনরায় নির্বাচন হবে। সর্বস্বত্বত্বক্রমে প্রফেসর গোপালাচারীকে করা হল সভাপতি 'আর মি: জন হলেন সহ-সভাপতি। সুমিত্রা এই সুযোগে নিজের ওপরে থেকে সম্পাদনার ভার নামাতে চেষ্টা করল কিন্তু সহকর্মীদের প্রবল আপত্তিতে সে চেষ্টা সফল হল না। শংকরের ওপরেও ভার পড়ল একটা—সাদ্য বৈঠক পরিচালনা করবার।

নির্বাচনে শেষ না হতেই টেলিফোনে পাওয়া গেল হবিবুল্লার বন্ধ সম্বন্ধে বিপোর্ট। শংকরের ভদ্র অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'রেডিয়েশন মনিটর' দিয়ে পরমাণুশক্তির কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। 'গাইগার কাউন্টার' আর 'সিটিলেশন কাউন্টার' দিয়ে পরীক্ষা করতে আরো কিছু সময় লাগবে যদি সামান্য পরমাণুর তেজ থেকে থাকে ঘটটার মধ্যে।

এ খবরে সবচেয়ে উজ্জসিত হল কিন্তু শংকর সে মন্তব্য করলে—বাক, এতগুলো থিয়োরির জল্পালোচনায় একটাকে তো বার দেওয়া গেল! সেটাও বড় কম কথা নয়।

মেধা গেল, ঘরের মধ্যেও গুমোট হাওয়াটা হঠাৎ কোন্ মন্তব্যে হাকা হয়ে গিয়েছে। স্বীকর্ত বনের মধ্যে বেন চুকলো এক কলক বসন্তের হাওয়া ফুলের সৌরভ আর পাখীর গানের সংবাদের নিয়ে। শংকরকে সহ করতে হল অনেক পরিহাসের বাণ। বলা বাহুল্য, এই লক্ষ্যভ্রমের খেলায় সুমিত্রাই এলো অগ্রণী হয়ে।

এ কাহিনীর সঙ্গে সে-সব ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই বলে সেগুলো না হয় বাইই দেওয়া গেল। [ক্রমশঃ।

অপরিচিতাকে

এডগার এলেন পো

হুঃখ আমি করছি না তো : এই যে পৃথিবীতে
আমার ভাগ্যে পার্থিব সুখ শান্তির নেই লেশ—
এই যে আমার অনেক কালের প্রেমকে চাপা দিতে
কণকলসের পরিহাসই ব্যাধিতে আসবে।

হুঃখ আমি করছি না তো : হতভাগ্যেরাও
আমার চেয়ে সুখী এবং শিষ্ট হলে বলে ;
হুঃখ তবু : ভাগ্যে আমার তুমি যে তুলে দাঁড়
সহানুভূতি, বখন আমি পাশ দিয়ে বাই চলে।

অহুসন্ধান : প্রকল্পকুমার দত্ত

ভলতেয়ার—জীবন ও দর্শন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

উপমহ্য

ইতিহাসের আলো

ভলতেয়ারের এই নির্ধারনের মূল ছিল বার্লিনে প্রকাশিত তাঁর অন্তিম শ্রেষ্ঠ এবং সুবৃহৎ অবদান। বইয়ের নাম—An essay on the morals and the spirit of the Nations from Charlemagne to Louis XIII; বইয়ের নামেই কুটে আছে লেখকের বক্তব্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা। Circyতে বান্ধবীকে হত্যা করার প্রেরণায় এই বইয়ের পরিকল্পনা, বার্লিনে এই বইয়ের প্রকাশ।

ইতিহাসের প্রতি ছিল বান্ধবীর বিষম বিরাগ। ইতিহাসকে তিনি বলভেন, পুণ্যতন পঞ্জিকা...বা অন্তরকে উন্মেল করতো করে কিন্তু উদ্দীপ্ত করে না। ভলতেয়ারও তাঁর এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলেছেন এই একই কথা, বলেছেন, ইতিহাস হচ্ছে শুধু অসংখ্য দৃষ্টি আর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ভলতেয়ারের মনের কথা আলাদা। এমন ইতিহাস লিখবেন তিনি যা প'ড়ে শুধু বান্ধবীর অন্তর নয়, প্রতিটি মানুষের অন্তর উদ্দীপ্ত হবে। মানুষের কথা লিখবেন তিনি। লিখবেন ছোটখাটো ঘটনার কথা, যা একটু অন্তরকম হ'লে বললে বেতে পারতো পৃথিবীর ইতিহাস। দার্শনিকের দৃষ্টির আলো কেলেতে হবে ইতিহাসের পুরাতন পাতায়, রাজনৈতিক ঘটনার আড়াল থেকে আলোয় আনতে হবে মানুষের মনের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্নার কাহিনী। তাঁর বইয়ের মুখবন্ধে লিখলেন ভলতেয়ার, প্রত্যেক জাতির ইতিহাস কালক্রমে অসংখ্য গালগল্পে ভরে ওঠে। তারপর একদিন জলে ওঠে দর্শনের আলো, নতুন মানুষকে উজ্জীবিত করবে বলে। ইতিহাসের গাঢ় অন্ধকার পথে যৌর যৌর সঞ্চারিত হয় সেই আলোর রশ্মি। কিন্তু পথ আর পরিষ্কার হয় না, উদ্দীপ্ত হয় না মানুষের মন। যুগ যুগ ধরে সজ্জিত ভূগীকৃত কাহিনী, সংস্কার আর বিশ্বাসের বেড়াভাল, মিথ্যার মোহ আর হ্রিয় করা যায় না। মড়ার হাড় নিয়ে এই ভোজবাজির মহড়া শেষ করার কাজে হাত দিলেন ভলতেয়ার।

যেমন বিরাট তাঁর পরিকল্পনা তেমনি ব্যাপক তাঁর প্রভুতির ইতিহাস। অসংখ্য পত্র আর পুঁথি পড়লেন ভলতেয়ার। প্রয়োজনীয় বা কিছু সামনে পেলেন সব রাখলেন সঞ্গ্রহ করে। অসংখ্য চিঠি লিখলেন ঘটনার বাখ্যার্ঘ্য বাচাইয়ের জন্য। দিনের পর দিন একাধ্র সাধনার, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পড়ে ভুললেন, মানবৈতিহাসের এই বিরাট সৌখ।

মালমসলা সঞ্গ্রহ হ'ল, তারপর সূক হ'ল বাছাই আর সাজানোর কাজ। শুধু ঘটনার প্রতি কোনো মোহ ছিল না ভলতেয়ারের। তাঁর হাতে যে ঘটনা দিয়ে নতুন পথের বোজনা সত্ত্ব নয়, সে ঘটনা সৈন্তের পিঠে বোঝার মতোই শুধু বাধা, আর কিছু নয়। বিকৃত পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক ঘটনা বিচার করে নিতে হবে, দিতে হবে

বৃহত্তর সম্ভাবনার ইঙ্গিত। তা না হ'লে মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক অসংখ্য বিবরণের ভাবে ক্লান্ত হবে মাত্র। সব ঘটনাই ইতিহাসের উপকরণ হবার যোগ্য নয়। ঘটনা জানার প্রয়োজন আজ মানুষের থাকতেই পারে। কথার অর্থ জানার প্রয়োজন অবশ্য মানুষের আছে আর তার জন্যে আছে অভিধান। তেমনি ঐতিহাসিক ঘটনার অভিধান সম্বলিত হ'লে আপত্তি নেই। আপনিও শুধু ইতিহাসকে অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় ঘটনা দিয়ে ভারাক্রান্ত করায়। তা'হলে কোন পরিকল্পনায় রূপায়িত হবে ভলতেয়ারের এই ইতিহাস?

ঠিক এই প্রশ্ন ভলতেয়ারকে কম ভাবায়নি। একটা ঐক্যের সূত্র খুঁজছিলেন তিনি, সে সূত্রে প্রয়োজনীয় ঘটনার ফুল সাজিয়ে ইউরোপীয় ইতিহাসের মনোহর এক মালা গাঁথা যায়। অবশেষে স্থির করলেন যে সত্যত্বের ইতিহাসই সেই সূত্র। স্থির করলেন যে, তাঁর ইতিহাসে রাজার কাহিনী থাকবে না, থাকবে শুধু বিভিন্ন আন্দোলন, বিভিন্ন ভাবধারা আর তার মাঝে জনগণের বিকাশ ও বিলুপ্তির বিবরণ। কোনো বিশেষ জাতি নয়, তাঁর ইতিহাসের উপজীব্য হবে সারা মানবজাতি। যুদ্ধ স্থান পাবে না তাঁর ইতিহাসে। সেই ইতিহাসের পাতায় পাতায় থাকবে নিত্য নব সিংগত্বের পানে মানব-মনের অভিধান। এই স্বপ্নকে বিস্ত্রষণ করে চিঠি লিখলেন তিনি, যুদ্ধ বা বিগ্রহ আমার পরিকল্পনার এক অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র; রাজার হাজার সৈন্ত জয়লাভ করলে কি পরাজিত হ'ল, কোন সূহর কতবার হাত বলল হ'ল—ও সব তো প্রত্যেক ইতিহাসেই লেখা আছে—কিন্তু মানুষের সৃষ্টি, তার মানব-বিকর্ষনের কাহিনীটুকু না থাকলে মানবৈতিহাসের মধ্যে লাখত সত্য, শিব আর সূক্ষর ব'লে কিছুই থাকবে না।

আমি সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে চাই না, লিখতে চাই সমাজের ইতিহাস; জানতে চাই কেমন ক'রে মানুষ যুগ যুগ ধ'রে তার সামাজিক জীবন, সাংসারিক জীবন বাপন করে এসেছে। কোন কোন কুষ্টির ধারক ও বাহক ছিল সে—অনুগা সব ঘটনার বিবরণে আমার বিশ্বাস নেই, রাজারাজড়ার কাহিনীর প্রতি মোহ নেই। আমার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মানব-বিকর্ষনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, মানুষ সত্ত্বপণে পা কেসে যুগ-যুগান্তের প্রচেষ্টার অর্থের অন্ধকার থেকে সভ্যতার আলোকে এসেছে। আমি জীকতে চাই মানুষের সেই প্রতিটি পদক্ষেপের চিত্র। এই ইতিহাস থেকে রাজার নির্ধারনের মাঝেই ভলতেয়ার লিখে রাখলেন আপামি দিনে দেশে দেশে সিংহাসন থেকে অপসারণের ইঙ্গিত। ভলতেয়ার শুধু নতুন ইতিহাসই লিখলেন না, সঙ্গে সঙ্গে গাইলেন বুরবো বংশের বিদায়-সঙ্গীত।

এই একান্ত সাধনার ফলে বিখ্যমানবের হাতে এল প্রথম ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা—ইতিহাসের দর্শন। যুগ-যুগান্তব্যাপী জীবনযাত্রার ইউরোপীয় মানব-বিকর্ষনের বিশেষ ধারাতিক নিষ্টি

জীবনের আর এক অধ্যায়। শুধু শেষ জানি না। তবে চলেছি। কোথায় চলেছি জানি না। শুধু জানি বাঁচতে হবে। যেমন করেই হোক, টিকে জামাকে সঙ্গরে থাকতেই হবে। অনেকদিন হলো ভুবনেশ্বর ছেড়ে কোলকাতা এসেছি। ভাল একটা চাকরীও পেয়েছি। রত্ননাথ সরকারের চায়ের দোকানে আনাগোনার দিনগুলোতে জানতাম জীবনে চাকরী পাওয়াটাই হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু চাকরী পাবার পর সে ধারণা আমার পাশটো গেছে। শিক্ষা-বীক্ষা থাকলে, সুযোগ সুবিধে মতো চাকরী একটা পাওয়া যায়। বেকার জীবনে টিউশনিও কোটো। দুইয় হলো মহানগরী কোলকাতার বৃক্কে আমাদের মতো সাধারণ চাকুরীদের পক্ষে একটা ভাড়ার বাড়ী পাওয়া। এমন নয় যে কোলকাতা সহরে বাড়ী নেই কিবা। মালিকরা তা ভাড়ায় দেন না। বাড়ীও আছে, ভাড়াও পাওয়া যায়। তবে হুশো পঁচিশ টাকা মাসে অফিসারের জন্য নয়।

শালাব সঙ্গার বেড়ে গেছে। বুড়ো মা। এখনতো একেবারে বেকার নই। আগের তুলনায় ভালই আছি। সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালনের আমারও দিন এসেছে। মা এখন আমার সঙ্গে চলননগরেই থাকেন। কোলকাতা থেকে ৪০ মাইলের দূরত্ব। কি আর করা বাবে, সহরে এখন জায়গা নেই তখন সহরতলীতেই থাকতে হয়। লোকাল ট্রেনে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করি। সকালে আটটার গাড়ী ধরতে হয়। নিত্যের ভাড়া। নাকে মুখে ছুটা ভাত শুভে ট্রেন পানে ছুটি। গাড়ীর ছুটার মিনিট আগেই পৌঁছুই। ভাত একদিন না খেলেও চলেতে পারে, কিন্তু আশিসের দেবী হলে আর রন্ধে নেই। ঘাণ করে 'লেট মার্ক' হয়ে বাবে। আমার আবার সেইটেই সবচেয়ে বড় ভয় কিনা।

ডেলী প্যাসেঞ্জারের দুর্গতির কথা ভাবায় বলা সম্ভব নয়। বসতে জায়গা পাওয়াতো বাপের ভাগ্যি। 'ফুট-বোর্ডে ঝাঁড়ানো আর 'হাওল' ধরার অধিকার নিয়েই তুমুল কাণ্ড হয়ে যাবে। বুলতে বুলতে কোন মতে এসে হরমত হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। তবে গেট থেকে সবাই আগে বেরবার তাড়াহড়োতে অনেককেই হাতের ছাতি লাগি হারাতে হয়। ভিড়ের ঠোঁড় পারের চটি হারিয়ে আমাদের একদিন খালি পায়ে আশিস বেতে হয়েছিল। একা হলে হয়ত হোটেল মেসেই থাকতাম। হুঁচিল হয়েছে মা-কে নিয়ে। বুড়ো মাতুল। কষ্ট তাঁর সইতেও পারি না, আবার কিছু করতেও পারছি না। একটা ছুটা বাস নয়, আজ আড়াই বছর ধরে চেষ্টা করলেও একটা ঘর ভাড়া পাইনি। লোকাল ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো, বোজাই আমি ভাঁড় ট্রেনে আশিসটাতে আসি যাই।

দৈবের ঘটনা। আশিস কেয় বাড়ি ফিরছি। এসুগ্রানোড়ে গাড়িরে আছি হাওড়ার ট্রাম ধরবে বলে। হঠাৎ একখানা হাত পেছন থেকে ধাক্কা এসে ঠক্কো। 'কি ভায়া চিনতে পারেন?' আমি তো অবাক। এভাবে এতদিন পরে আবার যে সরকার মশাইয়ের দেখা পাবো ভাবতেও পারিনি। মিনিট দুই মুখ থেকে কথাই সলোনা। বিষয়ে আর আনন্দে হতবাক হয়ে গেছি। 'আমি রত্ননাথ সরকার। সেই যে ভুবনেশ্বরের চায়ের দোকান মনে পড়ে?' 'সবই মনে পড়ে সরকার মশাই, সে কি আর ভোলার কথা। সত্যিই আপনাকে এখানে এভাবে দেখবে। ভাবতেই পারছি না। কতবে খুশী হয়েছি বলে বোঝাতে পারবে না।' 'সরকার মশাই হুচু কি হাসলেন।' 'আমিতো ভাবলাম বুঝি চিনতেই পারেননি। বাকু ভাল কথা, কোথায় চলছেন?' 'ট্রামের অপেক্ষা করছি। হাওড়া যাবো। চলননগরে থাকি। লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করি।' 'চলননগর?' 'এই, পুরে।' 'কি আর করি বলুন। চাকরী একটা ভালই হয়েছে। তবে কোলকাতা সহরে আমার ভাগ্যে বোধ হয় বাড়া লোনা নেই। মা-কে নিয়েতো আর হোটেল থাকতে পারি না। তাই...' 'থাক ও সব কথা পরে শুনো এখন চলুন আমার সাথে।' 'কোথায়?' 'জামবাজার। আমার

শুভরবাড়ী। পুজোর ছুটিতে আমরা সবাই এখানে বেড়াতে এসেছি। দ্রীর বাপের বাড়ী থাকতে আবার উঠবে কোথায়?' 'কিন্তু বড় দেবী হয়ে বাবে না? মা বাড়ীতে একা চিন্তা করবেন। তাই বলছি আর একদিন বাবেখন।' 'না না তা হতেই পারে না। একদিন মহাভারত অন্তত হয়ে বাবে না। মা ঠিকই বুঝবেন জোরান ছেলে বড় বাকবের সাথে ছবিটাবিতে গেছে। চলুন, চলুন।' 'কিন্তু...' 'কোর' কিন্তু নয়। চলুন এক সাথে আপনার হু' কাজ হবে। গিল্লীর সাথে পরিচয়টাও হয়ে বাবে। আর শুভর মশাইকে বলে তাঁর বেলেঘাটার বাড়ীতে আপনার জন্য একটা ফ্ল্যাটেরও ব্যবস্থা করে দেবো।' এবার কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বাড়ীর ব্যবস্থা হতে পারে এর পরেও কি আমি না বলতে পারি। '... চমৎকার লোক যনতাম রায়। তবে হ্যাঁ, সরকার মশাইয়ের বোগ্য শুভরই বটে। সরকার মশাইকে তবু ধামানো যায়। রায়মশাই একবার মুখ খুললে রাত কাবার করে দিতে পারেন। হাফুপে। ভালই হলো। রায়মশাই জামাইয়ের কথা মতো তাঁর বেলেঘাটার বাড়ীতে আমার রাখতে রাজী হলেন। নিত্যক সৌভাগ্য করতে হবে। সরকার মশাইকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই। রাত হয়ে যাচ্ছিল। ভেতর থেকে ডাক আসায় রায়মশাই উঠে গেলেন। বাবা: বাচা গেল। এবার মনে হয় সরকার মশাইয়ের পালা। তাড়াতাড়ি কোর দরকার। এখনও সরকার গিল্লীর সাথে পরিচয়টা হলো না। বাবার আগে আর একবার বলে দেখা যাক। 'সরকার মশাই সবইতো হলো তবে গিল্লীর যে দর্শন দেবার নামটি নেই। কি ব্যাপার? কীকিতে পড়লাম নতো?' 'কীকিতে পড়বেন কেন, ঐ দেখুন...' জমীতা ধালভর্ষি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাঙালী গিল্লী। ঠিক বা ভেবেছি। 'আচ্ছা সরকার মশাই এত কষ্টের কি দরকার ছিল? শুনাক শুধু শুধু বিরক্ত করা হলো।' 'বিরক্তের কিছুই নেই। আপনার কথা ভুবনেশ্বর থাকতে কত গুনতাম। খাবার জিনিষ মুখটি বুজে খেয়ে যান।' এক নিমিষে কথাগুলো শেষ করে যোমটা টেনে সরকার গিল্লী এক রকম দৌড়েই পালিয়ে গেলেন। বাঙালী ঘরের লজ্জা। 'ভালই হলো, কি বলেন সরকার মশাই। পেটটি পুরে খাওয়া যাক।' 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' '... অনেক দিন এমন রাত্রা খাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, বাঙালী মেয়ের রান্নার হয়ত জগতে তুলনা মেলা ভার। 'কেমন লাগছে?' 'চমৎকার। গিল্লীর আপনার তুলনা নেই সরকার মশাই। দাদার ওখানে গেলে বৌদি বেঁচে খাওয়াই। আমি আর একটা বৌদি পেলাম।' 'জি: কুতিভটা পুরোপুরি আপনার বৌদির একা নয়। একটু গাঁড়ান—' হঠাৎ সরকার মশাই অন্ধরে ঢুকলেন। এক মিনিটও হয়নি। একটা টিন হাতে আবার কিরে এলেন। টিনের গায়ের খেঁজুর গাঁছের ছাপ দেখেই চিনে-ছিলাম 'ডালডা' বই আর কিছু নয়। খাবারের খাদে গন্ধে সেইটেই মনে হচ্ছিল। আমার অবাক করার টোনে টিনটি দেখিয়ে বললেন, 'এটির সাথে পরিচয় আছে?' 'এর পরিচয় তো আপনার চায়ের দোকানেই পেয়েছি সরকার মশাই।' 'ভবে' মনে আছে তা হলে? আমিই তো গিল্লীকে ডালডায় রাখতে দেখালাম। নইলে এমন রাত্রা পেতেন কোথায়।' 'তা' হলো আপনাকেও ধন্যবাদ দিতে হয়, কি বলুন?' 'সরকার মশাই হাসলেন। 'ঘরের ব্যবস্থাতে' হয়ে গেলে। এবার গিল্লী বকল। 'আমরাও মাঝে মাঝে আসবো টাঙ্গো।' 'চুপি চুপি কখন বৌদিও এসে পেছনে গাঁড়িয়েছে। বৌদির কথাগুলো সত্যিই যে আপন। বাংলার দরনী বৌদি। 'সব হবে বৌদি। কোলকাতার আসি। তারপর সব ব্যবস্থাই হবে।' 'বৌঠানের হাতের রান্না খাওয়াবেনতো?' 'জিন্সী কাটলেন সরকার মশাই। 'নিশ্চয়ই তাতে সন্দেহের কি আছে?' '... রাত হয়ে গেছে আর দেবী নয় সত্যিই আজ খুশীর দিন। বাড়ী পেয়েছি, খুশীর খবরটা মাঝে দেওয়া দরকার। 'নমস্কার বৌদি। নমস্কার সরকার মশাই। আবার দেখা হবে।' '... আনন্দ ঠাকুর পো।' '...'

করার প্রথম প্রচেষ্টা করলেন ভলভেরার। বাস্তবিক ভাবেই তাঁকে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বা কিছু তা সমস্ত পরিহার করতে হল। অর্থাৎ খ্রিস্টোদ্ধিকের নিরাপন্ন দূরত্বে রেখে তাঁর ইতিহাস রচনা করলেন ভলভেরার। Buckle বলেছেন ভলভেরারের হাতেই স্থাপিত হয়েছে আধুনিক ইতিহাসের—বৈজ্ঞানিক বাণ্যার ভিত্তি। এ উক্তির সত্যতার প্রমাণ রয়েছে Gibbon, Niebuhr, Buckle এবং Grote-এর পরবর্তীকালে রচিত বিরাট সব ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে। ভলভেরার এক নতুন পথের পথিকৃৎই শুধু নন; রচনার বৈশিষ্ট্য এবং গভীরতার আলো বিশ্বাসহিতো অতুলনীর তাঁর এই অবদান।

আর এই অতুলনীর অবদানই হ'ল তাঁর নির্ধাসনের কারণ। ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা পড়ে রাগে এল উইল তাঁর স্বদেশের লোক। বিশেষ ক্রুদ্ধ হলেন রাজকর। তাঁরা বরদাভ করতে পারলেন না। ভলভেরারের মত, যে খৃষ্টধর্ম কর্তৃক রোমের নিজস্ব 'পেগান' জীবনধারা অতি দ্রুত কবলিত হওয়াই রোম সাম্রাজ্যের পতনের অজুতম কারণ। অবশ্য পরবর্তী Gibbon-এর বিরাট ইতিহাসেও এই মতেরই পরিচালন ও প্রতিষ্ঠার পরিচয় আছে। কিন্তু সংস্কারে বারা অত তারা সত্যের আলো চোখে পড়লেও চোখ বুজে থাকবে। শুধু তাই নয়, জুডিয়া এবং খৃষ্টধর্মকে কলাও ক'রে কুটিলে তোলবার চেষ্টা করেননি ভলভেরার। তার বলে তিনি তাঁর ইতিহাসে ছান দিয়েছিলেন চীন, ভারত ও পারস্যকে—ইউরোপের জনগণকে জানিয়েছিলেন এই ভিন প্রাচীন দেশের সাধনা ও সিদ্ধির ইতিবৃত্ত। ইউরোপীয় দর্শনের ভাসের স্বর ভেঙ্গে চুম্বার হয়ে গেল, নতুন আলোর বস্তার লুপ্ত হ'ল অসংখ্য কুসংস্কারের অন্ধকার। সকলে জানলো প্রাচ্যে যে সত্যতা, যে দর্শন কুলে-কলে সমৃদ্ধ, তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবে শুরু হয়েছে পাশ্চাত্যের মাটিতে। পাশ্চাত্য মানস-বিবর্তনের মানচিত্রে খাঁকা হয়ে গেল প্রাচ্যের ছায়া আসন। ভলভেরারের এই আত্মজাতিক মনোভাব বিবর্তকে দেখলেন ইউরোপের অজুতম সত্যতিকেত্র করাসী দেশের রাজা। হুজুম জারী হল যে করাসী হওয়ার চেয়ে নিবাসী হওয়ার প্রতি বার লোভ, তার ছান আর বেথানেই হোক, স্বদেশে, করাসী দেশের মাটিতে হবে না। নির্ধাসিত হলেন ভলভেরার।

রোমালোর রস—কীদিদ

নির্ধাসিত ভলভেরার কিন্তু স্বদেশের মায়া কাটাতে পারলেন না। মেনিভার প্রাজ্ঞ কুটিলের আশ্রয় তাই ভাল লাগলো না তাঁর। ১৭৫৪ সালে কার্ণিতে রচনা করলেন তাঁর নতুন নীড়। সুইজারল্যান্ডের মাটিতে কিন্তু করাসী সীমান্তের গা বেঁসে ঝাঁড়ানো কার্ণি তিনি পছন্দ করলেন অনেক ভেবেচিন্তে। আত্মবান'ছান থেকে ছানাত্তরে বাস করতে হয়েছে তাঁকে, পালিয়ে বেড়িয়েছেন বলা যায়। তাই বেছে নিলেন এমন জায়গা বেথানে করাসীরাঞ্জের অভ্যাচার নেই, অথচ সুইশ সরকার বিরাপ হলে বেথান থেকে সহজেই সরে বেতে পারবেন স্বদেশের মাটিতে। কোর্টি বহু বয়সে ভলভেরার বুঁজে গেলেন শুধু আশ্রয় নয়, তাঁর নিজস্ব আবাসস্থল। এইটুকুই তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর "The

Travels of Scarmantada" কাহিনীর শেষে নিজের মনের কথাই বলেছেন, পৃথিবীতে বা কিছু স্মরণ, বা কিছু বিরল—সব দেখার পর আমি ছির করলাম যে এর পর শুধু নিজের নীড়টুকু ছাড়া আর কিছুই দেখেবো না। বিয়ে করে ঘরে বসে আনলাম। অচিরেই জীবন বিধাতার সন্ধিহান হবার কারণ ঘটলো। তবু এ সব সন্তোষ আমার ঘরের মানুষ আমার কাছে একটুও রান হল না। ভলভেরারের অবশ্য ব্রী ছিলেন না। পরিচর্যার জন্ত ছিলেন এক ভাঙ্গী। তাতে স্রবী ছিলেন ভলভেরার। প্যারিসে কিংবো বাবার জন্তে আর একদিনও উৎসুক হননি। অনেকের মতে এই নির্ধাসন শাপে বর হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে শাড়ির ক্রোড়ে বিজ্ঞান পেয়ে বনৌরী ভলভেরার পরমাত্ম বুড়ির সুবাস পেয়েছিলেন।

সুখে শান্তিতে দিন কেটে যেতে লাগলো ভলভেরারের। বাঙীর চার পাশে এক সুরম্য বাগান গড়লেন নিজের হাতে। মাহুকের প্রতি আর সামান্য বিরাপতাও ছিল না এই বৃদ্ধ দার্শনিকের মনে। সকলকেই সন্তোষে কাছে ডাকতেন, সমাগরে করতেন অতিথি-পরিচর্যা। অবশ্য মাঝে মাঝে বুড়ির উৎসুক রেখা, বিজ্ঞানের শাসিত আভাস যে চমকে উঠতো না তা নয়। একদিন এক অতিথি এসে জানালেন যে তিনি আসছেন মিঃ হলস'—এর কাছ থেকে। অমনি প্রশংসার পঙ্করূপ হলেন ভলভেরার। ও মিঃ হলস'—এর কাছ থেকে। বিখ্যাত কবি, দার্শনিক, বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভা মিঃ হলস'কে না কেনে কে? বিনয়ে গ'লে গিয়ে অতিথি বললেন, আপনি বা বললেন তা সবই হয়তো ঠিক। কিন্তু মিঃ হলস'—এর মুখে আপনার সবচেয়ে একটা প্রশংসার কথাও কখনো শুনিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঠোটে বাঁকা হাসির রেখা কুটিলে এল ভলভেরারের উত্তর, ও তাই না কি! তা'হলে আমার হৃ'জনেই নিশ্চয় ভুল করছি।

ভলভেরারকে কেন্দ্র ক'রে কার্ণিতে পড়ে উইলো ইউরোপের নব সীতস্থান। ইউরোপের সাহিত্যিক, রাজা-মহারাজা, রাজনৈতিক নেতা—সকলের লক্ষ্য হ'ল কার্ণি। কেউ বা সমস্রীয়ে এলেন গুণবৃত্ত ভক্তের মত, কেউ বা পত্রের মাধ্যমে জানালেন প্রজ্ঞাঞ্জলি। এলেন প্রেরকরী পুরোহিত, উদারমনা অভিজ্ঞাত-মন্ডন, এলেন আলোকপ্রাপ্তা আধুনিকা মহিলায় হল। ইলগু থেকে এলেন Gibbon আর Boswell, এলেন d'Alembert Helvetius ইত্যাদি করাসী নব-জাগরণের বিব্রোহী নেতা। নিত্য অসংখ্য অতিথির অভ্যাচারে জর্জরিত ভলভেরার কোণ্ডে বলে উঠলেন, আমি শেষকালে সারা ইউরোপের জন্তে 'সংবিধান' খুলে বসলাম দেখছি। হৃ'সপ্তাহের জন্তে থাকতে এলেন এক অতিথি। সাগর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভালোমাহুকের মত বললেন ভলভেরার, আপনার সঙ্গে ডন কুইক্সোটের বিশেষ তফাত দেখছি না। ডন কুইক্সোট পাশ্চাত্যকে প্রাসাদ বলে ভুল করেছিল আর আপনি প্রাসাদকে পাশ্চাত্য বলে ভুল করছেন। অতিথি উচ্চাসের একটা রসিকতা শোনার আনন্দে হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে, হতাশ ভলভেরার মনে মনে গর্জে উঠলেন, যে ঈশ্বর, তুমি শুধু আমার বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষা কর, শত্রুদের বিরুদ্ধে আমি একাই লড়াই করতে পারবো।

কিন্তু কত লড়াই করলেন তিনি? শুধু অতিথির অভ্যাচার

হ'লেও না হয় কথা ছিল। এ ছাড়াও ছিল চিঠির বোঝা। প্রত্যহ রাশি রাশি চিঠি আসতো তাঁর নামে। আজকের দিনে হ'লে সংখ্যার মাপকাঠিতে অনেক চিত্তচাকার সঙ্গে পাঠ্য দিতে পারতেন ভলভেরার এবং প্রেবকদের ব্যক্তিত্বের বিচারে প্রায় সকলকে জান করে দিতেন। রাজা থেকে দিনমজুর প্রত্যেকের মনের কথা, অজ্ঞদের প্রহা বরে নিয়ে আসতো এইসর চিঠি। জার্মানী থেকে এক সাধারণ নাস্ট্রিক অল্পবোধ করলেন—গোপনীয় অল্পবোধ, ঈশ্বর আছে কি নেই? পত্রপাঠ জানালে বাহিত হব। এরই সঙ্গে এল দুইডেন আর ডেনমার্কের রাজার ব্যক্তিগত প্রহাজিলি এবং রাশিয়া থেকে দ্বিতীয় কাথারিণ পাঠালেন ছোট একটি পত্রের সঙ্গে রুমের এক উপহার। শেষ পর্বত বহর খানেক বিজ্ঞানির পর ত্রেডরিক আবার লিখলেন চি। তক্ত আবার মনিয়ের দরভার কিরে এল প্রহা ও প্রীতির অঙ্গলি নিয়ে।

বাইবের এই প্রীতি ও প্রহা অসংখ্য অঙ্গলি কিছ শান্ত করতে পারেনি ভলভেরারের মন, শান্তি কিরে আসেনি তাঁর স্রিষ্ট বিধাপ্রস্ত অন্তরে। জীবনে অনেক রত্নে আশার ভাল বুনেছেন তিনি, অনেক স্বপ্নই তাঁর সকল হয়েছে। তবুও মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশাবিহীন। কোনোদিনই হ'তে পারেননি এই মানবদরনী দার্শনিক। মনের গোপন পড়ায়ে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল হতাশার বিধান-মলিন মেঘ। মানুষের মানস-বিবর্তনের ইতিহাস লিপিতে শুরু করে ঘনীভূত হল সেই মেঘের আন্তরণ। ইতিহাসের প্রথম প্রভাত থেকে মানুষের অঙ্গগতির পিছনে যে অমাহুতিক হুগে, হুর্শা, নিপীড়ন, নিধাতন—সব জানার পর ব্যাখ্যার বিঘ্নে উঠলো তাঁর অন্তর। অন্তগামী দুর্বের রক্তভা রান করে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল সেই কালো মেঘের কুণ্ডলী। মেঘের বুক চিরে বিদ্রোহ চমকে উঠলো ১৭৫৫ সালের নভেম্বর মাসে।

১৭৫৫ সালের নভেম্বর মাসে লিসবনে হয়ে গেল এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প। All Saints Day বর্মেরাসবের দিন, কাতারে কাতারে মানুষ প্রার্থনার আশার জড়ো হয়েছিল সহরের বিভিন্ন গির্জায়। হঠাৎ কেশে উঠলো মাটি, প্রকৃত উপচার সামনে পেয়ে হিংস্রস্ত্র মেলে বেন এগিয়ে এল স্তুভা। জিশ হাজার মানুষের হল জীবন্ত সমাধি। সন্ধ্যা পেয়ে ভলভেরারের অন্তরে পুঞ্জীভূত মেঘ কুণ্ডে পড়ল করুণ কান্নার। হয়তো নিজের মনে কেঁদে আবার শান্ত হ'তেন তিনি। কিন্তু তা আর হ'লনা। কানে এলো করাসী রাজকের উক্তি—লিসবনের অববাসীরা তাদের পাপের শাস্তি পেয়েছে। ক্রোধে জলে উঠলেন ভলভেরার; এই ভূমিকম্পকে কেন্দ্র করে লিখলেন এক কবিতা। আগুনের অন্ধর সাজিয়ে তুলে ধরলেন তাঁর পুরাতন প্রহা—হয় ঈশ্বর এই ধ্বংসরূপী মন নিবারণ করতে পারতেন কিছ বেজ্ঞার করেন নি অথবা তাঁর নিবারণ করার ইচ্ছা থাকলেও শক্তি নেই। প্পিনোভা বলেছিলেন যে ভালে এবং মন মানুষের মনগড়া ছুটো কথা, বিশ্বরস্ত্রের বিচারে ও ছুটো কথার কোনো মূল্য নেই, আমরা যাকে ধ্বংস বলি অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে তা জতি অকিকিংকর ঘটনা। কিছ এ তত্ত্বের মধ্যে শান্তি পেলেন না ভলভেরার। তাই তাঁর কবিতার শেষ ছ' লাইনে মেলে ধরলেন তাঁর রক্তাক্ত অন্তর:

রত্নে হালকা হাসির দিন শেষ হয়েছে আমার,
শেষ হয়েছে সোনালী আলোর বলমল আনন্দের পথ;
তুমি নতুন যুগের পদধ্বনি, আর অভিজ্ঞতার ভাবের সঙ্গে
মানুষের ঠুনকো জীবনের বোঝা বইতে বইতে,
খুঁজছি এই ঘনায়মান তমিপ্রায় মধ্যে একটু আলোর রেখা,
বুঝছি বুক পেতে ব্যথা নিতে হবে আমার কিছ

বিস্মৃত হলে চলবে না।

করেক মাস পরেই শুরু হল ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধ। কানাডার কিছু ভূস্বায়বৃত অঞ্চল নিয়ে দুই দেশের এই উদ্বাদ অভিবাদে ব্যাহিত হলেন ভলভেরার। তারপর হঠাৎ একদিন এই যুদ্ধ মানবদরনীর বুক চরম আঘাত হানলেন ধ্বংসপ্রহা। ভলভেরারের কবিতার প্রতিবাদে রূপো লিখলেন: এই ধ্বংসের জন্ত মানুষই দায়ী। সহরে বাস না করে যদি আমরা মাঠে বাস করতাম তাহলে ভূমিকম্পে এত অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হত না। যদি আমরা বাড়িতে বাস না করে উন্মুক্ত আকাশের তলায় প্রকৃতির বুকে আশ্রয় নিতাম, তাহলে, মাঝার বাড়ী ভেঙ্গে পড়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা এভাবে পারতাম। বিপরীত ভলভেরার বিশ্বাস হলেন, এই উদ্বাদ উক্তি নিয়ে, নতুন এই ভূমি বাইকসোটি কেন্দ্র করে, মানুষের মাতামাতি দেখে। ছবির সিং আর একবার প্রকৃত হলেন আক্রমণের জন্ত। ১৭৫১ সালে তিন দিনের মধ্যে রচিত হল Candide—রূপোর প্রতি নিশ্চিন্ত হল মানুষের বুদ্ধির তুল থেকে নিশ্চিন্ত ইতিহাসের সব চেয়ে সেরা ইন্টেলেকচুয়াল অল্প ভলভেরারের মর্ষমাতী ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ।

হতাশ মানুষের মর্ষবেদনাকে হাসির রসে ভাঙ্গিয়ে পরিবেশন করলেন ভলভেরার। পড়তে পড়তে হেসে যেমন আকুল হ'ল মানুষ, তেমনি জানলো যে কি বিরাট বেলনা ও ব্যর্থতার ভরা এই পৃথিবী। ভলভেরার দেখলেন তাঁর উপলব্ধ সত্যকে এক সরল কাহিনীর রূপে, সহজ সলাপের মাধ্যমে। সারা কাহিনীতে একটিও তত্ত্বকথা নেই, নেই গুরুগভীর আলোচনা। আনাতোল কঁাস তাই বলেছেন, ভলভেরারের হাতে বলম ঘটনীর উচ্ছলতার হাসতে হাসতে ছুটে এগিয়ে গেছে; স্রষ্ট হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের সেরা ছোট গল্প।

নামেই বোঝা যায় যে Candide এক জতি সরল সৎ কিশোর। Baron of Thunder—Ten-Trockh of Westphalia আক্রমে মানুষ। সে আর মহা পণ্ডিত Metaphysicotheologicocosmonigology অধ্যাপক Pangloss এর ছাত্র। দুর্গের কক্ষে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছিলেন অধ্যাপক, সব কিছুই যে প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত প্রয়োজন, এটা প্রমাণ করা কিছু শক্ত নয়। দেখ, মানুষের নাক আছে চশমা ধারণের জন্ত—শা দেখলেই বোঝা যায় যে মোজা ধারণের জন্ত তাঁর স্রষ্টা...পাখর স্রষ্টা হয়েছে কোলা বানাবার উদ্দেশ্যে...ভেড়া স্রষ্ট হয়েছে আমাদের প্রাচাতিক মাসের প্রয়োজন মেটাতে। স্তবহ বাবা ব'লে বো, পৃথিবীতে বা কিছু আছে সবই রুমের তারা তুল বলে; তাদের কথা উচিত—পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত। এ বেন Candide ব্যায়ণ-কর্তার প্রেমে পড়ে বিভ্রান্ত হ'ল হুর্গ হ'তে। তার পর বুলগেরিয়ান সৈন্তদের হাতে বন্দী হ'ল সে; ছ'বার ছড়িল

বা করে বেত খেয়ে সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হ'ল—মাহুকের ইচ্ছায় বারীমতা ইত্যাদি অজুহাত কোনো কাজেই লাগলো না।

পথে নানা ঘটনায় মধ্য দিয়ে আবার তার দেখা হ'ল অধ্যাপক Pangloss-এর সঙ্গে। কুর্ভাগ্যাক্রান্ত অধ্যাপককে বাঁচাল সে, দেখা পেল তার হারিয়ে-যাওয়া প্রিয়ভ্রাতার। সেখানেই অধ্যাপকের মুখে শুনল যে শত্রুযুগ আক্রমণে ব্যারণ এবং তাঁর স্ত্রী নিহত হয়েছেন এবং তাঁদের দুর্গ লুপ্তি হয়েছে। অধ্যাপক ছাত্রকে সাধনা দিলেন, এ রকম না। ঘটে উপায় ছিল না, কারণ ব্যস্তির হৃৎশব্দে কলসেই সমস্তির শব্দের সুরপাত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য বত ঘটবে, ততই বেড়ে উঠবে সমস্তির সম্পদ। ছাত্র কি বুঝলো কে জানে। অধ্যাপকের সঙ্গে বাতী হ'ল এক লিসবনগামী জাহাজে। এক লিসবনে এসেই বুঝলো যে তার দুর্ভাগ্যের তথ্যনা শেষ হয়নি। ভূমিকম্পে মরতে মরতে বেঁচে গেল সে এবং অধ্যাপক ছুঁজেনই। অধ্যাপক ও ছাত্র পরস্পরের মধ্যে এ দুর্ভোগের কথা আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় এলেন এক বৃদ্ধ। তিনি ওদের হা-হতাশ শুনে হেসে বললেন, আমাদের দুর্ভোগের কাছে তোমরা বা কিছু বললে সব অতি তুচ্ছ। এই নিয়ে ল'খানেক বাস আমি জীবনের ওপর ধনিকা টেনে দিতে চেয়েছি, তবুও জীবনকে আমি ভালোবাসি। এই ভালোবাসা বোধ হয় মাহুকের এক অতি বিষয়কর বিশেষণ; তা না হলে দেখে যে বোকা আমরা সহজেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি, তাই কিনা হাসিমুখে দিনের পর দিন বয়ে বেড়াচ্ছি।

এর পর Candide চললো দেশ থেকে দেশান্তরে। প্যারাগুয়েতে দেখল ধর্মবাহকরা সব সম্পদ হস্তগত করে বসে আছে, সাধারণ মাহুয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ। বিচার ও বিবেচনার এই চরম দৃষ্টান্ত দেখে খুঁচি হ'ল সে। এক ভাট উপনিবেশে নিগ্রো ক্রীতদাস তাকে বললে আথ মাদ্রাইয়ের কলে কাজ করতাম আমি। কলে হাতের আঙ্গুল আটকে গেল, মালিক সারা হাতটা কেটে ফুট করলেন আমার। পালাতে গেলাম, মালিক একটা পা কেটে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন বৃত্তির পথ। ফলে আজ এক হাত, এক পা হারিয়ে ডিঙে করছি। আমার মত অদম্য ক্রীতদাস এই মূল্য দিচ্ছে বলেই তোমরা ইউরোপে বসে পাছ সন্তার চিনি খাবার মজা। ঘুরতে ঘুরতে Candide এক গুপ্তধন পেয়ে গেল। এই মহামূল্য ধনি-রত্ন নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে বাবার উদ্দেশ্যে এক জাহাজ ভাড়া করলো সে। জাহাজের চতুর কাপ্তেন মদিরত্ন নিয়ে উবাও হল, বললে একাকী বসে রইল বিপন্ন Candide। শেষে অল্প এক জাহাজে একটু স্থান পেয়ে ফ্রান্সের পথে বাতী করলো সে। জাহাজে এক সাধু সন্তের সঙ্গে আলোচনার একাংশ :

Candide বললেন, আপনীর কি মনে হয় যে মাহুয় চিরকালই আজকের মত পরস্পরকে হত্যা করতো, চিরকালই সে ছিল আজকের মত মিথ্যাবাদী? ইত্যাদি (মাহুকের স্বপ্ন বোঝাতে ছুঁটিটা বাছা বাছা বিশেষণ ব্যবহার করেছেন ভলভেরার)।

সাধু বললেন, তোমার কি মনে হয় যে বাজপাখী চিরকালই কণোত দেখলে আজকের মতোই মেয়ে কেলেছে।

নিশ্চয়ই, উৎসাহিত হয়ে বললে Candide।

হেসে বললেন সাধু, বাজপাখীর চরিত্রের বর্ণি কিছু বলল আজো না হয়ে থাকে, তবে মাহুকের হয়েছ এমন ভাববার কারণ কি?

এই ভাবে অনেক দেশ ঘুরলো candide, সফর করলো প্রভুত অভিজ্ঞতা। তারপর গল্পের শেষে দেখা যায় সে এসে ফুর্তে বাসা বেঁধেছে, জমী চাষ করে করছে জীবিকা নির্বাহ। অধ্যাপক pangloss ও রয়েছেন ছাত্রের পাশে। গল্পের শেষ হচ্ছে অধ্যাপক ও ছাত্রের সলাপের মধ্য দিয়ে :

অধ্যাপক বললেন ছাত্রকে, দেখ, এই অতি মনোহর পৃথিবীতে প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে রয়েছে একটা উদ্দেশ্যের অভিমুখে নসবৎ শৃঙ্খলার গতি। কারণ যদি ভূমি দুর্ভ হতে বিতাড়িত না হ'ত—যদি ভূমি পাত্রীদের বিচারের সমুখীন হয়ে জীবন্ত বস্তু হতে হতে বেঁচে না যেতে, সারা আমেরিকা ঘুরে না বেড়াতে—তোমার সব ধন-সম্পদ অপসৃত না হ'লে—ভূমি এই এখানে বাগাম আর শাক খেয়ে জীবনধারণ করতে না। ছাত্র উত্তর দিলে, খুব ভালো কথা বলেছেন, এখন আমরা বাগান কোণাতে শুরু করি।

দর্শনের দিব্যজ্যোতি

ফ্রান্সের লোক candide এর মতো এক অল্পত বস-সাহিত্য লুকে নিল বলা যায়। বেন এমনি কিছুই জটাই উৎসুক হয়েছিল তাদের পিপাসুর অন্তর। রিকরমেশন ফ্রান্সের মাটিতে কোনো দাগ ফেলতে পারেনি। যমীর বিবর্তনের স্রোতে অলস গা ভাসিয়ে চলেছিল ইংলও ও জার্মানীর বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু ফ্রান্স? বিধাদ আর অবিধাসের দোলায় দুলাছিল ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতি। বিধাসের আওতে, ব্যঙ্গাত্মক সঙ্কল্পের ভিত্তিতে জল ঢালছিলেন, আশাত হানছিলেন Le Mettrie, Helvetius, Hobbuch আর Diderot র নাস্তিক্য মতবাদ। তাই বোধ হয় প্রাণ খুলে হাসতে শেয়ে আর হাসির মধ্যে কারার শিউরে উঠে Candide কে আন্তরিক আগ্রহে গ্রহণ করলো ফরাসী জনগণ। শুধু তাই নয়, ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীরাও নতন প্রেণার তাকালো ভলভেরার পানে। ভলভেরার প্রথমটা সাড়া মিলল না। বিচার করতে চাইলেন, ধারা ডাকছেন তাঁদের আর তাঁদের প্রচারিত মতবাক্যে।

ডাকছিলেন Le Mettrie (১৭০৯-৪১) সৈন্তদলের ডাক্তার Le Mettrie চাকুরী হারালেন Natural History of the Soul লিখে—নির্ধাসন বরণ করলেন Man a Machine প্রকাশিত করে। ফ্রেডরিকের নবায়ন-সভার আশ্রয় মিলল ওই নব-প্রচারকের। Descartes ভরে যে পথ ছেড়ে, পালিয়েছিলেন সেই স্রবধার পথ ধরলেন তিনি। বললেন, বিশ্বের সব কিছু এমন কি মাহুয় পর্যন্ত বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। আরো বললেন—The soul is material and matter is soulful। তারপর ব্যাখ্যা করলেন যে সব কিছু সংজ্ঞা বাদ দিয়েও দেখা যাচ্ছে আত্মা এবং দেহের পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া, একের বৃত্তিতে অপরের বৃত্তি, একের বিলুপ্তিতে অপরের বিলুপ্তি। এর পর আত্মা ও দেহের সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতা সবচেয়ে আর সহজই থাকে না। বার্য বলে যে আত্মা অক্ষয় ও অব্যয়, বেহ হ'তে তা জিন্ন, তার্য। ভুলে যায় যে অক্ষর্যের উল্লাস দেহকে উত্তপ্ত করে এবং বেহ উত্তপ্ত হ'লে মন ঢকল হয়। একই বীজ থেকে বস্তু ও পরিবেশের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশাল বস্তুজগৎ। প্রাণীদের বুদ্ধি আছে বুদ্ধের নই।

তার কারণ থাকেবলু প্রাণীরা ইচ্ছাকৃত: বিচলন করে কিন্তু দুঃস্বপ্নের দ্বারা ভাবে পাড়িয়ে বা পায় তাই দিয়েই জীবন ধারণ করে। প্রাণীদের মধ্যে মানুষ সব চেয়ে বুদ্ধিমান, তার কারণ মানুষের অভাব অসংখ্য এবং তা মোচাবার জন্য তার গতি সর্বত্র। যে বস্তুর অভাব নেই তার মনও নেই।

La Mettrie নির্ধারিত হ'লেন কিন্তু তাঁরই প্রচারিত তত্ত্বের ভিত্তিতে On Man লিখে Helvetius শেলেন প্রচুর অর্থ এবং অল্প জনম। Helvetius বললেন, মানুষের সব কাজের উৎস হচ্ছে আত্মপ্রেরণ এবং বাক্য আমরা সন্তুষ্ট বলি সেও ওই আত্মপ্রেরণের আয়নার দৃশ্য দেখে আনন্দিত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। বিবেকের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্বন্ধ নেই। বা আছে তা হচ্ছে পুণিলের ভয়। বাতীতে, মূলে, খবরের কাগকে শিল্পের পর শিল্প বাণ্য-দ্রব্যের বিকপান করতে হয় মানুষকে। বহুল বাড়লেও মনের কোণে সেই বিয়ের তসামিটুকু থেকেই বার আর তার বাপ মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয় বিবেকের রূপ ধরে অমোঘ্যর ঘোঁরী অজ্ঞানসন দিয়ে, স্নেহ বা কিছু তার সজ্ঞা নির্ধারিত ওভাবে উচিত নয়। বিচার করতে হবে সামাজিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাতেই দাঁত করা হবে প্রকৃত সত্যকে।

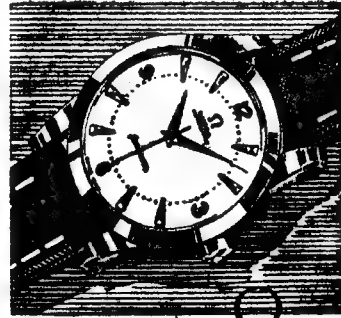
Denis Diderot (১৭১৩-৮৪) কে এই গোষ্ঠীর মেজা বলা যায়। Diderot নিজেকে খুব বেশী লেখেননি। তাঁর মতামত আছে নিজের টুকরো টুকরো লেখনি আর তাঁরই পৃষ্ঠপোষক Baron d' Holbach (১৭২৩-৮১) এর System of Nature। Holbach বললেন—আমি ইতিহাস বিশ্লেষণ করছি দেখা যাবে অজ্ঞানতা আর ভয় থেকেই ঈশ্বরের জন্ম। খামখেয়ালীপনা, আত্মসাহায্য আর চাতুর্য কখনো মানুষকে ঈশ্বরের কৃপায় আবার কখনো বা তাঁর মুখে কানি মাথানোর তৎপর করেছে। যুগে যুগে মানুষের দুর্বলতা ঈশ্বরের গুণার খোরাক জুগিয়েছে, অন্ধ বিশ্বাস তাঁর আসন স্থায়ী করেছে, সন্ধ্যার এনেছে প্রাণমীর নৈবেদ্য আর অজ্ঞাতাবীর স্বাধী তাঁকে দিয়েছে স্বর্গদার আসন। এই আগুনে গুতাঙ্কিত দিয়ে Diderot বললেন—একনারকরের অজ্ঞাতাবে আত্মসমর্পণের সঙ্গে একাঙ্গীভাবে ভড়িয়ে আছে মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস, এবং মানুষ ততক্ষণ প্রকৃত মুক্তির স্বাদ পাবে না বতক্ষণ না পৃথিবীর শেষ রাজকের অজ দিয়ে তৈরী রজ্জুতে কাঁসি হবে পৃথিবীর শেষ রাজার। স্বর্গকে না ধ্বংস করলে উপভোগ করা যাবে না পৃথিবীর মাটির মাধুর্য। বিশ্ব-রহস্যের অনেক কিছুই বস্তুতাত্ত্বিকতা দিয়ে বিচার বা বিশ্লেষণ করা যায় না ঠিকই। কিন্তু এর চেয়ে ভাল হাতিয়ার বতক্ষণ না পাওয়া যাক্কে, ততক্ষণ একেই চার্চকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করা ছাড়া পত্যন্তর নেই। ইতিমধ্যে অবস্র করতে হবে জ্ঞান আর শিল্পের প্রসার। শিল্পের মাধ্যমে আসবে শান্তি আর জ্ঞান মানুষকে দেবে নুতন জীবনের সন্ধান।

উপরোক্ত ভাবধারাকে সঞ্চারিত করার কাজে লাগলেন Diderot আর d' Alambert। ১৭৫২ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল বিরাট কোষ-গ্রন্থ Encyclopedic। প্রথম খণ্ড বার হ'তেই পাওয়া গেল চাচের বিরুদ্ধতা। বাজেরাণ্ড হ'ল প্রথম খণ্ড। বাধা আরো তীব্র হ'তে স'মে শীতালেন তাঁর বন্ধু আর পৃষ্ঠপোষকের বল। Diderot কিন্তু সম্মার পাজ নন। কোষে, কোষে পূর্ণন করে উঠলেন তিনি, মুক্তি বন্ধু এই ধর্মী

অজ্ঞানদের কোষ-এর চেয়ে অজ্ঞাতা আর কি হ'তে পারে? এই বিরুদ্ধাবাদীদের কথা শুনেও তখনও মনে হয় যে পড়ার কল বেধে আত্মবলে ঢোকে তেরমি নীরবে মস্তশিরে বেতে হয়ে ঈশ্বরের কোষে এ ছাড়া মানুষের মুক্তির আর কোনো পথ নেই। দিনের পর দিন প্রতিবাদ জানিয়ে চললেন Diderot। শোনালেন যে মানুষের বিচার-বিশ্লেষণের নিষিদ্ধেই হয়ে যা কিছু স্নেহ আর হৃদয়। বুদ্ধির বেগুনে চ'ড়ে ইউটোপিরার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন Diderot। কিন্তু তিনি জানতেন না যে সেই বেগুনে কেসে সব স্বপ্ন শীঘ্র মিলিয়ে যাবে। Diderotই কখনো (১৭১২-৭৮) প্যারিসের সমাজে পরিচিত কবিরাজিলেন। সেদিন কিন্তু তিনি ভাবতেই পারেননি যে সেই রূপেই একদিন এক দিশাসে মৃত্যু ক'রে দেবেন বুদ্ধির, মুক্তির জয়যাত্রা। সর্বশেষ দ্বাজো নুতন বিপ্লবের পরবর্তী তনতে পাদমি Diderot, তিনতে পারেননি রূশোক, ভাবতে পারেননি শাপের প্রাণিয়ার ইম্মানুয়েল কান্টের অজ্ঞান।

শেষ পর্যন্ত এই মবীন সম্প্রদায়ের এই Encyclopedistরা ডাকে সাড়া দিলেন বৃত্ত ভলতেয়ার। সহজেই এবং সাদকে মেজারী আসন গ্রহণ করলেন ভলতেয়ার। মবীনদের সব মস্তের সঙ্গে ছিল না থাক, তবু নব-জীবনের এই বস্ত্রে সার্থমত আত্মিত দিতে বাধা কি? বেশ কিছুদিন অশ্রান্ত বেগে বয়ে চললো ভলতেয়ারের স্বপ্নপ্রবী কলম, সমৃদ্ধ হ'ল কোষ-গ্রন্থের একাধিক খণ্ড।

কোষ-গ্রন্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে ভলতেয়ারের মনে জাগলো নুতন



OMEGA

Automatic SEAMASTER,
Steel Case Rs. 520/-

ROY COUSIN & CO

JEWELLERS & WATCHMAKERS

4, BALHOUSSIE SQUARE CALCUTTA

OMEGA, TISSOT & COVENTRY WATCHES

করের বীজ। কোথ-এইর লেখা দেখ করে তিনি দাঁড়িয়ে এই বসন্তে
 রূপান্তরিত করার কাজে, বীজকে ফুলে-ফুলে সন্তান বৃক্ষের পূর্ণতার
 পৌছে দেবার সাধনায়। স্মৃতি হ'ল Philosophic Dictionary।
 অভিধানে বর্ণিতকৃতিক বিষয়ের পর বিষয় সাক্ষরে লিখলেন
 ভলভেরার, উল্লেখ করে ঢেলে দিলেন তাঁর জ্ঞান ও বিজ্ঞতার
 অসুস্থতা তত্ত্ব। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে বিভিন্ন বিষয়ের
 লেখক হাজি একজন এবং বা তিনি লিখেছেন তার প্রত্যেকটি স্মৃতিক
 পরিচয়ের; সব মিলিয়ে সারবস্তুর সঙ্গে সৌন্দর্যের এক আশ্চর্য রসধন
 সন্ধান। Philosophic Dictionaryর স্মৃতি ভলভেরার এইবার
 আভাসিত হলেন প্রকৃত দার্শনিকের মহিমায়।

বেকন, মেকার্ট এবং লকের মত দার্শনিক ভলভেরারেরও রাজ্য
 ভক্ত, সন্দেহের চরণা পরে, পরিচায় স্মৃতি হাতে নিয়ে। পুরাতন
 বা কিছু সব বাতিল করে দিয়ে নতনের অমূল্যত্বানই হল তাঁর
 লক্ষ্য। তাঁর অভিধানে অজ্ঞানতা শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন কি করে
 আমি ভেতরী হলো, কেনন করে আমি জন্মালো, তা কিছুই জানি
 না। জীবনের এক-চতুর্থাংশ কাল আমি জানতাম না আমার
 দৃষ্টি, প্রবণ ও অসুস্থত শক্তির উৎস কোথায়—লোকে থাকে বস্তু বলে
 জা আমি দেখছি, দেখছি বিরাট বস্তুক নক্ষত্রের গঠনে, দেখছি
 অসুস্থতের সাহায্যে সূত্রমত অ্যাক্টমের অভিব্যক্তি; কিন্তু জানি না,
 সত্যি এই বস্তু কি।

এর পর আছে তাঁর সৎ ভ্রাতৃদের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি।
 ভ্রাতৃপন বলে আমার মনে হয় জন্ম না নেওয়াই ভালো ছিল।

কেন? আমি শুভোলাম।

কারণ, ভ্রাতৃপন উত্তর দিলেন, চল্লিশ বছর জ্ঞানার্জনের পর
 দেখছি যে এই দীর্ঘ সময় বুঝা চলে গেছে। পঞ্চভূতের সমষ্টি আমার
 যেহে কিছু আমার চিন্তার উৎস যে কোথায়, আজো তা ঠিক মতো
 বুঝতে পারলাম না। হাঁটা বা হজমের মতো আমার বোধশক্তির কি
 একটা সাধারণ জৈব প্রক্রিয়া? হাত দিয়ে যেমন আমি জিনিষ ধরি
 ঠিক তেমনি কি হস্তিক দিয়ে আমি চিন্তা করি? কত কথাই না বলি
 কিন্তু কথা শেষ হলেই বা বলেছি তাঁর ভেত্রে বিমিত ও লজ্জিত হই।

সেই দিনই আমার সেই ভ্রাতৃপনের প্রতিবেদিনী এক বুড়ার সঙ্গে
 দেখা হল। আমি তাঁকে শুভোলাম, আগমার আশ্রয় কি দিয়ে
 সঠিক জামেন না বলে কি আপনি কখনও অনুশীলন করেন?
 বিমিত চোখ মেলে চেয়ে রইলেন ভ্রাতৃপন। তিনি আমার
 প্রশ্নের অর্ধই বুঝতে পারেন নি। বোঝা গেল যে, যে প্রশ্ন নিয়ে
 ভ্রাতৃপন সারা জীবন মাথা খুঁড়ছে, সেই প্রশ্ন এই বুড়ার মনে এক
 হুহুর্ভর জন্ত কোনোদিন উদয় হয়নি। ভলভেরার বিস্তারিত প্রতি অচলা
 ভক্তি নিয়ে বেঁচে আছেন তিনি, পবিত্র গজাঙ্কলে ঠাকুরপুজাতেই
 তাঁর পরম আনন্দ। এই ভক্তি সামান্য এক বুড়ার এমন আনন্দময়
 জীবন দেখে আশ্চর্য হলো আমি। তখনই ভ্রাতৃপনের কাছে কিসে
 গিয়ে বললাম। এই নৈরাশ্রের জন্ত আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত,
 কারণ আপনারাই বাড়ীর পঞ্চাশ গজ ঘুরে এক বুড়া রয়েছেন
 যিনি চিন্তার দ্বার দিয়েও যাননা অথচ কেমন সুখে জীবন বাপন
 করছেন।

ভ্রাতৃপন উত্তর দিলেন, আপনার কথাই ঠিক। আমি জানি যে,
 ওই বুড়ার মতো লজ্জা হলো আমিও অনুশীলন হতে পারতাম। কিন্তু
 ঠিক ওই বয়সের সুখ আমার কাম্য নয়।

ভ্রাতৃপনের এই মন্তব্য আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

ভলভেরার এই পুত্র ঘরে এসিয়ে বার বার বলেছেন যে মর্শন
 যদি Montaigne এর আমি কতটুকু জানি? এই প্রশ্নেই শেষ হয়
 তাতেও কতি নেই, তাই হবে জ্ঞানের রাজ্যে মাছুষের বৃহত্তম
 এক মহত্তম অভিধান। আরও বলেছেন তিনি—বিজ্ঞান কোন পথে
 বাবে মনোবী বেকন তা নির্দেশ করেছেন—তারপর এলেন মেকার্ট
 এবং বা তাঁর করা উচিত তা না করে করলেন ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ
 প্রকৃতিকে অনুশীলন না করে করলেন তার আরাধনা, এই সব মহা
 মহা গণিতজ্ঞরা মর্শনকে রোমানে পরিণত করলেন। আমাদের
 কাজ হচ্ছে বিচার বিবেচন করা, সব কিছুকে নিষ্ক্রিয় ওজনে মেপে
 নেওয়া, সব কিছুকে দেখা এবং ভ্রাতৃপন করা, এই হচ্ছে প্রাকৃতিক
 মর্শনের ভিত্তি; এ হাড়া আর বা কিছু সব ওইই মর্যাদা।

[ক্রমশঃ।

জন্মকাল

শ্রীআশীষকুমার দাস

কবে যে জন্মেছিলেন :

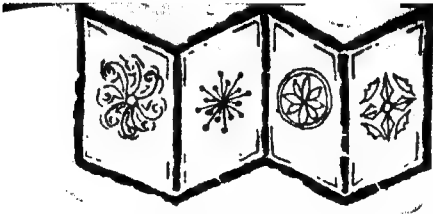
কিছু আলো আর অন্ধকার মিলে-খালা
 গাঢ় রজনীতে, সে দিনের কথা—
 মন থেকে একেবারে ঘুরে ঘুরে গেছে।

কোন এক কাঁড়সের রূপসী বিকেলে
 আকাশে বায়লু স্নান
 পাখী হয়ে উড়ে উড়ে
 ঘুরে ঘুরে আবার বাতায় ;
 অথবা,
 পৌষের কোন শীতের সন্ধ্যায়
 ঝিট ঝেলে হাসঘুমে
 বিপাকের গর ভোলে গালে,

কিংবা—

কোন বিকেল—সকাল আর পোখলি-বেলায়
 মিছেমে প্রাণের দেখে
 হাসি-হাসি মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন ?
 আমার বিবাহ বরং
 অরিবরা বৈশাখের তপ্ত কোন
 হৃপুয়ের কঠিন ছায়ায়
 আমার জীবনসেখা হয়েছিল ভক্ত।

তাই আমি আঙনের পিণ্ডের মত
 বত সব জরাগ্রস্ত জীবনধারাকে
 পুড়িয়ে পুড়িয়ে নতুন স্মৃতির দেশায়
 উদ্বাসিত হয়ে গেছি।



পত্র

রাজা রামনারায়ণের ঐতিহাসিক পত্রাবলী

[মহাদ্বৈত পন্থার বৃহৎ ঐক সমসাময়িক কাল—বাংলা ও ভারতে নবাবী ও বাদশাহী আমলের চলেছে তখন পতনের দুর্গ। জাতীয় স্বকল্যেতাৰ হিঁস্র ধৰে ইংৰাজ কৰ্মতা বিস্তাৰেৰ জোৰ আয়োজন ও বড়বড় চালিয়েছে সে সময়টিতে। এই মহাদ্বৈতকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক চরিত্র রাজা রামনারায়ণ। ইনি ছিলেন বিহারের বিচক্ষণ সহ-সুবাদার ১৭৫২ সাল থেকে ১৭৬১ সাল পর্যন্ত। বাংলার নবাব-বাদশাহের অধীনে তাঁর এই গুরুদায়িত্ব পালনকালে দিল্লীর শাহজাদা (শাহ আলম) তিন ভিনবার বিহারে আক্রমণ চালান। প্রকৃত সংগ্রামে বলবল নিয়ে শাহজাদাকে বাধা দিতে পিছ পাও হননি বীর রামনারায়ণ সেদিনে। দুই শতক আগেকার এই ঘটনাক্রমের প্রামাণ্য বিবরণ আজও সম্যক উদ্ধার হয়েছে, দাবী করা চলে না। রাজা রামনারায়ণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে হ'তে শাহজাদার আক্রমণ ও সন্ত্রাস্ত বিবরণসমূহ সম্পর্কে নবাব-বাহাদুর ও অপরাধের পন্থা ব্যক্তির সঙ্গে যে পত্রালাপ করেছিলেন, প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে এই চিঠিগুলি আমাদের অমূল্য সম্পদ। সব কয়টি পত্র (মূল কাগজে লিখিত) পূর্ণাঙ্গ উদ্ধার না হলেও এবং বিবরণ স্থানবিশেষে অসংলগ্ন ঠেকলেও এ সকলের মূল্যমান ও গুরুত্ব কিছুমাত্র অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুঙ্খ রাজা রামনারায়ণের আলোচ্য ঐতিহাসিক পত্রগুলোরই কয়েকখানি (বাংলা অনুবাদ) নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গ-বিহার তথা ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই দুঃখাশ্রয় ছিল বা পত্রাবলী এক উজ্জল আলোকপাত করবে। এই অমূল্য তথ্যবাহী 'বেঙ্গল : পাঠ এণ্ড প্রজেক্ট'-এর সকলনবিশেষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।—সম্পাদক]

জগৎ শেঠ ও মহারাজা তুলসীদাসকে লিখিত পত্র

“শাহজাদা (১) সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য পূর্বেই জ্ঞাপন করা হইয়াছে, বিস্তৃত বিবরণ ব্যক্তি কার্যের একেট সরবরাহ করিবেন। গত কিছুকাল হইতেই আমি দাশবীর নবাব বাহাদুরের (দীরজাকর) নিকট শাহজাদা সম্পর্কে সংবাদ পাঠাইতেছি। নবাব বাহাদুর যথারীতি এই একটি মাত্র জবাব লিখিয়া আমাকে বাণিত করিয়াছেন যে, সংবাদটি পাওয়া গিয়াছে। শাহজাদা ইতোমধ্যে বারানসীর সন্নিকটে (২) পৌঁছিয়াছেন এবং তিনি বিহার ও বাংলা দখল করিতে বন্দপরিচয়। এলাহাবাদে নবাব মহম্মদ কুলী খাঁ তাঁহার উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করিতে উত্তেজিত হইয়াছেন এবং তিনি অগ্রগামী সেনাদলের নেতৃত্ব দিতেছেন। আজিমাবাদের (পাটনা) সন্ত্রাস্ত ব্যক্তির নিকট পত্রাঙ্গ প্রেরণ করা হইয়াছে। এখন সময় খুবই কম, এই অবস্থার উক্ত পরিস্থিতির হাত-হইতে কি ভাবে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সেই সম্পর্কে সামান্য লোক হিসাবে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমার বিভিন্ন প্রেরণ—অর্থাভাবে, সৈন্যবাহিনীর বরকরা পাওনা এবং ক্রমবর্ধমান রাজস্ব অনাদার সঙ্কট, এই সকল সম্পর্কে আমি কি লিখি? পুঙ্খবহুক্রমিক দ্বারা আমি নবাব বাহাদুরের নকর (৩)

(১) শাহ আলম।

(২) শাহজাদা বারানসীর নিকট যোগেশ্বরায়ী পৌঁছেন ১লা রাজবৈষ্ঠ তারিখে (মার্চ, ১৭৫১)। রাজা বলবন্ত সিংহের একেট তাঁকে ১০১টি সোনার মোহর উপহার দেন।

(৩) আসিবর্দী ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হাইবাত জং (সিরাজউদ্দৌলার বাবা)—এঁরাই রামনারায়ণ ও তাঁর পরিবারের উত্তারি জন্ম দায়ী।

আপনারা হাজা আমাকে দেখিবার তিনবার আর কেহ নাই। অনুগ্রহ, এই বৃহত্তে বাধা কিছু করা স্থিরীকৃত হইবে, অনুগ্রহপূর্বক আমার শিখরা জানাইবেন।”

মহম্মদ আমিন বেগ খানের (৪) নিকট লিখিত পত্র

“এক মাস হইল শাহজাদার অগ্রগমন সম্পর্কে আমি নবাব বাহাদুরের নিকট সংবাদ পাঠাইতেছি। এখন পর্যন্ত কোন সাহায্য আসিয়া পৌঁছায় নাই। এই স্থানের অবস্থা আপনার কাছে অজ্ঞাত নাই কিছুই। আজ আমি এই পোশন বাড়ীটি পাইয়াছি যে, এই স্থানের সন্নিকটে শাহজাদা আসিয়া গিয়াছেন। এবং তিনি দাঁড়ি নগরের (৫) দিক হইতে আগাইয়া আসিতেছেন। পালোয়ান সিংহ তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছেন। এই অবস্থাবাদে কি করিব, তাহা পাইতেছি” না। নবাব বাহাদুর, নবাব নাসিরুল হুসৈন বাহাদুর (দীরজ) এবং সবিত জং কর্ণেল ক্রাইভের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি। আমি যেন শাহজাদাকে বাধা দেই, ইহাই তাঁহাদের পত্রের মর্ম। কারণ, নবাবরা এই দিকে নিশ্চয়ই দ্রুত আগাইয়া আসিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁহারা ইতোমধ্যে দুর্গাদাবাদ হইতে রওদানা হইয়া গিয়াছেন। সামান্য লোক আমি, আমার হেফাজতে যে অল্প সখ্যক সৈন্য আছে, এই লইয়া তাঁহার প্রায় ১০১৫ হাজার লোকের বিরুদ্ধে কি ভাবে আমি সংগ্রাম দিব, জানিনা। শাহজাদার কাছে কোন

(৪) দীরজের মাতুল ও দীরজাকরের ভ্রাতৃক। ১৭৫৭ সালে ইনি ছিলেন রামনারায়ণের একজন প্রতিদ্বন্দী। শাহ আলমের সাথে দীরজের সংগ্রামকালে (২০-১-১৭৬০) ইনি নিহত হন।

(৫) ১২ই রাজবৈষ্ঠ তারিখে শাহজাদা রাউলপুরে পৌঁছেন।

কোন দাঁ। অতঃপর প্রত্যেক অধিক সংখ্যার উপায় চাৰিপাশে
জব। হইতেছে—সরকার, জারগীর, টকা (ভাতা) পাইবে। এই আশার
বর্তমান সরকারের সহিত সঙ্গিত নাগরিকগণ স্বাধীন ও স্বাধীন নীতি
উল্লেখ্য করিয়া সৌভাগ্যে অপর পক্ষের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন।
সকল ধর্ম মিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, একদে আস সময় নাই।
হাইবাই রকম, সেই রকম আমারকে মিটেই হইবে। আপনি (স্বাধীন)
আমার ভাতাভাতী ও দরকার। আমার বাহাদুরের নিকট গোপনে
কিছা খোঁজাখনি ভাবে, এই দুইটি কথা আপনি ভাল মনে
করেন, সেইমতে অনুগ্রহপূর্বক লিখি পাঠাইবেন। আমার বাহাদুরকে
এই সময়ের পক্ষ হইতে এই মিথিতে অনুগ্রহ করিব যে, বাংলায়
স্বাধীন হিন্দুদের উপায় চাৰিপাশা ও ভবিষ্যৎ বিচার প্রদেশে সকল
চাৰিপাশ উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। উপর না করত, আমি অনেক
অন্তর লক্ষণ দেখিতেছি। স্বাধীনতা সকল মনে লইয়া আমি এই
কয়েকটি মন্ত্র সিদ্ধিলাভ। কেননা, আমার বাঁচিয়া থাকিবার কোন
আশা নাই। আপনার বাড়ীতে (৬) সকলেই বেশ ভাল আছে—
ভাড়াহের সুখ-সুবিধার ব্যাপারে আমি সর্বদাই বিশেষ মন
রাখিতেছি। আপনি ইহাট এইমতে আসিতে পারেন, এই আশার
সরকারের নামেবের নিকট হইতে কিস্তি পাওনা দাবী করিতে
বিরত হইয়াছি।

বলবন্ত সিংহের (৭) নিকট লিখিত পত্র

“আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছি। পত্রের বিবরণ
অনুসারে আপনি এখনও আপনার পূর্বলিখিত পত্রসমূহের উত্তরের
প্রতীকার করিয়াছেন। আন্তরিক বিবরণে আপনি রাজা বেণী বাহাদুরকে
লিখিয়াছেন এবং তিনি নবাবের (সুজাউদ্দৌলা) নিকট সৌহার্দপূর্ণ
ভাষার নিজের একখানি পত্র সহ আর্জি (আবেদন) পাঠাইয়াছেন।
অবগতি মত আমার কাছে এই সকলের প্রতিশ্রুতি প্রেরিত হইয়াছে।
আমি যেন উপযুক্ত জবাব দেই, সেজন্যও লিখিয়াছেন। এও
জানাইয়াছেন যে, মহম্মদ ফুলী থাকে ধরা হইয়াছে এবং রাজা
ভাড়াহের সুজাউদ্দৌলার (৮) নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভাড়াহ
সমস্ত বাহিনী ও মালপত্র আটক করা হইয়াছে এবং তিনি বলিতে
গেলেন—শেষ হইয়া গিয়াছেন। আমি বাহা প্রয়োজন মনে করিব,
কার্য-ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অবিলম্বে যেন সে সম্পর্কে আপনাকে
লিখিয়া জানাই, ইহাও আপনার বক্তব্য। সমস্ত বন্ধু! রাজা
বেণী বাহাদুরের পত্র এবং সেই সঙ্গে আপনারাটও আমার প্রভুত্ব
(স্বাধীন) নিকট পেশ করিয়াছি। সমস্ত বর্ষের কথা পত্র বাহা
লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্রিটিশে পাওয়া গেলেননা—আমি
হইয়াছে। সেই পত্র ও জবাবের নকল আপনার নিকট পাঠানো
হইতেছে এবং এই সঙ্গে আপনার নামীয় একখানি পরোয়ানাও
আপনি পাঠিবেন। ইহার পূর্বে আমার প্রভুত্ব পত্র এবং আমার
একখানি পত্র আপনার নিকট হরকরা মারকত প্রেরিত হইয়াছে এবং

ইত্যবসরে সেগুলি আপনার নিকট অবত পৌঁছিয়া থাকিবে।
ইত্যরক বক্তব্য, ভাড়াহই বিধান অনুসারে এই পক্ষের ও আপনার
পক্ষের আগ্রহ—ইহা—এই বিধানের সম্ভব হইয়াছে। একদে আপনার
বন্ধু হিসাবে আমি পলাতকদের সম্বন্ধে এবং পালোয়ান সিংহের
মনের জন্য আমার প্রভুত্ব মলমল লইয়া সীমান্তে পৌঁছিয়াছি।
ইত্যরক ইচ্ছা থাকিলে ভাড়াহনগকে উপযুক্ত পাণ্ডি দেওয়া যাইবে।
পাড়াহাচার সম্বন্ধে সরকারের সৈন্ত নামক পাঠানো হইতেছে—
পাড়াহা জমাদিয়ার পথ বহিরাছেন। পথে বাহা বড় ভরার ধর্ম
সমস্ত তিনি পাঠীপুর্বে আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হন নাই। আপনি
আমার বন্ধু, ইত্যরক অনুগ্রহে এই দুপক্ষের আপনি একজন প্রোট বিচক্ষণ
ব্যক্তি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, দুই প্রদেশের সীমান্ত
এলাকার এইজন্য একদল সৈন্তের অবস্থান খুবই অব্যাহত। স্বতন্ত্র
অনুগ্রহপূর্বক আপনি যেভাবে উপযুক্ত মনে করেন, সেইভাবে ঐক্য
ও বন্ধুত্বের ভিত্তি বাহাতে দৃঢ় হইতে পারে এবং অবিধান ও সন্দেহের
এতটুকু অবকাশ থাকিবার সুযোগ বাহাতে না হয়, সেইজন্য সর্বাত্মক
ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় রাজাকে (বেণী বাহাদুর) অবহিত
করিব। আপনার অপরূপ ওপাবনীতে ও আন্তরিকতার আপনি
আমাকে যথেষ্ট আনন্দ করিয়াছেন। বন্ধুত্বের জন্য বাহা প্রয়োজন,
আপনার নিকট হইতে তাহা করা হইয়াছে। আপনার সারিযে
ধাকার সৌভাগ্য লাভ করিতে আমি বিশেষ ব্যাকুল। রাজা
সাহেবের (বেণী বাহাদুর) নিকট লিখিত পত্রে ও আমি একই
মানোভাব প্রকাশ করিয়াছি।”

রাজা বেণী বাহাদুরের নিকট লিখিত পত্র

“প্রথম নিবেদনাতে এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎকারের আন্তরিক
আগ্রহ জ্ঞাপনপূর্বক আপনাকে এই পত্রখানি লিখিতেছি। আপনি
কিছুকাল আগে অনুগ্রহ করিয়া আপনার বারান্দাভীতে আসন সম্বন্ধে
লিখিয়াছিলেন। আপনার ও লাল পালাব রায়ের (৯) মধ্যে যে
অন্তরের নিবিড়তা ও বন্ধুত্ব বহিয়াছে, তাহার নকল এবং আমার
প্রাণাধিক প্রিয় রায় বসন্ত রায়ের সহিত আমার সম্পর্কের আপনি
যে মূল্য দিয়া থাকেন, সেই হেতু এমনটি হইয়া থাকিবে। আমার
উপর আপনার বিশেষ ভালবাসা আছে, ইহা আমি সব সময়ই
বিশ্বাস করি। ইত্যরক বক্তব্য জানাই (এক আশা রাখি) নবাব
সুজাউদ্দৌলার সহিত নিবিড়তা ও বন্ধুত্বের ভিত্তি যেন দৃঢ়তর হয়।
আপনি আমার কথা দিয়াছিলেন যে, কিছা বাইরা আপনি এই
কাজটি করিবেন। এখন আপনি কিছা গিয়াছেন। বিশ্বাস করিব
যে, বন্ধু হিসাবে আপনি নবাব সাহেবের (সুজাউদ্দৌলা) নিকট
যেভাবে ভাল মনে করেন আমার নিবেদনটি জ্ঞাপন করিবেন।
আমার প্রভু ও মনিষ (স্বাধীন) কিছা বাইতেছেন। তিনি হাজার
হাজার অর্থ ও পদাতি সৈন্ত দিয়া রহম খানের (১০) সহিত আধাকে
এই জেলার রাখিয়া গিয়াছেন। পালোয়ান সিংহের ব্যাপারটি

(৬) এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মহম্মদ আদিল খাঁর আদি
নিবাস ছিল পাটনায়।

(৭) বারান্দার রাজা।

(৮) অরোয়ান নবাব।

(৯) ইনি লক্ষী-এর অধিবাসী ছিলেন। রাজা হামনারায়ণের
একজন চতু মরদা বিধির স্বামী বসন্ত রায় এইই পুত্র।

(১০) রাষ্ট্রকলপের মতে বল থেকে বার হয়ে পাহা আসনের
পক্ষে ইনি যোগ দিয়েছিলেন।

বাহ্যতে চুকটিয়া কেলি, উঠাই তাঁহার বাঘদ্বার লক্ষ্য। নবাব সখিত
জ বাহাদুরও (রাইত) চলিয়া গিয়াছেন এক প্রতিনিধি হিসাবে
উল্লিখিত নবাবের একজন ভাই মীরওয়াজিরকে (৭) এখানে রাখা
হইয়াছে। এই মীরওয়াজির কোজতে আছে একটি মজিনালী
সৈন্যবাহিনী। উভয়ের অগ্রগহ্ন হইলে পালোয়ান সিংহের ব্যাপারটা
আমি শেষ করিয়া কেলিম। নবাব সাহেব (মজাউল্জোলা) আমাকে
আপা সিরেতেন একে তাঁহার উপর আমার মধ্যে বিধানও আছে।
আপনার সহযোগিতার উপরও আমি নির্ভর করি।”

মীরপুরের নিকট লিখিত পত্র

(ক) “ইতিপূর্বে হজুর রাজা বলবন্ত সিংহ মায়কত রাজা বেণী
বাহাদুরের পত্রের উত্তর দিয়াছেন, বেণী বাহাদুর তাহা হজুরের প্রতি
অত্যধিক প্রভাবশতঃ নবাব মজাউল্জোলাকে নিকট পেশ করিয়াছেন।
নবাব পাশপাশিত কার্য ও অন্তরে মিথিততা হেতু বেণী বাহাদুর
মায়কত হুইখানি খবিতা (পাকটে) পাঠাইয়াছেন—একটি মহামান
নবাব বাহাদুরকে লিখিত—এক অপরটি হজুরকে লিখিত। রাজা
বেণী বাহাদুরের উদ্ভটচালক উত্তর পাইবার আশার রাজা বলবন্ত
সিংহের নিকট অবস্থান করিতেছে। হজুর অগ্রগহ্ন করিয়া অবিলম্বে
খবিতাটির উত্তর পাঠাইবেন। তাহাতে এই কথাটি বেন জানাইবেন
যে, মাজবর নবাব বাহাদুরের নিকট লিখিত পত্রখানি খুশিভাবে
প্রেরণ করা হইতেছে। এক সেখান হইতে যে উত্তর পাওয়া
যাইবে, তাহা বখাসময়ে প্রেরিত হইবে। নবাব মজাউল্জোলা
বাহাদুর চিঠিপত্র আলান-এলান ব্যাপারে তৎপরতা দেখাইয়াছেন এবং
হজুরের পক্ষে উপযুক্ত উত্তর দেওয়া সমীচীন হইবে। রাজা বেণী
বাহাদুরের নিকট দয়া করিয়া বিস্তারিত লিখিবেন।”

(খ) “রাজা বেণী বাহাদুরের নিকট হজুরের নকর হিসাবে আমি
কি লিখিয়াছি, তাহা সবই অবহিত আছেন। নবাব মজাউল্জোলাকে
পত্রের বিবরণ তিনি পড়াইয়া শুনাইয়াছেন। উক্ত নবাব আপনার
নকর আমাকে যে মজা পাঠাইয়াছেন, সেইটা রাজা বেণী বাহাদুরের
খামে হজুরের নিকট পাঠানো হইতেছে। আপনার নকর এই
মজার উত্তরে খুশিভাবে কি ভাবে করিবে, হজুর অগ্রগহ্ন করিয়া
লিখিবেন। হজুরের পক্ষে কয়নীর ভাবার একটি পরোয়ানা লিখা
প্রয়োজন। প্যাকেটের প্রাপ্তি স্বীকারের সহিত আপনি রাজা
মায়নারায়ণের নিকট হইতে সব জানিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সেই
কথাটি বেন থাকে।”

মায়নারায়ণকে (১১) লিখিত পত্র

(ক) “এর আগে আমি তোমাকে এখানে বাহা বাহা বাটিয়াছে,
জানাইয়াছি। তোমার পত্রের উত্তরও আমি পাঠাইয়াছি এবং সে
সব নিকটই তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে। শোণ নবী পার হইয়া
আসিয়া আমি রাজপুরে অপেক্ষা করি। কুখ্যাত পালোয়ানের
বাসভূমি এই রাজপুরেই। পরদিন ভোরবেলা নোখার(১২)

(১১) রাজা মায়নারায়ণের ভাই, পাটনার মায়নারায়ণের
সহকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(১২) এটি আরার (সাহাবাদ) ভাবুয়া মহকুমার অন্তর্গত। ১১৭০
সালের স্বত্বান দানে (১৭৫৯ সালের এপ্রিল) এই অধিবাস চলে।

তাহার কল্যাণ হইতেছি (বাসভূমি) অভিমুখে হজুরানা হইয়া
বাই। এইখানে মাজবর চালান হয়। পরের দিন সকাল
অর্ধাৎ আজ স্বভাসের ৭ই তারিখ, মনিবার, আমি মাসারাম
পৌঁছিয়াছি এবং সেলিয় সাহ মীখির মজিকটে তাঁবু পাতিয়া অবস্থান
করিতেছি। নবাব মাসিকুল মুলক বাহাদুর এখনও নোখার
আছেন। তবে খুব শীঘ্র তিনি এখানে আসিবেন, আপা করা
বায়। আমরা বখন একত্র হইবে, তখন বাহা কিছু ভিত্তিকৃত
হইবে, তাহাই কার্যকরী করা হইবে। মজাপুরের অবস্থা সম্পর্কে
এই বলা যায় যে, মাজালা বখন সব ঠিক হইতে হইয়াছেন, সেই
সময় তিনি পালোয়ান সিংহের গৃহে বান এবং চার সহস্র টাকা
প্রাপ্ত হন। এখন তিনি জমানিয়া অভিমুখে হজুরানা হইয়া
গিয়াছেন এবং পাঞ্জীপুরে বাওয়ার বিঘর ভাবিতেছেন। পালোয়ান
সিংহ মাসিকো-এ রাজা অমর সিংহের (১৩) আশ্রয় নিয়াছেন
কিন্তু মনে হইতেছে অমর সিংহ ও মাজবর তাঁলাকে আর
রাখিতে নারাজ। আমি তাঁহাদের নিকট পরোয়ানা
পাঠাইয়াছি এবং আশা করিতেছি যে, দুই এক দিনের মধ্যে
তাঁহারা এখানে পৌঁছিবেন। বাবু গিরিজা সিংহের সহিত স্যারিষ্ট
মাকুল সিংহ চৌবে পালোয়ান সিংহের যে পত্রের নকল পাঠাইয়াছেন,
তাহা হইতেই তাঁহার (পালোয়ান) শরতানী মংলব স্পষ্ট বুঝা
যাইবে। এই প্রতিলিপিটি তেলিনবাসের পুলিশ বাটিতে খুশিয়া
দেখা হইয়াছে। মূল পত্রটি তাহার নিজের বিজ্ঞি হাতে লেখা—
পাসীতে লিখিয়া উত্তর একটি নকল তোমার নিকট পাঠানো
হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে লোকটি কত নিরাক্ষ এবং
তাঁহার মংলব কি। দুই তিন দিন আমি এখানে থাকিবার প্রস্তাব
করিতেছি। এর পর আমি কোথায় বাইব, সেই সম্পর্কে পরবর্তী
ডাকে তোমার সব বিস্তারিত করা হইবে। আমার জীবনের
চরে তোমার মূল্য বেণী—সব সময় তুমি নিজের উপর নজর রাখিয়া
চলিও। মনের ও নহবত অভিমুখে অব্যবাহী হইজন চৌকিকে
পাঠাইয়া দিবে। পথিক ও পথটিকদের চাচাল প্রসে উক্ত দুইটি
স্থানের উপর অবজ্ঞা কড়া নজর রাখিত হইবে। প্রত্যাহ অভিবাস
চলিতেছে বলিয়া আমার মেজাজ ঠিক নাট—মেজাজ ঠিক না
থাকার আর একটি কারণ অত্যধিক সূর্যাতাপ।”

(খ) “মজানোর ১৫ই তারিখ, বুধবার সকালবেলা এখন।
মাসারাম হইতে আমি বাটতেছি জাহানাবাদে। অভিশপ্ত পালোয়ান
এখন পর্যন্ত মায়কিতেই আছেন এবং তিনি বড়শত্রুর জাল বুনিতেন।
রাজা বলবন্ত সিংহ ও রাজা বেণী বাহাদুর বর্তমানে মায়নগরে
(বারাণসী) আছেন—তাঁহারা এই অধমের নিকট এবং আমার প্রত্ন
ও মনিব নসিরুল মুলক বাহাদুরের নিকট আন্তরিকতাপূর্ণ লিপি প্রেরণ
করিয়াছেন। রায় বসন্ত রায়ের(১৪) উপর ভালবাসা হেতু বেণী
বাহাদুর কার্যক্ষেত্রে খুব উদারতা দেখাইতেছেন। রায় বসন্ত রায়

(১৩) মীরণ, কর্ণেল রুইত ও মায়নারায়ণের অভিযানে
ভোজপুর জমিদারদের অনেকেরই ভীতভ্রম হইবে পড়েন, এমনটি মনে
হয়। সুবেশাবের সাথে বোগলানের আমন্ত্রণ জানানো হয় রাজা
হজুরারী গজরাজ সিংহ প্রমুখদের।

(১৪) মায়নারায়ণের জামাত।

আমার চক্ষু মণি, আমার লেহে আশা। ওমরাওর (১৫) ও বালু প্রতাপনারায়ণের নিকট চট্টো ও আমি পত্র পাইয়াছি। এই অবসরে বিশ্ববাহীর নবাব মুজাউদুল্লাহ (১৬) শাই খু বানসিত এক কন্যা সমাবেশ আমার কথা তিনি অহরহ বলিয়া থাকেন। মহম্মদ কুদী খাঁ অশ্বশান বরণ করিয়াছেন এবং ৫০ জন অশ্বারোহীর হোতায়েত নবাব, মুজাউদুল্লাহ নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করা হইতাহে। রাজা বলবন্ত সিং এই লোকটিকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন। শাহজাদা আমার ও কর্ণেল বাহাদুরের (১৭) নিকট হইতে কড়া জবাব পাইয়া হতবাক হইয়া পড়িয়াছেন এবং জবাবিয়ার সরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সন্তানে জাহানাবাসে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হইতেছে। কুখ্যাত পাগোয়ানের আচরণের জন্য কিছুটা হার্মজনা করিতে মহারাজ (১৮) লিখিয়াছেন। ইহা আমার কবজা বহিষ্ঠ। পরবর্তী পত্রে আমি বিস্তারিত লিখি। অজিবা চলইবার এই প্রসঙ্গ সময়—একাদশীর উপবাস চলিলেও সকল হইতেই আমি প্রস্থত রহিয়াছি। আমি যদি জীবিত থাকি, তবে তোমাকে আরও লিখিয়া জানাইব।”

জৈনক অভ্যাতনামা ব্যক্তিকে লিখিত পত্র

“মহারাজ রাজা বেণী বাহাদুর তাঁহার অকৃত্রিম প্রদ্বাবশতঃ আমার প্রভু ও মনিব নবাব নসিরুল হুলক বাহাদুরের বহুত্পূর্ণ মনোভাব সম্পর্কে নবাব মুজাউদুল্লাহ বাহাদুরকে সব কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহার প্রতি এই অবসরে প্রদ্বার কথাও লিখিত হইয়াছে। নিজের পত্র ও নবাব মুজাউদুল্লাহ পত্রাদি সমেত তিনি নবাব নসিরুল হুলকের নিকট ধরিভা প্রেরণ করিয়াছেন। সখর প্রাপ্তি-বীকার করিবেন, দেখিবেন যেন উষ্ট্র চানককে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিতে হয়। পরমানন্দ পাঠক, বাবু ছোট্টাম ও বালকরায় এখানে পৌছিয়াছেন এবং আন্তরিক ঐক্য ও সম-বর্ষের ব্যাপারে তাঁহার বিস্তারিত বক্তব্য শেন করিয়াছেন। ইহার পূর্বে আমি নবাব নসিরুল হুলক বাহাদুর ও নবাব সবত জন বাহাদুরের ফিরিতে আসার কথা লিখিয়াছিলাম। আজিমাতে আমার প্রিয় ভ্রাতা বীরাজনারায়ণের নিকট ধরিভাগুলি পাঠানো হইয়াছে। উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার কথাও আমি তাঁহাকে লিখিয়াছি। ইত্যবসরে পাগোয়ান সিংহের পত্র এখানে আসিয়াছেন। পাগোয়ানের অনির্ভরযোগ্য উক্তির সহিত আমার মনোভাবের তুলনামূলক বিচার বাহাতে চলিতে পারে, সেইজন্য পাঠকজীকে আমি আটকাইয়া রাখিয়াছি। আপনি জানেন, পাগোয়ান বহুত্বের বাধ্যবাধকতা রক্ষা করিয়াছে। আপনার নিকট হইতে বার বার পত্র পাওয়ার এক পাগোয়ানের ব্যাপারটি সম্পর্কে একটা কিছু বীমাঙ্গা করার জন্য পাঠকজীকে যেহেতু পাঠাইয়াছেন, সেই হেতু

তাঁহার সম্পর্কে কিছু করিতে কথামাত্র জোঁ করিব। পরে তিনি কি করেন, সেইটি আপনি নিজেই দেখিবেন।”

বীরাজনারায়ণকে লিখিত পত্র

এই অবসর পাগোয়ান সিংহের মতো সম্পর্ক অকৃত্রিম আকার ধারণ করিয়াছে। কথা যদি আর না বাড়াইতেই, যেদিন তিনি রহম খান ও মোলার শাহর (১৯) বাহিনীতে যোগ দেন এবং হুল সেনাবল হইতে দুই কোশ দূরে শিবির স্থাপন করেন, সেদিনই তাঁহার অবসঙ্গ পূরণ একটি বার্তা হইয়া আসেন। তাহাতে বলা হয় যে, আমি যেন আগাইয়া বাইরা হার্মজনা চাই এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করি। বাবু সাহেবরাও (অপর ভোক্তপূরীপণ) এইরূপ করিতে আমাকে প্ররোচিত করেন। ইহা আমার কাছে খুব বিরক্তিকর বোধ হয় এবং আমি তাঁহাদিগকে সোজাছবি জানাইয়া দেই যে, তাঁহার যেন সঙ্গে সঙ্গে বিদায় হইয়া যান এবং আমি কখনও তাঁহার সহিত দেখা করিব না। অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য আমি লাল সজদালাক পাঠাইতে নির্দেশিত হইয়াছি। উক্ত লাল আমাকে জানান যে, পাগোয়ান সিং এইরূপ কথা কখনও বলেন নাই—সমস্ত ব্যাপারটি বাবু সাহেবদের হস্তিক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহা হউক, এমন হইল যে, পাগোয়ান সিং নিজেই পরদিন সকালে জাঁকজমক করিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে এত লোকজন আসে যে, দেওয়ানখাসে ও প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে তাহারের স্থান সন্ধান হইতেছিল না। কিছুক্ষণ পর আমি তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেই। পরের দিন অপরাত্তে রহম খানের তাগিদে তাঁহার সঙ্গেই আমি পাগোয়ানের শিবিরে গমন করি। রাজ কয়েকজন লোক আমার সহিত যায় এবং এই করা ছাড়া আমার বিকল্প উপার ছিল না। রাত্রিতে এত প্রবল বৃষ্টি হইতে থাকে যে রাজ্যবাটগুলিতে ঢালেকা অলভব হইয়া পড়ে—সব বায়না জলে ডুর্ভ হইয়া যায়। প্রতি পক্ষক্ষেপেই আমার কাজের জন্য দুঃখ বোধ করি এবং এক ঘটাকাল সেখানে অপেক্ষা করিয়া লেনসেন আগামী দিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া আমি কিরিয়া আসি। বিদায়কালে তিনি আমার কাছে দুই হাজার টাকা অর্পণের প্রতিক্রিয়া সহ একখানি কাগজ উপস্থিত করেন। আমি ইহা কিম্বাইয়া দেই এবং কথাবার্তা পাকা করিয়া আমি ঐ হুল ত্যাগ করি। পরদিন তিনি (রহম খান?) আসিয়া এই অমুরোধ জানান যে, তাঁহার মধ্যস্থতার রাজার (পাগোয়ান) ব্যাপারটি বীমাঙ্গিত হইবে, নবাব আহম্মদ খাঁর হুলে অভ্য লোককে বসাইতে হইবে এবং ভোক্তপূর প্রসঙ্গটি নিজের মর্যাদার বাহাতে হানি না হয়, সেইজন্য তাঁহার হাতেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। আরও বলা হয় যে, আমি যদি নিজ হইতে তাঁহাকে এত সব করিতে বলি, তাহা হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। উত্তরে আমি বলি যে, এই সব কথা একান্তে বলা আমার ও তাঁহার—হুই-এর পক্ষেই খারাপ হইবে। এই কথাও আমি জানাইয়া দেই যে, তাঁহাকে বর্বার চুটটি হাস অপেক্ষা করিতে হইবে এবং আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইয়া সরকায়ে

(১৫) অবোধ্যার নবাবের পারিষদ।

(১৬) ১৭৫৭ সাল থেকে মুজাউদুল্লাহ সাহেব বাহনাবায়ণের অবিরাম পত্রালাপ চল।

(১৭) মহাব পাঁচী কবি শেখ আলিহাজিরের কথা বলা হচ্ছে—বাহনাবায়ণ, পাগোয়ান সিং ও বলবন্ত সিং এর মধ্যে অমুরোধ ছিল।

(১৮) বাংলার নবাবের এই দুই জন এরূপ অকিয়ার পাগোয়ান সিংহের বক্তৃত্বের নকল হাসিধপূরের বৃত্তে বাহনাবায়ণের সাথে বিবাদযুক্তকাল করেন।

খাপারটি সম্পর্কে তিনি যদি কিছু করতে চান, তাহা হইলে এক তিনি (পালোয়ান) যদি আলিবাগে আমার সহিত গমন করেন, সেক্ষেত্রে আমি তাঁহার সব সন্তানদিগা লইব। কিছুকাল ধরিয়া উত্তর ও প্রত্যন্তর চলিতে থাকে, কিন্তু কোন স্থল দেখা যায় না। ঐদিনই অপরাত্তে তাঁহার পুরাতন ব্রহ্ম সিংহের (১৯) বৃত্তায় জন্ম শোক প্রকাশকর সন্ধ্যা সিংহের শিবিরে গমন করি। সেখানেও তাঁহার দুই হাজার টাকার প্রতিক্রিয়া সহ একটি পত্র সামনে তুলিয়া ধরেন। আগের মতো এবারও আমি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি। পরের দিন সকালবেলা অর্থাৎ গতকাল তাঁহার সকলেই আমার কাছে আসেন। রহম খানের নিকট গুকেই আমি বলিয়াছিলাম যে, তিনি বেন বয়্য হইয়া ঐ লোকগুলির আচরণ দেখেন এবং তাহাদের বেন বাইতে দেওয়া হয়, এইটি চানেন। অতি তাড়াতাড়ি তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়—নিজের নিকট ডাকিয়া তিনি তাহারিগকে কয়েকটি কথা বলেন। লোকগুলি উদ্ভত প্রকৃতির বলিয়া তাহার কথার কোন কর্পণাত করে নাই। উক্ত খান বাহাদুর সুযোগ বুঝিয়া অশপূর্ত শোণ নদীটি পার হইয়া যান। সেই সময় উহা এই ভাবে অতিক্রম করা সম্ভবপর ছিল। সিদ্ধিনারায়ণ (২০) আমার নিকট আসিয়া বলেন, ‘আপনি আমার কথার কাম দিতেছেন না। আমি যে অর্ধ আপনাকে বিদ্যাহি, তাহা কেবল দিতে হইবে।’ এই কথা শুনা মাত্র আমার শরীরে ক্রোধের সঞ্চার হয়। আমি উত্তর করিলাম, ‘আপনি নিজের সম্পর্কে কি মনে করেন? আমার সৈন্তরা মদী পার হইয়া বাওয়ার আপনি সম্ভবতঃ সাহস পাইয়াছেন আর আমি এখানে একা পড়িয়া আছি। যখনযে (ঈশ্বর) নামে লুপ্ত করিয়া আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিতেছি—আপনি বাহা করিতে চানেন, এখনই করুন। কারণ, টাকার পরিবর্তে দিব্য মত আমার জুতা আছে।’ বাবু হুলীষ ও বাবু ভরত সিংহ এক আর আর সব বাধা দেন। শেষ অবধি পালোয়ান সিংহ আমার ক্রোধ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করেন এবং সিদ্ধিনারায়ণকে এইরূপ উক্তি কর্তৃক নিষা করেন। সন্ধ্যাে বলিতে গেলে অধীতির পরিবেশের মধ্যে বৈঠক ডাঙ্গিয়া যায় এবং তাক-বিরক্ত মন লইয়া তাহার হান ত্যাগ করে। আজ সকালে হুলীষের এই সবাব লইয়া আসিয়াছেন যে, তাহাদের মতলব পারাপ। হুলীষই তাহাদের বিচার দিতে আগাইয়া গিয়াছিলেন। আমার বেগন ভাল মনে হইয়াছে, আমি সেখানে তাহারিগকে একটি বার্তা প্রেরণ-করিয়াছি। তাহার যদি সেইটি পায়, তাহা হইলে তাহার আমার পক্ষে আসিতেও পারে। অত্যা সম্পর্ক বড়ই জটিল হইয়া পড়িবে। সিদ্ধিনারায়ণ অত্যন্ত উদ্ভত প্রকৃতির এবং সন্ধ্যা সিংহ একটি গুরুত্বাটী গুরু হাজা কিছুই নয়। দায়রার

(১১) সাহাবাদের তাবুয়া সহকর্ম্য অঙ্গুত চৈনপুয়ের জমিদার। পালোয়ান সিংহ এর নিকট-আস্বে।

(২০) দাকপুত উজ্জবিনারায়ণের প্রথম বীরের পুত্র। উইলসনের বিবরণে ১৭১৫-১৭ সালে বিহারের বিভিন্ন অংশে সিদ্ধিনারায়ণ যে সন্ধানরাজ বৃত্ত করেন, এর উল্লেখ আছে। তিনি যে ১৭৫৩-৬০ সাল অবধি জীবিত ছিলেন, সে সম্পর্কে এখানে একটি মনুন্ তথ্য পাওয়া যায়।

ও ভোজপুত্র সম্পর্কে বৃত্ত কথা হইয়াছে, সবই এখন বাতিল হইয়া গেল। ইহার পরে কি ঘটে, তাহাই দেখিতে হইবে। এই খান সম্পর্কে, হীল বিবরণ সিংহের (২১) কাব্যকলাপ নজর রাখা আবশ্যক। এই লোকটিকেও তাহার প্রেরোচিত করিয়াছে। গজরাজ সিংহকে আমি মলে টানিতে পারিব এবং আগামী কল্য তাঁহাকে নবাব আহমদ খানের নিকট পাঠাইব। বরত বাবর তুতি দশ হাজার টাকা নিতে পার এবং চিঠিখানি পড়িয়া বুঝা কল্য বীর (২২) নিকট বিবরণ শোণ করিতে পার।

নবাব বাহাদুরের (২৩) নিকট লিখিত পত্র

‘ইহার পূর্বে আমি একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছি বাহাদুর হুইট মলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আজ গতকাল ১ই জামাদি—আপনার দাস ক্যান্টেন সাহেবকে (ক্যান্টেন করর) সঙ্গে করিয়া এবং রহম খান, গোলাম দাহ ও অপরাপর সর্দারদের সৈন্ত সামন্ত লইয়া খোড়ার শিষ্টে সকাল বেলাতেই বাহির হইয়া পড়ে। পরাক্রান্ত ব্যক্তির (দাহ আলম) মলটি এক ক্রোশ দূরে তাঁরু পাতিয়া ছিল। আপনার নকর হিসাবে আমি এবং আমার সর্দারগণ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এক্ষণে দূর আর্দ্রক কমিয়া গিয়াছে। বতহু মনে হইতেছে আপানী কল্য (২৪) বৃত্ত হইবে। আশা করি, ঈশ্বরের অমুগ্ধে ও মাতবর নবাব বাহাদুরের সৌভাগ্যবলে জয়ের নজর পাঠাইতে পারিব। যদি কল অস্তরূপ হইয়া পড়ায়, ঈশ্বর না করুন, আমার অক্ষমতার জন্য কমা করিবেন এবং আমার পোষ্যদের বেন নবাব বাহাদুরের স্নেহ-পাশে রাখিবেন।’ (২৫)

বীরাজনারায়ণকে লিখিত পত্র

(ক) “...বুসি লা (এস লা) ও তাহার দলবল কর্তৃনাশা নদী অতিক্রম করিয়াছেন এবং এই দিকে আসিতেছেন। তিনি কি করিতে চানেন, দেখিব। বদরখোলা আগাইয়া গিয়াছেন। বুনিয়াদ সিংহের (২৬) নিকট আমি অনেক লিখিয়াছি। তিনি পাশ কাটাইয়া চলিয়াছেন। লোক বলে বুসি লা’র নাকি আলিবাগ হুগ্গ আক্রমণের একটি অভিপ্রায় রহিয়াছে। ইংরেজ সৈন্ত সেখানে মোতায়েন আছে। এই অবস্থায় আমি বড়ই বিপন্নবোধ করিতেছি। আমার পক্ষে বাহা সম্ভবপর, আমি করিয়া বাইতেছি এবং বতরূপ জীবিত থাকিব, তাহাই করিব। দুর্গের উপর অধিকার আমি ছাড়িয়া দিব না। তুমি আমার প্রাণাদিক প্রেয়—শাহজাদার বর্তমান অবস্থা ও তোমার সৈন্তবাহিনী সম্পর্কে তুমি আমার সম্যক অবহিত রাখিবে। রায় সরব সিংহ, ফিল্ডি হাসান খান, শেখ গোলাম ইসা, শেখ তালে ও বালকুচ পাঠক

(২১) পালোয়ান জেলার সেরস কুচুবার জমিদার। এর বিবরণে রায়নারায়ণ ১৭৫৮ সালের জুন মাসে এক অভিযান চালান।

(২২) সিরাজউদ্দৌলার স্বতন্ত্র ইরাক খানের ভাই।

(২৩) পত্রখানি কাকে লেখা, সঠিক নির্দেশ নেই, তবে বিবরণ থেকে অনুমিত হয়, এইটি তৎকালীন নবাব বাহাদুরকে (বালা) লিখিত হয়।

(২৪) ২১শে জামাদির পূর্বে বৃত্ত আরম্ভ হয়নি।

(২৫) এই বৃত্তে রায়নারায়ণ পরাক্রান্ত হন।

(২৬) টাকারির রাজা সর্দার সিংহের নিকট আশ্রয়।

কোনো ভীষণের ভয়ে পাঠাইতেন। এই পক্ষের অভিপ্রায় কি, সেই বিষয় আমাকে লিখিও। পশ্চিমাঞ্চল হইতে বিশেষ কিছু স্বাবাদ পাওয়া যায় হই। বলা হইতেছে যে, আরবালি অবসর গ্রহণ করিতে চাহিতেন, রাজা (২৭) শাহজাহান এখনও সিংহাসনে আছেন এবং গাজীউদ্দীন খাঁ উজীর হিসাবে বহাল হইরাছেন। নবাব-বাহাদুরের স্ত্রিনি বিরোধী কিন্তু ঈশ্বরকে বশবান্দ যে, তিনি নিজের সর্বপূর্ণ পরিশ্রুতিতে জড়িয়া পড়িয়াছেন।

(খ) "রমজানের ৩ই তারিখ হইতে এখানে যাত্রা যাত্রা ঘটরাছে, সেই সকলের বিবরণ তোমাকে ইতোমধ্যে পাঠাইয়াছি। লন্ডনের নবাব বাহাদুরের নিকট একখানি আশ্রিত হইয়াছে। ১৪ই তারিখ পর্যন্ত বেসব পত্র লিখিত হইয়াছে, সেইগুলি আজ সকালে আমি পাইয়াছি। এই সকল পত্র হইতে দেখা যায় যে, আমার পত্রসমূহ এখনও গন্তব্যস্থলে বাইরা পৌঁছায় নাই এবং নবাব বাহাদুর এই স্থানের ঘটনাবলী অবহিত নহেন। আজ রমজানের ২১শে তারিখ, বুধশনিবার। এই বৃহস্পতি অর্থাৎ বিপ্রহর অবধি ঈশ্বরকে বশবান্দ যে, আমার অর্জুত আশা এখনও দেহ-কাঠামোটির মধ্যেই আছে। আমার পক্ষেত্রিয়ের ক্ষেত্রে যে পোলযোগ ঘটরাছে, ইহাতেই অল্পমান হয়; কার্যতঃ ইল্লিয়সমূহ অবলম্ব্য। শাহজালা, করালীপন, মারাঠারা ও কামগার এই অবসোধ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কাম, ফ্রান্স, সোভ ও মোহের প্রাধান্য ঘটরাছে। আমার সাহসী লোকদের বীর্ঘাভাব ও অল্পগামীদের সন্ধ্যাক্রান্ত দৈহিক শক্তির ক্রমিক অবলম্ব্য ও পক্ষেত্রিয়ের সাধারণ বিনষ্টির অজ্ঞান ইঙ্গিতপূচক এবং আমার সকল পত্র ও কোর্নলের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচায়ক। এই সময় তিনবার সংঘর্ষ হয়—প্রারম্ভিক সংঘর্ষ, বখন তাঁহার সর্বপ্রথম দুর্গ অবরোধ (২৮) করে এবং ইহা ঘটে তৃতীয় মিসল রাক্ষসে। দ্বিতীয় লড়াই হয় করালীরা বখন বেগমপুর সেটে তাঁহাদের আক্রমণ চালান। সেইটি চতুর্থ মিসলে অর্থাৎ গতকল্য ভোর হইবার দুই ঘণ্টা পূর্বে সমাপ্ত হয়। তৃতীয় সংঘর্ষ—বখন কামগার, মারাঠা ও করালীরা পশ্চিম দিক হইতে আগাইয়া আসেন এবং গ্রোহিলারা, জরুল্লাবাসিন খান (উজীর) ও মাদারাহ দাওলা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দুর্গের পূর্বে দিক হইতে আমাদের উপর আক্রমণ চালান। একটি অল্পত ধরনের লড়াই হইয়া যায়, অনেক সাহসিকতাপূর্ণ কাজ হয়, বাহার বিস্তারিত বিবরণ নিতে বহু সময়ের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু সে সময় আমার নাই। ঈশ্বরের অল্পগ্রহে এখন অবধি সবই ভালরফালর চলিয়াছে। এই তিনটি সংঘর্ষে তাহাদের লোকসংখ্যা হইয়াছে প্রায় এক হাজার, তাহাদের নিপুণ সৈন্যধ্যক্ষদের অনেকেই নিহত হইয়াছেন, সমস্ত মনোবল তাহাদিগের ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। স্ত্রিন দল

(২৭) ইনি ছিলেন একজন সাক্ষিপোশাল, ১৭৫১ সালে গাজী উদ্দীন ইমামুল মুলকের সহায়তার সিংহাসন পান।

(২৮) পাটনা অবরোধ ও দুর্গের ওপর আক্রমণ চালান হয় ১৭৫১ সালের এপ্রিল মাসের শেষাংশে। ২৮শে এপ্রিল ক্যাপ্টেন নর উপস্থিত হন এবং সাদাওয়ালীসের অবরোধ প্রত্যাহারে বাধ্য করেন।

লড়াই শেষ হইলে ক্যাপ্টেন নর অপরাতে তাঁহার দলের পুরোভাগে থাকিয়া এখানে উপস্থিত হন এবং আমাদের সহিত বোপদান করেন। ইহাকে আমাদের সৈনিকরা প্রোবন্ত হইয়া উঠে। কিন্তু অপর পক্ষের লোকেরা নিজদের কংস তাকিয়া আনিতে নিরন্ত হইতেছিল না। আমাদের সম্পর্কে বলিতে পারি, আমরা সব সময় সব দিকে নিজদের সম্পূর্ণ তৈয়ারী রাখিয়াছি। রাজির অন্ধকার বখন নামে, সেই সময় আমরা কঠিন পরীকার সম্মুখীন হই। এই বৃহস্পতি বসারের বরহম শাহ, বুখা সিং ও বাহার সিংহের ভার জমিদারগণ আসিয়া উপস্থিত হন এবং আমাদের সহিত বোপাবোপ করেন। দুসিরামের (২৯) প্রায় এক হাজার লোকও আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। আমি এখন অবধি অধ্যবসায়ের রক্ষা শিখিল করি নাই এবং শেষ নিশ্বাস ধাকা পর্যন্ত ইহা অটুট থাকিবে। আমি সমস্ত নিরাহি বরাপসীতে মরিব (এখানে মরে)। তুমি আমার প্রাণাধিক জির, আমার ব্যাপার লইয়া তুমি যথার্থ ব্যামাইও না। আমি এই ভাবিয়াই বিশেষ দুঃখ অনুভব করি যে, এই কয়টি শিশু সন্তানের তখন কি হইবে এবং এইগুলি ও বিশ্ববারা চরম অসহায় ও বিদ্রু অবস্থার পড়িয়া কি ভাবে সুত্বাবরণ করিবে। তুমি আমার নিজের খেকেও জির, ঈশ্বর বেন তোমাকে নিরাপদে বাঁচাইয়া রাখেন। আমি বখন থাকিব না, সেই সময় নবাব বাহাদুরই তোমার উপর নজর রাখিবেন। আমার ক্ষমত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—কি আশ্চর্য আমি তর্যুত হইতেছি আমার উচ্চ দীর্ঘাশ উহারই ইঙ্গিতপূচক। কিন্তু হা-হতাশ করিয়া আমি মরিতে চাই না। আজ যে স্বাবাদ পাইয়াছি, তাহাতে জানিলাম, সকলের আগে তোমাকে চলিয়া আসার আগ্রহই বেন আমি দেখাইয়াছি। ঈশ্বরই আমার সাক্ষী, আমি কখনও সেইরূপ আগ্রহ দেখাই নাই। বতদিন আমি আমার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিব, ততদিনই আমি বাঁচিয়া থাকিব। অত্যা, আমি সকলের নিকট হইতেই বিদায় গ্রহণ করিব। ভ্রমলোকদের (ইংরেজ) ততই-ইহার উপর আমার যুক্তির সত্যবনা নির্ভর করিতেছে। আমি বখন বাঁচিয়া থাকিব না, তখন এই ভূমির হাল কি হইবে, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। এইবার কার্যতঃ আশ্চর্যবাদের প্রলয়কণ্ঠ ঘটয়া গিয়াছে। আলমগর, মুলতানগর ও মনেক্র'র সমগ্র অঞ্চল একরূপ ধূলার পর্বাবসিত হইয়াছে এবং শাহ আরজানের (৩০) দরবার অল্পত ব্যাপার ঘটরাছে। নিরাহ লোকদের বক্তব্রোত উহার ইমামবাড়ীতে অবাসে বহিয়া চলে এবং সক্রম দীর্ঘাশ কারবাল বাইরা পৌঁছে। বাস্তবিকই ইহা একটি কারবালার পরিণত হইরাছিল। সমগ্র পূর্বাঞ্চলবর্তী জেলাটি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তোমার উত্তান সম্পর্কে, সেখানে যে কি ঘটরাছে, আমি কি ভাবে লিখিব। আমার জীবিতাবস্থা হইতেই এই সকল ঘটিল বলিয়া আমার সুত্বাই খেরে। রাণীপুরের বাগানটি এখন একটি মাটির চিবিতে পরিণত হইয়াছে এবং আশ্চর্য পড়িয়াছে। গত পাঁচদিন বাবত পুজবীরা জননীর এবং আমার চক্ষে রবি সম্পর্কে

(২৯) মীরশের সৈন্যবাহিনীর অল্পতম সেরা সৈন্যধ্যক্ষ ও সারসের সরকারের কোর্নলার। বামনাওয়ারের সুপারিশে ইনি রাজার শ্রমমর্যাদা পান।

(৩০) এই সাল ১০৩৮ (১৬১৮) সালে পরলোকগমন করেন এবং সমাধিস্থিটি নির্মিত হয় ১০৭২ (১৬৬১) সালে।

কোন খবর পাই নাই। অবরোধ অবস্থাবীন কয়েকজন ছাড়া কেহই জীবিত নাই, ইহাই মনে হইতেছে। গভীরতার (?) মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার (৩১) লোক প্রাণ হারাইয়াছে। তোমার এবং সেখানকার ভক্তলোকটির পক্ষে জানা যায় যে, সেখানে প্রায় এক সহস্র মারাঠা আছে। এখানকার হিসাব এই যে, অশ্বারোহী সৈন্ত আছে প্রায় ত্রয় হাজার। শাহজাদার সৈনিকদের এবং অভিলুপ্ত কামাগারের একটি অবস্থা। কংসী সৈন্ত হইবে প্রায় ৩০০ (?) এই বিষয়ে আরও লিখিবার মত শক্তি আমার নাই। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি মনের কথা লিখি নাই এবং সে লিখিতে হইলে বহু তা কাগজ প্রয়োজন। অপর পক্ষ হইতে যে আক্রমণের আশঙ্কা করা হইতেছে, তাহা ঘটবার এই-ই সম্ভাবনা। সেই জন্য এই কয়টি ছত্র লিখিয়াই আমি শান্ত থাকিলাম। আমার প্রভু ও মনিবদের কাছে এখনও আমি আশ্রি প্রার্থন করি নাই, তোমাকে মাত্র সংবাদটি জানাইয়াছি।”

নবাব সৈয়দ জঙ্গের (কাইলন্দ) নিকট লিখিত পত্র

(ক) “শত্রুপক্ষের পুনঃপুনঃ আক্রমণের বিবরণ এবং ২২শে রমজান পর্যন্ত বাহা ঘটনাতে সকল বিষয়ই আপনাকে ইতিপূর্বে জানাইয়াছি। তাহাদের অনেকেই নিহত কিংবা আহত হইয়াছে। ক্যাপ্টেন নব্ব দুর্গ হইতে বাহির হইয়া শত্রুদের উপর আঁপাইয়া পড়েন এবং তাহাদিগের অনেককেই হত্যা করেন। ক্যাপ্টেন নব্বের আক্রমণে তাহাদের ভিতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং শাহজাদা নিরুশায হইয়া রমজানের ২৩শে তারিখে পশ্চাৎ অপসরণ করেন। এখান হইতে ত্রয় ক্রোশ দূরে পুনপুনে বাইয়া তিনি ঠাঁয়। কিন্তু এখনও তিনি নতুন করিয়া গোলযোগ সৃষ্টির মংলব ভাজিতেছেন। আপনি আমার সন্দেহ বন্ধ, আমার প্রভু ও মনিব নসিরুল মুলক বাহাদুরের সহিত আপনি বান, ইহাই সুবিবেচনার কাজ হইবে। কামগার, মারাঠা ও কংসীদের সহ শাহজাদার আশ্রিত্যবাদে উপস্থিতি এবং আশ্রিত্যবাদ হুগে তাহাদের অবস্থান বিষয় পূর্বেই মাস্তবর নবাব বাহাদুরের নিকট অবহিত করা হইয়াছে।”

(খ) “১৬ই সাওয়াল তারিখে লিখিত আপনার পত্রখানি পাইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন যে, আমার প্রভু ও মনিব (মীর) আকবরনগরে (রাজমহল) প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং একই দিনে পুর্ন্যা অভিমুখে অভিযান চালাইতে আগ্রহী ছিলেন। প্রয়োজন হইলে এই স্থানের দিকে তিনি আগাইয়া আসিতেন। আপনি জানেন যে, সাবনের মারামারি তিনি সেই ব্যক্তির (শাহ আলম) অঙ্গসন্ধান ছাড়িয়ে দিয়াছেন এবং কিরিয়া বাইয়া ১লা রমজান হুর্দিদাবাদে চুকিয়াছেন। সেই মাস্তব এই দিকে আগাইয়া আসিতে পারেন বলিয়া তাঁহার চলাচলের (৩২) ওপর

নবাব রাধিতে মাস্তবর নবাব বাহাদুর আপনাকে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। সমাগণও সক্রিয় থাকিবার জন্য আমার প্রতি নির্দেশ ভারী করাই যথেষ্ট কি না, কিংবা আশ্রিত্যকার জন্য আরও কিছু সৈন্ত সামন্ত আমার হেফাজতে পাঠাইয়াও পরিকল্পনা আছে কি না, তা আমি বলিতে অক্ষম। আমার অবস্থা বুঝিবার জন্য এক মাসকাল মধ্যে কোন বস্ত্র লওয়া হয় নাই এবং সাহাবের আশায় প্রেরিত আমার ব্যাকুল আবেদনপত্রগুলি সম্পর্কে কোন সাড়াই পাওয়া যায় নাই। এখন অবধি টাখরের অঙ্গগ্রহ এবং নবাব বাহাদুরের সৌভাগ্যের দক্ষণ আমি আমার মর্যাদা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছি কিন্তু এই পর্য্যন্তই। ইহার বাহিরে ঠাঁড়াইলেই দেখা যাউবে সেই বলিষ্ঠ পুরুষকে একা বাধা দিতে আমি অপারগ। খাদিম হাসান খানের গতায়ত এবং উক্ত পুরুষ পুরুষকে সাহায্য দেওয়ার তাঁহার মংলব সম্পর্কে বিস্তারিত আপনাকে এর পূর্বেই জানাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে আমি আগে বাহা লিখিয়াছি, তদনুসারে বেশী কিছু আমি জানি না। উল্লিখিত খানের বধন পুর্ন্যা হইতে এই অঞ্চলে চলিয়া আসার মংলব আছে, এই অবস্থার পুর্ন্যা অভিমুখে অভিযান চালান কেন বুদ্ধিযুক্ত মনে হইল না, কারণ ব্যক্তিতে আমি অক্ষম। তাহারা কি এই প্রদেশের উপর অধিকার রাখার চিন্তা বাধ দিয়া দিয়াছেন? আপনি জানেন যে, আশ্রিত্যবাদ আমার পিতৃ-পুরুষের সম্পত্তি নহে। উক্ত পুরুষ পুরুষের ব্যাপারটি (অতীত) অনেক বাড়িয়া চলিয়াছে। রাজা বলবন্ত সিংহ আমার যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, খুব সম্ভব স্বজাতিদোলা তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছেন এই পত্রের একখানি নকল এবং রাজা যুগলকিশোরের পত্র ইতিপূর্বে মাস্তবর নবাব বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। পত্রগুলি পড়িয়া আপনি বিস্তারিত অবহিত হইতে পারিবেন। পাঠাচ্ছে যদি আপনি সেইরূপ বুদ্ধিযুক্ত মনে করেন, পুর্ন্যা অভিমুখে আপনি অভিযান চালাইতে পারেন। কিংবা আপনি যদি চাহেন, যে এই প্রদেশের উপর অধিকার অটুট থাকুক, সেক্ষেত্রে আশ্রিত্যবাদের দিকে যেন দ্রুত আগাইয়া যাইবেন। আমার বিশ্বাস, এখানকার অবস্থা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার সন্দেহ বন্ধ হইয়া আমিয়াং বাহাদুর, সম্রাটের জং ইহার ভিতর আপনাকে সবিস্তার লিখিয়াছেন। বাহা হউক আমি এই অঙ্গরোধ জানাইতেছি এবং আপনি অঙ্গগ্রহপূর্বক আমার বস্ত্র নবাব বাহাদুরের সকাশে নিবেদন করিবেন। বিখ্যাত ব্যক্তিটি ১০ ক্রোশ দূরে তাঁর স্থাপন করিয়া আছেন এবং খাদিম হাসান খানের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। পুর্ন্যা অভিমুখে অঙ্গরোধ হইয়া বাইতে আমি কখনও অঙ্গরোধ করিব না এক্ষণে আমি এই কথা লিখিতেছি এইজন্য যে, আমার উপর যেন কোন দোষ দেওয়া না চলিতে পারে।”

(গ) “...বহুদয় কামগারের বজী খাণে রায় তাঁহার বাহিনী লইয়া শাহজাদার সহিত যোগদান করিয়াছেন। কামগার নিজে আপন এলাকা হইতে বওয়ানা হইয়া বুনিয়াদগঞ্জের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রাজা সন্দর সিংহ বাহাদুরের (বৃত্ত) জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল এই বুনিয়াদগঞ্জ। বিলম্বের সময় নাই বলিয়া আপনাকে কোনক্রমে এই দিকে চলিয়া আসার জন্য জরুরী জ্ঞাপন পাঠাইতেছি। ইহাতে রাজার স্বার্থ বহিয়াছে, কারণ,

(৩১) আলোচ্য অঙ্গগ্রহটি খুব স্পষ্ট নহে। যে সংখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে, তা একটু অতিরিক্ত মনে হয়।

৩২। সেরপূরে ১৭৬০ সালে পরাজয়বরণ করার পর শাহজাদা : বালায় অভিযান চালানার একটি পরিকল্পনা করেন। শাহজাদার সেই সাহসিকতাপূর্ণ ও ব্রহ্মবৃত্ত পরিকল্পনার কথাই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

শাহজাদা যে হাজিমা শ্রম করিয়াছেন, দিনের পর দিন তাহা গুরুতর ও জটিল আকার ধারণ করিতেছে। খাদিম হাসান খান (৩৩) সারনের সরকারের এলাকার বাসিয়া পড়িয়াছেন।

নবাব জাফর আলি খাঁ বাহাদুরকে লিখিত আবেদনপত্র

“নবীর অপরাধ প্রাপ্তের সন্নিহিত অঞ্চলে খাদিম হাসান খানের পৌছিয়া বার্তা এবং তাঁহার অগ্রগতি বোধের জন্য ক্যাপ্টেন নর ও রাও সিতা বরায়ের চিঠিপত্র ইতিপূর্বে মাননীয় নবাব বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আজ ২রা জিকাদ, সোমবার। উল্লিখিত খান সাহেব শিবির হইতে পূর্বদিকে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন এবং হাজিপুরে ক্যাপ্টেন ও রাও সিতা বরায়ের মুখোমুখি বাইয়া ঝাঁড়াইয়াছেন। শেষ হামিদুলীন বাহাব মুল খাইয়াছেন, তাহার গুল গাহিতে সম্পূর্ণ অক্ষমতা দেখাইয়াছেন। কামানের গর্জন শুনিবামাত্র কোনরূপ লড়াই না দিয়াই তিনি পলাইয়া যান। অজিত নারায়ণের ভ্রাতা জমিদারগণও তাঁহার নিলক্ষ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। এই ঘটনায় সরকারের সেনাদলের মধ্যে গুণগোল দেখা দেয়। খাদিম হাসান খান তাঁহার বাহিনী পুনর্গঠনের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং চতুর্দিকেই অবরোধ স্থাপন করেন। ক্যাপ্টেন ও রাও সিতা বরায় বাহাদুর অনেক সাহসিকতার কাজ করেন। হরকরারা ভীত সঙ্ঘাতের খবর এবং ক্যাপ্টেন ও রাও বাহাদুরের শৌর্যের বার্তা আপনার নকর আমার নিকট অহরহ বহন করিয়া জানিতে থাকে। কারণ, আমি নবীর এই ভীতে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব হইয়া মোতায়নে ছিলাম এবং আরও সৈন্য প্রেরণ করিতেছিলাম। প্রচণ্ড জনপ্রোত ও রাজপ্রোতের বিপুল সমাবেশের জন্য সাহায্যকারী সৈনিকদের পক্ষে সেখানে পৌছান প্রায় কঠিন হইয়া পড়ে। কামানের গর্জন এবং বন্দুক ও আগ্নেয়াস্ত্রের আগুয়াজ সকল হইতে সূর্যাস্তের পূর্বে চার ঘটিকা পর্যন্ত অবিরাম শব্দ বাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, মহামাজ নবাব বাহাদুরের সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত জয় হইয়াছে। নকর সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই নবাব বাহাদুরকে অভিনন্দন জানাইয়া একটি আজ্ঞা প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু, ইত্যাবসরে আমি জানিতে পারি যে, জয়লাভের পর ক্যাপ্টেন ও রাও সিতা বরায় বাহাদুর আসিতেছেন। সংবাদটি কিছুটা উৎসেহের সঞ্চার করে। আমি নিজের ক্যাপ্টেনের সহিত দেখা করিতে এবং তিনি কেন এইদিকে আসিয়াছেন, জানিতে আগাইয়া বাই। তিনি বলেন যে, বিজয়বার্তা জ্ঞাপনের জন্যই তিনি এই ভাবে আসিয়াছেন। তিনি ইহাও জানান যে, আর কোন ভয় নাই। সেই ব্যরণায় তিনি শব্দ লোকজন রাখিয়া আসিয়াছেন। ব্যক্তি শেষ হইবার পূর্বে চার ঘটিকার তিনি পুনরায় সেই ব্যরণায় রওয়ানা হইয়া বাইবেন। আজ ক্যাপ্টেন ও রাও সিতা বরায় রাও নবী অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আমি জানিতে পারি যে, তাঁহারা দুইটি হাতী এবং উহাদের পৃষ্ঠে আরুদু হুই কি তিনি জন প্রাধানকে হত্যা করিয়াছেন।

(৩৩) এ থেকে আলোচ্য পত্রগুলি ১৬ই জুনের আগেকার বলা যেতে পারে। এই সময়ই খাদিম হাসান খান হাজিপুরে পরাজয় বরণ করেন।

তাঁহাদের প্রায় ৪০০ লোককে তাঁহারা নরকে নিমজ্জিত করিয়াছেন বলিয়াও বলা হয়। আহত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেশী। ক্যাপ্টেন ও রাও বাহাদুরের অনুগামীদের প্রায় ৫০ জন হয় নিহত কিংবা আহত হয় এবং ক্যাপ্টেন দুইটি কামান আটক করেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও নবাব বাহাদুরের সৌভাগ্যের দক্ষ সরকারের বিপুল জয় জুটিয়াছে। প্রায় ২০ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়াই জয়লাভ করা সম্ভব হইয়াছে, ইহাও ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং নবাব বাহাদুরের ভাগ্যকল। রাও সিতা বরায় যে শৌর্য প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রত্যেকেই ইহার ভূমী প্রশংসা করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন সাহেবের সাহসিকতা সম্পর্কে কোন বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই নকর মন্তব্যের নবাব বাহাদুরের নিকট মাথা নত করিতেছে এবং শ্রদ্ধা জানাইতেছে। খাদিম হাসান খান চার ক্রোশ দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন।”

দীরাজনারায়ণকে লিখিত পত্র (৩৪)

“সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাবর্তন এবং সেই অভিশপ্ত অঞ্চলের (৩৫) পাশাপাশি উপস্থিত সর্বদা সম্মিলিত তোমার পত্র মঙ্গলবার বাব্ব মুলীধরের হরকরা মারফত পাইয়াছি। এই পত্রে মেজর (কাইলন্দ) ও চতুর জমিদারের মধ্যে যে কথাবার্তা ও আলোচনা হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারিলাম। সেই দিনই আমি নবাব মেজর সুবাসিভুদৌলা সৈয়দ জঙ্গ বাহাদুরের একখানি পত্র পাই এবং উহা আসে সমসের জঙ্গ বাহাদুরের (মিঃ আমিয়াট) মারফত। এই মর্যাদান্তিক ঘটনা (৩৬) সম্পর্কে উহা ছিল একটি শোকপুষ্টক পত্র। আমাকে সাধনা দিবার জন্যই ইহা প্রেরিত হয় ১০ নবাব (কাইলন্দ) এইরূপ চাহেন যে, আমি যেন এই জয়বিবারক সংবাদটি গোপন রাখি। সোমবার সন্ধ্যায় এক ঘটিকা পূর্বে আপনার লিপিটি হস্তগত হইয়াছে। আমি শোক মুহুমান হইয়া পড়ি এবং এই সম্পর্কে কাহারও নিকট একটি কথাও বলি নাই। তবে সন্ধ্যাবেলা স্বভাব অনুযায়ী আমি যখন সমসের জঙ্গ বাহাদুরের সকাশে গমন করি, আমি তাঁহার কানে কানে কথাটি বলি ১০ সেনাদলের অভ্যন্তরে যখন ইহা গোপন রাখা যায় নাই, এখানে উহা আর গোপন করিয়া লাভ কি? পরন্তু খবরটি যদি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, কি কতি হইবে পারে? শত্রুপক্ষের সৈন্য আগাইয়া আসিবার আশঙ্কায় কথাই যদি বলা হয়, এই অধম শাহজাদার ভয়ে আর্দ্র ভীত নহে। এই যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি আত্মন—আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইতে প্রস্তুত। তিনি আমাকে বেশ ভালরকম চিনেন ও বুঝেন। গতকাল সন্ধ্যায় এই মধ্যে সংবাদ পৌছিয়াছে যে, তিনি মুছিবিলপুর ছাড়িয়া সমসেরনগর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, আবদালির থিলাতকে লইয়া ঢাক পিঠাইতে আদেশ দিয়াছেন। জানা যায় যে, আবদালির প্রেরিত অশ্বারোহীরা তাঁহাকে

(৩৪) দীরণের যুদ্ধের পর এই পত্রখানি লিখিত হয়।

(৩৫) যেতিয়া অঞ্চল।

(৩৬) দীরণ ও কাইলন্দ চন্দ্রারণ জেলার পাহাড় অঞ্চলে খাদিম হাসান খানের পত্নাধীন করছিলেন, এ অবস্থায় ১৭০০ সালের ২রা জুলাই রাজিতে বজ্রাঘাতে দীরণ নিহত হন।

বারাণসী অবধি লইয়া বাইতে নির্দেশিত হইয়াছে। এবং তিনি সেই ভাবেই পশ্চিম দিকে বওয়ানা হইয়া বাইতেছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইহা যেন সত্য হয়। কামগার এখনও তাঁহার নিজের বাতগায় অবস্থান করিতেছেন। সুরজাউদৌলা গঙ্গানদী পার হইয়াছেন এবং নাজিব খানকে সঙ্গে করিয়া আবদালির যোগদান করিতে বাইতেছেন। আবদালি জলধরে তাঁরু পাতিয়াছে এবং সমস্ত মারাঠা বাহিনী আকবরাবাদের নিকট প্রস্তুত হইয়া আছে। উভয়ের মধ্যে একটি যুদ্ধ (৩৭) অনিবার্য এবং আশঙ্ক। কি ঘটে না ঘটে আমাদের দেখিতে হইবে।—তুমি প্রায় মীমাংসা ব্যাপারে তোমার এবং রাজা মুসিরামের (৩৮) যে আশঙ্কা, তাহার কথা বলিতে গেলে, বিষয়টি দরাজ জগৎ নবাব বাহাদুরেরই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই যুদ্ধেই তিনি আমাদের প্রতি অসুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন এবং সৈনিকদের মনোবল পুনরুদ্ধারের প্রয়াস নিতেছেন। তোমাকে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, জমিদারের শ্রমতানী মনোভাব সর্ববিদিত। তিনি সেই জঙ্গলের একজন বৃদ্ধ নেকড়ে এবং চতুর শিয়াল। সোজা পথে তাঁহাকে কি ভাবে ফিরাইয়া আনা চলিতে পারে? নবাবের অসুস্থতায় সম্পর্কে পূর্বেও সন্দেহ ছিল না, এখনও নাই। আমাদের কপাল খারাপ—অবস্থাদ্বীনে আমার সামর্থ্য ও ধৈর্য্যচ্যুতি ষটিগাছে। বা খুব জোর সুরজ হইয়াছে এবং এই সময়ে কোন পরিকল্পনা সফল হইবার আশা নাই। সেনাবাহিনীকে তুমি সেখানে থাকিতে দিও না, ইহাই প্রয়োজন। আজিমাবাদে সৈন্যদের লইয়া আস এবং বর্ষার প্তির দিকে না তাকাইয়া সময়টির কথা বিবেচনা কর। বাহা ষটিগাছে, তাহা আমাদের ক্ষমতার বাহিরে ছিল।

(৩৭) একটি বিখ্যাত পানিপথের যুদ্ধ, তবে ১৭৬১ সালের ভাদ্রমাসী অবধি এ সংঘটিত হয়নি।

(৩৮) খামি হাসান খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসিরাম নিহত হন, এ ঠিক নয়।

এখন আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা সমীচীন হইবে। নবাবকে (কাইলান) এই কথা বলিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে যে, তিনিই আমাদের প্রভু ও রক্ষাকর্তা এবং মহাহুজুরের উপর আমাদের সর্বরক্ষম আস্থা আছে। বেতিয়ার জমিদারকে শান্তি দেওয়া একটি কঠিন কাজ নয়। তবে এই যুদ্ধেই তাঁহার অপরাধ উপেক্ষা করিয়া বাওয়াই সমীচীন। এক দুই মাস পর এই অভিশপ্ত মাদ্রবটিকে ভাল রকম শান্তি দেওয়া হইবে এবং এই ব্যাপারে নবাব সাহেবকে কোন অসুবিধায় কেলিবারও প্রয়োজন হইবে না। কোনরূপ চেষ্টা যদি করাও হয়, নবাবের সৈন্যদের সম্বন্ধে পড়িবার সম্ভাবনা। ইহা সমীচীন হইবে না। নবাবের সাহায্য ও সমর্থন লইয়া অনেক ভাল কাজ করিতে হইবে। বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ইহার পূর্বে সংক্ষেপে আমি তাঁহাকে এই বিষয় জানাইরাছি। শুভকসে এই বাত্না সুর করা হয় নাই। তুমি ও মহারাজা বাহাদুর এখানে নিরাপদে চলিয়া আস, ইহাই প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি। কয়েক দিন পর এবং নবাব বাহাদুরের অনুমোদনক্রমে লব কিছু করা হইবে। তুমি, নবাব আহম্মদ খান, রাজা সিতাব রায়, রাজা মুসিরাম পত্রের বিষয়বস্ত সম্পর্কে ভাল রকমে চিন্তা করিও এবং তার পর তুমি উহা মহারাজা বাহাদুরের নিকট লইয়া বাইতে পার। সর্বশেষে উহা নবাবের সকাশে উপস্থাপিত করা চলিতে পারে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, পত্রখানি সেখানে পৌঁছিবাব পূর্বেই নবাবের সৌভাগ্য বলে একটা মীমাংসায় আসা হইবে। তাঁহার (বেতিয়ার জমিদার) সহিত কোন না কোন ধরণের ব্যবস্থা শেষ করিয়া তুমি যেন ঐ স্থান হইতে চলিয়া আসিও। নবাব ও মহারাজা উভয়েই বলিও যে, তাঁহাদের দুই জনের নিরাপত্তার জঙ্কই আমি বিশেষ ব্যাকুল। জমিদারের শান্তি সম্পর্কে আমি পূর্বেই কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও করিব।

অনুবাদ—হনিলখন ভট্টাচার্য্য

কবর সঙ্গীত

[R. L. Stevenson অনুসরণে]

ভারকা খচিত ওই আকাশের ছায়—
কবর খনন করিয়া তোমরা সবে
শরণ করিও আমারি এ ক্ষীণকার্য্য;
পৃথিবীতে প্রাণি কাটিয়েছি উৎসবে।

তুমি কথাটি লিখিও সমাধি 'পরে :
হৃদয়েছি আমি সব অভিল্য শেষে
শিকারী কিরেছে সকল শিকার করে
নাবিক কিরেছে সাগর হইতে দেশে।

অনুবাদ : শ্রীশৈলেনকুমার দত্ত।

মীনা কুমারী কামাল আমরোহী 'শাকিনা' ছবিতে



বিচিত্রকপিনী
নারী তুমি

....কবির
যুগ্ম
নয়নে

শব্দের দীপ্ত আকর্ষণে হাল্কা! মেঘের আনন্দোন্মত্ত মনে, হাজার
তারার স্তব্ধে, এক কালি চাঁদের এক তলক হাসির মতোই মিষ্টি মেঘের
মিষ্টি হাসি.....চাঁদের আলো হারিয়ে গেছে ঐ মেঘেরই স্নান। অপের
মানে.....রূপ, রূপ যে নারীর সব!

আর সে কথা চিত্রতারকা মীনা কুমারী ভাল করেই জানেন। জানেন
অন্যেই মীনা কুমারী বলেন, "অস্বাভাবিক চিত্র তারকাদের মতো আমিও প্রবাসভরা
লাজ ব্যবহার করি। এর ফলের মতো নরম কোমল পরশ আমার
হৃদয়ে বৃষ্টি আর মোলায়েম করে।"

আপনার রূপও এমনটিই হবে—নিরামিত লাজ ব্যবহার করুন!



চিত্র-তারকার
সৌন্দর্য্য
সাবান বিশুদ্ধ
শুভ্র লাল

বিশুদ্ধাণ্ড শিকারের তৈরী

L78, 63-X52 BG

নেই। সেইজন্য এরা অর্থাৎ নিরঞ্জন—আজ সিদ্ধেশে যেতে পার না।

স্বরত আবার প্রশ্ন করছে! এ সব শুনলুম। কিন্তু জীব আবার সিদ্ধেশে অর্থাৎ সত্যধামে পৌঁছাবে কেমন করে? সেখানে বাবার পুত্র কি?

স্বামী এই কথা শুনলেন। শুনে উত্তর দিচ্ছেন:

পাঁচ নাম কা স্মরিত করো।

শ্রাম সেতু তেঁ স্বরত ধরো।

পিরঞ্চর স্রুনে গগন মে বাক্য।

পাঁচ নাম স্মরণ অর্থাৎ জপ করো, আর শ্রাম সেতের মধ্যে স্বরতকে বসাত। তারপর প্রথমেই তোমার জন্মের গগনে জন্মুত বাত পোনে।

স্বরত আবার প্রশ্ন করছে। এই পাঁচ নাম কি? তার ভেদ কৃপা করে আমার বলুন।

স্বামী উত্তর দিচ্ছেন:

প্রথম অস্থান খোল কর পাউ'।

সহস কঁবল দল নাম স্তনাউ'।

জোত নিরঞ্জন বাস লখাউ'।

কবতা তিন লোক রহ ঠাউ'।

বেদ চার ইন রচে জনাউ'।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব তীনে'।

পুত্র ইনহী কে হৈ রহ চানহো'।

জাল বিছারা জগ মে ভারী।

ইনকী পূজা জীব সম্ভারী'।

প্রথম ধামের কথা খুলে বলি—তার নাম সহস্রনামকমল। সেখানে হল জ্যোত নিরঞ্জনের বাস, আসেই তা বলেছি। এই স্থানের কর্তা ইনি। চার বেদ ইনিই সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব, এই তিন হলেন এই পুত্র। এঁরা জগতে অপূর্ব জাল বিছার করেছেন। জীব এঁদেরই পূজা নিয়ে যন্ন।

স্বামী তারপর এই প্রথম ধাম সব্বন্ধে আরো বর্ণনা দিলেন, কত ব্যাখ্যা করলেন। পর-পর আবার কত ধামের কথা বলে গেলেন। যেমন—দ্বিতীয় ধাম 'ত্রিকুটীর' কথা, যে স্থান হল 'ব্রহ্মমণ্ডল'—বেখানে ঠিকারধারি ধরিত হচ্ছে প্রতিনিরঞ্জন। তারপর তৃতীয় ধাম 'মুক্তমণ্ডল' বেখানে দশমধারের তেজ ও শোভা প্রকাশমান। তারপর চতুর্থ ধাম 'ভবরঞ্জন'—বেখানে সোহংধারি ধরিত হচ্ছে প্রতিরঞ্জে। এই সকল ধামের বিষয় তিনি সব্বন্ধে ব্যাক্তি করে বললেন এমনভাবে, যেসব কথা অবর্ণনীয়।

সব শেষে স্বামী বললেন পঞ্চম ধাম 'সত্যলোক'-এর কথা। বলছেন:

বোড়স ভান চক্রে উজ্জিয়ায়া।

স্বরত চক্রে দেখা নিজ দ্বায়া।

সতগুরু মিলে ভেদ সব দীনহা।

তিন কী কৃপা দরস হম লীনহা।

দরশন কর অতি কর মগনানী।

সত্যপুরুষ সব বোলে বাকী।

বাদশাহ, সজা নিজ জানী।

পঞ্চম ধামের অর্থাৎ সত্যলোকের সুলভানী তথ্য (সিংহাসন) সাজা বাদশাহের আসন। সেখানে 'বোড়স' (অর্থাৎ অসংখ্য) সূর্য-চক্রে দ্বীপ্যমান। স্বরত সেখানে পৌঁছে সত্যপুরুষের দর্শনলাভ করে আর তাঁর অনির্বচনীয় বাণী শুনে অপূর্ব জানকে উজ্জিসিত।

এই হল স্বামী ও স্বরত-সংবাদ। এই সংবাদ সম্পূর্ণ নূতন ও অতীত অপূর্ব! এই সব উক্তি ভক্তদের বিশেষ ভাবে উপভোগ্য। পূর্ণ সতগুরু স্মরণ নিলে আর তাঁর নির্দেশিত প্রণালী অনুসরণ করে চললে নিজের ধাম সত্যধামে পৌঁছানো যাবে সুরিন্দ্ররূপে। এই হল স্বামীর বচন।

৪

আবার সন্ত কবীরের প্রসঙ্গে আসা যাক। কবীর নিজের সাধনবলে সত্যপুষ্টি ও সত্যবস্ত লাভ করে সমস্ত বর্ণগণ-কোন্ডালের উপরে চলে গেলেন। তিনি বলেছেন:

স্বর পরকাল তই রৈন কই পাইয়ে

রৈন পরকাল নাই স্বর ভাসৈ।

জ্ঞান পরকাল অজ্ঞান কহ পাইয়ে

হোয় অজ্ঞান তহ জ্ঞান নাটৈ।

কাম বলবান তহ প্রেম কহ পাইয়ে

প্রেম জহ হোয় তহ কাম নাটৈ?

কহে কবীর যহ সত্য বিচার চৈ

সমস্ত বিচার কর দেখ সাহী।

স্বর্য যেখানে প্রকাশমান, সেখানে রাত্রি পাবে কি করে? রাত্রি যেখানে প্রকাশমান, সেখানে স্বর্য কি প্রকাশমান থাকে? জ্ঞানের আলোর যেখানে প্রকাশ, সেখানে অজ্ঞানকে পাবে কোথায়? আর অজ্ঞান থাকলেই জ্ঞানের নাশ হয়। কাম যেখানে বলবান, সেখানে প্রেম থাকবে কি করে? যেখানে প্রেম আছে, সেখানে কাম। এই হল সত্য বিচার। যুকে সত্য বিচার করে দেখ।

আর বলছেন, সহজ—সমাধির কথা। বলছেন:

সজো সহজ সমাধি ভলী,

শুভ পরতাপ ভয়ো জা দিন তৈ

শুভ ন অজ্ঞ চলী।

আঁখি ন মুহু কানন ক'খু কয়া কঠ ন ধাক'।

সুনে নৈন মে হ'স হ'স দেখু, স্তম্ভর রূপ নিহাক'।

কহ' সো নাম সুর্য সোই স্মরিত, বাউ পিউ মোই পূজা।

পিরহ উজ্জান এক সম দেখু, ভাব মিটাই' দুজা।

জহ জহ জাউ' সেই পরিকরমা জো কুহ কহ' বো সেবা।

জব সোউ' তব কহ' লগবত, পুহু' গুর ন দেবা।

শব নিরঞ্জন মজুরা রাতা, মলিন বাসনা ত্যাগী।

উঠত বৈঠত কবহ' ন বিসঠৈ, এনো ভাড়ী লাগী।

কহৈ কবীর রহ উনমুল রহনী, সো পর ঘট কর গাই।

দুখ সুর্যকে ইক পরে পরম সুর্য, তেহি সুর্য রহা সমাদী।

ওহে সন্ত, সহজ সমাধিই ভাল। শুভর প্রতাপে যে দিন তোমার

বার, সেদিনের অস্ত থাকে না সুরতের। চোখ বন্ধ করি না, কানও ঢাকি না, কার্যকে কোন কষ্ট দিই না। চোখ বুজে আমি হাসতে হাসতে চাই, দেখি তাঁর স্তম্ভর রূপ। যা বলি, সেই নাম।

বা শুনি সেই জপ। বা খাই, বা পান করি সেই পূজা। বাড়ী আর উত্তান একই সমান দেখি; হুঁভাব মিটিয়ে মিহি। যেখানে-যেখানেই যাই, সেই হয় পরিক্রমা, যা কিছু করি সেই হয় সেবা। যখন শয়ন করি, সেই হয় দণ্ডবৎ; অন্ত দেবতার পূজা করি না। অনাহত শব্দে ঘন আমার মন্ত। করেছি মলিন বাসনা ত্যাগ। উঠতে-বসতে কখনো তাঁকে ভুলি না, এমনই হয়েছি মিলন। কবীর বলছেন, এই আমার উদ্বুথ ভাব, তাই আমি প্রকাশ করে গান করলাম। দুঃখ-সুখের পরে এক পরম সুখ, সেই সুখেই সমাহিত হয়ে রয়েছি।

কবীর, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টাই করেছেন, আর মিলনও করে দিয়েছেন। তিনি যেমন হিন্দু, তেমনই মুসলমানেরও। তখনকার ্যে কথার তিনি বলছেন, মুসলমান হলেন সূচ, আর হিন্দু হলেন সূতো। তাই নিয়ে হবে কাঁধা সেলাই, হবে চাদর সেলাই, হবে পিরান সেলাই। যোগীরা আর ভক্তেরা সেই সব পরবেন, ব্যবহার করবেন। মুসলমান হলেন বীণার তুবী, আর হিন্দু হলেন বীণার তার। সেই বীণা বজার দিচ্ছে, অতি মধুর আর মোহন সুরে।

কিছু এত সব করা সত্ত্বেও হিন্দুও গুনলো না তাঁর কথা, মুসলমানও গুনলো না তাঁর কথা। দুই দলই মহা খান্না তাঁর উপর। তাই তিনি শেষে আপশোষ করে বলছেন :

সাধো দেখো জগ বোয়ানা।

দাঁচ কঠৈ তো মারণ ধাপে, খুটে জগ পতিয়ানা।

হিন্দু কহত হৈ বাম হামারা, মুসলমান রহমান।

আপন যে দৌড় লাড়ে মরত হৈ, মরম কোই নহি জানা।

ঘর ঘর মন্ত জো দেত কিরত হৈ, মায়া কে অভিমানা।

গুরুদ্বা সহিত শিষ্য সব বুড়ে, অন্ধকাল পতিয়ানা।

হিন্দু কী দয়া মেহর তুরকন কা, দেখো ঘর সে ভাগী।

বহ কঠৈ জিবহ বহ বটকা মাইর, আগ দোউ ঘর লাগী।

দ্বা বিবি ইমত চলত হৈ হমকা, আপ কহাইবৈ তানা।

কঠৈ কবীর গুনো ভাই মাধো, ইন্মে কোঁন দিবানা।।

বলছেন, ভাই সাধু, দেখ এই জগৎটা ধারণা হয়ে গেছে। সত্যি কথা বললে মারতে আসবে, আর মিথ্যা যদি বল তো বিশ্বাস করবে।

হিন্দু বলছে আমার বাম, মুসলমান বলছে আমার রহিম—হুঁজনে লড়াই করছে খুব, কিন্তু মর্থ কেউই জানছে না। ঘরে ঘরে মন্ত দিয়ে বেড়াচ্ছে মারার অভিধানে, গুস্তর সঙ্গে শিষ্যও ভুবছে, শেষটাতে কি দুর্গতি। হিন্দুর দ্বা আর মুসলমানের মেহর, এ দুটোই ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। ও মিছে বলি, আর এ করছে জবাই—হুঁজনেরই ঘরে আগুন লেগেছে। ওরা আমাদের উপহাস করে চলে, আর নিজেদের বলে সেয়ানা। কবীর বলছেন, ভাই সাধো—বল দেখি এদের মধ্যে কে পাগল?

মনে রাখতে হবে কবীর বলছেন এই সব কথা পাঁচশ বছরেরও আগে। তখন ধর্মঘত নিয়ে ছিল মহা ঘোষাঘোষি, মহা দলাদলি আর বিরোধ। কবীর এই সব দলাদলি আর বিরোধ যে দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন, সে দৃষ্টি জামীরও হয় না, পণ্ডিতেরও হয় না।

কবীর-পন্থীরা বহু শাখায় বিভক্ত, অন্ততঃ হবে প্রায় পনেরোটি

শাখা। সে বহুকালের কথা। এখনো অনেক শাখা বর্তমান আছে। অনেকের মতে কবীর সম্প্রদায়-স্বষ্টির বিরোধী ছিলেন।

একবার কবীর রাজা চৈৎসিং কবীর-পন্থীদের সংখ্যা জানবার জন্য কবীর নিকটে এক মেলা বসান। সেই মেলায় কবীর-সম্প্রদায়ের ৩৫,০০০ হাজার উদাসীর সমাগম হয়। এও তো বহুকালের কথা। আর এক মতে, কবীর-পন্থীদের সংখ্যা দশ লক্ষের বেশী।

কবীর দীর্ঘজীবী ছিলেন। তিনি এক শত বৎসরের বেশীকাল জীবিত ছিলেন। এমনও প্রবাদ যে তিনি তিন শত বৎসর জীবিত ছিলেন। এ সবকিছু লিখিত আছে :

সবৎ বারহসরে ঔর পাঁচ

মো জ্ঞানী কিয়ো বিচার।

কাশী বাঁহি প্রবট ভরো শব্দ কঠো টক্সার ॥

সবৎ পন্দরহসরে ঔর পাঁচ

মো মগর কিয়ো গবন।

অগহন স্রুদি একাদশী

মিলে পবন সো পবন ॥

অর্থাৎ, ১২০৫ সন্থতে জ্ঞানী বিচার করে দেখলেন। তিনি কাশীতে আবির্ভূত হয়ে টক্সার শব্দ প্রকাশ করলেন। ১৫০৫ সন্থতে মগর নামক স্থানে গমন করলেন, তারপর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশীতে পবনের সহিত পবনের হুল মিলন, অর্থাৎ বেহ বাখলেন।

তিন শত বৎসর এ যুগে বৈৎস খাকা এক রকম অসম্ভব বলেই মনে হওয়ার কথা। কিন্তু এক চূড়ান্ত আছে। ত্রৈলোক্য স্বামী কাশীধামে ২৮০ বৎসরকাল পর্যন্ত দেহ ধারণ করে বিজ্ঞান ছিলেন। অবশ্য এটিও হয়তো প্রবাদ কথা—যদিও যোগীপুরুষদের সুদীর্ঘকাল দেহ ধারণ করা অসম্ভব কিছুই নয়।

কবীরের দেহত্যাগের স্থান সব্বদেও মতভেদ আছে। কারো-কারো মতে সর্বশেষে তিনি কাশীতে এসে অসিন্দীর তীরে বিরাজ করতে থাকেন। তিনি সেইখানেই পুষ্পশয্যায় শয়ন করলেন আর দেহত্যাগ করলেন।

তাঁর দেহত্যাগের পর বিরোধ বাগলো হিন্দু মুসলমানের ভেতর। হিন্দুরা বলেন, দেহটিকে তাঁরা দাহ করবেন, আর মুসলমানেরা বলেন, কবর দেবেন। মহা তর্ক, মহা দ্বন্দ্ব। দেহটি ছিল এক স্বচ্ছ গুজ্র বস্ত্র ঢাকা। এক উদাসী এই দুই দলের বিরোধ দেখে বস্ত্রটি তুলে ফেললেন। দেখা গেল দেহ নাই। তাঁর জায়গায় রয়েছে শুধু একরাশি স্বচ্ছ কুটন ফুল। দেখে সবাই অবাক। সেই ফুল তখন দুভাগ হল। তখনকার কবীর রাজা বীরসিং একতাপ নিয়ে কবীর এক মহান্নায় সমাধি-মন্দির তৈরী করলেন, তাঁর নাম হল—কবীর চৌরা। এখনো এই সমাধি বর্তমান। অপারভাগ নিলেন মুসলমানদের সর্দার, পাঠান বিজ্ঞানী বান। এই ভাগ নিয়ে গোরক্ষপুরের নিকট রংহর গ্রামে এক সমাধি তৈরী হল। এ সমাধিও এখনো আছে। এই দুইটি স্থান হল কবীরপন্থীদের তীর্থভূমি।

কবীরের পর এলেন গুরু নামক ৭১ বছর পড়ে—যদিও অল্পেক পরে। কিন্তু এই দুই মহাপুরুষের আবির্ভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মমতের হর, হু দলের মিলনও হয়। মানবজাতির এ যে কত বড় কল্যাণকর সেবা, ভাঙ্গ বর্ণনা করা যায় না।

কবীরের ধর্মপন্থা বিশেষভাবে প্রচারিত হয় উত্তর-ভারতে।
কবীরের পর তাঁর অল্পবর্তী হন অনেকেই। যেমন—অবোধার
জগজীবন দাস। জগজীবন দাস সংনামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।
আনোয়ারের চরণদাস চরণদাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মালব
দেশের বাবালাল সাধু বাবালালী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এঁদের
বাঁকী-বচনের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের কথা বেশ স্পষ্ট।
হিন্দু-মুসলমানের অন্ধ কুসংস্কার এবং অন্ধ গোঁড়ামী যে কত বৈধি
তিরোহিত হয়ে গেছে। এঁদের প্রভাবে উত্তর-ভারত থেকে, তা
দক্ষিণ ভারতের তখনকার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে বেশ স্পষ্ট
বুঝতে পারা যায়।

কবীরের গ্রন্থ আছে বিস্তর। সে সবই অতি মনোহর হিন্দী ছন্দে
রচিত। আর সে রচনা হল—গীতা, তোপাই, শাখী, শব্দ প্রভৃতি
অনুপম ছন্দ নিয়ে। কবীরের ২১খানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।
তাঁর ভিতর “শাখী” হল একটি। এই শাখীগ্রন্থে পাঁচ হাজার শ্লোক
আছে। এই সব শ্লোক অতীব মনোহারী।

‘শাখী’ অর্থ উপদেশ। সমস্ত কবীর নানা বিষয়ে, নানাভাবে জীবকে
উপদেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর উপদেশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করি—
হৃথ মে’ সুমিরণ সব কঠৈ
সুথ মে’ কঠৈ না কোয়।
জো সুথ মে’ সুমিরণ করে
তো হৃথ কাহে কো হোয়।

হৃথ পড়ে সবাই ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু সুথের সময় কেউ
স্মরণ করে না। সুথের সময় যদি স্মরণ করে, তো হৃথ হবে কেন?

নাটচ গাটৈ পর কঠৈ

নাহি সত্য সো হেত।

কঠৈ কবীর কৌ নাগজে

বোজ বিহনা খেত ॥

ভক্তি না হোসে, শুধু নর্তন, কীর্তন বা পদ পাঠে কোনই ফল
নেই। কবীর বলছেন, ভক্তিরূপ বোজ ভিন্ন, স্তবরূপ ক্ষেত্রে কোন
শ্রুত উপকার হয় না।

কথা শুখা থাইকে

ঠাণ্ডা পানী শিব।

দেখি বিরাগী চোপড়ী

মৎ ললচাবে জীব ॥

কুক ও শুক খাত ভোজন করে টাণ্ডাজল পান কর। পরের
সুখাৎ খাত দেখে যেন তোমার জিহবার জল না পড়ে।

সাধুন কৌ খুপড়ী ভলী

না সাকট কো গাঁব।

চন্দন কৌ কুটকী ভলী

না বাঁবল বনগাও ॥

সাধুব খুপড়ীও ভাল, ছত্রেয় গ্রামও ভাল নয়। চন্দন কাঠের
একটু টুকরোও ভাল, কিন্তু বাবুলের একটা বৃহৎ বৃক্ষও ভাল নয়।

কবীর চন্দনা ছুব কর

তরুনে সে সো চিত্ত।

বিন রোয়ে নহি পাইয়ে

শ্রেয় পিরায়ী মিও ॥

হে কবীর, আমি ছুব কর। রোদনে তোমার চিত্ত দাঁড়। শ্রেয়ের
সেই প্রিয় মিত্রকে বিনা রোদনে পাবে না।

হসি হসি কান্ড ন পাইয়া

জিন পায়্য তিন রোয়।

হসি খেলে গিউ মিলে

ভৌ কৌন দুহাগিন হোয় ॥

হেসে হেসে কান্ডকে পাওয়া যাবে না। বিনি পেয়েছেন,
তিনিই রোদন করেছেন। হাসি-খেলা করে যদি প্রিয়কে পাওয়া
যেত, তাহলে কেউই বিবাহিনী হোত না।

সুখিয়া সব সংসার হৈ

খাটৈ গুর সোটেব।

ছুনিয়া দাস কবীর হৈ

জাগৈ গুর রোটেব ॥

সংসারের সকলেই সুখী, সবাই খায় আর শয়ন করে। দাস
কবীরই কেবল দুঃখী, সে জেগে থাকে আর তাঁর বিরহে রোদন করে।

কামী ক্রোধী লালচী

ইনটৈ ভক্তি ন হোয়।

ভক্তি করে কোই সুরমা

জাতি বরণ কুল খোয় ॥

কামী, ক্রোধী আর লোভী এদের ভক্তি হয় না। জাতি,
বর্ণ আর কুল খুঁয়ে ছ’একজন বীর কেবল ভক্তি লাভ করে।

কবীর সব জগ নিধন

ধনবজা নহি কোয়।

ধনবজা সোই জানিয়ে

সত্য নাম ধন হোয় ॥

হে কবীর, জগতের সকলেই নিধন, কাকেও ধনবান দেখা
যায় না। তাকেই ধনবান বলে জেনো, যার সত্যনাম-ধন প্রাপ্তি
হোয়েছে ॥

পশিত গুর মশালচী

বোনো সুরে নহি ॥

গুর কো করে চান্দনা

আপ আফেরে মাহি ॥

পশিত আর মশালচী ছুনেরবই বোধ নেই। এরা অপরকে
আলো দেয়, কিন্তু নিজেরাই থাকে অন্ধকারের মধ্যে।

বোলো তো অনমোল হৈ

জো কোই জানে বোল।

হিয়ে তরাছু তোল কর

তব মুখ বাহর খেলে ॥

বোলো অর্থাৎ বাক্য হোল অমূল্য, যদি কেউ তা বলতে জানে।
হিরাক্ষ গাড়ি-পাঞ্জার আগে তাকে তোল অর্থাৎ ওজন কর—তায়ের
বাইরে মুখ খোল।

চলতি চকৌ দেখ কর

দিয়া কবীর রোয়।

দো পাটন কে বিচ

লাবিত গয়া ন কোয় ॥

জাঁতা দুইদে দেখে কবীরী বোদন করতে লাগলেন। জাঁতার
এই দুই পাটের মধ্যে এসে কোন প্রাণীই সাবিত অর্থাৎ আত
রইলো না।

সাধু কঠাবন কটিন টে

জোঁ লক' পেড় গজুব।

চটে তে: চটে প্রেমরস

গিটের তো চকন' চুর।

সাধু হওয়া বড়ই কটিন কাজ। টি ওটি লড়া খেজুর গাভর
তুল্য। পাঁচ চড়তে পারলে আহার লওয়া যেতে পারে, কিন্তু পতন
হোলেই একেবারে চূর্ণ।

সাধু স্মারসা চাটরে

ছুঁখে দুখাট' ন'হি'

ফল ঠের ফুল ছেঁই ন'হি'

বটৈ বনীচা মটি'।

সাধু এমন হওয়া চাই। যিনি নিজের হুংব বোধ করেন না,
অপরকেও হুংব দেন না। তিনি সংসাররূপ বাগিচায় বাস করেন
বটে, কিন্তু ফুল বা ফল ছিঁড়িয়া ভোগ করেন না।

কন ফু'কা গুরু হৃদ কা

বেহন কা গুরু ঠের।

বেহন কা গুরু জব মিলে'

ভৌ লগৈ ঠিকানা ঠৌর।

যে গুরু কানে মন্ত দেন, তিনি রয়েছেন সীমার মধ্যে। অসীমের
গুরু কথার আলো। অসীমের গুরু বন্ধন মিলবেন, তখনই ঠিক
জিনিসের ঠিকানা পাওয়া যাবে, নইলে নয়।

লাথ কোস জো গুরু বটৈ'

দ'জে সুরত পঠায়।

শখ তুহী অসবার হোর

ছিন আবে ছিন স'য়।

সাচ্ছা গুরু কি রকম? না, লাথ কোস দূরে তিনি যদি থাকেন
তাতে কি? শব্দের উপর সওয়ারী হোয়ে এক মুহূর্তে যায়, আর
এক মুহূর্তে আসেন।

হয় বাণী উস দেশ কা

জহা অবিনাশী কী স্থান।

হুখ হুখ কোই-ব্যাপে নহী'

সব দিন এক সমান।

আমি সেই দেশের বাসী, যেখানে অবিনাশী স্থান। সেখানে
জীবকে হুংব শুধু ব্যাপৃত করতে পারে না—সেখানে সকল দিনই
এক-সমান।

হয় বাসী উস দেশ কা

জহা বাওক হাস গিলস।

প্রেম বটৈ বিকলে কমল

প্রেমপুঞ্জ পরকাশ।

আমি সেই দেশের বাসী, যেখানে বার মাস বসন্তকুটু বিজয়মান।
যেখানে নিরন্তরকাল মহা অন্তর বর্ষণ করছে, আর সন্তপণ সেই
সদুতে দিক হুজেন।

হয় বাসী উস দেশ কাহা পার ব্রহ্ম কা খেল।

জীপকভটের অসম কাবিন বানি বিন ছেল।

আমি সেই দেশের বাসী, যেখানে পরব্রহ্মের খেল চলেছে। যেখানে
বিনা সাক্ষি আর সিনা তেলে, অসম-আত্মার জোয়ারি ফলছে।

কবীরের সাধনপথের সম্যক পরিচয়ী চড়ে তহে, তাঁর প্রাক্তসকল
পারি করা আশঙ্ক। কিছ এ সকল পড়বো' কে? কার সে
জ্ঞানিকায়? সে পাখে কিছু এবিসে না গোল, সে সকলের সত্য তথ্য
উপস্থাপন করা স্তব্ধ। কবীরের বাণী সকল লোকেরই অজ্ঞের
বাণী আর সে-বাণী অগাধ অভুলনীয়।

পূর্ব কথাই পুনরুক্তি করি—কবীর ছিলেন প্রথম সন্ত। তিনি যে
সন্ত-পন্থা অহুর্ভবন করে গেলেন, তা চলে আসছে তাঁর সময় থেকে
পূর্ণভাবে, মহিমময় ভাবে, অবিকৃত ভাবে। একটি বাণীর মধ্যে আছে—

সম্মতা সব সে বড়া

রহ নিশ্চয় কর জান।

সুখী ঠের বেদান্তী

দৌনো নীচে বান।

সন্ত দিবালী নিত করে'

সত্যলোক কে মাছি।

ঠের মতে সব কানকে

য়্যাহী মূল উড়াহী।

সমাপ্ত

Amico's
GREEN LINIMENT


আপনি নিশ্চয় বৈদিক ব্যাথার যত্ন পাচ্ছেন— কোথায়?
কোমরে, ঠাট্টে, কিংবা কোন বহিরাগত?
তবে বুঝি হবে—
বারীক, হৃৎ বা পিঠের পাঁচবার,
ঘড়ের ইত্যাদি ব্যবহার ব্যাথার

এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেন্ট
(সহজ হালি)
ব্যাবহারিক নির্ভরযোগ্য।

মূল্য: বড় পিশি—২.৭৫ নং পঃ
ছোট পিশি—১.৭৫ নং পঃ
"নাশুল" বস্ত্র

ব্যবহারের জন্য নির্দেশ—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
৮০ নং কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা-১



আধুনিক বঙ্গদেশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

সংস্কার প্রেরিত এই নতুন আত্মগত্যা সব সময়েই ধর্ম সংস্কারের পথে বারিনি। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এবং নিরীশ্বরবাদের দিকেও গেছে। এক বিগ্রহের বদলে আর এক বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা চলছিল। নতুন বিগ্রহ হাতুড়ির প্রতিচ্ছবি, তাই দিয়ে অল্প বিগ্রহ তাক্তা হচ্ছিল।

সংস্কার ও ধর্মসাহিত্যিক বিপ্লবের প্রেরিত যে আত্মগত্যা পরিলক্ষিত হচ্ছিল তার মধ্যে একটা গভীর সারবত্ত ছিল। এটা সংশয়বাদ, বিদেব অথবা হতাশার পরিণাম নয়। মানুষের মনে এই বিশ্বাস বহুদূর হয়েছিল যে অতীত ঐতিহ্যের বন্ধন ছিন্ন করতে পারলে নবীন স্বাভাবিক পথ প্রশস্ত হবে।

সংস্কারপন্থ ও ছাপাখানা

দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে এবং তার সঙ্গে সায়গত রেখে অর্থনৈতিক এবং কারিগরির ক্ষেত্রে যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে, তারই ভিত্তিতে বাঙালার সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর গতিবিধি নির্ণয় করা যেতে পারে। বাঙালার সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের পক্ষে এই পদ্ধতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া আমরা মনে করি, যদিও এটাকে অনেক সময় খাটো করে দেখা হয়। এই সমস্ত ঘটনার কিছু চিত্তাকর্ষক প্রমাণ সমাচারদর্পণ (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) থেকে জল্পনামাখি বঙ্গোপাখ্যার সঙ্কলন করে স্বাধীনপন্থে সেকালের কথা নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতার সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনে প্রগতিশীল শক্তি প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু তার আগেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতির জন্য পূর্বসূরীরা বহু উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেছেন। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা তাঁদের ভূমিকাকে অবধা খাটো করে দেখেছেন।

কারিগরির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির কোন একটি উদাহরণ দিতে গেলে বাঙাল দেশে ছাপাখানার প্রবর্তনের কথা বলতে হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স আর কামার পকানন কর্ণকার বাঙালি হরক ঢালাই করেছিলেন। এই ঘটনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। (বাঙালি সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, ১৩৫৩, পৃ: ৩৮)

বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন এন বি হ্যালিফ্রেড ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে। বিচারকার্য পরিচালনা ও ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্যের জন্য ১৭৯১, ১৭৯২ ও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি আইন বাংলা ভাষার ছাপা হয়। ১৭৯৩ ও ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে শব্দকোষ প্রকাশিত হয়। এর ফলে বাংলা দেশে ছাপাখানা এবং সংস্কৃত ও ফারসী ভাষার চিঠিপত্র লেখার বাংলা গল্পের স্রব্ধপাত হল। এর আগে সংস্কৃত অথবা পারস্য ভাষার চিঠিপত্র লেখা হত। (বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস পৃ: ২২)

১৭৭৮ থেকে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এন বি হ্যালিফ্রেড ও হেনরী পিটল কর্তৃক বাংলা ভাষাকে পারস্য ভাষার বন্ধন থেকে মুক্ত করে তার

কারিগর সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ধৃত শব্দ চালু করার চেষ্টা করেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, পৃ: ২৭-৩১)

মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত অথবা শব্দকোষের মত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রথম অনুবাদ করেন ইংরেজরাই। ফলে বিশ্ববাসীর কাছে এক নতুন বিশ্বের দুয়ার উন্মুক্ত হল। ইংরেজ লেখকদের কাছে বাংলা গল্প যে স্বর্গী তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, পৃ: ১৫-৩১) বাংলার বিশ্বসমাজের কাছে যে নতুন স্রব্ধপাত এসে গেল তাঁরা তা গ্রহণ করলেন এবং আমরা দেখতে পাই ছাপাখানার মতো ব্যবহার ও অনুবাদ কাজে নতুন উন্নত ধরনের গল্পের প্রচলন বেড়ে গেল। এককাল বৃষ্টিমের সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে তার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল।

শিক্ষা সম্পর্কে লোকের আগ্রহ বেড়ে গেল এবং গৌড়া ও প্রগতিশীল লোকেরা দেশের সর্বত্র বিলিতি ছাঁচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে দলবদ্ধ হল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্ণের কাছে সংস্কৃত বনাম ইংরাজী শিক্ষা সম্পর্কে যে পত্র লিখেছিলেন এখানে তা উদ্বৃত্ত করা হল :—

কলকাতার নতুন একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ভারতবাসীদের শিক্ষা উন্নয়নে গভর্নমেন্টের প্রশংসনীয় ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে। এই আশীর্বাদের সত্ত্বে তারা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে এবং মানবজাতির প্রত্যেক বঙ্গোপাখ্যাকামী কামনা করবে যে এই প্রচেষ্টা কৃষ্ণাঙ্কুরবিন্দিত আগ্রহের দ্বারা পরিচালিত হোক, যেন জ্ঞানের দ্বারা প্রয়োজনীয় খাতে প্রবাহিত হয়।

বখন এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়, তখন আমরা জানতে পেরেছিলাম যে ইংলণ্ডের গভর্নমেন্ট ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের শিক্ষার জন্য বার্ষিক একটা মোটা রকমের অর্থ ব্যয় করার আদেশ দিচ্ছেন। আমাদের নিশ্চিত আশা যে, ভারতের অধিবাসীদের গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়নশাস্ত্র, নবীরাব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই অর্থে প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষিত ইউরোপীয় ডক্টরদের নিযুক্ত করা হবে। ইউরোপের অধিবাসীগণ এই সমস্ত বিষয় আরও করে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের অপেক্ষা উন্নত হয়েছে।

আমরা দেখতে পাই গভর্নমেন্ট ভারতে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্য হিন্দু পণ্ডিতদের অধীনে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এই রকম বিদ্যালয়ে (লর্ড বেকনের আগে পূর্ব ইউরোপে এই ধরনের বিদ্যালয় বর্তমান ছিল) ব্যাকরণ সত্রাক্ত খটিনাটি ও পরা বিজ্ঞা বিবরণ আলোচনার দ্বারা যুবকদের মন ভারাক্রান্ত করা হয়, যা ছাত্র অথবা সমাজ কারও কোন কাজে লাগে না। হু'হাজার বছর আগে যে জ্ঞান প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীকালে উন্নত স্বল্পাংশ লোকেরা অল্পসংখ্যক বাগীদরদের দ্বারা যে জ্ঞানের

পরিধি অর্থহীনভাবে সম্প্রসারিত করেছে, সেখানে শুধু তাই শিক্ষা দেওয়া হবে। ভারতের সর্বত্রই তে এই ধরনের শিক্ষায় প্রচলিত আছে।

ইংলণ্ডের গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য হল ভারতের অধিবাসীদের শিক্ষায় জ্ঞান বর্ধকরূপে অর্থে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের উন্নতিবিধান। সেজ্ঞে আমি মহামায়া হজুরের বরাবরে নিবেদন করতে চাই, এখন যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তা অস্বকরণ করা হলে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। তত্ত্ববদের সংস্কৃত ব্যাকরণের কচকটি শেখবার জীবনের কয়েকটি মহামূল্য বহুর এইভাবে অপব্যয় করতে প্ররোচিত করে কোন উন্নতি হবে বলে আশা করা যায় না। ব্যাকরণের কচকটি কি ভাবে সমর অপব্যয় করে - র একটা উপাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। সংস্কৃত শব্দ শব্দের অর্থ খাওয়া। খাদ্যতির অর্থ কোন একজন পুরুষ অথবা একজন নারী অথবা কোন অচেতন জীব যাচ্ছে। এখন এখানে প্রশ্ন উঠে—খাদ্যতি শব্দটা সমগ্রভাবে ধরলে তাতে কি নারী, পুরুষ অথবা অচেতন জীব যাচ্ছে বোঝাবে? না, শব্দটার ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাড়াবে? ইংরাজি ভাষার eat (খাওয়া) শব্দটার অর্থই বা কতটুকু আর S-বর্ণমালার অর্থ কতটুকু সে প্রশ্ন ওঠে কি? এবং এই দুই অংশ একত্রে অথবা পৃথক পৃথকভাবে কোন সামগ্রিক অর্থে পৌছে কি?

ঐশ্বর্য্যিক করে আশ্চর্য্য বিলুপ্তি হয়, পরমাশ্চর্য্য সঙ্গে ভীষ্মাচার সম্পর্কিত, বেদান্তে এই সব কাল্পনিক তত্ত্বকথার আলোচনা করে

উন্নতি হবে না। বেদান্ত বলছে সবই মায়, বা আমরা চোখে দেখছি আসলে তার কোন অভিব্যক্তি নেই। বাপ তাই বলে কিছু নেই, তাদের প্রতি মাতা-সমতা রাখবারও কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং বড় শীঘ্র আমরা তাদের কাছছাড়া হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিই ততই মজল। যুবকরা বেদান্তের এই শিক্ষালাভ করে সমাজের উন্নততর সঙ্গত হতে পারবে না। বেদান্তের কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করে পাঠাবলি দিলে কোন পাশ হয় না—এই মীমাংসা কেনে অথবা বেদের কয়েকটি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগ প্রভাব অবগত হয়েও ছাত্ররা উপকৃত হবে না।

ভায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ছাত্ররা কেনেহে বিশ্বপ্রকৃতির বস্তুসমষ্টি ক'টি আদর্শ শ্রেণীতে বিভক্ত, আর কেনেহে দেহের সঙ্গে আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য সঙ্গে দেহের এবং চোখের সঙ্গে কান ইত্যাদির আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কি। কিন্তু তাতে ছাত্রদের মনের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

উপরে যে ধরনের কাল্পনিক শিক্ষার কথা বলা হল তাতে উৎসাহ দেওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে আমি মহামায়া হজুরের বরাবরে জানাতে চাই যে বেকনের সময়ের আগে ইউরোপে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যে বকয় অবস্থা ছিল তার সঙ্গে বেকনের লেখার পরবর্তী সময়ের জ্ঞানের অগ্রগতির তুলনা করা হোক।

বৃটিশ জাতিতে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখাই যদি উদ্দেশ্য হত তাহলে অজ্ঞতা চিরস্থায়ী রাখবার জন্য স্কুল শিক্ষকরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল তার পরিবার্তে বেকনীর দর্শন প্রবর্তন করতে দেওয়া



ক্যালকেমিকোর

ক্যাস্টরল

মনোরম গন্ধযুক্ত ক্যাস্টর অয়েল

ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্যমে সহায়তা করে

বড় শিশি কার্টন ছাড়া ও ছোট শিশি (পুন্সের ও আউল) কার্টন সমেত

পাওয়া যায়।



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা-২২

হত না। সেই ভাবে বলা যায় ব্রিটিশ আইনসভার যদি তাই উদ্দেশ্য হয় তবে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা দেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা গায়ে। 'কিন্তু দেশীয় অধিবাসীদের উন্নতি করাট যখন গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য তখন গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্যন্ত আরও উদার শিক্ষা প্রণালী গ্রহণ করে গান্ধী, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়নশাস্ত্র, শব্দ-ব্যবহাৰ বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করা যায় এবং উক্ত অর্থে ইউরোপে সুশিক্ষিত প্রতিনিধাসম্পন্ন কয়েকজন ভ্রমলোককে নিযুক্ত করে এবং প্রয়োজনীয় বই, সাক্ষরসম্পন্ন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সম্বিষ্ট একটি কলেজ স্থাপন করে সেই কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে। (হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস,—রাজনারায়ণ বসু, ২৬-৩৩) সংস্কৃত শিক্ষার সমসাময়িক অবস্থা কি রকম ছিল তা রামমোহনের পক্ষেই অত্যন্ত সঠিক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যে সমস্ত বিজ্ঞান ও কলিত জ্ঞান অন্ধৃত করে ইংলণ্ড একটি শক্তিশালী আধুনিক জাতিতে পরিণত হয়েছে তা আরও করবার জন্য এদেশে প্রগতিশীল নেতাদের মধ্যে যে-এবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তাও এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এখানে আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জীৱামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন দিগ্‌দর্শন নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন, তাতে বেঙ্গল বাম্পীরপোত প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিবরণ থাকত। স্থল বুক সোসাইটিও ১৮২২ খৃষ্টাব্দের কেজুরারী মাসে পদ্মাবলী নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। তাতে গিঁহ, ভটুক, ছাত্তা, গুণ্ডার, জলচন্তা প্রভৃতি জন্তু সম্পর্কে সচিত্র প্রবন্ধ থাকতো। বিজ্ঞান সেবি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানসার সংগ্রহ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পক্ষীর বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪০) শুরু থেকেই বার বছর কাল অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত হয়। প্রচলিত বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধগুলো অপরূপ ছিল এবং তা মাঝে মাঝে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ হত। পরে রাজকুমার মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহে (১৮৪১) প্রকৃতকথা বিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞানের প্রচার হতে থাকে।

এই ভাবে বাংলা দেশে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত আগ্রহ দেখা দেয়, কারণ তখন সকলেই বুঝেছিল যে এর মধ্যে ইউরোপের মহত্ত্ব নিহিত রয়েছে। সুতরাং গভর্ণর জেনারেলের কাছে রামমোহন যায় যে আবেদন করেছিলেন তা অস্বল্প ভাবে ভাবুক দেশবাসীর পক্ষ থেকে একজন বুদ্ধিমান নেতার কণ্ঠস্বর বলে ধরা যেতে পারে।

এ ছাড়াও, ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহের আরও একটি বাস্তব কারণ ছিল। ২৬শে জ্যৈষ্ঠবারী, ১৮২৮ তারিখে প্রকাশিত একটি সংবাদ এই ঘটনার উপর চমৎকার আলোকপাত করে।

"পূর্বে ইংরাজেরা এমত বৃত্তিতে ন যে, বাঙ্গালীরা কেবল কোরাণীপির উপযুক্ত ব্যক্তিই ইংরাজী শিক্ষা করে কিন্তু এখন দেখা গেল যে তাহারা আপনাদের দেশভাবার দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে অতএব আদালতের মধ্যে ইংরাজী ভাষার সওয়াল ও জবাব করিবার কি আটক। এখন বাংলা দেশের মধ্যে তাহা

আদালতে পারসি ভাষা চলিতেছে তাহা জ্ঞান সাহেবের ভাষা নয় ও উকীলদেরও ভাষা নয় আসামী করিয়াতীর ভাষা নয় এবং সাক্ষীদেরও ভাষাও নয়। আমাদেরও বিবেচনার এই যে যদি আদালতে কোন বিদেশীয় ভাষা চালান উচিত হয় তবে ইংরাজি ভাষা চালান উপযুক্ত। পূর্বে তাহারা এই প্রতিলব্ধ ছিল যে বাঙ্গালি লোকেরা ইংরাজি বৃত্তিতে পারিত না ও কহিতে পারিত না কিন্তু সে বাধা এখন দূরিত। গিয়াছে যেহেতুক আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতার হিন্দু কলেজে চারি শত বালক ইংরাজি শিখিতেছে এতদন্তর কলিকাতার মধ্যে অল্প অল্প ইচ্ছুক যত বালক ইংরাজি শিখিতেছে তাহাদের সংখ্যা কহিলে এক হাজারের নূন হইবে না এবং তাহারা এমত শিক্ষা করিতেছে যে আদালতের মধ্যে সওয়াল জবাব করিতে তাহাদের আটক হয় না। অতএব যদি আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষা চালান হয় তবে এই বিজ্ঞা শিক্ষার ফল দেখা যায় কিন্তু বাঙ্গালী লোকেরদিগকে তাহারা উত্তোষ করা উচিত। কলিকাতায় লোকেরদের উচিত যে তাহারা এই বিষয়ে চক্কে এমত এক দরখাস্ত করেন যে কালক্রমে আদালতে পারসি উঠিয়া ইংরাজ চলন হয় পরে যদি সে দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় তবে বাঙ্গালি লোকেরা অধিক উৎসাহপূর্বক আপনাদের বালকদিগকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করাইবেন ও শিক্ষার সাক্ষ্য হইবে।" (সংবাদপত্রে সেকালের কথা ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৬, ১ম খণ্ড পৃ: ৩৩-৩৪)

১৩ই জুন, ১৮১৯ তারিখে বঙ্গদত্ত পত্রে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা' এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:—
বঙ্গদত্ত (১৩ জুন ১৮২৯। ১ আশ্বিন ১২৩৩)

গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গোড় রাজ্যের সর্বত্র অনেক ঘন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই, পূর্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীত হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত টাকা পঞ্চাশ তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক চুট্টা দূট, এমতে ডুমারির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যে সকল লোক পূর্বে, কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্ট রূপে শ্রীত হইয়াছে এবং দিন দিন জনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহাদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।

এই যথাবিস্তারিত উদয়ের পূর্বে সমুদয় ঘন এতদেশের অন্যান্য লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের জীবন হইয়া অপর তাৎকালিক থাকিত ইহাতে জনপদ সমূহ হুগুধে অর্থাৎ কারিক ও মানসিক রূপে রূপিত থাকিত অতএব দেশ ব্যবহার ও কর্তৃদ্বারা অপেক্ষা এই পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদেশে সুনীতি বর্তনের মূলভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উপাধ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং এই অসংখ্যোপকার কেবল সৌভাগ্যের প্রভাউ এইমত নহে কিন্তু ইংলণ্ডপতির এতদেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও হৈর্য প্রভিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অনুরে সেই শ্রেণী প্রাপ্ত হইবেক। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৬, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৮)

দিনে
দিনে
দিনে
দি...



রেক্সোনা সাবানে 'কাউল' বলে
একটি বিশেষ ধনুকের তেল মেশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও
সুন্দর, আলও লাভণ্যময়ী হয়... সুশাস
ভরা রেক্সোনার পলিশ সাবান
আপনাকে সুস্বাদু আনন্দে রাখবে।
সৌন্দর্য সাধনায় সবদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন !



রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাভণ্যময়ী করে।

RPJ 64-333 MC

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

নানার

শক্তিপদ রাজগুরু

এ রাত্তো মানুষ আসে ভুল করে। মানুষের জগৎ এ নয়। কোথাও কোনখানে মানুষের জন্ত খাঁজের কোন সংস্থান নাই। গহন সীমাহীন বন, রাত্রির তমসা ভেদ করে কানে আসে হিঙ্গ্র খাপদের মত্ত গর্জনধ্বনি, চোখের তারায় তারায় প্রছলিত দৃষ্টি নিয়ে কেঁদে জীবন্ত মৃত্যুর দূত। গাছে কোথাও মানুষের খাবার মত ফল জগেনা, নেমা। মাটি মুখ খেতে পড়ে আছে বিশ্বাসঘাতকের মত, ফল ফলানোর স্বপ্ন—ধানের মঞ্জরীর মিনতি ভরা চাহনি এর দিকে কখনও পড়েনি। জল। জল—আর জল। কিন্তু গহীন কালল-কালো তৃণহারী পানীয় এ নয়। পঙ্কিল লবণাক্ত সমুদ্রের ভাষণতামাখা এর প্রতিটি বিন্দু, মাঝে মাঝে কোথাও এর বৃকে ভেসে রয়েছে তাতোয়িক কুংসিত শেওলা পড়া কুমীরের দলছাড়া কোন বৃদ্ধ শিতাবহ, চলতি নৌকার ধার ঘেঁষে চলেছে কমটের কাঁক, যদি কোন খাজ ছিটকে পড়ে সেই আশায় এক একবার লেজবাঁপটা দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। জীবনের সঙ্গে সন্ধিপথে কোথাও এই পরিবেশের স্বাক্ষর পড়েনি, অদৃশ্য অচ্ছেদ্য সম্পর্ক মাত্র একটিই বর্জমান তা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে বিদ্রোহের—ধ্বংসের।

তিনদিন তিনরাত্রি ধরে চলেছি ভাঁটার টানে—সমুদ্রের দিকে



বড় সাক্ষা মানুষ ছিল বাবু, গুরই দোয়ায়, আজ বনে বনে কার কাম করতছি।

সুন্দর বনের মধ্য দিয়ে। এখনও একভাটি গেলে তবে পৌছবো 'লোথিয়ান আইল্যান্ডে' সেই একই বৃন্ত, নদীর প্রসার বেড়ে চলেছে, অল্পপারের বনানী পরিদ্বারভাবে চোখে পড়ে না, একটা ক্ষীণ কালো রেখা কে যেন দিগন্তের কোলে টেনে রেখেছে।

সুয়মান বাঁওয়ালি হালে বসেছে, সাড়ে তিনশো মণের নোড়ুন নৌকাখানা চার পাঁড়ে বেশ এগিয়ে চলেছে, নদীর দোলালিতে সাধা শরীর ছলছে। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে বসে আছি নিঃসঙ্গ আমি—মৃত্যু দৃষ্টিতে এপাশের কেওড়া-গর্জন পশুর গাছের ঘন সবুজ বনানীর দিকে; তিনদিন-তিনরাত্রি লোকালয় ছেড়ে এলেছি, মানুষের কঠোর গুনছি ওই বাঁওয়ালি পাঁজনের, কুকুরের ডাক পাবীর ডাক—আজ তিনদিন কানে আশেনি, সমাজ আমাকে তার শাস্ত নিবিড় আলিঙ্গন থেকে নির্ধাসন দিয়ে বনবাসে পাঠিয়েছে।

—কই রে, গান গাইছিলি যে, ধামলি কেন?

ছোকরা মাঝি ইয়াকুব ওদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী, মাঝে মাঝে কারণ অকারণে গুন গুন করে সারী গানের একটা কলি গেয়ে বসে। বুড়ো মাঝি সুয়মান ধমক দেয়—চুপ কর, গান! এ জিনপরীর বনে গান করতে নাই। চাণ্ডা ছাওয়াল কোথাকার।

ছেলেটা চুপ করে যায়। মানুষ এখানে তার সমস্ত কিছু সৌন্দর্য—সুকুমার বৃত্তিকে পিছনে কেল আসে এই বৃত্তাপুরীতে, হুর এখানে ভক্ত, হাসি এখানে জোর করে ফুটিয়ে তুলতে হয়—সে হাসিও বা রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়—তাকে আর বাই হোক কিছু বলা যেতে পারে—হাসি সে নয়।

আমার কথায় ইয়াকুব মুখ তুলে চাইল মাত্র। কোন কথা না বলে কাঁড়ের টানে টানে আঙুপিছু হটতে থাকে। একটা শব্দ কানে দিনরাত বাজতে শুরু হয়েছে, তা ওই কাঁড়ের ঝপ ঝপ ছল।

বৈকাল নেমে এসেছে। ভাঁটার টান মন্দীভূত হয়ে আসছে। আঙুল দিয়ে দেখাল একজন কাঁড়ি—এই যে কেওড়াহঁত।

চেয়ে দেখি, বড় নদী থেকে বার হয়ে গেছে দু'রে বীকের মাথায় একটা প্রশস্ত খাল—হু'পাশে বিশাল করেকটা কেওড়া গাছ ঘন কালো ছায়ায় অস্তরালে কি এক গোপন রহস্য আবৃত করে রেখেছে।

হালের সাতানের উপর থেকে সুয়মান আলি লায়নের

দিকে চেয়ে আছে, বাবিরের কথা শুক হয়ে গেল, কি যেন একটা নিবিড় ভক্ততা নেমে এসেছে ওদের মুখে

কথা। কইল সুরমান—ভাঁটার টান কমি আসতিছে, জোরে বাতি হবে, নালি কেওড়াহুতে পৌঁচতি পারবা নি...

শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ওরা বাইরে নিরাপদ আশ্রয়টুকুর দিকে।

কোথাও জনমহুয়াি নাই, এও বন—ওখানে বরং নিবিড়তর বনানী, তবু কেন ওরা ওখানে পৌঁছতে চায় জানি না। নীরবে বসে আছি।

বন-কালো গাছের মাথায় মাথায় নেমে এসেছে আবার অন্ধকারের স্পর্শ, বাতাসে ভেসে আসে দুবসমুদ্রের গর্জনধ্বনি, পশ্চিম আকাশের বৃকে রং-এর শেষ খেলা তখনও যুড়ে রহিছে। কোন অথবা চিত্রকর আকাশজোড়া ইজলের বৃকে একরাশ লাল রং ছড়িয়ে নীচের দিক থেকে কালো কালিতে ঢেকে দিচ্ছে—নিখুঁত নীল আকাশের প্রাশান্তি মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল তীব্র শক্তিত চাহনিভরা দু'একটা ছিটকে পড়া তারার ফুল, অন্ধনে অবত্রে বেড়ে ওঠা সজ্যামালতীর মত।

—জা ইলাহা ইল্লালাহ, মহম্মদ রসুল্লাহ—

সুরমান বাঙালিরা নেওয়ারাজ পড়ছে, আরও চার জন রয়েছে তার সঙ্গে। দিন শেষ হয়ে গেল—এল সন্ধ্যা। নিবিড় প্রাশান্তিভরা রহস্যবৃত্ত অন্ধকার। হঠাৎ গাছের ডালের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। বাঁধা রয়েছে একটা জীর্ণ বিবর্ণ লুঙ্গি—একটা ছোঁড়া মাদুর—আর একটা পুটলিমত কি। গহন বনে—লোকালয় থেকে প্রায় পঞ্চাশ বাট মাইল দূরে—স্বাপদসঙ্কুল দুর্গম বনের মধ্যে মাদুরের স্পর্শমাথা কি এক রহস্য বাসা বেঁধেছে গাছের ডালে!

—ভটা কি সুরমান?

তামাক খাচ্ছিল সে নৌকার খোলে বসে, কলকের লাল আভা পড়ছে নৌক-বাড়িভরা মুখের এক পাশে, চোখের দৃষ্টি ওর শুদ্ধ-প্রসারী আগত অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—মজিদ বাওয়ালির কবর।

অন্ধরণে যেন আঁখিপাকা চুল ভর্তি মাথাটাও নোহাল একটু।

—কবর! বিস্মিত হয়ে উঠি। মাটি বলতে জোয়ারের পলিমাথা নোনা কালো কাঁসা, সমস্ত সুরমবনই প্রায় জোয়ারের সময় জলের তলে থাকে। এখানে কবর!

—বড় সাক্ষা মাদুর ছিল, বাবু, ওইই বোয়ার আজ বনে বনে কাঁচ কাম করতিছি।

কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুক চিরে বার হয়ে আসে।

চুপ করে আবার তামাকে মন দিল, কি যেন রহস্ত—একটা অব্যক্ত ইতিহাস চাপা রয়ে গেল ওর স্তম্ভতায়।

টেউ-এর দোলায় নৌকাখানা হুলছে। অন্ধকারের বুক চিরে এককালি চাঁদ চেয়ে রয়েছে থরথরে বনানীর দিকে, কাছেই ডাকছে হরিণের দল।

‘খনের মর্যে জেলে ওঠে অরণ্যানীর জীবনস্পন্দন, হই-এর ভিতর বসে আছি ব্যাগখানা মুক্তি দিয়ে। ওপাশে বসে সুরমান। হারিকেনের পলতেরা নামানো, কীপ জালাটাও আড়াল করা হয়েছে।

—কল-কললের কথা বাবু, কে জানে ডাকাতের ছিপও ঘুরি

বেড়ায়, অন্ধ জানোয়ার তো আছিই, বাতির নিশানা রাখতি নাই।

আবার অন্ধকারে চেয়ে রয়েছি সুরমানের দিকে। ওর দুটি অতীতের জীর্ণ পাঁতাভরা ইতিহাসের ছিন্ন মলিন পুঁথি ভাবড়াচ্ছে। জলো হাওয়া বাতের ফিমেল স্পর্শ নিয়ে আসে, বৃহ বৃহ হুলছে নৌকাটা—বৃথ দেখি যা যেন দোলনার সামনে ঝাঁড়িয়ে তন্দু ক করে গান গেয়ে দামাল হেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে বনের বৃক থেকে অনেক দূরে কোথায় একটি গ্রাম। জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত হয় এর ধমনীতে এর মাটিতে কসল কলে সোনাধানের শিবে, গাছের কীক দিয়ে পড়ন্ত রৌদ্র আবার ছড়ায় মুঠোমুঠো করে দিগন্তপ্রসারী ক্ষেতের বৃকে।

সুরমান তখন বোয়ান, নোহন গজানো কেওড়াগাছের মত পুষ্ক সতেজ গড়ন; খালের ধারেই মজিদ আলির বাড়ী, কয়েক বৎসর থেকেই বাওয়ালির কাঁচ ধরেছে—দু'পয়সা রোজগার করে মজদ নর, ছনের বেড়ার উপরে টিনের ছাদন দিয়ে ঘর কেঁসেছে দুখানা।

কাঁচ কাম নাই। ধান পোঁতা আর ধান বোওয়ার সময় কাঁচ কিছু পায়—বছরের বাকী দিনগুলো খোদার মজির দিকে চেয়ে থাকে, তাগড়া বোয়ান মরদ সুরমান, বিনি কাঁচ দিন শুকরান করতে মেজাজ চায় না। বুড়ী মা মাঝে মাঝে মুখঝাম্টা দেয়।

—গান করি, আর বাবরি চুল রাখলিই বাতি পারি? কাঁচ কাম করতি হবে না? গিটছিলি আড়তদারের কাছে?

—আড়তদারের ওখানে জন মহুবিব কাঁচ মাঝে মাঝে মেলে, তাও ওই খোদার মজির অর্থাৎ কালে ভাদ্র—বসে বসে তাহাক খাও ফুট ফরমাজ খাটো, হুঁচর বস্তা ধান তুলে দিয়ে ডিকি বেয়ে ওঘাটের হাটখোলায় বাও, বাস ওই পর্যন্তই, পয়সা চাইলেই আড়তদার শালা থাকের কলমের উটোপিঠি দিয়ে গা চুলকে বলে—পরসার কি কাঁচ করলি বে সুরমান? লে একছিলি তামাক নিয়ে বা।

সুরমান মাথের বকুনি নীরবে হজম করে, যেমন করে হোক একপালি চাল ও জোটাবে; সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে, হাটখোলায় ওপাশে গণি মিগ্রার দলিজে বসে জাবি গানের আসর, বাঁশের বাঁশীটা ছনের আঁড়া থেকে বার করে গামছাখানা গায়ে চাপিয়ে বার হয়ে যায়। ছিক সাহার দোকানে চৌদ্দ বাতির আলো জলছে, কুরোর

ডাঃ বসু

মেমোরি কার্ডিয়েল

নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

প্রথম প্রস্তুতকারক:

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯

যত নরম পলিমাটির রাস্তাটা ধরে চলে সে, কোথার জলাভে কে পাট তাঁক দিয়েছে তাইই ঠক-ঠক গড় বাতাসে ভাসছে, বাঁশীটার ফুঁ দেয় সে চলিবার কাছে এসে, সুরটা সকলেরই পরিচিত।

—এত দেরী কেন রে ?

সুস্থমান গিয়ে চুকলো সেখানে।

পান-বাতনার পূর্ব বাড়িখুঁধা হ'ল বখন রাত কত জানে না, এককালি চাঁদ সে-ও কুবে গেছে।

সঙ্গপণে হেঙাটা ঠেলে বিভালের মত নিঃশব্দ পরস্কার বাড়ী চুকলো। একটু শব্দ হলেই বুড়ীর ঘুম ভেঙে যায়, বুড়ী মায়ের চেহেড়া সাধনানী গুট সুরমান।

বেশ কাটছিল দিনগুলো, অভাব অভিযোগ থাকুক তবুও সকালের স্বর্ণবোত্র তার মনে সুর আনতো, সন্ধ্যার স্থির নীরবতা প্রেমন্ত কলগাছি নদীর বুকে শয়ন বিভাতো—বাতাসে বাতাসে কোথার কদম ফুলের সৌরভ কাজলকালো বর্ষার আকাশ তার অজ্ঞের সেই সুরপাখল মানুষটিকে ডাক দিত বার বার।

এমনি দিনে চঠাৎ চোখে পড়ল তার মরিমকে, কাশেমগাজির মেয়ে মরিম। সতেজ-বাড়ন্ত গড়ন, চোখ দুটোতে বর্ষার সজল আকাশের হাতছানি, মাথায় একরাশ চুলের কঁকো গৌড়া একটা হলুদ বাঁ-এর কদম ফুল।

তুবখালির ছোট খালটার ধারে ডিক্সি বেঁধে মাছ ধরছে সুরমান, হাছ ছ'চারটে পেয়েছে—ছিপ-সুতো পাড়ে আছে জলে, ডিসিতে বসে সুরমান বাঁশীতে ফুঁ দেয় সময় কাটাবার জন্য।

চঠাৎ শিল্পনে ভাসির শব্দে কিরে চাটল, কলগাছ-সুপুইগাছের ঘন কালো ঘাটটিকে ঢোক রেখেছে সবুজের আবরণে, দুটায় পড়েছে খালের জলে কয়েকঝাড় বাঁশ, নানাকল গাছের গুঁড়িপাল। ঘাটে পাঁড়িয়ে একটি মেষ সব শিকে চেয়ে হাসাচ্ছিল খিল খিল করে।

—ভাল বর্ষা তুমি, বাঁশী শুনিবে কি চান্না মাছ ডাকতিছ ?

মরিম ওর বাঁশী এর আগেও জাবিগানের দলে শুনত; তবে আজ খালের বুকে এমনি সবুজ কামল বর্ষার মাঝে সুরটা যেন কি এক মায়ার তাকে ডাক দেয়, বাবরি চুলগুলো সামলিয়ে বলে ওঠে সুরমান—মাছ না আসতে পারে, কিন্তু মানুষ যে আসিছেছে তা মানুষ পেলাম।

মরিম হাসে ফেলে—এ মানুষ তোমার মনের মানুষ না হয়ে, দুশমন যে নয়, তাই বা জানতেছ ক্যামনে ?

—সাপের হাঁচি বেদে চিনতে পারে বিধি।

মরিম কথাব জবাব দিতে পিছু আঁর পারে না, কি একটা দুর্বার লজ্জা শব্দ জ্বীতে তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলেছে। সুরমান এগিয়ে এসে ওর হাতে তুলে দিল একটা ভেটকি মাছের বড় বাচ্চা।

—লও।

কি যেন বলবার চেষ্টা করে মরিম, কিন্তু ঠিক প্রত্যাখ্যান করতে পারে না ওর মাছ।

এর পর থেকে কাঁধ আর একটা বাড়লো সুরমানের। বাড়তি কাঁধটা কাঁই নয়, একটা অনাবাসিতপূর্ব আনন্দের নেশায় তাকে মশগুল করে রাখে।

হুপরের নির্জনতা ঢেকে রেখেছে ছোট ছায়ামুখা পালটাক, ছুইয়ে পড়া বাঁশ পাছে বসে রয়েছে বাছাঝড়া পাখী অর্ধনিবিদিত

নেত্র, হুপরের হলদে রৌহ কলগাছের বুকে আলপনা কেটেছে আলোছায়ায়, নানাকল পাছের ভাঁজিতে হেলান দিয়ে বসে মরিম, ডিক্সিটা গাছের নীচে খালধারে বাঁধা,

একটু ঘুরে আসবি চল জৈরাম ?

মরিম ডাগর চট্টা চোখের তারার লহব ফুলে বলে, বাপকী জানক্তি পারলি পিঠের চামড়া তুলি নেবাঁনি ?

বাবরি চুল নেড়ে জবাব দেয় সুরমান—নেক তোয় লক্তি 'জান'ই দিয়া নিমু।

ইস।

ওর হাতটা সুরমানের হাতে, ভজনের চোখের দুটি কি একটা নিবিড় নেশার মাদকতায় ভরে উঠেছে। সুরমান আজ বাঁচতে শিখেছে—সব কিছু আজ সে দেখতে শিখেছে কি যেন স্বপ্নভরা দুষ্টিতে। আরও কাছে টেনে নেয় মরিমকে, উছল হাসিতে তার উজ্জত হাতখানাকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে মরিম।

—জা, দিনচপুবে কি করতিছ ? সাহস তো বহুতি তোমার ?

সুরমান অসহায় দুষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে, মরিমের সারা মনে জেগে উঠেছে কোন নারী, যে চায় ভোগ করতে, জীবনের পরম-ভুফার অমৃতধারা পান করতে, নিজেকে সামলে বলে ওঠে মরিম।

—বাও, বেলা পাড়ে গেছে, কেউ আসতি পারেন

—সুরমানের মনে বীরে বীরে প্রথম প্রেমের অগ্রধোর কেটে যায়, সেলাসে সজ ঢালা পানীয়ের উপবরে বৃদবৃদ শেষ হয়ে গিয়ে বাস্তবরূপে পাঁড়িয়েছে সে।

কাশেম গাজির অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়, হেলেমেয়ে বেচারায় অনেক ক'টাই, বোজগার পাতি সে তুলনায় তেমন কিছু নয়, কোন কয়ে দিনে আসে দিন যায়। ঈদের সময় চঠাৎ সুরমান আবছার করে, মরিমকে একখানা কাপড় হাট দিতে পাবতো সত্যি বড় খুশী হতো সে, আর নিজেও সাধ ওকে নিজের মননত করে সাজাতে।

কয়েকটা টাকার দরকার সেদিন হাটখোলায় দেখেছিল নীলজুয়ে শাড়ীর দাম চার টাকা; সারা নশীপুর চিনখালিতে সে চার পাঁচদিন অনমজুরের কাঁধে ঘুরে বেড়িয়েছে। কে দেবে কাঁধ ? বার বার কাঁধ নিজেগটি গারে গতরে তুলে নিচ্ছে। আড়তদার ওর কথা শুনে একটু চূপ করে থাকে, থাকের কলম দিয়ে পিঠ তুলকোতে চুলকোতে বলে—চার টাকা ?

সুরমান চেয়ে রয়েছে ওর দিকে আশাভরা চাচনিতে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে মরিমের মুখখানা, শাড়ীখানা হাতে লিলে কেমন করে কুট উঠবে মিঠে একটু হাসি ওর চট্টা চোখের তারার কাছে টেনে নেবে সে।

স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় আড়তদারের কথায়—টাকা কই নাযু ? চাইব টাকা। আটগুণায় হবেনি ? সে বস্তাটা তুলে দে ডিজিতে।

আড়তদারের দিকে চেয়ে থাকে সে। হুব দুষ্টিতে, সব আশা-স্বপ্ন তার মিলিয়ে গেল কোন অসাম শূন্য। নীরবে বার হয়ে এল সে। যিনের আশে সব যেন রান হয়ে গেছে, বাতাসে বাতাসে কনক-চাঁপা ফুল আজ গড় মাতাল ইগারা আসে না।

...কাঁধ করতে না পারলে লসে না, পরশা চাই—বোজকাঁধ

পাতি বার নাই মোহন্য তার সাজে না। বুড়ী হা গুরুগুরু করে,
কি হলো তোমার, বুধে হা নন্দ নাই, এমন চুপ মেয়ে আছিল কান?

বিরক্ত হয়ে বুধ খিঁচিরে ওঠে সুরমান—জবে কি চিল্লিয়ে হাট
বানানু?

বৈকাল বেলায় মরিয়মের বাড়ীর দিকে চলেছে সে ক্ষুব্ধনে,
হাতে একটা পুঁটুলিতে রয়েছে কয়েক পালি বাগম চাল, কীর খেতে
তাই দিয়ে আসবে, বাড়ীর কাছে আমপাছটার নীচে এসে থমকে
দাঁড়াল সে, মজিন মিক্রা ওদের বাড়ী থেকে বার হয়ে আসছে,
মজিনকে আজ চেনা যায় না, নৌতুন সাজ, গায়ে পপলিনের কমিজ,
তাতে রূপোর বোতাম বসানো, চুলও বেটোছে ‘ফ্যাশন’ করে, পান
বুখে বেশ হাসি-গল্প করতে করতে আসছে সে, কাশেম গাজি তাকে
এগিয়ে দিতে চলেছে। মজিন মিক্রার সারা বুধ-চোখে উপছে
পড়ছে শূণ্যের আভ, টাকের উপর ফুৎফুৎ হু-এক গাছ চুলও নাচছে
শূণ্যের আবেগ।

গাছের আড়ালে দাঁড়াল সে, ওরা আপন মনে কথা কইতে কইতে
পার হয়ে গেল।

মনটা আগে থেকেই বিগড়ে ছিল, হঠাৎ ওদের বাড়ীতে মজিন
মিক্রার আসা-বাওয়া মানখাতির দেখে সারা মন জ্বালা করে ওঠে।
বাড়ীতে ঢুকেই মরিয়মকে সামনেই পেল, তার দিকে চেয়ে থাকে
সুরমান। হঠাৎ সাজবেশের অর্ধও কিছু বাড়ে না। পরেই চাপা
রং-এর চুমকী বসানো শাড়ী, হাতে গায়ে গোলাপী আভা ধরিয়েছে
মেহনীর পাতার রংএ চোখে টেনেছে সুরমা।

কার জন্ত এ অভিনয় সাজ! ওকে দেখে মরিয়ম নীরবে বুধ
তুলে চাইল মাত্র, অল্প দিনের মত হাসির স্বরূপা ফুটে উঠলো না তার
বুধে-চোখে। থমথমে বর্ষাঘোষের মত গম্ভীর নীরবতা লেগে
রয়েছে তাতে।

...শোন—

এগিয়ে এল মরিয়ম তার কাছে, হঠাৎ টলটলে দুটো চোখে
নাথল প্লাবন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মরিয়ম,—আঁচল দিয়ে
চোখ ঢাকবার চেষ্টা করে সরে গেল তার সামনে থেকে। আর
এল না।

উঠানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বার হয়ে এল সুরমান
নীরবে। বৈকালের রোদ স্নান হয়ে গেছে, খালের বুকে বেয়ে চলেছে
অনেকো কত নৌকা বালাম তুলে, আকাশের বুকে চলেছে অসহি
টুকরো সাধা মেঘের দল। সারাটা দিন কি এক হুঃখণ্ডে কাটলো তার।

সন্ধ্যার সময় গমি মিক্রার দলিলেও গেল না, বাঁশটা নিয়ে বসে
বইল খালধারে নির্জন অশ্বখপাছের নীচে, থমথমে অন্ধকারে শোন
যায় নদীর শব্দ—আর রাতজাগা পাখীর ডাক।

সারা রাত তার শূঁ, হাহাকারে ভরে উঠেছে। এই হুঃখ-
বেদনার স্বাক্ষর সে এর আগে পায়নি, সারা অস্তর আসছে বেদনার
মোড় দিয়ে ওঠে।

স্বপ্না হয়ে যায় নীরবে, নীচে বসে ছড়ি-পাখর ঠেকে গতিরোধ
করে তার, তখনই সেখানে আগে ছন্দ, ভয় নেয় ‘সুর’। ভাল লাগার
মূল সন্ধান করতে পারেনি, তখনই আজ দেখে তাদের অজ্ঞাতেই
হুঃখের মনের পোশাকের ঠাঁই-এ রয়েছে তারা! অবিস্মৃত ভাবে
জড়িয়ে।

হারানো ঠাঁইটাতে বলে আছে মরিয়ম, সুরমানের বুকে তার
মাথা। কান্নার বেগ তখনও থামেনি।

মজিন মিক্রা অনেক টাকা দিয়েছে বাপজানকে, সাত কুড়ি টাকা।

মরিয়মকে বিক্রী করবে তার বাবা। কাশেম গাজি সব পাবে।
অভাবের সংসার, ঈদের সময় মজিনই দিয়েছে পোষাক-আশাক।
সাঁওতালসে সেও ওঠ-বস করছে কাশেম গাজির সন্ধি।

মজিনের ইতিপূর্বে তিনটে বিকিও রয়েছে, বিবিরাও বলে খার না,
মরিয়ম হলে চারটে হবে। শিউরে উঠে মরিয়ম। বুড়ো টাক-পড়া
ওই লোকটা, স্বরে একপাল ছেলেমেয়ে, নাতি, বিবির দল, আবার
তার দিকেও নজর দিতে ছাড়েনি। বিবির দিকে কারণ-অকারণে হয়ে
ঠেলাতেও কপ্তর করে না। বনে কার্ঠের কাজ করে—বখনই বাড়ী
আসে, বিবিমহলে প্রায়ই কান্নাকাটি পড়ে যায় তখন।

—ওখানে বাবার আগে গাং এ ভবে মরবে আমি।

মরিয়মের গালে লেগে রয়েছে কয়েক ফোঁটা অশ্রু, সুরমা বুছে
গেছে চোখের জলে, সারা রাত সে কেঁদেছে, সুরমান তাকে কাছে
টেনে নেয় নিবিড় করে—অশ্রু-বারা গালে একে দেয় চুম্বনসেবা।
কি এক নিশ্চিন্ত নির্ভর নেমে আসে মরিয়মের সারা মনে, অদেখা
প্রেমের স্পর্শ তাকে হুঃখ জর করবার সাহস এনে দেয়।

কাখাও চলে বাই আমবা দুজনে।

মরিয়মের দিকে চেয়ে থাকে সুরমান। ওকে নিয়ে এই
অনিশ্চিতের মধ্যে পা বাড়াতে সাহস হয় না।



ফোন ৬৪-৬২৬৩

পি,সি,ভাত্যা

জুয়েলার

১২৫-বি. বহু বাজার ফ্রীট-কলিকাতা-১২

অন্তরালে একটু ছোট্ট নাটকের অভিনয় হয়ে গেল এদের অলঙ্কারে। ছুজনেই তখন রূপবিভোর, কোনদিকে খেয়াল নেই। মজিন মিলে ডিকি বেয়ে বাক্সিল খালে, কি বেন কোঁতুলবসেই ওদিকে নজর দিতে দেখতে পায় ওদের দুজনকে ওই অবস্থায়, যন পাঁছের আড়ালে চলেছে ওদের গোপন অভিনয়।

টাকের উপস্থান চিন্ চিন্ করছে—তার উপর ওই দৃশ্য, ভাবী বিবিসাহেবের কেছ। রক্ত গধম হয়ে ওঠে কিছু সামল গেল। আগে যবে আহুক ওই খুগুহব বিবি—তার পর পয়জার আছে। হু' দিনেই ঠাণ্ডা করে দেবে ওট হাড়জ্ঞাত মেয়েকে।

সুহমান ভাবছে, মরিয়ম আজ আশ্রয় চায় তার কাছে। কামেশ গাঞ্জিক ঠাণ্ডা করে নিরস্ত করতে হবে কিছু টাকা দিয়ে, না হয় দুজনের পালালো দরকার। সেটা মন মানে না। টাকা! যেমন করে হোক, বেতাবেই হোক, টাকা বোজগার করতেই হবে তাকে। মরিয়মকে সুখী করবে সে, যার বাঁধবে তারা দুজনে। বেড়ার ধারে ফুটেবে বুনি খুঁই, সজ্জার অন্ধকারে সে বসবে বাঁশি নিয়ে—পাশে থাকবে আজকের এই মরিয়ম।

কি ভাবছো? মরিয়মের ডাকে মুগ্ধ ভুলে চাইল সুহমান।

—কিছুদিন সবু কর, দেখি একটা কিনারা পাবই,

সুপ্ত পৌক্বভেসে উঠছে সুহমানের দেহমনে। বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে আর গাঙ্গর করে যে সুহমান দিন কাটাতে সে উঠে পড়ে লেগেছে, কজি বোজগার করতে হবে তাকে। বুড়ী ছেলের দিকে চেয়ে মনে মনে খুঁই হয়। হঠাৎ একদিন মাকে বলে বসে সুহমান—চাকরী পেয়ে গেছি মা, খোরাকী আর মাসিক তিরিশ টাকা বেতন।

—খোলায় মরজি বুড়ীর চোখে মুখে ফুটে উঠে আনন্দের আভা।

কিছু বাদাবনে বাতি হবে। বাতলিয়ার কাম। সুহমান বলে ওঠে।

—বাদাবনে? কখাটা বুড়ীর মনঃগুত হয় না। বাদাবনে শুধু জল—আর বন। বিপদ আপদ দেখানে পদে পদে। যে মাছের এখানে কিছু হয় না—পেট চলেনা সেইই বার বাধ্য হয়ে ওই কঠিন বিপদের মুখে। তার দিনতো কেটে বাজে, তবে সে কেন বাবে ওখানে?

বাগা দেয় মরিয়মও—না তোমাকে বাতি হবে না।

মরিয়মের হুচোখে নামে প্রাণ। হুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে সুহমানকে কি নিবিড় বন্ধনে। সেখানে গেলে মাছের ফের না।

—তোকে আমার চাই মরিয়ম। সাত ফুড়ি টাকা দিতি হবে তার বাপজানকে, তারপরই চলি আসবো, তখন দেখিগ তোরে ছাড়ি যদি বাই—

—মরিয়মের মন মানে না। একি এক বিচ্ছেদের আলা। স্নিন কাটবে তার একা একা ওর পথ চেয়ে চেয়ে। এই ভালবাসার এত আলা সে যদি জানতো জীবনে এ জুল সে কৈরতো না কখনও আজ নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছে সে তার অজান্তে।

অতীতের তার হস্তে মগ্নবক্তরা বাতাস কি এক নাথ না জানা কলস সৌরভ দিয়ে আসে সাধা মনে। চোখের সাহসে তেলে ওঠে

হুটো বিলাই বাখাতুর জলভরা চোখের চাহনি—বেদনার ভাবে টলোমলো। আজকের সুরমানের চোখে ও সে দৃষ্টি কি এক মধুর আবেশ আছে। বিন বদলে গেছে, বদলে গেছে পরিবেশ, বরসের চিহ্ন পা পেলে ফেলে তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে জীবনের শেষ সীমান্তের দিকে, তবে সেই হুটো চোখের চাহনি আজও তাকে অমুসরণ করে চলেছে অহরহঃ, সে অদীম বেদনা কবিকের সীমা পায় হয়ে অনন্ত যৌবনে বিশেষ গেছে।

অন্ধকার বনে বনে কাদের পারের শব্দ শোনা যায়, ছপ-ছপ-ছপ। শিউরে উঠি—ডাকাতের ছিপের ঝাঁড়ের শব্দ কিনা কে জানে! হঠাৎ একটা মস্ত হুকায়ের কঁপে ওঠে বনতল—নদীর জলধারা। গজ্জন ধ্বনি দূর নদীর ওপারের আকাশে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে নৌকার বাসনগুলো বন বন করে কঁপে ওঠে। সাগা শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেছে।

সুহমান বসে রয়েছে গুড়ি হুড়ি মেয়ে, ছই-এর কাঁক দিয়ে দেখা যায় একটু দূরে নদীর উপরেই কেওড়া গাছের নীচে জলছে হুটো চোখ—প্রবলিত আশ্রনের ভাঁটার মত। বাতাসে বোটকা বিস্ত্রি গন্ধ।

কোথায় গেল মরিয়ম—সেই সজল ভ্রামল পরিবেশের স্মৃতি—যৌবনের কামনামন্দির হুটি মন। সামনে ঝাঁড়ের প্রতীক করছে মৃত্যু। জীবনের সব সৌন্দর্য—কামনা—সৌরভকে নিঃশেষ করে এই বনরাজ্যে ক্রসের দেবতা পেতেছে তার সিংহাসন।

আবার কিরে আসে প্রশান্তি বনের বৃকে। নিবিড় নীরবতা মুগ্ধ বৃক্ষে রয়েছে অন্ধকারের আলিঙ্গনে। মাঘমাসের রাত্রি—অধিরের সঙ্গে জীবনের কুহেলি হাত মিলিয়ে নেমেছে বন ভ্রমণে। কোন অশরীরী ছায়া ঘিরে রয়েছে নৌকাটা। মধ্য রাত্রে বনভূমি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে—কান পেতে শোনা যায় তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুধু বনমন্ডরে। আকাশ-জোড়া এক দেবতা পা ফেলে ফেলে চলেছে ওর বৃকে।

পিছনে পড়ে রইল মরিয়ম, ছায়াটাকা নশীপুরের ঝাল—ওদের স্মৃতি বৃকে নিয়ে ঘোয়ান সুহমান বাতুলিয়া এল এই রাজ্যে। মহাজনের নৌকাতেই থাকে—যায়, বনে কাষ করতে শিখছে।

—বনের জীবন আর প্রাণের জীবন আশমান জমিন ফারাক বাবু, এখানের আইন কাছন জালাদ। প্রথম পা দিয়ে ভয়েই শুকিয়ে বাতি লাগলাম। সুহমান সেরিনের স্মৃতিগুলো ভোলেনি।

খালের বৃকে জমেছে কয়েকটা নৌকা, এইখানেই বন কাটাই হবে। খাবার-দাবার নৌকাতেই। মজিন মিলে ও সেই মহাজনের কয়েকখানা নৌকার হেড মাস্তি অর্থাৎ সর্দার গোছেয়। তার হাঁক ডাকেই সকলেই অস্থির। সুহমান নৌকাটিকে সহ করতে পারেনি।

—গোঙ্গল করে নান্দাপানি করে বনে ঢুকবি ভাত নিয়ে। খুব হুঁসিয়ার।

বনে জান না করে কোন বাতুলিয়াই পা দেয় না। বনবিবির পুজো দিয়ে তবে নামে তারা প্রথম বনে। সুহমান অবাধ হয়ে চেয়ে থাকে এ পুজোর কোন মন্তব্য—মোরা লাগে না। একটা পাঁছের ডালে চাঁদমালা ঝুলিয়ে দিল—খানিকটা সিন্দুর লাগিয়ে দিল, পাঁছে সবাই মিজল চাঁৎকার করে উঠলো—বনবিবির, মোরা লাগে। একটা ছুরগীকে ছেড়ে কেওড়া হল বনবিবির মায়ে।

নৌকার উঠে আসবে হঠাৎ দেখে লোকালয় থেকে আনা খুসীটা বনের গুরু নির্জনতার কেমন ভয় পেয়ে গেছে, কল্পনাবর্তন করে ওদের পিছু পিছু এসে হাজির হয়—সেও নৌকাতে উঠে আসবে। ভাবাহীন ছুটো চোখ দিয়ে সে অনুমান করছে—এই গহন বনে আমাকে নির্ধাশন দিয়ে যেও না, নিয়ে বাও তোমাদের সঙ্গে তোমাদের কাছে। আজীবন মানুষের সমাজে বাস করে বস্ত্র পরিবেশ সে ভুলে গেছে। বড় মায়ী ছয় সুরমানের, খুসীটাকে ধরে কোলে ভুলে নেয়, আহা বেচারা! হঠাৎ মজিদের ধমকানি শুনে পায়, বনবিধির খুসী নৌকার তুলবি! খবরদার, ছেড়ে দে—বেতুক কোথাকার। বাগাবনের কাছন জানিস না?

পিছনে কেলে এল তাকে। খুসীটা তখনও খালের ধারে ধারে ছুটছে ওদের নৌকার সঙ্গে, ডাক পাড়ছে প্রাণপণে। নির্জন নীরব বনে ধ্বনিত হয় ওর ডাক। সুরমানের ছুঁচোখ জলে ভরে আসে—মরিষের কথা মনে পড়ে, আশবার সময় খালের ধারে ধারে সে এমনি বেদনাক্রুর দৃষ্টে তাকে অনুসরণ করছিল কতদূর।

খেতে বসেছে সুরমান মাখিলের সঙ্গে। খালা বলতে মাটির সরা—ভাতে লাল ফাটা ফাটা চালের ভাত আর তরকারী বলতে খানিকটা পুঁয়াজ কুঁচি দু'এক টুকরো আলুর ভরসা দিয়ে হাত। কয়েক লক্ষ্যর টুক-টেকে স্নেহ। ডাল আর তরকারী সব কিছুই ওই পশাৰ্শটাই। সকালের নাস্তা। ভাতওলা মুখে তুলতে পারে না। এ খাওয়া তার অভ্যাস নাই। চোখ কেটে জল বার হয়ে আসে। চেয়ে দেখে অন্যত্র বাওলিগারা তাই খেয়ে চলছে গোঁসাসে অমৃত মনে করে।

দু'এক গ্রাস খেয়ে বাকীগুলো জলে ফেলে দেয় সুরমান, খাবার জলও খাপ করা। জলে বাস করছে কিছু তা এক বিলু মুখে দেওয়া যায় না, তিন দিনের পথ পার হয়ে জালায় জালায় ভর্তি খাবার জল নিয়ে যেতে হয়।

প্রথমে বেগিন বনে নামলো সে, সেই শ্রুতি আজও ভোলেনি। ঘন বন নীচু হয়ে পথ চলতে হয়, নোনা কাণা মাটিতে উঠে রয়েছে গরানের শুলো, অন্যবধানে পা পড়লে ক্ষত বিক্ষত হয়ে বাবে, হাতে হাতিরার বলতে একটা কুড়ুল আর কোমরে গোঁসা ছোট লা। সারা বেহুমন অজানা আতঙ্কে ভরে ওঠে কোথায় একটু শব্দ শুনেই পা কাঁটা দিয়ে ওঠে কে জানে মৃত্যু কি বেশে অপেক্ষা করছে এখানে। গরুর ডালে বুলছে কোথায় বিবধর গোখরো সাপ উত্তত বশা বিস্তার করে—একটি মুহূর্ত—বীরে বীরে নেমে আসবে মৃত্যুর বনিকি।

দু'জনে পাছে কোণ স্নারছে, ছিটকে পড়ে কাঠের টুকরো, একজন নজর রাখে চারিদিকে। কোথাও কিছু দেখা যায় কি না, লত জন গাছটাকে কেলবার চোঁটা করে।

বনে লুঠন করতে এসেছে মানুষ, বনদেবীর বাহনের দল সমাপ দৃষ্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন অসতর্ক মুহূর্তে লুঠনকারীদের খড়ে এসে পড়বে পুড়েও মাকে মাকে। তাই ওরা এই ভাবে কাশ করে। হাত বুক টান টান করে সারাবিনি কোপ দিয়ে। দুপুরের সময় সুরমান ওদের মতই সেই ঠাণ্ডা ভাত আর লক্ষ্যর রোল ভরসেট খেলে, মিনাঙ্কে ফিরে আসছে নৌকার। স্নানি ভব আতঙ্কে সারা বন ভরে উঠেছে; এ কোন জীবনে এসেছে সে।

সন্ধ্যাবেলায় আবার ফিরে আসে তার মনে নশীপুরের জীবন, গণি

মিঞার দলিকে বসেছে জাতি গানের আসর, সে নাই। বাঁশি আর বাজবে না সেখানে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে মরিষের মুখ—সেই বিদায় বেলায় সজল চাহনি। বাঁশিটা বার করল সে, কুঁদিত বাবে, কি ভেবে মুখ থেকে নামাল এখানে বাঁশি সে বাজাবে না সুর আসবে না আর তাকে পিছনে কেলে এসেছে হারা ঢাকা সেই অতীত জীবনে। মরিষের এখানে শ্রুতি-তবুও সব দুঃখকষ্ট জর করবার সাহস আনে সেই-ই তার মনে।

পাশের নৌকার টেমির আলোতে মজিন সন্ধ্যাপীরের দোয়া পড়ছে।

আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবী কর সার

নবীর দোয়ায় হবে ভবনদী পার।

খুসী ভেসে যায় কোন অসীম আঁধার ঘেরা বন রাস্তা, ছই-এর কঁক দিয়ে খালের জলে পড়ছে এক চিলেতে লালিত প্রবল আলো; বনের ভিতর হরিণের ডাক শোনা যায়। মনটা হু হু করে ওঠে সুরমানের—মরিষ! নীচের মানুষ অন্ধকার আকাশের বুকে মহা রাস্তা জেগে ওঠা প্রবতাবার সন্ধান করে—তেমনি ভর বেদনাহত সারা মন উদ্ভূত হয়ে চেয়ে বসেছে মরিষের শ্রুতির পাশে।

কতকণ বুমিরে ছিল জানে না, হঠাৎ কার ডাকে ঘড়মড় করে উঠে বসলো।

গণি মিঞার দলিকে বাঁশির সুরে বনিকা পড়লো মজিদের

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"

- কলমে প্রস্তুত
- স্টীমে সঁকা
- মোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, চাপ্তি
ও সর্বত্র রক্ষা করিতে

আর্য বেকারি অ্যান্ড কন্সল্টেশনারী

কলিকাতা - ২৯

ভাল—ভাল হবে—ভাল হবে—খাওয়াতে হবে? মেহমান এসেছিল নাকি? ওঠ—কাবের বেলায় চু চু কেবল খাতি পারবে।

কোন করে ওঠে সুরমান—বাবু না।

হেসে কেসে মজিন—ওর হেসেমাছুবী দেখে। মারা হয়—কেন ও এই কঠিন জীবনে এসেছে সেই সত্যটা তার অজানা নাই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে—অতীত একটি হৃদয়ের ছবি, ছারাবেরা খালিবারে ওর নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ দেখেছিল মরিয়মকে। সেই ক্ষণিক স্বপ্ননীড়কে ও থাকাপাকি করে পড়ে তুলতে চায়—তাই এই জীবন-পন সংগ্রাম।

বলে ওঠে—বাড়ী এটা নয়। মৈরাম এখানে নাই যে গোসা ডালাবে। ওঠ—

সারা শরীরের রক্ত চকল হয়ে ওঠে মজিনের এই মন্তব্যে, দোলা হয়ে উঠেছে সুরমান, বাজে কামিয়া করবা না মিজ। উ কোন কথা কও?

ঠিক কথাই কইছি যে যোমান। বা খাই ল। জোর খঁদে উঠতি হবে।

কথা বাড়াল না মজিন, সুরমান কোন রকমে চাটি ভাত মুখে পূরে উঠে এল।

কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করছে মজিন সুরমানের পরিবর্তনটা। কি এক অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে সে কাষ করে চলেছে। বাবরী চুল কেটে কেলেছে তেল অভাব, গারে নোনা গাঁ-এর পানির দাগ, সাগা দেখে কঠিন পরিভ্রমের ফলে পেঁপীগুলো ফুলে উঠেছে—চোখের সেই গ্রাম্য সহজ সরল হাসিমাখা দুটি মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে বহু সন্ধানী সাবধানী দুটি—আর একটা ইন্দ্রিয় বহু জীবনে স্বাভাবিক ভাবে প্রকল হয়ে ওঠে তা দ্রাণশক্তি।

বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে আগামী বিপদের সন্ধান পায় সে।

—মনে মনে মজিন বাহবা না দিয়ে পারে না। মরিয়মই তাকে প্রত্যাহার মত পথ দেখিয়ে চলেছে বহু দূরে অসুখা জগতে থেকে। মোহকস-এর গল শুনেছিল সে, কিন্তু চোখের উপর দেখেছে তার ঘুঁহুঁহু।

মজিন বাড়ী বাচ্ছে। কথাটা শোনা অবধি কেমন চকল হয়ে উঠেছে সুরমান। মজিন বাড়ী গিয়ে এইবার মরিয়মকে ঘরে তুলবে। তার জীবনের এই কঠিন—এই বিপদ বরণ সব আশা স্বপ্ন ধুলিসাং হয়ে বাবে। মরিয়ম উঠবে তার ঘরে নয়—ওই আধবরসী টেকে বহু পরতানের ঘরে। কয়েক মাস চাকরী হয়ে গেছে তার—পো সেকেক টাকারও অর্থেই সেও বাড়ী বাবে। মজিনের সঙ্গে সুখোমুখী বোকাপড়া হবে সেইখানেই। এখানে আর নয়।

মহাজনের নৌকার গিয়ে উঠলো সন্ধ্যাবেলাতে। তামাক টানছিলো মহাজন ওকে দেখে মুখ তুলে চাইলো। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করেছে সে সুরমানকে কাবের হেসে, কাষ বোকে, হঁসিয়ায়।

—কি হবে?

—বাড়ী বাবে বাবু, যেমন মিত্রের ভান। এই চালানোই বেশে কিরাবে।

—তাইতো যে মজিনও বাব বলছে, তুই সেসে চকলে কি করে?

কথা কম না সুরমান, নৌ করে বসে আছে আমানে বাখিই হবে। মারের শরীর ধারণা ফুটলে জাব সেবা দেখতি পারবু না।

মিথ্যাকথাই বলল।

কথাটা মজিনের কানে বায়। হাসে মজিন। বোয়ানটা বুঝতে পেরেছে তার মনের ভাব। এখানে এ বনে মাছুবে মাছুবে কোন শত্রুতা করতে নাই, বনবিধির কোশে পড়বে।

মহাজনকে টিপে ধের মজিন—ওকে ছাড়লে আর আসবে না বাবু, কাবের লোক।

মহাজন শেষ পর্যন্ত আটকে কেলেল সুরমানকে। দেশ গাঁ নয় যে পারে হেঁটে চলে বাবে, দেশে কেরাও অনেক হাফামা এখানে। লোকালয় চারদিনের পথ—মাঝে দুর্গ বন—দুস্তর নদী সুরমানের সারা মন বিস্ত্রোহী হয়ে ওঠে

—কাম করবু না বাবু।

মহাজন বলে ওঠে তোকে চল্লিশ টাকা করে দোব মাসে।

চটে ওঠে সুরমান, চল্লিশ কেন একশো দিলেও নয়।

মরিয়ম চলে বাবে তার জীবন থেকে অন্তকার ঘরে—সব আলো নিভে বাবে তার। কি এক অসীম নিঃশ্বাস হাহাকার জরা জীবন সে বয়ে বেড়াবে কল্পনা করতে পারে না।

তবু ছুটি সে পেল না। কাষকর্মে যারনি দুদিন। কাল মজিন মিজা চলে যাচ্ছে দেশে। সুরমান ওর দিকে চাইতে পারে না—চোখে হেসে ওঠে চর নদীপূর্বের জীবন, গুানের সুর ছারাবেরা খালের ধারে অঙ্গসজল মরিয়মের হুটো চোখ, সারা মন হাহাকার করে ওঠে। জীবন আজ অর্ধহীন বলে মনে হয়।

খামল সুরমান। আজ থেকে কুড়ি বৎসর আগে ঠিক এই কেওড়াস্থানের মুখেই সেদিন বন কাটাই হচ্ছিল। নৌকা বোঝাই হয়ে গেছে, আর কয়েকখানা বড় বড় গরাদ কিংবা সুরমী ওড়ি চাই নৌকার হুপাশে ঝুলিয়ে দেবে ভারসাম্য বজায় রাখতে। ওই নৌকাতেই কিংবে মজিন, পড়ে থাকবে সুরমান এই বনরাজ্যে নির্বাসিত জীবনের বোঝা বইতে।

কয়েকজন বাওলিয়াকে নিয়ে নিজেই নেমেছে মজিন দেখেওনে বলকঠি কাটতে হবে মাগলোণ করে। কি ভেবে সুরমানও নীরবে গিয়ে তাদের ডিকিতে উঠে বসলো।

খালের ভিতর দিয়ে বনে ঢুকে নেমেছে তার পাছের সন্ধানে।

গভীর গহন বন। সোজা উঠে গেছে পত্তর সুরমী কেওড়াপাছের ওড়িগুলো, নীচে জমেছে গঁও পাছের বন বুকভোর জল, ঠেলে পথ করে যেতে হয়। সূর্যের আলো, আঁড়াল করে পাড়িয়ে আছে কেওড়াপাছের বন, মাছুবের পারের ছাপ এখানে পড়েনি।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস বয়ে যায়, থমকে পাঁড়াল সুরমান—সন্ধানী দুটি মেলে চারপাশ চাইতে থাকে। নীরব নিস্তর বনভূমি। পাছের শুকনো পাখা কোথায় হাওয়ার বেশে দূরতে দূরতে নীচে পড়ছে। অন্তহীন বিশাল শুকতার খুশো পরে শুক্য হানা দিয়েছে ওদের উপর।

—ছায়াটা নড়ছে।

—সুরমান। হঁসিয়ায়।

মজিন চীংকার করে ওঠে। শুক হয়ে গেছে সুরমান। সামনে অন্ধুর পাড়িয়ে শুক্য। পিছল ভোরাকাটা তার বিশাল বেহ, ত্রোণ হুটোতে কলসে উঠেছে অগ্নিআজ্ঞা, লেজটা নড়ছে বাবে মাসে।

যে বেথানে পেরেছে পাছে উঠে পড়েছে। সুরমানের সামনে গাউটা, ইচ্ছে করল বাঁচতে পারতো সে, কিন্তু মড়েনি এক পাও। চোখের সামনে ভেসে ওঠে চর নসীপুরের দিনগুলো— সেখানে নেমেছে অন্ধকার, মরিয়াঘের মুখখানা বুড়ে বার তার চোখ থেকে—কে আর সে তার। সম্পর্ক তার সঙ্গে বুড়ে ক্ষেত্র—সে হবে মজিরের বিবি। জীবনের সব আশা-আলো নিবে গেছে, দুঃসহ হয়ে উঠেছে জীবনের বোঝা। শুকনু হয়ে বাক কোলাহল, নেমে আশ্রয় সূতা নিবিড় শান্ত।

সামনের পা ছুটো ভেঙে বসেছে বাঁচটা—চোখের দৃষ্টি রয়েছে ওর দিকে, মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে ঝাপস লাগসার বিবাক্ত লাল। পাঁচ ছুটো দিনের আলোতে কলসে ওঠে।

মজির অরাক হয়ে গেছে—সুরমান মরছে। ঠিক মরছে নয়, নিজেকে বেছারা বুকুর হাতে তুলে দেবার অজ্ঞ তৈরী হয়েছে। চমকে ওঠে মজির।

হঠাৎ কোন দিকে কি হয়ে বার টের পায় না, প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ছিটকে পড়েছে সুরমান। কে বেন তাকে ধাক্কা মেরে সঠিয়ে দিল সেখান থেকে। বনের উপর একটা বড় বয়ে গেল, জুঁজ গর্জন মিলিয়ে গেছে। বনভূমিতে নেমে এসেছে শুকনু প্রশান্তি। সুরমানকে বাঁচিয়ে গেল সে নিজের জান দিয়ে।

—কু ট উ উ—

বনভূমি মাথুরের বাকুল আর্তনাদে ভরে ওঠে। এখানে নাম হয়ে কেউ কাউকে ডাকে না। শুকনু জানোয়ারের ভরে—ভায়াও বজ্র শুকনু মতই এমন বিচিত্র সুরে বিপদ জ্ঞাপন করে। দলের অস্ত্রাস্ত্র সকলে নেমে এসে দেখে সুরমান গাঁড়িয়ে রয়েছে মজিরমিঞা নাই। নয়ম কালা মাটিতে আঁকা রয়েছে কয়েকটা পায়ের চিহ্ন—খানিকটা ভাঙ্গা রক্ত ছিটিয়ে আছে কর্মমাত্ত নোনা মাটিতে, মজিরের শেষ চিহ্ন ওইটুকুই। বাড়ী তার বাড়ি আর ঘটনি জীবনে। খ্রিস্টজন্মের হাতে জীবনের শেষ শব্দও রচিত হয়নি, যে মাটিতে জন্মেছিল—মস্কু হইছিল—সে মাটির বুকেও টাই তার হয়নি।

অবশিষ্ট হাড় দু'এক টুকরো এই গগন বনের নির্জনতার সমাধি করেছিল ভায়া, এমন এক তারকিনী রাত্রি বধুবিহীন

বনভূমি বেধে পিঠেছিল ভাকো—পাছের ডালে খুলিয়ে দিয়েছিল মৃত আত্মার উৎসাহ পরিবেশ বজ্র এক টুকরো—একছুটা চাল—আর ছিন্ন মাহুর।

আজও বাবার আসার পথে তারা এইখানে নগ্ন পড়ে বার—তার আত্মার শান্তি কামনার, 'চেরাপ' এ বনে জলে না, বেধে বার ওই আহাৰ্য্য আর পরিবেশ।

সেই কেওভাসুত্তের ধারে বসে আছি আমরা। চূপ করল সুরমান বাওলিয়া, অশ্রুই আলোকে দেখি, তার কোটরাপত চোখ দুটো চকচক করছে—গড়িয়ে পড়েছে দু'এক বিলু অশ্রু দাড়ির প্রান্তে—তখনও মিলিয়ে বার নি। বাইরে রাত্রির নিবিড় শুকতা ভেদ করে কানে আসে হরিণ বনমুখের ডাক। আমার কথার মুখ তুলে চাইল বুজ—মরিয়াঘের কথটা তো বললে না। সে এখন—আমার কথটা শেষ হল না, বুজের চোখে বুজ ফুটে ওঠে বিবল হাসির রান আভা কাদার কল্পনতা নিয়ে—ওর বাপ ছিল একটা কসাই। বেকী টাকার লোভে মেরেছে ইরসাদ গাঁতিনারের সঙ্গে নিকের বসিয়েছিল, ইরসাদ তাকে বাড়ী নিয়ে যেতেও পাবেনি—নদীতে বাবার সমর নৌকা ডুবে মরিয়াঘা মায়া বার। খোদা তাকে মুক্তি দিয়েছে, তার কল্পের মাগ করেছে।

চূপ করল বুজ। সেই থেকেই বজ্রজীবনই মেনে নিয়েছে সে। বনের আহবান সে শুনেছে, সে দেখেছে নিভৃত রাত্রি প্রকৃতির শুকনু রূপের মহান সৌন্দর্য। ভালবেসে ফেলেছে এই কালো নদী সলু বন। এই মোহ থেকে তার নিজার নেই। বলে ওঠে—নদীর বাঁকে বাঁকে এখানে কবর বনে বনে ছড়ানো মরণ, আমার জন্তেও রয়েছে এমন শেষ দিন, শুকনু ঘর সঙ্গার ছেড়ে এর মোহবৎ এ আটকে রয়েছে বাবু। চোখের জলে গাং-এর পানি লোনা হয়ে গেল—তবুও মায়া কাটলো না।

তারকিনী রাত্রির গগন নীরবতার মধ্যে বসে রয়েছে সুরমান—সুন্দরবনের গহনে শুকনু বহুস্তের মতই একটা অধরা বহুস্ত খানিয়ে রয়েছে ওর মনে।

জোয়ার শেষ হয়ে—ভাটার বান পড়েছে। এইবার আমাদের বাক্স শুরু হবে আয়ত্ত দক্ষিণে—কানে আসে দু'বনুজের গর্জন—বনিন কোন সুরের আহবান।

জলছবি

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

হাওরার হরিণ ঘুরছে ফিরছে ঘুরছে
জোয়ারের জরি নজা আঁকছে আঁকাশে
সময়ে পুর থেকে থেকে পাভা মুড়ছে;
খুশির হাওরার কী কথা বলেছে কানে
মনের মনুর বলনা কি জানে কি জানে—
আয়নার মতো সাগরের মনে মনে
প্রোক্তের সোহাগে কী পারম এনে পূবছে।

শ্রেণিক জলর তার, গান হয়ে মৌমাছি উড়ছে;
হুঁচোখে নীরব ভাষা, কালোচুলে হাওরার চিক্কী
খানব্রত ভবিষ্যৎ মৌননীল বার্তা-সঙ্গাপনে
অরণ্যে বেধেছে ঢেকে, সবুজের মস্ত্র পদধ্বনি।
তবুও হাওরার হরিণ ঘুরছে ফিরছে,
নীলমাতানো সুরে আমাকেই ফিরছে;
জলতরঙ্গ কথার পাঁড়ি ছিঁড়ছে—

জোয়ারের জরি নজা আঁকছে আঁকাশে;
জলয়ে কোনাকি হুঁই হয়ে কোটে,
বুঝিবা সে আসে, সে আসে।

ডেথ রেলওয়ে

অমিত দাস

[ঘটনাটা সত্য। বর্মান্বিত আমার এক পরম আত্মীর চিঠি অবলম্বনে ঘটনাটা বিবৃত। চরিত্রগুলি কাল্পনিক।—লেখক]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা তখনও বাজছে। জাপানী আক্রমণে বর্মা হারবার হয়ে গেছে। জাপানী হামলা—মানবতার চরম অপমান। সাম্রাজ্যবাদের ভিষাঃসামূলক প্রবৃত্তি ও আর্থিক অর্থোপজিতে মানুষ হয়ে গেছে হুট চক্রের হাতে নেহাৎ ক্রীড়াসামগ্রী। তেমন এক অমানুষিক অত্যাচারের এক অধ্যায়—

সৈন্তসামন্ত ও রসদাদি পরিচালনের জন্যে জাপানীরা পরিকল্পনা নিয়েছে, বর্মী হস্তে ভ্রামদেশ অবধি এক ব্রহ্মগল উৎস লাইন তৈরী। কিন্তু শতাব্দীর ইতিহাসের মসীলিপ্ত অধ্যায়ে যাকে আমরা 'ডেথ রেলওয়ে' বলে জানি।

সোয়ার বর্মার মাঠেই বীশের সাগরের কোলবেঁধা একটা বাড়ীতে মিঃ মজুমদার ও ডাক্তার চক্রবর্তীর মধ্যে কথাবার্তা চলছে। ডাঃ চক্রবর্তী 'একদিন ডেথ রেলওয়ের সাথে সাক্ষাৎ ছিলেন। তিনি এক নিঃশব্দে বলে চলেছেন, তিলে তিলে কি করে মানুষ মরে—তা স্বরকে দেখে আমার সামনে আলো নিবে গেছে। মনে হচ্ছে বেন—এত আবিষ্কার—এত সাধনা—মানুষের কি সব বর্ষা হলো? মানুষ কি কখনো মানুষ হবে না?

মিঃ মজুমদার কথার ফাঁকে ফাঁকে মন্তব্য করলো, আপনি বাই বলুন, আমি সাম্রাজ্যবাদ ও ক্যাসোবাদকে আলো দিচ্ছি না। ভিক্টরের চরিত্রের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য কিছুটা থাকলেও গুণগত পার্থক্য মোটেই নেই।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, অস্বীকার করিনে সাম্রাজ্যবাদ মনুষ্যত্ব নাশ করে। কিন্তু আমি ডাক্তার। আমার কাছে রুগীর সেবা। কিন্তু ডেথ রেলওয়েতে আমার কাজ ছিল মৃত লাশগুলো সংগ্রহ করে তার হিসেব রাখা। কি ট্রেজেরী বলুন তো? ডাঃ চক্রবর্তী অন্তঃপর ডেথ রেলওয়ের এক মর্মভঙ্গ দৃশ্য বর্ণনা করেন।

নিশীথ রাত্রি। পাড়ার ঘোনির ছেলের রাত্রিতে পালা করে পাহারা দিতে হয়। বলা বায়না, কোন সময় জাপানী সৈন্তরা অন্ধকারে গাঁড়ি মেরে এসে এক এক বাড়ীর সমস্ত পুরুষদের টপাটপ ভ্যানে পুরে চলে যাবে। সেজন্তে পাড়ার সবাইকে সতর্ক করে দেবার জন্য পাহারা দেওয়া। রাত্রিতে কাবও চোখে ঘুম নেই। এমন কি কোলের শিশুটা পর্যন্ত সূত্কার মশ গুণছে বৃষ্টি। রাত্তার ধারের বাড়ীটা। বাড়ীর সবাই জাগ্রত। তাদের এ ভাবে বহু বিনিময় মজনী কেটেছে। পাড়ার আর পুরুষ মানুষ কোথায়? হরত বা এবার ওদেরই পালা। লঠনের আলো মিমিট করে জ্বলছে। সবাই বোঁবার মত পরস্পরের দিকে করণ দৃষ্টি তাকিয়ে আছে। একটা বেন খাপকড় আবহাওয়া। হঠাৎ বাইরে গমগম আওয়াজ হলো বৃষ্টি। লুংকুন ছুটে গিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরলো, বাবা, আমি তোমাকে বেতে দেব না।

—হাড়, পাগলী, ও যে বাতাসের শব্দ।

জানলা ফাঁক করে নামধুন অন্ধকারের মধ্যে হুঁড়ে হুঁড়ে দেখলো, কেউই কোথাও নেই। নামধুন স্বস্তির নিশ্বাস কেশলো।

কিন্তু সত্যিই দাক্ষিণ্যে অন্ধকার হুঁড়ে চারদিক ঝাপিয়ে বিলিটারি ভ্যান এসে ফাঁদে পাড়ার। ভ্যান একটু এগিয়ে গেল। নামধনের ভাবা হারিয়ে গেছে; বৃহত্তরই বৃষ্টি সমস্ত অন্ধ তাকিয়ে গেছে। পাড়ার ভোলাকিয়ারদের সকেতধনবির হাইসেল চারিদিকে বেজে উঠল; বোমা পড়ার পূর্বকারণ সাইরেনের মতোই বৃষ্টি করণ ও বিজ্ঞপ্ত।

নামধুন হত্যাশ হয়ে পড়ে। মাথার হাত দিয়ে বসে পড়ে নামধুন। লুংকুন তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আমিও তোমার সাথে যাবো, বাবা!

—চুপ।

কল্লার রোল উঠল আশে পাশের বাড়ী হতে। নামধনের বুক কঁপে উঠলো। সে জানে, ডেথ রেলওয়েতে কাজ মানে মৃত্যু অনিবার্য। ও দশদেশে বৈ আর কিছুই নয়। বার বার, তারা তো আর করে না।

নামধন আর ভাবতে পারল না। হঠাৎ মরজার প্রবল আঘাত হলো। পাঁচ ছয়জন কালো পোষাক-পরা জাপানী সৈন্ত ইতিমধ্যে নামধনের ঘরের মধ্যে ঢুক পড়েছে। লুংকুন মুচ্ছা গেল। বাড়ীর অজান্তরা হঠাৎ বেন চাঁৎকারেরও ভাষা হারিয়ে কেলছে।

সারা রাত্রির নৈশাংক কল্লার শব্দে চারদিক মথিত হলো। জ্যানটা যে পথে এলো—আজ্ঞে আজ্ঞে সেপথ দিয়েই চলে গেল।

নামধনের হাত-পা বাঁধা। সে ভানের মধ্যেই কাঁদবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বেতনটের ভঁতোর কাল্ল খেম গেল।

নামধুন ভাবে—এ কি স্বপ্ন, না বাস্তব! কিছুক্ষণ আগেও একমাত্র মেয়ে লুংকুনকে জড়িয়ে ধরেছিল। তাকে কেন্দ্র করে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপ নিয়েছিল। আর এখন সে লুংকুন কোথায়? স্ত্রীকে তার এখন স্বপ্নরাজ্যের হুমুস্ত প্রেয়সী বলে মনে হলো। এদের সে আর কোনদিন দেখতে পাবে না। নামধন কল্লার আরও ভেঙ্গে পড়ে। ডানে গোটা পনের লোক ছিল। অবিকালই নামধনের পাড়ারই। সবাই আধমরা হয়ে গেছে, বুধ থু বড়ে পড়ে আছে বেন।

পশ্চাৎহলে পৌঁছুতে প্রায়ই ভোর হয়ে গেছে। নামধুনকে নেমেই কাজ হাত দিতে হয়েছে। সারা রাত্রির অবসাদে তার হু চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো। ক্ষিণেও পেরেছিল খুব। সে আলো-পাশের করেক জনের নিকট হতে কিছু খাবার চাইল। কিন্তু কেউ কোন কথা বললো না। তার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে দিল।

নামধন অধীর হয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, এখানে খাবার টাবার মেলে না? এমন সময় পশ্চাৎহলে হতে লপাঃ লপাঃ করে বেজ্রাঘাত হলো। নামধনের সমস্ত পিঠটা বেন বৃহত্তরই মধ্যে ভাঁড়িয়ে গেল। নামধুন হাত জোড় করে খাবার চাইল; খাবার চাইছে নামধুন। অজান্তে কুলিদের চোখ বিক্ষারিত হলো। কি হুঃসাহস নামধনের! জবাব পেলও সাথে সাথে, হুট্টা চড়েই একেবারে ঠাণ্ডা। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে পড়ে তার। চোখে অন্ধকার দেখে। সেখানেই বসে পড়ে।

লপাঃ লপাঃ লপাঃ...

পিঠের উপর এলোপাখাটি চাবুক চললো। বজ্রধার অতিষ্ঠ হয়ে নামধন কোন বকমে টলতে টলতে উঠে ফাঁড়ার। কাঁপতে কাঁপতে সে কোকাল ঢালাবার চেষ্টা করে।

এ বেন সেখানকার স্বাভাবিক ঘটনা। কুলিদের মধ্যে বিশেষ কেউ কিংও তাকাল না।

নামধূন বুঝলো এটা খাবার দেবে না। খুঁকতে খুঁকতে মরতে হবে। অদূরে কতকগুলো লোক গুয়ে আছে দেখে পাশের এক কন্ঠার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তাকাল।

জুংলের মধ্যেও লোকটা বেন হাসবার চেষ্টা করে, ওরা আর উঠবে না।

—জ্যা, মায়া পেছে?

—হ্যাঁ। কথা বল না। কাজ কর। নাহলে এবার চাবুক পড়লে গুলের মতোই হবে। নামধূন শিউরে উঠলো। বৃষ্টি? তাহলে লুংকনের কি হবে? তার জ্বর কি হবে?

ভোর হতে একটানা ছয়টা পরিশ্রমের পর এক খটা বিজ্রাম। প্রত্যেককে আধ পোয়া চাল আর এক টুকরো নোনা মাছ দেওয়া হলো। নামধূন জিজ্ঞাস করে সন্ধ্যাক, এ খাবো কি করে?

—চিবিরে চিবিরে। এখানে রাজার বাসনপত্র নেই।

—এতে ক'দিন বাঁচা বাবে?

—বড়জোর তিন দিন।

—তোমরা করে এসেছ?

—জ'দিন হলো। আর একদিন পৃথিবীতে থাকবো।

কথাটা বেন লোকটা নেহাৎ সাধারণ ভাবেই বললো। নামধূনের অবাক লাগে। লোকটা বলে কি? বৃষ্টিতে সে ভর করে না? নামধূন একশে ভাল করেই দেখে লোকটাকে। তাইত। ওর দিন

কুরিয়ে এসেছে। ও ঠিকই বলেছে। বড়জোর একদিন টেনেটেনে বাঁচতে পারে। ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

প্রত্যেকের সময় খুব কম। কথাবার্তাও খুব সংক্ষিপ্ত। নামধূন শুকনো মাছের টুকরো দিয়ে কিছু চাল চিবিরে খাবার চেষ্টা করে। বমি আসে তার। জিবে এক কঁটাতাও জল নেই। চালগুলো গলাতেই আটকে গেল।

মনে পড়ে বার বৃদ্ধপূর্বিমার কথা। লুংকন কত আবার করে নামধূনের খাবার জোগাড় করতো। কত রকমারি। নামধূন ভাবে, না না। লুংকনের কথা আর ভাবা চলবে না। তাতে আরও কষ্ট বাড়বে; জল শুকায়। জল, জল।

নামধূন চারদিকে খুঁজে দেখলো, কোথাও জল নেই। সন্ধ্যা বললো, এখানে জল মেলে না।

নামধূনের মুখ দেখে ওরা নিকটবর্তী একটা ডোবা দেখিয়ে দিল তাকে। ডোবাই চোক আর বাই হোক জল তো। নামধূন বেন হাসে পানি পেল।

নামধূনের আর ঘোঁষাশক্তি নেই। গগুন করে ঢক ঢক করে প্রাণভরে জল পান করে সে। বৃষ্টি তো আসল—সবাই বখন ঐ জল পান করছে, তখন তার পান করতে বাধা কি?

হুইসেল পড়লো। বৃষ্টির মধ্যে সবাই কাজে লেগে গেল। নামধূন চাল চিবোতে পারেনি। তাই সমস্তই জলে কেলে দিয়ে এসে কাজে এসে মন দিল।

—শপাং শপাং শপাং...

নামধূন লক্ষ্য করলো, বিলম্বকারীরা কৈকিয়তের জবাব পাচ্ছে।

আনন্দ উৎসবে
ক, হোডের
প্রসারিত সামগ্রি

ক, হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১৯

কাজ চললো সন্ধ্যা পর্যন্ত। সূর্য পশ্চিম দিকতে অস্ত বার-বার।
কাজ বন্ধ হলো। সে: কর্বেল উচুড়ির আদেশে সমস্ত লোক কল-ইন
করে পাড়ায়।

—সোজা হও।

নামথুন কোন প্রকারে শিষ্টা সোজা করার চেষ্টা করে।

—মার্চি অনু।

সুতাপথবাজীরা বেন এগিয়ে চলে বরায় এক অন্ধকার প্রান্তরের
উপর দিয়ে।

—লেক্ট রাইট; লেক্ট রাইট—লেক্ট—লেক্ট—

নামথুনের একবার ইচ্ছে হয়, অন্ধকারে ছুটে পালিয়ে বাবে।
কিন্তু পালানোর শক্তি কোথায়? তাছাড়া চারদিকেই তো জাপানীদের
তীব্র। কড়া পাহারা।

অনেকক্ষণ পরে তারা আন্তানায় এসে পৌঁছলো।

সেখানে অনেকগুলো বাঁশের ছই নামথুনের নজরে পড়ে।

সঙ্গীরা বলে, ওতে ভুত হবে নামথুন। নামথুন তাদের দিকে
তাকাল। —হ্যা গো! ঐ আমাদের শব্দ? বিজ্ঞানাপন্ন হচ্ছে
পাছের পাতা। বেশী দূর লাগলে ঐ শালগাছের শুকনো পাতাগুলো
পারের উপর বিহিরে দিত। শরশব্দ্যও বলতে পার, কেননা কাল
জোরেই অনেককে আর জীবন্ত দেখবে না। তাতে কত কি?
আবার নোহুন গোস্ত পাব, কি বল নামথুন।

লোকটা বিকট ভাবে বেন ফেসে উঠল। নামথুনের বুক আবার
কঁপে উঠে 'অন। তার লুকুন? একটা বাঁশের ছই-এর উপর
বলে পড়ে নামথুন; কিসের বহুগা বেন তার স্তম্ভিত্রগুলো টেনে
হিঁচড়ে এক এক করে হিঁচড়ে ফেল। ভালই হলো।

মাথা চেপে নামথুন দেখানোই চলে পড়ে।

হুপুবেলোকার মতো আবার আঁধা পোয়া করে শুকনো
চাল আর সেই নোতা একটুকরো শুকনো মাছ। হুপু
থেকেই নামথুনের ভয়ানক ধ্বংস এসেছিল। অন্যাহারে আছে।
সবশেষে খাবারের মধ্যে পাওয়া:সেল ঐ আঁধা পোয়া চাল আর এক
টুকরো শুকনো মাছ। কিন্তু ফিরেটাও বে প্রচণ্ড গেরেছে তার।
নামথুন বলে কসে শুকনো চাল চিবার। হুচোথে অন্ধকারা নেমে
আসে। বাড়ীর কাক হুং বে বেন আর শরণে আনতে পারে না।

এমন সময় ডা: চক্রবর্তী এসে হাজির; সবাইকে তিনি পরীক্ষা
করছেন। নামথুনকেও তিনি পরীক্ষা করলেন। ডা: চক্রবর্তীর
ক্র বেন কুঁচকে গেল।

নামথুন ডা: চক্রবর্তীকে তারতীয় জেনে তাঁর হাতে পায়ে
ধরলো। —একটু খাবার দিন ডাক্তারবাবু! একটু উঠি।

ডা: চক্রবর্তী শুধু জবাব দিয়ে গেলেন, আইন নেই। আপনি
যেজর উচুড়ির সাথে দেখা করতে পারেন।

যেজরের কাছে যেতে হবে? যেজরের কথা চিন্তা করতেই
নামথুনের অস্তবাস্তা শুকিয়ে গেল। বাঁশের ছই-এর উপর নামথুন
ধরসেহে পড়ে থাকলো। তার শুধু মনে হচ্ছে এখন মাছবের
এত দুঃখ কেন? মাছব কেনই বা জন্মায়?

পরদিন ভোরবেলা। নামথুনের সাধা গাটা ভয়ানক বেমনায়
আড়ষ্ট হয়ে গেছে। উঠবার শক্তি নেই। কাঁপতে কাঁপতে শুধু
নামথুন যেজরের সামনে গিয়ে হাজির হলো।

—কি চাস?

নামথুন আঁকার ইচ্ছিতে পরম বিনয়ের সাথে নিজের ভয়ের কথা
জানাল। যেজর হত্বার দিয়ে ওঠে, বেটা খড়িবাঝ।

দশবার বেত্রাঘাতের আবেশ হলো। নামথুন মাটিতে লুটিয়ে
পড়ে। একজন জাপানী সৈন্য তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাঁশের
ছই-এর উপর ছুড়ে ফেলে দেয় মরা পশুর মতো। সাধা পথটা
নামথুনের শরীর নিঃশূন্য তাকায় রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

কল-ইন-এর ছইসেল পড়লো। সবাই লাইন দিয়ে টপ করেই
বেন কাঁড়িয়ে পড়লো। নামথুন দেখল সত্যি বাঁশের ছই-এর উপর
অনেকেই মরে পড়ে আছে। সেও শুয়ে থাকলো। সে পরিষ্কার
বুঝতে পারলো, তারও হয়ে এসেছে। এমন সময় আচমকা টান
দিয়ে একটা সৈন্য তাকে লাইনে কাঁড় করিয়ে দিল।

—ঘাটা ভণ্ড। হনলুল কোথাকার।

নামথুন হাত তুলে প্রাণভিক্ষা চাইল। সৈন্যটা বেত তুলেই
আবার কি মনে করাই বেত নামিয়ে অস্ত্রনিকে চলে গেল।

—মার্চি অনু।

নামথুন খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে। অন্যাহারে বেমন প্রহারে,
ধ্বংস, উদ্বেজনা নামথুন একটু গিয়েই ভয়ানক স্তম্ভ হয়ে
পড়লো। হঠাৎ বেন ভয়ানক মাথা ঘুরে উঠলো নামথুনের।
চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এলো। পারের নীচের মাটিও
বুরি-বা সরে গেল। নামথুন সজ্জাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে
পড়ে।

—হোয়াট? যেজর হত্বার দিয়ে উঠে।

—ডেড স্তার।

একজন সৈন্য নামথুনের নখর দেহটা ছুড়ে হাত্তার এক
পাশে ফেলে দিল। নামথুনের দিকে তাকানোর কাল সময়
নেই। সবাই এগিয়ে চললো।

সঙ্গীদের পায়ে চলার কাক বহুবু গিয়ে মিশিয়ে গেল নামথুনের
সজ্জাহীন দেহ নির্জনেই পড়ে রইল। আর হত্যার একমাত্র
সাক্ষী হয়ে রইল উপরের অনন্ত নীলিমা আর চারদিকের
নীরব প্রকৃতি।

এভাবে দৈনিক দু'শ হতে তিনশ অধিক নামথুনের মতো লোক
ঐ বেলগরে তৈরী করার অস্ত্র জীবনহতি দিয়েছে। সমস্ত ঘটনা
বলতে বলতে ডা: চক্রবর্তীর হুচোথ দিয়ে অকোরে জল ঝরতে থাকে।
হিরোসীমা নাগাসাকির পতনের পর জাপানীদের পরাজয়ের সাথে
সাথে অক্ষশক্তির সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটলো। ডেথ বেলগরে জাপানীরা
শেষ করে যেতে পারেনি। যেখানে হাজার হাজার মানুষের কুক
প্রোতাস্তার কাহা নিঃখাদ-প্রাণস বাতানে বাতাসে মিশে আছে—
সেই অভিলপ্ত ডেথ বেলগরে চিরকালের জন্য সজা মাছবের ইতিহাসে,
একটা কলংকমর গন্যায় হয়ে রইল।

মা সিক' বসুমতীর প্রচার ও প্রসার বাঙলা দেশের বিজয়!!

বিক্রুট



লজেন্স

এখানে



দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী

সুস্বাদু স্বাদে এমনটী আর হয়নি

পেরেক

মিহিরকুমার কাজিলাল

আজ্ঞা ধরন, আপনি ভাল পাঞ্জাবীট উড়িয়ে চলছেন। বেশ সেটের পক্ষ। পাশে পাউডার। হাতে সিগারেট। কোথাও হরত বাবেন, বেশ তাড়া আছে। হঠাৎ—কোথাও কিছুই নেই চোরারের কোণটার সেগে ফাঁস করে আপনার পাঞ্জাবীটা গেল ছিঁড়ে। দেখলেন—একটা পেরেক, চোরারের কোণটিতে ঝাপটি মেরে বসে আছে।

কিনা ভুতোর মধ্যে পেরেক উঠলে তার মর্যাদা অভিজ্ঞতা হরত আপনার থেকে থাকবে।

কিনা ধরন, প্রচুর মশাবল গ্রাসে, যেমন্টা ভায়পার থাকতে গিরে আপনাকে কিনা আপনার দ্রীক, রক্তিরে মশারির ঘুটে কোণ কোন মতে ম্যানেজ করে, অনেক সময় অগতির পতি (সময় বিশেষে দুর্ভাগ্য) একটা পেরেকের কথা মনে করতে হয়েছে কি না ভেবে দেখবেন। আর নিভাউই পেরেক না পাওয়া গেলে অনেক সময় দলানোটা করে ঠেকুনো দেওয়া গোছের মশারি টানানোতে যে কি অপূর্ণ রূপশ্রী করে তা আপনিই অনুভব করতে পারবেন।

সভ্যতার ইতিহাসে মাতৃভ্রম থেকে একনায়কত্ব পর্যন্ত অনেক তত্ত্ব—নিয়ন্ত্রিত যুগের মধ্যে গিরে আমাদের আসতে হয়েছে। কিন্তু আপনার আমার জীবনের অনেকখানিই যে পেরেক নিয়ন্ত্রিত একথা অস্বীকার করা হবে না।

হাঁ পেরেক—বা আপনি দেখেছেন। ছাদ, বহু, ময়ূ, মাঝে দেখেছে অঘট মনে করে রাখার কোন অর্থ খুঁজে পারনি। এত নগ্না এরা অপাঙ্কয়ের বে, তেজাল হবার সম্মানটুকুও তার সোভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু হুনিয়া জুড়ে আপনি মাহু, মেয়েছেলে, পাহাড়, নদী, শহর, বাড়ী দেখেছেন;—লক্ষ্য করেছেন কি কত লক্ষ লক্ষ পেরেক আপনার চহুর্দিকে পড়ে রয়েছে, হুড়িয়ে রয়েছে, বসে আছে। টেবিলে পেরেক, চোরার, দরজার, আলনাটোতে, দেওয়ালে, তারের দুই প্রান্তে, গাড়ী, বাসে, ট্রামে, টেলিগ্রাফিতে, এমন কি আপনার ভুতো—ভুতোটার তলায়ও—পেরেক। আপনার জীবনের চলার পথের পাশে পাশে ছোট বড়, মাঝারি, বৈটে মোটা, চাপটা—পেরেক হুড়িয়ে রয়েছে।

পেরেক একপান-বিশিষ্ট বস্তু। আমাদের গৃহপালিত বা গৃহরক্ষিত আর পাট্টা বস্তুর হুই উপকারী। পেরেক চাল-আটা-কাপড়ের মত নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ বলা যায় না। আবার অব্যবহার্য জিনিষ বলা যায় না। তবে পেরেক সাধারণত মধ্য ব্যবহার্য জিনিষ। আপনার সব সময়ই কাছে লাগছে না; কিন্তু হঠাৎ ধরন চটির ট্রাইসিটা খুলে পেছে, তখন পাইদের মধ্যে অচল চটিটাকে গলিয়ে অসহায় ভাবে এখিক-ওখিক ভাঙিয়ে দেখছেন হুড়ির দোকান কোথায়। ডানচাপিসেয়ার ওপর বায়া শোর তাগের থেকে আপনি একেবারে কেয়ার অব ফুটপাথ বাদেই ঠিকানা ভাঙের চরমটা বোঝ করে এসেও দেখবেন যে পেরেকের প্রয়োজন সবসময় সর্ব ভরই আছে। কারণ একটা দারী অরেকপাট থেকে বাস্তার কোণে চটখানা বাটোতে দেলেও

পেরেকের প্রয়োজন অবশ্যই। সুবিধার প্রথম ভেবে বসে কিনা পশ্চত বহুসংখ্যক করবাসি, বহুখালি আর পেটখালি থাকুক আর না-থাকুক, পেরেকের প্রয়োজন কখনও হাল হবে না।

কিন্তু এই পেরেক বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। “একোই বহু ভাব”—এক পেরেক বহুরূপে বিকশিত হয়েছে। কখনো সে কীলক, পজাল, ভাঁজি, খোঁটা, ফ্রু, ইক, আলশিন ইত্যাদি। অর্থাৎ এক এক যুগে মানুষের এক এক রকম অভাব বোধের চাহিদা থেকে পেরেক বহুবিভক্ত হয়ে হুড়িয়ে পড়েছে আর সেশ কাল পত্রি হিসাবে তার মায়করণ হয়েছে নতুন নতুন। বডুই কেন তার আলাদা আলাদা নামকরণ হোক না এক মানুষের সভ্যতা বডুই এতক বা পেছক না কেন—পেরেকের দ্বারা হুনিয়ার শাখত। চটের কলের বদলে প্রাচীর ব্যাপ হয়েছে, পনের বদলে ‘প্রায়-পন্ন’ হয়েছে, নীলালের মহাপ্রভুর রসাতলে মহাপ্রভু হিসাবে আবির্ভূত হওয়াও সম্ভব, শূণ্ড বিধে অনুভবের পুত্রদের অনুভবের প্যাচাল মনুষ্য পুত্র হতে দেখা গেছে, কিন্তু পেরেক সেই আছে প্রায় পৌরুষের বা অপৌরুষের বেদের মত। তার প্রভাব যুগ থেকে শতাব্দীক এক পর্যন্ত এই পেরেক, পাখর, বাতুর বা কাঠের রূপ নিয়ে কিছু রাজনীতিবিদ এক রাজনৈতিক পার্টির মত নামের ভোল পাণ্ডালেও, মানুষের প্রয়োজনের তালিকার সর্বযুগে, সর্বকালে অনিবার্য ভাবেই তার প্রচণ্ড দাবী জানিয়ে গেছে।

পেরেকের ব্যবহারিক দিকটা ছাড়াও এর একটা ভাব বহনকারী ভূমিকা আছে। মনুষ্যত্ব হলো, পেরেক আবার সভ্যতা এবং সজ্জতির দায়ক। পেরেক আপনার মনের ভাব কিছু প্রতিকলিত করতে সমর্থ। যেমন আপনার বরখানার—সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য কিনা সিনেমা লাইনের অভিনেত্রীর বিশেষ ভঙ্গিমা সন্নিহিত খান দুই ক্যালেণ্ডার, নেতাভী, সেনিন, গাড়ী, রবি ঠাকুরের কটো, পেরেক বৈধা বীণাখুঁটির সৃষ্টিটা, দুই-একজন আত্মীয়বন্ধনের কটো এবং সেই সজ্জ প্রাজুয়েট হবার সময় চোগা চাপ্পান পরে তোলা কটোখানা ইত্যাদি।

আর এছাড়াও—পেরেক চালুনিটা আটকানো, ঘরের এ পেরেক থেকে ও পেরেক পর্যন্ত টাকানো দড়িটাতে বাচা ছেলের কাঁধা, সাজী, গেজি, ব্লাউজ, কাপড়, মায় চা-হাঁকার বাধানী হয়ে আসা ছাকড়াটাও। আবার সেই ঘরের কোণে রাস্তার মোড় থেকে নীলামে কিনে আনা সাড়ে চার আনা দরের প্যাচা সমেত সিঁহুর লেটানো ঐশ্রীমাতা লক্ষ্মীদেবীর বাঁধানো কটো কিনা, বেলেডুমঠকে ব্যাকব্রাউণ্ড করে জিকুপ করে বসে থাকা রাস্তাক, দ্বারী বিবেকানন্দ, ও ঐসারদামণির কটোখানাও পেরেকেই ঝুলছে। আজ্ঞা, পেরেক যদি না থাকত এই সব সম্ভাব আপনি রাখতেন কোথায় ভাবুন তো। আপনি যে কুচিবির বা কালচারাল, এ পরিচর বহন করতে অনেকটা সাহায্য করবে আপনায়ই গৃহ রক্ষিত গৃহবাসী পেরেকগুলি। পেরেক আপনাকে একটা সুস্থ সবল, নিশাট নিভাঙ্ক জীবন চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বাতে মশারির কোশা হুঁচকাবে না, দেয়াল থেকে পেরেক ধসে গিরে প্রাজুয়েট হবার সময় তোলা কটোটা ভাঙবে না, ভুতোর মধ্যে মর্যাদাটী বেদনা সৃষ্টি করবে না, উপযুক্ত পেরেকের অভাবে দরজার পাটটা ধসবে না। অর্থাৎ আপনাকে কুচিবির, সঙ্গারী হিসাবী, সিনেমা দেখিরে, গোছালো সিঁদ্রী, কিনা সুখী ভরলোক বা

ভয়মহিলা হতে পেরেক বতো সাহায্য করবে এমন আর কেউ নয়।
একি দিয়ে উপভুক্ত, সবল পেরেক, উপভুক্ত সন্তানেরই
কাছ করবে।

আপনি আমার পৃথিবীর এমন একটা দেশ দেখান তো, যেখানে
পেরেক নেই? বর্তমান সভ্যতার চারমিনার সিগ্রেট, বেলিন হনরোর
দেহ বর্ণনা, মহুবালা কিংবা জৈনকা হুসেনের খবর কিংবা হিন্দী
সিনেমার গান (হিসেব করে দেখা গেছে হিন্দী সিনেমার গানের গতি
আলোর গতিকেরও হারিয়ে গিয়েছে) না পেলোও পেরেক আপনি
পাবেনই। ব্রহ্ম করে বরফের দেশের এন্টিমোনের কথা তুলবেন না,
কারণ তাদের জীবনে বাস্তব পদার্থের প্রয়োজন খুবই সীমাবদ্ধ।
পৃথিবীর ইতিহাসে পেরেকের প্রভাব খাটি ভাবে বাচাই করা তখনই
সম্ভব হতে পারে যদি সমস্ত পৃথিবীকে নিষ্পেক্ষ করা যেতে পারে।
জনহীন গণতন্ত্র, খাঁতশূন্য খাঁত বিভাগ বা দেশ, আইন এবং শৃঙ্খলা
শূন্য শাসন ব্যবস্থা, আমেরিকাহীন চীরাটীন, বাসদাদহীন বাগদাদ-
চুক্তি ইত্যাদি তবুও হরত করনা করা সম্ভব কিন্তু পেরেকহীন দুনিয়ার
একটি দিনও আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। ধ্বংসকারী
হাইড্রোজেন বোমা, এটম বোমা, বাটলিনাম টল্লিন তুলে নিলে মোটেই
কতি হবে না কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে বত নিরীহ, বেচারী পেরেকের
আত্মীয়রা আছে তাদের তুলে নিলে মানুষের তৈরী সভ্যতা এবং
সভ্যতার উপকরণগুলো হড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে। পৃথিবীকে
নিষ্পেক্ষক ভাষা আর ভয়াবহ ভূমিকম্পের ধ্বংসের কথা মরণ করা
একই জিনিষ। নিষ্পেক্ষক পৃথিবীর কল্পনা অস্বীকার্য ভয়ঙ্কর
জমাবন্ধা মরণ করিয়ে দেবে। ঠিক এই অবস্থার পটভূমিকার বলা
চলতে পারে যে, সভ্যতার ইতিহাসে ইলিয়াদ, ওডেসি, শাহনামা,
রামাযণ, মহাভারত শতৃঙ্খলা, ফাউন্ট, রবীন্দ্রনাথের কাব্য সৃষ্টি,
আইনষ্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি, ভারউইন এর ব্রাচায়ল
সিনেসন, ডায়ালেকটিকাল মেটরিয়ালিজম, পঞ্চাশ ইত্যাদি
অবদানের পাশাপাশি পেরেকের স্থান আপাত নগণ্য হলেও
গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়া পেরেকের আর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।
পৃথিবীর ইতিহাসের বর্তমান চেহারাটা পেরেকের কল্যাণেই সম্ভব
হয়েছে। বীতশৃঙ্খল যদি পেরেক বিদ্ধ না হতেন কিংবা ঐসময়ে যদি
পেরেকের প্রচলনই না থাকতো তা হলে পৃথিবীর ইতিহাস আজ
অজ্ঞাতরকম হতে পারত। কিন্তু কয়েকটি পেরেক বা নাকি বীতশ
শরীরে বিদ্ধ করা হয়েছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসের আজ এক অজ
চেহারা দান করেছে।

পেরেকের আসনটি কোমলে কঠোরে যেখানে হওয়া চাই, নইলে
কণ্ঠহারী এবং খুব দুর্বল জমিতে বা বেগুয়াল থেকে খুলে আসার
সম্ভাবনা আছে। যে সমাজে, যে দেওয়ালে, যে জমিতে, যে জায়গায়
দৃঢ়তা নেই, আশ্রয়বিধান নেই পেরেক সেখানে থাকে না। কণ্ঠস্থ,
কাঁপা জীবনের মধ্যখানে পেরেকের কোন গাভীঘরম অধিষ্ঠান সম্ভব
নয়। পেরেককে এক আশ্রয়বাহী জীবনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার
করা যেতে পারে। কোমলে কঠোরে যেখানে মানব জমিলে মুক্ত
জীবনের আকাংখা বা বাসিনতার প্লাহা পেরেকের মত সূক্ষ্ম হয়ে
জেগে বসতে থাকে। যেমন পিটের হুমুস করার নেশার পাগল

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বহুশরিকর আলজেরিয়ান, মাউজাউ,
গোঁরাবাসীদের দেশপ্রেমের মত।

ইতিহাসের এক অপূর্ণ ভেদিক দেখা গেছে মানুষের 'টোটেম'
বিধানে। প্রাচীন কালে এবং এখনকার কালেও কুকুর, পাখী
হুমীর ইত্যাদিকে আমাদের 'টোটেম' বলে আমরা মানি। আর
বর্তমান বহুতাত্ত্বিক 'টোটেম' বিধান কান্তে-হু-বেলচা-হুডোলরূপে
প্রকাশিত হওয়ায় পেরেকেরও একটা সম্মানজনক পদলাভের সম্ভাবনা
আছে বলে মনে হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একবার নির্দীক্ষিত হা-
ভোটবাতাদের বৃদ্ধাচুড়ি দেখিয়ে পেরেক-খাঁটি হয়ে 'এক-এক-এ' পর
খাঁকড়ে বসে থাকতে গেলে, পেরেককে এক নির্দীক্ষিত প্রতীক
হিসাবে গ্রহণ করা উচিত বলে আমরা মনে হয়। পেরেকের এই
গৌরবজনক গাভীঘরম আসনটি গণতান্ত্রিক দুনিয়ার এক পবিত্র কর্তব্য
হবে বলে আমরা বিশ্বাস।

সব অবজ্ঞাত, মরচে-পড়া কিংবা বুককে পেয়েকের কতীভ,
বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করলে আপনি অবাক হয়ে
যাবেন এবং চাই কি কবিতাও লিখে বেলেতে পারেন।
উপনিষদে এবং আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে পেরেককে কীলক
হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পেরেক নিয়ে আধুনিক কবিতা
আমার তো চোখে পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাব্যে
পেরেকের প্রচুর উপমা পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের পেরেকের
প্রভাব বা রবীন্দ্র সাহিত্যে পেরেকের উল্লেখের উপর কোন বিশিস
আজো পর্যন্ত জমা দেওয়া হয়নি বলে আমি জানি। কালিদাস
বা মেঘদূতের বিশ্বকবি পদবাচ্য হলেও পেরেককে অমর করার ক্ষেত্রে,
ভার উপর একছত্র কাব্যচর্চা করেছেন বলে খবর পাইনি। আপনি
জানেন, ভেল্লোনা সাবান, কুলোখা কালি, মাউস্টেনগেন ইত্যাদিকে
মহাকবি বা সাহিত্যিকদের বাণীর বসন পরিচয় বাজারে ছড়িয়ে
দেওয়ার অনেক বকর লাভ হয়েছে। শুধু যে বিজ্ঞাপন সাহিত্যই
ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে পড়েছে তাই-ই নয়, মহাকবির নামের
পাশাপাশি এইসব কোম্পানীও অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু বহুদূর
জানি পেরেকের ওপর কোন যুগোত্তীর্ণ বাণী মুখবন্ধ এঁটে দেওয়া
হয়নি। দুনিয়ার পেরেক ব্যবসায়ী এবং আমার মত ছই একজন
মুখ চোরা পেরেক প্রেমিকরা একত্র হয়ে মহাকবির কাছ থেকে
বাণী আদায় করে নিতে পারিনি। এমন কি দীর্ঘর গুপ্তের মত কবি
যিনি তপসে রাহু, আনারসকে রেহাই দেননি তিনি কেন যে পেরেকের
এই যুগান্তকারী মহিমা আবিষ্কার করতে পারলেন না তা সত্যিই
হৃৎস্পর্কের বিষয়। বৌদ্ধবাদের লোহাপাট্ট, বড়বাজার ইত্যাদি ছাড়া
সাহিত্য বাসরে পেরেক ককে পারিনি বলে ঘৃণিত হয়েছি।

পৃথিবীর ইতিহাসের পটভূমিকার আমাদের সামাজিক, সাংসারিক
প্রয়োজনের পটভূমিকার পেরেকের স্থান নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি।
যেখানে চেয়েছি কাব্যে, জীবনে, সমাজে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, ইতিহাসে
উপেক্ষিত পেরেকের বেরনার কথা। এই পেরেক বেন পোষিত
সমাজ ব্যবস্থার প্রোলোটারিয়েট। 'ডিখ না পাওয়া গৈয়ো বোয়ীর'
মত।—কবিতার বাণীর চিঠির একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে
পড়ে—'এরা সভ্যতার শিল্পজ্ঞান নিয়ে পিড়িয়ে থাকে, এদের পা দিয়ে
জেলা গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এরা জ্বলো পার না।'

একাত্ত নাৎসি মেয়ের ডায়েরী

মেরিয়া বিয়ারনোল্ড

[১৯৩৬ সালে জার্মানী শাসনকার হিটলারের হাতে আমরা ভাগ্যময়ী ছিলাম নাৎসীবাদের অত্যাচার। এই নাৎসীবাদ যে কোন জাতির কল্যাণ নিরাস করে না, বরং সভ্যতার চাকা, সংস্কৃতির চাকা লেপন দিয়ে ঘোরাতেই চেষ্টা করে, বুড়কালীন জার্মানি ইতিহাসই জার্মান প্রবাদ। নিজের জাতিকে পৃথিবীর অপরাধের জাতিগুলির চেয়ে স্রেষ্ঠ বলে কথা, কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর এক ইউরোপের সমগ্রীকৃত অত্যাচার জাতিগুলির ওপর অমানুষিক নির্ধাতম ইত্যাদি কল্পকল্পে কলংকজনক ক্রিয়াকলাপ মাত্র সেদিনকার ঘটনা। দেশের ভাষাভাষার এমন একটি কালো মেঘাবৃত পটভূমিকার এই পত্রগুলির সেখিকা মেরিয়া বিয়ারনোল্ড গড়ে উঠেছিল। এই পত্রগুলি যখন সে তার প্রাণীর কাছে লিখছিল তখন পত্রিকার থেকে ইংগ-আফিন শক্তি এক পুস্তিক থেকে মশিনার হুঁড়ি লাগলোই লৌহচক্র আঘাতে জার্মান বাহিনীকে চূর্ণকার করতে করতে হুঁমবেগে জার্মানীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। তখনকার ক্যাপা হিটলারী যুবলক্ষি মিত্রলক্ষি এই জার্মানী দেশের অভ্যন্তর যে প্রথমমানে গ্রহণ করেনি মাত্র ১৭ বছর বয়স্ক মেরিয়া বিয়ারনোল্ডের এই পত্রগুলিই তার হলুদ নিম্নর্ণন। হুঁড়িগ্যক্রমে এই পত্রগুলি তখন মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের হাতে পড়ে। তারা এগুলি অনুবাদ করে আমেরিকার বিখ্যাত সামরিক পত্র Readers Digest এ প্রকাশ করে। বর্তমান নিবন্ধটি সেই Readers Digest থেকেই অনূদিত হয়েছে। —অনুবাদক]

অনুসন্ধান, ১ই অক্টোবর, ১৯৪৪

মার্কিনরা এখানে প্রবেশ করার পর আমার মনকে বেলা দিতে পারেনা কিছুই। পিটার, তুমি এখন কোথায় আছ জানতে পারলে আমি অধিকতর সুখ বোধ করতাম। গতকাল আমি শুনেছি যে আমাদের প্রিয় কলোন শহরের ওপর আবার রব্বর আক্রমণ করা হয়েছে। পিটার, হ্যাঁ, আমি ক্রমশঃ বুঝতে পারছি যে এই যুদ্ধ এখন আর আমাদের বাঁচবার দাবী নিয়ে পবিত্র যুদ্ধ নেই। শুধুই জাগতিক সুখ-সুবিধার জন্য এই যুদ্ধ। আমাদের হতভাগ্য জাতিগণের এটা কোন অপরাধ নয় যে আমাদের আমেরিকার মত উর্বর ভূমি নেই এবং এরকম নীচ উপায়ে অসহায় একটা দেশকে শোষণ করার মত হীন প্রবৃত্তি আমাদের এখনও হয়নি।

অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও আমেরিকানরা প্ররাস হতে পারছে না। কিছু না করে শুধু রাখা বোঁকে বার বার বলতে হয়, জার্মান সৈন্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট সৈন্য আর নেই। আমেরিকানদের কাপুরুষতা অবশ্যই নয়।

১ই অক্টোবর, ১৯৪৪

নীল আকাশ থেকে পুঁই কিরণ দিচ্ছে আজ। গুপ্তগোলা শুধু এক বায়পার বোমাবর্ষণের অবিরাম শব্দ এবং গোলাগুলির অবিশ্রান্ত গুলন। জার্মানরা অমানুষিকভাবে আক্রমণকারীকে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু তবুও তাদের একপা একপা করে পতনাপসরণ করতে হচ্ছে। প্রিয়তম পিটার, আমরা এমন কি করেছি বার জন্ম জন্ম আমাদের

এক লাভ? যখন উভ উভের মনে কি জালান জলস্রাবের কাজ করেনি? যখনই কি-অতুল হয়ে যায়?

না, পিটার, আমি তাই আমাদের যুবলক্ষি কাজ হচ্ছে আমাদের নেতার আদর্শকে সফল করে তোলবার জন্য লৌহচক্র হয়ে থাকা। আমাদের নেতাকে সকলেই ত্যাগ করে চলে গেলেও তিনি এই যুবলক্ষি উপর নির্ভর করতে পারবেন। যুবলক্ষি তাই কাজে বিলাসবাতকতা করবে না। আমাদের 'অতীত' প্ররাস হতে পারে এবং আমরা যুগ পূর্ণকরণে প্রবৃত্তি থেকে এগিয়েও যেতে পারি।

পিটার, তোমার প্রিয় এই হুমবয়ে একটি বোকা, ক্রমবশী ক্রীলোক হয়ে বারমি। গ্রিক তার বিপরীত হয়েছে। আমার লাভ যমোজার আমার চিত্তাশ্রম আত্মীয়-বন্ধনদের বিধ্বংসিত করে। ক্রমশঃ, না, আমি একথা চিত্তাও করতে পারি না। আমার হানি এখন অস্বস্তি হয়ে গেলেও তদন্যকালে বতাব যে আমি আমার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা বজায় রাখতে পেরেছি।

১ই অক্টোবর, ১৯৪৪

আজ গোলাগুলি তখন চলছে না। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহরে গিয়ে 'অনুভূমির প্রতি বিশ্বাসী' সঙ্গে শেষ সন্ধ্যা জানাবার জন্য রওনা হব। আমি নারী বলে নিজের সম্মতি লক্ষিত। একথা যখন আমি তাই তখন আমি পাগল হয়ে বাই। কিন্তু বার সংঘের সভ্য তাদের ওপর লোকে নির্ভর করতে পারে। সংঘের সবাই হিটলার যুবলক্ষি নেতা।

পিটার হতভাগ্য জাতিগণের ভিতরকারী হুঁড়িগ্য বহন করতে হয়েছে। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপযুক্ত বলে প্রমাণ করব। আমি মার্কিনীদের ঘৃণা করি, বিশেষ করে তারা প্রায় সকলেই পূর্বে জার্মান ছিল বলে।

১০ই অক্টোবর, ১৯৪৪

পিটার, আমার প্রিয় প্রতিবেশী এবং মেয়ে বন্ধুদের হীনতা নীচা ছাড়িয়ে গেছে। বসকর্ড নিবাসী সংঘের ছজন নারী নেতা মার্কিনীদের সঙ্গে মৃত্যু করছে বলে গতকাল আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনেছে। এটা অসীম নীচতার পরিচয়।

আজকের দিনটা বড় ভীষণ। চতুর্দিকেই মেরিনগান থেকে গুলীবর্ষণ করা হচ্ছে। গুলার গুলনের মধ্যে অগ্নিকণার বুটী হচ্ছে বেন। বাস্তবিকই পিটার, আমরা এখনও পাহাড়ের ওপর নেই। আমাদের বনে জঙ্গলে এস, এস বাহিনীর সৈনিকেরা সশস্ত্র অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীচ গিরে মার্কিন বোমারু বিমানবহন উড়ছে।

আজ হারিতে আমরা সঙ্গে ডাঃ গোয়েবলসের বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করেছি। শত্রু অধিকৃত দেশে অবিবাহিতা জার্মান থাকবার মর্যাদা নষ্ট করেছে, আমরা এখানে থেকে মার্কিনীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি—একথা বলবার জন্য আমি তাকে কোমলিনই কমা করতে পারব না।

আমাদের সংঘের প্রত্যেককে সে পাগল করে দিয়েছে। আমরা কোথায় বাব? হাইন নরীর পায়ে গিয়ে শত্রুর সাংঘাতিক বোমাবর্ষণের মুখে নিজেদের এগিয়ে দেব?

পিটার, জার্মান ভাষা যে কত অসমলবারক তা আমি এখন উপলব্ধি করছি। জার্মান মানে হুঁড়ি করা। আমাদের সংঘের সভ্যসংখ্যা বর্তমানে হুঁড়ি করে এসে পড়িয়েছে—অতঃপূর্বে এক আমি বহর। আমি শুনেছি যে মার্কিনীরা এখন সহরকে লণ্ঠিকা হয়ে আত্মসমর্পণ অথবা বোমাবর্ষণ ও গোলাগুলিতে জলে হচ্ছে

স্বাধীনতা লাভ করছে। এল, এল সেনারা কি কখনও আত্মত্যাগ করবে? আমি এখনও তা বিশ্বাস করি না। আমরা জাতি হিসাবেই থাকতে চাই কবে তা: পোয়েবলু আমাদের বিশ্বাসঘাতক বলেবন—এ বাস্তবিকই সাংঘাতিক।

১১ই অক্টোবর, ১৯৪৪

এই প্রত্যয়ে মার্কিন গোলন্দাজবাহিনী এসেমেলা ভাবে পাগলের মত খোঁজাখোঁজ করছে। চারিদিক থেকেই এই বড় বড় কামানগুলো এসে গুলি করছে এক যোঁরাহ কুণ্ডলী আকাশে থাকিয়ে থাকিয়ে উঠছে। একেন সহর কি ভাবে?

১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৪

গত পরও পত্রখানা শেষ করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। আমাদের সকলকেই এই স্থান পরিভ্রমণ করতে হয়েছিল। তারা জাতি সৈন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আমরা আজ সকালে ফিরে আসতে না আসতেই তিন জন মার্কিন সৈন্য রাইফেল হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। তারা সকল কোঠাই খুঁজে দেখল। আব দীর্ঘার মধ্যেই আমাদের অস্ত্র চলে বেতে হবে।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৪

লক্ষেনট্রেনীতে আমাদের একখানা ঘর দেওয়া হয়েছে। আমাদের ঘরটা মোটেই পছন্দ হয়নি। জনসাধারণ দরিদ্র। সব কিছুই খোঁজা বাচ্ছে।

প্রিয়তম পিটার, আজ তোমার জন্মদিনে তুমি কোথায়? আমি যদি জানতাম যে তোমাদের অনেকের মত তুমি এখানকার জঙ্গলে লুকিয়ে আছ, তবে আমি তোমাকে দেখতে যেতাম।

একেন ও ডুইসবার্গের চরম দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে, আমাদের অস্ত্র নগরীগুলি ও চমৎকার কলোন সহরেরও কি এই দুর্ভাগ্য ঘটবে? এ অবস্থা এত সাংঘাতিক যে, একথা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। সময় এক নিরন্তর হাতে সব কিছুই সমর্পণ করতে হবে। আমরা কলাকল দেখা ও আশা করা ব্যতীত অস্ত্র কোন পরিবর্তন আনতে পারি না। আবার তোমার বাবাও তোমাকে যত্না দেবেন। আমিও আমার পরিবারের সঙ্গে আমার প্রতিদিনকার যুদ্ধ করে যাচ্ছি।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৪

আজ আমি একজন প্রাক্তন বন্দি ওয়াকেন এস, এস, সৈনিকের সঙ্গে আলাপ করলাম। মাত্র হু সপ্তাহ আগে সে মুক্তি পেয়েছে। যদি তুমি হঠাৎ আমার স্মৃতি এসে পাঁড়ি, তবে কী স্মরণেই না সেটা হয়।

আমি আজ বাড়ী গিয়ে আমার ছোট ক্রাসী বেতারযন্ত্রটা নিয়ে এলাম। চিন্তা করে দেখ, আমি প্রায় একটি মৃত্যুখনিতে প্রবেশ করেছিলাম। একজন মার্কিনী আমার জীবন রক্ষা করেছে। প্রিয়তম পিটার, হতই যুদ্ধ এস, এস, সৈনিকেরা এখানে আসছে ততই তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমার কলোন, আমার কলোন। পিটার, পৃথিবীতে এখন কি ভাবিচিঁতা বসে কিছু নেই—এ অপরাধীদের এই কাজের জন্ত শাস্তি দিতে পারে। প্রতিশোধের জন্ত আমাদের দলের হাটাকার করে তত।

গতকাল আমাদের একজন সত্য জানতে পেরেছে যে, হিটলারী যুদ্ধজিহ্ন নেতাদের ক্রালে গিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয়েছে।

১১শে অক্টোবর, ১৯৪৪

জাতিগত "গণ-সেনাবাহিনী" সম্বন্ধে তোমার এখন কি বক্তব্য আছে? এখানে ওরা এটাকে অপরাধ এবং পাইকারী হত্যার মত হিসাবে ধরে নিয়েছে। এসব দেখে আমার মনে হয় আমাদের নৃক্ষ কোন অস্ত্র নেই। পিটার, এত কসরের পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের পরেও আমাদের যুদ্ধজিহ্ন পরাজিত হয়েছে একথা ভাবতেও আমাদের দলের ব্যাখার টনটন করে ওঠে। না, তা হতেই পারে না। তাহলে, আমাদের যুদ্ধজিহ্ন কি হবে, পিটার?

যুদ্ধ এক জাতিগত মেসিনগান থেকে আবার গোলাবর্ষণ শুরু হয়েছে। ইকল বনে যুদ্ধ খুব দানা বেঁধে উঠেছে। আমেরিকানরা আসে বটে, কিন্তু অগ্রসর হতে পারে না। আমাদের সৈনিকেরা যদি এই দুর্বলদের নেতৃবাহিনী থাকত, তবে তারা আকাশপথে আমেরিকায় চলে যেত। তারা সৈনিক নয়। যুদ্ধ এবং অগ্রগতি শব্দ দুটি তাদের কাছে অজ্ঞাত। আমরা আশা করি, তারা একজন্ত জাতি শাস্তি পাবে।

পিটার, আমি এখন সনস্কর্ড সহরে আমাদের যুগল জীবনের কথা স্মরণ করি তখন ভাবতে পারি না যে এই স্থানের সময়টা এত ভাঙাভাঙি অভিযুক্ত হয়ে গেছে। মানুষের সেই বিবেচনা-শক্তি কোথায়? দুটি প্রাণীর জন্তও তাদের কোন দরদ নেই। কিন্তু, আমি একজন কি সব বলছিলাম? আমরা কারও দরদ চাই না। বেঁচে থাকাই মানে যুদ্ধ করা। জাতিগত মানেই বিখ্যাত হওয়া এবং আবার শেষ কাজ ও আত্মত্যাগের কাছে আমি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী থাকব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমার সন্তান-সন্ততিরাও এই আদর্শে প্রতিফলিত হবে।

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৪

প্রিয়তম, আমরা আর জাতিগত থাকতে পারব না কেন? মনস্কর্ড শহরে আর আমাদের দলের মাত্র তিনজন আছে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার? যুদ্ধেরা হত্যাশ চরে পড়েছে। পনের বৎসর বয়সের শিশুদের হাতে আমেরিকান সিগারেট গুলি দিয়ে ধূমপান করতে বলা হয়। পিটার, তোমার দলের কি বিলোপ হয়ে যায় না? আমাদের আদর্শ, জাতিগত যুদ্ধজিহ্ন সেই আত্মবিশ্বাস আজ কোথায়?



ক্যালকুলাটর অ্যাপারটুস প্রাইভেট লিঃ
ফোন-৩৫-১১১৭, প্রেসক্স: ড: কার্ভিট, পু: কু: সু: রি:
প্রিন্স-কলকাতা, ৫৫ নং ব্রাহ্মণী, ১১১৭ কলকাতা ৩।

পতকাল হুজুর আমেরিকান আর্মাদের প্রতিকূল দলের নেতাকে তার শিত সন্তানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তারা তার কাছ থেকে জেলার শাসনকর্তা ও অফিসারদের খবর জানতে চায়। কিন্তু সে কিছুই বলবে না। এবার, বোধ হয়, আমার পালা। তুমি ত জানই আমি কি বলব। আমি বলব যে সে একজন নহবে গেছে এক তার ছুটো পুত্রে তাকে চেনা হবে। আমি মিথ্যা কথা বলব, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৪

পতকাল অবস্থাটা নরকের মত পীড়িত ছিল। মেরিনামান থেকে তলীঘর্ষণ করা হয়েছে। আকাশটা লাল। এই পরিস্থিতির মধ্যে হুজুর আমেরিকান ট্যাংক-কামানের তলী এবং গোলাগুলি চলছিল। এই নরকের মধ্যে আমাদের বোমাবর্ষণ। ওঃ, অবশেষে।

আজ আমাদের সামরিক শাসন-বিভাগ অফিসে বেতে হবে। এটা খুব সম্ভব যে বাড়ী বাবার জন্য এই আমাদের শেষ সময়। তুমি ত জানই যে সময়মত আমেরিকানদের স্বরণ বোকা যায়।

২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৪

শিটার, আমি এখনও ভূতের মত দাঁড়াই। এক ঘটীর জন্য অসুস্থ হয়ে নিয়ে আমরা বাড়ী ফিরে গিয়েছিলাম। মেয়ের হাফখানে অন্ধকারময় জায়গায় আমার পায়ে একটা কিছু রস্ম পড়ে গেলে বৃক্ষে পংলায় যে আমার পায়ে একজন মহাব্যসেহ ঠেকেছে। ভয়ে আমাব রক্ত জমে গেল বরকের মত। স্বপ্নের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আমি চীৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত করলাম। নিয়ামলাই বের করে দেখলাম, আমায় সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছে—একজন জার্মানের গব পড়ে আছে। সাংঘাতিক! শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। লোভসার আহত এক ব্যক্তি পড়েছিল। এই সাংঘাতিক দৃষ্টের অর্থ কি, আমরা তার কাছ থেকে জানসাম।

আমাদের বাড়ীর পেছনে যে সব জায়াগ সৈন্ত নুকিয়েছিল তারা কুখার জ্বালার আমাদের ঘরে প্রবেশ করেছিল। কিছুক্ষণ পরে তারা নীচে লব্ধ গুলিতে পায়। হঠাৎ করেই জন আমেরিকান তাদের সুস্থকে এসে দাঁড়াল। এখন কী দুগ্ধের অবস্থার পালা হল, তুমি নিজেই তা কল্পনা করে নিতে পার। বর্ষভুলো তিন সারি মদের বোতল নষ্ট করলে। আলমারিতে কিছুই আর বইল না। সব কিছুই তারা মেয়ের ওপর ছড়িয়ে ফেলেছে। একটা ভীষণ দৃশ্য! এই বর্ষভুলো লোহার একটা ট্রাক দিয়ে লেবার টেবিলটাকে জেপে ফেলেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

শিটার, প্রিয়তম, তোমাকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে। তুমি এখন এস, এস বাহিনীর একজন সৈনিক। তুমি শুধু আমাকে এই অসুস্থটুকু দাও যে তুমি জনসাধারণের বাড়ী বাবে না। কুখার হয়ে পড়লে কিছু খাবার সংগ্রহ করে নিও; কিন্তু সাধারণ লোকের বাড়ী যেও না। বুঝতে পাচ্ছ? ওখানে বাওয়া বড় বিপজ্জনক ব্যাপার!

২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৪

চল্লিশ মিনিট অন্তর অন্তর ক্রসেসল এবং লিজ সহরে ভীষণ শব্দে বোমাবর্ষণ হচ্ছে। হ' সপ্তাহ আগে প্রতিবেশী একটি মেয়ে আহত হয়েছিল। সে কিরে এসেছে! সম্ভবতঃ দু-তিন দাঁস ওকে

শব্দমত থাকতে হবে। হঠাৎ ঠিক ওপরে তান পায়ে বোমার টুকরা হুকে গিয়েছিল। হনসকট বা ইউপেন সহরে বিস্ফোরণ ছিল না বলে ওকে আমেরিকান বেলকন ওয়েলকেন রেখে (বেলকিয়া) পাঠিয়ে দিয়েছিল। এক-রে করে দেখা গেল যে ওর হাঁটুটা জেপে গেছে। তেজবিনী মেয়েটিকে জ্বরের মধ্যে তারা কেসে রাখলে। দুদিন পরে তারা হামবুর্গে আমেরিকান হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। সেখান থেকে লিজ। সেখানে সে বেলজিয়ানদের দ্বারা এবং আমাদের বোমাবর্ষণের ভীতভা সহ করেছে।

শিটার, এখন তুমি কোথায়? এই চিঠি কি তোমার কাছে কোন দিন পৌঁছবে?

শিটার, আমি জায়াগরূপে থাকতে চাই এবং আমাকে তা থাকতেই হবে। নতুন অন্তরা যদি এসে পড়ত। ততই আমাদের রক্ষা হতে পারে। তুমি কি মনে কর না যে আমাদের সমস্ত হুঁতাপোর দায়িত্ব আমাদের বিশ্বাসঘাতকদের হাতে চাপিয়ে দেওয়া যায়? যিনি পর দিন তারা শিত্তুখিমির সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর দলে ভেঙে পড়ছে। এই চিঠি যে কোন লোককে হত্যা করে দেয়। তবু বৃদ্ধ করার জন্য সাহস এবং আকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার। বেঁচে থাকা মানেই সংগ্রাম করা। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার প্রাণ্ডীলে তোমাকে বলি : সাঁহসী হও।

১লা নভেম্বর, ১৯৪৪

বৃদ্ধ শেষ হয়ে গেলে দেখা হবে যে আমরা আমাদের বাবতীর সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু একটা জিনিষ তারা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেনা—সেটা হল কি করে বেঁচে থাকব বা কি প্রণালীতে আমরা চিচ্চা করব এই অধিকারটা।

এ জিনিষগুলো আমাদের যুবলজ্জিকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। আমরা কি সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বড় হয়ে উঠিনি? আমরা আমাদের পুরাতন আদর্শ অজুসারে আমাদের নতুন জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম করব। তার জন্যই আমরা আশা করব এবং জায়াগীর উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বাস রাখব।

৩রা নভেম্বর, ১৯৪৪

এখন আমরা বখেই মাংস পেলেও (সপ্তাহে জনপ্রতি দুই পাউণ্ড) ঈতকালে অনাহারে থাকতে পারি। আলু এখনও হার্টে আছে। এক টুকরো কটর জন্য আমাকে চার ঘটী পীড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। এটা কি সাংঘাতিক ব্যাপার নয়?

আমি এইমাত্র ৫ ঘটিকার সবাব গুললাম। সংবাদ ভাল বলে মনে হল না। আমি জায়াগীর জয়ে এখনও বিশ্বাস করি। এর পক্ষে বখেই যুক্তি আছে। আমি নিশ্চিত যে একদিন আমার বা তার মন পরিবর্তন করবে। সে কোথ গুলে দেখতেও পারে। চারিদিকে কি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার দিকে সে নজর দিতে পারে। এই দিনে বেঁচে থাকা মানে সংগ্রাম করা। আমার অনেক আগেই পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

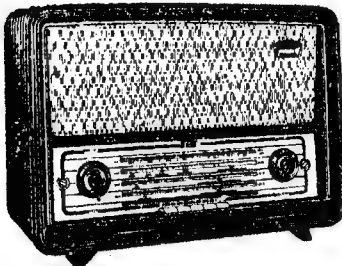
৫ই নভেম্বর, ১৯৪৪

আমি সর্বদাই কুখার। রুটি ও মাখন পাওয়া যায় খুব কম। শত্রুর আমাদের সুন্দর জায়াগিকে শাসন করতে চায় এবং আমাদের প্রাচীন, শক্তিশালী জায়াগ ভাষাকে অপরিষ্কার করে ফুলতে চায়। একথা ভাবলে আমি পাগল হয়ে বাই। আমাদের এক জালাতন দল

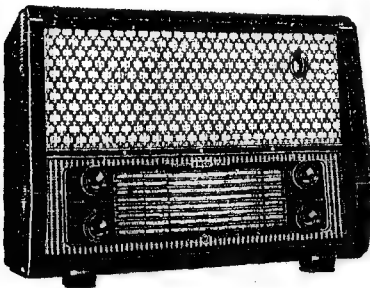
স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্যে জুন্দের জিনিস

কাজে ভালো অথচ দাম বেশী নয় বলে
গ্রাশনাল-একো রেডিও এবং ক্লীয়ারটোন
সরঞ্জাম বিখ্যাত। আর তা-ও এত হরেক
রকমের পাওয়া যায় যে আপনি মনের
মতো জিনিসটি বেছে নিতে পারবেন।

গ্রা শ নাল - একো রে ডি ও



গ্রাশনাল-একো মডেল এ-৭৪৪ : ৬ নোভাল
ভালব, ৯ তা'শান, ৯ বাণ্ড এসি রেডিও, মনোরম
মোডেড কেবিনেট। পিয়ানো-কী বাণ্ড সিলেকশন,
টপ রেকর্ডারের বিশেষ ব্যবস্থা। 'মনহুইজড'।
দাম ৩৮৫/- নীট



গ্রাশনাল-একো মডেল এ-৭৩১ : এসি।
'নিউ প্রমথ' ৭ ভালভ, ৮ বাণ্ড। এর শব্দগ্রহণশক্তি
অসামান্য। স্বরনিয়ন্ত্রিত আর-এফ-স্টেজ সংযুক্ত,
এছাড়া এক্সটেনশন স্পীকার ও গ্রানোফোন
শিট-অপের ব্যবস্থা আছে। 'মনহুইজড'।
দাম ৬২৫/- নীট



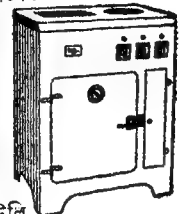
Kleerone ক্লীয়ারটোন বাতি ও সরঞ্জাম

ক্লীয়ারটোন ওয়াটার বয়লার—সঙ্গে সঙ্গে
পরম বা ফুটন্ত জল পাওয়া যায়। সাইজ : ৩.৫
ও ৮ গ্যালন। এসিতে চলে।



ক্লীয়ারটোন
ঘরোয়া ইঙ্গি
ওজন ৭ পাউন্ড; ২৩০ ভোল্ট,
৪৫০ ওয়াট; এসি/ডিসি।
খাকলাইটের হাতল।

ক্লীয়ারটোন কুইং রেক্স
ছোটো হট প্লেট ও উত্তম আছে—প্রত্যেকের
আলাদা কন্ট্রোল। সর্বোচ্চ লোড
৫,৫০০ ওয়াট।



ক্লীয়ারটোন
বৈদ্যুতিক কেটলি
৩ পাউন্ড জল ধরে; জোমিয়ম কলাই করা।
২৩০ ভোল্ট, ৭৫০ ওয়াট। এসি/ডিসি।

ক্লীয়ারটোন টুইন হট প্লেট
রান্নার জন্তে। প্রতি প্লেটের আলাদা
কন্ট্রোল। ২৩০ ভোল্ট—এসি/ডিসি।
সর্বোচ্চ লোড ৩,৫০০ ওয়াট।



ক্লীয়ারটোন ফোল্ডিং
স্টীল চেয়ার ও টেবিল
নানা রঙের পাওয়া যায়।
আরমের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী।
গদি বোড়া কিংবা গদি
ছাড়া পাওয়া যায়।



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড
৩, ম্যাডান স্ট্রিট, কলিকাতা-১০ • অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪ • ১১১৮, মাদ্রাস
রোড, মাদ্রাস-২ • ফ্রেজার রোড, পটনা • ৩৩৭৯, সিলভার জুবিলী পার্ক রোড,
হায়দরাবাদ • বোম্বাইর কলোনি, টাঙ্গুরি রক, দিল্লী • রাইশি রোড, সেকেন্দরাবাদ

করতে হচ্ছে কেন? কারণ একেই রকম অনেকে বিশ্বাস করা বলে এবং উভট গল্প তৈরী করে। জাৰ্ণা সৈনিকের ওপর আমার বিশ্বাস অটুট আছে। কারণ জাৰ্ণা সৈনিকই বিশ্বের স্রেষ্ঠ সৈনিক। আমাদের শত্রুদের অনেক রসদ আছে কিন্তু তাদের সৈনিকরা কাপুরুষ, আমাদের সৈনিকদের মত নয়। এটা যান্ত্রিক বৃদ্ধ। এর বিরুদ্ধে আমরা কি করে দাঁড়াব?

একটা ১নং ডি অল্প আমাকে আজ সকালে জাগিয়ে দিয়েছে। কয়েক মিনিট পরেই আমরা একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ পেলাম। সারা বাড়ীখানা কাঁপতে লাগল; দরজা-জালিগুলো খুলে গেল। ইউপেনের নিকটে ওটা নিশ্চয়ই বিস্ফারিত হয়েছে এবং আমি আশা করি লক্ষ্যস্থলের ওপরেই বর্ষিত হয়েছে। যেদিকে তাকাতে সেদিকেই বিমান দেখতে পাবে। হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য সৈনিকগণ ও সুলভ্য সহরগুলো।

১ই নবেম্বর, ১৯৪৪

আমি আমার পরিবারের সঙ্গে আর বাস করতে পারব না। আমার এখনও পেট ভরেনি, এই কথা টেবিলে বসতে আমার সঙ্গে বসেছিল। আমার ভাতা বলল, ডাক্তার দেখাও। আমার পিতামহী করুণকটা নিদারুণ মন্তব্য প্রকাশ করলেন। এখন তোমরা হিটলার এবং তার দলবলের জন্ত চীৎকার করতে পার কিন্তু তোমাদের কোন সুবাদ হবে না। তারা তাদের কৃতকর্মের বোণা শাস্তি পাবে। আমি আর ঘর থাকতে পারলাম না।

হামলেট

বরিস পাস্টারনেক

শব্দ খেয়ে গেল। আমি মকে এসে দাঁড়ালাম।
দরজার দরীরের সমস্ত ভর রেখে
দুর্ভাগ্য প্রতিনিধি তুনে ভাবতে চেষ্টা করলাম
আমার এ জীবনে কি ঘটছে।

হাজার অপেরা গ্রাসের দৃষ্টির সম্মুখে
রাত্রির অন্ধকার আমাকে কেন্দ্র করে আছে,
ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, যদি সম্ভব হয়—
পাত্রটি আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও।

তোমার দুর্বল ইচ্ছাকে ভালবেসে
আমি অতিনয়ে সম্মতি নিলাম।
কিন্তু এখন জন্ত নাটক অভিনীত হচ্ছে
এবং জন্তে আমাকে প্রস্তুত হ'তে লাগে।
জানি, নাটকের সমস্ত অঙ্গ পরিকল্পিত
এবং সমাপ্তি অপ্রত্যাশিত।
আমি একাকী, সকলে ফেরেসিসের কপটতার ময়।
'তোমার' জীবনধারণ করা বাঁচ পায় হওয়ার মত সহজ নয়।'

অমুখ্যবাদক—পৃথিবী সন্ন্যাস

আমাদের এখানে আজ বেশ গুলীবর্ষণ চলছিল। তুমি কি হয়ে
কর যে আজ রাত্রিতে আমাদের ফুরেরার বেতাম কিছুর বলবদ।
আমি আশা করি, তিনি বন্ধুতা দিলে তারা যেডিও বন্ধ করে দেবে
না। আমি তার বন্ধুতা তনতে চাই। আমার আকাংক্ষা হয় যে
আমি যদি ছেলে হতাম তবে আমার আদর্শের জন্ত সঙ্গ্রাম করতে
পারতাম।

১ই নভেম্বর, ১৯৪৪

আজ বরক পড়ছে। অভ্যস্ত বংশের আমরা কত আনন্দ করে
বেড়িয়েছি, কিন্তু এখন আমাদের রাজ্যের ঘেরানো বা সেরে ব্যবহার
করা নিষিদ্ধ। আমাদের আশু নেই। তা ছাড়া, রাজ্যের ঐ
বরকে নিমজ্জিত আমেরিকানদের আমাদের নষ্ট করতে হয়।
আমাদের, জাৰ্ণাণদের রাজ্যের ঘেরাতে কতই না ইচ্ছা হয়।

ডি—২ অল্প ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যে আমরা খুবই খুশী হয়েছি।
আশা করি, এই অল্প আমাদের অনেকটা সাহায্য হবে। গতরায়ে
আমরা ফুরেরার বন্ধুতা শোভাবার অপেক্ষায় বইলাম, কিন্তু বুধ।
গতকালও আমি ফুরেরার জন্ত সব কিছু করতে পারতাম; কিন্তু
আজ আমি কিঞ্চিৎ হতাশ হয়ে পড়েছি। এটা কি সত্য যে হিমলার
আমাদের প্রিয় ফুরেরারকে বন্দী করে রেখেছে। হাইকমান্ড আর
ফুরেরারের কথা ঘোষণা করেন। আমার তার প্রতি এখনও
বিশ্বাস আছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের উন্নতি হবে, একথাও আমি
বিশ্বাস করি। আমাদের শত্রুতার জয় নিশ্চিত।

—অমুখ্যবাদক : বিমলকুমার ঘোষ

সিদ্ধার্থ-সঙ্গীত

গৌতম বুদ্ধ

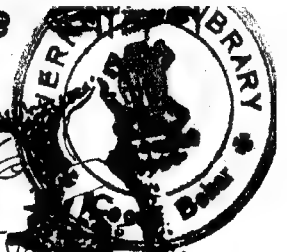
অনেক জাতি সঙ্গায় সন্ধ্যাবিশ্রাম অনিচ্ছাসয়
গৃহকারক গবেষণাে দুঃখা জাতি পুনরনয়।
গৃহকারক সিট্টোশি পুন গেল ন কাহসি
সব্বাতে কান্থকা তুংগা গৃহকূট বিসংখিত
বিসংখয় খন্ত চিত্ত তপহানঃ ধয় মজ্জবপা।

অমুখ্যবাদ—

জন্ম-জন্ম আসি আর বাই সন্ধান করে পাই না
কে করেছে এই গৃহ-নির্মাণ, জন্ম-জন্ম দুঃখ,
পেরেছি এবার তোমার তে কাছ, বুকেছি সত্য তাই না,
তুংগেতে গড়া এই গৃহ জানি মিছে মায়। হল বৃদ্ধ।

অজানতার শৃংখলে আর বসে নাকো আমি বাঁধা,
মিথ্যার গ্রানি, ভয়, মোহ হতে মুক্ত আমার মন—
বাসনা-কামনা করিয়াছি ত্যাগ, টুটিব সকল বাধা,
সত্য চিনেছি, পেরেছি আজিকে শান্তির এ জীবন।

—ভাবানুবাদ : সঞ্জিল মিত্র



প্রায় একশতাব্দী পূর্বে ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ ঠাকুর বাড়ীর গৃহ কোণে উলুগ্রনি শব্দধ্বনির মধ্যে অজ্ঞাত শিশুর মতই জন্মেছিল একটি শিশু। হয়তো দেবগণ বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্যই এই শিশুকে পাঠিয়েছিলেন স্বর্গলোক হ'তে মর্ত্যলোকে। অজ্ঞাত শিশুর মত বড় হবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট পুস্তকের গম্ভীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে তিনি পারেননি, তাঁর কল্পনা ও চিন্তা স্বাধীন, তাই তাঁর আত্মীয়গণের মনে এসেছিল হতাশা। তাঁরা অনেকেই বলতেন রবিকে দিয়ে অনেক আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু ওর কিছুই হলো না, সেদিন তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল যে, ভাবীকালের বৃকে এই শিশুই একদিন প্রতিভাত হয়ে উঠবে ভারতীয় সাধনার, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতি উত্তরাধিকারী রূপে, এই বীজরূপী শিশুই একদিন মহামহীকর রূপে বনস্পতির মত ঝড়িয়ে অসংখ্য তাপিত জনকে দান করবে শান্তিদায়িনী সুশীতল ছায়া। প্রতিষ্ঠা করবে ভাঙ্গ সঙ্ঘাতের প্রভাবে জীর্ণ পুণাতন ভাঙ্গা চোরা সমাজের বৃকে কুসংস্কার বর্জিত সমাজকে গরিমাপীণ্ড এক অভিনব রূপে, মানুষকে দিবে মুক্তির স্বাদ।

রবীন্দ্রনাথের নাম সার্থক প্রতিপন্ন হয়েছিল, কারণে তাঁর রক্ষা-জালে মগ্নিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, সর্বোপরি তাঁর পরিচয় তিনি মানবদরদী।

রবীন্দ্রনাথ উপর তলার লোক ছিলেন বলে ধরিত্রীমায়ের নিকটবর্তী স্থানে আগমন করতে অকৃতকার্য হয়েছিলেন তাঁর জন্ম তাঁর আকর্ষণের সীমা ছিল না, এবং যে অবস্থান করছে ধরিত্রীমায়ের নিকটে তাঁর জন্ম তিনি থেকেছেন উল্লসিত হয়ে।

সুন্দর এবং মজলকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্ম তিনি আহ্বান জানিয়েছেন ভাস্কর্য বায় দানবের সঙ্গে সঙ্গ্রামের জন্ম ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই সঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত অভিশাপ বহিত হয়েছে ভাস্কর্য উপরে, বাবা বিবাহিছে বায়, বাবা নিভাইছে আলো।

রবীন্দ্র প্রতিভা ছিল সত্ত্ব সত্ত্বতন, বার বা প্রাণ্য তাকে তাই গিড়ে রবীন্দ্র লেখনী কোনদিনই হয়নি কুঠিত। জাতীয়-আন্দোলন তাঁর অন্তরের অন্তর্ভুক্ত হতে আগত আত্মীয় লাভ করেছে। অভ্যাচার, অনাচার, অবিচার তাঁর কাছ থেকে পেরেছে তাঁর কণাখাত। তাই দেখি,—জালিয়াতওয়ারলাবাগে বখন সহস্র সহস্র নয়নারী ইংরেজের গুলীতে অমহাঙ্গভাবে হত্যাতে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ এই পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন তদানীন্তন গভর্নর জেনারেলের নিকট এবং প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ভারত সম্রাট প্রদত্ত 'মাইট' উপাধি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুন্দরের উপাসক, যেখানে সুন্দর তাঁর দৃষ্টি-পৌছায় হয়েছে সেখানেই তিনি সন্ধান পেয়েছেন মঙ্গলের। তাই সেখানেই তিনি বাসিত হয়েছেন জানাতে তাঁর অভিনন্দন। জাপানী কবি মোওচি জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কাঞ্চন স্যুরার নিকট আত্মবিক্রয় করার রবীন্দ্রনাথ তাকে কোনদিনই কমা করেননি। মিস রাভবানের উদ্ভট অহমিকাকে কবি ওড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর স্নেহের আঘাতে।

যে বাস্তব সভ্যতা, সভ্যতার নামে কলঙ্ক লেপন করেছে, পৃথিবীর অম্লরত দেশগুলিতে যে বাস্তব সভ্যতা বাস্তব বলে বিশ্বকর্ষক বজার রাখতে চায় তার বীজসংরক্ষণ দর্শন করে কবি আতঙ্কিত হয়েছিলেন, তাই তার উপর তিনি আত্মীয় বর্ষণ করেন নি, বর্ষণ করেছেন শুধু অভিশাপ। সেই সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বাস্তব সভ্যতার কল্যাণকর রূপ দর্শন করে কবি বিম্বিত হয়েছেন, হয়েছেন বিমুগ্ধ, অধিকাংশ মানুষকে অমায়ুষ্য বেধে তবেই সভ্যতা সমুদ্র থাকবে একথা অনিবার্য বলে চেয়ে নিতে অক্ষম হয়েছেন তাঁর দরদী মন। তাই তো দেখি সেই সব মানুষের প্রতি তাঁর দরদ, বাবা সভ্যতার পিলভুজরূপে সভ্যতার ঠাঁট মাথায় করে পাড়িয়ে আছে, বাবা সমাজের উচ্ছ্রিতির অগ্রে প্রতিপালিত, এদের উদ্দেশ্য করে মনুষ্য নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হাবনে আনন্দ অল্প অখণ্ড শেটের ভালো কম নছে, জীবনে বড় বড় দুর্ঘটনাই ঘটুক, দুই দুই অয়ের জন্ম নিয়মিত কাজ চালাইতে হইবে, কোন ক্রটি হইলে কেহ হাস করিবে না—বখন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য লোক আত্ম, বাহাদের দুঃখ কষ্ট বাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে বেন অনাবিকৃত, বাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই, ঘেহ দেখি না, তখন বাস্তবিকই মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি বেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত। আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর।'

রবীন্দ্রনাথ লেখনীর দ্বারা ব্যঙ্গ করেছেন ভাস্কর্যই বাবা অন্ধ কোলিক্তের মোহে বুদ্ধ হয়ে শত শত নবীন নারীর জীবন নষ্ট করতে হয়নি কুঠিত, যেখানে নারীরা সারা জীবন শুধে স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করতে পারতো সেখানে শিতা হাতার ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে ভোগ করতে হয় বৈধব্য বস্ত্রা। তিনি তাদেরকে স্থানীয় চক্ষু মেলেছেন

যারা অর্থের গরীতে বসে নিহক একটা খেয়ালের বশে অবহীন লোকদের করেছে গৃহহীন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সহস্রবর্ষের ভ্রমসা নিমজ্জিত জাতিকে তুলে আনা তাদের অবহেলিত লাজ্জিত জীবন থেকে মুক্ত করা এবং তাদের আত্মশ্রমের উপলব্ধি স্ফূর্ত করা আমার কর্তব্য কর্ম। যে দেশের অগঞ্জিত মানুষ তাচ্ছিল্যের জগতের ভূগীভূত সে দেশ স্বাধিকার লাভ করেনি। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক কৃষ্ণাঙ্গ ও অজ্ঞতার আচ্ছন্ন, তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে, গভীরে প্রবেশ করে তাদের আপন সত্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে, তাদের শিক্ষিত করতে হবে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।'

‘মহা ঐক্যধ্বনি নিম্নতলে

অন্ধাশনে অনশন দাঁহ করে

নিত্য দুখানলে,

ওদ্যপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,

দেহে নাই শীতের সঞ্চল,

অবারিত দুঃস্থর দুয়ার,

নিষ্ঠুর তাহার চেরে জীবমুত দেহ চর্যসার

শোষণ করিছে দিনরাত

রক্ত আরোগ্যের পথে রোগের

অবধ অতিষাভ,

সেখা হুমুঁর দল রাজত্বের

হয় না সহায়,

হয় মহাসার।

রবীন্দ্রনাথ শোহিতের কবি, রবীন্দ্রনাথ অবহেলিতের কবি, কবি তিনি হানবেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘যারা রাষ্ট্রের কোলের কাছে আছে, যারা রাষ্ট্রের হাতে মাহু, যারা রাষ্ট্রতেই হাটিতে আরম্ভ করে খেতাবলে রাষ্ট্রতেই বিজ্ঞান করে, আমি তাদেরই বন্ধু আমি তাদেরই কবি।’

মেয়েরাই দারী

মহামারা দেবী

জানি অনেক সময় সময়ে মেয়েদের নানা হুঁশা, দুঃস্বপ্ন

জন্ম পুত্ৰকে দারী কবি, নিজেরে স্বাধীনতার জন্য

মেয়েদের অহরহ দাবিরে রাখবার চেষ্টা আছে পুত্ৰের। তাই সব কিছু বুঝা-সুঝা তাইই ভোগ করে আর মেয়েরা হয় বঞ্চিত, এ কথা যোকা করতে কিছুমাত্র বিধা করি না। কিন্তু গভীর চিন্তা করে মনের গহনে একবার বসি মেয়েরা দুটি সেন, তাহলে ভাল করেই বুঝবেন, সত্য কারা এর জন্য দারী।

লোকে বলে, জানপাণীর উপায় কি? এই যে মেয়েজাতীর জীব, এরা হলেন জানপাণী, সব জানেন বোঝেন তবু উপায় বোঝেন কি করে সত্যকার ভাল, বুদ্ধিবীর্ণ মেয়েরা চিরকালই একভাবে এক গোয়ালে মাথা বুড়িয়ে ঢুক থাকেন। অবশ্য এ মনস্তত্ত্ব সনাতনী পন্থার সব কিছুই ভাল বিশ্বাসে ধীরা আত্মপ্রসার লাভ করেন সেই সব মেয়েদের। বেহেতু নিজেরা খোঁড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি খোঁড় করে জীবন কাটিয়েছেন, সেইহেতু সব মেয়েদেরই ওটি হাত চড়ে, সে যদি নিজের প্রতিভার বা কার্যক্ষমতার

জির রাজ্য ঘরে সঙ্গায়িক সুখী করবার বা নিজেকে সুখী করবার চেষ্টা করে, তাহলে একবারে রসাতল কাণ্ড বেধে যান—‘দেশ গেল, স্বর্গ গেল, ঐতিহ্য গেল’ বলে লক্ষবর্ষের শেখ থাকে না।

মেয়েদের মনের ইর্ষা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এসবের জন্য বহুল পরিমাণে দারী। এত আইন, এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও আজও যে মেয়েদের অবস্থার সত্যকার কেন উন্নতি হয়নি, তাদের যথার্থ্য যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছে, তার কারণও মেয়েরা। শিক্ষিতা মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক সাক্ষর করবার জন্য চাকরী করেন। বিশ্রাহের সনাতনী নিষ্কার যারা ভাগ্য করে তাঁরা যথাক্রমে কলেবরে বাড়ী করেন শ্রান্ত অবস্থার, কিন্তু তার জন্য কি কোন পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে! উপরন্তু ‘বিকী বউ বা মেয়ে’ বলে মেয়েরাই করে নানা সমালোচনা, তারা ফুরুরে হাওয়া খেয়ে মজা লুটে বেড়াচ্ছে, একথাও শোনা যায় প্রায়ই।

আজকালকার মেয়েরা কেবল রেখে প্রিয়জনকে খাইয়েই পয়স তৃপ্তিতে ডুবে যান না, তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গী বা মনোভঙ্গীর বদল সহ করতে পারেন না অনেকে। আধুনিকারা চার নানাভাবে নিজেরে বিকশিত করতে, স্কলার স্ট্রাকচার ভাবে গৃহ সাজাতে, নানা রকম শিল্পের মাধ্যমে, নানা রকম খেলা ও সাহিত্যচর্চার ভিতর দিয়ে নিজেরা আনন্দ পায় ও অপরকে তার ভাগ দিতে চায় কিন্তু তাই বলে গৃহকর্ম বা যাবার ব্যাপারে তারা মোটেই উদাসীন নয়, তবে তা করবার পদ্ধতি হয়তো পুরাতনের সঙ্গে মেলে না হুবেলা দীর্ঘ সময় রান্নাফর হাঁড়ি হেসেল নিয়ে কাটিয়ে দেওয়াটাই পরমার্থ ভাবেনা সেজন্য আশ্রয় করে কুকার, ঠোঁট ইত্যাদি। সুরচিকর, পুষ্টিকর সহজ পন্থার রাজ্য খানে কিছু মাত্র কম হয়না অথচ আর সময়ের মধ্যে অবশ্য বর্তব্য যাবার ব্যাপার মিটিয়েও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা নিজেরে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। মধ্যবিত্ত ঘরে এমন প্রতিজ্ঞা প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু আন্তর্যের বিপর্যয়ে সবদিকে বিচক্ষণ দৃষ্টি ও কর্ম ক্রমসত্যর জন্য প্রশংসাই মেয়েদের প্রাপ্য সেখানে এই মেয়েরাই প্রতিভাসিনী রূপে, নয় বাতনী-রূপে, নয় শাক্তী রূপে ঢেলে দেন এইসব মেয়েদের মাথার নিখা ও ফুংলার ডালি। তাই মনে হয় মেয়েরা নিজেরাই নিজেরে ভাল নয় করতে পারে না। সাবলীল, স্বাধীন যথার্থজানসম্পন্ন মেয়েরা এখনও যে ভক্ত বাধার সাহসে পাঁড়িরে আছে তা বলে শেষ করা যায় না।

আধুনিক মেয়ে কেবল স্বাধীন পরামর্শিনী, রত্নকারিণী ও অজয় সন্তানের জননী হয়ে থাকতে চাননা, সে চার স্বাধীন স্বর্গ সহজীও হতে। আজকালকার স্বাধীন চান স্ত্রী তাঁর সাথে সমান কার্যদায় সমাজে মেলামেশা ও চলাফেরা করবে, স্ত্রী ঘরের কোণে কেবল দায়ী কন্যে ও স্বামী নিজের দ্রাব বা বন্ধু নিয়ে সূর্য্যে হাতবের, আজকের যুগে এ প্রকার বদল হয়েছে। কাজকর্মে, সভাসমিতিতে স্বাধীন পাশে সলিনী হিসাবে স্ত্রী স্থান গ্রহণ করছে, এতে ভাল বৈ মন্দ মুমুর্ষু বলে মনে হয়না। মেয়েরা জগৎপুত্র স্রবনীত রচনার স্বপ্ন দেখে সুরভরা বাইরের নানা কাজে অংশ গ্রহণ করলেও তারা নিজেরে গৃহস্থালীর প্রতি এতো উদাসীন সাধারণত করেন যে স্বামী পুত্র বা আত্মীয় পরিজন স্রবাতের অভাবে হোটেল বেডরুমের পরপার হন, আজকাল মধ্যবিত্ত ঘরে এতো পরলো কাঁচও নেই। গৃহপাণি

বজার বেশেই মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের কুটির তুলতে প্রয়াস পায়।

আজকাল নববয়সের রাগারাজ অজ্ঞতা নিয়ে নানা রকম হাতকর কাহিনী অবতারণা করা হয় কিন্তু আধুনিক মেয়েরা একটু চোঁটা করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্ত্রী, মৌচাঁর খট্ট রাখতে দেখে, আবার স্বামীর কোন বিশেষ পদ অকিসরক আমন্ত্রিত করে আপ্যায়ন করবার সময় স্থানর ভাবে টেলি সাজিয়ে বিলাতী থানাও পরিবেশন করতে পারে। আজকালকার মেয়েরা নানা রকম রাগার পদ বা variety নিজেসাই সৃষ্টি করে, অল্প মেহনতে সূচক পুষ্টিকর খাততালিকার দিকেই সৃষ্টি তাদের বেশী। যেনে নেয়ে, হাত নেওয়া, কাপড় নেওয়া না করে মনোহরকর পরিবেশ যদি সে সৃষ্টি করতে পারে তার জন্ত প্রয়াসই তার প্রাণ্য। নিজের স্বামী সন্তানের জন্ত যে দরদ পুরাকালের যা ঠাকুরাদের ছিল, এখনও তাই আছে, নারী একই জাত, মাতৃরূপে, জায়গাশে রূপান্তর বড় একটা তাদের ঘটনা কাজেই আধুনিক কচিসম্পন্ন পুরুষের জন্ত আধুনিক কচিসম্পন্ন নারীই দরকার।

আধুনিক মেয়েরা কেবল যে পুরুষ স্থানর করে তুলতে চায় তা নয়, তারা সর্বরকম পুরুষকে আরাধন দেবার চেষ্টার নিজেসাই আজকাল

বহু কাজ নিজের বাড়ি থেকেই সানন্দে তুলে নিয়েছে। সাইকেল নিয়ে মেয়ে বাজার করে আনে বা করলো কিনে আনে সিন্ধিতে চাপিয়ে এ দ্রুত বোধ হয় বহুজনেরই সৃষ্টিকটু কিন্তু এতে দোষবীর কি সত্যই কিছু আছে? আজকাল ঘরে ঘরে ভূত জাতীয় জীব নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে সারাদিনের কর্মরত স্বামীকে আরাধন দেবার জন্ত স্ত্রী যদি এই কাজগুলি অন্যায়সে করে রাখতে পারে তার মত ভাল আর কি হয়? আধুনিক বহু মেয়েকে এই কাজগুলি আমি করতে দেখি আর ভাবি, কই আমরা তো কোনদিন সন্সারের জন্ত এই অবস্থ প্রয়োজনীয় কাজগুলি করতে পারতাম না, হয়তো সে যুগে এগুলি করার প্রয়োজন মেয়েদের খুব হতোনা কিন্তু বর্তমান ভূত সমস্তার যুগে মেয়েরা যে এগুলি করতে ক্রমশঃ পারদর্শী হচ্ছে তা আনন্দের বিষয়।

ব্যাংক টাকা জমা দেওয়া, চেক ভান্ডান, বাড়ীতে মনিঅর্ডার করা, পার্সেল বা চিঠি রেকিস্ট্রী করা, অন্তর স্বামীকে পাশে বসিয়ে নিজেই মোটর ড্রাইভ করে হাওয়া খাইয়ে আনা, এসব কাজগুলিই আধুনিকার অতি সহজে করেন। কে বলে—আধুনিকার সর্বতোভাবে কেবল গৃহসজ্জার মত শোভা পায়, আলমারীর শোকেসে সাজিয়ে রাখা ছাড়া তাদের দ্বারা আর কিছু হয়না। কথাগুলি বলেন অবশ্য ঐ

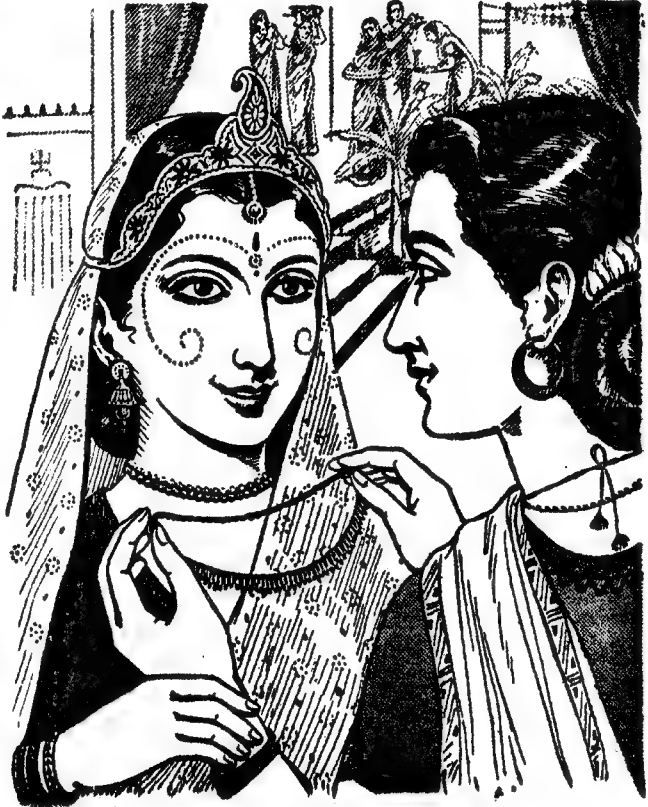
মনের কথা

“এমন স্থানর গহনা কোথায় গড়ালে?”
“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স
সিন্ধাছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই,
মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌঁছেছে
ঠিক সময়। এঁদের কচিজ্ঞান, সন্ততা ও
দারিদ্রবোধে আমরা সবাই থুসী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলার্স

সিপি লেনার নবম সিন্ধি ও রত - তলক
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১১

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



তথাকথিত মেয়েরা ধীরে নিজেদের জীবনের বঞ্চিত বাসিনা। আজ মৃত্ত
হয়ে উঠতে দেখছেন আধুনিকাদের মধ্যে।

আজও কত সন্তানের জন্ম সংসারে আনন্দ আনেনা, আনে
ভীতি। এ লক্ষ্য এ কলর সব মেয়েদেরই। পুরুষের শ্রেষ্ঠ চিরন্তন
তার শত অবগুণ থাকে সত্ত্বেও তারও কারণ মেয়েরাই। শান্তিরূপে
জননীরূপে এই সখি মেয়েরাই এ জাতীয় পুরুষদের প্রেমের সম্মুখে
অটল লালন করেন কিন্তু মেয়েদের বেলা এ রাই হয়ে ওঠেন রণচণ্ডী
হুজিঙে আসিনা।

পণপ্রথা নিবারণ বা বধুর উপর নির্ভরতন বন্ধ করা তখনই
সম্ভব হবে যখন মেয়েরা নিজেরা হয়ে উঠবে উদার নয়তো শত আইন
প্রণয়ন হবেও এর প্রতিকার সম্ভব নয়। ছেলের বিয়ে দেবার সময়
ছেলের মা ভুলে বান তিনি মেয়ে, তাঁর মনের মধ্যে কেবল একটি
কথা জেগে থাকে তিনি 'ছেলের মা' কিন্তু তাঁর এই মনোভাবই যে
টেনে আনে সমস্ত মেয়ে-জাতের উপর কলঙ্কের বোঝা। প্রতি মুহূর্তে
কুমারী কত ও নির্ভর্যাতিতা বধু নিজের মুক্তা কামনা করে কিন্তু এর
থেকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা একমাত্র মেয়েদেরই আছে। তিনি যে
যেয়ে, মেয়েজাতের কল্যাণ, তাদের মর্যাদা যে তাঁরই হাতে। তাঁরও
হয়তো একটি কত আছে, সমস্ত মেহেকে নিজের স্বভাব মধ্যে
কেলীভূত করে নিজেকে প্রায় করুন তিনি, 'ছেলের মা' হিসাবে তাঁর
ক্ষমতা কতদূর তা স্বরূপ না রেখে বরং ছেলে ও 'ছেলের বাবা'কে
সংযুক্তি দিয়ে সমাজ-কল্যাণের পথে চালনা করবার অসীম ক্ষমতারই
স্বাধীনতা করেন যে মারী তিনিই প্রণয়। মেয়েরাই তাদের সব
রক্ষা লালনার জন্য দায়ী। পুরুষকে সংযুক্তি দিয়ে চালনা করলে সে
সহজে অগ্রসর করে না, কারণ বাইরের কাজই তাদের জীবনের প্রধান
অঙ্গ, সাংসারিক কূটনীতিতে স্ত্রীলোকের মত দক্ষ নয় সেজন্য স্বভাবতঃ
উপর কিছু এ উদারতা সহ করতে পারেন না তথাকথিত মেয়েরা
কলে আজও সার্থক হলো না কোন মেয়েদের জন্য সৃষ্ট আইন
বা সত্যই রক্ষিত হয়েছে তাদের মঙ্গল ও মর্যাদার দিকে
লক্ষ্য রেখে।

মেয়েজাতের সমৃদ্ধি ও উন্নতি তো পুরুষের হাতেই কিন্তু তাতে
যুক্ত করতে হবে নারীর কল্যাণী শক্তি। অহেতুক মেয়েদের
সমালোচনা করে তাদের দিকভ্রান্ত করার মধ্যে সৌরভ নেই কিছু,
হুজিঙের কয়েকটি অত্যাধুনিক বিশ্বসর্ব্বধ, আলতপারায়ণা মেয়েই তো
সমস্ত মেয়েজাতের প্রতীক নয়।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, ভাল-মন্দ সব জিনিষেরই আছে। পুরাতন
কিছু ভাল আবার নতুনও কিছু ভাল। এই আধুনিকাদের ভালর
দিকেই দৃষ্টি রেখে প্রশংসা করে তাদের সমালোচনা করলে তারা
নিজেরাই মন্দ সত্ত্বেও সচেতন হয়ে উঠবে কিন্তু তাদের অগ্রান্ত
ভালবলীকে সমালোচনার দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেবার মধ্যে উদারতার
কোন লক্ষণ নেই। আধুনিক আমি নই কিন্তু আমার এ আলোচনা
সমস্ত মেয়েজাতের একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী বধু হিসাবে গ্রহণ করলে
নিজেকে বদ্ধ মনে করবে।

নারী শক্তির আধার, চণ্ডীতে চমৎকার এর বর্ণনা আছে অর্থাৎ
ত্রিভুবনের সমস্ত পুরুষশক্তি একত্র হয়ে পূজীভূত হয়েছে এ নারী-
শক্তির মধ্যে। মারী কি পারে আর পারে না, তা মনের কঠিনাথকে
বাচাই করে নিজেরাই নির্ণয় করুন।

পাহাড়ে গেলে পর শ্রীমলী রায়

পাহাড়—পাহাড়ে গেলে পর

তুমি যদি পাও

ঠাঁও' বাতাস আর সকল তুফান

যেখানে মধুর কুপ্তি,

যেখানে সমস্ত রং সাদার উষাও—

গভীরে প্রপাত নামা গান ভালবাসার,

তোমার অসীম সুখ

আমাকে জানাও।

আমি যে রোক্ত-রূপ সমতলে মাথাগোঁজা চরিত্রহীন—

ভীড়ে বাঁচি, অথচ বুকের পাখানে

কত আশা, কত সাধ একা আসে যায়

মধুর শেখম ধরা যন্ত্রের কোলে আলোনার ডাকে ইলারায়।

তাই, তুমি পাহাড়েই গেলে

তপস্কান্ত সমতলে সবুজ যন্ত্রের

হুমতাজা গান এলো, নতুন দিগন্ত

নতুন নীলিমা, কোনদিন সার্থক হবে।

যে দুঃখবিগ্না ভবিষ্যৎ লঙ্কায়-প্রোথিত জমা হয়—

তাহার চূড়ান্ত জয়, এলো সুনিকটর, বা

পাহাড়েই মেলে।

বাঁজালা বেগম শিবানী ঘোষ

সমুখে প্রবৃত্ত হিন্দুকুল পর্বতমালায় পানে প্রপাত দৃষ্টিতে

তাকিয়ে রয়েছেন বাবরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী বাঁজালা বেগম।

প্রাণাম অলিন্দে ঝাড়িয়ে থেকে তাঁর মনে পড়ছে বিগত দিনের কথা।

এই অলিন্দ থেকেই একদিন পতন ঘটেছিল পিতা ওমর শেখ

মির্জার। তাঁর ঐ অপঘাতমুহুর জন্ত সেদিন প্রস্তুত ছিল না কেউই।

তখন বাবর ছিলেন নিভাঁজই বালক। আজ সে হয়ে উঠেছে

অষ্টাদশবর্ষীয় নির্ভীক স্মরণ এক- যুবক। এখন সে সমগ্র

সমরখন্দের অধিপতি। শুধু সমরখন্দই নয় আজ তার অন্তরে স্রুত

রয়েছে সমগ্র আফগানিস্তান জয় করার স্বপ্ন। এ স্বপ্ন একদিন তার

সকল হবেই। কিন্তু তখন কি তার এই নির্দিষ্ট কথা মনে

থাকবে?

না থাকুক। বাঁজালা বেগম আপন ঘেহ থেকে কখনও বঞ্চিত

করতে পারতেন না ঐ ভাইটিকে। তাঁর বড় আদরের জিনিষ ঐ

ভাইটি। তার জন্যে তিনি নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত

আছেন।

ঐ ভাইটির তলারক করতেই তাঁকে ভুলে থাকতে হয়েছিল

নিজের কথা। বাঁজালা বেগম নিজে ছিলেন বাগমতী। কিন্তু

পিতার মৃত্যুর পর সব কিছু হয়ে গেল ভলটপালট। তিনি তাই এই

ভেঁইশ বছর বয়সেও রয়ে গেছেন কুমারী অবস্থায়।

—বড় চমৎকার এই পর্বতমালা তাই না বেগম সাহেবা ?

হঠাৎ পতাৎ হতে পুকবের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে শিহন কিরে তাকান খাঁজালা বেগম।

আগন্তুক মিষ্ট হাসি হেসে বলেন—তোমার দেখা এত সহজে পাখো ভাবিনি বেগম সাহেবা।

মুখে নেকাশ ছিল না খাঁজালা বেগমের। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর বন্ধু মসলিন-গুড়নার একপ্রান্ত স্থলের ওপর টেনে দিয়ে বলেন—কে ? কে তুমি ? এমন বেদ্যদেবের মত এসে পাড়িয়েছে। আমার পক্ষেতে ?

আগন্তুক আপন দেহের হ্রদ আবরণ সরিয়ে দিয়ে বলেন—আমি শায়বানি চিনতে পারছেন না খাঁজালা ?

—পারছি। কিন্তু তুমি হলনা করে এমন নিলজ্জের মত আমার পক্ষেতে এসে পাড়াতে তা আমি ভাবতেও পারিনি। তুমি আমার পথ ছেড়ে দাও। আমার দেখে বোরখা নেই, এ অবস্থায় আমি তোমার সমুখে পাড়াতে পারছি না।

শায়বানি তাঁর তবী দেহের পানে মুখ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হলেন—পথ আমি নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবো বেগম সাহেবা, আমি শুধু তোমার মতামতটুকু জ্ঞানতে চাই।

খাঁজালা বেগম কর্তার কণ্ঠ জবাব দেন—না তা কখনই হতে পারে না। আমি একজনের বাগনন্দ্য। এ অবস্থায় আমি তোমাকে স্বাধিক্রমে কখনই বরণ করে নিতে পারবো না।

শায়বানি হেসে বলেন—আবার সেই বাগদস্তার মিথ্যা ছেনালী। কিন্তু বেগম সাহেবা ভেবে ভাখো বরষ তো তোমার বসে থাকছে না। কোন্ অতীতে তুমি কার বাগনন্দ্য ছিলে তা সঠিকভাবে তুমি নিজেও জানো না। কাজেই মিথ্যা সেই সন্ধ্যার আঁকড়ে থরে থাকলে বিয়ে তোমার কোনদিনই হবে না।

শায়বানির কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে খাঁজালা বলেন—আমার বিয়ে হোক আর নাই হোক সে চিন্তা আমি তোমার ওপর ফেলি রাখিনি। কাজেই তুমি এখন আমার পথ ছেড়ে দাও।

শায়বানি বলেন—আমার প্রার্থের জবাব শোলেই আমি পথ ছেড়ে দেবো। আমি শুধু জানতে চাই তুমি আমার সহধর্মিণী হতে রাজী আছো কি না ?

—না।—দূর কণ্ঠ জবাব দেন খাঁজালা বেগম।

—না ? বেশ তবে আমি চললাম। কিন্তু জেনে রেখো আমিও এর প্রতিশোধ নিতে জানি। আমি নীত্বই সমরধন্দের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বধ করবো তোমার ভাইকে। বলেই হনহনিয়ে চলে গেলেন শায়বানি।

তাঁর কথা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে পাড়িয়ে থাকেন খাঁজালা বেগম। শায়বানি আক্রমণ চালাবে সমরধন্দের ওপর ? সে হত্যা কববে তাঁর ভ্রাতাকে। কথাটা চিন্তা করতেই যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর সর্বাঙ্গে।

খাঁজালা বেগম আর স্থির হয়ে পাড়াতে পারেন না। তিনি দ্রুত ছুটে যান বাবরের ঘাস মহলে।

আপন কক্ষে তখন পায়চারী করছেন বাবর। কাবুল জয় করার আনন্দে তখন মোলারিত হচ্ছে তাঁর জ্বর। এইবার তিনি বাবের ভায়র অভিযানে। ভায়রও তিনি বলেন এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।

হঠাৎ খাঁজালা বেগমকে দ্রুত থরে প্রবেশ করতে দেখে বাবর বিম্বিত হয়ে বলেন—এ কি মিমি তুমি এমন করে ছুটে এলে যে। কি হয়েছে ? তুমি শুনেছো আমি কাবুল জয় করেছি এবং নীত্বই ভারত অভিযানে যাওয়ার সঙ্কল্প করেছি ?

খাঁজালা বেগম হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন—শুনেছি জহির, আমি সব শুনেছি ভাই। তুমি কাবুল জয় করবে, ভারত অভিযানে যাবে এ সব তো আমার অনেক দিনের স্বপ্ন। তা আজ পূরণ হয়েছে। কিন্তু তবু বলি খুব সাবধানে থেকো। কারণ মনে হয় শায়বানি নীত্বই এই সমরধন্দ আক্রমণ করবে এবং তোমাকে আয়ত্তের মধ্যে পেলে সে বধ করতেও কুণ্ঠ বোধ করবে না।

বিম্বিত হয়ে বাবর বলেন—শায়বানি ? মানে তুমি কি উজ্জ্বলিক্তানের শাহি বেগ খাঁর কথা বলছো ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু হঠাৎ তার সমরধন্দ আক্রমণ করে আমাকে বধ করার কারণ কি থাকতে পারে ?

খাঁজালা বেগম বলেন—হুয়াত্বাবের কারণের কিছু অজাব হয় না। তার মনে অত্যন্ত নীচ বাসনা লুকিয়ে আছে। তুমি প্রতিটি হুহুর্ন্ত সতর্ক থেকো।—বলেই খাঁজালা বেগম দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যান আপন মহলে।

এর দিন কয়েক পড়ে সত্যিই একদিন অত্যন্ত ভাবে সমরধন্দ আক্রমণ করলেন শায়বানি। এমন অত্যন্ত আক্রমণের জন্ম প্রস্তুত ছিলেন না বাবর। ফলে শায়বানির নিকট পরাজিত হয়ে তাঁকে বরণ করে নিতে হল বন্দীদশা। শায়বানি স্থির করলেন এইবার তিনি নির্মমভাবে বাবরকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবেন খাঁজালা বেগমের ওপর।

বেগমসাহেবা এই দুঃসংবাদ তাঁর মহলে বসে থেকেই সব শুনলেন। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সর্বাঙ্গ। এমন কেমন করে খাঁচানো বার তাঁর জাইটিকে ? সারানিটা তাঁর কাঁটে নিলক্ষণ এক হুচ্চিক্সার মধ্যে দিয়ে।

সেমিন সন্ধ্যাকালে ছ' একটা তারা ফুটে উঠতেই খাঁজালা বেগম বোরখা-পরিহিতা হয়ে বেরিয়ে পড়লেন শায়বানির শিবিরের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে শুধু নিলেন একজন দাসী।

বেগমসাহেবা ধীরপদে হেঁটে চলেন পথ। যেতে যেতে অনেক কথাই উদ্ভিত হতে থাকে তাঁর মানসপটে। আজ তিনি তাঁর পবিত্র দেহ সঁপে দিতে চলেছেন শায়বানির মত এক লম্পটের হাতে। এ অপমান শুধুমাত্র খাঁজালা বেগমের অপমান নয়। সমগ্র তৈমুর বংশে এটা হবে এক নিদারুণ কলঙ্ক। কিন্তু তবু উপায় নেই, বাবরের জীবন যেমন করেই হোক রক্ষা করতে হবে।

—বেগম সাহেবা, এ যে শায়বানির তাঁবু দেখা যাচ্ছে।

দাসীর কথায় সেখানে পাড়িয়ে পড়েন খাঁজালা বেগম। তারপর বীর কণ্ঠে বলেন—আমি এখানে পাড়াছি, তুমি গিয়ে খবরটা দিয়ে আয়।

আপন তাঁবুতে তখন শায়বানি সমরধন্দ জয়ের আনন্দে মগ্ন হল হয়ে রয়েছেন বন্ধু পরিবৃত হয়ে। এমন সময় সেখানে গিয়ে কুর্শি কর পাড়ায় খাঁজালা বেগমের দাসী। শায়বানি তার গায়ে কিংবদন্তি বলেন—কি চাই ?

দাদী বলে—বেগমসাহেবা! একবার আপনার সাথে দেখা করতে চান।

—কোন বেগম সাহেবা?

—বাঁজালা বেগম।

দাদী তখন খানিকটা চমকে ওঠেন শায়বানি। মুখে তাঁর মুঠে ওঠে একই কুঁচি হাসি। তিনি বলেন—নিশ্চয় এসো তোমার বেগমসাহেবাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলেন এক বোরখা পরিহিতা রমণী। শায়বানি তাঁকে আপাদমস্তক দেখে নিশ্চয় বলেন—কি চাই?

বোরখা-পরিহিতা রমণী মুহূর্তে বলেন—আমার ভাই-এর প্রাণভিক্ষা।

তাঁর কথা শুনে হা-হা করে খানিকটা হেসে ওঠেন শায়বানি। তারপর হাসি থামিয়ে বলেন—তার বিনিময়ে যদি বলি তোমাকে চাই।

বাঁজালা বেগম বলেন—আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

—বেশ তবে উন্মোচন করে কেনো তোমার দেহের বোরখা।

তাঁর কথা শুনে খানিকটা শিউরে উঠে বাঁজালা বেগম বলেন—তোমার এত লোকজনের সাহায্য?

শায়বানি হাসতে হাসতে বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ বেগম সাহেবা এরা আমার ইঁদার বন্ধু, এদের সমস্যেই তোমাকে খুলতে হবে বোরখা।

—বেশ তাই খুলছি। বাঁজালা বেগম কণ্ঠিত হতে উন্মোচন করে কেনেন আপন দেহের বোরখা। মুহূর্তেই বেন আসো হয়ে ওঠে জায়গাটা।

শায়বানি তাঁর দেহের পানে নিঃসঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেন—এবার এগিয়ে এসো আমার কাছে।

বাঁজালা বেগম নিকট হতে পাড়িয়ে থাকেন মাথা হেঁট করে। শায়বানি বলেন, না না ওভাবে পাড়িয়ে থাকলে চলবে না। যদি ভাই-এর জীবন প্রকৃতই কীরে পেতে চাও তবে সহজ ভাবে বরা দাও আমার কাছে।

তাঁর কথা শুনে কঁপে ওঠে বাঁজালা বেগমের বুক। তিনি অবনত মস্তকে বীর পদে এগিয়ে আসেন শায়বানির কাছে।

সেবার সত্যি বাবরের প্রাণ ভিক্ষা নিয়েছিলেন শায়বানি এবং তিনি বাঁজালা বেগমকে গ্রহণ করেছিলেন সহৃদয়ী রূপেই। এক বছর না যেতেই তাঁর কোলে এল একটি পুত্র সন্তান। তার নাম রাখলেন খুরম-শাহ।

কিন্তু জীবনে শান্তি পান না বাঁজালা বেগম। শায়বানি তাঁকে বিবাহ করলেও তাঁর মর্যাদা কখনও বেন নাই। তা হাড়া বাবরের সঙ্গে শত্রুতা করতে পারলেই তিনি বেন পুণী হন। এ জিনিষটা কিছুতেই সহ করতে পারেন না বাঁজালা বেগম। পাছে ভাই-এর কোন খুনিই হয় এই ভয়ে তিনি বাবীর ঘরভিত্তির কথা অসংখ্য দবার গোপনে জানিয়ে বেন বাবরকে।

এমনি এক ঘটনা হঠাৎ বরা পড়ে গেল শায়বানির কাছে। তিনি দ্রুত ছুটে আসেন বাঁজালা বেগমের নিকট। এসেই কক্ষ কক্ষে বলেন—তুমি বাবরের কাছে আমার গোপন উদ্দেশ্য জানাবার জন্যে লোক পাঠিয়েছো?

নিরুত্তর হয়ে পাড়িয়ে থাকেন বাঁজালা বেগম।

শায়বানি তাঁকে একবার ঠেলা দিয়ে বলেন—চুপ করে রইলে যে। আমার প্রব্রের জবাব দাও।

বাঁজালা বেগম নিচু গলায় বলেন—হ্যাঁ পাঠিয়েছি।

শায়বানি বলেন—আপন স্ত্রী হয়ে এমন বেইমানী করতে তোমার একটুও বাধা না?

বাঁজালা বেগম দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দেন—আমাকে কোনদিন স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে কি? তুমি আমার সাথে যে ব্যবহার কর তা লোকে তাদের স্বকিতাদের নিয়েও অমন করে না।

—বটে। তোমার এত ভেদ হয়েছে। যাও তবে আমি এখন তোমাকে তালুক দিচ্ছি।

বাঁজালা বেগম বলেন—তোমার তালুক দেওয়াকে আমি আমার মজল বলেই মনে করি।—বলেই তিনি তাঁর শিশুপুত্র খুরম-শাহকে কোলে নিয়ে উত্তত হন বাড়ী থেকে চলে যেতে।

শায়বানি বলেন—ছেলেকে রেখে যাও।

বাঁজালা বলেন—ছেলে আমার, আমি তাকে নিক্ষেপই নিজে বাব।

—কখনই না।—শায়বানি বজ্র গভীর কণ্ঠে ডাক বেন—শামিয়া।

বাঁলী এসে পাঁড়ার কুর্শি জানিয়ে। শায়বানি বলেন—শামিয়া ওর কোল থেকে কেড়ে নে ছেলেটাকে।

শামিয়া এগিয়ে যায় বাঁজালা বেগমের কোল থেকে খুরম-শাহকে ছিনিয়ে নিতে। বাঁজালা কঠোর কণ্ঠে বলে ওঠেন—শামিয়া! আমার কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিলে তোর সোঁজখণ্ড ছান হবে না বলে রাখছি।

শামিয়া বলে—আমি প্রভুর আদেশ পালিকা বাঁলী বেগমসাহেবা। তাঁর আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে।—থলে সে জোর করে খুরম-শাহকে ছিনিয়ে নেয় তাঁর কোল থেকে।

টানটানিতে কেঁদে ওঠে শিশুটি। বাঁজালা বেগম আর বোধ করতে পারেন না তাঁর অজ্ঞ। তিনি কারার আবেগ নিয়ে নিষ্কান্ত হয়ে বান ঘর থেকে।

মার্ভের প্রান্তর দিয়ে রাতের অন্ধকারে পাগলিনীর মত ছুটে চলেন বাঁজালা বেগম। এমনি এক রাত্রে তিনি এসেছিলেন শায়বানির কাছে। আজ তিনি তার সকল সম্বন্ধ বিছিন্ন করে চলে যাচ্ছেন। আজ এতটুকু স্থির নেই তাঁর চিত্ত।

মার্ভের এই প্রান্তরে সকালের দিকেই বোধ হয় হয়ে গেছে এক খণ্ড যুগ। তাই অত্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠছে মাঠ। কিন্তু সন্ধ্যা জন্মের নেই বাঁজালা বেগমের। তিনি দ্রুত ছুটে চলে প্রান্তরের ওপর দিয়ে। হঠাৎ এক সময় তিনি খেঁচাৎ খেঁচাৎ পড়লেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় তাঁর চেতনা।

বহন বাঁজালা বেগমের জ্ঞান ফিরে তখন তিনি চেয়ে দেখলেন তিনি ভয়ে রয়েছেন এক কুঠির ঘরে ভয় বিভ্রান্ত। দাদার

কাছে বসে রয়েছে এক দাসী। খাঁজালা বেগম তাকে মিলেছেন করেন—
—আমি কোথায়?

দাসীটি জবাব দেয়—এটি সৈয়দ হাজার কুটির।

খাঁজালা বলেন—সৈয়দ হালা মানে শায়বানির অধীনস্থ এক সামান্য কর্মচারী না?

—হ্যাঁ বেগম সাহেবা কাল রাতে মার্ভের প্রান্তরে অচেতন আপনাকে পড়ে থাকতে দেখে সৈয়দ আপনাকে উঠিয়ে এনেছিলেন। আজই তিনি আপনাকে শায়বানির কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

—শায়বানির কাছে? চমকে ওঠেন খাঁজালা বেগম। তিনি সম্বোধে হাত নাড়তে নাড়তে রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—ওগো না না আমাকে শায়বানির কাছে পাঠাতে হবে না। সে আমার সর্বনাশ করেছে।

দাসীটি বলে—বেশ তো শায়বানির কাছে যেতে না চান সম্রাট বাবরের কাছেই আপনাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

খাঁজালা বেগম বলেন—ওগো তোমার মনিবকে বলে। আমাকে এই কুটিরেই বেন তিনি কিছুদিন রাখেন। কারণ বিরাট বিরাট রাজপ্রাসাদে প্রতিনিয়ত থেকে আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠছি।

দাসীটি বলে—একটা বেগম সাহেবা আমাদের অভ্যস্ত ভাগ্যের কথা। আমি বেশ জানি আমার মনিব এ কথা সাব্রহে গ্রহণ করবেন।

সত্যি সে কথার বিস্ময়াজ আপত্তি করেননি সৈয়দ হালা। খাঁজালা বেগম কিছু দিনের জন্ত থেকে গেলেন তাঁর কুটিরেই। ক্রমশঃ তাঁদের পরস্পরের মধ্যে চলতে লাগল কথা বার্তা। খাঁজালা বেগম অভ্যস্ত রুদ্ধ হতে গেলেন সৈয়দ হাজার ব্যবহারে। একদিন তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে সরাসরি বলে ফেললেন—ওগো আমি তোমাকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলছি, তুমি কি আমার পাণিগ্রহণ করতে পার না?

বেগম সাহেবার কথার শিহরণ লাগে সৈয়দ হাজার মনে। তিনি বলেন তোমার পাণিগ্রহণ করতে বত সুখ আমি করনাও করতে পারি না। কিন্তু তবু আমি বলি রাজবাণী হয়ে আমার মত একজন সামান্য ব্যক্তিকে স্বামিগ্রহণ বরণ করে নিলে তোমার কষ্টই হবে খাঁজালা।

খাঁজালা বেগম বলে—ওগো না না কষ্ট আমার কিছু হবে না। আমি যে কষ্ট পেয়েছি তাকে এত সুখ পাওয়া আমার করনার অতীত।

সৈয়দ হাজার সাথে দ্বিতীয়বার বিবাহ হল খাঁজালা বেগমের। এই বিবাহে সত্যি সুখী হয়েছিলেন বেগমসাহেবা। কিন্তু হৃৎপের বিবর এ সুখ হারী হল না খুব বেশী দিন। তাঁদের বিয়ের দু'মাস না যেতেই বৃত্তা ঘটলে সৈয়দ হাজার। তাঁর মৃত্যুতে চরম হৃৎপে নেমে আসে খাঁজালায় অন্তরে।

কালো বস্ত্র পরিধান করে বেগম সাহেবা স্থির করলেন এবার কিয়ৎ বাকেন ব্যবহারে কাছে। কঠোর মনে হল তাঁর ভাই যদি ইনি না দেয়? না দিলে তিনি সোজা চলে যাবেন মক্কার। তারপর আর কখনও ফিরবেন না এসিকে।

কিন্তু বাবর অবহেলা করেননি তাঁর দিকিকে। পূর্ব কৃতজ্ঞতা স্বরণ রেখে তিনি সম্রাটেরই আপন প্রাসাদে স্থান দিয়েছিলেন খাঁজালা বেগমকে। বেগমসাহেবা আবার পূর্বের মতই দিন কাটাতো

লাগলেন কুমারী মেয়ের মত। কিন্তু অন্তরে তিনি শান্তি পান না যুদ্ধের জন্ত। সর্বদা তাঁর হৃদয় ভরে থাকে গভীর মৃত্যুর।

সেদিন প্রাসাদ সালর উঠানে একাকিনী বসে রয়েছেন খাঁজালা বেগম। মনে মনে তিনি পর্যালোচনা করেন আপন উপেক্ষিত জীবনের কাহিনী। কেন তাঁর এমন করে বিধিয়ে উঠলো জ্বর? প্রথম যৌবনে তিনি ছিলেন বাগদত্তা। কার সাথে তা অবশ্য তিনি স্পষ্টভাবে জানতে পারেননি কোনদিন। কিন্তু তিনিই বা কেমন পুরুষ। আপন অধিকার তিনি কি আপন পৌরুষ দিয়ে জয় করে নিয়ে যেতে পারতেন না? খাঁজালায় চোখ ভরে ওঠে অশ্রুতে।

—তুমি কীদছো খাঁজালা?

বেগম সাহেবা পেছন ফিরে দেখেন মাহদি খালা। এঁর সাথেই ছিল তাঁর বালা-প্রশর। প্রথম যৌবনে তাঁরা কতদিন পরস্পরে মিলিত হয়েছেন গোপন অভিশরে। সে-সব দিন আজ স্বপ্নের সন্নিবিষ্ট। খাঁজালা তাড়াতাড়ি স্বপ্নের গুণের সেকাবটা টেনে নিয়ে বলেন—একি মাহদি তুমি হঠাৎ এখানে?

মাহদি খালা বলেন—একটা কথা ছিল। আজ্ঞা খাঁজালা তোমার মনে পড়ে একদিন তুমি আমাকে বলেছিলেন আমাকে পাওয়ার মত সুখ তুমি বেহস্তে গেলোও পাবে না?

তাঁর কথা শুনে হুঁপিয়ে ওঠে খাঁজালা বলেন—বলেছিলাম কি বলছো মাহদি, আমি আজও সে-কথা বলি। তোমাকে না পেয়েই তো এমন ভয়হুড়া হয়ে গেল আমার জীবনটা। জানো মাহদি, সেদিন আমি সত্যি বড় ভুল করেছি। তখন আমি কার না কার বাগদত্তা ছিলাম। যিথো সে-কথা মনের মধ্যে পোষণ করে আমি তাকেও পেলাম না তোমাকেও হারালাম।

মাহদি খালা বলেন—তুমি কার বাগদত্তা ছিলে তা আজও কি তুমি জানো না খাঁজালা?

—না মাহদি।

মাহদি হেসে বলেন—কথাটা শুনে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

খাঁজালা বলেন—তুমি আমার কাছে গোপন না করে সব কথা খুলে বলে মাহদি।

মাহদি বলেন—তুমি আমারই বাগদত্তা ছিলে।

চকু বিস্তারিত করে খাঁজালা বলেন—তোমার বাগদত্তা ছিলাম! কি বলছো মাহদি?

—ঠিকই বলছি খাঁজালা।

কম্পিত অংগে খাঁজালা বলেন—তবে এককাল এ কথা আমার কাছে গোপন করেছিলে কেন? কেন আমাকে আগে এ কথা বলে নি?

মাহদি খালা বলেন—গোপন করিনি খাঁজালা। আসল ব্যাপার কি এ কথা আমি নিজেও জানতাম না। জানলে সেদিন তোমাকে জোর করে অধিকার করতাম। কারণ কোন বাগদত্তা মানতাম না। তা সম্প্রতি এ খবর জানলাম আমার পিতা খালা হুসাকে লিখিত তোমার পিতা গুমর শেখ দিল্লীর এক পুরোনো পত্র থেকে। এই দ্রাব্যো সেই চিঠি।

মাহদি খালা চিঠিটা এগিয়ে দিলেন খাঁজালায় হাতে। সেটা বার হুই পড়ে কঁপিয়ে ওঠেন বেগম সাহেবা। তিনি কান্নার আবেশে

বলেন—তোমার যদি এমন কথাই এই পথে লেখা ছিল তবে তা আমবা আরও কিছুকাল আগে জানতে পারলাম না কেন ?

মাহদি খাঙ্গা কীং কাছে এসিয়ে এসে বলেন—খাঁজাণা আমি আবার নতুন করে তোমার পাণিগ্রহণ করতে চাই।

খাঁজাণা বেশম বলেন—আমার এ সেই অপবিত্র হয়ে গেছে মাহদি। তা ছাড়া রাজ আমি বিগত বৌবনা তেরিশ বছরের এক নারী। আমাকে নিয়ে তুমি কেমন করে স্থখ পাবে ?

মাহদি বলেন—তোমার সেই আমি চাই না খাঁজাণা। তোমার বয়স কত হয়েছে তাও আমি দেখতে চাই না। কামনার উদ্দেশ্যে সেই প্রেমে অভিসিঞ্চন করে আমি তোমাকে পেতে চাই। বল খাঁজাণা তুমি কি এতে রাজী হবে না ?

কম্পিত অধরে খাঁজাণা বলেন—আমার মন এই রাজীনামার চিরকালই মত দিয়ে এসেছে, আজও সে এতে সায় দিয়ে নিজেকে বন্ধা মনে করছে। বলতে বলতে বেগম সাহেবা মাথা রাখেন তাঁর বুকের ওপর। মাহদি খাঙ্গা তখন বাহ আবেষ্টনে জড়িয়ে ধরেন খাঁজাণা বেগমকে।

রামধনু আঁকে রঙ

মীনাক্ষী দালাল

যাচ্ছে? কালো কৌকড়ানো চুলভরা মাথাটা হুহাতে চেপে আচ্ছাদ্য এক ব্যথার ছোঁয়ায় দৃষ্টিটাকে ভাসিয়ে দিলে সে অনেকদূরের আকাশে।

হ্যাঁ। ভাগব চোখের মায়ায় ছোট্ট একটা হাসির স্রব ষ্ট্রকটিয়ে নিটোল সবুজ পাঞ্জার মত রাজা টোঁটের প্রান্তে এসে থামলো হঠাৎ।

বেশ কিছু কথা দিয়ে বাঙ বই কোনগিন মরকার হয় মনে করবে আমায়। সেই ব্যথিত বেননাটুকু বিকলের ছায়াবেয়া আলোর আবার নতুন করে ঘনিয়ে উঠলো তার রক্ত চোখের বিয়রতায়।

কথা মিলাব। প্রচণ্ড এক ঠাট্টার হাসি হুই চোখের ভাবায় লুকিয়ে নিয়ে শাও গলায় বিবাদের স্রব টানলো সে।

তোমাকে আসতে বলার অধিকার আমার আছে কি না জানি না জুও বলছি আবার এসো। ফুরিয়ে আসা বিকলের বিমিরে থাকা নির্জনতার ধরধরিয়ে কাঁপলো তার ভরাট গলাটা।

শিকরই আসবো। হুজোর মতো সালা একসার ঠাঁত ষ্ট্রিকমিকিরে এই জীক ভাবনাটাকে সেন হুহাতে সরিয়ে দিতে চাইলো সোনালী সেন। কিন্তু ক্যামাক ট্রীটের ঘন হয়ে আসা জালল পাছের ছায়ায় প্রতীক্ষায়ত এক আচ্ছাদ্য মিষ্টি হুখের হেলের স্বপ্ন আবার রঙ ছুট্টিয়ে দিলো তার নিটোল কপোলের রক্তিমতায় আর সেই হঠাৎ লজ্জা পাওরা চিব্বকের পানে চোখ রেখে নতুন আশার পাওয়ার বেননাটুকুকে মুছে দিলো অবিদ্যায়।

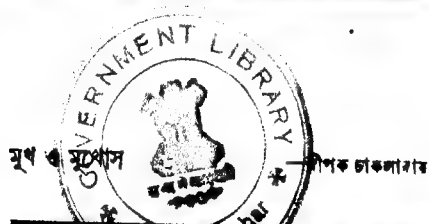
আজ্ঞা, এবার আমি ত্রায়—ঘন নীল পর্দাটার বুকে ছোট্ট একটু কাঁপন তুলে রতীন আলপনা আঁকা মিষ্টি একটা প্রতাপতির মতই ডানা মেলে উড়ে গেলো তবী স্রবর এক দেহ। আর সাধা ধবধবে ষেতপাখরের টেবিলে হড়ানো বইয়ের বুকে মাথা রেখে এক ঢলোঢলো মেয়ের ভালবাসার ভাবনায় হারিয়ে গেল প্রাক্সের অবিদ্যায় ষোবা। কিন্তু ঠিক এমন সময় আউটরাম ঘাটের হলোহলো টেবিলের স্রবে চাঁদের রূপো রঙে সোনালী সেনের হাডানো ছোট্ট টোঁটে একান্ত কাছে পাওয়ার গভীর স্বাক্ষর রেখে গেল এক আকাশ ছোঁয়া মনের দুরন্ত তৃষ্ণা। চন্দন বুখাঙ্কীর বুকে মুখ লুকিয়ে ভবিষ্যতের উজ্জল ছবি এঁকে পৌষলির রতীন আলোর মতই নরম মিষ্টি হাসে আপাতী দিনের সোনালী বুখাঙ্কী। তবুও উড এ্যাভিনিউর তিনতলার ল্যাটে সেতায় স্রব তোলে এক ভাল লাগা মনের নীল নির্জনতা। ছোট্ট একটা প্রতিজ্ঞাতি অনেক আঁধারে নীপ জালিয়ে কাঁপিরে দিয়ে বার অবিদ্যায় ষোবের ঘুরিয়ে পড়া চোখের ধরে রাখা বুখীর পাগলামিকে। আর ঘুমঘুম রাতের ছায়ায় পার্ক সাক্সেসর সোনালী সেন রজনীগন্ধার গন্ধে, ডোমে ঢাকা টেবিল ল্যাশের হাডা সবুজ আলোর কথার মালায় চন্দ গাঁথে ক্যামাক ট্রীটের এক মিষ্টি ছেলের সোহাগের রঙ মেখে নিয়ে। এতদিনের লুকিয়ে থাকা স্রবর একটা স্বপ্ন বাস্তবের পটে আলপনা দিয়ে স্বীকৃতির মূল্য পাবে কিছুদিনের মধ্যেই। আজসমূর্ণণের আবেশে পরম পাওয়ার কামনায় চন্দ গোলো সোনালী সেনের উন্নত বুকে। আজকের এই কুমারী লজ্জাটুকু সানাইয়ের স্রবে সার্থক এক উৎসবের মধ্য দিয়ে চন্দন বুখাঙ্কীর নীরব চোখের ভাবায় সানিরে দেবে অনেক কিছু না জানাকে। আর সন্ধ্যা সীথি আঁকা চুলভরা মাথাটা রাজা সিঁহুরের মায়া হুড়িয়ে বিশেষ একটা পুরুষের কল্যাণচিহ্ন বয়ে নিয়ে স্রবর এক অহঙ্কারের গর্বে বলমলিরে উঠবে মাত্র কয়েকদিন পরে। ফুল সাঁজানো শস্যর সোনালী সেনের অনাহত কর্মোদ্যের বুকে স্বাক্ষর এঁকে দেবে জীবনের প্রথম পুরুষের প্রথম পুরুষপে। ভোরের শিশিরে ভেজা এক বুটো শিউলীর মতো একরান্থ হাসি মরম টোঁটের কোলে হুড়িয়ে দিয়ে ভারী বৃষ্টি হবার কলনাত রঙে রঙে রতীন হয়ে ওঠে এক অনাজাত বৌবন।

কিন্তু প্রতিদিন বেলাশেষের কমে দেখা আলোর উড এ্যাভিনিউর অবিদ্যায় ষোবের সেই জীক কামনাটা সাধে প্রতীক্ষা নিয়ে জেগে থাকে তেইশ বছরের এক লজ্জারাজা হুখের ছায়া ভেবে। তবুও লাল স্রবকি বিদ্যাসো দ্বাভা হাডিরে ছোট ছোট টেট ফুলে সোনালী সেনের পারের লক্ষ বাক্যে না তিনতলার সিঁড়ির বুকে। সোনাজ হোদর মিষ্টি একটা হুট্টা দী টিট্টের দেহ না তার জঘরকালো চোখের হুই। ইশারার। থিসিস শেষ হয়ে বাবার সঙ্গে সঙ্কেই সম্পর্কের দুতোট্টু হিঁড়ে দিয়ে চলে গেছে সোনালী সেন। তাই সীক পৌষলির মিলিয়ে বাঙরা ছায়ায় চাঁপার কলির মত নরম আউসের কীকে ধরে থাকা কলমটা সালা কাগজের পাতার বেধা টানে সীক আর, নতুন তথ্য খোঁজার আনন্দে মোটা মোটা বইভলোর মানে লুটিয়ে পড়ে না সর্পিল হুট্টো বেনী। শুধু হাতের দিমারেটটা পুড়ে ছাই হয়ে বার। অন্তরালের আবার মেখে দিনের শেষে দীর্ঘে ফিরে আসে পাখীরা। হলছাড়া কাকের দাঁত স্রবের ডাকটা বিমিরে

- (১) এই গল্পটি লিখতে যে ছুটি বই-এর সাহায্য নিয়েছি :
Humayun-Nama of Gulbadan Begam
—Annette S. Beveridge, M. R. A. S.
• Tuzuk-i-babari—Leyden & Erskine.

আলোকচিত্র

মধুপাত্রী
—অবনী গুহ



সুখা

—বিলীশ বসু





পুতুল (জাপান)
—পুদিনবিহারী চক্রবর্তী



অস্বাভিক
—বীথেন আধিকারী



কাজের খেলা

—মহু বসন্ত

হাস-মিথুন
—অজিতকুমার শ্রীবাসী



দাঁড় ভেলে
—কুমার অজিত দাস



চন্দ্রিকা
—কটক 'চট্টোপাধ্যায়



পড়ে আর আবার আসবার প্রতীক্ষিত কথ। ভেবে নতুন আশায়
খেরায় পাড়ি দেয় অরিন্দব। এক ধূপছারা সন্ধ্যায় সাগর নীল
শাড়ীর ছন্দে হুইয়ের হাসিতে শিখিল কবরী সাজিয়ে নিয়ে এলো
সোনালী সেন। ইতনিং প্যারিসের মিঠে গন্ধটা ছড়িয়ে গেলে
হাতাসে আর প্রতীক্ষা শেষের আশ্চর্য্য অনন্দে চমকে উঠলো অরিন্দব
ঘোষ।

কি ধবর এতদিন পরে ?

একটু কান্ন ছিল—নতরুখে উত্তর দেয় সোনালী সেন।

কিন্তু অরিন্দব জানে আজ সোনালী সেনের দীঘল কালো
চোখ নীরব ভাষায় জানাতে এসেছে আত্মসমর্পণের গোপন
ইচ্ছাটুকু। আর সেই কাঁটি কথা শোনার আগ্রহে ব্যাকুল
হয়ে যায় বহু প্রতীক্ষিত রতীন আশাটা।

আপনাকে—মিষ্ট একটা সজ্জা আরও স্নান হয়ে ওঠে তব
পুকুরের বহন নিয়ে জেপে থাকা অন্তকালো চোখের
গভীরভাষ। আর সেই পরম মুহূর্তে সকলতার রঙে বিকমিকিয়ে
উঠলো অরিন্দব ঘোষের নিরুদ্ধ মনের কোণে সবচেয়ে লুকিয়ে
রাখা ভীক ভাবনাটা পরিপূর্ণ দৃষ্টির মাঝে আশ্চর্য্য এক

ভাল-লাগার আনন্দ ছড়িয়ে গিলে সে। কিন্তু সোনালী সেনের
বুড় দুটি চোখের তারা হঠাৎ বেন চমকে উঠে তাড়াতাড়ি শেষ করে
কেলে অসমাপ্ত কথাটা।

আপনাকে আগামী কাল আমার বিয়েতে আসতেই হবে কিন্তু।
কথার শেষে আবার সরমে বাঙ। হয়ে ওঠে সলজ্ঞ চৌটের স্নান
ভঙ্গিমাটুকু। সঙ্গে সঙ্গে ধমকে যায় অরিন্দব ঘোষের সেই সোনার
রঙে ভেজা বহু আকাঙ্ক্ষিত আশাটা। তবুও একরাত বেননা চাপা
চৌটের মাঝে লুকিয়ে নিয়ে মিত হাসি হাসে অরিন্দব।

নিশ্চয়ই বাবো—আজ আর হারিয়ে যাবার বেননার কৈশে
উঠলো না গভীর গলাটা। কেবল এক শান্ত স্নান হাসি করে
পড়লো আর কিছু হারিয়ে না ফেলার আনন্দে। ব্যথিত এক
হৃদয় দেহাতীত প্রেমের স্নান অর্ঘ্য সাজিয়ে গিলে জীবন দেবতার
বেদীতে অস্তরের রঙে রঙ মিশিয়ে সেই অন্ত গোপনীর সুরিয়ে-আসা
ছায়ায়। তারই বেশ তুলে আন্তে আন্তে কোলের কাছে সেতারটা
টেনে গিলে অরিন্দব। আর অতঃপর রাত্রির জাঁগার ঘন নির্জনতার
মিলে মিলে একাকার হয়ে গেলো ছায়ানট সোহিনীর স্নান-স্বাভাৱ
স্ববাহার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

পুষ্প দেবী

তোমার নরেন বিবেকানন্দ রূপেতে জগতে খ্যাত
কত রূপে তোমা করেছে বাচাই সত্যনিষ্ঠ ব্রত

কর্ম ও জ্ঞান ভক্তির মাথে

মিশে এক ধারা হয়ে যায় বাতে

প্রদীপ্ত সেই সূর্য্য সমান উজ্জল লম্ব দিক
শিশুর মতন তারও মন-প্রাণ তোমায় নির্নিমিত্ত।

দূর-দূরান্তে তোমায় প্রচার করিল বিশ্ববর
বুঝালো তোমায় বত কিছু বাণী শীঘ্র ছাড়া সে নয়

সরল রূপেতে জ্ঞানের আধার

মূর্ত্ত আপনি যুগ অবতার

শিশু তোমায় পূজা অধিক কুসুম কোমল মন
বস্ত্রের চেয়ে কর্তব্য তেমন অন্তরে সেইজন।

চলে গেছে তুমি ছাড়ি জগতের তবু আজ করে রয়ে
দয়াল ঠাকুর তোমার মুরতি দিবসে নিশিখে হয়ে

তোমার কাছেতে লভি মহাজান

দলে দলে সব তব সন্তান

জীব সেবা করে বাছ প্রেমারিরা হৃৎ লইল বরি
হে করুণাখন মমতা কোমল তোমায় আদেশ করি।

তোমারি আদেশে শত সেবাধামে চটিতেছে জীব সেবা
অভিনব তব পূজা সন্তারি বুদ্ধ না বলো কেবা

ভাঙ্গিবার তরে আসেনি ত কেহ

বিশাল বিশ্ব আপনাই সেই

গড়ে বাও শুধু বাহার যেটুকু সকল শক্তি দিয়ে
হুখীর হৃৎ মুহূর্ত্তাব্য তরে মায়ের মমতা নিয়ে।

পতিত পাবন পতিত জনেও গাঢ়রে বন্ধে নিলে

নামের মহিমা দেখায়ে তাদের পূর্ণ শান্তি দিলে

মানব জীবন প্রলোভনময়

অছূতাপ হলে বুঝা আর নয়

শোধান করিলা বাহা কিছু কালো করে দিলে নিরমল

মায়ের মমতা কোমল ও-মন করুণায় ছলছল।

আজো পুনঃ দেখি বেদিকেতে চাই কত বিধা-সংশয়

কত অন্তর কত অনাচার অকারণ জীব ক্ষয়

কেহ নাই আজ তোমায় মতন

হৃৎগতের করিতে বস্তন

গত সংশয় সহজ পথের সকেত কেবা দেয় ?

হৃৎবী জলরে বন্ধন মাঝে দেবতা ছাড়া কে দেয় ?

বন কেটে বসন্ত

[পূর্ব-প্রকাশিতের ৭৫]

মনোজ বসু

একত্রিশ

প্রভাত, খানেক বেলায় তারা কুমিরমারি পৌঁছল। হাট বসে দুপুরের পর থেকে। বড় সকাল সকাল রওনা হয়ে পড়েছে। তাড়াহাড়াি করতে হল দ্বারে পড়ে। বন কেটে সাধ করে বসন্ত পড়েছিল, ঘেরি বানিয়েছিল। হাটবে, খাবে, পরবে, জামোদকুর্তি করবে, এত দূরের বালাবনে দিনগুলো শান্তিতে কাটবে। হল না, ভুলে গটাল জনপদের মাছুষ এসে। সকালে কত পরিব মাছুষ নিঃসবল এসে শুষ্কিয়ে নিয়েছে কাঙালি চকোড়র মতো। এবারে রাজা হয়ে গেল—মাটিরপাড়ি চড়ে বাবুভৈরব এসে খোলামকুচির মতো টাকা ছড়াবে। বাদার বত মাছুষ কুকুরের মতো পা চাটবে তাদের। জগা হেন লোকের ঠাই নেই এ-বলুকে। লোকজনের চোখের সামনে পালাতে লজ্জা লাগে, রাত পোহাবার আগেই তাই পালিয়ে এল। ঘেরি করা চলল না।

হাটে কেনাকাটা আছে বিস্তর। জঙ্গলে যাচ্ছে, রসদ চাই কিছু দিনের মতন। তা ছাড়া নৌকো থেকে ভূঁয়ে শা দিয়েই গুজো-জাচা—তার রকমারি উপকরণ। পথ হাটতে হাটতে কাপা মহেশ ডড়-বড় করে ক' বলছিল। কতবার কত মাছুষ নিয়ে এসেছে তীর্থের পাণ্ডার মতো—রীত কর সবল বধনপণে তার। জগা বলে, বলেই বাছ তো ঠাকুর, থরচা জোগাবে কে? নৌকোও তো ভুবে বাবে তোমার ঐ গুহ্মদানের ভায়ে। সন্দেশ কর, বার নিচে আর হয় না।

অত কে মনে রাখতে পারে? বন্ধু বনে পড়ে কিনে টিনে চারজনের গামছার বাঁধে। কিরে আত্মক মহেশ, তার পরে দেখা বাবে। মহেশ কুমিরমারি অবধি আসেনি। খানিকটা পথ এসে শশী পোয়ালার বোঁকে রাজা ছেড়ে আলপথে নেমে পড়ল। সর্ব্বম্ব খুঁয়ে এসে শশী এক দ্বন্দ্বলপর্কে কুটুর ভাঙে পড়ে আছে। বখাসাধ্য খাটাখাটনি করে, হুটো হুটো খেতে দের তার। নিশীথ বানকেতের মধ্যে মাধার উপর বসতি। জায়গাটার নাম শোনা আছে, মহেশ ঠাকুর সেই তল্লাসে চলল। একটুখানি গিয়ে আলেরও আর নিশানা নেই, মহেশ তখন জলে নেমে পড়ে। জল বাড়ছে, কাপড় হাঁটুর উপর তুলছে। তারপরে এক সময় হরতো দিগম্বর হয়ে পরনের কাপড় পাগড়ির মতন মাথায় জড়তে হবে। বালা অকলে এই নিয়ম বের মাছুষের চলল—রাজা ব'লা হালকিল এই ভুল হয়েছ।

জগার এমিকে ভাড়ার নৌকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। জগার মতো দক্ষ মাঝির হাতে নৌকা দিয়ে শক্য কিছু নেই। খুব বেশি তো বিশ-পঁচিশ দিন—ভাড়া একবারে পুরো মাসের ধরে দিয়ে নৌকো ঠিক সময়ে ঘাটে হাজির করে দেবে। এবারে কেবল দেখে শুনে আস। জায়গা পছন্দ হলে তখন নিজস্ব নৌকার ব্যবস্থা হবে।

ঘাটমাঝিরের ধরতে হয় নৌকো-ভাড়ার ব্যাপারে। তারা বোঁজখবর রাখে। ভাড়া থেকে দস্তুরি কেটে নেয় আর দশটা দালালি কাজের মতো। নৌকা নিয়ে কাজকারবার, সব ঘাটোয়ালই জগাকে চেনে ভাল মতে। জগা যে ভাল মাছুষ হয়ে ঘাটে ঘাটে ভাড়ার নৌকার তল্লাসে ঘুরছে, ব্যাপারটা বড় ভাল ঠেকে না। নৌকা দিতে কেউ রাজি নয়। স্পষ্টস্পষ্ট 'না' বলছে না, এটা-ওটা অজুহাত দেখায়: জানাশোনার মধ্যে সব ক'টা নৌকাই যে বেরিয়ে গেল, ক'দিন আগে বললে হত। অথবা বলে, নৌকো কুটো হয়ে পড়ে আছে, যেসামত না করে ছাড়বার উপায় নেই।

ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যা হয়ে শেষটা জগা হাল ছেড়ে দেয়। কেউ বিশ্বাস করে না তাদের। ভবঘুরে মাছুষ—ক'বছর কোন রকমে ঠাণ্ডা হয়ে ছিল, মাথার মধ্যে ঘুনিপোকায় আবার কামড় দিচ্ছে। ত্রিভুবন চকোর দিয়ে বেড়াবে, কোন বিশ্বাসে ওদের হাতে নৌকা ছেড়ে দেয়।

একজনে তাদের মধ্যে বলল, আছে বটে নৌকা একটা। কিন্তু মালিকের বড় সন্দেহবাতিক, কাউকে বিশ্বাস করে না। ঘেরিয়ার গগন দাস জামিন হয়তো বল, চেষ্টা করে দেখি।

নিজের কথাটা অল্পগৃহিত অজ্ঞাত মালিকের দোষ দিয়ে বলল। সকল ঘাটোয়ালের এই এক কথা। জগাকে কেউ বিশ্বাস করে না। এক ছটাক ভুলশক্তি নেই, জগার কোন দুল্য ঘুনিমার উপর? গগন দাসের দুল্য হয়েছে এখন।

জঙ্গলে বাবার নামে মহেশ ঠাকুরের অসাধ্য কাজ নেই। খুঁজে বের করেছে ঠিক শশীকে। আগের হাটে খবর দেওয়া ছিল হাটুরে লোকের মারফতে। শশী একপারে খাড়া, কেশেভাড়ার চরে তার বন পড়ে রয়েছে। হুপুদের পর হুপুদন্ত হয়ে হু-জনে কুমিরমারি পৌঁছল। হাট তখন জবজ্বাট। খুঁজে খুঁজে জগাদের পায় না। অবশেষে হাটের বাইরে নতুন চরের পাশে দেখা গেল গাছের ছায়ায় চারজনে

গোল হয়ে বসে। কৌড় থেকে দুটো দুটো হুড়ি নিয়ে মুখগুহ্বরে ফেলাছে। একদিকে মাটির মালসায় হুড়ি জমা রয়েছে, কৌড়ের হুড়ি ফুরালে নিয়ে নিচ্ছে মালসা থেকে।

মুখ তুলে এক নম্র তাকিয়ে দেখে জগা বলে, বড় কাঁচা জল ভেঙে এসেছে। হুড়ি ঠেকা দাও এবারে জুত করে বসে।

মহেশ বলে, কেনাকাটা সারা করে তাড়াহাড়ি বেরিয়ে পড়া থাক জগা। খাওয়া-টাওয়া নৌকার বসে হবে। উজোন বেয়ে—হল বা ধানিক গুণ টেনে গিয়ে বিশ্বখালির মুখে নৌকা ধরতে হবে। রান্নাবান্না সেই জায়গায়।

নৌকাই তো হল না। গুণ টানবে কিসের?

বলাই বলে ওঠে, তাই দেখে 'কুহুমশায়'। আমরা ভাল হতে চাইলে কি হবে? দেবে না ভাল হতে। আগাম টাকাকড়ি দিয়ে নিয়মমাসিক ভাড়া নিতে গেলাম, কেউ দিল না। বাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো ঘুরেছি, খাটোয়ালের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পর্যন্ত তেল দিয়েছি।

মহেশ ব্যস্ত হয়ে বলে, সে কি গো! শলীকে আমি এক পথ টানতে টানতে নিয়ে এসাম। জগা নিয়ে বাচ্ছে তুলে কত আশা করে সে ছুটে এসেছে।

জগাথা বলে, আশু করে ঐ রাখেতাম এসেছে। সবাই আমরা এসেছি। বেরিয়ে এসেছি বখন উপায় কিছু হবেই। নৌকা দিল না, কিন্তু আমরা ঠিক নিয়ে নেব।

হি-হি করে সে হাসতে লাগল। বলে, বাবুজেরদের কারদা ধরি এবারে। নেমন্তন্নবাড়ি যায় বাবু। একজনের তার ভিতরে খালি পা। কিবা শতক তালি-মাথা জুতো পায়। ভাল একজোড়া জুতায় পা চুকিয়ে কাঁক মতন সে বেরিয়ে পড়ে। বলাই পচা আর আমি সেট বকম কাঁক খুঁজে বেড়ান এখন।

শলী বলে-ওঠে, নৌকা চুরি করবে তোমরা? হাটেবাটে ওরকম গেরাটুটি করতে যেও না। মায় খেয়ে কুলোতে পারবে না। বাকে বলে হাটুরে মার। বুজোমায় আমরা স্বচ্ছ মারা পড়ব।

ভাকাত শলীর বিগত বাকবনের কোন ঘটনা হয়তো মনে পড়ে শিউরে উঠে সে না-না করে উঠল।

জগা হেসে বলে, সিঁদকাটি এসে পেছে যোব মশায়। কাজের তো পনের আনা হাসিল। কেউ কিছু করতে পারবে না! আমাদের হাতের কাজ দেখনি তাই। সাকাই কাজকর্ম।

নৌকা না হোক, তিনটে বাওঁ জোগাড় করে এনেছে। সিঁদকাটি দিয়ে দেয়ালে গর্ত কেটে চোরে জিনিসপত্র সরায়, নৌকা সরানোর কাজে বাওঁ হল সেই সিঁদকাটি। নৌকা ধুল দিয়ে তিন মরবে বাওঁ ধরে পলকের মধ্যে বেমালায় হবে। নৌকার সেতু কেউ বাওঁ রেখে যায় না। কাঁধে করে নিয়ে হাটের মধ্যে ঢোকে, কোনখানে রেখে দিয়ে কেনাকাটা করে। নৌকা হল ঐ দেখে এরা এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে বাওঁ সরানোর তালে ছিল। বাওঁ ভেঙে পেছে বলে একটা বাওঁ চেয়ে এনেছে চেনাশোনা এক জেলের কাছ থেকে। অস্ত্র ছুটো চুরি। হারানো বাওঁর খোঁজ পড়বে হাট ভেঙে গিয়ে বখন বাড়ি কিরবার সময় হবে। ততক্ষণ নিরাপদ।

জগা বলে, হাট বলে ভব পাছ যোব মশায়, কিন্তু হাট নইলে এত নৌকা পাছ কুমি কোথায়? ইচ্ছে মতন পছন্দ করে নেব এর ভিতরে। কিন্তু মুকুনি মাছ তোমরা এর মধ্যে খোকা না। হাটনা তুল করে দাও। পূব মুখো হুঁড়ে বেরিয়ে একটা শোয়ানি পড়বে, সেইখানে কাঁচা-বাঙ্গার ধারে ঠাঁড়াও গিয়ে। ধরিতাম জানে সে জায়গা। তুই খেক কি কবরি বাবে, ওঁদের সঙ্গে চলে যা। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি।

রাখেতাম হাসতে হাসতে বলে, কুয়াপাখি ডাকবে—পাখি ধরে বেড়াব তো বনে?

জগা ঘাড় নাড়ে: হ্যাঁ। জানিস তুই সব। বেরিয়ে পড় এফুগি, ঠাঁড়াস নে। আমাদের আগে গিয়ে পড়বি।

বড় জোরে হাটে রাখেতাম। মহেশ ও শলী গোয়াল শেরে ওঠে না: আহা, দৌড় কিসের ভবে? আমাদের কি, কে আমাদের স্তোড়ে মরছে?

কিন্তু টানের মুখে নৌকা ছাড়বে জগা, প্রাণপণে বাইবে আর এদের হল পায় হাট। জোরে না হাটলে শেরে উঠবে কেন? ঐ ছুটোছুটির মধ্যেও কুয়াপাখির বৃত্তান্ত বলে এক সময়। কাঁচাবাঙ্গা হল গভীর বন—সেখানে 'কালভে' কটীরে কুড়াল পড়ে। বনের অভিসন্ধি জুড়ে খাল। কে যেন খালের মন্তবড় খেলোজাল ফেলছে বনের উপরে—জালের ফুটায় ফুটায় বনের গাছ বেরিয়ে পড়েছে। ঠিক এই গতিক। জোয়ারবেলা এক বিঘত পরিমাণ ডাঙা জোরে থাকে না, পাছগুলো মনে হবে সমুদ্র খুঁড়ে উঠেছে। নৌকা একবার তার মধ্যে ঢোকাতে পারলে কারো সাধ্য নেই খুঁজে

ডাক্তার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (মুখায়):—মনোজ বাবুর এই বইখানি মিথ্যা আদর্শমোহের রতীন আবরণধামি সরাসরি আমূলিক একেবারে নিম্ন সত্যের মুখোমুখি ঠাঁড় করা হয়েছে।...বিদগ্ধ সমাজে যে আদর্শবাদের কোন স্থান নাই, আদর্শপরায়ণ ব্যক্তি যে সমাজ-জীবনের সঙ্গে ভাল রাখিরা চলিতে পারিবে না—এই বিতীড়িকারম সত্যই কি আমাদের জ্ঞানযজ্ঞের চরম ফলফল? মনোজ বাবুর উপভাসে শিল্পবোধ ও সমাজশিকার অপূর্ণ সমন্বয় ইহা হইবে।...

মনোজ বাবুর কাহিনী

মনোজ বাবুর

সর্বকালের স্মরণীয় উপভাস

৫'৫০ ন. প.

ডাক্তার শ্রীকুমার বাবুগুপ্ত (পরিবারের চিঠি):—...এদের কলকল্পিত নিজেদের চেতনার ঘনীভবনে মধ্যে একটা বিতীর্ণ বিরক্তা দেখিতে পাই—যে কলকল্পিত ব্যক্তির পরিধিকে অভিজ্ঞ করিয়া আশে আশে জাতীয় জীবনের দিবলয়ে হড়াইয়া পড়ে।...

খেল পালাশাস (প্রাইভেট) লিমিটেড ॥ কলিকাতা - ১৫

বের করে। জগার কিন্তু নথরপণে সমস্ত—ঐ জারগার কথা বলে দিল সে। বলে তো দিল—কিন্তু এরা খুঁজে পাবে কোথায়? সাড়া দিলে তাই জানান দেবে—পাখির ডাক। লোকের ভাবে, কুরোপাখি ডাকছে রাত্রিকোলা বনের ভিতর। ডাকছে কিন্তু বলাই। পাখির ডাক ছাপিলের ডাক বেড়ালের ডাক মুরগির ডাক—অনেক বকম ডাক ডাকতে পারে। সেই ডাক নিরখ করে জল ভেঙে ওসোর ওঁতো খেয়ে ওসোর সেই নৌকোর উঠ পড়।

সন্ধানী চোখ, পাকা হাত, বাঁতবোঁত অভ্যাস কিছু নেই। এর চেয়ে কত ভারি ভারি কাজকর্ম হয়েছে আগে। এত নৌকো জমেছে, নৌকোর নৌকোর জল দেখবার জো নেই, তবু কিছু সহজে উপায় হয় না। পাতের একেবারে কিনারা অবধি হাট, হাটেরে মাছের ঘোরাফেরা করছে, ঠিক হাটের নিচে কিছু করতে গেলে ক্যান্সাস হবে মনে হয়। একেবারে শেষ দিকে চার পাঁড়ের ছিপি নৌকো একটা। জুত মতন বানগাঁহ পেয়ে বাট থেকে কিছু সরিয়ে এনে ঐখানে নৌকো বেঁধেছে। লোহার শিকল গাছে জড়িয়ে ভারী তাল। এঁটে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে।

প্রাণধান করে দেখে জগা বলে, দেখে তো পচা কুড়াল কোথা পাস। কামানের দোকানে ঘেরামতের লজ দেয়—ওদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আর একটা।

পচা বলে, কুড়াল কি হবে?

বলবি যে বস্তাই-কাজের লজ কাঠের ক'খানা চেনা তুলে নিয়ে একুশি দিয়ে বান্ধি।

বলাই বলে, বানগাঁহ কেটে ফেলবি। কিন্তু শব্দ হবে, কেউ না কেউ দেখে ফেলবে?

জগা বলে, শব্দসাড়া করে কাটবি। গরজ হয়েছে সবচেয়ে তাই গাঁহ কেটে নিচ্ছে—দেখেও কেউ দেখবে না।

কুড়াল এল। কপাল ভাল, গাঁহ কাটা অবধি বরকার হল না। কুড়ালের উটেটা পিঠের কয়েকটা ঘা দিতেই লোহার শিকলের জোড় খুলে গেল। নোনার জরে গিয়ে লোহার আর পদার্থ আছে কিছু?

কপাল আরও ভাল। এই টানের গাভ, তার উপরে পিঠের বাতাস। মারগাড়ে নিয়ে ফেলতে নৌকো ঘেঁ উড়িয়ে নিয়ে চলল। বোর্টে হাতে ধরে আছে বলাই-পচা, কিন্তু বাইতে হয় না। টানের জলে হোঁরােনাই যায় না বোর্টে। নৌকাই বেন কেমন করে বুঝতে পেরে গাভ বেয়ে চোঁচা দৌড় দিয়েছে।

এই বকম ছুটে পালানো দেখেই বোধকরি হাটের মাছবের নজরে পড়ছে। কিবা নৌকোর মালিকও দেখে ফেল চোঁচামেচি করে উঠতে পারে। পাতের কিনারা ধরে বিস্তর জমারোত হয়েছে। একটা হৈ-হৈ হবে আসতে বাতাসে। এরা অনেক হুয়ে। স্পটাস্পট নজর হয় না—মনে হল, আঁতুল দিয়ে দেখাচ্ছে। দেখিয়ে কি রকমে বাছুরিয়া? নৌকো খুলে পিছন ধরবে, ততক্ষণ একেবারে শূন্য হয়ে গেছে এরা। বাতাসে মিশে গেছে। বড়-পাতের আর নয়, খালি চুকে পড় এইবার। খালের গোলকর্বাখা। তখন আর খুঁজে পাব কে? নৌকা মাছবজন এবং হয়তো বা লাঠি-কলু নিয়ে সমারোহে ঘোঁরাখুঁজি হচ্ছে—তাদেরই এককরে পনের-কিশ হাতের

মধ্যে হেঁতালখাড়ের কীক নৌকো ছুকিয়ে গিয়ে হুপ-চাপ বলে আছে। এই অবস্থায় মাছব বলে কি—বরাং বরাবাকও তো খুঁজে বের করতে পারবে না।

বক্তৃত্ত

জললে বাবে তারা ঠিকই। কয়েকটা দিন কেবল ঘেরি পড়ে যাচ্ছে। চোরাই নৌকোর প্রকাণ্ড ছই—ছইটা ভেঙে চুরমায় করে গাভের জলে ডুবিয়ে গোলপাতা দিয়ে নতুন একটু ছই করে নিতে হবে। আলকাতরা আর কেরোসিন মিশিয়ে পৌচ টেল নিতে হবে নৌকোর আগাগোড়া। আরও এক ব্যাপার—ওঁকোর কাঠের উপর নাম খুঁজে রেখেছে 'তারণ'। তারণ নামে ব্যক্তি নৌকোর উপর নাম খোঁদাই করে বন-বাগিচা পাকা করে রেখেছে। নামটা টেঁচে ফুলে দিতে হবে। না হলে পুরো কাঠখানাই কেলে দিয়ে নতুন একটা বসিয়ে নেবে। নৌকোর ভোল এমন পালটে দেবে, খোঁদ মালিক সেই তারণ এসে স্বাক্ষর দেখলেও তখন চিনতে পারবে না। এই সব না হওয়া পর্যন্ত জনসমাঝে বের হবে না নৌকো। ছইটা তো ভেঙে দেওয়া বাক সকলের আগে। বাকি কাজগুলো কোথায় নিয়ে করা যার, তাই ভাবছে। নুদন ছাড়া অন্য কারো উপর আস্থা করা যায় না। তৈলকর ছেলে নুদন। জগাকে বজ্র খাতির করে, জগার ইদানী সে ডানহাত হয়ে উঠেছিল। সম্পন্ন চাষী-ঘরের ছেলে—পাঁও পেয়ে একটা নৌকো কিনে নিয়ে এসেছে, সেই পুরনো নৌকো ছুতার ভেঙে ঘেরামত করাচ্ছে, ছই বাঁধছে। এতে কোন সম্বন্ধের কারণ ঘটবে না। জগা তারপরে সবে পড়বে একদিন সেই নৌকো নিয়ে। জললে চুকে গেলে তখন কে কার তোহাফা যাবে? গুণগোল বতকণ এই মাছবের এলাকায় ঘোঁরাখুঁজি করছে। জলদের লজ হুয়ে 'মানবেলার সব আইনকাছন গিয়ে পৌঁছতে পারে নি।

কিছু ঘেরি লজএব হবেই। খুব বেশি তো পাঁচ-সাত দিন। এই এক বাগড়া পড়ে গেল, পথের উপর আটক হয়ে থাক। সকলে মুলড়ে গেছে। রাখেভামের কিন্তু একগাল হাসি। বলে, আশি করে চললাম। বাচ্চাটাকে একবার দেখে আসি। সাজহাতে সেদিন বড় কেঁদেছিল। নেড়ে চেড়ে আসি এই ক'দিন।

পচা টিপ্তনী কাটে: বাচ্চার মাও কিন্তু রয়েছে। ভাল কেলে পালিয়ে এসেছে, তুলোখোঁদা করবে ওঁবার বাসে গেলে।

বলি ঠিক কথা বটে। মাসির জন্মেই আমার বিবাহী হয়ে বাঙরা। নইলে এক পা নড়ে বলতে চাই। মাসিটাকে লো-শো করে-মিরে ফেলতে পারিস জললে? তাহলে শান্তি পাই। বাচ্চাকে কোলে-পিঠে করে দিখি কাটাতে পারি।

কাপা মহেশ বলে, শশীকে নিয়ে কি করা যার এখন? আমার নিজের কথা বলছি নে। কালী কালীমারা পাখি কালু উঠানে পাঁড়িয়ে যার নামে ঘোঁরাই পাড়ব, গৃহস্থ সঙ্গে সঙ্গে শিঁড়ি না দিয়ে পারবে না। কিন্তু শশী যোব যার কোথায় বল দিকি? পড়ে থাকত এক ব্যক্তি, তাদেরও আউড়ির বান জলার এসে ঠেকেছে। মাছবটার একদিন বিস্তর ছিল, চকুসজ্জার তারা কিছু বলতে পারছিল না। ভল্লিতরা ওঁটেরে চলে এসেছে, আবার এখন কোন্ মুখে কির যার দেখানে?

বলাই বলে, চলুন তবে আমাদের সাঁইতলায়। উপোস করে থাকতে হবে না। ভূমিও চল ঠাকুরমশায়।

জগা বলে, তুই বাড়িল তব বলাই?

বলাই বলে, নৌকো তো বরারখোলা নিয়ে চললে। পরের জারগার সবলুদ পড়ে থেকে কি হবে? এঁরা সব বাঞ্ছেন, রেঁগেবেড়ে খাওয়ার মাহুয চাই তো একজন।

বহেশ তাড়াতাড়ি বলে, আমার খাওয়ার লোক আছে। আমার জন্তে ভাবি নে। চাকরালার মতো ঘেঁরে হয় না। তোমরা ছিলে না, কী বন্ধ করে যে খাইরেছিল সেই কটা দিন। শশ্বেও রেঁগেবেড়ে দিতে হবে না। বন-ঘোরা মাহুয—চাল পেলে নিজেই সে ছুটো ছুটো কুটির নিতে পারবে।

জগা বলে, শুধু চাল কোঁতেই কি বাঞ্ছ বলাইখন? আরও কত কত কাজ। চাকরালার হুকুম তামিল করা—রাবার কাঠ কেটে দেওয়া, খাবার জল বয়ে আনা। পায়ের কাঁচা পাঁড়ুর জলে ধুয়ে দিয়েছে কিনা, সেটা অবত আমায় চোখে দেখা নেই।

বলাই বলে, ফুলতলায় সেই গয়নার নৌকার তোমার আর চাকরতে কী লাগে যে দেখা সেই বাগ আমায় মিলে না। সাঁইতলা ছেড়ে চলে বাড়ি—চাকরালার তাকে কোন দোষ নেই। শয়তান ঐ বোঁড়া-নগনা।

বহেশ ঠাকুরও লুকে নিয়ে বলে, না জগরায়। বাগ রেখো না। বড় ভাল মেয়ে। আমি বলছি, শুনে নাও। বয়ঃ বদ্বাচনী ঐ মেয়েটা ভাতো না, সমস্ত বজায় করে রাখে। মনেখো থেকে বাগায় এসেছে সকল দিক বন্ধ হবে বলে।

ফুলতলা থেকে চক্কোত্তি মশায় নতুন-আলার কিয়ে এলেন। সেই টোনি চক্কোত্তি।

একা যে মালা আবার কোথার আড্ডা পড়ল?

চক্কোত্তি বলেন, কাজকর্ম না চুকিয়ে আসে কেমন করে? আরও কটা দিন থাকতে হবে নগেনবাবুর। দলিল রেজেষ্ট্রী হয়ে কাজ বোলআনা পাঁকা হয়ে গেলে তবে আসবে। সেই রকম বলে এসেছি। আমি আর দেরি করতে পারলাম না। পরের উপকারে গিয়ে আমার গুদিকে সর্বনাশ হয়—বরাপোতার ঘান কটা হরির লুঠ হয়ে গেল বোহরর এন্ধিনে। বরাপোতা চলেছি—তা ভাবলাম। হাস মশায় উত্তলা হয়ে আছে, এই পথে অমনি খবরটা দিয়ে বাই। আমার বখান সহায় ধরেছ, কাজের ব্যবস্থার কোন দিক দিয়ে খুঁত পাবে না।

গগর এত সমস্ত শুনেছে না। উদ্বির করে প্রশ্ন করে, দলিল কিসের, বুঝলাম না তো।

চক্কোত্তি ভংগনা করে ওঠেন: কী কীও করে বলে আছ ভাব দিকি হাস মশায়। এত বড় জলকরের সম্পত্তি—আইন লন্ডর লেখাপড়া চুলোর বাক, কল-কাগজের উপর ছুটো চারটে ক-বঠ অক্ষরও তো কীয়ে রাখনি। ম্যানেজারের কাছে শুনে কথাটা - তো দোড়ায় বিখাসই করতে পারিলে।

গগর বলে, প্রথম বখান এলাম তখন তো করালীর উপর ছিটেখানেক চটের জমি। বা দেবার জোহুবিবাবুরা সমস্ত ঘের দিয়ে নিয়েছে। এটু বাড়িল হয়ে বাইরে হাফা ছিল জোয়ারের সময় এক-কোমর জল, তাঁটার সময় হাটুতর কালা। সাঁইবাবকে পর্বত

বাঘে ধরে নিয়ে বার, এমন গরম জারগা। তখন কি কানাকড়ি লাম ছিল যে লেখাপড়ার কথা ভাবতে বাব?

চক্কোত্তি চুকচুক করে: ভাবতে হয় গো দাঁদ মশায়। দলিল-মস্তাবেজ করে আটখাঁটি বেধে তবে কাজে নামতে হয়। বিবর নয়তো দু-দিন পরে বিব হয়ে পড়ায়। বিবরকর শক্ত ব্যাপার, সকলে বোঝে না। কিন্তু পুণ্ডরীক বাবু উকিল মশায় সময়ে লণ্ডর সাজিয়ে বসে আছেন কোন কর্ণে? আমরা আহি কেন? শিক্ষিত মাহুয হয়েও এমন অবুঝের কাজ করলে হাস মশায়, ভাল লোকের পরামর্শ নেবার কথা একটি বার মাথায় এল না।

শিক্ষিত কল উল্লেখ করার গগনের গর্ভ ঢাড়া দিয়ে ওঠে। বলে, সকলের আগেই তো ফুলতলায় গিয়েছিলাম, ম্যানেজার সেটা ক্রেপে গিয়েছে চক্কোত্তি মশায়। পাঁচ টাকা নজর দিয়ে দেখা করলাম ছোটবাবুর সঙ্গে। আর ম্যানেজার নিল তিন টাকা। তিন টাকা গাঁটে গুঁজে বলে দিল, কিছু করতে হবে না, কোল ভর নেই। পাঁচ থেকে চর উঠেছে—চরের মালিক সরকার... না, জোয়রি তারই কোন ঠিকঠিকানা নেই। বন কেটে তাড়াতাড়ি বাঁধ না হোক একটা পাতিড়ি দিয়ে নাওগে। বখলই হল স্বহের বারোআনা—বখল কর গিয়ে আগে। এত সমস্ত বলে দিল, আজকে আর কিছু বলে পড়ছে না।

বাড়ি নেড়ে চক্কোত্তি বলেন, বলেছিল ঠিকই বটে। বারোআনা কেন সাড়ে-পনের আনা। এবারে আবার তাই বতলব পাকাল, রাতারাতি মাঝের বাঁধ উড়িয়ে দেবে, তোমার আলাখেরও চিহ্ন



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
‘শঙ্খ ও গদা’
মার্কী গঞ্জী
ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ানি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—ব্রিটেন ডিপো—

হোসিয়ানি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কোন : ৩৬-১৯৫

রাখবে না। চৌধুরির সীমানা বলে গাউন অবধি লম্বা করে দেবে। আদালতে মাথলা উঠলে অমন বিশ জেনে হলপ পড়ে বলে আসবে। বেগে টা হয়ে আছে ম্যানেকার, ডরফা তার উদ্ভানি দিচ্ছে। আবার এদিকে সীতিলতার মাছ-মাঝারি বিগড়ে আছে—এখন তোমার লোকবলও নেই। সমস্ত খবর চলে যায় কুলতলা অবধি। এমন সুবিধা ছাড়বে কেন? সমস্ত ঠিকঠাক, দু-শ দিনের ভিতর এম্পার-গম্পার হয়ে যেত। এমনি সময় আমরা গিয়ে পড়লাম।

গগন আগুন হয়ে বলে, পাড়ার ওরা বিগড়াল তো ঐ নগনা-শালার জন্তই। বাদ্যবনেও মধ্যে কোমর বেঁধে খেটে সকলে মিলে একটা বাঁচবার পথ করছি, তা ভাঙনচণ্ডী এসে পড়ে তখনই করে মিল সমস্ত।

চক্কাতি বলে, আঃ, নিশ্চয় কর কেন দাস মশায়? খুব পাকা বুদ্ধি নগেন বাবুর।

গগন আরও উত্তেজিত হয়ে বলে, বুকের নিশ্চয় শুধু নয়। পারলে গুজরাটের নাকনি-চুবানি খাওয়াতাম। আমার ডান-হাত বাঁ-হাত হল 'জঙ্গা' বলাই ওরা সমস্ত। হাত-পা কেটে ফুটো করে দিল ঐ শালা। চৌধুরি সেইজন্তে সাহস পেয়ে যায়। তাদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়ে এসেছি, এখন তো কিছু করতে পারিনি।

চক্কাতি শান্ত করছেন গগন দাসকে : আর কিছু করবে না। মিটমাট হয়ে গেল। চৌধুরি মালিকানা আপোবে স্বীকার করে নেওয়া হল। নতুন যেহি নগেন বাবুর নায়ে উচিত খাজনার অক্ষুণ্ণ বাবু বন্দোবস্ত করে দিলেন।

গগন বলে, নগেনশায়র নামে কেন? সে আসে কেমন করে যেহি ব্যাপারে? সে কবে কি করল?

আহা, শালা-ভগ্নিপতি কি আর আলাদা? তোমার বললে নগেন বাবু না হয় হল। আসল যে কাজ—তাই পক্ষ এক হয়ে ইউকো বরমাইসলোককে এবারে শাসন করে বেশ দিকি। ভেড়ির উপরে বাতে অভ্যাচার না হয়, রাত-বিরেতে কেউ জাল না ফেলতে পারে। যে হাটটা জরাবে, তার বোলখানা বেচাকিনা হয়ে বাতে যাবে উঠে আসে।

গগন বলে, তা হলে ওরা খাবে কি?

মাছ-মাঝারির কথা তো? খাবে না। না খেতে পেয়ে উঠে বাবে তজ্জাট ছেড়ে। আপদের শান্তি হবে। তাই তো স্বার্থ ভেমেদেয়।

গগন বলে, ভেড়ি বাধার সময় বরকাবে লেগেছিল কিন্তু ওদের। আমাদের ছোট ব্যাপার, আমাদের কথা ছেড়ে দিন। চৌধুরি বাবুদেরও লেগেছিল। বছর বছর বাঁধে মাটি দেবার সময় এখনো ওদের ডাকতে হয়।

চক্কাতি জ্বলজ্বল করে বলেন, সে আর কতটুকু ব্যাপার? সমস্ত কথা হয়ে গেল বাবুদের সঙ্গে। ছোটবাবু বললেন, রাজা শেষ হয়ে গেল। শুকনোর সময় মাটি-কাটা কুলি আসবে লবী বোকাই হবে। কাজকর্ম চুকিয়ে চলে যাবে। তাদের কাজকর্ম ভাল, মজুরিও অবশেষেই মেয়াদিত, কাজের জন্য একজন দু-জন লেদার রেখে দিলে হয়ে যাবে।

হেসে বেললেন চক্কাতি। হেসে বললেন, তোমার কথাও একবার

বে না উঠেছিল তা নয়। দাস মশায় পুরানো যেহিয়ার, দলিলটা সেই নামে কি ক্ষতি? তা ছোটবাবুর খোর আপত্তি। এক সঙ্গে ওরা সব বন কেটেছে, গগন দাস ওদের কি রেড়ে ফেলতে পারবে? আদালতের কাঠগড়ার দাঁড়িয়ে ওদের বিরুদ্ধে জবানবন্দি দেবে? চক্কলজার কারণ হবে তার পক্ষে। আর আমাদের হবে বেরাল কাঁধে নিয়ে শিকার করার মতন। প্রথম ম্যানেকার তো মায়বুধি একেবারে। সেদিনে সেই যে নাজেহাল হল, তার মধ্যে তোমারও নাকি যোগাযোগ ছিল। শেষটা নগেনবাবুর নাম উঠে তখনই সব রাক্ষ হয়ে গেল, তা যাবড়াক্ক কেন দাস মশায়? বিষয়সম্পত্তি লোকে বেনামিও তো করে। ধরে নাও তাই করছে তুমি সবজির নামে।

গগনও হয়তো সেই রকমটা বুকে চুপচাপ হত। কিন্তু চাকুরালা এসে পড়ল। বেড়ার কাছে শুনছিল বুধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মায়বুধি হয়ে এল : আপনিই তো এই সব করাজেন। খোঁড়ার কাছে বুল খেয়ে। দাদার কাছে এখন আবার ভালমাস্ত্র হতে এসেছেন।

গাল খেয়ে চক্কাতির কিছুমাত্র ভাবান্তর নেই। এ সমস্ত অভ্যাস আছে ঢের। দস্ত মেলে হেসে আরও যেন উপভোগ করছেন। বলেন, করছি তো বটেই। নইলে তোমার সুস্থ হাতকড়া পড়ত। এত বড় একটা কাজ মানাই বা করতে হবে কেন? নগেনবাবু বলেছে খুশি করে দেবে। না দিলে ছাড়বে কেন? এই যখন পেশা হল আমরা।

আরও উত্তেজিত হয়ে চাকুরালা বলে, পাশের পেশা। একজনের হকেব ধন অভ্যাস করে অন্যকে পাঠিয়ে দেওয়া।

পরম শান্তভাবে চক্কাতি বলেন, তা ঠিক। মস্তেলের জন্ত সব সময় ভায়-অভায় বাহতে গেলে চলে না। কিন্তু আজকের এই ব্যাপারে তুমি কি জন্তে কথা বলতে এসেছ মা? হার জন্তে চুরি করি, সে কেন চোর বলবে? জগন্নাথ মরদমাস্ত্র—কোমরে হাড় বেঁধে ফিড়িফিড় করে টেনে নিয়ে থাক, জেলে নিয়ে পুতক, কিছু যায় আসে না। কিন্তু মেয়েমাস্ত্র তুমি, গৌরারটার সঙ্গে ভুলে সরকারি কাজে প্রতিবন্ধক স্থায়ী করলে, সরকারি মাস্ত্রবকে দেবীদ্বানে বলি দেবার বড়জ্ব করলে—তোমার ভাই বলেই দাস মশায় পঞ্চ চৌধুরিবাবুদের কাছে গোবী। আর কোন্ উপায় ছিল বল, এমনি ভাবে মিটমাট করা হাড়া?

সঙ্গে সঙ্গে আবার গগনের দিকে চেয়ে সাধনা নিচ্ছেন : বাবড়াবার কি হল দাসমশায়? রেজেক্ট্রী-দলিল ফুলেই কি সম্পত্তিটা অমনি নগেন বাবুর হয়ে যায়? দলিলখণ্ডে স্ববান তুমি। আইন-আদালত আছে কি করতে? আমরা আছি কেন? বেলিকে কুট, সেইদিকে ছাতা তুলে দরব। প্রবল শত্রু চৌধুরিদের সঙ্গে যখন মিটে গেল, এবারে নিশ্চিন্তে নিজেদের মধ্যে লড়ায়েটা কর।

চাক বলে, দাদাকে জাতিয়ে তুলে আবার নতুন গণ্ডগোল খটাতে চান বুধি? বরাপোতার না গিয়ে সেইজন্ত এখানে আসা? ছাতা ধরতে হবে না আপনাকে, রক্ষে করুন। বা করতে হয় আমরাই ভেবেচিন্তে দেখব। আপনি আসুন এবারে চক্কাতি মশায়। দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল, এর পরে চক্কাতি মাস্ত্রের উপর হপ করে বসলেন।

এত বেলায় কে আমার জন্ত সেখানে তাত রেঁবে-বেড়ে বাতাস করছে। খেতে হয়, দুটা খেয়ে বাব তোমাদের এখন থেকে।

চাক খুঁধ বাঁট। দেয় : আমি পেরে উঠব না।

বলে পাক দিয়ে পিছন ফিরে বরকর করে সে চলে গেল।

চক্কাতি ক্রান্তি করে বলেন, ওঃ, উনি না হলে আর লোক নেই। যে দেশে কাক নেই, সে দেশে বেন রাত পোহায় না। নগেনবাবুর বেন তো রয়েছে। ঘরের গিরি বিনি। বলি, ভনতে পাছ ভাল মাছবের মেয়ে? তোমার ভাইকে এর মধ্যে নিয়ে এসেই যত কাশাদ। তা সে বাই কোক, ব্রাহ্মণ-সন্তান ভবতুপূরে নিরুচ্চ চলে বাবে তোমার বাড়ি থেকে? গৃহস্থের তাতে কল্যাণ হবে?

রায়া শেখ হল চক্কাতির। মাছের তরকারি আর ভাত। ভাত বেড়ে নিলেছেন পাখরের খালার। বাবো দেবার ধান হয়—ভাত খাওয়া অতএব শহরে মাগে নয়। পাহাড়ের চূড়া না হল, তা বলে মোচার মাখাও নয়। বিড়ালে লক্ষ্য দিয়ে বাড়ি ভাত ডিঙাতে পারবে না। কড়াইস্থল তরকারি টেনে নিলেন ভাতের পাশে। লোকে এই সব অঞ্চলে মাছ খেতেই আসে, অত তরকারি বাছল। লোকালয়ে যেমন এক কুচি মাছ খুঁধ দিয়ে পরিতৃপ্তিতে জিভে টক্কর দেয়, বাগা বাক্সের মাছ খাওয়া তেমন ব্যাপার নয়। ভাতের পরিমাণ বা, মাছের তরকারিও তাই। বাটতে হয় না, বড় খোয়ার প্রয়োজন তরকারি ঢালায় ব্রহ্মত্ব। তার চেয়ে কড়াইতে বাবা সুবিধা—কড়াই থেকে তুলে তুলে খাবেন। তৈরাস্ত পারলে মাছ—তরকারির চেতাবাখানা বা ঝাড়িয়েছে, তাই থেকে বাসের আলাজ পাওয়া যায়। আরস্তের আগে গণ্ডু করে নেবেন, সেইটুকু সবু সইছে না।

কিন্তু এক গ্রাম খুঁধ দিয়ে চক্কাতি খুঁধ করে কেল দিলেন : মনে পড়ে গেছে। বরকার।

বিনি-বউ বলে, একজনের মতো রায়া। মনের আলাজ করতে পারেননি ঠাকুরমশায়।

আলাজ ঠিকই আছে। রায়া আজ নতুন করছিলেন মা-লক্ষী। মুন বা সেবার দিয়ে আমি একবার আলাখের গেলাম কলকের তামাক দিতে। শতুং এসে সেই সময় 'ডবল' মুন ছেড়ে দিয়ে গেছে।

বলে হাসতে লাগলেন : কাঁচ কাক হয়ে গেল। রায়া চাপিয়ে 'উম্মনের পিঠ ছেড়ে বাওয়া উচিত হয়নি। এ রকম কখনো করিনি। মুন না দিয়ে খানিক সৈকোবিরণ দিতে পায়ত রাগের বশে। বাগ না চণ্ডাল—সে অবস্থায় মাছবের হ'লজান থাকে না।

অতিথি-ব্রাহ্মণ নিয়েও এমনিধারা কাণ্ড। লক্ষ্যের আর ব্রহ্মশাপের ভয়ে বিনি-বউ দিশা করতে পারে না। চলে বান তো ইনি, তার পরে হবে একচোট আজ চাকর সঙ্গে। বন্ধ বাড় বেড়েছে। লক্ষ্য নেই শরয় নেই, সকলের সঙ্গে পারতাগ করে বেড়ায়। দিনে দিনে বিজি এক মাগি হয়ে উঠল, কোন চুলোর টাই হয় না। সেটাজেই আরও বোধ হয় ক্যাশা অমন।

চক্কাতি গুদিকে হাসতে হাসতে বলছেন, আমিও ছাউন-পারি নই। আসন ছেড়ে ওঠা বাবে না, ভাত হয়ে গাবে। এক বাট কল নিয়ে এস দিকি। খোলের মাছ কলে বুয়ে বুয়ে খাব। উঃ, কত মুন দিয়েছে যে বাবা—নোনা-ইলিশের মতো মাছের কাটা অবশি করে গেছে।

রায়াবের লাওয়ার উপর সেই খাবারের জায়গার গগন উঠে এল। হাসিমুখি ভাব নেই সেই থেকে। বলে, পাটা করে রেছেই হচ্ছে চক্কাতি মশায়?

চক্কাতি বলেন, বৃথাবার। সোম মঙ্গল দুটো দিন ছুটি—ইদের পরব পড়ে গেল কি না।

গগন বলে, ভাল হয়েছে। বৃদ্ধাধরক ফুলতলার পাঠাছি নগেনের কাছে। তার খুঁধে শুনি সমস্ত।

চক্কাতি আহতকণ্ঠে বলেন, আমার কথা বিশ্বাস হয় না—আমি কি মিথ্যে বানিয়ে বললাম? অত উত্তলা কেন হচ্ছে, তাও তো বুঝিনে। হয়ে থাক না রেছেই—যেমন খুঁশি লেখাপড়া করে নিক। তার পরে বইলায় আমরা সব। তোমার ঘেরির উপর কোন শালা না আসতে পারে, পুণ্ডরীক বাবুকে দিয়ে আমি তার বাবজীয় ব্যবস্থা করব। অমন দুঁদে উকিল সদরের উপর বিতীয় নেই।

উঁহ, চলে আসুক নগেন। সামনাসামনি হোক। মতলবটা বুঝব। চাক-গুডগুড নয়, খোলা ছাড়িয়ে কথাবার্তা এবার।

চক্কাতি একগাল হেসে বলে, আসবে না, দেখে নিও। নেহাৎ সাধা মাছব তুমি দাস মশায়, কথাটা তাই ভাবতে পারছ। এ সমস্ত সামনাসামনি আসে কখনো? বলি, মাছবের চক্কলক্ষ্য আছে তো একটা।

গগন বলে, আসবে ঠিক। চিবকুটে মস্তোয় লিখে বৃদ্ধাধরের কাছে দিয়ে দিচ্ছি। মস্তোয়ে টেনে আনবে। বাঁদরকে কলা দেখিয়ে ডাকতে হয়। হাত ঘুর্তা করে আ-তু-উ বলতে হয় কুকুরকে। ভবে আসে। আপনাকেও করেকটা দিন থেকে যেতে হবে চক্কাতি মশায়।

[ক্রমশঃ]

ডঃ ব্রজবল্লভ বসু

টার্কোমোডো | **নানাল**

অল্প, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়

ডঃ বসু ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা ৯



চড়ক উৎসব

শ্রীমূলকুমার মণ্ডল

বাংলার বাবো হাসে তেরো পার্ব। বোল-ভূর্গোৎসব থেকে শুরু করে সমস্তই বাংলার নিজস্ব উৎসব। আর বছরের শেষ উৎসবটিই হচ্ছে চড়ক উৎসব। চৈত্রের প্রথম দিন থেকেই এই উৎসবের শুরু এবং শেষ পরিণতি একেবারে চৈত্রের জিন্দে।

কানুন সক্রান্তিতে শৈব নয়নারী উপোস ক'রে থাকেন এবং পরদিন অর্থাৎ চৈত্রের প্রথম দিন গঙ্গার বাটে তাঁরা উত্তরীয় গ্রহণ করে শিবপোত্র ধারণ করেন।

গঙ্গার বাটের আশ্রয়দেয় যে মন্ত্র তা হচ্ছে, 'নিজপোত্র ত্যাগ করে শিবপোত্র ধারণ করা', এমনি ভাবে তিনবার বলে গঙ্গার তীরে উত্তরীয় গ্রহণ করতে হয়, অবশ্য এই মন্ত্র যে শুধুমাত্র আশ্রয়দেয় দেবেন তা নয়, যে কোন বর্গের যে কোন লোক রিতে পড়েন তবে তাঁকে হিন্দু হ'তে হবে এবং এ সবকিছু জান রাখতে হবে।

চৈত্রের প্রথম দিন থেকেই শৈব নয়নারী ভিকার বেরিয়ে পড়েন, এবং দিনের শেষে প্রীতি ঘরের ভিকালক চাউল সংগ্রহ করে সঞ্চয় করতে থাকেন। দিনান্তে আতপ চাউলে আহার সমাপন করেন।

এইভাবে প্রতিদিন তাঁরা ভিকার বেরিয়ে ভিকালক চাউল সংগ্রহ করে উৎসবের শেষ দিনে তাঁরাই আবার সেই চাউল ভিখারীদের দান করেন।

দিনান্তে তাঁরা বা আহার করেন তাকে বলা হয় 'হবিয়া'। পৌর্নমী লগ্নে তাঁদের এই হবিয়া হালসার তৈয়ারী হয়। তাঁরা যখন হবিয়া করতে ব্যস্ত থাকেন, তখন তাঁদের হুখে কোন কথা থাকে না, শুচি বস্ত্র পরিধান করে শিবের নাম নিয়ে তিনটি ধান ইটের তৈয়ারী উদানে আঙন বদান। কিন্তু এখান থেকে কোনক্রমে যদি হঠাৎ সেই হালস থেকে জল পড়ে কিংবা বেটে গিয়ে থাকে তবে সেদিন আর তাঁদের আহার হয় না, সেদিন তাঁদের কলমুসেই রাত কাটাতে হয়।

স্ব্যাসীরা অর্থাৎ উত্তরীয়ধারী শৈবেরা 'ভারকনাথের চরণে সেবা লাগি, কহাদের' 'বুঝা শির্ষের চরণে সেবা লাগি হকাদেব', প্রভৃতি মন্ত্র জপকৃত্য করতে থাকেন।

দিনের পর দিন গিয়ে শেষে আসের শেষ আসে, তার পর তৎক্ষণাৎ হয় উৎসবের আসল খেলা।

সাতাশ আটাত্ত তারিখ জোর বেলা থেকে শৈবেরা শিব মন্দিরের চারিদিকে পতী কাটতে থাকেন। এ যে শুধু উত্তরীয়ধারী স্ব্যাসীরাই করেন, তা নয়, অনেক শৈব নয়নারীও করেন।

এরপর শুরু হয় শিবের মাথার জল ঢালা। একের পর এক জল ঢালতে থাকেন শিবের মাথার। তবে ভক্তিপ্রাণা নারীরাই বেশী। মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে সেখান থেকে বায় সেখানে অনেক ঘাটিন তৈয়ারী বোঝা প্রভৃতি, শোনা বায় শৈবেরা তাঁদের শরীর গুহু আর সবল মাথার জল শিবের চরণে এই বোঝা হানসিক করেন, বোঝার পায়ে পড়ি যেমন, হানসিককারীর পায়েও যেন ভেদমনি পড়ি হয়। আরও সেখান থেকে বায় মাথার চুলের হানসিক। কেউ হয় জো অনেক দিন রোগ ভোগের পর শিবের নামে চুলের হানসিকে গুহু হয়েছেন, তিনিও শিবের সম্বন্ধে বিধানার্থে এখানে মাথার চুল উৎসর্গ করেছেন, এমনি আরও কত কি।

চড়কের আসের দিন নীলের বাতি, ভক্তিপ্রাণা নারীরা সেদিন উপোষ ক'রে নীলের বাতি জ্বালেন।

চড়কের দিনই অর্থাৎ জিন্দে তারিখই উৎসবের শেষ দিন। এই দিন সবাই একত্র হন চড়ক তলায়, সেখানে গিয়ে যে বায় ইচ্ছা যত চড়কে চড়েন।

কিছুকাল আগে চড়কের দিন বাণ ঝাঁড়া হ'ত। অর্থাৎ পাঁজরার হ'পাশে হ'টো হুচালো শিক ফুটিয়ে দিয়ে হু'হাতে সেই শিক ধরে মন্দিরের চারপাশে ঘুরতে হ'ত। শিকফুটোর জোড়া হুখে থাকতো সরবের তেলের ভাকড়া ভিজানো, সেই ভিজানো ভাকড়া জেলে ঘুরতে হ'ত সবাইকে এক হায়ে হায়ে সেই জলজ শিখাকে আরও জোর ক'রে ধরানোর জন্য ঘুরানোর ভাঁড়া তাতে দেওয়া হ'ত।

কিন্তু সরকার বাহাদুরের চৌর্য বর্ডবানে আর তা হয় না। কিংবা যদিও হয় তবে তাতে আর ভয় থাকে না অর্থাৎ পাঁজরার আর শিক কোটানো হয় না।

চড়কের একদম শেষে হয় আঙন বাঁপ। উত্তরীয়ধারী শৈবেরা বাঁপের ওপর থেকে কুলে পড়েন বাঁপের নিচের জলজ আঙনের দিকে। এইটিই হচ্ছে আঙন বাঁপ। বাণ ঝাঁড়া, আঙন বাঁপ ইত্যাদি হওয়ার পর চড়ক উৎসব শেষ হয়।

চড়কের দিন বিকেলে বিরাট দাঠের মাঝে চড়ককে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এবং খুব খুমখামের সঙ্গে পূজা হয়।

বাংলাদেশের চড়ক উৎসব নানা জায়গার হুড়িয়ে আছে।^১ বিশেষ ক'রে পাড়া-পীরেই এই পূজা বেশী হয়। তবে কলকাতাতেও কয়েক জায়গার হয়, যেমন, পদ্মপুরন্দ, কালীবাট, বেঙ্গলবাট প্রভৃতিতে। কলকাতার পদ্মপুরন্দে চড়ক উৎসবে এক মেলা বসে।

চড়কের প্রধান উৎসবের স্থান হ'ল হুগলীর তারকেশ্বর। এখানে সাতাশ তারিখ থেকে জিন্দে পর্যন্ত বিরাট মেলা বসে। নারীর পূজার্নন্য তপাতোও এই উৎসব হয় এবং এখানেও পাঁচদিন মেলা বসে।

উত্তরীয়ধারী স্ব্যাসীরা ১লা বৈশাখ তাঁদের উত্তরীয় জলে ভাসিয়ে দেন। ভাসাবার সময়ও একটি মন্ত্র বসেন, 'নিজ পোত্র ত্যাগ করা, শিবপোত্র ত্যাগ করা।' পরের দিন ২রা বৈশাখ খুব খুমখামের সঙ্গে বাঙরা হাঙরা করেন।

এইভাবে চড়ক উৎসব শেষ হয়।

লামেরিয়াং

(চৌদ্দ গল্প)

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

চাঁদার ছেলে। নাম লামেরিয়াং। গরু, ভেড়া, ছাগল চরাতে আর কোনো রকমে খেয়ে-পড়ে দিন কাটাতো। পাঠশালায় পড়ার খুব স্বখ—পরশা পাবে কোথা? তাই একদিন পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের কাছে গিয়ে সে সরাসরি বললো, আপনি আমাকে আঁকতে শেখাবেন—আমার খুব স্বখ আমি আঁকতে নিখি।

পরশা আছে—বেতম দিতে পারবে আঁকতে শেখার বিনিময়ে? গুরুমশাই জানতে চাইলেন।

না, পাবো কোথা। জবাব দিল লামেরিয়াং।

গুরুমশাই বললেন, তবে ভাগো। অল্প পথ দেখো—চাঁদার ছেলে বাথাল বালক গরু চরিয়ে খাও—আঁকার স্বখ কেন?

কীদমতে কীদমতে লামেরিয়াং চলে গিয়ে বাড়ীতে গুয়ে রইল। রাতে গুরুমশাই কুঁতার কাছে এসে তাকে সোনার একটা কলম দিয়ে বললো, এই কলম দিয়ে বা তুমি আঁকবে, তাই জীবন পাবে—লামেরিয়াং, তুমি সোনের ভাল ছাড়া কোনো দিন ধারণা কিছু করো না।

ঘুম ভেঙে লামেরিয়াং দেখলো, তার হাতে একটা সোনার কলম। খুশীতে লাঞ্ছিয়ে উঠলো লামেরিয়াং। ভগবান তার ওপর লক্ষ্য হয়ে তাকে এই কলম দিয়েছেন—এবন আর তাকে পায় কে? ছুটলো সে মাঠে।

আর চাবারা যে বা চাইলো—তাই সে মাটির ওপর এঁকে তাদের দিতে লাগলো একটা একটা করে। তারা তো লামেরিয়াংয়ের জয় জয় করতে করতে বাড়ী ফিরলো।

এমনি ভাবে লামেরিয়াংয়ের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কথটা ওই দেশের রাজার কানেও গিয়ে উঠলো; এমন একটা সোনার কলম লামেরিয়াং নামে একটা চাঁদার ছেলের কাছে কিছুতেই থাকতে পারে না। রাজা পাইক পাঠালেন লামেরিয়াংকে তার রাজসভায় হাজির করতে। পাইক ছুটলো এবং ঈগুগিরই লামেরিয়াংকে ধরে নিয়ে এলো রাজার কাছে। রাজা দেখলো লামেরিয়াংয়ের হাতে একটা সোনার কলমই বটে—কথটা তাহলে মিছে নয়। রাজা বললেন, কলমটা আমাকে দাও লামেরিয়াং, আমি অনেক টাকা দেবো, তার বিনিময়ে।

না, এটা আমি আমার প্রাণের বিনিময়েও দিতে রাজি নই রাজা। লামেরিয়াং জবাব দিল।

রাজা রেগে গেলেন। লামেরিয়াং তার কারাগারে কয়েকী হোয়ে রইল। এককোঁঠা একটা চাঁদার ছেলে তার কিনা এত বড় কথা। কয়েকী হোয়ে দুদিন থাকলেই বাহান্না খুড়নুড় করে কলমটা আপনা হতেই গিয়ে দেবে। রাজা এই না জেবে মনে মনে খুব খুশী হলেন, আর সরবরে তেল নাকে ধানিকটা ভাজে দিয়ে ঘুরতে শুরু করলেন আদায় করে।

এদিকে লামেরিয়াং কারাগার থেকে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলো। সে তার সেই কলম দিয়ে পানতোর সন্ধান

জিবেবলা, ছানাবড়া, বঙ্গদোলা এই রকম অনেক অনেক খাবার একে তাই বেশ মনের সুখে ভোজন করতে লাগলো।

পেটে খিদে থাকলে বুড়ী ভেমন বোগায় না তাই পেট ভরে খেয়ে লামেরিয়াং এখান থেকে পালাবার উপায় খুঁজতে লাগলো। এবং একটু পরে উপায় পেয়েও গেল।

সে ভাড়াভাড়ি পাখরের দেয়ালে বৈদিকটায় অনেক উঁচুতে একটা জানালা আছে, সেই দিকটায় একটা মই ঝুঁকে কেললো সেই মইটা দেখতে দেখতে সত্যকারের হোলো। সে তাই বেয়ে উঠে গেল ওপরে জানালার কাছে আর নামলো গিয়ে ওদিকের রাস্তায়। তারপর হৈ হৈ করে পাহারাদাররা তার পিছনে ছুটে এলো তাকে ধরতে কিন্তু লামেরিয়াং ততক্ষণে একটা বোকা এঁকে কেল তাইতে চড়ে বসেছে। আর তাকে পায় কে? বোকা ছুটিয়ে লামেরিয়াং তখন যে ছুট কোথায় বা রাজা আর কোথায় বা তার পাইক পাহারাদার। কেউই তার কিছু করতে পারলো না। লামেরিয়াংকে অনেক খুঁজতে রাজা আর ধরতে পারলেন না। সে তখন অনেক দূরের দেশে চলে গেছে—তার সোনার কলমটাকে সাথে নিয়ে।

তবে রাজা বা রাজার অনুচররা তার দেখা না পেলেও পরীষ লোকেরা তাকে ডাকলেই সে তাদের কাছে তথুনি হাজির হয়ে তাদের অভিযোগ শুনে অভাব মিটাতে তার সোনার কলমটা দিয়ে।

মন দিয়ে অভাব নিয়ে ডাকলে এখনো তার দেখা পাওয়া যায়। তবে মন দিয়ে ডাকতে হবে, তবেই না তার দেখা পাবে।

দেশী রং

শ্রীহনুবিকাশ দাশ

আমাদের দেশে নানাজাতীয় গাছ-পাছড়া জন্মায়, সেগুলোর

পটুয়ারা দেশের গাছপাছড়ার কল, বীজ, ছাল প্রভৃতি থেকে নিজেরা রং তৈরী করে নিজে। রং ব্যবহারের জন্য মাটি (medium) তাঁরা তৈরী করতেন, হাতের কাছে পাওয়া জিনিস থেকে—বখা—তেঁতুল বীজ, বেল ইত্যাদি। এখন অবিকাশ পটুয়া বাজারে কেনা রং ব্যবহার করেন, তাছাড়া ক্রমে ক্রমে পটুয়ারের জাত ব্যবসা লোপ পেয়ে আসছে—তাই প্রত্যেক রং করার জন্য দেশজ জিনিস ব্যবহার করতে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশী নালের কথা মনে পড়ে। নিজের তৈরী রং দিয়ে ছবি আঁকার একটা আনন্দ আছে।

কাঁঠাল কাঠ থেকে যে রং পাওয়া যায় তা আমার কল্পনাশ্রুত নয়। এক বাউলের সঙ্গে অনেকদিন থেকে আলাপ। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর কাঁঠাল কাঠের রং ব্যবহার করতেন। কিন্তু রং তৈরীর পথ তিনি দেখাতে পারেন নাই। রং তৈরী করা ও সেই রং দিয়ে ছবি আঁকা যায় কিনা তার পরীক্ষা করে যা পেরেছি; তাই জানাচ্ছি।

রং তৈরী—পাকা কাঁঠাল কাঠের মাঝের অংশটি হলদে রঙের হয়ে যায়। কাঠ চেঁচাই করার সময় যে ভেঁড়া পাওয়া যায় তা ব্যবহার। খুব ছোট কবাত দিয়ে চেঁচাই করা কাঠ ভেঁড়া হল

সবেরে ভাল হয়। কারণ তাঁকে ওঁড়ো আর পোতা খানার মত হোট হয়। এই ওঁড়োকে ভাল করে বেছে নিতে হবে, যেন অল্প কোম জিনিস না থেকে যায়। কাচের বা চীনাঘাটির বাটিকে এগুলিকে পরিমাপমত ঠাণ্ডা জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে আর জিন দিন। মনে রাখবে অল্প ঠাণ্ডা জল নিশিবে জলের পরিমাপ সঠিক রাখতে হবে। পরিষ্কার বোটা কাগজের টুকরায় ওঁড়ো ছেঁকে নিতে হবে। আর এক দিন পরে বে তলানি পড়বে, তা বাধ দিয়ে উপরের জলটুকু সাবধানে গড়িয়ে নিতে হবে অল্প ব্যক্তিতে। কোন ঢাকনা না দিয়ে বাটি ধরে রেখে দিলে জল ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে জল ও রঙের মিশ্রণ থাকতে থাকবে। শেষ পর্যায়ে জলটির রং ও ঘনত্ব যথুন্ন মত হবে ও পরে শুকিয়ে যাবে। শুকনো রং ঠাণ্ডা জল দিলে তা আগের চেহারা কিয়ে পাবে।

কাঠার ব্যবহার—পরিষ্কার গুঁড়ের টুকরো ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে আঠা তৈরী হবে। পরে তা ছেঁকে নিতে হবে। কাঁচের ওঁড়ো ছেঁকে নিয়ে তলানি বাধ দেওয়ার পর পরিমাপমত আঠা মেশাতে হবে এই রংএ। অল্প আঠা ব্যবহার করলেও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

রং—ছেঁকে দেওয়ার পর জলের রং হবে ক্রিকে কমলা। একটু ঘন অবস্থার রং হবে সৈরিক ও পরে কমলা। তুলি দিয়ে লাগানোর সময় রঙটি বেশ সহজেই কাগজের সঙ্গে ভাব করে নেয়। শুকিয়ে বাঁধার পর রঙটি ঘাবাবহিতে উঠে না বা আঁতলে কোন লাগ লাগে না। আঠা ব্যবহার করার রঙটি মোলায়েম হবে। 'জলরঙা' ছবি, রঙীন 'বেথাটিও', এ রং দিয়ে ভাল ভাবেই হয়েছে। এ রং দিয়ে অল্প ধরনের ছবি পরীক্ষা করা হয় মাই।

সংরক্ষণ—একটু ঘন হয়ে এলে, পরিষ্কার তুলোতে শুঁবে নিয়ে, শুকিয়ে শিশিতে রেখে দেওয়া যেতে পারে। রং করার অল্প, এ তুলো পরিমাপমত কেটে নিয়ে জলে বগড়ে নিসেই হল।

ছড়া

মুখ্যাকা নাশান

সোনার গালে সোনার ঘোঁ
সোনার হাসি হাড়িয়ে।
সন্ধ্যা তারার নাম চড়ে
বিকেল গেল গড়িয়ে।
ও বিকেল ছুই কিয়ে জা,
সোনার হাসি দেখে বা।

এক পরসার এল-বেল
এক পরসার ভেল।
মেটটিকে খুঁধু মেয়ে
আবার হ'ল কেল।
কেল নয়ত কেল নয়ত
পরীক্ষকের কোঁধ।
বাঁকান দিলে মেঘ বুকে
আটকে ছিল রোহ।

মহাকবি গ্যোটার বাল্যকাল

ভ্রামাদাস সেনগুপ্ত

পৃথিবীর মহাকবি ও নাট্যকারদের জীবনী সংগ্রহ উপাদান
খুব কম। উদাহরণ স্বরূপে গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের জনক

ইসকাইলাসের বৃন্দ পার হয়ে সকারিস থেকে ইউরিপিডাস পর্যন্ত আমরা যদি আলোচনা করি তা হলে দেখা যাবে তাঁদের জীবনের উপর আমরা খুব বেশী আলোকসম্পাত করতে পারব না। এমন কি প্রাচীন মহাকবি হোমারের বিষয়েও আমরা বেশী জানতে সক্ষম হইনি। আমাদের দেশে চণ্ডিগঙ্গা সমস্তা আছে। অল্পরূপে সমস্তা হোমারকে নিয়েও, হোমার নামে বাস্তবিকই কোন ব্যক্তি ছিলেন কি না, আর থাকলেও সংখ্যার হোমার নামধারী ক'জন ছিলেন এ নিয়ে আজও অনেক বাতর্জবাব চলছে। সূত্র গ্রীক দেশের সাতটি প্রদেশ এই বলে দাবী জানাচ্ছে, হোমারের জন্মভূমি তাদের প্রদেশে। তা ছাড়া দাঁত ও সেন্সপীয়ার সমস্তাও রয়েছে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত দাঁতের প্রতিকৃতি নিয়ে মতের গুরুতর পার্থক্য ছিল। সেন্সপীয়ার বিষয়েও সেই যন্ত্র। অনেকে বলেন সেন্সপীয়ার নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না। অনেকে বলেন ষষ্ঠ যুগে আহত মালো আমেরিকার পালিয়ে সেন্সপীয়ার ছদ্মনামে লিখতে থাকেন। আবার অনেকে বলেন বিখ্যাত দার্শনিক বেকনের রচনা সেন্সপীয়ারের নাটক বলে বোমালুম চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয় সাহিত্য ধানের আমরা যুগমানব বলি তাঁদের বিষয়ে আমরা খুবই কম জানতে পারি। গ্রীক সাহিত্য পার হয়ে ইটালী থেকে ইংল্যান্ড পর্যন্ত এসে দেখি মহাকবি ও নাট্যকারদের জীবনী খুব স্বল্পবিশ্ত। তবে বিরাট পরিধি বিস্তৃত জীবনে যার বিষয়ে আমরা জানতে পারি তিনি হচ্ছেন বোহান উলফনভ্যাঙ বন গ্যোটে। প্রত্যেক সমালোচকের মতে ইউরোপে দাঁতিকির পর এক বড় সর্বোত্তম প্রভাবের ভাষার রূপ নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। আমরা জানি চরিত্র মানব জীবনের স্বরূপ। এই চরিত্র থেকে প্রতিভার জন্ম হয়। অনেক প্রতিভা লোক চক্ষুর অন্তরালে রয়ে পড়ে বিকশিত হয়ে। আর এক প্রতিভা আছে বা সংঘর্ষে গড়ে ওঠে। গ্যোটে বলতেন এই সংঘর্ষ রোধ করবার জন্য ভগবান মায়ুথকে শক্তি দিয়েছেন। সব কিছু জয় করবার শক্তি। শক্তির অপব্যবহার হলে ভগবান মায়ুথকে কমা করেন না। শক্তি নিঃশেষ হলে ভগবান সেই ব্যক্তিকে নিঃশেষ করে দেন। আর সংঘর্ষ চরিত্র পূর্ণ হয়। তাই বোধ করি তাঁর তীর্থ যাত্রা শুরু হয়েছিল জেরেরে ত্রঃব হতে কাউন্ট নাটক রচনা করবার সর্বশেষ সীমান্ত অবধি, অসীম পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহে চরিত্র গড়ে ওঠে। তিনি গুটিলোকায় মত নিজের সূত্র গণ্ডির মধ্যে জাল বুনে রেশম সৃষ্টি করে নিঃশেষ হননি।

বিপুল পৃথিবীর ঘূর্ণনের মধ্যে ঝাঁড়িয়ে সব কিছু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। নিজের সর্বাঙ্গ বোঝাালের মধ্যে পরিমুত হয়ে, স্নাত হননি। চরিত্র তাঁর ছিল ব্যক্তিশেষ। কেউ বলেছেন তিনি পঙ্গব বোহোমিয়ান জীবনাবধি তাঁর মধ্যে। কেউ বলেছেন তিনি পঙ্গব আলমিয়ান প্রেমিক। কেউ বলেছেন তিনি ভুল স্বভাব কবি। অপরে বলেছেন তিনি আর্ধ্য কবি। কেউ তাঁকে দেখে বলেছেন তিনি বৃন্দর কটনীড়িবিদ, কেউ বলেছেন তিনি সর্বাঙ্গবিদ

একাধারে তিনি বিজ্ঞানী। অতিথি, রসায়ন শাস্ত্র, ভেষজ শাস্ত্র ও আলোক তত্ত্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন অগ্রগামী পুত্র। অপর দিকে তিনি ছিলেন মট, মকনিসে শক ও সাহিত্যিক। কেউ তাঁকে বলেছেন phillistine আবার কেউ তাঁকে বলেছেন তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃশ মানব।

এ-রেন ব্যক্তিগত সম্পদ পূর্বপুরুষ বিষয়ে বড়দর জানা যায় তা থেকে বলা যেতে পারে যে তাঁর উদ্ভূত পূর্ব পুত্র হাল ক্রিস্টিয়ান পোটে ছিলেন অব্যবহারী। এই জন্মসহোদরের পুত্র পিতার জীবিকা গ্রহণ না করে দর্জির পেশা নেন। জার্মানীর আর্টেন প্রদেশের থরিনগিয়া থেকে ফ্রেডরিক জর্জ ক্রাফকার্ট বসবাসের জন্ত চলে আসেন। তাঁর ছুটি পত্নী ছিল। দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন বিধবা। এই পত্নীর ছোটলোক ছিল। এই বিধবা জন্মহিলাকে বিবাহ করে ফ্রেডরিক জর্জ বৌতুক হিসাবে ছোটলোকের মালিকানা স্বপ্ন পান। সেট থেকে ইনি ধনী হন। দর্জির পেশা তাই ছেড়ে দেন। এই জর্জ ফ্রেডরিকের দ্বিতীয় পুত্র হলেন মহাকবি পোটার পিতা, ইনি স্মরণ স্বাক্ষর অধিকারী ছিলেন। মেয়ের গুজন ছিল মাঝারি ধরনের। পোটার পিতা আইন অধ্যয়ন করেন, আইনের এক বিষয়ের ওপর তাঁর একটি রচনা প্রতিনিধিগুরু কীর্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। ব্যবহার্য্যবীরা পোটার পিতার রচনা উল্লেখ করে বিচারালয়ে নজীর তুলত। তা ছাড়া সাহিত্যের প্রতি অগ্রদূতও তাঁর ছিল। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সৎ। পোটার মাতার নাম ছিল কুমারী ক্যাথরিন এলিভাবেথ টেক্সটর, ইনি ছিলেন জিলা শাসকের কন্যা। পোটার বাবার বিবাহকালে বয়স হয়েছিল আটত্রিশ। আর পোটার মায়ের বয়স ছিল মাত্র আঠারো। পোটার মাতার দিক থেকে বেশ মর্যাদা থাকলেও শিশুপুরুষের তরফ থেকে অভিজাত বংশীয় হিসাবে পোটে পরিবার তখনও পর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

১৭৪১ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট ঠিক দুপুর বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ক্রাফকার্ট অন দি মেইন-এ তিনি ভূমিষ্ট হন। স্তম্ভ তথ্যেই পোটার জন্ম হয়, অনেকে ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিলেন যে ছেলে খুব নাম ও বংশের অধিকারী হবে। তাঁর আত্মজীবনীতে গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান তিনি দিয়েছেন। বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের অবস্থান ভাল ছিল। বুধের অবস্থান অন্তত ছিল না, তাঁর ওপর শনি ও মঙ্গলের প্রভাব খুব বেশী ছিল না। চাঁদের পূর্ণ প্রভাব ছিল। নিজের কক্ষপথে ঘুরছিল চাঁদ, চাঁদ নিজের কক্ষপথ থেকে সরে না বাওয়া পর্যন্ত কবির জন্ম হয় নি। প্রস্তুত ও প্রস্তুতির তাই সবট দেখা দিয়েছিল, সে-সময় দ্বিতী ভাল পাওয়া যেত না, সেই কারণে প্রসবের সময় মাতা ও সন্তানের অবস্থা সঙ্কটজনক হয়েছিল, জাতকের প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। পোটার পিতামহী জাতকের জীবিত দেখে বিষয় প্রকাশ করে অসুস্থ হয়ে বলেছিলেন, জাতক এখনও বেঁচে আছে। পোটার মাতামহ এইজন্ম গরীবদের কিছু দান করেছিলেন, শহরে দ্বিতীবিদ্যার উন্নতি করে কিছু অর্থ ব্যয়ও করেন, দান করবার হেতু এই যে তিনি রাজকর্মচারী হয়ে অনেক অস্ত্রার করেছিলেন। দানের অর্থ একটা দাতব্যশালাও খোলা হয়, যে ঘরে পোটে জন্মেছিলেন সে-ঘরে শারিত জাতকের বিজ্ঞানীর চান্দর ছিল নীল রক্তের, লক্ষ্যকীর্তি বিবাহের এক বছর পরে পোটার জন্ম হয়। পোটার দেহ নীল ও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রাণের কোন অস্তিত্ব

ছিল না বলে পেটে ভাপ দেখা হয়েছিল। বদ গিরে দেখে মালিক করা হয়েছিল, পঁচাত্তর বছর বয়সে পোটার মায় জন্মতিথি উপলক্ষে পোটার বা বলেছিলেন সন্তানের জন্মতিথির কথা তাঁর প্রায়ই মনে পড়ে।

পোটার বয়স বখন মাত্র পাঁচ মাস, সে-সময় তিনি নানা ভয়ের স্বপ্ন দেখতেন। হাংকাবে এ-সব বোঝা যেত। বুধ জেতে গেলে তিনি কাঁদতেন, মধ্যে মধ্যে পোটে এত হাই তুলতেন যে পোটার বা বাবা ভাবতেন ছেলে বোধ হয় মারাই বাবেন। শিশু ঘুমিয়ে পড়লে তাঁরা একটা বট্টা বাজিয়ে চু চু শব্দ করতেন, তাঁরা ভাবতেন শিশুর চু-খু-খু কেটে যাবে, পোটার বয়স বখন তিন, নেভিরা জামা কাপড় পরা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কিছুতেই খেলা চালা করতেন না, প্রতিবাসে তিনি কান্না জুড়ে দিতেন, তাঁর কান্নার কারণ কী এই প্রশ্ন করলে তিনি জানাতেন যে নোংরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গ তিনি চান না। পোটার মা বলেছেন এ-ব্যবহার তার শোভন হয় নি, তখন আবার তিনি কান্না জুড়ে দিতেন।

পোটে সহোদরা কপেলিয়াক খুব ভালবাসতেন। কপেলিয়া কাঁদলেই বুখে পাউকাটির টুকরো ভাঙে দিতেন, বোনের জন্ত জামা বা প্যাণ্টের পকেটে পাউকাটি সম্বন্ধে রেখে দিতেন, বোলনা থেকে কেউ যদি ছোট বোনকে তুলত তখন ক্রুদ্ধ হয়ে সে-ব্যক্তির ওপর বাঁপিয়ে পড়তেন। কাঁদতেন না অবশ্য, বেগেই যেতেন। পোটার এক সহোদর তাঁর খেলার সঙ্গী ছিল। অল্পবয়সে এ-তাই মারা যায়। ভাই মারা গেলে তিনি চোখের জল কেলেননি। বয়ঃ তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি উগ্রা প্রকাশ করেছিলেন। মুক্তাকালীন অল্পটান শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পর পোটার মাতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : ভাই এর বৃত্তান্তে পোটে কী বৃত্ত ভাইকে তুলে গিয়েছেন ; তাঁকে পোটে এখনও কী ভালবাসেন ? পোটে তৎক্ষণাৎ একটা ঘরে ছুটে বান। বিজ্ঞানীর ভালা থেকে অনেকগুলো কাগজ নিয়ে আসেন। এই কাগজে সেই বৃত্ত ভাইয়ের পাঠ্যতালিকা লিখে রেখেছিলেন। পোটে জননীকে জানানেন, ভাইকে শিক্ষা দেবার জন্ত এ কাগজগুলো আগে থেকেই তিনি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

কসল তোলবার সময় পত্নীপ্রায়ে নানা বাজী পোড়ান হত। নানা রকম উদ্ভূত বাজী খুঁজে হোঁড়া হত। শহরের বাইরে মাথার টুপিতে আলো রেখে নাচ ও গানের আসরে তিনি যোগ দিতেন। তাঁর মায়ের বিবৃতি থেকে বোঝা যায় ; পোবাক পরিচ্ছদের প্রতি তাঁর বেশ নম্র ছিল। কবির জন্ত তিন প্রহ পোবাক তাঁর মা প্রস্তুত করে রেখে দিতেন। একটা চেয়ারের ওপর ওড়ারকেট লম্বা ট্রাইজার আর একটা মাথার তেঁত থাকত। তাঁর সন্ত্যাকালীন পরিচ্ছদ ছিল বেশদের মোজা। বিবিধ ধরনের পোবাক। এই পোবাক পরিধান করে বড়দের সঙ্গে দেখা করতেন। দ্বিতীয় প্রহ পোবাক ছিল সবচেয়ে দামী। পোবাকের সঙ্গে থাকত তরবারি আর কিছু পরচুলা। এ পোবাকগুলো ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। পোটার মা এগুলো খুব বড়সহকারে সাজিয়ে রাখতেন। তাঁর জুতো ছিল অসংখ্য। হুজাকার হয়ে পড়ে থাকত। বট জুতোর মোজা কক ডাঁজকরা অবস্থায় থাকত। গুলোবাশি, বুড়ে ঠিক জায়গার তিনি রেখে দিতেন।

গ্যেটের মা সকলকে ভালবাসতেন। স্বামীর প্রিয় কাজে ঘন ঘিরে অল্পপত হবার চেষ্টা করতেন। তিনি কোন উত্তেজক সংবাদ শুনে পানতেন না। চাকর নিয়োগকালে আসে থেকে তারের বলে দিতেন : পাড়ার কোন উত্তেজক কাহিনী বা ঘটনা তারা কেন না জানে। মায়ের স্বপ্ন গ্যেটে চিরকালই স্বীকার করেছেন। কোন ছেলেমেয়ে অস্তায় কুরলে স্বামীর কঠোর শাসনের হাত থেকে তিনি বাঁচতেন। গ্যেটের মা একজামগার লিখেছেন, যে কোন লোক, যে দাবী হোক বা পুরুষ হোক, তার পরমার্থাঙ্গা কম হোক বা বেশী হোক, তাঁদের জিহ্বা ভালবাসেন। খারাপটা তিনি মা দেখে ভালোটা দেখার চেষ্টা করেন, গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। বা দল তা ভালবাসের দান। দলকে ভালবাসের মিকট সংর্ধন করে নিজেকে পছন্দ করার চেষ্টা করেন তিনি।

গ্যেটের মা স্বপ্নবর্তী বয়সী ছিলেন। তাঁর চোখ ছিল চিকণ স্বাস্থ্যবান এবং, বয়সের পার্থক্য বেশী ছিল না। বলে আমাকে বিশ্বাস করতে পারত না। যে তিনি গ্যেটের মা। তাই একবার বলেছিলেন : ছেলের কাছে আমি নিজেকে ছানাদেবীর মায়ের মত প্রকাশ করব না। গৃহের মানসিক শান্তি বজায় থাক এই তিনি চাইতেন। অবশ্য এর জন্য অল্পশোচনা করতে হয়েছিল। উত্তরকালে শিলারের স্মৃতির সময় গ্যেটেও অন্তহ হন। এ সংবাদ পূর্বে গ্যেটের মাকে

জানান হয়নি। জীবন অল্পবয়সী সংবাদ বখর তাঁকে জানানো হল, তখন তিনি বললেন এ কথা আগে তাঁকে কেন জানান হয়নি। তখন তাঁকে বলা হয় তাঁর আমের অল্পবয়সী কোন উত্তেজক সংবাদ তাঁকে জানানো হয়নি। সন্তান পালনিত্রী হিসাবে গ্যেটের জীবনে তার মায়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাড়ীর মধ্যে একটা সুন্দর ও মনোমগ্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখতেন তিনি। ছেলের কলনাকে তিনিই উৎসাহিত করতেন। তাঁর মায়ের শিক্ষা বেশী ছিল না। তবু যে স্বল্প শিক্ষা তাঁর মাঝে কাছ হতে তিনি পেয়েছিলেন তা তিনি ফুলতে পারেন নি। গ্যেটের মা জানতেন তিনি নিজে বহু সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে পারবেন না। আর সব কর্তব্য ছেলের প্রতি সম্বন না হলেও যেহে নিতে কখনও কার্পণ দেখাতেন না। পিতার কঠোরতা হতে হুঁকি পাঠার জন্য ছোটবেলার মায়ের রেহী নীড়ে গ্যেটে আশ্রয় দিতেন। গ্যেটের পরবর্তী জীবনে সুখলা সহজে আসেনি কারণ গ্যেটের জীবনকে গঠনমূলক করে মা-বাবা আমতে লক্ষ্য হয়নি। এরকম বিশৃঙ্খল জীবন গ্যেটে প্রায় জিহ্বা বহর পর্যন্ত অভিযাচিত করেছেন। তাঁর জীবনে কনিষ্ঠ বোনের প্রভাব পড়েনি। বোনের চেয়ে কবির চারিত্রিক ও মানসিক উৎকর্ষতা বেশী ছিল। বোনের সঙ্গে দৈনন্দিন কাজ, শিশু মূলত খেলা ও আমোদ নিয়ে তাঁর সময় কাটিত।

[ক্রমশঃ]

মনস্তত্ত্ব

শ্রীশৈলেনকুমার দত্ত

ওদের বাড়ির পুতী—

খাবার সময় এই কটি ভাত
দুধের সঙ্গে খুঁকুর হ' হাত
পেলেই সে খুব খুশী।

এদের বাড়ির ময়না—

খাবার সময় রোজ দু'বারে
কেউ যদি হার খাওয়ার তারে
রাগটি যে তার বয় না।

মাঝার বাড়ির ডলি—

পায় যদি রোজ হাড়ের কুচি
মাছের কাঁটা শুকনো লুচি
তবেই সে খুব জলি।

মাগতুতো বোন হাসি—

বইগুলো তার কুলের শিকে
বসবে নিয়ে পুতুলটিকে
পড়তে হলেই কাশি ॥

কাঁটসের কবিতা থেকে

[On the Grassopper and the Cricket অবলম্বনে]

পৃথিবীর চিরন্তন কাব্যের আসর
কছু নাহি রাস্তা হয় এ নিত্যকতার
ঘন নীল বৃত্তার বিলাপে, বৈশাখের
নিরুপস্থ তাপে, উত্তপ্ত শিলার।
ঘাস কড়িয়ারে চির অশান্ত যৌবন
মন্ডালস জ্ঞানমুগ্ধি করিছে বহন।
শীতের তুহিন স্পর্শে নির্ঝাঁক অশাড়
তখনও প্রকৃতির বাহির্ষে সানাই
ঘাস কড়িয়ারে মতো খিঁঝিখি বলে
পৃথিবীর সৌন্দর্যের কছু শেব নাই।
তজ্জালস হাড়যেবা শোনে এই গান
চিরন্তন সঙ্গীতের নেই অবসান।

অল্পবাদ—শ্রীমশেখর দাস

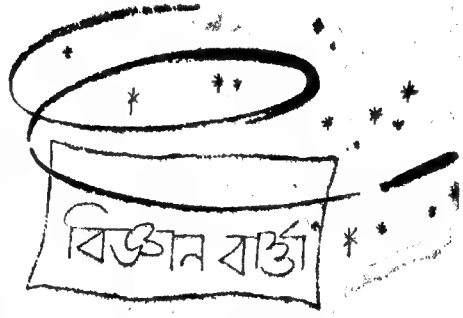
অনাবৃত্তক অস্ত্রোপচার

আজকে যে কথা বোলবো, তাতে দেখা যাবে, বৈজ্ঞানিকরা অদ্ভুত মনটাকেও টুকরো টুকরো করে দেখবার প্রয়াস করেন। যখন অবশ্য চোখে দেখা যায় না কিছু কবির ভাবের 'বিকশিত' পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন পদ্ম তার লুকায়ে কোথায়? অদ্ভুত অবস্থার বৈশিষ্ট্যগণই মনই শরীরকে চালনা করে—এই যেথাই কিছুকিন হল হল মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে।

এই ধরন না অস্ত্রোপচারের কথা। এ সবকে একটা গল্প বললে আপনাদের ভালো লাগবে। কোন একটা প্রসিদ্ধ হাসপাতালে একজন জন্মেবা মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা ডাক্তারকে দিয়ে সহাসরি বলেন : আমার সব সময় বস্ত্রা হয়, অতএব আপনাদের কাছে কাঁচকেই অপারেশন করতে এসছি। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করার সময় তিনি অনর্গল তাঁর আপেক্ষিক অস্ত্রোপচারগুলির গল্প করতে থাকেন। বলেন গল্প শেষ বৎসর তাঁর মাঝি সাত বার অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার কণীকে ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, অপারেশন কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না—হৃৎকের কথা লুকে নিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, বলেন কি আপনি, বস্ত্রায় যে আমার চক্ষিণ খণ্ডার মধ্যে এক মিনিট রেহাই নেই। একটা বড়ো নিঃশ্বাস নিয়ে ডাক্তার বললেন আপনি কিছু মনে করবেন না, কিছু আপনার বস্ত্রায় কারণ মানসিক। আপনার জীবনে কোন গোলমাল আছে—বোধ হয় আপনার দাম্পত্য-জীবনে স্বাভাবিকতা নেই। আপনার মানসিক অশান্তি থেকে দুবে পালিয়ে হাবার জন্মে আপনি আসছেন আমার ছুরীর অস্ত্রাচারের কাছে। তা ছাড়া অতীতে আপনার অতগুলো বার্ষিক অস্ত্রোপচার আমার কথাটাই প্রমাণ করছে। আমার মতে যে টাকা অপারেশন করতে খরচ করবেন, সেই টাকা দিয়ে কোন মনোবিজ্ঞানীর (psychopath) এর পরামর্শ নিন। যদি চান ঐ লাইনের ভালো একজন চিকিৎসকের নাম আমি আপনাকে বলতে পারি।

ভদ্রমহিলা বেশ বুদ্ধিমতী। সাধারণ লোকের এক্ষেত্রে রাগ হবার, কথা, এবং মনে হওয়া সম্ভব যে ডাক্তারের কোন প্রতিভা নেই, সে একেবারে বাজে। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা ডাক্তারের পরামর্শ মতই কাজ করলেন—তিনি ভাগ্যগুণে একজন প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানীর কাছে পৌঁছে গেলেন যিনি বিশেষভাবে মানসিক কারণে অস্ত্রোপচারের সবচেয়ে বহু দিন ধরে পূর্ববর্ণা করেছেন। তিনি ঐ ভদ্রমহিলাকে খুব ভাল ভাবে পরীক্ষা করে এমন পরামর্শ দিলেন যে কণী শুধু নিদারুণ শারীরিক বস্ত্রা থেকে মুক্তিই পেলেন না, তা ছাড়া মানসিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি থেকেও রেহাই পায় গেলেন। আজকে তাঁকে সুস্থ বলাই চলেতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রে শীর্ষস্থানীয় বীর্য, তাঁরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এই যে মানসিক কারণের জন্মে অনাবৃত্তক অস্ত্রোপচার অত্যন্ত বৈধ হচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার জেমস সি ডয়েল (Dr. James C. Doyle) ৬২৪৮টি আশিক ও পরিণত হিসটিরিয়া আক্রান্ত কণীকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, পাঁচজনের মধ্যে দু'জন কণীর অনাবৃত্তক অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। প্যাথোলোজিষ্টরা প্রকাশ করেছেন, শরীর থেকে অপারেশন করা অনেক অবরব একেবারে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বিশেষ করে ডোয়েলের। তাঁদের ব্যাপারে এত অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার হয় যে কোন দল ডাক্তারই ও বিবরে হাত দেবেন না।



একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এপেনডিসাইটিস-এর ৩৮৫ জন কণীকে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তাঁর মধ্যে ২২৫ জনের এপেনডিসাইটিস হয়নি—এ সব ক্ষেত্রে তুল রোগনির্দিষ্ট (diagnosis) হয়েছে।

উক্ত ডাক্তার প্রকাশ করেছেন যে ঐ ২২৫ জনের মধ্যে মাত্র দু'জনের পেটের ব্যথা সেয়েছে এক শতকরা ২৪ জনের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে।

আরও আশ্চর্যের কারণ হচ্ছে এই যে অনেক কণীর ২১ বার অপারেশন করিয়েও রোগ থেকে অব্যাহতি হয়নি। একজন একুশ বৎসর বয়স্ক ভদ্রমহিলার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তিনি ঐ রোগেই আটটা বার বড় রকমের অস্ত্রোপচারে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

মানসিক রোগী অনেক আছেন বীর্য তাঁদের মনোবৈকল্য ভোলবার জন্মে অপারেশন টেবিলে পৌঁছে যান। তবে একটা কথা বোঝা যায় না—ডাক্তাররা কেন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও কণীদের শরীরের অংশ কেটে বাদ দেন?

এখন অবশ্য অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এতোকে প্রসিদ্ধ হাসপাতালে কোন কণীর শরীরের কোন অংশ কেটে বাদ দিলে পরীক্ষাগারে সেটা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে ট্রেক করা হয় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল কিনা। অবশ্য এ ব্যবস্থা সব হাসপাতালে নেই—অনেক চিকিৎসাগারে ডাক্তাররা কারণে অকারণে শুধু ছুরি চালাতেই ভালোবাসেন।

একটা মুখিল প্রায়ই এসে উপস্থিত হয়। মানসিক কারণে অস্ত্রোপচার করতে অস্বীকার করলে কণী রোগে যায় এবং ডাক্তারের বিভ্রান্তি সত্ত্বেও তাঁর নীচ ধারণা হয়ে পড়ে।

একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের কাছে এ বকম একজন কণী ভদ্রমহিলা এসে পড়েন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিশেষ সন্তোষিত ছিলনা। অপারেশনের প্রয়োজন নেই বলতেই তিনি ডাক্তারের গুপের বিশেষ ক্রন্দ হয়ে ওঠেন এবং অস্ত্র ডাক্তারের কাছে চলে যান। সেখানে হু'তিন রকমের অস্ত্রোপচার করা হয় তাঁর গুপের, কিন্তু বস্ত্রা তার কিছুতেই কমেনি।

বৈশীর্ভাগ্য ক্ষেত্রেই দেখা যায় যৌন সখ্যকের গোলমালই মেয়েদের পেটের ব্যাধির প্রধান কারণ। তা ছাড়া ঐ কারণে অনেক লক্ষণই (Symptoms) আত্মপ্রকাশ করে। প্রচুর রক্তস্রাব, যেসকল গর্ভসঞ্চার ঐ কারণ থেকেই হয়ে থাকে। গর্ভবতী হবার ও ক্যান্সার রোগে অক্রান্ত হবার প্রবল ভয়ের জন্মে অনেক মহিলা অপারেশন করতে এক কথাতাই সন্মত হয়ে যান।

—বিজ্ঞান বাস্তব

কানপুরে রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীপূণ্ডরীক পাল

যুগাচারী শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখা বিভাগের প্রয়াস নানাহানে ইতিহাস স্মৃতি করিয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশে এক বা একাধিক শাখা বিভাগে কঠোর প্রয়াস বিষয়ক ও প্রায় প্রত্যেক স্থানের এক এক মহাশয়ের জীবনব্যাপী কঠোরত্ব ও নিদারুণ অর্থ সঞ্চয়ের মধ্যে আগ্রহের প্রতিষ্ঠা, বিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয় ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অন্তরী আত্মসত্যের পরিচায়ক।

আজ কানপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে রাষ্ট্রীয় মহাশয় বা পুজনীয় নেপাল মহাশয় জ্ঞান স্বামী নিভ্যানদের কথা।

এই পূর্বার্বে আত্মবিসম্বন্ধনের ব্রতধারী মহাশয় বারানসী হইতে আত্মমুখিত ১৯১৮ খৃঃ কানপুরে আসেন। তিনি ব্রতচারী ও অতি সাধারণ জীবন বাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণ জীবন বাপন ও উচ্চ চিন্তা ভারতীয় এই ভাবধারার তিনি ছিলেন প্রতিমূর্তি। তাঁহার অস্বাস্থ্য চৌর্য ও স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সহায়তায় কচাতিখানা মহল্লার প্রথম এই আগ্রহের সূচনা হয়। প্রথম প্রচেষ্টায় বাহারা সাহায্য করেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ শরৎ বিশ্বাস, হিষ্টিয়ারি একাডেমি অফিসের করণিক শ্রীরাধালাল জানা ও হারনেস সাতলারী ক্যান্টিনের শ্রীভূষণ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

মাত্র দশটি টাকার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও ছাত্রাবাসের উদ্বোধন হয়। এই সময় ছাত্রাবাসে মাত্র চারজন ছাত্র বাস করত। সন্ধ্যায় নিয়মিত ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকের পড়ানো হলে। ইহার পর হরিজনদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভাগ খোলা হয়। বাহারা এখানে এই সময়, সময় ও বস্তু লইয়া একাধারে সাহায্য করেন তাঁহাদের মধ্যে গ্যাস কোম্পানীর কর্মী শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বেগমসাদারল্যাবোরের কর্মচারী শ্রীসহায় ভট্টাচার্য ও ক্যানাল ডিভিশনের জীবসন্তালার নাম উল্লেখযোগ্য। শুনা যায় সেই সময় হরিজনদের জন্য সাধারণ বিভাগের লেখাপড়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

ইহার ৩/৪ মাস পরে প্রথমে হোমিওপ্যাথি লাতব্য চিকিৎসালয় এক ভাগের প্রায় দুই বৎসর পর অ্যালোপ্যাথি ঔষধেরও ব্যবহার শুরু করা হয়। হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণে ডাঃ শরৎ বিশ্বাস মনে-প্রাণে হৃদয়ের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসেন। পরে ডাঃ মনোজকুমার মিত্র ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মিশন প্রতিষ্ঠিত এই লাতব্য চিকিৎসালয়ে বহু সময় নিয়ন্ত্রিতেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ডাঃ মিত্র সর্বপ্রথম একটি আলবারী দিয়া ঔষধপত্র ব্যবস্থাপনা মিশনকে সাহায্য করেন।

রাষ্ট্রীয় মহাশয় ও অপর কয়েকজন সহযোগী কর্মীর একান্ত চেষ্টায় সেই সময় প্রায় ২৫০ ব্যক্তি আগ্রহে নিয়মিত চালা হিতে থাকেন। এই সময় ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও কিছু কিছু গৃহস্থায়ী ব্যক্তিও সাহায্য করিতে আগাইয়া আসেন। বিনামূল্যে চাহ রোগীদের চিকিৎসা কর্তব্যকারী হয় এবং ৬ জন রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় লক্ষ্যগ্ৰহ ব্যাপানে কানপুরে প্রসিদ্ধ

চান্দারী শ্রীকালীদেব নামক উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন ইন্টেনসিভাল কমিশনার ছিলেন। তাঁহার একান্ত পরিশ্রম ও অর্থ সাহায্যে মিশনের অগ্রগতিতে বিশেষ সাহায্য করে।

এই সময় স্থানীয় যুবকেরা দুই ডিগ্রি প্রবেশন করিয়া দরিদ্র ভাণ্ডারের সৃষ্টি করেন। মিশনের কর্মীরা রাষ্ট্রীয় মহাশয়ের সহযোগী ব্যক্তিকে নির্ভর করিয়া দরিদ্রকে সাহায্য দান, অসহায়ের শ্রীভায় সেবা ও বৃত্তান্তে সংকলের ব্যবস্থা এই সকল সমাজ কল্যাণমূলক কার্যে মন ও প্রাণ সমর্পণ করেন।

রাষ্ট্রীয় মহাশয় পূজাপাথ স্বামীজীর নির্দেশ অনুসারে কানপুরে আসেন। তিনি জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা করার মত লইয়াছিলেন। কাহাকেও তিনি হতু করিতেন না, কাহাও উপর তাঁহার জবরদস্তি ছিল না। কিন্তু পরিকল্পনা বাহাতে প্রকৃত জপ গ্রহণ করে সেজন্য তাহার দৃঢ়তা ও যত্নের অভাব ছিল না।

পূজাপাথ স্বামীজী এই কথা বারংবার মনে করাইয়া দিয়াছেন যে সমাজ কল্যাণকারী বা প্রকৃত কর্মীর থাকিলে দৈনিক সন্তোষ ও চারিত্রিক বৃদ্ধি। দেশের যুবকদের দৈনিক সন্তোষ বাচাতে বজায় থাকে সেজন্য এক্ষণে নিয়মিত দৈনিক ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা ছিল।

১৯২২/২৩ খৃঃ এই আগ্রহেই বিবেকানন্দ ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। বারানসী হইতে শ্রীপ্রাণগোপাল ভট্টাচার্য এই সময় কানপুরে আসেন। তিনি একজন ব্যায়ামবিদ এবং তাঁহার পেশীবহুল দেহ সৌষ্ঠব অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাণগোপাল বাবুর প্রচেষ্টায় এই সময় একটি সুন্দর ব্যায়াম অলিম্পিকারী মলের সৃষ্টি হয়। ব্যায়ামাগার স্থাপনার সাহায্যকারীদের মধ্যে ভোদনলালের নাম স্মরণীয়। তিনি এক ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন, এবং নিজেকে কবি এবং লিрик—রচয়িতা বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বিবেকানন্দ ইনিস্টিটিউটে এককালীন ৪০০ টাকা দান করেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, পূজাপাথ স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের অস্বাস্থ্য শিষ্যের বৃহদাকার আলোচ্য এই সময় তিনি মিশনে স্থাপন করেন।

কানপুরের ভদানীভদ্র কালেক্টর সাহেব মিঃ মুল্লারো প্রাণগোপাল বাবুর পেশী সন্ধান ও স্বাস্থ্য দর্শনে অতিশয় ব্যস্ত হন। তাঁহার অল্পপ্রেরণায় এই সময় মলের নিকটে 'ম্যাবে' নামে ক্রিকেট মাঠ ইনিস্টিটিউটের এক ব্যায়াম জোড়া প্রদর্শিত হয়। খরচ-খরচা বাড়ে প্রায় ২৫০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। মিঃ মুল্লারো ভারতীয় লাইট ইনস্পেক্টর বাবক দলকে এই অল্পটুকু নিয়োজিত করিয়া ইহার গৌরব বর্দ্ধন করেন।

এই সময় রাষ্ট্রীয় মহাশয় মিঃ মুল্লারোর সহায়তা লাভ করিয়া তাঁহারই নির্দেশে সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। এবং মিঃ মুল্লারোর সহায়তায় বার্ষিক ৮০০ টাকার মত সাহায্যের ব্যবস্থা হয়।

আশ্রয় এই সময় মলের নিকটবর্তী রোজা বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। তখন আবাসিক ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ জন। কানপুরে প্রবাসী বাবলীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০। বহু বাবলী এই সময় নিজদের কর্ম অল্পটুকুর পর মিশনের কোন না কোন কাজে আত্মনিয়োগ করিতেন।

রাষ্ট্রীয় মহাশয় এই সময় বর্তমান মিশন ভবনের পশ্চিমভাগে নিজে অধিষ্ঠিত করিয়া বাসিয়াছিলেন অল্পকাল ব্যক্তির নিকট তিনি এই পশ্চিমভাগ ভগ্নাবশেষ প্রায় ১৯১৩ বৎসর পূর্বে যত

করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ খৃঃ বার্ষিক নগরে সেই পরিচালনা আদালতে আশ্রম নির্দিষ্ট হয়। প্রায় ২০ বৎসর অল্পাত সাধনা করিয়া তিনি বর্তমান বিশ্বনের রূপ বিরাছেন। পূজাপাণ মহারাজেরা অবত সর্ব সময়েই বলিয়া থাকেন যে জীষ্টিষ্ঠাকুরের কার্য তিনিই করেন। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তিগত নমস্ত বীহাদের অল্পাত যৈষ্য ও পবিত্রমে এই সব আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীষ্টিষ্ঠাকুরের ভাব প্রচারে সহায়তা করে। এখন অবত এই আশ্রমে অল্পাত আশ্রমের মতো বহু গণ্যমাত পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। বর্তমান বার্ষিক বিভাগের প্রায় ৫০০ জন ছাত্র পড়াশুনা করিতেছে। কানপুরের ইহা এখন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলা চলে। এই বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতা ও পরীক্ষার ফলাফল সত্যই আজ গোঁরবেব বহু। এই বিদ্যালয়ের বর্তমান বার্ষিক আয়-ব্যয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা, কিন্তু আশ্রমের বিষয়, ৫০০০ টাকার বেশী কাহাও এককালীন দান নাই। মাতার মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিলে তাঁহার দুইজন স্নেহাঙ্গ্য শিষ্যের কথাও মনে করিতে হয়। জীষ্টিষ্ঠাকুরের আশীর্বাদ ইহারা দুইজনেই জীবিত এবং মাতার মহাশয়ের জীবনব্যাপী সাধনার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। প্রথম উল্লেখযোগ্য পূজাপাণ বাদী চিদাম্বানন্দ বা অলপী মহারাজ। ইনি বর্তমান বিশ্বনের সহস্রাব্দিক ও এক কথায় বর্তমানে এই আশ্রমের কর্তার, জীরাধিকৃষ্ণ দ্বি-বিশ্বনের উচ্চশিক্ষিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তিনি একজন। জীরাধিকৃষ্ণ কথাসুত্রে হিন্দু ব্যাখ্যায় ইনি সর্বদা সকলকে মুক্ত করেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি জীপাতিরাম, বর্তমান বার্ষিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষা ইহার ব্রত এবং ইনিই এই শিক্ষা-মন্দিরের প্রকৃত উত্তরধর।

ফানশুয়ের এ, ডি বিভাগের ডকম প্রাথমিক গণনাশালা ছিল, তাঁহার নিষ্ঠা ও সেবার এই বিভাগের প্রেক্ষিত উন্নতি হয় এক প্রায় ১৯৩১ অবধি তিনি এই বিভাগের সেক্রেটারি পদভূক্ত থাকেন।

খ্রীষ্টাঙ্করের প্রতি অবচল নিষ্ঠা ও বিশ্বাস তাঁহার কিরণ ছিল খ্রীষ্টাঙ্করের জন্মতিথি উৎসবের সময় তাহার কতবার কত রকমে প্রকাশ পাইয়াছে, একবারের কথা তদানীন্তন কন্যা খ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট জনিয়াছি, সেবার বখারীতে ২০০০/৩০০০ দরিদ্রনারায়ণকে খাইবার জন্ত বখারীতে টিকিট দেওয়া হইয়াছে, দরিদ্রনারায়ণদের পূর্বেই টিকিট বন্টন করিয়া দেওয়া হইত। সমস্ত কয়টি খানার রাজ্যের প্রায় মূল পর্য্যন্ত দরিদ্রনারায়ণদের হয়বার বসাইয়া পেট ভরাইয়া খাওয়াত। হইত। খাওয়াবার জন্ত বরাদ্দ হইত পুরি, একটি তরকারি ও লাড্ডু, কর্ম্মার দেখিলেন এত লোকের খাত হিসাবে ছিল মাত্র একবস্তা আটা ও আয়ুসজ্জিক জিনিষপত্র। তাঁহার অভিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং বায়বায় মাটির মহাপণকে ভাঙায়ে অবস্থার কথা জানাইলেন এবং তাঁহাকে পুনঃপুনঃ উত্থাপ্ত করিয়া তুলিলেন, মাটির মহাপণের বিশ্বাস কিন্তু অবল, বোধ হয় পূজাপাদ স্বামীজি ও অজ্ঞাত গুরুভাইদের প্রথম জীবনের মঠের কথা মনে হইয়া থাকিবে, শুনা যায় খ্রীষ্টাঙ্করের ইচ্ছা হইলে খাইব, অথবা উপবাস করিয়া থাকিব কাহারও নিকট কিছু চাহিব বা বলিব না, এইরূপ স্থির করিয়া স্বামীজি ও তদানীন্তন অজ্ঞাত গুরুভাতারা পূজাপাঠ শেষ করিয়া চান্দর বুড়ী দিয়া ভাইয়া রাখিলেন, কয়েক ঘণ্টা পর কেহ ঘরে খাড়া দিতে লাগিল, স্বামীজির আজ্ঞায় দরজা খুলিতে দেখা গেল লালসাব্যুহ বাড়ীর পূজার প্রচুর প্রসাদ লইয়া একটি লোক সাধু মহারাজদের দিতে আসিয়াছে। এইরূপ অসংখ্যবার খ্রীষ্টাঙ্করের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া বহু সন্তান তাঁহার কৃপা দেখিয়া বিম্মিত হইয়াছেন। নেপাল মহারাজও কর্ম্মীদের ২৫৬ ঘণ্টিতে বসিলেন। তিনি অভয় দিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন যে ঠাকুরের কাজ খ্রীষ্টাঙ্করই করিয়া দিবেন। কর্ম্মারা সেদিন অবাক বিষয়ে দেখিয়াছিলেন যে কিরূপ ভাবে বস্তা বস্তা আটা ও আয়ুসজ্জিক জিনিষপত্র একের পর এক রসবদার পৌঁছাইয়া দিতে লাগিলেন। কালীব্যু বলিলেন, আমরা বিম্মিত হইলাম যে মাটির মহাপণের অদ্বা বিশ্বাসের জয় হইল, এবং এই দরিদ্রনারায়ণ ভূপ্তির সহিত ভোজন করিল এবং কোনও জিনিষের অভাব হইল না।

আর্থনিক ছাত্রদের প্রতি তাঁহার অসুযোগ বিরাগ প্রবল ছিল তাহা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ১৯৩৩ খৃঃ বা ঐ সময় আর্থনিক ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫ জন। তাহার ছিল সকলেই দরিদ্র এবং মিশনের স্বল্প আয়েই সকলের ভরণ পোষণ চালাইতে হইত। মাষ্টার মহাশয়ের সমস্ত আয় মিশনে ব্যয়িত হইত। অলপী মহাশয়ও শিক্ষকতা করিয়া প্রায় ১০০ টাকা পাইতেন। এক তাহার সমস্তটাই মিশনের কাষে ব্যয়িত হইত। আর্থনিক অনটনের জন্য অলপী মহাশয় প্রার্থে মাষ্টার মহাশয়ের একান্ত অনুগত কর্মীরা অসুযোগ করতেন ও ছাত্র সংখ্যা কমাইবার জন্য বাস্তবায় মাষ্টার মহাশয়কে অনুরোধ করিতেন। মাষ্টার মহাশয়

বিত্ত বোধ করিতেন। শান্ত জীবনের জন্ম উনি বিতর্ক হইতে বিবর্তিত থাকিতেন। অক্ষয় বলিয়া তিনি এই অবস্থার জন্ম জীবন মানসিক কষ্ট অনুভব করিতেন কিন্তু শ্রীশ্রী ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অবিচল আস্থা জন্ম তিনি কিছুতেই এই মহা কর্তব্যবোধ হইতে বিবর্তিত হইতেন না। তিনি কাহাকেও এই অভাবের কথা বলিতে পারেন নাই কিন্তু নিঃস্বপ্ন মনস্তাপে অতিশয় অধীর হইয়াছিলেন। এই নিদ্রাঙ্গণ অর্ধ সন্ধ্যার সময় কোনও উপায় না দেখিয়া তিনি অঙ্গ সকলের অভ্যন্তরে এক কাবুলিওয়ালার নিকট অর্ধ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুকী দয়া এবারেও সফলকে বিদিত করিল। পরদিন কানপুরের বনামঞ্চ ব্যবসারী শ্রীকমলাপতির জননী প্রায় একশাসের মত চাউল, ডাইল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তখনকার মত অর্ধ সন্ধ্যা হইল।

প্রায় এই সময় আর একবার ৩৩শ পূজার আশ্রমবাসী ছেলেদের নূতন কাপড় জামার কোনও ব্যবস্থা করা হইয়া উঠে নাই। মাষ্টার মহাশয় অতিশয় চিন্তিত কিন্তু তাঁহার স্বভাবজাত শাস্তমুখির কোনও পরিবর্তন প্রকাশ পাইল না। তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না এবং কাপড় জামা যোগাড় করিবার কোনও উদ্যোগ করিলেন না, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ তিনি নিজেই করেন, ৩৩শার দুই দিন পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবাচিতভাবে মিশনে আসিয়া নগর ১০০ টাকা ছেলেদের জামা কাপড়ের জন্ম দিয়া গেলেন। মাষ্টার মহাশয়ের আনন্দ স্নিগ্ধ হস্তে ভরিয়া গেল এবং তাঁহার সমস্ত অবরোধে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস ও অবিচলিত মনোভাবের প্রকাশ পাইল। মাষ্টারের দোষ না দেখিয়া তাহাকে ভালবাসা বা শ্রীশ্রীনাট্যাকুরাণীর কথার অপরের দোষ না দেখিয়া নিজের দোষ দেখা এবং সমস্ত জগৎকে ভালবাসা, এই অনুশাসনটি নেপাল মহারাজের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল।

কালীবাড়ী বলিলেন, একবার মিশনের চাঁদা তুলিয়া প্রায় ৬০ টাকা। একদিনে এত চাঁদা উঠাইতে পারিয়া তারি আনন্দ হইল। এর পরে ক্লাবঘরে টাকাগুচ্ছ জামা টালিয়া রাখিয়া খোলাধুলা করিয়া, পরে পুনরায় জামা গায়ে দিয়া বাড়ী আসিয়া জামা তুলিয়া রাখিল। টাকার কথা মনে নাই। পরদিন নেপাল মহারাজের নিকট টাকা জমা দিতে গেলাম। মন-মেজাজ দুই-ই খুশী, কারণ স্বাপেক্ষা বেশী আদায় আমিই করিয়াছি। কথাটা গর্ব ভরিয়া সকলকে বলিলাম এবং মাষ্টার মহাশয়ের নিকট আদায় করিয়া মিষ্টি খাইতে চাহিলাম। মাষ্টার মহাশয় স্নিগ্ধ হস্তে রাজি হইলেন। তখন টাকা বাহির করিতে গিয়া দেখি, পকেটে টাকা নাই। ক্লাব ঘরেই কেহ টাকাটি আশ্রয় করিয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম এবং দানার নিকট হইতে টাকা লইয়া পুনরায় নেপাল মহারাজের নিকট গিয়া টাকাটা তাঁহার হস্তে দিলাম। আমার দান মিশনের চাঁদার টাকা হারাইয়াছি তুমি তৎক্ষণাৎ

তাহা দিলেন। মাষ্টার মহাশয় পূর্ব বীজিত অনুভবী মিষ্টি আদায় পাওয়াইলেন এবং পরে অনুভব পাওয়া গিয়া আমাকে ৬০ টাকা এবং দিয়া দেহভরে বলিলেন, টাকাটা তুমি এখন হারিয়ে কেনেছিস তখন আর কি করে দিবি। এ টাকার দরকার নেই। আমি অর্ধ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বলিলাম, মাষ্টার মহাশয় তা হতে পারে না। মিশনের জন্ম সাধারণের কাছ থেকে উঠিয়াছে। এটা হারিয়ে গেলে বা চুরি গেলে আমাকেই তার খোঁজ করতে হবে। মাষ্টার মহাশয় সেইরূপ স্নেহপূর্ণ ঘরে বলিলেন, তোরা তো সব সয়েই মিশনের জন্ম এত পরিচয় করছিস, এ টাকাটা খোঁজা বাওয়া কি আর এমন কঠিন হবে। এ টাকাটা তুমি বাড়ী নিয়ে যা। আমি মিশনের বাহিরে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। মনটা যেন কিরণ হইয়া গেল। আমার চক্ষু জলপূর্ণ হইল এবং মাষ্টার মহাশয় কি করিয়া ধারণা করিলেন যে, আমি টাকাটা হারাইয়া ফেলিয়াছি তাহা ভাবিয়া বিবর্তিত হইলাম। তাঁহার স্নেহপূর্ণ এবং একান্ত আপন জনের মত ব্যবহার আমাকে অভিভূত করিল।

আমার মনে পড়িল এইরূপ মহাশয় বিবর্তিত আমি বড় ক্লান্ত করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে বাহ্যতে ভালভাবে দৈহিক নির্ধাতন করিতে পারি সেজন্য চেষ্টা হইয়াছিল। আমি এ মুহূর্তে আমার মনে হইল মাষ্টার মহাশয়ের পারে ধরিয়া যেন কিছুক্ষণ অঙ্গ বিসর্জন করি।

পূজাপাদ মাষ্টার মহাশয় কখনও কখনও বলিতেন, ওরে বেশীকণ ধ্যান ও জপ যদি না করতে পারিস দিনান্তে একবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিস, আমাকে সাহায্য করে দাও, এতেই কাজ হবে।

মাষ্টার মহাশয় আর ইহজগতে নাই। নবনির্মিত আশ্রমে বসবাস করার পর ১৯৪৩ খৃঃ কেমার বন্দী বাতায় মানসে তিনি কানপুর ত্যাগ করেন। কানপুর উপত্যকার পৌছাইবার পর তাঁহার মনে হয় শ্রীশ্রী তাঁহাকে ইহজগৎ ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি হরিদ্বার আশ্রমে ফিরিয়া আসেন এবং অকস্মাৎ সন্ধ্যা রোগে আক্রান্ত হইয়া ৩০শ মে ১৯৪৩ খৃঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীনাট্যাকুরাণীর পাদপদ্মে লীন হন।

পূজাপাদ শ্রীশ্রী বসিয়াছিলেন, বাহ্যিক পদের জন্ম জীবন বারণ করেন তাঁহারই প্রকৃত জীবন বারণ করেন মাষ্টার মহাশয়ের জীবনে এই অনুশাসনের প্রকৃত অর্থ প্রতিকলিত হইয়াছে। রাসকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার বহু ত্যাগী মনীষীর অলিখিত জীবনের একটি লিপিও হইল। নিজ ইষ্টদেবতা বা ইষ্টপথ অনুশীলনে ধূশ মত নিজেকে সমর্পণ করা ও কোনও রূপ স্বার্থে নিজেকে বিচলিত না করিয়া অধ্যাত ও অভ্যাত থাকিয়া নিজেকে আজীবন পরার্থে সমর্পণ করার এই দৃষ্টান্ত মনকে প্রভাবিত আগ্রহ করে এবং এই সমস্ত মহাপুরুষদের চরিত্রে বারবার মস্তক আনত করিতে ইচ্ছা করে। কানপুরবাসী সকলের সহিত এই মহাশয়ের চরিত্রে আমার প্রাণময় জানাই।

[মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য]



মাছ ধরা—রকমারী পদ্ধতি

বিভর্তনবাদ অনুসারে মাছ পোনা মাছের আদি পুরুষ—মস্ত্র থেকেই কৃষিক ধারার মনুষ্য—কিন্তু এমনি পাড়িয়ে গেছে—জাল নয়, মরণাতীত কাল থেকেই, সেই মাছট মাছের একটি প্রধান খাদ্য-সামগ্রী। জল থেকে ডাকে ডালার ভোলবার জন্যে মাছের রকমারী পদ্ধতি তাই চালু করেছে—মাছ ধরাটাই পরিণত হয়েছে তার একটি মস্ত নেশার ও পেশার।

জলের বাসিন্দা এই মাছ—পুকুর, খাল, বিল, হ্রদ, নদী, সাগর, সব জায়গায় এর রাজ্য ছড়িয়ে। হুলের অধিবাসী মানুষ একে ধরবার জন্যে সব সময়ই ব্যস্ত। কিন্তু ইচ্ছে করলেই সে হাতে ধরা দেবার পাত্র নয়; ধরবার কৌশল খুঁজে বের করা সুরু হয় এরই কারণে। অল্প জলে নিহুত হাতে পারে চেপে মাছ ধরা আপো অনেক জায়গায় চলতো, এখনও যে না চলে এমন নয়। তবে এই পদ্ধতিটি উল্লেখ করার মতো কিছু হতে পারে না। কারণ, এত সময় দিয়েও করুটি মাছ ক'জন্যের পক্ষে কবলিত করা সম্ভবপর?

পল্লী-এলাকা যেখানে জলাভূমি বেশি, সে সব জলে দেখতে পাওয়া যায়, কত অভিনব উপায়ে মাছ ধরা চলেছে। ছিপ-বড়শি সাহায্যে, জালের সাহায্যে মস্ত্র শিকার প্রায় সর্বত্র এই ব্যবস্থা চলতি বলা যায়। বড়শি-ছিপ যেমন রকমারী আছে, মাছ ধরা জালও আছে বিভিন্ন ধরনের—যেখানে যেটি সুবিধাজনক, সেখানেই সেইটির ব্যবহার। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে টোপ (নানা জাতীয়) কেলেতে হয়—সুদূর মাছ তা গিলতে বেয়েই বহুপিতে আটকে পড়ে। নানা ধরনের চাব কেলে বসে থেকে ছইল (চাবকি) ছিপগুলিতে মাছ ধরায় সাধারণতঃ আনন্দ হয় প্রচুর এবং এ পদ্ধতির ব্যয়ছাটি বহুদিন থেকেই চলতি।

মাছ-ধরার জাল নানা দেশে নানারকম দেখতে পাওয়া যায়। সব জালে সব রকমের মাছ ধরা পড়বে, এমনটি আশা করা চলে না। আবার, যে-জালে পুকুরে বা খালে বিলে মাছ ধরা হবে, নদীতে বা সাগরে সে জাল স্বভাবতই আকেকো। পদ্মা বা গঙ্গার মাছ-ধরা পদ্ধতি বা সরঞ্জাম একটু ভিন্ন ধরনের লক্ষ্য করা যায়। দেশাঙ্কলে 'কহুই জাল' (ছোট) 'ধর্ষজাল' খেয়া জাল, বেড় জাল (বড়)—এ সব রকমারী জাল চালু। বেড় জালে যেখানে জাল জলে টেনে নিয়ে মাছের ঝাঁককে ঘেরাও করতে হয়, কহুই জাল ঠিক ঐ ধরনের বলা চলে না। শ্বেবোক্ত

জালটি বাতবন্ধন থেকে ছুঁড়ে কেলেতে হয় জলে, তারপর আবার সেটি গুটিয়ে আনতে হয় একটু সময় পরই।

মাছ ধরার পদ্ধতি বা সরঞ্জাম এ দেশের পল্লী অঞ্চলেই আরও নানা ধরনের দেখতে পাওয়া যায়। 'পলো', চাই শড়কি, বল্লম—এ সবের মারকতও বহু জায়গায় মাছ শিকার করা হয়। 'পলো' (বাঁশের তৈরী) দিয়ে বাঁপিয়ে মাছ ধরা হয় জল থেকে, তবে খুব গভীর জলে এ ব্যবস্থার কাজ চলে না। চাই এক প্রকার মাছ ধরা কঠিন কাঁদ—জলে বাঁশের তৈরী এ জিনিসটি পেতে রাখা হয়। মাছ এতে ঢুকতে পারে, কিন্তু ঢুকলে বের হবার পথ খুঁজে পায় না। শড়কি বা বল্লম মাছ কোথায় আছে নিশ্চিত হয়ে, তবে ভীরের মতো ছুঁড়তে হয়। বল্লম আবার এক কলক, যা একাধিক কলক বিশিষ্টও হয়ে থাকে।

নৌকাযোগে নদী বা সমুদ্র থেকে সুবহু জালের সাহায্যে মাছ ধরার পদ্ধতি চলতি আছে অনেক দেশেই। উপকূলবর্তী অঞ্চলের বীরসৈন্য এই ভাবে মস্ত্র শিকার করতে প্রায়শঃ দেখতে পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য মাছ ধরার নানা বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা অনুসরণ করা হচ্ছে। এ সকল ব্যস্তিক সরঞ্জাম নিয়ে ভুর, পরিয়ায় বেয়েও অনেকটা সকলতার সঙ্গে মাছ ধরা সম্ভবপর। জাপান, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে মাছ ধরবার বাপায়ঃ বিভিন্ন পদ্ধতি চালু আছে। এমনও দেখা যায়, যেখানে বড় বড়সিঁড়ে মাছ হয়তো ধরা হলো, কিন্তু সেই মাছকে অমনি হাতে পারান্ন কমতা নেই। উপায় কি হতে পারে? অমনি দেখা হবে, মস্ত্র শিকারী একটা বল্লম ছুঁড়ে মেরেছে সেই মাছটি লক্ষ্য করে—বল্লমের অপর দিকটিতে রয়েছে একটি বরার সরঞ্জাম, যেটি জলে ভেসে থাকবেই। অমনি কেহে লড়াই দিয়ে দিয়ে একটি মুহূর্তে হার স্বীকার না করে মাছ পায়ে না।

গভীর সমুদ্রে মস্ত্র শিকারের জন্যে আর সব দেশের জাহাজ শক্তিময়ল ও উন্নত ধরনের পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে চালু করছে। হল্যাণ্ড থেকে এথানিকার সরকার কয়েকখানি মাছধরা জাহাজ ক্রয় করেছেন। ট্রান্সের সাহায্যে মাছ ধরতে বেয়ে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন, প্রথম থেকেই তাঁদের এই দাবী। কোন কোন দেশে বিজ্ঞান সম্মত এমন পদ্মা অনুসরণ করা হচ্ছে—বা সত্যি অভিনব। সাবমেরিনের মতো একটি জাহাজকে সাগর-জলের নীচ দেশে বুয়ে বেড়াতে পাঠানো হয়, মাথায় শক্তিশালী কোকাস আলোতে মাছ কোথায়, জলের তলা থেকে নির্দেশ দেয় এ উপায়ে মাছকে। তারপরই বাস, মাছ ধরা আর ততটা অন্তবিধের হয়ে থাকলো না।

হাজারো রকম পদ্ধতিতে মাছ ধরা যায়, কিংবা ধরা হচ্ছে, এ আমরা নিশ্চয়ই মনে নেব। এর ভেতর একটি বিশেষ পদ্ধতি উল্লেখ করা যায়—যেটি নিয়ে পানুয়া ও নিউগিনির স্থানীয় বাসিন্দারা পরীক্ষা চালিয়েছেন বীধিনি। এই পদ্ধতি বা কথ-কোশলের মূল অঙ্গ হলো একটি করে মাকড়শার জাল। এখানে জালবুনন কাজটি যে মাকড়শা করছে, বুঝতে হবে সে বিরাট আকৃতির। এই আঁটালো জালে (কাঁদ) জড়িয়ে জলের দৃষ্টি মাছ আটকা পড়ে যায় অমনি। বড়ো হাওরা খাকাকালীন সাগরজলে হুড়ির সহায়তায় মাছ ধরার পদ্ধতিও সে সব দেশে অমুস্ত হয়ে থাকে। তীর-বন্ধক মায়ফত মাছ ধরার রীতি চালু আছে দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি জায়গায়। উক্ত মাছ আটক করার জন্যে কয়েকটি অভিনব উপায় অমুসরণ করা হয় ওয়েই ইতিহাসে। চীন, মালয়, জাপান প্রভৃতি দেশে মৎস্য শিকারে ট্রেনিং দেওয়া পাখির সহায়তা গ্রহণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে এবং অজ্ঞ আরও কতক জায়গায় রাত্রিতে জোর আলো জালিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে মাছ ধরা হয়।

একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মাছ ধরা পদ্ধতি চালু করেছে স্ট্রিপ মেনটিয়েথ লেক (ড্রন) অঞ্চলের যুব বাসিন্দারা। তারা লেকের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের (ইকুমাহোম) ওপর কতকগুলি মাছাঙ্গাসকে নিয়ে যায়। হাঁসগুলির পায়ে পায়ে টোপসমেত বড়শির লম্বা জড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর ছাড়া হয় ওদের জলে একই সঙ্গে। অলক্ষিত্যে শেষ করে ওরা লেক পার হয়ে বাড়ি কিংবা রাস্তা এক সময় ব্যস্ত হয়। ইত্যবসরে কিছু কয়েকটি করে 'পাইক' মাছ আটকিয়ে পড়ে রাজহংসগুলির পায়ে পায়ে। মাছে ও পাখিতে অমনি লড়াই বেধে যায়। অল্পকণ বেতে না বেতেই মাছকে হার দীকার করতে হয়, আর আনন্দোচ্চাস করার একটা মন্ত সুযোগ মিলে যায় যুবকদের।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ষাণ্ডারার জেইই মৎস্য শিকার বা মাছ ধরা, এর ওপর কেউ প্রায় তুলবেন না। কিন্তু তবু বলতে হবে—বাঙালি হিসাবে মাছ ধরাবান হলেও এ খেঁকে প্রাপ্ত সার, তৈল, হাত প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তাও উপেক্ষা করার নয়। বিশ্বময় মাছের বিপুল চাহিদা মেটাবার জন্যে মাছের চাব বাড়ানো প্রয়োজন যেমন প্রয়োজন মাছ ধরবার আরও নতুন নতুন উপায় বা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিকার।

চা ও ককির ব্যবহার

আজকাল এমন বেশ প্রায় বুঝে পাওয়া যাবে না, যেখানে চা-এর প্রচলন নেই। ককিও নগরী বা বড় বড় সহরগুলিতে তো বটেই, আরও বেশ দূরবর্তী অঞ্চলেও হুড়িয়ে পড়েছে। মোটের ওপর এ হুগো পানার হিসাবে চা ও ককির ব্যাপক ব্যবহার চলতি আর এ সত্যি বাস্তবে বই, কখনই কমবে না।

ককির জন্যে হলেও চা ও ককি দু-এরই একটু ঘাটতি আছে, এ স্বীকার্য। অতঃত বিষয়ে পড়া দ্রষ্টব্যগুলিকে সচেতন করে তুলতে এক কাপ চা ও ককির মূল্যই সময়ে কম নয়। এ অজানা নয় যেইটি চা-এর নেশা থাকে একবার গেলে বসেছে, তার পক্ষে সেক্ষেত্রে সহসা ছাড়তে বাওয়া হুড়িলের ব্যাপার। তেমনি প্রত্যহ ককি পান করে বাবা অভ্যস্ত, ইচ্ছামাত্র ককি ছাড়তে পারেন না তারা। ককি বা চা-এর নেশা বলতে আসলে এই—স্নায়ুতরিক্ত খেতে পেলে এতেও অব্যক্তি বিপদ আসবার কারণ হয়।

আজকের দিনের মতো ধরে ধরে চা এসে পৌঁছতে বেশ কয়েক শতক সময় লেগেছে। প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে চীনা চা-এর নেশার বৃত্তের তুলনার বেশি রকম মন্ত। জল হুড়িয়ে ষাণ্ডারার যে নিয়ম বা পদ্ধতি, এ বোধ হয় চীনেই প্রথম চালু হয়। এখন দেখা গেলো সারা হুড়ি জলে সুবিধা হচ্ছে না, তখনই তাতে ওরা লতা-পাতা মিশিয়ে খেতে শুরু করে। খেতে যেয়ে দেখতে পায় তারা একটি বিশেষ পাতার পানীয়টি তাদের সুবাস্ত্র হয় বেশি আর এ পাতাটিই হলো কিচু চা পাতা।

ককির ব্যবহার কিভাবে চলতি হলো, সেই নিয়েও কথা-কাহিনী ঠিক কম নেই। একটি কাহিনী—সেকালের আবিসিনিয়ার একজন মঠাধ্যক্ষ দেখলেন তাঁর পালিত ছাগগুলি বখেটে তাজা, অখণ্ড মঠের বাসিন্দারা সবাই নিভেজ, উপাসনা করতে যেয়ে তাদের বখন তখন ঘুম গেলে যায়। বিশেষ নজর দিতেই মঠাধ্যক্ষের দৃষ্টিতে পড়লো, সন্নিহিত একটি গাছের পাতা (ককি) খেয়েই মঠের ছাগগুলির এমনি স্বাস্থ্য। সেই পাতা-মঠের সকল বাসিন্দাই তৎপরব্যবহার করতে শুরু করেন, ফলশ্রুতি নিশ্চয়ই পেলেন যার জন্যে প্রচার গেলে যায় ব্যাপারটি দূর দেশেও।

চা ও ককি ক্ষেত্র বিশেষে গুরুত্বের ও কাজ করে থাকে, পরীক্ষাতেই দেখতে পাওয়া যায়। শ্রমজীবী দূর করে সাময়িকভাবে হলেও ঘনে সৃষ্টি এনে দিতে, দীর্ঘ সময় ধরে বিশেষভাবে অধিক রাত্রি অবধি কাজ করবার শ্রম জোগাতে, এ হুই-এর ক্ষমতা নিশ্চয়ই বখেটে। শীত-গ্রীষ্ম—সকল আবহাওয়াতেই এদের ব্যবহার চলে এবং প্রথমেই বা বলতে চাওয়া হলে, মাত্রা রেখে খেলে এতে সাধারণতঃ শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। বেশিরভাগ হয়তো মাথা ধরছে কিংবা গাংহাত-পা ব্যথা করছে অসম্ভব, এমন সময় পরম গরম এক পেয়াদা চা বা ককি প্রত্যিবেশকের কাজ কঃতে পারে।

এক্ষেণে দেখা যাক—ভারতে চাহিদার তুলনার চা ও ককির উৎপাদন অবস্থা কিরূপ? এ কথা ঠিক, এদেশে চা-এর এমনি ব্যাপক ব্যবহার চালু হয়েছে, দীর্ঘকালের ব্যাপার নয়। তবু হিসাবে দেখা যায় পৃথিবীর মধ্যে চা-উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম পর্ষায়। এর ভেতর শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ চাইই পশ্চিমবঙ্গ (দার্জিলিং ও তুয়ান অঞ্চল) ও আসামের বাগানগুলিতে উৎপাদিত হয়। চা উৎপাদনের অপর কেন্দ্রগুলি—বাঁচী, হাজারাবাগ, হোটাগপুর, পাঞ্জাবের কাংরা উপত্যকা, উত্তর প্রদেশের দেওয়াহন, মুম্বাই প্রভৃতি এলাকা মাত্রাভের দীর্ঘগিরি অঞ্চল, কেয়লা রাজ্য, মহীশূর ও ত্রিপুরা প্রভৃতি।

ভারতীয় চা-এ ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে অপর্যাপ্ত হতে পারে না। এখানে উৎপাদিত চা-এর (বেয়ন, ১৯৫৬ সালে ৬৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড) শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই বাইরে রপ্তানী হয়ে যায় আর চা রপ্তানী ব্যাপারে ভারতের স্থান বিশ্ববাসিত্যে ক্ষেত্রে একবারে প্রথম। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও আয়ারল্যান্ডে ভারতীয় চা রপ্তানী হয় যেটি রপ্তানীর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ। যুক্তন ভারতীয় চা-এর একটি মন্ত বড় বাজার। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও চা রপ্তানী হয়ে যায় এখান থেকে কম নয়।

এদিকে ককি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান কিন্তু প্রথমও অনেক তলার দিকে। এখানে মহীশূরেই অব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ককি উৎপাদিত হয়—এর পর নাম করতে হয় মাল্লারের। ১৯৫৪-৫৫ সালের একটি হিসাব—ভারতে ককি উৎপাদনের মোট

পরিমাণ ছিল সে বছরে প্রায় ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ পাউণ্ড। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যান্ড, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতীয় কফি রপ্তানী হয়ে যায় অনেক আগে থেকেই।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চা ও কফির একটি প্রকাণ্ড বাজার ইউরোপ; ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতকে চা খাওয়ার রীতি চালু হয়, তবে প্রথম পর্যায়ের সেটি ছিল অভিজাত মহলের বিলাস স্বরূপ। ইউরোপের মাটিতে কফির ব্যবহার চলতি দেখা যায় বোড়শ শতাব্দীতেই এবং সপ্তদশের বৃহৎ দোকান খুলে কফি বিক্রী শুরু হয় ১৬৩২ সালে। এক্ষণে ইউরোপের বাজারে কফি ও চা-এর অভাবই নেই। চা ও কফির বাজার বিধে এখনও প্রচুর সম্প্রদায়ের সুযোগ রয়েছে, এ সহজেই অনুমের।

কৃষি বিপণন ও ভারত

স্বর্ণ-স্বর্ণাকাল ধরে ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ বলে পরিচিত। স্বাধীন হওয়ার পর শিল্পায়নের উত্তম চললেও এখন অবধি কৃষিই ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান অঙ্গ। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা ব্যাপক ভাবে এখানে চালু করার প্রয়োজনীয়তা তাই খুব বেশী।

কৃষি বিপণনের দিকে সরকারী সক্রিয় দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, আজ প্রায় ২৫ বছর হলো। এই সময়ের ভেতর আলোচ্য ব্যবস্থার অগ্রগতি বিরাট রকমের কিছু হয়নি বটে, কিন্তু সেদিকে যে অব্যাহত চেষ্টা রয়েছে, এই বড় কথা। একটি সরকারী হিসাব থেকে বিপণন ব্যবস্থার এ যাবৎ ১১৫টি-পণ্যের মান নির্ধারিত হয়েছে, জানতে পারা যায়।

বিক্রয় মারকত কৃষিজীবী হাতে উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গত মূল্য পেতে পারেন, বিপণন ব্যবস্থার এ একটি লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে সরকারী বিপণন ও পরিদর্শন ডাইরেকটরের তত্ত্বাবধানে উন্নত পদ্ধতিতে পণ্য-শ্রেণীর বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্যের উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি বিপণনের প্রধান কাজই হলো কৃষিপণ্য, পণ্যশ্রেণী ও তদ্ব্যজ্ঞাত দ্রব্যসমূহের সঠিক

শ্রেণীবিভাগ। ভেজাল ও নকল জিনিসের ভিড়ে খাঁটি জিনিস খেল হারিয়ে না যায়, সেইটির একটি রক্ষাকবচ এই বিপণন-ব্যবস্থা। ঠিক ভাবে পণ্যের শ্রেণীবিভাগ ও মাননির্ণয় হলে বিদেশের কাছ থেকেও যথেষ্ট সাড়া পাওয়ার কারণ ঘটে আর বিপণন ব্যবস্থার গুরুত্বও সেক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি না হয়ে পারবে না।

১৯৩৭ সালের কৃষিপণ্য (শ্রেণীবিভাগ ও বিপণন) আইন অনুসারে এসময়ে এই ব্যবস্থা সর্বপ্রথম চালু হয়। গম, আটা, চাউল, দি, মাখন, তেল, ডিম, তুলা, ফল ও ফলজাত দ্রব্য, গুড়, আলু, আখ প্রভৃতির শ্রেণীবিভাগের সুযোগ রয়েছে এই ব্যবস্থাব্যবস্থানে। রপ্তানীবোধ্য বলে পশম, তামাকপাতা, শবের আঁশ, শূকরের কুঁচি, চন্দনকাঠ, চন্দনতেল—এ কয়টির ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগ না করলেই নয়।

বিপণন ব্যবস্থা অনুসারে খাতশুল্ক, শবের আঁশ, পশম, শূকরের কুঁচি প্রভৃতির বেলায় জোর দেওয়া হয় গঠন প্রকৃতির ওপর। কিন্তু দি ও খাত তেলের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অন্তরঙ্গ—এ সকলের ব্যাপারে বাসায়নিক বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে অবশ্য কতকগুলো স্থানে গবেষণাগার সমেত গ্রেডিং (শ্রেণীবিভাগ) কেন্দ্র খুলেছেন। কানপুর ও রাজকোটের নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারে প্রেরিত হয় দি ও তেল আর বোম্বাই ও জামনগরের গবেষণাগারে পশম। পরীক্ষা করে সরকারের কৃষি বিভাগের উপদেষ্টা নির্দিষ্ট পণ্যের গায়ে একটি লেবেল ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকেন। এই লেবেলকেই বলা হয় জানমার্ক—পণ্যের উৎকর্ষের প্রতীক হিসাবে এইটি গণ্য।

এ ধরনের শ্রেণীবিভাগ ও পণ্যমান নির্ধারণ অর্থাৎ বিপণন ব্যবস্থার দক্ষণ ভেজাল বন্ধ হয়ে যায়নি, এ ঠিক। কিন্তু ব্যবস্থাটি চালু থাকার ফলে কতকগুলো ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে হলেও সুফল দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন যে-টি, সে হলো এই ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর করা ও দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তনটি কার্যকরী করা। সরকার এই ব্যাপারে আরও মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন, আশা করা যায় এবং তা হলেই বিপণন ব্যবস্থার অগ্রগতির পথও হবে প্রশস্ত।

একজন মহৎ শিম্পীর মহাপ্রয়াণে

শ্রীতারক সেন

ভোর হয়ে হয়ে আসে

তখন নিভুলো চিতা। ছাই এক হুটি।

ভোরের নদীর জলে শাশান-মাটিকে করাসাম ভ্রান
শোক-শোক রচনায় রাজির প্রয়াণ।

এ কোন্ ভ্রমের ভার দিয়ে গেলে আমাদের হাতে?

ভ্রমের পরম প্রাণ বেখানেই রাখি পুণ্যবতী হবে।

হুড়াই নক্ষত্রলোকে, আকাশ-উজানে

দেখা দেবে আলোকের ফুল

হুড়াই বায়ুপ্রোতে উত্তর মরুতে

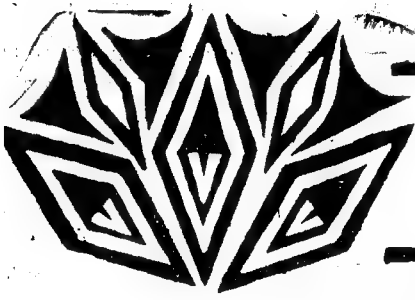
জন্ম নেবে ভ্রমের সুফল।

তোমার তো বৃত্ত্য নাই। তোমার এ 'মৃত্যুভ্রম' ভার

নিতে পারে একমাত্র হিরণ্ময় জিকাল আধার।

আমরা কল্প হাতে নিতে পারি চিত্তাভ্রমটুকু

ভার বেশী পাখি মাঝকা আর।



সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

হরিণ-চিতা-চিল

সাহিত্যের প্রায় সব ক্ষেত্রেই বীর স্বরূপ পদচারণ সেই প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলতঃ কবি, আর সেজন্যই তাঁর বর্ধার রূপটি কবিতা বহুটা ধরা দেয় এমন আর কোথাও নয়, আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থটিতেও তাঁর সেই কবিমানস প্রকাশ। ভাষামাধুর্য্যে ভাব ব্যঞ্জনার পরিপূর্ণ নিচোলা কবিতাগুলি যেন প্রকৃতির রসমতনলের এক একটা পাপড়ি, যত্নে বসে রূপে তারা আচ্ছন্ন করে চোখনাকে, আকৃষ্ট হয় মন। জীবন জিজ্ঞাসু কবি আশাবাদী, পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম করেন তিনি সহজেই, আজকের আত্মবিশুদ্ধ স্বপ্নচূড়ত বাহুরকে তাই তিনি বলেন। এককোঁটা জল দাও যদি, এই মূল্যেও দেখাবে তেলকি, কোথা থেকে ঠিক প্রাণের সবুজ আনবে। জ্বলন্ত সত্য ধরকে অব্যাকার করা কবির কাজ নয় তাই তিনি শঙ্কিত হয়ত। অতিশয় উত্তাপের সম্মত রথচক্র এই শব্দা আবিল করেনি তাঁর বিশ্বাসকে কোথাও, তিনি জানেন জোয়ার বধন আসে কোন বাধা না মেনেই নিয়ে আসে তা পূর্ণতা, সব তরঙ্গাঙ্গ হয় বৃহত্তে, জীবনের শাস্ত সত্য প্রকটিত হয় আপন মহিমায়। কবিতাগুলির চরণে চরণে সোড়ার কবির এই বিশ্বাস সজ্জামিত হয় পাঠকের মনেও আর এখানেই কবির চরম সার্থকতা। সর্বসম্মত ত্রিশটি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে সংকলনটিতে নয়নাভিরাম প্রচ্ছদ এঁকেছেন পূর্ণেশু পত্রী, অপরাপর আঙ্গিক ও প্রশংসনীয়। 'হরিণ-চিতা-চিল'—প্রেমেন্দ্র মিত্র, ত্রিবেণী-প্রকাশন, ২ জামাটরগে দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা মাত্র।

EDUCATIONAL SPEECHES

বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে ৩৩৩ আন্তঃভাষার দান চিত্রবরদী, ৩৩৩ জামাটরগে বহন করেছিলেন তারই প্রবোণা উত্তরাধিকার তাঁর অকালমৃত্যু দেশের এক মর্যাদিক কতি যে কতিয় মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব বলসেও অজ্ঞাতি করা হয়না। আমরা দেখে আনন্দিত হয়েছি যে জামাটরগে সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক মূল্যবান বক্তৃতাগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে, বর্তমান প্রসিদ্ধিতে। জামাটরগে ছিলেন বীর নীতিতে অবিসল আত্মবিশ্বাসী পুরুষ, অজ্ঞানের সঙ্গে আপোষ ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, সংকলিত রচনাগুলি তারই 'বাক্য' বহন করেছে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত প্রদত্ত এই বক্তৃতাগুলি স্বর্গীয় চিত্তাম্বরকর আদর্শ ও কার্যধারায় ৩৩৩ জামাটরগে পরিচিতি সম্পাদন করে। দুগুণের বক্তাব বিশিষ্ট

বে পরিবর্তন অক্ষ গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে তাকে কোন ও দিনই অব্যাকার করেননি ৩৩৩ জামাটরগে; মূলত তিনি ছিলেন গঠনবর্ধী; সমস্ত অজ্ঞার সমস্ত দুর্বলতাকে পরিহার করে জাতি গঠনে উজ্জাগী হয়েছিলেন তিনি, সর্বাঙ্গ প্রাদেশিকতা যেমন তাঁর ছিলনা, তেমনই জাতি হিসাবে বাঙ্গালী হিন্দুর আজ যে আত্মবিশুদ্ধি ঘটতে বসছে তারও ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি; উদাত্ত সবল কণ্ঠে জাতিকে বীর বীর আহ্বান করে এই সর্বনাশা আত্মলোপের পথ থেকেই অপসারিত করতে চেয়েছেন তিনি, আজ জামাটরগে নেই আর সেজন্যই তাঁর পথনির্দেশক রচনাগুলির মূল্য এত অধিক। বর্তমান সংকলনটিতে সংগৃহীত বক্তৃতাগুলি দ্বিগুণ জাতিবিশুদ্ধি পথনির্দেশে কম সহায়তা করবে না। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রীসর্বগদী রাধাকৃষ্ণন আলোচ্য সংকলনটির ভূমিকাকার; 'আঙ্গিক সম্পদেও এটি সমৃদ্ধ, আমরা উল্লিখিত গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। 'Educational Speeches' by Dr. Shyamaprasad Mookerjee, with a forward by Sarvapally Radhakrishnan. A. Mukherjee & Co. (Private) Ltd., 2, College Sqr., Calcutta-12. Price Rs. 5.50.

এই পৃথিবী পাণ্ডুরনিবাস

একালের বাংলা স্বল্পনী-সাহিত্যে কলম ধরেই বীর শক্তি পরিচয় নিয়েছেন রমাপন চৌধুরী তাঁদের মধ্যে অন্ততম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বাঙালীর ধ্যান ধারণার ও মানসচিত্তার যে অচিন্তনীয় পরিবর্তন অতিক্রান্ততার সঙ্গে ঘটে গেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে খুব কম স্রষ্টাই সেই চিরবিচিত্র স্রষ্টাকে সাহিত্যের কটু কবীর ও মিত্র বাহু মাধ্যমে বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। তার জন্তে চাই অহিরন্তার মধ্যে আত্মমগ্ন সমাধিস্থের সাধনা। সে সাধনার সার্থক সাধক যে রমাপন চৌধুরী একথা নির্বিধায় বলার সময় এসেছে।

বালকের বিশ্বাসভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে জগতের মূল স্রষ্টাকে ঘরবার আকাঙ্ক্ষা দেখেছি তাঁর 'প্রথম প্রথম'-এ। কখনও শিল্পকল কল্যাণখনির মধ্যে বৈজ্ঞানিকের মত হীরার সন্ধানে তিনি ব্যাপৃত থেকেছেন। সে বৈজ্ঞানিকের অন্তর্ভুক্তি মানবতা বহিত নয়। আবার ইতিহাস-আশ্রিত 'লালবাহী' উপভাষে তাঁকে বঙ্গালীর ইতিহাস-পুনর্বিচারে, নবমূল্যায়নে স্থানীয় আসনে বসিয়ে হতে লক্ষ্য করেছে।

লেখকের বর্ণনাকান চলে বনিজের নিম্ন অবিদিত অধ্যবসায়ের
মধ্য দিয়ে। এখানে সে খনি চল মাছের মন—আর পাত্রপাত্রী
এই পৃথিবীরই মাছ। তারা এই পান্থনিবাসের বাসিন্দা।

তার নবতম গ্রন্থ 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' এক প্রাচীন শহরের
একটি ছোট ছোট্টে সন্নিবেশিত চরিত্র নিচর নিয়ে রচিত হয়েছে।
কাহিনীর নায়ক এই ছোট্টেটি আর নায়িকা বলতে এই ছোট্টেটিরই
পরিচায়িকা। শ্রীচর স্বরপ্তমে নানা জাহাঙ্গা থেকে মাছের এসে
জড় হয় এখানে—কেউ স্বাহা উদ্ধারের আশা নিয়ে—কেউ অর্থ
অন্বেষণে।

কাহিনীতে কোথাও কোন স্বকণোলকিত ঘটনা নেই।
এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ঘটনার সূত্র-এ সমগ্র কাহিনী ক্রমে ক্রমে
ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে পরিণতিতে পৌঁছেছে। রসস্বপ্ন এখানে হব-
পার্থীর প্রতি-স্বপ্ন মিলনের মত সার্থক হয়েছে।

জীবনের ঘটমান সত্যকে শিল্পী রমাণ্য চৌধুরী জীবনরসিকের
দৃষ্টিতে দেখেছেন। মাছের ঐক্যে তিনি ভিত্ত্যভার কথার
জর্জরিত না করে গুরুত্ব ঠোঁট ক্রমাগত চক্রে দেখেছেন—তাই এই
পৃথিবীর মাছের হয়ে আমরা আমাদের 'এই পৃথিবী পান্থ নিবাসে'
দেখতে পাই—চিনতে পাই—দেখে মিলিয়ে নিয়ে তৃপ্তি পাই।
শিল্পীর সাধনা তাই সার্থক। দায় পাঁচ টাকা। ডি, এম লাইব্রেরী,
৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের পরমাণুকেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ

তথ্য সংকট ও সম্ভাবনা

বর্তমান যুগকে বলা হয়ে থাকে পরমাণবিক যুগ, পরমাণু ও
তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে রচিত আলোচ্য পুস্তকখানি একখানি অল্পবাদ।
এডওয়ার্ড টেলার ও এ্যালবার্ট এল ল্যাটার যুগেভাবে লিখেছেন।
বইটি অল্পবাদ করেছেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্পবাদক ভূমিকার
উল্লেখ করেছেন যে, পরমাণু বিজ্ঞান ও তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে সাধারণের
হাতে একটা মোটামুটি ধারণা হয়, তাই তাঁর গ্রন্থ-রচনার মূল কারণ।
বইটি তাঁর এই আশা যে সকল করে তুলবে বলেই আমরা মনে করি।
সহজ সরল বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন
করেছেন তিনি আলোচ্য গ্রন্থে, পাঠে সজানী পাঠক উপকৃত হবেন
বলেই আমরা আশা করি। বইটির প্রচার প্রার্থনীয়। 'আমাদের
পরমাণুকেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ তথ্য সংকট ও সম্ভাবনা', এডওয়ার্ড টেলার ও
এ্যালবার্ট এল ল্যাটার। অল্পবাদক : বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি-ফিল
রমায়ন বিভাগ, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক। পাল' পাব্লিকেশন্স
প্রাইভেট লি., বোম্বাই-১। মূল্য এক টাকা।

রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের এবং সমাজই গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে
উৎসাহের ও মত বিরোধের শেষ নেই, বর্তমান পুস্তকটিতেও লেখক

সম্র প্রকাশিত হয়েছে

HISTORY OF BENGALI LITERATURE

(সাহিত্য আকাদেমীর একটি ইংরেজী প্রকাশন)

লেখক

ডাঃ সুকুমার সেন, এম, এ, পি-এইচ-ডি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষা বিভাগের প্রধান

ভূমিকা লিখেছেন : জগদ্রাল নেহরু

ভেমি ৮ ভঃ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩১

রাজসংস্করণ : ১০'০০ টাকা (রেজিঃ পোস্টেজ ১ টাকা ২৫ ন.প.)

সাধারণ সংস্করণ : ৮'০০ টাকা (রেজিঃ পোস্টেজ ১ টাকা)

গ্রন্থান পুস্তক বিক্রেতাগণের কাছে অথবা নিম্ন ঠিকানার পাওরা যায়।

দি পাবলিকেশন্স ডিভিসন

৩৬৬ সেক্রেটারিয়েট,

মিল্লী - ৮

১, গাষ্ট্রন স্ট্রিট,

কলিকাতা-১

এই সব কথা সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতন্ত্রের বর্ষাধিকার যে কি তা নিয়ে বহুতর বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে, লেখক সহক ও সাহসীল ভাবার রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ভূমিকা সবক্ষে আলোচনা করেছেন; কয়েকটি মূল্যবান তথ্যেরও সমাবেশ ঘটেছে পুস্তকটিতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হাজি ও সাধারণ পাঠক উভয়েই বইটি পাঠে আনন্দিত হবেন বলেই আমরা আশা করি। রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র পরিমলচন্দ্র ঘোষ, বি. এস-সি (ইকন) লণ্ডন, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, প্রান্তস্থান—এইচ ট্যাটার্টো।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনা

আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের একটি সমালোচনা পুস্তক, সাহিত্যোদ্ধারী পাঠক সাধারণতঃ সাহিত্য যে রস সৃষ্টি করে তারই আধারনে পরিভূত থাকেন, সমালোচনার কচকচি তাঁদের কাছে ভীতিপ্রদ বস্তু কিন্তু অল্পদক্ষিণস্বকে বেতে হয় আরও গভীরে, সাহিত্য রণোত্তরী হল না তাঁদের কাছে এ প্রশ্নের গুরুত্ব কম নয়। মোহনচন্দ্র বস্তু নিয়ে সাহিত্য রসের প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে সমালোচনাকে দিতেই হবে তার প্রাণ্য মর্যাদা, সন্ধানী পাঠকের অনেকাংশই যে বর্তমান সমালোচনা পুস্তকটি পাঠে তৃপ্ত হবেন এ আশা করা হয়না নয়। কয়েকটি সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে আলোচ্য পুস্তকটিতে; প্রবন্ধগুলিতে বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ও নূতন উত্তরবিধ রীতিকেই সঠিক বিচার করা হয়েছে, লেখকের ভাবনিষ্ঠা ও সাহিত্যবোধের পরিচয়ে এগুলি প্রোচ্ছল। জান-শিশাহ পাঠক গ্রন্থটিকে সমালোচনার সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি। প্রবীণ শিক্ষাবিদ রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ বিদ্যাসিঁথি ভূমিকা ও প্রখ্যাত সমালোচক সুনীতিকুমারের সুচিন্তিত অভিপ্রায় এই গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। এইরূপ সমালোচনা পুস্তকের প্রয়োজন বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রমশঃই বৃদ্ধির পথে। পুস্তকটির অঙ্গসম্পদা যথার্থ। 'বাংলা সাহিত্যের আলোচনা'—ঐদীনমোহন কুমার। প্রকাশক—দাসগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইন্টং লিমিটেড, ৫৪১০ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য—৭ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

পশ্চিমমহল

আলোচ্য গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ লেখিকার সাম্প্রতিকতর একটি ছোট গল্প সংগ্রহ। আশাপূর্ণা দেবী প্রধানতঃ মনোমর্মী সাহিত্যিকার। তাঁর বিশেষত্বী ভঙ্গী ও প্রোচ্ছল সরল কথকতা এই উত্তরবিধ সম্পদে তাঁর রচনা সমৃদ্ধ। বর্তমান সংকলনটিতেও তাঁর স্বকীর্তা প্রকাশ। সর্বসমেত ১৩টি গল্প সংগৃহীত হয়েছে উল্লিখিত বইটিতে, বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত প্রায় সবগুলি কাহিনীই সুবর্ণাশ্রী ও কোঁকুলোদ্ভাপক। কয়েকটি গল্পে দোকালের সজ্জাবাদ জীবনের একটি পরিচ্ছন্নরূপ ফুটে উঠেছে; ঠাকুরদার বুলি, পশ্চিমমহল প্রভৃতি গল্পগুলি এই প্রেক্ষে উল্লেখযোগ্য, আবার অগ্নিহনন, অন্ধ, মকঃবল বার্তা, বাসনার নেশা ইত্যাদি গল্পে মানব মনের অনীম বৈচিত্র্যকে নিপুণ ভুলিতে একেছেন লেখিকা। মাহুদের মন বেশ এক বিচিত্র মহাশয়, এই মহাশয়ের পথে-প্রান্তরে বহুল পদচারণ লেখিকার, আর তারই পরিচয়ের দৃষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর রচনা। আমরা এই সুপাঠ্য সংকলনটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রণোদন প্রোচ্ছলটি একেছেন পূর্ণেন্দু পত্নী। পশ্চিমমহল—আশাপূর্ণা দেবী। প্রকাশক

—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ ভায়াচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৪৭ মাত্র।

এক ছিল কত্যা

জীবনের গভীরতায় বিখানী ও জীবনের সত্য অনুসন্ধানী যে কয়েকজন ঔপন্যাসিক আছেন, তাদের ভেতর স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর বর্তমান উপন্যাসটি সুবৃহৎ। একটি কত্যা জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে-তিনি মহত্তর জীবনের সত্যকে প্রকাশ করেছেন। এক ছিল কত্যা নাম তার মৃগনরনী। অতিসাধারণ এই কত্যা কাহিনীতে কত বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, কত অন্তরীণ ঘটনার ভরস্ব উঠেছে, মুছে গেছে, তবু বৃহত্তর জীবনের যে নিতা-স্বর, সেই সুরের মুহূর্ত এ কাহিনীকে এক মহান সঙ্গীতে পরিণত করেছে। এ সঙ্গীত সর্বকালের সুর-সন্ধান দেয়। ঘটনার সুত্রের গতির মধ্যেও এক স্থায়ী চিরকালের সত্যের প্রকাশটি অমূল্য করা যায়। লেখক প্রতিটি পাঠকের মনেই অনন্ত জীবন প্রবাহের অনুভূতি আনতে সক্ষম হয়েছেন। দাম ৬—৫০ নং, প্রকাশক—ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ ১০ হারিসন রোড, কলকাতা—৭।

হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান

উক্ত পঞ্চানন বোয়াল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী হাজি এবং সাহিত্য জগতে সুপরিচিত। তিনি কলিকাতা পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ সুযোগ্য অফিসার। পুলিশের কাজের এরূপ গুরুদায়িত্ব বহন করেও সাহিত্য ও গবেষণা মূলক কার্যে তাঁহার উৎসাহের অভাব নাই। পূর্বে তিনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর বিরাট গবেষণা গ্রন্থ 'অগম্য বিজ্ঞান' ৮য় খণ্ডে প্রকাশ করে, বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এক্ষেপে তিনি 'হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান' নামক গবেষণা মূলক গ্রন্থ রচনা করে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার পরিচয় দিরাছেন। এবং সমগ্র ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গ্রন্থকার এই পুস্তক রচনা করে ইহাই প্রমাণ করেছেন যে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় যে কোন চরম বিষয় ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষায় অবিকল্পন সহজ বোধরূপে প্রকাশ করা সম্ভব। লেখকের দৃঢ় বাধ্য যে এই একটিমাত্র পুস্তক পাঠ করলেই যে কোন একজন সাধারণ মানুষেরও পক্ষে প্রাণিবিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কীয় জ্ঞান সম্যকরূপে অর্জন করা সম্ভব। এই পুস্তকে লেখক দেখিয়েছেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকবিদগণ সত্যের সঙ্গে হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানের অনেক মিল দেখা যায়। পাঠক পাঠিকাগণ তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 'হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইভোলিউশন' পাঠ করিলে বুঝতে পারবেন যে তিনি বৈজ্ঞানিক তুলনা মূলক পদ্ধতিতে সৃষ্টি ক্রমের বহুভাব ও তৎসম্পর্কীয় প্রমাণ এবং হিন্দুধর্মে 'সৃষ্টি পর্বার' আলোচনা করেছেন। নকস-জিয়ারিষ দারা—তিনি তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে এই চরম বিষয়গুলি বুঝা সহজসাধ্য হইরাছে। লেখক এই পুস্তকে প্রাণিবিজ্ঞানের একটি নূতন দিক এবং তৎসহ ভারতে ও দুরোপে সৃষ্টি ঐ বিজ্ঞানের প্রকৃত ইতিহাস ও উহার উৎপত্তির তুলনামূলক আলোচনা করিরাছেন। জীব বৈজ্ঞানিক ডঃ পঞ্চানন বোয়ালের গ্রন্থ সার্থক হউক ও তাঁর রচিত 'হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান' পাঠক সমাজে সন্মুখ হউক ইহাই আমাদের কামনা। প্রকাশক—কলকাতা প্রেস প্রাইন্টার্স এণ্ড সন্স, ২০৩/১১—কর্ভোদাস স্ট্রীট, দাম—৭৪ টাকা।

নাট্যাশায়ে ও সঙ্গীতগ্রন্থে বাক্য

সঙ্গীত সনাতন গ্রন্থের মধ্যে বহুতর জানা যায় ভারতের নাট্যাশায়েই সব চেয়ে প্রাচীন। নাট্যাশায়েই সঙ্গীতের সাধারণতঃ প্রচলিত হয়। তৎকালে ৩য় শতাব্দীর মাঝেই নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারত তার অগ্রগামীদের মত বাজনাতে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন ও তাদের সুস্পষ্ট বর্ণনাও দিয়েছেন যথা,—

“ততঃ চৈবাবনকঃ চ বনঃ সুবিরমেব চ।

চতুর্বিধঃ চ বিজ্ঞেয়মাতোক্তঃ লক্ষণাধিতম্।

ততঃ তত্রীপকঃ জ্যেয়বকঃ চ পৌত্রবক্।

যনন্ত তালো বিজ্ঞেয়ঃ সুবিরো বংশ এব চ।” ৮।২৮-২৯

অর্থাৎ তারের বস্তুকে বলা হয় ‘তত’। বাঁশী প্রভৃতি বাতাসের সাহায্যে বাজের স্বরোৎপন্ন হয় তাদের ‘তত’র, বাতব বস্ত্র পতঙ্গের সাথে বা কোন দণ্ডের আঘাতে বাঁরা ধ্বনিত হয় তাদের ‘বন’ এবং চামড়ার বাজনা যেমন মুগ্ধ প্রভৃতিক অনন্য বলা হয়েছে। অনন্য ও ‘বন’ বাজ প্রধানতঃ তাল বা লয়কে বন্ধ করার উদ্দেশ্যই ব্যবহৃত হয়।

ভরত মাত্র ছুটি বীণাই বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তার সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় বাঁশীরে বর্ণিত নয় তারের ‘বিশকী’ ও সাত তারের ‘চিরা’ বীণার প্রচলন তখন ছিলো যথা—“সপ্ত তত্রী ভবেৎ চিরা, বিশকী নব তত্রীক।” (২।১২৪)। শুধু তাই নয় ছুটি সমানাকৃতির বীণার সাহায্যে তাঁর স্রুতি বিভাগ করা থেকে, তখন বীণার কতখানি সমাদর ছিলো এবং কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে বীণা শিক্ষা করা হোত, তার অনুমান করা যায়। বক্ত, মধ্যম, প্রভৃতি গ্রামে-এর পরিচয় দিতে তিনি আবার বেণু, বংশ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। এগুলিও সে যুগের বস্ত্র-সঙ্গীতে যে বেশ উন্নত-পছা অনুভূত হোত তার পরিচায়ক। নাট্যাশায়ে ৩২শ অধ্যায়ে তিনি বিভিন্ন বাজনা বাজাবার পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করেছেন।

নারদ তার সঙ্গীত-মকরকে (৭-১১ ধৃ:) ১১টি বীণার নাম করেছেন। যেমন, কন্দলী, কুজিকা, চিরা, পরিবালিনী, জঙ্গা, ঘোষাবতী, বহুতী, মকুল, মহতী, বৈকরী, বোঁতী, জাকী, কুম্বী, হাবরী, সরস্বতী, কিররী, সৌরঙ্গী, ঘোষকা, জ্যোতী। নারদ বলেছেন, তার সংস্থাপনের বিচিত্রতার জন্যই বিভিন্ন বীণার বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি কোন প্রকার বর্ণনা দেননি এবং তার প্রস্তুত নামগুলির ডিঙন এক মাত্র চিরা ছাড়া পূর্ণগামী গ্রন্থকারদের উল্লিখিত বৈকিক বা বৈকিকোক্তর যুগের কোন বীণার নাম পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রন্থের হামকুক তেগাল বলেন—“নারদ বীণা প্রসঙ্গে ১৮ প্রকার বীণা আছে বলেছেন অথচ তাঁর প্রস্তুত তালিকা থেকে আমরা ২১টি বীণার নাম পাচ্ছি।” এর কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে হয়, পরবর্তীকালের গ্রন্থকারদের অনেকেই ‘কুম্বী’ ও কন্দলীকে একই শ্রেণীর বীণা বলেছেন তা বার্থ। কেবলমাত্র নাম ছাড়া আকার বা প্রকৃতিসত্ত্ব তেজ না থাকতে নারদ তাদের একই শ্রেণীভুক্ত করেছেন এবং তাই ২৮ প্রকার বীণাই তিনি বীকার করেছেন।

বীণা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর যন্ত্রও তিনি উল্লেখ করেছেন, যথা—



মুগ্ধ, মর্জর, পণব, বরষরি, পটাহ, শূলা, ডঙ্কা, ডমক, ডিমডিম, গোপুঙ্ক, আলিঙ্গ প্রথা পাশ্চাত্যের সঙ্গীত সমন্বয়ে বিভিন্ন জাতীয় বাজনা এবং তাদের বাজানোর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি গানের সঙ্গে বাজনার সাহচর্য অপরিহার্য বলে স্বীকার করেছেন। অনন্য, বন, তত, শুবির প্রভৃতি বিভাগের উল্লেখও তিনি করেছেন। তিনি বীণা, কিররী, লবু পণ্ডিকা বৃহৎ কিররীকা, শাকিনী (৪।৫ প্রভৃতির) নাম দিয়েছেন। তার মতে বাজানোর পদ্ধতি অনুযায়ী বাজনার শ্রেণী বিভাগ হবে—এবং তারের সংখ্যাব্যবধী বীণার শ্রেণী বিভাজিত হয়েছে। তবে প্রত্যেক বীণাতেই একটি মাত্র তারেই প্রাধান্য থাকে। (৪।১২।৩) তার উক্তি থেকে জানা যায় তখন দশটা পছা অনুভূত হোত বিভিন্ন বীণা বাজানোর জন্য। তিনি বলেছেন,—

ছন্দো বাবা কৈকুটী চ কঙ্কালো বস্ত্রপূর্বক।।

গজলীলাভিধানং চ তমৈবোপরিবাদনম্।

দণ্ডকং চ তথা জ্যেয়ং বাজং পক্ষিকৃতভিধম্।।

এতৎ লক্ষণং নান্য বীণাবাজঃ সমীরিতম্। ৫।১৩।৫

অর্থাৎ হৃদয়, ধারা, কৈকুটী, কঙ্কাল, বস্ত্র, তুর্ণ, গজলীলা, উপরিবাদন, দণ্ডক, পক্ষিকৃত। বাজকে তিনি আবার ‘সকল’ ও ‘নিফল’ ভেদে দু’ভাগে ভাগ করেছেন সকল নিফল্য বোঝে।

শাক্দের সঙ্গীত বস্তুকরে (১২২০-১২৪৭ ধৃ:) ১১টি বীণার নাম পাওয়া যায়। একতন্ত্রী, নকুল, দ্বিতন্ত্রীকা, চিরা, বীণা, বিশকী, মন্তকালিকা, আলপিনি, কিররী পিনাকী ও নিশক বীণা। শাক্দের বর্ণনা থেকে তার সময়ের বীণার সঙ্গে আমাদের আধুনিক অনেক বীণার সৌসাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাঃ আমিরনাথ সান্ডাল বলেছেন চিরা ও বিশকী সম্ভবতঃ আমাদের সেতার ও পুর-শৃঙ্গার। কিররী বীণার বর্ণনা থেকে মনে হয় আধুনিক উক্তর ভারতীয় হুটি তুখা যুক্ত বীন ও কিররী বীণা একই বস্তু। পিনাকী বীণার বর্ণনা থেকে মনে হয় পিনাকী আধুনিক এসবজের পূর্ব রূপ হ’বে। কিররী, মকুল

কোফিলা একতন্ত্রী, তিত্ত্রীকা প্রভৃতি একই নামে আজও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে। চীকাকার কালিনাথ (১৪৪৬—১৪৬৫ খৃ:) বলেছেন, শেবোক্ত বীণাটা শার্ঙ্গদেবের নিজস্ব তন্ত্র বলেই তার নামাঙ্কবাহী ওট্টর নামকরণ করা হয়েছে 'নিঃশব্দ' বলে। বড়াকরে ১৫ প্রকার বীণীর বিবরণ পাই—বখা, বংশ, পাণ, পাবিকা, মুরলী, মধুকরী, কাকোলা, তুণ্ডসীনি, তুজা, শৃঙ্গা, শরু প্রভৃতি। তিনি অল্পকৃতি 'শব্দ' বা 'বোল'এর উল্লেখও করেছেন। অপরাপর বস্ত্রের মধ্যে পাটাহ, মাদল, তুড়কা, করতটা, খট্টা, ঘড়সু, ঢবসু, ঢকা, নকী, ডকা, কুকুয়া, মুরজ, ত্রিবলী, বল্লরী, ডমক, দুন্দুভী। আধুনিক ঢোলক পটাহের রূপান্তর এবং খোলএর উদ্ভব মুরজ হচ্ছেই।

শার্ঙ্গদেব ও নারদেব বর্ণনার বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সংখ্যক বাজনার নামোল্লেখ থাকতে এবং নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মাত্র দুটি বীণার উল্লেখ করিতে অনেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন, যে, বীণার এই বিভিন্ন বিকাশ ভরতের যুগ থেকে শার্ঙ্গদেবের সময়ের মধ্যেই ঘটেছিলো। কিন্তু সিদ্ধান্ত কতকগুলি প্রতিকূল কারণ আছে। যেমন বিভিন্ন গ্রন্থকারদের বিবৃতি তাদের একজনের প্রাপ্ত নামগুলির সাথে অপর জনের উল্লিখিত নামগুলির মিল কমই পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নৃত্তন নাম করেছেন শুধু এমনই নয়, একজন তার পূর্বগামী উল্লিখিত নামের মধ্যে যে ঐশ্বর্যমূলিক বাদ দিয়েছেন তার পরবর্তী জন আবার জারই মধ্যে থেকে দু'একটি নামের উল্লেখ করেছেন। রামায়ণে ও নাট্যশাস্ত্রে বিপকির উল্লেখ আছে, নারদেব তালিকার (নেই অথচ শার্ঙ্গদেবের বর্ণনার আবার তার বখাংশ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পর পর ভিন্ন জনই কেবল মাত্র কিরুরীর নাম করেছেন। নারদেব 'মুকুল' পার্শ্বদেবের তালিকার স্থান পার্যনি কিন্তু শার্ঙ্গদেব জার উল্লেখ করেছেন। তেমনই তার উল্লিখিত সরস্বতী বীণার চলন আজও দক্ষিণাভ্যে আছে, কিন্তু শার্ঙ্গদেব তাকে বাদ দিয়েছেন। 'কঙ্কলী, জিত্ত্রীকা, একতন্ত্রী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার লক্ষ্য করার বিষয়। এগুলি থেকে মনে হয়, স্থান ও কালভেদে। বিশেষ বীণা বিশেষ জনের কাছে প্রাধান্য লাভ করার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন তালিকার ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যাচ্ছে। কিছু কিছু যে নৃত্তন সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু নামের বিকার ঘটেছেই বৈধ, বার কলে বৈদিক বস্ত্রের দু'একটির ছাড়া আমরা আর তাদের সন্ধান পাইছি না। অপর্যবেক্ষিত বীণা 'কাকলী'তে পর্য্যবসিত হয়নি তা মনে করার পক্ষে কি বুদ্ধি থাকতে পারে 'অলাবু' যে পার্শ্বদেবের অলাবনী নয়, তাও কেউ জোর করে বলতে পারেন না। বরং কতকগুলি বস্ত্র যুগ সমাপ্ত হতে হঠাৎ অল্প হোল ও কিছুকাল পরে আবার পটুকুমিকার অবতীর্ণ হোল ও পূর্ববর্তী অল্প হোল এরকম সিদ্ধান্ত করার পক্ষেই যৌক্তিকতার অভাব ঘটে। প্রাচীন বাজনা সঙ্গীতেরও বীণার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ চর্যাপদে (আনুমানিক ১০ম ১২শ শতাব্দী) বীণা বাজানোর বর্ণনা আছে। বখা।

বাজাই আসো সহি হেঙ্ক অ বীণা

সুন তান্তি ধনি বিলসই রুনা। (চর্যাপদে বিনিময়)

কুকুরী, তন্ত্রী প্রভৃতি নামও এতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব গীতি সাহিত্যও নানা প্রকার বাজনা ও বীণার উল্লেখ আছে। এতে মুরলীর প্রাধান্য ও সর্বজন বিদিত। রূপপুরী কীর্তনের বীণা,

মুরজ, মুরলী, বেণু, মুরজ, মন্দিরার নাম প্রায়ই পাওয়া যায়। এগুলি সে সময়ের সমাজে এদের অধিত প্রচলনের সাক্ষ্য দেয়।

প্রাচীন স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে বস্ত্র

আজও সে সব মন্দির, সৌধ, গুহা, ও চৈত্য কালের নির্মিত হাত এড়িয়ে স্থাপত্যের চরম-উৎকর্ষের নিদর্শন বহন করে দাঁড়িয়ে আছে, তারাই আমাদের অতীত যুগের বিভিন্ন বস্ত্রের বিকাশ ও প্রাচীনত্বের খবর দেয়। ক্যাপ্টেন ডে, সীতা ও অমরাবতীর কোর্সাই করা ছবির মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করেছেন বাতে এমন করেকটি বস্ত্র আছে সেগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্যের করেকটি বস্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। তিনি অমরাবতীতে কোদিত একটি বীণা জাতীয় বস্ত্রের কথা বলেছেন যেটির সঙ্গে এশিয়ার হার্ণের ও আফ্রিকার 'সাকো'র (সানুচে!) হুবহু মিল পাওয়া যায়। রোমক টাইরিয়ালিসের অল্পরূপ বস্ত্রের প্রতিকৃতি ও দেখা বার সীতার কাঙ্কাক্ষে। শিল্পার অল্পরূপ একটি বস্ত্রসহ একটি মূর্তিও সেখানে কোদিত আছে। অমরাবতীতে একটি প্রতিকৃতিতে ১৮টি নারীর মূর্তি আছে, তাদের মধ্যে কোন জন শব্দ, কোন কোন জন মৃদঙ্গ জাতীয় বাজনা, কোন জন বা সানাই-এর মত বীণী এবং আরো দু'এক প্রকার বস্ত্র মনোনিবেশ করেছে দেখা যায়। কোনারকের প্রাচীন শিল্পেও নানা প্রকার বস্ত্র-সম্বন্ধিত মূর্তি কোদিত আছে।

বৌদ্ধ চৈত্যের বর্ণনা দিতে পার্শ্বি ব্রাউন তাঁর ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার বইয়ে একটি শুল্কর প্রতিকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন তুতী নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে উমার আগমন ঘটতে, মৃদঙ্গের ধনি পাছড়ে পাছড়ে প্রতিক্রমিত হয়ে তিক্কুরের আহ্বান কোরতো প্রাণবীর বোগ দেবার মত। চালুক্য মন্দির শিল্পের অল্পরূপ একটি মূর্তি শিল্পে, নৃত্যায়তা উমা ও তাঁর অল্পবর্তী দুটি বালকের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটি বালককে বীণী বাজাতে দেখা যায়। তাঁর আইডিয়াল অব ইণ্ডিয়ান আর্ট বইতে, এখানেও ই, বি জাভেল বর্ণনা করেছেন বালকটির নিবিড় অল্পকৃতিতে দুর্ভ বীণীর সুরের সাথে নৃত্য করছেন পূর্ণত হৃদিতা উমা চিঙ্গাধরম হতে প্রাপ্ত শিকনটরাজের মূর্তির ডান হাতে ডমক আছে দেখা যায়।

হায়বাহারের রাধালীলায় বন্দোপাধ্যায় ঢাকা হাটুঘর ও বয়েজ দিসাচি সোসাইটিতে সংরক্ষিত করেকটি মূর্তির উল্লেখ করেছেন, যেমন নটেশ, সলাশিব, বিদ্যাপাক, প্রভৃতি। এই মূর্তিগুলির হাতে ডমক, খট্টা, প্রভৃতি বস্ত্র দেখা যায়। বীণা হাতে যেহী সরস্বতী-মূর্তির ও বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। হাউকি আবুতে তেজপাল মন্দিরের প্রাচীন শিল্পের আলোচনা এসঙ্গে ডাঃ কুমার বার্মা একসল বাতরত নগনারীর প্রতিকৃতির ছবি দিয়েছেন যাদের হাতে বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ ও করতাল জাতীয় বস্ত্র দেখা যায়।

রাজস্থানের চিত্র শিল্পে (১৬-১৭ শতাব্দী) রাগনাসিন্দ্রীসের চিত্রেও বেণু, বীণা, ঢোল, করতাল প্রভৃতি দেখা যায়।

অধুনা প্রচলিত বস্ত্র

বর্তমান সমাজে প্রচলিত বস্ত্রের মধ্যে সচরাচর, লাম্বা, ঢাব, ঢোল, ঢোলক, খোল, মুরজ, পাখোয়াজ, মাদল, তবলা, ডমক, দুন্দুভী, অসক্প, তাগা, বল্লরী, বীণ, বীণা; সুর শৃঙ্গার, সুর বাহার, সোদা, সেতার বা সিতার, স্বরমণ্ডল, ভাদিনুয়া (তবুয় বীণা), মিলকুবা,

সারাজী, সুর-সারাজ, ববাব, বেহালা, তার সানাই, ডড়িং বীণ, টোটা একতারা, দুতারা, চৌতারা, সানাই, করতাল, খঞ্জী, বাঁকর ঘণ্টা, কাসর, নৃপুয় প্রভৃতি। এই ভাবে প্রতিটি যুগের পৃষ্ঠা আমাদের নতুন নতুন বস্তুর পরিচিতি দেয়। ভারতের সঙ্গীত তার উৎকর্ষতা শুধু কঠোর মাধ্যমেই প্রকটিত কোরে তোলেনি, বস্তুর স্বাকারে প্রকাশ করেছে তার রূপ।

আমাদের বস্ত্র-সঙ্গীতের ইতিহাস আর একটু দৃঢ়র সঙ্গে অঙ্গসন্ধান করলে দেখা যাবে আজকের যে সব বস্ত্র আমাদের সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে তুলছে তাদের জন্ত আমাদের বাচিরের জগতের কাছে শ্রুণ বীকার করতে হবে না মোটেই। বরং সমস্ত সংস্কৃতির মতো এর জন্ত আমরাও শ্রুণী আমাদের কৃষ্টির উৎস সেই বৈদিক যুগের কাছে। কতকগুলি বস্ত্র নিয়ে আলোচনা করলেই এ তত্ত্ব স্পষ্ট অঙ্গুভূত হবে। যেমন,

(১) কাতঙ্গী—ডাঃ ক্যালাও তার পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ অর্থবৈদিক বস্ত্র বলে বীণা কাতঙ্গীর উল্লেখ করেছেন (পৃ: ৮৬)। পরবর্তী যুগে সম্ভবত এইটিই কচ্ছপী নামে নারদের সঙ্গীত মকরন্দে পরিচিত লাভ করে ডাঃ উইল্টার নিজ কাতঙ্গীকে গীটার বলেছেন। উইলিয়াম শিখ কচ্ছপী, লায়ার ও টেস্টিজোক অভিন্ন বলেছেন। এডল্ফ মার্কস ও স্তার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতে এর থেকে গীটারের উৎপত্তি।

(২) অলাবুন—ডাঃ ক্যালাওর মতে অর্থবৈদিক বস্ত্র অলাবুয় সদৃশ অলাবনী (সঙ্গীত মকরন্দ স্তার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের) উল্লিখিত অলাবু সাতের সম্ভবতঃ অলাবুয়ই অঙ্গুভূত।

(৩) পিছোরাঃ—পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ও বোধায়ণে প্রাপ্ত। মহামহোপাধ্যায় বামকৃষ্ণ কবির মতে ঐদম্বরী পিছোরাই অপর নাম।

(৪) শততন্ত্রী বীণাঃ—পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত। পরবর্তী কালে কাত্যায়নী বীণা নামে পরিচিত। পাশ্চাত্যের ডালসিমার ও পারস্তের কুনাম্ কাত্যায়নীর নব-সংস্করণ।

(৫) চিত্রাঃ—ভবতের নাট্য শাস্ত্রে উল্লিখিত পরবর্তীকালীন সেতার ও চিত্রা এক। গ্রীস ও ইউরোপে এইটাই সিথারা নামে পরিচিত।

(৬) বেহালাঃ—ধর্মযাজ বা রাবণালয়ের নতুন রূপ। ইউরোপীয় ভায়লীন ও বেহালা একই প্রতীক।

• (৭) সারাজীঃ—রাবণালয়ের অপর রূপ। জাপানে কোকিউ ও চিনের উনহিন্-এর উৎপত্তি অনেকের মতে সারাজী থেকেই ঘটেছে।

(৮) রক্ত বা ব্রোতীঃ—সঙ্গীত মকরন্দে প্রাপ্ত। পারস্তের রেবেক ও ভারতীয় ববাব রক্ত-বীণারই অঙ্গুভূত সংস্করণ।

(৯) অগ্ন্যাতলিকা—অর্থবৈদিক বস্ত্র। অগ্নী যুগে করতাল রূপে পরিচিত।

বসিও বিদ্যুত বৈদিক সাহিত্যের মধ্য থেকে এই রকম করে বস্ত্রের বর্ণনা খুঁজে বার করা সহজ নয় তবুও বস্ত্র সহকারে সাধ্য মত চেষ্টা করলে আমাদের বিশ্বাস এ থেকে এ ধরনের বহু নির্ধন পাওয়া যাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বার মূল্য অল্প নয়। এই অঙ্গসন্ধান আর একটি শুভ দিক আছে বা। সহজই সঙ্গীত গণীদের অঙ্গপ্রেরণা বোপাবে যথা এই যন্ত্রগুলির বর্ণনা বস্ত্রশাস্ত্রের চিত্রার পরিপোষক হিসাবে তাদের সঙ্গীত উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা কোরবে। সে যুগের সাধনার প্রতিক্রিয়া

আমাদের সঙ্গীত ক্ষেত্রে প্রতিকলিত হবে বৃহত্তর মানব মনের অঙ্গপ্রেরণা বোপাতে সহজ হবে।

শেষ

রেকর্ড পরিচয়

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

এন ৮২৪৫৭—সতীনাথ বুধোপাধ্যায়ের 'নিজের দেশের চিত্তাকর্ষক সুরে পাওয়া দু'খানি আধুনিক গান।

এন ৮২৪৫৪—শ্রীলা সেন পরিবেশন করেছেন দু'খ পাড়ানি গান শিল্পমুগ দম্ভতার সহিত।

এন ৮২৪৫৯—তরুণ বন্দোপাধ্যায় দু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন।

এন ৮২৪৬০—ইলা বস্ত্র দু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন।

এন ৮২৮৬১—ভামল মিত্রের সঙ্গীতগুণিক অবদান, "চন্দ্রাবতী মেয়ে" এবং "লাল ঢেলি শরনে তার"।

এন ৮২৪৬২—শ্রীমতী উৎপলা সেনের আধুনিক গান সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

এন ৮২৪৬৩—এই রেকর্ড নিশ্চয় রাণী বোবালের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করবে। নবীন শিল্পীদের মধ্যে এখন তিনি ঐঙ্গিত আসন অধিকার করেছেন।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে **ডোয়ার্কিনের**



কথা, এটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা সবাই জানেন

ডোয়ার্কিনের

১৮৭৫ সাল

থেকে দীর্ঘ-

দিনের অতি-

জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার জন্ত লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :- ৮/২, এসপ্ল্যানেন্ড ইস্ট, কলিকাতা - ১

এন ৪২৪৬৪—সুখীর মুখোপাধ্যায় এই গানে শিল্পাঙ্গণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও তিনি রেকর্ড গানের ক্ষেত্রে নবাগত।

এন ৪২৪৬৫—হুত্বা মিত্র, এন ৪২৪৬৭—পূববী মুখোপাধ্যায়, এন ৪২৪৬৮—কবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, এন ৪২৪৬৯—চিস্মা চট্টোপাধ্যায়, এই চারখানি গান রেকর্ড করা হয়েছে বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদে ভগ্ন হিঙ্গল উৎসব উপলক্ষে। এঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

এন ৭৭০০৬, ৭৭০০৭—“নদের নিমাই” বাণী চিত্রের গান রেকর্ড করা হয়েছে।

এন ৭৭০০৮, ৭৭০০৯—“হুই বেচারা” বাণী চিত্রের গান রেকর্ড করা হয়েছে।

কলসিয়া

জি ই ২৪১৮৮—মঞ্জুলা গুহঠাকুরতার স্নিগ্ধ কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের হৃদয়নির্মীতি গান রেকর্ড করা হয়েছে।

জি ই ২৪২৮৪—লতা মঙ্গেশকর বাঙলা গান পরিবেশন করেছেন। এবার সুর দিয়েছেন স্বর জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক বিনোদ চট্টোপাধ্যায়।

জি ই ২৪১৪৫—নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লী-গীতি পরিবেশন করেছেন।

জি ই ২৪১৪৬—বিখ্যাত মিট দাসগুপ্ত দুটি সরস ব্যঙ্গ রচনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। এতে তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত জনপ্রিয় বাণীচিত্রের গানগুলির সুর ব্যবহার করেছেন।

জি ই ২৪১৪৭—নবাগত শিল্পী পাক্সল বিশ্বাসের কণ্ঠে ভক্তি মূলক গান; কথা স্বামী সত্যানন্দ এবং সুর দিয়েছেন কীর্তন কলানিধি রথান ঘোষ।

জি ই ২৪১৮৮—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের স্নিগ্ধ কণ্ঠে গাওয়া গাং হর সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গান।

জি ই—২৪১৪৯ পান্নালাল ভট্টাচার্য্য হৃদয়নির্মীতি গান উপহার দিয়েছেন।

জি ই ৩০৪৪৭, ৩০৪৪৮—যুব চিত্রের জনপ্রিয় বাঙলা ছবি পারদোনাং এসিস্টেন্ট বাণী চিত্রের গানগুলি পরিবেশন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, আদ্রনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অজিত শিল্পী।

জি ই ৩০৪৪১, ৩০৪৪২ এবং ৩০৪৪৩—এম পি প্রডাকশনের জনপ্রিয় বাঙলা ছবি “কুহক” বাণী চিত্রের ছয় খানি গান পরিবেশন করেছেন জনপ্রিয় গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

জি ই ৩০৪৪৪—“নদের নিমাই” বাণী চিত্রের গান গ্রহণ করা হয়েছে এই রেকর্ডে।

জি ই ৩০৪৪৫, ৩০৪৪৬ এবং ৩০৪৪৭—“সাপক কমলাকান্ত” বাণী চিত্রের গান রেকর্ড করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, মর্দোব্রজ মুখোপাধ্যায় ও নীলিমা মিত্র। প্রত্যেক গানে শিল্পীর বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল।

জি ই ৩০৪৪৮—কবি অতুল প্রসাদের হৃদয়নির্মীতি গান পরিবেশন

করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এর মধ্যে “কে তুমি বসি নদী কুলে” এম, বি কিং—এব “কবিকের আতিথি” বাণী চিত্রের গান।

আমার কথা (৬৩)

শ্রীমতী নীলিমা সেন

শিওবরস থেকে শান্তিনিকেতনে অবস্থান, তখন থেকে মায়ের সঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত অনুশীলন, আর বাবার সাথে প্রত্যহ ভোরে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ ও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক গান শেখার আগ্রহ—সুদূর একটা নন্দিনীকে পূর্ববর্তীকালে দেশেও বিদেশে রবীন্দ্র সঙ্গীতে অন্ততমা বিশিষ্টা গায়িকা হিচাবে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করে। পারিবারিক কুটুম্ব, উচ্চশিক্ষা ও গুরুদেবের আশীর্বাদপূত ধারায় পরিবেশে মাহুৎ হওয়ার জন্য শ্রীমতী নীলিমা সেন হলেন আত্মপ্রচারবিমুখা, নম্রা ও বিনয়বনতা গৃহস্থ-বধূ। তিনি জানান—

ঢাকা জিলার বেঙ্গলগাঁওর শ্রীললিতমোহন গুপ্ত ও শ্রীমতী পঞ্চজিনী দেবীর অন্ততমা কন্যা ১৩৩৫ সনের ১৫ই বৈশাখ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করে। গ্রামে বাবার সুযোগ সামগ্র্যই হয়েছে। ছয় বৎসর বয়সে বাবার মার সঙ্গে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে চলে আসি। পরিবারে গানের রেওয়াজ বেশী ছিল না তবে মা ও বাবার সঙ্গে একটু একটু গান গাইতাম। সেখানে থাকার জন্য বোধ হয় সঙ্গীতে আকৃষ্ট হই। শান্তিনিকেতন পাঠশাল (School) ও শিক্ষাভবনে (College) আমার লেখাপড়া হয়। ১৯২৫ সালে প্রাক্টমেন্ট হই সেখান থেকে। আমার সঙ্গীত শেখার হাতে খড়ি হয় অধ্যাপক শ্রীশৈলজ্যোত্স্ন মজুমদারের কাছে। ক্রমশঃ তাঁর হোমের পাত্রী হই। শুধু গানে নয় আমার লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও শ্রী মজুমদারের আগ্রহ ও



শ্রীমতী নীলিমা সেন

উৎসাহ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত সর্বদা মরণ করি। আমার অগ্রজা চেলোবেলা থেকে আমার অন্ততমা উৎসাহদাত্রী ছিলেন। এ ছাড়া শ্রীশান্তিদেব বোম্ব, শ্রীদময়ন্ত রায়চৌধুরী, শ্রীপ্রমোদকুমার, শ্রীকবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আমার সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। গুরুদেবের মৃত্যুর সময় আমি বালিকা। তাঁহার শেষ জন্মদিনের উৎসবে তাঁহাকে গান শোনাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কবিগুরু নিজের আমাকে 'ডাকঘর' এর 'অমল' ভূমিকায় মহড়া দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা মঞ্চস্থ হয়নি। কিন্তু সেই উজ্জল স্মৃতি প্রায়ই আমার মনে পড়ে। নৃত্যও আমি বিশেষ অনুরক্তা ছিলাম কিন্তু সঙ্গীতকেই আমি একান্তরূপে গ্রহণ করি। পরম্পরাকগত প্রথম চৌধুরী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী যখন শাস্ত্রনিকেতনে বরাবর থাকার জন্ত আসেন, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের লেখা অনেকগুলি গান শ্রীমতী দেবী-চৌধুরাণীর নিকট শেখা-শ্রবণে পাই। 'সঙ্গীত-তবন' এ চার বৎসর শিক্ষার পর আমি হিন্দুস্থানী ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ডিপ্লোমা লাভ করি। এখানে পড়ার সময় আমি সরকারী বৃত্তি ও শেষ পরীক্ষার বর্ধ-সঙ্গীতে পারদর্শিতার জন্য Tagore-Hymns পুরস্কার পাই।

১৯৫০ সনে শাস্ত্রনিকেতনের অধ্যাপক ও রবীন্দ্র-তবনের তদানীন্তন কিউরেটর (Curator) ও কুমিলার বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীপ্রমোদকুমার সেনের মধ্যমপুত্র শ্রীধর্মকুমার সেনের সহিত আমার বিবাহ হয়। সেই বৎসর তাঁহার সহিত আমি আমেরিকা যাই ও তথায় Social Studies কোর্সের সার্টিফিকেট লাভ করি।

চিকাগো, মিচিগান, উইসকনসিনের রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় বেতার-কেন্দ্র হইতে আমি রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করি। ফেরার পথে

লণ্ডন যি, যি, সিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পাই। চিকাগোয় একটি বিশিষ্ট গির্জাতে মহান্না গান্ধীর জন্মদিনে আমার গান গাইতে হয়। এ ছাড়া আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের বহু সভা-সমিতিতে আমি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়িকা ছিলাম। আমেরিকার বৌদ্ধদল্য বুদ্ধদেবের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ কৃত বুদ্ধ-প্রশস্তি গান গাইবার জন্য আমার আমন্ত্রণ করেন। ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে কতকগুলো কথিকা আমার বলতে হয় তথাকার বিদ্যালয় ও নারীমঙ্গল সমিতিতে। ১৯৫২ সালে শাস্ত্রনিকেতনে ফিরে আসি। কিন্তু ১৯৫৭ সালে শ্রীসেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে কলিকাতায় চলিয়া আসেন আর আমিও সেই থেকে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়ি। বর্তমানে 'সুরময়া' সঙ্গীত-শিক্ষালয়ের অন্ততমা প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাবে যুক্ত আছি। শাস্ত্রনিকেতনের সঙ্গীতদলের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা জায়গা আমি পরিভ্রমণ করেছি। সত্যসোক্তান্তরিত আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন আমার নিকট-আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার বহুতার সাথে আমি অনেকবার গিয়েছি। আমার স্বামীর গৃহেও 'সঙ্গীত-সাধনায় প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি।

আমার গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতেই প্রথম রেকর্ড হয় ১৯৪৪ সালে। সেই বৎসর থেকে কলিকাতা বেতারকেন্দ্র আমি নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনা করে থাকি। কবিগুরু লিখিত অধ্যায় সঙ্গীতের প্রতি আমার বেশী আকর্ষণ, আর আমি তাতেই প্রতিষ্ঠা পাব বলে মনে করি।

শ্রীমতী নীলমার গায় বীরা শোভেন, তাঁরাই জানেন যে গানের গুণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য সর্বদাই আর তাঁর কণ্ঠ হল অভিনয়নী।

স্বয়ংবরা

‘শতভিষা’

মরণ ভ্রামের লবন বাততে বাঁধিবারে সাধ মিলন-রাণী,
মোরে তুলো নাকো প্রিয়তম গুণো মিলন আশায় আছি যে এগি।
জানি বিধাহীন নির্ভীক তুমি কাহারো নিবেধ মানো না কভু,
এ মরণগঞ্জে পরম সত্য হে বিজয়ী তুমি তোমার প্রভু।
বাষিভেয় বৃকে কোমল করুণ সাধনা মারা পরশ দানো,
অহঙ্কারীয় দর্পিত মাখা চরণের তলে লুটীতে জানো।
আসন তোমার জীর্ণকঙ্কা অর্ধ তোমার অজ্ঞজল,
দীর্ঘবাস বন্ধনা তব হে চিরপ্রোক্ত অচল।
জীবন-বধুর বেলাকালেতে তব উত্তরী গ্রহি বীধা,
হে শ্রামকান্তি মোহন মরণ বামপাশে তব জীবন-রাধা।
বধু, করুণ নয়নে যিনতি জানায় প্রিয়তম তার বাধা না মানে,
ছুটে বত দূরে পলাইতে চায় সবলে যে প্রিয় বন্ধে টানে।
তোমাদের এই লুকাচুরি খেলা হেরিলাম সারা জীবন ভরি,
স্বয়ংবরা এ বধূরে তোমার লয়ে বাও প্রিয় হরণ করি !

◉ দেশে-বিদেশে ◉

চৈত্র, ১৩৬৬ (মার্চ-এপ্রিল, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ): সাকুলার বা ভূগর্ভস্থ রেলপথ ছাড়া কলিকাতায় বাক্সের ভাড়া হ্রাস অসম্ভব—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

২রা চৈত্র (১৬ই মার্চ): এপ্রিল মাসে নেহরু-চৌ (ভারতীয় ও চীনা প্রধানমন্ত্রীদের) বৈঠকের প্রস্তাব সম্পর্কে চীনা সরকার এখনও নিরুত্তর—দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

৩য় চৈত্র (১৭ই মার্চ): চলচ্চিত্রের উপর কর ধর্মের তীব্র সমালোচনা—লোকসভায় প্রচার ও বেতার দপ্তরের ব্যবসায়িক দাবী সম্পর্কে বিতর্ক।

৪ঠা চৈত্র (১৮ই মার্চ): কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেটে (১৯৬০-৬১ সাল) ১০ লক্ষাধিক টাকা ঘাটতি—ট্যাক্সি কিনাং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ বসু কর্তৃক বাজেট পেশ।

বোম্বাই বিধা বিভক্তিকরণ (মহারাষ্ট্র ও গুজরাট) বিল বোম্বাই বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৫ই চৈত্র (১৯শে মার্চ) ভারতের সর্বত্র ব্যাক কর্তৃচাষীদের প্রতীক ধর্মঘট—ব্যাক কর্মীদের বিরোধ জাতীয় ট্রাইবুনাল প্রেরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ।

দিল্লিতে পাক-ভারত বানিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত।

৬ই চৈত্র (২০শে মার্চ): নয়া দিল্লিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুই দিবসব্যাপী বৈঠক শেষ—রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের উপর কৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যমান হ্রাস বাধা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব অর্পণ।

৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ): চীনা প্রধান মন্ত্রী শি: চৌ এন লাই-এর ১১শে এপ্রিল নয়া দিল্লী আগমন—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

কাজ বিরোধ সম্পর্কে সালিশীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জাতীয় ট্রাইবুনাল গঠন।

৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ): পাকিস্তানকে বেসরকারী হস্তান্তর করার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধনের সিদ্ধান্ত—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সাধারণ খাতে ব্যয়-বরাদ্দের বিতর্কে সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা।

৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ): দক্ষিণ আফ্রিকার খেতাজীদের নরমের বজের তীব্র নিন্দা—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ।

১০ই চৈত্র (২৪শে মার্চ): ভারতীয় ট্রেড ব্যাক কর্তৃচাষীদের ২০ দিন ব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহার।

১১ই চৈত্র (২৫শে মার্চ): ভারতের পাল্লামেটোরী পণ্যতন্ত্রের রূপ পরিবর্তনের আন্দোলন—সেবাশ্রমে অধিল ভারত সর্বসেবা সংঘের বৈঠকে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের দাবী।

১২ই চৈত্র (২৬শে মার্চ): দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্তের জন্য ট্রাইবুনাল গঠনের দাবী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় প্রণীত।

১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ): ভারত-চীন প্রধান মন্ত্রী বৈঠকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার আশা—কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি শি কৈরালার মন্তব্য।

১৪ই চৈত্র (২৮শে মার্চ): দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ষের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

১৫ই চৈত্র (২৯শে মার্চ): ১২-দিন ব্যাপী ভারত সরকার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট গামেল আবদেল নাসেরের সঙ্গে দিল্লী আগমন।

১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ): দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালীন ইম্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণের আশা নাই—লোকসভায় ইম্পাত-সচিব সর্দার শরণ সিং-এর উক্তি।

দিল্লিতে প্রধান মন্ত্রী নেহরুর সহিত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসেরের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনা।

১৭ই চৈত্র (৩১শে মার্চ): পরবর্তী ছয় মাসের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ভারতের আমদানী নীতি ঘোষণা—কুড় শিল্প, কাঁচা মাল ও যন্ত্রাংশের আমদানী বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি—সিকিমের পৃথক প্রত্যাশা ব্যবস্থার প্রশ্ন উঠে না।

১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল): ভারতের সর্বত্র সরকারী প্রাইজ বণ্ড পরিকল্পনার উদ্বোধন—দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অর্থসচিব শ্রীমোহনলাল দশগুপ্ত কর্তৃক প্রথম দফার বণ্ড ক্রয়।

১৯ই চৈত্র (২রা এপ্রিল): ভারতের সর্বত্র সরকারী প্রাইজ বণ্ড পরিকল্পনার উদ্বোধন—দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অর্থসচিব শ্রীমোহনলাল দশগুপ্ত কর্তৃক প্রথম দফার বণ্ড ক্রয়।

২০শে চৈত্র (৩রা এপ্রিল): হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বঙ্গ উদ্বাস্ত সংমেলনের প্রাক্ত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীমোহনলাল দশগুপ্তের অংশগ্রহণ ও দণ্ডকার্য পরিকল্পনার পুনর্গঠন দাবী।

২১শে চৈত্র (৪রা এপ্রিল): চৌ-এর (চীনা প্রধানমন্ত্রী) দিল্লী আগমনে ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার সম্ভাবনা—নালালে সাংবাদিকদের নিকট আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসেরের আশা প্রকাশ।

২২শে চৈত্র (৫ই এপ্রিল): হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বঙ্গ উদ্বাস্ত সংমেলনের প্রাক্ত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীমোহনলাল দশগুপ্তের অংশগ্রহণ ও দণ্ডকার্য পরিকল্পনার পুনর্গঠন দাবী।

২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল): হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বঙ্গ উদ্বাস্ত সংমেলনের প্রাক্ত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীমোহনলাল দশগুপ্তের অংশগ্রহণ ও দণ্ডকার্য পরিকল্পনার পুনর্গঠন দাবী।

২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল): হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বঙ্গ উদ্বাস্ত সংমেলনের প্রাক্ত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীমোহনলাল দশগুপ্তের অংশগ্রহণ ও দণ্ডকার্য পরিকল্পনার পুনর্গঠন দাবী।

২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল): হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বঙ্গ উদ্বাস্ত সংমেলনের প্রাক্ত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীমোহনলাল দশগুপ্তের অংশগ্রহণ ও দণ্ডকার্য পরিকল্পনার পুনর্গঠন দাবী।

২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল): হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বঙ্গ উদ্বাস্ত সংমেলনের প্রাক্ত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীমোহনলাল দশগুপ্তের অংশগ্রহণ ও দণ্ডকার্য পরিকল্পনার পুনর্গঠন দাবী।

২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল): হুল কাইতালের প্রেরণক কীস হওয়ার রাজ্যবিধান সভার উদ্দেশ্য—প্রেরণক কীস ব্যাপারে কয়েক ব্যক্তি প্রেরণ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা কর্তৃক ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী বিল গৃহীত।

২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল): কাথোতে বড় আকারের তৈল খনি আবিষ্কার—লোকসভার খনি ও তৈল সচিব শ্রী কে ডি মালব্যের ঘোষণা।

২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল): কমাণ্ডার নানাবতীকে (বোম্বাই-এর ব্যবসায়ী আছজা হত্যার মামলায় অভিযুক্ত) মামলা চালাইবার জন্য সরকারী সাহায্য দান অস্বাভাবিক ও অর্থোক্তিক হইরাছে—কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের মন্তব্য।

২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল): ভারতের সীমান্ত সম্পর্কে ভারতীয় জনগণকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে—আসন্ন চৌ-নেত্র বৈঠকের উল্লেখকালে লোকসভার কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব শ্রীভি, কে, কৃষ্ণস্বামীনারায়ণের ঘোষণা।

২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল): দিল্লীতে নেহরু-নাসের বোধ ইত্তাহার প্রচার—কোন শক্তি-গোষ্ঠিতে ভারত ও সম্মিলিত আরব প্রজতন্ত্রের যোগ না দিবার সম্ভব ঘোষণা।

আসাম-পূর্ব পাকিস্তান সীমানা পুননির্ধারণের প্রসঙ্গে উভয় অংশের চাক সেক্রেটারীদের আলোচনার (শিলং) সম্ভাবজনক সমাপ্তি।

২৮শে চৈত্র (১১ই এপ্রিল): কলিকাতার পৌর সভার মেয়র নির্বাচনে দক্ষিণ হটখোল ও বিশ্বখলা—ইউ-সি-সি ও কংগ্রেস দলের পৃথক পৃথক মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচন।

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল): দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীধারার পদত্যাগ দাবী—লোক সভার বিরোধী সদস্যদের প্রস্তাব।

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল): বাংলার জল সংক্রান্ত বিরোধ-সীমান্তীয় পাকিস্তানের বাগা স্রষ্ট—লোকসভার সেচ ও বিদ্যুৎ সচিব মি: হাকিম মহম্মদ ইব্রাহিম কর্তৃক তথ্য জ্ঞাপন।

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক কলিকাতা পৌর সভার মেয়র নির্বাচনে প্রসঙ্গ আলোচনা।

বহিঃদেশীয়—

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ): জেনেভার প্রাচ্য-প্রতীচ্য দশ জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ।

৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ): ইতিহাসের মধ্যাক্ষেপে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা—৬০ জন আরোহীর সকলেই নিহত।

৪ঠা চৈত্র (১৮ই মার্চ): আসন্ন শীর্ষ সম্মেলন ও জেনেভা বৈঠকে সমস্ত সমস্যার সমাধান—রূপ প্রধানমন্ত্রী ম: ক্রুসেভের আশা প্রকাশ।

৬ই চৈত্র (২০শে মার্চ): সাধারণ নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ মহনাথের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশার প্রণয়।

৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ): চীনা প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ-এন-লাই

ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি. পি, কৈরালী কর্তৃক শিকি-এ চীন-নেপাল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ): কেপটাউন ও জোহান্সবার্গে (দক্ষিণ আফ্রিকা) কৃষকদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত—পরিচরণ আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের উপর সৈন্য ও পুলিশের বোমারো গুলীবর্ষণ।

৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ): সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ম: ক্রুসেভের জাতি সফর শুরু—প্যারিসে করাচী প্রেসিডেন্ট ভগলের সহিত বয়রা বৈঠক।

১১ই চৈত্র (২৫শে মার্চ): গণ-চীন কর্তৃক নেপালকে দশ কোটি টাকা ঋণ দান—নেপাল-চীন সীমান্ত চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ।

১২ই চৈত্র (২৬শে মার্চ): আফ্রিকানদের (কৃষক) বিনা পরিচরণে চলাকোর অধিকার স্বীকার—দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশের বিজ্ঞপ্তি।

১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ): রাওয়ালপিন্ডিতে চারদিন ব্যাপী পাক-ভারত অর্থনৈতিক আলোচনা ব্যর্থতার পর্যায়সি।

১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ): বিক্ষোভ দমনে দক্ষিণ আফ্রিকার ৮০টি জেলার জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও আঞ্চলিক বাহিনীর সমাবেশ।

১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল): দক্ষিণ আফ্রিকার নিকট বর্ষ-বৈষম্য নীতি পরিহারের আর এক দফা দাবী—হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে আক্রো-এশীয় প্রস্তাব গৃহীত।

২০শে চৈত্র (৩রা এপ্রিল): সকল আন্তর্জাতিক প্রায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমান্তের সমস্যা—প্যারিসে প্রচারিত ক্রুসেভ-ভ গল (রূপ ও করাচী রাষ্ট্রপ্রধানের) বোধ ইত্তাহারে ঘোষণা।

২১শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল): বিশ্বের সর্বোচ্চ গির্গিল এভারেস্টের উপর গণচীনের দাবী নেপাল কর্তৃক অগ্রাহ্য।

২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল): সিংহলের 'কমনওয়েলথের মধ্যে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নতুন পার্লামেন্টে গভর্ণর জেনারেল স্ত্রী অলিভার ওয়েলিংটনের ঘোষণা।

২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল): জেনেভা বৈঠকে সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক পশ্চিমী নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা অগ্রাহ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গে দাগ হামারফ্রেন্ডের (রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারী জেনারেল) তৎপরতা—ইউনিয়ন সরকারের নিকট সরকারী ভাবে নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ প্রেরণ।

২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল): আন্তর্জাতিক সীমান্তে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ডা: হেন্ড্রিক ভেরবোর্ড আহত।

২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল): তিস্তেতে আক্রমণ ও ব্যাপক নরহত্যার ব্যাপারে চীন অপরাধী—আক্রো-এশীয় সম্মেলনের রাষ্ট্রনৈতিক ও মানবাধিকার কমিটির অভিযুক্ত।

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল): হোগের আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক পর্তুগালের দাবী অগ্রাহ্য—ভারতের ভিতর দিয়া পর্তুগালের সৈন্য লইয়া বাঙালার অধিকার অস্বীকৃত।

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল): দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত প্রত্যাশিত বৈঠকের উদ্দেশ্যে চীনের প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ-এন-লাই-এর সমলে শিকি হইতে বাতায়।



ত্রিগোপালচন্দ্র নিয়োগী

সৌম্যান রী বিদায়—

পঁচাশী বৎসরের বৃদ্ধ দক্ষিণ কোরিয়ার দুর্দণ্ড প্রতাপাধিত প্রেসিডেন্ট ডাঃ সৌম্যান রী বিপুল রক্তপাতের মধ্যে গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৬০) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি একদিন কোরিয়ার জাতীয়তাবাদী জনপ্রিয় নেতা ছিলেন বার বৎসর দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে থাকিয়া তাহার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতালিপ্সা এবং নিষ্ঠুর দমননীতির জন্য তিনি জনগণের অশেষ অপ্রিয়ভাজন হইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপৃষ্ঠে আশ্রয় না পাইলে বহু পূর্বেই তাহার পতন হইত। মার্কিন সরকারের সমর্থন পাইলে এবারও তাহার পতন ঘটত কিনা সে কথা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। গত ১৫ই মার্চের নির্বাচনের পর হইতে প্রায় একদশবর্ষাধি ছাত্র ও গণবিক্ষোভের ফলে ১৪৫ জন নিহত এবং ৭০৫ জন আহত হওয়ার অমূল্য হইয়া তিনি প্রেসিডেন্টের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহাও স্বীকার করা সম্ভব নয়। গত ১১শে এপ্রিলের বিক্ষোভ দমনের জন্য প্রেসিডেন্ট ডাঃ রী যে চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাহার আত্মরক্ষা এবং রক্ষাকর্তা মার্কিন সরকারও উদ্বিগ্ন না হইয়া পারেন নাই। কোরিয়ার রাজবংশোদ্ভব অভিজাত্যগণী, দান্তিক এই বৃদ্ধ টাওয়ার উৎকট কন্যামিজম বিরোধিতার জন্যই মার্কিন সরকারের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন। মার্কিন সরকার মনে করিতেন শাসনভার ডাঃ রী হস্তে জ্ঞত না থাকিলে কন্যামিজমের প্রাধিকার দক্ষিণ কোরিয়া প্রাপ্ত হইয়া বাইবে। তাই ডাঃ রীর পন্থাবিরোধী এবং ক্যাসিট মূলত সমস্ত কার্যই মার্কিন সরকার পরম উদ্যোগের সহিত অকাতরে সহ করিয়াছেন। গত ১৫ই মার্চের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে চতুর্থবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার দুর্লভ বশতঃ যে-সকল অনাচারের অস্বপ্ন ডাঃ রী করিয়াছেন ১১শে এপ্রিলের বিপুল অকৃত্যানের পূর্ণপরিমাণে মার্কিন সরকার সেগুলিকে উপেক্ষা করিতেই দেখিয়াছেন, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু এই বিক্ষোভ দমনের জন্য যেসকল বিপুলভাবে ট্যাক এবং কামান ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে মার্কিন সরকারও বিচলিত না হইয়া

পারিলেন না। মার্কিন সরকার বুঝিতে পারিলেন, এইভাবে কন্যামিজম একনায়কত্বের অপ্রগতি-রোধ করিবার জন্য যদি দক্ষিণ কোরিয়ার ডাঃ রীর ক্যাসিট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাহাকে স্বাধীন বিশ্ব বলিয়া অভিহিত করে সেই স্বাধীন বিশ্বের সর্বত্র কন্যামিজমেরই প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে। দক্ষিণ কোরিয়ার যে যুবশক্তি আজ ডাঃ রীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে দমননীতির ফলে কাল সেই যুবশক্তিই যে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাই দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাপারে মার্কিন সরকার আর উদাসীন থাকিতে পারেন নাই।

১৫ই মার্চের নির্বাচনের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ যে ভায় সঙ্গত মার্কিন সরকার তাহা জানিয়াও নীরব ছিলেন। কিন্তু সেই ভায়সঙ্গত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য প্রবল গণবিক্ষোভকে বেড়াবে দমন করা হইতেছিল তাহাতে মার্কিন সরকারও আর নীরব দর্শক থাকিতে পারিলেন না। দক্ষিণ কোরিয়াকে মার্কিন আওতার রাষ্ট্রাধার জ্ঞত কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ফলে প্রায় অর্ধশতক মার্কিন যুবক নিহত হইয়াছে, আহত হইয়াছে প্রায় একশতক মার্কিন যুবক। সেই দক্ষিণ কোরিয়ার ডাঃ রীর শাসন বহাল রাখিলে কন্যামিজমেরই সুযোগ উপস্থিত হইবে। তাই ১১শে এপ্রিল তারিখেই সিউলস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ওয়াকার ম্যাকনগি প্রেসিডেন্ট রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় ৪৫ মিনিট কাল তাহার সহিত আলোচনা করেন এবং এই আলাপ প্রকাশ করেন যে, আর বাহাতে হতাশত না হয় তাহার জন্য যেন চেষ্টা করা হয়। তিনি বলেন, "The means adopted to maintain law and order would take into consideration the basic causes and grievances behind the disorder." অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের সময় বিপুলতার মূল যে মূল কারণ এবং অভিযোগ রহিয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরও নীরব থাকিতে পারেন নাই। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের 'অভিযোগের সঙ্গত কারণ' (justifiable grievances) রহিয়াছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর সে-কথা স্বীকার করিয়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে ভায়সঙ্গত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা দূর করিতে বলিয়াছেন। নির্বাচনে যে গলদ (irregularities) রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ হ্যাটরিও স্বীকার করিয়াছেন যে, দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্প্রতিক নির্বাচনে ডাঃ রীর সরকার যে-সকল নিয়মবিকৃত কারসাজি করিয়াছেন, বিক্ষোভ প্রধানতঃ সেই কারণেই ঘটয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ডাঃ রীর সরকার গণ-অসন্তোষের মূল কারণগুলি দূর না করিয়া অত্যধিক মাত্রায় দমননীতি চালাইয়া ফুল করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, নিজের গোপন প্রতাপ রক্ষা করিবার জন্য ডাঃ রী শুধু সাম্প্রতিক নির্বাচনেই পন্থাবিরোধী কারসাজি এবং দমননীতি প্রয়োগ করেন নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে কোরিয়া জাপানের কবল হইতে মুক্ত হয়। উত্তর কোরিয়া থাকে রাশিয়ার প্রভাবাধীনে এবং দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীনে আসে। ডাঃ রী ১৯৪৮ সালে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সেই সময়

হইতেই তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইতে থাকে। তবু ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনেও তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ঐ সময় কোরিয়ার শাসনতন্ত্রে বিধান ছিল, কোনও ব্যক্তি পর পর দুই বারের বেশী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। ডাঃ রী ১৯৫৪ সালে ঐ বিধান বাতিল করেন।

১৯৫৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিনি ডাঃ রীর অন্ততম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, ভোট গ্রহণের একদিন পূর্বে রহস্য জনক ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচনের পূর্বেই কারাকন্ড হন এবং গত বৎসর জুলাই মাসে বিচারের এক প্রেসন করিয়া উত্তর কোরিয়ার সহিত যোগসাক্ষরের অভিযোগে তাঁহার কাঁসী দেওয়া হয়। কোরিয়ার গৃহ যুদ্ধের বিরতির পর হইতে দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে বামপন্থী ভাে দূরের কথা প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদেরও গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতেছিল। কতকবে কোন কৌশলে কয়ানিষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিলে মৃত্যুদণ্ড এড়ানো তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়া আসিতেছে। এই অর্থ সরকারী এজেন্সী এবং জনকতক অভিজাত বংশীয়দের মাধ্যমে ব্যয় করা হইয়া থাকে। ফলে বড় লোকদের একটা বৃহৎ কায়দা স্বাধীন হইয়াছে। কয়ানিষ্টম নিরোধের জন্ম মার্কিন বাহিনী ১৯৫৬ সালে যে অর্ডিনাল জারী করে সেই পুরাতন অর্ডিনাল অনুসারে গত বৎসর এপ্রিল মাসে একটি স্বাধীন মতাবলম্বী বিশিষ্ট সংবাদপত্রকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গত মার্চ মাসের নির্বাচনে যে জবরদস্তী চলিয়াছে মার্কিন সরকার আজ তাহা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। এই নির্বাচনের প্রাক্কালেও ডাঃ রীর প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু হয়। তবে তাঁহার মৃত্যুটা নাকি রহস্যজনক নয়। ডাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্ম ডাঃ রীর লিবারেল দলের প্রার্থীর সহিত ডেমোক্রেট দলের প্রার্থী ডাঃ চাং মিউনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ডাঃ মিউন পরাজিত হন। মার্কিন সাম্প্রদায়িক পত্রিকা 'টাইম' পর্য্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, স্বাধীন ভাবে ভোট প্রদত্ত হইলে ডেমোক্রেটিক প্রার্থীই জয় লাভ করিতেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার রক্তপাত বড় কম হয় নাই। সরকারী হিসাব মতই ৮ জন নিহত হয়। বেসরকারী মতে নিহতের সংখ্যা অনেক বেশী। অনেকে বলেন যে, বহু মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ভোট গ্রহণের দিনও জবরদস্তি ও ভয় প্রদর্শন চলিয়াছিল। ফলে বহু ভোটার ভোট দিতে যান নাই। এই সুরাঙ্গে চিহ্নিত ব্যালট পেপার ছায়া ব্যালট বাধু পূর্ণ করা হয়। নির্বাচনে জয়লাভ স্থানিচিত-ই ছিল। ডাঃ রী শুধু হইতেই সক্ষম হন নাই। সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়া যে তাঁহাকেই চায় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। শত করা ৮০ জনেরও বেশী ভোটার ভোট দিয়েছেন বলিয়া খোঁজানো হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া যে তাঁহার বিরোধী তাহা প্রমাণিত হইতে বিলম্ব হয় নাই।

স্বাধীন বিশ্ব, গণতন্ত্র এবং কয়ানিষ্ট বিরোধিতার নামে মার্কিন সরকার ডাঃ রীর

বার বৎসর ব্যাপী বৈরাচারিতা সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু এবার মার্কিন সরকারেরও বৈরাচারী সীমা ছাড়িয়া গিয়াছে। মার্কিন সরকারের চাপে গত ২৩শে এপ্রিল (১৯৬০) ডাঃ সৌম্যান রী অপ্রতীত শাসন ক্ষমতার অধিকার ত্যাগ করিয়া নাম সর্বত্র রাষ্ট্র প্রধান থাকিতে সম্মত হন। তাঁহার মন্ত্রিভার সবল সমস্ত পদত্যাগ করেন। কিন্তু জনমত সন্তুষ্ট হয় নাই। গত ২৬শে এপ্রিল পাঁচ লক্ষ লোকের এক মারমুখী জনতা ডাঃ রীর বাসভবন ঘেরিয়া কেলে এবং অবিলম্বে তাঁহার পদত্যাগ দাবী করে। তাহার ডাঃ রীর একটি মূর্তি টানিয়া ছিঁড়েইয়া রাষ্ট্রীয় আনিয়া কেলে ও উহাতে থুথু দেয়। ডাঃ রী জানান যে, জনগণ যদি চায়, তাহা হইলে তিনি প্রেসিডেন্টের পদ অবিলম্বে ত্যাগ করিবেন। জনমতের দাবী আর কি ভাবে তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বুঝা কঠিন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইল। গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৬০) তিনি পদত্যাগ করেন। ঐদিন অপরাত্ত দক্ষিণ কোরিয়াস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেন, "কোরিয়া বিশাবলিক এবং বিশেষতঃ বহু বহুদের ইহা একটি চিরস্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। আমায় বিশ্বাস, জনগণের হ্রাস সমস্ত অভিযোগগুলির প্রতিকার করিবার জন্য বাহা কিছু স্বাধীন, কর্তৃপক্ষ সেগুলি সমস্তই করিবেন।" ডাঃ রী এবং তাঁহার লিবারেল দল শুধু দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষেই নয় আমেরিকা বাতাকে স্বাধীন বিশ্ব বলিয়া মনে করে তাহার পক্ষেও বিপক্ষজনক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মার্কিন সরকারও বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই পদত্যাগ করা ছাড়া ডাঃ রীর উপায়ান্তর ছিল না।

ডাঃ সৌম্যান রী প্রেসিডেন্টের পদ পরিত্যাগ করায় দক্ষিণ কোরিয়ার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি দুর্বার বাধা দৃব হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার জন্ম প্রচুর রক্তপাতের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ার গণতন্ত্রের নতুন পাদক্ষেপ কি ভাবে পরিচালিত হইবে তাহা বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই। ডাঃ রীর পদত্যাগের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ হু চু অন্তর্কর্ত্তী সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যদি এই বিপুল রক্তপাত এবং ডাঃ রীর পতনের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন তাহা হইলে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাদের লইয়াই তিনি সরকার গঠন

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বাকলা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অল্পশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, তেজুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাঙ্গি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। আহাৰে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও স্বাস্থ্যকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিখ্যানে মূল্য ফেরত। ৩২ গোলায় প্রতি কোটা ৩ টাকা, একচে ৩ কোটা - ৮।।। আনা। ডাঃ, মাঃ ও পাইকারী সব পৃথক।

হেড অফিস - বার্লিশালা (হুর্কি পাকিস্তান) স্ট্রাঃ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি, কলিঃ - ৭

দি বাকলা ঔষধালয়।

ককিৰেন এক স্বাধীনভাবে নিৰ্বাচন হওৱাৰ ব্যবস্থা কৰিবেন। জনসাধাৰণৰ ভাৱসম্মত অভিযোগৰ প্ৰতিকাৰ হওৱা সম্পৰ্কে দাৰ্শনিক বাস্তৱত যে আশা দিয়াছে স্বাধীন ভাবে নিৰ্বাচনৰ ব্যবস্থা হইলৈ এই অভিযোগৰ প্ৰতিকাৰ হইবে। দক্ষিণ কোৱিৱা সম্পৰ্কে দাৰ্শনিক বুদ্ধবাস্তৱৰ একটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বহিৰাংশ। দক্ষিণ কোৱিৱাৰ গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দৃষ্টি দায়িত্ব দাৰ্শনিক বুদ্ধবাস্তৱৰ একটা অধিকাৰ কৰা যায় না। কলুনিজমেৰ ভৱে দক্ষিণ কোৱিৱাৰ দ্বিতীয় সীমায়ান বী গড়িয়া উত্তীৰণ কোন সুযোগ যদি দাৰ্শনিক সরকার না দেন, তাহা হইলে বুৰ শক্তিৰ এই বুদ্ধবাস্তৱকাৰী বিকোভেৰ উপযুক্ত মৰ্যাদা দিতে হইবে। তাহা হইলৈ ডাঃ বীৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। গত বার বৎসৰে ডাঃ বী গণতন্ত্ৰৰ যে ধ্বংসাত্মক ঘটনা কৰিয়াছে তাহা অপসাৰণ কৰিয়া গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পথ বাধা দিয়াই সৰ্বপ্ৰথম প্ৰয়োজন।

নেহৰু-চৌ-আলোচনা ব্যৰ্থ—

চীন-ভাৰত সীমান্ত বিবাদী সীমান্তৰ জন্ত নয়াদিল্লীতে দুদিন ব্যাপী নেহৰু-চৌ আলোচনা ব্যৰ্থতাৰ পৰ্য্যবসিত হইয়াছে, ইহা বুঝি দুশ্বেৰ বিষয়। আলোচনাৰ এই ব্যৰ্থতা প্ৰত্যাশিত ছিল কি না এ বিষয়ে মন্তভেদৰ অবকাশ আছে। প্ৰথমে ব্ৰহ্মদেশ ভাৰতৰ নেপালৰ সৈতে চীনেৰ সীমান্ত বিবাদেৰ সীমান্ত হইয়াছে বলিয়াই চীন-ভাৰত সীমান্ত বিবাদেৰ সীমান্ত প্ৰত্যাশিত ছিল, একথা হয়ত বলা যায় না। কাৰণ চীন-ব্ৰহ্মদেশ ও চীন-নেপাল সীমান্ত বিবাদেৰ অপেক্ষা চীন-ভাৰত সীমান্ত বিবাদেৰ বহু গুণে গুৰুতৰ। এই সীমান্ত বিবাদেৰ লইয়া এমন অনেক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বাহাৰ কলে ভাৰতবাসী অন্তৰ্ভুক্ত হইয়াছে, চীন-ভাৰত মৈত্ৰী শুধু বিপন্ন হই হয় নাই, উহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে বলিলেও ভুল হইবে না। বৰ্ত্ততে ইতিপূৰ্বে দুইবাৰ চীনেৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎকাৰেৰেৰ আন্তৰিকতা লক্ষিত হইয়াছিল এবাৰ আৰ তাহা দেখা যায় নাই। শুধু এই সকল কাৰণেই নেহৰু-চৌ আলোচনাৰ ব্যৰ্থতা প্ৰত্যাশিত ছিল একথা স্বীকাৰ কৰা যায় না। কিন্তু চীন-ভাৰত সীমান্ত বিবাদেৰ কলে সমগ্ৰ এশিয়ায় কলুনিজ চীনেৰ মৰ্যাদা ক্ষুৰ হইয়াছে, একথা মিঃ চৌ-এন-লাই বুঝিতে পাবেন নাই, ইহা মনে কৰা সম্ভব নহয়। এশিয়ায় কলুনিজেশ্বৰ এবং অকলুনিজ দেশেৰ মধ্যে সহাবস্থান নীতি যদি ব্যৰ্থতাৰ পৰ্য্যবসিত হয় তাহা হইলে ইউৰোপে সহাবস্থান নীতি কাৰ্য্যকৰী কৰা মঃ ক্ৰুশ্বেভেৰ পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না। অনেকেই হয়ত আশা কৰিয়াছিলেন যে, মঃ ক্ৰুশ্বেভ শ্বিৎস-সম্মেলনেৰ পূৰ্বে চীন-ভাৰত বৈত্ৰী পুনঃ প্ৰতিষ্ঠিত দেখিতে চান। এই ধাৰণা নেহৰু-চৌ বৈত্ৰীকেৰ সাক্ষ্য সম্পৰ্কে একটা প্ৰত্যাশা সৃষ্টি কৰিয়াছিল ইহা মনে কৰিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। গত ১৯শে এপ্ৰিল (১৯৬০) পালাম বিমান বন্দৰে অবতৰণ কৰিবাৰ পৰা চীনেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলিয়াছিলেন যে, বিবাদেৰ সীমান্তৰ ঐকান্তিক আগ্ৰহ লইয়াই তিনি নয়া দিল্লীতে আসিয়াছেন। তাহাৰ এই উক্তি একটা কথাৰ কথা বাক্য, ইহা মনে কৰা তখন সম্ভব ছিল না। তিব্বত লইয়াই সৰ্বপ্ৰথম চীন-ভাৰত বৈত্ৰী ক্ষুৰ হওৱাৰ প্ৰবন্ধ দেখা দেয়। বলাই লামাকে ভাৰতে আশ্ৰয় দেওৱাৰ

চীন সম্ভৱ হয় নাই। ইহাৰ পৰেই আৰম্ভ হয় চীন কৰ্তৃক ভাৰতৰ সীমান্ত লঙ্ঘন এবং গুলীবৰ্ষণ। তা সত্ত্বেও পণ্ডিত নেহৰুৰ নিকট সকল পক্ষেই মিঃ চৌ-এন-লাই এই আশা প্ৰকাশ কৰিয়াছিলেন যে, দুই প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ মধ্যে আলোচনা বাহা চীন-ভাৰত সীমান্ত বিবাদেৰ ভাৰ সম্মত সীমান্ত সম্ভব হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। আলোচনা ব্যৰ্থ হওৱাৰ অবস্থা আৰম্ভ হইয়া উঠিয়াছে কিনা তাহাও ভাবিবাৰ বিষয়।

চীনেৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী মিঃ চৌ এন লাই গত ১৯শে এপ্ৰিল (১৯৬০) নয়াদিল্লীতে উপনীত হন। ২৬শে এপ্ৰিল তিনি নয়াদিল্লী হইতে সদলবলে নেপাল বাক্সা কৰেন। ২০শে এপ্ৰিল হইতে ২৫শে এপ্ৰিল পৰ্য্যন্ত দুই দিনে সীমান্ত বিবাদেৰ সম্পৰ্কে পণ্ডিত নেহৰু এবং মিঃ চৌ এন লাইয়েৰ মধ্যে প্ৰায় ২০ ঘণ্টা নিতৃত আলোচনা হয়। এই সুসীৰ্ণ আলোচনা সত্ত্বেও সীমান্ত বিবাদেৰ সম্পৰ্কে কোন সীমান্ত হয় নাই, আলোচনা ব্যৰ্থতাৰ পৰ্য্যবসিত হয়। আলোচনা একেবাৰেই ব্যৰ্থতাৰ পৰ্য্যবসিত হইয়াছে কি না সে সম্পৰ্কেও মন্তভেদেৰ অবকাশ যে একেবাৰেই নাই তাহাও নহয়। উভয় প্ৰধান মন্ত্ৰী সীমান্ত কৰিয়াছেন যে, উভয় দেশেৰ সরকারী কৰ্মচাৰীৰ সীমান্ত বিবাদেৰ সাক্ষাৎ তথ্য প্ৰমাণাদি পৰীক্ষা কৰিবেন। বৰ্ত্তমানে এই তথ্য প্ৰমাণাদিৰ পৰীক্ষা চলিবে ততদিন উভয় সরকারই সীমান্ত এলাকাৰ দৃশ্য পৰিহাৰ কৰিয়া চলিবেন। আলোচনাৰ ব্যৰ্থতা হইতে সীমান্ত পৰিমাণে হইলৈও বেটুকু ভাল কল পাওৱা বাইতে পাবে তাহাৰ জন্ত বিশেষভাৱেই যে চেষ্টা কৰা হইয়াছে তথ্য প্ৰমাণাদিৰ পৰীক্ষাৰ ব্যবস্থা এবং পৰীক্ষাকালে সীমান্ত এলাকাৰ দৃশ্য পৰিহাৰেৰ সিদ্ধান্ত হইতে তাহা বুঝিতে পাৰা যায়। সরকারী কৰ্মচাৰীয়েৰেৰ প্ৰথম বৈত্ৰীক বসিবে জুন মাহে। এই বৈত্ৰীক হইবে শিকিয়ে। তাৰপৰা পাণ্টাপাণ্ট কৰিয়া উভয় দেশেৰ ৰাজধানীতে বৈত্ৰীক বসিবে এবং সেপ্টেম্বৰ মাহে ৰিপোর্ট দাখিল কৰা হইবে। নেহৰু-চৌ বৈত্ৰীক শেষ হওৱাৰ পৰা ২৫শে এপ্ৰিল তাৰিখে প্ৰচাৰিত বোধ ইচ্ছাহাৰে এই সকল বিষয় ঘোষণা কৰা হয়।

উভয় প্ৰধান মন্ত্ৰীই নিজ নিজ দাবীতে যে অচল ছিলেন ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। মিঃ চৌ এন লাই মাকমোহন লাইনকে মানিয়া লইতে ৰাজী নহেন। তবে লাইনেৰ অপৰহিক চীনা সৈন্তেৰ অগ্ৰগতি ৰোধ কৰিতে তিনি সম্মত আছেন। এই অপৰহিকেৰ মধ্যে লঙ্ঘনও পড়িয়াছে। লাডাক অঞ্চলে ভাৰতৰ যে ৩০ হাজাৰ বৰ্গমাইল ভূমি চীনাৰ দখল কৰিয়াছে উহা চীনেৰ দখলে থাকি ভাৰত মানিয়া লউক মিঃ চৌ এন লাই ইচ্ছাই বলিয়া ছিলেন। এই ধাৰণেৰ প্ৰত্যাবে নেহৰুজী ৰাজী হইতে পাবেন নাই। কিন্তু আলোচনাতে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হইতে দেখা হয় নাই। জুন হইতে সেপ্টেম্বৰ পৰ্য্যন্ত উভয় দেশেৰ সরকারী কৰ্মচাৰীগণ সীমান্ত বিবাদেৰ সাক্ষাৎ তথ্য প্ৰমাণাদি পৰীক্ষা কৰিবেন। পণ্ডিত নেহৰু শিকিয়ে আশ্বস্ত হইয়াছেন। তিনি কবে চীনে বাইবেন তাহা অবস্থা বুঝিবা স্থিৰ কৰা হইবে। আলোচনাৰ পূৰ্বে সীমান্তেৰ অবস্থা বাহা ছিল আলোচনাৰ পৰেও তাহাই ৰহিয়া গেল।

ভাৰত হইতে মিঃ চৌ এন লাই নেপালে গমন কৰেন। সেখান হইতে শিকিয়ে ৰাওৱাৰ পথে গত ২৯শে এপ্ৰিল তিনি সদলবলে

কিছু সময় সময় বিমান বন্ধের অবস্থান করেন। ঐ সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেন যে, তিনি দিল্লী ত্যাগ করার পর জীনেহক সোকসভার এবং সাংবাদিকদের নিকট চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা অসঙ্গত এবং উচ্চা বদ্বুদ্ধনোচিত হয় নাই। তিনি এই অভিযোগ করেন যে, তাঁহার সঙ্গ দীর্ঘ আলোচনার সময় জীনেহক একধার উল্লেখ করেন নাই। সাংবাদিকগণ চৌ এন লাইকে পূর্ব পূর্ব প্রশ্ন করিতে থাকিলে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন ই উত্তেজিতভাবে হাত নাড়িতে নাড়িতে বলেন, 'আর নয়, আর নয়।' সঙ্গ সঙ্গ চীনা নিরাপত্তা বাহিনীর তের চৌদ্দজন কর্মচারী হাঙ্গা দিতে দিতে সাংবাদিকদিগকে বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করে। তখন মিঃ চৌ এন লাই উচ্চৈঃস্বরে চীনাভাষায় কি বলিয়া তাহাদিগকে ধামাইয়া দেন। ইতিপূর্বে গত ২৮শে এপ্রিল কাটমণ্ডুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ চৌ এন লাই পণ্ডিত নেহরুর উক্তি সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

এভারেট ও চীন—

চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই ভারত হইতে ১৬শে এপ্রিল নেপালে গমন করেন। নেপাল হইতে স্বদেশে যাত্রা করেন ২১শে এপ্রিল। নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরলার সহিত তাঁহার আলোচনা হয় পোখরায়া। নেপালের সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি করিতে এবং চীনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতে পারে এরূপ সামরিক ভোট নেপাল যোগদান করিবে না, এইরূপ একটি স্বীকৃতি ঐ চুক্তিতে পাইবার জন্য চীনের প্রধান মন্ত্রী আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চুক্তি হইবে মণ বংসরের জন্য এবং উচ্চাতে এইরূপ সর্ব্ব থাকিবে যে নেপাল ও চীন কেহ-ই অপরকে আক্রমণ করিবে না এবং কেহ-ই অপরকে বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে এরূপ কোন সামরিক চুক্তিতে যোগদান করিবে না। নেপালের প্রধান মন্ত্রী জীকৈরলা এইরূপ চুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। তিনি এই বৃত্তি প্রদর্শন করেন যে, সহাবস্থানের পক্ষপাল নীতি সম্পর্কে বালুঃ ঘোষণাই যথেষ্ট, এইরূপ অনাক্রমণ চুক্তির কোন প্রয়োজন নাই। তিনি আরও বলেন যে, এইরূপ চুক্তি কোন দেশকে এ পর্যন্ত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। নেপাল ও চীনের মধ্যে একটি শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি গত ২৮শে এপ্রিল (১৯৬০) স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

নেপাল ও চীনের মধ্যে সর্কাপেকা বৃহৎ সমস্তা দেখা দিরাছে এভারেট পর্বত লাইয়া। গত হার্ভ মাস পিকিংয়ে নেপাল ও চীনের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাহাতে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র এভারেট পর্বতটিই চীন দাবী করে। চীনের দাবী শুধু এভারেটের দক্ষিণ পার্শ্বই নয়, উচ্চা নিম্নস্থ গ্রেসিয়ার সহ নর্ম্চে বাক্সার পর্যন্ত পাঁচ মাইল ভূমিও এই দাবীর অন্তর্ভুক্ত। নেপালের প্রধান মন্ত্রী চীনের প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন যে, শুধু দক্ষিণ পার্শ্বই নয় এভারেটের উত্তর পার্শ্বও হংবুক গ্রেসিয়ার পর্যন্ত নেপালের অন্তর্ভুক্ত। নেপাল সবারে বাইরা চীনের প্রধান মন্ত্রী এভারেট পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বের দাবী ছাড়িয়া দিরাছেন বলিয়া প্রকাশ। পোখরায়া জীকৈরলাকে তিনি জানাইয়াছেন যে, এভারেট পর্বতের চূড়া যদি চীন ও নেপালের সীমা বলিয়া স্বীকৃতি হয়, তাহা হইলে এভারেটের দক্ষিণ পার্শ্বের দাবী তিনি ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে,

ডায়বেটিস

রোগীদিগকে

বিনা খরচায়

পরামর্শ দান

প্রশ্নাবের সঙ্গে চিনি বের হলে তাকে বলা হয় ডায়বেটিস মেলিটাস এবং চিনি ছাড়া বারবার প্রশ্নাব হলে তাকে বলা হয় ডায়বেটিস ইনসিপিডাস। যে সব রোগী এই রোগে ভুগে থাকেন, তাঁদের পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যন্ত বেড়ে যায়, সমস্ত শরীরে বেদনাবোধ করেন, শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কাজে আগ্রহের অভাব বোধ হয়। দিন দিন ওজন হ্রাস পেতে থাকে, চুলকানি হয়, চর্মরোগে ভুগে থাকেন, যকৃতের কাজ মন্ডর হয়, মূত্রাশয় দুর্বল এবং পাকায়ত্ব ক্রোময়ন্ত্র (প্যানক্রীজ) দোষবৃত্ত হয়। এই রোগকে অবহেলা করার ফলে বাত, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতা, অনিদ্রা, কার্ণাঙ্কল, দৈহিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস, দৈহিক অবসন্নতা, অতিরিক্ত স্নান বোধ এবং সাধারণ দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। যারা এই রোগে ভুগছেন, তাহাদিগকে বিনাখরচায় ডাক্তারের পরামর্শ লওয়ার জন্য আমাদের নিকট লিখিতে অনুরোধ করছি—যার ফলে তাঁরা ইনজেকশন না দিয়ে, উপোষ না করে বা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ না করেও এই হারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং সবসময় যৌবন ও শক্তিশালী বোধ করবেন এবং দৈহিক কার্যকলাপে আগ্রহ বেড়ে যাবে। খুব বিলম্ব না হওয়ার আগেই লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (B.M.)

পোস্ট বক্স নং ৫৮৭,

৬-এ, কানাই শীল স্ট্রিট, (কলকাতা)

কলিকাতা

এভারেস্ট সম্পর্কে আয়োজনের সময় চীনের পক্ষ হইতে এইরূপ প্রস্তাব করা হয় যে, পর্বতের যে কোন দিক হইতে এভারেস্ট শৃঙ্গে অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা চীন ও নেপাল উভয় দেশের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে নেপালের সার্বভৌমত্ব পূর্ণাঙ্গুরি রক্ষিত হয় না বলিয়া নেপালের পক্ষ হইতে উহা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এভারেস্ট সম্পর্কে আবার কবে কোথায় এবং কি ভাবে আলোচনা হইবে তাহা কিছুই জানা যায় না। তবে এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য যুক্ত সীমানা কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইবে না, একথা নিশ্চিত ভাবে জানা গিয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন—

৩রা মে (১৯৬০) লণ্ডনে বৃটিশ কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রীদের বৈ-সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের ইহা নবম সম্মেলন। ইতিপূর্বে সম্মেলন হইয়াছিল ১৯৫৭ সালের জুন-জুলাই মাসে। এই প্রসঙ্গে ইংলও উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের প্রথম সম্মেলন হই ১৯৪৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে। ১৬ই মে (১৯৬০) পারীসে বৈ-শীর্ষ সম্মেলন আরম্ভ হইবে তাহার প্রাক্কালে আলোচ্য কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন হইতেছে। এই দিক দিয়া এই সম্মেলনের যে বিশেষ গুরুত্ব আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। শীর্ষ সম্মেলনে শুধু চারিটি বৃহৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণই যোগদান করিবেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী শীর্ষ সম্মেলনের সহিত কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বৈশিষ্ট্য, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। নিয়ন্ত্রীকরণ, পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্তারণ নিষিদ্ধকরণ, আত্মাণ সমতা, বালিন সমতা প্রভৃতি সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গ শীর্ষসম্মেলনে কি নীতি গ্রহণ করিবেন সে-সম্পর্কে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে আলোচিত হইবে। সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীনের পররাষ্ট্র নীতি, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এবং মধ্য প্রান্তের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কেও কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীগণ আলোচনা করিবেন। সুতরাং এই সম্মেলন যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একথা অনস্বীকার্য কিন্তু এই সম্মেলনের সম্মুখে আশংকা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রহিয়াছে বাহা কমনওয়েলথ যেতাক প্রধান মন্ত্রীদের কাছে ঘোটেই স্থগিত হইতে পারে। সমস্যাটি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রেন্ডারাজের নৃশংস বর্ণবৈষম্য নীতি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি অনেকদিন ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এপর্যন্ত উহা কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের আলোচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। কিন্তু গত মার্চ মাসে (১৯৬০) পরিচয় পত্র আইনের বিরুদ্ধে আফ্রিকানদের বিক্ষোভ দমনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার যেতাক সরকার বৈ-নরমেধ বজ্জের অস্ত্রাধান করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বজনমত তীব্র ভাবার উদ্যম নিন্দা করিয়াছে। পৃথকীকরণ বর্ণবৈষম্য নীতি পরিহার করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে অস্বস্তি করিয়া নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার যেতাকরা তাহাতে একটুকুও বিচলিত হন নাই, অস্বস্তি হওয়া তো দূরের কথা। বরং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের দমননীতি আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কালা আদমী নিধনবজ্জের পর প্রবু উঠিয়াছে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে এই বিষয় উঠিয়া আলোচনা হইবে কি না। এই নরমেধ বজ্জের পর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী একজন যেতাকার আততায়ীর গুলীতে আহত হইয়াছেন। তিনি যদি একজন কৃৎকারের গুলীতে আহত হইতেন, তাহা হইলে দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র খেতাক সম্ভাব্য একাবদ্ধ হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কালাআদমী নিধন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রবু এই যে, কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে কৃৎকার প্রধানমন্ত্রীদের সহিত খেতাক প্রধান মন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি-সম্পর্কে আলোচনা করিতে রাষ্ট্র হইবেন কি না। দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটিশ কমনওয়েলথের একজন সদস্য। উদ্যম প্রধান মন্ত্রী এখনও মৃত্যু না হওয়ার এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন না। তাহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এবিক লো। তিনি লণ্ডনে পৌঁছিলে তাহার হোটেলের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আফ্রিকার আর একটি দক্ষিণ আফ্রিকা গড়িয়া উঠিয়াছে মধ্য আফ্রিকা কেডারেশন। উদ্যম প্রধানমন্ত্রী তার বয় ওয়েল্ডোও কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য লণ্ডনে গিয়াছেন। তিনি মনে করেন, দক্ষিণ আফ্রিকা যদি না চায় তবে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি আলোচনা হওয়া উচিত নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা যে চাহিবে না সে-কথা বলা বাহুল্য।

প্রায় এক মাস পূর্বে নিউজীল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নাস বলিয়াছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু পরে তিনি তাহার মত পারবর্তন করিয়াছেন, বলিয়াছেন যে, এ বিষয় সম্পর্কে সম্মেলনের বাহিরে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধির সহিত তিনি আলোচনা করিবেন। যেতাক প্রধান মন্ত্রী যে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হইতে বাদ দিতে চাহিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল অশেতকার প্রধান মন্ত্রীরাই চাহেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্মেলনে আলোচিত হউক। মালয়ে প্রধান মন্ত্রী টেঙ্গু আবদুল রহমান লণ্ডনে বাওয়ার পথে সাটাকুজ বিমানঘাঁটিতে সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন যে, বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে একটা কিছু করা আবশ্যক। কারণ, ইহা অনেকদূর গড়াইয়াছে। যানার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ কোরাসে সূচনা লণ্ডনে পৌঁছিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি চাহেন যে, কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীগণ দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গ আলোচনা করুন। জার্মানির প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও লণ্ডনে পৌঁছিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকাজ বা অপ্রকাজে যে ভাবেই হউক দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি স্থান পাইবে কি? অশেতকার প্রধান মন্ত্রীরা উহাকে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন কি? যেতাক প্রধান মন্ত্রীদের চোখ রাজনীতিতে তাহার ভীত হইবেন না তো? যদি হন তাহা হইলে অশেতকার দেশগুলির কমনওয়েলথের মধ্য থাকিবার কোন সার্বভৌমতা নাই।

টোগোল্যান্ডের স্বাধীনতা লাভ—

পশ্চিম আফ্রিকার নিম্নোক্ত অধ্যুষিত টোগোল্যান্ড ফ্রান্সের অধিভুক্ত হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করার আফ্রিকার আর একটি স্বাধীন দেশের অভ্যাস হইল। এই দেশটি খুবই ছোট, আয়তন প্রায় একশ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা বার লক্ষ। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে এই দেশটি জার্মানীর অধীনে আসে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য টোগোল্যান্ড দখল করে। যুদ্ধের শেষে সন্ধির সর্তীকৃত্যে উহার দুই-তৃতীয়াংশ ফ্রান্সের অধিকারে চলিয়া যায় এবং পশ্চিম এক-তৃতীয়াংশ বার ব্রিটিশ অধিকারে। ব্রুটন তাহার অংশটুকুকে গোম্বোকোটের সহিত যুক্ত করিয়া লয়। গোম্বোকোট স্বাধীনতা লাভ করিয়া বানান নাম গ্রহণ করে এবং উহার সহিত যুক্ত টোগোল্যান্ডের অংশ বানান অংশ রূপে স্বাধীনতা লাভ করে। লীগ অব নেশন্স ১৯২২ সালে ফ্রান্সকে টোগোল্যান্ডের অধি নিযুক্ত করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও টোগোল্যান্ডের উপর ফ্রান্সের অধিগিরি স্বীকার করিয়া লয় এবং সেই সঙ্গে উহার অধিবাসীদের অভিপ্রায় নির্ধারণের জন্য দশ বৎসর পর একটি গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। তদনুসারে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মার্চের ২৬ তারিখের ভিত্তিতে গণভোট গ্রহণ করা হয়। ফ্রান্সের অধিগিরির অবসান ও স্বাধীন শাসনের পক্ষে বিপুল সংখ্যার ভোট হয়। অতঃপর ১৯৫৮ সালের ১৪ই নবেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করেন যে, ১৯৬০ সালে টোগোল্যান্ড ফ্রান্সের অধিগিরি হইতে মুক্ত হইবে এবং মুক্ত হওয়ার তারিখ ফ্রান্স ও টোগোল্যান্ড নিজেদের মধ্যে আলোচনা দ্বারা স্থির করিবে। তদনুসারেই ২৭শে এপ্রিল টোগোল্যান্ডের স্বাধীনতা লাভের দিন স্থির করা হয়।

টোগোল্যান্ডের স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; গত ৭ই এপ্রিল বানান রাজধানী আফ্রার অনুষ্ঠিত সর্ব আফ্রিকা রাজনৈতিক সম্মেলনে বানান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ নুরুমা বলিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র দুর্বল টোগোল্যান্ডের মত দেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ পশ্চিম আফ্রিকার সম্মিলিত শক্তির মূল কঠোর আবাস্ত করা। সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিদিগকে পশ্চিম আফ্রিকাকে ‘বলকানাইজ’ করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছেন। ডাঃ নুরুমা আরও বলেন বলেন যে, টোগোল্যান্ডের যে-অংশ বানান অধিভুক্ত অংশে পরিণত হইয়াছে সেই অংশ পুনরুদ্ধারের জন্য টোগোল্যান্ডে এক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তাহার এই উক্তি তৎপক্ষ বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। পশ্চিম আফ্রিকা ইন্টারন্যাশনাল গঠনের প্রস্তাব অবতীর্ণ হইল। গত ১৯৫৮ সালের ২রা মে বানান প্রধান মন্ত্রী এবং গিনির প্রধান মন্ত্রী বানান ও গিনির সম্মিলিত করিয়া একটি শক্তিশালী নিম্নোক্ত গঠন করার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজও সেই প্রস্তাব কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয় নাই। কেন করা হয় নাই, প্রশ্ন উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করা যায় না। প্রাচ্য ও কোন আশঙ্কা ও সন্দেহ উহার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে কি?

ইরানের ভূমিকম্প—

আগামীবীরের পর ইরান। গত ২৫শে এপ্রিল (১৯৬০) দক্ষিণ ইরানের লার এবং পায়াস এই সহর দুইটি দুইবার প্রবল ভূমিকম্পে

বিস্তৃত হইয়াছে। এই ভূমিকম্পের ফলে তিন হাজার লোক নিহত এবং আরও প্রায় তিন হাজার লোক আহত হইয়াছে। আগামীবীরের ভূমিকম্পের আট সপ্তাহ পরে এই ভূমিকম্প হইল। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই তেহরান হইতে পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পূর্বে কাশ্মিয়ান সাগর এলাকায় ভূমিকম্পের ফলে প্রায় দুই হাজার লোকের প্রাণহানি হয়। ঐ বৎসরই ১৩ই ডিসেম্বর পশ্চিম ইরানে ভূমিকম্পের ফলে সহস্রাধিক লোক নিহত হয়।

ভূমিকম্পের ফলে লার সহরটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। সহরে একটি বাড়ীরও দেওয়াল খাড়া নাই। এই সহরের সমগ্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে মাত্র একটি কনষ্টবলের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। একটি বিভাগে শিশু-দিবস উপলক্ষে একটি উৎসবে সমবেত প্রায় পাঁচ শত ছাত্র-ছাত্রী সকলেই নিহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে। ভূমিকম্পের ফলে গবর্ণর নোসরাত দ্বারিহ মল্প নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছেন।

ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার প্রথম কম্পন অনুভূত হয়। দ্বিতীয় কম্পন ঘটে উহার চারি ঘণ্টা পরে। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে ভূমিকম্প বলয় আছে বিজ্ঞানীরা তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু কখন কোথায় ভূমিকম্প হইবে পূর্বে তাহার আভাস পাওয়া বাইতে পারে এমন কোন বস্তু এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

সিংহলে আবার সাধারণ নির্বাচন—

সিংহলে গত মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পর ইউনাইটেড ভাশনাল ফোর্সের নেতা মিঃ ডাডলী সেনানায়ক মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। গঠিত হওয়ার ৬৩ দিন পরেই উহার পতন হইয়াছে। এই পতন অপ্রত্যাশিত, ইংরেজি মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহার দল ৫০টি আসন লাভ করিয়াছিল। মন্ত্রিসভার পরামর্শে ছয় জন সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং সিংহলের প্রতিনিধি পরিষদ সরকারপক্ষের সদস্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৭ জন। মন্ত্রিসভা ১৩—৬৩ ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে আর মাত্র সাত জন সদস্য মন্ত্রিসভার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেলের উদ্যোগে বহুতা সবুজ আলোচনার পর যে বহুবাদীজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়, তাহারই এক সংশোধন প্রস্তাব দ্বারা মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়। এই সংশোধন প্রস্তাবটি ভোটে গৃহীত হওয়ার মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে। মিঃ ডাডলী সেনানায়ক হুমকি দিয়াছিলেন যে, তাহার মন্ত্রিসভাকে সমর্থন না করিলে তিনি গবর্ণর জেনারেলকে প্রতিনিধি পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার পরামর্শ দিবেন। তাহার এই হুমকিতে কোন কাজ হয় নাই। কিন্তু ভোটে হারিয়া ষাটবার পর তাহার পরামর্শ অনুসারে গবর্ণর জেনারেল প্রতিনিধি পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আগামী ২০শে জুলাই নতুন নির্বাচন হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এক মাসের মধ্যেই প্রতিনিধি পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং নতুন নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল বলিয়াই মনে হয়। ক্রীলক্কাড্রিম পাটিকে মন্ত্রিসভা গঠনের একটা অনুরোধ করা হইবে, এইরূপ আশাই বিবোধী পক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু আর একটি সাধারণ নির্বাচন হইলেই যে সিংহলের সমস্ত ক্ষমতা হইবে, এরূপ আশা করার মতও কিছু দেখা বাইতেছে না। —৪৪১ মে ১৯৬০



বিশ্ব কুটবল আসরে ভারতের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত

ভূক্ত বাঙালী নববর্ষ। এই দিনেই বিশ্ব কুটবল আসরে ভারতের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম একটি অলিম্পিক খেলার অঙ্গুষ্ঠানে ভারত সাক্ষ্য অর্জন করে। রোম অলিম্পিক কুটবলের মূল প্রতিযোগিতায় ভারত অংশ গ্রহণের সুযোগ অর্জন করেছে। অলিম্পিকের প্রাথমিক পর্বাঙ্গের হুটি খেলাতেই তারা ইকোনেশিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য অর্জন করে। ভারত কলকাতার অঙ্গুষ্ঠিত প্রথম খেলার ৪-২ গোলে এবং জাকার্তায় অঙ্গুষ্ঠিত দ্বিতীয় খেলার ২-০ গোলে জয়লাভ করে।

ভারতের মাটিতে অলিম্পিক পর্বাঙ্গের খেলার আসর এই প্রথম। কিন্তু এই ঐতিহাসিক আবোজন স্থানীয় ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে খুব বেশী আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। গত দশ বছরের মধ্যে ভারত ও ইকোনেশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক কুটবল খেলার চার বার সাক্ষ্যকার হয়েছে। এর মধ্যে তিনবার ভারত পরাজয় বরণ করে। ১৯৫৪ সালে ম্যানিলাতে ভারত ৪-১ গোলে, টোকিওতে ২-১ গোলে ও ৪-১ গোলে পরাজিত হয়। তবে ১৯৫১ সালে দিল্লীতে প্রথম এশীয় ক্রীড়ার ভারত ৩-০ গোলে জয়লাভ করে। ইকোনেশিয়ার কুটবলের যান ক্রমশঃ উন্নতির পথে, এই তালিকা ই তার সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতের এবারকার সাক্ষ্য সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়রা সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের গতিপথকে আরও কিছু দূর এগিয়ে নিয়ে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। এই সাক্ষ্য বিশ্ব কুটবল আসরে ভারতকে এক নতুন মর্যাদা দিয়েছে। দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে অভিনন্দন না জানালে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সাধাস ভারতীয় খেলোয়াড়গণ।

ইকোনেশিয়া দলের খ্যাতি সকলের সুবিধিত। কিন্তু তাদের সম্পর্কে বেরুপ না-ভাক শোনা গিয়েছিল খেলা দেখে তার বিশেষ কোন নিমর্শন পাওয়া যায়নি। তবে ইকোনেশিয়ার খেলা দেখলে ভাল ভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে ইহাদের খেলার পদ্ধতিতে অঙ্গুষ্ঠান, অধ্যবসায় ও সাধনার কোনটাই অভাব নেই। দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই বরষে তরুণ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তাঁদের গতিবেগ খুবই তীব্র। আক্রমণ করবার কৌশলও প্রশংসনীয়। তবে গোলে ঠিক ভাবে "স্ট" করতে তাঁরা খুব বেশী পটু নন। তাঁদের খেলার বৈশিষ্ট্য যে তাঁরা উপরে খুব কম সময় বল রাখেন। মাটিতে বল রেখে বল দেওয়া নেওয়া কার্যশীলও দেখার বিষয়। প্রতিপক্ষের আক্রমণ রোধের কন্যতাও দলের বখেই আছে। মধ্য মাঠে ইকোনেশিয়ার খেলা বিশেষ ভাবে চোখে পড়েছে।

ভারতের জয়লাভ-সঙ্গেও দলের খেলোয়াড়রা খুব উচ্চ মনের খেলা

দেখাতে পারেননি। তবে খেলোয়াড়দের নিয়মিত শিক্ষারীনে রাখলে সাক্ষ্য অর্জন করা যায়, ভারতের এবারকার সাক্ষ্য তার প্রমাণ করিয়ে দিয়েছে। ভারতের সাক্ষ্যের জন্ত "কোট" জনাব রহিমের অবদান কম নয়। তাঁর চোটা সফল হয়েছে। সকলেই তাঁকে অভিনন্দন জানাবেন।

'সর্ব ঘট্টে কঁটালিকলা' শ্রীএম, দত্তরায়

ইকোনেশিয়ার বিরুদ্ধে জাকার্তায় ভারতীয় দলের খেলা উপলক্ষে, ভারতীয় কুটবল দলের সঙ্গে হুঁজন কর্তৃকর্তা যাবেন বলেই ঠিক ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ নিখিল ভারত কুটবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত যোগা করলেন যে প্রয়োজন হলে দলের সঙ্গে একজন 'টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার' ও যাবেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আই এক, এ'র বেতনভূক্ত সম্পাদক শ্রী এম, দত্তরায় উপযুক্ত পরামর্শদাতার পদ অঙ্গুষ্ঠত করে জাকার্তা যাত্রা করলেন। বাঙালী দেশে একটি প্রবাদ আছে—'সর্বঘট্টে কঁটালিকলা'। শ্রীএম, দত্তরায়ের অবস্থাও তাই। ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণ আইনকে বুঝাসুঁই দেখিয়ে তিনি কেমন করে 'এ্যাডভাইজার' সঙ্গে পাড়ি দিলেন?

এদিকে ভারত সরকার বিশেষ প্রয়োজনেও অর্থী শিক্ষা বা চিকিৎসার জন্তেও বিদেশ যাত্রার অঙ্গুমতি দিতে রাজী হন না, অথচ এই এম, দত্তরায় প্রের্ষ সূচকুর ব্যক্তিত্ব। কথার কথার বিদেশ ভ্রমণে যান কেমন করে? নাকি এ'র বৈদেশিক মন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় পড়েন না? ভারত সরকারের উচিত, এই সময়েই এই সব লোকদের পাশপোট বাতিল করে দেওয়া।

শ্রীএম, দত্তরায়, আই, এক এ'র কর্তব্যচারা। তিনি বেশ মোটা মাইনে পান। আই, এক, এ'র অজ্ঞাত কর্তব্যচারীদের যেমন বেতন, ছুটি ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন আছে—সম্পাদকের বেলায় কি সেটা প্রযোজ্য নয়? শু না হ'লে বখন তখন এখানে—সেখানে 'তিনি যান কি করে? অথচ যে প্রতিষ্ঠানের বেতনভূক্ত কর্তব্যচারী তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাকে নিয়ে তো ছিন্দিমিনি খেলছেন। গত মরমুয়ে অর্থী ১৯৫১ সালে বিভিন্ন বিভাগীয় লীগ চ্যাম্পিয়নদের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন তিনি দেখার সময় পাননি অথচ ১৯৬০ সালের কুটবল মরমুয়ে সফল হয়ে গেছে। যে লোকের কর্তব্যশীলতার—এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তিনি যে তার টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজারের পদ অঙ্গুষ্ঠত করে ভারতীয় দলের সঙ্গে জাকার্তা যাবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে?

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের নতুন অধ্যায় রচনা

দর্শক-সমাকীর্ণ ক্যালকাটা মাঠ। এখানেই বাঙালী তথা ভারতের অঙ্গতম জনপ্রিয় দল ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের পৌরষবর ইতিহাস

জার একটা মজুর অধ্যায় রচনা হয়েছে—১৯৬০ সালের প্রথম ভিত্তিসন হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভে। তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মেদান স্পোর্টিং ক্লাবকে এক পোলে পরাজিত করে অপরাধিতভাবে এই গৌরবের অধিকারী হয়। এর পূর্বে কখনও তাদের এই গৌরব লাভ সম্ভব হয় নি। তবে ১৯৫৭ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা বাইটন কাপ লাভ করেছিল।

এত দিন পর্যন্ত ফুটবল খেলাতেই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের খ্যাতি বাঙালি তথা ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ক্লাবের পরিচালক-মণ্ডলীর হকি খেলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়ার পূর্বে কয়েক বছর তারা বাঙালি তথা ভারতেও খতিশালী হকি দল হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। এবারকার ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের মাফল্য ভারিই নিম্নশ্রম বরূপ বলা চলে। ক্রীড়ামৌলী মাত্রই “সব প্রতিটি খেলোয়াড়কে সাংবাদী জানাবেন।

প্রেমজিৎলালের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

তরুণ ও উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় প্রেমজিৎলাল খেলার সময় আশ্পারায়ের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করার ছয় মাস কাল কোন সাধারণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না বলে বাঙালি লন টেনিস এসোসিয়েশন যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন—নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশন প্রেমজিৎলালকে সতর্ক করে দিয়ে তাহা প্রত্যাহার করেছেন। নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের সম্পাদক জীশামসের সিং উক্ত সংবার ঘোষণা করে বলেছেন যে, প্রেমজিৎলাল কখনো প্রার্থনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে বর্ধাবধ আচরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রেমজিৎলালকে কেন্দ্র করে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার একটা সম্ভাব্যজনক মীমাংসা হওয়ার ক্রীড়ামৌলী মাত্রই খুশি হয়েছেন বলে মনে হয়।

ডেভিস কাপে ভারতীয় দল গঠিত

ডেভিস কাপ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় পূর্বীকল ফাইনালে কিলিপাইন অথবা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রামানাহ কৃষ্ণাণ, নরেশকুমার ও প্রেমজিৎলাল ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। প্রেমজিৎলাল সম্পূর্ণ স্বস্থ না থাকলে তাঁর স্থানে জয়দীপ মুখার্জীকে দলভুক্ত করা হতে পারে ঠিক হয়েছে। সকলেই ভারতীয় দলের সাফল্য কামনা করবেন, তা ধলাই বাহুল্য।

হকি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সরকার চেষ্টা করিবেন

“ভারত সরকার যৌম অলিম্পিকে ভারতীয় হকি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন”—সম্প্রতি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে. এল. জি.মালি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে যৌম অলিম্পিকের জন্য যে সকল হকি খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা যাতে

শিক্ষাক্ষেত্রে যোগদান করতে পারেন সেই জন্য ভারত সরকার ঐ সকল খেলোয়াড়ের নিয়োগকর্তাদের কাছেও ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে প্রস্তুত আছেন।

তবে ডাঃ জি.মালি যুগ করে বলেছেন যে কতকগুলি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে তিনি সম্বৃত্ত নন। কতকগুলি লোক কতকগুলি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানকে স্বর্থনিষ্ঠে পরিণত করেছেন। এই অবস্থার সরকার যদি সম্মত ভাবে গ্রহণ করে, তাহলে সমস্তার সমাধান হবে না। এরজন্য প্রয়োজন প্রবীণ ক্রীড়ামৌলী ও সাধারণের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এই সকল ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে যাতে প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হন তার ব্যবস্থা করা। ডাঃ জি.মালি এতদিনে ভারতে খেলোয়াড়ের অনন্যতম মূল কারণ অনুধাবন করেছেন। সত্যিই এক শ্রেণীর লোক বাঙালীতির বেড়াবাল বেধে খেলোয়াড় উন্নতির নামে তাঁদের স্বার্থ দ্বিধি করে চলেছেন। তা যদি না হয় হকিতে ভারতের বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব বোধানে টলরমান হতে চলেছে সেখানেও তাঁরা বাঙালীতির খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল গঠনকাল ৩৮ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে কোন শিক্ষাক্ষেত্রে বা ট্রায়ালে যোগদান না করেই প্রবীণ খেলোয়াড় কেশব নন্ডের নির্বাচনে সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। যে খেলোয়াড়ের বর্তমানে নিজ দলে স্থান লাভের যোগ্যতা নেই সেই খেলোয়াড়কে টেনে আনার ভেতর যে বহুত রয়েছে তা আজও উদ্ঘাটন হয় নি। আশা করা যায়, প্রবীণ খেলোয়াড় নিয়ে বহন এবারকার নির্বাচন কমিটি গঠিত—তাঁরা অন্ততঃ কর্মকর্তাদের বাঙালীতির বেড়াবালে পড়বেন না। যোগ্য খেলোয়াড়দের নিয়েই ভারতীয় দল গঠিত হউক, ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকুক, এটাই সকল চান।

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার হ্রস্বস্থা কেন?

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতার হ্রস্বস্থা দেখে ক্রীড়ামৌলীরা মর্মান্বিত হয়েছেন। এই প্রতিযোগিতার যোগদান বিনীত হকি দলের একটা বড় আকর্ষণ ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেয়া সেয়া দল অংশ গ্রহণ করতো, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে গুরুত্ব লোপ পেয়ে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা এখন স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যায়সিত হয়েছে। যে কয়েকটি বাইরেই দল যোগদান করে তারও অধিকাংশই শেব পর্যায় নাম প্রত্যাহার করে নেন। ফলে বাইটন কাপের জার কোন আকর্ষণ থাকে না। খেলার মাঠে ক্রীড়ামৌলীদের নৈনদিন উপস্থিতি থেকেই একথা প্রমাণিত হবে।

কিন্তু বাইটন কাপের এই শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই বাঙালি হকি এসোসিয়েশন। হকির স্বার্থের চেয়ে নিজস্বের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই বীরা বড় করে দেখেন, সেই সব পরিচালকের হাত থেকে বাঙালি হকি এসোসিয়েশন নিষ্কৃতি না পেলে, বাইটন কাপের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা নেই।

... এ ক্ষেত্রে প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে ‘একখানি যুগ’-এর আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। আলোকচিত্র-শিল্পী জি.মারেন অধিকারী।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

সকাল পাঁচটার জানালা দিয়ে ভোয়ের আলো আগামীর
আমার ঘর ভেঙে গিয়েছিল। এই বিদেশ বিতুঁই-এ এসে
পরের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি। এঁহাড়া এঁশহরে এই মামলা
সম্পর্কে আরও কয়েকটি তদন্তের কার্য আত সমাধা করার প্রয়োজন।
আমার ইচ্ছা হলো এখনি উঠে পড়ে বাইরে যেয়ে পড়ি।
কিন্তু চোঁটা সন্ধ্যা আমি বিছানা হতে উঠতে পারছিলাম না।
করু আবার আমার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল। ইতিমধ্যে
হরিশ্রম কখনো উঠে পড়ে বাইরে রকের উপর পায়েচাির করছিল।
এই সময় সে ঘরে এসে বাকি জানালা খুলে দিয়ে আমার কাছে
এসে পড়ালো। হরিশ্রম বাবু বোধ হয় বলতে চাইছিলেন, এবার
উঠে পড়ুন, স্নান, কিছু ভা আর তার বলা হলো না। সে এইবার
আজকে উঠে বলে উঠলো, আপনাদের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে যে
স্নান। হরিশ্রমের মুখে এই কথা শুনা মাত্র আমি তড়াক করে
লাফিয়ে উঠতে চোঁটা করলাম। কিন্তু উঠবার চোঁটা কথা মাত্র
আমি রকের পাঁজরের উপর অসহ্য ব্যথা অনুভব করলাম। এর
পর হরিশ্রম বাবু আর দেরী না করে ছুটে গিয়ে অফিসার ইন-
চার্জ সুবোধ বাবুকে ডেকে নিয়ে এলো। আমার এইরূপে অসহ্য
হওয়ার সন্ধান পাওয়া মাত্র সুবোধ বাবু ও তাঁর সহকারী একজন
বিহারী অফিসার ডুকুনি দেখানে ছুটে এলেন। এর একটু পরে
মশেয়াল বাবু একজন ডাক্তারও ডেকে এনেছিলেন। ডাক্তার বাবু
পরীক্ষা করে বললেন যে পাঁজরের কোনও ফ্র্যাকচার হয়নি। আমার
ওঁচ নাকের উপরই আঘাত লেগেছে। মশেয়াল বাবুর পুণা নাম
আমার মনে নেই কিন্তু তাঁর জীব নাম আমার মনে আছে। তাঁকে
বালিকা বললেই চলে। নাম তাঁর ছিল পুতুল। এতো ভগিনীপ্রতিম
স্নেহ-স্বপ্ন এখানে এসে পাবো তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।
ঔষধপত্রের ব্যবস্থা হতে সেবা শুশ্রূষার প্রতিটি কার্য তাঁরা আমি
জীতে বশেঁ করেছিলেন। তাঁরা আজ কোথার আছেন জানি
না। কিন্তু আজও তাঁদের আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।
সৌভাগ্যক্রমে ক্ষতাক্তির সময় খোকাবাবুর পড়াবাত মাত্র আমার
নাকটাই লক্ষ্য করেছিল। মশেয়াল বাবু ও তাঁর জীব নাম
সন্ধ্যা আমি বিকালের দিকে লোঁকাল সাব-জেলের গিয়ে খোকা-
বাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। খোকাবাবু আমাকে দেখা মাত্র উঠে পড়ে
আমাকে অভিবাদন করে জিজ্ঞেস করলো, নাকটার ব্যাওজ কেন?
লেগেছিলো নাকি। তা'ও কিছু নয়। জানে তো বেঁচে গেছেন।
জানে আমি যে বেঁচে গিয়েছিলাম তা সত্য কথা। কিন্তু
তার জন্মে খোকাকে বহুগুণ জানাতে আমার মন চাইল না।
আমাদের দেশের এই এক নব্বয়ের পাবলিক এনিমির এইরূপ
আপত্তিকর প্রচেষ্টার কোনও উত্তর না দিয়ে তাকে আমি পাঁটা
প্রশ্ন করলাম, আপনি পাগলা বাবুকে খুন করেছিলেন?

খোকাবাবু আমার এই প্রশ্নে প্রথমে হো হো করে হেসে
উঠলো। তার পর আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে
থেকে উত্তর করলো, আমরা দুজনার কেউ কচি খোকাটি নই।
তাই এসব প্রশ্ন আমি অব্যবহ্য মনে করি। সরকারীভাবে
আমি একথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবো। কিন্তু বেসরকারী ভাবে
জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো যে তাকে আমিই খুন করেছি।
পাগলাকে খুন করা ভিন্ন আমার অন্য কোনও উপায়ও ছিল না।
সে আমার মনের শান্তি অপহরণ তো করেই ছিল। এমন কি
সে আমার মলিনকেও সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। পুলিশ
আমাদের হস্তে কুহুরের মত এক পাড়া থেকে অপর পাড়ায়
তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা না পেরেছি একটু খেতে, না
পেরেছি একটু সুঁতি করতে। একজ্ঞ একমাত্র দারী ছিল ঐ পাগলা।
এই পৃথিবী কেবলমাত্র শক্তিমামদেরই উপভোগ্য। এই জন্মে
আমরা পাগলাকে ইহলোকে হতে সরিয়ে দিলাম। সুবিধে পেলে
আপনাকেও আমি পরলোকে পাঠাতাম। অন্তর্ধায় পাগলা বা
আপনি যদি আমাকে এ পৃথিবী হতে সরিয়ে দিতে পারতেন
তাঁহলেও তাতে আমার ক্ষোভ হতো না। যাই হোক, আমি
স্বীকার করবো যে বুদ্ধির ও শক্তির লড়াইতে আমি আত আপনাদের
কাছে হেরে গেছি, যদি কোনওক্রমে আদালতের বিচারে আমি মুক্তি
পাই তাহলে আর একবার দেখা হবে।

খোকার বিরুদ্ধে অনেকগুলি খুনের, তালা ভেঙে চুরির ও
রাহস্যজনিক অভিযোগ ছিল। কিন্তু আমরা জানতাম যে এখনি
এই সন্ধ্যা তাকে জিজ্ঞাসা করলে কোনও সহজতর পাওয়া হবে না।
তার কাছে মামলার সহিত সম্পর্ক রহিত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা
করে তাকে কিছুটা বিভ্রান্ত করে আসল কথাটা পাড়লে শ্রবণ পেলেও
পাওয়া যেতে পারে। এইজন্য বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাকে
প্রভাবান্বিত করে আমি তার নিকট হতে একটি বিবৃতি আদায়
করতে মনস্থ করলাম। আমি এই সময় তাকে অনেকগুলি প্রশ্ন
করেছিলাম। সে কখনও শান্তভাবে কখনও উত্তেজিত হয়ে সে
সেইগুলির উত্তরও দিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, তার কাছ হতে কথা
বার করবার জন্য আমি প্রয়োজন মত সুপরিকল্পিত ভাবে উত্তেজিত
করেছিলাম। এর কারণ এই যে আমি ভালো করেই জানতাম যে
তখনও পর্যন্ত সে খুনের নেপথ্য ভরপুর। তাই সঙ্গী উত্তেজিত হয়ে
উঠলে সে বহু বাহ্যদ্রব্যসমূহকে কাহিনীর অবতারণা করলেও করতে
পারে। এই সম্পর্কে আমাদের প্রয়োজনগুলি নিয়ে গিণিবন্ধ করা
হলো।

প্রঃ। আচ্ছা। তুই যে ঐ রকম একটা জলজাত দ্রব্যকে
এমনি নির্দয়ভাবে খুন করলি, এতে কি তোর একটুও দুঃখ হচ্ছে না?

উঃ। কেন দুঃখ হবে মশাই। আপনারা বধন একটা

বেড়াল বা ইঁদুর মনের তখন কি তাদের জন্ত আপনাদের একটুও দুঃখ হয়? এরা কি আপনাদেরই মত দুই পাওহালা জীব নয়? এই সব ইঁদুরদের মত পাগলাও আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিল, তাই তাকে আমার সরিয়ে দিতে হয়েছে। আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি যে এই পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার শুধু শক্তিমানদেরই আছে। তাছাড়া এই পাগলাকে তো আমি অকারণে মারিনি?

প্রঃ—এ তো তুই আমাদের এই ইহলোকের কথা বললি। কিন্তু পরলোকে তোর কি হবে সে সম্বন্ধে কি তুই কিছু ভেবেছিস? এধানকার শাস্তি এড়াতে পারলেও সেধানকার শাস্তি তুই এড়াতে পারবি না।

উঃ—আপনারা কি রকম লেখাপড়া শিখেছেন তা জানি না। আমার মতে পৃথিবীতে তিনটি জিনিস হচ্ছে একেবারেই অমূলক। এই তিনটি পদার্থের নাম হচ্ছে ভৃত, ভগবান আর প্রেম। আরহমান কাল ধরে লোকে বলে আসছে যে এই তিনটি জিনিসের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু কোন দিনই কেউ এর চাক্ষুষ প্রমাণ পায়নি। আমার মতে লাইকতা হচ্ছে একটা মোটরকার। এ-পারবেও কিছু নেই, ও-পারবেও কিছু নেই। পেট্রোল কুরিয়ে গেলেই তা খেমে যাবে। এর জন্য ভয় পাবার কি আছে, তা তো আমি বুঝি না। তবে প্রেমটার আমি হঠাৎ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সে বিশ্বাসও এবার আমার ভেঙে গিয়েছে। তাই পাগলার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে আমি সেটা মলিনাকে দেখিয়ে বলে এসেছিলাম, কি রে শালী! আর কাউকে ভালবাসবি? হতভাগী সে কথা বোধ হয় আপনাদের বলনি?

প্রঃ—এসব না হয় আমি বুঝলাম। কিন্তু তোর কি প্রাণের ভয়ও নেই? এমন সুন্দর পৃথিবীতে তোর কি আরও কিছু দিন বাঁচতে ইচ্ছে হয় না? ভালো করে ভেবে দেখ, আমি এই ব্যাপারে তোর জন্তে কিছু করতে পারি কি না?

উঃ। আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাতে ক্ষতি নেই। আমি কিছু সত্য কথা বলছি, সত্যই আমার মরতে ভয় নেই। এর কারণ এই যে, আমি আমার জীবনটা পূরাপূরি ভাবে ভোগ করেছি। আমি আমার লাইকের ইকি বাই ইকি ভোগ করে নিয়েছি। জীবনের প্রতি মুহূর্ত আমার ইচ্ছামত ভোগে লাগিয়েছি। তাই আজ আমার কোনও অজুশোচনা নেই। আমি মরবো আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়ে যাবো। অবশ্য ভগবান বলে কোনও ব্যক্তি বা বস্তু থাকে, তবে। আমরা হচ্ছে জীবনধর্মী, তাই মরতে আমাদের ভয় নেই। কিন্তু আপনারা যখন মরবেন তখন চিমড়ে খেয়ে খেয়ে আপনাদের তখন মনে হবে যে এটা করতে পারতাম, ওটাও করতে পারতাম। কিন্তু হার, কোনটাই তো আমাদের করা হলো না, শুধু রাষ্ট্র ও সমাজের ভয়ে।

প্রঃ। কিন্তু সত্যই কি তোর জীবনে আজ কোনও অভাব বা কোভ নেই? কোভ বা অভাব নেই, এমন জীবন তো বরনাও করতে পারিনি। এমন একটি নিরঙ্কুশ জীবনের অধিকারী হলে তোর এই সব খুন, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ করার কোনও দরকারই হতো না। একটু ভেবে দেখে বল ত আমাকে ঠিক কথা।

উঃ। আপনারা থাকে অভাব মনে করেন, আমি থাকে অভাব মনে করি না। তবু মনে হত জীবনে হার একটি অভাব আমি করেছি। আমি চন্দ্রনগরে একটা বিয়ে করে ফেলেছি। হারান যায়ে আমি কি রকম অসুস্থ হয়ে পড়ি। এই সব খুন-ডাকাতি আমার ভালো তো লাগেই না। এমন কি আমার লোকেদেরও তখন আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি তখন ভয়ভাবের ভ্রলোকদের সঙ্গ কামনা করে তাদের সঙ্গেই বসবাস করি। এধনি এক আমার দুর্বল মুহূর্তে চন্দ্রনগরে এসে আমি একটা বিয়ে করে ফেলি। তবে তাকে আমি হাজার পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এসেছি। আর তাকে আমি বলে এসেছি যে আমার দুখ্য হলে সে মেনে আমার মত এন্ডার সৃষ্টি করে। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, সে কিছু বিধবা নারীদের হার তুলনীপাতার রস দিয়ে নিরামিষ খাওয়া কিংবা সে বারমাসে বার ব্রত ও উপবাস করে যাবে। যদি সে তা না করে তাহলে আমার আত্মা স্বর্গে চলে যাবে। কিন্তু সে যদি তা করে তাহলে আমার আত্মা একটুকণও শাস্তি পাবে না।

খোকাবাবুর এই পরম্পরবিরাগী মতবাদ শুনে মনে হলো যে অপরাধগর্শন সত্যই কোনও হারী দর্শন নয়। উঃ! অপরাধীদের বিকৃত মনের পরিচয় দেয় মাত্র। আমি এই খোকাবাবুকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে বাঙ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এই সময় আত্মস্থ হয়ে বলে উঠলো, বাচ্চ কথা বলে আরেক কিছুই তো জেনে নিলেন দেখছি। আর কি জেনে আমি কোনও কথাই আপনাকে বলবো না। তবে সার কথা এই জেনে রাখুন যে চোরেরা মরে যেয়েদের ভালোবেসে। আর যেয়েরা মরে চোরদের বিশ্বাস করে।

খোকাবাবুর এই সকল প্রসঙ্গপাঙ্ক্তি শোনবার মত যথেষ্ট সময় এই দিন আমার ছিল না। এ ছাড়া এর এই সব কথাগুলো আমার মনে বিশেষ আগ্রহও সৃষ্টি করতে পারে নি। এর কারণ আমার শরীর ও মন এই দিন ভালো ছিল না। একটা নিদারুণ অবসাদ বেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মাসের পর মাস একটা নিদারুণ উত্তেজনার মধ্যে সময় অতিবাহিত করেছি। হঠাৎ এই সাংঘাতিক উত্তেজনা হতে রেহাই পাওয়ার আমবা বেন ভেঙে পড়েছিলাম। দ্রুতগতি যন্ত্রণকট হঠাৎ ব্রেক কসে খেমে গেলে তার কলকলার বা অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি আমাদেরও দেহ ও মন একটা বিরাট বাঁকুনি খেয়ে বেন খেমে যেতে চাইছে। তাই এইখানে আর দেহী না করে আমি দেওঘর থানার কিরে যেতে মনস্থ করলাম। ঠিক সেই সময় একজন বাঙালী অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন সেই সহরের একজন এ্যাংলো উর্ডতন অফিসার। হিন্দি ভাষার তিনি পাগলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখো। চোঁরা পাশ আউর পিন্ডল উত্তল হার? খোকাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই উর্ডতন অফিসারটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে উত্তর করলো, আমি সব কথাই আপনাদের কাছে স্বীকার করবো একটা পিন্ডল মাত্র আপনারা আমার ঘরে পেয়েছেন। কিন্তু আরও দশ বায়েটা পিন্ডল এক বায়ো টোটা ও এগাবোটা ভালো বোবা আমি জিরুট পরম্পরের একহানে পুঁতে রেখেছি। এধনি আপনারা সেখানো গলে আমার দলের লোকেরা সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাবে। পলকলানুবু হুখের এই বীকৃতি শুনে উপরোক্ত উর্ডতন অফিসারটি একবারে

বিপ্লবিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে টিংকার করে তাঁর সজের অফিসারটিকে বললে, ওরে এখনি কুমি খানার গিরে হ' ট্রাক সশস্ত্র সিপাহী প্রেরিত করে। আর এখান ওখান হতে আরও দশ বারো জন অফিসার আনিবে নাও। আমাদের এই খুনে আসামীকে নিয়ে এখনি চিত্রকূট পাহাড়ে বেঁচে হবে।

এসের এই সব ব্যাপার দেখে আমি এক রকম হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। এখানকার পুলিশদের কর্তব্য কার্য সবক্ষে আমায় পক্ষে কোনও উপদেশ দেওয়া সাজে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে এই সবচেয়ে হাবতর প্রতিবাদ জানাতে হলো। এর কারণ আমি জামো রূপেই বুঝেছিলাম যে, খোকাবাবুর পুলিশ হেপাজতি হতে অভ্যস্ত পলারন করবার এ এক সুপ্রসিক্ষিত কন্দি ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে খোকাবাবু পুলিশকে ভীতান্ত দিয়ে একবার চিত্রকূট পাহাড়ে পৌঁছতে পারলে সে তার অব্যবহৃত কল্প-বুদ্ধিতে আত্মপ্রকাশ করতো। এইরূপ অবস্থার বহু পুলিশ ও শাস্ত্রী পরিবেষ্টিত হয়েও সে মাত্র একটি উল্লঙ্ঘন ঘায়া পলারনে সমর্থ হতো। আমি প্রকৃত বিষয়টি ওখানকার ঐ উদ্ভূতন অফিসারটিকে ইংরাজীতে বুঝিয়ে দেওয়া মাত্র খোকাবাবু বুঝেছিল যে, তার এই সব কন্দি-কিকির আর কাজে লাগেনো না। সে এইবার একটু শ্রমের হাসি হেসে নিয়ে সেই বাঙালী অফিসারটিকে সন্ধান করে বলে উঠলো, আরে, ইনি কি আপনাদের ডি-এস-পি নাকি? কোলকাতার জমানাররাও এঁর চেয়ে ঢালাক। খোকাবাবু বাঙালয় কি বললো, তা বুঝতে না পেয়ে ঐ সাহেবটি আমাদের তা ইংরাজীতে বুঝিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু আমরা কেউই খোকাবাবুর বক্তব্যটুকুর সারমর্ম জানাতে পারিনি। খোকাবাবু এইবার আমার দিকে চেয়ে মুখ ভেঙেচে বলে উঠলো, বড় কোড়া সময়ে এসে পড়ে আপনি সব মাটি করলেন। এখন দেখছি আমি যে ভলবান বলে জটনক ব্রহ্মা ব্যক্তি তাহলে সত্যই আছেন। তা না হলে বারে বারে আমার প্রতিটি কল্পনা এমনি করে আত্মব্রাজনক ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবেই বা কেন? কিন্তু আমার কথাতার টাক কালাপাহাড়ের সন্ধানে যথুপুর গেলে কিং আপনাদের নির্ধাত বৃত্ত।

পরের দিন সকালে আমি ওখানকার মহকুমা হাকিম পুলিশ সাহেব ও ডেপুটি পুলিশ সাহেবের সহিত এক পরামর্শসভার মিলিত হলাম। আমি তাঁর কাছে খোকাকে সশস্ত্র পুলিশের পাহারাবীনে কোলকাতার পাঠিয়ে দেবার জন্য একটি লিখিত আবেদনও করেছিলাম। কিন্তু এদিকে খোকাকে তথুনি কোলকাতার নিয়ে বাবার একটি আইনগত বাধারও সৃষ্টি হলো। খোকার নেতৃত্বের ডেরাতে অন্তর্ভুক্ত হ্রব্যের সহিত একটি টোটো-ভরা শিল্ডলও পাওয়া গিয়েছিল। এইজন্য বেআইনি ভাবে বিনা লাইসেন্স আগ্নেয়াস্ত্র রাখার জন্য ভারতীয় অস্ত্র আইন অনুযায়ী দেওবর খানার এঁরা এই সম্পর্কে একটা পৃথক মামলাও রুজু করে গিয়েছিলেন। এই জন্য তাকে এখানকার এই মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোলকাতার পাঠানো চলে না। পরের দিন আদালতে উপস্থিত হয়ে খোকাবাবু এই সব সমস্তা ইচ্ছা করেই আরও জটিলভব করে তুললো। এই আগ্নেয়াস্ত্রটির হেপাজতী খোকার করে নিয়ে সে ইচ্ছা করেই এক বৎসরের জন্য কারাবরণ করে সেখানকার জেলে চলে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে এই হ্রব্যে কোলকাতার খুনের মামলাটির স্তনানি দেয়ী করিয়ে দিতে চায়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে তার বিশ্বস্ত অনুচরদের ঘায়া তদুপে ধিয়ে আমাদের সংগৃহীত সাক্ষী সাবুতদের কোলকাতা শহর হতে ভাগিয়ে দেওয়া। অন্য প্রদেশের কোনও জেল হতে অপর প্রদেশের আদালতে আনা নিয়ম আদালতের এজিডারের বাহিরে ছিল। একমাত্র কোলকাতা হাইকোর্ট বিচার হাইকোর্টের মাধ্যমে এইরূপ আসামীকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের নিয়ম আদালতে বিচারের জন্য আনিতে নিতে অক্ষম ছিল। এইরূপ অবস্থার মামলা কোলকাতার ব্যাঙ্কশাল ট্রীটের আদালতে পাঠিয়ে সেখানে খোকাকে আনয়নের জন্য কোলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। অসত্য্য নাচার উদ্যে আমরা এইবার খোকার এখানকার সেকেন্ড ইন্সপেক্টর কালাপাহাড়ের সন্ধানে যথুপুর বাতায় জন্ম প্রাপ্ত হলাম।

[ক্রমশঃ]

প্রত্যাশা

কমলা দেবী

ঘটনাটা বিশেষ কিছু নয়—

তবু আমার কাছে দামটা বে তাঁর অনেক মনে হয়।

সেদিন শোভার বাড়ী গিয়ে

কথাবার্তার কীক হঠাৎ দেখি চেয়ে

উঠানেতে পোনালী রৌদ মেখে

জন্মের বাহার ছড়িয়ে, আমার ডাকছে থেকে থেকে

সসলা মেখে সারা গায়ে—হ'ল না মোর তুল—

ভালা ভরা নিটোল টোপাকুল।

সসলা মোর উঠলো ত'রে জলে

শোপন রেখে সে তাঁর, যেন আমি কথাগুলো

বললাম, 'কি যে শোভা, ফুটো কুল খাওয়াবি নাকি?'

'তমা, তমা, সে কি কথা। তোমার আবার

বলতে হবে তা কি?

তবে তাই এখন তো নয়, আর্গে রুজু ক'দিন ধ'রে,

তার পরেতে দেবো তোমার একটি যোতল ত'রে।'

বড়ই খুশী হলাম আমি শোভার কথা শুনে।

• তবু একটা ঘটকা থেকেই গেল মনে—

যোতলটা যে দেবে

কি মাপের তা হবে।

বা হোক, এ হ'ল আজ অনেক দিনের কথা।

শেষ অবধি শোভার কীকি জাপার প্রাণে ব্যথা

ভাবছি বলে এখনও কি সে কুল বলে মজছে

কিবা সে কুল সার হয়ে তাই ধাপার মাঠে পড়ছে?

হায় রে বিধি। এই কি তোমার বিচার?

না হয় শুধু চেয়েছিলাম একটু কুসের আচার।

ক্রমিক পর্যায়ে ১৩৬৬ সালের বাংলা ছবি

ডিল্লি প্রবেশিত 'সাগর সন্ধ্যা' নিয়ে ১৩৬৬ সালের বাংলা

চলচ্চিত্র শিল্পের বাহ্যিক সূত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র এ চিত্রের কাহিনীকার, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : দেবকীকুমার বসু। গীতিকার শৈলেন রায়, বাইচাঁদ বড়াল করেন সুর যোজনা, চিত্র ও শব্দগ্রহণ করেন বঙ্কিম্বে বিমল মুখোপাধ্যায় এবং ভ্রামন্যস্থর ঘোষ ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, ভারতী, মঞ্জু অধিকারী, যোগ বিজু, নীতিল, জহর রায়, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি অভিনয় করেন। উত্তর, পূর্ববী ও উজ্জ্বলা চিত্রগৃহে ১৫ই এপ্রিল মুক্তিলাভ করে ডিমুয়েল্লের পরিবেশনায়। পরের সপ্তাহে (২৪শে এপ্রিল) এল জে এন প্রোডাকসনের 'স্বপনপুরী'। শিশুদের ছবি, প্রযোজনা করেন স্তানকুমার নগলক্ষা। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন কুমার সঙ্গীত। চৈকেন্তা ঘোষের সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দগ্রহণে ছিলেন নিমাই রায় ও নৃপেন পাণ্ডা। জীমান বিজু, অলোক, অঞ্জলী, নিতানন্দী, বাণী গাঙ্গুলী, বেবী নাজ প্রভৃতি অভিনয় করেন, এলিট ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় দর্পণা ও প্রাচী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে। এর পরই এসে সত্যজিৎ রায়ের 'অপর সন্ধ্যার', অবিকৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী। প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। রবিশঙ্করের সঙ্গীত। চিত্র ও শব্দগ্রহণে ছিলেন সূত্রক মিত্র, দুর্গাদাস মিত্র। সৌমিত্র, শর্মিলা, স্বপন, কুমারী, অলক, বেলাগাণী, শঙ্করন প্রভৃতি অভিনয় শিল্পী, ছায়াগাণীর পরিবেশনার ১লা মে রূপগাণী, অরুণা ও ভারতী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে। ঐ দিনই মিনার, বিজয়ী ও ছবিঘরে জি আর পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তি পায় বাদল পিকচার্সের 'দীপ জেলে বাই'। আন্তর্জাতিক মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী ও সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন অসিত সেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত। সুচিত্রা, বসন্ত, পাগড়ী, মিলিপ, তুঙ্গী চক্র, ভ্রাম্য লাহা, অনিল, অনিতা, কাজরী, নমিতা প্রভৃতি অভিনয় করেন। একই দিনে আরও একটি শিশুচিত্র মুক্তি পায়। কে জি প্রোডাকসনের 'মেডুসা খোকার কাণ্ড'। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কাহিনী, নটিকেন্তা ঘোষের সঙ্গীত, সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন কমল গাঙ্গুলী। তিলক, ছবি, তরুণ, অম্বপ, ভ্রাম্য লাহা, শীতল, পদ্ম, শান্তি প্রভৃতি অভিনয় করেন। টাস পিকচার্সের পরিবেশনায় বীণা বসুদেবীতে মুক্তিলাভ করে। নবাবের ফিন্সের জগবন্ধু বসু প্রযোজিত 'বিদ্রোহ' এল এই যে মা আনন্দহারী ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় বাধা, পূর্ণ ও প্রাচী চিত্রগৃহে। অজিত দেব কাহিনী অমলমুদ্রে চিত্র মুখোপাধ্যায় চিত্রটি পরিচালনা করেন, কাজি অনিকন্ড ও সুজিত নাথের সঙ্গীত, চিত্রগ্রহণ করেন সুবারি ঘোষ। সাবিত্রী, অসিত, অশীষ, পাগড়ী, কাহ্ন, কমল, পদ্মা, শীলা প্রভৃতি অভিনয় করেন। ১৫ই মে শ্রী. প্রাচী ও ইন্দিরা চিত্রগৃহে নরহা চিত্রের পরিবেশনায় মুক্তি পেল চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের 'জল জঙ্গল', মনোজ বসুর কাহিনী, পরিচালনা করেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দগ্রহণ করেন অনুল্য মুখোপাধ্যায় ও অতুল চট্টোপাধ্যায়। অমীষকুমার, মঞ্জুসা, সন্ধ্যা রায়, সুধেন, শিশির বটগাল, হরিধন, নববীণ, প্রেমোক্ত, গাজলক্ষ্মী প্রভৃতি অভিনয় করেন। গত বৎসরের আরো একটি আর্থিক সফল চিত্র হ'ল আর ডি বনশল প্রযোজিত ব্রেদ পিকচার্সের 'শশীবার সন্ধ্যার'। ২১শে মে জনশ্রু



শিকচার্সের পরিবেশনার বাধা, পূর্ণ ও লোচীসে মুক্তিলাভ করে। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা করেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। অনিল বাগচীর সঙ্গীত, পরিচালনা করেন সুবীর মুখোপাধ্যায়, দেওজী ভাই-এর চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ ছিলেন সুশীল সরকার ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। ছবি, পাহাড়ী, অন্ধকর্তা, তপতী, সাহিবী, বসন্ত, জীবেন, অল্পপ প্রভৃতি অভিনয় করেন। এই সপ্তাহের অপস চিত্রটি ছিল এস বি প্রোডাকশনের 'অভিশাপ'। ভ্রামল মন্ডর প্রযোজনা, পরিচালনা করেন সম্পাদক বিনয় চট্টোপাধ্যায়, কাহিনী শেফালী দেবী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা ফাহনী মুখোপাধ্যায়, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দগ্রহণ করেন তারক দাস ও নৃপেন পাল। কাহ্ন, বিকাশ, মঞ্জু, শোভা, সমর, পরেশ, গুরুদাস, গীতল, জহর বায়, গীতলী, অজিত প্রভৃতি শিল্পী। ভারাইটি কিয় একচেতের পরিবেশনার উত্তরা, পূর্ববী, উজ্জ্বলায় মুক্তিলাভ করে। ১২ই জুন বিশ্বভারতীর পরিবেশনার বি পি ফিল্মসের 'মাহত বন্ধু রে' মুক্তি পেল উত্তরা, পূর্ববী, উজ্জ্বলা প্রেকাগৃহে, অলোকেশ বড়ুয়ার কাহিনী। সঙ্গীত ও পরিচালনা করেন ভূপেন হাজারিকা। অজয় মিত্রের চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ করেন অবনী চট্টোপাধ্যায়। তুষা হাজারিকা, মানসী, দিলীপ, জহর বায়, প্রভাস, অরুণ, প্রকৃতিশ প্রভৃতি অভিনয় করেন। ২৪শে জুন অশোক চিত্রের 'পুণর্ধ্ব' মুক্তি পেল অজয় ফিল্মসের পরিবেশনার শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরায়। মনোজ ভট্টাচার্য্যর চিত্রনাট্যে পরিচালনা করেন সুশীল মজুমদার, প্রবোধ সাক্ষালের কাহিনী, সঙ্গীত রাজেন সরকার। বিপ্লু চক্রবর্তী ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের চিত্র ও শব্দগ্রহণ, উত্তম, অন্ধকর্তা, ভাহ্ন, তপতী, অজিত, জয়লী, বীবেন, নিভাননী, রাজলক্ষী প্রভৃতি অভিনয় করেন। রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের অনন্ত সিং প্রযোজিত 'ভ্রান্তি' এল ৩রা জুলাই বীশা ও বনশ্রী চিত্রগৃহে রাজকুমারীর পরিবেশনার, ভ্রামল মিত্রের সঙ্গীত, পরিচালনা প্রকুম চক্রবর্তী, কাহিনী সত্ৰু সেন, চিত্র ও শব্দগ্রহণ করেন বিজুতি চক্রবর্তী ও সুশীল সরকার। ছবি, পাহাড়ী, নির্মল, বাসনী, ভাহ্ন, হায়, তপতী, বাবুয়া প্রভৃতি অভিনয় করেন। ১৭ই জুলাই এল এন্টিয়ান ফিল্মসের প্রদীপ মৈত্র প্রযোজিত 'গলি থেকে রাজপথ', গীতা শিকচার্সের পরিবেশনার। প্রকুম চক্রবর্তীর পরিচালনা, সঙ্গীত সুবীন গীতচিত্র।

চিত্র ও শব্দ গ্রহণ করেন নীলেন গুপ্ত ও অতুল চট্টো। উত্তম, সাবিত্রী, বিকাশ, জহর, তুলসী, অরুণ, নৃপতি, হেলেন প্রভৃতি অভিনয় করেন। রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। ২৪শে জুলাই এল প্রমোদ লাহিড়ীর প্রযোজিত এল বি ক্ল্যাসের 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' জনতা পিকচার্সের পরিবেশনায় মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে। শিবরাম চক্রবর্তীর কাহিনী, পরিচালনা করিক ঘটক। সলিল চৌধুরীর সঙ্গীত, দীপেশ গুপ্ত ও নৃপাল ভট্টাচার্য্য চিত্র ও শব্দ গ্রহণ করেছেন। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য লাহিড়ী, শৈলেন, পান্না, জ্ঞানেশ, জহর রায়, মণি শ্রীমানী প্রভৃতি অভিনয় করেন। ২৪শে জুলাই উত্তম, পূর্ববী, উজ্জলার 'এল সানরাইজ' ক্ল্যাস প্রযোজিত ভেনাস ক্ল্যাসের 'কিছুক্ষণ' বনকুলের কাহিনী নিয়ে সিনে ক্ল্যাসের পরিবেশনায় অরুণা মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। নটিকতা ঘোষের সঙ্গীত। চিত্র ও শব্দ বঙ্কাক্রমে বিজয় ঘোষ ও জগদ্বাণ চট্টো। অক্ষয়ভট্টাচার্য্য, অসীম, শোভা, গঙ্গাপদ, জীবন, নিভাননী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি শিল্পী।

— এই আগষ্ট এল শব্দগ্রহণের কাহিনী-চিত্র কানাই গুহ প্রযোজিত ইন্ডোবর্মা ক্ল্যাস কর্পোরেশনের নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত 'ছবি'। রবীন চট্টো: সুরকার। চিত্র ও শব্দ বঙ্কাক্রমে বিভাশক্তি ঘোষ ও নৃপেন শাল, ছবি, বিকাশ, অসীম, মালা, হরিমোহন, ভানু, প্রমোদ প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। চণ্ডিকা পিকচার্সের পরিবেশনায় বাবা, পূর্ণা, প্রোটিতে মুক্তিলাভ করে। ২১শে আগষ্ট বীণা, বনুজীতে এইচ এল যেহতা প্রযোজিত এম এম মুভিয়ার 'এ জহর সে জহর নয়' এল যেহতা সিনে কর্পোরেশনের পরিবেশনায়। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা কনক মুখোপাধ্যায়, ডি বালসারার সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দ বঙ্কাক্রমে দেওজীভাই ও বাণী দত্ত। সুপ্রিয়া, জহর রায়, কমল, পাহাড়ী, নীতিশ, রবীন চন্দ্রাবতী তপতী, প্রভৃতি অভিনয় করেন এই চিত্রে। এই সপ্তাহে মিনার, বিজলী, ছবিঘরে এল নালন্দা ক্ল্যাসের শ্রীতারাপুর পরিচালিত 'বান্ধবপানী' চিত্রালোকের পরিবেশনায়। অনিল বাগচী সুরকার, চিত্র ও শব্দ গ্রহণ বিভাশক্তি ঘোষ ও অশীল সরকার। সুপ্রিয়া, ছবি, দীপক, কমল, নীতিশ, অসিত, বনানী, সুদীপ্তা, সিপ্রা সাহা প্রভৃতি অভিনয় করেন। ২৮শে আগষ্ট শ্রী, প্রোটি, ইন্দিয়া চিত্রগৃহে অধুতের কাহিনী-প্রযোজিত বি এল খেমকা প্রযোজিত মেট্রোপলিটান পিকচার্সের নির্মল দে পরিচালিত 'নির্ধারিত শিল্পীর অধুতহিত্তে' নটিকতা ঘোষের সুর চিত্রে ও শব্দে দেওজী ভাই ও সুশীল সরকার। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স পরিবেশন করেন, ছবি, বাসবী, ভানু, অনিল, তুলসী, প্রমোদ, কেতকী, তপতী প্রভৃতি অভিনয় করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে সর্বোচ্চ সেনগুপ্ত প্রযোজিত এম এল জি প্রোডাকশনের 'খোঁসার' এল মিতালী ক্ল্যাসের পরিবেশনায়। জহর কর পরিচালক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত। সলিল সেনগুপ্তের কাহিনী। শব্দ গ্রহণ দেবেশ ঘোষ। উত্তম, মালা, অসিতবরণ, ছবি, সবিতাজিত, অসীম, হানসী অভিনয় করেছেন, ১১ই সেপ্টেম্বর দর্পণা, প্রিয়া, লোটাস এল সুশীল মজুমদার পরিচালিত আর্ট হাও বালচায়ের 'অরিসত্ত্বা'। শক্তি শঙ্কর কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত রচনা দ্বোজ

ভট্টাচার্য্য। চিত্র ও শব্দ গ্রহণ অনিল গুপ্ত ও বাণী দত্ত, মঞ্জুসা, নির্মল, ছবি, কালী, বনানী, নৃপতি প্রভৃতি অভিনয় করেছেন, ১৮ই সেপ্টেম্বর ইকা প্রোডাকশনের সুবীরবন্ধু রচিত ও পরিচালিত 'নৃত্যেরই তালে তালে' এল বাবা, পূর্ণা, প্রোটিতে। চিত্র ও শব্দ গ্রহণ বিভূতি চক্রবর্তী ও পরিভোষ বনু। গোপীকৃষ্ণ, বাগিনী, সফা, ছবি, পাহাড়ী, অসিত, সুকুমারী, ভারতী, পদ্মা, রাজলক্ষ্মী অভিনয় করেছেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর নারায়ণ পিকচার্সের পরিবেশনায় উত্তম, পূর্ববী, উজ্জলার এল রীতেন হ্যাও কোম্পানীর নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে অগ্রগামী পরিচালনায় রচিত 'হেডমাষ্টার'। সুবীন দাশগুপ্তের সঙ্গীত। চিত্র ও শব্দ রামানন্দ সেনগুপ্ত ও জগদ্বাণ চট্টোপাধ্যায়। ছবি, কল্পনা, ভ্রামল, রজনী, শোভা সেন, মণি শ্রীমানী প্রভৃতি অভিনয় করেন। ৩রা অক্টোবর শ্রীমতী পিকচার্সের ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অরুণাদি মুক্তি পেল বিলিমোহিয়া হ্যাও লালজীর পরিবেশনায় মিনার, বিজলী, ছবিঘরে, শব্দগ্রহণের কাহিনী। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা হরিবাস ভট্টাচার্য্য, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুর, চিত্র ও শব্দ জি কে যেহতা ও দেবেশ ঘোষ। বিকাশ, কানন সঙ্গল, পার্শ্বপ্রতিম, মলিনা, গুজরাল, প্রভৃতি অভিনয় করেছেন, ৮ই অক্টোবর গিবিজালকর দত্ত প্রযোজিত 'সোনার হরিণ' এল এল কে ক্ল্যাসের পরিবেশনায় শ্রী, প্রোটি, ইন্দিয়া, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ময়ল চক্রবর্তী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দ জহর মিত্র ও অতুল চট্টোপাধ্যায়, উত্তম, কালী, সুপ্রিয়া, নমিতা, ভানু, তরুণ, বিপিন প্রভৃতি শিল্পী। তরুণকুমার প্রযোজিত গোঁতম পিকচার্সের 'অবাক পৃথিবী' মুক্তি পেল ৬ই নভেম্বরে রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে চিত্র পরিবেশকের পরিবেশনায়। কাহিনী ও চিত্রনাট্য বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, পরিচালনা বিম্ব চক্রবর্তী, শব্দগ্রহণ ঘোষ। উত্তম, সাবিত্রী, তরুণ, শ্রীমান টুকাই, গঙ্গাপদ, তুলসী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। এই সপ্তাহে বাবা, পূর্ববী, পূর্ণিতে এল সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের 'রাতের অন্ধকারে'। অগ্রগীর পরিচালনা, সঙ্গীত ডি বালসারা, চিত্র ও শব্দ নির্মল গুপ্ত ও জে ডি ইরাণী। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স পরিবেশক। ছবি, সাবিত্রী, অনিল, দীপক, চন্দ্রাবতী, রাজলক্ষ্মী, বীরেন প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ২০এ নভেম্বরে চলচ্চিত্র প্রদর্শন সংস্থার 'গুপ্ত বিবাহ' মুক্তি পায় ডিল্লাজের পরিবেশনায় উত্তম, পূর্ববী, উজ্জল চিত্রগৃহে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য শঙ্কু মিত্র ও অমিত মিত্র। চিত্র ও শব্দ দেওজীভাই ও ভানুসঙ্গর ঘোষ, ডি বালসারার সঙ্গীত। ছবি, পাহাড়ী, তৃপ্তি, সুপ্রিয়া, কল্পনা, হারী, গঙ্গাপদ, কমলা, শঙ্কু মিত্র প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ২৭এ নভেম্বর মিরাবলস্ ইণ্ডিয়ান 'নৃত্যের মর্ত্যে আগমন' শ্রী, প্রোটি, ইন্দিয়া মুক্তি পায় শ্রীকৃষ্ণ ক্ল্যাসের পরিবেশনায়। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত গৌর সী। রমধ দাসের সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জে ডি ইরাণী। বাসবী, ভানু, তুলসী, জহর, হরিধন, অমর, তপতী, অরুণী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। এই সপ্তাহে যুব চিত্রের 'পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট' মুক্তি পায় দর্পণা, প্রিয়া, লোটাস প্রভা পিকচার্সের পরিবেশনায়। হরিবারাণ্য ভট্টাচার্য্যের কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা চিত্রকর, সঙ্গীত নটিকতা

ঘোষ, চিত্র ও শব্দগ্রহণ রামানন্দ সেনগুপ্ত ও দুর্গাদাস মিত্র। ভানু, কমা, তরুণ, তুলসী, অমর, মিতা, নৃপতি, পাহাড়ী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তি পেল এল বি ফিল্মসের 'ক্ষণিকের অতিথি'। নির্মল সেনগুপ্তের কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা তপন সিং, সঙ্গীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিত্র ও শব্দ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভুল চট্টোপাধ্যায়। কমা, মা: তরুণ, নির্মল, ছবি, বাধামোহন, নৃপতি, অনিল প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ছায়াস্কোপের পরিবেশনায় মিনার, বিজলী, ছবিঘর মুক্তিলাভ করে। ১লা জানুয়ারী এম কে জি প্রোডাকশনের 'মায়াদুগ' মুক্তিলাভ করে কালিকার পরিবেশনায় রাধা, পূর্ণ, প্রোটা চিত্রগৃহে। নোহারওয়ান গুপ্তের কাহিনী, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত, পরিচালনা চিত্র বসু। উত্তম, বিশ্বজিত, সন্ধ্যারঙ্গী, এনকা, ছবি, বিকাশ, সন্ধ্যা রায়, তরুণ অভিনয় করেন, রাধা, প্রোটা, পূর্ণতে প্রদর্শিত হয়। এই সপ্তাহের অপর চিত্র হীরেন বসু প্রযোজিত নারদের সংসার পরিচালনা পঙ্কজুত, সঙ্গীত দুর্গা সেন, ছবি, নোশি, কালী সরকার জহর রায়, রঞ্জিত, নববীণ, নৃপতি অভিনয় করেন, ঐবিক্রম পরিবেশনায় শ্রী, ইন্দিরা, সত্যজিৎ মুক্তিলাভ করে। ৮ই জানুয়ারী ছায়াচিত্র পরিষদের 'রাজা সাধা' এল ছায়াবাণীর পরিবেশনায় রূপাঙ্গী, অরুণা ও ভাবতী চিত্রগৃহ, চিত্র নাট্য ও পরিচালনা বিকাশ রায়। উত্তম, সাবিত্রী, ছবি, বিকাশ, জীবন, তরুণ, গঙ্গাপদ, চন্দ্রাবতী, মিহির অভিনয় করেছেন। ১২ই জানুয়ারী জে এম পিকচার্সের 'উত্তরমেঘ' মুক্তি পেল শ্রী, প্রোটা, ইন্দিরা ভাণ্ডারাল মুভিজে পরিবেশনায়, রাজকুমার মৈত্রের কাহিনী, পরিচালনা জীবন গাঙ্গুলী, সঙ্গীত বরীন চট্টো। কমল মিত্র, মলিনা, শোভা, বীরেন, শ্রীমা, জ্ঞানেশ বিধায়ক প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ১৫ই জানুয়ারী এল সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশনের 'দেবী', জ্ঞানতা পিকচার্সের পরিবেশনায় মিনার, বিজলী, ছবিঘর, প্রোডাকুমার মুখোঁর কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সত্যজিৎ রায়, সঙ্গীত আলি আকবর খাঁ। চিত্র ও শব্দ সুরেন্দ্র মিত্র ও দুর্গা মিত্র, ছবি, কল্পনা, সৌমিত্র শ্রীমা, কালী সরকার, অনিল, পূর্ণপু, মহম্মদ ইসরাইল অভিনয় করেছেন। ২০ই জানুয়ারী নারায়ণ পিকচার্সের পরিবেশনায় এম পি প্রোডাকশনের 'কুহক' এল উত্তম, পূর্ববী, উজ্জল চিত্র গৃহে, সমরেন বসু'র কাহিনী, পরিচালনা অগ্রদূত, সঙ্গীত হেমন্ত মুখোঁ: উত্তম, সাবিত্রী, তরুণ, গঙ্গাপদ, তুলসী, প্রেমংগ প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ২৬ই জানুয়ারী এল চিত্রেখরীর 'ভয়' বাণা, বসুজিৎ চিত্রটি মুক্তিলাভ করে, ছবি, অসিত, বীরেশ্বর সেন, শিশির মিত্র, মিহির, শিশ্রা, সবিতা, প্রভৃতি অভিনয় করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মুক্তি পেল, মালা প্রোডাকশনের 'হুই বেচারী' দিলীপ বসু পরিচালিত ও জুপেন হাজারিকা সুরারোপিত এই চিত্রে অভিনয় করেছেন কালী, অমর, বাসবী, সন্ধ্যা, তুলসী, অনিল, জহর, কমল মিত্র প্রভৃতি, বিশ্বভারতীর পরিবেশনায় উত্তরা, পূর্ববী, উজ্জল মুক্তি লাভ করে।

১৩৬৬ সালে মোট উনচল্লিশটি ছবি আত্মপ্রকাশ করল। তারকাচিত্রের সাহায্যে আদরা ছবিগুলির প্রেক্ষী নির্দেশের চেষ্টা কমই।

সাগরসঙ্গমে * *
স্বপনপুরী * * *
অপুর সংসার *
দীপ জেলে বাই *
দেড়শ' খোকার কাণ্ড *
বিভ্রান্ত * * *
জলজঙ্গল * *
শঙ্কিবাবুর সংসার *
অভিশাপ * * *
মাহুত বন্ধুরে * * *
পুশ্চন্দ্র *
ভাঙ্কি * * *
সোনার হরিণ * * *
অবাক পৃথিবী * *
বাতের অন্ধকারে * * *
শুভবিবাহ *
বৃন্তের মর্তে আগমন * * *
পার্সেনাল স্যাসিট্যাট * *
ভর * * *

গলি থেকে রাজপথ * *
বাড়ী থেকে পালিয়ে *
কিছুক্ষণ * *
ছবি * * *
এ জহর সে জহর নয় * * *
আত্মপালী * * *
নির্ধারিত শিল্পীর অল্পপদ্ধতিতে * *
খোলাঘর * * *
অগ্নিগন্তবা * *
নৃত্যেই ভালো ভালো * * *
হেডমাষ্টার * *
ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অরুণাদি * *
ক্ষণিকের অতিথি * *
মায়াদুগ * *
বেববি নারদের সংসার * * *
রাজাসাধা * * *
উত্তরমেঘ * *
কুহক * * *
হুই বেচারী * * *

১৩৬৬ সালে বাঙালির অভিনয়-জগতে ইন্দ্রপদম হ'ল। বীর অনবদ্য প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোর বাঙালির রঙ্গালয়ে নবমুগের উদ্বোধন ঘটল, সমস্ত হতাশার অন্ধকার ভেদ করে আলোর আলো দেখা দিল, বাঙালির নাট্যজগতের গৌরবময় ইতিহাসের নবরূপায়ণ ঘটল—জনবশিত নটগুরু শিশিরকুমার এই বছরই পৃথিবীর রজমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন সংস্কৃতির জগতকে বহুল পরিমাণে নিঃশ্বাস দিয়ে। শিশিরকুমারের অভাব সকল দিক দিয়েই অসুবিধীর।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববশিত প্রতিভার পুণ্য পরশদীপ্ত অসামান্য মর্বাদাসম্পন্ন ছোট গল্পগুলির মধ্যে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন একটি হৃদয়বর্মী গল্প। এবং স্ফুট: বাৎসল্যরসান্বিত। বাৎসল্যরসের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিরাট রহস্যের প্রতি মাহুতবেষ কুটি আকর্ষণ করেছেন। বর্তমানে এর চিত্ররূপ প্রদর্শিত হচ্ছে। এই ছবিখানি অগ্রদূতগোষ্ঠী পরিচালনা করেছেন। কয়েকপাতায় গল্পকে রূপালী পর্দার ফোটাতে গেলে তার আত্মতনু বৃদ্ধি স্বভাবতই দরকার, এবং এ'রও সেইজন্মে কাহিনীর আরতন বাড়িয়েছেন অর্থাৎ রাইচরণের পরিবারবর্গকে দেখিয়েছেন কিন্তু এইখানেই ভাববার বিষয়, রাইচরণের পরিবারবর্গকে ইচ্ছা করলে হয় তো রবীন্দ্রনাথও সেখানে পারতেন কিন্তু সে পথ তিনি ত্যাগ করেছেন। কেন না যে ভাবে তিনি গল্পটিকে গেঁথেছেন সে ক্ষেত্রে এ'ভাবে কলেবর বৃদ্ধি তার সুরাহানি ঘটাবে। গল্পের রসবিচার করলে এবং মূল সুরকে অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ কাহিনীকে খোকাবাবুর পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, অল্পপথ অবলম্বন করে তার গভীরতা নষ্ট করেন নি। ছায়াছবিতে সেই দিক দিয়ে খিচাট করলে গল্পের রসহানি ঘটেছে এ কথা বলতেই

হয়। অত্যন্ত দিক দিয়েও চিত্রনাট্যকে জটিলত্ব বলা চলে না। পল্লি সে-দুপের। তখনকার পল্লীগ্রাম-সেই গ্রামের একটি অশিক্ষিতা কিশোরী বধূ, তার চালচলন, হাবভাব যে ভাবে হওয়া উচিত সুরচিত্র নাট্যলোকের অভিনয়ে সেই ভাবগুলি বখাবণ ভাবে কুটে উঠতে পেরেছে কি? তার অভিনয়ে অনেকখানি শহুরে মার্জিত ভাব পাওয়া যায়, অশিক্ষিতা পল্লীবধূ রূপটি তার অভিনয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। উত্তমকুমারের ক্ষেত্রেই এই কথাই বলব। কোন কোন অংশে তার অভিনয় দেখে মনে হয় যেন রাষ্ট্রচরনের রূপসজ্জার অন্তর্ভুক্ত থেকে টালিগঞ্জের চিত্রনাট্যগতের একচ্ছত্র উত্তমকুমারই বুলি কথা বলে চলেছেন, মনে হয় রাষ্ট্রচরন যেন এখানে শিখণী আর উত্তমকুমার যেন অর্জুন।

এরা ছাড়া এ ছবিতে অসিতবরণ শিশির বটবাল, শোভা সেন, শ্যামলী বায় প্রভৃতি শিল্পিবর্গ অভিনয় করেছেন।

হাত বাড়ালেই বন্ধু

হাসির ছবিও যে কত পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও ভঙ্গ ধরণের হতে পারে হাত বাড়ালেই বন্ধু তার নিদর্শন। অল্লীলাতা প্রমুখ বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করে এই হাসির ছবিটিকে রূপ দেওয়া হয়েছে। অল্লীলাতা প্রমুখ কয়েকটি হাসির ছবি অর্ধে দেখা যায় অল্লীলাতা ও ভাবমির সময়কাল কিন্তু ভাবমির মধ্যে যে কটি ব্যতিক্রম চোখে পড়ে হাত বাড়ালেই বন্ধু তার অন্ততম। এক শিল্পী এই ছবির নায়ক, কর্মোপলক্ষে মায়ের আদেশে কলকাতার আসে, কিন্তু তার ইচ্ছে শিল্পচর্চায় দিন কাটানো, বেকমল করে নানা ঘটনার প্রবাহে সে জীবনে সাক্ষ্য লাভ করল সেই কাহিনীই এখানে পরিবেশিত হয়েছে। এরই মধ্যে বখেই গাভীর্ষের সঙ্গেই প্রতাপ (শিল্পী) ও নীলমার প্রেম গড়ে উঠেছে ও পরিণয়ে সেই প্রেম সফলতা লাভ করছে এই প্রেমোপাখ্যান দর্শকের সামনে অনেকখানি গাভীর্ষ সহকারেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। কাহিনীর মধ্যেই জিলোচন ও তার ভাগিনেকে কেন্দ্র করে বেশ একটি হাস্যমুহুর অধ্যায় গড়ে উঠেছে, তবে সব কিছুই মধ্যে অল্পকৃতি সম্পন্ন দর্শকের যে অংশটি ভালো লাগবে সেটি হচ্ছে শিল্পীর সাধনার প্রথম দিকের ক্রমগত ব্যর্থতা। জীবনে কি নিদারুণ ব্যর্থতাকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হয় তারই একটি প্রতিচ্ছবি। প্রতিভাকে নিয়ে জুয়াখেলায়ই একটি নিখুঁত আলোচ্য, 'হাস্যরসের সার্থকতা সেইখানেই যেখানে কাহিনী গড়ে ওঠে বখেই গভীর পটভূমিকে ভিত্তি করে।

ছবির কাহিনী রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুকুমার দাশগুপ্ত। ছবিতে অনবদ্য অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস ও তরুণকুমার। পাহাড়ী সান্তাল এবং উত্তমকুমার আশামুরূপ অভিনয় নৈপুণ্যই প্রদর্শন করেছেন বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জহর বায়, বীরাজ দাস, বেচু সিংহ, খগেন পাঠক, পদ্মা দেবী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণা ঘোষ প্রভৃতি অত্যন্ত চরিত্রগুলিকে রূপ দিয়েছেন।

রূপপট প্রসঙ্গে

প্রসিদ্ধ কথাসিল্পী ঐশ্বরাজকুমার রায়চৌধুরীর "নতুন কল" কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক হেমেন্দ্র চন্দ্র, সুরবোজনা করছেন স্বনামধন্য সুরকার রাষ্ট্রচরন বড়াল বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায়, অম্বুপকুমার, অমর মল্লিক, নির্মল চৌধুরী, সুরেশ চৌধুরী, বাণী হাজরা প্রভৃতি। পরিচালক অসীম পালের পরিচালনায় যে ছবিটি চিত্রায়িত হচ্ছে তার নাম "মিঃ ও মিসেস চৌধুরী।" রথীন ঘোষ সুরবোজনা করছেন। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন নবগোপাল লাহিড়ী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দায়ু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর বায়, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় অজিত চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শীলা পাল, গুল্লা দাস ইত্যাদি। "রতনলাল বাগালী" নামে একটি গাথবি আত্মপ্রকাশ করবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছবির মাধ্যমে আশীষকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, বীরাজ দাস, অম্বু দত্ত, চন্দ্রা দেবী সন্ধ্যা বায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, বাগবী নন্দী প্রভৃতির অভিনয় আপনারা দেখতে পাবেন। "রাগ ও অম্ময়োগ" নামে যে ছবিটি বৃন্দালয়ের পরিচালনায় রূপ নিচ্ছে তাতে অভিনয় করছেন বলে বাংলার নাম শোনা যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে নির্মলকুমার, সমীরকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সার্বিজী চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষী দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ছবির সঙ্গীতঃ-গৃহীত হচ্ছে কালীপদ সেনের পরিচালনায়। "মনে মনে" ছবিটি গৃহীত হচ্ছে উষাশ্রীর মৈত্রেয় পরিচালনায়। রূপায়ণে আছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী, অলোক চট্টোপাধ্যায়, মণি ঐশ্বরী, তুলসী চক্র, গুণপতি কুণ্ড, সন্ধ্যা বায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জাতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবর্গ।

একটি সনেট

অম্মরাধা মুখোপাধ্যায়

রাতের কবিতা শেষ করে দাঁও কবি
সবুজ পাঠার বৃকে হলুদের বেণু
যাক ঝড়ে। তুহিন কালার হিম পলে
হোক মুক্তার তনিম। তুমি আঁকো ছবি।

কামনার প্রতিবিম্ব প্রত্যয় গভীরে
দোলা দেয়। কুটিল রাত্রি বায়ে উসগ্র
কাদ-রায়াজালে। বস্ত্র লালসার স্মৃণ
খির খির বলে ওঠে নয়নের তীরে।

শবর আঁছার ছায়া ছবি হয়ে বাসা
বীয়ে শরীরী-সম্ভার। দেশার চান্ডক
বুটী ছায়ায় জয় দেয় লুকু মায়ায়
: মায়াবী সম্ভার ভীড়ে নীরব হতাশা।

রাতের কবিতা শেষ করে দাঁও কবি
জ্যোতি সন্ধ্যাতা নামে রাতের আঁধারে
মায়ায় কুহরে জমে নৃত্যের তলানি
অতল ভিত্তিক। নিরে তুমি আঁকো ছবি।

স্বাময়িক প্রসাদ

কোন উচ্চবাচ্য স্তনা যায় নাই। আলোচ্য বোহিত জাতীয় মাহের
সংবাদটিরও এই ধরণের পরিণতি হওয়া বিচিত্র নয়।

—ଜାନକବାଜାର ମଝିକା ।

ईशा मठ

“কলিকাতা মুক্ত-বহির বিভাগের পুস্তক্য বিতরণ উৎসব উপলক্ষে গত রবিবার বাদরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর ডাঃ ত্রিদিপ্তা সেন বলিয়াছেন যে, এই বিভাগটির পরিচালনভার রাজ্য সরকারের গ্রহণ করা উচিত। বিভাগটির পরিচালক কমিটির চেয়ারম্যান কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এম পি মিত্র বলিয়াছেন যে, বিভাগটির পরিচালনে মাসিক প্রায় চার হাজার টাকা হিসাব-খাতি পড়িতেছে। রাজ্য সরকারের নিকট ইহার পরিচালনভার গ্রহণের জন্য আবেদনও করা হইয়াছে, তাঁহার নাকি বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার মতে সহরের উত্তরাংশে এই ধরনের আরও একটি বিভাগ খোলা উচিত। মুক্ত-বহির ও অন্ধদের জন্য কলিকাতায় কয়েকটি বে-সরকারী বিভাগ আছে, কিন্তু এই ধরনের বিভাগ, যাহা সাধারণ বিভাগের পরিচালন অপেক্ষা বহু ব্যয়, মনোযোগ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, তাহা বেসরকারী ভাবে পরিচালনের অন্তর্বিধা অনেক। নবরঙ্গপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীনে অন্ধদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। ‘অন্ধের আলোনিবেশন’ নামেও একটি বিভাগ আছে। বিভাগের ছাত্রদের তৈরী বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যের প্রদর্শনী প্রেতি বৎসরই ইয়া থাকে, সরকারী কর্তৃকই হউক কিংবা বে-সরকারী পরিচালনাই হউক, এই সকল বিভাগের সামগ্রিকভাবে আর্থিক সম্ভা সমাধান বাঞ্ছনীয়। কথায় বলে ‘বোবার শত্রু নাই’, অন্ধের ভ্রাতৃ দুঃখী নাই।’ কিন্তু ইহাদের জন্য ভাবিবার লোকও যে খুব বেশী নাই, ইচ্ছাও সত্য। অথচ সমাজের লোকের তাহাদের সম্পর্ক বিশেষ কর্তব্য আছে এক সে কর্তব্য। রাজ্য সরকার পূর্বে সম্পাদিত হওয়াই অধিক কল্যাণ ও স্বার্থকর। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইবেন, ইহাই আমার আশা করি।”

—इति ।

ବଡ଼ ହୁଏ

মৎস্যপ্রীতি

“মৎস্যপ্রিয় বাঙালীর নিকট মাছের যোগান বৃদ্ধি যে কোন সংবাদ আনন্দদায়ক। প্রকাশ যে, সাইপ্রাস দ্বীপে সার্পিনাস কার্পিও নামক বোহিত, কাতলা, মুগেল ইত্যাদি শ্রেণীর এক প্রকার মাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।” উহা ওজনে সাত হইতে সাড়ে সাত সেরের বেশী হয় না বটে, কিন্তু উগার একটা বিশেষত্ব এই যে, উহা স্রোতের জল ও বহু জলাশয়ে—উত্তর স্থানেই ডিম ছাড়ি এবং উহা হইতে বংশবৃদ্ধি ঘটয়া থাকে। অথচ এদেশের বোহিত, কাতলা, মুগেল ইত্যাদি মাছ নদীর জল ছাড়া বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না। প্রকাশ যে, এই মাছটি কয়েক বৎসর পূর্বে সাইপ্রাস হইতে চীন দেশে আনীত হয় এবং পরে জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে উহার প্রবর্তন হয়। ভারতে ভিন বৎসর পূর্বে উহা আনিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের উদ্বিগ্নাবৃত্ত মৎস্য-গবেষণা কোষে পরীক্ষা করা হয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীস্থিত মৎস্য-গবেষণাকোষেও উহার পরীক্ষা হইয়াছে এবং এই পরীক্ষার ন্যায় খুব সুফলও পাওয়া গিয়াছে। এই জাতীয় মাছ নাকি এক একবারে লক্ষাধিক ডিম ছাড়ি এবং উহার মধ্যে শতকরা ৬ ভাগ ডিম হইতে পোনা বাহির হয়। কল্যাণীতে পরীক্ষার ফলে নাকি এরূপও জানা গিয়াছে যে, কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি অনুসরণ করিলে এই মাছের ডিমের শতকরা ৮০ ভাগ হইতে পোনা পাওয়া বাইতে পারে। সংবাদটি বিশেষ উৎসাহজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গে পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, নদী ইত্যাদিতে যদি এই মাছের চাষ হয় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের মাছের অভাব বহুলাংশে দূরীভূত হইতে পারে। তবে এই বিষয়ে বতদিন পর্যন্ত উপযুক্ত বিলিগবস্থা না হয়, ততদিন পর্যন্ত কোন আশা ভরসা করিবার তেজু নাই। কিছুদিন পূর্বে এরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আফ্রিকার টিলাপিয়া নামক কই মাছ জাতীয় এক প্রকার মাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভারতে বাহার চাষ হইতে পারে। এই শ্রেণীর মাছের এক একটি নাকি ওজনে এক হইতে দেড় সের হইয়া থাকে এবং কোন জলাশয়ে হই একটি মাছ ছাড়িলে বৎসর সময়ের মধ্যে উহা হইতে নাকি সহস্র সহস্র মাছ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে পরবর্তীকাল আর

“দক্ষিণ-পশ্চিম কলিকাতা লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কমিউনিষ্ট প্রার্থীর বিপুল জয়লাভ সম্পর্কে লিখিত সম্বাদকীর প্রেক্ষে গত মঙ্গলবার কাংগ্রেসীদের যুগ্মণ্ড “জনসেবক” লিখিয়াছেন ‘যে অবস্থায় ভারতের উপর কমিউনিষ্ট চীনের আক্রমণ ঘটিলে এবং সারা দেশের মধ্যে একমাত্র কমিউনিষ্ট দলই সেই আক্রমণের বিরোধিতা করিতে অস্বীকার করিয়াছে সেই অবস্থায় কমিউনিষ্ট প্রার্থী নির্বাচনে জিতিয়াছে ইহা বড় লিডার্স বিজ্ঞান্য কসে না

বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে বলা চলে কমিউনিষ্ট প্রাণীকে নির্দোষে জিতাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম কলিকাতার ভোটপাড়া প্রকায়ত্তে স্বদেশের উপর বিশেষ আক্রমণ সমর্থন করিয়াছেন, অর্থাৎ সহযোগী 'জনসেবক' বড় দুঃখে স্বীকার করিতেছেন কমিউনিষ্টদের 'চীনের দালান ও দেশের শত্রু' বলিয়া তাহারা প্রাণপণে মত চীৎকারই 'করিয়াছেন সব ব্যর্থ হইয়াছে এবং জনসাধারণ কমিউনিষ্টদের বক্তব্যই বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাদের প্রকৃত দেশভক্ত বলিয়াই মনে করিয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, 'জনসেবক' আর শুধু কমিউনিষ্টদের 'দেশের শত্রু' ও 'বিদেশীর দালান' বলিতেছেন না, দক্ষিণ-পশ্চিম কলিকাতার নির্দোষসমুদায় ও জনসাধারণকে এ আখ্যায় ভূষিত করিতেছেন। ইহার জবাব সংগ্রহাই যিবেন।

—স্বাধীনতা।

যুব ও প্রতিকার

“বহরমপুর চাক মেডিকেল অফিসের বিলম্বারকে পাঁচ টাকা যুব গ্রহণের অপরাধে প্রেস্তারের সংবাদ এই সংখ্যার অন্তর পরিবেশিত হইয়াছে। সংবাদটি সাধারণ একটি যুব গ্রহণের সংবাদ হইলেও নানা কারণে অধিকতর গুরুত্ব দাবী করিতে পারে। কারণ অল্পবয়স্ক যুব গ্রহণ সরকারী কর্মচারীদের একটি প্রচলিত প্রথা। যে কোন সাধারণ মানুষ এ কথা বাস্তব সত্য বলিয়াই জানে যে, সরকারী অফিসে যুব না গিলে কোন কাজই উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। সং বিবেকবান কর্মচারী যে নাই, এ কথা বলিতে চাই না কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য। অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীই সুযোগ এবং সুবিধামত উৎকোচ গ্রহণে সংকোচেরও বিন্দুমাত্র কারণ ঘটে না। উৎকোচ গ্রহণের একমাত্র কারণ যে অভাবজাত তাহা নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অভাবের চাপে বিপর্যস্ত নিরবেতনের কর্মচারীরা উৎকোচ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তাহা না হইলে তাহাদের সংসার চলে না। এই শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে কেহ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দশ-বিশ হাজার টাকার মালিক হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। নিরবেতনমূলক কর্মচারীরা প্রাপের দ্বারা যুব গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহ মনে করবেন না যে, আমি কর্মচারীদের যুব গ্রহণের সমর্থন করিতেছি। আমি যুব গ্রহণ করিবার প্রথান একটি কারণ যুক্তিসহ উপস্থিত করিতেছি মাত্র। আমাদের সরকার নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের যে হারে বেতন দিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা বাঁচিয়া থাকা যায় না। বাঁচিয়া থাকিবার উপায় উদ্ভাবন মানুষেরই সভাবজাত। সং উপায়ে বাঁচিয়া থাকিতে না পারিলেই মানুষ অসং উপায় অবলম্বন করে সরকারী কর্মচারীরাও যখন মানুষ, তখন মানুষের বাহা অভাব তাহার বিক্ষেপে তাহারা হাইতে পারেন না। সরকারের কর্তব্য, যে প্রতিষ্ঠানের তাহারা মালিক, সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বাঁচিবার মত ন্যূনতম বেতন প্রদান করা।

—জনমত (বহরমপুর)।

কৃষিভিত্তিক পরিকল্পনা

“ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার কাজ আর সমাপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরায় ও উত্তরবঙ্গের কাজের কোল কোল অংশ

তৃতীয় পরিকল্পনার গ্রহণ করা হইবে তাহাও আশা করা যায় যোগাযোগ দ্বারা হইয়াছে। গত দুইটি পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তৃতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরিহার করা হইবে ইহা নিশ্চয়ই আশা করা হাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে থাকায় ত্রিপুরা তাহার আর অপেক্ষা বহুগুণে বেশী অর্থ প্রতি বৎসর ব্যয়িত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অবস্থা এমন লাভাইয়াছে যে ত্রিপুরার বাজেটে কেবল খরচের প্রতিই নজর রাখা হইতেছে, যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তাহার বেশীর ভাগ অংশই কেন্দ্রীয় সরকারের দান ধরারভিত্তি হইয়াছে হইতেই আসিতেছে। দুই দুইটি পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে কিন্তু ত্রিপুরার আরের দিকটা সেই পূর্বের জায়গাতেই দ্বিগুণ হইয়া রহিয়াছে বরঞ্চ কোন ক্ষেত্রে মাল নির্দেশক পারা নিরাভিযুগী। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, আদ্য ত্রিপুরা সর্ব ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী। লক্ষ লক্ষ লোকের আগমন হইয়াছে কিন্তু চারোপাশেই জমির উন্নতি সাধন হয় নাই। লোক সংখ্যাশূন্য হইয়াছে বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। প্রতি বৎসর হাজার হাজার টন খাদ্য বাহির হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। এমন অবস্থায় আর কতকাল ত্রিপুরার অর্থনৈতিক কাঠামো কেন্দ্রীয় সরকারের অল্প অর্থব্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া টিকিয়া থাকিবে? একটা অস্বাভাবিক কৃত্রিম উপায়ে আর কতকাল একটা অক্ষমকে কাঁপাইয়া রাখা হইবে?” —গণবাদ (আগরতলা)

হাসপাতাল প্রসঙ্গে

“বিজ্ঞানের কল্যাণে এই বিশ শতাব্দীতে মানুষের জীবনের বিভিন্ন শাখায় যে অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে চিকিৎসা ও অর্ন্তজ্ঞান তাহারই অন্ততম। পূর্বে রোগ মহামারীর এক শ্রেণীভেদ ও বৈচিত্র্যও ছিল না আর ছিল না প্রকৃতিক পরাজিত করিবার এই অদম্য শক্তি, বাহার ফলে মানুষ আজ আর জীবন-মরণের সহস্তর গ্রহিমোচনের সন্নিকটবর্তী হইতে সক্ষম হইয়াছে। জনকল্যাণক্রমী রাষ্ট্রে নাগরিকের স্বাস্থ্য বিধান ও রোগশয্যার গুণোন্নতির ব্যবস্থা যথাসম্ভব সরকার করিয়া থাকেন। এই পশ্চিমবঙ্গেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু বর্তমান বিজয়চাঁদ হাসপাতাল বাহা জেলা হাসপাতাল বলিয়া পরিগণিত, তাহার সর্ববিভাগে যে পরিমাণ অপচয় ও ভুলীকৃত বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে তাহাতে ইহাকে আর হাসপাতাল পর্যায়ভুক্ত করিতে দিবা হয়। আপাদী নভের মনে ইহার প্রতিষ্ঠার ৫০ বৎসর পূর্ণ হইবে। বিগত ৫০ বৎসরের ইতিহাসে ইহার বিশেষ উন্নতি তো হইয়া নাই পরন্তু দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার ভারাক্রান্ত হইয়া ইহা ক্রমবর্ধমান পথে চলিয়া গড়িতেছে।

—বর্ধমান।

ভাবার প্রেমে কংগ্রেস

“সৌহার্দ্যে অল্পপ্রতি প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভার অসমীয়ায় অবিলম্বে আগামের সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করার জন্য রাজ্যসরকারের নিকট সুপারিশ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসে কাছাড়ের প্রতিনিধিগণ একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ জনাইয়াছেন। ভাবার প্রেমে লইয়া অদম্য ইতিপূর্বে কয়েকবারই আলোচনা করিয়াছি। এই ব্যাপারে কাছাড়ের জনমত সুস্পষ্ট

রূপেই অভিযুক্ত হইয়াছে। কাশ্মীরী দুই মনোভাবের কথা জানিয়াও আসাম উপত্যকার কয়েকগুণ কাছাড়ও ক্রমে ক্রমে অসমীয়া ভাষা প্রবর্তন করিবার যে সুপারিশ করিয়াছেন ইহার কলে ইচ্ছা করিয়াই কখনো একটা অবান্তর অবস্থার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। পুনর্গঠন কমিশন আসামের ভাষা সম্বন্ধে লইয়া বিস্তারিত আলোচনাই করিয়াছিলেন। অসমীয়া ভাষা এই প্রদেশে অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা নহে—তৎসত্ত্বেও সংখ্যালঘু এই ভাষাকে অনিচ্ছক ভিন্ন ভাষাভাষীদের উপর জোর করা চাপাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই প্রদেশে সরকারী পৰ্যায় যে সমস্ত চলাকী চলিয়াছে তাহা রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের এড়ার নাই। অতি সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমন্ত শ্রীমন্ত নরেন্দ্র মোদী ভাষাকে লইয়া বাড়ীবাড়ি না করিবার যে সাবধানবাণী পৌঁছাওঁতে উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহাও অব্যর্থপাত করাও অসমীয়া বহুগুণ প্রয়োজন বোধ করেন না। স্বাধীন প্রকাশ, অসমীয়াকে সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে সত্তাই বিধান সভায় 'সরকারী ভাষা বিল' প্রস্তাবিত করা হইবে। পার্শ্বতা অঞ্চলের এবং কাছাড়ের অনিচ্ছাপূর্ণ সমবেত বাধানানের পরেও হয়ত বিলটি পাশ হইয়াই যাবে। ভারতীয় সংবিধানের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিলে আশংক্য একটি বহু ভাষাভাষী রাজ্যেই পরিণত করিতে হইবে। সমস্ত ভাষাভাষীদের এই মৌলিক অধিকারকে অসমীয়া বহুগুণ প্রবর্তন করিতে পারিবেন না। ভাষার প্রায় সম্পর্কে কাছাড়ের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট কাছাড়বাসীদের পক্ষ হইতে আবেদন দাখিল করার জন্য কাছাড়ের জনসাধারণ এখনই প্রস্তুত হইবেন বলিয়া আসাম বিশ্বাস রাখে। আসাম উপত্যকার স্বাসকারী বঙ্গভাষাভাষীগণও এই ব্যাপারে চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। সম্ভাব্য-সম্প্রতিগণের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এই উপায়ে শাসনাত্মিক বিধান অমুখ্যায়ী তাঁহাদের যে মৌলিক অধিকার হারাতে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহারাও তৎপর হইবেন—আমরা ইহাও আশা করিতেছি।

—জনশক্তি (শিলচর)।

ইহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মস্থানের ব্যাপারে থানাটিকে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। অরুণাচল, বাজিতপু, কাশ্মীরগর ও মহেশাইল—এই চারটি ইউনিয়নের জন্য একটি ব্রহ্ম এবং হুয়পু, আহিরণ, হিলোড়া ও বহুতালি এই চারটি ইউনিয়নের জন্য আর একটি ব্রহ্ম। প্রথমোক্ত চারটি ইউনিয়নের ব্রহ্ম অফিস অরুণাচলে স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু শেষোক্ত চারটি ইউনিয়নের ব্রহ্ম অফিস কোন ইউনিয়নে স্থাপিত হইবে ইহা নাকি এখনও শাংকাপকি লক্ষ্য হইয়া নাই। শুনা বাইতেছে সরকারী ভাবে আহিরণ ইউনিয়নের অজগরপাড়া গ্রামে দ্বিতীয় ব্রহ্ম অফিস স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে নাকি প্রান্তবর্তী হিলোড়া ও বহুতালি ইউনিয়নের অধিবাসীরা সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাদের বক্তব্য দ্বিতীয় ব্রহ্ম অফিসটি হিলোড়া ইউনিয়নে স্থাপিত হওয়াই সুবিধাজনক। ইহাতে হিলোড়া ও বহুতালি এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চল দুইটি অধিকতর উপকৃত হইবে। অপর পক্ষে লোকসংখ্যা বিচারে আহিরণ ও হুয়পু ইউনিয়নের লোকসংখ্যা হিলোড়া ও বহুতালি ইউনিয়নের লোকসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ এবং প্রস্তাবিত অজগরপাড়া গ্রামটি প্রান্তবর্তী হুয়পু ও বহুতালি ইউনিয়নের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং এছাড়া হিলোড়া ও বহুতালি ইউনিয়ন দুইটিতে ইতিপূর্বেই দুইটি স্বাধীনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে অথচ জনবহুল হুয়পু ও আহিরণ ইউনিয়নে আজ পর্যন্ত একটি স্বাধীনকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই এমিক দিয়া চিন্তা করিলে ব্রহ্ম স্থাপনের ব্যাপারে এই প্রায়ের দাবী একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও শুনা বাইতেছে যে বহুতালি হইতে অজগরপাড়া পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং জাতীয় সড়ক হইতে হিলোড়া পর্যন্ত অপর আর একটি সড়ক নির্মাণেরও দাবী উঠিয়াছে। এই সড়ক দুইটি নির্মিত হইলে এই দিককার ইউনিয়নগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা অনেকটা দূরীভূত হইবে এবং এই কারণে ব্রহ্মটি বৈশােনেই স্থাপিত হউক না কেন, পারম্পরিক বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না।

—ভারতী (বহুনাথগঞ্জ)।

সুদূর ব্রহ্ম

পশ্চিম বাংলার একমাত্র দূরীত থানাতেই বোধ হয় সরকার দুইটি উন্নয়ন ব্রহ্ম স্থাপন মন্ত্রণ করিতেছেন। ইহার অবশ্য বৃষ্টি কারণ আছে। এই থানা আটটি ইউনিয়ন লইয়া গঠিত। বর্ধমান জেলা ইহার বিল অঞ্চলে জল জমিয়া। বিরাট 'পাখার' স্রোত হইয়া থানার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থা বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন চারি মাসকাল স্থায়ী হয়। এই সব দিক চিন্তা করিয়াই হয়ত অজ্ঞাত থানার একটি ব্রহ্ম স্থাপিত হইলেও এই থানা দুইটি ব্রহ্ম স্থাপনের সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। ভৌগোলিক কাল সরকারের এ সিদ্ধান্ত খুবই সঙ্গত

শোক-সুখ

বিভূতিভূষণ ভট্ট

অশ্রীণ কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ ভট্ট গত ১২ই চৈত্র ৭৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙালির বয়সী সাহিত্যিক স্বর্গীয় নিকশমা দেবী এর স্ত্রী। বাল্যকাল থেকেই ইনি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘদিনের সাহিত্যসাধনার বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্টির ক্ষেত্রে বৃষ্টি লাভ্য করেন। এর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় ভাগলপুরে এবং সেখানে শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রহ্মনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরীকুমার বসুগোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহচর্য ও সাহিত্যে এর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৩৬ নং বিশিষ্টবাহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 'বহুবলী মোটারী বেসিনে' প্রচারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পত্রিকা সমালোচনা

মাসিক বহুমতীর আধুনিক সন্ধ্যায় জীবন্ত প্রবোধচক্র কর
বহুমতীর আমার লিখিত এবং ভাঙ্গ মাসের মাসিক বহুমতীতে
প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর মৌনবিক্রম' শীর্ষক প্রবন্ধটির সমালোচনা
করিয়াছেন। সমালোচনার সূত্রপাত দেখিয়া আনন্দিত
হইয়াছিলাম, বোধ হয় নতুন কোন তত্ত্ব এবং তথ্য অবগত
নাই। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। উপরন্তু জানিলাম,
প্রবন্ধ বাবু নিজের অজ্ঞতা ত প্রকাশ করিয়াছেনই, অকারণ
বিজ্ঞপ করিতে বাইরা নিজেকে ছোট করিয়াছেন। তিনি
লিখিয়াছেন, "বেটিকের মূর্তি কবে অপসারিত হইয়াছিল। কিংবা
খবরের কাগজে কবে অনেক আলোচনা হইয়াছিল, তাহা জানি না।
আমি অন্ততঃ ৩৫ বৎসর যাবৎ High Court এর main gate এ
High Court এর দিকে যুখ করিয়া ঐ প্রতিমূর্তিটি দেখিয়া
আসিতেছি; High Court এর main gate দিয়া যে High
Court এ প্রবেশ করে সে ঐ প্রতিমূর্তিটি দেখিতে পায়। Sensa-
tion ও Interest এর জন্য ঐরূপ ভুল সংহার দিলে কখন কখন
কাজ হয়, কিন্তু সর্বদা কাজ হয় না; বহু হাতশাপ্পদ হইতে হয়।
লর্ড উইলিয়াম বেটিকের মূর্তি যে অপসারিত হইয়াছে
ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আমি মফঃসলের অধিবাসী। এখানকার
পাঠাগারে এক মাসের বেশী কোন সংবাদপত্র রাখিবার প্রথা নাই, এ
জন্য সঠিক তারিখ দিতে পারিলাম না। তবে বহুদূর মনে আছে
দৈনিক বহুমতী, যুগান্তর এক আনন্দবাজার পত্রিকার বেটিকের
মূর্তি অপসারণ সব্বদে আপত্তি উঠিয়াছিল। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল
ইংরাজ শাসক বা সেনাপতিগণের মূর্তি প্রকাশ স্থান হইতে অপসারণ
করা অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু উহা নির্বিকারে অপসারণ করা সম্ভব
নহে। বেটিক, বিশপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের শাসকগণের মূর্তি
সব্বদে ভিন্নভর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অঙ্গুরোধই উক্ত সংবাদপত্র
সমূহ করিয়াছিলেন। বাহা হউক, দৈনিক পত্রিকাগুলি না থাকায়
অপরূপের সঠিক তারিখ প্রাপ্তি দিতে পারিতেছি না। তবে
সাপ্তাহিক "লেন" পত্রিকার ১৫ ভাগ (১৩৬৬) সংখ্যার ৩৭৩
পৃষ্ঠার প্রতি প্রবোধবাবুর মূর্তি আকর্ষণ করিতেছি। উহাতে
বেটিকের অপসারিত মূর্তির প্রতিমূর্তি বা কটো দেওয়া আছে এবং
কটোর নীচে লিখিত আছে লর্ড উইলিয়াম বেটিকের অপসারিত মূর্তি।
পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সঙ্গর উদ্বোধন হইতে ৭ হাজার টাকা ব্যয়ে
সম্প্রতি মূর্তিটিকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বহুদূর মনে আছে

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এই মূর্তি রক্ষিত হইয়াছে। আমি
মফঃসলের লোক। কাহাকেও High Court দেখানর সৌভাগ্য
আমার হয় নাই। প্রবোধবাবু যখন অন্ততঃ ৩৫ বৎসর যাবৎ
High Court দেখিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহার জানা উচিত
ছিল High Court এর main gate এ High Court এর
দিকে যুখ করিয়া যে প্রতিমূর্তিটি আছে তাহা লর্ড উইলিয়াম বেটিকের
নহে, North brook এর। ভ্রমসা কবি ভবিষ্যতে নিজে ভুল
করিয়া না দেখিয়া তিনি অন্ততঃ High Court দেখাইবার চেষ্টা
করিবেন না। ইতি—বিনীত শ্রীনিধিচন্দ্র চৌধুরী, মালদহ।

নিবেদন,

মাসিক বহুমতীর সঙ্গে পরিচয় জেলেবেলা থেকেই তবে তার
বর্তমান রূপের সঙ্গে তদানীন্তন রূপের তফাৎ অনেকখানি।
মাসিক বহুমতী বর্তমানে বহু পড়ছি সত্যি বলছি যে চমৎকার
দেখে ক্রমেই বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে পড়ছি। মাসিক বহুমতী
আপনার সুযোগ্য সম্পাদনার যেভাবে স্বাধীন সমুদ্রের দিকে আগ্রহ
হচ্ছে তার তুলনা মেলা ভার, আপনার এই অতুলনীয় কীর্তি
ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করবে। ভবিষ্যৎ যুগে সাময়িকপত্রের
ইতিহাসে মাসিক বহুমতীর নাম স্বর্গাকরে লেখা থাকবে। সেই
সঙ্গে থাকবে আরও একজনের নাম, যিনি তাকে এতখানি
সমৃদ্ধিশালী করে তুলছেন। মাসিক বহুমতীর মধ্যে দিয়ে আপনি
যে বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন তা তাবল বিষয়্যভিজ্ঞ হইতে হয়।
এতে আপনার রসপিপাসু মনেরই পরিচয় মেলে। জাতীয় জীবনে
মাসিক বহুমতীর প্রভাব আল অনতিক্রম্য, মাসিক বহুমতীকে শুধু
সাময়িক পত্রের পর্যায়ে ফেললে তার প্রতি অবিচার করা হয়,
মাসিক বহুমতী এমন একটি পত্রিকা খার মধ্যে মানুষ নিজেকে
খুঁজে পায় তার মনের ভাব, ভাষা, চিন্তা ধারণা সব কিছুই তাহা
দেখতে পায় মাসিক বহুমতীতে। আপনার সুযোগ্য সম্পাদনার
মাসিক বহুমতী আজ মানবচরিত্রের ধারণা পরিণত হতে পেরেছে।
নতুন যে লেখাগুলি আরম্ভ করেছেন তার মধ্যে হবিবুল্লাহ
মেশিন ভাল লাগল। লেখককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার
সমালোচনাদি যথেষ্ট মজ্জিত ও কটুপূর্ণ এবং বোধাৎ
ঠাকুরের পবিত্র আশীর্বাদপুত্র আপনার প্রতিষ্ঠান, মাসিক
বহুমতী আল সাহা ভারতের শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা, ঠাকুরের
আশীর্বাদে এর গুরুত্ব বর্ধিত ও বৈশিষ্ট্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক
কামনা করি। —কুতলা সেন, কালীঘাট (উত্তরপ্রদেশ)

গ্রাহক-গ্রাহিক হইতে চাই

মাসিক বহুমতীর বার্ষিক টাকা ৭'৫০ টাকা পাঠাইলাম।
অনুগ্রহপূর্বক নিম্নমিত মাসিক বহুমতী বাবিত করিবেন।—
শ্রীমতী নীহারিকা বসু, গোহাটি।

এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১ টাকাইলাম। আমাকে গ্রাহিকা
শ্রেণীভুক্ত করিয়া বাবিত করিবেন।—শ্রীমতী রায়, খানবান।

১৩৬৭ সালের মাসিক বর্ষ বাবিত মূল্য ১৫ টাকা
পাঠাইলাম।—শ্রীমতী দেবী, জা

আমাদের মাসিক বহুমতীর জন্য ১৩৬ হইতে আশ্বিন ১৩৭
পর্যন্ত ৮ মাসের টাকা বাবদ ১ টাকা পাঠাইলাম। নিম্নমিত পত্রিকা
পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।—শ্রীমতী মণ্ডল, মেদিনীপুর।

আমি মাসিক বহুমতী পত্র গ্রাহক হইবার জন্য ১২২ টাকা
পাঠাইলাম। বৈশাখ মাস হইতে নিম্নমিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাবিত
করিবেন।—শ্রীমতী ভট্টাচার্য, শিলাংগ।

আমাকে আগের মাসিক বহুমতী পত্রিকার গ্রাহিকা করিবার
জন্য ১৫ টাকা পাঠাইলাম। ৮ মাসে নিম্নমিত পত্রিকা পাঠাইয়া
বাবিত করিবেন।—শ্রীমতী দেবী, মজঃফরপুর।

Remitting Rs. 15/- for my annual subscrip-
tion of Masik Basumat. Please send the magazine
regularly.—Sm. Nirupa Das, Assam.

অন্ত ৭'৫০ টাকা পাঠাইলাম গত কার্তিক সংখ্যা হইতে পত্রিকা
পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।—শ্রীমতী মণ্ডল, পুর্বা।

Remitting Rs. 7-50 for six months subscrip-
tion of the Monthly Basumat.—Sm. Mira
Das (Mitra), Shibsagar, Assam.

বৈশাখ মাস হইতে আমি বহুমতী পাঠাইবার জন্য ১৫
টাকা পাঠাইলাম। গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।—শ্রীমতী
ভট্টাচার্য, কানপুর।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত মাসিক বহুমতীর
বার্ষিক টাকা ৭'৫০ টাকা পাঠাইলাম। নিম্নমিত পত্রিকা
পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।—শ্রীমতী দাশগুপ্তা, বারপুর
(এম, পি,)

মাসিক বহুমতীর বার্ষিক টাকা ১৫ টাকা পাঠাইলাম।
—শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়, হাজারিবাগ।

মাসিক বহুমতীর বর্তমান বর্ষের বার্ষিক টাকা ১৫ ও গত
বৎসরের বাবদ ১ মোট ১৬ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী মিত্র,
জলপুর।

Sending subscription for the year 1367 B.S.
Kindly send Monthly Basumat regularly.—Mrs.
Nirupama Majumder, Santoshpur, Cal-32.

Remitting Rs. 15/- in payment of subscription
for the year 1367 B.S.—Sm. Malina Mookerjee,
Jalpaiguri.

১৩৬৭ সালের মাসিক বহুমতীর জন্য অগ্রিম টাকা বাবদ ১৫
টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী ভট্টাচার্য, নিউদিল্লী।

বৈশাখ হইতে চৈত্র (১৩৬৭) পর্যন্ত এক বৎসরের মাসিক
বহুমতীর টাকা বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিও।
—শ্রীমতী দেবী, জালালাবাদ।

Remitting herewith Rs. 7-50 np. being the
half-yearly subscription of the Monthly Basumat.
—Sm. Radharani Mitter, Calcutta-37.

মাসিক বহুমতীর ১৩৬৭ সালের টাকা বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম।
—শ্রীমতী বসু রায়, উড়িষ্যা।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে আমাকে গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত
করিয়া লইবেন। টাকা ৭'৫০ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সেন,
বীরভূম।

১৩৬৭ সালের টাকা বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম। নিম্নমিত মাসিক
বহুমতী পাঠাইবেন।—শ্রীমতী ঘোষ, কটক।

আমার মাসিক বহুমতীর টাকা বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত
টাকা ৭'৫০ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সেন, কানপুর।

১৩৬৬ সালের মাস সংখ্যা হইতে ১৩৬৭ সালের আশ্বিন পর্যন্ত
টাকা বাবদ টাকা ৭'৫০ টাকা পাঠাইলাম। অন্তর্হত থাকায় জন্য
সময়মত টাকা পাঠাইতে পারি নাই।—শ্রীমতী দেবী, বর্ধমান।

শুভ-দিনে মাসিক বহুমতী উপহার দিন

এই অমিয়দিনে দিনে জাতীয়-বন্ধন বন্ধ-বান্ধবীর কাছে
সামাজিকতা রক্ষা করা যে এক দুর্দ্বার বোকা বহনের সামিল
হয়ে থাকিয়াছে। অথচ হৃদয়ের সঙ্গে মাতৃবির মৈত্রী, প্রেম, ঐতিহ্য,
যে আর ভক্তি সম্পর্ক আর না থাকিলে চলে না। কারণ
উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারণ শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-
বাধিকার, নয়তো কারণ কোন কৃতকার্যতার, আপনি 'মাসিক
বহুমতী' উপহার দিতে পছন্দ নাহি সন্দেহ। একবার যদি
উপহার দিনে সারা বছর ধরে তার প্রতি বহন করতে পারে একমাত্র

মাসিক বহুমতী। এই উপহারের জন্য সর্বত্র আবেগের ব্যবস্থা
হবে। আপনি শুধু নাম টিকানো টাকা পাঠিয়েই ভাল।
প্রাপ্ত টিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের।
আমাদের পাঠক-পাঠিকা যেন যাঁর যখন, সন্তোষিত বেশ করে
শুভ এই বহনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এক এখনও
করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে।
এই বিষয়ে যেকোন জ্ঞাতব্যের জন্য লিখুন—প্রচার বিভাগ,
মাসিক বহুমতী। কলিকাতা।

মোহন গিরিজ

(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন ও রমা (৪) রমার বিয়ে (৫) আবার মোহন (৬) রমাহারা মোহন (৭) নাসরিক মোহন (৮) মোহনের কাশ্মীর অভিজ্ঞান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) বাবদারী মোহন ইত্যাদি।

মুদ্রণ প্রকাশিত

(২০৫) আবার মোহন-চপলা

(২০৬) মোহন-চপলা সংবাত

প্রতি খণ্ড ২।

শ্রীমোহনমোহন রায়ের কয়েকখানি বিখ্যাত রহস্যপটাস। প্রত্যেকটি ২।০

চৌনের নব-নায়ক
শ্রীলৈর হীরার হল
মুণ্ডার দাওয়াই
সুদৃশ্য-সংগ্রাম
সাংঘাতিক উইল
আর্সেনিয়ামের মর্ষণভেদ
ভীষণ বিভৌষিকা
নরপশু ও নাতালী
বিসর্জননের পর
বিজলির বলক

শ্রীবিমলপ্রতিভা দেবীর উপস্থাপন

নতুন দিনের আলা

বাংলাদেশ আদেশ প্রত্যাহৃত। ৩।

শ্রীশৈলেশ বিশী বি-এল রচিত

শরৎচন্দ্রের জীবন উপন্যাস

শরৎচন্দ্রের জীবন ছাড়িয়ে রয়েছে তারই স্টে চরিত্রগুলির মধ্যে। কোন্ চরিত্র লুপন কিং করে শরৎচন্দ্রের জীবনে এসে দেখা দিয়েছিল। তা জানতে পারবেন এই গ্রন্থ পাঠ করলেই। ২।০

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন

জীবন, অজ্ঞান, কল্যাণ, অজ্ঞান, বিপ্লবী প্রভৃতি চরিত্রগুলির মূল কোথায়? বিপ্লবী প্রভৃতি বিজ্ঞানিত গ্রন্থ—রাজলক্ষ্মী, পিটারী আইজি কি তাঁর জীবনের মূলধারা? সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন এই গ্রন্থে। মূল্য ২।

শ্রীমোহনমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত বঙ্গভূমিতে এক অভিনব কৃষ্টি!

দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ

বিষয়গ্রেসে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-পরিভ্রমণ এবং বীনা দেশ, জাতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই সভ্যসঙ্গঠী মহামানবের মন্তব্য। তার এই ভবিষ্যৎ বাণী আজ কিরণ সার্থক হতে চলেছে—তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাবেন। ডাঃ হুনীভকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য ২।

শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য

শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক সাহিত্য-সাধনা হতে সংগৃহীত করে শরৎচন্দ্রের রহস্যময় জীবনের বহু অপ্রকাশিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ২।০

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নবতম

এপার ওপার

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয়রত্ন গোস্বামী, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির প্রত্যেক অভিজ্ঞতা ও বহু অলৌকিক ঘটনা পড়ুন। ২'২৫

মরণের পর

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়, কেমন থাকে, তার চিন্তাবৃত্তির কোন পরিবর্তন হয় কিনা—খিনার্ভা থিয়েটারের স্বর্গীয় গির্জাশ্রম ও দেবকান্ত বাগচীর সম্মুখে ব্রহ্মদেবতা—মহারাজা নন্দকুমারের পৌত্র কতক সঙ্গীতে অপূর্ব মর-সংযোজন, নিশীথ রায়ের স্বর্গীয় বক্রিমচন্দ্রের মন্মথী তত্ত্বাবধী ছায়ামূর্তি ধরবার কথা চেষ্টা, মহাশি বিজয়রত্নের সম্মুখে মনোব্রজ গুহর অপূর্ব অভিজ্ঞতা, প্রভৃতি পড়ুন। মূল্য ২'২৫।

ওপারের আলা

পরলোক সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ও তত্ত্বীয় ভ্রাম্যগতের বিশিষ্ট প্রচারক ও মিডিয়াম কর্তৃক শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সংঘটিত বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ পড়ুন। মূল্য ২'২৫

অঘটন যা দেখেছি

লেখকের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। এই সব অলৌকিক কাহিনী পড়তে পড়তে আপনি বিষয়ে অভিভূত হবেন। মূল্য ২'২৫

ফরাসী শ্রেষ্ঠ গল্প মূল্য ২।

জার্মানীর শ্রেষ্ঠ গল্প মূল্য ১।০

ইংরাজী শ্রেষ্ঠ গল্প মূল্য ১।০

ইটালীয় শ্রেষ্ঠ গল্প মূল্য ১।০

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গল্প মূল্য ১।০

রুশ-মুন্দের শ্রেষ্ঠ গল্প মূল্য ১।০

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প মূল্য ১।০

বালজাকের শ্রেষ্ঠ গল্প মূল্য ১।০

আমর জীবন

জীবন অবিনশ্বর, দেহান্তরের পরও যে তার অস্তিত্ব থাকে তার প্রত্যেক প্রমাণ স্বরূপ রোমাঞ্চকর ১০টি কাহিনী বিবৃত করেছেন বশবী কথামণি। সঙ্গ প্রকাশিত। মূল্য ২'২৫

আলোকিকা

মাছুবে মূল-স্বকৃতে যার-ব্যাঘা চলে না এমন সব বৈচিত্র্যময় চমকপ্রদ সভ্য কাহিনী। ২।০

ওপার থেকে আসেন

জড়জগতে এসে আত্মিকদের বিচিত্র সব কার্যকলাপ—দেহী ও বিদেশী বহু দুর্ভাগ্য ভায়া অজ্ঞাত ভাগ্যে বহু তথ্য উদ্ঘাটিত। মূল্য ২'২৫

মৃত্যু-হীন প্রাণ

এই দেহাকান্দেই যে মানুষের সব শেষ হয় না, তার পরেও যে জড়-জগতের সঙ্গে তাদের বোণাবোণ কত ক্ষুদ্র উপায়ে হয়ে থাকে, তার বহু বিচিত্র আখ্যান পড়ুন। মূল্য ২'২৫

ভূতে পাওয়ার কাহিনী

দেশী প্রথার ভয় মন্ত্র দ্বারা ভূত তাড়ানার অদ্ভুত সব কাহিনী ছাড়াও বিলাতে বিজ্ঞানীরা তাদের তাড়াবার বিধিবদ্ধ কতখানি সার্থক করেছেন তারও বহু বিচিত্র কাহিনী পড়ুন। মূল্য ২।০

পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

পরলোকের গল্প

গল্পগুলি সভ্য হলেও রোমাঞ্চকর ও অপূর্ব রহস্যময়। গ্রন্থের বাঙালার বহু বিখ্যাত লোকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা জানতে পারবেন। প্রত্যেকটি ২।০

রবীন্দ্র-স্মৃতি ৩।০

শেষ পর্য্যন্ত ৩।০

জা-ভাগ্যে ২। কাঁচা ও পাকা ৩।

সবগুলিই নতুন মরণের কমেডি উপস্থাপন

বশবী নাট্যকার শরীফ সেনগুপ্ত

মরণ-মহল (রহস্যপটাস) ২।

সাধারণ পাঠকেরা অনুগ্রহ দশ টাকার বই একসঙ্গে নিলে ডাক-ব্যয় লাগবে না।

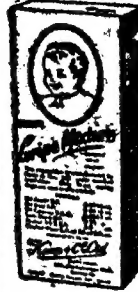
শিশির পাবলিশিং হাউস—২৭।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা—৬

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

গৃহস্থের নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধ



রিংকনোল মলম
এটি সেই আসল মলম যা
লাগালে দাঁদ, চুলকানি, ফোড়া,
কুসুড়ি ও অন্যান্য চর্মরোগ
অবিকমে আরাম হয়।

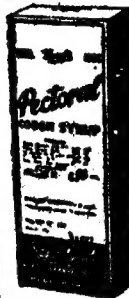


**পাইনপ
মিক্চার**
পেটের গোল-
মালে ইহা
আণ্ডকলপ্রদ।
বিশেষ ভাবে
ক্রমিক অংশে বিভক্ত বোতল
খালি হইলে শিশুর খিড়ার
স্বল্পে ভালভাবে ব্যবহৃত হয়।



**মিক্
অফ
ম্যাগনেসিয়া**

আদর্শ অন্ত্রনাশক ও মুত্র বিরেচক
বাদহীন, মনোরম ও নিরাপদ
ঔষধ। বটীকাকারেও গ্রাহ্য।



**পেক্টোরাল
কাশ
নিরূপ**

কাশি সদি,
হাঁপানী বরভঙ্গ প্রকৃতি রোগে
আণ্ডকলপ্রদ ঔষ। হাতের
কাছে এক বোতল রাখুন।

কম্প এণ্ড ^{করা} সন্থালিঃ

বোম্বাই - মাদাজ
কলিকাতা - দিল্লী

